সূচীপত্র

বৈশাখ—আশ্বিন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

অনাথবন্ধু দত্ত
— মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি … ৭৯
অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
—আশা নাই : আছে ক্ষোভ (কবিতা) … ৫১৯
—তুমি কেন এসেছিলে কবিতার সম (ঐ) … ৩৬৮
অবিনাশচন্দ্র বসু
—প্রবাসী বাঙালীর কয়েকটি সমস্যা … ৫৪২
অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী
—বঙ্গ ও আসামের দ্রাবিড় জাতি … ৪২৫
অমরকুমার দত্ত
—মৃত্যু ও জীবন (কবিতা) … ২৬৭
অমলেন্দু দত্ত
—তুমি (কবিতা) … ৪৫৭
অমলেন্দু সেন
—আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক … ১৭৯
অমিতাকুমারী বসু
—নওচণ্ডী বা নবচণ্ডী … ৩৬৯
অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
—যামিনীকান্ত সেন … ৪৬৮
আশরাফ হোসেন
—আরবী-হরফে বাংলা লিখন … ৫৬৪
উপেন্দ্রনাথ সেন
—"হিন্দুস্থান" না "ভারতবর্ষ" … ১৬৮
কস্তুরচাঁদ লালওয়ানী
ভারতের জনসম্পদ … ৩৪৫
কালিদাস রায়
—কবির প্রতি (কবিতা) … ৪০৩
—দামোদর (ঐ) … ২৭২
— পুষ্পহীন তরু (ঐ) … ৫৩৩
রাতের লেখা (ঐ) … ১৪৯
কালীপদ ঘটক
—মাণিক (গল্প) … ৪০৪
কুঞ্জবিহারী পাল
—সৌরশক্তির উৎস … ৮২
কুমারলাল দাশগুপ্ত
—তিলকীর খোকা (গল্প) … ৫০৪
— রাজপুত্তুর (নাটিকা) … ২১৯
কুমুদরঞ্জন মল্লিক
—খেলাভঙ্গ (কবিতা) … ৪৬
—সোমনাথ মন্দির দর্শনে (ঐ) … ৪২৬
কুমুদশঙ্কর রায়
—যক্ষ্মা ও তার প্রতিকার … ১৭৭
শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী
—ধ্বনি-ধ্বংসে ধ্বনির জন্ম … ৩২
শ্রীগৌরমোহন দাস দে
—পেনাঙের কথা (সচিত্র) … ৬৪
শ্রীচিত্রিতা দেবী
—অস্তরাগের পথে (সচিত্র) ২২৪, ৩৩১
শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ
—বাসি ফুল (গল্প) … ৪৩১
শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ
—নিম্ন পশ্চিম বাংলার বারিপাত ও লবণ উৎপাদন … ১৫৪
শ্রীজীবনময় রায়
—পয়লা বৈশাখ ১৩৫৬ (কবিতা) … ২২৬
শ্রীতারাপদ দাশ
—প্রবাসী বাঙালীর শিক্ষা-সমস্যা … ১৭০
শ্রীতারাপদ রাহা
—'ডু য্যাজ ইউ লাইক্' (গল্প) … ২৬২
শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন
—আফ্রিকায় চীনাবাদামের চাষ (সচিত্র) … ৪২১
শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত
—আধুনিক (কবিতা) … ১৭৮
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
—রাঢ়দেশের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ … ১১৩
শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার
— চাকমা জাতির ধর্ম্মকাম … ৫২৮
—প্রাচীন বঙ্গে ধর্ম্মপূজা (সচিত্র) … ২৬০
শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য
—মাতৃভাষায় অনাস্থা … ১৪৬
শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় : সরোজিনী নাইডু
—সতী (কবিতা) … ৩৭১
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
—বাঘে মানুষে (গল্প) … ১১৮
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র
—কৃষি-শিক্ষা (সচিত্র) … ৩১৫
—ঝাড়গ্রাম কৃষি মহাবিদ্যালয় (ঐ) … ৫৩৮
—হরিণঘাটা … ১০৪
শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ
—পদ্মিনী (কবিতা) … ১৪৯
—ভালোবেসেছিনু (ঐ) … ৪৪৯
শ্রীননীমাধব চৌধুরী
— সাহিত্যের সমস্যা … ৪২৩
—সিন্ধুধর্ম্মে পুরুষ দেবতার উপাসনা … ৩০৫

শ্রীনন্দলাল বসু
—পত্র ... ২৭৪
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ... ৭৬
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র
—বাংলার লোকসংস্কৃতি—ব্রত ও উৎসব ... ৫৫৬
—রেঙ্গমা নাগা (সচিত্র) ... ১২৭
—লোটা নাগা (ঐ) ... ৪৪৯
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ
—শিক্ষা ও সাহিত্য ... ৪৯৯
শ্রীনীরদেন্দু সান্যাল
—বাংলা বর্ণমালা ও বাংলা টাইপ রাইটার ... ২৭০
শ্রীনীলরতন দাশ
—শ্রীঅরবিন্দ (কবিতা) ... ৪৫৭
—মুক্তিসাধক রামানন্দ-স্মরণে (ঐ) ... ১৪১
শ্রীনীলিমা সিংহ
—মেষ্টা পাট ... ৩৬৭
শ্রীপরিমল গোস্বামী
—পশ্চিম হিমালয়ের পথে (সচিত্র) ... ৫০৫
শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার
—চাঁদ-জাগা রাতে (কবিতা) ... ৩৪১
শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
—পতঙ্গ (উপন্যাস) ... ৫৪৫
—"মর্নিং গ্লোরী" (গল্প) ... ৩৩৮
শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
—আবিষ্কার (গল্প) ... ১৫০
বজলুর রশীদ, এ. এস. এম.
—মৃত্যু-বাসর (কবিতা) ... ৩২০
—শাহ্ আবদুল লতীফের কবিতা ... ৪৬৪
শ্রীবাসনা সেন
—প্রস্থানভেদ ... ৪৪৩
শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী
—আমার দিদিমা—নিস্তারিণী বসু ... ৫০১
শ্রীবিপ্ররাজ মিত্র
—চিত্রশিল্পী ইন্দ্র দুগার (সচিত্র) ... ৫৩০
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত
—প্রবাহ (উপন্যাস) ৪০, ১৬৬, ২৩৯, ৩২২
শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
—উচ্চশিক্ষার অবস্থা ... ৫১
শ্রীবিমলাচরণ দেব
—মানুষের জীবন ... ৪৯৭
—"লক্ষ্মী" (আলোচনা) ... ১৮১
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত
—ভাস্কর্য (কবিতা) ... ৩৯
শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়
—পরীক্ষা সংস্কার ... ৩৬৫
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
—বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্র ... ২১৮
—সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিলা ... ২৯
"ভাস্কর"
—শিক্ষার মর্য্যাদা (গল্প) ... ২৫

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়
—বাংলা লিপির সংস্কার (আলোচনা) ... ৩৭৩
শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
—পূর্ব্ব বাংলার ব্রতকথা (সচিত্র) ... ৩৪২
শ্রীমনকুমার সেন
—মৃত্যু-কর ... ৩৫৮
শ্রীমন্মথ রায়
—মসাঞ্জোর মনুমেণ্ট (সচিত্র) ... ১৩৪
শ্রীমহাদেব রায়
—জাগরী (কবিতা) ... ১৬৫
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভড়
"বীরভূমের জাতি-প্রসঙ্গ" (আলোচনা) ... ১৮২
শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত
—বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ... ৪০১
শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস
—ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-এলাহাবাদ অধিবেশন ... ১২৩
শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
—হরিণঘাটা ... ২৭৩
শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত
—কেরলের কঙ্কি (সচিত্র) ... ১৬১
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
—বেথুন বালিকা বিদ্যালয় (সচিত্র) ... ২৪৫
—স্বাধীন ভারত ও ছাত্রসমাজ ... ১৪২
—হিন্দু মেলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ (সচিত্র) ... ৬১
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি
—বাংলা ভাষার প্রসার চিন্তা ... ২০৯
—ভারতের বিচার্য ... ১৭
শ্রীরঞ্জনকুমার দত্ত
—কৃষি-উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কাজিরখিল গান্ধী-ক্যাম্প ... ৫৫১
শ্রীরঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়
—হিন্দু আমলে নারীর স্থান ... ৪২৯
শ্রীরাধিকারঞ্জন ঘোষাল
—বাঙালী ও মুষ্টিযুদ্ধ (সচিত্র) ... ৪৫৫
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়
—একলা (গল্প) ... ৩১২
—দুর্ঘটনা (ঐ) ... ৫১৫
—বিষ (ঐ) ... ৭০
শ্রীরেণু দাশগুপ্তা
—"প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" ... ১৫৬
শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়
—এই রাতে (কবিতা) ... ৫৫৯
শ্রীশান্তু মজুমদার
—"কালকাটা গ্রুপ" ও তার প্রদর্শনী (সচিত্র) ... ২৫১
শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
—জলদস্যুদের কথা ... ২৫৪
শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস
—বিপ্লবী (কবিতা) ... ১৮০
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
—আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ (কবিতা) ... ৬৪
—আষাঢ়ের বার্ত্তা (ঐ) ... ২৬৭
—তুলসীদাস (ঐ) ... ১৪৫
—বঙ্গভাষা (ঐ) ... ৫১৪

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ
—স্পেনের লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত (সচিত্র) ... ৬৬
শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী
—চট্টগ্রাম বিপ্লব-কাহিনী ৫৬, ২৩১, ৩৬০, ৪৫৮
শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
—বিরহী বাউল ... ৫২৫
শ্রীসমীর ঘোষ
—পদার্থের পরিবর্ত্তন ও অন্তর্গঠন ... ২৬৮
শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত
—মিস্টিক কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ ... ৩৫৫
শ্রীসারথিনাথ শেঠ
—বিশ্বের খাদ্যসঙ্কট (সচিত্র) ... ৪৩৭
শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
—বুদ্ধের অন্তরঙ্গ অন্তেবাসী আনন্দ ... ৪৭
শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়
—ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয় ... ৫২০
শ্রীসুধীর খাস্তগীর
—কলিকাতার শিল্প-প্রদর্শনী ... ১৬৬
শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী
—বাংলা লিপির সংস্কার ... ৪৭১
শ্রীসুন্দরীমোহন দাস
—পুলিনবিহারী দাস (সচিত্র) ... ৫৫৫
শ্রীসুবোধচন্দ্র কুণ্ডু
—"বীরভূমের জাতি-প্রসঙ্গ" (আলোচনা) ... ১৮২
শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
—প্রকৃতির লীলাভূমি সিকিম (সচিত্র) ... ৪১৭
শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়
—লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ ... ৩২১
শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত
—রবীন্দ্রকাব্যে নারী ... ৭০
শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী
—সন্তবাণী ... ১৬২
—হিন্দী ভাষার মুসলমান কবি ... ২৭৫
শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস
—ইউরোপীয় চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ... ৩২৮
—যুদ্ধোত্তর জার্ম্মান চিন্তাধারার একটি দিক ... ৫৬০

বিষয়-সূচী

অন্তরাগের পথে (সচিত্র)—শ্রীচিত্রিতা দেবী ২২৪, ৩৩১
আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ... ৬৫
আধুনিক (কবিতা)—শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত ... ১৭৮
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক—শ্রীঅমলেন্দু সেন ... ১০৯
আফ্রিকায় চীনাবাদামের চাষ (সচিত্র)—শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন ... ৪২১
আবিষ্কার (গল্প)—শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ... ১৫০
আমার দিদিমা: নিস্তারিণী বসু—শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী ... ৫০১
আরবী-হরফে বাংলা লিখন—মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন ... ৫৬৪
আলোচনা ১৮১, ৩৭৩, ৪৭১
আশা নাই: আছে ক্ষোভ (কবিতা)—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ... ৫১৯
আষাঢ়ের বার্ত্তা (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ... ২৬৭
ইউরোপীয় চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য—শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস ... ৩২৮
উচ্চশিক্ষার অবস্থা—শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ৫১
এই রাতে (কবিতা)—শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায় ... ৫৫৯
একলা (গল্প)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ... ৩১২
কবির প্রতি (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ... ৪০৩
কলিকাতার শিল্প-প্রদর্শনী—শ্রীসুধীর খাস্তগীর ... ১৬৬
কৃষি-উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কাজিরখিল গান্ধী-ক্যাম্প
—শ্রীরঞ্জনকুমার দত্ত ... ৩৫১
কৃষি-শিক্ষা (সচিত্র)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৩১৫
কেরলের কল্কি (সচিত্র)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত ... ১৬১
"ক্যালকাটা গ্রুপ" ও তার প্রদর্শনী (সচিত্র)
—শ্রীশান্তু মজুমদার ... ২৫১
খেলাভঙ্গ (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ৪৬
চট্টগ্রাম বিপ্লব-কাহিনী—শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী ৫৬, ২৩১, ৩৬১, ৪৫৮
চাঁদ-জাগা রাতে (কবিতা)—শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার ... ৩৪১
চাক্‌মা জাতির ধর্ম্মকাম—শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার ... ৫২৮
চিত্রশিল্পী ইন্দ্র দুগার (সচিত্র)—শ্রীবিপ্ররাজ মিত্র ... ৫৩০
জলদস্যুদের কথা—শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৫৬
জাগরী (কবিতা)—শ্রীমহাদেব রায় ... ১৬৫
ঝাড়গ্রাম কৃষি মহাবিদ্যালয় (সচিত্র)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৫৩৮
'ডু য়্যাজ ইউ লাইক্' (গল্প)—শ্রীতারাপদ রাহা ... ২৬২
তিলকীর খোকা (গল্প)—শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত ... ৫৩৪
তুমি (কবিতা)—শ্রীঅমলেন্দু দত্ত ... ৪৫৭
তুমি কেন এসেছিলে কবিতার সম (কবিতা)
—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ... ৩৬৮
তুলসীদাস (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ... ১৫৫
দামোদর (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ... ২৭২
দুর্ঘটনা (গল্প)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ... ৫১৫
দেশ-বিদেশের কথা (সচিত্র)— ৯৫, ১৯১, ২৮৭, ৩৮৪, ৪৮০, ৫৭৬
ধ্বনি-ধ্বংসে ধ্বনির জন্ম—শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী ... ৩২
নওচণ্ডী বা নবচণ্ডী—শ্রীঅমিতাকুমারী বসু ... ৩৬৯
নিম্ন পশ্চিম-বাংলার বারিপাত ও লবণ উৎপাদন
—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ ... ১৫৪
পতঙ্গ (উপন্যাস)—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ৫৪৫
পত্র—শ্রীনন্দলাল বসু ... ২৭৪
পদার্থের পরিবর্ত্তন ও অন্তর্গঠন—শ্রীসমীর ঘোষ ... ২৬৮
পদ্মিনী (কবিতা)—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ ... ১৪৯
পয়লা বৈশাখ ১৩১৬—শ্রীজীবনময় রায় ... ২২৩
পরীক্ষা সংস্কার—শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় ... ৩৬৫
পশ্চিম হিমালয়ের পথে (সচিত্র)—শ্রীপরিমল গোস্বামী ... ৫০৫
পুলিনবিহারী দাস (সচিত্র)—শ্রীসুন্দরীমোহন দাস ... ৫৫৫
পুষ্পহীন তরু (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ... ৫৩৩
পুস্তক-পরিচয় ৮৬, ১৮৪, ২৮০, ৩৭৮, ৪৭৪, ৫৬৯
পূর্ব্ববাংলার ব্রতকথা (সচিত্র)—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ... ৩৪২
পেনাঙের কথা (সচিত্র)—শ্রীগৌরমোহন দাস দে ... ৩৪

প্রকৃতির লীলাভূমি সিকিম (সচিত্র)
—শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ... ৪১৭
প্রথম আন্তর্জাতিক নারী শারীর শিক্ষা কংগ্রেস— ... ৪৬৬
প্রবাসী বাঙালীর কয়েকটি সমস্যা—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু ... ৫৪২
প্রবাসী বাঙালীর শিক্ষা-সমস্যা—শ্রীতারাপদ দাশ ... ১৭০
প্রবাহ (উপন্যাস)—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ৪০, ১৩৬, ২৩৯, ৩২২
প্রস্থানভেদ—শ্রীবাসনা সেন ... ৪৪৩
প্রাচীন বঙ্গে ধর্ম্মপূজা (সচিত্র)—শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার ... ২৬০
"প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—শ্রীরেণু দাশগুপ্তা ... ১২৬
বঙ্গ ও আসামের দ্রাবিড় জাতি—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী ... ৪২৫
বঙ্গভাষা (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ... ৫১৪
বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্র
—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২১৮
বাংলা বর্ণমালা ও বাংলা টাইপ-রাইটার
—শ্রীনীরদেন্দু সান্যাল ... ২৭০
বাংলা ভাষার প্রসার চিন্তা—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ... ২০৯
বাংলা লিপির সংস্কার—শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী ... ৪৭১
বাংলা লিপির সংস্কার (আলোচনা)—শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় ... ৩৭৩
বাংলার লোকসংস্কৃতি—ব্রত ও উৎসব
—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র ... ৫৫৬
বাঘে মানুষে (গল্প)—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ... ১১৮
বাঙালী ও মুষ্টিযুদ্ধ (সচিত্র)—শ্রীরাধিকারঞ্জন ঘোষাল ... ৪৫৫
বাসি ফুল (গল্প)—শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ ... ৪৩১
বিপ্লবী (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস ... ১৮০
বিবিধ প্রসঙ্গ— ১, ৯৭, ১৯৩, ২৮৯, ৩৮৫, ৪৮১
বিরহী বাউল—শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ... ৫২৫
বিশ্বের খাদ্য-সঙ্কট (সচিত্র)—শ্রীসারদিনাথ শেঠ ... ৪৩৭
বিষ (গল্প)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ... ৭৩
"বীরভূমের জাতি-প্রসঙ্গ"—শ্রীসুবোধচন্দ্র কুণ্ডু ও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভড়... ১৮২
বুদ্ধের অন্তরঙ্গ অন্তেবাসী আনন্দ
—শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৪৭
বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী
—শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত ... ৪০১
বেথুন বালিকা বিদ্যালয় (সচিত্র)—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ... ২৪৫
ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়—শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় ... ৫২০
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র—শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ... ৭৬
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—এলাহাবাদ অধিবেশন
—শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস ... ১২৩
ভারতের জনসম্পদ—শ্রীকস্তুরচাঁদ লালওয়ানী ... ৩৪৫
ভারতের বিচার—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ... ১৭
ভালোবেসেছিনু (কবিতা)—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ ... ৫৪৪
ভাস্কর্য (কবিতা)—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ... ৩৯
"মর্নিং গ্লোরী" (গল্প)—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ... ৩৩৮
মসাঙ্কোর মনুমেণ্ট (সচিত্র)—শ্রীমন্মথ রায় ... ১৩৪
মাণিক (গল্প)—শ্রীকালীপদ ঘটক ... ৪০৪
মাতৃভাষায় অনাস্থা—শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য ... ১৪৬
মানুষের জীবন—শ্রীবিমলচরণ দেব ... ৪৯৭
মিস্টিক কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ—শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত ... ৩৫৫
মুক্তসাধক রামানন্দ-স্মরণে (কবিতা)—শ্রীনীলরতন দাশ ... ১৪১
মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ... ৭৯
মৃত্যু ও জীবন (কবিতা)—শ্রীঅময়কুমার দত্ত ... ২৬৭
মৃত্যু-কর—শ্রীমনকুমার সেন ... ৩৫৮
মৃত্যু-বাসর (কবিতা)—এ. এন. এম. বজলুর রশীদ ... ৩২০
মেস্তা পাট—শ্রীনীলিমা সিংহ ... ৩৬৭
যক্ষ্মা ও তার প্রতিকার—শ্রীকুমুদশঙ্কর রায় ... ১৭৭
যামিনীকান্ত সেন—শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ... ৪৬৮
যুদ্ধোত্তর জার্ম্মান চিন্তাধারার একটি দিক
—শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস ... ৫৬০
রবীন্দ্রকাব্যে নারী—শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত ... ৭০
রাজপুত্তুর (নাটিকা)—শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত ... ২১৯
রাঢ়দেশের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ... ১১৩
রাতের লেখা (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ... ১৪৯
রেঙ্গমা নাগা (সচিত্র)—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র ... ১২৬
"লক্ষ্মী" (আলোচনা)—শ্রীবিমলাচরণ দেব ... ১৮১
লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ (সচিত্র)—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় ... ৩২১
লোটা নাগা (সচিত্র)—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র ... ৪৪৯
শাহ্ আব্দুল লতীফের কবিতা—এ. এন. এম. বজলুর রশীদ ... ৪০৪
শিক্ষা ও সাহিত্য—শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ ... ৪৯৯
শিক্ষার মাধ্যম (গল্প)—ভাস্কর ... ২৫
শ্রীঅরবিন্দ (কবিতা)—শ্রীনীলরতন দাশ ... ৪৫৭
সতী (কবিতা) : সরোজিনী নাইডু—শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় ... ৩৭১
সন্তবাণী—শ্রীসুধাপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী ... ১৬২
সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিলা
—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৯
সাহিত্যের সমস্যা—শ্রীননীমাধব চৌধুরী ... ৪২৩
সিন্ধুধর্ম্মে পুরুষ দেবতার উপাসনা—শ্রীননীমাধব চৌধুরী ... ৩০৫
সোমনাথ মন্দির দর্শনে (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ৪৩৬
সৌরশক্তির উৎস—শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল ... ৮২
স্পেনের লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত (সচিত্র)
—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ ... ৬৬
স্বাধীন ভারত ও ছাত্রসমাজ—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ... ১৪২
হরিণঘাটা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র ... ১৭৪
ঐ —শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ... ২৭৩
হিন্দী ভাষার মুসলমান কবি
—শ্রীসুধাপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী ... ২৭৫
হিন্দু আমলে নারীর স্থান—শ্রীরঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৪২৯
হিন্দু মেলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ... ৩১
"হিন্দুস্থান" না "ভারতবর্ষ"—শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন ... ১৬৮

বিবিধ প্রসঙ্গ

আন্দামান দ্বীপে বাঙালী বসতি ... ৯
আমাদের বন-সম্পদ ... ১৩
আমেরিকার দৃষ্টিতে জবাহরলাল ... ১০৯
আসামে বাঙালী উদ্বাস্তু ... ৩৯৫
আসামে বাঙালীর বিরুদ্ধে আর এক দফা অভিযান ... ৮
আসামের ভবিষ্যৎ ... ২০৪
ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য জাতি ... ৪৯৫
কংগ্রেসে দলাদলি ... ৯৮
কংগ্রেসে দলাদলি বন্ধের উপায় ... ৯৭
কয়লার খনির শ্রমিক ... ১৫
কলিকাতা হাইকোর্ট সংস্কার ... ৪৯১
কলিকাতায় অবাঙালীদের কার্য্যকলাপ ... ৩৮৭
কলিকাতায় বিদেশী ও অবাঙালী ... ৩৮৯
কাশ্মীর ... ৩৯৬
কাশ্মীর সমস্যা ... ২০৫
কৃষির উন্নতিকল্পে ব্যয় ... ১০৩
কোচবিহার, ত্রিপুরা, মণিপুর ... ৪৮৯
কোন্ডা ভেঙ্কটপ্পিয়া ... ৪৯৬
ক্ষুদিরাম-স্মৃতি উদ্বোধনে পণ্ডিত নেহরুর অনিচ্ছা ... ৮
খাদ্য উৎপাদন ... ৩৯০
গ্রামবাসীর আত্মনির্ভরতা ... ১২
চন্দননগরের ভারতভুক্তি ... ৩০২
চীনের অদূর ভবিষ্যৎ ... ৪৯৪
চীনের সমস্যা ... ২০৮
জাহাজের ব্যবসায় ও নাবিক বৃত্তি ... ৪৯২
জেলের ঘটনার শিক্ষা ... ১৯৫
ঝাড়গ্রাম কৃষি মহাবিদ্যালয় ... ১০৪
তাল ও খেজুরের গুড় চিনি ... ২০৭
দক্ষিণ-কলিকাতা উপনির্ব্বাচন ... ১৯৩
দমদম ও প্রেসিডেন্সি জেলে গুলি চালনা ... ১৯৪
দীনবন্ধু সি. এফ্. এণ্ড্রুজের স্মৃতিতর্পণ ... ১৬
দুর্নীতি সম্বন্ধে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর বিবৃতি ... ১৯৮
দুর্নীতির প্রতিকার ও হাইকোর্ট ... ১৯৬
দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় ... ৩০২
নববর্ষ ... ১
নরেন্দ্রনাথ দত্ত ... ১৬
নূতন বিক্রয়-কর আইন ... ৯
নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৯৬
পঞ্চায়েৎ-রাজ ... ৪৯৩
পণ্ডিত নেহরুর আগমনের ফল ... ২৮৯
পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ ... ২৯০
পররাষ্ট্র-সচিব চতুষ্টয়ের সম্মেলন ... ৩০৩
পল্লীবাসী মুসলমানের মতিগতি ... ২৯৯
পশ্চিম ইউরোপের বিপদ ... ৩৯৯
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসকর্ম্মী সম্মেলন ... ৪৮২
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য পরিকল্পনা ... ২৯১
পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা ... ২৯৮
পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ... ২০১
পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য উৎপাদন ... ১০৪
পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন ... ৩৯০
পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের হিসাব ... ২৯৫
পশ্চিমবঙ্গে খাল ইত্যাদির অবস্থা ... ৩৯৩
পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি দমন ... ৪৮৭
পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান ... ৩৮৯
পশ্চিমবঙ্গে বয়স্ক-শিক্ষা বা সামাজিক শিক্ষা ... ১০৫
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা বিস্তার ... ২০০
পশ্চিমবঙ্গে সেচ পরিকল্পনা ... ৪৮৭
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ও ব্যবস্থা ... ৪৮১
পশ্চিমবঙ্গের নূতন বিপদাশঙ্কা ... ৮
পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য-বিভাগ ... ৪৮৮
পাকিস্থানে পরিত্যক্ত উদ্বাস্তুদের সম্পত্তি ... ৩০০
"পাকিস্থানে" ভারত-নাগরিকের সম্পত্তি ... ১০৭
পাকিস্থানে হিন্দু-শিখ ... ২০৩
পাকিস্থানের সঙ্গে সম্বন্ধ ... ১০৯
পানাগড়ের উদ্বাস্তু ও বর্দ্ধমানের পতিত জমি ... ২৯৭
পুলিনবিহারী দাস ... ৪৯৬
পূর্ব্ববঙ্গে খাদ্যের অবস্থা ... ২৯৯
পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা-বিভ্রাট ... ১০৮
পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু ... ৪৮৯
"ফসল বাড়াও" আন্দোলন ... ১২
বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ... ২৯৬
বাংলা ও আসাম রেলওয়ে ... ৪৯০
বাংলায় রেশন-বহির্ভূত খাদ্য ... ২৯৫
বাংলার গৃহবিবাদ ... ৩৮৫
বাংলার রেশনিং ... ২৯৩
বাইশে শ্রাবণ ... ৩৮৬
বিক্রয়-কর ... ১০২
বীরবল সাহনি ... ১১২
বেথুন বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী ... ১১১
বৈদিক ভারত ও বৌদ্ধ ভারত ... ১১২
ব্রহ্মরাষ্ট্রে ব্রিটিশ মূলধন ... ১৫
ভারত রিপাবলিক ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ... ১০১
ভারত সম্বন্ধে ব্রিটেনের মনোভাব ... ৩০৩
ভারতরাষ্ট্রে মুসলমান ... ১০৬
ভারতরাষ্ট্রে শিক্ষার ব্যবস্থা ... ৩৯৬
ভারতরাষ্ট্রের আদিবাসী ... ২০২
ভারতরাষ্ট্রের ভাষা-সমস্যা ... ৬
ভারতরাষ্ট্রের রেল-সমূহ ... ১৮৯
ভারতে বৈদেশিক মূলধন ... ১৩
ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন ... ৪
ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন ... ৪৮৬
ভিয়েটনামে যুদ্ধ ... ৪৯১
মনোহরলাল ... ১১২
মাঠকে শূন্য রাখিস নে ভাই ... ২০৮
মাতৃভাষা সম্বন্ধে ডাঃ ঘোষের নূতন সংজ্ঞা ... ১৯৯
মাধ্যমিক শিক্ষাবিল ... ১০
মানভূম ও ধলভূম ... ৫
মানভূম সত্যাগ্রহ ... ৯৯
মানভূম সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে বামপন্থীদের মনোভাব ... ৪
মানভূমে দমন-নীতি ... ১

মার্কিনী সংবাদপত্রে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা ... ৪৯১
মুসলিম লীগের ভূত ... ১০৭
যুক্তরাষ্ট্রে সত্যাগ্রহ ... ১১০
রাজস্ব আদায়ে গলদ ... ৯
রামেন্দ্র-রচনাবলী ... ৪০০
রাষ্ট্রভাষা সমস্যা ... ৩৯৮
শিক্ষা-বিজ্ঞান-সাংস্কৃতিক উন্নতি ... ২০৬
সংযুক্ত প্রদেশে খাদির উন্নতি ... ৩০৩
সামরিক বৃত্তি ও বাঙালী ... ১১৯
সুখী পাকিস্থান ... ১০৮
সোভিয়েট-রাষ্ট্রে দাসত্ব প্রথা ... ৪৯৪
সোভিয়েট-রাষ্ট্রে পাটচাষের সাফল্য ... ১৫
স্বাধীনতা দিবস ... ৩৮৫
স্মৃতি-তর্পণ ... ৯৭
হরিণঘাটার পরিকল্পনা ... ৬৯৩
হরিনারায়ণ সেন ... ১৬
হাওড়া সম্মেলন ও ভাষা-সমস্যা ... ৪৮৩
হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ ... ৪৮৫

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

জোয়ার—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ... ২৮৯
নববধূর পতিগৃহযাত্রা—শ্রীইন্দ্র দুগার ... ৪৮১
বসন্ত—শ্রীসুধীর খাস্তগীর ... ১৯৩
মূষিক-বাহন - শ্রীপ্রিয়প্রসাদ গুপ্ত ... ১
মৌজ—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ... ৩৮৫
সংঘাত—শ্রীসুধাংশু ঘোষ ... ৯৭

একবর্ণ চিত্র

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ... ২৮৭
আফ্রিকায় চীনাবাদাম-বোঝাই নৌকা ... ৪২১
ইন্দ্র দুগারের অঙ্কিত চিত্রাবলী ৫৩০-৩৩
এডেন বন্দর ... ২২৯
এণ্ড্রুজ, সি. এফ. ... ১
শ্রীকনকলতা দত্ত ... ৩২১
কল্কি অবতার ... ১৬১
কল্কি, কেরলের ... ১৬২
কাঞ্চনজঙ্ঘা ... ৪১৭
কারিয়াপ্পার বঙ্গীয় রক্ষীদল পরিদর্শন ... ১৪৪
কার্কিআইড, মার্গিট ... ৪৬৭
কালকা ষ্টেশন—ভিখারিণী ... ৫০৭
কাশ্মীর ... ৩৮৫
—অমরনাথের পথে চন্দনবাড়ী ... ২৮৯
—ঝাঙড়ে আত্মা সিং কর্তৃক সৈন্য পরিদর্শন ... ১৪৫
—পহলগাম পল্লী ... ১৪৫
—শালিমার উদ্যান ... ২৮৯
কাশ্মীরের বেদনা—শ্রীরথীন মৈত্র ... ২৫৩
চীনা কৃষক ৪৩৯-৪১
চেট্উড হল, দেরাদুন ... ৪৮১
ছুটির দিন—শ্রীপরিতোষ সেন ... ২৫১
জবাহরলাল নেহরু ... ১
জাতীয় রক্ষীবাহিনীর মহিলা-বিভাগের শিক্ষার্থিনী ... ৪২৪
জে. এন. চৌধুরী, মেজর জেনারেল ... ৪২৫
ঝাড়গ্রাম রাজপ্রাসাদ ও অতিথিশালা ৫৩৮-৩৯
'ভেন্তুরা'—ভারত-সরকার কর্তৃক ক্রীত ... ৪৮১
[illegible]
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ... ২৪৭
দানব-নৃত্য—প্রাণকৃষ্ণ পাল ... ২৪৯
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ—ভাস্কর : শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় ... ৪২৪
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৬৪
নরসিংহ মল্লদেব, রাজা ... ৩১৭
পুলিনবিহারী দাস ... ৫৫৫
পেনাঙের চিত্রাবলী ... ৩৪-৩৯
পোর্ট সৈয়দ ৩৩১,৩৩৩
শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩১৬
প্রেরণা—ভাস্কর : শ্রীপ্রদোষ দাশগুপ্ত ... ২৪৯
বল্লভভাই প্যাটেল ... ২৪৯
বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধা ... ৪৫৬
বাঁশী—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ ... ৫১৩
বেথুন, জে.ই.ডি ... ২৪৫
বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন-উৎসব ... ২৪৯
ব্যাঙ্কক : বৌদ্ধমন্দিরগাত্রে রামায়ণ-চিত্রাবলী ৩৪৪-৪৫
ব্রজগোপাল বালক-সঙ্ঘ—চিত্রাবলী ১৯১-৯২
মালয়—টিনের খনি ... ১৯৩
যবদ্বীপের চাষী ৪৩৭-৩৮
যুদ্ধজীর্ণ—শ্রীঅবনী সেন ... ২৫২
রামগোপাল ঘোষ ... ২৪৬
ব্রহ্মা—পুরুষ ও নারী ১২৯-৩৩
লীলা রায় ... ৪৬৭
লোটা নাগা—চিত্রাবলী ৪৫০-৫৪
ল্যান্সডাউন পাহাড় ৫০৫, ৫১০-১২
শেখ আবদুল্লা, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিনিধি সহ ... ৩৮৫
সন্ধ্যাপ্রদীপ—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ ... ৫১৩
সরোজিনী নাইডু ... ৪৮
সাঁচি, স্তূপ, মন্দির ও মঠ ... ৪৯
সিকিমের চিত্রাবলী ৪১৮-২০
সিমলা পাহাড়ের দৃশ্যাবলী ... ৫০৮-৯
সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ২৭৪
সুয়েজ খাল ৩৩২-৩৫
সৌদামিনী দেবী ... ২৪৯
স্পেনে লোকনৃত্যের চিত্র ...৬৬-৬৯
হিন্দু মেলায় প্রদত্ত পদক ... ৬৩
[illegible]

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

হিমালয়ের একটি অঞ্চল

নিকোলাস রোয়েরিক

বুদ্ধ ও রাহুল —শ্রীঅমূল্যগোপাল সেন

নববধূ —শ্রীমৃণালকান্তি দাস

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৮শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৫৫

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নব বর্ষ

বিষম ঝড়ঝঞ্ঝাটে যখন সমস্ত ভারত আচ্ছন্ন সেই সময়ে আসিয়াছিল ১৩৫৪। পঞ্জাবে ও পূর্ব্ববঙ্গে তখন সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভের আগুন জ্বলিয়াছে, বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি কোথাও বাড়িতেছে, কোথাও বা তাহাকে সংযত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কলিকাতায় তখন চতুর্দ্দিকে গুণ্ডারাজের এবং সুহ্‌রাবর্দি মন্ত্রীসভা-আনীত পাঠান পুলিসের অত্যাচার ও অনাচারের স্রোত বহিতেছে এবং তাহারই প্রবল প্রতিক্রিয়ায় বাঙালীর যুবশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে সশস্ত্র অভিযান চালাইতেছে। সমস্ত দেশের অবসন্ন মনপ্রাণ তখন শুধুমাত্র স্বাধীনতা লাভের আশায় উৎসুক হইয়া আছে। বাহিরের জগতে এক মহাযুদ্ধের চিতার আগুন নিবিবার পূর্ব্বেই আর এক মহাযুদ্ধের পূর্ব্বাভাসস্বরূপে শক্তিপুঞ্জ দুই ভাগে বিভক্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছে।

বর্ষারম্ভ হইবার কিছুদিন পরেই ভারতের আকাশে স্বাধীনতার আলো দেখা দিল। কিন্তু লোকের মন দেশ বিভাগ ও আত্মীয়বিচ্ছেদজনিত বিষাদে আচ্ছন্ন হওয়ায় আনন্দের স্রোত বহিয়াও বহিল না। তাহার পর পঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে জ্বলিয়া উঠিল সাম্প্রদায়িক হিংসার দাবানল যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোকের ধনমনপ্রাণ জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইল। এক কোটির উপর লোক বাস্তুছাড়া, সর্ব্বহারা হইয়া দলে দলে আশ্রয়ের আশায় চলিল পূর্ব্ব বা পশ্চিম মুখে। দাবানলের আগুন দিল্লীতে ও যুক্তপ্রদেশে ছড়াইয়া পড়িল কিন্তু মহাত্মাজীর প্রয়াসের ফলে এবং ঐ অঞ্চলের প্রকৃত কংগ্রেসকর্ম্মীদের চেষ্টায় তাহা নিবিয়া গেল। অন্য দিকে কংগ্রেসের শান্তির চেষ্টা ও প্রতিহিংসা নিরোধের জন্য হিন্দুর উপর অত্যাচারের সংবাদদানের অনিচ্ছাকে দুর্ব্বলতা ভাবিয়া পাকিস্থানের উচ্চতম অধিকারীবর্গ ছলেবলে কাশ্মীর অধিকার করার জন্য অযুত সংখ্যায় পাঠান উপজাতি ও পঞ্জাবী প্রাক্তন সৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া পাঠাইলেন সেখানে লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের অভিযান চালাইতে। ভারত-রাষ্ট্র বিষম বাধাবিঘ্নের মধ্যে কাশ্মীর রক্ষার জন্য সৈন্য ও বিমানবাহিনী পাঠাইতে বাধ্য হইল, আরম্ভ হইল বিনা ঘোষণায় কাশ্মীরের যুদ্ধ। ঘরের যুদ্ধ এইরূপে আরম্ভ হইল এবং বাহিরেও যুদ্ধের আশঙ্কা ক্রমেই ঘনীভূত হইতে থাকিল। সারা জগৎ যেন আতঙ্কে ক্রমেই অভিভূত হইতে লাগিল। ভারতের বাহিরে চীনেও সমরানল জ্বলিয়া উঠিল এবং পেলেস্তিনে প্রবল আরব-ইহুদী সংঘর্ষ চলিতে থাকিল। ভারত-রাষ্ট্রের পশ্চিম সীমান্তস্থিত আতঙ্কের ছায়া গিয়া পড়িল পূর্ব্ব সীমান্তের পারে, সেদিকেও আতঙ্কপীড়িত উদ্বাস্তুর স্রোত ক্রমেই স্ফীতধারায় সীমান্তের এপারে বহিয়া আসিতে লাগিল।

কি নিদারুণ দুর্ব্বিপাকের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল ১৩৫৪ সাল অথচ ইহাই আমাদের স্বাধীনতার প্রথম বৎসর!

আজ ১৩৫৫ সাল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে আমাদের সম্মুখে। কিন্তু আজ "নবীন বরষে নূতন হরষে" গান গাহিবার কবিও নাই, তাঁহার প্রিয়তম "শিষ্য" মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও নাই আশার বাণী শুনাইতে আর্ত্ত ও দুঃখক্লিষ্ট জনগণকে। ঘরে-বাহিরে, চতুর্দ্দিকে, আজ যেন নৈরাশ্যবাদেরই জয়, দুর্দ্দৈবের আশঙ্কায় সকলেরই মন চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত। এরূপ বিপরীত অবস্থার মধ্যে বর্ষফলের শুভ ভবিষ্যদ্বাণী করে এমন দৈবজ্ঞ কে আছে কোথায়? সকলেই শুনাইতেছেন আসন্ন বিপদের কথা, চারিদিকেই শোনা যায় ক্ষোভ ও রোষের চীৎকার, অভিযোগ-অনুযোগে ছাইয়া গিয়াছে দেশ; অভাব ও কষ্টে জর্জ্জরিত লোকের মন আজ স্বভাবতই অবসন্ন ও ব্যস্তত্রস্ত। দেশের পরিস্থিতি যখন এইরূপ তখন উদ্ধারের পথ দেখাইবে কে, আসন্ন দুর্য্যোগের মুখে গ্রহশান্তিকর যাগযজ্ঞের হোতা উদ্গাতা কেবা আছে কোথায়?

১৩৫৫ সালের পথ অতি দুর্গম সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের নেতৃবর্গের মধ্যে যদি কিছুমাত্র পৌরুষ থাকে, তবে সে পথে আমরা নিশ্চয়ই পার পাইতে পারিব। দেড় শত বৎসরের নিদারুণ দমন লুণ্ঠন উৎপীড়ন সত্ত্বেও যে দেশে স্বাধীনতার আলো নিবে নাই, এই সেদিনও যেখানে দেশের শতসহস্র

সন্তান বিদেশীর শাসন-উৎপীড়নের মধ্য দিয়া, স্বাতন্ত্র্যের কামনায়, স্বাধীনতা-যুদ্ধের অনলে সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়াছে, এই কয় মাসের মধ্যে সে দেশের সমস্ত বীর্য্য ও সহিষ্ণুতা শেষ হইয়া গিয়াছে ইহা অবিশ্বাস্য। স্বাধীনতা বিনা-মূল্যে পাওয়া যায় না ইহা তো ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। আমরা দেড়শত বৎসরের দাসত্বের ফলে ভুলিয়াছি যে স্বাধীনতার মূল্যদান করিতে হয় পৌরুষে। যদি আমরা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চাই তবে আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে ধীর স্থির ভাবে, দৃঢ়চিত্তে, অনিমেষ সতর্ক দৃষ্টিতে সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে, কেননা স্বাধীন জগতে ক্লীবত্বের স্থান নাই। নৈরাশ্যবাদের অর্থ "ছায়াভয়চকিত মূঢ়ের" আর্ত্তনাদ, তাহাতে সর্ব্বনাশেরই পথ খুলিয়া যায়। আমাদের এখন স্মরণ রাখিতে হইবে সুদূর অতীতের পিতৃপিতামহগণের গৌরবময় বীরত্বের কথা, শোণিত-তর্পণের কথা।

আত্ম-প্রবঞ্চনার দিন চলিয়া গিয়াছে। মুখে বলিব বেদান্তের মায়াবাদের কথা, কাজের বেলায় প্রতিদিন প্রতিক্ষণে চলিব বাস্তববাদের পথে, সকাল সন্ধ্যায় আওড়াইব গীতার জ্বলন্ত ক্ষাত্রধর্ম্মের শ্লোক, বিপদের সম্মুখে দিব চরম ক্লীবত্বের পরিচয় এবং তাহার ফলে বিপদ আরও ঘনীভূত হইলে অন্যের উপর দোষারোপ করিয়া, তর্জ্জনে গর্জ্জনে নিজের অপদার্থতা ঢাকিবার চেষ্টা করিব এবং শেষে "সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন" হইলে সব কিছু ছাড়িয়া, পলায়ন করিয়া, কপাল চাপড়াইয়া, অদৃষ্টের দোষ দিয়া কাঁদুনী গাহিব, এই কি আজকার দিনে মনুষ্যত্বের নিদর্শন? যদি পৌরুষ থাকে, ১৩৫৫ সালেই ভাগ্যচক্র ফিরিবে, নহিলে নয়।

সর্ব্বশেষে বাংলার কথা। লিখিবার সময় শোনা যাইতেছে যে বাংলার মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন ধুরন্ধর আবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইঁহাদের এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বার্থ সম্পর্কিত। যদি দেশের মঙ্গলামঙ্গল ইঁহাদের উদ্দেশ্য হইত তবে তাহার পরিচয় আমরা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকালেই পাইতাম বা অন্যরূপে, দেশের মঙ্গলের জন্য মন্ত্রীসভার কার্য্যকলার দোষগুণ ইঁহারা সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেন। সেইরূপ কোনও কিছু অভিযোগের অভাবে এবং ঐ মহাশয় ব্যক্তিদিগের মনোবৃত্তির পরিচয় থাকায় আমরা বলিতে বাধ্য যে দেশের এইরূপ দুর্দ্দিনের মধ্যে ইঁহাদের এরূপ স্বার্থান্বেষণ অতিশয় নিন্দনীয়। ইঁহারা আগে প্রকাশ্যে বলুন যে মন্ত্রীসভায় প্রবেশ করিয়া দেশের কি উপকার ইঁহারা করিতে চাহেন এবং অতীতে ইঁহারা দেশের নামে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া কি করিয়াছেন যে দেশের লোক ইঁহাদের হাতে শাসনের ভার ছাড়িয়া দিবে। কংগ্রেসের নাম লইয়াই তো কলিকাতা করপোরেশনকে ক্রমে চোরপোরেশনে পরিণত করা হইয়াছে, শেষে কি বি,পি,সি,সি "বঙ্গীয় প্রাদেশিক চৌর-চক্রে" পরিণত হইবে? পূর্ব্ববঙ্গ ডুবাইয়া কি ইঁহাদের আশ মেটে নাই?

ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থান রাষ্ট্রসমস্যা

১৩৫৫ সালের ২রা বৈশাখ হইতে ৫ই বৈশাখ পর্য্যন্ত ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থানরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ কলিকাতায় একটি সম্মেলনে বাগ্‌বিতণ্ডায় নিযুক্ত ছিলেন। এই বাগ্‌বিতণ্ডার বিবরণ যাহা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা নানা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু যে সিদ্ধান্তসমূহ এই সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে তাহা সোমবার, ৬ই বৈশাখ, ঘোষণা করা হইয়াছে। তাহার ফলে সংস্কার-বিমুক্ত মন লইয়া এই বিষয়গুলির বিচার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সেইজন্য প্রথমেই এই সংস্কারগুলির গতিপ্রকৃতির আভাস দিতে হয়। কারণ এই সংস্কাররাজিই বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সৃষ্টি করিয়া ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়াছে। এই বিভাগের ফলে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এই সংস্কাররাজির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

আমরা গত চল্লিশ বৎসরের ঘটনাবলীর নিরিখে এই মনোমালিন্যের বিচার করিব। তাহার পূর্ব্বের ঘটনা বর্ত্তমান আলোচনার বাহিরে রাখিতে চাই। এই চল্লিশ বৎসরের প্রাক্কালে আমরা বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাক্ষাৎ পাই। এই আন্দোলনের সূত্রপাতে হিন্দু-মুসলমান সমস্ত বাঙালী ইহার বিপক্ষে ছিল। সেই একাগ্রতা বেশী দিন টিকে নাই। ঢাকা নগরীকে রাজধানী করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে একটি মুসলিম প্রদেশের প্রতিষ্ঠা করিবেন—বড়লাট কার্জ্জন এই প্রলোভন দেখাইয়া নবাব সলিমুল্লা প্রমুখ মুসলমান সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর নেতৃবর্গের সহায়তা লাভ করিতে সমর্থ হন। ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই যে ভাঙ্গন দেখা দিল তাহা আর জোড়া লাগিল না। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট, ১৯১৯-২১ সালের খেলাফৎ আন্দোলনে হিন্দুর সহযোগিতা, রাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডের সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা সম্পর্কে কংগ্রেসের "না গ্রহণ না বর্জ্জন" নীতি, সবই ব্যর্থ হইয়াছে। ইহাতেই শেষ হয় নাই। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ-প্রবর্ত্তিত যে দানবীয় রূপ আমরা কলিকাতা নগরীর বুকে ও তাণ্ডবলীলা নোয়াখালিতে দেখিলাম, এই অভিজ্ঞতার পর ইহা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়িল যে হিন্দু মুসলমান আবার প্রতিবেশীরূপে বাস করিতে পারিবে। বিহার প্রদেশে ১৯৪৬ সালে মুসলমানের উপর অনুরূপ দানবীয় অত্যাচার চলিল। ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাসে পঞ্জাবের হিন্দু-শিখ সম্প্রদায়কে সেই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইল। তাহার পর ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভারতবর্ষ বিভাগের ঘোষণার অল্পদিন পরে পশ্চিম পঞ্জাব ও পূর্ব্ব পঞ্জাবের ঘটনা ভারতবর্ষের বুকে এমন রক্তরেখা টানিয়া দিয়াছে যে, তাহা গান্ধীজীর বুকের রক্তেও ধুইয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।

১৯৫৫ সালের বৈশাখ মাসের এই চারিটি দিন এই মর্ম্মান্তিক ইতিহাসের মোড় ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কয়েকজনকে এই চেষ্টার জন্য আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। ফলাফল নিরপেক্ষ হইয়া এই চেষ্টাকে গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া আমরা মনে করি। পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লওয়া একটা অস্বাভাবিক কার্য্য নয়, এর জন্য খুনাখুনি করিতে গেলে যে অবস্থা দাঁড়ায় তাহাই গান্ধীজী প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের এই নৈতিক অবনতির বেদনায় তাঁহার বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছাও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। প্রতিবেশীর মধ্যে যে আত্মীয়তা ও সৌহার্দ্দ্য স্বাভাবিক তাহাই গান্ধীজী ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিলে তিনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন। এই কথা ভাবিয়াই আমরা ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের নেতা শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী যে অনুরোধ করিয়াছেন---"চুক্তিনামার সর্ত্তাবলী সম্পর্কে খুব সমালোচনা না করিতে"—তাহা মানিয়া লইলাম। এই সর্ত্তগুলি কি ভাবে প্রতিপালিত হয় তাহার পরীক্ষার সময় আমরা দিব। "পাকিস্থান" রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের নেতা জনাব গুলাম মহম্মদ "হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া মনস্থির করিতে" অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই সম্পর্কে আমরা বলিতে চাই যে "হৃদয়" দিয়া ভারতবর্ষের বিভাগ আমরা সমর্থন করি না ও করিতে পারিব না। বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা আপদ্‌ধর্ম্ম বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। সেইজন্য একটা সর্ত্ত সম্বন্ধে আমাদের মনে দ্বিধার ভাব রহিয়া গেল :

"পাকিস্থান ও ভারতের কিম্বা ইহাদের অংশসমূহের একীকরণের কোনরূপ প্রচারকার্য্য নিরুৎসাহ করা হইবে। অংশসমূহের মধ্যে একপক্ষে পূর্ব্ব বঙ্গ এবং অপর পক্ষে পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, কুচবিহার কিম্বা ত্রিপুরা রাজ্যও ধরা হইবে।"

অর্থাৎ লাট মাউণ্টব্যাটেন ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়া যে আঁচড় কাটিয়া দিয়াছেন তাহা চিরকালের জন্য মানিয়া লইতে হইবে। এরূপ দাবি মানুষের জ্ঞানবিশ্বাসের আশা-আবেগের স্বাভাবিক পরিণতির বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। আমরা মনে করি "পাকিস্থান" রাষ্ট্র যখন ভারতরাষ্ট্র হইতে রাজনৈতিক অর্থে ভিন্ন ধর্ম্মী তখন বন্ধুতা বা শত্রুতা সম্বন্ধে অপরাপর রাষ্ট্রের মতই ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধিয়তে এই নীতি অনুসারে তাহা স্থির হইবে। আমরা মনে করি না ভারত-রাষ্ট্রের মুসলমান অধিবাসী এত শীঘ্র তাঁহাদের "পাকিস্থানী" মনোভাব বদলাইয়া ফেলিতে পারিয়াছে। আমরা মনে করি না যে "পাকিস্থান"বাসী হিন্দু ও শিখ এত শীঘ্র তাঁহাদের রাজনীতিক বিশ্বাস বদলাইয়া ফেলিতে পারিবে। এই দুই রাষ্ট্রের এই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই দুনিয়ার সঙ্কটময় পথে চলিতে আরম্ভ করা উচিত। কলিকাতা সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ এই বিরুদ্ধ ভাবদ্বয়ের মধ্যে একটা সেতু নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র, তাহাদের পক্ষে এর বেশী সার্থকতা দাবী করা বিচারসহ হইবে না। যে হিংসার স্রোত ও অপমানের স্রোত দুই রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবাহিত তাহা সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করা রাজনীতিক কৌশলের কার্য্য। সেই কৌশল দুই রাষ্ট্রের আছে কিনা তাহা অদূর ভবিষ্যতে পরীক্ষিত হইবে।

চুক্তিনামার বিস্তারিত বিবরণ

চুক্তিনামার সর্ত্তাবলীর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

যেহেতু উভয় ডোমিনিয়নের গবর্ণমেণ্টদ্বয় স্বীকার করিতে-ছেন যে, সংখ্যালঘুদের ব্যাপকভাবে বাস্তত্যাগ কোন ডোমি-নিয়নেরই স্বার্থের পরিপোষক নহে, তাঁহারা বাস্তত্যাগকে নিরুৎসাহ করার জন্য ও বাস্তত্যাগ বন্ধ করিবার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টির জন্য সম্ভবপর সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তাঁহারা বাস্তত্যাগীদিগকে তাঁহাদের পৈতৃক বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে যত দূর সম্ভব উৎসাহ ও সুযোগসুবিধা দিবেন, সেই হেতু দুই ডোমিনিয়ন নিম্নোক্ত বিষয়গুলি মানিয়া লইতেছেন :—

১ম ধারা

১। সংখ্যালঘুগণ যে ডোমিনিয়নে বাস করে তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার এবং তাহাদের সুবিচার পাওয়ার ও নাগরিক অধিকার রক্ষার নিশ্চিত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সেই ডোমিনিয়নের গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে।

২। ভারতে ও পাকিস্থানে প্রত্যেক লোকের সমান অধিকার, সুযোগসুবিধা, বিশেষ অধিকার ও বাধ্যবাধকতা থাকিবে ; সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা থাকিবে না ; তাহাদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকার সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—"শিক্ষা বিষয়ক" অধিকার সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

৩। পাকিস্থান ও ভারতের কিম্বা উহাদের অংশসমূহের একীকরণের কোনরূপ প্রচারকার্য্য নিরুৎসাহ করা হইবে। অংশসমূহের মধ্যে এক পক্ষে পূর্ব্ব বঙ্গ এবং অপরপক্ষে পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, কুচবিহার কিম্বা ত্রিপুরা রাজ্যও ধরা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রচারকার্য্য বলিতে ঐ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানও বুঝাইবে।

৪। উভয় গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিতেছেন যে আরও ভাল আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সংবাদপত্রসমূহের সর্ব্বাঙ্গীণ সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক ; সুতরাং উভয় গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিতেছেন

যে, প্রত্যেক ডোমিনিয়নে সংবাদপত্রগুলি যাহাতে নিম্নোক্ত কাজসমূহ না করে তজ্জন্য যেখানে সম্ভবপর হইবে সেখানে সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়া সর্ব্ব প্রকার চেষ্টা করা হইবে—

(ক) অপর ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য। (খ) কোন ডোমিনিয়নের অধিবাসীদের কিম্বা তাহাদের কোন অংশের মধ্যে উত্তেজনা, ভয় কিম্বা আতঙ্কের সৃষ্টি হইতে পারে এরূপ সংবাদ অতিরঞ্জিত ভাবে প্রকাশ। (গ) এক ডোমিনিয়ন কর্ত্তৃক অপর ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমর্থক অথবা দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এইরূপ অর্থবোধের কোন বিষয় প্রকাশ।

৫। উভয় ডোমিনিয়নে সংখ্যালঘুগণ তাহাদের প্রতি অত্যাচার বা অন্যায় ব্যবহারের এজাহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ার অভিযোগ করিলে তৎসম্বন্ধে সত্বর তদন্ত হইবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

৬। পূর্ব্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলায় প্রাদেশিক সংখ্যালঘিষ্ঠ বোর্ড থাকিবে এবং এই প্রাদেশিক বোর্ডের অধীনে জেলা সংখ্যালঘিষ্ঠ বোর্ড থাকিবে। এই বোর্ডসমূহ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করিবে, তাহাদের মন হইতে ভীতি দূর করিবে ও বিশ্বাসের ভাব জাগ্রত করিবে। এই বোর্ডসমূহ ক্ষিপ্রতার সহিত সংখ্যালঘিষ্ঠদের অভিযোগ কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনিবে এবং সন্তোষজনকভাবে ও ক্ষিপ্রতার সহিত তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা করিবে।

প্রাদেশিক সংখ্যালঘিষ্ঠ বোর্ড পাঁচ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অন্ততঃ তিন জন সদস্য থাকিবেন, উহারা প্রাদেশিক আইন সভার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের সদস্যগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। অবশিষ্ট দুই জন প্রভাবপ্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হইবেন ও প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা মনোনীত হইবেন। জেলা সংখ্যালঘিষ্ঠ বোর্ডের চেয়ারম্যান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং প্রাদেশিক বোর্ডের চেয়ারম্যান এক জন মন্ত্রী প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন।

৭। উভয় ডোমিনিয়নের গবর্ণমেণ্ট এবং উভয় ডোমিনিয়নের প্রদেশসমূহের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের ভাল ভাবে জানাইয়া দিবেন যে, যদি কোন সরকারী কর্ম্মচারী সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার কার্য্যে কোন অবহেলা দেখান অথবা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন অথবা কর্ত্তব্যের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রদর্শন করেন তবে তাঁহাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে।

৮। একক অথবা দলবদ্ধভাবে যদি কেহ সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের মনে ভীতির সঞ্চার করে তবে তাহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

৯। উভয় ডোমিনিয়ন নিম্নলিখিত অভিযোগসমূহ দূর করিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন :—

(ক) আমদানী ও রপ্তানি লাইসেন্স মঞ্জুর করা সম্পর্কিত বৈষম্য এবং রেলে মাল প্রেরণের অগ্রাধিকার সম্পর্কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ।

(খ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে অর্থনীতিক বয়কটের চেষ্টা অথবা তাহাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করার চেষ্টা বন্ধ করা।

উভয় ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নিজ নিজ প্রদেশসমূহকে তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকায় ঐ নীতি অনুসারে কাজ করিতে বলিবেন।

যে সকল জেলা অথবা স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক চলিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থানে বাস্তত্যাগীদের সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের জন্য বোর্ড গঠনের নিমিত্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট আইন প্রণয়ন করিবেন। ঐ প্রকার বোর্ড গঠনের যদি দাবী করা হয় তবেই বোর্ড গঠিত হইবে। যদি সম্পত্তির মালিকগণ অনুরোধ করেন তবেই বোর্ড সম্পত্তির তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করিবে। তাঁহাদের কার্য্য তত্ত্বাবধায়কের কার্য্যের ন্যায় হইবে এবং ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরের কোন ক্ষমতা তাঁহাদের থাকিবে না। সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের লোকদের লইয়া এই সকল বোর্ড গঠিত হইবে।

দ্রষ্টব্য—যাঁহারা ১৯৪৭ সালের ১লা জুন অথবা তাহার পরে প্রদেশ ত্যাগ করিয়াছেন এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবার পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদেরই আশ্রয়প্রার্থী বলা হইবে।

প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের জন্য বিস্তৃত প্রস্তাব রচনার উদ্দেশ্যে উভয় গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে অফিসারদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করিবেন।

২য় ধারা

এই চুক্তি যাহাতে কার্য্যকরী হয় তৎসম্পর্কে সুনিশ্চিত হইবার জন্য দুই ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিগণ দুই মাসে অন্ততঃ একবার সম্মিলিত হইবেন। উক্ত বৈঠকে উপরোক্ত নীতি কোন ডোমিনিয়নে প্রতিপালিত না হওয়ার দৃষ্টান্ত থাকিলে উত্থাপন করা হইবে। পূর্ব্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে জরুরী প্রয়োজনের আবশ্যকতা হেতু দুই প্রদেশের প্রধান মন্ত্রিগণ মাসে অন্ততঃ একবার উক্ত উদ্দেশ্যে মিলিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত দুই প্রদেশের চীফ সেক্রেটারীদ্বয় পনর দিনে একবার সম্মিলিত হইবেন। যখন আসাম, কুচবিহার ও ত্রিপুরার সমস্যা আলোচিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে তখন পশ্চিম বঙ্গের চীফ সেক্রেটারী উক্ত অঞ্চলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতির ব্যবস্থা করিবেন।

৩য় ধারা

১। এই সম্মেলন অগৌণে আর একটি আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলন আহ্বান করিবার জন্য সুপারিশ করিতেছেন। এই সম্মেলনে যে অপরাপর প্রদেশ (পূর্ব্ব ও পশ্চিম পঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত) হইতে ব্যাপকভাবে বাস্তত্যাগ হইয়াছে অথবা বাস্তত্যাগের সম্ভাবনা আছে সেই সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ উপরে উল্লিখিত প্রস্তাব অথবা নিম্নোক্ত ধারায় অপর উপযুক্ত প্রস্তাব গ্রহণের জন্য সমবেত হইবেন :—

(ক) যে সকল শরণাগত এক ডোমিনিয়ন হইতে অপর ডোমিনিয়নে সাময়িকভাবে বা অন্যভাবে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সম্পত্তি রক্ষা বা রক্ষা সম্পর্কে অপর ব্যবস্থা।

(খ) উপদ্রুত এলাকায় এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠরা তাহাদের স্বার্থ ও অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ বলিয়া আশ্বস্ত হইতে পারে এবং বাস্তত্যাগ বন্ধ হইতে পারে কিম্বা বাস্তত্যাগীদিগকে পুনরায় তাহাদের বাড়ীঘরে প্রত্যাবর্ত্তনে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে।

২। আরও জানা গিয়াছে যে, ইতিমধ্যে স্বীকৃত আর একটি পৃথক সম্মেলন পূর্ব্ব ও পশ্চিম পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে বিবেচনার জন্য অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ সম্মেলনের ব্যবস্থাও অগৌণে করিবার জন্য এই সম্মেলন সুপারিশ করিতেছেন।

৩। আর একটি আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলনও অগৌণে আহ্বান করিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। এই সম্মেলনে পূর্ব্ব বাংলা ও আসামের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিয়া পূর্ব্ব বাংলা হইতে আসামে যাইয়া মুসলমানদের বসবাস সম্পর্কে এবং উক্ত সম্মেলন হইবার সাপেক্ষে ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বে আসামে পূর্ব্ব বাংলার বসবাসকারী মুসলমানদিগের সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন কিংবা ব্যাপকভাবে বাস্তত্যাগের সম্ভাবনা থাকিতে পারে এমন কিছু করা হইবে না বলিয়া উভয় পক্ষ সম্মত হইয়াছেন।

৪র্থ ধারা

আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলনের নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়াছেন তৎসম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে এবং উভয় ডোমিনিয়ন এতৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট পত্রে উল্লিখিত সংশোধন সহ উক্ত রিপোর্টের সুপারিশ অবিলম্বে কার্য্যকরী করিবার জন্য দুই ডোমিনিয়ন সম্মত হইয়াছেন। উক্ত কমিটির রিপোর্ট এই সঙ্গে দেওয়া হইল।

বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ

স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়াতে উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে শুল্ক নির্দ্ধারণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন এবং মাল চলাচল সম্পর্কে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধিনিষেধ আরোপ করিতে হইয়াছে। উল্লিখিত বিষয় সহ অন্যান্য আরও বহু সমস্যা পরীক্ষার জন্য ভারত-পাকিস্থান সম্মেলন প্রারম্ভেই উভয় ডোমিনিয়নের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, কয়েকজন প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের কর্ম্মচারী এবং বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি কমিটি নিয়োগ করেন। শুল্ক নির্দ্ধারণ ব্যবস্থা ও নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ার ফলে যে আর্থিক কষ্ট এবং যাত্রীদের বহু অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে ইহা উপলব্ধি করিয়া কমিটি যথাসম্ভব উহার কঠোরতা ইত্যাদি হ্রাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কমিটি ইহাও বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন যে আর্থিক কষ্ট সৃষ্টি হওয়াতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারী ব্যাপকভাবে বাস্তত্যাগ করিতেছেন, কাজেই এইরূপ অবস্থা চলিতে দেওয়া সমীচীন নহে। উভয় ডোমিনিয়নের স্বার্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কমিটি নূতন পরিস্থিতি অনুযায়ী সমস্যাগুলিকে যথাসম্ভব সহজ উপায়ে সমাধানের উদ্দেশে কতক সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কমিটির যে সমস্ত প্রস্তাব ডোমিনিয়ন ও প্রাদেশিক মন্ত্রী সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। মাল ও যাত্রী চলাচল সম্পর্কিত বিধিনিষেধ।

(ক) উভয় ডোমিনিয়নের যাত্রীদের সাধারণ বিছানাপত্র বলিতে কি বুঝাইবে তাহা উভয়পক্ষের শুল্ক বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যুক্তবৈঠকে স্থির করিবেন।

(খ) বিছানাপত্র সম্পর্কিত বিধিনিষেধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিরক্তিকর আচরণ ও যাত্রীদের অযথা হয়রানির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(গ) শুল্ক বিভাগ কর্ত্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ যাত্রীদের বিছানাপত্র তল্লাসী করিতে পারিবে না।

(ঘ) নীতি হিসাবে গাত্রতল্লাসীর ব্যবস্থা যথাসম্ভব পরিহার করিতে হইবে। গোপনে কোন দ্রব্য লইয়া যাইতেছে এইরূপ সন্দেহ জন্মিবার সন্তোষজনক কারণ থাকিলে গাত্রতল্লাসী লওয়া হইবে। উল্লিখিতরূপ ক্ষেত্রে শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীদের মধ্যে, ঘটনাস্থলে যে সিনিয়র অফিসার উপস্থিত থাকিবেন তাঁহার সমক্ষে গাত্রতল্লাসী লওয়া হইবে এবং তল্লাসীর সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। আইনের প্রয়োগ যাহাতে যথাযথভাবে হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সংযোগরক্ষাকারী অফিসারকে সুযোগসুবিধা দিতে হইবে।

(ঙ) কোন কারণে মহিলাযাত্রীর গাত্রতল্লাসী লওয়া অপরিহার্য্য হইলে সামুদ্রিক শুল্ক আইনের বিধান অনুসারে মহিলা অফিসার দ্বারা তল্লাসী করিতে হইবে।

(চ) যাত্রীদের ব্যক্তিগত দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে শুল্ক বিভাগীয় বাঁধাধরা নিয়মের দায় হইতে অব্যাহতি অথবা কঠোরতা হ্রাসের উদ্দেশে উভয় ডোমিনিয়ন স্ব স্ব টেরিফ সিডিউল এবং আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি পুনর্বিবেচনা করিবেন।

(ছ) যাত্রীদের সুখসুবিধার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার

নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। 'ধ' প্যাসেঞ্জারদের অযথা তল্লাসীর দায় এবং হয়রানি হইতে অব্যাহতি দানের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(ঙ) অনুমোদিত সরকারী কর্ম্মচারী, অর্থাৎ পুলিস অফিসার ব্যতীত অপর কেহ নিষিদ্ধ পণ্য অথবা গোপনে মাল আমদানী রপ্তানী চালাইতেছে কিংবা উক্ত কাজে লিপ্ত এরূপ সন্দেহজনক কোন ব্যক্তিকে সীমান্ত অতিক্রমকালে আটক করিতে পারিবেন না। উল্লিখিতরূপ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিকটবর্ত্তী কাষ্টম ঘাঁটিতে প্রেরণ করিতে হইবে। শুল্ক বিভাগীয় কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর কেহ তাহার জিনিষপত্র তল্লাসী করিতে পারিবে না। অনুমোদিত প্রত্যেক অফিসারকে যথারীতি 'ব্যাজ' ধারণ করিতে হইবে।

(ঝ) শুল্ক বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে 'ব্যাজ' অথবা পরিচয়পত্র রাখিতে হইবে।

(ঞ) কোন যাত্রী কাষ্টমস সীমান্ত অতিক্রম করিলে পুনরায় তাঁহার গাত্র অথবা জিনিষপত্র তল্লাসী করা হইবে না।

১। পণ্য ও অন্যান্য দ্রব্য

পণ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদির চলাচলের সুবিধার জন্য কমিটি নিম্নোক্ত সুপারিশগুলি পেশ করেন,

(ক) উভয় ডোমিনিয়নকে যথাসম্ভব পরস্পর নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে সমসংখ্যক কাষ্টমস পোষ্ট স্থাপন করিতে হইবে।

(খ) আর্থিক দিক বিবেচনা করিয়া উভয় ডোমিনিয়ন যথাসম্ভব আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক ধার্য্যযোগ্য দ্রব্যের তালিকা হ্রাস করিবেন। সুনির্দিষ্ট কতক দ্রব্য ব্যতীত অপরগুলি শুল্কমুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ইহাতে পচনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা দেখা দিয়াছে তাহা দূরীভূত হইবে।

(গ) উভয় ডোমিনিয়ন অনুরূপভাবে রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণসম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি পুনর্বিবেচনা করিবেন। উভয় ডোমিনিয়নে বর্ত্তমান আমদানীর উপর কোনরূপ শুল্কধার্য্য নাই।

(ঘ) সীমান্তবাসী কোন কৃষক অপর ডোমিনিয়নে চাষ-আবাদ করিলে এবং উৎপন্ন শস্য নিয়ন্ত্রণ তালিকাভুক্ত থাকিলে শস্য সংগৃহীত হইবার পর একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য উক্ত শস্যের একটা অংশ গৃহে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে আইনের কড়াকড়ি যথাসম্ভব হ্রাস করিতে হইবে।

২। মাল চলাচল ব্যবস্থা

(১) অপর ডোমিনিয়নকে মাল চলাচলের সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ডোমিনিয়নকে আন্তর্জাতিক চুক্তির বিধানাবলী অনুযায়ী কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে; (২) চুক্তিবদ্ধ ভাবে চালানী মালের বহির্বিনিময় ব্যবস্থার দরুন পাওনা কিম্বা দেনা হইলে তাহা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাক্রমে যে ডোমিনিয়ন হইতে মাল প্রেরিত হইয়াছে, কিম্বা যে ডোমিনিয়নে প্রেরিত হইয়াছে তাহার উপর বর্ত্তিবে, যে ডোমিনিয়নের ভিতর দিয়া ইহা চলাচল করিবে তাহার উপর নহে; (৩) অন্তত্র প্রেরিত মাল চলাচলেও আভ্যন্তরীণ মাল চলাচল ব্যবস্থার অনুরূপ সুযোগসুবিধা দিতে হইবে; (৪) উভয় ডোমিনিয়নের শুল্ক বিশেষজ্ঞগণ বৈঠকে মিলিত হইয়া ভৌগোলিক অবস্থান ও মাল চলাচলের সুবিধা অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে মাল চলাচলের যথাসম্ভব সহজ ও সরল পন্থা নির্দ্ধারণ করিবেন। বিশেষ দ্রষ্টব্য :—উভয় ডোমিনিয়নের সীমান্তবর্ত্তী ঘাঁটিসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে মাল চলাচল ঘাঁটি স্থাপনের আবশ্যকতা এবং ইতিপূর্ব্বে যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধেও পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে; (৫) শুল্ক ঘাঁটিতে যে ডোমিনিয়ন হইতে মাল প্রেরিত হইয়াছে সেই ডোমিনিয়নের শুল্ক বিভাগীয় অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে। এই মাল অপর ডোমিনিয়ন হইতে আসিয়াছে এরূপ সন্দেহে ইহা অগ্রাহ্য করা চলিবে না; (৬) মাল চলাচলের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার জন্য এবং যাহাতে কোনপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি না হয় তজ্জন্য এক ডোমিনিয়নের অফিসারদিগকে অপর ডোমিনিয়নের অফিসারদের সহিত সহযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ গ্রহণ করিতে হইবে; (৭) যদি কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাহা দূর করিবার জন্য প্রত্যেক ডোমিনিয়নকে অপর ডোমিনিয়নে সর্ব্বসম্মত ব্যবস্থানুযায়ী নির্ব্বাচিত প্রধান প্রধান শুল্ক ঘাঁটিসমূহে ও মাল চলাচল পথের অন্যান্য স্থানে বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসার নিয়োগ করিতে হইবে। এই সব অফিসারকে যাত্রী ও লটবহর চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য কর্ত্তব্যও সম্পাদন করিতে হইবে; (৮) যে সব ক্ষেত্রে শুধু সড়কের পথে কিম্বা জলপথে অথবা অন্য কোনপ্রকার যানবাহনের সাহায্যে সড়কের পথে ও জলপথে মাল চলাচলের ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেই সব ক্ষেত্রে 'আউট এজেন্সী' প্রতিষ্ঠা করিয়া মাল চলাচলের প্রয়োজনীয় সুবিধা করিয়া দিতে হইবে।

৩। যানবাহন

(ক) যানবাহনের উপর যে চাপ পড়িয়াছে তাহা লাঘব করিবার জন্য উভয় ডোমিনিয়নের রেলওয়ে কর্তৃক কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক চুক্তির প্রয়োজন।

ট্রেণযোগে মাল প্রেরণ সম্পর্কে যে সমস্ত অসুবিধা দেখা দিয়াছে ঐগুলি দূর করিবার জন্য পূর্ব্ব অঞ্চলের তিনটি রেলওয়ে এবং পশ্চিম অঞ্চলের রেলওয়ে দুইটির প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গঠন করিতে হইবে। এই কমিটিকে (১) ওয়াগনগুলি যাতায়াতে বিলম্ব, (২) ওয়াগন বরাদ্দ ও ভাড়া নির্দ্ধারণ সম্পর্কে বৈষম্যমূলক ব্যবহার এবং (৩) অগ্রাধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে।

(খ) সমগ্রভাবে উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে ট্রেন ও মালগাড়ী চলাচল সংক্রান্ত বৃহত্তর বিষয়টি সম্পর্কে নীতি নির্দ্ধারণকল্পে একটি আন্তঃ-ডোমিনিয়ন রেলওয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গঠনেরও সুপারিশ জানান যাইতেছে।

(৪) মেরামতের সুযোগ-সুবিধা

আমদানী এবং পুনরায় রপ্তানী সংক্রান্ত নিয়মানুযায়ী সাধারণতঃ যেরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, এক ডোমিনিয়ন হইতে অন্য ডোমিনিয়নে মেরামতের জন্য যন্ত্রপাতি প্রেরণ ও প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যাপারেও তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু শুল্ক আদায় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে যন্ত্রপাতি প্রেরিত হইয়া থাকিলে সে ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়ম প্রয়োগের ব্যাপারে বিশেষ কড়াকড়ি অবলম্বন করা হইবে না এবং তিন মাস পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হইবে।

বিবিধ বিষয়

(ক) স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। এই অবস্থার প্রতীকারকল্পে বিদেশ হইতে আমদানী মালপত্র যাহাতে অন্য ডোমিনিয়নের ক্রেতাদের অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করা যায় তজ্জন্য উভয় ডোমিনিয়নের কর্ত্তৃপক্ষই রপ্তানীর লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে বিশেষ সহানুভূতির সহিত আবেদনপত্রগুলি সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন।

অন্তর্ব্বর্তী সময়ের জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। সাধারণতঃ ১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্ব্বে যে সমস্ত মালপত্র জাহাজযোগে প্রেরিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য মাশুলও প্রদত্ত হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে। এক ডোমিনিয়নের ব্যবসায়িবৃন্দ অন্য ডোমিনিয়নের বন্দরগুলির মারফত আমদানীর উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে কোনও মালপত্রের অর্ডার দিয়া থাকিলে সে ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা চুক্তি অথবা স্বাভাবিক চালান ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে হইবে। যে সমস্ত ব্যক্তি এই ভাবে মালপত্র আমদানীর জন্য অর্ডার দিয়াছে এবং যথারীতি মালপত্রের মূল্য প্রদান করিয়াছে বা করিতে মনস্থ করিয়াছে তাহাদিগকে এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইবে না।

(খ) ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, কমিটির কলিকাতার এই বৈঠকে বাণিজ্য চুক্তির নির্দ্দিষ্ট ধারা নির্দ্ধারণ কল্পে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষ এক্ষণে দুইটি ডোমিনিয়নে বিভক্ত হইয়াছে। যত দিন পর্য্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা ও নীতিসমূহ নির্দ্ধারিত না হইতেছে তত দিনের জন্য দেশ বিভাগের পূর্ব্বের সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থাদির বিচার করতঃ এক ডোমিনিয়ন যাহাতে অন্য ডোমিনিয়নের পক্ষে অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র সরবরাহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই এই কমিটির উদ্দেশ্য। স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় এবং শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়াছে। তৎসম্পর্কেও এই কমিটিকে অবহিত হইতে হইবে। এই অবস্থার ফলে বিশেষভাবে পূর্ব্বাঞ্চলের সাধারণ লোকজনের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। মাছ, টাটকা ফলফুলারি, দুগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, শাকসব্জী এবং জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি প্রাত্যহিক প্রয়োজনের জিনিষপত্রের জন্য এক ডোমিনিয়নভুক্ত কোন কোনও অঞ্চলকে অন্য ডোমিনিয়নের সীমান্ত এলাকার উপর নির্ভর করিতে হয়।

(গ) বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের অভিমতাদি সম্পর্কে বিবেচনান্তে কমিটি টাট্‌কা ফলফুলারি, শাকসব্জী, টাট্‌কা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, হাঁস মুরগী প্রভৃতি ও ডিম্ব, স্থানীয় মসলাপত্র, বাঁশ, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি দ্রব্যাদি এক ডোমিনিয়ন হইতে অন্য ডোমিনিয়নে চালানের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ করিয়া থাকিলে তাহা প্রত্যাহারের সুপারিশ জানাইতেছেন। ইহাদের উপর কোনরূপ শুল্ক ধার্য্য হইয়া থাকিলে তাহাও বাতিল করিতে হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গে সর্ষপ তৈল সরবরাহ সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইয়াছেন। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যেই এই সভার অধিবেশন হইবে। তত দিন পর্য্যন্ত পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ শুল্ক না লইয়া অবাধে পূর্ব্বের ন্যায় মৎস্য (টাট্‌কা ও শুট্‌কী) চালানের অনুমতি দিবেন।

(ঘ) কমিটির অভিমত এই যে, উভয় অঞ্চলের পারস্পরিক অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য উভয়তঃ অত্যাবশ্যক মালপত্র সরবরাহের উদ্দেশ্যে অদূর ভবিষ্যতে উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে এক বা একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে তদ্দ্বারা উভয় ডোমিনিয়নেরই স্বার্থ রক্ষিত হইবে। এইরূপ চুক্তি সম্পাদিত ও কার্য্যে পরিণত হইলে বর্ত্তমানে যে সমস্ত অঞ্চল একাধিক ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বকালীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলা সম্ভবপর হইবে এবং উত্তরোত্তর আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে। এই বিষয়টি ও এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আলোচনার জন্য শীঘ্রই তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। ইতিমধ্যে উভয় ডোমিনিয়নের পক্ষে অত্যাবশ্যক আশু-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কমিটি কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছেন।

(ঙ) ডাক তার ও টেলিফোনের হার:

ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, উপরোক্ত বিষয় এবং এক্সচেঞ্জের মারফত পোষ্ট কার্ড এবং অন্যবিধ পত্রাদি প্রেরণের দরুন

বর্ত্তমানে যেরূপ বিলম্ব ঘটিতেছে উহা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে চিঠিপত্র চলাচল ব্যবস্থার জটিলতা হ্রাস করার প্রশ্ন উভয় ডোমিনিয়নের বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক অতি সত্বর পরীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। এই আলোচনার উদ্যোগ-আয়োজন ইতিমধ্যেই সুরু হইয়াছে। শুল্কের আওতায় পড়ে এরূপ পার্শ্বেলের বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন হইতে পারে।

(চ) অতীতে উভয় ডোমিনিয়নেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি সহ অন্যান্য মালপত্র বে-আইনীভাবে আটক করা হইয়াছে। কমিটি স্বীকার করিতেছেন যে, বর্ত্তমানে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অবিলম্বে এই ধরণের বে-আইনী আটক বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি উভয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ জারী করা প্রয়োজন। স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই যে সকল মাল চালান হইয়াছে সেগুলি মামুলী নিয়মের বিশেষ কড়াকড়ি না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

সংযোগরক্ষা

কমিটি মনে করেন যে, ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং হয়রানি ও সর্ব্বপ্রকার বিলম্বের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য উভয় ডোমিনিয়নের প্রত্যেক স্তরের কর্ম্মচারীদের মধ্যে সংযোগরক্ষা একান্ত আবশ্যক। কাজের চাপ ও ধরণ বুঝিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্পেশ্যাল লিয়াজন অফিসার নিয়োগ ছাড়াও উভয় পক্ষের অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ভারত ও পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের কর্ম্মচারী-দিগকে পরস্পরের সহিত সংযোগ ও সদিচ্ছা রক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সার্থকভাবে কোন চুক্তি বা বিধি পালন করিতে হইলে সর্ব্বস্তরের সরকারী কর্ম্মচারীদের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করিতে হয়। উভয় ডোমিনিয়নের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহাদের অধীন সর্ব্বস্তরের কর্ম্মচারীদের মধ্যে এই মনোভাব জাগ্রত করিবার জন্য প্রয়াসী হইতে হইবে।

পাকিস্থানে মাল চালান

কাষ্টমস ফাঁকি দিয়া পূর্ব্ব পাকিস্থানে বে-আইনী মাল চালান একটি বড় রকমের সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। রাণাঘাট এবং হিঙ্গলগঞ্জ এ বিষয়ে চূড়ান্ত কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। ২৪পরগণা জেলার হাসনাবাদ থানার এলাকাধীন হিঙ্গলগঞ্জ বাজারটি পশ্চিম ও পূর্ব্ব বাংলার সীমান্তে অবস্থিত। এই বাজার হইতে কিছু দিন যাবৎ লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্য প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে নদীর অদূর তীরবর্ত্তী পাকিস্থান অঞ্চলে বে-আইনী ভাবে চালান দেওয়া হইতেছে। এই কার্য্যে পাকিস্থানী চোরাকারবারীদের সহিত সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ ও স্থানীয় বাজার কমিটির বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ সহযোগিতা করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কংগ্রেস-সদস্যের সংখ্যাও কম নয়। হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জে ইছামতী ও কালিন্দী নদী পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রবেশপথ। সেই পথ দিয়া মাল সারা পূর্ব্ববঙ্গে এমন কি আসাম পর্য্যন্ত চলাচল করে। গত ১লা মার্চ্চ হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে শুল্কপ্রাচীর স্থাপিত হওয়ার পর হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জে আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য্যের জন্য কয়েকজন কর্ম্মচারী লইয়া ল্যাণ্ড কাষ্টমস আপিস খোলা হইয়াছে। কিন্তু বসিরহাট মহকুমার সর্ব্বত্র ও হাসনাবাদ-হিঙ্গলগঞ্জে ল্যাণ্ড কাষ্টমসের কর্ম্মচারিগণ, স্থানীয় পুলিস, মহকুমা হাকিম ও কয়েকজন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সহযোগিতায় বা নিষ্ক্রিয়তায় প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ টাকার বস্ত্র, চিনি, সরিষার তৈল, দেশলাই প্রভৃতি অবাধে পাকিস্থানে চলিয়া যাইতেছে। এই বে-আইনী চালানের পিছনে একটি সঙ্ঘবদ্ধ দল কার্য্য করিতেছে। ইহারা যেমন চতুর, তেমনি দুঃসাহসী এবং তেমনি বিত্তশালী ও প্রতিষ্ঠাবান।

দৈনিক ভারতের নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণ হইতে অবস্থার গুরুত্ব খানিকটা উপলব্ধি করা যাইবে। উহার কতকাংশ এইরূপ :—

"কিরূপভাবে এই সকল ব্যবসা চলিতেছে তাহার বিবরণ দিতে গেলে প্রথমেই পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ বিভাগ, দ্বিতীয় বসিরহাট মহকুমা হাকিম, তৃতীয় হিঙ্গলগঞ্জের ল্যাণ্ড কাষ্টম অফিসার, চতুর্থ হাসনাবাদের ল্যাণ্ড কাষ্টম অফিসার, ও দুই-এক জন ছাড়া হাসনাবাদের পুলিসকে ইহার জন্য বিশেষ দায়ী করিতে হয়। ইহা ছাড়া হিঙ্গলগঞ্জের বাজার কমিটির প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী এবং হাসনাবাদ বাজার কমিটির সেক্রেটারী ও কয়েকজন সদস্যের কথা বলিতে হয়। এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হিঙ্গলগঞ্জ বাজার কমিটির প্রেসিডেণ্ট এক জন চিকিৎসা ব্যবসায়ী কিন্তু একণে তাহা ত্যাগ করিয়া তিনি বস্ত্র কারবারীরূপে পরিণত হইয়াছেন। আর হাসনাবাদের বাজার কমিটির সেক্রেটারী এক জন হোটেলওয়ালা এবং অন্যান্য সদস্যগণের মধ্যে উকিল প্রভৃতি আছেন। কিন্তু তাহারাও তাহাদের ব্যবসা ছাড়িয়া লক্ষ লক্ষ টাকা মালের চোরাই কারবার করিতেছে ও প্রচুর মুনাফা খাইতেছে।

প্রত্যহ ৫০।৬০ গাঁইট এবং সপ্তাহে প্রায় ৪ শত গাঁইট বস্ত্র হিঙ্গলগঞ্জে প্রেরিত হয় কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় হিঙ্গলগঞ্জ তো দূরের কথা আশেপাশের ইউনিয়নে একখানি বস্ত্রও পাওয়া যাইবে না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যত বস্ত্র, চিনি ও সরিষার তৈল হিঙ্গলগঞ্জে পাঠানো হইয়াছে তাহাতে সে স্থান ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ইউনিয়নের লোকেরা দৈনিক দুইখানি নূতন বস্ত্র, এক সের চিনি ও এক সের সরিষার তৈল পাইতে পারে।

অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ বিভাগের ১২নং ক্লাইভ স্ট্রীট হইতে ইচ্ছামত পারমিট ইস্যু করা হয় হাসনাবাদ ও অন্যান্য স্থানে বস্ত্র লইয়া

যাইবার জন্ত। তাহাতে দেখিলাম যে দাগী চোরাকারবারীরা—যাহারা জেলে আছে তাহাদের নামেও এখনও পারমিট ইস্থ করা হইতেছে। সেই পারমিটের বলে কাপড় অবাধে লরী ও রেলযোগে হাসনাবাদে আসে ও ল্যাণ্ড কাষ্টম, পুলিস ও বাজার কমিটির সুপারিশে হিঙ্গলগঞ্জে যাইবে এই নামে নৌকায় উঠান হয় ও পাকিস্থানের দিকে পাড়ি দেয়। মাঝে মাঝে কাজ দেখানো হইতেছে মনে করিয়া যদি বা কখনও কোন নৌকা আটকানো হয় তো হিঙ্গলগঞ্জের ল্যাণ্ড কাষ্টম অফিসার আবার আগাইয়া আসিয়া নিজের দায়িত্বে তাহা ছাড়াইয়া লইয়া যান। পুলিসের যিনি সৎ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচিত শুনিলাম তিনি প্রথমে এই সকল অনাচার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাহাতে কিছু পরিমাণ সফলকামও হইয়াছিলেন। কিন্তু বসিরহাটের মহকুমা হাকিমের নির্দ্দেশে তিনি গত ১৩ই মার্চ্চ হইতে কোন কিছু আর করিতে পারিতেছেন না। তাহার ফলে দেখা গেল যেস্থানে দৈনিক ৫।৭ বেল বস্ত্র যাইত সেস্থানে এখন দৈনিক ২০০।৩০০ বেল কাপড়ও চলিয়া যাইতেছে। অনুরূপভাবে সরিষার তৈল ও চিনিও যায়। যাহারা আবার কাষ্টমকে ফাঁকি দিতে চায় তাহারা হাসনাবাদ বাজার কমিটির সাহায্যে রাত্রের অন্ধকারে মাল পরপারে চালান করে। বাজার কমিটির লোকেরা তাহাদের মাল খালাস ও নৌকা ভাড়া পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া দেয়। দেখিলাম মার্টিন রেলে এক জন কুলির সর্দ্দার আমার সম্মুখে ১ ঘণ্টায় ৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করিল।

হাসনাবাদের ল্যাণ্ড কাষ্টম অফিসারকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কি পদ্ধতিতে তিনি মাল ছাড়েন। তিনি একখানি রেলের রসিদ দেখাইলেন। তাহাতে দেখিলাম শুধু পারমিট নম্বর আছে কিন্তু স্থানের উল্লেখ নাই। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন ইহাতেই হইবে এবং তিনি হিঙ্গলগঞ্জের জন্ত সরাসরি সেই মালের পারমিট ইস্থ করেন। আমি বলিলাম যে ইহাতেই যদি হইবে বলিলেন তবে পাকিস্থানে মাল পাঠানোর জন্ত আপনি কেন পারমিট ইস্থ করিতেছেন এবং সে বিষয়ে আপনার ক্ষমতা কতদূর? তিনি নিরুত্তর রহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম হিঙ্গলগঞ্জে কত বস্ত্র যায়। তিনি আমাকে একখানি হিঙ্গলগঞ্জ বাজার কমিটি কর্ত্তৃক তৈয়ারী বস্ত্রব্যবসায়ীর লিষ্ট দেখাইলেন। তাহাতে দেখিলাম চোরাকারবারী বলিয়া শাস্তি প্রাপ্ত ব্যবসায়ী হইতে যাহারা কোনদিন ব্যবসা জানে না তাহাদের নাম পর্য্যন্ত এই তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে এবং রোজই আরও নাম আসিতেছে। সেই তালিকা হইতে দেখা গেল যে, সরকারীভাবেও সপ্তাহে ৪০০ বেল বস্ত্র হিঙ্গলগঞ্জে যায়।

হাসনাবাদ বাজার পাকিস্থানে চালান দেওয়ার জন্ত একটি বিরাট্ ব্যবসায় কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। রাতারাতি পানের দোকান, মুদির দোকান, বাসনের দোকান প্রভৃতি বস্ত্রের দোকানে পরিণত হইয়াছে। এই বাজার ২৪ ঘণ্টার জন্ত খোলা থাকে এবং পাকিস্থানে চালানের জন্ত বাজার কমিটির সুপারিশে অসংখ্য বস্ত্র বিক্রয় হয় এবং রাত্রের অন্ধকারে পাকিস্থানগামী নৌকায় চাপানো হয়।"

সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী ব্রহ্মচারী ভোলানাথও কালিন্দী ও ইছামতী নদী পথে সীমান্তের বে-আইনী চোরাকারবার সম্বন্ধে বহু তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। নদীপথ ভিন্ন রেলপথে এবং যশোর রোড ও কৃষ্ণনগর রোড দিয়াও প্রচুর মাল বে-আইনী ভাবে চালান যাইতেছে। রেলপথে কলিকাতা হইতে বনগ্রাম লাইনে বারাসত, মসলন্দপুর, গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি প্রত্যেক ষ্টেশনে চোরাকারবারীদের এক একটি ঘাঁটি আছে। ইহারা সুযোগ বুঝিয়া যে কোন একটি ঘাঁটিতে মাল নামায় এবং গোপনে সুবিধা মত এক স্থান হইতে অপর স্থানে সরাইয়া অবশেষে পাকিস্থান এলাকায় লইয়া যায়। এই রাস্তার মধ্যে বারাসত ষ্টেশনে ও বারাসতের চাঁপাডাঙ্গার সংযোগস্থল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। এই সংযোগস্থল হইতে তিনটি রাস্তা তিন দিক দিয়া পাকিস্থানে গিয়া পড়িয়াছে। প্রথমটি যশোর রোড, দ্বিতীয়টি বসিরহাট ইটিণ্ডাঘাট রোড এবং তৃতীয়টি কৃষ্ণনগর রোড। এখানে পুলিসের কোন কড়া পাহারা নাই। চোরাকারবারীরা জানে যে একবার মাল লইয়া ভারতীয় ইউনিয়নের সীমানা পার হইতে পারিলেই তাহাদের আর কোন ভাবনা নাই।

ডায়মণ্ডহারবার এবং রাণাঘাটেও এরূপ ঘাঁটি গড়িয়া উঠিতেছে। রাণাঘাটে তিনটি ট্রেন তল্লাসী করিয়া এক দিনে তিন লক্ষ টাকার কাপড় উদ্ধার হইয়াছে। মেলব্যাগে, ট্রেনের জলের ট্যাঙ্কে এবং ট্রেনের তলায় বাঁধা অবস্থায় বহু কাপড় পাওয়া গিয়াছে।

কাষ্টমস ফাঁকি দেওয়া গুরুতর অপরাধ। মুর্শিদাবাদ সীমান্তে বে-আইনী চালান বন্ধ করিবার জন্ত তথাকার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, রাত্রে কারফিউ জারী করিতেও তিনি দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, নদীয়া এবং ২৪পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদ্বয় এবং সংশ্লিষ্ট মহকুমা হাকিমেরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। উচ্চতর অধিকারীদের কথা না বলাই ভাল। কলিকাতা এই সব চালানের মূল কেন্দ্র। কলিকাতার পুলিস কমিশনার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে চোরাকারবার বন্ধ করিবার ক্ষমতা পুলিসের নাই, কারণ পুরনো অর্ডিনান্স বাতিল হইয়া গিয়াছে এবং নূতন বিল আইনে পরিণত হয় নাই। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি ব্ল্যাক-মার্কেট বিল নামে একটি বিল ব্যবস্থা-পরিষদে আনিয়াছিলেন এবং নিরাপত্তা বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্ত ঐ বিল পাস হইতে এক দিন দেরী হওয়ায় বলিয়াছিলেন যে

বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা চোরাকারবারীদের হইয়া বিল পাস হইতে দেরী করাইয়া দিয়াছে। বিলটি পাস হওয়ার পর প্রায় এক মাস তিনি প্রধানমন্ত্রীর গদীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু বিলটিতে গবর্ণরের সম্মতি তিনি লইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রীসভাও তিন মাসের মধ্যে এই কাজটি করেন নাই।

সীমান্তের চোরাকারবারে বাঙালী এবং মারোয়াড়ী ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। সরবরাহ বিভাগ এবং মন্ত্রীসভা এটা জানেন না ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মন্ত্রী বড়বাজারে মারোয়াড়ীদের নিকট সভায় অভিনন্দন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে বলিয়া আসিয়াছেন যে কাপড়ের চোরাকারবার বন্ধ করিবার ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাই। মন্ত্রী মহাশয়ের দুর্ব্বলতার পূর্ণ সুযোগ মারোয়াড়ীরা গ্রহণ করিয়াছে, বোম্বাই ও আমেদাবাদ হইতে গত কয়েক সপ্তাহে এত কাপড় আসিয়াছে যে পশ্চিম-বঙ্গে সাত মাস কাপড়ের বন্যা বহিয়া যাইতে পারিত। অথচ এদিককার লোকে কাপড় দেড় গুণ দাম দিলেও পাইতেছে না। ইহার ফল হইয়াছে এই যে ভারত-সরকার শুল্ক ব্যবস্থা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে কাপড়ের চালান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গের পাঁচ-ছয়টি ঘাঁটিতে কড়া পাহারা বসাইলেই বে-আইনী কারবার বন্ধ হইয়া যায়, তৎসত্ত্বেও তাহা করা হইতেছে না ইহা মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী কাহারও পক্ষে শ্লাঘার বিষয় নহে।

দার্জ্জিলিং-কলিকাতা রেলওয়ে

র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ডে পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং জেলা দুইটিকে মূল ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দার্জ্জিলিং-কলিকাতা রেল লাইনটি ঐ দুই জেলার সহিত কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রধান যোগসূত্র। লালগোলা-মণিহারিঘাট-কাটিহার হইয়া শিলিগুড়ি যাওয়ার একটা রেলপথ আছে বটে, কিন্তু ঐ লাইনে যাওয়া দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং পথে অনেকবার ট্রেন ও ষ্টীমার বদল করিতে হয়। অল্প সময়ে এবং শিলিগুড়িতে একবার মাত্র ট্রেন পরিবর্ত্তন করিয়া আসিবার এই রেলপথটি ভ্রমণযোগ্য থাকা পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এই পথটির অধিকাংশ পূর্ব্ব পাকিস্থানে পড়িলেও উহা ব্যবহারের দাবী পশ্চিম বঙ্গের কিছু কম নয়।

পাকিস্থানের অতি উৎসাহী লীগ চমুদের উপদ্রবে এবং তথাকার সরকারী কর্ম্মচারীদের উপেক্ষা ও নিষ্ক্রিয়তায় দার্জ্জিলিং-কলিকাতা রেলে ভ্রমণ অসুবিধাজনক এবং কখনো কখনো রীতিমত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। রেলযাত্রীদের উপর স্থানীয় লোকেরা যথেচ্ছ উপদ্রব করিতেছে, কোন প্রতিকার পাওয়া যাইতেছে না।

দার্জ্জিলিং মেলে জনৈক অসুস্থ ও প্রায় পঙ্গু বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহার পত্নী ও কন্যা এবং এক জন ডাক্তারসহ কামরা রিজার্ভ করিয়া দার্জ্জিলিং যাইতেছিলেন। পার্ব্বতীপুরের দুই ষ্টেশন আগে কামরার দরজা খুলিবার জন্য বাহিরে কতকগুলি লোক চীৎকার এবং দরজায় ধাক্কাধাক্কি সুরু করে। দরজা খোলা হয় না। পরের ষ্টেশনে আবার ঐ ব্যাপার; তবে এবার দরজার উপর আঘাত আরও সজোরে। গাড়ী ছাড়িবার সময় ইহারা পার্ব্বতীপুরে দেখিয়া লইবে বলিয়া শাসাইয়া যায়। পার্ব্বতীপুরে গাড়ী থামিলে ইহারা দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলে, তাঁহারা দরজা খুলিয়া দেন এবং একদল লোক কামরায় ঢুকিয়া উপদ্রব সুরু করে। অসুস্থ লোক ডাক্তার সঙ্গে লইয়া গাড়ী রিজার্ভ করিয়া যাইতেছেন বলিলেও ইহারা কর্ণপাত করে না। পার্ব্বতীপুর বলিয়া রক্ষা, গোলমাল শুনিয়া রেল কর্ম্মচারীরা আসিয়া বদমায়েস-দের নিবৃত্ত করেন। পথিপার্শ্বস্থ ছোট ষ্টেশনে দরজা খুলিলে কি অবস্থা হইত তাহা অনুমান করা কঠিন নয় এবং তিনটি ষ্টেশনে একই দলের কার্য্য ও কথাবার্ত্তা হইতে বুঝা গিয়াছিল যে ইহারা ঐ ট্রেনেই ভ্রমণ করিতেছিল।

এই উপদ্রব নিবারণের সহজ উপায় আছে। দার্জ্জিলিং মেল, নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস প্রভৃতি যে-সব ট্রেন ভারতীয় ইউনিয়নের একাংশ হইতে অপরাংশে পাকিস্থানের উপর দিয়া যায় সেইগুলিতে কয়েকটি করিয়া প্রথম, দ্বিতীয়, ইণ্টার ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী ইউনিয়নের দুই অংশের যাত্রীদের জন্য রিজার্ভ রাখা যাইতে পারে। ঐ সব গাড়ীতে "শুধু ইউনিয়নের যাত্রীদের জন্য" এইরূপ কোন লেখা থাকা উচিত এবং পাকিস্থানের মধ্যে ঐ যাত্রীদের মালপত্র টানাটানি এবং তাঁহাদের উপর অপর কোন উপদ্রব যাহাতে না হয় তাহা দেখিবার জন্য প্রত্যেক ট্রেনে উভয় ডোমিনিয়নের এক বা দুই জন করিয়া রেল ও পুলিস কর্ম্মচারী থাকা উচিত। কোন গাড়ীতে যাত্রীদের উপর উৎপাত হইতেছে কিনা ইঁহারা প্রত্যেক ষ্টেশনে নামিয়া তাহা দেখিবেন। পাকিস্থান ও ইউনিয়নের মধ্যে যাঁহারা যাওয়া আসা করিবার সময় ষ্টেশনে ষ্টেশনে অন্যায় ভাবে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হন তাঁহাদের হয়রানি ও ক্ষতি নিবারণের জন্য পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন। ইউনিয়নের দুই অংশে মাল-চলাচল সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা যায় এই ভাবে যে ঐ সব মালগাড়ী শীলমোহর করা থাকিবে, পাকিস্থানে কেহ ঐগুলি খুলিতে পারিবে না।

পশ্চিম বঙ্গের সামরিক শিক্ষা

পশ্চিম বঙ্গের তরুণদের সামরিক শিক্ষাদান বিষয়ে কর্তৃ-পক্ষের যে গড়িমসি প্রথম হইতে দেখা যাইতেছিল, তাহা কতকটা দূর হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। পশ্চিম বঙ্গ

এখন সীমান্ত প্রদেশ, সামরিক প্রস্তুতির দিক দিয়া এই প্রদেশ এখন আর উদাসীন থাকিতে পারে না, সীমান্তরক্ষী দল এবং দেশরক্ষী বাহিনী গঠনে যত বিলম্ব হইবে পশ্চিম বঙ্গ তথা নিখিল-ভারতের স্বাধীনতা ও স্বস্তি ততই বিপন্ন হইবে একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। প্রাক্তন মন্ত্রীসভা এ বিষয়ে বিন্দু-মাত্র কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই বরং এরূপ প্রস্তাবকে সন্দেহের চোখেই দেখিয়াছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের গবর্মেণ্ট এই মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু যতটা তৎপর হওয়া উচিত এখনও ততটা হইতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা এদিকে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন এবং এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র।

সীমান্ত রক্ষার জন্য একটি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের ও উহার সৈনিকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের আয়োজন করা হইয়াছে। ডাঃ রায়ের গবর্মেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে সীমান্তের ৩৩০টি গ্রামের প্রত্যেকটি হইতে ২০ জন করিয়া লোক লইয়া ৬৬০০ জনের একটি সীমান্ত রক্ষীবাহিনী গঠিত হইবে। বলা বাহুল্য, স্থানীয় লোক লইয়া গঠিত এরূপ বাহিনী অধিকতর কার্য্যকরী এবং স্বল্পতর ব্যয়সাধ্য হইবে।

বাঙালী সামরিক জাতি নহে এই কথা ইংরেজ আমাদের শিখাইয়া গিয়াছে এবং দুঃখের বিষয় বহু শিক্ষিত বাঙালী এই মিথ্যায় বিশ্বাস করিয়াছেন। ভারতীয় সমর বিভাগে বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠন এবং বাংলার পুলিসে বাঙালী কনেষ্টবল গ্রহণের জন্য যে সব আন্দোলন বিচ্ছিন্ন ভাবে হইয়াছে তাহা বাংলার শিক্ষিত সমাজের সমর্থন কখনও পায় নাই। ফলে সমগ্র ভারতবাসীর মনে এমনই একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে বাঙালী ভীরু, নিজের দেশ ও পরিবার রক্ষায় অক্ষম, আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার জন্য ভিন্ন প্রদেশের সৈনিক ও বিহারী কনেষ্টবলের উপর অসহায় ভাবে নির্ভর করা ভিন্ন তাহার আর কোন উপায় নাই। অথচ এই অপবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইংরেজ আমলেই ক্লাইভের সৈন্যদল কয়টি বাঙালী হিন্দুর নানা সম্প্রদায় হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। ভিন্ন প্রদেশীয় সৈনিক ও বাঙালী সৈনিকে যে প্রভেদ বাঙালী রেজিমেণ্ট এবং বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও গোলন্দাজবাহিনী প্রভৃতিতে গত দুই যুদ্ধে স্পষ্টভাবে দেখা গিয়াছে ইংরেজ তাহা বহু আগেই ধরিতে পারিয়াছিল। ইহা পারিয়াছিল বলিয়াই তাহারা ভারতবাসীকে সামরিক ও অসামরিক এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া বাঙালীকে শেষোক্ত পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তাহাকে সমর বিভাগে অপাংক্তেয় করিয়াছে এবং বাংলার নমঃশূদ্র, বাগদী প্রভৃতি সামরিক সম্প্রদায়গুলিকে অপরাধপ্রবণ জাতি আখ্যা দিয়া Criminal Tribes Act পাস করিয়া উহার বলে উহাদিগকে নিকটবর্ত্তী থানার দারোগার ক্রীতদাস করিয়া রাখিয়াছে। বক্তিয়ার খিলিজীর আগমনের পূর্ব্বে দেবপাল জয় অভিযান করিয়াছিলেন, শশাঙ্কের সামরিক শক্তিও বড় কম ছিল না, ইঁহারা পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সাহায্যে লড়িতেন, বাঙালী সৈনিক তাঁহাদের সৈন্যদলে ছিল না এরূপ কথাও হাস্যকর। আজও কাশ্মীর রণাঙ্গনে অফিসারদের মধ্যে বাঙালী আছেন এবং তাঁহারা উত্তম যোগ্যতার পরিচয় দিতেছেন কিন্তু সেখানে বাঙালী সৈনিক নাই। এটা বাঙালীর দোষ নয়, ইংরেজের নিকট হইতে যে মিথ্যা সামরিক তথ্য বর্ত্তমান ভারত-সরকার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন উহাই তাহার জন্য দায়ী। বাংলার নমঃশূদ্র, পোদ, দুলে, বাগ্দী প্রভৃতি শ্রেণী হইতে লোক সংগ্রহ করিলে বাংলায় বিরাট্ ও সবল সামরিক বাহিনী গড়িয়া উঠিতে পারে। ঝড় জলে বড় বড় নদীবক্ষে মাছ ধরায় ইহারাই বেশী দক্ষ। ইহা হইতে মনে হয় যে চাষবাসের শান্তি-পূর্ণ বৈচিত্র্যহীন জীবন অপেক্ষা বিপৎসঙ্কুল উন্মাদনাপূর্ণ জীবনের প্রতি ইহাদের আকর্ষণ বেশী। সৈনিক এবং নাবিক এই দুইটিই ইহাদের মধ্য হইতে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে। দেশরক্ষা সচিব সর্দ্দার বলদেব সিংহ এবং ডাঃ রায়ের গবর্মেণ্ট বাংলায় সামরিক বাহিনী গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এখানে প্রথমেই দশ হাজারের বাহিনী গঠনের আয়োজনও হইতেছে তন্মধ্যে ছয় হাজার ছাত্র ও চার হাজার বাহিরের যুবক লওয়ার কথা। আমাদের মনে হয় বাংলার ঐ সব স্বাভাবিক সামরিক জাতিগুলি হইতে সৈন্যবাহিনী রক্ষী বাহিনী ও লস্কর গঠিত হইলে তাহাদের আয়ের নূতন পথ খুলিয়া যাইবে এবং দেশেরও মঙ্গল হইবে।

আমাদের দেশের যে কোন পরিকল্পনা রচিত হয় তাহাতে মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেদের সরকারী চাকুরীপ্রাপ্তিই প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠে। ইহাতে দেশের স্থায়ী কল্যাণ হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ডাঃ রায়ের গবর্মেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে বাঙালী তরুণদের নৌবহরের কাজ শিখাইবার জন্য তিনটি নৌ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাদ্বারা সরকারী চাকুরীজীবী অফিসার তৈরি হইবে এটা ঠিক, কিন্তু লস্কর মিলিবে কোথায়? আজও কি ভারতীয় ইউনিয়নকে নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের লস্করদের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে? বাঙালী ব্যবসায়ী চাঁদসদাগর এবং আরও অনেক সদাগর সিংহল, ব্রহ্ম ও বোম্বাই উপকূলের সহিত বাণিজ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের বিরাট সদাগরী নৌবহর বাঙালী নাবিক ও লস্করেরা চালাইয়াছে। বাঙালী নাবিকেরাই দুর্দ্দান্ত পর্ত্তুগীজ জলদস্যু-দের সহিত লড়াই করিয়া নৌবহর রক্ষা করিয়াছে এবং তাহা গন্তব্য স্থলে লইয়া গিয়াছে।

বাঙালীকে সামরিক জাতি হিসাবে গড়িয়া তুলিতে এবং এত লোককে শিক্ষা দিতে সময় লাগিবে। কিন্তু কাজ এখনই আরম্ভ হওয়া দরকার। আর একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ

দেওয়া দরকার। বাঙালীকে কাপুরুষ করিয়া তুলিবার আর মস্ত উপায় ছিল অস্ত্র আইনের কঠোরতা। অস্ত্র ধারণে ও অস্ত্র চালনায় বাঙালীকে দক্ষ এবং সাহসী করিয়া তোলা আবশ্যক। শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোকদের অস্ত্রের লাইসেন্স বেশী করিয়া দিলে তবেই এই অযৌক্তিক ভীতি দূর হইবে। কর্তৃপক্ষের একটা ধারণা আছে যে অস্ত্রের লাইসেন্স বাড়াইলেই বুঝি বা দেশে ডাকাতির বান ডাকিবে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সমস্ত সশস্ত্র ডাকাতি হয় বিনা লাইসেন্সের অস্ত্রের সাহায্যে। উপযুক্ত লোকদের অস্ত্র দিলে হঠাৎ একজন বা অল্প কয়েকজন লোক অস্ত্র বাহির করিয়া ডাকাতি বা ট্রেনে রাহাজানি করিতে সাহস পাইবে না।

হায়দরাবাদে পাগলামি

প্রতিপক্ষের মতিগতি, প্রকৃতি না বুঝিলে তাহার সঙ্গে তর্ক করা যায় না বা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণভাবে করিতে পারা যায় না। মুসলিম লীগের সঙ্গে তর্কে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা সেইজন্য হারিয়া গিয়াছেন। মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল বলিয়া পরিচিত যাঁহারা আমাদের মধ্যে ছিলেন বা আছেন, তাঁহারা মুসলিম সমাজের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস-অনুপ্রেরণা সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত পরিচয় দিতে পারেন নাই। চারি কোটি মুসলমান যাঁহারা কোন অবস্থায়ই "পাকিস্থান" রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে না, তাহারা পাকিস্থান আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছিল কেন, তাহার উত্তর জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ আজ পর্যান্ত দিতে পারিতেছেন না। সেইরূপ হায়দরাবাদ রাজ্যে যে পাগলামি চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ দুঃখ প্রকাশ করিতে পারেন, হাজি কাসিম রাজভীর নিন্দা করিতে পারেন, নিজাম ওছমান আলী খানের নিকট শান্ত হইবার জন্য অনুরোধ-উপরোধ প্রেরণ করিতে পারেন। কিন্তু নিজাম বাহাদুরের ও তাঁহার চেলাচামুণ্ডাদের মতিগতি, প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত থাকিলে, জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ এইরূপ ভাবে বৃথা শ্রম করিতেন না। নিজাম বাহাদুর ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষিত ইত্তেহাদ-উল-মুসলেমিন প্রতিষ্ঠান—মিলিত মুসলিম দল—কতকগুলি বিশ্বাস বা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন। সেই বিশ্বাস বা কুসংস্কার যত দিন তাহাদের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিবে, তত দিন দাক্ষিণাত্যে শান্তি আসিতে পারে না। এই কথাটা ভারতরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে বুঝিতে হইবে, এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ যাঁহারা নিজাম বাহাদুর ও তাঁহার অনুচরবৃন্দের উন্মত্ত কার্য্যাবলীতে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের এই বিশ্বাস বা কুসংস্কারের মূল কথা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তবেই তাঁহারা ভারতরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে সৎপরামর্শ দিতে পারিবেন, এবং নিজামবাহাদুরের রোগের প্রকৃত চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

ভারতরাষ্ট্রের অধিকাংশ মুসলমান যে এই বিষয়ে মাথা ঘামাইতে চান না, তাহার প্রমাণ আছে; তাঁহারা তফাতে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে চান। এই মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে আচার্য্য কৃপালনীর প্রস্তাবের প্রতি-উত্তরে। গত ৩১শে চৈত্র "জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড" দিবসের বার্ষিকী উপলক্ষে দিল্লী নগরীতে এক সভা হয়, এবং আচার্য্য কৃপালনী একটি বক্তৃতা দেন। তাহার মধ্যে এই কথাগুলি ছিল: "ভারতীয় মুসলমানদের কর্ত্তব্য দলে দলে হায়দরাবাদে গিয়া সেখানকার মুসলমাদের প্রধান প্রতিষ্ঠান ইত্তেহাদ উল মুসলেমিন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অত্যাচার ও আতঙ্ক-সৃষ্টির প্রয়াস বন্ধ করা। তাহা না হইলে ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের আনুগত্যের শপথ অর্থহীন হইয়া পড়িবে।" এই কথায় কলিকাতার দুইখানি পাকিস্থানী দৈনিক—ইত্তেহাদ ও আজাদ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। এরূপ উপদেশ নাকি অপমানজনক। স্বাভাবিক বুদ্ধির লোকে মনে করিবে যে হায়দরাবাদ রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান না করিয়া কৃপালনীজী যে এই অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা মন্দের ভাল। কিন্তু উল্টা বুঝিলি রাম—পাকিস্থানী মনের এই বিকার কৃপালনীজীর সদুপদেশও বাঁকা চোখে দেখিবে, হিন্দু মুসলমান পৃথক নেশন এই উদ্ভট তত্ত্বের ক্ষেপামি এত শীঘ্র ভোলা যায় না। হাজি কাসিম রাজভী যে কথা প্রচার করিতেছেন তাহা মুসলিম লীগ প্রচারিত তত্ত্বের রূপান্তর বলিয়াই কি পাকিস্থানী মুসলিমগণ ইহার গায়ে হাত দিতে চান না! নতুবা কৃপালনীজীর উপদেশ ত একটা কর্ত্তব্য পালনের পথ বাহির করিয়া দিয়াছে, যে পথে চলিলে দাক্ষিণাত্যে শান্তি আসিবে। এই পথে ঠিক ভাবে চলিতে হইলে হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসকসম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসক (নিজাম বাহাদুর) ও তাঁহার সিংহাসন রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব ও সাংস্কৃতিক অধিকারের প্রতিভূ ও ধারক মাত্র; সেই প্রভুত্ব ও অধিকার চিরকাল অটুট থাকিবে। এই প্রয়োজনেই শাসনব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সময়ও নিজাম বাহাদুরের প্রভাব ও বিধিদত্ত অধিকার অব্যাহত রাখিতে হইবে। যুগ-যুগান্ত ধরিয়া রাজ্যের মুসলমানগণ যে অধিকার ও সুবিধা রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহা কোনরূপে ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না। প্রায় একুশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯২৭ সনে যখন ইত্তেহাদ-উল-মুসলেমিন প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে তখন ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ইসলাম ধর্ম্ম-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ মৌলানা আবদুর কাদের সিদ্দিকির সভাপতিত্বে এক সভায় এই তত্ত্ব প্রচারিত হয়। এই একুশ বৎসরে তাহা দানা বাঁধিয়া যে রাজনীতিক রূপ ধারণ করিয়াছে,

তাহা এই সমিতির নিম্নলিখিত ঘোষণায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

(1) Monarchy must rule over Hyderabad and be sovereign. The ruler must be a descendant of the Asaf Jahi Dynasty only.
(2) If any change in the constitutional governance of Hyderabad becomes inevitable, nothing which will prejudice the traditional political superiority of Muslims should be done.
(3) Muslims must be in a majority both in the Local Self-Government bodies and in the Legislature.
(5) Urdu must be the official language of the State.
(6) The problem of State srevices being interlinked with the political and cultural superiority of the Muslims and their economic interest, division of the same in proportion to the population is out of the question.

হায়দরাবাদ রাজ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা শতকরা পনর-কুড়ি জনের বেশী নয়; ১ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে ২৫-৩০ লক্ষ। রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়াইবার জন্য শাসক সম্প্রদায়ের চেষ্টার অন্ত নাই। সুদূর দক্ষিণ আরব দেশ হইতে একদল লোক ত আজ দুই শত বৎসর হইতে "বাদশাহী জাতের" পদ লাভ করিয়াছে; দুনিয়ার অগণিত মুসলমান ভাগ্যান্বেষী হায়দরাবাদ রাজ্যে আশ্রয় পায় এবং "নবাবী" করে। এই দাবীদাওয়ার সঙ্গে রাজ্যের অধিকাংশ নরনারীর, ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের, কোন সম্মতি নাই। এই ১ কোটি ৩০ লক্ষের মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ লোক তেলুগু ভাষাভাষী; ৪০ লক্ষ লোক মারাঠি ভাষাভাষী, এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক কানাড়ি ভাষাভাষী। এই অবস্থায় উর্দু ভাষাকে রাজকীয় ভাষা করিবার মধ্যে একটা জোর-জবরদস্তি ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনীতিক প্রাধান্যের জন্য এরূপ একটা মনোবিকারের পরিচয় পাওয়া যায় যাহার লজ্জাজনক প্রকাশ সচরাচর দেখা যায় না। এই মনোবিকারই হায়দরাবাদ রাজ্যে সংঘর্ষের মূল কারণ।

ভারতরাষ্ট্রের আয়ব্যয়ের এক দিক

ভারতরাষ্ট্রের জনসমষ্টির বাৎসরিক আয় মোটামুটি ভাবে ধার্য্য হইয়াছে ৪,৫০০ কোটি টাকায়। এই টাকা ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় ত্রিশ-বত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে—প্রাসাদ-বাসী রাজা মহারাজা শেঠ ও পর্ণকুটিরবাসী এই আয়ের অংশ লইয়া বিলাসিতা ও ক্ষুন্নিবৃত্তির উপকরণ সংগ্রহ করে। কার ভাগে কি পড়ে তাহার হিসাবও একটা আছে। এই আয় হইতে রাষ্ট্রের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার ব্যয়—বহন করিতে হয়। একটিমাত্র খরচের বহর দেখিলে তৎসম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয় ছিল প্রায় ৫৪৷৫৫ কোটি টাকা; অন্যান্য খাতেও এই সামরিক ব্যয় কিছু কিছু ঢুকাইয়া দেওয়া হইত। মোট প্রায় ৬০ কোটি টাকা ছিল। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ছিল প্রায় ১০৪৷৫ কোটি টাকা। আজ সেই আয় ও ব্যয় গিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার তিন গুণে। সামরিক ব্যয় বাবদ ১৩৬ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে ১৯৪৮-৪৯ সনে। এই ব্যয় সংক্ষেপ করা যায় কিনা, তৎসম্বন্ধে কোন চেষ্টা হয় নাই।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কে যে আলোচনা হয়, সেই উপলক্ষে কোন কোন সদস্য অপব্যয় সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীশিব রাও তর্ক তুলেন যে সৈন্য বিভাগের খাতে দেখান হইয়াছে ঘাস জমির জন্য ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার একটা ব্যয়। আজ মোটর গাড়ীর ব্যবহারে এই ঘাসের জমির প্রয়োজন শেষ হইয়াছে বা তাহার প্রয়োজন কমিয়াছে; এবং এই ব্যয়ের ব্যবস্থাও অবান্তর হইয়া পড়িয়াছে। এই উদাহরণ হইতে সামরিক বিভাগের দরাজ হাতে ব্যয়ের একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

কেন্দ্রীয় অর্থসচিব শ্রীসন্মুখম চেট্টি ক্ষমতা হাতে পাইয়াও ইহার প্রতিকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজের বিভাগেই যুদ্ধের পূর্ব্বে উচ্চপদের কর্ম্মচারী সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৩ জন; আজ তাহা ২৪৬ জন। বাণিজ্য বিভাগে ছিল ১১ জন, আজ তাহা ৯৫ জন। সর্দ্দার প্যাটেল যে বিভাগের কর্ত্তা, তাহাতে এরূপ বৃদ্ধি দেখা যায় না; পূর্ব্বে ছিল ৫৬ জন, আজ হইয়াছে ৬৫ জন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় এরূপ আলোচনা যদি শ্রীসন্মুখম চেট্টিকে ব্যয়বাহুল্য সম্বন্ধে একটু সচেতন করে তবে আমরা করদাতারা তৃপ্তিলাভ করিব। বেশী দিন এরূপ অপব্যয় লোকে সহ্য করিবে না।

ধনকুবের ও সরকারী ট্যাক্স

শ্রীসন্মুখম চেট্টি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসচিব। তাঁহার সম্বন্ধে রাজনীতিক মহলে একটা বিরূপ ধারণা আছে। সাম্য-বাদের যুগে তাঁহার মতন লক্ষপতিকে কেন্দ্রীয় অর্থসচিব করিবার জন্য শ্রীজবাহরলাল নেহরু ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নিন্দাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু গত ১১ই চৈত্র কেন্দ্রীয় আইন-সভায় আয় ব্যয় সম্পর্কে নানা আলোচনার উত্তরে তিনি একটা হক কথা বলিয়াছেন।

"যে সৎলোক নিজের দেয় ট্যাক্স ঠিক ঠিক ভাবে দেয়, সে কখনও ধনকুবের হইতে পারে না। আমাদের দেশে লোকে ধনকুবের হইতে পারে অসদুপায় অবলম্বন করিয়া। এই নৈতিক অবনতি একটা পৃথক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের সকলের চিন্তা কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে।"

১৯৪৫ সনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু আহমদনগর দুর্গ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন যে কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের রাস্তায় রাস্তায় যে বাতিদানের ব্যবস্থা আছে সেই স্তম্ভে ঝুলাইয়া দিলে ইহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আজ কুড়ি মাস তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা অল্প-বিস্তর লাভ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে এই রক্ত-শোষক শ্রেণীর কাহাকেও পণ্ডিতজীর মতানুসারে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। তাঁহার অর্থসচিব ইহাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সকলের পরিচিত করিয়া দিয়াছেন।

ভারতবাসীর শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইংরেজ বিশেষজ্ঞ

দিল্লী হইতে ১লা বৈশাখে প্রেরিত নিম্নলিখিত সংবাদটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে :—

"গত আগষ্ট হইতে এ বৎসর (১৯৪৮ সন) মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৪,৫০০ জন ইংরেজকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (শিল্প) গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতবর্ষে এই সর্ব্বপ্রথম পদার্পণ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কারিগর, যান্ত্রিক এবং বাণিজ্য-শিল্পী রহিয়াছে।...

"ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ৩১৫ জন বিশেষজ্ঞ, ১১৬৮ জন শ্রেষ্ঠ কারিগর এবং ৪,০৪৩ জন নিম্নস্তরের কারিগর প্রয়োজন।"

এই সংবাদ পড়িয়া যে কয়েকটি প্রশ্ন মনে উদয় হইল, তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। যে সব পুঁজিপতি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা এই ৪,৫০০ জন ইংরেজ আমদানী করিয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশই ভারতবাসী। হঠাৎ ইঁহাদের ইংরেজ-প্রীতি উথলিয়া উঠিল বলিয়া মনে করা কঠিন ; ইঁহারা কি ভারতবর্ষে এই বিশেষজ্ঞদের মত লোক পাইলেন না বলিয়াই এই লোকদের নিযুক্ত করিয়াছেন ? কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট নিশ্চয়ই এই সংবাদ রাখেন। এই সম্বন্ধে তাঁহাদেরও একটা দায়িত্ব আছে। কারণ সংবাদটির অন্য অংশে দুইটি মন্তব্য আছে, যাহা প্রণিধানযোগ্য—"যে সমস্ত ভারতবাসী কারিগর বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদিগকে কাজ না দিয়া ইউরোপীয় কারিগরদের নিয়োগ করিতেছে।"

"সরকারী মহল মনে করেন ভারতীয় শিল্পপতিরা যদি ভারতীয় কারিগরদের উপযুক্ত কাজ না দেন, তাহা হইলে বিদেশী কারিগরের উপর নির্ভর করার অভ্যাস কমিবে না।"

এই দুইটি মন্তব্য পড়িয়া মনে হয় যে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের শিল্পবিভাগীয় মন্ত্রীর নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হওয়া প্রয়োজন। তাঁহার অনুমতি ছাড়া কোন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, এবং নানা শিল্পের নানা বিভাগে ভারতবাসীর নিয়োগ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই একটা নিয়ম আছে। দিল্লী হইতে প্রেরিত সংবাদে এই সব কথা পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই। আর বেশী দিন দেশের লোকে ইহা সহ্য করিবে না যে, ভারতবর্ষে শিল্প-প্রতিষ্ঠা হইবে অথচ তাহার পরিচালনে ভারতবাসী যোগ্য পদ ও অবসর পাইবে না। "সরকারী মহল" কেবল দুঃখ করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারিবেন না। শিল্পপতিদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া রাখিতে হইবে। আজ যখন রাষ্ট্রের উপর শিল্পপতিদের নানা ভাবে নির্ভর করিতে হয়, তখন তাঁহারা রাষ্ট্রের নীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না। ভারতীয়-করণ ও জাতীয়-করণ আজ ভারতরাষ্ট্রের নীতি। সেই নীতি রক্ষা করিতে হইলে দিল্লী হইতে প্রেরিত সংবাদ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

মার্কিন মুলুকে 'সাজ সাজ' রব

মার্কিন মুলুকে "সাজ সাজ" রব উঠিয়াছে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন দেখিতেছি। দেশের ব্যবস্থাপক সভার সেনেট ও কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে সাময়িকভাবে দেশে সার্ব্বজনীন বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে ; দেশ-রক্ষা বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করিতে হইবে, এবং ১৯ হইতে ২৫ বৎসর বয়সের স্ত্রী-পুরুষকে এই রক্ষি-বাহিনীতে যোগদান করিতে হইবে যদি তাহারা কোন কর্ম্মে নিযুক্ত না থাকে। এই প্রস্তাব-ত্রয়ের স্বপক্ষে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এই যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন: "ইউরোপ খণ্ডের দেশসমূহ আজ বিধ্বস্ত ও দুর্ব্বল। কম্যুনিজম তাহাদের উপর আক্রমণোদ্যত। এই কম্যুনিজমের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আজ আমাদের মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এক কথায় ইহাকে বর্ণনা করা যায়—ইহা পুলিস রাজ ; রাষ্ট্রের দণ্ড সর্ব্বদাই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে দাবাইয়া রাখিতেছে এবং এক কল্পিত শ্রেণী-বিহীন রাষ্ট্রের নামে এক বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। এই বিপদে মার্কিন দেশের কর্ত্তব্য স্পষ্ট—তাহাকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে ; সর্ব্বদা তাহার ক্ষাত্র-শক্তি সুসজ্জিত ও সুসম্বদ্ধ রাখিতে হইবে।" প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের এই ঘোষণার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লোকের মনে আর কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রস্তুতি সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উদ্দিষ্ট। যে কারণেই হউক এই ধারণা সৃষ্ট হইয়াছে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের নেতৃত্বে দুনিয়ার নানা দেশে ধ্বংসমূলক কার্য্য চলিতেছে ; সোভিয়েট রাষ্ট্র তাহার আশ্রিত ও বশংবদ রাষ্ট্রগুলির সাহায্যে তাহার প্রভাব ইউরোপ খণ্ডে বিস্তার করিতে দৃঢ়সংকল্প। এই সংকল্পে বাধা দিতে, এবং এই কার্য্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ যদি কম্যুনিজমের প্রভাব প্রতিপত্তি এই ভাবে প্রসারিত করিতে দেওয়া হয় তবে ব্যক্তির স্বাধীনতা সর্ব্ব দেশে ক্ষুণ্ণ হইবে।

বর্ত্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্র ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দুই পক্ষই পরস্পর পরস্পরকে দোষ দিতেছে। সোভিয়েট পক্ষীয়েরা বলিতেছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্র ধনে-জনে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও সামরিক শক্তির বলে আজ দুনিয়ার উপর প্রভুত্ব স্থাপন ও বিস্তার করিবার দুরাশা পোষণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে তাহাদের এরূপ কোন দুরাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহারা শুধু সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিশ্বজয়ের অভিযানকে ঠেকাইয়া রাখিতে চায়। এই অভিযানের প্রকৃতি জার্ম্মানীর অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। পটসড্যাম নামক বার্লিনের উপনগরীতে ১৯৪৫ সনের মে মাসে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল সোভিয়েট রাষ্ট্র পদে পদে তাহা লঙ্ঘন করিয়াছে। জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক কাঠামো অটুট রাখিবার

প্রতিশ্রুতি তাহার মধ্যে অন্যতম—সেকসন্ ৩, বি ১৪ ধারামতে এইরূপ অঙ্গীকৃত হইয়াছিল। সোভিয়েট রাষ্ট্র পূর্ব্ব জার্ম্মানীতে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে তাহার সঙ্গে আমেরিকা, ব্রিটিশ ও ফরাসী-অধিকৃত জার্ম্মানীর সঙ্গে কোন সঙ্গতি নাই। সেকসন ৩, বি—১৫ (সি) ধারামতে সোভিয়েট রাষ্ট্র অঙ্গীকার করিয়াছিল যে "প্রত্যেক অধিকৃত অঞ্চল হইতে এরূপ ভাবে মালপত্র, শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের আদান প্রদান করিতে হইবে যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানী যথাসম্ভব কম করিতে হইবে।" সোভিয়েট রাষ্ট্র এই বিধান ভঙ্গ করিয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে জার্ম্মানীর শিল্প-প্রস্তুতির কলকারখানা ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ বিজয়ী রাষ্ট্র-মণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইবে। জার্ম্মানীর পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সোভিয়েট রাষ্ট্র অনেক কলকারখানা সরাইয়াছে যাহা এই নিয়ম বিরুদ্ধ।

এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাষ্ট্র উতোর গাইতেছে এবং দুই পক্ষের তর্কের ধূম্রজাল ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া কঠিন। সোভিয়েট রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্থান সংকীর্ণ, সেখানে একনায়কত্ব অপ্রতিহত। এই বিপদ আজ বিশ্বব্যাপী সমস্যায় পরিণত হইয়াছে, এবং আমাদের রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণকল্পে এই বিপদকে একেবারে তুচ্ছ করা যায় না। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু আজ এই রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার। তাঁহার বিভিন্ন ঘোষণা পড়িয়া মনে হয় যে আমরা তফাতে দাঁড়াইয়া এই বিপদ সম্বন্ধে এক প্রকার উদাসীন থাকিতে পারিব। সোভিয়েট রাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বন্দ্বে এই প্রকার মনোভাব সম্ভব কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিয়াছে। বলা হইতেছে যে আমাদের একপক্ষ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। সে কোন্ পক্ষ? হঠাৎ, শেষ মুহূর্ত্তে তাহা স্থির করা কি সম্ভব? এবং বেশী দিন এই দ্বিধার ভাবের প্রশ্রয় দিলে কি আমাদের রাষ্ট্রের স্বার্থ হানি হইবে না? অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে বিশ্বজগৎ ১৯৩৮-'৩৯ সনের অবস্থায় ফিরিয়া যাইতেছে। সেই দুই বৎসরে চেকো-স্লোভাকিয়ার ভাগ্যবিড়ম্বনা আরম্ভ হইয়া দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। দশ বৎসর পরে সেই চেকো-স্লোভাকিয়ার ভাগ্য লইয়া আবার কৌতুক আরম্ভ হইয়াছে।

কম্যুনিজমের শতবার্ষিকী

একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রায় এই মাসে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এন্‌জেল্‌স কম্যুনিষ্ট প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। সেই প্রচারপত্রের মুখবন্ধে বিদ্রোহের আহ্বান ছিল।

> "এক অশরীরী ক্ষোভ ইউরোপের আকাশ বাতাসে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে; সেই ক্ষোভ ভাষা পাইবার চেষ্টা করিতেছে এই প্রচারপত্রে; সেই ক্ষোভ সংহত হইতেছে কম্যুনিষ্ট সংঘে। এই ক্ষোভ ও সংঘকে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য ইউরোপখণ্ডের সব প্রাচীনপন্থী শক্তি সংঘবদ্ধ হইতেছে। রোমের পোপ, রাশিয়ার জার, অষ্ট্রিয়ার মেটারনিক, ফ্রান্সের গিজো, ও জার্ম্মানীর পুলিস ও গোয়েন্দা, ফ্রান্সের উগ্র উদারনৈতিকগণ দল বাঁধিয়া প্রস্তুত হইতেছে।"

এক শত বৎসরের মধ্যে কম্যুনিষ্ট ভাব ও আদর্শ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জারের রাশিয়া আজ কম্যুনিষ্ট দলের শাসনব্যবস্থার দাপটে নূতন সাম্রাজ্যবাদের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই দলের এক নূতন বিশ্বাসের ধারকরূপে যে দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছিল, এক শত বৎসর পূর্ব্বেও তাহার মধ্যে মানুষের নৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি কোন শ্রদ্ধা ছিল না; ব্যষ্টির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে একটা আক্রোশের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কারণ যুগে যুগে এই ব্যষ্টি নিজকে বঞ্চিত হইতে দিয়াছে এবং নিজে জনগণকে বঞ্চনা করিয়াছে। এই ব্যষ্টির নৈতিক বোধ-শক্তির উপর শ্রদ্ধা থাকিলে কম্যুনিজম এতটা নিষ্ঠুর হইতে পারিত না, নির্ম্মম হস্তে এরূপভাবে দুই কোটি লোককে ধ্বংস করিতে পারিত না যেমন করিয়াছিল ১৯১৭ সন হইতে ১৯২৭ সনের, এই দশ বৎসরের মধ্যে। এই নিষ্ঠুরতার পক্ষে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে তার ফলে শত কোটি লোকের শরীর-মন মুক্ত হইয়াছে; এবং এই মুক্ত মানুষ এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করিতেছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে চলিয়াছে সংহারলীলা। কার্ল মার্কস বলিয়াছিলেন, "নিষ্ঠুরভাবে সকল সমাজব্যবস্থা ও চিন্তাপ্রণালীর দোষ উদ্ঘাটন করিতে হইবে।" কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার প্রতি উত্তরে যে আক্রোশের সৃষ্টি হয়, তাহা ত আজ লুকাইয়া রাখিবার উপায় নাই। কার্ল মার্কস এক শত বৎসর পূর্ব্বে পোপ ও জারের বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগোষ্ঠী আজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ধনিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করিতেছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহারা ত নূতন কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। হিংসার প্রতিদানে হিংসাই বাড়িয়া চলিয়াছে। মানবপ্রকৃতি কম্যুনিজমের কল্যাণে ত কোন বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন লাভ করিতে পারিল না।

"উদ্বোধন" পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী

১৩০৫ সালের ১লা মাঘ স্বামী বিবেকানন্দ কল্পিত ও স্বামী ত্রিগুণাতীত সম্পাদিত এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। গত মাসে ইহার ৫০ বৎসর পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে একটি বিশেষ সংখ্যার আয়োজন করিয়া স্বামী সুন্দরানন্দ বর্ত্তমান যুগের পাঠকবর্গের নিকট পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা পরিচয় দিয়াছেন। বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ লেখকগণ এই বিশেষ সংখ্যায় তাঁহাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ত্তমান ও অতীত যুগের অনেক সমস্যার কথা আলোচনা করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক পল্লীবাসী ব্রাহ্মণের দেহ অবলম্বন করিয়া ভারতের ভাগ্য-বিধাতা এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন, এই কথা জগদ্বিদিত। ফেরঙ্গ সভ্যতা সাধনার, শাসনের ও শোষণের চাপে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা তখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, ফেরঙ্গ ভাবধারায় যখন আমাদের পূর্ব্বজগণ অকূলে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তখন দেশের হৃদয়-মন নিশ্চেষ্ট ছিল বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। "ইয়ং বেঙ্গল" "ইয়ং বোম্বাই" নূতন উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছিল সত্য কিন্তু সে সময়েও ভারতপন্থী, আত্মবিশ্বাসী লোক অপ্রতুল ছিলেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় যে "তত্ত্ববোধিনী" গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই উপনিষৎ সাধনার ধারকগণ তাঁহার প্রমাণ। শুনিয়াছি "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা হিন্দি, উর্দ্দু, তেলুগু, তামিল ও মরাঠি ভাষার মাধ্যমেও প্রচারিত হইত। এইরূপ প্রচারের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দেশে যে নবজাগরণের সূচনা হয়, তার মধ্যে আমরা পাই কেশবচন্দ্র সেনকে, বঙ্কিমচন্দ্রকে, সর সৈয়দ আহম্মদকে, আর্য্যসমাজের প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দকে, থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটিকে।

এই সময়েই পরমহংসদেব প্রায় অলক্ষ্যে ভারতবর্ষের নব সংগঠনে আসিয়া যোগদান করিলেন; এঁদের পুত্র নরেন্দ্রনাথ নিলেন সন্ন্যাস কিন্তু ভারতবর্ষে করিলেন রজোগুণের ক্ষাত্র ভাবের প্রবর্ত্তন। ইহার প্রেরণা তিনি পাইয়াছিলেন কামারপুকুরের এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণের নিকটে।

"উদ্বোধন" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা "পাঁচ মিশালীর" ভাণ্ডার করিতে গিয়া পাঠকবর্গের এ বিষয়ে আশা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। যে সংস্কৃতি ও সাধনার তিনি ধারক উনবিংশ শতাব্দীর ভারত ইতিহাসে তাহার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। তুলনামূলক সমালোচনায় তাহা নির্ণীত হইতে পারে। এরূপ আলোচনার চেষ্টা বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা খুব কমই পাইলাম। স্বামী বিবেকানন্দ যে শক্তির আধার ও কেন্দ্র ছিলেন, তাহার রূপ ও গতিপ্রকৃতি কতটা উনবিংশতির ভাব-সংঘাতের সৃষ্টি, কতটা পরমহংসদেবের সঙ্গগুণের ফল, তাহা না বুঝিলে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্ভব ও কর্ম্মপ্রবাহের প্রকৃত মাহাত্ম্য নির্ণয় করা সহজ নয়।

আমাদের অতৃপ্তির কারণ বলিলাম। তৃপ্তি যাহা পাইয়াছি তাহাও বলা উচিত। "উদ্বোধনের" প্রথম সংখ্যায় বিবেকানন্দ যে প্রবন্ধ লিখেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া সম্পাদক মহাশয় আমাদের এক বিরাট্ পুরুষের সম্মুখীন করিয়াছেন; বাংলা ভাষা তাঁহার হাতে খড়্গের মতন খেলা করিয়াছিল, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের নিবেদিতা-চরিত-কথা সুলিখিত; তাঁহারা এই আইরিশ তনয়ার ভারত-ভক্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন অনবদ্য ভাষায়। কিন্তু নিবেদিতার যোদ্ধৃভাব এক বাংলাদেশের বিপ্লব আন্দোলনে তাঁহার সহযোগিতার কথা আজও অনুক্ত রহিয়া গেল। "ভারতের মর্ম্মবাণী" প্রবন্ধে যে আদর্শের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাই জগতের রক্ষার একমাত্র উপায়। নচিকেতার উপাখ্যান একটা সাধনার ইতিহাস—ব্যক্তির নয়; একটা জাতির।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

একজন চিন্তানায়ক ও সংগঠক মরজগৎ হইতে চলিয়া গেলেন। পরিণত বয়সে—৮৫ বৎসর বয়সে—তাঁহার তিরোধান হইল। গত পঁচিশ বৎসর তিনি কাশীবাস করিতেছিলেন, এবং কাশীতেই তাঁহার দেহরক্ষা হইল। বর্ত্তমান যুগের কম বাঙালীই সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কর্ম্মকথা জানেন। কারণ তিনি পলিটিশিয়ান ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেইরূপ স্রষ্টা যাঁহাদের কর্ম্মফলে সমাজজীবনে যে নবজীবনের নানা শক্তির উদ্ভব হয়, যাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রনৈতিকগণ জনগণের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্তি দান করেন, তাদের দুর্গতিমোচনে চেষ্টা করেন। সতীশচন্দ্র সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যখন ভারতবর্ষের চিন্তাজগতে আত্মসম্মানবোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে, যখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপ্লুনকার, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও আলীগড়ের সৈয়দ আহম্মদ নূতন চিন্তাধারা ও নূতন কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন তিনি এবং ইঁহারা যে নব-ভারতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার সেবায় এই আজীবন ব্রহ্মচারী নীরবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তুলনামূলক সমালোচনা করিবার সাহস সতীশচন্দ্রের ছিল এবং এই সমালোচনার যন্ত্র ছিল "ডন" (Dawn) নামক পত্রিকা। এই পত্রিকার সাহায্যে দেশের লোকের মধ্যে জাতীয়তার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ থাকিত। সতীশচন্দ্রের কাজ অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে, সেই যুগের ছাত্রসমাজে শ্রেষ্ঠ জনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তাঁহার শিষ্যেরাই গবেষকরূপে ভারত ইতিহাসের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই "জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ" সংগঠনে অগ্রণী ছিলেন। সেই পরিষদের নানা কল্পনার ভগ্নাংশ আমরা আজ দেখিতে পাই যাদবপুর বিজ্ঞান কলেজে। ১৯১২ সনের পরে সতীশচন্দ্র কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। যে আদর্শের প্রেরণায় তিনি ভাব, চিন্তা ও কর্ম্মে সন্ন্যাসী ছিলেন, তাহা ফুটিবার আয়োজন তিনি দেখিয়া গেলেন। এই সান্ত্বনা তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তকে দীপ্ত করিয়াছিল।

নঈ তালিম

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

পশ্চিম বঙ্গ সরকার বহু আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষা-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন; দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন রহিয়াছে ইহার পিছনে। রাজনৈতিক জীবনের নূতন পরিপ্রেক্ষিতে নূতন সমাজ ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে নূতন আদর্শ ও উদ্যমের প্রয়োজন। বহু দিনের শোষিত নিপীড়িত নবজাগ্রত দেশে জাতির জাগরণকে কল্যাণকর ধারায় প্রবাহিত করিতে, দেশকে অর্থে সম্পদে, জ্ঞানে গৌরবে মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে যোগ্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন আবশ্যক। লোকায়ত্ত গবর্ণমেণ্ট জনগণের মঙ্গলের প্রতি অবহিত হইয়াছেন, ইহা এক বিপুল সম্ভাবনাময় নবযুগের সূচনা করিতেছে।

স্বাধীন পশ্চিম বাংলার প্রথম মন্ত্রিসভা অর্থাৎ ডাঃ ঘোষের মন্ত্রিসভা এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অচলায়তনে নাড়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁহারা বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহার আয়োজন হিসাবে শিক্ষকের বনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা সুরু হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীকর্তৃক পরিকল্পিত বনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি মুসলিম লীগের শাসনকালে বাংলাদেশে গৃহীত হয় নাই। ভারতের কংগ্রেসশাসিত প্রদেশসমূহে ইহার পরীক্ষামূলক প্রবর্তন হইয়াছিল। তাহার ফলাফল দেখিয়া এই নূতন শিক্ষাপ্রণালীর দোষগুণ বিচার করিতে হইবে। বাংলাদেশে বনিয়াদী শিক্ষা সরকারীভাবে গৃহীত না হওয়ায় ইহার প্রতি এত দিন জনসাধারণের খুব বেশী কৌতূহল জাগ্রত হয় নাই। বর্তমানে যখন এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের আয়োজন হইতেছে তখন ইহার স্বরূপ কি এবং অন্যান্য প্রদেশে ইহাতে কিরূপ সুফল পাওয়া গিয়াছে তাহা জানা দরকার।

আমাদের বন্ধ্যা প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিকারকল্পে বনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভব। শিক্ষার এই বন্ধ্যাত্ব ও ব্যর্থতার প্রধান কারণ—ইহার মধ্যে দেশের পক্ষে কল্যাণ-কর—মানুষ তৈয়ার করার উপযোগী কোন বলিষ্ঠ আদর্শ নাই; দ্বিতীয় কারণ—অর্থাভাবে প্রাথমিক শিক্ষা এতদিন নিদারুণভাবে অবহেলিত হইয়া আসিয়াছে। সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলভিত্তি যে প্রাথমিক শিক্ষার উপর এই পরম সত্যটি উপেক্ষিত হওয়ায় শিক্ষা-ইমারতের বনিয়াদ কাঁচা গাঁথুনি দিয়া বালুর উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গম্বুজে শ্বেত পাথরের উপর মীনা এবং চুনির কাজ করার প্রয়াস চলিয়াছে। সার্থক শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান অন্তরায়—অর্থাভাব ও আদর্শের অভাব। গান্ধীজী বাস্তব কর্মপ্রণালীর মধ্য দিয়া এই অভাব দুটি দূর করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। বনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ মহাত্মাজীর জীবন-দর্শনের সঙ্গে জড়িত। তিনি গড়িয়া তুলিতে চান সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে স্বাধীন, সবল সুস্থ, কর্মক্ষম নাগরিকদের—যাহারা পারস্পরিক সহযোগিতায় শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ রচনা করিবে, নিজেদের সুপ্ত শক্তির বিকাশ ঘটাইয়া জীবনকে শ্রীমণ্ডিত ও দেশকে সম্পদভূষিত করিবে। গান্ধীজীর সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আদর্শ এই নূতন শিক্ষার ভিতর দিয়া তিনি রূপায়িত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

বনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা, কোন শিল্পকাজের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা। ইহাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলিলে ভুল করা হইবে। সাত বৎসরের জন্য যে পাঠক্রম নির্ধারিত হইয়াছে তাহাতে ইতিহাস, ভূগোল, ব্যবহারিক গণিত, মাতৃভাষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান প্রবেশিকা-মানের বেশী ছাড়া কম হইবে না; ইংরেজীর পরিবর্তে ছাত্রগণ হিন্দী শিখিবে। শিক্ষাক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়, নিছক জ্ঞানবারিপায়ী অপেক্ষা স্বচেষ্টায় সক্রিয় শিক্ষাগ্রহণ-কারী বিদ্যার্থী যে মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর উপর অধিকতর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত তাহা শিক্ষাবিদ্গণকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। শিশুকে বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলা শিক্ষার উদ্দেশ্য; তাহার মানসিক বৃত্তিগুলির পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি ও ব্যবহারিক কাজে পটুতা অর্জন করাও শিক্ষার অন্তর্গত। এদেশে শিক্ষিত-মহলে কায়িক শ্রমকে অবজ্ঞা করিয়া মানসিক শ্রমকে উচ্চ স্থান দেওয়ার ফলে যে ভ্রান্ত ও অকল্যাণকর আত্মাভিমানের সৃষ্টি হইয়াছে গান্ধীজী তাহা মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়া-ছেন। এ বিষয়ে নঈ তালিম তাঁহার সহায়ক।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিলে বনিয়াদী শিক্ষার স্বয়ং-সম্পূর্ণতার নীতিগ্রহণ পরিকল্পনা-রচয়িতার বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশের—ব্রিটেনের—শিক্ষা-কাঠামোর অনুকরণে যে শিক্ষাসৌধের পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা চিন্তায় সুখকর হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সার্জেণ্ট-পরিকল্পনার

হিসাবমত বাংলাদেশের শিক্ষার বার্ষিক খরচ ধরা হইয়াছে ৫৭ কোটি টাকা, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৪০ কোটি! যেখানে শিক্ষা বাবদ ৩ কোটি টাকার কম খরচ হইতেছে সেখানে ৫৭ কোটি খরচ বরাদ্দ ধরিলে জনসাধারণের বা রাষ্ট্রের আয়ের পরিমাণ শুধু শিক্ষার জন্যই ১৯ গুণ বাড়াইতে হয়। ইহা ছাড়াও জাতিগঠনের, দেশরক্ষার, এবং দেশের ধনসম্পদবৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় আরও কত বিষয়ে সরকারকে অবহিত হইতে হইবে। স্বর্গের অমৃতফল আর পারিজাত-মন্দার কুসুমের জন্য ঊর্দ্ধমুখে প্রতীক্ষা করিয়া না থাকিয়া মহাত্মাজী নিজের কুটিরসংলগ্ন ভূমিখণ্ডে দেশী ফলফুলের আবাদ করার পক্ষপাতী। তিনি বলিয়াছেন: আমার মধ্যে ভাববিলাসীর সঙ্গে একজন বাস্তববাদী মানুষও রহিয়াছে। নিজের জীবন-দর্শনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের কোটি কোটি বালকবালিকার প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা সমাধানের পথ নির্দ্দেশ তিনি করিয়াছেন। অর্থাভাবের দরুন শিক্ষাব্যবস্থা অচল থাকিবে ইহা তিনি মানিয়া লইতে রাজী নন।

গান্ধীজী প্রস্তাবিত মূলনীতি অবলম্বন করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদগণ যে শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠক্রম রচনা করিয়াছেন তাহা বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত হয় এবং শিক্ষকের শিক্ষণ ও ছাত্রদের নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সুরু হয়। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের ফলে অর্থাৎ কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলে আমলাতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বনিয়াদী শিক্ষা সরকারের সহানুভূতি ও সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হয়। কোন কোন স্থানে সরকার বনিয়াদী বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিলেও জনসাধারণ নিজেদের চেষ্টায় তাহা চালু রাখে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে অবস্থিত একটি রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া বনিয়াদী শিক্ষার ভাগ্যে অনুগ্রহ-নিগ্রহ, আদর-উপেক্ষা উভয়ই জুটিয়াছে। পরিকল্পনা-রচয়িতার ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্য ইহার পক্ষে প্রথমে অনুকূল পরিবেশ রচিত হইলেও নূতন শিক্ষাপ্রণালীকে নিজের প্রাণশক্তি ও গুণাবলীর উপর নির্ভর করিয়া অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে দিল্লীতে বনিয়াদী শিক্ষার দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহার উদ্বোধন করেন এবং সভাপতিত্ব করেন ডক্টর জাকির হোসেন। বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, কাশ্মীর এবং বেসরকারী বনিয়াদী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে এক শতের অধিক শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাবিদ্ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। তিন দিনব্যাপী অধিবেশন চলে; প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—বনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্য, শিল্পকার্য্যের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার সংযোগ সাধনের উপায় ও শিক্ষকের শিক্ষণ। নিম্নলিখিত মন্তব্যটি সম্মেলনে গৃহীত হয়,—

গবর্ণমেণ্ট এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ও ব্যক্তিগত চেষ্টায় যে সকল বনিয়াদী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে তাহাদের বিবরণীতে প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে যে, ছাত্রদের সাধারণ স্বাস্থ্য, আচরণ এবং শিক্ষার উন্নতি আশাপ্রদ। বনিয়াদী শিক্ষালয়ের ছাত্রগণ অধিকতর কার্য্যক্ষম, প্রফুল্ল, স্বাবলম্বনশীল; তাহাদের আত্মপ্রকাশের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, সহযোগিতামূলক অভ্যাসে তাহারা অভ্যস্ত হইতেছে এবং সামাজিক কুসংস্কার ভাঙিয়া পড়িতেছে। নূতন আদর্শ এবং নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যে নূতন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার প্রথম অবস্থার অসুবিধাগুলি বিবেচনা করিলে ভবিষ্যতে ইহা হইতে আরও অধিকতর সুফল লাভের আশা করা যায়।

একটি বনিয়াদী শিক্ষা বিশেষজ্ঞ সমিতি বিহারে ২৭টি বনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ছাত্রদের নৈতিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতির মাত্রা নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তাঁহাদের বিবরণ চিত্তাকর্ষক। বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে যে সকল গুণের স্ফুরণ আশা করা যায় বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে এই নূতন শিক্ষার স্বরূপ অনেকখানি বুঝা যাইবে।

বনিয়াদী শিক্ষার প্রথম ফল হইবে হস্তশিল্পে ছাত্রের নিপুণতা, তাহার ক্রিয়াকুশলতা বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয় ফল—উপর হইতে চাপানো শৃঙ্খলাবোধের পরিবর্তে কাজের মধ্য দিয়া শৃঙ্খলা-জ্ঞানের পরিস্ফুরণ; তৃতীয় ফল—বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ; চতুর্থ ফল—সপ্রতিভ ও সক্রিয় অভ্যাসগঠন। আলস্য পরিহার করিয়া ছাত্রগণ দৈহিক এবং মানসিক শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া উঠিবে; পঞ্চম ফল—সুশৃঙ্খলভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাজ করিবার অভ্যাস; ষষ্ঠ ফল—কাজে আনন্দলাভ করিবার ক্ষমতা; সপ্তম ফল—কৌতূহল জাগ্রত করা, অনুসন্ধিৎসা এবং পর্য্যবেক্ষণশক্তি বাড়ানো; অষ্টম ফল—ছাত্রদের সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা; নবম ফল—সহযোগিতা ও সেবার অনুপ্রেরণা লাভ।

বিশেষজ্ঞ সমিতি বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে উল্লিখিত গুণের অধিকাংশই দেখিতে পাইয়াছেন—কোনটি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, কোনটি সবে সুরু হইয়াছে। তাঁহাদের মতে দৈহিক পরিচ্ছন্নতা, সুশৃঙ্খল সপ্রতিভ আচরণ ও কথাবার্ত্তা বলা—এ সব বিষয়ে বনিয়াদী

বিদ্যালয়ের ছাত্র সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্র অপেক্ষা অনেক অগ্রসর।

পাটনা ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিহারের চম্পারণ জেলার বেতিয়া থানায় বনিয়াদী এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অধীত বিদ্যার তুলনা-মূলক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। উভয়বিধ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ চার বৎসর কাল একই রকম পরিবেশে, শুধু ভিন্ন পদ্ধতিতে, শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। পরীক্ষার বিষয় ছিল সাহিত্য পাঠ, লিখন, গণিত, সামাজিক পাঠ, সাধারণ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান। পরীক্ষক তাঁহার বিবরণীর উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

"আমার পর্যাবেক্ষণ হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, একই অঞ্চলের ছাত্রগণ বনিয়াদী বিদ্যালয়ে চার বৎসরে যাহা শিক্ষা করিয়াছে তাহা সেখানকার সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অপেক্ষা অনেক বেশী। মৌখিক পাঠ, প্রাথমিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যনীতি ও সামাজিক পাঠ বিষয়ে এই অগ্রগতি আরও অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে।"

আগষ্ট আন্দোলনের 'পর কারাগারের বাহিরে আসিয়া গান্ধীজী বনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োগ-ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিলেন। বালক-বালিকা উভয়ের শিক্ষার জন্য যে পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন তাহা শুধু শিশুর শিক্ষা-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া শিশুর অশিক্ষিত পিতামাতাকে জ্ঞানালোক দানের দায়িত্বও তাহার উপর অর্পণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:

"আমাদের বর্তমান সাফল্যেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিব না। শিশুদিগের গৃহে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে; তাহাদের পিতামাতাকে শিক্ষিত করিতে হইবে। বনিয়াদী শিক্ষাকে প্রকৃতই সমগ্র জীবনের শিক্ষা হইতে হইবে।... এখন ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের মধ্যেই আমাদের এই শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়; নঈ তালিম বা নূতন শিক্ষার প্রয়োগ-ক্ষেত্র শিশুর মাতৃগর্ভ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমগ্র জীবনে প্রসারিত হইয়াছে।

এই নঈ তালিম অর্থের উপর নির্ভরশীল নয়। এ শিক্ষার খরচ শিক্ষা-প্রক্রিয়া হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে যতই বিরূপ সমালোচনা হোক না কেন আমি জানি যে, যে শিক্ষা আর্থিক দিক দিয়া স্বাবলম্বনশীল তাহাই সত্যকার শিক্ষা। এ আদর্শ নূতন এবং বৈপ্লবিক, কিন্তু ইহার জন্য আমি লজ্জিত নই। তোমরা যদি কাজ করিতে পার, তোমরা যদি প্রমাণ করিতে পার যে, মনের বিকাশসাধনের ইহা সত্যকার পথ তাহা হইলে যাহারা আজ আমাদিকে বিদ্রূপ করিতেছে তাহারাই এক দিন আমাদের প্রশংসায় মুখর হইবে, নঈ তালিম সার্বজনীনভাবে গৃহীত হইবে এবং যে সাত লক্ষ গ্রাম আমাদের ব্যাপক দারিদ্র্যের চিহ্নস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে তাহা আমাদের সমৃদ্ধির আকর হইয়া উঠিবে। এই সমৃদ্ধি বাহির হইতে আসিতে পারে না, ভিতরের দিক হইতে ইহা গড়িয়া তুলিতে হইবে। নঈ তালিমের ইহাই লক্ষ্য, ইহার কম কিছু নয়।"*

আমাদের বর্তমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছায়া নাই; কাজেই ইহা ছাত্রের ব্যক্তিত্ববিকাশে বিশেষ সহায়তা করে না। গান্ধীজীর কথায় বলিতে গেলে—বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য, সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ; 'ইহার আদর্শ হইল এমন এক নূতন পৃথিবী রচনা যেখানে জাতি বা বর্ণভেদ থাকিবে না, যাহা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতাপূর্ণ এবং অহিংসা যার ভিত্তি।'

ভারতের রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে, স্বরাজ-সাধনার পথে গান্ধীজীর দান যেমন মহান, নবভারত রচনায় নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তোলার ব্যাপারেও তাঁহার চিন্তার আলোক তেমনি কল্যাণ-পথের নির্দেশ দিয়াছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মহাত্মাজী পরিকল্পিত শিক্ষা-প্রণালীর মিল নাই, ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের শিক্ষাপ্রণালীও ইহার অনুরূপ আদর্শে গঠিত হয় নাই; কেননা জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, মানবের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতনতা গান্ধীজীর যেমন, অন্যান্য রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের তেমন নয়। বিদেশী দ্রব্যমাত্রেরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্বদেশজাত জিনিষের অপকৃষ্টতাবোধ যাঁহাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে তাঁহারা নবশিক্ষাপ্রণালীকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। বিদেশের চাকচিক্য ও আড়ম্বরে তাঁহাদের চক্ষু মুগ্ধ ও মন মোহগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ভারতের আদর্শ, ভারতের বৈশিষ্ট্য, ইহার ঐতিহ্য, ইহার সমস্যা স্বতন্ত্র। গান্ধীজীর শিক্ষা-ধারার আলোচনা-প্রসঙ্গে রোমাঁ রোলাঁ বলিয়াছেন,—

"নূতন ভারত গড়িয়া তুলিতে হইলে ভারতের মাল-মশলা হইতেই এক নূতন আত্মা গড়িয়া তুলিতে হইবে—যে আত্মা হইবে নিপাদ শক্তিমান। এই আত্মাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে চাই ত্যাগী ঋষিতুল্য মানবের একটি বাহিনী—যেমনটি ছিল খ্রীষ্টের।"

নঈ তালিম বা বনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এক নূতন প্রাণবান সমাজ গড়িয়া তোলার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ শিক্ষাপ্রণালী পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করিয়া যে ফল

---

* Eighth Annual Report of Nai Talim 1938-45. p 23

লাভ করা গিয়াছে তাহাতে আরও ব্যাপক প্রয়োগে অধিকতর সুফল আশা করা যায়। শিশুর উচ্চতর জ্ঞান লাভে এবং সুপ্ত-মানসিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না করিয়া বনিয়াদী শিক্ষাকে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যেভাবে জুড়িয়া দিবার প্রস্তাব সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায় করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। নিম্ন ও উচ্চ বনিয়াদী শিক্ষাক্রমের দুই ভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্য ছাত্র নির্বাচন, সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে জীবন্ত আদর্শ সঞ্চার ও আন্তরিকতার সহিত ইহার অনুসরণ ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিবে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নঈ তালিমের ব্যবহারিক প্রয়োগের সুফল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন,—

"আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নঈ তালিম যুগান্তর আনয়ন করিতে সক্ষম। তবে ইহার নূতন পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সহিত আমাদের দেশে অধুনা প্রচলিত পুরাতন ভাবধারার সামঞ্জস্য বিধান করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য।"*

জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রেই শ্রেয় ও প্রেয়কে লাভ করা সহজসাধ্য নয়। জাতীয় জীবনের শ্রেয়োলাভের সাধনা কঠিন হইলেও, দুঃসাধ্য হইলেও, দায়িত্ব পরিহার করিয়া সহজতর পথ বাছিয়া লইলে আমাদের মানসিক দুর্বলতা ও অযোগ্যতারই পরিচয় দেওয়া হইবে। যে পথ কল্যাণের পথ বলিয়া নির্ধারিত হয় তাহা দুস্তর হইলেও নিষ্ঠার সহিত অনুসরণীয়।

*শিক্ষক—পৌষ, ১৩৫৪

নব বর্ষের নবীন সূর্যোদয়

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কৈশোরে আর যৌবনে যার গাহিয়াছি জয়গান,
শুধু যার কথা ভাবিতে ভাবিতে ভরিয়া উঠেছে প্রাণ,
জন্ম জন্ম দেশে দেশে যার করেছি অন্বেষণ,
মন্দিরে যারে স্থাপন করিতে করেছি জীবনপণ;
মঙ্গলঘট সাজায়ে রেখেছি; হয়ে অনন্যমনা
করিয়াছি ধ্যান; হৃদয়-রক্তে আঁকিয়াছি আলিপনা;
যুগযুগান্ত কেটে গেছে, তবু তুমি সে আসিবে জানি,
আশার বার্তা শুনেছি চিত্তে, শুনেছি আকাশবাণী,
স্পর্শে তোমার সার্থক হবে আমার জন্মভূমি,
তুমি আসিয়াছ, তবু ভাবি আজ, এ তুমি কি সেই তুমি?

তুমি স্বাধীনতা? তোমারি কীর্তি ঘোষিছে কাব্যে গানে?
দেখিতে তোমার স্বরূপ, শুধুই চেয়েছি প্রতীচী পানে।
গণি শতাব্দী, বর্ষ ও মাস, পল-অনুপল গণি,
সারা-এসিয়ার নব-জাগরণে শুনি তব আগমনী।
মহাসমরের মরণ-যজ্ঞে করি তব সন্ধান,
পৃথিবীর মহা-ধ্বংসলীলায় শুনি তব আহ্বান।
তুমি চিরদিন অধিষ্ঠিত কি বিশ্বের বেদনায়?
সুখ-সন্ধানী যারা তারা বুঝি তোর নাহি দেখা পায়।
জাগরে-স্বপনে জীবনে-মরণে বহেছি বিপুল ব্যথা,
হে চির-এষিতা তুমি এলে আজ, তুমি সেই স্বাধীনতা?

এ কি রূপে তুমি দেখা দিলে আজ? কেন এ ছদ্মবেশ?
কল্পনা কেন পেলে না মূর্তি? স্বপ্নের এ কি শেষ!
দিকে দিকে দিকে দাবানল-শিখা, বঙ্গ দ্বিখণ্ডিতা,
কাশ্মীর হ'ল ধ্বস্ত শ্রীহীন, পঞ্জাবে জ্বলে চিতা।
বিভীষিকা-ভরা পল্লী-নগরে উঠিছে আর্তনাদ,
মানুষের তরে মানুষ পেতেছে মানুষ-মারার ফাঁদ।
ছয় সহস্র বর্ষের কই সিন্ধুর সভ্যতা?
ক্রীড়া-তরবারি কে আস্ফালিছে হায়দ্রাবাদের হোথা?
তোমারে লইয়া করে হানাহানি তোমারি পূজারীদল,
তুমি এলে, তবু এলো না কো কেন শান্তি সুমঙ্গল?

সুরু হোক তবে নূতন এষণা, যাত্রা নূতন পথে;
প্রাচীন অতীত মিলে যায় যেথা নবীন ভবিষ্যতে
সেই নব যুগে, দীপ্ত তোমার দিব্য মূর্তি ধরি'
হে অভয়া এস; দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দাও দেবী, দূর করি।
হৃদয়ে হৃদয়ে অগ্নি জ্বালাও, উজ্জ্বল তার শিখা
দূর করে দিক্ বহ্নুৎসবে সব গ্লানি বিভীষিকা।
যে মায়ামন্ত্রে ভুলালে সকলি, সে মন্ত্রে দাও ডাক,
সেই আহ্বানে-শঙ্কা এবং সংশয় ঘুচে যাক;
সব মালিন্য মুছে যাক, আজ করুক জ্যোতির্ময়
এ নব জীবনে নব-বর্ষের নবীন সূর্যোদয়।

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২১

সুনীতি করের বাড়ীর কাছে মোটর থামিয়ে প্রশান্ত গাড়ীর দুয়ার খুলতে না খুলতে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল বাড়ীর ভিতর থেকে। মেয়েটির চলার ভঙ্গি পরিচিত—অথচ পিছন ফিরে পথ চলাতে এর মুখ দেখা যাচ্ছে না। প্রশান্ত না নেমে ড্রাইভারকে বললে, ওই মেয়েটির পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে চালাও গাড়ী। হর্ন দেবার দরকার নেই।

গাড়ী পাশে আসতেই মেয়েটি একটু সরে চাইলে সে দিকে। সন্দেহ ভঞ্জন হ'ল।

শুভা।

শুভা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসলে, কমরেড প্রশান্ত! ব্যাপার কি?

বলছি। আসবে গাড়ীতে?

শুভা বললে, নিশ্চয়। কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা—! বলতে বলতে গাড়ীর দরজা খুলে প্রশান্তর পাশে বসে পড়ে হাসলে, আর—তোমার গাড়ীখানা ছোট বটে—বসার ব্যবস্থা চমৎকার।

প্রশান্ত বললে, আমার খবর বোধ হচ্ছে কিছু কিছু জান।

কিছু না—সময় আমার এতই কম যে বন্ধুরা কে কোথায় কেমন আছেন জানবার বা জানাবার ফুরসৎ পাই নে।

প্রশান্ত বললে, একটু সময় মানুষের হাতে থাকা ভাল নয় কি?

কি জানি! শুভা তার পানে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। পরে বললে, তুমি তো দেখছি ভালই আছ। আর তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে খানিকটা সময় বাড়তি না থাকলে মানুষ ভালই থাকতে পারে না!

প্রশান্ত ওর কটাক্ষপাতকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে বললে, ভাল থাকা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার।

নিশ্চয়! শুভা কণ্ঠে জোর দিলে।

অথচ তোমাকে দেখলে তা মনে হয় না, শুভা।

জন্মগত অধিকার কিংবা জন্মান্তরগত সুকৃতি অর্থাৎ ভাগ্য সকলের তো সমান নয় কমরেড।

প্রশান্ত স্বরে জোর দিয়ে বললে, তুমি পরিহাস করলেও অস্বীকার করবে না যে চেষ্টার দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা মানুষ অবস্থার উন্নতি করতে পারে।

তা কেন করব—বাঃ রে! দৃষ্টান্ত দেখেও না বোঝে যারা—

যাই বল শুভা—ধন থাকাটা মানুষের অন্যায় নয়, কাউকে বঞ্চিত বা লাঞ্ছিত না করে যে উপার্জ্জন—

শুভা বললে, তোমার মোটরে বসে তোমার যুক্তি খণ্ডন করব এতটা নিরেট নই আমি।

প্রশান্ত বললে, এ ভাবে উপার্জ্জনকে অন্যায় বলবে তবু?

শুভা বললে, ব্যক্তিগত ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের বাদানুবাদ চলবে না কমরেড। তোমার ধন আছে ব্যাঙ্কে—দয়া আছে মনে—সবাইকে সুখী করে সুখী হতে চাও—বেশ তো। ব্যক্তিটা তুমি ভাল—তবু কতটুকু তুমি! তুমি পুঁজি-বাদকে ভাল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গলাতে পারবে না—

তোমরাও চেষ্টা কর না কেন এই ভাবে।

কমরেড—তুমি বুদ্ধিমান্ হয়ে এমন প্রস্তাব করবে ভাবি নি। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম লোকেরে শিখায়'—সব কাজের এই হ'ল মূল নীতি। বড় খাঁটি কথা।

প্রশান্ত বললে, তা বলে—

শুভা বললে, তর্ক করব না—কমরেড। যে গুরুমশাই হুঁকো টানতে টানতে ছাত্রদের তামাক সেবনের অপ-কারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, তাঁর বক্তৃতাকে কি বলবে তুমি?

কিছুই বলব না। তাঁর আচরণটা অভ্যাসগত কিন্তু অভিপ্রায়টি নিঃসন্দেহে মহৎ।

শুভা বললে, ছাত্ররা অল্প বুদ্ধি—আর অনুকরণপটু, আমাদের মত বুনো আর সাধু হলে—অবশ্য

প্রশান্ত বললে, চল, একটা ভাল রেষ্টুরেন্টে বসা যাক। এভাবে কথা কাটাকাটি করে তোমাকে বোঝাতে পারব না।

চল। কিন্তু পেটে কিছু পড়লেই মাথার গোলযোগ থামবে—আশা করো না।

অভিজাত শ্রেণীর একটা রেষ্টুরেন্টে পর্দ্দানশীন হয়ে বসলে দু'জনে। চা এল—আনুষঙ্গিক এল এবং সেগুলির সদ্ব্যবহারের জন্য কাউকে অনুরোধ করতে হ'ল না। খাওয়া চলল অত্যন্ত সহজ ভাবে—আর সেই কারণেই আলাপের স্রোত আটকে গেল। মোটরের গতির তালে—পাশাপাশি বসে যে কথা সহজে বলা যেত—নিশ্চল চেয়ারে মুখোমুখি বসে তার সূত্র কিছুতেই টানা গেল না। মনে হ'ল কথা শেষ হয়ে গেছে। দুই বিপরীত স্রোত এক জায়গায় মিলেছে—একটুখানির জন্য—আবার তারা বিপরীত গতি নেবে। তাদের মিলনে যে শব্দ উঠছে তা প্রীতিসম্ভাষণ নয়—পথের কথাও নয়—ওটা সংঘাতই। অনৈক্যজাত সংঘাত—শব্দটাকে প্রতিবাদ বলাই শোভন বা সঙ্গত।

খাওয়া শেষ হলে—অকস্মাৎ প্রশান্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। সিগারেট বার করে বললে, তোমার অসুবিধা হবে না তো?

শুভা বললে, আগে তো হয় নি—

প্রশান্তর রক্ত এই প্রত্যুত্তরে দ্রুত প্রবাহিত হ'ল। সিগারেট রেখে ও শুভার একখানি হাত চেপে ধরে কোমল কণ্ঠে বললে, আগের কথা সব তোমার মনে আছে?

শুভা বললে, আছে কিছু কিছু।

আমি কি ভালবাসি—না বাসি—

কমরেড বড্ড আপসেট হয়ে গেছ। আগের কথা মনে থাকলেই ভাবাবেগে ভেসে যাওয়া চলবে না। হাত ছাড়াবার চেষ্টা মাত্রও করলে না।

ঘরের আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। হাতের উত্তাপে ভাষা সঞ্চার করবার চেষ্টা করলে না প্রশান্ত। ধরা না-দেবার লীলায় তার প্রকাশ সহজ হয় সুন্দর হয়। বিনা বাধায় তাই বোধ হচ্ছে নিরুত্তাপ—বিস্বাদ। একটি নিশ্বাস মোচন করে ও শুভার হাতখানা ছেড়ে দিলে।

শুভা সহজ ভাবেই বললে, আরও কিছু অর্ডার দেবে—না বিল মিটিয়ে বেরিয়ে পড়বে?

কি খাবে বল? নিরুৎসুক স্বরে প্রশান্ত প্রশ্ন করলে।

একটু হাওয়া—ফ্যানের নয় প্রকৃতির। বলে শুভা হাসলে।

বিল মিটিয়ে বাইরে এল প্রশান্ত। বললে, তোমায় পৌঁছে দেব ঠিকানায়?

ধন্যবাদ। ট্রাম বাস যা হয় একটা পেয়ে যাব।

ও পিছন ফিরতেই প্রশান্ত নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগল। শুভা তাকে কি ভাবলে? নিবিড় সঙ্গ পাবার জন্য ওর এই আকুল কামনাকে কি চাটুবাদ বলে উপেক্ষা করলে শুভা? আর পাঁচ জনের মত সে-ও কি শুভার কাছে সাধারণ আলাপিত একজন! তাঁদের অন্তরঙ্গতায় কোন দিন কি অনুরাগ-সিক্ত কৌতূহল ভেসে ওঠে নি? নিকটে টানবার আয়োজনের মধ্যে ছিল দেহগত আকর্ষণ—স্থূল মাংস-কামনার আবেগ?

না—সোজা উত্তর চায় সে। দলগত নীতি—বা সমাজ-গত বাধা···কিংবা ভালমন্দ মনে করা-করির সঙ্কোচ এসব একপাশে ঠেলে একটি মাত্র সহজ সোজা প্রশ্ন করবে ওঁকে—হৃদয়-দৌর্ব্বল্য বা আবেগ-উচ্ছ্বাস যাই বলুক—একটি মাত্র প্রশ্ন করবে—ভালবাস আমাকে?

মোটরের জানালা দিয়ে পিছন দিকে চাইলে প্রশান্ত। শহরের রাজপথে মানুষের আর যানবাহনের ঢেউ ঘন হয়ে উঠছে—চেনা মানুষের কূলে দৃষ্টিকে ভেড়ানো দুঃসাধ্য বটে।

কয়েকখানা জরুরি চিঠির মধ্যে—একখানি এসেছে বাড়ি থেকে। উপার্জ্জনের ভেলায় চড়ে আবার সে স্নেহ-নদীর উপকূলে এসে পৌঁছেছে। বাবা তূষ্ণীভাব অবলম্বন করে থাকলেও চোখের দৃষ্টিতে স্বস্তির ভাব—মা তো আনন্দে চোখের জল ফেলে ভগবানকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সংসারের জোয়ালে পাকাপাকি ভাবে জুড়ে দেবার পরামর্শ ওঁরা বহুদিন থেকেই আঁটছেন—তবে লাখ কথায় নিধি মেলানোর যোগাযোগ সহজে তো আসে না। আজকের চিঠিটায় বিয়ের কথা নেই—আছে বিপত্তির কথা। কলকাতা-নোয়াখালি-বিহারের প্রতিক্রিয়া ওদের গ্রামেতেও সুরু হয়েছে। ভয়াবহ রকম কিছু ঘটে নি—তবে যে কোন মুহূর্ত্তে কিছু ঘটাও বিচিত্র নয়। প্রতিবেশীরা পরস্পর সন্দেহাকুল হয়ে বিনিদ্র রাত্রিযাপন করতে আরম্ভ করেছে। দুই পাড়ার সীমানা থেকে যথাসম্ভব লোকজন ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছে। গরু ছাগল বাসন-কোসন—সঞ্চিত চাল ডাল আর মেয়েছেলে সরে যাচ্ছে পাড়ার ভিতরে। কোলাহল-মুখরিত বাড়িগুলি দিনে রাত্রিতে খাঁ-খাঁ করে। চুরি হবার ভয়ে রাত্রিতে যে-কেউ একজন বাড়ির লোক শূন্যবাড়িতে শুয়ে থাকে। দিনের বেলায় দেখা হলে এ ওকে শুধোয়, আচ্ছা ভাই—কারা এসব করছে বলতে পারিস?

ভাই মাথা চুলকে বলে, নইলে কলিকাল আর বলেছে কেন!

কালের দোহাই দিয়ে আসল সমস্যা এড়ানো যায় না—রাত জেগে জেগে দু'পক্ষই বহুতর গুজব সংগ্রহ ক'রে আর দিনে দিনে তা মনের অন্ধকারে মাকড়সার জালের মত সূতাতন্তু বিস্তার করে চলে। নানাবিধ মারাত্মক অস্ত্র—হাত-বোমা বর্শা এসিড রামদাও লাঠি তীর ধনুক কিনা সংগ্রহ করছে এরা। অগ্নিগর্ভ অরণি কাষ্ঠে সামান্য ঘর্ষণ মাত্রই দাবানল জ্বলে উঠবে।

বাড়িটা ওদের প্রান্তদেশে—তাই এত কথা পত্রে জানিয়েছেন মা। প্রশান্ত যেন শীঘ্র এসে তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।

সেইদিন সন্ধ্যাকালেই প্রশান্ত বাড়ি রওনা হ'ল।

২২

বাহ্যত গ্রামখানি আগেকার মতই আছে—মানুষের মুখে ভাসছে উদ্বেগ। বর্গীর হাঙ্গামার কথা কেউ বইয়ে পড়েছে—কেউবা গল্প শুনেছে—কেউ কেউ শোনেই নি—অথচ মনে হচ্ছে তেমনতর দুর্দ্দিনই বুঝি সমাগত। তারা এসেছিল বাইরে থেকে···দিনের কার্য্যতালিকায় আর রাত্রির নিদ্রায় সর্ব্বক্ষণ-ব্যাপী ব্যাঘাত দিতে পারে নি—এ হ'ল কি? 'সসর্পে চ গৃহে বাসে'র মত লাগছে গ্রামখানিকে।

পথের দু'জায়গায় দেখলে গরুর গাড়ীতে মাল বোঝাই হচ্ছে। ছেলেতে বুড়োতে টানাটানি করে ট্রাঙ্ক থলে বোঝাই বাসন আরও কি সব জিনিস গলিপথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভিন্ন পাড়ায়—নিরাপদ স্থানে এও চোখে পড়ল। এই ভাবে পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে সব?

প্রশান্ত গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই পাড়ার যুবক ছেলেরা ছুটে এল। বললে, আপনি এলেন—তবু সাহস হ'ল আমাদের।

বৈঠকখানায় এসে বললে, এ পাড়ার চাঁদা বিশেষ কিছুই ওঠে নি—মালপত্তরও যোগাড় নেই। আপনি এসেছেন—ব্যবস্থা করে যান।

প্রশান্ত বললে, রিলিফ ফাণ্ড খুলছ নাকি।

রিলিফ ফাণ্ডই বটে। বলে কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে ফিস্ ফিস্ করে কি বললে।

প্রশান্ত বলল, এই ভাবে বাঁচবে! ছি!

কি করব—ম্যাজিষ্ট্রেট বন্দুক জমা দেবার হুকুম দিয়েছেন, কেউ বাড়ি চড়াও হলে আত্মরক্ষা করব কি দিয়ে!

যাতে আত্মরক্ষার প্রয়োজন না হয় তেমন ব্যবস্থা কর নি কেন। দু'পক্ষ মিলে—

আজ্ঞে পিস কমিটি একটি আছে—তবে তাতে বিশ্বাস কারও নেই। লোক দেখানো কখনো বারোয়ারি তলায়, কখনো দরগা তলায় তার মিটিং বসে—বক্তৃতা হয় কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত!

এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে দুম্ করে একটা পট্কা ফাটার শব্দ হ'ল। দক্ষিণ দিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে দুম্ দুম্ করে গোটা দুই শব্দ উঠল।

যুবকটি বললে, শুনছেন তো—বোমার আওয়াজ। রাত ভোরই শুনবেন আওয়াজ।

সুতরাং এখানে শান্তির কথা বলা নিরর্থক। দু'পক্ষের এত আয়োজন—শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে না পৌছে কি নিরস্ত হবে! তাই মুখে হুমকি আর বিনয়—প্যাঁচ কষাকষির কৌশল ছাড়া কিছু নয়। গত মহাযুদ্ধের আগে এগুলি পোষাক বদল করে রাজনীতির ক্ষেত্র কর্ষণ করে নি কি!

প্রশান্ত বললে, ওবেলা কথা বলব তোমাদের সঙ্গে।

মায়ের পায়ে প্রণাম সেরে বাবাকে দেখতে গেল। তিনি বেশির ভাগ সময় শুয়েই কাটান। শরীরে মেদ বেড়েছে—মনটাও কেমন যেন বিক্ষিপ্ত। কোন কথার যোগসূত্র টেনে রাখতে পারেন না।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন?

দুর্গামোহন ললাটে তর্জ্জনী ঠেকিয়ে হাসলেন। বললেন, গাঁয়ের কথা শুনেছ সব?

শুনেছি। আপনি কি কলকাতায় যেতে চান?

কলকাতায়? কেন? সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন। না-না তোমার গর্ভধারিণীকে আর বোনটিকে নিয়ে যাও—আমি কোথাও যেতে পারব না।

আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে?

কেন—ভগবান নেই! তিনি করবেন সব। বলতে বলতে শব্দ করে হেসে উঠলেন, তোমরা বিশ্বাস কর না কিছুই—কিন্তু তিনিই সব করান—আমরা নিমিত্তমাত্র।

প্রশান্তর ইচ্ছা নয় গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বিভীষিকা বাড়ায়। সে আর কোন কথা বললে না এ সম্বন্ধে।

বিরাজমোহিনী বললেন—ওঁর ভয় বাড়ি ছাড়লেই এখানকার ইট কাঠ কিছুই থাকবে না। কিন্তু বাবা—আপনি বাঁচলে তবে তো বিষয়সম্পত্তি। মথুরার মাও তো যাব যাব করছে। উত্তুর পাড়ায় জিনিষপত্তর সব পাঠিয়ে দিয়েছে—চেষ্টা করছে একখানা বাড়ি ভাড়া নেবার। ওরা চলে গেলে পাড়ায় আর রইলই বা কে! কার ভরসায় থাকব বল?

মাকে আশ্বস্ত করে প্রশান্ত বললে—সব ঠিক হয়ে যাবে—ভেব না মা! ভয় করলেই ভয়।

মা বললেন—তুই এসেছিস—যা ভাল ব্যবস্থা হয়—কর্।

জলযোগ করে সে বেরিয়ে পড়ল পাড়ায়। বহুক্ষণ ধরে এ পাড়া ও পাড়া ঘুরল—হিন্দু মুসলমান বহু লোকের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলাপ করলে। দুই দলই ভীত-সন্ত্রস্ত। রাজনীতির জটিল বিষয় এরা বুঝতে চায় না—দলগত প্রীতি-বিদ্বেষেও বিচলিত নয়। ব্যক্তিগত সুখদুঃখ—ব্যবসায়গত লাভক্ষতি বা সমাজগত দুর্নীতি অপবাদ এইটুকুতেই ওরা কাঁদে—আনন্দ করে—উত্তেজিত হয়। বহুকাল পাশাপাশি বাস করে—কখনও গালাগালি—কখনও মাথা ফাটাফাটি হয়ে গেছে—আবার একদিল হয়ে গলাগলি করার সুযোগও এসেছে অচিরাৎ। ঝগড়াবিবাদের মধ্য দিয়ে যে ব্যবধান গড়ে ওঠে—তার তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন নয়—কিন্তু এই আকস্মিক বিভেদ—এর মাথা মুণ্ড খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। প্রায় সবাই বলছে—এমনটা হ'ল কেন বাবু?

প্রশান্ত মাতব্বর লোকদের কাছে গেল। এঁদের কেউ কেউ শান্তি কমিটিতে আছেন।

বললে—আপনারা এক কাজ করুন। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ছেড়ে দিন।

সবাই অবাক হয়ে বললেন—সে কি—গান্ধীজী পর্য্যন্ত বলেছেন—

প্রশান্ত হাসলে। বললে, আপদ বাড়িয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তিনি দেন নি। অস্ত্রশস্ত্র বাড়িয়ে যদি শান্তিরক্ষা চলতো তো এত বড় যুদ্ধটা হ'ত না।

মিছেই যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা। তার কথায় সায় দিলেন কেউ কেউ—কেউ বা বললেন—তুমি ছেলেমানুষ—কতটুকু জান জগতের। স্বয়ং ভগবান্ জীবজন্তুদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন—আর মানুষকে বলেছেন—কিছু করো না—পড়ে পড়ে মার খাও!

অন্য পক্ষেরও ঐ কথা। বললে—ওরা কলকাতা থেকে গুণ্ডা আনিয়েছে—সে দিন বাজারে দেখলাম ইয়া গালপাট্টা—মুখখানা ঢাকা—এদেশে কোন দিন দেখি নি ওদের—

দু'দলকে এক করে আলোচনা চালাবার চেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল। যাঁরা রটনা করছেন রঙ ফলিয়ে—তাঁরা দূরেই রইলেন —যারা এক জায়গায় মিললেন—তাঁরা বললেন—ঠিক কথাই তো—এ ভাবে মানুষ বাস করতে পারে পাশাপাশি? মিটমাট করে ফেলাই উচিত।

কিন্তু মিটমাট করবে কে! কোন পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে কেউ এগিয়ে এলেন না। বললেন—ওরে বাবা, একলার কি সাধ্যি আমার!

বুড়োরা বললে—ছেলেরা মানে না আমাদের।

ছেলেরা বললে—বুড়োদের মত উস্‌কানি দিতে দ্বিতীয় কেউ নেই—ওদের সবান আগে পিস কমিটি থেকে।

সুতরাং ক'দিন চেষ্টা করেও গ্রামের অবস্থা উন্নত করা গেল না।

পুলিসের পাহারা বসেছে—একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারী হয়েছে—তবু ভয় আর সন্দেহ ঘুচছে না মন থেকে।

নন্তু ঠাকুরদার চণ্ডীমণ্ডপে আজকাল ভীড় বেশী। বুড়ো-বুড়ীরা দু'বেলা এসে সাধছে—চলুন রায় মশায়—দুর্গা শ্রীহরি বলে বেরিয়ে পড়া যাক। যা খরচপত্তর লাগে আমরা দেব। যে ক'টি দিন আছি, অশান্তি সহ্য হয় না—তবু মনের শান্তিতে ঠাকুরদেবতা দেখে বেড়ানো যাবে।

ঠাকুরদা হেসে বলেছেন—এমনি করেই পরীক্ষা করেন ভগবান্। ভয় দেখিয়ে বলেন—ওরে আমি আছি, আছি। সম্পদে কে আর তাঁকে ডাকে বল।

প্রশান্তকে দেখে বললেন, কি দাদু শান্তির দূতিয়ালী নিয়ে নাকি!

না দাদু—এ যুগের দূতিয়ালী ভোল বদলেছে, সে কালের মন গলানো কথা মনের বাইরেই পড়ে থাকে।

দাদু বললেন—যা বলেছিস নাতি—লাখ কথার এক কথা। আমরা কেষ্টযাত্রা দেখে কেঁদে বুক ভাসিয়েছি—তোরা এক কথায় তা ডিস্‌মিস্ করে রায় দিস্—রাবিশ। আমাদের কালে মন ছিল বুকে—তোদের মন উঠেছে মগজে। তোদের নিস্তার নেই।

প্রশান্ত বললে—তা তো দেখতেই পাচ্ছি দাদু। কিন্তু ফ্যাসাদ এই—এ কালে তোমরাও রয়েছ—আমরাও রয়েছি—মাঝখানে কোন বাঁধন নেই।

দাদু বললেন—বাঁধন দেবার চেষ্টা কর—

না দাদু, চেষ্টা করে ফল হবে না। জগতে বার বার যত অশান্তি দেখা দিয়েছে—তার কোনটিই তো চেষ্টার দ্বারা শেষ হ'ল না। যুদ্ধের কারণ সবাই জানে—যুদ্ধের কুফল সবাই বোঝে—অথচ যথানিয়মে যুদ্ধে যোগও দিচ্ছে সকলে। কেন এমন হয়?

দাদু বললেন—তোদের রাজনীতিটিতি বুঝি না ভাই—তবে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্ত বার বার যে যুদ্ধ হ'ল ত্রেতায় —দ্বাপরে—তার মূল কথা হ'ল দুষ্কৃতের বিনাশ। এক দুষ্কৃত বিনাশ হলে অন্ত দুষ্কৃত যে জন্মবে না এমন কথা নয়—তাই সম্ভবামি যুগে যুগে। এই হচ্ছে জগতের সৃষ্টিলীলা।

তোমার সৃষ্টিলীলাকে প্রণাম করি দাদু—।

দাদু হাসলেন—তোমাদের কল্যাণ-বুদ্ধি দিয়েও এ অমঙ্গলকে ঠেকাতে পারছ না তো ভাই—

আমাদের চেষ্টাকে শেষ চেষ্টা মনে করো না দাদু—

দূর বোকা—তা মনে করলে তাঁর সৃষ্টির রইল কি? সৃষ্টিতত্ত্ব যত সোজা মনে করিস তা নয়।

প্রশান্ত বললে—সৃষ্টিতত্ত্ব আর এক দিন শুনব দাদু—আজ সময় কম।

দাদু হো হো করে হেসে উঠলেন—আচ্ছা, আচ্ছা। তবে ও তত্ত্ব শুনে বোঝা যায় না ভাই—আর বুঝলেও শোনানো কঠিন।

মলয়ের মা ওর হাত দুটি ধরে কাঁদলেন, হাঁ বাবা তোমার সঙ্গে দেখা হয় না তার? বলবে তাকে—মাকে এত কষ্ট দিলে ভাল হয় কোন ছেলের। বুড়ো বয়সে জাত খোয়াতে পারি নি—এই হ'ল গিয়ে আমার দোষ!

ওঁকে আশ্বস্ত করে বাড়ি ফিরে এসে মাকে বললে, কোন ভয় নেই মা বাড়িতেই থাক। কলকাতা ত বেশি দূর নয়—খবর পেলেই আসব আমি।

গ্রাম আর সে গ্রাম নেই। পুরাতন বিধি-ব্যবস্থা মুছে যাচ্ছে—নূতন কিছু আশ্রয়ের মত অন্তত গড়ে ওঠে নি। ট্রান্‌জিশন পিরিয়ড। কি ভীষণ এই অন্তর্বর্ত্তী কাল।—সমাজ-অনুগত মানুষগুলিকে জোর করে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে টেনে আনা হচ্ছে। কে টানছে? সুবিধাবাদীরা? মহাকাল? যুগ-ধর্ম্ম? যে-ই টানুক—এর গতি রোধ করা যাবে না।—দুটি প্রধান শক্তি···শক্তিসঞ্চয়ের নেশায় পৃথিবীর দেশ মহাদেশের নাড়ীতে দিচ্ছে টান। অভয়—হুঙ্কার—স্বস্তিবাণী আর পরমাণু-শক্তি এই নিয়ে চলেছে খেলা। ইউরোপ—ভূমধ্যসাগর মধ্য-প্রাচ্য—ভারতবর্ষ—দ্বীপময় ভারত, আরব জগৎ—চীন—জাপান—দুটি শক্তির অক্রক্রীড়ার ছকে ছড়িয়ে আছে। খেলা চলেছে পুরোদমে। কিন্তু এই খেলাই যে শান্তির চূড়ান্ত ফলাফল প্রসব করবে—সে ভবিষ্যদ্বাণী করবে কে?—নতুন করে ভাঙাগড়ার মুখে পুরাতন পৃথিবী পাক খাচ্ছে—বিদীর্ণ হচ্ছে ছিঁড়ে গুঁড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে মহাব্যোমে। সূর্য্য টানছে পৃথিবীকে—পৃথিবী টানছে চন্দ্রকে—উপগ্রহে বেষ্টিত হয়ে গ্রহগুলি চাইছে শক্তিমান্ হতে। অবিভাজ্য অণুর অহঙ্কার চূর্ণ করেছে মানুষ—মানুষ আজ ধ্বংসের দেবতা। তবু সে শিব হতে পারে নি; সৃষ্টি সংহারের ভারকেন্দ্রে জগৎকে স্থিত করে রাখবার চেষ্টাই হচ্ছে নূতন পৃথিবী তৈরির ইতিহাস—দাদুর ভাষায় সৃষ্টিলীলা।

আজকার মানুষ সেই লীলার রস আস্বাদ করতে পারছে কি ?

২৩

এক দিন সুচিত্রা বললে, কই বললে না ত কি ধরণের কাজ আরম্ভ করেছ তোমরা ?

মলয় বললে, বলার চেয়ে প্রত্যক্ষ দেখতে চাও কি ?

চাইব না কেন।

সংসার ভেঙে দিতে হবে—ষ্ট্রাইক দি টেস্ট সুচিত্রা।

সুচিত্রা বললে, ভাল করে না বললে বুঝব কি করে।

মলয় বললে, কাগজ তো পড় আজকাল—রোজই। পৃথিবীর নানা দেশে নানা রকমের গোলমাল—তবু এমন কোন মহৎ চেষ্টার খবর পাও না কি যাতে করে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

সুচিত্রার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, পাই সে খবর। কিন্তু সে কি সার্থক হবে ?

সন্দেহ রাখলে বিশ্বাস আনা কঠিন। এক জনের চেষ্টা—পাঁচ জনের চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হলেই কাজ সহজ হয়ে আসে। তুমি ত দেখি কাগজ হাতে পেলেই মহাত্মাজীর প্রার্থনার অর্থগুলি মন দিয়ে পড়।

সুচিত্রা বললে, পড়ি এই কারণে—ওগুলিতে স্পষ্ট সত্যকে খুঁজে পাই।

মলয় হেসে বললে, স্পষ্ট সত্য খুব কঠিন মনে হয় বুঝি ? আর খুব তিক্ত ?

সুচিত্রা বললে, মন আমাদের তৈরি নয় বলেই কঠিন ঠেকে।

তারপর নোয়াখালিতে গিয়ে কাজ আরম্ভ করার দায়িত্ব ও বিপদ আছে—এও জান ত।

সুচিত্রা বললে, জীবনে কোন পরীক্ষাই তো দিলাম না; বইয়ে আর কাগজে লোকের দৃষ্টান্ত পড়ে—ভাল ভাল করলাম শুধু।

মলয় বললে, সংসারের মায়া কাটিয়েছ বুঝি—তাই ইচ্ছে হয়েছে মানুষের মাঝে গিয়ে দাঁড়াতে।

দূর, সংসার ছাড়ব বললেই কি ছাড়া যায়। মহাত্মাজী তো সংসার ছাড়তে বলছেন না কোথাও। সত্য আর ভালবাসা এই মূলধন নিয়েই তো দাঁড়িয়েছেন পরীক্ষা দিতে।

তবু তোমাদের সন্দেহ হয়—এ পরীক্ষা কি সফল হবে ?

তা হয়।

কেন হবে সন্দেহ। সত্য যদি জয়ী না হয় তার শক্তি কমে গেল এ ভাববেই বা কেন। কাজকে যথার্থ ভাবে পেতে হলে কাজকেই নিতে হবে বেছে। আর কাজের আনন্দ শক্তি—সে-ও তো কাজের মধ্যেই রইল। যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল বলে—তাঁর মহৎ বাণীকেও যে হত্যা করা হয়েছিল এ ধারণা ভুল।

সুচিত্রা বললে, সাধারণ মানুষ সাধারণ ফলাফলে লক্ষ্য রেখে কাজ করে। খ্রীষ্টের মহৎ বাণী পৃথিবীতে ভেসে বেড়াচ্ছে, আশ্রয় পাচ্ছে না—এও তো দেখছি আমরা।

মলয় বললে, তা হ'লে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভার কথাগুলি তোমার ভাল লাগে কেন ?

সুচিত্রা বললে, হয়তো একটা দেহের মধ্যে দুটো মানুষ বাস করে এইজন্যে। একটা মানুষ চায় সংসারের লাভ-ক্ষতির চুলচেরা বিচার করে তাতে জড়িয়ে থাকতে—আর একটা মানুষ সত্যের কষ্টিপাথরে কেদে সেগুলিকে যাচাই করতে চায়।

সংসারের লাভক্ষতির দিকটা কি সত্যের দিক নয় ?

সুচিত্রা হেসে বললে, আমি পণ্ডিতলোক নই—পাঁতি দিতে পারব না। বাস্তব দিককে অস্বীকার করে মঙ্গল চেষ্টা বেশী দূর এগোয় না—এই তো দেখি। ধর্ম্ম নিয়ে যারা পাগলের মত হানাহানি কাটাকাটি করে—তাদের কাছে প্রকৃত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করাই হ'ল বাস্তবকে খোলা চোখে দেখা।

প্রকৃত ধর্ম্মের ব্যাখ্যাটি কি ?

মলয়ের কথায় সুচিত্রা কৃত্রিম ক্রোধে মুখ ফিরিয়ে বললে, যাও—জানি না।

মলয় হো হো করে হেসে উঠল। বললে, এই ত, এত অল্পে রাগ করলে মানুষের সেবা করবে কি করে।

সুচিত্রা বললে, মানুষের সেবা করব—এত বড় অহঙ্কার আমার নেই।

ইস্—ক্রমশঃ বিনয়ে নুইয়ে পড়লে যে! সুচিত্রা রাগ করে পালাচ্ছে দেখে মলয় খপ করে ওর হাত ধরে বললে, ধরে নিলাম মানুষকে বাঁচিয়ে রাখাই হ'ল মানুষের ধর্ম্ম—আপাতত সে ধর্ম্ম পালনে তুমি অবহেলা করছ।

সুচিত্রা ভ্রুকুটি হেনে বললে, কিসে ?

মানুষ যাতে শান্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে—যাতে শান্তিতে বাস করতে পারে—যথাসময়ে স্নান আহার উপাসনা স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে পারে—এসব দেখা প্রত্যেক সৎ প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য নয় কি ?

তাতে কি!

তাতেই তো সব—সকালের রোদ চড়েছে কতখানি এ দেখেও যে প্রতিবেশী স্বাস্থ্য পালনের নিয়ম না মেনে মনুষ্য ধর্ম্মচ্যুত হয়ে পড়ছে তাকে সচেতন করে দেওয়া যায় যদি—

সুচিত্রা বললে, থাম—আর ব্যাখ্যায় কাজ নেই···সামান্য খিদে সহ্য করতে পারে না যারা তারা আবার সেবা করতে যায় কোন্ সাহসে!

নিতান্তই দুঃসাহসে।

হাসতে হাসতে সুচিত্রা স্টোভ জেলে ফেললে। খানিকটা হালুয়া আর চা করে মলয়ের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, চা খেয়ে চল বেড়িয়ে আসি।

আপত্তি নেই।

ব্লকটার বাইরে আসতেই প্রশান্তর সঙ্গে দেখা। প্রশান্ত হাত তুলে ওদের ডাক দিয়েছে।

বললে, তোমাদের খুঁজছিলাম—চল বাসায়।

সুচিত্রা বললে, আর কোটরে নয় ভাই—পার্কে বসা যাক।

কাছাকাছি একটা ছোট মত পার্ক ছিল—তিন জনে তারই মধ্যে প্রবেশ করলে। যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগের শ্রী পার্কের কোথাও চোখে পড়ে না—একেই শ্রী বলতে কলকাতার পার্কের কোনটিতেই নেই। অবিচ্ছিন্ন শব্দ ও ধূলিধূমের মধ্যে প্রকৃতির নির্জ্জনতা বা শ্রী খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। যুদ্ধোত্তর যুগে এগুলিকে যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা হিসাবে ধরে নিয়ে খানিকক্ষণ বক্তৃতা দেওয়া চলে। শ্লিট ট্রেঞ্চের প্রয়োজন মিটে যেতেই সেগুলিকে কবর দেওয়া হয়েছে—তবে মাটিটাকে সমান করে দেবার বা সে মাটিতে ঘাস বুনবার কি মরসুমি ফুল ফোটাবার চেষ্টা কেউ করেন নি। বেঞ্চিগুলিও পায়া ভাঙা ও পিঠ ভাঙা অবস্থায় কোন রকমে খাড়া হয়ে আছে। তারই একটিতে তিন জন এসে বসলে।

প্রশান্ত বললে, তোমার বাড়ি যাওয়া উচিত মলু।

জ্যেঠিমার অবস্থা দেখলাম খুব খারাপ—তাঁকে দেখবার লোকেরও দরকার।

কেন, মেজ বউদি?

তিনি তো বাড়িতে নেই—মেজদা বাসা করে তাঁদের কলকাতায় এনেছেন। তা ছাড়া দেশের অবস্থাও ভাল নয়।

মলয় সুচিত্রার পানে ফিরে বললে, মা আমাদের কথা বললেন ঠাকুরপো? কি বললেন!

দেশের অবস্থা সংক্ষেপে জানিয়ে প্রশান্ত বললে, তোমার মা তাঁর আত্মীয়বাড়ি উঠবেন ঠিক করেছেন—কেবল বড় বউদির ব্যবস্থা—

সুচিত্রা বললে, আমরা যাব।

প্রশান্ত চলে গেলে মলয় বললে, যেজন্ত আমরা বাড়ি ছাড়লাম চিত্রা—

সুচিত্রা বললে, এক একটি মুহূর্ত্ত এত বড় হয়ে আসে যখন অন্ত মুহূর্ত্তের ঘটনাগুলি মুছে যায়। কেন আমরা বাড়ি ছেড়েছি সে কথা এখন থাক। একটি নোয়াখালিতে আমরা সবাই ভিড় করে নাই-বা গেলাম।

ঠিক বলেছ—আমার গ্রামেও তো যথেষ্ট কাজ রয়েছে। বলে সুচিত্রার হাত ধরে ও টানতে আরম্ভ করলে।

সুচিত্রা বললে, আঃ আস্তে—তোমাদের সঙ্গে আমরা দৌড়ে পারব কেন।

মলয় বললে, আমরা হাউই—তোমরা হচ্ছ তার বারুদ। ঠেলে দিয়েছ যখন তখন তাল রাখবে নাই-বা কেন।

আঃ তবু টানে! এটা পথ না!

মলয় হেসে বললে, আমরাও তো যাত্রী।

২৪

ব্যারাকে ফিরতেই দেখে—মেজদা তালা-লাগানো দোর-গোড়ায় পায়চারি করছেন। মেজদাকে দেখেই মলয়ের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। প্রশান্ত এই মাত্র চলে গেল, দেশের অবস্থা ভাল নয়—মেজদা কোন মন্দ খবর নিয়ে আসে নি তো!

মেজদা।

মেজদা ফিরে চাইলেন—মুখের ভাব তাঁর একটুও কোমল বোধ হচ্ছে না। কোন কথা না বলে প্রখর সন্ধানীর দৃষ্টি দিয়ে ওদের দু'জনকে বিঁধতে লাগলেন।

সুচিত্রা অস্বস্তি কাটিয়ে প্রথম এগিয়ে এল তাঁর দিকে—হেঁট হয়ে প্রণাম করলে তাঁকে। তারপর আঁচল থেকে চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে···তালা খুলে ফেললে।

মলয় বললে, বস মেজদা।

মেজদা ঘরের চারদিকে সেই প্রখর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, এইটুকু ঘরে—আচ্ছা ঘরের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—এই নানান জাতের মধ্যে থাকিস কি করে?

মলয় সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, বসবে না?

মেজদা বললেন, কাজটা জরুরী বলেই এলাম নইলে—একটু থেমে বললেন—তোমার বউদিকে কলকাতায় নিয়ে এসেছি—দেশের অবস্থা শুনেছ বোধ হয়।

মলয় বললে, চা খাবে তো?

নাঃ—থাক। তাচ্ছিল্যভরে অনুরোধ ঠেলে পাতা বিছানার উপর বসলেন। বসে বললেন, মাকে এত সাধলাম, এলেন না। ভিটে কামড়ে পড়ে থেকে কি যে পরমার্থ লাভ করবেন তা উনিই জানেন! এখন বায়না ধরেছেন বৃন্দাবন পাঠিয়ে দাও। যত হুজুগের দল নাকি বলেছে—দাদার মত দেখতে এক জন সন্ন্যাসীকে—ওই কাশী মথুরার দিকে দেখা গেছে। ব্যস—আর যায় কোথায়।

তা মা যদি যেতে চানই—

যেতে চাইলেই তো পাঠানো সম্ভব নয়—রেস্তর জোগাড় না হলে তীর্থধর্ম্মই বল—আর বাপের শ্রাদ্ধ, মেয়ের বিয়েই বল কোনটাই হবার জো নেই। রুধির—রুধির, সব আগে চাই রুধির।

মলয় কথা কইলে না। সংসারে এতকাল ব্যবস্থা যা করবার উনিই করেছেন—কোথা থেকে কি করলে ভাল হয় সে উনিই জানেন ভাল। এ বিষয়ে তার মতামতের কোন দাম নেই।

মেজদা বললেন, দাদা বিবাগী—তুমি উপার্জ্জন কর না—সংসারের যত দায় আমার। একলা মানুষ নিজের ছেলেপিলে পরিবার দেখব—না জমিজমা দেখব, না—মা বউদিকে দেখব বল। অথচ মার একটা ব্যবস্থা করা দরকার—খুবই দরকার। তাই ঠিক করলাম পুব মাঠের পাঁচ বিঘে জমি বিক্রী করে—মার ব্যবস্থা করে ফেলা যাক। তুমিও তো অংশীদার, তোমার মত চাই—বিক্রী কোবালায় সই চাই—তাই—

মলয় বললে, এ বিষয়ে আপনি যা ভাল বোঝেন করুন—সই সাবুদ যা দরকার করে দেব।

সুচিত্রা দু' কাপ চা ও কিছু খাবার নামিয়ে দিলে দু'জনের সামনে। মেজদার মুখের গাম্ভীর্য্য মিলিয়ে গেছে—প্রসন্ন মুখে উনি হাত বাড়িয়ে একটি পেয়ালা টেনে নিলেন—খাবারের প্লেট থেকেও কিছু খাবার নিলেন, চা খাওয়া শেষ করে বললেন, কাগজ পড় নিশ্চয়, খবর রাখ—তেভাগা ব্যবস্থায় আমাদের দফা রফা। জমির খাজনা টানতে হবে ষোল আনা—ঘরে আসবে না একটি আধলা। কিন্তু ফাঁকি দেব বললেই তো ফাঁকিতে ইচ্ছে করে পড়ে না কেউ। আইন ঠেকাবার ব্যবস্থা আমরাও জানি।

তারপর গলার স্বর নামিয়ে তিনি বললেন, সবাইকে জমি ছাড়িয়ে দিয়েছি—ওরা ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখে দেয় যে হাল বলদ জমির সার ইত্যাদি যাবতীয় খরচ মালিকের কাছ থেকে পেয়ে চাষ করছি, তবেই—ভাগে দেব জমি।

মলয় বললে, সবাই কি হাল বলদ লাঙল দিতে পারবে?

এই বুদ্ধি নিয়ে বাস করলেই জমি তোমার থাকবে! হাল বলদ দেবে না ঢেঁকি। ওরা লিখে দেয় ভাল—না দেয় পথ দেখুক গে। আত্মপ্রসাদে স্ফীত হয়ে তিনি হেসে উঠলেন।

মলয় হঠাৎ উঠে ভিতরের দিকে গেল। সুচিত্রা ইতিমধ্যে তোলা উনুনে আঁচ দিয়েছে—কয়লার ধোঁয়ায় ছোট ঘরটা গেছে ভরে। দাঁড়িয়ে থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসে।

সুচিত্রা বললে, মেজ বটঠাকুরকে খেয়ে যেতে বল না।

না—দাদা বাসায় গিয়েই খাবেন।

তা যাও—ওঁর সঙ্গে গল্প করগে—এখানে বড্ড ধোঁয়া।

তা হোক। একখানি পিঁড়ি পেতে মলয় বসে পড়লে সেইখানে। বললে, বাড়ি কালই যেতে চাও?

মানে—নিয়ে যাবার মালিক কে—

হাঁ—কালই চল। স্বরে জোর দিয়ে মলয় উঠে দাঁড়াল।

সুচিত্রা অবাক হয়ে ওর পানে চাইলে। বুঝলে ও মনে মনে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে—অস্বস্তি ভোগ করছে।

মলয় এ ঘরে আসতেই মেজদা বললেন, কি বলিস—কাল কাগজগুলো এনে সইসাবুদের ল্যাটা চুকিয়ে ফেলি—কেমন?

মলয় বললে, মার সঙ্গে একটা পরামর্শ করা—

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন তিনি। তবেই করেছ ব্যবস্থা! উনি কি মানুষ আছেন—না বুদ্ধিসুদ্ধি—আর বলবেনই বা কি! টাকার দরকার তো বটেই—আর জমি না বেচলে—

মলয় তাড়াতাড়ি বললে, বেশ আপনি যা ভাল বোঝেন—

মেজদা খুসী মনে মাথা নাড়লেন। বললেন, এই এতটুকু বেলা থেকে মাথা দিয়েছি সংসারে। কিসে ভাল কিসে মন্দ সে হিসেব আমার যথেষ্ট আছে। একবার হয়েছিল কি জানিস—দশমীর দিন—

মলয় আর একবার উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরতা প্রকাশ করলে। মেজদা ইঙ্গিতটা বুঝে গল্পের জের আর টানলেন না। মলয়কে তিনি ভাল মতেই জানেন। দেখতেও পরম বিনয়ী—উঁচু গলায় কাউকে চড়া কথা বলে না কখনো—কিন্তু ওর অন্তরের কাঠিন্য—তার মত অনমনীয় বস্তু আর দ্বিতীয় নাই। কোথা থেকে আঘাত লেগে ওরা মুহূর্ত্তে অমন বদলে যায়—ওদের নীতির মাপকাঠিই বা কি—অন্যায় অপমান বোধ কোন্ তুচ্ছ কারণে উগ্র হয়ে ওঠে—এসব রহস্য আজও তিনি বুঝতে পারেন না। কব্জি উল্টে ঘড়িটা দেখে হঠাৎ তিনি সচকিত হয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করলেন, ইস্—রাত হয়ে গেল দেখ! দাঙ্গাহাঙ্গামা না থাকলেও বিশ্বাস নেই এখানকার অবহাওয়াকে। উঠি।

তিনি চলে যেতেই মলয় নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করলে। সে কেন মেজদার সর্ত্তে রাজী হয়ে গেল! একি তার দুর্ব্বলতা নয়! মনে স্বীকার করে যে নীতিকে মঙ্গলপ্রদ বলে—মুখে তাকেই করলে অস্বীকার! যে জমির ওপর জীবন ধারণ করে মানুষ—তার স্বত্বে কেন সে স্বত্ববান হবে না। যাদের উপার্জ্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে—তাদের লোলুপ দৃষ্টি জমির উপস্বত্বে নাই বা রইল! জমি কি তারই যে খেয়ালখুসিমত হস্তান্তর করে দেওয়া চলবে!

এই বাড়ির ঘরে শুয়ে আকাশ দেখা যায় না—আকাশের নক্ষত্র তো দুর্লভ বস্তু। একটু ফাঁকা—একটু হাওয়া—রাতের পৃথিবীর সুপ্তিমগ্ন সামান্য দেহাংশ—এ না দেখতে পেলে আজ তার ঘুম আসবে না।

সুচিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, শরীর খারাপ লাগছে কি? হাওয়া করব?

না।—স্বর গম্ভীর—ভাঙ্গা-ভাঙ্গা।

তবে অমন করছ কেন? অন্ধকারে সরে এসে সুচিত্রা ওর কপালের ওপর একখানি হাত রাখলে।

মলয়ের মনে হ'ল এর চেয়ে চমৎকার সান্ত্বনা পৃথিবীতে নেই। নিস্তব্ধ পৃথিবীর নিঃসঙ্গ অন্ধকারে নক্ষত্রচ্যুত হয়ে ও পরিভ্রমণ করছে। সৌধের অন্তরালে যে আকাশ হীরকদ্যুতিতে অপরূপ হয়ে পৃথিবী পরিক্রমণ করছে—তার সুরভি নিশ্বাস ওর উত্তপ্ত কপালে এসে লাগছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে—ঘুম আসবে এই মুহূর্ত্তে। (ক্রমশঃ)

ক্যাপশীয় রঙ্গ-চিত্র

শ্রীকানাইলাল সাহা

ইউরোপে প্রস্তর-যুগ আরম্ভের সময় মধ্য-ইউরোপের অ্যারিগ্-ন্যাক্ নামক স্থানে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, এর অনেক আগে আফ্রিকার টিউনিশিয়া প্রদেশের গ্যাফ্‌সা বা ক্যাপশিয়া নামক স্থানে আর একটি স্বতন্ত্র সভ্যতার সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় ক্যাপশিয়ান সভ্যতা। এর স্থিতিকাল প্রস্তর-যুগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত।

১ নং চিত্র

এই সভ্যতার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কোন কোন গবেষক বলেন: খৃষ্টের জন্মের প্রায় এগার হাজার বছর আগে এক দল ক্যাপশিয়ান অভিযাত্রী জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনে উপস্থিত হয়। ক্রমে তারা আধিপত্য স্থাপন করে স্পেনের পূর্ব দিকে। এই অভিযাত্রী দলই স্পেনে ক্যাপশিয়ান সভ্যতাবিস্তারের অগ্রদূত।

কোন কোন গবেষকের অনুমান: স্পেন অভিযানের পূর্বে আর এক দল ক্যাপশিয়াবাসী বর্তমান সিসিলি দ্বীপের ওপর দিয়ে ইটালী দেশে চলে যায়। এই সময় দুটি সংকীর্ণ ভূমি-খণ্ড দ্বারা সিসিলি টিউনিশিয়া ও ইটালীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এই অভিযাত্রীদের দ্বারাই ক্যাপশিয়ান শিল্পের ধারাটুকু ইটালীতে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে এই শিল্পের ধারা গ্রিম্যাল্‌ডির (Grimaldi) শিল্পের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় ক্যাপশিয়ান সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য লোপ পায়।

খ্রীষ্টের জন্মের সাত হাজার বৎসর পূর্বে যে সংকীর্ণ স্থলভাগ টিউনিশিয়া ও সিসিলিকে সংযুক্ত ক'রে রেখেছিল তা সমুদ্র-গর্ভে বিলীন হওয়ায় ক্যাপশিয়াবাসীদের ইটালী অভিযান বন্ধ হয়।

গবেষকগণ বলেন: অ্যারিগ্‌ন্যাকের অধিবাসীরা ফ্রান্সের দক্ষিণে পৌঁছুবার অল্পদিন পরেই ক্যাপশিয়াবাসীরা জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনে হাজির হয়। কারো কারো মতে, অ্যারিগ্‌নেশীয় ও ক্যাপশীয় শিল্পের উদ্ভব একই উৎস ও মনোবৃত্তি থেকে। এই সময় ডাকিনী-বিদ্যার প্রচলন ছিল। এই ডাকিনী-বিদ্যার করণ-কারণ থেকেই যে চিত্র-কলার উদ্ভব এ কথা বহু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত স্বীকার করেন। গবেষকদের ধারণা, ক্যাপশিয়াবাসীদের অদ্ভুত ধরণের ছবিগুলির সঙ্গে যাদু-বিদ্যার একটি অতি নিকট সম্বন্ধ আছে।

ক্যাপশিয়ার অধিবাসীদের চক্‌মকি পাথরের তৈরি বহু লম্বা সরু সরু যন্ত্রপাতি ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরবর্তী টিউনিশিয়া প্রদেশ থেকে মরক্কো প্রদেশের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ভূখণ্ডের মধ্যে পাওয়া গেছে। তারা উঁচু পাহাড়ের ঝোলানো পাথরের ওপর ছোট ছোট ছবি আঁকতে ভালবাসত এবং এ সম্বন্ধে তাদের আগ্রহও ছিল খুব বেশী। এই সব ছবিতে তাদের জীবনধারণের প্রণালী খুব স্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত। এই ধরণের যে সব ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে তার চরম উন্নতি হয়েছিল প্রস্তর-যুগের প্রথম দিকেই।

ক্যাপশিয়াবাসীরাই সম্ভবতঃ রঙ্গ-চিত্রের প্রবর্ত্তক। এদের

২ নং চিত্র

আঁকা মানুষের ছবিগুলি অত্যন্ত অদ্ভুত ধরণের ও কৌতুকপ্রদ। দেখে মনে হয়, কতকগুলি কাঠি জোড়া দিয়ে যেন মানুষের মূর্তি খাড়া করা হয়েছে (১নং চিত্র)। এইসব মূর্তির কোনটির মাথায় পালকের টুপি পরানো, কোনটির মাথায় আবার কয়েকটি পালক গোঁজা।

পুরুষদের ছবির অধিকাংশই নগ্ন, নীচের ও ওপরের হাতে তাগা-বালার মত গহনা পরানো এবং কাঁধের ওপর ঝোলানো আছে একটি ঝালর-দেওয়া পোশাক। মেয়েদের ছবিগুলি কিন্তু নগ্ন নয়। গায়ে আঁট-সাট ঘাঘরা পরানো, কটিতে একটি কোমরবন্ধ এবং মাথায় লম্বা টুপি। এদের কোমর আঁকা হয়েছে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী সরু করে (২নং চিত্র)।

ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের চিত্রকলার বিশেষত্ব, প্রত্যেকটি মূর্তি যেন জীবন্ত এবং প্রত্যেকটিতে অঙ্গ-চালনার ভঙ্গীটুকু পরিস্ফুট। এই অঙ্গভঙ্গী আবার অভিব্যক্ত করা হয়েছে উদ্ভট

৩ নং চিত্র

ভাবে। পুরুষরা সব চলেছে লম্বা লম্বা পা ফেলে (৩ নং চিত্র)। এদের আঁকা কয়েকটি শিকারের ছবিরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ছবিগুলিতে শিকার-রত তীরন্দাজদের ক্ষিপ্রতা খুব স্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত (৪ নং চিত্র)।

পণ্ডিতেরা বলেন: এই যুগের শিকারী-শিল্পীরা নিজেদের গতির ক্ষিপ্রতা বাড়াবার উদ্দেশ্যেই ছবিতে গতি-ভঙ্গী ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করত। ছবিতে যে গতি-ভঙ্গী প্রকাশ করা হবে তার প্রত্যক্ষ ফলটুকু বর্তাবে শিল্পীর নিজেরই ওপর, এই ছিল তাদের ধারণা। এই ক্ষিপ্র গতির প্রভাবেই তারা ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠবে সুদক্ষ শিকারী, এ ধারণাও যে তারা পোষণ করত তা কতকটা অনুমান করা যায়।

এই ছবিগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এই যুগের শিল্পীদের শিল্পের প্রধান অঙ্গ ছিল গতি-ভঙ্গীর (Movement Speed) অভিব্যক্তি। সুনিপুণ রেখাপাতে এই যুগের শিল্পীরা তাদের শিল্পগত বৈশিষ্টটুকু এমন স্পষ্টভাবে রূপায়িত করেছে যে, বর্তমান শিল্পীদের চোখে তা সত্যিই বিস্ময়ের বস্তু। শুধু আঙ্গিকের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে তাদের কৃতিত্বের প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

এই যুগের শিল্পীদের আঁকা কয়েকটি মানুষের ছবি থেকে সে যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবনধারার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। তাই এই ছবিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য খুবই বেশী।

৪ নং চিত্র

স্পেনের পূর্ব-ভাগে যে সব ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, সে যুগের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করত। অনেক গবেষক তাই অনুমান করেন যে তাদের নগ্ন পুরুষের ছবিগুলি আঁকা হয়েছে চিত্রকলার উদ্ভবের প্রথম দিকে। এই সময় ডাকিনী-বিদ্যার প্রভাব ছিল অত্যধিক। শিল্পী বোধ হয় এই ডাকিনী-বিদ্যার কোন করণ-কারণের গোপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই বাধ্য হয়েছে নগ্ন মূর্তি আঁকতে।

এই সময়ের শিল্পীদের আঁকা কয়েকটি শিকারের ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সব ছবিতে দেখা যায় পুরুষরা শিকার করছে দল বেঁধে (৫ নং চিত্র), আর মেয়েরা নৃত্যে মেতে উঠেছে (৬ নং চিত্র)।

প্রথম অবস্থায় ক্যাপশিয়াবাসীরা শিকারের আশায় বনের ভেতর ঘুরে বেড়াত। এই সময় সাহারা প্রদেশ এখনকার মত শুষ্ক মরুভূমি ছিল না। এর পশ্চিম দিকটি ছিল শিকারের একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র। সিংহ, ভল্লুক, হায়েনা, জিরাফ, বুনো ষাঁড়, হরিণ, জেব্রা, জলহস্তী, উটপাখী প্রভৃতি বন্য জীবজন্তুর বিহার-ভূমি। ক্রমে সাহারা প্রদেশ যখন মরুভূমিতে পরিণত হতে লাগল এই সব জীবজন্তু তখন চলে গেল দক্ষিণ-আফ্রিকার অভিমুখে। একদল ক্যাপশিয়াবাসী শিকারীও তাদের অনুসরণ করতে করতে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যায়। এই ভাবে তাদের কৃষ্টির খানিকটা দক্ষিণ আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

কেউ কেউ বলেন: স্পেনের ক্যাপশিয়ান অভিযাত্রীরা পশু-শিকারের তত পক্ষপাতী ছিল না। ম্যাগডালেনিয়ান শিকারীদের অনুকরণে তারা ক্রমে মৎস্য-শিকারে অভ্যস্ত হয়। এই সময় তাদের রুচিরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। অবসরকালে তারা উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ছবি আঁকত। এই ছবি আঁকা ছিল তাদের অবসর বিনোদনের খেলা।

ক্যাপশিয়াবাসীরা জীবজন্তুর ছবি আঁকা সুরু করে ম্যাগডালেনিয়াবাসীদের প্রভাবে, গবেষকদের অভিমত এইরূপ। ক্রো-মাঞোঁ গুহার অনেক শিল্পীর নিজের প্রতিকৃতির সঙ্গে

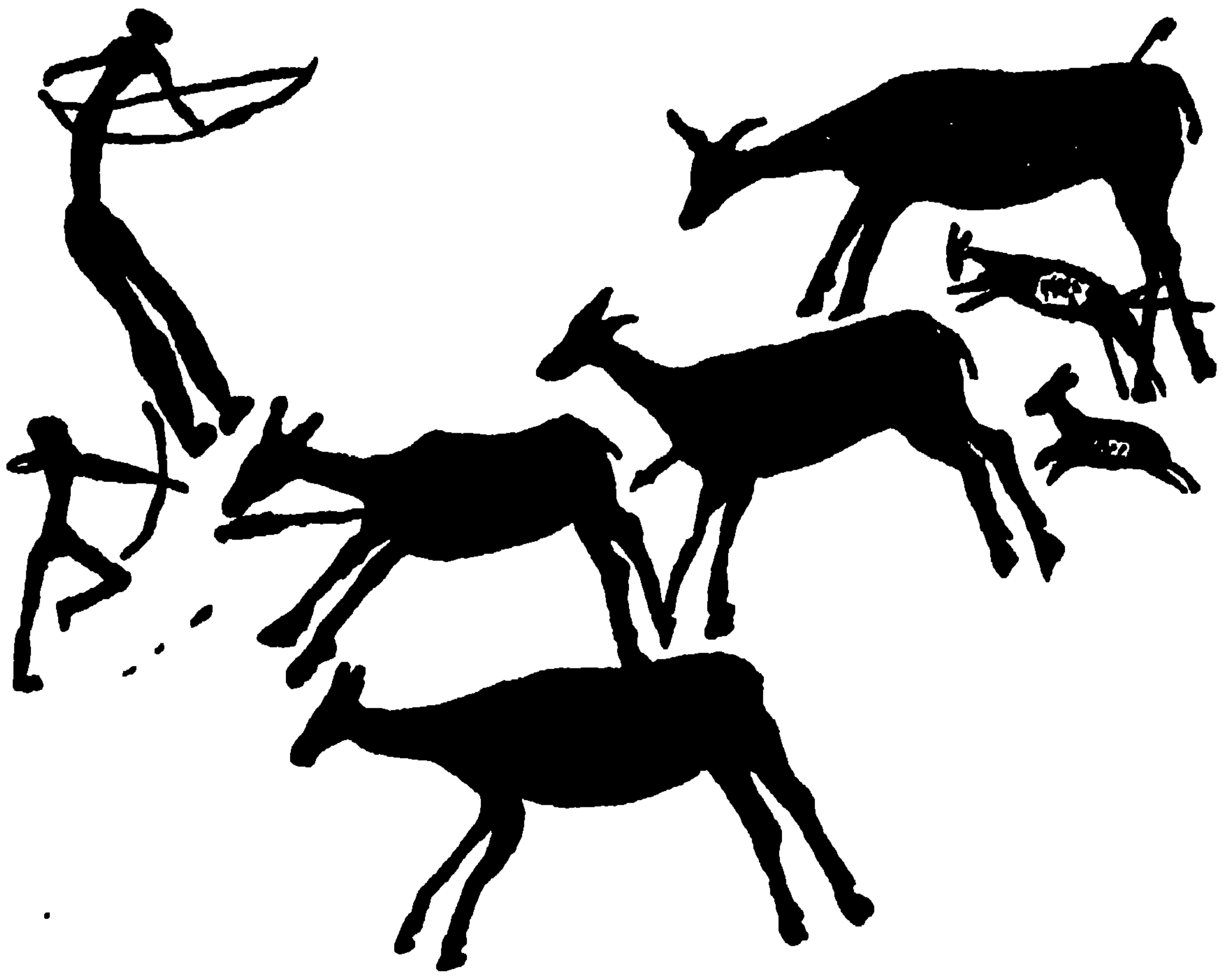

৫ নং চিত্র

জীবজন্তুর ছবি আঁকা রয়েছে দেখা যায়। এই সব ছবি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন, এগুলি ক্যাপশিয়ান শিল্পীদেরই আঁকা। তাঁদের এই ধারণাটুকুর যাথার্থ্য প্রমাণের সপক্ষে বলা যেতে পারে যে, মানুষের মূর্তি আঁকতে ক্যাপশিয়ান শিল্পীরাই ছিল সিদ্ধহস্ত। পূর্ব স্পেন বা দক্ষিণ ফ্রান্সে মনুষ্যমূর্তি আঁকার প্রচলন হয় ক্যাপশিয়াবাসীদের স্পেন-অভিযানের পর। আবার মনুষ্যমূর্তিকে রেখাবদ্ধ করে অঙ্কনের প্রবর্তক এই ক্যাপশিয়ান শিল্পীরাই। তাই মনুষ্য-মূর্তিসহ শিকারের ছবিগুলি ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের আঁকা—তাঁদের এই মত সঠিক বলেই মনে হয়।

পূর্ব-স্পেনের ছবিগুলিতে একটি জিনিষ কিন্তু লক্ষ্য করবার আছে। উভয় সভ্যতার শিল্পীদের চিত্রকলা পাশাপাশি গড়ে উঠলেও প্রত্যেকেই কিন্তু নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রাখবার চেষ্টা করেছে।

ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের চিত্রকলাকে মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :—

(১) প্রথম অবস্থায় এরা ছোট ছোট মূর্তি আঁকত। এগুলির অঙ্কন-প্রণালী অতি সাধারণ, তাই এগুলিকে চিত্রকলার নিদর্শন হিসাবে না ধরে রেখাচিত্রের প্রাথমিক পদ্ধতি হিসাবে ধরে নেওয়াই ভাল।

(২) ক্রমে এরা অভ্যস্ত হয়ে উঠল একরঙা রেখা-চিত্রে। এগুলিতে প্রকৃত চিত্রকলার কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়।

(৩) এর পরের অবস্থার ছবিগুলি বড় বড়। এগুলির অঙ্কন-প্রণালী আর একটু উন্নত ধরণের। এই ধারার রেখা-চিত্রগুলিতে তারা আলো-ছায়ার খেলা দেখাতে সুরু করে।

(৪) তার পর সুরু হয় একরঙা ছবিতে আলো-ছায়ার খেলা। এই আঙ্গিকের ছবিগুলিতে ওদের শিল্পবোধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

(৫) [illegible]

তারা দ্বিবর্ণ ও বহু বর্ণের ছবি আঁকতে সুরু করে। এই সময়ই তাদের চিত্রকলার চরম উন্নতি হয়।

(৬) শেষ অবস্থায় বিভিন্ন সভ্যতার, বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রভাবে ক্যাপশিয়ান চিত্রকলার অঙ্গহানি হয়। তাই ধীরে ধীরে ওদের চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য লোপ পেতে থাকে।

ক্যাপশিয়ান চিত্রকলার উৎকর্ষের কালের বিভিন্ন জায়গায় আঁকা ছবিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এক এক জায়গার ছবির আঙ্গিক এক এক ধরণের। এই সব ছবির মধ্যে মানুষের ছবিগুলির বিভিন্ন ভঙ্গী লক্ষ্য করবার মত। অনেকে অনুমান করেন, বিভিন্ন ছবিতে রকমারি পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করার জন্যেই এই পার্থক্যটুকু ঘটেছে।

৬ নং চিত্র

এদের আঁকা রঙ-লেপা (silhouette) ছবিগুলিও আকর্ষণ-যোগ্য। এগুলির অঙ্কন-প্রণালী ম্যাগডালিয়ান শিল্পের মত হলেও ক্যাপশিয়ান্ শিল্পের বৈশিষ্ট্যটুকু সম্পূর্ণভাবে বজায় আছে।

ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের চলমান (chattel) শিল্পের কোন নমুনার সন্ধান পাওয়া না গেলেও অনেকের ধারণা, তারা এই জাতীয় শিল্পের সঙ্গেও পরিচিত ছিল। এদের চলমান শিল্পের নমুনাগুলি ম্যাগডালিয়ান শিল্পের নিদর্শনের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, সেগুলির শ্রেণী বিভাগ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

পূর্ব-স্পেনে ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের আঁকা মণ্ডনশিল্পের নিদর্শন—পোশাক পরিহিত ছবিগুলির সঙ্গে মিশরবাসীদের অলঙ্করণ শিল্পের অনেকটা মিল দেখা যায়।

কারো কারো মতে উভয় অঞ্চলের শিল্পীরা হয়তো একই সময়ে এই আঙ্গিক উদ্ভাবন করে। কেউ আবার বলেন : মিশরবাসীরা তাদের ব্যবহার করা পোশাকগুলি অতি যত্নে সংগ্রহ করে রেখেছিল। ক্রমে ওদের মণ্ডন-শিল্পের (Decorative Art) আঙ্গিকটুকু আয়ত্ত করে নিজেদের চিত্রকলায় তা প্রতিফলিত করতে সুরু করে।

শেষের যুক্তিটিই সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন। স্পেনের চিত্রকলার আবির্ভাব হয়েছিল নব্য প্রস্তর (Neolithic) যুগের অধিবাসীদের ইউরোপ অভিযানের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগে। মিশরে [illegible]

জলধর সেন

১৮৬০—১৯৩৯

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ; শৈশব-শিক্ষা ঃ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ (১২৬৬, ১ চৈত্র) নদীয়ার অন্তর্গত কুমারখালী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-পরিবারে জলধরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—হলধর সেন। "আমার বয়স যখন তিন বছর,...সেই সময়ে আমার পিতার মৃত্যু হয়।...পিতার মৃত্যুর পর আমরা শুধু পিতৃহীন হলাম না, পথের ভিখারী হয়ে পড়লুম।"

জলধর শৈশবে স্থানীয় বঙ্গবিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করেন। হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৭১ সনের ডিসেম্বর মাসে জলধর গোয়ালন্দ স্কুল হইতে মাইনর পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৭৮ সনে তিনি কুমারখালী উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দেন ; পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি থার্ড গ্রেড জুনিয়ার স্কলারশিপ লাভ করেন। এই বৎসর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া সেকেণ্ড গ্রেড স্কলারশিপ লাভ করিয়াছিলেন।

"গণিতের দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল বলিয়া জলধর ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হইবেন। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সেসন্ জুন মাসে আরম্ভ হইত, এজন্য ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার পর তিনি কয়েক মাস বাড়ীতেই বসিয়া ছিলেন। সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় একই স্থানের অধিবাসী। তিনি সে সময় এম-এ পড়িতেছিলেন। জলধরের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রবেশের ইচ্ছা শুনিয়া তিনি জানান যে, গরীবের পক্ষে উহার ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। তিনি জলধরকে জেনারেল লাইনেই প্রবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন। বলিলেন ১০৲ টাকা স্কলারশিপ আছে, আর ৪।৫ টাকা হলেই কলিকাতার খরচ চলিয়া যাইবে। কলিকাতায় গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধরিলে বিনা মাহিনায় তাঁহার কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।...

কলিকাতায় আসিয়া জলধর এক পুরাতন বন্ধুর বাসায় উঠেন এবং পরদিন প্রাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। এই সাক্ষাতের বিবরণ তাঁহার মুখের কথায় যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহাই হুবহু এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।...

বিদ্যাসাগর বললেন—'একজামিনের রেজাল্ট ত ডিসেম্বর মাসে বেরিয়েছে, তুই এই এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত কি করছিলি ?' আমি তখন অল্প কথায় আমার বিলম্বের কারণ তাঁকে জানালাম, আর আমার দুরবস্থার কথাও বললাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিস্তব্ধ ভাবে আমার দিকে চেয়ে, আমার দুঃখ কষ্টের কাহিনী শুনলেন। তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—

পরিব্রাজক-বেশে জলধর সেন

'তাইত রে, আমার কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে বোধ হয় স্থান নেই, সব ভ'রে গিয়েছে। দাঁড়া জিজ্ঞাসা করছি।' এই ব'লে, সূর্য্যিবাবুকে ডাকলেন। তিনি এলে বললেন—'দেখ সূর্য্যি, এ ছেলেটি তোমাদের দেশের, এর বাড়ী কুমারখালী। এ ফার্ষ্ট ইয়ারে ভর্ত্তি হ'তে চায়। ভাল ছেলে হে, স্কলারশিপ পেয়েছে।' সূর্য্যিবাবু বললেন, 'আর ছেলে নেবার উপায় নেই, সব ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছে।' বিদ্যাসাগর মশায় তখন আমার দিকে চেয়ে বললেন—'শুন্‌লি ত, এ বছর আর আমার কলেজে স্থান হবে না। এ বছরটা অন্য কলেজে ভর্ত্তি হ, আসছে বছর তোকে সেকেণ্ড ইয়ারে নেবো। মাইনে টাইনে কিছু দিতে হবে না।' তার পরই একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—'দ্যাখ্‌ তোর কথা যা শুনলুম, তোর খরচ চলবে

কি ক'রে ? এই ধর না কেন, জেনারেল এসেম্‌ব্লীতে যদি ভর্ত্তি হ'তে পারিস, তা হলে তারা ৫৲ মাইনে নেবে,—

জলধর সেন

স্কলারশিপওলাদের এক টাকা রেহাই দেয়। তা হলে আর তোর ৫৲ টাকা থাকলো, তাতে চলবে কি ক'রে রে ?' এ কথার আমি আর কি উত্তর দেবো, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি তখন বললেন—'মনে কিছু করিস না, এ বছর তোর কলেজের মাইনে আমি দেবো। তার পর, সেকেণ্ড ইয়ারে ত এখানেই আসছিস। তাই যা, জেনারেল এসেমব্লীতে খোঁজ নে গিয়ে। শুনেছি তারা ভর্ত্তি করে, তাদের বেশী ছেলে হয় নি। আজই সেইটে ঠিক ক'রে, কাল সকালে আবার আমার এখানে আসিস্—বুঝলি ?'

আমি তখন কেঁদে ফেলেছি। মানুষের হৃদয়ে যে এত দয়া থাকতে পারে, এ আমি জানতাম না। আমার সেই অবস্থা দেখে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উঠে এসে, আমার মাথায় হাত দিয়ে, যে একটি কথা বলেছিলেন, সে কথা এখনও আমার মনে আছে। বললেন—'ওরে পাগল, দারিদ্র্য অপরাধ নয়! আমিও তোর মত দরিদ্র ছিলাম। যা, কাল আসিস্।' ("দয়ার সাগর ও দীন জলধর" : শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু।—'জলধর-কথা,' ১৩৪১)

১৮৭৯ সনে জলধর জেনারেল এসেমব্লীজ ইনষ্টিটিউশনে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। ১৮৮০ সনের শেষে তিনি এল. এ. পরীক্ষা দিলেন বটে কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না।

গোয়ালন্দে মাষ্টারি ঃ এল. এ. ফেল করিয়া জলধরকে চাকুরীতে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। ১৮৮১ সনে তিনি ২৫৲ বেতনে গোয়ালন্দ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার বড় দাদা (জ্যেষ্ঠতাতপুত্র) তখন গোয়ালন্দের ফৌজদারী আদালতের পেশকার ; তিনিই চেষ্টা করিয়া চাকুরীটি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

বিবাহ ঃ গোয়ালন্দে মাষ্টারি করিবার সময় জলধরের বিবাহ হয় (ইং ১৮৮৫)। তিনি লিখিয়াছেন :—

"সেই যে ৮১ অব্দে ২৫৲ টাকা বেতনে মাষ্টারী আরম্ভ করেছিলাম, ৮৫ অব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আমার সে মাইনে আর বাড়ে নি। ঐ সালের শেষ ভাগে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তাঁরা আমার বেতন ৫৲ টাকা বাড়িয়ে দিলেন।...আমার এ বেতন বৃদ্ধির কারণ এই যে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষরা নানাভাবেই জানতে পেরেছিলেন যে আমাদের দরিদ্র সংসারে আর একটি লোক বৃদ্ধি হয়েছে। সেই নবাগত লোকটির খোরাকি বাবদ তাঁরা আমার ৫৲ বেতন বৃদ্ধি ক'রে দেন। সে নবাগত আর কেহ নন—আমার স্ত্রী। সেই বৎসরের প্রথম ভাগে আমি বিবাহ করি।" ("স্মৃতি-তর্পণ" : 'ভারতবর্ষ,' মাঘ ১৩৪২)

সাহিত্যানুরাগ ঃ শৈশব হইতেই মাতৃভাষার প্রতি জলধরের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। গোয়ালন্দে অবস্থিতিকালে তিনি কাঙ্গাল হরিনাথের মাসিক 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'য় মাঝে মাঝে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ (জুন ১৮৮১) সংখ্যায় "পূর্ণচন্দ্র" নামে তাঁহার একটি সুলিখিত সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছি। উত্তরকালে জলধর সাংবাদিকের খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু সংবাদপত্র-সেবায় তাঁহার হাতে খড়ি হয়—সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'য়। গোয়ালন্দে মাষ্টারি-কালে তিনি বন্ধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সহযোগে, কিছু দিন (বৈশাখ ১২৮৯—আশ্বিন ১২৯২) সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

প্রবাস-যাত্রা ঃ ১৮৮৭ সন জলধরের জীবনে একান্ত দুর্বৎসর। এই বৎসর তাঁহাদের পরিবারে শোকের গভীর ছায়াপাত হইয়াছিল। তিনি "শোকসন্তপ্ত, অধীর চিত্তকে সংযত করিবার জন্য জন্মভূমি ছাড়িয়া এক অনির্দ্দিষ্ট দেশে যাত্রা" করিলেন। তাঁহার "স্মৃতি-তর্পণে" প্রকাশ :—

"পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার [জানুয়ারি ১৮৮৭] নয় মাস পরে এক দিন অপরাহ্নে গোলদীঘির ধারের ফুটপাথের উপর অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে আমার দেখা।...অশ্বিনীকুমার [দত্ত] সেই রাস্তার মধ্যেই আমাকে জড়িয়ে ধ'রে তিরস্কার ক'রে বললেন, হাঁরে জলধর, এত নিষ্ঠুর তুই,—এই ন' মাসের মধ্যে একটা খবরও দিলি নে। আমি শুষ্ক মুখে বললাম—খবর তো কিছু নেই দাদা,—সব খবর শেষ হয়ে গিয়েছে।

সে কি, আমি যে বুঝতে পারছি নে! আমি বললাম—শুনবেন দাদা! আপনার সঙ্গে শেষ দেখার চার মাস পরে আমার একটি কন্যা-সন্তান হয়। বার দিন পরেই সেটি মারা যায়। তার বার দিন পরেই আমার গৃহিণীও সেই পথে যান। তার তিন মাস পরে আমার মাতাঠাকুরাণীও চলে গিয়েছেন। এখন আমি হিমালয়যাত্রী।···

দুই মিনিট পরেই আত্মসম্বরণ ক'রে অশ্বিনীকুমার ধীরে ধীরে বললেন—"জলধর, এ আনন্দের হাট সকলের ভাগ্যে বেশী দিন টিকে না। হিমালয়ে যাচ্ছ, যাও। দেখ, যদি শান্তি পাও।" ('ভারতবর্ষ,' মাঘ ১৩৪২)

নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে জলধর শেষে ডেরাডুনে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"তখনো আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাই নি। যাবার কল্পনাও মনে হয় নি। কালীকান্ত সেন নামে বরিশাল জেলাবাসী এক শিক্ষিত ভদ্রলোক ডেরাডুনে এক ইংরেজী স্কুল খুলেছিলেন। আমি ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের মধ্যে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম ডেরাডুনে এই মাষ্টারজীর আশ্রয়লাভ করি।

মাষ্টারজী আমাকে পেয়ে বসলেন। তিনি বললেন—হিমালয়ে বেড়াতে হয় বেড়াবেন, যখন যেখানে ইচ্ছা যাবেন—একটা আড্ডা তো দরকার। যখন আমার এখানে এসেছেন, হিমালয়-ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে এইখানে এসেই বিশ্রাম করবেন এবং সেই বিশ্রাম-সময়ে আমার স্কুলে ছেলেদের পড়াবেন।···

কি করি,—ভদ্রলোক খেতে দেবেন, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় কিনে দেবেন, শীতবস্ত্র দেবেন—তার পরিবর্তে যখন ডেরাডুনে থাকব তখন তাঁর স্কুলের ছেলেদের অঙ্কশাস্ত্রে গাধা বানাব।" ('ভারতবর্ষ,' ফাল্গুন ১৩৪২)

১৮৯০ সনের ৬ই মে জলধর ডেরাডুন হইতে বদরিকাশ্রম যাত্রা করেন। হিমালয়-ভ্রমণ শেষ করিয়া কিছু দিন পরে পুনরায় ডেরাডুনে ফিরিয়া আসেন।

মহিষাদলে মাষ্টারি : মুসাফিরকে শেষ পর্য্যন্ত পুনরায় সংসারে বাসা বাঁধিতে হইল। দীনেন্দ্রকুমার রায় "সে কালের স্মৃতি" কথায় বলিয়াছেন :—

"কিছু দিন পরে জলধর বাবু দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি কুমারখালী ফিরিলে শুনিতে পাইলাম, তিনি লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া তাপিত চিত্ত শীতল করিবার জন্ম হিমাচলের সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, অনেক দুর্গম তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রয়েও কালযাপন করিয়াছিলেন; অবশেষে তিনি কোন মহাজ্ঞানী সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিলে, সেই সাধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের সময় হয় নাই; তাঁহার ভাগ্যে আছে—তাঁহাকে দীর্ঘকাল সংসারধর্ম্ম করিতে হইবে, তিনি পুরা সংসারী হইবেন, তাঁহার সংসারধর্ম্মের সকলই বাকি; তিনি কিরূপে সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন? সাধু তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এইজন্যই তাঁহার সন্ন্যাসী হওয়া হইল না, তাঁহাকে লোটা-কম্বল ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিতে হইল।···

কুমারখালী প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সাহিত্যসাধনায় কাঙালের সাহচর্য্য অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু সংসারী হইবার জন্ম আর তাঁহার আগ্রহ হইল না। কিন্তু কাজকর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তিনি কষ্টকর মনে করিলেন। তিনি সংসারত্যাগের পূর্ব্বে মাষ্টারী করিতেন; কোথাও মাষ্টারী পাইলে আবার ছেলে পড়াইতে আরম্ভ করিবেন—বন্ধুগণের নিকট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

এই সময় আমি মহিষাদলে আসিয়া স্কুলের শিক্ষকের খাতায় নাম লিখাইয়া শিক্ষকরূপে এল, এ, পরীক্ষা দিব—এইরূপ স্থির হইয়াছিল। এ কালের মত সে কালেও কেহ 'প্রাইভেট ষ্টুডেণ্ট'-রূপে এল, এ, বি, এ, পরীক্ষা দিতে পারিত না। মাষ্টারীর লেজুড় জুড়িবার প্রয়োজন হইত।

মহিষাদল স্কুলে তখন তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি ছিল। শিক্ষকের জন্ম কোন কোন ইংরেজী কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। কাকাই স্কুলের কর্ত্তা; আমি তাঁহাকে বলিলাম, তৃতীয় শিক্ষকের গণিতে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন; জলধর বাবু গণিতে বিশেষজ্ঞ। আমি তাঁহাকে জানি, আপনারা ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেতনে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর শিক্ষক পাইবেন না; এতদ্ভিন্ন, আমি মাষ্টারী করিয়া এল, এ, দিব, অথচ আমি গণিতে এত কাঁচা যে, কোন গণিতজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য ভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। জলধর বাবু যদি দয়া করিয়া আমাদের বাসায় থাকেন, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে সর্ব্বদাই তাঁহার সাহায্য পাইতে পারি; তিনি চেষ্টা করিলে হয়ত গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিতে পারিবেন।···আমার চেষ্টা সফল হইল। জলধর বাবু মহিষাদল স্কুলে চাকুরী করিতে আসিলেন। ম্যানেজারের বাসের অট্টালিকার কয়েক গজ পশ্চিমে মৃৎ-প্রাচীর পরিবেষ্টিত একখানি খড়ের ঘর ছিল; সেই ঘরে আমি ও জলধর বাবু একত্র বাস করিতাম। আমি তাঁহার নিকট অঙ্ক শিখিতাম। সেই সময় হইতে তিনি আমার 'মাষ্টার মশায়'। আমি তাঁহার নিকট গণিতবিদ্যা শিখিতাম বটে, কিন্তু সে সময় আমাদের সাহিত্যালোচনারও বিরাম ছিল না।" ('মাসিক বসুমতী,' ভাদ্র ১৩৪০)

১৮৯১ কি ১৮৯২ সনে জলধর ৪০৲ বেতনে মহিষাদল রাজস্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহিষাদলে থাকিতেই তাঁহার হিমালয়-ভ্রমণ-কাহিনী 'ভারতী ও বালক,' 'ভারতী,' 'সাহিত্য' ও 'জন্মভূমি'তে ক্রমশঃ প্রকাশিত

হয়। এ বিষয়ে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ—১২৯৯ সালের মাঘ-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' মুদ্রিত "টপকেশ্বর ও গুচ্ছপাণি"। জলধর লিখিয়াছেন :—

"যখন আমি হিমালয়ের মধ্যে ছিলাম, সেই সময়ে আমার আর কিছুই সম্বল ছিল না, সুধু সম্বল ছিল কাঙ্গাল হরিনাথের বাউলের গানের একখানি বই। আমার এক বন্ধু সেই বইখানির দুরবস্থা দেখিয়া যখন ভাল করিয়া বাঁধাইয়া দেন, তখন তিনি তাহার সহিত কয়েক পৃষ্ঠা সাদা কাগজ জুড়িয়া দিয়াছিলেন। আমি সেই সাদা পৃষ্ঠাগুলিতে আমার ভ্রমণের কথা একটু-আধটুকু লিখিয়া রাখিতাম,—ওটা একটা খেয়াল-মাত্র; পরে যে কিছু করিব, একথা ভাবিয়া লিখিতাম না; সে অভিপ্রায় থাকিলে যথাযথভাবে অনেক কথা লিখিয়া রাখিতে পারিতাম। যখন মহিষাদলে গেলাম, তখনও ঐ বইখানি আমার সঙ্গে ছিল,···মহিষাদলে এক দিন দীনেন্দ্রবাবু আমার সেই গানের বইখানি দেখিতে পান এবং পেন্সিলে লেখা সেই কথাগুলিও পড়েন। সে সময়ে তিনি 'ভারতী'তে প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং 'ভারতী'-সম্পাদিকা মহাশয়াও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। দীনেন্দ্রবাবু আমাকে ধরিয়া বসিলেন যে, আমার হিমালয়-ভ্রমণকথা 'ভারতী'তে লিখিতে হইবে। আমি ত কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলাম। শৈশবকাল হইতে যদিও একটু আধটুকু লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতাম, কাগজপত্রেও সামান্য কিছু লিখিতাম; কিন্তু বাঙ্গালা দেশ ত্যাগের পর হইতে লেখাটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।···কিন্তু দীনেন্দ্রবাবু কিছুতেই ছাড়িলেন না, জোর করিয়া হিমালয়-ভ্রমণের প্রথম প্রস্তাব লিখিয়া লইলেন এবং নিজেই বিশেষ উদ্যোগী হইয়া 'ভারতী' পত্রে প্রেরণ করিলেন।···সম্পাদিকা মহাশয়া আমাকে জানাইলেন যে, আমার হিমালয় ভ্রমণ পাঠকগণের ভাল লাগিয়াছে, এ সংবাদ তিনি পাইয়াছেন।···সে যাহাই হউক, আমি 'ভারতী'তে লিখিতে লাগিলাম।···হিমালয়ের কথা তাহার পূর্ব্বে কেহ বাঙ্গালায় হয়ত লেখেন নাই; তাই আমার লেখা যা তা-ই সকলে পড়িতে লাগিলেন। তখন আমার সেই প্রবাস পল্লী হইতেই শুনিতে লাগিলাম যে, 'জলধর সেন' নামে কোন ব্যক্তি নাই, ঠাকুরবাড়ীর কেহ ছদ্ম নামে হিমালয়-কাহিনী লিখিতেছেন।···আমি যখন 'ভারতী'তে হিমালয়-ভ্রমণ লিখিতে আরম্ভ করি, তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ইউরোপযাত্রীর পত্র' প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আমি হিমালয় লিখিবার সময় তাঁহারই অতুলনীয় লিখন-পদ্ধতি (style) অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছিলাম;···সে সময় হয়ত বা ঐ লিখন-পদ্ধতি দেখিয়াই অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন।···যাক্ সে কথা। আমি প্রায় দুই বৎসর ক্রমাগত লিখিয়া 'ভারতী' পত্রে আমার হিমালয়-ভ্রমণের এক অংশ শেষ করিয়াছিলাম; তাহাই একত্র সংগ্রহ করিয়া পরে 'হিমালয়' ছাপাইয়াছিলাম।" ("ভারতী-স্মৃতি": 'ভারতী,' বৈশাখ ১৩২৩)

বিপত্নীক জলধরকে সংসারী করিবার জন্য তাঁহার মহিষাদলের বন্ধুরা বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে ডায়মণ্ড-হারবারের সন্নিহিত উস্তি গ্রামের দত্ত-পরিবারে তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন, "বিবাহের পর জলধর বাবু মহিষাদলে স্বতন্ত্র বাসা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী দীর্ঘকাল পরে সংসারী হইলেন দেখিয়া আমি রাজসাহীতে চাকরি করিতে চলিলাম। সে বোধ হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা।" ('মাসিক বসুমতী,' আশ্বিন ১৩৪০)

'বঙ্গবাসী' ঃ প্রায় আট বৎসর মহিষাদলে কাটাইয়া জলধর সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির চেষ্টায় তিনি মাসিক ৩০৲ বেতনে 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করিবার সুবিধা পাইলেন (ইং ১৮৯৯)। কিন্তু 'বঙ্গবাসী'র মূলমন্ত্রের সহিত নিজকে খাপ খাওয়ান তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি "দেড় মাস সেবা করবার ভান ক'রে অবশেষে অব্যাহতি লাভ" করিলেন। ('ভারতবর্ষ,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩)

'বসুমতী' ঃ ১৮৯৬ সনের ৮ই আগষ্ট (২৫ শ্রাবণ ১৩০৩) 'বসুমতী' সাপ্তাহিকরূপে জন্মলাভ করে। ১৮৯৯ সনের ২৭এ এপ্রিল (১৩০৬, ১৫ বৈশাখ) হইতে জলধর সহকারী সম্পাদক রূপে 'বসুমতী'তে যোগদান করেন।* কিছু দিন পরে পাঁচ-কড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিদায় গ্রহণ করিলে জলধরই 'বসুমতী'র সম্পাদক হন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"১৩০৬ সালের···পূজা কেটে গেল। আমরা অবকাশান্তে এসে কার্য্যে যোগদান করলাম। সেই সময়েই অতর্কিতভাবে আমাদের নিরুপদ্রব শান্তির ব্যাঘাত উপস্থিত হ'ল, 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রবাবুর সহিত সম্পাদক পাঁচকড়ি বাবুর সংঘর্ষ উপস্থিত হ'ল।···এই সংঘর্ষের ফলে পাঁচকড়ি বাবু 'বসুমতী' থেকে বিদায় পেলেন এবং তাঁর স্থানে আমি সম্পাদক

---

* দীনেন্দ্রকুমার রায় "জলধর-স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা" নামে আলোচনায় ('মাসিক বসুমতী,' ভাদ্র ১৩৪৩, পৃ. ৮৯৫) এই তারিখ দিয়াছেন। তারিখটি ঠিক বলিয়াই মনে হয়। মনে রাখা দরকার, জলধরের 'প্রবাস-চিত্র' প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসে, তখন তিনি কলিকাতায়। সমাজপতি যখন নিজ প্রেসে 'প্রবাস-চিত্র' ছাপিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তাঁহার পরামর্শে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে পুস্তকের প্রকাশক হইতে অনুরোধ করিবার জন্য জলধর মহিষাদল হইতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন—এ কথা জলধর নিজেই বলিয়াছেন ('ভারতবর্ষ,' বৈশাখ ১৩৪৩ দ্রষ্টব্য)। এই ঘটনার "তিন-চার মাস পরে" তিনি মহিষাদল ত্যাগ করিয়া 'বঙ্গবাসী'তে যোগদান করেন এবং দেড় মাস পরে 'বসুমতী'র সহকারী সম্পাদক হন।

নিযুক্ত হলাম।...অতবড় একখানা কাগজ আমি একলা কি ক'রে চালাই।...আমার তখন মনে হ'ল সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের কথা। তিনি তখন সুদূর বরোদায় শ্রীঅরবিন্দকে বাংলা ভাষা শিখাচ্ছিলেন। তাঁরা দুই জন ব্যতীত সেখানে আর বাঙালী ছিল না। দীনেন্দ্রবাবুর কাজ-কর্ম্ম খুব কমই ছিল এবং অবসরও যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তিনি বাঙালীর সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, এ কথা আমি জানতাম। আমি তখন উপেন্দ্রবাবুর সম্মতি নিয়ে বরোদায় দীনেন্দ্রবাবুকে পত্র লিখলাম। তিনি সানন্দে আমার সহযোগী হ'তে সম্মত হলেন এবং দশ পনর দিনের মধ্যে কলিকাতায় এসে আমার পাশে বসে তিনিও হাঁফ ছাড়লেন—আমিও হাঁফ ছাড়লাম।"* ('ভারতবর্ষ,' আষাঢ় ১৩৪৩) প্রায় আট বৎসর কাল জলধর যোগ্যতার সহিত 'বসুমতী'র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ১৩১৩ সাল অশুভ মূর্ত্তিতে দেখা দিল। জলধরের সংসারে রোদনরোল উঠিল; তিনি একে একে কনিষ্ঠ সহোদর ও ভগিনীকে হারাইলেন। পূজার পরেই তাঁহার কন্যা ও পত্নী কলেরায় আক্রান্ত হইলেন। কন্যাটিকে বাঁচান গেল না। তিনি কলেরার কবল হইতে রুগ্না পত্নীকে ছিনাইয়া লইয়া উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে দেশে যাত্রা করিলেন। দীনেন্দ্রকুমার 'বসুমতী'র কর্ণধার হইলেন।

'সন্ধ্যা'ঃ তিন চার মাস দেশে কাটাইয়া অন্নচিন্তায় জলধরকে পুনরায় কলিকাতা ফিরিতে হইল। তিনি মাঝে মাঝে সকালবেলা 'সন্ধ্যা'র চায়ের আড্ডায় জমায়েৎ হইতেন।

"সেই সময়ে একদিন [ব্রহ্মবান্ধব] উপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বললেন—দেখুন জলধরবাবু, আপনার ত এখন কোন কাজ নেই। প্রত্যহ সকাল বেলা 'সন্ধ্যা' অফিসে আসুন না কেন? মুড়ি বেগুনি আর চা খাবেন—আর 'সন্ধ্যা' কাগজের জন্য এক কলম কি দু' কলম যা হয় লিখবেন। বাসায় ফিরে যাবার সময় আমি আপনাকে বেশী দিতে পারব না। 'সন্ধ্যা'র সে শক্তি নেই। নগদ দুটি ক'রে টাকা দেব। আমি ভাবলাম—মন্দ কি? বসেই তো আছি, যে দিন আসবো চা যোগ তো হবেই, আর 'সন্ধ্যা' কাগজের এক কলম কি দু' কলম লিখতে আধ ঘণ্টার বেশী সময়ও লাগবে না। দক্ষিণা নগদ দুটি টাকা—যথা লাভ।" ('ভারতবর্ষ,' শ্রাবণ ১৩৪৩) জলধর মাত্র কয়েক দিন 'সন্ধ্যা'র সহিত যুক্ত ছিলেন।

'হিতবাদী'ঃ এই সময়ে সংবাদ আসিল, 'হিতবাদী'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ জাপান হইতে প্রত্যাগমন কালে জাহাজে দেহরক্ষা করিয়াছেন (৪ জুলাই ১৯০৭)। 'হিতবাদী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ সেন সখারাম গণেশ দেউস্করকে দিয়া জলধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

"উপেন দাদা কাজের লোক; ভূমিকা বা ভণিতা না ক'রে তিনি সোজাসুজি ব'লে বসলেন, 'দেখ জলধর, তোমাকে হিতবাদীর ভার নিতে হবে।' আমি ত অবাক্—এ কি প্রস্তাব। আমি বললাম, 'আমার দ্বারা হবে না দাদা।' তাই নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হলো। অবশেষে আমি বললাম, 'আপনারা যদি সখারামের উপর সম্পূর্ণ ভার দেন, তা হলে আমি তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।' উপেন দাদা কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বললেন 'ভেবে দেখি। তুমি কাল একবার এসো।' পরের দিন গেলাম। তিনি বললেন 'তোমার প্রস্তাবেই সম্মত হলাম। আজ থেকেই কাজ আরম্ভ করে দাও।' তাঁর আদেশে সেই দিন থেকেই আমি 'হিতবাদী'র সেবক হলাম।" ('ভারতবর্ষ,' শ্রাবণ ১৩৪৩)

সুরাট কংগ্রেসে কালাপাহাড়ী কাণ্ডের পর রাজনীতিক মতামত লইয়া 'হিতবাদী'র স্বত্বাধিকারিগণের সহিত সম্পাদকের বিরোধ বাধিল। তেজস্বী মরাঠা-সন্তান তিলকের বিরুদ্ধে কোন কিছু লিখিতে সম্মত না হইয়া চাকরি ত্যাগ করিয়া গেলেন। অতঃপর জলধরই 'হিতবাদী'র সম্পাদক হন (ডিসেম্বর ১৯০৭)।

কিছু দিন পরে জলধর বুঝিলেন, তাঁহার পক্ষে বেশী দিন 'হিতবাদী'র সহিত যুক্ত থাকা চলিবে না। তিনি লিখিয়াছেন:—

"হিতবাদীর পরম শুভানুধ্যায়ীরা বলতে আরম্ভ করলেন, হিতবাদীর সুর নরম হয়ে গিয়েছে। সে কথা শুনেও চুপ ক'রে রইলাম। তার পরে অভিযোগ হ'তে লাগলো, আমি বিশারদের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করছি। যে বিশারদ দাদাকে আমি গুরুর মত ভক্তি করি, আমার দ্বারা তাঁর বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, এ অভিযোগ আমি সহ্য করতে পারলাম না—আমি তখন বিশারদ দাদার উদ্দেশে প্রণাম ক'রে তাঁর হিতবাদীর সেবা হ'তে অবসর গ্রহণ করলাম।" ('ভারতবর্ষ,' শ্রাবণ ১৩৪৩)

সন্তোষের গৃহশিক্ষক ও দেওয়ানঃ জলধর হিতবাদীর সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সন্তোষের জমিদার শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরীর ছেলেমেয়ের অভিভাবক ও শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন (ইং ১৯০৯)। তিনি দুই বৎসরাধিক কাল সন্তোষে ছিলেন; কিছু দিন দেওয়ানীও করিয়াছিলেন। কিন্তু ম্যালেরিয়ার উৎপাতে সে স্থান ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

'সুলভ সমাচার'ঃ সন্তোষে অবস্থানকালে 'সুলভ সমাচারে'র সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য জলধর

* "১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শীতের প্রারম্ভে, বোধ হয় পূজার কয়েক সপ্তাহ পর, আমি অরবিন্দকে বাংলা ভাষা শিখাইবার ভার লইয়া বরোদায় যাই। ...আমি দুই বৎসরাধিক কাল তাঁহার সহবাসে যাপন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম।"—দীনেন্দ্রকুমার রায়ঃ 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' (মাঘ ১৩৩০), পৃ. ৩, ৮৪।

অনুরক্ত হন। নরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদকত্বে নবপর্য্যায়ের দৈনিক 'সুলভ সমাচার' ১৩১৮ সালের ১লা বৈশাখ (১৯১১, ১৪ এপ্রিল) ক্রীক্ রো হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা গবর্মেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত পত্রিকা ছিল; গবর্মেণ্ট ইহার ২৫ হাজার খণ্ড নির্দ্দিষ্ট মূল্যে (অর্দ্ধ আনা) ক্রয় করিয়া বাংলা দেশের জনসাধারণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। নরেন্দ্রনাথ ভাল বাংলা জানিতেন না, জলধরই তাঁহার নির্দ্দেশমত পত্রিকার সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

পত্রিকা প্রকাশের পর চারি মাস যাইতে না যাইতেই নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় (জুলাই ১৯১১)। তখন গবর্মেণ্টের তরফ হইতে জলধরই বর্দ্ধিত বেতনে 'সুলভ সমাচারে'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু গবর্মেণ্ট এক বৎসরের অধিক কাল পত্রিকাখানি জীবিত রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। এই বৎসর পৌষ মাসে দিল্লী-দরবারের ঘোষণায় বঙ্গবিভাগ রদ হইয়া গেল। দেশে আর অশান্তির কারণ নাই বিবেচনা করিয়া সরকার জানাইয়া দিলেন, ১৩১৮ সালের চৈত্র মাসের পর আর তাঁহারা 'সুলভ সমাচারে'র জন্ত অর্থ ব্যয় করিবেন না।

'ভারতবর্ষ'ঃ অতঃপর জলধর ঘটনাচক্রে কেমন করিয়া 'ভারতবর্ষে'র সহিত সংশ্লিষ্ট হন, সে কথা তাঁহার নিজের ভাষায় বর্ণনা করিতেছি:—

"'সুলভ সমাচার' উঠে যাওয়ার সংবাদ পেয়েই আমার পরম হিতৈষী বন্ধু আমার পূর্ব্ব মনিব সন্তোষের কবি-জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং যত দিন আর কোন সুবিধা না হয় তত দিন তাঁর প্যারাগন প্রেসের ভার নিতে বললেন। এখন যেখানে আমাদের ভারতবর্ষ-আফিস হয়েছে পূর্ব্বে সেখানে ট্রাম কোম্পানীর আস্তাবল ছিল। সেই আস্তাবলের ঘরগুলি ভাড়া নিয়ে প্রমথবাবু প্যারাগন প্রেস করেছিলেন। আমি সেই প্রেসের ম্যানেজার হলাম।

তখন 'ভারতবর্ষ' প্রচারের বিপুল আয়োজন চলছে। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ যুগ্ম-সম্পাদক হয়েছেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারী শ্রীমান হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বললেন যে তিনি প্যারাগন প্রেসেই 'ভারতবর্ষ' ছাপতে চান। আমার আর তাতে আপত্তি কি! অতবড় একখানি কাগজ ছাপবার জন্য যা কিছু ব্যবস্থা করতে হয় আমি তাই করতে লাগলাম। হরিদাসবাবু কিছু টাকা অগ্রিমও দিলেন। তখন 'ভারতবর্ষে'র সঙ্গে আমার ঐটুকুই সম্বন্ধ ছিল।

আমি চার পাঁচ ফর্ম্মার মত কম্পোজ তুলে দিলাম। প্রথম ফর্ম্মার পেজ সাজিয়ে যেদিন দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম, সেই দিনই সেই ফর্ম্মার প্রুফ দেখতে দেখতেই অকস্মাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল অমরধামে চলে গেলেন।

তখন চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। 'ভারতবর্ষে'র কর্ম্ম-কর্ত্তাগণ কি করবেন স্থির করতে পারলেন না'। অনেকের নাম প্রস্তাবিত হ'ল। অবশেষে হরিদাসবাবু আমাকেই দ্বিজেন্দ্র-লালের শূন্য পদে জোর ক'রে বসিয়ে দিলেন।" ('ভারতবর্ষ,' ভাদ্র ১৩৪৩)

১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে সূচনা হইতে সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর কাল জলধর অতীব যোগ্যতার সহিত 'ভারতবর্ষ' পরিচালন করিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থাবলীঃ জলধরের রচিত ও সম্পাদিত পুস্তকের সংখ্যা বড় অল্প নহে। আমরা এই সকল গ্রন্থের একটি নির্ভরযোগ্য কালানুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন* করিয়াছি; বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরির মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। প্রবাস-চিত্র (ভ্রমণ)। ১৫ বৈশাখ ১৩০৬, এপ্রিল ১৮৯৯। পৃ. ২০৮।

সূচী:—প্রবাস-যাত্রা, গুরুদ্বার, নালাপাণি, কলুঙ্গার যুদ্ধ, টপকেশ্বর, গুচ্ছপাণি, চন্দ্রভাগা-তীরে, সহস্রধারা, মুশৌরী, তিহরী, অতিপ্রকৃত কথা, উত্তর-কাশী।

২। চাহার দরবেশ (উর্দ্দু উপন্যাস—"অনুবাদিত")। ১৩০৬ সাল (১০ মার্চ ১৯০০)। পৃ. ৮০।

বসুমতী-কার্য্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩। হিমালয় (ভ্রমণ)। ১৩০৭ সাল (১৩ অক্টোবর ১৯০০)। পৃ. ৩৩৯।

দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখিত ভূমিকা সহ।

৪। নৈবেদ্য (গল্প)। ১ আশ্বিন ১৩০৭ (১৩ অক্টোবর ১৯০০)। পৃ. ১১৪।

সূচী:—অন্ধের কাহিনী, পাগল, প্রতীক্ষা, মা কোথায়?, অদৃষ্ট, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারিণী।

৫। পথিক (ভ্রমণ)। আশ্বিন ১৩০৮ (৬ অক্টোবর ১৯০১)। পৃ. ১৬১।

ইহাকে 'প্রবাস-চিত্র' ও 'হিমালয়ে'র পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে।

৬। হিমাচল-বক্ষে (ভ্রমণ)। ১৩১১ সাল (২ সেপ্টেম্বর ১৯০৪)। পৃ. ৬০।

"প্রবাসচিত্র, হিমালয় ও পথিকে যাহা বলিতে পারি নাই, হিমাচল-বক্ষে তাহার কিছু বলিবার চেষ্টা করিলাম।" বসুমতী-কার্য্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৭। ছোট কাকী ও অন্যান্য গল্প। ? (১০ অক্টোবর ১৯০৪)। পৃ. ১১৬।

সূচী:—ছোট কাকী, মোহ, ডিপুটি বাবু, প্রায়শ্চিত্ত, রমণী, সমাজ-চিত্র, কবি, মৃতের মৃত্যু, মামাবাবু। "শেষোক্ত গল্প দুটি প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের রচনা।"

৮। নূতন গিন্নী ও অন্যান্য গল্প। ১ আশ্বিন ১৩১৪ (১ অক্টোবর ১৯০৭)। পৃ. ১১৭।

সূচী :—নূতন গিন্নী, জুনিয়ার উকীল, কালো মেয়ে, মেয়ে লাথি, সুষমা, ক্ষুদিরাম, রমাঠাকুর, রঘুনাথ।

৯। দুঃখিনী (উপন্যাস)। সন্তোষ, ১৯০৯ (৩০ জুলাই)। পৃ. ৮৯।

"১৮৭৫ অব্দে মধ্য-ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা প্রদানের পর আমি এইখানি এবং আর একখানি [২২ নং দ্রষ্টব্য] গল্পপুস্তক লিখি—তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর।"

১০। পুরাতন পঞ্জিকা ('গল্প ও ভ্রমণ)। সন্তোষ, ১৫ আশ্বিন ১৩১৬ (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৯)। পৃ. ১৩২।

সূচী : (ক্ষুদ্র গল্প)—শেফালিকার দুঃখ, বিবাহের কর্দ্দ, চিতার আগুন। (দেশ ভ্রমণ)—দেশ-ভ্রমণ। (শিকার কাহিনী)—শিকার-কাহিনী, ব্যাঘ্র-শিকার, বাঘের ঘরে অতিথি। (হিমালয়ের স্মৃতি)—হিমালয়ের স্মৃতি, শ্রীনগর, তিহরীর পথে।

"এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত "হিমালয়ের স্মৃতি"র কিয়দংশ বসুমতীর স্বত্বাধিকারী পূজনীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুস্তকাকারে ['হিমাচল-বক্ষে'] প্রকাশিত করিয়া বসুমতীর গ্রাহকগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।"

১১। বিশুদাদা (উপন্যাস)। ইং ১৯১১ (১৫ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ২২৪।

১২। হিমাদ্রি (ভ্রমণ)। ১৩১৮ সাল (২৩ নবেম্বর ১৯১১)। পৃ. ১৫৯।

সাধু ভাষায় লিখিত 'হিমালয়ে'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

১৩। আমার বর ও অন্যান্য গল্প। ফাল্গুন ১৩১৯ (৫ মার্চ ১৯১৩)। পৃ. ১৮৩।

সূচী : আমার বর, রাধারাণীর ইচ্ছা, পূজার তত্ত্ব, পূজার ভ্রমণ, পিতা-পুত্র, শিবনাথের অধিকার, কন্যাদায়, হরিনাথের পরাজয়, গল্পের মূল্য, মামা-বাবু, বাতাসী।

১৪। কাঙ্গাল হরিনাথ (জীবনী) : ১ম খণ্ড। ১৫ আশ্বিন ১৩২০ (২০ অক্টোবর ১৯১৩)। পৃ. ১৫৯।

২য় খণ্ড। জন্মাষ্টমী ১৩২১ (৩১ আগষ্ট ১৯১৪)। পৃ. ১৫২।

১৫। করিম সেখ (উপন্যাস)। ১০ আশ্বিন ১৩২৯ (২৪ অক্টোবর ১৯১৩)। পৃ. ৯৭।

১৬। আলান কোয়াটারমেন (অনূদিত উপন্যাস)। ইং ১৯১৪। পৃ. ১৪৭।

১৭। পরাণ মণ্ডল ও অন্যান্য গল্প। ভাদ্র ১৩২১ (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। পৃ. ১৫৬।

সূচী : পরাণ মণ্ডল, শান্তিরাম, পয়লা বৈশাখ, রঘু পাগলা, আর এক দিন আগে, নসীবের লেখা, কোথায় আমরা যাই, জল—একটু জল, জ্যা কাম কর্‌বি নে ?, না।

১৮। আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ। ফাল্গুন ১৩২১ (১৮ এপ্রিল ১৯১৫)। পৃ. ৮২।

বর্দ্ধমানাধিপতির *Impressions* অবলম্বনে লিখিত।

১৯। অভাগী (উপন্যাস) :

১ম খণ্ড। আশ্বিন ১৩২২ (৭ অক্টোবর ১৯১৫)। পৃ. ৩১১।

২য় খণ্ড। জন্মাষ্টমী ১৩২৯ (২৭ আগষ্ট ১৯২২)। পৃ. ১৮৪।

৩য় খণ্ড। আশ্বিন ১৩৩৯ (২৭ অক্টোবর ১৯৩২)। পৃ.১২২।

২০। আশীর্ব্বাদ (গল্প)। ভাদ্র ১৩২৩ (১০ আগষ্ট ১৯১৬)। পৃ. ১৯২।

সূচী : আশীর্ব্বাদ, অপমান, বেয়ারিং চিঠি, বিচার, ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত, দিগম্বর, "লেড়কী মর গেয়ী," কত দূরে, বিধবা, সতীর আসন, দীনের বন্ধু।

২১। দশদিন (ভ্রমণ)। ভাদ্র ১৩২৩ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৬)। পৃ. ১৫২।

২২। বড়বাড়ী (উপন্যাস)। আশ্বিন ১৩২৩ (২ অক্টোবর ১৯১৬)। পৃ. ১৭৯।

ইহা "মিত্রপরিবার" নামে ১৮৭৫ সনে রচিত।

২৩। এক পেয়ালা চা (গল্প)। ১ আশ্বিন ১৩২৫ (৫ অক্টোবর ১৯১৮)। পৃ. ১৫২।

সূচী : এক পেয়ালা চা, আমার মাষ্টারী, কূপের কথা, নিয়তি, সমাজ-চিত্র, মহৌষধি, তুলসী।

২৪। হরিশ ভাণ্ডারী (উপন্যাস)। বৈশাখ ১৩২৬ (১৫ মে ১৯১৯)। পৃ. ১৪৫।

২৫। ঈশানী (উপন্যাস)। ইং ১৯১৯ (২১ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৯৭।

২৬। পাগল (উপন্যাস)। ১ বৈশাখ ১৩২৭ (১ মে ১৯২০)। পৃ. ১৪২।

২৭। কাঙ্গালের ঠাকুর (গল্প)। ভাদ্র ১৩২৭ (১৯ আগষ্ট ১৯২০)। পৃ. ১১৭।

সূচী : কাঙ্গালের ঠাকুর, মহামায়ার মায়া, কত দূর !, আনন্দময়ী, মায়ের অভিমান।

২৮। চোখের জল (উপন্যাস)। ১ আশ্বিন ১৩২৭ (১২ সেপ্টেম্বর ১৯২০)। পৃ. ১৮০।

২৯। ষোল-আনি (উপন্যাস)। বসন্ত-পঞ্চমী ১৩২৭ (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২১)। পৃ. ১৫৭।

৩০। মায়ের নাম (গল্প)। ১ শ্রাবণ ১৩২৮ (২০ জুলাই ১৯২১)। পৃ. ১২৩।

সূচী : মায়ের নাম, মায়ের কোলে, উৎসর্গ, ভায়বাগীশের মন্ত্রদান, প্রায়শ্চিত্ত, প্রবাসের কথা, এবং, মোহিতের পরিণাম, বড়-দিদি, অন্তিম প্রার্থনা।

৩১। সোনার বালা (উপন্যাস)। ২৫ পৌষ ১৩২৮ (১ ফেব্রুয়ারি ১৯২২)। পৃ. ১৮৪।

৩২। দানপত্র (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩২৯ (২ সেপ্টেম্বর ১৯২২)। পৃ. ১২৩।

৩৩। জলধর গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড। শ্রাবণ ১৩৩০, জুলাই ১৯২৩। পৃ. ৬২৪।

সূচী : হিমাদ্রি, চোখের জল, প্রবাসচিত্র, পাগল, পুরাতন পঞ্জিকা, করিম সেখ, আশীর্ব্বাদ।

২য় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ (১৪ মে ১৯২৫)। পৃ. ৫৮০।

সূচী : কাঙ্গাল হরিনাথ, ১ম-২য় খণ্ড ; এক পেয়ালা চা ; দশদিন ; দুঃখিনী ; ষোল-আনি ; নৈবেদ্য।

৩৪। মুসাফির-মঞ্জিল (ভ্রমণ)। মাঘ ১৩৩০ (২৪ জানুয়ারি ১৯২৪)। পৃ. ১৩৬।

সূচী : বামড়া-দেবগড়, সাগর-সঙ্গমে, হিমাচল-পথে।

৩৫। পরশ-পাথর (উপন্যাস)। কার্ত্তিক ১৩৩১, নবেম্বর ১৯২৪। পৃ. ১৫৬।

৩৬। ভবিতব্য (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩২, আগষ্ট ১৯২৫। পৃ. ১৫৪।

৩৭। দক্ষিণাপথ (ভ্রমণ)। অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ (১০ ডিসেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ২৫৫।

৩৮। তিন পুরুষ (উপন্যাস)। ? [ভাদ্র ১৩৩৪—আগষ্ট ১৯২৭]। পৃ. ১৪৪।

৩৯। বড় মানুষ (গল্প)। আশ্বিন ১৩৩৬ (৯ অক্টোবর ১৯২৯)। পৃ. ১৮৫।

সূচী : বড়মানুষ, স্মৃতি, কবি-ব্যাধি, অদৃষ্ট-লিপি, সন্ন্যাস, জাতিস্মর, গৃহিণীরোগ, অধঃপতন, ব্রাহ্মণ-ভোজন, রামলাল, গুরুগিরি, শেষ আদেশ।

৪০। মধ্যভারত (ভ্রমণ)। মাঘ ১৩৩৬ (১৯ জানুয়ারি ১৯৩০)। পৃ. ২০৪।

৪১। সেকালের কথা (চিত্র)। ১ আশ্বিন ১৩৩৭ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩০)। পৃ. ১১১।

সূচী : যমজয়ী চূড়ামণি দত্ত, সেকালের ভোজ, কেরোসিন তেল, আমার প্রথম চা-পান, সেকালের বাল্য-বিবাহ, লর্ড মেয়োর অপঘাত মৃত্যু, বিজয়া-উৎসব, ভাতার-মারীর মাঠ, বালিকা-বিদ্যালয়, সেকালের পাঠশালা, সেকালের ছাত্রশাসন, পাঠশালার ছাত্র ও তাহাদের শিক্ষা-প্রণালী।

৪২। উৎস (উপন্যাস)। আষাঢ় ১৩৩৯ (২০ জুলাই ১৯৩২)। পৃ. ১০৭।

শিশুপাঠ্য গ্রন্থ : জলধর যে-সকল শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার এই কয়খানির সন্ধান আমরা পাইয়াছি :—

সীতা দেবী। ১ আশ্বিন ১৩১৮ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১১)। পৃ. ৭৬।

কিশোর (গল্প-সংগ্রহ)। ১৩২১ সাল, জানুয়ারি ১৯১৫। পৃ. ১৪২।

শিব-সীমন্তিনী। আশ্বিন ১৩৩১, অক্টোবর ১৯২৪। পৃ. ৯০।

সরল বাংলায় F. W. Bain-লিখিত *In the Great God's Hair*-এর গল্পাংশ।

মায়ের পূজা (গল্প-সংগ্রহ)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, মে ১৯২৭। পৃ. ১৪৬।

আফ্রিকায় সিংহ শিকার। ইং ১৯২৯। পৃ. ১১৬।

রামচন্দ্র। ১ আশ্বিন ১৩৩৭, সেপ্টেম্বর ১৯৩০। পৃ. ১৫৪।

আইসক্রীম সন্দেশ। ? (১০ নবেম্বর ১৯৩৫)। পৃ. ১১১।

১৩২৯ সালে প্রকাশিত 'দানপত্রে' জলধরের 'সাথী' নামে ।০ আনা মূল্যের একখানি পুস্তিকার বিজ্ঞাপন আছে। 'সন্দেশ' ও 'কটক' নামেও তাঁহার দুইখানি শিশুপাঠ্য পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পাঠ্য পুস্তক : জলধর অনেকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থেরও রচয়িতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বাঙ্গালা দ্বিতীয় পাঠ,' 'প্রথম শিক্ষা,' 'শিশুবোধ,' 'নবীন ইতিহাস' ও 'বঙ্গ-গৌরব'-এর নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

সম্পাদিত গ্রন্থ : তিনি যে-সকল গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা :—

হরিনাথ গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ। ১৩০৮ সাল (৪ নবেম্বর ১৯০১)। পৃ. ২৩২ (বসুমতী)

জাতীয় উচ্ছ্বাস (স্বদেশী গান সংগ্রহ)। ? (৪ নবেম্বর ১৯০৫)। পৃ. ৭৫ + ৫ (বসুমতী)।

প্রমথনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী, ১ম-৩য় ভাগ। ১৩২২-২৩ সাল।

প্রতিভার সম্মান : জলধর দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারী ছিলেন। বহু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান—এমন কি রাজ-সরকারও তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দিয়াছেন। ১৩৩৯ সালের ১২ই ভাদ্র রবিবার কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরি হলে প্রথম জলধর-সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। বাংলার সাহিত্যিকবৃন্দ ও রবি-বাসরের সদস্যগণের পক্ষ হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা যে অভিনন্দন পাঠ করেন তাহার শেষাংশ এইরূপ :—"তোমার দৃষ্টি সকলকে সমানভাবে নন্দিত করিয়াছে। তোমার প্রীতি অখ্যাতকে খ্যাত এবং নবীনতাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছে। স্নেহ-বিতরণে তোমার কার্পণ্য নাই, দারিদ্র্যে তোমার কুণ্ঠা নাই, বিলাসে তোমার স্পৃহা নাই ; সম্মানে তোমার গর্ব্ব নাই, সামাজিকতায় তোমার শৈথিল্য নাই, বাণীর সেবায় তোমার শ্রান্তি নাই। হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, সাহিত্যে ও সমাজে তাই তুমি জ্যেষ্ঠত্বের অধিকারী।

হে তাত, আমরা তোমায় অভিনন্দন করি।" অন্যান্য যে-সকল প্রতিষ্ঠান তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন তাহার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি :—

সভাপতি…তৃতীয় বার্ষিক মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলন…১৩২২
সহ-সভাপতি…বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ…১৩২৯-৩০, ১৩৪৩-৪৫
'রায়-বাহাদুর' উপাধি… …৩ জুন ১৯২৯
সাহিত্য-শাখার সভাপতি…বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, রাধানগর …৬-৭ বৈশাখ ১৩৩১
ঐ …প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন, ইন্দোর …পৌষ ১৩৩৫
সর্ব্বাধ্যক্ষ…'রবি-বাসর' …১৩৩৮
বিশিষ্ট সদস্য…বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ …১৩৪১
নিখিল-বঙ্গ-জলধর-সম্বর্দ্ধনা… …২-৪ ভাদ্র ১৩৪১
সম্বর্দ্ধনা…বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ …২৮ বৈশাখ ১৩৪২

মৃত্যু ঃ ১৩৪৫ সালের ৮ই মাঘ সহধর্ম্মিণীকে হারাইয়া বৃদ্ধ জলধরের শরীর সেই যে ভাঙ্গিয়া পড়িল আর তাহা সুস্থ হইল না; তিনি পরবর্ত্তী ২৬এ চৈত্র (১৫ মার্চ ১৯৩৯), ৮০ বৎসর বয়সে, পত্নীর অনুগামী হন।

উপসংহার ঃ ১৩৪১ সালের ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত নিখিল-বঙ্গ-জলধর-সম্বর্দ্ধনায় স্বদেশবাসীর পক্ষ হইতে কথা-শিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরে তাঁহারই রচিত যে মান-পত্রখানি জলধরকে দেওয়া হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি :—

পরম শ্রদ্ধাস্পদ—

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের
করকমলে—

বরেণ্য বন্ধু,

তোমার দীর্ঘজীবনের একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনায় আমাদের মানস-লোকে তুমি পরমাত্মীয়ের আসন লাভ করিয়াছ।

তোমার অকলঙ্ক চরিত্র, নিষ্কলুষ অন্তর, শুভ্র সদাচার আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তোমার স্নেহে তোমার সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ,আমাদের অকপট মনের ভক্তি-অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ কর।

বাণীর মন্দির-দ্বারে তুমি সকলকে দিয়াছ অবারিত পথ, কনিষ্ঠগণকে দিয়াছ আশা, দুর্ব্বলকে দিয়াছ শক্তি, অখ্যাতকে দিয়াছ খ্যাতি, আত্মপ্রত্যয়হীন, শঙ্কাকুল কত আগন্তুক জনই না সাহিত্য-পূজার বেদী-মূলে তোমার ভরসা ও বিশ্বাসের মন্ত্রে স্বকীয় সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছে।

সাহিত-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে তুমি আনন্দ বিতরণ করিতে। সে ব্রত তোমার সফল হইয়াছে; তোমার সৃষ্টি কাহাকেও আহত করে না, তোমার অন্তঃপ্রকৃতির মতই সে সৃষ্টি স্বচ্ছন্দ সুন্দর ও অনাড়ম্বর। তোমার দুঃখ-বেদনাভরা হৃদয় একান্ত সহজেই জগতের সকল দুঃখকে আপন করিয়াছে, তাই, ব্যথিত যে জন সে তোমারই সৃষ্টির মাঝে আপনার শান্তি ও সান্ত্বনার পথের সন্ধান পাইয়াছে।

হে নিরহঙ্কার বাণীর পূজারী, তুমি আজ বঙ্গের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর। ইতি—তোমার স্বদেশবাসীর পক্ষ হইতে—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

কবি জন্মতিথি এল চির অমলিন, ক্ষয়হীন,
স্বপ্নভাঙা নির্ঝরিণীসম তার উচ্ছলিত প্রাণ,
কুয়াশার জাল ভেদি' বাজিবে যে আলোকের বীন্
সুনীল আকাশে আর কিশলয়ে রবে তার গান।

নূতনের মায়াদণ্ড এই দিন স্পর্শ দিবে গায়,
পুরাতন দ্বারে আসি' ফিরে যাবে শুষ্ক হতবাক্—
নূতন যৌবন আসি' প্রকৃতির পর্ণ-লতিকায়
নৈবেদ্য সাজায়ে আনি' বাজাইবে মাঙ্গলিক শাঁখ।

ভারতের পূর্ব্বাচলে এই দিনে দিগন্ত সীমায়
তোমার উদয় কবি, নবরবি, তমিস্রা বিনাশি',
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মুগ্ধ আলোকের রশ্মি-প্রতিভায়
চেতনার দোলা দিল প্রাণে প্রাণে নবরূপ আসি'।

ভারতের পুণ্যভূমি আজি মহা সিন্ধু বক্ষসম
উদ্বেলিত ঝঞ্ঝা ঝড়ে উন্মথিত পাশব বিদ্বেষে;—
হে মহা দিবস, তুমি মুছে দাও অন্তহীন তম,—
প্রেমের অমৃত ভাণ্ড ঢেলে দাও সবারে নিঃশেষে।

পঁচিশে বৈশাখ

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

বিজলী-চঞ্চল-গতি নিষ্করুণ কালের পাখায়
কতদিন এলো গেল কত শুভ্র শারদ শেফালী
রচে গেছে ফুলহার। বসন্তের পেলব শাখায়
পিকের অমিয় ধারা প্রাণপ্রান্তে জেলেছে দেয়ালী।
তবু ত শরৎ নয়—নহে ফুল্ল বসন্তের মাস।
রুদ্র ও রৌদ্রের মাঝে অপরূপ একি সুরঙীন
জীবন্ত যৌবনরসে সুসবুজ রক্তিম পলাশ
আশা ও ভাষায় পূর্ণ বিমুখর ছন্দঘন দিন।

সুদূর পশ্চিম আর পূরবের প্রতিপ্রান্ত দ্বারে
শ্রদ্ধায় নোয়ায়ে শির শতলক্ষ কণ্ঠ দেয় ডাক,
তোমারে স্মরণ করি—হে রবীন্দ্র! হৃদি নমস্কারে
তোমারে স্মরণ করি—হে সুন্দর! পঁচিশে বৈশাখ!
অভাব দারিদ্র্য আছে, পায়ে বাঁধা অজস্র শিকল
তবুও উন্নত শির; প্রাণে ফোটে সহস্র কমল।

শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সরকার

রবীন্দ্র-ভক্ত এন্‌ড্রুজ সাহেব সত্যই বলিয়াছেন—"Never was there a man with so many windows for so many winds as Tagore." ইহার তাৎপর্য্য এই, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। সেই প্রতিভার অন্যতম মূর্ত্ত রূপ—তাঁহার গড়া শান্তিনিকেতন। দেশের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি তাঁহার ভাল লাগে নাই, নিজ ছাত্রজীবনের বিষাদময় অভিজ্ঞতা তাঁহাকে ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়াছিল। এই বিদ্রোহের ফলে শান্তিনিকেতনের সৃষ্টি।

কবিগুরু শিক্ষাগুরুর আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহার শিক্ষায়তনের আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিলেন—আর্য্যাবর্ত্তের পুরাতন 'আশ্রম' ও 'তপোবন'। ইহাই শিক্ষাক্ষেত্রে 'টটক'-আদর্শ। তাঁহার মতে প্রত্যেক শিক্ষায়তন প্রকৃতিদেবীর ক্রোড়ে এমন স্থানে স্থাপিত হইবে, যেখানে প্রকৃতির রূপ ও মহিমা স্বতঃস্ফূর্ত্ত। তিনি বলেন, আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতার জন্য প্রকৃতির সহিত যোগসূত্র স্থাপন অপরিহার্য্য। জীবনের প্রারম্ভে মন ও চরিত্রকে গড়িয়া তুলিবার জন্য অনুকূল আবহাওয়া অতীব আবশ্যক। শুধু ব্রহ্মচর্য্য পালন নয়, তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই। "বিরাট প্রকৃতির অন্তরে আদিম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল, শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতি-সঞ্চার করে; জীবনের আরম্ভে অভ্যাসের দ্বারা অভিভূত হবার আগে কৃত্রিমতার জাল থেকে ছুটি পাবার জন্য ছেলেরা ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে, সহজ প্রাণলীলার অধিকার তারা দাবি করে বয়স্কদের শাসন এড়িয়ে। আরণ্যক ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাই কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হ'তে নিঃসৃত হ'য়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ মহান্ শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের এই স্পন্দন লাগতে দাও—ছেলেদের দেহে মনে শহরের বোবা-কানা-মরা দেওয়াল-গুলোর বাইরে।"

শান্তিনিকেতনে শিক্ষাদানের প্রণালী অভিনব। এখানে রবীন্দ্রনাথ শিশু-মনকে বাঁধাধরার কঠিন বন্ধন হইতে, এবং শিক্ষকের পীড়ন হইতে মুক্ত করিয়া সহজভাবে প্রকৃতির সাহচর্য্যে বিচরণ করিবার সুযোগ দিয়া প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বহু কুফল হইতে শিশুদিগকে সযত্নে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক শিশু-মনেই সমস্ত নূতন ঘটনা বা সত্য সাদর অভ্যর্থনা পায় এবং এইভাবে শিশুরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। জ্ঞান অর্জ্জন করিবার ক্ষেত্রে—প্রকৃতি তাহাদের এক প্রধান সহায়, কবিগুরু ইহা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। শিশুমন যেন বহিঃপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির মিলন-তীর্থ।

"শিশুকাল হইতে কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যথাপরিমাণে হৃদয়াঙ্কুরগুলি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মান্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইতেছে, যখন নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি—, নবীন কৌতূহল চারিদিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে, তখন যদি ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্ব্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল, সরস এবং পরিণত হইতে পারে; কিন্তু সেই সময় যদি কেবল শুষ্ক ধূলি এবং তপ্ত বালুকা, কেবল নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তবে পরে মুষলধারায় বর্ষণ হইলেও সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি আর তাহার জীবনের মধ্যে তেমন সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া যায়।" ইউরোপীয় শিক্ষা-বিজ্ঞানীদের মত আমাদের শিক্ষাগুরুও বলিতেছেন—'প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভাবই বল, চরিত্রই বল নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, অতএব আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।'"

সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রধান ত্রুটি এই যে, সেখানে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টায় নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনা হয়। ইহার ফলে শিশুদের মনের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা সঙ্কুচিত হইয়া যায়—পাঠে তাহাদের মন আকৃষ্ট হয় কম। শৈশবকালেই এই জ্ঞানস্পৃহা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী থাকে—আর ঠিক এই সময়েই শিশুরা বিদ্যালয়ে আসিয়া পড়ে। বিদ্যালয়ের যান্ত্রিক পদ্ধতি তাহাদের কাছে প্রাণবান বলিয়া মনে হয় না, বরং উহা তাহাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। স্কুলের দেওয়ালগুলি তাহাদের নিকট মৃত মানুষের খোলাটে ও রক্তহীন চক্ষুস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। বহির্বিশ্বের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যাওয়ার ফলেই বিদ্যালয়সমূহ শিশু-মনে ভীতির উদ্রেক করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যের স্কুল 'বেঙ্গল একাডেমি' সম্বন্ধে বলিতেছেন—"ইহার ঘরগুলা নির্ম্মম, ইহার দেওয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মত—ইহার মধ্যে বাড়ীর ভাব কিছুই নাই—ইহা খোপ ওয়ালা একটা বড় বাক্স। ছেলেদের যে ভালমন্দ

লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিষ আছে, বিদ্যালয় হইতে সেই চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্ব্বাসিত।"

আমাদের বিদ্যালয়ে যে তথাকথিত নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রচলিত আছে তাহা শিশুমনের সতেজ ভাবকে নষ্ট করিয়া দেয়। ভাইকাউন্ট ব্রাইস বলিয়াছেন—"Discipline has its worth, but it may imply some loss of individuality."—নিয়মানুবর্ত্তিতার মূল্য আছে, কিন্তু ইহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য খানিকটা নষ্ট করিয়া দেয়। শিশুর মন অসাড় এবং জড় হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাদের এই মনোভাবের প্রতি দৃকৃপাত করা হয় না এবং পাঠের ঝড় তাহাদের উপর দিয়া বহিয়া যায়। বলপ্রয়োগে মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়, ইহা একটা মস্ত বড় ভুল ধারণা।

মুক্ত বাতাসে, ছায়াচ্ছন্ন আম্রবৃক্ষতলে প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় সৌম্যমূর্ত্তি ও প্রশান্তবদন রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপনা ভারতের এক গৌরবময় বিস্মৃত-প্রায় যুগের কথা আমাদিগকে মনে করাইয়া দেয়। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছাপ শিশুমনে যে চিত্র আঁকিয়া দেয়, তাহা সহজে মুছিয়া যায় না। "আত্মশক্তির আবিষ্কারই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য," ইহা কবিগুরুর পাঠদানের রীতি হইতে সম্যক্ উপলব্ধি হয়। কবি কীট্সের 'Autumn' বা শেলির 'Intellectual Beauty' পড়াইতেছেন। সেখানে বয়স্ক শ্রোতাও গিয়া বসিতেন। তাঁহার ব্যাখ্যার দানসত্র অজস্রধারে ঝড়িয়া পড়িয়া বালক ও বয়স্ক সকলের মন পূর্ণ করিয়া দিত। সকলেই প্রয়োজনের বেশী পাইত, এই উদ্বৃত্ত অংশটাই মানুষের ঐশ্বর্য্য। তাঁহার নিয়ম ছিল প্রশ্ন করিয়া করিয়া ছাত্রছাত্রীদের মুখ দিয়া ঠিক শব্দটি বাহির করিয়া লইতেন—ইহাতে তাঁহার শ্রান্তি বা অসন্তোষ ছিল না। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের ইঙ্গিত ধরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে নিজেদের শক্তি আবিষ্কার করিত; রবীন্দ্র-চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য—লঘুতম কথাবার্ত্তা হইতে মোচড় দিয়া রস আদায় করিবার ক্ষমতা, অভাবনীয়ের সঙ্গে তান রাখিয়া রস-সৃষ্টির শক্তি, শিশুমনের সঙ্গে সমসূত্রে নিজেকে অনায়াসে স্থাপন।"*

কবির মতে শিক্ষকগণ হইবেন একাধারে শিক্ষার্থীর বন্ধু এবং উপদেষ্টা। অধ্যাপনার সময় শিশুমনের গতির সহিত শিক্ষকের নিজ মনের গতির সংযোগসাধন করিতে হইবে। শিক্ষাদানকার্য্য যে একটা প্রাণবন্ত জিনিষ, উহা যে যান্ত্রিক-ভাবে সুসম্পন্ন হয় না—এই কথা যেন শিক্ষক সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন। এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া কবি তাঁহার ছাত্র-ছাত্রীগণের সহিত খেলায় মত্ত হইতেন, অভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ করিতেন এবং নৃত্যে যোগদান করিতেন। তিনি গাহিয়াছেন—

"হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে,
ময়ূরের মতো নাচে রে,
হৃদয় নাচে রে।"

সত্যই উঁহাদের সহিত নৃত্যে তাঁহার হৃদয় ময়ূরের মত নাচিয়া উঠিত। তখন যে নৃত্যের অবতারণা হইত তাহা অনির্ব্বচনীয়, স্বর্গীয়। সেই নৃত্যের সঙ্গে যে সঙ্গীত গীত হয় এবং যে ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়, তাহা অপূর্ব্ব। এ ধরণের নৃত্য একাধারে দেহ ও মনের পুষ্টিসাধন করে।

Dr. Laurin Zilliacus বলেন, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন প্রমাণ করাইয়া দেয়, মানুষের জীবনধারণ শুধু খাদ্যদ্রব্য আহরণ ও ভোজনের জন্য নয়; জীবনের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য আরো কিছু দরকার। এজন্য এখানে মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় এবং এই উদ্দেশ্যেই এখানকার বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় কলাবিদ্যা, সঙ্গীত, জাতীয় উৎসব এবং আমোদ-প্রমোদের অবতারণা করা হইয়াছে। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে জীবনের প্রতি দিকের, প্রতি অংশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন। মনে হয়, আমাদের দেশের স্কুলগুলি হইতে প্রকৃতি ও ভগবান নির্ব্বাসিত, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্বন্ধও খণ্ডিত; এরূপ অবস্থায় কবিগুরু তাঁহার বিদ্যায়তনে এই তিন সত্তার—প্রকৃতি, ভগবান ও মানুষ—একত্র সমাবেশের চেষ্টা করিলেন। মানব শিশু কুসুম-কোরক; তাহার পূর্ণ বিকাশের জন্যই এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা।

প্রকৃতির সহিত শান্তিনিকেতনের প্রাণ যে একসূত্রে গ্রথিত ইহার অন্যতম প্রমাণ—এখানকার ঋতু-উৎসবগুলি। বিভিন্ন ঋতুর আগমনে যে বৈচিত্র্যময় নব নব অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহা অতুলনীয়। এক একটি ঋতু-পরিবর্ত্তনের সহিত শিশুর হৃদয়ও স্পন্দিত হয়। যখন নবীন বর্ষার প্রথম বারিধারা আশ্রমে পরম আদরে শিশুদের কপোলে স্নেহচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেয়—সত্যই যখন "এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা, গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন ভরসা"—তখন তাহারা বর্ষার আগমনে হঠাৎ ছুটি পাইয়া নববর্ষার ন্যায়ই উদ্বেল হইয়া উঠে, আর তখন হয়ত আমাদের সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে হতভাগ্য ছাত্রগণ দরজা জানালা বন্ধ করিয়া গণিত-সাগর মন্থনে ব্যস্ত। এই হঠাৎ পাওয়া ছুটির মধুর স্মৃতি চিত্তপটে চির দিনের জন্য অঙ্কিত থাকে। শিশুমন তখন আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠে—'আজ আমাদের ছুটি রে ভাই, আজ আমাদের ছুটি।'

রবীন্দ্রনাথের সহিত ফরাসী দার্শনিক রুশোর অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। উভয়েই প্রকৃতির পূজারী। রবিন্সন ক্রুশোর

* শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী

গল্প দু'জনের কাছেই সম আদরণীয়। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। রুশো অসামাজিক, আমাদের কবি ঠিক ইহার বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ বলেন, আমার ছাত্রেরা ধীরে ধীরে আমাদের প্রতিবাসীদের নানা রকমে সাহায্য করিতে এবং তাহাদের জীবনধারার সহিত সর্ব্বদা সম্বন্ধ রাখিয়া চলিতে শিখে। রবিন্সন ক্রুশোর গল্পে আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলনের অভাবনীয় রূপ প্রকাশ পাইয়াছে একটা গল্পের মধ্যে—যেখানে মানুষ প্রকৃতির সহিত মুখোমুখী দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত করিতেছে, তাহার সহিত সহযোগিতা করিতেছে এবং তাহার সহায়তালাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী যে আধুনিক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই, কারণ তিনি তাঁহার শিক্ষায়তন হইতে শাস্তিপ্রদানের বর্ব্বরোচিত প্রথা তুলিয়া দিয়া উহাকে প্রকৃত শিক্ষানিকেতনে পরিণত করিয়াছেন। অন্যত্র যাঁহার শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী তাঁহাদিগের মধ্যে উৎসাহের ও উদ্দীপনার একান্ত অভাব রহিয়াছে, তাঁহারা শিক্ষার্থীকে শাস্তি দিতে তৎপর, কিন্তু পাশে বসিয়া প্রীতির দ্বারা তাহার সংশয় ঘুচাইয়া তাহার সহচর হইতে পারেন না। কবিগুরু মনে করেন, মনুষ্যত্বের নামে তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত যে, তাঁহারা জীবনে ভুল পথ বাছিয়া লইয়াছেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদের শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া কারারক্ষীর কার্য্যভার গ্রহণ করা উচিত। সকল শিক্ষকই যেন মনে রাখেন যে, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও সহানুভূতি ক্লাসে এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে, যাহা শিক্ষাদানের কাজকে অনেকখানি সহজ করিয়া দেয়।

কবি অন্যত্র বলিতেছেন—"আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁহার ব্যবসায়। তিনি খরিদ্দারের সন্ধানে ফেরেন। শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিদ্যাবস্তু বিক্রয় করেন। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক দেনা-পাওনার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠেন সে তাঁহাদের বিশেষ মাহাত্ম্যগুণে। তিনি এমন জিনিষ দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত, সুতরাং ছাত্রের নিকট ধর্ম্মের বিধানে, স্বভাবের নিয়মে তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশী দিয়া আপন কর্ত্তব্যকে মহিমান্বিত করেন।"

কবিগুরুর ভাষা অননুকরণীয়; অতএব তাঁহার ভাষাতেই বলি, "যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয় সেইখানেই আমরা শিখিতে পারি, যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একান্তে সাধনা সেইখানেই আমরা শক্তিলাভ করি; যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর, যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চ্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত, সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়; বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত, ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্ম্মশিক্ষা সেইখানেই সরল ও স্বাভাবিক; আর যেখানে কেবল পুঁথি ও মাষ্টার, সেনেট ও সিণ্ডিকেট, ইটের কোঠা ও কাঠের আসবাব সেখানে আজও আমরা যত বড় হইয়া উঠিয়াছি, কালও আমরা তত বড়টা হইয়াই বাহির হইব।"

মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত—এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতীদের সহিত একমত। মাতৃদুগ্ধ যেমন শিশুর জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য্য, সেইরূপ শিশুর জ্ঞানবৃদ্ধিকল্পে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান অত্যাবশ্যক। মাতৃভাষা যদি শিক্ষার বাহন হয়, তবে চিন্তাকে ভাষায় ব্যক্ত করা অনেক সহজ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে। কবি বলিতেছেন—"শিক্ষা-সরস্বতীকে শাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালী বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে, শাড়ি পরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।"

কবিগুরুর শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য—শিশু-মনে অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করা। বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মস্তিষ্ক নানা রকম তথ্যে ভরপুর করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা সেগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষার উত্তর-পত্রে উগরাইয়া দিয়া আসে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেহ হয়ত চিত্রাঙ্কনে দক্ষ, কেহ বা নৃত্যে পটু, কাহারো সঙ্গীত লাগে ভাল, কেহ বা গাছপালার অনুরাগী; কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে এ সকল প্রবৃত্তি উৎসাহ পায় না। জানিতে চাওয়ার সঙ্গে জানিতে পাওয়ার যে যোগ আছে, সে যোগ ইহাদের বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ওরা কোনো দিন জানিতে চাহিতে শেখে নাই। শান্তিনিকেতনে পড়াশুনাকে ছাত্রজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্যরূপে না ধরিয়া একটা অংশরূপে গণ্য করা হয়; ফলে পড়ার প্রবৃত্তিটি অব্যাহত থাকে। ব্রতী বালকবালিকারূপে এবং অন্যান্য নানা ভাবে তাহাদের মনে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ছেলে-মেয়ে ও শিক্ষকদের অনেকবার একথা বলিয়াছেন, "লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ববোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি ক'রে থাকি, শান্তিনিকেতনের ছোট সীমার মধ্যে তারই একটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে চাই। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণ হিতের অনুগত করে তোলবার চর্চা রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে হ'তে পারে না,

তার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়, সেই ক্ষেত্র আমাদের আশ্রম।"

যে জাতিগত ও শ্রেণীগত বিদ্বেষ এবং দ্বন্দ্বের বহ্নি আজ সমগ্র বিশ্বকে প্রজ্বলিত করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে কবি উদাত্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া মৈত্রী ও মহামানবতার বাণী প্রচার পূর্ব্বক শান্তিনিকেতনকে প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে পরিকল্পিত করিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের দেশের বিদ্যা-নিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন-নিকেতন ক'রে তুলতে হ'বে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয় লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্য লাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য করতে যার কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই—যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা ক'রে সে ধন্য হবে। শিক্ষা-ক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা।" শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনস্থল; সত্যই পূর্ব ও পশ্চিম এখানে হাত মিলাইয়াছে। ইহা মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষের অন্যতম অবদান। সুরুলের 'শ্রীনিকেতন' বোলপুর আশ্রমের এক নূতন অঙ্গ। শ্রীনিকেতনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে আধুনিক কালে জীবিকা অর্জন করিবার জন্য নানারূপ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। সুইট্জারল্যাণ্ডের স্বাবলম্বী শিক্ষা-উপনিবেশগুলির ন্যায় এখানে স্বাবলম্বন ও শ্রমের মর্য্যাদা শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রীনিকেতনে যেন কবিগুরু বাস্তব জগতে নামিয়া আসিয়াছেন। শ্রীনিকেতনের হলকর্ষণ উৎসবে কবির উক্তি উল্লেখযোগ্য। "যখন যন্ত্র মানুষকে অমানুষ করছে এবং সমাজকে ভেঙে দিচ্ছে, তখন মাতৃস্বরূপা ধরিত্রীর নিকট আমাদের ঋণের কথা স্মরণ করা উচিত। তিনি আমাদের জীবনধারণের উপাদান যোগাচ্ছেন। আমরাও তাঁর পুষ্টিসাধন করব। এই হলকর্ষণ উৎসব আমাদের কৃতজ্ঞতার প্রতীক। মানব-সন্তান ধরিত্রীরও সন্তান। মানুষের সুখ—পৃথিবী এবং মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বে ও সহযোগিতায়—সর্বগ্রাসী বিরোধিতায় নয়।"

রবীন্দ্রনাথ শান্তির বার্তাবহ ও বিশ্বপ্রেমিক। তাঁহার চরিত্রের এই দুইটি গুণই প্রতিভাত হইয়াছে তাঁহার এই প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনে। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত ভাবে আমরা যতই ক্ষুদ্র হই না কেন এবং জগতের যে কোনো স্থানে বাস করি না কেন, সমষ্টিগত হিসাবে আমাদের ক্ষমতা আছে—সমগ্র মানবজাতির জ্ঞানে আলোকপাত করা।

শান্তিনিকেতন—তথা বিশ্বভারতী যে শুধু ভারতের গর্বের বস্তু তাহা নহে, ইহা সারা বিশ্বের এক অমূল্য সম্পদ। শিক্ষা যে কোনো ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে, তাহা যে সর্বলোকের এবং সর্ব-কালের—এই আশ্রম লোকচক্ষুর সমক্ষে এই বিরাট সত্য উপস্থাপিত করিয়াছে। কবির আরব্ধ কার্য্যে কত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তিনি শিশুদের কত ভালবাসিতেন এবং তাহাদের শিক্ষা মধুর ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া পৃথিবীর রূপ পরিবর্ত্তনে কিরূপ প্রয়াসী হইয়াছিলেন—তাহার মূর্ত্ত প্রয়াস চিরতরে বিরাজমান থাকিয়া শিক্ষাগুরুর যশোগাথা ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের নিকট প্রচার করিবে। রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে বুঝিতে হইলে শুধু তাঁহার কাব্যের আলোচনা যথেষ্ট নয়, শান্তিনিকেতনকেও বুঝিতে হইবে; নচেৎ একদেশদর্শিতা হইবে।

বর্ষ-সন্ধি

শ্রীমহাদেব রায়

লেখনীর মসী মুখে রূপ সজ্জা কি রচি তোমার।
মানস দর্পণে স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব তোমার উজ্বল,
এত রূপ এত সজ্জা হে মাধবী, অঙ্গে যে অপার,
কি সযত্ন আবরণে আবরিয়াছিল হিমাঞ্চল।
কান্তি তব জাগিয়াছে প্রতি অঙ্গে রেখায় রেখায়
শিথিল অঞ্চলে যেন সঞ্চারিণী কাঞ্চী কোমলা,
মাধুর্য্যের সুর শোভা ধরিয়াছে পল্লবে শাখায়,
দিব্য আভরণ তব সর্ব অঙ্গে হে দিব্য কুন্তলা।

স্বর্ণ-কান্তি শাল শীর্ষে কাঞ্চন কুন্তল মনোহর,
বরিতে দাঁড়ায়ে যেন আসন্ন বৈশাখ তপশ্চরে,
পলাশে গৈরিক বাসে পতিব্রতা পবিত্র সুন্দর
আচরিছ তপশ্চর্যা শুচিতার বরমাল্য করে।
নববর্ষ-সন্ধি-লগ্ন বাঁধে দৃঢ় গ্রন্থির বন্ধনে
বাঞ্ছিত বৈশাখে আজি সুপবিত্র তোমার অঞ্চলে
এ বিশ্ব-বাসর মুগ্ধ বধূ-বরে মধুর মিলনে,
নব রবি-গীতি-রাগ নববর্ষে কমলের দলে।

সিন্ধুসভ্যতার উৎপত্তি

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

সিন্ধু, পঞ্জাব ও বেলুচীস্থানের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হইবার পরে সর জন মার্শাল মত প্রকাশ করিলেন যে সিন্ধুযুগের তাম্রযুগীয় সভ্যতা এক বৃহত্তর তাম্রযুগীয় সভ্যতার অংশমাত্র। এই বৃহত্তর সভ্যতা পশ্চিমে থেসালী ও দক্ষিণ ইটালী এবং পূর্বে হোনান ও চিহলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে দক্ষিণ রুশিয়া (Tripolje I) পর্যন্ত ইহার বিস্তার দেখা যায়। সে যাহা হউক, মার্শালের বক্তব্যের অর্থ এই যে পূর্বে মাঞ্চুরিয়া হইতে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত এই তাম্রযুগীয় সভ্যতা প্রসারিত ছিল। এই মতবাদের প্রধান ভিত্তি সেরামিক্স (ceramics) বা পোড়ামাটির তৈজসপত্রের গঠনপ্রণালী, রঙের কাজ ও উহার উপরের নক্সা। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে এই মতবাদ ভিত্তিশূন্য নহে তাহা হইলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে মাঞ্চুরিয়া হইতে দক্ষিণ ইটালী পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাম্রযুগীয় কৃষ্টির অভ্যুদয় কি সমসাময়িক না প্রত্যেক দেশে বা নিকটবর্তী কতকগুলি লইয়া গঠিত এক একটি অঞ্চলে এবং প্রত্যেক জাতি বা কতকগুলি জাতি যাহারা এক গোষ্ঠীভুক্ত বা সমগোষ্ঠীয় তাহাদের মধ্যে ইহার বিকাশ বিভিন্ন সময়ে ঘটিয়াছিল? অথবা মার্শাল যে ভাবে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে এ প্রশ্নও উঠিতে পারে, এই কৃষ্টি কি একটি কেন্দ্র হইতে—মাঞ্চুরিয়া হইতে দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল? তারপরের জিজ্ঞাস্য, তাহা হইলে সেই কেন্দ্র কোথায়?

প্রাচীন প্রস্তরযুগ, নূতন প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জযুগ, ও লৌহযুগের কৃষ্টির সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে যে সকল আলোচনা হইয়াছে—তাহা হইতে সভ্যতার বিকাশ সম্বন্ধে এক কেন্দ্র হইতে বিস্তৃতি বা বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে এক স্তরের কৃষ্টির সমসাময়িক বিকাশের ধারণা সমর্থিত হয় না। ইতিহাসও এ ধারণার সমর্থন করে না। সিন্ধু উপত্যকার তাম্রযুগের কাল খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন খ্রীঃ পূঃ ৫০০০ বৎসরে মিশরে তাম্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়ায় খ্রীঃ পূঃ ৫০০০ বৎসরে, চীনে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরে, সাইপ্রাসে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পূর্বে তাম্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ইউরোপের প্রধান ভূভাগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে আয়র্লণ্ড ছাড়া অন্যত্র প্রকৃত প্রস্তাবে কোন তাম্রযুগ ছিল না। লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে বলা হয় খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীতে মধ্য ইউরোপে ইহার প্রচলন হয় কিন্তু ভারতবর্ষে সম্ভবত খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ বৎসরে লৌহের ব্যবহার জানা ছিল। দক্ষিণ-ভারতে লৌহের ব্যবহার আরও প্রাচীন। দক্ষিণ-ভারতে তাম্র বা ব্রোঞ্জযুগ ছিল না, প্রস্তরযুগ হইতে লৌহযুগের প্রবর্তন হয়। মিশরে ৪র্থ রাজবংশের আমলে (খ্রীঃ পূঃ ৩৭৩৩) লৌহের ব্যবহার হইত। গিজের পিরামিড হইতে লৌহ পাওয়া গিয়াছে, পঞ্চম বংশের আমলের (খ্রীঃ পূঃ ৩৫৬৬) আবুসিরের স্তূপ হইতে লৌহের কোদালী পাওয়া গিয়াছে। চীনে খ্রীঃ পূঃ ২৩৫৭, ক্রীটে খ্রীঃ পূঃ ১২০০, আসিরীয়ায় খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে লৌহের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। (**Huxley Memorial Lecture for 1912 ; Journal of the Royal Anthropological Institute, XLII**)।

সে যাহা হউক, মার্শালের মন্তব্য হইতে একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে একই প্রকারের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণযুক্ত তাম্রযুগীয় কৃষ্টি এশিয়ার পূর্ব সীমানা হইতে দক্ষিণ-ইউরোপ পর্যন্ত একই সময়ে বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রকৃত অবস্থা এই যে প্রাচীন ইতিহাস হইতে দেখা যায়, কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চল সভ্যতা বিকাশের কেন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্র হইতে সভ্যতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সভ্যতা বিকাশের এই সকল কেন্দ্রের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ ছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রের এই সকল লক্ষণ তাহার প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতে সংক্রামিত হইয়াছে। বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে দুই-একটি লক্ষণের সাদৃশ্য তাহাদের মধ্যে সম্পর্কের প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হইতে পারে না। বৈষয়িক ব্যাপারে, অর্থাৎ জীবন-যাত্রার স্থূল প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যেমন যন্ত্রপাতি, অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ, কৃষিকার্যের পদ্ধতি, জলযানের ব্যবহার, বস্ত্রাদি বয়ন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে অল্পবিস্তর সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। কারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজন সর্বত্র এক। প্রাচীন যুগের মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি এই সকল প্রয়োজন নিজেদের অবস্থানুযায়ী মোটামুটি মিটাইবার চেষ্টায় নিয়োজিত হইত। তারপর এই সকল বিভিন্ন কেন্দ্রে কোন নির্দিষ্ট স্তরের কৃষ্টির বিকাশ এক সময়ে ঘটিয়াছিল ইতিহাস এ কথা বলে না। তাম্রযুগীয় কৃষ্টির অভ্যুদয় যে

বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে লক্ষিত হয় সে সম্বন্ধে উপরে একজন পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, পরে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক হইবে।

সভ্যতার বিকাশের ধারা সম্বন্ধে ইতিহাস এই প্রকার সাক্ষ্য দিলেও দেখা যায় যে সাধারণ মানুষের চিন্তার গতি খানিকটা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। একজন সাধারণ পূর্ব-পুরুষ বা একজন আদিম মানবের কল্পনা করা লোকের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। শুধু কবি কল্পনার আদম ইভ নহে, বহু বিষয়ের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া বহু শিক্ষিত লোকের চিন্তাধারা এই অবৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া চলে। গোড়ায় এই পুরাতন, বদ্ধমূল অভ্যাসের দরুণ সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকের চিন্তাধারা এই অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কার্য করিয়াছে। একটি মাত্র কেন্দ্রে সভ্যতার উৎপত্তি হইয়া তাহা সমগ্র পৃথিবীতে প্রসারিত হইয়াছে এই কথা শুনিতে হাস্যকর মনে হইলেও কার্যতঃ হাস্যকর মনে করা হয় নাই। প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন যুগের সামাজিক প্রথা, প্রাচীন যুগের বিশিষ্ট কোন চিন্তা বা ভাব-ধারার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে বসিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুসন্ধান করিবার শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই পুরাতন, মজ্জাগত অভ্যাস কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হন না। এই পুরাতন অভ্যাসের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারা যখন আপনাদের অনুসন্ধানের ফল পুরাদস্তর বৈজ্ঞানিক ঠাট বজায় রাখিয়া লোকের নিকট উপস্থিত করেন, পাণ্ডিত্যের প্রতিপত্তি ও মর্যাদার কবচে সুরক্ষিত গবেষকের গবেষণা লোককে সহজে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত সিন্ধুসভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই আলোচনার মধ্যে দেখা যাইবে।

সর জন মার্শালের যে মন্তব্যের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে সেই মন্তব্যকে আলোচনার সূত্র স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাঁহার সম্পূর্ণ বক্তব্য এইরূপ :

"A civilisation as widely diffused as the chalcolithic, with ramifications extending as far as Thessaly and Southern Italy and as far east, perhaps, as the Chinese provinces of Honan and Chih-li could not have been homogeneous."

১৯২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"I surmise that it (Mohenjo Daro and Harappa culture) will also be found to have formed part and parcel of a much wider sphere of culture which embraced not only South Mesopotamia and India, but probably Persia and a large part of Central Asia, and which may have extended as far west as the Mediterranean where the early Aegean civilisation presents certain somewhat similiar features."

লক্ষ্য করিতে হইবে যে মার্শাল ভারতবর্ষ, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া, পারস্য ও মধ্য-এশিয়াকে এক বৃহত্তর কৃষ্টি কেন্দ্রের (sphere of culture) বা অঞ্চলের মধ্যে ধরিতেছেন এবং বলিতেছেন যে এই কেন্দ্র সম্ভবতঃ ভূমধ্য-সাগরীয় কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত প্রথম উক্তিতে তিনি বলিতেছেন যে এই বহু বিস্তারিত সভ্যতার লক্ষণসমূহ সর্বত্র এক প্রকারের হওয়া সম্ভব নহে।

যে কৃষ্টিকেন্দ্র ভারতবর্ষ, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া, পারস্য ও মধ্য এশিয়া লইয়া গঠিত তাহার সহিত ভূমধ্যসাগরীয় কেন্দ্রের সংযোগ—লক্ষ্য করিতে হইবে যে মার্শাল সং-যোগের উপরে যান নাই—তাঁহার মতে প্রমাণিত হয়—(১) Ceramic wares এবং (২) Possible association of religious ideas। এই পোড়া মাটির তৈজসপত্রের এবং ধর্মভাব বা চিন্তার সাদৃশ্য বা সম্পর্কের প্রমাণের আলোচনা করা প্রয়োজন।

সেরামিকসের প্রমাণের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্বে মনে পড়ে এই বিষয়টি সম্বন্ধে ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের বীতস্পৃহা। আরও মনে হয় স্বর্গীয় ননীগোপাল মজুমদারের সিন্ধুদেশে আততায়ীর হস্তে অকাল মৃত্যুর ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার কথা।

পটারির উপরে নক্সার বৈচিত্র্য এক একটি কৃষ্টি-কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক। এই নক্সা নানাপ্রকারের দেখা যায়, যথা জ্যামিতিক নক্সা—সরল রেখা, ত্রিকোণ, বৃত্ত, অর্দ্ধবৃত্ত, পঞ্চকোণ, অষ্টকোণ। তারপর জাল, দড়ি, স্ক্রোল, গাছ, পাতা, ফল, ফুল, মালা, বিভিন্ন প্রকারের পাখী ও জন্তু, মূর্তি প্রভৃতি। ইহা ছাড়া স্বস্তিকা, চক্র প্রভৃতি চিহ্ন পাত্রের গায়ে খোদাই বা অঙ্কিত করা হইয়াছে। নক্সার মত পটারির রঙও বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক। পশ্চিম সিন্ধুদেশের আম্‌রির কৃষ্টি প্রাক্-মোহেঞ্জোদারো যুগের এবং বেলুচী-স্থানের নালের (Nal) কৃষ্টির অপেক্ষা প্রাচীন বলা হইয়াছে। ইহার কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে আম্‌রির পটারি সাধারণতঃ এক রঙের (buff or light red) বা দুই রংয়ের (bichrome) এবং নক্সা জ্যামিতিক চিত্র। অবশ্য তিন রঙের পটারিও আম্‌রিতে কিছু পাওয়া গিয়াছে। মোহেঞ্জোদারোর পটারিতে উজ্জ্বল লাল জমির উপর কাল রঙের নক্সা দেখা যায়। নক্সায় জ্যামিতিক চিত্রের সঙ্গে গাছ, পাতা, ফুলও জীব-জন্তুর চিত্র। এই রঙের বৈশিষ্ট্যকে black-on-red technique বলা হয়। এই টেকনিক দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল মনে হয়। এই দুইটি টেকনিক ব্যতীত বেলুচীস্থানের নাল, সুনদারা প্রভৃতি স্তূপে ও উত্তর বেলুচীস্থানের ওয়াজির সীমান্তের দাবার কোট প্রভৃতি স্তূপে প্রাপ্ত পটারিতে দুইটি টেকনিক দেখা

যায়। নালের বহু রঙের বা Polychrome technique আম্‌রির টেকনিকের পরিণত অবস্থা বলিয়া মনে করা হয়। দাবারকোটের টেকনিক মোহেঞ্জোদারোর টেকনিকের সঙ্গে সম্পর্কিত বলা হইয়াছে। সিন্ধুর ঝুকর, লোহুনঞ্জো-দারোর পটারিতে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত রূপে 'মোহেঞ্জোদারোর টেকনিক অনুসৃত হইয়াছে।

পঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচীস্থানের প্রাচীনযুগের স্তূপসমূহ হইতে প্রাপ্ত পটারি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মত মোটামুটি এই যে গঠন ও রঙের বৈশিষ্ট্য এবং নক্সা বা কারুকার্য হইতে 'একটি কৃষ্টিকেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায় যাহার সহিত পশ্চিমে সিষ্টান, সুসা ও দক্ষিণ মেশো-পটেমিয়া, উত্তরে পশ্চিম তুর্কীস্থানের আনাউ-এর সংযোগের কিছু সূত্র পাওয়া যায়। বেলুচীস্থানের পেরিয়ানো গুণ্ডাই ও ঝোব উপত্যকার অন্যান্য স্তূপে প্রাপ্ত পটারির নক্সা ও গঠনে সিষ্টানের পটারির সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। ঐ সকল স্তূপে প্রাপ্ত ভেসের গঠনে আনাউ-এর (deposits of culture II) ভেসের গঠনের সাদৃশ্য দেখা যায়। সিন্ধুর আম্‌রি প্রভৃতি স্তূপের পটারির নক্সার কতকগুলির সঙ্গে মেশোপটেমিয়ার আল-উবাইদ, সামারা, পশ্চিম-পারস্যের সুসা এবং টেপে মুসেয়ানির নক্সার মিল দেখা যায়। সিন্ধুর ফিকে রঙের জ্যামিতিক নক্সার পটারির সঙ্গে পারশ্য, মেশোপটেমিয়া ও আনাউ-এর পটারির সঙ্গে যতটা মিল দেখা যায় মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার পটারির সঙ্গে ততটা মিল দেখা যায় না। সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে বৈদেশিক সভ্যতার সংযোগের কথা যখন বলা হয় তখন সেরামিকসের এই সাক্ষ্য স্মরণ রাখিতে হইবে। পঞ্জাব, সিন্ধু, ও বেলুচী-স্থান লইয়া যে কৃষ্টি-কেন্দ্র দেখা যায় সেই কেন্দ্রের মধ্যেই প্রাক্-সিন্ধুযুগের, সিন্ধুযুগের ও উত্তর-সিন্ধুযুগের কৃষ্টির পরিচয় পটারির সাহায্যে ও স্তরবিন্যাসের প্রমাণের দ্বারা পাওয়া যায়। লোহুঞ্জোদারো ও মানছারের নিকটবর্ত্তী স্তূপসমূহে যে পটারি পাওয়া গিয়াছে বিশেষজ্ঞের মতে তাহা মোহেঞ্জোদারোর পরবর্ত্তীকালের। ঝুকর প্রভৃতি স্তূপের উপরের স্তরগুলি হইতে ইন্দো-সাসানীয় আমলের নক্সাযুক্ত পটারি পাওয়া গিয়াছে।

এ সম্বন্ধে আরও দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। ওয়াজিরস্থান ও উত্তর বেলুচীস্থানের কয়েকটি প্রাচীনযুগের স্তূপ হইতে প্রাপ্ত পটারি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সর অরেল ষ্টাইন বলিতেছেন,

"But so much is certain in view of the geographical position which these sites of the chalcolithic period in North Baluchistan occupy that they help us very usefully to link up the prehistoric civilisation now revealed in the Lower Indus with that traced already before in Iran and easternmost Mesopotamia."

প্রাচীন যুগের স্তূপগুলির ভৌগোলিক অবস্থান যে এই সংযোগ নির্ণয়ের কাজে বিশেষভাব সাহায্য করিয়াছে তাহার স্বীকৃতি পাওয়া যাইতেছে। ঝোব উপত্যকায় প্রাপ্ত পটারির নক্সা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,

"The resemblance of motifs used in the painted pottery to that from culture strata ascribed to the pre-Sumerian times in Mesopotamian sites and hence approximately dateable, is very striking indeed."

অর্থাৎ উত্তর বেলুচীস্থানের পটারির বয়স মেশো-পটেমিয়ার সুমেরযুগের পটারি অপেক্ষা প্রাচীন। এ motif বা নক্সার সঙ্গে হোনানের ইয়াং-শাও, সা-কুও-টান এবং কানসুর নক্সার সাদৃশ্যের কথা বলা হইয়াছে। হোনানের এই ইয়াং-শাও কৃষ্টি নূতন প্রস্তরযুগের (late Neolithic age) এবং কানসুর চিত্রিত পটারি তাম্রযুগের বলিয়া অনুমান করা হয়। ইয়াং-শাও কৃষ্টির বয়স খ্রীঃ পূঃ ২৫০০-২০০০ বলা হয়। সর জন মার্শাল তাম্রযুগের কৃষ্টির বিস্তৃতি দক্ষিণ ইউরোপ পর্য্যন্ত দেখা যায় বলেন। একজন পণ্ডিত সিন্ধু দেশের মানছার হ্রদের নিকটবর্ত্তী ঝাঙ্গার স্তূপ হইতে প্রাপ্ত পটারির টেকনিকের (black ware with incised patterns) সঙ্গে ইউরোপের দানিউব অঞ্চলের "বেলবিকার" (bell-beaker) টেকনিকের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। বাঙ্গালোরের নিকটবর্ত্তী পুতানহাল্লিতে ঠিক এই টেকনিকের পটারি পাওয়া গিয়াছে। এই স্তূপের বয়স লৌহযুগের আরম্ভ-কাল বলিয়া মনে করা হয়। পশ্চিম বেলুচীস্থানের কলবার কুল্লী স্তূপের পটারিতে মিশরের পদ্ম নক্সা দেখা যায় বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। মোহেঞ্জোদারোতে (D site) প্রাপ্ত একটি ভেস সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে—

"Which in beauty of form, intensity of feeling and vigour of execution is unsurpassed by the painted pottery recovered in Transcaspia, Persia, Sumer or Baluchistan."

উপরে সেরামিকস সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে কয়েকটি তথ্য পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের সীমান্তের অর্থাৎ ইরাণ ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী কয়েকটি অঞ্চলের রঙের টেকনিকে (Pale ware) বৈদেশিক টেকনিকের সহিত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। নক্সায় প্রধানতঃ জ্যামিতিক প্যাটার্ণের টেকনিকে বিদেশের টেকনিকের মিল দেখা যায়। মোহেঞ্জোদারোর টেকনিক সিন্ধু উপত্যকার নিজস্ব টেকনিক। জ্যামিতিক নক্সা, ঢেউ, মালা, শিকল, স্ক্রোল, পাতা, ফুল, জীবজন্তুর মধ্যে মাছ প্রভৃতির নক্সাকে conventionalised pattern বলা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাচীনযুগের পটারির রং ও নক্সা

করিবার শিল্পীদিগের মধ্যে এই সকল নক্সা "বাঁধা গৎ" ছিল। সুতরাং এই সকল নক্সাকে বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক বলা যায় না। ইরাণ, মেসোপটেমিয়া ও আনাউ-এর পটারির সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার পটারির যে সাদৃশ্য দেখা যায় তাহার প্রকৃত মূল্য এখন সহজে যাচাই করা যাইতে পারে! দেখা যাইবে যে অতি দুর্বল বনিয়াদের উপর বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করা হইয়াছে।

সেরামিকসের প্রমাণ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। এইবার মার্শালের ব্যবহৃত দ্বিতীয় প্রমাণের কথা বলা যাইতে পারে।

হরাপ্পা, মোহেঞ্জোদারো ও বেলুচীস্থানের বিভিন্ন স্তূপ হইতে বহু সংখ্যক পোড়ামাটির স্ত্রী মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সর জন মার্শাল, সর অরেল ষ্টাইন এবং অন্য বহু পণ্ডিতের মতের এই স্ত্রী মূর্তিগুলি দেবী প্রতিমা বা **representations of the Mother Goddess**। এই সিদ্ধান্তে আসিতে যুক্তি প্রয়োগ যাহা করিবার তাহা মার্শালই করিয়াছেন, অপরাপর পণ্ডিতের নিকট এই সিদ্ধান্ত দাঁড়াইয়াছে স্বতঃসিদ্ধান্তের মত, অর্থাৎ প্রমাণপ্রয়োগনিরপেক্ষ। মার্শাল এই সিদ্ধান্তে আসিবার জন্য যে সকল যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার প্রমাণকে **evidence of analogy** নাম দেওয়া যায়। এই **evidence of analogy**-কে আর একটু বিশদ করিলে দাঁড়ায় **evidence of possible association of ideas**, ইহার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। মার্শাল বলিতেছেন সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রী-মূর্তির অনুরূপ মূর্তি পারশ্য হইতে ঈজিয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে, বিশেষতঃ এলাম, মেশোপটেমিয়া, ট্রান্সকাস্পিয়া, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীট, বলকান এবং মিশরে পাওয়া গিয়াছে। (**M. I. C. vol. 1 p. 50**) তারপর তিনি বলিতেছেন এই সকল মূর্তি সম্বন্ধে প্রচালিত মত এই যে **they represent the Great Mother or Nature Goddess (M. I. C. vol. 1-p. 50)** তাম্রযুগের সিন্ধু উপত্যকায় এবং বেলুচীস্থানে এই সকল মূর্তি পাওয়াতে মনে করা যায় যে এই কাল্‌ট যতটা বিস্তৃত ছিল বলিয়া এ পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল প্রকৃতপ্রস্তাবে তদপেক্ষা বেশী বিস্তৃত ছিল। ইহাই **evidence of possible association of ideas**।

সিন্ধু ধর্মের আলোচনার সময়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে; কারণ এই মতবাদের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। এখানে মার্শালের প্রচারিত এবং দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতসমাজে গৃহীত এই মতবাদ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে একটি কথা বলা আবশ্যক।

হিন্দু ধর্মের মধ্যে বহু অনার্য ভাব রহিয়াছে, আর্য সভ্যতার উত্তরাধিকার দাবি করিলেও হিন্দুগণ অনার্যদের নিকট অনেক ধর্ম বিশ্বাস, দেবদেবী প্রভৃতি ধার করিয়াছে একথা বলিতে বিদেশী পণ্ডিতগণ বড় ভালবাসেন, দেশী পণ্ডিতগণও তাঁহাদের দেখাদেখি ভালবাসিয়া থাকেন। প্রাক-আর্যযুগের অধিবাসীদিগের নিকট, সম্ভবতঃ দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর নিকট হইতে হিন্দুরা স্ত্রী-দেবতার পূজা করিতে শিখিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয় হিন্দুদিগের তথাকথিত আর্যকৃষ্টি বার আনা অনার্য ভেজাল, দ্রাবিড়দিগের নিকট ধার করা। স্ত্রী-দেবতার পূজা অনার্য-দিগের জিনিস, ইহার উৎপত্তি ম্যাট্রিয়ারকাল সমাজে। এই সমাজব্যবস্থা এককালে সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল, এখনও দ্রাবিড়দিগের মধ্যে দেখা যায়। এইভাবে পুরাতন আর্য বনাম দ্রাবিড় মামলার জের সূক্ষ্মভাবে, নানাপ্রকারে টানিয়া চলা হইতেছে। স্ত্রী-দেবতার পূজা যে আর্যদিগের নিকট অপাংক্তেয় ছিল এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহ, প্রমাণ ব্যতিরেকেই নিঃসন্দেহ। সেজন্য দেখা যায় যে ফারনেল ও ওপার্টের সাক্ষ্যের বলে মার্শাল বলিতেছেন,

"As a fact, there is no example of the ancient Aryans, whether in India or elsewhere, of having elevated a female deity to the supreme position occupied by the Mother-Goddesses."*

আর্যদিগের ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ অপঠিত জ্ঞানের বাহুল্যের পরিচয় পাওয়া যায় আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের উক্তিতে,

"The sancity of the cow is foreign to the Rigveda and appears far more suggestive of the religions of Asia Minor, Egypt and Crete than of Indo-European invaders." (Hutton, Census Report, 1931, Vol. I, Part I, pp. 395, 396.)

যে দুইটি মত উদ্ধৃত করা হইল তাহার তুল্য অযথার্থ উক্তি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

উপরে যাহা বলা হইল অবান্তর হইলেও সতর্কতার প্রয়োজন কতখানি জানাইবার জন্য তাহা বলা হইল।

মার্শাল যে প্রমাণের বলে সিন্ধু ধর্মের সহিত সিন্ধু উপত্যকা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত দেশগুলিতে প্রচলিত প্রাচীন যুগের ধর্মের সংযোগ দেখাইয়াছেন সেই **evidence of analogy** সম্বন্ধে এখানে অধিক আলোচনা স্থগিত রাখিয়া এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে উল্লিখিত দেশগুলিতে প্রাচীন যুগে প্রচলিত স্ত্রীদেবতার উপাসনার আলোচনা করিলে এবং

---

* এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য লেখকের "Mother Goddess Worship in the Vedic Literature—*Indian Culture* vol VIII No. 1 & 2 (1941 1942) দ্রষ্টব্য।

প্রাপ্ত স্ত্রীমূর্তিগুলির তুলনা করিলে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে analogy-র প্রমাণ দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং সংযোগের কথা উঠে না।

কিন্তু যে প্রমাণের দ্বারা কিছু প্রমাণিত হয় না তাহাই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এবং শুধু সংযোগ নহে পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নিকট সিন্ধু-সভ্যতার প্রচুর ঋণের কথা পুনঃপুন বলা হইয়াছে। এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাউক।

পটারি এবং স্ত্রীদেবতার উপাসনার প্রমাণের বলে সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার সংযোগ প্রমাণিত হয় এই মতবাদ প্রচারিত হইলে পণ্ডিতগণ সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের গবেষণার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হইয়া সিন্ধুবাসীদিগের জাতি, বৈষয়িক কৃষ্টি, ধর্ম, এক কথায় সমগ্র সিন্ধু-সভ্যতা ও সিন্ধু-সভ্যতার বাহকদিগকে সেই ক্ষেত্রের মধ্যে গ্রহণ করিল।

সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া পণ্ডিতগণের দৃষ্টি প্রথমে স্বভাবতই মেশোপটেমিয়ার উপর পড়িল। কারণ এশিয়ার এই অঞ্চলে মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতা সমধিক প্রসিদ্ধ এবং ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজ বহুকাল এই সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মেশোপটেমিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানও এ সম্পর্কে উপেক্ষার বিষয় নহে। মেশোপটেমিয়ার সহিত সিন্ধু-সভ্যতার প্রকৃত সংযোগসূত্র কি প্রকারের পূর্বের এক প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই মত প্রচারিত ও অনেকটা গ্রাহ্য হইয়াছে যে ভূমধ্যসাগরীয় ও আর্মেনয়েড গোষ্ঠীর লোক সমুদ্রপথে সিন্ধু উপত্যকায় আসিয়া মেশোপটেমিয়ার সভ্যতাকেই ভারতবর্ষের মাটিতে ঢালিয়া সাজাইয়াছিল।

সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি মেশোপটেমিয়া হইতে এই মতবাদ প্রকৃতপ্রস্তাবে মেডিটারেনীয়ান থিওরীর একটি অংশ। মেডিটারেনীয়ান থিওরী অনুসারে সভ্যতার উৎপত্তি পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বলিতে যে সকল অঞ্চল বুঝায় তাহার মধ্যে ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলি এবং এশিয়া মাইনরের কথা এখানে সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

ঈজিয়ান সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে এশিয়া-মাইনরের ট্রয়, গ্রীসের টিরিন্স (Tiryns) এবং ক্রীটের নোসাস ও ফেসটাস (Cnossus, Phaestus) হইতে। ঈজিয়ান সভ্যতাকে প্রাক্-হেলেনিক, মাইসিনিয়ান বা মিনোয়ান সভ্যতাও বলা হয়। শ্লিম্যান কর্তৃক ট্রয় হইতে যে সকল নিদর্শন উদ্ধার করা হইয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ঐ সভ্যতার বয়স খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ বৎসর বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ক্রীটে ইভান্সের ও অন্যান্য পণ্ডিতের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হইতে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরের মধ্যে ক্রীট প্রস্তরযুগ হইতে ব্রোঞ্জ যুগে উপনীত হয় এবং অনুমান খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বৎসর পরে ক্রীটের ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। ["The golden age of Crete lasted about a century" (B. C. 1500-1400)]। পণ্ডিতগণের হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে ঈজিয়ান সভ্যতার প্রকৃত অভ্যুদয় যে সময়ে ঘটে সেই সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৪০০) ইউরোপীয় আর্যবাদ অনুসারে বৈদিক আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঈজিয়ান সভ্যতার বয়সের যে হিসাব করা হইয়াছে সেই হিসাব অন্ততঃ আংশিকভাবে নির্ভরযোগ্য মনে করিলে তাম্রযুগের সিন্ধু-সভ্যতার সহিত ঈজিয়ান সভ্যতার সংযোগ কল্পনা করা সম্ভব নহে। ক্রীটের সভ্যতার যখন স্বর্ণযুগ (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-১৪০০) মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা তখন পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

তারপর এশিয়া-মাইনর। এশিয়া-মাইনরের গ্রীক নাম আনাতোলিয়া, তুর্কগণ এই নাম গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ফ্রিজিয়া, গ্যালিসিয়া, কাপাডোসিয়া এই অঞ্চলে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা ফ্রিজিয়ার নিকট বিশেষ ঋণী। রোমানগণ ফ্রিজিয়া হইতে কিবেলের (Cybele, Great Mother, Mother of the Gods) পূজাপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল। ফ্রিজিয়ানদিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাহারা সম্ভবতঃ থ্রেসের ইলিরিয়ান গোষ্ঠীর একটি শাখা। ইতিহাসে ফ্রিজিয়ার অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে পশ্চিম এশিয়া-মাইনরের হালিস নদীর উপত্যকায় প্রাচীন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হিটাইট জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। এশিয়া-মাইনর হইতে তাহাদের রাজ্যের সীমা সিরিয়া ও মিশরের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। আনাতোলিয়ায় যে তাম্রযুগের সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা এই হিটাইট জাতির কীর্তি বলিয়া অনুমান করা হয়। খ্রীঃ পূঃ ৩য় সহস্রকের শেষের দিকে শক্তিশালী হইয়া তাহারা পূর্ব এশিয়া-মাইনর অধিকার করে এবং খ্রীঃ পূঃ ১৯২৫ অব্দে হাম্মুরাবির বংশকে বাবিলোনের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করে।

হিটাইট ও ফ্রিজিয়ানদিগের ধর্ম সম্বন্ধে পরে সিন্ধু ধর্মের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইবে, এখানে সিন্ধু-সভ্যতার বাহকগণ ও তাহাদের স্ত্রীদেবতার উপাসনা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের এই মতের সম্বন্ধে কিছু বলা হইতেছে।

কর্ণেল সেওয়েল ও ডাঃ গুহের অভিমত উল্লেখ করিয়া

ডাঃ হার্টন বলিতেছেন যে সিন্ধু-সভ্যতার অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে বেলুচীস্থান ও সিন্ধু-উপত্যকায় এবং সমগ্র উত্তর-ভারতে ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর জাতি উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। এই গোষ্ঠী পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে মেশোপটেমিয়া হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তারপর এই মত পাওয়া যাইতেছে যে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রী-মূর্তিগুলি Great Mother বা Nature goddess-এর প্রতিমূর্তি। এই দেবীর পূজা—

"Is believed to have originated in Anatolia (probably in Phrygia) and spread thence throughout most of Western Asia."

মায়াসের মতে উহা আনাতেলিয়া বা সিরিয়া হইতে মেশোপটেমিয়ায় আসিয়াছিল। হাটনের মতে—

"The religious history of pre-Vedic India was probably similar and parallel to that of eastern Mediterranean and of Asia Minor."

মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে মেডিটারেনিয়ান থিওরীর প্রচারকগণের মতে সিন্ধু জাতি ও সিন্ধুধর্ম পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। সিন্ধু জাতির মধ্যে যে আর্মে-নয়েড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের কথা বলা হইয়াছে সেই গোষ্ঠী ঐ অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল অনুমান করা হইয়াছে (ডাঃ হাটন)। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ঈজিয়ান এলাকা ও আনাতোলিয়ার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঈজিয়ান সভ্যতার সম্বন্ধে উপরে বলা হইয়াছে যে তাম্রযুগের সিন্ধু-সভ্যতা ও ব্রোঞ্জযুগের ঈজিয়ান সভ্যতাকে সমসাময়িক বলিয়া মনে করা চলে না। প্রাচীনত্বের হিসাব করিলে এবং সংযোগ প্রমাণ করিবার মত তথ্য পাওয়া গেলে বরং অনুমান করিতে হয় যে সিন্ধু-কৃষ্টির প্রভাব ঈজিয়ান এলাকায় প্রসারিত হইয়াছিল। তারপর পণ্ডিত-গণ ঈজিয়ান সভ্যতার বাহকদিগকে লম্বামুণ্ড ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর লোক বলিয়া মনে করেন না। অনুমান খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের মধ্যে এই অঞ্চলে একটি মিশ্র জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে প্রস্‌পেক্টরস্ বা আর্মেনয়েড মারিনার্স (Prospectors or Armenoid Mariners)। আনাতোলিয়া সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত এই যে নূতন প্রস্তরযুগের কাল হইতে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর লোক এই অঞ্চলের অধিবাসী। তাম্রযুগের হিটাইটগণ এই গোষ্ঠীয়। হিটাইটগণের পরে যে ইলিরিয়ান গোষ্ঠীর ফ্রিজিয়ানগণ এই অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠে সেই ইলিরিয়ান গোষ্ঠী গোলমুণ্ড, লম্বামুণ্ড মেডিটারেনিয়ান নহে। হিটাইট-গণ দক্ষিণ-সিরিয়ায় মিশরের সীমান্ত পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। ইহার পরে দেখা যাইবে যে তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাতে মেশোপটেমিয়ার প্রভাব পরিস্ফুট। ডাঃ হেডনের মতে হিটাইটগণের মধ্যে প্রোটো-নর্ডিক (অর্থাৎ আর্য) সংমিশ্রণ ছিল।

সিন্ধুজাতি ও সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি যাঁহাদের মতে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের অভিমত ও ইতি-হাসের সাক্ষ্য তাঁহাদের সমর্থন করে না।

মিশরের প্রসঙ্গ এখানে উঠাইবার প্রয়োজন নাই। মিশর প্রাচীন সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র এবং প্রাচীন মিশরীয়গণ ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর হইলেও সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তির প্রসঙ্গে মিশরের উপর জোর দেওয়া হয় না।

সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তির প্রসঙ্গে মেশোপটেমিয়া ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে ও যে সকল যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে অতি সংক্ষেপে তাহার কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু যাহা বলা হইয়াছে ও যে সকল যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার প্রকৃত মূল্য যাচাই করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এই প্রকারের আলোচনার এখানে স্থানাভাব, তাহা ছাড়া ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কা আছে। কিন্তু একথা বুঝিবার ও বলিবার সময় হইয়াছে যে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে অপরের মুখে দুইটি মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট বা তিক্ত বাক্যে রুষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকা যাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে চাহে তাহাদের পক্ষে শোভা পায় না। ভারতীয়ের এবং বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। এজন্য লেখক ও পাঠক উভয় পক্ষকে শ্রমস্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইবে। এই আলোচনার সঙ্গে মানসিক ভাবের কোন সম্পর্ক নাই, এই আলোচনা হইবে তীক্ষ্ণ, সত্যানুসন্ধানী, বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

সে যাহা হউক, সিন্ধু-সভ্যতার সহিত মেশোপটেমিয়ার বা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সংযোগ ছিল এবং সিন্ধু-সভ্যতা মাঞ্চুরিয়া হইতে দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত তাম্রযুগের কৃষ্টির অংশমাত্র যাঁহারা এইরূপ মনে করেন তাঁহাদের ব্যবহৃত দুইটি প্রধান যুক্তি, সেরামিক্‌সের থিওরী এবং Possible association of ideas-র থিওরী সংক্ষেপে পরীক্ষা করা হইয়াছে। সিন্ধু-সভ্যতার ও সিন্ধু জাতির উৎপত্তি যাঁহারা মেশোপটেমিয়া বা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বলেন তাঁহাদের অভিমতের ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই পরীক্ষা ও আলোচনার ফলে দেখা যায় যে একমাত্র সেরামিক্‌সের থিওরীর কিছু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রহিয়াছে। কিন্তু সেরামিক্‌স হইতে যাহা প্রমাণ হয় তাহা এইরূপ: পশ্চিম সিন্ধু ও বেলুচীস্থানের কয়েকটি স্তূপ হইতে তাম্রযুগের যে সকল পটারি পাওয়া গিয়াছে তাহা মোহে-

জোদারো ও হরাপ্পার পটারি হইতে ভিন্ন এবং মোহেঞ্জো-দারো ও হরাপ্পা যুগের পূর্ববর্তী। এই পটারির সহিত সিস্তান, ইরাণের বিভিন্ন অঞ্চল, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া এবং মধ্য-এশিয়ার আনাউতে প্রাপ্ত পটারির কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সাদৃশ্য আবার কয়েকটি conventionalised motifs বা অভ্যস্ত নক্সা ছাড়া অন্য কিছুতে নাই। তাহা হইলে এই পর্যন্ত বলা যায় যে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিম সিন্ধু ও বেলুচীস্থান এবং ভারতবর্ষের বাহিরের এই অঞ্চলগুলির মধ্যে কোন প্রকার সংযোগ হয়ত ছিল অথবা সংযোগ থাকা সম্ভব। মেশোপটেমিয়ার বাহিরে সংযোগের অনুসন্ধান করা বাহুল্য, কারণ পশ্চিম এশিয়ায় মেশোপটেমিয়ার সভ্যতার তুল্য প্রাচীন ও সমৃদ্ধ আর কোন সভ্যতার পরিচয় জানা নাই। তারপর দক্ষিণ-মেশোপটেমিয়ার বা সুমেরীয় সভ্যতা ছিল বাবিলোনীয়, আসিরীয় এবং সাধারণভাবে সমগ্র পশ্চিম-এশিয়ার সভ্যতার ভিত্তি (সর জন মার্শাল)।

শুধু এই সংযোগ ছাড়া সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তির সম্বন্ধে কোন কথা উঠে না, মেশোপটেমিয়া সম্পর্কেও উঠে না। কারণ মেশোপটেমিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতার কতকটা সমসাময়িক, পূর্ববর্তী নহে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে সুমেরীয় সভ্যতার কয়েকটি নিদর্শন মোহেঞ্জোদারোর উপরের স্তরগুলি হইতে পাওয়া গিয়াছে।

এখন ভারতবর্ষের মধ্যের ও ভারতবর্ষের বাহিরের যে দেশগুলির মধ্যে সংযোগ ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় সেই সকল দেশ একটি কৃষ্টি-কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই কৃষ্টি-কেন্দ্রের পশ্চিম সীমানায় এলাম, সুমের এলাকা-উত্তর সীমানায় আনাউ এলাকা, দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় বেলুচীস্থান-সিন্ধু-পঞ্জাব এলাকা। মধ্যে সিস্তান বা জাবুলীস্থান পশ্চিম এলাকা ও পূর্ব এলাকার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেছে।

দেখা প্রয়োজন এই সীমানার মধ্যে আর কোন কৃষ্টি-কেন্দ্র আছে কি না।

সিন্ধু-সভ্যতাকে এশিয়া মাইনরের নিকট ঋণী প্রমাণ করিতে একদল পণ্ডিত এত ব্যস্ত হইয়াছেন যে সিন্ধু উপত্যকার নিকটবর্তী মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন কৃষ্টি-কেন্দ্রটি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই অথবা দৃষ্টিকে তাঁহারা আকৃষ্ট হইতে দেন নাই। মধ্য-এশিয়ার এই প্রাচীন কৃষ্টি-কেন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনার এখানে স্থানাভাব ঘটিতেছে। এ সম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের অভিমতের সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইতেছে।

পূর্বের এক প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ডাঃ হেডনের একটি মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার মত এইরূপ :

"There is reason to believe that a great pre-historic civilisation spread from Central Asia to the plateau of Iran and to Syria and Egypt long before 4000 B.C., and the Sumerians who were a somewhat later branch of this Central Asian people, entered Mesopotamia before 5000 B.C."

অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ সহস্রকের বহুপূর্বে মধ্য-এশিয়ায় একটি বড় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল এবং মধ্য-এশিয়া হইতে এই সভ্যতা ইরাণ, সিরিয়া ও মিশরে বিস্তৃত হইয়াছিল এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। সুমেরীয়গণ এই মধ্য-এশিয়ার জাতির শাখা এবং খ্রীঃ পূঃ ৫ম সহস্রকে তাহারা মেশোপটেমিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিল। ডাঃ হেডনের মতে এলামের সভ্যতার অভ্যুদয় খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বৎসরের ব্যাপার। বলা বাহুল্য, এই কাল নির্ণয় বেশীর ভাগ অনুমান মাত্র। আসল কথা এই যে, তিনি সুমেরীয় এলামাইট সভ্যতাকে প্রাচীনতর মধ্য-এশিয়ার সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত করিতেছেন এবং প্রাচীনতম ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার উৎপত্তি এই মধ্য-এশিয়ার সভ্যতা হইতে এইরূপ বলিতেছেন। হোনানের ইয়াংশাও কৃষ্টিকেও তিনি এই মধ্য-এশিয়ার সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করেন। বয়সের হিসাবে ফ্রিজিয়ান সভ্যতা খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৫০০, এশিয়া-মাইনরের সভ্যতা খ্রীঃ পূঃ ২৫০০-২০০০ ও ইয়াংশাও কৃষ্টি খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৫০০ বৎসর বলিয়া অনুমান করা হয় একথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

মধ্য-এশিয়ার এই কৃষ্টি-কেন্দ্র কোথায় ছিল এবং কোন্ গোষ্ঠীয় জাতি এই মধ্য-এশিয়ার সভ্যতার প্রবাহ দূর-দূরান্তরে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার আলোচনা পরে হইবে।

মধ্য-এশিয়ার যে কৃষ্টি-কেন্দ্র এলাম-সুমের এলাকার সহিত যুক্ত অতি নিকটবর্তী সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে তাহা যুক্ত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি কোথায় অনুসন্ধান করিতে হইলে টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস, নীলনদ বা ভূমধ্যসাগর নহে, সিন্ধু ও অক্সাসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

স্বপ্ন-শিল্পী

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

[যে সকল প্রতিভাবান তরুণ ইংরেজ সাহিত্যিক প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দ) নিহত হন, অলিফ্যাণ্ট ডাউন (Oliphant Down) তাঁদেরই একজন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনের অবসান হয়। বর্ত্তমান একাঙ্কিকাখানি তাঁরই লেখা 'দি মেকার অব ড্রিম্‌স'-এর অনুবাদ।]

কুশীলব : পিয়েরট, পিয়েরেটে, শিল্পী।

সন্ধ্যা। একটি পুরাতন কুটিরের অভ্যন্তরে বিবর্ণ ওক কাষ্ঠে নির্ম্মিত একখানি কক্ষ। কোনও আলো জ্বালা হয় নি; কেবল পিছনের বড় বড় জানালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো আসছে আর একটা চুল্লীতে গন্ গন্ করে আগুন জ্বলছে। জানালার পাশেই একটি দরজা—দরজা থেকে বাইরের একটি এবড়ো-খেবড়ো সড়ক নজরে পড়ে। চুল্লীর উল্টো দিকে একটি ছোট খাবারের টেবিলের উপর সাজিয়ে-রাখা কাপ-ডিসগুলি আগুনের আভায় ঝিক্‌মিক্ করছে। ওক কাঠে তৈরি একটি উঁচু বসবার আসন যেন শীতের ভয়েই জানালা থেকে আড়াল করে চুল্লীর কাছে রাখা হয়েছে—আগুনে আসনের পিরাগুলি গরম করে তোলাই বুঝি উদ্দেশ্য। ঘরের মাঝখানে লাল কাপড়ের আচ্ছাদন দেওয়া একটি টেবিল; টেবিলের চারপাশে কয়েকখানি চেয়ার মুখোমুখি করে রাখা হয়েছে। চুল্লীর কাছে একটি কেৎলী দেখা যাচ্ছে; মাথার উপরে চিম্‌নীর গায়ে ঝোলানো আছে একটা লণ্ঠন। লণ্ঠনের শিখা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জানালার বাইরে ক্ষণিকের জন্য একটি মূর্ত্তি দেখা গেল, এবং পরক্ষণেই 'ক্লিক্' করে তালা খোলার শব্দ হ'ল। ঘরে ঢুকল পিয়েরেটে। সে দরজার কাছে তার লম্বা কোটটা টাঙিয়ে রাখলে, তার পর শীতে কাঁপতে কাঁপতে চুল্লীর কাছে গিয়ে ক্ষণকাল আগুন পোহালে। তারপর লণ্ঠনের শিখাটি বাড়িয়ে দিয়ে কেৎলীটা চুল্লীর উপর রাখলে এবং টেবিলে বসে দু'জনের মত চা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জানালায় ঝোলানো সস্তা পর্দাটা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে কি যেন দেখলে—তারপর হতাশ ভাবে আবার গৃহ-কার্য্যে মনোনিবেশ করলে। চায়ের পাত্রে সে ধীরে ধীরে এক, দুই, তিন চামচে চা ঢাললে। এমন সময়ে বাইরের গানে তার মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল। সে যেন কি শুনলে—তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—বাইরে থেকে কার গান ভেসে আসছে :—

"চাঁদের তরে মেয়ে, থাকিস না লো চেয়ে,
চাঁদ পড়েছে ধরা তরুশাখার জালে,
আলোয় গানে ভরা জ্যোৎস্নায় যায় ধেয়ে—
ধবলীরে বিদায় জানায় সন্ধ্যাকালে।"

গানের ধ্বনি ক্রমেই কাছে এল এবং জানালার বাইরে একটি সাদা মোচাকার (conical) টুপী দেখা গেল। পিয়েরট ঘরে ঢুকল।

পিয়েরট—(টুপীটা পিয়েরেটের কাছে ছুড়ে ফেলে) উঃ! কি ঠাণ্ডা আজ—আমার পা দুটো যেন বরফ হয়ে গেছে।

পিয়েরেটে—এই নাও তোমার চটি জুতো—গরম করে রেখেছি। (পিয়েরেট হাঁটু গেড়ে বসে পিয়েরটের জুতো খুলতে আরম্ভ করল।)

পিয়েরট—(গান)—

'চাঁদের তরে মেয়ে, থাকিস না লো চেয়ে,
সে যে বাঁকিয়ে মুখ যাবে চলে জানি,
আলোয় গানে ভরা জ্যোৎস্না দিল ছেয়ে
লক্ষ কোটি তারায় তারায় আকাশখানি।'

...চা কি এখনো তৈরী হয়নি ?

পিয়েরেটে—প্রায় হয়ে এসেছে। কেৎলীর জলটা ফুটে উঠতেই যা দেরী।

পিয়েরেটে—বাজারে* আজ কি ঠাণ্ডা! আমার গান মোটেই ভালো হয়েছে বলে মনে হয় না—ঠাণ্ডায় আমি গাইতেই পারি না।

পিয়েরেটে—তোমার অবস্থা দেখছি কেৎলীটার মতই—সেও ঠাণ্ডায় গাইতে পারে না। ওহে কেৎলী বাবাজী, দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি করুন না।

পিয়েরট—হায়! কেৎলীটা যদি ওর নিজের সুরের সঙ্গে প্রেমে পড়বার পথ চিনত!

পিয়েরেটে—মনে হয়, ও জানে। ওই শোন, পাখীর মত ও এবার গেয়ে উঠেছে। আমরা এই পাপিয়ার সুর-নির্য্যাস দিয়ে চা তৈরী করব। (চায়ের পাত্রে সে ফুটন্ত জল ঢালতে লাগল) এস।

পিয়েরট—(আগুনের দিকে চেয়ে) কি আশ্চর্য্য! ওর সৌন্দর্য্য ছিল, আকৃতিও ছিল, কিন্তু প্রাণ কি আছে ?

পিয়েরেটে—(রুটি কেটে কেটে মাখন মাখিয়ে টেবিলের

---

* বিলাতে ভ্রাম্যমাণ নাট্যসম্প্রদায় হাটে-বাজারে গান গেয়ে বেড়ায়।

উপর রেখে) ওখানে বসে আগুনের সঙ্গে গল্প গল্প করার চেয়ে এখানে এসে খেয়ে দেয়ে একটু তাজা হও দেখি!

পিয়েরট—আমি ভাবছিলাম—।

পিয়েরেটে—এস, এস, চা খাও। চুল্লীর কাছে বসলে তোমার ভাব কেবল ধোঁয়া হয়ে চিম্‌নী দিয়ে উড়তে থাকে।

পিয়েরট—সারা দুনিয়াটাই একটা চিমনী। ছেঁড়া কাগজের মত একটা বাজে জিনিষ মানুষকে দাও, দেখবে তাতে আগুন ধরেছে—আন্দোলন সুরু হয়েছে; অথচ, আসল বস্তু যে ধোঁয়ার মতই মিলিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে কারও নজর নেই।

পিয়েরেটে—মেজাজ ঠিক কর, পিয়ের। দেখ, রুটিতে আমি কেমন পুরু করে মাখন মাখিয়েছি।

পিয়েরট—তোমার মেজাজ তো দেখছি সব সময়েই ঠিক থাকে।

পিয়েরেটে—আমি যে সুখী হবার চেষ্টা করি।

পিয়েরট—উঃ!

(পিয়েরট টেবিলের কাছে সরে এসেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটছে। পিয়েরট ভাবপ্রবণ ভঙ্গীতে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে।)

পিয়েরেটে—চা ঠিক হয়েছে ত?

পিয়েরট—তা একরকম হয়েছে!

পিয়েরেটে—এক রকম! দাও, আমি তোমাকে আবার নতুন করে তৈরী করে দি।

পিয়েরট—না না, এই-ই ঠিক আছে। তুমি মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে ওস্তাদ।

পিয়েরেটে—বটে! পাগলা কুকুরটাকে বেঁধে রাখব নাকি?

পিয়েরট—ভাল কথা, সেই মেয়েটির সঙ্গে আজ তোমার দেখা হয়েছিল?

পিয়েরেটে—কোন্ মেয়েটি?

পিয়েরট—সেই যে, ঘোড়-দৌড়ের মাঠের কাছে দাঁড়িয়েছিল। খাসা চেহারা—গলায় বড় বড় মালা জড়ান।

পিয়েরেটে—না, আমি তাকে দেখি নি।

পিয়েরট—কিন্তু আমি দেখেছি এবং সেও আমাকে দেখেছে। আমি যতক্ষণ গান গেয়েছি, ততক্ষণ সে আমার দিকে চেয়েছিল—হাততালি দিয়েছে ঘন ঘন। মেয়েদের যে এমন সুন্দর চেহারা আর এমন রসানুভূতি থাকা সম্ভব, তা বিশ্বাস করা সত্যিই বড় কঠিন।

পিয়েরেটে—ও ছদ্মবেশী।

পিয়েরট—কখনই নয়। আর হলেই বা, তুমি জান্‌লে কি করে? তুমিও তো তাকে দেখ নি।

পিয়েরেটে—বোধ হয় দেখেছি।

পিয়েরট—দেখ, পিয়েরেটে, ঈর্ষা করা তোমার উচিত নয়। যখন তুমি আর আমি এই গান শোনানোর ব্যবসা খুলি, তখন ঠিক হয়েছিল যে আমাদের সম্পর্ক থাকবে অংশীদারের মতই—তার বেশী নয়। আমি যদি বিয়ে করার উপযুক্ত কারও খোঁজ পাই, তবে তাকে বিয়ে করব। আর তোমাকে বিয়ে করতে চায়, এমন কারও সন্ধান পেলে তুমিও তাকে বিয়ে করতে পারবে।

পিয়েরেটে—আমার একটুও ঈর্ষা হয়নি। কি বাজে বকৃছ?

পিয়েরট—(আত্মগত ভাবে গান)

চাঁদের তরে মেয়ে, থাকিস্ না লো চেয়ে,
তুষার-ধবল অধরে তার মেঘের ছায়া,
আলোয় গানে ভরা জ্যৈষ্ঠ দিল ছেয়ে
দুখের ছোঁয়ায় প্রভাত-পাখীর গানের মায়া।

পিয়েরেটে—'শো' ভাঙার পর কি তুমি আর মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছিলে?

পিয়েরট—না, সে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। যথেষ্ট চা খেলুম। এবার যাই, তাকে খোঁজবার চেষ্টা করি।

পিয়েরেটে—তার চেয়ে এই চুল্লীটার পাশে এসে বস না। আমাকে এই মোজাগুলোয় তালি দিতে সাহায্য করলেও তো পার।

পিয়েরট—আমার কাজে বাগড়া দেবার চেষ্টা কর না। তালি দেওয়াই বটে! তালি দেওয়ার চেয়ে জীবনে দামী কাজ আরও কিছু আছে বলে আমার মনে হয়।

পিয়েরেটে—আমার কিন্তু সন্দেহ আছে। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এক ধারা। প্রথমে আমরা ছেঁড়া মোজা পায়ে দি, তারপর সেই মোজায় লাগাই তালি। তারাই হ'ল বুদ্ধিমান, যারা মোজার সদ্ব্যবহার করতে জানে—সময় থাকতে যথা-সম্ভব তালি দিয়ে নেয়।

পিয়েরট—ঠিক, ঠিক। তুমি আমাকে একটা নতুন গানের ভাব জোগালে।

পিয়েরেটে—গাইতে আরম্ভ কর তা হলে।

পিয়েরট—কিন্তু গানটা আমি এখনও বাঁধতে পারি নি। তোমার কথা শুনে ভাবটা আমার মনে ঝিলিক দিয়েছে মাত্র।

(সে লাফিয়ে টেবিলের উপর উঠে অভিনেতার ভঙ্গীতে দাঁড়াল।)

জীবন হ'ল ছেঁড়া সুতোর জট-পাকান গুলি,
তোমরা কি কেউ পার এ জট খুলতে?
মুখে কেবল অহর্নিশি অহঙ্কারের বুলি—

(সে এক মুহূর্ত্ত থামল, তারপর তাড়াতাড়ি ছন্দ মেলাবার তাগিদে বলে উঠল) 'মানুষ বলে জিগির চাহ তুলতে'।...

এ অখিচ্ছি গানের ছকমাত্র—আসলে গান নয়।

পিয়েরেটে—তুমি 'শো'-তে এ গান গাইতে চাও নাকি ?

পিয়েরট—(টেবিল থেকে লাফিয়ে নেমে) তোমার মধ্যে একটুও আবেগ নেই। শিল্পীদের গায়ের চামড়া হবে শিশুদের মতই পাতলা—যেন একটুতেই বেঁধে।

পিয়েরেটে—এখন ঘরে থাক পিয়ের, বাইরে যেয়ো না—বড় ঠাণ্ডা।

পিয়েরট—তুমি বুঝি চাও যে আমি তোমার খুঁতখুঁতানি শুনি বসে বসে।

পিয়েরেটে—এইমাত্র না তুমি বললে যে, আমার মেজাজ সব সময়ে ঠিক থাকে।

পিয়েরট—এই তো আবার আমার সঙ্গে খচ্‌খচ্‌ আরম্ভ করলে।

পিয়েরেটে—অন্যায় হয়েছে, পিয়ের। কিন্তু বাজারে আজ সত্যি বড় শীত পড়েছে। তার ওপর তোমার জুতো যা পাতলা।

পিয়েরট—যতই বল না কেন, আমি ঘরে থাকব না। আমি সেই মেয়েটির খোঁজে যাচ্ছি। কে জানে, ও-ই হয়ত আমার স্বপ্নচারিণী।

পিয়েরেটে—তুমি কেবল আদর্শ মেয়েদের স্বপ্ন দেখে বেড়াও কেন ?

পিয়েরট—তুমি কি কখনও আদর্শ পুরুষের স্বপ্ন দেখ না ?

পিয়েরেটে—না, আমি বাস্তববাদী হবার জন্যই চেষ্টা করি।

পিয়েরট—মেয়ে জাতটাই একেবারে কল্পনাশক্তিহীন! তারা নেহাতই মায়ের জাত। এই মা হবার ইচ্ছেটাই যখন জোরে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে; তখন তারা বলে, 'আমরা প্রেমে পড়েছি'। অত্যন্ত জঘন্য আর নীচ এই মনোবৃত্তি। আমি এমন এক নারীকে চাই যাকে বেদীর উপর বসিয়ে তার দিকে চেয়ে থাকতে পারি আর প্রেম নিবেদন করতে পারি।

পিয়েরেটে—(ভাবগদগদ সুরে)

পথে চেয়ে 'পিয়ের', থেকো নাকো চাঁদের,
জোছ্‌নাতে তার একটি হৃদয় পড়ছে ঢলে,
আলোয় ভরা গানে ওরা মধু জ্যৈষ্ঠের
থাকবে নাকো চিহ্ন কোনও দিন ফুরলে।

পিয়েরট—না, আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। যাক্ আমি চল্‌লাম। (বাইরে যেতে যেতে পিছন ফিরে সে বিদ্রূপের সুরে গাইতে লাগল) "চাঁদের তরে মেয়ে, থাকিস্ না লো চেয়ে।"

পিয়েরেটে—গানের ক্রমবিলীয়মান সুর শুনতে লাগল। তারপর চুল্লীর কাছে গিয়ে আগুনটাকে বাড়িয়ে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। একটি হারানো কবিতা তার মনে পড়ল। হাস্যোজ্জ্বল মূর্তির মত জ্বলন্ত কয়লাকে শুনিয়ে শুনিয়ে পিয়েরেটে আবৃত্তি করতে লাগল।)

'একটি আছে কুমারী এই বিশাল দুনিয়ায়—
আছে মিশে লোকের ভিড়ে নগরে হাটে,
কেঁদে ওঠে পথিক যারা সে পথ দিয়ে যায়,
তৃপ্তিহীনা এই কুমারী ভবেরি নাটে।
গোলাপ-রাঙা অধরে তার উঠচে কেঁপে সুর—
প্রকাশ তাহার হয় না যে হায় মুখের বাণীতে,
চোখ দুটি তার দুঃখমলিন, হৃদয় ভারাতুর,
দেয় না সাড়া এই মনোরম দিনের ধ্বনিতে।
ভাবসাগরের অতল তলে ঘুমে অচেতন
সেই কুমারীর মনের মানুষ কিসের নেশাতে,
রাত্রি হ'ল মধুর আরো—জাগ্‌ল শিহরণ
প্রিয়ার চোখে প্রিয়মুখের স্বপন-চুমাতে।
জানি, জানি, এমন পুরুষ আছেই দুনিয়ায়,—
যে পারে এ নারীর প্রাণে আগুন জ্বালাতে,
সে পুরুষের খোঁজ কে দেবে ? খোঁজ যে নাই হায়,—
এই কুমারীর হৃদয় কে গো পারবে জুড়াতে ?
প্রেমবিধুরা এই কুমারীর দেখা যদি পাও,
মিথ্যা তারে শুনায়ো না সান্ত্বনা-বাণী,
নীরব থেকে অন্তরে তার গোপন রাখতে দাও
তৃপ্তিহীনার স্বপ্নরঙীন আলেখ্যখানি।'

(তার চোখে অশ্রু উপচে উঠল। দুই হাতে সে মুখ ঢাকলে। কে যেন ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে দরজার কড়া নাড়লে। পিয়েরেটে অবাক হয়ে তাকাল। দরজায় আবার আঘাত পড়ল।)

পিয়েরেটে—ভেতরে এস।

(দরজা যেন আপনা হতেই খুলে গেল। বাইরে দেখা গেল শিল্পীকে—চাঁদের আলোয় সে এসে দাঁড়াল। অদ্ভুতদর্শন ও স্নিগ্ধ চেহারা এই বৃদ্ধের। যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাকে মোটেই দুর্বল দেখায় না। যাদের দেখে শিশুর দল আপনা থেকেই মজে যায়, এই বুড়ো তাদেরি অন্যতম। তার পরনে নীল কাঁচের মত রঙীন একটা অদ্ভুত আকারের আলখাল্লা, তাতে রূপোর বোতাম আর বড় বড় পকেট—আলখাল্লাটিতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা। তার জুতোয় বড় বড় বগলেস পরানো, জুতোর হিলদুটো টকটকে লাল রঙের। তাকে দেখে বিত্তশালী শিল্পী বলে মনে হয় না—গেঁয়ো চারণ বলেই ধারণা জন্মায়। কোনও কথা না বলে সে ঘরের মধ্যে এল এবং দরজাটা আপনা থেকে আবার বন্ধ হয়ে গেল।)

পিয়েরেটে—(ব্যস্তসমস্ত হয়ে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে) ওঃ, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আমার—কড়ানাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দেওয়া উচিত ছিল।

শিল্পী—ঠিক আছে, ব্যস্ত হয়ো না। দরজা খোলায় আমি অভ্যস্ত ; বিশেষতঃ, আমি যে সব দরজা খুলেছি তাদের অনেকের চেয়ে তোমার দরজা সহজেই খোলে। বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, এমন অনেকে আছে যারা ইচ্ছে করে দরজায় পেরেক মেরে রাখে—তাদের দরজার কড়া নেড়ে কোনও ফল নেই। ভাল কথা, আমি কে তা ভেবে বোধ হয় অবাক হচ্ছ ?

পিয়েরেটে—আমি ভাবছি, তোমার বোধ হয় খিদে পেয়েছে।

শিল্পী—সেই পুরনো মেয়েলী ভাবনা। যাক্‌, তোমাকে ধন্যবাদ। আমার খিদে পায় নি। আমি খাই কম—খুবই কম খাই। একটু হাসি অথবা একটুখানি হাতের ছোঁয়া পেলেই আমি দিন কাটিয়ে দিতে পারি।

পিয়েরেটে—তুমি বস্‌বে তো অন্ততঃ—এটাকে নিজের ঘর মনে করে একটু জিরিয়ে নাও।

শিল্পী— (কাঠাসনের কাছে এগিয়ে গিয়ে) আমি যেখানেই যাই, সেখানেই আমার নিজের ঘর বলে মনে করা আমার স্বভাব। বলতে কি, লোকে বলে আমায় ছাড়া তোমরা নাকি ঘর বাঁধতে পার না। উনুনের পিঠে আমার পাদুটো রাখ্‌তে পারি কি ? এটাও আমার পুরনো অভ্যাস। আমি সব সময়েই এম্‌নি রেখে থাকি।

পিয়েরেটে—এখানকার লোকেরা বলে—

'না রাখ্‌লে পা উনুনের পিঠে
প্রণয় যে গো লাগে না মিঠে।'

শিল্পী—খাঁটি কথা। গৃহস্থালির গোপন যাদুও এই-ই। পিয়েরেট্, তুমি কাঁদ্‌ছিলে।

পিয়েরেটে—বোধ হয় কাঁদ্‌ছিলুম।

শিল্পী—মন খোলো। আমি সব জানি। সবই তো পিয়েরকে নিয়ে—নয় কি ? তুমি তাকে ভালোবাস, অথচ সে তোমাকে এতটুকু গ্রাহ্য করে না। কি অদ্ভুত জায়গা এই পৃথিবী ! আর তুমি তার জন্য কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলছ।

পিয়েরেটে—না না, আমি বড় একটা কাঁদি না। কিন্তু আজ রাতে ওর আচরণ অস্বাভাবিক রকম খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছে, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি ওকে খুশী করবার জন্য।

শিল্পী—কি বললে ? খুঁতখুঁতে।

পিয়েরেটে—অবিশ্যি, ওর তেমন দোষ নেই। যা শীত পড়েছে। তার ওপর কিছু দিন থেকে 'শো'-তেও তেমন রোজগার হচ্ছে না। পিয়ের চায় কোনও দৈনিক কাগজে আমাদের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখতে, এতে বিজ্ঞাপনের কাজ হবে। সম্পাদককে ফ্রি পাশে "শো" দেখতে দেবার বন্দোবস্ত করবে, প্রবন্ধ ছাপান যাবে বলে তার ধারণা।

শিল্পী—তুমি কি মনে কর যে পিয়ের তোমার চোখের জলের উপযুক্ত পাত্র ?

পিয়েরেটে—নিশ্চয়ই।

শিল্পী—মনে রেখ, নষ্ট করবার মত চোখের জল আমাদের নেই। যে সামান্য অশ্রু আমাদের আছে, তা দিয়ে কেবল হৃদয়কেই ভিজিয়ে রাখা যায়। এই অশ্রু যখন সব শুকিয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে, তখন হৃদয়ও যাবে শুকিয়ে।

পিয়েরেটে—পিয়ের অপূর্ব্ব মানুষ। আমার মত তুমি তাকে জান না। সত্যি কথা যে সে সব সময়ই অতৃপ্ত—সব সময়ই খিট্‌খিট্‌ করে ; কিন্তু তার কারণ, সে কারও প্রেমে পড়ে নি। জানই তো, প্রেম পুরুষের জীবনে এক মস্ত পরিবর্ত্তন ঘটায়।

শিল্পী—ঠিক কথা। কিন্তু প্রেম কি তোমার জীবনে কোনও পরিবর্ত্তন এনেছে ?

পিয়েরেটে—নিশ্চয়ই। আমি পিয়েরের চটি জুতো গরম করে রাখি, তাকে চা তৈরি করে দি, আর তার জন্য কিছু করবার সুযোগ পেয়ে সর্ব্বদা নিজেকে সুখী মনে করি। তাকে যদি ভাল না বাসতুম, তা হলে এ সব কাজে বিরক্তি আসত।

শিল্পী—তুমি কি ঠিক জানো যে এই হ'ল প্রকৃত প্রেম ?

পিয়েরেটে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই !

শিল্পী - যখনি তুমি পিয়েরের কথা ভাবো, তখনি কি দুটি ছোট্ট খালি পায়ের আওয়াজ শুনতে পাও ? যখনি সে কথা বলে, তুমি কি তোমার বুকে আর মুখে দুখানি ছোট্ট গোলগাল হাতের ছোঁয়া পাও ?

পিয়েরেটে—(উত্তেজিত ভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক—ঠিক পাই।

শিল্পী—তা হলে তোমার প্রেম খাঁটিই বটে। কিন্তু পিয়েরের কথায় তোমার মনে এমন কাব্য জেগে ওঠে কেন ?

পিয়েরেটে—কারণ—কারণ সে পিয়ের।

শিল্পী—কারণ সে পিয়ের ! সেই পুরনো যুক্তি !

পিয়েরেটে—স্বীকার করি, সে একটু ভাববিলাসী। কিন্তু তার আত্মাই যে ঐ রকম। আমার স্থির ধারণা, চেষ্টা করলে বড় কাজও সে করতে পারে। তুমি কি তার হাসি দেখেছ ? কি সুন্দর সে হাসি ! যখন সে আমার দিকে তাকায় না, তখন আমিও মাঝে মাঝে অমনি করে হাসতে চেষ্টা করি—ওরকম হাসিতে আমাকে কেমন মানায়, তা জানতে ইচ্ছে করে। (চিন্তাকুল ভাবে) মাঝে মাঝে মনে হয়, অন্তের দিকে চেয়ে হাসির মাত্রা কমিয়ে আমার দিকে চেয়ে সে একটু বেশী হাসলে ভাল হ'ত।

শিল্পী—হুঁ। তা হলে সে অন্তের দিকে চেয়েও হাসে ?

পিয়েরেটে—এমন একটা দিন কদাচিৎ আসে যেদিন না সে 'শো' দেখানোর সময় একজন না একজন অপরূপ নারীর

দেখা পায়। আজও একজনের দেখা সে পেয়েছে—লম্বা তার গড়ন, গোলাপী তার গাল। তারি সন্ধানে সে এখন বেরিয়েছে। অবশ্য, মেয়েরা এর জন্য দায়ী নয়—তারা ওর সঙ্গে প্রেমে না পড়ে থাকতে পারে না। (গর্বিত ভাবে) আমার মনে হয় সবাই পিয়েরের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে।

শিল্পী—কিন্তু ধরো, এই সব অপরূপ নারীদের কেউ যদি তাকে বিয়ে করতে চায় ?

পিয়েরেটে—না না, তারা তা করবে না। অপরূপ নারীরা কখনো গরীব গাইয়েকে বিয়ে করে না। আর পিয়ের যদি কোনও দিন বিয়ে করতে উদ্যত হয় তা হলে আমার মনে হয়, আমি—আমি শূন্যে বিলীন হয়ে যাব। দূর ছাই, এসব আমি তোমায় বলছি কেন ? মনে হচ্ছে, তুমি যেন আমার অনেক—অনেক দিনের চেনা। (পিয়েরেটে সাদা টেবিল-ক্লথটা মুড়ে রাখছিল। শিল্পী আসন ছেড়ে তার দিকে এগিয়ে গেল।)

শিল্পী—(অত্যন্ত ধীরে ধীরে) বোধ হয়, তুমি আমাকে অনেক, অনেক দিন ধরেই চেনো।

(তার সুরে এমন মমতা আর আন্তরিকতা ফুটে উঠল যে, পিয়েরেটে টেবিল-ক্লথের কথা ভুলে তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। শিল্পী পিয়েরেটের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে মুহূর্ত্তকাল হাসল। তারপর গালে জিভ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করে চুল্লীর দিকে এগিয়ে গেল।)

পিয়েরেটে—(শিল্পীর কোটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট ধনুক টেনে বার করে) এটার দিকে চেয়ে দেখ দেখি।

শিল্পী—(চকিত হবার ভান করে) আহা-হা। ওটা তোমাকে দেখাবার ইচ্ছে আমার ছিল না। আমার মনেই ছিল না যে, ওটা আমার পকেটের বাইরে ঝুলছিল। এক কালে আমার খুব তীর ছোঁড়া অভ্যাস ছিল। আজকাল আর সুযোগ হয় না।

(শিল্পী পিয়েরেটের হাত থেকে ধনুকটা নিয়ে পকেটে রাখলে)

(দূরে পিয়েরটের গান)

চাঁদের তরে মেয়ে, থাকিস্ না লো চেয়ে,
চাঁদ ফেলেছে জাল যে তাহার সাগর-জলে,
আলোয় গানে ভরা যে যায় ধেয়ে,
বিস্মরণে সুর সে শেখায় গোলাপ-দলে।

শিল্পী—(গানের সুর ক্রমেই কাছে আসতে শুনে ফিস্-ফিস্ করে) ও কে ?

পিয়েরেটে—পিয়ের !

(জানালার বাইরে আবার মোচাকার টুপিটি দেখা গেল। পিয়েরটের প্রবেশ।)

পিয়েরট—না, কোথাও তার দেখা পেলুম না। (শিল্পীকে দেখে) তুমি কে ?

শিল্পী—তোমার কাছে আমি অপরিচিত, কিন্তু পিয়েরেট আমাকে পলকেই চিনেছে।

পিয়েরেট—কোনও পুরনো অগ্নিশিখার মত বোধ হয় ?

শিল্পী—সত্যিই আমি পুরনো অগ্নিশিখা। অনেকদিন ধরেই আমি দুনিয়াটাকে আলোকিত করে রেখেছি। তবে তুমি আমায় পুরনো বললেও দুনিয়ায় এমন অনেকে আছে যারা আমায় বয়সের অনুপাতে তরুণ বলেই মনে করে। বলতে পার—আমি কত দিন পৃথিবীতে বিচরণ করছি।

পিয়েরট—(মেপে দেখবার ভঙ্গীতে দু' হাত ফাঁক করে) এই এত দিন।

শিল্পী—সারা দিন ধরে রঙ্গ দেখাবার ফলে তোমার শিরায় শিরায় রঙ্গ জমে গেছে।

পিয়েরেটে—তোমার অভদ্র হওয়া অসঙ্গত, পিয়ের।

শিল্পী—(পিয়েরটের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করবার জন্য অধীর হয়ে) পিয়েরেট তোমার রাতের বাজার করা হয়ে গেছে তো ?

পিয়েরেটে—ঠিক কথা! আমাকে এখনি ছুটতে হবে! দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেল বলে। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাকবে তো ?

শিল্পী—(তাকে ঠেলে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে) কথা দিতে পারি না, তবে চেষ্টা করব, চেষ্টা করব।

(পিয়েরেটে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ—শিল্পী সকৌতুকে পিয়েরটকে দেখতে লাগল।)

শিল্পী—তারপর, বন্ধু পিয়ের ? ব্যবসা তেমন জোর চলছে না, এ্যা!

পিয়েরট—জোর! হাসি যদি ব্যবসা হয় তা হলে জোরই বলতে হবে, কিন্তু তাতে টাকা মেলে না। যা হোক, আজ একটা কাজের মতো কাজ করেছি, এক সম্পাদকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ছাপাবার বন্দোবস্তও করেছি। এতে টাকা আসবে। (গান)

'আবার আসিয়ো রে বন্ধু,যখন তমাল ঘেরা কুটির মোরা গড়ব,
আসিয়ো নাকো, বেলাশেষে যখন মৌমাছিদের গুণব,
যখন দীঘির জলে ভেকের খেলায় মজব
যখন শিশির ভেজা শশার নাচন দেখব।'...

আমি এই গানখানি লিখেছি।

শিল্পী—পিয়ের, দুনিয়ার সমস্ত ধনরত্ন পেলেও তুমি সুখী হতে না।

পিয়েরট—কি বলছ! হতুম না! দুনিয়ার সমস্ত ধনরত্ন আমাকে দিয়ে দেখ, দেখ, আমি কি ভাবে খরচ করি। প্রথমেই স্কুল গড়ব, মানুষকে উঁচুদরের জিনিষ বুঝতে শেখাব।

শিল্পী—তুমি কেবল যশ ঐশ্বর্য্য আর ফাঁকা আদর্শের স্বপ্ন দেখছ। ফলে, আসল বস্তু ফেলছ হারিয়ে। তুমি অতৃপ্ত—

কিন্তু কেন? কারণ, কি করে যে সুখী হতে হয়, তা তুমি জান না।

পিয়েরট—(আবৃত্তির সুরে)

জীবনটা যে পাগলা নদী,
তার তীরে বসে বড়শী বাই ;
কে তুই বাঁধিস্ রে গান নারীর কেশে?
এইখানে আজ আয় না ভাই।

(ব্যাখ্যার ভঙ্গীতে) এই আর একখানি গান আমি বেঁধেছি। এটি হ'ল দ্বিতীয় চরণ। আমার মাথায় ভাব এমনি হুড়মুড় করেই এসে পড়ে। এক্ষুনি তৃতীয় চরণটিও বেঁধে গানটিকে শেষ করতে হবে।

শিল্পী—তুমি এমন একখানি গান লেখ না, যার শেষ নেই। অনন্তকাল ধরে যাকে বাড়ানো চলে।

পিয়েরট—দূর! এ অত্যন্ত নিরেট প্রস্তাব।

শিল্পী—নিরেট কিনা, তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কারণ, এই ধরণের গান গাইতে হ'লে শিল্পীকে সব সময়ে খুশী থাকতে হবে।

পিয়েরট। ব্যবসায়ে আর একটু জোয়ার না এলে আমার পক্ষে খুশী হবার উপায় নেই।

শিল্পী—আচ্ছা, তোমার আমার মধ্যে একটু বৈষয়িক আদান-প্রদানে কোনও আপত্তি আছে কি?

পিয়েরট—মোটেই না। তুমি কোন্ সিটের টিকিট কিনতে চাও? সামনের সিটগুলি ভেলভেট মোড়া—বার আনা করে টিকিট। এর পেছনে আছে কাঠের চেয়ার ছ'আনা করে। সব শেষের সিটগুলি দু-আনা ক'রে। তুমি নিশ্চয়ই বার আনারই একখানা নেবে। ক'খানা টিকিট চাও?

শিল্পী—তুমি বোধ হয় জান না, আমি কে?

পিয়েরট—জানা না জানায় কিছু এসে যায় না। সকলেই 'স্বাগতম্'। তুমি যে দয়া ক'রে শো দেখতে এসেছ, তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শিল্পী—পিয়ের, আমি স্বপ্ন-শিল্পী।

পিয়েরট—কিসের শিল্পী?

শিল্পী—এই ক্লেদাক্ত পৃথিবীতে যে সব স্বপ্ন উড়ে বেড়ায়, আমি তা তৈরি করি।

পিয়েরট—দেখ, তুমি একটু জিরিয়ে নাও। মনে হচ্ছে, তুমি বড় নাটুকে হয়ে পড়েছ।

শিল্পী—পিয়ের, পিয়ের, তোমার উচ্চাভিলাষী মন আমার কাছে ধরা দেবে না, জানি। শিশুর মন, সাধারণ মানুষের মন এক নিমেষেই ধরা দেয়। আমি স্বপ্ন তৈরি করি—যে স্বপ্ন ছোট শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে মানুষের অন্তরে ঢুকে তাদের পুলকিত করে তোলে। শরৎকালে 'সোয়ালো' পাখীর দল কোথায় উড়ে চলে যায়, তা কি তুমি জানতে চাও নি কোনো দিন? তারা যায় আমার কর্ম্মশালায়।—সেখানে গিয়ে আমাকে জানায় কারা স্বপ্নের সন্ধান করছে, আর গত বসন্তে তারা যে স্বপ্নসম্ভার নিয়ে গিয়েছিল তার বায়নাক্কাও দাখিল করে।

পিয়েরট—থাক্, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এই আজগুবি কাহিনী বিশ্বাস করাতে চাও না।

শিল্পী—ফুল যখন ঝরে পড়ে তখন কি তোমার খোঁজ নেবার ইচ্ছা জাগে নি কোনও দিন, কোথায় হারিয়ে যায় ফুলের রূপবৈচিত্র্য? খোঁজো নি কখনও শীতের দিনে কোথায় বাসা বাঁধে প্রজাপতির দল? আমার কারখানায় শীত খুব বেশী নয়।

পিয়েরট—আমি তোমার কর্ম্মশালার কথা আগে ভাবি নি।

শিল্পী—আমার কর্ম্মশালা অনেকটা হারানো মালের আপিসের মত—দুনিয়ায় যে সব সুন্দর বস্তু আদর পায় না, তাদেরি ঠাঁই সেখানে। সেখানে বসেই আমি গড়ে তুলি আমার বিখ্যাত স্বপ্ন—সে স্বপ্নের নাম প্রেম।

পিয়েরট—বাঃ, বাঃ, বেশ বলছ তো তুমি!

শিল্পী—তুমি বুঝি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?

পিয়েরট—কিছু কিছু বিশ্বাস করছি বটে। কিন্তু এ রকম স্বপ্ন বেশী দিন বাঁচে না। বাঁচে না, এ বাঁচতে পারে না। আকৃতি এর হয়তো আছে, কিন্তু প্রাণ নেই; অথবা প্রাণ যদি থাকে, তা হলে আকৃতি নেই। নাঃ, বিশ্বাস করতে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করছি—কিন্তু এক ধোপেই যে রঙ উঠে যায়।

শিল্পী—তুমি কেবল নকল জিনিষই দেখেছ; দাঁড়াও, আগে আসল বস্তুটাও দেখ।

পিয়েরট—কিন্তু কোন্‌টা আসল, তা চিনব কি করে?

শিল্পী—ভূরি ভূরি লক্ষণ আছে। যেই তুমি আসল বস্তুটিকে পাবে, অমনি ওড়বার বেগ জাগবে তোমার কাঁধে—এ হ'ল প্রেম-বিহঙ্গের পক্ষবিস্তার। এর পর তোমার ইচ্ছে হবে তারকাদের মধ্যে উড়ে যেতে, আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে বসতে, চাঁদকে গান শোনাতে। এর কারণ হচ্ছে, একটা বড় চাঁদকে ঘিরে আমি আমার স্বপ্ন গড়ে তুলি। একটু একটু করে আমি সেই চাঁদকে গুঁড়ো করে ফেলি—ফের তাকে বড় হয়ে গড়ে উঠতে দি। চাঁদ যে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে তা বোধ হয় তুমি দেখেছ। এক পক্ষকালের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

পিয়েরট—ভারী মজা তো! আচ্ছা, সোয়ালো পাখীরাই কি তোমার সমস্ত স্বপ্ন বয়ে নিয়ে আসে?

শিল্পী—সব সময় নয়। আমার আরও দূত আছে। প্রতি রাত্রে ঘড়ীতে যেই চারটা বাজে, অমনি পাঁজির পাতা থেকে একটা দিন খসে পড়ে। সেই দিন ছুটে যায় অনেক আগের দিনের দেশে—আমার কর্ম্মশালায়। আমি তার

ঠোঁটে লাগিয়ে দি' একটু টকটকে লাল রঙ, আর পরিয়ে দি তাকে সোনার জরী ; তারপর বলি : "ফিরে যাও, হে ক্ষুদ্র গতকল্য, যাও, দুনিয়ায় গিয়ে স্মৃতি হয়ে বাস করো।" কিন্তু আমার সেরা স্বপ্ন রাখি আজকের জন্ত। আমি শিশুদের কিনে আনি, তাদের গায়ে জড়িয়ে দি' স্বপ্ন-আঙরাখা, তারপর রাহাখরচ হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দি' অভিযানে সেই চিরাচরিত প্রথায়।

পিয়েরট—আমি আমার সারাজীবন স্বপ্ন দেখে চলেছি। কিন্তু সে সব স্বপ্ন নেহাতই আমার নিজের গড়া। মনে হয়, ঠিকমতো মালমশলা মেশাতে পারি নি।

শিল্পী—তুমি আসল মশলাটাই বাদ দিয়ে এসেছ। তোমার স্বপ্নে যে একটুখানি দুঃখ মেশানো চাই-ই, নইলে মিষ্টির আধিক্যে মুখ মেরে আসবে। এ সত্যের খোঁজ আমিও অতি অল্প দিনই পেয়েছি। তাই ত ভোরবেলা যে শিশির মুক্তো গড়ে, আমি তারই কয়েকটি নিয়ে আমার স্বপ্নে ছিটিয়ে দি' অশ্রুর অঞ্জলি।

পিয়েরট—(পরমোল্লাসে) অশ্রুর অঞ্জলি ! কি সুন্দর ! সত্যি বলছি, একটা স্বপ্ন আমার একবার পরখ ক'রে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে—অবশ্য আমার নিজের গড়া স্বপ্ন নয়।

শিল্পী—অনেক স্বপ্ন আছে ; কিন্তু তুমি সত্যি কি পরখ করতে চাও ?

পিয়েরট—সত্যিই চাই, কিন্তু ইতস্ততঃ ছড়ানো স্বপ্নের খোঁজ করব কি করে ?

শিল্পী—আমি এক সময় একটা স্বপ্ন গড়েছিলুম—সেটা ঠিক তোমারই উপযুক্ত। এই স্বপ্নটি আমি একটি শিশুর গায়ে জড়িয়ে দি'। সে আজ বিশ বছর আগের কথা। সেই শিশু আজ পূর্ণযৌবনা তরুণী—বড় বড় নীল চোখ তার—অপূর্ব্ব তার কেশদাম।

পিয়েরট—বলো, বলো, তার কথা বলো ;—শুনেও তৃপ্তি পাব।

শিল্পী—বলার চেয়েও বেশী করব। তাকে পৃথিবীতে পাঠাবার সময়ে দাবিনামাখানা আমার কাছেই রেখে দিয়েছিলুম—সেখানা এই—তোমাকে দিয়ে যাব।

পিয়েরট—ধন্তবাদ। কিন্তু, এ নিয়ে আমি কি করব ?

শিল্পী—কেন ! এর জোরে তুমি তাকে দাবি করতে পারবে। পড়ে দেখ, এতে তার চেহারার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে। ভাগ্যবান তুমি !

পিয়েরট—তার গাল দুটি কি গোলাপী ? গলায় কি তার মালা ?

শিল্পী—না।

পিয়েরট—তা হলে সে নয়। কোথায় তার সন্ধান পাব ?

শিল্পী—তা তোমায় নিজেকে খুঁজে নিতে হবে। এখন তোমার একমাত্র কাজ হচ্ছে খোঁজা।

পিয়েরট—আমি এখুনি খুঁজতে বেরুব। (যেন খুঁজতে বেরুতেই উদ্যত হ'ল।)

শিল্পী—আমি হ'লে আজ রাতে বেরুতুম না।

পিয়েরট—কিন্তু আমি যে শিগ্‌গীর তার সন্ধান চাই। আমার আগেই হয়তো অন্ত কেউ তার খোঁজ পাবে।

শিল্পী—পিয়ের, কোন এক সময়ে একজন লোক ব্যাঙের ছাতা কুড়ুতে চেয়েছিল।

পিয়েরট—(রসভঙ্গের জন্ত বিরক্ত হয়ে) ব্যাঙের ছাতা !

শিল্পী—পাছে আর সবাই তার আগে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়ে, এই ভয়ে সে রাত থাকতেই বেরিয়ে পড়েছিল। ভোর যখন হ'ল তখন সে কোথাও ব্যাঙের ছাতা দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ীতে ফিরে এল। বাগান থেকে ফিরে সে দেখলে যে তার বাড়ীর দোরগোড়ায়ই এক প্রকাণ্ড ব্যাঙের ছাতা ফুটে আছে।...অভিজ্ঞের উপদেশ নাও, একটু অপেক্ষা করে যাও।

পিয়েরট—এই যদি তোমার উপদেশ হয়...। যাক, ব'ল তো, তোমার কি মনে হয়, যে, আমি তার সন্ধান পাব ?

শিল্পী—আমি নিশ্চয় করে' তা বলতে পারি না। তুমি কি নিজেকে বোকা মনে কর ?

পিয়েরট—তা, নিশ্চয়ই। তুমি এমন খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন করো যে, আমি ভারি বিপদে পড়ি। কিন্তু আমাকে যদি একথা স্বীকার করতে হয়, অবশ্য গোপনে, অবশ্য...(সে ইতস্ততঃ করতে লাগল।)

(প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের ইচ্ছায়) ঠিক ! ঠিক !

পিয়েরট—হাঁ, তবে আত্মপ্রশংসা করছি বটে।

শিল্পী—যা বলেছ ! ঐখানেই তো তোমার আসল বিপদ। যখন তুমি তারার পানে চেয়ে চেয়ে হাঁটো, তখন ছোট্ট জোনাকিটি তোমার পায়ের চাপে মারা পড়তে পারে তো ? আমি তোমার গানের তৃতীয় চরণটি বেঁধে দি, কি বলো ?

জীবনটারে ডাকে নারী,
মাঝি, তুই রাখিস তোর পেতে কান
নইলে, রাত্রি যখন যাবে চলে
তখন বইবে চোখে বান।

(শিল্পীর দরদমাখানো চিত্তহারী স্বর কিছু আগে পিয়েরেটেকে যেমন বেঁধে রেখেছিল, পিয়েরটকেও তেমনি আটকে রাখলে। তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে এমন সময় জানালার বাইরে একটি লাল জামা দেখা গেল, বাজার ক'রে ঘরে ঢুকল পিয়েরেটে।)

পিয়েরেটে—ওঃ, তুমি আছ তা হলে। ভারি আনন্দ হ'ল আমার।

শিল্পী—কিন্তু আমাকে এবার যেতেই হবে। আমাকে অনেক ঘুরতে হয়।

পিয়েরেটে—(দরজা আটকে দাঁড়িয়ে) না, এক্ষুনি তুমি চলে যেতে পারবে না।

শিল্পী—আমাকে জানালা দিয়ে উড়ে যেতে বাধ্য করো না—অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থায়ই মানুষ তা করে।

পিয়েরট—(বক্তৃতার ভঙ্গীতে সকৌতুকে)—পিয়েরেট, আমাদের অতিথিকে সম্মান দেখাও। তুমি যার আদর-যত্ন করছ, সে যে কে, তা সামান্যই জানো। স্রোতে ভেসে যাওয়া অসংখ্য মাছের মতো দুনিয়ায় যে সব স্বপ্ন ভাসছে, তারি স্রষ্টা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। উনি ওঁর সেরা সৃষ্টির দাবিনামা আমাকে দিয়েছেন, এখন আমার খোঁজ করতেই যা দেরি। (নিতান্ত অন্তরঙ্গতার সুরে) আহা, যদি জানতুম, কোথায় গেলে খোঁজ পাওয়া যাবে।

শিল্পী—যাবার আগে আমি তোমাদের একটা শ্লোক শুনিয়ে যাই—

মেয়েরা সব এক একটি পাঠশালা গড়ি
মারুক্ বেত—জনম-বোকা পুরুষদেরে ধরি।

(সে অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথা নোয়ালে। তারপর নিঃশব্দে দ্রুত বেরিয়ে গেল।)

পিয়েরেটে—(তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলে)। ইস্! কি তাড়াতাড়িই না চলে গেল! আর ত তাকে দেখা যায় না।

পিয়েরট—অবশেষে আমার আদর্শ জয়যুক্ত হতে চলেছে। একটি চমৎকার বিয়ের আয়োজন হবে;—রূপালী ঝালর-দেওয়া সাদা জামা থাকবে গায়ে, হাতে থাকবে সোনায় মুখ বাঁধানো একগাছি লম্বা ছড়ি। (গান)

তখন আরও যদি খেলি লুকোচুরি,
শিশির ভেজা ঘাসে তোমার চরণ ভিজে
হয়ত জাগবে কাঁপন,
তাই ত আমি জ্বালিয়ে দিয়ে বটের ঝুড়ি
উত্তাপে তার শুকিয়ে নিতে তৃণে নিজে
করব রাত্রিযাপন।

পিয়েরেট, আমি যেন সত্যিই লাভ করতে চলেছি পুরুষের শাশ্বত অধিকার অর্থাৎ প্রেম।

পিয়েরেটে—আমি তোমায় সর্ব্বাঙ্গীণ শুভ কামনা করি।

পিয়েরট—(ক্ষ্যাপাইবার উদ্দেশ্যে গান)

আমরা দোঁহে মিলব স্বপনে,
এই জেনেছি মনে মনে।
স্বর্ণা আমার গড়বে স্বপন,
স্বপ্ন তোমার গড়বে কানন,
আমার দেখা পাবে তুমি
স্বর্ণা যখন বইবে,
তোমার দেখা পাব যখন
কানন কথা কইবে।

পিয়েরেটে—অনেক টাকা আয় করতে হবে আমাদের, যাতে করে সে যা চায় তা তুমি তাকে দিতে পার। যতক্ষণ না আমার পা ভেঙে যাবে, ততক্ষণ আমি নাচব, আর লোকে বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠবে—'আহা, মেয়েটি যে নাচতে নাচতে মারাই পড়ল।'

পিয়েরট—ঠিক বলেছ তুমি! আমরা দু'জনে একত্রে শো দেখাব। আমাকে এখুনি কাগজের জন্য প্রবন্ধটা লিখে ফেলতে হবে। (সে দেরাজ খুলে লেখবার উপকরণাদি বার করলে, তারপর টেবিলের সামনে বসে লিখতে আরম্ভ করলে।) "সম্প্রতি এই শহরে একটি ভ্রাম্যমাণ নাট্যসম্প্রদায় আসিয়াছে। তাহারা গীতিনাট্য ও প্রহসন অভিনয় করে। পিয়েরট তাহার অপূর্ব্ব নৃত্যগীত দ্বারা দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতেছে এবং পিয়েরেটের পল্লীনৃত্যে সবাই পুলকিত হইতেছে। পিয়েরেটে বিংশতিবর্ষীয়া সুন্দরী অভিনেত্রী। মিলনাত্মক নাটক অভিনয়ে অপূর্ব্ব তাহার দক্ষতা। তাহার কেশদাম...।" কোন্ রঙ?

পিয়েরেটে—সুন্দর, পরিপূর্ণ সুন্দর!

পিয়েরট—কি অদ্ভুত! নিত্য যাকে দেখছি, তার চুলের কি রঙ, তারও খোঁজ রাখি নে। যাক্। (আবার পড়তে লাগল) "তাহার কেশদাম সুন্দর আর...।" চোখ?

পিয়েরেটে—নীল, পিয়ের।

পিয়েরট—"কেশদাম সুন্দর আর চক্ষুর্দ্বয় নীলবর্ণ।" সুন্দর! নীল! আহা! না, নিশ্চয়ই এ সব বাজে।

পিয়েরেটে—কি বাজে?

পিয়েরট—আমি একটা বিষয় চিন্তা করছিলাম। প্রায় সব মেয়েরই চুল সুন্দর আর চোখ নীল।

পিয়েরেটে—সত্যিই পিয়ের, আমরা সবাই তো আর কিছু অপূর্ব্ব হতে পারি না।

পিয়েরট—তোমার কণ্ঠস্বর কি মধুর! না, আমি এর কিছু বুঝতে পারছি নে। নিশ্চয়ই এসব বাজে। (সে তার পকেট থেকে দাবিনামাখানা বার করে পড়তে লাগল।)

পিয়েরেটে—কি সব বাজে? পিয়ের, আমাকে কি বলবে না?

পিয়েরট—পিয়েরেট, একটু আলোর নীচে গিয়ে দাঁড়াও।

পিয়েরেটে—কেন? কি হয়েছে?

পিয়েরট—মনে হচ্ছে, হয় নি কিছু। (দাবিনামা পাঠ ও পিয়েরেটেকে নিরীক্ষণ) "যে চোখ বলে, 'আমি ভালবাসি,' যে বাহুযুগল বলে, 'আমি তোমাকে চাই,' যে অধর বলে, 'কেন দেবে না?...পিয়েরেট, একি সম্ভব? তুমি যে এত সুন্দর তা তো আগে চেয়ে দেখিনি। তোমাকে

আর একটুও আগের মত মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, তোমার আসল মুখখানি যেন হারিয়ে ফেলেছ; গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ে যেন তোমার নূতন মুখখানি তৈরি করা হয়েছে।

পিয়েরেটে—এসব কি, পিয়ের?

পিয়েরট—প্রেম। শেষ পর্য্যন্ত আমি খুঁজে পেয়েছি। তুমি কি বুঝতে পারছ না?

'বোকার মত ঘুরতে ছিলাম গোলকধাঁধার পিছে পিছে,
প্রিয়ে, তোমার পাঠশালাতে পাঠ না নিলে জীবন হ'ত মিছে।'

...ভাবলেও অবাক হই যে, রোজ তোমাকে দেখেছি, অথচ তোমাকে ঘিরে গড়ে ওঠে নি আমার কোনও স্বপ্ন—স্বপ্নই বটে! আঃ, সত্যিই এ সেই সুন্দর স্বপ্নমালার একটি। তাই তো মনে হচ্ছে, যেন ভোরের আলোয় আমার অন্তর ভরে উঠেছে।

পিয়েরেটে—আঃ, পিয়ের।

পিয়েরট—উঃ, আমার কাঁধে কি ওড়বার গতিবেগই না জেগেছে। আমি উড়ে যেতে চাই ঊর্দ্ধে—বহু ঊর্দ্ধে। তুমি কি চাও না আকাশের গায়ে হেলান দিতে? তারকাদের গান শোনাতে?

পিয়েরেটে—আমি যে বহু দিন ধরেই আমার প্রিয়তমের অপেক্ষায় চাঁদের রাজ্যে বাস করছি। পিয়ের, আমাকে তোমার হাসি উপভোগ করতে দাও। এক চুমুতে তোমার হাসিটুকু ঢেলে দাও আমার মুখে।

(দু'জনে পিছনে দু'হাত বাড়িয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে পরস্পরের ঠোঁটে ঠোঁট আটকে রাখল)

পিয়েরেটে—(মাথা সরিয়ে নিয়ে পরম শান্তির নিশ্বাস ফেলে) ওঃ, কি সুখীই না আজ হয়েছি। আজই যদি সবকিছুর অবসান হয়ে যেত।

পিয়েরট—এস, আমরা আগুনের কাছে বসে উনুনের পিঠে পা রাখি: এর পর থেকে আমাদের জীবনে বিরাজ করুক চির শান্তি। (তারা আগুনের কাছে গিয়ে বসল। পিয়েরট মৃদু সুরে গাইতে লাগল)

চাঁদের তরে মেয়ে, থাকিস না লো চেয়ে—
অনেক বেঁকে পথ গেছে ঐ স্বর্গলোকে,
আলোয় ভরা গানে ভরা জ্যৈষ্ঠ আসে ধেয়ে—
ঘুম দিয়ে যায়, চুম দিয়ে যায় তোমার চোখে।

[চিম্‌নীর গায়ে ঝোলানো লণ্ঠনের তেল শেষ হয়ে গেছে; শিখাটা তখনো পুড়ছে লাল হয়ে, আর তারি আভা পড়েছে দু'জনের মুখে। ধীরে ধীরে নেমে আসছে যবনিকা।]

তিরুমঙ্গই আলোয়ার

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

আলোয়ার অথবা মরমী (Mystic) বৈষ্ণবগণ খ্রীষ্টীয় সপ্তম এবং নবম শতকের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন। তামিল ভাষায় আলোয়ার শব্দের অর্থ—সেই সাধকবৃন্দ যাঁহারা ভগবৎপ্রেমের পূত মন্দাকিনীধারায় স্নাত হইয়া পরম পুরুষ সচ্চিদানন্দের স্বরূপ চিনিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছেন। পার্থিব ভোগৈশ্বর্যে আকৃষ্ট ভ্রান্ত নরনারীকে মুক্তির পথ নির্দেশ করিয়া, অমৃতের আস্বাদের সন্ধান দিয়া—ভক্তিরসাত্মক চারি হাজার থেবারম্ (তামিল স্তব) ইঁহারা রচনা করেন। উপনিষদ এবং গীতার সরল ভাষ্য রূপান্তরে এই সমস্ত থেবারমে স্থান পাইয়াছে। রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু নারায়ণ নরসিংহ ইত্যাদি ভগবানের বিভিন্ন মূর্তির উদ্দেশ্যে এই সমস্ত স্তোত্র রচিত হইয়াছে। ভারতের এক শত আটটি বৈষ্ণব মন্দিরে উক্ত বিগ্রহগুলি প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ-ভারতে শ্রীরঙ্গম্ শ্রীবৈকুণ্ঠম্ শ্রীবিল্বিপুত্র তিরুপ্পতি কুম্ভকোনম্ প্রভৃতি তীর্থ বৈষ্ণবগণের প্রধান উপাসনা-কেন্দ্র। বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ মতে ভগবান বিষ্ণু দ্বাদশ জন আলোয়ারের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হন। আলোয়ারগণ প্রপত্তিমার্গের উপাসক ছিলেন। ব্রহ্মপদে পূর্ণ আত্মসমর্পণকে প্রপত্তি বা শরণাগতি বলে। প্রপত্তিমার্গের ছয়টি অংশ—(১) 'আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ'—ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্তই ব্রহ্মের অংশ, এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত সার্বজনীন শ্রদ্ধা ও প্রেম। (২) 'প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্'—হিংসা দ্বেষ পরনিন্দা প্রভৃতি ধর্ম-বিরুদ্ধ কার্যের বর্জন। (৩) 'রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাসঃ'—ঈশ্বরই একমাত্র ত্রাণকর্তা বলিয়া ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস। (৪) 'গোপ্‌তৃত্ব বরণ'—ভগবান পরম করুণাময় হইলেও প্রার্থনা ব্যতীত তাঁহার করুণাকণা লাভ করা যায় না—এই বিশ্বাস। (৫) 'কার্পণ্যম্'—স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ও অহংভাবের পরিপূর্ণ বর্জন। (৬) 'আত্ম-নিক্ষেপঃ'—ব্রহ্মপদে আত্মসমর্পণ। এই সমস্ত আলোয়ারের অধ্যাত্মরাজ্যের ভাবধারা থেবারমগুলিতে প্রাণবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরম ভক্ত এবং মনীষী শ্রীনন্দ মুনি এই সমস্ত থেবারম সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। এই প্রপত্তিমার্গ আচার্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির ভিতর দিয়া বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে চিঙ্গলপুট জিলায় রামানুজ জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় চোলরাজ অধিরাজেন্দ্রের রাজত্বকাল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে রামানুজ শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরে অবস্থান করিয়া স্বীয় ধর্মমত প্রচার করেন। পুণ্যতোয়া কাবেরী নদী দ্বিধাবিভক্ত হইয়া মেখলারূপে মন্দিরটিকে বেষ্টন করিয়া আছে। মন্দিরে শ্রীরঙ্গরাজ (বিষ্ণু) অধিষ্ঠিত। বিগ্রহের আদিমূর্তি ক্ষীরোদসমুদ্রশায়ী ভগবান; অনন্তশয্যায় ইনি শয়ন করিয়া আছেন। বিগ্রহের নাভিমূল হইতে উৎপন্ন পদ্মে ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী পদসেবায় নিরত। বিষ্ণুর অপর একটি মূর্তি আছে—এই মূর্তিটি বিশেষ আড়ম্বরের সহিত নিত্য পূজিত হইয়া থাকে। আচার্য রামানুজের সাধনক্ষেত্র বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীরঙ্গম্ অতি পবিত্র তীর্থস্থান। প্রতি বৈষ্ণবপর্ব উপলক্ষে সাধক এবং উপাসকগণ এখানে সমবেত হইয়া থাকেন। দক্ষিণাপথের সাধকপ্রবর তিরুমঙ্গই আলোয়ার কর্তৃক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিরুমঙ্গই আলোয়ার চোলদেশের অন্তর্গত থিরুকুরিয়ালোর নামক স্থানে এক শৈব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে ইনি শূদ্র ছিলেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম নীল। তাঁহার পিতা এক জন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি যুদ্ধবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। সেই সময় ধনুর্বিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। অশ্বারোহণে এবং সমর-কৌশলে তিনি বিশেষ নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। চোলরাজ তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করেন। তিনিও সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সন্তুষ্ট হইয়া চোলরাজ তাঁহাকে কিছু ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে তিনি চোলরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। মদগর্বে স্ফীত সেনাপতি নীল রাজ্যের সর্বত্র অবাধ লুণ্ঠনকার্যে ব্রতী হন। কিন্তু তিনি চোলরাজকে নিয়মিত কর প্রদান করিতেন।

এই সময় তিরুবলী নামক স্থানে কুমুদ্বল্লী নামে এক ধর্ম-পরায়ণা কুমারী বাস করিতেন। তাঁহার জীবন-কাহিনী সবিশেষ কিছুই জানা যায় না। এক পরম বৈষ্ণব কর্তৃক তিনি লালিত পালিত হন। তিরুবলী মন্দিরে অধিষ্ঠিত বিগ্রহের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। এই মন্দিরে নারায়ণ-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। কুমুদ্বল্লী অপরূপ সৌন্দর্যময়ী ছিলেন। রমণীকুলমুকুটমণি কুমুদ্বল্লীর পাণিগ্রহণেচ্ছু বহু রাজকুমার নিয়ত তাঁহার নিকট উপনীত হইতেন। কিন্তু কেহই এই কুমারীর হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইলেন না। সেনাপতি নীল শীঘ্রই তাঁহার অপার্থিব সৌন্দর্যের কথা শুনিতে পাইলেন। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। এই কুমারীর প্রতি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অবিলম্বে তিনি কুমুদ্বল্লীর পালক-পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তদীয় কন্যার পাণিপ্রার্থী হইলেন। পিতা কন্যার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক-যুবতী মুখোমুখি দাঁড়াইয়া—এই সময় ভগবান্ পুষ্পধন্বা অলক্ষ্যে উভয়ের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তরুণী দেখিলেন—তাঁহার সম্মুখে একান্ত বাঞ্ছিত দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। সে হাসিতে যেন স্বর্গীয় সুষমা ঝরিয়া পড়িতেছে। কুমারী আত্মবিস্মৃত হইলেন। আর সেনাপতি নীল অনুভব করিলেন যেন এক মহীয়সী দেবীমূর্তি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। নয়ন ভরিয়া তিনি এ রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। সেনাপতি নীল দেখিলেন—কুমুদ্বল্লীর দেহযমুনা যৌবনের নিরুপম সৌন্দর্যে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। প্রেমের আবেশে তাঁহার মনপ্রাণ আজ উন্মুখ হইয়া উঠিল, তিনি কুমুদ্বল্লীর জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন। কুমুদ্বল্লী বলিলেন—'ভদ্র, একমাত্র পরম বৈষ্ণব ব্যতীত কেহ আমার পাণিগ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ আমার সমস্ত দেহমন বিষ্ণু-ভক্তকে সমর্পণ করে নারায়ণ-সেবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করাই আমার একমাত্র কাম্য।' 'দেবি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'—এই বলিয়া নীল তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কালবিলম্ব না করিয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষা লইয়া তিনি প্রেমাস্পদার নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, 'দেবি, আশা করি এবার তুমি আমাকে গ্রহণ করবে।' কুমুদ্বল্লী মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন—'ভদ্র, আপনার এ বাহ্যিক দীক্ষা কিছুই নয়। আপনি প্রতিদিন এক হাজার আট জন বৈষ্ণবকে আহার্য প্রদান করে তাদের সেবাপূজা করবেন এবং তাঁদের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ আমায় এনে দেবেন। এ ব্রত আপনাকে এক বছর ধরে পালন করতে হবে।'

—'তথাস্তু।'

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর অতিবাহিত হইল। নীল কুমুদ্বল্লীর নির্দেশ প্রতিপালন করিলেন। কুমুদ্বল্লী সানন্দে নীলকে পতিরূপে বরণ করিলেন।

সেনাপতি নীলের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। প্রতিদিন বৈষ্ণবগণের সেবাপূজার ভিতর দিয়া তাঁহার মনপ্রাণ পরমপিতা জগদীশ্বরের দর্শনমানসে অশান্ত হইয়া উঠিল। নীল বুঝিতে পারিলেন তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য বৈষ্ণব-গণের পদরেণুরও তুল্য নহে। তাই তিনি সাধ্বী পত্নীর পূর্ব-নির্দেশমত প্রতিদিন এক হাজার হরিভক্তের সেবাপূজায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। এইভাবে তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য নিঃশেষ হইয়া গেল। তিনি কপর্দকহীন হইয়া পড়িলেন। সম্বলের মধ্যে রহিল শুধু রাজকর বাবদ দেয় অর্থ। কিন্তু তিনি কি তাঁহার এই মহান্ ব্রত হইতে বিরত হইতে পারেন। বরং

নিজে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন তবু নরনারায়ণের সেবাব্রত হইতে বিচ্যুত হইবেন না এই তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প। ভগবানে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়া তিনি রাজকর ব্যয় করিলেন।

প্রাগুক্ত ঘটনার কয়েক মাস পর নীলের নিকট হইতে রাজস্ব পাইতে বিলম্ব দেখিয়া চোলরাজ ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেন। নীলের সেবাব্রতের কথা অতিরঞ্জিত ভাবে রাজার নিকট পৌঁছিল। প্রথম হইতেই তিনি নীলের আচরণে মর্ম-জ্বালায় জ্বলিতেছিলেন। তাই কালবিলম্ব না করিয়া নীলকে বন্দী করিয়া আনিতে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। বীরের ন্যায় নীল রাজসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। নীলের কল্লার বাহিনীর নিকট রাজসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। দারুণ অপমানে চোলরাজ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া স্বয়ং এক বিরাট্ বাহিনী লইয়া নীলকে শাস্তি দিতে চলিলেন। নির্ভীক নীল রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। চোলরাজ তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইলেন, বলিলেন—

—'কেন তুমি রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেছ ?

—'বৈষ্ণবগণের সেবায় ঐ অর্থ ব্যয় করেছি ; আমার মনে হয় এতে অর্থের সদ্ব্যবহারই হয়েছে। রাজকোষে অর্থ প্রেরণ করলে তা শুধু আপনার অত্যুগ্র ভোগের সামগ্রী সংগ্রহেই সাহায্য করত। জনসাধারণের কোন উপকারে আসত বলে মনে হয় না।'

—বেশ, তোমার উত্তরে আনন্দ লাভ করলাম। তোমার সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করতে রাজী আছি যদি তুমি পুনরায় সেনাপতির পদ গ্রহণ করে আমার অধীনে কাজ কর। কিন্তু যে পর্যন্ত না তুমি আমার প্রাপ্য রাজস্ব দিচ্ছ—সে পর্যন্ত তুমি আমার বন্দী থাকবে।

নীল কারাগারে বন্দীজীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সত্যং শিবং সুন্দরমের পূজারী নীল। তিনি কি জীবনের ক্ষণিক দুঃখকষ্টে ম্রিয়মাণ হইয়া তাঁহার লক্ষ্য শ্রেয়কে ত্যাগ করিবেন? তাহা হইলে তাঁহার জীবনের সাধনাই তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া যাইবে। চিরসুন্দরকে লাভ করিবার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে, তাহা ক্ষুরধার দুর্গম—'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'। রুদ্ধ কারাগৃহে ভক্ত নীল আকুল প্রাণে ভগবানের চরণে প্রাণের আকূতি নিবেদন করিতে লাগিলেন—'প্রভো! তোমার ভক্তগণের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ ভিন্ন অন্য খাদ্য আমি স্পর্শ করি না। বৈষ্ণবদের অভুক্ত রেখে কোন্ প্রাণে আমি এখানে আহার করব! অনশনে বরং প্রাণত্যাগ করব তবু ব্রত ভঙ্গ করতে পারব না। দয়াময় প্রভো! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' ভক্তশ্রেষ্ঠ নীল অনশনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এক দিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্নচ্ছলে ভগবানের প্রত্যাদেশ পাইলেন। কাঞ্চীপুরের অন্তর্গত বেগবতী নদীগর্ভ হইতে ভগবান তাঁহাকে গুপ্তধন গ্রহণ করিতে বলিলেন। ভগবানের অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাতে তিনি রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, কাঞ্চীপুর গিয়া তিনি রাজস্ব পরিশোধ করিবেন। চোলরাজ তাঁহাকে সশস্ত্র রক্ষীবর্গের তত্ত্বাবধানে কাঞ্চী পাঠাইলেন। কাঞ্চীর বরদারাজ তাঁহার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সেখানে গুপ্তধন উদ্ধার করিয়া তিনি চোলরাজের রাজস্ব সুদে আসলে পরিশোধ করিলেন। এই অলৌকিক ব্যাপারে চোলরাজ ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—সেনাপতি নীল সাধারণ ব্যক্তি নহেন। তিনি একজন মহাপুরুষ। ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা তাঁহার সমস্ত কার্যের পিছনে রহিয়াছে। তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি নীলের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন এবং বারংবার ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন। ভক্তপ্রবর নীল প্রসন্ন হাস্যে তাঁহার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিলেন। চোলরাজ নীলকে রাজস্ব ফিরাইয়া দিলেন এবং তদীয় পুণ্য কৃত্যের জন্য প্রভূত অর্থ রাজকোষ হইতে প্রদান করিলেন।

নীল পুনরায় পূর্ণোদ্যমে বৈষ্ণব সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বৈষ্ণবগণের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বর্ধিত হইল। পুনরায় তিনি নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বৈষ্ণবসেবা যাহাতে বন্ধ না হয় তজ্জন্য কুমুদ্বল্লী তাঁহাকে একান্ত ভাবে অনুরোধ করিলেন। নীল উপায়ান্তর না দেখিয়া ধনিক সম্প্রদায়ের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতে মনস্থ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি বিরাট সংঘ প্রতিষ্ঠা করিলেন। লুণ্ঠন করিয়া যে ধনরত্ন সংগৃহীত হইত তাহা হইতে তিনি এক কপর্দকও নিজের ভোগের জন্য গ্রহণ করিতেন না। সমস্ত অর্থই তিনি ভক্তগণের সেবায় ব্যয় করিতেন।

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। এক দিন লক্ষ্মী আর নারায়ণ ছদ্মবেশে নীলের নিকট উপনীত হইলেন। বনপথে নীল সদলবলে উদ্গ্রীব হইয়া পথচারীদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সহসা এক ধনিকের ছদ্মবেশে সস্ত্রীক নারায়ণ সেখানে উপস্থিত হইলেন। দস্যুদল চারিদিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ছদ্মবেশী নারায়ণ তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, তিনি তিরুবলীতে বাস করেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি আরও বলিলেন—দস্যুতা পাপ। ব্রাহ্মণের কথায় নীল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—'ঠাকুরমশাই, আমরা যা করি সেটা মোটেই

দস্যুবৃত্তি নহে; আমরা ধনীর ধনরত্ন লুণ্ঠন করি দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য। অফুরন্ত ধনরত্ন আপনার অধিকারে—তা শুধু আপনার এবং আপনার পরিবারবর্গের ভোগে ব্যয়িত হয়ে থাকে। সাধারণের কোনই উপকার হয় না। আপনার সঞ্চিত অর্থ জনসাধারণের উপকারে এলে তার সদ্ব্যবহারই হবে। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে সঙ্গে যা-কিছু আছে দিয়ে দিন।' ছদ্মবেশী নারায়ণ তখন সমস্ত ধনরত্ন ও স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কাররাশি দস্যুকরে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার অনুচর-বর্গের মধ্যে কেহই সঞ্চলব্ধ দ্রব্যের পোঁটলাটি উঠাইতে পারিল না। নীল সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু পোঁটলাটি একচুলও নড়িল না। ব্রাহ্মণ উহা মন্ত্রপূত করিয়াছেন; সুতরাং মন্ত্রটি শিখাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে যাইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া নীল মত প্রকাশ করিলেন। ছদ্মবেশী নারায়ণ মৃদু হাসিয়া নীলের কানে কানে বলিলেন—'ওঁ নমো নারায়ণায়ঃ' সঙ্গে সঙ্গে নীলের সমস্ত শরীরে এক অপূর্ব্ব পুলকশিহরণের সঞ্চার হইল। তিনি অভিভূতের ন্যায় পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—ওঁ নমো নারায়ণায়। ভাবাবেশে তিনি বিহ্বল হইলেন।

এদিকে সমস্ত ধনরত্নসহ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী চক্ষুর নিমেষে অদৃশ্য হইলেন। নীল দেখিতে পাইলেন সমস্ত বনভূমি আলোকিত করিয়া গরুড়-আরোহণে লক্ষ্মী-নারায়ণ আকাশ-পথে চলিয়াছেন। তখন তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার চির আরাধ্য দেবতা নারায়ণ আজ তাঁহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছিলেন! অনুশোচনায় তাঁহার সমস্ত অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। ভক্তের মনোভাব ভগবানের অগোচর রহিল না। অকস্মাৎ নীলের কানে আকাশবাণী ভাসিয়া আসিল—'প্রিয় ভক্ত তিরুমঙ্গই, তোমার কৃত কর্ম্মের জন্য অযথা নিজকে দোষী করো না। তুমি শ্রীরঙ্গমে গিয়া দেব-দেউল নির্ম্মাণ কর। সেখানে আমার মূর্ত্তি স্থাপন করে সেবাপূজার ব্যবস্থা এবং আমার মহিমা সাধারণ্যে প্রচার কর। তা হলেই তোমার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত হবে।' এই ঘটনার পর হইতেই নীলের জীবনে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। শ্রীরঙ্গম্ মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে বহু অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু নীল তখন কপর্দকশূন্য। উপায়ান্তরবিহীন হইয়া তিনি নেগাপত্তমে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দির আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করেন। মন্দিরের সুবর্ণ-নির্ম্মিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি দ্বারা নীল আরব্ধ কার্য্য সমাধা করেন।

তিরুমঙ্গই আলোয়ারের (নীল) কতিপয় কবিতার বিচ্ছিন্ন অংশ কাঞ্চীতে পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কবিতা হইতে অধ্যাপক কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার প্রমাণ করিয়াছেন, তিরুমঙ্গই আলোয়ার খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীরঙ্গম্ মন্দির নির্ম্মাণ এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সুচারু ভাবে সম্পন্ন হইল। এই সময় পরম যোগী এবং সিদ্ধ নাম্মালোয়ার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীরঙ্গমে আগমন করেন। তিরুমঙ্গই আলোয়ার তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তিনি অশেষ মনোযোগের সহিত এই মরমী সিদ্ধপুরুষের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যান শ্রবণ করেন। অতঃপর তিরুমঙ্গই তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। শৈবাচার্য্য শ্রীজ্ঞান সম্বন্ধর তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। শৈবাচার্য্য তাঁহার অধ্যাত্ম-সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হন। তিরুমঙ্গই আলোয়ার এক হাজার থেবারম্ (তামিল স্তোত্র) রচনা করেন। সমস্ত থেবারম্ তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীরঙ্গরাজের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এই থেবারমগুলি 'পেরিয়া থিরুমোলি' নামে অভিহিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থ 'দিব্য প্রবন্ধমে' তাঁহার রচিত অধিকাংশ স্তব স্থান পাইয়াছে। তাঁহার রচনায় বহু কিম্বদন্তী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। স্তবগুলি সহজ সরল অথচ ভাবমাধুর্য্যে অতুলনীয়। দাস্য ভাবে তিনি ভগবানকে আরাধনা করিয়াছেন। নিজেকে তিনি পরম পুরুষের পদে সম্পূর্ণ ভাবে উৎসৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন।

রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সেই পার্থিব প্রেম ভগবৎ প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া ভগবানকে পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। তাঁহার মতে ভগবদারাধনায় বাহ্য আড়ম্বর কিছুই নহে, একমাত্র ভগবানের নামই সার। সচ্চিদানন্দের করুণাকণা লাভ করিতে হইলে নির্ম্মল-চিত্তে পরম পিতাকে স্মরণ মনন করাই যথেষ্ট। ভাগবতে ভক্তির নয় প্রকার লক্ষণের উল্লেখ আছে—শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পদসেবন অর্চনা বন্দনা দাস্য সখ্য এবং আত্মনিবেদন। তিরুমঙ্গই আলোয়ার দাস্য এবং আত্মনিবেদনের (আত্ম-নিক্ষেপঃ) ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভগবানের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রেম-ধর্ম্মের কথা স্মরণ করিলে এমার্সনের উক্তি মনে পড়ে—"When it breathes through man's intellect, it is genius. When it breathes through his will, it is virtue. When it flows through his affection, it is love."

তিরুমঙ্গই আলোয়ার এবং তদীয় সহধর্ম্মিণী কুমুদ্বল্লীর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় নাই। কারণ প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী ইঁহাদের শেষ জীবন সম্বন্ধে নীরব। প্রাচীন ভারতের বিস্মৃতপ্রায় ধর্ম্মগুরুদের জীবনের তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে দেশবাসীর অবহিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

মুদ্রামূল্যাবনতি

শ্রীবিমলাকান্ত সরকার

কিছুকাল হইতে মুদ্রামূল্যাবনতির (Devaluation) কথা শোনা যাইতেছে। সম্প্রতি ফ্রান্সে মুদ্রামূল্যাবনতি হইয়াছে। ইংলণ্ডেও হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল এবং অনেক প্রধান দেশে যে ইহার আশঙ্কা একেবারে নাই তাহা বলা যায় না।

সাধারণতঃ দেশে যে টাকা চলিত থাকে তাহা কোনও ধাতুর সহিত জড়িত। এই ধাতুর মূল্যের যাহাতে বেশী হ্রাস বৃদ্ধি না হয় তাহা লক্ষ্য রাখিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'সোনা'র কথা ধরা যাক। ইহা অধিকাংশ দেশে চলিত মুদ্রা। সোনার মূল্য নানা কারণ বশতঃ (যেমন শিল্পাদির জন্য নিয়মিত চাহিদা এবং আহরিত প্রভূত ভাণ্ডার হেতু) অপেক্ষাকৃত স্থির। সোনার মূল্য ধাতু হিসাবে অর্থাৎ ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন অনুসারে বাজারে যেরূপ কেনাবেচা হয়—মুদ্রা হিসাবেও সেইরূপ হইবার কথা। মুদ্রা তৈয়ারী করিতে অর্থাৎ ছাপ ইত্যাদি দিবার জন্য যাহা খরচ হয় তাহার হিসাব কেবল ধরিয়া লইতে হয়। ইংলণ্ডে 'সভরেন' ১১৩'০০১৬ গ্রেন সোনা দিয়া তৈয়ারী হইত; আমেরিকাতে 'ডলার' ২৩'২২ গ্রেন সোনা দিয়া তৈয়ারী হইত। ঐ ঐ পরিমাণ সোনার মূল্য বাজারেও ঐ দরে চলিত হইবার কথা—কেবলমাত্র খরচার জন্য 'Brassage' মূল্যের তফাৎ হইতে পারিত।

আমেরিকার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ আরভিং ফিশার ঠিক করিয়াছিলেন যে সাধারণতঃ—যেমন মুদ্রার পরিমাণ (ওজন) আমরা হ্রাস বৃদ্ধি করি না অপর পক্ষে জিনিষপত্রের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি সহিয়া যায় অর্থনৈতিক স্থৈর্য্যের (stability) জন্য জিনিষপত্রের দাম মুদ্রার পরিমাণ অনুযায়ী কমি বেশী না হইয়া সেই পরিমাণে মুদ্রার ওজনের বেশী কমি করা দরকার। জিনিষপত্রের দাম সাধারণতঃ যদি শতকরা ১০% কমে তাহা হইলে মুদ্রার ওজন ১০% কমাইতে হইবে, জিনিষপত্রের দাম যদি ১০% বাড়ে তাহা হইলে মুদ্রার ওজনও সেই পরিমাণে বাড়াইতে হইবে। এক ক্ষেত্রে মুদ্রার সংখ্যা (Quantity) বাড়িবে, অপর ক্ষেত্রে তাহা কমিবে। ধরা যাক আমেরিকায় ১০% জিনিষপত্রের দাম কমিল তাহা হইলে পূর্ব্বের আমেরিকার ডলার অনুসারে তাহার ওজন ২'৩২২ গ্রেণ কমাইতে হইত এবং মুদ্রার পরিমাণও সেই অনুসারে বাড়িত।

অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক সূত্রানুসারে উহাকেই মুদ্রামূল্যাবনতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু আর এক অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়। যখন দেশে মুদ্রাস্ফীতি খুব হয়—মুদ্রার মূল্য খুবই কমিয়া যায়—তখন স্বর্ণমান (বা কোনও ধাতু মান) পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা দরকার হইয়া থাকে। নতুবা কি বৈদেশিক বাণিজ্যে অথবা কি স্বদেশীয় চুক্তিমূলক বা অন্য রূপ আদান প্রদানে ভীষণ বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য ও স্বদেশীয়—সামাজিক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্বর্ণমান সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মুদ্রামূল্যাবনতি দরকার হয়। ফ্রান্সে ও ইউরোপীয় কোনও কোনও দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা গেল সেখানকার মুদ্রার মূল্য খুবই কম হইয়া গিয়াছে। তখন বহুদেশে স্বর্ণের ওজন মুদ্রাতে সেই পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইল। সম্প্রতি ফ্রান্সে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হইল এবং অবাধ স্বর্ণপ্রচলন ও স্বর্ণ মুদ্রণের ব্যবস্থার কথায় মনে হয় স্বর্ণমানও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে।

এইরূপ কেন করা হয় তাহার অন্তর্নিহিত অর্থ জানিতে হইলে মুদ্রার বিষয়ে অনেক কথা জানা দরকার। বহু প্রাচীন প্রথা অনুসারে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলনের বিষয় প্রথমেই বলা হইয়াছে। এই প্রথা ঠিক মত রাখিতে হইলে সকল রকমের মুদ্রার পরিমাণ নিয়মিত ও বিধিবদ্ধ করা দরকার। এখন প্রায় সকল দেশেই ব্যাঙ্কে যে সকল চলতি (Deposits) হিসাব থাকে এবং ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া 'নোট' (Notes) যাহা টাকা হিসাবে বাহির করা হয়—তাহাও মুদ্রারই রূপান্তর। নোট ভাঙ্গাইয়া মুদ্রা সকল সময়ই পাওয়া যায়। যদি নোট প্রচুর পরিমাণে বাহির করা হয় তাহা হইলে সাধারণতঃ মোটামুটি হিসাব অনুসারে 'টাকার' সংখ্যা বেশী হইল সুতরাং জিনিষের মূল্য বাড়িল। তাহা হইলে 'সোনা'র মূল্যও সেই অনুসারে বাড়িল। অর্থাৎ মুদ্রা হিসাবে 'সোনা'র মূল্যে ও 'জিনিষ' হিসাবে 'সোনা'র মূল্যে তফাৎ হইল। 'জিনিষ' হিসাবে 'সোনা'র মূল্য বেশী হইলে যে সমস্ত মুদ্রা সোনার থাকিবে তাহা লোকে গলাইয়া ফেলিয়া 'জিনিষ' হিসাবে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে অর্থাৎ তখন স্বর্ণমান আর থাকিবে না।* সেইজন্য এখন প্রায় সকল রকমের স্বর্ণমান বিধিবদ্ধ বা নিয়মিত হইয়া থাকে যাহাতে মুদ্রার মূল্য ও মুদ্রার ধাতুর মূল্য একই হয়। এই যে বিধিবদ্ধ মুদ্রামান তাহার উদ্দেশ্য কি—বৈজ্ঞানিকভাবে জানা দরকার। যদিও সাধারণতঃ—প্রতীয়মান হইতে না পারে, কিন্তু সামাজিক কল্যাণের জন্য মুদ্রামান যাহাতে দেশের (বার্ষিক) আয় ঠিক-

* দেশের জিনিষের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় আমদানী বেশী হওয়া সম্ভব এবং তাহার মূল্য দিবার জন্য 'সোনা' পাঠাইতে হওয়ায় দেশ হইতে 'সোনা' চলিয়া যাইতে পারে।

মত উৎপাদনে, বিভাজনে ও হিতসাধনে প্রয়োজিত হয় তাহা দেখা দরকার। এখন মনে হইতে পারে যে মুদ্রামানের দ্বারা তাহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে ?

বিস্তৃত ভাবে ইহার আলোচনা না করিয়া দুই-একটা উদাহরণ দ্বারা ইহার অর্থ সম্যক্ প্রকাশ করা যাইতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি নানাপ্রকারের হইতে পারে। সাধারণতঃ জিনিষের মূল্য যখন সাধারণ ভাবে বাড়িয়া যায় তখনই আমরা মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে বলিয়া থাকি। যখন এইরূপ অবস্থা হয় তখন সাধারণতঃ দরিদ্র ও বৃত্তিভোগীদের ধন ধনীদের নিকট ও কর্ম্মীদের (active classes) নিকট পক্ষান্তরিত হইয়া থাকে। ধনীরা 'জিনিষ'-পত্র তৈয়ারী করাইয়া থাকেন, তাহার মূল্য বেশী হওয়ায় আরও প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী করিবার চেষ্টা ও ইচ্ছা হয়—এই 'জিনিষ'-পত্রগুলি (consumption articles) সাধারণ লোকে কিনিয়া থাকে, তাহাদের আয়, মাহিনা ইত্যাদি সেই পরিমাণে বাড়ে না, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা আয়ের বেশী অংশ খরচ করিতে হয় ; ফলে ধনীরা লাভবান হয় এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুদ্রামানের দ্বারা সামাজিক কল্যাণ যাহাতে সাধিত হয় সেইটাই সমাজের বেশী দেখা দরকার ইহাই এখনকার মত। যখন সমাজ-কল্যাণও সাধিত হয় এবং মুদ্রামূল্যের স্থৈর্য্যও থাকে তখন সকল দিকেই সুবিধা কিন্তু দুইটির মধ্যে কোন্‌টি পছন্দ করা উচিত এই লইয়া যখন সমস্যা উদ্ভূত হয় তখন মুদ্রামূল্যের স্থৈর্য্য অপেক্ষা সমাজ হিতসাধনই বেশী প্রয়োজনীয় ধরা হয়। এই রকম বিবেচনা করিবার নানারূপ ক্ষেত্র উপস্থিত হইতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে আমরা যেরূপ স্থৈর্য্যের কথা বলিলাম ঐরূপই হইয়া থাকিত। কিন্তু ক্রমশঃ অধিকাংশ দেশেই মুদ্রাস্ফীতি বা অন্য নানাকারণ উপস্থিত হওয়ায় সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ মুদ্রামানের ক্ষেত্র তৈয়ারী হইল। সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ মুদ্রামান অনুসারে কোনও ধাতব মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণ 'কাগজ টাকা' (ব্যাঙ্ক-এর আমানত টাকা ও নোট প্রভৃতি) দ্বারা সমস্ত কার্য্যাদি হইয়া থাকে, অবশ্য 'মুদ্রার' নামটি পূর্ব্বের ন্যায় রাখিয়া দেওয়া হয় (Money of account)। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেট ব্রিটেনে ধাতবমুদ্রা রহিত করিয়া দেওয়া হয় কিন্তু 'মুদ্রা'র নাম 'পাউণ্ড-ষ্টার্লিং' রাখিয়া দেওয়া হইল। ১৯৩৫ সালে যে সমস্ত দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তাহারা স্বর্ণমুদ্রার মূল্য ঠিক রাখিবার চেষ্টায় দেখিলেন ১৯২৬ সালে জিনিষপত্রের যাহা দাম ছিল তাহা অপেক্ষা প্রায় শতকরা ৫ ভাগ জিনিষপত্রের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। মোটামুটি হিসাবে ধরা যায়—সম্ভবতঃ জিনিষপত্রের উৎপাদন খুব বেশী হইয়াছিল অপর পক্ষে উপার্জ্জন বা ব্যক্তিগত আয় সমষ্টি অথবা মুদ্রার পরিমাণ সেইরূপ ভাবে বাড়ান সম্ভব হয় নাই। অপর পক্ষে গ্রেটব্রিটেন স্বর্ণমুদ্রার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করায় কেবল 'কাগজ-টাকা'র দ্বারা ব্যবস্থা করায় সেখানে জিনিষপত্রের দাম বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। আমেরিকাতে ক্রমশঃ অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। সেখানেও দেখা গেল জিনিষপত্রের দাম কমিয়া যাইতেছে। 'সোনা'র দাম জিনিষ-হিসাবে যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে মুদ্রা হিসাবে তাহার চাহিদা বেশী হইবে, যথেষ্ট সরবরাহ হইলে মোটের উপর ঠিক অবস্থা হইয়া যাইবে। কিন্তু 'সোনা'র যদি যথেষ্ট সরবরাহ না হয়—এবং যে পরিমাণ 'টাকা' দরকার তাহা না পাওয়া যায়—তাহা হইলে আপনাআপনি টাকার এই মূল্য নিরূপণ ব্যবস্থা বাতিল হইয়া যায়। সেখানেও (আমেরিকাতেও) ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে স্বর্ণমাণ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল এবং 'কাগজ-টাকার' উপর নির্ভর করায় জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া গেল। এইরূপ অবস্থা কিন্তু বেশী দিন রাখা হইল না—১৯৩৪ সালে একটি আইন করা হইল। এই আইন অনুসারে 'ডলার'-এর ওজন কমাইয়া দেওয়া হইল। পূর্ব্বে ১ আউন্স সোনায় ২৫ ডলার হইত, এই আইনে ৩৫ ডলার হইল ; পূর্ব্বে ১ ডলারে ২৫·৮ গ্রেন* সোনা থাকিত, এখন সেস্থলে ১৫·২৩ গ্রেন সোনা দেওয়া হইল। 'মুদ্রা'র মূল্য কমিল সোনার মূল্য বাড়িল। বাহিরের সাধারণ মূল্যের সহিত 'মুদ্রা'র মূল্যের সামঞ্জস্য করা হইল। মুদ্রার ওজনের ও মূল্যের অবনতি হইল। সাধারণ স্বর্ণমান হইতে ইহা অনেকটা পৃথক। ইহাকে বলা হয় Gold value standard অথবা স্বর্ণমূল্যানুযায়ী মান।

ফ্রান্সে যে মুদ্রামূল্যাবনতি হইল তাহা জানিতে হইলে আরও কিছু বলিতে হইবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সুইডেনের অধ্যাপক ক্যাসেল আন্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময় দর সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য প্রকাশ করেন। ইহার পূর্ব্বে এই দর সম্বন্ধে বিশেষ কঠিন কিছু সমস্যা ছিল না। ইংলণ্ডে একটি 'সভারেন'-এ ১১৩·০০১৬ গ্রেন সোনা থাকিত ; আমেরিকাতে একটি ডলারে ২৩·২২ গ্রেন সোনা থাকিত সুতরাং একটি ডলারের সহিত সভারেনের ২৩·২২ / ১১৩·০০১৬ বিনিময়মূল্য ছিল। অর্থাৎ ১ পাউণ্ড ষ্টার্লিং-এ ৪·৮৬৬৫৬ 'ডলার' পাওয়া যাইত। সেই অনুসারে জিনিষ-পত্র দুই দেশে কেনাবেচা চলিত, কেবল সোনা পাঠাইবার খরচের জন্য সামান্য দরের কম বেশী হইতে পারিত। বিধিবদ্ধ মুদ্রামান হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রার সহিত দেশের চলিত মুদ্রার কোনও সম্বন্ধ না থাকিতে পারিত। এই বিধিবদ্ধ মুদ্রামান অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশের জিনিষপত্রের মূল্যের সহিত জড়িত থাকিত।

* ২৩·২২গ্রেন খাঁটি সোনার সমান।

ইহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইলে আরও সুবিধা হইবে। সাধারণ জিনিষপত্রের দাম কমিল না বাড়িল জানিবার নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে। এখন মোটের উপর Index number (weighted) অর্থাৎ শতকরা সাধারণ জিনিষ-পত্রের দরকার অনুসারে দাম কম-বেশী নিরূপণ উপায়টি ঠিক বলিয়া ধরা হয়। ডাল, চাল, আটা প্রভৃতি দ্রব্য সাধারণ লোকেরা ক্রয় করিয়া থাকে—এখন বিলাসদ্রব্যও অনেকে ক্রয় করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং বিলাসদ্রব্য যেখানে ১, অন্যান্য দ্রব্য সেখানে ২ ধরা যাইতে পারে।[১]

১৯২৬ সালে এইরূপ ভাবে ধরিয়া সাধারণ জিনিষপত্রের মূল্য ১০০ ধরা যাউক। ১৯৪৮ সালে ঐরূপ ভাবে দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করিয়া যদি দেখা যায় তাহা ১২৫ হইয়াছে তখন বলা যাইতে পারে সাধারণ দ্রব্যের মূল্য ২৫ ভাগ, অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা $\frac{১}{৪}$ বাড়িয়াছে।[২]

অধ্যাপক ক্যাসল বলেন যে দেশে যেরূপ দ্রব্যের সাধারণ মূল্য বাড়িবে কমিবে পূর্ব্বের তুলনামূলক বিদেশীয় মুদ্রা-বিনিময় হার সেইরূপ ভাবে কম-বেশী হইবে। ১৯১৪ সালে দ্রব্যের মূল্য যদি ১০০ ছিল ১৯২০ সালে আমেরিকায় তাহা ২২৬, গ্রেটব্রিটেনে ২৮২ এবং ১৯২৪ সালে আমেরিকায় তাহা ১৪৯ ও গ্রেট ব্রিটেনে তাহা ১৬৬ হইল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ১ পাউণ্ড ষ্টার্লিং সমান প্রায় ৪·৮৬...ডলার ছিল। এই নিয়ম অনুসারে তাহা হইলে ১৯২০ সালে ১ পাউণ্ড ষ্টার্লিং $= ৪·৮৬ \times \frac{২২৬}{২৮২}$ অর্থাৎ সম্ভবতঃ প্রায় ৩·৯...ডলার এবং ১৯২৪ সালে তাহা $\frac{১৪৯}{১৬৬} \times ৪·৮৬$...অর্থাৎ প্রায় সম্ভবতঃ ৪·৩৬...ডলার হইবে। অনেকে বলেন সাধারণতঃ এই নিয়মটিই প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে দেখা গিয়াছিল মুদ্রা-বিনিময় হার একটু তফাৎ হইয়াছিল। তাহার কারণ ধরা হয় যে অনেক ক্ষেত্রে অবাধ দ্রব্য-বিনিময় হয় না, quota system হইয়া থাকে এবং অযথা দ্রব্য বহন করায় খরচ বেশী পড়িয়া যায়।

যেখানে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে সেখানে স্বর্ণ দ্বারা মুদ্রা বিনিময় হার মোটের উপর বহাল থাকে। ধরা যাউক, আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে বেশী মাল রপ্তানী হইল। তাহা হইলে আমেরিকাতে ইংলণ্ড হইতে বেশী "মূল্য" দিতে হইবে। ইংলণ্ডের মুদ্রা আমেরিকায় প্রচলিত নয়, সুতরাং স্বর্ণ পাঠাইতে হয়। যদি স্বর্ণ পাঠাইবার দরকার হয় তাহা হইলে ডলার পাউণ্ড হারে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচ পর্য্যন্ত তফাৎ হইতে পারে।

১

জিনিষ	বার্ষিক খরচ (লক্ষ পাউণ্ড)	তুলনামূলক সংখ্যা
গম	৬০	৫
বার্লি	৩০	৫
মাংস	১০০	১০
দুগ্ধ প্রভৃতি	৬০	৭$\frac{১}{২}$
...		
...		
		মোট ১০০

Bowleyর পুস্তক দ্রষ্টব্য।

(অভিনব তুলনামূলক শতৈকিক সংখ্যা)

২ সাধারণ Index Number

	১৯১৪	শতৈকিক সংখ্যা	১৯৪৮	শতৈকিক সংখ্যা
চাউল (মণ)	৪৲	১০০	১৫৲	$\frac{১৫}{৪} \times ১০০ = ৩৭৫৲$
ডাল (মণ)	৫৲	১০০	২০৲	... ৪০০৲

শতৈকিক সংখ্যা $= \frac{২০০}{২}$ ... $= \frac{৭৭৫}{২}$

১৯১৪ = ১০০ ১৯৪৮ = ৩৮৭$\frac{১}{২}$

মন্তব্য :—৩ নং কলমে শতৈকিক সংখ্যা $\frac{২০০}{২}$ = ১০০ না ধরিয়া ১নং 'কলমে'র নিয়ম অনুসারে ভাগ করা যায়।

Weighted Index Number
প্রয়োজন মত তুলনামূলক শতৈকিক সংখ্যা

১৯১৪এ মূল্য ও শতৈকিক সংখ্যা (প্রয়োজন অনুসারে)	১৯৪৮এ মূল্য ও প্রয়োজন অনুসারে শতৈকিক সংখ্যা
চাউল—	
৪৲ × ৪০ কোটি মণ	১৫৲ × ৪৫ কোটি মণ
= ১৬০ কোটি টাকা	$১০০ \times \frac{৬৭৫}{১৬০}$
১০০	= ৪০৩
ডাল—	
৫৲ × ৮ কোটি মণ	২০৲ × ১২ কোটি মণ
= ৪০কোটি টাকা	$১০০ \times \frac{২৪০}{৪০}$
১০০	= ৬০০

শতৈকিক সংখ্যা

১৯১৪ $= \frac{২০০}{২}$ = ১০০ ১৯৪৮ $= \frac{১০০৩}{২}$ = ৫০০$\frac{১}{২}$

মন্তব্য :—

সাধারণ শতৈকিক সংখ্যা অনুসারে ১৯৪৮ সালে প্রায় ৪ গুণ বাড়িল কিন্তু প্রয়োজন ও সরবরাহমূলক তুলনায় প্রায় ৫ গুণ বাড়িল। দাম ইত্যাদি এখানে প্রায়ই কাল্পনিক।

সুবিধার জন্য বাছাই জিনিষের পাইকারী দর অথবা জীবিকা নির্ব্বাহের জিনিষের শতৈকিক সংখ্যা ধরা হয়।

১ পাউণ্ড ৪'৮৬ ডলার ছিল। ডলারের চাহিদার দরুন তাহা (পাউণ্ড) ৪'৮৭ ডলারে দাঁড়াইতে পারিত। তদপেক্ষা বেশী তফাৎ হইলে ইংলণ্ড হইতে "সোনা" পাঠাইবার খরচ পোষাইয়া যাইত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত "সোনা" পাঠান দরকার না হয় ব্যাঙ্কগুলি যোগান দিয়া থাকেন। সেইজন্য মুদ্রা বিনিময় হার তফাৎ হয়। "সোনা" পাঠাইয়া দেনা পরিশোধ করিতে হইলে মোটামুটি হিসাবে আমেরিকায় জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যাইত এবং ক্রমশঃ রপ্তানী কমিয়া যাইত—অর্থাৎ তাহার খাঁটী মুদ্রা বিনিময় হার বজায় থাকিত।

এখন বিধিবদ্ধ মুদ্রামানে এইরূপ স্বতঃই হার ঠিক করিবার কিছু উপায় রহিল না। সোনার অপব্যবহার দূর করিবার জন্য অনেক দিন হইতে নানা উপায় উদ্ভাবন করা হইতেছিল। তাহার মধ্যে 'Gold exchange managment' একটি। ধরা যাউক ক দেশ খ দেশকে জিনিষপত্র বেশী পাঠাইতেছে। তাহা হইলে খ দেশ হইতে ক দেশে সোনা পাঠাইতে হইত। এই উপায়ে খ দেশ ক দেশে তাহার নানারূপ গবর্ণমেণ্ট বা কোম্পানীর কাগজ (Securities) কিনিয়া রাখিয়া দিল। তাহাতে খ সুদ ইত্যাদি পাইতে লাগিল এবং ক দেশে জিনিষের মূল্যের দরুণ সোনা না পাঠাইয়া ঐ কাগজ হস্তান্তরিত করিতে লাগিল। ক দেশ যদি তাহাতে আপত্তি না করে তাহা হইলে সোনা না পাঠাইয়া আমদানী-রপ্তানী করার কোনও আপত্তি থাকে না। অনেক দেশই যদি এইরূপ সোনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায় তাহা হইলে সকলের আমদানী-রপ্তানীর ব্যবস্থা করার জন্য একটি সর্ব্বদেশীয় ব্যাঙ্ক (International Bank)* থাকা দরকার। তাহাতে স্ব স্ব দেশের নামে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্টের কাগজ (Goverment Paper and Securities) কেনা থাকিলে স্বর্ণমান না থাকিলেও আমদানী-রপ্তানীর মূল্য দেওয়ায় অসুবিধা হয় না। এইরূপ চেষ্টা আগে হইয়াছিল। কিন্তু কয়েকটি কারণে ইহা ভাঙ্গিয়া যায়। বিশেষতঃ ১৯২৮ সালে ফ্রান্স সোনা ছাড়া আর কিছু লইতে চায় নাই। সেইজন্য ইহারই রূপান্তর আর একটি ব্যবস্থা করা হইল। 'Sterling Area' বলিয়া কয়েকটি দেশের সমষ্টিগত একটি বাণিজ্যস্থান ঠিক হইল। গ্রেট ব্রিটেনের সাম্রাজ্য মধ্যে যতগুলি দেশ আছে সেইগুলি—কানাডা ছাড়া—এবং পর্টুগাল, নরওয়ে, সুইডেন, জাপান, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি কয়েকটি দেশ এই ব্যবস্থাতে যোগ দিল (১৯৩১)। পাউণ্ড-ষ্টার্লিং ঐ সময় স্বর্ণমান বিবর্জ্জিত হইল এবং বিধিবদ্ধ মুদ্রামানে পর্য্যবসিত হইল। অন্যান্য দেশগুলি যাহারা ইহার সহিত যোগ দিল তাহারাও সোনার সহিত সম্পর্ক রাখিল না গ্রেট-ব্রিটেনে ষ্টার্লিঙে গবর্ণমেণ্ট কাগজ ইত্যাদি কিনিয়া রাখিল এবং পরস্পরের আমদানী-রপ্তানীর দাম কাটাকাটি করিয়া ঐ কাগজ দিয়া শোধ করিতে আরম্ভ করিল।

এই রকম অবস্থাতেও যেরূপ মুদ্রা-বিনিময় হারের কথা বলা হইল সেইরূপ হার কার্য্যকরী হইতে পারে। ইহা স্বর্ণমানের ন্যায় স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ কোনও দেশের হার তাহার অনুকূল হইলে ক্রমশঃ সে দেশের দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়া যাইবে এবং ঐ হার আর অনুকূল না হইয়া প্রতিকূলগামী হইয়া পূর্ব্বহারে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু যখন কোনও দেশের মুদ্রামূল্য খুবই কমিয়া যায় এবং তাহার বিনিময় হার ঠিক রাখিবার জন্য যে কাগজ-টাকা বা সোনা রাখা দরকার তাহা না থাকে তখন এই বিনিময় হারের কোনও বাধ্যবাধকতা থাকে না এবং কপিধ্বজবিহীন পার্থের রথের ন্যায় যথেচ্ছ ছুটিয়া চলে এবং কোনও মানাই মানে না। বলা বাহুল্য এ ক্ষেত্রে অন্তর্জাতীয় কাজকর্ম্ম বা আমদানী রপ্তানী করা অতীব দুরূহ হইয়া দাঁড়ায়।

সুতরাং স্বর্ণমান বা বিধিবদ্ধ স্বর্ণমান স্থির করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। স্বর্ণমান ঠিক করিতে হইলে পুরানো দর ঠিক রাখার চেষ্টা বৃথা হইয়া থাকে। গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য অনেক দেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সম্ভব হয় নাই। মুদ্রার মূল্য খুবই কমিয়া যাওয়ায় মাহিনা ও অন্যান্য চুক্তিমূলক দেনা খুবই বেশী দরে স্থির হইয়া গিয়াছিল। ধরা যাক ১৯১৪ সালে যে মজুর দৈনিক ১ শিলিং লইত ১৯২৫ সালে সে হয়ত ২ শিলিং পাইত। ১৯২৫ সালে যদি চেষ্টা করা যায় যে শিলিঙের মূল্য পূর্ব্বের ন্যায় হইবে তাহা হইলে মজুরকেও ১ শিলিং লইতে হইত। কিন্তু তাহা কি হঠাৎ সম্ভব? সুতরাং স্বর্ণমানও বজায় রহিল, দেশের জিনিষপত্রের মূল্য ও মাহিনা ইত্যাদিও কমিল না, এইরূপ ব্যবস্থা মুদ্রামূল্যাবনতি দ্বারা করা হইয়া থাকে। মধ্য ইউরোপে মুদ্রামূল্যাবনতি অনেক দেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে মুদ্রার পরিমাণ বাড়ান হইল না কিন্তু মুদ্রার ওজন যে পরিমাণে মুদ্রার মূল্য হ্রাস হইয়াছিল সেই পরিমাণে করা হইল। তাহা হইলে সোনার মূল্য বাহিরে অর্থাৎ ব্যবহার্য্য দ্রব্য হিসাবে খুবই বেশী হইয়া গিয়াছিল এখন মুদ্রা হিসাবেও বেশী হইয়া গেল এবং তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করার সুবিধা হইল। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় হারও স্থিরীকৃত হইল, সেই

---

* ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাস হইতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (International Monetary Fund) নামে একটি প্রতিষ্ঠান কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কও (International Bank for Reconstruction and Development) গঠিত হইয়াছে। প্রথমটি 'টাকা' আগাম দেওয়া ইত্যাদি ব্যাঙ্কের ন্যায় কতকগুলি কার্য্য করিতে পারিবে।

অনুসারে আমদানী রপ্তানী করায় কোনও বাধা রহিল না। বর্ত্তমানে ফ্রান্সের কথা ধরা যাউক, নূতন যে আইন হইল তাহাতে ২১৪·৪ ফ্রাঙ্ক এক ডলারের সমান ধরা হইয়াছে, আগে ১১৯ ফ্রাঙ্ক এক ডলারের সমান ধরা হইয়াছিল।*

এখন প্রশ্ন হইতে পারে মুদ্রাস্ফীতির সময়ও মুদ্রামূল্যাবনতি করা হয় এবং মুদ্রাস্বল্পতার সময়ও (Deflation) মুদ্রামূল্যাবনতি করা হয় তাহা কিরূপে সম্ভব? উত্তর হইতেছে যে মুদ্রাস্বল্পতার সময় যে মুদ্রার মূল্যের অবনতি করা হয় তাহা একটি আদর্শের জন্য। তখন সমাজের অবস্থার অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক সামঞ্জস্য (equilibrium in social economy) অথবা দেশের আয়ের (বার্ষিক) উৎপাদন, বিভাজন ও হিতসাধনের যাহাতে সম্পূর্ণ উৎকর্ষ হয় তাহার জন্য সৃষ্টি করা হয়। ইহাতে সোনার মূল্য বৃদ্ধি করা হয়, মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হয় এবং পরিমাণের উন্নতি করা হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় যে মুদ্রার মূল্যের অবনতি করা হয় তাহা সে রকম আদর্শানুযায়ী নহে। যাহা চলিতেছে তাহাই চলুক হঠাৎ সমস্ত ওলট্‌পালট্ না হইয়া যায় তাহারই জন্য। এক্ষেত্রে মুদ্রার সংখ্যা অথবা সাধারণ জিনিষপত্রের মূল্যের কোনও কমি বেশী করা হইল না।

* যদিও আগে বলা হইয়াছে যে সম্ভবতঃ স্বর্ণমানে ফিরিয়া যাইবার জন্য এইরূপ মুদ্রামূল্যাবনতির চেষ্টা করা হইয়াছে তথাপি আমার ধারণা বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময়ের হারের স্থৈর্য্যের জন্যও এইরূপ করা সম্ভব হইতে পারে। যেখানে কেবল বিধিবদ্ধ মুদ্রামান প্রচলিত সেখানে যদি কোনও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক থাকে অথবা পূর্ব্ব কথিত ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে মুদ্রাবিনিময়ের হার সাধারণ মূল্যের আপেক্ষিক সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিতে পারে (relative price level) কিন্তু হার ঠিক রাখিবার জন্য যথেষ্ট কাগজ-পত্র বা "টাকা" না থাকিলে চেষ্টা করা বৃথা বিশেষতঃ মুদ্রা-মূল্য ক্রমশঃই কমিতে থাকিলে হার যে কোথায় দাঁড়াইবে কেহ বলিতে পারে না। যদি সাধারণ মূল্য (price level) কেবল বদ্‌লাইয়া না যায় তাহা হইলে মুদ্রাবিনিময় হারের কিছু ইতরবিশেষ (foreign exchange method) করিলেই মোটের উপর ঠিক হইয়া যায় কিন্তু যেখানে সাধারণ মূল্য কেবলই বদ্‌লাইয়া যাইতেছে সেখানে বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় হার আইন দ্বারা ঠিক করিয়া পরে সেই অনুসারে মুদ্রাসংখ্যার ব্যবস্থা ব্যাঙ্কের সুদের (Bank rate method) দ্বারা ঠিক করাই সুবিধা। সুতরাং অন্য দেশের মুদ্রার মূল্যের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া দেশের মুদ্রার মূল্য কমাইলেও তাহাকে মুদ্রামূল্যাবনতি বলা যাইতে পারে।

এই প্রবন্ধটি রচনা করিবার জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকাদির সাহায্য লওয়া হইয়াছে,—

ক Keynes—Treatise on money.

খ Bernstein—Money and the Economic System.

গ Smith—Economics.

ঘ Taussig—Principles of Economics, vol 1.

ঙ League of Nations publication—International Currency Experience.

চ Statesman, Eastern Economist প্রভৃতি সংবাদ-পত্রাদি।

ছ Bowley—Elements of Statistics.

জ S. K. Basu.—Recent Banking Developments

ভারতে রেশমশিল্প

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

গুটিপোকা নামে এক জাতীয় কীটের দেহনির্গত লালা হইতে রেশম পাওয়া যায়। ইহারা নিশাচর 'মথ'। এক একটি 'মথ' একবারে হাজার হাজার ডিম্ব প্রসব করে; দশ হইতে বার দিনের মধ্যে ডিম্ব কাটিয়া শুঁয়াপোকা বাহির হয়। এই অবস্থায় ইহাদিগকে বলা হয় পলু। এই বাচ্চাগুলি বেজায় পেটুক এবং মাসখানেক ধরিয়া নানা প্রকার বৃক্ষের পাতা আহার করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহারা তৎপর খাদ্য বন্ধ করিয়া মুখ হইতে লালা নিঃসরণপূর্ব্বক নিজ নিজ অঙ্গের চতুর্দ্দিকে যে আবরণের সৃষ্টি করে তাহাকে বলা হয় গুটী। তিন-চারি দিনের মধ্যে এই গুটী একটি পাতি লেবুর আকার প্রাপ্ত হয়। এই সময় উক্ত কীট গুটীর ভিতরে পলু হইতে পিউপা এবং পিউপা হইতে প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয় এবং গুটীর একটি দিক কাটিয়া বহির্গত হইয়া থাকে। একটি গুটি হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ২০০ হইতে ১,২০০ গজ দীর্ঘ রেশম-সুতা পাওয়া যাইতে পারে। কোন কোন প্রকার রেশম অবিচ্ছিন্ন নহে। উহা হইতে উপযুক্ত যন্ত্র-সাহায্যে তুলা, পাট প্রভৃতির ন্যায় পিঁজিয়া সুতা বাহির করা হয়।

রেশমশিল্পকে প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—প্রথম অংশ হইল, রেশম-গুটী উৎপাদন করা। ডিম্ব হইতে সুস্থ ও সবল কীট উৎপাদনপূর্ব্বক উপযুক্ত খাদ্য-

দানে তাহাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া গুটী তৈয়ারী করা পর্য্যন্ত এই অংশের অন্তর্ভুক্ত। এই গুটীগুলি ক্রয় করিয়া গুটী হইতে সুতা বাহির করা, সুতাকাটা যন্ত্রসাহায্যে খারাপ রেশম (অর্থাৎ যে রেশম অবিচ্ছিন্ন নহে) হইতে সুতাকাটা প্রভৃতি পদ্ধতিগুলি দ্বিতীয় পর্য্যায়ভুক্ত। পূর্ব্বে অবশ্য অবিচ্ছিন্ন রেশম ব্যতীত অন্য জাতীয় রেশম বিশেষ কোন কাজে লাগান সম্ভব হইত না, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুলা, পাট প্রভৃতির ন্যায় রেশম হইতে সুতা কাটিবার যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ব্যবসায়ের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। রেশম-শিল্পের তৃতীয় অংশ হইল, সুতা হইতে বস্ত্রবয়ন ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি তৈয়ারী এবং আনুষঙ্গিক কার্য্যাদি। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, রেশমশিল্পের এই তিনটি বিভিন্ন অংশ, একে অন্যের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পুরনো আমলে এই তিনটি অংশই কুটিরশিল্প হিসাবে একই শ্রেণীর লোকদ্বারা পরিচালিত হইত। রেশম ব্যবসায়ের প্রথম অংশকে বলা হয় সেরিকালচার (sericulture), প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের সম্মিলিত নাম কাঁচা রেশম শিল্প, এবং তিনটি অংশের একত্রিত নাম রেশম-শিল্প।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার কীট কর্ত্তৃক চারি প্রকার রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে :—১। তুঁত রেশম—এক কথায় ইহাকেই রেশম বলা হয়। তুঁত গাছের পাতা খাইয়া এই জাতীয় কীট জীবন ধারণ করে; ২। এঁড়ি রেশম—এই কীটগুলি এরণ্ড গাছের পাতা খায়; ৩। মুগা রেশম—এই জাতীয় কীটের খাদ্য হইল শাম ও হুয়ালু গাছের পাতা ৪। তসর রেশম—এই কীট আসান, শাল, অর্জ্জুন ও অন্যান্য বন্য বৃক্ষের পাতা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে।

উপরোক্ত চারি প্রকার রেশমের মধ্যে প্রথম দুই প্রকারের কীটকে সেবাযত্ন দ্বারা গৃহে প্রতিপালন করা যায়; কিন্তু অন্য দুই প্রকার রেশমকীট বনে জঙ্গলে স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইহারা মানুষের আয়ত্তের বাহিরে এবং এই উপায়ে রেশম যাহা পাওয়া যায় তাহা উন্নত ধরণের নহে। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার রেশম অবিচ্ছিন্ন সুতার আকারে পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার রেশম হইতে যন্ত্রসাহায্যে সুতা কাটা হইয়া থাকে। জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, তুঁত রেশমই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রেশম এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইহার উৎপাদন ইত্যাদি নানা দিক দিয়া যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতিসাধন করাও সম্ভব হইয়াছে। কাজেই জগতের রেশমশিল্পের ব্যবসা-ক্ষেত্রে তুঁত রেশমই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে এবং রেশমশিল্প বলিতে এক কথায় আমরা তুঁত রেশম শিল্পই বুঝিয়া থাকি।

বিভিন্ন প্রকার রেশম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্নভাবে নিম্নে আলোচনা করা হইতেছে।

তুঁত রেশম

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কম বেশী তুঁত রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে জাপানই এই শিল্পে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী; ১৯৩৪ সালে বিভিন্ন দেশ হইতে কাঁচা রেশম রপ্তানীর পরিমাণ নিম্নের তালিকা হইতে সুস্পষ্ট হইবে।

দেশের নাম	শতকরা পরিমাণ
জাপান	৮২'৩
চীন	১১'০
ইটালী	৪'৯
ফ্রান্স	০'১
স্পেন	০'১
তুরস্ক, সিরিয়া প্রভৃতি	১'৬

এই বৎসর ভারতবর্ষে মোট ২,৫০০,০০০ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা হইতে বিদেশে কিছু রপ্তানী হয় নাই। অথচ ১৮৬০ সালে শুধু বঙ্গদেশ হইতেই প্রায় ১,৬০০,০০০ পাউণ্ড কাঁচা রেশম বিদেশে গিয়াছিল; কিন্তু জগতের রেশমের বাজারে জাপানী রেশমের আবির্ভাবই হইল রেশমশিল্পে বাংলার চরম অবনতির কারণ। অতি অল্পদিনের মধ্যেই অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া জাপান রেশমশিল্প জগতের মধ্যে শীর্ষ স্থান লাভ করিয়াছে। ১৯২৯ সনে জাপানে যে কাঁচা রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার দাম ছিল ৭০০,০০০,০০০ ইয়েন (প্রায় ১১০ কোটি টাকা) এবং উৎপন্ন রেশমজাত দ্রব্যের মূল্য ছিল ২০০,০০০,০০০ ইয়েন (৩২'৫ কোটি টাকা)।

প্রগতিশীল এবং আধুনিক বিজ্ঞানে উন্নত কতকগুলি দেশ জাপান হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা রেশম ক্রয় করে বলিয়াই জাপান রেশমশিল্পে এতাদৃশ সাফল্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৩৪ সনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জাপানে উৎপন্ন রেশমের প্রায় শতকরা ৮২ ভাগ ক্রয় করিয়াছে, ১৯২৯ সনে কিনিয়াছে শতকরা ৯৭ ভাগ। মাল ক্রয় করিবার পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত যন্ত্রাদি সাহায্যে ইহারা রেশমের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া থাকে, কাজেই জাপানকে উৎকৃষ্টতর রেশম সরবরাহের জন্য যত্নবান হইতে হয়। রেশমশিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারে নাই বলিয়াই বাংলাদেশ আজ রেশম-শিল্পের চরম অবনতি হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে মহীশূর, মাদ্রাজ, বাংলা, কাশ্মীর ও জম্মু এই কয়টি অঞ্চলই তুঁত রেশমশিল্পে অগ্রণী। পঞ্জাব এবং আসামেও অল্প পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত বিহার, বোম্বাই, রাজপুতানা এবং মধ্যপ্রদেশে রেশম-উৎপাদন প্রচেষ্টা চলিতেছে। এক সময় বাংলার ছাব্বিশটি জেলায়ই গুটিপোকার চাষ হইত কিন্তু ১৯৩০ সনের কাছাকাছি সময়ে মাত্র তিনটি জেলায় অল্প পরিমাণে রেশম উৎপাদন করা হইয়াছে। প্রথম

মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে মহীশূর রাজ্যে ৫৫,০০০ একর জমিতে তুঁতগাছের চাষ হইত।

আসাম, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম প্রভৃতি স্থানে অভাবধি প্রাচীন পদ্ধতিতে গৃহস্থেরা অল্প পরিমাণে গুটীপোকার চাষ করে এবং গুটি তৈয়ারী হইলে তাহা হইতে সূতা বাহির করিয়া দেশী তাঁতের সাহায্যে এক প্রকার মোটা বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। বাংলা, মহীশূর ও মাদ্রাজে সূক্ষ্ম সূতা কাটিবার যন্ত্রাদি প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, বাংলা তথা ভারতের রেশমী সূতা বা বস্ত্র জাপানের রেশমী সূতা ও কাপড় অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। জাপানে সরকারী পরীক্ষণাগারে বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত রেশম-কীটের ডিম্ব সরকার-মনোনীত ব্যক্তিদের কাছে বিক্রয় করা হয়। কারণ রেশমশিল্পের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে রেশম-কীটের সুস্থ ও সবল ডিম্ব উৎপাদনের উপর। জাপানে সরকারী তত্ত্বাবধানে ডিম্ব হইতে মথ উৎপন্ন করা হয় এবং তাহা হইতে যে ডিম্ব পাওয়া যায় তাহাই সাধারণ লোকেরা ক্রয় করিতে পারে। যদি এই ডিম্বগুলি সরকারী পরীক্ষণাগারে দোষযুক্ত বলিয়া অমনোনীত হয় তবে তাহা দ্বারা রেশম উৎপাদন করানো আইনসঙ্গত নহে। জাপানে সরকারী সাহায্য-নিরপেক্ষ ভাবে গুটি উৎপাদন আইন দ্বারা রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফ্রান্স এবং ইটালীতেও বীজকীট উৎপাদন সরকারের তত্ত্বাবধানে হইয়া থাকে। কারণ উৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ ডিম্ব হইতেই উৎকৃষ্ট রেশম আশা করা যায়।

গুটী তৈয়ারী হইলে কীটগুলি যথাসময়ে তাহা কাটিয়া বহির্গত হয়; কিন্তু ইহাতে অবিচ্ছিন্ন সূতা পাওয়া যায় না। সেইজন্য কীটগুলিকে, গুটী কাটিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ পিউপা অবস্থায় মারিয়া ফেলা হয়। এই প্রক্রিয়ার নিমিত্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত আছে। তবে বর্ত্তমান কালে প্রায় সর্ব্বত্রই সূর্য্যের উত্তাপ বা উত্তপ্ত বাষ্প-সাহায্যে দম বন্ধ করিয়া পিউপাগুলিকে ধ্বংস করা হয়। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা সময় লাগে। মৃত পিউপাগুলি দ্বারা রেশমগুটীর যাহাতে কোন ক্ষতি সাধিত না হয় তজ্জন্য আট হইতে ষোল ঘণ্টার মধ্যে মধ্যে গুটীসমূহকে উত্তমরূপে শুকাইয়া লইতে হয়। এর পর গুটীগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত গুদাম ঘরে জমা করার পর বিভিন্ন ওজনের গুটীসমূহকে পৃথক করিয়া এক এক জায়গায় রাখা হয়। ইহাতে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ধরণের সূতার মধ্যে একটা মোটামুটি পার্থক্য সহজে বুঝা যায়। তৎপর 'রিলিং বেসিন' নামক পাত্রে গুটীগুলি ফুটাইয়া ব্রাশ দ্বারা থেঁতলাইয়া দিতে হয় এবং যে পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সূতা না পাওয়া যায় সেই পর্য্যন্ত রেশম বাদ দিতে হয়। সূতা জড়ান হইয়া গেলে সূতার গুণাগুণ লক্ষ্য করা অধিকতর সহজ; একন্ত জাপানে জড়ান সূতা পুনরায় জড়াইয়া লওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এখন নাটাই হইতে সূতা বাহির করিয়া অল্প পাক দিয়া ফেটিবদ্ধ করা হয়; প্রতি ফেটিতে প্রায় ২.৪ আউন্স রেশম থাকে, প্রতি বেলে রেশম থাকে ১৩৩.৩ পাউণ্ড।

ডিম্বের নিমিত্ত যে সমস্ত কীটকে প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হইতে দেওয়া হয় সেই সমস্ত কীটের গুটী, রেশম জড়াইবার সময়ে পরিত্যক্ত অংশ এবং ইঁদুর, পিপীলিকা, পরপিণ্ডোপ-জীবী কীটপতঙ্গাদি কর্ত্তৃক নষ্ট গুটীর রেশমও নানা কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাংলাদেশে তকলী বা টাকুর সাহায্যে এই গুটীগুলি হইতে কিঞ্চিৎ মোটা সূতা তৈয়ারি হইয়া থাকে। এই সমস্ত রেশম হইতে যে বস্ত্র বয়ন করা হয় তাহা আমাদের কাছে মটকা নামে পরিচিত। কাশ্মীর, মহীশূর প্রভৃতি স্থান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উপরোক্ত প্রকারের রেশমগুটী বাংলা-দেশে আমদানী হইয়া থাকে। হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, বাংলাদেশে প্রায় ১৫,০০০ জন স্ত্রীলোক এই জাতীয় রেশমগুটী হইতে সূতা কাটিয়া থাকে। মহীশূর স্পান্ সিল্ক মিলস্ লিমিটেড ও জয়া স্পান্ সিল্ক মিলস্ লিমিটেড যন্ত্রসাহায্যে পরিত্যক্ত রেশমগুটী হইতে সূতা তৈয়ারী করে।

দেখা যাইতেছে, রেশম-শিল্পের প্রথম অংশ বা সেরিকাল-চার চাষীদের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। তদ্ব্যতীত কাঁচা রেশমগুটীর মূল্য বিশেষ ভাবে উঠা-নামা করে বলিয়া চাষীদের পক্ষে অন্যান্য কৃষির সঙ্গে রেশমের চাষ করা বিশেষ সুবিধা-জনক। ভারতবর্ষের মত গ্রীষ্মপ্রধান সমতল দেশে বৎসরে সাত-আট বার পর্য্যন্ত রেশমের চাষ করা সম্ভব, কারণ তুঁতগাছে পাতা প্রচুর পরিমাণে থাকিলে একবারের মত রেশমের চাষ করিতে সময় লাগে মাত্র এক হইতে দেড় মাস। গুটী তৈয়ারী হইলে চাষীরা সঙ্গে সঙ্গেই উহা বিক্রয় করিয়া দেয়, কাজেই উহারা নগদ অর্থ লাভে বঞ্চিত হয় না। তবে শুধু রেশম-চাষের জন্যই রেশমচাষ অনেক দেশেই হইয়া থাকে। বাংলা-দেশে এমন পরিবারও ছিল যাহারা একই সময় প্রায় দুই হাজার পাউণ্ড রেশমগুটী উৎপন্ন করিত। প্রমাণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রেশমশিল্পের চরম উন্নতির সময় বাংলাদেশে এইরূপ পরিবার ছিল প্রায় ছয় হাজার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে, দেশে যদি গুটী হইতে সূতা বাহির করিবার উন্নত প্রণালীর প্রচলন ও ব্যাপক বন্দোবস্ত না থাকে তবে রেশমকীট ও গুটী উৎপন্ন করা লাভজনক নহে। বাংলার রেশমশিল্পের অবনতির ইহাও একটি কারণ।

রেশমকীটের চাষ করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তন্মধ্যে দেশের আবহাওয়া, কীটের শ্রেণীভেদ, কীটের খাদ্য, দেশের সরকারের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৭০ হইতে ৮০ ডিগ্রী ফারেনহিট উত্তাপ সকল অবস্থায়ই কীটের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। বায়ুমণ্ডলে

জলীয় বাষ্প হ্রাস প্রাপ্ত হইলে তুঁতগাছের পাতা শুষ্ক হইয়া যায়, ফলে কীটের পক্ষে আশানুরূপ খাদ্য পাওয়া কষ্টকর হইয়া ওঠে। অন্য পক্ষে জলীয় বাষ্পের আধিক্য হইলে কীটগুলি খুব মোটা হইয়া যায় এবং রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সেইজন্য বর্ষা ঋতু কীটের পক্ষে অতি দুঃসময়। বাংলাদেশে অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসই কীট-উৎপাদনের প্রশস্ত সময়।

রেশমগুটী সাধারণতঃ দুই প্রকার। এক প্রকার কীট বৎসরে একবার ডিম্ব প্রসব করে; ইহাদের বলা হয় ইউ-নিভোল্ট। দ্বিতীয় প্রকার কীট বৎসরে বহুবার ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, ইহাদের মাল্‌টিভোল্ট বলা হয়। দক্ষিণ-চীন, ইন্দোচীন, শ্যাম, আসাম, মান্দ্রাজ, বাংলা এবং মহীশুরে মাল্‌টিভোল্ট কীটের চাষ হয়; কিন্তু জাপানে এবং আমাদের দেশের কাশ্মীর, জম্মু, পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে ইউনিভোল্ট কীট উৎপন্ন হইয়া থাকে। একবার প্রসবকারী কীটের রেশম নানা দিক দিয়া বহুবার প্রসবকারী কীটের রেশম অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। আসাম, বাংলা প্রভৃতি স্থানে যে গুটী উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে রেশম থাকে এক হইতে দেড় গ্রেন, কিন্তু জাপানী রেশমের প্রতিটি গুটী হইতে রেশম পাওয়া যায় প্রায় ৩ গ্রেণের উপর। তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইউনিভোল্ট কীটের চাষ ভাল হয় না, হইলেও উহারা ক্রমে ক্রমে মাল্‌টিভোল্ট কীটে পরিবর্তিত হইয়া যায়। আবার শীতপ্রধান দেশে মাল্‌টিভোল্ট কীটের চাষ করিতে গেলে উহারা ইউনিভোল্ট কীটে পরিণত হয়। তবে বর্ত্তমানকালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে এই অসুবিধা অনেকাংশে দূরীভূত হইয়াছে।

জাপানে প্রায় ৪০০ রকমের তুঁতগাছ আছে। উহার মধ্যে মাত্র নয় রকম তুঁতের পাতাই রেশমকীটের আহার্য্য। তুঁত বিরাট আকারে বা ঝোপবদ্ধ অবস্থায় জন্মে। বাংলা, মহীশূর, মান্দ্রাজে ঝোপ-আকারে এবং কাশ্মীর, জম্মু ও পঞ্জাবে বড় তুঁতগাছ জন্মান হইয়া থাকে। জাপানের অনুকরণে বাংলাদেশে সম্প্রতি বড় ঝোঁপের আকারে তুঁতগাছ উৎপন্ন করা হইতেছে। ইহাতে খরচ অল্প হয় এবং সময়ও লাগে কম। এক একর জমিতে ৩০০ তুঁতগাছের বড় ঝোপ জন্মাইলে উহা হইতে বৎসরে ১২,০০০ হইতে ১৫,০০০ পাউণ্ড পাতা পাওয়া যায়; উক্ত পরিমাণ ছোট ঝোপ হইতে পাতা মেলে ২০,০০০ হইতে ২৪,০০০ পাউণ্ড। সেরিকালচারে সাফল্য লাভ দেশের সরকারের দায়িত্ববোধের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। জাপান এই বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য। বাংলা ও মহীশূর সরকার এই বিষয়ে জনসাধারণকে যে সাহায্য প্রদান করিতেছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

রেশম গুটান হইলে উহা বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত গুদাম-ঘরে সঞ্চিত করিয়া রাখা দেশের সরকারের উচিত। কারণ সাধারণ লোকের নিকট মাল খরিদ করিলে ক্রেতাদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী এবং ইহাতে ব্যবসায়ের দুর্নাম হইয়া থাকে, যাহা কোন ব্যবসায়ের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নহে। জাপানে ইয়াকোহামা ও কোবে বন্দরে এতাদৃশ গুদাম অবস্থিত। কলিকাতায়ও এইরূপ গুদামঘর আছে।

দেখা যাইতেছে, সকল দেশে কাঁচা রেশম উৎপন্ন করা সম্ভব নহে বটে, কিন্তু রেশমের চাহিদা সর্ব্বত্রই কম-বেশী বর্ত্তমান। সুতরাং সরকারের আনুকূল্য লাভ করিলে উপযুক্ত গবেষণার ফলে আমাদের দেশেও রেশমশিল্পের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। জাপান রেশমশিল্পের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত গবেষণাদির যে-সকল ব্যবস্থা আছে তাহা অনুকরণীয়। ১৯২৯ সনে জাপানে শুধু রেশমচাষ শিক্ষা দিবার জন্য ১৬টি স্কুল ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য অনেকগুলি কলেজ বর্ত্তমান ছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে ২২৫টি স্কুলে রেশমের চাষ শিক্ষা দেওয়া হইত। টোকিও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি যে গবেষণা-কার্য্য চালায় তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে যে পরিমাণ কাঁচা রেশম নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় তাহার পরিমাণ গড়ে প্রায় ৪০,০০,০০০ পাউণ্ড, অথচ দেশে উৎপন্ন হয় প্রায় ১,৫০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ২,৫০০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত। যে পরিমাণ রেশমজাত দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আমদানী হয় তাহা ১৯৩৭-৩৮ সালে ছিল প্রায় ৩৬,৩৬৩,০০০ গজ। কাজেই একমাত্র দেশের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই ভারতে রেশমশিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্য মনোযোগী হওয়া উচিত। তবে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত রেশম ব্যবহারের জন্য বর্ত্তমান যুগে প্রাণীজ রেশম ব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে কিন্তু অদ্যাবধি কৃত্রিম উপায়ে রেশম উৎপাদনের যন্ত্রাদি স্থাপিত হয় নাই।

এঁড়ি-রেশম

আসাম ও বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলেই প্রধানতঃ এঁড়ি রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। এরণ্ডি গাছের পাতা খাইয়া এই জাতীয় কীট জীবনধারণ করে বলিয়া এঁড়ি-রেশম এণ্ডি, এরণ্ডি প্রভৃতি নামেই সমধিক প্রচলিত। এঁড়ি-রেশমের ব্যবসায় অদ্যাবধি কুটির-শিল্পের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই জাতীয় রেশম হইতে অবিচ্ছিন্ন সুতা পাওয়া যায় না। তবে তকলী বা চরকার সাহায্যে যে সুতা পাওয়া যায় তাহা পরিত্যক্ত তুঁত-রেশম হইতে প্রাপ্ত সুতা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। এঁড়ি-রেশম চাষের প্রণালী অনেকটা তুঁত রেশম চাষেরই অনুরূপ।

বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় গরিব চাষীরা অল্প পরিমাণে এঁড়ি-রেশমের চাষ করিয়া

থাকে। প্রচুর পরিমাণে রেশম-উৎপাদন প্রচেষ্টা অনেকবার চলিয়াছে। তবে নানারকম অসুবিধার জন্ত তাহা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। একটি প্রধান কারণ হইল, রেশমগুটী উৎপাদনোযোগী যন্ত্রের অভাব। বিদেশী কোম্পানীগুলি গুটী ক্রয় করিবার নিমিত্ত যে মূল্য দিতে স্বীকৃত হয় তাহা অতিশয় নগণ্য। তবে এরণ্ডি চাষের সঙ্গে অল্প পরিমাণে এঁড়ি-রেশম চাষ বেশ লাভজনক বলিয়াই মনে হয়। মাদ্রাজ প্রদেশের চিতুর জেলায় মাত্র দুইটি গ্রামে ২৫০,০০০ হইতে ৩০০,০০০ একর জমিতে এরণ্ডির চাষ হয়। এখানে আনুষঙ্গিক হিসাবে এঁড়ি রেশমের চাষ চলিয়াছিল, তবে উল্লেখযোগ্য কোন ফললাভ হয় নাই। কিন্তু মনে হয়, বিশেষ বন্দোবস্ত করিলে এবং সরকারের সাহায্য লাভ করিলে এদেশের এঁড়ি-রেশমশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কারণ পৃথিবীর অন্য কোন স্থানেই এই জাতীয় রেশমের চাষ হয় না।

মুগা-রেশম

অতি প্রাচীনকাল হইতেই আসামের বিভিন্ন জেলায় মুগা-রেশমের চাষ চলিয়া আসিতেছে। তবে কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলায়ই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং বৎসরের সকল ঋতুতেই সুষ্ঠুভাবে মুগার চাষ হইয়া থাকে। গারো, কাছাড়ী, রাভা প্রভৃতি আসামের বিভিন্ন আদিম অধিবাসিগণই বিশেষভাবে মুগার কীট প্রতিপালন করিয়া থাকে। ডিম কাটিয়া শুঁয়াপোকা বাহির হইলেই সেগুলি শাম, হুয়ালু গাছে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উহারা গাছের পাতা খাইয়া বাড়িতে থাকে। একটি গাছের পাতা শেষ হইলে উহাদের অন্য গাছে আনয়ন করা হয়। চারি হইতে ছয় সপ্তাহের মধ্যেই যখন কীট গুটী তৈয়ারী করিবার উপযুক্ত হয়, তখন উহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া একটু যত্ন লইলেই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে উহারা গুটী তৈয়ার করে। গুটীমধ্যস্থিত পিউপাগুলি অগ্নির উত্তাপ দ্বারা মারিয়া ফেলিয়া গুটীগুলি রৌদ্রে শুকান হয়। তৎপর বিক্রয়ের নিমিত্ত পাঠানো হয়। পলাশবাড়ী এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ মুগা দ্বারা বস্ত্রবয়নশিল্পে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এঁড়ি-রেশমের ন্যায় মুগার গুটী হইতেও সূতা বাহির করা এবং সূতা হইতে বস্ত্র তৈয়ার করার জন্য কোন যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হয় না। বৎসরের সকল ঋতুতেই মুগার চাষ চলিতে পারে। মুগার গুটী বাহিরে রপ্তানী হয় না।

মুগার রং স্বর্ণাভ; কাজেই নানাপ্রকার মূল্যবান বস্ত্র বয়নের নিমিত্ত ইহার বিশেষ চাহিদা আছে। তবে মুগার চাষ বিশেষ শ্রমসাধ্য বলিয়া মুগার বস্ত্রাদি দুর্মূল্য। কীটগুলি উন্মুক্ত স্থানে বৃক্ষের উপর বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং বাদুড়, পিপীলিকা প্রভৃতি তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিতে পারে। ঝড়-বাদলেও অনেক কীট ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। চীন ও জাপানের কোন কোন অঞ্চলে মুগার ন্যায় এক প্রকার রেশমের চাষ হয়। প্রতি একরে জাপানে প্রায় ছয় হাজার হইতে দশ হাজার গুটী পাওয়া যায়। বিশেষ গবেষণা সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আসামে প্রচুর পরিমাণে মুগা উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

তসর-রেশম

তসরের কীট মুগার কীট অপেক্ষা আহারে বিহারে অধিকতর যথেচ্ছাচারী। রেশম উৎপাদন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মুগার কীটকে গৃহে আনয়ন করিয়া যত্ন লওয়া যায়। কিন্তু তসর-কীটের বেলায় তাহা সম্ভব হয় না। ইহারা নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে বৃক্ষের উপর বিচরণ করে, ইচ্ছানুযায়ী ভক্ষণ করে এবং সাধ্যানুসারে গুটী উৎপন্ন করে। ফলে রেশম হয় নিকৃষ্ট ধরণের। গুটী তৈয়ারী হইতে সময় লাগে এক হইতে দুই মাস। দশ বৎসর বয়স্ক কোন আশ্রয়-বৃক্ষ প্রায় ৫,০০০ কীটের আহার্য্যের সংস্থান করিতে পারে। কীট ও গুটীগুলি সর্ব্বদা পাহারা দিয়া রক্ষা করিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তসর-কীট শাল, আসান, অর্জ্জুন প্রভৃতি গাছের পাতা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। এই সমস্ত বৃক্ষ ব্যতীতও সিধা, কালচেরী, তাল, ডুমুর, দেশীবাদাম, বহেড়া, মহুয়া, আম প্রভৃতি গাছের পাতাও ইহাদের খাদ্য।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তসর উৎপন্ন হয়। সিংভূম জেলাই তসরের প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্র, তবে ছোটনাগপুর উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বাংলা, সংযুক্ত প্রদেশের নানাস্থানেও তসরের চাষ হইয়া থাকে। শুধু বিহারেই বৎসরে গড়ে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার তসর উৎপন্ন হয় এবং ইহার অধিকাংশই বাংলা ও মধ্যপ্রদেশে রপ্তানী হয়।

গুটী হইতে সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুতপ্রণালী মুগা রেশমের ন্যায়ই সেকেলে ধরণের। পনর দিনে একটি স্ত্রীলোক পাঁচ শত তসর-গুটী হইতে সূতা বাহির করিতে পারে। এই পরিমাণ সূতার ওজন হয় প্রায় ১ পাউণ্ড। অধিকাংশ সূতা ও বস্ত্র তৈয়ারী হয় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।

পরিমাণের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, তুঁত-রেশমের পরেই তসরের স্থান। একমাত্র বিহার প্রদেশেই ৬০,০০০ লোক তসর-কীট উৎপাদনে নিযুক্ত আছে। তাহা ছাড়া সূতা বাহির করা, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কাজেও বহু লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। তসর-কীট উৎপাদন-কার্য্য উপযুক্তভাবে পরিচালিত হইলে তসর-শিল্পেও ব্যবসায়গত উন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এস নব-বৈশাখ

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

নমো নমঃ বৈশাখ,
রক্তেতে রঙীন এস যুগবৈশাখ,
তব অভিনন্দনে বাজে ঐ জয়শাঁখ,
বন্দিগো বৈশাখ।
দৈন্ত ও অনশন রচে দিল প্রাঙ্গণ,
সৃজনিত পশ্চাৎ সম্মুখে ভাঙন।
হাঁকো তুমি শঙ্খে,
ভাঙনের পঙ্কে
ফোটে ঐ ছন্দ
সৃজনের পদ্ম,
গা'ক তব কীর্ত্তি গো হিমালয় মৈনাক।
এস নববৈশাখ।
নাচো তুমি দুর্জ্জয়, চমকাক্ বিদ্যুৎ,
আনো কালবৈশাখী, ক্ষেপে যাক্ শিবদূত।
বৃষ্টির ঝাপ্ টা,
দেখাও সে দাপটা
খুলে যাক শিবজট, ক্ষেপে যাক সাপটা।
কড় কড় হানো বাজ, আনো ভীম ঝঞ্ঝা,
করো পাপ ধ্বংস, চাহে আজ মন যা।
হুঙ্কারি মহাকাল ডঙ্কাতে গর্জ্জায়,
শঙ্কিত চারি দিক তার ভীমনৃত্যে,
নন্দী ও ভৃঙ্গীর ঘন ঘন মালসাট,
করে হাড় ঠকমক্ ভূতপ্রেতভৃত্যে।
ভারতের মানবের আজ বুঝি অন্তিম,
বম্ বম্ ঘোরে তাই ধূর্জ্জটি হস্ত,
মহামনুবংশের ধ্বংসের মহাপাপ
তাই নিয়ে সূর্য্য যে যাবে আজ অস্ত।
পাপে ভরা সন্ধ্যায় এলে তুমি বিশ্বে,
রক্তেতে রঞ্জিত ধ্বংসের দৃশ্যে,
এ ভারতবর্ষ,
আজ তুমি কর্ষো,
আনো তুমি বর্ষণ করুণার বর্ষা,
শক্তি মা উদ্দাম নয় আজি হর্ষা,
করো তুমি শান্ত গো মা-কালীর খড়্গে,
হোক্ রণরঙ্গিণী শ্রীজগদ্ধাত্রী,
তব কৃপাকল্যাণে ধ্বংসের সন্ধ্যায়
আনো তুমি বৈশাখ চাঁদভরা রাত্রি।

ইন্দোচীন

গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ জগতের বিভিন্ন দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে। তবে মাত্র পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে দুই-দুইটা মহাসমর সংঘটিত হইয়া যাওয়ার ফলে ইহা আজ পতনোন্মুখ, একথা জোর করিয়া বলা চলে। সাম্রাজ্যবাদ পতনোন্মুখ হইলেও সাম্রাজ্যবাদীর আশাভরসা কিন্তু এখনও নির্ম্মূল হয় নাই। তাই আজ, সদ্যগত দ্বিতীয় মহাসমরের পরেও, যখন জগতের বিভিন্ন অংশ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে চলিয়াছে এবং যুদ্ধজনিত বিরাট্ ক্ষয়ক্ষতির ফলে বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির বিষ-দাঁত একরূপ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই সময় ইন্দোনেশিয়ায় এবং ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদের শেষ পরীক্ষা চলিয়াছে। প্রথমোক্ত অঞ্চলে ওলন্দাজ ও শেষোক্ত ভূখণ্ডে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীর দল স্বাধীনতা-প্রচেষ্টাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে উদ্যত। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে তথ্য ও সংবাদাদি বিদেশে প্রেরিত হইয়া বহির্জগতেও কতকটা ইহার সপক্ষে জনমত গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার কথা বাহিরে অজ্ঞাত না থাকিলেও ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ আমরা পাইতেছি না। এই সুন্দর দেশটিতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীর দল আড়াই লক্ষ ফরাসী, নিগ্রো ও জার্ম্মান সৈন্ত লইয়া প্রচণ্ড ও নির্ম্মম দমননীতি চালাইতেছে। ইন্দোচীন নামেই প্রকাশ—ইহার সঙ্গে ভারতবর্ষ এবং চীন উভয়েরই যোগাযোগ বিদ্যমান। বৃহত্তর ভারতে—অন্যত্রও যেমন এখানেও তেমনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তর নিদর্শন রহিয়াছে। এশিয়াবাসী যখন পরাধীনতার নাগপাশমুক্ত হইয়া স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণ করিতে সবেমাত্র চলিয়াছে তখন এই অঞ্চলটিতে প্রচণ্ড দমননীতি চালাইয়া ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা অশেষ অদূরদর্শিতারই পরিচয় দিতেছে। প্রত্যেক এশিয়াবাসী ইন্দোচীনের মুক্তি-সংগ্রামে সহানুভূতিশীল। তবে নিরীহ ইন্দোচীনবাসীদের আর্ত্তনাদ বাহিরে সেরূপ পৌঁছাইতেছে না। স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশেও যাহাতে তাহাদের সপক্ষে জনমত গঠিত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক।

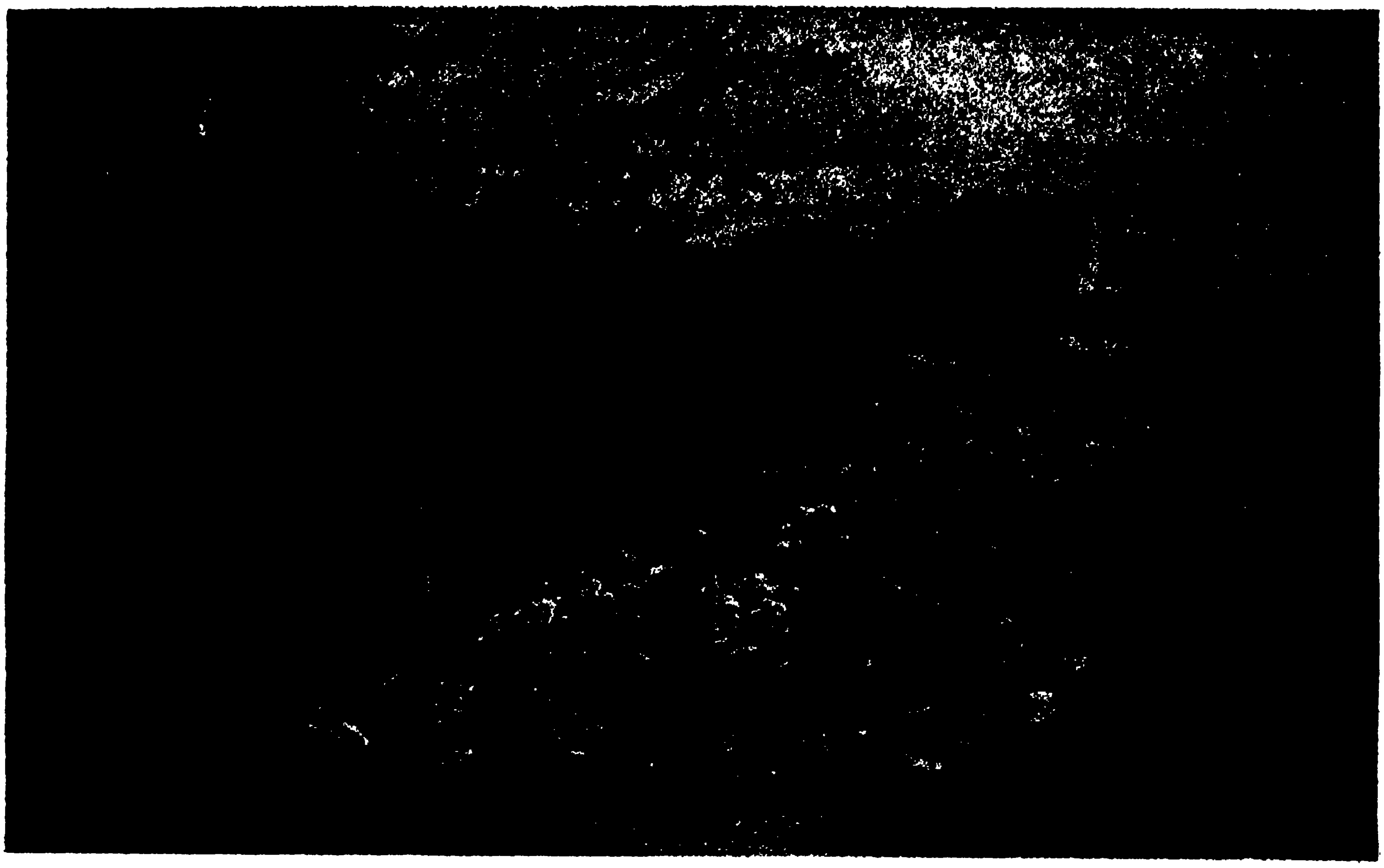

ইন্দোচীনে পাহাড়ের উপর বৌদ্ধ শ্রমণদের একটি 'ওয়াট ফু' বা ধ্যানধারণার নিভৃত স্থান

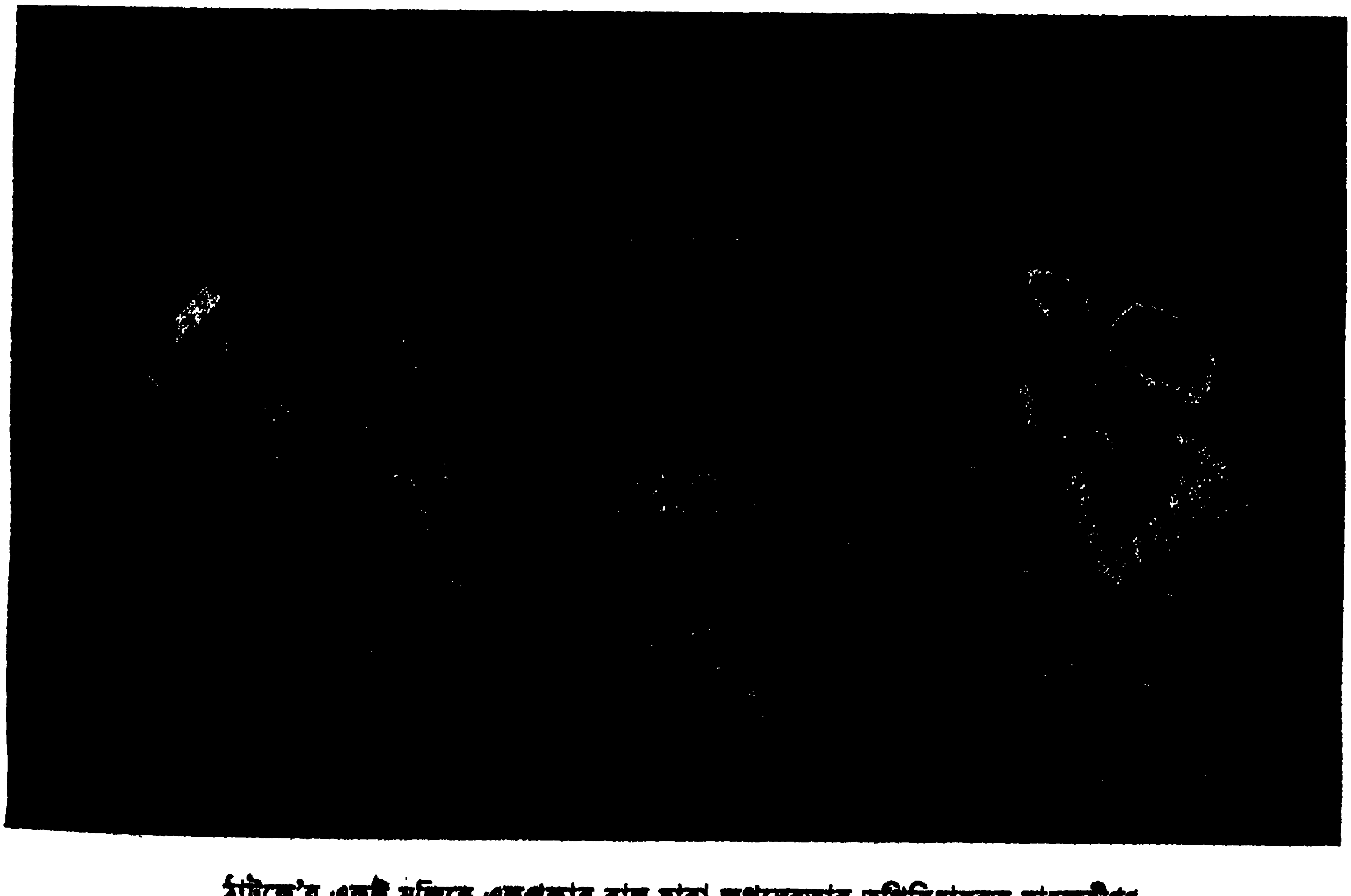

ঠাট্টকে'র একটি মন্দিরে একপ্রকার বাত দ্বারা অপদেবতার তুষ্টিবিধানরত যাদুকরীগণ

আঙ্কোর ভাট গামী রাজপথের পার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীনকালের একটি সর্পমূর্ত্তি

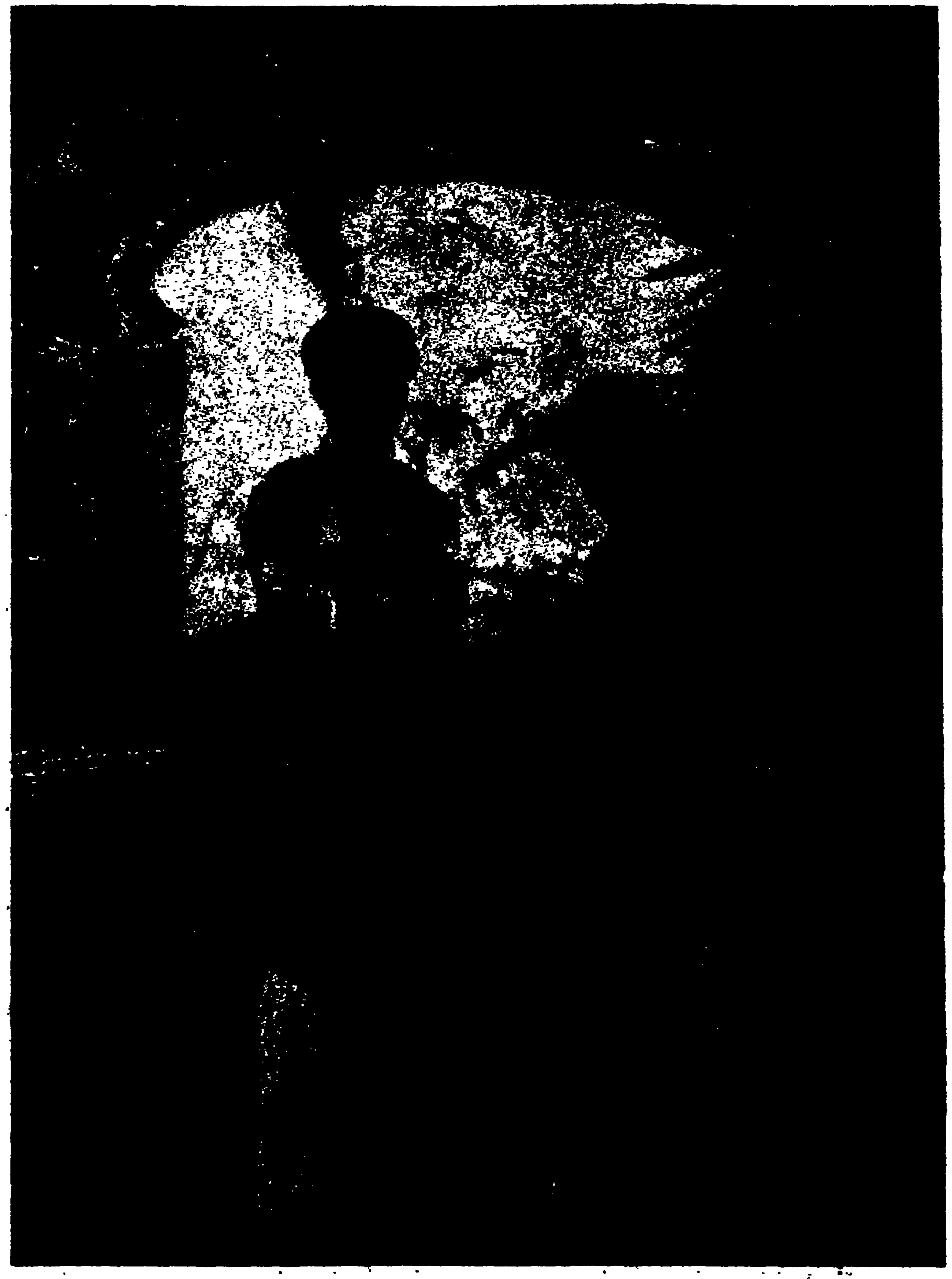

হুয়ে নামক স্থানের একটি প্রমোদোদ্যানে স্বামীসহ আনামী রাজকন্যা

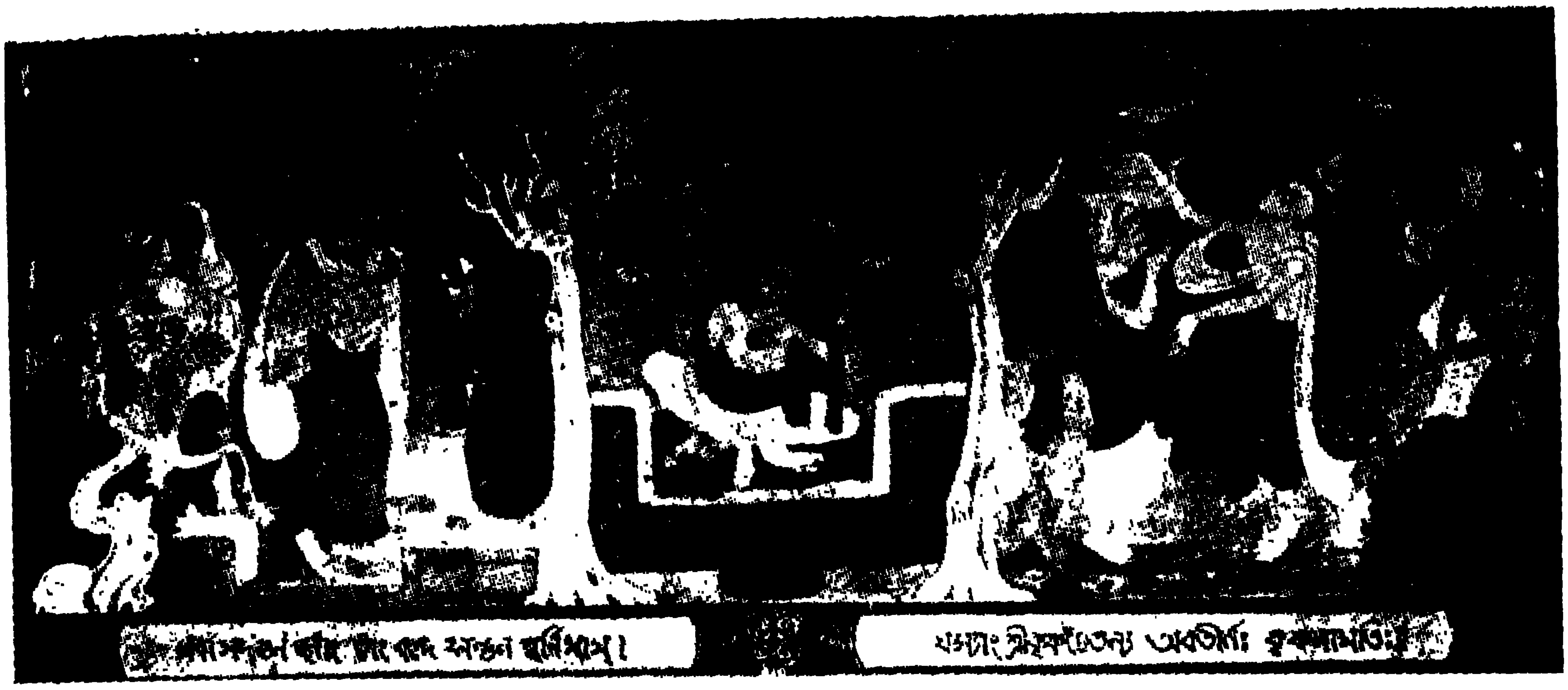

চৈতন্যদেব —শ্রীঅমূল্যগোপাল সেন

ভারতীয় চিত্রকলায় রচনাশৈলী

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা সময় ছিল যখন ভারতীয় চিত্রকলা বলতে বিশেষ ধরণে আঁকা ঐতিহাসিক ঘটনা বা পৌরাণিক কাহিনীর ছবিই বোঝাত—যেমন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, পরলোকগত সুরেন গাঙ্গুলী প্রমুখ শিল্পীদের আঁকা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনীর ছবিগুলো জল-রঙের 'ওয়াশ'-এর ছবি বা টেম্পারা রঙে মুঘল বা রাজপুত ধরণে আঁকা ছবি। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রানুমোদিত দেহের গঠনভঙ্গী বা রাজপুত-মুঘল চিত্রকলায় অনুসৃত গঠনকৌশলই এঁরা মেনে চলতেন। ফলে মাঝে এমন একটা সময় এসেছিল যখন শুধু ঐ বিশেষ আঙ্গিকের পুনরাবৃত্তিই চলছিল। রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে নূতনত্বের অভাবে ছবি গতানুগতিক হয়ে পড়ছিল—সর্ব্বোপরি ছবি হয়ে উঠছিল প্রাণহীন—নীরস।

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ শুধু একটা নূতন আঙ্গিকই সৃষ্টি করেন নি—তিনি চিত্রকলায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কি করে এই ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি সৃষ্টি হ'ল—সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'পুরাতন ছবিতে দেখলুম ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি, ঢেলে দিয়েছে সোনা রূপা সব। কিন্তু একটা জায়গায় ফাঁকা, তা হচ্ছে ভাব, কোথাও কোন কার্পণ্য নেই; কিন্তু ভাব দিতে পারে নি। মানুষ আঁকতে সবাই যেন সাজিয়ে সাজিয়ে পুতুল বসিয়ে রেখেছে। আমি দেখলুম, এইবারে আমার পালা। ঐশ্বর্য্য পেলুম, কি করে তার ব্যবহার তা জানলুম, এবারে ছবিতে ভাব দিতে হবে। বাড়ী এসে বসে গেলুম ছবি আঁকতে, আঁকলুম "সাজাহানের মৃত্যু"।' আজকের দিনে যখন বাংলার চিত্রশিল্পে নানাদেশীয় প্রভাব এসে পড়ছে এবং নানাবিধ রচনাশৈলীর পরীক্ষা চলছে তখন এ কথাগুলো বিশেষ করেই মনে রাখা দরকার—নইলে ছবির ভাব ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের মত অসামান্য প্রতিভাশালী শিল্পী বিরল। তাঁর রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে যে দুর্লভ শিল্প-প্রতিভা এবং সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়—তার তুলনা খুব কমই মেলে। ভারতীয় চিত্রকলায় যে ধারা তিনি বইয়ে দিয়েছেন, নূতন নূতন পথে প্রবাহিত হয়ে তা নব নব রূপরসের সৃষ্টি করে চলেছে। ভারতীয় চিত্রশিল্পে দেখা দিয়েছে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন রচনাশৈলী এবং নূতন বিষয়বস্তু। শিল্পকলা তাতে প্রাণবন্ত হয়েই উঠেছে।

দৃষ্টিভঙ্গীর নূতনত্ব, রচনাশৈলীর অভিনবত্ব নন্দলালের শিল্পসৃষ্টিতে সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে। কোন বিশেষ শৈলীতে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি—তাই দেখি তাঁর সাধনার পথ বৈচিত্র্যে ভরপুর। পৌরাণিক কাহিনীর অনবদ্য রূপায়ণ যেমন তাঁর ছবিতে দেখি, তেমনি দেখি আধুনিক কালের ছবিতে নূতন নূতন আঙ্গিক নিয়ে নব নব পরীক্ষা। তাঁর আঁকা "শিব", "সতীর দেহত্যাগ" ইত্যাদি মহাভারতের ছবিগুলো ভারতীয় শিল্পের অতুলনীয় সৃষ্টি। শান্তিনিকেতনের দৃশ্যাবলী, ঋতু এবং মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার ছবিগুলিতে রচনাশৈলীর

গুরুশিষ্য —শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নূতন পথের সন্ধান তিনি দিয়েছেন। চৈতন্তের জন্ম, যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা ইত্যাদি ছবিগুলো আর একরূপ আঙ্গিকে সার্থক সৃষ্টি।

যামিনী রায় প্রথম জীবনে পাশ্চাত্য রীতিতে ছবি এঁকে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন; কিন্তু সে ধারা বর্জ্জন করে ভারতীয় শিল্পে এক নূতন রচনাশৈলী তিনি প্রবর্ত্তন করেছেন—রসিকসমাজে তাঁর ছবির বিশেষ কদর হয়েছে। আমাদের দেশের আগেকার দিনের পটুয়ারা যে পট অঙ্কন করত, তাতে তুলির জোর ছিল এবং রং ও রেখার বাহুল্য বর্জ্জন করে ছবির এক সহজ কিন্তু সরস রূপ তারা সৃষ্টি করেছিল; কিন্তু অশিক্ষিত শিল্পীমনের ছাপ তাদের ছবিতে প্রকট থাকত। যামিনীবাবুর ছবিতে পটের ছাপ আছে, কিন্তু শিক্ষিত শিল্পীর তুলিকা অল্প রং এবং সামান্ত কয়েকটি বলিষ্ঠ রেখার বিন্যাসে বিশিষ্ট এক রচনাশৈলী সৃষ্টি করেছে। প্রথম দৃষ্টিতে পট বলেই মনে হয়—কিন্তু যামিনীবাবুর ড্রয়িং অত্যন্ত জোরালো এবং ভাবব্যঞ্জক—পটচিত্রের সঙ্গে তাঁর ছবির পার্থক্য ওখানে। যামিনী বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করার সৌভাগ্য বর্ত্তমান লেখকের হয়েছিল। ১৯৪১ সনে রবীন্দ্রনাথ বাঁকুড়ায় যান। সেই উপলক্ষে একটা কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। শিল্পবিভাগের ভার পড়ে আমার উপর। বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের ছবি সেখানে প্রদর্শিত হয়েছিল। সেবারে ছবি সংগ্রহের জন্ত যামিনী বাবুর কাছে গিয়ে পটের পদ্ধতিতে আঁকা কিছু ছবি আমাদের প্রদর্শনীর জন্ত দিতে অনুরোধ করেছিলাম। সেই সময় ছবি সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁর মুখে শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পটের ছবির সঙ্গে তাঁর ছবির প্রভেদ কোথায় তাও বুঝিয়ে বলেছিলেন। হুবহু পটের অনুকরণেই ছবি তিনি আঁকেন, এ রকম একটা ভুল ধারণা তখন আমার ছিল—মনে হয় এ রকম ভুল ধারণা অনেকেরই রয়েছে।

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীও নিত্য নূতন ধরণের চিত্ররচনার সাধনায় নিমগ্ন। তাঁর বুদ্ধের ছবিগুলো এবং রামায়ণের ছবি রচনারীতির অভিনবত্বে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করে। তাঁর আঁকা "সাঁওতাল নৃত্য", "বাজার" এবং টেম্পারা রঙের দৃশ্যচিত্রের ছবিগুলিতেও ভারতীয় চিত্ররীতির গতানুগতিক ছাপ নেই। একই গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে সুন্দরের রূপকে তিনি সঙ্কীর্ণ করে তোলেন নি। রচনাশৈলীর বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই তাঁর শিল্পসাধনা অগ্রসর হচ্ছে। সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিগুলিতে যদিও নূতনত্বের প্রবল ছাপ নেই, তবু ছবির প্রধান বস্তু যে রস, তা সেগুলোতে পূর্ণমাত্রায়ই বিদ্যমান। তাঁর আঁকা, "মা", "যশোদা ও কৃষ্ণ", "গুরুশিষ্য" ছবিগুলি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। শান্তিনিকেতনের বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের চিত্রাবলীর রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন দুটোই তাঁর বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। শান্তিনিকেতনের দেওয়ালে আঁকা

এঁর ফ্রেস্কোগুলি নয়নানন্দকর। তথাকথিত ভারত-শিল্পের গতানুগতিক রচনারীতি এঁর ছবির মধ্যে নেই।

গগনেন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলায় এক নূতন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। ভারতীয় শিল্পে তিনিই কিউবিজমের প্রবর্ত্তন করেন। রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে তাঁর দান সামান্য নয়।

নূতন নূতন পথ অবলম্বন করে গোপাল ঘোষ, শুভো ঠাকুর এরাও খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। কিন্তু উৎকট অভিনবত্বে এদের রচনা চোখ এবং বিশেষ করে মনকে মাঝে মাঝে পীড়াই দেয়। শৈলীর নূতনত্বই যখন শিল্পীর মনকে বেশী অধিকার করে থাকে—তখন ছবিতে ভাবব্যঞ্জনা বা রস ক্ষুন্ন হয়। তবুও এঁদের ছবিতে রেখা ও রঙের সমাবেশ জোরাল;

মা ও ছেলে —শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

তা ছাড়া মনে হয় নূতন নূতন পথ অনুসরণে যে সাহসের দরকার, তা এঁদের যথেষ্ট আছে।

নবীনতম শিল্পীদের মধ্যে অনেকে বাংলার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ছবি এঁকে খ্যাতি লাভ করেছেন। এঁদের রচনানীতিও গতানুগতিক নয়; এদের তুলিতেও জোর আছে, কিন্তু কতকগুলি ত্রুটি এঁদের ছবিতে সুপরিস্ফুট। শ্রদ্ধেয় যামিনী রায় এ সম্বন্ধে বলেছিলেন, তোমাদের এই সব ছবিতে যখন ল্যাণ্ডস্কেপ আঁক, তখন গাছের গোলাকৃতি বা জমির উঁচুনীচু বোঝাতে যতটা আলোছায়ার ব্যবহার কর—সেই ছবিতেই মানুষ বা জীবজন্তুর বেলায় ততটা কর না; ফলে একই ছবির মধ্যে দু-ধরণের টেক্‌নিক প্রয়োগ কর। পরিপ্রেক্ষিত দেখাবার বেলায় সামনের জিনিষ বড় করেই আঁক, দূরের জিনিষ ছোট করেই আঁক। কিন্তু সেই ছবিতেই সামনের জিনিষ ও দূরের জিনিষ প্রায় একই রকম ফিনিশ কর, মুঘল বা রাজপুত ছবির মত। আর যে ধরণের ছবি তোমরা আঁক, তাতে ওয়াশ বা টেম্পারাতে ছবি না ক'রে, তেলরঙে আঁকলে ছবি আরো ভাল হয়।

পাহাড়ী মেয়ে —শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

আচার্য্য নন্দলাল এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—তোমাদের "ছবিগুলি অনেকটা ফটোর মত হয়ে যাচ্ছে। ছবির রূপ আলাদা, আর ফটোর রূপ আলাদা। নেচার থেকেই আঁকবে, কিন্তু আঁকবে ছবির রূপ—শিল্পদৃষ্টিতে ছবি আঁকবে। আর ফটোর মত হচ্ছে বলেই expressive (ভাবব্যঞ্জক) হচ্ছে না—ছবির প্রধান বস্তু যে রস, তোমাদের ছবিতে তার অভাব থেকে যাচ্ছে। expression বা ভাবব্যঞ্জনার অভাবে মানুষগুলো যেন সাজান পুতুলের মত মনে হয়।" উপদেশ দিয়েছিলেন (পৌরাণিক বিষয়) নিয়ে ছবি আঁকতে—তাতে ভাবব্যঞ্জনার দিকে আপনিই বেশী নজর পড়বে।*

স্বাধীন ভারতে আমাদের জাতীয় জীবনের আজ সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা চলছে—চিত্রকলার ক্ষেত্রেও বাংলাকে গৌরবমণ্ডিত করে তুলতে হবে নূতন ভাবধারা, নূতন বিষয়বস্তু এবং রচনাশৈলীর বৈচিত্র্যে।

* এ সম্বন্ধে ১৩৫৩ সনের পৌষের প্রবাসীতে লেখকের 'শিল্পপ্রসঙ্গে আচার্য্য নন্দলাল' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মহিলা-শিল্পী শ্রীউষা সেনগুপ্তা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

একথা সত্য যে, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সুকুমার শিল্পে কৃতিত্ব অর্জন করিবার জন্য উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক এবং

১নং চিত্র

শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। যথোচিত শিক্ষাদ্বারা পরিমার্জ্জিত না হইলে সহজাত শক্তির আশানুরূপ বিকাশ হয় না এবং উৎসাহের অভাবে শিল্পীর সৃষ্টিপ্রেরণাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও যে দেখা যায় তাহার প্রমাণ নিতান্ত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে মহিলা-শিল্পী শ্রীউষা সেনগুপ্তার দীর্ঘকালব্যাপী একাগ্র শিল্পসাধনা। এই মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের বধূ, সুদূর মফস্বলে লোকচক্ষুর অন্তরালে বহুকাল যাবৎ শিল্প-কলার সাধনার রত আছেন। কোন শিল্প-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ তিনি পান নাই অথবা কোন শিল্পাচার্য্যের নিকটেও তাঁহার শিল্পশিক্ষার হাতে খড়ি হয় নাই। আপনার শিল্পী-মনের খেয়ালেই আজ দীর্ঘ কুড়ি বৎসর যাবৎ তিনি মাটি দিয়া মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি গড়িয়া চলিয়াছেন। মাটির মূর্ত্তি ভঙ্গুর, মাটির দেহের মত তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। তাঁহার গড়া অধিকাংশ মৃন্মূর্ত্তিরই চিহ্নমাত্র আজ বিদ্যমান নাই; মাটির গড়া মূর্ত্তি মাটিতেই বিলীন হইয়া গিয়াছে।

নিজের কাজকে কি ভাবে স্থায়ী করা যায়, সে বিষয়ে কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। মফস্বলে প্রস্তর দুষ্প্রাপ্য, কাজেই পাথর দিয়া মূর্ত্তি গড়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। নানারূপ পরীক্ষণ চলিল—শেষে তিনি ইট খোদাই করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ সুরু করিলেন। ইহাতে তিনি কতদূর সাফল্যলাভ করিয়াছেন বর্ত্তমান প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট ইষ্টকমূর্ত্তিসমূহের প্রতিচ্ছবি তিনটিই তাহার প্রমাণ।

এই মহিলা-শিল্পীর জন্মস্থান কুমিল্লা। তাঁহার পিতা পরলোকগত রজনীকান্ত দেব। তিনি কুমিল্লা বারের একজন শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ এবং সংস্কৃত সাহিত্যে অধ্যয়ন ছিল বহুবিস্তৃত। তাঁহার শ্রীমুখাৎ দেবদেবীর বর্ণনা ইত্যাদি শুনিয়া অতি শৈশবেই শ্রীমতী উষার মনে অস্ফুটভাবে রূপসৃষ্টির প্রেরণা জাগে। তাঁহার নিজের কথায়ই বলি—

"...কোন রকমে ম্যাট্রিকটা দেই। তার পর হইতে গৃহকর্ম্মের অবসরে দিন রাত কত কষ্ট করিয়াই যে চর্চ্চা রাখিয়াছি তাহা একমাত্র ভগবান জানেন। কুমিল্লায় দুই বার এগজিবিশন হয়, তাহাতে এবং কয়েকবার সরস্বতী পূজায় মূর্ত্তি গড়িবার সুযোগ পাই এবং এগজিবিশনে পুরস্কার লাভ করি। তখন বয়স মাত্র ১৬।১৭ ছিল। কুমিল্লার রাজনৈতিক নেতা শ্রীযুক্ত

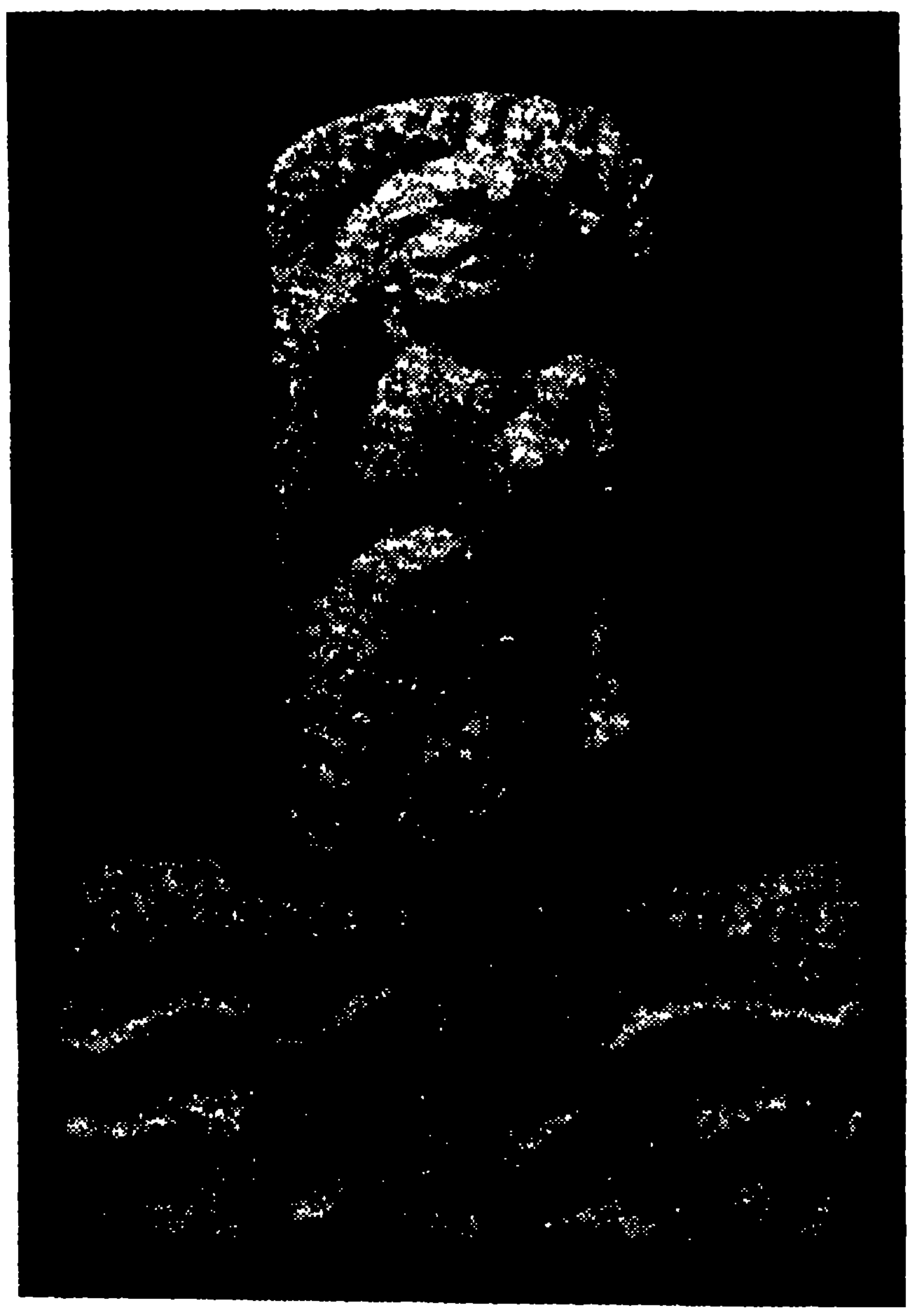

২নং চিত্র

অখিল দত্তের বাড়ীতে আমার গড়া কয়েকটি মূর্ত্তি ছিল। প্রসিদ্ধ নেতা অধ্যাপক রঙ্গ একবার কুমিল্লা আসিয়া মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া খুশী হন ও একটি মূর্ত্তি মাদ্রাজে লইয়া যান।"

শিল্পী শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্তের সহিত বিবাহের পর শ্রীমতী উষা ত্রিপুরা জেলার নাছিরনগর গ্রামে তাঁহার মামাশ্বশুরের বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করেন। শহরের কোলাহল হইতে বহুদূরে অবস্থিত এই ছায়ানিভৃত পল্লীগ্রামটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার শিল্পীমনকে মুগ্ধ করিল। গ্রামের উত্তর প্রান্তসীমা দিয়া প্রবহমাণ লঙ্কন নদী আর তাহার ওপারের মেদীর হাওরের দৃশ্য-সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। এখানকার প্রকৃতির নব নব রূপবৈচিত্র্য এই মহিলা-শিল্পীকে আত্মপ্রকাশের বেদনায় আকুল করিয়া তুলিল। মাটির কাজ কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিয়া তিনি সুরু করিলেন ছবি আঁকা—সেগুলি মুখ্যতঃ দৃশ্য-চিত্রাঙ্কন।

৩নং চিত্র

নাছিরনগরে কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি স্বামীর সহিত তাঁহার কর্ম্মস্থল শ্রীহট্টে চলিয়া যান, সম্প্রতি সেখানে মূক-বধির বিদ্যালয়ে শিল্পকলার শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত আছেন। ইদানীং তিনি মাটির মূর্ত্তিগুলিকে কি ভাবে দীর্ঘস্থায়ী করা যায় এবং মৃন্মূর্ত্তিতে পাথরের ধর্ম্ম (Character) ফোটানো যায় সে সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিতেছেন। এই মহিলা-শিল্পীর পক্ষে পরম গৌরবের কথা এই যে, তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

শ্রীউষা সেনগুপ্তা

বাংলাদেশে মহিলাদের মধ্যে ভাস্কর্য্য-শিল্পে কেহ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। শ্রীউষা সেনগুপ্তার সহজাত শিল্পপ্রতিভা এবং নিপুণ হস্তের পরিচয় তাঁহার ইট খোদাই মূর্ত্তিগুলির প্রতিচ্ছবিতেই পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ ইটের গায়ে শিল্পসুষমা ফুটাইয়া তুলিতে তিনি যে কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, উপযুক্ত সুযোগ পাইলে তাহার নিপুণ হস্ত-স্পর্শে পাষাণের কঠিন-গাত্রেও অপরূপ শিল্পমাধুরী বিকশিত হইয়া উঠিবে।

সামঞ্জস্য

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

নলিনী চৌধুরীর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এত বয়স বাঙালী বড় একটা পায় না। এই তার আশী চলছে। তবে ইদানীং তিনি একটু কাহিল হয়ে পড়েছেন। নানা প্রকার ছোট-খাটো ব্যাধি তাঁর লেগেই আছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় ছোট বড় কোন বিধিনিষেধই তিনি মেনে চলতে চান না। এই নিয়ে কিছুদিন যাবৎ তাঁর বড় এবং একমাত্র পুত্র সুধীরের সঙ্গে মতান্তর চলেছে। ফলে সুধীর পিতাকে ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে পড়েছে।

সুধীরের স্ত্রী শোভনা বললে, বুড়ো বয়েসে অমন লোকের একটু হয়েই থাকে। তা নিয়ে রোজ রোজ কথা বাড়িয়ে লাভ কি!

সুধীর একটু উষ্ণ কণ্ঠে বললে, যাকে ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় সে-ই তার মর্ম্ম বোঝে। তুমি বুঝবে কি!

শোভনা হাসিমুখে জবাব দিলে, তা বটে! সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত যাকে বাইরে বাইরে কাটাতে হয় ঝঞ্ঝাট পোহাবার মর্ম্ম তারই বেশী বোঝার কথা!

কথাটা মিথ্যে নয়। সুধীর নীরব থাকে। তা ব'লে পিতার সম্বন্ধে সে মোটেই অমনোযোগী নয়। আপিসে যাবার পূর্ব্বে সে রোজই সেদিনের ঔষধ থেকে আরম্ভ ক'রে আহার-বিহারের একটা সুপরিকল্পিত রুটিন করে দিয়ে যায়। স্ত্রীকে উপদেশ দেয় সেই অনুযায়ী কাজ করতে, বাপকে অনুনয় করে সেই ভাবে চলতে। কিন্তু সুধীর বাড়ীর বাইরে পা বাড়াতেই নলিনী চৌধুরী পুত্রের সকল বিধিনিষেধ, অনুনয়-বিনয় লঙ্ঘন করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। সন্তর্পণে পা টিপে টিপে রান্নাঘরে এসে উপস্থিত হন। শোভনাকে উদ্দেশ করে বলেন, তোমার নিতাই এখনও বাজার থেকে ফিরে আসে নি বুঝি মা? হতভাগা আজ বাজারসুদ্ধ কিনে আনবে দেখছি!

শোভনা হাসিমুখে প্রতিবাদ জানায়, সে ত অনেকক্ষণ ফিরে এসেছে। কিন্তু আপনি আবার এই রোগা দুর্ব্বল শরীর নিয়ে উঠে এলেন কেন বাবা।

নলিনী বলেন, অসুখ মনে করলেই অসুখ মা, নইলে কি এমন হয়েছে। বরং দিন-রাত শুয়ে থেকে থেকে সর্ব্বাঙ্গে আমার বাত ধরে গেল।—কথা বলতে বলতে ততক্ষণে তিনি রান্নঘরে প্রবেশ করেছেন। শোভনা একখানি আসন পেতে দিতেই তিনি নিঃশব্দে উপবেশন করলেন। ভৃত্যকে উদ্দেশ করে বললেন, আজ কত করে মাছ নিয়ে এলে নিতাইবাবু। টুকরোটি বেশ পাকা রুই থেকেই এনেছ দেখছি।

নিতাই হাসিমুখে জবাব দেয়, আজ্ঞে, পাকা রুই সস্তায় পাওয়া গেছে, কিন্তু সিঙ্গিমাছ পুরো চার টাকা সেরে আনতে হয়েছে।

শোভনা ধমক দিয়ে বলে, মাছের দাম নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না নিতাই। কাজ না থাকে ত যাও।

নিতাই একটু অপ্রস্তুতভাবে দ্রুত প্রস্থান করে।

নলিনী চৌধুরী আপন খেয়ালেই মাথা নেড়ে বলেন, নিতাই কিছু মিথ্যে বলে নি। দেশে যে পরিমাণ রোগের মরসুম পড়েছে তাতে রুই কাতলা খাবার লোকেরই যে অভাব মা।

নলিনী চৌধুরী থামতে পারলেন না। কোন দূর অতীতের স্মৃতি যেন অকস্মাৎ তাঁকে মুখর করে তুলেছে। তিনি বলে চললেন, 'সে দিনের কথা আজ তোমাদের কাছে গল্প বলেই মনে হবে। তোমাদের কেন, সময়েতে আমার নিজেরও ভুল হয়ে যায়।'—শোভনা চুপ ক'রে থাকে। বুড়ো শ্বশুরের কাছে তাঁর বাল্যকালের গল্প শোনা ওর প্রতিদিনের একটি নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। রোজই তাকে সেই একই কথা ধৈর্য্য সহকারে শুনতে হয়। লাগেও মন্দ নয়। তার একক নিঃসঙ্গ জীবনপথে বৃদ্ধ শ্বশুর ছোট একটি শিশুর মতই তার চেতনাকে মধুর ভাবে ঘিরে আছে।

নলিনী চৌধুরী পুনরায় বলেন, তোমাদের মহামূল্য সিঙ্গিমাছ আমাদের ছোটবেলায় পয়সায় এক খালুই পাওয়া যেত। চার আনার মাছ কিনলে একটা লোক দরকার হ'ত তা বয়ে নিয়ে আসতে। অন্য মাছেরও অভাব ছিল না। আর সে সব কি তোমাদের এই বরফ দেওয়া মাছ—এমনি চটাচটা পুঁটি মাছ ভাজা মুগের ডালের সঙ্গে আট দশ গণ্ডা এক এক জনে আমরা খেয়ে ফেলতাম। সে মাছে তেলের দরকার হ'ত না মা। মাছের তেলই যথেষ্ট। মাছের তেমন স্বাদ যেন ভুলেই গেছি।

নলিনী চৌধুরী থামলেন। জিভের সাহায্যে ঠোঁট দুখানা বারকয়েক ভিজিয়ে নিয়ে পুনরায় সোৎসাহে আরম্ভ করলেন, সেদিনের কথা আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। মাছ-মাংসের চিরদিনই আমি ভক্ত। গ্রামের বাড়ীতে অন্ততঃ পাঁচ-ছ'গাছা ফেঁকা জাল সব সময়ের জন্য মজুত থাকত। কোনটা বজুরি ট্যাংড়া ফাঁস, কোনটা পুঁটির ফাঁস, কোনটা বা ভাসা মলাজির। মোটের উপর মাছের আকার বুঝে ফাঁসের নাম। সবচেয়ে বড় ফাঁসের জাল হ'ল রুই, কাতলা, বোয়াল ধরবার জন্য। সে যুগে ক'টা লোক আর মাছ কিনে খেত মা।

মাছের কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধ সহসা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। মুদ্রিত নেত্রে চুপ করে বসে থাকেন। শোভনা কাজের ফাঁকে ফাঁকে শ্বশুরের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে। একটা চোখ এবং একখানা কান তার সর্ব্বদা সজাগ রয়েছে। আহা বুড়ো মানুষ। শিশুর মত অসহায়। ছোট ছেলেরই মত অকারণ অভিমানী।

শোভনা জিজ্ঞেস করে, তারপর বাবা ?

নলিনী চোখ খোলেন। মৃদু কণ্ঠে বলেন, সুধীরের মার রান্নার খুব খ্যাতি ছিল। তোমাদের আজকালকার মত রান্না সে নয়। নিতান্তই সাধারণ রান্না। কিন্তু সে কি ভুলবার কথা মা—আজও মুখে তা লেগে আছে।—বৃদ্ধের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এর পরে কথার ধারা যে কোন্ পথে যাবে এ যেন সহজ সংস্কারবশেই শোভনা টের পায়। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যই সে একমুখ হেসে বলে, কেন বাবা আমরা বুঝি একেবারেই রাঁধতে শিখি নি ?

নলিনী সহজ কণ্ঠেই জবাব দেন, সে কথা আর বলি কি করে মা! রাঁধ তোমরা ভালই। তার চেয়েও ভাল তোমাদের রান্নার নামগুলো। কালিয়া, কোপ্তা অথবা কোর্ম্মার নাম সে যুগে তাঁরা জানতেন না। কিন্তু একই ঝোলের রকমারি স্বাদের বুঝি তুলনা হয় না।

শোভনা প্রশ্ন করে, মা বুঝি খুব ভাল রান্না করতেন বাবা ?

নলিনী উৎসাহিত হয়ে উঠেন। পরমুহূর্ত্তেই চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা বেদনার ভাব ফুটে ওঠে। তিনি মৃদু কণ্ঠে বলেন, তাই ত সকলে বলত মা। ভালো রান্নার মূল রহস্যটি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। কোন্ মাছের সঙ্গে বেগুন আর বড়িভাজা দিলে, কোন্ মাছটি ঝোলের চেয়ে ভাতে কিংবা কোন্টি পাতুরি করলে মুখরোচক হবে একথা কেউ কোনদিন তাঁকে শিখিয়ে দেয় নি, অথচ সকলের রুচির সঙ্গে তাঁর রান্নার চমৎকার সমন্বয় ছিল।

শোভনা মৃদুকণ্ঠে বলে, চেষ্টা ত করি বাবা কিন্তু হয় না যে—

বৃদ্ধ যেন সহসা অনেকখানি সজাগ হয়ে ওঠেন। না জেনে পুত্রবধূকে কোন প্রকার আঘাত করে বসেন নি ত! তিনি বারকয়েক মাথা নেড়ে বলেন, কে বলে হয় না মা! এই যে সেদিনে তুমি পাব্দা মাছ বড়িভাজা আর ধনে শাক দিয়ে রেঁধেছিলে। বলি নি তোমায়, এমনটি বহুদিন খাই নি ? সুধীরের মা চলে যাওয়ার পর এমন স্বাদ প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ? তোমার ঐ সিঙ্গিমাছের ঝোলটাই যা আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

শোভনা মৃদু কণ্ঠে বলে, কিন্তু ও ছাড়া যে আপনার আর কিছু সহ্য হয় না।

বৃদ্ধ ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন,—'সহ্য হয় না তোমায় কে বললে মা ? সুধীর বুঝি এই সব তোমায় বুঝিয়েছে ? মিথ্যে কথা, একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা। এ কি তোমার আজকালকার ভেজাল খাওয়া শরীর যে একটুতেই ভেঙ্গে পড়বে ? এই বুড়ো হাড়ে এখনো কথা কয় মা। চেয়ে দেখ ত তুমি, এতখানি বয়েসেও একটি দাঁত পড়েছে আমার ? জান, এখনও মাংস চিবিয়ে খেতে পারি আমি!

শোভনা বাধা দিয়ে বলে, খেতে পারা আর সহ্য হওয়া না হওয়া ত এক কথা নয় বাবা ?

বৃদ্ধ পুনরায় গরম হয়ে উঠলেন, এ তো তোমার কথা নয় মা। নিশ্চয় সুধীরের ডাক্তারও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে। আমার কি সহ্য হবে আর কি হবে না সে কথা ব'লে দেবে ডাক্তার! ওরা পাগল, একেবারে বদ্ধ পাগল। এই তোমায় আমি বলে রাখছি ও ডাক্তারের কোন বিধানই আমি আর মানব না। তুমি বরং তোমার খুড়োমশায়কে একটা খবর পাঠাও। শুনেছি তিনি বড় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, তাঁকে দিয়েই চিকিৎসা করাব।

শোভনা আপত্তি জানায়, আমার কাকা হোমিওপ্যাথ নন্ বাবা—

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বললেন, বয়স হলে অমন ভুলভ্রান্তি একটু আধটু হয়েই থাকে। তিনি যে বড় কবরেজ সে কথাটা আমার মনেই ছিল না।

শোভনা হেসে বললে, এর দুয়ের কোনটাই তিনি নন্ বাবা। কাকাবাবু এলোপ্যাথ চিকিৎসক।

বৃদ্ধ বলে উঠলেন, এ হতেই হবে। যেমন সুধীর তেমনি তার ডাক্তার। মাথায় আমার কিছু আর রাখে নি। না খেতে দিয়ে দিয়ে মাথার ঘিলু একেবারে শুকিয়ে ফেলেছে। —তিনি একটু থেমে পুনরায় বললেন, তা বলে চিকিৎসকের যে নামই তোমরা দাও না কেন—মূলত সব চিকিৎসাই এক মা। শুধু নামেরই রকমফের।

শোভনার মুখে মৃদু হাসি দেখা গেল, কিন্তু কোন প্রতিবাদ এল না। বরং কি ভাবে সিঙ্গিমাছ রান্না করবে শ্বশুরকে সেই কথাটাই ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলে। এমনি ধারা কিছুদিন ধরে তাঁকে জিজ্ঞেস করে আসতে হচ্ছে। পরিষ্কার করে কথাটা শুধাতে তার আটকায়। মোট কথা ডাক্তার এবং স্বামীর অনুজ্ঞায় যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও শোভনা কোনমতেই শ্বশুরের পাতে শুধু মাত্র রুগীর পথ্য তুলে দিতে পারছে না। এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গেও তার বাদানুবাদ লেগেই আছে।

সুধীর বলে, ব্যাধির চিকিৎসা দরকার।

শোভনা বলে, রোগ যাঁর নিছক বার্দ্ধক্য তাঁকে চিকিৎসার নামে উপোস করিয়ে মারতে আমি পারব না।

সুধীর বিস্তর চেঁচামেচি করলেও প্রতিবাদের অভাবে তা

আপনি বন্ধ হয়ে যায়। এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় নরম সুরে বলে, আচ্ছা এই করে যে তুমি বাবার কত বড় ক্ষতি করছ এ কথাটাও কি তুমি কিছুতেই বুঝবে না?

শোভনা বলে, কথাটা যেদিন বুঝব সেদিনে আর এত কথার দরকার হবে না। কিন্তু দোহাই তোমার, সব কথা না জেনে মিথ্যে গোল কর না।

সুধীরকে থামতে হয়। কিন্তু কথাটা শোভনা ভুলতে পারে না। এবং পারে না বলেই প্রতিদিন একবার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে জিজ্ঞেস করে। বৃদ্ধ সব খবর রাখেন না। রাখবার কথাও নয়। তাই প্রত্যহ তাঁকে রান্নাঘরে দেখা যায়। দেখা যায় খাদ্য নিয়ে নানা প্রকার আলোচনা করতে, সিঙ্গি মাছের প্রতি তাঁর নিদারুণ অনাসক্তির কথাটা প্রকাশ করতে।

শোভনার প্রশ্নে বৃদ্ধ যেন সজাগ হয়ে উঠেছেন, তুমি কি আজ আমায় সিঙ্গিমাছ খাওয়াতে চাও?

পাকা রুই মাছের টুকরোটা তখনও সম্মুখেই পড়ে আছে। সেই দিকে চোখ পড়তে শোভনা যেন কেমন লজ্জিত হয়ে পড়ল। নম্র কণ্ঠে বললে, আপনি যে সকাল-বেলা আপনার পেটের গোলমালের কথা বলছিলেন।

বৃদ্ধ বাধা দিয়ে বললেন, বলেছিলাম বুঝি! ভুল বলে-ছিলাম মা। আসলে গোলমাল আমার পেটের হয় নি, হয়েছে আমার মাথার। এক বলতে আর বলি। বুড়ো বয়সে চিন্তাশক্তির অবসাদ ঘটেছে।

শোভনার ঠোঁটের কোণে পুনরায় একটুখানি করুণ হাসি দেখা গেল। চোখ মুখ স্নেহ মমতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। আহা, অসহায় বৃদ্ধ। যত জ্বালা হয়েছে তার। মোটকথা স্বামীর রূঢ়তা এবং ডাক্তারের অসংখ্য বিধিনিষেধ এ দুয়ের কোনটাই সে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারছে না। অথচ খোলা মনে নিজের ইচ্ছামত চলতেও যেন কোথায় আটকাচ্ছে। পাশাপাশি দু'রকমের ব্যবস্থা করতে সে পেরে উঠছে না। এই নিয়ে প্রতিদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাদপ্রতিবাদ হতে দেখা যায়। বৃদ্ধ শ্বশুরকে স্নেহে এবং সেবায় চতুর্দিক থেকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখতে চায়। তার বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ের কতকটা আকাঙ্ক্ষা অন্তত এই পথ ধরেই পূর্ণ হয়ে উঠবার সুযোগ পায়। সুধীর পয়সা রোজগার করে। পয়সা সে যথেষ্টই পায়। তার বাইরের একটা সমাজ আছে। তার মত স্বল্পপরিসর গণ্ডীর মধ্যে এক রোগজর্জরিত বৃদ্ধকে নিয়ে অষ্টপ্রহর পা গুণে গুণে চলতে হয় না, তাঁর সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগের সম্মুখীন হতেও হয় না। কাজেই সুধীরের পক্ষে উপদেশ দেওয়া সহজ হলেও তা পালন করা তার স্ত্রীর পক্ষে তেমন সহজে ঘটে উঠে না।

শোভনা নতমুখে বসে আছে। সেই দিকে খানিকক্ষণ সস্নেহে চেয়ে দেখে বৃদ্ধ পুনরায় বলে ওঠেন, সুধীরের ডাক্তারের উপর আমার আর একতিল বিশ্বাস নেই। তুমি দেখে নিও মা তোমার খুড়োমশাই নিশ্চয় আমার কথায় সায় দেবেন।

অন্ধকার পথে চলতে চলতে সহসা শোভনা যেন একটু-খানি আলোর সন্ধান পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠল। সাগ্রহে শ্বশুরকে বললে, আমি আজই কাকাবাবুকে খবর পাঠাব বাবা।

বৃদ্ধ খুশীভরা কণ্ঠে বললেন, তাই পাঠিয়ো মা। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, সুধীরের ডাক্তার আমার না খেতে দিয়ে হজম-শক্তির দফাটিও রফা করে দিয়েছে।

শোভনার মুখে পুনরায় একটুখানি ম্লান হাসি দেখা গেল; যে কথা বৃদ্ধ বার বার তাকে বোঝাতে প্রয়াস পাচ্ছেন, তা বিশ্বাস করতেই সে চায়, কিন্তু শ্বশুরের সংশয় শোভনাকে বেদনা দেয়। স্বামীর যুক্তি এবং বর্তমান ডাক্তারের অনুজ্ঞা সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তোলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শোভনাকে তার কাকাবাবুর নিকট খবর পাঠাতে হ'ল।

খেতে বসে আজ বার বার বৃদ্ধকে রান্নার তারিফ করতে শোনা গেল। এমন রান্না নাকি তিনি বহুদিন খান নি। এক কথায়—খাসা। রুই মাছের ঝোলটার উপরই যেন নজর তাঁর বেশী। পূর্ণ উৎসাহে পরম পরিতোষের সঙ্গে তিনি বার বার চেয়ে নিয়ে আহার করলেন। একমুখ হেসে শোভনাকে বললেন, একেই বলে রান্না, মা। যেমন হয়েছে ডুমুরের সুক্তো, তেমনি করেছ মুলোর ঘণ্ট। সবার সেরা রেঁধেছ মাছের ঝোলটি, তা বলে সোনা মুগের ডালও কারুর চেয়ে কম যায় না।

শোভনা বৃদ্ধের অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

বৃদ্ধ পুনশ্চ বললেন, তুমি এক দিনে আমার দশ দিনের পরমায়ু বাড়িয়ে দিয়েছ মা। যেমন সুধীর—তেমনি জুটেছে তার ঐ ডাক্তারটি। এরা আমার শরীরের ধাত জানে না। উল্টো ব্যবস্থা দিয়ে আমায় হয়রান করছে বৈ ত নয়।

বৃদ্ধ থামলেন। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে বসে রইলেন। সুধীরের ডাক্তারের উপর তাঁর বাহ্যিক যত বিরাগই থাক না কেন, অন্তরে তিনি তাঁর বার আনা ব্যবস্থাই স্বীকার করতেন, কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে নানাবিধ বিধিনিষেধ মেনে চলতে তিনি চান না। আজন্মের সংস্কার এবং অভ্যাস পদে পদে বাধা দেয়। পুত্র পিতাকে যতই নিয়ম মেনে চলতে বলে পুত্রবধূর কাছে বৃদ্ধের বায়না ততই বৃদ্ধি পায়। শোভনার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের দুর্বলতার স্থানে মোচড় দিয়ে কাঙালের মত দু'হাত পেতে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকেন। এই এক স্থানেই তাঁর যত কাঙালপনা, নইলে আজ এতখানি বয়সে তিনি নিজের

ইচ্ছাকেই বরাবর প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। কোথাও বিন্দুমাত্র এর অন্যথা হবার উপায় ছিল না।

সুধীরের বয়স তখন বছর তিনেক হবে যখন তার মাতৃ-বিয়োগ ঘটে। গুটিকয়েক মৃত সন্তান প্রসব করার পর সুধীরই প্রথম টিকে গিয়েছিল কিন্তু সেই প্রথম টিকে যাওয়া সন্তানই তাঁর শেষ সন্তান। সেই থেকেই সুধীরের মা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে লাগলেন। সুধীর বাঁচল বটে, কিন্তু তার মাকে যেতে হ'ল। মৃত্যুটাকে অত্যন্ত গভীর ভাবে অনুভব করলেও নলিনী চৌধুরীর বাহ্যিক ব্যবহারে তার কোন প্রকাশ কারুর চোখে পড়ল না। শুধু পুনরায় বিয়ের তাগিদ এলে তিনি অত্যন্ত সহজ গলায় আত্মীয়-স্বজনকে বললেন, না—এবং সেই থেকেই পুত্রের সকল ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

শোভনার মৃদু আহ্বানে বৃদ্ধের অন্যমনস্কতার ঘোর কেটে গেল। তিনি বললেন, আমায় কিছু বলছিলে মা?

শোভনা বললে, হ্যাঁ বাবা—কাকাবাবু এলে সব কথা আপনি নিজেই খুলে বলবেন কিন্তু।

বৃদ্ধ সোৎসাহে বলেন, নিশ্চয় বলব মা। আমার ভুল হয়ে গেলে তুমি স্মরণ করিয়ে দিও। আর সুধীরের ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশনগুলো হাতের কাছে গুছিয়ে রেখ, তোমার কাকাবাবুর দরকার হতে পারে।

শোভনা প্রস্থান করলে।

বৃদ্ধ পুনরায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। অতীতে তিনি যা কিছু ভাল বলে জেনেছেন তার এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটতে তিনি দেন নি। তাঁর মনের দৃঢ়তা আত্মচেতনার সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করে গেছে। তাঁর সেদিনের সে মনোবল আজ আর নেই, তার স্থানে এক দুর্নিবার দুর্বলতা তাঁকে পেয়ে বসেছে। নইলে তিনি...

পুনরায় তাঁর চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। পুত্রবধূ দেখা দিয়েছে—সেই সঙ্গে তার ডাক্তার কাকাও।

বৃদ্ধ তাঁকে পরম সমাদরে আহ্বান করলেন, আসুন বেয়াই মশাই। একটু থেমে তিনি যেন একটু অনুযোগ দিয়ে বললেন, এমনিতে আপনাদের ত আর দেখা পাওয়া যায় না—

প্রত্যুত্তরে হেসে ডাক্তার বলেন, ডাক্তারের আবির্ভাব যত কম হয় ততই মঙ্গল।

বৃদ্ধ খুব খানিক হেসে নিলেন এবং আরও দু-চারটে বাজে কথার পর তাঁকে আহ্বান করবার যথার্থ কারণ সবিস্তারে জানালেন।

ডাক্তার পরম গম্ভীরভাবে বৃদ্ধের অভিযোগ এবং অনুযোগগুলি একের পর এক শুনে গেলেন। কখনও কৌতুকে তাঁর চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল, কখনও বা হাসিমুখে বৃদ্ধের কথায় সায় দিয়ে আলোচনার ধারাটাকে একটা সহজ পথে নিয়ে আসছিলেন এবং নিতান্ত মনোযোগের সঙ্গে পূর্ব্বের প্রেস্‌ক্রিপশনগুলি দেখে নিয়ে হাসিমুখে বললেন, আপনার কিছুই হয়নি ত! এতখানি বয়সে বুকে অমন একটু সর্দ্দিভাব থাকবেই—আর হজমশক্তি হ্রাস পাওয়াটাও নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে ব্যস্ত হবার কিছুই নেই। ডায়েট একটু হালকা—অর্থাৎ যতটা সহ্য করতে পারেন তাই খাবেন। আর ওষুধ যা খাচ্ছেন তাতে আপত্তির কিছু নেই, তবে সেই সঙ্গে একটা এনজ্যাস´ ইমালসন হলে ভাল হয়।

ডাক্তার উঠলেন, কিন্তু পুনরায় তাঁকে ফিরতে হ'ল। শরীরটা কিছু খারাপ থাকায় সুধীর একটু শীঘ্রই ফিরে এসেছে। বাড়ীতে ডাক্তারের আবির্ভাব দেখে একটু যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার অবগত হয়ে সে আশ্বস্ত কণ্ঠে খুড়শ্বশুরকে প্রশ্ন করলে, কেমন দেখলেন?

শ্বশুরকে নিয়ে সুধীর তার নিজের ঘরে এসে বসেছে।

ডাক্তার বললেন, নূতন কিছুই নয়। যেমন চলছে চলুক। তবে একটা ইমালসনের ব্যবস্থা কর।—তিনি চলে গেলেন। কিন্তু সুধীর পুনরায় পিতার ঘরে আসতেই তিনি হৈ চৈ বাধিয়ে দিলেন, আমি তখুনি বলেছিলাম তোর ঐ ডাক্তার কিছু জানে না। এখন হ'ল ত! তোর ডাক্তার শুধু চিনেছে সিঙ্গিমাছ আর থানকুনি পাতার ঝোল। আর বোতল বোতল ওষুধ গেলানো। খেতে দিচ্ছ সিঙ্গিমাছ, তার জন্যে আবার হজমি আরক কেন? আর কখনও আমি তোর ডাক্তারের ওষুধ খাব মনে করেছিস—কক্ষনো নয় এ আমি আজ তোকে সাফ জানিয়ে রাখছি।

সুধীর বিস্মিত চোখে চেয়ে রইল। শোভনার মুখে একটু যেন চাপা হাসি দেখা গেল। সুধীর বললে, এসব আপনি কি বলছেন বাবা! কাকাবাবুও যে একই ব্যবস্থার কথা বলে গেলেন।

বৃদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন, বলে গেলেন! তুমি বললেই আমাকে তাই বিশ্বাস করতে হবে? দু'মিনিটে তোমাকে তিনি সব কথা বলে গেলেন, আর দু'ঘণ্টা ধরে আমাদের যা বলেছেন সব মিথ্যে? শোন কথা মা, হতভাগা ছেলের কথা শোন—

শোভনার মুখে পুনরায় যেন চাপা হাসি দেখা গেল, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। উত্তর দিলে সুধীর, আপনি মিথ্যে রাগ করছেন বাবা। সত্যি মিথ্যে একটা ফোন করেই না হয় একবার ভালভাবে জেনে নিন না।

বৃদ্ধ পুনরায় রেগে উঠলেন। বললেন, জানতে হয় তুমি নিজে জান গিয়ে। আমায় যা বলবার তা তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন।

সুধীরের সঙ্গে তার স্ত্রীর একবার দৃষ্টি বিনিময় হতেই সে আর কথা না বাড়িয়ে অন্যত্র প্রস্থান করলে।

বৃদ্ধ আর একবার বাধার দিয়ে উঠেই পুত্রকে না দেখে থেমে গেলেন এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুত্রবধূকে উদ্দেশ করে বললেন, বুঝলে মা, সুধীর আমার তেমন ছেলে নয়—যত নষ্টের গোড়া তার ঐ ডাক্তার।

শোভনা হাসিমুখে প্রস্থান করলে।

প্রসঙ্গটা তখনকার মত চাপা পড়ে গেলেও এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ল না। দিন চলে যায়। বৃদ্ধ ঔষধ সেবন একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছেন। শোভনা অনুযোগ দেয়। বৃদ্ধ হেসে বলেন, তোমার কাকাবাবুর ওষুধ যে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না মা।

শোভনা বললে, অন্ত ওষুধ খেতে কাকাবাবু ত নিষেধ করেন নি বাবা!

বৃদ্ধ বললেন, খেতেই হবে এমন কথাও তিনি বলেন নি ত মা!

শোভনা এই নিয়ে আর কথা বাড়াতে চায় না। নিঃশব্দে অন্তত্র প্রস্থান করে। কিন্তু বয়সের ধর্ম্ম স্বভাবের গতিকে উপেক্ষা করে চলতে পারে না। এক সময় বৃদ্ধকে শয্যাশায়ী হতে হ'ল। সুধীর তখন আপিসে। শোভনা আশঙ্কায় এতটুকু হয়ে গেছে। বৃদ্ধের মতে এটা শুধু একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা।—যা সকলেরই হতে পারে। কিন্তু শোভনার মনে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছে। একটি বেলার তাণ্ডবে বৃদ্ধকে যেন একেবারে দুমড়ে ভেঙে ফেলেছে। ডাক্তারের কাছে খবর পাঠান হয়েছে, সেই সঙ্গে সুধীরকেও।

শোভনার অদৃষ্টে জুটল নিষ্ঠুর তিরস্কার। কোন প্রতিবাদই সে করলে না। তার মন নিয়ে ঘটনাটার বিচার ত ওরা করবে না। ওদের চুলচেরা হিসাবে ব্যতিক্রম ঘটেছে তাই ওরা অকরুণ হয়ে উঠেছে। শোভনা শুধু নিঃশব্দে শ্বশুরের পরিচর্য্যা করে চলেছে।

রাত্রে একলা ঘরে স্ত্রীকে পেয়ে সুধীর সহসা অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে উঠল, তোমার অন্যায় প্রশ্রয় পেয়ে পেয়েই এমনটি ঘটেছে।

শোভনা শান্ত কণ্ঠে বললে, সে বিচার না হয় পরে করো কিন্তু দোহাই তোমার, একটু আস্তে কথা বল। বাবা এখন ভালই আছেন এবং জেগে আছেন।

সুধীর কিন্তু থামতে পারলে না। সে তেমনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই বলে চলল, এমনি করেই ইদানীং তুমি আমার মুখ চাপা দিয়ে আসছ। একটি বারও তোমরা কেউ আমার দিকটা ভেবে দেখছ না। সারাদিন পরিশ্রম করে এসে—

পুনরায় বাধা দিয়ে শোভনা বললে, তুমি কিছুতেই কি চুপ করবে না?

বারবার বাধা পেয়ে পেয়ে সুধীর যেন ক্ষেপে গেল, বলতে লাগল, চুপ করেই এতদিন ছিলাম, কিন্তু তোমরাই তা থাকতে দিচ্ছ না। তোমাদের আজ আমি পরিষ্কার করেই জানিয়ে দিতে চাই যে এমনি খেয়ালখুশী মত যদি তোমরা চলতে চাও তা হলে বাবাকে আমি দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব। নয়তো অন্য কোথাও···

পাশের ঘরে কোন কিছু পতনের শব্দে উভয়ে চমকে উঠল। শোভনা ত্রস্ত পদে সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেল। সুধীরও তাকে অনুসরণ করলে।

বৃদ্ধ অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও যে তিনি পুত্র এবং পুত্রবধূর বাদানুবাদ উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন একথা বুঝবার উপায় নেই।

শোভনা একমুহূর্ত্তেই ঘরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। খাটের পাশের টেবিলের উপরকার বড় ঔষধের শিশি দুটো মেঝের গড়াগড়ি যাচ্ছে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে।

স্ত্রী একবার স্বামীর মুখের প্রতি চোখ তুলে চাইলে, আর স্বামী স্ত্রীর পানে নির্ব্বাকভাবে তাকালে।

সুধীর নিম্ন কণ্ঠে বললে, তোমার হতভাগা মিনির কাজ···

শোভনা একথার কোন উত্তর দেওয়াও আবশ্যক বোধ করলে না। উবু হয়ে বসে কাঁচের টুকরোগুলো একস্থানে জড়ো করতে লাগল। চোখ দুটো কি জানি কেন তার ঝাপসা হয়ে গেছে।

* * *

কয়েক দিনেই বৃদ্ধ পুনরায় একটু সামলে নিয়েছেন। চিকিৎসক নির্দ্দেশিত আহার্য্যই তিনি এখন গ্রহণ করছেন। তবে ইদানীং সিঙ্গিমাছের প্রতি তাঁর আসক্তিটা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। পুত্রবধূকে ডেকে বলেন, মাছগুলোর চেহারাটাই যা বিদ্ঘুটে নইলে খেতে অতীব সুস্বাদু, মা। তিনি পরম পরিতোষের সঙ্গে আহারে মনোনিবেশ করেন।

শোভনার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, কিন্তু গোপনে সে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস মোচন করে।

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

মধ্য-পশ্চিম

২১শে ডিসেম্বর শনিবার এগারটায় শিকাগো হইতে ট্রেনে রওনা হইয়া দুইটার সময় লিঙ্কনের স্মৃতিবিজড়িত স্প্রিংফিল্ড নগরে পৌঁছিলাম। স্প্রিংফিল্ড ইলিনয় রাজ্যের রাজধানী। শিকাগো হইতে দূরত্ব ২০০ মাইল। ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে ট্রেন ছুটিতেছিল। পথে তিনটি ষ্টেশন, কান্‌কাকি, গিব্‌সন সিটি ও ক্লিণ্টন। রওনা হইবার সময় এবং প্রায় সারা রাস্তাই বরফ পড়িতেছিল। ট্রেনের দুই ধারে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর। আগাগোড়া বরফে ঢাকা। স্প্রিংফিল্ড শিকাগোর দক্ষিণে। এখানে বরফ ছিল না। মাঝে মাঝে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছিল। ওয়েব্‌ষ্টারের সহিত হোটেলে গিয়া উঠিলাম। আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে শহর সুসজ্জিত। হোটেলের লাউঞ্জে উত্তমরূপে সাজানো খ্রীষ্টমাস তরু। চারিদিকেই আনন্দ। পরের দিন বৃষ্টি কাটিয়া গেল। তারপর যে তিন দিন এখানে ছিলাম সে তিন দিন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছিল।

স্প্রিংফিল্ড এব্রাহাম লিঙ্কনের কর্মক্ষেত্র। তাঁর জন্ম হইয়াছিল কেণ্টাকি রাজ্যে। সাত বৎসর বয়সে তিনি ইণ্ডিয়ানা রাজ্যে আসিয়া কয়েক বৎসর বাস করেন। পরে যৌবনে ইলিনয় রাজ্যের সালেম গ্রামে আসেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান। বেশী লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। সালেম গ্রামে প্রথম এক মুদির দোকানে কাজ করেন। পরে নিজেই একটি দোকান করেন। কিন্তু সে দোকান লোকসান হইয়া উঠিয়া যায়। তখন কিছু আইন পড়িয়া স্প্রিংফিল্ডে আসিয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এখানে বেশ পসার হয়। পরে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়া এখান হইতে ওয়াশিংটন চলিয়া যান। যুক্তরাজ্য তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। তৎকালে আমেরিকায় দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। লিঙ্কন উহা রহিত করিয়া দেন। ইহাতে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাজ্য হইতে আলাদা হইয়া পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে সঙ্কল্প করে। লিঙ্কন তাহাতে বাধা দেন। উভয় রাষ্ট্রে যুদ্ধ হয়। লিঙ্কন জয়ী হন। দেশের ঐক্য রক্ষা হয়। সে ঐক্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। এই ঐক্যের জন্যই আজ এরা এত বড়। এদেশের লোক লিঙ্কনকে খুব শ্রদ্ধা করে। গৃহ-বিবাদের দিনে ইনিই এদের পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিজয়ী লিঙ্কন পরে গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে নিহত হন।

পরদিন রবিবার। সুন্দর রৌদ্র উঠিয়াছে। সকালেই বাহির হইয়া পড়িলাম। ওয়েব্‌ষ্টারকে সঙ্গী করিলাম। উভয়ে লিঙ্কনের সমাধি-মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। হুলেট নামক একজন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ হইল। কলিকাতা হইতে আগত দর্শকের সাক্ষাৎলাভে বৃদ্ধের কি উৎসাহ! আমি বলিলাম, আমেরিকা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা খুবই বেশী। গত যুদ্ধের পূর্বে এদেশকে জানিবার কৌতূহলও বিশেষ ছিল না। তবে ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের কথা আমরা স্কুলপাঠ্য পুস্তকে পাঠ করিতাম। বৃদ্ধ ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিলেন। গান্ধীজীর সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ তন্ন তন্ন করিয়া আমাকে সমাধিমন্দিরের সমস্ত দেখাইলেন। পরে এই সমাধিমন্দিরের প্রাণস্বরূপ এইচ, ডব্লিউ, ফে মহাশয়ের গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। ফে মহাশয়ের বয়স ৮৮। এই লোলচর্ম বৃদ্ধ লিঙ্কনের পরম ভক্ত। এই সমাধির পার্শ্বেই বাস করেন। লিঙ্কনের স্মৃতি-বিজড়িত ছোট-বড় বহু জিনিস সংগ্রহ করিয়া যক্ষের ধনের মত আগলাইতেছেন। আমাকে একটি একটি করিয়া সব দেখাইলেন। তন্মধ্যে লিঙ্কনের একটি ছোট চেয়ার দেখিলাম। তিনি ইহাতে বসিয়া কাজ করিতেন। বৃদ্ধদ্বয় আমাকে এই চেয়ারে বসাইবেনই। পুরাতন চেয়ার। বহু স্মৃতি এর সঙ্গে বিজড়িত। আমার আড়াই মণী বপুকে ইহার উপর স্থাপন করিতে কিছুতেই ভরসা পাইতেছিলাম না। বৃদ্ধদ্বয় নাছোড়বান্দা। তাঁহারা বলিলেন, "আপনি বসুন। যে চেয়ারে লিঙ্কন বসিতেন সে চেয়ারে বসিলে আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবে।" অগত্যা চেয়ারের উপর অতি সন্তর্পণে বসিতেই হইল। সহসা ফে মহাশয় বলিলেন, "আপনার পিতা যখন এদেশে আসিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহার নিকট একটি স্বর্ণমুদ্রা ধার করিয়াছিলাম। আজ আপনার হাতে তাহা প্রত্যর্পণ করিতেছি।"

আমি প্রথমে কথাটির অর্থ বুঝি নাই। বলিলাম—আমার পিতা তো এদেশে আসেন নাই।

বৃদ্ধ হাসিয়া একটি স্বর্ণমণ্ডিত মুদ্রা পকেট হইতে বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। বলিলেন, "আপনার কয়টি সন্তান?" আমি বলিলাম, "তিনটি।" বৃদ্ধ তখন আরও দুইটি মুদ্রা আমাকে দিলেন। বলিলেন, "আমার কথা বলিয়া আপনার সন্তানগণকে এই মুদ্রাগুলি দিবেন। তারা যখন এখানে আসিবে তখন আমাকে স্মরণ করিবে। আমি তো তখন থাকিব না।" মুদ্রাগুলিতে লিঙ্কনের মূর্তি মুদ্রিত। লিঙ্কনের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ এই গিল্টিকরা মুদ্রাগুলি লিঙ্কন স্মৃতি-কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত ও প্রচারিত। বিশিষ্ট অতিথিগণকে স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ এইগুলি দেওয়া হয়। তখন বৃদ্ধ হুলেট আর একটি স্বর্ণমণ্ডিত মুদ্রা আমার হাতে দিলেন। আমি

ইঁহাদের হৃদয়স্পর্শী ব্যবহারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমি বলিলাম, "তিনটি তো পাইয়াছি। আর কেন?" হুলেট মুদ্রাটি দেখাইয়া বলিলেন, "এটি স্প্রিংফিল্ড মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক নির্মিত ও প্রচারিত। সম্পূর্ণ অন্য ধরণের।" এই সহৃদয় উপহার প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। বলিলাম, "বেশ, এটি আমার ভাইপো লইবে।" এখনও ঐ মুদ্রা চতুষ্টয়ের মধ্যে আমি বৃদ্ধদ্বয়ের তথা স্প্রিংফিল্ড-বাসিগণের হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করি। বৃদ্ধ কে-র সহাস্য মুখখানি এখনও মুদ্রাগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ করি।

বৈকালে জনৈক সরকারী কর্মচারী হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। নাম হ্যারল্ড ব্রাডশ। ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্টের গবেষণা ও সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ। এখানে আমার কাজের কিরূপ প্রোগ্রাম হইবে প্রথমে সে সম্বন্ধে আলোচনা হইল। পরে ভদ্রলোকটি বলিলেন, "স্প্রিংফিল্ডে এসেছেন। চলুন এব্রাহাম লিঙ্কনের স্মৃতিচিহ্নগুলি আপনাকে দেখাইয়া লইয়া আসি। আমি এগুলি কয়েক বার দেখিয়াছি। কিন্তু যখনই যাই তখনই পুনরায় নূতন কিছু দেখিতে পাই।"

আমি বলিলাম, "আমি সকালে লিঙ্কনের সমাধিমন্দির দেখিয়া আসিয়াছি।"

ব্রাডশ বলিলেন, "তবে চলুন প্রথম লিঙ্কনের নিজ বাড়ী ও পরে সালেম গ্রামে যাওয়া যাইবে। তাঁহার নিজ বাড়ী খুব কাছে। সালেম গ্রাম ১৫ মাইল দূরে।"

অদূরস্থিত লিঙ্কনের নিজ বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। একটি মহিলা গৃহের রক্ষণকার্যে নিযুক্ত এবং আগন্তুকগণের প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিতেছেন। এটি ভিন্ন লিঙ্কনের দ্বিতীয় নিজ বাড়ী ছিল না। সরকার এই বাড়ীটি কিনিয়া লইয়া লিঙ্কনের সময় যেরূপ ছিল ঠিক সেই ভাবে রক্ষা করিতেছেন। বাড়ীটি ছোট, দোতলা, খুব সাদাসিধা। উপরে নীচে তিনটি করিয়া ঘর। ঘরগুলি বেশী বড় নয়। আসবাবপত্র খুব সামান্য। একটা বৈঠকখানা ঘর একটু সাজান। ব্রাডশ বলিলেন, এঘরটি সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়। যেন একটু বেশী সজ্জিত। লিঙ্কনের সাদাসিধা অভ্যাসের সঙ্গে এটা যেন খাপ খায় না। হয়তো বা প্রেসিডেণ্ট হইবার পর বিশিষ্ট অতিথিদের বসাইবার জন্য ঘরটি সাজাইয়াছিলেন। লিঙ্কন-পত্নী যে স্থানে যে চেয়ারে বসিয়া জামা প্রভৃতি বুনিতেন, লিঙ্কন যেখানে বসিয়া কাজ করিতেন সব ঠিক সেই ভাবে আছে। সবই খুব সাদাসিধা। সাজাইবার চেষ্টাও বিশেষ লক্ষিত হয় না।

তারপর সালেমের দিকে চলিলাম। সুন্দর রাস্তা। দু'ধারে দিগন্তবিস্তৃত শূন্য প্রান্তর। ব্রাডশ গাড়ী চালাইতেছেন; আমি পাশে বসিয়া। নানা বিষয়ে আলাপ চলিতেছে। এ দেশে লোকবসতির বিরলতা সর্বত্রই লক্ষ্য করিতেছি। মাঠই বেশী। শুনিলাম ভুট্টাই এখানকার প্রধান ফসল। একটি ছোট বনাকীর্ণ পাহাড় দেখিলাম। তাহার নীচে একটি ছোট লোহার কারখানা। পাহাড়ের উপরে সালেম গ্রাম।

আসল গ্রামটি দুই মাইল দূরে ছিল। লিঙ্কনের সময় সেখানে বহু লোকের বাস ছিল। ক্রমশঃ গ্রামটি পরিত্যক্ত হয়। জনশূন্য গ্রামটিও নষ্ট হইয়া যায়। শুধু কাঠের ঘরগুলির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান থাকে।

১৯১৮ সনে আসল গ্রামের ধ্বংসাবশেষ লইয়া এই পাহাড়ের উপর গ্রামটিকে ঠিক পূর্বের মত পুনর্গঠিত করিতে আরম্ভ করা হয়। একটি স্থানীয় লিঙ্কন-সমিতি এই কাজ আরম্ভ করেন। পরে সরকার ইহার ভার লন। লিঙ্কনের সময় যেরূপ ছিল সরকার বাড়ীগুলিকে ঠিক সেইভাবে নির্মাণ করিয়া রক্ষা করিতেছেন। ছোট ছোট কাঠের ঘর; সামান্য বিছানা। বিছানার সরঞ্জামের মধ্যে কাঁথাই প্রধান। আস্‌বাব নাই বলিলেই চলে। গ্রাম্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কয়েকটি দোকান। তাহার মালপত্র অতি সামান্য রকমের। কামারশালা, মুদির দোকান, ডাক্তারখানা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে। গ্রামটি আমাদের দেশের গ্রামেরই মত ছিল বলিয়া মনে হয়। ঘরগুলিও আমাদের দেশের গ্রামের সাধারণ লোকেদের ঘরের মত। সেদিন ভারতবর্ষের গ্রাম ও আমেরিকার গ্রামে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। আজ তাহাদের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। একটি ছোট সংগ্রহশালা আছে। তার মধ্যে লিঙ্কনের ব্যবহৃত অনেক জিনিস বিদ্যমান। ব্রাডশ একটি শীল-করা পেট্‌রার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। লিঙ্কনের পুত্র এটি উপহার দেন। এর মধ্যে লিঙ্কনের বহু চিঠিপত্র আছে। পেট্‌রাটি দিবার সময় লিঙ্কনের পুত্র একটি সর্ত করিয়া দেন যে ১৯৪৭ সনের অমুক মাসের পূর্বে এ পেট্‌রা যেন খোলা না হয়। তাই এতদিন ইহা বন্ধই আছে। ব্রাডশ বলিলেন, "আমি কয়েক বার এখানে আসিয়াছি। অথচ এই পেট্‌রাটি দেখি নাই। ইহা খুলিবার দিন যে এত নিকটবর্তী তাহাও লক্ষ্য করি নাই। দেখুন, আমি ঠিকই বলিয়াছি যে, এখানে আমি যখনই আসি তখনই নূতন কিছু দেখি।"

আমি—"আচ্ছা খুলিবার তারিখ সম্বন্ধে এইরূপ সর্তের অর্থ কি?"

ব্রাডশ—"এই সমস্ত চিঠির মধ্যে পরিবারের অনেকের ব্যক্তিগত কথাবার্তা নিশ্চয়ই আছে। তাহাদের জীবিতকালে সেগুলির প্রকাশ হয়তো তাঁহারা পছন্দ করিবেন না। সেজন্যই এই সর্ত।"

শ্রদ্ধা-বিনম্র চিত্তে এই সব দেখিলাম। এই কাঠ-কুটির (লগ কেবিন) হইতেই লিঙ্কন হোয়াইট হাউস্ বা "সাদা

বাড়ীতে" গিয়াছিলেন। এখানে তিনি ছিলেন সামান্ত মুদির দোকানের কর্মচারী।

ব্রাডশ লিঙ্কনের একজন ভক্ত। লিঙ্কন বলিতে গদ্‌গদ। বলিলেন—"লিঙ্কন অতি সামান্ত লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার ভাষা এত প্রাঞ্জল, এত সরল এবং এত মর্মস্পর্শী যে তাহার মধ্য হইতে প্রক্ষিপ্ত অংশ বাছিয়া ফেলা খুব সহজ।" কথাটি শুনিয়া আমার বিশেষ করিয়া লিঙ্কনের ছুইটি বক্তৃতাংশ মনে পড়িল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী লিঙ্কন প্রেসিডেণ্টের কার্যে যোগ দিবার জন্ত স্প্রিংফিল্ড ত্যাগ করিয়া যান। সেদিনকার বিদায়-সভায় তিনি বলিয়াছিলেন—

"২৫ বৎসরের বেশী আমি আপনাদের মধ্যে বাস করিয়াছি। এত কাল ধরিয়া আপনাদের কাছে সদয় ব্যবহার ভিন্ন অন্ত কিছুই পাই নাই। যৌবন কালে আমি এখানে বাস করিতে আসিয়াছিলাম। আজ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি এখানেই পৃথিবীর পবিত্রতম বন্ধনগুলি গ্রহণ করিয়াছি। আমার সমস্ত সন্তান এখানে জন্মিয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক জন এখানেই চিরনিদ্রায় মগ্ন।

বন্ধুগণ, আমার যা কিছু আছে এবং আমি যা কিছু হইয়াছি সবই আপনাদের জন্ত। আমার অদ্ভুত ঘটনাবহুল অতীত আজ আমার মনের মধ্যে ভিড় করিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে। আজ আমি আপনাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি। জর্জ ওয়াশিং-টনের উপর যে দুরূহ কার্য বর্তিয়াছিল আজ তদপেক্ষা কঠিন কাজের ভার গ্রহণ করিতে আমি যাইতেছি। পরমেশ্বর তাঁহার সহায় ছিলেন। পরমেশ্বর যদি আজ আমার সঙ্গে না থাকেন তবে আমি নিশ্চয়ই বিফল হইব। কিন্তু সেই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যদি আমাকে চালাইয়া লন আমি কিছুতেই বিফল হইব না, সফল হইবই। আসুন আমরা প্রার্থনা করি আমাদের পিতৃপিতামহের প্রতি প্রসন্ন ভগবান যেন আমাদিগকে ত্যাগ না করেন। তাঁহারই চরণে আমি আপনাদিগকে সমর্পণ করিতেছি। অনুরূপ সরল বিশ্বাস লইয়া আপনারাও তাঁহার দয়া আমার জন্ত মাগিয়া লউন—ইহাই আপনাদের নিকট প্রার্থনা করি।"

১৮৬৩ সনের ১৯শে নবেম্বর গেটিস্‌বার্গের রণক্ষেত্রে লিঙ্কন এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"চার কুড়ি সাত বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই মহাদেশে এক নূতন জাতির জন্ম দিয়াছিলেন। সে জাতির জন্ম স্বাধীনতায়; মানুষমাত্রই সমান অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে এই মহাভাব ছিল তাহাদের সাধনা। আজ আমরা গৃহ-যুদ্ধে ব্যাপৃত। আজ পরীক্ষা হইবে সেই জাতি অথবা স্বাধীন-তায় উদ্বুদ্ধ মানবের সমতাসাধক অনুরূপ যে-কোন জাতি পৃথিবীতে বাঁচিতে পারে কিনা? সেই গৃহযুদ্ধের একটি মহা-রণক্ষেত্রে আজ আমরা মিলিত হইয়াছি। যাঁহারা জাতিকে বাঁচাইবার জন্ত নিজেরা মৃত্যুবরণ করিল তাঁহাদের চির-বিশ্রামের জন্ত এই মহারণক্ষেত্রের একাংশ আজ আমরা উৎসর্গ করিব। ইহা আমাদের অবশ্যকর্তব্য।

কিন্তু লৌকিক আচারের কথা ছাড়িয়া দিলে এই মহারণ-ক্ষেত্রকে উৎসর্গ বা পবিত্র করিতে আমরা কে? যে জীবিত এবং মৃত বীরগণ এখানে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহারাই ইহাকে পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছেন। সে পুণ্যভূমির পবিত্রতা বাড়াইবার বা কমাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা আজ এখানে কি কথা বলিলাম পৃথিবী তাহা ভুলিয়া যাইবে। তাঁহারা এখানে যাহা করিয়া গেলেন তাহা পৃথিবী কদাপি ভুলিবে না। অতএব আসুন আমরা আজ সেই বীরগণের অসমাপ্ত কর্মে নিজেদেরই উৎসর্গ করি। যে মহাকার্যের জন্ত তাঁহারা সংগ্রাম করিয়া গেলেন আসুন তাহা সমাধা করিবার জন্ত আমরা আত্মোৎসর্গ করি। আসুন আমরা জীবন পণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করি—

যে কাজে এই বীরগণ জীবন দিলেন আমরা সেই কাজের প্রতি অনুরাগী রহিব; আমরা সঙ্কল্প করিতেছি যে যাঁহারা মরিলেন তাঁহাদের মৃত্যু আমরা বৃথা হইতে দিব না; পরমেশ্বরের অনুশাসনে এই জাতির স্বাধীনতামন্ত্রে আজ নবজন্ম হইল; এবং জনগণ কর্তৃক জনহিতে জনশাসন পৃথিবী হইতে আমরা কখনও বিলুপ্ত হইতে দিব না।"

ব্রাডশ'র সঙ্গে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। শহরে আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ৭৫০০০ লোক-অধ্যুষিত সুন্দর শহরটি দেখিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বর কাজে ব্যস্ত রহিলাম। ষ্টেট ক্যাপিটলেই আমার কাজ বেশী ছিল। প্রত্যেক ষ্টেটেই ষ্টেট ক্যাপিটলটি খুব গৌরবের স্থল। ইহা নগরের কেন্দ্র-স্থলে অবস্থিত। বড় গম্বুজ এবং বড় বড় ঘর। ষ্টেটের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মর্মরমূর্তি ইহার চারিদিকে বসানো। ষ্টেটের অতীত ইতিহাসের ছবি দেওয়ালে ঝুলানো। আইন-সভার অধিবেশন এই ভবনে হয়। সরকারের কেন্দ্রীয় আপিস-গুলি সাধারণতঃ এই ভবনে। রাষ্ট্রের স্বাধীনতার এবং মর্যাদার প্রতীক এই ষ্টেট ক্যাপিটল। স্প্রিংফিল্ডে ষ্টেট ক্যাপিটলের সদর দরজায় এব্রাহাম লিঙ্কনের দণ্ডায়মান পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপিত। এখানে যে কয়জন সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ হইল তন্মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাজেট ডিরেক্টর টি, আর, লেথ এবং রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের উইলার্ড আইস। লেথ প্রবীণ, সদালাপী এবং সদা সহাস্যবদন। নিজের বিভাগের তথ্যাদি ইঁহার নখদর্পণে। গণতন্ত্রের নিরঙ্কুশ প্রবণতা এবং কর্ম-সচিবগণের নিয়মানুবর্তিতার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা—এই দুইয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য ইঁহাতে দেখিতে পাই। এই দুইটি পরস্পরবিরোধী ভাবের সুষ্ঠু সমন্বয় ইঁহার কথাবার্তায়

লক্ষ্য করিলাম। উইলার্ড আইস যুবক, সম্পূর্ণ অন্ধ। অথচ ইনি ট্যাক্স আইনে একজন বিশেষজ্ঞ। ইঁহাদের বিবিধ ট্যাক্স সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আমার সঙ্গে রেভেনিউ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ একটি বৈঠকে মিলিত হন। তাহাতে এই অন্ধ যুবকটির আইনজ্ঞান দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিয়াছিলাম।

২৫শে ডিসেম্বর বুধবার বড়দিন। বেলা এগারটায় রেল-যোগে স্প্রিংফিল্ড ত্যাগ করিলাম। ছটায় শিকাগো আসিয়া অন্য ট্রেনে রাত আটটার সময় ম্যাডিসন নগরে পৌছিলাম। ম্যাডিসন উইস্কন্‌সিন ষ্টেটের রাজধানী। শিকাগো হইতে প্রায় ১৪০ মাইল উত্তরে। উইস্কন্‌সিন রাজ্যের বৃহত্তম নগর মিলওয়াকি পথে পড়িল।

ম্যাডিসন ছোট শহর। জনসংখ্যা ৮৫০০০। উইস্কন্‌সিন রাষ্ট্র কৃষিপ্রধান। পনির প্রস্তুত করিবার জন্য বিখ্যাত। এই রাষ্ট্রে সহস্র স্বাভাবিক হ্রদ বিদ্যমান। গ্রীষ্মকালে মৎস্যশিকারে ও প্রমোদভ্রমণার্থ এখানে বিস্তর লোকসমাগম হয়। ম্যাডিসন নগরটি এইরূপ দুইটি হ্রদের মধ্যস্থলে অবস্থিত। হ্রদ-দ্বয়ের নাম মেনোনা ও মেণ্ডোটা। মেণ্ডোটার আয়তন ২১ বর্গমাইল। মেনোনা তাহার অর্দ্ধেক। মেনোনার অদূরে ক্যাপিটল এবং অন্যান্য সরকারী ভবন। মেণ্ডোটার পারে উইস্কন্‌সিন বিশ্ব-বিদ্যালয়। আমার হোটেলটি ছিল ক্যাপিটলের খুব কাছে। নাম হোটেল লোরেন। হ্রদ-দ্বয়ের কোনটির পারেই প্রশস্ত রাজপথ নাই। তবে প্রত্যেকটির তীরেই বসিবার ও ঘুরিবার স্থান আছে। মেন্ডোটার পারে সাঁতারের ক্লাবও আছে। শীতে সব জায়গাই জনশূন্য; আশেপাশে শুধু স্তূপাকার বরফ। কিন্তু দেশের এ হিমাবগুণ্ঠিত রূপ অতীব নয়নসুখকর। বিশ্ব-বিদ্যালয়টির বেশ নাম আছে। কিছু ভারতীয় ছাত্র এখানে পড়িতেছে।

যে কয়দিন এখানে ছিলাম মেঘ বৃষ্টি ও বরফের খেলাই দেখিয়াছি। যে তাপে বরফ গলে সাধারণতঃ তাপ তার চেয়ে ১০৷১৫ ডিগ্রি নীচে থাকে। কখনও আরও নীচে নামিয়া যায়। রোদ উঠিলে ঠাণ্ডা বেশী হয়। একটু ঠাণ্ডা কমিলেই মেঘ হয় এবং বৃষ্টি বা বরফ পড়ে। বরফ তো আর গলে না, কাজেই শীত যতই প্রচণ্ড হয় ততই বরফের স্তূপ উঁচু হয়। রাস্তাগুলিকে কষ্টেসৃষ্টে চলনসই করিয়া রাখা হয়। প্রায়ই কুয়াশা ও ধোঁয়া হয়। 'স্মোক' (ধোঁয়া) এবং ফগ (কুয়াশা) কথা দুইটির সংমিশ্রণ করিয়া ইহারা নামকরণ করিয়াছে স্মগ। এখানকার বাজেট-ডিরেক্টর ই সি. গিজেল আমাকে বলিলেন, "এবার তো বরফ কম। অন্যবার অন্ততঃ হাঁটু-সমান বরফ এ সময় হয়-ই। আর আপনি সেণ্টপলে যাইতেছেন। সেখানে দেখিবেন কোমর-সমান বরফ।"

এই ষ্টেটে একটি প্ল্যানিং বোর্ড দেখিলাম। ১৯২৯ সন হইতে বোর্ডটি আছে। এত আগে স্বতন্ত্র প্ল্যানিং বোর্ড অন্য কোন রাষ্ট্রেই গঠিত হয় নাই। কিন্তু ইহার উপর রাষ্ট্রীয় সরকারের নীতির খুব বেশী প্রভাব লক্ষ্য করিলাম না। স্থানীয় সরকারগুলির উপদেষ্টা হিসাবেই ইহার কাজ সমধিক।

২৭শে ডিসেম্বর সকালে ট্যাক্স বিভাগের কমিশনার এ. ই. ওয়েগনার মহাশয়ের আপিসে যাই। তাঁহার সেক্রেটারী আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "বিশেষ জরুরী কার্যে ওয়েগনার মহাশয়ের মিনিট পাঁচেক দেরী হইবে। সেজন্য তিনি খুব দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি, আপনি তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন।"

সেক্রেটারী মহাশয়া তখন নানা বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করিলেন। বলিলেন, "দু'দিন আগে আপনাকে পাইলে আমাদের খুব সাহায্য হইত।" আমি বলিলাম—"কি ব্যাপার বলুন দেখি!"

মহিলাটি বলিলেন, "আমার ছোট বোনের এক বন্ধু ভারতবর্ষে আছেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে একটি শাড়ী বড়দিনের উপহার-স্বরূপ আমার বোনকে পাঠাইয়াছেন। শাড়ীটি পরম মনোরম। কিন্তু আমরা কেহ পরিতে জানি না। ভদ্রলোক অবশ্য শাড়ী পরিবার নিয়ম সম্বন্ধে অনেক-গুলি ফটো সহ ছাপান উপদেশাবলী ভারতবর্ষ হইতে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও আমাদের ভুল হইতেছিল। পরে এক লাইব্রেরিতে গিয়া একখানি মাসিক পত্রিকা লইয়া আসি। তাহাতে শাড়ী পরিবার নিয়ম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সহ একটি প্রবন্ধ ছিল। তাহা দেখিয়া আমরা দু'জনে মিলিয়া শেষে কৃতকার্য হই। কি সুন্দর শাড়ী! পরিবার পর আমার বোনকে অপূর্ব সুন্দরী দেখাইতেছিল। আপনাদের দেশের মেয়েরা কি সর্বদা ঐরূপ শাড়ী পরেন?"

বলিতে বলিতে মহিলাটির কণ্ঠ গদগদ হইয়া উঠিল। অচিরাগত ওয়েগনার মহাশয়ের সহিত সরকারী কর-সংগ্রহ-বিষয়ক নানাবিধ আলোচনান্তে হোটেলে ফিরিলাম।

২৮শে ডিসেম্বর শনিবার। বসুমতী হিমাবৃতা; প্রকৃতি 'স্মগে' আচ্ছন্না। বিশেষ কাজ না থাকিলে কেহ বাহিরে আসে না। বেলা দুটায় বিমানযোগে ম্যাডিসন ত্যাগ করিয়া বেলা চারটায় সেণ্ট পল বিমান ঘাঁটিতে পৌছিলাম। উপর হইতে শুধু তুষারাবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তরই দৃষ্টিগোচর হইল। রচেষ্টার নামক একটি ষ্টেশনে বিমানটি নামিয়াছিল।

ম্যাডিসন হইতে সেণ্ট-পল বিমানযোগে ২৩৩ মাইল। ইহা আমেরিকার উত্তর সীমানাস্থ মিনেসোটা রাজ্যের রাজধানী। বিমানঘাঁটি হইতে মোটরযোগে হোটেলে আসিতে এক ঘণ্টা লাগিল। গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়িতেছে। সর্বত্র বরফে ঢাকা। মিসিসিপি নদীর পাশ দিয়া আসিতেছি। নদীর জল জমিয়া গিয়াছে। নদীর নিকটেই আমার হোটেল। নাম হোটেল

লাউরী। নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকিয়া দেখি ঘরের রেডিওটি খোলা রহিয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শী কর্তৃক একটি অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসলীলার সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। বুঝিলাম শহরে একটি খুব বড় এলিভেটরে আগুন লাগিয়াছে। দশ লক্ষ বুশেল গম সহ এলিভেটারী পুড়িয়া যাইতেছে।

পর দিবস ১৯শে ডিসেম্বর রবিবার। আকাশ হইতে শেফালিকা ফুলের মত বরফ ঝরিতেছে। সর্বত্র স্তূপাকার বরফ। বিকালে বরফ পড়া বন্ধ হইল। বেশ রোদ উঠিল। কিন্তু ঠাণ্ডা খুব বেশী। পরিষ্কার আকাশে উজ্জ্বল সূর্য্য। সূর্য্যের দিকে তাকান যায় না। উজ্জ্বল রৌদ্র মনকে বাহিরে টানে। কিন্তু বাহিরে আসিলেই ঠাণ্ডায় জমিয়া যাইতে হয়। রোদের কোনই তাপ নাই; বরফ গলাইবার ক্ষমতাও নাই। বিকালের দিকে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু রাস্তায় হাঁটা যায় না। পিচ্ছিল বরফের উপর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে যে-কোন সময় পা ফস্‌কাইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। আপাদ-মস্তক নানাবিধ গরম কাপড়ে ঢাকা থাকিলেও নাক ও মুখের অনাবৃত অংশ যেন জমিয়া যায়। হোটেলের মধ্যে তাপ ৭০ বা ৭৫ ডিগ্রী। বাইরের তাপ শূন্যের উপরে কচিৎ উঠে। কখনও শূন্যের ১৭।১৮ ডিগ্রী নীচে নামিয়া যায়। বাহিরে আসিবামাত্র নাক হইতে খানিকটা স্বচ্ছ জল গলিয়া পড়িল। কোটের উপর তাহা জমিয়া শক্ত হইয়া গেল। ট্রামে প্রবেশ করিলে গলিয়া ঝরিয়া গেল। ট্রামের মধ্যে কেন্দ্রীয় তাপ ব্যবস্থা আছে। নচেৎ তাহার মধ্যে অধিকক্ষণ বসা সম্ভব হইত না। ট্রামে শহর দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

সেণ্ট পল ও মিনিয়াপলিস নামক শহর দুইটি পরস্পর-সংলগ্ন। কোথায় এক শহরের সীমানা শেষ হইয়া অন্য শহর আরম্ভ হইল তাহা বলিয়া না দিলে বুঝা সম্ভব নয়। ইহারা যমক-শহর নামে সুপরিচিত। গুরুত্বে, আকারে ও লোক-সংখ্যায় মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে শিকাগোর পরেই যমক-শহরের স্থান। শহরদ্বয় বাণিজ্যপ্রধান। লোকসংখ্যা আট লক্ষ। কাঁচা লোহা ও গম চালান দিবার কারবারই এখানকার বড় কারবার। আটা ও ময়দার বড় বড় কলও এখানে অনেক। মিন্নেসোটা রাজ্যের উত্তর প্রান্তে বড় বড় লৌহ-খনি আছে। এ অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। রাজ্যের উত্তর সীমানায় সুপিরিয়র হ্রদ। সুপিরিয়র হ্রদের তীরে ডুলুথ বন্দর। বন্দরটি যমক-শহর হইতে কিঞ্চিদধিক শত মাইল দূরে অবস্থিত। ওপারে কানাডা রাষ্ট্রের পোর্ট আর্থার নামক বন্দরে পৃথিবীর বৃহত্তম গমের আড়তসমূহ বিদ্যমান। কানাডায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর সীমানায় সুপিরিয়র হ্রদ, মিসিগান হ্রদ, হুরণ হ্রদ, ইরী হ্রদ, অণ্টেরিও হ্রদ প্রভৃতি বড় বড় হ্রদ পর পর সাজান রহিয়াছে। এই হ্রদমালা স্থানে স্থানে খালদ্বারা সংযুক্ত হইয়া সেণ্ট লরেন্স নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। সেণ্ট লরেন্স মণ্ট্রিয়ল নগরের পাদদেশ ধৌত করিয়া আটলাণ্টিকে পতিত হইতেছে। ডুলুথ ও পোর্ট আর্থার বন্দরদ্বয় হইতে এ অঞ্চলের বহু মালপত্র জলপথে দেশের ভিতরে ও আটলাণ্টিকের পথে দেশের বাহিরে রপ্তানি হয়। বন্দর হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিউ ইয়র্কের পরেই ডুলুথের স্থান। এখান হইতে মিন্নেসোটার কাঁচা লোহা বিশ্ববিখ্যাত পিট্‌স্‌-বার্গের লোহার কারখানায় প্রেরিত হয়। যমক-শহরের যাবতীয় বাণিজ্যদ্রব্য ডুলুথের পথেই যাতায়াত করে। যমক-শহর হইতে ডুলুথের দূরত্ব শতাধিক মাইল। ডুলুথে ও সেণ্ট পল-মিনিয়াপলসে বড় বড় 'এলিভেটর' আছে। এক একটি এলিভেটর লক্ষ লক্ষ মণ গম চালান দেয়। ইহারা বস্তা ব্যবহার করে না। যন্ত্রসাহায্যে রাশি রাশি গম গুদাম, গাড়ী বা জাহাজে স্থানান্তরিত করে। 'এলিভেটরে'র ব্যবহার যত বেশী হইবে পাটের চাহিদা তত কমিবে। এই হিসাবে 'এলিভেটর' পাটের প্রতিযোগী।

ট্রামে চলিতে চলিতে দু'ধারে সুন্দর সৌধশ্রেণী দেখিতেছি। আমেরিকার সমস্ত শহরের মত এই যমক-শহরও সুসজ্জিত এবং সমান ও সমান্তরাল পথশ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। রাস্তায় পথচারী নাই বলিলেই হয়। লোক ঘর হইতে বাহির হইয়া যত শীঘ্র পারে ট্রাম বা অন্য যানে আরোহণ করে। রাস্তায়, প্রান্তরে, বাড়ীর ছাদে, গাড়ীর মটকায়, গাছের নগ্ন শাখায় শুধু বরফের স্তূপ। মিউনিসিপ্যালিটির বরফ-ঠেলা গাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গাড়ীগুলির সামনে বিরাট্ পাখা। সেই পাখা দিয়া রাস্তার মধ্যস্থলের বরফস্তূপ ঠেলিয়া দিতেছে। তাহাতে রাস্তার পাশে পর্বত-প্রমাণ বরফ জমিতেছে। পরে বরফ-বাহী গাড়ী আসিয়া যন্ত্রসাহায্যে সেই বিরাট স্তূপকে উড়াইয়া গাড়ীর মধ্যে ফেলিতেছে, আর শহর হইতে দূরে লইয়া গিয়া সেই বরফরাশি রাখিয়া আসিতেছে। ট্রাম লাইনের পাশেই গত দিনকার অগ্নিদগ্ধ এলিভেটরটি দেখিলাম। বিরাট্ 'এলিভেটর'। বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া সম্পূর্ণ ভস্মীভূত অবস্থায় ইহা পড়িয়া আছে। তখনও স্থানে স্থানে আগুন জ্বলিতেছে। বরফ আগুনের মধ্যে পড়িয়া গলিতেছে। পাশে সরিয়াই আবার জমাটবদ্ধ হইয়া যাইতেছে। এইরূপে স্থানে স্থানে বহু জটাজুট সৃষ্টি হইয়াছে। নিকটেই মিসিসিপি নদী। নদীর উপর সুদৃশ্য সেতু। তাহার উপর দিয়া ট্রাম লাইন গিয়াছে। নদীর জল জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। মার্চ পর্যন্ত এই বরফ বাড়িবে। তারপর যখন এই দিগন্তবিস্তৃত বরফরাশি গলিতে সুরু করিবে তখন মিসিসিপি নদীর দক্ষিণাংশে বন্যা দেখা দিবে। এই বন্যা নিবারণ করাই টেনেসি উপত্যকা কর্তৃপক্ষের অন্যতম কর্তব্য। শহর ঘুরিয়া ফিরতি ট্রামে হোটেলে আসিলাম। তখন ৫টা বাজিয়াছে। তাপ শূন্য ডিগ্রী। রাত্রে তাপ শূন্যের ১৩ ডিগ্রী নীচে নামিয়া গেল।

৩০শে ডিসেম্বর সোমবার সকালে মিনিয়াপলিসের মিউনিসিপ্যাল আপিসে গেলাম। সেখানে শিকাগোর ১৩১৯ নং বাড়ীর পাব্‌লিক এড্‌মিনিষ্ট্রেশন সার্ভিসের কতিপয় বিশেষজ্ঞ কাজ করিতেছিলেন। নগরের শাসন-প্রণালীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধান মানসে মেয়র মহাশয় এই সমিতিকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সমিতির বিশেষজ্ঞগণ শাসনযন্ত্রের সমস্ত অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেছেন। ইঁহাদের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়া ইঁহাদের কর্মপদ্ধতি দেখিলাম। ইঁহাদের মধ্যে হেষ্টভেড্‌ নামক জনৈক ইঞ্জিনীয়ার যুবক আমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিতেছিলেন। ইঁহাকে লইয়া নিকটস্থ একটি হোটেলে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিলাম। আপিসে ফিরিবার পথে দেখি বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। পরিষ্কার নীলাকাশ। ধরণী রৌদ্রস্নাতা। উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান্‌ সূর্য্য। তাহার দিকে তাকান যায় না। কিন্তু রৌদ্রের একটুও তাপ নাই। বরফ গলাইতেও সে রৌদ্র অসমর্থ। সূর্য্যের এবংবিধ রূপ আমাদের কল্পনাতীত। আমি হেষ্টভেড্‌কে বলিলাম, "আমাদের পুরাণে আছে যে এক অসুর সূর্য্যকে শাসন করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন যে পদ্মফুল ফুটাইতে যতটা তাপ প্রয়োজন তার বেশী তাপ সূর্য্য প্রকটিত করিতে পারিবেন না। কিন্তু এদেশে দেখিতেছি সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বলতা আছে, তাপ আদৌ নাই। সূর্য্যের আর এক রূপ দেখিয়াছি নবেম্বর মাসে লণ্ডনে। ধোঁয়াটে আকাশে নিস্তেজ সূর্য্য। সে সূর্য্য রৌদ্র বিকিরণ করে না। চিত্রিত সূর্য্যের ন্যায় তাহার দিকে যতক্ষণ ইচ্ছা তাকাইয়া থাকা যায়। সূর্য্যের সে রূপ তবুও আমরা কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু এ রূপ ভাবিতেই পারি না। এ সূর্য্য আমাকে বহুবার বিভ্রান্ত করিয়াছে। ঘরে বসিয়া ভাবিয়াছি যে একটু রোদ পোহাইয়া আসি। বাহিরে আসিয়া হতাশ হইয়াছি।"

হেষ্টভেড্‌ আমাকে ক্যাপিটল ভবনে লইয়া গেলেন। সেখানে সকলের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়া তিনি স্বকার্যে ফিরিয়া গেলেন। সরকারী আপিসগুলির বেশীর ভাগ এই ভবনে অবস্থিত। কতকগুলি আপিস রাস্তার ওপারে আর একটি বাড়ীতে। দুইটি বাড়ীর মধ্যে মাটির নীচে দিয়া সুড়ঙ্গ-পথ আছে। শীতের অত্যধিক প্রকোপের জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা। এখানে ড্রিস্‌কল ও আর্লবার্গ নামক দুই জন কর্মচারী আমাকে যথাসম্ভব সহায়তা করেন। ড্রিস্‌কলের পদবী কমিশনার অব্‌ এড্‌মিনিষ্ট্রেশন আর আর্লবার্গ তাঁহার সহকারী।

পরদিনের কর্মসূচী স্থির করিয়া বৈকালে হোটেলে ফিরিলাম। ঐদিন বেশ রোদ ছিল। সকাল ন'টায় তাপ ছিল শূন্যের দশ ডিগ্রী নীচে। সর্বোচ্চ তাপ চার ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়াছিল। তখন বেলা ২টা। বৈকাল ৬টায় তাপ নামিয়া শূন্যে আসিল। রাত্রি ২টায় শূন্যের ষোল ডিগ্রী নীচে নামিয়া গেল।

বৈকালে হোটেল লাউঞ্জে বসিয়া আছি। লোকজন আসিতেছে, যাইতেছে। একটি বৃদ্ধ আমার পাশে আসিয়া বসিলেন। প্রশ্ন করিলেন—

"আপনি কোন্‌ দেশের লোক ?"

আমি—"ভারতবর্ষের"

বৃদ্ধ—"ইংরেজ কি আপনাদিগকে স্বাধীনতা দানে কৃতকার্য হইবে ?"

কথাটা কানে ঠেকিল। একটি ইংরেজী প্রবাদবাক্য আবৃত্তি করিলাম—"ইচ্ছা থাকিলে উপায় হইবেই।"

বৃদ্ধ—"আমাদের ভারতবর্ষে কোন স্বার্থ নাই। কাজেই ওদেশের খবর বিশেষ রাখি না। চীনে আমাদের কিছু স্বার্থ আছে। কাজেই চীনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ উদ্বেগ আছে।"

আমি—আমরাও গত যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকার বিশেষ খবর রাখিতাম না। অবশ্য জর্জ ওয়াশিংটন ও এব্রাহাম লিঙ্কনের নাম অনেকেই জানিতেন।"

বৃদ্ধ মিনেসোটার হ্রদমালার সৌন্দর্য এবং আকর্ষণের কথা বলিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ উঠিয়া গেলে ভাবিলাম এমন কাট-খোট্টা কথাবার্তা এদেশে তো কাহারও কাছে শুনি নাই। বৃদ্ধের কথার মধ্যে ঘৃণাও নাই, প্রীতিও নাই। ভারতবর্ষ ও ইংরেজ-শাসন সম্বন্ধে এখানে ওখানে দু-একটি কথা শুনিয়া তাহার মনে যেটুকু দাগ লাগিয়াছে তাহাই সরলভাবে প্রকাশ করিলেন মাত্র।

বাসন্তী ঘৃত
বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত
টেলিঃ—বাসন্তী ঘি ফোন—বি,বি, ৫৭৩৮ পোঃ বক্স ৬৮৩৬ কলিঃ

ঘি, সুগারমার্চেন্টস, একস্‌পোর্টারস্‌, ইম্পোর্টারস্‌ ও
জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারস্‌
প্রমথনাথ পাল এণ্ড সন্স্‌
২সি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা—৭

বাংলার বাচ

শ্রীশান্তি পাল

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষ জলকে জয় করিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। সেই সুদূর অতীত হইতে জলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য মানুষ কত রকমের জলযান আবিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে তাহার সীমা-পরিসীমা নাই। নদীমাতৃক বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বাংলাদেশের মাঝিমাল্লারা আগেকার দিনে যে সেই সকল জলযানে আরোহণ করিয়া দেশ-বিদেশে যাতায়াত করিত এ তথ্য আমরা বহু প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে পাই।

সেকালের নাবিক বা মাঝি-মাল্লাদের ভিতর যে রীতিমত পাল্লা দেওয়া চলিত তাহার অনেক প্রমাণ পুথিপত্রে আমরা পাই। এই বাচখেলার ভিতর দিয়া বাংলাদেশের ভদ্র-ইতর নির্ব্বিশেষে সকলেই শক্তিচর্চ্চা বা শরীরচর্চ্চা করিত। জনসাধারণও ইহা হইতে প্রচুর আমোদ উপভোগ করিত। তাই এক সময়ে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে পাল-পার্ব্বণে বাচ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইত।

ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া গ্রামের বাচ-প্রতিযোগিতার বিবরণ হইতে পূর্ব্ববঙ্গের বাচ সম্পর্কে অনেক কিছু জানিতে পারি। ঐ অঞ্চলের বাচের বিশেষত্ব এই যে, এখানকার বৃহদাকারের বাচের নৌকাগুলিতে একসঙ্গে পঞ্চাশ-ষাট জন মাঝি বৈঠা হাতে শ্রেণীবদ্ধভাবে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নৌকা বাহিতে পারে। সেই সকল বাচ নৌকার গলুই পনর হইতে কুড়ি হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এখানে অনেক সময় নৌকার মালিকের নামানুসারে নৌকার নামকরণ হইয়া থাকে। যথা—শুখিয়ামধু, বুখিয়ামধু, বাসের-নাও ইত্যাদি। কোটালীপাড়ার বাচ-প্রতিযোগিতায়ও বাংলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এক এক বাচ-দৌড়ে সাধারণতঃ দশ-বারখানি নৌকা যোগদান করিত, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

কোটালীপাড়ায় সাধারণতঃ দুই প্রকার বাই-নৌকা বা বাচারী নৌকা ব্যবহৃত হয়। ইহার একটিকে প্রকৃত বাচারী ও অপরটিকে জেলে-বাচারী বলে। বাচ-বাচারী ও জেলে-বাচারীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, বাচ-বাচারীর গলুই কিঞ্চিৎ লম্বাটে ধরণের এবং ইহার গঠনসৌষ্ঠবও অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের।

নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত ঘৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার "শ্রী" মার্কা ঘৃতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিষ্প্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 'শ্রী' ঘৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ঘৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ ঘৃত যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা ঘৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

জেলে-বাচারীর গলুই ছোট এবং গঠনসৌষ্ঠব বাচ-বাচারীর তুলনায় অনেকাংশে হীন। বাচ-বাচারী অনেকটা ছিপের মত আকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ দীর্ঘ ছাঁচের তৈয়ারী। জেলে-বাচারীর গঠনপ্রণালীর বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে তরার দিকটা কিঞ্চিৎ ফাঁক থাকে। কারণ, এই নৌকাগুলি এমনভাবে তৈয়ারী যে, ইহাতে বাচখেলা ও মাল বহন দুই কাজই সম্পন্ন হইতে পারে; অর্থাৎ বাচের সময় বাচখেলা এবং অন্য সময় মহাজনী নৌকার মত ব্যবহার করা চলে। বাচারীর গলুই অতিশয় লম্বা ধরণের হওয়ায় তাহা জেলে-বাচারীর মত জলপথে দৈনন্দিন ঘর-সংসারের কাজকর্ম্ম চালাইবার উপযোগী নহে, তবে কোন কোন স্থানে ঐ ধরণের নৌকায় ধান বোঝাই করিয়া আনিতে দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রকৃত বাচারী নৌকাগুলি সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ হইতে ষাট হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই 'হাতে'র মাপ কিন্তু সাধারণ হাতের মাপ হইতে কিঞ্চিৎ বেশী। ছোট আকারের বাচারী অর্থাৎ জেলে-বাচারীগুলি সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে পনর হইতে কুড়ি হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই শ্রেণীর নৌকাগুলিকে সময় সময় বাচ-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেও দেখা যায়। বড় নৌকাগুলিতে পঞ্চাশ-ষাট জন মাঝি আরোহণ করে। আরোহীদের ভিতর সকলেই নৌকার দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধভাবে হাতবৈঠা লইয়া বসে। নৌকার মাঝখানে মালিক ও মোড়লশ্রেণীর পাঁচ-সাত জন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া থাকেন এবং টিকারা ও কাঁসরের তালে তালে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাচিয়া নাচিয়া ও নিজেদের রচিত গান গাহিয়া মাঝি-মাল্লাদের উৎসাহিত করেন। বৃহৎ বাচারীর আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, বাচের সময় তাহাতে দুই জন করিয়া মাঝি হাল ধরিয়া থাকে। গ্রামের ওস্তাদ ও পুরাতন মাঝিরাই এই হাল ধরার কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কারণ বাচের সময় নিপুণতার সহিত হাল না ধরিতে পারিলে বিশেষ বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে।

নদীবক্ষ বিস্তৃত হইলে বাচের সময় একসঙ্গে আট হইতে দশখানি নৌকা ছাড়া হয়। কিন্তু নদীর বুক অপরিসর হইলে তিন-চারিখানির বেশী একসঙ্গে ছাড়া হয় না। পূর্ব্বে কোটালীপাড়ায় বহুস্থানে বাচ খেলা হইত। উৎসাহের অভাবে এবং নানারূপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় ইদানীং অনেক স্থানে বাচের রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে। তবে এখনও বিশ্বকর্ম্মা পূজা, শারদীয়া ষষ্ঠীপূজা, দশহরা অর্থাৎ বিজয়া দশমীর দিন এবং লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে চৌধুরীর হাট, ঘাঘর, বাহির শিমুল, রাধাগঞ্জ বুরুয়া, বিলবাধিয়া প্রভৃতি স্থানে নামমাত্র বাচ-খেলা

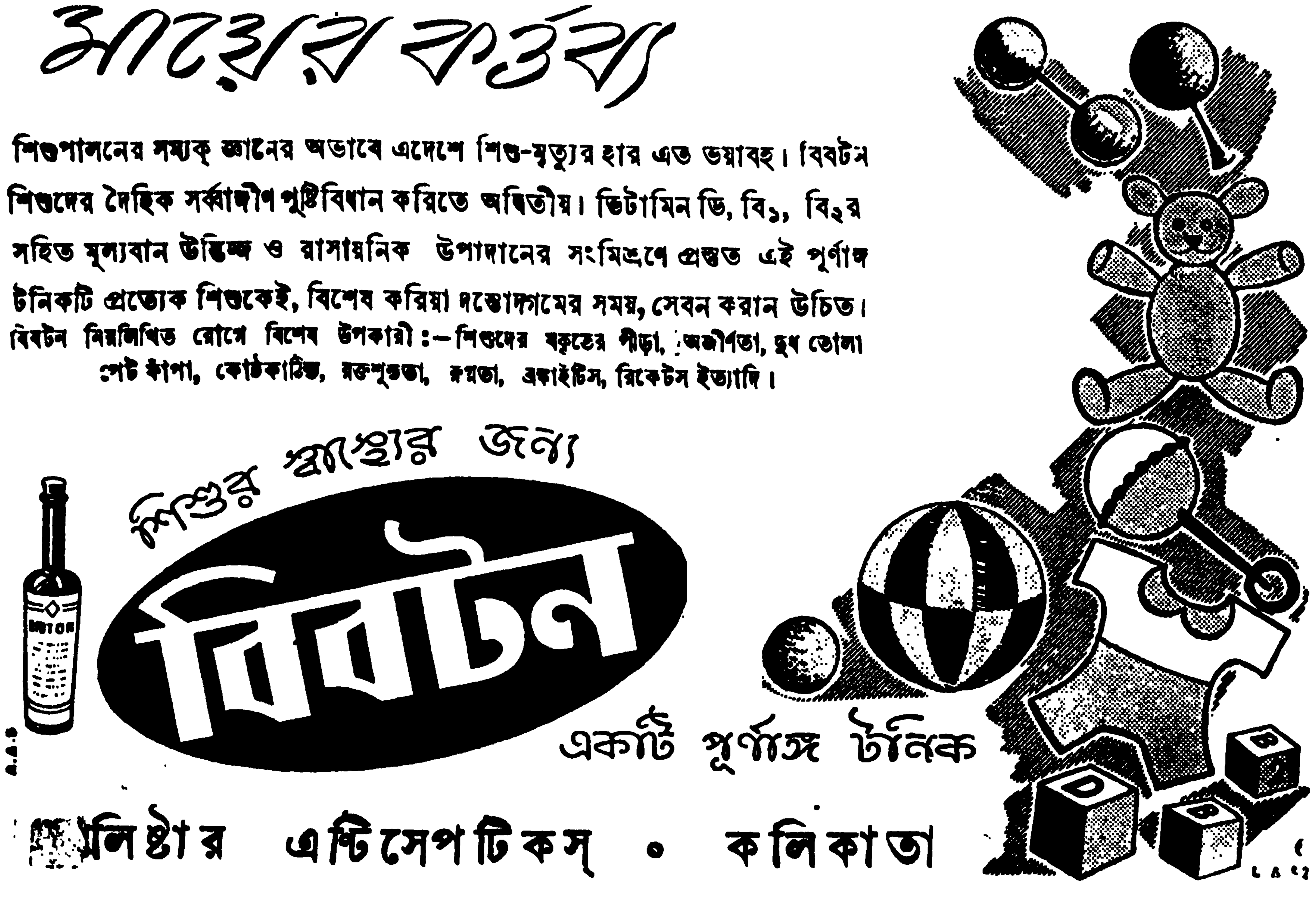

"মধ্য দিনে যবে গান বন্ধ করে পাখী"

গ্রীষ্মের খররৌদ্রে যখন পাখী পর্য্যন্ত তার গান বন্ধ করে, গাছপালা কালবৈশাখীর ক্ষণবর্ষণের প্রতীক্ষায় ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকে, মাঠের বুক ফেটে বেরোয় পৃথিবীর তপ্তশ্বাস—তখন মানুষের দেহেও লাগে তার দহনের জ্বালা।

গ্রীষ্মে মানুষের দেহের রসও শুকিয়ে আসে, তাই তার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা ক'মে যায়,—দেখা দেয় উদরাময়, কলেরা প্রভৃতি পীড়া ও মহামারী।

এ সময়ে আপনার দরকার **কুমারেশ**। কারণ **কুমারেশ** আপনার লিভারকে সবল করে, নূতন রক্তকণিকা-গঠনে সাহায্য করে এবং সর্ব্বোপরি আপনার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়।

কুমারেশ লিভার ও পেটের যে কোন পীড়া নিশ্চিত আরোগ্য ত করেই সঙ্গে সঙ্গে যে কোন রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও দেয়।

কুমারেশ

দি ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ

সালকিয়া ঃঃ হাওড়া

হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ঐ সকল গ্রামে রঙ্গস্থলে পঞ্চাশ-ষাটখানি নৌকার সমাবেশ হইত। এখন পাঁচ-সাতখানির বেশী হয় না। কোটালীপাড়ায় বাচ-নৌকা এক রকম নাই বলিলেই চলে। দশ-বার বৎসর পূর্ব্বে সেখানে অন্যূন ছোটবড় চল্লিশ-পঞ্চাশখানি বাচ-নৌকা বা বাচারী একত্র দেখা যাইত। উৎসবক্ষেত্রেও যেরূপ জনসমাগম হইত এখন তাহার এক-অষ্টমাংশও হয় কিনা সন্দেহ। সবই যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। কোটালীপাড়ার এ বিষয়ে এমন অবনতি হইয়াছে যে এখন সারা গ্রাম ঢুঁড়িলে সাত-আটখানির বেশী জেলে-বাচারী পাওয়া যাইবে না।

বাচের সময় অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এখানেও মাঝিরা নানাপ্রকার গান গাহিয়া থাকে। তন্মধ্যে ব্রজলীলা সম্বন্ধীয় গানেরই প্রচলন বেশী। বাচ-নৌকা যখন মালিকের ঘাট হইতে রঙ্গক্ষেত্রের দিকে রওনা হয়, যখন গ্রাম-বধূরা বরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তখন এই গানটি কাঁসার তালে তালে গীত হয়।

"কয় নীলমণি, ও জননী!
সাজাইয়া দাও গোষ্ঠে যাব আমি।
যাব গোচারণে রাখাল সনে
বলাই দাদা শিঙের দিচ্ছে ধ্বনি।
দে মা! মোহন বাঁশী মোহন চূড়া
কটিতে মা বাঁধ পীতধরা—
দেও মা পায়ে নূপুর, হাতে বলয়
রাখালবেশে সাজিয়ে দেও তুমি
(শোন মা!) গাভী বৎস রাখালগণে
সবাই চেয়ে আছে আমার পানে
আমি না গেলে মা, গোচারণে—
ধেনুগণ খায় না তৃণ-পানি।"

আড়ঙে অর্থাৎ রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া এবং দুই-তিন ক্ষেপ বাচ টানিবার পর বাচ-ক্ষেত্রের দুই ধার দিয়া নৌকা ধীরে ধীরে চালাইবার সময় তাহারা কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা শ্রীমতীর মর্ম্মবেদনাদ্যোতক গান গাহিয়া থাকে।

তারপর যখন বাচ খেলা শেষ হইয়া যায়, যখন গৃহাভিমুখে ফিরিবার জন্য মাঝিরা প্রস্তুত হয়, তখন এই গানটি গাহিতে থাকে—

"বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল
কানাই এবার গৃহে ফিরে চল।
ওই দেখ গগনেতে নাহি আর বেলা
গোষ্ঠের খেলা খেলবে কত বল?

দুর্লভ নয় মোটেই—

তনুদেহের পেলব কোমলতা ও লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য সুষমা প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কাম্য-বস্তু রূপের এই ঐশ্বর্য্য। প্রাক্‌বৈজ্ঞানিক যুগে নারীর পক্ষে এ সম্পদ দুর্লভ ছিল বটে, কিন্তু একালে 'ক্যাল-কেমিকো'র সযত্নে প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্য্যকে প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে।

বিউটি মিল্ক
রেণুকা টয়লেট পাউডার
লাবণী স্নো এবং ক্রীম

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

ডেকে বলে বলাই ও নীলমণি
তোর লাগিয়া কাঁদিছে জননী
চল রে সকাল সকাল গৃহেতে যাই
গোঠের খেলা সাঙ্গ হ'ল।"

শেষে নৌকা মালিকের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলে, বাচ-খেলোয়াড়রা বাই-নৌকা হইতে নামিয়া গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে। কোটালীপাড়ায় মাঝি-মাল্লাদের ভিতর এখনও পর্য্যন্ত এই প্রথা বজায় রহিয়াছে। এখানকার বাচখেলায় যারা অগ্রণী তন্মধ্যে সূর্য্যকান্ত হাজরা, অধরচন্দ্র বাড়াই—প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলমানদের কোন বাচারী-নৌকা কোটালী পাড়ায় আর বড় একটা দেখা যায় না। তাহারা দুই তিন বৎসর হইতে আর প্রতিযোগিতায় যোগদানও করে না।

মুর্শিদাবাদ বা অন্যান্য জেলায় বাচখেলার সময় 'জারি' গান গাওয়া হয়।

ঢাকা অঞ্চলে বাচখেলার সময় যে সকল গান গাওয়া হয় তাহার একটি নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল। বাচ-খেলায় হারিয়া গেলে মাঝিরা এই ধরণের করুণরসাত্মক গান গাহিয়া থাকে—

"নিমাই সন্ন্যাসের কথা মায় যেন শোনে না,
আমি যাবো ঐ বৃন্দাবনে, আমার মা যদি শোনে
শুনলে পরে শচীরাণী বাঁচবে না প্রাণে।
আমি মায়ের একা পুত্রধন—
আমি বিহন মায়ের এ সংসার সং-সারের জীবন।
আমার মায়েরে তোমরা করো সান্ত্বনা।"

খুলনা বরিশাল অঞ্চলে বাচের সময় যে ধরণের 'জারি' গান গাওয়া হয় তাহারও যৎকিঞ্চিৎ নমুনা দিলাম। নৌকা ছাড়িবার পূর্ব্বে মাঝিরা এই গান গাহিয়া থাকে—

"গুরুমান পথ চেন কেন বেড়াও ঘুরে
হাট করতে এসেছ বান্দা ভবের হাটুরে।
ভবের হাটে এসে বান্দা বেচ কেন খাও
আলিস্তি কর না বান্দা আল্লার নাম নাও।"

এইবার আমরা কলিকাতার উপকণ্ঠের পল্লী অঞ্চলের আধুনিক বাচের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্বে আমরা বালি, উত্তরপাড়া, বরাহনগর, বেনিয়াটোলা, আহিরীটোলা, বাগবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের বাচ-সম্বন্ধে বিষয় মোটামুটিভাবে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আড়িয়াদহের প্রসিদ্ধ বাচ সম্পর্কে

কৃত্তিবাস রচিত

সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

স্বনামধন্য ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
সুবিখ্যাত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট
অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশবর্জিত মূলগ্রন্থ অনুসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় সুসম্পূর্ণ! ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আঁকা রঙীন ষোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি আছে। রঙীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিত্রশালা হইতে সংগৃহীত ছবির অনুলিপি। অন্যান্য বহুবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বর্ম্মা, নন্দলাল বসু, সারদাচরণ উকীল, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর, অসিতকুমার হালদার, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র দে প্রভৃতির সুনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত।

জ্যাকেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইণ্ডিং মূল্য ১০॥০, প্যাকিং ও ডাকব্যয় ১৲

প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নম্বরসহ সত্বর আবেদন করুন! এই সুযোগ সর্বপ্রকার দুর্ম্মূল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না।

প্রবাসী কার্য্যালয়—১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকদের গোচরীভূত করিতেছি। এখানে একটি কথা বলা দরকার। বাংলা-সাহিত্যে বাংলার বাচ সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে বড় একটা আলোচনা হয় নাই। ইহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস আজও পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই।

১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মাহেশের রথ উপলক্ষে আড়িয়াদহের পরলোকগত রায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয় পান্‌সীতে করিয়া শ্রীরামপুর বেড়াইতে যান। তথায় গিয়া তিনি চাপদানির জমিদারের সহিত মিলিত হইলে পর উভয় পক্ষের নৌকার মাঝিদের ভিতর এক প্রীতি-প্রতিযোগিতার কথাবার্ত্তা হয়। বলা বাহুল্য, তাঁহারা ইহা সমর্থন করেন এবং নিজ নিজ পক্ষের মাঝিমাল্লাকে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহিত করেন। তাঁহারা এই ঘটনা হইতেই এখানে প্রতি বৎসর মাহেশের মেলায় আসিয়া প্রতিযোগিতার সূত্রপাত করেন। এই দুই ব্যক্তি মহা আড়ম্বরের সহিত নৌকা-'প্রতিযোগিতা অর্থাৎ বাচখেলা চালাইতেন। প্রতিযোগিতায় জয়ী হইবার জন্য উভয় পক্ষই প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নিজ নিজ এলাকার শক্তিমান্ মালা জাতীয় লোকদিগকে হাল ও দাঁড়ে নিযুক্ত করিতেন। কখনও কখনও নিজেদের বশবর্ত্তী হইয়া জমিদারদ্বয় নৌকা বাজি রাখিয়া খেলা চালাইতেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া আড়িয়াদহের স্বর্গগত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রামস্থ ভদ্রযুবকদিগকে ঐ খেলায় তালিম দিতে লাগিলেন। তিনিও অল্প দিনের মধ্যে একটি নূতন দল গঠন করেন। কিছুদিন অভ্যাসের পর সেই নূতন দলের ভিতর কেহ হাল ধরায়, কেহ বা দাঁড় টানায় বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইহাই আড়িয়াদহ বাচ-সঙ্ঘের জন্ম কথা।

আড়িয়াদহ, বালি, উত্তরপাড়া, বরাহনগর, চাতরা প্রভৃতি স্থানে নদীবক্ষে যতবার বাচ খেলা হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আড়িয়াদহের যুবকেরা জয়ী হন। ১৯১০ সনে আড়িয়াদহ 'রোয়িং-ক্লাব' সর্ব্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত হয়। আড়িয়াদহ রোয়িং ক্লাবে দাঁড় টানায় ও হাল ধরায় যাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতারণ ভট্টাচার্য্য, নৃত্যগোপাল ঘোষাল (হালি), দাশরথি কর, হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল রোয়িং এ্যাসোসিয়েশন'-এর সৃষ্টি হওয়ার পর 'লীগ' খেলা আরম্ভ হয়। আড়িয়াদহ ক্লাবের সভ্যেরা বহুবার এই লীগ-প্রতিযোগিতায় জয়ী হন। উক্ত অনুষ্ঠানের কিছুকাল পরেই 'ট্রফী' খেলাও সুরু হয়। ইহাতেও আড়িয়াদহ বহুবার জয়লাভ করে। ১৯৩৭-৩৮-৩৯ উপর্য্যুপরি এই তিন বৎসর লীগ ও ট্রফীতে জিতিয়া আড়িয়াদহ রেকর্ড সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়—এরূপ রেকর্ড ইতিপূর্ব্বে আর কোন ক্লাব করিতে পারেন নাই। যাঁহারা চ্যাম্পিয়ানশিপ বা বিজয়ী বীর আখ্যা লাভ করিবার সময় দাঁড়ী ও হালী ছিলেন তাঁহাদের নাম—শ্রীযুক্ত তারাপদ কুণ্ডু (হালী); নিরঞ্জন দাস (সোয়ার) অনন্তদেব ঘোষাল, বলাইলাল ভট্টাচার্য্য, তারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, কালীচরণ দাস, বৈদ্যনাথ পাল, বলাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের দেশে পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে বাচখেলা সাধারণতঃ বৈঠার সাহায্যে সম্পন্ন হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বাঁধা-দাঁড়েও বাচখেলা হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পূর্ব্ববঙ্গের বাচ-নৌকাগুলি আসলে ছিপ নৌকা। ইহার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ-ষাট হাত পর্য্যন্ত। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ পল্লীসমূহে বাঁধা-দাঁড়ে বাচ-খেলা হইয়া থাকে। ইহাদের বাচ-নৌকাগুলি অনেকটা পান্‌সীর আকারে নির্ম্মিত। ইহাতে ছয়খানি দাঁড় থাকে। এই পদ্ধতিতে দাঁড় টানিবার সময়ও দেহের সমস্ত ভার ও শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়। এই পদ্ধতিতে বিশেষ করিয়া কব্জি, বাহু, কাঁধ, কটি ও বুকের পেশীগুলি বেশী ক্রিয়াশীল হয়।

বাচ-খেলায় জয়লাভ দাঁড় ক্ষেপণের কৌশলের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। হাত, বাহু, কাঁধ প্রভৃতি দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ চালনারও অনেক নিয়ম আছে। এ সম্বন্ধে বিদেশী পদ্ধতি প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য। দাঁড় ক্ষেপণ কিরূপে সুষ্ঠু ভাবে করা যাইতে পারে—কেমন করিয়া নিরর্থক ক্লান্তির হাত এড়ানো যাইতে পারে তাহা কিছুদিন দাঁড় চালনা অভ্যাস করিলে দাঁড়ীরা নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন। দাঁড় ক্ষেপণই হোক আর হাল ধরাই হোক, যতদূর সম্ভব সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন দলের দাঁড়ীদের দাঁড়টানা-পদ্ধতি তাঁহাদের বিপক্ষদলের দাঁড়ীমাঝি অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও কেবল সামঞ্জস্যপূর্ণ দাঁড় ফেলার জন্য তাঁহারা জয়ী হইয়াছেন। হাল ধরার উপরেও অনেকাংশে জয়-পরাজয় নির্ভর করে।

বাচখেলায় যে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগের সুযোগ পাওয়া যায়, তাহা একমাত্র সন্তরণ ছাড়া আর কোন খেলায়ই পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সকল দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবিদের অভিমত এই যে, নৌচালনা একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ইহা সন্তরণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। নদীবহুল বাংলা দেশে বাচ খেলার কদর যে হ্রাস পাইতেছে, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। এই নির্দ্দোষ ক্রীড়ার অনুষ্ঠান যাতে দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় সে বিষয়ে দেশহিতৈষী মাত্রেরই অবহিত হওয়া উচিত।

পুস্তক-পরিচয়

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড) —শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। পৃ. ৩২+২৫২ শ্রীভারতী পাবলিশার্স, ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ষোলখানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য চারি টাকা আট আনা।

এই গ্রন্থখানি পুরাতন "অমৃত বাজার পত্রিকা"র ফাইল হইতে নির্ব্বাচিত অংশের সঙ্কলন। বর্ত্তমানে "অমৃত বাজার পত্রিকা" একখানি সুপরিচিত ইংরেজী দৈনিক পত্র। কিন্তু প্রথমে ইহা ছিল একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র। মুখ্যতঃ রাজনৈতিক সংবাদপত্র হইলেও ধর্ম্ম, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভাষা, সাহিত্য ও দেশের উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত নানা সভা-সমিতি বিষয়ক বহু আলোচনা ইহাতে হইত। অমৃত বাজার পত্রিকার প্রথম তিন বৎসরের বিভিন্ন সংখ্যায় এই সমুদয় বিষয়ে যে সকল আলোচনা ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে সঙ্কলন করিয়া যোগেশবাবু এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।

প্রথম খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা সংকলিত হইয়াছে :—(১) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ; (২) সিবিল সার্বিসে ভারতবাসী ; (৩) বিচার ও শাসন ; (৪) মামলা-মকর্দ্দমা ; (৫) রাজনৈতিক সভাসমিতি, (৬) হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা ; (৭) জমিদার ও জমিদারী ; (৮) জনসাধারণ ও মধ্যবিত্ত ; (৯) কৃষি ও বাণিজ্য ; (১০) মুসলমান সমাজ ও রাজনীতি ; (১১) হিন্দুসমাজ সংস্কার ; (১২) ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ ; (১৩) কেশবচন্দ্র সেন। এই সমুদয় বিষয়ের আলোচনা পৃথকভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং প্রতি উদ্ধৃত অংশের শেষে পত্রিকার যে সংখ্যায় উহা বাহির হইয়াছিল তাহার তারিখ দেওয়া আছে। ইহা ব্যতীত পরিশিষ্টেও কতকগুলি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে।

এইরূপ গ্রন্থ বাংলাদেশে সম্পূর্ণ নূতন না হইলেও খুব বেশী নাই। সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" নামক গ্রন্থে এই ধরণের আলোচনা বঙ্গসাহিত্যে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। গ্রন্থকার কেন কেবলমাত্র অমৃত বাজার পত্রিকা হইতে সঙ্কলন করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন তাহা গ্রন্থের প্রথমেই "পূর্ব্বাভাষ" নামক ভূমিকায় সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অমৃত বাজার পত্রিকার সাহায্য যে খুবই মূল্যবান গ্রন্থকার তাহা বিশদভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন যে, "শিশিরকুমার ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথপ্রদর্শক।" তৎকালে "সমাচার চন্দ্রিকা"ও লিখিয়াছেন যে, "নিরপেক্ষভাবে স্বাধীনতা প্রদর্শন ও দেশের প্রকৃত স্বাধীনতার চেষ্টা অমৃত বাজারের ন্যায় কোন পত্রিকায়ই দেখা যায় না।" বস্তুতঃ ভারতবাসীর অবনতির মূলে যে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই যে উন্নতির একমাত্র উপায় নানা ভাবে তাহা প্রতিপন্ন করাই ছিল ঐ পত্রিকার মূল নীতি। আর সেকালে অমৃত বাজারই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা প্রগতিশীল পত্রিকা। সুতরাং গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন যে, "আমাদের সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলমুক্তির সম্ভাবনার কথা তখন কিরূপে বাঙালীর মনে উৎসারিত হয় ইহাতে তাহার সূত্র মিলিবে।"

এই শ্রেণীর গ্রন্থ ঐতিহাসিক উপাদানের সংগ্রহ হিসাবে যে বহু মূল্যবান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালীর—এমন কি উচ্চশিক্ষিত বাঙালীরও—জ্ঞান অতিশয় অল্প। এই যুগের যে ইতিহাস আমরা জানি তাহা প্রধানতঃ ইংরেজরাজের ইতিহাস। কিন্তু এই শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে যে সমুদয় গুরুতর পরিবর্ত্তনের ফলে আমরা মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগে উপনীত হইয়াছি তাহার ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই—এবং ইহার মূল কথাগুলিও অনেকের নিকট অজ্ঞাত। অথচ আমাদের জাতীয় জীবনের বিবর্ত্তন বুঝিতে হইলে ইহার সহিত সম্যক্ পরিচয় থাকা দরকার। সম্প্রতি আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিতে বা বুঝিতে হইলেও ইহার মূলসূত্র ঐ যুগেই খুঁজিতে হইবে। কেবল অতীতের কথা নহে, ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় শক্তি কোন্ দিকে চালিত হইবার সম্ভাবনা বা হওয়া কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলেও জাতীয় জীবনের ঐ গোড়ার কথা জানা আবশ্যক। সুতরাং বঙ্গের তথা ভারতবর্ষের—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃত ইতিহাস যাহাতে আমরা জানিতে পারি তাহার জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু বহু আয়াস স্বীকার করিয়া যে গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, এই প্রকার ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপকরণ হিসাবে তাহা চিরদিনই আদৃত হইবে। বস্তুতঃ এই প্রকার উপকরণ বহুল পরিমাণে সংগৃহীত না হইলে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভবপর হইবে না।

আলোচ্য গ্রন্থে যে সকল সঙ্কলন স্থান লাভ করিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা সম্ভব নহে। তবে 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা' শীর্ষক অধ্যায়ে যে সকল উক্তি ও মতবাদ সংগৃহীত হইয়াছে বর্ত্তমানকালে তাহা পাঠ করিয়া অনেকেই আমাদের দেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্ব হইতেই রাজনৈতিক চিন্তার ধারা কোন্ পথে প্রবাহিত হইতেছিল তাহার সন্ধান পাইবেন। সিপাহী বিদ্রোহ (৪০ পৃঃ) ও ভারতে ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্ব (৪৫ পৃঃ) সম্বন্ধে ১৮৭০ সালে অমৃত বাজার পত্রিকায় যে সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল অতি আধুনিক কালের পূর্ব্বে তাহার সম্ভাবনাও আমরা কল্পনা করি নাই। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হিন্দুদিগকে জব্দ করিবার জন্য কিভাবে মুসলমানদের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কিছু আভাসও ১৮৭০ সালের পত্রিকায় পাওয়া যায় (১৭৪ পৃঃ)। সকলেই জানেন যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরও বহুদিন পর্য্যন্ত কেবল ছোটখাট শাসন-সংস্কারই ইহার প্রধান আবেদনের বিষয় ছিল। কিন্তু ১৮৭০ সালেই পত্রিকায় "ভারতবর্ষের স্বাধীন শাসন-প্রণালীর সূত্রপাত হিসাবে প্রতিনিধি সভা স্থাপনের প্রস্তাব অনেক যুক্তি তর্ক দিয়া সমর্থিত হইয়াছে" (৫৭ পৃঃ)। রাজনৈতিক সভা-সমিতি শীর্ষক অধ্যায়ে যে সমুদয় সঙ্কলন আছে তাহা হইতে আমরা সংঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক আলোচনার একটি সমসাময়িক চিত্র দেখিতে পাই। "হিন্দুসমাজ সংস্কার" অধ্যায়েও অনেক নূতন তথ্য আছে (১৮৩ পৃঃ)। আর অধিক দৃষ্টান্ত দেখাইবার প্রয়োজন নাই। এযাবৎ যাহা বলিয়াছি আশা করি তাহা হইতেই আলোচ্য গ্রন্থের প্রকৃতি ও প্রয়োজন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভবপর হইবে। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি ও দ্বিতীয় খণ্ড যাহাতে শীঘ্রই প্রকাশিত হয় তাহার জন্য গ্রন্থকারকে বিশেষ অনুরোধ করি।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

মহিলাদের লিখিত গল্পের জন্য তিনটি পুরস্কার ১৫৲, ১০৲ ও ৫৲।

মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে ছাত্রীদের লিখিত প্রবন্ধে দুইটি পুরস্কার ২০৲ ও ১৫৲।

১১০০ কথার ভিতরে বৈশাখের মধ্যে লেখা চাই।

ঠিকানাঃ 'বঙ্গলক্ষ্মী' (প্রতিযোগিতা)

২৩।১, বালিগঞ্জ ষ্টেশন রোড, কলিকাতা।

বাংলা সাময়িক-পত্র—(১৮১৮-১৮৬৮)। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, নূতন সংস্করণ, মাঘ ১৩৫৪। মূল্য পাঁচ টাকা।

এই অধুনা-প্রখ্যাত পুস্তক ১৩৪২ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। নাটক, নভেল ও কবিতায় পরিপ্লাবিত দেশে বার বৎসরের মধ্যে এই শ্রেণীর পুস্তকের দুইটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া নূতন সংস্করণের প্রকাশ অভাবনীয় না হইলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত করিতেছে। কেবল সুধীসমাজ নহে, সাধারণ পাঠকও যে ইহার সমাদর করিয়াছেন, তাহা আনন্দের বিষয়।

ইহার একটি কারণ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা সাময়িক-পত্রের প্রসারের যে ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে, তাহার সংযত, প্রামাণ্য ও ধারাবাহিক বৃত্তান্ত এই পুস্তকই প্রথম বাঙালী পাঠকের গোচরে আনিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এই বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তৎকালীন পত্রিকাগুলির পুরাতন ফাইলে যে ঐতিহাসিক উপাদান বিক্ষিপ্ত ও দুষ্প্রাপ্য অবস্থায় ছিল, উৎসাহী কর্ম্মীর অভাবে তাহার সম্পূর্ণ অনুসন্ধান হয় নাই। এরূপ অনুসন্ধানের জন্য যে ধৈর্য্য, পরিশ্রম, ও যত্নের আবশ্যক তাহা এখনও বাংলাদেশে সুলভ নয়। ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু অভিজ্ঞ ও সাবধানী গবেষক নহেন, তাঁহার অনুরাগ ও অধ্যবসায় অনন্যসাধারণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তিনি একাই একটি জীবনে যাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে তাঁহার একনিষ্ঠ ঐতিহাসিক সাধনার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য উপকরণ সংগ্রহ হিসাবে তাঁহার অন্যান্য মিতভাষী ও তথ্যবহুল বহু গ্রন্থের মত বর্ত্তমান গ্রন্থও যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পরিচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া বাহুল্যমাত্র।

বর্ত্তমান সংস্করণের শুধু এইটুকু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক যে, ইহাতে অনেকগুলি নূতন পত্র-পত্রিকার বিবরণ সংযোজিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশিত সাময়িক-পত্রগুলির বিবরণ ছিল, এবার তাহা আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে—১৮৬৮ এপ্রিল পর্য্যন্ত।

শ্রীসুশীলকুমার দে

জেলে ত্রিশ বছর—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

এই পুস্তক "যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, বীরত্ব দেখাইয়াছেন, অত্যাচার-নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন, দেশবাসী যাঁহাদের নাম জানে না, সেই সব অজ্ঞাতনামা বীর দেশপ্রেমিকের উদ্দেশ্যে" উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী এইরূপ উৎসর্গ করিবার যোগ্যতম ব্যক্তি, কেননা তাঁহার জীবনের কাহিনী ঐরূপ জলন্ত ও নিষ্কাম দেশপ্রেমের অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আজিকার পেশাদারী দেশ-প্রেমের দিনে, যেখানে চতুর্দ্দিকে স্বার্থান্বেষী ভণ্ড তথাকথিত "ত্যাগীদিগের" চক্রান্তে দেশ ডুবিতে বসিয়াছে সেই বাংলাদেশে ত্রৈলোক্যবাবুর এই কারাকাহিনী প্রকাশ অতিশয় সময়োপযোগী হইয়াছে।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁহারা প্রকৃতই জীবন-মরণ পণ করিয়া কোনও ফলের আশা না রাখিয়া সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়াছিলেন, "মহারাজ" তাঁহাদেরই একজন। সেই কারণেই বোধ হয় এই পুস্তক এত হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। ইহার প্রতিটি পরিচ্ছেদ পড়িলে আরও পড়িবার, আরও জানিবার ইচ্ছা বাড়ে। এই পুস্তক বাংলার প্রত্যেক স্কুলে সাধারণ পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলে দেশের ছেলেমেয়েদের বিশেষ উপকার হইবে। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইবে আশা করি, কেননা বাংলার ও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রকৃত পরিচয় এইরূপ পুস্তকেই পাওয়া সম্ভব।

ক. চ.

রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

এখানি আলোচনা-গ্রন্থ, কবির কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কবিতা ও কাব্যগুলির আলোচনা। ইহার পূর্ব্বে ভিন্ন গ্রন্থে গ্রন্থকার ধারাবাহিকভাবে কবির অন্যান্য কাব্যের আলোচনা করিয়াছেন। ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ও মানসের উৎসমূলে পৌঁছিবার চেষ্টাই 'রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝরে'র একটিমাত্র লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবনের কথা আমাদের আকর্ষণ করে। সেই আলোচনায় যদি নূতনত্ব থাকে তাহা আমাদের আনন্দের কারণ হয়। গ্রন্থকার সুলেখক, বাল্য হইতেই তিনি কবির সংস্পর্শে আসিয়াছেন, এবং রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে তিনি গভীরভাবে অবগাহন করিয়াছেন। তাঁহার রচনা সরস। আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁহার মন্তব্যগুলি অনেক সময় আমাদের চমৎকৃত করে।

কবির প্রথম সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ ১২৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইখানিতে সেই 'বনফুল' হইতে আরম্ভ করিয়া, 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়' এবং 'শৈশব সঙ্গীত' পর্য্যন্ত কাব্যগুলির আলোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনার আলোচনায় লেখক 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র সাহায্য লইয়া তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে যে-সব প্রভাব পড়িয়াছে এই দুইখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থে সেইসব সূত্রের মূল বর্ণিত আছে। রবীন্দ্রকাব্যের পারিপার্শ্বিক নির্ণয় করিতে গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের উপর মহর্ষির প্রভাব, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অন্যান্যের প্রভাব, এবং তাঁহার প্রাথমিক রচনার উপর বিহারীলাল ও হেমচন্দ্রের প্রভাবের কথা বলিয়াছেন। শেষোক্ত প্রভাব অল্পকালের মধ্যেই অন্তর্হিত

সুপরিচিত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রণীত

মহাত্মা গান্ধীর শান্তি-অভিযান

মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালি, বিহার, কলকাতা ও দিল্লীর ঐতিহাসিক শান্তি-অভিযানসমূহের এক সুবিস্তৃত আলেখ্য। সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, এই সব অভিযান কাহিনী। পূর্ববাঙ্গলায় ও কলকাতায় শান্তি-অভিযানের সময় লেখক কিছুদিন মহাত্মা গান্ধীর নিকটে থেকে প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন মহাত্মার এই মৈত্রী-অভিযান। তাই লেখকের সেই চোখে-দেখা অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে প্রতি ছত্রে ছত্রে। সুন্দর আর্ট পেপারে ছাপা, বহু চিত্র সুশোভিত। দাম নামমাত্র—এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—বঙ্গবাসী কার্য্যালয়

২৬, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, (হ্যারিসন রোড ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল) কলকাতা।

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত

যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি

যুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষ এক অনিশ্চিত আর্থিক সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়েছে। ভারতবর্ষ একা নয়, অন্যান্য দেশেরও এ-ধরণের সমস্যা সমাধান করবার দায়িত্ব এসেছে। তাই যুদ্ধকালীন অর্থনীতি কেমন করে যুদ্ধোত্তর অর্থনীতিতে পরিণতি লাভ করতে পারে সে-সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধানকল্পে আজ পর্য্যন্ত যা-কিছু চেষ্টা হয়েছে 'যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি'র প্রকাশ তাদের অন্যতম।

সূচী :

ভারতবর্ষ ও বিদেশের আর্থিক সম্ভাবনা।

সরকারী ব্যয়ের বিবর্ত্তন।

ছাঁটাই ও নিয়োগ।

কর্ম্মসংস্থান ও ব্যয়।

শিল্পকর্ম্মে নিয়োগ ও অবস্থান্তর :
- শিল্পকর্ম্মে নিয়োগ;
- উৎপাদনকারী মাল তৈরীর শিল্প কারখানার অবস্থান্তর;
- ব্যবহার্য্য মাল উৎপাদনকারী শিল্পের অবস্থান্তর;
- অবস্থান্তরে সহায়তা।

দরের স্তর ও বিনিময়ের হার।

মালমুক্তি নীতি।

অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ।

সিদ্ধান্ত।

একশো যোলো পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

॥ দাম বারো আনা ॥

পূর্ব্বাশা-প্রকাশিত অন্যান্য বই-এর তালিকা সংগ্রহ করুন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত

বৌদ্ধধর্ম্ম

পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও মনন-শীলতার পরিচয় আধুনিক বাঙালী সমাজের কাছে আজ আর নতুন করে দেবার নেই। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা, এতদিন পর্য্যন্ত তা প্রাচীন সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ ছিলো। সম্প্রতি বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত তাঁর প্রবন্ধগুলোকে একত্র সংকলিত করা হচ্ছে এই গ্রন্থে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের প্রতি যাঁর সামান্যমাত্রও শ্রদ্ধা আছে, এ-গ্রন্থ তাঁর কাছেই যে শুধু অমূল্য সম্পদ ব'লে বিবেচিত হবে তাই নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রত্যেকটি পাঠকই এ-গ্রন্থকে অপরিহার্য্য বলে গ্রহণ করবেন।

বিষয়সূচী : বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাহার গুরু কে; নির্ব্বাণ; নির্ব্বাণ কয় রকম; কোথা হইতে আসিল; হীনযান ও মহাযান; মহাযান কোথা হইতে আসিল; সহজযান; বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপাত; বৌদ্ধধর্ম্ম কোথায় গেল; এখনও একটু আছে; উড়িষ্যার জঙ্গলে; জাতক ও অবদান; দলাদলি; মহাসাঙ্ঘিক মত; থেরবাদ ও মহাসাঙ্ঘিক; মানুষ ও রাজা।

বৈশাখ মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হবে।

প্রবোধচন্দ্র সেনের

ধর্ম্মবিজয়ী অশোক

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের যে গৌরবময় অধ্যায় আজ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেন সেই অধ্যায়কেই প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থে। অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসায়, ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটনে, যে-আন্তরিকতার পরিচয় লেখক এখানে দিয়েছেন, তা তাঁর মতো নিষ্ঠাপরায়ণ ঐতিহাসিকের পক্ষে স্বাভাবিক হলেও, পাঠকের পক্ষে বিস্ময়ের বিষয়। এই গ্রন্থে প্রবোধচন্দ্র সেনের সার্থক সত্যানুসন্ধানের পরিচয় মিলবে। দাম তিন টাকা॥

লুই ফিশারের

মহাজিজ্ঞাসা

লুই ফিশারের নাম আজ আর কোনো মহলের কাছেই অপরিচিত নয়, তেমনি অপরিচিত নয় তাঁর '*The Great Challenge*' বইটির নাম। 'মহাজিজ্ঞাসা' তারই অনূদিত সংস্করণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক তথা সামাজিক বিবর্ত্তন যে গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত নানা-প্রকার আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চলেছে তার ইতিহাস জানা প্রয়োজন আজ সকলেরই। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ এখনও প্রচুর-ভাবে প্রচারিত হয়নি। লুই ফিশার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তা-ই আলোচনা করেছেন বলে বর্ত্তমানকালে এ বই-এর প্রয়োজন অপরিহার্য্য। যন্ত্রস্থ॥

প্রকাশক :

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩

হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন, তিন জন কবির প্রভাব রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তর্লোক পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে—বৈষ্ণব কবি, শেলি ও কালিদাস। ইহার সঙ্গে আছে উপনিষদের তত্ত্ব। দুই জাতীয় লেখক আছে—জাতীয় ও সর্ব্বমানবীয়। রবীন্দ্রকাব্যে সর্ব্বমানবীয় উপাদান অধিকতর। গ্রন্থকারের মতে, এইজন্যই বিদেশের পক্ষে তাঁহাকে বুঝিতে পারা বোধ করি এত সহজ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে সবচেয়ে বড় প্রভাব বিশ্বপ্রকৃতির। প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবান এই তিন সত্তা মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের জগতের সম্পূর্ণতা।

লেখক বলিতেছেন, আমাদের সৌভাগ্য—রবীন্দ্রনাথ এমন এক সময়ে জন্মিয়াছিলেন যখন বাঙালী-সমাজের ভিত্তিতে ফাটল প্রশস্ত হয় নাই, সমাজ ছিল অখণ্ড ও এক। কবির জীবন ও কাব্যের মূলে এই অখণ্ড বাঙালী-জীবন। "পরবর্ত্তীকালে জন্মিলে তিনি মহৎ জাতীয় কবি মাত্র হইতে পারিতেন, কিন্তু মহত্তর সর্ব্বজাতীয় কবি হইতেন কি না সংশয়।" 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্য, 'রুদ্রচণ্ড' নাটক। রবীন্দ্রনাথ কাহিনী-কাব্য দিয়াই প্রথম রচনা আরম্ভ করেন। পরীক্ষা করিয়া কবি বুঝিলেন লিরিক বা খণ্ডকাব্যই তাঁহার শক্তির যথার্থ বাহন। "সারা জীবন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ যে আত্মকাহিনী লিখিয়া চলিয়াছেন কবিকাহিনী তাহার প্রথম ধাপ।" 'শৈশবসঙ্গীতে'র কবিতাগুলির মধ্যে ভবিষ্যৎ রবীন্দ্র-কাব্যের মহত্ত্বের সূচনা আছে। 'রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর' অত্যন্ত সুখপাঠ্য। আলোচনা-সাহিত্যের অন্তর্গত এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রন্থখানি শুধু পাঠকের আনন্দ বিধান করিবে না তাহার চিন্তাও উদ্রিক্ত করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

অলঙ্কারচন্দ্রিকা—শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ বিদ্যারত্ন সাংখ্যভূষণ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮-সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

বাংলা কাব্যে ছন্দের প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বিভিন্ন সাহিত্যরসিক পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছেন—সাহিত্যের স্বরূপ ও নানা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও দেশী ও বিদেশী সমালোচকদের মতবাদ অবলম্বনে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাব্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গ অলঙ্কার বাংলার সাহিত্যসমালোচকদের নিকট একরূপ উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে যে সামান্য আলোচনা হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র—বাংলা কাব্যের বিশ্লেষণের চেষ্টা তাহার মধ্যে নগণ্য। আলোচ্য গ্রন্থের দ্বারা বাংলাসাহিত্যের এই ত্রুটি অনেকাংশে বিদূরিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে উল্লিখিত অলঙ্কারগুলি ইহাতে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করা হইয়াছে এবং বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে উদাহরণ সংকলন করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে পাশ্চাত্ত্য অলঙ্কারের সহিত আমাদের দেশের অলঙ্কারের তুলনা করা হইয়াছে। সংস্কৃতে অনুল্লিখিত কয়েকটি পাশ্চাত্ত্য অলঙ্কারের বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। তবে ইহাদের অনেকগুলিই ভারতীয় আদর্শ অনুসারে ঠিক অলঙ্কারের পর্য্যায়ে পড়ে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে—যে বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্বকে আমাদের দেশে অলঙ্কারের প্রাণ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে তাহাদের অভাব ইহাদের মধ্যেই অনুভূত হয়। ইহাদের কোন কোনটি সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের লক্ষণাবৃত্তির প্রকারভেদ মাত্র বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত অলঙ্কারের মধ্যে পর্য্যায়োক্ত ও পরিবারের অনুল্লেখ স্বেচ্ছাকৃত কি আকস্মিক বলা যায় না। কোন কোন কাব্যাংশের অলঙ্কার নিরূপণ বিষয়ে সন্দেহ ও মতানৈক্যের অবকাশ থাকা বিচিত্র নহে। বহুল আলোচনার ফলেই তাহাদের নিরসন সম্ভবপর। আশা করি, বর্ত্তমান গ্রন্থ বাংলার সাহিত্যিক সমাজকে সাহিত্যের আলঙ্কারিক বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট করিবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং ৪-এ, সাহানগর রোড, কালীঘাট—কলিকাতা হইতে শ্রীঅজিতকুমার জ্যোতিঃ শেখর কর্তৃক প্রকাশিক। ১৭০ পৃঃ। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডীশক্তি সাধনা সহায়ে অপূর্ব, মাতৃজাতির অক্ষয় গৌরব প্রকাশে অদ্বিতীয় এবং জাতীয় সঙ্ঘশক্তি সংগঠনের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ প্রকাশে অতুলনীয়। এই দুর্লভ স্তোত্রগ্রন্থের যত আলোচন হয়, ততই মঙ্গল। আর্যশাস্ত্রাভিজ্ঞ ও সাধননিষ্ঠ বহু আচার্য এর বিস্তারিত টিকা-টিপ্পনী করেছেন। বাংলায় সাধক সত্যদেবের বিস্তারিত ব্যাখ্যার পর অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তীর পাঠ ও আলোচনা দেবীমহিমা প্রচারে বেশ কার্যকরী হয়েছিল। কিন্তু এর পর চণ্ডীর আলোচনা আশানুরূপ হয় নাই, অথচ দেশের সাম্প্রতিক অবস্থায়, এই দুর্দিনে এই গ্রন্থের আদর্শ গ্রহণ করা জাতির পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। তত্ত্বসুবোধিনী ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্ত হলেও সুবোধ্য।

গীতা ও গীতামৃত (১ম ও ২য় খণ্ড)—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। এ, বি, সন্স এণ্ড কোং ৬, উইণ্ডসর হাউস, মিশন রো, কলিকাতা। ৪২ পৃঃ ও ১০০ পৃঃ মূল্য যথাক্রমে ৮০ ও ১।০।

বিজ্ঞ সম্পাদক এই গ্রন্থের দুই খণ্ডে গীতার প্রথম অধ্যায় বিষাদযোগ এবং দ্বিতীয় অধ্যায় সংখ্যযোগের সরল ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের জাতীয় জীবনে গীতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যত চেষ্টা হয় ততই মঙ্গল।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কলকল্লোল—শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী। 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী'। মূল্য এক টাকা আট আনা।

কবিতাগুলি সুবোধ্য ও সুন্দর। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার অনুবাদ 'ইয়ারো সন্দর্শনে' স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হইয়াছে। 'জয়তু সুভাষ' ও 'জয় হিন্দ' কবিতা দুইটিতে উদ্দীপনা ও বলিষ্ঠ স্বকীয়তার পরিচয় আছে। বইখানি প্রশংসার যোগ্য।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মাতৃমন্দির
২৬-এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
গর্ভাবস্থায়, নিরাপদে থাকা, প্রসব এবং শিশু রক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়।
মানদা দেবী, লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট

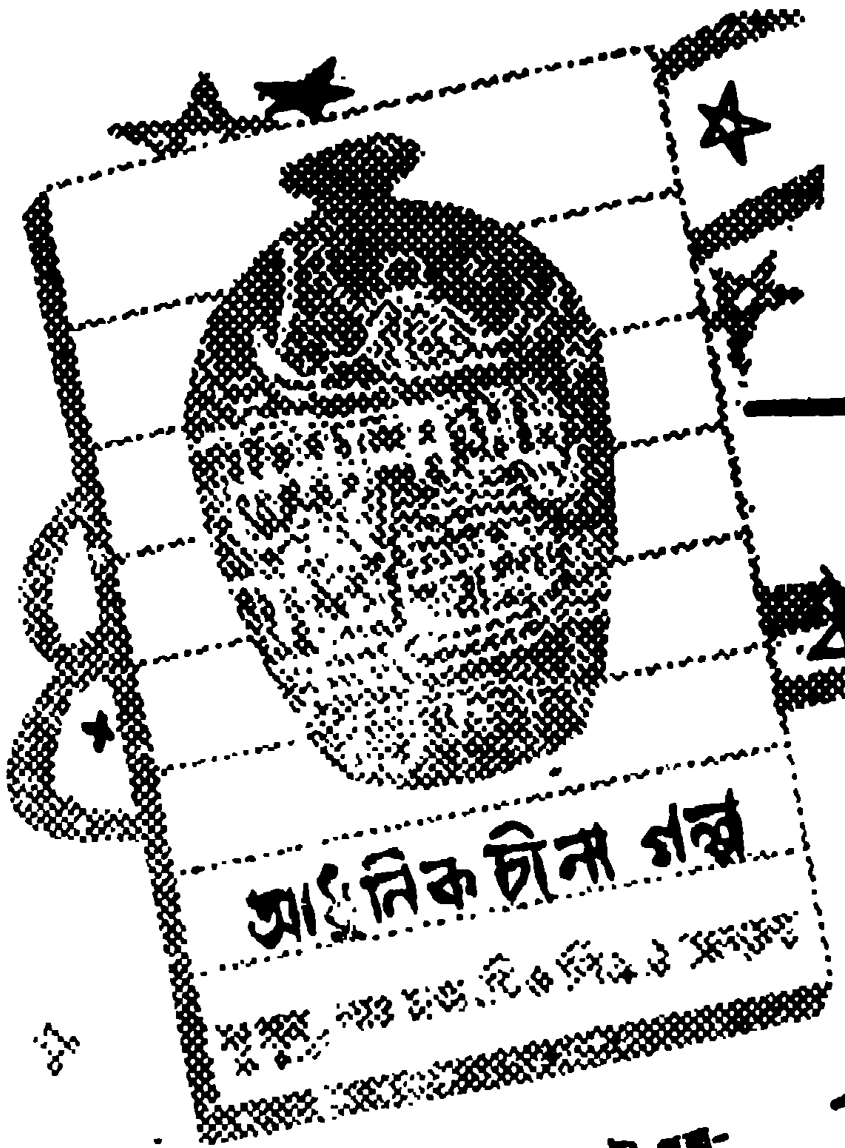

লুসুন থেকে শুরু করে অতি আধুনিক চীনা সাহিত্যিকদের এগারটি সুনির্বাচিত গল্পের সংকলন। যে চেতনা চীনের সমাজ-জীবনকে বন্যার মত উদ্বেল করে তুলেছে তারই নিখুঁত ও সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। অনুবাদ করেছেন অমল দাশগুপ্ত। দাম—৩৷৹

গোর্কীর সাহিত্যসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই গল্প-সংকলন। প্রত্যেকটি গল্পে নীচুতলার মানুষরা এক অপূর্ব দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে মানুষের সামনে উন্মোচিত করে দিয়েছে নিজেদের। অনুবাদ করেছেন নীহার দাশগুপ্ত। দাম—৩৷৹

সোভিয়েট-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর রুশ কথাসাহিত্যে এক নতুন পর্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক চেতনায় দীপ্তিমান চাষীমজুর জনসাধারণের প্রাণস্পন্দনে সঞ্চারিত বাছাই-করা আটটি গল্পের সংকলন। অতি-সাম্প্রতিক যুদ্ধ গল্পগুলি এই সংগ্রহে বাদ দেওয়া হয়েছে। দাম—২৷৹

তরুণ কথাশিল্পী ননী ভৌমিকের দশটি গল্পের সংকলন। বাংলার চাষী মজুর ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনের দুঃখ কষ্ট ও সংগ্রামের বাস্তব প্রতিফলনে প্রতিটি গল্প রসোত্তীর্ণ ও নিখুঁত। দৃষ্টিভঙ্গী, আঙ্গিক ও আবেদনে গল্পগুলি সম্পূর্ণ নতুন পথের নির্দেশ দেবে। দাম—২৸৹

ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৩০ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা ১৬.

নতুন সাহিত্য

নতুন ভাবধারায় সমৃদ্ধ ত্রৈমাসিক বামপন্থী সংকলন। আধুনিক শক্তিশালী তরুণ লেখকদের নির্ভীক ও বলিষ্ঠ প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প এবং শিল্প ও সাহিত্য সমালোচনার অপূর্ব সমাবেশ।

দ্বিতীয় সংখ্যা এক টাকা

বাংলা কাব্য সাহিত্যে
—উল্লেখযোগ্য বই—

ছাড়পত্র
সুকান্ত ভট্টাচার্য

সুকান্ত ভট্টাচার্য নতুন যুগের সার্থক কবি। তাঁর প্রতিটি কবিতা কোটি কোটি মানুষের বলিষ্ঠ আশার নির্ভীক ঘোষণা। দাম ১৷৹

সন্দ্বীপের চর
বিষ্ণু দে

নতুন বাংলা কবিতাকে আত্মসন্ধানের অস্থিরতা থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে সব কবি তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু দে নিঃসন্দেহে অগ্রণী। 'সন্দ্বীপের চর' তাঁর সার্থক কবি-কর্মের স্বাক্ষর। দাম ২৲

রবীন্দ্রনামা
প্রভাত বসু সম্পাদিত

পঁয়তাল্লিশজন প্রবীণ ও নবীন কবির নানাভাবে ও নানা ছন্দে রচিত 'কবি-প্রশস্তি'র সংকলন। দাম ১৷৹

Get your Art work, Illustrations, Cover Designs, Advertisement Lay-outs and Cinema Slides done by us. Moderate charges for Brilliant and Novel Ideas.

Studio Dept.
International Publishing House Ltd.

দেশ-বিদেশের কথা

শ্রীসুহাসিনী সেন

নাগপুর ন্তাশনাল কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুহাসিনী সেন বর্ত্তমান বৎসরে নাগপুর ইউনিভার্সিটি কোর্টের একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাঙালী মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করিলেন। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট-সভ্যদের মধ্যে ইনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ।

শ্রীমতী সুহাসিনী ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজীতে এম-এ ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ন্তাশনাল কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপিকারূপে যোগদান করেন। অধ্যাপনাকার্য্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীআদরিণী সেন এম-এ ও নাগপুরের এস বি সিটি কলেজের একজন অধ্যাপিকা।

শরদিন্দু দাশগুপ্ত

ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট শরদিন্দু দাশগুপ্ত ১৯২০ ইংরেজীর ১০ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রায় বাহাদুর গিরিশচন্দ্র দাশগুপ্ত হাওড়ার সবডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহাদের আদি নিবাস ত্রিপুরা। শরদিন্দু দাশগুপ্ত প্রথমে হাওড়া জিলা স্কুলে ও পরে প্রেসিডেন্সি ও সেণ্ট জেভিয়াস´ কলেজে অধ্যয়ন করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আই-এসসি পাস করিয়া ১৯৩৮ সালে তিনি শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হন। এই সময় হইতে বিমান-চালনা শিক্ষার জন্য তিনি অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত হইয়া উঠেন। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা তাঁহার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হওয়ার পথে অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে তখন তিনি এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ছাড়িয়া সেণ্ট জেভিয়াস´ কলেজে ভর্ত্তি হন

শরদিন্দু দাশগুপ্ত

এবং অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবে বিমান-চালনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে বাংলা সরকার বাঙালী যুবকদের বিমান চালনায় উৎসাহিত করিবার জন্য বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। শরদিন্দু দাশগুপ্ত সর্ব্বপ্রথম এই বৃত্তি লাভ করেন। এইবার দমদমে অধিকতর উৎসাহের সহিত তিনি বিমান-চালনা শিক্ষা করিতে থাকেন। ১৯৪১ সনে তিনি আই, এ, এফ, ভি, আর-এ ক্যাডেট অফিসাররূপে যোগ দেন। এই সময় তিনি বিমান চালনা শিক্ষার জন্য মাতার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখেন তাহা হইতে তাঁহার দেশপ্রীতি। জাতি ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য-বোধ, পৌরুষ, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি নানা সদ্গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪৩-৪৪ সনে তিনি প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধে যান। সৈনিক জীবনে লেফটেন্যাণ্ট গুপ্তকে অনেকবার নির্যাতিতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সংগ্রাম করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯৪৬ সনে ফাইটাস´ লিডার ট্রেনিঙের জন্য বিদেশে পাঠান। ১৯৪৭ সনের জুন মাসে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯৪৭-৮ সনে কাশ্মীর রণক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২২শে মার্চ্চ যখন তিনি তাঁহার বিমান-বহর চালনায় নিযুক্ত ছিলেন তখন নিহত হন।

লেফটেন্যাণ্ট দাশগুপ্ত সদাহাস্যময়, কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বী ও চরিত্রবান্ যুবক ছিলেন। কিশোর বয়স হইতেই অশ্বচালনা, খেলাধুলা ও শিকার ইত্যাদি পুরুষোচিত ব্যায়াম ও ক্রীড়াদিতে বিশেষ নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গোপন দান যথেষ্ট ছিল এবং তিনি প্রাণ ঢালিয়া দুর্গতের সেবা করিতেন।

ডাঃ রাখালকৃষ্ণ মণ্ডল

কলিকাতা কর্পোরেশনের ডিষ্ট্রিক্ট হেল্থ অফিসার ডাঃ রাখালকৃষ্ণ মণ্ডল, এম-এসসি, এম-বি, ডি. পি. এইচ, ডি. টি. এম, মহোদয় গত ১৬ই ফাল্গুন ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাঃ মণ্ডল মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার রামচক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি

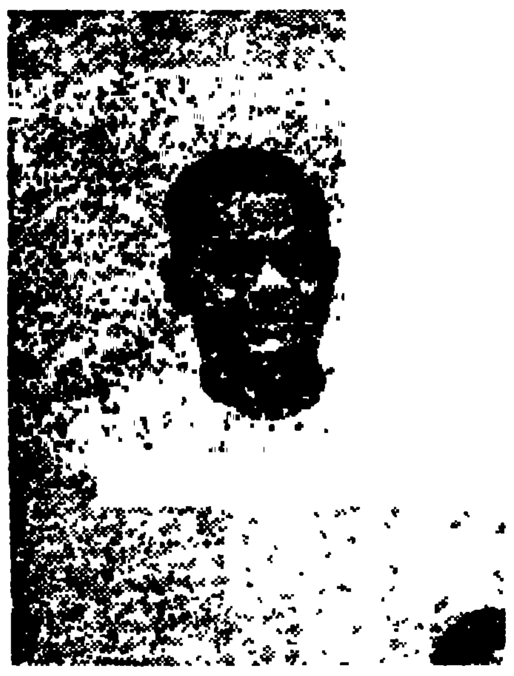

ডাঃ রাখালকৃষ্ণ মণ্ডল

কলিকাতা কর্পোরেশনে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা এতই প্রবল ছিল যে দীর্ঘকাল চাকুরী করিয়াও নিয়মিত ছাত্ররূপে কলেজে যোগদান করিয়া ৪৫ বৎসর বয়সের পর ক্রমে ক্রমে এম-এসসি, ডি. পি. এইচ, ডি টি. এম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ম্যাক্‌ডোনাল্ড বাঁটোয়ারায় হিন্দু-সমাজকে যখন বর্ণহিন্দু ও তপশীলভুক্ত জাতিরূপে বিভক্ত করা হয় এবং তাঁহার স্বসম্প্রদায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়কে যখন তপশীল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়—তখন নিখিল বঙ্গ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সেবক সমিতির সম্পাদকরূপে তিনি ইঁহার প্রবল প্রতিবাদ করেন ও ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন সুরু করেন। ইহা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রবাসী পত্রে রামানন্দবাবু দৃঢ়ভাবে তাঁহার মতবাদ সমর্থন করিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত উচ্চপদ লাভের সুযোগ আসিলে তিনি ঘৃণাভরে তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। জাতিগঠনমূলক ও জনহিতকর বহু কর্ম্মপ্রচেষ্টার সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। সমস্ত কর্ম্মের মধ্যেও জ্ঞানচর্চ্চা হইতে তিনি কখনও বিরত হন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মীনেন্দ্রনাথ বসুর সহযোগে তিনি *An Introduction to Anthropology* ও *Elements of Pre-history* নামে বৈজ্ঞানিক পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

আনন্দ ও অস্পৃশ্যা
শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

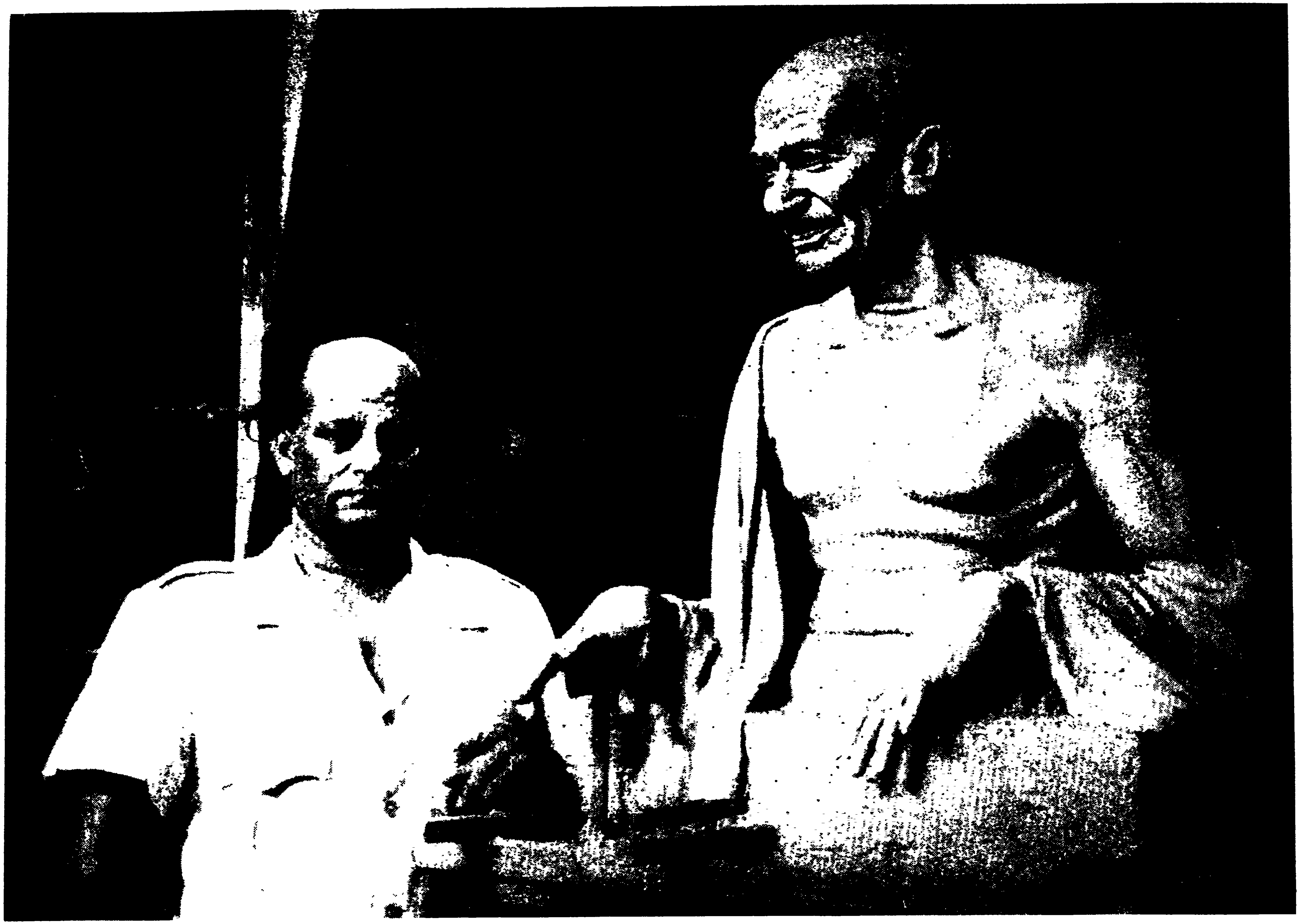

মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্ত্তি
পার্শ্বে—ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৮শ ভাগ, ১ম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৫৫ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রাদেশিকতা

ইংরেজীতে প্রবাদবাক্য আছে, "charity begins at home" অর্থাৎ দয়াদাক্ষিণ্য ঘরেই আরম্ভ করা উচিত। আমাদের এই ভাবতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই এই প্রবাদবাক্যের সার্থকতা সকলেই বুঝিয়াছে, কেবল বুঝে নাই বাঙালী। অন্য প্রদেশে বাঙালী ক্রমেই উচ্ছেদ হইতে চলিয়াছে, সম্প্রতি তাহার উপর পশুবলের প্রয়োগও আরম্ভ হইয়াছে, অথচ বাঙালী যদি তাহার স্বার্থরক্ষার কোনও চেষ্টা করে তখনই চতুর্দ্দিকে চীৎকার শুনা যায় "প্রাদেশিকতা মহাপাপ, বাঙালী পাপের পথে চলেছে।" পণ্ডিত নেহরু হইতে আমাদের বিদায়প্রার্থী প্রদেশপাল শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচাবী পর্য্যন্ত সকলেই ঐ একই উপদেশ দিয়া আমাদের বাধিত করিতেছেন, কিন্তু কাহারও কোন মাথাব্যথা দেখা যায় না যখন ভিন্ন প্রদেশের লোকে নিজের স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হয় বা যখন তাহারা বাঙালীর স্বার্থনাশে উদ্যত হয়। সুতরাং ঐরূপ সকল উপদেশই বাঙালী-ধ্বংসের আয়োজনের অঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ করা প্রয়োজন। পণ্ডিত নেহরু উচ্চপদের কাজ যাহা কিছু তাঁহার হাতে ছিল তাহার অধিকাংশই স্বজাতীয়দিগের হাতে দিয়া দিয়াছেন, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর দেশের লোকে নিজের স্বার্থ কতটা বুঝে তাহাও কাহাকেও বলিবার প্রয়োজন নাই, সুতরাং তাঁহাদের উপদেশ নিজের নিজের ঘরেই দিলে ভাল হইত বোধ হয়। বাঙালীর এখন একথা বুঝা নিতান্তই প্রয়োজন যে, তাহার স্বার্থরক্ষা সে নিজে না করিলে তাহার সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত। আত্মীয়স্বজন বা সন্তানসন্ততির স্বার্থরক্ষা যদি প্রাদেশিকতা হয় তবে প্রাদেশিকতা মহাপুণ্য, স্তোকবাক্যে ভুলিয়া এ পুণ্যকার্য্যে অবহেলা যেন বাঙালী আর না করে।

এই সেদিন যে অর্থপিশাচের দল প্রায় ৬০ লক্ষ বাঙালী নরনারীকে অনাহারে বধ করিল, তাহাদের শতকরা ৯০ জন অবাঙালী বা অবাঙালীর দাস। আজ যে তস্করের দল দেশের অবশিষ্ট সম্পত্তির সবটুকু চোরাকারবারের পথে লুট করিতেছে তাঁহাদেরও দলপতি প্রায় সকলেই অবাঙালী। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযানও কি প্রাদেশিকতারূপ মহাপাপ?

মানভূম, সিংহভূম ও সাঁওতাল পরগণায় বিহারীর দল বাঙালীর ভিটামাটি উচ্ছেদ করিয়া, তাহার মাতৃভাষা পর্য্যন্ত লোপ করাইবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহাতে বিহারীদের প্রাদেশিকতার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, কেননা তাহারা কংগ্রেস নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রদেশের লোক। রাজেন্দ্র বাবু চিত্রগুপ্তের স্বজাতি, হয়ত সেই কারণেই তিনি "দোষ লিখেছেন বাঙালীর বেলা, আর বিহারীর বেলা লীলাখেলা।" ব্রিটিশ শাসকের জুয়াচুরিতে বাংলার মাটির যে অংশ অন্যায়ভাবে বিহারের হাতে দেওয়া হইয়াছিল, যে অঞ্চলের মাটির সঙ্গে বাঙালীর রক্তমাংসের সম্পর্ক হাজার বৎসরেরও অধিক, সেই মাটি ফিরিয়া চাওয়া, সেই আত্মীয়-কুটুম্বের "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হওয়ার শেষ চাওয়া, ইহাই হইল ঘোর অন্যায়। বলিহারি বিচার, বলিহারি ধর্ম্মজ্ঞান!

আবার একদল রব তুলিয়াছেন যে ভারতের পুণ্যভূমিতে সকল ভারতীয়েরই সমান অধিকার, সুতরাং প্রাদেশিক অংশ লইয়া বাদবিসম্বাদের প্রয়োজন কি? সমান অধিকার যে কতটা সে ত বাঙালী আজ বিহারে, আসামে ও উড়িষ্যায় হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। সুতরাং ঐ যুক্তি যে কতটা অসার সে কথা কি আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে? নিজের ভিটাতেই বাঙালী দাসত্বে ডুবিতে বসিয়াছে, অন্য প্রদেশের ত কথাই নাই। অন্য প্রদেশের লোককে বাংলায় স্থান দেওয়ায়, কাজ দেওয়ায় বাঙালী এত দিন যাবৎ কখনও আপত্তি করে নাই, এখন অন্য প্রদেশের লোকের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাহাকে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

বিদেশীর অত্যাচার ও দমননীতি হইতে আজ ভারতবর্ষ উদ্ধার হইয়াছে। কিন্তু ঐ অত্যাচার ও অনাচারের প্রকোপ কোন্ প্রদেশের উপর সকলের চেয়ে অধিক পড়িয়াছিল? কোন্ প্রদেশের লোক বিদেশীর হাতে নিদারুণ পীড়ন সহ্য করিয়াও অদম্য উৎসাহে অক্লান্ত ভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইয়াছিল? বিদেশীর মাৎসন্যায় ও দমননীতির ফলে সর্ব্বাপেক্ষা নির্যাতিত হইয়াছে কোন্ প্রদেশ? এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে এক বাংলা ও বাঙালী এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের

চল্লিশ বৎসরে যে ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, সমগ্র ভারতের অন্য সকল প্রদেশ একত্র করিলেও তাহার তুলনা হয় না। বাংলার মাটিতেই এই সংগ্রামের আরম্ভ এবং এই মাটিতেই তাহার পূর্ণতম বিকাশ এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে? অথচ আংশিক ক্ষতিপূরণের কথা তুলিলেই আজ সেই বাঙালীকেই শুনিতে হইবে দেশপ্রেমের বিষয়ে উপদেশ ও প্রাদেশিকতা সম্পর্কে অনুযোগ।

বাঙালী কোন দিনই বিদেশী বা ভিন্ন প্রদেশীর প্রতি বিরূপ ছিল না এবং কোন দিন হইবেও না। কিন্তু ভিন্ন প্রদেশীয় শত্রুর সাহায্যে এবং শত্রুর ইঙ্গিতে যাহারা বাঙালীর ধনমান-প্রাণ নাশ করিতে উৎসাহ দেখাইয়াছে এবং আজও যাহারা অসৎ উপায়ে বাংলার সম্পদ বাংলায় ফিরাইয়া আনিবার পথে বাধা দিতেছে তাহাদিগকে বাঙালী আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিবে বা নির্ব্বিবাদে অপহৃত সম্পত্তি ভোগদখল করিতে দিবে এ কিরূপ বিচার?

ইহা সত্য যে আজ ভারতভূমির চতুর্দ্দিকে শত্রু এবং ভিতরে প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে শত্রুর দল চক্রান্ত চালাইতেছে। এরূপ অবস্থায় গৃহবিবাদ যুক্তিযুক্ত নহে ইহাও সত্য। কিন্তু এই গৃহবিবাদ ও আত্মকলহের পথ যাহারা সকলের আগে ধরিয়াছে, যাহারা অকারণে বাঙালীকে নির্ব্বাতন ও বাংলার সমৃদ্ধির পথ চিরদিনের মত কণ্টকিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছে, তাহাদিগকে কিছু বলা হয় না কেন? অন্য প্রদেশ মাতৃভাষার হিসাবে বিভাগ হইলে কোনও দোষ হয় না, যত দোষ এই অভাগা বাংলাদেশের।

বাঙালীকে এখন অবহিত হইয়া ভাবিতে হইবে আত্মরক্ষার কথা। দেশের শক্তি যাহাতে ক্রমেই গঠিত ও বর্দ্ধিত হয় সে বিষয়ে শুধু মন্ত্রীসভাকে অনুরোধ-উপরোধ বা অভিযোগ-অনুযোগ করিলেই চলিবে না। দেশে রাষ্ট্রশক্তির পুনর্জ্জাগরণ নিতান্তই প্রয়োজন। বাংলার কংগ্রেস নেতৃদল যে পথে এত দিন চলিয়াছিলেন তাহারই ফলে দেশের এই অসহায় অবস্থা এবং বাংলার কংগ্রেসের এই অবনতি। ভিন্ন প্রদেশীয় নেতৃবর্গের আজ্ঞাপালন এবং দেশের লোকের নিকট দেশপ্রেম ও ত্যাগের অজুহাতে স্বার্থসিদ্ধির দাবী ভিন্ন অন্য কিছুর চিহ্ন তাঁহাদের মধ্যে এতদিনেও বিশেষ দেখা যাইতেছে না। দেশকে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন কংগ্রেসকে সংস্কৃত ও অনাচার মুক্ত করা। দেশের লোকের উচিত এখন যাচাই করিয়া দেখা যে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রবাদের আদর্শ বর্ত্তমান কংগ্রেসের দলে কতটা আছে। কংগ্রেসের ছাপের দৌলতে এত মেকী দেশে চলিয়াছে যে সাচ্চা চেনা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। দেশের প্রয়োজন খাঁটি জাতীয়তাবাদ ও বিশুদ্ধ গণতন্ত্রবাদ, তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে দেশবাসীকে সমস্ত কর্ম্মপদ্ধতি বদলাইতে হইবে। চোরাকারবারীর জুয়াচুরির ফলে হাজার টাকার নোটও অচল হইয়া গিয়াছে। আজিকার পরিস্থিতিতে ভাবিবার সময় আসিয়াছে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কি করা উচিত।

পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ সচিবের অসহায়তা

পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন নানা স্থানে তাঁহার নিজের অসহায়তার কথা প্রচার করিতেছেন। এই প্রচারের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝা সহজ নয়। সহজ বুদ্ধির লোক মনে করিবে যদি অভিজ্ঞতার ফলে সেন মহাশয় বুঝিতে পারিয়া থাকেন যে তাঁহার কিছু করিবার নাই, তবে মন্ত্রিত্ব পদটি ছাড়িয়া দিলেই ত পারেন। তাহা না করিয়া এইরূপে পরাজিতের মনোভাব দিকে দিকে বিস্তার করিবার সার্থকতা কি? পশ্চিম বঙ্গ রাষ্ট্রের কিছু ক্ষমতা আছে; সেই ক্ষমতার অংশীদার শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। এই ক্ষমতার একটা রুদ্ররূপ আছে। তিনি কেন এই রুদ্ররূপে প্রকট হইতেছেন না? মেদিনীপুর হইতে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রেরিত এক সংবাদে দেখা যায় যে তিনি বলিতেছেন—

> "পশ্চিম বঙ্গ খাদ্যের সমস্ত দ্রব্যে ঘাটতি প্রদেশ হওয়ায়, ক্ষুধিত জনসাধারণের আহার দিবার যে গুরু দায়িত্ব তাঁহার উপর পড়িয়াছে সেই কর্ত্তব্য পালনে তিনি অসমর্থ হইয়াছেন, এবং একান্ত অসহায় বোধ করিতেছেন।"

এই অসহায় বোধের সঙ্গে মুর্শিদাবাদে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কোন সঙ্গতি নাই; সেখানে তিনি দেশের লোককে গালাগালি দিয়া নিজের অক্ষমতার জ্বালার উপর প্রলেপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

> "দেশে শতকরা যদি একজন চোরাকারবারী থাকে, তা হলে তাকে ধরা যায়। কিন্তু শতকরা পঞ্চাশ জনই যদি চোরাকারবারী হয়, তা হলে তা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা কোন সরকারের নেই।"

সেন মহাশয়ের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেও, একটা প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। রাষ্ট্র কেন "শতকরা পঞ্চাশ জন" চোরাকারবারীকে দমন করিবার জন্য আর পঞ্চাশ জনকে উদ্বোধিত করিতে পারে না? সমস্ত দেশের লোককে চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বলিলে তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের বিপদ আছে হয়ত। দেশের শতকরা পাঁচ জনের বেশী চোরাকারবারী হইতে পারে না ইহা সকলেই জানে, কেননা উহার অধিক ব্যবসায়ীই দেশে নাই। তবে মন্ত্রী মহাশয়ের পার্শ্বচররূপে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের শতকরা পঞ্চাশ জন কেন শতকরা পঁচাত্তর জন ঐ পথের পথিক বলিয়াই হয়ত তিনি চতুর্দ্দিকে চোরাকারবারী দেখিতেছেন।

চোরাকারবার অর্ডিনান্স

জনসাধারণের পক্ষ হইতে বহু আন্দোলন এবং গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে বহু গড়িমসির পর শেষ পর্য্যন্ত চোরাকারবার অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে। গত ১লা জানুয়ারী হইতে

অর্ডিনান্সের মেয়াদ আরম্ভ হইয়াছে। উহা জারী হইয়াছে ভারতশাসন আইনের ৮৮ ধারা অনুসারে, সুতরাং লোকে উহা ১৭ দিনের অর্ডিনান্স বলিয়া যাহা আশঙ্কা করিতেছিল তাহা হইবে না, ৩০শে জুন অর্ডিনান্সের মেয়াদ শেষ হইবে না। ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী অধিবেশনের প্রথম ছয় সপ্তাহ পর পর্য্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে, এই ছয় সপ্তাহের মধ্যে অর্ডিনান্সটিকে আইনে পরিণত করিতে হইবে, মূল বিলটি পাস হইয়াই আছে, উহার সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া বিলটিকে পাকা আইনে পরিণত করিতে ছয় সপ্তাহ সময়ই যথেষ্ট।

ডাঃ বিধান রায়ের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রধান অভিযোগ দুর্নীতি ও চোরাকারবার নিরোধে উহার অক্ষমতা। তাঁহাদের এই অক্ষমতা অথবা দুর্ব্বলতার পূর্ণ সুযোগ চোরাকারবারীরা এবং দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারীরা গ্রহণ করিতেছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে ছোট-বড় বহুসংখ্যক দুর্নীতিপরায়ণ এবং দেশদ্রোহী কর্ম্মচারী তদ্বিরের জোরে নানা স্থলে নিয়োজিত হইয়াছেন, ফলে সৎ ও দক্ষ কর্ম্মচারীদের মনোবল ভাঙিয়া গিয়াছে এবং সরকারের প্রত্যেক বিভাগে দুর্নীতির স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। ডাঃ ঘোষ এই জিনিষটির পত্তন করিয়া গিয়াছেন, ডাঃ বিধান রায় ও শ্রীকিরণশঙ্কর রায় এখনও উহার সংস্কার করিতে বিশেষ সক্ষম হন নাই। সরকারী কর্ম্মচারীদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয়বিধ সহায়তা ব্যতীত চোরাকারবার কিছুতেই চলিতে পারে না, কারণ সমস্ত চোরাকারবারটা নানাবিধ পারমিট প্রদানকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। পারমিট সংগ্রহে প্রকৃত ব্যবসায়ীর অক্ষমতা এবং অব্যবসায়ীর নিকট উহার সহজলভ্যতা চোরাকারবারের মূল কারণ। এইজন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে যতক্ষণ এই ধারণা না জন্মিতেছে যে চোরের সহিত যোগাযোগ রাখিলে একদিন না একদিন ধরা পড়িবই এবং সেদিন কিছুতেই রক্ষা পাইব না—ততদিন সহস্র অর্ডিনান্সেও চোরাকারবার বন্ধ হইবার উপায় নাই। মন্ত্রীরা ত অর্ডিনান্স জারী করিয়া ছাড়িয়া দিলেন কিন্তু যে পুলিস উহা কার্য্যে পরিণত করিবে তাহার শীর্ষদেশে যদি বর্ত্তমান কমিশনার এবং হেড কোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনারের ন্যায় লোক অধিষ্ঠিত থাকেন তবে ফলের আশা লোকে কিরূপে করিবে? এক্ষেত্রেও হয়ত দেখা যাইবে এই কঠোর অর্ডিনান্স সত্ত্বেও পূর্ব্ববৎ পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা, চাউলওয়ালী প্রভৃতিই দণ্ডিত হইতেছে, রাঘব বোয়াল প্রভৃতি নির্ব্বিবাদে পার পাইয়া যাইতেছে। অর্ডিনান্সের একটি ধারা আমাদের নিকট খুব অসঙ্গত ঠেকিল; ১০ নং ধারায় চোরাকারবারকে পুলিসগ্রাহ্য এবং জামীন নামঞ্জুর অপরাধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু ৩ (২) নং ধারায় বলা হইয়াছে যে এই অর্ডিনান্স অনুসারে কাহাকেও মামলা সোপর্দ্দ করিতে হইলে প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি লইতে হইবে। এত বিচার-বিবেচনা ও গবেষণার পর যে অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে তাহার মধ্যে এত বড় গলদ লোকে সামান্য ত্রুটি বলিয়া মনে করিতে পারিবে না; রাঘব বোয়াল পার করিবার জন্য জালের মধ্যে এই ছিদ্রটা রাখা হইয়াছে বলিয়াই লোকে ধরিয়া লইবে। গত বৎসর সর্দ্দার প্যাটেল সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি নিবারণকল্পে যে দুর্নীতিদমন আইন পাস করিয়া দিয়াছিলেন তাহাতেও ঠিক এই ছিদ্রটি রাখা হইয়াছিল এবং তাহারই জন্য এই আইন আজ পর্য্যন্ত দেশের কোন উপকারে আসে নাই। যে অপরাধ পুলিসগ্রাহ্য এবং জামিনের অযোগ্য করা হইতেছে তাহার মামলা চালাইবার জন্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হইবে কেন?

ডাঃ বিধান রায়ের গবর্ণমেণ্ট এত দিন এই কথাই বলিয়া আসিয়াছেন যে ক্ষমতার অভাবেই তাঁহারা দুর্নীতি ও চোরাকারবার বন্ধ করিতে পারেন নাই। এই ক্ষমতা এখন হাতে আসিয়াছে। চোরাকারবারের মূল কাহারা তাহা তাঁহাদের জানা আছে। কাপড়ের কথাই ধরা যাক। বাংলা দেশে কাপড় বিক্রয়ের একমাত্র কর্ত্তা ছিল বি-টি-এ; বিনিয়ন্ত্রণের সময় ইহাদের হাতে প্রায় ৫০,০০০ গাঁইট কাপড় ছিল। চারজন ব্যবসায়ী ইহা ছাড়া আমেদাবাদ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে আরও প্রায় ৫০,০০০ গাঁইট কাপড় আমদানী করিয়াছেন। তা ছাড়া বাংলার মিলগুলিতেও প্রায় ৩৫,০০০ গাঁইট কাপড় তৈয়ি হইয়াছে। এই সমস্ত কাপড় কেবল দশ-বার জন মাত্র লোকের হাত দিয়া বিলি হইয়াছে এবং আমরা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে ইহারা দুই-তিন মাসের মধ্যে এই কাপড়ের উপর প্রায় ১৮।২০ কোটি টাকা দাম ও সাধারণ লাভ বাদে গাঁইট খুলিবার আগেই কেবল অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে। ইহাদের নাম-ঠিকানা সরকারের জানা আছে, কারণ ইহারাই আইনতঃ কাপড় বিক্রয়ের পারমিটধারী। এই লোকগুলিকে অবিলম্বে নূতন আইনের কবলে ফেলিবার সক্রিয় ব্যবস্থা করিলে ও আদালতে লইয়া গেলে বড়বাজারের চোরাকারবারী মহলে হাহাকার উঠিতে এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগিবে না। ইহাদিগকে জেলে আটক করিয়া আইনের রুদ্রমূর্ত্তি দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলে চোরাকারবারের একেবারে গোড়ায় ঘা পড়িবে। চালের কাটকাবাজী ও মুনাফাখোরির জন্য যাহারা বাংলাদেশের ৩০ লক্ষ লোককে অনাহারে মারিয়া ফেলিয়া লাশ পিছু ২৫০৲ টাকা করিয়া লাভ করিয়াছে, সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের চোরাকারবার ও ভেজাল চালাইয়া আজ যাহারা বাঙালী জাতিকে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছে, পুরনারীদের বিবস্ত্র রাখিতেছে সেই সব নরপিশাচের প্রতি একটু কঠোর ব্যবহার হইলে সমাজ তাহাতে আনন্দিতই হইবে এবং

সমাজ হইতে দুর্নীতি ও চোরাকারবারের মহাপাপ দূর করিতে হইলে এই প্রকার কঠোরতা অপরিহার্য্য। স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিনে এক জনকে ধরিতে গিয়া এক শত জনকে আটক করা যদি সম্ভব হইয়া থাকে তবে এখন দশটা চোর ধরিতে গিয়া এক জন সাধুর কিঞ্চিৎ লাঞ্ছনার আশঙ্কা থাকিলেও তাহাতে পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে।

পুলিস বিভাগে অতীতের অসাধুতা এবং বর্ত্তমানে দলাদলি ও অযোগ্য নিয়োগের ফলে যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে উঁহাদের নিকট হইতে কাজ পাওয়া অতিশয় কঠিন হইবে। অসাধু পুলিসকে প্রমোশন দিয়া, গ্রামের ও শহরের পুলিস একাকার করিয়া এবং ভাল কর্ম্মচারীদের সমর্থন না করিয়া পুলিসের সততা ও দক্ষতা একেবারে রসাতলে দেওয়া হইয়াছে। চোরাকারবার অর্ডিনান্সটিকে কাজে লাগাইতে হইলে বাছা বাছা উপযুক্ত ও সৎ লোক লইয়া এনফোর্সমেণ্ট বিভাগটিকে ঢালিয়া সাজিতে হইবে। এরূপ উপযুক্ত লোকসংখ্যা অল্প হইলেও পুলিসে এখনও আছে, ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা দরকার। তাহা ছাড়া বাহির হইতে উচ্চশিক্ষিত ও সদ্বংশীয় যুবকদের এই কার্য্যের জন্ত নিযুক্ত করা ও চাকুরি দেওয়া দরকার। আবগারী বিভাগে একটা নিয়ম আছে যে, চোরাই কারবারের সংবাদ যে দেয় সে পুরস্কার পায়। এখানেও এই নিয়ম করা যাইতে পারে যে চোরাকারবারীর কাজ ধরাইয়া দিতে পারিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আমরা বারংবার যে কথা বলিয়া আসিয়াছি এই প্রসঙ্গে আবারও তাহা বলিতে চাই। কাজ করে মানুষে, চেয়ার টেবিল নহে; উপযুক্ত লোকের উপর কাজের ভার না পড়িলে সহস্র অর্ডিনান্স ও আইনেও কোন কাজ হইবে না। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত অফিসার সকলপ্রকার দুর্নীতি, আশ্রিতবাৎসল্য, পক্ষপাতিত্ব ও দুর্ব্বলতার অতীত না হইলে বিভাগীয় শৃঙ্খলা ও কর্ম্মদক্ষতা কিছুতেই বজায় থাকিতে পারে না। বাংলা-সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগ, বিশেষতঃ পুলিস বিভাগ, ইহার জলন্ত নিদর্শন। গবর্ণর কেসির অনুরোধে শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় এই সমস্তার আনুপূর্ব্বিক বিশ্লেষণ করিয়া একটি অতি মূল্যবান রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন, লালদীঘির দপ্তরখানায় আজও উহা বস্তাবন্দী হইয়া রহিয়াছে। ঐ রিপোর্টটি পাঠ করিলে গবর্মেণ্ট দুর্নীতি নিবারণের প্রকৃত পথের সন্ধান পাইবেন।

শেষ কোথায় ?

"গণরাজ" নামক পত্রিকাখানি মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির মুখপাত্র। জনাব রেজাউল করিম তাহার সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি। সুতরাং এই পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য ও সংবাদ সততা ও ধীরতার দিক হইতে অনুকরণীয়। সেই পত্রিকার ১লা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় একটি সংবাদের উপর মন্তব্যের শিরোনামা দেওয়া হইয়াছে—"শেষ কোথায়" ? আমরাও সেই প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে চাই "মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন সীমান্তবর্ত্তী এলাকায় যে পাকিস্থানী হানাদারের জুলুম নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে"—তার শেষ কোথায় ? আমাদের সহযোগী কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এবং তাহার বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে "এই সব ঘটনা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। 'পূর্ব্ব পাকিস্থান' কর্ত্তৃপক্ষ অফিসারের পশ্চাতে সুপরিকল্পিত একটি নীতি কার্য্য করিতেছে।" এই নীতি কি তাহা এই প্রবন্ধে বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু তাহা বুঝিবার জন্ত খুব বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

এ দিকে পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেণ্ট এই সব বিষয়ে অনেকটা ক্ষমাঘেন্না করিয়া চলিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এই ধৈর্য্য সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গের লোকের মন কিরূপ বিষিয়া উঠিতেছে, তৎসম্বন্ধে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভা সজাগ নয়। "গণ-রাজ" মুর্শিদাবাদের "জনৈক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার" একখানি পত্রের অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাংলাদেশের দুই অংশের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পাইতে পারে বলিয়া এই পত্রখানি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই মনে হয়। কেন এরূপ অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, "গণরাজে" বর্ণিত একটি ঘটনায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

"আক্তর্ডমিনিয়ন চুক্তি তখনও হয় নাই। মুর্শিদাবাদ হইতে প্রতিদিন—(২৪ ঘণ্টা) গরু ছাগল, চাউল আটা, তেল ঘি, চিনি লবণ, কাপড় কম্বল প্রভৃতি গুপ্তপথে পর্দ্দা পার হইয়া যায়। সাধারণে দেখে সবই, বলিতে ভয় পায়। অ-সাধারণে দেখিলে চোরাকারবারীর কাছে বিধিমতে অর্থগুপ্তি লইয়া মাল ছাড়িয়া দেয়। এহেন কাঁচা দু'পয়সা রোজগারের একটি লোভনীয় সুযোগ ভাগ্য-ক্রমে খাদ্য ক্রয় বা প্রোকিওরমেণ্ট বিভাগের এক ইন্স-পেক্টরের জুটিয়া যায়। অভাগা কিছু খাইয়া—পাকিস্থান-গামী মাল ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু তাহার এই খাওয়ার কথা কোনও প্রকারে বড়কর্ত্তা জানিয়া ফেলেন। বড়কর্ত্তা ইন্সপেক্টরকে তলব করিয়া খাওয়ার বিবরণ জানিতে চান। ইন্সপেক্টর অকপটে সব স্বীকার করেন: "হাঁ স্তার, আমি খেয়েছি। তবে আমি কিছু না খেলেও তারা মাল পার ক'রে দিতই। কোন রকমেই আমি তাদের বাধা দিতে পারতাম না। কাজেই, মাল যখন চলে যাবেই, তখন আমার পাওনাটা বাদ যায় কেন ?

আর একটি অভিজ্ঞতা আরও চমৎকার। তাহাতে মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের শতকরা পঞ্চাশ জন চোরাকারবারীর খোঁজ পাওয়া যায়।

"আমাদের জনৈক মাড়োয়ারী বন্ধু প্রোকিওরমেণ্ট করিতেন এবং সরকারী চাউলের বস্তা পিছু মাত্র এক সের

ওজন ধরিয়া লইতেন। প্রোকিওরমেন্টে যাঁহারা মুসলমান রাজত্বে কার্য্য করিতেন তাঁহাদের অনেকে এখনও আছেন—তাঁহারা সৎ, অনাহারী (অর্থাৎ যাঁহারা খাইতে জানেন না) এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া, আমাদের বন্ধু পঁচিশ হাজারের পর পঞ্চাশ হাজারে ধরা পড়েন এবং তাঁহার এজেন্সী চলিয়া যায়। অবশ্য নাম বদলাইবার ফলে এজেন্সী তাঁহার হাত ছাড়া হয় নাই। ব্যবসায়ের খাতিরে বিবিধ দুর্নীতির আটঘাট জানা থাকায় তিনি বলেন যে গবর্ণমেন্টের কাজ একবার পাইলে সহজে যাইত না; তদ্বির থাকিলেই চলিত। সে দিন কথাচ্ছলে তিনি বলিয়া ফেলেন যে ১৫ই আগষ্টের পর হইতে তাঁহারা অর্থাৎ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা সর্ব্ববিধ অপকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কি সরকারে কি সাধারণে তাঁহাদের দুর্নাম থাকিয়াই যাইতেছে। বন্ধুর ক্ষোভের কারণ বুঝিতে চেষ্টা করিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলাম: "এ যে বসন্তের দাগ জন্মে না মিলায়!"

চাউল সংগ্রহে সরকারী ব্যবস্থা

চাউল সংগ্রহে ঘোষ মন্ত্রীসভার সরবরাহ সচিব আশ্রিত পোষণের সুবিধাজনক যে অদ্ভুত পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বুঝা যায় যে উহাতে আর যে কাজ হউক না কেন, চাউল সংগ্রহ হইবে না। ইহার ফলে কলিকাতার রেশন ব্যবস্থাও প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ডায়মণ্ড-হারবার মহকুমায় চাউল সংগ্রহের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মহকুমায় ধান চাউল সংগ্রহকার্য্যে তিনি মূলতঃ তাঁহার দলভুক্ত কংগ্রেস কর্ম্মীদেরই পারমিট দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মহিলারাও এই অনুগৃহীতের তালিকা হইতে বাদ পড়েন নাই। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার রিপোর্টে প্রকাশ যে এই অনুগৃহীত কংগ্রেস কর্ম্মীদের অনেকেই ছিলেন স্ব স্ব অঞ্চলের স্বনামখ্যাত চোরাকারবারী। অবশিষ্ট অনেকের এত বড় কাজে হাত দিবার উপযুক্ত আর্থিক সংস্থান না থাকায় দরুন নিজেদের নামের পারমিট প্রায়শঃই দাগী ব্যবসাদারদিগের নিকট হস্তান্তরিত করিয়া ঘরে বসিয়াই মোটা লাভ করিতেন।

ডাঃ বিধান রায়ের মন্ত্রীসভার আমলে এই ব্যবস্থা লোপ হইয়াছে কিন্তু তার পরিবর্ত্তে অন্য যে ব্যবস্থা চালু হইয়াছে তাহাও সুবিধাজনক নহে। ভাণ্ডারী মহাশয়ের অনুসৃত পদ্ধতির কতকটা বর্ত্তমান সরবরাহ সচিব মহাশয় পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার আমূল সংশোধন তিনিও করেন নাই, অথবা করিতে পারেন নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ চব্বিশ পরগণা জেলার কথা ধরা যাইতে পারে। হাঁড়া হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত যে পাকা রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে তাহাকে কর্ডন লাইন ধরিয়া গোটা ডায়মণ্ডহারবার মহকুমাটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। রাস্তার দক্ষিণ দিকের চাউল উত্তর দিকে যাওয়া বারণ। ফলে রাস্তার দক্ষিণ দিকের চাউলের দর ১৪৲ টাকা, কিন্তু রাস্তার ঠিক অপর পার্শ্বেই সেই চাউল বিক্রয় হইতেছে ২২৲ টাকা হইতে ২৪৲ টাকা দরে। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই এপার হইতে ওপারে বে-আইনী ভাবে চাউল চালান দিবার চেষ্টা বেশ ভাল ভাবেই দেখা দিবে। এই চোরাকারবারে বড় বড় রুই কাতলা হইতে চুনাপুঁটি অনেকেই আছে। রুই কাতলার স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের হাত তৈলসিক্ত করিয়া তাহাদের কারবার ঠিক চালাইয়া যাইতেছে। সরকারী রোষের সমস্তটা আসিয়া পড়িতেছে মাথামুটে, গরীব চাষী আর ভূমিহীন দিনমজুরদের উপর।

সুন্দরবনের চাষী

কলিকাতার চল্লিশ মাইলের মধ্যে চব্বিশ-পরগণার সুন্দরবন এলাকা। রাজধানীর এত নিকটে বাস করিয়াও এখানকার প্রজারা যে দুর্দশার মধ্যে বাস করে তাহা অবর্ণনীয়। রাস্তাঘাট নাই, পানীয় জল নাই, স্কুল, ডাক্তারখানা নাই, পোষ্ট আপিস নাই—তার উপর আছে কয়েক বৎসর পর পর নোনা জলের বন্যা। সাধারণ বন্যা এবং নোনা জলের বন্যার মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। সাধারণ বন্যার জল সরিয়া গেলে লোকে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে, ঘরবাড়ী পরিষ্কার করিয়া আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম্মে মন দিতে পারে। নোনা জলের বন্যায় তাহা হয় না। এই বন্যায় ধানক্ষেতে লবণ পড়িয়া তিন বৎসরের জন্য জমি নষ্ট হইয়া যায়, চাষ হয় না। পুকুরে নোনা জল ঢুকিয়া পানীয় জল নষ্ট হইয়া যায়, মাছগুলিও মরিয়া যায়। গরুবাছুরের পায়ে ও মুখে এক প্রকার ক্ষত দেখা দেয়, ফলে অল্প দিনের মধ্যে গৃহপালিত পশু নষ্ট হইয়া যায়। ঘরবাড়ীতে নোনা ধরিয়া ঐগুলিও মেরামতের অতীত হইয়া পড়ে। সুন্দরবন এবং কাঁথি অঞ্চলে এই সব কারণে নোনা জলের বন্যাকে স্থানীয় লোকেরা ভয়ানক ভয় করে।

নোনা জলের বন্যায় চাষী এবং স্থানীয় গরীব লোকেদের সমূহ ক্ষতি হইলেও এক শ্রেণীর লোকের লাভ আছে। ইহারা স্থানীয় জমিদার ও জোতদার। সুন্দরবন অঞ্চলের প্রজাস্বত্ব আইন এমন যে জমিতে লবণ ধরিয়া তিন বৎসর চাষ না হইলেও খাজনা মকুব হয় না। ঐ খাজনাও প্রজার নিকট হইতে আদায় করা হয়। যে প্রজা উহা না দিতে পারে তাঁহাদির নালিশ করিয়া তাহাকে উচ্ছেদ করা হয় এবং

প্রাণের দায়ে সে আবার ঐ জমিই নূতন সেলামী দিয়া নূতন করিয়া ইজারা লইতে বাধ্য হয়। এই কারণে চার-পাঁচ বৎসর পর পর এই এলাকায় বন্যা হওয়া এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে লাভজনক এবং আশ্চর্য্যের বিষয় ঠিক এই ভাবেই বন্যাও হইয়া থাকে।

প্রজাদের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মাথাব্যথা ছিল না কিন্তু কোন কোন ইংরেজ বিবেক বজায় রাখিয়া চাকুরি করিতেন বলিয়া প্রজারা মাঝে মাঝে হিতকারী বন্ধু পাইয়া একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিত। সুন্দরবনের সারেঙ্গাবাদ অঞ্চলের দুর্দশা দেখিয়া কালেক্টর ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন যে এখানে বাঁধ না দিলে নোনা জলের প্লাবন কিছুতেই বন্ধ করা যাইবে না। পি-ডাব্লিউ-ডি ইহাতে আপত্তি করে কারণ বাঁধ মেরামত ও উহা ঠিক মত বজায় রাখিবার দায়িত্ব তাহাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। গবর্ন্মেণ্টের কোন বিভাগের সহিত কোন বিভাগেরই সহযোগিতা নাই, বরং প্রত্যেকে যেন প্রত্যেকের সম্বন্ধে একটা armed neutrality-র ভাব লইয়া কাজ করে। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের যুক্তির সম্মুখে পি-ডব্লিউ-ডির অন্যায় আপত্তি টিঁকিল না, সারেঙ্গাবাদের বাঁধ দেওয়া হইল। প্রজারা রক্ষা পাইল। বাঁধ রক্ষার ভারপ্রাপ্ত এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার বিবেকবান লোক বলিয়া প্রত্যেক বৎসর উহাতে মাটি পড়ে, কাজেই বাঁধটি বজায় থাকে। সম্প্রতি এই ভদ্রলোক বদলী হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থলে যিনি আসিয়াছেন তিনি দিনগত পাপক্ষয় করিয়া চাকুরি বজায় রাখাই বোধ হয় জীবনের ব্রত মনে করেন। বর্ষার আগে বাঁধে কাঁকড়া প্রভৃতি ঢুকিয়া গর্ত্ত করে এবং ঐ সব গর্ত্ত মাটি দিয়া বুজাইয়া না ফেলিলে উহাতে জল ঢুকিয়া বাঁধ ভাঙিয়া যায় এটা সব কর্ম্মচারী জানেন, স্থানীয় লোকেরা তো জানেই। এবার সারেঙ্গাবাদের বাঁধে মাটি দিয়া গর্ত্ত বুজাইতে ইঞ্জিনিয়ার অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া স্থানীয় লোকেরা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় না। এই গাফিলতির জন্য শেষ পর্য্যন্ত বাঁধটি ভাঙে। নোনা জলের বন্যায় প্রায় ৬০ হাজার বিঘা জমির সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। ২২শে মে এই ঘটনা ঘটে। প্রায় পক্ষকাল পর "সাহায্য দেওয়া হইতেছে" এই ধরণের কতকগুলি ভাসাভাসা উক্তিতে পূর্ণ একটি প্রেসনোট প্রকাশিত হয় কিন্তু দুর্গতদের সাহায্য করা বা যাহাদের দোষে শত শত লোকের এইরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিল এবং ৬০ হাজার বিঘা জমি বর্ত্তমান ফসলের টানাটানির দিনে তিন বৎসরের জন্য নষ্ট হইয়া গেল তাহার তদন্তেরও কোন ব্যবস্থা হইল না। বাঁধ ভাঙিয়া গেলে লোকের সাহায্যের জন্য কালেক্টরকে অপরিমিত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কালেক্টর এখন বাঙালী কিন্তু তিনি তাহা প্রয়োগও করিলেন না, ঘটনাস্থলে গিয়া দুর্গতদের পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের দুর্দশা মোচনের কোন চেষ্টামাত্র করিলেন না। সেচমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার, রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এবং সাহায্যমন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জ মাইতি ঘটনাস্থলে গিয়াছেন কিন্তু শ্রীবিমল সিংহ কিছু জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছাড়া আর কেহই কিছুই করেন নাই। এ সম্বন্ধে সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির ব্রহ্মচারী ভোলানাথ যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার কতকাংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। ব্যাপারটা লইয়া এখনও কি ভাবে গড়িমসি চলিতেছে উহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির যুগ্মসম্পাদক ব্রহ্মচারী ভোলানাথ জানাইতেছেন—"ক্যানিং ও ভাঙড় অঞ্চলে প্লাবন ও সরকারী সাহায্য ব্যবস্থার সংবাদ বাহির হইয়াছে। সরকারী সাহায্যের সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, সরকার পুরাতন আমলাতন্ত্রী মনোভাবের এতটুকু ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। গত ২২শে মে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হইয়াছে, সেচমন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীরা ২৬শে মে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। ২রা ও ৩রা জুন বৈঠক বসিয়াছে কিন্তু অদ্যাবধি সাহায্যের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই, সরকারী সংবাদে যে সমস্ত বন্দোবস্তের কথা (পানীয় জলদান, নলকূপ মেরামত, কুটিরে সাহায্য ইত্যাদি) উল্লিখিত হইয়াছে তাহার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই; শুধু একখানি জলসরবরাহের নৌকা ৭ই জুন হইতে ঐ এলাকায় যাইতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, সরকার কোন্ সূত্রে খবর পাইয়া লিখিতেছেন যে 'সাহায্যের ব্যবস্থা হইতেছে' এবং 'সাহায্য দেওয়া হইয়াছে'? আজ এক পক্ষকাল ধরিয়া সরকার যে ভাবে শম্বুক গতিতে অগ্রসর হইতেছেন তাহা স্বাধীন দেশের জনপ্রিয় সরকারের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা নয় কি?

"গত ৭ই জুন ক্যানিং-এ মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের উপস্থিতিতে এবং দৈনিক ভারত পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণের সভাপতিত্বে একটি "সুন্দরবন সম্মেলন ও প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী" অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সরকারী প্রেসনোটের দিকে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আলোচনা করা হয়। মন্ত্রী মহাশয় ঐ খানেই ১৪খানি পানীয় জলসরবরাহকারী নৌকার ব্যবস্থার জন্য আলিপুরের সদর মহকুমা হাকিমকে নির্দ্দেশ দেন। জানি না এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিতে আবার কোন্ আমলাতন্ত্রী হিসাব নিকাশের বেড়াজাল সৃষ্টি হইবে। তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের জানান দরকার যে, এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিতে নৌকা পিছু সরকারকে অন্ততঃ মাসে ১৪০ টাকা (এক জন মাঝি ৫০ ও ২ জন দাঁড়ি ৩০ টাকা হিসাবে ৬০ টাকা এবং নৌকা ভাড়া ৩০ টাকা) খরচ করিতে হইবে।

"আমরা জানি যে, '২৭ নং ট্রেজারী রুল' অনুসারে

প্রত্যেক জেলা কর্তৃপক্ষকে সরকার অসীম ক্ষমতা দান করিয়াছেন এবং এইরূপ ঘটনায় যখন জনসাধারণের ধন ও প্রাণ বিপন্ন হয় তখন তিনি ঐ ক্ষমতাবলে প্রয়োজনমত যত খুশী ইচ্ছা টাকা ট্রেজারী হইতে তুলিতে পারেন। আজ পনেরো-ষোল দিনের মধ্যেও ২৪-পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কি ঐরূপ একটি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করিলেন না? অতিশয়োক্তিপূর্ণ বিভিন্ন বিবৃতি দাখিল করা অপেক্ষা ঐরূপ দ্রুত কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন সাধারণের বেশী উপকারে আসিত।

"আমরা আরও জানাইতে চাই যে, সারেঙ্গাবাদের যে বাঁধ লইয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইতেছে এবং জনসাধারণের আগ্রহ এবং আবেদন সত্ত্বেও প্রেসনোটে সরকার ঘোষণা করিলেন যে, ঐখানে বাঁধ হওয়া সম্ভব নয়, সেই বাঁধ সম্বন্ধে রাজস্বমন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ক্যানিঙে বলিয়া আসিয়াছেন যে, তিনি রাজস্ব বিভাগ হইতে টাকা দিয়া ঐ স্থানে বাঁধ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবেন এবং এ সম্পর্কে সম্মেলনে উপস্থিত আলিপুরের সদর মহকুমা হাকিমের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং অনতিবিলম্বে যাহাতে লোকজন সংগৃহীত হইয়া বাঁধ নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় সেইভাবে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রেসনোটে সরকার কেন ঘোষণা করিতেছেন যে, ঐ স্থানে বাঁধ নির্ম্মাণ অসম্ভব, তাহা আমাদের ধারণার বাহিরে।"

এই বিবৃতি হইতে সন্দেহ হয় পি-ডব্লিউ-ডি এখনও নিজেদের জিদ বজায় রাখিয়া বাঁধ নির্ম্মাণে বাধা দিয়া কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে এবং মন্ত্রীরা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ দুর্ব্বলতা এবং শাসনকার্য্যে অজ্ঞতা ও অযোগ্যতার জন্য এই আপত্তি কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইংরেজ আমলেও এই শ্রেণীর ঘটনায় ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে কতখানি কঠোরতা অবলম্বন করিতেন একটি ঘটনা উল্লেখ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

কাঁথিতে বিয়াল্লিশের বন্যার কয়েক বৎসর আগে আর একবার প্রবল বন্যা হয় এবং বহু সহস্র লোক উহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ইংরেজ, বিভাগীয় কমিশনারও ইংরেজ। ম্যাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট দেন বন্যা ভয়াবহ রকমের হইয়াছে আশু সাহায্য প্রয়োজন; কমিশনার রিপোর্ট দেন বিশেষ কিছুই হয় নাই। বাংলা-সরকার কমিশনারের রিপোর্ট গ্রাহ্য করিয়া বিষয়টি ধামাচাপা দেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ভারত-সরকারের হোম সেক্রেটারীকে পত্রে বিষয়টি সবিস্তারে জ্ঞাপন করেন, ভারত-সরকার গবর্ণরকে তদন্তের জন্য অনুরোধ করেন। তদন্তে প্রকাশ পায় ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবরণই সত্য, বন্যা ভীষণ রকমের হইয়াছে। এই ভুল রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বিভাগীয় কমিশনারকে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার, এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কাহারও একটা কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত তলব হইল না। মন্ত্রীরাও পরম নির্ব্বিকার।

প্রাথমিক শিক্ষকদের দুর্দ্দশা

মুর্শিদাবাদের প্রাথমিক শিক্ষক সতীশচন্দ্র প্রামাণিক অর্থাভাবে বিব্রত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন—এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক প্রেসনোট জারী করিয়া বলেন যে, মানসিক বৈকল্য, পারিবারিক অশান্তি এবং একটি খুনের মামলায় সাক্ষ্যদান এই আত্মহত্যার কারণ। প্রেসনোটে বলা হয়, "বকেয়া বেতন না পাওয়ার জন্য উক্ত প্রাথমিক শিক্ষক আত্মহত্যা করিয়াছেন—শিক্ষা বিভাগ তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না।" মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রীনির্ম্মাল্য বাগচী সতীশচন্দ্র প্রামাণিকের মৃত্যু সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতেই প্রকৃত তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ১৫ টাকা অথবা তাহার খুব কাছাকাছি। এই সামান্য টাকাও যদি নিয়মিত না পাওয়া যায় তবে মানুষের এই বাজারে কি অবস্থা হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। সতীশবাবু জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ এবং এপ্রিল এই চারি মাস—অর্থাৎ তাঁহার আত্মহত্যার দিন পর্য্যন্ত বেতন পান নাই। বাগচী মহাশয়ের বিবৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে তাঁহার জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন ২৬শে মে তারিখে অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর ১২ দিন পরে এবং মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসের বেতন ২৯শে মে তারিখে অর্থাৎ স্কুল ইন্‌সপেক্টরের উপস্থিতিতে সরকার কর্ত্তৃক মৃত্যুর তদন্তের পরদিন মনি অর্ডারযোগে সতীশবাবুর নামে প্রেরিত হয়। আসল ব্যাপার এই যে, আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়ার পর স্কুল-বোর্ড এবং স্কুল-ইন্‌সপেক্টর তাড়াতাড়ি মণি অর্ডারে টাকা পাঠান এবং নিজেদের গাফিলতি চাপা দিবার জন্য মৃত ব্যক্তির নামে টাকা পাঠানো হয়। চারি মাসের টাকা না পাওয়ায় চরম দুর্দ্দশায় পড়িয়া ভদ্রলোকের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়া থাকিলে যাঁহাদের দোষে টাকা যায় নাই তাঁহারা তার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। সরকারী ইস্তাহারে পরিষ্কার বলা হইয়াছে তাঁহার মানসিক বৈকল্য ঘটিয়াছিল এবং এই কথা বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাগচী মহাশয় দেখাইতেছেন যে, সতীশচন্দ্র ৩রা মে পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে রীতিমত কাজ করিয়াছেন; কোন রূপ মানসিক বৈকল্য বা বিমর্ষতা যদি দেখা দিয়া থাকে তবে তাহা ৪ঠা হইতে ১২ই তারিখের মধ্যে ঘটিয়াছে। ইহা নিশ্চিত যে সতীশচন্দ্র প্রামাণিক একাদিক্রমে চার মাসের বেতন পান নাই এবং তার জন্য তাঁহাকে অনশনে পারিবারিক অশান্তি এবং বিমর্ষতার মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে। এই

অবস্থায় অকস্মাৎ জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া কেহ যদি আত্মহত্যা করিয়া বসে তবে তাহাকে মানসিক বৈকল্যের ফল বলিয়া এড়াইবার চেষ্টা চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থাও যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে নিম্নলিখিত দুইটি বিবৃতি হইতে তাহা বুঝা যাইবে। গবর্মেণ্ট এখনও এই দুঃসহ অবস্থার প্রতিকারে অগ্রণী হইবেন কিনা আমরা জানি না। শ্রীশশাঙ্কশেখর সায়্যাল লিখিতেছেন :

"মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ডের শাসন পরিচালনা যে কি পরিমাণ ত্রুটিপূর্ণ আমি তৎপ্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক শিক্ষক এই দুর্দ্দিনের বাজারে কিরূপ অবস্থায় কাল কাটাইতেছে, তাহা বিচার করিলেই উহা প্রমাণিত হইবে। বরহাটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত মহাশয়ের ৫ মাসের বেতন, সেকেণ্ড পণ্ডিতের ১০ মাসের বেতন ও থার্ড পণ্ডিতের ১৩ মাসের বেতন বাকি পড়িয়াছে। ইহাদের নাম যথাক্রমে শ্রীনীলকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীললিতমোহন চাটুজ্যে ও শ্রীগুরুপদ গোঁসাই।"

বালীর শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন :

"বাংলাদেশের প্রত্যেক পল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জেলা স্কুলবোর্ডের আদেশে ছাত্রদের নিকট হইতে কোন বেতন গ্রহণ না করিতে বলা হইয়াছে এবং শিক্ষকগণের বেতন দিবার দায়িত্ব স্কুলবোর্ড গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার ফলে অধিকাংশ বিদ্যালয়ই অবৈতনিক কিন্তু শিক্ষকগণের মাসিক বেতন যে কত তাহা এ পর্য্যন্ত জানা গেল না। পূর্ব্বে তিন মাস বা ছয় মাস অন্তর তিন মাসের বেতন একত্রে মণিঅর্ডারে আসিত ; মণিঅর্ডারে টাকার অঙ্ক দেখিয়া শিক্ষকেরা স্থির করিতেন নিজ নিজ পারিশ্রমিকের পরিমাণ। এই মাসে অর্থাৎ জুন মাসে দেখা গেল শিক্ষকগণের মার্চ্চ মাসের বেতন বাবদ কাহারো ভাগ্যে ১৪৲, কাহারো ১২৲, ১০৲ এমন কি ৮৲ পর্য্যন্ত। আট টাকা বেতন গ্রহণ করিয়া যদি কোন হতভাগ্য শিক্ষকের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে এবং সেইজন্ত যদি আত্মহত্যা করে তবে সে দোষ আর যাহার হউক নিশ্চয়ই সরকারী ত্রুটির ফলে নহে। ইহা কি অদৃষ্টের পরিহাস না ধৈর্য্যের পরীক্ষা ?"

পশ্চিম বাংলার সামরিক সংগঠন

কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতার বাংলা দৈনিক পত্রিকায় একটা সংবাদ প্রকাশিত হয় যে এখনও ভারতরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীতে বাঙালী সৈনিকেরা স্থান পাইতেছে না ; ইংরেজের আমলের ব্যবস্থা এখনও অটুট আছে ; বাঙালীকে "অসামরিক জাতি" এই বদনাম দিয়া দূরে সরাইয়া রাখিতে হইবে। এ কথা কল্পনা করা যায় যে বর্ত্তমানে যাঁহারা সৈন্যবাহিনীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, সেই বিভাগের সৈন্তাধ্যক্ষবৃন্দের বাঙালীকে "সামরিক জাতি" করিয়া তুলিবার জন্ত তাগিদ বা অবসর নাই ; কাশ্মীর রণাঙ্গনে ব্যস্ত আছেন তাঁহারা ; হাতের কাছে যে আয়োজন পাইয়াছেন, তাহা দিয়াই কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া যাইতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে, কাশ্মীর রণাঙ্গনে বাঙালী সৈন্তাধ্যক্ষ আছেন কয়েক জন, কিন্তু বাঙালী সৈনিক একজনও নাই। গণপরিষদের সদস্য শ্রী কে. শান্তনম কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই কথা বলেন—কাশ্মীরে বাঙালী সৈন্তাধ্যক্ষ দেখিলাম, বাঙালী সৈন্ত দেখিলাম না ; তাহার কারণ ইংরেজ আমলে কোন বাঙালী সৈন্যবাহিনী গঠিত হয় নাই। তিনি এই বিষয়ে তৎপর হইবার জন্ত গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করেন।

কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের এই বিষয়ে কোন বিশেষ দায়িত্ববোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। সর্দ্দার বলদেব সিংহ যে কাঠামো পাইয়াছেন, তাহার সাহায্যে কাজ চালাইয়া যাইতেছেন ; যে সব অঞ্চলে সৈন্যবাহিনীর জন্ত লোক সংগ্রহ করা হইত সেইখানেই "রংরুট মেলা" বসাইয়া সেনাদলে যোগদান করিবার জন্ত আহ্বান করা হইতেছে ; যুক্ত প্রদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে, মহারাষ্ট্রে, মাদ্রাজে, আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই বিষয়ে চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া শুনিয়াছি। পশ্চিম বাংলায় কেন হয় নাই, এই বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব জানিতে পারিলে সুবিধা হয়।

তৎপূর্ব্বে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীকে উদ্যোগী হইতে হইবে। তাহাদের প্রচার বিভাগের মারফতে জানিতে পারিয়াছি যে "জাতীয় ক্যাডেট কোর" সংগঠনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; এই "ক্যাডেট কোর" সৈন্তাধ্যক্ষ শ্রেণী গড়িয়া তুলিবার আয়োজনের প্রারম্ভ মাত্র। কিন্তু আমরা যে বাঙালী পল্টনের কথা বলিতেছি, তাহার ব্যবস্থা ইহার মধ্যে নাই। পশ্চিম বাংলার জাতীয় রক্ষিবাহিনী দল গড়িবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে ; ইতিমধ্যে কয়েক শত পূর্ব্ব সীমান্তবাসী গ্রামিক লোককে সামরিক অ, আ, ক, খ, গ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে ; এই শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের মধ্য হইতে বাঙালী পল্টনের লোক সংগ্রহ করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না ; ইহারা বড়ই "ঘরমুখো", ছাপোষা লোক এরূপ একটা কথা আছে। "টেরিটোরিয়াল কোর্স" নামে পরিচিত যে সৈন্যবাহিনী গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে তাহার মধ্যে হইতে বাঙালী পল্টনের জন্ত লোক সংগ্রহ করা একমাত্র উপায় বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে, কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের বর্ত্তমান "রংরুট" নীতির কল্যাণে বাঙালীর সামরিক শিক্ষা ব্যাহত হইতে পারে।

এই নীতি পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে রংরুট নিবদ্ধ রাখার প্রথা মানিয়া লইয়াছে ; পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চলে যে সব পার্ব্বত্য জাতি আছে কেবল তাহাদের মধ্য হইতে ১৩,০০০ হাজার টেরিটোরিয়াল ফোর্স সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

আর একটা বাধার কথা আমাদের জানিয়া রাখা প্রয়োজন —কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের মনে নাকি একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে বাঙালী সামরিক জীবনের সংযম ও নিয়মকানুন মানিয়া লইতে চাহে না ; তাহারা এমন আত্মস্বাতন্ত্র্যপ্রিয় যে সামরিক জীবনে বাক্যে ও কার্য্যে যে স্বাধীনতার অভাব অপরিহার্য্য এই বিধান তাহারা মানিতে প্রস্তুত নয়। বাঙালী যাঁহারা নৌ-বিভাগে ও বিমান-বিভাগে যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের মুখে এরূপ ধারণার ইঙ্গিত পাইয়াছি। বাঙালী সমাজের নেতৃবর্গের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া এবং শিক্ষা দীক্ষার ভিতর দিয়া এইরূপ মনোভাবের সংস্কার-সাধন করা উচিত। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ভাল কি মন্দ তাহার আলোচনা সামরিক জীবনে অবান্তর। স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে সকল স্ত্রী পুরুষকেই রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নিজ নিজ স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিতে হয়। অন্য কোন পথ কাহারও জানা নাই। গান্ধীজীর অহিংস সমাজ-ব্যবস্থায়ও ব্যষ্টির স্বাধীনতা সঙ্কোচের নিয়ম ছিল।

এই সব কথা ও যুক্তি আলোচনা করিয়া মনে হয় পশ্চিম বঙ্গ গবর্ন্মেণ্টের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের নিকট এরূপ অধিকার পাইবার দাবী করিতে হইবে। বাঙালী "অসামরিক জাতি" এই কলঙ্ক মোচনের জন্য আমাদের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা সফলতার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করি। আমরা এই বিষয়ে পশ্চিম বাংলার সকল শ্রেণীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। গবর্ন্মেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিবেন তখনই, যখন জনমত তাঁহাদের উপর চাপ দিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে বাধ্য করিবে। গণতন্ত্রে আর কোন উপায় নাই।

আসাম সরকারের কার্য্যকলাপ

আসাম সরকারের কার্য্যকলাপে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে একটা জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে। অসমীয়াদের বাঙালী বিদ্বেষ রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার সঙ্কুচিত করিতেছে—ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবর্গের আসাম প্রদেশে বসবাস করিবার অধিকার নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি কোন প্রদেশের আছে কিনা, এই প্রশ্ন তুলিয়া চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার সময় আসিয়াছে। শীঘ্রই গণপরিষদের যে অধিবেশন আরম্ভ হইবে, সেই সময়ে বাঙালী সদস্যবর্গের অগ্রণী হইয়া এই বিষয়ে একটা সুষ্ঠু মীমাংসার চেষ্টা করা উচিত। কেবল আসাম প্রদেশেই এই সমস্যা দেখা দেয় নাই ; বিহারেও তাহার একটা নগ্ন মূর্ত্তি আমাদের জাতীয়বাদকে বিদ্রূপ করিয়া যাইতেছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগে গৌহাটিতে যে অসমীয়া উদ্দামতা দেখা দেয়, তাহার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে বিগত ২৫ বৎসরের ইতিহাস ঘাঁটিতে হয়। সে চেষ্টা না করিয়া যদি এক বৎসরের ঘটনাবলীর বিচার করা যায়, তবে এই উৎকট মনোভাবের একটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। আসামের প্রদেশপাল সর আকবর হায়দারী ত আসাম ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়া বসিলেন যে, বাঙালীরা আসামে "বিদেশী" (foreigners)। আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বড়দলৈ শ্রীহট্টের গণভোটের সময় তাঁহার প্রদেশে শ্রীহট্টের বাঙালী অধিবাসী সংখ্যা কমাইতে যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার বিষ পূর্ব্ব-ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বহুদিন পর্য্যন্ত বিষাক্ত করিয়া রাখিবে।

আসাম ও শ্রীহট্টের বাঙালী নায়কগণ অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলিতে পারেন ; ভারতরাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাঁহারা মুখ বুজিয়া আছেন। এই সংযমের একটা অকল্যাণের দিকও আছে। গোপীনাথ বড়দলৈ, বিষ্ণুরাম মেধি, অম্বিকাগিরি রায়-চৌধুরী যে চিন্তাধারার বাহক তাহার ফল যে যদুবংশের মুষলের মত ভারতরাষ্ট্রের সংহতির পক্ষে মারাত্মক হইবে, এই বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। আমরা মাসের পর মাস ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারগোষ্ঠীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য এই বিষয়ে আমাদের আশঙ্কার কথা প্রকাশ করিতেছি। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়া প্রাদেশিকতার নিন্দা করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন ; সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল দরাজ হাতে বাঙালীকে সম অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট এইরূপ অনাচারের কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না।

এই উপলক্ষে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যত দিন শ্রীহট্ট আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং আসামের মন্ত্রিমণ্ডলীতে শ্রীহট্টের প্রতিনিধি ছিল, তত দিন অসমীয়া মন্ত্রীমহোদয়গণের একটা চক্ষুলজ্জার সংযম ছিল ; গত জুলাই মাসের পর, শ্রীহট্টের গণভোটের পর, সে লজ্জার প্রয়োজন চলিয়া গিয়াছে। সর আকবর হায়দরীর বক্তৃতা তাহার প্রমাণ। আজ আমাদের অসমীয়া প্রতিবেশীবর্গ মনে করিতেছেন যে তাঁহারা দেশের (আসামের) দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াছেন, এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা যখন তাঁহাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে তখন সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বানাইবাব শক্তিও তাঁহাদের জন্মিয়াছে। কিন্তু এই কথা তাঁহাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না, গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রের ক্ষমতার চক্রবৎ পরিবর্ত্তন হয়।

আরও একটা কথা তাঁহাদের মনে রাখিতে বলি। আসামে চৌদ্দ-পনর লক্ষ মুসলমান এখনও আছে ; তাহাদের

মধ্যেই অধিক সংখ্যক বাঙালী ; প্রায় দশ লক্ষ বাঙালী হিন্দু আছে। এই পঁচিশ লক্ষ বাঙালীকে বেশী দিন দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে, প্রায় পঁচিশ লক্ষ অসমীয়া ভাষাভাষী লোকসমষ্টির পক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমতা স্বীয় অধিকারে রাখা কঠিন হইবে। প্রায় কুড়ি লক্ষ পার্ব্বত্য জাতি, তাহাদের বিশিষ্ট ভাষা ও সংস্কার লইয়া অসমীয়াদের দিকে বরাবর ঢলিয়া থাকিবে, এই কথা রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। আমরা জানি যে শ্রীযুত রোহিণী চৌধুরীর মত লোক মনে করেন তাঁহাদের সম্পর্ক পীত বর্ণ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর। এইরূপ ভাব মাথায় না খেলিলে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিতে পারিতেন না যে অসমীয়াদের কেন্দ্রীয় শাসনকার্য্যে অধিকতর অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হউক, হয় কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে আরও অধিক সাহায্য আসামের প্রয়োজনে নির্দ্দিষ্ট হউক, না হয় তাঁহাদের (অসমীয়াদের) বর্ম্মীদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যাইবার সুযোগ দেওয়া হউক। এই কথা রোহিণী চৌধুরী মহাশয় অনেকটা ঠাট্টার ভাবে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাট্টাটা অনেক সময় মনোভাবের মুকুর হইতে দেখা যায়।

এই সব ভবিষ্যতের কথা। যে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি, তাহার ফলাফল সম্বন্ধে কেহই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে না। তবে একথা সত্য যে বাঙালীকে ভারত-রাষ্ট্রের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আসামে ও বিহারে যে তাণ্ডব চলিতেছে তাহা বন্ধ করিতে হইবে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে অগ্রণী হইয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি অ-অসমীয়া ও অ-বেহারী আসামের ও বিহারের সীমান্ত রেখায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার যদি এই দুই প্রদেশের সীমান্তরেখায় গিয়া বাধা পায়, তবে ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের কোন মূল্য নাই। এই সংকীর্ণ মনোভাবই প্রাদেশিকতার প্রকৃত পরিচয়। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবর্গ এই বিসদৃশ পরিচয়ের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইতেছেন না। আবোলতাবোল বক্তৃতা দিয়া তিনি কালক্ষয় করিতেছেন। যে ক্ষিপ্রতা দেশীয় রাজ্যসমূহের সমস্যা-সংকুল অবস্থাকে অপেক্ষাকৃত সহজ করিয়াছে, তাহা কেন এই প্রাদেশিকতার সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ হইতেছে না, সে রহস্য কে আমাদের বুঝাইবে ?

সোহরওয়ার্দ্দি পর্ব্ব

হুশেন শহীদ সোহরওয়ার্দ্দির রাজনীতিক জীবনে আর একবার পটভূমিকার পরিবর্ত্তন হইল। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কত রকম ভোল ফিরাইলেন তিনি। পশ্চিম বাংলার স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীকিরণশঙ্কর রায় এই বিষয়ে অনেক কথাই জানেন। জনসাধারণ আমরা যাহা জানি তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে চাই। রাজনীতিক জীবনে প্রথম আমরা দেখি জনাব হুশেন সোহরওয়ার্দ্দিকে দেশবন্ধুর সহকর্ম্মীরূপে, কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়ররূপে। দুই বৎসর যাইতে না যাইতে তিনি নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন ; হগ সাহেবের বাজারে এক জন মৃত ব্যক্তির কবরের ব্যাপারে আমরা তাঁহার "জেহাদী" মূর্ত্তির আভাস পাই। এই ব্যক্তিটি ধর্ম্মে কি ছিল কেহ সঠিক বলিতে পারে না ; কেহ বলে তিনি ছিলেন খ্রীষ্টান ; কেহ বলে তিনি ছিলেন মুসলমান ; তিনি ছিলেন "দেওয়ানা" এবং হগ সাহেবের বাজারের মুসলমান কসাইরা তাঁহাকে পীর বলিয়া সম্মান করিত। তাহাদের আবদারে ডেপুটি মেয়র এই ব্যক্তির কবর দিতে দিলেন প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে। একটা বিশ্রী আন্দোলনের সৃষ্টি হইল, এবং জনাব সোহরওয়ার্দ্দি অলক্ষিতে কর্পোরেশন হইতে সরিয়া পড়িলেন। তারপর আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই "মিনা পেশওয়ারির' রক্ষকরূপে, এই শ্রেণীর লোকের সাহায্যে কলিকাতার শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে একটি দল গড়িয়া তুলিতে তিনি তৎপর হইয়া উঠেন। বর্ত্তমান যুগে কলকারখানার সাহায্যে যে জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে "বস্তি" সকল তাহার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ ; এই বস্তির মধ্যে যে লোকসমষ্টি বাস করে তাহাদের বলা হয় ইংরেজী ভাষায় "denizens of the underworld"—পাতালপুরীর অধিবাসী। আলো ও বাতাস-বঞ্চিত এই লোকে যাহারা বাস করে, তাহারা সমাজের সাধারণ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অনেক সময়ে অ-মানুষে পরিণত হয়। জনাব সোহরওয়ার্দ্দি এদের লইয়া খেলিতে গিয়া এদের কোন ভাল করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই ; নিজে এদের দলপতি হইয়া শ্রমিক আন্দোলনে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করেন।

তার পর তাঁহাকে দেখিতে পাই "শের-এ বাংলা" আবদুল করিম ফজলুউল্‌হক সাহেবের সহচররূপে। বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ তখন সরকারী চাকুরীর স্বাদ পাইয়াছে, "শের-এ-বাংলা" প্রধান মন্ত্রী হইয়া হাতে মাথা কাটিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন ভাবিয়া হিন্দুকে "সাস্তানা" করিবেন বলিয়া শাসাইতেছেন। হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার মুসলমান রাজনীতিকের ব্যবসায়ের মূলধন—একমাত্র মূলধন হইয়াছে। জনাব সোহরওয়ার্দ্দি এই খেলায় মাতিয়া গেলেন। "শের-এ-বাংলা" মুক্তহস্ত হইয়াও সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিবেন কেন ! গবর্ণর হারবার্ট সাহেবেরও না ; জনাব হুসেন সোহরওয়ার্দ্দির না। সুতরাং তাঁহাকে উজির-এ-আজমের তক্ত ছাড়িতে হইল। জনাব খাজা নাজিম উদ্দিন তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন ; সোহরওয়ার্দ্দি সাহেব হইলেন সরবরাহ মন্ত্রী, অর্থাৎ বাংলাদেশে ছয়.সাত কোটি লোকের ভাত কাপড় সরবরাহ করিবার কর্ত্তা। এই পদাধিকারের কল্যাণে দুই তিন বৎসরের

মধ্যে কোটি কোটি টাকা মুসলমান সমাজের হাতে আসিয়া পড়িল। এত বড় কুবেরের ভাণ্ডার যাঁহার হাতে, তাঁহার ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতাকেও ছাড়াইয়া যায়। ফলে ১৯৪৬ সালে আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশে জনাব হুসেন সোহরওয়ার্দিকে প্রধান মন্ত্রীরূপে। তখন "পাকিস্থানী" উন্মাদনা দেশের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিতে আরম্ভ করিল; "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান" এই চীৎকারে মুসলমান সমাজের শুভবুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া গেল। এই লড়াই পরদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়; মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ এই বিষয়ে বিশেষ সাবধানী ছিলেন।

এই "লড়কে লেঙ্গের" গতিপ্রকৃতি প্রকট হইয়া উঠিল ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে। অপ্রস্তুত হিন্দু এই অপ্রত্যাশিত বিশ্বাসঘাতকতায় প্রথম সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল; তার পর তাঁহার প্রাণ ও সম্মান রক্ষার আয়োজন করিতে বেশীক্ষণ লাগিল না। ফলে, "লড়কে লেঙ্গের" দল পলাইবার পথ পাইল না। এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে শুভ-বুদ্ধি ফিরিয়া আসিবে বলিয়া যাঁহারা ভরসা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিল নোয়াখালি-ত্রিপুরার বীভৎসতা। কলিকাতা ও তাহার শিল্পাঞ্চল হইতে ব্যর্থ-মানস মুসলমান "জেহাদীরা" এই দুই জেলার হিন্দুর উপর কলিকাতার শোধ তুলিল। জনাব হুসেন সোহরওয়ার্দি বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী; নেতৃবৃন্দ আশা করিয়াছিলেন যে এই পদাধিকারের মারফতে তাঁহার হাতে রাষ্ট্রের যে ক্ষমতা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া "কাফেরকে" এমন একটা শিক্ষা দেওয়া যাইবে যে দেশের বুকে মুসলমান প্রভুত্ব অটুট ও অটল হইয়া পড়িবে।

সেই সময় হইতে জনাব হুসেন সোহরওয়ার্দি মুসলীম-লীগের অ-বাঙালী নেতৃবৃন্দের নিকট খেলো হইয়া গেলেন। যত দিন তিনি বাংলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তত দিন একটা লোকদেখানো সম্মানের ঠাঁট তাঁহার বজায় ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর সেই ভদ্রতা রক্ষার প্রয়োজনও রহিল না। কায়েদ-আজম (মুসলমান নেতা) জিন্না দেখাইয়া দিলেন যে ছিন্ন বস্ত্রের শেষ আধার আস্তাকুড়ে। আর এ-ও হইতে পারে যে সোহরওয়ার্দি বিতাড়ন একটা অভিনয় মাত্র। ভারত-রাষ্ট্রে প্রায় ৪ কোটি মুসলমান রহিয়া গিয়াছে; ইহাদের অধিকাংশের "পাকিস্থানী" মনোভাব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এদের স্বার্থরক্ষার জন্য একজন "পাকিস্থানী" নেতা ভারতরাষ্ট্রে রাখিয়া যাওয়া প্রয়োজন যিনি গান্ধীজীর কথা মুখে আওড়াইবেন এবং সেইজন্য "পাকিস্থানীদের" বাহ্য শত্রুতা অর্জ্জন করিবেন। "পাকিস্থানের" শত্রুতা তাঁহাকে ভারতরাষ্ট্রের মিত্রতার মুখোস পরাইয়া দিতে পারে। এই মুখোস ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের অনেককেই বিভ্রান্ত করিবে। এই বিভ্রান্তি "পাকিস্থান" ধুরন্ধরবর্গের আকাঙ্ক্ষিত। নিজের রাষ্ট্রে "শরিয়তের" বিধান; প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় বিধানের ব্যবস্থা। এই পরস্পর বিরুদ্ধভাবের খেলায় স্বভাবতই একটা কুয়াসার সৃষ্টি হইয়াছে। সোহরওয়ার্দি বিতাড়ন অভিনয় এই কুয়াসা গাঢ় করিতে পারে। হইতে পারে এই ভরসায় একটা দাবার চাল দেওয়া হইল সোহরওয়ার্দি-নাজিমুদ্দিনের পুরাতন বৈরতার অজুহাতে।

বাংলার মিউনিসিপালিটি

বাংলাদেশের মিউনিসিপালিটিসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের একটি সম্মেলন সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ৭১টি মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া বলেন, কলিকাতার বাহিরের মিউনিসিপালিটিগুলির আর্থিক সচ্ছলতার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, কারণ ঐ সকল স্থানের নাগরিক জীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে না পারিলে কলিকাতার বাসস্থান সমস্যা ও শহর পরিচ্ছন্ন রাখার সমস্যা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। বাংলার বিভিন্ন শহরের অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে চলিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণকে কলিকাতায় অযথা ভীড় না জমাইতে অনুরোধ করিবার পূর্ব্বে ঐ সকল স্থান বাসোপযোগী ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার জন্য পয়ঃপ্রণালী ও জল সরবরাহের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। লোকে যদি মফঃস্বল শহরে পরিবার লইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে না পারে তবে তাহারা স্বভাবতঃই ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল কলিকাতার দিকে ছুটিবে। নিশ্চিত বড়বঞ্ঝা অপেক্ষা অনিশ্চিত অবস্থাকেও শ্রেয়ঃ বলিয়াই লোকে বড় বড় শহরে আসিয়া ভীড় করে। এই সমস্যা সমাধানকল্পে কলিকাতার বাহিরের শহরগুলির আর্থিক সচ্ছলতা এবং বসবাসের সুব্যবস্থা বিধানের উপায় অবিলম্বে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

উপশহর গঠনের প্রতি বেশী ঝোঁক দেওয়া হইতেছে। মিউনিসিপাল শহরগুলিকে গড়িয়া তুলিবার দিকে মনোযোগ দিলে বাংলার বাসস্থান সমস্যার সমাধান অনেক সহজ ও অল্প সময়ে হইতে পারে। ৭১টি মিউনিসিপাল শহর বড় কম nucleus নহে। ১২টি জেলায় ১২টি ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গঠন করিয়া শহরগুলির উন্নতি বিধান করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। ইহাতে সরকারের এক পয়সা লোকসান নাই, অথচ দেশের ও দশের লাভ। শহরের চতুষ্পার্শ্বে জমি লইয়া ট্রাষ্ট সুপরিকল্পিত ভাবে শহর সম্প্রসারণ করিতে পারেন। ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া ট্রাষ্টের কাজের টাকা তোলা যায়। জমি বিক্রয়

আরম্ভ হইলে টাকা উঠিয়া যাইবে। শহরে জল, রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী এবং বিজলী বাতির ব্যবস্থা করিয়া দিলে বাকীটা লোকে আপনিই করিয়া লইবে। বাসস্থান-সমস্যার সমাধানের জন্য এই দিকে অবিলম্বে মনোনিবেশ করা আবশ্যক।

পশ্চিম বঙ্গের সমুদ্র-তট

স্বাস্থ্যের অন্বেষণে বাঙালী বাংলাদেশের বাহিরে নানা স্থানে ঘরবাড়ী প্রস্তুত করিয়াছে। উড়িষ্যায় পুরী, বারহামপুর, ওয়াল্টেয়ার; বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের দুই ধারে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর পর্য্যন্ত এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের দুই ধারে প্রায় প্রয়াগ পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যান্বেষীবর্গের কোঠাবাড়ী বাঙালীর প্রাচুর্য্যের যুগের পরিচয় দিতেছে। অনেক দিন পূর্ব্বে একটা হিসাবে দেখিয়াছিলাম যে বাঙালীর এই সব সম্পত্তির মূল্য চার পাঁচ কোটি টাকার কম হইবে না। প্রাচুর্য্য হইতে এই ব্যয় হইয়াছিল বলিয়া কোন বাঙালী বাংলাদেশের বাহিরে এই ব্যয় লইয়া মাথা ঘামান নাই। আজ কি হিসাব করিবার দিন আসে নাই? বাংলাদেশে স্বাস্থ্যের উন্নতি বিশেষ হয় নাই; স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বাংলাদেশের মধ্যেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা করিতে গেলে বাংলার সমুদ্রতটের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মুখপাত্র 'নবসঙ্ঘ' এই বিষয় লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। মেদিনীপুর সমুদ্রতটে দীঘা অঞ্চলে এইরূপ স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মাণের সুবিধা ও সুযোগ আছে। সেখানে স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মাণ সম্বন্ধে মেদিনীপুরের উদ্যোগী লোকেরা অবহিত হইলে ভাল হয়। সমুদ্রে স্নানের কি ব্যবস্থা সেখানে হইতে পারে তাহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। আর আছে ২৪ পরগণা জেলার কেন্দ্রীয় ফ্রেজারগঞ্জ অঞ্চল। শেষোক্ত স্থান সম্বন্ধে আমাদের সহযোগী বলিতেছেন:

> বৈপ্লবিক প্রয়োজনসিদ্ধির কামনায় ফ্রেজারগঞ্জের সমুদ্রতটে যে জমিখণ্ড খরিদ করা হইয়াছিল তাহা এক্ষণে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অধিকারে। ফ্রেজার সাহেব বাংলায় ছোটলাট পদে যখন সমাসীন ছিলেন, তখন তাঁহারই নির্দ্দেশে জনৈক ইংরেজ ফ্রেজারগঞ্জে নগর নির্ম্মাণ পরিকল্পনা করেন। বহু অর্থ ব্যয় করার পর তিনি এক খুনের দায়ে এই কার্য্য হইতে ইস্তাফা দিয়া বিলাতে প্রস্থান করেন। তার পর ৺মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই বিশাল ফ্রেজারগঞ্জ তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। এই সময় হইতে বাংলার নানা শ্রমিক ও কৃষক এই স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ফ্রেজারগঞ্জের তটপ্রান্তে বঙ্গোপসাগরের ঊর্ম্মিমালা লীলারত।...সমুদ্রতটবর্ত্তী ফ্রেজারগঞ্জটি উত্তম স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হইতে পারে। এত প্রশস্ত দীর্ঘ সমুদ্রতট বাংলায় তো নাই-ই—কোন প্রদেশেও আছে বলিয়া মনে হয় না।

"নব-সঙ্ঘ" এই আয়োজনে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। আমরা মনে করি ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালী এই কাজে হাত দিতে পারেন। তবে সর্ব্বপ্রথমে জানা প্রয়োজন যে এখানে সমুদ্র-স্নান নিরাপদ কি না।

দেশভেদে কর্ম্মভেদ

"নির্ণয়" পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম যে বর্ত্তমান গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে হুগলী জেলার কয়েক শত ছাত্র গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য এক দলবদ্ধ অভিযান আরম্ভ করিবার আয়োজন চলিতেছে। সেই কাজ এখনও চলিতেছে নিশ্চয়ই। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দের চাষিজীবনের কাদামাটির মধ্যে ডাক দিবার কল্পনা করা কঠিন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কলেজ বন্ধের অবকাশে কৃষিকার্য্যে সাহায্য করিয়া, গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিয়া, বাসন ধুইয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন বলিয়া শুনিয়াছি। আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরা অন্যলোকে, কল্পলোকে, বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের নিকট বিলাতের ছাত্রছাত্রীবৃন্দের মত কর্ম্মের আহ্বান আসে না। ছাত্র-আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় হয়ত এরূপ একটা পরিণতি আমরা দেখিতে পাইব।

> "ব্রিটেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ডাকা হয়েছে ক্ষেত খামারে কাজ করে তাদের ছুটি কাটাবার জন্য। আগামী গ্রীষ্মকালে তারা প্রায় পাঁচ লক্ষ ম্যান-আওয়ার ঘণ্টা (Man hour) চাষের কাজ করে দেবে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য ২৫টি ক্যাম্প স্থাপন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জাতীয় ছাত্র-সংসদ বলে যে, ঐ সব ক্যাম্পে প্রায় ৫০০০ ছাত্রছাত্রী অবস্থান করবে। তারা ফল ও শস্য সংগ্রহ, শস্য ঝাড়া, বাছাই ইত্যাদি ধরণের কাজ করবে। ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকেও প্রায় এক হাজার ছাত্র তাহাদের এই কাজে সাহায্য করবে।"

নিজামশাহী নীতির উদ্দেশ্য

ভারতরাষ্ট্র ও হায়দরাবাদ রাজ্যের মধ্যে মীমাংসার যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। নিজাম বাহাদুর মীর ওস্মান আলী খাঁ এইজন্য কতটা দায়ী ও মজলিসই-ইত্তেহাদুল-মুসলিমিন প্রতিষ্ঠান তাহার জন্য কতটা দায়ী, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমানে কিছু নিশ্চিত করিয়া বলা সম্ভব নয়। গত দুই-তিন মাস হইতে আমরা "প্রবাসী"র সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই সমস্যার গতি প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই গতি-প্রকৃতির সঙ্গে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে কোন সামঞ্জস্য-বিধান সম্ভবপর নয় বলিয়া আমরা মনে করি, এবং বর্ত্তমানে দিল্লী

ও হায়দরাবাদের সলা-পরামর্শের মধ্যে যে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সময়ে আবার নিজামশাহী নীতির গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। এই গতি-প্রকৃতির সম্যক্ ধারণা না থাকিলে, এই সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা বুঝা সহজ হইবে না।

মুঘল শাসনের অধঃপতন সময়ে দাক্ষিণাত্যের একজন মুঘল "নবাব" (দেশপাল) নিজের জন্য একটা ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হন; নামে তিনি মুঘল সম্রাটের প্রতি আনুগতা স্বীকার করিতে থাকেন। এই অস্বাধীন "নবাবকে" মারাঠা আক্রমণ হইতে রক্ষা করে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। তারপর প্রায় এক শত ত্রিশ বৎসর আসফ্ শাহী বংশ ইংরেজের সার্ব্বভৌম অধিকার (Paramountcy) স্বীকার করিয়া আসিতেছে। সেই সময়েই, গত পঁচাত্তর বৎসরের মধ্যে, উত্তর-ভারতের মুসলমান ভাগ্যান্বেষীগণ গিয়া হায়দরাবাদ রাজ্যে ভিড় করিতে থাকে; সৈয়দ হুসেন বিলগ্রামি হইতে সৈয়দ কাশিম রাজভী এই দলের প্রতিভূ। এই সব মুসলমান বুদ্ধিজীবী শ্রেণী হায়দরাবাদ রাজ্যের চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারার নিয়ামক হইয়া পড়ে। এই শ্রেণীই মুসলমান স্বাতন্ত্র্যের স্রষ্টা যার পরিণতি হইয়াছে "পাকিস্থানে"। এই শ্রেণীর পরামর্শেই "নবাব" বংশ এই ঘোষণা করিতে প্রবুদ্ধ হয় যে হায়দরাবাদ রাজ্য মুসলমান রাষ্ট্র। মাঝে মাঝে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দাবিটা শানাইয়া রাখা হইত। আবার ব্রিটিশ কূটনীতির প্রয়োজনে "নবাব"কে ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্টও করিতে হইত। সেইজন্য নিজাম বাহাদুর ইংরেজের বিধান অনুসারে His Exalted Highness; অন্যান্য রাজা বা "নবাবরা" কেবলমাত্র Highness, নিজাম বাহাদুরের উপাধি সকলের অপেক্ষা "উচ্চ"। তুর্কির সুলতানের পদ যখন কামাল আতাতুর্ক বাতিল করিয়া দিলেন, তখন অনেক ইংরেজ শাসনকর্ত্তা ও সাংবাদিক প্রস্তাব করেন যে নিজাম বাহাদুরকে মুসলমান জগতের "খলিফা" করা হউক। এইরূপ নানাপ্রকার উৎসাহে ও প্ররোচনায় নিজাম মীর ওসমান আলী খাঁয়ের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তিনি মুসলমান জগতের মধ্যে এক জন প্রধান ব্যক্তি। এই অহমিকা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে তুর্কির শেষ "খলিফা" সুলতান মহম্মদের কন্যার বিবাহ দেন, এবং মুসলমান জগতের নানা দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য মুক্ত হস্তে দান-খয়রাৎ করেন। এই প্রসঙ্গে এই কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে মীর ওসমান আলী খাঁ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিদের অন্যতম।

এই ক্ষুদ্র ইতিহাসটি মনে রাখিলে নিজাম বাহাদুরের কার্য্যকলাপ বুঝিতে কষ্ট হয় না। বংশের গৌরব সকলেই চায়। বর্ত্তমান যুগে, বিশেষতঃ এই গণতন্ত্রের যুগে হায়দরাবাদ মীর-বংশের স্বার্থ-রক্ষার প্রয়োজনে রাজ্যের এক কোটি সত্তর লক্ষ লোকের সুখ-দুঃখ, মান-অপমান নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। মীর-বংশের দুর্ভাগ্য যে হায়দরাবাদ রাজ্যের লোকসমষ্টির অধিকাংশ লোক হিন্দু; তাহাদের সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষের উপর। সেইজন্য মীর ওসমান আলী খাঁর প্ররোচনায় ও সাহায্যে একটি গোঁড়ার দল গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার নাম গত দশ বৎসরের মধ্যে কু-প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ইত্তেহাদ-উল-মুস্লিমিন দল গুণ্ডামি করিয়া রাজ্যের শতকরা ৮৫ জন প্রজাকে দাবাইয়া রাখিতে চায়; অত্যাচার করিয়া বা ভয় দেখাইয়া তাহাদের দেশ-ছাড়া করিতে চায়। গত নবেম্বর মাসে ভারতরাষ্ট্র ও হায়দরাবাদ রাজ্যের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল, তাহার ফলে আশা করা গিয়াছিল যে রাজ্যের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং গণতন্ত্রের বিধান-অনুসারে প্রজাপুঞ্জের ইচ্ছানুযায়ী রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হইবে। আজ মীর ওসমান আলী খাঁ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী; তাঁহার ইচ্ছায়ই রাজ্যের আইন-কানুন নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে এরূপ দাবী করা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় যে রাজ্যের মধ্যে ইত্তেহাদ-উল-মুস্লিমিন প্রতিষ্ঠানের অত্যাচারের শেষ করিতে হইবে এবং প্রজাপুঞ্জের ইচ্ছানুসারে রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা চলিবে। এই ব্যবস্থা স্বীকার করিলে নিজামশাহী ক্ষমতার তিরোধান হইবে, এবং মুসলমান সংখ্যা-লঘিষ্ঠের পক্ষ হইতে যে প্রাধান্যের দাবী এত দিন কার্য্যকরী ছিল, তাহার অবসান ঘটিবে।

এইরূপ ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া মীর ওসমান আলী খাঁর পক্ষে বা ইত্তেহাদ-উল-মুস্লিমিন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহজ নহে। সেইজন্য গত তিন মাসব্যাপী আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের শান্তি নিজামশাহী বংশের অহমিকা ও রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়ের উগ্র স্বার্থবুদ্ধির নিকট বলি পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারবৃন্দ এই অবস্থায় কি করিবেন, তাহা আমরা জানি না। বোধ হয় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবেন না। শক্তির খেলার পরিণতি সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত-রাষ্ট্রের সাড়ে তিন কোটি মুসলমান জনসমষ্টির মতিগতির কথা ভাবিতে হইবে। "পাকিস্থান" রাষ্ট্রের প্রধানগণের মনোভাব আমাদের অবিদিত নহে। ব্রিটিশ কূটনীতি এই ঘোলা জল আরও ক্লেদাক্ত করিবার চেষ্টা করিবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ধুরন্দরগণ যে খেলায় নামিয়াছেন, তাহার কথাও ভাবিতে হইবে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে নিজাম মীর আলী খাঁ হাতের পাশার শেষ দান ছাড়িয়া দিয়াছেন; তাঁহার সমর্থক সৈয়দ কাসিম রাজভির দল উন্মাদনায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ভারত-

রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যপথ সুস্পষ্টরূপে সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া আছে। আমাদের কর্ত্তব্যও সুপরিস্ফুট। রাষ্ট্রের বিপদে আমাদের মনোভাবের মধ্যে কোন দ্বিধার স্থান নাই।

ইন্দোনেশিয়া

পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মাদুরা, বোর্নিয়ো প্রভৃতি প্রায় দুই হাজার দ্বীপসমষ্টির বেশীর ভাগ ডাচ সাম্রাজ্যবাদের অধীন ছিল। ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে যখন জাপান তাহার বিজয় অভিযানে বহির্গত হয়, তখন হলাণ্ড দেশের পক্ষে এই দ্বীপপুঞ্জের রক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না; কারণ তাহারা নিজেরাই জার্ম্মানীর কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছিল। ডাচ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে মনোভাব পুঞ্জীভূত হইয়াছিল এই সময়ে এই দ্বীপপুঞ্জের দেশপ্রেমিকেরা তাহা জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেন; গোপন সংগঠন করিয়া জাপানী অধিকার দুর্ব্বল ও সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা করেন। ১৯৪৫ সনের আগষ্ট মাসে যখন জাপান পরাজয় স্বীকার করিল, তখন ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবৃন্দ এক স্বাধীন সাধারণতন্ত্রের ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলেই এই স্বাধীন রাষ্ট্রের গতি কিন্তু বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া পড়িল; তাহারা তাহাদের তাঁবেদার ডাচ শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভগ্নপ্রবণ ডাচ সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল। এই তিন বৎসরের ইতিহাস এই অসমান যুদ্ধের ইতিহাস। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দরবারে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পড়িয়া একটা গোঁজামিলের চেষ্টা হইয়াছে; লোক দেখানো একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু প্রতি পদে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্র কোণঠাসা হইয়া পড়িতেছে। এই সেদিন হইতে উতাকামণ্ডে যে এশিয়া মহাদেশের বৈষয়িক সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছে, সেই উপলক্ষেও তাহার একটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকার লইয়া এই কমিশনে ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ হইতে একটা স্থান দাবী করা হইয়াছে। ডাচ গবর্ণ্মেণ্টের পক্ষ হইতে এই দাবীর বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয় এই যুক্তিতে যে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্র সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার উপর কর্ত্তৃত্বের দাবী করিতে পারে না; ডাচ গবর্ণ্মেণ্টের তাঁবেদাররূপে অন্যান্য রাষ্ট্র আছে যাহাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী অগ্রাহ্য করা যায় না এবং তাহাদের পক্ষ হইতে ডাচ প্রতিনিধিগণ এই দাবী উপস্থিত করে। সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ জন মাথাই এই সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়া "ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতার" উল্লেখ করেন। এই তর্ক এখনও শেষ হয় নাই। ইন্দোনেশিয়ার দাবী সমর্থন করিয়া ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,

বিদেশী বাণিজ্য সম্পর্ক বিষয়ে ইন্দোনেশিয়ান রিপাব্লিক স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করিতেছে। হাভানা সম্মেলনে তাহাকে শুধু যোগ দিতে দেওয়া হয় নাই, ডাচ গবর্ণ্মেণ্টের সঙ্গে সে এই সম্মেলনের চূড়ান্ত বিবরণীতে স্বাক্ষর করিয়াছে। হাভানা সম্মেলনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী এক অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, কমিশনে ইন্দোনেশিয়ান রিপাব্লিককে একটি আসন দেওয়া হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কমিশনে সে যদি আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে তাহার পক্ষে অর্থনৈতিক কমিশনে আসন গ্রহণ করিবার কোন বাধা থাকিতে পারে না।

পাকিস্থান রাষ্ট্র ও এশিয়া মহাদেশের সকল প্রতিনিধি, অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি পর্য্যন্ত এই যুক্তি স্বীকার করিয়া ইন্দোনেশিয়ার দাবীর সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু কাণা গরুর ভিন্ন পথ। ব্রিটিশ প্রতিনিধি সর এণ্ড্রু ক্লো ডাচ পক্ষে ভিড়িয়া পড়িয়াছেন। এই ভিন্ন পথের বিপদ আছে। এশিয়া মহাদেশের সন্তজাগ্রত জনমত এই বিরুদ্ধতা স্মরণ রাখিবে।

রাষ্ট্রনীতিতে বদান্যতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নানা ভাবে ছত্রভঙ্গ ইউরোপের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে। এই সাহায্যদানে বদান্যতা ও ব্যবসায়-বুদ্ধি দুইটি ভাবের খেলা চলিতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নও এইভাবে কিছু কিছু ব্যয় করিতেছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, এই দুই বিরুদ্ধ রাষ্ট্র কেহই ইউরোপের কোন দেশ সম্বন্ধে ব্যবসায়-বুদ্ধির হিসাবের বাহিরে যাইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জার্ম্মানীর কথা উল্লেখ করা যায়। সোভিয়েট ইউনিয়ন জার্ম্মানীর আক্রমণে ধনে প্রাণে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে; সেই ক্ষতির কোন সীমা-পরিসীমা নাই। সুতরাং ন্যায়তঃ জার্ম্মানীর নিকটে ক্ষতিপূরণের দাবি চলিতে পারে। কিন্তু পট্‌সডাম-চুক্তির কল্যাণে পূর্ব্ব জার্ম্মানীতে সোভিয়েট ইউনিয়নের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চলিতেছে; সেই দেশ হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে কোন হিসাব-নিকাশের বালাই আছে বলিয়া মনে হয় না। একটা লোহার কারখানার আসল মূল্য ছিল প্রায় ৪ কোটি টাকা; ক্ষতিপূরণ উপলক্ষে ইহা রাশিয়ার ভাগে পড়ে এবং তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয় এই পরিমাণ টাকার অর্দ্ধেক। রাশিয়ার পক্ষে যখন ইহার যন্ত্রপাতির পরীক্ষা হয়, তখন তাহার মূল্য কমাইয়া দেওয়া হয় তৃতীয়াংশে। যন্ত্রপাতি সরাইয়া লইবার জন্য সহস্র সহস্র লোকের খাটুনির মূল্য বাবদ ও কাঠের বাক্সের মূল্য বাবদ এই এক-তৃতীয়াংশের তিন ভাগ ব্যয় হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধরা হয়। অর্থাৎ জার্ম্মানীর ৩।৪ কোটি টাকার সম্পত্তি ২৫।৩০ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়।

স্বস্থানে রাখিয়া এই কলটি চালাইলে প্রতি বৎসর এই পরিমাণ মূল্যের ইস্পাত প্রস্তুত করিয়া জার্ম্মানী ক্ষতিপূরণ দিতে পারিত। আজ জার্ম্মানীর ক্ষতি করিয়াও রাশিয়ার কোন লাভ হইল না।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের অংশে জার্ম্মানীর যে দুই ভাগ পড়িয়াছে, তাহার অবস্থাও ইহা অপেক্ষা ভাল নয়। সেখানে এক হাতে যাহা দেওয়া হয়, তার তিনগুণ তুলিয়া লওয়া হয়। চিকাগো নগরীতে মাংসের দাম যখন হাজার টাকা টন (প্রায় ২৭ মণ) তখন আমেরিকা ও ব্রিটেনের অধিকারভুক্ত জার্ম্মানীতে তার মূল্য তিন হাজার টাকার উপর। গমের মূল্য যখন আড়াই শত টাকা চিকাগোতে, তখন জার্ম্মানীতে তার মূল্য প্রায় চারি শত টাকা। একটি ডাচ লোহার কারখানা ২৭ লক্ষ মণ কয়লা কিনিতে চায় রুর অঞ্চল হইতে। তাহা দেওয়া হইল না; কয়লা আসিল জাহাজে করিয়া যুক্তরাষ্ট্র হইতে। ৮০।৯০ মাইল দূর হইতে না আসিয়া আসিল সমুদ্রপথে ৩,০০০ মাইল দূর হইতে। জার্ম্মানীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ এই কয়লা কিনিয়া দিতে হইল প্রায় ৮০৲ টাকা দরে প্রতি টনে কিন্তু তার হিসাবে—ক্ষতি-পূরণের হিসাবে—উঠিল প্রতি টন ৬৲ টাকা হারে।

এই ভাবেই কি "মার্শাল পরিকল্পনার" ৬১৭ শত কোটি টাকার হিসাব করিয়া জার্ম্মানীর সাহায্য করা হইবে? ডান হাত বাঁ হাতের এরূপ কৌশল দেখিবার জিনিস বটে।

রাজনারায়ণ বসু

রাজনারায়ণ বসুর জন্মশতবার্ষিকী বাংলাদেশের অনেক স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই উপলক্ষে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থানের পুনরুদ্ধার করিয়া তথায় কোন সমাজ-সেবার প্রতিষ্ঠান করিবার কল্পনা চলিতেছে। তদুদ্দেশ্যে শ্রীহেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষকে সভাপতি এবং বোড়াল গ্রামবাসী শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্রকে সম্পাদক করিয়া রাজনারায়ণ বসু স্মৃতিরক্ষা সংঘ নামে এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি ৫০,০০০ হাজার টাকা তুলিয়া রাজনারায়ণ বসুর পুস্তকাবলী পুনর্মুদ্রিত করিবেন. তাঁহার পৈতৃক ভিটায় একটি বালিকা বিদ্যালয়, একটি চিকিৎসালয় ও একটি প্রসূতিসদন প্রতিষ্ঠা করিবেন।

বর্ত্তমান যুগের বাঙালীর অব্যবহিত পূর্ব্বযুগের বাঙালী প্রধানগণের কর্ম্মধারার সঙ্গে পরিচিত হইবার আগ্রহ নাই, গতানুগতিক রাজনীতিক উন্মাদনার মধ্যে তাঁহাদের জীবন কাটিয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা বর্ত্তমান রাজনীতিকে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেশের মনে পরাধীনতার জ্বালা জ্বালিয়াছিলেন, আত্মবিস্মৃত জাতির মনে সম্বিৎ আনিয়াছিলেন, ভারতবাসীর মনে স্বাজাত্যাভিমান জাগাইয়াছিলেন, প্রাচীন গৌরবকথা শুনাইয়া ভবিষ্যতের নবভারতের সংগঠনের মন্ত্র আমাদের কানে দিয়াছিলেন—তাঁহাদের কথা জানিতে ও বলিতে বাঙালী কোন উৎসাহ পায় বলিয়া মনে হয় না। খুব বেশী হইলে বৎসরে একবার স্মৃতিবাসরের আয়োজন করিয়া, কোনরূপে "নমো, নমো" করিয়া স্মৃতি-পূজা সমাপন করে। এই অকৃতজ্ঞতা কেবল বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশেও তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

বাঙালী জানে না যে যখন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ভারতবর্ষের রাজনীতিক গগনে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মতই দীপ্যমান হইয়া উঠেন, তখন রাজনারায়ণ বসুর নূতন পরিচয় হয়—নব-জাতীয়তার পিতামহ (Grandfather of Indian Nationalism)। এই কয়টি কথার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিলে শ্রীঅরবিন্দের মাতামহের সম্যক্ পরিচয় লাভ করা যায়। তাঁহার যুগের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, নবগোপাল মিত্র, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আবদুল লতিফ প্রভৃতি বাঙালী প্রধানবর্গের কর্ম্মজীবনের সহিত পরিচয় লাভ করিতে হয়। সেই চেষ্টা করিলে বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র, মহারাষ্ট্রের বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলুঙ্কার, অন্ধ্রদেশের বীরেশলিঙ্গম পান্টালু, মালাবারের নারায়ণ স্বামী, আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতি সর্ব্বভারতীয় চিন্তানায়ক ও সংস্কারকের কর্ম্মজীবনের পরিচয়লাভ করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে গান্ধীজীর আবির্ভাব একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে; তাঁহার জন্য জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন রাজ-নারায়ণ বসু প্রভৃতি যুগপ্রবর্ত্তকবৃন্দ। এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মধ্যে নিহিত আছে প্রায় এক শত বৎসরের আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, স্বপ্ন ও তাহা রূপায়িত করিবার চেষ্টা। রাজনারায়ণ-স্মৃতিরক্ষা-সংঘের যিনি সভাপতি তিনি এই বিষয়ে অনেক কিছু বলিতে পারেন। এই সংঘের চেষ্টায় আমাদের পূর্ব্বজগণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলে, তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে দায়িত্ব দেশের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিবে; অতীতকে বুঝিয়া আমরা বর্ত্তমানকে সুষ্ঠু রূপ দিতে পারিব।

রুচিরাম সাহানী

পঞ্জাবের এক জন বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ নেতার তিরোভাব হইল। রুচিরাম যখন জীবনযাত্রা আরম্ভ করেন তখন পঞ্জাবের হিন্দুসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর দেবসমাজ ও দয়ানন্দের আর্য্যসমাজের কল্যাণে ফেরঙ্গভাবের আক্রমণ সহ্য করিবার শক্তি ভারতবাসী অর্জ্জন করিয়াছে। এই সাম্য ও সমন্বয়ের যুগে দেশের চিন্তানায়ক ও কর্ম্মনায়কবৃন্দ যে নব-সংগঠনের কল্পনা করিয়াছিলেন, জাতিধর্ম্মের বিভেদ সত্ত্বেও দেশের জীবনে একপ্রাণতা আসিতে পারে, এই ভরসায় যে কর্ম্মের ধারা তাঁহারা দেশের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া-

ছিলেন, তাহা দেশের জীবনের বিভেদের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া গেল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং বর্ত্তমানের ব্যর্থতার মধ্যে তার সন্ধান করিতে পারিলে ভবিষ্যতের সংগঠন সার্থক হইতে পারে। রুচিরাম সাহানী যে পঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে পঞ্জাবের নানা সংস্কার প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন—'ট্রিবিউন' পত্রিকার অছিরূপে, দয়াল সিংহ কলেজের কর্ম্ম-নির্ব্বাহক সভার সভ্যরূপে—সে পঞ্জাব আর আমরা দেখিতে পাইব না। কিন্তু সে পঞ্জাবের ইতিহাসের নিকট অনেক কিছু শিখিবার আছে। সেই ইতিহাসের কথা কিছু কিছু "ট্রিবিউন" পত্রিকার স্তম্ভে আমরা দেখিয়াছি রুচিরামের প্রবন্ধের ভিতর দিয়া। সেই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল সজাগ মনের খেলা। সেই মন যে যুগে গঠিত হইয়াছিল তাহা শেষ হইয়াছে; সেই মনের অধিকারীও চলিয়া গেলেন তাঁহার প্রার্থিত লোকে।

নেহরু ও প্যাটেল

বোম্বাইয়ের "ভারত জ্যোতি" সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই দুই লোকনেতার সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য তুলনা করিয়া একটি প্রণিধান-যোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন ডাঃ বালকৃষ্ণ কেশকার, নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক। "গান্ধীজীর তিরোধানের পর এই দুই জনই ভারত রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের স্রষ্টা; দেশের লোক-মনের উপর তাঁহাদের প্রভাব এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আকৃতি-প্রকৃতি, শিক্ষায়-দীক্ষায় বিভিন্ন হইয়াও, গান্ধীজীর প্রতি আনুগত্য দুই জনকে একসূত্রে বাঁধিয়াছে। জবাহরলাল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির আওতায় বর্দ্ধিত; বল্লভভাই প্যাটেল হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার সংহত রূপের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত। জবাহরলাল ভাবুক, স্বপ্নবিলাসী, চিন্তাশীল; বল্লভভাই বস্তুতান্ত্রিক লোক-সংগ্রাহক। জবাহরলাল দেশের লোকের গতানুগতিক ভাব ও চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন। বল্লভভাই এই সব সংস্কারের বিরুদ্ধে কখনও প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নাই; হিন্দু সমাজের সংস্কার চেষ্টায় নীরবে গান্ধীজীর অনুসরণ করিয়াছেন। জবাহরলাল নেহরুকে রাজনীতিক জীবনে প্রাধান্যের জন্য চেষ্টা করিতে হয় নাই; গান্ধীজী তাঁহাকে ঠেলিয়া তুলিয়াছেন; জবাহরলাল নেহরু রাজনীতিক ক্ষেত্রে কূটনীতিক খেলা করিতে শিখেন নাই; তাঁহার ঐ ভাবনা গান্ধীজী যথাসম্ভব ভাবিয়াছেন এবং তাহা করিয়া তাঁহাকে নষ্ট (spoilt) করিয়াছেন। বল্লভভাই প্যাটেল রাজনীতিক দলের মোড়লী করিবার শক্তি লইয়া গান্ধীজীর কাছে আসেন (a born manager) এবং তাঁহার সাহায্য ও আনুকূল্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের চালক ও ধারক হইয়া আছেন। গত ২৫ বৎসর গান্ধীজী জবাহরলালকে জনতার মধ্যে নানা ভাবে ঠেলিয়া দিয়াছেন; এই জনতার রিক্ত জীবন ও বিবিধ বিশ্বাসকে ঘৃণা করিয়াও জবাহরলাল নেহরু এই জনতার সাহচর্য্য ভাল-বাসিয়াছেন, তাহাদের শ্রদ্ধা অকুণ্ঠিত মনে গ্রহণ করিয়াছেন। বল্লভভাই এই জনতা হইতে কখনও দূরে ও উচ্চে ছিলেন না; সেইজন্য তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার একটা নির্ব্বিকার ভাব আছে। জবাহরলাল নেহরু সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী—রক্তপাতশূন্য সমাজতন্ত্রবাদে; বল্লভভাই প্যাটেল কোন "বাদে" বিশ্বাস করেন কিনা তাহা বলা কঠিন। ধনিকতন্ত্র (capitalism) সমাজের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া তিনি মনে করেন; সেই জন্য সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধী তিনি।"

এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবের অধিকারী দুই জনের মধ্যে গান্ধীজী লোকহিতৈষণার আদর্শে একটা সমন্বয়ের বিধান করিয়াছিলেন জবাহরলালের ভাবুকতাকে সংযত করিয়া, বল্লভভাইয়ের বস্তুতান্ত্রিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া। তাঁহার তিরোধানে আজ দুই জনকেই তাঁর ভাবসম্পদ ও কর্ম্মসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে নিকটে আনিয়াছে; স্ব-ইচ্ছায় আর তাঁহারা পৃথক হইতে পারিবেন না। ভারতরাষ্ট্রের দায়িত্ব তাঁহারা বাধ্য হইয়া এক পথে চালাইয়া লইবেন, একথা সুনিশ্চিত; দুই জনের বিরুদ্ধ গুণাগুণ একে অন্যের গুণ ও দোষের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিবে। এই সব কথা স্বীকার করিয়াও ডাঃ বালকৃষ্ণ কেশকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। তাঁহাদের দুই জনের কেহই দেশের ভবিষ্যতের নেতৃত্ব সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহাদের অনুপস্থিতি বা অবর্ত্তমানে শক্তিশালী লোকনেতৃত্বের এমন কোন কাঠামো তৈয়ার হইতেছে না। তাঁহারা কেহই অমর নহেন; তাঁহাদের পদের দায়িত্ব আস্তে আস্তে ও অলক্ষিতে তাঁহাদের নিজের চিহ্নিত লোকের হাতে দিয়া এইসব লোককে দায়িত্ব পালনে সক্ষম করিবার কোন চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। গান্ধীজীর অভাবে ভারতরাষ্ট্র অচল হয় নাই, কারণ জবাহরলাল ও বল্লভভাই আছেন। তাঁহার হাতে গড়া জবাহরলাল ও বল্লভভাই। কিন্তু জবাহরলাল ও বল্লভভাই কেন সেরূপ লোক তৈয়ার করিতে পারিতে-ছেন না? লোকের অভাব আছে কি, শক্তির অভাব আছে কি? অদূর ভবিষ্যতে এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর চাহিয়া দেশের ভাগ্যবিধাতা আমাদের নূতন পরীক্ষায় ফেলিতে পারেন। জবাহরলাল বা বল্লভভাই এই বিষয়ে কেহই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না; তাঁহাদের জীবনের সাধনা তাঁহাদের নিকট হইতে এই নূতন সংগঠন আদায় করিয়া লইবে।

বাঙ্গলা নবলিপি

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

ভূমিকা।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি আমার "বাঙ্গালা ব্যাকরণে" দেখাইয়াছিলাম, বাঙ্গলা ভাষা শেখা সোজা। ইহা অক্লেশে কহিতে ও বুঝিতে পারা যায়। এখানে আমি সাধুভাষার কথা বলিতেছি। সে ভাষাই প্রামাণিক ও লৈখিক। কিন্তু প্রচলিত বঙ্গাক্ষর অক্লেশে লিখিতে ও পড়িতে পারা যায় না। এই ভাষায় পঞ্চাশৎ মূলধ্বনি অর্থাৎ বর্ণ আছে। কিন্তু পঞ্চাশৎ আকৃতি অর্থাৎ অক্ষর দ্বারা সকল শব্দ লিখিতে পারা যায় না। লিখিতে বহু সংখ্যক যুক্তাক্ষর আবশ্যক হয়। প্রত্যেক যুক্তাক্ষরই একটি নূতন অক্ষর। ইহা মনে রাখিতে, লিখিতে, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে হয়। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পাস ছাত্র দেখিয়াছি যাহারা ঋ, গু, শু, ও, জ্ঞ, হ্ম ও এইরূপ অপর দুই একটা অক্ষর লিখিতে পারে না।

আমরা পাঠশালায় লিখিতে লিখিতে অক্ষর পড়িতে শিখিতাম। প্রায় দুই বৎসর লাগিত। সমুদয় অক্ষর ছয় ভাগ করা হইত। যথা—

(১) অ আ ইত্যাদি স্বরবর্ণ;

(২) ক খ ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণ;

(৩) ক কা কি ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত করিবার স্বরাক্ষর;

(৪) ক কিঅ (ক্য) অর্থাৎ য র ল ব ম ন ফলা এবং রেফ।

(৫) আঙ্ক। অর্থাৎ ব্যঞ্জনের পাঁচ বর্গের পাঁচ অনুনাসিক যোগ। য র ল বা দি অবর্গীয় ব্যঞ্জনে অনুস্বার যোগ।

(৬) আস্ক। অর্থাৎ ব্যঞ্জনাক্ষরে অপর ব্যঞ্জনাক্ষর যোগ।

এই মূল ভাগের বহু ব্যতিক্রম হইয়াছে। কয়েকটা উদাহরণ দিতেছি।

ক+ ু = কু; কিন্তু গু, ত্ত (যেমন স্তু), শু, ক্রু, দ্রু, ধ্রু, ভ্রু, রু, হু।

ক+ ূ = কূ; কিন্তু দ্রূ, ধ্রূ, ভ্রূ, রূ।

ক+ ৃ = কৃ; কিন্তু হৃ।

বলিতেছি য-ফলা, কিন্তু 'য' অক্ষরের পূর্ণ আকার নাই। ইহাকেও নূতন শিখিতে হয়।

র-ফলা যোগে গ্র; কিন্তু ক্র, ত্র, ত্র, ভ্র।

ক্‌ম = ক্ম; কিন্তু হ্‌ম = হ্ম। হ্‌ন = হ্ন, যেমন চিহ্ন।

ঙ্‌ক = ঙ্ক; ঙ্‌গ = ঙ্গ; ঞ্‌চ = ঞ্চ।

গ্‌ধ = গ্ধ; দ্‌ধ = দ্ধ; ন্‌ধ = ন্ধ; ব্‌ধ = ব্ধ।

ন্‌থ = ন্থ; স্‌থ = স্থ ইত্যাদি।

দেখা যাইবে, এক উকারের পাঁচ রকম আকার আছে। ঊকার ও ঋকারের দুই, ক-কারের তিন, গ-কারের দুই, ঙ-কারের তিন রকম আকৃতি আছে। এই প্রকারে বাঙ্গলা অক্ষরসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। উকারের পাঁচ রকম আকার বলা ঠিক হইল না; কারণ যে-কোন রূপ যে-কোন ব্যঞ্জনে যোগ করা চলে না।

আমার "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" ও "শব্দ কোশে" সংযুক্ত স্বরাক্ষরের অনাবশ্যক অতিরিক্ত রূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে। সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর স্পষ্ট ও পূর্ণ আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। রেফ-যুক্ত অক্ষরের দ্বিত্ব বর্জিত হইয়াছে। এইরূপ অক্ষর-সংস্কার দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। অক্ষরের আকার চিরকাল এক ছিল না। অধিক নয়, শত বৎসর পূর্বের লিখিত পুথীর সকল অক্ষর পড়িতে পারা যায় না। সকল স্থানের পুথীর অক্ষরও অবিকল এক ছিল না। আমার প্রদর্শিত প্রণালীতে ১৪টি স্বরাক্ষর ও ৮টি রেফ দ্বিত্ব ব্যঞ্জনাক্ষর কমিয়াছে। ইহা অল্প লাভ নয়। যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে, লিখিবার ও পড়িবার সুবিধা হইয়াছে।

এই ক্রমে "আনন্দবাজার পত্রিকা" মুদ্রিত হইতেছে। প্রত্যহ লক্ষাধিক পাঠক পড়িতেছেন, বিশেষ অসুবিধা বোধ করেন না। "পত্রিকা" আরও অগ্রসর হইয়াছেন, ı, ু, ূ, ৃ, ´, এই কয়েকটি চিহ্ন ব্যঞ্জনাক্ষরের সহিত না জুড়িয়া পৃথক মুদ্রিত হইতেছে। এই পরিবর্তনে অগণ্য টাইপ কমিয়াছে। কিন্তু র-ফলাটি পৃথক হয় নাই। এ কারণ ১৫।১৬টা টাইপ রাখিতে হইয়াছে। এখন বই ছাপার দিন; ছাপাখানার সুবিধাও দেখিতে হইবে।

অপর যুক্তব্যঞ্জনাক্ষরের একটি ছোট অপরটি বড়, অথবা একটি বড় অপরটি ছোট করিতে হইতেছে। দুইটিই সমান ছোট করিলে অক্ষর অস্পষ্ট হয়। দেখা যায়, প্রত্যেক যুক্তব্যঞ্জনাক্ষর যদিও পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্ট, একটি নূতন অক্ষর হইয়াছে, চিনিতে শিখিতে হয়। যুক্তব্যঞ্জনাক্ষরের সংখ্যা অল্প নয়। ফলার সংখ্যা রেফ সহ ৮; আঙ্কের ২২; আস্কের ৩০; একুনে ৬০ সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর শিখিতে হয়। বস্তুতঃ আরও অধিক। প্রত্যেকের কলেবর নূতন।

এই কারণেই শিশুর বর্ণ- ও অক্ষর-পরিচয় করিতে তুই বৎসর লাগে। ইহার কমে সে অক্ষর পড়িতে শিখিতে পারে, কিন্তু লিখিতে পারে না। কারণ লিখিবার সময় প্রত্যেক অক্ষরের আকার, কোথায় কোণ, কোথায় তরঙ্গ, কোথায় বক্ররেখা, কোথায় ঋজুরেখা আছে, তাহা স্মরণ করিতে হয়। হাতের অভ্যাসও অল্প সময়ে হয় না।

অক্ষর-যোজনার দোষও আছে। সংযুক্ত স্বরাক্ষর-যোগে স্বাভাবিক ক্রম রক্ষিত হয় নাই। ক+া=কা; কিন্তু ক+ি=কি। ক+ী=কী, কিন্তু ক+ে=কে। আমরা বলি, ক্এ=কে; কিন্তু লিখি এ (ে) ক=কে। এই অনিয়ম হেতু সংযুক্ত স্বরাক্ষর ভাঙ্গিয়া লিখিতে পারা যায় না। 'বন্দ' শব্দ 'বন্‌দ' লিখিতে পারি, দোষ হয় না। কিন্তু 'বন্দে' শব্দ যদি 'বন্‌দে' লিখি, প্রথমে ন্‌দ পড়িয়া পরে 'ে' যোগ করিতে হয়; অর্থাৎ শেষাক্ষর পড়িবার পর বামে দৃষ্টি করিতে হয়। ইহা অক্ষর শিক্ষার এক অন্তরায়। আর, হস্‌ চিহ্নই বা কত দেওয়া যাইবে? হস্‌ চিহ্ন দিয়া অক্ষর লিখিলে অসুন্দর দেখায়। বিশেষ দোষ, এই চিহ্ন লিখিবার সময় কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয়। অতএব দেখা যাইবে, অক্ষর-সংস্কার ও অক্ষর-যোজনার সংস্কার, তুই-ই আবশ্যক।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গরাজ দেশময় লেখাপড়া-বিদ্যাবিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছেন। দেশের সকল বালকবালিকাকে ও বয়স্ককেও লিখন ও পঠন শিখিতে হইবে। আদ্যশিক্ষা কলাশ্রয়ী হউক, আর বিদ্যাশ্রয়ী হউক, উভয় স্থলেই লিখন ও পঠন শিখিতে হইবে। যাহাতে লিখন ও পঠন সহজ হয়, তাহাদের শ্রম লঘু হয়, আমাদিগকে সে বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। লিখন-পঠন-বিদ্যা জ্ঞান-ভাণ্ডারের কুঞ্চিকা। লিখন ও পঠন উপায় মাত্র, উপেয় নহে। জনগণ যত সহজে সে কুঞ্চিকা পাইবে, দেশে বিদ্যা-বিস্তারও তত দ্রুত হইবে। এই কারণে বাঙ্গলা অক্ষর সংস্কার আবার চিন্তনীয় হইয়াছে।

কিন্তু মানুষ অচেতন পুতুল নয়, তাহার রাগ-বিরাগ আছে, ইতিহাস-সংস্কার আছে। আমরা সুবিধা-অসুবিধা ভাবিয়া সকল কাজ করি না। তথাপি আমরা ইদানীং রেল গাড়ীতে চড়িয়া তীর্থ-দর্শনে যাইতেছি, পূর্বের মত পায়ে হাঁটিয়া যাই না। যে সংস্কার দ্বারা অক্ষরের দোষ ও অক্ষর-যোজনার দোষ সংশোধিত হইতে পারে, কিন্তু অক্ষর স্বীয় রূপ হারায় না, অক্ষর-যোজনার বিপর্যয় ঘটে না, সে সংস্কার বাঞ্ছনীয়।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি "ভারতবর্ষে" দেশে জ্ঞান-প্রচারের উপায় চিন্তা করিয়াছিলাম। সাতাইশ বৎসর পূর্বে "প্রবাসী"তে তৎকালের শিক্ষার দোষ-গুণ আলোচনা করিয়া নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন কামনা করিয়াছিলাম। কিন্তু পরাধীন জাতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। এক্ষণে শিক্ষামন্ত্রী সে বিষয় চিন্তা করিতেছেন। যদিও ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে, আমার আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন করিতে হয় নাই। কেবল শিক্ষা-পরিপাটীর যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক মনে করিয়াছি। সম্প্রতি "শিক্ষা-প্রকল্প" নামে আমার প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইতেছে। "বিশ্বভারতী" প্রকাশ করিতেছেন।

এখানে বাঙ্গলা লিপির সংস্কার চিন্তা করিতেছি। বাঙ্গলা স্বরাক্ষর ও ব্যঞ্জনাক্ষর তিন ভাগে লিখিতেছি। (১) প্রচলিত অক্ষর, (২) সংস্কর্তব্য অক্ষর, (৩) উপন্যস্ত অক্ষর। সংস্কর্তব্য ও উপন্যস্ত অক্ষর সম্বন্ধে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। সুধীগণ নবলিপির প্রয়োজন, যোগ্যতা ও দোষ-গুণ বিচার করিবেন। ছাপাখানার এই তুই ভাগের অক্ষর নাই। ১, ২, ৩ অঙ্ক-ক্রমে লিখিয়া পরে আকার প্রদর্শিত হইল। নবলিপির আদর্শও প্রদর্শিত হইল। পাঠক সহজে দোষ-গুণ বুঝিতে পারিবেন।

নবলিপি

১। স্বরাক্ষর—অসংযুক্তরূপ।

ক। প্রচলিত—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ঁ ং ঃ। (১৪)

খ। সংস্কর্তব্য—ঈ (১)। তুই হ্রস্ব-ই যোগে দীর্ঘ-ঈ। একটি ই দেখিতে পাওয়া যায়, অপরটি বিকৃত হইয়াছে। অক্ষরের তুইটি 'ই' দেখাইলে সহজে মনে রাখিতে পারা যাইবে।

গ। উপন্যস্ত—এ্য, ওা। ইংরেজী and শব্দের আদ্য-স্বর লিখিবার বাঙ্গলা অক্ষর নাই। আমি এই ধ্বনির নাম বাঁকা-এ রাখিয়াছিলাম। আমি 'বাঁকা-এ' লেখা আবশ্যক বিবেচনা করি না। কারণ, এ, কোথাও আ দ্বারা সে অক্ষরের কাজ চলিতে পারে। একদিন হাইকোর্টের এক প্রসিদ্ধ এড্‌ভোকেট (D.L.) 'এফিডেবিট্' বলিতেছিলেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিলে তিনি বলিলেন, আমরা বাঙ্গলায় এইরূপ বলি। তথাপি কেহ কেহ অ্যা এ্যা, য়্যা লিখিতেছেন। স্বরবর্ণে য-ফলা কিম্বা অন্য ব্যঞ্জন যোগ অসম্ভব। য়্যা-র ধ্বনি 'ইআ'-ই রহিল; 'বাঁকা-এ' হইল না। 'এ্য,' এই যুক্তস্বর দ্বারা বাঁকা-একারের ধ্বনি প্রায় আসে। স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণ যুক্ত হইতে পারে। স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের সন্ধি হইয়া অন্য স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব নূতন নয়। আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণে এ্য উপস্থিত করিয়াছিলাম।

ওা, যেমন পাওা (পাওয়া), পুরাতন পুথীতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত শব্দে 'য়' অক্ষরের উচ্চারণ ঠিক আছে; যেমন, মায়া, বায়ু, প্রয়োগ। কিন্তু বাঙ্গলা শব্দে 'য়' অক্ষর স্বরের বাহন হইয়াছে। 'অন্তঃস্থ-অ' এই নামই বর্ণের আধোগতি প্রকাশ করিতেছে। ইহাকে 'ইঅ' বলাই ঠিক। বাঙ্গলা ভাষায় 'য়' অক্ষরের বাহুল্য ঘটিয়াছে। আমরা 'করিআ' না লিখিয়া 'করিয়া' লিখি; চেআর—চেয়ার। কিন্তু এতদ্দ্বারা বাঙ্গলা শব্দের 'য়' অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ লুপ্ত হইতেছে। ইহারই ফলে প্রাকৃত জনে আউ (আয়ু), বাউ (বায়ু) বলে। 'ওা' এই যুক্তস্বর দ্বারা 'য়া' লেখা হ্রাস হইবে। অসংখ্য বাঙ্গলা শব্দে 'ওা' আছে। যেমন, ফেরীওালা, গাড়ীওালা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এ ওা নূতন অক্ষর নয়।

২। স্বরাক্ষর—সংযুক্তরূপ।

ক। প্রচলিত—া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ো, ৌ। (১০)।

খ। সংস্কর্তব্য—ি (২), ু (৩), ূ (৪), ৃ (৫), ে (৬), ৈ (৭)।

'ি' অক্ষরে একটি ধনুঃ, তাহাতে আর একটি ধনুঃ যোগ করিয়া দীর্ঘ 'ী' হইয়াছে। সেই সাদৃশ্যে ু অক্ষরে আর এক ু জুড়িয়া দীর্ঘ-উ করা হইল। ু ূ ৃ অক্ষরগুলির প্রচলিত রূপ ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র করিবার কোন হেতু নাই। এগুলিকে ব্যঞ্জনাক্ষরের সমান বড় করিলে সুন্দর হইবে। বাঙ্গলা ভাষায় সংযুক্ত দীর্ঘ-ৠ কদাচিৎ আবশ্যক হয়। ইহার নিমিত্ত একটা পৃথক অক্ষর না রাখিয়া দুইটা ৃ পরে পরে লিখিয়া দীর্ঘ জানাইতে পারা যাইবে।

সঙ্কেত—১। যাবতীয় সংযোজ্য স্বরাক্ষর ব্যঞ্জনের পরে বসিবে, পূর্বে নয়। বর্তমানে ১০টি সংযোজ্য স্বরাক্ষরের মধ্যে ৫টি (া, ী, ু, ূ, ৃ) ব্যঞ্জনের পরে বসিতেছে। ৩টি পূর্বে (ি, ে, ৈ) ও ২টি (ো, ৌ) অর্ধেক পূর্বে অর্ধেক পরে বসে। আমরা ব্যঞ্জনের পরে স্বরবর্ণ উচ্চারণ করি। যথা—ক+ু=কু। অতএব পরে লেখাই ঠিক।

গ। উপন্যস্ত—'ঁ' (ঈষৎ-ই)। মৌখিক ভাষায় শব্দের স্বরসংক্ষেপ ও স্বরলোপ ঘটে। ইদানীং কেহ কেহ মৌখিক ভাষা লিখিতেছেন। কিন্তু ইহার শব্দের শুদ্ধ বানান প্রচলিত হয় নাই। এই কারণে ঈষৎ-ই জ্ঞাপনের চিহ্ন উদ্ভাবিত হয় নাই। 'কলিকাতা' সংক্ষেপে 'কইলকাতা' কিন্তু 'ই' পূর্ণ নয়, ঈষৎ। এইরূপ, সে বকিবে—সে বইকবে, এখানেও ঈষৎ-ই। বহুকাল পূর্ব হইতে আমি এই বর্ণ জানাইবার নিমিত্ত 'ই' অক্ষরের হ্রস্বীকৃত শৃঙ্গ লিখিয়া আসিতেছি। ইহার কোন দোষ দেখিতে পাই নাই। ছাপায় ইহা সংযুক্ত ৌ অক্ষরের দক্ষিণাংশের শৃঙ্গ। আকারের সহিত যুক্ত হইয়া 'ঈষৎ-ই' অসংখ্য শব্দে শুনিতে পাওয়া যায়। তখন ইহাকে 'আই' বলা যাইতে পারে। ই ও উ স্বর সংক্ষেপে 'ঈষৎ-ই' রূপে উচ্চারিত হয়। যথা, চাউল—চাল। দালি—দাল বা ডাল। ধাতু—ধাত। মারি ধরি—মার ধর। রামশালি—রামশাল। এইরূপ, পূর্ববঙ্গের ইন্দ্রশাল ধান। গ্রামের নাম শ্রীকালী—শ্রীকাল, টাঙ্গালি—টাঙ্গাল ইত্যাদি। অক্ষর অভাবে পূর্ববঙ্গে পূর্ণ-ই লিখিত হইতেছে এবং পশ্চিম বঙ্গে উচ্চারণে 'ঈষৎ-ই' থাকিলেও বানানে লুপ্ত হইতেছে। যে ধ্বনি আছে, তাহা বানানে প্রদর্শিত না হইলে সে বানান অশুদ্ধ।

কেহ কেহ ঈষৎ 'ই' জ্ঞাপনের নিমিত্ত ঊর্ধ্বকমা দিয়া থাকেন। ইংরেজীর অনুকরণে ঊর্ধ্বকমা আসিয়াছে। ইংরেজীতে শব্দের অক্ষর ও ধ্বনি লুপ্ত হইলে সে স্থানে ঊর্ধ্বকমা বসে। যেমন can't। কিন্তু বাঙ্গলায় ধ্বনি আছে। অতএব তুল্য হইল না। 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত পদের মৌখিকরূপে অন্ত্য য়-ফলা (ইঅ) প্রায় লুপ্ত হয়। যথা, চলিয়া—চল্যা—চল্যে, অন্ত্য য়-ফলা (ইঅ) লুপ্ত হইলে থাকে চলে'। এখানে ল পরে ঊর্ধ্বকমা লিখিয়া গ্রস্ত য়-ফলা জ্ঞাপিত হইতে পারে। কেহ কেহ "চ'লে" লেখেন। কিন্তু চ-এর পরে কোন অক্ষর বা ধ্বনি লুপ্ত হয় নাই। অতএব পদের অন্তে ঊর্ধ্বকমা লেখাই যুক্তিসঙ্গত। ঊর্ধ্বকমা না বলিয়া উৎকলা বলা যাইবে।

৩। ব্যঞ্জনাক্ষর

ক। প্রচলিত রূপ—ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ। য় ড় ঢ়। (৩৬)

খ। সংস্কর্তব্য,—ত(৮), ভ(৯), য(১০), র(১১), য়(১৩), ড়(১৪), ঢ়(১৫)।

যে যে অক্ষর দ্বারা একটি শব্দ লিখিত হয়, সে সে অক্ষরের মাথায় রেখা অর্থাৎ মাত্রা দ্বারা পরবর্তী শব্দ পৃথক করিতে হয়। যেমন 'রাম বনবাসে গেলেন', তিনটি পৃথক মাত্রা দ্বারা তিনটি পৃথক শব্দ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু বর্তমান ছাপার ত ও ভ বৃন্তহীন; মাত্রার নীচে নিরলম্ব থাকে। পূর্বে হাতে লেখা পুথীতে এরূপ ছিল না। অদ্যাপি কেহ কেহ সবৃন্ত ত ও ভ লেখেন। তাহাই ঠিক। অতএব ত-স্থানে সবৃন্ত ত এবং ভ-স্থানে সবৃন্ত ভ হইলে যুক্তিসঙ্গত হয়। এই দুই অক্ষরের সহিত অন্য অক্ষর যুক্ত করিতে হইলে মাত্রার সহিত যুক্ত হইবে। যেমন, তা, ভা। এ কারণেও ত ও ভ সবৃন্ত করা যুক্তিসঙ্গত।

যে 'য' হইতে য-ফলা (্য) আসিয়াছে, সে 'য' বর্তমান 'য' নয়। দুইটি অক্ষর দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

বর্তমান 'য'তে চারিটি ঋজুরেখা আছে। পূর্বকালের 'য'তে প্রথম দুই ঋজুরেখার স্থলে একটি তরঙ্গ থাকিত। ফলার 'য'তে এবং নাগরীতে সেইরূপ আছে। নবলিপিতে য-ফলা একটি নূতন অক্ষর থাকিবে না। 'য়' অক্ষর দ্বারাই য-ফলা বুঝিতে পারা যাইবে। এইজন্য 'য' অক্ষরের আকার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক হইল।

র। পূর্বকালে ব-এ শূন্য র ছিল না, পেটকাটা র ছিল। সে র অক্ষরও ব-এর মত ছিল না, নাগরী र-এর মত ছিল। বোধহয় সে অক্ষরে পেটকাটা সহজে দেখিতে পাওয়া যাইত না, বিন্দুর আকার ধরিয়াছিল। সে বিন্দু এখন ব-এর তলে আসিয়াছে। ব ও র উচ্চারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন; আকারেও এই দুই যত ভিন্ন হয়, ততই ভাল। র-স্থানে নাগরী र অপর বাঙ্গলা অক্ষরের সহিত মিশিতে পারে। এই কারণে আমি র-স্থানে নাগরী र গ্রহণ করিতে বলি। বিন্দু দিতে গেলেই কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয়; এই দোষও সংশোধিত হইবে। এই দোষ য় ড় ঢ় এই তিন অক্ষরেও আছে। ইহাদের নীচের বিন্দু অক্লেশে ইহাদের অবয়বে জুড়িয়া দিতে পারা যায়। ড় ঢ় উচ্চারণ করিতে অসংখ্য নরনারী কষ্টবোধ করে। কালে ড় ঢ় উঠিয়া গেলে কোন ক্ষতি হইবে না। বস্তুতঃ, য়, ড়, ঢ় শত বৎসর পূর্বে ছিল না।

গ। উপন্যস্ত,—অন্তঃস্থ-ব (১২)। বর্গীয়-ব ও অন্তঃস্থ-ব আকারে ও উচ্চারণে এক হইয়া গিয়াছে। একটি কাটিয়া দিলে ভাষায় অভাব ঘটে না। কিন্তু ব-ফলার উচ্চারণ বিকৃত হইলেও ব চাই। অন্তঃস্থ-ব-এর উচ্চারণ পুনরুদ্ধার করা কঠিন। কিন্তু নবলিপিতে অন্তঃস্থ-ব আনিতে হইতেছে। নচেৎ ফলার ব পাওয়া যায় না। 'উদ্‌বাহু' স্বচ্ছন্দে পড়িতে ও বুঝিতে পারি; কিন্তু 'গৃহদ্‌বার' লিখিলে পড়িতে ও বুঝিতে পারা যায় না। সংস্কৃত, হিন্দী, আসামী ও ইংরেজী শব্দ লিখিতে অন্তঃস্থ-ব আবশ্যক হয়। আসামীতে অন্তঃ-ব বর্গীয়-ব এর তলে রেখা দিয়া ৱ লেখা হয়। কিন্তু এই ৱ লিখিতে গেলে কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয় ও রেখা দিতে গেলেই অক্ষরটি কিছু ছোট হয়। নাগরী অন্তঃস্থ-व বৃত্তাকার; ইহাতে বাঙ্গলা অক্ষরের কোণ নাই; সে व অন্য অক্ষরের সহিত মিশিতে পারে না। নাগরী অন্তঃস্থ-ব ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া বাঙ্গলায় সকোণ ব করিতে পারা যায়।

২। যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর

ক্ষ (ক্খিঅ), জ্ঞ (গঁ্য), ঞ্চ (ইঁ)। (৩)

বাঙ্গলা ভাষায় এই তিন অক্ষরের উচ্চারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এই তিনটি সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর রাখিতে হইতেছে।

সঙ্কেত ২। সংস্কৃত ও সংস্কৃত-মূলক ভাষায় একটি চমৎকার সঙ্কেত চলিয়া আসিতেছে; ব্যঞ্জনাক্ষর নিয়ত অকারান্ত। কিন্তু অন্য স্বরাক্ষর কিম্বা কোন ব্যঞ্জনাক্ষর যুক্ত হইলে সে অক্ষর হসন্ত হয়। যেমন, ক অকারান্ত, কিন্তু ক যুক্ত উ সন্ধি না হইয়া কু। ক যুক্ত ত কৃত। নবলিপিতে এই সঙ্কেত অবশ্যপালনীয়। মনে রাখিতে হইবে যাবতীয় সংযুক্তব্যঞ্জন স্বরান্ত। 'চন্‌দ্‌র' 'চন্দ্র' পড়িতে হইবে, 'চন্দর্‌' নয়। এই কারণে ইংরেজী park 'পার্‌ক্‌' লেখা উচিত, পার্ক বানান ভুল।

সঙ্কেত ৩। উক্ত তিন সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর ব্যতীত অন্য যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর লিখিবার সময় প্রথমাক্ষরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপরে একটি তির্যক্ যোগ-রেখা দিতে হইবে, যেন নীচের হস্ চিহ্ন উপরে বসিয়াছে। যেমন ভক্‌ত। এই যোগ-চিহ্নকে 'পাতী' বলা যাইবে, কারণ রেখাটি অক্ষরের মাথা হইতে নীচের দিকে আসে। ঙ, ছ, জ, ঞ, ত, ভ কয়েকটি অক্ষর ব্যতীত অন্য অক্ষর লিখিবার সময় কলমের এক টানে 'পাতী' আসিবে। কিন্তু ছাপায় একটি টাইপ পৃথক রাখিতে হইবে। পাতী নূতন নয়; সংযুক্ত 'া' দেখুন।

নবলিপিতে 'ফলা' নাম নিরর্থক ও অনাবশ্যক 'য-ফলা' না বলিয়া 'ইঅ' বলাই ঠিক। 'তথ্য' বানান করিতে হইলে ত, থ, যুক্ত য় (ইঅ) বলিতে হইবে। এইরূপ ত, ক যুক্ত র—তক্‌र; ত, র যুক্ত ক—তर্‌ক, ইত্যাদি। বাঙ্গলায় কয়েকটি ফলার উচ্চারণ বিকৃত হইয়াছে। ব্যঞ্জন ও ফলা সমান বড় লিখিলে উচ্চারণ-দোষ সংশোধিত হইতে পারিবে। ইহা অল্প লাভ নয়। য়-ফলা সর্বত্র নষ্ট হয় নাই। দামিন্যা গ্রামে কবিকঙ্কণের নিবাস ছিল। তদ্দেশবাসী অদ্যাপি 'দামিন্‌য়া' বলে, দামিন্না বলে না। বাঁকুড়া জেলায় নিরক্ষর জনেও য়-ফলা স্পষ্ট উচ্চারণ করে। এই কারণে অদ্যাপি বাঁকুড়ায় কেহ কেহ 'করিআ' লেখেন। উচ্চারণ শুদ্ধ হইলে শব্দের বানান সহজ হইয়া পড়ে।

কোন কোন শব্দে হস্ চিহ্ন আবশ্যক হইতে পারে, যেমন 'দৈবাত্‌'। ইহার বিপরীত, কোন কোন শব্দের শেষাক্ষর অকারান্ত লিখিত হইলেও হসন্ত পড়িবার আশঙ্কা থাকে। এই আশঙ্কা নিবারণ নিমিত্ত সে অক্ষরের নীচে দক্ষিণ কোণে একটি বিন্দু বসিবে। যেমন স্বস্তিক.। ইহা 'স্বস্তিক্' নয়। এইরূপ কোন কোন বাঙ্গলা শব্দেও বিন্দু আবশ্যক হয়। যেমন, কট.মট. চোখ। বিন্দুর অন্য প্রয়োজনও আছে। অনুস্বারের নীচে হস্ চিহ্ন অনাবশ্যক, যেমন কং।

এইরূপে ৬৩টি অক্ষর পাইলাম। ইহাদের সহিত শৃঙ্গ, উৎকলা, পাতী, হস্‌চিহ্ন, বিন্দু, এই ৫টি চিহ্ন পাইলে লৈখিক ও মৌখিক ভাষার যাবতীয় শব্দ লিখিতে পারা যাইবে। ফলে অক্ষর-সংখ্যা প্রায় তিন ভাগের এক ভাগে দাঁড়াইবে।

এক্ষণে এই নবলিপির দোষগুণ আলোচনা করি। প্রথম দোষ, প্রথম প্রথম নবলিপি পড়িবার সময় বর্তমান লিপিতে অভ্যস্ত পাঠকের বাধ. বাধ. ঠেকিবে। পাঁচটি সংযোজ্য স্বরাক্ষরের (ি, ে, ৈ, ো, ৌ) স্থান পরিবর্তনই ইহার প্রধান কারণ। কিন্তু একবার সঙ্কেতটি জানিলে আর সে বাধা থাকিবে না। দ্বিতীয় দোষ, যদি কোন বালক নবলিপিতে অভ্যস্ত হয়, সে প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত বই পড়িতে পারিবে কি? যে অগণ্য বাঙ্গলা বই ছাপা হইয়াছে, যাহাদের মধ্যে অমূল্য সাহিত্য আছে, সে সব এই বালকের অনধিগম্য হইবে না কি? এই আশঙ্কা গুরুতর নয়। কারণ প্রচলিত ৬৩টি অক্ষরের মধ্যে ৭।৮টি ব্যতীত অপর সমুদয় অক্ষর তাহার পরিচিত। সে অনেক শব্দও শিখিয়াছে। প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত শব্দের দুই-একটি অক্ষর পড়িলেই সে অপর অজ্ঞাত অক্ষরও অনুমান করিয়া লইতে পারিবে। এই ক্রমে আমরা পুরাতন পুথী পড়িয়া থাকি। তাহার সাহায্যের নিমিত্ত তাহার পাঠ্যপুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় ক কা কি, ক কিঅ, আঙ্ক ও আঙ্ক, এই চারি শ্রেণীর অক্ষর ছাপিলে সে অক্লেশে উভয় লিপির ঐক্য করিতে পারিবে। এই নিমিত্ত কেহ কেহ ঈ, ৃ, য, ও র এই চারি অক্ষরের আকার-পরিবর্তন চাহিবেন না। কিন্তু তদ্দ্বারা অধিক সুবিধা হইবে না। সংস্কার করিতে গেলে প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা হইবেই।

ইতিমধ্যে পাঠক নবলিপির গুণ বুঝিতে পারিয়াছেন। যে শিশু দুই বৎসরের কমে প্রচলিত লিপি পড়িতে ও লিখিতে পারে না, সে নবলিপি তিন মাসে পড়িতে পারিবে। আর তিন মাসে হাত বশ করিতে পারিবে। শিক্ষক উপযুক্ত হইলে তাহাকে অসংখ্য শব্দের বানান মুখস্থ করিতে হইবে না। ('শিক্ষক' শব্দ দ্বারা শিক্ষিকাও বুঝিতে হইবে।) তিনি শিশুকে বর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণ শিখাইবেন। জ য, ণ ন মধ্যে প্রভেদ লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু অন্য বর্ণ শুদ্ধ উচ্চারণ অল্প চেষ্টাতেই হইবে। তিনি য়-অক্ষরের নাম 'ইঅ' শিখাইবেন। শিশু 'এক' শুনিবে, 'এক' লিখিবে, 'এ্যাক' বলিবে না; 'সত্য' শুনিবে, 'সত্য' লিখিবে, 'সোত্ত' বলিবে না। 'পদ্ম' শুনিবে', 'পদ্‌ম' লিখিবে ইত্যাদি। সে বড় হইয়া শব্দের বিকৃত উচ্চারণ শুনিবে, কিন্তু প্রথম সংস্কার নিশ্চয় স্থায়ী হইবে। সে মৌখিক ভাষা শিখিবে না; কারণ মৌখিক ভাষার স্থিরতা নাই। স্থানভেদে, নরনারীভেদে, শিক্ষাভেদে, বৃত্তিভেদে মৌখিক শব্দের রূপান্তর হয়। যেমন,—চিঁড়ে, পিঠে, হিসেব-নিকেশ, ভেতর-ওপর, গোণাগুণতি, চার(৪), বোঁচকা-বুঁচকী, নতুন, বাঙলা, বাঙালী, ম্নাত্তির, চন্দর ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ ছিনু, ছিলুম, ছিলেম, ছিল্যম, ছিলাম ইত্যাদি ক্রিয়াপদে প্রভেদ আছে। শিশু, 'সসী', 'সস্থ', 'অতীৎ', 'অমৃৎ', 'তৃণ্' ইত্যাদি ভাখা-দোষ পরিত্যাগ করিবে।

আদ্যশিক্ষা অবশ্যক করিতে হইলে পূর্বকালের পাঠশালা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। শিশু ঘরের মেঝেয় তালচাটিতে বসিবে। কঞ্চির বা শরের কলম পাঁচ আঙ্গুলে মুঠা করিয়া ধরিবে, মসীতে তাল পাতায় লিখিবে। ছয় মাস পরে, কেহ বা এক বৎসর পরে কাগজ ধরিবে। তখন পাঠশালা হইতে শিশু একখানি পাতলা কাঠের মসৃণ পাটা পাইবে। পাটার উপরে কাগজ রাখিয়া পাটা কোলে ধরিয়া লিখিবে। অ আ লিখিবে, অ আ পড়িবে। প্রথম তিন মাস তাহার বই নাই; বর্ণ ও অক্ষর পরিচয়ের পরে ছাপা বই পাইবে। সে বইএ বড় ও মোটা অক্ষরে পুরু কাগজে নবলিপির অক্ষরমালা ও ছোট ছোট শব্দ থাকিবে। বলা বাহুল্য আদ্যশিক্ষার সমুদয় পুস্তক এই লিপিতে ছাপিতে হইবে। আমার "শিক্ষাপ্রকল্পে" আদ্যশিক্ষার কাল ৭ বৎসর।

নবলিপি প্রবর্তিত হইলে ছাপাখানার অভূতপূর্ব উন্নতি হইতে পারিবে। ছাপাখানায় ৬৩টি অক্ষর ও ৫টি চিহ্নের (শৃঙ্গ, পাতী, উৎকলা, বিন্দু, হস্ চিহ্ন) জন্য মোট ৬৮টি টাইপ রাখিলেই লৈখিক ও মৌখিক ভাষার যাবতীয় শব্দ ছাপিতে পারা যাইবে। শুনিলাম বর্তমানে ছোট প্রেসেও ১৬৮ অক্ষরের টাইপ রাখিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি বিরামাদি চিহ্ন রাখিতে হইবে। সে সকল চিহ্নের ইংরেজী নামের পরিবর্তে বাঙ্গলা নাম রাখিয়া ভাষার অন্তর্গত করিতে হইবে। এখানে নাম উপন্যস্ত করিলাম। যথা—

,—কলা। (কলা অর্থে চন্দ্রকলা, আর কলা অর্থে অংশ। এই বিরাম চিহ্নের আকার চন্দ্রকলার তুল্য। এতদ্দ্বারা বাক্যের ক্ষুদ্রাংশ পৃথক করা হয়)।

;—কলা বিন্দু।

'—উৎকলা অর্থাৎ উর্ধ্ব কলা।

'—ব্যুৎকলা (একটো বা দুটো)। ইহার দক্ষিণেরটি ' উৎকলা।

।—দাঁড়ি।

নূতন অক্ষর

(১) ঈ — ঈ। (২) ি — ী। (৩) ৎ — ৎ। (৪) এ — এ।
(৫) ‹ — ‹। (৬) ে — ে। (৭) ৈ — ৈ। ো — ো।
ৌ — ৌ। (৮) ত — ত। (৯) ভ — ভ। (১০) য — য।
(১১) র — র। (১২) অন্তঃস্থ ব — ব। (১৩) য় — য়। (১৪) ড় — ড়।
(১৫) ঢ় — ঢ়। শূন্য — s। পাতী — ৲।

নবলিপির আদর্শ

(১)

বনদে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্॥
শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকীত-যামীনীং
ফুল্ল-কুসুমীত- দ্রুমদল-শোভীনীং
সুহাসীনীং সুমধুর ভাষীনীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥

(২) গ্রাসীতা অবনী উথলে সীন্ধুগরজনে কাঁপে-হীয়া।
গণ্ডুষ তরে কুমভজ কত তাণ্ডবে তাথীয়া থীয়া॥
এড়ী ফুল-শর সুমর সদমভে লম্ফে,কম্পে ধরা।
জাগী উঠে তায় সমর-নীসূদন লোচন দহন-ভরা॥

মৌখিক ভাষা,—

বছর সাত আট আগে এক আশচর্য কাণ্ড হয়েছীল। সেদীন ভারী গরম, বেলা ১টা, বাইরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছীল। হঠাৎ নীকটের মাঠ হতে মড়-মড় শবদ শুনতে পাওয়া গেল। কত লোক ছুটে দেখতে গেল। আমী ৪টার সময় গেলাম। তখনও ১০/১২ জন লোক দাঁড়ীয়ে। তাদের মধ্যে একজন আধবুড়ো ছীল। তার নাম হ্রীশংকর পাত্র, ঘর অনেক দূরে। সে বল্লে এ আর নূতন কী? যীনী এই রকম আশ্চর্য করেছীলেন তীনী চলে গেলেন, জানীয়ে গেলেন। তারপর ঠীক ১টার সময়, ১২টা নয়, ২টা নয়, ১টার সময়; সবার নীচের ডাল, উপরের নয়, মাঝের নয়; অশত্থ গাছের কাঁচা ডাল, এই বৈশাখ মাসে আজ ভাঙবে কেন?

॥—দু-দাঁড়ি।

?—খড়্গ।

!—তিলক।

— রেখ।

(-)—লিক (বা' লিকি, স' লিক্ষা)।

বেষ্টনীর চিহ্ন—

( )—চাপ

{ }—দীর্ঘ চাপ

[ ]—বাহু

*—তারা। এইরূপ দ্বিতারা, ত্রিতারা।

গণিতের ১, ২, ৩...দশ অঙ্ক; ৴০, ৵০, ৶০, ।০, ॥০, ৸০ ইত্যাদি চিহ্ন।

গণিত কর্ম্মের চিহ্ন—

+—বজ্র (বজ্র ও হীরা একই অর্থ)।

×—হীরা (ইহা হইতে বা' ঢেরা; যেমন ঢেরা সই)।

/—বিপাতী (ভাজন চিহ্ন)।

=—দ্বিরেখ।

চিহ্ন সংখ্যা মোট ৩৪। অক্ষর ও চিহ্ন মিলিয়া মোট ১০২টি টাইপ থাকিলেই প্রেস চলিতে পারিবে। আর, ছোট, বড়, মোটা, গোদা নানা প্রমাণের অক্ষর রাখা স্বল্প-ব্যয় হইবে। একটা গোদা টাইপের অভাব পুনঃ পুনঃ অনুভব করিয়াছি। নাগরীতে মানুষের নামের ও গ্রন্থের নামের অদ্যক্ষর গোদা টাইপে ছাপা হইতে পারে। এক্ষণে সেরূপ টাইপ অক্লেশে পাওয়া যাইবে।

এখন 'টাইপার' নির্মাণ সুসাধ্য ও স্বল্পব্যয় হইবে। অচিরে অসংখ্য ইংরেজী 'টাইপার' অনাবশ্যক হইয়া পড়িবে। সে সকল যন্ত্রের ইংরেজী টাইপ-তুলিয়া বাঙ্গলা টাইপ বসাইতে পারা যায় কিনা, কারিকর চিন্তা করিবেন। সাধারণ টাইপারে ৮২টি টাইপ থাকে। বোধ হয় ৮২টি টাইপ দ্বারাই আবশ্যক অক্ষর ও চিহ্ন পাওয়া যাইবে।

কীর্ত্তনানন্দ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দস্যু জগাই কি জানি কেন যে হঠাৎ হইল মন—
পরিহাস-হাসি হাসিছে শুনিছে তবু সংকীর্ত্তন।
নাচে ভক্তেরা তা থেই, তা থেই, বাজে খঞ্জনী খোল,
শ্রোতৃবৃন্দ মহা আনন্দে বলে হরি হরি বোল।
জগাই ভাবিছে ভক্ত ওদের দুরাধিরোহিণী আশা
নাচিয়া গাহিয়া স্বর্গে যাইবে পন্থা পেয়েছে খাসা!
শ্রমে বীতরাগ অলসের দল নাচে দিয়া করতালি—
ক্ষুধা বাড়াইয়া শূন্য করিতে ভরা অন্নের থালি।

এটা খাঁটি কথা নয় কপটতা—কেঁদে কেঁদে পথ চাওয়া—
বলে মোর মন হৃদয়ের ধন ওপথেই যায় পাওয়া।
ভিতরে তুফান, চোখে ডাকে বান—বাধা যে মানে না আর
চাঁদের উদয়ে উতল চকোর, উথলিছে পারাবার।
একি কীর্ত্তন পুরুষে কাঁদায়ে রমণীর মত করে,
কোথা ছিল হেন রমণীর রূপ হৃদয়ের অন্দরে?
বুক কেন মোর ফাঁকা ফাঁকা লাগে? বুঝিতে পারিনে কি যে-
এই কি বিরহ? পাথারে পড়িনু পরিহাস করি নিজে।

নয়নে নিয়ত অশ্রু ঝরিছে—এইটা নূতন ঠেকে?
সকলেই কিছু আসেনি এখানে চক্ষে মরিচ মেখে।
কে ডাকে কাহারে? কোথায় ইহারা? ভগবান আছে কোথা?
করুণ ও সুরে অন্তরপুরে তবু যে জাগয়ে ব্যথা।
ওকি কাতরতা, ওকি ব্যাকুলতা! ওতো নয় অভিনয়,—
বেদনার ডাক, গাঢ় অনুরাগ বুক দেয় পরিচয়।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়ানি এতে কি হইবে ভাল?
বেদনার লাগি কি মধু যাতনা, আঁধারে এত কি আলো!

কালিন্দী জল বহিল উজান চিত উৎকণ্ঠিত
কদম্বে হ'ল কোরকোদ্গম, তমাল মুঞ্জরিত।
কোথা সে আমার কঠোর হৃদয় দেখে শুধু হাসি পায়
নামাইতে গিয়া আপনি উঠিয়া বসিনু হিন্দোলায়?
নব অনুরাগ বীজাণু পশেছে—হায় রে কপাল ভাঙা
ফাগ খেলা দেখে বিদ্রূপ করি নিজে হয়ে এনু রাঙা;
কাঁদায়, নাচায় পুলকানন্দে—খেলা করে নিয়ে মন
মনে ও বৃন্দাবনে মেশামিশি একি সংকীর্ত্তন?

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২৮

কোথা থেকে চালাবে আলাপ-আলোচনা এই হ'ল প্রশান্তর চিন্তা। ট্রেড ইউনিয়নের আপিসে যাবে কি? কিন্তু সেখানে তথাকথিত বহু নেতা আছেন—যাঁরা সঙ্ঘকে ক্ষমতাশালী করবার জন্ত বাঁকা পথটিই হয়ত বেছে নিয়েছেন। হলদে চিরকুটখানা যে অঙ্ক দাবি করেছে তা একের কল্পনাপ্রসূত বলে বিশ্বাস হয় না। শুভার কাছে যাবে? সে-ও সঙ্ঘের একজন প্রভাবশালী সভ্য। বাঁকা পথের এই খবর সে হয়ত জানে না—হয়ত সমর্থন করে না এই অন্যায় নীতি। নীতির একটি অর্থই তার কাছে পরিস্ফুট। সে হ'ল সত্য। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সুযোগ নিয়ে মানুষ যে স্ফীত হয়ে উঠবে এই কল্পনা তার কাছে অসহ্য। বুক-পকেটে হাত দিয়ে দেখলে চিরকুটখানা যথাস্থানে আছে কিনা। স্বাক্ষরহীন কাগজের দ্বারা হয়ত প্রমাণকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, তবু সঙ্ঘের নীতি যে নিষ্কলুষ নয় এটি তার সর্ব্বোত্তম নিদর্শন। প্রয়োজন হলে এটা কাজে লাগানো যাবে।

মোটর চৌধুরীর গ্যারাজে তুলে দিয়ে পায়ে হেঁটে চলল প্রশান্ত। সমান ভিত্তিতে চলুক আলাপ। মোটরে চেপে দুর্দশাগ্রস্ত বাড়ীর দুয়ারে আসার অসঙ্গতি ইতিপূর্ব্বে তাকে যথেষ্ট পীড়িত করেছে। শুভা তার সান্নিধ্য থেকে খানিকটা সরে গেছে। অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিল। ওর সঙ্গী বহু—আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিভিন্ন—পদমর্য্যাদার শাল-আলোয়ান গায়ে চাপিয়ে সে বৃত্তে প্রবেশ করা সুকঠিন। ওদের মনে হয়—কম সীরিয়াস—নীতি-শিথিল—পরিমিত-ভাষী তার্কিক; আর দেশের মাটিতে পা দিয়েও চেয়ে থাকে দূর বিদেশের বর্ণময় আকাশে। সে আকাশের যে ভাষা ইথার-তরঙ্গে এ আকাশের গায়ে আখর ফোটাতে পারে স্পষ্ট দ্যুতিময় অক্ষরে—নিখিলের দুঃখ-দুর্দশার ভাষা তবু…

আপাতত সে শুভার বাসায় পৌঁছে গেল। সেই নড়বড়ে সিঁড়ি—সেই আলো-বায়ুবঞ্চিত বন্দী-নিবাস। মন বিমুখ করা পরিবেশ। বুকের মাঝখানে হৃৎপিণ্ডটা অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠবার পরিশ্রম, না বহুদিন পরে আসার সঙ্কোচ, না অবাধ্য রক্তের মধ্যে একান্ত আত্মীয়-তার স্বাদলোলুপতা—বাস্তব-স্বপ্নে-মেশানো অদ্ভুত মনোময় আবেগে খানিকটা দুর্ব্বল আর খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়ল প্রশান্ত। মাঝপথে এক মুহূর্ত্ত সে থামলে—শুধু মুহূর্ত্তমাত্র—তারপর সবলে বৃত্তির গতিপথ ফিরিয়ে বাকি ক'টা ধাপ অনায়াসে অতিক্রম করলে।

ঘর থেকে বেরুচ্ছিলেন শুভার মা—তাঁর সঙ্গেই মুখোমুখি দেখা।

শুভার মা আনন্দ-মেশানো দুঃখ প্রকাশ করলেন, আর আস না কেন প্রশান্ত! তোমার কথা প্রায়ই মনে হয় আমাদের।

একটু হেসে কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিটাকে সে সহজ করে নিলে। বাহ্যত এটা ত্রুটিস্বীকার।

শুভার মা বললেন, বস। শুভা এইমাত্র বেরিয়ে গেল। না না, তোমার সঙ্গে আমার ভীষণ দরকারী কথা আছে যে। তোমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্ত এইমাত্র আমি প্রার্থনা করছিলাম। ভগবান আমার কথা শুনেছেন।

অগত্যা বসতে হ'ল। শুভার মা ভূমিকা বাড়ালেন না। বললেন, শ' দুই টাকার বিশেষ দরকার যে বাবা। শোন নি বোধ হয় মাসখানেক হ'ল শাশুড়ী ঠাকরুণ গত হয়েছেন। তাঁর শ্রাদ্ধের দরুন আর ছেলেমেয়ে দুটোর আট মাসের মাইনেতে বেশ কিছু অভাব বোধ হচ্ছে। আর জানই তো সংসারের খরচ আজকালকার দিনে—যে চালায় সে-ই জানে এর মর্ম্ম।

বুকপকেটে হাত দিয়ে নোটের বাণ্ডিলটা সে অনুভব করলে—কিন্তু এঁদের অভাবগ্রস্ত সংসারের দায় মিটানোর গরজ কি তার! যে সম্বন্ধ মধুর হতে পারত—অন্তরের সূত্রে অভিন্ন হতে পারত—তা ঘটনার স্রোতে হ'ল ভিন্নমুখী। এ আকাশ একদিন তারই ছিল অথচ এখানে স্বপ্ন-বিহার করার দুর্ব্বলতা আজ তার নাই। আশ্চর্য্য—হাত গুটিয়ে না নিয়ে নোটের বাণ্ডিলটা নিঃশব্দে সে টেনে নিলে। গুনলে না কত টাকা আছে—তেমনি নিঃশব্দে শুভার মায়ের দিকে হাত-খানি বাড়িয়ে বললে, নিন—

শুভার মা-র কোটরগত চক্ষু উজ্জ্বল বোধ হ'ল। অশ্রুতে চক্‌চকে—প্রাপ্তির আনন্দে চক্‌চকে—দায়মুক্তির আশ্বাসে চক্‌চকে। বললেন, তাই তো বলি ভগবান আছেন। নইলে আমাদের অভাব বুঝে তোমাকেই বা পাঠাবেন কেন আজ—আর ঠিক দু'শো টাকা—

দু'শো নয়—আরও বেশি আছে।

আরও বেশি! কিন্তু আর বেশি তো আমার দরকার নেই বাবা।

রেখে দিন—কখন কি দরকার হয় বলা তো যায় না।

শুভার মা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, হায়রে—হতভাগী তবু তুই ঘুরছিস টো টো করে! তোর বন্ধুবান্ধব—তোর সভা,

বক্তৃতা তোকে কি স্বর্গে নিয়ে যাবে। শোন বাবা—তুমি ওর কোন কথা শুনো না—ওকে জোর করে এ সব ছাড়িয়ে দাও।

আমার কথা শুনবেন কেন উনি!

না, শুনবেন না! শুভার মা উত্তপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন। একশো বার শুনবে! তুমি ওকে যথেষ্ট ভালবাস আমি জানি আর ও তোমাকে ভালবাসে। যথার্থ ভালবাসে। না হলে—

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। রক্ত আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে—হৃৎপিণ্ড আঘাত হানছে বুকে। ধ্বক্-ধ্বক্-ধ্বক্। এই বর্ণলেশহীন আকাশ—এর আকাশেই স্বপ্নের ফুল ফুটতে শুরু হ'ল বুঝি!

হ্যাল্লো—কমরেড—রেসের ঘোড়ার মত চলেছ কোথায়? চল—চল—

উঠে এসে বসতে হ'ল ঘরে। অন্ধকার ঘর, মনের ভাব-তরঙ্গ মুখের আয়নাতে কোন চিহ্ন ফুটিয়ে তুলবার ফুরসত পায় না! বেশ নিরঙ্কুশ কণ্ঠেই আলাপ চালানো যায়।

তোমার কাছেই নালিশ আছে আমার—প্রশান্ত সহজ কণ্ঠে বললে।

শুভা খিল খিল করে হেসে বললে, রক্ষে কর কমরেড—সারা পৃথিবীটাই নালিশে ভরে রয়েছে—কোন্টা রেখে কোন্টা শুনব! আর নিজেকে যোগ্য মনে করি না—নালিশ শোনবার যোগ্যতা থাকা চাই তো!

ঠাট্টা নয়—সত্যি আমার কিছু বলবার আছে।...প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে।

শুভা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে, বেশ বল—কিন্তু সংক্ষেপে।

জানি, তোমার সময়ের দাম আছে! প্রশান্তর কণ্ঠে পরিহাসের প্রচ্ছন্ন আভাস।

শুভা বললে, আমি ক্লান্ত। এইমাত্র একজনের সঙ্গে তর্ক করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

ক্লান্ত? আচ্ছা সংক্ষেপেই বলছি।

সমস্ত শুনে শুভা বললে, আমি কি করতে পারি!

তুমি কিংবা তোমরা যেই হোক—ওদের বুঝিয়ে—

পেট কাঁদলে, না ধর্ম্ম না যুক্তি কিছুতেই কেউ বোঝে কি কমরেড!

তবু দাবি ন্যায্য কি অন্যায্য—

সবটাই ন্যায্য যাদের পরনে নেই কাপড়—পেটে নেই অন্ন।

তর্ক করে লাভ নেই—দাবির যতখানি মেটানো যায় সেই চেষ্টা করতে হবে আমাদের।

আলোচনা মীমাংসার পথে গেল না। প্রশান্ত ঈষৎ উষ্ণ হয়ে বললে, সত্যি বলতে কি—এ তোমরা ওদের কথা বলছ না—তোমাদের জিদ্ বজায় রাখছ।

তাতে আমাদের লাভ?

লাভ? লাভ এই—মাস মুভমেন্ট জাগিয়ে তোমরা নেতা-গিরি করতে চাও! এই হচ্ছে তোমাদের সঙ্ঘের পাবলিসিটি

রেগে উঠছ কেন প্রশান্ত, গাল দিলেই কিছু যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ করা যায় না।

শুভার নিরুত্তাপ কণ্ঠে প্রশান্ত বেশি মাত্রায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। বলল, তোমরা যে সাধু নও—তার প্রমাণ আমার কাছেই আছে। এই দেখ—

হলদে চিরকুটখানা সে শুভার কোলে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, আশা করি এ লেখা সনাক্ত করা তোমার পক্ষে কঠিন হবে না।

শুভা বললে, আচ্ছা বস—আলোটা জ্বালি।

না—বসব না। কাল সকালে আমি আসব।

মা কিন্তু দুঃখ করবেন।

প্রশান্ত প্রত্যুত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খানিকটা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে গোলদীঘিতে এসে বসল। দুপুরে লোক চলাচল কম থাকে—তবু শহর স্ফীত হয়েছে আগেকার চেয়ে। ট্রামের ফুটবোর্ডে লোক ঝুলছে—বাসের সর্বাঙ্গে মানুষ। রাজপথে সশস্ত্র পাহারার ঘটা বিশেষ করে চোখে পড়ল। সিনেট হলে কোন সভা আছে? কোথাও কি উত্তেজনার কারণ ঘটেছে? আশ্চর্য্য কিছু নয়। যুদ্ধের উগ্রতা হ্রাস হলেও—উত্তাপ বেড়ে উঠছে পৃথিবীতে। দু' হাতে সঞ্চয় করে যারা উপরে উঠল—তারা নাগালের বাইরে—যারা নীচেয় রইল তারা মানুষের শ্রেণী থেকে নেমে পড়েছে—মাঝখানে কিছু নেই। প্রাসাদ-তোরণে নিপতিত ক্ষুধা-নিষ্পিষ্ট ভারবাহীর প্রাণহীন দেহ—প্রাসাদ-অলিন্দ-বিহারীর মনে একটুও তুফান তুলছে না। তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ মানুষকে এমনি উদাসীন করেছে—তার অন্তর থেকে লোপ করে দিয়েছে কোমল অংশ।

হঠাৎ জনস্রোত স্তব্ধ হ'ল—ঝড়ের আগেকার আকাশ নিঃশেষে টেনে নিল বায়ুকে। দূরে বহু কণ্ঠের চীৎকার। মিছিল আসছে—ভুখা মিছিল!

এ জিনিষ নূতন নয়—অভাবনীয় নয়! যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এ রকমের ঝড় প্রতিদিনের ঘটনা। সাধারণ জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়ে গেছে।

সারি দিয়ে লোক চলেছে—নানা জাতি—নানা ধর্ম্মের লোক—গোটা ভারতবর্ষ মিশেছে কলকাতার রাজপথে! হাতে হাত মিলিয়ে যেতে যেতে চেঁচাচ্ছে অপরিমিত। ধ্বংস হোক—ধ্বংস হোক পুরাতন সব কিছু। কায়েমি স্বার্থের প্রাচীর-ঘেরা পৃথিবী জীর্ণ হয়ে এসেছে—জীর্ণ হয়েছে তার

আচারগত মানবীয় বৃত্তি—সুপ্রাচীন আর্য্যামির গৌরবত্তার বহন করতে পারছে না তথাকথিত সভ্যতা। ধ্বংস হোক—সব কিছু ধ্বংস হোক। মুছে যাক স্লেটের পুরাতন লেখা—আভিজাত্য সংস্কৃতি হোক লুপ্ত—বর্ণাভিমান যাক মুছে—কমলা আবার ফিরে যান সিন্ধুপুরীর মণিময় হর্ম্ম্যে।

প্রশান্ত মুখ ফিরিয়ে নিলে। বড় বেশি উদ্ধত—বড় বেশি প্রগল্‌ভ মনে হ'ল। সৃষ্টিকে নস্যাৎ করে দেবার দুঃসাহসে বড় বেশি আত্মপ্রত্যয়শীল। সৃষ্টি কিছু শৃঙ্খলিত হয়ে পৃথিবী আশ্রয় করে নি—ক্রমবিকাশে গড়ে উঠেছে বিরাট সভ্যতা। একক মানবগোষ্ঠি আনুগত্য মেনে নিয়েছে—একনায়কত্ব—পশুহনন বৃত্তি থেকে উন্নীত হয়েছে কৃষিধর্ম্মে—গুহা থেকে এসেছে কুটীরে—বন্যবৃত্তিকে শৃঙ্খলিত করে দীক্ষা নিয়েছে মানবীয় ধর্ম্মে। এ তার এক দিনের খেয়াল নয়—এক যুগের সাধনা নয়—এক শতাব্দীর সঞ্চয়ও নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খাদ বার হয়েছে—সংস্কার হয়েছে বার বার—রাজা রাজ্য—রাজসিংহাসন নিয়ে কত না পরীক্ষা হয়েছে বারংবার। কেউ কি শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলবার দুঃসাহস করেছে বিশাল মহীরুহকে। তা হয় না। কাণ্ডে বসে মূলে কুঠারাঘাত করা—আর—

দুম্—দুম্—দুম্। দেবদারুর ডালে ডালে অসংখ্য কাক কা কা শব্দে ডানা ঝাপটে উঠল। বন্দুকের শব্দে ওরা এমনি কোলাহল করে। পথেও কোলাহল তীব্র হয়ে উঠল। দু'ধারের জনতা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। অগ্রগামী মিছিল থেকে চীৎকার উঠছে—ধ্বংস হোক—ধ্বংস হোক। ব্যাপার কি? একশ চুয়াল্লিশ ধারা বলবৎ, ওরা নিয়ম ভঙ্গ করেছে। ওদের সাবধান করা সত্ত্বেও নিষেধ মানে নি—অতএব আইন রক্ষার ভার নিয়েছেন সরকার।

লোক ছুটছে মিছিলের বিপরীত দিকে—মিছিলের অভিমুখে। বন্দুকের শব্দ—শোভাযাত্রীদের বিক্ষোভকে তীব্র করে তুলছে—অসহায় ক্রোধ মুহুর্মুহু চীৎকারে শাসনতন্ত্রকে ধিক্কার দিচ্ছে—সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুকামনা করছে।

আরও কয়েকটা বোমা ফাটল। প্রচুর ধোঁয়া আর দমআটকানো একটা তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বায়ুস্তরে। নাক মুখ চোখ জ্বালা করতে লাগল।

সরে আসুন—সরে আসুন—কাঁদানে গ্যাস ছেড়েছে—সরে আসুন।

এখানে বসবেন না—এখনই সান্ধ্য আইন জারী হবে। বাড়ী যান। আরে মশাই ধর্ম্মতলার ব্যাপারটা ভুলে গেলেন! রামেশ্বর বাঁড়ুজ্যে কেন মরেছিল জানেন?

পিছু হটতে হটতে প্রশান্ত কখন গোলদীঘির বাইরে এসেছে। এধারের রাস্তাটি নির্জ্জন। বৌদ্ধ বিহারের গা দিয়ে একটা বাঁকা গলি বেরিয়েছে। সেটার মধ্য দিয়ে ওপারে হ্যারিসন রোড বা এধারে ঘুরে মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে পড়া যায়। তার পুরাতন মেসে যাবার পথ ওটা। বহুদিন এ পথে আসে নি। মেসে দুই একজন পরিচিত আছে—তাদের সঙ্গে আলাপ করে যাবার আগ্রহ হ'ল প্রশান্তর। আইন থেকে সাময়িক ভাবে নিস্কৃতি লাভের বাসনা কিনা কে জানে।

হ্যালো—কি খবর?

বলছি।

সুনীলের বিছানার ওপর বসে পড়ে প্রশান্ত বললে, এক গ্লাস জল খাওয়া দেখি।

শুধু জল। অস্ফুটে উচ্চারণ করে সুনীল বললে, তা ছাড়া আর কিই বা আছে। দোকানপাট এতক্ষণে হয়ত বন্ধ হয়ে গেল।

জলপান করে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, এত শীঘ্র যে আপিসের ছুটি হ'ল?

আপিস! সুনীল হাসলে, ষোলই আগষ্টের পর থেকে নিয়মকানুন ঢিলে হয়েছে। এক শ চুয়াল্লিশ ধারার ওপর কারফিউ অর্ডার—এ তো লেগেই আছে; সকাল দুপুর সন্ধ্যে রাত্রি সব সময়ে। যাই হোক—অনেক দিন পরে দেখা—প্রাণভরে গল্প করা যাবে'খন।

আমাকে এখনই যেতে হবে।

সুনীল হাসলে, যাবে? রাস্তার এপিঠ ওপিঠ দু'পিঠে আঠার ঘণ্টা কারফিউ। কাল বেলা এগারটা পর্য্যন্ত এই জেলখানাতেই— হাসিটা ওর উচ্চ হয়ে উঠল।

প্রশান্ত পাংশুমুখে বললে, আমার যে ফিরতেই হবে। বিশেষ জরুরি কাজ—

গল্পের চেয়ে জরুরি কাজ আপাতত নেই। বস ভাল হয়ে।

...গল্পের স্রোতে চিন্তা কোথায় তলিয়ে গেল। সুনীল প্রধানমন্ত্রীর ২০শে ফেব্রুয়ারির ঘোষণার কথা তুললে। লর্ড ওয়াভেলকে সরিয়ে নিয়ে ব্রিটিশ তার প্রতিশ্রুতির আন্তরিকতা প্রমাণ করে নি কি? কিন্তু এই ঘোষণায় ভারত-সমস্যায় আর একটি যেন গ্রন্থি পড়ল। কার হাতে ক্ষমতা দিয়ে ভারত ত্যাগ করবে ওরা? অগ্রগামী একটি দল—অনুমান করা যায় কংগ্রেস—তারাই ক্ষমতা পাবে। সম্পূর্ণ ক্ষমতা অবশ্য নয়। লীগ-শাসিত প্রদেশ আছে—তাদের অনিচ্ছায় মূল অংশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে না। আছেন ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ। তাঁরা প্রতিশ্রুতি পালনের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত হয়ত প্রতীক্ষা করবেন। তাঁরা স্ব-স্ব স্বার্থ অনুযায়ী যদি অনিচ্ছুক হন—কেউ তাঁদের বাধ্য করতে পারবে না প্রধান অংশের অঙ্গীভূত হতে। এই সব গ্রন্থি ক্রমাগতই পড়ছে। সম্প্রতি পঞ্জাবে খিজির মন্ত্রীসভার পতন হয়েছে—তিরানব্বই ধারায় শাসন চলছে। উনিশ শ আটচল্লিশের আগে যাতে পুরোপুরি

পাকিস্থানী সাম্রাজ্যভুক্ত হতে পারে পঞ্জাব, তারই আয়োজন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সারা পঞ্জাবে আগুন জ্বলছে। সীমান্ত প্রদেশ আর আসামেও আগুন জ্বালাবার ইন্ধন সংগৃহীত হচ্ছে। সিন্ধু তো ইতিমধ্যে স্বতন্ত্র লীগশাসিত প্রদেশ বলে উনিশ শ আটচল্লিশের জুলাই থেকে স্বাধীনতালাভ করবে এই আশা ব্যক্ত করেছে। বাংলা দু'ভাগে বিভক্ত হবার জন্য রব তুলেছে। ফেব্রুয়ারির ঘোষণার ক্রিয়া সুদূরপ্রসারী বলেই মনে হচ্ছে। অছিগিরির চেষ্টা না থাকলেও—ভারতের মাটিতে অনেকখানি আশ্রয় যেন এই সব প্রতিক্রিয়ার সঙ্গেই কায়েম হবার আশা রাখে। ভারতের মহাসাগরে—আর ভারতের মাটিতে—দু-একটি শক্ত শিকড় নামিয়ে ওরা কি আমেরিকা ও সোভিয়েট প্রতিদ্বন্দ্বিতার পূর্ণ পরিণতির দিন গুণবে না? ইতিমধ্যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন আসছেন। ঘোষিত হয়েছে তিনি ভারতের শেষ বড়লাট। ক্ষমতা যাতে সুশৃঙ্খলায় হস্তান্তরিত হয় তারই চেষ্টা তিনি করবেন। তবু একথা স্বীকার করতে হবেই—ক্ষমতালাভের আশাতেই হোক কিম্বা ভারতের দুর্ভাগ্য বলেই হোক—শৃঙ্খলা আজ কোথাও নেই। হিমালয়ের শীর্ষ থেকে কন্যাকুমারিকার অগ্রবিন্দু পর্য্যন্ত বিপ্লবের বহ্ন্যুদগারে মুহুর্মুহু কাঁপছে।

২৯

সুশীল খেয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করলে।

প্রশান্ত বললে, আচ্ছা ঘুরে এখানেই আসব। কাজটা মিটিয়ে নিই—যে তোমাদের শহর, কখন কি আইন জারি হয়!

শুভাদের বাসায় এসে শুভার দেখা পেলে না—উলটে নূতন দুর্ভাবনা মাথায় চাপল। ওর মা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, কাল নাকি শহরে ভারি হাঙ্গাম গেছে বাবা—শুভা সেই যে তোমার সঙ্গে বেরুল আর ফেরে নি? সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারি নি। বুড়ো বয়সে আর কত সহ্য হয় বল ত। উনি কেঁদে ফেললেন।

কি সান্ত্বনা দেবে—প্রশান্ত চুপ করে রইল। মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে নেন্টু আর খুকী। সেই রুগ্ন ছেলেটি আর সজীব মেয়েটি। মেয়েটির মুখখানি অত্যন্ত ম্লান। চোখে মুখে ওর পর্য্যাপ্ত প্রাণশক্তির আভাস—একটু আশ্বাসে—সামান্ত স্নেহে আদরে আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ঝড়ের রাত্রি—পরে প্রভাত এলেও সূর্য্যোদয় হয় নি—শাখা-চ্যুত লতা মাটিতে লুটিয়ে আছে আধশুকনো পাতার ভারে। প্রশান্ত তাকেই ডাকলে কাছে—মাথায় হাত দিয়ে একটু আদর জানালে। বললে—কি খুকী—একটু জল খাওয়াবে?

আশ্বাস নয়, অথচ এই কথাতেই মেয়েটি উৎফুল্ল হয়ে ঘাড় নেড়ে হেসে উঠল…আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে গেল।

শুভার মা বললেন—বস বাবা।

প্রশান্ত বললে—আমি একবার খোঁজ করে দেখি—একটু বোস—আমি আসছি…

ঘরের কোণে একটা হ্যারিকেন জ্বলছিল। হ্যারিকেনের সামনে বইখাতা ছড়ান দেখে মনে হয়—ছেলেরা লেখাপড়া করছিল। মা চলে যেতে ছেলেটি সেখানে দাঁড়ায় নি। যেমন দুর্ব্বল ওর দেহ—তেমনি মনটিও হয়ত ভীরু—অপরিচিতের সান্নিধ্য এই ধরণের লাজুক ছেলেরা সহ্য করতে পারে না।

অন্যমনস্কে একখানা খাতা সে টেনে নিলে। খাতার ভিতর থেকে মনিঅর্ডারের কুপনের চিলতে কাগজটুকু ওর কোলের উপর খসে পড়ল। মনে কৌতূহল না জাগলেও চোখের ধর্ম্ম পালন করলে চোখ। বেশ গোটা হরপে স্পষ্ট লেখা দু'লাইন সে অনায়াসে পড়ে ফেললে।

পঞ্চাশ টাকা পাঠালাম। পৌছান সংবাদ দিও। আশা করি তোমরা কুশলে আছ। ইতি—

অবন্তী

মীরাট থেকে টাকা পাঠিয়েছে অবন্তী। নূতন চাকরী—মাইনে এমন বেশি কিছু নয়—আর সংসারে তার পোষ্য-সংখ্যাও কম নয়। তবু তাঁদের অভাব না মিটিয়ে—কোন্ সুবাদে শুভাকে সে টাকা পাঠালে। কোন্ সুবাদে! মন আলোড়িত হয়ে উঠল। ঝড় কিংবা মনোজগতের বিপ্লব বলা যায় একে। জ্ঞানের কেন্দ্রটি ভূমিকম্পে ধরিত্রীর মত টলমল করছে—বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে মস্তিষ্ককেন্দ্রে ঘনিয়ে এল কুয়াশা। ঈর্ষা অথবা অভিমান—অথবা দুঃখ ক্ষোভ মেশানো অস্বস্তি—কানের ডগা আর গণ্ডদেশ লেহন করছে মৃদু আগুনের শিখা। অন্ধকার পথে চলতে চলতে হঠাৎ দূরে দেখা গেল প্রদীপ। চোখে তার আলোয় জাগছে বিভ্রম—তবু স্পষ্ট হ'ল অনেক রহস্য।

আনমনে সে অন্য বইগুলি ঘাঁটতে লাগল। উত্তেজনার মুহূর্ত্তে—উচিত-অনুচিত বোধ থাকে না—মনও থাকে না সজাগ, নইলে লণ্ঠনের আলোয় সে দেখতে পেত, ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে শুভা মৃদু মৃদু হাসছে।

শুভা অবশেষে বললে—আর কিছু পাবে না কমরেড, মিথ্যে বইখাতা ঘাঁটছ।

চমকে সে মুখ তুললে। মুখ তার পাংশু হয়ে গেল। বিবেক তার ভদ্রতার ত্রুটিতে চোখ রাঙিয়ে ধমক দিয়ে উঠল। মাথা নামিয়ে সে অন্যদিকে চাইলে অপরাধীর মত।

শুভা সরে এসে বললে—না না, অন্যায় কিছু কর নি। যে জিনিসে স্বত্ব তোমার স্থির করেই নিয়েছ—সে তো একান্ত করে তোমারই।

প্রশান্ত সবেগে মুখ ফিরিয়ে বললে, তার মানে?

মানে আমি জানি না—মা জানেন। হাসতে হাসতে জবাব দিলে শুভা।

প্রশান্ত বললে, তুমিও জান—কেবল স্বীকার করতে ভয় পাও।

ভয়—তা হবে। শুভা এক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবলে। ওসব কথা কাটাকাটি এখন থাক কমরেড—তোমাদের সর্ত্তগুলি আমি পড়েছি—পড়ে ভেবেছিও।

সর্ত্তের কথা পরে হবে—

আমার ধারণা ছিল—তোমার মিলের ব্যাপার নিয়ে তুমি অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করছ।

হাঁ—অনেক রকমের অশান্তি আমার—অস্বীকার করব না—কিন্তু তোমাকে যা বলবার—

শুভা বসে পড়ল তার পাশে। মৃদু শান্ত গলায় বললে—তোমার কথা আমি জানি। কোন অনাত্মীয় পুরুষ যখন কোন অনাত্মীয় মেয়ের কাছে একান্ত করে আর আগ্রহভরে কিছু বলতে চায়—তখন তার অর্থ অতি নির্ব্বোধ মেয়েরাও অনায়াসে বুঝতে পারে।

শুভা তোমার মন বলে কোন বস্তু কি নেই? প্রশান্তর কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হ'ল।

শুভা হাসল—বললে, মনের বালাই না থাকাই ভাল। একটা মাত্র মন—অবন্তী টাকা পাঠায়—তুমি অর্থসাহায্য কর—অন্য প্রাণ বাঁচানোর দায়িত্বটা বহন করে, কার প্রতি বেশি করে কৃতজ্ঞ হব বল।

প্রশান্ত কি বলতে যাচ্ছিল—হাত উঁচিয়ে শুভা তাকে নিরস্ত করলে। কাছে এসে এইটুকু কি বোঝ নি—মতে আমরা ভিন্ন—পথও আমাদের এক নয়। তুমি চাও দাক্ষিণ্যে ধন্য করতে—টাকা দিয়ে হোক, মিষ্টি কথা বা ব্যবহার দিয়ে হোক কিংবা জীবনপাত করেও দুর্গতদের ভাল করতে চাও। এ হ'ল খানিকটা ওপরে ওঠার ব্যাপার। আর আমরা চাই—যারা কাদায় পড়ে লুটুচ্ছে তাদের হাত ধরে কাদা মেখে তাদের দুর্গতির অংশ নিতে। তোমার আমার মিলবার সাঁকো কোথায় কমরেড?

না শুভা—

চুপ—অসম্মান যথেষ্ট করেছ তাও সয়েছি অসম্মানকে অস্বীকার করার জোরে—কিন্তু অসত্যকে মানব না বলছি।

আমি তোমায় অসম্মান করেছি!

কর নি? কেন দু'শ টাকার বদলে মাকে বেশি টাকা দিয়েছ! আমার দুঃখ দূর করতে তোমার এত আগ্রহ কেন? পৃথিবীতে দুঃখী মানুষ আর তোমার চোখে পড়ল না।

শুভার কণ্ঠস্বর শুষ্ক—দৃঢ়। ও কি রূঢ় হ'ল! প্রশান্তর কি দোষ—মন যেখানে আত্মীয়তার সূক্ষ্মজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে—সেখানকার তুচ্ছ দুঃখকষ্টে বিচলিত হয়ে পড়া কি এমনই অস্বাভাবিক? পৃথিবীতে দুঃখী যথেষ্ট আছে—মনের সঙ্গে তাদের দুঃখ যুক্ত নয় বলেই তো নরম হবার অবকাশ আসে না। বড় পৃথিবীতে মানুষ অত্যন্ত ছোট—যে পৃথিবী বাইরের; কিন্তু কতকগুলি সূক্ষ্ম মমতা দিয়ে সেই ছোট মানুষ যে দুনিয়া তৈরি করে তাও কি খণ্ডিত নয়—ক্ষুদ্র নয় অথচ সে মানুষ নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তখন তো আর ছোট থাকে না। সে হয় বৃহৎ—সে তখন অদ্বিতীয়।

শুভা বলতে লাগল, দোষ তোমার দিই না প্রশান্ত—জগৎটাই এমনি ভাবে তৈরি। বহুকাল থেকে যা দেখে আসছি, যা শিখে আসছি—সংস্কারের ধারা কি সংস্কৃতির আলো—ধর্ম্ম কিংবা ঈশ্বর—ভালবাসা আর পরদুঃখমোচনের চেষ্টা এ সব যে সৃষ্টিগত উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে দৃষ্টিকে আর মনকে অমনি করেই তৈরি করেছে। সবাই বলে পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে কিন্তু মানুষ মিলতে পারছে না তবু। ছোট ঘরে কলহ কোলাহল করলে আমরা সৃষ্টি থেকে কি মুছে যাব না কমরেড!

প্রশান্ত ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। শুভার সব কথা ওর শ্রুতিস্পর্শ না করলেও তার আবেগ-গাঢ় স্বর ওর মনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সে যেন বলছে—বাইরেটা জগতের সব নয়—মানুষের তো নয়ই। এই বিশ্বসংস্কারের ভার তোমার আমার সকলের। সংস্কার করতে বিলম্ব হয়—রচনা কর নূতন করে। চিরাচরিত প্রথায়, নীতিতে, বিশ্বাসে, মিথ্যাশ্রিত সত্যে আঘাত লাগবে। প্রচণ্ড আঘাত। তবু এগিয়ে চল। এগিয়ে চল!

অবশ্য এ ধ্বনি ক্ষীণ, আর অবিরাম নয়। মাঝে মাঝে মনের পর্দ্দায় বাতাসের বেগে বেজে উঠছে। গভীর নয় বলেই কেন্দ্র-লগ্ন হতে পারছে না।

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন মানসে ও বললে, আমার সর্ত্ত সব পড়েছ আর ভেবেছ বললে। সত্যিই কি সেগুলি স্বীকার কর না?

শুভা ওর মনোভাব বুঝলে। সহজ কণ্ঠে বললে, সবগুলোর কথা নিয়ে আলোচনা করব আর একদিন—আজ একটি কথা শুধু তুলব। তুমি বলেছ—আমাদের দেশে শ্রমিকদের সততা কম। তারা মজুরি বাড়িয়ে নেয় কিন্তু কাজে ফাঁকি দিতে কসুর করে না। এই ধীরপন্থা নীতিতে নাকি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে—মানুষের দুঃখ ঘুচছে না।

অস্বীকার কর এ কথা? প্রশান্ত উদ্দীপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

না, বরং স্বীকার করে নিচ্ছি তোমার অভিযোগ। কিন্তু প্রতিবাদ আমার এইখানেই যে, দোষ একলা শ্রমিকদের নয়।

মানে ধর্ম্মঘট না হলে—

একে একে তোমার কথার জবাব দেব প্রশান্ত। শিল্প উৎপাদন কমানোর জন্যে দায়ী একলা শ্রমিক নয়—মালিকও।

কিসে।

কেন—জিনিসের বাজারদর যাতে চড়া থাকে, মুনাফা যাতে বাড়ে তেমন কৌশলের কথা কোন দিন কোথাও পড় নি—কি তোমার মনে হয় নি? বেশি দিনের কথা নয়, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে বাংলায় যখন লক্ষ লক্ষ লোক মরছিল—যুদ্ধরত ইউরোপের যখন নাভিশ্বাস উঠেছিল—তখন আমেরিকা কত লক্ষ মণ খাদ্য-শস্য নষ্ট করে ফেলেছিল বাজারদর চড়া রাখতে—সে খবর নিশ্চয় রাখ। শোন—শিল্পের ক্ষেত্রেও এমন অসাধুতার দৃষ্টান্ত বহু আছে। ধনিকের ধারাই হ'ল—নিজেদের পুষ্টিসাধন।

কিন্তু—

ধর্ম্মঘট করে দুঃখী মানুষের লাভ কতটুকু প্রশান্ত! একান্ত নিরুপায় হয়েই শেষ অস্ত্র হিসাবে—

না—ওদের ক্ষেপিয়ে যখন ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা একজাতীয় নেতাদের পেশা। তাতেই তাদের নেতাগিরি টিকে আছে।

বেশ ত সেই নেতাগিরিতে আঘাত দাও না। ভণ্ডামির প্রশ্রয় দিলে সমাজ সুস্থ থাকে না।

আঘাত দেব কি করে—তারা যে বর্ণচোরা। যাদের ক্ষেপানো হয়, তাদের হিংসাকে, তাদের ধর্ম্মমতকে, এমন কি তাদের সব রকমের দুর্ব্বলতাকে অস্ত্রের মত ব্যবহার করতে এরা যে পটু!...কাল যে চিরকুটখানা তোমায় দিয়েছি—

ওটা যে তোমাদেরই সৃষ্টি নয়—

হাতের লেখাটা সনাক্ত করা শক্ত নয়। আর সেটা তুমি চেষ্টা করলেই পারবে।

চেষ্টা করব কমরেড। শুভা হাসল।

তার আগে ধর্ম্মঘটের যে গুজব শোনা যাচ্ছে।

গুজবে বিশ্বাস করো না। যারা দুর্ব্বল তারা মুখে একটুও আস্ফালন করবে না এ কেমন করে আশা কর কমরেড।

প্রশান্ত উঠবার ভঙ্গি করে বললে, কাল আসব কি?

সুবিধে হয় আসবে—না হয় চিঠি লিখে জানাব।

সিঁড়িতে নামবার মুখে শুভা বললে, একটা ত্রুটি স্বীকার করে রাখি কমরেড। তোমার টাকাটা আপাতত ফিরিয়ে দিতে পারছি না। তুমি হয়ত বলবে—যদি আত্মসম্মানে বাধল তো ও জিনিষ নেওয়া কেন! আমার উত্তর—অবস্থার চাপ। ওটা আত্মসাৎ করব না—ফিরিয়ে দেব—তবে বিনা সুদে।

প্রশান্ত আরক্ত মুখে বললে, তোমার এ আঘাতও স্বীকার করে নিলাম শুভা।

আর কোন কথা না বলে সে সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ করে নেমে গেল। ক্রমশঃ

বৈদিক ও দেশী-সঙ্গীতের স্বর

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

লৌকিক স্বর দেশী স্বর হিসাবেই পরিচিত। দেশী-সঙ্গীতকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদ্‌রা 'folk song' বলেছেন। ডাঃ পারি (C. Hubert H. Parry) বলেছেন: 'Folk-tunes are the first essays made by man in distributing his notes so as to express his feelings in terms of design. * * Folk-music supplies an epitome of the principles upon which musical art is founded; * *'১ রাশিয়ান সঙ্গীতবিৎ ক্যাল্‌ভোকোরেশী (M. D. Calvocoressi)-ও স্বীকার করেছেন, রাশিয়ার জাতীয় সঙ্গীত বেশীর ভাগ তখনকার সময়ে প্রচলিত দেশী আর গ্রীস, রোম, আরব সঙ্গীতের কাছ থেকে মালমশলা সংগ্রহ করেছিল: 'Russian national music owes much to the influence of native folk music, and also of Eastern music.'২ রাণী এলিজাবেথের সময়ে (১৭৪১-১৭৬১ খ্রীঃ) ইউরোপের দেশী-সঙ্গীতের পাশে ইতালীয় দেশী-সঙ্গীতও বিকাশলাভ করেছিল। এডোয়ার্ড ম্যাক্‌ডাওয়েল (E. Macdowell) বলেছেন: মধ্যযুগীয় গির্জায় প্রার্থনা-সঙ্গীতের সময় দেশী-সঙ্গীতই সর্বদা গাওয়া হ'ত।৩ ক্রোয়েষ্ট (F. J. Crowest) ও পার্সি বাক্ (Percy C. Back) দেশী-সঙ্গীতের আগে বাদ্যের তথা বাদ্যযুগের ('drum age') প্রচলনের কথা বলেছেন।৪ কিন্তু আমাদের মনে হয়, কণ্ঠ ও বাদ্য তথা যন্ত্রসঙ্গীতের ভেতর কোন্‌টা প্রথমে বিকাশলাভ করেছিল তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন; কেননা প্রাচীন যন্ত্র ও বাদ্য যেমন শঙ্খ, বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ, ভেরী, দুন্দুভি, শততন্ত্রী, সহস্রতন্ত্রী এসবের উপযোগিতা তখনি আসে যখনি স্বর ও সুরের সমবেত রূপ কণ্ঠে প্রকাশিত না হলেও মানুষের মনে সূক্ষ্ম আকারে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কাজেই উন্নত বিধিবদ্ধ রুচিকর মার্গ-সঙ্গীতের উৎপত্তি গোড়াকার দিকে না হলেও দেশীর আওতায় সাধারণতঃ সঙ্গীতই ছিল কণ্ঠ, যন্ত্র ও বাদ্যের সংমিশ্রণ রূপ।৫

১। *The Art of Music* (1923), পৃঃ ৮০ ৮১ দ্রঃ

২। *A Survey of Russian Music* (1914), পৃঃ ১১ দ্রঃ

৩। *Critical and Historical Essays*, পৃঃ ১৬ দ্রঃ

৪। Crowest: *The Story of Music*, পৃঃ ১৩; Back: *A History of Music*, পৃঃ ১৫ দ্রঃ

৫। মিঃ ক্রোয়েষ্ট আবার বলেছেন: 'Instrumental music

সামিক যুগের গানকে সাধারণতঃ আমরা 'সামগান' বলি। একটি মাত্র স্বর দিয়ে যে সময়ে গান গাওয়ার রীতি ছিল তখনকার নাম আর্চিক যুগ। আর্চিকের পর গাথিক যুগ। সে সময়ে দু'স্বরের গান গাওয়া হ'ত। সামিকে তিন স্বর দিয়ে গান গাওয়ার রীতি ছিল। সামিক অথবা সামগানে তিনটি স্বরের প্রচলন থাকলেও তিনটির বেশী স্বরও যে ব্যবহার হ'ত তার প্রমাণ আমরা সামপ্রাতিশাখ্য পুষ্পসূত্রে ও নারদীশিক্ষায় পেয়ে থাকি। পুষ্পসূত্রকার পুষ্পর্ষি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন : শাখাভেদে ভিন্ন ভিন্ন সামগানের প্রচলন বৈদিক সমাজে ছিল ও সেই সব গানে তিন, চার, পাঁচ, ছয় ও সাত স্বরের ব্যবহার ছিল। কাজেই শ্রেণী বা পঙ্‌ক্তি হিসাবে সামিক গান ও সামগানকে আমাদের আলাদা ভাবেই দেখা উচিত; কেননা ওড়ব (পাঁচ) ষাড়ব (ছয়) ও সংপূর্ণ (সাত) স্বরের সঙ্গীত যখন সমাজের সর্বত্র প্রচলিত ছিল তখনও সামগানকে বৈদিক ও মাঙ্গলিক যে কোন অনুষ্ঠানের সঙ্গে গাওয়া হ'ত।

বৈদিক সঙ্গীত সামগানে সাত স্বরের নাম ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, ও অতিস্বার্য। সায়ণাচার্য সামবিধান-ব্রাহ্মণ ও সামবেদের ভাষ্যভূমিকায় এদের আবার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্বর বলেও উল্লেখ করেছেন। বৈদিক সামগানের পাশাপাশি দেশী ও মার্গ-সঙ্গীতের ষড়জাদি সাত স্বরের প্রচলনও ছিল। আর্ষেয়, সামবিধান প্রভৃতি ব্রাহ্মণে অরণ্যেগেয়গান ও গ্রামেগেয়-গানের উল্লেখ থাকায় বোঝা যায়—অরণ্যেগেয়গানই ছিল বৈদিক তথা সামগান, আর গ্রামেগেয়গান ছিল উন্নত আকারে মার্গ ও গান্ধর্ব আর সাধারণভাবে দেশী-সঙ্গীত। অথবা বলা যায়, অরণ্যেগেয় থেকেই সামগান তথা নিছক বৈদিক সঙ্গীত আর গ্রামেগেয় থেকে মার্গ ও দেশী-সঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েছিল। ঋগ্বেদের মন্ত্র বা ছন্দের ওপর স্বরবিন্যাস করে গাওয়াতেই সাম বা সামগানের সার্থকতা। সামগান প্রধানতঃ যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞবেদীর পাশে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণেরা গান করতেন।

সঙ্গীত-শাস্ত্রকারেরা সঙ্গীতকে দেশী ও মার্গ এই দু'ভাগে প্রধানত ভাগ করেছেন। মার্গ-সঙ্গীত বলতে তাঁরা বলেছেন : ব্রহ্মা চার বেদ থেকে অন্বেষণ করে যা ভরতাদি শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন ও পরে ভরত প্রভৃতি কলাবিদ্‌রা আবার শিবের কাছে সাধারণ সমাজের কল্যাণের জন্যে যা প্রচার করেছিলেন তাই মার্গ—'মার্গঃ স যো বিরিঞ্চাদ্যৈঃ অম্বিষ্টো ভরতাদ্যৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তোঽর্হ্য'। এই ব্রহ্মা চতুর্মুখ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা কিনা আজ পর্যন্ত তার কোন নির্ধারণ হয় নি। তবে মার্গ-সঙ্গীতের প্রচারক ব্রহ্মা যে একজন সঙ্গীত-শাস্ত্রবিৎ কৃতবিদ্য কলাকুশলী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই ব্রহ্মার কাছেই নাট্যশাস্ত্রকার ভরত, দত্তিল, তুম্বুরু প্রভৃতি সঙ্গীত-নায়কেরা মার্গ তথা গান্ধর্ববিদ্যায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। মোট কথা শিল্পাচার্য ব্রহ্মা সাম প্রভৃতি চারবেদ থেকে তন্ন তন্ন অন্বেষণ করে যে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন তার নাম 'মার্গ', আর দেশে দেশে বাধানিষেধের বালাই না রেখে স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে লোকে যে গান গাইত তার নাম 'দেশী'। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত সামগানের খুঁটিনাটির পরিচয় না দিলেও গান্ধর্বগানের কথা উল্লেখ করেছেন।

অনেকে মনে করেন বৈদিক সঙ্গীতের স্বরের সঙ্গে মার্গ অথবা দেশী-গানের স্বরের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু তা ঠিক নয়। নারদী-শিক্ষায় নারদ 'যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ' শ্লোকগুলির নজিরে বৈদিক ও মার্গসঙ্গীতের স্বরগুলির ভেতর একটা সম্পর্ক দেখিয়েছেন। এ ধরণের কৃতিত্ব বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্যেরও প্রাপ্য, যদিও তাঁর পদ্ধতি ও ইঙ্গিত নারদ থেকে একেবারে আলাদা বা উল্টাই বলা যায়। যেমন নারদ বলেছেন : 'যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ। যো দ্বিতীয়ঃ স গান্ধারস্তৃতীয়স্ত্বৃষভঃ স্মৃতঃ। চতুর্থঃ ষড়জ ইত্যাহুঃ পঞ্চমীধৈবতো ভবেৎ। ষষ্ঠে নিষাদো বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ॥" কিন্তু সায়ণাচার্য বলেছেন, 'লৌকিকে যে নিষাদাদয়ঃ সপ্তস্বরাঃ প্রসিদ্ধাঃ ত এব সাম্নি ক্রুষ্টাদয়ঃ সপ্ত স্বরাঃ ভবন্তি তদ্ যথা, যো নিষাদঃ স ক্রুষ্টঃ, ধৈবতঃ প্রথমঃ, পঞ্চমঃ দ্বিতীয়ঃ, মধ্যমস্তৃতীয়ঃ, গান্ধর্বশ্চতুর্থঃ, ঋষভো মন্দ্রঃ, ষড়জোতিস্বার্য ইতি।' অর্থাৎ সামস্বরের আর নারদ ও সায়ণাচার্যের স্বরগুলির পরিচয় পাশাপাশি দেখালে দেখা যায়,

সামস্বর	নারদ	সায়ণ
(৭) ক্রুষ্ট	পঞ্চম	নিষাদ
(১) প্রথম	মধ্যম	ধৈবত
(২) দ্বিতীয়	গান্ধার	পঞ্চম
(৩) তৃতীয়	ঋষভ	মধ্যম
(৪) চতুর্থ	ষড়জ	গান্ধার
(৫) মন্দ্র	ধৈবত	ঋষভ
(৬) অতিস্বার্য	নিষাদ	ষড়জ

---

as we know it, is of comparatively modern date—little more than two hundred years old.'—*The Story of Music*, পৃঃ ১৫২।

কিন্তু আমাদের অভিমতে ক্রেয়েষ্টের অনুমান ঠিক নয়, কেননা প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপ থেকেও বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র পাওয়া গেছে যা বেশ উন্নত। মহেঞ্জোদড়োর বয়স পাঁচ হাজারেরও বেশী। তা ছাড়া ব্রাহ্মণের যুগে শততন্ত্রী বীণারও উল্লেখ আছে।

এই সাতস্বরের বিকাশের কিন্তু একটা ইতিহাস আছে, ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ীই তারা সমাজে বিকাশ লাভ করেছিল। স্বরগুলির বিকাশের রীতি মোটামুটি বর্ণনা করতে গেলে বলা যায়, আর্চিকের যুগে প্রথম স্বরই মাত্র ছিল; গাথিকের যুগে প্রথম ও দ্বিতীয়, সামিকের যুগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, স্বরান্তরের যুগে প্রথম থেকে চতুর্থ, ওড়বের যুগে প্রথম থেকে পঞ্চম বা মন্দ্র পর্যন্ত, ষাড়বের যুগে প্রথম থেকে অতিস্বার্য পর্যন্ত আর সংপূর্ণের যুগে প্রথম থেকে ক্রুষ্ট পর্যন্ত স্বরের বিকাশ হয়েছিল। ঠিক এই ধরণের বিকাশের ধারা সকলে আবার স্বীকার করেন না। প্রথম স্বরকে কেউ কেউ বলতে চান পঞ্চম, কারো মতে নিষাদ অথবা ষড়্জ। কিন্তু সায়ণাচার্যের স্বরগুলি নিয়ে আলোচনা করলে ধৈবত-স্বরই হয় প্রথম। কিন্তু সায়ণাচার্যের আরোহণগতির বা upward movement-এর ক্রমবিকাশকে মেনে নিতে আমরা ঠিক রাজী নই, কেননা বৈদিক যুগে স্বরগুলির গতিই ছিল অবরোহণ গতিতে অর্থাৎ downward movement-এ। কাজেই বৈদিক যুগের অবরোহণগতি অনুযায়ী স্বরগুলির বিকাশ স্বীকার করলে বিকাশভঙ্গী হয় এরকম,—

মন্দ্র				মধ্য		
প্‌	ধ্‌	নি	সা	রে	গা	মা—দেশী স্বর
ক্রুষ্ট	অতিস্বার্য	মন্দ্র	চতুর্থ	তৃতীয়	দ্বিতীয়	প্রথম—বৈদিক স্বর
৭	৬	৫	৪	৩	২	১

কিন্তু এ সব বিকাশের ইতিহাস ও সঙ্গীতের খুঁটিনাটি শিল্পীরা আগেও বেশী আলোচনা করেন নি, এখনও নয়। এখন আমরা এসব ঔপপত্তিকের (theoretical) আলোচনার স্থান দিই ততটুকু যতটুকু সঙ্গীতের কার্যকর (practical) সাধনার পক্ষে একান্ত দরকার, তাও আধুনিক বিকাশের ওপরই বেশী জোর দিয়ে। যেমন কানড়া বা কানাড়া রাগিণীর শ্রেণী কত রকম, তাদের পরস্পরের রূপভেদ কি, তাদের বাদী সংবাদী ও ঠাটের স্বরূপ কি—এই সব নিয়েই আলোচনা আমাদের বেশী, অবশ্য খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জানা সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেরই উচিত; কিন্তু আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, কানাড়াকুঞ্জের উৎপত্তির পেছনে অভিব্যক্তি কেন এল, কি প্রয়োজনের তাগিদে তাগিদে সঙ্গীতসমাজ একটি কানাড়া থেকে আরো সতেরটি কানাড়ার রূপভেদের সৃষ্টি করল, আর সে করার পিছনে যুক্তি ও যথার্থ বিজ্ঞানই বা কি—এ সব বিষয়ে আলোচনা অথবা গবেষণাকে আমরা মোটেই স্থান দিই নি। বরং যুক্তি ও বিজ্ঞানের বালাই না রেখে পৌরাণিকী গল্পের দোহাই দিয়েই আমরা এক রকম সন্তুষ্ট হতে চাই। যেমন কানাড়া রাগ অথবা রাগিণীটির নামের সার্থকতা দেখাতে গিয়ে আমরা বলে থাকি কাহ্নু, কানাই বা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী থেকে এই রাগ, রাগিণী বা সুরের জন্ম হয়েছিল আর এজন্তে এর নাম কানড়া, কানাড়া অথবা কাহ্নড়া। কথাটি উচ্চশিক্ষিত সঙ্গীতসমাজ থেকে এখনও মুছে যায় নি। অথচ কর্ণাট দেশ থেকে যে এর উৎপত্তি হয়েছে এ ঐতিহাসিক নজির দেখাতে আমরা রাজী নই। সে রকম সাত স্বরের জন্মকথা সম্বন্ধেও বলা যায়। প্রকৃতি-দেবী জীবজগৎ সকলকেই প্রসব করেছেন বলে পশুপক্ষীর ডাক তথা অভিম স্বর থেকে ষড়্জাদি সাত স্বরের উৎপত্তি হয়েছিল এ কথাই আমরা বেদবাক্য বলে আজ পর্যন্তও বিশ্বাস করি যদিও বীণা স্বর-সংস্থানের দূরত্ব দেখিয়ে কেউ কেউ যুক্তির নজির দেখাবার চেষ্টা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত ঠিক এ ধরণের প্রমাণ একটা দেবার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরাও ঠিক ঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর এর কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। কিন্তু তা হলেও দেশ ও সমাজের ধারা সকল দিক দিয়ে এগিয়েই চলেছে, পেছন হাঁটার ইঙ্গিত মোটেই তাদের মধ্যে দেখা যায় না। বিশেষতঃ এখন যে যুগে আমরা বাস করি সে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ও যুক্তির যুগ। সকল জিনিষকে বিজ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করার এখন সময় এসেছে। সঙ্গীতের পূজারী আমাদেরও তাই উচিত—সঙ্গীতের সবকিছুকেই পুরোপুরি যুক্তির আলোক দিয়ে বিশ্লেষণ করা। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের প্রমাণগুলিকে আমাদের এখন থেকে বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষণে যাচাই করে দেখা উচিত। তাতে সঙ্গীতের গুপ্ত ও আসল অনেক রহস্য বরং প্রকাশিত হবে। বৈদিক ও দেশী-সঙ্গীতের স্বরসম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় আমরা সকলেই জানি, কিন্তু বৈদিকের পাশে মার্গ তথা গান্ধর্বের স্বরগুলির বিকাশ কেমন করে হয়েছিল তার সত্যিকার রহস্য ও ইতিহাস আমরা ঠিক ঠিক ক'জন জানি বলা সত্যিই দুষ্কর। বৈদিক, মার্গ ও দেশী সঙ্গীত নিয়েও সত্যিকার আলোচনা এখনো পর্যন্ত হয় নি। মার্গকে কেউ কেউ ক্লাসিকালের পর্যায়েও ফেলে থাকেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। মার্গ-সঙ্গীতকে অনেকে আবার পুরোপুরি বৈদিক সঙ্গীতও বলতে চান যেটা নিতান্তই ভুল। তা ছাড়া দেশীর সঙ্গে মার্গ তথা গান্ধর্ব আর বর্তমানে মুসলমান যুগের আমদানি করা ক্লাসিকাল সঙ্গীতের মিল ও অমিল অথবা সম্পর্ক কতটুকু তাই বা আমরা ক'জনে জানি? কাজেই এ "বৈদিক ও দেশী-সঙ্গীতের স্বর" প্রবন্ধের অবতারণায় আমরা বলতে চাই যে, সঙ্গীত-সাধনার উপযোগিতা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের ক্রিয়াংশ ও উপপত্তিকের সবকিছুকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং বিজ্ঞান ও যুক্তির মাপকাঠিতে আমাদের গ্রহণ করা দরকার। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আলোচনা প্রবর্তন করে ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিক এভাবেই গড়ে তুলতে হবে, আর তা হলেই মনে হয় সঙ্গীতের বিকাশ ও আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হবে; দেশের জনসাধারণের ভেতরও সঙ্গীতের ওপর আগ্রহ ও শ্রদ্ধার ভাব ক্রমশঃ বাড়বে।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগ

শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দ্দেশমত এবার আমি ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত কয়েকখানি সুপ্রাচীন বাংলা উপন্যাস দেখিয়া প্রীত্মাবকাশের সদ্ব্যবহার করিয়াছি। এগুলির কোন-কোনটি সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ আছে বলিয়া মনে করি।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৯ শক বা ১২৬৪ সাল, অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহের সময়, বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই বৎসর তিনখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়; উহা— ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস,' কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ,' ও টেকচাঁদ ঠাকুরের (ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের) 'আলালের ঘরের দুলাল'।

'ঐতিহাসিক উপন্যাস': ভূদেবের এই গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ একান্ত দুষ্প্রাপ্য; এই কারণে ইহার প্রকাশকাল লইয়া অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এমন কি, অধুনা-প্রকাশিত 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থের ২য় সংস্করণে "প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস" প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাবের তারিখ অনিশ্চিত।" ব্রিটিশ মিউজিয়মে আমি যে কয়েকখানি প্রাচীন উপন্যাস দেখিয়াছি, 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র ১ম সংস্করণ তাহাদের অন্যতম। উহার আখ্যা-পত্রটি হুবহু উদ্ধৃত করিতেছি:—

Historical Tales
in Bengali
By
Bhoodeb Mookerjea
—
ঐতিহাসিক উপন্যাস।
—
শ্রী ভূদেব মুখোপাধ্যায়
কর্তৃক
প্রণীত।
কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে
শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা, বাহির
মৃজাপুর, ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত
শকাব্দা: ১৭৭৯।

ইহা হইতে 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র প্রথম প্রকাশকাল যে "১৭৭৯ শক" তাহা জানা যাইতেছে। কিন্তু শকাব্দার সহিত মাস-তারিখের উল্লেখ না থাকায় ইহা ইংরেজী ১৮৫৭ কি ১৮৫৮ সনে প্রকাশিত তাহা জোর করিয়া বলা কঠিন। মনে রাখিতে হইবে, "১৭৭৯ শক" ইংরেজী ১২ এপ্রিল ১৮৫৭ হইতে ১২ এপ্রিল ১৮৫৮ পর্য্যন্ত সূচনা করে।

'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ': 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র সমসময়ে আচার্য্য কৃষ্ণকমলের এই উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়। ইহা পাঠ করিয়া মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' (আষাঢ় ১৭৮০ শক) লিখিয়াছিলেন:—

"এতদ্দেশীয় উপন্যাস সকলেরই এক ধারা; সকলেই 'এক রাজা ছিলেন তাঁহার সো দো দুই রাণী' এই রূপ বাক্য ধরণে আরম্ভ হইয়া থাকে; এই উপন্যাস তদ্রূপ নহে, এবং গল্পটীও তাদৃশ নিন্দনীয় নহে।"

ইহার ভাব ভাষা ও গল্প সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে মুগ্ধ করিয়াছিল (২ নং সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা: 'কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য' দ্রষ্টব্য)। শ্রীকুমার বাবুর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র উল্লেখ আছে, অথচ একই সময়ে প্রকাশিত এবং একই ইংরেজী গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে লিখিত কৃষ্ণকমলের বইখানির নাম কেন যে হিসাবে বাদ পড়িল বুঝিয়া উঠা কঠিন; হয়ত তিনি ইহার সন্ধান রাখেন না। কিন্তু "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"য় পুনর্মুদ্রিত করিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ত ইহার দুষ্প্রাপ্যতা ঘুচাইয়াছেন!

'বিজয় বসন্ত': উপরি-উক্ত উপন্যাসগুলির অব্যবহিত পরেই হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) প্রণীত 'বিজয় বসন্ত' প্রকাশিত হয়; উহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ:—

> বিজয় বসন্ত। / নীতিগর্ভ অপূর্ব্ব উপাখ্যান, / কুমারখালী নিবাসী / শ্রী হরিনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক / প্রণীত / কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে / শ্রী লালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা বাহির / মৃজাপুর চাষাধোবা পাড়ায়, ১৩ সংখ্যক ভবনে / মুদ্রিত হইল, / ১৭৮১ শক ১০ই পৌষ / মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

'বিজয় বসন্ত' সেকালের একখানি বহুল-প্রচারিত নীতিগর্ভ উপাখ্যান। শ্রীকুমার বাবুর গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিলে সুখী হইতাম।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ': ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। ইহার লেখিকা—বিবি মুলেন্স। পুস্তকের আখ্যা-পত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি:—

The history / of / Phulmani and Karuna / a book for / Native Christian Women / ফুলমণি

ও করুণার বিবরণ / স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত / Calcutta. /.Printed for the Calcutta Christian Tract and / Book Society, B. J Baptist, at Bishops / College Press / 1st ed. 1852 [3000 copies /]

এই বইখানিকে কেহ কেহ মহিলা-রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাস বলিতে চাহিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে উপন্যাস বলা চলে না। ইহাতে কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি দ্বারা গল্পচ্ছলে স্ত্রীলোকদের মধ্যে তৎকাল-প্রচলিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এবং কি উপায়ে তাহা দূর করা যায়,—খ্রীষ্টিয়ান সমাজ ও তদর্থই বা এ বিষয়ে কি করিতে পারেন, তাহাও আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের সূচনায় Calcutta Christian Tract and Book Society-সম্পাদককে Mrs. Mullens পুস্তকের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষের একটি অধ্যায়ে খ্রীষ্টিয়ানেরা যে হিন্দুদের অনুকরণে হিন্দু দেব-দেবীর নামানুসারে শিব কৃষ্ণ হরি প্রভৃতি নাম রাখেন তাহাতে আক্ষেপোক্তি আছে।

সমুদ্র ও মহাদেশের উদ্ভব

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত

পৃথিবীতে শতকরা ৭১ ভাগ জল ও ২৯ ভাগ স্থল। জল ও স্থলের উৎপত্তিবিষয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক মতবাদও দেখিতে পাওয়া যায়। আদিতে পৃথিবী জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ডরূপে সূর্য্য হইতে জন্মগ্রহণ করে। মহাশূন্যে বিচরণকালে তাপবিকীরণ হেতু উহা ক্রমেই শীতল হইতে আরম্ভ হয়। পৃথিবী প্রথমে তরল ও পরে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অবস্থান্তরের ফলে পৃথিবী আয়তনে সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং সঙ্কোচনের ফলে উহার উপরিভাগে তরঙ্গাকারে ভাঁজের সৃষ্টি হইতে থাকে। পৃথিবী জলধারণের উপযোগী শীতল হইলে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে ভাঁজের নিম্নাংশে সঞ্চিত হওয়ায় সমুদ্রের সৃষ্টি হইল। উচ্চাংশ স্থলভাগরূপে উত্থিত হইয়া বিরাজমান রহিল।

পৃথিবীর জন্মের পর হইতেই জলাশয় ও স্থলভাগের সৃষ্টি-কার্য্য স্বাভাবিক ভাবেই সম্পন্ন হইতেছিল—ইহাই কতিপয় বৈজ্ঞানিকের অভিমত। পদার্থবিদ্ কেলভিন বলেন যে, পৃথিবীর গ্যাসীয় অবস্থা হইতেই স্থলভাগ দানা বাঁধিয়া উঠিতে-ছিল। সোলাসের মতে বায়ু-মণ্ডলের অসমান চাপের জন্যই পৃথিবীর তরল অবস্থাতেই ভূপৃষ্ঠ অসমতল হইয়া স্থলভাগ ও জলাধারের সৃষ্টি করিয়াছে। আবার গ্রহাণুবাদ মতের (Planetesimal Hypothesis) উদ্ভাবক চেম্বারলেনের মতে কঠিন গ্রহাণুগুলি পরস্পরের আকর্ষণে ও সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত তাপদ্বারা জমাট বাঁধিয়া যায়। এইরূপে সৃষ্ট ভূতল অসমতল ও গহ্বরযুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। এই গহ্বরগুলিই পরে সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে। উচ্চাংশ স্থলভাগের সৃষ্টি করিয়াছে।

যেরূপেই সৃষ্ট হোক না কেন, পরবর্ত্তীকালে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থলভাগ একত্রে জমাট বাঁধিয়া এক বিরাট্ মহাদেশের সৃষ্টি করিল। তাহাকে ঘিরিয়া রহিল এক বিশাল মহাসমুদ্র। এই মহাদেশটির নাম দেওয়া হইয়াছে প্যানজিয়া (Pangaea) এবং মহাসমুদ্রটির নাম দেওয়া হইয়াছে প্যান্থালাসা (Panthalassa)। বর্ত্তমানের মহাদেশগুলির স্তরবিন্যাস (stratification) ও তন্মধ্যস্থ প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ হইতে এইরূপে একটি মহাদেশের অস্তিত্ব সমর্থিত হইয়াছে। এই মহাদেশটিই পরবর্ত্তীকালে ভাঙিয়া চুরিয়া বর্ত্তমানের মহাদেশ-গুলির সৃষ্টি করিয়াছে আর প্যান্থালাসার জল ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

প্যানজিয়ার ভাঙন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকমহলে কয়েকটি বিরুদ্ধ মতবাদের প্রচলন দেখা যায়। একদল বলেন যে, শীতল হইবার জন্য সঙ্কোচের ফলে পৃথিবীতে যে ভাঁজের সৃষ্টি হয় তাহারই জন্য প্যানজিয়ার ভাঙন সুরু হয়। এইরূপে সৃষ্ট ফাটলে সমুদ্রের জল প্রবেশ করিয়া অন্তর্বর্ত্তী সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

পৃথিবীতে কোন কোন জলপূর্ণ অবনমিত স্থানে পলি সঞ্চয় হইয়া থাকে। সঞ্চিত পলির চাপে ভূপৃষ্ঠের ঐ সকল অবনমিত অংশ আরও বসিয়া যায়। ফলে উহার উভয় পার্শ্বস্থ স্থলভাগ পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসে। এইরূপে সঙ্কোচনের দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি ও তাহাতে পলিসঞ্চয়ের দরুন উভয় পার্শ্বস্থ অংশের সঞ্চরণের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। একই প্রকারে প্যানজিয়া ভাঙিয়া সমুদ্র ও মহাদেশের সৃষ্টি করিয়া থাকিবে—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অপর মতে পৃথিবীপৃষ্ঠের অংশ-বিশেষের সঞ্চরণের ফলে প্যানজিয়ার ভাঙন ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। সঞ্চরণ মত-

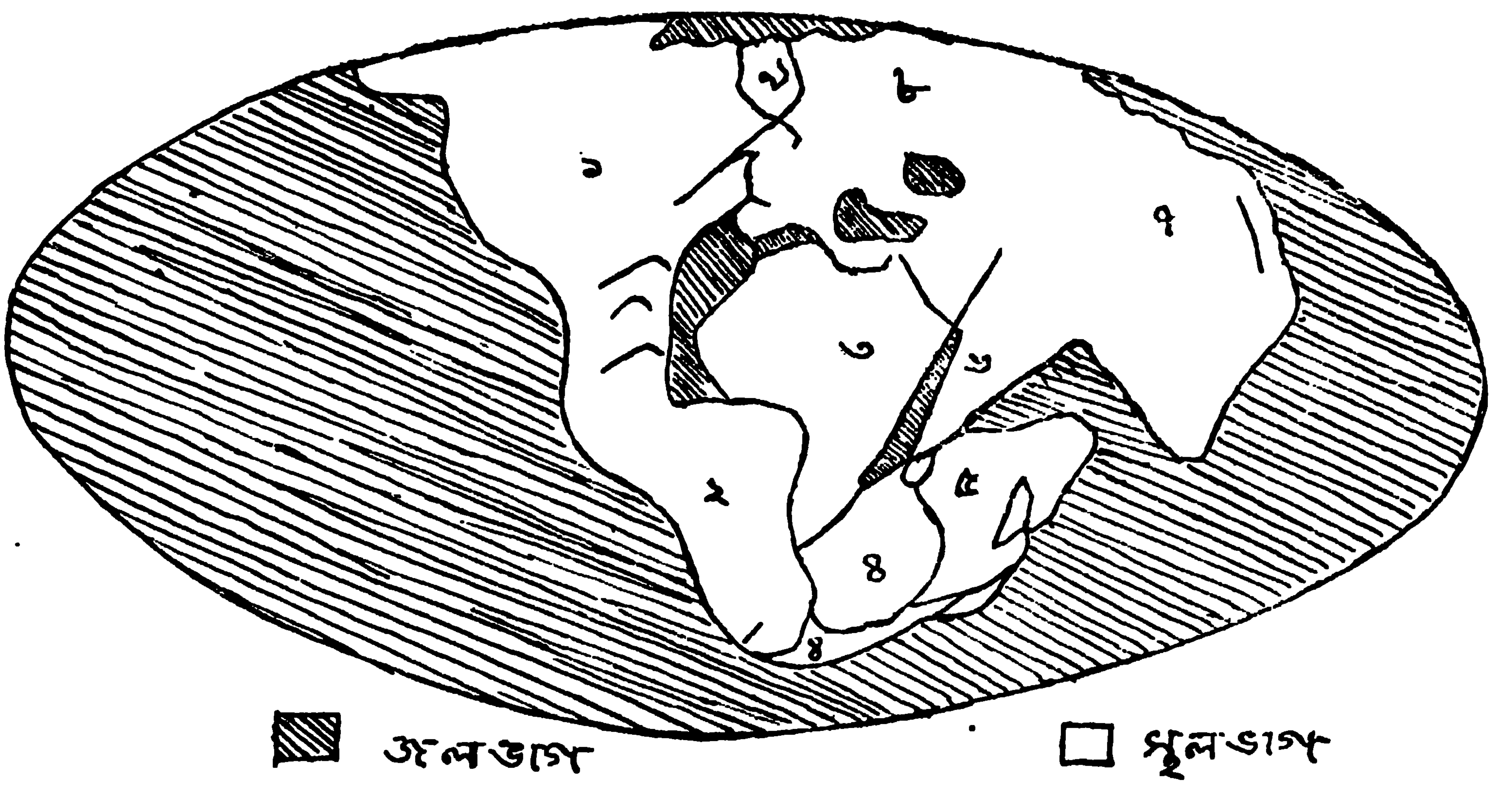

২০০,০০০,০০০ বছর আগে "প্যানজিয়া" (Pangea) ও
"পান্‌থালাসা" (Panthalassa)—Wegener মতে।
১। উত্তর আমেরিকা, ২। দক্ষিণ আমেরিকা, ৩। আফ্রিকা, ৪। এণ্টারকটিকা, ৫। অষ্ট্রেলিয়া,
৬। ভারতবর্ষ, ৭। উত্তর এশিয়া, ৮। ইউরোপ, ৯। গ্রীনল্যাণ্ড

বাদকে একটি সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করান সর্ব্বপ্রথম আলফ্রেড ভেগনার। ড্যালি ও টেলর নিজ নিজ ব্যাখ্যার দ্বারা এই মতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। ভেগনার একজন জার্ম্মান আবহাওয়া-তত্ত্ববিদ্। পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়া নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি লক্ষ্য করেন যে, পৃথিবীতে এমন সব স্থান আছে যেখানে পূর্ব্বের আবহাওয়ার সহিত বর্ত্তমানের আবহাওয়ার কোন সাদৃশ্যই নাই। পূর্ব্বে যেস্থানে হিমশীতল আবহাওয়া ছিল সেখানে হয়ত বর্ত্তমানে উষ্ণ আবহাওয়া বিদ্যমান। ইহা সাধারণতঃ দুইটি কারণে ঘটিতে পারে। হয়ত সেখানে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—নচেৎ সে স্থান পূর্ব্বের জায়গায় আর নাই। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন কল্পনা করিতে গেলে বহু প্রকৃতিগত বিষয়ের পরিবর্ত্তন করাইতে হয়। সুতরাং উহা গৃহীত হয় নাই। অতএব কেবলমাত্র ভূপৃষ্ঠের অংশবিশেষের সঞ্চরণ-মতবাদ দ্বারাই ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে। আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের উভয় পার্শ্বের স্থলভাগের বক্ষবিন্যাস, জীবাশ্ম (fossil) পর্ব্বতাদির অবস্থানের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ভেগনার ভূপৃষ্ঠের অংশবিশেষের সঞ্চরণ স্বীকার করিয়া লন। ভেগনারের মতে একটি পশ্চিমমুখী ও অপর একটি বিষুবরেখামুখী শক্তির প্রভাবে প্রায় ২০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে প্যানজিয়ার ভাঙন সুরু হয়। এশিয়া বিষুবরেখার দিকে সঞ্চরণ করার ফলে ভারত মহাসাগরের ও আমেরিকা পশ্চিম দিকে সরিয়া যাইবার ফলে আটলাণ্টিক মহাসাগরের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের সম্বন্ধে ভেগনার কিছু না বলিলেও এ বিষয়ে ফিশারের মত চিত্তাকর্ষক। ফিশার বলেন, চন্দ্রের উৎপত্তির জন্য প্রকাণ্ড মহাসাগরের গহ্বর সৃষ্টি হইয়াছে। ফিশারের এই মত বৈজ্ঞানিক মহলে গৃহীত হয় নাই। তাহার কারণ চন্দ্রের আয়তন প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন অপেক্ষা অনেক বড়।

আর একটি দিক হইতে এই বিষয়টির সমাধান করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ভূত্বকের উপরি অংশে কতকগুলি তেজস্ক্রিয় (radio-active) পদার্থ বিদ্যমান আছে। ঐ পদার্থগুলির ধর্ম্ম এই যে, উহারা স্বতঃই অপর মৌলিক পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফলে বহুল পরিমাণে তাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই তাপ স্থলভাগের নিম্নে সঞ্চিত হইতে থাকে। তাপের ধর্ম্ম পদার্থমাত্রকেই আয়তনে বর্দ্ধিত করা। একই পরিমাণ পদার্থ বর্দ্ধিত-আয়তন হইলে উহার ঘনত্ব কমিয়া যায়। ঠিক একইরূপ স্থলভাগের নিম্নের চাপ-প্রভাবে উহার উপরিস্থিত অংশ লঘুতর হইয়া অধোগমন করিবে। উহাতে নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের জল স্থলভাগের উপর আসিয়া পড়ায় একটি বৃহত্তর সমুদ্রের সৃষ্টি হইবে।

সমুদ্র ও মহাদেশের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে অপর মতবাদে বলা হয় যে, প্যানজিয়ার অংশগুলি একটি বিরাট্ ভূভাগ-দ্বারা সংযোজিত ছিল। কি প্রকারে এই সকল সেতুর অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল তাহা বলা কঠিন। তবে ভূপৃষ্ঠে সঙ্কোচন, শিলার রূপান্তর ও তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিবর্ত্তনের দ্বারা সঞ্চিত তাপ এই সকল প্রক্রিয়ায় সাহায্য করিয়া থাকিবে।

সাঁইত্রিশ রাগিণী

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালে উঠিয়া দেখিলাম নায়েগ্রার প্রপাতের মুখের উপর বিরাট গম্ভীর এক পাহাড় খাড়া হইয়াছে। প্রপাতের উদ্দাম উচ্ছ্বাসের শব্দে কান ঝালাপালা হইয়াছিল, তাই বলিলাম - যাক্ বাঁচা গেছে।

পাহাড়ের গর্ভ হইতে হঠাৎ আগুন বাহির হইল, গা বাহিয়া গলিত লাভার সোনালি আভা আকাশটা ঝলসাইয়া দিল। এ দৃশ্য সর্ব্বদা দেখা ভাগ্যে জোটে না, তাই আবার বলিলাম—দিনটা আজ ভালই যাবে দেখছি।

গৃহিণী নীলা চায়ের কেটলি হাতে লইয়া আসিয়া আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—সকালে উঠেই আবার ওর পেছনে লেগেছ।

'ও' মানে আমার ছোট বোন সুমিতা, কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যাকে দেখিলে নায়েগ্রাকেই মনে পড়িত এবং আজ সকাল হইতে যার মুখে পাহাড়িয়া গাম্ভীর্য।

চোখ দিয়া আর এক ঝলক আগুন ঠিকরাইয়া সুমিতা তার বৌদিকে আক্রমণ করিয়া বলিল—থাক, তোমাকে আর সাওখুরি করতে হবে না।

চা ঢালিতে ঢালিতে নীলা বলিল—বা রে, আমি আবার কি করলাম ?

সুমিতার গাম্ভীর্যে একটু চিড় লাগিল ; মাথা ও কানের ঝুলন্ত ঝাড় লণ্ঠন দুটা এপাশ ওপাশ দোলাইয়া বলিল—তুমি না তো দাদাকে ভালমানুষ বানিয়েছে কে শুনি ?

নীলা বলিল—দাদার বদলে তুই নিজেও তো দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে গায়ের জ্বালাটা ঠাণ্ডা করতে পারতিস।

চা খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি ?

নেহাত পাথরের পাহাড়, তাই বেলুনের মত ফট করিয়া না ফাটিয়া শুধু ভূমিকম্পের আলোড়ন তুলিয়া সুমিতা বলিল—আহা জানো না যেন কিছু! লোকটা বাড়ী বয়ে এসে যা-তা বলে গেল, আর তুমি চুপ করে বসে রইলে।

বুঝিলাম এরা এখনও গত কল্যের ঘটনা লইয়া ঘণ্ট পাকাইতেছে।

বলিলাম—যা-তা বলে গেছে তা কি করে বুঝব ?

নীলা বলিল—হাত পা ছুঁড়ে বাজখাঁই গলায় কত কি বললে…

নীলার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—তাই বলে তাকে ধরে মারতে হবে না কি ?

সুমিতা বলিল—না, পুজো করতে হবে।

আমি বলিলাম—তোমরা ঘরের পয়সা খরচ করে থিয়েটারে গিয়ে যখন দেখিস ষ্টেজের ওপর হাত পা ছুঁড়ে বাজখাঁই গলায় কেউ কিছু বলছে তখন সীটে বসে মিঠে মিঠে মন্তব্য না করে সোজা ষ্টেজে উঠে বক্তাকে তক্তাপেটা করিস নে কেন ?

তাজ্জব বনিবার মত এমন কিছু বলি নাই যাতে ননদ বৌদি অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারে। তাই তাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম—গত কল্যের বক্তা যাই বলিয়া যান না কেন, তাঁর কোন কথারই যখন অর্থ করিতে পারি নাই তখন অনর্থক চটিয়া নিজেদের মাথা খারাপ করিলে লাভ কিছু হইত না।

নীলা বলিল—ওদের কথা আমরা বুঝতে পারি, আর তুমি বোঝ না বললেই হ'ল কি না…

আমি বলিলাম—তোমরা তো কাকপক্ষী নির্বিশেষে সর্ব্বজীবের কথাই বুঝিতে পার, রামানুজনের মুখে মাদ্রাজী ভাষা তো তার কাছে জলের মত সোজা।

নীলা বলিল—তোমার কথা শুনলে গা জ্বালা করে। তুমি নিজে তো কোন দায়িত্ব নিলে না ; আমরা খেটে খুটে যেটা তৈরী করবার চেষ্টা করছি বাইরের লোকের কথায় সেটা যে বন্ধ করে দেবো, তা ভেবো না।

বলিলাম—পাগল! তা ভাবব কেন ? বরং তোমাদের রিহের্শালের জন্যে আর এক জায়গায় ঘরের বন্দোবস্ত করে দেব।

নীলা বলিল—না না, আমরা এই বাড়িতেই রিহের্শাল দেবো…দেখবো রামানুজন কি করতে পারে।

সুমিতা তাকে সমর্থন করিয়া বলিল—নিশ্চয় ; আমাদের বাড়ীতে আমরা যা খুশি করবো।

এদের যা খুশির বহরটা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম, মুখে বলিলাম—আচ্ছা বেশ।

নমিতা তবু ছাড়িল না, বলিল—মুখে "আচ্ছা বেশ" বললেই হবে না, কাল যে সব মেয়ে আর আসবে না বলে গেছে, ছোড়দাকে বল তাদের খবর দিতে। ছোড়দা বলেছে যে তুমি না বললে এ ব্যাপারে আর হাত দেবে না।

নীলা বলিল—আর তোমার বন্ধুদের কাছে কতকগুলো টিকিট বিক্রি করতে হবে, মনে থাকে যেন।

'আচ্ছা বেশ' বলিলে এরা সন্তুষ্ট হয় না দেখিয়া সংস্কৃত করিয়া বলিলাম—তথাস্তু।

গম্ভীর পাহাড়টা ধ্বসিয়া গেল ; নায়েগ্রায় ঢাকা রূপ আবার খুলিয়া গেল সুমিতার খিল খিল হাসিতে।

নিজের ঘরে আসিয়া তখনকার মত বাঁচিলাম।

এ বাড়িতে সুমিতার গম্ভীর মুখ কারও পছন্দ হয় না; নীলাও যা জেদ ধরে সহজে তা ঢিলা হয় না। তাই আমারই যে ত্রুটির জন্য এদের এত বড় আমোদটা টুটিয়া যাইতে বসিয়াছে, অন্য উপায়ে সেটা অচিরে সংশোধন না করিলে পিসীমা এখনি ছুটিয়া আসিয়া রোদন করিতে বসিবেন এবং আমি না কি মুখচোরা নিজের মান নিজে রাখিতে জানি না ইত্যাদি বলিয়া সব ঝালটা আমারই উপর ঝাড়িবেন। ঝাড়িবেনই বা না কেন? পয়লা তারিখে কতকগুলা ময়লা নোট সংসারের জন্য ফেলিয়া দিয়া সারা মাস গা ছাড়িয়া যে বসিয়া থাকে, বাহিরের কেহ উপর-চড়াও হইয়া দু'কথা শুনাইয়া গেলে পরুষ কণ্ঠে যে জবাব দিতে জানে না, সে আবার পুরুষ নাকি? আর নীলা সুমিতারা মেয়েমানুষ হইয়া যে আমোদের আয়োজনটা করিয়াছে আমি তাতে কোন সাহায্য তো করি নাই, বরং বাহিরের লোকের বাগড়া দিবার আগড়গুলা খুলিয়া দিয়া আড়াল থেকে মজা দেখি।

আসল কাহিনীটা খুলিয়া বলি। আমাদের বাড়ির লোকগুলা স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে একটু আমোদপ্রিয়; তবে আমোদের বিশেষ ধারাটা বহিয়া থাকে সঙ্গীতের তরঙ্গে ভর করিয়া।

পিসীমার মুখে বাউলকীর্ত্তনের সাঙ্গীতিক নর্ত্তন ছেলেবেলা থেকে অনেক উপভোগ করিয়াছি। তারপর যেদিন তাঁর নিরামিষ ঘরে বসিয়া গুনগুন করিয়া ভজন সুরু করিলেন, তার আসল ওজন বুঝিলাম খাইতে বসিয়া তাঁর মাথা সাঁতরাগাছির পদার্থবিশেষ গলাধঃকরণ করিয়া আমার নিজের গলার সুড়সুড়িতে। আরও বুঝিলাম যে ভজন গাহিতে হইলে গলা পরিষ্কার করিবার জন্য এর মত অমোঘ ঔষধ আর নাই।

কিন্তু আমার অ-সুরকণ্ঠে কোন সুরই দানা বাঁধিল না দেখিয়া আমাকে ছাড়িয়া পিসীমা আমার ছোটভাই সুখেন্দুকে লইয়া পড়িলেন।

সুকণ্ঠ সুখেন্দুকে ইন্দ্রসভাতেই মানাইত ভাল, কিন্তু সে ইন্দ্রও নাই, তাঁর সভাও নাই। তাই স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সুখেন্দু যখন দরাজ সুরে গানের গলা ছাড়িয়া দিত পিসীমা তখন একটা কাঠি দিয়া কাসুন্দি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে হয়তো ভাইপোর কণ্ঠমাধুর্য্যে পুলকিত হইয়া উঠিতেন।

সুমিতা যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তখন তার খুদে অঙ্গ দেখিয়া মনে হইত, আকারে তারই মত ছোট একটা সারেঙ্গ বাজনা জাফরানি রঙে রাঙাইয়া কে যেন বিছানার উপর শোয়াইয়া রাখিয়াছে। বালিকা বয়সে সারেঙ্গীটি গোঙানি ছাড়িয়া খরখরে ঝরঝরে এস্রাজে পরিণত হইল। কিশোরী সুমিতা সেতারে পৌঁছাইল কথায় ও কাজে প্রিং প্রিং রব তুলিয়া, আর সে যখন তিড়িং তিড়িং করিয়া লাফাইত তখন তার পিঠের উপরকার ঝুলন্ত বিনুনি দুটার একটা দিয়া রামকেলি ও আর একটাতে মালকোষ কোঁস কোঁস করিয়া ফণা তুলিয়া দুরন্ত লয়ে নামিয়া পড়িত। সেতার কিন্তু বেতার হইল রামকেলি ও মালকোষে আপোষ হইল না বলিয়া—তাই রক্ষা করিবার জন্য বিনুনি দুটা একত্র করিয়া তালের মত ভারী একটা খোঁপা বাঁধিয়া যেদিন সে বাহার ধরিল, সুখেন্দু জানাইল সুমিতা সুর-বাহারে প্রমোশন পাইয়াছে। সঙ্গীত-শাস্ত্রের জটিল তথ্য না বুঝিলেও সেদিন থেকে আমি সুমিতাকে সুরবাহার বলিয়া আদর করি। সুমিতা তাতে চটিয়া যায় এবং মনে মনে হাম্বীর ভাঁজিতে ভাঁজিতে ফাঁকা ঘরে গিয়া সম ফাঁক তাক করিয়া তার পোষা বিড়ালটাকে চাপড়াইতে থাকে।

এ বাড়ীতে নীলা যেদিন পদার্পণ করিল সুমিতা অনুনয় করিয়া বলিল—হ্যাঁ নীলু বৌদি, গান গাইলে না যে? ফিক করিয়া হাসিয়া নীলু পিলু সুরের গান ধরিল। নিমন্ত্রিত জনকে ভালমন্দ পরিবেশন করিতে করিতে সুখেন্দু তখন চাপা গলায় হিন্দোল ভাঁজিতেছিল; নীলুর মুখে পিলু শুনিয়া সে ছুটিয়া আসিয়া হাতের মাছের বালতিটা আলতো করিয়া তুলিয়া সে গান শুনিতে লাগিল।

ব্যস, তার পরের দিন থেকে শুধু রোয়াকে নয়, বাড়ীর সর্ব্বত্রই গানের বন্যা বহিতেছে। নীলা সুমিতা সুখেন্দু—অর্থাৎ গঙ্গাযমুনা ব্রহ্মপুত্রের ত্রিধারা সুরের উত্তাল তরঙ্গের মাঝখানে অ-সুর আমি নিরেট কাঁপাখয়ার মত ভাসিতেছিলাম।

ভাসিতেছিলাম, তবে অকূলে নয়; শক্ত লোহার শিকলে বাঁধা ভারী একটা নোঙরে তলাকার মাটি আঁকড়াইয়া ছিলাম। কিন্তু শিকলটা বুঝি এবার ছিঁড়িয়া যায়, প্রতিবেশী রামানুজন বনাম আমাদের বাড়ীর বাসিন্দাদের সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বে।

রামানুজনের মত সজ্জন লোক এ পাড়ায় আর নাই। যে-কোন একটা ছুতা করিয়া চাঁদার জন্য রামানুজনের ছোট ভাই রামাশেষণকে একবার বলিলেই ইংরেজীতে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে রামানুজনের নাম-সই-করা একখানা চেক আসিয়া যাইবে, তাই এত বড় একজন মহাশয় ব্যক্তিকে আমরা দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়াছি ভাবিয়া তিনি যদি দু'কথা শুনাইয়া যান তাহা হইলে আর কি করিতে পারি। তবে তাঁর গরম মেজাজে হয়তো কিছু শীতল জল ঢালিতে পারিতাম, যে দু'কথা কাল শুনাইয়াছেন তার একটারও যদি অর্থ করা আমার সাধ্য হইত।

গোড়ার কথা কিছু বলিয়া রাখি। দক্ষিণ ভারতের কুটির-শিল্পের উৎকর্ষের নিদর্শনগুলি নামমাত্র দামে বিতরণ করিয়া রামানুজন এ অঞ্চলে কিঞ্চিৎ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন এবং আমাদের বাড়ীর পাশের খালি জমিটার উপর বৃহৎ একটি অট্টালিকা তুলিয়া প্রতিবেশীরূপে আমাদের

গ্রস্ত করিয়াছেন। তবে বহুদিন ধরিয়া বড়বাজার ও রাধাবাজারে ঘোরাফেরা করার জন্য তাঁর কথা ভাষার অসঙ্গতিটা পূরণ করেন এ পাড়া ও অন্য পাড়ার অভিজাত নাগরিকমহলে ব্যাঙ্কের মোটা অঙ্কের আভিজাত্য দেখাইয়া এবং সেই আভিজাত্যের জোরেই প্রৌঢ় বয়সে একটি অষ্টাদশীকে বিবাহ করিয়াছেন।

লোকে বলে, অবিমিশ্র মাদ্রাজী ভাষার মত কাঠিন্যবর্জ্জিত সুললিত ভাষা একটা অ-মাদ্রাজী বালকেও বুঝিতে পারে—বিশেষতঃ আমাদের এই দক্ষিণ অঞ্চলে, যেখানকার বালকের দল সেবার কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রোডে সার্ব্বজনীন পূজায় ঢাক-ঢোলের বদলে মাদ্রাজী কথকতায় কোরাস শোনাইয়া সর্ব্বজনের তুষ্টি বিধান করিয়াছিল। তবে রাধাবাজারের ধোপ ও কৃষ্ণবাজারের ইস্ত্রির পর রামানুজনের মুখে এ হেন একটি ভাষা কি দশায় যে পড়িয়াছে তা বাজার-অনভিজ্ঞ আমিই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি।

তাই ভাবি, আমাদের বাড়ীর বাসিন্দাদের বিশুদ্ধ আমোদপ্রিয়তা কেন এই প্রমাদ ডাকিয়া আনিল ?

প্রমাদের ভূমিকাটা বলি। নীলা সুমিতাদের হর্ষবাহিকা সমিতি পাঁচ মাস আগে স্থির করিয়াছিল বর্ষামঙ্গল গীতাভিনয় করিবে ; সেজন্য আয়োজনের ত্রুটিও রাখে নাই—পাড়ার ও স্কুল কলেজের কতকগুলি মেয়ে জুটাইয়া দিনের পর দিন মহল্লা দিয়া পাড়া সরগরম করিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ একদিন রামানুজনের ছোট ভাই রামাশেষণ আসিয়া বলিল—মহল্লার হল্লা বন্ধ করিতে হইবে ; কারণ রামানুজন-জায়ার মাথার অসুখ সুরু হইয়াছে। কর্ণেল মাথাইকে 'কল' দেওয়া হইয়াছিল। তিনি নাকি বলিয়াছেন যে রামানুজন-পত্নীর মাথার অসুখের জন্য এখান থেকে চৌমাথা পর্য্যন্ত সকল বাড়ীর বাসিন্দাদের নিরানন্দে থাকিতে হইবে। এর সোজা মানেটা এই যে, আমোদের নাম করিয়া যে সোরগোল করা হয় সেটা যে প্রচণ্ড গণ্ডগোল, কর্ণেল মাথাই তা একদিন শুনিয়াই বুঝিয়াছেন।

সুমিতা কথাটা শুনিয়া বলিল—রামাশেষণকে বল যে আমাদের রিহের্শাল বন্ধ করবার চেষ্টা না করে সে তার বেহালা বাজানো আগে বন্ধ করুক।

তাই তো, ওদের বাড়ীর বেহালার কথা তো মনে ছিল না। তবু সুমিতাকে বলিলাম—রামাশেষণের বেহালাতে এমন আর কি গোলমাল হয় ?

পিছন থেকে নীলা বলিল—বিশেষ কিছু না, তবে সুস্থ মানুষের মাথায় গোলমাল হয়।

পিসীমা বলিলেন—বেয়ালা ত বাপু অনেক শুনেছি, কিন্তু উৎকট সুরে পেত্নীর কান্নার মত বেয়ালা বাজানো বাপের জন্মে শুনি নি। আর রাতে যখন আমি শুতে যাই ঠিক তখনই ছোঁড়াটার বেয়ালার বাতিক চাগে।

সুখেন্দু মন্তব্য করিল যে, রামাশেষণের বেহালাই তার বৌদির মাথার অসুখের একমাত্র কারণ।

আমি বলিলাম যে রামাশেষণ যখন বেহালা বাজায় তার বৌদি তখন নিশ্চয় ঘুমাইতে থাকেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে মানুষ বেহালা শুনিতে পায় না। কিন্তু আমাদের বাড়ীর রিহের্শাল বসে বিকালে ; মাথাব্যথার পক্ষে বিকালটা নেহাত অকাল নয়। আর মাথার রোগের কারণ অনুসন্ধান করিবেন কর্ণেল মাথাই নিজে। আপাতত দু'চার দিন রিহের্শাল বন্ধ রাখিয়া ভদ্রতা রক্ষা করিলে এমন কিছু আসিয়া যাইবে না ; বরং অভিনয়ের দেরীর জন্য কারও কোন অসুবিধা হইলে রামানুজনের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে মোটা চাঁদা আদায় করা যাইবে।

পরের দিন হর্ষবাহিকা সমিতি আমার প্রস্তাব শুনিয়া বিমর্ষ হইলেও বর্ষামঙ্গলের খাতা সাতদিন স্পর্শ করিল না।

ক'দিন পরে দেখিলাম প্রৌঢ় রামানুজন অষ্টাদশী পত্নী ললিতা দেবীকে লইয়া লেকের দিকে বেড়াইতে যাইতেছেন। সুতরাং আমাদের বাড়ীর রিহের্শাল আবার সুরু হইল।

পাঁচ দিন পরে সকালের দিকে রামাশেষণ আবার আসিয়া জানাইল যে, তার বৌদির কর্ণপ্রদাহের জন্য কর্ণেল সাহেবকে আবার ডাকা হইয়াছে।

সুমিতা সেখানে বসিয়াছিল ; বলিল—তা হলে ত আমাদের গানবাজনা তোমার বৌদির কানেই ঢুকবে না।

রামাশেষণ বাংলা বলিতে পারে ; মাথা নাড়িয়া বলিল—না সুমিতদি, ডাক্তার সাহেব বলেছেন যে বৌদির কান দুটোকে একটানা আট দিন রেষ্ট দিতে হবে। কাজেই আপনাদের গান-বাজনা—

সুমিতা বাধা দিয়া বলিল—তোমার বৌদিকে বলো, কানে দেড় সের তুলো গুঁজে অন্ধকার ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকতে, তা হলেই তাঁর কান মাথা সবই রেষ্ট পাবে।

রামাশেষণ সবিনয়ে জানাইল যে, ডাক্তার সাহেবের প্রেসক্রিপশানে দেড় সের তুলা ও অন্ধকার ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকার কথা লেখা নাই।

সুমিতা বলিল—নেই ত নেই, আমরা রিহের্শাল বন্ধ করব না।

রামাশেষণ নেহাত বালক নয় ; একজন নারীর কাছে হার মানাটা রামাশেষণের মানে বাধিল, তবু প্রতিপক্ষ নেহাত নারী-জাতীয়া জীব বলিয়াই হাত জোড় করিয়া বলিল—মাত্র আট দিনের জন্যে, সুমিতদি ; এর মধ্যে বৌদির কান ভাল হবে আশা করা যায়।

সুমিতা কোন উত্তর না দিয়া—দুম দুম করিয়া পা ফেলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

আট দিন বন্ধ থাকিবার পর রিহের্সাল আবার সুরু হইল। তিন দিন পুরাদমে রিহের্সাল চলিবার পর চতুর্থ দিনে প্রৌঢ় রামানুজন নিজে আসিলেন, সঙ্গে তরুণী ভার্য্যা ললিতা দেবী ও ছোট ভাই রামাশেষণ। নীলা সুমিতারা ছুটিয়া আসিল ললিতা দেবীকে অভ্যর্থনা করিতে।

দোভাষীরূপে রামাশেষণ জানাইল যে তাদের বাড়ীতে একটা মহোৎসব লাগিতেছে দক্ষিণ-ভারতের কোন এক মহর্ষির জন্মতিথি উপলক্ষে; সেজন্য দশ দিন ধরিয়া অহোরাত্র কীর্তন নৃত্যগীতানুষ্ঠান চলিবে। মহিলাদের বসিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে এবং প্রতিবেশী হিসেবে সুমিতদি, নীলা বৌদি ও সুখেন্দুদা অবসর কালে যদি কিছু সহযোগিতা করেন তাহা হইলে রামানুজন-পরিবার কৃতার্থ হইবে।

নীলা সুমিতারা কিছু বলিবার পূর্বে আমি সকলের পক্ষে বলিয়া বসিলাম—বেশ বেশ, তোমাদের বাড়ীর কাজও যা আমাদের বাড়ীর কাজও তাই; সকলেই যাবে, যা দরকার করবে ইত্যাদি।

মাদ্রাজী প্রতিবেশীরা বিদায় লইলে পিসীমা ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—আমাকে বাপু অন্য কোথাও নিয়ে চল। ওদের একটা বেহালাতেই আমার ঘুম চড়ে যায়, আর বাইশটা বেহালা বত্রিশটা খোল চারশো বিরাশীটা মাদ্রাজী গলার সঙ্গে দশ দিন ধরে যদি ক্রমাগত বাজতে থাকে প্রাণ তা হলে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে, বাবা।

নীলা বলিল—আমি ঠাকুরপোর সঙ্গে মেজদার বাড়ীতে চলে যাই।

সুখেন্দু বলিল—মাপ করতে হবে বৌদি, বলাইদা কবে থেকে আমাকে দেওঘরে যাবার জন্যে বলছে। এমন সুযোগটা আর ছাড়ছি নে।

সুমিতার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তুই কোথায় যাবি?

সুমিতা বলিল—যমের বাড়ী।

বলিলাম—আমাকেও তোর সঙ্গে নিয়ে চল।

পিসীমা বলিলেন—ষাট।

নীলা বলিল—কি যা তা বল।

সুখেন্দু বলিল—তোমরা সবাই মিলে দাদার মাথাটা খারাপ করে দেবে দেখছি।

বলিলাম—দাদার মাথা খারাপ হলে তুই তো দেখতে আসবি নে, তুই থাকবি দেওঘরে।

সুখেন্দু বলিল—বা রে, তোমাকে ফেলে যাব না কি? ওরা যেখানে খুশি যাকগে, তুমি আর আমি থাকব।

পিসীমা বলিলেন—তার মানে, দুই ভাইয়ে মিলে বাড়ীতে মেলেচ্ছপনার একশেষ করবে।

নীলা বলিল—ফিরে এসে দেখবো দেরাজের জিনিষ চেয়ারের ওপর আর আলমারির জিনিষ খাটের নীচে জড়ো হয়েছে।

সুমিতার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আর তুই এসে কি দেখবি?

'কলা' বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সুমিতা পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় আপিস থেকে ফিরিয়া দেখিলাম সুখেন্দু সুমিতা নীলা, মায় পিসীমা পর্য্যন্ত কেহই বাড়ীতে নাই। তবে কি এরা আমাকে ফেলিয়া যে যার পথ দেখিয়াছে?

চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—বৌদি কোন চিঠি রেখে গেছে?

সে বলিল—না।

দিদিমণি কিছু বলে গেছে?

না।

ছোটবাবু কোন খবর রেখে গেছে?

না।

পিসীমাকে কে নিয়ে গেছে।

পিসীমা বৌদি দিদিমণি ছোটদাদাবাবু সব একসঙ্গে গেছেন।

কোথায়?

মাড্রাজীদের বাড়ী।

যাক, এদের সুবুদ্ধি হইয়াছে বলিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

সুখেন্দু সুমিতা নীলা—প্রতিবেশীর বাড়ীর মহোৎসবে মহা উৎসাহে কাজকর্ম করিয়া সামাজিক ধর্ম রক্ষা করিয়াছে। পিসীমাও নাওয়া-খাওয়া ভুলিয়া দশ দিন ধরিয়া বাইশটা বেহালা বত্রিশটা খোল সহযোগে চারশো বিরাশী জন মাদ্রাজী গায়কের কীর্তন শুনিয়াছেন; প্রাণ তাঁর ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে নাই।

পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি যে এখনও বেঁচে আছ?

তিনি বলিলেন—রামানুজনের বৌ ললিতা কি ছাড়ে, "পিসীমা পিসীমা" করে অস্থির। রামানুজনের মত ভাল-মানুষের পেছনে তোরা কি বলে যে লাগতে যাস, বুঝিনে বাপু।'

আমিও বুঝি না এবং কারা পেছনে লাগে তাও জানি না। তবে পিসীমার কথা শুনিয়া মনে হইল উক্ত ভালমানুষটির পেছনে যারা লাগে, আমিই যেন তাদের দলের চাঁই।

রামানুজনের বাড়ীর উৎসবের দিনগুলা কাটিলে সুখেন্দুকে বলিলাম—শরৎকাল পড়ে গেছে, এখন আর বর্ষামঙ্গল দিয়ে মাথা ঘামিও না।

সুখেন্দু বলিল—ব্যাপা শ্রাবণ প্রতি বছরই আশ্বিনের আঙিনায় ছুটে আসে ; সুতরাং বেমানান কিছু হবে না।

আপিস হইতে ফিরিয়া দেখিলাম, রামানুজনের দোতলার ঘরের লাগোয়া আমাদের বড় ঘরের মধ্যে এস্রাজ সেতার ম্যাণ্ডোলিন বেহালা তবলা ঘুঙুর, ইত্যাদি সযত্নে রক্ষিত আর সতের জন মেয়ে ও আট-দশ জন ছেলেতে মিলিয়া আসর গুলজার করিয়াছে।

পুরা বার দিন ধরিয়া রিহের্শাল চলিবার পর সুখেন্দু ঘোষণা করিল, মহালয়ার দিন বর্ষামঙ্গল অভিনয়ে কোন বাধা থাকিবে না।

আরও কয়েক দিন রিহের্শাল চলিল। শেষে এক দিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম ঘরগুলা সব অন্ধকার। ফিউজ হইয়াছে না কি ?—না তো—আমার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। অথচ বাড়ীর লোকজন সব কোথায় ?

লোকজন সব বাড়ীতেই আছে, তবে ছাদে। ছাদে যাইতেই শুনিলাম সুখেন্দু বলিতেছে—ভারি শয়তান !

জিজ্ঞাসা করিলাম—কে ?

নীলা ধরা গলায় বলিল—রামানুজন।

জিজ্ঞাসা করিলাম—তিনি আবার কি করলেন ?

পিসীমা বলিলেন—যা করবার তাই করেছে।

সুমিতা বলিল—ভয়ানক শত্রুতা করেছে।

সুখেন্দু ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল—যে হলটা আমরা সস্তায় পাব বলে ঠিক করা হয়েছিল, এমন কি পাকা কথাও পেয়েছিলাম, আজ শুনলাম, কোথাকার একটা ক্লাব মোটা টাকা আগাম দিয়ে সেই হলটা মহালয়ার দিনের জন্যে ভাড়া করে ফেলেছে ; আর সেই ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট হচ্ছেন রামানুজন। বুঝলে এখন ব্যাপারটা ?

বলিলাম—উনিই যে এসব করছেন তা কি করে জানলে ?

পিসীমা বলিলেন—তাও আবার বিশেষ করে জানতে হয় না কি ?

বলিলাম—বেশ ত, তোমরা আর একটা হল ভাড়া নাও।

সুখেন্দু বলিল—সস্তায় পাব না, তা ছাড়া বৌদিরা রাজী নয়।

কেন ?

সুমিতা বলিল—ঐ হলই আমরা নেব।

নীলা বলিল—দু'দিন আগে আর পরে বই ত নয়।

শেষে স্থির হইল যে পূজার হিড়িক কাটিলে ভাল একটা দিনে বর্ষামঙ্গল অভিনয় হইবে।

মহালয়ার পর আর একটা খারাপ সংবাদ আসিল। অভিনয় ব্যাপারে যে সব ছেলেমেয়ের উৎকট উৎসাহ ছিল তাদের মধ্যে অনেকে ছুটিতে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে। নীলা সুমিতার মাথায় হাত দিয়া বসিল। পিসীমা বলিলেন—কপাল !

সুখেন্দু বলিল—কপাল না হাতী ! আজ থেকে বাড়িতে ধ্রুপদ খেয়ালের বান ডাকিয়ে দেব। কি রে সুমি,

যখন জমবে ধুলা রিহের্শালের ঘরগুলায়,
পড়বে ছাতা যন্ত্রপাতির ছন্দগুলায়,
একলা তখন নাই বা বসে থাকবে ;
তানপুরাটা আনতে বলে
খেয়াল গেয়ে হাকবে।'

হর্ষবাহিকা সমিতির বর্ষামঙ্গল আপাতত ধামাচাপা পড়িল। পিসীমা আবার নিরামিষ ঘরে নির্জ্জনে বসিয়া ভজন সুরু করিলেন। খেয়াল গাহিতে গাহিতে নীলা অনেক সুরের হেঁয়ালি দেখাইল। সুমিতার কণ্ঠ থেকে নায়েগ্রা প্রপাতের মত প্রচণ্ড বেগে ধ্রুপদ নামিতে লাগিল চৌতাল ধামারের উত্তাল তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে ; সে তরঙ্গে সঙ্গত দিবার জন্য আহারনিদ্রা ভুলিয়া সুখেন্দু পরমানন্দে তবলার উপর পাখোয়াজের আওয়াজ শোনাইতে লাগিল :

কৎ ধুন্ দি কেটে তাক্ গদি ঘেনে,
ঢোল আর তবলার বোল সব রাখি জেনে।

কিন্তু ভাগ্যে যা মাপা আছে বারে বারে ফসকাইয়াও শেষ পর্য্যন্ত একদিন তা মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িবেই। যে সব ছেলেমেয়ে ছুটিতে বাহিরে গিয়াছিল কার্ত্তিকের শেষে তারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল—বেশ লোক তোমরা একেবারে গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছো ? ও সব শুনবো না, অভিনয় আমরা করবোই।

নীলা সুমিতার টনক নড়িল, তানপুরা রাখিয়া অন্য যন্ত্রপাতিতে তার চড়াইতে সুরু করিল। বর্ষামঙ্গলের খাতা আবার খোলা হইল। হর্ষবাহিকা সমিতির সভ্যরা সমবেত হইয়া নূতন উদ্যমে রিহের্শাল সুরু করিল। তবে অনেক টালবাহানার জন্য পার্টগুলা সব ঢিলা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সবই আবার ঢালিয়া সাজিতে হইল। শেষে স্থির হইল যে পুরা সাত সপ্তাহ ধরিয়া রিহের্শাল দিয়া বড় দিনের বন্ধে বর্ষামঙ্গল অভিনয় করা হইবে।

আমি সেই পুরানো কথাটার ধূয়া তুলিয়া বলিলাম—বর্ষামঙ্গলে তোমাদের অরুচি না হতে পারে, কিন্তু দর্শকদের রুচি বলে একটা পদার্থ আছে। পৌষ মাসে বর্ষামঙ্গল মানে কাঁসার বাটিতে অম্বল খাওয়ার সামিল।

সুখেন্দু বলিল—তুমি কিছু বোঝ না দাদা। আমাদের দৃশ্যপটের বালাই নেই বলে আবহাওয়ার সবটাই কল্পনা করে নিতে হবে ; আর কল্পনার লাগামটা একটু আলগা করলেই দেখবে···পৌষে ঘন বরষা ঝর ঝরিয়ে ঝরে পড়ছে।"

রিহের্শাল যখন আবার জমিয়া উঠিয়াছে এমন সময় এক

দিন রামানুজনের বাড়ী থেকে বিকট একটা আওয়াজ উঠিল। মেয়েরা গান বাজনা বন্ধ করিয়া কান পাতিয়া শুনিল, গলা ছাড়িয়া কতকগুলা পেঁচা ডাকিতেছে। শব্দটা যখন খাদে নামিল তখন বুঝিলাম পূজার সময় ঢোল কাঁসির সঙ্গে যে সানাই বাজে কতকটা সেই রকম প্যাঁকপেঁকে' আওয়াজ, আর সুরটা যখন চড়িয়া যায়, মনে হয়, সাতটা পেঁচা এক সঙ্গে ডাকিতেছে।

পরের দিন রামানুজনের সঙ্গে পথে দেখা হইলে তার এই নূতন সুরসাধনার জন্য তারিফ করিলাম। সে জানাইল, প্রশংসাটা যার প্রাপ্য…সে রামানুজনের শ্যালক, অর্থাৎ ললিতা দেবীর ভাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—সানাইটা আকারে কত বড় ?

বেশী নয়, সোয়া দু'হাত।

অর্থাৎ প্রায় রামশিঙ্গার সমান। নীলার ভাই, আমার শ্যালক—খেলার মাঠে ফু ফু করিয়া ছোট একটা বাঁশী বাজায়, আর রামানুজনের শ্যালক রামশিঙ্গার মত প্রকাণ্ড একটা সানাই বাজাইয়া পাড়ার লোকজন তাড়াইতে পারে। এমন গুণী শ্যালকের ভগ্নীপতি রামানুজন ঈর্ষ্যার পাত্র বটে।

সানাইয়ের জবাব দিবার জন্য সুখেন্দু এক জোড়া কর্ণেট ও একটা স্যাক্সফোন জোগাড় করিয়াছে। রাত্রে বড় ঘরে গিয়া দেখিলাম রিহের্শালের মেয়েরা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, তবে সুখেন্দু স্যাক্সফোনে ফুঁ দিতেছে আর নীলা ও সুমিতা গাল ফুলাইয়া দুইটা কর্ণেট বাজাইতেছে।

পিসীমা বলিলেন—বেশ করছে।

পরের দিন রামাশেষণ বলিল—বড়দা, আজকের রাতের আওয়াজটা শুনে বলবেন…হ্যাঁ।

নূতন একটা বাজনা শুনিব জানিয়া সারাদিন আগ্রহে কাটাইলাম। কিন্তু রাতে যে আওয়াজটা শুনিলাম তাতে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম। কালীপূজার পর জগদ্ধাত্রী পূজা শেষ হইয়াছে সবে ; সুতরাং কতকগুলি খালি টিনের মধ্যে কয়েক শত পটকার ফালিতে আগুন দিলে শব্দটা অবশ্য উৎকট হয়, তবে নূতনত্ব তাতে কিছুই নাই। ইচ্ছা হইল রামাশেষণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তোমাদের রসিকতার রস মরিয়া গিয়াছে নাকি ?

কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম কালীবোমের দমে ভারী আওয়াজ ও সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং রামানুজনের চড়া গলার চীৎকার। শেষে আসল ব্যাপারটা শুনিয়া গালে হাত দিয়া বসিলাম।

রামানুজনের বাড়ীতে আধঘণ্টা ধরিয়া টিনের মধ্যে পটকা ফাটার পর সুখেন্দু কতকগুলি কালীবোম জোগাড় করিয়া দুমদাম ছাড়িতে লাগিল। একটা বোমের সলিতায় আগুন দেওয়া হইলে বোমটা ব্যাঙের মত হঠাৎ তড়াক করিয়া লাফ দিয়া রামানুজনের বারান্দায় পড়িয়া দুম করিয়া ফাটিল, রামানুজনও রাগে ফাটিয়া পড়িলেন।

রামানুজন সহজে রাগিয়া উঠেন না, তবে একবার রাগিলে সহজে থামিতে চান না।

কি করা যায় ভাবিতেছি, এমন সময় রামানুজন সোজা আমাদের বাড়ীতে চলিয়া আসিয়া মুখে যা আসিল বলিতে লাগিলেন।

সুখেন্দু বিশুদ্ধ ইংরেজী করিয়া বলিল—মশায়, কাজটা যখন ইচ্ছে করে করা হয় নি তখন অত মেজাজ দেখাবার কি আছে ?

রামানুজন রাধাবাজার ও চীনাবাজারের ইংরেজীই শুধু বোঝেন, তাই সুখেন্দুর কেতাবি ইংরেজীতে কোন ফল হইল না। ব্যাপারটা পাছে বেশী দূর গড়ায় সেজন্য সুখেন্দুকে বাড়ীর ভিতরে পাঠাইলাম।

আজ সন্ধ্যা থেকে অনেক পটকা-বোমার আওয়াজ শুনিয়াছি, কিন্তু রামানুজনের বচন-বোমাগুলি সব আওয়াজকেই ছাড়াইয়া গেল।

রামাশেষণের মুখে ভাঙা মাদ্রাজী বুঝিতে পারি, ললিতা দেবীর আধা হিন্দি আধা বাংলাও বুঝি ; কিন্তু রামানুজনের কথার এক বর্ণও বুঝি না। না বোঝার অপরাধটা একা আমার নয়, পাড়ার অনেকেই বোঝেন না। তবে নীলা সুমিতারা নাকি বুঝিতে পারে।

রামানুজনের ক্রোধ রোধ করিবার কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইলাম না। ঝাড়া কুড়ি মিনিট ধরিয়া হাতমুখ নাড়িয়া চড়া গলায় বকিয়া বকিয়া গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেলে রামানুজন আমাদের হাটকরা দরজার একটা পাটের উপর ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন। নূতন একটা পোজ দেখাইবেন ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, বিশেষ আর কিছু না বলিয়া মুখ গোঁজ করিয়া তিনি সোজা নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

রামানুজন বিদায় লইলে মাথা ধরিয়াছে বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

সকালে উঠিয়া খাবার ঘরে গিয়া যা দেখিলাম তা আগেই বলিয়াছি।

যাই হোক, নীলা সুমিতা বলিয়াছে যে রামানুজন রাগই করুন বা তাঁদের বাড়ীর লোকজন যত বাগড়াই দিক বর্ষামঙ্গল অভিনয় করিতেই হইবে—এবং এ বিষয়ে আমি তাদের সাহায্য করিবার জন্য 'তথাস্তু' বলিতে বাধ্য হইয়াছি ; তবু এত রেষারেষির পর কার্য্যতঃ ব্যাপারটা কত দূর গড়াইবে তা ধারণা করিতে পারিলাম না।

রিহের্শালের মেয়েদের খবর দিবার জন্য সুখেন্দুকে পাঠাইবার আগে একটা মতলব মাথায় আসিল। চুপি চুপি চাকরের হাত দিয়া এক টুকরা কাগজে রামাশেষণকে লিখিয়া

পাঠাইলাম,তুমি আমাকে বড়দা বলিয়া খাতির কর। আমি বিপদে পড়িয়াছি, একবার আসিবে কি?

রামাশেখর তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া প্রথমেই বলিল—দাদার হয়ে আমিই মাপ চাইছি বড়দা।

আমি বলিলাম—তোমার দাদার কথা ভুলে গেছি; এখন তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করবো তার জবাব দেবে।

বলুন।

আমাদের বাড়ীর মেয়েরা যে অভিনয় করবার জন্তে আয়োজন করেছে তোমরা তাতে এত বাগড়া দিচ্ছ কেন?

উহুঁ, আমরা তো উৎসাহই দিয়েছি।

রামশিঙ্গা বাজিয়ে আর পটকা ফাটিয়ে?

রামাশেখর বলিল—এ সব তো হালের ব্যাপার। সুখেন্দুদাকে জিজ্ঞেস করবেন, আগে উৎসাহ দিয়েছি কিনা। গোলমালটা হ'ল শুধু সুমিতদির জন্তে—

অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—সুমিতার জন্তে?

বৌদি বলেছিলেন বর্ষামঙ্গলের গানের সঙ্গে বেহালা বাজাবেন—

তোমার বৌদি, ললিতা দেবী বেহালা বাজাবেন?

হাঁ বড়দা।

বেহালা তো তুমিই বাজাও—

আমি বৌদির কাছে শিখি। বৌদি বেহালা বাজিয়ে অনেক মেডেল পেয়েছেন।

খবরটা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলাম; বলিলাম—বটে! তারপর?

সুমিতদি রাজী হলেন না, আর বৌদিও চটে রইলেন। তারপর যা হ'ল সবই জানেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এত সব কাণ্ড না করে আমাকে আগে জানালে না কেন?

বৌদি বলতে বারণ করেছিলেন।

রামাশেখরকে বলিলাম—আজ বিকেলে তোমাদের বাড়ী যাব। তোমার বৌদিকে বলো কফি তৈরি করে না রাখলে ঝগড়া করব; বুঝলে?

রামাশেখর বিদায় লইলে সুমিতাকে বলিলাম—তুই তো যত নষ্টের গোড়া।

সুমিতা যেন আকাশ থেকে পড়িয়া বলিল—আমি?

বলিলাম—রামানুজন-জায়াকে বেহালা বাজানোর পার্ট দিস নি কেন?

নীলা বলিল—ওমা, সেই কথাটা এখনও মনে করে রেখেছে না কি?

বিষয়টা চট করিয়া বুঝিয়া লইয়া পিসীমা বলিলেন—মনেই যদি না রাখবে তা হলে মহোৎসবে তোমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে বেহালা বাজাবে কেন?—কিন্তু মেয়েটা কি মিটমিটে শয়তান দেখেছ? তাই ভাবি, ললিতা-বউ আজকাল আমাদের বাড়ীতে আসে না কেন?

সুমিতাদের হর্ষবাহিকা সমিতির জন্ত সব চেয়ে মোটা চাঁদা যিনি দেন সেই প্রেসিডেণ্ট মহোদয়ার স্বামী বলিয়া যে সম্মানটা পাইয়া থাকি তার কতখানি ঝুটা আর কতখানি আসল তা পরীক্ষা করিবার জন্ত দুপুরে রিহের্শালের মেয়েদের লইয়া মিটিং করিয়া প্রস্তাব করিলাম—ললিতাদেবী বেহালা বাজাইয়া বর্ষামঙ্গল মধুরেণ সমাপয়েৎ করিলে সব দিক রক্ষা পাইবে।

মেয়েরা প্রথমে আপত্তি তুলিয়া বলিল—বেনো জল ঢুকিলে বর্ষামঙ্গল ঘোলা হইয়া যাইবে; সুতরাং—

আপত্তিটা খণ্ডন করিবার জন্ত উত্তরে বলিলাম—বর্ষার জল চিরদিনই ঘোলা, মাঙ্গলিকী গাহিয়া যদি কর্সা করিতে না পার, তবে—

কথাটা মেয়েদের প্রাণে লাগিল। ললিতাদেবীর বেহালা সমিতির কাজে বহাল হইল।

বিকালে ললিতাদেবী আমাকে উৎকৃষ্ট কফি খাওয়াইলেন। রামানুজন তস্ত জায়ার মুখ দিয়া জানাইয়া দিলেন যে অভিনয়ের খরচের সব ভার তিনি নিজের কাঁধে লইয়া কৃতার্থ হইবেন।

অবশেষে সুখেন্দুর নির্বাচিত হলেই বড়দিনের বঙ্গে বর্ষামঙ্গল অভিনীত হইল। রামানুজন প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া দৃশ্যপট এবং সাজসরঞ্জামের সাহায্যে ষ্টেজের উপর যে বৃষ্টিটা দেখাইলেন, পুনার আবহাওয়া আপিসে খোঁজ লইলে জানা যাইবে, চেরাপুঞ্জীতেও তত বৃষ্টি কখনও হয় নাই। বিরামের সময় পাখীর পালক মাথায় গুঁজিয়া রামানুজন-শ্যালক সোয়া দু'হাত লম্বা সানাই মুখে করিয়া যখন নাচিতে লাগিল, দর্শকরা তখন হাঁচি কাশি সবই ভুলিয়া গেল।

অভিনয়-শেষে রামাশেখর সংস্কৃত করিয়া বলিল—নমস্তে।

রামদাস সেন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪৫—১৮৮৭

জন্ম ; বিদ্যাশিক্ষা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রজবল্লভ সেন নামে জনৈক বঙ্গজ কায়স্থ পূর্ব্ববঙ্গের ইদিলপুর হইতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে আসিয়া সস্ত্রীক বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র কৃষ্ণকান্ত সেন নিমকির দেওয়ান হইয়াছিলেন ; কলিকাতা দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার সুবৃহৎ বাস-ভবনটি আজিও "দেওয়ান-বাড়ী" নামে পরিচিত। কৃষ্ণকান্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—কৃষ্ণগোবিন্দ। রামদাস এই কৃষ্ণগোবিন্দের পৌত্র ও লাল-মোহনের পুত্র। ১০ ডিসেম্বর ১৮৪৫ (২৬ অগ্রহায়ণ ১২৫২) তারিখে বহরমপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিন বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন।

রামদাস প্রধানতঃ গৃহেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহশিক্ষকগণের মধ্যে ভোলানাথ পালের নাম করা যাইতে পারে। তিনি কিছু দিন বহরমপুর কলেজেও বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। লেখাপড়ায় তাঁহার বিলক্ষণ যত্ন ছিল। বহরমপুরের বাস-ভবনে স্থাপিত তাঁহার পুস্তকালয়টি আজিও তাঁহার বিদ্যানুরাগের পরিচয় দিতেছে। বহরমপুর কলেজের পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' রচনাকালে এই মূল্যবান গ্রন্থ-সংগ্রহটি ব্যবহার করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

> "এ স্থলে আমার প্রিয়তম ছাত্র বহরমপুর নিবাসী পরঃক্ষেমাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেনের নাম পৃথক্ ভাবে উল্লেখ না করা আমার পক্ষে অনুচিত কার্য্য করা হয়। রামদাস ধনিসন্তান ও অল্পবয়স্ক পুরুষ, কিন্তু ধন ও বয়সের অল্পতা একত্র সমবেত হইলে সচরাচর যে সকল দোষের সংঘটন হয়, রামদাসে সে সকলের কিছুমাত্র নাই। রামদাস অতি বিনয়ী, নিরহঙ্কার, প্রিয়ভাষী ও সদনুষ্ঠানরত। বিদ্যানুশীলনই তাঁহার একমাত্র উপজীব্য। ...তিনি নিজ ভবনে একটি উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা যে সকল পুস্তক ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, সে সকল পুস্তকই প্রায় ঐ পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে।"

বিবাহ ঃ ১৮৫৯ সনের ২১এ ফেব্রুয়ারি, ১৫ বৎসর বয়সে, রামদাসের বিবাহ হয়। পাত্রী—দুর্গাতারিণী দাসী, টাকী-নিবাসী জানকীনাথ রায় চৌধুরীর কন্যা। এই বিবাহ প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' (২৪ মার্চ ১৮৫৯) লিখিয়াছিলেন :

> "বহরমপুরনিবাসি ধনরাশি স্বর্গীয় লালমোহন সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বাবু রামদাস সেন মহোদয়ের শুভোদ্বাহ গত ১০ ফাল্গুন [২১ ফেব্রুয়ারি] সোমবার রজনীযোগে অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে,...।"

বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৬৪ সনে, রামদাস বিপত্নীক হন। পত্নী-বিয়োগে তিনি 'বিলাপতরঙ্গ' নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে টাকীর ভারতচন্দ্র রায় চৌধুরীর কন্যা—বিন্ধ্যলতা দাসীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

সাহিত্যানুরাগ ঃ তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতেই মাতৃভাষার প্রতি রামদাসের অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে তিনি কাব্যচর্চা করিতেন ; ক্রমশঃ স্বদেশের অতীত গৌরবের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ; তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। জ্যেষ্ঠতাত রাধামোহনের হস্তলিখিত 'পশুপাশমোক্ষণ'* (প্রশ্নোত্তর ছলে লিখিত) গ্রন্থ দেখিয়া সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তিনি কালীবর বেদান্তবাগীশের নিকট সযত্নে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন রাজকার্য্যে বহরমপুরে অবস্থান করিতেন, সেই সময়ে রামদাস তাঁহার সহিত গভীর সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হন। বহরমপুরে তখন রীতিমত সাহিত্যের আসর—সাহিত্য-চর্চায় যেন বান ডাকিয়াছিল। ১৮৭২ সনের এপ্রিল মাসে বহরমপুর হইতে 'বঙ্গদর্শন' প্রচারিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে রামদাস 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন ; এগুলি সাদরে 'বঙ্গদর্শনে' গৃহীত হইয়াছিল।

গ্রন্থাবলী ঃ রামদাস যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। তত্ত্বসংগীত লহরী অর্থাৎ পরমার্থ বিস্তৃতত্ত্ব বিষয়ক গীতসমূহ।

১ মাঘ ১৭৮০ শক, জানুয়ারি ১৮৫৯।

---

* পুত্র-বিয়োগে রাধামোহন সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনধামে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বৃন্দাবনে তাঁহার বাগান-বাড়ী "বাগিচা বাড়ী" নামে পরিচিত। তাঁহার রচিত 'পশুপাশমোক্ষণের পাণ্ডুলিপি বর্ত্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

"জগন্মান্ত শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় যথোচিত পরিশ্রম স্বীকার ও অপার করুণা বিতরণ করিয়া আত্মোপান্ত সংশোধন করিয়াছেন⋯।"

২। কুসুম মালা (কাব্য)। ১২৬৮ সাল, ইং ১৮৬১।

সূচী: গোলাপ, জুঁই, রজনীগন্ধ, বকুল, চাঁপা, গন্ধরাজ, কমলিনী, সন্ধ্যামণি, ঝুমকালতা, সূর্য্যমুখী, ধুতুরা।

৩। বিলাপতরঙ্গ (কাব্য)। ইং ১৮৬৪।

প্রথমা পত্নীর বিয়োগে রচিত। ১৮৬৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' লেখেন:—"বহরমপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয় স্বপ্রণীত 'বিলাপ তরঙ্গ' নামক একখানি পুস্তক আমাদিগকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। তিনি প্রণয়িনী-বিরহ-বিধুর হইয়া গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন।"

৪। কবিতালহরী। ১২৭৪ সাল (১৭ জুলাই ১৮৬৭)। পৃ. ৫৯+১ শুদ্ধিপত্র।

৫। চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা। ১২৭৪ সাল (৩১ ডিসেম্বর ১৮৬৭)। পৃ. ৬৪

ইহা ১২৭৫ সালে প্রকাশিত ২য় সংস্করণ 'কবিতালহরী'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

৬। ঐতিহাসিক-রহস্য, ১ম ভাগ। ১২৮১ সাল (২৮ এপ্রিল ১৮৭৪)। পৃ. ২২০

সূচী: ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন, মহাকবি কালিদাস, বররুচি, শ্রীহর্ষ, হেমচন্দ্র, হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়, বেদপ্রচার, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্র, পরিশিষ্ট।

ইহার মধ্যে 'ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন' ও 'মহাকবি কালিদাস' স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে যথাক্রমে ১৮৭২ সনের ২১এ সেপ্টেম্বর ও ১৩ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হইয়াছিল।

"ভাগবত-সম্বন্ধীয় সমালোচন 'রহস্য-সন্দর্ভে' ও অপর প্রস্তাবগুলি সমুদয় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার পরম সুহৃদ বঙ্গদর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অনুরোধক্রমে আমি এই প্রস্তাবগুলি বহু পরিশ্রম ও বহ্বায়াস স্বীকারপূর্ব্বক নানাবিধ প্রাচীন সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করি,⋯।"—বিজ্ঞাপন।

৭। ঐতিহাসিক-রহস্য, ২য় ভাগ। ১২৮২ সাল (১৯ ডিসেম্বর ১৮৭৬)। পৃ. ২৩৬

সূচী: বাণভট্ট, জৈন-ধর্ম্ম, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়, সঙ্গীত-শাস্ত্রানুগত নৃত্য ও অভিনয়, সাহসাঙ্ক চরিত, বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন, পালিভাষা ও তৎসমালোচন, বেদ, শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি, বুদ্ধদেবের দন্ত, পরিশিষ্ট।

৮। ঐতিহাসিক-রহস্য, ৩য় ভাগ। ১২৮৫ সাল (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯)। পৃ. ২৩৩

সূচী: জৈনমত সমালোচন, বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত, বেদ-বিভাগ, কুমারপাল, বিদ্যাপতি বিহ্লণ, আর্য্যসম্প্রদায়ের আচারব্যবহার, বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ, স্বরবিজ্ঞান, পাণিনি, রাগ-নির্ণয়।

রামদাস সেন

৯। রত্ন-রহস্য। ১২৯০ সাল (২১ জানুয়ারি ১৮৮৪)। পৃ. ২৮৩+৭২।

"এই গ্রন্থে সমস্ত মহারত্ন, স্বল্পরত্ন, উপরত্ন রত্নালঙ্কার ও স্বর্ণাদি ধাতু সম্বন্ধে স্থূল স্থূল অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে ;⋯ ⋯

"বৃহৎসংহিতা মণিপরীক্ষা, শুক্রনীতি, মানসোল্লাস, অমর-বিবেক, হেমচন্দ্রকোষ, মুক্তাবলী, রাজনির্ঘণ্ট, অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ, ও রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কল্পদ্রুম, এই সকল মহান্ নিবন্ধ হইতে ইহার প্রমাণাবলী সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইহার শেষে মণিপরীক্ষা পুস্তকখানি ক্ষুদ্র টিপ্পনীসহ মুদ্রিত ও সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"সম্প্রতি খ্যাতনামা সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত রাজা সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর (ডাক্তর অপ্ মিউজিক) মহোদয় 'মণিমালা' নামক এক খানি রত্ন-সম্বন্ধীয় বিস্তীর্ণ পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিদেশীয় জনসমাজে প্রচারিত করিয়াছেন। উহা এদেশে অতীব বিরলপ্রচার, সুতরাং তাহা আমি দেখিতে পাই নাই।"

১০। ভারত-রহস্য। ১২৯২ সাল (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫)। পৃ. ৩০১।

"ভারত-রহস্য নাম দিয়া ভারতের পূর্ব্বজ্ঞান, ভারতের পূর্ব্বধর্ম্ম, ভারতের পূর্ব্বাচার, ভারতের পূর্ব্ব ব্যবহার, ভারতের সমর-বিজ্ঞান, ভারতের যুদ্ধাস্ত্র এবং ভারতের পূর্ব্বভক্ষ্য ও পূর্ব্ব-পরিচ্ছদ প্রভৃতি অবশ্য স্মর্ত্তব্য কতিপয় বিষয় সাধারণের গোচর করিলাম। পূর্ব্বে ভারতবাসী ঋষিরা কি প্রকারে যাগ-যজ্ঞ করিতেন; কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতেন, যুদ্ধের উপকরণ বা অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি কিরূপ ছিল? এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর বা প্রকৃতভাব আজকাল জনসাধারণের অবিদিতপ্রায় হইয়া আছে; সুতরাং ঐ সকল তথ্যের অব-বোধক এতৎপুস্তকের 'রহস্য' নাম দেওয়া বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই।"—ভূমিকা।

সূচী: সোমযাগ, আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ, অসি, দেবযান, রাজসূয়যজ্ঞ, অশ্বমেধযজ্ঞ, পুরুষমেধ-যজ্ঞ, রাজ্যাভিষেক-পদ্ধতি, ভারতীয়-যুদ্ধরহস্য, যুদ্ধ-ধর্ম্ম।

১১। বাঙ্গালীর ইউরোপ-দর্শন (ভ্রমণ)।? (২০ জুলাই ১৮৮৬)। পৃ. ২৫২

মৃত্যুর বছর-দুই পূর্ব্বে (এপ্রিল ১৮৮৫?) রামদাস ইউরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণ-কাহিনীর প্রায় সমগ্র অংশ প্রথমে ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ-মাঘ সংখ্যা 'নব্যভারতে' প্রকাশিত হয়। পুস্তকে গ্রন্থকারের বা মুদ্রণ-কালের কোনরূপ উল্লেখ নাই। 'বাঙ্গালীর ইউরোপ-দর্শন' পাঠ করিয়া সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"ভ্রমণবিষয়ক পুস্তক অনেক সময়েই উপন্যাসের অপেক্ষাও মনোহর হয়। কিন্তু ইহা লিপিচাতুর্য্যের উপর নির্ভর করে। সেই লিপিচাতুর্য্য এই গ্রন্থে আছে। চাতুর্য্যের পরিত্যাগই এই চাতুর্য্য। ইউরোপে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় বাঙ্গালির পক্ষে তাহা অদ্ভুত। যেমন দেখিয়াছি, বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া ঠিক তেমনি লিখিলেই উপন্যাসের অপেক্ষা বিস্ময়কর হয়; তাহার ভিতর আপনার গুণপনা প্রকাশ করিতে গেলেই রসভঙ্গ হয়। এই গ্রন্থকার সেই কৌশল বিলক্ষণ জানেন। ইনি দৃষ্ট বস্তুর বর্ণনায় বিশেষ ক্ষমতাশালী; যাহা দেখিয়াছেন, চিত্রকর যেমন তুলিকায় ছবি তুলে, ইনি কথায় সেইরূপ ছবি তুলিয়াছেন; তাহার উপর আপনার সরল, অকৃত্রিম হৃদয়ের ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থ বড় মনোহর হইয়াছে। গ্রন্থে শব্দের অনর্থক আড়ম্বর নাই; কোন প্রকার নিজের বাহাদুরি নাই; কোন পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা নাই; কাহারও প্রতি রাগদ্বেষ নাই; কিছুই বাড়ান হয় নাই; কোন প্রকার রঙ ফলাইবার চেষ্টা নাই। ইহাই উৎকৃষ্ট রচনাচাতুর্য্য। এই জন্য এ গ্রন্থ আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।"

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

১২। বুদ্ধদেব (জীবনী ও ধর্ম্মনীতি)। (১২ আগষ্ট ১৮৯১)। পৃ. ২৮৩

"ইহার কিয়দংশ প্রচারাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৯৪ সালের ভাদ্র মাসে যখন পিতৃদেব [রামদাস] পরলোক-গমন করেন, তখন এই পুস্তকের চারি ফরমা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল।"

রামদাস-গ্রন্থাবলী: ১৩০৯ সাল (৩ জুলাই ১৯০২) হইতে ১৩২২ সালের মধ্যে মণিমোহন সেন পিতার গ্রন্থাবলী তিন ভাগে প্রকাশ করেন। ৩য় ভাগ গ্রন্থাবলীতে সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত অথচ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কতক-গুলি রচনাও সংগৃহীত হইয়াছে; এগুলি—

সংস্কার-রহস্য, যুদ্ধ-ধর্ম্ম, পার্থিব চিন্তা, উৎকলে শ্রীগৌরাঙ্গ (কবিতা), প্রলয় (কবিতা), শ্রীজীবগোস্বামী (কবিতা), ইন্দ্র (কবিতা), Hasyarnava, On Chand's mention of Sri Harsha, Gaudiya Desa of the Ancients, The Firearms of the Hindus, On the Modern Buddhistic Researches.

১২৯৪ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত "মহাকবি রাজশেখর" প্রবন্ধটি এই সংগ্রহে বাদ পড়িয়াছে।

রামদাস স্বীয় অর্থব্যয়ে কয়েকখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ পুনঃ-প্রকাশ করিয়া বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন; সেগুলি

'বাসবদত্তা'...মদনমোহন তর্কালঙ্কার
'অভিধান চিন্তামণি'—সংস্কৃত অভিধান
'অগস্তিমতম্' (রত্নশাস্ত্র)।

মৃত্যু

১৯ আগষ্ট ১৮৮৭ (৩ ভাদ্র ১২৯৪) তারিখে, মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে, রামদাস ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি নদীয়া জেলার হাট-বোয়ালিয়া গ্রামে জমিদারী দেখিতে গিয়াছিলেন; তথায় সন্ন্যাস রোগে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭) লেখেন:—

Dr. Ram Das Sen, the Zamindar and *savant* of Berhampore, is no more! It is simply impossible to express in adequate terms the deep sorrow we have felt at the news of his untimely death. The poignancy of the grief is enhanced by the fact that he died in a strange place—a village named Boalia in Nuddea where he had gone to see his zemindari affairs, and not a single member of his family was with him at the time of his death. He was overtaken by that fell disease, apoplexy, and died in the course of nearly 42 hours. The deceased was only forty-two years old, but he had long before established a literary reputation for himself which is not only Indian but European also. He was in constant correspondence with the *savants* of Europe,

and the Italian and the German Governments conferred on him the title of "Doctor." He has left a library the like of which is perhaps not to be seen in whole Bengal. As an author his works always showed vast erudition and deep researches. His name will be remembered as long as the Bengali language ceases not to exist. In his private life, he was a dutiful son, an affectionate father, a loving husband and a warm friend. As a Zamindar, his treatment with the ryots was the most generous. In short, in Dr. Ram Das Sen Bengal has lost a most worthy son—one who, though belonging to young Bengal, had none of his vices, but had all the sterling merits of the old Hindu, and who was as unostentatious and silent a worker as a true patriot ought to be.

মুর্শিদাবাদের এই উজ্জ্বল রত্নের স্মৃতিরক্ষাকল্পে গুণমুগ্ধ দেশবাসী ইতালীয় ভাস্কর সিনিয়র রণ্ডনীর (Signor Rondoni) সাহায্যে তাঁহার পাষাণ-মূর্তি রচনা করাইয়া, গঙ্গাতীরে বহরমপুর কলেজের উত্তর-পশ্চিম কোণের মাঠে স্থাপনা করিয়াছেন। ১ আগষ্ট ১৮৯৯ তারিখে বঙ্গের ছোট লাট উড্‌বার্ণ প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। প্রতিমূর্তির নিম্নে স্তম্ভ-গাত্রে খোদিত আছে :—

To the Memory
of
Dr. Ramdas Sen.
Born: Dec. 10, 1845. Died: Aug. 19, 1887.
An eminent oriental scholar, a learned antiquarian and a staunch friend of education. This bust is raised by his admiring and grateful friends, the people of the district of Murshidabad. August 1. 1899.

রামদাস ও বাংলা-সাহিত্য : ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীদের মধ্যে পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে খুব অধিক লোক কাজ করেন নাই। মাত্র দুই জন বিশিষ্ট গবেষকের নাম আমাদের সর্ব্বদা স্মরণে আসে—রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রামদাস সেন। ইঁহাদের মধ্যে রামদাসের প্রতি আমাদের অধিকতর কৃতজ্ঞ হইবার কারণ আছে। তিনি তাঁহার সমস্ত গবেষণা মাতৃ-ভাষার মাধ্যমেই প্রচার করিয়া পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল যাহা ইউরোপীয় ভাষায় ও ইউরোপীয় পদ্ধতিতে করিয়াছিলেন, রামদাস মাতৃ-ভাষায় সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে তাহা করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি খুব দীর্ঘ দিন মাতৃভাষার সেবা করিবার অবকাশ পান নাই, কিন্তু তাঁহার স্বল্প-পরিসর জীবনে ঐতিহাসিক, ভারতীয় ও বহু রহস্য উদ্ঘাটন করিতে গিয়া তিনি আমাদিগকে যে সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। এই কারণেই 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' (ইং ১৮৮৪) লিখিয়াছিলেন :—

"An as earnest and indefatigable student of Indian antiquities, he has no equal in this country, with the single exception of Dr. Rajendra Lala Mitra. But he is, in one respect, a greater benefactor to his country than even Dr. Mitra. Dr. Mitra's antiquarian writings are a sealed book to those who know not English ; Dr. Ram Das Sen's antiquarian writings are open to those who know only Bengali, as well as those who know English."

বাংলা-সাহিত্যের প্রতি রামদাসের অসাধারণ প্রীতি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর হইতে যখন 'বঙ্গদর্শন' বাহির করেন, তখন রামদাস তাঁহাকে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের প্রসারকল্পে তাঁহার বদান্যতাও স্মরণযোগ্য। তাঁহার নিজস্ব চেষ্টায় পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে যে-সকল মৌলিক গবেষণা আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সেগুলি আধুনিক সাহিত্য-সাধকদের আদর্শস্বরূপও চিরদিন কীর্ত্তিত হইবে।

রামদাসের পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণা পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। ইটালীর ফ্লোরেন্টিনো একাডেমী তাঁহাকে "ডক্টর" উপাধি ভূষিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সংস্কৃত-বিদ্যানুরাগী ইউরোপীয় পণ্ডিত-গণের সহিত রামদাসের পত্র-ব্যবহার ছিল। একবার মনীষী ম্যাক্সমূলার একখানি পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন :—

"Take all what is good from Europe only, do not try to become Europeans, but remain what you are, sons of Manu, children of a bountiful soil, seekers after truth, worshippers of the same unknown God, Whom all men ignorantly worship, and Whom all very truly and wisely serve by doing what is just and good."

রামদাসের জীবনের আদর্শও ইহাই ছিল। ধনীর সন্তান হইয়াও তিনি পাশ্চাত্য ভাব-প্রবাহে অন্য অনেকের মত ভাসিয়া যান নাই, ভারতীয় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সে যুগের পক্ষে ইহা যে কত বড় শক্তির পরিচয়, আজ আমরা তাহা অনুমানও করিতে পারি না।

দেশসেবায় মূক-বধির কারিগর

শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার

বাস্তব জগতে শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত ব্যাপক। আমাদের সুখসুবিধার জন্য যে নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করি সেকথা ভাবিয়া দেখিলেই উপরোক্ত মন্তব্যটির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। ইহার পশ্চাতে

কামারের কাজ করিতেছে

যে সকল শিল্পীর পরিশ্রম ও বুদ্ধির খেলা চলিতেছে তাহারা সত্যই ধন্যবাদার্হ।

এই শিল্পী কর্ম্মীদের মধ্যে এমন এক দল আছেন যাঁহাদের শিল্পনৈপুণ্য ও কার্য্যকুশলতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় ও তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা সহজেই অপসারিত

দপ্তরীর কাজে রত একটি মূক-বধির বালক

হইয়া যায়। ইঁহারা হইলেন সমাজের নগণ্য মূক-বধির শিল্পী-গণ। এত দিন আমরা ইঁহাদিগকে কালা বা বোবা বলিয়া ঘৃণা ও উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। উপরন্তু বলিয়াছি, ইঁহারা সমাজের বোঝাস্বরূপ। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা আর সেরূপ নাই। ইঁহাদের সম্বন্ধে এখন তেমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করাও উচিত নয়। শিক্ষাগুণে ইঁহারা শিল্পকলায় অপূর্ব্ব দক্ষতা লাভ করে, উপরন্তু কথাও বলিতে শিখে। আজকাল যে সমস্ত মূক-বধির শিল্পী শিল্পকলার সাহায্যে নিজেদের অন্নসংস্থান করিয়া দেশের ও দশের সেবা করিয়া যাইতেছেন তাঁহারা সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়

মাটির পুতুল গড়া

এই যে, এই সকল মূক-বধির নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে যোগ দিতে এবং সমাজেও বিশিষ্ট আসন অধিকার করিতে পারেন। শিক্ষাগুণে সমাজের এই বিকল অংশ অমূল্য সম্পদে পরিণত হইতে পারে।

বিগত মহাসমরে জগতের বিভিন্ন স্থানে স্ব-স্ব দেশের কল্যাণ-কর্ম্মে মূক-বধির শিল্পীদের দানও উল্লেখযোগ্য। মূক-বধিররাও যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিল। তাহারা অন্যান্য বহু কর্ম্মীর মত দেশের সেবা করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহারা সম্মুখসমরে প্রাণ দেন তাঁহাদের আত্মোৎসর্গ যেমন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়, তেমনই যাঁহারা

যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ করেন তাঁহারাও সমানভাবে প্রশংসার্হ। এই মূক-বধিরগণ নীরবে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে

কাঠের কাজ করিতেছে

বিগত মহাসমরের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুতির কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা নিজেদের শিল্পনৈপুণ্য-গুণে বড় বড় কল-কারখানায় কার্য্যকুশলতা দেখাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মূক-বধিরদের নির্ম্মিত কুটীর-শিল্প যুদ্ধের বহু অভাব মিটাইয়াছে।

অনেকের ধারণা মূক-বধিরগণ বড় বড় কল-কারখানাতে কাজ করিবার অনুপযুক্ত। কারণ সাধারণ বুদ্ধির অভাবে, শ্রবণশক্তির অভাবে যে কোন মুহূর্ত্তে তাহারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে

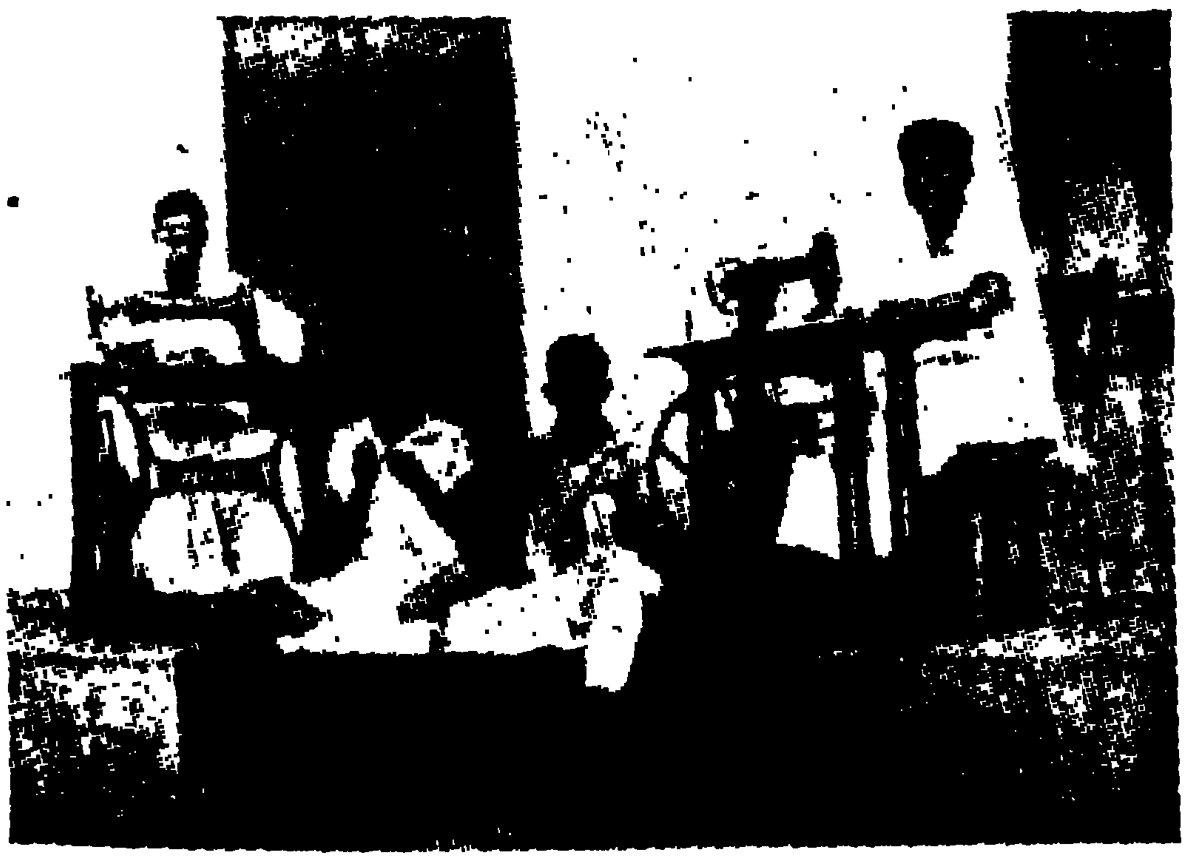

মেসিনে সেলাইয়ের কাজ করিতেছে

পারে। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই অমূলক। পাশ্চাত্য দেশসমূহে বহু বড় বড় কলকারখানায় অসংখ্য মূক-বধিরকে নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিয়োগ করা হইতেছে। আমেরিকার বিখ্যাত "ফোর্ড কোম্পানীতে" বহু মূক-বধির সাধারণ কর্ম্মীর মত কাজ করিয়া যাইতেছে। স্বয়ং হেনরী ফোর্ড স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, মূক-বধির কর্ম্মিগণকে কার্য্যে নিয়োগ করা ষোল আনাই নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য।] তাহাদের দায়িত্ব লইবার জন্য বিশেষ কোন আইন বা

ছুতারের কাজ করিতেছে

ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন নাই। অনেক মিল-মালিক দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। কিন্তু মূক-বধিরগণ কৃপাপ্রার্থী হইতে যাইবে কেন? তাহারা তাহাদের পূর্ণ কর্ম্মক্ষমতার দাবিতে সর্ব্বত্র সমান মর্য্যাদা পাইবে। জন্ম-বধির হইলেই মানুষ মূক অর্থাৎ বোবা হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় বিকল হওয়ায় মূক-বধিরদের দর্শনেন্দ্রিয় ও স্পর্শনেন্দ্রিয় অতীব প্রখর হয়। এই দুই ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন দ্বারাই উহাদিগকে কথা বলা শিখানো হয়। শিল্পকলাদি বিষয়ে ইহারা ছোটবেলা হইতেই দক্ষতা অর্জ্জন করে, কারণ সাধারণ লোক অপেক্ষা ইহাদের অনুকরণ করিবার ক্ষমতা অনেক বেশী। সেইজন্য সাধারণ লোকেরা কখনো কখনো

ছাপাখানায় কাজ করিতেছে

ইহাদের শিল্পনৈপুণ্যের কাছে হার মানিতে বাধ্য হয়। যাহাতে মূক-বধিরগণ সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত না হইতে পারেন, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গবর্ণমেণ্ট তদনুরূপ আইন প্রণয়ন করিয়া রাখিয়াছেন।

কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়ের শিল্প-শিক্ষা বিভাগে কুঁদে এবং তুরপুনে কর্ম্মরত ছাত্রবৃন্দ

আজ আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। কিন্তু সে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক এবং সর্ব্বোপরি সামাজিক স্বাধীনতা আনিতে গেলে আমাদের এই মূক বন্ধুদের কথা ভুলিলে চলিবে না। প্রগতিশীল সমাজ গঠন করিতে হইলে আমরা এতদিন যাহাদিগকে অবহেলা করিয়া আসিতেছি তাহাদিগের প্রাণে আশার সঞ্চার করিতে হইবে, 'মূক মুখে ভাষা' দিতে হইবে। তাহারা যেন বুঝিতে পারে যে তাহারা ঘৃণ্য, অবহেলিত জীবন যাপন করিতে আসে নাই। সম্মুখে তাহাদের করিবার মত বহু কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে।

দপ্তরীর কাজ করিতেছে

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। কয়েক জন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগী নীরব কর্ম্মীর প্রচেষ্টায় আজ ভারতের অগণিত মূক-বধিরের সেবাকল্পে কয়েকটি মাত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। মূক-বধিরদের সংখ্যা-অনুপাতে শিক্ষাকেন্দ্র অতি অল্প। এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ছাত্র মূক-বধির-শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের পরবর্ত্তী জীবনের কথা যদি সকলে ভাবিয়া দেখেন তবে তাঁহাদের জন্য এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সার্থকতা উপলব্ধি

মাটির খেলনা তৈরি করা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে

করিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে মূক বধিরদের মধ্যে অনেকে এমন খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন যাহা সচরাচর বিরল। আমাদের দেশেও বহু মূক-বধিরের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোনও বিষয়ে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। যে-কোন মূক-বধির বিদ্যালয়ে মূক-বধিরদের কার্য্যপ্রণালী ও তাহাদের তৈয়ারি নানা ধরণের কাঠের আসবাবপত্র, চামড়ার দ্রব্য, লোহার নানা প্রকার জিনিষ ও বিভিন্ন রকমের পুতুল দেখিলে সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইবেন। আজকাল কলিকাতায় বহু দোকানে মূক-বধির শিল্পীদের তৈয়ারী নানাপ্রকার জিনিষপত্র

বিক্রয় হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন মূক-বধির-চালিত অনেক দর্জির দোকান আছে। বহু কর্ম্মী ছাপাখানার কাজ এবং দপ্তরীর কাজ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। অনেক মূক-বধির চিত্রাঙ্কন, চারুশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। বড় বড় কলকারখানাতেও তাহাদের অনেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়া থাকে।

এই সব হতভাগ্য মূক-বধিরকে শিক্ষিত, আত্মমর্য্যাদা বোধসম্পন্ন, স্বাবলম্বী হইতে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। তাহারা প্রত্যেকেই যাহাতে শিল্প-শিক্ষা পাইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। শুধু মৌখিক উৎসাহবাণী বর্ষণ করিলে চলিবে না, এই কার্য্যে ধৈর্য্যসহকারে নামিতে হইবে। এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টেরও দায়িত্ব অনেক।

পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর শ্রীরাজাগোপালাচারী কারখানায় ছেলেদের কাজ পরিদর্শন করিতেছেন

পলাতকা

আশরাফ সিদ্দিকী

প্রমমুকুলিত প্রথম ফাগুনে বকুল-ঝরানো দিনে
হে রাজকুমারী, তেপান্তরিকা, আধো হাসি আধো লাজে
লের বাসরে প্রথম প্রেমের দিয়েছিলে মালাখানি
অধীর আবেগে অধর-সুধায় টেনেছিনু বাহুমাঝে।

ক্লান্তিথির চাঁদেরে জড়ায়ে সরসী স্বপন দেখে
কুমুদ-বাসরে মরাল-মরালী বুকে বুকে মিশে রয় ;
মার ভুবনে নামিল বুঝি রে স্বপ্নতেপান্তর
'বউ কথা কও' ডাকছে তখনো মায়াময়, মধুময় !

খে চোখ রাখি সেদিন তোমায় বলেছিনু : 'মমতাজ !
আমি তব কবি—তুমি যে কাব্যশতদল সুবিমল
মি রূপকার—শ্যামলী গো মোর তুমি হবে রূপায়ণ
ধূলির ধরায় নতুন প্রেমের গাঁথবো তাজমহল !'

র মলয়ে কামরাঙা-বন কেঁপে ওঠে থরোথরো
থরোথরো বুক, সেদিন আমায় বলেছিলে : 'প্রিয়তম !
হে চাঁদ, তোমার রূপালী সুধার অমল ঝরণাতলে
আমার পৃথিবী কুসুমে কুসুমে করে দিও অনুপম।'

কাছে থেকে দূর সারাটি দিবস হাজারো কাজের ফাঁকে
চুরি ক'রে তব ভীরু দুটি চোখ আমারে খুঁজিয়া মরে ;
হাসনুহানার মধু রজনীর গানের পাখীরা মোর
জানিনি তো হায় ! সহসা প্রভাতে লুটাবে ব্যাধের শরে !

জানি স্বরগের সোনার টিয়ারে এ মাটির খেলাঘরে
যাবে নাকো বাঁধা সোনার শিকলে ! হাসনুহানার দল
জানি ঝরে যায়—আবার মিলায় অসীম সুরভিলোকে
এ মাটির বুকে সবটুকু তার ঢেলে দিয়ে পরিমল !

এই মধুমাস—এই মধুরাত—জীবন-সাথী গো মোর !
তুমি কাছে নাই—নাই নাই নাই ! নীরব বাসর-রাতি
রুদ্ধ কপাট ! ঘরের প্রদীপও নিভায়ে দিয়েছি তাই
আলোতে কি কাজ ? অন্তরে যার জ্বলিছে প্রেমের বাতি।

ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্

শ্রীভূপেশ দত্ত, সি.-এ.-আই.-বি. (লণ্ডন)

ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল ও ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে এবং ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল ও পাকিস্থানের সঙ্গে যে আলোচনা সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলস্বরূপ পৃথক পৃথক ভাবে আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিখ পর্য্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। এখন উভয় ডোমিনিয়নের পৃথক সত্তার উপর জোর দিয়া ভারতীয় ইউনিয়নের "ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ একাউণ্ট নাম্বার ওয়ান্"-এর অনুরূপ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া পাকিস্থানের জন্য নূতন করিয়া খুলিয়াছে "পাকিস্থান ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ একাউণ্ট নাম্বার ওয়ান্।" পাকিস্থানের একাউণ্ট নাম্বার ওয়ানের ওপেনিং ব্যালান্স হইল এক কোটি পাউণ্ড। তাহা ছাড়া দুই ডোমিনিয়নের সম্পত্তি হিসাবে রহিয়াছে "ফ্রোজেন্ ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ একাউণ্ট নাম্বার টু"। এই একাউণ্ট নাম্বার টু হইতে বর্ত্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নের একাউণ্ট নাম্বার ওয়ানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড, আর পাকিস্থানের একাউণ্ট নাম্বার ওয়ানে করা হইয়াছে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। দুই ডোমিনিয়নের আলাদা আলাদা একাউণ্ট নাম্বার ওয়ান চলতি হিসাবের জন্য ব্যবহৃত হইবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারত ও পাকিস্থানের মোট পাওনা ছিল ১১৬ কোটি পাউণ্ড। তন্মধ্যে ব্রিটেন ১৭ কোটি পাউণ্ড পরিশোধ করিয়া দেওয়ায় উক্ত পাওনার অঙ্ক দাঁড়াইয়াছে ৯৯ কোটি পাউণ্ডে।

ভারতীয় ইউনিয়ন আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিখ পর্য্যন্ত সেণ্ট্রাল রিজার্ভ বা হার্ড কারেন্সীস্ হইতে ১ কোটি পাউণ্ডের বেশী মুদ্রা উঠাইবে না বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। ভারত ইউ. এস্. ডলারের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য মুদ্রা তহবিল হইতে কর্জ্জ গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

৬ মাসের চুক্তি ছাড়া বর্ত্তমানে ব্রিটেনের সঙ্গে অন্য কোনও আলোচনা হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা চলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

যুদ্ধবিরতির পর হইতে দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে ব্রিটেনের সঙ্গে ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ প্রশ্ন লইয়া সামগ্রিক আলোচনা করা হয় নাই। গত আগষ্ট মাসে করা হইয়াছে ৬ মাসের অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা, আর এইবারও করা হইল আর একটা ৬ মাসের চুক্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের ঘোর বিপদের দিনে দরিদ্র ভারত অপরিসীম ক্লেশ স্বীকার করিয়া ব্রিটেনকে যে সব যুদ্ধোপকরণ যোগাইয়াছে সেগুলির ব্রিটিশের ধরা দাম অনুসারে ভারতের পাওনা দাঁড়াইয়াছে ১১৭ কোটি পাউণ্ডে। কিয়দংশ পরিশোধ হওয়ার দরুন ঐ পাওনার অঙ্ক এখন দাঁড়াইয়াছে ৯৯ কোটি পাউণ্ডে। দেনাদার কেবল তার খুশীমত কম দাম ধরিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, সুদের হারও নিজের সুবিধামত ধরিয়াছে। পাওনাদার হওয়া সত্ত্বেও সঙ্কোচের ভাব যেন আমাদেরই বেশী। আমাদের টাকাটা কত বছরের মধ্যে, কি প্রকার কিস্তিতে এবং ষ্টার্লিং, ইউ-এস্. ডলার ও বুলিয়ান্—এই তিনের কি কি প্রকার অংশে ফেরত পাওয়া যাইবে তাহা নির্ণয় করিবার সৌভাগ্যের অপেক্ষায় আছি।

"কুইট্ ইণ্ডিয়া"র দাবি জানাইয়া আমরা যেমন নির্ভীক ভাবে ব্যাপক আন্দোলন চালাইয়াছি, ব্রিটেনের নিকট ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ পরিশোধের পাকাপাকি ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার দাবি জানাইয়া তেমন কোনও আন্দোলন আমরা চালাই নাই। সাধারণ লোক অর্থনীতির জটিলতা লইয়া মাথা ঘামাইতে চাহে না। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরাও এই ব্যাপারে যথোপযুক্ত উৎসাহ দেখান নাই। পক্ষান্তরে ব্রিটেন তার দেনাটা যত কম ও যত দেরি করিয়া শোধ করিতে পারে তজ্জন্য কর্ণধার হিসাবে পাঠাইয়াছে একজন ভারতের প্রাক্তন অর্থসচিবকে, যাঁর ব্যক্তি-সত্তা ব্রিটিশ স্বার্থের পক্ষে অতীব কার্য্যকরী হইয়াছে।

কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে ব্রিটেন আমাদের পাওনা মিটাইয়া দিবার ব্যাপারে অবিচার করিবে না। ২০শে নবেম্বর, ১৯৪৪ তারিখে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ইকনমিক সোসাইটিতে "আন্তর্জাতিক মুদ্রা-তহবিল ও ভারত" শীর্ষক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন,

"But I think it is best to proceed in the belief that Great Britain will not be deliberately unjust and will honour her obligations to India."

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"Britain need only pay about one per cent of her National Income towards the liquidation of India's sterling balances over a period of ten years. This should not put an excessive strain on the National Economy and standard of living of Britain."

কিন্তু ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা থাকিলেই যে দেনাদারের মনে তাহা করিবার ইচ্ছা জাগিবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। আমরা আজও ভারতীয় ঋণ পরিশোধকল্পে ব্রিটেনের দশবার্ষিকী চুক্তির কথা শুনি নাই। আগামী ছয় মাসের মধ্যে ব্রিটেন উভয় ডোমিনিয়নকে দিবে ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড + ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। মোট ৯৯ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে উভয় ডোমিনিয়ন পাইবে ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড

(উপরোক্ত পৃথক অঙ্ক)। এই অনুপাতে বছরে পড়িবে প্রায় ৫ কোটি পাউণ্ড এবং সমস্ত টাকা সুদ সমেত পরিশোধ হইতে সময় লাগিবে ২৫ বৎসরের অধিক।

আমাদের ঘরের টাকা ব্রিটেনের কাছে আটকা পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও পরের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে আমাদের কি কি লোকসান তাহা বিচার করিয়া দেখা দরকার। চলতি খরচ ছাড়াও আমাদের শিল্প বিস্তার ও কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হইবে। আমাদের টাকা আমাদের হাতে ফিরিয়া আসিলে যেখানে মূলধন খাতে একটা মোটা রকমের নিজস্ব ক্রেডিট ব্যাল্যান্স থাকিত, পরের নিকট হইতে ধার করিলে সেই জায়গায় আসিয়া পড়িবে একটা ক্যাপিট্যাল লোন। আসল টাকা ও তার সুদ উভয় মিলিয়া একটা বিরাট্ বোঝা ঘাড়ে চাপিবে। নিজেদের ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ ও তার সুদবাবদ কিছু পাওয়া যাক বা না যাক, কর্জ্জ করা টাকার সুদ কিস্তিমত চালাইয়া যাইতে হইবে। আমাদের ফরেন্ এক্সচেঞ্জ তহবিলের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই সুদের টাকা পরিশোধ করিবার জন্য মুদ্রা-তহবিল হইতে চড়া সুদে কর্জ্জ করা ছাড়া কোনও উপায় থাকিবে না। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা দরকার যে আমরা ষ্টার্লিং ব্যাল্যান্সেস্-এর "বুক এন্ট্রি" হিসাবে যে সুদ পাইতেছি, আমাদের অপরের নিকট হইতে কর্জ্জ করা টাকার উপর সেই সুদ দিতে হইবে এবং ঐ সুদ পরিশোধ করিবার জন্য মুদ্রা-তহবিলকে যে সুদ দিব, শেষোক্ত দুইয়ের গড়পড়তা হার প্রথমোক্ত পাওনা সুদের হারের চেয়ে কমপক্ষে শতকরা ১% বেশী হইবে। কোনও কালে আমাদের ঘরের টাকা ঘরে ফিরিয়া আসিলেও আমাদের মোট লোকসান একটা বিরাট্ অঙ্কে দাঁড়াইবে। ক্যাপিট্যাল লোন গ্রহণ করার দরুন সুদের জের টানা মুদ্রা-তহবিলস্থিত আমাদের চলতি হিসাবকেও দারুণভাবে পঙ্গু করিয়া ফেলিবে। সুদের টাকার বোঝা ও সুদ পরিশোধ করিবার জন্য মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্জ্জ গ্রহণ—এতদুভয় নিয়মানুসারে মুদ্রা-তহবিলের চলতি হিসাবের এলাকায় আসিয়া পড়িবে। এই গুরুভার মুদ্রা-তহবিল ও ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-হারের উপর জোর আঘাত হানিবে—যাহার ফলে আমরা একটা "ক্রনিক অ্যাডভার্স ব্যাল্যান্স-ওয়ালা" দেশে পরিণত হইব। এমতাবস্থায় ব্রিটেনের নিকট হইতে আমাদের পাওনা টাকা আদায় করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করাই সমীচীন।

ভারতীয় ইউনিয়ন ব্রিটেনের সঙ্গে এই প্রকার চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইয়াছে যে আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিখ পর্য্যন্ত "সেন্ট্রাল রিজার্ভস্ ফর হার্ড কারেন্সীস্" হইতে এক কোটি পাউণ্ডের বেশী উঠাইবে না। দ্বিতীয়তঃ ভারত ইউ. এস্. ডলারের ঘাটতি পূরণ করার জন্য আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্জ্জ গ্রহণ করিবে। এই কর্জ্জের পরিমাণ হইবে এক কোটি ইউ. এস্. ডলার। এই ঋণের জন্য সার্ভিস্ চার্জ্জ দিতে হইবে শতকরা চার ভাগের তিন ভাগ। ওভারড্রাফট হারের নিয়ম এমন ভাবে বাঁধা আছে যাহাতে মুদ্রা-তহবিল হইতে বেশী পরিমাণ টাকা ধার করা অথবা দীর্ঘ দিন ঋণ পরিশোধ না করা—উভয় কার্য্যই দেনাদারের পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িবে। ভারতকে মোটা টাকা ধার করিতে হইবে। আমাদের পক্ষে ইহা কত বড় লাভজনক ব্যাপার তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছে ষ্টেটস্ম্যান্ পত্রিকা ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ তারিখের এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। উক্ত প্রবন্ধে আছে,

"The Fund's articles of Agreement allow a member to buy the currency of another in exchange of its own currency subject to certain limitations. As India's quota is equivalent to $400m she is apparently entitled to buy $100 in the coming year at a service charge of ¾ per cent, rising by ½ per cent annually. The U. K. has already purchased dollars from the Fund. India's present opportunity is a strange commentary to the Bretton Wood's debate in the Central Assembly during 1946. Ratification of the Agreement setting up the Fund was agreed to only after a prolonged debate."

ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকা স্বজাতিপ্রেম বশতঃ আমাদিগকে ভুল রাস্তা বাতলাইতেছে। উক্ত পত্রিকা আমাদের পাওনা টাকা ব্রিটেনের নিকট হইতে আদায় না করিয়া মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্জ্জ গ্রহণের কানুনের কথা উল্লেখ করিয়াছে এবং ইহাকে একটা সুযোগ বলিয়া আখ্যা দিয়াছে। ব্রিটেনের মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্জ্জ লওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া আমাদের আশঙ্কা দূর করিবার চেষ্টায় ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকা কিঞ্চিন্মাত্র কসুর করে নাই। কিন্তু আর্থিক সঙ্কটে পতিত ব্রিটেনের নিকট যাহা সুযোগ আমরা তাহাকে সুবিধা মনে করিব কোন্ কারণে? বরং ব্রিটেনের অবস্থা আরও খারাপ হওয়ার পূর্ব্বে আমরা আমাদের টাকা যতটা ঘরে উঠাইয়া আনিতে পারি তাহার চেষ্টাই করিতে হইবে। ব্রিটেন মুদ্রা-তহবিল হইতে ধার লইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইউ. এস.-এর নিকট হইতে যে মোটা অঙ্কের ধার করিয়াছিল তাহার শেষ কিস্তি ১০ কোটি ইউ. এস. ডলার এই মাসের মধ্যে উঠাইয়া লইবে। একদিকে অতি শীঘ্র ব্রিটেনের তহবিল শূন্য হইয়া পড়িবার কথা; কিন্তু অপর দিকে মার্শাল প্ল্যানের দৌলতে আগামী মাসেই ব্রিটেনের হাতে মোটা রকমের ইউ. এস. ডলারের তহবিল আসিয়া জুটিবে। সুতরাং ব্রিটেনের হাতে এই টাকা থাকিতে থাকিতে ভারত তার পাওনার একটা বড় অংশ আদায় করিবার চেষ্টা না করিলে প্রকাণ্ড ভুল করিবে। যাহাতে আমাদের চলতি খরচের জন্য মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্জ্জ গ্রহণ করিতে না হয় এবং আমরা

আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের জন্য একটা বড় তহবিল পাইতে পারি, কালবিলম্ব না করিয়া ব্রিটেনের উপর সেই প্রকার চাপ দিতে হইবে। ষ্টেটসম্যান পত্রিকা আমাদিগকে যাহা 'opportunity' সুযোগ বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে তাহা মোটেই opportunity নহে। বরং ইহা আমাদের অতি বড় দুর্ভাগ্য যে আমাদের মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্জ্জ করিতে হইতেছে। ইহাতে আমাদের আনন্দিত হইবার কারণ মোটেই নাই।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ষ্টার্লিং ব্যাল্যান্সেস্-এর প্রয়োজন হইবে খুব বেশী। আমাদের শিল্পপ্রসারে এবং কৃষিকর্ম্মের উন্নতিসাধনে বিদেশ হইতে মূলধন ও কাঁচা মাল আমদানী করিতে হইবে। এইজন্য আমাদের দুইটি স্থায়ী ষ্টার্লিং ফাণ্ড ও ডলার ফাণ্ডের দরকার যাহাতে আমরা প্রয়োজনানুসারে টাকা উঠাইয়া উপরোক্ত বিদেশী মাল ক্রয়ের পাকাপাকি ব্যবস্থা করিতে পারি। ব্রিটেনের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়াই এই ফাণ্ড দুইটির গোড়াপত্তন করিতে ও বৃহৎ অংশ জোগাইতে হইবে। ব্রিটেনের ডলার ও স্বর্ণের অবস্থা সম্বন্ধে ইউ. এস. ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট হালে যে মন্তব্য করিয়াছে তাহা এই,—

"Britain's gold and dollar resources now at about $200 m will go down to $100 m by the end of 1948 and large dollar deficits will continue thereafter."—*Reuter*, January 14, 1948.

ব্রিটেনের অবস্থার শোচনীয় অবনতি ঘটিবার পূর্ব্বেই জোর তাগাদা দিয়া ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্-এর একটা মোটা অংশ উসুল করিবার জন্য আমাদিগকে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। ইহাও ভাবিবার বিষয় যে আমরা এক দিকে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করিয়াছি পাঁচ বৎসরের জন্য এবং অপর দিকে ষ্টার্লিং ব্যালেন্সেস্ চুক্তি করিয়াছি ৬ মাসের জন্য। দুইটার সময়ের বিরাট্ ব্যবধান। বৈদেশিক পাওনার প্রশ্নকে এইভাবে উপেক্ষা করিয়া এত বড় একটা উন্নয়ন পরিকল্পনাকে যে কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইবে সর্ব্ববিধ উন্নয়ন কার্য্যের সূচনা মাত্র। তারপরে আসিবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। এইরূপ পর পর দুইটা পরিকল্পনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে ব্রিটেনের নিকট হইতে যাহাতে পাওনা টাকাটার উদ্ধার ঘটে সেইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। দীর্ঘকালীন উন্নয়ন-পরিকল্পনার সঙ্গে কি করিয়া স্বল্পকালীন ষ্টার্লিং ব্যাল্যান্সেস্ চুক্তি খাপ খাইতে পারে তাহা আমাদের নেতারা একবার ভাবিয়া দেখিতে পারেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের আশানুযায়ী ব্রিটিশ-জাতি যদি ন্যায়পরায়ণ হইয়া দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের পাওনা টাকা ফিরাইয়া দেয় তাহা হইলে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ থাকে না। কিন্তু আমরা আজ পর্য্যন্ত আশান্বিত হইবার মত কিছুই পাই নাই। অথচ দ্বিতীয় অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন চুক্তিতে আমরা উল্লসিত হইয়াছি এত বেশী যে মুদ্রা-তহবিল হইতে কর্জ্জ গ্রহণ করার মত দুরবস্থা আমাদের হওয়া সত্ত্বেও সর জেরিমি রেইসম্যান্ ও তাঁর জাতভাইদের বর্ত্তমান চুক্তির সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছি। কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচীতে ষ্টার্লিং ব্যাল্যান্সেস্ লইয়া কোনও বিস্তৃত আলোচনা করা হয় নাই। 'ইকনমিক কমিটি'র নেতা হিসাবে পণ্ডিত জবাহরলালও আজ পর্য্যন্ত ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ সমস্যার উপর কোনরূপ আলোকসম্পাত করেন নাই। একটা বড় প্রোগ্রাম হাতে লইয়া আট-ঘাট বাঁধিয়া কাজে নামা উচিত। এই ক্ষেত্রে বৈদেশিক দেনা-পাওনা সম্বন্ধে চোখ বুজিয়া থাকিলে সমস্যার সমাধান হইবে না।

ষ্টার্লিং-ব্যাল্যান্সেস্ এর সামগ্রিক আলোচনায় বিলম্ব ঘটায় আমাদের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি হাতে লওয়া ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। একজন বিচক্ষণ ও ভারতীয় স্বার্থ সম্পর্কে অতীব সজাগ ব্যক্তির নেতৃত্বে একটা মিশন ব্রিটেনে পাঠানো দরকার যাহাতে তথায় আমাদের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি হইতে পারে। আর একটা মিশন পাঠানো দরকার অন্যান্য দেশসমূহে। ষ্টার্লিং ব্যালান্সেস্ অর্জ্জন করিতে আমাদের কি প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে আমাদের ঐ টাকার কিরূপ জরুরী দরকার তাহা সকলকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে হইবে—যাহাতে আমাদের পাওনা টাকা আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ঘরে ফিরিয়া আসে। ব্রিটেন অতীব কৃতজ্ঞচিত্তে আমাদের পাওনা ন্যায্য হারে পরিশোধ করিবে এইরূপ আশা করিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের বিফলমনোরথ হইতে হইবে।

পরিশেষে ইহা বলাই যথেষ্ট হইবে যে ষ্টার্লিং ব্যাল্যান্সেস্ পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য দেখাইবার বিষয়ও নহে কিম্বা সাধারণ লোকের ভীতির বস্তুও নহে। ইহা আমাদের একটি অতি প্রয়োজনীয় সম্পত্তি। ষ্টার্লিং ব্যাল্যান্সেস্ যুদ্ধের সময় গড়িয়া উঠিয়াছে, আর আজ আমাদের প্রয়োজনের সময় এই টাকা মুক্ত করিতে না পারিলে আমাদের দুর্ভাগ্যের বোঝা ক্রমশঃ ভারী হইতে থাকিবে।

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

মধ্য-পশ্চিম

শনিবার সকালে এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিঙের ছাদে গিয়া উঠিলাম। কিছু প্রবেশমূল্য লইয়া ইহারা দর্শনার্থিগণকে ছাদে উঠায়। শ্রেণী-বদ্ধ অসংখ্য লিফট্ নরনারীকে উঠাইতেছে ও নামাইতেছে।

৫টি বা ৬টি করিয়া তলার জন্ত এক একটি লিফট্ নির্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক লিফট্ শুধু নির্দিষ্ট তলা কয়টিতেই ওঠানামা করে। এতদ্ভিন্ন এক্সপ্রেস লিফট্ আছে। সেগুলি সকল তলায় না থামিয়া দ্রুত একটি বা দুইটি নির্দিষ্ট তলায় চলিয়া যায়। ছাদে উঠিতে আমাদের একবার লিফট্ বদল করিতে হইল। প্রথম এক্সপ্রেস লিফট্ কোথাও না থামিয়া আমাদিগকে ৮৭ তলায় লইয়া গেল। দ্বিতীয় এক্সপ্রেস লিফট্ ৮৭ তলা হইতে ছাদ পর্যন্ত চলে। অন্ত কোথাও থামে না।

মধ্য-ম্যানহাটনে ৫ম এভিনিউ ও ৩৪তম ষ্ট্রীটের সংযোগ-স্থলে বাড়ীটি অবস্থিত। বাড়ীটি ১০২ তলা, ১২৫০ ফুট উচ্চ—পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম। একবার নাকি একটি এরোপ্লেন এই বাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ছাদ হইতে নিউ ইয়র্ক নগরীর দৃশ্য অপূর্ব। আকাশচুম্বী সৌধমালা এখান হইতে ছোট মনে হয়। অদূরে ১০৪৬ ফুট উচ্চ, ৭৭ তলা ক্রাইস্‌লার বিল্ডিং। ইহা পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতায় দ্বিতীয় বাড়ী। রকফেলার কেন্দ্রের উচ্চতম ৭০ তলা আর, সি, এ বিল্ডিং উচ্চতায় তৃতীয়। দক্ষিণে ৬০ তলা-বিশিষ্ট উল-ওয়ার্থ বিল্ডিং। ৫০ তলা, ৬০ তলা বাড়ীর অভাব নাই। সমস্ত শহরটি ছাদের উপর হইতে চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠে। দক্ষিণে স্বাধীনতার মূর্তি পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। পূর্বে ও পশ্চিমে নদী। নদীতে ইতস্ততঃ ভাসমান জাহাজসমূহ। নদীর উপর সেতুসমূহ দৃশ্যমান। হাডসনের ওপারে নিউ জার্সি শহর। দূরে ক্যাটস্‌কিল পর্বতমালা। ইষ্ট নদীর ওপারে ব্রুকলিন্। বহু দূরে লাগার্ডিয়া এরোড্রোম। দূরে হাডসনের উপরিস্থিত জর্জ ওয়াশিংটন সেতু। উত্তরে কেন্দ্রীয় পার্ক সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে। ওয়ালডর্ফ এষ্টোরিয়া হোটেল বেশীদূর নয়। আমার হোটেলটিও দেখা যাইতেছিল। রাস্তায় প্রবহমাণ নদীর মত জনস্রোত ও শকটশ্রেণী। গাড়ীগুলি চলিতে চলিতে ইষ্ট নদীর টানেলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। সমস্ত মিলিয়া এক অতুলনীয় দৃশ্য।

বিকালে রকফেলার-কেন্দ্রে গেলাম। দর্শনার্থীদের এক একটি দল লইয়া এক একটি গাইড সমস্ত কেন্দ্রটি দেখাইতেছে। কয়েক মিনিট পর পরই এক একজন গাইড এক একটি দল লইয়া রওনা হইতেছে।

উক্ত কেন্দ্রটি ১৪টি আকাশচুম্বী সৌধের সমষ্টি; ৫ম ও ৬ষ্ঠ এভিনিউর মধ্যে ৪৮তম ষ্ট্রীট হইতে ৫১তম ষ্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত। বাড়ীগুলির উচ্চতা সমান নয়। উচ্চতম বাড়ীটি ৭০ তলা। বহু দোকান, আপিস, থিয়েটার প্রভৃতি এই গৃহসমষ্টির মধ্যে অবস্থিত। ৩০,০০০ কর্মচারী প্রত্যহ এই বাড়ীটিতে কাজ করিতে আসে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় ও ছুটির সময় এই ত্রিশ হাজার লোককে উঠানো ও নামানো লিফট্গুলির একটি বিরাট কার্য। প্রত্যহ নানাবিধ কার্যোপলক্ষে এই বাড়ীতে কয়েক লক্ষ লোক প্রবেশ করে। এত বড় অঞ্চলের কেন্দ্রীয় তাপ-ব্যবস্থা ও সুড়ঙ্গপথশ্রেণী বিস্ময়কর বস্তু। বস্তুতঃ ইহা একটি স্বতন্ত্র নগরবিশেষ।

বাড়ীগুলির মধ্যে বহু হোটেল ও আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত আছে। একস্থানে ছেলেমেয়েরা স্কেট করিতেছে। দেখিতে বেশ লাগিল। পৃথিবীর বৃহত্তম রঙ্গমঞ্চ ইহারই একটি বাড়ীর মধ্যে অবস্থিত। এখানে ৬,২০০ লোকের বসিবার আসন বিদ্যমান। একটি বাড়ীর নাম আন্তর্জাতিক বাড়ী। ইহাতে ইংরেজ, ফরাসী, ইটালী, ভারতীয় প্রভৃতি বহু জাতির কন্‌সালগণের আপিস। একটি বাড়ীতে রেডিওতে নানা অনুষ্ঠান চলিতেছে। ছোট ছেলেমেয়েদের একটি গীতাভিনয় আমাদের সমক্ষে প্রচারিত হইল। এখানে টেলিভিশন দেখিতে পাইলাম। আমাদেরই মধ্যে কেহ কেহ দূরের একটি ঘরে গিয়া কিছু আবৃত্তি করিলেন বা অন্ত কথা-বার্তা বলিলেন। এ ঘরে যন্ত্রের উপরে তাঁহাদের চেহারা ও অঙ্গসঞ্চালন ভাসিয়া উঠিল। আমরা তাঁহাদিগকে পরিষ্কার দেখিলাম ও তাঁহাদের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনিলাম। ইহার কয়েকদিন পরে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সর্বপ্রথম তাঁহার "সাদা বাড়ী"তে বসিয়া টেলিভিশন যোগে কংগ্রেসের অধিবেশন দেখিলেন ও বক্তৃতাদি শুনিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন টেলিভিশন যোগে সাধারণ্যে প্রচার করা সঙ্গত কিনা এ সম্বন্ধে তখন খবরের কাগজে আলোচনা চলিল। এক পক্ষ ইহার বিরোধিতা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "কংগ্রেসের অধিবেশনকালে সভ্যগণের আচরণ প্রত্যক্ষ করিলে কংগ্রেসের উপর এবং কংগ্রেসের পাস করা আইনের উপর সর্বসাধারণের অশ্রদ্ধা আসিবে।"

ঐ দিন রাত্রে নিউইয়র্কস্থ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমিতির বাড়ীতে গিয়া সমিতির অধ্যক্ষ অখিলানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করি। ১৭নং পূর্ব-৯৪তম ষ্ট্রীটে সমিতির নিজস্ব বাড়ী। স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম

এবং পরদিন সকালের প্রার্থনা-সভায় এবং মধ্যাহ্ন-ভোজনে উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া হোটেলে ফিরিলাম। স্বামীজীর নিকট সংবাদ পাইলাম যে মহলানবিশ-গৃহিণী নিউ জার্সিতে ডাক্তার স্টুয়ার্ট নামক এক প্রসিদ্ধ সংখ্যাতত্ত্ববিদের গৃহে অতিথি রূপে অবস্থান করিতেছেন।

রবিবার সকালে নিউ জার্সিতে টেলিফোন করিয়া জানিলাম যে মহলানবিশ-গৃহিণী নিউ ইয়র্কে এক ভারতীয় ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটে দুই দিন যাবৎ আছেন। সেখানে টেলিফোন করিতেই মহলানবিশ-গৃহিণী তৎক্ষণাৎ আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে প্রাতরাশে যোগ দিতে বলিলেন। ফ্ল্যাটটি দূরে ছিল না— অধিবাসী একজন যুক্তপ্রদেশীয় ভদ্রলোক। তাঁহার পত্নী মার্কিন-বংশে রুশ। মাত্র এক কক্ষের ফ্ল্যাট। অতিথিসেবা-পরায়ণা মহিলাটি স্বামীকে বন্ধুগৃহে ঘুমাইতে পাঠাইয়া মহলানবিশ-গৃহিণীকে স্বীয় কক্ষে অভ্যর্থনা করিয়া স্থান দিয়াছেন। আমি পৌঁছিবার একটু পরেই ভদ্রলোক স্বগৃহে ফিরিলেন। তিনি ইঞ্জিনীয়ার। অনেক দিন এদেশে আছেন। তাঁহার মার্কিন গৃহিণী স্বহস্তে প্রাতরাশ প্রস্তুত ও পরিবেশন করিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। প্রাতরাশের টেবিলে একটি বাটিতে পাইন বৃক্ষের কতকগুলি কাঁচা পাতা জ্বালাইয়া দিলেন। এই অভিনব গন্ধে আমোদিত বোধ করিলাম। মহিলাটি বলিলেন, "এ গন্ধটা আমি খুব ভালবাসি।" কালিদাসের সরল বৃক্ষ পরিস্রুত ক্ষীর সৌরভে সুরভিত বায়ুর বর্ণনা মনে পড়িল।

পীতাম্বর পন্থকে খবর দিয়া ওখানে ডাকিয়া আনা হইল। তাঁহাকে বৈকালে আমার হোটেলে আসিতে বলিয়া একটি ট্যাক্সি লইয়া দ্রুত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সমিতির বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তখন স্বামীজীর বক্তৃতা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। বাড়ীটির নীচের তলায় বড় হলঘরের প্রান্তে দাঁড়াইয়া স্বামীজী বক্তৃতা করিতেছেন। পরিধানে গেরুয়া বস্ত্র। মাথায় গেরুয়া পাগড়ী। প্রায় দুই শত মার্কিন নরনারী একাগ্রচিত্তে বক্তৃতা শুনিতেছে। বক্তৃতার বিষয়—প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ। বক্তৃতান্তে শ্রোতাগণ কিছুকিছু দান করিয়া উঠিয়া গেলেন।

আশ্রমে একটি বাঙালী যুবক ও একটি মার্কিন যুবক বাস করে। উভয়েই ছাত্র। মার্কিন যুবকটি সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক ভারতবর্ষেই জীবন কাটাইবে সঙ্কল্প করিয়াছে। স্বামীজী বলিয়াছেন যে, যদি ভারতবর্ষেই থাকিবে তবে যাতে সে দেশবাসীর কাজে লাগিতে পার এরূপ কিছু শিখিয়া যাও। তিনি যুবকটিকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়াছেন।

যুবকটি ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ মিশনের ডাক্তারী বিভাগের ভার লইতে পারিবে। সে বিনয়ী, অল্পভাষী ও কর্তব্যপরায়ণ। বাঙালী যুবকটিও অনুরূপ গুণসম্পন্ন। একটি বৃদ্ধা মার্কিন প্রতিবেশিনী আশ্রমের খুব ভক্ত। আশ্রমের অনেক কাজকর্ম করেন। আমাকে বলিলেন, "আমার একবার ভারতবর্ষে যাইবার ইচ্ছা আছে। তোমরা আমাকে গ্রহণ করিবে ত?"

আমি—"ভারতবর্ষ সকলকেই গ্রহণ করিয়াছে। কাহাকেও সে প্রত্যাখ্যান করে না।"

মহিলাটি (লজ্জিতভাবে)—"হাঁ, এ বিষয়ে তোমাদের উদারতা সুবিদিত। হয়তো এ উদারতা আর একটু কম হইলেই তোমাদের সুবিধা হইত।" একটি নবাগত গুজরাটি যুবকের সহিত এখানে আলাপ হইল। তিনি টাটা কোম্পানীর অভিজ্ঞ কর্মচারী। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমেরিকা দর্শনে আসিয়াছেন। বলিলেন, 'সঙ্গে আমার স্ত্রী আসিয়াছেন। কিন্তু আবাসস্থলের অভাবে বড়ই বিপন্ন বোধ করিতেছি।"

স্বামীজী বলিলেন—"বাসস্থান এখানে খুবই দুর্লভ। তারপর এখানে আদিম অধিবাসীদের অনেকে বাসা দিতে চায় না। আপনাকে যদি আদিম অধিবাসী বলিয়া ধরিয়া লয় তবে আরও মুশকিল। আপনার স্ত্রী যখন সঙ্গে আছেন তখন এ অসুবিধা নাও হইতে পারে। কারণ শাড়ীপরিহিতা স্ত্রীলোক দেখিলে বিদেশী বলিয়া বুঝিতে পারিবে এবং বিদেশীর সঙ্গে এরা ভাল ব্যবহারই করে।"

বিভা মুখুজ্যে নামে একটি মেয়ে এদেশে এম্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউট্রিশন পড়িতেছে। দুই দিনের ছুটিতে আশ্রমে বেড়াইতে আসিয়াছে। আশ্রমে মেয়েদের থাকিবার বিধি বা বন্দোবস্ত নাই। কাজেই মেয়েটি বৃদ্ধা মার্কিন প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে আছে। মেয়েটি দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসিনী। আমাকে চিনিতে পারিল। সেদিন সে-ই ডাল ভাত, কপির ডালনা রান্না করিল। বহুদিন পর আশ্রমের প্রসাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

ঐ দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনে স্বামীজী, আশ্রমবাসী বাঙালী ও মার্কিন যুবকদ্বয়, বৃদ্ধা মার্কিন প্রতিবেশিনী, বিভা মুখুজ্জে ও আমি ভিন্ন আরও দুই জন আগন্তুক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এক জন মাদ্রাজী ও অন্য জন হিন্দুস্থানী। মাদ্রাজী ভদ্রলোক হায়দরাবাদ রাজ্যের ব্রডকাস্টিং ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ। হিন্দুস্থানী যুবকটি ছাত্র। ভোজনান্তে নানা বিষয়ে আলাপ চলিল। প্রসঙ্গত স্বামীজী বলিলেন, "আমি অনেক সময় বলিয়া থাকি যে আমাদের বিবেকানন্দ আমেরিকারই দান। ভারতবর্ষে ত কেহ তাঁহাকে চেনে নাই। যখন আমেরিকা তাঁহাকে চিনিল তখনই ত ভারতবর্ষ তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া বরণ করিয়া লইল।" সকলের সঙ্গে সদালাপে পরিতৃপ্ত হইয়া, স্বামীজীর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইয়া হোটেলে ফিরিলাম।

বৈকালে পন্থ আমার হোটেলে উপস্থিত হইলেন। পন্থ উচ্চ আদর্শবাদী যুবক। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী

ছাত্র ও পরে অধ্যাপকরূপে সুনাম অর্জন করিয়াছেন। ১৯৪২ সনের আগষ্ট-আন্দোলনে জেলও খাটিয়াছেন।

কংগ্রেসের বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় জবাহরলাল নেহরুর সেক্রেটারী রূপে বহু ঘুরিয়াছেন, পরে কলিকাতায় ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে গবেষণা করিবার জন্য যোগদান করেন। সম্প্রতি অধ্যাপক মহলানবিশের সঙ্গে এদেশে আসিয়াছেন। অধ্যাপক দেশে গিয়াছেন; অল্পদিন পরেই ফিরিবেন। তাঁহার কাজের ভার ইহার উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। পন্থ একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, এখানে যে ধরণের হোটেলে আছি তাহাতে খরচ বড় বেশী। ইহার অনেক কম খরচেও এদেশে থাকা চলে এবং সে টাকাটা আমি বোধ হয় চেষ্টা করিলে রোজগার করিয়া লইতে পারি। সরকারের উপর নির্ভরশীলতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে এখানে থাকিতে পারি কিনা তাহাই চিন্তা করিতেছি।”

পন্থের সঙ্গে মধ্য-মানহাটনে অনেক ঘুরিলাম। সন্ধ্যার পর টাইম্ স্কোয়ারের দৃশ্য সত্যই অপরূপ। ব্রডওয়ের উভয় পার্শ্বে ৪২তম ষ্ট্রীট হইতে ৫২তম ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত টাইম স্কোয়ার বিস্তৃত। অঞ্চলটি থিয়েটার, সিনেমা, নাচঘর, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট প্রভৃতিতে পূর্ণ। আলোক সজ্জা পরমাশ্চর্য্য উজ্জ্বলতায় দিবালোককেও হার মানাইয়াছে। রঙের খেলায় মনে হয় যেন সহস্র রামধনুর উদয় হইয়াছে। আলোকমালার নানা ভঙ্গীর গতিশীলতা এবং পালা করিয়া জ্বলা-নেবার খেলায় এক অপূর্ব মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। মন হয়, ইহার তুলনা নাই।

একটি সিংহল-ভারতীয় রেষ্টুরেন্টে ভারতীয় খাদ্যে নৈশ-ভোজন সমাপন করিয়া ম্যাডিসন্ স্কোয়ার গার্ডেনের দিকে চলিলাম।

প্রকাণ্ড উঁচু বাড়ী। ভিতরে হকি প্রভৃতি সর্বপ্রকার খেলা হয়। ১৯০০০ দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা আছে। গৃহাভ্যন্তরে এত বড় ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। শুনিলাম ভিতরে হকি খেলা চলিতেছে। লাইনে দাঁড়াইয়া টিকিট কিনিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। দোতলার ছাতে খেলার মাঠ। উপরে চারিদিকে ঘুরানো গ্যালারী। লোকে পরিপূর্ণ। ফিরিওয়ালা আইসক্রীম, বাদাম প্রভৃতি হাঁকিয়া বেড়াইতেছে। উজ্জ্বল আলোক দ্বারা ঘরটিকে দিবালোকের মতই আলোকিত করা হইয়াছে। খেলার মাঠটি বরফে প্রস্তুত স্কেটিঙের মাঠের মত। খেলোয়াড়গণ স্কেট পায়ে বাঁধিয়া বরফের উপর খেলিতেছে। স্কেট পায়ে হকি-ষ্টিক হাতে বল লইয়া ছুটাছুটি করার দৃশ্য আমার নিকট শুধু অপূর্ব নয়, অদ্ভুত লাগিতেছে। এ খেলায় পরিশ্রম অত্যধিক। সর্বদা স্কেটের উপর দেহের ভার-সাম্য রক্ষা করিয়া স্কেট ঠেলিয়া বলের পিছনে ছুটায় অত্যধিক পরিশ্রম হয়। রেঞ্জার্স দল ও শিকাগো দলে খেলা হইতেছে। ৬ জনে এক এক পক্ষ। রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিট হইতে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত খেলা চলিল। ২০ মিনিটের পর ৫ মিনিট বিশ্রাম। এইরূপ তিন বারে মোট ১ ঘন্টা খেলা হইল। প্রত্যেক দলের রিজার্ভ খেলোয়াড়গণ পাশেই লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া। যে কোন খেলোয়াড় ক্লান্তি বোধ করিলে সেইখানে আসিয়া দাঁড়ায় এবং অপর এক জন তাহার জায়গায় নামিয়া পড়ে। এইরূপে যতবার ইচ্ছা বদলী দিয়া বিশ্রাম লওয়া যায়। এই খেলায় রেঞ্জার্স দল ৯-০ গোলে জিতিল। প্রত্যেক বিশ্রামের সময় মাঠের আল্‌গা বরফ চাঁছিয়া ফেলিয়া জল ছিটাইয়া ঐ জলকে জমাইয়া দিয়া পুনরায় শক্ত ও মসৃণ করিয়া দেওয়া হয়। এই মাঠেই বক্সিং বাস্কেটবল প্রভৃতি খেলাও হয়। যন্ত্র-সাহায্যে মাঠটিকে ইচ্ছামত ছোট বড় করা চলে এবং গ্যালারীগুলিকেও আগাইয়া বা পিছাইয়া লওয়া যায়। প্রয়োজনমত বরফ দিয়া মাঠ ঢাকিয়া দেওয়া হয় বা বরফ গলাইয়া ফেলা হয়।

নিউ ইয়র্কের সুড়ঙ্গ-রেলপথ লণ্ডনের সুড়ঙ্গ-রেলপথের মত সুদৃশ্য নয়। লণ্ডনে লাইনের হদিস ও মানচিত্রগুলি বিদেশীর পরম সহায়ক বলিয়া মনে হয়। এখানে সেরূপ হদিস ও ম্যাপ নাই বলিলেই হয়। তবে লণ্ডন অপেক্ষা শ্রমসংক্ষেপমূলক যান্ত্রিক ব্যবস্থা নিউ ইয়র্কে অনেক বেশী। এখানে ভাড়ার কোন তারতম্য নাই। একবার উঠিলে পাঁচসেণ্ট ভাড়া—তা তুমি যত দূরই যাও না কেন। টিকিট কেনা-বেচার রীতি নাই। ষ্টেশনে কোম্পানীর কোন টিকিট-ঘর, টিকিট বিক্রেতা বা টিকিট সংগ্রাহক নাই। একটি বাক্সের মধ্যে একটি মাত্র লোক কতকগুলি পাঁচ সেণ্ট মুদ্রা লইয়া বসিয়া থাকে। যাত্রীগণ ইহার নিকট অন্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে পাঁচ সেণ্ট মুদ্রা পাইতে পারে। ষ্টেশনের প্রবেশপথ যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একটি পাঁচ সেণ্ট মুদ্রা নির্দিষ্ট ছিদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিলে প্রবেশ-পথটি খুলিয়া যায় এবং একজন মাত্র লোক প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। ষ্টেশন হইতে বাহিরে যাইবার পথ আলাদা। সেখানে পয়সা লাগে না। এইরূপে অনেক কম কর্ম্মচারীর দ্বারা, বিনা টিকিটে রেলপথটিতে লোকজন ও যানবাহন চলাচল করিতেছে। রেলের কোন কর্ম্মচারীর সঙ্গে যাত্রীদের দেখাই হয় না। ভাড়াও খুব সস্তা, মাত্র পাঁচ সেণ্ট বা দশ পয়সায় বহু দূর যাওয়া যায়।

নানা স্থানে ঘুরিয়া খেলা দেখিয়া সুড়ঙ্গ-পথে পন্থ ও আমি স্ব-স্ব আবাসে ফিরিলাম।

৬ই জানুয়ারী সোমবার। সকালে ট্যাক্সিযোগে সিটি আপিসের দিকে চলিলাম। এ ট্যাক্সিওয়ালাও আলাপ সুরু করিল। সে যাহা বলিল তাহার মর্ম এইরূপ: "তোমাদের দেশ ঐশ্বর্য্যের দেশ। পৃথিবীর যত সোনা, রূপা, মণি, মুক্তা তোমাদের দেশ হইতে আসে। অথচ তোমরা নিজেরা

নিজেরা এত মারামারি কর কেন? ইংরেজ তোমাদের শাসক। তাহারা কি করে? আমরা দেখ ট্রুম্যানকে প্রেসিডেণ্ট করিয়াছি। তাঁহাকে সেলাম করিতেছি। কিন্তু যদি তিনি তাঁহার কর্তব্য পালন না করেন তবে তাঁহাকে গদি হইতে টানিয়া নামাইব। তোমরা সেরূপ কর না কেন? আচ্ছা; তোমরা আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত কর না কেন? ইংরেজ আমাদের কাছে অনেক টাকা ধারে। আমাদের গবর্ণমেণ্টের কথা না শুনিয়া পারিবে না।"

ঐ দিন নগরীর প্রথম ডেপুটি কণ্ট্রোলার সিড্‌নি সুগারম্যানের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি ট্যাক্স কৌঁসুলি মিল্‌টন স্যাণ্ডবার্গের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়া বলিলেন, "ইনি জাপানে য়িমাশিটা বিচারে আসামী পক্ষের কৌঁসুলি ছিলেন।" ইহার সঙ্গে নিউ ইয়র্কের বিক্রয়-কর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইল। নদীর ওপারে নিউ জার্সি শহরে বিক্রয়-কর নাই। কাজেই নিউ ইয়র্কের বিক্রয়-করের হার যতক্ষণ খুব বেশী না হয় ততক্ষণ কেহ সামান্য জিনিস কিনিবার জন্য কষ্ট করিয়া নদী পার হইয়া ওপারে যায় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপের পর য়িমাশিটার বিচারের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। স্যাণ্ডবার্গ বলিলেন, "য়িমাশিটা বিচারে নুরেম্‌বার্গ বিচারগুলির ন্যায় আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন উঠে নাই। সাধারণ অপরাধঘটিত আইনের উপরই ইহা চলিয়াছিল। য়িমাশিটার সৈন্যগণ লোকের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে, রমণীর উপর অত্যাচার করিয়াছে—এই সমস্ত বিষয়েই সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। এই সমস্ত কাজ যে য়িমাশিটার আজ্ঞায় হইয়াছিল তাহারও কোন প্রমাণ ছিল না। আমি এইরূপ তর্ক করিয়াছিলাম যে এই সমস্ত সাক্ষ্য হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই সমীচীন যে য়িমাশিটা তাহার সৈন্য-বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় য়িমাশিটার সৈন্যবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব সৃষ্টি করিবার জন্য মার্কিন সরকার তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যখন তাহাদের এই প্রচেষ্টা সফল হইল এবং তাহাদের ঈপ্সিত বিশৃঙ্খলা ও আইন না মানার প্রবণতা দেখা দিল তখন সেই বিশৃঙ্খলা ও নিয়মানুর্ত্তিতার অভাবকে য়িমাশিটার অপরাধ বলিয়া বর্ণনা করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। আমার এই তর্ক বিচারকগণের মধ্যে অন্ততঃ একজন সমর্থন করিয়াছিলেন।"

৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার এখানকার বয়স্কাউটের সদর আপিসে যাই। আমার পরম সুহৃদ্, উৎসাহের প্রতিমূর্তি শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ বঙ্গীয় বয়স্কাউট সঙ্ঘের প্রাদেশিক কমিশনার। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বয়স্কাউট সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষের সহিত বঙ্গীয় সঙ্ঘের সংযোগ স্থাপন মানসে বঙ্গীয় সঙ্ঘের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি লণ্ডনে আন্তর্জাতিক স্কাউট সঙ্ঘের সভাপতি কর্ণেল উইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি কলিকাতার স্কাউট-সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ঘোষ মহাশয়ের গুরু। আমার নিকট কলিকাতার এবং বিশেষতঃ ঘোষ মহাশয়ের কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। আগামী জাম্বুরীতে ঘোষ মহাশয়ের যোগ দিবার সম্ভাবনা আছে শুনিয়া তিনি খুবই উৎফুল্ল হইলেন। মার্কিন স্কাউটের ডাক্তার রে ও ওয়াইল্যাণ্ডের নিকট তিনি আমাকে একটি পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। সেইটি লইয়াই এখানে আসিয়াছিলাম। সেদিন ওয়াইল্যাণ্ড মহাশয় অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহকারী টম্‌চীন্ পরম যত্নে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। দেখিলাম কর্ণেল উইলসনের উপর ইঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা। চীন্ মহাশয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হইল। ইনি বলিলেন, "আমেরিকার হাতে আজ বিশ্বনেতৃত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত শিক্ষা তাহার নাই। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের বহু দিনের শিক্ষা। কিন্তু তাহার হাত থেকে আজ বিশ্বনেতৃত্ব চলিয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে আমেরিকার শিক্ষা লইতেই হইবে।" আগামী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন সম্বন্ধে বলিলেন, "ট্যাফ্‌ট যদি দাঁড়ান এবং নির্বাচিত হন তবে সব চেয়ে ভাল হয়। ইঁহার পিতা প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ইনি নানা সদ্‌গুণে ভূষিত। বর্তমান বিশ্বে আমেরিকার নেতৃত্ব করিবার পক্ষে ইনি যোগ্যতম ব্যক্তি।" দেখিলাম দেশের বালকদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী হিসাবে স্কাউটিংএর উপর ইহাদের অগাধ বিশ্বাস।

চীন্ মহাশয় আমাকে হাউয়ার্ড আর. প্যাটনের নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। ইনি বিশ্ব-বন্ধুত্ব তহবিলের ডিরেক্টর। তাঁহার সহৃদয় ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইলাম। এক এক করিয়া সমস্ত পদস্থ কর্মচারীর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিলেন। ইঁহাদের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আমাকে বলিলেন। আপিসের যাবতীয় বিভাগ আমাকে দেখাইলেন। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠানটি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। লণ্ডনে কর্ণেল উইলসনের আপিসে দেখিয়াছি তিনি নিজে একটি সেক্রেটারী লইয়া কাজ করেন। আপিসে দেখিতেছি ৬০০ কর্মচারী। যন্ত্রের ব্যবহারও যথেষ্ট। সমগ্র আমেরিকার স্কাউট-সঙ্ঘগুলি বৎসরে ৮০ লক্ষ ডলার ব্যয় করে। তন্মধ্যে এই আপিসের মারফত খরচ হয় ১৫ লক্ষ ডলার। এ দেশে ২০ লক্ষ স্কাউট আছে। এ দেশে যত লোক যুদ্ধে গিয়াছিল তাহার শতকরা ২৫ জন স্কাউট। এই শতকরা ২৫ জন পুরস্কার ও সম্মানাদির শতকরা ৪০ ভাগ লাভ করিয়াছিল। স্কাউট-সঙ্ঘ তাহাদের এই বিশিষ্টতায় বিশেষ গৌরব বোধ করে।

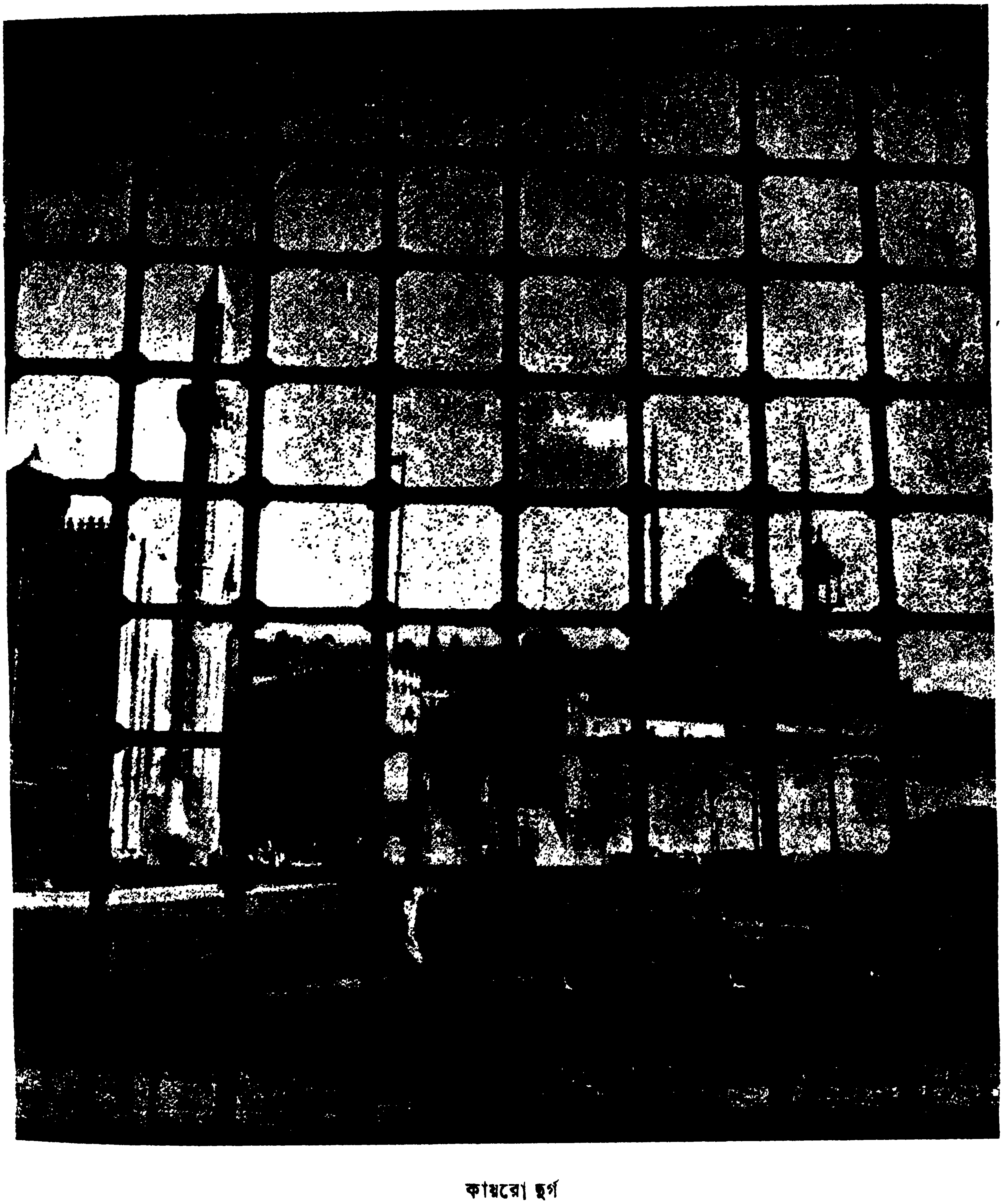

কায়রো দুর্গ
এইখানে আরবদিগের পক্ষ হইতে যুদ্ধবিরতির সূচনা করা হয়

প্যালেষ্টাইনের হাইফা বন্দর। ইহা আরব ইহুদী উভয় পক্ষের কাম্য

মিশরের আলেকজাণ্ডিয়া নগরী ও বন্দর। ইহাই আরবদিগের অন্ততম অভিযান-কেন্দ্র

প্যাটন মহাশয় তাঁহাদের প্রচারিত পুস্তকাবলী কলিকাতার স্কাউট-সঙ্ঘের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে শুনিয়াছিলাম যে তাঁহারা এত পুস্তক পাঠাইয়াছেন ও পাঠাইতেছেন যে কলিকাতার স্কাউট আপিসের কর্ণধারগণের পক্ষে তা ছিল সম্পূর্ণ অভাবনীয়।

প্যাটন মহাশয় বলিলেন, "সকল জাতির প্রতিনিধির সহিতই আমার সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু যে কয়েকটি জাতির বুদ্ধিমত্তা আমাকে চমৎকৃত করিয়াছে ভারতবর্ষ তাহাদের অন্যতম। গ্রীস, চীন এবং কোরিয়ার লোকেরাও অনুরূপ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন।

প্যাটন মহাশয় আমাকে পরদিন একটি প্রাতরাশের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করিলেন। বলিলেন, "বহু জাতির প্রতিনিধি এই প্রাতরাশে উপস্থিত থাকিবেন। ভারতবর্ষের কেহই নাই। আপনি আসিয়া পড়িয়াছেন ভালই হইয়াছে। আপনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।" পরদিন প্রাতরাশের পূর্বেই আমাকে অটোয়া রওনা হইতে হইবে। কাজেই দুঃখের সহিত নিমন্ত্রণটি প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলাম।

স্বদেশী যুগের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী তারকনাথ দাস মহাশয়ের দর্শনলাভেচ্ছায় তাঁহার নিকট টেলিফোনে একটু সময় চাহিয়া লইয়াছিলাম। তদনুসারে নৈশ ভোজনান্তে রাত্রি আটটায় তাঁহার হোটেলে উপস্থিত হইলাম। ব্রডওয়ে এবং ৭৩তম ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে 'হোটেল এনসোনিয়ার' ১৫৯২ নম্বর ঘরে অর্থাৎ ১৬ তলার ৯২ নং ঘরে তিনি সস্ত্রীক বাস করিতেছেন। শুভ্রকেশ উজ্জ্বল-চক্ষু বৃদ্ধ আমাকে দেখিয়াই 'বন্দেমাতরম্' শব্দে অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। তদীয় গৃহিণীকে আরও বেশী শ্রদ্ধা দেখাইতেছিল। ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী লইয়া আলাপ হইল। দেখিলাম দাস মহাশয় বহু বিষয়ে অধুনাতম সংবাদসমূহ রীতিমত সংগ্রহ করেন। যাদবপুর কলেজ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের একটি চিঠিতে কলেজের অনেকগুলি সমস্যার কথা উত্থাপন করা হইয়াছে। সেগুলি উল্লেখ করিলেন। আমাদের দেশে সরকারী সাহায্য সরকারী হস্তক্ষেপের অজুহাত হইয়া দাঁড়ায়। সে হস্তক্ষেপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নতির জন্য না করিয়া বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য করা হয়। এরূপ কেন হয়? তিনি অভিযোগ করিলেন, "আমাদের দেশের ধনী ব্যক্তিগণ শিক্ষার জন্য দান করেন না কেন? সাধারণ উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরাই বা তাহাদের আয়ের কিয়দংশ, অন্তত: একটি বা দুইটি ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য দান করেন না কেন?"

আমি—আমাদের দেশে শিক্ষার জন্য দানের অভাব আছে কি? শিক্ষার উন্নতিকল্পে রাসবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিতের বদান্যতার কথা তো সুবিদিত। পি. সি. রায় কি করিয়া গিয়াছেন? তাঁহার সমস্ত বেতন তো তিনি এই জন্যই দিয়া গিয়াছেন? শিক্ষার্থীকে স্থান, আহার প্রভৃতি দানে সাহায্য করায় কোন দিনই কি আমাদের দেশের লোক পরাঙ্মুখ ছিল?

দাস মহাশয়—কিন্তু এখন তো সেরূপ দেখি না। এদেশের উচ্চশিক্ষা বেশীর ভাগই ব্যক্তিগত দানে। এই সেদিন জেনারেল মোটরের ম্যানেজার খুব বড় রকমের একটি দান করিলেন। তিনি বাল্যে সামান্য কারিগর রূপে ঐ কারখানায় কাজ সুরু করেন। আজ তিনি জেনারেল ম্যানেজার। তিনি বলেন, স্বাধীন ব্যক্তিগত উদ্যোগের দ্বারা ব্যক্তির প্রতিভা-স্ফুরণের সম্পূর্ণ অবকাশ এদেশে আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। উদ্যোগী পুরুষ-সিংহগণই দেশে দেশে লক্ষ্মীশ্রী আনিয়াছেন। তাই আজ পৃথিবীর এত উন্নতি। আটলান্টিকের ওপারে সংবাদ-প্রেরণ পূর্বে অসাধ্য ছিল। আজ তাহা সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ত। কয়েকটি ডলার ব্যয়ে যে-কোন লোক ইহা পাঠাইতে পারেন। আজ আমেরিকার দীনতম লোক যে সুযোগ ও সুখ-সুবিধার অধিকারী, পূর্বে তাহা রাজারাজড়ারও অপ্রাপ্য ছিল। ইহা সমস্তই স্বাধীন ব্যক্তিগত উদ্যমের ফল। কাজেই তিনি ব্যক্তিগত উদ্যমের ইকনমিক্স্ পড়াইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদ প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু টাকা দান করিতে যাইতেছেন।

আমি—ইহা প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ধনী আমেরিকার সঙ্গে দরিদ্র ভারতের তুলনা সাবধানে করা উচিত। ইহাও অবশ্য সত্য যে বর্তমানে ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে দানের উৎস যেন শুকাইয়া যাইতেছে। কেন এমন হইতেছে? শুধু দারিদ্র্যই ইহার কারণ নাও হইতে পারে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাও হয়তো ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। যে জন্য দান করিলাম সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কিনা সে সন্দেহও হয়তো লোকের মনে আজ উঠিতেছে। সাম্প্রদায়িক বিষে আজ দেশ জর্জরিত।

ভারতীয় সংবাদপত্রের কথা উঠিল। আনন্দবাজার প্রভৃতি বাংলা সংবাদপত্রের সৌষ্ঠব ও প্রচারের কথা শুনিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, এরা তো দেশের অনেক কাজ করিতে পারে। এখানকার 'নিউ ইয়র্ক টাইম্স্' তো একটি সাম্রাজ্যবিশেষ। বাংলাদেশের এক একটি বড় পত্রিকা দরিদ্র ছাত্রদের জন্য প্রতি জেলায় একটি করিয়া বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিতে পারে। ইহাতে শিক্ষার উন্নতি হয়, খরচও বেশী নয়, পত্রিকারও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

ভারত বিভাগের কথা উঠিতে বৃদ্ধ গর্জন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সংক্ষেপে এবং দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "যাহারা ধ্যানে বা জ্ঞানে, জাগ্রতে বা স্বপ্নে ভারতমাতার স্বাধীন মূর্তি একবারও দর্শন করিয়াছে তাহারা কিছুতেই ভারত বিভাগের কথা চিন্তা করিতে পারিবে না।"

বৃদ্ধ আমার সঙ্গে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া 'বন্দেমারতম্' শব্দে বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া ঘরে ফিরিলেন। ভাবিলাম, বৃদ্ধের বিশ্বাস কি সরল ও দৃঢ়! ভারতমাতার যে হাস্যমণ্ডিত অখণ্ড রূপ ইনি এখানে বসিয়া ধ্যান করেন তাহা যে আজ কত পরিবর্তিত, দূরে বসিয়া তাহা হয়তো ইঁহার অজ্ঞাত। আজ দেশে ফিরিলে অনশন-ক্লিষ্ট সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত ভারত-মাতাকে ইনি চিনিতে পারিবেন কি?

স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রভাষা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণে ভারত-মহাসাগরে অনেকগুলি ছোট-বড় দ্বীপ আছে। সমগ্রভাবে এ সকলের বর্ত্তমান নূতন নাম ইন্দোনেশিয়া। দ্বীপগুলির মধ্যে সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস বড় বড় দ্বীপ। ছোটগুলির মধ্যে বলী, মদুরা, তিমোর মলাক্কা, লম্বক আমাদের খুব পরিচিত। ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে এছাড়া আরও অনেকগুলি ছোট ও মাঝারি দ্বীপ পড়ে। দ্বীপগুলি পর্ব্বতময় এবং একটি পর্ব্বতমালার অন্তর্গত। এককালে মালয় থেকে আরম্ভ করে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত একটা বিরাট্ মালভূমি ছিল। কালক্রমে তার অনেক অংশ ভেঙেচুরে ভারতমহাসাগরে ডুবে গিয়েছে। যে যে অংশ এখনও উঁচু রয়েছে, সেইগুলিই এখন এক একটা দ্বীপে পরিণত হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে যারা বাস করে তারা মালয়ীজাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের ভাষাও পুরাতন মালয়ী ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এ সমস্ত ভাষা মূলে এক হলেও এদের পরস্পরের মধ্যে এখন অনেক তফাৎ দাঁড়িয়ে গেছে। তা হলেও এক মালয়ী ভাষার সাহায্যে সমস্ত দ্বীপেই কাজকর্ম্ম চালিয়ে নেওয়া যায়।

পূর্ব্বকালে সমুদ্রপথে ঘুরে বেড়ান ছিল মালয়ীদের স্বভাব। তারা মালয় থেকে সমুদ্রপথে এসে এই দ্বীপগুলিতে বাস করতে আরম্ভ করে। তাদের মালয়ী ভাষাও সেই সঙ্গে এখানে আমদানি হয়।

যে মালয়ী ভাষা থেকে বর্ত্তমান ইন্দোনেশীয় ভাষার উৎপত্তি হয়েছে তার শব্দকোষে অনেক সংস্কৃত, আরবী, ফারসী শব্দ আছে—কিছু তাদের পুরনো রূপে, আর কিছু বিকৃত হয়ে। এ ছাড়া আছে প্রচুর পর্ত্তুগীজ, ইংরেজী ও ওলন্দাজ ভাষার শব্দ।

পুরাকালে আরব, ইরাণী, ভারতীয় এবং চীনা ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে আসে। তারা এদের সঙ্গে আদান-প্রদান ব্যাপারে মালয়ী ভাষাই ব্যবহার করত। সে হিসাবে তৎকালে এখানে মালয়ী ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার কাজ করত। বাণিজ্যসূত্রে ইউরোপীয়েরা এখানে আসে ষোড়শ শতাব্দীতে। তাদেরও কাজকর্ম্ম চালাতে হ'ত মালয়ী ভাষায়। তাতে দ্বীপগুলিতে মালয়ী ভাষা আরও বিস্তৃতিলাভ করে।

ভাষা হিসাবে মালয়ী ভাষার রীতি ও প্রকৃতি খুবই সহজ, সরল। বাঁধাধরা বা জটিল ব্যাকরণের খুঁটিনাটি এতে নাই। সেটা ভাষার অপূর্ণতা হলেও মোটামুটি খানিকটা শিখে নিয়ে তা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া বিদেশীর পক্ষে কঠিন হ'ত না।

ইন্দোনেশিয়াবাসীর জাতীয়তাবোধও উদ্দীপ্ত হয়েছে এই মালয়ী ভাষার ভিতর দিয়ে। পরে তারা জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির পথে এক দিন যেমন তাদের 'নেদারল্যাণ্ড ঈষ্ট ইণ্ডিজ' নাম পরিত্যাগ করে নতুন নাম নিলে ইন্দোনেশিয়া, তেমনি সেই সঙ্গে মালয়ী ভাষা ছেড়ে দিয়ে স্থানীয় এক কথ্য ভাষাকে তাদের জাতীয় ভাষা বলে গ্রহণ করলে এবং এই ভাষাকে তারা নানা রকমে সমৃদ্ধিশালী করতে লেগে গেল।

ইন্দোনেশীয় ভাষার সঙ্গে মালয়ী ভাষার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ—যেমন সংস্কৃতের সঙ্গে আমাদের বাংলার। এর ব্যাকরণ মালয়ী ভাষার ব্যাকরণের আদর্শে রচিত হলেও অন্যান্য ভাষা থেকে নূতন নূতন শব্দ গ্রহণ সম্বন্ধে এই ভাষা সম্পূর্ণ স্বাধীন, এর ব্যাকরণের বাঁধনও অনেক শিথিল।

মালয়ী ভাষা থেকে ইন্দোনেশীয় ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করার পর হতে উক্ত ভাষার দ্রুত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়ে গেল—ধাপে ধাপে উন্নতিও হতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীর পর থেকে ইন্দোনেশীয়দের জাতীয় আন্দোলনের সব রকম প্রচারকার্য্য এই ভাষাতেই হতে লাগল।

১৯১৬ সালে হেগে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের এক ঔপনিবেশিক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে তামান্ শিশ্ওয়া স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কি হাজার দেওয়ান্তারা উপস্থিত ছিলেন। ইন্দোনেশিয়ায় প্রচলিত মালয়ী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে ইন্দোনেশীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের উপর তিনি খুব

জোর দেন। তাঁর সে প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয় নি। তিনিই প্রথম তাঁর স্কুলে ইন্দোনেশীয় ভাষাকে মুখ্য স্থান দেন। এর পর ১৯২৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার যুবসঙ্ঘ চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে যে, তারা এক জাতি এবং তাদের এক ভাষা। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের বা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় ভাষা যাই হোক, ইন্দোনেশীয় ভাষা হবে তাদের জাতীয় ভাষা। সেই থেকে ইন্দোনেশিয়ার সকলেই তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম্মে ইন্দোনেশীয় ভাষা ব্যবহার করে এবং এই ভাষাকেও তারা তাদের জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার করে আসছে। নূতন শব্দও সেই থেকে ইন্দোনেশীয় ভাষার মধ্যে আরও বেশী আমদানি হচ্ছে। সে তার জননীস্বরূপা মালয়ী ভাষা থেকে একেবারে আলাদা হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল। আগেকার ইন্দোনেশীয় ভাষা, যা ছিল একটা প্রাদেশিক ভাষা, মাত্র কয়েক হাজার লোকের ভাষা, এখন তা হ'ল কয়েক কোটি লোকের জাতীয় ভাষা।

ওলন্দাজ সরকারের আমলে সরকারী তত্ত্বাবধানে ১৯০৮ সালে "বালাই পুস্তাকা" নাম দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সেখান থেকে যে সকল বই ছাপা হ'ত তা সমস্তই মালয়ী ভাষায়—পাঠ্যপুস্তক। এ হ'ল কেতাবী ভাষা—কথ্য ভাষা নয়। তা ছাড়া এই "বালাই পুস্তাকা" থেকে রাজনীতি বা ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন বই ছাপা হতে পারত না—সরকারের নিষেধ ছিল। কবি এবং সাহিত্যিকদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁদের মালয়ী ভাষাতেই লিখতে হ'ত। তা না হলে তাঁদের লেখা "বালাই পুস্তাকা" থেকে ছাপিয়ে বের করা যেত না। জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোনেশীয় ভাষায় স্বতন্ত্র ভাবে বই ছাপান আরম্ভ হ'ল—বিশেষ করে রাজনীতি ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বই। ১৯৩৩ সালে ইন্দোনেশীয় ভাষায় ইন্দোনেশীয়দের প্রথম মাসিকপত্র বেরল "পুজাংগা বারু"। চিন্তাশীল রাজনীতিক, প্রতিভাবান সাহিত্যিক, কবি, সকলেই এই মাসিকপত্রে ইন্দোনেশীয় ভাষায় লিখতে আরম্ভ করলেন। ভাষা আর একটা বড় ধাপে উন্নীত হ'ল।

সকল দেশেই যেমন রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বেধে থাকে, ইন্দোনেশিয়ায় ভাষার ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এখানেও পুরাতনপন্থী মালয়ী ভক্তদের সঙ্গে নূতন দলের বিরোধ উপস্থিত হয়। ইন্দোনেশীয় ভাষাকে তাঁরা প্রাকৃতজনের ভাষা বলে অবজ্ঞা করতেন। মালয়ী ভাষাই ছিল তাঁদের কাছে আভিজাত্যের ভাষা। এঁরা শিক্ষকগোষ্ঠী—ইন্দোনেশীয় ভাষাকে প্রশ্রয় দেওয়া একেবারেই পছন্দ করেন নি। তাঁদের মতে কথা বলার ভাষা লিখবার ভাষার পর্য্যায়ে উঠবে সে ত সৃষ্টিছাড়া অরাজক কাণ্ড। প্রথমটায় তাঁরা খুব বাধা দিলেন। তাতে কোন ফল হ'ল না। কারণ তরুণ দলের এই আন্দোলনের মূলে ছিল তাদের স্বদেশপ্রেম। ইন্দোনেশীয় ভাষা হ'ল তাদের নিজের দেশের ভাষা—জাতীয় ভাষা।

বাধা দিয়ে কোন ফল হ'ল না দেখে, মালয়ীভক্তরা ইন্দোনেশীয় ভাষাকে উপেক্ষা করে চলতে লাগলেন। এই উপেক্ষা এবং অবজ্ঞার অবসরে তরুণেরা তাদের জাতীয় ভাষায় প্রয়োজনমত বিদেশী শব্দ গ্রহণ করে তাকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে লাগল। রাজনৈতিক প্রবন্ধ, প্রচারপত্র ইন্দোনেশীয় ভাষায় লেখা হতে লাগল, সভাসমিতিতে ইন্দোনেশীয় ভাষার ব্যবহার হতে লাগল এবং উপন্যাসও প্রকাশিত হ'ল এই ভাষায়।

১৯৪২ সালে গত মহাযুদ্ধে ওলন্দাজেরা জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করার ফলে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলি জাপানীদের হাতে গিয়ে পড়ল। ঐ সকল দ্বীপের উপর থেকে ওলন্দাজ আধিপত্য অন্তর্হিত হবার সঙ্গে সঙ্গে, ভাষার অগ্রগতির পথে তারা যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে আসছিল তাও লোপ পেল। উক্ত দ্বীপসমূহ অধিকার করে তাদের শাসন-কার্য্য চালাতে জাপানীদের ইন্দোনেশীয় ভাষা গ্রহণ করতে হ'ল। স্থানীয় লোকদের জাপানীভাষা শিখিয়ে নিয়ে তার পর কদ্বীপের কাজকর্ম্ম চালানো সম্ভবপর ছিল না। কাজেই তারা ইন্দোনেশীয় ভাষাকে সরকারী ভাষা বলে স্বীকার করে নিলে এবং সরকারী স্কুল কলেজে ঐ ভাষা শেখাবার বন্দোবস্ত করলে। ওলন্দাজ ও ইংরেজী ভাষার ব্যবহার জাপানীরা দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করলে। অবশ্য ভিতরে ভিতরে জাপানীদের মতলব ছিল, যত দিন কিছু পরিমাণ স্থানীয় লোক কাজকর্ম্ম চালাবার মত জাপানী না শিখছে তত দিন ঐ ভাষাই চলুক, তার পর ক্রমে ইন্দোনেশীয় ভাষাকে বিদায় করে দেওয়া যাবে।

নবীন ইন্দোনেশীয়গণ এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলে—তারা ভাষার আরও উন্নতি করে নিলে। তারপর জাপানীরা যুদ্ধে হেরে দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে গেলে তথাকার লোকেরা এবং তাদের ভাষা স্বাধীন জাতি ও স্বাধীন জাতির ভাষার মর্য্যাদা লাভ করলে। এটা আনুষ্ঠানিক ভাবে হয় ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগষ্ট। ঐ তারিখে ইন্দোনেশীয়েরা নিজেদের স্বাধীন জাতি বলে ঘোষণা করে।

ইন্দোনেশীয় ভাষা সাধারণতঃ রোমান অক্ষরে লেখা হয়, আরবী অক্ষরেও হয় যদিও খুব কম। নীচে ইন্দোনেশীয়দের জাতীয় সঙ্গীতের কিয়দংশ বাংলা অক্ষরে দেওয়া গেল।

ইন্দোনেসিয়া তানাঃ আইকু,
তানাঃ তুম্পাঃ দারাকু,
দিসানালাঃ আকু বেরদিরি,
জাদি পান্দু ইবুকু।
ইন্দোনেসিয়া কেবাঙ সাকু,

বাঞ্জ্সা দাম্ তানা: আইর্,
মারিলা: কিতা বেসের্,
ইন্দোনেসিয়া বেস্র্তু।
ইন্দুপ্লা: তানা:কু,
ইন্দুপ্লা: নেগেরিকু,
বাঞ্জ্সাকু, রাক্যাৎকু, সেম' ওয়াপ্পা
বাঙুনলা: জিওয়াপ্পা,
বাঙুনলা: বাদাপ্পা,
উন্তুক্ ইন্দোনেসিয়া রায়া।
ধুয়া। ইন্দোনেসিয়া রায়া মের্দেকা মের্দেকা,
তানা:কু নেগেরিকু যাঙ্ কুচিন্তা,
ইন্দোনেসিয়া রায়া মের্দেকা মের্দেকা,
ইন্দুপ্লা: ইন্দোনেসিয়া রায়া।

এর বাংলা মর্ম্মানুবাদ এই রকম—

ইন্দোনেশিয়া আমার মাতৃভূমি,
আমার জন্মভূমি,
আমি সেই দেশে দাঁড়িয়ে আছি,
তাকে পাহারা দিতে।
ইন্দোনেশিয়া এই আমার জাতি,
আমার জাতি, আমার দেশ,
সকলকে আহ্বান করে,
এস এক হয়ে দাঁড়াই।

দীর্ঘায়ু হোক আমার মাতৃভূমি,
দীর্ঘায়ু হোক আমার স্বদেশ
আমার জাতি, আমার জনগণ, আমার সকল,
আত্মা তার জাগো,
ওঠো আমার দেশ,
গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া।
ধুয়া। গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন মুক্ত,
আমার মাতৃভূমি, আমার দেশ, যাকে আমি ভালবাসি,
গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া, স্বাধীন মুক্ত,
দীর্ঘায়ু হোক, গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া।

[এই প্রবন্ধ রচনা করতে 'ইন্দোনেশিয়ান ইন্‌ফরমেশন্ সার্ভিসের' মুখপত্র 'মের্দেকা'য় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। জাতীয় সঙ্গীত বাংলা অক্ষরে লিখতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহায্য করেছেন]

১৩৫৫

শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেন শর্ম্মা

তেরশো পঞ্চান্ন সাল, পূর্বের গগনে এল—
যাত্রাপথে তরী,
বন্দরে বন্দরে, নব তরঙ্গের স্বপ্ন তারে দিক
মণিমুক্তা ভরি;
ভারতের সপ্তডিঙা, রত্নরাগে—আবার ভরুক,
কনক ধান্যের;
অতীতের রক্তরেখা, লুপ্ত করি' জাগুক উৎসব—
মধু নবান্নের।
সঙ্কীর্ণ, সঙ্গীন পথ—অনেক করেছি অতিক্রম,
...সঙ্গে যারা ছিল—
রক্তের অঞ্জলি ভরি, মানবাত্মা-অনির্ব্বাণ শিখা...
তারা জ্বেলে দিল।
ভুলি নি তাদের বন্ধু, সাতারা...মেদিনীপুর...
ভুলি নি, ভুলি নি—
মণিপুর-প্রান্তরের, সূর্যকরোজ্জ্বল ধ্বজা—
চিনি তারে চিনি।
প্রভাত-মধ্যাহ্ন পরে, ছায়াপথে, বর্ষেতে বর্ষেতে—
সাবিত্রী ধরণী;
ঋতুচক্র-আবর্তনে, ফাল্গুন চৈতালী চলে যায়—
অক্ষমালা গণি,
কাঁদা-হাসা, ভালবাসা, উৎকেন্দ্র মনেরে তুচ্ছ করি—
যাত্রা তার চলে,
তেরশো পঞ্চান্ন সাল, বঙ্গের অঙ্গনে এল—
...সূর্য আরো জ্বলে।
মনেরো মঞ্জুষা 'পরে, বহ্নিশিখা দীপ্তিমান জাগে—
আরো অভ্রলেহী,
মানবের, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সে...ব্যথায় কাঁদিছে—
দেহি, মুক্তি দেহি'...
অনেক রক্তেতে ভেজা, সুশুভ্র কঙ্কাল বেদী 'পরে
নতুন বাণীর—
হে রুদ্র, শোনাও গান, সঞ্জীবনী অভয়মন্ত্রের,
দক্ষিণ পাণির।
আশীর্বাদ ঝরি পড়ে,...প্রথম স্বাধীন সূর্য—
স্বাধীন আকাশে,
বন্দরে তরঙ্গগানে, আগামীর হাতছানি...
সুর ভেসে আসে।
রিক্তহাতে, দীপ্তবুকে, তেরশো পঞ্চান্ন সালে মাগি
—বিশ্বের কল্যাণ;
হে রুদ্র, এবার ভরো, ক্লান্তচিতে 'সত্য আর শিব-
সুন্দরের' ধ্যান।

মহাত্মা গান্ধী ও বাংলার রাজনীতি

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নানা দেশে নানা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহাপুরুষের জন্ম দেশ বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ কথা সত্য। কিন্তু একথাও সত্য—মহাত্মা গান্ধীর জন্ম ভারতবর্ষেই সম্ভব। ইহার অর্থ এই নয় যে ভারতবর্ষ এক অভিনব দেশ, দেবানুগৃহীত দেশ। এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য, ভারতের মৃত্তিকা মহামহীরুহের জন্ম ও পরিপুষ্টির জন্য যুগযুগান্তর হইতে প্রস্তুত হইয়া আছে।

মহেঞ্জোদারো বা তাহারও পূর্ব্বের যুগ হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতা প্রবহমাণ। বহু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভারতে জন্মিয়াছে, বহুবিধ ধর্ম্মমত এখানে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, জরথুস্ত্রীয়, খ্রীষ্টান, ইসলাম, শিখ প্রভৃতি ধর্ম্ম এখানে স্থায়ী হইয়াছে। একই ধর্ম্মের নানা শাখা বিভিন্ন মত লইয়া পরীক্ষা করিয়াছে। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব বিভিন্ন দিক হইতে সত্যের সন্ধান করিয়াছে। তন্ত্রের প্রভাব হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মে সমান ভাবে পড়িয়াছে।

এ সব সত্ত্বেও দেখিতে পাই—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী হোক, বৌদ্ধ হোক, জৈন হোক, যে-কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক অথবা সংস্কারক অথবা ঋষি অথবা সাধক সত্যকে তত্ত্বের মধ্যে রাখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজের জীবনে তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, ত্যাগ করিয়াছেন, কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই—আনন্দের সঙ্গে দুঃখকে বরণ করিয়াছেন। দিগম্বর জৈনদের কথাই ধরা যাক। শীতাতপকে তাহারা অগ্রাহ্য করে, আহারে বিশ্রামে বাক্যে কর্ম্মে কৃচ্ছ্রতা-সাধনই তাহাদের অভ্যস্ত ব্যাপার।

ইহাই ভারতবর্ষের ঐতিহ্য। গান্ধীজীও যখন জীবনে নানা ভাবে সত্যকে লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের ছয় সহস্র বর্ষের ঐতিহ্যই তাহার মধ্যে কাজ করিয়াছে।

জৈন ধর্ম্মের কথা বলিতেছিলাম। গৃহী জৈন—বিশেষতঃ বর্ষীয়সী জৈন মহিলারা—আজ পর্য্যন্ত অল্প কৃচ্ছ্রতা সাধন করেন না। উপবাস অর্থাৎ অনশন ত লাগিয়াই আছে, মাসের মধ্যে চার পাঁচ দিন মৌনব্রতও তাঁহারা পালন করেন। জৈন ধর্ম্মের মূল মন্ত্র—অহিংসা পরমো ধর্ম্ম। এই অহিংসা বৌদ্ধ অহিংসা হইতে কঠোরতর। শুধু মানুষ নয়—দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রাণিজগৎ জৈনের নিকট এই অহিংস আচরণ হইতে বঞ্চিত হয় না। গান্ধীজীর জন্ম গুর্জ্জরে। গুজরাটে জৈনপ্রভাব অল্প নয়। প্রতিবেশ-প্রভাবে শৈশব হইতেই গান্ধীজী অহিংসাপন্থী। বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের বাণী ও জীবন-সাধনা পরবর্ত্তীকালে তাঁহার অন্তরে এই অহিংসা-তত্ত্বকে দৃঢ়মূল করিয়া তুলিয়াছিল। অন্য প্রদেশে জন্মিলে গান্ধীজীর অহিংসা হয়ত অন্য আকার ধারণ করিত। কিন্তু তাহা অনুমান ও কল্পনার কথা। বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম আছে, জৈন প্রভাব নাই।

বাংলা শতবর্ষ ধরিয়া স্বাধীনতার সাধনা করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনে এই ধারা বিরাট রূপ পরিগ্রহ করে। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল পর্য্যন্ত কাব্যে এই ধারাকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এই দেশপ্রেমকে ধর্ম্মে পরিণত করেন। তিনি মন্ত্রবিৎ। 'বন্দেমাতরম্' দেশাত্মবোধের এক অপূর্ব্ব মন্ত্র। বঙ্কিম-সাহিত্য দেশপ্রীতির সাহিত্য। বাঙালী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পত্রাবলী এবং অন্যান্য রচনার মধ্যে সেই একই ধারার সন্ধান পাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের 'উপক্রমণিকা'য় আছে—

"অতি বিস্তৃত অরণ্য। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূন্য।··· সেই অনন্তশূন্য অরণ্য মধ্যে, সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব্দ হইল,

—"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

শব্দ হইয়া আবার সেই অরণ্যানী নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল।··· এইরূপ তিন বার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?"

প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল, "ভক্তি।"

বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রীতির দর্শনকার। এই ভক্তি কি?

গান্ধীজী 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও জানিতেন জীবন তুচ্ছ। চাই ভক্তি।

এইখানে গান্ধীজীর সহিত বাংলার মিল। এই ঐক্যের অনুভূতিতেই বাংলায় বিশেষতঃ মেদিনীপুরে সত্যাগ্রহ অপূর্ব্ব সাফল্যলাভ করিয়াছিল। এইজন্যই বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের অবসান ঘটাইতে গান্ধীজীকে বেগ পাইতে হয় নাই।

মূলগত আদর্শে যেমন ঐক্য আছে, তেমনি এক প্রভেদও আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তিবাদ ও গান্ধীজীর ভক্তিবাদ এক নয়।

২

'ধর্ম্মতত্ত্ব' বা 'অনুশীলনে' বঙ্কিমচন্দ্র এই ভক্তি কি তাহা বুঝাইয়াছেন।

"ভক্তি" কথাটা হিন্দুধর্ম্মে বড় গুরুতর অর্থবাচক।...

যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয় সেই অবস্থাই ভক্তি।...

সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।...

দেশভক্তির কথা ধরিতে হইলে অবশ্য বলিতে হইবে, সকল বৃত্তিকে দেশাভিমুখিনী করিতে হইবে। "যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।"

শিষ্যের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। শিষ্য বলিতেছে,

"সকল বৃত্তিগুলিই কি ঈশ্বরগামী করা যায়? ক্রোধ একটা বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী করা যায়?"

গুরু বলিতেছেন, "জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগীতি তোমার স্মরণ হয়?

ক্রোধং প্রভো সংহরসংহরেতি,
যাবৎ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনঞ্চকার॥

এই ক্রোধ মহা পবিত্র ক্রোধ।...ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ।"

এখানে মহাত্মা বলিবেন, 'অক্রোধেন ক্রোধং জিনে।'

এখানেও কিন্তু গান্ধীজী ও বঙ্কিমচন্দ্রে মূলতঃ প্রভেদ নাই। প্রভেদ অন্যত্র। এই ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইতে বঙ্কিমচন্দ্র গীতার কথা আনিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "যুদ্ধ মাত্র যে পাপ নহে এ কথা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি।"* বলিতেছেন, "আত্মরক্ষার্থ ও স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্মমধ্যে গণ্য।"†

৩

মহাত্মা কোন অবস্থাতেই যুদ্ধের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার নিকট সত্য ও অহিংসা অভিন্ন।

"Truth and non-violence are synonymous with God, and whatever we do is nothing worth apart from them."

অহিংসার মধ্য দিয়া দেশের স্বাধীনতা যদি না আসে মহাত্মা সে স্বাধীনতা কামনা করেন না।

১৯০৮ সালে স্বদেশী আন্দোলন যখন বাংলায় চরমে উঠিয়াছে তখন মহাত্মা একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থের নাম, *Hind Swaraj or Indian Home Rule.* তখনকার দিনের স্বাধীনতাকামীরা যে সব কথা বলিতেন তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মহাত্মা নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী, অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্র-তন্ত্র কিছুই চাহেন নাই। তিনি তখনকার দেশহিতৈষীদের কাম্য দেশপ্রগতির প্রচলিত উপায়গুলিকে পরিহার করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

বাংলার পথ বঙ্কিমচন্দ্রের পথ। বঙ্কিমের অনুসরণে সেদিনের দেশভক্তেরা গীতাপন্থী ছিলেন। গান্ধীজীও গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু যুদ্ধই ত গীতার পটভূমিকা। যুদ্ধকে বাদ দিলে গীতা দাঁড়াইবে কোথায়? কিন্তু গান্ধীজী অহিংসাবাদী। তিনি গীতার রূপক ব্যাখ্যা—allegorical interpretation প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, "মহাভারতকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ ব'লে ধরা হয়, কিন্তু আমার মতে মহাভারত ও রামায়ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয়—ধর্ম্মগ্রন্থ।...দেব ও দানব, রাম ও রাবণের ভিতর প্রতিদিন যে সংগ্রাম চলছে, মহাভারত ও রামায়ণে তারই বর্ণনা রয়েছে।" (গীতাবোধ—প্রস্তাবনা)। প্রথম অধ্যায় ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিতেছেন, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ত নিমিত্ত মাত্র, অথবা আমাদের শরীরই প্রকৃত কুরুক্ষেত্র।"

এইখানেই বাংলার চিন্তাধারার সহিত মহাত্মার চিন্তাধারার মৌলিক প্রভেদ। গীতার সম্বন্ধে নানারূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতে পারে। গান্ধীজীই প্রস্তাবনাতে বলিতেছেন, "গীতা মহাভারতের এক ছোট অংশ।" ভারতকার স্বয়ং মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু সে কথা গৌণ। মহাত্মা অহিংসায় একান্ত বিশ্বাসী। যে শাস্ত্রে আপাত-অন্যরূপ কথা আছে, মহাত্মা অহিংসার অনুগামী করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন।

তিনি যে রামরাজ্যের কথা বলেন, তিনি অযোধ্যাধিপতি দশরথপুত্র রাবণহন্তা শ্রীরামচন্দ্র নহেন। অর্থাৎ ঐতিহাসিক শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণকেই কি আমরা পূজা করি? ইতিহাস ত দেশ-কালে আবদ্ধ। দেশ ও কালের অতীত যিনি আমরা তাঁহারই অর্চনা করি। এই হিসাবে মহাত্মার রামরাজ্য, Kingdom of God—Heaven on Earth।

---

* "আত্মরক্ষা যেমন আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম, আপনার স্ত্রীপুত্র পরিবার স্বজন কুটুম্ব প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও তাদৃশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম।... যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম্ম।...দুর্ব্বল সমাজকে বলবান সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় সর্ব্বদায়ই আছে।"—ধর্ম্মতত্ত্ব, অষ্টম অধ্যায়।—শারীরিক বৃত্তি

† গীতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,

"যুদ্ধ পরিহার করিতে পারিলে, যুদ্ধ কাহারও কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু এমন অবস্থা ঘটে যে, এই নৃশংস কার্য্য অপরিহার্য্য ও অবশ্যসম্পাদ্য হইয়া উঠে।...ধর্ম্মযুদ্ধও আছে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশরক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষার জন্যও যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এরূপ যুদ্ধে যোদ্ধার অধর্ম্ম সঞ্চয় না হইয়া পরম ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়। এখানে কেবল স্বধর্ম্মপালন নহে, অনন্ত পুণ্য সঞ্চয়।"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

৪

কোন্ নীতি সর্ব্বোত্তম—কথা ইহা নয়। মনের গোচরে অথবা অগোচরে বাংলা বঙ্কিম-নিয়ন্ত্রিত পথে চলিয়াছে। অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র কেহই এই পথকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই দেশভক্তির ক্ষেত্রে এক হইয়াও মহাত্মার মত এবং বাংলার পথ বার বার বিভিন্নমুখী হইয়াছে। মহাত্মা-নির্দ্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও দেশবন্ধুকে স্বরাজ্যদল গঠন করিতে হইয়াছে। মহাত্মার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াও নেতাজীকে দেশ হইতে দূরে সৈন্যবাহিনী গঠন করিতে হইয়াছে। এ সব সত্ত্বেও মহাত্মার মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। গান্ধীজী যে fundamental difference—মৌলিক পার্থক্যের কথা বলিয়াছেন তাহা এই।

অনেকে মনে করেন বাংলার দেশাত্মবোধ বুঝি Hindu Nationalism। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা মহাত্মা শুনাইয়াছেন। এই কার্য্যে তিনি জীবন দান করিয়াছেন। শেষজীবন বাংলার নোয়াখালীতে বাস করিয়া এই মন্ত্রই প্রচার করিবেন ইহাই ছিল তাঁহার মনোগত ইচ্ছা।

বাংলার জাতীয়তা হিন্দু জাতীয়তা নয়। এখানেও মহাত্মার সহিত বাঙালী চিন্তানায়কের কোন পার্থক্য নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে কোন কোন মুসলমান সুচক্ষে দেখেন না। সেই বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়ে কি বলিতেছেন দেখা যাক্।

"সীতারামে"র প্রথম সংস্করণের একটি পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।*

শ্যামপুরে সীতারাম একটু স্থির হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর দর্শনে সস্ত্রীক চলিলেন।...দেখিলেন মন্দির ভূগর্ভস্থ, বাহির হইতে কেবল চূড়া দেখা যায়।...সোপান সাহায্যে তাঁহারা তিন জনে মন্দিরদ্বারে অবতরণ করিলে পর, সীতারাম সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, মন্দিরদ্বারে দেবমূর্ত্তিসমীপে একজন মুসলমান বসিয়া আছে। বিস্মিত হইয়া সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বাবা তুমি?"

মুসলমান বলিল, "আমি ফকির।"

সীতারাম। মুসলমান?

ফকির। মুসলমান বটে।

সীতা। আ সর্ব্বনাশ!

ফকির। তুমি এত বড় জমীদার, হঠাৎ তোমার সর্ব্বনাশ কিসে হইল?

সীতা। ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান!

ফকির। দোষ কি বাবা! ঠাকুর কি তাতে অপবিত্র হইল?

সীতা। হইল বৈ কি। তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল?

ফকির। তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর? ইনি করেন কি?

সীতা। ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা।

ফকির। তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই।

ফকির। আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই—যিনি জগদীশ্বর তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন।

ফকির। মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই—কেবল মুসলমান ইহার মন্দিরদ্বারে বসিলেই ইনি অপবিত্র হইবেন?

ফকির। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ইনি থাকেন কোথা? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন? না, আর থাকিবার স্থান আছে?

সীতা। ইনি সর্ব্বব্যাপী; সর্ব্বঘটে সর্ব্বভূতে আছেন।

ফকির। তবে আমাতে ইনি আছেন?

সীতা। অবশ্য—তোমরা মান না কেন?

ফকির। বাবা, ইনি আমাতে অহরহ আছেন, তাহাতে ইনি অপবিত্র হইলেন না—আমি উঁহার মন্দিরের দ্বারে বসিলাম, ইহাতেই ইনি অপবিত্র হইলেন?

[এইরূপ নানা কথার পর ফকির বলিলেন]

তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ তবে এই হিন্দু মুসলমানদের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্ম্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ, পাপের রাজ্য থাকে না।

সীতা। মুসলমান রাজা প্রভেদ করিতেছে না কি?

ফকির। করিতেছে। তাই মুসলমান রাজ্য ছারেখারে যাইতেছে।...আমি মুসলমান হইয়াও হিন্দু-মুসলমানে কোন প্রভেদ করি না।

অতএব বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যারও সমাধান পাওয়া যায়।

৫

গান্ধীজী একজন আবিষ্কারক। সহনশীলতার মধ্যে যে অসীম শক্তি নিহিত আছে তাহা গান্ধীজীরই আবিষ্কার। তিনি ভারতবর্ষের এই বিপুল অপূর্ব্বপরিচিত সঞ্চিত-শক্তিকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছিলেন। এই নূতন শক্তির সন্ধান পাইয়া তিনি অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। করিলে শক্তি বিক্ষিপ্ত হইত। সত্য এক, কিন্তু সত্য বহুমুখ। বিভিন্ন দিক দিয়া সত্যের সন্ধান করিতে পারা যায়। ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে জনগণের সহিত মহাত্মা নিজেকে একীভূত করিয়াছিলেন

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

বলিয়াই জনগণকে তিনি অনুপ্রেরিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সকল সাধকই নিজেদের জীবনে সত্যকে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলার তরুণ দেশভক্তেরাও নিজেদের জীবনদানে এই সত্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মহাত্মার ত্যাগ, কারাবরণ, দুঃখবরণ এবং অবশেষে মৃত্যুবরণও—আত্মজীবনে সত্যকে উপলব্ধি করিবার অপূর্ব্ব চেষ্টা। ভারতবর্ষের ছয় সহস্র বর্ষের সাধনা এই দারুণ দুঃখনিপীড়িত দেশে মহাত্মার আবির্ভাবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। আজ স্বাধীনতার জ্যোতি মহাত্মার আদর্শকে উজ্জ্বল করুক।*

* রবিবাসরে পঠিত।

কথা-সাহিত্যের দু'একটি দিক

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বসূরিগণ বহু দিক থেকেই সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁদের মূল্যবান প্রবন্ধ-সমূহ বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু তত্ত্বনিরূপণ—গতিপ্রকৃতি নির্ণয় ছাড়াও সাহিত্য সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যায়। সেটি হ'ল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুবিধা এইটুকু নয় যে-সত্যের উপর রঙের পোঁচ একটু গাঢ় করে দেওয়া চলে, এদিকে ওদিকে কয়েকটি রেখা টেনে ছবিটাকে গ্রহণযোগ্য করা যায়। এটা সকলেরই জানা আছে যে, যে কাহিনী নিজ গুণে মনের ভেতর আসন করে না নিতে পারে—সে কাহিনী শোনবার কৌতূহল বা শোনাবার উৎসাহ কোন পক্ষেরই থাকে না। দু'পক্ষের যোগসূত্র কাহিনীর প্রাণ।

সাহিত্যের অন্য বিভাগের কথা ছেড়ে দিয়ে গল্প লেখার কথাই বলব। কারণ গল্পলেখক মাত্রেরই গল্পলেখার পিছনে কিছু অভিজ্ঞতা থাকা বিচিত্র নয় এবং একজন গল্প-রচয়িতা বলে বর্ত্তমান লেখকও তার ব্যতিক্রম নন।

এই প্রসঙ্গে দু'একটি প্রশ্ন যা প্রায়ই শুনতে হয় তার কথাই বলব। গল্প লেখবার সময় বাস্তব সত্যকে কল্পনার সঙ্গে কতটুকু গ্রহণ করি, এই প্রশ্ন বহুবার শুনতে হয় আর লেখবার সময় পাঠককে সামনে রেখে লিখি কিনা—এ বিষয়েও অনেকে জানতে চান। এই ধরণের প্রশ্ন থেকে মনে হয় যে, কাহিনী আমরা ভালবাসি চিরকাল। অপরিপক্ব বুদ্ধির স্তিমিত আলোয় যতটুকু পাই আর পূর্ণ জ্ঞানের জ্যোতিতে যা প্রভাসিত হয়, তার মধ্যে কাহিনীই সর্ব্বোত্তম—যাকে আশ্রয় করে কৌতূহল মেটে—রসপিপাসা পরিতৃপ্তি লাভ করে। সে কাহিনী জীবনজিজ্ঞাসার সমতালে যতই গতিছন্দ মেলায় ততই তা অন্তরকে অভিভূত করে—আনন্দকে পূর্ণতর করে।

এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুশর্ম্মা বা ঈসপের গল্পগুলির কথা স্বতঃই মনে পড়ে। বনের বাঘ সিংহ শৃগাল ভল্লুক, গাছের বানর পাখী বা গর্ত্তের সাপ আর জলের কুমীর এরা যখন মানুষের মত আচরণ করে মানুষের ভাষায় কথা বলে তখন তার চেয়ে কৌতুককর ব্যাপার আর কি আছে। যদিও তা হিতোপদেশ তবু তা অদ্ভুত গল্প। এর মধ্যে কতটুকু বাস্তব কতখানি বা কল্পনা এ বিচার জাগে না। যে কথা জীবজন্তুর মুখ দিয়ে বার হচ্ছে—যা তাদের আচার-আচরণে পাওয়া যাচ্ছে, যে প্রবৃত্তিবশত তারা চলাফেরা করছে তা মানুষের অন্তর্নিহিত সত্যকেই প্রকাশ করছে। অন্তঃসন্ধানী দৃষ্টি না থাকলে এমন মনোহর কাহিনীগুলির সৃষ্টি হ'ত না। বাস্তব অনুভূতির দিক দিয়ে ঈসপ বা বিষ্ণুশর্ম্মার গল্পগুলি উপাদেয় এবং শিশু ও যুবাবৃদ্ধকে তা সমানভাবেই আকর্ষণ করে।

লেখকমাত্রেই জানেন, যে-কোন উপাদান পেলেই তা থেকে লেখা যায় না। এমন অনেক জীবন আছে যার মধ্যে ঘটনাপ্রবাহ যথেষ্ট অথচ গল্পের উপাদান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—আবার এমন সামান্য ঘটনাও ঘটে যা কাহিনী বলে আপাতদৃষ্টিতে মেনে নেওয়া শক্ত অথচ তা থেকেই গড়ে ওঠে চিত্তাকর্ষক গল্প। আসল কথা, ঘটনা থাক আর নাই থাক, বৈচিত্র্য যার মধ্যে আছে তাই গল্পের উপাদান আর সে উপাদান গ্রহণ করে বৈচিত্র্যপিয়াসী মন। সব মনের গ্রহণ-ক্ষমতা সমান নয়, সকলের দৃষ্টিভঙ্গি এক হবার কথাও নয়। তবু যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশেষ একটি দিকের কাহিনী আমি লিখব তা যেন আমার রসবোধের পরিধিতে আবদ্ধ না থাকে। আমার দুঃখ বেদনা কৌতুক অন্যের দুঃখ বেদনা কৌতুককে উদ্দীপ্ত করতে না পারলে সৃষ্টিকার্য্য সম্পূর্ণ বা সার্থক হবে না। মনের এই গ্রহণ-ক্ষমতার উপরই কাহিনীর বাস্তব কল্পনা উভয় অংশ নির্ভর করে। ধরুন, চোখের সামনে দেখছেন, একজন ধনী লোক দরিদ্র প্রতিবেশীর উপর উৎপীড়ন করছে। আপনার মনের মধ্যে সেই ঘটনার বেগ

সম্প্রসারিত হ'ল। একজনের জন্ত জাগল দরদ আর এক জনের উপর ঘৃণা। গল্পে ফুটিয়ে তুললেন ঘটনাটি। কিন্তু এই ঘটনা ফুটিয়ে তুলতে যতটুকু বস্তু আপনি সামনে পেয়েছেন তার চেয়ে বেশী সংগ্রহ করেছেন যা পান নি। অর্থাৎ কল্পনায় আপনি মানবমনের বেদনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে আপনার অনুভূতি যত গভীর হবে, আপনার কল্পনা যত সুদূরপ্রসারী হবে, আপনার চিত্রাঙ্কন ততই হবে সার্থক। আমাদের মনের বিচিত্র ধারা হ'ল কল্পনা-বাস্তবে মেশামিশির ব্যাপার। ধরুন, কোন দুর্বৃত্ত লোকের কথা কারও মুখে শুনলেন, তাকে কোন দিন না দেখলেও তার আচার-আচরণের সঙ্গে একটি অপ্রিয়দর্শন মূর্ত্তি আপনার চোখের সামনে ফুটে উঠবেই। চোখের সামনে যা ঘটে তাই সব সময়ে রূঢ় বাস্তব হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়—অনুভূতির রসে পরিপাক করে জ্ঞান যা প্রকাশ করে তারই মধ্যে সত্য-মিথ্যার সার্থকতা। যেমন দুপুরের চড়া রোদে সঙ্কীর্ণ দিগন্ত পরিপূর্ণ শ্রীতে উদ্ভাসিত হয় না—সকাল-সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে অপূর্ব্ব বিস্তারে তা মনকে অভিষিক্ত করে। সর্ব্বজনগ্রাহ্য যে রস তা পরম আনন্দ থেকে উদ্ভূত—যে পরম আনন্দ থেকে নিখিল চরাচরের যাবতীয় প্রাণীর উদ্ভব। লিখতে বসলেই দেখা যায়—বাস্তবের কাঠামোটা অস্থিকঙ্কালসমেত চোখের সামনে ছায়ার মত এগিয়ে আসছে আর দূরে সরে যাচ্ছে; কল্পনার রক্তে মাংসে যতক্ষণ না সেগুলি কায়াবন্ধনে ধরা পড়ছে ততক্ষণ তার আকার নাই, গতি নাই, লাবণ্য নাই। কথিত আছে, জগৎ সৃষ্টির মূলে এই পরমা কল্পনা নিহিত।

সামান্ত অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে গুরুভার তত্ত্বকথা এসে পড়ছে। অভিজ্ঞতা তত্ত্বকথার আকার নিলে উপদেশের অহমিকা প্রকাশ পায় জানি, তবু ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা জানাবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। এ কথা জানা আছে যে, অন্তর্লোকপ্রবাহিত রসপ্রবাহের ধারাটি যেইমাত্র কণ্ঠে এসে পৌছয় তখনি মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠি, 'চমৎকার'। তা সুন্দর বলেই সত্য এবং রসসমৃদ্ধ বলেই শাশ্বত।

এই রসসমুদ্রে পাক করা বৃহৎ বেদনা—অন্তহীন দুঃখ, অপার আনন্দ ও গভীর অনুভূতি সব কিছুই জীবন-জিজ্ঞাসার বিচিত্র রূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রশ্নে ছিল—গল্পে বাস্তব সত্যকে কতটুকু নিতে পারি? কতটুকু কল্পনায় মিশিয়ে তার প্রকাশ সম্ভব? সে নির্দ্দেশ দেয় অনুভূতিশীল মন। শিক্ষকের নির্দ্দেশে ত্রৈরাশিক অঙ্কের নিয়ম মেনে তবে অঙ্কটাকে নির্ভুল করা যায়, কিন্তু জীবনশিল্পীর গতিপ্রকৃতি ভিন্নরূপ। জাতশিল্পী বলে যে একটা কথা আছে তা মনীষীরা স্বীকার করেন। সবার মধ্যে শিল্পী হবার উপকরণ থাকে না সেজন্ত দুঃখ করে কোন লাভ নাই। একথা স্বীকার করতেই হবে—সাহিত্য-সেবার প্রধান উপকরণ হ'ল নিষ্ঠা; মূলধন—অনুভূতিসম্পন্ন মন। কল্পনার বিলাস নয়—বিকাশই হ'ল সাহিত্যের প্রাণ। বলুন তো কল্পনা কার প্রাণে নাই? অশ্ব-মনোরথে চড়ে মানুষ কোন্ দুস্তর পারাবার না উত্তীর্ণ হয়, কোন্ 'সব পেয়েছির দেশে' গিয়ে দু'দণ্ডের জন্তও নিজেকে সার্থক না মনে করে।

লিখবার সময় পাঠক সম্মুখে থাকেন কিনা জানি না—অন্তত ধ্যানলোকে জাগ্রত প্রহরী রেখে কেউ সাধনার পথে অগ্রসর হয়েছেন কিনা, শুনি নি। আত্মলুপ্তির মুহূর্ত্তে কে রইল, কে রইল না—সে হিসাব রাখা তো সম্ভব নয়। লেখা শেষ হ'লে তবে সে বিচার সম্ভব। তখন তীক্ষ্ণ সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে সৃষ্টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে হবে বহু গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত লোক রয়েছেন আমার সম্মুখে। আমার অকিঞ্চিৎকর দান তাঁদের গ্রহণের অযোগ্য যেন না হয়, যেন অনাদরের দৃষ্টিতে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে না নেন। তাঁদের কথা ভেবে আমার লেখনী নিরঙ্কুশ হবে না এবং সৃষ্টিকার্য্যের খুঁতগুলি আমার মনশ্চক্ষে প্রখর ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে একথা সত্য, তবু তাঁদের প্রসন্নতা অর্জ্জন করবার জন্ত আমাকে যত্ন ও পরিশ্রম করতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে।

গল্প লেখার গল্পকে আর দীর্ঘ করব না। গল্প যাঁরা বলতে ভালবাসেন তাঁরা নিঃসন্দেহে উত্তম শ্রোতা, কিন্তু যাঁরা গল্প শোনেন একাগ্রচিত্তে তাঁদের ভাল গল্প লিখিয়ে বলে আমি শ্রদ্ধা দিই। কেননা বাণীতে আর শ্রুতিতে প্রীতিবন্ধন চিরকালের। বক্তা ও শ্রোতা দু'পক্ষের মনকেই সৃষ্টিরসের আনন্দে অনুভূতির গাঢ়ত্বে উদ্বেল করে তোলে এই প্রিয় বন্ধন। সমুদ্রের বাষ্প আকাশে উঠে মেঘ সৃষ্টি করে—দুই ঘন নীলের সংযোজন অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে ভরা। তেমনি মিতালী লেখককে আর পাঠককে। এর মাঝখানে রয়েছে যে প্রাণ-সঞ্চারিণী সৃষ্টি তা অনন্ত কালের লীলাপ্রবাহ ছাড়া আর কিছু নয়। জাগ্রত মন, প্রশ্ন-জিজ্ঞাসু মন—সর্ব্বসংশয়ছিন্নকারী সত্যঅভিমুখী বলিষ্ঠ মন—রসবস্তুর আদানপ্রদান-সেতু দিয়ে মানুষের কাছে মানুষকে এগিয়ে আনে—মানুষকে ভালবাসতে শেখায়—সস্নেহে তার ভুল সংশোধন করে দেয়—গ্রন্থির পর গ্রন্থি মোচন করে সংস্কৃতি-উজ্জ্বল বিস্তৃত জগৎকে তার সামনে তুলে ধরে। এই বাধাবন্ধহীন সংস্কৃতি-উদ্ভাসিত বিস্তৃত জগতের প্রবেশপত্র হ'ল সাহিত্য। সব কালে সব দেশের লোকেরা এরই একাগ্র সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে দিচ্ছেন।*

* বুড়ুল যুবসঙ্ঘের সাহিত্যসভায় পঠিত।

সোভিয়েট রাশিয়ায় ধনসঞ্চয়ের উপায়

শ্রীঈপ্সিতা দেবী

গত ডিসেম্বর মাসে যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন সরকার মুদ্রা-প্রচলন সম্পর্কে একটি সর্ব্বদেশব্যাপী আইন ঘোষণা করেন, তখন আমেরিকার জনসাধারণ প্রায় সর্ব্বত্রই এই মন্তব্য প্রকাশ করে, "রাশিয়ানদের আবার ব্যাঙ্কে জমা সম্পত্তি থাকে নাকি? আমাদের কেমন জানি ধারণা ছিল তারা কম্যুনিষ্ট, সাম্যবাদী।"

খেলনার দোকান—এই সমস্ত খেলনা অত্যন্ত দামী

আসল কথা হচ্ছে এই যে, সোভিয়েট রাশিয়াও এমন একটি দেশ যেখানে যে-কোন অবস্থাপন্ন লোকে ইচ্ছে করলেই কোন শহরের মধ্যে এবং তৎসঙ্গে শহরের বাইরেও যতগুলি খুশী বাড়ী কিনতে পারে। সে তার খুশীমত আলমারী বোঝাই কাপড়-চোপড় এবং নিজের ব্যবহারের জন্য মোটরগাড়ীও কিনতে পারে। তার স্ত্রী সিল্ক এবং দামী ফার কোট পরে বেড়াতে যায়। মনের সাধ মিটিয়ে রাশিয়ান মদ ভড্‌কা এবং পেন পান করতে পারে। তার বাড়ীর যাবতীয় কাজে-কর্ম্মে সাহায্য করবার জন্য, নিজের কাপড়চোপড়ের যত্ন করবার জন্য, চিঠিপত্র টাইপ করে দেবার জন্য, রান্না-বাড়া করা, গাড়ী চালানো, এসবের জন্য সে বেতন দিয়ে ভৃত্য রাখে। এমন কি, সরকারের অনুমতি পেলেই সে তার নিজের একটি শর্টওয়েভ রেডিও ষ্টেশন তৈয়ারী করাতে পারে (আমেরিকায় অনেক সময় এই ধরণের বিচিত্র রাশিয়ান বেতারবার্ত্তা শোনা গিয়েছে)—দরকার-মত প্রচুর বিস্ফোরক পদার্থ, নিদারুণ বিষের রসদ এবং তার সঙ্গে জুতোর বাক্স ভরে রেডিয়ম রাখতেও আপত্তি নেই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রজা যা-কিছু জিনিষ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে জানে—দলিলপত্র, সব রকম দ্রব্য, টাকাকড়ি, পেটেন্টের স্বত্ব ইত্যাদি সবই তার মৃত্যুর পর তার পরিবারের সম্পত্তি বলে ধরা হয় এবং সেগুলির জন্য তাকে কোন কর দিতে হয় না।

এসব শুনতে নেহাত ধনতন্ত্রবাদী প্রথার অনুরূপ মনে হয়, তবে এর একটা সীমা আছে। ব্যক্তিগত ধনলাভের জন্য মজুরীভুক্ শ্রমিককে "স্বার্থপর" ভাবে খাটিয়ে নেওয়া, "শোষণ" করা সোভিয়েট আইনে নিষিদ্ধ। কোন ধনী ব্যক্তি তাই নিজের ধনসম্পত্তির দ্বারা মজুরী দিয়ে লোক নিযুক্ত করে কোন দ্রব্য তৈরী করে বিক্রী করতে পারে না। সে কোন কারখানা বা ফ্যাক্টরীর মালিক হতে পারে না, বা এমন কোন বড় কৃষিক্ষেত্র বা ফার্ম্মের মালিক হতে পারে না যেখানে কাজ চালাবার জন্য বেতনভোগী মজুর রাখতে হয়। সে একটি বা দশটি বাড়ী কিনতে পারেন, কিন্তু যে জমির উপর সে বাড়ী নির্ম্মাণ করা হয়েছে সেই জমি কিনতে পারে না—সে জমির নিমিত্ত তাকে খাজনা দিয়ে সরকারের কাছ থেকে বহু বৎসরের পত্তনি নিতে হয়। অবশ্য কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই নিয়মে কারুর বিশেষ অসুবিধা হয় না। জমির জন্য তাকে যা খাজনা দিতে হয় তা কোন ধনতন্ত্রবাদী দেশের জমির কর বা ট্যাক্সেরই সমান, এবং সোভিয়েট সরকার যেমন প্রয়োজন-মত জনসাধারণের বা রাষ্ট্রের কোন কাজের জন্য সে পত্তনি বাতিল করে দিতে পারেন, ঠিক তেমনি সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরেও অন্য দেশেও এমন আইন ও নিয়ম আছে, যাকে বলে রাষ্ট্রীয় একাধিপত্য আইন। এই রকম কয়েকটি সীমাবদ্ধ আইন-কানুন ও নিয়মাদি ব্যতীত সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধিবাসী আপন খুশীমত যে-কোন ভাবে টাকা উপার্জ্জন এবং খরচ করতে পারে।

গোড়াতেই বলা উচিত যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের অতি সম্পদশালী ব্যক্তিসমষ্টির মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য খুব কমই আছে। পার্টির সাধারণ সভ্য অনেকটা আগেকার আমলের আমেরিকার "ট্যামানি" অনুচরের মত রাজকার্য্যে সাহায্য-কারী। তার কাজ হচ্ছে জনসাধারণের মতামতের খবর রাখা, সমবায়ী চাষীদের বা স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সভ্যদের বুঝিয়ে দেওয়া কেন স্থানীয় নেতারা এটাওটা করতে চান, আবার স্থানীয় কর্ত্তাদেরও বুঝিয়ে দিতে হয় তাদের অনুগত জনসাধারণ কি কি নিয়ম বা সঙ্কল্প সহজেই গ্রহণ করবে, আর কি কি তারা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এই রকম সারা দিনব্যাপী পরিশ্রমের পারিতোষিক হিসাবে পার্টির সভ্য, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উন্নতির প্রত্যাশা করে। জীবনে তবে আমেরিকার শহরস্থিত কারখানার এই ধরণের সাহায্যকারী

এবং এদের মধ্যে তফাৎ আছে। সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যেরা সাধারণতঃ খুব সাবধানে স্থায়পথে চলে এবং আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করে।

সুগন্ধি দ্রব্যের দোকান

কিছুদিন যাবৎ এই মুদ্রাপ্রচলন আইনটি ঘোষণা করবার পর ধনশালী রুশীয়দের সংখ্যা বেশ কমে গেছে। যারা তাদের টাকাকড়ি ঘরে জমিয়ে রেখেছিল, তাদেরই হয়েছে সবচেয়ে বেশী দুর্দ্দশা। অনেকে এরকম ভাবে টাকা ঘরে লুকিয়ে রাখে, হয় সঠিক কি পরিমাণ সম্পত্তি আছে তা প্রকাশ করতে চায় না বলে, অথবা ইউরোপের অধিকাংশ চাষীর মত তারাও ব্যাঙ্ক-বইয়ে লেখা নীরস হিসাবের চেয়ে হাতে টাকা ধরে নাড়াচাড়া করা বেশী পছন্দ করে। এইরূপ ধনসঞ্চয়ীরা তিন হাজার রুবলের অধিক যা ছিল তার দশ ভাগের নয় ভাগ হারিয়েছে। সরকারী "বণ্ড" কিনে দেশের ধন-ভাণ্ডার বাড়াবার এবং জনসাধারণকে উৎসাহে অনুপ্রাণিত করবার জন্য আমেরিকায় গবর্মেণ্ট ইদানীং যে রকম চেষ্টা করেছে, ততোধিক চেষ্টার ফলে রাশিয়ায় সেসব স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তি এরকম "বণ্ড" কিনে তার দুই-তৃতীয়াংশ হারিয়েছে। তার তুলনায় যেসব লোকের টাকা ব্যাঙ্কে ছিল তাদের ভাগ্য ঢের ভাল—তাদের সম্পত্তির তিন থেকে দশ হাজার রুবলের মধ্যে প্রতি তিন রুবল মুদ্রার পরিবর্ত্তে দুটি "নূতন" রুবল লাভ করেছে, এবং দশ হাজারের উপর টাকার মধ্যে প্রতি দুই রুবলের বদলে একটি নূতন রুবল লাভ করেছে। তবে টাকাকড়ি, ব্যাঙ্কে জমা সম্পত্তি এবং সরকারী দলিলপত্র বাদে অন্য কোন দিক দিয়ে ধনী রুশীয়ের সম্পদের কিছু ক্ষতি হয় নি। তার মাসিক আয়ের কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। সে যদি লেখক বা সুরশিল্পী প্রভৃতি হয় তা হলে তার সম্মান-মূল্য আগের মতই সে পায়। তার বাড়ীঘর, নিজের ভাল জামা-কাপড়, তার মদ্যভাণ্ডার, স্ত্রীর হীরের গয়না, ইত্যাদি যাবতীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তিই অক্ষুণ্ণ আছে এবং এই পরিবর্ত্তনের পর তার যা রুবল বাকি রয়েছে, তার মূল্য আগের চেয়ে অনেক বেশী।

এই আইনের ফলে রুবলের মূল্য বেড়ে গেছে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের আগে রুশীয় জনসাধারণ বেশ কম দাম দিয়েই রেশন-নিয়ন্ত্রণানুসারে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জিনিষপত্র কিনতে পারত। তবে সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণটি ছিল, নেহাত যতটুকু জিনিষ না হ'লে জীবনযাপন করা যায় না ততটুকু। তার বেশী কিছু যদি প্রয়োজন হ'ত তা হলে স্থায়সঙ্গত ভাবেই। হয় সরকারী ব্যবসায়ী দোকানে কিংবা কৃষিকর্ম্মীদের বাজারে লোকে সে সব কিনতে পারত, কিন্তু তার জন্য তাকে যা দাম দিতে হ'ত তা রেশননিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের তিন-চার শত গুণ বেশী। গরীব লোকে তার রেশনের বরাদ্দের বাইরে প্রায় কিছুই কিনতে পারত না, এবং বড়লোককেও বেশী জিনিষ কিনতে হ'লে অত্যধিক অর্থদণ্ড দিতে হ'ত। এখন রেশনপ্রথা তুলে দেওয়ার পর "একাধিক মূল্যের" প্রথার বদলে "এক দর" নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়েছে—(অন্ততঃ এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে) এবং

রেডিও

নিয়ন্ত্রিত দরে সকলেই যত খুশী, নিজ নিজ শক্তিমত, জিনিষ কিনতে পারে। অধিকাংশ জিনিষের দাম এখন যা স্থির করা হয়েছে তা এর পূর্ব্বের রেশনের দামের থেকে একটু বেশী, কিন্তু আগে রেশনের বাইরে জিনিষ কিনতে হ'লে যা দিতে হত তার থেকে অনেক কম—এতে অবস্থাপন্ন লোকেদের খুব সুবিধাই হয়েছে। তবে, পূর্ব্বে অনেকে কোন বিশেষ কাজ—যা জনসাধারণের পক্ষে মহামূল্যবান নির্দ্ধারিত হ'ত, করবার জন্য উচ্চ পারিশ্রমিক পেত, তারা সেগুলি হারিয়েছে। যেমন, তারা খুব আগে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্য ন্যায্য রেশন হিসেবে পেত, এবং কয়েকটি শ্রেষ্ঠ দোকান থেকে অল্প দামে ভালরকমে মজুত রাখা দ্রব্য সব কেনবার অধিকার পেত—এখন সেগুলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আবার এরই সঙ্গে গরীব লোকেরাও এক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, তারা পূর্ব্বের রেশনের দামের থেকে কম দামে প্রচুর পরিমাণ রুটি কিনে নিয়ে যেতে পারে—(রুটিই হচ্ছে রুশীয়দের খাবার টেবিলে

একান্ত আবশ্যক খাদ্যদ্রব্য)। নূতন প্রণালী কতদূর সফল হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে জিনিষ সরবরাহের উপর—যে-পরিমাণ রুটি প্রয়োজন গবর্মেণ্ট যদি তত না যোগাড় করতে

মস্কো শহরে একটি বস্ত্র বিক্রয়ের কেন্দ্র

পারে, তা'হলে কৃষকরা বাজারে যতদূর পোষাবে তত বেশী দাম চাইবে। তবে সম্ভবতঃ সোভিয়েট অর্থনীতিবিদ্‌গণ মনে করছেন যে তাঁদের দেশে এটা নূতন, পূর্ব্বের চেয়ে অল্পসংখ্যক কিন্তু অধিকতর মূল্যের রুবল দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা যায়, সেই পরিমাণই প্রস্তুত করা যাবে।

অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়াতে এখন একটি শ্রেণীর অবস্থাপন্ন লোকেরা বেশ অসুবিধা ভোগ করবে। কৃষিকর্ম্মীরা বিশেষ করে পূর্ব্বের "বহু মূল্য" প্রথা থাকায় প্রচুর লাভ করে আসছিল। সমবায় কৃষিক্ষেত্রগুলি থেকে তাদের ভাগে যা লাভের অংশ পড়ত তা তো তারা পেতই, উপরন্তু তাদের ব্যক্তিগত কৃষি-ক্ষেত্রে যা উৎপন্ন হ'ত তাও বাজারে বিক্রয় করে যথেষ্ট লাভ করত। একজন সমবায়ী কৃষক পঞ্চাশ লক্ষ (৫ মিলিয়ন) রুবলের সরকারী "বণ্ড" কিনেছিল বলে দৈনিক পত্রিকাগুলিতে তার নাম প্রশংসিত হয় এবং সে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করে। নতুন আইনের ফলে তার এই বৃহৎ সম্পত্তির অনেক-খানিই নষ্ট হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাজার-দর ধরাবাঁধা করে দেওয়াতে আর এই রকম ধনসঞ্চয় করাও সম্ভব হবে না।

এই নূতন আইন প্রচারের পর বে-আইনী অর্থোপার্জ্জনের কয়েকটি পথ বন্ধ হয়ে গেছে। রেশন-নিয়ন্ত্রিত জিনিষ এবং রেশনের বাইরে জিনিষের মূল্যে যে প্রভেদ ছিল তার ফলে "ঝুঁকিদার" ব্যবসায়ীগণ (speculator) যথেষ্ট সুযোগ পায়। তাদের বিরুদ্ধেই এই আইন বিশেষ করে প্রয়োগ করার কথা ঘোষণা করা হয়। এতে আছে, "যে সব দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবসায়ী যুদ্ধের সময়ে প্রচুর ধন অর্জ্জন এবং সঞ্চয় করেছে, তারাই যে রেশন-প্রণালী তুলে দেওয়ার পর বাজারের সব জিনিষ কিনে নিতে পারবে তা সহ্য করা যায় না।"

দেখা গিয়েছে, সোভিয়েট রাশিয়ায় যুদ্ধে জয়লাভকারী সৈনিকদের উঁচু দরের ব্যবসায়ী (commercial) দোকান-গুলিতে বাজারদর থেকে কম দামে জিনিষ কিনবার অধিকার ছিল। তাদের পক্ষে অন্য লোকের 'মধ্যস্থ' ব্যক্তি হয়ে জিনিষ কিনে দিয়ে ভাগে টাকা দেওয়া খুব সহজ হ'ত। যে সব লোকের রেশনের পরিমাণ অন্য লোকের চেয়ে বেশী ছিল, তারা তাদের পাওনা সবকিছু সস্তাদরে কিনে যা প্রয়োজন হ'ত না তা ফের বাজারে খোলাখুলি ভাবেই বাজার-দরে বেচে দিত। অবশ্য রেশনিং তুলে দেওয়াতে যে সোভিয়েট রাশিয়ায় এরকম বে-আইনী অর্থোপার্জ্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে তা নয়। যখনই এই ভাবে দ্রব্যাদি প্রয়োজন অপেক্ষা কম থাকার দরুন ধরাবাঁধা দামে বিক্রী করা হয়, তখনই কিছু কিছু গুপ্ত বাজারে বা চোরাবাজারে কেনা-বেচা চলবেই। কিন্তু এ

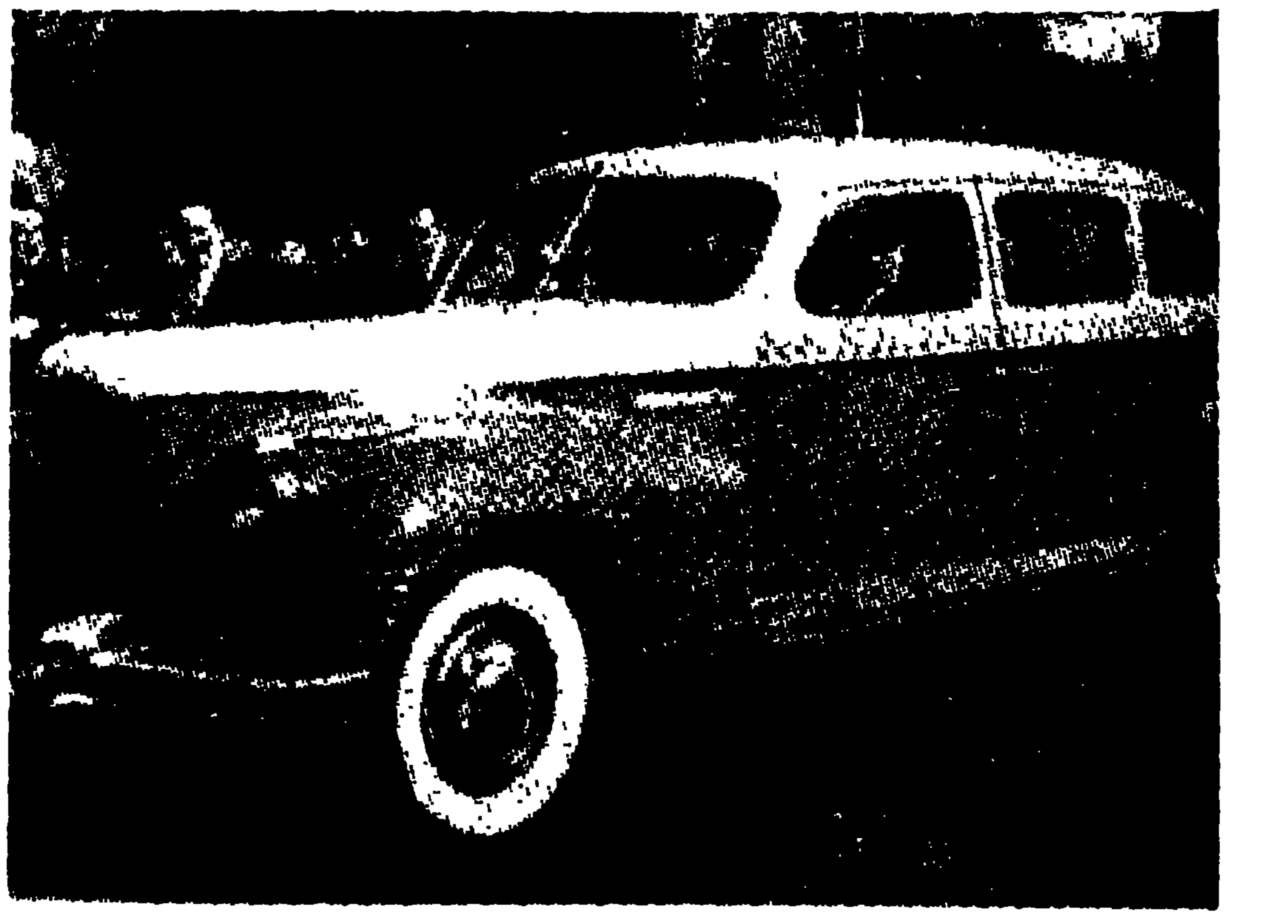

সোভিয়েট রাশিয়ার 'জিস' নামক এক শ্রেণীর মোটর গাড়ী

কথা সত্য, যে এক ব্রিটেন বাদে যুদ্ধকালীন ইউরোপে বোধ হয় সোভিয়েট রাশিয়ার গুপ্ত-বাজারই সব চেয়ে ক্ষুদ্র ছিল। তা হলেও ব্ল্যাক-মার্কেট তখনও ছিল এবং এখনও আছে।

বর্ত্তমান বাসস্থানাভাব দুর্ব্বলচরিত্র বাড়ীওয়ালাদের সম্মুখে প্রলুব্ধ হওয়ার সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত করেছে। নিউ ইয়র্কে আজকাল বাসস্থানের যে রকম টানাটানি পড়েছে, মস্কোতে প্রায় তার দশগুণ বেশী। একটি উদাহরণ দিচ্ছি,—একটি মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থপরিবার বাস করে মাত্র একটি ঘরে, সে ঘরের মধ্যে একটি খাবার টেবিল, চারদিকে দেওয়াল ঘিরে রয়েছে শোবার খাট। রান্নাঘর ও স্নানাগার প্রতিবেশী-দের সঙ্গে ভাগে ব্যবহার করতে হয়, সুতরাং পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব রাখা একান্ত আবশ্যক। কোন অল্পবয়স্ক বিবাহিত দম্পতিকে নিভৃতে বাস করতে হ'লে ঘরের মধ্যে পর্দ্দা, ইত্যাদি দিয়ে ঘরের কিয়দংশ ভাগ করে নিতে হয়। মস্কো শহরের লোকসংখ্যা এমন ভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে সোভিয়েট সরকার এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, বেশ বড়রকম আয়োজন

করেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করা সুরু হয়, কিন্তু যুদ্ধের দরুন এই প্রচেষ্টা পণ্ড হয়ে যায় এবং এখনও মস্কোর ক্রেমলীন প্রাসাদের পাশ দিয়ে চতুর্দ্দিকে যে সব রাজপথ চলে গেছে তার দু'ধারে অর্দ্ধনির্ম্মিত বাড়ীর কাঠামোগুলো পড়ে আছে।

বাসস্থানের এ রকম মারাত্মক অভাব থাকা সত্ত্বেও বাড়ীভাড়া এখনো খুব সামান্যই রয়েছে, এত কম যে, যে সব পরিবারের আয় অতি অল্প তারাও ঘরভাড়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয় না। নিয়ম হচ্ছে, যে সব লোক মস্কোতে কাজ করে, তারাই প্রথমে থাকবার জায়গা পাবে এবং তার জন্য কাকে প্রথম সুযোগ দেওয়া হবে তার নিয়মাবলীও আছে। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় কোন বাসিন্দার মৃত্যু হ'লে বা কেউ অন্যত্র চলে যাওয়ার দরুন কোন ঘর খালি হয়ে গেলেও সেকথা সরকারী দপ্তরে পৌঁছায় না। ইতিমধ্যে যে সব দম্পতির বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, তাদেরও স্থানাভাবে এক ঘরে বাস করতে হয়; নববিবাহিত বর তার বধূর পরিবারের সঙ্গেই বাস করতে বাধ্য হয়, শহরে নবাগতরা এসে তাদের পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে তাদের ঘরেই আর এক একখানি বিছানা পেতে তাদেরও স্থান দিতে পীড়াপীড়ি করে। এ ছাড়া শহরে হাজার হাজার লোক আছে যাদের বাসস্থান পাবার কোন আশা নেই, কারণ আইন অনুসারে তাদের মস্কোতে বাস করবার অধিকার নেই—কারুর ওপর হয়তো রাজনৈতিক কারণে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে, কেউ বা সুদূর সাইবেরিয়া থেকে ছুটি না নিয়ে কাজ ছেড়ে চলে এসেছে। এমনি একটি মেয়ে ছয় মাস তার এক বন্ধুর হোটেলের কক্ষে গোপনে বাস করবার পর হোটেলে একটি ঘর পায়—তার ভাড়া অবশ্য অতি সামান্য, কিন্তু ঘরটি পেতে ম্যানেজারকে তার যে সেলামী দিতে হয় তার জন্য তাকে পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একটি বহুমূল্য মুক্তার মালা বিক্রী করতে হয়।

যে-কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির কাছে যদি কোন একটি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য থাকে (সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন অনেক জিনিষই দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে), সে তার জন্য অভাবনীয় দাম চাইতে পারে। যে সব রুশ সৈন্য এখন জার্ম্মানীতে আছে তারা প্রত্যেকেই হাতঘড়ি যোগাড় করতে ব্যস্ত, তাদের যে সময় সম্বন্ধে অত্যধিক আগ্রহ আছে তা নয়, আসল ব্যাপার হচ্ছে যে-কোন সাধারণ ভাল ঘড়িরই দাম ছিল তিন হাজার রুবল—বাজার ঘড়িতে ছেয়ে যাওয়ার পূর্ব্বে—সাধারণ কারখানার শ্রমিকের মাসিক আয়ের পাঁচ-ছয় গুণ টাকা।

সোভিয়েট রাশিয়ার একটি খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়-কেন্দ্র

ভাল মজবুত একটি ধূমপানের পাইপ, একটি সৌখীন নেকটাই বা দুটি আমেরিকান লিপ-ষ্টিক কিনতে হ'লে দুই সপ্তাহের আয় খরচ করতে হয়। আমেরিকার প্রচারপত্র "আমেরিকা"র প্রকৃত মূল্য হচ্ছে দশ রুবল, কিন্তু এই পত্রিকার মাত্র কয়েকখণ্ড যায় হাসপাতালগুলিতে, লাইব্রেরিসমূহে, কয়েকটি ক্লাবে এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী রাজকর্ম্মচারীর কাছে। কিন্তু এ ছাড়াও বহুসংখ্যক লোক বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে খবরাখবর জানতে চায় বলে এবং পত্রিকাটি দেখতেও সুন্দর বলে বেসরকারী ভাবে বিক্রী হ'লে এর মূল্য কখনও আশী রুবলে দাঁড়ায়—ব্যক্তিগত ভাবে হাত বদলালে কখনও কখনও এই পত্রিকার বিনিময়ে, যে থিয়েটারে সব টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে, সেরকম স্থানেও দুইখানি টিকিট পাওয়া যায়, কিম্বা নিজের মোটরগাড়ীর জন্য ষ্টোরেজ ব্যাটারী পাবার সুযোগ পাওয়া যায়, কখনও বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করা যায়।

অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়াতে যে কেবলমাত্র ব্যবসা করেই ন্যায়সঙ্গত বা বে-আইনী মতে ধনলাভ করা যায় তা নয়; ব্যক্তিগত ভাবে কোনো বিশেষ কর্ম্মোদ্যমে প্রণোদিত হবার জন্য আর্থিক পুরস্কারই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, সোভিয়েট সরকার দৃঢ়ভাবে তা বিশ্বাস করে। প্রতি কর্ম্মক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে প্রস্তুতকারীরা দক্ষতার সহিত ও সুনিপুণ ভাবে কাজ করবার চেষ্টা করে সেই উদ্দেশ্যে। প্রায় সব শ্রমিককেই প্রতিটি কার্য্যের জন্য পারিতোষিক দেওয়া হয় এবং যারা তাদের সাধারণ গড় পরিমাণের চেয়ে বেশী কাজ দেখাতে পারে, তাদের কাজ হিসেবে যা পাওয়া উচিত তার চেয়ে ঢের বেশী পুরস্কার দেওয়া হয়। সুতরাং "ষ্টাখানো ভাইট"রা (যারা অন্য শ্রমিকদের কাজের চেয়ে বেশী কাজ দেখাতে পারে) বেশ আরামেই দিন

কাটায়…তাদের জীবিকা ও সাধারণ রুশীয় শ্রমিকের আয়ের মধ্যে যা তফাৎ আছে, তা অন্ততঃ আমেরিকার একজন অতি সুদক্ষ, শিল্পপদ্ধতিতে শিক্ষিত কর্ম্মীর ও একজন সাধারণ দিনমজুরের আয়ের তফাতের সমান। রাশিয়ার মত শ্রমশিল্পে নিরত দেশে ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার এবং ইঞ্জিনিয়ার সর্ব্বক্ষণই আবশ্যক এবং যারা কাজে দক্ষতা দেখাতে পারে তারা যে-কোন হিসেবেই অবস্থাপন্ন বলে গণ্য হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় লেখক এবং শিল্পীসম্প্রদায় বেশ মোটারকম আয়

মদের দোকান

করে। সাধারণতঃ তারা তাদের মূল জীবিকা অর্জ্জন করে কোন একটি বিশেষ সঙ্ঘ থেকে, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে কাজ করে যায়। যেমন, কোন একজন লেখক হয়ত এভাবে কোন দৈনিক পত্রিকার পত্র-প্রেরক বা সংবাদদাতা হতে পারে, বা সে হয়ত কোন মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে থাকতে পারে। কিন্তু তার এই মূল মাহিনা তার আসল আয়ের একটি অংশ মাত্র। অন্য কোন পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে যদি তার কোন লেখা প্রকাশ করতে চায় তা হ'লে তার জন্য তাকে বিশেষ নিয়মানুযায়ী দক্ষিণা দিতে হয়। তা ছাড়া উক্ত লেখক তার লেখা প্রতি গ্রন্থের জন্য "রয়্যালটি" বা সম্মান-মূল্য পায়, তার পরিমাণ নির্ভর করে বইয়ের কত পাতা, সংস্করণের সংখ্যা, কয়টি সোভিয়েট ভাষায় সে বই অনুবাদিত হয়েছে—এ সবের ওপর। এই সব "রয়্যালটির" যা কিছু ব্যবস্থা করতে হয় তা সব প্রকাশক এবং লেখকের মধ্যে আলোচনা হয়ে ঠিক ধনতন্ত্র-বাদী দেশের মত আইনানুযায়ী দলিলপত্রে লেখাপড়া করা হয়। কোন জনপ্রিয় লেখক অনায়াসে রেডিওতে বা এমনি মঞ্চে বক্তৃতা দিয়ে নিজের আয়বৃদ্ধি করতে পারে। কোন লেখক যদি বিদেশে বই প্রকাশ করে কিছু ধন অর্জ্জন করে, সে টাকা সে ইচ্ছামত যেখানে খুশী খরচ করতে পারে—কনষ্ট্যানটিন সিমিনভ মাত্র অল্প কিছু দিন আগে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে একটি বুইক মোটর গাড়ী কিনে এনেছেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজন ইচ্ছে করেই রোজ নিয়মিতভাবে "চ্যাম বোর্ড" নামক নিউ ইয়র্কের বেশ একটি নাম করা রেস্তরাঁতে খেতেন, সেখানে খেতে হ'লে বেশ খরচ করতে হয়। মস্কোনিবাসী লেখকদের মধ্যে অনেকেই শহরের একটু বাইরে সুন্দর সাজান গুছান বাড়ীতে বাস করেন।

ডাক্তারদের পক্ষেও সঙ্গতিপন্ন হওয়া কিছু কঠিন নয়। তাঁদের সবাইকেই রুটিন অনুসারে হাসপাতালে কাজ করবার জন্য কিছু সময় দিতে হয়, তার জন্য তাঁদের ধরাবাঁধা মাহিনা আছে, কিন্তু এছাড়া বাকি সময়ে পৃথক ভাবে রোগী দেখলে তাঁরা পৃথক ফি নিতে পারেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে-কোন প্রজা প্রয়োজনমত বিনা খরচে বা নামমাত্র খরচে ডাক্তারের এবং হাসপাতালের চিকিৎসা পেতে পারে, কিন্তু সে যদি নিজের ইচ্ছানুসারে কোন বিশেষ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য যায়, তা হ'লে তার প্রতিদানে উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়।

নর্ত্তকী এবং ছায়াচিত্র অভিনেত্রীরাও সুখে জীবনযাপন করতে পারে। ছোটবেলায় প্রতিভার লক্ষণ দেখা গেলে তাদের বিশিষ্ট শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি করা হয়, সেখানে অন্যান্য সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চেয়ে উত্তম মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা আছে এবং শিক্ষালাভের জন্য ঢের বেশী পরিশ্রম করতে হয়। পরে তারা ধরাবাঁধা মাহিনা হিসাবে বেশ মোট টাকা পায় এবং তার ওপর আলাদাভাবে কনসার্টবাদন, অভিনয় ইত্যাদি করে, অথবা সেই সঙ্গে বেতার-শিল্পী হয়ে উপার্জ্জন করতে পারে। যুদ্ধের সময় আমেরিকার অভিনেতা ও শিল্পীদের মতন রুশীয় শিল্পীরাও সৈন্যদের আনন্দদান করবার জন্য ঘুরে ঘুরে বিনা পারিশ্রমিকে অভিনয় ইত্যাদি করেছিল।

বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এবং উদ্ভাবনী শক্তি যার আছে এমন ব্যক্তিও হঠাৎ ধনবান হয়ে যেতে পারে। নূতন এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের কিছু আবিষ্কার করলে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করবার আশা আছে—তা নূতন প্রণালীতে বল-বেয়ারিং তৈয়ারী করবার পন্থাই হোক বা অজানা নতুন টিনের খনির খোঁজই হোক। এই ধরণের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার সম্বন্ধে দেশ জুড়ে প্রচার করা হয়, কারণ তার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নূতন চেষ্টার উদ্দীপনা করা। লোভনীয় পুরস্কারের উপরেও একটি বিশেষ সুবিধা আছে, এই পুরস্কারের টাকার থেকে কিছু আয়কর দিতে হয় না।

জীবিকার জন্য বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনকারীদের মধ্যে সব চেয়ে উপরের ধাপে হচ্ছে লেখক, শিল্পী, সুরশিল্পী, নর্ত্তকী, রঙ্গমঞ্চ এবং ছায়াচিত্রের অভিনেতা, এর সঙ্গে আছে ফ্যাক্টরী ম্যানেজার ও ইঞ্জিনিয়ার। এর বেশ কয়েক ধাপ নীচে রয়েছে নানা উপজীবিকায় নিরত ব্যক্তিবর্গ—যেমন, চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, সেনা ও নৌ-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, শিল্প-পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষিত কর্ম্মী, কারিগর এবং মধ্য-এশিয়ার নূতন

জলসেচ-প্রণালী দ্বারা উর্ব্বর-করা কৃষি-ক্ষেত্রগুলিতে যে সব কৃষিকর্ম্মী রয়েছে, সেই সব লোক। একেবারে নীচের ধাপে রয়েছে কেরাণীকুল, সাধারণ সৈনিক ইত্যাদি, অধিকাংশই কৃষক ও মজুর। দুই বছর আগে পর্য্যন্ত শিক্ষকদেরও এই সর্ব্বনিম্ন ধাপে ফেলা হ'ত। কিন্তু ইদানীং তাদের বেতন হঠাৎ তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের কারিগরদের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলা যায়।

ব্রিটেন, আমেরিকা বা ফ্রান্সের তুলনায় সোভিয়েট রাশিয়াতে "ইনকম ট্যাক্স" খুব সামান্যই দিতে হয়। সব চেয়ে নিম্নশ্রেণীর আয় যাদের—যেমন সাধারণ মজুর এবং কেরাণী, তাদের আয়ের শতকরা দুই থেকে তিন ভাগ ট্যাক্স দিতে হয় এবং এর মধ্যে যাদের পরিবারে তিন জন বা তার বেশী আশ্রিত আছে তাদের এই ট্যাক্স কম দিতে হয়, অন্যদের চেয়ে শতকরা ত্রিশভাগ কম। উপরের ধাপে আবার যে সব লেখক বা শিল্পী ইত্যাদির বার্ষিক আয় ৩০০,০০০ রুবল অথবা তারও বেশী তাদের ট্যাক্স শতকরা পঞ্চাশ ভাগই হয়ে থাকে। কৃষিকর্ম্মীদের বেলায় নিয়ম হচ্ছে যে, সমবায় কৃষিক্ষেত্র থেকে তারা যা লাভ করে তার থেকে ট্যাক্স কিছু দিতে হয় না, তবে তাদের ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্র থেকে যা লাভ হয় তার থেকে ট্যাক্স কিছু দিতে হয়, এর সর্ব্বোচ্চ হার হচ্ছে বার্ষিক আট হাজার রুবলের পিছু শতকরা ত্রিশ ভাগ। ১৯৪২ সাল থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে দেয় খাজনা বা ট্যাক্স ইত্যাদি উঠে গেছে।

কয়েক শ্রেণীর লোককে একেবারেই ট্যাক্স দিতে হয় না, তার মধ্যে পড়ে সেনা-বিভাগের লোক এবং তাদের পরিবারবর্গ, স্বর্ণ, রৌপ্য, টিন, প্লাটিনাম প্রভৃতি বহুমূল্য ধাতুর সন্ধানে যারা কাজ করে—সেই সব লোক যারা পেনসনের ওপর নির্ভর করে, যে সব কর্ম্মীর মাসিক আয় ২৬০ রুবলের কম, নূতন জিনিষের উদ্ভাবক এবং আবিষ্কারকগণ, মাসে ২১০ রুবলের কম বৃত্তিধারী ছাত্ররা, এবং এক শ্রেণীর লোক যাদের "হিরোজ অব সোশ্যালিষ্ট লেবার" বলা হয়। অবশ্য, সত্য কথা বলতে গেলে, যাদের এমনি আয়ের ওপর ট্যাক্স দিতে হয় না, তাদেরও অন্যভাবে একটা প্রচ্ছন্ন কর দিতে হয়, তার রকম অন্যরূপ। এর ফলেই রুবল এবং ডলার বা পাউণ্ডের মূল্য তুলনামূলক ভাবে নির্দ্ধারণ করা বৃথা এবং হাস্যকর প্রয়াস হয়ে পড়ে। "নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স" পত্রিকার একজন লেখক কিছুদিন আগে লিখেছিলেন যে, এক জন সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধিবাসী যে সব দ্রব্য কেনে তার জন্য আমেরিকাবাসীর চেয়ে তাকে ঢের বেশী অর্থদণ্ড দিতে হয় পরিশ্রমের দিক দিয়ে। তুলনা করে দেখা গিয়েছে যে, এই হিসেবে রুশীয় ও ব্রিটিশ জনসাধারণ, বা রুশীয় ও ইতালীয় বা মেক্সিকোবাসীর মধ্যে এত বেশী প্রভেদ নেই। কিন্তু প্রত্যেক রুশীয়ের ক্রয় করা দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে নিহিত আছে সুবৃহৎ ফ্যাক্টরী ও শ্রমশিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা। স্কুলের ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে মধ্যাহ্নের আহার করান, অণুপরমাণু সম্বন্ধে অনুসন্ধান, শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য বিরাট্ আমলাতন্ত্র এবং তার অপটুতা, অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ, বাসস্থান তৈরির জন্য অর্থ সাহায্য করা, ফ্যাক্টরী শ্রমিকদের ক্রিমিয়াতে গিয়ে ছুটি উপভোগ করবার দায়িত্ব বহন এ সব তো আছেই—উপরন্তু মস্কো শহরে "দি প্যালেস অব দি সোভিয়েটস"—"সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রাসাদ," আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে যাতে এক দিন সে উচ্চতায় "এম্পায়ার ষ্টেট"-কেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই গোপন "ট্যাক্সে"র জন্যই বিশেষ সঙ্গতিপন্ন রুশীয় যে-কোন অবস্থাপন্ন আমেরিকাবাসীর মতই হালচালে জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু আর একটি লক্ষ্য করবার মত জিনিষ হচ্ছে, সোভিয়েট রাশিয়ার ধনী ও অবস্থাপন্ন লোকেরা তাদের দেশের জনসাধারণের চেয়ে বহুগুণ সুখে স্বস্তিতে জীবন যাপন করে।

বরষার গান

শ্রীশান্তি পাল

এসেছে বরষা, এসেছে বরষা
　　বিজলী বিহসি চমকে!
এ কি উচ্ছ্বাস মেঘ-ডম্বরে
　　অম্বরে ডিমি-ডমকে।
　　বিজলী বিহসি চমকে!
আজি　এমনি মধুর যামিনী—
তোরা　কেমনে গোঁয়াবি কামিনী?
হের　তালীবন ঘন কাঁপিছে সঘন
　　ঝিম্ ঝিম্ ঝম্ ঝমকে।
　　বিজলী বিহসি চমকে!

আজি　নূপুরে নৃত্যে রণনে
এস　চঞ্চল চল-চরণে,
এস　যৌবন লোল চরকি উছল
　　অঞ্চল কাঁপি ঠমকে।
　　বিজলী বিহসি চমকে!
ওগো　এসেছে বরষা শ্যামল সরসা
　　মীড়-মূর্চ্ছনা-গমকে।
　　দারুণ দামিনী দমকে!

অমৃতের উত্তরাধিকার

শ্রীসুনীলকুমার বসু

মায়ের চিঠিখানা পাওয়ার পর থেকে বারবারই মনে পড়ছে রেণুর কথা। আমার বাল্যের সঙ্গিনী রেণু, দীর্ঘ দশ বছরের উদাসীন বিচ্ছেদের ওপারে যাকে ফেলে রেখে এসেছি। বছর পাঁচেক আগে একবার যখন ওর সঙ্গে দেখা হয়, তখন সে পাকা গৃহিণী এবং অভিজ্ঞ জননী। তার পর দেখা হয় নি, কেননা বিয়ের পর থেকে বরাবরই রেণু স্বামীর সঙ্গে দূর মফস্বল শহরে থেকেছে। হঠাৎ মায়ের চিঠিতে জানলাম মাসখানেক হ'ল রেণুরা কলকাতায় এসেছে। এসেই মাকে চিঠি দিয়েছে রেণু আমার খোঁজ করে, ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে দেখা করবার অনুরোধ জানিয়ে। তাই অনেক দিন পর বারবারই মনে পড়ছে রেণুর কথা। জানি, জীবনের চেহারাটা আজ আমূল বদ্‌লে গেছে, বাল্যে যে আনন্দ উৎসারিত হ'ত ঐ মেয়েটিকে কেন্দ্র করে, জানি সে উৎস আজ শুকিয়ে গেছে। তবু মনে হ'ল হয়ত আজও ভাল লাগবে সেই প্রায় ভুলে যাওয়া রেণুকে, ভাল লাগবে তার মুখে পুরানো ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা ওল্টাতে। তাই রবিবার অপরাহ্নে বেরিয়ে পড়লাম ফটিক মিস্ত্রির গলির উদ্দেশ্যে।

মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর বাসিন্দাদের ভিড়ে এ স্থানটি অদ্ভুত রকমের ঘিঞ্জি, দারিদ্র্যের দুরপনেয় কলঙ্ক এরা যেন লজ্জায় গোপন করতে এসেছে এই সর্পিল গলির মধ্যে, লাস্যময়ী নগরীর এই অন্ধকার অন্তস্থলে। গলিটা এত সঙ্কীর্ণ এবং ঘোরালো যে সন্ধ্যার অন্ধকারে মনে হচ্ছিল যেন তুতেন-খামেনের তমিস্র সমাধিগহ্বরে প্রবেশ করছি। তার উপর আবার এক নাছোড়বান্দা রিক্‌সাওয়ালা গলির মধ্যে রিক্‌সাটাকে নিয়ে গিয়ে আর বাইরে আনতে পারছে না। ফলে পথটা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এবং পাড়ার ছেলেরা রিক্‌সাওয়ালাকে রীতিমত নাকাল করতে লেগেছে।

গলির দু'ধারে পুঞ্জীভূত জঞ্জাল থেকে বেরুচ্ছে বীভৎস গন্ধ, তার উপর ধোঁয়ায় চারদিক ছেয়ে গেছে। একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, ৩৩।৭ ডি নং বাড়ীটা কোথায়? অমনি চার-পাঁচটি উৎসাহী ছেলে এসে আমাকে প্রশ্নবানে জর্জ্জরিত করে তুলল,—'কার বাড়ী যাবেন? কত নম্বর বললেন? রাস্তার নামটি কি? ঠিকানা ভুল হয় নিতে?' ওদের পরহিত-ব্রতকে ধন্যবাদ। কেননা ওদেরই সাহায্যে সেই অন্ধকার গোলকধাঁধার মধ্যে উক্ত নম্বরের বাড়ীটার ভগ্নাংশ খুঁজে বার করতে পারলাম।

একটা ছোট স্যাঁতসেতে ঘরের মেঝের বসে জনচারেক ছেলে মোমবাতি জ্বালিয়ে বই সামনে নিয়ে কলরব করছে। ঘরের মধ্যে ঢুকে অবস্থাটা উপলব্ধি করতে না করতেই শুনতে পেলাম তীব্র কণ্ঠের চীৎকার, 'তুমি সাক্ষী থেকো, ভগবান, তুমি তিরিযুগির সার, তুমি শুনো সব, আমারে বলে মিথ্যেবাদী। খসে পড়বে, ওর জিবে খসে পড়বে, আমি অভিশাপ দিচ্ছি, এ বেরথা হবে না…।'

অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কি বিমলবাবুর বাড়ী, রেণু কি এখানে থাকে?' একটি ছেলে ছুটে চলে গেল বাড়ীর মধ্যে। আর একটি ছেলে পাশের ঘরে গিয়ে শাসনের সুরে বললে, 'থাম না ঠাকুমা, বাইরে একজন ভদ্র-লোক এসেছেন।' উত্তরে শোনা গেল, ভদ্দর নোক এসেছেন তাতে আমার কি, আমি হক কথা বলবই।

পরমুহূর্ত্তেই বেরিয়ে এল রেণু—না, রেণুর প্রেতমূর্ত্তি বললেই ভাল হয়। কে, অভয়দা' না? কি ভাগ্যি আমার! বলে নীচু হয়ে পায়ের ধুলো নিতে এল ও। আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, এ তোর কি হাল হয়েছে রে রেণু? তোকে যে আর চেনা যায় না। মোমের আলোয় এক ক্ষীণ পরাজিত দীপ্তি ওর শীর্ণ তোবড়ানো গালে ক্ষণিকের জন্য চমক দিয়ে গেল। আমি বললাম, তুই এত রোগা হয়ে গেছিস্? চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে? কি হয়েছে তোর? উত্তর না দিয়ে ও শুধু বললে, ভিতরে এস অভয়দা', প্রণাম কর, ওরে বিশু, পণ্টু, ঘণ্টা, ভোম্বল, ইনি তোদের মামা হন…।

ভিতরে ঢুকলাম, আর একটি সঙ্কীর্ণ গলিপথে বললেই চলে। আসলে গলি নয়, একখানা লম্বাটে ঘর। এক দিকে তার কিছু কয়লা সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে—অন্য দিকে, সভয়ে চেয়ে দেখি, মাটিতে একটা ময়লা ছেঁড়া বিছানা পাতা—পাশেই কালীর একখানা ছবির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজার ভঙ্গিতে বসে এক বৃদ্ধা এদিকে ওদিকে কুতূহলী চোখে চাইছেন। পূজায় তাকে খুব নিবিষ্টচিত্ত মনে হ'ল না। যেতে যেতে শুনতে পেলাম নিজের মনেই তিনি বলে চলছেন। হে: রোগা হয়ে গেছে না আরও কিছু, ভারি তো হাল ছিল, রোগা, চিমড়ে-পড়া এক বউ নিয়ে এয়েছিলাম। তা' বউরি তো আর বসে বসে খাওয়াতি পারি নে, খেটে খাতি তো হবে…।

পাশের ঘরে একটা মোড়ায় বসেছি। বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর তখনো কানে আসছে, 'ওরে ও পণ্টু, ও বিশু, বলি ও লোকটা কেডা?' 'শুনলে না, ঠাকুমা', বললে বিশু, 'উনি

আমাদের মামা হন।' 'হাঃ, মামা না আরও কিছু,' বৃদ্ধা বললেন, 'কোথাকার কে, বোম পাভাতি এসে হাজির হ'ল। বলি ও রাত্তিরি থাকতি চাবে না তো?' 'জানি না' ঘণ্টা বললে, 'তুমি পুজো করতে বসে বড় বকবক কর ঠাকুমা।' 'তুই থাম, বখাটে ছোঁড়া,' বৃদ্ধা বললেন, 'তোরা মা'পোরা মিলে আমারে জ্বালায়ে খালি।'

বিবর্ণ আলোয় রেণুর মুখে ব্যর্থতার বিশীর্ণ রেখা ফুটে উঠেছে পেন্‌সিল স্কেচের মত, কোটরগত চোখ থেকে স্তিমিত দীপ্তি প্রতিফলিত হচ্ছে ঘোলাটে কাচের মত। মনে হ'ল বহু বৎসরের বিস্মৃতি-ঘেরা এক মমি আমার সামনে উঠে এসেছে পিরামিডের গহ্বর থেকে।

ছেলেগুলি এসে আমাকে ঘিরে ধরেছে। 'গায়ের উপর ঝুঁকে পোড়ো না পল্টু,' রেণু বললে। ঘণ্টা তীব্র অনুসন্ধিৎসা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি বুঝি আমাদের মামা হন? বিশু বয়সে বড়, অতএব ঘণ্টার প্রগলভতা সে সহ্য করলে না। বললে, তুই থাম্ না। ঘণ্টার সপ্রতিভ ভাব আমার ভারি ভাল লাগল, ওকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি পড় খোকা?' ওর হয়ে জবাব দিলে রেণু, পড়াশুনোয় ওরা চার ভাই-ই বেশ ভাল। ঘণ্টা একটু দুষ্টু। কিন্তু ভারি বুদ্ধিমান, এখনই ও ক্লাস ফোরের বই সব পড়ছে। আবার বিশু কেমন ছবি আঁকতে পারে। দেখা না তোর মামাকে, সেই মহাত্মা গান্ধীর ছবিখানা।

রেণুর বিশীর্ণ মুখ এক অলৌকিক আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে আলো মাতৃগর্ব্বের। অতলস্পর্শ অনুভূতির আবেশে ওর চোখ দুটি যেন দীর্ঘায়ত হয়ে মমতার ভারে নিস্পন্দ হয়ে গেছে। মুগ্ধ পুলকের দৃষ্টিতে ও চেয়ে আছে ওর ছেলেদের দিকে। ইতিমধ্যে আর একখানি কুতূহলী মুখ আমার পানে উঁকি দিচ্ছে, গোছা গোছা কোঁকড়ানো চুলে সে মুখের অর্দ্ধেক ঢাকা। রেণু ডাকলে, 'এদিকে আয় না পূর্ণিমা। প্রণাম কর। এ আমার মেয়ে, ঐ একটিই'। মেয়েটি এগিয়ে এল, সুন্দর, সহাস্যমুখ—রুগ্ন, তবু প্রাণের আনন্দে উচ্ছল। রেণু বললে, তোর মামার জন্যে একটু চা করে নিয়ে আয়। আমি বললাম, সে কি, অতটুকু মেয়ে চা করবে কি করে? রেণু বললে, ও সব পারে। আমি তো এই শরীর নিয়ে সব পেরে উঠি না। তাই ওকে করতে হয়। একটু আধটু রাঁধতেও পারে। রাঁধবার লোক তো আর নেই।

শিশুর কান্নার শব্দে সচকিত হয়ে উঠলাম, ঠিক কান্না নয়, অব্যক্ত যন্ত্রণার একটা ভাষাহীন প্রকাশ। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, এবার চেয়ে দেখি, রেণুর ঠিক পাশেই কাঁথা দিয়ে ঢাকা একটি শিশু শুয়ে আছে। স্বল্প আলোয় ভাল করে দেখা যাচ্ছে না, শুধু তার আকারটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে মাত্র। রেণু ধীরে ধীরে ওর গায়ে চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, 'ইস্, গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। ঘণ্টা ছুটে এসে শিশুটির গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'তাই ত'। রেণু বললে, 'আমার কোলের ছেলে, দিন দশেক হ'ল অসুখ করেছে, সর্দি জ্বর আর কাশি। পরশু থেকে বেশ একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে'। শিশুটি নড়ে উঠল, তার পর সুরু করলে প্রবল কাশি। রেণু তাকে কোলে তুলে নিয়ে মৃদু দোলা দিতে দিতে তার মুখে তুলে দিলে বিশীর্ণ স্তন দ্বিধাহীন অকপট সারল্যে, তার পর বললে, বাচ্চাটার অসুখের জন্যে মনে শান্তি নেই।

ছেলেরা বাইরের ঘরে ফিরে গিয়ে পুনরায় কলরব সুরু করলে। পাশের ঘরে বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, এ সংসারে শান্তি নেই, উচ্ছন্ন যাবে এ সংসার, যে সংসারে বউ এমন, ছেলেপিলে অমন…। আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কি তোর শাশুড়ী রে, রেণু? রেণু বললে, হ্যাঁ, ওই এক রকমের মানুষ, খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে দিনরাতই খালি খিটমিট করেন।…পূর্ণিমা কানা-ভাঙা কাঁচের গ্লাসে চা নিয়ে এল। বৃদ্ধার স্বর সপ্তমে উঠেছে, যাবে, এডাও যাবে, একটা গেছে, এডাও…। পূর্ণিমা ছুটে গিয়ে দাবড়ি দিয়ে বললে, 'তুমি থামো না ঠাকুমা'। কেন লা—বৃদ্ধা দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠলেন, আমি কি কাউকে ভয় করি? কোন বেটাবেটিকে?

রেণুর মুখখানা বাসি ফুলের মত বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি বললাম, তোর ক'টি ছেলেমেয়ে রে? ও বললে, বেঁচে আছে ছ'টি, বাইরের ঘরে ওই চারটি ছেলে আর কোলের এটা। মেয়ে ঐ পূর্ণিমা। কিন্তু…। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল রেণু, ইতস্তত করতে করতে, কি যেন অদম্য আবেগের ঝড় বুকে চেপে রাখবার চেষ্টা করতে করতে বললে, কিন্তু…আর একটি ছেলে ছিল আমার—এই এরই মত। আর বছর ঠিক এই সময় সে চলে গেছে—সেই আমার মিণ্টু… বলতে বলতে ওর রুদ্ধ আবেগ চোখ দিয়ে অজস্র অশ্রুধারায় ঝরে পড়ল।

আমি শুধু শুনে যাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক চাইছিলাম। সমস্ত ঘরখানায় কি কঠোর নিশ্বাসরোধী দারিদ্র্যের বিষাক্ত আবহাওয়া চারদিক থেকে যেন ঘিরে ধরছে, নিঃশ্বাস রোধ করে মেরে ফেলতে চাইছে—আলো ও হাওয়া বর্জ্জিত সেই ছোট ঘরখানায় মেঝের উপরে শুয়ে সেই মুমূর্ষু শিশুটি প্রাণবায়ুকে আটকে রাখবার জন্যে যেন মরীয়া হয়ে চেষ্টা করছে। পাশে বসে অসহায় জননী। রেণু একটু আত্মসম্বৃত হয়ে বললে, মিণ্টুর জন্মের পর থেকে আমার সূতিকা হয়। সে কিন্তু চলে গেল আমাদের ছেড়ে। তার পর যখন পেটে এল এই নান্টু, তখন আমার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। প্রায় না বাঁচার মত। কিন্তু কি সুন্দর চেহারা, কি সুন্দর স্বাস্থ্য হয়েছিল এর। শুধু অসুখে অসুখে বাছা আমার সারা

হয়ে গেল, কিন্তু এবারে তাকে বাঁচাতে পারব কিনা···বলতে বলতে আবার সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা পাচ্ছিলাম না, তবু বললাম, ভয় নেই তোর, বাচ্চাদের ও একটু-আধটু অসুখবিসুখ হয়েই থাকে। তা কি ওষুধ খাওয়াচ্ছিস ওকে? রেণু বললে, গোড়ার দিকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাচ্ছিল। তাতে কোন ফল হয় নি। এখন খাচ্ছে তারিণী বৈরাগীর জলপড়া, আমি বললাম, সে কি? এই মারাত্মক অসুখে জলপড়া? ও বললে, কি করব, শাশুড়ীর ওতে অগাধ বিশ্বাস। তা ছাড়া। তা ছাড়া···মানে···আর কিছু বলতে পারলে না।

বুঝলাম ও আর্থিক অসচ্ছলতার ইঙ্গিত করছে। ও প্রসঙ্গ আর তুললাম না। তার প্রয়োজনও ছিল না। ওর জীবনের পূর্ণাবয়ব একখানি সর্ব্বাঙ্গীণ চিত্র আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে, সেখানে আমি সবই দেখতে পাচ্ছি। মনে হ'ল বহু দূরে চলে গেছি। অনেক দূরে, যৌবনের খেয়াপারে, সেখানে হাস্যমুখী সঙ্গিনী রেণু, কোঁকড়ান চুল, ছিপছিপে চেহারা। রেণুর মেয়েটির চুল ঠিক তার মায়ের মতই কোঁকড়ানো। আর রেণুর? ওর মাথার চুল তো প্রায় উঠেই গেছে, কয়েক গাছা আছে মাত্র দড়ির মত। রেণু অতীতের ভগ্নস্তূপ, যৌবনের ধ্বংসাবশেষ।

অভয়দা, রেণু ডাকলে। চমকে উঠে বললাম, 'বিমল বাবু তো এখনও ফিরলেন না?' ও বললে, 'ওঁর ফিরতে অনেক রাত হয়। আপিস থেকে বেরিয়ে দুটো টিউশনি করে তবে ফেরেন।'

সদরের দরজা পর্য্যন্ত এল রেণু আমাকে এগিয়ে দিতে। 'ভাইকে নিয়ে তো বসে গল্প করা হ'ল অনেকক্ষণ,' বৃদ্ধার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শোনা গেল, বলি আমার দু'খানা রুটি কি তৈরী হবে, না হবে না?'

'আমার অবস্থা, সবই তো দেখলে অভয়দা', রেণু বললে, 'আর একদিন এসো কিন্তু'। ছেলেরা আবার আমায় ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ওদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে রেণুকে আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাইরে পা বাড়িয়েছি—এমন সময় রেণু হঠাৎ বলে উঠল, একটা কথা বলব অভয়দা? তুমি কাজের মানুষ, তোমার কি সময় হবে? আমি আগ্রহান্বিত হয়ে বললাম, কি বলবি বল? আমি সময় করে নেব তোর জন্যে। অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে ও বললে, একটা জিনিস আনবার কথা বলছিলাম। মানে ওঁর তো সময় হয় না, রবিবারেও উপরি খাটুনি। আর তো কোনো লোক নেই আমার। আমি বললাম, বল না কি আনতে হবে? ও ইতস্তত করে বললে, বলছিলাম কি, একটা মাদুলি। আমাকে বিস্মিত হবার সুযোগ না দিয়ে বললে, বরানগরে এক সন্ন্যাসী এসেছেন, কালী-সাধক। তাঁর মাদুলির নাকি ভয়ানক ক্ষমতা। এ পাড়ার অনেকেই এনেছে, ফলও পেয়েছে খুব ভাল। এই তো বিনয়বাবুর ছেলের অম্বলের ব্যথা ছিল। তারপর পুঁটির মা'র ছিল বুক ধড়-ফড়ানি—সব সেরে গেছে, আরও অনেকে ঢের উপকার পেয়েছে। তাই আমার খুব ইচ্ছে একটা মাদুলি এনে আমার নান্টুকে পরিয়ে দেখি।—মাদুলিতে বিশ্বাস করি না, তবু মনের উদ্‌গত আবেগ চেপে বললাম, দেব, নিশ্চয় এনে দেব তোকে। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ও বললে, দেবে? একটু দাঁড়াও তবে। পূর্ণিমা যা তো মা, ঐ তাকের উপর সিঁদুরের কৌটোর মধ্যে সোয়া পাঁচ আনা পয়সা আছে। সন্ন্যাসীর কাছে ভোগের জন্য দিতে হয় পয়সা···। আমি বাধা দিয়ে থামিয়ে দিলাম, থাক্ থাক্ পয়সা দিতে হবে না। তুই নিশ্চিন্ত থাক্ রেণু, কাল আমি মাদুলি নিয়ে আসব।

পরদিন আবার সেই নিরানন্দ গলিটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। সন্ধ্যা উতরে যাচ্ছে প্রায়। গলির মোড়ে পাড়ার ছেলেদের জটলা। একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে গলির মধ্যে-কার পুঞ্জীভূত জঞ্জাল থেকে, ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে বাতাস হয়েছে ভারাক্রান্ত। নিকটে কোনো বাড়ীতে পুজো হচ্ছে। সেখানকার কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ একটা তীব্র রোল তুলেছে। পকেট থেকে মাদুলিটা বার করে এক বার দেখে নিলাম। মাদুলিতে আস্থা নেই। তবু আজ দুপুরে বরানগরে গিয়ে সন্ন্যাসীকে কাতর অনুনয় করে বলেছিলাম, তিনি যেন এই ক্ষুদ্র মাদুলির বুকে নিরাময়ের অমোঘ শক্তি ভরে দেন, এর স্পর্শ মুমূর্ষু শিশুর জ্বরতপ্ত দেহে যেন বুলিয়ে দেয় চন্দনের স্নিগ্ধ প্রলেপ। ভাল করে দেখে নিলাম মাদুলিটাকে। ক্ষুদ্র তামার একটা জিনিষ, তার ভিতরে ওষুধের শিকড় ভরে মোম দিয়ে মুখটা আঁটা। রোগীর কপালে তিনবার ছুঁইয়ে রঙীন সুতো দিয়ে পরিয়ে দিতে হবে তার গলায়। তারপর তার মাকে পাঁচ সিকের ভোগ দেওয়ার মানত করতে হবে। রোগ সেরে গেলে মাকে ছেলে সহ সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে মানত শোধ দিতে হবে। ভাবতে ভাবতে চলে গেছি ওদের বাড়ীর কাছে।

ছেলেগুলো আজ নিঃশব্দে বসে আছে বাইরের ঘরে। বললাম, 'কি রে, তোরা যে আজ বড় চুপচাপ। গোলমাল করছিস্ না, মারামারি করছিস্ না, ব্যাপার কি? তোদের মা কোথায়?' 'ভিতরে আসুন আপনি', বললে মন্টা স্বভাব-বিরুদ্ধ গাম্ভীর্য্য নিয়ে। একটা ক্লান্ত, করুণ, বিলাপের সুর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দেখি, রেণুর শাশুড়ী বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন। ভাবলাম, রেণুর সঙ্গে কলহের পরিণাম হয়তো। ভিতর থেকে পুরুষ-কণ্ঠের আওয়াজ পাওয়া গেল, কে রে মন্টা। কে এলো?—'কে, বিমলবাবু নাকি, বেশ মশায়, আপনার যে দেখাই পাওয়া যায় না।' বলতে বলতে ঘরে ঢুকলাম। আসুন, আসুন বলে মোটা

এগিয়ে দিলেন বিমলবাবু। মেঝের শায়িত অবসন্ন রেণু তাড়াতাড়ি উঠে বসে গায়ের কাপড় সামলে নিলে, তার পর মাথার উপর ঘোমটাটা টেনে দিলে—তার পাশে বসে পূর্ণিমা। কাল আপনি আমার জন্যে অনেকক্ষণ বসেছিলেন শুনলাম,—বললেন বিমলবাবু। আমি বললাম হ্যাঁ, তা বটে, আপনি কেমন আছেন? কই রেণু, তোর ছেলে কই? কেমন আছে আজ? তার জন্যে মাদুলি নিয়ে এলাম যে, এই নে মাদুলিটা…।

সহসা একটা তীব্র মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ বিষাক্ত তীরের মত ছুটে এসে আমার বুকের মধ্যে বিঁধে গেল, আর তার দীর্ঘায়িত প্রতিধ্বনি বিষবাষ্পের মত সমস্ত ঘরখানাকে অসহনীয় যন্ত্রণায় ভরে তুলল। আকস্মিকতায়, ত্রাসে চমকে উঠলাম। দেখলাম, রেণু উপুড় হয়ে শুয়ে অঝোরে কাঁদছে, আর পূর্ণিমা মায়ের গায়ে আছড়ে পড়ছে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে কালকের সেই সুন্দর, সপ্রতিভ ছেলে ঘণ্টা,—আজ তার মুখ ঝড়ের মত গম্ভীর।

কোথা থেকে কি যেন ঘটে গেল, অভাবিত, অপ্রত্যাশিত, কাল ঐখানে ঐ মেঝের উপর শিশুটিকে শোয়া দেখে গেছি। আজ সে নেই। এত শীঘ্র, এত অতর্কিতে মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। কেউ তাকে আটকে রাখতে পারে না। এমন কি মায়ের স্নেহাতুর অন্তরও নয়। বললাম, বিমলবাবু এ কি হ'ল। ম্লান হেসে বিমলবাবু বললেন, ভাগ্য। রাখা গেল না, কাল রাত্রেই চলে গেছে।

রেণু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, গায়ের কাপড় তার বিশৃঙ্খল। লজ্জা পাবার মত সংজ্ঞা নেই ওর। আমি দেখছি ওর অসম্বৃত দেহ—হাড়-বার-করা, শীর্ণ, মাংসহীন কঙ্কাল যেন। জানি না, ঐ কঙ্কালের নিভৃত নিঃসঙ্গ বুকে কি অমৃত লুকানো আছে যার হাজার ধারায় ঐ মাটি ভেসে গেল।

উদ্‌ভ্রান্তের মত পথে বেরিয়ে এসেছি, সহ্য করতে পারি নি বেশীক্ষণ। জনবহুল পথ দিয়ে আবার চলছি। লক্ষ্যহীন ভাবে চলতে চলতে হঠাৎ মনে হ'ল হাতের মুঠির মধ্যে কি যেন রয়েছে। মুঠি খুলে দেখি সেই মাদুলি।

সংস্কৃতশিক্ষা ও বাঙালী হিন্দু সমাজ

অধ্যাপক শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ রায়

এদেশে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যসমাজ শিক্ষা বলিতে ইংরেজী শিক্ষাই বুঝিয়াছিলেন। মাতৃভাষা ও সংস্কৃত ভাষা সেই দিন হইতেই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। আপাতরম্য তথাকথিত বিজাতীয় শিক্ষার মোহে আমরা এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যাহার দরুন বাংলা ভাষায় চিঠিপত্র লেখা পর্য্যন্ত আমাদের কাছে লজ্জাকর হইয়া উঠিয়াছিল। স্বনামধন্য স্যর আশুতোষের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই আমাদের বঙ্গভাষা-জননী বিশ্ববিদ্যালয়ভবনে প্রবেশের অধিকার লাভ করিলেন। আশুতোষের চিন্তাশক্তির মৌলিকতা ছিল বলিয়া স্রোতের তৃণের মত তিনি গতানুগতিকতার প্রবাহে ভাসিয়া যান নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার যোগ্য স্থান লাভ যে অত্যাবশ্যক তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। সেও আজ অনেক দিন হইল। তারপর আমাদের ভাষাজননী ধীরে ধীরে নিজের আসন কায়েম করিয়া লইতেছেন, বঙ্গের বাহিরেও তাঁহার প্রভাব আজ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। ইহা খুবই আনন্দের কথা সন্দেহ নাই—কিন্তু সেই বঙ্গভাষার অস্থিমজ্জা যে-সংস্কৃত ভাষার উপাদানে গঠিত সমগ্র ভারতের সেই মহীয়সী ভাষাজননীর মর্য্যাদা আজ বাংলাদেশের শিক্ষামন্দিরে ধূল্যবলুণ্ঠিত একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিছু দিন ধরিয়া 'প্রাচ্যবাণীমন্দিরে'র শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী সংস্কৃত সাহিত্যের অবদান ও উক্ত ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার যোগ্যা সেবিকা, তাঁহার প্রয়াস সার্থক হইবে ও বর্ত্তমান শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারগণ তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিবেন বলিয়াই আশা করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বিবিধকুসুমসম্ভারে সংস্কৃতভাষার পূজার স্থান হওয়া এক দিন হয়তো সম্ভব, কিন্তু আমার অদ্যকার আলোচ্য বিষয় "টোলের সংস্কৃত শিক্ষা"। যথাযোগ্য উপায়ে এই টোলের অধ্যাপনায় এক দিন শাস্ত্রাদিরক্ষা সম্ভব হইয়াছিল। এই শিক্ষা সরকারের অধীন হইলেও ইহাকে নানা কারণে আর প্রকৃত শিক্ষার কোঠায় স্থাপন করা এখন অনেকেরই অনভিপ্রেত। ভবিষ্যৎ জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া শিক্ষাধারার পরিবর্ত্তন আজ যেমন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যেও দরকার হইয়া পড়িয়াছে, সংস্কৃতশিক্ষার মধ্যেও তাহার অনুরূপ প্রয়োজনীয়তা নিতান্ত অল্প নহে। প্রথমতঃ দেখা উচিত এ জাতীয় টোলের শিক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা? যদি প্রয়োজন না থাকে তবে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমরা টোলের শিক্ষার ভিতরে দুইটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই—প্রথমটি প্রাচীনভাবধারার সংরক্ষণ; দ্বিতীয়টি শাস্ত্রগ্রন্থ-

সংরক্ষণ। পূর্বে শিষ্যবর্গ গুরু-গৃহে ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক অধ্যয়ন করিত। আচার্য্যেরাই ছিলেন তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী, শিষ্যদিগকে কোন বেতন দিতে হইত না। অধ্যয়ন শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে যথা অভিরুচি কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেওয়া হইত—কিন্তু তাহাও বাধ্যতামূলক ছিল না। শিষ্যেরা গুরুগৃহে বাসকালে গুরুর সাংসারিক কার্যে সাহায্য করিতেন এবং আনন্দের সহিত আপন বাড়ীর মতই থাকিতেন। গুরু ও গুরু-পত্নী অপত্যনির্বিশেষে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। রবীন্দ্রনাথ গোড়ায় শান্তিনিকেতনে এই ভাবধারা রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শিষ্য গুরুদেবের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইলে, শিক্ষা মাত্র আক্ষরিক না হইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে এবং ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকভাবেও তাহার অন্তরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। আরশিতে বিম্বের প্রতিফলনের ন্যায় গুরুর মহনীয় শিক্ষার ছাপ শিষ্যে সর্বাংশে ফুটিয়া উঠে। টোলে এই আদর্শরক্ষার কাঠামো এখনও বর্তমান আছে। সংস্কার করিয়া লইতে পারিলে—সমাজ এ বিষয়ে একটু সচেতন হইলে, ইহা অংশতঃ কার্যে পরিণত করা একান্ত অসম্ভব নাও হইতে পারে; কারণ এখনও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহ টোলের সহিত সংসৃষ্ট ব্যক্তিদের মনে সম্পূর্ণরূপে আসন পাতিয়া লইতে সমর্থ হয় নাই। স্বাবলম্বী-সমাজ গঠন করিতে হইলে এই জাতীয় ভাবধারার অনুবর্তন ফলপ্রসূ হইবে ইহা নিঃসংকোচে বলা যায়। "হাতে কলমে" শিক্ষার সুযোগও ইহাতে সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়। সুতরাং বিশেষ চিন্তা করিলে দেখা যায়, টোলে প্রথমোক্ত বৈশিষ্ট্যটির মর্যাদা নিতান্ত অল্প নহে।

দ্বিতীয়টির মর্যাদা আরও অনেক বেশী। সংস্কৃত দর্শনাদি বিবিধশাস্ত্রসম্পদের যথার্থ অধিকারী হইতে হইলে শাস্ত্রের নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাতৃগণ যে সমস্ত অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন সেগুলির সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সেইগুলি যথাযথভাবে পর্যালোচনা করিলে স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তাধারা স্বতঃপরিস্ফুরিত হইয়া উঠে—যাহার ফলে শাস্ত্রার্থবোধ ও শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ সম্ভব হয়। শাস্ত্রের যথাযথ তাৎপর্য বোধগম্য না হইলে শিষ্যপরম্পরায় তাহা যে প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব নয় তাহা সহজেই বোঝা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা শাস্ত্রমর্ম সংরক্ষণে অসমর্থ। সংক্ষেপতঃ, উল্লিখিত অপরিহার্য দুইটি কারণে সম্প্রতি টোলের শিক্ষার আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। এজাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়মন্দিরে যে একান্ত অসম্ভব এরূপ কথা বলা যাইতেছে না, কিন্তু যে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লিখিত প্রণালীতে শিক্ষাপ্রবর্তন সম্ভব না হয় সে পর্যন্ত কে এই গুরু কর্তব্যভার বহন করিবে? কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই কর্তব্য দুইটির গুরুত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। বর্তমানে, শাস্ত্রার্থরক্ষা দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে, আমরা শাস্ত্রের মর্মার্থ হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছি…তাই ভবিষ্যৎবেত্তা মহর্ষি উদয়ন দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন "জন্মসংস্কারবিদ্যাদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায় কর্মণোঃ। হ্রাসদর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তাম্"—(কুসুমাঞ্জলিঃ)। তাঁহার উক্তি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাইতেছে।

যদি বর্তমান সুধীসমাজ মনে করেন, এই দুইটিতে গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন নাই, অথবা অন্য উপায়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে টোলের উচ্ছেদই একান্তভাবে তাহাদের কাম্য। আজ 'টোল' কথাটি পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালীর কাছে কাছে উপহাসাস্পদ। টোলে অধ্যয়ন করিয়া যাঁহারা কৃতবিদ্য হন তাঁহাদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষকে শিক্ষিতের মর্যাদা সময়বিশেষে দেওয়া হইলেও আর্থিক মর্যাদা তাঁহাদের তাদৃশ দেওয়া হয় না। টোলের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা যেন একান্ত কৃপার পাত্র। টোলের শিক্ষার উপর সমাজের অনাস্থা ইহার অন্যতম কারণ হইলেও আজিকার শিক্ষাধারার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও নিতান্ত অল্প নহে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে আমাদের নিত্য নূতন অভাব পূরণের জন্য অর্থের অকারণ আবশ্যকতা সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও মোটামুটি জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যও বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা ঢের বেশী অর্থের প্রয়োজন। আজ টোলের কৃতবিদ্য পণ্ডিতসম্প্রদায় আর্থিক মর্যাদায় যদি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের অপেক্ষাও ন্যূন হন তবে সমাজ কেনই বা এই সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য যত্নবান্ হইবে? এই ভাবে যে সংস্কৃতশাস্ত্র-সম্পদের নিকট পৃথিবীর সভ্য-সমাজ ঋণী, আজ তাহা চরম অবনতির স্তরে পৌঁছিয়াছে। আজ সমাজের চিন্তা করার সময় আসিয়াছে। আজ ভারতে হিন্দু সংস্কৃতি বজায় রাখার প্রয়োজন থাকিলে সংস্কৃতশিক্ষাকে অধিকতর মর্য্যাদাশালী করিতে হইবে। আজ ভারত ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত হইতে চলিয়াছে, সুতরাং তাহার নিজস্ব সংস্কৃতির ভাষাকে তাহার মুখে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

ভারতের প্রদেশবিশেষে সংস্কৃতশিক্ষার একটা বিশিষ্ট মর্যাদা আছে কিন্তু বাংলায় তাহার মর্যাদার প্রশ্ন তোলাও যেন অনাবশ্যক বিবেচিত হয়। তাই বাঙালী সুধীসমাজ ও শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারদের নিকট এই বিষয়টি চিন্তা করিবার জন্য উপস্থাপিত করিতেছি। সংস্কারের যুগ আসিয়াছে—সর্ববিধ সংস্কারের মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধক শিক্ষাসংস্কারের মূল্য যে সর্বাপেক্ষা বেশী সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। সমাজে যে যে শিক্ষার প্রয়োজন অপরিহার্য সেগুলির আর্থিক মর্যাদার এরূপ তারতম্য নিতান্তই অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক। সমাজের নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে আশা করা যায়।

যে ইংরেজ জাতি সংস্কৃত ভাষাকে মৃত ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতির চরম অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের উক্তিকে অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়া এতকাল ভারতীয় ভাবধারাকে ও তাহার সংস্কৃতিসমৃদ্ধ ভাষাকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। কিন্তু আজ ভারতজননী পুনরুজ্জীবিতা ও মুক্তা। এখন আর সংস্কৃত ভাষাকে পাশ্চাত্ত্য বুলির অনুকরণে মৃত ভাষা বলিয়া অবমাননা করা আত্মহত্যার নামান্তর বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার পুরকায়স্থ

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, প্রথমেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা মনে পড়ে। পৃথিবীর কোন দেশে, কোন কালেই বোধ হয় এই রকম জটিল সমস্যা আর দেখা দেয় নাই।

হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায় বহু শতাব্দী হইতে একই দেশে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে। যাহারা এতদিন সৌহার্দ্দ্যের সহিত একত্র বসবাস করিয়াছে, আজ তাহাদের মধ্যে এই হিংসা ও বিদ্বেষের ভাব দেখা দিল কেন?

আজ আমাদিগকে প্রথমে এই কথাটাই ভাবিয়া দেখিতে হইবে, এবং এই প্রশ্নের উত্তর আমরা যত সত্বর বাহির করিতে পারিব আমাদের আসল সমস্যার সমাধানও ততই সহজ হইয়া আসিবে।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। প্রতিবেশীর সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া তাহার কোন মতেই চলে না। এই প্রয়োজনের তাগিদই মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল যাযাবর-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া, দলবদ্ধ ভাবে বসতি স্থাপনে তৎপর করিয়াছিল।

রামপুরের নিতাই মণ্ডলের ঘরে আগুন লাগিলে, মাধবপুরের কেশব সরকার আসিয়া সাহায্য করিবে না। তাহার প্রতিবেশী করিম আলীকেই সাহায্যের জন্য দৌড়িয়া আসিতে হইবে। প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর এই যে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্দ্যের ভাব, সুখে দুঃখে ও বিপদে আপদে সমবেদনার ভাব—ইহাই সমাজবন্ধন এবং ইহার বৃহত্তর সংস্করণই জাতীয়তাবাদ।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত। দেশ বলিতে আমরা এক একটা বিশেষ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ স্থানকেই বুঝি। এই সকল স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কতকগুলি সমস্বার্থ থাকে। দেশে যদি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তাহা হইলে কোন দল বা সম্প্রদায়বিশেষ তাহা হইতে রেহাই পায় না। গত পঞ্চাশের মন্বন্তরে দেখা গিয়াছে, হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারী দুর্ভিক্ষের কবলে প্রাণ দিয়াছে। কাজেই দল ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলের স্বার্থের জন্য, দেশের সাধারণ উন্নতিবিধান করা ও সকল রকম বিপদ আপদ হইতে দেশকে রক্ষা করার সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইতে দেশের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্দ্য, সহযোগিতা ও সমবেদনার ভাব আসে, একটা একতাবোধ জাগ্রত হয়—ইহাই জাতীয়তাবাদ। এইজন্যই রুশিয়ার খ্রীষ্টান ও মুসলমান অধিবাসী—সম্মিলিত রুশ জাতি। চীনের বৌদ্ধ ও মুসলমান—চীনা জাতি। বাংলার হিন্দু-মুসলমান—বাঙালী। ভারতের অধিবাসী সমুদয় ভারতবাসী একই জাতি।

এক দেশের অধিবাসীদের এক-জাতীয়তার যে সত্যকে আমরা গায়ের জোরে অস্বীকার করিয়াছিলাম, প্রয়োজনের চাপে আজ আমাদিগকে তাহাই স্বীকার করিতে হইতেছে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এক শ্রেণীর লোক সাম্প্রদায়িক ভেদ-নীতিকে প্রশ্রয় দিয়াছে। তাহারা প্রচার করিয়াছে, হিন্দু মুসলমান দুই পৃথক জাতি, কেননা তাহারা দুই পৃথক ধর্ম্মাবলম্বী। তাহাদের মধ্যে মিলন হইতে পারে না, এক দেশে সম্প্রীতির সহিত পাশাপাশি বসবাস সম্ভব হইতে পারে না। কাজেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে (ভৌগোলিক সীমার ভিত্তিতে নয়) দেশ-বিভাগের প্রয়োজন। এই দুই-জাতি-তত্ত্বই আমাদের ভিতরে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি আনিয়াছে, আমাদের বহু শতাব্দীর সাম্প্রদায়িক মিলন ও ঐক্য ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

দেশবিভাগের পর আজ আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হইলেও উভয় সম্প্রদায়কে উভয় রাষ্ট্রেই থাকিতে হইবে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও সৌহার্দ্দ্য বজায় রাখিতে না পারিলে তাহা সম্ভব হইবে না। তাই দল ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে দেশের সকল নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিও আজ এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

বর্ত্তমানে যে সাম্প্রদায়িক মিলন ও ঐক্যের চেষ্টা করা হইতেছে, বিভিন্ন রুচি ও প্রয়োজনের অনুসারে তাহাকে যে নামেই অভিহিত করা হোক, আসলে ইহা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত এক-জাতীয়তাবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে।

আমরা আসল জিনিষই চাই। আমরা চাই পরস্পর শান্তিতে বাস করিতে, তার জন্য চাই সাম্প্রদায়িক মিলন ও ঐক্য। যে নামে যে পথ দিয়াই তাহা আসুক, আমরা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াই গ্রহণ করিব।

এ সম্বন্ধে আর কথা বাড়াইয়া লাভ নাই। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মিলন আনিতে হইলে প্রথমেই তাহার উপযোগী পরিস্থিতি ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করা প্রয়োজন। যে সকল নীতি, যে সকল মতবাদ আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ আনিয়াছে, মিলনের অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হইবে। ইহা করিতে না পারিলে কেবল বক্তৃতা ও বিবৃতির দ্বারা কোন ফল হইবে না।

এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই যে, 'ডিভাইড এণ্ড রুল' অর্থাৎ বিভেদ এবং শাসন—এই নীতিই সাম্রাজ্যবাদকে টিকাইয়া রাখার প্রধান অপকৌশল। পরস্পরবিরোধী দল বা সম্প্রদায়গত স্বার্থের সৃষ্টি করিয়া, দেশের মধ্যে দুই বা ততোধিক দলে বিরোধ লাগাইয়া রাখাই ইহার উদ্দেশ্য। তাহা হইলে এক দল অন্য দলকে জব্দ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য লইতে বাধ্য হয় এবং তাহারাও এই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে।

যে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ আয়ারল্যাণ্ডে আলষ্টার ও মিশরে সুদান-সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদী সমস্যার মূলে রহিয়াছে যাহা, ভারতের হিন্দু-মুসলমান দুই জাতিতত্ত্ব সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্টি।

ইংরেজরা যখন বুঝিল যে, ভারতের হিন্দু-মুসলমান এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি বিরোধের সৃষ্টি করা না যায়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে এই দেশে টিকিয়া থাকা সম্ভব হইবে না, তখন বিভেদসৃষ্টির সুযোগেরও অভাব তাহাদের হইল না। অনেক দিন হইতেই শিক্ষিত ও অভিজাতশ্রেণীর এক দল মুসলমান সরকারী চাকুরী প্রভৃতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য কতকগুলি বিশেষ সুবিধার দাবী করিয়া আসিতেছিলেন। লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতের বড়লাট মুসলমান জমিদারদের পক্ষ হইতে তখন তাঁহার নিকট এক ডেপুটেশন প্রেরিত হয়। তখন তাঁহারা এই সব দাবিই উত্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির উদ্গাতা, লর্ড কার্জ্জন পর্য্যন্ত তখন তাহা সমর্থন করিতে পারেন নাই। ইঁহার দাবির উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—

"I say you put forward these requests. You are asking for preferential advantages, which are unreasonable and which no Government would dream of giving you.

"Again when you ask for a fixed proportion of appointment in the public service and promotion, regulated not by merit but by a fixed numerical standard, you must see that you are advancing an untenable claim.

"It is a cheering spectacle to see a community, once so great and prosperous and so richly endowed with stability of intellect and force of character, lifting itself again in the world by patient and conscientious endeavour. But the pleasure of the spectacle is diminished and the chances of success are reduced if those who are pluckily engaged in climbing the ladder, cry out for artificial ropes and pulleys to haul them up."

লর্ড কার্জ্জন যাহা অন্যায় ও অযৌক্তিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই তাহার প্রবর্ত্তন করেন। ফলে মুসলমানসম্প্রদায়ের জন্য সংখ্যানুপাতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক চাকুরী প্রভৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইল। ইহাতে শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণীর একদল মুসলমানের বিনা প্রতিযোগিতায় একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক চাকুরী প্রভৃতি নানা রকম সুবিধা-লাভের বিশেষ সুযোগ হইল। শিক্ষাদীক্ষায় অধিকতর উন্নত হিন্দুসম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া এই সুবিধা আদায় তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। এক-জাতীয়তাবাদের আদর্শ হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে পৃথক করিতে না পারিলে, পৃথক ভাবে সৃষ্ট এই বিশেষ সুবিধার অস্তিত্ব থাকে না। নিজের স্বার্থের জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের এই বিশেষ সুবিধাভোগী দলই হিন্দু-মুসলমান ভেদনীতিকে উস্কানি দিতে লাগিলেন। ইহা হইতেই ক্রমে দুই জাতি-তত্ত্বের (Two-Nation theory) উদ্ভব হইল।

কংগ্রেসের ত্রুটিবিচ্যুতিও এর জন্য কম দায়ী নহে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে বানচাল করার জন্য কংগ্রেস যতটুকু শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন, দেশের আভ্যন্তরিক সংগঠন-কার্য্যে সেই অনুপাতে মনোযোগ দেন নাই। ইহাই কংগ্রেসের মারাত্মক ভুল।

কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য জনসাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য যে ব্যাপক প্রচার-কার্য্যের প্রয়োজন ছিল, কংগ্রেস আশানুরূপভাবে তাহা করেন নাই; মুসলীম লীগের সহিত আপোষ করিয়া, তোষণনীতির আশ্রয় লইলেন। তাহাদিগকে ন্যায্য প্রাপ্যের অনেক বেশী দিয়াও কংগ্রেস তাহাদের সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না, বরং ফল বিপরীত হইল। লীগের সহিত আপোষের জন্য সীমাহীন উদারতা দেখানোর ফলে, কংগ্রেসের অতিরিক্ত গরজ ও দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইল।

ওদিক কোনো কোনো মুসলমান নেতা মুসলমানসম্প্রদায়কে বুঝাইলেন যে, কংগ্রেস হিন্দু-প্রতিষ্ঠান। হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনই তাহার-লক্ষ্য। কংগ্রেসের হাতে শাসনক্ষমতা আসিলে মুসলমানদের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য কিছুই থাকিবে না।

ভারতবর্ষ হইতে ইসলাম ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। উপরন্তু লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোষের আগ্রহকে, মুসলমান সমাজকে ধোঁকা দেওয়ার কূটনৈতিক চাল বলিয়াই বুঝানো হইল। একতরফা প্রচারের ফলে সরলবিশ্বাসী মুসলমান জনসাধারণ তাহাই বুঝিল।

১৯৩৫ সালের নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পর কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তখন কংগ্রেস কর্ত্তৃক মুসলমান নির্যাতনের নানা মিথ্যা কাহিনী প্রচার করা হইল।

তার পর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত মতভেদ হওয়ায় কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিল। মুসলমান-সমাজ কংগ্রেসের জুলুম-জবরদস্তি হইতে রেহাই পাইল বলিয়া, মুসলিম লীগ হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে একদিন মুক্তি-দিবস (Day of deliverance) পালনেরও নির্দ্দেশ দেওয়া হইল।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি সর মরিস গায়ার বা অন্য যে-কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তির নেতৃত্বে একটা জুডিশিয়াল ট্রাইবিউন্যাল গঠন করিয়া ইহার নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক। কিন্তু মিঃ জিন্নাই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। নিরপেক্ষ তদন্তের ফলাফল তাহার অনুকূল হওয়ার আশা থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই এরূপ করিতেন না।

মহাত্মা গান্ধী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মিঃ জিন্নার মধ্যে এই সম্বন্ধে যে পত্র বিনিময় হয়, সেগুলি পড়িয়া দেখিলেই সমস্ত পরিষ্কার বুঝা যায়। এই সমস্ত পত্রাবলী এখানে উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধ অহেতুক দীর্ঘ হইয়া পড়ে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার মৌলবী জামাল-উদ্দীন আহম্মদ প্রণীত "Recent speeches and writings of Mr. Jinnah" নামক বহিখানি পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

ঘটা করিয়া মুক্তিদিবস পালন ও একতরফা প্রচারের ফলে মুসলমান জনসাধারণ বুঝিল যে, কংগ্রেসের চেয়ে মুসলমান সমাজের বড় শত্রু আর নাই।

তার পর বলিতে হয় আসামের বহিরাগত-উচ্ছেদ প্রথার কথা। বাংলার যে সকল বহিরাগত আসাম গবর্ণমেন্টের খাস জমি ও গোচরণ-ভূমি দখল করিয়াছিল, আসাম গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে উচ্ছেদ করেন। সাদুল্লা গবর্ণমেন্ট (লীগদল) ইহাদিগকে এক বৎসরের মেয়াদে উচ্ছেদের নোটিশ দেন। তার পর বরদলৈ (কংগ্রেসদল) গবর্ণমেন্টের আমলে সেই নোটিশের মেয়াদ পূর্ণ হয়। লীগ-গবর্ণমেন্টের নোটিশের সর্ত্তই কংগ্রেস-গবর্ণমেন্ট কার্য্যকরী করেন। হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে (অবশ্য হিন্দুর সংখ্যা খুব কম) সকল বহিরাগতকেই এই সময় উচ্ছেদ করা হয়।

এই উচ্ছেদনীতি অসমীয়াদের বাঙালীবিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই নহে। অসমীয়া মুসলমানদেরও ইহাতে সমর্থন ছিল। কাজেই ইহাকে কংগ্রেসের মুসলমান বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে, অসমীয়াদের বাঙালীবিদ্বেষ আখ্যা দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু এই সকল ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়া কংগ্রেসের মুসলমানবিদ্বেষ বলিয়াই প্রচার করা হইয়াছে। কংগ্রেসের তরফ হইতে প্রতিবাদের একটা ক্ষীণকণ্ঠ পর্য্যন্ত জনসাধারণের কাছে পৌঁছে নাই।

কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যের ত্রুটির জন্যই মুসলমান জনসাধারণ কংগ্রেসকে ভুল বুঝিয়াছে। ধীরে ধীরে কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

আগে যে দুই জাতি-তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, ইহার অস্তিত্ব রাখিয়া সাম্প্রদায়িক মিলন সম্ভব হইবে না। কারণ ইহার মধ্যে মিলনের কোন নীতি নাই। পরস্পরকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াই ইহার আদর্শ। দুই জাতিতত্ত্বের সমর্থকগণ আজও তাঁহাদের পুরাতন নীতিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। জাতিতত্ত্ব লইয়া উদ্দেশ্যমূলক গবেষণা চালাইলে, দুই জাতিকে আরও বহু জাতিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। হিন্দুদের ভিতরেও আরও একটা উপ দুই-জাতির (বর্ণহিন্দু ও হরিজন) সৃষ্টি ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আছেন, কায়স্থ আছেন, হরিজনদের ভিতরেও নানা সম্প্রদায় আছে। ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে আরও কয়েকটা জাতিতে বিভক্ত করা যায়।

মুসলমানসম্প্রদায়ও বাদ যান না। তাঁহাদের সমাজেও সিয়া আছেন, সুন্নি আছেন, মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, জোলা-সম্প্রদায়—অনেক কিছুই আছে। মুসলমান মৎস্যজীবীদের মধ্যে পৃথক সুবিধার দাবি করিবার প্রয়াস ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে বিভক্ত হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার প্রভাবও সাম্প্রদায়িক মিলনের পথে কম অন্তরায় নয়।

পাকিস্থানের মুসলমানগণ মনে করিতেছেন, পাকিস্থান তাঁহাদের নিজস্ব হোমল্যাণ্ড বা বাসভূমি—হিন্দুরা এখানে 'পরবাসী' অবস্থায়ই আছে। হিন্দুরাও মনে করিতেছেন, পাকিস্থানে তাঁহাদের কোন অধিকারই নাই। মেজরিটির দয়া করিয়া দেওয়া, কেবলমাত্র প্রাণে বাঁচিয়া থাকার অধিকারটুকু লইয়াই তাহাদিগকে থাকিতে হইবে। এই সব কারণে জনসাধারণের মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ দেখা দিয়াছে, তাহারা দলে দলে দেশত্যাগ করিতেছে।

এই অবস্থা দূর করিতে না পারিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্ভব হইবে না। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই বুঝাইতে

হইবে যে, কোন দেশেই সম্প্রদায়বিশেষের একচেটিয়া অধিকার নাই। উভয় দেশে উভয় সম্প্রদায়েরই সমান অধিকার বিদ্যমান। তাহা হইলে আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া দল, সম্প্রদায় ও ধর্মনিরপেক্ষ সকলের মিলিত সেই এক-জাতীয়তাবাদের আদর্শেই আসিতে হয়।

হিন্দুসম্প্রদায় চিরদিনই মিলনের প্রত্যাশী, মিলনের অর্ঘ্য লইয়া তাহারা চিরদিনই প্রস্তুত হইয়া আছে। হিন্দুর স্বার্থপরতায়, হিন্দুর অদূরদর্শিতায় সাম্প্রদায়িক মিলন ব্যর্থ হইয়াছে, হিন্দুর উপর কাহারও এই দোষারোপ করিবার সঙ্গত হেতু নাই। কংগ্রেসের আহ্বানে হিন্দুসমাজ চিরদিনই সাড়া দিয়াছে। কংগ্রেসের আন্দোলনে মহাজনী আইন পাস হইল। ইহাতে শতকরা প্রায় একশত হিন্দু মহাজনেরই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া মুসলমান খাতকদেরই উপকার করা হইল। হিন্দুরা ইহার প্রতিবাদ করে নাই। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বৃহত্তর জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিই তাহাদিগকে তাহা করিতে দেয় নাই।

সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিন্দুর চেষ্টা ও অর্থেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু দাতাগণ ইচ্ছা করিলে এই সব দান কেবল নিজ সম্প্রদায়ের উপকারের জন্যই করিতে পারিতেন। কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের জন্যই তাঁহারা ইহা করেন নাই।

সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় আজ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে, অন্য প্রদেশের অযোগ্য মুসলমান ছাত্ররা তাহাতে প্রবেশাধিকার পাইতেছে, কিন্তু সিন্ধুপ্রদেশের যোগ্যতর হিন্দু ছাত্রদের জন্য উহার দ্বার রুদ্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া কি রকম টানাহ্যাঁচড়া চলিয়াছিল, তাহা কাহারও অজানা নাই।

দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের অধিকাংশই মুসলমান। তাহাদের দাবি ও অধিকার লইয়া কংগ্রেসই চিরকাল আন্দোলন করিয়াছে, আজও করিতেছে। মুসলীম লীগ কোনদিনই তাহাদের জন্য দরদ দেখায় নাই, বরং কংগ্রেসের আন্দোলনে চিরদিন বাধাই দিয়াছে। ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে কংগ্রেস যখন দক্ষিণ-আফ্রিকার লবঙ্গ বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, হিন্দুব্যবসায়ীরা তাহাতে যোগ দেন, কিন্তু মুসলমান ব্যবসায়ীরা সহযোগিতা করেন নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার মুসলমান অধিবাসীদের জন্য পাকিস্থানের দরদের পরিচয় আজও পাওয়া যায় নাই।

হিন্দু নিজের সংস্কৃতি অন্যের উপর চাপাইয়া দিতে চাহে না। কিন্তু অন্যের সংস্কৃতি তাহার ঘাড়ে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হোক, ইহাও তাহারা মানিয়া লইতে পারে না। ইস্লামের সত্য ও আদর্শকে তাহারা শ্রদ্ধা দেখাইতে প্রস্তুত এবং বহুক্ষেত্রে তাহা দেখাইয়াছেও, কিন্তু ইস্লামের সত্য ও আদর্শ নহে, কেবল এইজন্যই অন্য যে-কোন ধর্ম্মের সত্য ও আদর্শকে ঘৃণা করিতে হইবে, ইহাও তাহারা সমর্থন করিতে পারে না।

সাম্প্রদায়িক মিলন ও সম্প্রীতির জন্য যতটুকু করা প্রয়োজন তাহা করিতে হিন্দু-সম্প্রদায় কোন দিনই পশ্চাৎপদ ছিল না, আজও নহে।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া বলিতে চাই, আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের উপরই আজ অধিকতর দায়িত্ব পড়িয়াছে। তাহাদিগকেই আজ অধিকতর উদারতা দেখাইয়া মিলনের জন্য আগাইয়া আসিতে হইবে—অবশ্য, ইহার অর্থ এই নহে যে, মুসলমানসম্প্রদায়কে নিজেদের ন্যায্য দাবি ও অধিকার ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইহার অর্থ, নিজের যথাযোগ্য দাবি ও অধিকারের ন্যায় অপরের ন্যায়সঙ্গত দাবি ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, তাহা মানিয়া লওয়া। মুসলমানসম্প্রদায়কে, শাসকসম্প্রদায়ের পর্য্যায়ে উন্নীত হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া দেশের সকল দল ও সম্প্রদায়ের সহিত সমান অধিকার লইয়া মিলিয়া-মিশিয়া থাকার গণতান্ত্রিক নীতিই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইহা করিতে না পারিলে সাম্প্রদায়িক মিলনের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

ইহা করিতে হইলে সকল রকম বিশেষ সাম্প্রদায়িক সুবিধার অস্তিত্ব লোপ করিতে হইবে। তাহা হইলে দুই-জাতিতত্ত্বের আর কোন প্রয়োজনই থাকে না এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিভাগের সমস্ত যুক্তিও বানচাল হইয়া যায়।

দেশ-বিভাগের পক্ষে যে সকল যুক্তি ছিল, তাহার অসারতা ইতিমধ্যেই প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। পুনরুক্তি হইলেও কথাটা এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না।—হিন্দু-মুসলমান দুই পৃথক জাতি, ইহাদের মিলন হইতে পারে না, এক দেশে পাশাপাশি বাস করা সম্ভব হইতে পারে না—কাজেই উভয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক হোম ল্যাণ্ডের প্রয়োজন—পাকিস্থানের নির্দ্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা না দিলেও লীগ নেতৃবৃন্দ এই সব কথা চিরদিনই খোলাখুলি ভাবে প্রচার করিয়াছেন এবং দেশবিভাগের পক্ষে ইহাই ছিল আসল যুক্তি। এই সকল যুক্তি দেখাইয়া যাহারা দেশবিভাগ করিয়াছেন, দেশবিভাগের পর তাহারাই আজ স্বীকার করিয়াছেন যে, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মিলন হইতে পারে এবং উভয় সম্প্রদায়ই উভয় ডোমিনিয়নে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে পারিবে।

বিভক্ত ভারতের উভয় ডোমিনিয়নে, উভয় সম্প্রদায়ই যদি মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে অবিভক্ত ভারতেও তাহারা এইভাবেই মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারিত—একথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কাজেই দেশ-বিভাগের সকল যুক্তি ও উদ্দেশ্য আজ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

যাহাই হোক, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা লইয়া পৃথক পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের জন্ত বিভক্ত অঞ্চল গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা করার অধিকারও হয়তো তাহাদের আছে। হিন্দুদের ইহাতে আপত্তি করার কোন কারণ নাই।

কিন্তু পাকিস্থানে হিন্দুসম্প্রদায়কে কতটুকু অধিকার দেওয়া হইবে এই সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

কথা উঠিয়াছে পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র শরিয়তের বিধান অনুযায়ী রচিত হইবে। ইহা যদি ইসলামিক রাষ্ট্র হয়, এবং মেজরিটির কৃপালব্ধ শুধু কায়ক্লেশে প্রাণধারণের অধিকার লইয়া সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া মাইনরিটির আর কোন গত্যন্তর না থাকে, তাহা হইলে এই সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। আর ইহা যদি সত্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়, তাহা হইলে ইহার গঠনতন্ত্রে যাহাতে গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিগুলি অনুসৃত হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

রাষ্ট্রের আচরণ জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সমান ও পক্ষপাতবর্জ্জিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের অধীন প্রত্যেক নাগরিকই নিজের সামর্থ্য ও যোগ্যতার অনুপাতে আত্ম-বিকাশের ও সব রকম সুখ-সুবিধা ভোগ করার স্বাধীন ও অবাধ অধিকার পাইবে। জাতি ধর্ম্ম বা বর্ণের জন্ত রাষ্ট্র কাহারও প্রতি কোন রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করিবে না। ইহাই গণতান্ত্রিক নীতি।

এক সম্প্রদায়কে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্ত অন্ত সম্প্রদায়ের বিশেষ অসুবিধা ঘটাইবার নীতি, এক সম্প্রদায়কে অগ্রগামী করার উদ্দেশ্তে অন্ত সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক অগ্রগতির পথে আইন-কানুন ও বাধানিষেধের কৃত্রিম গণ্ডী সৃষ্টি করিয়া তোলার নীতি—এই সকল নীতিকে গণতান্ত্রিক নীতি বলা চলে না।

মুসলমান-সম্প্রদায় ধর্ম্মে মুসলমান, কেবল এইজন্তই যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক শতকরা সত্তরটি সরকারী চাকুরী, কণ্ট্রাক্ট প্রভৃতি তাহাদের জন্ত সংরক্ষিত থাকিবে। যোগ্যতা না থাকিলেও নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বৃত্তি পাইবে। হিন্দুরা হিন্দু, কেবল এইজন্তই, তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের যোগ্যতা তাহাদের প্রতিভা উপেক্ষিত হইবে, আত্ম-বিকাশের সব রকম সুযোগ-সুবিধা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে, এই রকম একদেশদর্শী ও পক্ষপাতমূলক আচরণ পৃথিবীর কোন সভ্য দেশই সমর্থন করিতে পারে না। এই সুয়োরাণী দুয়োরাণী নীতিকে গণতন্ত্র বলা চলে না। ইহাকে ধর্ম্মীয় ফ্যাসিজম্ আখ্যা দিলেই ঠিক হয়।

যোগ্যতাকেই চাকুরী প্রভৃতির মাপকাঠি করা উচিত। ইহা হইতেই জনসাধারণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব আসে, জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির সূচনা করে। তাহা ছাড়া এই নীতি অনুসৃত হইলে রাষ্ট্র ও দেশের যোগ্যতম ব্যক্তিদের প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতা কাজে লাগাইবার সুযোগ হওয়ায় জনসাধারণ উপকৃত হইতে পারে। পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই এই নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। পাকিস্থানকে যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র করিতে হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রের এই মৌলিক নীতিগুলিও তাহার মানিয়া লওয়া উচিত।

এখন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। ভারত এশিয়া ও আফ্রিকার সমস্ত নিপীড়িত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক। সে চিরদিনই তাহাদের দাবি ও অধিকার লইয়া দৃঢ়তার সহিত আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানও তাহার এই দায়িত্বের গুরুত্ব আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সমদর্শিতা ও উদারতাই প্রদর্শন করিয়াছে। সেখানে মাইনরিটি ও মেজরিটিতে কোন তফাৎ নাই। মাইনরিটিকে সেখানে মেজরিটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয় নাই, পর করিয়া দূরে রাখা হয় নাই। তাহাদিগকে সুখ-সুবিধা ভোগ ও আত্মবিকাশের সুবিধা সংখ্যানুপাতের নিক্তি দিয়া ওজন করিয়াও দেওয়া হয় নাই। সামর্থ্য ও যোগ্যতার অনুপাতে সেখানে সকল নাগরিকের অধিকারই সমান—মুক্ত, উদার, সব রকম বাধানিষেধ ও পক্ষপাত বর্জ্জিত।

কংগ্রেস দেশ-বিভাগ মানিয়া লইয়াছে। আমাদের মতে ইহা কংগ্রেসের ভুল নহে—এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু জনসাধারণ কংগ্রেসকে ভুল বুঝিয়া বিরূপ হইয়া উঠিতেছে, তাহা সত্ত্বেও কংগ্রেস এই সম্বন্ধে কোন প্রতিকারই করিতেছেন না—ইহা বাস্তবিকই কংগ্রেসের ভুল। তাহা ছাড়া স্বাধীনতার পর কংগ্রেস জাতিকে কোন সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন নাই। উদ্দেশুহীন লক্ষ্যহীন জাতি মাঝপথে দিশাহারা হইয়াছে। আর প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি এই সুযোগে তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে।

দিশাহারা ও বিচ্ছিন্ন জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করাই রাষ্ট্রনায়কদের আজ প্রধান কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে সময়োপযোগী মত ও পথের সন্ধান দিতে হইবে। এইজন্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রচার ও গঠনমূলক কাজের প্রয়োজনই বেশী। জনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে—দেশবিভাগ স্বীকার করিয়া কংগ্রেস ভুল করে নাই। বরং বিচার করিলে মনে হয়, কংগ্রেসের জয়ই সূচনা করিতেছে।

দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্ত কংগ্রেস লীগকে যে চড়া মূল্য দিতে রাজী হইয়াছিল, ইহা দ্বারা দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখিতে পারিলেও, আভ্যন্তরিক জটিলতা দূর হইত না। পরস্পর রেষারেষি পরস্পরকে বাধা

দেওয়ার ও নাজেহাল করার মনোবৃত্তি, দেশের আভ্যন্তরিক সমস্যাকে আরও জটিল ও দুঃসাধ্য করিয়া তুলিত। কংগ্রেস-লীগের অন্তর্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের অল্পদিনের কার্য্যকালে আমরা এই সম্বন্ধে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি।

তাহা ছাড়া অখণ্ড ভারতে প্রত্যেক প্রদেশই প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব ভোগ করিত। প্রদেশের আভ্যন্তরিক কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের থাকিত না। কারণ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা কেবল দেশরক্ষা, যানবাহন, ডাক, বৈদেশিক নীতি প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকিত। ইহার ফলে, দেশের যতটুকু অংশ লইয়া এখন পাকিস্থান হইয়াছে, তার চেয়ে অনেক বিস্তৃত অংশে—(সমস্ত পঞ্জাব ও বাংলা) পাকিস্থান না হওয়া সত্ত্বেও, পাকিস্থানী নীতি কায়েম হইত। পাকিস্থান স্বীকার করিয়া কংগ্রেস এই সব জটিলতা হইতে রেহাই পাইয়াছেন। প্রাকৃতিক সম্পদহীন একটা ঘাটতি এলাকা পাকিস্থানের ভাগে পড়িয়াছে। বিরাট জনবল ও প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ যে বিস্তৃত এলাকা কংগ্রেসের হাতে আসিয়াছে, তাহা যথাযথ কাজে লাগাইতে পারিলে অচিরেই ভারত পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইবে।

কংগ্রেসের এই দেশবিভাগ মানিয়া লওয়ার ফলে পাকিস্থানের হিন্দুদের উপর অবিচার করা হইয়াছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় পাকিস্থানের হিন্দুরাও ইহাতে মত দিয়াছিল। জাতির বৃহত্তর মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই তাহারা স্বেচ্ছায় এই দুরবস্থা বরণ করিয়া লইয়াছে। পাকিস্থানে যদি তাহাদের বসবাস অসম্ভব হইয়া উঠে তাহা হইলে তাহারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় পাইবে ইহাই তাহারা আশা করে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—হিন্দুরাষ্ট্র, এইজন্যই হিন্দুগণ এখানে আশ্রয় পাইবে—এই ধারণা হইতেই তাহারা ইহা দাবি করে না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। নিপীড়িত মানবতার প্রতি যে স্বাভাবিক মমত্ববোধ—ভারতকে, ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান, দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় (অধিকাংশই মুসলমান) এবং পৃথিবীর অন্যান্য নিপীড়িত মানবজাতির স্বার্থের জন্য আন্দোলন করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, সেই নীতিবোধই তাহাকে পাকিস্থানের হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতি, হিন্দু হিসাবে নয়, একদল নিপীড়িত মানব হিসাবে—সহানুভূতি-সম্পন্ন করিয়া তুলিবে। পাকিস্থান যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয় এবং জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল অধিবাসীর সমান নাগরিক অধিকার সেখানে থাকে তবে ইহার কোন প্রয়োজন হইবে না।

পাকিস্থানের হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য ভারতের হিন্দুদের যে যথেষ্ট দরদ ও সহানুভূতি আছে একথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। কাজেই তাহারা নিজেদের রাষ্ট্রকে যদি শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে তাহারা আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থানের হিন্দুদেরও স্বার্থ এবং নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। পাকিস্থানের হিন্দুরাও তাহাই চায়।

ভারতের মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে পাকিস্থানের হিন্দুদের কোন লাভ হইবে না, বরং ইহা তাহাদের নিজেদেরও সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। দেশের ভিতরে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা জীয়াইয়া রাখিলে তাহারা নিজেদের গবর্ণমেণ্টকেই বিব্রত করিয়া তুলিবে। গঠনমূলক বা প্রগতিমূলক কোন কাজেই সরকার হাত দিতে পারিবেন না। ইহাতে তাহাদের নিজেদের রাষ্ট্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং শত্রুদেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

তা ছাড়া একের অপরাধের জন্য অন্যের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ নীতির দিক দিয়াও গর্হিত এবং সমস্ত মুসলমানই মুসলমান সম্প্রদায়ের অপকর্ম্মের জন্য দায়ী নহেন। মৌলানা মাদানী ও মৌলানা আজাদের মত নেতা মুসলমান-সমাজ হইতেই আসিয়াছেন। পৃথিবীর যে-কোন দেশ ও জাতি ইঁহাদের নেতৃত্ব লাভে গৌরব-বোধ করিতে পারে।

ইংরেজ বলিয়াছিল, তাহারা চলিয়া গেলে ভারতে হানাহানি সুরু হইবে, গৃহযুদ্ধে ভারত ছারখার হইয়া যাইবে। তাহাদের সেই ভবিষ্যদ্বাণী আংশিকভাবে সফল হইয়াছে। ইহাতে স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের উপর কলঙ্ককালিমা লিপ্ত হইয়াছে। যে-কোন মূল্যে, যে-কোন উপায়ে ভারতকে এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিতে হইবে। "পাকিস্থানে যাহা ঘটিয়াছিল ভারতে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে"—সভ্য জগৎ এই ধরণের কৈফিয়ত শুনিতে রাজী হইবে না।

যে ন্যায় ও সত্যকে সঙ্গী করিয়া আমরা দুর্গম পথে যাত্রা সুরু করিয়াছিলাম, বহু অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়া তাহা আমরা উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমরা আমাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছি। তীরের কাছে আসিয়া আমরা আজ হাল ছাড়িয়া দিতে পারি না। আমাদিগকে ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে। এই দুঃখ-দুর্য্যোগ ও অশান্তির ভিতর দিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ চিরদিনের জন্য অক্ষয় হইয়া রহিবে যে, সত্য কখনো ব্যর্থ হইতে পারে না।

এই সঙ্গে পাকিস্থানের হিন্দুসম্প্রদায়কে এ কথাটাই বলিতে চাই যে, দেশত্যাগে বাধ্য করা না হইলে তাহাদের দেশত্যাগ করা উচিত হইবে না। পাকিস্থান যদি হিন্দু-মুসলমানের দেশ হয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়, তাহা হইলে আমাদের অধিকার কেহই ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না। আর আমাদিগকে যদি জানাইয়া দেওয়া হয় যে, ইহা মুসলমানের দেশ—দয়া করিয়া যতটুকু অধিকার দেওয়া হইবে, তাহা লইয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, তাহা হইলে আমরা প্রতিকার অসম্ভব

হইলে প্রতিবাদ না করিয়া ভারতে চলিয়া আসিব। ভারত যদি আমাদিগকে আশ্রয় না দেয় আমরা পৃথিবীর সমস্ত মানব-জাতির কাছে মানবতার আবেদন জানাইব, সকলের সাহায্য ভিক্ষা করিব। সমস্ত সভ্যজগৎ তখন আমাদের কথা শুনিবে। কিন্তু বিনা কারণে আমরা যদি দেশত্যাগ করি, দুয়ারে দুয়ারে আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরি, আমাদের অদৃষ্টে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই জুটিবে না।

ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ যে অহেতুক চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, স্থানে স্থানে কলকারখানার শ্রমিকদলের ধর্ম্মঘটের ফলে দেশের উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে, রাষ্ট্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, এসকল জাতির উন্নতির সূচনা করিতেছে না। ছাত্রদের ও যুবকদের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতার নামই ব্যক্তি-স্বাধীনতা নহে। শ্রমিকদের তরফ হইতেও অভিযোগের অনেক কিছুই আছে। বিক্ষোভপ্রদর্শন এবং ধর্ম্মঘট করার অধিকারও তাহাদের আছে একথাও স্বীকার করি, কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও বুঝা উচিত যে, মাত্র সেদিন আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি; সমস্ত সমস্যা দূর করিয়া, সরকার এরই মধ্যে দেশকে একেবারে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবেন—আমরা এখনই এতটা আশা করিতে পারি না। এই সকল অভাব-অসুবিধা আমরা যখন এত দিনই সহ্য করিয়াছি, তখন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের উচিত—অন্ততঃ কিছুকাল ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ দেওয়া। তারপর যদি বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এই দিকে মনোযোগী না হন তাহা হইলে আমরা আমাদের খুসীমত ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারিব। কিন্তু এখন দেশের ভিতর এই রকম হট্টগোল বাধাইয়া তুলিলে আমরা আমাদের নবজাত স্বাধীনতাকে সূতিকাগারেই বিনষ্ট করিয়া ফেলিব।

ভারতের সমস্যা বহুবিধ। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে অনেক অভিনব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তাহার কোনটার চেয়ে কোনটাই ছোট নয়। তবু আত্মরক্ষা-ব্যবস্থাকে সকলের উপরে স্থান দিতে হইবে। কারণ স্বাধীনতা বজায় থাকিলে আজ হোক, আর দুই দিন পরেই হোক আমরা আমাদের অন্যান্য সমস্যারও সমাধান করিতে পারিব। কিন্তু আবার যদি স্বাধীনতা হারাইতে হয়, তাহা হইলে কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না। আমরা আবার যে তিমিরে সেই তিমিরেই ডুবিয়া যাইব। কাজেই আমাদের দেশরক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রথমেই দৃঢ় ও শক্তিশালী করিয়া তোলা প্রয়োজন।

ইংরেজ সৈন্য আমাদের দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে। দেশীয় সৈন্যও দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে আমাদের সামরিক শক্তি স্বভাবতই দুর্ব্বল হইয়াছে। এই সব কারণে আমাদের সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠনে বিশেষ ধৈর্য্য, বিচক্ষণতা ও সাবধানতার প্রয়োজন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কামান-গর্জ্জন থামিতে না থামিতে তৃতীয় মহাযুদ্ধের রণ-দামামা বাজিয়া উঠিতেছে। আজ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া ভারতকেও চলিতে হইবে। তাহা ছাড়া, ভারতের আভ্যন্তরিক জটিলতা, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ভৌগোলিক অবস্থান এই প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি করিয়াছে।

শান্তিই আমাদের কাম্য, কিন্তু দুর্ব্বল ও কাপুরুষের শান্তি নহে। আধুনিক জগতে শান্তির ব্যাখ্যা অন্যরূপ। Perpetual Preparedness for war is peace—যুদ্ধের জন্য সব সময় প্রস্তুতির নামই শান্তি। আধুনিক অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত এমনই একটি বিরাট শক্তিশালী সৈন্যদল আমাদিগকে গঠন করিতে হইবে, যাহার সাহায্যে পৃথিবীর যে-কোন স্থানে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইবে তাহারই প্রতিকার আমরা করিতে পারিব। শক্তির প্রাচুর্য্যের মধ্যে সংযমের বিকাশ হইতে যে শান্তি আসিবে সেই শান্তিই আমরা চাই। কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত শত্রুতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যুদ্ধকে আমরা অকারণে নিজের দেশে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে চাই না। কিন্তু বিশ্বমানবের মঙ্গলের জন্য যুদ্ধ যদি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, ন্যায় এবং সত্য যদি তাহাই চায় তবে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখার পক্ষে যুক্তি নাই।

আমরা চাই, সব রকম অত্যাচার-অবিচার, উৎপীড়ন ও শোষণ, মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব পৃথিবী হইতে বিদূরিত হোক। পৃথিবীর প্রত্যেকটি নরনারী মানুষের মত বাঁচিয়া থাকার অধিকার লাভ করুক। শান্তির কুসুমাস্তীর্ণ পথে তাহা যদি নাই আসে তবে তার জন্য আমরা বসিয়া থাকিব না। দুর্যোগের কণ্টকাকীর্ণ পথেই আমরা তাহার সন্ধানে বাহির হইব। ভারতকে যদি কোনদিন অস্ত্র ধরিতে হয় তাহা হইলে পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব-মানবের কল্যাণের মহান উদ্দেশ্য লইয়াই সে তাহা করিবে।

খাদ্য-সমস্যা আজিকার পৃথিবীর একটি প্রধান সমস্যা। ভারত-সরকারকে প্রত্যেক বৎসরই অত্যন্ত চড়া দামে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হয়। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সাড়ে তিন বৎসরে মাত্র ৫৫ লক্ষ টন খাদ্য-শস্যের জন্য গবর্ণমেণ্টকে ১৬৯ কোটি টাকা বিদেশে পাঠাইতে হইয়াছে। দেশের ভিতর ইহা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করার ফলে, প্রত্যেক বৎসরই গবর্ণমেণ্টকে অনেক টাকা ঘাটতি দিতে হয়। এইজন্য আগামী সাড়ে সাত মাসেই মোট ২২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই এই খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন। কলিকাতার মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি শ্রীযুক্ত বি. এন. জালান দেশের খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি

দেখাইয়াছেন যে, ভারতে মোট ৯ কোটি ৪০ লক্ষ একর আবাদযোগ্য অনাবাদী জমি আছে। এই সব জমি যদি বন্দোবস্ত দিয়া ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে কৃষিকার্য্যের প্রজাগণ নিজেরাই এই সব পতিত জমি আবাদ করিয়া ফসল উৎপন্ন করিতে পারিবে। গবর্ণমেণ্টকে এর বেশী কোন দায়িত্বই লইতে হইবে না।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানীতে ব্যাপক খাদ্য-সঙ্কট দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্ম্মানীর পরাজয়ের ইহাই প্রধান কারণ। তারপর তাহারা দেশের খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মন দেয়। এই প্রচেষ্টাকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা দেশের এক ইঞ্চি জমিও পতিত ফেলিয়া রাখে নাই। ধনিগণ তাহাদের সখের বাগান পর্য্যন্ত এইজন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই অবস্থায় সরকারের অবিলম্বে এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। ইহা দ্বারা এক দিকে যেমন সরকারকে প্রতি বৎসর প্রভূত অর্থ আর বিদেশে পাঠাইতে হইবে না, অন্যদিকে তেমনি খাদ্য-শস্য চড়া মূল্যে ক্রয় করিয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করার ঘাটতি হইতেও সরকার রেহাই পাইবেন। অপর দিকে রাজস্বও বৃদ্ধি পাইবে।

এই কাজে লোকেরও অভাব হইবে না। পশ্চিম-পঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ হইতে যে-সব আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে, তাহাদিগকে এই সব জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে পারে। এই রকম জমি বন্দোবস্ত পাইলে পূর্ব্ববঙ্গ ও পাকিস্থানের অন্যান্য স্থান হইতেও কৃষক সম্প্রদায় উৎসাহ সহকারে ছুটিয়া আসবে।

আমাদের দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী করিয়া তোলার জন্য দেশের লোকবল ও সম্পদকে পরিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগাইতে হইবে। কোথায় কোন্ শিল্প, কি ভাবে গড়িয়া তোলার সম্ভাবনা আছে, কোথায় কোন সম্পদ নিহিত, তাহা কি ভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে—এই সম্বন্ধে ব্যাপক তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন কমিটি গঠন ও জনসাধারণের নিকট হইতে এই সম্বন্ধে পরিকল্পনা রচনার সাহায্য গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হোক। এইসব পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া, কমিটিসমূহ নিজ নিজ মত গঠন করিবেন। ইহাই হইবে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট উপায়। ইহ দ্বারা সরকার দেশের প্রত্যেকটি প্রতিভার উদ্ভাবনী-শক্তি কাজে লাগাইবার সুযোগ পাইবেন।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কি হওয়া উচিত, এখন এই সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। পৃথিবীর যাবতীয় দেশ বিশেষ ভাবে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত ভারতের বন্ধু-ভাবাপন্ন হওয়াই সঙ্গত।

সত্যই যদি পৃথিবীতে তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ভারতের উচিত হইবে—নিরপেক্ষ থাকিয়া নিজের শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া তোলা। প্রথম মহাযুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত শিল্পপ্রধান রাষ্ট্রসমূহ যখন যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে, জাপান তখন নিরপেক্ষ থাকিয়া এই সুযোগে তাহার শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতকেও এই সুযোগে নিজের শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উপসংহারে এই কথাই বলিতে চাই—আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি, কিন্তু অত্যন্ত জটিল অবস্থার ভিতর দিয়াই তাহা পাইয়াছি। এইজন্য আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। জাতির জীবনে দুঃখ আসে, দুর্য্যোগ আসে, সমস্যা আসে। জয় পরাজয় ও উত্থান-পতনের কাহিনী প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই আছে। নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে সকলেই তাহা অতিক্রম করিতে পারে। আমরা দুর্ব্বল নহি, অক্ষম নহি, ব্রিটিশ শাসকদের আমরাই ভারত ছাড়িতে বাধ্য করিয়াছি। আমাদের শিক্ষা, আমাদের প্রতিভা, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে। আমরা যদি আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ পালন করিতে পারি তাহা হইলে কোন প্রতিকূল শক্তিই আমাদের অগ্রগতি রোধ করিতে পারিবে না।

সমস্ত হিংসা-দ্বেষ ও দলাদলি ভুলিয়া আমাদিগকে আজ এক হইতে হইবে। "জীবন ধূলিমুষ্টির চেয়েও তুচ্ছ, কর্ত্তব্য পর্ব্বতের চেয়েও কঠোর"—এই মহামন্ত্রেই আমাদিগকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের জন্য, জাতির জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য, পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলের জন্য মৃত্যুকে পর্য্যন্ত আমরা সহজ ও শান্ত ভাবে বরণ করার শিক্ষা গ্রহণ করিব। সমস্ত পৃথিবীকে আমরা নূতন সত্য ও আলোকের সন্ধান দিব।

বাসন্তী ঘৃত
বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত
টেলিঃ—বাসন্তী ঘি ফোন বি,বি, ৫১৩৮ পোঃ বক্স ৬৮৩৬ কলিঃ

ঘি, সুগারমার্চেন্টস্, এক্সপোর্টারস্, ইম্পোর্টারস্ ও জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারস্
প্রমথনাথ পাল এণ্ড সন্স্
২সি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা—৭

ধাতুর বিনতি

শ্রীপিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঠিন্ত ধাতুর সাধারণ ধর্ম্ম হলেও তার বিনতি (প্লাস্টিসিটি) আছে। এই বিনতির সুযোগ নিয়ে কামার গড়ে কৃষাণের কাস্তে লাঙল, দিন-মজুরের কোদাল কড়ুল, সেকরার কাঁসারির হাতুড়ি ; সেকরা সোনা রূপা গড়ে পিটে তৈরী করে কৃষাণ বৌয়ের, কামার বৌয়ের, মজুর বৌয়ের হাতের কাঁকন, পায়ের মল ; কাঁসারি কাঁসা পিটে তৈরী করে তাদের ঘটি বাটি, থালা কলসী। কৃষাণ ফসল ফলায়, দিন-মজুর রাস্তা ঘাট তৈরী করে, সেই ফসলকে পৌঁছে দেয় হাটে বাজারে।

ধাতুর দুটি প্রধান ধর্ম্ম হ'ল ঘাত-কাঠিন্ত (work hardening) ও ক্ষর-লেখ দ্রাবকের (etching agent) প্রভাবে বহু বিচিত্র নক্সা ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা। এ দুটি ধর্ম্মের মূলেও রয়েছে তার বিনতি। প্রথম ধর্ম্মটি অর্থাৎ ঘাত-কাঠিন্তের সঙ্গে কামার, সেকরা ও কাঁসারির বিশেষ পরিচয় আর দ্বিতীয়টিকে চেনেন গোয়েন্দা পুলিশের অপরাধ-তত্ত্ব বিভাগের ধাতুবিদ্‌।

পিটলে ধাতু নমনীয় হয়। কিন্তু ক্রমাগত পিটতে থাকলে এমন একটা অবস্থা আসে যখন ধাতু আর নরম না হয়ে কঠিন হতে সুরু করে, তার ভঙ্গপ্রবণতা বেড়ে যায়। এই অবস্থায় তাকে তাতিয়ে না নিয়ে যদি কেবলই পেটা হয় তা হলে সে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু তাতিয়ে নিলে তার নমনীয়তা আবার ফিরে আসে, তাকে প্রসারিত করা যায়। তাপের মাত্রাটা এ ক্ষেত্রে ধাতুর গলনাঙ্কে (মেল্টিং পয়েণ্ট) পৌঁছবার কোনও প্রয়োজন নেই। তাই কোনও কিছু পেটাই করে গড়তে হলে ধাতুকারকে জিনিষটিকে একবার গরম করতে ও একবার হাতুড়ির ঘা মারতে হয়। অবিচ্ছিন্ন আঘাতে কঠিন হয়ে যাওয়া ধর্ম্মকে বলা হয় ঘাত-কাঠিন্ত (ওয়ার্ক হারডেনিঙ্‌)।

খুনের তদন্ত করতে গিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ অনেক সময় দেখে যে খুনী পলাতক, ঘটনাস্থলে খুন-করা বন্দুকটা ফেলে যাওয়া ছাড়া আর কোনও চিহ্ন রেখে যায় নি। ধরা পড়বার ভয়ে গোয়েন্দা পুলিশের পাকা খাতায় টোকা, বন্দুকের গায়ে খোদাই করা রেজিষ্টার্ড নম্বরটা উকো দিয়ে একেবারে ঘসে তুলে ফেলেছে। খুনীর চালাকি কিন্তু খাটে না। গোয়েন্দা পুলিশের ধাতুবিদ বন্দুকটার ঘসা জায়গায় ক্ষর-লেখ দ্রাবক লাগিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্দ্রজালের মত নম্বরটি পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়ে তোলেন, ধরে ফেলেন খুনীর কেরামতি।

ধাতুর ঘাত-কাঠিন্ত বা সংখ্যার নক্সা ফোটান ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানীরা কি বলেন তার সংবাদ নেওয়া যাক্‌। বিজ্ঞানীরা বলেন ধাতু তৈরী হয় বহু ছোট ছোট কেলাস অর্থাৎ ক্রিষ্ট্যাল দিয়ে এবং কেলাস সজ্জার বৈচিত্র্যের ফলেই জন্ম নেয় ধাতব-বিনতি, ঘাত-কাঠিন্ত ও নক্সা-ফোটান ধর্ম্ম। ঠিকমত তৈরী করতে পারলে যে কোন ধাতুখণ্ডে এই ছোট ছোট কেলাসগুলিকে অনুবীনের (মাইক্রসস্কোপ) সাহায্যে দেখতে পাওয়া যায়। অনুবীনের নাগালের বাইরে আছে কেলাসের অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র কোঠাদল (ক্রিষ্ট্যাল ব্লক্‌স্‌) আর বহু কোঠাদলের সমাবেশে গড়ে ওঠে এক-একটি অনুবীক্ষণিক কেলাস (ক্রিষ্ট্যাল)। কেলাসের বহু অনু-কোঠা (ইউনিট সেল) এক সঙ্গে মিলে তৈরী করে এক একটি কোঠাদল। কেলাসে কোঠাদল বা অনুকোঠার সমাবেশ-বৈচিত্র্য তাদের এক্স-রশ্মির (X-rays) আলোক-চিত্রের পাঠোদ্ধার করে বুঝতে পারা যায়। কেলাসে কোঠাদল অনুকোঠার সমাবেশের তারতম্য অনুযায়ী তাদের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে-আসা রঞ্জন রশ্মির (X-rays) তীব্রতা কমে বাড়ে। অঙ্কের সাহায্যে এই কমা-বাড়ার হিসাব করা যায় এবং তার থেকে ধরা পড়ে কেলাসে কোঠা-দল ও অনুকোঠাদের সমাবেশ-বৈচিত্র্য।

ধাতুর কেলাসে অনুকোঠাই আদি নয় কারণ অনুকোঠার আদিতে রয়েছে ধাতুর পরমাণু কণারা। অনুবীক্ষণিক কেলাসের দেশে একটি কেলাস যেন আকাশ-ছোঁয়া প্রাসাদ, এক একটি কোঠাদল যেন তার এক একটি তলা আর এক একটি অনুকোঠা যেন তার এক একটি ঘর। এক একটি অনুকোঠার ঘর আবার তৈরী ধাতুর একাধিক পরমাণু কণা দিয়ে—প্রত্যেকটিই নক্সা অনুযায়ী তলায় তলায়, ধাপে ধাপে, সারিতে সারিতে সমস্ত কেলাসটিতে সুন্দর ভাবে মেপে-জুপে সাজান। একটি কোঠাদল আর একটি কোঠাদলের, একটি অনুকোঠা আর একটি অনুকোঠার, একটি পরমাণু আর একটি পরমাণুর আকর্ষণে বাঁধা। স্বাভাবিক অবস্থায় আকর্ষণের টান এড়িয়ে তাদের অবস্থান সমাবেশ বদলাতে পারে না—টানের বাঁধনেই সমস্ত কেলাস প্রাসাদটা টিকে থাকে, তাসের ঘরের মত সহজে ধ্বসে পড়ে না। কোন একটি ধাতব কেলাসে প্রচণ্ড চাপ পড়লে কেলাসের কোঠাদলগুলির একটি অপরটির ওপরপিছলে যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তারা সিঁড়ির ধাপের মত বা হাতের ঠেলায় ছড়িয়ে-পড়া এক প্যাকেট তাসের মত সাজিয়ে পড়ে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই পিছলে যাওয়াটা

চলতে থাকে। বিজ্ঞানীদের ভাষায় একে বলে বিনতি-বিকৃতি (প্ল্যাসটিক ডিফরমেশন)। চাপের বহরটা যদি মাঝামাঝি রকমের হয় তা হলে এই স্খলনটা প্রত্যাকর্ষণের বাইরে যায় না, কোঠাদলেরা পরস্পরের টানের এলাকার মধ্যেই থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্বাভাবিক অবস্থান থেকে পরমাণুদের সামান্য বিচ্যুতি ঘটে। চাপটা সরিয়ে নিলে পরামাণু কণারা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বের স্থানে ফিরে যায়, কেলাসের বিকৃতিটা স্থায়ী হয় না। প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে উঁচু পাকা বাড়ীর অবস্থা অনেকটা এ রকম হয়। ঝড়ের প্রচণ্ড বেগের মুখে বাড়ীটা একটু ঝুঁকে পড়ে, ঝড় কমলে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে। এ ধরণের বিকৃতিকে বৈজ্ঞানীরা বলেন বিনতি-বিকৃতি বা স্থিতিবেদী বিকৃতি (ইলাষ্টিক ডিফরমেশন)। বিনতি-বিকৃতির ব্যাখ্যায় এক টুকরো ধাতুকে পিটে পাতে, কিম্বা টেনে তারে কেন রূপান্তরিত করতে পারা যায় তার উত্তর দেওয়া চলে। কিন্তু ধাতুর ঘাত-কাঠিন্য, ভঙ্গপ্রবণতা বা নম্রা কুটিয়ে তোলার রহস্য ভেদ বিনতি-বিকৃতির ব্যাখ্যায় হয় না।

কয়েকটি সিদ্ধান্ত বা প্রকল্পের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা এই ধর্ম্মগুলির ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। প্রথম সিদ্ধান্ত অনুসারে কেলাসের একটি কোঠাদল আর একটি কোঠাদলের উপর চাপের ঠেলায় হড়কে গেলে কোঠাদলের ঘষটে-যাওয়া পিঠদুটি থেকে পরমাণু কণারা ছিঁড়ে আসে; ছিঁড়ে-আসা পরমাণু কণারা ঘষটে-যাওয়া পিঠদুটোর মাঝখানে এলো-মেলো ভাবে ছড়িয়ে পড়ে মিশে যায়। এই অনিবদ্ধ অবস্থায় পরমাণু কণারা আঠার মত কাজ করে এবং রগড়ে যাওয়া কোঠাদল দুটোকে টান লাগিয়ে ধরে রাখবার চেষ্টা করে। চাপের ধাক্কায় কোঠাদলেরা যতই পেছলাতে থা৻ আঠাল পরমাণুদের সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে এবং জোরাল হতে থাকে স্খলন-নিবর্ত্তি বাধা। এভাবে স্খলন-নিবর্ত্তি বাধার টানে পিছলে যাওয়াটা কমলে ধাতুর বিনতিটাও কমে যায় এবং তার ঘাত-কাঠিন্য বাড়ে। চাপের ধাক্কাটা পরিমাণে খুব বেশী হলে কোঠাদলদের পরস্পরের সংযোগটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, আর এর ফলে ধাতুর টুকরোটা ভেঙে বা ছিঁড়ে যায় দু'ভাগে। এই ভেঙে যাওয়াটাই আমরা চোখের স্থূলদৃষ্টিতে দেখি। সিদ্ধান্তটিকে আঠালপরমাণুর সিদ্ধান্ত (এটমিক গ্লু থিওরি) বলে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটির ভাষ্যটি একটু অন্য রকমের। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ঘষটাবার সময় কোঠাদল থেকে খুব ছোট টুকরো ভেঙে গিয়ে স্খলন-তলের (স্লিপ-প্লেন) মাঝে মাঝে আটকে থাকে। টুকরো জমার রুক্ষতায় ও চাপের ধাক্কায় কোঠাদলের পেছলানটা মোলায়েম ভাবে ঘটতে পারে না কারণ টুকরোগুলো বাধা দেয়। সানবাঁধান রকে পেছলান আর খোয়া-ওঠা কাঁচা রাস্তায় আছাড় খাওয়ায় যে তফাৎ সেই আর কি! সিদ্ধান্তটির নাম হ'ল "টুকরো ভাঙা সিদ্ধান্ত" (ফ্র্যাগমেন্টেশন থিওরী)

তৃতীয় সিদ্ধান্তটি অনুসারে পিছলে যাবার সময় কোঠাদলরা নিজেরাই বেঁকে তরঙ্গিত হয়। ঢেউ খেলান একটি লোহার পাতকে আর একটি ঢেউ খেলান পাতের উপর দিয়ে লম্বালম্বি ভাবে টেনে যাবার সময় একটির ঢেউয়ের মাথা অপরটির ঢেউয়ের পেটের সঙ্গে খাঁজে খাঁজে মিলে আটকে যাওয়ার জন্য যেমন বাধার সৃষ্টি করে এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কোঠাদলে ভাঁজ পড়ে সেই রকম বাধার সৃষ্টি করে, চাপের ধাক্কায় পিছলে যাওয়া কোঠাদলদের আটকে রাখে; পেছলান বাড়লে কোঠাদলের তরঙ্গ বিকৃতির মাত্রাও বাড়ে, ফলে তাদের পেছলানটা ক্রমশঃ কমতে কমতে থেমে আসে, বিনতি-বিকৃতি পৌঁছায় তার শেষ সীমায়। সিদ্ধান্তটিকে "অনুজাল বিকৃতি" (ল্যাটিস্ ডিসটরসন) বলা হয়।

এতক্ষণ কেবল একটিমাত্র কেলাসের কথা ধরা গেছে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এক টুকরো ধাতুর মধ্যেও এ রকম হাজার হাজার কেলাস আছে। প্রত্যেকটি কেলাস তার কোঠা-দলকে নিয়ে দৈবক্রমে নানা দিকে নানা ভাবে পংক্তি করা থাকে, আশে পাশের কেলাসদের সঙ্গে সকল সম্ভাব্য কোণে সাজান থাকে। কেলাসদের এই সমাবেশটিকে কাঁচের ইঁটের নিচ্ছিদ্র ভরাট স্তূপের সঙ্গে তুলনা করা চলতে পারে। কাচের স্তূপটিতে চাপের ধাক্কা লাগলে কতকগুলো ইঁট সামনে এগোবে, কতকগুলো তাদের পাশেরগুলিকে পাশে বা পেছনে ঠেলে দেবে। যেন খেলার মাঠে পুলিশের গুঁতোয় দর্শকদলের মধ্যে ঠেলাঠেলি। প্রত্যেক দলেরই চেষ্টা আশ-পাশের দলকে ঠেলেঠুলে নিজের দলকে সামলে রাখা। চাপের ধাক্কায় ধাতুর ঘন সন্নিবিষ্ট কেলাসদের মধ্যেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটে; কতকগুলি কেলাসের কোঠাদল ধাক্কার মুখে পিছলে যায়, ঠেলমারা অপরাপর কেলাসের কোঠা-দলকে পাশে ওপরে নীচে পিছলে যেতে বাধ্য করে। চাপটা হাতুড়ির ঘা, টান বা ঠেল যেরূপেই আসুক না কেন এলো-মেলো পেছলানোর ফলটা হয় একই। প্রত্যেক কেলাসের কোঠাদলরা বিনতি-বিকৃতির শেষ সীমায় পৌঁছয়। তারা বিনতি-বিকৃতির সীমা ছাড়ালে ধাতুর টুকরোটি ভেঙে যায়। পূর্ব্বোক্ত তিনটি সিদ্ধান্তের ব্যাখায় ঘাত-কাঠিন্যের রহস্যটা একটু পরিষ্কার হলেও সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোন্ সিদ্ধান্তটি আসলে ঠিক সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আজও নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি।

ঘাত-কাঠিন্যের রহস্য ত একটু পরিষ্কার হ'ল। এইবার তাতাবার পর পেটাই করা রূপটা (যে রূপটার জন্য হাতুড়ীর ঘা থেকে) ল্লা হারিয়ে ধাতু আবার নমনীয় ও প্রসার্য্য হয় কেন বা ধাতুর বিনতি ফিরে আসে কি ভাবে তার ব্যাখায়

আসা যাক। ক্রম-লেখ গ্রাবকের প্রভাবে মন্থর বা নম্রা ফুটিয়ে তোলার কারণও সেই সঙ্গে বুঝতে পারা যাবে।

ইতিপূর্ব্বে বলা হয়েছে স্বাভাবিক অবস্থায় পারস্পরিক টান এড়িয়ে ধাতুর কেলাসে কোঠাদল ও তাদের পরমাণু কণাদের অবস্থান সমাবেশ বদলান দুর্ঘট। কেলাসে কোঠাদলে পরমাণু কণাদের স্তরে স্তরে পংক্তিতে পংক্তিতে সাজিয়ে পড়বার ঝোঁকটা খুব প্রবল। চাপের ধাক্কায় একটি কোঠাদল আর একটি কোঠাদলের ওপর যখন পিছলে যায় তখনও এই ঝোঁকটা থাকে। কিন্তু ঝোঁকটা থাকলেও সেটা সব সময় কার্য্যকরী হতে পারে না। হাতুড়ীর ঘা বা অন্য চাপের ধাক্কায় পিছলে যাবার সময় প্রায়ই কোঠাদলের পিঠ থেকে একটা পরমাণু কণা ছিঁড়ে গিয়ে তার নিকটবর্ত্তী কোঠাদলের দুটো পরমাণু-কণার মাঝামাঝি থামতে বাধ্য হয়। তখন দুটো লড়ায়ে জাতের মাঝখানে একটা নিরপেক্ষ জাতের মত এই ছিঁড়ে আসা পরমাণু-কণাটির অবস্থা উভয় সঙ্কট হয়ে দাঁড়ায়, দু'পাশের পরমাণু-কণার টানে সে একই সময়ে যেতে চায় দুটো অবস্থিতিতে। কাজেই নিরপেক্ষ জাতটার মত অসম্ভব টানাটানির মধ্যে থাকা ছাড়া তার অন্য উপায় থাকে না। চারদিকের টানের মাত্রাটা এত বেশী হয় যে তাকে অচল হয়েই থাকতে হয়। হাতুড়ীর ঘা বা অন্য কোন বাইরের চাপ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ধাতুর ওপরের পিঠে ও ভিতরের মাঝামাঝি জায়গায় কোঠাদলগুলিতে এটা ঘটতে থাকে, কিন্তু বাইরের চাপ সরিয়ে নিলে ধাতুর ওপরের পিঠের অবস্থার সঙ্গে ভিতরের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থায় আর কোনও মিল থাকে না। দু'জায়গায় অবস্থা তখন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। সে সময় ধাতুর ওপরের পিঠের কোঠাদলগুলি থেকে ছিঁড়ে আসা পরমাণু-কণাদের ওপর চাপের ধাক্কায় স্থানচ্যুতির টান ছাড়া অপর কোন বাড়তি চাপ থাকে না। তখন তাদের ওপর ধাতুর মাঝামাঝি জায়গার পরমাণু-কণাদের টানটা তাদের স্থানচ্যুত অবস্থায় আর ধরে রাখতে পারে না। এর ফলে স্থানচ্যুত রমাণু-কণারা স্থানচ্যুতির টান এড়িয়ে কাছের পংক্তিতে আবার সারি দিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু হাতুড়ীর ঘা বা অন্য কোন বাইরের চাপ সরিয়ে নিলে ধাতুর ভিতরের মাঝামাঝি জায়গার কোঠাদল থেকে স্থানচ্যুত পরমাণু-কণারা স্থানচ্যুতির টান এড়াতে পারে না—স্থানচ্যুতির টান ছাড়াও সেখানে তাদের ওপর চারদিক থেকে, ওপর থেকে নীচে থেকে দু'পাশ থেকে একটা বাড়তি টান থাকে এবং এই টানের জোরটা তাদের পংক্তিতে সারি বাঁধবার স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে অনেক বেশী জোরাল। সুতরাং ধাতুর ভিতরের পিঠের স্থানচ্যুত পরমাণুদের স্থানভ্রষ্ট হয়ে

অচল অবস্থায় টানাটানির মধ্যেই থাকতে হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে ধাতুর ওপরের পিঠের ও ভিতরের মাঝামাঝি জায়গায় কেলাসের কোঠাদলে পরমাণু-কণারা বাইরের চাপের ফলে টান-পীড়িত হয়। বাইরের চাপটা সরিয়ে নিলে ধাতুর ভিতরে এই টানটা থেকে যায় কিন্তু ধাতুর ওপরের পিঠের পরমাণু-কণারা এই টানটাকে এড়িয়ে পংক্তি সাজিয়ে ধাতুর ওপরের পিঠে কেলাসের কোঠাদলে টানমুক্তি ঘটায়।

খুনের বন্দুকের নম্বর ফুটে ওঠার কারণ এবার পরিষ্কার হবে। নম্বরগুলো বন্দুকের ওপর প্রচণ্ড চাপে খোদাই করা হয়। উকোর ঘষটানিতে খুনী নম্বরগুলো ও তার আশপাশের টানমুক্ত তলটাই কেবল নষ্ট করে কিন্তু নম্বরগুলোর নীচে প্রবল টান-পীড়িত কেলাসগুলির ওপর কোন প্রভাব রেখে যেতে পারে না। ক্ষর-লেখ দ্রাবক প্রথমে টান-পীড়িত কেলাসগুলির ওপরের পাতলা স্তরটা ক্ষয়ে ফেলে, তার পর টানমুক্ত কেলাসগুলির চেয়ে টান পীড়িত কেলাসগুলিকে বেশী এবং তাড়াতাড়ি ক্ষয় করায়। কাজেই নম্বরগুলোর নীচের কেলাসগুলি ক্ষয় হয় বেশী আর ক্ষয় হওয়ার ফলে ঘষে ফেলা নম্বরক'টি ফুটে ওঠে।

ভেতরে টান থাকা ধাতু মোটেই ভাল নয়। তাপের প্রথম কাজ হ'ল এই টান দূর করা। ধাতুতে পরমাণু-কণার, এমন কি স্থানভ্রষ্ট পরমাণুরা পর্য্যন্ত একসঙ্গে তাড়াতাড়ি কাঁপতে থাকে; উষ্ণতা যত বেশী হবে কাঁপুনিটা ততই বাড়বে। ক্রমে এমন একটা অবস্থা আসে যখন পরমাণুদের কাঁপুনি এত বেশী বাড়ে যে আভ্যন্তরিক টান থাকা সত্ত্বেও স্থানচ্যুত পরমাণুরা পংক্তিতে ফিরে যেতে পারে এবং যায়ও। এই রকম তাপ লাগানকে ধাতুবিদ্‌দের ভাষায় বলে পীড়ন মুক্তি (ষ্ট্রেস রিলিভিং) বা আরোগ্য (রিকভারি)। পীড়ন মুক্তির জন্ত খুব বেশী উষ্ণতার দরকার হয় না। কতকগুলি ধাতু আবহিক উষ্ণতায়ও (রুম টেম্পারেচর) টানমুক্ত হয়। সাদা কথায় ক্রমাগত হাতুড়ির ঘা খেলেও তারা কঠিন বা ভঙ্গপ্রবণ হয় না—কারণ হাতুড়ির ঘা থামলেই তারা তাদের পূর্ব্বাবস্থা ফিরে পায়। রাং (টিন) ও সীসে হ'ল এ সব ধাতুদের দলে।

কেবলমাত্র আরোগ্য ধাতুর প্রসার্য্যতা বা নমনীয়তা ফিরিয়ে দিতে পারে না। কেলাসরা তখনও বিস্তৃত এবং বিকৃত অবস্থায় থাকে। ধাতুকে যদি আরও বেশী গরম করলে ব্যাপক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়; বিকৃত বিস্তৃত কেলাসরা ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়, ও তাদের জায়গায় নূতন সুগঠিত ছোট ছোট কেলাসরা গড়ে ওঠে। অনিয়তাকার আঁঠাল পরমাণু-কণারা লাগাম-টানা (ব্রেকিং) টুকরো পরমাণুপুঞ্জ তরঙ্গিত বস্তুর কোঠাদলরা নূতন গড়ে ওঠা কেলাসগুলিতে মিশে যায়। অণুবীনের দৃষ্টিতে এটা দেখতে ও ধরতে পারা যায়। নূতন কেলাসগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন স্খলন তলও (গ্লাইড প্লেনস) গড়ে ওঠে। নূতন স্খলন তল গড়ে ওঠার ফলে কোঠাদলগুলি আবার পেছলাতে পারে এবং ধাতুর টুকরাটি তার পূর্ব্বের প্রসার্য্যতা ফিরে পায়। তখন তাকে আবার তার বিনতি সামর্থ্যের (প্লাষ্টি-এবিলিটি) শেষ সীমা পর্য্যন্ত পেটাই করা বা টানা চলতে পারে।

এভাবে ধাতুর ঘাত-কাঠিন্য ও কমলায়নের (অ্যানিলিং) নানা পর্য্যায়ের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন ধাতুর বিনতি সীমা (প্লাসটিক-লিমিটস্), আরোগ্যদায়ক উষ্ণতা (রিকভারি টেম্পারেচর), কেলাস পুনর্ব্বিকাশক তাপমাত্রা (রিক্রিষ্টালি-জেসন টেম্পারেচর) সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা ধাতুকারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ধাতু নিয়ে কাজ করার বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তার এ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান জন্মান স্বাভাবিক কিন্তু বিজ্ঞানীই ধাতুর নানা ধর্ম্মের উৎস জেনে তার ব্যাখ্যা করেন, যে অদৃশ্য ছন্দ দোলায় ধাতুর দেহে নানা বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন রূপ নেয় তাকে লোকগোচর করেন।

মাতৃমন্দির

২৬-এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গর্ভাবস্থায়, নিরাপদে থাকা, প্রসব এবং শিশু রক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়।

মানদা দেবী, লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

পুস্তক-পরিচয়

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজ-চিত্র—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে দশ টাকা।

'সমাচার দর্পণে' "বাবুর উপাখ্যান" প্রকাশিত হয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে। 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "কলিকাতা কমলালয়" ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং "নববাবুবিলাস" ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার পর হইতেই বাংলা-সাহিত্যে সামাজিক নক্সা রচনার ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ উপন্যাস-রচনার পূর্ব্ব হইতেই সমাজচিত্র-রচনায় বাঙালী মন দিয়াছে। ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় "আলালের ঘরের দুলাল" হইতে আরম্ভ করিয়া "আনন্দ-লহরী" পর্য্যন্ত দশখানি সামাজিক চিত্রের নাম করিয়া বলিয়াছেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলা-গদ্যে এইরূপ আরও অনেকগুলি চিত্র জন্মলাভ করে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" প্রথম প্রচারিত হয়। বলিতে গেলে বাংলা ভাষা ও রচনারীতির উপর "হুতোম প্যাঁচা"র প্রভাব সাধারণ নয়। আজকাল চলিত ভাষায় গ্রন্থ-রচনার যে রীতি প্রচলিত হইয়াছে "হুতোম"কে তাহার পথপ্রদর্শক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০--১৮৭০) শুধু মহাভারতের অনুবাদ সম্পাদন এবং প্রকাশ করিয়াই যশস্বী হন নাই, "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। "নক্‌শা"র তখনকার কলিকাতার অপূর্ব্ব চিত্র দেখিতে পাই। সচিত্র "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সহিত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "সমাজ কুচিত্র" (১৮৬৫ খ্রীঃ) ও রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণের "পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব" (১৮৬৮ খ্রীঃ) পরিষৎ-প্রকাশিত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সম্পাদকদ্বয় লিখিত ভূমিকাটি মূল্যবান।

দেবতার জন্ম ও অন্যান্য গল্প—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী। দি বুক এম্পোরিঅম লিমিটেড, ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

ছোট গল্পের বই, এগারোটি গল্পের সমষ্টি। গ্রন্থকারের লিখিবার একটি নিজস্ব ভঙ্গী আছে এবং এই বিশেষ রচনাভঙ্গী গল্পগুলিকে সরস ও সুপাঠ্য করিয়াছে। প্রথম গল্প 'দেবতার জন্ম'। পথের-মাঝে-পড়িয়া-থাকা এক শিলাখণ্ড কিরূপে প্রস্তর জন্ম পরিহার করিয়া দেবতার পদে উন্নীত হইল তাহারই কাহিনী। শেষের গল্পটি 'মহা পাকিস্থানের পথে'। গল্পটি অত্যন্ত সুকৌশলে লিখিত। যাহা মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি হইতে পারিত তাহাই এক কৌতুককর ঘটনায় পরিণত হইয়া প্রচুর হাস্যের উপাদান যোগাইয়াছে। 'আমার প্রথম লেখা' নামক গল্পটিতে লেখক বলিতেছেন, "আমার গল্পরা যখন রূপান্তরিত হয়ে সেজেগুজে আপনাদের সমক্ষে গিয়ে দাঁড়ায় তখন তাদের দেখে হয়ত হাস্যকর বলে মনে হলেও হতে পারে কিন্তু যখন আমার সামনে বা আশেপাশে, আমাকে জড়িয়ে নিয়ে, গাঁজতে থাকে তখন তা দস্তুরমতই গঞ্জনাদায়ক। মোটেই হাস্যকর নয়, 'অন্ততঃ আমার পক্ষে তো নয়।" ভাবাবেগসঙ্কুল গুরুগাম্ভীর্য্যের দেশে হাসি এবং কৌতুকের লীলাচাপল্য সত্যই রুচিকর। তবে ভঙ্গী যেখানে ভঙ্গিমায় অর্থাৎ mannerism-এ পরিণত হইবার

নেতাজীর অনুসরণে

বাংলার বিখ্যাত ঘৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার "শ্রী" মার্কা ঘৃতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিষ্প্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 'শ্রী' ঘৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ঘৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ ঘৃত যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা ঘৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

বিশেষ সম্ভাবনা লেখককে সেখানে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। পাঠক গল্পগুলি পড়িয়া আনন্দলাভ করিবেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ— সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৬৮—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র। সাহিত্যের এই নীরব এবং অক্লান্ত সাধক বহু বিষয়েই অগ্রণী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথের নাম প্রথম সম্পাদকরূপে থাকিলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথই "ভারতী"র সঙ্কল্পয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা। "পুরুবিক্রম", "সরোজিনী", "অশ্রুমতী" প্রভৃতি নাটক, "কিঞ্চিৎ জলযোগ" "অলীক বাবু" প্রভৃতি প্রহসন একদা যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত ও ফরাসী সাহিত্যের অন্তর্গত বিভিন্নপ্রকার গ্রন্থের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃত সুষ্ঠু অনুবাদগুলি বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। জ্যেষ্ঠ-অনুসৃত পথে তিনি বাংলা স্বরলিপির নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রাঙ্কনশক্তি সাধারণ ছিল না। তিনি নানা-বিষয়ক প্রায় অর্দ্ধ শত গ্রন্থের প্রণেতা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবন-গঠনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব অল্প নহে।

স্বদেশপ্রেমিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক "হিতবাদী"র খ্যাতনামা সম্পাদক, স্বদেশী আন্দোলনের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও প্রচারক, কয়েকটি বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা, সুরসিক এবং সুলেখক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) মাত্র ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ এবং নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা প্রতিপক্ষের ভয়ের কারণ ছিল। তাঁহার সম্পাদনায় "হিতবাদী" একদিন সংবাদপত্র-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সাহিত্যবিচার—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং। ৮সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি এবং সমালোচক মোহিতলালের রচনা সাহিত্যরসিকমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। বর্ত্তমান গ্রন্থে 'কবি ও কাব্য,' 'কাব্য ও জীবন', 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস,' 'সাহিত্যের ষ্টাইল' 'নাটকীয় কথা,' 'আধুনিক সাহিত্যের ভাষা', 'সাহিত্যের আসরে' এবং 'সংবাদপত্র ও সাহিত্য' এই আটটা প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। মোহিতবাবু চিন্তাশীল এবং সুরসিক লেখক। মনস্বিতা এবং হৃদয়বত্তার এরূপ সম্মিলন বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে বিরল। লেখক 'কাব্য কথা' নাম দিয়া একখানি গ্রন্থরচনার সংকল্প করিয়াছিলেন, ঐ নামে কতকগুলি প্রবন্ধও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, —'কবি ও কাব্য' সেই সংকল্পিত গ্রন্থের অংশবিশেষ। দেশী ও বিদেশী শ্রেষ্ঠ কাব্যের রসে তাঁহার চিত্ত পরিপুষ্ট। আজিকার অনেক সমালোচক নূতন ভঙ্গীমাত্র দেখিয়া চমৎকৃত, কেহবা পাণ্ডিত্যপ্রকাশে উদ্‌গ্রীব, কাহারও দৃষ্টি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারে আচ্ছন্ন, আবার কাহারও কাব্যবিচার অপর সমালোচকের প্রতিধ্বনি ছাড়া কিছু নয়। মোহিতলালের আছে স্বাধীন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, তাঁহার আলোচনায় পাই সংবেদনশীল হৃদয়ের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। পুরাতনের মধ্যে যাহা অমর, তাহার প্রতি তিনি অতিশয় শ্রদ্ধাবান্‌, নূতনের মধ্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা দেখিলে তিনি তাহার অভ্যর্থনায় অগ্রসর। তিনি নিজে যাহা বুঝিয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন, স্থায়ী সাহিত্যের কষ্টিপাথরে কষিয়া যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা অকুণ্ঠিত ভাবে জানাইয়াছেন। শুধু জানাইয়াছেন বলিলে যথেষ্ট হইবে না, রচনাগুণে আপন আনন্দ ও প্রত্যয় পাঠকের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।

সাহিত্যের মূলতত্ত্বের অভ্যন্তরে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন এবং সেই

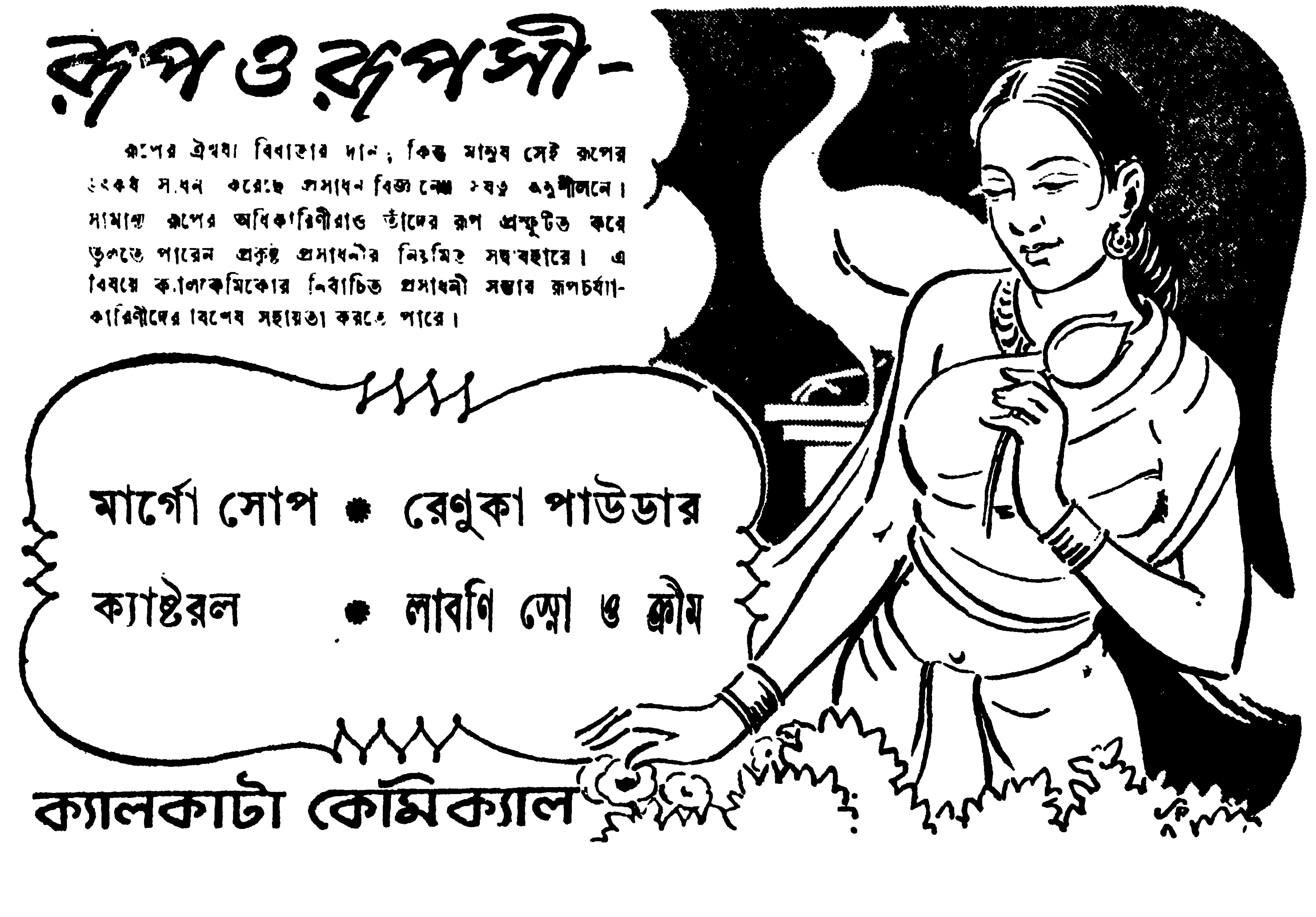

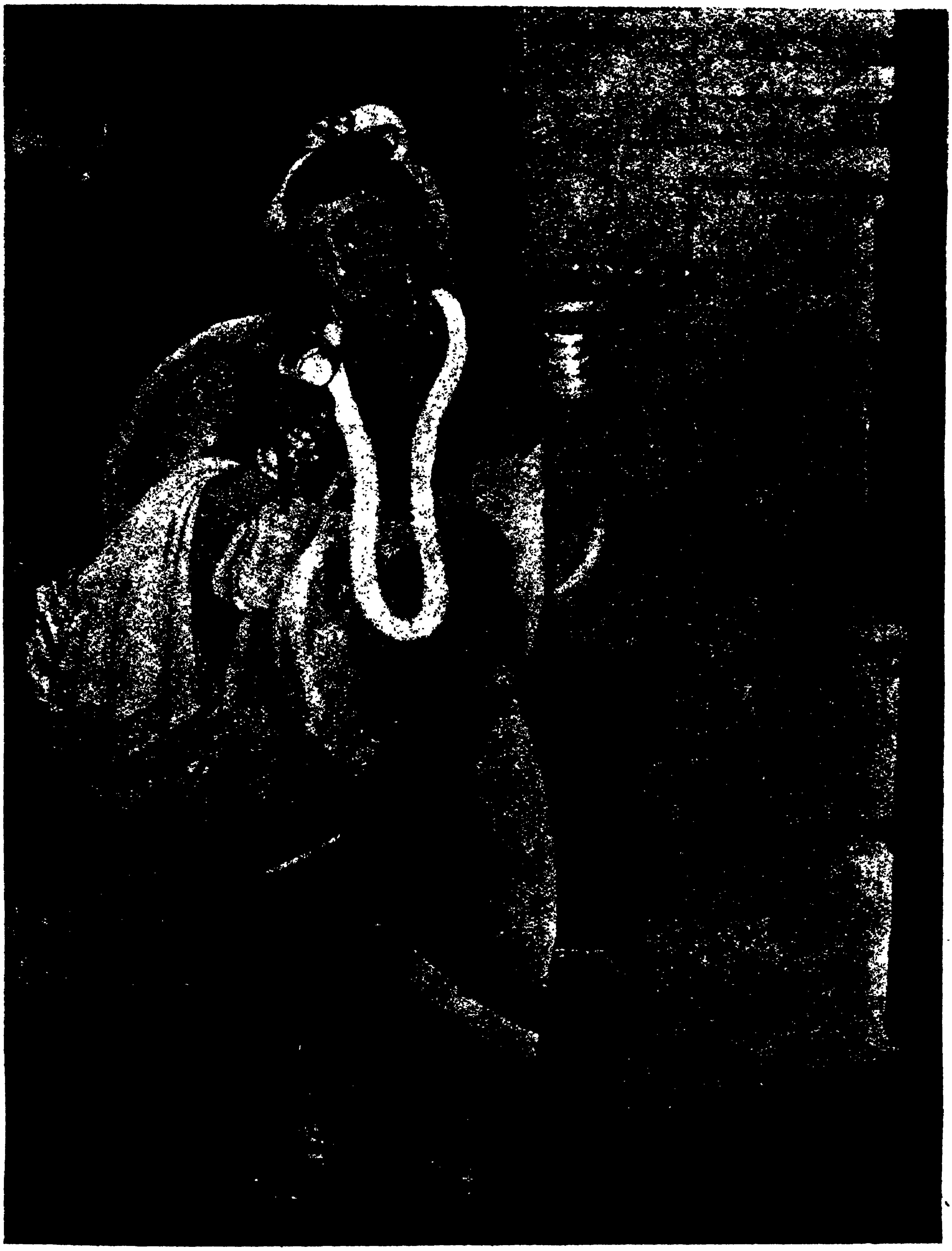

নটী

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রাইসট্যাগ শহর—যুদ্ধের পূর্ব্বে

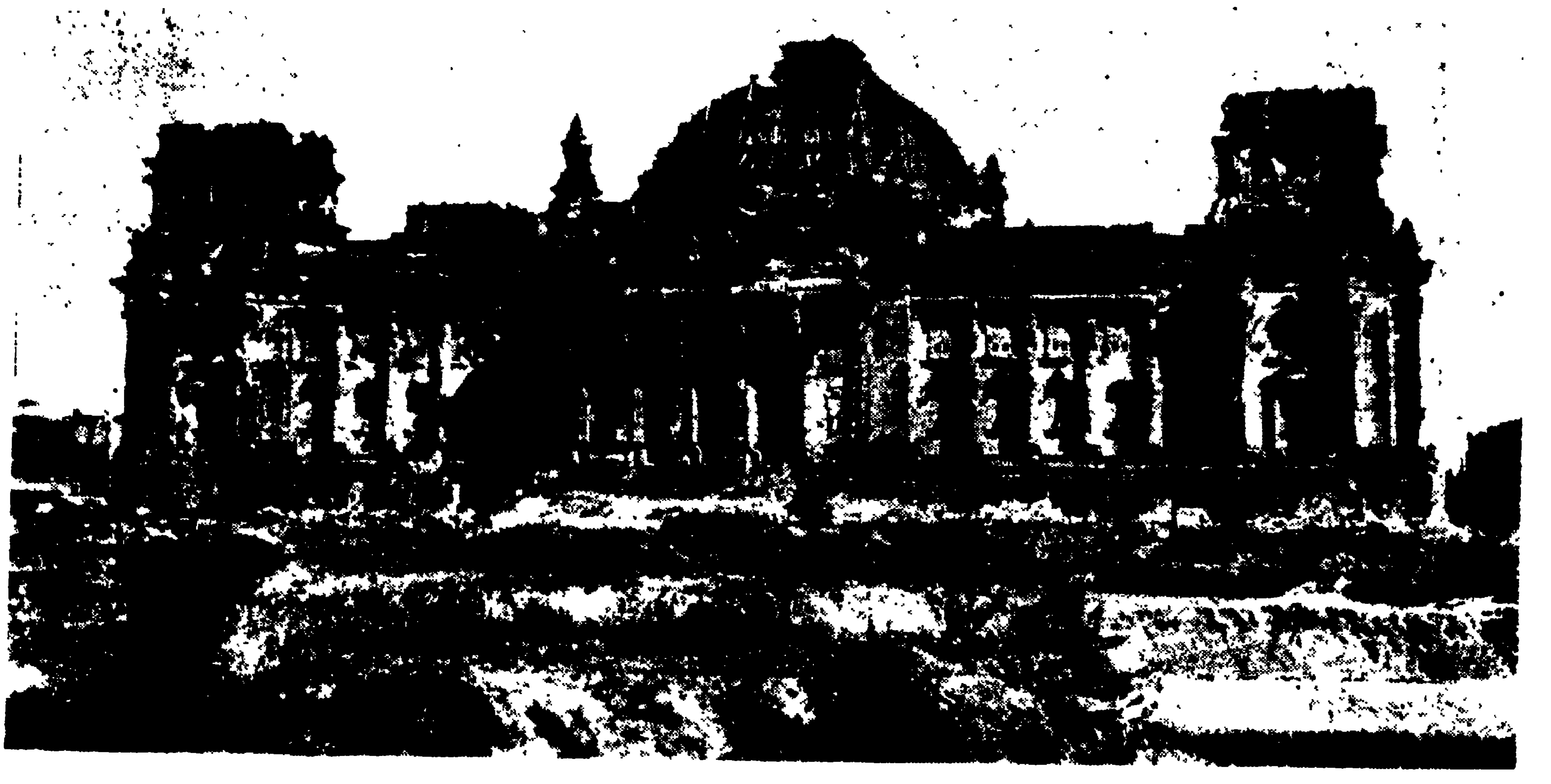

যুদ্ধোত্তর রাইসট্যাগ

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৮শ ভাগ ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৫৫ | ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতার প্রথম বৎসর

স্বাধীনতার প্রথম বৎসর শেষ হইতে চলিয়াছে। এই বৎসরের হিসাব-নিকাশের এখনও সময় হয় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কি সন্দেহ আছে যে এই বৎসরের মধ্যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র যে ঝড়-ঝঞ্ঝার, যে বিষম অনাচারের স্রোতের সম্মুখীন হইয়াছে তাহার তুলনা ভারতের ইতিহাসে অতি অল্পই আছে? আজ দেশ যে দুরাচারদিগের কবলে পড়িয়া অতিশয় শঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে রহিয়াছে তাহারা সকলেই ঘরের শত্রু, সকলেই এদেশের মাটিতে জন্ম ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে। এখন আর বিদেশীর উপর দোষারোপ করিয়া নিজের মনকে ভুলাইবার উপায় নাই। স্বাধীনতার যে উজ্জ্বল চিত্র আমাদের সকলেরই মানসচক্ষের উপর এত দিন ছিল, আজ বাস্তবের কঠোর সঙ্ঘাতে তাহা মৃগতৃষ্ণিকার মত ক্রমেই দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া যাইতেছে কেন?

কারণ প্রধানতঃ দুইটি, প্রথমতঃ স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা এবং রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব, দ্বিতীয়তঃ যাঁহাদের হস্তে আমাদের দেশের শাসন ও পরিচালনের ভার রহিয়াছে তাঁহাদের অনেকের নিদারুণ নৈতিক অবনতি। স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছাচারের মধ্যে এবং স্বাধীনতা ও স্বার্থসিদ্ধির মধ্যে প্রভেদ বুঝেন আমাদের মধ্যে এরূপ লোক এক লক্ষে এক জনও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এত দিন আমাদের বিশ্বাস ছিল যে কংগ্রেস নেতৃবর্গ এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সজাগ; আজ তাঁহাদের অধিকাংশের চরম অধঃপতনের পরিচয় পাইয়া আমাদের চমক লাগিতেছে। জনসাধারণের তো কথাই নাই, চতুর্দ্দিকে স্বাধীনতার নামে যে সকল যুক্তি-তর্ক শুনা যায়, যেরূপ কার্য্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ছয় শতাব্দী ব্যাপী দাসত্বের ফলে আমরা স্বাধীনতার অর্থে বুঝিয়াছি স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ ও প্রবঞ্চনার সুযোগ, স্বাতন্ত্র্য অর্থে বুঝিয়াছি ফাঁকি দিয়া কার্য্যসিদ্ধির সুযোগ। স্বাধীনতা বিনামূল্যে পাওয়া যায় না একথা আমাদের বুঝাইবে কে এবং স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য যে আমাদের সদাসর্ব্বদা সজাগ হইয়া থাকিতে হইবে ইহাই বা বলিবে কে? ইংরেজীতে যে প্রবাদ আছে "Eternal vigilance is the price of Liberty."—"স্বাধীনতার মূল্য অবিশ্রান্ত সজাগ-সতর্কতা"—তাহা আমাদের সকলেরই সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

ঘুষ, চোরাকারবার এবং শাসনতন্ত্রের অবনতির ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে যে কলুষ চতুর্দ্দিক কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার প্রতিকারে কয়জন প্রকৃতপক্ষে চেষ্টিত? প্রায় সকলেই উহাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্রামের সময় পর-নিন্দায় আনন্দলাভ করেন, কেহ কেহবা স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্ররূপে উহাকে আশ্রয় করিয়া পরের অনিষ্টের ব্যবস্থা করেন। কদাচিৎ একজন দেখা যায়, যিনি নিজে সচেষ্ট হইয়া উহার প্রতিকারের বিষয়ে চিন্তা করেন। দেশ জাগ্রত হইলেও চোরাকারবার, ঘুষ ইত্যাদি বন্ধ করা যায় না ইহা অবিশ্বাস্য কথা। এক জনের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে, দশ জনের চেষ্টাতেও ফল না ফলিতে পারে, কিন্তু শত সহস্র লোকের মিলিত চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে না, ইহা স্বাধীন দেশে সম্ভব নয়। আসলে আমরা এখনও সমষ্টিগত ভাবে দেশের ও নিজেদের প্রগতির বিষয় চিন্তা করিতেই শিখি নাই।

নেতৃবর্গের উপর নির্ভর করিলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। ইংরেজ অভিধানকার জনসন অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক দুঃখে লিখিয়া গিয়াছিলেন, "Patriotism is the last resort of a scoundrel"—"দুর্বৃত্ত নরাধমের শেষ আশ্রয় দেশভক্তি"—এবং ঐরূপ লেখার ফলেই বোধ হয় ইংরেজ পরে জগতে অত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল। আজ আমাদের ঐ কথা মনে রাখিয়া যাঁহারা দেশভক্তির ও "ত্যাগ" নামক পরশপাথরের সাহায্যে আমাদের কর্ণধার হওয়ার দাবী করিতেছেন তাঁহাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে।

উদাহরণ-স্বরূপ সেই দলের কথা বিচার করা যাউক যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের লোকজনকে বিপদে ফেলিয়া পশ্চিম বঙ্গের "গদী" দখলের চেষ্টায় ব্যস্ত—বলা বাহুল্য, প্রকৃত দেশপ্রেমী ও ত্যাগী যাঁহারা তাঁহাদের প্রায় সকলেই পূর্ব্ববঙ্গেই থাকিয়া স্বদেশবাসীর পরিত্রাণের চেষ্টা করিতেছেন—ইঁহাদের ব্যবহারে ও কার্য্যকলাপে দলগত এবং ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণ ভিন্ন অন্য কিছুর পরিচয় পশ্চিম বঙ্গের লোক কোনও দিন পায় নাই। আজও ইঁহাদের যদি পশ্চিম বঙ্গের লোক না চিনে তবে এদেশের উদ্ধারের

আশা কম। ইঁহাদের মুখে আজকাল এক নূতন যুক্তি শুনা যাইতেছে যে, ইঁহাদের "ত্যাগ" না থাকিলে, পশ্চিম বঙ্গ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত না, সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের লোকের স্বায়ত: ও ধর্মত: উচিত ইহাদের কাছে দাসখত লিখিয়া দেওয়া। "ত্যাগ" কি করিয়াছেন সে প্রশ্নের উত্তরে শুনা যায় যে ইঁহারা যে দয়া করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় ভোট গ্রহণ-কালে বঙ্গচ্ছেদের ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গের ভারতরাষ্ট্রে যোগদানে বাধা দান করেন নাই, তাহাতেই উঁহারা ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। বস্তুত: পক্ষে ইঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের আত্মীয়স্বজনকে যেভাবে ভাসাইয়া দিয়া স্বার্থচিন্তায় বিভোর রহিয়াছেন, তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের লোকের ইঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে ইঁহারা ঐ চরম বিশ্বাসঘাতকতার লোভ সম্বরণ করিয়া, "নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ" করেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু বাঙালীর দুঃখ-সুখের চিন্তা আমাদের সর্ব্বদাই করা কর্ত্তব্য, আত্মীয়তার জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য, কিন্তু তাঁহাদের এই যে রাষ্ট্রনৈতিক চোরাকারবারী নেতৃবর্গ—যাহারা সুদিনে তাঁহাদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং দুর্দ্দিনে তাঁহাদের মাথায় পা দিয়া জলা পার হইয়া পশ্চিম বঙ্গের ডাঙ্গায় উঠিতে ইচ্ছুক—তাঁহাদের প্রতি আমাদের প্রকৃত দায়িত্ব কি তাহা সকলেরই বুঝা উচিত। পশ্চিম বঙ্গ না বাঁচিলে না বাড়িলে বাঙালী নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে একথা সকলেরই বুঝিতে হইবে। দেশে যে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল নিয়ম-বিরোধিতা চলিয়াছে, তাহা যে চরম দেশদ্রোহিতার পরিচয় ইহা সকলেরই জানা প্রয়োজন। দেশের লোক যদি বাঁচিতে চাহে তবে এখনই এই অনাচারের স্রোতে বাঁধ দিতে কর্ত্তৃপক্ষকে আহ্বান ও সাহায্য করা প্রয়োজন।

স্বাবলম্বী বাঙালী

গত বার বৎসর যাবৎ বাঙালীর উপর দিয়া সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত এই ঝঞ্ঝায় ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবন প্রায় ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। খাদ্য, বস্ত্র এবং প্রত্যেকটি নিত্য-ব্যবহার্য্য শিল্পদ্রব্যের জন্য বাঙালী পরমুখাপেক্ষী। বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার সমগ্রভাবেই ভিন্ন প্রদেশীয়দের হাতে চলিয়া গিয়াছে। ইহাদের হাতে তেল, ঘি প্রভৃতির ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে চলিয়া যাওয়ার ফল হইয়াছে এই যে ভেজাল খাদ্যে বাঙালীর জীবনী-শক্তি ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; দুধের ব্যবসা অবাঙালীর হাতে চলিয়া যাওয়ায় উহাতেও যে ভেজাল চলিতেছে তাহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। ভেজাল দুধ এবং ভেজাল খাদ্যের দ্বারা ভবিষ্যদ্বংশীয় বাঙালীকে ক্ষীণজীবী ও পঙ্গুপ্রায় করিয়া ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার পথ প্রশস্ত হইতেছে। বাংলার যে মধ্যবিত্ত সমাজ দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল তাহাই মরণের পথে দাঁড়াইয়াছে। স্বদেশীর নামে কষ্টস্বীকার ইহারা করিয়াছে, তাহার লাভ কুড়াইয়াছে অবাঙালী ধনীর দল। দীর্ঘস্থায়ী দুর্ম্মূল্যের বাজারে এবং ভেজাল খাদ্যে মধ্যবিত্ত, বিশেষত: নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীর অবস্থা এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে একটু কঠিন রোগের ধাক্কা সামলাইবার শক্তি তাহার আর নাই, আগেকার দিনে যাহাকে সাধারণ রোগ বলা হইত এখন তাহাতেই অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটিতেছে। যক্ষ্মা তো প্রায় ঘরে ঘরে।

বাঙালী জাতিকে বাঁচাইতে হইলে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশকে সর্ব্ববিষয়ে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। পশ্চিম বঙ্গে যে জমি আছে তাহার সবটা যদি ভাল ভাবে চাষ হয়, কৃষকেরা যদি ভাল বীজ, সার এবং অল্প সুদে প্রয়োজনানুযায়ী ঋণ পায়, সেচ-ব্যবস্থার যদি উন্নতি হয়, তাহা হইলে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ খাদ্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে। র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ডে পশ্চিম বঙ্গের আয়তন এমন করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বাঙালীকে গ্রাম্য জীবনের পরিবর্ত্তে এখন শহরকেন্দ্রিক শিল্পজীবন অবলম্বন করিতে হইবে। এই পরিবর্ত্তনকে স্বীকার করিয়া লইয়া এখন হইতে উহাকে রূপ দিবার জন্য পরিকল্পনা আরম্ভ করা দরকার। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এখনও এ বিষয়ে কোন পরিকল্পনা আরম্ভ পর্য্যন্ত হয় নাই। প্রতি জেলায় একটি করিয়া সূতাকল বসাইয়া তাঁতে কাপড় বুনিবার ব্যবস্থা করিলে বাঙালীর বস্ত্রসমস্যা ঘুচিয়া যায়, বহু লোকের কর্ম্মসংস্থানও হয়। বস্ত্র উৎপাদনের দায়িত্ব মুষ্টিমেয় কয়েকজন মিল-মালিকের হাতে ছাড়িয়া না দিয়া উহা বহু জনের মধ্যে ছড়াইয়া সমবায় নীতিতে বণ্টন করিয়া দিলে এখনকার স্থায় রক্তচোষা জুয়াচোর বস্ত্রব্যবসায়ীর সৃষ্টিও হইতে পারিবে না। বাংলার বড় বড় শিল্পগুলি এতদিন ছিল ইংরেজের হাতে, এখন ঐগুলি ক্রমে অন্য প্রদেশীয় লোকে কিনিয়া লইতেছে; উহা আশু বন্ধ হওয়া দরকার। কাপড়ের এবং খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা মাড়োয়ারীদের এবং দুধের ব্যবসা অবাঙালীদের একচেটিয়া অধিকার থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। পশ্চিম বঙ্গের পরিত্রাণের পথ সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠানের গঠন এবং শিল্পকেন্দ্রগুলিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা—বাঙালী জাতিকে বাঁচাইতে হইলে এ কাজ করিতেই হইবে।

অভিজ্ঞ, দূরদর্শী এবং উপযুক্ত লোক লইয়া অবিলম্বে একটি অর্থনৈতিক বোর্ড গঠন করিয়া বাঙালীকে স্বাবলম্বী করিবার উপায় নির্দ্ধারণের ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করা উচিত। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা বাঙালীর স্বাবলম্বনের একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত হইলে এবং উহা কাজে পরিণত হইলে বাঙালীর বাঁচিবার উপায় হইবে। কাজটা কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু মোটেই অসম্ভব নহে। তবে ইহা ঠিক যে, এ বিষয়ে যতই অবহেলা করা হইবে কাজ ততই কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিবে।

কংগ্রেস গবর্ন্মেণ্টের ভিতরে ও বাহিরে

শ্রীকিশোরীলাল মশরুওয়ালা সম্প্রতি 'হরিজন' পত্রে কংগ্রেস এবং কংগ্রেস গবর্ন্মেণ্টের যে সমালোচনা করিয়াছেন দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিতেছেন যে যাহারা

কংগ্রেস কমিটিসমূহে পদ অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং যাহারা তাহার বাহিরে আছে তাহাদের উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সদ্ভাবপূর্ণ নহে। গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের ও প্রতিষ্ঠানেরভিতরে যে কংগ্রেস কাজ করিতেছে এবং বাহিরে যে কংগ্রেস কাজ করিতেছে তাহাদের সম্বন্ধও মোটেই সদ্ভাবপূর্ণ নহে। প্রত্যেক শ্রেণীই অপর দুই শ্রেণী সম্বন্ধে বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। এই সকলের বাহিরে আরও দুই শ্রেণীর কংগ্রেসের লোক আছে। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণী স্বাধীনতা অর্জ্জন ও ন্যায়নিষ্ঠ নিষ্কলঙ্ক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যৌবনের প্রারম্ভে আন্তরিক আগ্রহ ও আনুগত্যের সহিত কংগ্রেসের কাজ করিয়াছে। স্বাধীনতালাভের দ্বারা তাহাদের মনে শান্তি ও আনন্দ আসে নাই বরং তাহারা অসুখী ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে; কারণ যে মহান্ কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলার কাজে তাহারা সাহায্য করিয়াছে সেই কংগ্রেস ক্ষমতা লাভ করিয়াই জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছে এবং যে সকল উচ্চ আদর্শের কথা পূর্ব্বে প্রচার করিয়াছে আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির জন্য তদনুযায়ী কাজ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহারা অতি বেদনাহত চিত্তে চোখের সম্মুখে দেখিতেছে যে কংগ্রেস এখন স্বার্থসিদ্ধির ও ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক দল-উপদল গঠনের সুবিধাজনক যন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা এখন আর নিজেরা সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছে না কিন্তু চারিদিকে দুর্নীতির বিস্তার দেখিয়া শান্তিতে বিশ্রাম করিতেও পারিতেছে না। দ্বিতীয় শ্রেণী সাধারণ লোক; তাহারা এদল ওদল লইয়া মাথা ঘামায় না। তাহারা চায় ন্যায়নিষ্ঠ গবর্ণমেণ্ট, ভদ্র ব্যবহার, জনসাধারণের আবেদন নিবেদন সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা এবং দুর্নীতিবিহীন শাসন পরিচালনা যাহাতে জনসাধারণের সুখসুবিধা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই সকল বিষয়ে জনসাধারণ কোন উন্নতি দেখিতে পাইতেছে না এবং তাহাদের ধারণা জন্মিতেছে যে অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে আরও মন্দের দিকে চলিয়াছে। ইহার ফলে কংগ্রেসের নাম লোকের নিকট দিন দিন অপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

গবর্ণমেণ্টের ভিতরের কংগ্রেসকর্ম্মী এবং কংগ্রেস কমিটির কর্ম্মীদের মধ্যে বিরোধ কেন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং একটা দ্বৈত শাসন কেন দেখা দিতেছে শ্রীযুক্ত মশরুওয়ালা তাহা অতি সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন—

"কংগ্রেসের যাহারা গবর্ণমেণ্টের ভিতরে আছে আর যাহারা বাহিরে আছে, তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষভাবের প্রধান কারণসমূহ এইরূপ বলিয়া আমার মনে হয়।

"যে লোক গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদ অধিকার করিয়া আছে, সে লোক দায়িত্বের বোঝা ততটা অনুভব না করিয়া তাহার পদকে অর্থ ও মর্য্যাদা লাভের উপায়স্বরূপ মনে করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক পদে ও গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত কমিটির প্রত্যেক স্থলে, ভাতা, মাহিনা, অন্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া, চাকুরী প্রদানের ক্ষমতা কিম্বা অন্যের দ্বারা নিজের কিছু কাজ করাইয়া লওয়া—যে কাজ গবর্ণমেণ্টের পদ অধিকার করিয়া না থাকিলে আদায় করা যায় না—এই সমস্ত সুযোগ আছে। তাহাকে যে সকল কাজ করিতে হয় তাহা অপেক্ষাকৃত হালকা আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেখানে দায়িত্ব বৃহৎ ও চরম সেখানে কংগ্রেস-পরিচালিত গবর্ণমেণ্টসমূহেও জা'ত ও সম্প্রদায় দেখিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। অথচ কংগ্রেস নীতি এই পদ্ধতিতে কর্ম্মচারী নিয়োগের বিরোধী। যখন কংগ্রেসের সমর্থন দেওয়া হয়, মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়, এমন কি অল্প সময়ের জন্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিটি গঠন করা হয় সেই সকল ক্ষেত্রেই কোন্ ব্যক্তির কি যোগ্যতা আছে না আছে সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া, সেই ব্যক্তি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ও কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী তাহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। দলকে মজবুত রাখিবার জন্য এরূপ প্রয়োজন হইয়া উঠে এবং প্রত্যেক চাকুরীই গোপন ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়ায়। চাকুরীর জন্য লালায়িত নহে এরূপ লোক খুব অল্পই আছে এবং যদিও চাকুরীর প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে তথাপি যত লোক আশা করিয়া থাকে চাকুরীর সংখ্যা তত নয়, ফলে যাহারা চাকুরী পায় না তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যলাভে ব্যর্থ হইয়া ইহারা কংগ্রেস কমিটিসমূহের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে স্থান করিয়া লইবার চেষ্টা করে এবং কংগ্রেসের যাহারা গবর্ণমেণ্টের কাজে নিযুক্ত আছে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কংগ্রেস কমিটিগুলিকে পরিচালিত করে। এই প্রকারে এক রকম দ্বৈত শাসনের সৃষ্টি হইয়াছে। কংগ্রেসের যাহারা গবর্ণমেণ্টের অভ্যন্তরে আছে কংগ্রেস কমিটিগুলি তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চায়, আর যাহারা গবর্ণমেণ্টের অভ্যন্তরে আছে তাহারা কংগ্রেস কমিটিগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখিতে চায়।"

রাজনৈতিক কারণে উচ্চপদে প্রিয়পাত্র নিয়োগ দেশের পক্ষে যে কি ভয়ানক ক্ষতিকর "spoil system" প্রবর্ত্তন করিয়া আমেরিকা তাহা বুঝিয়াছিল এবং এখন উহা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ ভাবে কর্ম্মচারী নিয়োগের নীতি অবলম্বন করিয়া নিজের শাসনযন্ত্র সুদৃঢ় করিয়াছে। আমাদের দেশে কংগ্রেস ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার পরিত্যক্ত এই spoil system চাকুরিক্ষেত্রে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং তার ফলে উচ্চপদে অযোগ্য লোক নিয়োগ করিয়া শাসনযন্ত্রের দক্ষতা যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা রসাতলে দিয়াছেন ও দেশের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। পাবলিক সার্ভিস ট্রিবিউনাল কর্ত্তৃক প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার দ্বারা নিরপেক্ষ ভাবে নিছক যোগ্যতার ভিত্তিতে লোক নিয়োগ ও প্রমোশনের নীতি প্রবর্ত্তিত হইলে শাসনযন্ত্রের দক্ষতা বাড়িবে, গবর্ণমেণ্টের ভিতরের ও বাহিরের কংগ্রেস কর্ম্মীদের বিরোধের মূল কারণটি দূর হইবে এবং ইহাতে শাসনযন্ত্রের ব্যয়ভারও অনেক কমিয়া আসিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় কংগ্রেস এই ন্যায়সঙ্গত ও কল্যাণকর নীতি এখনও প্রবর্ত্তন ও পালন

করিতে চাহেন না, খসড়া রাষ্ট্রবিধিতেও এখানকার ন্যায় পাবলিক সার্ভিস ট্রিবিউনালকে এই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। কংগ্রেস কমিটিগুলিতে, বর্ত্তমান দলাদলি যে এত বাড়িয়াছে তার একমাত্র কারণ মন্ত্রিত্ব ও চাকুরির লোভ। ইহারই জন্য কংগ্রেস সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠানরূপে জনসাধারণের সম্মুখে আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। যাহারা এখন বড় হইয়া উঠিতেছে, যাহাদের বয়স উনিশ-বিশ বৎসর হইতে চলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই ধারণা জন্মিতেছে যে কংগ্রেস অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে ইহা আর যুবকদের যোগদান করিবার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নাই। শ্রীযুক্ত মশরুওয়ালা এই কথা বলিয়া বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতাদের সতর্ক করিয়া দিয়া মন্তব্য করিতেছেন যে যদি কংগ্রেস নিজের দোষ দূর না করে তবে ইহা কয়েকটি প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির পয়সায় পোষা লোকের সংকীর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে।

ট্যাক্স ফাঁকি

ভারতের যে সমস্ত কোটিপতি আয়কর ফাঁকি দিয়া বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি আয়কর তদন্ত কমিশন গঠিত হইয়াছে। সর্ এস বরদাচারী কমিশনের সভাপতি। গত বাজেট-বক্তৃতায় অর্থ-সচিব শ্রীষমুখম চেট্টি বলিয়াছেন যে সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি না দিলে কাহারও পক্ষে কোটি কোটি টাকা সঞ্চয় করা সম্ভব নহে। আয়কর কমিশন ভারতের শ্রেষ্ঠ ধনকুবেরদের নামের একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তালিকায় যাঁহাদের নাম আছে তাঁহাদের সম্পত্তি যুদ্ধের পূর্ব্বে কি ছিল এবং এখন উহার পরিমাণ কি তাহা জানাইবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আমেদাবাদ, বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, কোয়েম্বাটুর, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ এবং আজমীঢ়ে প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে। যাহাদের অভিযোগ আয়কর তদন্ত কমিশনের বিচারের জন্য দেওয়া হইয়াছে তাহার কয়েকটি তুলিয়া লওয়া হইবে বলিয়া কোন কোন সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল। ভারতের কয়েকটি সবচেয়ে বড় ধনকুবের পরিবারের অনেকগুলি নাম তদন্ত কমিশনের তালিকায় আছে এবং ইঁহাদের সম্বন্ধে তদন্ত স্থগিত রাখিবার চেষ্টা হইতেছে বলিয়া সাধারণের মনে একটা ধারণা জন্মিতেছে। এই ধারণা যত শীঘ্র দূর করিয়া দেওয়া হয় ততই মঙ্গল।

শুধু আয়কর নয়, বড় বড় ধনকুবেরগণ প্রাদেশিক ক্রয়শুল্ক ফাঁকি দিতেও সমান আগ্রহশীল এরূপ সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। এইরূপ এক গোষ্ঠীর প্রায় ৬৮টি কোম্পানী আছে; তার মধ্যে কয়েকটি বড় বড় কারবার কলিকাতায় আছে। ইহাদের নিকট হইতে ক্রয়শুল্ক যথারীতি আদায় হইতেছে না বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ আমাদের আছে। এই শ্রেণীর বৃহৎ কারবারগুলি হইতে যথারীতি ক্রয়শুল্ক আদায় হইলে বাজেটে আদায়ের পরিমাণ যাহা ধরা হইয়াছে তাহা হইতে অনেক বেশী আদায় হওয়ার কথা। এই সব কোম্পানীর ব্যালান্স শীটে উৎপাদনের পরিমাণ যাহা দেখানো হয় তাহা সঠিক কিনা বলা কঠিন, তথাপি উহার উপরও ক্রয়শুল্ক ধার্য্য হইলে টাকা অনেক বেশী আদায় হওয়ার কথা। এখন আইন যাহা আছে তাহাতে খাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া পার পাওয়া কঠিন নয়। অবিলম্বে এই মর্ম্মে অর্ডিনান্স জারী করা উচিত যে প্রত্যেক কোম্পানী তাহাদের পাঁচ বৎসরের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবের খাতা রক্ষা করিতে এবং প্রয়োজন মাত্র সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবে। ম্যানুফ্যাকচারিং একাউণ্ট শাখা আপিস মারফৎ বিক্রয়ের হিসাব এবং ফাটকাবাজির হিসাব লুকাইয়া সরকারের ট্যাক্স এবং অংশীদারের লভ্যাংশ ফাঁকি দেওয়ার জন্য ম্যানেজিং এজেন্সি পরিচালিত কোম্পানীগুলির আগ্রহ এত বেশী যে খাতা গোপন করিবার জন্য ইঁহারা অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। শুধু জরিমানার ভয় দেখাইয়া ইহাদিগকে খাতা বাহির করিতে বাধ্য করা যাইবে না, ইহার জন্য কঠোর কারাদণ্ডের বিধান আবশ্যক। এইরূপ অর্ডিনান্স করা হইলে আয়কর এবং ক্রয়শুল্ক উভয় বিভাগেরই আয় বাড়িবে। শিয়ালদহ ষ্টেশনে ল্যাণ্ড কাষ্টমসের বিবেকবান কর্ম্মচারীরা ট্রেন তল্লাসী করিতে গেলে ভারপ্রাপ্ত অফিসার বাধা দেন একথা প্রকাশিত হইয়াছে এবং আমরাও লিখিয়াছি। ক্রয়শুল্ক বিভাগেও বড় কারবারিয়াদের বাঁচাইবার জন্য এরূপ হইতেছে কিনা তাহা দেখা দরকার।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকার

কয়েক দিন হইল পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেণ্ট আটা, ময়দা ইত্যাদির দাম প্রায় শতকরা ৫৬ ভাগ বাড়াইয়া দিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পাউরুটির কথা বলা যায়—আধ সের ওজনের রুটির দাম ছিল ।/০ ; হইয়াছে ।।০। এই মূল্যবৃদ্ধির অজুহাত দেওয়া হয় যে বিদেশ হইতে গম ও আটাময়দা খুব বেশী দামে কিনিতে হয় এবং আমাদের প্রদেশে বিক্রয় করিতে হয় কম দামে ; এই ব্যবসায়ে প্রায় ৪ কোটি টাকা বৎসরে ক্ষতি হয়। কত দামে কেনা হইয়াছিল তাহা না জানিলে, এই হিসাব গ্রহণ করা যায় না। গম, আটাময়দার আমদানি দাম ; জাহাজ ভাড়া, রেল ভাড়ার খরচ ; গুদাম ভাড়ার খরচ ; কর্ম্মচারিবৃন্দের অসাবধানতায় শস্যের ক্ষতি—এই সব এই হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে। এরূপ হিসাব না দেখাইয়া সরবরাহ বিভাগের খেয়াল মত দাম ধার্য্য করিলে তাহার সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ থাকিয়া যাইবে। কারণ কাপড় ও চিনি লইয়া যে খেলা চলিতেছে, তাহার সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের নানা বিভাগের যোগাযোগ না থাকিলে ইহা কখনও সম্ভব হইত না।

পাঁচ-ছয় মাস পূর্ব্বে চিনির জন্য আমাদের দিতে হইত

সেরপ্রতি ॥৶১০ আনা; এখন দিতে হয় ১/০, ১৶০ আনা। কাপড়ের বাজারে ত কাট্‌কাবাজী চলিয়াছে; তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট দাম নাই। গত মে মাসের ৮ তারিখে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন মিলে যে ধুতি জোড়া বিক্রয় হইত ৫৮/১০ আনায়, ৯ই মে তারিখে তাহা বিক্রয় হইয়াছিল ১০৷৶১০ আনায়। তারপর কাপড়ের বাজারে যাহা হইয়াছে তাহা আমাদের হাড়ে হাড়ে বুঝাইয়া দিয়াছে "স্বদেশী ভাবের" মূর্খামি। গবর্ন্মেণ্ট প্রায় আড়াই মাস এই গলা-কাটা দৃশ্য দেখিয়াছেন দ্রষ্টারূপে, বেদান্তের ব্রহ্মরূপে। এই গলা-কাটাগিরি ন্যায্য বা অন্যায্য তাহা স্থির করিবার ভার শুল্ক সমিতির (Tariff Board) উপর দিয়া কিছু সময় কাটাইলেন; এই সুযোগে কাপড়ের কলের মালিক ও ব্যবসায়ীরা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা আমাদের গলা টিপিয়া ট্যাঁকে পুরিলেন। এখন শুল্ক সমিতি নাকি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বর্ত্তমানে কাপড়ের কলে যে দাম আদায় হইতেছে তাহা "অত্যধিক ও অন্যায়" ("exhorbitant and unjustified")। গত জানুয়ারী মাসের তুলনায় মোটা কাপড়ের দাম শতকরা ৫০ ভাগ, মাঝারি কাপড়ের দাম শতকরা ৭৫ ভাগ ও মিহি কাপড়ের দাম শতকরা ১০০ ভাগ অধিক। কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের মন্ত্রিমহোদয়গণ কাপড় কিনেন না; খাদি পরেন। কাপড়ের দাম যে চড়িতেছে তাহার খবর তাঁহাদের কানে পৌছিতে কত সময় লাগিয়াছিল জানি না। কিন্তু জনসাধারণ শুল্ক সমিতির হিসাব-নিকাশ না দেখিয়াই কাপড়ের কলের মালিকের ও ব্যবসায়ীর ডাকাতিটা বুঝিতেছিল।

কাপড় ও চিনি সম্বন্ধে বিদেশ হইতে আমদানীর অজুহাতটা চলে না। কিন্তু আমাদের সরবরাহ বিভাগগুলির কল্যাণে একটা অজুহাত খুঁজিয়া বাহির করা যাইবে। তাহাদের পেছনে পুলিশ ও মিলিটারি আছে; তাহার জোরে আমাদের ঘাড়ে যাহা ইচ্ছা তাহাই যে চাপাইয়া দেওয়া চলে তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছে। বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে চিনি ও গুড় মজুত হইয়া যাইতেছিল; তাহাদের দাম কমিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। আমাদের সদাশয় সরকার বাহাদুর হুকুম দিলেন—"চালাও এসব বিদেশে; দেশের লোকে বেশী দাম দিয়া কিনিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যখন তখন দাম কমিতে দেওয়া হইবে না; বিদেশে চালান দিতে পারিলে দাম কমাইবার কোন কথা উঠিবে না।" এই ত অবস্থা। কৌপিনবস্ত হইয়া থাকিতে হইবে; আধপেটা খাইয়া থাকিতে হইবে। আর দিল্লী কলিকাতায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা "স্বাধীনতার" শ্লোগান তুলিয়া আমাদের বুদ্ধিকে করিবেন বিভ্রান্ত; চোরাকারবারীরা আমাদের পকেট মারিবে; আর আমাদের সরকার বাহাদুর ক্যাল ক্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিবেন। আছি বেশ! কোন অন্যায়ের প্রতিকারের কথা দুরাশা ছাড়া কিছু নয়।

পাকিস্থানে চোরাই চালান

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদপত্রে পত্র লিখিয়া পাকিস্থানে কাপড় চালানের একটি বিবরণ দিয়াছেন। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সহিত উহা হুবহু মিলিয়া যায়। বে-আইনি চালান কি ভাবে কোথা দিয়া হয় এতদিনে কর্ত্তৃপক্ষ তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাইয়াছেন এবং ইচ্ছা করিলে এই চোরা কারবার সপ্তাহ কালের মধ্যে বন্ধ করা অসম্ভব কাজ নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বহু আন্দোলন সত্ত্বেও সরকার ইহা নিবারণের জন্য কোন আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন না বরং নিষ্ক্রিয় থাকিয়া এই পাপের প্রশ্রয় দিয়া চলিয়াছেন। শিয়ালদহ হইতে বেনাপোল পর্য্যন্ত কি কৌশলে কাপড় চালান যাইতেছে প্রত্যক্ষদর্শী ভদ্রলোকের বিবরণ হইতে তাহা সুন্দর ভাবে জানা যায়। গ্রীষ্মাবকাশে তিনি পাকিস্থানের পল্লীভবনে যাইতেছিলেন; সন্ধ্যার পর শিয়ালদহ ষ্টেশনের ভীড়ে সাধারণ যাত্রীদের ফটক অতিক্রম করাও দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকিয়া দেখা গেল বস্ত্রের পুঁটুলিধারী অসংখ্য নরনারী পূর্ব্বে সুকৌশলে প্রবেশলাভ করিয়াছে। শুল্ক-বিভাগের কর্ম্মচারীদের প্রথম সাক্ষাৎ মিলিল কয়েকটি ষ্টেশন পার হওয়ার পর, শিয়ালদহ ষ্টেশনে নহে এবং তদন্ত আরম্ভ হইল বনগাঁ ষ্টেশনে। বনগাঁয় পৌছিবামাত্র প্রত্যক্ষদর্শী যে কামরায় ছিলেন সেই কামরা হইতেই পাঁচ-সাত জন লোক কাপড়ের বড় বড় বোঁচকা পিঠে করিয়া নামিয়া বিনা বাধায় অদৃশ্য হইয়া গেল। লক্ষ্য করিয়া তিনি দেখিলেন যে প্রত্যেক কামরা হইতেই এইরূপ কয়েকজন পাইকারী ব্যবসায়ী নামিয়া গেল। পাকিস্থানে প্রবেশ করিবামাত্র সমগ্র কামরাটি কর্ম্ম-চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভোজবাজীর ন্যায় নানা অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে কাপড়ের বাণ্ডিল বাহির হইতে লাগিল। যে সব ফেরিওয়ালা এতক্ষণ 'আশ্চর্য্য মলম' বা 'নকল দানা' বেচিতেছিল তাহারা থলি হইতে 'আসল দানা' চার-পাঁচ জোড়া ধুতি-শাড়ী বাহির করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া দিল। বারো আনা যাত্রীই তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ লুঙ্গি খুলিয়া দেখাইল চার-পাঁচখানা কাপড় সুকৌশলে তাহারা পরিধান করিয়াই চলিয়াছে। অনেকে উলঙ্গ ও অর্দ্ধ উলঙ্গ হইয়া লুক্কায়িত কাপড়ের বস্তা বাহির করিতে আরম্ভ করিল।

রেলের কামরাগুলি এতক্ষণে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের দর কষাকষিতে মুখরিত হইয়া ছোটখাট এক একটি বড় বাজারে পরিণত হইয়াছে। দেখা গেল ট্রেনের বারো আনা যাত্রীই এই মাল বেচাকেনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক পল্লীতেই বেকার দল রাতারাতি বড়লোক হইবার এই ফন্দীতে দলবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা প্রতি ট্রেনে দলে দলে কলিকাতায় আসে। যশোর হইতে আগত আর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতার

ট্রেনে ছাদে ফুটবোর্ডে ও চাকার পাশের লোহার ডাণ্ডায় পর্য্যন্ত লোকের ভীড় দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে ইহারা 'স্মাগ্‌লার'—কাপড় আনিতে কলিকাতা চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে কাপড় কিনিয়া ইহারা পুলিস, শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারী এবং রেল-কর্ম্মচারীদের সহায়তায় গাড়ীতে কাপড় উঠায় এবং ভারত সীমান্ত অতিক্রম করিয়া গাড়ীতেই বিক্রী আরম্ভ করে। বিক্রয়াবশিষ্ট মাল পল্লীগ্রামে পৌঁছে এবং সেখানে স্বর্ণমূল্যে বিক্রীত হয়।

খুলনা লাইনে এবং রাণাঘাট লাইনে এই চোরাকারবার নিরঙ্কুশভাবে চলিয়াছে। বেকার দল ছাড়া ইহার মধ্যে পুলিস, শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারী এবং রেল কর্ম্মচারীদের একটা বড় অংশ রহিয়াছে। রেলগাড়ীর তলায় বাঁধা অবস্থায় এবং ছাদের তক্তা সরাইয়া তাহার ভিতর হইতে কাপড় বাহির হওয়ার অর্থ রেল কর্ম্মচারীদের সক্রিয় সাহায্য; তাহাদের সহায়তা ভিন্ন ঐ সব স্থানে কাপড় প্যাক করা যাইতে পারে না। শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীরা কি ভাবে এই কুকার্য্যে সহায়তা করে তার একটা বড় দৃষ্টান্ত সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শিয়ালদহে শুল্ক বিভাগের লোক আছে; তন্মধ্যে দুই-তিন জন কর্ম্মচারী চোরাই মাল ধরিবার জন্য উদ্‌গ্রীব কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া রাখিতেছেন। এই কর্ম্মচারীটি আদেশ দিয়াছেন যে সন্ধ্যা ৬টার পর কোন ট্রেনে তল্লাসী করাই চলিবে না, অথচ সন্ধ্যার পরেই শিয়ালদহ হইতে দার্জ্জিলিং মেল, ঢাকা মেল, খুলনা মেল প্রভৃতি বড় বড় ট্রেনগুলি ছাড়ে। শিয়ালদহে মোতায়েন শুল্ক বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সম্বন্ধেও গুরুতর অভিযোগ হইতেছে যে তিনি দুই-চারিটা ক্ষুদে লোক ধরিয়া বড় বড় কারবারিয়াদের পার করিয়া দিতেছেন। এই সমস্ত অভিযোগ দীর্ঘকাল যাবৎ হইতেছে কিন্তু তার কোন প্রতিকার আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। চোরাকারবারে লিপ্ত পুলিস, রেল এবং শুল্ক বিভাগের কতকগুলি বড় বড় কর্ম্মচারীকে ধরিয়া কঠোর শাস্তি দিলে যে কাজ হইত, সহস্র ইস্তাহার জারী করিলেও তাহার একাংশও হইবে না ইহা নিশ্চিত। এখানে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারত-খণ্ড হইতে পাকিস্থানে মাল চোরাই চালান যায় কিন্তু যশোর, খুলনা বা পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থান হইতে একটি সব্জী পর্য্যন্ত কেহ আনিতে পারে না। এ বিষয়ে পাকিস্থানের কর্ম্মচারী এবং নাগরিক উভয়েই সমান সতর্ক।

আসামে প্রাদেশিকতা

আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় বাঙালীর দ্বার ক্রমশঃ কি-ভাবে রুদ্ধ করিয়া আনা হইতেছে এবং বাঙালীর উদার-চিত্ততা ও আদর্শানুরাগের সুযোগ লইয়া কিভাবে ঐ তিন প্রদেশেরই লোক বাংলায় বসিয়া বাঙালীকে শোষণ ও অপমান করিতেছে তার কিছু কিছু আলোচনা আমরা করিয়াছি। নিজের প্রদেশে অপর প্রদেশের লোককে বসবাসের জন্য আসিতে না দেওয়া ঐ সব প্রদেশে সাধারণ নিয়মে পরিণত হইয়াছে কিন্তু বাংলা আত্মরক্ষার জন্য এবং নিজের বেকার-সমস্যা মিটাইবার জন্য বাংলাদেশের কাজে কর্ম্মে আগে বাঙালীর দাবি গ্রহণের কথা তুলিলেই বলা হয় বাঙালীর মন অতি সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতায় ভরিয়া উঠিতেছে। এই কয়েক দিন আগেও আসামের নওগাঁ জেলায় পূর্ব্ব-বাংলা হইতে আগত কতক লোক খড়ের ঘর বাঁধিয়া বসবাসের চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন; গবর্মেণ্ট তাঁহাদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। একটি প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট অপর প্রদেশের লোক সেখানে আশ্রয়ের জন্য আসিয়াছে বলিয়া তাহাদের ঘর জ্বালাইয়া বিতাড়িত করিয়াছে এ দৃষ্টান্ত বোধ হয় পৃথিবীর কোন অসভ্য দেশেও নাই। গৌহাটিতে বাঙালীদের উপর আক্রমণের কথা ছাড়িয়া দিলেও জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন অধিনায়ক" গানে আসামের নাম নাই বলিয়া একদল অসমীয়া গৌহাটি বেতার-ষ্টেশন উদ্বোধনের দিন ভারত-সরকারের নিমন্ত্রিত অতিথি দুইটি আমেরিকান মহিলাকে যেভাবে অপমান করিয়াছে তাহা তীব্র নিন্দার যোগ্য। এই লোকগুলির অতিশয় অসঙ্গত দাবি সমর্থন করিয়া এবং অতিথিদের অপমানের নিন্দা না করিয়া আসাম-সরকার যে প্রেসনোট দিয়াছেন প্রাদেশিকতাসূচক সঙ্কীর্ণতার দৃষ্টান্ত হিসাবে তাহাও অতুলনীয়। আসামের এই ক্রমবর্দ্ধমান প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে শ্রীরোহিণী চৌধুরী একটু শক্ত ভাষা প্রয়োগ করিয়া একটি বিবৃতি দিয়াছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আসামের অন্যতম মন্ত্রী মৌলানা তায়েবুল্লা চৌধুরী মহাশয় বিবৃতিটির আপত্তি করিয়া শিলচরে বক্তৃতা করিয়াছেন। আসামে ৭৮ লক্ষ লোকের বাস। তন্মধ্যে মাত্র ২২ লক্ষ অসমীয়া এবং ইহারাই প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অলস লোক। আসামের প্রধান সম্পদ চা-বাগান ও পেট্রল। প্রায় সমস্ত বড় ও ছোট চা-বাগানের মালিক ইংরেজ; অতি অল্প কয়েকটি মাত্র অসমীয়াদের হাতে। সমস্ত চা-বাগানের শ্রমিক সাঁওতাল, কোল, ভীল, মাদ্রাজী প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশের লোক; আসামের চা-বাগানে একটিও অসমীয়া শ্রমিক নাই। পেট্রল কোম্পানীর মালিক ইংরেজ, সমস্ত শ্রমিক আসামের বাহিরের লোক। আসামের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য মাড়োয়ারীদের হাতে। কৃষকদের মধ্যেও অধিকাংশই অসমীয়া নহে। তালুকদারী প্রভৃতি জমির উপস্বত্ব ভোগ করে অসমীয়ারা, কৃষি ব্যবসা বা শিল্প কোনটিতেই তাহারা পরিশ্রম করে না। এণ্ডি, মুগা, পাট প্রভৃতি রেশমের কাপড়ের ব্যবসা আসামে আছে, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে পরিচালনা করে অসমীয়া স্ত্রীলোকেরা। স্ত্রী-

লোকেরা সেখানে পুরুষদের চেয়ে বেশী পরিশ্রমী এবং ঘরের বাহিরের কাজ তাহারাই বেশীর ভাগ করিয়া থাকে। চাকুরি ও বিনাশ্রমে জমির উপস্বত্ব ভোগ অসমীয়া পুরুষদের একমাত্র লক্ষ্য। আসামে আবাদী এবং গোচারণ ভূমি ছাড়া বহু লক্ষ বিঘা আবাদযোগ্য জমি পতিত রহিয়াছে। ঐ সব জমিতে প্রচুর আনারস, কলা প্রভৃতি ফল ফলিতে পারে, ঘাস তো প্রচুর আছে। কানাডার ন্যায় আসামে ফলের চাষ ও ডেয়ারী ফার্ম্ম গঠন করিয়া টিনের ফল ও টিনের দুধের বড় বড় ব্যবসায় গড়িয়া তোলা যায় কিন্তু তাহাতে পরিশ্রম দরকার। অসমীয়ারা নিজেরাও ইহা করিবে না, জমি ফেলিয়া রাখিবে তবু বাঙালীকে আসিয়া উহা করিতে দিবে না। ইংরেজ, মাড়োয়ারী, সাঁওতাল প্রভৃতি কাহারও বিরুদ্ধে অসমীয়ারা একটি কথাও বলে না, যত আক্রোশ তাহাদের বাঙালীর উপর। বাঙালী যাহাতে আসামে স্থায়ীভাবে বাস করিতে না পারে তাহার জন্য যত সতর্কতা সম্ভব সমস্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট তো বহু পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আসামে যে সময়ে বাঙালীদের ঘরে আগুন দেওয়া পর্য্যন্ত সুরু হইয়া গিয়াছে সেই সময়েও বাংলাদেশে অসমীয়ারা নির্ভয়ে এবং নির্ব্বিবাদে লেখাপড়া, চাকুরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছেন। আমরা এখানে অসমীয়াদের অসভ্যতার অনুকরণ করিতে বলি না কিন্তু এই দাবী করি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কঠোর হস্তে এখানে অসমীয়াদের প্রবেশ, ব্যবসা ও চাকুরি প্রভৃতি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন, যাহাতে অসমীয়াদের সদ্‌বুদ্ধি জাগ্রত হইতে পারে। বাঙালীর এই প্রচেষ্টাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না।

বিহারে প্রাদেশিকতা

বিহারে প্রাদেশিকতা যে কত নীচে নামিয়াছে সম্প্রতি শ্রীজগৎনারায়ণ লাল তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মানভূম, সিংভূম প্রত্যর্পণের বিরোধিতাকল্পে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ হইতে সুরু করিয়া সকল বিহারী নেতা এবং বিহার গবর্ন্মেণ্ট যাহা করিতেছেন তাহাকেও অসমীয়া ও আসাম গবর্ন্মেণ্টের ন্যায় বর্ব্বরোচিত আখ্যায় ভূষিত করা যাইতে পারে। পাটনায় বিড়লার কাগজ সার্চ্চলাইট বাঙালীদের বিরুদ্ধে অসংযত ভাষায় বিষোদ্গার এবং কলিকাতায় বিহারীদের উপর ট্রামে, বাসে ও বাজারে ব্যাপক আক্রমণের মিথ্যা কাহিনী প্রচার করিয়া এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে যাহাতে যে কোন সময়ে বিহারে বাঙালীদের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড রকমের মারামারি আরম্ভ করিয়া দেওয়া যায়। মানভূম, সিংভূম প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে বাংলার দাবী ক্রমশঃ যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে এরূপ একটা গোলমাল বাধাইতে পারিলে উচ্চস্থানীয় নেতারা উহার সুযোগ লইয়া ইহার মীমাংসা ধামাচাপা দিতে পারিবেন। মানভূম, সিংভূম প্রত্যর্পণের দাবীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস-সভাপতি ও গণপরিষদের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলালের অভিমত আজ কাহারও অজানা নাই; সম্প্রতি গঠিত সীমানা-কমিশনে বাংলার দাবী কেন সুকৌশলে এড়ানো হইয়াছে তাহাও দুর্ব্বোধ্য নহে। পাটনার বিড়লা-পরিচালিত সংবাদপত্রই বা কেন বাঙালীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার ও বিষোদ্গার করিয়া আসর গরম করিয়া রাখিতেছে তাহারও তাৎপর্য্য অনুমান করা কঠিন নয়। সীমানা-কমিশনের অন্যতম সদস্য শ্রীজগৎনারায়ণ লাল সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। নববঙ্গ সমিতির কয়েকজন সদস্য তাঁহার সহিত বঙ্গ-বিহার সীমানা লইয়া আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে শ্রীজগৎনারায়ণ আসল কথা এড়াইয়া গিয়াছেন কিন্তু পাটনা ফিরিয়া গিয়াই বাঙালীকে প্রাদেশিক মনোভাব পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে কলিকাতায় বিহারী এসোসিয়েশন তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে এখানে নাকি বিহারীদের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক মনোভাব বড় বেশী বাড়িয়া গিয়াছে এবং মারামারিও বেশ চলিতেছে। আমরা যত দূর জানি এটা নির্জ্জলা মিথ্যা এবং এই সব ধরণের প্রচার-কার্য্যের দ্বারা বাঙালীর উপর ভবিষ্যৎ আক্রমণের পথ পরিষ্কার করা হইতেছে। বাঙালীদের উপর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ হইতে সুরু করিয়া বিহারী নেতাদের মনোভাব বিহারে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রবর্ত্তনের সময় এবং বাঙালী-বিহারী সদ্ভাব সৃষ্টির জন্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু-প্রদত্ত লক্ষ টাকার ব্যাপারে বেশ ভাল করিয়াই দেখা গিয়াছে। এখন ত মানভূম ও সিংভূমে, পাটনায় ও রাঁচীতে উহা প্রত্যহ প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

বিহারে বাঙালী বিতাড়ন চলিতেছে কিন্তু বাংলায় লক্ষ লক্ষ বিহারী বিনাবাধায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে এবং সৎ অসৎ নানাবিধ উপায়ে অর্জ্জিত অর্থ মণিঅর্ডার করিয়া দেশে পাঠাইতেছে। বাংলা হইতে প্রাপ্ত মণিঅর্ডারের টাকা বিহারের সবচেয়ে বড় জাতীয় আয়। বিহারীরা এখানে কলকারখানায় শ্রমিকের কাজ, রেলষ্টেশনে মুটেগিরি, রিক্সা টানা, ঠেলাগাড়ী চালানো, দারোয়ান ও সিপাহীর চাকুরী, দুধের ব্যবসায় প্রভৃতি নানাবিধ কাজ করে। ইহারা ফুটপাথে বা আত্মীয় দারোয়ান থাকিলে পরের দালানে শোয় এবং ফুটপাথে রান্না করে; ঘরভাড়া ইহাদের লাগে না। সরকারের ট্যাক্স ইহারা সর্ব্বরকমে ফাঁকি দেয়। কাজেই ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙালীরা পারিয়া উঠে না; Rate war যেমন নিন্দনীয়, ফুটপাথে বাস করিয়া খরচা কমাইয়া ইহাদের এই অন্যায় প্রতিযোগিতাও ঠিক তেমনি আপত্তিজনক। বাংলাদেশে ইহাদের সংখ্যা ৩০ লক্ষের কম হইবে না। ইহারা নিজেদের ভাষা সম্পূর্ণরূপে বজায়

রাখে; বাঙালী মনিব নীচে নামিয়া ইহাদিগের ভাষায় কথা বলেন কিন্তু বাংলা ভাষা শিখিতে ইহাদের বাধ্য করেন না। দেশে ইহারা বাঙালীকে ঠেঙ্গাইয়া হিন্দী বলায়, এখানেও বাঙালী inferiority complex বশতঃ হিন্দী বলে। ট্রামে বিহারী কণ্ডাক্টারকে বাংলায় কথা বলিতে বলিলে সে বলিয়াছে "আমার ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইবে, তোমাদেরই এখানে হিন্দী বলিতে হইবে।" আত্মস্বার্থ এবং হিন্দীর প্রাধান্য সম্বন্ধে অশিক্ষিত বিহারীদেরও যে মনোভাব প্রতি পদে ফুটিয়া উঠে তৎপ্রতিও বাঙালীর সতর্ক হওয়া দরকার। বিহারে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট কঠোরভাবে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছে। বাংলায় বিহারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত কাজের জন্য লাইসেন্স এবং ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রবর্ত্তিত হওয়া একান্ত দরকার, ইহাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। Reciprocity বলিয়া একটি জিনিষ আছে এবং তাহা রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ডিগ্রী অননুমোদিত করায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৎক্ষণাৎ উহাদের ডিগ্রী সম্বন্ধে ঠিক সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই চৈতন্য উদ্রেক হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার সহিত ভারতবর্ষের ব্যবহার এখনও এই Reciprocity নীতির দ্বারাই চালিত হইতেছে। মাড়োয়ারী, উড়িয়া প্রভৃতি আরও যাহারা বাঙালীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধেও বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ও অন্যান্য কাজের জন্য ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রবর্ত্তিত হইলে উহাদেরও চৈতন্য সম্পাদনে বিলম্ব হইবে না।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন

ভারতীয় গণ-পরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠন সম্পর্কে একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। তার প্রথম অধিবেশন বসিবে আগামী ৩রা শ্রাবণ তারিখে। যুক্তপ্রদেশের দুই জন শ্রী এস্. কে. দার ও ডাঃ পান্নালাল ও বিহারের এক জন শ্রীজগৎনারায়ণ লাল, এই কমিশনের মূল সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিভিন্ন নূতন প্রদেশের গঠন সম্বন্ধে এই কমিশন অনুসন্ধান করিবেন। বর্ত্তমানে এই উপলক্ষে চারিটি প্রদেশের নাম শুনা যাইতেছে—অন্ধ্র, তামিল, কর্ণাটক ও মারাঠা। যদি এই প্রদেশ কয়টি রূপ গ্রহণ করে, তবে গুজরাটী ও মালয়লম-ভাষী লোকসমষ্টির জন্য একটা পৃথক ব্যবস্থার আয়োজন করিতে হইবে। উপরোক্ত চারিটি প্রদেশ সম্বন্ধে যখন আলোচনা ও অনুসন্ধান চলিবে, তখন তত্তৎ প্রদেশের প্রতিনিধি এই কার্য্যে যোগদান করিতে পারিবেন; এই প্রতিনিধিবর্গের নামও ঘোষণা করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পশ্চিম বাংলার দাবী সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছেন না। ১৯১২ সালে আমাদের প্রদেশের যে কয়টি অংশ বিহারে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া পাইবার দাবী নূতন নয়; গত পঁচিশ বৎসর নানা ভাবে ইহা জানানো হইয়াছে। ১৯১২ সালে বিহারী নেতৃবৃন্দ এই দাবীর যুক্তি মানিয়া লইয়াছিলেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ আজ সে কথা মনে করিতে চাহেন না। এই সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কোন স্বীকৃতি যে আছে, তাহা তিনি ভুলিবার ভান করিতেছেন। কিন্তু লোকে তাঁহাকে জ্ঞানপাপী হইতে দিবে বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্য দেখি যে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র স্তম্ভে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের এই স্বীকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৪ই জুন তারিখে প্রেরিত একটি পত্রে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরকার তাহা লোক সমক্ষে আনিয়াছেন। জ্যোতিষবাবু বর্ত্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলা উদ্বাস্তু সমিতির সম্পাদক। এক সময়ে তিনি বিহার প্রদেশে সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য ছিলেন, বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য ছিলেন, পালামৌ জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন।

জ্যোতিষবাবুর বক্তব্য হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

> "গত ১৯৩১ সালে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে মানভূম জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতির আসন হইতে আনীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—
>
> যে হেতু এই মানভূম জেলার শতকরা ৮৯ জন লোক বঙ্গ-ভাষায় কথা বলে, সেই হেতু যখন দেশ স্বাধীন হইবে এবং ভাষানুযায়ী প্রদেশ গঠিত হইবে, তখন এই মানভূম জেলা বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হইবে।
>
> বিনা বাধায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। যখন এই প্রস্তাব বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় রচিত হয়, তখন ইহার বিরোধিতা করেন ৺নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত। তিনি বলেন দেশ যখন স্বাধীন হইবে তখন কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী এই জেলা ত বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হইবেই; সুতরাং এই প্রস্তাবের সার্থকতা নাই।"

১৯৩১ সালের পরে পৃথিবীর অনেক কিছু বদলাইয়া গিয়াছে। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তিন-তিন বার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন। গণ-পরিষদের সভাপতি হইয়াছেন; কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের মন্ত্রীও হইয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবনের এই নানা পরিবর্ত্তনে যদি তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু এই কথাটা পরিষ্কার

করিয়া সকলকে জানাইয়া দিলে, আমরা এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। তাঁহার দু'মুখো নীতি অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। নববঙ্গ সমিতির সভাপতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তাঁহার এক মূর্ত্তি, গণ-পরিষদের সভাপতিরূপে তাঁহার ভিন্ন মূর্ত্তি। এইরূপ পোষাক পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নহে। নানা কারণে বাঙালী দু'ভাগ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসী বিধানমতে পশ্চিম-বাংলা ভারত-রাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত। এই প্রদেশের লোকের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখাইলে রাষ্ট্রের কল্যাণ নাই; এই প্রদেশের লোকের উপর পূর্ব্ব সীমান্তরক্ষার ভার দিতে হইবে। সুতরাং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তাচ্ছিল্য করিলে চলিবে না। বিহারের অন্তর্গত বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের বঙ্গভুক্তি এই আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি প্রতীক।

"অসংযত প্রাদেশিকতা"

এই প্রসঙ্গে শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালা "হরিজন" পত্রিকায় ২৭শে জুন (১৩ই আষাঢ়) সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। বিহার সরকারের রাজস্ব বিভাগ ৪৮টি খনি-শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে একটি নির্দ্দেশ দিয়াছে। মশরুওয়ালাজী তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন; নিম্নে তাহা দেওয়া হইল,—

পাটনা—১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮

বিষয়: সিংভূম জেলার খনি-শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বিহারীদের নিয়োগ সম্পর্কে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালকগণের প্রতি:

মহাশয়, প্রাদেশিক সরকারের খনিনীতির সর্ত্ত আপনার গোচরে আনিতে আদিষ্ট হইয়াছি। গবর্মেণ্ট একটি বোর্ড নিযুক্ত করিবেন। এই বোর্ডের সুপারিশক্রমে অ-শ্রমিকের চাকরিগুলিতে লোক লইতে হইবে, নহিলে কোন ব্যক্তি বা ব্যবসায়কে ভবিষ্যতে ইজারা ('লিজ') দেওয়া হইবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ এই যে এই সকল প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ভাবে বিহারীদের এবং বিশেষভাবে স্থানীয় লোকদের ঠিক মত চাকরি দেওয়া হয় না। এ কথা সত্য যে বর্ত্তমান ইজারাদারদের উপর এরূপ কোন সর্ত্ত নাই। কিন্তু গবর্মেণ্ট ভাল করিয়াই বলিতে চান যে অতঃপর এই নীতি অনুযায়ী যেন কাজ হয়। নির্দ্দেশপত্র অনুযায়ী আপনি কি ব্যবস্থা করেন গবর্মেণ্টকে তাহা জানাইবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে। ইতি—

কর্ম্মসচিব

পত্রলেখক বলিতেছেন যে এই নির্দ্দেশপত্র বিহারী-দের স্বার্থের অনুকূলে বলা হইলেও আসলে বাংলা ভাষা-ভাষী সংখ্যালঘুগণের স্বার্থের বিরুদ্ধেই ইহা কাজ করিবে— ইহা তাহাদেরই বিরুদ্ধে অভিযান।

এইরূপ ইঙ্গিত করা পত্রলেখকের পক্ষে কতটা ঠিক হইয়াছে তাহা আমি জানি না। তবে এই কথা বলিতে পারি, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রে যদি স্বীকৃত হয় যে প্রত্যেক ভারতবাসীর ভারতের যে কোন স্থানে বসবাস করিয়া স্থায়ী হইবার অধিকার আছে, তাহা হইলে সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই কর্ত্তব্যেরও উল্লেখ করিতে হয়, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঙ্গ (প্রদেশ) এরূপ কোন নীতির অনুসরণ করিতে পারিবে না যদ্দ্বারা সেখানকার কোন অধিবাসী তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী জীবিকার্জ্জনের কাজ হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। কংগ্রেস যে ধরণের প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের পরিকল্পনা করেন তাহাতে সেই গবর্মেণ্ট সেই প্রদেশে কার্য্যরত কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে কোন একটা বিশেষ শ্রেণীর লোক হইতে কর্ম্মচারী নিয়োগের নির্দ্দেশ দিতে পারেন কি না সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। এরূপ চেষ্টাকে আমি কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন ব্যাপারে ব্যবসায় পরিচালকগণের স্বাধীনতার উপর অযথা আক্রমণ বলিয়া মনে করি।

আজ পঁচিশ বৎসর যাবৎ বিহার প্রদেশে বাঙালীর বিরুদ্ধে যে অভিযান চলিয়াছে তৎসম্বন্ধে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেক আলোচনা হইইয়াছে। এক রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও যেরূপ ভাবে বিহারে, আসামে ও উৎকলে বাঙালীর সম্বন্ধে পার্থক্য করা হয়, তৎপ্রতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ও তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলী সজাগ আছেন বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। বরং তাঁদের প্রশ্রয় পাইয়া এদের ব্যবহার এত উৎকট হইয়া উঠিয়াছে যে ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের কোন মূল্য আছে বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হয়। উৎকল ও বিহারের শাসক সম্প্রদায় ভুলিয়া গিয়াছেন যে বাংলাদেশের কল্যাণে যত লক্ষ উড়িয়া ও বিহারী জীবিকা উপার্জ্জনের পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন, তার এক-চতুর্থাংশ বাঙালী এই দুই প্রদেশে উচ্ছ উদ্দেশ্যে যান নাই। এই হিসাব হইতে বিহারের বাংলাভাষা-ভাষী অঞ্চলের ২০।২২ লক্ষ বাঙালীকে বাদ দিতেছি। এই অবস্থায় নিজেদের স্বার্থের খাতিরেও উৎকল ও বিহার ভদ্র ও সংযত হইতে পারিত। কিন্তু এই দুই প্রদেশের শাসক সম্প্রদায় তাহা হন নাই।

মানভূম জিলার ভবিষ্যৎ

কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারী। বিহারের বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলসমূহ পশ্চিম বাংলায় প্রত্যর্পণ করা সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব আজ আর কাহারও অবিদিত নহে। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতীয় গণ-পরিষদেরও সভাপতি, ভারতরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার দায়িত্ব

আছে। এই শাসনতন্ত্রের সাফল্যের জন্ত প্রদেশসমূহের আঞ্চলিক সীমা পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। ভাষার ভিত্তিতে নূতন নূতন প্রদেশ গঠন করিবার নীতি এই পরিবর্ত্তনের পরিপোষক। সেইজন্তই গণ-পরিষদের সভাপতিরূপে তিনি একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। গত ১৬ই জুন (২রা আষাঢ়) এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ইস্তাহারটি পরিষদ দপ্তর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে :

জনসাধারণ কিছুদিন হইতে কয়েকটি নূতন প্রদেশ গঠনের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। গণ-পরিষদ যে খসড়া কমিটি গঠন করিয়াছিলেন তাঁহারা এ সম্পর্কে একটি কমিশন গঠনের জন্য সুপারিশ করেন। উক্ত সুপারিশে বলা হয় যে কমিশনকে নূতন প্রদেশ গঠন সম্পর্কে সকল বিষয় তদন্ত করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হউক এবং ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবার পূর্ব্বে এই সম্পর্কিত রিপোর্ট দাখিল করিতে বলা হউক। তদনুযায়ী গণ-পরিষদের সভাপতি অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরল ও মহারাষ্ট্র এই ৪টি নূতন প্রদেশ গঠন সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্ত নিম্নলিখিত কমিশন গঠন করিয়াছেন—

শ্রী এস কে ধর (এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ)—চেয়ারম্যান, ডাঃ পান্নালাল (অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস, (শ্রীজগৎনারায়ণ লাল, শ্রী সি, সি, ব্যানার্জ্জী (অ্যাকাউণ্টেট জেনারেল, বিহার) সম্পাদক।

কমিশনের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্ত নিম্নলিখিত সহযোগী সদস্তগণকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। সহযোগী সদস্তগণ—শ্রীরামকৃষ্ণ রাজু (মাদ্রাজ), শ্রীরামলিঙ্গম চেটিয়ার (অন্ধ্র), শ্রী টি সুব্রাহ্মনিয়াম (বেলারি কর্ণাটক) শ্রী কে এম মুন্সী (গুজরাট), শ্রী আর আর দিবাকর (কর্ণাটক), শ্রী এইচ ভি পাতাসকর (মহারাষ্ট্র) শ্রী টি এল শেয়োদে (নাগপুর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ) শ্রীগোপীলাল শ্রীবাস্তব (মহাকোশল)। উপরে যে ৪টি স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে কয়টি নূতন প্রদেশ গঠিত হইতে পারে, কমিশন সে সম্পর্কে রিপোর্ট করিবেন এবং উক্ত প্রদেশসমূহের সীমানা কি হওয়া উচিত কমিশন সে সম্পর্কেও রিপোর্ট দিবেন। পরে নূতন প্রদেশসমূহের সীমানা কমিশনের সাহায্যে চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারিত হইবে।

•নূতন প্রদেশগুলি গঠনের ফলে ঐসব প্রদেশের অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া কি হইবে কমিশন সে সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত জানাইবেন। নূতন প্রদেশসমূহ গঠনের ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া কি হইবে কমিশন তাহাও রিপোর্ট করিবেন।

এই ইস্তাহারে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলার দাবী পূরণ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, একজন "সহযোগী সদস্য" পশ্চিম বাংলার পক্ষ হইতে নিযুক্ত করা হইত। তাহা করা হয় নাই। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত উকীল এই কার্য্যের সপক্ষে যুক্তি বা অজুহাত আবিষ্কার করিতে পারিবেন না, তাহা আমরা মনে করি না। এই যুক্তি বা অজুহাত আমরা স্বীকার করিতে পারি না, স্বীকার করিয়া লইব না, এবং পশ্চিম বাংলার জনমতকে এই বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিলে আর চলিবে না। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে বিহারের কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেসী সভ্যগণ বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে যে তাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। এই অন্যায়ের প্রতিকার বাঙালীকে করিতে হইবে—যেমন ব্যর্থ করিতে হইয়াছিল বড়লাট কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রচেষ্টাকে। এই কার্য্যে কে অগ্রণী হইবে, তাহা দেখিবার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিয়া আছি। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী নেতৃবর্গ এই বিষয়ে নিশ্চেষ্ট। নব বঙ্গ সমিতি যে আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা জমাট বাঁধিতেছে না। পশ্চিম বাংলা হইতে মনোনীত গণ-পরিষদের সদস্যবর্গও তদপেক্ষা তৎপর বলিয়া কোন প্রমাণ পাই নাই। এক এক জন করিয়া তাঁহাদের নাম ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—এই বিষয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে আপনারা কে কি করিয়াছেন বা করিতেছেন? যত দূর মনে হয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পশ্চিম বাংলার পক্ষ হইতে গণ-পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং এই পদ অধিকার করিয়া আছেন : শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, জনাব আবদুল হেলিম গজনবী, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ, শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত, শ্রীবসন্তকুমার দাশ, শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ; ২।১টা নাম হয় ত বাদ যাইতেছে। সে যাহাই হউক এই কংগ্রেসী নেতৃবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছি বিহার প্রদেশস্থ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে পশ্চিম বাংলায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহারা কি করিয়াছেন, তার একটা হিসাব দিবার সময় কি আসে নাই? এবং গণ-পরিষদের সভাপতিরূপে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহার প্রতিকারকল্পে তাঁহারা কি করিতে প্রস্তুত আছেন? অবস্থা দেখিয়া মনে হয় ভারত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এই অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু ভাষার ভিত্তিতে নূতন প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে তাঁহার অমত জানাইয়াছিলেন। কিন্তু গণ-পরিষদের সভাপতি ঐ অমত মানিয়া লইতে পারেন নাই। অন্ধ্র, তামিল, মহারাষ্ট্র, গুর্জ্জর সম্বন্ধে ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাংলার

বেলায় এক যাত্রায় পৃথক ফল হইবে কেন তাহার উত্তর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট জানিতে হইবে।

পশ্চিম বাংলায় সামরিক সংগঠন

গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এই সম্বন্ধে দুইটি সংবাদ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমটি আমাদের জানাইয়া দিল যে "জাতীয় রক্ষীবাহিনী" বলিয়া পশ্চিম বাংলার পূর্ব্ব সীমান্তবাসী জনগণকে সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয় সংবাদটি দুই ব্যাটেলিয়ন প্রায় ১,৮০০ হইতে ২,০০০ বাঙালী যুবক লইয়া দুইটি পদাতিক বাহিনী গঠনের সুসংবাদ আমাদের মধ্যে বিতরণ করিল।

কি কারণে "জাতীয় রক্ষীবাহিনী"র শিক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, তৎসম্বন্ধে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী নীরব। সেইজন্য নানা জল্পনা-কল্পনা হইতেছে। কেহ বলিতেছেন যে কেন্দ্রীয় সামরিক বিভাগ কোন বিষয়ে বিশেষ আপত্তি জানাইয়াছে, কেহ বলিতেছেন যে পূর্ব্ব সীমান্তবাসী জনমণ্ডলী এই বিষয়ে উৎসাহ দেখাইতেছে না; সামরিক জীবনের দায়িত্ব ও হাঙ্গামা তাহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর শিক্ষা বন্ধের সংবাদে এরূপ একটা ইঙ্গিত ছিল বলিয়া মনে হয়। আমরা সর্ব্বদাই বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার পরিকল্পনা সমর্থন করিয়া আসিয়াছি; প্রধানতঃ এই কারণে যে ইংরেজ আমলে বাঙালীকে অসামরিক বলিয়া সামরিক জীবন সম্বন্ধে অপটু করিয়াছে, কোনরূপ বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইবে না। বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেনাবাহিনীতে ও বিমান-বিভাগে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হইয়াছে; নৌবিভাগেও কয়েকজন উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ সৈনিক-বৃত্তি যে সব শ্রেণীর অবলম্বন করিবার সম্ভাবনা তাহারা কেহই অগ্রসর হইয়া আসে নাই। সেইজন্য কাশ্মীর রণাঙ্গনে বাঙালী সৈন্যাধ্যক্ষ দেখা যায় কিন্তু পদাতিক শ্রেণী অনুপস্থিত; এই দৃশ্য দেখিয়া অন্য প্রদেশের সাংবাদিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

সেইজন্য আমরা মনে করি শেষ পর্য্যন্ত বাঙালী পল্টনের সম্পূর্ণ সংগঠন বিষয়েও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রায় দেড় শত বৎসরের অনভ্যাসজনিত মনোভাব দূর করা কঠিন হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত ভাবিতেছেন যে সব শ্রেণী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের নানা বিভাগে যোগদান করিয়াছিল, তাদের মধ্য হইতে এই দুই হাজার সংগৃহীত হইতে পারে। একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে যে প্রকৃত রণাঙ্গনের মধ্যে খুব কম বাঙালীই উপস্থিত ছিল; বেশীর ভাগ লোক রাস্তাঘাট, বিমানকেন্দ্র তৈয়ার করিতে খাটিয়াছে মজুরের মত; রেলওয়ে বিভাগে বা মোটর বিভাগে অনেকে যোগদান করিয়াছিল; তাহারা লড়াই করিয়াছে কয় জন বা কয় শত? পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এই বিষয়ে একটা আদমসুমারী লইলেই প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিতে পারিবেন; ভ্রান্ত ধারণায় চালিত হইয়া আয়োজন-উদ্যোগের ঘটা করিয়া লোককে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়োজন নাই। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সংগঠন ব্যাপারে এই কথাটা পরিষ্কার প্রমাণিত হইয়াছে। কেন এই শিক্ষার ব্যবস্থাটা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল, তাহা যদি আমাদের জানাইয়া দেন তবে লোকের মনে যে আশাভঙ্গের ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা যায়।

দুই ব্যাটেলিয়ন বাঙালী পল্টনে রংরুট ভর্ত্তি করা কঠিন হইবে না; কিন্তু তাহা বাঙালী হইবে কি না, সেই বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চলে "পাহাড়ী" জাতি হইতে এই সংখ্যক লোক অতি সহজে সংগৃহীত হইতে পারে। আমরা চাই বাংলার জনসাধারণ সামরিক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার শিক্ষাপ্রাপ্ত হউক; নিয়মানুবর্ত্তিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিবার যোগ্যতা ও সাহস অর্জ্জন করুক। "জাতীয় রক্ষীবাহিনী" সংগঠন ব্যবস্থায় সেইজন্য উৎফুল্ল হইয়া বিধান-মন্ত্রিমণ্ডলীকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়াছিলাম। সেই ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়া বাঙালী ব্যাটেলিয়ন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইতেছে "মন্দের ভাল" বলিয়া তাহা আমরা গ্রহণ করিব। কিন্তু যত দিন বাঙালী জনসাধারণের কপালে "অসামরিক" জাতি বলিয়া যে কলঙ্কের ছাপ দাগিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা মুছিয়া না যায়, তত দিন আমরা বাংলার কোন মন্ত্রিমণ্ডলীকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে দিব না। কলঙ্ক মোচন যে সম্ভব তাহা পূর্ব্ববঙ্গে প্রমাণিত হইয়াছে; মুসলিম লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী "আনছার বাহিনী" গঠন করিয়া এবং তাহাদের সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া একটা কাজের মত কাজ করিয়াছেন। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এই বিষয়ে গড়িমসি করিয়া দিন গুণিতেছেন; দলাদলিতে কাল কাটাইতেছেন। সামরিক শিক্ষা এই দলাদলির ঊর্দ্ধে থাকা উচিত, এবং দেশের লোককে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই বিষয়ে অবহিত হইবার শিক্ষা দেওয়া উচিত। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এই বিষয়ে যে তৎপর হইয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। তাঁহাদের একটা প্রচার-বিভাগ আছে; তাহা যে এই বিষয়ে সজাগ তাহার লক্ষণ আমাদের চোখে পড়ে না। দেড় শত বৎসরের নিশ্চেষ্টতা এই সরকারের সকল বিভাগে অনড় হইয়া আছে বলিয়া মনে হয়। একটা বিপ্লব না আসিলে তাহা দূর হইবে না।

অবশ্য এতদিনের বাধা যে ক্লীবত্বের বন্ধন ছিল তাহা দূর করিয়া বাঙালীকে সচেতন ও সচেষ্ট করা কঠিন ব্যাপার

তাহা আমরা জানি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আছে যে সঠিক পন্থা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে সুফল পাওয়া যাইবে। বাঙালী কৃষক, মৎস্যজীবী ও ঐরূপ শ্রেণীর মধ্যে বলিষ্ঠ সৈনিক সংগ্রহ করা মোটেই অসম্ভব নহে।

ভারত-রাষ্ট্রের মুসলমান

হায়দরাবাদ রাজ্যের বিরুদ্ধে এখন পর্য্যন্ত অর্থনীতিক সংগ্রাম চলিতেছে; নিজাম সরকার কর্ত্তৃক পুষ্ট "রজাকার" দল রাজ্যের হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে। ভারত-রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গ এই দৃশ্য দেখিয়াও এখনও কোন চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন না। তাঁহাদের অক্ষমতার কারণ কি তৎসম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া তাঁহারা কিছু বলিতে চাহিতেছেন না যদিও দাক্ষিণাত্যের প্রধান সেনাপতি রাজেন্দ্র সিংজী আমাদের অভয় বাণী শুনাইতেছেন। এ বিষয়ে আমরা যাহা বুঝি তাহাতে মনে হয় ভারত-সরকার যে কয়েকটি কারণে এখনও ইতস্তত করিতেছেন তাহার তাহার মধ্যে প্রধান কথা সংযুক্ত জাতিসঙ্ঘের কাশ্মীর কমিশনের উপস্থিতি। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, ভারত-সরকার এখনও নিজামের পক্ষে বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়তা ও সহানুভূতির পরিমাণ বিচার করিতে পারিতেছেন না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভারত-রাষ্ট্রে এখনও সাড়ে তিন চারি কোটি মুসলমান রহিয়া গিয়াছেন। হায়দরাবাদ সমস্যার সমাধানকল্পে কি ইহাদের মনোভাব হিসাবের মধ্যে ধরা হইতেছে এবং সেইজন্যই ভারত-রাষ্ট্রের নীতি সম্বন্ধে একটা দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছে? এই মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়া দিল্লীর "হিন্দুস্থান টাইমস্" দৈনিক পত্রিকায় একটি পত্র গত মে মাসের ২৭ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রটি "জামাল-উদ্দিন" এই নামে লিখিত হইয়াছিল। পত্রলেখকের বিশ্লেষণ ও তার রাজনীতিক গুরুত্ব এত অধিক যে আমরা তার মূল অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

> এই কঠোর সত্যটি এখনও স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, ভারতের মুসলমানেরা কোনকালেই ভারতীয়দের মত চিন্তা করিতে, কার্য্য করিতে অথবা নিজেকে সম্পূর্ণ ভারতীয় বলিয়া উপলব্ধি করিতে শিখে নাই। ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে, মুসলমানেরা সমগ্র জগতের মুসলমানকেই ভাই বলিয়া মনে করে। প্যান-ইস্লামিজিম একটি কাল্পনিক বস্তু নহে। পাকিস্থান জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র মুসলমান জগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। সকল মুসলমানই মুসলিম রাষ্ট্র চাহে। জগতে একই সম্প্রদায় (মুসলিম সম্প্রদায়), একই ধর্ম্মশাস্ত্র (মুসলিম শাস্ত্র) এবং একই রাষ্ট্র (মুসলিম রাষ্ট্র) স্থায়ী হউক, ইহাই মুসলমানগণের কাম্য। সুতরাং যে সকল মুসলমান ভারতরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতেছে, হয় তাহারা নিজেকে প্রবঞ্চিত করিতেছে, নচেৎ পরম উদার ভারত গবর্ণমেণ্টকে প্রতারিত করিতেছে। মুসলমানেরা মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখিতে অসমর্থ; কেবল মুসলমান কি অ-মুসলমানরূপে দেখিতে পারে। অ-মুসলমানকে মুসলমানের সমান অধিকারপ্রাপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে সে অত্যন্ত নহে। মুসলমানের দৃঢ়মূল সাম্প্রদায়িকতা যে কোন অ-মুসলমান রাষ্ট্রে ঘোরতর সমস্যা সৃষ্টি না করিয়া পারে না। আমাদের দেশে এক দিকে পণ্ডিত জবাহরলাল বিশ্বমানবতার ভিত্তিতে সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখিতেছেন, অপরদিকে মুসলমানেরা কেবল মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কথা চিন্তা করিতেছে।

"হিন্দুস্থান টাইমস্" পত্রিকা এই পত্র প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, বিশেষত: "কংগ্রেসপন্থী রাষ্ট্রনায়কগণকে" প্রশ্ন করিয়াছেন—"এ সমস্যার সমাধান কোথায় মিলিবে?" এই বিশ্লেষণ যদি সত্য হয়, এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে মন ও বুদ্ধি আমাদের সায় দেয় না, তবে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর প্রচেষ্টা সহজ হইবে না। তিনি চাহিতেছেন ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে; কিন্তু তাহা তিন-চারি কোটি নাগরিকের জানবিশ্বাসের বিরোধী; এবং এই বিপুল জনসমষ্টির প্রকৃত মনোভাবের বিরুদ্ধে কোন রাষ্ট্রীয় বিধান চাপাইয়া দেওয়া সম্ভব কি? নূতন রাষ্ট্রের গঠন সম্বন্ধে নানা পরিকল্পনা চলিতেছে; এই পরিকল্পনা নানাভাবে আমাদের চিরাচরিত চিন্তা ও কর্ম্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিবে; প্রায় প্রতি পদে তাহা আমাদের নানা সংস্কারের উপর আঘাত হানিবে। গত এক শত বৎসরে হিন্দুসমাজ নানাভাবে বর্ত্তমান যুগ ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। ভারতীয় মুসলমান সমাজ তাহা পারে নাই বলিয়াই "পাকিস্থানের" জন্য আন্দোলন করিয়াছে, এবং প্রতিবেশী সমাজের বিরুদ্ধে আক্রোশ উদ্দীপিত করিয়া আমাদের দেশের জন-মনকে বিষাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই অসুস্থ মনোভাবের একটা বহিঃপ্রকাশ নিজাম সরকারের কার্য্য-কলাপের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতরাষ্ট্রের তিন-চারি কোটি মুসলমান বর্ত্তমানে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া আছে। হায়দরাবাদ রাজ্যের বিরুদ্ধে যদি কখনও কোন চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, তবে তাঁহারা কি করিবেন, তৎসম্বন্ধে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন লোকের মনকে ভারাক্রান্ত করিতেছে।

ভারতীয় রাজ্যসমূহের নূতন সংগঠন

ইংরেজ আমলে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে

তাহাদের প্রতিবেশী জনপদের কোন রাষ্ট্রিক যোগ ছিল না। ইংরেজের বিধানে দেশীয় রাজ্যসমূহ অনেকটা যাদুঘরের প্রদর্শনীর মত পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৯৪৭ সনের ৫ই জুলাই হইতে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অধীনে যে দেশীয় রাজ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার একটা কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দেখিতে পাই ৫৩২টি দেশীয় রাজ্যের একটি নূতন সংগঠন চেষ্টা। ২১৯টি রাজ্যকে প্রতিবেশী প্রদেশসমূহের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে; ৩১৩টি রাজ্য মিলাইয়া নূতন প্রদেশ গঠন করা হইয়াছে অথবা নূতন "রাজস্থান" সৃষ্টি করা হইয়াছে। "হিমাচল" প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ২১টি ক্ষুদে রাজ্য ভারত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন রাখা হইয়াছে, ভারতবর্ষের পশ্চিম সমুদ্রকূলে কচ্ছ-রাজ্যেও সেই ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে; এই রাজ্যটি সিন্ধুদেশের প্রতিবেশী বলিয়াই ভারত-রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ২৯১টি রাজ্য মিলাইয়া যে ৬টি "রাজস্থান" সঙ্ঘের পত্তন করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ২১৭টি রাজ্যকে "সৌরাষ্ট্র" সঙ্ঘের মধ্যে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে; "মৎস্য" সঙ্ঘের ভাগে পড়িয়াছে ৪টি রাজ্য; "বিন্ধ্য প্রদেশ" গঠিত হইয়াছে ৩৫টি রাজ্যের সমবায়ে; "রাজস্থানে"—১০টি, "মধ্য-ভারতে"—২০টি এবং "পাতিয়ালা ও পূর্ব্ব-পঞ্জাবে" ৮টি রাজ্য পড়িয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে সান্দুর রাজ্য, যুক্তপ্রদেশে বারানসী ও রামপুর রাজ্য, পূর্ব্ব-ভারতে ত্রিপুরা, কুচবিহার, ১৯টি খাসিয়া রাজ্য ও মণিপুর সম্বন্ধে এখনও কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

এই বিধান অনুসারে রাজ্যের নৃপতিবৃন্দের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রহিল না। যে সব রাজ্যকে প্রতিবেশী প্রদেশসমূহের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের রাজারা একটা "ভাতা" পাইয়া পেনসন ভোগ করিতেছেন বলিলেই চলে; তাঁহাদের আত্মীয়-কুটুম্বদেরও সেই অবস্থা। এই "বেকার" রাজাদের ভারত-রাষ্ট্রের সেবায় নিযুক্ত করা যাইবে কিনা বা যাইতে পারে কিনা, তৎসম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। বড় বড় রাজ্যের রাজাদের, যেমন—জামনগর, গোয়ালিয়র, উদয়পুর, রেওয়া, পাতিয়ালা, যোধপুর, ভরতপুর, ইন্দোর,—তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও রাজপ্রমুখ ও উপ-রাজপ্রমুখ প্রভৃতি পদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছে। এই সব রাজ্যসঙ্ঘে, দায়িত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থা যখন প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন তাঁহাদের ক্ষমতা বা অধিকার ভারত-রাষ্ট্রের প্রদেশ-পালের (Governor) ক্ষমতা ও অধিকার হইতে উচ্চ হইবার কথা নয়।

এই বিবরণী হইতে আমরা যে নূতন সংগঠনের পরিচয় পাই, তাহাতে মনে হয় এই নৃপতিবৃন্দ বর্ত্তমান যুগের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন; রাজ্য পরিচালনে তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতার দিন ফুরাইয়াছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন; অনেকেই স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের সংগঠনে সাহায্য করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়াও নিজেদের স্বার্থ বলি দিয়াছেন। হায়দরাবাদ রাজ্য কিন্তু ভিন্ন পথে চলিতেছে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, কাশ্মীর ও জুনাগড় সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সংসদের দরবারে হাজির হইয়াছে। এই তিনটি রাজ্যের ভবিষ্যৎ লইয়া ভারত-রাষ্ট্রের পরিচালকবৃন্দের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। ইহাদের ভাগ্য লইয়া কূটনীতির খেলা চলিতেছে। আমেরিকা ও বিলাত "পাকিস্থানের" পিছনে থাকিয়া ঘুঁটি চালিতেছে। এই বিষয়ে আমাদের রাষ্ট্রপরিচালকদের পিছনে জনমণ্ডলীর অকুণ্ঠ সহযোগ আছে। হায়দরাবাদ, কাশ্মীর প্রভৃতি ছাড়া, রাজপুতানা ও উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহেও কিছু কিছু গণ্ডগোল চলিতেছে।

উড়িষ্যা প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে উড়িষ্যার প্রদেশপাল জনাব আসফ আলী বক্তৃতা প্রসঙ্গে তথাকার নৃপতিদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, তাঁহারা যেন কোনোপ্রকার বেআইনী কার্য্যকলাপে জড়িত না হন। প্রাদেশিকতার নিন্দা করিয়া তিনি বলেন, আমাদের উদার ও সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন।

তিনি বলেন, "আপনারা জানেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত গবর্ন্মেণ্টকে অধিকতর মনোযোগ দিতে হইয়াছে এবং দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদের ব্যাপারেও তাঁহাদিগকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে। আমি আপনাদিগকে এই আশ্বাস দিতেছি যে, ভারত গবর্ন্মেণ্ট প্রত্যেক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত আছেন।"

গবর্ণর বলেন, সুখের বিষয় এই যে, উড়িষ্যা এই সকল অঞ্চল হইতে দূরে আছে। তবুও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলির পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের সজাগ থাকা দরকার।

উড়িষ্যার রাজ্যগুলির সংহতির কথা উল্লেখ করিয়া জনাব আসফ আলী বলেন, চুক্তি শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ইঁহারা পূর্ব্বেকার ব্যবস্থায় যে সকল ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা পাইতেন সেগুলি পাইবেন না এই মনে করিয়া ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। যাঁহারা এখনও বাস্তব অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহারা যাহাতে বিপথে চালিত না হন তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়।

জনাব আসফ আলী উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহের মূল্যবান খনিজ সম্পদের উল্লেখ করিয়া বলেন, এতদঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারণের উন্নতিকল্পে এই সমস্ত সম্পদ নিয়োজিত হইবে।

তিনি নৃপতিবৃন্দকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করেন।

তিনি বলেন, নৃপতিদিগকে বিশেষ করিয়া শিল্পোন্নতিতে সহযোগিতা করিতে হইবে। ইহার ফলে শুধু যে ভবিষ্যৎ সমাজের কাঠামো রচিত হইবে তাহা নহে; নৃপতিবৃন্দ দেশবাসীর সদিচ্ছাও লাভ করিতে পারিবেন। আমি উজ্জ্বলতর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বাস্তব রূপ যেন চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পাইতেছি। জীবনধারণের মানের উন্নতিকল্পে নৃপতিবৃন্দ প্রজাদের সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আমি আশা করি। তবে এই সতর্কবাণী আমি উচ্চারণ করিতেছি যে, যাঁহারা বে-আইনী কার্য্যকলাপে জড়িত হইবেন তাঁহাদের পরিণতি ভয়াবহ হইবে।

অতঃপর তিনি বলেন, চরম প্রাদেশিকতা আজ সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে, ইহা সত্যই দুঃখজনক ব্যাপার। বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠজাতি হিসাবে ভারতকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আমরা যে ভিত্তি স্থাপন করিতেছি তাহা ঘাতসহ ও শক্তিশালী করিতে হইবে—ইহার জন্য প্রয়োজন উদার, বলিষ্ঠ সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গী। সংলগ্ন প্রদেশসমূহ নিজেদের সীমান্ত অঞ্চল বিস্তার সাধনের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। তাহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতা চলিতেছে। আমাদের প্রদেশে সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ান রাজ্য লইয়া অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, আমি ইহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছি। প্রদেশগুলির সীমা পুনর্নির্দ্ধারণের চূড়ান্ত সময় এখনও আসে নাই। আমাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য হইতেছে শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র শান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করা। তখন আমরা সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণের ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পুনর্ব্বণ্টনের অনেক সময় পাইব। বর্ত্তমানে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দিকেই সর্ব্বাধিক মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

সিন্ধু দেশের হিন্দু-শিখ

সিন্ধু দেশে প্রায় ১৪ লক্ষ হিন্দু-শিখ ছিলেন; পাকিস্থানীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রায় ১২ লক্ষ তাঁহাদের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। পাকিস্থানীদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, বিধর্ম্মীর মুখ আর তাহাদের প্রতিদিন দেখিতে হইবে না। এই বিরাট জনসমষ্টি ভারতরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে বোম্বাই, কাথিবার, কচ্ছ, ও রাজপুতানায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, নূতন করিয়া জীবন সংগঠন করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই কাজে তাঁহাদের সাফল্য অর্জ্জন করিতে হইবে। নানা প্রকার কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা এই আয়োজন সার্থক করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। আচার্য্য কৃপালনীর একটা বিবৃতির মধ্যে এইরূপ একটি প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। কচ্ছ রাজ্যে কান্দলা (Kandla) নামক একটি স্থান সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। কচ্ছের মহারাজের নিকট হইতে এই ৪৫,০০০ হাজার বিঘা জমি দানস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু পুনর্ব্বসতি সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে; সমবায় প্রণালীতে এই জমি ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে, এবং সিন্ধুর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ছিন্নভিন্ন না হইয়া এই স্থানকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কচ্ছ রাজ্য পরিচালনার ভার নিজ হস্তে লইয়াছেন এবং কান্দলাকে একটি বন্দরে পরিণত করিবার দায়িত্ব এখন তাঁহাদের। কালে এই বন্দর করাচি বন্দরের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে পরিগণিত হইবে, এরূপ কল্পনা উদ্ভট নয়। এই বন্দরের কল্যাণে সিন্ধুর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সহজাত কৌশল ও ব্যবসায়-বুদ্ধি দ্বারা নূতন ভাবে নিজেদের লুণ্ঠিত সম্পদ পুনর্গঠন করিতে পারিবেন। কান্দলার উদাহরণ অন্যান্য প্রদেশের বাস্তু-ত্যাগীদের নিকট পথপ্রদর্শকরূপে অনুপ্রাণনা দিবে।

রাষ্ট্রপাল মাউণ্টব্যাটেন—রাষ্ট্রপাল রাজাগোপালাচারী

গত ৭ই আষাঢ় রাষ্ট্রপাল মাউণ্টব্যাটেন চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীর হাতে কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিয়া ভারতরাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ১৯০ বৎসরের ব্রিটিশ আধিপত্য শেষ হইল। এই আধিপত্যের ফলাফল লইয়া আলোচনা করিয়া লাট মাউণ্টব্যাটেনকে দায়ী করিবার প্রয়োজন নাই। নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্ত্তা বলিয়া ভারতরাষ্ট্রের মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট লাট মাউণ্টব্যাটেন নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্ত্তা হইলেন। তাহার পূর্ব্বে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন হইতে ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত, ২ মাস ১১ দিন যে কাজ বা অকাজ করিয়াছেন, তাহার জন্য দায়ী তিনি। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর মন্ত্রিমণ্ডলী এই সময়ের কার্য্যকলাপের জন্য কোন দায়িত্ব স্বীকার করিবেন কিনা তাহা আমরা জানি না। এই সময়ের মধ্যেই পঞ্জাবের খুনাখুনি আরম্ভ হয়। সেই জন্য "পাকিস্থানের" অর্থমন্ত্রী জনাব গোলাম মহম্মদ লাট মাউণ্টব্যাটেনকে দায়ী করিয়াছেন, "পাকিস্থানের" ভূতপূর্ব্ব পুনর্ব্বসতি মন্ত্রী জনাব গজনফর আলী খাঁ বলিতেছেন যে লাট মাউণ্টব্যাটেন তাঁহাকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে যদি খুনাখুনি আরম্ভ হয়, তবে নিষ্ঠুরভাবে তাহা দমন করা যাইবে। সে চেষ্টা হইয়াছিল কিনা তাহা আমরা এখন পর্য্যন্ত জানি না। তবে পশ্চিম-পঞ্জাব হইতে হিন্দু ও শিখকে বাস্তুত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছিল তাহাদের মুসলমান প্রতিবেশীর অত্যাচারে এবং পূর্ব্ব-পঞ্জাব, পাতিয়ালা, আলোয়ার ও ভরতপুর রাজ্য হইতে সম-সংখ্যক মুসলমানকে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল তাহাদের হিন্দু ও শিখ প্রতিবেশীর প্রতিশোধের অত্যাচারে। প্রতিবেশীর মধ্যে এই হানাহানির জন্য ব্রিটিশ কূটনীতি দায়ী, তাহার জন্য ব্যক্তিগতভাবে লাট

মাউন্টব্যাটেনের কোন দায় আছে কিনা ইতিহাস তাহা স্থির করিবে। সেই ইতিহাস আমরা জানি না।

এর বেশী তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু বলিবার সময় আসে নাই। যাঁহার হাতে তিনি কার্য্যভার দিয়া গেলেন, তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা জানি যে শান্তির জন্য ভারত বিভাগ তিনি পছন্দ করিয়াছেন। ১৯৪২ সাল হইতে মুসলিম লীগের "পাকিস্থানি" দাবী মানিয়া লইবার জন্য তিনি চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না যে খণ্ড "পাকিস্থান" স্বীকার করিয়া লইলেন তাহা যদি ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে করিতেন তবে শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীর রাজনীতিক কৌশলের সার্থকতা হইত। আজ দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষে যে রক্ত-গঙ্গা দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে তাহার মধ্যে কোন সেতু নির্ম্মাণ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য নূতন রাষ্ট্রপাল তাহা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। আর করিবেন ব্রিটিশ রাষ্ট্র-গোষ্ঠির (British Commonwealth) সঙ্গে সম্বন্ধ অটুট রাখিতে। দুনিয়ার কূটনীতির ক্ষেত্রে যে ঠেলাঠেলি চলিয়াছে, এই অনিশ্চয়তার মধ্যে রাষ্ট্রপাল রাজাগোপালাচারী ব্রিটেনের সামরিক আয়োজন-উদ্যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিবেন না। এই সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কোন কথা না বলিলেও আমরা জানি তাঁহার মনোভাব কি। এই মনোভাবের সঙ্গে দেশের রাজনীতিক সাধারণ কর্ম্মিবৃন্দের বিরোধ আছে, কংগ্রেসের নানা ঘোষণা তাহার বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু এই বিরোধের সমাধান হইবে যেমন হইয়াছে "পাকিস্থানী" সমস্যার। শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী এই বিশ্বাস করেন যে অবস্থার তাড়নায়, দুনিয়ার রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রের নানা জটিলতার প্রয়োজনে একটা গোঁজামিলের ব্যবস্থা হইবে। আমাদের নূতন রাষ্ট্রপাল বস্তুতান্ত্রিক, ভাবের উন্মাদনায় তিনি চলেন না; আপদ্‌ধর্ম্মের নীতি অনুসারে তিনি কর্ত্তব্য পালন করেন। এই কথাটা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

বার্লিন লইয়া ঝগড়া

"ওয়ার্লড অভার প্রেস" (*Worldover Press*) মার্কিন মুলুকের একটি সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান; ইহা পৃথিবীর নানা-স্থানের সংবাদের উপর প্রবন্ধ প্রকাশ করে—এই সংবাদের অন্তর্নিহিত ভাব ও কর্ম্ম-ধারা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য। এইরূপ একটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে (ভাদ্র-আশ্বিন) ইউরোপের বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিবে; তখন জার্ম্মানীর পশ্চিম অংশে ত্রিশক্তি—যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স—একটি রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবে, হয়ত বা তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবে। সোভিয়েট ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছে; তখন হয়ত তার প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে গিয়া এমন কোন কার্য্য করিয়া বসিবে যাহা পরিণতি লাভ করিবে যুদ্ধে। বার্লিন লইয়া যে ঝগড়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়।

বর্ত্তমানে বার্লিন অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে; ত্রিশক্তি তাহাদের এলাকায় যাইতে পারিতেছে বিমানের সাহায্যে; প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি বিমানপথে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইতেছে; কয়লা পর্য্যন্ত এই ভাবে পাঠানো হইতেছে। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ এই বিমানপথ রুদ্ধ করিবার ভয় দেখাইতেছে; তাহারা যদৃচ্ছ ভাবে সোভিয়েট বিমান বার্লিনের উপরের আকাশপথে চালাইয়া যাইবে; যদি তার ফলে ত্রিশক্তির বিমান জখম হয়, তবে তার ফলাফল সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব তারা গ্রহণ করিবে না। এইরূপ এক তরফা ব্যবস্থা ত্রিশক্তি মানিয়া লইলে বার্লিন হইতে তাহাদের বাহির হইয়া আসিতে হইবে, নতুবা সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট নতি স্বীকার করিতে হইবে। যুদ্ধের হার-জিত ছাড়া, এই অবস্থা কল্পনা করা কঠিন। "ওয়ার্লড অভার প্রেসের" পর্য্যবেক্ষক যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল বলিয়া মনে করেন না।

তার সপক্ষে একটা যুক্তি তিনি দিতেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের আশ্রিত রাষ্ট্রসমূহ এই টানা-হেঁচড়ায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে; তারা মনে করে না যে মার্শাল-পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়া তাদের উপকার করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েট ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীতে (Polit Buro) মলোটভ নীতির বিরুদ্ধে মনোভাব দেখা দিয়াছে; এখনও তাহা দানা বাঁধে নাই। কিন্তু বার্লিনের ঝগড়া না মিটিলে ও যুদ্ধ ছাড়া মীমাংসার কোন উপায় দেখাইয়া দিতে না পারিলে, সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ বেশী দিন তাহাদের দেশের লোককে ও তাহাদের আশ্রিত রাষ্ট্রসমূহের লোককে অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখিতে পারিবেন না।

বার্লিনে যেমন ভিয়েনায় তেমনি ত্রিশক্তিকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিবার জন্য ঠেলাঠেলি চলিতেছে। তাহারা কিন্তু খুঁট গাড়িয়া বসিয়া আছে; যুদ্ধে না হারিলে নড়িবে বলিয়া মনে হয় না। ইতিমধ্যে যুগস্লাভিয়ার শাসকশ্রেণীর সঙ্গে বিবাদ বাধিয়া গিয়াছে। মার্শাল টিটোর পিছনে দেশের কম্যুনিষ্ট দল পর্য্যন্ত সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্তের দেশসমূহে যে কম্যুনিষ্ট সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে একটা ফাটল দেখা দিয়াছে। এই ফাটল একটা ছিদ্রমাত্র হইতে পারে, কিন্তু ছিদ্র দিয়াই বন্যার জলের তোড় পথ করিয়া বাঁধ ভাঙিয়া দেয়। এরূপ অবস্থা হইলে আমরা বিস্মিত হইব না। ইউরোপের ভাগ্য লইয়া যে খেলা চলিতেছে, তাহার শেষ কখন ও কোথায় হইবে তাহা বিশেষজ্ঞগণও বলিতে পারিতেছেন না। বার্লিন লইয়া ঝগড়া এমন এক মনোভাবের

সাক্ষ্য দিতেছে যাহা শান্তির পথে বিশেষ বিঘ্নস্বরূপ। এর বেশী কেহ কিছু দেখিতে পাইতেছেন না।

প্যালেষ্টাইন

প্রায় চারি সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির পর আবার প্যালেষ্টাইনে রণদামামা বাজিয়া উঠিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদের প্রতিনিধি কাউণ্ট বার্ণাদোত্তো বিফল হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন—ইহুদি ও আরবের পরস্পরবিরোধী আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সমন্বয় বিধান সম্ভব হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নেতৃবর্গের যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের মতের ও পথের মিল নাই বলিয়াই ইহুদি ও আরব এই ভাবে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নস্যাৎ করিবার পক্ষে সাহস পাইল। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন প্যালেষ্টাইন বিভাগের পক্ষপাতী ছিল; ১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাসে এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়—প্যালেষ্টাইনে দুইটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের সম্মতি ছিল; ব্রিটেন তখনও প্যালেষ্টাইনের "অছি" ছিল; তাঁহার পক্ষে ঘোষণা করা হইল যে ইহুদি ও আরবে মিলিয়া যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, ব্রিটেন তাহা স্বীকার করিয়া লইবে। আপাতদৃষ্টিতে এই মনোভাব সরল বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু যাহাদের ব্রিটিশ কূটনীতির সহিত সামান্য পরিচয় আছে, তাহারা ইহাতে বিভ্রান্ত হইতে পারে না। ব্রিটিশ স্বার্থের প্রয়োজনে প্যালেষ্টাইনে ইহুদির জন্য একটা আস্তানা করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে; ব্রিটিশ স্বার্থের প্রয়োজনে আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আরবদের তোয়াজ করিতে হইল। এই যুদ্ধের সময়েই জেরুজালেমের মুফতি আল্-হুসেনী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন; ইরাকের রশিদি সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টা করেন; মিশরের শাসক সম্প্রদায় কেবলমাত্র ভদ্রতা রক্ষা করিয়া প্রকাশ্যে কোন অনিষ্ট করেন নাই। কিন্তু ইহাদের মনস্তুষ্টির জন্য এমন কোন অন্যায় কাজ নাই, যাহা ইহুদির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ রাজনীতিকরা করেন নাই।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইহুদিরা পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের লোকবল ১ লক্ষ হইতে ৬ লক্ষে পরিণত করিয়াছে; বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের সাহায্যে প্যালেষ্টাইনে অভূতপূর্ব্ব অর্থনীতিক উন্নতি সাধন করিয়াছে। এই উন্নতি দেখিয়াও আরবদের মোহ ভঙ্গ হয় নাই। ব্রিটিশ শাসন তাঁহাদের মধ্যযুগীয় মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। কিন্তু ব্রিটেন তাঁহার নিজের স্বার্থের জন্য আরব নৃপতিবৃন্দের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। এ কথা আজ অবিদিত নাই যে অধুনা-প্রসিদ্ধ "আরব লীগের" জন্ম হইয়াছিল ব্রিটিশ কূটনীতিকবর্গের চক্রান্তে। মিঃ রবার্ট কেসি ১৯৪২-৪৩ সনে আরব দেশসমূহে ব্রিটিশ দূত ও মন্ত্রীরূপে বিরাজ করিতেছিলেন; ১৯৪৪-৪৬ সনে তিনি বাংলাদেশের গবর্ণর হইয়া আসেন। তিনি ও ব্রিগেডিয়ার ক্লেটন "আরব-লীগের" জন্মদাতা। এই ইতিহাস যাঁহারা জানেন, ব্রিটেনের কূটনীতিক চাল বুঝিতে তাঁহাদের কোন কষ্ট হয় না। "অছিগিরির" দায়িত্ব এড়াইয়া আরব রাষ্ট্রপুঞ্জের সাহায্যে ব্রিটেন নিজের ক্ষমতা ও স্বার্থ এই অঞ্চলে অটুট রাখিতে চায়। এই বিষয়ে আমেরিকার পুঁজিপতিদের স্বার্থ জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য আমেরিকার পক্ষ হইতে প্যালেষ্টাইন বিভাগের সমর্থন প্রত্যাহার করা হইয়াছে, যদিও ঘটা করিয়া ইসরাইল রাষ্ট্রকে এক প্রকার স্বীকার করা লওয়া হইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এই রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়াছে। কিন্তু গভীর জলের সব মাছ; কত খেলাই যে তাহারা খেলিতেছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ইহুদি-আরবের যুদ্ধ ঘনীভূত হইয়া উঠিলে তাহাদের স্ব-মূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিবে।

সত্যানন্দ বসু

সত্যানন্দ বসুর দেহত্যাগে স্বদেশী যুগের একজন নীরব ও নিরলস কর্ম্মী আমরা হারাইলাম। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পুরোভাগে আমরা দেখিয়াছি সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে। এই আন্দোলনের আয়োজন-উদ্যোগে বহুবাজারের ভারত-সভা সর্ব্বপ্রথমে অগ্রণী হইয়াছিল; এবং এই সভার একজন কর্ণধার ছিলেন সত্যানন্দ বসু। জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য তাঁহাকে কোন চাকুরী করিতে হয় নাই, তিনি সেইজন্য আজীবন নানা প্রকার লোকসেবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন। দেশের শিল্পবাণিজ্যের নূতন শিক্ষা ও ব্যবস্থার আয়োজনে তাঁহার আগ্রহ ছিল বলিয়াই তিনি বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (Council of National Education) প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। এই পরিষদের কাজ যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া আছে। সত্যানন্দ বসু বহু বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকমণ্ডলীর একজন ছিলেন বলিয়া মনে হয়। দেশের অর্থনৈতিক নানা সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত সুরেন্দ্রনাথ পরিচালিত "বেঙ্গলী" পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্থান পাইত, এবং বিগত বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বেও তাঁহাকে এই বিষয়ে বিশেষ চিন্তাগ্রস্ত দেখিয়াছি। স্বদেশী যুগের স্মৃতি-কথা লিপিবদ্ধ করিবার তাঁহার কল্পনা ছিল; কিন্তু তৎসম্বন্ধে কিছু করিয়া যাইতে পারিয়াছেন কি না জানি না। যৌবনে ও প্রৌঢ়ে তিনি রাজনৈতিক ভাবে ও কর্ম্মে ছিলেন নরমপন্থী (Moderate)। ১৯১৭ সাল হইতে তাঁহাদের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত অনেক কর্ম্মপন্থায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, কারণ ধ্বংসাত্মক কার্য্যাবলী তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। পূর্ব্বযুগের একজন বাঙালী প্রধানের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

কালা-আম

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

[তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের লুপ্ত স্মৃতি]

১

কালা-আম একটি আমগাছ। পাণিপত শহর হইতে কয়েক মাইল দূরে ধূ-ধূ মাঠে পথহারা পথিক কিংবা রৌদ্র-ক্লিষ্ট কৃষক দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মধ্যাহ্নে ইহার ছায়ায় বিশ্রাম করিত। তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের পরে এক বিষাদময় স্মৃতি বুকে লইয়া এই "কাল-আম" কখন মরিয়া গিয়াছে কেহ জানে না। এই আমগাছের তলায় মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত কালো সন্ধ্যার আঁধারে বিলীন হইয়াছিল। এইজন্য উহা "কালা-আম" বা অভিশপ্ত আম্রবৃক্ষ দুর্নাম বহন করিয়া জনশ্রুতিতে পরিণত হইয়াছে। চতুর্দিকস্থ জনপদের গ্রামবৃদ্ধগণ পুরুষানুক্রমে এই জনশ্রুতি শুনাইয়া আসিতেছে, গ্রাম্য যোগী বা চারণ যুদ্ধগীতিকা গাহিয়া ইতিহাসকে সজীব রাখিয়াছে।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি সূর্য্যাস্তের সময় তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের বহুবিস্তৃত রণক্ষেত্রে শ্মশানের নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিয়াছিল। এই সময় রাশীকৃত শবদেহের মধ্যে ভূপতিত এক সৈনিক পুরুষ সংজ্ঞালাভ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং হস্তস্থিত ভল্লের সাহায্যে দেহভার রক্ষা করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় চলিতে লাগিলেন, কেন কিংবা কোথায় চলিয়াছেন তিনি জানেন না। এইভাবে তিনি অর্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া জনশূন্য মাঠে একটি আমগাছের তলায় বসিয়া পড়িলেন। যোদ্ধার বয়স তখনও ত্রিশ পার হয় নাই; তাঁহার সবল দেহসৌষ্ঠবের মধ্যে যেন সৌন্দর্য্য ও বীর্য্যের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। পরিধানে তাঁহার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে ভূষিত। যুবকের রাজশ্রীমণ্ডিত প্রশস্ত ললাটে ব্রাহ্মণ্যের পরিচায়ক তিলক, গলায় মুক্তার মালা, কানে হীরকের দুল, মস্তকে রত্নখচিত উষ্ণীষ, অবসন্ন চক্ষুদ্বয় ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত স্তিমিতদীপ্তি। ঐ দিন সূর্য্যোদয় হইতেই তিনি অমিতবিক্রমে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহাকে পিঠে লইয়া পর পর তিনটি ঘোড়া মরিয়াছে। হয় যুদ্ধজয় কিংবা মৃত্যু—ইহাই ছিল তাঁহার কাম্য; কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁহার এ দুটি আকাঙ্ক্ষার কোনটিই চরিতার্থ হইল না। বসিয়া বসিয়া তিনি আপন অদৃষ্টের কথাই ভাবিতেছিলেন এমন সময় পাঁচ জন দুরাণী পাঠান অশ্বারোহী আমিষলোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায় শিকার খুঁজিতে খুঁজিতে "কালা-আমে"র তলায় পৌঁছিল। বৃক্ষতলে উপবিষ্ট রক্তাপ্লুত অবসন্ন রাহুগ্রস্ত মধ্যাহ্নভাস্করসদৃশ সেই মারাঠা সেনানীর বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া পাঠানেরা বিস্মিত ও দয়ার্দ্রচিত্ত হইল। সরাসরি মাথা না কাটিয়া তাহারা তাহাকে বলিল, যাহা আছে দাও, প্রাণে মারিব না। নির্ভীক যোদ্ধা আত্মপরিচয় দিলেন না, নির্ব্বাক্ নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া রহিলেন। লুঠের লোভে পাঠানেরা তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিবামাত্র সেই অর্দ্ধমৃত যোদ্ধার দেহে যেন নব চেতনার সঞ্চার হইল; নিমেষমধ্যে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া একাকী পাঁচ জনকে তিনি আক্রমণ করিলেন। ভল্লের আঘাতে চারি জন পাঠানকে আহত করিয়া স্বয়ং বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন। ক্রুদ্ধ পাঠানগণ যোদ্ধার বসনভূষণের সহিত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন মস্তকটিও লইয়া চলিল। ইহাতে আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। ইহাই তো বীরের অভীপ্সিত মৃত্যু। কবি বলিয়াছেন—

"জীয়ত সিংহ নহি আপুধরাবা, মুয়ে পিছে কোই ঘিসি আওবা।"

(প্রাণ থাকিতে জীবন্ত সিংহ নিজে ধরা দিবে না। মরিলে যে কেহ তাহার গা ঘেঁষিতে পারে।) বীরধর্ম্ম অনুসরণকারী এই তরুণ সেনানীও জীবিত অবস্থায় শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করেন নাই, সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুকেই বরণ করিয়াছিলেন। পাঠানেরা কাহাকে হত্যা করিয়াছিল তাহা কিন্তু কেহই জানিতে পারিল না।

২

যে আহত মহারাষ্ট্র বীরকেশরী চিরাভ্যস্ত "মারা! মারা! হানা! হানা!" এই মারাঠী রণহুঙ্কার ছাড়িয়া একাকী পাঁচ জন দুরাণী অশ্বারোহীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি কে? আচার্য্য যদুনাথ লিখিয়াছেন, ইনিই সেনাপতি সদাশিব রাও "ভাওসাহেব"। পাণিপতের কালা-আম সম্বন্ধে জনশ্রুতি তাঁহার অজানা নয়; উহার অবস্থান নির্দ্দেশসূচক পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রস্তর ফলক তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু স্বরচিত ইতিহাসে কালা-আমকে স্থান দেন নাই। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—

"As he was walking over the field . . . a knot of five Durrani horsemen surrounded him and cried out to him to surrender . . . he gave them no reply . . . he was killed and his head cut off and carried away by his slayers."*

* *Fall of the Mughal Empire*, II, p. 343.

কয়েক পাতার পর ঐ পুস্তকেই ভাও সাহেবের শেষ-কৃত্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"The headless trunk of the Bhau *was dragged out of a huge heap of the slain* two days after the battle, and the *head on the third day,* and *burnt at different times with* proper rites."†

উদ্ধৃতাংশদ্বয় আমাদের কাছে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হইতেছে, যথা :—

(১) প্রথমাংশের বর্ণনা যদি সত্য হয় তবে ভাও-সাহেব যুদ্ধস্থলে যেখানে এবং যে সময়ে নিহত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার সঙ্গে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না, আক্রমণ-কারী পাঠানগণ আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেহ মরে নাই। সুতরাং ঐ স্থানে দ্বিতীয়াংশে উদ্ধৃত "huge heap of the slain" কেমন করিয়া আসিল ?

(২) ঐ মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে শুধু ভাওসাহেবের ধড় কেমন করিয়া পড়িয়া রহিল ? যে ব্যক্তি মাথাটি কাটিয়াছিল সে যদি জানিত উহা ভাওসাহেবের মাথা তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা সরাসরি আহ্‌মদশাহ আবদালীর কাছে পৌছাইয়া দিয়া শাহান্‌শাহ্‌-র দুশ্চিন্তা এবং তৎসহ আনুষঙ্গিক সকল ঐতিহাসিক সমস্যার অবসান ঘটাইত।

আমাদের মনে হয় তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের প্রমাণপঞ্জী বিচারের সময় মারাঠী ভাষায় লিখিত "ভাওসাহেবাঁ-চী বখর" প্রায় সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়া আচার্য্য যদুনাথ সরকার মহাশয় সংশয়গ্রস্ত হইয়াছেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"But what puzzles the critical historian in the *Bhau Sahibanchi Bakhar* is that, hopelessly mixed up with its mass of demonstrably false statements, there are some true traditions (as proved by authentic facts), and some statements which have every appearance of being true though unsupported elsewhere. Therefore, the simple remedy of rejecting this work in its entirety would impoverish our scanty store of information on the battle, and *yet it is not safe to accept any of its statements so long as it cannot be corroborated by other and more reliable sources.*"

উদ্ধৃত কথাগুলির সারমর্ম্ম হইতেছে এই যে, সংশয়স্থলে যাহা একাধিক প্রমাণদ্বারা সমর্থিত হয় না ঐরূপ কোন উক্তি তাঁহার মতে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা নিরাপদ নহে। আমরা কিন্তু বিপদের ঝুঁকি লইবার পক্ষপাতী। যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ক্ষেত্রে যে উক্তি অধিকতর প্রামাণ্য, প্রতিকূল উক্তির দ্বারা তাহা যত দিন খণ্ডিত না হয় তত দিন ঐ উক্তিকে সত্যের কাছাকাছি কিছু বলিয়া গ্রহণ করিতে দোষ কি ? অবশ্য এই রীতি—নীতি নহে, আপদ্ধর্ম্ম—ইহাতে সত্যের সন্ধান না মিলিতেও পারে। 'ভাও-বখর' হইতে ইতিহাস সংগ্রহ অনেকটা স্বর্ণকারের পোড়া কাঠকয়লা ধুইয়া চালিয়া দু-এক রতি সোনা বাহির করার মত ব্যাপার। ভাওসাহেব এবং তাঁহার দ্বিখণ্ডিত শব ও মস্তকের পরিণাম আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা আচার্য্য যদুনাথের বর্জ্জন-নীতির একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি।

ভাওসাহেব-বখরে লিখিত আছে—বিশ্বাস রাও এবং অপর তিন জন মারাঠা সর্দ্দারের মৃতদেহ নিজের বেতন হইতে তিন লক্ষ টাকা কাটাইয়া সুজাউদ্দৌলার সেনানায়ক উমরাও-গিরি গোঁসাই মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তৎসমুদয় বিধিপূর্ব্বক অগ্নিসংকার করিয়াছিলেন। এই উক্তির মধ্যে যে অংশ ভ্রমাত্মক আচার্য্য যদুনাথ অধিক প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্যে উহা সংশোধন করিয়াছেন; কিন্তু ছাঁটাইয়ের সঙ্গে "তিন লক্ষ টাকা" এবং গোঁসাই উমরাও গিরির প্রশংসা এই ব্যাপার হইতে বাদ পড়িয়াছে। আমাদের অভিযোগ এই ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে। "তিন লক্ষ টাকা" ভাওসাহেব-বখর ব্যতীত অন্য কোথাও নাই বলিয়া তিনি গ্রহণ করেন নাই। বিশ্বাস রাও-র মৃতদেহ তিন দিন দুরাণীর ডেরায় আটক ছিল। কাঁচা চামড়ার ভিতর বিচালী পুরিয়া ঐটিকে তাহারা বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ দেশবাসীকে "হিন্দুর বাদশাহ" দেখাইবে ইহাই ছিল পাঠানদের দাবি। বিনা মূল্যে শুধু সুজাউদ্দৌলার কাকুতি-মিনতিতে দুরাণী বিশ্বাস রাও-র মৃতদেহ হাতছাড়া করিল—ইহা যত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, মৃতের জন্য "তিন লক্ষ টাকা" পণ ততদূর অবিশ্বাস্য নহে। দ্বিতীয় কথা—উমরাও গিরির নাম স্বতন্ত্র প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত না হইলেও তাঁহার দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। দুরাণী যদি কোন কাফেরের উপর এই মেহেরবাণী করিয়া থাকেন তবে সেই কাফের উমরাও গিরি ছাড়া আর কেহ নহে। কেননা মুসলমান অপেক্ষা অধিক ইমানদারীর সহিত তিনি ও তাঁহার নাগা চেলারা দুরাণী-পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বহু মারাঠা বধ করিয়াছিলেন। ইহার উপরে আরও তিন লক্ষ টাকা না পাইলে দুরাণী হয়ত বিচালী-ভরা বিশ্বাস রাওকে কাবুল লইয়া যাইতেন। বিভিন্ন বর্ণনার গোলমাল মিটাইবার জন্য আচার্য্য যদুনাথ গোঁসাইজীর নাম না করিয়া লিখিয়াছেন, "সুজাউদ্দৌলার ব্রাহ্মণগণ"। ইহাতে গোঁসাইজীর প্রতি হয়ত অবিচার করা হইয়াছে। গোঁসাই উমরাও গিরির গুরু রুদ্রতেজা রাজেন্দ্রগিরি ছিলেন সুজাউদ্দৌলার পিতা নবাব সফদর জঙ্গের গুরু এবং নাগা-

---

† *Ibid*, p. 349.

বাহিনীর সেনানায়ক; শিষ্যের জন্য বাদশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ফিরোজশাহ কোটলা আক্রমণ করিবার সময় তিনি লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। পুত্রকে যুদ্ধে বিদায় দেওয়ার সময় সুজাউদ্দৌলার মাতা উমরাও গিরির হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন, যেহেতু রাজমাতা সুন্নী মুসলমানের সান্নিধ্য মিত্র হিসাবেও শিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক মনে করিতেন। সুতরাং ভাও-বখর-বর্ণিত উমরাও গিরির পুণ্যকৃত্যের প্রশংসা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা যায় না; পাঠান শিবিরে থাকিয়া হিন্দুর শেষকৃত্য সমাধা করিবার মত বুকের পাটা এক মাত্র উক্ত নির্ভীক সন্ন্যাসী যোদ্ধা ব্যতীত আর কাহারও হইতে পারে না।

৩

তৃতীয় পাণিপত-যুদ্ধের সম্পূর্ণ প্রমাণপঞ্জী আচার্য্য যদুনাথ ব্যতীত আর কাহারও হস্তগত হয় নাই। তাঁহার সর্ব্বশেষ এবং অতি মূল্যবান সংগ্রহ সৈয়দ নূরউদ্দীন হাসান-প্রণীত নাজিবুদ্দৌলার জীবন-চরিত যুদ্ধের বার বৎসর পরে লিখিত। নূরউদ্দীন যুদ্ধের কয়েক মাস পূর্ব্বে ভরতপুরে পলাইয়া গিয়াছিলেন। সুজাউদ্দৌলার শিবিরে এবং মহম্মদ জাফর শামলু দুরাণী সর্দ্দার শাহ-পছন্দ খাঁর ডেরায় উপস্থিত ছিলেন। কাশীরাজ যুদ্ধের ১৯ বৎসর পরে এবং শামলু ৩৫ বৎসর পরে ক্ষীয়মাণ স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভাওসাহেব সম্বন্ধে অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, এ ধরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন মহারাষ্ট্রবাসীর লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। বহু বৎসর পরে জনশ্রুতিমূলক কতকগুলি বখর এবং কৈফিয়ত লেখা হইয়াছিল। ভাওসাহেবাঁ-চী বখর এই শ্রেণীর রচনা এবং এইগুলির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আচার্য্য যদুনাথ ভাও-বখরকে আফিমখোরের গল্পের পর্য্যায়ে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বেই তাঁহার মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অন্য কোন লেখক কর্ত্তৃক সমর্থিত না হইলেও ইহার কোন কোন অংশ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া তিনি মনে করেন, এবং স্বয়ং স্থানে স্থানে এই বখরের বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন। তবুও আমাদের মনে হয় ইহাকে তিনি কিছু অতিরিক্ত সন্দেহের চোখে দেখিয়াছেন। যাহারা এই যুদ্ধ দেখিয়াছে, যুদ্ধের পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি যাহারা সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষভাবে অবগত হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে এই বখর-লেখক খবর সংগ্রহ করিয়াছেন—এইরূপ অনুমান করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। মারাঠা পক্ষের সত্য এবং অর্দ্ধ সত্য বিবরণ এই বখর ছাড়া আর কোথায়ও আছে বলিয়া মনে হয় না। সন তারিখ অশুদ্ধ কিংবা বিভিন্ন অংশ পরস্পর অসংলগ্ন এই ত্রুটির জন্য ইহাকে বাতিল করা যায় না। এই বখর জনশ্রুতি সংগ্রহ; কিন্তু 'নাস্ত্যমূলা জনশ্রুতি':—শুধু এই কারণেই আমরা ইহাকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী নহি। "জনশ্রুতি অমূলক নয়"—এই দুর্ব্বলতার স্থান ঐতিহাসিক গবেষণায় থাকিতে পারে না; অথচ বিনা বিচারে সামান্য বস্তুকেও ত্যাগ করিবার অধিকার ঐতিহাসিকের নাই। উৎপত্তিস্থল, সময় এবং বক্তা ও শ্রোতার মনোভাব দ্বারা জনশ্রুতির বিচার যদি ইতিহাস-সম্মত হয় তবে ভাও-বখর মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।

যাহা হোক, ভাওসাহেবের অন্তিমদশা এবং মৃতদেহের কি গতি হইয়াছিল উহাই বিচার্য্য বিষয়। আচার্য্য যদুনাথের বিবরণ বহু পুস্তক হইতে সংগৃহীত এবং প্রত্যেকটি ঘটনা বিচারের কষ্টিপাথরে তিনি ঘষিয়া দেখিয়াছেন; তবে পাঁচ জন পাঠানের সহিত ভাওসাহেব একা যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিলেন, অথচ দুই দিন পরে তাঁহার ধড় মৃত দেহের স্তূপ হইতে বাহির হইল—ইহাই বা কেমন কথা? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় ইহার একটি সত্য হইলে অপরটি মিথ্যা। যাঁহারা কাশীরাজের পুস্তক অন্যান্য বিবরণের সহিত মিলাইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন উক্তিদ্বয়ের কোনটাই মিথ্যা কিংবা অসম্ভাব্য নহে। দুইটি ঘটনার মধ্যে যেমন দু'দিনের ব্যবধান, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যাপারগুলি আচার্য্য যদুনাথ বিশদভাবে বর্ণনা করিলে পুস্তকের (*Fall of the Mughal Empire*, vol. ii) অন্ততঃ দুই পাতা বাড়িয়া যাইত এবং সাধারণ পাঠক কোন অসংলগ্নতা দেখিতে পাইত না। তিনি মাত্রারক্ষার খাতিরে তাহা করেন নাই বলিয়া আমরা বিভ্রান্ত হইয়াছি। প্রথমে আমরা ভাওসাহেব-বখর হইতে মোটামুটি ঘটনাবলী উদ্ধৃত করিব। বখরকার লিখিয়াছেন—

"[ভাওসাহেব এবং জনকোজী সিন্ধিয়া] কিছুক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। ইহার পর ভাওসাহেব ও জনকোজী সিন্ধের গতি কি হইল কেহ বলিতে পারে না; বিশেষতঃ তাঁহারা দুই জন কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হইলেন না—গায়েব হইলেন, কি আশমানে উড়িয়া গেলেন, কি পৃথিবীর পেটে ঢুকিয়া পড়িলেন? ভগবানের লীলা ব্রহ্মাদি বুঝিতে পারে না, মানুষের কি কথা? শত্রুর হাতে পড়িলে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী তাহাদের আনন্দ হইত—তাহাও হয় নাই।"

(পৃঃ ১৫৩ টিঃ ১৭)।

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভাওসাহেব সম্বন্ধে ইহার বেশী কিছু জানা যায় না। তাঁহার স্ত্রী পার্ব্বতী বাঈ অতি কষ্টে

দিল্লী পৌঁছিলেন; ভাওসাহেব সেখানেও নাই দেখিয়া তিনি নিরাশ হইলেন। সেখান হইতে হতাবশিষ্ট মারাঠা সর্দ্দারগণের সহিত পার্ব্বতী বাঈ মথুরার পথে গোয়ালিয়রে আসিয়া একমাস অপেক্ষা করিলেন। ভাওসাহেবকে তালাশ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে সন্ন্যাসী-চর প্রেরিত হইল; কিন্তু তাঁহার কোন ঠিকানা মিলিল না। ভাও-সাহেব মরিয়াছেন কি বাঁচিয়া আছেন কেহ নিশ্চয়পূর্ব্বক জানিতে পারে নাই। মোট কথা, যুদ্ধের বিশ বৎসর পরেও মহারাষ্ট্রের জনসাধারণ ভাওসাহেব বাঁচিয়া আছেন এই গুজবে বিশ্বাস করিত, এবং এইজন্তই এক "জালী ভাও" উত্তর-ভারতে দেখা দিয়াছিল। "বলবন্তনামা"-প্রণেতা ঐতিহাসিক ফকর উদ্দীন এলাহাবাদী লিখিয়াছেন, একজন মারাঠা কর্ম্মচারী নিরুদ্দিষ্ট ভাওসাহেবকে চুণারে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত ভোজন করিয়াছিলেন। পেশবা-দপ্তরের কাগজপত্রে এই "জালীভাও"-র সহিত যাহারা ভোজন করিয়াছিল তাহাদিগকে দণ্ডপ্রদানের উল্লেখ আছে। ভাও-বখর হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়, ভাওসাহেবের মৃতদেহ আবিষ্কার ও অগ্নি-সংকার মারাঠাগণ বিশ্বাস করে নাই। বিশ্বাস রাও এবং অন্যান্য মারাঠা সর্দ্দারদের মৃতদেহ উমরাও গিরি গোঁসাই কর্তৃক উদ্ধার এবং দাহক্রিয়া সম্পাদনের কথা ভাও-বখরে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই ব্যাপার জানিতেন, অন্য ব্যাপার অর্থাৎ ভাওসাহেবের ধড় ও মাথার বিভিন্ন দিনে দাহক্রিয়ার কথা তিনি শুনেন নাই এমন অনুমান করা যায় না।

তবে ভাওসাহেবের কি হইল? দুরাণী রক্ষী সেনা-দলের শেষ হাম্‌লায় ভাওসাহেব আহত ও ভূপাতিত হইয়া-ছিলেন কিন্তু প্রাণে বাঁচিয়া ছিলেন; নতুবা শেষ বেলা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাঁহার পক্ষে পাঠানের দৃষ্টি এড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আধ ক্রোশ দূরে যাওয়া সম্ভব নয়। আধ ক্রোশ দূরে যেখানে তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন ঐ স্থান পাণিপতের "কালা-আম"। আচার্য্য যদুনাথের বিবরণ জনশ্রুতি হইতে গৃহীত না হইলেও জনশ্রুতি উহার পরি-পূরক। তাঁহার বর্ণনার মধ্যে "কালা-আম" নাই কিন্তু এখন উহাকে ইতিহাসে স্থান দেওয়া আমরা অযৌক্তিক মনে করি না।

৪

কালা-আমের তলায় ভাওসাহেবের যে মস্তকবিহীন দেহ নিভৃতে পড়িয়া রহিল দুই দিন পরে উহা স্তূপীকৃত মড়ার গাদার মধ্যে কেমন করিয়া আসিল? এই প্রশ্নের উত্তর কাশীরাজ-লিখিত বিবরণে নাই; কিন্তু মৃতদেহের স্তূপের মধ্যেই ঐ দেহ পাওয়া গিয়াছিল ইহা তিনি লিখিয়াছেন। যুদ্ধের পরের দিন পাণিপতের ময়দানে মরা বাছাই এবং গণনার ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। মুসলমানদের মৃতদেহ গোর দেওয়া হইল এবং কাফেরগণ পড়িল শকুন-শিয়ালের ভাগে। যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য বীভৎস—স্থানে স্থানে মড়ার গাদা এবং প্রতি দুরাণী তাঁবুর সামনে কাটা মাথার স্তূপ। আটাশ হাজার মৃত এবং বাইশ হাজার বন্দী মারাঠার মধ্যে ভাওসাহেবকে না পাইয়া দুরাণী আহমদশাহ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। বন্দী স্ত্রীলোকগণের মধ্যে যাহারা ভাওসাহেবকে চিনিত তাহাদের দ্বারা মড়া সনাক্ত করিবার হুকুম জারী হইল। ভাওসাহেবের নর্ত্তকী এবং ক্রীতদাসীগণ গায়ের গন্ধ শুঁকিয়া ভাওসাহেবের মৃতদেহ চিনিতে পারে কিনা এই জন্য তাহাদিগকে যুদ্ধস্থলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, ইহার বেশী ইতিহাসে নাই। কিন্তু ইহা হইতে বুঝা যায় মৃত-দেহগুলির মধ্যে মাথাকাটা শব বিস্তর ছিল। মুখ দেখিয়া চিনিবার উপায় থাকিলে গায়ের গন্ধ শুঁকাইবার বুদ্ধি মাথায় গজাইত না। তালাশের এই তোলপাড়ের হিড়িকেই যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে গৃহীত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃতদেহের মধ্যে সম্ভবতঃ ভাওসাহেবের কবন্ধ ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। মাথা না থাকিলেও অন্তরঙ্গ-জনের পক্ষে সদাশিব রাওয়ের মত সুপুরুষের ডন-কুস্তী করা শরীর ঠিক ঠিক সনাক্ত করা এবং আটাশ হাজার মড়া উলট-পালট করিতে দুই দিন সময়ক্ষেপ কিছুই বিচিত্র ব্যাপার নহে। ভাওসাহেবের ধড় পাইয়াও আহমদশাহ-র সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই। এইজন্যই ধড়ের পরে আসিয়া-ছিল মাথা সনাক্তের পালা। যে পাঁচ জন দুরাণী অশ্বারোহী অজ্ঞাতসারে মহারাষ্ট্র সেনাপতির ছিন্নমস্তক লইয়া ফিরিয়া-ছিল তাহারা অন্যান্য গাজীগণের ন্যায় বাহাদুরির নমুনা-স্বরূপ ঐ মাথা তাঁবুর সামনে নিশ্চয়ই রাখিয়া দিয়াছিল এবং পরে তালাশের সময় উহা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

আচার্য্য যদুনাথ টিপু সুলতানের মৃত্যুর সহিত সদাশিব রাওয়ের অসীম সাহস ও বীরোচিত মৃত্যুর তুলনা করিয়াছেন বলিয়া যদি কেহ মনে করেন যুদ্ধস্থলে শত্রুমিত্রের শবদেহ-বেষ্টিত হইয়া ভাওসাহেব মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন, এই কথা ঐতিহাসিক বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা হইলে ভুল করা হইবে। এইরূপ অভিপ্রায় থাকিলে ঐ অংশ পুস্তকের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে সংযুক্ত হইত।

আহমদশাহর মত আচার্য্য যদুনাথও অনেককাল ভাওসাহেব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। এই জন্য দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি একবার সশিষ্য "কালা-আম" অভিযান করিয়াছিলেন; সম্প্রতি সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই পাঠকদের কাছে নিবেদন করিব।

৫

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর বেলা ১১টার সময় একখানা মোটরগাড়ীতে আচার্য্য যদুনাথ তাঁহার যে দুই জন ছাত্রকে লইয়া পাণিপত যাত্রা করেন তন্মধ্যে এক জন এক ছদ্মবেশী রাজপুত্র,অপর ব্যক্তি বর্ত্তমান লেখক স্বয়ং। আমাদের সঙ্গে পাণিপত তহশীলের ৪ মাইল স্কেল ম্যাপ, ক্যামেরা ইত্যাদি ছিল, স্থানীয় কোন পথপ্রদর্শক ছিল না। বেলা সাড়ে বারটার সময় পাণিপত ষ্টেশনে মোটরগাড়ী রাখিয়া আমরা শহরের মধ্যে একটি জৈন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাজির হইলাম। স্কুলের প্রধান পণ্ডিত আচার্য্য যদুনাথের পূর্ব্বপরিচিত। তাঁহার খর্ব্বাকৃতি দোহারা চেহারা, রং কালো চোখ দুইটি বড় এবং দৃষ্টি চঞ্চল। জাতিতে তিনি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ; মহাদজী সিন্ধিয়ার আমল হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পাণিপত তহশীলে জায়গীর ভোগ করিয়া প্রায় হিন্দুস্থানী হইয়া গিয়াছেন। আমরা "কালা-আম" দেখিতে যাইব, অথচ পথ কাহারও জানা নাই। স্কুলের এক জন শিক্ষক তালাশ করিয়া এক ব্যক্তিকে লইয়া আসিলেন, জাতিতে চামার, নাম রামদাস। উক্ত শিক্ষক এবং রামদাসকে সঙ্গে লইয়া আমরা শহরের বাহিরে ধূ-ধূ করা মাঠে উপস্থিত হইলাম। ঐখানে রাস্তা দূরের কথা, পাকদণ্ডী পর্য্যন্ত নাই, মাথার উপর রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। মাইলখানেক চলিবার পর আচার্য্যদেব একটা উঁচু টিবির মত দেখিতে পাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কালিকা! ওটা কি?' আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, চারিদিকেই যেন শুধু অতীত ইতিহাসের ছবি দেখিতেছি। গুরুদেবের কথায় চমক ভাঙিল, দেখিলাম একটি ছোটখাটো পাহাড়, লাল রং, রৌদ্রে ঝলমল করিতেছে। একটু বুদ্ধি খাটাইয়া উত্তর দিলাম, 'বোধ হয়, ইটের পাঁজা, কি কোন পুরনো জিনিষ হইতে পারে।' আমার উত্তর শুনিয়াই সকলে হাসিয়া উঠিলেন; আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। গুরুজী হাসিয়া বলিলেন— 'তোমার নেহাত চেনা জিনিষ চাটগেঁয়ে লঙ্কামরিচ চিনিতে পারিলে না?' একটু কাছে গিয়া দেখিলাম সত্যই শুকনা লঙ্কামরিচের ক্ষেত, যেন ছোটখাটো একটি পাহাড়ের মত। চলিতে চলিতে আমি কল্পনায় পাণিপতের ময়দান মারাঠার রক্তে লালে লাল দেখিতেছিলাম, লঙ্কামরিচ কল্পনায়ও আসে নাই।

ইহার পর আরও কিছুদূর যাইবার পর আমাদের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িল। রামদাস আমাদিগকে কখনও বামে, কখনও ডাহিনে হাঁটাইয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিল। তাহাকে বিদায় দিয়া গুরুজী ম্যাপ খুলিয়া বসিলেন। কদম ফেলিয়া স্থানের দূরত্ব নির্ণয়ের তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা। তিনি ম্যাপ দেখাইয়া আমাদিগকে বলিলেন, 'শহর হইতে আমরা এত দূরে এই জায়গায় এখন আছি; অমুক গ্রাম হইতে এত মাইল দূরে লড়াই হইয়াছিল; মারাঠারা পলাইয়া হয় উত্তর না হয় পশ্চিম দিকে গিয়াছিল। এই জায়গা হইতে দুই মাইল অমুক দিকে গেলে আমরা "কালা-আম"-এ পৌছিতে পারি।' রামদাসের মত আমিও দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়াছিলাম। আমরা তাঁহার পিছে পিছে চলিলাম। এক ঘণ্টা পরে প্রায় তিনটার সময় "কালা-আম"-এ পৌছিলাম। এক শত ছিয়াত্তর বৎসর পূর্ব্বে এমনি সময়েই তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল; শস্ত্রাঘাতে সম্বিৎহারা ভাওসাহেব তখনও শবদেহের স্তূপ হইতে উঠিয়া কালা-আমের দিকে শেষ যাত্রা সুরু করেন নাই। "কালা-আমে"র স্মৃতিচিহ্নের কাছে এক জন সপ্ততিপর ব্রাহ্মণ-কৃষক Persian wheel-এর দ্বারা কুয়া হইতে ক্ষেতে জল দিতেছিল। গুরুজী বলিলেন,'এই স্থানের সন্নিকটে কোন একটা বাউলী বা পাকা ঘাট-বাঁধান কুয়ার পারে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর মারাঠা সৈন্যগণ এক দল দুরাণী অশ্বারোহীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে হটাইয়া দিয়াছিল। ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ এই জায়গার কাছাকাছি কোন বাউলী আছে নাকি।'

এই বার আমার পালা। পূর্ব্ব-পঞ্জাবের গ্রামীণ লোকের সহিত কথা বলিবার ভাষা গুরুজী কিংবা রাজপুত্রের রপ্ত নাই। দিল্লী রোহতকের গ্রামে জাঠ চৌধুরীগণের সাহচর্য্যে আমি গ্রাম্য ভাষা কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়াছিলাম। আমি কুয়ার কাছে গিয়া নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিলাম। বৃদ্ধ বলিল, 'লালাজী, (যেহেতু আমার মাথায় লক্ষ্ণৌর লালা টুপী ছিল) এই জায়গার চারদিকে বহু ক্রোশ পর্য্যন্ত মাঠ-গ্রাম আমার কদম কদম জানা আছে। যেখানে আমরা চাষবাস করিতেছি সেইখানে সুয়া খেরী নামে এক গ্রাম ছিল। এখান হইতে দেড় মাইল দূরে রাজা খেরী গ্রামে একটা বাউলী আছে; গ্রামের যোগী এখনও ভাও-র গীত গাহিয়া ভিক্ষা করে।' আমি আসিয়া গুরুজীকে এই কথা বলিবামাত্র তিনি আমাকে বলিলেন, 'তুমি সেই বাউলী দেখিয়া যোগীর নিকট হইতে ঐ গীত লিখিয়া আনিতে পার? অতঃপর স্থির হইল, আচার্য্যদেব তাঁহার অপর শিষ্যসহ আমার জন্য ষ্টেশনে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন, ইতিমধ্যে আমি রাজা খেরী গ্রামে যাইয়া যোগীর গান লিখিয়া আনিব এবং বাউলী দেখিয়া আসিব। তিনি কয়েকটা টাকা আমাকে দিলেন, টাকার কি প্রয়োজন

হইতে পারে আমি তখন ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। পরে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ এবং আরও কয়েকজন লোকের সহিত আমি গ্রামের দিকে চলিলাম। কথাবার্ত্তায় তাহাদের সঙ্গে ভাব হইয়া গেল। তাহারা বলিল রাত্রে আমার থাকার বন্দোবস্ত করিবে এবং যোগীর গীত শুনাইবে। আমরা গ্রামে পৌঁছিতেই বেলা প্রায় শেষ হইয়াছিল! গ্রামের বাহিরে যেখানে লোকে গরু-মহিষকে জল খাওয়ায় সেখানে আসিয়া আমার সঙ্গীরা ফিস ফিস করিয়া কি বলাবলি করিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকজন লোক সেখানে জমায়েৎ হইল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-কৃষক বলিল, গ্রামের ভিতরে গেলেই "বাউলী" দেখা যাইবে, আমি ইচ্ছা করিলে সেটি গিয়া দেখিয়া আসিতে পারি, আমি ফিরিয়া না আসা পয্যন্ত আমার জন্য তাহারা অপেক্ষা করিবে। বৃদ্ধ যে দিকে পথ দেখাইয়া দিল সেই দিকে গিয়া দেখিলাম কিছুই নাই; কতকগুলি উলঙ্গ শিশু ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। ফিরিয়া আসিয়া দেখি বৃদ্ধ ও তাহার সঙ্গী লোকজন সবাই চম্পট দিয়াছে। বেগতিক দেখিয়া আমি সটান গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া সরকারী মেজাজে কড়া আওয়াজে এক জনকে বলিলাম, 'চৌকিদার-কো বোলাও।' ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন লোক জড় হইয়া সন্ত্রস্তভাবে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা আমাকে গ্রামের চোপাড়ে লইয়া গেল।

চোপাড় কাঁচা চৌচালা বড় হল-ঘর, সর্ব্বসাধারণের খরচে তৈয়ারী। ঐখানে সারি সারি খাটিয়া, গোটা দুই জলের মটকা, দুই ডজন হুঁকা। এই হল-ঘর একাধারে গ্রামের ক্লাব, অতিথিশালা এবং পঞ্চায়েতী আদালত। ঐ গ্রামের লম্বরদার এক জন অশীতিপর বৃদ্ধ জাঠ। এইবার আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার উপস্থিতিতে গ্রামে সাড়া পড়িয়া গেল। আমি কে? কি জন্য আসিয়াছি? কেহ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। যোগীর খবর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে এই গ্রামের লোক নয়; রিসালু গ্রামে তাহার নিবাস। একজন লোক সাইকেল লইয়া যোগীকে আনিবার জন্য চলিয়া গেল। আমি এই অবসরে বাউলী দেখিয়া আসিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম পুরনো বাউলীর নূতন সংস্কার হইয়াছে। এক ঘণ্টা পরে লোকটি রিসালু হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, যোগী ভিক্ষা করিবার জন্য কোন দূর গ্রামান্তরে গিয়াছে, পরের দিন ফিরিতে পারে। গ্রামের লোকেরা এক বানিয়ার বাড়ী হইতে আমার জন্য রুটি আনাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। আমি কিন্তু আতিথ্যগ্রহণে অক্ষমতা জানাইয়া একাকীই পাণিপত যাত্রা করিলাম। গ্রামবাসীরা সম্ভবতঃ মনে করিল নায়েব তহশীলদার বাউলীর তদন্ত করিতে আসিয়াছিলেন, বাড়ী গাজিয়াবাদ। তাহারা গ্রামের সীমানায় রাস্তা পর্য্যন্ত আমাকে আগাইয়া দিয়া বিদায় লইল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে যাহাকে জিজ্ঞাসা করি পানিপত কত দূর, সে-ই বলে আধ ক্রোশ। এই ভাবে চারি আধ ক্রোশ চলিয়া পাণিপতে উপস্থিত হইলাম। তখন রাত প্রায় ৮টা হইয়াছে। নূতন কিছু পাওয়ার উত্তেজনা এবং সরকারী মেজাজের গরমে এতক্ষণ শীত অনুভব করি নাই; এবার কাঁপুনি আরম্ভ হইল। শীতে কাতর হইয়া আমার আসল বিলাতী গরম ওভারকোটের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম যাওয়ার সময়ে গুরুজী হয়ত গাড়ীতে তালাশ করিয়া প্রাইমারী স্কুলমাষ্টারের কাছে ওটি রাখিয়া গিয়াছেন। মাষ্টারের বাড়ীতে গিয়া জানিতে পারিলাম সন্ধ্যা পয্যন্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া গুরুজী দিল্লী চলিয়া গিয়াছেন, কোন কোট রাখিয়া যান নাই। ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, শুনিলাম রাত ১২টায় দিল্লীর একখানা গাড়ী আসিবে। ঐখানে ভাজা ছোলা ও গুড় ছাড়া কোন ভোজ্য দ্রব্যই নাই। দুই আনায় পেট ভরাইয়া শেষে ঠাণ্ডা জল খাইলাম। ইহার পরে শীতের সহিত লড়াই। দুইখানা হাত মাত্র সম্বল—বুকটা চাপিয়া ধরিলাম। যাত্রী সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর। এক জন গরীব জাঠ ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়া বসিয়াছিল। আমার অবস্থা দেখিয়া সে বলিল, "মাষ্টারজী, আধা কম্বল ওড় লেও।" তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলাম—রাত্রি ২টায় দিল্লী পৌঁছিয়া বাকী রাতটা কাটাইব কোথায়? গুরুজী যেখানে আছেন রাত্রিবেলা সে আস্তানা বাহির করা যাইবে না, হ্যামিল্টন রোডে রাস্তা হইতে চীৎকার ছাড়িলে বন্ধু অশ্বিনী মুখুজ্জে জাগিবেন কিনা সন্দেহ; সুতরাং ষ্টেশন ইয়ার্ডে যেখানে কাঁচা কয়লা পোড়াইয়া কুলীরা রাত কাটায় সেখানেই আশ্রয় লইতে হইবে। যাহা হোক শেষে অশ্বিনীবাবুর কাছে জানিতে পারিয়াছিলাম, রাত প্রায় ৮ টার সময় একখানা মোটর গাড়ী হইতে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছিলেন; তিনিই আমার ওভারকোট রাখিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছিলেন রাত্রিতে আমি দিল্লী ফিরিব। তাঁহার সঙ্গে আর একজন যুবক ছিলেন—বলা বাহুল্য ইনিই "সীতামৌ" রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাঠোর কুলতিলক কুমার রঘুবীর সিংহজী। দিল্লীতে পৌঁছিয়া প্রস্তুত অন্ন এবং অপেক্ষমাণ অর্দ্ধজাগ্রত বন্ধুকে পাইয়া পথশ্রম সার্থক মনে করিলাম।

৬

এই অভিযান নিতান্ত নিরর্থক হয় নাই। রিসালু গ্রামের যোগীর গীত সম্বন্ধে যে খবর পাইয়াছিলাম, ঐ গীত প্রায় এক মাস পরে পাণিপতে আচার্য্য যদুনাথের পরিচিত এক সহৃদয় ব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ গীত ব্যতীত ভাওসাহেব সম্পর্কিত অন্য জনশ্রুতিও গ্রাম্য লোকেদের মধ্যে প্রচলিত আছে। রাজাখেরী গ্রামের চোপাড়ে নিকট হইতে আমি যাহা শুনিয়াছিলাম উহার সারমর্ম এই :—

"ভাওসাহেবের এক গেড়েরিয়ার সহিত এক পাঠানের ষড়যন্ত্র ছিল। পাঠান ঐ গেড়েরিয়াকে বলিল, বাবা! এইবার লড়াইয়ে আমাকে জিতাইয়া দাও, না হয় দুরাণীর কাছে আমার মান থাকে না। ভাও কুঞ্জপুরার (কুরুক্ষেত্রের কাছে) "ওলী"কে [নবাব] বন্দীদশায় অনাহারে রাখিয়াছিলেন, মরিবার সময় সে শাপ দিয়াছিল তাহারাও অন্নকষ্ট পাইবে। এইজন্য ভাও-র ডেরায় দুর্ভিক্ষ লাগিল। যুদ্ধে হার-জিতের অনিশ্চয়তার সময় ঐ গেড়েরিয়ার কথায় ভাও হাতী হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল। এই সময় ঐ বিশ্বাসঘাতক নীল ঝাণ্ডা তুলিয়া পাঠানকে ইশারায় জানাইয়া দিল সব শেষ হইয়াছে অর্থাৎ ভাও মরিয়াছে। ইহার পর দক্ষিণীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়া গেল; এবং ঐ পাঠানের যোগসাজসে গেড়েরিয়া সরিয়া পড়িল। ভাও "কালা-আমে"র তলায় যুদ্ধ করিতে করিতে মারা গেল।"

ইহার অধিক ইতিহাস প্রায় দুই শত বৎসর পরে জনশ্রুতির মধ্যে কেহ আশা করিতে পারেন না। কুঞ্জপুরার যুদ্ধে (অক্টোবর, ১৭৬০) বিজয়ী মারাঠাগণ বর্ব্বরোচিত আচরণ করিয়াছিল। গুরুতররূপে আহত এবং বন্দী হইয়া কুঞ্জপুরার পাঠান-বীর কুতব শাহ মারাঠাদের কাছে প্রার্থনা করিলেন, "আগে আমাকে একটু জল দাও, পরে আমার মাথা কাটিয়া ফেলিও।" দিল্লী হইতে ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে বাদলীর যুদ্ধে দত্তাজী সিন্ধিয়া যখন মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন (৯ই জানুয়ারী ১৭৬০) তখন এই কুতব শাহ দত্তাজীর মাথা কাটিয়া দুরাণীকে উপহার দিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর আচরণ মারাঠারা ভুলিয়া যায় নাই, প্রতিহিংসায় উন্মত্ত মারাঠারা মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া মুমূর্ষু যোদ্ধাকে অশ্লীল গালাগালি দিল—"য়া মাত্রাগমনিয়াস লঘুশংকা প্রাশণ করবণে" [—কে মূত্র খাওয়াইয়া দাও]; এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। জনশ্রুতি-উল্লিখিত "গেড়েরিয়া" বিশ্বাসঘাতক হীন প্রতিহিংসায় উত্তেজিত মলহর রাও হোলকর। হোলকর এবং সিন্ধিয়া শূদ্রজাতীয় ছাগল ও মেষপালক (হিন্দী—গেড়েরিয়া) ছিলেন। নজীব খাঁ রোহিলার নাম গ্রামবাসীরা ভুলিয়া গিয়াছে; তিনিই এই গল্পের "পাঠান।" "নীল ঝাণ্ডা" সম্পূর্ণ কাল্পনিক হইলেও হোলকার-নজীব খাঁর ব্যাপার সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। "সকরতাল" দুর্গে সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ নজীব খাঁ হোলকারকে পিতৃ সম্বোধন করিয়া রেহাই না পাইলে দুরাণী শেষ বার হিন্দুস্থান আক্রমণ করিত না এবং পাণিপতের তৃতীয় যুদ্ধও হইত কিনা সন্দেহ। হিন্দুস্থানে হোলকারের অনেক "ধর্ম্মপুত্র" ছিল—নজীব ইহাদের অন্যতম।

রিসালু গ্রামের যোগীর যুদ্ধগীতি* ছাপা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু "কালা-আম" এইবার সত্যই মরিয়া গেল। কারণ, আচার্য্য যদুনাথ "কালা-আম"কে তাঁহার ইতিহাসে স্থান দেন নাই। ভবিষ্যতে কোন ঐতিহাসিক উহা করিতে সাহসী হইবেন কিনা বর্ত্তমানে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না।

* *Fragment of a Bhao-Ballad in Hindi* by **K. R Qanungo** in *Sardesai Commemoration Volume.*

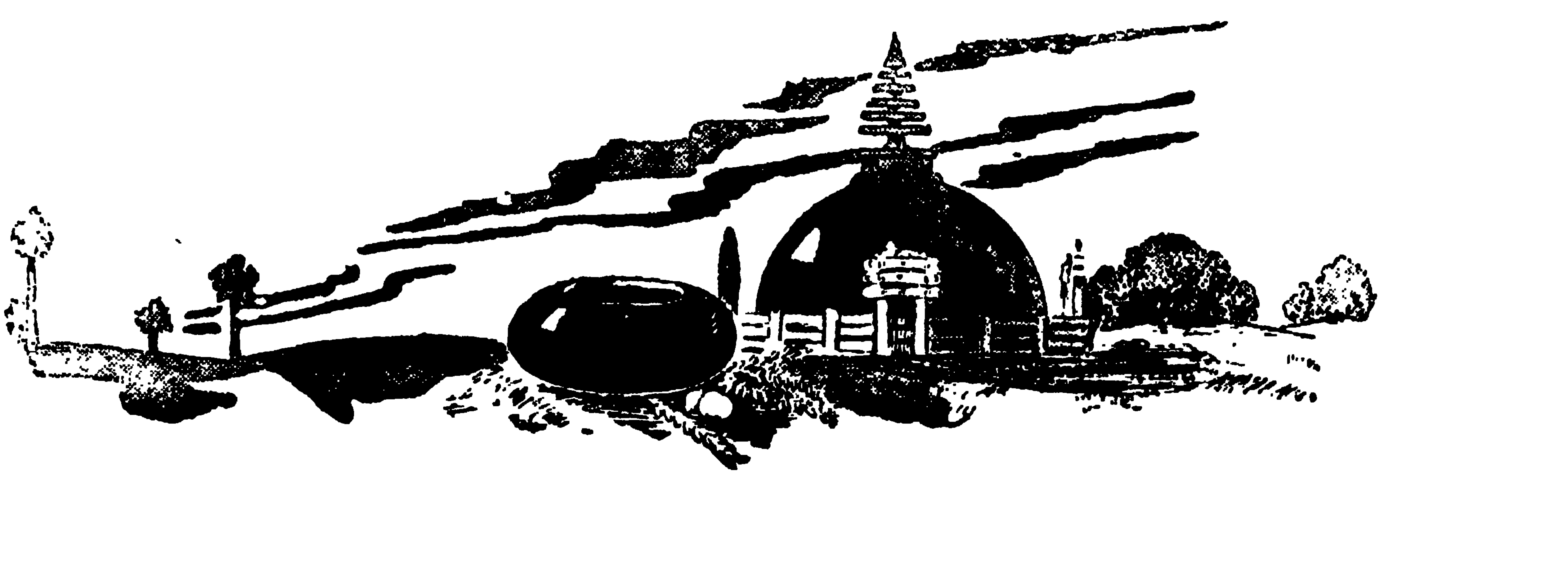

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩০

যত বার শুভার সান্নিধ্য থেকে সরে এসেছে তত বারই মনে হয়েছে, এক একটা দুঃস্বপ্নের অবসান হ'ল। মনে হয়েছে সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে বৃহত্তর পরিধিতে বুঝি মুক্তি এল এগিয়ে। আসক্তির বাষ্প তরল হবামাত্র কর্ত্তব্যের পথ স্পষ্ট ফুটে ওঠে সামনে। প্রশান্ত তখন ভিন্ন মানুষ। তবে সে কাঠিন্যও কিছু দিন বাদে দ্রব হতে থাকে, যেখান থেকে আঘাত খেয়ে বিমুখ হয়েছিল চিত্ত—আবার সেই দিকেই তার গতিবেগ প্রসারিত হয়। আবার জমে বাষ্প—আশায় আবেগে উচ্ছ্বাসে আবার সব ভাসানোর, সব ভুলানোর মত্ততায় সে অধীর হয়ে ওঠে। দুর্নিরীক্ষ্য নক্ষত্রের নাগাল পাবার জন্য—এত ত্বরা কেন—সে রহস্য কে বোঝাবে তাকে। ঘৃণা কি মানুষকে নিকটবর্ত্তী করে? বেদনা কোন্ আনন্দ-অমৃত-রসের সন্ধান দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে লঘু করে—আত্মবিশ্বাসকে শিথিল করে দেয়? দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বুঝি পূর্ণত্বের প্রথম সোপান।

এ অন্যায়—অন্যায়। শুভা আজ তাকে আনন্দ দিতে পারে না—পূর্ণতা তো নয়ই। ওর কাছে এসে কেবল অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করবার বাসনা হয়। যুক্তি দিয়া যুক্তি খণ্ডনের পুলক সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করা যায়। ওকে অস্ত্রহীন করে যদি বাধ্য করাতে পারে আত্মসমর্পণে অর্থাৎ পরাজয় স্বীকারে—তার চেয়ে বড় সম্পদ প্রশান্তর কামনাতে আর কি-ই বা আছে। কিন্তু এই দণ্ডে মনে হচ্ছে—এ খেলার মত তুচ্ছ জিনিষ জগতে কিছু নাই। আনন্দ-অমৃতের সন্ধান শুভাই তাকে দেয় নি—মালতীও দিয়েছে পূর্ণতার ইঙ্গিত। একখানি ঘর, একটি মধুর সঙ্গ, নির্জ্জন অবসর আর আত্ম-উদ্ঘাটনের মুহূর্ত্তে—আত্মনিমজ্জন—পৃথিবীতে এই পাওনাটাই তো নর-নারীর সর্ব্বোত্তম সম্পদ। শুভা মরীচিকা—মালতী বন্দর। মালতী পরিপূর্ণ বিশ্বাসে তার আত্মার সমীপে এসে দাঁড়িয়েছে—তাকে প্রত্যাখ্যান করবার ক্ষমতা প্রশান্তর নাই। এ রকম আত্মবঞ্চনা সে নাই বা করলে।

হাঁ অন্যায় হয়েছে—কালই মালতীকে নিয়ে তার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। শুভার সঙ্গে বুঝাপড়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। যে পার্টির অণুতম অংশ শুভা—সেই পার্টির কাছেই তার দরবার। তাদের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজনকে যুক্তি বলে স্বমতে আনলেই ব্যাপারটার আশু নিষ্পত্তির সম্ভাবনা ছিল। অথচ আলোচনার ছুতায় শুভাকে আর একবার দেখে…

পায়ের গতি দ্রুত হ'ল। শ্যামবাজারের মোড়ে এসে দেখলে ট্রাম ডিপোর কাছে জনতা। কারা উত্তেজিত ভাবে কি বলছে—মাঝে মাঝে চীৎকার উঠছে শ্রমিকের ন্যায্য দাবি নিয়ে। ওরা শাসাচ্ছে ধর্ম্মঘট করবে। আট হাজার শ্রমিক রুখে দাঁড়িয়েছে বিলিতী মালিকের দ্বারা শোষিত না হবার দৃঢ় সঙ্কল্পে। আয়ের অঙ্ক যাদের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সে উপচে পড়ছে তাদের কর্ম্মচারীরা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে চারশো গুণ দ্রব্যমূল্য যুগিয়ে অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন যাপন করছে। যা সামান্য মুষ্টিভিক্ষা রেশনে ও মাগ্গি ভাতায় মিলছে—তা 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম'। ওরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে ধর্ম্মঘট করবে।

পাশ থেকে একজন বললে—পনেরোটা দিন সবুর করলেই হ'ত—বিলেতের কর্ত্তাদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া হ'লে—

একজন রোগামত ছোকরা খেঁকিয়ে উঠল—বুঝাপড়া তো মাসখানেক থেকে চলছে। ন্যাকা! কর্ত্তারা কিছু জানে না—না?

তবু—

না—মশাই—না—যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হওয়া দরকার।—উৎসাহে ছোকরার মুখ-চোখ জ্বলছে।

প্রশান্ত সরে এল। এ সব আলোচনা তার ভাল লাগছে না। আগুন জ্বললে দাহ্য বস্তুর বিচার-বিবেচনা নিরর্থক। ধর্ম্মঘট হবেই।

মালতীর সন্ধানে সে একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করলে। কিন্তু মালতীর ঠিকানা সে জানে না। বারকয়েক গলির এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়ে আবার ফিরে এল বড় রাস্তায়। ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। মেসে ফিরে যাবার ইচ্ছা তার নেই—একটা মাঝারি মত রেষ্টুরেন্ট দেখে ঢুকে পড়ল।

শুধু আসন্ন ট্রাম-ধর্ম্মঘটের নয়—আরও বহু জায়গায় ধর্ম্মঘট চলছে ও চলবে তারও কর্ণরোচক মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। পোর্ট ট্রাষ্ট নাকি কুড়ি হাজারের ওপর কর্ম্মচারী নিয়ে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। প্রস্তুত হচ্ছে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—রাস্তায় রাস্তায় ওদের প্রাচীরপত্র দেখা যাচ্ছে। একশো চুয়াল্লিশ ধারা না থাকলে ধর্ম্মঘট ঘোষণার বন্যায় কলকাতা পরি-প্লাবিত হয়ে যেত।

ভাবতে ভাবতে মালতী যে গলিতে থাকে সেই গলিটাই সে বার দুই পরিক্রমা করলে। যদি পরিচিত কারও দেখা মেলে—কিম্বা মালতীই যদি দৈবক্রমে তাকে দেখে ছুটে আসে।

দুপুর বেলা—গলিটা নির্জ্জন আর আলো-আঁধারী। কারণ

সঙ্কীর্ণ অষ্টবক্রাকৃতি গলি। লোকজনের চলাচল কম। চার বার পাক খেয়ে গলিটা বড় রাস্তায় এসে মিশেছে। দ্বিতীয় বার পরিক্রমা সেরে প্রশান্ত যেমন মাঝামাঝি একটা বাঁকের কাছে পৌঁছেছে—অমনি তার মনে হ'ল কারা যেন সুড়ুৎ করে সরে গেল অন্ধকারের মধ্যে। দুষ্কৃতকারী না হ'লে অমন করে পালাবে কেন ওরা?

কে—কে—ওখানে? প্রশান্ত চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কোন একটি কঠিন দ্রব্যের আঘাত এসে পড়ল মাথায়। অতর্কিত আক্রমণের বেগ সহ্য করতে পারলে না—জ্ঞান হারিয়ে ও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তার পর কিছুদিন কাটল ছায়ার জগতে। পরিচিত পৃথিবীর বহু দূরে সে লোক। তন্দ্রা-জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হ'ল। অগাধ আলস্যে মন্থর হয়ে উঠল মুহূর্ত—বিস্তৃত হ'ল দিন—আবার গভীর নিদ্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল—কোন চিহ্ন না রেখে। কত সংবাদ শ্রবণ-পথে অর্থহীন প্রবাহে ভেসে এল—নিদ্রা আর অর্দ্ধ চৈতন্যে মিশে তারা কালসমুদ্রে হারিয়ে গেল একে একে। প্রায়ই দেখা দেয় সুপ্রসাধিতা একটি মেয়ে। মমতাভরা দুটি চোখে তার পলক পড়ে না—সেবানিপুণ করে প্রশান্তর মাথার চুলে সে পরিচর্য্যার স্পর্শ রেখে দেয়।

সেই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর স্পর্শে চৈতন্য পূর্ণ প্রস্ফুটিত হতে চায়—আবার ছেয়ে আসে গভীর অন্ধকার। এমনি ভাবে চলতে চলতে এক দিন সে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, আমি কোথায়?

মেয়েটি ছুটে এসে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, আমায় চিনতে পারছ?

ক্ষীণস্বরে প্রশান্ত উচ্চারণ করলে, মালতী।

মেয়েটির মুখচোখ আনন্দে ঝলসে উঠল। পরম স্নেহে প্রশান্তর মাথায় হাতখানি রেখে বললে—ঘুমোও।

আমি কোথায়?

আমাদের বাড়ীতে।

প্রশান্ত মাথা নাড়লে। জ্ঞান ফিরে আসছে—মালতীও ফিরে এসেছে—কিন্তু সে কোথায়? অস্থির হয়ে উঠল প্রশান্ত। হাত দিয়ে টেনে টেনে মাথার বালিশটা খাটের একধারে সরিয়ে দিলে—ডান হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটাকে অল্প তুললে—বিস্ফারিত চোখে মালতীর পানে চেয়ে বললে, না—না—এসব সরিয়ে নাও—সরিয়ে নাও। ওরা ধর্ম্মঘট করেছে—বুঝতে পারছ না।

মালতী তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কোমল কণ্ঠে বললে, কেউ ধর্ম্মঘট করে নি—তুমি ঘুমোও।

শরীরে ক্লান্তি—মনে কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে কৌতূহল জেগে উঠেছে। ও একটার পর একটা প্রশ্ন করেই চলল। অবশেষে ওর জিজ্ঞাসায় ক্লান্ত হয়ে মালতী উঠে গিয়ে রেডিয়োর চাবিটা ঘুরিয়ে দিলে। খবরের অনর্গল প্রবাহ বয়ে চলল।

আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলন শেষ হ'ল আজ। গান্ধীজী বললেন—এক-দুনিয়া তৈরির মহৎ ব্রত এশিয়াবাসীরা যেন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত নেহরু বললেন, ইউরোপের শক্তির উৎস আজ দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। একটি ধারা আত্মসাৎ করেছে আমেরিকা—আর একটি ধারা এশিয়াতে পৌঁছল। দু'শো বছরের নিপীড়িত মানুষেরা সেই শক্তিকে যেন সত্যের মহিমায় শুদ্ধীকৃত করে নিতে পারে। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদে এই বিশোষিত শক্তি আঘাত করুক প্রচণ্ড ভাবে, এশিয়ার জাগরণ হোক—পৃথিবীর নির্য্যাতিত মানবের কল্যাণময় জাগরণ।

৩১

এর পর ভারতবর্ষের জয়যাত্রা সুরু হ'ল। ঘটনার পর ঘটনার প্রবাহ ত্বরিত গতিতে বয়ে চলল। বিদায় নিলেন ওয়াভেল—শেষ বড়লাট হয়ে এলেন মাউণ্ট ব্যাটেন। ভারত-সমস্যার মীমাংসার জন্য ত্বরান্বিত হয়ে উঠলেন তিনি।...তিন মাসের স্তিমিতপ্রায় অগ্নি—জাতিবিদ্বেষ আবার জ্বলে উঠল। যে যেখানে প্রতিক্রিয়াপন্থী ছিল সবাই তৎপর হয়ে উঠল। কেউ বললে, দ্বিজাতি-তত্ত্বের ফয়সালার জন্য এ একটা চাপ—কেউ বললে, না এটা বিদায়ী ব্রিটিশের কূটনীতি। দিনে দিনে নরশোণিতে ঘাতকের অস্ত্র হ'ল রঞ্জিত—পঞ্জাবী পুলিশের অত্যাচারে শহর হ'ল দূষিত। পঞ্জাবেও আগুন জ্বলে উঠল। মুসলিম লীগ দৃঢ় পণ করলে—পাকিস্থান চাই-ই। জীবন-পণ। হিন্দুর ষড়যন্ত্রজাল ছেদন করে মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করলে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। অবশেষে কংগ্রেসও টলল তার দৃঢ় সঙ্কল্প থেকে। দ্বিখণ্ডিত বাংলা আর দ্বিখণ্ডিত পঞ্জাবের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে। প্রস্তাব নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন ছুটলেন বিলেতে। বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি ঘোষণা করলেন—যেহেতু নেতৃবৃন্দ অখণ্ড ভারতের আপোষ-মীমাংসায় রাজী নন সেজন্যে ভারতবর্ষ দুটি খণ্ডে বিভক্ত হবে—হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান। সেই সঙ্গে পঞ্জাব আর বাংলাও বিভক্ত হবে। দুটি গণপরিষদ বসবে—প্রয়োজন হবে দু'জন গভর্ণর-জেনারেলের। দেশীয় রাজারা যে-কোন একটি গণপরিষদে যোগদান করতে পারবে। আর কোন বিভাগ হবে না। কেবল শ্রীহট্ট জেলা গণভোটের দ্বারা আসামে থাকবে কি বাংলায় যাবে—ঠিক হবে। আর সীমান্ত প্রদেশেও গণভোট প্রযুক্ত হবে। ওখানকার কংগ্রেসী মন্ত্রী বহাল থাকা-না-থাকা তারই দ্বারা নির্ণীত হবে। ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্য্যাদা দেওয়া হবে—আর পনেরই আগষ্টের ভিতর ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। একে ওরা জুনের পরিকল্পনা বলা যায়।

মলয় এক মনে ডায়েরি লিখছিল। ভারতবর্ষের এই পরিবর্ত্তন তাকে নিজ শক্তি সম্বন্ধে প্রত্যয়শীল করে তুলেছে। এক দিন দুর্গম অন্ধকারে যাত্রা হয়েছিল সুরু—পথের নিশানা দৃষ্টিগোচর ছিল না—মনের দৃঢ় সঙ্কল্পে পথ চলছিল। লাঞ্ছনা নির্য্যাতন সয়ে অশেষ ক্লেশ ভোগ করে সর্ব্বস্বান্ত হবার পর যে পথ আজ সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার আবিষ্কার ইতিহাসের নজীর হয়ে থাকবে—বিশ্বের বিস্ময়ও বটে! বিনা রক্তপাতে···ভ্রূকুঞ্চিত করে এক মিনিট স্তব্ধ হয়ে থেকে মলয় হাসল। আবার সে কলম তুলে নিয়ে লিখলে, এই ভাবে বিনা রক্তপাতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতনতর অধ্যায় সংযোজিত হ'ল। বিনা রক্তপাতেই বটে! শক্তির কেন্দ্রে কেন্দ্রে যে আঘাত পড়ছে—টুকরো ভারত শুধু নয়—জাতি-বিদ্বেষ ও শক্তি বিকেন্দ্রীকরণের প্রধান উপকরণ হয়ে আরও কতকাল ধরে এই দেশকে—প্রত্যক্ষ না হোক অলক্ষ্য-নিয়ন্ত্রিত পরশাসনের ষড়যন্ত্রজালে আবদ্ধ করে রাখবে, কে জানে! ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব তো চলছেই—পৃথক অস্তিত্বে সে বিদ্বেষের নিবৃত্তি ঘটবে এ ধারণা হয়ত ভুল। তবু আলাপ না হয়ে আজ গত্যন্তর নাই।···রুগ্ন অঙ্গে অস্ত্রোপচারের দ্বারা আসল মানুষটাকে সুস্থ করে তুলবার মত আশা পোষণ না করে উপায় কি! আবার খণ্ড ভারত জোড়া লাগবে—যদি মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। মানুষ সৃষ্টি করেছে দেশকে—মানুষকেই আবার দাঁড়াতে হবে দৃঢ় সঙ্কল্পে—যাতে ক্লেদ-পঙ্কিল বিষাক্ত বাসনাগুলির ধ্বংসসাধন হয়।

সুচিত্রার হাসিতে মলয় মুখ তুলে চাইলে। ও এতক্ষণ চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে মলয়ের লেখনী চালনা লক্ষ্য করছিল। কলমের ডগায় বাইরের ঘটনা মনের রসে অভিষিক্ত হয়ে যা ব্যক্ত করছিল তা একান্ত মলয়ের বক্তব্য নয়। রক্তমোক্ষণজনিত দৌর্ব্বল্যে পৃথিবী ফিরে পেতে চাইছে এমন শান্তি যা সত্যকারের কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা তাই জাতিকে সতর্ক করে দিচ্ছেন—পরমাণুর ধ্বংসকারিতা শক্তি বাড়াবার গবেষণা এইবার ইতি হোক। মানুষ আর তার সভ্যতাকে বাঁচাবার জন্ত এই অনুসন্ধিৎসাকে নিবৃত্ত করতেই হবে। অস্ত্র সঞ্চয় করে যুদ্ধ করব না—এই নীতি অচল। আগেকার বহু যুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী গত দুটি মহাযুদ্ধে এর প্রমাণ স্বাক্ষরিত রয়েছে। সুচিত্রার হাসির পরও কলম নিয়ে মলয় ঐ ক'টি লাইন যোগ করে দিলে।

ডায়েরি বন্ধ করে সে হাসিমুখে বললে, তোমার হাসির কারণ?

কারণ—সৃষ্টির আদিযুগের প্রথম কথাটি মনে পড়ল। পুরাণে আছে না—সুর-অসুরের দ্বন্দ্ব পৃথিবীর জন্মকাল থেকে চলে আসছে। সমুদ্র মন্থনে এর সূত্রপাত—

মলয় বললে, তখন অসুরেরা ছিল বর্ণজ্ঞানহীন, কাজেই তাদের কথা পুরাণে নাই। তবু সুচিত্রা, সেই প্রথম যুগের বঞ্চনার প্রতিক্রিয়া আজও চলছে।

আজ অসুরেরা কোথায়—দেবতাই বা কে?

সেটা এক কথায় বলা শক্ত নয়। আর বললেও কেউ মানবে না। হিটলারের 'আমরা আর্য্য' নীতির প্রত্যুত্তরে রাশিয়ার নৃতত্ত্ববিদেরা ঘোষণা করেছিলেন, সভ্য মানুষের আদি জন্মভূমি নাকি ঐ দিকে—স্বর্গ বলতে সেকালে যা বোঝাত তা উরাল পাহাড়ের ওপিঠে কোন দেশ—।

আচ্ছা—ওসব বড় বড় কথা না বললেও আমরা জানি—আজকার অসুরেরা আর বর্ণজ্ঞানহীন নয়—তারা বুদ্ধিহীনও নয়। তারা বেশ বদল করেছে বলে আমরা তাদের চিনতে পারছি না। .

আজকের দেবতারা কে?

আজ দেবতার সংখ্যা কমে গেছে—এত কম যে আঙুলের পর্ব্বে এসে দাঁড়িয়েছে সে সংখ্যা। যাই হোক—তোমার মিলনতত্ত্বের মধ্যে এই কথাটিও লিখে রাখ—দুটি পরস্পর-বিপরীত-ধর্ম্মী দ্রব্যের মিশ্রণেই সৃষ্টির উন্নতি—সৃষ্টির সার্থকতা। অনেক চেষ্টা করেও—আধবুড়ো বয়সের মাথার কাঁচা চুল থেকে পাকা চুলগুলো নিঃশেষ করা যায় না—তেমনি এই সৃষ্টিকেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তবে চেষ্টা করব না? মলয় হাসল।

বাঃ! না হলে বেঁচে থাকার অর্থ কি রইল!

মলয় কলম তুলে নিয়ে বললে, দাঁড়াও তোমার মন্তব্যটা লিখে রাখি।

সুচিত্রা ওর হাত চেপে ধরে বললে, না। কলম রেখে এটা পড়ে ফেল তো চট্ করে! একখানা চিঠি সে এগিয়ে দিলে।

খাম ছিঁড়ে মলয় বার করলে চিঠিখানা। চার পৃষ্ঠার চিঠি—আসছে গ্রাম থেকে। মায়ের জবানীতে লেখা। পুত্রকে স্নেহ জানিয়ে তিনি লিখেছেন কিছু টাকা পাঠাতে। আর জানিয়েছেন মেজ ছেলে ও পুত্রবধূর আচরণের কথা। তা ছাড়া দেশের সংবাদও জানিয়েছেন সবিস্তারে। তাতে জানা যায়—দেশ এখন শান্ত। আসন্ন বাঁটোয়ারা সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা তো চলছেই—খানিকটা উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়েছে। বড়লাটের ঘোষণা অনুযায়ী—অস্থায়ী বিভাগে কোন পক্ষ উল্লসিত—কোন পক্ষ ম্রিয়মাণ হলেও র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের দিন গুনছে। তখন কিছু অশান্তি ঘটতে পারে—তবে সবাই আশা করে কলিকাতায় নোয়াখালির পুনরাবৃত্তি হবে না। মলয়ের কি মত?—এসব মায়ের জবানীতে এলেও লেখকের অনুসন্ধিৎসার প্রকাশ। আর একটা খবর সর্ব্বশেষে দিয়েছেন মা এবং সকাতরে জানিয়েছেন যে যেখানে থাকুক জন্মভিটার টানে মায়ের কোলে একদিন ফিরে আসেই। মলয় কি

ফিরে আসবে না? সর্ব্বশেষের খবরটি এই—দুর্গামোহন পক্ষাঘাতে মারা গেছেন—প্রশান্ত বাড়ী ফিরে এসেছে। সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়ে—ওর বাগ্‌দত্তা বধূ। রূপে-গুণে মেয়েটির তুলনা নেই; আবার ধনবতীও—শোনা যাচ্ছে এই বিয়েতে যৌতুকই পাবে একটা লাখো টাকার সম্পত্তি—

মলয় হেসে বললে, রূপগুণের ওজনটা খাঁটি কি বল চিত্রা?

সুচিত্রা বললে, যতই সাম্যবাদের জাঁক করি না আমরা আমাদের মন থেকে ও-বিষ সহজে যাবার নয়।

যাবে দেশে?

না। মুখ নামিয়ে সুচিত্রা উত্তর দিলে। সেবারও তো যাবার সব ঠিক করেছিলাম কিন্তু—

শেষ পর্য্যন্ত আমিই পিছিয়ে ছিলাম নয়? কি করি চিত্রা—মার সেই চিঠিখানা যদি না আসত—!

আজ তো মা তোমায় যেতে লিখেছেন।

তোমাকে যেতে লেখেন নি।

তবু তোমার কর্ত্তব্য—

মলয় একটু হাসল। বললে, জান চিত্রা—এই পৃথিবীটা আশ্চর্য্য। সম্পদ আমাদের মনকে এতখানি বিষিয়ে তুলেছে যে আসল-মেকি চিনলেও—মানতে পারি না। একটু থেমে বললে, আমি না গিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিই যদি—তাতেই মা খুশী হবেন। হয়ত বেশী খুশী হবেন। মৃদু একটা নিশ্বাস পড়ল।

সুচিত্রা বললে, এমনও হতে পারে দুটি জিনিষই তাঁর অত্যন্ত দরকারী।

স্বাভাবিক সেটা। সংসার যাকে ঘিরে রয়েছে চারদিক থেকে—সে সংসারের তুচ্ছ জিনিষটিকে পর্য্যন্ত আগলে রাখতে চায়। তা হয় না বলেই আমরা অনেক দুঃখ পাই।

মলয়ের গভীর দুঃখ সুচিত্রাকে স্পর্শ করল। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা না করে সে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নিলে। আচ্ছা, প্রশান্ত-ঠাকুরপো তা হলে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করলে না—যার জন্ত ও বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

মলয় বললে, সে এখন একটা ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার—তার মনের খবর জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব কি?

সুর আগেই কেটে গেছে—এ প্রসঙ্গটাও তাই ভেসে গেল। সুচিত্রা আর কি বলবে ভেবে পেলে না। টেবিলের ওপর একখানা বই পড়ে ছিল, গান্ধীজীর নোয়াখালি-ভ্রমণের বৃত্তান্ত। গান্ধীজীর সত্য-পরীক্ষার শেষ অধ্যায়। পরীক্ষা শেষ হতে না হতে তিনি বিহারে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে গেছেন দিল্লীতে। স্বাধীন ভারতের কর্ত্তব্য নির্ণয়ে তাঁর উপস্থিতি প্রয়োজন—অত্যাসন্ন স্বাধীনতার মুখে চারদিকে জ্বলছে আগুন। গান্ধীজী তাঁর সমগ্র শক্তি দিয়ে রোধ করতে চান এই বহ্নিবিস্তৃতিকে—অকল্যাণকে।

বইখানা হাতে নিয়ে সুচিত্রা বললে, পড়বে?

মলয় বললে, বেশ ত। গান্ধীজী বলেন, স্বাধীনতা আসছে। এত দিন পরশাসনের প্রতিবাদে যে সংগ্রাম-শক্তি আমরা প্রয়োগ করেছিলাম—সেই শক্তিকে গঠনের কাজে নিয়োগ করতে হবে। ভারতীয় রাষ্ট্র ভারতবর্ষীয়দের রাষ্ট্র—কোন ধর্ম্মগত দাবি নিয়ে সে সার্থক হতে পারবে না। স্বাধীনতা আর স্বরাজ এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টা বড় জান সুচিত্রা?

সুচিত্রা বললে, স্বাধীনতা?

না—স্বরাজ। মলয়ের সংক্ষিপ্ত গম্ভীর স্বর নিস্তব্ধ কক্ষে প্রতিধ্বনিত হ'ল।

স্বাধীনতার সাধনা আমাদের প্রায় শেষ হয়ে এল—এবার চলবে স্বরাজের সাধনা। শোন।

মলয় বইখানি হাতে তুলে নিলে।

৩২

স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার শেষ অধ্যায় চলছে। কঠিন পরীক্ষা সম্মুখে। বহু বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে—বহু প্রতিবন্ধক রয়েছে সামনে। মার্চ্চের শেষ থেকে আবার যে আত্মঘাতী কলহ সুরু হয়েছে কলকাতায়, তার মধ্যে স্বাধীনতার ঘোষণাকে সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া যাবে কি না—এই আশঙ্কা জাগছে সকলের মনে। পূর্ব্বপাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হলে আবার ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান হবে হয়ত। গান্ধীজী আশ্বাস দিয়েছেন ঐ দিন তিনি পূর্ব্ব-পাকিস্থানে থেকে স্বাধীনতা-দিবস পালন করবেন। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীসভা কার্য্যভার নেবে; সরকারী কর্ম্মচারীদের লিখিত ভাবে জানাতে হবে—পাকিস্থান অথবা ভারতবর্ষ—কোন্ ডোমিনিয়নে তারা যোগদান করবে। পাঠান পুলিস কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হচ্ছে। ভাগা-ভাগির কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ নিয়ে—পদস্থ কর্ম্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। গান্ধীজীও এসেছেন কলকাতায়। দু-একদিন এখানে কাটিয়ে যথাসময়ে তিনি নোয়াখালি যাবেন। সংবাদপত্রের নিত্যনূতন সংবাদে বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

আর সেই উত্তাপের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল অচিরেই। হানাহানি কাটাকাটি ত চলছিলই—স্বাধীনতা-দিবসের সপ্তাহ-খানেক আগেই তা দাবানলের মত শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার যে সব উপকরণ এতদিন গোপনে গোপনে সঞ্চিত হয়েছিল—পুলিস-শাসন শিথিল হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রতিহিংসাকে শাণিত করে তুলল। বিদায়ী প্রধান মন্ত্রী গান্ধীজীর কাছে প্রার্থনা জানালেন—স্বাধীনতা-দিবসে তিনি যেন কলকাতা ত্যাগ না করেন। গান্ধীজী কর্ত্তব্য বেছে নিলেন। বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় বসে তিনি সারা বাংলাকে রক্ষা করবার ব্রত গ্রহণ করলেন। সেই সময়ে

নগরোপান্তে এক অখ্যাত পল্লীতে এসে আশ্রয় নিলেন—আরম্ভ হ'ল অগ্নিপরীক্ষা।

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন বাপুজী ?

সুচিত্রার প্রশ্নে ডায়েরি লেখা বন্ধ করলে মলয় ? তোমার কি মনে হয় চিত্রা ?

কালকের রাত্রির ঘটনা পড়েছ তো—ক্ষিপ্ত জনতা ওঁর বাসগৃহ আক্রমণ করেছিল—ওঁকে আঘাত করেছিল।

দাঁড়াও লেখাটা শেষ করি। সত্যকে সামনে রেখে যিনি বলতে পারেন—হয় জীবন, নয় মৃত্যু—তাকে এই ভাবেই বারবার পরীক্ষা দিতে হয়। আর সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। কাল রাত্রিতে গান্ধীজী অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

ডায়েরিটা বন্ধ করে মলয় হাসল।

বা: রে—কোথায় পেলে এ খবর। বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে সুচিত্রা।

চল—দেখবে। হিংসার উদ্যত ফণা যেইমাত্র নত হ'ল—তখনই হ'ল সত্যাশ্রয়ীর জয়। চল দেখে আসি।

দু'জনে গান্ধীজীর আশ্রয়স্থলের দিকে এগুতে লাগল। পদব্রজেই চলল। যেন তীর্থযাত্রা করেছে। বহু অখ্যাত পল্লী দিয়ে নির্ভয়ে ওরা অগ্রসর হ'ল। আরও অনেকে চলেছে। নিরস্ত্র—নির্ভীক। কয়েকদিন আগে এই পথ দিয়ে সশস্ত্র হয়েও চলবার কল্পনা পর্য্যন্ত কেউ করত না।

তীর্থে এসে দেখলে—হিংস্র সাপটা ফণা নীচু করে পড়ে আছে। ষ্টেনগান, বোমা, এসিড বাল্‌ব, তীর, বর্শা, তরবারি প্রভৃতি নানান রকমের মারাত্মক অস্ত্রে আকীর্ণ হয়ে রয়েছে গৃহ-প্রাঙ্গণ।

মলয় হাসিমুখে সুচিত্রার পানে চাইলে, কি চিত্রা, পরীক্ষা শেষ হয় নি ?

সুচিত্রা উত্তর না দিয়ে যুক্ত কর ললাটে স্পর্শ করালে। ওর দুটি চোখের কোণ অশ্রুবাষ্পে মেদুর হয়ে উঠল।

স্বাধীনতার উৎসবের ঢেউ গ্রামেও এসে লাগল। তবে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রকাশিত না হওয়ায় দ্বিধা সন্দেহে দুলতে লাগল দু'পক্ষের মন। তবু উভয় পক্ষেরই আয়োজন চলল—গোপনে এবং প্রকাশ্যে। বড়লাটের অস্থায়ী ঘোষণা অনুযায়ী এ গ্রাম আপাতত পাকিস্থান এলাকায়—র‍্যাডক্লিফ ঘোষণা না বেরুলেও—গোপন সংবাদে জানা গেছে ভারত-রাষ্ট্রে সংলগ্ন হয়েছে এ জায়গা। প্রকাশ্য ঘোষণা না হলে—উৎসব করতে নিষেধ করে দিয়েছেন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। হিন্দুরা তাই ম্রিয়মাণ চিত্তে রোয়েদাদের অপেক্ষায় দিন গুনছে। রীতিমত আশঙ্কাও জেগেছে তাদের মনে। যারা অতি সাবধানী তারা ইতিমধ্যে যতদূর সম্ভব—স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ভারত-সীমানায় অর্থাৎ গঙ্গার অপর পারে চালান করে দিয়েছে। কেউ উঠেছে আত্মীয়-বাড়ী—কেউ নিয়েছে অস্থায়ী ভাড়াবাড়ী। কেউ কেউ জমির বায়না দিয়েও রেখেছে—শেষ ফল জেনে সরে পড়বে। মোট কথা দু'শো বৎসরের দাসত্বমোচনের উল্লাসকে সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারছে না কেউ। তবু উৎসবের আয়োজন চলছে। নন্দ-দাদুর বৈঠকখানায় ছেলেরা জমায়েত হয়েছে। একটা হারমোনিয়ম এসেছে—তার সঙ্গে একটা ক্ল্যারিওনেট বাঁশী—আর একটা পিকল্‌ জোগাড় হয়েছে। স্বদেশী গানের বই থেকে বাছা বাছা কয়েকটি গানের মহলা দেওয়া চলছে। বাড়ীর ভেতরে উৎসাহী ছেলেরা মিলে তৈরি করেছে অশোকচক্র-চিহ্নিত তিনরঙা পতাকা—লাল শালুর অভাবে—লালরঙে ন্যাকড়া ছুপিয়ে তাতে তুলো বসিয়ে তৈরি করছে স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণাবাণী—জয়হিন্দ—বন্দেমাতরম্‌। দিল্লী পৌঁছে গেল যারা তাদের দিল্লীযাত্রার তাগিদ বা লাল কেল্লা ধ্বংস করার উৎসাহ না থাকাই স্বাভাবিক। শ্লোগানটা বাদ পড়েছে। আর তৈরি হচ্ছে নেতাদের প্রতিমূর্ত্তি—গ্রাম্য পটুয়ারা আঁকছে। মুচিপাড়ায় খবর দেওয়া হয়েছে—সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র তারা যেন যন্ত্রপাতি নিয়ে ইস্কুলের মাঠে এসে জমায়েৎ হয়। এখান থেকেই বিরাট্‌ একটি শোভাযাত্রা বেরুবে—কুচকাওয়াজের ভঙ্গিতে। পুরোভাগে থাকবে গান্ধীজী আর নেতাজীর পুষ্পমাল্যভূষিত সুবৃহৎ ছবি। পরি-কল্পনা প্রতিদিন পরিপুষ্ট হচ্ছে। শহর থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা এসে বর্ণনা দিচ্ছে কি ভাবে ওখানকার উৎসব হবে। হিন্দুরাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে কোনো কোনো উৎসাহী যুবক। গান্ধীজী একা আর কি করবেন। বৃদ্ধ হয়েছেন—ওঁর এখন এ সব চিন্তা না করাই ভাল। এই ধরণের সংবাদে এরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু পাছে শান্তিভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় যথেষ্ট বন্দুকধারী সৈন্য মোতায়েন করা হচ্ছে—শহরে, গ্রামে। কংগ্রেস-নেতারা উপদেশ দিচ্ছেন—অহিংস থাকতে। তাঁদের অনুরোধ পাকিস্থানের আনুগত্য স্বীকার করে জনগণ যেন সংযত থাকে—শান্ত থাকে। ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে আনন্দ প্রকাশ করলে স্বাধীনতাকে অসম্মান করা হবে। বলা বাহুল্য—এই উপদেশ বা অনুরোধে অনেকেই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে। হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপার না করে নিরীহ গোছের একটি শোভাযাত্রা, খানিকটা বন্দেমাতরম বা জয় হিন্দ বলে চেঁচানো, কোন মাঠে লোক জমিয়ে কিছু জোলো বক্তৃতা—এরই জন্য দু'শো বছর ধরে এত কাণ্ডকারখানা, জেলখাটা সর্ব্বস্বান্ত হওয়া, ফাঁসি কাঠে ঝোলা, গুলি বা বিষ খেয়ে মরা—এ সবের কি দরকার ছিল ? উত্তেজক সুরার মত যদি উৎসবকে না প্রাণ ভরে পান করতে পারলাম—তবে কেমনতর উৎসব এ ? ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাঠান পুলিস বসিয়ে শান্তি রক্ষার অছিলায় ধমক

দিচ্ছেন বাংলা-সরকার, খবরদার অন্যায় কাজ কর না—শাস্তি পাবে। তবু র‍্যাডক্লিফ সাহেবের রোয়েদাদ বেরুলে—দলবেঁধে রাস্তা দিয়ে যখন চেঁচাতে চেঁচাতে যেতে পারবে তখন উৎসবের নামে প্রতিশোধস্পৃহা খানিকটা অন্তত চরিতার্থ করে নিয়ে এরা পরিতৃপ্ত হবে। পনেরোইএর মধ্যে খবরটা কি আসবে না!

হেমলতা আশুর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দিদি—দিনকতকের জন্ত না হয় আবার ময়রাপাড়ায় গিয়ে থাকি। কি বল?

আশুর মা বললেন, মরণ—কি দুঃখে যাবি সেখানে। শুনছি রাজ্যি আমাদেরই হবে। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুললে হেঁটে কাঁটা আর ওপরে কাঁটা দিয়ে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াবে না?

সাহস সঞ্চয় করে হেমলতা ভিটেয় পড়ে রইলেন। বড় বাড়ীটা শূন্য খাঁ খাঁ করছে। মেজ ছেলে বউ নিয়ে কলকাতাবাসী হয়েছে। যে সংসার কোলাহলে পূর্ণ ছিল—সেখানে আজ সাধন ভজনের অনুকূল আবহাওয়া। বৃদ্ধ বয়সে নিরিবিলিতে বসে দু'দণ্ড ভগবানের চিন্তা করবার আকাঙ্ক্ষা কি মানুষের মনে জাগে না? এই রকম অবসর পেলে অনেকে ত ধন্য হয়ে যান। তবু হেমলতা এমন অখণ্ড অবসর চান না। সংসারে আজ তাঁর কেউ নেই—অথচ ভাঁড়ারে গুছানো জিনিসের প্রাচুর্য্য—রান্নার ধুম নেই, গৃহপারিপাট্যের শ্রম আছে; যে সংসারের তুচ্ছতম খবরে বাইরের বড় পৃথিবীর আহ্নিক গতি সুনিয়ন্ত্রিত সে সংসার হেমলতার কল্পলোক থেকে মুছে যাচ্ছে—তবু তাতেই মগ্ন হয়ে রয়েছেন তিনি। উঠান ঝাঁট, বাসিপাট সারা—শাকের ক্ষেত বা ফুলগাছে জল ঢালা, রান্নার আয়োজন—ঘর-বারান্দা ধোয়া মোছা—লেপ বালিশের ওয়ার তৈরি, ঘর-বারান্দার ঝুল ঝাড়া—কি না করছেন তিনি। দুপুরে খাওয়ার পর মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে খানিকটা ঘুম, ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান—দুটি পান ও এক খামচা দোক্তা গালে দিয়ে কোন দিন প্রশান্তদের বৈঠকখানা ঘেঁষে আড্ডিপাতা কোন দিন বা পাড়ায় টহল দিয়ে সংবাদ বিতরণ ও সংগ্রহ কোনটির অঙ্গহানি ঘটছে না। ঘুম তাঁকে শুধুই আনন্দ দেয় না—দুঃখও নিরবচ্ছিন্ন বেদনাদায়ক নয়। এ দুয়ের ওপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে বৃহৎ ভিটেয় স্বচ্ছন্দে দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন। দেশের স্বাধীনতা কি বস্তু হেমলতা বোঝেন না—তবে চারদিকে যে ফিস্‌ফাস্ কানাকানি চলছে তাতে উত্তেজনা খানিকটা—খানিকটা কৌতূহল আর তৃপ্তিও বেশ লাভ হচ্ছে। প্রশান্তদের বৈঠকখানায় প্রায়ই আলোচনা বসে—এবং রোয়াকের কোল ঘেঁষে তিনিও জলের গ্লাস ও জরদার কৌটা নিয়ে ঢুমোবার চেষ্টা করেন। কয়দিন আগে প্রশান্তদের উপরে তাঁর কৌতূহলটা উগ্র হয়েছিল। মালতী মেয়েটি চলে যাওয়াতে সে কৌতূহল স্তিমিত হয়েছে—এবার রটনার বিষয় অভাবে রসনাও প্রায় স্তব্ধ হয়েছে। কিন্তু মেয়েটি ভাববার খোরাক যথেষ্ট রেখে গেছে। আশ্চর্য্য ছেলে মেয়ে আজকালকার! ওরা মিশবে হাসবে কথা বলবে নির্লজ্জের মত অথচ বিয়ে করবে না।

কথাটা পেড়েছিলেন এক দিন, হাঁ দিদি—এই মেয়েটির সঙ্গেই তো ঠিক করলে? তা স্বয়ম্বরা হয়েছিলেন সেকালে দময়ন্তী—

প্রশান্তর মা গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছিলেন, ছেলে আমার আগে সারুক—তারপর বিয়ে।

ঢোক গিলে বলেছিলেন হেমলতা, তা বিয়ে হবে তো! ওই মেয়েটি না থাকলে—ছেলেকে কি ফিরে পেতে ভাই!

সেও তাঁর দয়া। উপর দিকে চেয়ে প্রশান্তর মা কাজের অছিলায় অন্য ঘরে গিয়েছিলেন চলে। সেই থেকে প্রকাশ্য সংবাদ নেওয়া দুষ্কর জেনে হেমলতা জরদা আর জলের গ্লাস নিয়ে ওদের বৈঠকখানা ঘেঁষেই প্রায় শুয়ে থাকেন।

স্বাধীনতা-উৎসবের দু'দিন আগে মালতী বললে, কলকাতায় যাবে না তুমি?

না।

মামা চিঠি লিখেছেন আমায় যেতে। তোমাদের ফ্যাক্টরী তো ভালই চলছে। স্বাধীনতা-উৎসবে শ্রমিকদের কিছু বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা নাকি হচ্ছে।

ভাল।

আচ্ছা—তুমি এমন মুষড়ে পড়লে কেন বল ত? আর কি ফিরে যাবে না?

কি হবে সেখানে গিয়ে—কাজের কখন অসুবিধে হচ্ছে না। প্রশান্তর কণ্ঠস্বর নিরুৎসাহ।

কিন্তু মামা লিখেছেন—একখানা চিঠিতে নয় প্রায় প্রত্যেক চিঠিতে লিখেছেন—তোমার জন্যই নাকি অতবড় ধর্মঘট বন্ধ হয়ে গেল।

আমার জন্য! প্রশান্ত হাসল! আমি তো তখন শয্যাশায়ী।

তার ফলে শ্রমিক-নেতাদের সঙ্গে কি সব চুক্তি নাকি করেছিলে—

চুক্তি! আমি করেছিলাম? প্রশান্তর কণ্ঠস্বর উচ্চ হ'ল।

হাঁ—সেই রফা অনুসারেই তো দশ হাজার টাকা দিয়ে—এতবড় ব্যাপারটা মিটল!

প্রশান্তর স্বর পুনরায় স্তিমিত হয়ে এল। সে বললে, তা হবে।

হবে নয়—সবাই জানেন—

সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠল প্রশান্ত, আচ্ছা মালতী, এতবড় অসম্মানের বোঝা আমার ঘাড়ে না চাপালে কি চলছিল না?

অসম্মান ? বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে মালতী।

হাঁ—বিশ্বাসঘাতকতাও বলতে পার। কিন্তু বিশ্বাস কর—এ কাজ আমি করি নি—আমি করতে পারি না। অত্যন্ত কাতর শুনাল তার স্বর।

মালতী তার একখানি হাত টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিলে, আঃ কি পাগল তুমি! ছিঃ লক্ষ্মীটি, আবার কাঁদে।

ফোঁপানোর শব্দ—সান্ত্বনা দেওয়ার গদগদ ভাষা—আরও কম্পিত কয়েকটি মধুর আশ্বাসের স্পর্শ—হেমলতা দুরুদুরু বুকে উঠে বসলেন।

তারপর দিন মালতী চলে গেল। পাড়ায় রটল প্রশান্ত তার সম্মানহানি করেছে।

তারপর ঝড়ের মত এল কতকগুলি ঘটনা। স্বাধীনতা-দিবস ঘোষিত হ'ল ঘটা করে। মুসলমানরা আল্লা-হো-আকবর রবে ঘরবাড়ী কাঁপিয়ে—রাস্তা দিয়ে মার্চ্চ করে গ্রামের বারোয়ারি তলায় একটা প্রকাণ্ড বাঁশের খুঁটিতে চাঁদ-তারা-মার্কা পতাকা টাঙিয়ে দিল। এ যেন স্বাধীনতার জয় ঘোষণা নয়—দ্বিজাতিতত্ত্বের বনিয়াদের গাঁথুনিকে পাকা করবার জন্য খানিকটা সিমেন্ট আর খানকয়েক ইট বসানো হ'ল। দু'দিন বাদে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ বেরুনোর পর হিন্দুরা দিলে এর প্রত্যুত্তর। চাঁদ-তারাকে ভূমিশায়ী করে অশোকচক্রলাঞ্ছিত তিন বর্ণের পতাকাকে উড্ডীন করে দিলে সেইখানে। ব্যাণ্ড বাজিয়ে সদর্প কুচ কাওয়াজ—জয়ধ্বনি আর মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীত আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। বলা যেতে পারে এরাও আর খানকয়েক ইট আর কিছু মশলা দিয়ে পার্থক্যের বনিয়াদকে আরও শক্ত করে দিলে। স্বাধীন হ'ল ভারতবর্ষ। (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথঃ শিল্পী ও দার্শনিক

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়

মানুষ সীমাবদ্ধ জীব। ভাষাটুকু তার অর্থ দিয়ে ঘেরা—সে অর্থ দেহ সীমায় পীড়িত মানবের চারিপাশে নিরন্তর ঘুরে বেড়ায়। অথচ মানুষ চায় মুক্তি—সীমার বন্ধন থেকে মুক্তি। এই মুক্তিসাধনায় প্রয়োজন শিল্পীর। তাই তো এলেন শিল্পী, সৃষ্টি করলেন ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে—রূপের মধ্যে অরূপকে। রবীন্দ্রনাথ "ভাষা ও ছন্দ" কবিতায় লিখেছেন—

"মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে।"

এই হচ্ছে প্রকৃত শিল্পীর কাজ। আর্ট দেয় মানুষকে সীমা থেকে মুক্তি, শিল্পী আমাদের ভুলিয়ে দেয় পৃথিবীর অন্তবিহীন বন্ধন। নিখিল-বিশ্বের সহিত মানুষের একটা নিগূঢ় যোগ আছে, অথচ মানুষের কাছে অনেক সময়ই তা থাকে অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। শ্রেষ্ঠ শিল্পী সেই নিগূঢ় যোগকে প্রকাশ করে। শিল্পী প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা থেকে মানবাত্মাকে দেয় মুক্তি, তাকে নিয়ে যায় অসীমের পথে, তার মধ্যে জাগিয়ে তোলে সুদূরের পিপাসা। বাসনা থেকে মানবাত্মাকে মুক্তি দেওয়াই যে কবি বা শিল্পীর কাজ, রবীন্দ্রনাথ সে কথাই "ফাল্গুনী"তে কবি-বাউলের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে একটি কবি বা শিল্পী-মন, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তার প্রকাশ নেই। একমাত্র প্রকৃত শিল্পীই পারেন মানুষের অন্তর্নিহিত শিল্পীকে মুক্তি দিতে, সীমার মধ্যে অসীমের যোগসূত্র রচনা করতে। এবার দেখতে হবে আর্টের জন্ম-রহস্যের মূল কোথায়। বাইরের জগতে যে অজস্র আনন্দধারা নানা রূপে নানা বর্ণে বিকীর্ণ হচ্ছে তা শিল্পীর মনে সাড়া জাগায়। শিল্পী ভুলে যায় সব, ভুলে যায় নিজেকে, অন্তবিহীন আনন্দধারার সহিত আপন সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে একীভূত করে দেয়—জীবনে আসে সৃষ্টির মাহেন্দ্র ক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আজকের আকাশে যে ভীষণ নির্মমতা, তার মধ্যে ভয়ানক দুঃখের আশঙ্কা আছে। এর যেমন একটা বাণী আছে, তেমনি বসন্তকালে আনন্দের রবে চতুর্দিক ভরে উঠে, তাতে আমরা কান দেই বা না দেই, তার প্রতি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।"

"এই বাণীর ভাষায় কোথাও প্রকাশ নেই, ব্যাকরণশুদ্ধ বানানো কোনও কথা নেই, কিন্তু তার একটা ধ্বনি আছে তা অনির্ব্বচনীয়। সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে সেই ধ্বনি উঠে। আমাদের চারিদিকে যা রয়েছে তা অসীম, তার কোন নির্দ্দিষ্ট ভাষা নেই, তা অতি বিরাট, কবি তাকে ছন্দের মধ্যে ছাঁচের মধ্যে ফেলে তৈরি করে তুলেছেন, তিনি মনের ভিতর যে প্রতিমা গড়েছেন তাতে তার আশা, ভালবাসা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। এই হচ্ছে কবির কাজ। তাকে সুন্দরের সীমায় বাঁধতে চেয়েছেন, তাই তিনি তার মানসী প্রতিমা গড়েছেন, সেই প্রতিমার রূপ নিয়েছে তার আশা, তার ভালবাসা।"

নিখিল-বিশ্ব অন্তরে-বাহিরে নিরন্তর যে বিচিত্র সংঘাত দ্বারা কাব্যরূপের সৃষ্টি করে, কবি তাকে মনের পথে ভাষা-

অলঙ্কারে গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের "মানসী" কাব্যগ্রন্থের "উপহার" কবিতাটি তারই অভিব্যক্তি:

"নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয় তাই মুহূর্ত্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।
সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর
ধ্বনি শুধু সাথে নাই ভাষা;
বিচিত্র কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চির জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু, অসীমের সীমা;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।"

শিল্পের জন্ম আনন্দের মধ্যে। নিখিল-বিশ্বের আনন্দধারা কবি-চিত্তে ধ্বনিত হয়ে উঠে, কিন্তু সে ধ্বনি নির্দ্দিষ্ট নয়, সুস্পষ্ট নয়—তা বিরাট, তা অসীম। এই নিয়েই তো শিল্পীর কারবার। তাই শিল্পীর সাধনায় দেখি তিনি নির্দ্দিষ্টকে চান না—চান অনির্দ্দিষ্টকে, অরূপকে—রূপাতীতকে।

আর্টের সৃষ্টি আনন্দের মধ্যে, আর্ট তাই মানুষকে দেয় আনন্দ। নিখিল প্রকৃতির আনন্দধারার সহিত 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' কবি রচনা করেন তাঁর কাব্য। আর্ট মানুষকে আনন্দ দান করে, তা বলে একথা যেন কেউ না মনে করেন, আনন্দ দিতে হবে এই সজাগ উদ্দেশ্য নিয়েই আর্টিষ্ট সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর্টিষ্টের অন্তরে যখন আনন্দবেগ দুর্ব্বার হয়ে ওঠে তখন তিনি তা প্রকাশ না করে পারেন না। অন্তরের মধ্যে রস উচ্ছল ও দুর্নিবার হয়ে উঠলে তবেই প্রকৃত আর্টের সৃষ্টি সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ বারবার নানা জায়গায় নানা প্রবন্ধে এই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, আর্টের জন্ম প্রয়োজনাতীত আনন্দের মধ্যে—রসের মধ্যে। প্রয়োজনে মানুষ দীন, আত্মমুখী, অপ্রয়োজনে সে ঐশ্বর্য্যবান—সে সকলের। তাঁর নিজের ভাষায়, "যে রস সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন মাত্রকে অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে ধাবিত হয়, তাহাই সাহিত্যরস। এইরূপ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদকেই আমরা ঐশ্বর্য্য বলিয়া থাকি। সাহিত্য মানব-হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্যেই সকল মানুষ সম্মিলিত হয়—যাহা অতিরিক্ত তাহাই সর্ব্বসাধারণের।"* "বিশ্ব-সাহিত্য" প্রবন্ধেও কবি সেই একই কথা জানিয়েছেন, "সাহিত্যে আমরা কিসের পরিচয় পাই? না, মানুষের যাহা প্রাচুর্য্য, যাহা ঐশ্বর্য্য, যাহা তাহার সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। যাহা তাহার সংসারের মধ্যেই ফুরাইয়া যাইতে পারে নাই।"* 'শিক্ষা' বা 'সাহিত্য' গ্রন্থে কবি যে কথা বলেছেন, সে কথাই Religion of an Artist নামক প্রবন্ধে এবং অন্যত্রও স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, সাহিত্যসৃষ্টির জন্য দরকার রসের, কিন্তু সে রস হবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কেননা যা প্রয়োজনের চেয়ে বেশী তাই আমরা আর এক জনকে দিতে পারি। সাহিত্যরস সকলের জন্য। তাই সাহিত্যের এত গৌরব।

প্রয়োজনে মানুষ বদ্ধ, সেখানে তার প্রকাশ নেই, অথচ মানুষের অন্তরাত্মা ডুকরে কেঁদে উঠে আত্মপ্রকাশের জন্যে। তারই জন্যে এল চিত্র, এল সঙ্গীত, এল নৃত্য—এগুলি মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাই মানুষ নিজকে প্রকাশ করতে চেয়েছে চিত্রের মধ্য দিয়ে, সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে, নৃত্যের মধ্য দিয়ে। প্রয়োজনের ভিতরে মানুষের পরিপূর্ণ প্রকাশ নেই, নেই তার অখণ্ড বিকাশ। সম্পূর্ণ প্রকাশ আছে একমাত্র সাহিত্য আর শিল্পে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "যতই আলোচনা করছি ততই অনুভব করছি যে সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ।...মানুষের প্রবাহ হু হু করে চলে যাচ্ছে; তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাকবে না, কেবল সাহিত্যে থাকবে। সঙ্গীতে চিত্রে, বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এইজন্যই সাহিত্যের এত আদর। এইজন্যই সাহিত্য সর্ব্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার।"

সৃষ্টির মধ্যে যেমন স্রষ্টার লীলা তেমনি মানুষের লীলা চলেছে সাহিত্যে। সাহিত্যে মানুষ নিজেকেই বিচিত্র রূপে দেখে। মানুষ এক--সাহিত্যে সে বহু এবং বিচিত্র। সাহিত্য তাই ব্যক্তির প্রকাশ। যাঁরা বলেন সাহিত্য নৈর্ব্যক্তিক তাঁরা ভুলই করেন। সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ-অনিবার্য্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "হৃদয় আপনার ভিতরের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগকে যখন বাইরের কিছুতে প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, তখন অন্ততঃ সে নানা উপকরণ লইয়া নিজের হাতে তাহার একটা প্রতিরূপ গড়িবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। এমনি করিয়া জগৎকে আপনার ও আপনাকে জগতের করিয়া তুলিবার জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা কেবলি কাজ করিতেছে।"† এই চেষ্টাতেই সাহিত্যের সৃষ্টি। সুতরাং সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ না থাকার কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত নয়। এখানে 'ব্যক্তি' শব্দটিতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপরই জোর দিতে চাই। স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র। বিশ্বজগতে তার

* শিক্ষা—পৃঃ ১০৭

* সাহিত্য—পৃঃ ৬৩

† সাহিত্য—পৃঃ ৫৯

সম্পূর্ণ অনুরূপ আর দ্বিতীয় নেই।"* প্রশ্ন হবে, এই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় কোন্ পথে? হৃদয় যখন পরিপূর্ণ আনন্দে রসের তরঙ্গে উচ্ছল হয়ে ওঠে, প্রয়োজন নিঃশেষে শেষ হয়ে যায় তখনই ব্যক্তি 'বেগের আবেগে' প্রকাশমান হয়। এই প্রকাশে মানুষ পায় নিজেকে—তার আত্মাকে। এই প্রকাশের পথে মানুষ সীমার বন্ধন হতে মুক্তি পায়, সীমার মধ্যে পায় অসীমের সন্ধান। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'—আনন্দরূপের অমৃতবাণী বিশ্বে প্রকাশ পাচ্ছে, জলে স্থলে, ফুলে ফলে, বর্ণেগন্ধে, রূপেসঙ্গীতেনৃত্যে, জ্ঞানেভাবে-কর্ম্মে। কবির কাব্যও সেই বাণীর ধারা: যে চিত্তযন্ত্রের ভিতর দিয়ে সেই বাণী ধ্বনিত হয়, তার প্রকৃতি অনুসারে এই প্রকাশ আপন বিশেষত্ব লাভ করে। সেই বিশেষত্বই অসীমকে বিচিত্র সীমা দেয়। এই সীমার সাহায্যেই সীমার অতীতকে আপন করে নিয়ে তার রস পাই।"† তা হলে দেখা যাচ্ছে যে অনন্তের সন্ধান দার্শনিক করেন, কবিও চান সেই অসীমকেই প্রকাশ করতে। কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। কবি সৌন্দর্য্যের পূজারী আর দার্শনিক সত্যের সাধক। কবি বা শিল্পী সৌন্দর্য্যের পূজারী বটে,কিন্তু সকল সৌন্দর্য্যের নয়—আনন্দজাত সৌন্দর্য্যের। প্রশ্ন হবে আনন্দ কি? কোথায় তার প্রকাশ?

উপনিষদ বলেন, জ্ঞানময় অনন্ত সত্য অহরহ নিখিল প্রকৃতি ও মানবসমাজে আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশিত হয়ে চলেছেন। এই আনন্দধারা যা নিখিল-বিশ্বে অজস্র সৌন্দর্য্য-ধারায় প্রকাশমান, কবি বা শিল্পীর কারবার সেই সৌন্দর্য্য নিয়ে। সুতরাং বলতেই হবে, যে আনন্দজাত সৌন্দর্য্য নিয়ে কবির কারবার সেই সৌন্দর্য্য এবং জ্ঞানময় অনন্ত সত্য একই। ইংরেজ কবি তাই বলেছেন, Truth is beauty, beauty is Truth। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সাহিত্য জানাইতেছে, সত্যই আনন্দ, আনন্দই অমৃত। সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে—'রসো বৈ সঃ। রসং হেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।' তিনিই রস, এই রসকে পাইলে মানুষ আনন্দিত হয়।"‡

সৃষ্টির মধ্যে দার্শনিক খুঁজে বেড়ান স্রষ্টাকে, বৈচিত্র্যের মধ্যে সন্ধান করে ফিরেন এক-কে। যে মুহূর্ত্তে সেই এক-কে পান—বলে উঠেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

অর্থাৎ—আঁধারের পরপারে আমি জ্যোতির্ম্ময় এক-কে পেয়েছি। প্রকৃত কবি বা শিল্পীর সন্ধানও সেই একের জন্য।

* কবি-পরিচিতি—পৃঃ ১১
† কবি-পরিচিতি পৃঃ ২
‡ সাহিত্য—পৃঃ ৪৮

নিখিল-বিশ্বের নানা সৌন্দর্য্য, নানা বৈচিত্র্য শিল্পীকে বিস্মিত করে, শিল্পী নিজেকে হারিয়ে ফেলেন সেই রসমাধুর্য্যের মধ্যে। তারপর আনন্দানুভূতির পথে শিল্পীর মনে জাগে প্রশ্নের পর প্রশ্ন—বিশ্বের এই নানা বৈচিত্র্যের মূল কি এবং কোথায়। সেই জিজ্ঞাসার সমাধান করতে গিয়ে শিল্পী আবিষ্কার করেন বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ় যোগসূত্রকে—আঁধারের পারে জ্যোতির্ম্ময় এক-কে। তাই দেখা যায়, কবিরা বাস্তবকে স্বীকার করেও বাস্তবের অতীত এক আদর্শকে বরণ করে নেন এবং সেইখানেই হয় কাব্যসাধনার চরম সার্থকতা।

পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য, নদীর কলধ্বনি, প্রভাতের সূর্য্যালোক এবং বসন্তের মিলন-উষার মধ্যে অনন্তকাল ধরে যে সুর ধ্বনিত হয়ে চলেছে তাতে আছে এক অতীন্দ্রিয় জগতের আভাস। রবীন্দ্রনাথ জীবনের সেই আদর্শে বিশ্বাসী। কবি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন সেই ইন্দ্রিয়াতীত জগতের বাণীকে এবং এমনি করে সুদূরের সন্ধান করতে গিয়ে পৌঁছেচেন 'মহান্ত পুরুষে'র কাছে। পূর্ব্বেই বলেছি সাহিত্য ব্যক্তির প্রকাশ। মানুষের অন্তরে যে শিল্পী বাস করে সে ক্রমাগত নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করে থাকে—নিখিলবিশ্বের আনন্দধারা যাঁর প্রকাশ তাকেই পাবার জন্য সে সচেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

"In Art the person in us is sending its answers to the Supreme Person, Who reveals Himself to us in a world of endless beauty across the lightless world of facts." (*Personality*, p. 27)

রবীন্দ্রনাথের মতে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য এবং মানবপ্রেম অসম্পূর্ণ; এই সৌন্দর্য্য, এই প্রেম অসীমের ছায়ামাত্র। অসম্পূর্ণের মধ্যে পরিপূর্ণতাকে, অখণ্ডকে নিয়ে আসতে না পারলে কবি-মানসের চরম তৃপ্তি হতে পারে না এবং কাব্য সৃষ্টিও সম্পূর্ণ সার্থক হয় না। "অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Ideal-এর মিলনেই কবিতার সৌন্দর্য্য। কল্পনার centrifugal force Ideal-এর দিকে Real-কে নিয়ে যায়, এবং অনুরাগের Centripetal force Real-এর দিকে Ideal-কে আকর্ষণ করে; কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।"* কবিত্বের এই উভয় অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা কঠিন, কিন্তু প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যেই সেই সামঞ্জস্য আছে। শ্রেষ্ঠ কবির রচনার তাই তো এত গৌরব।

কাব্যসৃষ্টির গোড়ার কথা আত্মপ্রকাশ, "In Art man reveals himself and his objects।" মনের ধর্ম্ম এই যে, বাইরের জগৎ অন্তরে এসে এক নূতন জগতের সৃষ্টি করে।

* সবুজপত্র, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২৪

সেই অন্তরজগৎ নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ নয়, বাইরে পুনর্ব্বার প্রকাশিত হ'লে তবে সে হয় পূর্ণ। কবি-হৃদয় সেই প্রকাশে তৃপ্ত হয়।

কবি জীবনের পথে বহু দূর, তাঁর গতি সর্ব্বত্র। "ফাল্গুনী"* নাটকে আছে, "সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলি সরে, কেবলি চলে, সেই তো বৈরাগী, সেই তো পথিক, সেই তো কবি-বাউলের চলা।"†

কবি যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও গানের ভিতর দিয়ে নিজকে প্রকাশ করতে করতে চলেন, সে কি কেবল অর্থহীন চলা? তাঁর চলার কি কোন স্থির লক্ষ্য নেই? কবি বলেন:

"আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ,
সেই তো বাঁধায় সেই তো মেটায় দ্বন্দ্ব।
জানা আমায় যেমনি আপন ফাঁদে
শক্ত করে বাঁধে
অজানা সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় দ্বন্দ্ব
এক নিমেষে যায় গো ফেঁসে অমনি সকল বন্ধ।"

তাই কবি ব্যাকুল হয়ে বলে উঠেন—

"ঘণ্টা যে ঐ বাজলো কবি, হোক রে সভাভঙ্গ।
জোয়ার জলে উঠেচে তরঙ্গ।
এখনো সে দেখায় নি তার মুখ,
তাই তো দোলে বুক!
কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ,
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ।"
(বলাকা, পৃঃ ৮০)

দার্শনিকের মত শিল্পীও অজানার সন্ধানী। শিল্পী তার সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন—আপনাকে জানতে চান। সেই জানার মধ্য দিয়ে কবি উপলব্ধি করেন নিখিল বিশ্বব্যাপী এককে—অনন্তকে। ভারতীয় কলাসৃষ্টির মূল কথা সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে সপ্রমাণ করেছেন, সৌন্দর্য্যের প্রকাশ সাহিত্যের বড় কথা নয়, সৌন্দর্য্য সাহিত্যসৃষ্টির উপলক্ষ্যমাত্র—অখণ্ড মানুষকে প্রকাশ করাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য; বাইরের জগৎকে অন্তরের জগৎ—আপনার জগৎ—মানুষের জগৎ করে তোলাই সাহিত্যের কাজ। কবি বলেন, মানুষের সত্যিকার জগৎ সেইখানেই গড়ে উঠে যেখানে সে নিজের মধ্যে অনুভব করে অনন্তকে, জানতে পারে সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে,

"Building of man's true world…is the function of Art. Man is true, where he feels his infinity, where he is divine, and divine is the creator in him" (*Personality* p. 31)।

রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি হ'ল ধ্যানী দার্শনিকের দৃষ্টি। কবি দার্শনিক নন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই যে আনন্দানুভূতির দ্বারা অহরহ জীবনের ব্যাখ্যা করে থাকেন তা দার্শনিকসুলভ আনন্দানুভূতি। Poetry is the criticism of life—কাব্যের মধ্যে রূপায়িত হয় জীবনের ব্যাখ্যা। এইজন্যই কবিমানসের পিছনে একটি দার্শনিক মন না থাকলে সেই কবি, বড় কবি—শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারেন না। তাই শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই দার্শনিক। দার্শনিক কবি না হতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত কবিকে দার্শনিক হতেই হয়। রবীন্দ্রনাথ কবি এবং কবি বলেই দার্শনিক। রবীন্দ্রনাথ কবি—তাঁর একটি মাত্র পরিচয় তিনি শিল্পী। কাব্যসৃষ্টিকে সার্থক করে তুলতে হ'লে যে দার্শনিক অনুভূতির প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম্ম' সেই পথেরই যাত্রী। দার্শনিক কবির ধর্ম্ম তার শিল্প-চেতনার পথ ধরেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে। 'Religion of An Artist' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই মর্ম্মে লিখেছেন, "আমার ধর্ম্ম মূলতঃ কবির ধর্ম্ম। কাব্যের প্রেরণা যেমন করে অজ্ঞাত অপরিচিত পথ ধরে আমার কাছে এসেছে সেই পথ ধরেই এসেছে আমার জীবনে ধর্ম্মপ্রেরণা। আমার ধর্ম্মজীবন ও কবিজীবন একই পথে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। যদিচ এই উভয় জীবনের সম্মিলন হয়ে গেছে বহুকাল পূর্ব্বে তবু অনেক দিন পর্য্যন্ত তা ছিল আমার কাছে অজ্ঞাত।*

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন এবং ধর্ম্মজীবনের পরিপূর্ণ মিলন হয়েছে এবং সেই মিলনে সৃষ্টি হয়েছে তাঁর কাব্যসম্ভার। রবীন্দ্রকাব্যে তাই অধ্যাত্মরাজ্যের অন্তহীন সুর, অসীমের জন্য অনন্ত ব্যাকুলতা, সুদূরের জন্য অশান্ত ক্রন্দন।

* *Personality*, p. 12
† ফাল্গুনী, পৃঃ ১৩

* রাধাকৃষ্ণণ সম্পাদিত *Contemporay Indian Philosophy* পৃ, ৩২।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি অক্ষয়কুমার গাহিয়াছেন :—

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ত্তা—গর্ব্বোন্নত শির,
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি ;
তবু কাঁদ কাঁদ,—জনম-ভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও বঙ্গভূমির এইরূপ একজন ভাগ্যহীন কবি। বর্ত্তমান খুলনা জেলার ভৈরবনদতটবর্ত্তী সেনহাটি গ্রামে, এক বৈদ্য-পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম-তারিখ—১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪ (৩১ মে ১৮৩৭)। তিনি যখন ৬ মাসের শিশু, সেই সময়ে তাঁহার পিতা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার অগ্রজেরও কাল হয়। কি করিয়া দিন চলিবে এই চিন্তায় তাঁহার মাতা ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এই দুঃসময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের পিতার মাতামহ—বরিশাল কীর্ত্তিপাশার ভূম্যধিকারী রাজারাম সেন জমিদারী হইতে তাঁহাদের কিছু কিছু বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে তাঁহাদের দিনাতিপাত হইত। কৃষ্ণচন্দ্র গুরুমশায়ের গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, গৃহ-পুরোহিতের নিকট কলাপ ব্যাকরণ পড়িয়া এবং কীর্ত্তিপাশায় ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিয়া, ১৯ বৎসর বয়সে, ভাগ্যান্বেষণে ঢাকায় উপস্থিত হন।

এই সময়ে গবর্মেণ্ট হইতে বাংলা শিক্ষা প্রদানের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছিল। কৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিত নিয়োগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ বেতনের একটি সার্কেল পণ্ডিতের পদলাভ করেন। ইহার অল্প দিন পরেই তিনি ঢাকা নর্মাল স্কুলের অন্তর্গত মডেল স্কুলের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার অবসরকাল মাতৃভাষার সেবায় নিয়োগ করিতেন। 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর,' 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রভৃতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে কবিতা লেখা অভ্যাস করিতেন। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি একজন অকৃত্রিম বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন; ইনি তাঁহার সমবয়সী কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র। তাঁহাদের প্রাথমিক রচনাগুলি ১৮৫৮ সনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' স্থান পাইয়াছিল; গুপ্ত-কবি তাঁহাদের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজসুন্দর মিত্র, ভগবানচন্দ্র বসু (আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পিতা) প্রমুখ কয়েক জন কৃতবিদ্য বাঙালীর চেষ্টায় ঢাকায় সর্ব্বপ্রথম একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্র—'ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মুদ্রাযন্ত্রেই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' নাটকের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা যন্ত্রের মুদ্রাকর ছিলেন—কৃষ্ণচন্দ্রের বন্ধু হরিশ্চন্দ্র। এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে, এই দুই দরিদ্র কবির উদ্যোগে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 'কবিতাকুসুমাবলী' নামে একখানি পদ্যবহুল মাসিক পত্রিকা জন্মগ্রহণ করে। কৃষ্ণচন্দ্রের 'সদ্ভাবশতকে'র অধিকাংশ কবিতাই ইহাতে স্থান পাইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে 'কবিতাকুসুমাবলী'ই ঢাকা হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র।

এই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের মনের মত একটি নূতন চাকুরী জুটিয়া গেলে, তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া সংবাদপত্র-সেবায় ব্রতী হন। ঢাকাবাসীরা অনেক দিন হইতে স্থানীয় একখানি বাংলা সংবাদপত্রের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। বাঙ্গলা যন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকবর্গের দ্বারা সে অভাব পূরণ হয়। তাঁহারা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত 'সোম-প্রকাশে'র আদর্শে, 'ঢাকাপ্রকাশ' নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার করেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারই সম্পাদকের গৌরবময় আসন অলঙ্কৃত করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর।

ইহার তিন বৎসর পরে বালিয়াটী-নিবাসী গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী ঢাকায় আর একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ও 'বিজ্ঞাপনী' নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি ৫০৲ বেতন দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে 'ঢাকাপ্রকাশ' হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া তাঁহার হস্তে পত্রিকা ও প্রেসের সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। 'বিজ্ঞাপনী'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—মার্চ ১৮৬৫।

যোগ্যতার সহিত সাড়ে তিন বৎসর 'ঢাকাপ্রকাশ' ও দেড় বৎসর 'বিজ্ঞাপনী' পরিচালন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ঢাকার সংবাদপত্র প্রসঙ্গে কলিকাতার 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' একবার লিখিয়াছিলেন :—"কলিকাতায় যে যে বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে, ঢাকার বিজ্ঞাপনী ও ঢাকাপ্রকাশ ইহার কাহার দ্বিতীয় নহে।" প্রকৃতপক্ষে বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে ঢাকার প্রথম সাংবাদিক-পদের গৌরব কৃষ্ণচন্দ্রেরই প্রাপ্য। এই হিসাবে তিনি ঢাকাবাসীর কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ঢাকায় সঙ্গদোষে সুরাপানে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার আত্মকথায় প্রকাশ :—"দেশেও তখন সুরার বড়ই প্রকোপ। বড়-লোকের চিহ্ন ছিল তখন—

সুরাপান ! ভাগ্য-দোষে, মতিহীন আমি, আমিও তাহাতে মজিয়াছিলাম !...বন্ধুগণ বলিতেন, 'পোলাও-কালিয়া ভাল খাবার খেতে হ'লে মদ খাওয়া চাই-ই ; নহিলে, শরীর টেঁকে না—অতিসারে মারা যেতে হয় !' কাজেই, আমিও প্রথমে বুঝিয়াছিলাম, তাই। এই প্রলোভনে, ক্রমেই তাহা নেশায় পরিণত হইয়াছিল ; আর, তাহাতেই আমার সর্ব্বনাশ ! শেষ, ইহাতেই, ঝগড়া করিয়া আমার কাজ যায় ; আমি পরিবারাদি লইয়া বাড়ী চলিয়া আসি। কর্ম্ম ছাড়িয়া আমি কেবলই দুরবস্থার চরম সীমায় উপনীত হইতে থাকি। এমন কি, ক্রমে যতই সাংসারিক কষ্ট বাড়িয়াছে, আমিও ততই পাগলের মত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে, আমায় পাগলের মত হইতে দেখিয়া, আমার কোন আত্মীয় আমায় কীর্ত্তিপাশায় লইয়া যান। এবং তাঁহারা নানারূপে আমার চিত্ত-সংস্কারেরও চেষ্টা পাইতে থাকেন। এই সময় মদটাও আমার আর তত জুটিত না ; ক্রমে আমিও একটু স্থির হইতে থাকি। অধিকন্তু, 'শিব-বিবাহ' নাম একখানি গানের পুস্তক এবং পারশী, উর্দ্দ, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এই ভাষা চতুষ্টয়ে আমার পূর্ব্বতন শিক্ষকগণের গুণবর্ণনা নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া, আমার মতি অনেকটা ফিরিয়া যায়। এই সময়ই আমার মাতাঠাকুরাণী আমায় কীর্ত্তিপাশা হইতে বাড়ী আনিতে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া আমিও প্রতিজ্ঞা করি—'আর কখনও এমন কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না।' বেশীর ভাগ, বাড়ীর তাৎকালিক দুর্দ্দশা দেখিয়াও আমার মনে বড়ই ঘৃণা জন্মে।" ('অনুসন্ধান,' ৩০ ফাল্গুন ১২৯৮)

কর্ম্মহীন অবস্থায় দুই-তিন বৎসর দেশে কাটাইবার পর, কৃষ্ণচন্দ্র সামান্য বেতনে কখন ঢাকা ব্রাহ্মস্কুলে (ইং ১৮৭০), কখন দৌলৎপুর স্কুলে, কখন-বা পিলজঙ্গ-নপাড়া এন্ট্রান্স স্কুলে পণ্ডিতী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; শেষে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ২৫৲ বেতনে যশোহর জেলা-স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। যশোহরে অবস্থানকালে তিনি 'দ্বৈভাষিকী' নামে একখানি স্বল্পায়ু সংস্কৃত-বাংলা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ উনিশটি বৎসর অতি দীনভাবে যশোহরে এক ব্রাহ্মণের হোটেলে কাটাইয়া, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি শিক্ষকতা কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার ও গণিতজ্ঞ কালীপদ বসুর নাম উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণচন্দ্রের শেষের দিনগুলি স্বগ্রাম সেনহাটিতেই বিশৃঙ্খলভাবে কাটিতেছিল। "ক্রমে বিশ্বাসী ও সাধক কৃষ্ণচন্দ্রের মর্ত্ত্যলীলা শেষ হইয়া আসিল। লোকচক্ষুর অগোচরে প্রস্ফুটিত বনকুসুমের মত সমগ্র দেশকে অজ্ঞাতসারে সৌরভে আমোদিত করিয়া তাঁহার জীবন-পুষ্প ঝরিয়া পড়িবার দিন আসিল। কিছু দিন হইতে তিনি রোগে অত্যধিক ক্লেশ পাইতেছিলেন। এইরূপে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ [১৩ জানুয়ারি ১৯০৭, ৭০ বৎসর বয়সে] প্রত্যূষে জন্মভূমি সেনহাটির ক্রোড়ে তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিলেন।" ('জীবনচরিত')

ইহাই সংক্ষেপে কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-কথা।

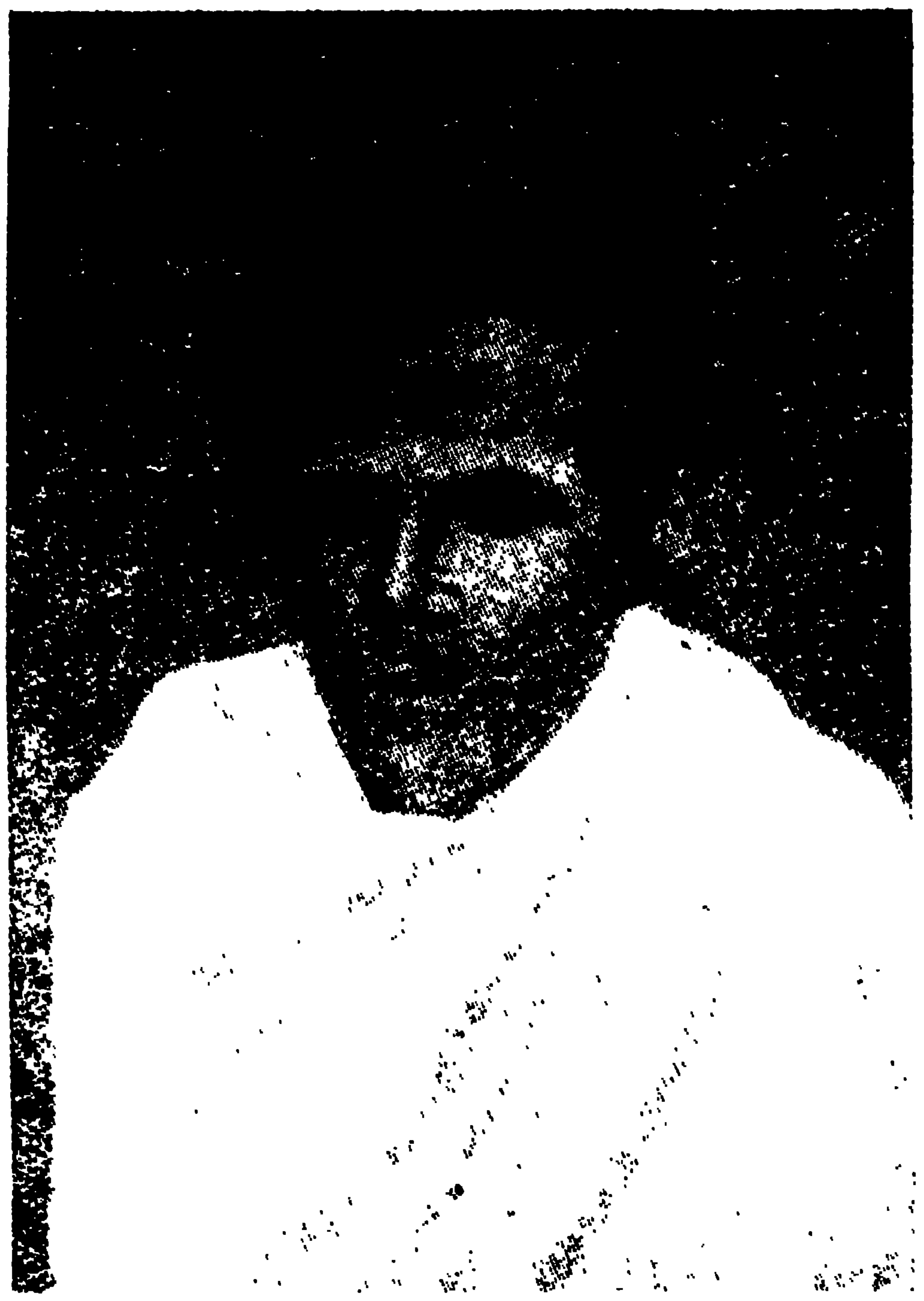

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

এইবার বাংলা-সাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্রের দানের কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার দানের পরিমাণ বিপুল নহে। তিনি চারিখানি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন ; ইহার মধ্যে দুইখানি কাব্য,—'সদ্ভাবশতক,' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি (ইং ১৮৬১) ও 'মোহভোগ'—মহাভারতের বাসব-নহুষ সংবাদ অবলম্বনে নাটকাকারে লিখিত ক্ষুদ্র কাব্য (জানুয়ারি ১৮৭১)। অপর দুইখানি—গদ্য-গ্রন্থ ; 'ইতিবৃত্ত' নামে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় লিখিত আত্মকথা (এপ্রিল ১৮৬৮) ও 'কৈবল্যতত্ত্ব'* নামে সন্দর্ভ-

* ইহার "বিজ্ঞাপনে" কৃষ্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন :—"এই পুস্তকে কৈবল্য ও কৈবল্য লাভের উপায় বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।" যশোহরে অবস্থানকালে তিনি সাত্ত্বিক হিন্দুর আচার পালন করিতেন। একদিন দুর্গাদাস লাহিড়ী তাঁহার ধর্ম্মমতটি জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন :—"এখন তো বুঝিতেছেনই ! তবে ঢাকায় যখন ছিলাম, সেখানে তখন বড়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন ; আমারও তখন যৌবনোচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি ! কাজেই, তখন সেইরূপ ভাবেই ছিলাম। পরেই এই ভাব !"

সমষ্টি (জানুয়ারি ১৮৮৩)। পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার গদ্য-পদ্য বহু রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল রচনার মধ্যে ১২৯৮-১৩০০ সালের পাক্ষিক 'অনুসন্ধানে' প্রকাশিত তাঁহার আত্মকথা, সানুবাদ "শিবপঞ্চাশৎ" ও নীতি-কবিতা" উল্লেখযোগ্য। 'ব্রহ্ম-সঙ্গীতে'ও "তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয় হে" ও "কি বেশ ধরেছ আজি শারদীয়" প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটি গান স্থান পাইয়াছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের অপর সকল রচনা বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু একমাত্র 'সদ্ভাবশতক'ই তাঁহাকে বাংলা-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, যশোহরে অবস্থানকালে, একদা দুর্গাদাস লাহিড়ী 'অনুসন্ধান' পত্রের জন্য তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সংগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, বিনয়-সহকারে বলিয়াছিলেন :—

"কোন এক পারস্য-গ্রন্থে একটি গল্প পড়িয়াছিলাম। সে গল্পটির মর্ম্ম এই যে, ধনুর্ব্বাণ দ্বারা এক লক্ষ্য-ভেদ করিবার জন্য কয়েক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক ছিল। যাহার বাণ সেই লক্ষ্য-ভেদ করিতে পারিবে, সে-ই ঐ মুদ্রা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু কেহই সে লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিল না। মহা মহা ধনুর্ব্বিদ্যা-পারদর্শীগণও তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলেন। অতঃপর, কৌতুকচ্ছলে, একটি বালক তৎপ্রতি একটি বাণ প্রয়োগ করায়, কি দৈব ঘটনা, সেই লক্ষ্যটি ভেদ হইয়াছিল। কিন্তু যেই লক্ষ্যটি ভেদ হইল, বালক অমনি তাহার ধনুর্ব্বাণ জলে ফেলিয়া দিল। এবং লোকে তাহার ধনুর্ব্বাণ জলে নিক্ষেপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে উত্তর দিল,—'দৈবাৎ একটা লক্ষ্য ভেদ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমি তো আর ধনুর্ব্বিদ্যা-পারদর্শী হই নাই। আমার ছেলেখেলার যন্ত্রে কেন আর লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইব; তাই উহা ফেলিয়া দিলাম।'...আমারও হইয়াছে তাই। দৈবাৎ 'সদ্ভাব-শতক'টা একটু ভাল হইয়াছে বলিয়া, আমি তো আর একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত হই নাই যে, আমার জীবনে নানা গৌরব-গরিমার কথা পাইবেন?"

'সদ্ভাবশতক' প্রকাশিত হয়—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে; কৃষ্ণচন্দ্র তখন 'ঢাকাপ্রকাশে'র সম্পাদক। এই কাব্যখানি বাংলা দেশের ছাত্র-সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হইতে লব্ধ এই খ্যাতি ছাত্র-সমাজকে অতিক্রম করিয়া অভিভাবক-সমাজকেও অভিভূত করিতে বিলম্ব হয় নাই।

চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে, দংশে নি যারে?

কবিতার লেখককে বাংলা দেশের রসিকমাত্রই সহজে চিনিয়া লইয়াছিলেন। কবি কৃষ্ণচন্দ্র পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সর্ব্বদা পারসিক কবি হাফেজ ও সাদীর কাব্যরসে নিমগ্ন থাকিতেন। 'সদ্ভাবশতক' প্রধানতঃ হাফেজের কাব্য অনুসরণেই রচিত। পারসিক কবিদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবোধ ও এই বিশ্বপ্রকৃতির যিনি স্রষ্টা, তাঁহার প্রতি সহজ আত্মনিবেদন কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্যে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই সৌন্দর্য্য ও ভগবৎ-প্রীতিই বাংলা-সাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ দান।

'সদ্ভাবশতকে'র কবিতাগুলি এমনই প্রসাদগুণবিশিষ্ট যে অনেক কবিতার অনেক পংক্তিই আমরা প্রবাদবাক্যস্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি; ব্যবহার করি বটে, কিন্তু এগুলির রচয়িতা যে কৃষ্ণচন্দ্রই তাহা অনেক ক্ষেত্রে বিস্মৃত হইয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ "অপব্যয়ের ফল" নামে তাঁহার সুপরিচিত

যে জন দিবসে, মনের হরষে,
জ্বালায় মোমের বাতি;
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর,
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।

কবিতার উল্লেখ করিতে পারি। শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের মত খ্যাতনামা কবি ও সমালোচকও কবিতাটিকে কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের নামে 'কাব্য-মঞ্জুষা'য় স্থান দিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর মজুমদার-কবি উনবিংশ শতাব্দীর মজুমদার-কবির সম্যক্ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কবি-পক্ষেই যদি এইরূপ হয়, সাধারণে যে তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি!

আমরা সাহিত্যিক পূর্ব্বপুরুষদের স্মরণীয় করিবার জন্য সচরাচর বার্ষিক স্মৃতিবাসরের অনুষ্ঠান করি; কখন কখন তাঁহাদের নামে রথ্যা-রচনা, পদক-দান বা স্মৃতি-সৌধের আয়োজন করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়া থাকি। কিন্তু কেবল-মাত্র এইগুলির দ্বারাই তাঁহারা অমরত্ব লাভ করেন না; তাঁহারা সত্যকার বাঁচিয়া থাকেন—সাহিত্যে তাঁহাদের বিশিষ্ট দানের জন্য। কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বদেশবাসীর অন্তরে জাগরূক রাখিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তাঁহার 'সদ্ভাবশতকে'র একটি সুষ্ঠু সংস্করণ প্রকাশ করা; তবেই তাঁহার আত্মার শান্তি হইবে, তবেই তাঁহার যথোপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা হইবে।*

---

* কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে, ৬ই জুন অনুষ্ঠিত কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বার্ষিক স্মৃতিসভায় প্রধান অতিথির ভাষণ।

যুদ্ধোত্তর বার্লিন

শ্রীপশুপতি ঘোষ

অনেক দিন থেকেই বার্লিন দেখবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় বার্লিনের যে চিত্র খবরের কাগজে পাঠ করেছি তাতে হিটলারের পতন হওয়ার পরেও বার্লিনে যাওয়ার ইচ্ছা আমার একটুও কমে নি। বার্লিনের পতন হয়েছে, মিত্র-শক্তির আক্রমণের আঘাতে বার্লিন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, বোমার আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবে বার্লিনের কত ঐতিহাসিক স্মৃতিজড়িত প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বার্লিনের প্রসিদ্ধ রাইস্‌ট্যাগ, ব্রাণ্ডেনবার্গ গেট, কাইজার উইলহেলম্‌স গেট ইত্যাদি অতীতের কত সমৃদ্ধ স্মৃতি বহন করে দণ্ডায়মান, ইতিহাস তার সাক্ষী। বোমার আঘাতে ধ্বসে-যাওয়া তাহাদের বিষাদ-মাখা স্মৃতি মনকে অভিভূত করেছিল। যে বার্লিন মাত্র পনর-ষোল বৎসরের মধ্যে বিপুল শক্তির অধিকারী হয়ে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবার সামর্থ্য অর্জ্জন করেছিল তার সেই শক্তির উৎস কোথায় দেখবার জন্য আমি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম। একা হিট্‌লার, এক গোয়েরিং বা গোয়েবল্‌সের সাধ্য ছিল না এত বড় একটা বিরাট্‌ শক্তিকে পূর্ণ বিকাশের পথে চালিয়ে নেবার। যারা জার্ম্মানীকে গড়ে তুলেছিল, শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ করেছিল, দিগ্বিজয়ীর বিরাট্‌ পরিকল্পনাকে মূল কেন্দ্রাভিমুখে পরিচালিত করেছিল, তারা জার্ম্মানীর অসংখ্য শিল্পী বা টেকনিসিয়ান। তাদের পরিশ্রম ও প্রতিভা, তাদের অনমনীয় কর্ম্মনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা, জাতিকে বড় করার উদগ্র বাসনা হিট্‌লারের কর্ম্মকুশলতায় সুপরিচালিত হয়ে জার্ম্মানীকে এত বড় করে তুলেছিল। জার্ম্মানার মধ্যমণি সেই বার্লিনকে দেখবার জন্যে আমি ভারত থেকে যাত্রা করেছিলাম।

ভারতবর্ষ থেকে ১৯৪৭ সনের ২২শে ডিসেম্বর বিওসি-এর ইয়র্ক প্লেনে যাত্রা করে আমি ২৪শে ডিসেম্বর বেলা ২টায় লণ্ডনে উপস্থিত হলাম। লণ্ডনে কয়েক দিন নানা কাজে কাটিয়ে শেষে বার্লিন যাত্রা ঠিক করলাম। লণ্ডনের ৪৬ মাউণ্ট ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়া সাপ্লাই কমিশনের অধ্যক্ষ মিঃ বিগ্নিমিনের সঙ্গে দেখা করলাম। মিঃ বিগ্নিমিন পঞ্জাবের অধিবাসী, ভারতীয় খ্রীষ্টান। প্রত্যেক মাসেই ভারতবর্ষ থেকে বার্লিনের যাত্রীদের একটা সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে—নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা সাপ্লাই কমিশনের অধ্যক্ষই করে থাকেন। তিনি আমার নাম নির্ব্বাচন করে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করলেন। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে লণ্ডনে দেখা করলে আমার ছাড়পত্রে অনুমতির স্বাক্ষর দিয়ে আমাকে আর একখানি চিঠি দিলেন। সেই চিঠি পেয়ে আমার বার্লিন যাত্রার ব্যবস্থার জন্য প্রথমে এক্সচেঞ্জ আপিসে (ফরেন অফিস, নরফোক হাউস, সেণ্ট-জেমস্‌ স্কোয়ার, লণ্ডন) টাকা জমা দিতে গেলাম, সত্তর পাউণ্ড ব্রিটিশ ও আমেরিকান জোনের জন্য জমা দিলাম এবং পনের পাউণ্ড জমা দিলাম লিপজিগের মেলা দেখবার জন্য। ঐ মেলা দেখবার জন্য পূর্ব্ব থেকেই আমি নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম।

যুদ্ধোত্তর বার্লিনের একটি রাস্তা

আমষ্টার্ডাম থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ রওনা হয়ে ২৭শে ফেব্রুয়ারী বৈকালের দিকে বার্লিন পৌঁছলাম। ইংরেজদের অতিথি হয়ে যাঁরা বার্লিন দেখতে যান তাঁদের জন্যে ব্রিটিশ জোনে দুটি হোটেলের ব্যবস্থা আছে। একটি হোটেল আম্‌যু আর একটি হোটেল সেন্তর। যাত্রারম্ভেই বেশ খানিকটা নাজেহাল হয়েছিলাম। ভুল করে জার্ম্মান ট্রেনে উঠেছিলাম। জার্ম্মান ট্রেনে কোনও রেষ্টুরেণ্ট-কার নেই এবং পথে যে সমস্ত হোটেল পড়ল তাতেও কিছু কিনতে পাওয়া যায় না।

ফলে সারারাত্র হরিবাসর করেই কাটাতে হয়েছিল। আমি হোটেল আমজুতেই উঠলাম।

পরের দিন থেকেই আমার কাজ সুরু হ'ল। আমি এক জন মুদ্রাকর—আমার একান্ত অভিপ্রায় ছিল মুদ্রাযন্ত্র যাঁরা নির্ম্মাণ করছেন তাঁদের খোঁজ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাঁদের কাছ থেকে যন্ত্রপাতির কলাকৌশল শিখে তবে ভারতে সেটাকে কার্য্যকরী করা। সাম্রাজ্যবাদ-নিষ্পেষিত ভারতে এটা আশা করতে পারি নি, গঠন-মূলক কার্য্যে বিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত গবর্ণমেণ্টের কোনও সাহায্য পাব আশা করতে পারি নি, তাই

বার্লিনের একটি দৃশ্য

স্বাধীন ভারতের নয়া তালিমে যন্ত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে বার্লিন থেকে কিছু কার্য্যকরী শিক্ষা আয়ত্ত করে নিজের দেশের শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করব এই আশা নিয়েই বার্লিন গিয়েছিলাম।

বার্লিনে পৌঁছবার পরের দিনই সেখানকার ভারতীয় সামরিক মিশনের সহিত সাক্ষাৎ করে বার্লিনের নাম-করা মুদ্রাকরদের এবং মুদ্রাযন্ত্র-নির্ম্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম জানতে চাইলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা আমায় কোনও সংবাদ দিতে পারলেন না। তাঁদের এই অজ্ঞতায় খুব বিস্ময়বোধ করলাম। এইখানেই বলে রাখছি যে ভারতীয় সামরিক মিশনের কর্ম্মচারীদের ভিতরে একজনও টেকনিসিয়ান ছিল না। সামরিক মিশনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? ভারত ইউনিয়নের সহিত বার্লিনের যোগসূত্র অটুট রাখার দায়িত্ব কি সামরিক মিশনের নয়? তাই যদি হয় তবে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত ভারতের পক্ষে বর্ত্তমানে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কি তার আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় করা নয়? বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে যে সকল জাতি শিল্প-উন্নয়ন দ্বারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে জাতিগঠনমূলক কার্য্যে তাদের কাছ থেকে যেটুকু আমাদের গ্রহণ করবার আছে তৎসম্বন্ধে আমরা যদি সচেতন না হই তা হলে আমাদের কল্যাণ হবে কিসে? বার্লিনে বসে বসে এসব প্রশ্ন আমার মনকে ব্যাকুল করে তুলত এবং নিজেদের অসহায়তা আমার মনকে পীড়া দিত।

যুদ্ধোত্তর বার্লিনের একটু পরিচয় এখন দেওয়া প্রয়োজন। প্রায় পঁচাত্তর ভাগ বার্লিন এখনও ধ্বংসের গর্ভে। ধ্বংসে-যাওয়া প্রাসাদগুলির সংস্কার করা দূরে থাকুক ছাইয়ের জঞ্জালও দূর করা হয় নি। মিত্রশক্তি অধিকৃত বার্লিন চার ভাগে বিভক্ত।

(১) ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চল।
(২) মার্কিন অধিকৃত অঞ্চল।
(৩) রুশ অধিকৃত অঞ্চল।
(৪) ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল।

আমি ইংরেজ সরকারের অতিথি। অতএব আমার পক্ষে সকল স্থান পরিভ্রমণ করার কোনও বাধা ছিল না। হোটেল থেকে ট্যাক্সি দেওয়া হ'ল এবং ট্যাক্সিতে সব জায়গা ঘুরে দেখতে লাগলাম। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আমি চলাফেরা করছি, সর্ব্বত্র ঘুরে সবকিছু দেখার চোখের স্বাধীনতা আমার রয়েছে, কিন্তু মনের স্বাধীনতা আমার নেই। চোখ খুলে দেখতে পারি, কিন্তু মন খুলে কথা কইতে পারি না এবং ইচ্ছামত নিজের পকেটের টাকা ব্যয় করবার অধিকার আমার নেই। অন্তরের এই রিক্ততায় কেন আমার মন বিষিয়ে উঠেছিল তার বর্ণনা একটু পরেই পাবেন। লণ্ডন থেকে যে টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম সেটা জার্ম্মানদের দেওয়া ছিল নিষিদ্ধ, কোনও জার্ম্মানকে টাকা দিতে পারবে না এই ছিল কর্ত্তৃপক্ষের বিধান—পারিতোষিক হিসাবে কেবল সিগারেট বিতরণের প্রথাটাই দেখলাম, টাকার বদলে সিগারেটকেই চতুঃশক্তি কারেন্সি হিসাবেই মেনে নিতে চায়।

পূর্ব্বেই বলেছি যে ভারতীয় সামরিক মিশন আমাকে কোন সাহায্য করতে পারে নি, ইংরেজী জানা একজন জার্ম্মান ডাক্তার বন্ধু এখানে পেলাম। নাম Dr. Kuhnest। তিনি স্থানীয় একটি মেডিক্যাল জার্ণালের সম্পাদক এবং এই সূত্রে অনেক মুদ্রাকরের সহিত ও তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সহিত পরিচিত। ডাঃ কুনের সৌজন্যের অভাব ছিল না—কিন্তু তাঁর সময় এত কম ছিল যে তিনি সব সময় আমাকে নিয়ে ঘোরাফেরা করবার অবসর করে উঠতে পারেন নি। তিনি

এক জার্ম্মান ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার পরিচিত করে দিলেন। তিনি কাজ চালাবার মত ইংরেজী ও রুশ ভাষা জানতেন। তিনিই আমার দোভাষীর কাজ করতেন। ডাঃ হ্যুনের কাছ থেকে যুদ্ধ-পূর্ব্ব বার্লিনের যে সকল ছাপাখানার তালিকা পেয়েছিলাম তন্মধ্যে অনেকগুলির অস্তিত্বের সন্ধানই পেলাম না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলে একটি প্রেসের পাত্তা পাওয়া গেল। ডাঃ হ্যুনেকে সঙ্গে করে প্রেসের মালিকের সঙ্গে দেখা করলাম, জঞ্জালের স্তূপ পরিষ্কার করে একটি মেসিন বের করা হ'ল। এজন্য শুধু সিগারেটের খরচাই হয়েছিল। কর্ম্মব্যপদেশে বার্লিনে যে সকল জার্ম্মানের সহিত পরিচিত হয়েছিলাম তাঁদের সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

বার্লিন একটি শিল্পকেন্দ্রিক শহর, যুদ্ধ-পূর্ব্ব বার্লিনের পরিচয় আগে পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু যুদ্ধোত্তর বার্লিন নিজের চোখে দেখতে গিয়ে হতাশ হয়েছি। বার্লিনের বাজারে দোকানীরা দোকানপাট সাজিয়ে বসে, কিন্তু অতি সাধারণ জিনিষও কিনতে পাওয়া যায় না। নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের অভাব বার্লিনে প্রচুর। সুঁচ ব্লেড প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ বার্লিনের বাজারে নেই। জার্ম্মানীর "পানামা" ব্লেড এক সময় সারা দুনিয়ার বাজারে খুব চালু হয়েছিল, কিন্তু বর্ত্তমান বার্লিনে ব্লেড দুষ্প্রাপ্য বললেই চলে। এত সব দুর্ভাগ্যের মধ্যেও দেখলাম বার্লিনের শিল্পীদের প্রতিভায় মরচে পড়ে নি, সৃজনীশক্তি তারা হারায় নি। ইংরেজ ও মার্কিনরা টিনে ভরা খাদ্যটুকু গ্রহণ করে টিনগুলিকে অকেজো জিনিষ বলে ফেলে দেয়, কিন্তু বর্ত্তমান বার্লিনের শিল্পকারগণ সেই পরিত্যক্ত টিনগুলি কুড়িয়ে তা দিয়ে কাজ চালাবার মত ব্লেড প্রস্তুত করছে। ধাতুর অভাব খুবই বেশী, দেখলাম কাঠ দিয়ে ক্ষুরের হাতল তৈরী করে চমৎকার ভাবে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। বার্লিনে বস্ত্রসমস্যা ভারতের চেয়ে অনেক প্রবল, বিশেষ করে শীতের দেশে গরম কাপড় না হলে চলতেই পারে না, তারা কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাকে খুশীমনে মেনে নিয়েছে—বস্ত্রাভাবের জন্যে হা-হুতাশ নেই।

যুদ্ধের সময় থেকেই জার্ম্মানীর খাদ্য ভাণ্ডারে ঘাটতি সুরু হয়েছে—বর্ত্তমান অবস্থার ত তুলনাই হতে পারে না।

বার্লিনে প্রত্যেক জার্ম্মান সপ্তাহে ৫১ গ্রাম (সাড়ে চারি তোলা) মাংস পায়, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে সকলের ভাগ্যে তাও জোটে না। লার্ড বা ফ্যাট নামক পদার্থ খাদ্যদ্রব্য ভাজবার জন্য অল্প পরিমাণেও সেখানে পাওয়া যায় না। রুটি প্রতি সপ্তাহে আধ পাউণ্ড করে দেওয়া হয়, দুধ চোখে দেখা যায় না। নবজাত শিশুকে প্রথম কয়েক দিন স্যাকারিন জলে ভিজিয়ে খাওয়ান হয় তারপরে সুপ অভ্যাস করান হয়। কোনও প্রকারের কাঁচা বা পাকা ফল জার্ম্মানীর কি গ্রামবাসী কি শহুরে লোকেরা বহুদিন চোখে দেখে নি।

স্কুল কলেজের শিক্ষা চলছে মন্দাক্রান্তা ছন্দে। বাইরের জলুস খানিকটা আছে, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের প্রাণখোলা স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের অভিব্যক্তি নেই। বার্লিনে পৌঁছে বিশেষ করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচিত হওয়ার বাসনা ছিল, কিন্তু অন্তরায় হ'ল জার্ম্মান ভাষা সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা। বিশেষ চেষ্টা করে কতকটা কাজ চালাবার মত ভাষা আয়ত্ত করলাম, আর বাকিটা বোঝাবার প্রয়াস পেতাম অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে। তৎসত্ত্বেও যেটুকু ত্রুটি রয়ে যেত—সেটুকু পূরণ করতে চেয়েছিলাম ভালবাসা দিয়ে তাদের চিত্ত জয় করে। ট্যাক্সি করে টিফিনের সময় প্রায়ই কোনও না কোন স্কুলের দরজায় গিয়ে হাজির হতাম—কাঁধে বেদুইনের ঝুলি তাতে নানা রকমের চকলেট, লজেঞ্চ, টফি ইত্যাদি। ওগুলি তাদের বিলিয়ে দিয়ে এক নির্ম্মল আনন্দ লাভ করতাম। বালকবালিকারাও তাদের ভারতীয় বন্ধুকে কয়েক দিনের মধ্যেই আপন করে নিয়েছিল।

রুশ অধিকৃত অঞ্চলের প্রবেশদ্বার

পূর্ব্বেই বলেছি যে আমি হোটেল আমজুতে উঠেছিলাম। হোটেল আমজুর একটু বর্ণনা দেওয়া দরকার। হোটেল আমজুর কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে ম্যানেজার ইংরেজ এবং রান্নাঘরের তত্ত্বাবধানকারী দু'জন ছিলেন ইংরেজ। নিম্নতন কর্ম্মচারীদের ভিতরে সবাই ছিল জার্ম্মান। পরিবেশন থেকে

বুঝি ছুঁড়েই ফেলে দেয়। তুলসীর চোখ যেন মৌন ভাষায় বলে, "আহা, কত কষ্ট। নাও না এ টাকা কয়টা।" সে যেন মূর্ত্তিমতী করুণা। কি জানি কি ভেবে শুনা রাজী হ'ল।

দিন সাতেক পর তুলসী আবার এল, তার হাতে কিছু জনরা আর মহুয়া ফল। শুনা রাঁধছিল। হাসি হাসি চোখে তুলসী বেটাছেলের রান্না করা দেখছিল,···হাত পুড়ছে, ভাত পুড়ছে; হাঁড়ি হেঁসেল ওলটপালট··

যার কাজ তাকে সাজে। তুলসী বললে, "আসব আমি"। শুনা না বলতে পারল না। মুহূর্ত্তে সব বদলে গেল নিপুণ হাতের ছোঁয়ায়। মেঘের মত কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের মেঝেতে, কতদিন গোবর-লেপ পড়ে নি মেঝের ওপর কে জানে। উনুনের আগুনের লাল আভা এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে—আঙুলের ডগাগুলির লীলায়িত গতি, সুডোল বাহু দুটি চোখকে আকৃষ্ট করে। সর্ব্বাঙ্গে নিকষ-কালোর অপরূপ চাকচিক্য।

পেটুক ছেলের মত শুনা খেতে বসল। এ যে কতদিন জোটে নি, এই মমতার স্নিগ্ধতা, গৃহিণীপনার স্নেহস্পর্শ! শুনার সামনে শালপাতা, তুলসী হাওয়া করছে; বলছে, 'এটা খাও, ওটা ফেলো না'—এর মধ্যে অকস্মাৎ শোনা গেল কাটুকোর বিকট ঘেউ ঘেউ, যেন বাড়ীতে ডাকাত চড়াও হয়েছে। দাঁত খিঁচিয়ে কুকুরটা তুলসীকেই যেন বলছে "তফাৎ যাও, নইলে টের পাবে আমার দাঁতের ধার"? তার চোখে যেন খুনীর দৃষ্টি। তুলসীকে এক কোণে ভয়ে জড়সড় দেখে শুনা ভাত ফেলে একটা চেলাকাঠ নিয়ে কুকুরটাকে এক ঘা বসিয়ে দিলে, তারপর মনে হ'ল যেন চোখের জল সামলাল। কাটুকো কিন্তু থামে না, উঠানে বসে আর্ত্তনাদে পাড়া কাঁপিয়ে তুলল, যেন বাড়ীতে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। তুলসী হেসেই বিদায় নিলে, যাবার সময় কি ভাবল সে-ই জানে। কাটুকো আড়চোখে মেয়েটির চলনশীল ছায়াকেই যেন লক্ষ্য করতে লাগল।

বিকালবেলা শুনার মনে পড়ল কাটুকোর খাওয়া হয় নি; অনুতাপের গ্লানিতে তার মনটা ভরে গেল। কুকুরটা তার একসঙ্গে খায়, তাদের দুজনের সমান সমান ভাগ। আজ সে করেছে কি? অবোলা জীবটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। তাই তো শ্রীমানের গোসা হয়েছে। শুনা ডাক দিলে 'কাটুকো'। সে এল, ভাবে ভঙ্গিতে তাহার ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নেই, একটা সলজ্জ অপরাধীর দৃষ্টি। প্রভু খাবার দিচ্ছে দেখে কাটুকো আনন্দে যেন উপচে পড়ল।

শুনা হাসল, আদরের সুরে বললে, "হ্যাংলা, হাভাতে"। তারপর কুকুরটার গায়ে হাত বুলোতে লাগল, আদরে আদরে, হাসিঠাটায় উচ্ছল হয়ে উঠল। মনে পড়ল মৃতা স্ত্রীর কথা, কাটুকো ছিল একান্ত ভাবে তারি আদরের। সেই এক আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে এনে মায়ের মত যত্নে সে কুকুরটাকে এত বড়টি করেছিল, সন্তানহীনা নারী মাতৃত্বের স্বাদ সে পেত কাটুকোকে আদর সোহাগ করে। খাওয়া-দাওয়া শোয়া সব সময়েই কাটুকোর খোঁজ পড়ে, ও যেন তার জাগ্রতে চিন্তা, নিদ্রায় স্বপ্ন। সবাই বলত, কুকুর-পাগলী এমন আর দেখি নি বাপু! লক্ষ্মীছাড়া কুকুরটার কাণ্ডও ছিল অদ্ভুত। এক এক দিন সে কোথায় পালাত কে জানে। তখন "খোঁজ, খোঁজ" বনেবাদাড়ে, পাহাড়ে, মাঠে। ওদিকে শুনার স্ত্রীর খাওয়া-দাওয়া বন্ধ···দু দিন-তিন দিন পর মহাপ্রভু বাড়ী ফিরলেন যেন হারানিধি।

ক্রমে-ক্রমে মনে পড়তে লাগল, স্ত্রীর মৃত্যুর কথা, তার শেষ উক্তি 'কাটুকোকে দেখো'। চারপাইয়ে করে শব নিয়ে তারা যাত্রা করেছে, সঙ্গে তাদের কাটুকো, চোখ ফুলেছে কেঁদে কেঁদে, মাঝে মাঝে করুণ আর্ত্তনাদে চারদিক কেঁপে উঠছে···

আর ভাবা যায় না। মাথাটা বন্ বন্ করে ঘোরে··· টলতে টলতে শুনা বেরিয়ে পড়ে, সামনের জঙ্গলে গিয়ে কি একটা লতাপাতা নিয়ে এল। তারপর তা ছেঁচে কাটকোর সেই কাটা জায়গাটায় দিতে গিয়ে ক্ষত দেখে বুঝতে পারল সে কি অন্যায় করেছে। ততক্ষণে চোখের জল আর মানা মানে না।

বিপত্নীকের বিয়ে হবে, চারদিকে একটা হাসিঠাট্টার জোয়ার এসে গেছে। কেউ বলছে, "এ সব মস্করা মুখ ভেঙচায় বানরের মত।" কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি মত প্রকাশ করছে, "সব সমান, 'ছাড়ুই কুড়ী' (তালাক দেওয়া মেয়ে) সবুজ বুলবুল, হাজার রকম ডাকে। রাঁড়ীগুলো বাঁজা ঘোড়া, হান্ হান্; আর বউ-মরা বর, কর্কশ ঝাঁটার মত।"

চলল নাচগান, তুলসী-শুনাকে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা···শুনা যেন কি একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে···এক একবার আড় চোখে তুলসীকে দেখছে, আর ভাবছে এতক্ষণ 'লু' বইছিল, দিগদিগন্ত জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল; তার মধ্যে আজ বর্ষা নেমেছে, সেই নব জলধারায় সে ভিজছে—এ যেন তার মুক্তিস্নান।

দূরে বুড়া পরগনাইত্, পাকা দাড়িওয়ালা মুখে হাসছে। সামনে তার বউ। দু'জনার চোখেই যেন একটা স্বপ্ন খেলে যাচ্ছে··প্রকৃতি আজ উর্ণনাভের মত দুটি নরনারীকে তার জালে জড়িয়েছে।

শুনা কাপড়ের মধ্য থেকে একটা রূপার হাঁসুলী বার করে পরগনাইতের স্ত্রীর হাতে দিলে। বুড়ী তুলসীকে কোলে করে তার গলায় পরাল···মেয়েরা কতকগুলি ফুল তার হাতে গুঁজে দিচ্ছে···

দূরে মনে হ'ল সরে যাচ্ছে এক জোড়া ভাঁটার মত লাল চোখ। আপন মনে শুনা বলে উঠল, "কাটুকো"!

চার দিকে একটা মাতাল হাওয়া বইছিল। বসন্ত এসে গেছে, কিন্তু শুনার মনে হ'ল আচমকা একটা কুয়াসার জাল এসে যেন দিগ দিগন্ত আচ্ছন্ন করে দিলে। হঠাৎ সে যেন অন্ধ হয়ে গেল……

আবার বিশ্রম্ভালাপ, নিজের কুটিরে খাটিয়ায় শুয়ে।

"পাগল হয়েছিস! দেখি মাথাটা! বাবা, কি গরম!" কাটকো মাথা নাড়ে, "না।"

"তা হ'লে এখানে সেখানে কেঁদে কেঁদে বেড়াস কেন? তুলসীর সঙ্গে আমায় দেখলেই ক্ষেপে যাস কেন? বল্ কেন, হতভাগা পাজী!…"

কাটকো গুড়িসুড়ি মেরে শুনার পা চাটছে।

"জবাব দে, তা নইলে, তোর এক দিন আমার এক দিন।"

কুকুরটা সাড়া দিলে। ঘেউ ঘেউ নয়, যেন একটা কাঁদুনীর সুর, ক্লান্ত, অতীতের স্মৃতিবিজড়িত; কোথায় যেন কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়।…

ক্রুদ্ধ প্রভু হুকুম জারী করলেন, "এক দিন উপোস, ঠায় উপোস। পাগলামির ওষুধ দিলাম।"…

বিয়ের দিন এসে গেছে। বন্ধুবান্ধব নিয়ে, বাজনা বাজিয়ে বরপক্ষ দক্ষিণ কাঠিকুণ্ড রওনা হ'ল। পৌঁছুতেই জগ-মাঝি মেয়েদের নিয়ে এল বরপক্ষের পা ধোয়াতে…দু-পক্ষে একটা দাঙ্গার নাটক হ'ল, বর কাড়াকাড়ি…নাচ, গান, মদ্যপান… জগ-মাঝি মাতালদের সামলায়, গ্রামের ভদ্রতা বাঁচায়…

পাগড়ী মাথায় শুনা বসে আছে, সিন্দুর দানের এখনো অনেক দেরি। সব যেন আজ ওলটপালট, খেয়ালী কাণ্ড। চোখে যেন পৃথিবী, নরনারী—সব কিছুরই চেহারা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। লোকগুলো কি 'বোঙ্গা' (অপদেবতা), নারীগুলো সব ডাইনি? মনে হচ্ছে শুনা যেন পাতালপুরীতে যাচ্ছে…তাদের রূপকথায় যেমন বলে…তাকে পাকড়াও করেছে এক অপরূপ 'বোঙ্গী' রাজকন্যা…গভীর অন্ধকার, গহ্বর…রাজসভা…অজগরের মাথায় আসনগুলো ঝলমল করছে…বোঙ্গী? না তুলসী? সে নাচছে, দুলছে, সাপ-বাঘের সঙ্গে খেলা করছে…

আর একটি মেয়ে এসে শুনাকে বলছে,"আমরা জিতেছি।"

শুনার সাহস বেড়েছে—সে জবাবে বলছে, "মেয়েরা সবখানেই জেতে।"

পাশ থেকে আর এক বোঙ্গী হাসল, "এটা কাপুরুষ।"

একটি ছিপছিপে তরুণী বললে—"বোকা"। তার দেহে একটা চাঞ্চল্য খেলে যাচ্ছে…

"তুলসীর চাকর গো," খিল খিল করে হেসে বললে এক মোটা বোঙ্গী।

তার পর নাচ সুরু হ'ল, দাড়িওয়ালা বোঙ্গা, অর্দ্ধেক নারী অর্দ্ধেক পশু বোঙ্গীর দল…হৈ হৈ, কলরব, উদ্দণ্ড তাণ্ডব…

অনতিদূরে শোনা গেল একটা কোলাহল, তার পর একটা চীৎকার, "মার, মার! খেপা কুকুর।" আর একজন যেন বলছে—"মেরো না ওটা শুনার পোষা, কাটকো যে।"

তন্দ্রাবিজড়িত চোখে শুনা আঁৎকে উঠল, বললে—"কাটকো, কি বলছ।"

একজন শুনাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে—"দেখ দেখ, তোমার কুকুরটা পাগল হয়েছে। কাছে গেলেই কামড়াতে আসে।"

নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। "হ'ল কি", ভাবলে শুনা। রাগে আগুন হয়ে বুড়া পরগনাইত্ শুনাকে এসে বললে—"তোমার কুকুর তুলসীকে কামড়েছে।"

শুনা হাঁকল, "কোথায় ওটা?"

আঙ্গিনার কোণে একটা পেঁপে গাছের নীচে কাটকো গুড়ি মেরে বসে ছিল। কোথা থেকে একটা লাঠি যোগাড় করে শুনা তার দিকে ছুটল। কাটকো চাইল শুনার পানে, যেন সে জানে তার অন্তিম মুহূর্ত্ত এসে গেছে। শুনা চোখ বুজল…তড়িদ্বেগে তার চোখের সামনে যেন একটা ছায়া-ছবি খেলে গেল…তার স্ত্রীর মৃত্যু হচ্ছে…মৃত্যুপথ-যাত্রিণী বলছে, "ওকে দেখো।" লোকজনের চিৎকার কানে গেল, কে একটা লোক, হয় তো বা একটা মাতাল, বলছে—'মার, মার, ক্ষেপা কুকুর, মার।' দিশাহারা শুনা মারল লাঠি ছুঁড়ে।

মেয়েরা বর নিতে এসে শোনে শুনা কাটকোর মৃতদেহ নিয়ে পালিয়েছে। এ কি কাণ্ড! লোকে ছুটল শুনার বাড়ী, কিন্তু ভগ্নদূত ফিরে এল, শুনা আসবে না।

চার দিকে যেন একটা অমঙ্গলের ছায়া ঘুরছে। তুলসীকে সবাই প্রবোধ দিচ্ছে, এমন সময় পরগনাইত্ ও তার স্ত্রী ফিরে এলেন দেখা গেল; ততক্ষণে সাঁওতাল পরগণার জাঙ্গালে রাঙা বেলুনের মত সূর্য্যোদয় হচ্ছে।

শোনা গেল কুকুরটাকে নিয়ে পাঁচ মাইল দৌড়ে এক ওঝার বাড়ী ছুটেছিল শুনা। সে মরা বাঁচিয়েছে কি এক পাতা দিয়ে। অদ্ভুত ওষুধ, পেয়েছিল সে ময়ূরভঞ্জের এক জান-গুরুর কাছে।

"কিন্তু, কুকুরটা ত বেঁচেছে; বিয়ে করতে ক্ষতি কি?" একটি মধ্যবয়সী নারী প্রশ্ন করলে।

"তা, হয় না গো," জবাব দিলেন পরগনাইতের স্ত্রী। "শুনা আমার পা ধরে বললে, তুলসীকে বল আমায় ক্ষমা করতে। আমি নিজের মন বুঝিনি, কাটকোকে ছেড়ে আমি বাঁচব না। আসলে আমি তো তুলসীকে ভালবাসি নি, চেয়েছিলাম ভুলতে…"

ততক্ষণে কুয়াসার মধ্য দিয়ে সূর্য্যালোক এসে সবাইকে যেন অভিষিক্ত করছে। ধীরে ধীরে কখন যে এসে তুলসী সেখানে দাঁড়িয়েছিল, কেউ দেখে নি। সে বলে উঠল, "তা বেশ, ওরা সুখী হোক।" মনে হ'ল গলাটা যেন কেঁপে গেল।

বুঝি ছুঁড়েই ফেলে দেয়। তুলসীর চোখ যেন মৌন ভাষায় বলে, "আহা, কত কষ্ট। নাও না এ টাকা কয়টা।" সে যেন মূর্ত্তিমতী করুণা। কি জানি কি ভেবে শুনা রাজী হ'ল।

দিন সাতেক পর তুলসী আবার এল, তার হাতে কিছু জনরা আর মহুয়া ফল। শুনা রাঁধছিল। হাসি হাসি চোখে তুলসী বেটাছেলের রান্না করা দেখছিল,...হাত পুড়ছে, ভাত পুড়ছে; হাঁড়ি হেঁসেল ওলটপালট ..

যার কাজ তাকে সাজে। তুলসী বললে, "আসব আমি"। শুনা না বলতে পারল না। মুহূর্ত্তে সব বদলে গেল নিপুণ হাতের ছোঁয়ায়। মেঘের মত কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের মেঝেতে, কতদিন গোবর-লেপ পড়ে নি মেঝের ওপর কে জানে। উনুনের আগুনের লাল আভা এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে—আঙুলের ডগাগুলির লীলায়িত গতি, সুডোল বাহু দুটি চোখকে আকৃষ্ট করে। সর্ব্বাঙ্গে নিকষ-কালোর অপরূপ চাকচিক্য।

পেটুক ছেলের মত শুনা খেতে বসল। এ যে কতদিন জোটে নি, এই মমতার স্নিগ্ধতা, গৃহিণীপনার স্নেহস্পর্শ! শুনার সামনে শালপাতা, তুলসী হাওয়া করছে; বলছে, 'এটা খাও, ওটা ফেলো না'—এর মধ্যে অকস্মাৎ শোনা গেল কাট্‌কোর বিকট খেউ খেউ, যেন বাড়ীতে ডাকাত চড়াও হয়েছে। দাঁত খিঁচিয়ে কুকুরটা তুলসীকেই যেন বলছে "তফাৎ যাও, নইলে টের পাবে আমার দাঁতের ধার"? তার চোখে যেন খুনীর দৃষ্টি। তুলসীকে এক কোণে ভয়ে জড়সড় দেখে শুনা ভাত ফেলে একটা চেলাকাঠ নিয়ে কুকুরটাকে এক ঘা বসিয়ে দিলে, তারপর মনে হ'ল যেন চোখের জল সামলাল। কাট্‌কো কিন্তু থামে না, উঠানে বসে আর্ত্তনাদে পাড়া কাঁপিয়ে তুলল, যেন বাড়ীতে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। তুলসী হেসেই বিদায় নিলে, যাবার সময় কি ভাবল সে-ই জানে। কাট্‌কো আড়চোখে মেয়েটির চলনশীল ছায়াকেই যেন লক্ষ্য করতে লাগল।

বিকালবেলা শুনার মনে পড়ল কাট্‌কোর খাওয়া হয় নি; অনুতাপের গ্লানিতে তার মনটা ভরে গেল। কুকুরটা তার একসঙ্গে খায়, তাদের দুজনের সমান সমান ভাগ। আজ সে করেছে কি? অবোলা জীবটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। তাই তো শ্রীমানের গোসা হয়েছে। শুনা ডাক দিলে 'কাট্‌কো'। সে এল, ভাবে ভঙ্গিতে তাহার ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নেই, একটা সলজ্জ অপরাধীর দৃষ্টি। প্রভু খাবার দিচ্ছে দেখে কাট্‌কো আনন্দে যেন উপচে পড়ল।

শুনা হাসল, আদরের সুরে বললে, "হ্যাংলা, হাভাতে"। তারপর কুকুরটার গায়ে হাত বুলোতে লাগল, আদরে আদরে, হাসিঠাটায় উচ্ছল হয়ে উঠল। মনে পড়ল মৃতা স্ত্রীর কথা, কাট্‌কো ছিল একান্ত ভাবে তারি আদরের। সেই এক আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে এনে মায়ের মত যত্নে সে কুকুরটাকে এত বড়টি করেছিল, সন্তানহীনা নারী মাতৃত্বের স্বাদ সে পেত কাট্‌কোকে আদর সোহাগ করে। খাওয়া-দাওয়া শোয়া সব সময়েই কাট্‌কোর খোঁজ পড়ে, এ যেন তার জাগ্রতে চিন্তা, নিদ্রায় স্বপ্ন। সবাই বলত, কুকুর-পাগলী এমন আর দেখি নি বাপু! লক্ষ্মীছাড়া কুকুরটার কাণ্ডও ছিল অদ্ভুত। এক এক দিন সে কোথায় পালাত কে জানে। তখন "খোঁজ, খোঁজ" বনেবাদাড়ে, পাহাড়ে, মাঠে। ওদিকে শুনার স্ত্রীর খাওয়া-দাওয়া বন্ধ...দু দিন-তিন দিন পর মহাপ্রভু বাড়ী ফিরলেন যেন হারানিধি।

ক্রমে-ক্রমে মনে পড়তে লাগল, স্ত্রীর মৃত্যুর কথা, তার শেষ উক্তি 'কাট্‌কোকে দেখো'। চারপাইয়ে করে শব নিয়ে তারা যাত্রা করেছে, সঙ্গে তাদের কাট্‌কো, চোখ ফুলেছে কেঁদে কেঁদে, মাঝে মাঝে করুণ আর্ত্তনাদে চারদিক কেঁপে উঠছে...

আর ভাবা যায় না। মাথাটা বন্ বন্ করে ঘোরে... টলতে টলতে শুনা বেরিয়ে পড়ে, সামনের জঙ্গলে গিয়ে কি একটা লতাপাতা নিয়ে এল। তারপর তা ছেঁচে কাটকোর সেই কাটা জায়গাটায় দিতে গিয়ে ক্ষত দেখে বুঝতে পারল সে কি অন্যায় করেছে। ততক্ষণে চোখের জল আর মানা মানে না।

বিপত্নীকের বিয়ে হবে, চারদিকে একটা হাসিঠাটার জোয়ার এসে গেছে। কেউ বলছে, "এ সব মদ্দরা মুখ ভেংচায় বানরের মত।" কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি মত প্রকাশ করছে, "সব সমান, 'ছাড়ই কুড়ী' (তালাক দেওয়া মেয়ে) সবুজ বুলবুল, হাজার রকম ডাকে। রাঁড়ীগুলো বাঁজা ঘোড়া, হান্ হান্; আর বউ-মরা বর, কর্কশ ঝাঁটার মত।"

চলল নাচগান, তুলসী-শুনাকে নিয়ে ঠাটা-মস্করা...শুনা যেন কি একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে...এক একবার আড় চোখে তুলসীকে দেখছে, আর ভাবছে এতক্ষণ 'লু' বইছিল, দিগদিগন্ত জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল; তার মধ্যে আজ বর্ষা নেমেছে, সেই নব জলধারায় সে ভিজছে—এ যেন তার মুক্তিস্নান।

দূরে বুড়া পরগনাইত্, পাকা দাড়িওয়ালা মুখে হাসছে। সামনে তার বউ। দু'জনার চোখেই যেন একটা স্বপ্ন খেলে যাচ্ছে ..প্রকৃতি আজ ঊর্ণনাভের মত দুটি নরনারীকে তার জালে জড়িয়েছে।

শুনা কাপড়ের মধ্য থেকে একটা রূপার হাঁসুলী বার করে পরগনাইতের স্ত্রীর হাতে দিলে। বুড়ী তুলসীকে কোলে করে তার গলায় পরাল...মেয়েরা কতকগুলি ফুল তার হাতে গুঁজে দিচ্ছে...

দূরে মনে হ'ল সরে যাচ্ছে এক জোড়া ভাঁটার মত লাল চোখ। আপন মনে শুনা বলে উঠল, "কাট্‌কো"!

চার দিকে একটা মাতাল হাওয়া বইছিল। বসন্ত এসে গেছে, কিন্তু শুনার মনে হ'ল আচমকা একটা কুয়াসার জাল এসে যেন দিগ দিগন্ত আচ্ছন্ন করে দিলে। হঠাৎ সে যেন অন্ধ হয়ে গেল······

আবার বিশ্রম্ভালাপ, নিজের কুটিরে খাটিয়ায় শুয়ে।

"পাগল হয়েছিস! দেখি মাথাটা! বাবা, কি গরম!"

কাট্‌কো মাথা নাড়ে, "না।"

"তা হ'লে এখানে সেখানে কেঁদে কেঁদে বেড়াস কেন? তুলসীর সঙ্গে আমায় দেখলেই ক্ষেপে যাস কেন? বল্‌ কেন, হতভাগা পাজী!···"

কাটকো গুড়িসুড়ি মেরে শুনার পা চাটছে।

"জবাব দে, তা নইলে, তোর এক দিন আমার এক দিন।"

কুকুরটা সাড়া দিলে। ঘেউ ঘেউ নয়, যেন একটা কাঁদুনীর সুর, ক্লান্ত, অতীতের স্মৃতিবিজড়িত; কোথায় যেন কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়।···

ক্রুদ্ধ প্রভু হুকুম জারী করলেন, "এক দিন উপোস, ঠায় উপোস। পাগলামির ওষুধ দিলাম।"···

বিয়ের দিন এসে গেছে। বন্ধুবান্ধব নিয়ে, বাজনা বাজিয়ে বরপক্ষ দক্ষিণ কাঠিকুণ্ড রওনা হ'ল। পৌঁছুতেই জগ-মাঝি মেয়েদের নিয়ে এল বরপক্ষের পা ধোয়াতে···দু-পক্ষে একটা দাঙ্গার নাটক হ'ল, বর কাড়াকাড়ি···নাচ, গান, মদ্যপান··· জগ-মাঝি মাতালদের সামলায়, গ্রামের ভদ্রতা বাঁচায়···

পাগড়ী মাথায় শুনা বসে আছে, সিন্দুর দানের এখনো অনেক দেরি। সব যেন আজ ওলটপালট, খেয়ালী কাণ্ড। চোখে যেন পৃথিবী, নরনারী—সব কিছুরই চেহারা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। লোকগুলো কি 'বোঙ্গা' (অপদেবতা), নারীগুলো সব ডাইনি? মনে হচ্ছে শুনা যেন পাতালপুরীতে যাচ্ছে···তাদের রূপকথায় যেমন বলে···তাকে পাকড়াও করেছে এক অপরূপ 'বোঙ্গী' রাজকন্যা···গভীর অন্ধকার, গহ্বর···রাজসভা···অজগরের মাথায় আসনগুলো ঝলমল করছে···বোঙ্গী? না তুলসী? সে নাচছে, দুলছে, সাপ-বাঘের সঙ্গে খেলা করছে···

আর একটি মেয়ে এসে শুনাকে বলছে, "আমরা জিতেছি।"

শুনার সাহস বেড়েছে—সে জবাবে বলছে, "মেয়েরা সবখানেই জেতে।"

পাশ থেকে আর এক বোঙ্গী হাসল, "এটা কাপুরুষ।"

একটি ছিপছিপে তরুণী বললে—"বোকা"। তার দেহে একটা চাঞ্চল্য খেলে যাচ্ছে···

"তুলসীর চাকর গো," খিল খিল করে হেসে বললে এক মোটা বোঙ্গী।

তার পর নাচ সুরু হ'ল, দাড়িওয়ালা বোঙ্গা, অর্দ্ধেক নারী অর্দ্ধেক পশু বোঙ্গীর দল···হৈ হৈ, কলরব, উদ্দণ্ড তাণ্ডব···

অনতিদূরে শোনা গেল একটা কোলাহল, তার পর একটা চীৎকার, "মার, মার! খেপা কুকুর।" আর একজন যেন বলছে—"মেরো না ওটা শুনার পোষা, কাট্‌কো যে।"

তন্দ্রাবিজড়িত চোখে শুনা আঁৎকে উঠল, বললে—"কাটকো, কি বলছ।"

একজন শুনাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে—"দেখ দেখ, তোমার কুকুরটা পাগল হয়েছে। কাছে গেলেই কামড়াতে আসে।"

নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। "হ'ল কি", ভাবলে শুনা। রাগে আগুন হয়ে বুড়া পরগনাইত্‌ শুনাকে এসে বললে—"তোমার কুকুর তুলসীকে কামড়েছে।"

শুনা হাঁকল, "কোথায় ওটা?"

আঙ্গিনার কোণে একটা পেঁপে গাছের নীচে কাট্‌কো গুড়ি মেরে বসে ছিল। কোথা থেকে একটা লাঠি যোগাড় করে শুনা তার দিকে ছুটল। কাটকো চাইল শুনার পানে, যেন সে জানে তার অন্তিম মুহূর্ত্ত এসে গেছে। শুনা চোখ বুজল···তড়িদ্বেগে তার চোখের সামনে যেন একটা ছায়া-ছবি খেলে গেল···তার স্ত্রীর মৃত্যু হচ্ছে···মৃত্যুপথ-যাত্রিণী বলছে, "ওকে দেখো।" লোকজনের চিৎকার কানে গেল, কে একটা লোক, হয় তো বা একটা মাতাল, বলছে—'মার, মার, ক্ষেপা কুকুর, মার।' দিশাহারা শুনা মারল লাঠি ছুঁড়ে।

মেয়েরা বর নিতে এসে শোনে শুনা কাট্‌কোর মৃতদেহ নিয়ে পালিয়েছে। এ কি কাণ্ড! লোকে ছুটল শুনার বাড়ী, কিন্তু ভগ্নদূত ফিরে এল, শুনা আসবে না।

চার দিকে যেন একটা অমঙ্গলের ছায়া ঘুরছে। তুলসীকে সবাই প্রবোধ দিচ্ছে, এমন সময় পরগনাইত্‌ ও তার স্ত্রী ফিরে এলেন দেখা গেল; ততক্ষণে সাঁওতাল পরগণার জাঙ্গালে রাঙা বেলুনের মত সূর্য্যোদয় হচ্ছে।

শোনা গেল কুকুরটাকে নিয়ে পাঁচ মাইল দৌড়ে এক ওঝার বাড়ী ছুটেছিল শুনা। সে মরা বাঁচিয়েছে কি এক পাতা দিয়ে। অদ্ভুত ওষুধ, পেয়েছিল সে ময়ূরভঞ্জের এক জান-গুরুর কাছে।

"কিন্তু, কুকুরটা ত বেঁচেছে; বিয়ে করতে ক্ষতি কি?" একটি মধ্যবয়সী নারী প্রশ্ন করলে।

"তা, হয় না গো," জবাব দিলেন পরগনাইতের স্ত্রী। "শুনা আমার পা ধরে বললে, তুলসীকে বল আমায় ক্ষমা করতে। আমি নিজের মন বুঝিনি, কাটকোকে ছেড়ে আমি বাঁচব না। আসলে আমি তো তুলসীকে ভালবাসি নি, চেয়েছিলাম ভুলতে···"

ততক্ষণে কুয়াসার মধ্য দিয়ে সূর্য্যালোক এসে সবাইকে যেন অভিষিক্ত করছে। ধীরে ধীরে কখন যে এসে তুলসী সেখানে দাঁড়িয়েছিল, কেউ দেখে নি। সে বলে উঠল, "তা বেশ, ওরা সুখী হোক।" মনে হ'ল গলাটা যেন কেঁপে গেল।

আঁরি বার্গ্‌সঁ

(১৮৫৯-১৯৪১)

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

১৯১৪ সাল প্রথম মহাযুদ্ধের বাড়বাগ্নিকে পৃথিবীর বুকে নিয়ে এল। মানবসমাজ নীতিজ্ঞান হারিয়ে ধ্বংসের লীলায় মেতে উঠল। সেদিন মনে হয়েছিল সভ্যতার অগ্রগতির পথ বুঝিবা রুদ্ধ হয়ে গেল।

ঠিক এমনই সময় এই প্রলয় তাণ্ডবের অন্তরাল থেকে ফরাসী দেশের এক সৌম্যমূর্ত্তি অধ্যাপক সর্ব্বসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করলেন এই বাণী নিয়ে: 'আজ মানুষ হতাশ হয়ে পড়েছে, পথচলায় তার ক্লান্তি এসেছে। কিন্তু নিরাশার কিছু নেই। এক দিন আমিও ক্লান্ত হয়েছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই অকস্মাৎ আমি এ জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করেছি।'

প্রথম জীবনে এই সত্যসন্ধ অধ্যাপকটির অন্ধ ভক্তি ছিল বিজ্ঞানশাস্ত্রে, গণিতে ছিল অসাধারণ মেধা। কিন্তু তারই সঙ্গে ছিল শিল্পকলায় অনুরাগ; সুন্দর ভাষা, সুন্দর প্রকাশভঙ্গী —একই সঙ্গে বার্গ্‌সঁর ব্যক্তিত্ব দুটি বিভিন্ন ধারায় বয়ে চলেছিল। একই সময়ে তিনি প্রকৃতিবিজ্ঞান ও গ্রীক্ সাহিত্যে সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন।

১৮৫৯ সালে পারী শহরে বার্গ্‌সঁর জন্ম। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন ঘোরতর জড়বাদী। হৃদয়াবেগের মূল্য তাঁর কাছে কিছুই ছিল না। তাঁর মতে মায়ের অশ্রু, প্রকৃতির রূপরাশি অর্থহীন, জগতের সব কিছু আকস্মিক আণবিক সংগঠনের ফলে উদ্ভূত, আবার ধূলিতেই তারা মিশে যায়। জীবন একটা আকস্মিক ঘটনা—তার কোন উদ্দেশ্য নেই।—এই ধরণের মতবাদের জন্যে সহপাঠীরা তাঁকে নাস্তিক আখ্যা দিয়েছিল।

পরীক্ষা পাসের পর 'ক্লেরমঁ-ফের'াঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ নিলেন বার্গ্‌সঁ। এইখানে মহানগরীর কলকোলাহল থেকে বহুদূরে শান্ত পল্লীর পথে ঘুরতে ঘুরতে বার্গ্‌সঁর মনে একটা পরিবর্ত্তন এল।

এখানে মহানগরীর 'জনসম্পাত-মদিরা' ছিল না, ছিল মুক্ত প্রকৃতির দৈন্যলেশহীন রূপসম্ভার। এখানকার মৌন প্রশান্তির মধ্যে বার্গসঁ উপলব্ধি করতে পারলেন জীবন নামে সত্তাটাকে শুধু একটা বৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়ে বেঁধে ফেলা যায় না—তার অন্তরালে নিগূঢ়, অনির্ব্বচনীয় কোনও একটা শক্তি রয়েছে। পল্লীর আকাশে সূর্য্যাস্তের আরক্ত মহিমার কাছে রসায়নাগারের পরীক্ষাগুলিকে বড় তুচ্ছ, বড় ক্ষুদ্র মনে হ'তে লাগল। তারাখচিত নৈশ আকাশের অতন্দ্র মৌনতায় যে জীবন গোপন রয়েছে, মহাকবি শেক্‌স্‌পিয়রের যে বিরাট মনের আভাস পেয়ে বিশ্ববাসী বিমুগ্ধ—সে সব কি শুধুই কতকগুলি আকস্মিক আণবিক সংগঠনের ফল? বার্গসঁর মন বলল, 'না। যারা জীবনে বিশ্বাস হারিয়েছে, জীবনের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য যাদের অন্ধ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না, বিজ্ঞান তাদেরই সম্বল। বিজ্ঞান জীবনের সারল্যকে অনর্থক জটিল করে তুলেছে। পূর্ণকে খণ্ড করে দেখাই তার স্বভাব। এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—

'আপনারা সকলেই অণুবীক্ষণ যন্ত্র দেখেছেন ও ব্যবহার করেছেন। একটি মাকড়সার পা-কে অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়ে কি অদ্ভুত দেখায়। কিন্তু জিনিষটাই বা কি, আর আপনারা দেখলেনই বা কি!'

তিনি যা বললেন, তার সার মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সব পাওয়া যায়, শুধু পাওয়া যায় না গতিকে। বিজ্ঞান গতিকে আজ অবধি ব্যাখ্যা করতে পারে নি। গতিকে সে স্থিতির রূপ দিয়ে দেখায়। দুটি বিন্দু এঁকে একটি রেখার সাহায্যে তাদের যুক্ত করা হ'ল। বিজ্ঞান বলবে, ঐ দুটি বিন্দুর মাঝে ঘন ঘন ক'রে আরও বহু 'স্থির' বিন্দু অঙ্কনের ফলে এই রেখাটি হ'ল। বার্গ্‌সঁ বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করলেন তা নয়, আয়ত্তাতীত একটি গতিবেগ এর অন্তরালে রয়েছে। রেখা আঁকার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত যে চঞ্চল হয়ে উঠল, সে কি শুধু কতকগুলি স্থির অবস্থার সমষ্টি?—তা নয়।

আবার, কালের মাপকে আমরা স্থানের মাপের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি। ঘড়ির কাঁটা অথবা দোলক যতটা স্থান অতিক্রম করল, তাই তো আমাদের সময় নয়। সময়ের কোনও পরিমাণ নেই, কোনও পরিমাপ নেই। ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ডের সমষ্টিই সময় নয়—সময় ধরা-ছোঁয়ার অতীত, সে অমেয়। তাকে শুধু অনুভব করা যায় আমাদের 'অস্তিত্ব' দিয়ে।

মনোরাজ্যের একটি গুণকে বার্গ্‌সঁ আবিষ্কার করলেন—সেটি আন্তর অস্তিত্ব বা 'ইনর ডুারেশন্'। তিনি বললেন, 'আমাদের মনের যে অংশ যুক্তিতে অভ্যস্ত, সে পারে শুধু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে, অনুভব করতে পারে না। এই অনুভূতির ক্রিয়া মনের আর এক অংশে—তার নাম স্বজ্ঞা বা ইন্‌টুাইশন্। তাঁর মতে 'স্বজ্ঞা' মনোরাজ্যের মহান্ একটি বিভাগ। বস্তুতঃ বস্তুর অন্তরসত্তা উপলব্ধি করবার এ-ই একমাত্র সহায়।'

বার্গ্‌সঁ বিচার ক'রে দেখলেন, স্বজ্ঞা জিনিষটি মানুষের 'মস্তিষ্কের' অন্তর্গত নয়। রাগ, ভয়, শোক, দ্বেষও মস্তিষ্কের অন্তর্ভুক্ত নয়। মস্তিষ্কের অনুভূতি তার উদ্দীপনার মান বা

'ম্যাগনিটুড অফ ষ্টিমুলি' অনুসারে ধার্য্য হয়। কিন্তু আমাদের অন্তরের কোনও আবেগকে কি 'এত ক্যালরি তাপ' এই হিসাব করা যায়? রণক্ষেত্রে সেদিন স্বদেশের জন্যে যে লক্ষ লক্ষ যুবা প্রাণ উৎসর্গ করেছিল, তাদের সে বীর্য্যের পরিমাণ কি তাদের মস্তিষ্কের বিদ্যুৎপ্রবাহ শুনে পাওয়া যাবে? —বস্তুতঃ তা সম্ভব নয়। আপনার মনুষ্যত্ব নিয়ে মানুষ যেখানে সমগ্র জীবজগতে অদ্বিতীয়, তার হিসাব তার মস্তিষ্কে পাওয়া যাবে না। ধরাছোঁয়া না গেলেও অনুভবে সে আছে আমাদের স্বজ্ঞাসম্পন্ন সত্তায় বা 'ইনট্যুইটিভ সেল্ফ'-এ। বার্গসঁ তারই নাম দিয়েছেন স্বজনী বুদ্ধি—'ক্রিয়েটিভ ইনটেলেক্ট্'। এরই সাহায্যে অমৃতের সন্তান, মানুষ আমরা উপলব্ধি করি আমাদের অস্তিত্ব এবং বৃদ্ধি, অনুভব করি আত্মার অমরতা।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ দ্য ফ্রাঁস-এ বৈজ্ঞানিক বার্গসঁ দর্শনের অধ্যাপক হয়ে এলেন। দেশ-বিদেশে তখন তাঁর নবপ্রচারিত মতবাদ নিয়ে তুমুল আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। এই বস্তুবাদের যুগে যিনি আত্মার অমরতার বাণী নিয়ে এলেন, সকলের দৃষ্টি পড়ল তাঁর ওপর। নিন্দা-প্রশংসার কোলাহল উঠল চারদিকে।

তাঁর বক্তৃতাগুলি খুবই জনপ্রিয় হতে লাগল। ধীরপদক্ষেপে এসে তিনি যখন মঞ্চে বসতেন, ঘরে নামত নিঃশব্দতা, শ্রোতৃমণ্ডলীর মুখে পড়ত নীরব প্রতীক্ষার ছায়া। ধীরে ধীরে তিনি ব'লে যেতেন—সংক্ষিপ্ত, মধুক্ষরা কথাগুলি সবার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করত। শ্রোতাদের তিনি অনুরোধ করতেন, যেন অন্ধের মত তাঁর মতবাদ অনুসরণ না ক'রে তাঁরা তাঁর চিন্তাগুলিকে পরীক্ষা ক'রে নিজেরাও ভেবে দেখেন।

জনসাধারণের কাছে দর্শন যতই দুর্বোধ্য হোক, বক্তৃতাসভায় বার্গসঁর সরল কথাগুলি কিন্তু সবাই বুঝত, তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তায় তারা মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হ'ত। তাদেরই মত ক'রে সহজ সরল ভাষায় বলতে পারতেন তিনি।

বার্গসঁ ইহুদিবংশজাত। ১৯৪০-এ হিটলার ফরাসী দেশ অধিকার করেন। বিশুদ্ধ আর্য্যত্বাভিমানী তিনি, সেমিটিক ইহুদিদের প্রতি তাঁর সুতীব্র ঘৃণা। কলেজ দ্য ফ্রাঁস-এর সমস্ত ইহুদি অধ্যাপক পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হ'ল, শুধু বার্গসঁকে এ নির্দেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি এ অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান ক'রে সহকর্ম্মীদের ভাগ্যই বরণ ক'রে নিলেন। পর বৎসরেই অকস্মাৎ তাঁর জীবনান্ত হ'ল।

আজ দেশে দেশে মারণ-মন্ত্র উদ্ঘোষিত। এই মহামরণের মধ্যে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন বার্গসঁ—আলো-আঁধারের মধ্য দিয়ে যুগে যুগে ক্ষয়হীন সেই মহাজীবন শুধুই এগিয়ে চলেছে কোন্ অজানা লক্ষ্যের দিকে। এ পথ জীবনের অগ্রগতির পথ, সেই জীবন-পথ-যাত্রীর এক মুহূর্ত্তও আর পিছনে ফিরে যাওয়ার, ফিরে চাওয়ার উপায় নেই।

আকিঞ্চন

শ্রীঅমলকুমার মাল

আজাদী এবং অন্ন এবং বস্ত্রের সংগ্রামে—
দেশের ভাগ্যে দশের ভাগ্যে কি যে সঁপিয়াছ প্রভু
তার মাহাত্ম্য আজিও বুঝিতে নারি!
আজিও বুঝিতে নারি—
মৃত্যুর সাথে যে-ই জীবনের শাশ্বত সংগ্রাম
যে জীবন অবিনাশী, সৃজনপিয়াসী, বিধাতার শুভাশীষ;
সেই জীবনের অজস্র অপচয়
লাঞ্ছনা আর নির্যাতনের নিত্য-নূতন রূপ।

দ্বিধাবিভক্ত মা ও মাটির
বুক চিরে জাগিয়াছে—
শ্বেত-হস্তের সর্ব্বশেষের দান!
হিন্দু এবং পাকিস্থানের বুকে,
ইসলাম আর শাস্ত্র বেঁধেছে বাসা—
মানুষের ঠাই নাই।

মহিমা তোমার অপার, তোমার করুণা অসীম জানি-
তাই আকুল আবেগে করুণ-কণ্ঠে আকুতি জানাই,
প্রভু, রেখোনা প্রতীক্ষায়—
বজ্র-আঘাত হানো গো বিধাতা
বজ্র-আঘাত হানো,
মিলিত-মৃত্যু দাও
এক সাথে যেন সবাই মরিতে পারি।
তিলে তিলে ক্ষয়, সে তো অপচয়—মৃত্যুর লাঞ্ছনা,
শুধু হানাহানি আর অন্নহানিরও ক্ষুদ্র অস্ত্রে জানি—
ব্যাপক বিনাশ? সে নহে তো সম্ভব!

ওগো দয়াময়!
তোমার দয়ার আদি ও অন্ত নাই।
দয়া কর প্রভু—বজ্র আঘাত হানো,
মিলিত-মৃত্যু দাও—
এক সাথে যেন সবাই মরিতে পারি।

বাঙালী

শ্রীনির্ম্মাল্য দাশগুপ্তা

নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া কোন কথা কেহ যদি বলিতে যায়, লোকে তাহাকে মনে করে সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক মনোভাবপূর্ণ। আমি বাঙালী হইয়া বাঙালীর কথা বলিতে বসিয়াছি, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা মনোভাবাপন্ন হইয়া বা প্রাদেশিকতার মনোভাব লইয়া নহে। আমি সাম্প্রদায়িক নই, তবে মানুষ মাত্রেরই নিজ গৃহ ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি টান সর্ব্বাগ্রে, তার পর সে ভাবে প্রতিবাসীর কথা। নিজের ঘরে আগুন লাগিলে, প্রতিবেশীর গৃহ নিরাপদ আছে—এই আশ্বাস তাহার মনে সান্ত্বনা আনে না। তাহার নিজের গৃহ তো পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল, সতর্ক না হইলে এই আগুন প্রতিবেশীর গৃহেও ছড়াইতে পারে। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ীই বাঙালীর বাংলার প্রতি আকর্ষণ সর্ব্বাগ্রে। তাহার জন্য তাহাকে প্রাদেশিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলা সঙ্গত নহে। বাঙালী জাতির আর যাই দোষ থাকুক সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা নাই। সাজাত্যাভিমান তাহার আছে বটে, কিন্তু সাজাত্যাভিমান ও প্রাদেশিকতা এক নয়।

বস্তুতঃ বাঙালী যতটা উদার মনোভাববিশিষ্ট এমন আর ভারতের কোন প্রদেশের অধিবাসীই নয়। বিদেশ ভারতবর্ষকে প্রথম জানিয়াছে বাঙালীর ভাবধারা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়াই। বাংলার রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ চন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বিদেশে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সমগ্র ভারতের জন্যই ভাবিয়াছেন, সমগ্র ভারতের কথাই বলিয়াছেন কেহই কখনও শুধু বাংলার কথা বলেন নাই। সাধারণ বাঙালীরও অন্য প্রদেশবাসীর প্রতি অসূয়া নাই। বাঙালীত্বের গর্ব্বে ভিন্ন প্রদেশবাসীর প্রতি কিছু অবজ্ঞা হয়তো আছে, কিন্তু যেখানে তাহাদের গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, বাঙালী সেখানে অবাঙালীত্বের জন্য তাহাকে গুণের মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত করে নাই; বরং অগ্রসর হইয়া কণ্ঠে যশের মাল্য পরাইয়াছে। ভারতের বাহিরেও তাহার এই উদার দৃষ্টি প্রসারিত।

কিন্তু মানবপ্রীতি ও স্বাদেশিকতা সভ্য জগতের পক্ষে যতই উচ্চ আদর্শ হোক বাঙালীর এখন নিজের ঘর সামলাইবার সময় আসিয়াছে। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রমেই পিছু হটিতেছে। বাংলা আজ যাহা ভাবে, কাল সারা ভারত তাহাই চিন্তা করে—গোখেলের এই প্রশংসাবাণী লইয়া আমরা বহুকাল গর্ব্ব অনুভব করিয়াছি, কিন্তু এখন আর সে জের টানিয়া লাভ নাই। অতীতের ঐশ্বর্য্যের কথা বার বার টানিয়া আনিলেও বর্ত্তমানের দৈন্য ঢাকা পড়ে না।

একদা বাংলাদেশ সর্ব্বক্ষেত্রে ভারতের শীর্ষস্থানে ছিল। সে স্থান বাংলাদেশ ক্রমে হারাইতে বসিয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে বাংলা আজ অবজ্ঞাত। অথচ রাজনীতির চেতনা জাগে প্রথম এই বাংলা দেশেই। বাংলার সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন সর্ব্ব ভারতের নেতা ছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি বাঙালী উমেশচন্দ্র। ভারতের বিপ্লবাত্মক কার্য্য প্রসারলাভ বাংলাদেশে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহীদ বাঙালী ক্ষুদিরাম। কিন্তু বর্ত্তমান বাংলা অতীত বাংলার যোগ্য উত্তরাধিকারী হইতে পারে নাই। বাংলার যুবশক্তি আজ বিবদমান বিভিন্ন দলে বিভক্ত। বাংলাদেশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া হৃতশক্তি। একযোগে গঠনমূলক কাজ করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা আজ বাঙালীর নাই। দলাদলি ও ভাঙ্গাচোরাতেই তাহার রাজনীতি পর্য্যবসিত। এক দিন বাংলার যে প্রাণশক্তি একযোগে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ তাহা পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী এখন ভাঙার কাজেই মন দিয়াছে, গড়িতে যেন ভুলিয়া গিয়াছে। বিদেশী শাসন যেদিন দেশে ছিল, সে দিন বাঙালীর এই ভাঙার মন্ত্র কাজে লাগিয়াছিল। আজ দেশ স্বাধীনতার সোপানে উঠিয়াছে—এখন দরকার ভাঙা নয়, গড়া। বাঙালী এখনও এই নূতন পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছে না।

বাঙালীর সব চেয়ে গর্ব্ব তাহার সংস্কৃতি লইয়া। বাংলার বহু পুণ্যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথের মত অসাধারণ মানুষেরা এদেশে জন্মিয়াছেন। বাংলার কৃষ্টি-জগৎ তাঁহাদের দানে গৌরবোজ্জ্বল হইয়া আছে। ইঁহাদেরই প্রভাবে বাঙালী অন্যান্য প্রদেশ হইতে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। সংস্কৃতি লইয়া গর্ব্ব করিবার অধিকার বাঙালীর এখনও আছে, তবু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সব উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা দিয়াছিল, আধুনিক বাংলায় সেইরূপ দেখা যায় নাই।

চিত্রশিল্পে আমরা পাইয়াছি শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদিগকে। ইঁহাদের উপযুক্ত মর্য্যাদা আমরা দিতে পারি নাই। আমাদের চিত্ত কি চিত্রশিল্পের রস গ্রহণে উন্মুখ হইয়াছে? চলচ্চিত্রের তারকাদের নাম-ধাম ও বিভিন্ন অভিনয়-ভূমিকা আমাদের কণ্ঠস্থ, কিন্তু চিত্র-শিল্পে কাহার কি অবদান তাহা কি আমরা ভাল করিয়া জানি?

সাহিত্য লইয়া বাঙালীর এখনও গৌরব করিবার

অধিকার আছে। সাহিত্য-সৃষ্টিতে বাঙালী অন্যান্য প্রদেশের বহু ঊর্দ্ধে। বর্ত্তমান কালেও বাঙালীর যদি কিছু গর্ব্ব করিবার থাকে তবে সে তাহার সাহিত্য। অনন্যসাধারণ প্রতিভা না থাকুক, বাংলাদেশে এখনও প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন লেখক আছেন যাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছেন।

কিন্তু শুধু ভাববিলাস লইয়া এবং সাহিত্য বা শিল্পকলার-চর্চ্চা করিয়া কোনো জাতি দাঁড়াইতে পারে না। তাহার মধ্যে বলিষ্ঠতা থাকা চাই। আরও চাই পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা এবং একত্রে কাজ করিবার আগ্রহ। সর্ব্বোপরি চাই একাগ্রতা ও নিষ্ঠা। বাঙালী-চরিত্রে এ সমস্ত সদ্‌গুণের অভাব ঘটিয়াছে। কেন আজ বাঙালী তাহার পুরাতন গৌরবময় আসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। একদা বাঙালী বিপ্লবনীতিকে কাজে লাগাইয়া বিদেশী শাসনকে বানচাল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এখনো সেই সংগ্রামের উন্মাদনা তাহার অস্থিমজ্জায় ও প্রতি শোণিত-বিন্দুতে মিশিয়া রহিয়াছে। সেইজন্যই বোধ হয় বাঙালী এখনও স্থির হইয়া কাজ করিতে শিখিল না। মতের অমিল সে সহ্য করিতে পারে না; ফলে পরিণামে কাজে বিঘ্ন ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

বাঙালীর অবনতির আর একটি কারণ তাহার অহমিকা। একদা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে ভারতে সে অগ্রণী ছিল। সেই গর্ব্বে আজিকার বাঙালী কিছু না করিয়া এবং কিছু না হইয়াও নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে শিখিল। সে যে পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। অতীতের সেই গৌরব বাঙালী এখনও মূলধন করিয়া রাখিতে চায়। বিদ্যায় বুদ্ধিতে অন্যান্য প্রদেশ যে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে সেদিকে তাহার দৃষ্টি নাই। সর্ব্বত্রই সে ফাঁকি দিয়া জয়ী হইতে চায়। সে দলাদলি করিতে ভালবাসে। কাজ কেমন হইল, সে বিচার সে করে না। কে নেতৃত্ব করিবে তাহাই তাহার লক্ষ্য। সকলেই বড় হইতে চায়। দলাদলি বাঙালী-চরিত্রের প্রধান কলঙ্ক। তদুপরি বাঙালী হুজুগপ্রিয়।

প্রবাসী বাঙালী আমরা, এই অবাঙালীর প্রদেশে চারিদিকে দেখি বাঙালীর পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতি। স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই বাঙালী কর্ত্তৃক স্থাপিত। বহু বাঙালী অতীত কালে এই প্রদেশে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আজিও স্মরণীয় হইয়া আছেন। শুধু এই একটি প্রদেশেই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেই এইরূপ। বাঙালী সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যেখানে গিয়াছে সেখানেই সে জ্ঞান, চরিত্র ও কর্ম্মে সেখানকার অধিবাসীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। বাংলা আজ সে মর্য্যাদা হারাইয়াছে। এই অবস্থা অত্যন্ত বেদনা-দায়ক। রাজনীতিতে বাংলাকে পুরোভাগে লইয়া যাইতে পারেন এমন লোক বর্ত্তমানে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও জনসেবা, একনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সহৃদয়তার দ্বারা বাঙালী এখনও পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে।

বাঙালী আগে চলুক, অন্য সমস্ত প্রদেশ পিছনে পড়িয়া থাকুক—এমন কথা বলার অর্থ সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা। এমন কথা বলি না। নিজের প্রদেশের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণবশে তাহার গৌরবে গৌরবান্বিত, অপমানে ক্ষুব্ধ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এ কথা যেন বিনা দ্বিধায় আমরা বলিতে পারি যে অখণ্ড ভারত গঠনে বাংলার দান যেন কম না হয়। রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় বলিতে গেলে, "এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে বাংলাদেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফল-প্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে তারই জন্যে আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলন-যজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্যে উপযুক্ত আহুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে। বাংলা দেশের সেই আত্মাহুতি ষোড়শোপ-চারে সত্য হউক, ওজস্বী হউক, তার আপন বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।"

ধ্বনিতত্ত্বের নূতন নিয়ম

শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী

ধ্বনিতত্ত্বের কতকগুলি নূতন নিয়ম দৃষ্টান্তসমেত এখানে দেখাব। এই ধ্বনির বিকৃতিগুলি বহুকাল থেকেই ঘটে আসছে, সুতরাং অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের কাছে এগুলি পরিচিত বলেই বোধ হবে। তবু এই বিকৃতিগুলি এখানে তুলে দেখানর. সার্থকতা হচ্ছে এই যে এ পর্য্যন্ত এগুলো কোন নিয়মের অধীন বলে ব্যাখ্যাত হয় নি।

(১) শক্র-হেটেরো রীতি—অনেকটা "সতেম-কেন্তম রীতি"র মতন, তাই সংস্কৃত "শক্র" শব্দ আর গ্রীক "হেটেরো" শব্দ দিয়ে এই বিশেষ রীতির নামকরণ হ'ল। গ্রীক ও ইরাণীয় উপভাষা-বিশেষে ইন্দো-ইউরোপীয় "স"ধ্বনি "হ"-ধ্বনিতে পরিবর্ত্তিত হ'ত। ফলে ঐ গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষার সঙ্গে উপরোক্ত শাখা দুটির উপভাষার "স-হ" পার্থক্য হ'ত। যেমন, সংস্কৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষার "শক্র"= ইরাণীয়—"হাথর"=গ্রীক-"হে-টে-রো"; সংস্কৃত—"সিন্ধু"=

ইরাণীয়-"হিন্দু"=গ্রীক "ইন্ ডুস্" ; সংস্কৃত-"সম"=ইরাণীয় "হম"=গ্রীক—"হো মো" ; সংস্কৃত—"সূর্য্য"=গ্রীক—"হে লি ও" ; সংস্কৃত—"সোম"=ইরাণীয় "হওম" ; সংস্কৃত "সরমা"= গ্রীক—"হে র্মে স্" ইত্যাদি।

(২) ধ্বনি সম্প্রসারণ ও ধ্বনি-দৃঢ়ীভবন (Phonetic elongation and phonetic elaboration—একটি শব্দ তার আয়ুষ্কালের মধ্যে কোন সময়ে দৃঢ়ীভূত বা সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। সব ভাষাতেই এই লক্ষণটি দেখা যায়। যেমন, ইংরেজী Message+er=Messenger ; Passage+er= Passenger। আবার ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলিতে— সু+নর=সুন্দর ; বানর<বান্দর<বাঁদর ; "মক্ষি" স্থলে "মক্ষিকা" ; "শ্রী" স্থলে "শ্রিয়ক" ; "ময়ূর" স্থলে "মজুর" ও "মজুল","পারিজাত" স্থলে "পারিয়াত্র" ; "বঙ্গ" স্থলে "বাঙ্গালা" *"ক-লি" স্থলে "কদলী, কন্দলী" ; *"বাঁ, বাং" হইতে "বংশ, বেতস, বেত্র" ; "লঙ" হইতে "লিঙ্গ", "উলঙ্গ," ইত্যাদি।

(৩) ধ্বনি-ব্যত্যয় (Reduction)—অনেক সময়, প্রায় সব ভাষাতেই দেখা যায় যে, শব্দবিশেষের কোন অংশ খসে পড়েছে। এমন কি, তার যথাযোগ্য কারণও নির্দ্দেশিত হয় না। যেমন—ইংরেজীতে university থেকে varsity, কি, Cabriolet থেকে Cab। আমাদের ভারতীয় আর্য্যভাষা-গুলিতে—"হ্রদ" থেকে "হদ"; কি "দহ"; "ভ্রাতৃক পুত্র" থেকে" ভাত-পুত্ত", আবার তা থেকে "ভাত পুত্ত", আবার তা থেকে "নাথ পুও" এবং তার পরিণতি (উপাধিবাচক) "নাথ-"এ। *"আবুবকর্-গঞ্জ" থেকে "বকর-গঞ্জ" এবং তার পরিণতি "বাখরগঞ্জ-"এ ; "মোমিনশাহী" থেকে "মৈমনসিং" "পগার" থেকে "গড", ইত্যাদি।

(৪) ধ্বনি-দ্বিত্ব (Doubling)—অনেক সময় ভাষা-বিশেষের মধ্যে দেখা যায় যে, কোন দ্রব্য, গুণ বা অবস্থাকে বুঝাবার জন্ম এক সঙ্গে দুইটি একার্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন ইংরেজীতে—Cruc+hill=Cruc hill<Churchill (দুইটিই পাহাড়বাচক শব্দ)। ভারতীয় আর্য্যভাষাতে পাই— "আগাগোড়া, বেটাছেলে, জুমচাষ, কলিকাতা" ইত্যাদি। "আগা" সংস্কৃত "অগ্র" থেকে উদ্ভূত ; তার সঙ্গে মিলেছে অষ্ট্রিক "গুল্" বা "গুরহ" থেকে উৎপন্ন "গোড়া" শব্দ। দুটো শব্দই আদিবাচক শব্দ, কিন্তু একত্র হ'লে অর্থ হয়—আদ্যোপান্ত। সংস্কৃত "পুত্র" শব্দ থেকে উৎপন্ন ("পুট<বুট<") "ব্যাটা" আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শাব+আল+ইআ=শাওয়ালিআ =ছাওয়ালিআ<ছেলিআ<"ছেলে।" দুটিই সন্তানবোধক শব্দ, কিন্তু একত্রিত হয়ে অর্থ করে পুরুষ। "জুম্"—অষ্ট্রিক কৃষিবোধক শব্দ আর সংস্কৃত "কৃষি" শব্দ থেকে উৎপন্ন "চাষ" একত্রিত হ'লে বিশেষ এক রকম কিনা, পাহাড়ে-জমিতে শস্যোৎপাদন বোঝায়। "কলি" অর্থে শামুক পোড়ান চুণ বোঝায়, তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল সংস্কৃত "কাথ্" থেকে উৎপন্ন "কাতা"-কিনা জলে গোলা চুন ; এই দুইয়ে মিলে স্থানবিশেষ বোঝায়।১

(৫) ভ্রান্তশ্রুতি (mis-audition)—"তিলকে তাল করা" আর "ধান শুনতে কান শোনা"র ব্যাপার প্রায় সব ভাষাতেই আছে। এ রকম দুর্ঘটনাকে শ্রুতিভ্রম কি, ভ্রান্তশ্রুতি বলে। "অজাত শ্মশ্রু বালক"-এর বদলে অনেকেই-"অজাতশত্রু বালক" বলে থাকেন ; "সবার উপরে মনুষ্যত্ব" কি না, "ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ"—"সবার উপরে মানুষ সত্য" বলে বহুকাল চলে আসছে। লোকে একবারও ভেবে দেখে না যে মানুষের চেয়ে সত্য, মানুষের ওপরে সত্য আরও কত রয়েছে, সুতরাং কি ক'রে এমন কথা আমরা বলে থাকি। রীতিমত নামকরা লেখকও—"উদ্দেশের" জায়গায় "উদ্দেশ্যে", "মুদিত"র জায়গায় "মুদ্রিত", "আব্রহ্মস্তম্ব"-র জায়গায় "আব্রহ্মস্তম্ভ", "লক্ষ্য"র বদলে "লক্ষ" লিখে থাকেন।

(৬) ধ্বনি-বৈপরীত্য (Spoonerism)—অনেক ভাষা-তাত্ত্বিক মনে করেন যে, কোন শব্দ বা কোন ধ্বনি একেবারে উল্টে যেতে পারে না। ভারতীয় আর্য্য ভাষাতে অন্ততঃ, এই রকম উল্টে যাওয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, "হ্রদ<রহদ<হদ<দহ ; সবুর<সউর<সোর<রোস ; দেখ<দেহ<দেহো, দেহে<হেদে (="হ্যাদে") ইত্যাদি।

(৭) অনুনাসিকতা (Nasalization)—আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলিতে নাসিক্যপ্রবণতা কিছু দেখা যায়। যে সব শব্দ মূলতঃ নাস্ত, কি নাস্ত নয়, এমন কি যার মধ্যে কোন অনুনাসিক ধ্বনির আভাসমাত্র নাই, এমন শব্দও সময় সময় দেখা যায় চন্দ্রবিন্দুযুক্ত হইয়াই উচ্চারিত হইতেছে। যেমন অক্ষি<আঁখি ; বক্র<বাঁকা ; কুব্জ<কুঁজা ; ওষ্ঠ<ঠোঁট ; চীৎ (কার)<চেঁচান, ইত্যাদি।

(৮) সংস্কৃত-করণ (Sanskritization)—আর্য্যী-করণের অনুরূপ ব্যাপার এই সংস্কৃত-করণ। আনার্য্যিক—হয় অষ্ট্রিক, নয় দ্রাবিড় শব্দগুলিকে, অনেক সময় দেখা যায় যে, সংস্কৃত তার নিজের রঙে রসে সবুজ ক'রে সভ্য ক'রে তুলেছে, যেমন—*"দিস্তাং" বা "তিস্তা"কে "ত্রিস্রোতা" করা;"তম্লুক", কি, "তম্-লক্"কে "তাম্রলিপ্তি" করা ; *"মক" *"ত্রক" থেকে "ময়ূর" কি "বক্র" ইত্যাদি।

এ ছাড়া, কোন কোন বিদেশী শব্দও সংস্কৃতান্বিত হয়েছে বলে দেখা যায়, যেমন—Shakespeare হয়েছে "সেক্ষপীয়র" বা,"সেক্ষপীর" ; Max-muller হয়েছে—"মোক্ষমূলর", Anderson হয় "ইন্দ্রসেন" ; Sun yat-sen হয় "সনৎ সেন" ইত্যাদি।

১ অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণার ফল। তিনি আরও এই রকম যুক্তশব্দের উল্লেখ করেছেন তাঁর ইউরোপ-ভ্রমণ সম্বন্ধীয় কোন পুস্তকে।

শিল্পী প্রণবনাথ ঠাকুর

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

ছবি এঁকে ও খেলনা বানিয়ে সময় কাটানো যে কত আনন্দদায়ক হতে পারে, সে বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান লেখকের আছে। সেইজন্যে যখন শ্রীপ্রণবনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হ'ল, আর তাঁর খেলনার কারখানা ও তাঁর আঁকা ছবি দেখলাম—খুব খুশী হয়ে উঠেছিলাম।

খেলনার কারখানায় প্রণবনাথ ঠাকুর (বাঁদিকে)

নিজের খেয়ালমত ছবি এঁকে ও কাঠের খেলনা বানিয়ে জীবিকা অর্জ্জন করা আমাদের দেশে খুবই কঠিন। এতে ব্যবসায়-বুদ্ধির দরকার—যাঁরা ছবি আঁকেন সাধারণতঃ তাঁদের সেটার বড়ই অভাব। আবার ব্যবসায়-বুদ্ধি অত্যুগ্র হয়ে উঠলে সার্থক শিল্পসৃষ্টিও যে ব্যাহত হয় তাতে সন্দেহ নেই। শিল্প-প্রতিভার সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবসায়-বুদ্ধির সংমিশ্রণ আমাদের দেশে দুর্লভ বললেই চলে।

বাংলাদেশের বাইরে আমার বহুকাল কাটল। হিমালয়ের পাদদেশে দেরাদুনে নিজের কাজ নিয়ে আমার দিন কাটে। এখানে যে আর কেউ নিজের খেয়ালে ছবি এঁকে ও খেলনা বানিয়ে সময় কাটাচ্ছেন, যখন প্রথম তা জানতে পারি তখন যেন কোন নূতন জিনিষ আবিষ্কারের আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠেছিলাম। আমার আস্তানা থেকে শহরে যাবার পথে একটি প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী দেখতাম—বাড়ীটির নাম "টেগোর ভিলা"। শুনেছিলাম এটা হচ্ছে কলকাতার রাজা পি. এন. ঠাকুরের বাসভবন। মাঝে মাঝে সে বাড়ী লোকজনের আগমনে সরগরম হয়ে উঠত—কিছুকাল পরেই বাড়ীটি হ'ত জনশূন্য, সদরে পড়ত তালা—বিরাট ভবনটি যেন চলে-যাওয়া অতিথিদের স্মৃতি নিয়ে ঝিমাত।

কয়েক বছর আগেকার কথা—একদিন খবর পেলাম শিল্পী শ্রীপ্রণবনাথ ঠাকুর সপরিবারে ঐ বাড়ীতে এসে উঠেছেন এবং একটি কাঠের খেলনার কারখানা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমরা দু'জনেই শিল্পতীর্থের যাত্রী, সুতরাং সমধর্ম্মী—কাজেই আমাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হওয়ার পথ খুবই সুগম। এগিয়ে গিয়ে অপরিচয়ের বাধা কাটিয়ে নিলেই হ'ল। একদিন ঢুকে পড়লাম বাড়ীর ভেতর। পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে আলাপ হ'ল। প্রণবনাথের আঁকা ছবি দেখলাম, তারপর তিনি আমাকে তাঁর কারখানায় নিয়ে গেলেন।

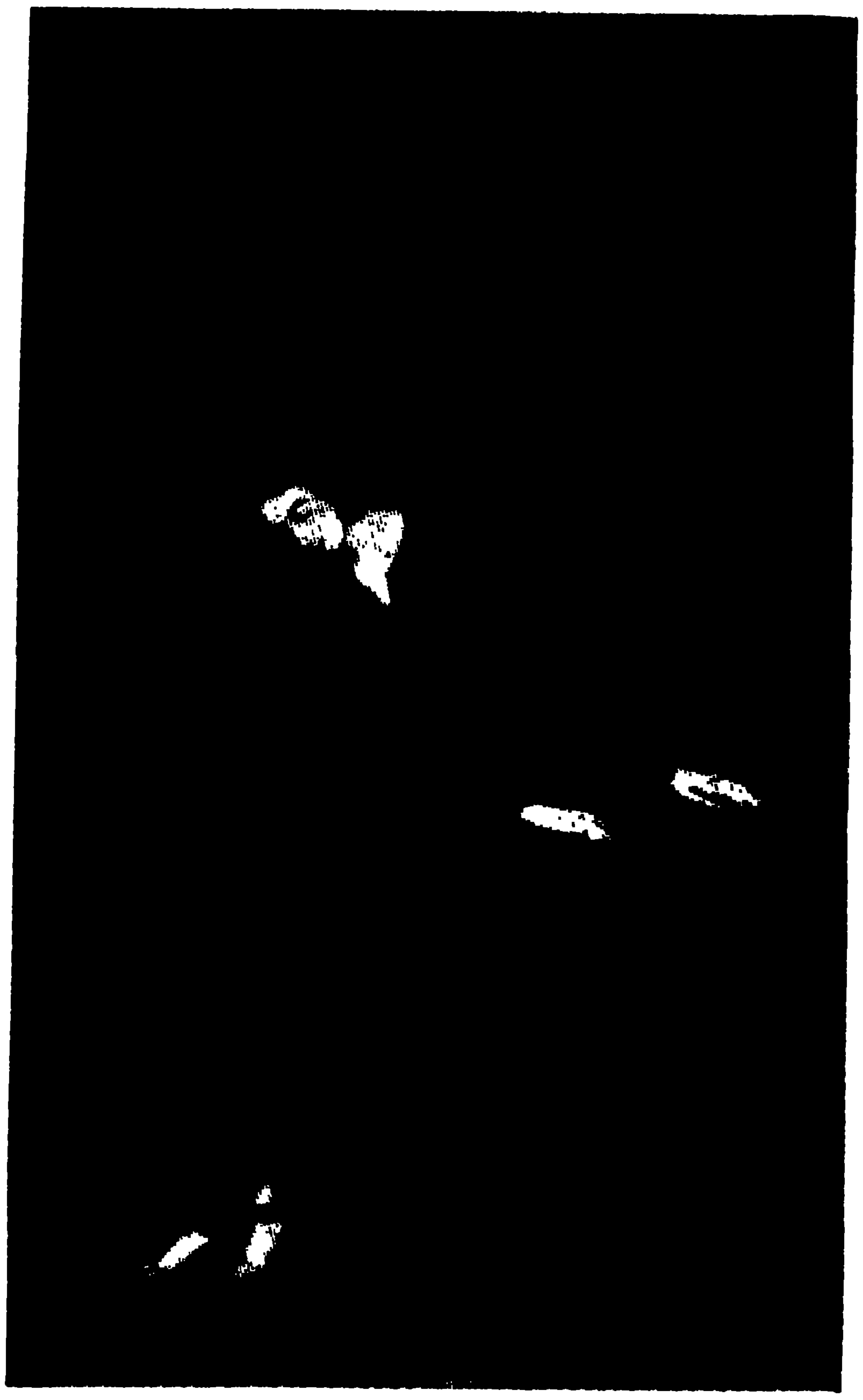

প্রত্যাখ্যাতা

কাঠের পুতুল থেকে আরম্ভ করে রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী নানান রকম জন্তু-জানোয়ার—সবই শিল্পী তৈরি করছেন। বাজারে কিছু কিছু বিক্রীও হচ্ছে। নানান রকমের যন্ত্র-পাতিও বসিয়েছেন। কথাবার্ত্তায় বুঝলাম—নেহাৎ আনন্দের প্রেরণায়ই তিনি এসব নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন। নূতন কিছু খেলনা বানাতে পারলেই তাঁর মন খুশীতে ভরে ওঠে। সে-গুলো বাজারে বিক্রী করার তেমন উৎসাহ তাঁর নেই।

কালো মেয়ে

ব্যবসায়-বুদ্ধি তাঁর তেমন প্রখর নয়. সেইজন্যেই বাজারের চাহিদামত গতানুগতিক খেলনা তৈরির পক্ষপাতী তিনি নন।

এক দিন দিবাভাগে তাঁর কারখানায় গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম রং দেবার যন্ত্র হাতে তিনি কাজে ব্যস্ত। তাঁর ছোট মেয়ে দুটিও হাতে পায়ে রং মেখে তাঁর কাজের সাহায্য করছে, কি ..ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে—ঠিক বোঝা গেল না। যাই হোক, মনে হ'ল খেয়ালী শিল্পীর সময়টা কাটছে বেশ।

নূতন ছবি কিছু আঁকছেন কি না জিজ্ঞেস করলাম। একটি ছবি দেখালেন। তখনও শেষ হয় নি। বললেন, ছবি আঁকতে আমার বড় দেরি হয়।

বললাম—হোক না দেরি ক্ষতি কি? আপনাকে ত ছবি এঁকে জীবিকা অর্জ্জন করতে হবে না।

. তিনি উত্তর দিলেন, কথাটা সত্য কিন্তু কাঠের খেলনা বানিয়ে খরচটা অন্ততঃ উঠিয়ে নিতে পারলে ত মনটা খুশী থাকে।

ছবি আঁকা তিনি শিখেছিলেন কলকাতায় শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। পরে 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট'-এ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে শিখতেন। একখানা ছবি দেখিয়ে বললেন, "এতে অবনবাবুর হাতের 'টাচ' আছে"—দেখলাম সেই আগেকার 'ওয়াশ' পেণ্টিং গোছের। খুব ভাল 'ফিনিশ'।

তাঁর আঁকা ছবির আলোকচিত্র কয়টি থেকে বুঝতে পারা যাবে যে কাজ তিনি বেশ ভাল ভাবেই শিখেছিলেন। যদি আরো কিছু সময় তিনি ছবি আঁকার সাধনায় রত থাকেন তবে তাঁর হাত দিয়ে যে নূতন ধরণের শিল্পসৃষ্টি বেরিয়ে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।

রবিস্মৃতি

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাহিরে মলিন ধূমল আকাশ, ভিতরে আঁধার ঘর,
নবজীবনের স্বপ্ন দেখালে তুমি।
নব অরুণের উদয়রশ্মি লাগিল ললাট 'পর,
জাগে ধরিত্রীভূমি।

ভেঙে গেল ঘুম, প্রাণ-নির্ঝর বহিল কলোচ্ছ্বাসে,
দূরে সরে গেল মরণের কালো ছায়া,
অজানা রূপের অপরূপ আভা আকাশে বাতাসে ভাসে,
এ কোন্ মন্ত্রমায়া।

শিশু-মনে দিলে লীলা-হিল্লোল কল্পনা-মধুধারা,
যৌবনশিখা জ্বালালে তরুণ প্রাণে,
ছন্দে বহিল স্বর্গ-মর্ত্ত্য রবি শশী গ্রহতারা—
নিখিল ভরিল গানে।

মালয় উপদ্বীপের পুরাবৃত্ত

শ্রীনিরুপমা দত্ত

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার যতগুলি খণ্ড রাজ্য আছে তন্মধ্যে রাজনীতিক্ষেত্রে মালয় আজও যে সর্ব্বনিম্নস্থানীয় এ কথা অস্বীকার করিবার জো নেই। কিন্তু ইহার বর্ত্তমান পরিস্থিতি যাহাই হোক না কেন, প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার গৌরবোজ্জ্বল অতীত হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। মালয় উপদ্বীপের অধিবাসীরা প্রধানতঃ মোঙ্গোলীয় মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত এই যে, ইহাদের দেহে আর্য্যরক্তের কিঞ্চিৎ ছিটেফোঁটা আছে। স্মরণাতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কত বিভিন্ন জাতি আসিয়া এই সুজলা সুফলা ভূখণ্ডে রাজত্ব করিয়া গিয়াছে। তাহাদের পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী পরম চিত্তাকর্ষক।

মালয়ের ইতিবৃত্ত কবে প্রথম লিপিবদ্ধ করা আরম্ভ হয় সে বিষয়ে এখন আলোচনা করা যাইতেছে। গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে এই দেশের ইতিকথা ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অলিখিত ছিল, এবং ইহার ইতিহাসের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাঁচিয়া রহিয়াছিল শুধু মালয় জাতির উপকথা ও কিংবদন্তীর ভিতর দিয়া। মালয় যে অতি প্রাচীন দেশ তা সেখানকার ভূগর্ভ খনন করিয়া যে সমস্ত নিদর্শন-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীত হয়। সেই আদিম যুগ হইতে ইসলাম অভিযানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার বুকে যে কত বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যুত্থান ও পতন হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও পাওয়া যায় নাই।

গত চতুর্বিংশ বৎসর ধরিয়া পুরাতত্ত্ববিদদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বিস্মৃত অতীতের যে সমস্ত প্রত্নসম্পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি সম্বন্ধে আমরা এবার আলোচনা করিব।

উত্তর-মালয়ের ওয়েলস্‌লি জেলায় ধান্যক্ষেত্র মধ্যে অনেকগুলি সুউচ্চ ঝিনুক-স্তূপ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের কোনটিরই উচ্চতা কুড়ি ফুটের কম নয়। এগুলির গড়ন ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উক্ত স্থানটি সমুদ্রোপ-উপকূলবর্ত্তী ছিল। সাগরের এই তীরভূমিতে বাস করিত নাম-গোত্র না-জানা এক দল মানুষ, যাহারা কৃষিকার্য্য এবং শিকার করিতেও জানিত না। ঝিনুক, গুগলি, কাঁকড়া ইত্যাদি সমুদ্র-তীরে অনায়াসলব্ধ খাদ্য আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারা জীবন ধারণ করিত। তাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট ঝিনুকের খোলাগুলি ক্রমে ঐ সকল স্তূপে পরিণত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, সুদূর অষ্ট্রেলিয়ার হাক্সবেরি নদের উপকূলেও অনুরূপ স্তূপাবলী আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনৈক জার্ম্মান নৃতত্ত্ববিদ্ বলেন, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের দৈহিক গঠন হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আসিয়াছিল বৃহত্তর ভারত ও ইন্দোনেশিয়া হইতে। তাহাদের নির্ম্মিত পাত্রাদি এবং প্রস্তর-যন্ত্রসমূহের আশ্চর্য্য সাদৃশ্যের জন্য এই ধারণাটি দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে।

প্রস্তর-যুগের অসংখ্য যন্ত্রপাতি মালয়ের বহু স্থানে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বেশ সুদৃশ্য এবং কারু-কার্য্যখচিত। মধ্য-মালয়ের পাহাঙ জেলায় তেমব্লিং নদীর তীরেও সম্প্রতি প্রস্তরোত্তর যুগ ও লৌহ-যুগের কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করা হইয়াছে। প্রাগ্‌যুদ্ধকালে এই নদীটির উপকূলস্থ নিবিড় অরণ্য-মধ্যে আবিষ্কৃত অনেকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ লোকেদের মনে অভিনব কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছিল। এখানে উদ্ধৃত বিভিন্ন বস্তু হইতে ইহা নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া মনে হয় যে একদা ঐ স্থানে একটি বিরাট নগরী বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশের সরস্বতী নদীতীরস্থ সপ্তগ্রামের ন্যায় তেমব্লিং নদীতীরস্থ উক্ত বিস্মৃতনামা নগরীটিও বহির্বাণিজ্যের দৌলতে একটি মহাসমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই নগরীটি আখোন রূপকথায় বর্ণিত "ধারাওয়াংশা" রাজ্যের প্রধান বন্দর "আমারোয়াতী" (অমরাবতী?)। কিন্তু আসলে ইহা অনুমান ছাড়া কিছুই নহে। কারণ রূপকথায় উল্লিখিত 'আমারোয়াতী' চীনসমুদ্র-তীরে অবস্থিত ছিল—তেমব্লিং নদীর সহিত ইহার কোনই সংস্রব ছিল না।

আদিম যুগের তথাকথিত অসভ্য মানুষ কি ভাবে গিরি-গহ্বরে বাস করিত তাহার নিদর্শনও মালয়ে মিলিয়াছে। উত্তর-মালয়ে কেডা ও পেরাক জেলায় অবস্থিত চুন পর্ব্বত-গুহায় (Lime Stone Hills) তাহাদের ব্যবহৃত অস্থি ও প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র এবং মৃৎপাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি এখন স্থানীয় যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত।

উক্ত অঞ্চলে এক প্রকার পাতলা শিলাখণ্ডে নির্ম্মিত কতকগুলি আশ্চর্য্যজনক মৃতের সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বাঙ্কা, বিলিটন ও বিহাউ দ্বীপে অনুরূপ সমাধি পাওয়া গিয়াছে। এগুলির মধ্যে মৃৎপাত্র, অস্ত্রশস্ত্র এবং কাঁচের ও পুঁতির অলঙ্কার ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কঙ্কাল বা এক খণ্ড অস্থিরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ কঙ্কালগুলি শত শত বৎসর ভূগর্ভে পড়িয়া থাকার দরুন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কাহারা এই সমস্ত সমাধি তৈয়ার করিয়াছিল এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা দিতে পারেন নাই।* তবে সুবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডাক্টো ব্র্যাডেল বলেন, অতি প্রাচীনকালে ভারত হইতে যেসব ব্যবসায়ী টিনের সন্ধানে মালয়ে আসিয়া পেরাক অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এগুলি তাঁহাদেরই সমাধি···।

কিছুদিন পূর্ব্বে দক্ষিণ মালয়ে জোহর নদীতীরে অবস্থিত একটি অখ্যাত শহরের উপকণ্ঠে প্রাপ্ত কতকগুলি দুর্লভ হিটাইট † পুঁতির সাহায্যে এই দেশের অতীত কালের অনেক অজানা তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। উক্ত পুঁতিগুলি বিবিধ বর্ণের কাঁচে নির্ম্মিত। খ্রীঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হিটাইট রাজ্যের মেয়েরা অনুরূপ পুঁতির অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা প্রমাণিত করিয়াছেন। এখানে এই প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সেই বিস্মৃতপ্রায় মান্ধাতার আমলে সুদূর হিটাইট হইতে উক্ত বস্তু কি করিয়া এই ভূখণ্ডে আসিল? ইহার সঠিক উত্তর ইতিহাস আজও দিতে পারে নাই। তবে ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে মিশরীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ টলেমির অঙ্কিত একখানি মানচিত্র হইতে উক্ত প্রশ্নের উত্তর কতকটা মিলিতে পারে বলিয়া মনে হয়। উক্ত মানচিত্রটি হইতে জানা যায় যে, প্রাচ্যে আসিবার জলপথ টলেমির সমসাময়িক আলেকজান্দ্রিয়ার নাবিকদের অজানা ছিল না। ইহাতে মালয় উপদ্বীপের চিত্রটি এমন নিখুঁত ভাবে খুঁটিনাটিসহ অঙ্কিত যে তাহা আজও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। উত্তর মালয়ের "ক্রা" যোজকটিও ইহাতে অঙ্কিত আছে।

টলেমি তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন—স্বর্ণভূমির দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত "পালাণ্ডাস" নামক নদীতীরে অবস্থিত পালাণ্ডা নগরী ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়া বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। প্রাচ্য-ভাষাতত্ত্ববিদ্ ফরাসী পণ্ডিত বার্থিলট দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন টলেমির উল্লিখিত "পালাণ্ডাস" নদীই বর্ত্তমানে জোহর নদী নামে পরিচিত। কিন্তু জোহর নদীতীরে অবস্থিত বর্ত্তমানে "কোটাতিঙ্গী" শহরটি টলেমি-বর্ণিত সেই পালাণ্ডা নগরী কিনা তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে "কোটাতিঙ্গী" শহরটি যে অতি প্রাচীন এবং ইসলাম অভিযানের বহু পূর্ব্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল তাহা ইহার অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার ভূগর্ভ হইতে হিটাইট পুঁতি ছাড়া আরও এমন সব দুষ্প্রাপ্য বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা দুই সহস্র বৎসর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত মালয়ের ব্যবসায়গত এবং অন্তবিধ কিরূপ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার নীরব [illegible] সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উক্ত বস্তুগুলি

মালয় উপদ্বীপ

টলেমির স্বর্ণভূমি

* *Notes on Ancient Times in Malay*—R. Braddell.

† ভূমধ্যসাগর তীরস্থ সিরীয়া রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত একটি প্রাচীন দেশ।

পরীক্ষা করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া জানা গিয়াছে যে একদা সেগুলি এদেশে আসিয়াছিল হিটাইট, ফিনিসিয়া, মিশর, ইটালী, দক্ষিণ-আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কাম্বোজ, চীন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি অধুনাবিলুপ্ত রাজ্য হইতে। এই সমস্ত নিদর্শন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান সুবিখ্যাত নগরী "পালাণ্ডা" বোধ হয়, কালক্রমে আজিকার অখ্যাত শহর কোটাতিঙ্গীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।*

সুপ্রাচীন কালে ভারতবর্ষের সহিত তৎকালীন "স্বর্ণভূমির" (মালয়ের প্রাচীন নাম) যে কি সুদৃঢ় যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল তাহা যে শুধু ভূগর্ভে নিহিত বিবিধ দ্রব্যনিচয় হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে তাহা নহে; এই উপদ্বীপের নগর পল্লী পর্ব্বত নদী ইত্যাদির সংস্কৃত নাম এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা সংস্কৃতি আচার-ব্যবহারাদিতেও তাহা সুপরিস্ফুট। শিক্ষিত মালাইরা আজও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভারতবর্ষ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন একথা বলিতে গৌরববোধ করেন।

জাপানী যুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে ক্লান্তান ও ত্রাংগানু জেলার সীমান্তে "চিন্তাপা" পর্ব্বতের উপত্যকায় একটি প্রাচীন বিলুপ্তপ্রায় শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন মালয়ে ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি যে কি বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন এই নাম-না-জানা শহরটির প্রতি ইষ্টকখণ্ডে বিদ্যমান। শহরটির চারিদিকে ছিল প্রশস্ত রাজপথ; পথিকদের নিমিত্ত পথিপার্শ্বে কয়েক ফারলং অন্তর অন্তর কূপ এবং সরাইখানার ব্যবস্থা ছিল। দক্ষিণ-ভারতের শৈবমন্দিরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কয়েকটি ভগ্ন জীর্ণ মন্দির এখানে বিদ্যমান। তন্মধ্যে একটি মন্দিরে প্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গের অর্দ্ধাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনেকগুলি মৃৎপাত্র, দু'খানি তাম্রথালা এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের কয়েকটি মুদ্রা ও পদক এ স্থানের ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত মূল্যবান বস্তু সিঙ্গাপুরে আনিয়া যাদুঘরে রাখা হইয়াছিল। এমনি ভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্য বেশ চলিয়াছিল। কিন্তু মালয়ে অকস্মাৎ জাপানীদের আক্রমণাত্মক অভিযান সুরু হওয়ায় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কাজকর্ম্ম একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়।

তখন এদেশীয় জনৈক প্রত্নতত্ত্ববিদ জাপানী সরকারকে অনুরোধ করেন যে যাদুঘরে রক্ষিত মালয়ের অতীত সম্পদগুলি কোন নিরাপদ স্থানে সরাইতে পারিলে ব্রিটিশ বিমানবহরের ব্যাপক আক্রমণ হইতে এগুলিকে রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে।

প্রথমে এই আবেদনটি অগ্রাহ্য করা হয়। আত্মসমর্পণের কিছুদিন পূর্ব্বে, যখন সিঙ্গাপুরের উপর রোজ তিন-চার বার করিয়া বিমানহানা চলিতেছিল তখন যাদুঘর হইতে মালয়ের বহু অমূল্য প্রত্নসম্পদ বিমানযোগে জাপানে প্রেরিত হয়। কিন্তু শত্রুর ঘাঁটি অতিক্রম করিয়া সেগুলি যথাস্থানে ঠিকমত পৌঁছিয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় নাই।

উত্তর মালয়ে কেডা জেলায় প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তি

মালয় ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগটিও পুনরায় খোলা হয়।

দুই বৎসর পূর্ব্বে কেডা অঞ্চলে আর একটি চমকপ্রদ বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা শাক্যমুনির একটি ব্রোঞ্জনির্ম্মিত মূর্ত্তি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ ওয়েলস্ বলেন, ইহা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গুপ্তযুগে নির্ম্মিত মূর্ত্তি। কেডা অঞ্চলে অদ্যাবধি যতগুলি হিন্দু এবং বৌদ্ধ দেবদেবীর বিগ্রহ উদ্ধৃত হইয়াছে তন্মধ্যে শুধু এই মূর্ত্তিটিকেই অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিটির গঠনপ্রণালী হইতে ইহাও সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কেডার হিন্দু ঔপনিবেশিকরা আসিয়াছিলেন কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চল হইতে। উক্ত মূর্ত্তিটি বর্ত্তমানে স্থানীয় যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

* *Road to Angkor.*—By Dr. Q. Wales.

শিশুশিক্ষার গোড়ার কথা

শ্রীনীলরতন দাশ

অতীতের বহু স্মৃতি-বিজড়িত ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ইটন স্কুলের নাম অনেকেই জানেন। বস্তুতঃ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদীক্ষার গুণে বহু ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া পরবর্ত্তী জীবনে প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছেন। এই ইটন স্কুলের জনৈক প্রধান শিক্ষক রোজই ক্লাসে প্রবেশ করিয়া প্রথমে নিজেই ছেলেদিগকে অভিবাদন করিতেন। ফলে ছেলেরা আগে তাঁহাকে অভিবাদন করিবার সুযোগ পাইত না। একবার ছেলেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তিনি আগেই কেন তাহাদিগকে অভিবাদন করেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "কে বলতে পারে, তোমাদের মধ্যে একজন ভাবী সেক্‌স-পিয়ার নেই? কে জানে তোমাদের ভেতরে কোনও নূতন নিউটন বালকরূপে রয়েছে কিনা? কে বলতে পারে, তোমাদের মধ্যে আর-একজন ক্রম্‌ওয়েল আসেন নি? তোমাদের রয়েছে সেই অজানা মহা সম্ভাবনা। তাই আমি ক্লাসে প্রবেশ করেই তোমাদের সেই অজানা মহা সম্ভাবনাকে জানাই আমার অন্তরের অভিবাদন।"

বাস্তবিক, ভগবানের কি অদ্ভুত সৃষ্টি মানবশিশু। দেহে ক্ষুদ্র হইলেও তাহার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এক বিরাট্ সম্ভাবনা। তাই ইংরেজ কবি বলিয়াছেন—"The child is father of the man." "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা, সব শিশুরই অন্তরে।" অনাগত ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী এই মানবশিশু বহন করিয়া আনে সমগ্র জীবনের নবীন বার্ত্তা। এই অসহায় ক্ষুদ্র প্রাণীটির উপরেই নির্ভর করে পরিবারের সুখশান্তি, সমাজের কল্যাণ, জাতির গৌরব, রাষ্ট্রের শক্তি, দেশের আশাভরসা। যে শিশুটি আজ এক আনা মূল্যের একখানি 'শিশুশিক্ষা' বই, 'নব ধারাপাত' এবং ভাঙা স্লেট সম্বল করিয়া পাঠশালার জীর্ণ গৃহে বসিয়া বর্ণমালা শিখিতেছে, অথবা নামতা মুখস্থ করিতেছে—সেই শিশুটিই হয়ত এক দিন হইবে দেশের ও দশের ভাগ্যবিধাতা। বৃক্ষজীবনের যেমন অঙ্কুর, মানবজীবনের পক্ষে সেইরূপ শৈশব। শৈশব সমগ্র ভবিষ্যৎ মানবজীবনের অঙ্কুরীভূত সম্ভাবনা মাত্র। তাই উপযুক্ত যত্নে লালন করিতে না পারিলে শৈশব সার্থক যৌবনে পরিণত হইতে পারে না।

অতএব ছেলেকে যদি প্রকৃত মানুষ করিতে হয়, তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে; নতুবা "সে ছেলেই থাকিয়া যাইবে, মানুষ হইবে না।" ছেলেকে মানুষ করিতে হইলে, শৈশব হইতেই আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে তাহার প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে আনন্দের ভিতর দিয়া তাহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশুকে শিক্ষাদান করা যে কত কঠিন, কত জটিল, কত গুরুতর বিষয় তাহা আমরা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। অনেকেই বলেন, "ছেলে পড়ান? ও! এ আবার কঠিন কি? পড়াইলেই হইল।" এই শ্রেণীর লোক শিক্ষাদানের যোগ্য অধিকারী নহেন। অধ্যাপনা যে কিরূপ গুরুতর এবং কঠিনতর কার্য্য তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শিক্ষাদাতাকে শিশু হইয়া শিশুর অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। শিশু কি প্রকার জ্ঞান চাহিতেছে, কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহার জ্ঞানপিপাসা স্বাভাবিক ভাবে বর্দ্ধিত ও পরিতৃপ্ত হইবে, শিশু কেন বুঝিতেছে না, কি করিলে সে সহজে বুঝিতে পারিবে ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদাতার বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত, বিকশিত ও পরিপুষ্ট করিয়া তাহাকে সমাজ ও সংসারের উপযুক্ত করিয়া তোলা। শিশুর মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে, তাহাকে জীবনে রূপায়িত করিয়া তোলা—শিক্ষার সোনার কাঠি স্পর্শে তাহার অন্তরের 'মানুষটি'কে জাগ্রত করিয়া তোলাই শিক্ষাদাতার কাজ। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, শিশুশিক্ষার এই গুরু দায়িত্বভার কে গ্রহণ করিবে? কবির কথায় বলিতে গেলে—

"এই যে শিশু তরুণ তনু
নতুন মেলে আঁখি,
ইহার ভার কে লবে আজি
তোমরা জান তা কি?"

ফরাসী দেশের সুবিখ্যাত মনীষী রুশো বলিয়াছেন—মাতৃগর্ভ হইতে মানবশিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়; সুতরাং গৃহই শিশুশিক্ষার ভিত্তিভূমি এবং শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া মানুষ করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্বও পিতামাতার। কিন্তু শিশুকে যথোচিতরূপে শিক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অথবা সুবিধা সকল পিতামাতার থাকে না। বিশেষতঃ আমাদের দেশে, যেখানে শতকরা ৯০ জন নরনারী নিরক্ষর, সেখানে পিতা-মাতার পক্ষে গৃহে শিশুশিক্ষার ভার গ্রহণ করা কতটা সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমেয়। এমন কি, শিক্ষাদীক্ষায় সম্যক্ অগ্রসর এবং জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সমুন্নত পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে—যেখানে শতকরা ৯০ জনের অধিক নরনারী শিক্ষিত, সেখানেও শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নার্সারি স্কুলে

প্রধানতঃ শিক্ষয়িত্রীরাই চালিত হয়। ইংলণ্ডের জনৈক খ্যাতনামা শিক্ষক বলিতেন যে, যদি তাঁহার কোন ছাত্রের বাড়ী না থাকিত, তবে তিনি তাঁহার আদর্শকে কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন। তাঁহার অধিকাংশ ছাত্রই সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে ছিল, এবং তাহারা সকলেই বোর্ডিঙে থাকিয়াই অধ্যয়ন করিত। তথাপি উক্ত শিক্ষকের ধারণা ছিল যে, ছুটির সময় ছাত্রগণ গৃহে অবস্থান করে বলিয়া তাঁহার শিক্ষাদানকার্য্যের সাফল্যে ব্যাঘাত জন্মে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা-স্থানীয় না হইলে চলে না। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর প্রয়োজনই বেশী। শিশুবয়সে নির্জ্জীব শিক্ষার মত ভয়ঙ্কর আর কিছুই নাই। তাহা মনকে যতটা দেয়, তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশী। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি, যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন।"

সদাচঞ্চল ও ক্রীড়াশীল শিশু খেলাধুলা, হাসি-গান ও আনন্দের মধ্য দিয়া এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কৌতূহলবশে যে শিক্ষালাভ করিবে, তাহাই হইবে সত্যকার শিক্ষা। শিক্ষক যদি সকল শিশুকে একই ছাঁচে ঢালিয়া, ঘষিয়া মাজিয়া, মারিয়া পিটিয়া, অচিরাৎ পণ্ডিত বানাইতে চেষ্টা করেন, তবে কালক্রমে সেই শিশুর মানসিক বৃত্তিসমূহের উপযুক্ত বিকাশ হইবে না, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার পক্ষে বিকৃত মনোবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। শিক্ষকের প্রধান কাজ হইবে, সর্ব্বদা শিশুর সঙ্গে থাকিয়া সাবধানে, সযত্নে ও সুবিবেচনার সহিত তাহাকে পরিচালিত করা। শিক্ষক হইবেন শিশুর "Friend, philosopher and guide"। শিশু ও কিশোরদের এই ভাবে শিক্ষাদানের জন্য পৃথিবীর স্বাধীন ও প্রগতিশীল দেশগুলিতে কত বিচিত্র রকমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং নিত্য কতই না অভিনব শিক্ষাপদ্ধতির আবিষ্কার ও গবেষণা চলিতেছে। শিশুর জীবনকে শিক্ষাদীক্ষায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য সেই সকল দেশে নার্সারি স্কুল, এবং কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী ও মন্টেসরী-পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য কত উন্নত-ধরণের শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উপরন্তু প্লেওয়ে রীতি, ড্রামাটিক্ ওয়ে অব টিচিং প্রভৃতি শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। ইহার সহিত আমাদের দেশের শিশুশিক্ষার কুব্যবস্থার তুলনা করিলে মন দুঃখ ও নৈরাশ্যে ভরিয়া উঠে। কারণ এ দেশে শিশুশিক্ষার নামে চলিতেছে শিশুপাল বধ, এখানে এখনও বহু-ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থার অনুরূপ শিক্ষাদান চলিতেছে। "Spare the rod and spoil the child"—এই নীতিবাক্য এ দেশের অনেক শিক্ষক এখনও পরিহার করিতে পারেন নাই। কাজেই শিশু যেদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম আসিয়া ভর্ত্তি হইল, সেদিন হইতে আরম্ভ হইল তাহার জীবনের ট্রাজেডি। যে সুকুমারমতি সদাপ্রফুল্ল শিশু আপনার গৃহে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে, সর্ব্বদা ছুটাছুটি করিয়া খেলাধুলায় মাতিয়া মনের আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিত, আজ সহসা তাহার উপর নামিয়া আসিল শিক্ষকের প্রচণ্ড শাসনদণ্ড। সদানন্দ শিশুর অন্তরাত্মা শিক্ষকের রক্তচক্ষু আর ঘূর্ণ্যমান বেত্রদণ্ড দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। শিশুমনে সেই যে প্রথম আতঙ্কের সৃষ্টি হইল, তাহা আর ঘুচিল না। শিশু পাঠশালাকে আনন্দ-নিকেতন বলিয়া ভাবিতে পারিল না, উহা তাহার কাছে একটা ভীতিপ্রদ বন্দীশালাসদৃশ বলিয়া মনে হইল, মুক্ত বনবিহঙ্গ যেন পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া পড়িল। এখানকার বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে নিরানন্দ শিক্ষাপ্রণালীকে সে প্রাণের সহিত, আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারিল না। রুদ্ধশ্বাসে বদ্ধঘরে আনন্দহীন পরিবেশের মাঝখানে বসিয়া বসিয়া তাহার শিশুচিত্ত অবসাদ ও অস্বস্তিতে হাঁপাইয়া উঠিল। শিশুর মানস-শতদলের পাপড়িগুলি পূর্ণবিকশিত হইবার পূর্ব্বেই স্নেহবারি-সিঞ্চনের অভাবে এবং রুদ্রশাসনের খররৌদ্রে শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িল। যে সকল নববিদ্যার্থী পুঁথিহাতে গুরুমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হয়তো ভাবী বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র, আশুতোষ ও চিত্তরঞ্জন লুকাইয়া ছিল,—তাহাদের হইল অকালমৃত্যু।

রবীন্দ্রনাথ বড় দুঃখেই বলিয়াছেন—"বাঙালীর ছেলের মত এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্ব্বণ করিতেছে, বাঙালীর ছেলে তখন স্কুলের বেঞ্চের উপর কোঁচাসমেত দুই-খানি শীর্ণ খর্ব্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেত্র হজম করিতেছে, মাষ্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর অন্য কোনরূপ মসলা মিশানো নাই।"

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও ইউরোপের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীকে শারীরিক শাস্তিদানের ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু শিশুচরিত্র ও শিশুমনস্তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমে ক্রমে শিক্ষাবিদ্ পণ্ডিতগণ শারীরিক দণ্ডবিধান প্রথা বিদ্যালয় হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার আইন অনুসারে পিতামাতা পর্য্যন্ত সন্তানকে প্রহার করিতে পারে না, সন্তানকে শারীরিক কষ্ট দেওয়া তথায় অপরাধ

বলিয়া গণ্য, এবং ইহার জন্য পিতামাতাকে শাস্তি পাইতে হয়। কিন্তু এ দেশে শিশুদের কোমলগাত্রে কত পিতামাতা আর শিক্ষক যে প্রতিদিন আঘাতের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। জীবনের প্রভাতে শিশুর যাত্রাপথ যদি চোখের জলে ভিজিয়া উঠে, তবে শিশুজীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু হইতে পারে না। স্বাধীনতা এবং আনন্দের মধ্য দিয়া যদি শিশুদের জীবনকে আমরা পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ দিতে পারিতাম, তবে আজ পৃথিবীর রূপ বদলাইয়া যাইত! শিশুর জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে জোরজবরদস্তিতে নয়, স্নেহমমতা দিয়া; আঘাত করিয়া নয়, আলিঙ্গন করিয়া। শিশুশিক্ষা বেত্র-কণ্টকিত পথে ঠিকমত হইবার নয়; অপরিমেয় সহানুভূতি, অসীম ধৈর্য্য আর অফুরন্ত দরদের পথই শিশুশিক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা।

জৈন মহর্ষি রায়চাঁদ ভাই

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

গুজরাটী ভাষায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি রাজচন্দ্র অথবা রায়চাঁদ ভাই কাথিয়াবাড় ষ্টেটের অন্তর্গত ভবানীয়া নামক স্থানে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। লণ্ডন থেকে ১৮৯১ সালে, যেদিন আমি দেশে ফিরে আসি সেদিনই বোম্বাইয়ে ডক্টর পি. জে. মেহতার বাসভবনে এই কবির সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আমি কবি বলেই তাঁকে সম্বোধন করতাম, তিনি ডক্টর মেহতার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি শত-ধাঁধনী অর্থাৎ একসঙ্গে এক শত বিষয় স্মরণ রাখতে সমর্থ বলে আমার নিকট পরিচিত হন। কবি তখন যুবক ছিলেন, আমার প্রায় সমবয়সীই হবেন। বয়স খুব সম্ভব তখন একুশের কাছাকাছি। বাস্তব জগতের সকল কাজকর্ম্ম থেকে অবসর নিয়ে তিনি ধর্ম্মসাধনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছিলেন। আমি তাঁর সরল অনাড়ম্বর জীবন, এবং স্বাধীন বিচারশক্তির জন্য তাঁর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতাম। তিনি সর্ব্ববিধ অন্ধ গোঁড়ামির হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। তিনি কর্ম্মকে সক্রিয় ধর্ম্মসাধনায় রূপান্তরিত করেছিলেন বলেই সম্ভবতঃ তাঁর প্রতি আমি সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলাম। অধ্যাত্ম-দর্শনের একজন কৃতী ছাত্র হিসাবে তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাই কার্য্যত অনুশীলনেও সচেষ্ট হতেন। স্বয়ং জৈন ধর্ম্মাবলম্বী হলেও অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর সহনশীলতা উল্লেখযোগ্য। উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ইংলণ্ড যাবার সুযোগ পেয়েও তিনি তা গ্রহণ করেন নি।

তিনি ইংরেজী শেখেন নি। তাঁর বিদ্যালাভ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই যা কিছু হয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন বিশেষ প্রতিভার অধিকারী। তিনি সংস্কৃত ও মাগধী ভাষা জানতেন এবং আমার ধারণা পালী ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি একজন গ্রন্থকীট ছিলেন। গুজরাটী ভাষার মাধ্যমে তিনি অধ্যাত্মশাস্ত্র-বিষয়ক প্রভূত জ্ঞান আহরণ করেন, এমন কি ইসলাম ধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং জরথুস্ত্র-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিষয়েও যথোচিত ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করেন। তিনি বাস্তবিকই একজন মনীষী ছিলেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আমাকে নিরতিশয় মুগ্ধ করেছে। আমি অন্যত্র বহুবার বলেছি যে, আমার আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে উক্ত কবির প্রভাব টলষ্টয়, রাস্কিন প্রভৃতির প্রভাবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। কবিবরের প্রভাব গভীরতম হওয়ার এটাই মুখ্য কারণ যে, আমি তাঁর ব্যক্তিত্বের নিকটতম সংস্পর্শ লাভে ধন্য হয়েছিলাম। তাঁর উপদেশাবলী জীবনের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের অধিকাংশ ব্যাপারেই আমার বিবেককে প্রবুদ্ধ করেছে। তাঁর ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলভিত্তি নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে অহিংসা। একমাত্র বৃদ্ধ ও রুগ্ন গৃহপালিত পশু এবং বিবিধ কীটপতঙ্গ ইত্যাদিকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করাই অহিংসার পরাকাষ্ঠা একথা যারা বলে থাকে, সেইসব তথাকথিত অহিংসার পূজারীর দ্বারা যে সকল অদ্ভুত আচরণ অনুষ্ঠিত হতে দেখতে পাওয়া যায়, রায়চাঁদ ভাইয়ের অহিংসা ঠিক সে ধরণের নয়। তাঁর অহিংসা ক্ষুদ্রতম কীট থেকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সমভাবে প্রযুক্ত হ'ত।

তথাপি কবিকে দোষত্রুটিহীন পূর্ণ মানবরূপে মেনে নিতে আমি কখনো পারি নি। কিন্তু যেসব শ্রেষ্ঠ মনীষীর সঙ্গে আমি সবিশেষ পরিচিত তাঁদের সকলের চেয়ে এই কবি পূর্ণতার অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলে আমার নিকট প্রতিভাত হতেন। হায়! তিনি অকালে, মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। সত্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সত্যলোকে প্রয়াণ করলেন। তিনি তাঁর ভাবক রেখে গেছেন অসংখ্য, কিন্তু অনুগত শিষ্য রেখে গেছেন খুবই কম। তাঁর লেখার ভিতর অধিকাংশই পত্রাবলী, যা তিনি অনুসন্ধিৎসুদের নিকট গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিপূর্ণ প্রাণের ভাষায় লিখেছিলেন। এই পত্রসংকলন প্রকাশিত হয়েছে গুজরাটী ভাষায়। হিন্দীতে অনূদিত হয়ে এগুলি প্রকাশের চেষ্টাও হচ্ছে। এর ইংরেজী অনুবাদও শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে আমি জানি। এই পত্রাবলীতে বর্ণিত বিষয়গুলি প্রধানতঃ কবির আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।*

* ১৯৩০ জুনের 'মডার্ণ রিভিয়ু'র একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক লিখিত।

পোর্ট তকিকে 'আরব লীগের' দুই কর্ণধার।
সৌদি আরবের নৃপতি ইবন সৌদ (বামে) ও মিশরের রাজা ফারুখ

ইজ্রায়েল রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্র তেল আভিভ

কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্য ও তাহার বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ-প্রণালী

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস, এম-এস্‌সি

ভারতবর্ষে উৎপন্ন কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্যসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যে একান্ত প্রয়োজন তাতে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি ও জলসেচন প্রভৃতির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে প্রত্যেক ফসলের উৎপাদন বহুলাংশে বাড়ানো যেতে পারে। বর্ত্তমানে কৃষিবিদ্‌গণ এ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং আশা করা যেতে পারে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য্য পরিচালনা করলে ক্রমশঃ উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেড়ে চলবে। কিন্তু কেবল ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয় চিন্তা করলেই চলবে না—দেখতে হবে কি করে এই উৎপন্ন ফসলসমূহ সুরক্ষিত অবস্থায় দেশবাসীর নিকট দীর্ঘ কালের জন্য ব্যবহারযোগ্য থাকে। আমরা সকলেই ফসলের ক্ষতি-সাধনকারী বিবিধ কীটপতঙ্গের বিষয় অবগত আছি। ফসল গোলাজাত করবার পরও কীটপতঙ্গের দ্বারা বহুলাংশে বিনষ্ট হতে পারে। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এজন্য বহু অর্থের অপচয় ঘটে এবং গবর্ণমেণ্ট ও বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় এইরূপ অপচয় বহুলাংশে নিবারণ করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের পক্ষেও এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই দেশেও এইরূপ কীটপতঙ্গের জন্য বহুল পরিমাণ শস্য বিনষ্ট হয় এবং বার্ষিক অপচয়ের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ টাকা হবে সন্দেহ নাই। বিস্তর ধান, চাল, ডাল, গম, তামাক ও বিবিধ ফল এইরূপ কীটপতঙ্গের জন্য বিনষ্ট হয়। এর আশু প্রতিকার একান্ত প্রয়োজন।

উপরোক্ত কীটপতঙ্গসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর হতে পারে এবং এদের বিনষ্ট করারও নানারূপ উপায় আছে। সাধারণ ভাবে গরম ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সৃষ্টি করে উপযুক্ত আধারের মধ্যে শস্যাদি সংরক্ষণ করবার ব্যবস্থা করলে কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে অনেকাংশে সেগুলোকে রক্ষা করা যেতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ১৪০° ফারেন হাইট টেম্পারেচারের সাহায্যে ধান ও তামাক ছাড়া অনেক শস্য-বীজকে কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে বাঁচানো যেতে পারে। এই উপায় অবলম্বন করলে বীজগুলির অঙ্কুরিত হবার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হয় না। অতিশয় ঠাণ্ডা আধারসমূহের মধ্যে খাদ্য-দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করবার ব্যবস্থাই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। অবশ্য এটা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং এদেশের পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। ঠাণ্ডা ও গরম আধারের মধ্যে শস্য ও ফসলসমূহ সংরক্ষণ করার বিষয় আলোচনা করা গেল। এক্ষণে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগে কিভাবে শস্যাদি সংরক্ষিত হতে পারে তা দেখা যাক।

ফরমাল্‌ডিহাইড, ন্যাপথলিন প্রভৃতি কতিপয় রাসায়নিক পদার্থের সহিত অনেকেই সুপরিচিত এবং এই সকল পদার্থ সাধারণ টেম্পারেচারেই ধীরে ধীরে বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত হয়ে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে ও সকল রকম কীটপতঙ্গ বিনষ্ট করে। সঞ্চিত দ্রব্যসমূহ এই বাষ্পের কিয়দংশ শোষণ করে রেখে দেয় যার ফলে অনেকদিন নূতন কীটসমূহ জন্মাতে পারে না। খাদ্যদ্রব্যাদি সঞ্চয়ের জন্য যে সব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করতে হবে সেগুলো মানুষ ও যাবতীয় জীবজন্তুর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিষ হওয়া দরকার। অবশ্য এই সকল পদার্থ অতি সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করেই বহুল পরিমাণ খাদ্যশস্য সংরক্ষিত করা চলবে। কীটপতঙ্গ বিনষ্ট করবার সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ঔষধ পাইরেথ্রাম নামক একপ্রকার গাছের ফুল হতে প্রস্তুত হয় এবং তাকে পাইরেথ্রাম একস্ট্রাক্ট বলে। এটি একটি তরল পদার্থ এবং তৈলে দ্রবীভূত করে স্প্রে করবার ব্যবস্থা করলে এর কীটবিনাশক শক্তি অনেক বেড়ে যায়। পাইরেথ্রাম জাপান থেকে বেশী পরিমাণে আমদানী হ'ত এবং পূর্ব্ব-আফ্রিকা থেকেও কিছু কিছু পাওয়া যেত। শস্য সংরক্ষণাগারে পাইরেথ্রাম স্প্রে দিয়ে মধ্যে মধ্যে কীটাদি বিনাশ করবার চেষ্টা করতে হবে। এতে কীটপতঙ্গ বহুল পরিমাণে ধ্বংস হবে। শুষ্ক আবহাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। তাতে কীটপতঙ্গ বেশী পরিমাণ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। সে কারণ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে যেন খাদ্যশস্য-সঞ্চয়ের আধারসমূহ বেশ শুষ্ক থাকে ও স্যাঁতসেঁতে না হয়।

আমেরিকায় আর একটি মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে—এর নাম ডি, ডি, টি। এর পুরা রাসায়নিক নাম ডাইক্লোরো, ডাইফেনিল, ট্রাইক্লোরোইথেন। এটা দেখতে সাদা লবণের মত এবং কেরোসিন তৈল, ইথার, স্পিরিট প্রভৃতি তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয়। ডি, ডি, টি উপরোক্ত দ্রাবক পদার্থসমূহের সহিত ভালরূপ মিশে গেলে স্প্রে করা উচিত। তখন বাষ্পীয় আকারে ডি, ডি, টি কণাসমূহ কেরোসিন, ইথার প্রভৃতি তরল পদার্থসমূহের সহিত সূক্ষ্মভাবে মিশ্রিত হয়ে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। ফলে বায়ুমণ্ডলস্থ কীটাণুসমূহ সত্বর বিনষ্ট হয়। স্প্রের সাহায্যে ডি, ডি, টির ক্রিয়া কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাপকভাবে ডি, ডি, টি স্প্রে করবার জন্য বড় বড় স্প্রে পাম্প ব্যবহার করা যেতে পারে। ডি, ডি, টি যেখানে স্প্রে করা

সম্ভব হবে না সেখানে পাউডার ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। ডি, ডি, টি অন্যান্য পাউডারের সহিত মিশ্রিত করা হয় এবং সাধারণতঃ শতকরা .৫ থেকে ১০ ভাগ ডি, ডি, টি এই পাউডারের মধ্যে থাকে। কীটাণুসমূহের বাসস্থানে এই পাউডার ছিটান হয়, ফলে আস্তে আস্তে সমস্ত কীটাণু ধ্বংস হয়ে যায়। স্প্রের মত এত শীঘ্র না হলেও বেশ স্বল্পকালের মধ্যেই সমস্ত কীটপতঙ্গ বিনষ্ট হয়। ডি, ডি, টি-র কীটাণু-বিনাশক শক্তি অসীম এবং সঞ্চিত শস্যাদি মাত্র সহস্র ভাগের এক ভাগ ডি, ডি, টি-র প্রয়োগেই কীটাণুর আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকে।

আদর্শ শস্যাগার নির্ম্মাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। আবহাওয়া ভেদে খাদ্যদ্রব্যাদির সংরক্ষণ-কার্য্যের মধ্যে বেশ তারতম্য দেখা যায়। বাংলাদেশের জলীয় বাষ্পপূর্ণ আবহাওয়ায় কীটাণু সহজেই জন্মগ্রহণ করে এবং সেজন্য এখানে খাদ্য সঞ্চয়ের আধারসমূহ খুব সাবধানে তৈরি করতে হবে। পক্ষান্তরে শুষ্ক আবহাওয়ায় ফলশস্যাদি প্রকৃতির সাহায্যেই বেশ কিছুকাল সংরক্ষিত হতে পারে। এর উপর যদি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আধারসমূহ নির্ম্মাণ করা যায় ত এগুলো দীর্ঘকাল টাটকা থাকবে। বিহার, যুক্তপ্রদেশ পঞ্জাব এবং আরও কয়েকটি শুষ্ক আবহাওয়া প্রধান দেশে আদর্শ শস্যাগারসমূহ নির্ম্মিত হতে পারে। এমন কি, বাংলায় উৎপন্ন মূল্যবান খাদ্যশস্যাদির কিয়দংশও ঐ সকল দেশে ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত করা যেতে পারে।

খাদ্যসংরক্ষণ-ব্যবস্থার উন্নতি না হলে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্যাদি বিনষ্ট হবে। এরূপ অপচয় নিবারণ করা অবশ্য কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই, তবুও বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক সহযোগিতা পেলে এটা সম্ভব হবে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে হলে এই সঞ্চয় ও সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। অবশ্য এ সম্বন্ধে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতাও দরকার। সাধারণ কৃষক যদি বুঝতে পারে যে তার উৎপন্ন ফসল দীর্ঘদিন সযত্নে সংরক্ষিত থাকবে এবং সে উপযুক্ত মূল্যে একদিন নিশ্চয়ই তা বেচতে পারবে তা হলে সে এই সংরক্ষণনীতি অবশ্যই মেনে চলবে। আদর্শ শস্যাগার নির্ম্মাণ যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য হবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সরকারের সহায়তা পেলে এই কাজ কঠিন হবে না। কৃষি-দ্রব্যাদি বার মাস সমান উৎপন্ন হয় না। প্রত্যেক ফসলেরই একটি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে এবং এই উৎপন্ন ফসলের স্থায়িত্ব সব সময় সমান নহে। অধিকাংশই দু-এক মাসের মধ্যে পচে নষ্ট হয় এবং সেজন্য শীঘ্র জনসাধারণের মধ্যে সেগুলি বিলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। জনসাধারণও প্রত্যেক খাদ্যশস্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করে। ফলে অনেক সময় তাদের অর্থের অপচয় ও স্বাস্থ্য-হানি ঘটে। এরূপে অবশ্য খাদ্যদ্রব্য কীটপতঙ্গের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেল, কিন্তু এর দ্বারা ঠিক অপচয় নিবারণ হ'ল না। যে সকল খাদ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন হয় সেগুলো যদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় ত ভবিষ্যতে তাদের সদ্ব্যবহার হবে এবং দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অনেকাংশে নিবারিত হবে। খাদ্যশস্য সংরক্ষণ বিষয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনা করা দরকার। এরূপ পরিকল্পনা যে জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাংলা পরিভাষা

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ইংরেজ জাতির সহিত আমাদের দেশের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পর হইতেই বিকৃত ও অবিকৃত ভাবে অনেক ইংরেজী শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া অজস্র ইংরেজী শব্দ বাংলায় অনূদিত হইয়া বাংলার শব্দভাণ্ডারকে পুষ্ট করিতেছে। সাধারণতঃ লেখকগণ যে যাহার প্রয়োজন মত শব্দের অনুবাদ করিয়া থাকেন—সংঘবদ্ধ চেষ্টাও মাঝে মাঝে কিছু কিছু দেখা যায়। তবে দেশের জনসাধারণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ সম্পর্কে বিশেষ কোনও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যেই শিক্ষাভিমানী সমাজের মুখ্য উপজীব্য—দু'চার জন ছাড়া তাঁহাদের অধিকাংশই বাংলার ধার ধারেন না—বাংলায় কোনও গভীর বিষয়ের গুরু আলোচনার প্রয়োজন বা তাগিদ তাঁহাদের অনেকেরই নাই। বাংলায় কিছু বলিতে বা লিখিতে হইলে বিপন্ন বোধ করেন এরূপ লোকের সংখ্যা শিক্ষিতের মধ্যেও যথেষ্ট। তার পর ইংরেজী ভাবে ভাবিত, ইংরেজীর মোহে আচ্ছন্ন হইয়া অনেকে যাহা লেখেন তাহা বাঙালীর বাংলা প্রায়শই হয় না—তাহার মধ্যে সাহেবী গন্ধ পুরা দস্তুর বর্ত্তমান। বাংলার এই অবস্থার কথাই অতি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়া শ্রীবুদ্ধদেব বসু লিখিয়াছেন—

'বাংলায় লিখতে ব'সে দেখি ইংরেজীতে ভাবছি, অথচ ইংরেজীতেও কথাটা পুরোপুরি বলতে পারি তা নয়। বাংলা লেখা আমাদের শিখতে হয় অতি কষ্টে প্রাণপণ পরিশ্রমে··· ভাষাকে শিল্পরূপে গড়ে তোলা এমনিতেই শক্ত কাজ, আমাদের দেশে তার ওপরে বিদেশী ভাষার মধ্যবর্ত্তিতা জড়িত হ'য়ে ব্যাপারটিকে আরও দুরূহ ক'রে তোলে।···এখন পর্য্যন্ত আমাদের সাধারণ শিক্ষিত লোকদের বেশির ভাগই, ভাল বাংলা দূরে থাক, নির্ভুল বাংলাও লিখতে পারেন না—ছাপার অক্ষরের বইয়েও শুধু অপটুতা নয়, প্রমাদও লক্ষিত হয় প্রচুর।' (সব পেয়েছির দেশ, পৃঃ ৮৫-৬)।

এই অবস্থায় ভাষার সৌন্দর্য্য ও পরিপুষ্টির দিকে দেশের জনসাধারণ বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি তেমন ভাবে পড়ে নাই। এক জনের ব্যবহৃত শব্দ সুন্দর হইল কি অসুন্দর হইল, শুদ্ধ হইল কি অশুদ্ধ হইল তাহা লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন কচিৎ দুই এক জন মাত্র অনুভব করিয়াছেন। ফলে আজ যে কত অসঙ্গত, অসুন্দর ও অশুদ্ধ শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ভ্রূকুটি বা অনুনয় এ বিষয়ে বিশেষ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বহুল প্রচলিত শব্দের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা, কৃষ্টি, সহানুভূতি, অন্তরীণ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্ট ভাষায় তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অথচ কয়জন তাহার খবর রাখে বা রাখার প্রয়োজন বোধ করে?

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কথারই পুনরুক্তি করিয়া আমরা বলিতে পারি 'ভাষা যে সব সময় যোগ্যতম শব্দের বাছাই করে কিম্বা যোগ্যতম শব্দকে বাঁচাইয়া রাখে' তা নয় তথাপি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের দোষগুণ সম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন করা যে কোন ভাষাভাষীর পক্ষে মোটেই প্রশংসার বিষয় নহে। এ দিকে সতর্ক দৃষ্টি ও মমত্ববোধ থাকিলে তবেই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবপর, অন্যথা নহে। আজ স্বাধীনতালাভের পর যখন বাংলাভাষার প্রসারবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী—যখন ইংরেজীকে একেবারে না ছাড়িলেও বাংলা ভাষার মধ্য দিয়াই আমাদিগকে প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে তখন আর কাহারও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে অনবহিত হওয়া সঙ্গত ও শোভন নয়। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে সরকারী অনুবাদ সমিতি, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রবর্ত্তিত সারস্বত সমাজ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ইংরেজী শব্দের সুষ্ঠু বাংলা প্রতিশব্দ প্রণয়নে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ চেষ্টার সূত্রপাত করেন তখন যথেষ্ট চাহিদার অভাবতশতঃ এই সকল প্রচেষ্টা কল্পনাবিলাসীর বিলাস হিসাবে জনসমাজ কর্ত্তৃক অনাদৃত বা উপেক্ষিত হইয়া থাকিলেও তেমন দোষ দেওয়া চলে না। কিন্তু বর্ত্তমানে শোভন অনুবাদের মধ্য দিয়া কেবল বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য নহে আধুনিক জগতের ভাবধারা বাঙালীর কাছে বাঙালীর মত করিয়া বলিবার প্রয়োজনে উপযুক্ত শব্দের চাহিদা ও মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জনসাধারণের ঔদাসীন্যের ভাব এখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। ফলে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দেশীয় ভাষার পূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থার জন্য যখন বিভিন্ন বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল তখন দেশের লোক শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে বরণ করিয়া লয় নাই—নিন্দা করিয়াছে, ব্যঙ্গ করিয়াছে কিন্তু দোষ থাকিলে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই—দোষগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ার ক্লেশ পর্য্যন্ত স্বীকার করে নাই। সদ্যপ্রকাশিত 'সরকারী কার্য্যে ব্যবহার্য্য পরিভাষা' সম্বন্ধেও অনুরূপ মনোভাব ও ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছি। বিভিন্ন পত্রিকা একরূপ সমস্বরে ইহাকে নিন্দা করিয়াছেন—উপহাস করিয়াছেন। পথে-ঘাটে বন্ধুবান্ধব, সরকারী কর্ম্মচারী, উকীল, মোক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী যাহারই সঙ্গে কথা হয় তিনিই ইহার নিন্দা করেন—ইহা অচল, অব্যবহার্য্য বলিয়া মত প্রকাশ করেন। সংস্কৃতের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাতিতা, প্রচলিত ইংরেজী বা অন্য দেশীয় শব্দের প্রতি উপেক্ষা ও খাঁটি বাংলার প্রতি অশ্রদ্ধা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সরকারী পরিভাষার প্রধান দোষরূপে সাধারণত উল্লিখিত হইয়া থাকে। তবে ইহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে অনেকের কাছেই জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় না। কোন্ কোন্ শব্দের অনুবাদের প্রয়োজন নাই—কোন্ কোন্ শব্দের অনুবাদের কিরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইতে পারে এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও খুঁটিনাটি আলোচনায় বিশেষ কেহ অগ্রসর হইতে চাহেন না। সত্য বটে, অনেকের পক্ষেই এরূপ আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। হয়ত বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের মতামত সরকারের পরিভাষাসংসদের নিকট সরাসরি পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু দেশের সাধারণ লোকের যে আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ আছে তাহার তেমন কোনও নিদর্শনও পাওয়া যায় নাই। বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সভাধিবেশনের বিবরণ প্রতি দিনের পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কিন্তু কোথাও এই পরিভাষার আলোচনার ইঙ্গিতমাত্র দেখা যায় না। সাধারণের আগ্রহের ফলেই ছোট বড় নানা বিষয় সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দের মতামত সাড়ম্বরে পত্রিকায় প্রচারিত হয়। সরকারী পরিভাষা সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্ববিদ্ বা সাহিত্যিকগণের অভিমত বা সমালোচনা কিন্তু পত্রিকাধ্যক্ষগণ সংগ্রহ করিয়া পত্রিকাস্থ করার বিশেষ কোনও প্রয়োজনই অনুভব করেন নাই। সাধারণের এ বিষয়ে আগ্রহের অভাবই কি ইহার মুখ্য কারণ নয়? অথচ এরূপ সমালোচনা উপযুক্ত পরিভাষা নিরূপণের কাজে হয়ত প্রচুর সহায়তা করিতে পারিত।

একথা কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে প্রস্তাবিত পরিভাষা সম্বন্ধে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। প্রথমেই পূর্ব্বাচার্য্যগণ, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ, এ বিষয়ে যে সাধারণ সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহার প্রথম ও প্রধান কথা—'বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির হয় নাই, অতএব পরিভাষার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা কর্ত্তব্য, কিন্তু বিবাদ করা অসঙ্গত।' আজ কবিগুরুর এই উপদেশ মাথায় করিয়া আমাদের কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। নূতন শব্দ গঠনের সময় ভাষার প্রকৃতি, সৌন্দর্য্য, বিশুদ্ধি ও অর্থের স্পষ্টতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অবশ্য সব সময় সকল দিক রক্ষা হইবে না—তবে তাই বলিয়া বিচলিত হইবার কোনও কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নতুন তৈরি শব্দ নতুন নাগরা জুতোর মতই কিছুদিন অস্বস্তি ঘটায়।' 'বার বার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দ বিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে ওঠে, মূলে যেটা অসঙ্গত অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে।' (শব্দতত্ত্ব, পৃঃ ১৬৬, ১৮৭)। অবশ্য এই অজুহাতে যদৃচ্ছাচার শোভা পায় না বা সমর্থন করা চলে না। যথাসম্ভব, নির্দ্দোষ শব্দ গঠনের চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এজন্য বিপুল সমৃদ্ধিশালিনী সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। রবীন্দ্রনাথ তাই স্পষ্ট বলিয়াছেন—'একথা স্বীকার করতেই হবে সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কি জ্ঞানের কি ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ ক'রতে হচ্ছে। পাশ্চাত্য ভাষাগুলিকেও এমনি ক'রেই গ্রীক-লাটিনের বশ মানতে হয়।' (বাংলা ভাষাপরিচয়, পৃঃ ৫০)। কারণ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার প্রকৃতিগত একটা দৌর্ব্বল্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন—'বিশেষ্যকে বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে পরিণত করবার সহজ উপায় আমাদের ভাষায় নেই বললেই হয়। তাই বাংলা ভাষার আপন রীতিতে শব্দ বানানো প্রায় অসাধ্য।' (বাংলা ভাষাপরিচয়, পৃঃ ১০৪)। তাই দেখিতে পাই বিগত দেড় শত বৎসর ধরিয়া যখনই বাংলায় নূতন শব্দের প্রয়োজন হইয়াছে তখনই সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে—শুদ্ধ ভাবে হউক বা অশুদ্ধ ভাবে হউক, মূল অর্থ বজায় রাখিয়া হউক বা উহাকে সঙ্কুচিত, প্রসারিত বা বিকৃত করিয়া হউক সংস্কৃতমূলক শব্দকেই বাঙালী তাহার ভাষার মধ্যে বরণ করিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমানেও যে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা মোটেই বলা চলে না। ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক স্থাপনের পর যে সমস্ত নূতন শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহাদের কোনও তালিকা এখন পর্য্যন্ত সঙ্কলিত হয় নাই সত্য তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এই জাতীয় শব্দের মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃত বা সংস্কৃতের আদর্শে রচিত। যাঁহারা চলতি বা কথ্য বাংলার একান্ত পক্ষপাতী তাঁহারাও যে দরকারমত অজস্র সংস্কৃত শব্দ গঠন ও প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, অতি আধুনিক মতাবলম্বীদের লেখা হইতেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উদ্গাতা, ঋত্বিক্, পুরোধা, স্নাতক, সমাবর্ত্তন প্রভৃতি লৌকিক সংস্কৃতে অপ্রচলিত বৈদিক শব্দ পর্য্যন্ত আজ অবাধে বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে। বস্তুতঃ মুখে আমরা যাহাই বলি না কেন সংস্কৃতের প্রতি আমাদের অন্তরের টান অস্বীকার করিবার উপায় নাই—পরিভাষারচনায় বা নূতন শব্দ গঠনে তাই সংস্কৃতের প্রভাব অপরিহার্য্য।

তাই বলিয়া প্রচলিত শব্দের স্থলে নূতন অপরিচিত সংস্কৃত শব্দ গঠন করিয়া চালাইতে হইবে এরূপ কথা বলা চলে না। অবশ্য প্রচলিত শব্দের দ্বারা সমস্ত কাজ চলে কিনা এবং প্রচলিত বলিতেই বা ঠিক কি বুঝায় তাহা ধীর ভাবে পর্য্যালোচনা করা দরকার। পুলিশ শব্দটি প্রচলিত সন্দেহ নাই কিন্তু পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টকে প্রচলিত বলিলে ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা হয় কি? Deputy Superintendent of Police, Inspector-General of Police প্রভৃতির বেলায় কোনও অজুহাতেই অনুবাদ ঠেকাইয়া রাখা সঙ্গত বা শোভন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আর এগুলি অনুবাদ করিতে গেলে পুলিশ শব্দটিকে বাঁচাইয়া রাখা সুকঠিন। এইরূপ magistrate, deputy-magistrate প্রভৃতি শব্দও বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া না যাওয়ায় তাহাদেরও অনুবাদ না করিয়া বাংলা ভাষায় কাজ চালান চলে না। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর মুখে মুখে সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যেও অনেক ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হয় সত্য তবে সেগুলিকে বাংলা ভাষার অঙ্গ বা আভরণ কোনওক্রমেই বলা চলে না—সেগুলি পরাধীন জাতির পরানুকরণের মোহ ও বিকারের সাক্ষ্য বহন করে মাত্র। জোর করিয়া সেগুলিকে ভাষায় চালাইতে গেলে তাহাতে ভাষা পরিপুষ্ট না হইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে—ভাষার শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া বিকৃতিই প্রকট হইয়া উঠিবে। তাই আমরা কথাবার্ত্তায় যত ইংরেজী শব্দই ব্যবহার করি না কেন লেখার বেলায় যথাসম্ভব বাংলা শব্দ ব্যবহার করিতে সাধারণত ত্রুটি করি না। meeting, secretary, editor, election, nomination, report, proceedings, result, class, subject প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ আমরা কথ্য ভাষায় ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্তু লেখার সময় সভা, সম্পাদক, নির্ব্বাচন, মনোনয়ন, কার্য্যবিবরণ, ফল, শ্রেণী, বিষয় প্রভৃতি ব্যবহার করিতে কোনও দ্বিধা করি না অথচ কথ্য ভাষায় এ সব শব্দ ব্যবহার করিতে যে একটা সংকোচ বোধ করি না এমন কথা কয়জন হলপ করিয়া বলিতে পারেন?

অনুবাদ-প্রবণতা শুধু বাংলাদেশে নয় বাংলার বাহিরেও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে সমস্ত ইংরেজী শব্দ আজ বিভিন্ন দেশীয় ভাষার অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে তাহাদের দেশীয় রূপ প্রচারের অসীম আগ্রহ সর্ব্বত্র অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। তাই স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হোটেল, থিয়েটর, সিনেমা আজ দেশীয় ভাষায় সাদরে গৃহীত হইলেও বিদ্যালয়, বিদ্যানিকেতন, বিদ্যাপীঠ, পাঠশালা, মহাবিদ্যালয়, আরোগ্যশালা, ভোজনাগার, নাট্যনিকেতন, চিত্রমন্দির, ছবিঘর প্রভৃতি অনুবাদাত্মক শব্দ ব্যবহারের দিকেও ঝোঁক নিতান্ত কম নয়। মধ্যপ্রদেশ সরকার তাঁহাদের এলাকার সরকারী কলেজগুলির দেশী নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। নাগপুর মরিস কলেজ, জব্বলপুর রবার্টসন কলেজ, অমরাবতী এডওয়ার্ড কলেজের পরিবর্ত্তিত নাম নাগপুর মহাবিদ্যালয়, মহাকোশল মহাবিদ্যালয় ও বিদর্ভ মহাবিদ্যালয় নিশ্চয়ই লোকরুচির পরিপন্থী নহে। বোম্বাই শহরে রেষ্টোর‍্যান্ট অবাধে উপাহারগৃহরূপে চলিতেছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত দোকান ইংরেজী নাম লইয়া সাধারণের মধ্যে মর্য্যাদা লাভ করিত কিছুকাল যাবৎ তাহাদের স্বজাতীয় অনেকেই বাংলা নামকরণকেই অধিকতর লোকরঞ্জক মনে করিয়া আরামঘর, তৃপ্তিসদন, বসনালয়, বাসনালয়, সাধনালয়, সূচীশিল্পসদন, রূপায়তন, মিষ্টান্নাগার, বস্ত্রাগার, বস্ত্রালয়, বস্ত্র-প্রতিষ্ঠান, পরিচ্ছদভবন, মাতৃভাণ্ডার, কমলাভাণ্ডার, বিক্রমপুরভাণ্ডার, খাদ্যপ্রতিষ্ঠান, পাদুকাপ্রতিষ্ঠান, উপানৎ শিল্পসদন, মুদ্রণী, মুদ্রণালয়, গ্রন্থগেহ, প্রকাশনী, পুঁথিঘর প্রভৃতি নাম সাড়ম্বরে প্রচার করিতেছে। এই সকল ব্যাপার হইতে দেশের লোকের প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—তাহার মানসিক গতির প্রত্যক্ষ আভাস মিলে। নির্ব্বাধে নিজের রুচির অনুসরণ করিতে দিলে নিজের অজ্ঞাতসারেই সে ইংরেজী শব্দের পরিবর্ত্তে সংস্কৃতমূলক গালভরা শব্দের দিকে আকৃষ্ট হইবে।

পরিভাষা রচনায়ই হউক আর সাধারণ ইংরেজী শব্দের অনুবাদেই হউক মূল শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—কেবল আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া দেশের প্রকৃতি, রীতিনীতি অনুসারে নূতন শব্দ গঠন করিতে হইবে। ইংরেজী হাবভাব আদবকায়দা আজ আমাদিগকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্র ও তাহার দেশী পরিভাষা রচনার সময় আমাদিগকে ভাবিতে হইবে—আমাদের কাজকর্ম্ম কি চিরদিনই বিলাতী ছাঁচে চলিবে? বিলাতী নামগুলিই অন্ধ ভাষায় আমাদিগকে চালাইয়া যাইতে হইবে? ইংরেজীর ভুলত্রুটি অসম্পূর্ণতাও কি নির্ব্বিবাদে উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদিগকে বহন করিয়া যাইতে হইবে? Gazetted officer এবং non-gazetted officer এই পার্থক্য কি চিরকাল আমাদিগকে ঠিক এই নামেই বা ইহার আক্ষরিক অনুবাদ দিয়াই বজায় রাখিতে হইবে? আমাদের দেশে ত উত্তম মধ্যম বা প্রথম দ্বিতীয় প্রভৃতি নামে শ্রেণীবিভাগ অধিকতর সুপরিচিত এবং সাধারণের নিকট সহজবোধ্য।

পূর্ব্ব আমলে নানা সময়ে যখন নূতন নূতন পদের সৃষ্টি ও নামকরণ হইয়াছে তখন যে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া তাহা করা হইয়াছে এরূপ মনে হয় না। যখন আমাদিগকে নূতন ভাবে সমস্ত জিনিষ গড়িয়া তুলিতে হইবে তখন এ বিষয়ে যথাসম্ভব শৃঙ্খলা ও সারল্য বিধানের চেষ্টা করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। Superintendent, manager, director, ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কর্ম্মগত যে সূক্ষ্ম পার্থক্যই থাকুক না কেন ইঁহারা সকলেই প্রাচীন মতে অধ্যক্ষ বা মুখ্যাধিকারী—ইঁহাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র শব্দ উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। Care-taker (Writers Buildings) এবং superintendent (Governor's Estate) দুইয়ের মধ্যে কর্ম্মগত এমন কি বিভেদ আছে যাহাতে দু'জনকেই তত্ত্বাবধায়ক বলা চলে না? অপরপক্ষে Superintendent (Government House Gardens) স্বতন্ত্র পদের দরকার থাকিলেও সেই পদাধিকারীও কি তত্ত্বাবধায়কমাত্র নহেন? Chief Executive Officer (Calcutta Corporation) এরূপ স্থলে executive শব্দটির বিশেষ কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না—অনুবাদে ইহাকে বর্জ্জন করিলে বিশেষ অঙ্গহানির আশঙ্কাও করা যায় না। বিষয়পতি বা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের করণীয় বিচিত্র কর্ম্মরাশির পূর্ণ পরিচয় কেবল ওটি দুই শব্দের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইতে পারে না অথচ পতি শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সুতরাং magistrate and collector-এর অনুবাদে দুইটি শব্দ ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র বিষয়পতি শব্দের দ্বারাই বেশ কাজ চালান যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে কোনও ভাষায়ই পারিভাষিক শব্দ বাঞ্ছিত অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং তাহার মধ্য দিয়া সমগ্র অর্থ প্রকাশ করিতে যাওয়ার চেষ্টা নিস্ফল। তাহাকে যথাসম্ভব সরল ও সুন্দর করিতে হইবে। তাহার পর বিভাগীয় ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

পরিভাষা বিষয়ে সর্ব্বভারতীয় ঐক্যের কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইংরেজ এ সকলের রাজত্বকালেই এই বিশাল ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া শাসন ব্যাপারে মোটামুটি একটা ঐক্য ছিল; সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী ভাষার মারফত শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে একই শব্দ সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন প্রান্তের

লোকসমাজের মধ্যে তখনকার দিনে ভাবের আদান-প্রদান বা পারস্পরিক আলাপ-পরিচয় মেলামেশার তেমন প্রয়োজন বা প্রচলন না থাকিলেও এই ঐক্যের মূল্য অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক যুগে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ঐক্য অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এই ঐক্য যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্য চাই ভাষার ঐক্য—সর্ব্ব-ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা যাহাই হউক না কেন প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়াও যথাসম্ভব এই ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করিতে হইবে—শাসন-সংক্রান্ত বা অন্য বিষয়ক পারিভাষিক শব্দ-গুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায়ও যাহাতে একটা সাম্য থাকে সে দিকে তৎপর হইতে হইবে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মধ্য দিয়া এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহ পণ্ডিত সমাজে বহু দিন হইতেই দেখা দিয়াছে। তবে দুঃখের বিষয় প্রকৃত কার্য্যের মধ্যে তাহা সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

বর্ত্তমানে যখন সমগ্র দেশময় ইংরেজী শব্দের দেশীয় প্রতিরূপ প্রণয়নের আয়োজন চলিতেছে তখন এই ঐক্যের কথা প্রধান ও প্রথম বিবেচ্য বিষয়। এজন্য সকল ভাষার প্রতিনিধি লইয়া একটি সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা দরকার। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কর্ত্তৃক এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠিতও হইয়াছিল মনে হইতেছে। তবে কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল জানি না। প্রদেশগুলি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিলেও বিভিন্ন প্রদেশের—বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের—পক্ষ হইতে যে কাজ হইতেছে তাহার ব্যাপক প্রচার ও আলোচনা আবশ্যক। ভারতীয় গঠন-পরিষদ বা গণপরিষদ এ সম্পর্কে যে সমিতির উপর কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন তাহার কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু কার্য্যের পূর্ণ পরিচয় এখনও প্রকাশিত বা প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি নাই—এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আলোচনার আভাসও পাই নাই। অন্য প্রদেশের মধ্যেও কোন্‌টি কত দূর অগ্রসর হইয়াছে বুঝিবার উপায় নাই। অথচ এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের মনীষিগণের কৃত কার্য্যের বিবরণ যথাযথ প্রচারিত হইলে পরস্পরের কার্য্যে সহায়তা হয়—যথাসম্ভব ঐক্যপ্রতিষ্ঠার সুবিধা হয়—একের প্রস্তাবিত সুন্দর গ্রহণযোগ্য শব্দের কথা না জানার জন্য নূতন শব্দ সংকলনের অনর্থক প্রয়াসের পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না। সুতরাং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের অনুকূল দৃষ্টি সাগ্রহে ও সনির্ব্বন্ধভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

বাঙালীর যখন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ও সংসারে আসন সঙ্কুচিত হয়ে আসছে তখন আমাদের বার বার ও সবলে উপলব্ধি করতে হবে যে আমরা সামান্য নই, বিশ্বে আমাদের অন্তত এমন একটি দান আছে যার গৌরবে ও গুরুত্বে আমাদের ইতিহাস চির গরীয়ান্ হয়ে থাকবে। হঠাৎ একটা মহা প্রলয়ে যদি বাঙালীর যা-কিছু সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কোন দিন, দূর ভবিষ্যতে যদি সে প্রলয়-সাগর-তীরে মন্থর কোন বংশধর—বাঙালীর বিস্মৃত পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করতে বসে, তখনো রবীন্দ্রনাথের অভ্রভেদী বিশালতা তার দৃষ্টি অতিক্রম করবে না। রবীন্দ্রনাথ যে বাঙালী ছিলেন, অতএব বাঙালীর স্থান যে সভ্যতার ইতিহাসে সার্থক, সে কথা সে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করবে।

তার কারণ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবি। যে-পৃথিবী তিনি রচনা করেছেন, যে-সৌরভ ও অনুভব তাতে স্পষ্ট ও বিকশিত হয়েছে তা বিশ্বমনের জন্য; বিশ্বমানবের প্রতিবিম্ব তাতে আছে। গত বৎসর ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী শহরে অনুষ্ঠিত আন্তঃ-এশিয়া মহাসম্মেলনে, শুধু সমগ্র এশিয়ার নয়, বিশ্বের মহামানবতার ঐক্য-গাথার কবি রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করতেও বহু ভারতপ্রধান যখন কুণ্ঠা ও বিস্মৃতির পরিচয় দিয়েছিলেন তখন আমরা নিখিল-ভারত সাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষ থেকে এশিয়ার সাহিত্যিকদের যে সংবর্দ্ধনা করেছিলাম তাতে সেই বিদেশী সাহিত্যিকরাই বার বার বিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথের কথা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করে-ছিলেন; তাঁর বাণী যে মানুষকে নূতন আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-প্রত্যয়ের ভাষা দিয়েছে, ঐক্য ও মৈত্রীর গান শুনিয়েছে সে কথা স্বীকার করেছিলেন, এবং বর্ত্তমান লেখক সে সময় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁদের যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেজন্য তাঁরা ধন্যবাদ দিয়েছিলেন।

"আমি পৃথিবীর কবি, সেকথা তার যত ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।"

পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানেই এ আক্ষেপ করেছেন, কিন্তু তাঁর বাঁশীর সুরে যদি সব সময় সাড়া না জেগে থাকে সে ত্রুটি পৃথিবীর; পৃথিবীর কবির নয়। আমরা কবি-জগতে গৌরী-শৃঙ্গের ঠিক নীচেই এখন রয়েছি; তাই তাঁর বিশালতা ও উচ্চতা বুঝতে পারার সময় আসে নি এখনো। হয়ত ১৪০০ সালের মানুষ সেই ভাবী কালের নববসন্ত-প্রভাতে অনুভব করবে আমাদের যুগের ও চিরযুগের এই কবির প্রভাব এবং তাঁর কাব্যের বিস্তার ও প্রসার। তবুও আমরা ত এমনি বুঝতে পারি।

"কতো যে প্রাতের আশা ও রাতের প্রীতি
কতো যে সুখের স্মৃতি ও দুখের গীতি"—

নব নব বিকাশ ও বৈচিত্র্য নিয়ে কারণে-অকারণে সময়ে-অসময়ে চিত্তে দোলা দিয়ে যায়। বাঁশীর উচ্ছ্বাসে হাসির উল্লাসে বেদনায় ও সমবেদনায় বিচিত্র অনুভব জাগিয়ে তোলে বিশ্বমনের মধ্যে।

জীবনে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও সঙ্গীত তিনি এনে দিয়েছেন। "পুরস্কার" কবিতাটির অভাবগ্রস্ত কবি রাজসভায় গেয়েছিল যে ধরণীতে সে আর একটি সুর যোগ করে দিতে চায়, আর একটু সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে দিতে চায়। সে কথাই কবিরও মর্ম্মবাণী। পৃথিবীকে তিনি মায়াময় বলে ত্যাগ করেন নি; কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতও লিপ্ত হয়ে থাকেন নি। অবজ্ঞা বা উপেক্ষার চোখে তিনি জীবনকে দেখেন নি। বন্ধনের মধ্যে মুক্তির, সংগ্রামের মধ্যে সমন্বয়ের সন্ধান তিনি করেছেন। প্রাচীর বৈরাগ্য ও প্রতীচীর অনুরাগ মিশ্রিত হয়েছে তাঁর কাব্যধারায় রাসায়নিকের প্রক্রিয়ায় নয়, রসস্রষ্টার প্রতিভায়। তাই তিনি বিশ্বনিখিলের কবি; শুধু বাঙালীর বা ভারতবাসীর নয়।

তাই মর্ত্যই কবির কাছে স্বর্গ; মর্ত্যই মহান্—মানবেরই অশ্রুজলে চিরশ্যামল, প্রীতিফুলে চিরসুরভিত। প্রেমধারা মানুষকে শুধু প্রিয় করে নি দেবতা করেছে। "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা"—এই ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মর্ম্মকথা। মানুষকে এই মূল্যদান, দেবতাকে এই প্রীতিমাল্যদান রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ তথ্য।

শুধু যে প্রিয় দেবতা হয়েছে তা নয়, সাধারণ মানুষ 'মানুষ' হয়েছে—বিশ্ববিধানে এটাও তো কম কথা নয়; তারও যে জীবন সার্থক ও সম্পূর্ণ হতে পারে এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেছেন। মানুষ তার সভ্যতাসৌধের ভিত্তি ও প্রাকার গড়ে তুলেছে মানুষকে সমষ্টিগত ভাবে বলি দিয়ে। ধনী শ্রমিককে শোষণ করেছে, রাজা প্রজাকে শাসনের নামে উৎপীড়ন করেছে। প্রতাপশালীর প্রতাপের আগুন জ্বলেছে দুর্ব্বলের রক্ত-আহুতিতে, রাষ্ট্র-স্বার্থের রথ চলেছে রজ্জুবদ্ধ প্রজার সম্মিলিত আকর্ষণে। এই সভ্যতার মধ্যে ক্ষমতা আছে মমতা নেই, আত্মম্ভরিতা আছে, কিন্তু আত্মা নেই। রক্তকরবীর রাজা যে যৌবনকে হত্যা করে, আনন্দকে নিঃশেষ করে নিজেই নিজের নিগড় গড়ে তুলেছে সে কথা বিশ্বকবি যত গভীর ভাবে বলেছেন বিশ্বব্যাপী যে দিবসের সরব ও প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যেও সে কথা তেমন ভাবে ফুটে উঠে না। "মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা" দিতে "শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে আশা" ধ্বনিত করে তুলতে যিনি এরূপ সার্থক চেষ্টা করেছেন তিনি বিশ্বজনের কবি, তাই তিনি বিশ্বকবি।

রবীন্দ্রনাথের জগতে পাই মানব, অনুভবের প্রভাবে যে মহামানব হয়ে উঠেছে; কিন্তু অতিমানব সেখানে নেই। তিনি মহাকবি, কিন্তু মহাকাব্য তিনি রচনা করেন নি, কারণ মহাকাব্যের অতিমানব পৃথিবীর কবির সৃষ্টিতে থাকার কথা নয়। দীনের জীবন মহত্তর, বৃহত্তর হবে, কিন্তু দীনতর বা অসুন্দর হয়ে প্রকাশিত হয় নি কখনও সে প্রচেষ্টার মধ্যে। যেখানে সমাজ ক্ষমাহীন, ধর্ম্মাচার দয়াহীন ও মানুষ উদাসীন সেখানে সাধারণ জীবনের সাধারণ কাজে ও কল্পনায়, চিন্তায় ও চেষ্টায় তিনি এনে দিয়েছেন সুকুমারতার আভা ও সার্থকতার আভাস। এই যে শ্যামল সুন্দর ধরণী—প্রিয়গৃহ ও গিরিপ্রান্তর, সাগর ও অরণ্যানী নিয়ে অপরূপ শোভায় প্রতিভাত হয়ে উঠেছে কাব্যে ও জীবনে, এই প্রকৃতি যদি নিজেই প্রধান হ'ত মানবকে বাদ দিয়ে তা হলে তা হ'ত প্রাণহীনা। এখানে যারা ছিল, যারা আছে ও যারা আসবে তাদের সকলেরই কবির জগতে সার্থক স্থান আছে। "পলাতকা"র বাইশ বছরের রোগিণী যখন প্রথম বসন্ত অনুভব করে, মরণ-পথের যাত্রিণী বিনু যখন বাইরের জগৎকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠে ও দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি দেখায়, 'শ্যামলী'র প্রণয়ভীতা প্রমিতা যখন দুঃসাহসে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে, তারা এই আমাদের গৃহকোণের সামান্য প্রাণী হলেও বিশ্বনিখিলের অধিবাসিনী। শ্যামল বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে বেরিয়ে এসে এরা পৃথিবীর প্রান্তরে স্থান পেয়েছে; নিখিলের অনুভব এদের জন্য প্রতিভাত হয় কবির মানসদর্পণে। সেই জন্যই তিনি বিশ্বকবি।

শুধু প্রাণধারণ করলেই যে বাঁচা যায় না, শুধু প্রত্যহের দিন যাপনের গ্লানি ও ম্লানিমা, সংশয় এবং সংগ্রামের ঊর্দ্ধে ও অতীত ক্ষেত্রে যে এমন একটি জগৎ আছে যা আমাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন সে কথা যিনি আমাদের বুঝিয়েছেন তিনি বিশ্বের কবি। স্নেহলোলুপ অথচ বীরভাবময় বাল্য, অসীমের আহ্বানচঞ্চল কৈশোর, প্রেমের আনন্দবেদনারসে উচ্ছল যৌবন, বহুমুখী কর্ম্মসাধনার পথে পরিণত প্রৌঢ়ত্ব ও জীবনের চরম পরিণতি—এই সব স্তরেরই বিকাশ ও বিস্তার প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীতে। তারই প্রতিবিম্বে আমরা নিজেদের চিনতে পারি—

"সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে।"

জীবনে যে আশা ও আলো ছিল বলে মনে করি নি, তাকে এনে দিলে এই সাহিত্য। তাই বৈশাখের ভয়াবহ তাপের মধ্যে দেখি নটরাজের পিঙ্গল জটাজালময় ধূসর ভৈরব-মূর্ত্তি, বর্ষার নবমেঘভারে বিশ্বের সব বিরহীর শোক সঘন সঙ্গীতের ধারায় ঝরে পড়ে। কেউ বা তখন জীবনদেবতার অভাব অনুভব করে বলে

মেঘের পরে মেঘ জমেছে
আঁধার করে আসে
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।

সেই একই বর্ষণমুখর দিনে বিশ্ব থেকে ব্যক্তিতে যখন ফিরে আসি, গ্রামের পাশেই চাষাকে সোনার ধানের তরী বেয়ে চলে যেতে দেখি।

মানব থেকে মানসে এই পরিণতি, উভয় লোকের এই সমন্বয় ও সুসম্বদ্ধ আত্মীয়তা কাব্যকে দিয়েছে নূতন আত্মা, প্রেমকে দিয়েছে নবীন সত্তা। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির ভিতর দিয়ে সংসারকে সুন্দরতর করে তাই দেখতে পাই, সাংসারিকতার মধ্যে থেকেও সংসারাতীত শালীনতা ও শোভনতা অনুভব করি। দেহের নিগড়ে গড়া গৃহের বনিতা তাই কল্পনার উদার মুক্তিতে বিশ্বের কবিতারূপে উদয় হয়, 'পরাণের সাথে ঝুলন খেলা' খেলে। তার বিয়োগে কবি এই প্রভাত এই পৃথিবী সব-কিছুকে বিলোপ করে দিয়ে নিজের চিত্ত দিয়ে তার কামনাকে ফুটাতে চেয়েছেন—"তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ"—এই অতীন্দ্রিয় আশ্বাস অনুভব করতে পেরেছেন। মিলনে যে একটি মূর্ত্তিতে আবদ্ধ, বিচ্ছেদে সে দগ্ধধূপগন্ধসম বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে চিরমিলনের আশ্বাস দেয়। এই ভাবেই বসন্তবিলাসের ধরা প্রেমের অমরাবতীর পথে পরম পরিণতি লাভ করে।

কিন্তু আগে সাধনা, পরে সিদ্ধি। প্রেমপূজায় দেহের আরাধনার পরেই তাতে দেহাতীতের আরোপ হয়। যৌবনের প্রথম আষাঢ়ের বাসনার মেঘে আবৃত এই আকাশ, তার ছায়াচ্ছন্ন অরণ্য, নীলিমাম্লান গিরিশিখর কিন্তু—কামনার যুগপক্ষের বহু বহু ঊর্দ্ধের প্রতিচ্ছবি। সেই যুগ চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন মেঘকে সুখস্বপ্নের মতন পিছনে ফেলে, হৃদয়ের বাঁধ ভেঙে, নবনীপ ও কেতকীর গন্ধবিকল, নদীকলধ্বনিত বিপুল কল্পনার পৃথিবীতে আমাদের নিয়ে যায়। সে এক অপরূপ সুখসৌন্দর্য্যভোগ ঐশ্বর্য্যের চিত্রলেখা যা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু কাছে আসতে দেয় না, আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, কিন্তু নিবৃত্তি করে না।

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

এই আকুল ও অন্তহীন অন্বেষণ ক্রমে অরূপের সন্ধানে পরিণতি লাভ করল। প্রেম কখনও বলে—

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না

কখনও বলে—

নাই নাই কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।

কখনও প্রশ্ন করে—

হৃদয়ের ধন কভু ধরা দেয় দেহে?

প্রশ্ন ও প্রাপ্তি, আবাহন ও আবির্ভাবের মাঝখানে যে ব্যবধান তাকে কবি অতিক্রম করলেন বহু বিচিত্র ভাবধারা বিকাশের মধ্য দিয়ে। ক্রমে দেখি কোন্ সময় যে ইন্দ্রিয় অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ করেছি তা লক্ষ্য করি নি। লীলাসঙ্গিনী লীন হয়ে গেছে মানস-আকাশের নীলিমায় এবং যে আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ আছে তার প্রকাশ হচ্ছে এই বাণী-রূপে—

দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি পরশ,
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ সুধারস।

এ ভাবেই কবি বিরহের ধরণীতেই মিলনের সরণী রচনা করেছেন; মুহূর্ত্তকে অনন্তে পরিণত করে দিয়েছেন। তাই মানব চির আশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে যে "এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল।" সবচেয়ে বড় কথা এই যে, মানসী যে অন্তরদেবতার মধ্যে লীন হয়ে যান, প্রেমের পরম পরিণতি যে অনন্ত পরমাত্মায়, সে বাণী নবীন করে আমরা পেয়েছি নূতনের আবেদনের মধ্য দিয়ে। তাই ত আমাদের মানসী প্রিয়া মর্ত্ত্যের মানবীর সসীমতা অতিক্রম করে সেই অসীমে স্থান লাভ করেছে যেখানে বাসনা নেই সাধনা আছে, আকুলতা নেই আত্মা আছে।

আমরা দু'জনে ভাসিয়া এসেছি যুগল মিলনস্রোতে
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হ'তে।

এই উৎস যে পরমাত্মা সে কথা কবি কখনও ভাষায় প্রচার করেন নি, কিন্তু ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা বহু বিচিত্র ব্যঞ্জনায়।

বিরহী যখন ভাবে—

পাছে আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কইনে ফুটে।

অথবা যখন বাণবিদ্ধ বেদনাহত মূক হরিণের মত অনাসক্ত প্রিয়ার'দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শুধু স্তব্ধ রাত্রিতে একটি চুম্বন রেখে চলে যায় প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ও উদার বৈরাগ্য অন্তরে বহন করে—

অথবা যখন আশ্বাস পায়—

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই

নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই,

আজি তাই

শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল,

আমার নিখিল

তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল—

তখন যে মিলনের আশ্বাস আমরা লাভ করি সে মিলন জীবনদেবতার সঙ্গে যাকে উদ্দেশ করে কবি নিবেদন করেছেন—

মোর হাতে যাহা দাও

তোমার আপন হাতে তার বেশী ফিরে তুমি পাও।

জীবন যখন অন্ধকার হয়ে আসে তখনি আমরা তাঁর কবিতার দীপশিখায় অন্তর উদ্ভাসিত করে দেখতে পাই, "কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই।"

কিন্তু শুধু অতীন্দ্রিয় প্রেমাভিষেক বা আত্মার অমৃত নিষেকেই বিশ্বের প্রতি কবির বাণী নিবদ্ধ ছিল না। সত্য শিব ও সুন্দর এই তিনের সমন্বয়ে তাঁর আদর্শের পরিপূর্ণতা এসেছে; সুন্দরের প্রতি অনুরাগ সমাজে অসত্য বা অকল্যাণকে প্রশ্রয় দেয় নি। সাহিত্য ও শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র করে কবি দেখেন নি। স্বজাতির সমাধির উপর ফুলবাগান রচনা কখনো তাঁর কাব্যে সম্ভব হ'ত না। বিশ্বের পক্ষে যা শিব তাই তিনি চেয়েছেন, জাতীয়তার পরিপূর্ণ অনুরাগী হয়েও আন্তর্জাতিকতাকে নবজীবন দান করতে চেয়েছেন। তিনি ত শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষের ছিলেন না। আমাদের সৌভাগ্য যে জন্মভূমি তাঁর ছিল এখানে; কিন্তু মনোভূমি তাঁর ছিল বিশ্বময়। নিখিল-মানস-স্বর্গ যিনি রচনা করেছেন তিনি পৃথিবীর কবি।

এই যে পৃথিবী কবি সৃষ্টি করে গেছেন সেখানে তার

—মনের নৃত্য কতবার জীবন মৃত্যুরে

এড়ায়ে চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে।

সেখানে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অক্ষয় দান ও অনন্ত প্রেরণা ভারতবর্ষের বৈশাখের তপ্ত তাম্র আকাশ ও শুষ্ক ধূসর প্রান্তর অতিক্রম করে শ্যামল সুন্দর এক বিশ্বসৃষ্টি করে নশ্বর মর্ত্যেই ভাস্বর অমরতা দান করে গেছে। কবির লোকান্তর হয়েছে যেমন ভাবে হয়ে থাকে আমাদের সকলের, কিন্তু তাঁর কবিতার আলোক চিরকাল অন্তরের গহনে চির উজ্জ্বল দীপ-শিখা জ্বালিয়ে রাখবে। পৃথিবীর কবির পৃথিবীতেই ত আমরা আছি।*

---

* জোড়াসাঁকো রবীন্দ্র-ভবনে নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন-অভিভাষণ।

স্বাধীনতার প্রতীক—প্রাচ্যে

স্বাধীনতার প্রতীক—প্রতীচ্যে

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

সমৃদ্ধ মার্কিন

সমৃদ্ধিতে আমেরিকা আজ শুধু অদ্বিতীয় নয়, অন্য যে-কোন দেশকে সে বহু পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে মাত্র ১৩টি রাষ্ট্র স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া একটি কন্‌ফেডারেশন গঠন করিয়াছিল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই নেতৃত্বে এই কন্‌ফেডারেশন ফেডারেশনে পরিণত হয়। তখন 'নূতন পৃথিবীতে' অল্পসংখ্যক শ্বেতকায় মানুষ পুরাতন লোকালয়ের বহুদূরে নিজেদের আবাস গড়িতে মনোযোগ দেন। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি ছিল কৃষিপ্রধান, আর আটলান্টিক রাষ্ট্রগুলি ছিল বাণিজ্যপ্রধান; কৃষি ছিল দাসপ্রথার উপর নির্ভরশীল।

স্থানীয় আদিম অধিবাসিগণ দাসরূপে আগন্তুক শ্বেতকায়গণের কৃষিকর্মে সহায়তা করিত। কৃষিস্বার্থ ও বাণিজ্যস্বার্থে শীঘ্রই সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ দেশ-বিভাগের দাবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এব্রাহাম লিঙ্কন তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট। তিনি দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিবার দাবি প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফলে গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হইল। লিঙ্কন জয়ী হইলেন। লিঙ্কনের নেতৃত্বে আমেরিকা সঙ্কটে উত্তীর্ণ হইয়া জাতীয় ঐক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। যুক্তরাষ্ট্র তখন স্ব-শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী। ক্রয় চুক্তি প্রভৃতি দ্বারা বহুদেশ এক এক করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভূত হইয়া গেল। এইরূপে আজ ৪৮টি রাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। ইহা ছাড়া আলাস্কা, হাওয়াই প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলও তাহার শাসনাধীন। যদি রুশ-মার্কিনে কখনও যুদ্ধ হয় তবে সে যুদ্ধে আলাস্কা হইবে আমেরিকার একটি মূল্যবান ঘাঁটি। আলাস্কা আয়তনে ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪ শত বর্গ মাইল। ১৯৪০ সালের আদমসুমারী অনুসারে এখানে ৭২,৫০০ লোকের বাস। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২০ লক্ষ টাকা মূল্যে আমেরিকা রুশিয়ার নিকট হইতে এই দেশটি ক্রয় করিয়াছিল।

বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ৩০ লক্ষ ২২ হাজার ৩ শত ৮৭ বর্গ মাইল, আলাস্কা, হাওয়াই প্রভৃতি অঞ্চল ধরিলে ৩৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬ শত ৬০ বর্গ মাইল। ইহার লোক-সংখ্যা ১৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ২ শত ৭৫; উপরোক্ত অঞ্চলসমূহের লোকসংখ্যা ধরিলে ১৫ কোটি ৬ লক্ষ ২১ হাজার ২ শত ৩১। ঐ অঞ্চলগুলির মধ্যে পুয়েটো রিকোর জন-সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৬৯ হাজার আর হাওয়াইয়ের জনসংখ্যা ৪ লক্ষ ২৩ হাজার।

রাষ্ট্রগুলির আয়তনের তারতম্য অনেক। ক্ষুদ্রতম নেভাডা রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ১ লক্ষ ১০ হাজার। বৃহত্তম নিউইয়র্ক রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার। জনবসতির গড়পড়তা হার প্রতিবর্গ মাইলে নেভাডায় ১, নিউইয়র্কে ২৮১°২, রোড দ্বীপে ৬৭৪°২, এবং সমগ্র দেশে ৪৪°২।

জনসংখ্যার শতকরা ৫৬°৫ শহরে এবং ৪৩°৬ গ্রামে বাস করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই অনুপাতের প্রভূত তারতম্য আছে। শহরবাসীর সংখ্যা রোড দ্বীপে শতকরা ৯১°৬, ম্যাসাচুসেট্‌স্ রাষ্ট্রে ৮৯°৪, নিউইয়র্ক রাষ্ট্রে ৮২°৮ এবং সি সি সি পি রাষ্ট্রে মাত্র ১৯°৮।

সমগ্র দেশে ৩৪৬৪টি শহর। লক্ষাধিক লোকপূর্ণ শহরের সংখ্যা ৯৯। ১০ লক্ষাধিক লোকপূর্ণ শহরের সংখ্যা ৫। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র দেশে শ্বেতকায় জনসংখ্যার অনুপাত ছিল শতকরা ৮৬°৫, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ৮৯°৫-এ উঠিয়াছে।

পর্ব্বতসঙ্কুল ওয়াইয়োমিং রাষ্ট্রের চেই-এন্ শহরের উচ্চতা ৬১৪৪ ফুট। সমুদ্রতীরবর্ত্তী মায়ামী শহর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে মাত্র ২৫ ফুট উচ্চ।

নিউইয়র্কের তাপ জানুয়ারীতে ২৪° ডিগ্রী, জুলাইয়ে ৮২° ডিগ্রী। শীতে মায়ামীর দিনগুলি পরিষ্কার, তুষারপাতশূন্য। মায়ামীর শীত কলিকাতার শীতের মতই উপভোগ্য। মণ্টানা, সিয়েসোটা প্রভৃতি অঞ্চলে শীতকালে তাপ শূন্যের ৪৯° ডিগ্রী নীচে পর্য্যন্ত নামিয়াছে, এবং ৫৫" ইঞ্চি পর্য্যন্ত তুষারপাত হইয়াছে। গ্রীষ্মে তাপ আলাবামায় ১১৮° ডিগ্রী পর্য্যন্ত এবং মিসিয়াপলিসে ১০৮° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

দেশের শিল্প ও বাণিজ্য পূর্ব্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল কৃষিপ্রধান। কৃষিপ্রধান পশ্চিমে মজুরীর হার শিল্পপ্রধান পূর্ব্বাঞ্চলকেও হার মানাইয়াছে। দক্ষিণাঞ্চলের টেনেসী প্রভৃতি স্থানের কৃষি নিম্নস্তরের।

এই বিশাল ও বিচিত্র দেশের কৃষি, শিল্প এবং খনিজ সম্পদ অতুলনীয়। এই দেশবাসীদের সংগঠনশক্তি অসাধারণ। ফলে এখানকার কলকারখানা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং বিরাট কোম্পানী-গুলি শিল্প ও বাণিজ্যে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

জর্জ ওয়াশিংটনের বাড়ীতে বা লিঙ্কনের গ্রামে যে সব যন্ত্রপাতি দেখা যায় তাহা খুব উন্নত যন্ত্রশক্তির ব্যবহারের পরিচয় দেয় না। তার পর ধীরে ধীরে আমেরিকা উন্নতির পথে চলিয়াছে। মনরো নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সে পুরাতন পৃথিবীর আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে নিজেকে লিপ্ত করে নাই। ফলে তাহার উন্নতি অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। বিংশ

শতাব্দীর দুইটি বিশ্বযুদ্ধের সংঘাতে তাহার উন্নতির গতি বিস্ময়কর রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। যে দুইটি যুদ্ধ ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক প্রথা ভাঙিয়া দিয়া তাহার অর্থনৈতিক কাঠামোকে চূর্ণপ্রায় করিয়া দিয়াছে সেই উভয় যুদ্ধই আমেরিকার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে বিপুল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতে অদ্বিতীয় করিয়া তুলিয়াছে। আমেরিকার উন্নতি কোনরূপ ঔপনিবেশিক প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইহার প্রতিষ্ঠা তাহার নিজস্ব কৃষি-শিল্প ও খনিজ সম্পদে। তাহার লোকবল ছিল কম। এখনও ভারতবর্ষের দ্বিগুণায়তন দেশে ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ লোক বাস করে। অতএব স্বতঃই সে যন্ত্রশক্তির সমধিক ব্যবহারে বাধ্য হইয়াছিল। আজ যন্ত্রশক্তিতে তাহার জুড়ি নাই। নব নব যন্ত্রের দ্রুত আবিষ্কারে তাহার সমকক্ষ নাই। যুদ্ধ দুইটিতে জড়িত হইয়া পড়ায় দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। সেই ধাক্কায় তাহার উৎপাদনশক্তি এত বাড়িয়া গেল যে যুদ্ধের মধ্যেই যুদ্ধের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়াও সে জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিয়া তুলিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের যে স্থায়ী উন্নতি হইয়াছিল, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্যচক্রের মহাবেগে নিম্ন আবর্ত্তনে তাহা কথঞ্চিৎ ব্যাহত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তখন ডিমোক্রেটিক দলের নেতা রুজভেল্ট তাঁহার 'নিউ ডিল' অবলম্বনে বাণিজ্যচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এবারও নানা পথে বিপদ আসিতে পারে। যুদ্ধকালে জনসাধারণের হাতে যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা এখন দ্রুত বাজারে আসিয়া মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিয়া বিপদ আনিতে পারে। যুদ্ধকালে যে মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নামিয়া আসিবার সময় বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। উৎপাদন-বৃদ্ধিতে বাধা হইলে বিপত্তির সৃষ্টি হইবে। জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান, উৎপাদনের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে না পারিলেও বিপদ অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে এবারে হয়তো সমস্ত সঙ্কট এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে অনেকেই এরূপ আশা পোষণ করেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের "গ্রোস্ ন্যাশন্যাল প্রোডাক্ট" বা "সমগ্র জাতীয় উৎপাদনে"র মূল্য ছিল ৮৮'৬ বিলিয়ন ডলার; ১৯৪৫ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭'৩ বিলিয়ন ডলারে উঠিয়াছিল।(১) এত অল্প সময়ে এত বেশী বৃদ্ধি পূর্ব্বে লোকের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আমেরিকার বহির্বাণিজ্য তাহার স্বকীয় উৎপাদনের তুলনায় নগণ্য। কয়েক বৎসরের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(সংখ্যাগুলি সহস্র ডলারের)

	রপ্তানী	আমদানী	বিয়োগ ফল
১৯৩৯	৩,১৭৭,১৭৬	২,৩১৮,০৮১	+৮৫৯,০৯৫
১৯৪০	৪,০২১,১৪৬	২,৬২৫,৩৭৯	+১,৩৯৫,৭৬৭
১৯৪১	৫,১৪৭,১৫৪	৩,৩৪৫,০০৫	+১,৮০২,১৪৯
১৯৪২	৮,০৭৯,৫১৭	২,৭৪৪,৮৬২	+৫,৩৩৪,৬৫৫
১৯৪৩	১২,৯৬৪,৯০৬	৩,৩৮১,৩৪৯	+৯,৫৮৩,৫৫৭
১৯৪৪	১৪,২৫৮,৭০২	৩,৯১৯,২৭০	+১০,৩৩৯,৪৩২
১৯৪৫	৯,৮০৫,৮৭৫	৪,১৩৫,৯৪০	+৫,৬৬৯,৯৩৫

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার নিজস্ব উৎপাদন ছিল ১৭৯ বিলিয়ন ডলার, বিদেশ হইতে আমদানী মাত্র ৪ বিলিয়ন ডলার এবং বিদেশে রপ্তানী মাল ৯'৮ বিলিয়ন ডলার। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে আমেরিকার অর্থনৈতিক শক্তি পরনিরপেক্ষ; এবং তাহার অর্থনৈতিক গঠন ইংলণ্ডের গত শতাব্দীর অর্থনৈতিক গঠন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

আমেরিকার বর্ত্তমান সমৃদ্ধির প্রধান প্রমাণ তাহার মজুরীর হারে এবং মজুরগণের দৈনিক শ্রমকালে। ১৯৪৫ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল অঞ্চলে কৃষি-মজুরীর মাসিক হার ছিল ১৮৬ ডলার বা ৬২০ টাকা।

শিল্প-মজুরীর সাপ্তাহিক হারের গড় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৪৬'০৮ ডলার বা ১৫০ টাকার কিছু বেশী এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৪৪'৪১ ডলার বা ১৫০ টাকার কিছু কম। সাপ্তাহিক শ্রমকালের গড় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৪৫'২ ঘণ্টা এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪৩'৪ ঘণ্টা। এত বেশী মজুরী এবং এত অল্প শ্রমকাল ইংলণ্ড রাশিয়া বা যে-কোন দেশে স্বপ্নেরও অগোচর। মজুরের স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে সে আমেরিকা।

সমস্ত পৃথিবীতে ডলারের দুষ্প্রাপ্যতার কারণও আমেরিকার অর্থনৈতিক গঠনের মধ্যে নিহিত। আমেরিকা দুনিয়ার নিকট খুব কম জিনিষই চায় বা পায়। অথচ দুনিয়া আমেরিকার কাছে চায় নানা প্রকারের মাল—এমন কি খাদ্যশস্য পর্য্যন্ত। কিন্তু তাহার বিনিময়ে আমেরিকার চাহিদামত তুল্য-মূল্য মাল সরবরাহ করিবার সামর্থ্য পৃথিবীর নাই। ডলারের দুষ্প্রাপ্যতা এই মৌলিক অসামঞ্জস্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমেরিকার মাল কিনিতে চাই ডলার। আমেরিকায় মাল বেচিতে না পারিলে ডলার পাওয়া যায় না। আমেরিকায় আমরা কম মালই বিক্রী করিতে পারিতেছি; কিন্তু কিনিতে চাহিতেছি তদপেক্ষা অনেক বেশী। কাজেই যত ডলার পাইতেছি তদপেক্ষা বহু বেশী ডলারের প্রয়োজন বোধ করিতেছি। ফলে আমাদের নিকট ডলার দুর্লভ হইয়াছে। চাহিদার তুলনায় কম পাওয়া যাইতেছে বলিয়াই সব দেশে ডলার রেশনিং চলিতেছে। ডলারের

(১) টেব্‌ল্ নং ৩০২, ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল অ্যাবস্‌ট্র্যাক্ট অব দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্, ১৯৪৬

দুষ্প্রাপ্যতা কমাইতে হইলে আমাদের প্রথমতঃ খাদ্য বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইয়া আমেরিকা হইতে খাদ্যশস্য আমদানী বন্ধ করিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ আমেরিকার বাজারে আমাদের মাল যাহাতে বেশী কাটে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমেরিকা বাহির হইতে যত মাল আমদানী করে তন্মধ্যে পাট-জাত দ্রব্যের স্থান বেশ উচ্চে। আমেরিকায় পাটজাত দ্রব্য বেচিয়া আমরা কম ডলার পাই না।

আমেরিকার সমৃদ্ধি-সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে ডিমোক্রেসি ও ব্যক্তি-উদ্যোগের ভিত্তিতে। সাধারণ মানুষেরাই এই সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছে। ষ্টালিন বা হিটলারের মত কোন ডিক্টেটর তাহাদিগকে জবরদস্তি করিয়া একাজে লাগায় নাই। তাহারা নিজের স্বাধীন এবং সহজ বুদ্ধিতেই এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সাধারণ লোকের মধ্য হইতেই উদ্যোগী পুরুষ-সিংহগণ আবির্ভূত হইয়া দেশে লক্ষ্মী আনিয়াছেন। ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যেই লোকে এখানে কাজ করে। অথচ লক্ষ্মী এখানে ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের করায়ত্ত হন নাই, ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন। ফলে এদেশের দীনতম মজুর মাসিক ৬০০ টাকা উপার্জ্জন করে এবং সপ্তাহে ৪০।৪৫ ঘণ্টার বেশী পরিশ্রম করে না। ডিক্টেটরশিপ ও দারিদ্র্যনিপীড়িত পৃথিবীতে আমেরিকা ডিমোক্রেসি ও স্বাধীন ব্যক্তি-উদ্যোগের আকাশচুম্বী বিজয়-নিশান স্বরূপ।

বর্ত্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আমেরিকায় ব্যক্তি-উদ্যোগের এক সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়। আবর্ত্তমান বাণিজ্য-চক্রের প্রচণ্ড সঙ্ঘাতে ব্যক্তি-উদ্যমের কক্ষচ্যুত হইবার উপক্রম হয়। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তখন তাঁহার 'নিউ ডিল' নীতি অনুসারে বহুমুখী রাষ্ট্র-উদ্যমের আয়োজন করেন। এই নীতিতে রাষ্ট্র-উদ্যমকে ব্যক্তি-উদ্যমের প্রতিযোগীরূপে ব্যবহার করা হয় নাই—ক্ষণ-বিভ্রান্ত ব্যক্তি-উদ্যমকে গণতন্ত্রোচিত উপায়ে স্ব-মর্য্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই প্রয়োগ করা হইয়াছিল।

আমেরিকায় ব্যক্তি-উদ্যমের প্রসার দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। টেলিগ্রাফ লাইন পর্য্যন্ত এখানে কোম্পানীর হাতে। রাষ্ট্র ব্যক্তির ক্ষমতাকে অভিব্যক্ত করিবার জন্যই—ব্যক্তিকে খর্ব্ব করিবার জন্য নয়। এখানকার ডাকবিভাগের খরচ স্বকীয় আয়ে নির্ব্বাহিত হয় না। ডাকমাশুল সস্তা করিয়া ব্যক্তি-উদ্যমকে সহায়তা করা সরকারের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য।

ডিমোক্রেসি সাধারণ মানুষের শক্তিতে আস্থাশীল। সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিলে সাধারণ মানুষ সত্য ও মঙ্গলের পথই বাছিয়া লইবে। স্বাধীন উদ্যম এবং স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ এই অবস্থাগুলির মধ্যে প্রধান। যুক্তিদ্বারা অপরকে স্বমতে আনিবার অবাধ সুযোগ ডিমোক্রেসির অচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সমস্ত বিষয়ে সুযোগ-সাম্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে চাই সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, পুস্তক প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমিতিতে অবাধে মিলিত হইবার স্বাধীনতা, এবং স্বমত প্রতিষ্ঠাকল্পে নিরঙ্কুশ বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতা। গবর্ণমেণ্টকেও সমস্ত বিষয় যথাসম্ভব সাধারণের গোচরীভূত করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। গোপনতা ও রহস্যসৃষ্টি ডিমোক্রেসিতে যথাসম্ভব পরিহার্য্য। এইরূপ স্বাধীনতা ও সুযোগ-সাম্যের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া জনসমুদ্র মন্থন করিতে পারিলেই কল্যাণ-লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে।

গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচন-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই ডিমোক্রেসি হয় না। সাধারণ মানুষকে নিগড়বদ্ধ করিয়া বা তাহাকে উপযুক্ত সুযোগ না দিয়া নির্ব্বাচন নিরর্থক। নির্ব্বাচনের পিছনে স্বাধীনতা ও সুযোগ-সাম্য থাকা চাই। তদ্রূপ মেজরিটি শাসনও ডিক্টেটরি শাসন হইতে পারে, যদি মাইনরিটির কখনও মেজরিটি হইবার সম্ভাবনা বা সুযোগ না থাকে। ডিমোক্রেসির আসন এই সমস্ত নাম ও রূপের মধ্যে নয়। নাম ও রূপের বহু পিছনে ডিমোক্রেসির সন্ধান করিতে হইবে।

মেজরিটির আনুকূল্য লাভ করিলেও পেসিস্ট্রেটাস্-এর গবর্মেণ্টকে কেহ ডিমোক্রেসি বলে নাই। সিজারের শক্তি নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত এবং রিপাবলিকান্ গবর্ণমেণ্ট রূপে প্রকাশিত হইলেও তাঁহার গবর্ণমেণ্ট ডিমোক্রেসি নামের অযোগ্য ছিল। ষ্টালিন বা হিটলারের গবর্ণমেণ্টের কদাপি ভোটের অভাব হয় নাই। অবিভক্ত বঙ্গে মুস্লিম লীগ গবর্ণ-মেণ্টেরও ভোটের অভাব হয় নাই। তথাপি ইহারা কেহই ডিমোক্রেসি নয়। ইহারা সকলেই ডিমোক্রেসির ছদ্মবেশে ডিক্টেটরশিপ।

সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধিতে আস্থা ডিমোক্রেসির প্রথম প্রতিজ্ঞা। ডিমোক্রেসির দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা—মানুষ যুক্তিবাদী এবং তৃতীয় প্রতিজ্ঞা—মানুষ পরস্পর সদিচ্ছাপরায়ণ ও সহযোগিতা-মূলক মনোবৃত্তিসম্পন্ন। সামাজিক জীবনের মধ্যে নানা প্রকার বিরোধ নিহিত আছে। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থের সংঘাত সেখানে উপস্থিত হইবেই। ডিমোক্রেসির বিশ্বাস এই সমস্ত বিরোধের উভয় দিক বুঝিবার মত বুদ্ধি সাধারণ মানুষের আছে এবং তাহারা পরস্পরের প্রতি এইরূপ সদিচ্ছাপরায়ণ ও সহযোগিতার মনোভাবসম্পন্ন যে অপর পক্ষের স্বার্থ বুঝিয়া একটি গ্রহণযোগ্য আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হইবার মত সুবুদ্ধিও তাহাদের আছে।

আলোচনা দ্বারা মীমাংসায় পৌঁছিবার ক্ষমতা আমেরিকা-বাসিগণের স্বভাবসিদ্ধ। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে যেখানেই আইন প্রণয়নে দুইটি স্বতন্ত্র সভার ঐকমত্য প্রয়োজন সেখানেই দেখা যাইবে যে, অন্ততঃ টাকাকড়ির বিষয়ে একটি সভাকে

সম্পূর্ণ ক্ষমতাশূন্য করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের লর্ড সভার এ বিষয়ে প্রায় কিছুই ক্ষমতা নাই। এরূপ ব্যবস্থার কারণ এই যে সভা দুইটি আলোচনা দ্বারা সর্ব্বদা ঐকমত্যে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; এবং টাকাপয়সাঘটিত প্রস্তাব ঐকমত্যের অভাবে গৃহীত না হইলে রাষ্ট্রব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে। আমেরিকায় কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। এখানে হাউস অব্ রিপ্রেজেন্টেটিভ ও কংগ্রেসের সর্ব্ববিষয়ে তুল্য শক্তি—বাজেট, ট্যাক্স প্রভৃতি সমস্ত জরুরী বিষয়ে আলোচনা দ্বারা প্রতি বৎসর ঐকমত্যে উপনীত হওয়া ইহাদের নিকট এখন পর্য্যন্ত অসম্ভব হয় নাই। আমি অবাক হইয়া সবাইকে প্রশ্ন করিয়াছি—"ইহা কিরূপে সম্ভব হয়।" সহজভাবে জবাব আসিয়াছে "কোনরূপে হইয়া যায়।"

শ্রমিক-বিরোধও এখানে আলোচনাদ্বারা মীমাংসা হয়। যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা চালাইতে সবাই অভ্যস্ত। শ্রমিকগণ এখানে যন্ত্রব্যবহারের বিরোধিতা করে না। ট্রেড ইউনিয়নসমূহ নিয়মিতরূপে অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতত্ত্ববিদদের নিযুক্ত করিয়া উৎপাদনের অগ্রগতির হিসাব রাখে এবং বর্দ্ধিত উৎপাদনের ন্যায্য অংশ দাবী করে। ধর্ম্মঘট করার স্বাধীনতা সকল শ্রমিকেরই আছে। আলোচনাদ্বারা যাহাতে যাবতীয় বিরোধের মীমাংসা হয় তাহার অনুকূল অবস্থার পোষণ করাই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এইরূপে উৎপাদনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবনযাত্রার মানও বাড়িয়া চলে।

আইন-আদালত যুক্তিদ্বারা বিরোধ মীমাংসারই একটি উপায়। এইজন্য গণতান্ত্রিক দেশ মাত্রেই আইন-আদালতের বিশেষ প্রাধান্য।

পারস্পরিক সদিচ্ছা ও যুক্তিপ্রবণতা ইহাদের জীবনযাত্রার সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট। ডিমোক্রেসি ইহাদিগকে আলোচনাপরায়ণ করিয়াছে; আলোচনাপরায়ণতা ইহাদিগকে যুক্তিপ্রবণ করিয়াছে এবং যুক্তিপ্রবণতা ইহাদিগকে প্রত্যেকটি বিষয়ের সুনিপুণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে উদ্যোগী করিয়াছে। ইহাদের উন্নতির মূলে এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-প্রবৃত্তি। কাজ সম্বন্ধে ইহাদের ঢাক-ঢাক গুড়গুড় ভাব নাই। প্রত্যেকটি কাজ ইহারা এরূপভাবে নিষ্পন্ন করিবে যে তাহার সম্পাদন-চাতুর্য্য এবং ফলোৎকর্ষ সম্বন্ধে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশ না থাকে। সরকার তাঁহার কার্য্যাবলী ও সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অনাবশ্যক গোপনতা অবলম্বন করেন না—সরকারের সমস্যা জনসাধারণেরই সমস্যা। তাহার সমাধান চিন্তায় সকলেরই তুল্য অধিকার।

এদেশে সুযোগ-সমতা অতুলনীয়। ন্যূনতম শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নয়নমূলক ব্যবস্থা সকলেরই করায়ত্ত। দীনতম মার্কিন শ্রমিক যে আয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী তাহা অন্য দেশের শ্রমিকদের আশাতীত। সাধারণ সামাজিক ব্যবহারে ছোট বড় ভেদ নাই। প্রভু ভৃত্যের সঙ্গে বিনা দ্বিধায় একত্র বসিয়া আহার করেন।

মনুষ্যজাতির পাঁচ-ছয় হাজার বৎসরের ইতিহাস প্রায় ডিক্টেটরশিপেরই ইতিহাস। পৃথিবীতে ডিক্টেটরশিপ নানা সময়ে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; নানা মতবাদের উপর স্বীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, কম্যুনিজম প্রভৃতি ডিক্টেটরশিপের রূপভেদ মাত্র। ইহাদের মধ্যে কেহ নির্জ্জলা শক্তিবাদের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে; কেহ ঈশ্বরদত্ত অধিকার দাবি করিয়াছে; কেহ সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্রাদর্শের কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বলি দিয়াছে, আবার কেহ বা ইতিহাসের অনিবার্য্য স্রোতোবেগের মুখে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ভাসাইয়া দিয়াছে।

সাধারণ মানুষে অনাস্থা ডিক্টেটরশিপ মাত্রেরই প্রথম প্রতিজ্ঞা। ইহারা সকলেই অতিমানবে বিশ্বাসী। সাধারণ মানুষ ভ্রান্তবুদ্ধি। অতিমানবের বুদ্ধি অভ্রান্ত। অতএব সাধারণ মানুষকে পরিচালিত করিবার অধিকার তাঁহার জন্মগত।

ডিক্টেটরশিপ মাত্রই শক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যুক্তিবাদে ইহাদের আস্থা নাই। সাধারণ মানুষের বিচার-বুদ্ধি ভ্রান্ত। যুক্তিদ্বারা তাহাদিগকে কাজ করান সব সময় সম্ভব নয়। অতএব নিয়ন্ত্রণ ও জবরদস্তির বিশেষ প্রয়োজন।

কম্যুনিষ্টদের মতে শক্তিবাদী ডিক্টেটরশিপ আরও দুইটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি শ্রেণীবিদ্বেষ, অপরটি ইতিহাসের এক অনিবার্য্য গতির ধারণা। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম অনিবার্য্য। শ্রেণী প্রধানতঃ দুইটি; শোষক ও শোষিত। এই সংগ্রামে পরিণামে শোষিতের জয় সুনিশ্চিত। ইতিহাসের গতি এই সুনিশ্চিত পরিণামের দিকে দুর্ব্বার বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই দুর্ব্বার গতি ডিক্টেটর বা মহানায়করূপে আমাদের সমক্ষে প্রকট। তাহার কাছে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই; ব্যক্তি এই দুর্ব্বার নিয়তির ক্রীড়নক মাত্র।

ডিমোক্রেসি ও কম্যুনিজম আদর্শ হিসাবে সম্পূর্ণ বিরোধী। ডিমোক্রেসি সাধারণ মানুষে আস্থাবান ও যুক্তিপ্রতিষ্ঠ। কম্যুনিজম সাধারণ মানুষে আস্থাহীন ও শক্তিপ্রতিষ্ঠ। ডিমোক্রেসি বলিতেছেন সংসারের ভিত্তি প্রেমে। পারস্পরিক সদিচ্ছাই মনুষ্য-সমাজের বিশেষত্ব। সদিচ্ছাপ্রণোদিত আলাপ-আলোচনা দ্বারা বিরোধী স্বার্থসমূহ বা বিরোধী ভাব-সমূহ মীমাংসায় উপনীত হয়। এক মীমাংসা হইতে অন্য মীমাংসায় সংক্রমণ দ্বারাই ইতিহাসের অগ্রগতি সূচিত হয়। কম্যুনিষ্ট বলিতেছেন শোষক ও শোষিত লইয়াই সমাজ। হিংসা ও বিদ্বেষেই এই সমাজের প্রতিষ্ঠা। যুক্তি এখানে অচল। মীমাংসা এখানে অসম্ভব। সংগ্রাম সর্ব্বত্র ধূমায়িত। দুর্ব্বার নিয়তি তোমাকে এই সংগ্রামে লিপ্ত

করিবেই এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণামের দিকে লইয়া যাইবে। শোষক ও শোষিতের সংগ্রামে শোষিতের জয় অনিবার্য্য। তাহাদের মধ্যে যে সংগ্রাম সর্ব্বত্র প্রধূমিত অবস্থায় বর্ত্তমান, তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়া উদ্দীপ্ত করিতে পারিলেই শোষিতের জয় অনিবার্য্য। সংগ্রাম হইতে সংগ্রামান্তরে গমনই ইতিহাসের অগ্রগতি সূচনা করে।

ডিমোক্রেসির একটি অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রয়োজন। যখন মানুষের ন্যূনতম আর্থিক প্রয়োজন সহজেই মিটিয়া যায় এবং মোটামুটি সুযোগ-সমতাও বিদ্যমান থাকে তখনই মানুষ সাধারণতঃ সদিচ্ছাপরায়ণ ও যুক্তিপ্রবণ হয়। যাহার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান নাই এবং সংস্থান করিবার সুযোগও নাই তাহার বিদ্বেষপ্রবণ ও যুক্তিবিমুখ হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই ডিমোক্রেসির জন্য কথঞ্চিৎ আর্থিক সমৃদ্ধি অবশ্যপ্রয়োজনীয়। দারিদ্র্য কম্যুনিজমের প্রসূতি। বণ্টন-ব্যবস্থায় অসমতা বেশী দূর গড়াইলে শ্রেণীবিদ্বেষ দেখা দেয়। তখন উৎপাদন কমিয়া যায়। উৎপাদন কমিয়া গেলে ভাগ লইয়া টানাটানি আরও বাড়িয়া যায়। এইরূপে বিদ্বেষ হইতে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্য হইতে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। তখন সাধারণ মানুষকে তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা একতাবদ্ধ ও সদিচ্ছাপরায়ণ রাখা দুরূহ হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় গণতন্ত্রোচিত মনোবৃত্তিসমূহ লোপ পায়। দারিদ্র্যক্লিষ্ট সাধারণ মানুষ সহজেই ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা নেতার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ইহাই ডিক্টেটরশিপের আবির্ভাবের চিরন্তন কারণ।

আমেরিকা, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেই আজ সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উচ্চতম এবং স্বাধীনতা সর্ব্বতোমুখী। কাজেই ফলদ্বারা বিচারে ডিমোক্রেসির শ্রেষ্ঠতা সুপরিস্ফুট। কিন্তু শুধু শ্রেষ্ঠ বলিয়াই ডিমোক্রেসি আপনা আপনি আসিবে না, বা আসিলেও টিকিয়া থাকিবে না।

ডিমোক্রেসিকে জীয়াইয়া রাখিতে হইলে সাধারণ মানুষকে বিদ্বেষমুক্ত ও যুক্তিপ্রবণ রাখিতে হইবে। তজ্জন্য চাই ন্যূনতম সমৃদ্ধি ও সুযোগ-সমতা। যদি আমরা এবিষয়ে কৃতকার্য্য না হই, আমাদের ডিমোক্রেসি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বজায় রাখিতে বিফল হইব। বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রেম ও সদিচ্ছার সহিত মিলিয়া মিশিয়া স্ব-স্ব কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। তবেই দারিদ্র্য দূর হইবে; ডিমোক্রেসি ও স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় এ কাজের দুরূহতার প্রমাণ মিলিবে।

মানুষ স্বরূপতঃ অনন্ত জ্ঞানৈশ্বর্য্যময়। ব্যবহারে মানুষের অশেষ দোষ। স্বরূপই যদি তাহার আসল পরিচয় হয় তবে একথা অবশ্যই মানিতে হইবে যে পরিণামে ডিমোক্রেসিই মঙ্গলকর। কিন্তু স্বরূপ বা তত্ত্ব লইয়া তো লোক-ব্যবহার চলে না। বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান চলিতে পারে কিন্তু সমব্যবহার তো চলিতে পারে না। অতএব যদিও ডিমোক্রেসি মানুষের স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত তথাপি ব্যবহারিক জগতে মানুষের দোষ-গুলির নিয়ন্ত্রণের যথোচিত ব্যবস্থা ডিমোক্রেসিকে করিতে হইবে। আবার ব্যবহারের দ্বারা যদি স্বরূপই ব্যাহত হইয়া যায় তবে ফল অবশ্যই অশুভ হইবে, কাজেই স্বরূপকে ব্যাহত না করিয়া তাহার দোষরাশিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

ডিক্টেটরশিপ মানুষের দোষগুলির উপরই নিবদ্ধদৃষ্টি হওয়ায় স্বরূপকে বিকৃত করিয়া দেখে। বস্তুতঃ তাহা মানুষের প্রকৃত স্বরূপে অবিশ্বাসী।

তত্ত্ব এবং ব্যবহারের সামঞ্জস্যবিধানের উপরই ডিমোক্রেসির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তত্ত্ব ও ব্যবহারের নব নব সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে হইবে। তবেই তো ডিমোক্রেসি টিকিবে। অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলেই নূতন অসামঞ্জস্যের উদ্ভব হইবে, নূতন সমস্যার উদয় হইবে। এই সমস্যার সমাধান করিয়া নূতন সামঞ্জস্যে উপনীত হইতে হইবে। ইতিহাসে সমস্যার সমাধান নাই, রূপান্তর মাত্র আছে। সমস্যার রূপান্তরের মধ্য দিয়াই ইতিহাস অগ্রসর হইতেছে। আর এই অগ্রগতিতে মানুষের একমাত্র সহায় তাহার বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি।

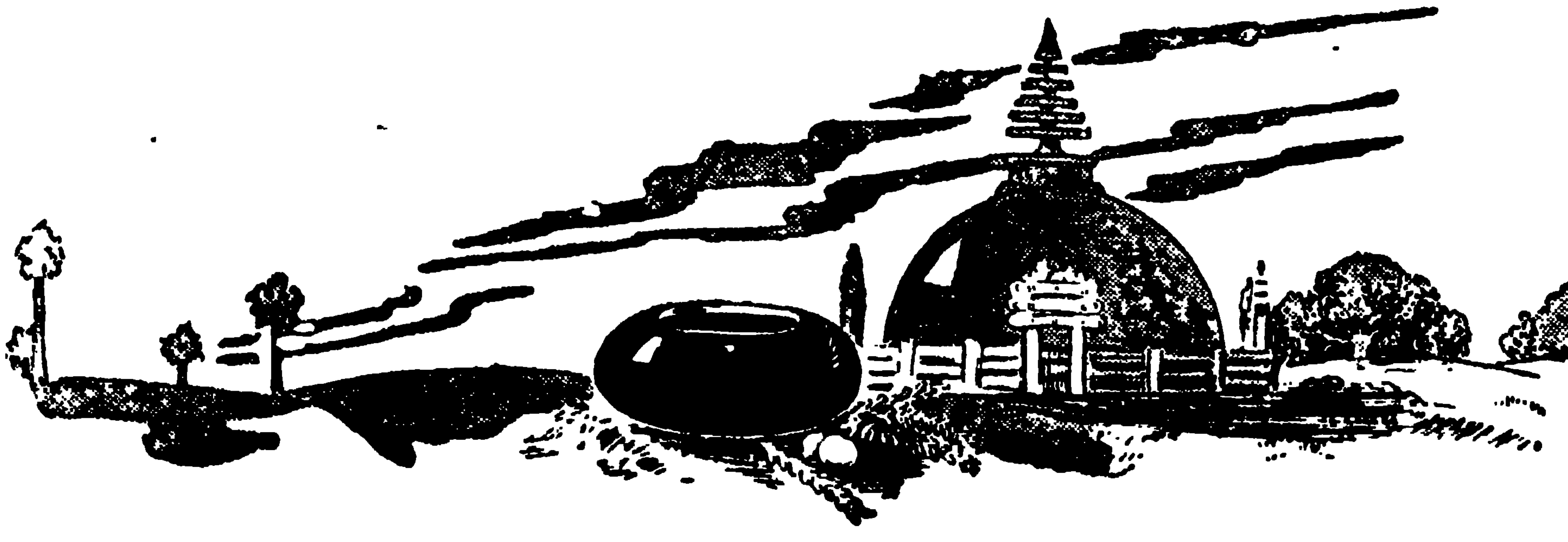

নতুন মানুষদের কাহিনী নয়

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার পকেট বার কয়েক হাতড়াল সুমন্ত। আধপোড়া একটা সিগারেট যে ছিল, গেল কোথায়? কে নিলে? হঠাৎ মনে পড়ল, প্রতুল সেদিন বলছিল, বলাই নাকি গোল্লায় গেছে। গোল্লায় যাওয়া মানে অনেক কিছু; সিগারেট টানাও তার মধ্যে আসে। এই ভেবে সে সটান ওকে ধরল।

—এই, আমার পকেটে একটা সিগারেট ছিল, নিয়েছিস তুই?

স্পষ্টই বললে বলাই—হাঁ।

রাগে ফেটে পড়ল সুমন্ত—হারামজাদা, উল্লুক ছেলে, এ সব কবে থেকে সুরু করেছ?

—গাল দিও না বলছি। ভারি তো একটা সিগারেট, তাও আবার পোড়া!

—বেশ করব দোব, একশ বার দোব।

—ভদ্রলোকের ছেলে, ভদ্রলোকের মত কথা বল।

সুমন্ত চেঁচিয়ে উঠল,—বেরো বাড়ী থেকে, বেরো।

—বেরুব না। তোমার বাড়ী নাকি!

মা ছুটে এলেন—তোরা থামবি না কি? দুই ভায়ে রোজ ছোটলোকের মত ঝগড়া। কে বলবে এটা ভদ্দর লোকের বাড়ী।

সুমন্ত বললে—ওই রাস্কেলটাই তো প্রথম ঝগড়া সুরু করলে।

—রাস্কেল বোলো না বলছি বড়দা।

—না বলবে না। আদর দিয়ে তুমিই ওর মাথাটা খেয়েছ, মা।

—'খেয়েছি, বেশ করেছি।' মা বললেন—'তুই এখন যাবি কিনা এখান থেকে।'

—আমার কি, আমি যাচ্ছি। তোমরা দু'জনে মিলে যা ইচ্ছে কর।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সোজা রাস্তায়। রাগ হয়েছে ওর বলাই ইডিয়েটটার ওপর। এই বয়স থেকে সে ওসব নেশা করতে শিখেছে বলে নয়, সিগারেটটা মেরে দিয়েছে বলে। যে যাই নেশা করুক, তার তাতে কি? হোক না সে যতই আপনার লোক। নেশা কর আপত্তি নেই। তবে যে যার গাঁট খসিয়ে কর। সিগারেটটা দামী, কাল দুটো কিনেছিল। বাজে সিগারেট খেয়ে মুখ মরে গেছে। রেখে দিয়েছিল অর্দ্ধেকটা। আজ সুখে টানবে বলে রেখেছিল। হতভাগা বলাইটার ঠিক চোখ পড়েছে।

পানের দোকানটার দিকে তাকাল। ব্যাটা বড় চালাক হয়ে গেছে। আর ধার দেয় না। তা ওরই বা দোষ কি। ধার দিলে ধার বেড়েই চলে। পুরনো ধার শোধ হবার কোনই আশা নেই দেখেই না ও নতুন ধার দেওয়া বন্ধ করেছে। তা বেশ করেছে। সুমন্ত পকেটে হাত দিয়ে একটা ঘষা সিকি পেলে। দোকানটার সামনে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। নাঃ, রোজ আর পয়সা দিয়ে নেশা করা চলে না।

হনহন করে দোকান পেরিয়ে গেল। অন্ধকার, ভিজে ঘর। দরজার ফাঁক দিয়ে দিয়ে উঁকি মারল সুমন্ত। বিলাস এক কোণে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে।

—কি কবি, কি করছ?

—কিছু নয়, কিছু নয়। এই যে এস।

—কি এত তন্ময় হয়ে ভাবছিলে?

—কিছু নয়, আচ্ছা বল তো রাতারাতি কি করে বড়-লোক হওয়া যায়? আচ্ছা মনে কর, কেউ যদি আমার নামে লাখ দু'য়েক টাকা উইল করে যায়।

—কে ক'রবে?

—এই ধর যে কেউ।

—তার আপনার লোক থাকতে তোমাকে কেন দিয়ে যাবে শুনি?

—ধর, তার তিন কুলে কেউ নেই।

—তবে সে কোনো ভাল কাজে দান করে যাবে।

—'তা বটে।' বিলাস ঘাড় হেলাল।—'আচ্ছা মনে কর, এখানে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ যদি সোনার খনি আবিষ্কার করি।'

হাসল সুমন্ত।—'খুঁড়ে দেখেছ নাকি কোন দিন?'

—দেখলে হয়, কি বল?

—তুমি দেখছি টাকা টাকা করে পাগলই হয়ে যাবে। এখন একটা সিগারেট খাওয়াও দেখি।

—সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি। বিড়ি দিতে পারি।

—ছেড়ে দিয়েছ! কবে থেকে?

—এই দিন কয়েক হ'ল।

—তাই দাও। কিন্তু কবি, বিড়ি! স্বপ্ন থেকে একেবারে নেমে এলে বাস্তবে।

ভাতের থালার সামনে বসে বলাই ডাকলে—মা।

—কি রে?

—রোজ রোজ খাওয়ার এ কি ছিরি হচ্ছে!

জবাব দিলে বাপ—'যা পাচ্ছিস খেতে হয় খা, না হয়

উঠে যা।'...একটু থেমে—'নবাবের জন্যে নবাবী খানা আসবে কোথেকে শুনি?'

সুমন্ত নিবিষ্টমনে খাচ্ছিল। বললে—তোমরাই ত নবাব করে তুলেছ ওকে।

বলাই ভারিক্কী চালে বললে, 'রোজ এমনি যা-তা খাওয়া যায় নাকি! এই এক ভাত আর চচ্চড়ি। তুমি কি বলে এসব খাওয়াও বাবা! ছেলেদের ভাল খাইয়ে মানুষ করা তোমার মরাল ডিউটি।'—বাপ চেঁচিয়ে উঠল: 'শূয়ার ছেলে, ফাজলামি করতে হবে না। ভাল খেতে হয়, গাঁটের পয়সা খরচ কর। বাপের হোটেলে নবাবী চলবে না।'

সুমন্ত না হেসে পারল না।

আমার এক বন্ধুর হোটেল আছে। সেখানেই খাব কাল থেকে।—বলাই বললে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইখানেই যা। দূর হ'।

ভাত খেয়ে আঁচাতে আঁচাতে বললে—নিশ্চয়ই যাব। এখানে আধ-পেটা আর অখাদ্য খেয়ে মরব নাকি!

রাণী বললে—সত্যি ঠাকুর পো, রাগ করে চলে যেও না।

—'যাবে কোথায় শুনি?' বাপ বলে উঠল—'কোন চুলোতেই কারুর জায়গা হবে না। সব মিয়াকেই এখানে ফিরে আসতে হবে। ওসব লম্বা-চওড়া বুলি আমার জানা আছে। ওর সেই হোটেলওয়ালা বন্ধু কেমন মাগনা পাত সাজিয়ে খেতে দেয় দেখি!...'

কবির কাছ থেকে কতকগুলো বিড়ি পকেটে পুরেছিল সুমন্ত। ঘরে বসে তারই একটা টানতে থাকে। বিড়িতে নেমে মন্দ করে নি কবি।

একটু পরে রাণী ঘরে এল। বললে—একটা কথা বলব।

—নিশ্চয়ই বলবে।

—এমনি করে কত দিন বসে থাকবে!

—যত দিন পারা যায়।

—রোজ মা-বাবা গাল দেন। সেটা কি খুব ভাল?

সুমন্ত বললে—বাপমায়ের গালাগাল না খেয়ে কোন্ ছেলে বড় হয়েছে বল।

—তুমি আর বড় হবে কি, বড় তুমি অনেক দিনই হয়ে গেছ।

—তা যা বলেছ। হাসল সুমন্ত।

—পুরুষমানুষ হয়ে ঘরে বসে থাকতে তোমার লজ্জা করে না?—আমি তো তোমার জন্যে লজ্জায় মরে যাই।

—সে তো মরবেই। কেননা লজ্জা সখী, রমণী-ভূষণ।

—ঘরে বসে থাক, নানা লোকে নিন্দে করে।

—কেন? দোষটা কি করলাম? কারুর বাড়ীতে সিন্দুক ভাঙি নি, কারুর মেয়ের দিকে কুনজরে তাকাই নি।

—কিছু বললেই তোমার আটকায় না দেখছি!

—না, আটকায় না। লোক ভাবে আমার কথা, আমি ভাবি তোমার কথা—আর তুমি ভাব লোকের কথা।

রাণী বললে—ভাব তুমি আমার কথা?

—নিশ্চয়ই। তোমায় আমি খুব ভালবাসি। আর যেই বিয়ে করুক তোমায়, আমার মত এত ভালবাসতে পারবে না। আমি বেকার বলে তুমি আমায় ততটা ভালবাস না। দুঃখ কেন তোমার, আমি বেকার বলে? কবি বিলাস কি বলে জান, 'বেকারস্ আর দি মেকার্স অব নেশ্যন'।

ওকে দু'হাতে একটু উঁচুতে তুলে ধরল সুমন্ত।

—এই ছাড় ছাড়। বাবা মা দেখে ফেলবেন যে!

—বাবা-মা দেখুন, ভাই দেখুক, পাড়ার লোকেরা দেখুক। দেখুক না, তোমার ভয় কি!...

সতীনাথ পেনসন্ পান সত্তর টাকা। সত্তর টাকায় এই বাজারে সংসার চালানো অসম্ভব ব্যাপার। দুটো ছেলে—দুটোই বেকার। কিছুই তারা করে না। তবে ঘরে বসে থাকে না। দিনরাত্র বাইরে ঘোরে। কি যে করে সতীনাথ জানেন না, তবে টাকাকড়ি যে উপায় করে না তা নিঃসংশয়ে জানেন। সতীনাথের ঘাড়ে বিরাট সংসার, অভাবে-অনটনে মাথা ঠিক থাকে না। একটা ছেলের আবার বিয়ে দিয়েছেন। ভাবতে ভাবতে মাথা তাঁর গরম হয়ে ওঠে। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যান। গৃহে শান্তি নেই। দিনরাত চীৎকার, কলহ। সব সময় অশান্তির আগুন জ্বলছে।...

সোজা বলে দিলেন সতীনাথ—সাফ জানিয়ে দিচ্ছি, আমি আর ঘরে বসিয়ে ষাঁড় পুষতে পারব না। যে যার খেটে খাও।

বলাই বলে উঠল—ভারি তো পুষছো! দু'বেলা চাট্টি তো খেতে দাও। তাও যা দাও, তা বলবার নয়।

—যাই হোক, তাও আজ থেকে বন্ধ।

—দিও না, চায় কে!

—তবে রে উল্লুক, এত বড় কথা! বেরো বেরো এখুনি।

...লাল হয়ে ওঠে সতীনাথের মুখ-চোখ।

—থাম। আর কিছু পার না, শুধু গাঁক গাঁক করে চেঁচাতেই শিখেছ।

থেমেই যান সতীনাথ। ইচ্ছে হয়, এমন জোরে ওর গালে এক চড় মারেন যে আর কোন দিন উঠে দাঁড়িয়ে কথা না বলতে পারে। কিন্তু পারেন না।

সাতে পাঁচে নেই সুমন্ত। কারুর সঙ্গে ঝগড়া করে না। কেউ ঝগড়া বাধালেও চুপ করে থাকে। তা তার দোষ থাকুক আর না থাকুক। চেঁচামেচি করতে ওর ভাল লাগে না। বাড়ীতে সব সময় চেঁচায় সবাই। তাই ঘরে ওর মন টেঁকে না।

বাড়ীওয়ালা রাস্তায় ধরে।—দিব্যি গা-ঢাকা দিয়ে আছ বাবাজী। যখনই যাই, বাড়ী নেই। বাপ যেমন ধড়িবাজ শয়তান ছেলেগুলোও ঠিক তেমনি হয়েছে।

—বাপ তুলো না বলছি।

—আলবৎ তুলব। একশো বার তুলব। বাপ কেন, বাপের বাপ তুলব।

সুমন্ত হাসল : তা তোলো। তবে তাতে লাভ এই হবে যে ভাড়া পাবার সম্ভাবনার যেটুকু ছিটেফোঁটা ছিল, তাও হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

বাড়ীওয়ালা একটু যেন নরম হ'ল। : ও, তবে ভাড়া দেবে ঠিক করেছিলে নাকি!

—পাগল! ও এমনি কথার কথা বললাম।

—পুরো পাঁচটা মাস তো বিনা ভাড়ায় কাটালে। কত দিন আর এভাবে চালাবে!

—যত দিন পারি।

—মানে!

—এর আর মানে নেই।

—ওসব চালাকি ঢের হয়েছে। শোন, আজ বলে যাচ্ছি, কাল সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ী খালি করা চাই।

—ক্ষেপেছো! যাদের পাঁচ মাসেও নড়াতে পারলে না, এক দিনে তারা নড়বে কি করে!

—তার মানে বলতে চাও, ভাড়া কোনদিনই দেবে না!

—টাকা থাকলে কি আর দিই না।

—টাকা না থাকে, বাড়ী ছেড়ে দাও।

—তার পর?

—তারপর যেখানে যাও, আমার কি!

—বাঃ, বেশ বললে যা হোক! টাকা নেই বলে বাড়ীতে থাকা হবে না!…

বাড়ীওয়ালার অবাঞ্ছিত সঙ্গ যত তাড়াতাড়ি পারল ত্যাগ করলে। পানের দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল। বিড়ি টেনে মুখ নষ্ট হয়ে গেছে। বললে : দুটো পাসিং দাও তো…

—নগদ পয়সা ছাড়ুন। ধার চলবে না।

—অমন বেয়াড়া কথা বল কেন? সখ করে নেশা করব তার জন্যেও পয়সা! এই নাও। একটা আনি অনেক খুঁজে বার করে নিজের মান রাখল সুমন্ত।

বিলাস ঘরের মেঝেয় চিৎ হয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনছে। সুমন্ত ডাকল : কবি, কি খবর?

—আচ্ছা হঠাৎ যদি লাখখানেক টাকা পাই, কি করে খরচ করা যায় বল তো? বাড়ী আর গাড়ী তো হবেই।

—পাবার আশা আছে নাকি?

—নিশ্চয়ই।

—'পাব' 'পাব' রোজই শুনছি। তুমি আর পেয়েছ কবি!

—লাখ না হোক, আধ লাখই যদি পাই।

—দেখো লাখ থেকে শেষ পর্য্যন্ত হাজারে নেমো না। শোনো, বিড়িটিড়ি তো খাওয়াও। সিগারেট দুটো ঝট করে কিনে ফেললাম! থাক, অসময়ে কাজ দেবে।

—বিড়ি নেই, ছেড়ে দিয়েছি।

—সে কি! এবার দেখছি কোন্ দিন ভাত ছাড়বে কবি। নাঃ কবি, তোমার স্বপ্ন দেখা বৃথাই গেল!

—'নাঃ, কিছু টাকাকড়ি উপায়ের চেষ্টা দেখতে হবে। ট্যাঁক খালি রেখে আর তো দিন চলে না।'—ভাবতে থাকে সুমন্ত।—'লেখাপড়া কেন যে শিখেছিল ছোটবেলায়! এতগুলো আপিস রয়েছে, যে-কোন একটাতে স্থায়ীভাবে ঢুকে পড়া গেল না এত দিনে। গেল মাসে সেই কারখানায় কাজ করে তিরিশ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। তারপর ওরাই তাড়িয়ে দিলে। ওখানে একবার ঢুঁমারলে মন্দ হয় না। নাঃ, থাক। লোহা-লক্কড় নিয়ে ঠোকাঠুকি, ওসব কি আর ভদ্রলোকের ছেলের পোষায়! গোকুল সেদিন বলছিল, ওদের আপিসের সামনে নতুন একটা কোম্পানী খুলেছে। সেখানকার শেয়ার বিক্রিতে মোটা কমিশন দেয় নাকি। একবার দেখলে হয়।—গালে হাত বুলালে সুমন্ত। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। কামানো বিশেষ দরকার। তিনটে আনা গচ্চা হবে। হোক গে।… রাণী কেমন যেন হয়ে গেছে আজকাল। হয়েছে অনেক দিন থেকেই। চোখে পড়ে নি সুমন্তর। কথা কয় না, হাসে না। গায়ের সেই উজ্জ্বল রং ম্লান হয়ে গেছে। কানায় কানায় ভরা উচ্ছল যৌবন অকালেই রিক্তপ্রায়। চোখের কোলে পড়েছে কালি। দেহে ছেঁড়া, ময়লা শাড়ী।—সুমন্তর ভাবনার স্রোত চলেছে অবাধ গতিতে—কেন এমন হ'ল! পরে নিজেই হেসে ওঠে। এই অভাব আর হাহাকারের সংসারে ও যে এতদিন বেঁচে আছে, এইটেই আশ্চর্য্য!

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে সুমন্ত বলে : এখানে তোমার বড় কষ্ট না, রাণী?

—কষ্ট কেন? কে বললে?

—আমি জানি।

—ইস্, ভারি আমার গনৎকার এসেছেন!

—তুমি আর হাস না, সব সময় চুপ করে থাক।

—কি যে বল! হাসবার আর হৈ হল্লা করবার বয়েস আর আছে নাকি!

সুমন্ত আস্তে আস্তে বললে : সত্যিই কি সে বয়েস তুমি হারিয়েছ রাণী?

রাণী কি বলবে ভেবে পায় না।

—রোজ দেখি ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে থাক। ভাল কাপড় পর না কেন?

হাসল রাণী। বা রে, ঘরে কেউ বুঝি ভাল কাপড়-জামা পরে থাকে!

—থাকলে ত পরবে!

—আছে গো আছে, অনেক আছে।

—ঘোড়ার ডিম আছে!

প্রতিবাদের ভাষা পায় না রাণী। বলে: তোমারও তো ময়লা ছেঁড়া কাপড়।

—আমার কথা তোমায় ভাবতে হবে না।

—আমার কথাও তোমায় ভাববার দরকার নেই।

—কে ভাবছে কে? বয়ে গেছে ভাবতে! তুমি ময়লা ছেঁড়া কাপড় পর, না খেয়ে শুকিয়ে মর কার কি!

কিন্তু সত্যিই কি কিছু নয় সুমন্তর?···

অনেকদিন আগে বিশ্বনাথের কাছ থেকে কুড়িটা টাকা ধার করেছিল সুমন্ত। ফিরে পাবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে, বাজারে সবার সামনে বিশ্বনাথকে যা মুখে এল তাই বলে অপমান করলে। কুতুহলীদের ভিড় জমে গেল।

হেসে বললে সুমন্ত: এতদিন ধরে এই জিনিষটাই শিখলে বিশ্বনাথ!

—টাকা ধার করে শোধ না দিলে এমনি গালই দিতে হয়।

—তোমার টাকা ফেরত দেবার মত অবস্থা আমাদের নেই।

—তবে ধার নিয়েছিলে কেন?

—ভীষণ দরকার পড়েছিল।

—বেশ তো, এখন শোধ দাও।

হেসে জানায় সুমন্ত—শোধ দেবার মত অবস্থা থাকলে কি কেউ কখনও ধার নেয়।

রাগে গজরাতে লাগল বিশ্বনাথ,—জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী, ধাপ্পাবাজ!

ভিড়ের মধ্যে বলাইও ছিল। সহ্য করতে পারল না। ছুটে গিয়ে ওর নাকে মারল সজোরে এক ঘুষি। বিশ্বনাথ ছিটকে পড়ল মাটিতে আচমকা আঘাত পেয়ে। নাক দিয়ে রক্ত ছুটল। সবাই হৈ হৈ রৈ রৈ করে উঠল।

—এই বলাই রাস্কেল, এ কি করলি!

বলাই চেঁচিয়ে উঠল—তুমি থাম বড়দা। ঠিকই করেছি! ও শূয়ারকে মেরেই ফেলব।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় মারতে শিখেছিস! চল শিগ্‌গির এখান থেকে চল। এক রকম জোর করে টানতে টানতেই সুমন্ত ওকে ভিড়ের মাঝখান থেকে বার করে আনল।

—মারলি কেন?

—না মারবে না! যা তা বলে অপমান করবে।

—বেশ করবে।

—আমিও বেশ করেছি, মেরেছি। সেই কখন থেকে যা-তা বলে যাচ্ছে, আর তুমি চুপ করে শুনে যাচ্ছ। একটু লজ্জাও করল না তোমার!

—লজ্জা করে করব কি? টাকা তো শোধ দিতে পারব না।

—তাই বলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপমান হবে।

– তা ছাড়া উপায় কি? মারলেই কি অপমান বন্ধ হবে?

—ও সব তুমি সহ্য করতে পার বড়দা, আমি পারব না।

মুখ ভেংচে উঠল সুমন্ত—না পারবেন না! না পারবি তো কেন গরীব হয়ে জন্মেছিলি?···

নগরীর চোখে ঘুম নেমেছে। সঙ্কীর্ণ ছোট্ট গলিটায় নিব নিব আলো। হোটেলটার এক কোণে ক'জন গোল হয়ে বসে তাস পেটা সুরু করেছে। মুখ তাদের নির্ব্বাক, চোখে হিংস্র লোলুপতা। বিড়ির কড়া ধোঁয়া পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। বলাইকে এদের মাঝে দেখা গেল। পকেটে একটা সিকি ছিল, তারই ভরসায় এগিয়ে এল। কেউ কেউ ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

মোটা মতন একজন শুধাল—কত সঙ্গে আছে?

—যাই থাক। তোমার কি দরকার তাতে?

বলাই উঠে দাঁড়িয়ে টাকাগুলো গুণে নিলে। চব্বিশ টাকা দশ আনা। সিকির বদলে হাতে এল। মন্দ কি!

একজন বলে উঠল—এরই মধ্যে চললে? এই তো সবে সন্ধ্যে হ'ল। আর খেলবে না?

—না।

—ও আর কি নিয়ে চললে! নিয়েই যদি যেতে হয়, কম করে একশো নিয়ে যাও।

বলাই কোন জবাব না দিয়ে এগুলো। পার হ'ল গলিটা। ভীষণ খিদে পেয়েছে। খেতে হলে মোড়ের মাথার ওই বড় হোটেলটাতেই ঢুকতে হয়। হোটেলে ঢুকে গোগ্রাসে গিলে চলল। অনেক খাবার—ভাল খাবার, দামী খাবার। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল বৌদির কথা। বৌদি না খেয়ে আছে। বৌদি কি খায়, কখন খায় সে জানে না। উপোসই বোধ হয় করে রোজ। কেউ তো আর দেখতে যায় না। বাড়ীর সবার খাওয়া হলে বৌদি খায়। সকলের খাবার পর হাঁড়িতে কিছু কি পড়ে থাকে।

একটা ঠোঙায় রকমারি মিষ্টি প্রচুর কিনে বলাই বাড়ী ফিরল। বন্ধ দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিলে।

—কে?

—আমি, বৌদি।

রাণী দরজা খুলে দিয়ে বললে—কোথায় ছিলে এত রাত অবধি ঠাকুরপো?

—এই এমনি ঘুরছিলাম। তোমার জন্তে কি এনেছি দেখ।

—কি? কি আছে এতে?

—খুলেই দেখ না।

—ওরে, এ যে অনেক খাবার, এ কি হবে?

বলাই বললে—তুমি খাবে।

—এ···তো! তা ছাড়া এই তো ভাত খেয়ে উঠলাম। পেট একদম ভর্ত্তি।

—তা হোক। এত ভাল খাবার তো তুমি খেতে পাও না।

—তোমরাও যেন কত পাচ্ছ!

বলাই জবাব দিতে না পেরে চুপ করে থাকে।

রাণী ডাকল—ঠাকুরপো।

কি?

এত খাবার কোত্থেকে পেলে?

বলাই হাসল—পাব আর কোত্থেকে! কিনলাম।

—টাকা পেলে কোত্থেকে?

—পেলাম।

—জুয়া খেলেছ বুঝি?

বলাই চুপ করে রইল। সুমন্ত এতক্ষণ চুপ করে এক কোণে শুয়েছিল। বলে উঠল—যা করে পাক তোমার তাতে কি বল তো? তোমায় খেতে দিচ্ছে, খেয়ে নাও।

সুমন্তর কথায় কান দিলে না রাণী। ওকে বললে—তোমায় না আমি জুয়া খেলতে বারণ করেছিলাম! তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে ঠাকুরপো, আর কোন দিন খেলবে না!

বলাই বললে—সত্যি। কিন্তু বৌদি অনেক চেষ্টা করে দেখলাম এ ছাড়া টাকা রোজগারের আমার আর কোন পথ নেই। ভাল কাজ করে টাকা উপায় আমা দ্বারা হবে না।

সুমন্ত বললে—পুরুষ মানুষ টাকা রোজগার করেছে। তা যা করেই হোক। চুরি ক'রে বা জুয়ো খেলে তা নিয়ে এত চুলচেরা বিচার কেন?

চেঁচিয়ে উঠল রাণী—তুমি থাম। নিজে তো নীচে নেমেছ, ওকে আর নামিও না। এ সব বলতে লজ্জাও করে না!

হাসল সুমন্ত। তুমিই বল রাণী, চোরের মুখে কি শোভা পায় ধর্ম্মের কাহিনী।

রাণী বলাইকে বললে—খাবার আমি খাব না, ঠাকুরপো! তুমি নিয়ে যাও।

—কেন?

জবাব নেই রাণীর।

—ইস্ খাবে না! না খাবে তো বয়ে গেল! তেজ দেখ! আমরাই খাব, দে তো বলাই। গরীবের আবার তেজ কি!

—না। বলাই খাবারের ঠোঙাটা দরজা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়।—তোমাদের কারুরই খাবার ভাল করতে নেই।

সুমন্ত কিছুক্ষণ প্রাণ ভরে হাসল। অন্ধকারে এক কোণে রাণী আচ্ছন্নের মত বসে। কেউ দেখতে পেলে না, ওর কাল দুটো চোখে জল টল্‌টল্ করছে।···

মাসের শেষ সপ্তাহ। রেশন আনতে হবে। হাতে একটাও টাকা নেই সতীনাথের। বাক্স হাতড়ালেন, এদিক-ওদিক খুঁজলেন। কোথাও নেই কিছু। রাণীকে বললেন, তোমার কাছে কিছু টাকা হবে বৌমা?

—না তো।

—তাই তো। আজ রেশন আনার দিন।

স্বামীকে বললে রাণী, তোমার কাছে টাকা আছে? দাও তো আমায় কিছু।

—কেন কি হবে?

—দরকার আছে।

সুমন্ত জোরে হেসে উঠল।—টাকা চাইছ আমার কাছ থেকে? হায় নারী, এখনও পতি-দেবতাকে চিনলে না!

রাণী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, টাকা না দিতে পার, একটা কাজ করতে পারবে?

—টাকা দেওয়া ছাড়া আর সব কিছুই পারব।

—বেশ।—দু' হাতে দুটো সোনার চুড়ি ছিল। সে দুটো খুলে ওকে দিলে।—এই নাও।

—এ কি হবে?

—এ দুটো জমা রেখে আমায় অন্ততঃ দশটা টাকা এনে দাও।

—এ তো সোজা কাজ। কিন্তু টাকার তোমার কি এমন জরুরী দরকার শুনি?

—টাকা না আনলে এই হপ্তা উপোস করে থাকতে হবে।

—উপোস করতে তোমার তো বেশ অভ্যাস আছে।

—ছি ছি, আমি আমার নিজের জন্তে বলছি নাকি!

চুড়ি দুটো হাতে নিয়ে সুমন্ত রাস্তায় নামল। মন্দ নয় চুড়ি দুটো। বিয়েরই সময় রাণী পেয়েছিল। বার কয়েক সে দেখল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। অনেক ময়লা জমেছে। কেমন যেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে ম্লান হয়ে গেছে।

ঘুরতে ঘুরতে সোজা প্রতুলের বাড়ী হাজির। প্রতুল ডাক্তার, বড়লোক।

—কি রে, কি ব্যাপার? আজকাল যে বড় আসিস্ না?

—চাইতে আর ভাল লাগে না। কাঁহাতক আর হাত পাতা যায় বল? এবার তাই দিতে এলাম।

চুড়ি দুটো ওর দিকে এগিয়ে দিল সুমন্ত।

—এ কি, এ কার চুড়ি? বউয়ের বুঝি?

—হুঁ।

—ছিনিয়ে এনেছিস নাকি ?

—না। ও নিজেই দিলে। এগুলো রেখে দশটা টাকা দে দিকি। অন্ত কোথাও বাঁধা রাখতে পারলাম না।

—কেন ?

—কনসান্সে বড় বাধলো রে।

—হুঁ। হাসল প্রতুল।—কিছু ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে দেখছি! মনিব্যাগ থেকে দশ টাকার দুটো নোট বার করল।—এই নে।

—থ্যাংক্‌স্। চুড়িটা রাখ্।

—পাগলামি করিস নে। বাড়ী যা।

বাড়ীর পথেই পা বাড়াল সুমন্ত, কিন্তু বাড়ী গেল না। কুড়ি টাকা পকেটে রয়েছে। একসঙ্গে কুড়িটা টাকা কদাচিৎ তার পকেটে থাকে। এখন সে যা যা খুশী করতে পারে। কিন্তু টাকা নিয়ে যা খুশী সে করল না। দোকান থেকে খুব ভাল দেখে একটা শাড়ী কিনল। বেশ মানাবে এ শাড়ী রাণীকে। কত দিন ও ভাল শাড়ী পরে নি কে জানে! এ শাড়ীতে তাকে চমৎকার দেখাবে। দেখাবে ঠিক রাণীরই মত। রাণী সত্যিই ছিল রাণী। সেই তো তাকে ভিখারিণী করেছে।

বাড়ী ঢুকতেই রাণী শুধাল—টাকা এনেছ ?

—আমার কাছে এস। হাত দুটো দেখি।

—কেন ?

—এস তো।

কাছে আসতেই ওর দু' হাতে চুড়ি দুটো পরিয়ে দিল।

—এ কি, চুড়ি ফিরিয়ে আনলে কেন ? টাকা কই ?

—টাকা আনি নি।

—পাও নি বুঝি ?

—পেয়েছিলাম। টাকা দিয়ে শাড়ী এনেছি। দেখতো কি সুন্দর শাড়ী! কেমন তোমায় মানাবে!

—এ কেন আনলে! এ তো আমি চাই নি।

সুমন্ত বললে, চাও নি বলেই তো আনলাম। মেয়েরা নিজের জন্তে কখনই যে কিছু চায় না। ওই তো মেয়েদের দোষ।

—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ? এতো টাকা খরচ করে এই দামী শাড়ী কিনতে বলেছিল কে ?

—কেউ বলে নি। তোমায় আজ রাণীর বেশে সাজাব, তাই আনলাম।

—খুব কাজই করেছো! এদিকে একটা হপ্তা যে উপোস করতে হবে, তা ভেবে দেখছো ?

—না খেয়ে থাকা আমাদের জীবনে নতুন নয়। এমনি উপোস করার দিন প্রায়ই আসে। কিন্তু আজ হঠাৎ এই যে মনের কোণে রং লাগল, একি আর কোন দিন ঠিক এমনি করে লাগবে!

—সত্যিই তোমার মাথা খারাপ হয়েছে আজ!

রাগে ঘর ছাড়ল রাণী।

আবছা অন্ধকার ঘরে রাণী নির্ব্বাক হ'য়ে বসেছিল। বলাই আস্তে ডাকল—বৌদি।

—কে, ঠাকুরপো ? রাণীর যেন তন্দ্রা ভাঙে।—একি তোমার চেহারা হয়েছে! কোথা থেকে আসছ ?

বলাই হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, কোথাও তো যাই নি। এই নাও, ধর।

—কি ?

—নাও তো।

এক গাদা নোট মুঠো ক'রে ওর দিকে এগিয়ে দিল। রাণী ভীত, কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল—এ কি, এত টাকা কোত্থেকে আনলে ? সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতের দিকে চোখ পড়তে রাণী শিউরে উঠল। থেঁৎলে গেছে হাতের আঙুলগুলো। টস্ টস্ করে রক্ত পড়ছে হাত বেয়ে। ও আর্ত্তনাদ করে উঠল—এ...এ তোমার কি হয়েছে ঠাকুরপো!

—ও কিছু নয়, হাসল বলাই।—পালাতে গিয়ে নীচে পড়ে গিয়েছিলাম বৌদি। পুলিসের জুতোটা একেবারে হাতের উপর এসে পড়ল। কি ভারি জুতো, নীচে লোহা লাগানো।

তাই তো...

সতীনাথ কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ লক্ষ্য করে নি একবারও। সাড়া পেয়ে দু'জনেই চমকে উঠল।

—দেখি টাকাগুলো। গুনতে গুনতে বললেন, এ যে অনেক টাকা রে! তারপর বলাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছিস! পালা শিগ্‌গীর। নিজে তো যা করবার করেছিস, বাড়ীসুদ্ধ সবাইকে কাঁসাতে চাস নাকি! পালা পালা।

রাত্রির অন্ধকারে ও ঘর ছাড়ল।...

'কে কাঁদে ?' সুমন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।—'রাণী।'

—আঃ, চুপ কর।

রাণী থামে না।

—আঃ, আচ্ছা এক ছিঁচকাদুনে মেয়ে নিয়ে পড়া গেছে।

তবু কান্না ওর থামে কই ? ওই ছেলেটা, যাকে এরা সবাই অনাদরে, অপরাধের বোঝা মাথায় চাপিয়ে দিয়ে এই গভীর রাত্রে ঘরে ঠাঁই দিল না তার জন্তে ঘরের মেয়ের বুক কি ভাঙবে না। তারাই যে ঘর বাঁধে, ভালবাসে, স্নেহমমতা দিয়ে প্রিয়জনকে ঘিরে রাখে ?

সুমন্ত ওর কাছে এগিয়ে এল। আস্তে আস্তে বললে, পাগল এত বড় হলে এও জান না, আমাদের কাঁদতে নেই! কাঁদা আমাদের পাপ।

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

জীবনময় রায়

(জনমনের খোলা কথা)

[বামপন্থীদের জন্যে এ প্রবন্ধ লেখা হয় নি। তাদের মনোভাবের সঙ্গে আমার প্রবন্ধের আন্তরিক কোন যোগ নাই। পণ্ডিত জবাহরলালের সততা ও কৃতিত্ব বিশ্ববিদিত। কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি দুরূহ সমস্যায় তাঁর রাজনীতি প্রয়োগ-পদ্ধতি, তাঁর শান্ত, দৃঢ়, আত্মশক্তিতে আস্থাবান মনের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচক্ষণতা প্রমাণ করে।

আমি ভারতের জনসাধারণের যে মনোভাব ব্যক্ত করেছি, সে জনসাধারণ জবাহরলালের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন জনসাধারণ এবং পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনে তাঁর নায়কত্বের উপর তারা নির্ভর ও আশাশীল।

প্রবন্ধটিকে এই মনোভাব নিয়েই পড়তে হবে।]

ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা পেয়েছে এ ধারণা ভারতবাসীর মনে ঠিকমত শিকড় নিতে পারে নি। ৬০ বছর ধরে এই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে আসমুদ্রহিমাচল সমস্ত ভারত। কংগ্রেসের পত্তন থেকে সুরু করে কংগ্রেসের নায়কেরা এবং তাঁদেরই ভাবে প্রভাবিত নরনারী বহুকাল পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে চেয়েছে ব্রিটিশবর্জ্জিত স্বাধীনতা আর প্রকাশ্যে চেয়েছে—আরো চাকরি দাও, আরো সুবিধা দাও, দেশের শাসনে তোমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে দাও—অর্থাৎ যতটুকু আবদার করলে ব্রিটিশ প্রভুরা সেটাকে বেয়াদবি বলে মনে করবেন না, ততটুকু। ইংরেজের কামানের সামনে দাঁড়িয়ে তখনও "ভারত ছাড়ো" বলে হুঙ্কার দেবার হিম্মৎ হয় নি তাঁদের। কিন্তু আজ যখন বহু যুগের প্রতীক্ষিত সেই সাধনার ধন ঘরে এল তখন তাকে দেখে আমরা চিনতে পারছি না। কেন? ভারতবাসী কি এতই অসাড়, এত বিচারজ্ঞানহীন? প্রকৃত স্বাধীনতার বিদ্যুৎপ্রবাহ কি তাদের ধমনীতে চেতনা আনতে পারে না? যদি আনত তবে 'দুশমনের' (Satanic Government শব্দটি স্মরণ করুন) কবলমুক্ত ভারতবর্ষে দুশ্‌মনির বাড় বৃদ্ধি এত কেন? তবে কি ভারতবর্ষ আসলে 'দুশমনে'র কবল মুক্ত হয় নি? প্রচ্ছন্ন ভাবে তারা কি সর্ব্বঘটে বিরাজ ক'রে ভারতের সর্ব্বনাশ সাধনে নিযুক্ত আছে? তা নইলে, মুক্ত ভারতের জনগণের যে ছবি যে স্বপ্ন দেখিয়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জনতাকে নায়কেরা, ধন-প্রাণ সুখ-শান্তি তুচ্ছ করতে আহ্বান করেছিলেন, সে ছবি আজ তারা দেখতে পাচ্ছে না, কেন? তবে কি নায়কেরা দুশমনের সঙ্গে রফা করে একটা মেকী স্বাধীনতা হাত পেতে নিয়েছেন? এবং তাকেই কি গলার জোরে সকল নায়কে মিলে প্রজাসাধারণের কাছে "স্বাধীনতা, স্বাধীনতা" বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছেন? নইলে এত সাধের স্বাধীনতা ধন এত প্রতীক্ষার পর লাভ ক'রেও আজ তারা স্বাধীনতার সেই স্বাস্থ্যকর প্রাণবান চেতনা পাচ্ছে না কেন?

আর সে প্রতীক্ষা এবং চেষ্টা কি এক দিনের? রামমোহন রায়ের মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ সুপ্ত ভারতের অন্তরে এসে আঘাত করেছে। সে মুক্তি দিকে দিকে দিনে দিনে আত্ম-প্রকাশ করেছে মানুষের জীবনের সর্ব্ববিধ বন্ধন ছেদন করে ভারতবাসীকে মুক্তি-প্রয়াসী হবার শিক্ষা দিতে—বহু যুগের অন্ধকার কারাগার ভেঙে—সংস্কারে, ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে, ভাষায়, চরিত্রে, শিক্ষায়, মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্ব্বক্ষেত্রে। এক দিকে বহুশতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জড়তা এবং অন্য দিকে সেই দাসত্ব-প্রসূত নব-উজ্জীবনের প্রতি ভয়, সন্দেহ, বিরুদ্ধতা, স্বার্থ পদে পদে সেই মহামুক্তির আন্দোলনকে ব্যাহত করবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু পারে নি। ধীরে ধীরে ভারত-বাসীর মন জেগে উঠেছে সেই মুক্তির আহ্বানে। ক্রমে তীব্র-তর হয়েছে তাদের অন্তঃকরণে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—"স্বাধীনতা হীনতায় কে, বাঁচিতে চায়?" পরাধীনতার অপমান বহন করে, নিশ্চিন্ত নিরাপদে, শান্তিপূর্ণ আরামে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করার ঘৃণ্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে, একদিন দুর্দ্ধর্ষ বিদেশী দানবের বিরুদ্ধে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিশ্চিত মৃত্যুর আহবে—পরমানন্দে, নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। "আমি ধন্য হব মায়ের জন্য ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলে।" এ কথা কোনো দিনই তারা মনে করে নি যে তারা সামান্য কয় জনে কয়েকটা বোমা ছুঁড়ে ব্রিটিশকে ভারত ছাড়া করবে। ব্রিটিশের প্রসাদভোজী ভীরু বুদ্ধিমান দল তাঁদের চায়ের আসরে নিরাপদে বসে সে দিন একে "ছেলে মানুষি" বলে বাঁকা হাসি হেসেছিল। নির্ব্বোধেরা এ কথা সে দিন ভাবে নি যে এই বীর-ভঙ্গী সুধু প্রবলের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রাণ তুচ্ছ করে "মানি না তোমাকে" বলবার নৈতিক বলের ভঙ্গী; দেশের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করার জন্যেই তারা প্রাণ উৎসর্গ করেছিল। সেই নির্ভয় দল যে আগুন জ্বেলে-ছিল, দেশের প্রাণে সে আগুন নেবে নি। ক্রমেই সে আগুন প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশের পূর্ণ মুক্তি লাভ করতে চাইলে, প্রাণটা যে তুচ্ছ করতে হয়, এ প্রেরণায় দেশের যুব-শক্তি জেগে উঠেছে। আজ দেখতে পাচ্ছি, দেশের জনতার সঙ্গে সঙ্গে সেই 'বাঁকা-হাসি'র দলও ওদের "শহীদ" বলার জন্যে দৌড়ে দৌড়ে আসছে। কালের কুটিল গতি!

কামান-বন্দুক-মাইন-রণপোত-বোমা-বোমযানে সুসজ্জিত

ইংরেজকে ভারত ছাড়াবার নূতন শিল্পকলা আবিষ্কার করলেন ও শেখালেন মহাত্মা গান্ধী।

১ম—কংগ্রেসের আন্দোলনকে শিক্ষিত মুষ্টিমেয়ের অভিজাত মঞ্চ থেকে বঞ্চিত জনতার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করার শিল্প। "দেশের জনতাই প্রকৃত দেশ; তারা স্বাধীনতা দাবি করতে না শিখলে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না; ভারতবর্ষ জনসাধারণের; দেশের অল্প কয়েক জন মানুষের হাতে শাসনভার গেলেই দেশ স্বাধীন হ'ল না। স্বাধীনতা আনবে জনতা, স্বাধীনতা গড়বে জনতা, স্বাধীনতা বাঁচিয়ে রাখবে জনতা। তাদের বঞ্চিত করলে, দেশের ত্রাণ নাই।"

"ভাগ করে খেতে হবে সবাকার সাথে অন্নপান।"

"সেই নিম্নে নেমে এসো নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।"

কবি এ কথা অনেক আগেই গেয়েছেন। সাধক তাকে কাজে রূপান্তরিত করার শিল্পকলা শিক্ষা দিলেন।

২য় শিল্পকলা—অহিংসা। প্রচুর মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচুরতর মারণাস্ত্র সংগ্রহ ক'রে, কোন পরাধীন দেশের পক্ষে ব্রিটিশের মত কোনও দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে জয় করা অসম্ভব। অতএব বিনা অস্ত্রে, নির্ভয়ে মৃত্যুপণ করে, প্রবলের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াও অহিংস অসহযোগ ক'রে। সেই দুর্জ্জয় সাহস মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলো, সম্পূর্ণ অপ্রমত্ত অনুত্তেজিত অবস্থাতেও যে সাহস মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করতে পারে; বলতে পারে, 'সির দিয়া, সর্ নাহি দিয়া।'—প্রাণ দিয়েছি, ধর্ম্ম দিই নি। বলতে পারে, 'মানি না তোমার পশু-শক্তিকে, আমাকে মারতে পারো—মানাতে পারো না।' বড় দুর্জ্জয় সেই মৃত্যুশঙ্কাশূন্য বীরত্ব। ভীরু পরপদাশ্রয়ী মানুষ এমন সাহসের কথা কল্পনা করতে পারলে না। আবার নিরাপদ আরামীর দল বাঁকা হাসি হাসলে। কেউ বললে, তা কি করে হবে? লড়াই না করে কি ওদের তাড়ানো যাবে? চটে গেল তারা গান্ধীজীর উপর। "তুলসীর মালা নিয়ে উনি হিমালয়ে চলে যান।" "এই বোষ্টোমী করেই দেশটা নপুংসক হয়ে গেল।" বললে, কিন্তু 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই খামচি মারেঙ্গা'র দল কোন উপায় বাৎলাতে পারলে না—কি করে ব্রিটিশ ষাঁড়কে ভারতছাড়া করবে। আবার তার চেয়েও বুদ্ধিমান্ কেউ কেউ বললে, "ও অছিলা লড়াই করে মরার ভয়ে।" কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর নিজস্ব মৃত্যুশঙ্কাপরিশূন্য বীর্য্য ও প্রেম ধীরে ধীরে জনতার মধ্যে, দেশের যুবকদলের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। সম্ভব হয়ে উঠল, যা অসম্ভব। দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্ভয়ে শান্তমুখে বারংবার ব্রিটিশের গুলির মুখে এগিয়ে গেল। শিক্ষিত অশিক্ষিত ভারতের জনতার পবিত্র শোণিতে দেশ প্রাণের ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হয়ে উঠল। লোকে মার খেতে খেতে মরে গেল, জেলে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার হাসিমুখে সয়ে প্রাণ দিলে, সজ্ঞানে স্থির থেকে মেসিনগানের সামনে বুক পেতে দিলে। সমস্ত দেশের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বন্যাস্রোতের মত বইতে লাগল। এক দিন লাহোর কংগ্রেসে বীর জবাহরলাল যে পূর্ণ স্বাধীনতা পণ করেছিলেন, বছরের পর বছর সেই পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার যুদ্ধ চলতে লাগল।

তার পর পৃথিবী জোড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে উপস্থিত হ'ল—ইংরেজের সঙ্গে জার্ম্মানীর স্বার্থ বিরোধে। একজন সাম্রাজ্যবাদী, আর একজন ফ্যাসিষ্ট। ইংরেজ ভারতবাসীকে এসে বললে, গত যুদ্ধের মত এস আমার জন্যে লড়, আমাকে বাঁচাও—তোমাদের স্বাধীনতা দেব। কংগ্রেস উত্তর দিলে যে গত যুদ্ধেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার স্বরূপ আমাদের জানতে বাকী নেই। ভারতবাসী ধনপ্রাণ দিয়ে তোমাকে বাঁচালে আর তুমি তার প্রতিদানে দিলে জালিয়ানওলাবাগ। বেশ, এবারেও তোমাকে বাঁচাতে আমরা রাজি আছি, কিন্তু আগে স্বাধীনতা চাই। হাত পা বাঁধা নিয়ে আমরা ইচ্ছামত লড়তে পারি না। এখন লড়তে গেলে তোমাদের ইচ্ছা এবং আবশ্যক মত আমাদের দিয়ে লড়িয়ে শুধু আমাদের প্রাণ বের করে দেবে; তাতে তোমরা বাঁচবে কিনা জানি না, কিন্তু আমরা যে মরব তা নিশ্চয়। স্বাধীনতা দাও। চল্লিশ কোটি মানুষের জনসমুদ্র তোমাদের পক্ষে উদ্বেল হয়ে উঠলে সেই বিরাট শক্তির কাছে যুদ্ধ আপনিই অসম্ভব হয়ে উঠবে। নইলে মুখে তোমরা বলবে দুনিয়ার মানুষের মুক্তির জন্যে লড়াই করছ আর কাজে আমাদের তোমরা তোমাদের ঘানিতে বেঁধে রেখে তেল ভাঙাবে তা হতে দেব না। স্বাধীনতা যদি না দাও তবে বুঝব যে স্বাধীনতা-যুদ্ধ কথাটা ভাঁওতা বই আর কিছুই নয়। তোমাদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থেই তোমরা আমাদের ধনেপ্রাণে সারা করতে চাও; অতএব সে রকম যুদ্ধে আমরা বাধা দেব। চার্চ্চিল কথাটা স্পষ্টই কবুল করলে, মন্ত্রী হয়ে সে সাম্রাজ্য ভেঙে দিতে বসে নি।

ক্ষেপে গেল ইংরেজ। ১৯৪২, ৮ই আগষ্ট, কংগ্রেসের সব বড়দের নিয়ে জেলে ভরলে একদিনে। নায়কহীন দেশ, ৯ই আগষ্ট, অহিংস সংগ্রামে নেমে পড়ল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। হাজারে হাজারে নিরস্ত্র মানুষকে খুন করলে ইংরেজ, লক্ষ লোক জেলে পচতে লাগল, তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিলে মেয়েদের বে-ইজ্জৎ করলে, শিশু বৃদ্ধ কেউ তাদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেলে না। দেশে হিন্দু মুসলমানের যে বিরোধ ঘটেছিল, তাকে চরমে আনবার জন্যে তলে তলে ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। দুর্ভিক্ষ ঘটালে, কালো বাজারের সৃষ্টি করলে, টাকার দাম কমিয়ে দিয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষগুলোকে খাওয়ার লোভ, টাকার লোভ, মুনাফার লোভ আর সর্ব্বনাশের ভয় দেখিয়ে যুদ্ধে সাহায্য করতে বাধ্য

করলে। দেশের সয়তান স্বার্থলোভীর দল সুবিধার লোভে, টাকার লোভে, চাকরির লোভে, নিরাপত্তার লোভে এবং কংগ্রেসের উপর যে অত্যাচার চলছিল সেই অত্যাচারের আতঙ্কে সাম্রাজ্যলোভী ব্রিটিশের তাঁবেদারীতে লেগে গেল। ভেঙে পড়ল দেশের নৈতিক ভিত্তি। পাপ সম্বন্ধে, অপরাধ সম্বন্ধে নির্লজ্জতা বাহাদুরী দেখানোর পর্য্যায়ে গিয়ে উঠল। সমস্ত ধর্ম্মনীতি, মনুষ্যত্ব টাকার তলে চাপা পড়ল।

রুশিয়া আর আমেরিকার দৌলতে ব্রিটিশ যুদ্ধ শেষ করে বেরিয়ে এল দুর্ব্বল রক্তশূন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ ঢেঁকিবাহন চার্চ্চিলকে গদি থেকে নামিয়ে এটলীকে বসালে গদিতে।

ভারতের জনসাধারণের, দলনির্ব্বিশেষে, তখন একটি মাত্র ইচ্ছা—ইংরেজ ভারত ছাড়ো। গান্ধীজী ঐ রব তুলেছিলেন 'কুইট ইণ্ডিয়া'। কোটি কোটি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হ'ল 'কুইট ইণ্ডিয়া'—ভারত ছাড়ো। ইংরেজ দেখলে যে এই প্রবল জনমতের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে টেঁকা অসম্ভব। বললে হাঁ, এবার আমরা ভারত ছাড়ব। কিন্তু সে কি 'ছাড়া' রে বাবা! সয়তানের গুড়ের কৌটা। এত দিন মুসলমানদের তাতিয়ে তাদের দিয়ে অদ্ভুত উদ্‌ভুটে এক দাবি খাড়া করেছিল—যার মাথামুণ্ডু কিছু নেই—যে হিন্দু আর মুসলমান দুটো আলাদা ধর্ম্ম নয় শুধু দুটো আলাদা জাত—সুতরাং মুসলমানদের জন্যে পাকিস্থান চাই। জিন্না বললেন, ছাড়ো ভারত, তবে তোমরা মুরুব্বি থেকে ভারত ভাগ ক'রে আমাদের পাকিস্থান দিয়ে তবে ছাড়ো—ডিভাইড এণ্ড কুইট। এই দাবি বীভৎস চরমে তোলার ব্যবস্থাও (মুসলমানদের উৎসাহ এবং জমি তোয়ের করিয়ে দিয়ে) করতে তারা ত্রুটি করে নি। ফলে ১৯৪৬, ১৬ই আগষ্ট "লড়কে লেয়েঙ্গে পাকিস্থান"-রূপী বর্ব্বর তাণ্ডব সভ্যতা-গর্ব্বিত ইংরেজ রাজের দ্বিতীয় প্রধান নগরী কলকাতার বুকের উপর প্রকাশ্যে দিবালোকে সুরু হয়ে গেল। নরনারী শিশুহত্যা হিন্দু মুসলমানের কাছে ছারপোকা, তেলাপোকা মারার সামিল হয়ে উঠল। নারীহরণ ধর্ম্মের অঙ্গ হয়ে উঠল। কয়েক দিনের মধ্যে কলিকাতায় পাঁচ হাজার অগ্নিকাণ্ড দিয়ে লঙ্কাকাণ্ড সুরু হ'ল। সে আগুন দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি। সমস্ত ভারত জুড়ে মানুষ পশুরও অধম হয়ে উঠল। ইংরেজ নিজের কৃতকার্য্যতায় মনে মনে নৃত্য করতে লাগল আর দুনিয়ার দরবারে আমাদের পশুত্বের কথা ভণ্ড হা-হুতাশে সোৎসাহে পেশ করতে লাগল। চার্চ্চিলের চর ওয়াভেল, দিল্লীতে বসে তাল নাড়ছিলেন, কলিকাতায় এসেও একদফা তাল নেড়ে গেলেন, কিন্তু বন্দুক-কামান-বোমা-বোমারুধারী ইংরেজ এই তাণ্ডবকে থামাতে পারলে না—থামতে দিলে না। কেননা তারা চাইছিল যে অবস্থা এমনই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক যে কংগ্রেসকেও বাধ্য হয়ে বলতে হয়, আচ্ছা, তাই সই, ভাগাভাগিই হোক। যাতে দু'জনে দু'জনের শত্রু হয়ে ওঠে আর দুই শত্রুতে চিরশত্রু হয়ে পাশাপাশি থেকে চিরদিন খেয়োখেয়ি করে এবং বৃটিশের মুরুব্বি-আনাটা বজায় থাকে।

মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মহাত্মাজী আশি বছরের বৃদ্ধ ভগ্নদেহ। তবু অতিমানুষিক বলে পদব্রজে বেরুলেন তিনি শান্তি অভিযানে—নোয়াখালিতে, বিহারে, দিল্লীতে। বললেন, থামাও প্রতিশোধ থামাও, নইলে প্রতিশোধের প্রতিশোধ তার প্রতিশোধ কোন কালেই থামবে না। ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি করে নিজেরাই মারা যাব। শত্রু হাসবে। পৃথিবীতে আমাদের চিরকলঙ্ক রয়ে যাবে। কেউ বাঁচবে না—থামাও প্রতিশোধ থামাও।

জবাহরলাল প্রমুখ নেতারা দেশের এই নিদারুণ অবস্থায় বিচলিত হয়ে ভাবলেন, আর ত চলে না, ভাইয়ে ভাইয়ে এই খুনাখুনি যদি ভাগাভাগিতে থামে তবে আপাতত তাই হোক। তার পর মুসলমান ভাইদের মাথা ঠাণ্ডা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এবারেও স্থিরপ্রজ্ঞ গান্ধীজী পই পই ক'রে বারণ করলেন কংগ্রেসকে—নিও না এই খণ্ডিত ভারত, এই দ্বি-জাতিরূপ মিথ্যা। কাটাকাটি তাতে থামবে না; বরং আরও নূতন নূতন এবং জটিলতর দুর্দ্দশার উদ্ভব হবে—তা সামাল দিতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। ষাট বছর যে অখণ্ডভারতের জন্যে লড়ে এসেছ, আরও অল্প সময় তার জন্যে যুদ্ধ কর, সহ্য কর, কাপুরুষের মত নিজের ধর্ম্মত্যাগ করে নিও না এই সর্ব্বনাশ হাত পেতে। ইংরেজ জগতের সামনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ১৯৪৮-এর জুনে ভারত ছাড়ার—এই ক'টা দিন অপেক্ষা কর। তাদের হাতের বণ্টন করা বিষপাত্র মুখে তুলো না, তুলো না। তারা যাক, তারপরে, উস্‌কে দেবার জন্যে পিছনে যখন ইংরেজ থাকবে না তখন আমরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেব। সাবধান, আরও সর্ব্বনাশ ডেকে এনো না।

কিন্তু শুনলে না কেউ তাঁর বুদ্ধির কথা। জবাহরলাল, প্যাটেল, আজাদ প্রভৃতি এই টুকুরো-স্বাধীনতাকে হাতছাড়া করতে পারলেন না। জবাহরলাল ত স্বপ্নে বিভোর—সব ঠিক হো জায়গা।

কিন্তু হায়! এই ছিন্ন ভারতের ঘৃণ্য-সমস্যার পাঁকে পড়ে তিনি হাবুডুবু খাচ্ছেন। চিৎকার করে পরিতাপের আর্ত্তনাদ উঠছে তাঁর গলায় 'হায় রে, স্বাধীন ভারত গড়ার স্বপ্ন আমার, এই খুনোখুনি, নারীহরণ, ধর্ম্মান্তরণ, পুনর্ব্বসতি, কাশ্মীর, জুনাগর, হায়দ্রাবাদের হাবড়ে পড়ে হা হতোস্মি বলে ডাক ছাড়ছে!'

কিন্তু শুধু পরিতাপ ও আর্ত্তনাদে কি দেবে তাঁকে? তাঁর

মত আর কাকে রাখলেন তিনি তাঁর সঙ্গে—এই দুরন্ত দুর্দ্দশার মধ্যেও যারা চরিত্রবলে চতুর্দ্দিকের সমস্তার বিরুদ্ধে, তাঁরই আদর্শ গড়ে তোলবার জন্যে, সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হবে? ধনপ্রাণ মান ভবিষ্যৎ সর্ব্বস্ব পণ করে যারা তাঁরই আহ্বানে অখণ্ডভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছিল। তিল তিল করে, ভোগসুখসম্পদসৌভাগ্য বিসর্জ্জন দিয়ে যারা মার খেয়েছে, জেলে পচেছে, মরতে ভয় পায় নি—আজ কোথায় রইল তারা পড়ে! তারা কি শুধু তাঁর মরণের সঙ্গী, বিপদের বন্ধু ছিল, সম্পদের কেউ নয়, জীবনের আহবে তাদের স্থান নেই? যারা প্রাণ দিয়ে, দিল্‌সে, হিম্মৎ নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে এগিয়ে চলতে সাহায্য করত, হায়, তাদের আজ মহারথীরা ভুললেন কেন? কোথা থেকে পাবেন আর তাঁরা আদর্শ জয় করার মত কর্ম্মী দেশের এই সর্বনাশের দিনে?

আজ স্বাধীনতার নামে পরাধীন ভারতের সেই চিরন্তন শোষণযন্ত্র তার সমস্ত প্যাঁচকলসমেত ভারতের বুকের উপর জাঁতানো হয়েছে এবং সেই ইংরেজ বুরোক্রেসির কলে তৈরি আর স্বার্থসর্ব্বস্ব দেশের বিশ্বাসঘাতী সমস্ত ভৃত্যকুলকেই ত তিনি নিজের তাঁবেদারীতে এবং দেশের খবরদারীতে যথাপূর্ব্বং বহাল করেছেন। চিরকাল যারা নিজের ক্ষুদ্রতম স্বার্থেও দেশকে শত্রুর চরণে বলি দিতে লজ্জা পায় নি আজ অকস্মাৎ এক দিনে তারা "পৈতে পুড়িয়ে সন্ন্যাসী" হয়ে যাবে! যে মুহূর্ত্তে দেশের সব চেয়ে বেশী করে দরকার স্বার্থত্যাগী, নির্লোভ, চরিত্রবান মানুষের, দেশকে গড়ে তোলার জন্যে, সেই অবস্থায় কাদের হাতে সব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? যারা ইংরেজ প্রভুকে চির-স্থায়ী করার চেষ্টায় দেশের মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে—মেরেছে, ধরেছে, খুন করেছে, গুলি করেছে, ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, জেলে পুরেছে, ফাঁসী দিয়েছে, সেই আই-সি-এস, সেই পুলিসের হাতে, সেই মিলিটারির হাতে—যাদের দিয়ে ইংরেজ ভারতবাসীর গলায় শিকল পরিয়ে রেখেছিল—অন্য দেশে স্বাধীনতা এলে প্রথমেই যাদের চরম শাস্তি দিত। দেশদ্রোহিতার অপরাধে শাস্তি পাওয়া দূরে থাক, পেল তারা আশাতীত পুরস্কার; তারাই আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হয়ে রইল; আর রইল তাদের বন্ধু কালোবাজারী মুনাফাখোর পেটমোটা ধনিকের দল—প্রথম গদিতে বসার উত্তেজনার মুখে, যাদের ফাঁসী দিতে চেয়েছিলেন জবাহরলালজী।

আত্মস্বার্থে দেশের সর্ব্বনাশ করতে যারা কোনোদিন কুণ্ঠিত হয় নি, আজও আত্মস্বার্থে তারা সে কাজে কখনই কুণ্ঠিত হবে না। এদের দিয়েই দেশের মঙ্গলসাধন, দুর্নীতি দমন, ভগ্ন-পতিত দেশের সংগঠন হবে? যে সরষেতে ভূত, সে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে? শিল্পে, বাণিজ্যে, শাসনে, রাষ্ট্রব্যাপারে দুর্নীতি যাদের স্বার্থে অভ্রভেদী হয়ে উঠল; সেই দুর্নীতি-পরায়ণরাই হ'ল দুর্নীতিদমনের অভিভাবক! এদের দ্বারাই জবাহরলালজী দুর্নীতি দূর করবেন? আজ কালোবাজার, ঘুষ, ঠকামি, জুয়াচুরিভরা নির্দ্দয় অর্থগৃধ্নুতা যেতেই পারে না এরা সব পূর্ব্বের ঘাঁটিতে বহাল থাকলে—এই পুলিস, এই আই-সি-এস, এই গণেরীরাম বাটপাড়িয়ার দল। অল্প কয়েকজন সজ্জন এদের মধ্যে আছেন এ দেখিয়ে কোন সান্ত্বনা আমাদের নাই। প্রচুর পরিমাণে সজ্জন নির্লোভ স্বার্থত্যাগী দেশপ্রেমিক মানুষ এই দুর্য্যোগে আমাদের বড় দরকার তা না হলে শুধু বক্তৃতার তোড়ে এ কায়েমী দুর্নীতি ভেসে যাবে না, যেতে পারে না। শুধু উপদেশে আর গলাবাজিতে কাজ হবে না, হতে পারে না। আর কার উপদেশই বা শুনবে লোকে? সর্ব্বত্যাগী মহাত্মা গান্ধী কেউ নন! লালচে পড়ে তাঁর কথাই বড় মেনেছে লোকে, তা অন্য কেউ।

জবাহরলাল আজ -জাঁতিকলে পা দিয়েছেন। এই বুরোক্রেসির কল এমনি কায়দায় তৈরি যে, "যে যায় লঙ্কায় সেই নাকি হয় রাবণ"। তাই ভয় হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর মানস পুত্র সিংহশিশু জবাহরলাল আজ আই-সি-এস-এর খাঁচাকলে পড়ে তাদের তোষামোদের অহিফেন প্রভাবে পাছে বা তিনি সার্কাসের সিংহ হয়ে দাঁড়ান—তাঁর চির-জীবনের ধর্ম্ম পাছে বিস্মৃত হন, ভারতবাসীর কাছে পাছে সত্য ভঙ্গের দায়িক হন, বাস্তব পরিস্থিতির অজুহাতে ভারতের গলায় শিকল দিয়ে আবার তাকে টেনে নিয়ে ব্রিটিশ-রাখালের গোয়ালভুক্ত না করেন! অতএব সাধু সাবধান! কাণ্ডারী, হুঁশিয়ার!

আজ কোথায় জবাহরলালের সেই পণ "অখণ্ডভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই—নইলে কিছুতেই নিরস্ত হব না।" যার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক সর্ব্বস্ব পণ করে তাঁর পিছনে ছুটেছিল। তাঁর নেতৃত্বে অবিচলিত বিশ্বাস নিয়ে ছুটেছিল তারা। আজ তাদের সেই বিশ্বাসের অন্ধি হয়ে তিনি জনতার হাতে এ কি স্বাধীনতা তুলে দিলেন? এর জন্যই জীবন পণ করেছিলেন তিনি এবং তাঁর সৈনিকের দল—করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে? না, কখনই না, এই বুরোক্রেসির অধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে জবাহরলালের ঝাণ্ডার তলে ছোটে নি তারা। জবাহরলালরা কয়েকজন ইংরেজের কয়েকটা উঁচু আসন দখল করে বসবেন এবং দেশের জনতার উপর চির-অত্যাচারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চুটিয়ে রাজত্ব করতে থাকবেন এমন কথা ছিল না। তাঁরা কয়েকজন হবেন পূর্ব্বভৃত্যকুলের প্রভু এবং জনতাকে রেখে দেবেন সেই তাঁবেদারকুলের শাসনের তলে এই পরমাশ্বাস দিয়েই কি জনতাকে স্বাধীনতা-যুদ্ধে তিনি নামিয়েছিলেন? এরই নাম

জনগণের স্বাধীনতা? "যথা পূর্ব্বং তথা পরং" "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে" এই যদি জনসাধারণের অবস্থা হয় তা হলে তারা কি দিয়ে অনুভব করবে যে তারা স্বাধীনতা পেয়েছে? তা যদি উপলব্ধি না করে তবে তারা স্বাধীন দেশের মানুষের মত ব্যবহার করবে কি ক'রে? দেশের সংগঠনে তারা অন্তরের সঙ্গে যোগ কি ক'রে দেবে? শুধুই গলাবাজির জোরে?

যে বিশ্বাসে জনতা এত দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে সে বিশ্বাস কাণ্ডারীর প্রতি বিশ্বাস, সে বিশ্বাস জনগণের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার আশ্বাসে বিশ্বাস। তাদের সে বিশ্বাস কাজে পরিণত না হলে তাদের শক্তি, তাদের বীর্য্য, তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযানের ইচ্ছাশক্তি, এক কথায় ইংরেজীতে যাকে বলে "morale" তা যে চূর্ণ হয়ে যাবে। এই জনতার ইচ্ছাশক্তি এবং ত্যাগের মূল্যেই না জবাহরলাল-জীরা আজ গদিতে বসেছেন? আজ তাঁর অনুগত দেশ-প্রেমিকদল তাঁদের সহকর্ম্মী হতে পারবে না—দেশের সৃষ্টি-কার্য্যে আনন্দে তারা যোগ দিতে পারবে না—দেবে তারা, যারা একদা আত্মস্বার্থে ব্রিটিশের কবলে দেশকে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে সমর্পণ করেছে। হা অদৃষ্ট! যারা বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি শুনে অল্পদিন আগেও খেঁকিয়ে তেড়ে এসেছে, জাতীয় পতাকাকে প্রতি মুহূর্ত্তে অপমান করেছে এবং বিজাতীয় পতাকার তলে গিয়ে পুচ্ছ আন্দোলন করেছে, দেশের এই সর্ব্বনাশের অবস্থা, এই চরম দুর্নীতির অবস্থা নিজ হাতে ঘটিয়ে, নির্লজ্জ আত্মপ্রসাদে যারা মশগুল হয়েছে, তারাই আজ জাতীয় পতাকার অভিভাবক! তারাই দেশের দুর্নীতিদমনের কর্তা! তাদেরই কপট কণ্ঠে আজ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি, রাতের বেলার শব-বাহী মাতালের বিকৃত "হরি-বোল" ধ্বনির মত নিনাদিত হচ্ছে! হায় রে দুর্ভাগা দেশ!

হবে না, কিছুতে হতে পারে না জনগণের স্বাধীনতা এই পথে, এই পদ্ধতিতে, যে পদ্ধতি সাম্রাজ্যবাদীদের কলে প্রস্তুত। এতে জনতার স্বাধীনতা, দেশের সকলের স্বাধীনতা আসবে না। এতে অল্প কয়েকজন সকলের উপর ব্যুরোক্রেসির চালে রাজত্ব করার সুযোগ পাবে মাত্র। এমনি করে জনতার বিশ্বাস ভাঙতে থাকলে বাঁচবে না ভারত।

কংগ্রেস নায়কদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, কংগ্রেসকে থাকতে হবে সর্ব্বাধিনায়ক হয়ে। সমস্ত শাসন তারই নির্দ্দেশে, তারই কর্তৃত্বে পরিচালিত হবে। তা না হয়ে কংগ্রেসের সেরা মাথাগুলি যদি চাকরী নিয়ে গিয়ে গদিতে বসেন তা হলে বাকি কংগ্রেস স্বভাবতই তাদের পরিচালক না হয়ে, তাদের পরিচারক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। ব্রিটিশ যদি লীগ আর কংগ্রেসের হাতে ভারতকে ছেড়ে দিয়ে গিয়ে থাকে তা হলে কংগ্রেসের আইন-সঙ্গত পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত শাসন-নিয়ন্ত্রণে। তা না হলে, ব্রিটিশ গঠিত শাসন-ব্যবস্থার চক্রে যারা চাকরী নেবে দুর্নীতি-দমনে, বিপদ-বারণে, তাদের অসহায়তা থেকে রক্ষা করা কারও সম্ভব হবে না, এবং দেশ সেই শাসন-ব্যবস্থায় মকর-সঙ্কুল কাল-হ্রদে ডুবে মরবে, অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে তাই চোখে দেখতে হবে।

কাণ্ডারীর উপর জনতার যে অখণ্ড বিশ্বাস তা ভেঙে গেলে নির্বীর্য্য হয়ে পড়বে জনতা; তাদের হৃদয় ভেঙে গিয়ে হিম্মৎ ধুলোয় লুটোবে। জনতার প্রীতি ও শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত জবাহর এক দিন দেখতে পাবেন যে তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। কেননা, সেই জনতার শক্তিই না তাঁর শক্তি?

হায়! জবাহরলালজী জনতার নায়কত্ব ছেড়ে কেন এ চাকরি নিতে গেলেন? জননায়ক জবাহরলালের চাকরি করা মানে কি নিজের ধর্ম্ম নষ্ট করা নয়? নেমে আসুন তিনি মেকী স্বাধীনতার তকমা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, দৃঢ় প্রত্যয়ে জনতার মধ্যে। নেমে আসুন তিনি পূর্ণ-স্বাধীনতালাভের সংগ্রামে—পূর্ণ করুন তাঁর পণ। 'তখ্‌তে' বসে নিজকে নিঃসহায় না মনে করে তিনি জনতার ক্ষেত্রে নেমে এসে তাদের নতুন করে চালনা করুন অভীষ্ট সিদ্ধির অভিমুখে। দেখবেন চল্লিশ কোটি হৃদয়ের প্রীতির রসায়নে তিনি আজও অমিত-বল, অজেয়।

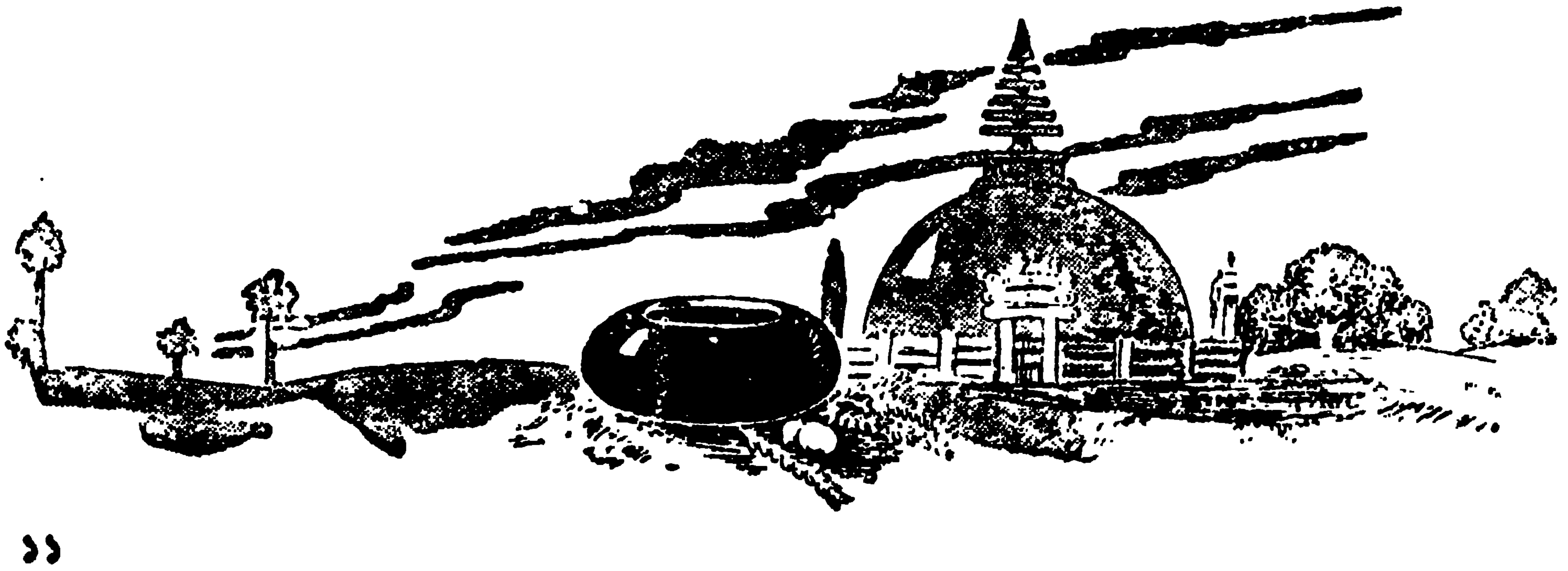

ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাস

শ্রীকস্তুরচাঁদ লালুয়ানী

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে মুদ্রার মূল্যহ্রাস গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিছুদিন আগে ফ্রাঙ্কের যে মূল্যহ্রাস করা হয়েছে তাতে করে দ্বিতীয় বার কয়েকটি জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এবং তার ফলে এই প্রসঙ্গ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনাও চলেছে। তাই ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাসের তাৎপর্য্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলার আগে মুদ্রার মূল্যহ্রাস বিষয়ে দু-এক কথা বলা দরকার। মুদ্রার মূল্য দুই প্রকার—অন্তর্মূল্য এবং বহির্মূল্য। মুদ্রার অন্তর্মূল্য বলতে আমরা টাকার আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির কথা বুঝি, যেমন—এক টাকার বিনিময়ে আমরা কতটুকু চাল, কাপড় বা অন্যান্য সামগ্রী নিজের দেশে পেতে পারি। মুদ্রার বহির্মূল্য বলতে আমরা বুঝি এক টাকার পরিবর্ত্তে আমরা কি পরিমাণ সামগ্রী বিদেশ থেকে আনতে পারব। স্বদেশে আমরা যে সকল দ্রব্যসামগ্রী কিনি তার বেলায় কোন জটিলতার উদ্ভব হয় না; কারণ টাকার বদলে আমরা সহজেই সেগুলো কিনতে পারি। কিন্তু যখনই আমাদের বিদেশী পণ্যদ্রব্য কিনতে হয় তখন প্রথমে নির্দ্দিষ্ট বিনিময়হার অনুসারে টাকাকে রূপান্তরিত করতে হয় সেই দেশের মুদ্রায় এবং সেই বিদেশী মুদ্রা দিয়ে কিনতে হয় সেই দেশের দ্রব্যসামগ্রী। এই ভাবে যে ডলার, ষ্টার্লিং বা অন্য বিদেশী মুদ্রায় টাকার রূপান্তর হয় এবং সেই বিদেশী মুদ্রার রূপান্তর হয় বিদেশী দ্রব্যসামগ্রীতে তাতেই যত রকম জটিলতার সৃষ্টি হয়। যত দিন বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল এবং বিভিন্ন দেশের দ্রব্যমূল্য পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ছিল তত দিন কোন অসুবিধাই হয় নি। কারণ স্বর্ণমানের স্বয়ং সামঞ্জস্যশীল বিধানে বিভিন্ন দেশের আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা মোটামুটি বজায় থাকত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্বর্ণমান ভেঙে পড়ল। তাই বিভিন্নদেশের দ্রব্যমূল্যের পারস্পরিক সম্বন্ধেরও অবসান ঘটল। যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলার জের চলল যুদ্ধেরও পর পর্য্যন্ত। এইভাবে অর্থনৈতিক কারণে অথবা ভ্রান্তমুদ্রানীতির ফলে কোন কোন দেশের দ্রব্যমূল্য বর্দ্ধিত হ'ল এবং কোন কোন দেশের দ্রব্যমূল্য হ'ল আনুপাতিক ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত। এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রবল বিপর্য্যয় উপস্থিত হ'ল। যেসব দেশের দ্রব্যমূল্য কম তারা আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে রইল আর অবস্থাগতিকে যে সব দেশে মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল দুনিয়ার বাজারে তাদের ঠাঁই মেলা মুশকিল হয়ে পড়ল। যেমন—মনে করা যাক, ১৯১৩ সনে এক টাকার বিনিময়-মূল্য ছিল এক শিলিং ছয় পেন্স, তখন পাঁচ টাকায় বা সাড়ে সাত শিলিঙে 'ক' সংখ্যক দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যেত। যুদ্ধের ফলে ১৯২০ সনে দ্রব্যমূল্য হ'ল দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৫ শিলিং। টাকা ষ্টার্লিং বিনিময়-হারে যদি কোন পার্থক্য না ঘটে তা হলে ১৯২০ সনে সেই 'ক' সংখ্যক দ্রব্যসামগ্রী কিনতে লাগবে দশ টাকা, অর্থাৎ যুদ্ধ-পূর্ব্ব মূল্যের দ্বিগুণ। অন্য দেশের সেই দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যে যদি বিশেষ পরিবর্ত্তন না হয়ে থাকে তা হলে ইংলণ্ডের পক্ষে দুনিয়ার বাজারে টিকে থাকা কঠিন। এই অবস্থায় ইংলণ্ডকে দ্রব্যমূল্য এমন ভাবে কমাতে হবে যাতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সে টিকে থাকতে পারে। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উৎপাদন কার্য্যে সাহায্যকারীদের পারিশ্রমিক এত অপরিবর্ত্তনশীল হয়ে উঠল যে, খরচা কমান হয়ে দাঁড়াল অসম্ভব। এ অবস্থায় যদি উৎপাদনের খরচাই না কমে তা হলে দ্রব্যমূল্য কমান যাবে কি করে? অতএব ইংলণ্ডকে যদি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে টিকে থাকতে হয় তা হলে ষ্টার্লিঙের মূল্যকে আধাআধি কমিয়ে দিতে হবে এবং উপরের হারের নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্ত্তন করতে হবে:—

১৯১৩ সনে টাকা ষ্টার্লিং বিনিময়হার ১৲=১ শিঃ ৬ পেঃ; ক সংখ্যক সামগ্রীর মূল্য সাড়ে সাত শিঃ বা পাঁচ টাকা।

১৯২০ সনে টাকা ষ্টার্লিং বিনিময়হার ১৲=১ শিঃ ৬ পেঃ; ক সংখ্যক দ্রব্যের মূল্য ১৫ শিঃ বা ১০৲ টাকা।

এই অবস্থায় যদি বাজারে টিকে থাকতে হয় তা হ'লে যে ভাবেই হোক মূল্য ১৫ শিলিং হতে দেওয়া উচিত হবে না; মূল্যকে রাখতে হবে সাড়ে সাত শিলিঙে। তা হলে যুদ্ধ-পূর্ব্ব ৫৲ টাকার দ্রব্যসামগ্রী ৫৲ টাকাতেই পাওয়া যাবে। কিন্তু আগেই বলেছি যে, দ্রব্যমূল্যহ্রাস কোনমতেই সম্ভবপর নয়; অতএব দ্রব্যমূল্য স্থির রেখে টাকা ষ্টার্লিং বিনিময়-হারেই উপযুক্ত পরিবর্ত্তন করা দরকার। এই পরিবর্ত্তন হবে নিম্নলিখিত প্রকার:—

টাকা ষ্টার্লিং বিনিময় হার যদি ১৲=৩ শিঃ বা ৷০ আনা =১ শিঃ ৬ পেন্স হিসাবে বেঁধে দেওয়া হয় তা হলে ১৫ শিঃ-এর ক সংখ্যক দ্রব্য মূল্য দাঁড়াবে টাকার হিসাবে ৫৲ টাকা বা যুদ্ধ-পূর্ব্ব মূল্যেরই সমান।

অর্থাৎ বিদেশে যুদ্ধ-পূর্ব্ব মূল্য বজায় রাখা সম্ভবপর হচ্ছে মুদ্রার মূল্যহ্রাস করে, বিদেশী মুদ্রার অনুপাতে দেশের মুদ্রাকে সস্তা করে দিয়ে। এই হ'ল মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাসের তাৎপর্য্য। মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস যদি ঠিকমত কাজ করে,

অর্থাৎ একে যদি ঠিকমত কার্য্যকরী হতে দেওয়া হয় তা হলে এতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসামঞ্জস্য ত দূর হবেই, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতাও আসতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা হয় না। এক দেশের মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেশগুলোও আপন আপন মুদ্রার বহির্মূল্য কমিয়ে দিতে আরম্ভ করেন। এই প্রতিযোগিতায় মুদ্রাহ্রাসের যেসব সুবিধা আছে তা উবে যায় এবং তার জায়গায় এসে পড়ে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, সংরক্ষণমূলক নীতি ইত্যাদি। ১৯২৯-৩৭ সনে পৃথিবীব্যাপী মহাসঙ্কটের আবির্ভাবে প্রত্যেকটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অনেকখানি অসামঞ্জস্য দেখা দিলে। এই অসামঞ্জস্যের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশই মুদ্রার মূল্য হ্রাস করে। ১৯৩১ সনে ষ্টার্লিঙের বহির্মূল্য হ্রাস থেকে এর সূচনা হয়। ইংলণ্ডে এই মূল্যহ্রাসের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল দুটি। প্রথম, যুদ্ধ-পূর্ব্ব মূল্য বজায় রাখায় পাউণ্ডের যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছিল তা দূর করা; এবং দ্বিতীয় রপ্তানী বাড়ান। পাউণ্ডের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় ১৯২৪ সনের পর থেকে ইংলণ্ডের রপ্তানী-বাণিজ্য কমে যায়; ফলে, বিদেশে ইংলণ্ডের যে পুঁজি খাটছিল তার কিছু কিছু উঠিয়ে আনতে সে বাধ্য হয়। ষ্টার্লিঙের মূল্যহ্রাসের পরই ঘটল ডলারের মূল্যহ্রাস; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইংলণ্ডের মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পিছনে যেমন এক বিরাট অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পিছনে তা ছিল না। তাই এদেশের মুদ্রার মূল্যহ্রাস নিছক প্রতিযোগিতামূলক। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা মূল্যাবনতির ফলে ফ্রান্স এবং স্বর্ণমান-প্রতিষ্ঠিত দেশসমূহের মুদ্রার মূল্য আনুপাতিকভাবে বেশী হয়ে পড়ল। তাই অবশেষে ফ্রান্সকেও ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাস করতে হ'ল। এই যে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা এতে কারও সুবিধা হয় না বরং সবারই ক্ষতি হয়। কতকটা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার মত। বাজারে যদি একজন দোকানদার সস্তায় জিনিষ বিক্রি করে তা হলে তার বিক্রয়ের পরিমাণ হবে বেশী; কিন্তু সবাই যদি মূল্য কমিয়ে দেয় তা হলে কোন বিক্রেতারই কিছুমাত্র সুবিধা হবে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এ ধরণের ব্যাপারই ঘটে।

২

বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বহির্মূল্যের মধ্যে অসামঞ্জস্যের ফলে বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কটের পর সারা পৃথিবী জুড়ে যে এক বিরাট অনিশ্চয়তার উদ্ভব হয় তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হতে পারে সেজন্য দ্বিতীয় মহাসমর শেষ হবার আগেই বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিবিশারদগণ সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার এই চেষ্টার ফল। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্যেরা এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁরা দেশী-বিদেশী মুদ্রা-বিনিময়-হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখবেন। এ ব্যাপারে যাতে কোন প্রকার প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয় সে বিষয়েও তাঁরা মনোযোগী থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে যদি কোন দেশের মুদ্রার বহির্মূল্য পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক হয়ে ওঠে তা হলে সেদেশ মুদ্রাভাণ্ডারের পরামর্শ অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রত্যেকটি সদস্যদলভুক্ত দেশকেই কিয়ৎপরিমাণ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বুঝাপড়া হয়েছে যে, এই স্বাতন্ত্র্যের কোন প্রকার অপব্যবহার করা চলবে না যাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যাহত হতে পারে। যদি কোন সদস্য এর বিরোধিতা করেন তা হলে মুদ্রাভাণ্ডার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন এবং প্রয়োজন হলে সেই দেশকে সদস্যপদ থেকে বরখাস্ত করবেন।

ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাস বর্ত্তমান সময়ের মুদ্রা-বিনিময়-হার বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে পাউণ্ডের সঙ্গে ফ্রাঙ্কের বিনিময়-হার ছিল ১ পাউণ্ড=১৭৬·৭০ ফ্রাঙ্ক। জার্ম্মানীর কবল থেকে মুক্তি পাবার পর এই বিনিময়-হার হ'ল ১ পাউণ্ড=২০০ ফ্রাঙ্ক। এই অবস্থাই চলল ১৯৪৫ সালের শেষ পর্য্যন্ত। এই সময় সরকারীভাবে ফ্রাঙ্কের যে মূল্য হ্রাস করা হয় তার ফলে দাঁড়াল ১ পাউণ্ড=৪৮০ ফ্রাঙ্ক। গত জানুয়ারী মাসে সরকারীভাবে দ্বিতীয় বার ফ্রাঙ্কের বহির্মূল্যের যে পরিবর্ত্তন করা হয়েছে তার ফলে বিনিময়-হার হয়েছে নিম্নলিখিত প্রকার :—

	১ পাউণ্ড=৮৬৪ ফ্রাঙ্ক।
	১ ডলার=২১৪·৩৯২ ফ্রাঙ্ক।
স্পেনের	১ পেসেতা=১০·৯৫৮ ফ্রাঙ্ক।
ফরাসী	১ টাকা=৬৪·৮০ ফ্রাঙ্ক।

ফ্রান্স শুধু ফ্রাঙ্কের মূল্য হ্রাস করেই ক্ষান্ত হয় নি; সেই সেই সঙ্গে ফ্রাঙ্কের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এক খোলা বাজার প্রতিষ্ঠিত করবার সিদ্ধান্তও জ্ঞাপন করেছে। প্যারিসের টাকার বাজারের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে এই নূতন বাজার কাজ করবে এবং এই বাজারে মুদ্রার বিনিময়-হার নির্দ্ধারিত হবে চাহিদা ও সরবরাহ অনুযায়ী। এই বাজারে মার্কিন ডলার এবং অন্য কয়েকটি মুদ্রা, যাদের সহজেই ডলারে রূপান্তরিত করা চলে সেগুলোর কেনা-বেচা চলবে দৈনিক বিনিময়-হার অনুসারে। অবশ্য এই বিনিময়-হার নির্ভর করবে চাহিদা ও সরবরাহের উপর। অতএব সরকারী বিনিময়-হার থেকে খোলা বাজারের এই বিনিময়-হার পৃথক হয়ে পড়বে। ফ্রান্সের রপ্তানীকারিগণ তাঁদের রপ্তানী-দ্রব্যের মূল্য হিসাবে যে সব বিদেশী মুদ্রা পাবেন তার অর্দ্ধেক দিতে হবে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে সরকারী বিনিময়-হার অনুসারে--বাকি অর্দ্ধেক তাঁরা খোলা বাজারে

বৈদেশিক বিনিময়-হার অনুসারে বিক্রি করতে পারবেন। আমদানীকারিগণ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী টাকা খোলা বাজারে কিনতে পারবেন। এ ছাড়া খোলা বাজারে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলিও সম্পন্ন হবে:—ভ্রমণকারীদের মুদ্রা পরিবর্ত্তন, মূলধন স্থানান্তর, ব্যক্তিগত ভাবে মুদ্রা প্রেরণ ইত্যাদি।

এই ধরণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন কতকটা অপরিহার্য্যও হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের ফলে ফরাসী দেশের রাজস্ব-ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতিতে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হয়ে যায়। মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের জন্য যে সব কর ধার্য্য করা হয় এবং যে-সকল মুদ্রাবিষয়ক ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাতে অবস্থা আরও জটিল হয়ে ওঠে। এ ছাড়া দীর্ঘদিন স্থায়ী শ্রমিক ধর্ম্মঘট, উৎপাদন হ্রাস, করভার বৃদ্ধি এবং পারিশ্রমিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার দরুন ফ্রান্সে উৎপাদন-বিষয়ক খরচ অনেক গুণ বেড়ে যায়। এতে ফ্রান্সের পক্ষে বিদেশী বাজারে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। রপ্তানীর পরিমাণ বাড়ান ত দূরের কথা, যুদ্ধের আগে ফ্রান্সের রপ্তানী-বাণিজ্য যা ছিল যুদ্ধের পর সেটুকু ফিরে পাওয়ার আশাও সুদূর-পরাহত হয়ে উঠল। ফ্রান্স থেকে যুদ্ধের আগে যে সব জিনিষ রপ্তানী হ'ত তাদের অধিকাংশই বিলাস-সামগ্রী। যুদ্ধোত্তর কালে এদের চাহিদা অসম্ভবরকম কমে যাওয়ায় অন্যান্য দেশের তুলনায় ফ্রান্সের সঙ্কট হ'ল আরও জটিল। তা ছাড়া যুদ্ধের দরুন ফ্রান্সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের খরচ অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় বিদেশী ভ্রমণকারীদের সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। এতেও ফ্রান্সের আয়ে যথেষ্ট ঘাটতি পড়েছে। সর্ব্বোপরি, ফ্রান্সে বিদেশী মুদ্রার চোরাবাজার যে ভাবে গড়ে উঠেছিল তাতে সরকারী মুদ্রা-বিনিময়-হারের গুরুত্ব অনেকখানি কমে যায়। এই সব কারণে ফ্রাঙ্কের বহির্মূল্য পুনর্বিবেচনা করা ফরাসী সরকারের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য হয়ে উঠল।

এই অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই ফ্রান্স উপরি-উক্ত ব্যবস্থা দুটি গ্রহণ করে। এগুলির উদ্দেশ্য হ'ল রপ্তানী বাড়ান, আমদানী কমান এবং এই ভাবে দেশে নিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং ব্যবসায়ক্ষেত্রে যে সব অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছিল তা দূর করা। খোলা বাজার প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য হ'ল দেশের লুকানো সোনা এবং বিদেশী টাকাকে আকর্ষণ করা এবং এই ভাবে ফ্রাঙ্কের বহির্মূল্যকে যথাযথভাবে নির্দ্ধারিত করা। অবশ্য এই সমস্ত উদ্দেশ্য কতখানি সফল হবে সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ আছে। মঁসিয়ে ব্লুমের কথায়, "যত দিন ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাস চলতে থাকবে তত দিন ফাটকা-বাজেরা আত্মপ্রকাশ করবে বলে মনে হয় না। এই মূল্য নিম্নতম স্তরে নেমে না আসা পর্য্যন্ত তারা অপেক্ষা করে দেখবে।" এই যুক্তিতে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কারণ আজও ফ্রাঙ্ক মূল্যাবনতির সর্ব্বশেষ স্তরে এসে পৌঁছয় নি, ১৯৪৫ সনে এর যা মূল্য ছিল ১৯৪৮ সনে তা হয়ে পড়েছে তদপেক্ষা অনেক কম। ভবিষ্যতে যে এর মূল্য আরও কমবে না এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে ফরাসী সরকার গত জানুয়ারী মাসে যে স্তরে ফ্রাঙ্কের বহির্মূল্য বেঁধে দিয়েছেন তা বজায় রাখা সম্ভব হবে বলেই তাঁরা আশা করেন এবং ভবিষ্যতে খোলা বাজারের সহায়তায় ফ্রাঙ্কের বহির্মূল্য পুনরায় গড়ে তোলা এঁদের উদ্দেশ্য।

এই ভাবে ফ্রাঙ্কের দুইটি বহির্মূল্য নির্দ্ধারিত হয়েছে—একটি সরকারী এবং অপরটি খোলা বাজারের। এতে বাইরের দেশগুলিতে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তার আশঙ্কায় সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছেন। ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাসের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করেছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে একটা খোলা বাজার প্রতিষ্ঠা করার যুক্তি অনেকেই সমর্থন করতে পারেন নি। এবিষয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষ নিম্নলিখিত মতামত প্রকাশ করেছেন:—

"এ বিষয়ে মুদ্রাকোষ অবাস্তব কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করতে চান না, বিশেষ করে বর্ত্তমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তা সমীচীন নয়। মুদ্রাবিনিময় হার বিষয়ে যদিও মুদ্রাকোষের সিদ্ধান্তগুলি প্রায় অপরিবর্ত্তনীয় তথাপি ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা দৃষ্টে তাঁরা যথাসম্ভব কার্য্যকরী পন্থা নির্দ্দেশের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে মুদ্রাকোষ খোলাবাজার প্রতিষ্ঠা বা রপ্তানী-বাণিজ্যে প্রাপ্ত বিদেশী মুদ্রাকে সে বাজারে চালু করার পক্ষে যুক্তি দিতে পারেন না। কারণ এতে এক দিকে যেমন ফ্রান্সের বাণিজ্যিক স্বার্থ সিদ্ধ হওয়ার আশা নেই অন্য দিকে তেমনি মুদ্রাকোষের অন্যান্য সদস্যদের উপর এর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বলেই মনে হয়।

মুদ্রাকোষের কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে, যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে অন্যান্য দেশের মুদ্রার বহির্মূল্য যখন অপরিবর্ত্তিত আছে তখন যে-কোন একটি অঞ্চলের উপর কোনো দেশ প্রতিযোগিতামূলক মূল্যহ্রাস চাপিয়ে দিতে পারে। যে দেশ এই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করবে সেই দেশ যদি বাণিজ্যপ্রধান হয় তা হলে তার বাণিজ্য-ব্যবস্থায় বিপর্য্যয় ঘটবার সম্ভাবনা আছে এবং তাতে করে অন্যান্য দেশের মুদ্রার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অনেকে শঙ্কিত হয়ে উঠবেন; কারণ অন্তত সেই দেশের খোলা বাজারে সেই সব মুদ্রার মূল্য স্থির ভাবে না থাকার জন্য এইরূপ অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে।

মুদ্রাকোষের কর্ত্তৃপক্ষ আরও মনে করেন যে, অন্যান্য দেশেও যদি অনুরূপ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় তা হলে মুদ্রা-বিনিময়-হারে এসে পড়বে এক বিরাট অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা এবং এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে এর সভ্যশ্রেণীভুক্ত

প্রত্যেক দেশকেই দুর্গতি ভোগ করতে হবে। যদিও ফ্রাঙ্কের অবস্থা এখন জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে তথাপি সহযোগিতার ভিতর দিয়ে যদি বিনিময়-হার স্থির করা হয় তা হলে সকল দেশের পক্ষে সেটিই হবে সব চেয়ে কল্যাণপ্রদ ব্যবস্থা।

ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাসে ইংলণ্ড এবং আমেরিকাও গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। ইংলণ্ডে অনেকেই আশঙ্কা করেন যে, ফ্রান্সের খোলা বাজারে যদি সস্তায় ষ্টার্লিং পাওয়া যায় তা হলে বিদেশীয়েরা সেই ষ্টার্লিং কিনে নেবে এবং তাতে ইংলণ্ডের রপ্তানী-বাণিজ্য গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে ইউরোপের পুনর্গঠন-কার্য্যেও অন্তরায় উপস্থিত হতে পারে। তা ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশও নিজ নিজ দেশের মুদ্রার বিনিময়মূল্য কমাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতে পারে। যদি তাই হয়, এবিষয়ে যদি প্রতিযোগিতা সুরু হয় তা হলে তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পক্ষে তো ক্ষতিকর হবেই, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষের ভবিষ্যৎও তমসাচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। ফরাসী কর্তৃপক্ষ অবশ্য একথা স্বীকার করেছেন যে, উল্লিখিত ব্যবস্থা বরাবরের জন্য গ্রহণ করা হয় নি। ফ্রাঙ্কের মূল্য স্থির অবস্থায় এলেই এই ব্যবস্থা পরিহার করা হবে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, বর্ত্তমানে আমরা যে পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে চলেছি তাতে সময়ের গুরুত্ব খুবই বেশী। বর্ত্তমান সময়ে যে ব্যবস্থায় কিছুমাত্র অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী এবং ভবিষ্যৎও তাতে অনিশ্চয়তাপূর্ণ হয়ে উঠবে। অবশ্য আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষ বা ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু এক একটি দেশ যদি এ ভাবে স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে থাকে তা হলে তাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হবে।

ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাসে আমাদের বহির্বাণিজ্যে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করবে বলে মনে হয় না। কারণ যুদ্ধের আগে আমরা ফ্রান্সে রপ্তানী করতাম তুলা, তৈলবীজ ও কফি এবং সেখান থেকে আমদানী করতাম বিবিধ বিলাস-সামগ্রী। বর্ত্তমানে দেশেই তুলা এবং তৈলবীজের প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে সম্প্রতি এগুলির রপ্তানীর প্রসঙ্গই ওঠে না। ওদিকে আমরা বিলাস-সামগ্রীর আমদানী প্রায় বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা আমরা নাড়াচাড়া করতে পারি, অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এ অবস্থায় বিলাসের সামগ্রী আমদানী করা চলতে পারে না। তবে ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাসে আমাদেরও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া উচিত। একথা সকলেরই জানা আছে যে, যখন পৃথিবীব্যাপী মহাসঙ্কটের পর দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি দেশই নিজ নিজ মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস করেছিল, ভারতের টাকার মূল্য তখনও প্রায় যথাপূর্ব্বংই ছিল। প্রায় বলছি এইজন্যে যে, টাকার মূল্য যেটুকু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল তা ষ্টার্লিঙের সঙ্গে এর যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার দরুন। ভারতের জনমত দাবী করেছে ১৲ টাকাকে ১ শিলিং ৪ পেন্সের সমান করার জন্য; সে জায়গায় সরকার স্থির করলেন ১ শিলিং ৬ পেন্স হারে। তার পরে কত পরিবর্ত্তনই না হয়েছে। ডলার ও ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাস হয়েছে; যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পৃথিবীব্যাপী একটা বিরাট ওলটপালট দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের বিনিময়-হার আজও ঠিক আছে। ফ্রান্সের ন্যায় আমাদের দেশেও মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বহুগুণ বেড়েছে, এমতাবস্থায় দেশের শিল্প-প্রসারের জন্য আমাদেরও রপ্তানী এবং আমাদানী বাণিজ্যকে অবহেলা করলে চলবে না। তাই বলছি এই পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতি অনুসারে টাকার বহির্মূল্যেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। অবশ্য আমরা এমন কোন পরিবর্ত্তনের কথা বলছি না যাতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় অথবা আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষের সম্মান ও প্রতিপত্তির হানি হয়। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করতে গিয়ে আমরা নিজেদের ভবিষ্যৎকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে পারি না। তা ছাড়া ভারত শিল্পবাণিজ্যে আজও অনগ্রসর দেশ। এ কারণে আমরা সরকারী সহানুভূতি পাবার অধিকারী। এ অবস্থায় বর্ত্তমান পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা টাকার বিনিময় হারকে কিছুতেই ১৲= ১ শিলিঙের বেশী করতে পারি না। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ আজও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট। যদি অদূর ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয় তা হলে যুদ্ধের সময় চরম স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়ে আমরা যে সব বাজার বিদেশে গড়ে তুলেছি তা অচিরেই হারাতে হবে। এই ভাবে যদি আমরা নিজেদের রপ্তানী-বাণিজ্য নষ্ট করে ফেলি তা হলে বিদেশ থেকে পণ্যদ্রব্য আমদানী করবার টাকাই বা পাব কোথা থেকে? এইজন্য আমাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্বন্ধে জাতীয় সরকারের অবিলম্বে সচেতন হওয়া উচিত। শিল্পের অগ্রগতি এবং আমাদের আর্থিক ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া বা না হওয়ার উপর।

নাইলন

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

মনুষ্যসমাজে বস্ত্র প্রচলনের ইতিবৃত্ত মনুষ্যসভ্যতার ইতিহাসের মতই পুরাতন। মহেঞ্জোদরোতে যে কার্পাসবস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা যীশুখৃষ্টের জন্মেরও তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার বলিয়া অনুমিত হয়। যদিও প্রাচীন মনুষ্যসমাজ তাহাদের বস্ত্রের নিমিত্ত প্রকৃতির অফুরন্ত দানেরই মুখাপেক্ষী ছিল তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের বস্ত্রবয়ন-প্রণালী কম উন্নত ধরণের ছিল না। বিভিন্ন দেশের প্রাচীনতম ইতিহাসের যে সামান্য অংশ আমাদের কাছে উন্মুক্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, তদানীন্তন মনুষ্যগণ তিন প্রকার প্রাকৃতিক আঁশ বা তজ্জাতীয় পদার্থসাহায্যেই তাহাদের বস্ত্র সমস্যার সমাধান করিয়াছে—উদ্ভিজ্জ আঁশ, তুলা ও প্রাণীজ আঁশ, রেশম ও পশম। ন্যূনপক্ষে তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া বস্ত্রের নিমিত্ত এই তিন প্রকার আঁশেরই ব্যবহার চলিয়াছে। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে আরও অনেক প্রকার উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ আঁশের প্রচলন হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই সর্ব্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে আঁশ প্রস্তুত করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হয়। কৃত্রিম রেশম বা রেয়নই হইল এই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম আঁশ। তৎপর নানাভাবে কৃত্রিম আঁশ প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানকালে বহুপ্রকার কৃত্রিম আঁশ জগতের বস্ত্রসমস্যার সমাধানকল্পে বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

কৃত্রিমভাবে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিবার সময় বৈজ্ঞানিক-গণকে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়—তন্মধ্যে প্রস্তুত করিবার মূলবস্তুগুলি যাহাতে সহজলভ্য হয় এবং প্রস্তুত-প্রণালী যাহাতে ব্যয়বহুল না হয়। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বস্ত্রপ্রদানকারী আঁশের মধ্যে রেয়ন প্রস্তুতে এই সমস্ত গুণই কমবেশী রহিয়াছে বটে, কিন্তু আমরা এখানে যে নাইলন সম্বন্ধে আলোচনা করিব তাহার প্রস্তুতির মধ্যেও উপরোক্ত সুবিধাগুলি বিশেষভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন কোন বিষয়ে নাইলন কৃত্রিম রেশম অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেমন কৃত্রিম রেশম প্রাকৃতিক রেশমকে সকল দিক দিয়া অতিক্রম করিয়াছে তদ্রূপ অদূর ভবিষ্যতে নাইলন ব্যবহারও প্রাকৃতিক পশমকে অতিক্রম করিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, কৃত্রিম-ভাবে রেশম তৈয়ারীর প্রধান কথা হইল মাত্র উদ্ভিদরাজ্যের সেলুলোজের আণবিক গঠনবিধি পরিবর্ত্তন করা; কিন্তু নাইলনের বেলায় এরকম কোন নীতি অনুসৃত হয় না। এই প্রকারে কৃত্রিম আঁশ বলিতে নাইলনই হইল সর্ব্বপ্রথম আঁশ যাহা প্রস্তুত করিতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্ম্মী মূল পদার্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। নাইলন আবিষ্কারের ইতিহাস বিশেষ চমকপ্রদ।

১৯২৭ সন হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ডু পঁ দ্য নেমুর (du pont de nemour) কোম্পানীর কেরোথার (carother) এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ সরল প্রাকৃতিক পদার্থ সাহায্যে কি করিয়া জটিল পদার্থের সৃষ্টি করা যায় তাহার চেষ্টা করিতে থাকেন। প্রাকৃতিক পদার্থের গঠনবিধি সম্বন্ধে গবেষণা চালাইয়া কৃতকার্য্য হইবার পর তাঁহারা কয়লা, জল ও বায়ুর সংমিশ্রণে জটিল অণু সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পান এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর ব্যয় করিয়া ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে নাইলন নামে এক প্রকার কৃত্রিম সূতার আঁশ তৈয়ারী করেন। নাইলনের ভিতর অঙ্গার, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন বিশেষভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। ১৯৩৯ সনের শেষের দিকে প্রচুর পরিমাণে নাইলন প্রস্তুত করিবার জন্য কলকারখানা স্থাপিত হয় এবং ১৯৪০ সনের মে মাসে সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত নাইলন মোজা বাজারে বাহির হয়। ১৯৪১ সনে ভার্জ্জিনিয়ায় আর একটি কল স্থাপিত হয়। ঐ স্থানে বৎসরে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড নাইলন সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৯৪১ ও ১৯৪২ সনে বৃটেনেও দুইটি কল স্থাপিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক রেশম, পশম ও চুলের ন্যায় নাইলন হইল একটি প্রোটিন জাতীয় পদার্থ, যদিও উহাদের কোনটির সঙ্গেই নাইলনের সাদৃশ্য তত বেশী নয়। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, নাইলন হইল প্রকৃতির অনুকরণে প্রস্তুত প্রোটিন ঘটিত এক বিশেষ গুণসম্পন্ন পদার্থ। নাইলন নামটিও প্রয়োগ করা হইয়াছে ব্যাপক অর্থে, যেমন হইয়াছে কাচ, প্লাষ্টিক প্রভৃতির। নাইলন নানা আকারে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, গুঁড়ার আকারে, দ্রবণ আকারে, সূতার আকারে প্রভৃতি। এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রায় চারি শত প্রকারের নাইলন প্রস্তুত হইয়াছে।

যদিও অঙ্গার, জল ও বায়ুর সাহায্যেই নাইলন প্রস্তুত করা হয় তথাপি ইহার প্রস্তুত প্রণালী বিশেষ ভাবেই জটিল এবং বহুপ্রকার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইয়া থাকে। জটিল রাসায়নিক ক্রিয়াদি এবং যন্ত্রপাতির বিস্তৃত বিবরণ রাসায়নিক এবং নাইলন-বিশেষজ্ঞদের এলাকাভুক্ত। এখানে মোটামুটি কি ভাবে জল, বায়ু এবং অঙ্গারকে নাইলনে রূপান্তরিত করা হয় তাহা

সংক্ষেপে বলা হইতেছে। বায়ুমধ্যস্থ নাইট্রোজেন গ্যাস ও জলমধ্যস্থ হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়া এমোনিয়া তৈয়ারী করা হয়। অঙ্গার হইতে প্রথমে আলকাতরা এবং তৎপর ফেনল তৈয়ারী করিয়া বায়ুর অক্সিজেন সাহায্যে উহাকে এডিপিক এসিডে পরিবর্ত্তন করা হইল। এইবার পূর্ব্বোক্ত এমোনিয়া, জলমধ্যস্থ হাইড্রোজেন এবং এডিপিক এসিড মিলিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হেক্সামিথিলিন ডাই-এমিন-এ রূপান্তরিত হইল। এই ডাই-এমিন হইতে পাওয়া যাইবে নাইলন-ঘটিত লবণ এবং তাহা হইতে উপযুক্ত প্রক্রিয়া সাহায্যে নাইলন পাওয়া যাইবে।

নাইলন সূতার এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে যাহার জন্য বস্ত্র ও নানা প্রকার কাজের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার বিশেষ সুবিধাজনক। ইহার একটি গুণ হইতেছে যে, ইহাতে ছাতা ধরে না বা ভিজাইলে পচিয়া যায় না। ফলে যুদ্ধকালে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জঙ্গলে খাদ্যাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত নাইলন বস্ত্র ও জাল ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার স্থিতিস্থাপকতা ও দৃঢ় সংলগ্নধর্ম্মিতার জন্য গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি তৈয়ারীর নিমিত্ত ইহা ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, একই আয়তন বিশিষ্ট নাইলন মোজা রেশমের মোজা অপেক্ষা দীর্ঘ স্থায়ী হয় এবং ব্যবহারও বিশেষ আরামদায়ক ও তাপরক্ষক। একমাত্র ডু পন্ট কোম্পানীই বৎসরে ৪৫ লক্ষ জোড়া মোজা তৈয়ারী করিয়া থাকে। কৃত্রিম রেশমের বিশেষ অসুবিধা হইল যে, উহা ভিজাইলে সূতার দৃঢ়তা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ফলে বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কিন্তু নাইলন এ দোষমুক্ত। নাইলনের বিভিন্ন বস্ত্রখণ্ড সেলাই দিয়া জোড়া লাগাইবার প্রয়োজন হয় না; সামান্য উত্তাপ প্রয়োগ করিলে জোড়ার মুখ আপনা-আপনি মিশিয়া যায়। তাহা ছাড়া রেশম বা তুলার ন্যায় নাইলন সহজে অগ্নিপ্রজ্বলনশীল নহে। যুদ্ধকালীন কয় বৎসরে নাইলন দিয়া প্যারাসুটের দড়ি, জাল, সেলাইয়ের সূতা, টুথ ব্রাস, চুলের ব্রাস প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। তবে নাইলন ব্যবহারে কোন কোন বিষয়ে যে অসুবিধা আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না, বৈজ্ঞানিকগণ অবশ্য এই সমস্ত দোষ মুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, বিলাত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কৃত্রিম রেশমের যুগ অস্তমিত হইয়া নাইলন যুগের সুপ্রভাত নানা দিক দিয়া ঘোষিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

কম্যুনিজম্ কোন্ পথে?

শ্রীশিশির মুখোপাধ্যায়

একটি মাত্র দেশে রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করেই প্রোলেটেরিয়েট্-বৈপ্লবিক যুগের অবসান ঘটেছে। সে বিপ্লব মূলগতভাবে মার্ক্সীয় নীতি অনুসারে, বিশেষ করে তার গঠনতান্ত্রিক দিক অনুসরণপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় নি। এমন কি প্রাথমিক অংশে মার্ক্সীয় বৈপ্লবিক পন্থাও অনুসৃত হয় নি। মার্ক্সীয় নীতি অনুসারে যদি প্রোলেটেরিয়েট্ বিপ্লব শক্তিসঞ্চয় করত তা হলে তার সূচনা হওয়া উচিত ছিল ইংলণ্ডে, যেখানে যন্ত্রশিল্পের ইমারৎ গড়ে উঠেছে। রুশ-বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে একটি দুর্ঘটনা মাত্র— কয়েকটি আকস্মিক ঘটনার সংমিশ্রণেই তা সম্ভব হয়েছিল। বস্তুতঃ এ বিপ্লব ঐতিহাসিক বৈরবাদের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীকে অস্বীকার করে। অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্ণীত ঐতিহাসিক প্রসারের নিশ্চিত ফল না হওয়ায় সে বিপ্লব জগদ্ব্যাপী কোন অদূর বিপ্লবের ইঙ্গিত দিতে পারে নি। পক্ষান্তরে ১৯২১ সন থেকেই অন্যান্য দেশে সে বিপ্লবের বিস্তৃতির পথ রুদ্ধ হয়েছে।

তখন থেকে রাশিয়াতেও সে বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়া প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সমস্যার সম্মুখীন হয়েই লেনিন আবিষ্কার করলেন যে মার্ক্স এ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নি। মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক রচনাবলী সবই সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা। ধনতন্ত্রবাদের শরীরব্যবচ্ছেদ নিয়েই ব্যাপৃত ছিলেন মার্ক্স—তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ধনতন্ত্রবাদের পরস্পরবিরোধিতা সাধারণের সামনে প্রকট করা। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—সময়ের স্রোতে পরস্পর বিরোধিতার টানাপোড়েনের বিপাকে ধনতন্ত্রবাদের বিরাট ইমারৎ ভেঙে পড়বে, আর সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে থেকে জন্ম নেবে সর্ব্বজয়ী সাম্যবাদ। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ তিনি করেছিলেন বটে, কিন্তু সাম্যবাদী পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করে যেতে পারেন নি। দ্রব্যাদি নির্ম্মাণের বিভিন্ন শক্তির প্রসারের দ্বারাই তা স্থিরীকৃত হতে পারত। ধনতন্ত্রবাদের শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্ত করতে পারে কেবলমাত্র সামাজিক বিপ্লব; তার পর ভবিষ্যৎ আপনা থেকেই তার পথ বেছে নেবে। অর্থনীতিবিদ্ বলে মার্ক্সের যা কৃতিত্ব

সে শুধু সমালোচকরূপে। তাঁর বিপুল পরিমাণ রচনার কোন স্থানে সামাজিক পরিকল্পনা বা অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে ইঙ্গিত নেই। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে-কোন পরিকল্পনাই "ইউটোপিয়া" ছাড়া কিছু নয়—এই ছিল তাঁর মত। "New Economic Policy" প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন যে, মার্ক্সের রচনায় সাম্যবাদী অর্থনীতি সম্বন্ধে একটি কথাও লিপিবদ্ধ হয় নি।

বিপ্লবোত্তর রাজনীতি সম্বন্ধেও মার্ক্সের কোন রচনা নেই। বুর্জোয়া শাসনের ভিত্তিমূলকে শিথিল করে দেওয়ার জন্য তিনি প্রোলেটেরিয়েট্ একনায়কের আদর্শের জন্ম দিয়েছেন। তারপর কি ঘটবে, কেমন করে বিপ্লবোত্তর সমাজকে রাষ্ট্রিক নীতি অনুসারে একত্রিত ও সংবদ্ধ করে শাসন করা হবে—সে প্রশ্নের উত্তর তিনি সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছেন ইতিহাসের অজানা শক্তির হাতে। রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে—এই অলীক কথার সৃষ্টি করে তিনি রাজনীতির মূল কথাটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। নূতন সমাজব্যবস্থায় পারস্পরিক অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি "এনার্কিষ্ট" আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন—"from each according to his ability, to each according to his need"—লেনিনের মতে এই আদর্শ 'ব্যর্থ স্লোগান মাত্র'। ষ্টালিনের ব্যবস্থায় মার্ক্সীয় নীতিকে নিম্নলিখিত ভাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে—"from each according to his ability, to each according to his work." যদি মার্ক্সীয় নীতিকে ব্যর্থ স্লোগানমাত্র বলা হয়, তা হলে তার রূপান্তরকে, যদিও মোটামুটি তাকে একই বিবৃতি বলে মনে হবে, একেবারে অর্থহীন বলা চলে না; বস্তুতঃ এর অর্থই নতুন সমাজব্যবস্থায় অসাম্য ও অসমবণ্টনকে স্বীকার করা। কাজের মূল্যনির্দ্ধারণের কোন উপযুক্ত মাপকাঠি নেই। যাদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি তারাই কেবলমাত্র সে মূল্য নির্দ্ধারণ করতে পারবে, এবং এখন তার ফল কি দাঁড়িয়েছে সে কথা সকলেরই জানা আছে।

রাশিয়ায় বিপ্লবোত্তর রাজনৈতিক-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রনায়কদের ইচ্ছানুসারে করা হয়েছে। তাদের কোন লিখিত ভিত্তি নেই, মার্ক্সবাদের সঙ্গে সংযোগ অতি সামান্য। সুতরাং এই ব্যবস্থাদ্বয়কে সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রবাদী বলা অন্যায়। পক্ষান্তরে নতুন সমাজব্যবস্থা কেমন হবে মার্ক্স তার কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত না দেওয়ায় যে-কোন ব্যবস্থার ওপরেই খুশীমত লেবেল সেঁটে দেওয়া চলে এবং কেউই প্রমাণ করতে পারবে না যে, সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং সোভিয়েট অর্থনীতি সাম্যবাদী নয়। সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যে সংঘাত তা কাউকেই উৎসাহিত করতে পারবে না। এই হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতা আজ আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন স্বীকার করিয়েছে—বিশেষ করে তাদের, যারা কেবলমাত্র ঘটনা-সংঘাতকেই প্রগতির ধারা বলে মানে না, যারা সেই সংঘাতের তাৎপর্য্য নির্ণয় করতে চায় বিচারশীলতাকে মাপকাঠি করে।

বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক বিপ্লব—কোন্‌টা গ্রহণ-যোগ্য এখন সে প্রশ্ন অবান্তর; এক দিকে বিকৃত অত্যাচারী বিলীয়মান ধনতন্ত্রবাদের কদাকার বাস্তব রূপ—যার ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পেরেছে ফাসিষ্ট স্বেচ্ছাচার, আর অপরপক্ষে রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সমতার বেদীতে স্থাপিত নতুন আদর্শ—এ দুয়ের মধ্যে বেছে নেবার প্রশ্ন ওঠে না। স্থির চিত্তে ভেবে দেখা উচিত এখন আমাদের চোখ ফেরাতে হবে কোন্ দিকে? আমরা অনুপ্রাণিত হব নতুন ব্যবস্থার আদর্শে অথবা চলতি সাম্যবাদের অভিনব বাস্তবতায়, যাকে আমরা রুশীয় সাম্যবাদ বলি।

পূর্ব্বে সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে এই বেছে নেওয়ার সমস্যার সহজ সমাধান ছিল, কিন্তু বিপ্লবোত্তর যুগে স্বাধীন চিন্তা-শীল ব্যক্তিমাত্রেই যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তার সমাধান ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠেছে। কেবলমাত্র প্রচলিত সাম্যবাদই যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছে তা নয়, অভিজ্ঞতার ফলে সেই আদর্শই সন্দেহের উদ্রেক করেছে। আমাদের বিচার্য্য বিষয় এই যে, তেমন আদর্শকে কি অনুসরণ করা চলে, আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় যে আদর্শের প্রতি সোপানে হোঁচট খেতে হচ্ছে? ওদিকে বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠেছে; এবং নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য্য সকলেই আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছেন। এই ভাব-সংঘাত আজ প্রতি বিপ্লবী চিন্তাশীল মাত্রেরই মনে আলোড়ন তুলেছে, ফলে সাম্যবাদী আন্দোলনের আজ এক সঙ্কটকাল উপস্থিত।

তবু আজও অনেকে আশা নিয়ে প্রতীক্ষা করছে; প্রয়োজনীয়তার অজুহাতে অনেকে রুশীয় রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম্মের নৈরাশ্যজনক বিফলতাকেও মেনে নিচ্ছে, ভাবছে অন্যান্য দেশে বিপ্লবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হয় তো সে বিফলতার বীজ আর থাকবে না। কিন্তু সেই ভাবী আশাবাদকে টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর হয় না, যখন দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রতিক্রিয়াশীলতার দূষিত আবহাওয়ায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের সমস্ত সম্ভাবনা। সেই থেকে সুরু হয় আত্মজিজ্ঞাসা—অন্তরের অন্তরতম মূল অনুসন্ধান করে দেখার পালা। তার ফলে আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে সে প্রভেদ দেখতে পাই, বাস্তব ও বিচারবুদ্ধিপ্রবণ দৃষ্টি-ভঙ্গীর সাহায্যে। এক দিকে দেখা যায়, সর্ব্বগ্রাসী শক্তির আশাদীপ্ত বিশ্বাস, অপর দিকে নূতন সমাজব্যবস্থার সমস্যা—যা প্রোলেটেরিয়েট নয় তেমন অংশকে সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এবং স্বভাবতঃই

আন্দোলন হয়ে পড়েছে দুর্বল ; সে অংশের কাজ বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের পথ প্রশস্ততর করা নয়, তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, নূতন "রুশ জাতীয় রাষ্ট্র" নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও সুবিধার জন্য যে-কোন পন্থা অবলম্বন বা যা কিছু করবে তাতেই অংশীদার হওয়া এবং এই জাতীয়-রাষ্ট্রই নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলে বিশ্বের সমক্ষে প্রচার ও দাবি করছে।

এই সঙ্কটের প্রথম আসামী হ'ল কম্যুনিষ্ট ইন্টারনেশন্যাল, আগামী বিশ্ববিপ্লবের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হবার জন্য যার জন্ম হয়েছিল। প্রাক্-বৈপ্লবিক ও বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদের সমস্যাগুলির পারস্পরিক বিরোধিতার ফলে সে প্রতিষ্ঠান টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে। শক্তি করায়ত্ত করে একমাত্র সাম্যবাদীদল রাশিয়ার কম্যুনিষ্টরা আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে দিকপালস্বরূপ হয়ে উঠল। অন্যান্য দেশের সাম্যবাদী দলগুলি স্বেচ্ছায় প্রাক্-বৈপ্লবিক সমস্যাসমূহের সমালোচনা থেকে বিরত হ'ল—যদিও সেইসব সমস্যার গুরুভারে আজও তাদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত। রাশিয়ার কম্যুনিষ্টরা কেবলমাত্র চল্‌তি সাম্যবাদ নয়, সাম্যবাদী থিয়োরীর প্রভু বলে নিজেদের প্রচার করছে। অদৃষ্টপূর্ব্ব বিপ্লবোত্তর চল্‌তি শাসনব্যবস্থার স্বেচ্ছাপ্রণয়ন রাশিয়ার কম্যুনিষ্টদের মার্ক্সীয় বিধিব্যবস্থার যথেচ্ছ ব্যবহারে শক্তি দিয়েছে। প্রথম প্রোলেটেরিয়েট বিপ্লবের পর উক্ত শাসন-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় সুখসুবিধা বিশ্ববিপ্লবের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটিমাত্র দেশের সমাজ-তান্ত্রিকতা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের আদর্শ প্রচারে প্রবলতম অন্তরায় হয়েছে।

সোভিয়েট রিপাবলিক বাস্তব পক্ষে একটি জাতীয়-রাষ্ট্র—যদিও এক নতুন ধরণের—এবং এইজন্যই আন্তর্জাতিক শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে রাশিয়া এসে পড়েছে একেবারে কেন্দ্রস্থলে। রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানতে পেরেছি যে, সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ রাষ্ট্রিক ধনতন্ত্রবাদের এক ইঞ্চি ওপরে উঠতে পারে নি। রাশিয়ার সাম্যবাদী জাতীয়-রাষ্ট্র বর্ত্তমান শোচনীয় বিধিব্যবস্থা রক্ষণের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। দুই ধরণের জাতীয়-রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধিতা বিদূরণের কোন খোলা পথ নেই। যথা ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ এরা পরস্পরবিরোধী—যদিও আজকাল রাজনীতিতে পারস্পরিক শক্তিসজ্ঘাতে সকল আদর্শই রাহুগ্রস্ত হতে বসেছে। আজ এই দুই ধরণের জাতীয়-রাষ্ট্র পরস্পরবিরোধী দুটি বিভিন্ন শিবিরে তাদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করেছে—সে বিরোধ বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লবের সজ্ঘর্ষ নয়, সে বিরোধ আত্মসুখ এবং সুযোগ-সুবিধার বিরোধ, স্বার্থের সজ্ঘাত—যার ফলে পৃথিবীতে আজ জলস্থলব্যাপী আর একটি বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন। পৃথিবীব্যাপী সভ্যতা ও সংস্কৃতির আজ এক মহা-সঙ্কট কাল উপস্থিত, এই ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল হয়েছে। এ সঙ্কট পার হবার কি কোন পথ নেই ? ইতিহাস কি সভ্যতার বুকে আর একটি চিতাগ্নি-রেখা আঁকবার আয়োজন করছে ?

যদি এই আসন্ন সঙ্কট পার হতে হয় তা হলে আমাদের সাম্যবাদী আদর্শের ফাঁকিকে কাটিয়ে উঠতে হবে। মানুষের জ্ঞানের উপর, তার শক্তির উপর আমাদের আস্থা রাখতে হবে, মানব-মনের সৃষ্টিশক্তিকে স্বীকার করতেই হবে। বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে কার্ল মার্ক্সের অদূরদর্শী ভবিষ্যৎ-বাণীর বিরুদ্ধে—নতুন সমাজসৃষ্টির অগ্রদূতেরা মনোনিবেশ করবেন সমাজগঠন-ব্যবস্থার ও সামাজিক পরিকল্পনার দিকে, এবং তাঁরা মুক্তির সঙ্গে পরিকল্পনাকে, ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক কল্যাণ ও প্রগতিকে মিলিত ও সংযুক্ত করে পৃথিবীতে নব যুগ আনয়ন করবেন।

মেঘের গুহায় ঘুমায়েছে !

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নির্জ্জনে ঘনবনে
বিরামবিহীন নৃত্যের মত আশার স্বপন যত
মৌনমাতাল হৃদয়ে আমার করে কোলাহল কত !
ছিন্ন প্রহরে পথের প্রান্তে তোমারে পড়েছে মনে :
পথে প্রেতায়িত দিগ্‌বধূগণ অবগুণ্ঠিতা রহে,
ধরোত-হাওয়া পল্লব দোলে মৃদুল গন্ধ বহে।
বাণীহীন মোর অন্তর তলে প্রদীপের সম জ্বলে
অনাদিকালের কথা।

মেঘের গুহায় ঘুমায়েছে চাঁদ : ঝরা বকুলের ব্যথা
এই ভিজে রাতে করিতেছি অনুভব,
থেমে গেছে সব পৃথিবীর কলরব ;
সমন্ন সাগরতীরে
আমি একা। রাঙা করবীর সম ধীরে
ঝুরে পড়ে স্মৃতি তব
যৌবন বায়ে। তুমি নাই—মিছে অভিনয় অভিনব !
কালের যাত্রা অনবিগম্য প্রাণের বিবর্ত্তনে।

পুস্তক-পরিচয়

পাহাড়িয়া কাহিনী: শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র। এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

নানা দেশের নানা উপকথা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু আসামের পাহাড়ে পাহাড়ে খাসিয়া, লুসাই, গারো, মিকির, কাছাড়ীদের মধ্যে যে-সব রূপকথা প্রচলিত আছে তাহার সন্ধান এতদিন আমরা করি নাই। খাসিয়া জৈন্তিয়া লুসাই পর্ব্বতের অধিবাসীরা আমাদের প্রতিবেশী। এই আদিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল জাগ্রত করিতে শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ব-প্রকাশিত "বিচিত্র মণিপুর" এবং "আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী" সেই চেষ্টার ফল। 'খাম্বা ও থইবি'র উপাখ্যান "বিচিত্র মণিপুরে" সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "পাহাড়িয়া কাহিনী"তে লেখক আসামের পার্ব্বত্য জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রচলিত সাতটি গল্প সঞ্চয়ন করিয়াছেন। চয়ন করিতে তিনি ইংরেজী পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বটে, এ-সব গল্প কিন্তু সম্পূর্ণ অনুবাদ নয়। জৈন্তিয়া পাহাড়ের রাজধানী জোয়াইয়ে এবং অন্যান্য স্থানে আদিবাসী বন্ধুদের মুখে লেখক এই সব উপাখ্যানের অনেকগুলি শুনিয়াছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া তিনি রচনার মধ্যে সহানুভূতির সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। এই দরদ কাহিনীগুলিকে সত্যই উপভোগ্য করিয়াছে। লোকসাহিত্য নৃতত্ত্বের একটি অঙ্গ। বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত উপকথাগুলির তুলনামূলক আলোচনা জাতিসমূহের মধ্যে বিচিত্র সম্পর্কের সন্ধান দেয়। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি সুন্দর এবং তথ্যপূর্ণ ভূমিকায় এই সব পার্ব্বত্য আদিবাসীর পরিচয় দিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন, "এর তিনটি গল্প (মিকির উপাখ্যান 'হারাটা কুর'র', কাছাড়ী উপকথা 'রাজহংস-কুমারী' আর গারো রূপকথা 'সতী-সিংউইল') পৌরাণিক রূপকথা হিসাবে অতি সুন্দর। এদের বিষয়বস্তু অতি প্রাচীন। দেবকন্যার সঙ্গে মানুষের প্রেম ও মিলন, বিচ্ছেদ, কচিৎ পুনর্মিলন এবং এই আশয় নিয়ে উপাখ্যান বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে।"

প্রত্যেকটি উপাখ্যানের উপক্রমণিকায় যে আদিম জাতির মধ্যে সে কাহিনী প্রচলিত গ্রন্থকার সেই জাতির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই পরিচয় উপক্রমণিকাগুলিকে মূল্যবান করিয়াছে।

দুইটি মিকির, দুইটি কাছাড়ী, একটি গারো, একটি খাসিয়া এবং একটি লুসাই উপাখ্যান "কাহিনী"র মধ্যে সঞ্চয়িত হইয়াছে। প্রত্যেকটি আখ্যানের মধ্যেই একটি বিশেষ মনোহারিত্ব আছে। রচনার গুণে এই কাহিনী-সপ্তক শিশু এবং বয়স্ক পাঠক উভয়েরই মনোরঞ্জন করিবে।

রামরাম বসু, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—৬, ৭, ৯। মূল্য এক টাকা।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য; রামকমল ভট্টাচার্য্য; জয়গোপাল তর্কালঙ্কার; মদনমোহন তর্কালঙ্কার; গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার; রাধামোহন সেন;

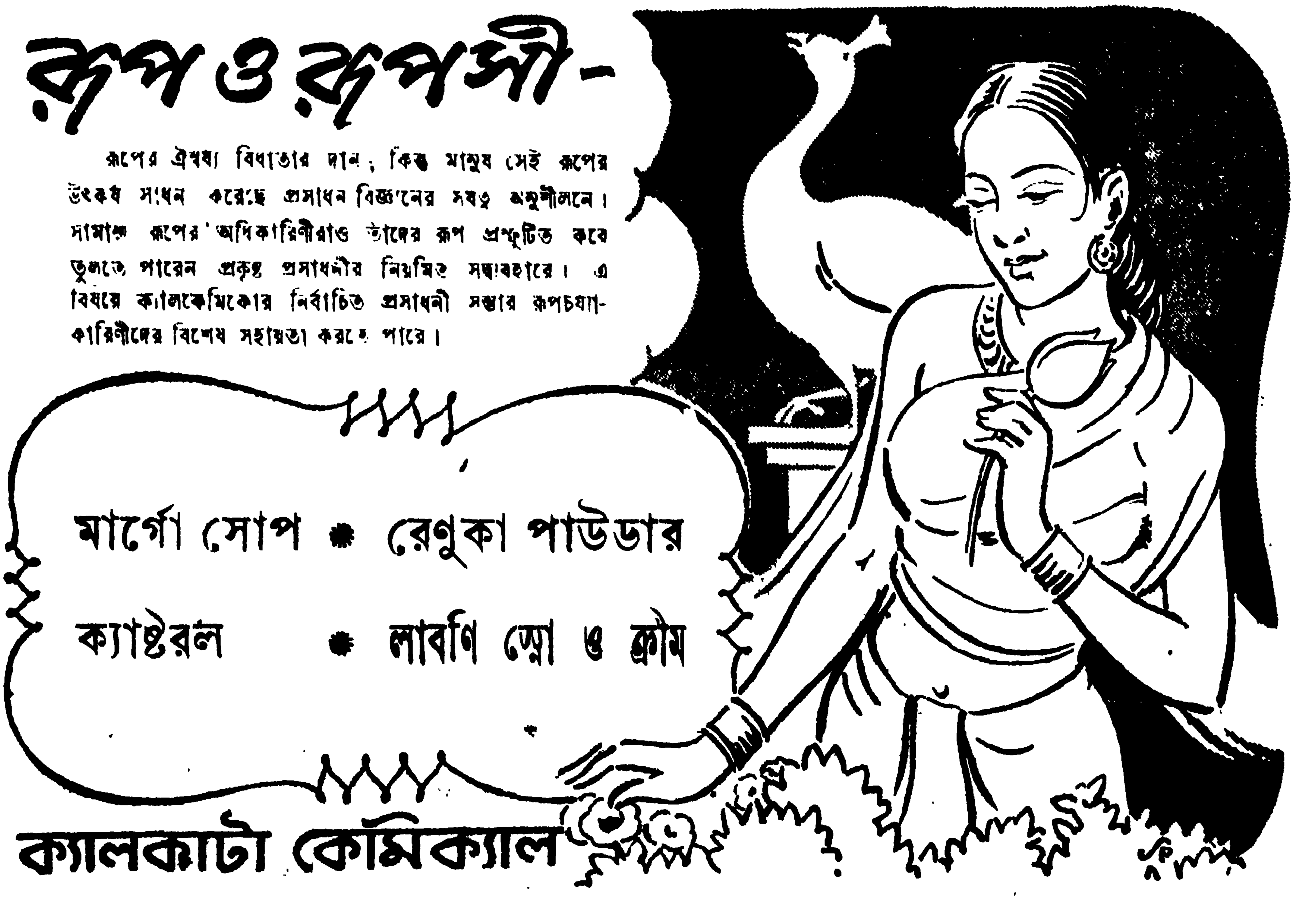

ছায়া ছবির গান

এম্‌, জি, পিকচার্সের
'বিশ বছর আগে'
GE 7277
কথাটি বলিস্‌ না রে

GE 7278
মায়াজাল বুনছে মনে

GE 7279
একি দোলা লাগে প্রাণে
হৃদয় দিয়ে কি পাব না

বোসার্ট প্রোডাকসনের
'প্রিয়তমা'
GE 7266
এসো আরো কাছে
কুঞ্জের গুঞ্জন শোন ঐ

অজিত চট্টোপাধ্যায়
GE 7267
Good Evening
১ম ও ২য় ভাগ

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
GE 7268
স্মরণের এই বালুকা-বেলায়
তোমার বিরহ (আধুনিক)

চিত্রবাণী লিমিটেডের
'মহাকাল'
GE 7280
এ জীবনে সুখ যেন
কে গো আমার মনের

GE 7281
পরীদের জলসায়
আমরা বেদের দল

মজুমদার-স্বামী প্রোডাকসনের
'সর্বহারা'
GE 7264
ও চাঁদ বদনী
ফুল কলিরে কয়

GE 7265
সুন্দরী লো মাই
হামরা দোনো জনে হায়

এম্‌ পি প্রোডাকসনের
'অনির্বাণ'
VE 2553
কানন দেবী
সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
তোমায় সাজাব যতনে কুসুম রতনে

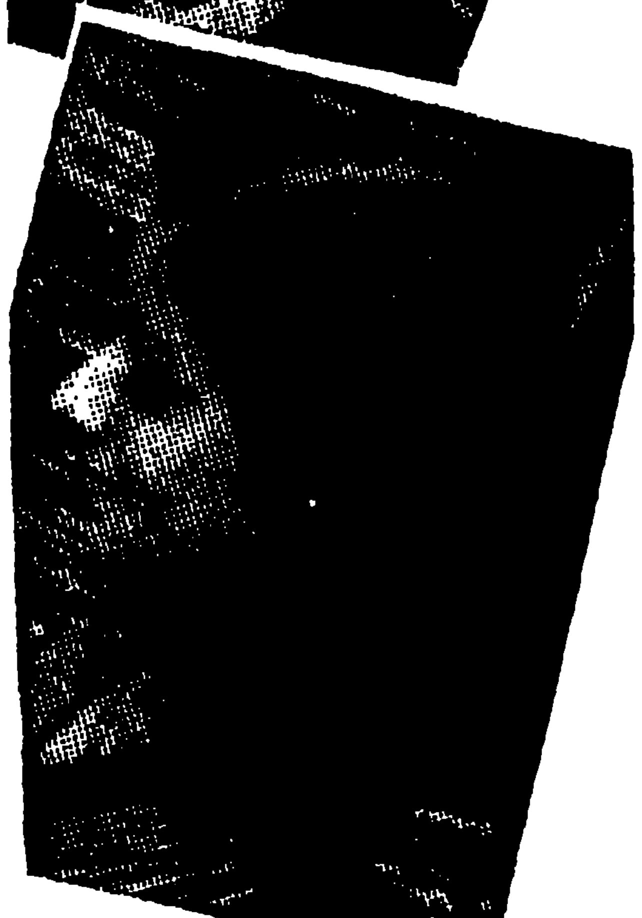

MAGIC NOTES
TRADE MARK

কলম্বিয়া

গ্রামোফোন কোং লিঃ
কলিকাতা ★ বোম্বাই ★ দিল্লী ★ লাহোর ★ করাচী

CB/F.7/48

ব্রজমোহন মজুমদার ; নীলরত্ন হালদার - সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২, ১৩, ১৭। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র রচয়িতা রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩), বাঙালী-প্রবর্ত্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র (১৮১৮ খ্রীঃ) 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, প্রথম বাংলা অভিধানকার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬-১৮৫৪) এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী রূপে পরিচিত প্রসিদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের (১৭৬২-১৮৩২) চরিত প্রথম গ্রন্থখানিতে আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য (১৮৪০-১৯৩২) প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর পরিচয় আছে। দু-খানি পুস্তকেরই চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইয়াছে। নূতন সংস্করণে বহু নূতন উপকরণের সন্নিবেশ আছে। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে চারিটি সংস্করণ প্রকাশেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ঘূর্ণাবর্ত্ত শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য। ডি, এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা

প্রথমেই একটি মুসলমান চরিত্র লইয়া বইটি আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আগ্রহের সহিতই পড়িতে আরম্ভ করি, কিন্তু অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই নিরাশ হইয়া পড়িতে হয়। মুসলমান-সমাজের পারিবারিক জীবনের বাতাবরণ সৃষ্টি করার উপযোগী ভাষা এবং খানিকটা অভিজ্ঞতা দুই-ই লেখকের আছে, কিন্তু উপন্যাসকে দাঁড় করাইতে হইলে যে মাত্রাজ্ঞানের দরকার বর্ত্তমান পুস্তকে সেটির অভাব আছে। একে উপন্যাসের গতি ঘটনা বা সংলাপের মধ্য দিয়া নয়, বর্ণনার মধ্য দিয়া—যাহাতে স্বভাবতই একটা ক্লান্তি আসে, এর ওপর বর্ণনাও অযথা এত দীর্ঘ যে ধৈর্য্য রাখা দায় হইয়া উঠে। সমস্ত বইখানির মধ্যে মাত্র দুই জায়গায় 'ইণ্টারেষ্ট' একটু জমিয়া উঠিয়াছে—যেখানে কতকগুলা মতবাদ লইয়া বিতর্ক চলিতেছে এবং যেখানে কলিকাতার দাঙ্গার কথা আসিয়াছে ; শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেও মাত্রাধিক্যের জন্য ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে।

প্লটও নিতান্ত দুর্ব্বল—টানিয়া বুনিয়া মেলানো। মাঝে মাঝে নাটকীয় ঝলক আনিবার চেষ্টা আছে—যেমন ধীরা ও নীরার পিতৃগৃহ ত্যাগের মধ্যে ; কিন্তু চরিত্রগুলি সুসমঞ্জস হইয়া ফুটিয়া না ওঠায় এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির অভাবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

লেখকের উদ্দেশ্য ভাল—সাম্প্রদায়িকতার উপরে মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সখ্য স্থাপন করা। কিন্তু উদ্দেশ্য ভাল হইলেও মুসলমান-সম্প্রদায়কে চটাইবার ভয়ে বা অনিচ্ছায় লেখক যে-ভাবে চরিত্র তথা ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হিন্দু পাঠকের মনে পীড়া দিবে। এক শ্রেণীর লোক এ ব্যাপারটাকে উদারতা বলিয়া কাটাইতে চান, কিন্তু এমনও অনেকে আছেন যাঁহারা মনে করেন এটা হীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক—কাপুরুষতাজনিত তোষণ-নীতি।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র— শ্রীদুর্গাদাস বসু, পৃষ্ঠা ৬৩, মূল্য ১৲।

কৃত্তিবাস রচিত

সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

স্বনামধন্য ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সুবিখ্যাত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকৃষ্ট

অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশবর্জিত মূলগ্রন্থ অনুসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় সুসম্পূর্ণ! ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আঁকা রঙীন ষোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি আছে। রঙীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিত্রশালা হইতে সংগৃহীত ছবির অনুলিপি। অন্যান্য বহুবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বর্মা, নন্দলাল বসু, সারদাচরণ উকীল, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর, অসিতকুমার হালদার, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র দে প্রভৃতির সুনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত।

জ্যাকেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইণ্ডিং মূল্য ১০।০, প্যাকিং ও ডাকব্যয় ১৲

প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নম্বরসহ সত্বর আবেদন করুন! এই সুযোগ সর্বপ্রকার দুর্মূল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না।

প্রবাসী কার্য্যালয়—১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির
নিরপেক্ষ আলোচনা

লুই ফিশারের

মহাজিজ্ঞাসা

লুই ফিশারের নাম আজ আর কোনো মহলের কাছেই অপরিচিত নয়, তেমনি অপরিচিত নয় তাঁর '*The Great Challenge*' বইটির নাম। 'মহাজিজ্ঞাসা' তারই অনূদিত সংস্করণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক তথা সামাজিক বিবর্ত্তন যে গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চলেছে তার ইতিহাস জানা প্রয়োজন আজ সকলেরই। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ এখনও প্রচুরভাবে প্রচারিত হয়নি। লুই ফিশার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তা-ই আলোচনা করেছেন বলে বর্ত্তমান কালে এ-বইয়ের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। প্রথম পর্ব্ব প্রকাশিত হলো। **চার টাকা॥**

মিনু মাসানির

নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ—বারো আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের

অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ—চার আনা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত

বৌদ্ধধর্ম্ম

পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও মননশীলতার পরিচয় আধুনিক বাঙালী সমাজের কাছে আজ আর নতুন করে দেবার নেই। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা, এতদিন পর্য্যন্ত তা প্রাচীন সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ ছিলো। সম্প্রতি বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত তাঁর প্রবন্ধগুলোকে একত্র সংকলিত করা হচ্ছে এই গ্রন্থে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের প্রতি যাঁর সামান্যমাত্রও শ্রদ্ধা আছে, এ গ্রন্থ তাঁর কাছেই যে শুধু অমূল্য সম্পদ ব'লে বিবেচিত হবে তা-ই নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রত্যেকটি পাঠকই এ-গ্রন্থকে অপরিহার্য্য বলে গ্রহণ করবেন। লেখকের আলোকচিত্র এবং স্বাক্ষর সম্বলিত। **তিন টাকা॥**

পূর্ব্বাশা লিঃ, পি/১৩ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩

ভারতীয় গণপরিষদের নির্বাচিত খসড়া প্রণয়ন সমিতি ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের খসড়া ইংরেজীতে প্রণয়ন করিয়া জনমত সংগ্রহের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন; বর্তমান পুস্তিকাকে উহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা চলে। মোটামুটি শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। তবে ইহা এত সংক্ষিপ্ত যে ইংরেজী জানা অভিজ্ঞ পাঠক ইহা পড়িয়া তৃপ্ত হইবেন না। মূল ইংরেজী ২১৪ পৃষ্ঠার পুস্তকের মূল্য ১৲ এবং এই সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ পুস্তিকার মূল্যও তাহাই নির্দ্ধারিত হওয়ায় পাঠক মহলে ইহার যথোচিত প্রচারের সম্ভাবনা কম, যদিও ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

ভাষার ভিত্তিতে বঙ্গদেশ — শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৭২, মূল্য ১৲।

ভাষার ভিত্তিতে ভারতের প্রদেশসমূহ পুনর্গঠিত হওয়া উচিত একথা মহাত্মা গান্ধী হইতে সুরু করিয়া প্রায় সকল দেশনেতাই স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ কার্যে প্রধান বাধা পুরাতন প্রদেশ-বিভাগগুলি, যদিও এরূপ বিভাগ-ব্যবস্থা ইংরেজের শাসন-সৌকর্যার্থেই হইয়াছিল। সর্বভারতীয় জাতীয়তা স্বীকার করিলেও প্রাদেশিক ভাষা ও কৃষ্টিকে অস্বীকার করা চলে না। স্বাধীন ভারতে প্রত্যেক রাষ্ট্রে (গণপরিষদের খসড়া গঠন আইনে প্রদেশগুলি State বা রাষ্ট্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে) সেগুলির স্ব স্ব ভাষায় শিক্ষাদান ইত্যাদি হইবে, সুতরাং আইনের রক্ষাকবচ সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠদের নানা অসুবিধায় পড়িতে হইবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের সহানুভূতির অভাব থাকিলে প্রথমোক্তদের দুর্দ্দশার চরম হইবে। বিহার ও আসামের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলসমূহের সেই দুর্দ্দিন আসিয়াছে। এই সকল অঞ্চল, যথা—মানভূম, ধলভূম, পুরুলিয়া, সাওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের অংশবিশেষ, কাছাড়, গোয়ালপাড়া, শ্রীহট্টের আসাম প্রদেশস্থ অঞ্চলগুলি ও অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণ অধিকাংশই বঙ্গভাষাভাষী বাঙালী, কিন্তু নানা কারণে আজ উক্ত অঞ্চলসমূহ অপর প্রদেশের অঙ্গীভূত এবং উহার ফলে অর্থাৎ বিহারী ও অসমীয়াদের সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার জন্য নানা ভাবে সেখানকার বাঙালীরা অপমানিত ও উৎপীড়িত। নূতন করিয়া স্বাধীন ভারতের আইন প্রণয়ন ও প্রদেশ বা রাষ্ট্রগঠনের সময় এই ত্রুটি সংশোধনের নিতান্তই প্রয়োজন। সময় খুবই অল্প এবং ইহার মধ্যেই সমস্ত বাঙালী জাতিকে স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। খণ্ডিত বাংলার জীবনমরণ এই সমস্যার সমাধানের উপরে বহুলাংশে নির্ভর করিবে। এই পুস্তিকার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

প্রথম প্রশ্ন — দ্বিতীয় সংস্করণ: শ্রীরাইমোহন সাহা। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা। দাম চার টাকা।

উপন্যাস। সংকীর্ণ জাতিভেদের মূলে আঘাত করিয়া লিখিত। উপন্যাসের প্রধান নায়ক মানবতার পূজারী। সাম্য, মৈত্রী ও কল্যাণের পথে তার অগ্রগতি। প্রেমকে লেখক উচ্চ আসন দিয়াছেন। জাতিভেদ মানুষের নিজেদের সুবিধার জন্য সৃষ্ট। কথাটা তিনি যুক্তি ও নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া দেখাইয়া গেলেও কোথাও বিন্দুমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেন নাই বরং প্রাচীনপন্থীদের সংঘর্ষকে কৌশলে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। নায়কনায়িকাদের জবানীতে এই কথাটাই লেখক বলিতে চাহিয়াছেন যে, সমাজ যেন মানুষকে মানুষ বলিয়াই গ্রহণ করে। পুস্তকের চরিত্রগুলি তিনি এমন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের জীবনের পরিণতির প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই পাঠকের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আমাদের সামাজিক বিধি-নিষেধগুলি সহজ এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে কেমন জটিল করিয়

নেতাজীর অনুসরণে

বাংলার বিখ্যাত ঘৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার "শ্রী" মার্কা ঘৃতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিষ্প্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 'শ্রী' ঘৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ঘৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ ঘৃত যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা ঘৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

তুলে। উপন্যাসখানির স্থানে স্থানে লেখক সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।

পরিশেষে কয়েকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করিব। যেমন—মায়ার বিধবা মাতার আত্মহত্যা করিবার প্রয়াসের দৃশ্যটি। পরেশকে স্বমতে আনয়ন করিতে না পারিয়া হঠাৎ একখানা বটি দ্বারা আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা যে ভাবে দেখান হইয়াছে তাহা অশোভন লাগিল। উদাহরণস্বরূপ আমরা একটির উল্লেখ করিলাম। আশা করি ভবিষ্যতে লেখক এদিকে একটু দৃষ্টি দিবেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

মহাসূর্য্য—কিংশুক। সেঞ্চুরি পাবলিশার্স। কলিকাতা। দুই টাকা।

"স্বপ্ন দেখি আসমুদ্র হিমাচল এ ভারত জুড়ে
কোটি কণ্ঠে সমুত্থিত মহাগীতি নব জীবনের।"

নবজীবন-স্বপ্নে অধিকাংশ কবিতা সমুজ্জ্বল। ভাঙনের গান চারিদিক হইতে কবির কানে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু তাঁহাকে নিরাশ করে নাই—"নূতন সৃষ্টি-বোধনের গান" শুনিবার জন্য তিনি উৎকর্ণ।

সৈনিক—অজয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভেন্যু। কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। দেড় টাকা।

কবিতা-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বাংলাদেশে বড় একটা হয় না। "সৈনিকের" দ্বিতীয় সংস্করণ ইহার জনপ্রিয়তার প্রমাণ। কবি গীতিকার রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গম্ভীর ভাষা ও ছন্দের মধ্য দিয়া এই কবিতাগুলিতেও গীতিধারা বহিয়া চলিয়াছে।

নতুন দিন—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা। আট আনা।

কবিতাগুলির রোমান্টিক সুর, মধুর কোমল ভাষা হৃদয় স্পর্শ করে।

যৌবনোত্তর—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা। আট আনা।

কবির ভাবনা স্বপ্নচিত্রে ফুটিতে চাহিয়াছে। ভাষায় ও ছন্দে আছে কোমল লাবণ্য।

প্রেমের ডালি—শ্রীরসিকলাল দে। শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী কার্য্যালয়, এলাটী, হুগলী। মূল্য ॥০।

ধর্ম্মভাবাশ্রিত গান ও কবিতা। অধিকাংশ শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয়।

যুদ্ধ তখনও হয় নাই শেষ—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪২।৪ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

কয়েকটি প্যারডি ও কৌতুক কবিতা। কষ্টকৃত কৌতুক।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কলির দধীচী—শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

যুগমানব মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে বহু পুস্তক বাহির হইয়াছে ও হইবে। তাঁহার অমর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা, বাণী ও কীর্ত্তিকাহিনী জ্ঞাত হওয়া প্রত্যেক আবালবৃদ্ধবনিতা দেশবাসীর কর্ত্তব্য। সংক্ষেপে যাহাতে তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি ও তাঁহার প্রধান বাণীগুলি, তাঁহার সাধনা ও উপদেশ সম্বন্ধে জানা যায় সেই উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তদনুষ্ঠিত একটি প্রায়োপবেশন-পঞ্জিকা ও তাঁহার প্রিয় সঙ্গীতাবলী গ্রন্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়াছে। মহাত্মাজীর কয়েকখানি চিত্র ও মলাটের রঙীন চিত্রখানি ও উৎকৃষ্ট বোর্ড-বাঁধাই পুস্তকের সৌকর্য্যসাধন করিয়াছে।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ শীল

দেশের কাজে যারা দিল সব (নাটক)—শ্রীসতীকুমার নাগ। প্রকাশক—জাতীয় গ্রন্থঘর, ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি কিশোর-নাটক। ভূতের গল্প এবং রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনী প্লাবিত কিশোর-সাহিত্যে এই ধরণের বলিষ্ঠ দেশাত্মবোধক কিশোর-নাটকের প্রয়োজন খুব বেশী। নাটকের গল্পাংশ সুন্দর এবং প্রচুর নাটকীয় সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়—লেখক তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দুর্ব্বল ঘটনা বিন্যাসের জন্য চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি অপেক্ষা বর্ণনা এবং বক্তৃতা বিস্তারের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক থাকায় নাটকখানি আশানুরূপ রস নিবিড় হয় নাই। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল, কিন্তু নাটকের সংলাপ ধারালো এবং সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। সুজিতকুমার নাগের 'মাগো আমার ইচ্ছে করে বনের পথে যেতে" গানখানি চমৎকার।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

ধর্ম্মবিজয়ী অশোক—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা।

দেশবিদেশের ঐতিহাসিকগণের এ বিষয়ে ঐকমত্য আছে যে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক। কলিঙ্গ যুদ্ধে অনুষ্ঠিত ধ্বংস-লীলার মর্ম্মান্তিক দৃশ্য তাঁহাকে মৌর্য্য সম্রাটদের দিগ্বিজয়-নীতির পরিবর্ত্তে ধর্ম্মবিজয়-নীতি প্রবর্ত্তিত করিতে প্রণোদিত করে এবং তিনি হিংসার পরিবর্ত্তে 'অবিহিংসা' এবং শত্রুতার পরিবর্ত্তে প্রেম ও মৈত্রীর বাণী প্রচারকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। এই নৃপতিশ্রেষ্ঠের ধর্ম্মবিজয়-নীতি একদা সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরে ইরাণ, আসীরিয়া, সিরিয়া, মিশর, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থানে প্রচারিত হইয়া সমগ্র এশিয়াখণ্ডের প্রায় অর্দ্ধেক নরনারীকে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। বর্ত্তমান পুস্তকে লেখক অশোকের সেই ধর্ম্মবিজয়-নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। অশোকের রাষ্ট্রনীতিও ছিল ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রবোধবাবু বর্ত্তমান পুস্তকে তাঁহার সেই ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্রনীতির যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছেন এবং ধর্ম্মবিজয় ও অহিংসানীতি, অহিংসা ও রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ধর্ম্মনীতির পরিণাম—এই চারিটি অধ্যায়ে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার প্রধান উপজীব্য হইয়াছে অশোকের শিলালিপিসমূহ। লেখকের মতে এগুলি তাঁহার আত্মজীবনীস্বরূপ। এগুলির সাহায্যে তিনি সম্রাট অশোকের জীবন ও কৃতির নবভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান পুস্তকে লেখক যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা

মফঃস্বলে বসিয়া কলিকাতার দরে বই কিনুন

যে কোনও প্রকারের এবং বিভিন্ন প্রকাশকের নাটক, নভেল, ধর্ম্মগ্রন্থ, ভ্রমণকাহিনী, ব্যবসায় বাণিজ্য, চিকিৎসা ও আইনের পুস্তকাদি, স্কুল-কলেজের ও উপহারের জন্য যে কোনও ভাষায় দেশী ও বিলাতী ভাল ভাল পুস্তক আমরা সযত্নে কলিকাতার দরে সত্বর সরবরাহ করিয়া থাকি। লিখিলে লাইব্রেরী ও উপহারের জন্য নানাবিধ নূতন নূতন পুস্তকের সন্ধান বিনামূল্যে দিই। অর্ডারের সহিত মূল্যের অর্দ্ধাংশ দিলেই সমস্ত পুস্তক ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। প্যাকিং, সরবরাহ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। লিখুন :

কুণ্ডু পাব্লিসিটি সোসাইটী অব ইণ্ডিয়া
(পাব্লিকেশন এণ্ড বুক-সেলিং ডিপার্টমেন্ট)
১৪৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

প্রশংসনীয়। প্রচলিত ধারণা এই যে কলিঙ্গযুদ্ধের পর অশোক সম্পূর্ণরূপে সংগ্রামবিমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু লেখক অশোকের শিলালিপি ইত্যাদি বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তিনি পররাজ্যজয়লিপ্সা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'রাজ্যরক্ষামূলক' বা defensive যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন না। লেখকের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য এই যে, সম্রাট অশোক ব্যক্তিগত ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। সকল ধর্ম্মের, এমনকি বৌদ্ধধর্ম্মবিরোধী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার সমান শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে। সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক নীতিগুলি চুনিয়া চুনিয়া তিনি প্রচার করিয়াছিলেন এক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম—যাহাকে বলা যাইতে পারে 'সর্ব্বধর্ম্মসার'। সুতরাং তাঁর "বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের কাহিনী নিতান্তই অমূলক।"

প্রবোধবাবুর পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও রত্নখনি-স্বরূপ। স্বল্প-পরিসরের মধ্যে ইহার যথার্থ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল, বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকর্ষক। স্থানে স্থানে অশোকের চরিত্রবর্ণনায় তিনি আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু প্রতিপদে সংযমের রাশ টানিয়া রাখিয়াছেন—ভুলিয়া যান নাই যে, তিনি ইতিহাসই লিখিতেছেন, উপন্যাস লিখিতে বসেন নাই। পরলোকগত ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়ার সুচিন্তিত ভূমিকাটি এই পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

আমাদের বাপুজী—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু। 'ভারতী বুক ষ্টল, ৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

বইখানি প্রধানতঃ ছেলেদের উপযোগী করিয়া লেখা এবং সেজন্যই লেখককে বিশেষ যত্নের সহিত মহাত্মা গান্ধীর জীবন হইতে এমন সব ঘটনা নির্ব্বাচন করিতে হইয়াছে যাহা শিশুমনে সাড়া জাগাইতে সক্ষম হয়। বইখানি পড়িলে গান্ধীজীর সমগ্র জীবনের চিন্তা ও কর্ম্মের সঙ্গে তাহাদের একটা মোটামুটি পরিচয় হইবে। লেখকের ভাষা সহজ, সরল এবং গান্ধীজীর জীবন-কথা বর্ণনা করিয়াছেন তিনি কথকতার ভঙ্গিতে। সময় সময় উচ্ছ্বাসের একটু মাত্রাধিক্য পরিলক্ষিত হইলেও রচনার মধ্যে আগাগোড়া যে আন্তরিকতার স্পর্শ রহিয়াছে তাহা পুস্তকখানিকে শিশু এবং বয়স্ক সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

পুস্তকের গোড়ায় 'মহাত্মা' শব্দের যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা লেখক করিয়াছেন, পুস্তকের কাহিনী অংশের তুলনায় তাহা একটু গুরুগম্ভীর হইয়াছে। এই অংশটুকু বাদ দিলেই ভালো হইত। পুস্তকে গান্ধীজীর বিভিন্ন অবস্থার কতকগুলি ছবি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা প্রচ্ছদপটটি মনোরম।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

পাটের অনুকল্প

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

চুকাই এক প্রকার গুল্মজাতীয় গাছ। উহার কাঁচা ছাল এত শক্ত যে কিছুতেই উহা ছেঁড়া যায় না। এই ম্যালভাসী বা জবা-গোত্রীয় গাছের ছালের আঁশ বা তন্তু পাটের চেয়েও শক্ত, তাহা হইতে অধিকতর উজ্জ্বল। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের টেষ্ট অনুসারে এই আঁশ পাটের অনুকল্প ("জুট সাবস্টিটিউট") বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

এই চুকাইকে "মেস্তা"ও বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে "চুকৈর" বলেন। বাংলার কোনও কোনও স্থানে, বিশেষতঃ মেদিনীপুর এবং চব্বিশ পরগণা জেলায় সব্জী-বিক্রেতারা এবং স্থানীয় বীজ বিক্রেতারা ইহাকে "টক ট্যাঁরস" বলে। শীতকালে কলিকাতার বৈঠকখানা বাজার, বহুবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট এবং অন্যান্য বাজারগুলিতে ডালের বড়ির আকারের গাঢ় লাল বর্ণের চুকাইয়ের ফলগুলি বিক্রয় হইয়া থাকে।

মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশের কোন কোন স্থানে এবং পঞ্জাবেও এই গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহার ফুলগুলি দেখিতে ঠিক কার্পাস ফুলের মত।

চাষের জন্য মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ইহার বীজ বপন করা হয়। এই গাছ খুব রৌদ্রবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে। অতিরিক্ত উত্তাপে যখন জমির রস শুকাইয়া যায় তখন ইহার চারাগাছ-গুলির পাতা ম্লান ও শীর্ণ হইয়া গেলেও প্রথম বারিপাতে সজীব হইয়া উঠে। বর্ষায় জমিতে জল দাঁড়াইয়া গেলেও গাছগুলি সহজে নষ্ট হয় না। যে অঞ্চলের জমি পাট চাষের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত সেখানে পাটের অনুকল্প হিসাবে চুকাই আঁশ উৎপাদন ভালভাবে হইতে পারে। চুকাই গাছ জাগ দিবার পর, পাটের চেয়েও সহজে আঁশ বাহির হয়।

চুকাই গাছের কতকগুলি বিশেষত্ব হইতে দেখা যায় উহা পশ্চিম বঙ্গের উচ্চ জমিতে বপন করিবার উপযোগী। পশ্চিম বাংলায় পাটের উৎপাদন কম; ইহা এ প্রদেশের একটি ঘাটতি উৎপন্ন দ্রব্য। নানা দিক হইতে বিবেচনা করিয়া পশ্চিবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ চুকাই আঁশ সম্বন্ধে তৎপর হইতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিও এই দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। অনুসন্ধিৎসুগণ খাদিপ্রতিষ্ঠান সোদপুর আশ্রমে চুকাই গাছ দেখিতে পাইবেন। ইহার আঁশ প্রভৃতির কার্য্যালয় ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতায় এবং সোদপুরে বিদ্যমান।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

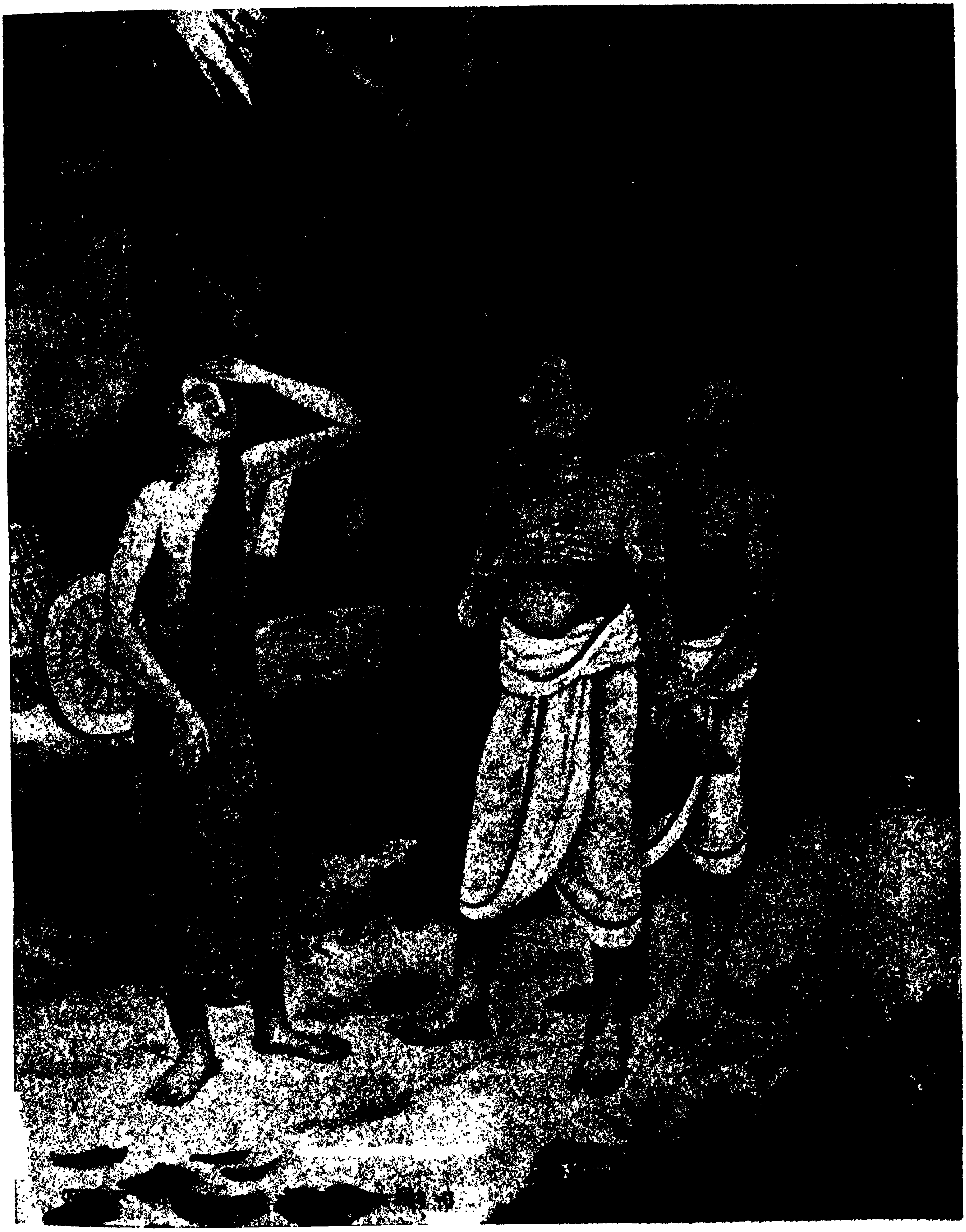

জগাই মাধাই

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসীগণ কর্তৃক পণ্ডিত নেহরুর অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন

১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭)। ভারত-স াটের শেষবাণী পাঠরত লর্ড মাউন্টব্যাটেন —পার্শ্বে মিঃ জিন্না

করাচি ব্যবস্থা পরিষদ্ ভবনে জিন্না ও তাঁহার ভগ্নী এবং সস্ত্রীক ভারতের শেষ ব া াট

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৮শ ভাগ ১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৫৫ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতার প্রথম বৎসর

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, সকল দেশ, সকল জাতি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধবিগ্রহ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের পথই বাছিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। ইউরোপের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতির ইতিহাসেই অবিরাম অবিশ্রাম সংগ্রামের কথাই পাওয়া যায়। শত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ (Hundred Years' War), ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ (Thirty Years' War)—ইহা ত বিখ্যাত। তাহা ছাড়াও বিরাট সমর-অভিযান, দিগ্বিজয় ইত্যাদির কাহিনী প্রত্যেক জাতির ইতিহাসের শত শত পৃষ্ঠা জুড়িয়া আছে। পরাধীন জাতি স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে বিনা বলিদানে, বিনা ধ্বংস-বিপ্লব রক্তের প্লাবনে, ইহা জগতের ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না। অথচ বিগত ১৯৪৭ সালের জুন মাসে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন যখন বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার পরিকল্পনা দিলেন তখন আমরা সকলেই ভাবিলাম অসম্ভব সম্ভব হইল, বিনাযুদ্ধে, বিনা বলিদানে আমরা স্বাধীনতা পাইলাম। আমাদের কাহারও জীবনধারায় কোন বাধাবিঘ্ন আসিবে না, রূপকথার রাজপুত্র রাজকন্যার মত আমরা চিরস্থায়ী সুখ স্রোতে তরী ভাসাইয়া যাইব। এ কথা কাহারও মনে উদিত হইল না যে, স্বাধীনতা ও সংগ্রাম এই দুই বস্তু বাস্তবের রাজ্যে প্রায়ই অবিভাজ্য সংজ্ঞা জ্ঞাপন করে। অতীতের ইতিহাসে সকল জাতিই সংগ্রামের পর স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, আমাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পর সংগ্রাম আসিবে প্রভেদ মাত্র এইটুকু।

বস্তুতঃপক্ষে স্বপ্নরাজ্যের বাহিরে সংগ্রামবিহীন স্বাধীনতার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। মনুষ্য জগৎ কেন প্রাণিজগতের সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বাধীন প্রাণীর জীবনমরণ, আহার-বিহার সমস্তই একটা অবিশ্রাম সংগ্রামের মধ্যে চলে। বিনা যুদ্ধে আহার্য্য সংগ্রহ, বিনাযুদ্ধে জীবনধারণ গৃহপালিত ভারবাহী বলিবর্দ্দই আশা করিতে পারে কিন্তু বনের স্বাধীন পশুও তাহা পায় না। অথচ সহস্র বৎসরের দাসত্বের ফলে আমরা স্বাধীনতার রূপ এমনই ভুলিয়াছি যে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিয়া লইলাম—বিনা রক্তপাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল হইতে যখন আমরা মুক্ত হইয়াছি তখন আমাদের সকল বিপদ-আপদের শান্তি হইল, অতঃপর আর কোনও ভাবনা আমাদের রহিল না।

সুখশান্তির এইরূপ অলীক স্বপ্ন কখনও কোথাও স্থায়ী হয় নাই, আমাদের ক্ষেত্রেও যে হইবে না ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আশ্চর্য্য এইমাত্র যে, আমরা এখনও বুঝিলাম না কেন এই ঝড়-ঝঞ্ঝা আসিল, কেন এই সুখের স্বপ্ন আলেয়ার মতই বাস্তবের কঠোর রশ্মিতে মিলাইয়া গেল। যাঁহারা আজ অনুযোগ-অভিযোগের গগনভেদী আর্ত্তনাদে ভারত-রাষ্ট্রের আকাশ মুখরিত করিয়াছেন তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত যে যদি রাষ্ট্র-বিপ্লব ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইত তাহা হইলে আজ দেশের অবস্থা কত শত গুণ ভীষণতর হইত এবং তখন তাঁহাদের এই সকল চীৎকারের অবকাশই বা থাকিত কোথায় এবং তাহা শুনিতে চাহিতই বা কে। সত্য কথা এই যে, আমরা স্বাধীনতার যোগ্যতা এখনও সম্যক্ অর্জ্জন করিতে পারি নাই, এবং আমাদের মধ্যে এখনও দাসত্বের চিহ্ন পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। রাষ্ট্রের ক্ষতি করিয়া নিজের ও দলগত স্বার্থকামনা চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি এখনও চতুর্দ্দিকেই রহিয়াছে তাহার প্রধান কারণ এই, সহস্র বৎসরের দাসত্বের ফলে দেশের অধিকাংশ লোকেরই মনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে রাষ্ট্র যখন পরের অধীন তখন তাহার ক্ষতি করিয়া নিজের লাভের পথ পরিষ্কার করাই সুবুদ্ধির পরিচয়। সেইজন্য আজ ধনিক আরও ধনলাভের জন্য রাষ্ট্রের সহিত ও ভারতের জনসাধারণের সহিত প্রবঞ্চক তস্করের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে এবং শ্রমিক দল বিশ্বাস-ঘাতক, বিদেশীর পঞ্চমবাহিনীর নায়কদিগের ছলনায় ভুলিয়া ক্ষণিক লাভের আশায় নিজের ও দেশের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিতেছে।

আজ এক বৎসর হইল দেশ স্বাধীন হইয়াছে। এই এক বৎসরে দেশের অবস্থার যেটুকু পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে যে

নৈরাশ্য বা আক্ষেপের কোন কারণ নাই একথা বলা বাতুলতার পরিচায়ক ইহা সত্য। কিন্তু সেই নৈরাশ্য বা আক্ষেপের কারণ দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া, সংগ্রামের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দাঁড়াইতে যিনি প্রস্তুত তাঁহার মধ্যেই স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা আছে এবং ভারত-রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা তাহারই হাতে। নৈরাশ্যবাদী ক্লীব, পরনিন্দায় মুখর সুবিধাবাদী বা সংগ্রামবিমুখ ভাগ্যান্বেষী যাহারা তাহারাই স্বাধীন-রাষ্ট্রের বিপদের কারণ। নিজেদের দুঃখকষ্ট মোচনের জন্য যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করি এবং নিজের অযোগ্যতা ও কর্ম্মবিমুখতা ঢাকা দিবার জন্য কেবলমাত্র পরের নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হই, তবে আমরা সর্ব্বনাশই ডাকিয়া আনিব এবং সেই সর্ব্বনাশের কবল হইতে আমাদের কেহই রক্ষা করিতে আসিবে না একথা যেন আমাদের স্মরণ থাকে।

স্বাধীন ভারতের জন্মক্ষণ হইতেই চতুর্দ্দিকে বিপদ-আপদ দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতে আরও ঘোরতর বিপদের আশঙ্কা আছে বলিয়াই পণ্ডিত নেহরু তাঁহার ১৫ই আগষ্টের বেতার-বক্তৃতায় বলেন যে, "সংঘর্ষ চলিতেছে এবং ভারতে ও সমস্ত বিশ্বে ব্যাপক সংঘর্ষের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জনরবও রটিতেছে। আমাদের সর্ব্বপ্রকার বিষম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। জাতির সম্মুখে যখন বিপদ উপস্থিত হয় তখন নিঃশঙ্ক-চিত্তে এবং পুরস্কারের আশা না রাখিয়া জাতির সেবায় আত্মোৎসর্গ করাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য।" পণ্ডিত নেহরু বাহিরের বিপদের কথাই বলিয়াছেন, যাহার সম্ভাবনার সূচনা আমরা পাইয়াছি জিন্নার ১৫ই আগষ্টের ঘোষণায়। ঐ ঘোষণা হিটলার বা গোয়েবেল্‌সের বক্তৃতার অংশ বলিয়া মনে হইতে পারে, এমনই তাহার ধরণ-ধারণ। প্রতিবেশীর মনোবৃত্তির এরূপ প্রকাশ্য পরিচয় যেখানে পাওয়া যায়, যাহার নীতি ও প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কাশ্মীর ও হায়দরাবাদে, সেখানে বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে প্রতিক্ষণে, প্রতিপদে। ভারত-রাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ বিপদের কথা বলিয়াছেন সর্দ্দার প্যাটেল তাঁহার ১৫ই আগষ্টের বেতার-বক্তৃতায়। তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন, "এক সময়ে সকলেই মনে করিয়াছিল যে, এশিয়ার মধ্যে চীনই সকলের অগ্রণী হইবে। কিন্তু চীনে আজ গুরুতর অন্তর্বিপ্লব বর্ত্তমান। জগতের মধ্যে কোন রাষ্ট্রই চীনের মত এত জটিল ও সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে নাই। তারপর মালয়, ইন্দোচীন এবং ব্রহ্মেরও আভ্যন্তরীণ অবস্থা আজ উদ্বেগজনক। ভারতেও যাহাতে সেইরূপ অবস্থার উদ্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা করাই ভারত-সরকারের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে কঠোর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করায় ভারতের জনসাধারণকে কিছুকালের জন্য আংশিক ভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। দেশের অবাঞ্ছিতদিগকে যদি অবিলম্বে কঠোর হস্তে দমন করা না হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা এশিয়ার অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও বিশৃঙ্খলা ও অচল অবস্থার সৃষ্টি করিত।" আজও এই অচল অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা চলিতেছে প্রচ্ছন্নভাবে ছদ্মবেশী শ্রমিক-নেতার প্ররোচনায়। সমস্ত ভারতের, বিশেষতঃ বাংলাদেশের ছাত্র-সমাজের, এক বৃহৎ অংশ এই পঞ্চমবাহিনীর প্ররোচকদিগের কার্য্যক্রমের ফলে আজ উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অবনতির পথে চলিয়াছে। অচিরে তাহাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় না হইলে তাহাদের অধঃপতন অনিবার্য্য।

কিন্তু রাষ্ট্রের অমঙ্গল ও অকল্যাণের প্রধান আশঙ্কা হইয়াছে কংগ্রেস কর্ম্মী ও তাঁহাদের নেতৃবর্গের দ্রুত নৈতিক অধঃপতনে। আজ দেশের চতুর্দ্দিকে ক্ষমতার লোভে ও অর্থলাভের লালসায় কংগ্রেসের নামে যে সকল দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে কঠোর হস্তে তাহার প্রতিকার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রের কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে সরবরাহ বিভাগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানা বিভাগ এই দুর্নীতির মূল আকর। এই সকল বিভাগের সমস্ত কার্য্যকলাপের অধিকাংশই সাধারণের দৃষ্টির আড়ালে হয় বলিয়াই উহাতে এতটা ঘুষ ও দুর্নীতির প্রসার হইয়াছে। কেন্দ্র ও প্রদেশের রাষ্ট্রচালকগণ যদি সত্য সত্যই রাষ্ট্রের মঙ্গল কামনা করেন তবে প্রত্যেকটি কণ্ট্রাক্ট, প্রত্যেকটি "পারমিট" এবং প্রত্যেকটি এজেণ্ট নিয়োগ সাধারণের অবগতির জন্য অবিলম্বে প্রকাশ করা প্রয়োজন, যাহাতে সাধারণে বুঝিতে পারে যে কোন্ বিভাগে কত অযোগ্য লোক, কত চোরাকারবারী রাষ্ট্রকে লুণ্ঠন ও প্রবঞ্চনা করার সুযোগ পাইল এবং কোন্ কংগ্রেস-ভেকধারীর অধঃপতন কতদূর অগ্রসর হইয়াছে।

প্রথম বৎসরের হিসাব-নিকাশ

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিল। এই মুক্তির জন্য দেশের ঐতিহাসিক সংহতিকে বলি দিতে হইল। তার ফলে ভারত-বর্ষের ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে দুইটি রাষ্ট্রের পত্তন হইল—ভারত-রাষ্ট্র ও পাকিস্থান-রাষ্ট্র। এই বিভাগের কথা মনে করিয়াই পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বলিয়াছিলেন—স্বাধীনতা, রাজনৈতিক মুক্তি ত আসিল, কিন্তু সেইজন্য আমাদের হৃদয়ে কোন আনন্দ নাই (there is no joy in our hearts)। ১৯৪৭ সালে ভারত-রাষ্ট্রের জন্মক্ষণে আনন্দোৎসবের মধ্যে যে নিরানন্দের ছায়া পড়িয়াছিল, ১৯৪৮ সালে বার মাস পরেও তাহা লুপ্ত হয় নাই।

এই অবস্থার জন্য কোন ব্যক্তিকে দায়ী করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ যে অবস্থার তাড়নায় ভারতবর্ষের বুকের উপর

দিয়া কালি টানিতে হইল অন্ততঃ গত পঞ্চাশ বৎসর হইতে তাহার পটভূমি ত প্রস্তুত হইতেছিল। এই আয়োজনে ব্রিটিশ কূটনীতি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, এই কথা স্বীকার করিয়াও আমাদের কোন সান্ত্বনা নাই। ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজের মনে একটা ভাব ছিল যে ধর্ম্মবিশ্বাসে ও জীবনযাত্রার দৈনন্দিন রীতিনীতিতে তাহারা প্রতিবেশী হিন্দু, শিখ, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সমাজ হইতে পৃথক। এই ভাব জমাট বাঁধিয়া উঠে যখন হইতে রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহাদের প্রভুত্ব ও প্রাধান্যের অবসান হয়। পরদেশী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে স্বাভাবিক ক্ষোভ তাহাদের মনে দানা বাঁধিতেছিল তাহা ইংরেজের কৌশলে প্রতিবেশী সমাজের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রিত হইতে আরম্ভ হইল। লর্ড কার্জ্জনের সময় যে বঙ্গবিভাগ করা হয়, সেই উপলক্ষে এই ভাবের একটা বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখিতে পাই। সেই সময়েই মুসলিম লীগের জন্ম হয় এবং তাহা স্বকীয় রূপ ধারণ করে ১৯৪০ সালে যখন লীগের লাহোর অধিবেশনে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূ-খণ্ডে পৃথক রাষ্ট্রে পত্তন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাবানুযায়ী উপায় অবলম্বন করিবার জন্য ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন সংগঠন করিবার কথা মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের মনে উদয় নাই, তাহারা প্রতিবেশী সমাজের বিরুদ্ধে আয়োজন-উদ্যোগ করিবার ব্যবস্থাই সহজ বলিয়া মনে করিল। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট কলিকাতায় ও তারপর নোয়াখালি-ত্রিপুরায় অক্টোবর মাসে যে তাণ্ডব ও রক্তারক্তির স্রোত প্রবাহিত হইল, তাহার ফলে সারা ভারতবর্ষে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইল। কলিকাতা, নোয়াখালি-ত্রিপুরার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল বিহার ও যুক্তপ্রদেশের পশ্চিমাংশে; পরে ইহারই প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হইয়া প্রকাশ পাইল পশ্চিম ও উত্তর পঞ্জাবে। বড়লাট ওয়াভেলের কর্তৃত্বাধীনে যে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল, তাহার অপদার্থতা প্রত্যক্ষ হইয়া পড়িল এই বিপর্য্যয়ের সময়; পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ছিলেন এই কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের সহকারী সভাপতি, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতবর্ষের শান্তিরক্ষা বিভাগের কর্ত্তা। কিন্তু মুসলিম লীগ প্রবর্ত্তিত অরাজকতা দমন করিবার আয়োজন তাঁহাদের সাধ্যের বাহিরে ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ তাহা দমন করিবার ইচ্ছা বড়লাট ওয়াভেলের ছিল না। এই নীতিগত বিপর্য্যয় ব্রিটিশ কূটনীতির কল্যাণে সৃষ্টি হইয়াছিল।

সুতরাং যখন ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনের বিধানানুসারে ভারতবর্ষের বিভাগ স্বীকার করিয়া লওয়া হইল তখন লোক-নেতাদের মনে যে হতাশার ভাব দেখা দেয়, তাহা পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর কথার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পঞ্জাবের জনসাধারণ—হিন্দু-মুসলমান-শিখ প্রতিবেশী-হত্যার প্রতিযোগিতায় এমন করিয়া মাতিয়া উঠিল যে ঐতিহাসিক যুগে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

পাকিস্থানের প্রতিক্রিয়া

১৯৪৭ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসের তাণ্ডব মহাভারতে বর্ণিত যদু-বংশ ধ্বংসের কথা মনে করাইয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণ আপন কুলের নরনারীর নানা দুর্গতি দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন দস্যুরা যদু-নারীদের হরণ করিতেছে। আমরাও ইহা দেখিয়াছি। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর এই তের মাসে উত্তর-ভারত ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। মুষল-পর্ব্বের পরিণতি দেখিতে পাই ব্যাধ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ এবং তাঁহার দেহত্যাগে। স্বজন হত্যা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাঁচিবার কি কোন সাধ ছিল? সেইরূপ আমাদের সামনে আর একজন মহাপ্রাণ মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন; ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল। বিনায়ক গড়সে নিমিত্ত মাত্র।

১৯৩৭ সাল হইতে দশ বৎসর মুসলিম লীগ হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার করিয়া যে জমি তৈয়ার করিয়াছিল, এবং তাহাতে যে বীজ বুনিয়াছিল, তাহার ফসল ১৯৪৬-৪৭ সালে আমরা ঘরে তুলিয়াছি। ইহাই শেষ নয়। কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সমস্যা এই বিপদের প্রতি অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিতেছে। এই সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই যে পাকিস্থান রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এই বিষয়ে সক্রিয় ভাবে ভারত-রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যে উৎসাহ দিতেছে এবং নেহরু মন্ত্রিমণ্ডলী তাহাতে বাধা দিবার জন্য ও লোকসমক্ষে এই কুচক্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিবার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইয়াছে। পাকিস্থানের কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের নিকট যে আরজি পেশ করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে দেশের মধ্যে একটা মতভেদের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া এইরূপ মনে হয় যে এই অভিযোগ উপস্থিত না করিলে যে ফল হইত, আজিও তাহা হইয়াছে। ভারত-রাষ্ট্র ও পাকিস্থান-রাষ্ট্রের মধ্যে একটা যুদ্ধ চলিতেছে। গতানুগতিক ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াও পাকিস্থান-রাষ্ট্র যুদ্ধে গোড়া হইতেই নামিয়াছে।

এত দিন পাকিস্থান-রাষ্ট্র নানা মিথ্যা কথা বলিয়া কাশ্মীরের উপর হানাদারদের বর্ব্বর কার্য্যাবলীর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক নিয়ম অনুসারে এই দায়িত্ব সে এড়াইতে পারে না। এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে হানাদারেরা পাকিস্থান-রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া কাশ্মীর আক্রমণ করিতে দল বাঁধিয়া অগ্রসর হইয়াছে, পাকিস্থান-রাষ্ট্র তাদের বাধা দেয় নাই। এই অনিচ্ছার জন্য আন্তর্জ্জাতিক বিধান অনুসারে সে দোষী।

হায়দরাবাদ সমস্যা পাকিস্থান দাবীর অন্ত একটা রূপ। মুসলমান বলিয়া নিজাম মীর ওসমান আলী খাঁ এক কোটি ত্রিশ লক্ষ হিন্দুর উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, এই দাবীর পিছনে বর্ত্তমান যুগে কোন যুক্তি থাকিতে পারে, তাহা কেহই স্বীকার করিবে না। "ইত্তেহাদ-উল্-মুসলিমিন" নামে পরিচিত যে প্রতিষ্ঠান ২৫।৩০ লক্ষ মুসলমানের পক্ষে যুদ্ধের পায়তারা কষিতেছে, তাহারাও এই মনোভাবের সৃষ্টি। সুতরাং কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ প্রমাণ করিতেছে যে ভারতবর্ষকে দ্বি-খণ্ডিত করিয়া কোন লাভ হয় নাই। যে বিষ মুস্‌লিম লীগ ছড়াইতেছিল, তাহার ক্রিয়া এখনও চলিতেছে, এবং কোন উৎকট চিকিৎসা না হইলে সেই বিষ সমাজ-দেহ হইতে দূর হইবে না। সেই চিকিৎসা অবিলম্বে আরম্ভ করিতে হইবে। এই সমস্যায় জন-মন এমনি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে যে মন স্থির করিয়া কোন সংগঠনকার্য্যে হাত দিবার চিন্তা করিতেও পারিতেছে না। আত্মপর ভেদ-বুদ্ধি বিরহিত হইয়া একটা অক্ষম ক্ষোভে নিজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র স্বার্থ-চিন্তায় দিন গুনিতেছে। এই অবস্থা চলিতে দিলে ভারত-রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলে যে সব আশার কথা ভাবিতেছে, তাহা সফল হইবে না।

ভারতের প্রধান শত্রু চোরাকারবারী

এই নিরাশার আরও অনেক কারণ আছে। ভারত-রাষ্ট্রে প্রকৃতিপুঞ্জের জীবন-যাত্রার নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থার ব্যাপারে যে বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে, তাহা নিবারণ করিবারও কি তাঁহাদের সামর্থ্য নাই যাঁহাদের হাতে শাসন-দণ্ড আজ চলিয়া গিয়াছে? গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে; কংগ্রেসের নেতৃবর্গ আজ শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থিত; রাষ্ট্রের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা। সুতরাং রাষ্ট্রের সার্থকতা বা ব্যর্থতার জন্য কংগ্রেস নেতৃবর্গকে প্রশংসা বা নিন্দার ভাগ লইতেই হইবে। এই দায়িত্ব এড়াইবার উপায় নাই। সেইজন্য "ভাত-কাপড়ের" ক্ষেত্রে যে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছে, তাহার জন্য নিন্দা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রি-মণ্ডলীর প্রাপ্য। কংগ্রেসের ত্যাগ, কংগ্রেস নেতৃবর্গের বিদ্যা-বুদ্ধি কৌশলের বড়াই করিয়া এই নিন্দার মুখ বন্ধ করা যাইবে না। ভারত-রাষ্ট্রের দরিদ্র সাধারণ আজ হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে যে স্বাধীনতার আগমন তার জীবনে কোনও পরিবর্ত্তন আনিতে পারে নাই; তাহার প্রতিদিনের অভাব-অভিযোগের কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্যের নানা জটিলতা তাহার বুদ্ধিগ্রাহ্য না হইতে পারে; কিন্তু তাহার নিত্য-প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দ্রব্যের জন্য তাহাকে স্বাধীন রাষ্ট্রে কেন এরূপ কাঙালের মত দিন কাটাইতে হইবে, তাহার একটা কারণ আছে নিশ্চয়ই। যে জমি চাষ করিয়া শস্য উৎপাদন করে সে হয়ত তার উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য চারি গুণ মূল্য পাইতেছে; কিন্তু এই বর্দ্ধিত আয়ও তাহার অন্যান্য প্রয়োজনের মূল্য মিটাইতে পারিতেছে না। এক কাপড়ের ব্যাপারেই তাহার দুরবস্থা বিশেষ ভাবে দেখা হইতেছে, ইহা সর্ব্বাঙ্গীন চিত্রের একদিক মাত্র। এই কাপড়ের বাজার লইয়াই পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে যে স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ কাপড়ের উৎপাদক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর নিকট হারিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত জবাহর-লাল নেহরু এই কথা স্বীকার করিয়াছেন যে গত তিন-চার মাসে কাপড়ের উৎপাদক ও ব্যবসায়ী এক শত কোটি টাকা অন্যায় লাভ করিয়াছে। একটা হিসাবে দেখিয়াছি যে আমাদের কাপড়ের ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে ৭৫ কোটি টাকা উসুল করা হইয়াছে, এবং আয়কর ও বিক্রয়-কর বাবদ পঁচিশ কোটি টাকা রাষ্ট্রকে ফাঁকি দেওয়া হইয়াছে। অথচ এই অন্যায়ের কোন প্রতিকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলী করিতে পারিলেন না।

এই সম্পর্কে কাশ্মীরের সেখ আবদুল্লার মন্ত্রিমণ্ডলীর ব্যবস্থায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর শিক্ষা লাভ করা উচিত। কাশ্মীরের চাউলের ব্যবসায়ীরা দেশের লোকের গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল। "খান্দেদার" নামে পরিচিত এই শ্রেণী দেশের লোকের অর্দ্ধাহার ও অনাহারে অবিচলিত থাকিয়া চালের দাম মণ প্রতি ত্রিশ টাকায় তুলিয়াছিল। মন্ত্রিমণ্ডলীর কেহ কেহ ইহাদের "ধর্ম্ম-কথা" শুনাইতে গিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন কাশ্মীরের সহকারী প্রধান মন্ত্রী ও স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রী বক্‌সি গোলাম মহম্মদ তাহাদের "বুঝাইবার" ভার নিলেন। তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হইল; চাউলের দাম কমাইবার প্রস্তাবে তাহারা সম্মত হইল না। শেষ কথার জন্য দশ মিনিট সময় দিয়া বক্‌সি সাহেব অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। "খান্দেদাররা" অটল। তাঁহার আদেশে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দিলেন। তখনও "খান্দেদাররা" ভাবিল যে এ এক কৌতুক। পুলিসের গাড়ী আসিল, এবং তাহা চড়িয়া ছাপ্পান্ন জন ভুঁড়িওয়ালা "খান্দেদার" শহরের মধ্য দিয়া যাত্রা আরম্ভ করিল। শহরের কেন্দ্র-স্থানে পুলিসের গাড়ী থামাইয়া এক সভার অনুষ্ঠান হইল; শহরের লোক ইহাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় লাভ করিল। লক্ষ-পতিদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কাহাকেও রুষ্ট হইতে দেখা গেল না। পনর দিন জম্মু প্রদেশের জেলখানায় বাস করিয়া ইহাদের সুবুদ্ধির উদয় হইল। আগামী ফসল হইতে চাউলের ব্যবসা "জাতীয়করণ" হইবে।

ভারত-রাষ্ট্রে চোরাকারবারী ও দেশের লোকের গলা-কাটা ব্যবসায়ীদের অভাব নাই। বক্‌সি সাহেবের "দাওয়াই" তাহাদের প্রতি প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা কেন নেহেরু মন্ত্রি-

মণ্ডলীর মনে উদয় হয় না, তাহা একটা রহস্য হইয়া আছে। সমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী, রক্তশোষক এই শ্রেণী আজ বার মাস ধরিয়া স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের প্রজাপুঞ্জের জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের প্রকৃতি ও কার্য্য-কলাপ আজ কাহারও অবিদিত নাই। সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়াই "ইণ্ডিয়ান ফাইন্যান্স"-এর (সাপ্তাহিক) মত সংবাদপত্রও লিখিতে বাধ্য হইয়াছে যে অন্য দেশে ইহাদের রাষ্ট্রের শত্রু বলিয়া পরিগণিত করা হইত। এই পুঁজিপতিরা আমাদের জাতীয় সরকারের কার্য্যাবলী ভীতির চক্ষে দেখে; গোপনে তাহাদের বাধা দেয়। এদের নষ্টামি, সমাজদ্রোহিতা, সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধ ভারত-রাষ্ট্রের নানা ব্যর্থতার জন্য দায়ী; দেশের সংগঠন-চেষ্টা যে বানচাল হইতেছে তার জন্য এই শ্রেণীর কার্য্যকলাপ দায়ী। "ইণ্ডিয়ান ফাইন্যান্স"-এর ১৯শে জুন তারিখে এই বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়।

> "The attitude of Big Business in India to the National Government has been one of sullen suspicion, and frequently of covert hostility. It is the sinister and anti-social designs and the organised though veiled opposition of Big Business in India which must explain the failure of Government policies in many fields, and the tardy progress of their programmes in others. In any other country, conduct such as some of our businessmen have been guilty of, would be treated as nothing short of treason."

ইহাদের নষ্টামিতে কংগ্রেস কর্ম্মিবৃন্দ পর্য্যন্ত "নষ্ট" হইয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ যুগের কর্ম্মচারিবৃন্দ গত যুদ্ধের সময় কি করিয়াছিল, তাহা এত শীঘ্র ভুলিয়া যাইবার কথা নয়। পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া ইহারা দেশের মধ্যে অসততার স্রোত বহাইয়াছিল। সেই পুঁজিপতিরা আজও আছে; সেই কর্ম্মচারিবৃন্দ আজও তাহাদের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই দুই পক্ষের সঙ্গে কংগ্রেসের কর্ম্মিবৃন্দের এক বৃহৎ অংশ মিলিয়া গিয়াছে। চোরাবাজারী, "পারমিট" বেচা, সরকারী কণ্ট্রাক্ট লইয়া হাত-চালাকী—এই ত্রয়ীর মিলিত শক্তি আজ দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গ নিষ্ফল আক্ষেপ করিয়া দিন কাটাইতেছেন। বার মাসের মধ্যে তাঁহারা এমন কোন ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না যাহার ফলে চোরা-কারবারী দমন ও বিনষ্ট হয়, যাহার ফলে পুঁজিপতির রাক্ষসী লোভ সংযত হয়, যাহার ফলে অসাধু সরকারী কর্ম্মচারী শাস্তি পায়, কংগ্রেসকর্ম্মী তাহাদের আদর্শ-পূত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়া পায়। আমাদের ভাবের রাজ্যে, চিন্তা-ক্ষেত্রে কোথাও কোন অসত্য ও অন্যায় আছে, যাহার জন্য আমাদের নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের স্বাভাবিক শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহারা গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত সাধনা ও শিক্ষার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত করা কম কষ্টদায়ক নহে। কারণ ইহা আমাদের দেশবাসীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের কলঙ্কের কথা, এবং কোন সাংবাদিক নিজেদের দেশের লোকের কলঙ্ক কীর্ত্তন করিতে পারে না। কিন্তু যে যুগ সন্ধির সময়ে আমাদের কার্য্য করিতে হইতেছে, যে সময় বিপদের আশঙ্কার মেঘ আমাদের দেশের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, তখন দেশের লোকের নিরাশা এবং দেশ-নায়ক-বৃন্দের নিশ্চেষ্টতা ও অপারগতার কারণ আর তার ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার দায়িত্ব সাংবাদিকের।

মধ্যবিত্ত বেকার সমস্যা

মধ্যবিত্ত বেকার সমস্যা বাংলাদেশে অতি মারাত্মক আকার ধারণ করিতেছে। গত এক বৎসরে ইহা আরও তীব্র হইয়াছে। অথচ বাংলা-সরকারের এদিকে একটুকুও দৃষ্টি নাই। পঞ্জাবের আশ্রয়প্রার্থীরা সকল সুযোগ ত পাইতেছেই ঐ সঙ্গে সরকারী চাকুরিতে তাহারা খুব বেশী সংখ্যায় ঢুকিয়া পড়িতেছে। তার উপর আছে মাদ্রাজী। বাংলাদেশে সরকারী চাকুরিগুলিও ইহারা দখল করিয়া লইতেছে। কেন্দ্রীয় আয়কর বিভাগের সঙ্গে প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলির এই মর্ম্মে একটা বোঝাপড়া আছে যে, যে-প্রদেশে আপিস সেই প্রদেশের লোক প্রাদেশিক আপিসে নিযুক্ত করিতে হইবে। তদনুসারে বাংলাদেশের আয়কর বিভাগে বাঙালী নিযুক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি সম্প্রতি ঐ আপিসে প্রায় শতখানেক পঞ্জাবী ও মাদ্রাজী ঢুকিয়া গিয়াছে। শতখানেক বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার এইভাবে তাহাদের প্রাপ্য অন্ন হইতে বঞ্চিত হইল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। এই সব পদে নিযুক্ত হওয়ার উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন বহু লোক সিভিল সাপ্লাই বিভাগে অযথা বিনা কাজে বসিয়া আছে এবং কর্ম্মচ্যুতির আশঙ্কায় ক্লিষ্ট হইতেছে। তাহার বাহিরে তো অজস্র লোক আছে। ইহাদিগকে বাছিয়া আয়কর আপিস, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে প্রভৃতিতে ভর্ত্তি করা যাইতে পারে যদি বাংলা-সরকার এই কার্য্যের জন্য একজন উপযুক্ত লোককে ভার দেন। আসানসোলের রেল কারখানায় লোক নিয়োগ কার্য্যটা এতদিন সেখানেই হইতেছিল। সম্প্রতি ঐ রিক্রুটিং আপিসটি যুক্তপ্রদেশে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ বাঙালীর কর্ম্মপ্রাপ্তির ঐ পথটিরও দফা নিকাশ হইল। চাকুরি ভিন্ন অন্য কাজে বাঙালীকে সুযোগ দেওয়ার যে সব পথ আছে, অযোগ্য এবং স্বার্থপর লোকের হাতে পড়িয়া সেগুলিও কাজে লাগিতেছে না। কয়েক সপ্তাহ আগে মোটর ভেহিক্‌ল বিভাগ হইতে জনৈক অবাঙালীকে এক শত লরীর লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। এই লাইসেন্সগুলি এক শত জন বাঙালীকে ভাগ করিয়া দিলে এক শতটি পরিবারের অন্নসংস্থান হইত। এদিকে অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

সরকারী দপ্তরে অপব্যয়

অবিভক্ত বাংলার তুলনায় এখন ব্যয়ভার বহু ক্ষেত্রে সমান

রহিয়াছে, অনেক স্থলে বাড়িয়াছে এবং কোনস্থানে কমে নাই। সরকারী অর্থ বিভাগ তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। অর্থ বিভাগের মূল নীতি এই যে, ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা সরকারের টাকাকে নিজের টাকা মনে করিয়া ব্যয় করিবেন এবং ঐ মনোভাব লইয়া সকল বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিবেন। স্বাধীন বাংলায় এই নিয়মটি অবহেলা করা হইতেছে। মাঝে মাঝে মিতব্যয়িতার দুই-একটা নমুনা যে না দেখান হয় তা নয়, তবে সেটা সর্ব্বত্রই নিম্নতম কর্ম্মচারীদের উপর দিয়াই যায়। মোটা বেতনের বড় বড় নূতন চাকুরি সৃষ্টিতে ইঁহারা বাধা দেন না। অর্থ বিভাগের নিজের কথাই ধরা যাক। এই বিভাগের সেক্রেটারী পদে আগে বাংলাদেশের সব চেয়ে অভিজ্ঞ এবং কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারীকে বাছিয়া বাছিয়া নিযুক্ত করা হইত। মুসলিম লীগ আমলে অনেক বিভাগে অনেক কুকীর্ত্তি হইয়াছে, কিন্তু এই বিভাগটিকে কলুষিত করিতে তাহারা বিশেষ সক্ষম হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পর এক বৎসরের মধ্যে সেক্রেটারিয়েটের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই বিভাগটিতে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে।

কর্ম্মচারী সংখ্যার দিক দিয়াও অর্থ বিভাগে ব্যয়বৃদ্ধি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। সেক্রেটারীর সঙ্গে আবার এক জন সিভিলিয়ান স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। তার উপর চার জন ডেপুটি সেক্রেটারী মোতায়েন আছেন; অবিভক্ত বাংলায় সাধারণতঃ এক জন সেক্রেটারী এবং এক জন ডেপুটি সেক্রেটারী কাজ চালাইতেন, কাজ বেশী পড়িলে বড় জোর অপর এক জন ডেপুটি সাময়িক ভাবে আনা হইত। এখন অর্থ-বিভাগে এক জন ২৭৫০৲ টাকার সেক্রেটারী, এক জন সিভিলিয়ান স্পেশাল অফিসার আর এক-তৃতীয়াংশ বাংলায় চার জন ডেপুটি সেক্রেটারী! তাহার উপরে এসিষ্টাণ্ট-সেক্রেটারী প্রভৃতি ত আছেনই।

লালদীঘির দপ্তরখানায় ইংরেজ, মুসলিম লীগ এবং বর্ত্তমান আমলের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সংখ্যার তুলনামূলক হিসাব প্রকাশ পাইলে দেখা যাইবে যে, এখন মুসলিম লীগ আমলের চেয়েও বাংলাতে এক-তৃতিয়াংশ বেশী কর্ম্মচারী রহিয়াছেন এবং ক্রমশঃই সংখ্যা আরও বাড়িতেছে। জেলা শাসন, পুলিস প্রভৃতি ব্যয়বহুল এবং অনাবশ্যক কর্ম্মচারীবহুল বিভাগগুলিতে উচ্চপদাধিকারীর সংখ্যা আরও বাড়িয়াই চলিয়াছে। উচ্চতম পদে অযোগ্যতম লোক নিয়োগের যে নীতি ডাঃ ঘোষ আরম্ভ করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাঁহার পরবর্ত্তী পদাধিকারীরা অতি যত্নের সহিত সেই পথেই চলিতেছেন, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অযোগ্য হইলে তাঁহাকে দুইটা এডিশনাল, তিনটা এসিষ্ট্যাণ্ট না দিলে কাজ চলে না; পুলিস কমিশনার অপদার্থ হইলে তাঁহাকে অনেক বেশী সংখ্যায় ডেপুটি কমিশনার দিতে হয়। অবস্থাটা সাধারণ ভাবে এই দাঁড়াইয়াছে যে প্রিয়পাত্র এবং পোষ্যবর্গের যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, তাহাদিগকে উচ্চতম পদগুলি দিতেই হইবে। সমান পদে যোগ্য লোক দিলে ইহাদের অপদার্থতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে, সুতরাং উপযুক্ত লোকদের নিম্নপদে নানাবিধ অছিলায় দাবাইয়া রাখা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যাহাকে উচ্চতম পদে বসাইতে হইবে তাহার কর্ম্মজীবনের মসীলিপ্ত এবং কলঙ্কমলিন রেকর্ডেও অসুবিধা হয় না; উপযুক্ত লোকদের সার্ভিস রেকর্ডে দোষ ধরা যায় না বলিয়া অন্য অছিলায় অর্থাৎ Confirmation আটকাইয়া রাখিয়া পরবর্ত্তী উচ্চ পদে প্রমোশন বন্ধ রাখা হয়। সমস্ত সরকারী বিভাগে এটা একেবারে সাধারণ নিয়মে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

সমবায় ও মৎস্য বিভাগের ব্যর্থতা

সমবায় বিভাগ কৃষির প্রাণ। ইংরেজ আমলে এই বিভাগটিকে চিরকাল উপেক্ষা করা হইয়াছে। তাহার কারণও আছে। আলাউদ্দীন খিলজী মুখেও বলিতেন যে, হিন্দুদের দারিদ্র্যের চরম সীমায় যদি চাপিয়া না রাখা যায়, একটুখানি দম ফেলিবার সুযোগ যদি তাহারা পায়, তৎক্ষণাৎ তাহারা বিদ্রোহ করিবে। তিনি ট্যাক্স নির্দ্ধারণ এবং আদায় এমনভাবে করিতেন যাহাতে হিন্দু পুরুষেরা মাঠের কাজের পর আর এক মুহূর্ত্ত সময় না পায় এবং স্ত্রীলোকেরা মুসলমান বাড়ীতে চাকুরি করিতে বাধ্য হয়। হিন্দুদের আর্থিক উন্নতির সমস্ত পথ তিনি কঠোর হস্তে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন খিলজী হিন্দুদের বেলায় যে নীতি প্রয়োগ করিয়াছেন, ইংরেজ সরকার হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলের উপর তাহাই চালাইয়া গিয়াছেন, শুধু মুখে কিছু বলেন নাই। ভারতের তিন-চতুর্থাংশ লোক কৃষিজীবী, ইহাদের অবস্থা সচ্ছল হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ টিঁকিবে না—ইংরেজ এটা খুব ভাল করিয়া জানিত; তাই কৃষি এবং সমবায় এই দুটি বিভাগকে তাহারা সর্ব্বপ্রযত্নে উপেক্ষা করিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন হইয়াছে বটে, কিন্তু নূতন শাসকবর্গ এখনও কোট প্যাণ্টলানের মোহ ছাড়িতে পারেন নাই; ইংরেজের ধারাটা এখনও অব্যাহতই রহিয়াছে। দেশকে বাঁচাইতে হইলে কৃষকের দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইবে, কৃষকের দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইলে কৃষি, সেচ এবং সমবায় বিভাগকে একমন একপ্রাণ হইয়া এক মহা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একযোগে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। দপ্তরখানার ফাইল ছাড়িয়া কর্ত্তাদের মাঠে নামিতে হইবে। বর্ত্তমান কর্ম্মচারীদের দ্বারা এটা হইবে না। কৃষি বিভাগের ভার দুই জন ভাগ্যান্বেষী এবং অক্ষম অবাঙালীর হাতে রহিয়াছে; সেচ বিভাগের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হইয়াছে একটি অকর্ম্মণ্য ও অক্ষম সিভিলিয়নের হাতে; এবং সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার রূপে

যাহাকে শীর্ষদেশে বসানো হইয়াছে তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে—এইরূপ সরকারী ব্যবস্থা যেখানে, সেখানে কৃষির উন্নতি হইবে কিরূপে? লোক নাই এই বাঁধা বুলি আমরা শুনিতে প্রস্তুত নহি। বাংলাদেশে মানুষ নাই এটা একেবারে মিথ্যা কথা। মানুষ আছে, খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

কৃষি বিভাগ হইতে মৎস্য বিভাগ আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে কেন তাহার তাৎপর্য্য আমরা বুঝিলাম না। মৎস্য-মন্ত্রী শ্রীহেম নস্করের সহিত মাছের ব্যবসায়ের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; এরূপ ক্ষেত্রে মৎস্যবিভাগ আলাদা করিয়া তাঁহার হাতে তুলিয়া দেওয়া হোক ইহা তো তিনি স্বভাবতই চাহিবেন। আমরা ইঁহার নিয়োগের পরেই লিখিয়াছিলাম যে এবার মাছের দাম ছয় টাকা হইবে। দাম যখন প্রায় পাঁচ টাকার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিল তখন নস্কর মহাশয় মন্ত্রীর গদী হইতে বিতাড়িত হন। মাছের দাম অল্প দিনের মধ্যেই আড়াই টাকায় নামিয়া আসে। বেগতিক দেখিয়া কাকুতি-মিনতি করিয়া ইনি পুনরায় হারানো গদী ফেরত পাইয়াছেন এবং যথারীতি মাছের দর আবার হু হু করিয়া চড়িয়া চার-পাঁচ টাকা হইয়াছে। মাছের দর বৃদ্ধির একমাত্র কারণ দালালদের অতি লোভ এবং এটা সংযত করা আদৌ কঠিন নয়; তবে এর জন্য নিঃস্বার্থ লোকের হাতে ভার দেওয়া দরকার।

কলিকাতার পুলিস ও বেঙ্গল পুলিস

কলিকাতার পুলিস অন্তর্বিদ্বেষে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে ইহা প্রতিজনে প্রতিদিন অনুভব করিতেছেন। পুলিস কাজে তৎপরতা না দেখাইতে পারিলেও বক্তৃতায় সক্ষম হইতেছে। কমিশনার প্রতি মাসে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করিতেছেন এবং পূর্ব্বে গোয়েন্দা বিভাগের ও বর্ত্তমানে হেড কোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনার শ্রীপ্রণব সেন পত্রিকায় সচিত্র প্রবন্ধ লিখিতেছেন। অপরাধ কিন্তু ইহাতে কমিতেছে না, বাড়িয়াই চলিয়াছে। জুলাই মাসের মধ্যে ১১২ জনের পকেট মারা গিয়াছে, ৯০ জন ধরা পড়িয়াছে; প্রকাশ্য দিবালোকে সাইকেল চুরি হইয়াছে ৮৮টি, ধরা পড়িয়াছে ১৪টি; রাত্রে রাহাজানি হইয়াছে ২০১টি, ধরা পড়িয়াছে ৫২টি; ডাকাতি হইয়াছে ১৪টি, ধরা পড়িয়াছে ৭টি; বাড়ীর চাকর কর্ত্তৃক চুরি হইয়াছে ১৫৫টি, ধরা পড়িয়াছে ৪৮টি। এইসব ধরা পড়া লোকের মধ্যে আসল অপরাধী কয়টি এবং চাকরি বাঁচাইবার জন্য গ্রেপ্তারই বা কয়টি তাহা জানা নাই। ডাকাতি দমন বিভাগটি যত দিন ছোট ছিল তত দিন ভাল কাজ হইয়াছে; এখন উহার আয়তন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাই ডাকাত ধরা পড়িতেছে না। যেগুলি ধরা পড়িতেছে তাহার মধ্যেও কিছু রহস্য আছে বলিয়া সন্দেহ হয়।

গত বৎসর শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী"তে কলিকাতা পুলিসের লোক নিয়োগের সমালোচনা করিয়া আমরা দেখাইয়াছিলাম যে উহাতে পুলিস অধঃপাতে যাইতে বাধ্য। ঠিক তাহাই হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি যে মন্ত্রী মহাশয়ের অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার অবকাশে বর্ত্তমান পুলিস কমিশনার নিজের দল পাকা করিতেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে কলিকাতার পুলিসবাহিনীর নিয়মশৃঙ্খলা ও কার্য্যোৎসাহকে (discipline and morale) ক্রমে ক্রমে দিয়া মহানগরীর সর্ব্বনাশ করা হইতেছে সেটা কেহ দেখিতেছেন না। কলিকাতা পুলিস ও বেঙ্গল পুলিশ একত্রীভূত করিয়া তিনি নিজের লোক আমদানী করিতেছেন এবং কলিকাতা পুলিসের অভিজ্ঞ ও সৎ কর্ম্মচারীদের দাবাইয়া রাখিতেছেন। গ্রামের ও শহরের পুলিস পৃথিবীর কোন দেশ কখনও একাকার করে নাই; কলিকাতায় ইহাই করা হইতেছে। শহরের অপরাধীরা চতুর, শিক্ষিত এবং বহু ক্ষেত্রে অর্থশালী। স্পেশাল ট্রিবিউনালের কয়েকটি মামলায় দেখা গিয়াছে যে অপরাধ করিবার সময়েই ইহারা উকীল এবং অডিটার প্রভৃতির পরামর্শ লয়। ইহাদিগকে ধরিবার জন্য যে পুলিস দরকার তাহাদের উচ্চশিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থাকা চাই। ইহাদের গ্রামে বদলী করা যেমন বোকামী, গ্রামের আনাড়ী পুলিশ সহরে আনিয়া তাহাকে দিয়া আধুনিক অপরাধী ধরাইবার চেষ্টা আরও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। গ্রামের অপরাধ ধরিবার জন্য অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত লোক অল্প বেতনে নিয়োগ করিলেই যথেষ্ট। এই দুইটি একাকার করিলে সকলের দৃষ্টি থাকিবে কলিকাতার দিকে; না থাকিলে এ-আই-জি (ফোর্স)এর হেড ক্লার্ককে ঘুষ দেওয়ার প্রয়োজন থাকিবে না। শহরের পুলিস পাঁচ বৎসরের পর গ্রামে বদলী হইয়া অর্জ্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ভুলিবে এবং গ্রামের পুলিস কলিকাতায় বদলী হইয়া চোখ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে বদলীর সময় আসিবে—এটা জানিয়াও ডাঃ ঘোষ এই বিচিত্র ব্যবস্থাটি করিয়া গিয়াছেন এবং বর্ত্তমান পুলিস-মন্ত্রীও উহাই আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন। থানার পুলিসকে দিয়া কোন কাজ হয় না, বাসার চাকরের চুরিটা পর্য্যন্ত কমিল না। অথচ এন্টি-রবারি, এন্টি-স্মাগলিং প্রভৃতি গালভরা নামের নূতন নূতন বিভাগ ক্রমেই বাড়িতেছে। গোয়েন্দা বিভাগ, এন্‌ফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ, ডাকাতি দমন বিভাগ ও এন্টি-স্মাগলিং বিভাগ—একই ধরণের কাজের জন্য এই চারটি আলাদা বিভাগের প্রয়োজন কিসের? আমরা জানি এবং জনসাধারণও বিশ্বাস করে যে শ্রীসত্যেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপর ভার দিলে এবং উপযুক্ত সহকারী দিলে এই চারটি বিভাগের কাজই তিনি একাই কৃতিত্বের সহিত চালাইতে পারেন।

কলিকাতা পুলিসে দুর্নীতি

কলিকাতা পুলিস ও বেঙ্গল পুলিস একীকরণ সম্বন্ধে আমরা এই কৈফিয়ত শুনিয়াছি যে তাহা হইলে নাকি কলিকাতার মার্কামারা অযোগ্য ও অসৎ কর্ম্মচারীগুলিকে আরামবাগ পাঠানো যাইবে। কিন্তু কার্য্যকালে দেখিতেছি শশিকলার ন্যায় গত এক বৎসর যাবৎ এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীদেরই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

গত মাসে কলিকাতা পুলিস এসোসিয়েসন একটি সম্মেলন করিয়া প্রকাশ্যে এই বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে কলিকাতা ও বেঙ্গল পুলিস একাকার করা বন্ধ করা হউক। পুলিস-দুর্নীতিপরায়ণতা বন্ধ করিবার জন্য আগে আত্মীয় প্রেম ও আশ্রিতবাৎসল্য বন্ধ করা হউক, তারপর অসাধু কর্ম্মচারীদের বাছিয়া বাছিয়া বরখাস্ত করা হউক। এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে গবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া উহার প্রতিকার দাবি করেন এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীহিমাংশু গুপ্ত মূল প্রস্তাবগুলি উত্থাপনকালে দুর্নীতির কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দেন।

এখন আমাদের পুলিসের যে অবস্থা লণ্ডন পুলিসের অবস্থা ১৮২৮ সালে ঠিক তাহাই ছিল। প্রধান মন্ত্রী পীল পুলিস-সংস্কারে বদ্ধপরিকর হন এবং বাছিয়া বাছিয়া সৎ, শিক্ষিত এবং স্বাস্থ্যবান লোক উপযুক্ত বেতনে নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। কনেষ্টবলের বেতনের শতকরা ২০ ভাগ বেশী পাইত সার্জ্জেণ্ট, ইনস্পেক্টরের বেতন তার দ্বিগুণ এবং সুপারিণ্টেডেণ্টের বেতন চার গুণ। আমাদের দেশে কনেষ্টবল ২৫৲ টাকা; সার্জ্জেণ্ট ও ইনস্পেক্টর ২৫০৲ টাকা এবং সুপারিণ্টেডেণ্ট ১০০০৲ হইতে ২০০০৲ টাকা। পীল ৫০০০ পুলিশ কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করিয়া এবং ৬০০০ জনকে পদত্যাগে বাধ্য করিয়া ৩০০০ লোকের একটি আদর্শবাহিনী গঠন করিতে সক্ষম হন। আমাদের পুলিস মন্ত্রী ইহার সবই জানেন, আরও জানিবার ইচ্ছা থাকিলে সে সুযোগও তাঁহার রহিয়াছে, এই কাজে হাত দিলে দেশসুদ্ধ লোকের সহানুভূতি তিনি পাইবেন ইহা বুঝিবার মত বুদ্ধিও তাঁহার আছে; তথাপি তিনি কমিশনার মহাশয়ের হাতের ক্রীড়নক হইয়া দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া কলিকাতাকে অরক্ষিত শহরে পরিণত করিতেছেন কিসের মোহে এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

শাসন যন্ত্রে দুর্নীতি

পূর্ণ এক বৎসর হইল ভারতবর্ষ ইংরেজের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। রাজনৈতিক হিসাবে দেশ এখন স্বাধীন, কিন্তু এই স্বাধীনতা এখনও জনগণের অধিগত হয় নাই। নবভারতের নূতন শাসকবর্গ এক বৎসরের মধ্যে দেশের মূল সমস্যাগুলির কোন সমাধানই করিতে পারেন নাই। রাজনৈতিক সমস্যাগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল দেশীয় রাজাদের গুটাইয়া আনিয়া সর্দ্দার প্যাটেল একটি মস্ত সমস্যার সমাধান প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছেন; বাকি রহিয়াছে শুধু হায়দরাবাদ। কাশ্মীর লইয়া আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির খেলা চলিতেছে। কিন্তু অন্য রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যে দেশরক্ষার আয়োজন, সমরোপকরণ নির্ম্মাণব্যবস্থা ও সামরিক শিক্ষা উপেক্ষিত হইতেছে। শিক্ষা সমস্যা সমাধানকল্পে এতদিন যতটা কাজ অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল, তাহাও হয় নাই।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় গবর্মেণ্টই সমান অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। এক দিকে দেশের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, চিনি, তেল, সাবান প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য্য সর্ব্ববিধ দ্রব্যের অভাব এখনও তীব্র হইয়াই রহিয়াছে, অপর দিকে ঐ সব দ্রব্য চোরাই পথে পাকিস্থানে বিস্তর পরিমাণে চালান যাইতেছে। ভারতের পশ্চিম ও উভয় প্রান্তে পাকিস্থানের সহিত যে বিরাট ভূমি-শুল্ক প্রাচীর উঠিয়াছে, তার মধ্যে এত বেশী রাজপথ রহিয়া গিয়াছে যে উহাদের ভিতর দিয়া দেশের অমূল্য সম্পদ বাহির হইয়া যাইতেছে। শুধু পাকিস্থানে গিয়াই যে এই সব চালান থামিতেছে তাহা নহে, পাকিস্থান মারফত ভারতীয় দ্রব্যের চোরা কারবার পশ্চিম এশিয়ায় আরব রাজ্যসমূহ এবং পূর্ব্ব এশিয়ায় চীন দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষে নিদারুণ কাপড়ের অভাব রহিয়াছে, অথচ চোরাপথে করাচী হইয়া কাপড় আরবদেশে এবং চট্টগ্রাম হইয়া চীন দেশে যাইতেছে। রেলকর্ম্মচারী, পুলিস এবং ভূমি-শুল্ক কর্ম্মচারিবৃন্দ এই চোরাকারবারের সক্রিয় সহায়ক। রেলের ছাদের তক্তা সরাইয়া জলের ট্যাঙ্কে কাপড় ভর্ত্তি করিয়া ঐ তক্তা আবার বসাইয়া যথারীতি রং করিয়া দেওয়া হইতেছে এরূপ ব্যাপারও ধরা পড়িয়াছে। রেলকর্ম্মচারীদের সাহায্য ভিন্ন ইহা কখনও হইতে পারে না। কলিকাতায় শিয়ালদহ ষ্টেশনে ভূমি-শুল্ক বিভাগের যে সব কর্ম্মচারী মোতায়েন রহিয়াছেন তাঁহারা যথাসম্ভব চোরাকারবারের সুযোগ করিয়া দিতেছেন বলিয়া সংবাদপত্রে অভিযোগ হইয়াছে। রাত্রের যে সব ট্রেনে জোর চোরাকারবার চলে সেগুলিতে তল্লাসী বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ ভারপ্রাপ্ত অফিসার দিয়াছেন এরূপ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতিকার হয় নাই। যে সব সৎ কর্ম্মচারী তল্লাসী করিয়া কর্ত্তব্যপালন করিতে চাহিতেছে তাহাদিগকে ইনি বাধা দিয়া রাখিতেছেন

এবং বিভাগ হইতে সরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। ভূমি-শুল্ক বিভাগের কালেক্টর এই অভিযোগ জানেন কিন্তু উহার প্রতিকারের কোন প্রয়োজন তিনিও অনুভব করেন নাই। মাঝে মাঝে বছরে কয়েক হাজার বা দু-এক লক্ষ টাকার মাল আটকের চমকপ্রদ সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে; এবং কোটি কোটি টাকার চালান যে ধরা পড়িল না এই ঢক্কা নিনাদের দ্বারা তাহা চাপা দেওয়া হইতেছে।

খাদ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ম বক্তৃতা অনেক হইয়াছে কিন্তু কাজ কিছুই হয় নাই। গত এক বৎসরের মধ্যে কোন বিষয়ে একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই, কাজ আরম্ভ হওয়া ত দূরের কথা। সুপরিকল্পিত ভাবে কাজ আরম্ভ করিতে হইলে শাসনযন্ত্রের দক্ষতা ও সততা বৃদ্ধি অপরিহার্য্য। তাহার জন্ম সর্ব্বশক্তি দিয়া দুর্নীতি দমন আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই কাজটিও এখনো আরম্ভ হইল না।

সেচ বিভাগে অবহেলা ও অক্ষমতা

সেচ বিভাগের কাজ সুপরিকল্পিত না হইলে কৃষির উন্নতি পদে পদে ব্যাহত হইতে বাধ্য। জল সরবরাহ এবং জল নিকাশ বাংলাদেশে এই দুইটাই সমান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের যে স্বাভাবিক প্রণালীগুলি ছিল ইংরেজ আমলে সেগুলি ধ্বংস করা হইয়াছে। বাংলাদেশের এই মহা অনিষ্ট কিরূপে করা হইয়াছে তাহার বিস্তারিত পরিচয় বিশ্ববিখ্যাত সেচবিশেষজ্ঞ সার উইলিয়াম উইলকক্স কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহাতেও গবর্ন্মেণ্টের চোখ খোলে নাই। দামোদরের সহিত সংলগ্ন কাণানদীগুলি সমস্ত এলাকায় জল সরবরাহ করিত এবং স্থানীয় লোকেরা নিজেরাই ঐগুলি সংস্কার করিয়া রাখিয়া জলের ব্যবস্থা করিয়া লইত। সেচ বিভাগের ইংরেজ বিশেষজ্ঞেরা কাণানদীগুলির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ঐগুলিকে উপেক্ষা করেন। নদীনালা সংস্কারের ভার আনু-ষ্ঠানিকভাবে সরকারী সেচবিভাগের হাতে যাওয়ায় তাঁহারাও উহা করেন নাই, দেশের লোকেও করিবার সুযোগ পায় নাই। বাংলার বিচিত্র প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং বৈষয়িক সমস্যার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত বিলাতী বিশেষজ্ঞেরা পুঁথিগত বিদ্যার জোরে উল্টা বিধান দিয়াছেন, দেশের লোকের নিকট ঐ সব বিধান কার্য্যে পরিণত হইয়াছে এবং উল্টা ফল ফলিয়াছে। বিলাতী বিশেষজ্ঞেরা তাঁহাদের বেতনের টাকা লইয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। দেশের চাষী শুকনা মাঠ চোখের জলে চষিবার চেষ্টা করিয়া সপরিবারে শুকাইয়া মরিয়াছে। স্যার উইলিয়াম উইলকক্স তাঁর বক্তৃতায় এই কথাটাই বার বার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে বাংলার স্বাভাবিক যাহা কিছু ব্যবস্থা ছিল সেটিকে ধ্বংস করা হইতেছে এবং যে কাজটি করিলে বাংলা বাঁচিয়া যায় ঠিক সেইটি বাদ দিয়া কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সহস্র প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। বাঙালীর দারিদ্র্য এবং ম্যালেরিয়ার জন্ম এই বিপরীত বুদ্ধিই একমাত্র দায়ী। কৃষি বিষয়ে অভিজ্ঞ দেশপ্রেমিকরাও বার বার এই কথাই বলিয়াছেন যে, বাংলার শুভঙ্করের দাঁড়া প্রভৃতির ন্যায় ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থাগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিলে এবং পুকুরগুলির সংস্কার করিলে কৃষির প্রভূত উন্নতি হইবে। প্রচলিত ভূমি আইনে পুকুরগুলিও ভাগ হইয়াছে, ভাগের পুকুরের মাছটা সকলেই চায় কিন্তু সংস্কারের টাকাটা কেহই বাহির করিতে চায় না। যে সরিক পুকুর সংস্কার করিবে সম্পত্তিটা তাহার হইবে এই মর্ম্মে একটি আইন পাস করাইয়া লইলে গ্রাম্য সেচ ব্যবস্থার অপরিমেয় উন্নতি হইবে। দামোদর খালের ন্যায় ছোটখাট পরিকল্পনাও এখনই আরম্ভ হইতে পারে। বড় দামোদর স্কীম কবে কার্য্যে পরিণত হইবে তার জন্ম হাত গুটাইয়া বসিয়া না থাকিয়া এখন হইতে ছোটখাট কাজগুলি করিতে থাকিলে বছর দুয়েকের মধ্যে তার ফল পাওয়া যাইবে।

সেচ বিভাগে রাজনীতির প্রবেশ দেখিয়া আমরা আশঙ্কান্বিত হইয়াছি। এটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হওয়া দরকার, নতুবা উহা দেশের লোকের পক্ষে একটি মহা অনিষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। খাদ্য লইয়া রাজনীতি যেমন ঘোরতর নিন্দনীয় কার্য্য, খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ব্রহ্মাস্ত্র সেচকার্য্যে রাজনীতির প্রবেশও তেমনি নিন্দার্হ। ক্যানিং অঞ্চলে সারেন্দা-বাদের বাঁধ সরকারী সেচ বিভাগের অবহেলায় ভাঙ্গিয়াছে এবং উহাতে বিস্তৃত ভাবে উর্ব্বর জমি তিন বৎসরের মত নষ্ট হইয়া গিয়াছে; ইহা লইয়া আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এই বাঁধ ভাঙা ব্যাপার লইয়া একজন সুপরিচিত কর্ম্মী আন্দোলন করেন এবং উহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন। যে কর্ম্মচারীদের দোষে বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে তাহাদের বিষয়ে কোনও তদন্ত হয় নাই। এখন গবর্ণ্মেণ্ট স্থানীয় লোকদের বলিয়াছেন যে একটি কমিটি গঠন করিয়া তাঁহারা ঐ সমস্যা লইয়া ভবিষ্যতে কি করা উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করুন, তবে ঐ কমিটিতে তাঁহারা ঐ সুপরিচিত কর্ম্মীকে লইতে পারিবেন না। এই আদেশের তাৎপর্য্য লোকে এই বুঝিয়াছে যে যদি কোনও বিশেষ কর্ম্মীর চেষ্টায় স্থানীয় অধিবাসীরা বাঁধ ভাঙার ন্যায় একটা মহাবিপদ ও তাহার বিষময় প্রতিক্রিয়া হইতে উদ্ধার পায় তবে আগামী নির্ব্বাচনে ঐ এলাকা হইতে তাঁহার নির্ব্বাচন আটকান যাইবে না; কলিকাতায় নবাবী করিয়া যাঁহারা ঐ এলাকা হইতে এতকাল নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতে-ছেন তাঁহাদের পক্ষে সেখানে মুখ দেখান অসম্ভব হইবে। দেশবাসীর জীবন লইয়া এই শ্রেণীর রাজনৈতিক প্যাঁচ সুরু হইলে তাহা জাতির পক্ষে সমূহ অনিষ্টের কারণ হইবে।

কৃষির উন্নতি

অন্নসমস্যার সমাধান করিতে গেলে কৃষির উন্নতিতে মন দিতে হইবে। এ বিষয়ে আলোচনা অনেক হইয়াছে, কাজ কিছুই হয় নাই। ১৯৪২ সালে ডাঃ গ্রেগরী ফসলবৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা দিয়াছিলেন, তদনুসারে কাজ হইলে এত দিনে অনেকটা সুফল পাওয়া যাইত কিন্তু তাহাও হয় নাই। ফসল বৃদ্ধির নামে ভারত-সরকার বহু কোটি টাকা খরচ করিয়াছেন, তার প্রায় সবটা জলে গিয়াছে। তার পর বহু শত কোটি টাকার খাদ্য আমদানী করিয়া দুর্ভিক্ষ সামলাইতে হইয়াছে। ভারত-সরকারের ন্যায় বাংলা-সরকারের কাজ এ বিষয়ে সমান অক্ষমতার পরিচায়ক। কৃষির উন্নতির পথে একটি গোড়ায় গলদ রহিয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ এটি একটি প্রাদেশিক বিষয়; তার পর কৃষির উন্নতির জন্য কৃষি বিভাগ এবং সমবায় বিভাগ একসঙ্গে একই লোকের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়া উচিত কিন্তু বাংলায় উহা দুইটি আলাদা মন্ত্রীর অধীন। কৃষি বিভাগ হইতে মৎস্য বিভাগ আলাদা করিয়া উহাকে অপর একটি তৃতীয় মন্ত্রীর অধীনে দেওয়া হইয়াছে। সমবায় বিভাগ রাখা হইয়াছে পুনর্বসতি মন্ত্রীর হাতে; পুনর্বসতি লইয়াই ইনি ব্যতিব্যস্ত, সমবায় বিভাগের প্রতি নজর দেওয়ার ইঁহার সময় কোথায়? সেচ বিভাগটিও কৃষি মন্ত্রীর হাতে থাকিলে ভাল হয়; এতটা কাজ এক জনের উপর দেওয়া হয়ত অনুচিত বোধ হইতে পারে, কিন্তু এটা ঠিক যে কৃষি সমবায় এবং মৎস্য বিভাগ গ্রাম্য অর্থনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন কর্ম্মী লোকের হাতে না দিলে কৃষির উন্নতি পদে পদে ব্যাহত হইতে বাধ্য। বাংলা-দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, ডাঃ ঘোষ কৃষি বিভাগের শীর্ষদেশে দুইটি ভাগ্যান্বেষী এবং বাংলার কৃষিবিষয়ে অজ্ঞ অবাঙালীর উপর ভার চাপাইয়া দিয়া গিয়াছেন; বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা উহাদিগকে সরাইয়া না দিয়া এখনও বহাল রাখিয়াছেন। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে যুক্তপ্রদেশের কৃষিবিভাগ সংগঠন করিয়াছেন কৃষি বিষয়ে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ এমন একজন বাঙালী হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও এবং তিনি বিনা বেতনে বাংলার কৃষি বিভাগে সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও বাংলা সরকার তাঁহাকে কাজে লাগাইতে পারিলেন না। ইঁহার নাম শ্রীপ্রমোদকুমার দে; যুক্তপ্রদেশে ডাঃ কাটজুর অধীনে ইনি কাজ করিয়া অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বাংলার খাদ্যসমস্যা সমাধান করিতে হইলে প্রমোদবাবুর ন্যায় লোকেরই দরকার; সিকা, ভান প্রভৃতির কর্ম্ম নয়। শ্রীসুশীল দের ন্যায় যে সব সিভিলিয়ানের উপর কৃষি বিভাগের উন্নতির ভার অর্পিত হইয়াছিল তাঁহারাও কিছুই করিতে পারেন নাই। এবার উপযুক্ত লোক আনা দরকার। কৃষি বিভাগে আজ-কাঁচা পয়সা আছে, সুতরাং এখানে মধুলোভী মক্ষিকার ভীড় হওয়া আশ্চর্য্য নয়। এই চাকটা অবিলম্বে ভাঙা দরকার। আলুর বীজ লইয়া গত বৎসর এবং এ বৎসর যাহা হইয়াছে ও হইতেছে তাহা ঐ বিভাগের অশেষ গলদের কিছু পরিচয় সূচিত করিতেছে।

পশ্চিম বাংলায় সামরিক শিক্ষা

পশ্চিম বাংলার গবর্ণমেণ্টের একটি প্রচার বিভাগ আছে। এই প্রদেশের সামরিক শিক্ষার সফলতা বা অসফলতা সম্বন্ধে তাহাদের কোন বিবৃতি পড়িয়া ব্যাপারটি বুঝা যায় না। বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষী বাহিনী দলের শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের এই অভি-যোগ প্রযোজ্য। কাঁচড়াপাড়া শিক্ষা-শিবিরে পশ্চিম বাংলার পূর্ব্ব প্রান্ত নিবাসী কতজন শিক্ষা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কতজন শেষ পর্য্যন্ত টিঁকিয়া রহিল, এই সম্বন্ধে এই বিভাগ নীরব। অথচ আমরা দেখিতেছি, বাহিরের লোকে এই বিষয়ে বেশী খবর রাখেন; নব-বঙ্গ সমিতির সভাপতি ডাঃ এস, কে, গাঙ্গুলী বলিতেছেন যে ৭০২ জন লোক ভর্ত্তি হইয়াছিল শিক্ষা শিবিরে, তাহার মধ্যে ৩৪০ জন টিঁকিয়া-ছিল শিক্ষা শেষ করিবার জন্য। এই অবস্থার কারণ সম্বন্ধে ডাঃ গাঙ্গুলী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

> প্রথম অবস্থাতেই আংশিকভাবে সময়মত খাদ্যদ্রব্যাদির অভাবের জন্য এবং অংশতঃ কোন একটি মহলের অপপ্রচারের ফলে শতকরা প্রায় ৫০ জন শিক্ষার্থী শিবির পরিত্যাগ করে। অবশিষ্ট শিক্ষার্থিগণের অধিকাংশই নদীয়া জেলাভুক্ত।

এই সংবাদ পড়িয়া মনে হয় যে পশ্চিম বাংলার গবর্মেণ্ট এই শিক্ষা ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম যে তাঁহারা এক বৎসরের মধ্যে পশ্চিম বাংলার প্রান্তবাসী গ্রামাঞ্চলের লোকদের মধ্যে ৬২০০ জনকে রক্ষী বাহিনীর উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া দিবেন। এই ঘোষণা অনুরূপ চেষ্টা করা হইতেছে কি না তাহা দেশের লোকের জানা প্রয়োজন।

ইংরেজের আমলে বাঙালীকে "অসামরিক জাতি" বলিয়া সামরিক বিভাগ হইতে দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছিল, এবং আমরা মাথা খাটাইয়া বা কলম পিষিয়া রাষ্ট্রের সেবা করি বলিয়া সামরিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের মনে এই ভাবটা বিদ্যমান বলিয়া শুনিয়াছি। বাংলাদেশ হইতে সৈন্যাধ্যক্ষ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সৈন্য পাওয়া যাইবে না—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নাকি তাঁহারা তাঁহাদের রংরুট নীতি নিয়ন্ত্রিত করিতে-ছেন। না হইলে দক্ষিণ-ভারতে মেলা বসাইয়া, ঢাক ঢোল বাজাইয়া লোক সংগ্রহের ব্যবস্থা চলিতেছে আর বাংলাদেশে এই কার্য্য চলিতেছে নিভৃতে কোন্ আপিসে বসিয়া। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে ভারত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট ইংরেজ আমলের জের টানিয়াই চলিবেন যদি না পশ্চিম বাংলার

গবর্মেণ্ট এই বিষয়ে সক্রিয় হইয়া কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে অভিষ্ঠ করিয়া তুলেন। আমাদের বিশ্বাস যে বাংলাদেশে আংশিক ভাবে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে, দেড় শত বৎসরের অনভ্যাসের শৃঙ্খল আমরা ভাঙ্গিতে পারিব না। পশ্চিম বাংলার গবর্মেণ্ট প্রদেশের বিশেষ অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিতে পারেন।

এই বিষয়ে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী একেবারে নিশ্চেষ্ট তাহা আমরা বলিতে চাই না। ১৮ই শ্রাবণের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রধান মন্ত্রীর একটি বিবৃতি দেখিলাম। তিনি বলিয়াছেন যে হিজলীর নিকটে একটি পরিত্যক্ত বিমান ঘাটিতে আবাসিক সামরিক শিক্ষা কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার একটা কল্পনা তাঁহার মাথায় খেলিতেছে; এই কলেজটি আজমীর, রাজপুতানা, বাঙ্গালোর (মহীশূর) ও ঝিলামের (পূর্ব্ব পঞ্জাবের) অনুরূপ করিবার চেষ্টা হইবে। এই প্রস্তাবের মধ্যে বাংলায় সামগ্রিক সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন মিটাইবে না; সেনাধ্যক্ষ তৈয়ার করিবে। কিন্তু বাংলার সৈনিক বাহিনী কোথায়? যে দুই ব্যাটেলিয়ন সংগ্রহের ও শিক্ষার পরিকল্পনা চলিতেছে, তাহার মধ্যে "জাত" বাঙালী কতজন থাকিবে, তাহা আমরা জানি না। প্রান্তিক রক্ষীবাহিনী দলটি প্রকৃতভাবে গঠন করিতে পারিলে, কিছু ভরসার কথা ছিল। কিন্তু এই বিষয়ে যে নীতি অনুসরণ করা হইতেছে, তাহার ফলে সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। পশ্চিম বাংলাকে স্পষ্ট জানাইতে হইবে এই বিষয়ে তাহার অভাব কোথায়।

দেড় শত বৎসরের অনভ্যাস এই বিষয়ে আমাদের শরীর মনকে অনড় করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার প্রতিষেধ চাই। ইহার প্রয়োগে কে অগ্রণী হইবেন—গবর্মেণ্ট, কংগ্রেস, না নূতন কোন প্রতিষ্ঠান? গবর্মেণ্ট তাঁহার "লালফিতা"র চালে চলিতেছেন, পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস যে কি চিজ তাহা "বঙ্গীয় রক্ষী বাহিনী"র ব্যর্থতায় প্রমাণিত হইয়াছে। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রিসভা নৈষ্ঠিক গান্ধিবাদী সাজিয়া এবং প্রদেশপাল শ্রীরাজাগোপালাচারী ঐ ভাবের ভাবুক বা দার্শনিক বলিয়া এই বিষয়ে বিশেষ কিছু করেন নাই। কংগ্রেস দলাদলি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছে; সামরিক শিক্ষার মত অত্যাবশ্যক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিবার তাহার সময় ছিল না। ডাঃ বিধান রায়ের মন্ত্রিমণ্ডলী এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন এবং নূতন প্রদেশপাল শ্রীকৈলাসনাথ কাটজু দার্শনিক নহেন এইমাত্র ভরসা। কিন্তু "অসামরিক জাতি" বলিয়া যে কলঙ্ক ইংরেজ আমাদের কপালে দাগিয়া দিয়াছিল, তাহা কেবলমাত্র সরকারের চেষ্টায় মিলাইয়া যাইবে না। যাঁহারা দলাদলির ঊর্দ্ধে থাকিয়া, এই কার্য্যে অনন্যমনা হইয়া খাটিতে পারিবেন, তাঁহাদের প্রতীক্ষায় আমরা বসিয়া আছি। তাঁহাদের আবির্ভাব সহজ ও সুগম করিবার জন্য আমরা মাসের পর মাস এই বিষয়ে কথা বলিয়া যাইতেছি। আমাদের সহযোগিতা তাঁহাদের জন্য অবারিত হইয়া আছে।

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ভার তাঁহার উপর। তিনি চিন্তাশীল লেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বোম্বাই-এর "নিউ ডেমক্রেট" (New Democrat) সাপ্তাহিক পত্রিকায় তিনি বাংলা ও বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই উপলক্ষে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে তিনি নিরাশার কথাই শুনাইয়াছেন। ভারত-রাষ্ট্রে বাঙালীর কোন বিশিষ্ট স্থান আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী নব-ভারতের সংগঠনে অগ্রণী হইতে পারে; কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে তাহার সেই শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। ব্যবহারিক জীবনে অন্য প্রদেশের লোকেরা বাংলাদেশেই তাহাদের কোণঠাসা করিয়া ফেলিয়াছে। এবং নিজের দেশে নিজের আসন অটল রাখিতে পারে নাই যে সমাজ, সর্ব্বভারতীয় সমাজে তাহার কোন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে তাহারা কোন্ শক্তিতে! বরং তাঁহাদের একটা সাংস্কৃতিক অভিমান আছে, যাহা অন্য প্রদেশের লোককে আঘাত করে; প্রতিদানে লাভ হয় তাহাদের বিরূপ ভাব। ইহাই হইল অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই প্রবন্ধ কয়টি পড়িয়া একটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগিয়াছে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নহেন বলিয়া আমরা জানি। সুতরাং তিনি বিংশ শতাব্দীর বাঙালীকে শ্রদ্ধা করিবেন, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। কিন্তু তিনি যে পর্য্যালোচনার ফল বোম্বাইয়ের সাপ্তাহিক পত্রিকায় বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন সত্য বস্তু থাকিলে বাঙালীকেই তাহা প্রথম শুনান উচিত ছিল। তাহা তিনি কেন করেন নাই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। সমাজবিজ্ঞানীর চক্ষু সমাজের দুর্ব্বলতার উপরেই প্রথমে পড়ে। এরূপ দুর্ব্বলতার বিবরণ প্রদানের এক মাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে যে উদ্দিষ্ট সমাজ নিজের চেষ্টায় নিজের দুর্ব্বলতা দূর করুক; নিজেকে সুস্থ করিয়া তুলিবার দায়িত্ব গ্রহণ করুক। বাঙালী হইয়াও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বর্ত্তমান বাংলা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অতি সামান্য, কেননা বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে তিনি সরেজমিনে এ বিষয়ে লেশমাত্রও অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। অন্য দিকে তিনি দূরে থাকিয়া আমাদের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিতে পান ইহাও ঠিক। কিন্তু তৎসম্বন্ধে, তাহার কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে, আমাদের সাবধান করিবেন, এরূপ

প্রত্যাশাই আমরা করিয়া থাকি। তাহা তিনি করেন নাই কেন ?

পূর্ব্বাচল প্রদেশ

বাঙালী-প্রধান কাছাড় জেলার মধ্যে একটি আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে; ক্রমশঃ ইহা আসামের অন্যান্য বাঙালী-প্রধান অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িবে। কারণ, আসাম-সরকার ইহার পিছনে তাঁহাদের গোয়েন্দা লাগাইয়াছেন যেমন করিতেছেন বিহার-সরকার মানভূম-ধলভূম অঞ্চলে। এইরূপ একটা আন্দোলনের কথা আমরা গত ফাল্গুন মাসে শুনিয়াছিলাম। ওয়ার্ধাগঞ্জে গঠনমূলক কর্ম্মিবৃন্দের একটি সভা হয়। গান্ধীজীর কর্ম্মপন্থায় যাঁহারা বিশ্বাসী সেইখানে তাঁহারা সম্মিলিত হইয়াছিলেন এবং "সর্ব্বোদয় সমাজ" প্রতিষ্ঠার কল্পনা গ্রহণ করেন। সেই সম্মেলন হইতে আগত এক জন কর্ম্মী, বাঙালী কর্ম্মী, আমাদের বলিয়াছিলেন যে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের কেহ কেহ এইরূপ নূতন প্রদেশ গঠনের কথা অনুমোদন করিতেছেন বলিয়া মনে হয়।

আজ প্রায় ছয় মাস পরে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এই নূতন প্রদেশ সংগঠিত হইবার যে আয়োজন চলিতেছে তাহাতে কাছাড়, ত্রিপুরা রাজ্য, মণিপুর রাজ্য ও লুসাই পাহাড়ের জনমণ্ডলীর সম্মতি আছে বলিয়া শুনিতেছি। আসাম প্রদেশের ২৫ লক্ষ আসামী ভাষাভাষী লোকসমষ্টির অহমিকাই নাকি এরূপ আন্দোলনের অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ এই সম্প্রদায়ের এইরূপ স্পর্দ্ধা নাকি অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। রাজনীতিক ক্ষমতা পাইয়া ইঁহারা যেরূপ হিতাহিত বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহার ফলে এরূপ একটা বিরোধী ভাবের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু এই নূতন প্রদেশের পক্ষে আন্দোলনকারী নেতৃবর্গকে আমরা একটা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতে চাই। তাঁহারা কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের, বিশেষতঃ সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের, মতামত জানিয়া লইবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া স্বরাষ্ট্র বিভাগ আসামের প্রদেশপালকে কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছেন। পশ্চিম বাংলার প্রদেশপাল এই দুইটি বাংলা ভাষাভাষী রাজ্যের সঙ্গে নিকটতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার কথা। সর্দ্দার প্যাটেলের বিভাগ তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মনে কি পরিকল্পনা আছে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। ভারত-রাষ্ট্রের পূর্ব্বাঞ্চল লইয়া আর একটা ভাঙা-গড়ার কাজে তাঁহারা মনোনিবেশ করিতেছেন, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। পশ্চিম বাংলার রাজনীতিকেরা এই বিষয়ে স্রোতের জলে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। নিজ নিজ দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থ তাঁহাদের নিকট বড় হইয়া উঠিয়াছে।

কস্তুর-বা শিক্ষা-কেন্দ্র

প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে পশ্চিম বাংলায় গঠনমূলক কিছু কিছু কার্য্য প্রয়োজনের তুলনায় অতি ধীরে চলিতেছে। নদীয়া জেলায় সাহেব-নগর গ্রামে কস্তুর-বা শিক্ষা-কেন্দ্র এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাতৃজাতির শিক্ষা ও সেবা-ধর্ম্ম লইয়া যে এই কাজের আয়োজন চলিতেছে তাহা বাংলা দেশে নূতন নয়। গত দশ বৎসর হইতে নারীশিক্ষা সমিতি অনুরূপ শিক্ষা ও সেবা করিয়া আসিতেছে। পল্লীগ্রামের বয়স্কা স্ত্রীলোকের মধ্যে লিখন, পঠন ও বর্ত্তমান যুগোপযোগী স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গবর্মেণ্টের কোন সাহায্য এই সমিতি পায় নাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর এক লক্ষ টাকা দানের উপস্বত্ব হইতে সমিতির এই প্রচেষ্টার ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়; আচার্য্য-পত্নী শ্রীযুক্তা অবলা বসু এই আয় সমিতির হস্তে অর্পণ করিয়া একটা নূতন শিক্ষার প্রবর্ত্তনে সাহায্য করিতেছেন।

সাহেব-নগর কেন্দ্র আরও ব্যাপক ভাবে এই কার্য্যের আয়োজন করিতেছে। ১৯৪৫ সালের নবেম্বর মাসে এই কেন্দ্রের পত্তন হয়। শ্রীযুক্তা নিরুপমা সেন এই কেন্দ্রের ভার প্রাপ্ত হন। এক বৎসরের মধ্যে ২৫ জন শিক্ষার্থিনী তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হন। এই সময়ে মুসলীম লীগ বাংলাদেশে যে আগুন জ্বালায় তাহা নিবাইবার জন্য তাঁহাদের ডাক পড়ে; কুমিল্লায় ও নোয়াখালিতে তাঁহাদের যাইতে হয়। ত্রিপুরার দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে দুইটি সেবাকেন্দ্রকে কস্তুর-বা কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করা হয়।

"সংগঠন" (মাসিক) পত্রিকায় সাহেব-নগর কস্তুর-বা শিক্ষা-কেন্দ্রের গত দুই বৎসরের কার্য্য-বিবরণীর একটা চুম্বক প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপাঠে আমরা জানিতে পারি যে ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে শিক্ষা-বৎসর আরম্ভ হয় তার অন্তে ১৮ জন শিক্ষার্থিনী শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৪৮ সালের মার্চ্চ মাসের হিসাবে দেখা যায় যে ২৩টি কেন্দ্রে ইঁহারা ব্যাপকভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন; প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্রে দুই জন করিয়া সেবাব্রতী বসিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১০টি কেন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গে—বানরিপাড়া (বরিশাল); কাইতল (ত্রিপুরা); হর-নগর (শ্রীহট্ট); সুচীপাড়া (ত্রিপুরা); ইব্রাহিমপুর (ত্রিপুরা); কাউনিয়া (বরিশাল); বাগোয়ান (কুষ্টিয়া); কানুনগোপাড়া (চট্টগ্রাম); কার্ত্তিকপুর (ফরিদপুর); বালিয়াখোড়া (ঢাকা)। বাকী কেন্দ্রগুলি পশ্চিম বাংলার নানা জেলায় বিস্তৃত। বাসুদেবপুর, বাল-গোবিন্দপুর, গোয়াল-পাড়া, ও বাড় বাসুদেবপুর (মেদিনীপুর); সাত মাইল বস্তি (কালিম্পং) ২টি কেন্দ্র; সাহেবনগর; কৃষ্ণচন্দ্রপুর (নদীয়া),

রাঘবপুর, হটুগঞ্জ ও বসর-কেন্দ্র (২৪-পরগণা); তাজিগ্রাম কেন্দ্র (বীরভূম); বাঁকুই কেন্দ্র (বাঁকুড়া)।

কস্তুর-বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিরাট ব্যাপার; ইহার কর্ম্ম-কেন্দ্র সারা ভারতবর্ষে বিস্তৃত আছে। ইহার অর্থসম্পত্তি, প্রায় ১২৫ লক্ষ টাকার সুদের আয়, যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গর্ব্বের বিষয়। বাংলাদেশের শিক্ষা-কেন্দ্রের বিবরণীর একটি সংবাদে আমরা সুখী হইয়াছি, ভবিষ্যতে ইঁহাদের সাহায্যে ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামসমূহে গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা বিস্তারের আশায়। হুগলী জেলার খালনা ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটি আপনি উদ্যোগী হইয়া দুইটি গ্রাম্য মেয়েকে শিক্ষার জন্য সাহেব-নগর শিক্ষা-কেন্দ্রে পাঠাইয়াছে। অন্যান্য ইউনিয়ন এরূপ উদ্যোগী হইলে বাংলাদেশের আশী হাজার গ্রামে কত বড় সংগঠন আরম্ভ করিতে পারেন! ভারতের নারীসমাজের সম্মুখে কি বিরাট কর্ম্মের সুযোগ উন্মুক্ত রহিয়াছে।

বিহার সরকারের অবস্থা

বিহার সরকার বড়ই ফাঁপরে পড়িয়াছেন। বাংলার সংবাদ-পত্র তাঁহাদের সম্বন্ধে নাকি মিথ্যা কথা প্রচার করিতেছে। ইহা একরূপ সহ্য করা যায়। কিন্তু যখন শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালার মত লোক "হরিজন" পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কলম ধরিতে বাধ্য হন, তখন ব্যাপারটা গুরুতর হইয়া পড়ে বই কি! গান্ধীজীর নাম ভাঙাইয়া যাঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে নিজের স্থান করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত পত্রিকায় গান্ধী-ভক্ত একজন প্রধানের বিরূপ সমালোচনা সহ্য করা কঠিন হইয়া পড়ে, এবং তাঁহাদের অভি-মান অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেইজন্য দেখিতে পাই যে বিহারের শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীবদরীনাথ বর্ম্মা রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিহারের ভাষা-শিক্ষা নীতির আলোচনা করিতে গিয়া তিনি "হরিজন" পত্রিকায় একটি পত্র লিখিয়া তাঁহার "বাঙালী ভাই-দের" উপর এক হাত লইয়াছেন। "তাহারা বিহার গবর্মেণ্টকে লোকচক্ষে হীন করিবার জন্য জিদ ধরিয়াছেন। বিহার প্রদেশের এক অংশ পশ্চিম বাংলাভুক্ত করিয়া লওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য, এবং মতলব হাঁসিল করিবার জন্য কোন উপায়কেই তাঁহারা অতি নীচ বলিয়া মনে করেন না।" তিনি নাকি এই কথা বলিতে "বড় ব্যথা" পাইয়া থাকেন। আমরাও তাঁহার "ব্যথার" নমুনা ও বহর দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি।

কিন্তু বর্ম্মাজী তাঁহার গুরুজী শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের মত জ্ঞান-পাপী বলিয়াই এরূপ "ব্যথা" পাইতেছেন। তিনি মনে রাখিতে চান না কি কারণে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল বিহার প্রদেশের অঙ্গরূপে বাংলাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়া-ছিল। এই প্রদেশের জন্মবার্ত্তা ঘোষণা করা হয় ১৯১১ সালে। ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে তদানীন্তন বিহারের নেতৃবর্গ একটি বিবৃতি দিয়া এই অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করেন; এবং কোন্ কোন্ অঞ্চল বিহার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ১৯৩১ সালে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে মানভূম জেলা কংগ্রেস সম্মেলনের একটি অধিবেশন হয়; এবং বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজে একটি প্রস্তাব করেন: "যেহেতু মানভূম জেলার লোক-সংখ্যার শতকরা উননব্বই জন বাংলা ভাষায় কথা বলেন, সেইজন্য এই সম্মেলন মনে করে যে যখন দেশ স্বাধীন হইবে এবং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠন হইবে, তখন মানভূম জেলা বাংলাদেশের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইবে।"

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ অসুবিধায় পড়িয়াএই প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হইয়াছেন ভান করিতেছেন। শ্রীবদ্রীনাথ বর্ম্মার মত তাঁহার চেলা-চামুণ্ডারা যে গুরুদেবকে ছাড়াইয়া যাইবেন তৎ-সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। "হরিজন" পত্রিকায় বর্ম্মাজীর পত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৩১ সালে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বীকার করিয়াছিলেন যে মানভূম জেলার শতকরা ৮৯ জন লোকের মাতৃভাষা বাংলা। আর ১৯৪৮ সালের ২৭শে জুলাই রাঁচি হইতে "হরিজন" পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত এক পত্রে বিহারের শিক্ষা-মন্ত্রী লিখিতেছেন:

> আপনি বোধ হয় জানেন মানভূমের শতকরা ৭০ হইতে ৮০ জন হয় হিন্দী নয়ত কোন উপজাতীয় ভাষা—বেশির ভাগ সাঁওতালী বলে। ইহাদের সকলকেই জোর করিয়া বাংলা ভাষার মাধ্যমে পড়ান হইত। নূতন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী এই সব লোক বাঙালীদেরই মত প্রাথমিক শিক্ষা কালে নিজের মাতৃভাষায় লেখাপড়া করিতে পারিবে। আমাদের কয়েকজন বাঙালী বন্ধু—তাঁহারা প্রায় সকলেই বাহির হইতে আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন—স্পষ্টতঃ এই পরিবর্ত্তন চান না এবং বাহিরের জগতের কাছে বিহার-সরকারের বদনাম দিবার জন্য সব রকম কলকৌশল খাটাইতেছেন।

এই "পুকুরচুরি" কি করিয়া সম্ভব হইল তাহা মশরু-ওয়ালাজী ধরিয়া ফেলিয়াছেন। সেইজন্যই ১১ই জুলাই-এর "হরিজন" পত্রিকায় "কুৎসিত পদ্ধতি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়া-ছিলেন: "সুতরাং স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় বিহারের যে সকল অঞ্চলে বাংলা ভাষার প্রচলন রহিয়াছে তাহাকে দাবাইয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা অনুচিত।" বিহার-সরকার তাহাই করিতেছেন এবং ধরা পড়িয়া লোককে, বাঙালীকে, অযথা গালি দিতেছেন।

হায়দরাবাদের প্রকৃত রূপ

ভারত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিবরণী প্রকাশ করিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে হায়দরাবাদ সমস্যার প্রকৃত রূপ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দৈনিক সংবাদপত্রে এই বিবরণীর যে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভারতবাসীর পক্ষে নূতন কথা কিছুই নাই। পূর্ণ বিবরণী পাইলে আমরা বলিতে পারিতাম ইহাতে হায়দরাবাদ রাজ্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন নির্দেশ আছে কিনা। কিন্তু যদিও এই বিবরণীতে নিজাম মীর ওসমান আলী খাঁ বাহাদুরের "কুলের কথা" বর্ণিত হইয়াছে, তবুও মনে হয় কংগ্রেস নেতৃবর্গ —যাঁহারা বর্ত্তমানে ভারত-রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য চালাইতেছেন, তাঁহাদের নিজাম রাজ্যের সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল ছিল না; তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, পাকিস্থান দাবীর পিছনে যে মনোভাব ক্রিয়া করিতেছিল, তাহার জন্মস্থান হায়দরাবাদে, এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন অধ্যাপক, সৈয়দ আবদুল লতিফ, তাঁহার হিন্দু মুসলমান সাংস্কৃতিক বিরোধ সম্বন্ধে পুস্তিকায় ১৯৩৮ সালে ভারত বিভাগের পক্ষে যুক্তি দিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটা সঙ্গতি ছিল। এই কথা বুঝিলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হায়দরাবাদ রাজ্যের গণ-আন্দোলনকে এমন ভাবে নিরুৎসাহ করিতেন না।

হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসকগোষ্ঠির ভারত-বিরোধী মনোভাব নূতন নয়। গত এক শত বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এই কথা পরিষ্কার বুঝা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তদানীন্তন নিজামের এক ভ্রাতা "ওহাবী" আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলিয়া সহযাত্রীদের সঙ্গে আটক-বন্দী ছিলেন। ১৮৫৭ সালের পর উত্তর-ভারতের মুসলমান প্রধানগণ নিজামের রাজ্যে নিজেদের ভাব ও আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন এই ভরসায় তথায় ভিড় করিতে থাকেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে মুসলিম সংস্কৃতির বিশেষ কেন্দ্ররূপে এই রাজ্যকে রূপায়িত করিবার আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ৫০ বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাহার মূর্ত্ত প্রতীক। আমাদের দেশের নেতৃবর্গের এই বিষয়ে নিরুৎসুক মন ছিল বলিয়াই তাঁহারা এই ঘটনার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই।

তারপর যখন পাকিস্থানী ভূত ভারতের বুকে নৃত্য আরম্ভ করিল তখন তাঁহারা মহম্মদ আলী জিন্নার কার্য্যকলাপ লইয়াই ব্যস্ত থাকিলেন, কিন্তু মুসলিম লীগ নেতার পিছনে নিজামের যে অর্থ ও নিজামের কূটবুদ্ধি জোগান দিতেছে, তাহা বুঝিলেন না। ব্রিটিশ রাজ্যের প্রয়োজনে নিজামকে জিয়াইয়া রাখার দরকার ছিল, সেই প্রয়োজনে মুসলিম লীগের জন্ম ইহাও সত্য। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিলেন না। ভারতবর্ষ যখন দ্বিখণ্ডিত হইল তখন নিজাম মীর ওসমান আলী খাঁর সাহস বাড়িয়া গেল। কারণ তাঁহাকে যে মারিবে হায়দরাবাদ রাজ্যের সেই গণ-আন্দোলনকে ত তাঁহারা বাড়িতে দিলেন না। আর একটা কারণ নিজামের সাহস বাড়াইয়াছে। তিনি দেখিলেন যে মহম্মদ আলী জিন্নার প্ররোচনায় হুসেন সহীদ সোহরাওয়ার্দ্দি বাংলাদেশে যে তাণ্ডবের সূচনা করিলেন তাহার ফলে লাভ হইল পাকিস্থান। সুতরাং এরূপ একজন ক্রীড়নকের সৃষ্টি করিতে পারিলে দাক্ষিণাত্যে পাকিস্থান কায়েম করা কঠিন হইবে না। সৈয়দ কাসেম রাজভী এই নীতির হায়দরাবাদী সংস্করণ। উত্তর-ভারত যদি মুসলমানের সংখ্যা-গরিষ্ঠতার নামে দ্বি-খণ্ডিত হইতে পারে, তবে দক্ষিণ-ভারত কেন দ্বি-খণ্ডিত হইবে না---মুসলমানের ৫০০ বৎসরের রাজনীতিক প্রাধান্যের (traditional political superiority of Muslims) নামে। কারণ নিজাম বাহাদুর কি বাহমনী রাজবংশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী নন? এই বিশ্বাস হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর মনে গাঁথিয়া গিয়াছে বলিয়াই মীর ওসমান আলী খাঁর দুরাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার রাজ্যের প্রকৃত রূপ কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে, আজ যাহা আমাদের চক্ষের উপর ঘটিতেছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। বিলম্বে হইলেও এই বিষয়ে আমাদের নেতৃবর্গ সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

আর একটা কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। "খুঁটির জোরে মেড়া লড়ে" এইরূপ একটা গ্রাম্য কথা আছে। কোন্ খুঁটির জোরে নিজাম লড়িতেছেন? ব্রিটেনের শ্রমিক গবর্ণেমণ্ট একটা সাফ জবাব দিয়াছেন। কিন্তু ব্রিটেনের শাসক-গোষ্ঠীর একাংশ যে নিজামের স্পর্দ্ধার পিছনে আছে, এই বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। মহম্মদ আলী জিন্নার মানসপুত্র পাকিস্থানের কথা না-ই বলিলাম। উত্তর-ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ যে পাকিস্থানের জন্মদাতা, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের সকলেই পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাহারা ভারত-রাষ্ট্রে আছে, এবং নিজাম ওসমান আলী খাঁ তাহাদের উপর কোন ভরসা রাখেন না, এই কথা কেহ বিশ্বাস করে না। কৌটিল্যের রাষ্ট্রনীতি এরূপ বিভীষণ-গোষ্ঠীর সহযোগিতার কথা আমাদের শুনাইয়া গিয়াছে। ভাবালুতায় ইহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। হিন্দুও ভারত-রাষ্ট্র বিরোধী হইতে পারে, তার প্রমাণ আছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর তাহা নির্ব্বংশ হয় নাই। হিন্দু ব্যবসায়ী প্রধানরা পর্য্যন্ত এরূপ বিশ্বাসঘাতকায় লিপ্ত আছে। এই সব বিপদের কথা মনে রাখিয়াই ভারত-রাষ্ট্রের শাসন-কর্ত্তাদের যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

ভারত-রাষ্ট্রে ইংরেজী ভাষার স্থান

বোম্বাই-এর ইংরেজী সাপ্তাহিক "ভারত-জ্যোতি" ভারত-রাষ্ট্রে ইংরেজী ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লোক-মত যাচাই করিয়া তাহার ফলাফল প্রকাশ করিয়াছেন। প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে ভারত-রাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাধ্যক্ষগণ (Vice-Chancellors) স্থির করেন যে পাঁচ বৎসরের বেশী ইংরেজী ভাষা আমাদের স্কুল কলেজে বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে না। "ভারত-জ্যোতি" এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে লোক-মত যাচাই করেন। কতজন লোক এই মতামতের আদমসুমারিতে যোগদান করিয়াছিলেন, ফলাফল প্রচারের মধ্যে তাহার উল্লেখ দেখিলাম না। কিন্তু যাঁহারা ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের শতকরা হিসাব দেওয়া হইয়াছে। স্কুলে ইংরেজী ভাষার পাঠ সম্বন্ধে শতকরা ৭৭'৩ জন বলিয়াছেন যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভুল হইয়াছে ; বাকী ২২ ৭ বলিয়াছেন, সিদ্ধান্ত ঠিকই হইয়াছে। শতকরা ৭৭'৩ যাঁহারা অমত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ১৩ ৬ জন চান যে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আরও ১০ বৎসর চলুক ; ১৫ বৎসর চান শতকরা ১২'৮ জন ; ২০ বৎসর চান শতকরা ১০'১ জন ; ২৫ বৎসর চান শতকরা ১৭'৭ জন, এবং ২৩'৪ জন চান ২৫ বৎসরের উর্দ্ধে একটা অনির্দ্দিষ্ট সময়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার স্বপক্ষে মত দিয়াছেন শতকরা ৯৫'৭ জন। এই আদমসুমারিতে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ৪৫'০ জন পশ্চিম ভারত অঞ্চলের ; ২৯'২ মাদ্রাজের ; ১১'৭ মধ্য-ভারতের (যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মালব, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল) ; ১৪'১ সিন্ধু, পঞ্জাব ও বাংলাদেশের। ইহাদের মধ্যে ৫২'৭ বি এ পাশ করিয়াছেন।

হিন্দি ভাষা রাষ্ট্র-ভাষা হউক, এই সম্বন্ধে অধিকাংশ ইহার সপক্ষে মত দিয়াছেন ; আন্তঃ-প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে এই প্রয়োজন তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন ; আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে হিন্দি ইংরেজীর স্থান গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শতকরা ৬১ ৫ জন হিন্দি পড়িতে ও লিখিতে পারেন। ইঁহাদের মধ্যে ৭২'৩ জনের বয়স ৩৫ বৎসরের কম ; ২৭'৭ জনের ৩৬ বৎসরের বেশী।

এই আদমসুমারিতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দিহান। গান্ধীজীর প্রস্তাবিত "হিন্দুস্থানি"—দেব-নাগরী ও উর্দ্দু হরপে লিখিত—সম্বন্ধে মতামত যাচাই করা প্রয়োজন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশের সারদাচরণ মিত্র "এক লিপি বিস্তার সমিতি" প্রতিষ্ঠা করিয়া "দেব-নাগরী" অক্ষরের প্রচলন করিতে চাহিয়াছিলেন। আজ পশ্চিম বাংলার প্রদেশপাল শ্রীকৈলাসনাথ কাটজু "সংস্কৃত" ভাষাকে ভারত-রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-ভাষা করিবার পক্ষে মত দিতেছেন। কিন্তু গান্ধীজীর উত্তমলিপি এই প্রস্তাবের বিপক্ষে। মুসলমান সমাজের মনের ও মতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া এই সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। মীমাংসা সহজ হইবে না।

মহম্মদ ওসমান

ভারত-রাষ্ট্রের সৈন্যাধ্যক্ষবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা কাশ্মীর রণাঙ্গনে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন ব্রিগেডিয়ার মহম্মদ ওসমান তাঁহাদের অন্যতম। নওশেরা-বিজয়ী এই সেনানায়ক বীর আকাঙ্ক্ষিত লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন—যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ভারত-রাষ্ট্রের প্রধানগণ তাঁহার স্মৃতির প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য দেশবাসীর হৃদয়ে দৃঢ় করিয়া দিলেন।

যে উন্মাদনার ফলে পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার আকর্ষণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান থাকা মুসলমান সেনানায়ক বা সৈন্যের পক্ষে সহজ ছিল না। তাহারা প্রায় সকলেই পাকিস্থানের দিকে চলিয়া পড়িল। শত শত বৎসর ভারতবর্ষের জল-বায়ু যাহাদের বর্দ্ধিত করিয়াছে, যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিল হিন্দু তাহারা এই যুগ-সন্ধিক্ষণে বিরোধী রাষ্ট্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে দ্বিধা করিল না। যে দু-দশ জন মুসলিম লীগ দলের সৃষ্ট মায়ামৃগের পশ্চাতে ছুটিয়া গেলেন না, মহম্মদ ওসমান তাঁহাদের একজন, এবং তিনি জীবন দিয়া প্রমাণ করিলেন যে মহম্মদ আলী জিন্না কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত "দুই-নেশন" তত্ত্ব মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। কাশ্মীর রণাঙ্গনে সেই পরীক্ষাই চলিতেছে—হিন্দু-মুসলমান গান্ধী-পন্থা অনুসরণ করিবে, না জিন্না-পন্থা অনুসরণ করিবে। বীর মহম্মদ ওসমান প্রমাণ করিলেন যে মুসলমান হইয়াও জিন্না-পন্থায় অবিশ্বাসী হওয়া যায় ; হিন্দুর হাতে হাত মিলাইয়া ভারতবর্ষে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা যায়। মহম্মদ ওসমান স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণ বলি দিয়া এই সম্ভাবনা প্রমাণ করিলেন। আর প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন সেখ মহম্মদ আবদুল্লা কাশ্মীর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীরূপে। এই সম্ভাবনা যখন সার্থক হইবে, তখনই মহম্মদ ওসমানের কীর্ত্তি অমরত্ব লাভ করিবে।

ইউরোপের সমস্যা

জার্ম্মানী লইয়া বিজয়ী শক্তিবর্গ পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করিতে পারিতেছে না। জার্ম্মানী তাহাদের গলায় কাঁটার মত বিঁধিয়া আছে ; ইহা বাহির করিতে গিয়া চিকিৎসা বিভ্রাট আরম্ভ হইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন বলিতেছে এরূপ করিলে জার্ম্মানী নিরাময় হইবে ; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বলিতেছে তার বিপরীত কথা। সুতরাং দুই বৈদ্য ঝগড়া করিতে গিয়া রোগীর হইয়াছে প্রাণান্ত। বৈদ্য দুইজনও হিমসিম খাইতেছেন বলিয়া মনে হয়।

রোগটা ধরা পড়িয়াছে। জার্ম্মানী ইউরোপ মহাদেশের অনেকটা ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিয়াছে। তদ্দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে সে তাহার লোক-বল, বুদ্ধি-বল সৃষ্টি করিবার শক্তিও ধারণ করে। কিন্তু তাহার এই সৃষ্টি-শক্তিই বিজয়ী শক্তি-বর্গের নিকট ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য তাহার সৃষ্টি-শক্তিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্ব তাহাদের লইতে হইয়াছে। এই কার্য্যেই মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহা ক্রমে মনান্তরে পরিণত হইতেছে। রাশিয়া মনে করিতেছে যে জার্ম্মানীর শাসক-গোষ্ঠি, যাহারা দুই-দুইটি মহাযুদ্ধ বাধাইয়া দুনিয়ার সর্ব্বনাশ করিল, তাহাদের নির্ম্মূল না করিলে মঙ্গল নাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স এরূপ উৎকট চিকিৎসার পক্ষপাতী নয়। জার্ম্মানীর শাসক-গোষ্ঠির সকলেই দুষ্ট, এই কথা তাহারা স্বীকার করে না; ইহাদের মধ্যে দুষ্টকে বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া নির্ম্মূল করিতে হইবে যেমন করা হইয়াছে নুরেনবার্গ বিচারের পর। এই মতভেদ হইতেই রাশিয়ার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে জার্ম্মানীর শাসক-গোষ্ঠির লোকের বিষ জিয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে। বর্ত্তমানের বিরোধ ও বিতণ্ডার ইহাই হইল মূল কথা।

তার পর প্রশ্ন উঠিয়াছে জার্ম্মানী হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে কি উপায়ে। রাশিয়া বলিতেছে যে রাষ্ট্রের হাতে সমস্ত উপার্জ্জনের সুযোগ তুলিয়া লইতে পারিলে এই ক্ষতিপূরণের আদায় সহজ হইবে। জার্ম্মানীর সাত কোটি লোকের পরিশ্রমের শক্তি, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সেবায় তাহাদের সার্থকতা ও উদ্ভাবনী শক্তি অর্থ উপার্জ্জনে নিযুক্ত করিতে পারিলে যে ধনের উৎপাদন হইবে, তাহা হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা কঠিন হইবে না। তাহার বিরুদ্ধ পক্ষ এই কথা যে একেবারে অস্বীকার করে, তাহা মনে হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় জার্ম্মানী রাষ্ট্রবিজয়ী শক্তিবর্গের তাঁবেদার ছাড়া কিছু হইতে পারে না যেমন হইয়াছে জাপানের শাসন-কর্ত্তারা এবং কে—রাশিয়া বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—জার্ম্মান রাষ্ট্রের উপর প্রভুত্ব খাটাইবে, এই প্রশ্ন লইয়া উঠিয়াছে তর্ক ও বিরোধ। বার্লিনের শাসন-ব্যবস্থা লইয়া বিজয়ী চারিটি শক্তির —রাশিয়া একদিকে এবং যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স অপর দিকে—মধ্যে বর্ত্তমানে আবার তাহা আরম্ভ হইয়াছে; মস্কো নগরীতে ষ্টালিনের সামনে তাহার জের টানা হইতেছে। দুই পক্ষের "সাজ, সাজ" রব যেন একটু কোমলে নামিয়াছে।

এদিকে জার্ম্মানীকে যে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল, তার উৎপাদন হইতে বিদেশী শাসন-ব্যবস্থার ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে। এই উৎপাদনের পরিমাণ যুদ্ধের পূর্ব্বের শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র এবং এই উৎপাদন হইতে কে যে কতটা ক্ষতি-পূরণ আদায় করিতেছে তাহার কোন হিসাব নাই; কত ক্ষতিপূরণ জার্ম্মানীকে করিতে হইবে, তাহা এখন স্থির হয় নাই। কে হিসাব বুঝিয়া লইবে? রাশিয়া বলিতেছে যে ইতি-মধ্যে পাশ্চাত্য ত্রিশক্তি প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার ক্ষতি-পূরণ আদায় করিয়া লইয়াছে; সে যে জার্ম্মানীর পূর্ব্বাঞ্চল হইতে কি লইয়াছে বা লইতেছে, তাহা অপর কেহ জানে না। এদিকে, অন্ততঃ ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য জার্ম্মানীর লোকসমষ্টিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

কিন্তু এই তর্ক ত ইউরোপের বিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করিতে পারিবে না। সেই উদ্দেশ্যে আমেরিকা একটা উপায় বাহির করিয়াছে; ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য সে প্রায় ১,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছে; এই টাকায় খাদ্য-শস্য, কাঁচা মাল, কল-কব্জা ইত্যাদি নানা দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিবে; তাহার শিল্প-কৌশল ইউরোপের লোকদের শিখাইয়া দিবে। ইউরোপের ১৭টি দেশ বর্ত্তমানে এই সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। রাশিয়া কিন্তু এই ব্যবস্থায় খুশী হয় নাই। তাহার আশঙ্কা যে এই সুযোগে আমেরিকার পুঁজিপতিরা তাহাদের প্রভুত্ব কায়েম করিয়া লইবে। সুতরাং সে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত পুঁজিবাদ বনাম কম্যুনিজম লইয়া তর্ক আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

এ তর্কের মীমাংসা বৈঠকখানায় যে হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ১৮৪৮ সালের বসন্তকালে মার্কস ও এঙ্গেলস্ যে তত্ত্ব প্রচার করিয়া দুনিয়ার মনোজগতে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার ঢেউ আজ দুনিয়ার সকল ঘাটে আঘাত করিতেছে। মার্কস-প্রবর্ত্তিত নীতি রাশিয়ার রাষ্ট্রতন্ত্রে যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা সকলের প্রীতিপ্রদ হয় নাই। তত্ত্বের দিক লইয়া তর্ক, ব্যবহারের দিক লইয়া তর্ক আরও মুখর হইয়া উঠিয়াছে। এই তর্কের মীমাংসা বৈঠকখানায় হইবে, না রণক্ষেত্রে হইবে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে বলিয়াই "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের" কলরব উঠিয়াছে। এই কলরবে দুনিয়ার লোক ভীত, সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং পুনর্গঠনের কোন কাজে কেহ নিবিষ্টমনা হইতে পারিতেছে না। এই ভাবের সংঘর্ষ এড়াইবার কোন উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। দুনিয়ার পথ-মনে বিদ্রোহের বন্যা ফুলিয়া উঠিয়াছে। এই জলতরঙ্গ রোধিবে কে? এই পটভূমিকার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? ইউরোপের সমস্যার প্রতিচ্ছায়া দেখা দিয়াছে মালয়ে এবং ব্রহ্মদেশে। যেরূপ ব্যাপকভাবে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় ভারত-বর্ষে উহার প্রসারের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। তাহা সাময়িক ভাবে স্থগিত আছে মাত্র। ভারত-রক্ষার ব্যবস্থা যাহাদের হাতে তাঁহাদের পশ্চিম বঙ্গের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

যাজ্ঞবল্ক্যের দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

বৃহদারণ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ নামে দুইটি 'ব্রাহ্মণ' আছে (২।৪ ও ৪।৫)। উভয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত বিষয় একই, স্থানে স্থানে ভাষার কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে মাত্র। ব্রাহ্মণদ্বয়ের উপাখ্যানভাগ সুপরিচিত। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। প্রব্রজ্যা অবলম্বনে ইচ্ছুক মহর্ষি মৈত্রেয়ীকে কহিলেন, "আমি অন্যত্র যাইতেছি; যাইবার পূর্ব্বে আমার যে সম্পত্তি আছে, তোমার ও কাত্যায়নীর মধ্যে তাহা বিভাগ করিয়া দিতেছি।" শুনিয়া মৈত্রেয়ী কহিলেন "সম্পত্তি ত দিবেন, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীও যদি বিত্তপূর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা কি আমি অমর হইতে পারিব?" যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, "তাও কি হয়? বিত্তদ্বারা অমৃতত্ব-লাভের আশা কোথায়? উপকরণবান্ ব্যক্তির জীবন যেমন হয়, তোমার জীবনও তেমনই হইবে। বিত্তদ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না।" তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যাহা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, তাহা দ্বারা আমি কি করিব। এই অমৃতত্ব বিষয়ে ভগবান যাহা জানেন, তাহা আমাকে বলুন।" প্রিয়া ভার্য্যার এই কথা শুনিয়া মহর্ষি বিশেষ প্রীত হইলেন, এবং তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করিলেন। মহর্ষির এই উপদেশের মধ্যে তাঁহার দার্শনিক মতবাদ নিহিত, এবং মনে হয় এই উপদেশই আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যাত অদ্বৈতবাদের ভিত্তি।

মহর্ষি কহিলেন, "পতি পত্নীর প্রিয়, জায়া পতির প্রিয়, পুত্র পিতার প্রিয়, কিন্তু কেহই নিজের জন্য অন্যের প্রিয় নয়; যে যাহার প্রিয়, সে তাহার নিজের প্রীতির জন্যই প্রিয়, তাহাকে ভালবাসিয়া সুখ হয়, তাই সে প্রিয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আমাদের প্রিয়, বেদ ও দেবগণ আমাদের প্রিয়, বিত্তও আমাদের প্রিয়, ইহারা এবং জগতে যাহা কিছু আমাদের প্রিয় আছে, তাহারা কেহই আপনার নিমিত্ত প্রিয় হয় না, যাহার প্রিয় তাহার নিজের জন্য প্রিয় হয়। যাহার প্রীতির জন্য এই সমস্ত প্রিয় হয়, তিনি আত্মা; সেই আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। সেই আত্মার দর্শন, মনন ও নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য। আত্মার দর্শন, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা যাবতীয় পদার্থ জানা যায়। যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, স্বর্গাদিলোকসমূহ, দেবগণ, বেদ, ভূতসমূহ ও সমুদায় বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে সে তাহাদের স্বরূপ অবগত হইতে পারে না।"

ইহার পরে যে যে দৃষ্টান্ত দ্বারা মহর্ষি সর্ব্বাত্মকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা নির্ব্বিশেষ-অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক। গভীর মনস্তত্ত্বের উপর এই ব্যাখ্যান প্রতিষ্ঠিত। একটু বিস্তারিত ভাবে তাহার বর্ণনা আবশ্যক।

মহর্ষি বলিলেন, "তাড্যমান দুন্দুভি হইতে নির্গত শব্দকে গ্রহণ করিবার জন্য দুন্দুভি অথবা দুন্দুভিবাদককে গ্রহণ করিতে হয়। তাহা না করিলে আমরা সে শব্দকে দুন্দুভি-শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। দুন্দুভি যখন বাদিত হয়, তখন দুন্দুভি বা তাহার বাদনকার্য্য দুন্দুভির শব্দের সঙ্গে মিলিত হয়, এবং যখন দূরে দুন্দুভিশব্দ শ্রুত হয় তখন তাহার সঙ্গে দুন্দুভি অথবা তাহার বাদনকার্য্যের চিন্তাও এক সঙ্গে মনে উদিত হয়। কিন্তু ইহাই দুন্দুভি-শব্দজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যখন প্রথম দুন্দুভিশব্দ শুনিয়াছিলাম, তখন মনের মধ্যে যে অনুভবের উদয় হইয়াছিল, শ্রৌত অন্য কোনও অনুভবের সঙ্গে তাহাকে এক শ্রেণীতে ফেলিতে পারি নাই। সেটা ছিল অনন্যসদৃশ, অনুপম একমাত্র (unique) অনুভব। তাহার দেখা আর এ জীবনে পাই নাই—পাইবার সম্ভাবনাও নাই। কেননা তাহার পরে যখনই দুন্দুভিবাদ্য শুনিয়াছি, তখন যে অনুভব (sensation) হইয়াছে, তাহার সঙ্গে পূর্ব্বশ্রুত বাদ্যের সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু অনন্যতা (identity) থাকা সম্ভব ছিল না, একজাতীয় হইলেও তাহা ভিন্ন ছিল; সময়ের ভিন্নতা, আমার মানসিক অবস্থার ভিন্নতা, বাদ্য-ভঙ্গীর ভিন্নতা, শব্দের গ্রামের ভিন্নতা প্রভৃতি নানা পার্থক্য পূর্ব্বশ্রুত বাদ্য হইতে তাহাকে পৃথক্ করিয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় শব্দের মধ্যে যে সাদৃশ্য ছিল আমার মন তাহা উপলব্ধি করিয়া বুঝিয়াছিল—সেদিন অমুক স্থান অমুক সময়ে যে শব্দ শুনিয়াছিলাম, ইহা তাহারই অনুরূপ। এই ভাবে যখনই দুন্দুভি-শব্দ শুনিয়াছি, তখনই তাহার ভিন্নতা সত্ত্বেও পূর্ব্বশ্রুত শব্দের সহিত তাহার সাদৃশ্যের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়া এই সমস্ত বিশিষ্ট দুন্দুভিশব্দের মধ্যে যে সাধারণ ভাবটি আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাই আমার দুন্দুভিশব্দের জ্ঞান (concept)। তাহারই মধ্যে প্রতি দুন্দুভিশব্দকে ফেলিয়া আমি তাহাকে দুন্দুভিশব্দ বলিয়া বুঝিতে পারি। দুন্দুভিশব্দের এই সাধারণ জ্ঞানকে দুন্দুভি-শব্দ—"সামান্য" বলে। এইরূপ বীণাশব্দ, শঙ্খশব্দ প্রভৃতি যাবতীয় শব্দজ্ঞানই "সামান্য" জ্ঞান—কোনও

বিশেষ শব্দের জ্ঞান নহে। এই সামান্যের অস্তিত্ব বাহ্যজগতে আমরা খুঁজিয়া পাই না। রাম, শ্যাম, গোপাল সকলেই "মানুষ"। রামের জ্ঞান, শ্যামের জ্ঞান, গোপালের জ্ঞান আমাদের মানুষ-সামান্য জ্ঞানের (concept of man) অন্তর্ভূত; কিন্তু "মানুষ"কে, বিশেষত্ব-বর্জ্জিত কোনও মানুষকে জগতে দেখিতে পাই না। এই স্থলে দর্শনের একটি গুরুতর প্রশ্ন আসিয়া পড়ে,—বাহ্যপদার্থ ও তাহার প্রতিরূপ প্রত্যয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। সে প্রশ্নের আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান আলোচনায় আমাদের আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

আমাদের ইন্দ্রিয় দশটি—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহা ভিন্ন জ্ঞান ও কর্ম্ম—উভয়-সাধারণ মনও ইন্দ্রিয়মধ্যে পরিগণিত। উভয়বিধ ইন্দ্রিয় আমাদের "আমি"র সঙ্গে বাহ্যজগতের সংযোগ বিধান করিতেছে। বাহ্যজগৎ আমাদের মনে প্রবিষ্ট হয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারপথে, এবং বাহ্যজগতের উপর আমাদের স্বকীয়শক্তি প্রযুক্ত হয় কর্ম্মেন্দ্রিয় করণ দ্বারা। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটির প্রত্যেকেই বাহ্য-বস্তুর এক-একটি গুণের পরিচয় বহন করিয়া আনে। রূপরস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ, জড় পদার্থের এই পাঁচ গুণের পরিচয় আমরা পাই যথাক্রমে চক্ষু, রসনা, নাসিকা, ত্বক ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা। ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ আমাদের স্থূল অঙ্গবিশেষ নহে; আমাদের "আমি" (আত্মা বলিলাম না, কেননা "আমি" ও "আত্মা" এক অর্থ ব্যক্ত করে না) যে শক্তি স্থূল অঙ্গবিশেষের সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করে, সেই শক্তিই ইন্দ্রিয়শব্দবাচ্য। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যত প্রকার শব্দের জ্ঞান আমাদের আছে, তাহা "শব্দ-সামান্যে"র অন্তর্ভূত। সেইরূপ নীল, লোহিত, পীত প্রভৃতি বর্ণ, সরল, বক্র, বর্ত্তুল প্রভৃতি আকার—যত বিভিন্ন রূপ আছে, তাহারা প্রত্যেকেই "সামান্য" হইয়াও বৃহত্তর "রূপ-সামান্যে"র অন্তর্গত। চৈতক নামক অশ্ব নীল বর্ণ। আরও বহু অশ্বের বর্ণ নীল। কিন্তু প্রত্যেক নীল অশ্বেরই নীলবর্ণ ব্যতীত আরও এমন অনেক বিশেষত্ব আছে যাহার সহিত নীল বর্ণের সমবায়ে তাহার ব্যক্তিত্ব গঠিত হইয়াছে। আবার নীল অশ্ব ভিন্ন আরও অনেক দ্রব্য নীলবর্ণযুক্ত। তাহাদের নীল বর্ণের সঙ্গে অন্য বিশেষত্ব যুক্ত হইয়া নীল অশ্ব হইতে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। যাবতীয় নীল বর্ণের পদার্থের নীল বর্ণ ভিন্ন অন্য সমস্ত বিশেষত্ব বর্জ্জন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই "নীলবর্ণ-সামান্য"। রূপের বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন "সামান্য" আছে। এই সমস্ত খণ্ড রূপ-সামান্য—নীল-সামান্য, লোহিত-সামান্য, পীত-সামান্য, সরল-সামান্য, বক্র-সামান্য প্রভৃতি সকলেই একটি বৃহত্তর বিস্তৃততর সামান্যের অন্তর্ভুক্ত, যাহা প্রত্যেক বর্ণ ও আকারের বিশেষত্ব-বর্জ্জিত, যাহাতে যাবতীয় বর্ণ-ও-আকার-সামান্যের মধ্যে যাহা সাধারণ, সেইরূপ ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই বৃহত্তর-সামান্যই রূপ-সামান্য। ইহা রূপ-মাত্র। কোনও বিশেষ ইহার মধ্যে নাই। এইরূপে দেখা যায়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে যে পদার্থের জ্ঞানলাভ করি, তাহারা রূপ-সামান্য, রস-সামান্য, গন্ধ-সামান্য, শব্দ-সামান্য ও স্পর্শ-সামান্য—এই পাঁচ সামান্যের অন্তর্ভূত। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা কথন-সামান্য, গ্রহণ-সামান্য, গমন-সামান্য, বিসর্গ-সামান্য ও রতি-সামান্য এই পাঁচটি ক্রিয়া-সামান্য প্রাপ্ত হই।

যাজ্ঞবল্ক্যের যুক্তির সোপানপরম্পরায় আরোহণ করিয়া আমরা অনেক দূর উঠিয়াছি। আর দুইটি সোপান অতিক্রম করিতে পারিলেই আমরা মীমাংসা-শিখরে উপনীত হইতে পারিব। এই সোপান দুইটি আমাদিগকে পাঞ্চভৌতিক হইতে আধ্যাত্মিক জগতে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে। ইহারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা দেখিয়াছি প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে যে বিশিষ্ট পদার্থের পরিচয় লাভ করি, তাহারা সকলেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সামান্যের বিশিষ্ট রূপ মাত্র—প্রকৃতপক্ষে তাহা সেই বিষয়-সামান্য মাত্রই। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির প্রতি কার্য্যও ক্রিয়া-সামান্য মাত্র। এখন বুঝিতে হইবে আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা জ্ঞাত হই, তাহা মনেরই সঙ্কল্পবিশেষ মাত্র। সুতরাং রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ ইহারা সকলেই মনঃ-সামান্যের বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার মনঃ বুদ্ধির বিশেষ মাত্র। সুতরাং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যাবতীয় বিষয়বুদ্ধিরই বিশিষ্ট রূপ। এই বুদ্ধিরূপ সামান্যই (বিজ্ঞান-সামান্য, বিজ্ঞান মাত্র) মহাসামান্য প্রজ্ঞান-ঘন ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা অথবা মহাভূত।

অন্য দিকে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে আমরা যে পাঁচটি ক্রিয়া-সামান্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহারাও প্রাণেরই বিভিন্ন বিশিষ্ট রূপ; বাপী, তড়াগ প্রভৃতি জলের বিশিষ্ট রূপকে জল হইতে পৃথক করা যায় না, তেমনই প্রাণ হইতে তাহার বিশিষ্ট রূপসমূহকে বিভক্ত করা অসম্ভব, তাহারা প্রাণই। আবার প্রাণও বিজ্ঞানেরই বিশেষ। বিজ্ঞান মাত্রই "যো বৈ প্রাণঃ, সা প্রজ্ঞা, যা বৈ প্রজ্ঞা, স প্রাণঃ" (ইতি কৌষিতকী)। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, সমস্ত পদার্থই—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় সমস্তই বিজ্ঞান।

এখন বোধ হয়, আমরা মহর্ষির উদাহৃত পরবর্ত্তী দৃষ্টান্তগুলি সহজেই বুঝিতে পারিব। আর্দ্র ইন্ধনাহৃত অগ্নি হইতে থাকিয়া থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ ধূমকুণ্ডলী নির্গলিত হইতে আমরা দেখিয়াছি। সেই ধূমসৃষ্টিতে অগ্নির প্রয়াস নাই, স্বতঃই ধূম তাহা হইতে নির্গত হয়। তেমনই সেই মহাভূত হইতে নিঃশ্বাসের মত বিনা প্রযত্নে নির্গত হয় ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোকসমূহ, সূত্রসমূহ, অনুব্যাখ্যান ও ব্যাখ্যানসমূহ, ইষ্ট, হুত, পান, ইহলোক, পরলোক এবং এই ভূতসমূহ। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে সৃষ্টির এই বর্ণনায় সৃষ্ট পদার্থের তালিকায় মহর্ষি মনোজগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে কোনও ভেদ করেন নাই। ভূতসমূহও যেমন সেই মহাভূত হইতে নিঃশ্বসিত হয়, বেদ-উপনিষৎ প্রভৃতি বিদ্যাও তেমনই। উভয়ই একজাতীয় পদার্থ—প্রকারভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু স্বরূপতঃ একই।

তার পর মহর্ষি বলিতেছেন, "সমুদ্র যেমন যাবতীয় জলের একমাত্র আশ্রয়, স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয়-সামান্য (স্পর্শমাত্র) তেমনই যাবতীয় স্পর্শ-বিশেষের এক আশ্রয়। রসনেন্দ্রিয়-বিষয়-সামান্য (রসমাত্র) তেমনই যাবতীয় রস-বিশেষের একমাত্র আশ্রয়। নাসিকেন্দ্রিয়-বিষয়-সামান্য (গন্ধমাত্র) তেমনই যাবতীয় গন্ধ-বিশেষের একমাত্র আশ্রয়। দর্শনেন্দ্রিয় বিষয়-সামান্য (রূপমাত্র) তেমনই যাবতীয় বিশিষ্ট রূপের একমাত্র আশ্রয়। শ্রোত্রেন্দ্রিয় বিষয়-সামান্য (শব্দমাত্র) তেমনই যাবতীয় বিশিষ্ট শব্দের একমাত্র আশ্রয়। তেমনই মন যাবতীয় সঙ্কল্পের একমাত্র আশ্রয়, বুদ্ধি যাবতীয় বিদ্যার একমাত্র আশ্রয়, হস্ত যাবতীয় কর্ম্মের একমাত্র আশ্রয়, উপস্থ যাবতীয় আনন্দের একমাত্র আশ্রয়, পাদ যাবতীয় পথের আশ্রয়, পায়ু যাবতীয় বিসর্গের আশ্রয়, বাক্ সর্ব্ববেদের আশ্রয়।" সমুদ্র অর্থে জল-সামান্য। বিশেষ বিশেষ আধারে জল তড়াগ, বাপী, নদী প্রভৃতি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ সমস্তই জল-সামান্যের অন্তর্ভূত। তেমনই উপরি-উক্ত যাবতীয় বিষয়-সামান্য একই মহা-সামান্যের বিশিষ্ট রূপ; সেই মহা-সামান্য সকল পদার্থেই বর্ত্তমান; যাবতীয় বিশিষ্ট পদার্থ সেই মহাসামান্যেরই বিশেষ, সেই মহাসামান্যকে বর্জ্জন করিয়া কোনও পদার্থই সম্যক্ বিদিত হওয়া যায় না।

মহর্ষি আবার বলিতেছেন, "সৈন্ধবখণ্ড সিন্ধু অর্থাৎ জল হইতে উৎপন্ন, জলেরই বিকারমাত্র। স্বীয় যোনি জলে প্রক্ষিপ্ত হইলে সৈন্ধবখণ্ড জলেই বিলীন হইয়া যায়, আর তাহাকে কঠিন সৈন্ধবখণ্ডরূপে পাইবার সম্ভাবনা থাকে না, সেই জলের যেখান হইতেই কিছু তুলিয়া দেখ না, তাহা তরল জলই—কঠিন সৈন্ধবখণ্ড তাহার কোথায়ও পাওয়া যায় না। সৈন্ধবখণ্ড যেমন জলের বিকার, জল হইতে উদ্ভূত হয়, জীবাত্মাও তেমনই সেই অনন্ত, অপার ও বিজ্ঞানঘন (কেবলই বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই যাহাতে নাই) মহদ্ভূত হইতে উদ্ভূত হয়। সেই মহদ্ভূত এই সমুদয় ভূতসমূহ হইতে (জীবাত্মারূপে) উত্থিত হইয়া আবার এই সমস্ত ভূতেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তার পরে আর সংজ্ঞা থাকে না।" অর্থাৎ সৈন্ধবখণ্ডকে যেমন আর জলের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, জীবাত্মাকেও আর সেই পরমাত্মারূপী মহদ্ভূতের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে না।

এই কথা শুনিয়া মৈত্রেয়ী চমকিত হইলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন অমৃতত্ব—চাহিয়াছিলেন মৃত্যুকে জয় করিয়া অমর হইতে, এবং কিসে সেই অমরত্ব লাভ করা যায়, মহর্ষির নিকট তাহা জানিতে। মহর্ষি বলিলেন, জীবাত্মা ব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবে—তাহার আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকিবে না। এ কি রকম অমরতা? কহিলেন, "ভগবন্, আপনার কথায় আমি মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িলাম। প্রেত্য সংজ্ঞা ন আস্ত—এ কি বলিলেন আপনি? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।" মহর্ষি কহিলেন, "মোহকর কিছুই তো আমি বলি নাই। আত্মা তো অবিনাশী, অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা-ই। যেখানে দ্বৈত আছে বলিয়া মনে হয়, সেখানেই একজন দ্বিতীয়কে দেখে, ঘ্রাণ করে, আস্বাদ করে, শোনে, স্পর্শ করে, জানে, অভিবাদন করে। কিন্তু যখন সকলই আত্মা হইয়া গেল, তখন কে কিরূপে কাহাকে দেখিবে, কে কিরূপে কাহাকে স্পর্শ করিবে, কে কিরূপে কাহাকে অভিবাদন করিবে, কে কিরূপে কাহাকে জানিবে? যাহা দ্বারা সকল পদার্থ জানা যায়, তাহাকে কিরূপে জানিবে? বিজ্ঞাতাকে কিসের দ্বারা জানিবে?

আমরা দেখিলাম যাজ্ঞবল্ক্য জাগতিক যাবতীয় পদার্থকে ইন্দ্রিয় বিষয়-সামান্যে পর্য্যবসিত করিয়া দশবিধ ইন্দ্রিয়-সামান্যকে মনঃ-সামান্যে ও প্রাণ-সামান্যে পর্য্যবসিত করিয়াছেন, এবং মনঃ-সামান্য ও প্রাণ-সামান্যকে বুদ্ধি-সামান্যের "বিশেষ"-এ পরিণত করিয়া, তাহাকেই "মহাভূত" আখ্যা দিয়াছেন। এই মহাভূত ও "বিজ্ঞান" একই—ইহা অনন্তর অবাহ্য, কৃৎস্ন ও বিজ্ঞানঘন। ইহাই পরমসত্য, জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই ইহা; ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই আত্মা। কিন্তু শব্দ-সামান্য, রূপ-সামান্য প্রভৃতি যাবতীয় সামান্যই আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য হইলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, অবিশিষ্ট অবস্থায় কোথায়ও তাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। আমাদের দেশকালের জগতে তাহাদের অস্তিত্ব নাই। তাহা হইলে তাহারা যে সত্তাহীন নয়, আমাদের মনো-

গঠিত ভাবমাত্র নয়, তাহার প্রমাণ কি? যে মহাসামান্যে যাজ্ঞবল্ক্য সমগ্র জগৎকে বিলীন করিয়াছেন, তাহারই বা বাস্তব সত্তা কোথায়?

সামান্যের (universals, concepts) বাস্তব সত্তা আছে কি না, ইহা দর্শনের একটি সনাতন প্রশ্ন। প্লেটোর মতে বহির্জ্জগতের অন্তরালে আর এক জগৎ আছে, যাহা "সামান্য"-দিগের আবাসভূমি। আমাদের জগতের যাবতীয় পদার্থ—বিশেষ-ক্ষুদ্র পদার্থ—সেই অদৃশ্য জগতের "সামান্য"দিগের আদর্শে গঠিত, দেশ ও কালে প্রতিফলিত সেই সামান্য হইতেই আমাদের জগতের বিশিষ্ট পদার্থ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। প্লেটোর দর্শনে সামান্যের নাম Ideas। আমাদের জগতে নির্ব্বিশেষ মানবত্ব, গোত্ব, বৃক্ষত্ব না থাকিলেও, সেই অদৃশ্য জগতে আছে। সর্ব্ববিশেষত্ব-বর্জ্জিত মানব, গো, বৃক্ষ সেখানে বর্ত্তমান। আমাদের জগৎ নশ্বর, অনিত্য, কিন্তু সেই 'আইডিয়া'র জগৎ নিত্য। কিন্তু প্লেটোর এই জগৎ ও যাজ্ঞবল্ক্যের মহাভূতের মধ্যে ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য। প্লেটোর অবিনশ্বর জগৎ বহুর আবাসস্থল, বৈচিত্র্যপূর্ণ। অসংখ্য Idea শিবকে (The good) কেন্দ্র করিয়া বর্ত্তমান—সেই দেশকালের অতীত জগতে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মহাভূত অনন্তর, অবাহ্য ও বিজ্ঞানঘন। তাহা এক ও অদ্বিতীয়—বিজ্ঞান ভিন্ন তাহাতে আর কিছুই নাই। সমুদ্রে নদী-প্রবাহের মত যাবতীয় খণ্ডসামান্য যে মহা-সামান্যে বিলীন, তাহার মধ্যে তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি খণ্ডিত জ্ঞানই বহন করিতে পারে; অখণ্ড জ্ঞান তাহাদের দ্বারা লাভ করা যায় না। খণ্ডিত পদার্থ সম্বন্ধেও তাহাদের সাক্ষ্য সকল সময় সত্য হয় না। সেইজন্য বিজ্ঞানে নানা ভাবে ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ পরীক্ষা করা হয়। সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়গণ যদি এক সর্ব্বাত্মক মহাভূতের সাক্ষাৎ না দেয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের প্রমাণকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নাই। অসংশয়ে সমগ্র জগৎকে জানিবার জন্য যে "সবিজ্ঞান জ্ঞানে"র প্রয়োজন, গীতায় যাহার উল্লেখ আছে, সে জ্ঞান ইন্দ্রিয়লভ্য নহে। তাহার জন্য দিব্য ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন, বুঝি-বা দিব্য ইন্দ্রিয় দ্বারাও তাহা লাভ করা যায় না। দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া অর্জ্জুন মহাভূতের যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে বহুত্বের অভাব ছিল না, সে রূপ দেশ ও কালের অতীত ছিল না। তাহা অনন্তর, অবাহ্য, বিজ্ঞানঘন রূপ নহে।

এক অখণ্ড পদার্থকে ইন্দ্রিয় অখণ্ডরূপে দেখিতে পায় না বলিয়াই যে তাহা অখণ্ড নয়, তাহা নহে। এখন প্রশ্ন এই জগৎ যদি অখণ্ড হয়—এক বিজ্ঞানঘন পদার্থই হয়, তবে তাহাকে আমরা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখি কেন? ইহার উত্তর উপনিষদ দিয়াছেন—নাম ও রূপের জন্য। অখণ্ড বিজ্ঞানে নাম ও রূপ আরোপিত হইয়া খণ্ডিত অসংখ্য পদার্থের আবির্ভাব হইয়াছে। এই বহুত্ব সত্য নয়, নামরূপ সত্য নয়, একমাত্র বিজ্ঞানই সত্য। বিজ্ঞানের উপর নাম ও রূপের বহু প্রলেপ পড়িয়া বিজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের মধ্যেও সেই বিজ্ঞান যেমন আছে, বহির্জ্জগতেও তাহা তেমনই বর্ত্তমান। নামরূপে খণ্ডিত প্রত্যেক পদার্থে সেই বিজ্ঞানই সত্য,—তদতিরিক্ত যাহা তাহা "বিশেষ", তাহা নাম ও রূপ, তাহা আরোপিত, তাহা সত্য নয়। নাম রূপের আবরণ উন্মোচিত হইলে এক অখণ্ড বিজ্ঞানই অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু ভ্রান্তির কারণ এই নামরূপ আরোপিত হয় কেন?

নাম ও রূপের আবরণযুক্ত হওয়া, তাহাদের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সহজ অর্থ দেশ ও কালে প্রকাশিত হওয়া। নামরূপহীন অবস্থা—অব্যক্ত অবস্থা, দেশকালের অতীত অবস্থা, প্রলয়ের অবস্থা। নামরূপ কোথা হইতে আসিল? ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—জগৎ এক, অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপে বর্ত্তমান ছিল, তিনি ইচ্ছা করিলেন বহু হইতে, এবং তেজ, জল ও অন্নের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন। ইহার অর্থ যখনই সেই অনন্ত বিজ্ঞানময় পরমাত্মা আপনার বিজ্ঞানকে সঙ্কীর্ণ করিয়া জীব-রূপে পরিণত হইলেন, তখনই সেই জীব নামরূপের বন্ধনে আবদ্ধ হইল, সমগ্র জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া সামগ্রিক দৃষ্টি হারাইল। সসীমত্বের ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। সেই অনন্ত বিজ্ঞানঘন ব্রহ্মে নামরূপ নাই, আছে আমাদের সান্ত দৃষ্টিতে এবং যত দিন আমাদের সসীমত্ব থাকিবে তত দিন নামরূপও থাকিবে। এই সসীমত্ব কখনও যাইবে কি?

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—"ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি।" "প্রেত্য" শব্দের সাধারণ অর্থ "মরিয়া", "মৃত্যুর পরে"। এই অর্থ ধরিলে মহর্ষির কথার অর্থ হয় "মৃত্যুর পরে বিশেষ-সংজ্ঞা থাকে না—অর্থাৎ জীবাত্মারূপে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলোপ হয়। কিন্তু মৃত্যুর পরেই যে বিশেষ-সংজ্ঞার লোপ হয় তাহা মহর্ষির বক্তব্য না হইতেও পারে। আচার্য্য শঙ্কর অর্থ করিয়াছেন "ন তত্র প্রেত্য বিশেষসংজ্ঞাস্তি কার্য্য-কারণ-সংঘাতেভ্যঃ বিমুক্তস্য।" অর্থাৎ—"কার্য্যকারণ সংঘাত হইতে বিমুক্ত যিনি, তাঁহারই সেখানে (ব্রহ্মধামে) গমন করিয়া বিশেষ-সংজ্ঞা থাকে না। ইহা মোক্ষ-প্রাপ্তের পক্ষেই প্রযোজ্য, সকলের পক্ষে নহে।" কিন্তু এই গতি, এই মোক্ষ, এই ব্রহ্মপ্রাপ্তি—ইহাকেই কি অমরত্ব বলা যায়? কাহার অমরত্ব? পরমাত্মার অমরত্ব তো

আলোচ্য নহে? মৈত্রেয়ী চাহিয়াছিলেন কিরূপে তিনি নিজে অমর হইতে পারিবেন—কার্য্যকারণ-সংঘাত-যুক্তা খিল্য ভাবাপন্না মৈত্রেয়ী নামধেয়া জীবাত্মায় অমরত্ব লাভ কিরূপে হইতে পারে, তাহাই জানিতে। কিন্তু মহর্ষি যাহা বলিলেন তাহাতে বিত্তবর্জ্জন ব্রহ্মজ্ঞানের পরিণাম ও স্ত্রীপ্রজ্ঞা কাত্যায়নীর পরিণাম হইতে ভিন্ন নহে। বরং মোক্ষের জন্য প্রযত্নবতী মৈত্রেয়ীর বিনাশ সংসারাসক্তা কাত্যায়নীর বিনাশের বহুপূর্ব্বেই সংঘটিত হইবে। "ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি।" মহাভূতের সংজ্ঞা তো চিরকাল আছে, চিরকালই থাকিবে। সে সম্বন্ধে মৈত্রেয়ীর সংশয় ছিল না। সংশয় ছিল—তাঁহার নিজের বিশেষ-সংজ্ঞা সম্বন্ধে। মহর্ষি তাঁহাকে বলিয়া দিলেন বিশেষ-সংজ্ঞা থাকিবে না। জানি না এই বিশেষ-সংজ্ঞা লোপ রূপ বিনাশকে অমৃতত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে মৈত্রেয়ী স্বীকৃত হইয়াছিলেন কি না।

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩৩

কয়েক দিন পরে মালতী ফিরে এল। বললে, বড্ড ভুল করেছ কলকাতায় না গিয়ে। ঈদের দিন যদি থাকতে—বসতে যাদুকরের যাদু ছাড়া এ জিনিস সম্ভব নয়। হিন্দু-মুসলমানের এমন মিলন আর কোনদিন দেখবে না।

প্রশান্ত অল্প হেসে বললে, তোমার চোখ ছলছলিয়ে উঠল দেখেই বুঝতে পারছি—

দুর! বলে আঁচলে চোখের কোণটা মুছে মালতী হাসল। তবে একটা খবর তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি—চৌধুরী ছাড়বেন না তোমায়—এক সপ্তাহের মধ্যে এখানে আসছেন তিনি।

প্রশান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল, কি মুশকিল—আমি এখনও সেরে উঠি নি যে।

সেরে উঠেছ—বাইরে তোমাকে দেখলে কেউ বলবে না অসুস্থ, তবে মনের অসুখ আলাদা জিনিস। কয়েক দণ্ড চুপ-চাপ কাটল। মালতী আর একটু সরে এসে ওর একখানা হাত হাতের ওপর তুলে নিয়ে কোমল কণ্ঠে বললে, কি হয়েছে আমাকেও বলবে না?

প্রশান্ত হাসবার ভঙ্গি করে বললে, কিছুই হয়নি—ভাল লাগছে না শুধু।

আচ্ছা।—হাত ছেড়ে দিয়ে মালতী অভিমানে খানিকটা দূরে সরে এল। চলেই যাচ্ছিল ঘর থেকে। ঠিক যাবার ইচ্ছায় নয়—ভঙ্গিতে অন্ততঃ সেটা দেখালে। প্রশান্ত ওর এই নিঃশব্দ অভিমানটুকু বুঝলে। বুঝে ডাকলে, শোন।

মালতী ফিরল। খানিকটা ব্যবধান বজায় রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রশান্ত বললে, তুমি কেন আমার জন্ত কষ্ট পাও। বুঝতে পারছ না কি—আমি ফুরিয়ে গেছি। আমার দ্বারা আর পৃথিবীর কোন কাজ হবে না।

এই কথায় মালতীর দুঃখবোধ দ্বিগুণ হ'ল—মমতায়, প্রেমে সে বিগলিত হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে আবার প্রশান্তর হাতখানি তুলে নিয়ে দু' হাতে চেপে ধরলে। কান্নার আভাসে ওর কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে উঠল। না না, ও কথা বলো না। তোমাকে ফিরতেই হবে—বাঁচতেই হবে। এ ভাবে তিলে তিলে তোমাকে আত্মহত্যা করতে দেব না আমি। শেষের দিকে কণ্ঠে ওর দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল।

প্রশান্ত মুখ তুলে মালতীর পানে চাইলে—তার পর বাঁ হাত দিয়ে মালতীর দু'খানি হাত চেপে ধরে বললে, তাই হোক।

অনেক সংবাদ এনেছে মালতী। একটা পেপার মিল স্থাপনের পরিকল্পনা চলছে। স্বাধীন হ'ল ভারতবর্ষ—সংবাদ-পত্র চালনার জন্ত পশ্চিমের মুখ চেয়ে সে বসে থাকবে কেন? তবে এ কাজে যে সব আধুনিক যন্ত্রপাতির দরকার, তা পেতে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এনামেল-শিল্পের ভবিষ্যৎও বেশ উজ্জ্বল। চৌধুরী কয়েকজন অংশীদার জুটিয়ে অনেকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠান চালু করবেন—এই আশা করছেন। দেশ যখন স্বাধীন হ'ল তার শিল্প-সম্পদ না বাড়ালে স্বাধীনতার মূল্য থাকবে কেন। শ্রমিকদের সঙ্গে একটা রফাও নাকি করতে হবে। প্রশান্ত বোধ হয় জানে—ভারতের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের উদ্বোধন হবে শীঘ্রই। জাতির শক্তি যাতে ক্ষমতালোভীর নেতৃত্বে অপচিত না হয় তার জন্ত এই ধরণের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। শ্রমিকে-মালিকে আর শাসকে সহযোগিতা না থাকলে কেউ বাঁচতে পারবে না। বহু দেশেই শিল্পকে জাতীয় সম্পদে রূপান্তরিত করে রাষ্ট্র তথা সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য যথেষ্ট হয়েছে—আর হবেও, তবে মেকি দিয়ে সত্যকে ঢেকে রাখতে পারে না কেউ চিরকাল। বিলেতে কয়লা-খনির কথা নিশ্চয় প্রশান্ত জানে।

প্রশান্ত আশ্চর্য্য হ'ল মালতীর এই ধরণের কথা শুনে। শোনা কথা নিয়ে এতক্ষণ ধরে আলোচনা চালাতে পারে কেউ? মালতী যা ছিল না—তারই দিকে এগিয়ে চলেছে। গভীর চিন্তার ছাপ ওর মুখে। প্রফুল্ল চক্ষুতেও ছায়া ফেলছে চিন্তা। আত্মচিন্তা ঠিক নয়—স্বাধীন ভারতবর্ষকে নিয়ে চিন্তা। কিসে দেশ উন্নত হবে, সমৃদ্ধ হবে, সম্মানিত হবে বিশ্ব-সভায় সেই চিন্তা। নতুন পৃথিবী রচনার স্বপ্ন-ঘোর ওর চোখেও লাগল বুঝি।

অবশেষে ও সঙ্কল্প করলে কলকাতায় ফিরে যাবে।

কিন্তু পরের দিন খবরের কাগজ পড়ে ও স্তম্ভিত হ'ল। কলকাতায় আবার আত্মঘাতী হানাহানি সুরু হয়েছে। শান্তিদূত উপস্থিত থাকতেও হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। অভিশপ্ত ভারতবর্ষ! দুশো বছরের পরাধীনতা তার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে।

পরদিন দুপুরে বৈঠকখানায় বসে ওরা পরামর্শ করলে কালই কলকাতায় ফিরে যাবে। মহাত্মা অনশন আরম্ভ করেছেন, এই ভ্রাতৃহনন যজ্ঞে আত্মাহুতি দেবেন। ছাত্রেরা বেরিয়েছে শান্তিমিছিল নিয়ে। বেরিয়েছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদল—বালক-যুবক-বৃদ্ধ-মহিলা। অকুতোভয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্ব্বত্র—প্রচার করছে শান্তির বাণী। স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে গান্ধীজীর অমূল্য জীবন যাতে নষ্ট না হয় তারই চেষ্টা চলছে দিনরাত।

হকার খবরের কাগজ দিয়ে গেল। মালতী দোরের কাছ থেকে কাগজখানা উঠিয়ে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই চীৎকার করে উঠল, কি সর্ব্বনাশ!

এই দেখ—। কাঁপতে কাঁপতে ও বসে পড়ল প্রশান্তর পাশে। এই দেখ—বড় বড় হরফে কম্পিত আঙুল ঠেকিয়ে ও বললে, দুর্ব্বৃত্তেরা শান্তিমিছিল আক্রমণ করেছিল। শচীন মিত্র স্মৃতীশ বাঁড়ুজ্জে হ'ত হয়েছেন—আরও অনেকে সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছেন। উঃ—

প্রশান্ত রুদ্ধ নিশ্বাসে ঘটনার বিবরণ পড়ে যেতে লাগল। উত্তেজিত মুহূর্ত্তে ওর কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে উঠল—কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। আহত নামের তালিকায় এসে হঠাৎ ও চেঁচিয়ে উঠল, মলয়—মলয়ও আহত হয়েছে। আঘাত গুরুতর।

বৈঠকখানার ওপিঠে একটি কাতরোক্তির সঙ্গে গুরুভার দ্রব্যবিশেষ পতনের শব্দ হ'ল। মালতী তাড়াতাড়ি জানালা খুলে চৌকির ওপর উঠে পাঁচিলের ও-পিঠে চেয়েই ভীতকণ্ঠে বললে, দেখ, দেখ—ও বাড়ির গিন্নী অজ্ঞান হয়ে উঠোনে পড়ে গেছেন।

সুচিত্রাকে দেখে প্রশান্ত অবাক হয়ে গেল। চিত্তের স্থৈর্য্য ওকে মহীয়সী করে তুলেছে কিংবা পাষাণ করে দিয়েছে হয়ত। যার একমাত্র আশ্রয় ভেঙে পড়ল অকস্মাৎ—সে কি করে অম্লান মুখে সহজভাবেই উচ্চারণ করলে, ঠাকুরপো—এইবার আমাকেও তোমাদের শান্তিমিশনে টেনে নাও—ওঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করি।

প্রশান্ত বললে, তার দরকার হবে না বৌদি—দাঙ্গা থেমে গেছে।

সুচিত্রা বললে, গান্ধীজী যে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন আশা করেন তা হয়েছে কি?

না হোক—উনি অনশন ভঙ্গ করেছেন—হিন্দু-মুসলমান মিলে ওঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ভাল। একটু থেমে বললে, কিন্তু মানুষ ত মানুষই, মহাত্মা নয় ঠাকুরপো। তাঁর সাধনা আছে—অথচ সাধ্যে কুলোয় না এমন তো অনেকবার দেখা গেল। আমাকে যে কোন কাজ দাও—আমাকে বাঁচাও।

প্রশান্ত বুঝলে—সুচিত্রার অন্তরের বেদনা। নিদারুণ শোককে ও কাজের চাপে ডুবিয়ে দিতে চায়। ওর গৃহ আজ দিগন্তে মিশেছে—আরাম-বিলাসের চিন্তা আগুনের মতই দগ্ধ করছে। এমনি গভীর বেদনা থেকেই তো মানবকল্যাণ-ব্রতের সঙ্কল্প নেয় মানুষ। আমাদের মধুরতম সঙ্গীতের মর্ম্মমূলে রয়েছে গভীরতর শোকের আঘাত—কবির এ বাণী অমর সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

বললে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বৌদি—কাজ আপনার মিলবে। যাবার আগে বললে, সত্যিই কি দেশে ফিরে যাবেন না?

আজ নয় ঠাকুরপো। হয়ত সেখানেই যেতে হবে। এখানকার কাজ যেদিন শেষ হবে—

এখানকার কাজ শেষ হবে না বৌদি—খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েও জগতে করুণা জাগাতে পারেন নি—গৌতম সাধনায় বুদ্ধত্ব লাভ করেও জরা-মৃত্যু উত্তীর্ণ হবার ভেলা তৈরি করতে পারেন নি। যেটুকু আলো জ্বলেছে—পৃথিবীতে অন্ধকারের পরিমাণ তার বহুগুণ বেশী।

তবু আলো জ্বালাতে হবে। আলো না জ্বললে আমরা ঠাঁই পাব কোথায়।

সুচিত্রাকে মুখে সাহস দিলে—মনে মনে জানালে প্রণতি। সঙ্কল্প করলে, আবার সে কাজ করবে। যে কালে সে রয়েছে সে কালের দাবি তাকে পূরণ করতেই হবে—আর অনাগত কালকেও স্বাগত জানাতে হবে। সমস্ত বন্ধনের মূলে রয়েছে জাড্য—সে বন্ধন ছেদন করতেই হবে।

৩৪

হাঁ—ছেদন করতে হবে বন্ধন। সুখে দুঃখে উদাসীন

থেকে নয়—কাজকে ভালবেসে—সুখ-দুঃখকেও গ্রহণ করতে হবে। উদাসীনের ধর্ম সংসার নয়—সংসারীর ধর্ম নয় শাস্ত্রবচন আউড়ে কর্মবিমুখ হওয়া। মান-অভিমান, তুচ্ছ হৃদয়ের আবেগ, উত্তেজনা সবকিছুকেই মেনে নিয়ে—কখনো হাসিতে কখনো কান্নায় অতিক্রম করতে হবে পথ। ভুল ভ্রান্তি স্বীকার করে মহৎ না হোক সহজ হতে হবে। সহজ হওয়া আজকের দিনে কত যে শক্ত সভ্যতা-নাগিনীর পাশবদ্ধ মানুষ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে।

শুভার চিঠিখানা হাতে করে এই ধরণের কথাই সে ভাবছিল। যে দিকের দুয়ার ঘটনার প্রবাহে একদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছে—সেই রুদ্ধদ্বারে নিষ্ফল কামনায় করাঘাত করার কোন সঙ্গত অর্থও তো নাই। অথচ বুঝাপড়ার জন্য সেই দুয়ারে গিয়ে তাকে দাঁড়াতেই হবে—মালতী তার পাশে থাকা সত্ত্বেও।

শুভা তাকে আহ্বান জানিয়েছে, দৃঢ় সঙ্কল্প সূর্য্যোত্তপ্ত তুষারকণার মত অমনি দ্রব হতে আরম্ভ হয়েছে। হাঁ, সে যাবে। শুভাকে আর একবার বোঝাবে—যে পথ তুমি বেছে নিয়েছ—তা কল্যাণের পথ নয়। গণ-অধিকারের দাবি জানিয়ে শ্লোগান ছুঁড়ে মারার নাম—গণবিপ্লব সাধন নয়। ও হ'ল দেশলাই কাঠির আগুন—ছোট কাঠির আগায় যা বহন করছে তা পরিমাণে অল্প, স্থায়িত্বে আয়ুহীন। ওর মধ্যে 'ভাল করছি'র ঔদ্ধত্য প্রচুর—'সব জানি'র অহঙ্কার আকাশস্পর্শী—তরঙ্গের কুলুধ্বনিতে মিশে আছে রাশি রাশি ফেনা—সূর্য্যের কিরণে যা শুকিয়ে যায়।

চিঠির তারিখ বহু দিন আগের। ফ্যাক্টরীতে তখন আসন্ন ধর্মঘটের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। আপোষ-আলোচনা এক-দিকে ব্যর্থ হবার উপক্রম হয়েছিল—অন্য দিকে গোপন চুক্তির ফলে শ্রমিকস্বার্থ বলি দিয়ে নেতারা উপরে উঠবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন ধর্মঘটের রসদ সংগ্রহ করছি। আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি।

শুভা লিখছে: একবার এস কমরেড—দোটানায় পড়ে গেছি। দু'দিক বজায় রাখা চলবে না—বুঝতে পারছি। তবু পথ বেছে নেবার আগে—তোমাকে সব খুলে বলব। অনুমতি নয়—পরামর্শও নয়—তোমাকে উপদেশ দেবার সঙ্কল্পও নয়—শুধু একবার এস—পথ আমার ঠিক করাই আছে—যাবার আগে তোমাকে জানিয়ে যাব শুধু।

বহুদিন আগেকার আহ্বান—রক্তে নতুন করে দোলা দিলে। এ আহ্বানের ভাষা পুরাতন হয় নি—হয়ত শুভা তার শেষ কথাটি তাকেই বলে যাবার আশায় এখনও প্রতীক্ষা করছে—সেই আলো-বাতাসবঞ্চিত জীর্ণ স্যাঁতসেঁতে ঘর-খানিতে। সেখানে জ্বলছে মৃদু বায়ু-শিহরিত তৈলবিন্দু-নিঃসেবিত একটি প্রদীপ—তারই ম্লান আলোতে করতললগ্ন চিবুকে—চিন্তার গুরুভার বহন করছে সে; চুল রুক্ষ—গণ্ডে বলিরেখা—চক্ষুতে কালিমা।

ঝড়ের বেগে প্রশান্ত এসে পৌঁছল সেই বাড়ীর সামনে।

মুহূর্ত মাত্র ইতস্তত না করে সে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল।

ঘরের মধ্যে বসে খুকী এক মনে কি লিখছিল। ইস্কুলের পড়া তৈরি করছিল হয়ত। প্রশান্ত আসতেই উৎফুল্ল মুখে উঠে দাঁড়াল। বললে, বসুন—মাকে ডেকে আনি।

ও ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল—প্রশান্ত খপ করে ওর একখানা হাত চেপে ধরে বললে, আরে—তোমার সঙ্গেই গল্প করতে এলাম যে!

খুকী হাসল। ও বুঝতে পারে কার সঙ্গে গল্প করবার জন্য প্রশান্ত এসেছে। হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললে, দিদি কিন্তু এখানে নেই—তা বলে দিচ্ছি।

সে কি—তোমার দিদি গেলেন কোথায়?

বাঃ রে—আপনি জানেন না বুঝি? সে ত কবে চলে গেছে।

সবিস্ময়ে প্রশান্ত বললে, চলে গেছে? কোথায়?

তা কি করে জানব—মাকে ডেকে আনি—তিনি বলতে পারবেন।

প্রশান্ত ওর হাত ছেড়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শুভার মাও জানেন না মেয়ে কোথায় গেছে। প্রায় মাস দুই হবে সে চলে গেছে। বলে গেছে ফিরতে দেরী হবে। বাইরে তার নাকি অনেক কাজ।...চিঠিপত্র আসে মাঝে মাঝে—ঠিকানা থাকে না। পোষ্টাপিসের মোহরের ছাপ এক জায়গার নয়। টাকাও আসে অত্যন্ত কম—কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তাতেও দুঃখ নেই শুভার মার—কিন্তু মেয়ে যে ভেসে গেল—সংসারে ঠাঁই পেলে না—এই দুঃখ শেলের মত বিঁধে আছে বুকে। যে মেয়ে স্বামী পেলে না, সংসার পাতলে না—তার মেয়ে-জন্মই যে বৃথা। কোন্ সান্ত্বনায় বুক বাঁধবেন তিনি!

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, এ ভাবে তার চলে যাওয়ার কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন।

না বাবা—জানই তো সে মেয়ে খেয়ালী। পুরুষের সঙ্গে সমান তালে তর্ক করে ঝগড়া করে। যেদিন সে চলে যায় তার দু'দিন আগে দু'জন লোকের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়—সে একরকম ঝগড়াই। তাদের সঙ্গে মতের মিল ছিল না ওর।

তাঁদের চেনেন আপনি?

মানে বারকতক তাঁরা এসেছিলেন এখানে। ভারি ভাল লোক। তাঁদের কাছেই বুঝি ও কাজ করত—কারণ মাঝে মাঝে তাঁরাই টাকাপয়সা দিয়ে যেতেন। এ বাজারে এমনিতে কে কাকে সাহায্য করে বাবা।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, তাঁদের সঙ্গে ঝগড়াই যদি হয়ে থাকে তাতে ঘর ছাড়বার যুক্তিটা ঠিক বোঝা গেল না। তাঁরা তো নিকট-আত্মীয় নন।

না—। কিন্তু একটু দাঁড়াবে বাবা—একটি জিনিস তার বাক্স থেকে পেয়েছি—তাতে অনেক কথা লেখা আছে। সব আমি বুঝতে পারি নি। দাঁড়াও বাবা, আমি আসছি। তিনি দ্রুতপদে চলে গেলেন এবং ফিরে এলেন দ্রুতপদেই। একখানি ছোটমত ডায়েরি প্রশান্তর হাতে দিয়ে বললেন, এইটি পড়লে হয়ত অনেক কথা তার জানতে পারবে। পড়ে দেখো।

প্রশান্ত সঙ্কোচ প্রকাশ করলে, কিন্তু—এ পড়া কি আমার পক্ষে অন্যায় হবে না!

একটুও না। আমি তার মা, আমি বলছি—একটুও অন্যায় হবে না।

তবু—প্রশান্ত নতমুখে চেয়ে রইল ডায়েরিখানির দিকে।

শুভার মা হাসির ভঙ্গি করলেন, বয়স আমার কম হয়নি বাবা—এ সংসারে অনেক দেখলাম—অনেক শুনলাম। কিসে কার অধিকার সে আর আমাকে বোঝাতে হবে না বাবা। মেয়ের যদি আমার কপাল মন্দ না হবে তো তুমিই বা দূরে সরে থাকবে কেন?

প্রশান্ত লজ্জায় আরক্ত মুখে ডায়েরির একখানা পাতা খুলে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল। বললে, কাল এখানা ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

সে তোমার ইচ্ছে। খানিকটা এগিয়ে এলেন তিনি। হাতখানা একবার বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ গুটিয়ে নিলেন। দ্বিধায় সঙ্কোচে ভীরু চোখে চাইলেন প্রশান্তর পানে। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, মাঝে মাঝে খবর নিও বাবা, তোমার ভরসাই আমার সবচেয়ে বড় ভরসা।

আসব, বলে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল প্রশান্ত।

৩৫

ডায়েরির পাতা উল্টে যাচ্ছে প্রশান্ত। পুরো ডায়েরি নয়—ছাড়া ছাড়া ঘটনাগুলিকে জুড়ে—রঙ ফলিয়ে কাহিনী রচনা করবার প্রয়াস নেই এর মধ্যে। এ অত্যন্ত খাপছাড়া এলোমেলো চিন্তা—অক্ষরের ছাঁচে বন্দী হয়ে আছে পরিমিত পৃষ্ঠায়। কোথাও স্পষ্ট—কোথাও বা কুয়াসাচ্ছন্ন। কাটাকুটি—লাইনবাঁকা লেখা—চঞ্চল ও দ্রুত সঞ্চরণশীল মনোভাবকে প্রকাশ করছে। তারিখের ধারাবাহিকতা নাই—কতকগুলি ছিন্ন চিন্তাকে জোড়া লাগিয়েও একটি মীমাংসায় পৌঁছানো দুষ্কর। তবু এগুলি যেন অনাবিষ্কৃত দেশ—প্রশান্তর কাছে গভীর রহস্য সমাধানের ইঙ্গিত বহন করে আনছে। অপরাহ্ণে ঘরের দুয়ার বন্ধ করে এক নিশ্বাসে অনেকখানি সে পড়েছে—গভীর রাত্রিতে রুদ্ধ দ্বারকক্ষে আবার অজানা রহস্যের পাঠোদ্ধারে মগ্ন হ'ল সে।—যেখানটা তার ভাল লাগছে—দু'বার তিনবার করে পড়ছে। তন্ময় হয়ে পড়ছে। বাইরে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি ক্রমে গভীর হচ্ছে—নীরব হচ্ছে সে খেয়াল তার নেই।

এক জায়গায় আছে:

আজও প্রশান্ত এসেছিল। ওর সঙ্গে বেশ খানিকটা তর্ক হয়ে গেল। ও একটা কথা ভুলে আছে যে দুঃখীর দুঃখমোচনপ্রয়াস ওর অন্তরের বস্তু নয়। দয়াবৃত্তি মানুষকে কোমল করে—অহঙ্কৃত করে। সাধারণের চেয়ে উঁচুতে উঠে নিজেকে পরিতৃপ্ত বোধ করে না কি? ও কি করে বুঝবে দারিদ্র্যের বেদনা—ও তো দরিদ্র নয়।

পরের পাতায়:

ধর্ম্মঘট যদি হয়ই আমি কি করতে পারি। যারা পেট ভরে দু'বেলা খেতে পায় না তাদের দাবিকে অন্যায় বলবে কোন্ যুক্তিতে! তোমার শিল্প উৎপাদনে কি ব্যয় পড়ল—তোমার মুনাফায় কোথায় ধরল টান—আধপেটা খেয়ে কোন দুর্গত রাখতে পারে তার হিসাব! ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করবার সবচেয়ে বড় যুক্তি অন্ন—উৎপাদনের আয়ব্যয় লাভ-লোকসান এ সব তো তুচ্ছ ব্যাপার। হাঁসকে মেরে ফেললেই একসঙ্গে অনেকগুলি সোনার ডিম পাওয়া যায় না সত্য—কিন্তু সোনার ডিমের লোভ অন্নপ্রাপ্তির চেয়ে বড় বস্তু এটাই বা ভাবছ কেন! পৃথিবীতে দুর্দ্দিন এসেছে—মানুষের ক্ষুধামান্দ্য তো ঘটে নি। খাদ্য-শস্যের দাম পাঁচ ছ' গুণ বাড়িয়েছ—সিকি ভাগ মাইনে বাড়াতে যত আপত্তি তোমাদের। তোমরা বুর্জ্জোয়া নও বললে সর্ব্বহারারা মেনে নেবে কেন? তোমরা কথার কৌশল জান—অঙ্কের কৌশল জান—ষ্ট্যাটিস্টিকসের দোহাই তোমাদের প্রতি যুক্তিতে। সে যুক্তি বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়ত-বিবেকগ্রাহ্য নয়—সহজবোধ্য তো নয়ই।

কয়েকখানা পাতা উল্টে পাওয়া গেল:

একটা সভায় বক্তৃতা দিলাম। প্রথমটা অত্যন্ত সঙ্কোচ হচ্ছিল—কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। ভাল ভাল কথা বা যুক্তিগুলো ভাবের স্রোতে একই সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে বেরুতে চাইছিল—আর একসঙ্গে বেরুনোর জন্য কোনটাই স্পষ্ট হ'ল না। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল, নিজের অক্ষমতা বুঝে বসে পড়লাম।

অন্যত্র:

আজ বক্তৃতাটা ভালই হয়েছে। যাদের উদ্দেশে কথাগুলি বললাম—তারা হাততালি দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করলে। আজও মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল—অক্ষমতার দরুন নয়—নিজেকে উপযুক্ত মনে করে।

কয়েক দিন পরের একটি তারিখে এসে পৌঁছল প্রশান্ত:

যখন বক্তৃতা দিই—নিজেকে বেশ খানিকটা উঁচু মনে হয়। আজকাল ভাল কথা যুক্তি কিছুই আটকায় না। খানিকক্ষণ বলার পর আরও বলতে ইচ্ছা হয়। এ-ও কি নেশা? শুনেছি সুরার ক্রিয়ায় দেহমনে উত্তেজনা জাগে—অনেকটা এই রকমের উত্তেজনা কি? নইলে নিজেকে যোগ্য মনে করে স্ফীত হয়ে উঠি কেন? শুনেছি নেশা কাটলে আসে অবসাদ। ডায়েরি লিখতে লিখতে অবসাদ অনুভব করছি। আমার কেবলই মনে হচ্ছে গোর্কীর সেই কথা: You are not that which you want to appear. আমি যা নই ভঙ্গিতে ভাষণে চালচলনে তাই হবার চেষ্টা করছি।

পর পৃষ্ঠায়:

না—বক্তৃতা আর দেব না। সত্যিই আমি তো তা নই। চাষীর দুঃখ, মজুরের দুঃখ হয়ত বুঝি—দারিদ্র্যের সঙ্গে আমারও আবাল্যের পরিচয়। তবু আমি গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে—যাকে বলে মধ্যবিত্ত। আমি চাষী নই—মজুর নই। এক এক সময় মনে হয় সাম্যবাদের নামে ওদের হিংসাকে ওদের লোভকে জাগিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করছি না তো! আচ্ছা, আমাদের কয়েকজন নেতাকে লক্ষ্য করব।

তারপরের মন্তব্যগুলি লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে। কাটাকুটির মধ্যে একটি লাইন এই: নেতারা সবাই মধ্যবিত্ত পরিবারের।

কয়েকটা তারিখ পার হয়ে···আছে:

ধর্ম্মঘট সর্ব্বত্র সফল হচ্ছে না—কারণ শ্রমিকরা ভালমতে সঙ্ঘবদ্ধ নয়। তা ছাড়া শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি আগুপিছু ভেবে না দেখেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রীতিমত কষ্টের সৃষ্টি না হলে ধর্ম্মঘট সফল হবে কেন। যে ক্ষুধা মেটাবার জন্ম এই আয়োজন তাকেই সাথী করে কখনও যুদ্ধ করা সম্ভব! দাঁড়াবার ঠাঁই না থাকলে বলবার শক্তি আসবে কোথা থেকে!

এক জায়গায় আছে:

অবন্তীর টাকা নিলাম। না নিলে সংসারের অভাব মিটছিল না। কিন্তু কেন নিলাম! আমি তাকে দিতে পেরেছি কি কিছু? দেওয়া নেওয়া সমান মানে না থাকলে সমাজের সুর কাটে—মনের তালও কাটে। কাল প্রশান্ত যা বলে গেল—তা ভাবছি। সত্যিই তো দুনো দাবি চাপিয়ে আধাআধি পেয়ে মিটিয়ে ফেলা মানে আপোষ-নিষ্পত্তির ব্যাপার। এটা যেন ভয় দেখানো ও ঘুষ খাওয়ার মত ঠেকছে। অধিকাংশ ধর্ম্মঘট এইভাবে মিটছে। এ পথ ভাল নয়।

অন্তত্র:

দাশগুপ্ত কিছুতেই বুঝবেন না—বাঁকা পথ কল্যাণের পথ নয়। সঙ্ঘের শক্তি বাড়াবার জন্ম মালিকদের সঙ্গে টাকা নিয়ে রফা করার যুক্তিটা কি! শ্রমিকদের বোঝানো হ'ল, এ হচ্ছে রসদ সংগ্রহ। ভবিষ্যতে তোমরা যাতে ভাল ভাবে লড়তে পার তারই প্রস্তুতি এটা। ছলে বলে অথবা কৌশলে। আমি বললাম, অপকৌশল। উনি ক্ষুব্ধ হলেন, বেশ বুঝা গেল। বক্রোক্তি করলেন, গান্ধীর ছোঁয়াচ লেগেছে। সত্য কি শুধু গান্ধীরই একচেটে? আশ্চর্য্য!

তারপর লিখেছে:

শ্রম আর মূল্য-বিনিময়ের কথাটা প্রশান্ত মন্দ বলে নি। ন্যায্য পরিশ্রমিকের বিনিময়ে ন্যায্য শ্রম এত দিতেই হবে—এরই ভিত্তিতে আমরা দৃঢ় করতে পারব এই আন্দোলনকে। নইলে আধাআধি রফায় কারো বিশ্বাস অর্জ্জন করা যায় না। যে শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদ ঘোষণা সেই শোষণকেই সমর্থন করা হচ্ছে এই নীতির দ্বারা। গুপ্ত বললেন, কিসে? বললাম, নয় কিসে? আপনারা শ্রমিকের হয়ে যে দাবি জানাচ্ছেন তা কি ধনিক-শোষণের যন্ত্র নয়! দাবি জানিয়ে পুরোপুরি যদি আদায় করতে পারেন তবে বুঝব দাবি আমাদের যথার্থ। রফা মানেই তো মানহানির মামলা।

অত্যন্ত অস্পষ্ট লাইন ক'টিতে বিক্ষিপ্ত মনের পরিচয় আছে:

মাকে তিরস্কার করেছি—কটু বলেছি। প্রশান্তকেও কটু কথা বললাম, আমাদের দুঃখ দেখে ওর অর্থসাহায্যের হেতু কি থাকতে পারে! ওর রক্তে নীল রঙের নেশা জমেছে, ও জগৎকে কিনতে চাইছে।···হলদে চিরকুটখানা হাতে আগুনের শিখার মত জ্বলছে। জানি এ কার লেখা। কতবার প্রতিবাদ জানিয়েছি এ নিয়ে। ক্ষুধার্ত্তের অন্ন প্রার্থনার দাবিতে যুদ্ধের তহবিল পূর্ণ করবার কি অধিকার আছে। এ নিয়ে আমরা বিলাস করছি হয়ত।

তারপর—

ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে অনেক কিছু। পেলেই মানুষ তৃপ্ত হয় না—অন্নেরও প্রয়োজন আছে। যুদ্ধ তার স্বভাবের ক্রিয়া। নানান রকমের যুদ্ধ। ক্ষমতামদের মত—এ পাওয়ার বাসনা কমে না বাড়েই। এ দৃষ্টিকে করে সঙ্কুচিত আবিল, একাংশে লগ্ন। পৃথিবীর বহু দিক আছে—নানা বিপরীতধর্ম্মী সমস্যা আছে। সব দুঃখের কারণই খাঁটি নয়, ন্যায্য নয়। তর্ক করলাম—কলহ করলাম—ওঁরা কিন্তু অবিচল। বললেন, এ দাবি প্রত্যাহার করব না আমরা। শ্রমিকরা কিছু পেলেই আপাতত সন্তুষ্ট হবে। নইলে বহুদিন ধরে ধর্ম্মঘট চালানোর মনোবল বা অন্নবল ওদের নাই। ওঁরা চলে গেলেন। ভাবছি—পার্টির কাজে ইস্তফা দেব কিনা।

তারপরের লাইনগুলি স্পষ্ট—বড়—

না ইস্তফা দেব না—শেষ পর্য্যন্ত এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করব—এ প্রথার সংস্কার করব। শ্রমিকের সঙ্গে—চাষীর সঙ্গে জীবনকে মিশিয়ে দিয়ে ওদের প্রকৃত মর্ম্মকথাটি বুঝতে

চেষ্টা করব। যুদ্ধই যখন মানবীয় বৃত্তির অপরিহার্য্য ধর্ম্ম তখন সে ধর্ম্ম কেন পালন করব না! ভীরুর মত পলায়ন আমার স্বধর্ম্ম নয়।

এর পর তিনটি পাতায় লেখার ঠাসবুনানি—কাটা ও লাইনগুলি বাঁকা আর কালি ধ্যাবড়ানো। বোঝা যাচ্ছে চিত্তের স্থৈর্য্য হারিয়েছে। কোথাও অস্পষ্ট লেখা আছে; এ সংসারের ভার ওর ওপরেই দেব কি? ওকে চিঠি লিখলাম। তার পরেই মন্তব্য রয়েছে; সব ভাবনা একসঙ্গে ভাবা যায় না। আমার যথাসাধ্য সাহায্য করব—কিন্তু সংসার থেকে দূরে যেতে হবে। দুঃখের পাঁকে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে দুঃখটাকে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ—কিন্তু সমস্যার সমাধান তাতে হবে না। পাঁকের বাইরে একটা পা না রাখলে আর একটি পা-কে পাঁক থেকে তুলব কি করে!

দু'একজনকে সঙ্কল্পের কথা বললাম। ওরা হাসল, বললে, ভীরু। ধর্ম্মঘট যত এগিয়ে আসছে—দুর্ব্বল যুক্তির জালে জড়িয়ে আমি নাকি চাইছি পিছিয়ে যেতে। কিন্তু আমি তো জানি যুদ্ধ হবে না—এ শুধু যুদ্ধের অভিনয়।

প্রায় শেষ পাতায় এসে পৌঁছল প্রশান্ত।

কাকেই বা জানাই সঙ্কল্পের কথা। সবাই ভুল বুঝল। কিন্তু একজনকে না জানিয়ে আমিও তো স্বস্তি পাচ্ছি না। প্রশান্তকে জানাব কি? না—ছিঃ। তার চেয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব পত্র লিখে। সে একদিন কাছে আসতে চেয়েছিল—পথের বাধা তখন ছিল দুর্লঙ্ঘ্য; পথ আজও সুগম নয়। তবে সত্যের অরুণবর্ণ জ্যোতি মাঝে মাঝে দেখতে পাই আজ। যে যা বলে তার সবটা ভুয়ো নয়—আমাদের নীতিও ভেজাল-শূন্য নয়। সত্য আছে এ দুয়ের মাঝামাঝি। এখন পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষার মূল্য দিতে হবে বৈ কি—তার পর যে সম্পদ আসবে···নূতন কালের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলে আমরা সে সম্পদের সন্ধান পাব। তবু জানিয়ে রাখি—সম্পদ সঞ্চয় করব না আমরা—তাকে ভাসিয়ে দেব কালের স্রোতে। নতুন সমাজ—নতুন বিধিবিধান—নতুন পারিপার্শ্বিক বার বার ফিরে আসে নতুন হয়ে। পুরাতন রীতি-অভ্যস্ত মন তাকে সহজে স্বীকার করতে চায় না। বয়োধর্ম্মে স্থিতিশীলতার জাড্যভারে তার কল্যাণবুদ্ধি আচ্ছন্ন—চিন্তা অস্বচ্ছ আর বিবেক পীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মোহমুক্ত দৃষ্টি ও বিচারপ্রবুদ্ধ মন—এ যেন জরাগ্রস্ত না হয়। এ যদি জাগ্রত না রইল—কিসের প্রয়োজন জীবনে!

শেষ লাইন ক'টি।

চলে যাচ্ছি—গণ্ডি পার হয়ে। প্রণাম জানাচ্ছি পুরাতন পৃথিবীকে—প্রণাম জানাচ্ছি অনাগত পৃথিবীকে। দেশ স্বাধীন হতে চলেছে—সে দায়িত্ব বহন করবার যোগ্য যেন হতে পারি—যেন প্রণতি জানাবার অধিকার অর্জ্জন করি।

খুকী এই মাত্র জিজ্ঞাসা করছিল, দিদি তাই কোথায় যাচ্ছ? ফিরবে তো এক্ষুনি—মার শরীর খারাপ।

ওর চিবুক ধরে চুমো খেয়ে উত্তর দিলাম, ফিরব বই কি ভাই।···

ডায়েরি শেষ হয়েছে এইখানে—প্রশান্ত আত্মসমাহিত হয়ে বসে আছে। শুভা কোন্ সত্যের সন্ধানে গৃহ ছাড়ল—সে সত্য সে লাভ করবে কিনা—মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে সে ফিরে আসবে কিনা একদিন—এ সব প্রশ্ন ওর মনেই উঠল না। ওর মন চলে গেছে—জগৎ ছাড়িয়ে সুদূর ধ্যানলোকে। যে অনাদি কালস্রোতে জন্মমৃত্যুর ফুল ভেসে আসছে আর ভেসে যাচ্ছে—সূর্য্যপিণ্ডের জ্যোতি আকর্ষণে পৃথিবী স্বকেন্দ্রে লগ্ন হয়ে গ্রহ পরিক্রমা করছে শূন্যমণ্ডলে—অনিত্য বস্তু নিত্যসত্তার সংঘাতে প্রতি মুহূর্ত্তে রূপ বদল করছে—সেই কালস্রোতে পা রেখে দাঁড়িয়েছে প্রশান্ত, দাঁড়িয়েছে আজকের মানবগোষ্ঠী। সে মানুষ মরণশীল অথচ চিরজীবী। এক হাতে ধ্বংসের খর্পর—অন্য হাতে সৃষ্টির লীলাকমল—খড়্গ ও বরাভয়যুক্ত পাণিতে—যুগপৎ শাসন ও সান্ত্বনা—আপাত বিপরীতধর্ম্মী অথচ পরস্পরের পরিপূরক—দুই বস্তু নিখিলের নিত্য প্রবহমাণ স্রোতধারাকে নির্ম্মল ও গতিবান করে রেখেছে। ডায়েরির পাতা থেকে যে ইঙ্গিত পেলে—তাই বুঝি ওর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল স্বপ্ন-কল্পনায়। ও মগ্ন হয়ে রইল তার মাঝে।

দুয়ারে মৃদু করাঘাতের শব্দ। ঠুক্—ঠুক্—ঠুক্।

প্রশান্ত চমকে উঠল—ওর ধ্যান ভঙ্গ হ'ল।

প্রশান্ত—প্রশান্ত—

অন্তরস্থিত প্রিয় কণ্ঠের আহ্বান বাইরের প্রতিধ্বনিতে বুঝি বেজে উঠল।

ও ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এ আহ্বানের অর্থ ওর কাছে অস্পষ্ট নয়···ও ভুল করে নি।

রাত্রিশেষের বার্ত্তা নিয়ে সে ফিরে এল···প্রশান্ত তাকে ভাল মতে জানে। তাকে স্বাগত জানাতেই হবে।

(সমাপ্ত)

নিম্ন বঙ্গের আবহাওয়ায় লবণের চাষ

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ, এম এস্-সি.

পশ্চিম বঙ্গের মাত্র দুইটি জেলা সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত—মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা। এই দুইটি জেলার সমুদ্রতীরবর্ত্তী অঞ্চল ভিন্ন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্বপ্রান্তে এমন আর কোনও স্থান নাই যেখানে লবণের চাষ চলিতে পারে। এই দুই স্থানে লবণ-চাষ কত দূর সফল হইবে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, কারণ লবণাক্ত ভূমিকে ক্রমশঃ উর্ব্বরা করিয়া খাদ্য-শস্যের চাষও সম্ভব এবং তাহা বর্ত্তমান খাদ্য-পরিস্থিতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কোকনদের জগনায়কপুর কেন্দ্রে লবণ তৈরি

বর্ত্তমান প্রবন্ধে লবণাক্ত অঞ্চলের আবহাওয়া, মাটির অবস্থা এবং লোণা জলের গাঢ়তা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। এ বিষয়ে লোকের যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। অনেকেই বলিয়া থাকেন—'যা বৃষ্টি, জল তো কম লোণা, তার উপর যেরূপ স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া তাতে কি আর আমাদের দেশে লবণ হয়?' কিন্তু একদা নিম্ন বঙ্গে কিরূপ বিস্তৃত ভাবে লবণের চাষ হইত সে কথা ইঁহাদের জানা নাই—যে প্রণালীতেই হোক আগেকার দিনে মলঙ্গীরা প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করিত এবং সূর্য্যের তাপ, বৃষ্টি ও আর্দ্রতা সব কিছুরই উপযুক্ত ব্যবস্থা তাহাদের করিতে হইত। কাজেই বর্ত্তমানে তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলিলে চলিবে কেন?

লবণ-চাষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রভাব বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য :—

১। সাগরের বা নদীর লোণাজলের গাঢ়তা (density)

২। জমির অবস্থা এবং মাটির গুণ

৩। যেখানে লবণের চাষ হয় সেই স্থানের বৃষ্টির পরিমাণ, বিশেষ করিয়া লবণ-চাষ-ঋতুতে বৃষ্টির পরিমাণ এবং বৃষ্টির দিবস-সংখ্যা

৪। বাতাসের গতি

৫। আর্দ্রতা

৬। তাপমান বা টেম্পারেচার

এই কয়টি বিষয় বিশদ ভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, নিম্ন পশ্চিম বঙ্গের আবহাওয়া লবণ-শিল্প প্রসারের পক্ষে কতটা অনুকূল।

লোণাজল—পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণদিকস্থ সাগরের বা সাগরে পতিত নদীগুলির লবণাক্ত জল—যাহা হইতে রৌদ্র সাহায্যে লবণ নিষ্কাশন করা হয়, তাহার ঘনত্ব বা লোণাভাগ কিরূপ তাহা নিম্নের রিপোর্ট দেখিলে বুঝা যাইবে।

নমুনার শতকরা অংশ

	দিঘা-কাঁথি	সপ্তমুখী (সুন্দরবন)	মাদ্রাজ
লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড)	২·২০	২·১৯	২·৫
ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড	·২৪	·২৭	·২৭
" সালফেট	·১৯	·১৯	·১৮
ক্যালসিয়াম "	·১০	·১০	·১৩
" কার্ব্বনেট	·০১	·০১	—
	২·৭৪	২·৭৬	৩·০৮

উপরের রিপোর্ট হইতে এইটুকু দেখা যায় যে, মাদ্রাজ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের সাগরজলের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের উপকূল অঞ্চলের সাগরজলের বিশেষ পার্থক্য নাই। কাঁথি ও সপ্তমুখী হইতে যে জলের নমুনা সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসের। প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে এপ্রিলের জল তদপেক্ষা কিছু গাঢ়। সাধারণতঃ বোম্বাই ও মাদ্রাজের সাগরজলের লোণাভাগ আড়াই বা তিন। নিম্ন বঙ্গের সাগরজলেও লোণাভাগের অনুপাত প্রায় সেইরূপ—এই সামান্য পার্থক্যে কিছু আসিয়া যায় না। এ বৎসর মার্চ্চ মাসে মাদ্রাজের কোকনদ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্ন কাঁথির উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের সাগরজল পরীক্ষা করিয়াছি—সর্ব্বত্রই লবণাক্ত ভাগের পরিমাণ ২·৫ বা ২·৬।

অতএব সাগরের লোণাজল সম্বন্ধে বাংলাদেশের সর্ব্বসাধারণের ধারণা যে ভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কাথিয়াবাড় বা কচ্ছদ্বীপে শতকরা ৩।৪ লবণাক্ত ভাগ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভারতের সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রায় যাবতীয় লবণ-প্রস্তুতি-কেন্দ্রে যে জল ব্যবহার হয় তাহার শক্তি (strength) গড়ে শতকরা ৩ বা ৩-এর কম। সিংহল ও ব্রহ্মদেশের কারখানাতেও ২½ বা ৩-এর অধিক লবণের ভাগ পাওয়া যায় না। কাঁথিতে দেখিয়াছি মার্চ্চে আড়াই ট্রেংথের জল কনডেন্সারে এক দিনের রৌদ্রতাপ ও বাতাসে ৩-এর অধিক হইয়া যায় এবং এপ্রিলের ৩ শক্তির জল একদিনে ৪ হইয়া যায়। রীতিমত বর্ষার সময় সর্ব্বত্রই এই জলের লবণ-ভাগ যথেষ্ট হ্রাস পায়। কিন্তু সে সময় এদেশের কোথাও লবণ প্রস্তুত হয় না। সাধারণতঃ জানুয়ারী হইতেই ভারতের সমুদ্রোপকূলস্থিত স্থানগুলিতে লবণের চাষ আরম্ভ হইয়া জুন জুলাই বা আগষ্ট মাস, অর্থাৎ বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। সাধারণতঃ আষাঢ়ে মৌসুমী বায়ুর আবির্ভাব ঘটিলেই লবণ-প্রস্তুতি-কেন্দ্রসমূহের কাজ বন্ধ হইয়া যায়, বিশেষ করিয়া বোম্বাই, বাংলা, উৎকল এবং অন্ধ্র প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে। নবেম্বর মাস হইতে মেরামতি কাজ আরম্ভ করিয়া জানুয়ারীর শেষ হইতে পুনরায় লবণ সংগ্রহ করিতে হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে ঠিকমত লবণ-চাষ-ঋতু ৬।৭ মাসের অধিক নহে। মাদ্রাজের দক্ষিণ দিকে তিউতিকোরিণ পর্য্যন্ত অবশ্য ৭।৮ মাস কাজ চলে, কারণ উক্ত অঞ্চলে বর্ষা সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হইতে ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত ৪ মাস মাত্র থাকে। জানুয়ারীতে অল্প বৃষ্টি হইলেও ফেব্রুয়ারী হইতে লবণ উৎপাদিত হয়।

মাটি—উৎকৃষ্ট লবণ উৎপাদনের উপযোগী গুণ মাটির আছে কিনা তাহা দেখিতে গেলে জমির অবস্থান এবং অবস্থা পরীক্ষা করিতে হয়। সাধারণ ভাবে নিম্ন বঙ্গের মাটি, আমরা যতটুকু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, লবণ-চাষের পক্ষে বেশ উপযোগী—পলি পড়িয়া পড়িয়া যে এঁটেল মাটির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা মাদ্রাজের অনেক লবণ-ক্ষেত্রের মাটির চেয়ে ভাল। কাঁথি, তমলুক, মৌশুনী (সাগর), মথুরাপুর (উপকূল অঞ্চল) প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ভাল মাটিই দেখিয়াছি—ঐ সমস্ত জায়গায় পূর্ব্বে রীতিমত লোনা মাটি চাঁচিয়া লবণের চাষ হইত। উপরকার স্তর বেলে (loamy) হইলেও নিম্নস্থ স্তর খুব শক্ত—তাহা ঠাসিয়া সম্পূর্ণ শোষণ-ক্ষমতাহীন [impervious (watertight)] করা যায়, যাহাতে লোণা জল ভেড়িতে কমিয়া না যায়। আর একটা কথা এই যে, যে মাটিতে ধান জন্মে সেই মাটিকেই ঠিকমত প্রস্তুত করিয়া লইলে লোনা জল শুষ্ক করিবার আধার বা কনডেন্সার-এ পরিণত করা যায়। সেইজন্য উপকূলস্থিত যে সমস্ত জমিতে বাঁধ দিয়া খাদ্যশস্যের চাষ হইতেছে, তৎসংলগ্ন লোণা জলপ্লাবিত পতিত অংশগুলিকে বেশ ভাল কনডেন্সারে পরিণত করা যায়। এরূপ জমি কাঁথি অঞ্চলে বহু আছে। ২৪-পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে আবাদের প্রসারের ফলে বৃক্ষহীন লবণাক্ত পতিত জমির পরিমাণ অবশ্য অনেক কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু বনাঞ্চলের সীমানায় সীমানায় যে সমস্ত জমিতে ভাল ধান হয় না, সেগুলিকে লবণ-চাষের জন্য কাজে লাগান যাইতে পারে। এই সমস্ত জমির ধান্য-উৎপাদিকা শক্তি খুব কম, কারণ বর্ষার পূর্ব্বে মিষ্ট জলের অভাবে সেরূপ সেচকার্য্য হয় না। মাটি খুঁড়িয়া যে জল পাওয়া যায় তাহা ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বেশীর ভাগই লোণা। এইজন্য আমাদের মনে হয়, এই জমিগুলি লবণ-চাষের কাজে লাগাইলে তাহাদের উপযোগিতা অনেক বৃদ্ধি পাইবে। বিঘা প্রতি সাত-আট মণ ধান্যোৎপাদন না করিয়া যদি অন্ততঃ ১০০ মণ লবণ উৎপাদন করা যায় তাহা হইলেও জমির কদর বাড়ে। ফসল বাড়াইবার জন্য সারের

মাদ্রাজে লবণ উৎপাদন

সাহায্যে এ সমস্ত জমির কিছু উৎকর্ষ সাধন করা যায় সত্য, কিন্তু লোণা জলের পরিবর্ত্তে মিষ্ট জল কোথায় পাওয়া যাইবে? মিষ্ট জলের সেচ ভাল ভাবে করার অনেক অসুবিধা আছে। বৃষ্টির ভরসায় থাকিলে বড়জোর ১০।১২ মণ ধান হইবে, কিন্তু প্রতি বৎসর ক্রমাগত লবণের চাষ করিয়া গেলে শত মণের স্থানে দুই শত মণ লবণ উৎপাদন করা সম্ভব হইতে পারে। ইহা ছাড়া খানিকটা অংশে লোণা জলের ভেড়িতেই মাছের চাষ করা যায়।

আর একটা কথা। পশ্চিম বঙ্গে এখনও বহু জেলায় এমন প্রচুর ধান-জমি আছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাহার উর্ব্বরতাশক্তি

বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু লবণ প্রস্তুতির উপযোগী জমি কেবলমাত্র নিম্ন পশ্চিম বঙ্গের দুইটি জেলাতেই পাওয়া যাইবে। অতএব কাঁথি অঞ্চল এবং ২৪-পরগণার সপ্তমুখী, ঠাকুরাণ এবং মাতলা নদীর মোহানার নিকটবর্ত্তী দ্বীপগুলির প্রান্তিক অঞ্চলসমূহ রীতিমত লবণ-চাষের কাজে লাগান উচিত। এই তিনটি নদীর জল বেশ লোণা এবং তীরবর্ত্তী স্থানের মৃত্তিকা লবণ-চাষের বিশেষ উপযোগী।

লবণ-চাষের জমি যতটা সম্ভব বৃক্ষলতাশূন্য হওয়া উচিত। মাটি যত জলশোষণ-শক্তিহীন হইবে ততই ভাল। কারণ বৃক্ষের শিকড়গুলিই লোণা জল শোষণের বিশেষ সহায়তা করে। সেজন্য একেবারে উপরে বেলেমাটি থাকিলেও তাহার নিম্নস্তরে অন্ততঃ যদি এক ফুট শক্ত এঁটেল মাটি থাকে তাহাতে কিছু যায় আসে না। সেই জমি লবণ-চাষের উপযুক্ত—তলায় যাহাই থাকুক না কেন। তবে ইহাও ঠিক যে, দোআঁশলা মাটিতে বালির অংশ যদি শতকরা ৩০ ভাগের বেশী না হয় তাহা হইলে সে মাটিতেও লবণের চাষ চলিতে পারে।

বারিপাত—এইবার দেখা যাউক নিম্ন পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ও মাদ্রাজের গড় বৃষ্টিপাত কিরূপ—

	নবেম্বর	ডিসেঃ	জানুঃ	ফেব্রুঃ	মার্চ্চ	এপ্রিল	মে	জুন
দিঘা (রামনগর)	১'৭৪	'০৮	১'১	'৮৫	১'৫	১'০৯	২'৩	
কাঁথি	১'০৭	'০৬	'৯৬	'৬৯	'৮৩	১'৩৯	২'০৯	
সাগরদ্বীপ	১'২২	'১৬	'৩০	'৭৮	'৮৮	১'১৪	২০৪	
গোসাবা	'৭৪	'১৪	'৩৫	·৮৬	'৯২	১'৪৯	২'৮	
মাদ্রাজ	...	৫'৮	১'৪৩	'৩২	'১৯	'৫৩	১'০৭	১'৮৯
কোকনদ	৪'৯	'৪	'১৫	'৭	'৮৯	১'১২	১'৪৪	৪'৩

উপরের তালিকা হইতে এইটুকু বুঝা যাইবে যে, বৎসরের মোট বারিপাত যাহাই হোক না কেন লবণ-চাষ-ঋতুর মাসগুলিতে গড়ে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তাহাতে নিম্ন পশ্চিম বঙ্গে লবণ প্রস্তুতি সম্বন্ধে নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। মেদিনীপুর জেলার উপকূল অঞ্চলস্থ কাঁথি ও রামনগরের বাৎসরিক মোট বর্ষণের পরিমাণ গড়ে ৬০ ইঞ্চি, কিন্তু নবেম্বর হইতে মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই কয় মাস গড়ে ৮।৯ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টিপাত হয় না। বোম্বাই শহরের বাৎসরিক বারিপাত গড়ে ৭৫ ইঞ্চি, কিন্তু নবেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত মাত্র ৩।৪ ইঞ্চি। শহরের ৩০ মাইলের মধ্যে সাগর-উপকূলে প্রায় চারি শত কারখানা প্রতি বৎসর ৮০ হইতে ১০০ লক্ষ মণ লবণের চাষ করে। মাদ্রাজের নৌপদা, ওয়ালটেয়ার বা মাদ্রাজ সহরে বৎসরে গড় বারিপাত যথাক্রমে ৩৮'৫৩, ৩৫'৬ এবং ৫০'৭৪ ইঞ্চি, কিন্তু লবণ-চাষ-ঋতুতে ৫'৮৬, ৫'৯ এবং ১৪ ইঞ্চি।

লবণ-চাষে বৃষ্টির প্রভাব কতটুকু শুধুমাত্র লবণ উৎপাদনের মাসগুলির বারিপাতের হিসাব হইতে তাহা ঠিকমত বুঝা যাইবে না। অল্প বৃষ্টিতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু বাদ্‌লা ও মেঘলা দিনের সংখ্যাগুলিও বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন, কারণ ঐ দিনগুলিই লোণা জল ঘন করিবার বা লবণের দানা পড়িবার প্রধান অন্তরায়।

(গড়ে বর্ষণ দিন)

	নবেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	মে	জুন
কাঁথি	১½	½	১½	১ ২/৫	৩	২	৬	—
সাগর	১½	½	১	২	২	২	৫	—
মাদ্রাজ	—	৫	২	½	½	১	২	৪

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় মাদ্রাজের তুলনায় নিম্ন পশ্চিম বঙ্গে বৃষ্টিপাতের দিনের সংখ্যা এমন কিছু বেশী

কোকনদ, লোণা জল শুষ্ক করিবার ক্ষেত্র

নহে। মাদ্রাজে ২১ দিন ধরিয়া মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় যাহার সমষ্টি হইল ১৫দিন, অবশ্য লবণ-চাষ-ঋতু কিছু দীর্ঘ এবং কাঁথি ও সাগরদ্বীপেও বৃষ্টিপাতের দিন-সংখ্যা গড়ে ১৪।১৫ দিনের বেশী নহে। অতএব মাদ্রাজ অপেক্ষা নিম্ন পশ্চিম বঙ্গের বারিপাত লবণ-চাষের পক্ষে খুব ক্ষতিকর বলিয়া মনে হয় না। কালবৈশাখীর স্বল্প বর্ষণ যেটুকু ক্ষতি করে জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্র তাহা পূরণ করিয়া দেয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে দেখিয়াছি—সেখানে বৎসরে ১২০ ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও লবণ প্রস্তুতকারীরা দমিয়া যায় না। তাহারা জ্যৈষ্ঠের দুপুরে পুনরায় লবণ-ক্ষেত্রে লোণা জল শুষ্ক ও ঘন করিয়া লয়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশের মলঙ্গীরাও হিজলী বা সুন্দরবন অঞ্চলে এই ভাবেই লবণ প্রস্তুত করিত।

৪। বাতাসের গতিও (wind velocity) মোটের উপর প্রায় মাদ্রাজের মত। মাদ্রাজ ও সাগর-মানমন্দিরের হিসাব অনুযায়ী ৫০ বৎসরের গড় পরিমাণ—

	সাগরদ্বীপ		মাদ্রাজ
নবেম্বর—	৫'১	মাইল ঘণ্টায়	৪'৫
ডিসেম্বর—	৫'২	"	৫'১
জানুয়ারী—	৫'২	"	৪'১
ফেব্রুয়ারী—	৬'৩	"	৩'৬
মার্চ—	৯'৩	"	৪ ৪
এপ্রিল—	১৩	"	৫'৪
মে—	১২'৫	"	৬'৩
জুন—	১১'৬	"	৬'৪

বায়ুর গতি সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, আবহাওয়ার অন্যান্য দিক—যথা সূর্য্যের তাপ এবং আর্দ্রতা যদি যথোচিত ভাবে থাকে তাহা হইলে ঋতুর শেষের দিকে বায়ুর গতি প্রবল হইলেও বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। দ্রুতগতিশীল বাতাস যদি শুষ্ক হইত তাহা হইলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু এপ্রিল-মে মাসের বাতাস পূর্ব্বদক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিম হইতে সমুদ্রের বাষ্প লইয়া আসে। ফলে যে মৃদু শুষ্ক বাতাস লবণ প্রস্তুতির উপযুক্ত আমরা সব মাসে তাহা পাই না। কাল-বৈশাখীর পর হইতে এই বাতাসের গতি প্রায়ই বাড়িয়া যায়। পিট্ অবশ্য তাঁহার রিপোর্টে যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে বায়ুর গতি সম্বন্ধে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই।

বোম্বাই—	৯.৩	মাইল	ঘণ্টায়
সাগর—	৭'৮	"	"
পুরী—	৮'৭	"	"
ভাইজাগ (মাদ্রাজ)—	৩'৫	"	"

১৯৩৮ সালে তদানীন্তন বাংলা সরকারের নিকট প্রদত্ত, বর্ত্তমান ল্যাণ্ড কাষ্টমসের কালেক্টর শ্রী ডি. এন. মুখার্জ্জির রিপোর্টে বায়ুর গতি সম্বন্ধে যে হিসাব প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা নৈরাশ্যজনক নহে।

(গড় বায়ুর গতি ডিসেম্বর হইতে মে পর্য্যন্ত)

	সাগর	গোপালপুর	মাদ্রাজ	পম্বন
১৯৩৪-৩৫	১০'৭	১০'৬	১০'৩	১১'৪
১৯৩৫-৩৬	৯'৭	১১	১০'৬	১১
১৯৩৬-৩৭	৮'৯	৮'৯	১১'৬	১৩'৪

নৌপদার নিকটবর্ত্তী গোপালপুর, রামেশ্বরের নিকটবর্ত্তী মাদ্রাজ এবং পম্বন এই তিন কেন্দ্রের উত্তরে ও দক্ষিণে বহু স্থানে লবণ প্রস্তুত হয়। এই সব স্থানে যদি প্রায় সমান গতি-বেগসম্পন্ন বায়ু দ্বারা লবণ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে তাহা হইলে সাগরদ্বীপ অঞ্চলে বা নিম্ন পশ্চিম বঙ্গের সমুদ্রোপকূলস্থিত অঞ্চলে লবণ প্রস্তুতি সাফল্যমণ্ডিত হইবে না, একথা মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই।

আর্দ্রতা—আবহাওয়ার মধ্যে আর্দ্রতার প্রভাব লবণ চাষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশী থাকিলে

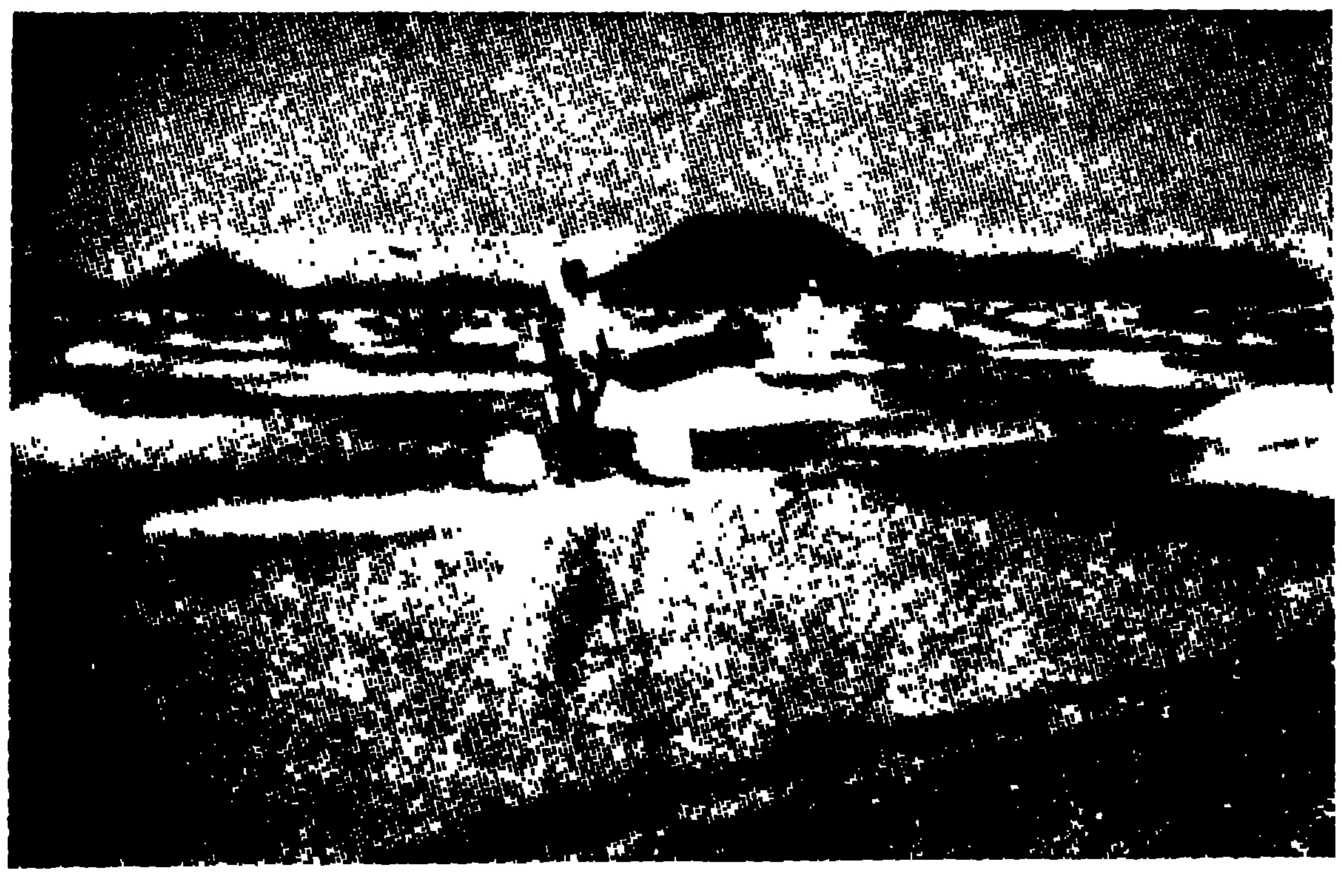

বালাচেরু (ভিজাগাপট্টম) লবণের কারখানা

বুঝিতে হইবে তাহার আর্দ্রতা বা হিউমিডিটি বেশী এবং সেই ভিজা বাতাসে জমির উপরিস্থিত লোণা জল শুষ্ক বা ঘনীভূত হইতে বিলম্ব হইবে। আর্দ্রতা মাপিবার জন্য রিলেটিভ হিউমিডিটি কষিয়া বায়ুর ভিজা অবস্থার পরিমাণ কত তাহাই পদার্থতত্ত্ববিদ্‌গণ দেখিয়া থাকেন। ইহা শতকরা হিসাবে ধরা হয়। সাধারণতঃ সমতলভূমিতে বাতাসে শতকরা ৫০।৬০ বা ততোধিক ভাগ জলীয় বাষ্প থাকে, কিন্তু স্থান হিসাবে এবং ঋতু অনুযায়ী ইহা কমে ও বাড়ে। রোদ ও বাতাসের অবস্থার উপরই ইহার হ্রাসবৃদ্ধি অল্পবিস্তর নির্ভর করে। মুক্ত জলকে বাতাস অবিরতই আকর্ষণ করে এবং তাহার ফলে জলীয় বাষ্প ক্রমাগত বাতাসে মিশিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে যখন ভারাক্রান্ত করে তখন সেই বাতাস আর জলকণাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু সেই সময় রৌদ্র তাহাকে সাহায্য করিয়া বাষ্পকে ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া দিতে থাকে এবং তাহাতে তাহার আর্দ্রতা নিম্নতম স্তরে নামিয়া গেলে পুনরায় জমির উপরিস্থিত জল আকৃষ্ট হইতে থাকে। অতএব সাধারণ ভাবে আবহাওয়ায় হিউমিডিটি বেশী থাকিলেও সূর্য্যের প্রখর রশ্মি থিতানো লোণা জলকে ক্রমশঃ ঘন হইতে বিশেষ সহায়তা করে। নিম্ন বঙ্গে এই রৌদ্র-তাপের অভাব নাই, মাঝে মাঝে অবশ্য বাদলা ও মেঘলা দিবসে ইহা ম্লান থাকে, কিন্তু মোটামুটি ভাবে প্রখরোজ্জ্বল রৌদ্র আমরা প্রচুর পরিমাণেই পাইয়া থাকি।

অন্যান্য লবণ-প্রস্তুতি কেন্দ্রের আর্দ্রতার সহিত সাগর মান-মন্দিরের গড় আর্দ্রতার তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—

রিলেটিভ হিউমিডিটি (১৯৪০-৪৪)

	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	মে	জুন	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর
বোম্বাই—	৭৫·৮	৭৩·৮	৭৭	৭৪·৮	৭৫·৮	৮২	৮১·৬	৭১·৮	৭০
সাগর—	৬২	৬১	৭৩	৮০	৭৮·৬	৭৮	৭৫	৬৬	৬০
মাদ্রাজ—	৮২	৮২·৬	৮২	৭৭	৬৮·৬	৬৪	৮৩·৮	৮৮	—
ভিজাগাপটম—	৭৭·২	৮০	৭৭·৮	৭৪·৬	৭৪	৭৫	৭৮	৭০	৭৩

তাপমান—এবার বিভিন্ন অঞ্চলে তাপের পরিমাণ কত পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। নিম্নে পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা সবচেয়ে বেশী তাপ কত তাহাই তুলনামূলক ভাবে দেখান হইল।

	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	মে	জুন
সাগর—	৮১·৩	৮৫·৪	৯০·৮	৯২·৪	৯৫	৯৫·৬
মাদ্রাজ—	৮২·৪	৮৬	৮৮	৯২	৯৭	৯৮
বোম্বাই—	৮৩ ৫	৮৪	৮৫	৮৮	৯২	৯০

তাপের দিক দিয়াও আমাদের সমুদ্রোপকূলস্থ অঞ্চলসমূহ মোটেই লবণ-চাষের অনুপযোগী নহে। সাধারণ ভাবে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থানগুলির উষ্ণতা ও অনুষ্ণতা প্রায় সমান আর আবহাওয়াও প্রায় একই রূপ, তবে তাহা অক্ষাংশে অবস্থান অনুযায়ী পৃথক পৃথক হয়। পশ্চিম বঙ্গের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অঞ্চল উত্তরাক্ষ (north latitude) ২০ হইতে ২৪-এর অন্তর্গত—যাহার মধ্যে পশ্চিম ভারতের কাথিয়াবাড় কচ্ছ পড়ে। মরুভূমি নিকটে থাকায় এবং স্বল্প বৃষ্টিপাতের জন্ম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কাথিয়াবাড়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাফল্যের সহিত সাগরজল শুষ্ক করিয়া লবণ প্রস্তুত হয়। কিন্তু বোম্বাইয়ের লবণ-প্রস্তুতি-কেন্দ্রগুলি ১৬ হইতে ২০ উত্তরাক্ষের মধ্যে এবং মাদ্রাজ কোরমণ্ডল উপকূল ৮ হইতে ২০ উত্তরাক্ষের মধ্যে পড়ে। দক্ষিণ মাদ্রাজের তিউতিকোরিণই এদিককার মধ্যে লবণ-চাষের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান—এখানে ঋতুও যেমন দীর্ঘ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণও তেমনি কম।

বাংলা টাইপ ও কেস

শ্রীঅক্ষরচন্দ্র সরকার

চল্লিশ বৎসরের উপর হইতে চলিল বাংলা বানান ও টাইপ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করি। ১৯০৬ সালে এফ-এ পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বপ্রথম আমাদের চুঁচুড়ার মহামায়া প্রেসে এই বিষয়ে আমার হাতেখড়ি হয়। তখন হইতে পিতৃদেবকে এই সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে সুরু করি। যেমন, একটিমাত্র 'ষ্ট্রীট' শব্দ ছাপিবার জন্য বাঙলা কেসের মধ্যে ষ্ট্রি এবং ষ্ট্রী দুইটি চার বর্ণের জোড়া টাইপ রাখিবার দরকার কি? একই খোপের ভিতরে চার-পাঁচ-ছয়টি করিয়া টাইপ রাখা হয় কেন? ৯ এখনও বাংলা বর্ণমালার মধ্যে স্থান পায় কেন? দুইটা ন, দুইটা জ, তিনটা শ, য-ফলা, ব-ফলা, ড়, ঢ়, য় প্রভৃতির বিশুদ্ধ উচ্চারণ আমরা করি না বলিয়া আমাদের ছেলেমেয়েরা কেহই বানান শিখিতে পারে না। ইহার প্রতিকারের কি কোন উপায় নাই, ইত্যাদি। তারপর কলিকাতার 'বিশ্বকোষ' প্রেসের পরিচালনভার আমার উপরে পড়ে। সেই প্রেসে কাজ করিতে করিতে এই বিষয়ে আমার অনুসন্ধান ও গবেষণা আরো জোরে চলিতে থাকে। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসে দীর্ঘ ষোল বৎসর কাজ করিবার সুবিধা হওয়ায় এই সম্বন্ধে অনুশীলন করিবার অনেক সুযোগ পাই।

যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় চাকরি করিতেছিলাম তখন কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে বাংলা টাইপ ও কেস সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। আমার তিনটি প্রবন্ধ ১৩৩৯ সালের পৌষ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যার 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আরও সাত-আটটি প্রবন্ধ লিখিলে আমার বক্তব্য শেষ হইত, কিন্তু কি কারণে যে লেখা বন্ধ হইয়া গেল তাহা পরে বলিতেছি।

এই তিনটি প্রবন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

১। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলা টাইপ ও কেসের আমূল সংস্কার ও পরিবর্ত্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

২। আমার ধ্রুব ধারণা, বাংলা টাইপ ও কেস যথোপযুক্তভাবে সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত হইলে বাংলা ভাষায় মুদ্রণকার্য্য অনায়াসে সুসম্পন্ন হইবে, এখনকার অপেক্ষা অনেক কম খরচায় অনুষ্ঠিত হইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে বাংলা ভাল টাইপ-রাইটার, মনোটাইপ ও লাইনোটাইপ মেশিন প্রবর্ত্তিত হইলে বাংলার মুদ্রণকার্য্যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

৩। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরে অর্থাৎ প্রায় ৮০ বৎসর হইল বাংলা টাইপ ও কেসের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই।

৪। একটি বাংলা কেসের মধ্যে ৪৭৪টি বিভিন্ন প্রকারের টাইপ, ৪৯টি বিভিন্ন চিহ্ন, সংখ্যা, স্পেস প্রভৃতি এবং ৪০টি 'কার্ন' (Kerned) টাইপ। মোট ৪৭৪+৪৯+৪০=৫৬৩ প্রকারের রকম ি টাইপ থাকে।

৫। ইংরেজী বর্ণমালায় ২৬টি বর্ণ আছে বটে, কিন্তু টাইপের প্রত্যেক কেসে প্রতি টাইপ বড় (capital), মাঝারি (small capital) এবং ছোট (lower case type)—এই তিন সেট করিয়া থাকে বলিয়া এবং সংখ্যা, ছেদ, স্পেস প্রভৃতি চিহ্নাদি লইয়া ইংরেজী কেসে মোট ১৬০ প্রকার বিভিন্ন টাইপ থাকে।

৬। ইংরেজী কেস অপেক্ষা বাংলা কেসের টাইপ-সংখ্যা সাড়ে তিনগুণ বেশী।

৭। কয়েকটি টাইপের প্রয়োজনীয়তা ও অপ্রয়োজনীয়তা বিষয়ের আলোচনা তাহাতে ছিল, যেমন—

(ক) একই আকারের দুইটি ই কেসের দুইটি স্বতন্ত্র ঘরে থাকে ; (খ) ঌ, ৯ এবং ৄ এখনও বাংলা কেসে বিরাজমান ; (গ) ⁾, t, ে, ে, ৈ, ৈ, া, া—দুই প্রকার করিয়া থাকে ; ২, ৄ, দুইটি খ্ব, শ্রী, র্ভ, দুইটি ত্রি, ষ্ট্রী প্রভৃতি কেসে থাকে ; (ঘ) বাংলা ভাষায় কতকগুলি যুক্তাক্ষর রহিয়াছে যেগুলির প্রয়োগ অতিবিরল অথবা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত যেমন—র্ঘ্ব, হ্ন, ঙ্ক, প্ন, ঙ্গ, ক্ষ, ঙ্ক, ম্ভ, ম্ব প্রভৃতি।

৮। চারখানি আলাদা আলাদা কেস লইয়া সমগ্র বাংলা কেস। কম্পোজিটারের সম্মুখে একখানি, কোলের কাছে একখানি, ডান দিকে একখানি এবং বাঁ দিকে একখানি।

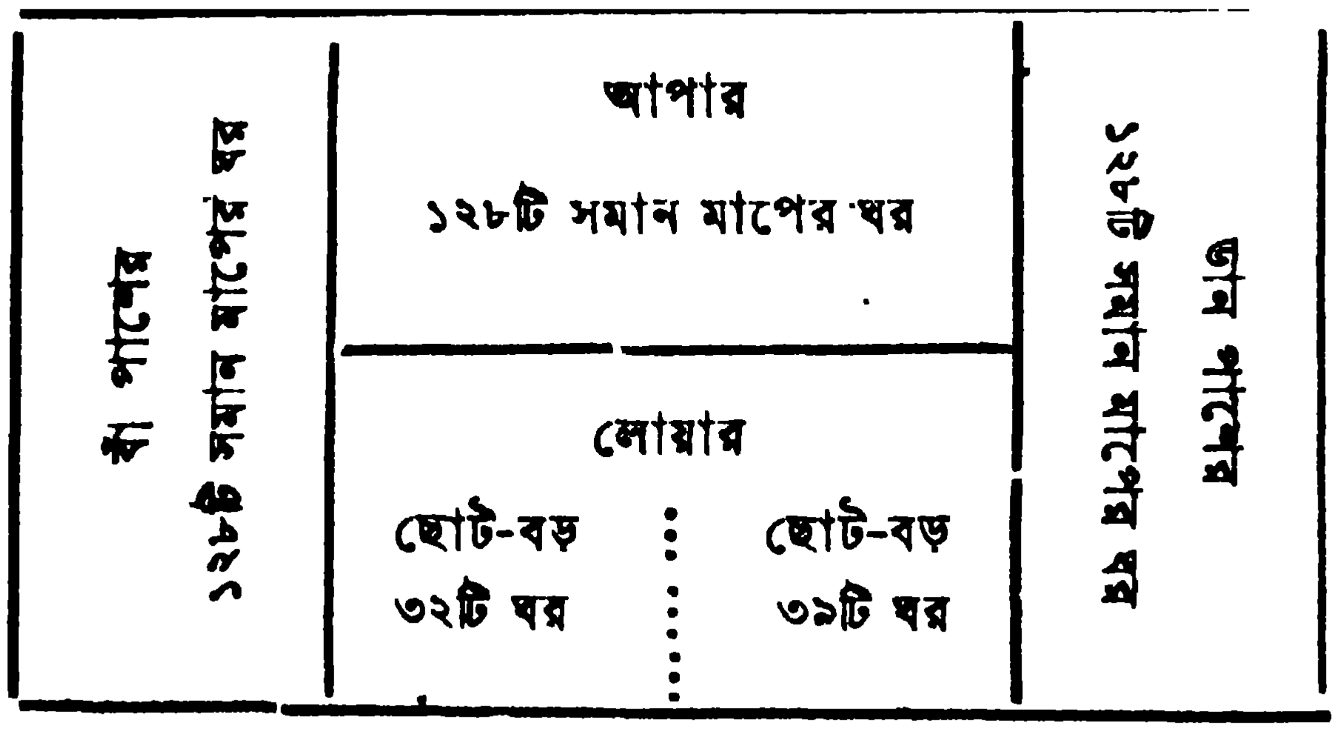

কেসের মধ্যে ঘরের বা খোপের সংখ্যা—১২৮×৩+৩২+৩৯=৪৫৫ ; টাইপ সংখ্যা ৫৬৩ ; সেইজন্য কোনও কোনও ঘরে দুইটি হইতে ছয়টি পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র টাইপ থাকে, অর্থাৎ ১০৮টি টাইপের নিজের নিজের ঘর নাই—তাহারা প্রত্যেকে অন্য দুই পাঁচ জন আত্মীয়কুটুম্বের সহিত একত্র ঘর করে।

৯। কোলের ৭১টি ঘরের মধ্যে কতকগুলি আকারে ছোট-বড়, নতুবা বাকি ৩৮৪টি আকারে ঠিক সমান। ঘর এরূপ ছোট-বড় করার কারণ এই যে, ভাষার মধ্যে যে টাইপ যে পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, সেই টাইপের জন্য সেই আকারের ঘর করা হয় ; কিন্তু বাংলা কেসের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে।

১০। যে টাইপ যত বেশী ব্যবহারে আসে তাহাকে কম্পোজিটারের হাতের তত কাছে কেসের মধ্যে রাখিতে হয়, যাহাতে অনায়াসে, অতি শীঘ্র ও সহজে কম্পোজিটার সেটিকে তুলিয়া লইয়া কম্পোজিং ষ্টিকে বসাইতে পারে। বাংলা কেসের মধ্যে টাইপ-সংস্থাপনের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে।

১১। ভাষার মধ্যে কোন্ অক্ষরটি সাধারণ পুস্তকাদিতে কি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে নির্ণীত হইলে তবে কেসের ঘরের আকার কোন্‌টির কিরূপ হওয়া আবশ্যক, কোন্ ঘরে কোন্ টাইপটি রাখা দরকার এবং কোনও নির্দ্দিষ্ট ওজনের এক সাট টাইপ কিনিতে হইলে কোন্ টাইপটি সংখ্যায় বা ওজনে কি পরিমাণ হওয়া উচিত ইত্যাদি নিরূপিত হইতে পারিবে। বাংলায় এই তিনটি ব্যাপারই আন্দাজে মৌজে এবং হত ইতি গজভাবে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

১২। ইংরেজী সাটের নির্দ্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইংরেজী ভাষাভাষী সকল জাতির ছাপাখানায় ঐ বাঁধা তালিকাভুক্ত টাইপ দুই শত বর্ষের অধিককাল হইতে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সমানে চলিয়া আসিতেছে।

১৩। ইংরেজী লোয়ার কেস দুই সমান অংশে বিভক্ত, কিন্তু ডান দিকের অংশে ২৯টি ও বাঁ দিকের অংশে ২৪টি অসমান ঘর আছে। সমস্ত লোয়ার কেস টাইপগুলি, অর্থাৎ a b c d প্রভৃতি, লোয়ার কেসের বড় বড় ঘরগুলিতে স্থান পাইয়াছে।

১৪। ইংরেজী লোয়ার কেসের যে ঘরটি যে পরিমাণে বড় বাঙ্গালা কোলের কেসের ঠিক সেই ঘরটি সেই পরিমাণে বড়।

১৫। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ e-র ঘরে t, তদপেক্ষা ছোট ঘরগুলিতে c d i m n h u t thick space a r quadrat প্রভৃতির বদলে যথাক্রমে ক দ ে ম ন স য ত থিক স্পেস অ র এবং কোয়ারেট স্থানলাভ করিয়াছে। ইহাদের অপেক্ষা ছোট ঘরগুলিতে b l v f g y এবং p প্রভৃতির স্থানে যথাক্রমে ব ল হ য গ ও এবং প বিরাজিত। কাজেই বুঝা গেল, ইংরেজী লোয়ার কেসের পুরাপুরি নকল করিয়া বাঙ্গালা কোলের কেস বা লোয়ার কেস তৈয়ার করা হইয়াছে, আর মোটামুটি হিসাব করিয়া বাঙ্গালার যে অক্ষরগুলি বেশী ব্যবহারে লাগে বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেইগুলিকে ইংরেজীর বহুব্যবহৃত টাইপের ঘরে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৬। বাঙ্গালা সাটের কোন নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ তালিকা নাই—ভিন্ন ভিন্ন টাইপ-ঢালাইকার নিজ নিজ খেয়ালমত বা মর্জ্জিমাফিক সাটের ফর্দ্দ অনুযায়ী টাইপ যোগান দেন।

১৭। স্বর ও ব্যঞ্জন প্রভৃতি অযুক্ত ও যুক্ত ৪৭৪টি টাইপকে

অ ই প্রভৃতি বর্ণ, । া ি ী প্রভৃতি, ৎ ঃ 'কলা' প্রভৃতি ৪১ দফায় ভাগ করা হইয়াছিল এবং মাত্র ১ হইতে ৬ দফা পর্য্যন্ত প্রত্যেক দফার প্রত্যেক টাইপের উপকারিতা, প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যকারিতার দিক হইতে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছিল, অর্থাৎ ৪৭৪টি টাইপের মধ্যে মাত্র ৭৮টি টাইপ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

৪ দফা—ক্ব ক্ব কু প্রভৃতি ১৭টি টাইপের মধ্যে ক্ব ছিল। ক্ব,—পক্ব ছাড়া ক্ব দিয়া বাঙ্গালায় আর কোন শব্দের ব্যবহার আছে কি? তবে 'পক্ক' 'পকৃব' রূপে চলিবার পক্ষে অনেকের উচ্চারণগত আপত্তি থাকিতে পারে। আমাদের বহুকালের উচ্চারণ-দোষে আমরা নিম্নে লিখিত যুক্তাক্ষরগুলির বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারি না, এবং পারিলেও বিশুদ্ধ উচ্চারণ না করিয়া অশুদ্ধ উচ্চারণ করাই রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে:

ক্ব জ্ব ত্ব ত্ত্ব দ্ব ধ্ব ন্ব ল্ব শ্ব স্ব ক্ষ ত্ম দ্ম শ্ম স্ম ক্ষ্ম প্রভৃতি।

লিখি পক্ব, উচ্চারণ করি পক্ক; লিখি জ্বর, উচ্চারণ করি জর; লিখি গুরুত্ব উচ্চারণ করি গুরুত্ত, লিখি সত্ত্ব, উচ্চারণ করি এমনভাবে যেন মনে হয় মুখে আমসত্ত্ব পুরিয়া উচ্চারণ করিতেছি; (আচ্ছা, বাঙ্গালায় রস বা নির্য্যাস বা সার বুঝাইতে যে 'সত্ব' লিখি তাহার বানান কি হইবে? 'সত্ব' 'সত্ত', না 'সত্ত্ব'? 'সত্ত্বেও' 'ত্ত্ব' দিয়া বাঙ্গালায় লেখা হয় কেন?) লিখি দ্বয়, উচ্চারণ করি দয়; লিখি ধ্বনি, উচ্চারণ করি ধনি, ইত্যাদি। সুতরাং উপরে লিখিত যুক্তাক্ষরগুলির প্রথম অক্ষরটি বা উপরকার অক্ষরটি হসন্ত চিহ্ন দিয়া ছাপা হইলে ছেলেরা শৈশব হইতে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখিয়া ফেলিবে এবং এতকাল বাদে ছেলেদের মুখে সেই সব বিশুদ্ধ উচ্চারণ বুড়াদের কানে বড়ই বাজিবে। এইরূপ আপত্তি অনায়াসে উঠিতে পারে, তাহা মানি।

১৮। এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিতে গিয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালা বানান ঠিক না হইলে বাঙ্গালা টাইপ ও কেসের সংস্কার হইতেই পারে না।

প্রবাসীতে লেখা কেন বন্ধ হইয়া গেল—এইবার সেই কথা বলিতেছি। প্রবাসীতে ঐ তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বহু সাহিত্যসেবী আমার বক্তব্যগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় প্রবাসীতে প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে উৎসাহিত করেন; এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের হোমরা-চোমরা অধ্যাপকগণও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সঙ্গে আলাপ করেন এবং এই সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। আমি বিশেষ উৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালা লাইনো টাইপ তৈয়ারের ব্যবস্থা করিতে লাগিয়া যাই। লাইনো টাইপ কোম্পানীর সহিত কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে।

তারপর ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে দেখা করি। তিনি সেদিন আমার সঙ্গে প্রায় চার ঘণ্টা বাঙ্গালা টাইপ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বলেন যে, আমার নির্দ্দেশমত টাইপের সংস্কার হইলে বাংলা ছাপার কাজের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে—ঢের অল্প সময়ে কম্পোজ করা যাইবে এবং ছাপার খরচাও অনেক কমিয়া যাইবে। তখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতি গঠিত হয়, এবং বিভিন্ন বিষয়ের পারিভাষিক শব্দের তালিকা তৈয়ার করিতে গিয়া, বাংলা বানানের গোলযোগ লক্ষিত হইলে বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়মাবলী রচনা করেন।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহে ও চেষ্টায় 'Type Sub-committee of the Bengal Text-books Committee' নামে একটি সমিতিও গঠিত হয়; এই সমিতিকে রবীন্দ্রনাথ 'অক্ষর-সমিতি' বলিতেন। চার জনকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হয়: আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ (চেয়ারম্যান), শ্রীযুত রাজশেখর বসু, অধ্যাপক শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বর্ত্তমান লেখক। এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৩৩, ১২ মার্চ্চ তারিখে। উক্ত অধিবেশনে চার জন সভ্যই উপস্থিত ছিলেন। ইহার কার্য্যবিবরণী হইতে প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

Mr. Ajar Chandra Sircar placed before the meeting an exhaustive table of types together with a scheme, as prepared and sketched out by him, with a view to reducing the number of types now actually employed in Bengali printing. He explained his scheme in detail, and it was pointed out that he was successful in reducing the number of Bengali types from 563 to 180 only, and that this number will be sufficient not only for Bengali but also for Sanskrit written in Bengali character.

The Chairman and other members of the Sub-committee examined Mr. Sircar's scheme and made certain suggestions regarding the body, face and shape of some of the types.

Resolved—(1) That Mr. Sircar's scheme be approved in both principle and execution.

(2) That Mr. Sircar does revise his scheme and chart, and prepare some suitable illustrations of the practical application of the reformed types. He may, if he finds feasible, include the suggestions made by the other members.

(3) That specimen sentences and other illustrative matter written out in these revised types and style of orthography be placed before the next meeting of the Sub-committee to be held by the last week of the current month, so that a definite decision may be arrived at next month.

Sd. Rabindranath Tagore,
Chairman.

তারপর আমাদের এই সমিতির কয়েকটি অধিবেশন হয় —বিশ্ববিদ্যালয়গৃহে, রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে এবং শ্রদ্ধেয় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বরাহনগরের বাড়ীতে। শেষ অধিবেশনে আমার পরিকল্পিত, সংশোধিত ও পরিবর্তিত বাঙ্গালা বর্ণমালা বা টাইপগুলি সভাকর্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ হাসি হাসি মুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা, অক্ষয়, বিশ্ববিদ্যালয় কি উপযুক্ত লোককে যে-কোন উপাধি দিতে পারেন?" সহসা এইরূপ প্রশ্নের কারণ বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ, তা পারেন—*Honoris Causa*-হিসাবে যে-কোন উপাধি দিতে পারেন।" তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তা হলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে ধরে তোমাকে অক্ষরতত্ত্ববিদ্ বা ঐ রকমের কোন একটা উপাধি পাইয়ে দেবো।" আমি নতমুখে নির্বাক।

আমি সেদিন প্রথম অধিবেশনের নির্দেশ অনুসারে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি বিষয়ের অংশবিশেষ গ্রাফ কাগজে নূতন অক্ষরে লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ সেগুলি বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, "বুঝলেম, ছাপার অক্ষরে এই রকম দাঁড়াবে, কিন্তু লেখাও কি সহজ হবে? আচ্ছা, সুনীতি, তুমি একটু লিখে দেখাও তো।" সঙ্গে সঙ্গে সুনীতিবাবু পেন্‌সিল দিয়া খুব তাড়াতাড়ি লিখিলেন—

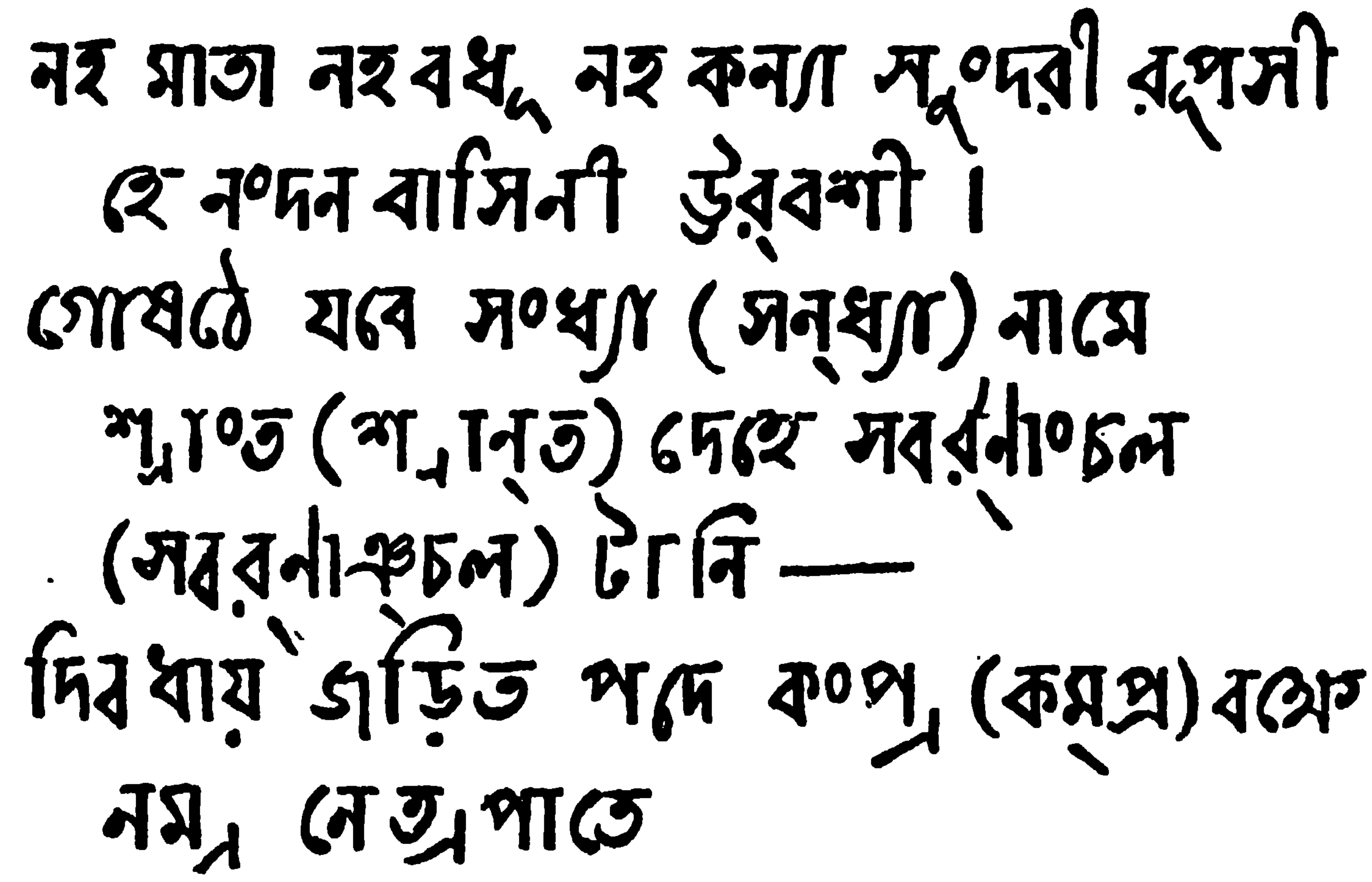

আচ্ছা, আমি পারি কি না দেখি—বলিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন—

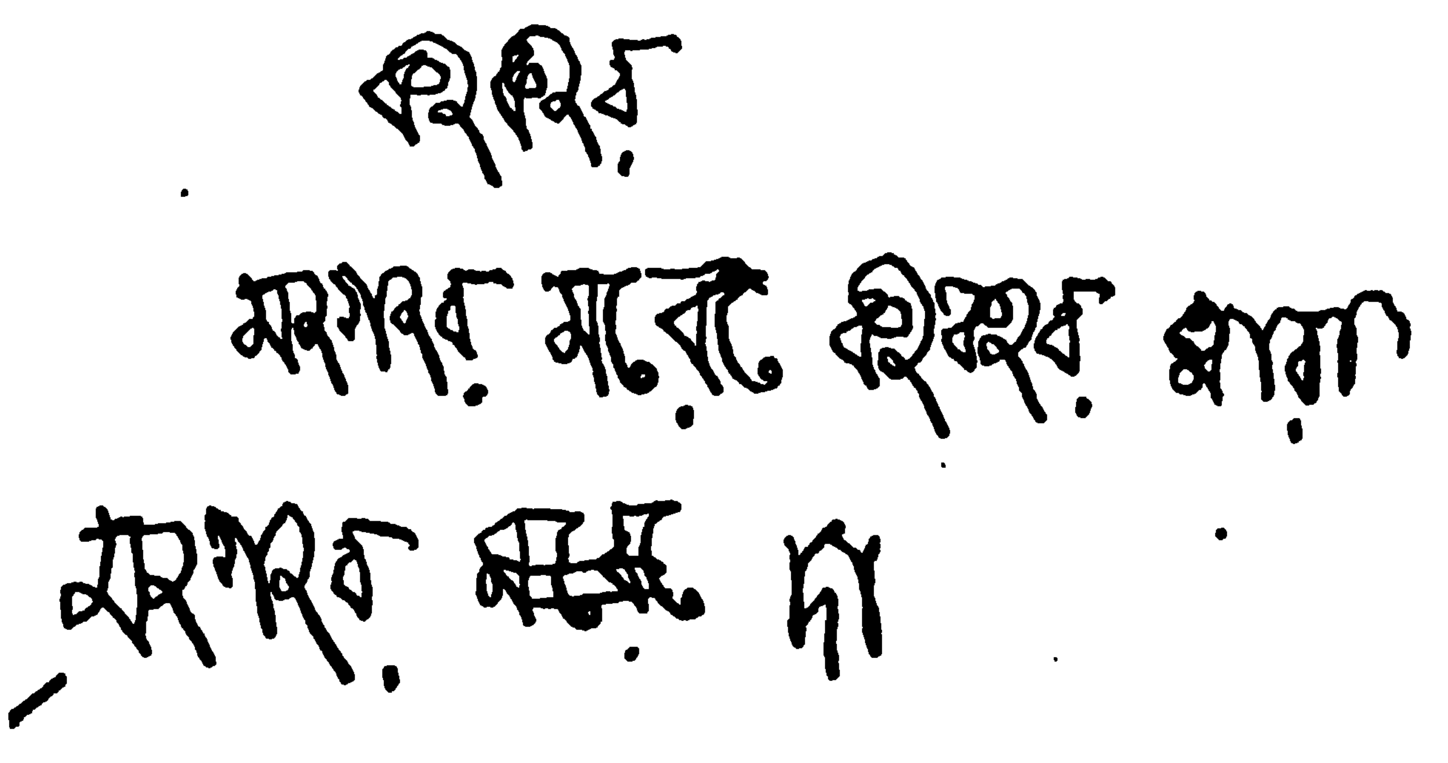

লিখিতে লিখিতে বলিলেন—"একটু বাধোবাধো ঠেকছে প্রথম প্রথম, তাই বোধ হয়। এটা চালাতেই হবে।" আমি বলিলাম, "সাধারণে, বিশেষতঃ সাহিত্যিক ও লেখক-মহলে চলবে কি?" তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "আমাদের বিশ্বভারতী, তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আর প্রবাসী যদি তোমার এই ছক অবলম্বনে ছাপতে সুরু করে, তা হলে সাধারণই বল, আর অসাধারণ সাহিত্যিকই বল ক্রমে এই ছকের মত লিখতে আর ছাপতে বাধ্য হবে।"

শেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী নিম্নে মুদ্রিত হইল,—

The number of different types (excluding mathematical signs, signs of punctuation, signs of reference, spaces, quarters, etc.) now actually employed in Bengali printing is 514 in all. This number can be reduced to 117 only, if the following procedure is adopted :

1. By avoiding all ligature characters (যুক্তাক্ষর —consonant with vowel, consonant with consonant and consonant with consonant as well as vowel) with the following exceptions:—

(*a*) Retaining ঙ্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ ঞ্চ ম্প and ক্ষ the faces of which will have to be changed.

(*b*) Reading ক্ষ and জ্ঞ

(*c*) Introducing স্ট

2. By avoiding the doubling of consonants when joined with *reph* (রেফ)

3. By retaining only one form of each of the following

া ে ৈ ৗ and ৭.

4. By making ি and ী two distinct and independent types, which when joined with consonants will no longer go within the shanks of consonants.

5. By making the following distinct and separate types to be joined generally with consonants and sometimes with vowels :

ৃ ু ্ ্ ্ and ঁ

6. By making the following *phalas* or subscribed consonants distinct and separate types to be joined with consonants :

্ব ্য ্ম ্ন and ্র

7. By introducing the following new types :

(To represent the short অ sound at the end of a word ; it will occupy the position of a decimal

point), (এ ে ৰ্‌ ৰ্‌ ভ্‌ ব্‌ র (to represent রেফ) and (to represent the five nasal consonants, *viz.*, ঙ ঞ ণ ন ম)

N.B. It is to be noted that the symbol representing the nasal consonants may be used at the option of the author.

8. By introducing a set of 34 types joined with ্ (হসন্ত-চিহ্ন) :—ক্ ঙ্ ঞ্ ড় য়্ etc.

Resolved that the above suggestion made by Mr. Ajar Chandra Sircar be accepted.

তারপর সহসা বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় বসিয়া কাজ করিতেছি, হঠাৎ দ্রুতপদে সুনীতিবাবুর প্রবেশ। তিনি বলিলেন, "আপনার এত দিনের চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। আপনারই লেখা 'প্রবাসী'র সেই তিনটি প্রবন্ধ অবলম্বন ক'রে আর অক্ষর-সমিতিতে আলোচিত আপনার যুক্তি ও আমাদের তর্কের উপর ভর দিয়ে বাংলা লাইনো টাইপের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেল—আমি এই মাত্র দেখে এলুম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রবাসীর লেখা বুঝলাম যেন সাধারণের সম্পত্তি, কিন্তু বুঝলাম না মিটিঙের গূঢ় তত্ত্ব আর আলোচনাগুলো কি ক'রে প্রকাশ পেলে। মিটিং-এর সভ্য ত আমরা চার জন মাত্র।" তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কবির ভাষায় বলি, বুঝ লোক যে জান সন্ধান। এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করার দরকার কি? কি বলেন?"—"তা বটে, বলিয়া আমি নির্ব্বাক হইলাম—সে দিন আর কাজে মন দিতে পারিলাম না। কয়েক মাস পরেই বাংলা লাইনো টাইপে দৈনিকপত্র ও সাপ্তাহিকপত্র মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল, প্রবাসীতে আমার লেখা আর বাহির হইল না।

বর্ত্তমান সময়ে কি কি উপায় অবলম্বিত হইলে বাংলা টাইপ ও কেস সুসংস্কৃত হইয়া অধিকতর কার্য্যকর হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা হওয়া সমীচীন।

আমাদের সংস্কৃত শিক্ষা

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

সম্প্রতি রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে সংস্কৃতের দাবি উত্থাপিত হইয়াছে—বাংলার প্রদেশপাল ডক্টর শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ কাটজু প্রমুখ মনীষী* সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষারূপে নিরূপিত করার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাটজু মহাশয়ের মতে—'সংস্কৃত ভাষাই' ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। ইংরেজী ভাষার স্থান সংস্কৃত ভাষারই অধিকার করা উচিত। সংস্কৃত ভাষা দেশের কতকগুলি প্রধান প্রধান ভাষার ভিত্তি। যে ভাষা মর্য্যাদার সহিত গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং যাহা সংস্কৃতির সম্বন্ধের উন্নতিকর তাহাই জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত। বাজারে ভাষা জাতীয় ভাষা হইতে পারে না।† ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের চিরন্তন ঐক্যের মূলভিত্তি এই সংস্কৃত ভাষা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শোচনীয় আত্মবিচ্ছেদ ও বহির্বিপ্লবের সময়ে ভারতবর্ষে একটিমাত্র ঐক্যের মহাকর্ষ শক্তি ছিল; সে তার সংস্কৃত ভাষা। এই ভাষাই ধর্মে কর্মে, কাব্য ইতিহাস-পুরাণ চর্চ্চায় তার সভ্যতাকে রেখে ছিল বাঁধ বেঁধে। এই ভাষাই পিতৃপুরুষের চিত্তশক্তি দিয়ে সমস্ত দেশের দেহে ব্যাপ্ত করেছিল ঐক্যবোধের নাড়ীর জাল।' এই ঐক্যবোধ পরস্পরের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদবুদ্ধিকে সংযত করে—বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাবকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ ও অবসর দেয় না। তাই স্বামী বিবেকানন্দের মতে জাতিভেদের গ্লানি দূর করিবার—তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায়কে উন্নত করিবার একমাত্র উপায় জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসার। আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের পরিপুষ্টিসাধনের দিক হইতেও সংস্কৃতের উপযোগিতা প্রতিপদে উপলব্ধি করা যায়। বিভিন্ন ভাবপ্রকাশের উপযোগী শব্দগঠন সংস্কৃত ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে দুঃসাধ্য। সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক ভাষাকে অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য ও শ্রী ভূষিত করে। রবীন্দ্রনাথ তাই স্পষ্টই বলিয়াছেন—'এ কথা স্বীকার করতেই হবে, সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কী জানে কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে।' সংস্কৃতের সহিত ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কারের যে ঘনিষ্ঠ যোগ তাহাও সকলেরই সুবিদিত। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের সমস্ত ধর্ম্মকৃত্য সংস্কৃত মন্ত্রের সাহায্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—আমাদের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র সংস্কৃতে নিবদ্ধ। সুতরাং সকল দিক্ দিয়াই সংস্কৃত আমাদের পক্ষে সযত্নে অবশ্য শিক্ষণীয়। আমাদের

* Journal of Oriental Research, September . 1946, vol. XVI, পৃঃ ৫৮ প্রঃ ইহাতে কাটজু মহাশয়ের দুইটি বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথম বক্তৃতা নিখিল ভারত বিশ্ববিদ্যালয় সংঘের উদ্বোধন বক্তৃতা এবং দ্বিতীয়টি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন অভিভাষণ।

† ১৯৪৮, ২৩এ জানুয়ারী বহরমপুর (গঙ্গামে) প্রদত্ত বক্তৃতা।

সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সহিত সংস্কৃত এমন নিবিড় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে সংস্কৃত এখন আর কথোপকথনের ভাষা না হইলেও ইহাকে আমরা কোনরূপে মৃতভাষা বলিয়া গণ্য করিতে পারি না—ইহা আমাদের কাছে সজীব ও শক্তি-পূর্ণ।

কিন্তু বাস্তবপক্ষে সংস্কৃতের এই বহুমুখী উপযোগিতা আজ আমরা কার্য্যত অনুভব করি না—সংস্কৃতের প্রতি আমাদের মৌখিক শ্রদ্ধা বিশেষ ক্ষুন্ন না হইলেও ইহার প্রতি আমাদের আদর—ইহা শিখিবার জন্য আমাদের আগ্রহ দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সংস্কৃতশিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। সংস্কৃত চতুষ্পাঠী বা টোল আজ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। বিত্তশালী লোকের সাহায্যপুষ্ট কিছু কিছু চতুষ্পাঠী যে এখনও নাই তাহা নহে। যে অল্প-সংখ্যক ব্রাহ্মণপণ্ডিত এখনও প্রাচীন ধরণের অধ্যাপনাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যের ব্যবস্থাও তাঁহাদের জন্য আছে সত্য কিন্তু কেবল চতুষ্পাঠী থাকিলেই ত হয় না। অধ্যয়নেচ্ছু ছাত্র কোথায়? সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহ বিধানের জন্য স্বতন্ত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে—স্বতন্ত্র বৃত্তির ব্যবস্থা আছে—বিবিধ উপাধি বিতরণের রীতি আছে—প্রতিবৎসর পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এই সব পরীক্ষার্থীর বেশীর ভাগই স্কুল-কলেজের ছাত্র—চতুষ্পাঠীতে নিয়মিত পড়াশুনা করার ইহাদের অবসর বা প্রয়োজন হয় নাই—বস্তুতঃ খুব কম চতুষ্পাঠীতেই ছাত্রগণ নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করিয়া থাকে—সর্ব্বোপরি পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যাবাহুল্যের মুখ্য হেতু। তাহা ছাড়া, চতুষ্পাঠী সম্বন্ধে যাঁহাদের সামান্য অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাই জানেন প্রতি চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ, বেদ প্রভৃতি বিষয়ে আদ্য ও মধ্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যাই কেবল বেশী নয়, একই ছাত্র হয়ত এক এক বৎসর এক এক ব্যাকরণের বা তজ্জাতীয় বিষয়ের আদ্য পরীক্ষা দিয়া চতুষ্পাঠীর অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সাহায্য করিতেছে—বিশেষ পড়াশুনা করার প্রয়োজনই হইতেছে না। পরীক্ষণীয় বিষয় সমগ্রভাবে না হউক মোটামুটি পড়াশুনা করিয়া পরীক্ষা দিতেছে এইরূপ ছাত্রের সংখ্যাও চতুষ্পাঠীতে দুর্লভ। ফলে, সংস্কৃত শাস্ত্রের গভীর পাণ্ডিত্যের ধারা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতেছে—বংশানুক্রমে খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিতগণের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারিগণ শাস্ত্র-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন—সংস্কৃতের চর্চ্চা গভীরতা ও ব্যাপকতা হারাইয়া আজ ক্ষুদ্রগণ্ডীর মধ্যে আবিল হইয়া উঠিয়াছে। গহন শাস্ত্রকাননে পথপ্রদর্শকের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে—সন্দিগ্ধ বিষয়ে সুমীমাংসা করিবার মত লোক আজ দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিত-কুলের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সংগৃহীত ও অপত্যবৎ পরিপালিত বিপুল গ্রন্থরাজি এবং তাঁহাদের অলিখিত জ্ঞান-ভাণ্ডার অযত্নে, অবহেলায় ও অনুশীলনের অভাবে অপসৃত হইতেছে।

স্কুল-কলেজের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইলেও ছাত্রদের সংস্কৃত জ্ঞান বা সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধা মোটেই আশাপ্রদ নহে। ছাত্রেরা সকলে শুনুক বা না শুনুক, বুঝুক বা না বুঝুক পাঠ্য বিষয়গুলি পরীক্ষার পূর্ব্বে মোটামুটি ভাবে পড়াইয়া দিবার ও মুখ্য বিষয়গুলির বিশেষ আলোচনা করিবার ব্যবস্থা স্কুল-কলেজে আছে। তবে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে ছাত্রদের অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ—ব্যাকরণের গোড়ার কথাও অনেকে জানে না বা জানার দরকার বোধ করে না—দেবনাগরী লিপিতে অনভিজ্ঞ ছাত্রের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। তৎসত্ত্বেও পরীক্ষা ব্যাপারে ঔদার্য্যের ফলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় সংস্কৃতে অনুত্তীর্ণ হইবার দুর্ভাগ্য খুব কম ছাত্রেরই হইয়া থাকে। সংস্কৃত না জানিয়াও কেবল মূলের অনুবাদ ও সাধারণ প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর লিখিয়া বি-এ পর্য্যন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন নয় এ কথা ছাত্র-সমাজে সুবিদিত। তাই কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সহজ বলিয়াই অধিকাংশ ছাত্র সংস্কৃতকে পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করিত। এখন অবশ্য বিষয়ান্তরের আকর্ষণ ও মূল্য বোধের ফলে সহজ হইলেও সংস্কৃতের দিকে আর বেশী ছাত্র আকৃষ্ট হইতেছে না—সংস্কৃতের প্রতি উপেক্ষা ও অনাদর স্কুল কলেজে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

কিন্তু কেবল দুরবস্থার বর্ণনা করিয়া, দুঃখের কাহিনী গাহিয়া ত লাভ নাই। এই দুরবস্থার প্রতীকারের উপায় কি তাহাই চিন্তা করিতে হইবে—দেশব্যাপী এই দুরবস্থার মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা দুরীকরণের উপায় উদ্ভাবন এবং সম্ভবপর হইলে কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিতে হইবে। অবশ্য এ অনুসন্ধান বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে—সামান্য অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায় সংস্কৃত পঠনপাঠনের প্রতি এই যে আগ্রহের অভাব ইহার একমাত্র কারণ সংস্কৃত বিদ্যার বাজারদরের নিদারুণ স্বল্পতা। দীর্ঘকাল পরিশ্রমে সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াও একজন পণ্ডিতের পক্ষে নিজ পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য—সংস্কৃত সাহিত্যে সাধারণ জ্ঞান মাত্র অর্জ্জন করিবার সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে ত বিশেষ বলিবার কিছুই নাই। নিতান্ত আয়াসসাধ্য উঞ্ছবৃত্তিই তাঁহাদের অবলম্বন—মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা সরকারী সাহায্য লাভের জন্য চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে হইবে—বহু আয়াসে

অনেক অনুরোধ-উপরোধে পরীক্ষার্থী ছাত্র জোগাড় করিতে হইবে। অথচ সাহায্যের পরিমাণ অতি সামান্য এবং সে সাহায্য নির্ভর করে প্রধানতঃ যে কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যার উপর। পূজা-পার্ব্বণাদিতে যাজনিক কার্য্যের দক্ষিণা বা পণ্ডিত বিদায়ের স্বল্প আয়ও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সাধারণের আগ্রহাতিশয্যের অভাব, বিশেষ করিয়া পুরোহিত পণ্ডিতই হউন বা অপণ্ডিতই হউন তাহাতে কাহারও কিছু আসিয়া না যাওয়ায় অপণ্ডিত ও সুলভ পুরোহিতের প্রাচুর্য্য। সংস্কৃত পণ্ডিতের এই আর্থিক দুরবস্থা সংস্কৃত শাস্ত্রানুশীলনে কোন ছাত্রকেই উৎসাহিত করিতে পারে না। সুতরাং নিতান্ত নিঃস্ব নিরুপায় না হইলে—কোনরূপে স্কুল-কলেজে পড়া চালাইতে পারিলে কেহ সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে পড়িতে যায় না। তাই দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান কালে চতুষ্পাঠীর ছাত্র সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত দুর্ম্মেধ ও প্রতিভাহীন।

সরকারী ব্যয়ে সুপরিচালিত বর্ত্তমান আদর্শের চতুষ্পাঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি বা পণ্ডিতকে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা এই অবস্থার আংশিক উন্নতি হইতে পারে সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রতিবিধান হইতে পারে না। চতুষ্পাঠীর সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষার সমুত্তীর্ণ ছাত্রের মর্য্যাদা প্রদান করিলেও সংস্কৃত শিক্ষার সর্ব্বজনীন সমাদর দেখা দিবে না। বস্তুতঃ সংস্কৃতের সমাদর বৃদ্ধি ও পাণ্ডিত্য পরিপোষণের উপযোগী পূর্ব্বযুগের সমাজব্যবস্থা আজ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সংস্কৃত ও সংস্কৃতের ধারক পণ্ডিতসমাজের প্রতি জনসমাজের যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহার মূল কারণ ধর্ম্মগত—সেকালে হিন্দুর ধর্ম্ম ও আচারের প্রতি সমাজের অটুট আস্থা ছিল—ধর্ম্মের নিয়ম পালনের জন্য। ধর্ম্মের রহস্য জানিবার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যের প্রয়োজন হইত—পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা-নিবেদনের অবকাশ লাভ করিলে অতি বড় ধনী ও মানী ব্যক্তিও নিজেকে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। সেকালে সমাজে পণ্ডিতের প্রয়োজন ছিল—তাই পণ্ডিতের সৃষ্টি হইত—শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মোটামুটি ভাবে জানিবার আকাঙ্ক্ষা জনসাধারণের ছিল, তাই তাহারা দেবভাষা শিক্ষা করিত। তাহা ছাড়া, তখনকার দিনে সাধারণ হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত বিদ্যা ব্যতীত অন্য শিক্ষণীয় বিষয়ও বিশেষ কিছু ছিল না। তাই প্রাথমিক সাধারণ শিক্ষার পরই লোকে চতুষ্পাঠীর শরণাপন্ন হইত এবং সম্পন্ন গৃহস্থমাত্রেই গ্রামে চতুষ্পাঠী রক্ষার সুব্যবস্থা করা সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিত। উপনয়ন, বিবাহ, দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি বিভিন্ন উৎসব ও ধর্ম্মকৃত্য উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায় বা সংবর্দ্ধনার যে ব্যবস্থা ছিল—অগণিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে দক্ষিণা ও অন্যান্য বাবদে যে প্রাপ্য ছিল তাহাতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে বা চতুষ্পাঠী পরিচালনায় বিশেষ কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। বরং জমি-জমা তৈজসপত্র ও ভোজ্য দ্রব্যাদির প্রাচুর্য্যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সংসার শ্রী ও ঐশ্বর্য্যে ভরপুর থাকিত—দুঃখদৈন্যের লেশমাত্র সেখানে স্থান পাইত না।

পূর্ব্ব অবস্থা আবার ফিরিয়া আসিবে এ সম্ভাবনা নাই। সত্য বটে, আজও হিন্দু আছে, তাহার ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে কিন্তু পূর্ব্ব মনোভাব আর নাই। ধর্ম্মানুষ্ঠানের ঠাট এখনও অনেকটা বজায় আছে—বিশেষতঃ আড়ম্বর বাড়িয়াছে বই কমে নাই—কিন্তু মন্ত্রতন্ত্রের দিকে কোনও আগ্রহ নাই—অনুষ্ঠানের মূলতত্ত্ব বা খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ্য নাই। তাই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরও তেমন প্রয়োজন নাই—তাহার স্থলে প্রয়োজন আছে আমোদ-উৎসবের জাঁকজমকের। এরূপ অবস্থায় সমাজের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের শ্রীবৃদ্ধিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং কেবল সমাজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না—একমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবার দিন আর নাই। অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায়কে উপেক্ষা না করিয়া তাহার জন্যও পূর্ব্ব হইতেই উপযোগিতা অর্জ্জন করিতে হইবে। সংস্কৃত শিক্ষার মুখ্য দোষ—ইহাতে প্রাথমিক পর্য্যায়ের সাধারণ শিক্ষারও ব্যবস্থা নাই, ফলে উচ্চতম উপাধিধারী সংস্কৃত পণ্ডিতের পক্ষেও নির্দ্দিষ্ট ধরণের পঠনপাঠন ব্যতীত অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া সুকঠিন। শিক্ষাব্যবস্থার এই মূলগত ত্রুটি অতি সত্বর দূর করিতে হইবে। অবশ্য সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়াই ইতিহাস, ভূগোল, গণিতাদি শিক্ষা দেওয়ার নূতন ব্যবস্থা করা অপেক্ষা প্রচলিত সাধারণ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করাই সমীচীন হইবে। সংস্কৃতের ছাত্রগণকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব সংস্কৃতানুবাদের মারফত শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বিশেষভাবে করা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা চলে না। বস্তুতঃ সংস্কৃত শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে চলিবে না—সংস্কৃত শিক্ষাকে করিতে হইবে সাধারণ শিক্ষার পরিপূরক—ইহা হইবে সাধারণ শিক্ষার অলংকরণ। সাধারণ শিক্ষা কোনরূপে উপেক্ষিত হইলে এই অলংকারের কোনও শোভা বা গৌরব বর্ত্তমান থাকিবে না। ইহার ব্যতিক্রম কখনও পরিদৃষ্ট হইলে তাহা ব্যতিক্রমরূপেই সম্মান ও শ্রদ্ধা পাইবে, তাহাকে নিয়ম বা আদর্শ বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। পল্লবগ্রাহী হইলেও বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন করা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উল্লিখিত ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিতে পারিলে সংস্কৃত শিক্ষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে। সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করায় সংস্কৃত পণ্ডিতদের দৈন্য অনেকাংশে দূরীভূত

হইবে। অবশ্য এজন্য সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারসাধন করিতে হইবে। সরকারী ব্যয়ে বা সাধারণের বদান্যতায় প্রচুর পরিমাণে আদর্শ চতুষ্পাঠী স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, সংস্কৃত পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্ত্তন ও মান বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। উত্তীর্ণ ছাত্রের গুণানুসারে অধ্যাপকদিগের বৃত্তিদান প্রথার বিলোপসাধন করিতে হইবে, টোলগুলি যাহাতে নামমাত্র পরীক্ষা দেওয়ার সহায়ক প্রাণহীন যন্ত্রমাত্র না হইয়া শাস্ত্রানুশীলনের প্রকৃত কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিতে পারে সে দিকে কর্ত্তৃপক্ষকে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে এই সংস্কার যতই অপ্রীতিকর ও কষ্টসাধ্য হউক না কেন ইহার উপর দেশের মঙ্গলামঙ্গল প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করিতেছে—দেশের গৌরবময় প্রাচীন সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত ও অকলঙ্কিত ভাবে যদি রক্ষা করিতে হয় তবে তাহার মূলসূত্র এইখানে। মূলকে উপেক্ষা করিয়া—অবাঞ্ছিত উদ্ভিজ্জের নির্ব্বাধ আক্রমণ ও তজ্জনিত যথোপযুক্ত প্রাণদ রসসঞ্চারের প্রতিকূলতা হইতে ইহাকে সুরক্ষিত না করিয়া বৃক্ষকে সঞ্জীবিত রাখিবার যে ব্যর্থ প্রয়াস মাঝে মাঝে করা হইয়াছে তাহাতে সুফললাভ ত হয়ই নাই—বরং সমস্ত বৃক্ষই ক্ষীণ ও মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য আজ যদি আমরা আন্তরিকভাবে আমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ না করি তাহা হইলে অদূরভবিষ্যতে আমাদের পক্ষে একান্ত নিষ্ফল অনুতাপ করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকিবে না—পণ্ডিতসম্প্রদায় বিলুপ্ত হইয়া যাইবে—পাণ্ডিত্যের প্রাচীন ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

এ বিষয়ে স্কুল-কলেজেরও যে একটা গুরু কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। স্কুল-কলেজের মধ্যে দিয়াই দেশের জনসাধারণের ভিতরে সংস্কৃত-প্রীতি সঞ্চারিত করিতে পারা যাইবে—দেশের শ্রদ্ধা সংস্কৃতের দিকে আকৃষ্ট হইবে। এজন্য প্রচলিত পাঠ্যধারার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে নিয়মে স্কুল-কলেজে সাধারণ সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জাগরিত হইবার বিশেষ কোনও অবকাশ থাকে না—পক্ষান্তরে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কৃতের যে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব রহিয়াছে সাধারণ ছাত্রের দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট না হইয়া তাহার চিত্তে বিরুদ্ধ ধারণার সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে। না বুঝিয়া ব্যাকরণের নিয়ম ও প্রয়োগ কণ্ঠস্থ করা, আজগুবি পশুপক্ষীর গল্প, ধর্ম্মশাস্ত্রের অলৌকিক উপাখ্যান ও দুর্ব্বোধ্য আড়ম্বরপূর্ণ রচনার অধ্যয়ন ছাত্রদের মনে অনেক ক্ষেত্রেই একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। পরীক্ষার পদ্ধতি এ বিষয়ে ছাত্রদের মনে কোনওরূপ কৌতূহল উৎপন্ন করিবার অনুকূল নহে। অথচ বাংলা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ যোগ—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংস্কৃত ভাষার উপযোগিতা প্রাচীন ভারতের গৌরবের ইতিহাসের বিভিন্ন নিদর্শন ও সংস্কৃত সাহিত্যের বহুমুখী বিকাশধারার সহিত ছাত্রদের পরিচয় সাধনের ব্যবস্থা-সম্পাদন বর্ত্তমান পাঠ্যে ও পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্ত্তনের সাহায্যে একেবারে দুঃসাধ্য নয়। আর এই পরিচয় সাধনের ফলে সকলের না হউক অনেকের মনে সংস্কৃতের প্রতি একটা শ্রদ্ধা জাগরিত হইতে পারে—আরও জানিবার ও বুঝিবার একটা আগ্রহ সৃষ্টি হইতে পারে। তাহা যদি হয় তবে সেই আগ্রহ পরিতৃপ্ত করিবার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা থাকিবে চতুষ্পাঠীতে। এইভাবে চতুষ্পাঠী ও স্কুল-কলেজের সহযোগিতার ফলে সংস্কৃত বিদ্যা দেশের মধ্যে আবার শাখাপল্লব বিস্তৃত করিয়া পরিপূর্ণ শোভায় বিকশিত হইয়া উঠিবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদিগকে তৎপর হইতে হইবে।

প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে অভিজ্ঞ মনীষীদের সম্মান ও শ্রদ্ধা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস ও মুখ্য আধার পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহেও বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়—অথচ গ্রীক ল্যাটিনের সহিত পাশ্চাত্ত্য জগতের আধুনিক জীবন-ধারার সম্পর্ক নিতান্ত সামান্য। পক্ষান্তরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সত্ত্বেও আমরা এখন আর সংস্কৃত পণ্ডিতদের যথোচিত সমাদর করি না। বস্তুতঃ লেখাপড়ার আদর, জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের দেশে এখন পূর্ব্বের তুলনায় অনেক কমিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের রাজা-মহারাজা নবাব-বাদশাহ্ ধনী-জমিদার সকলেই নানাভাবে পণ্ডিতদের অশেষ সম্মান করিতেন—উপাধি, ধনরত্ন, অভিনন্দন সকলই পণ্ডিতেরা অজস্র পরিমাণে লাভ করিতেন—সমাজে তাঁহাদের স্থান ছিল অতি উচ্চে। প্রবন্ধান্তরে (প্রবাসী, ১৩৪০ কার্ত্তিক, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা-৪৪ খণ্ড) তাহার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি। পাণ্ডিত্যের প্রতি আমাদের দেশের সেই প্রাচীন মনোভাব স্মরণ করিয়া, বর্ত্তমান জগতের উন্নতিশীল অন্যান্য দেশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাণ্ডিত্যের গৌরব আমাদিগকে সমাজের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুরূপ মর্য্যাদা যাহাতে প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞানও লাভ করিতে পারে সেদিকে আমাদিগকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এতদিন এদিকে যথোচিত দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ ঘটে নাই—ইচ্ছা থাকিলেও যথোচিত সুব্যবস্থা করার শক্তি আমাদের ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পরে দেশের শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারসাধনের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করিতেছি—এই সময়ে আমাদের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথাও বিশেষভাবে স্মরণ করিতে হইবে, উপেক্ষিত অনাদৃত সংস্কৃত শিক্ষার প্রকৃত মানোন্নতির বিধান করিতেই হইবে।

"মরণে কি মরে প্রেম"

(আও নাগা প্রণয়কাহিনী)

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

নাগা পাহাড়ের উত্তর পূর্ব্ব দিকে যে তরঙ্গায়িত পর্ব্বতমালা কনিয়াকদের মুলুকের অভিমুখে প্রসারিত তারই একটি শিখরের উপর অবস্থিত মিউবংচকুট নামে নাগাপুঞ্জী। গিরি-সানুদেশস্থ এই জনপদটির চতুস্পার্শ বাঁশঝাড় আর পাতলা জঙ্গলে ঘেরা। সেই বনে চরে বেড়ায় গরু মোষ আর শুকরের পাল। গ্রামপ্রান্তে কারুকার্য্যখচিত কাঠের দ্বারযুক্ত প্রকাণ্ড প্রবেশ-তোরণ; গিরিপাদমূল থেকে ঘনবনের নিবিড়তার ভেতর দিয়ে একটি আঁকাবাঁকা রাস্তা বরাবর চলে এসেছে ফটকের দোরগোড়া অবধি। সেই তোরণ-দ্বার আজ ভেঙে পড়েছে, ফটকটি বিগতশ্রী। আগেকার আমলে এই তোরণ যখন তৈরি হয় তখন এখানকার অধিবাসীরা একটি নরমুণ্ড ছেদন করে বিজয়োল্লাসে মত্ত হয়ে নবনির্ম্মিত দ্বার-পথে গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। এটাই ছিল তখনকার দিনের প্রথা। বহিঃশত্রুর অতর্কিত আক্রমণের হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করবার জন্তে তোরণ-দ্বার সকল সময়েই থাকত অবরুদ্ধ।

গিরিশিখরস্থিত এই ঘনবসতিপূর্ণ পল্লীটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে দু'টি আও তরুণ-তরণীর বেদনা-করুণ বিয়োগান্ত প্রণয়-কাহিনী। যুগ যুগ ধরে গ্রাম-বৃদ্ধদের প্রমুখাৎ নাগা-নরনারী তাদের এই মহান জাতীয় প্রণয়কথা শুনে আসছে।

সেই স্মরণাতীত কালে মিউবংচকুটে বাস করত চংলী-গোষ্ঠীর একটি জংলী যুবক নাম তার চিন সানাবা, আর তার প্রতিবেশিনী ছিল একটি রূপলাবণ্যবতী তরুণী—নাম ইটিভেন। এদের পরস্পরের মধ্যে ছিল গভীর প্রেম—পরিণয়ের মধ্য দিয়ে এই প্রণয়কে সার্থক করে তুলবার জন্তে দু'জনেরই মনে জাগল ব্যাকুল বাসনা। নিজেদের সামাজিক প্রথামত চিন সানাবা একদিন নিজ-গোষ্ঠীর মাতব্বর গোছের এক বুড়োর কাছে গিয়ে তাকে বললে—"আমি আজ মাছ ধরতে যাচ্ছি, বিকেলে আমার বাড়ীতে এসো।" এই হেয়ালিপূর্ণ কথার তাৎপর্য্য বুঝতে বুড়োর দেরি হ'ল না। এর মানেই হচ্ছে শ্রীমান কোনো শ্রীমতীর প্রেমে পড়েছেন।...যুবকটি ছড়াতে গিয়ে কিছু মাছ ধরে বাড়ীতে ফিরে এল। বুড়ো আর তার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব তার জন্তে অপেক্ষা করছিল। একটি মাছ সে বুড়োর হাতে দিয়ে দিলে, তার পর তারা সকলে মিলে ইটিভেনের পিত্রালয়ের অভিমুখে রওনা হ'ল। সেখানে পৌঁছে বুড়ো মাছটা ও-তরফের এক জনের হাতে সঁপে দিলে, তার পর তাকে আর বুড়োকে কিছু 'মধু' অর্থাৎ দেশো মদ খেতে দেওয়া হ'ল—বিয়ের সম্বন্ধে কোন কথাই কিন্তু সেদিন হ'ল না। পরদিন সকালে যুবকটি একা আবার ইটিভেনের বাপের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল। তাকে ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে ইটিভেনের বাপ মা দু'জনে খেতে বসল। চিন সানাবা রুদ্ধ নিশ্বাসে তাদের ভোজন-পর্ব্ব অবলোকন করতে লাগল, কিন্তু যখন দেখলে যে, তারা তার আনা আগেকার দিনের সেই বিশেষ মাছটি ছুঁলেও না, তখন তার মন ভেঙে পড়ল, সে বুঝলে এ বিয়েতে ইটিভেনের বাপমায়ের সম্মতি নেই। তার সব আয়োজন বৃথা।

ইটিভেনের বাপ কোন কথা না বলে নিজের আচরণ দ্বারা একথাই তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, তার মত চালচুলোহীন গরীবের পক্ষে ইটিভেনকে পত্নীরূপে পাবার আশা বাতুলের কল্পনামাত্র। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চিন সানাবা বাড়ীতে ফিরে এল।

এর পর থেকে ইটিভেনকে কি করে পাওয়া যায় তাই হ'ল তার একমাত্র চিন্তা। কিন্তু ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা পেলে না। ওদিকে, এদের মধ্যে যাতে আর অবাধ মেলামেশার সুযোগ না হয়, সেজন্তে ইটিভেনের বাপ তার মেয়ের ওপর খুব কড়া নজর রাখতে সুরু করলে। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়ল যে, ইটিভেনের দর্শনসুখ থেকেও বুঝি তাকে বঞ্চিত হতে হয়! শেষে একদিন সুযোগ পেয়ে গোপনে দু'জনে দেখা করলে এবং সলাপরামর্শ করে পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হবার একটা ফন্দী বার করলে।

সেদিনকার পর থেকে রোজই ইটিভেন যখন অন্তান্ত মেয়েদের সঙ্গে খুব ভোরে জুমের ক্ষেতে কাজ করতে যেত তখন চিন সানাবা মোরাঙের* মাচার ওপর এসে বসত। দু'জনে চোখাচোখি হবামাত্রই ইটিভেন তাকে বিশেষ ভঙ্গিতে একটি ইঙ্গিত করত। যেতে যেতে কাঁধের ওপর হাত দিয়ে সে তার পিঠে ঝোলানো ঝুড়িটিকে ঠিক করে বসিয়ে নিত। যেদিন সে ঝুড়িটিকে দু'টি আঙুল দ্বারা স্পর্শ করত সেদিন চিন সানাবার মন ভেঙে পড়ত, কেন না এই ইশারা থেকে সে বুঝতে পারত যে সেদিন ইটিভেনের বাপ মা দু'জনেই ক্ষেতে গিয়ে মেয়ের ওপর চোখ রাখবে। দিনটাই যেন তার মাটি হয়ে যেত। খাওয়া-দাওয়া কাজ-কর্ম্ম কিছুতেই আর সেদিন তার রুচি হ'ত না, সারা দিন সে মোরাঙের মাচার ওপর ম্লান মুখে বসে কাটিয়ে দিত; মনটা কিন্তু তার ঘুরে বেড়াত পাহাড়ের ওপরকার জুমক্ষেতের আশেপাশে যেখানকার মাটি ভিজে উঠত প্রিয়বিযুক্তা ক্ষেত্রকর্ম্মরত ইটিভেনের অশ্রুজলে। কিন্তু যেদিন ইটিভেন একটি আঙুল দিয়ে ঝুড়িটি স্পর্শ করত সেদিন খুশীতে তার সমস্ত অন্তর ভরে

---

*অবিবাহিত যুবকদের যৌথ শয়নাগার।

উঠত। কেন না একথা তার জানা ছিল যে, সেদিন সে ক্ষেতে যাবে একলা, অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন বাপ-মায়ের পক্ষে সেদিন তার সঙ্গে যাওয়া সম্ভবপর হবে না। সেদিন আনন্দের আবেগে তার নৃত্য করতে ইচ্ছে হ'ত, ভোরের আলো তার কাছে যেন বয়ে নিয়ে আসত এক নূতন বার্তা। এক লাফে মাচা থেকে নীচে নেমে এসে সে তার সঙ্গ ধরত। তারপর ইটভেনের সঙ্গিনীদের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে চিন সানাবা তাকে নিয়ে সরাসরি চলে যেত গিরিগাত্রস্থ নিবিড় জঙ্গলের ভেতরে। পাশাপাশি অবস্থিত বনানীমণ্ডিত সারি সারি পাহাড়ের মালা যেন তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকত; এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে, বন থেকে বনান্তরে দুরন্ত আবেগে তারা অকারণে ঘুরে বেড়াত—মনে হ'ত এই সর্ব্ববাধাবন্ধনহীন স্বচ্ছন্দবনচারী তরুণ-তরুণী দুটি যেন বিধাতার সৃষ্ট প্রথম পুরুষ ও নারী—কোন অসম্ভবের প্রত্যাশায় দুর্গম গিরিপথে সুরু হয়েছে এদের দুঃসাহসিক অভিযান। এমনি ভাবে কত দিন যে তারা অরণ্য-পর্ব্বতে ঘুরে বেড়িয়েছে তার আর অন্ত নেই।···

সে আজ কতকালের কথা! তারপর কত যুগযুগান্ত অতীত হয়ে গেল, কিন্তু আজও সেই গিরিকান্তারে তাদের স্মৃতিবিজড়িত বহু স্থান, বহু নির্ঝরিণী সেই দুটি আদিম তরুণ-তরুণীর প্রণয়লীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেদিনকার মত আজও প্রেমিক-প্রেমিকা, চংলিম্মিমসেনের নিকটবর্ত্তী সেই অভ্রভেদী শৈলশিখরে গিয়ে আরোহণ করে, যেখানে একদা এক বিশাল শিলাপটে পাশাপাশি বসত ইটভেন আর চিন সানাবা। চিন সানাবা ধরত বাঁশীতে মধুর তান আর ইটভেন সেই মধুর সুরলহরী শুনতে শুনতে একেবারে তন্ময় হয়ে যেত। বহুক্ষণ রোদে ঘোরাফেরা করার দরুন তাদের কর্ণভূষণে গোঁজা পুষ্পগুচ্ছ যখন শুকিয়ে যেত তখন তারা গিরি-গাত্রস্থ কুণ্ডগুলোর স্ফটিকস্বচ্ছ নির্ম্মল জলে সেগুলো ভিজিয়ে নিত। সঙ্গে সঙ্গেই ফুলগুলো আবার তাজা হয়ে উঠে সৌগন্ধে চারদিক আমোদিত করে তুলত। আজও যদি তুমি চংলিম্মিমসেন অঞ্চলের গিরিসানুদেশে বেড়াতে যাও তা হলে সুবাসিত জলপূর্ণ সেই কুণ্ডগুলো দেখতে পাবে। সেগুলোতে চিন সানাবা আর ইটভেনের কর্ণভূষণে গোঁজা পুষ্পরেণুর সুগন্ধ আজও যেন মিশে রয়েছে।···

এমনিভাবে চিন সানাবা আর ইটভেনের দিন কাটছিল। এমন করে পরস্পরকে কাছে পাওয়ার সুযোগ তাদের অদৃষ্টে খুব কম জুটত। এক দিনের মিলনানন্দকে ম্লান করে দিত এক মাসের বিচ্ছেদ-বেদনা। একমাত্র পরিণয়-বন্ধনই স্থায়ী করতে পারত তাদের মিলনকে, কিন্তু ইটভেনের পিতামাতার প্রতিবন্ধকতার দরুন এ জীবনে যখন তা সম্ভবপর নয় তখন তাদের নিকট আর বেঁচে থাকার সার্থকতা রইল না। অনেক ভেবে চিন্তে তারা স্থির করলে যে, আত্মহত্যা করে তারা তাদের ব্যর্থ জীবনের অবসান করবে। তা হলে হয়তো পরলোকে গিয়ে পরস্পরকে তারা একান্তভাবে পেতে পারবে।

কিন্তু এই সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করার পথেও যে ছিল দারুণ বাধা!

ছোটবেলায় তাদের দু'জনেরই বাপ মা তাদের কর্ণভূষণে বেঁধে দিয়েছিল মন্ত্রপূত বনৌষধি। এই ওষধির এমনি গুণ যে এগুলো যতক্ষণ কারুর কানে থাকবে ততক্ষণ হাজার চেষ্টা করলেও তার পক্ষে স্বহস্তে জীবনাবসান করা সম্ভবপর নয়, কেন না যারা অপমৃত্যু ঘটিয়ে থাকে সেই উপদেবতারা এই ওষধিধারণকারীর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। অবশ্য ওষধি খুলে রেখে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তারা হয় তো ইহলোকের সকল জ্বালাযন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারত, কিন্তু তারা জানত যে, এই ওষধি ধারণ করবার পর খুলে ফেলা মহাপাপ, আর তার শাস্তি হচ্ছে পরকালে অপরিসীম দুর্গতি ভোগ। পরলোকে অনন্ত-কাল কঠোর শাস্তি ভোগ করার চাইতে সংসারে দু'দিন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা শতগুণে শ্রেয়ঃ, এ কথা ভেবে শেষ পর্য্যন্ত তারা আত্মহত্যার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করলে।

একদিন বহুক্ষণ বনেজঙ্গলে ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে তারা একটা নাম না জানা গাছের ছায়ায় এসে বসল। সেই গাছের মগডালে ঝুলছিল অনেকগুলো নিষিদ্ধ ফল। তাদের দু'জনেরই খিদে পেয়েছিল বেজায়। চিন সানাবা চটপট গাছে উঠে কতকগুলো ফল পেড়ে নীচে নেমে এল, তার পর দু'জনে মিলে সেগুলোর সদ্ব্যবহার সুরু করলে। এত মিষ্টি ফল তারা জীবনে খায় নি। সেগুলো এই প্রণয়িযুগলের বুভুক্ষু রসনার নিকট যেন অমৃতাস্বাদনবৎ লাগল। ফলগুলো খাবার পর ইটভেন আর চিন সানাবার মনে কি যেন একটা বিরাট পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। তারা দু'জনের পরস্পরের দিকে নির্ব্বাক ভাবে তাকিয়ে রইল—কি যেন একে অপরকে তারা বলতে চায় অথচ ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। সেদিন শান্ত প্রভাতে সেই বৃক্ষচ্ছায়াতলে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণকারী দুটি আদিম তরুণতরুণী একে অপরের একান্ত সন্নিকটে এগিয়ে এল, নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরের বুকে তারা অঝোরে অশ্রুবিসর্জ্জন করতে লাগল। পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যে যে অনন্ত বিরহবেদনা লুকানো আছে সেই অনুভূতি তাদের মনকে বিষাদে পূর্ণ করে দিলে।

অচিরেই দুর্য্যোগের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হ'ল তাদের ভাগ্যাকাশ। সেদিন ইটভেনের হয়েছিল মারাত্মক ভুল, স্নান করবার সময় মন্ত্রপূত ওষধিটি সেই যে সে খুলে রেখেছিল, তার-

পর আর তা পরবার খেয়াল হয় নি। নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণান্তে সেদিন অশ্রুজলে যখন তাদের প্রেমের অভিষেক হয় তখন সকল সন্তাপহারী সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশক, সেই ঔষধি তার কর্ণ-ভূষণে বিদ্যমান ছিল না। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে এটা নজরে পড়বামাত্র চিন সানাবা ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় আতঙ্কে শিউরে উঠল।

চিন সানাবা যা আশঙ্কা করেছিল তাই হ'ল। দিনকতকের মধ্যেই সাংঘাতিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ইটিভেন তার বাপের বাড়ীতে একেবারে শয্যাশায়িনী হয়ে পড়ল। চিন সানাবা যখন তার অসুখের খবর জানতে পারলে তখন সে যেন একেবারে পাগলের মত হয়ে উঠল। প্রিয়তমার রোগ-শয্যা-পার্শ্বে যাবার উপায় ত ছিল না তার, কেন না ইটিভেনের বাবার কড়া হুকুম— কোন অবস্থাতেই চিন সানাবা যেন তার বাড়ীর চৌকাঠ না মাড়ায়।

এখন কি করে ইটিভেনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা যায় তাই হ'ল চিন সানাবার একমাত্র চিন্তা। কিন্তু ভেবে ভেবে সে কোনও কুলকিনারা দেখতে পেলে না। তার মনে হ'ল এই দারুণ ব্যাধির সময় তার জীবনসর্ব্বস্ব ইটিভেনের কোন কাজে যদি সে না লাগতে পারে তা হলে তার বেঁচে থাকার সার্থকতা কি? ইটিভেন কখন কেমন থাকে সে খবরও তার পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা ভোগ করতে করতে তার এমন চেহারা হ'ল যে, তা দেখলে পাষাণেরও মায়া হয়।

শেষে ইটিভেনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যোগ স্থাপনের একটা ফন্দি তার মাথায় এল। একদিন গভীর রাত্রে সিঁধ কেটে সে ইটিভেনের ঘরে ঢুকে তার রোগশয্যাপার্শ্বে গিয়ে বসল। ঘরের ভেতরটা চুল্লীর আগুনের আভায় ঈষৎ আলোকিত, সবাই গাঢ় নিদ্রায় অচেতন। চিন সানাবা ধীরে ধীরে ইটিভেনের গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগল। অতিপরিচিত প্রিয়করস্পর্শে জেগে ওঠে ইটিভেন দেখে শিয়রে বসে আছে চিন সানাবা। একি অভাবনীয় ব্যাপার! নিজের চোখ দুটোকেও বিশ্বাস করতে যেন তার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। বিস্ময়ের ঘোর খানিকটা কাটলে চিন সানাবাকে সে বললে—"সর্ব্বনাশ! এ কি দুঃসাহস তোমার। শিগ্গীর পালাও, বাবা জেগে উঠলে তোমাকে আর আস্ত রাখবে না।" চিন সানাবা চটপট তার হাতে কতকগুলো পাকা ফল গুঁজে দিয়ে বললে—"ইটু, বহু আয়াসে বন থেকে তোমার জন্যে এগুলো খুঁজে পেতে নিয়ে এসেছি। তোমার এ অসুখের সময় তোমার জন্যে কিছু না করতে পারলে আমি হয়তো মরে যেতাম।" একটু থেমে আবার বললে—"ভবিষ্যতে এরকম দুঃসাহস আর করব না, মানে তোমাদের ঘরে আর ঢুকব না। তবে রোজ দুপুর রাতে ঐ সুড়ঙ্গপথে তোমার জন্যে কিছু ফল নিয়ে আসব। তোমার বিছানাটা এমনভাবে দেয়ালের পাশে এখানটায় পাতবে যেন এই গর্ত্তের অস্তিত্ব কেউ টের না পায়। আমি যাবার সময় গর্ত্তের মুখটা বুজিয়ে দিয়ে যাব। আমি রাত্রে এসে তিন বার গলা খাঁকার দিলে তুমি এই গর্ত্তের ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেবে, ফলগুলো তোমার হাতে দিয়ে আমি সটকাবো।"

এর পর রোজই গভীর রাত্রে চিন সানাবা গর্ত্তের মুখে এসে ইটিভেনকে ফল দিয়ে যায়। সুস্বাদু ফলের চেয়ে শতগুণে মিষ্টি, প্রিয়তমের করাঙ্গুলির সেই ক্ষণিক স্পর্শলাভের জন্যে ইটিভেন রোজ রাত দুপুর পর্য্যন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। ফল আদান-প্রদান কালে পরস্পরের করস্পর্শ তাদের উভয়ের দেহ-মনে জাগিয়ে তোলে পুলকশিহরণ। এমনি ভাবে প্রতি রাত্রে নীরব ভাষায় ক্ষণিক সান্নিধ্যের ভিতর দিয়ে হয় তাদের অন্তরের ভাব বিনিময়।...ফলগুলো খেয়ে ইটিভেন তার খোসা-গুলো রোজই গর্ত্তের ভেতর ফেলে দিত। কিন্তু একদিন অসতর্কতা বশত একটা ফলের খোসা যে তার বিছানার এক-পাশে পড়ে রইল সে খেয়ালই তার হ'ল না। খোসাটি হঠাৎ ইটিভেনের মায়ের নজরে পড়ল। সে তো অবাক! এটা তার মেয়ের বিছানার পাশে এল কি করে। এগুলো তো ফলে পাহাড়ের একেবারে শীর্ষদেশে গভীর জঙ্গলে। কালেভদ্রে এ জাতীয় দু'একটা ফল তাদের নজরে পড়ে। সে স্বামীকে নিয়ে গিয়ে খোসাটা দেখালে। দেখে ইটিভেনের বাবার মুখখানা তো একেবারে হাঁড়িপানা হয়ে উঠল, বললে—"ব্যাপারখানা বুঝতে পারলে তো। বাইরে থেকে কেউ রাত্রে আমাদের অজ্ঞাতে ইটিভেনকে ফল দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কার এত বুকের পাটা! কেমন করেই বা সে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে ঘরে ঢুকছে। ব্যাপারটা যে বড় হেঁয়ালিপূর্ণ ঠেকছে। যাই হোক, আজ থেকে কড়া নজর রেখে এ রহস্যের মীমাংসা করতে হবে।"

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ইটিভেনের বাবা ঘরের ভেতরকার জ্বলন্ত চুল্লীর অনতিদূরে বিছানাটি বিছিয়ে মটকা মেরে পড়ে রইল। মশালটি সে শিয়রের কাছেই রাখলে। বহুক্ষণ পরে যখন পর পর তিন বার গলা খাঁকারের আওয়াজ শোনা গেল তখন সে উৎকর্ণ হয়ে মশালটি হাতে নিয়ে বিছানায় উঠে বসল, একটু বাদে মনে হ'ল ইটিভেন যেন কি চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। বড় অদ্ভুত ব্যাপার তো! বুড়োর বিস্ময়ের আর পরিসীমা হইল না। ক্ষিপ্রহস্তে মশালটি জ্বলন্ত অঙ্গারে গুঁজে সে ফুঁ দিয়ে জ্বালিয়ে নিলে, তার পর এক লাফে ইটিভেনের বিছানার কাছে এসে দেখলে তার শিয়রের ঠিক পাশেই একটা গর্ত্তের মুখ দিয়ে একখানা হাত উপরে উঠেই এক লহমায় অন্তর্হিত হয়ে গেল।

নিশ্চয় মনে করা যেত যে এটা ভৌতিক ব্যাপার। হাতটি

ভূতের হাত। কিন্তু ভূতের হাতে চিন সানাবার ধাতুনির্ম্মিত দস্তানাটি থাকবে কেন? ঐ দস্তানাটি চিন সানাবা চব্বিশ ঘণ্টাই পরত। দেখতে দেখতে জিনিষটা লোকের এত পরিচিত হয়ে গিয়েছিল যে অন্ধকারেও এটাকে চিনতে তার বেগ পেতে হ'ত না। কোন বহুব্যবহৃত পুরনো জিনিষের উপমা দিতে গেলেই লোকে বলত যেন চিন সানাবার দস্তানা। বুড়োর কাছে এখন ফলের খোসার রহস্য জলের মত সাফ হয়ে গেল। গভীর রাত্রে তার আস্তানায় রন্ধ্রপথে দস্তানাপরা হাতের আবির্ভাবের নিগূঢ় তাৎপর্য্যটি কি তাও বুঝতে তার বাকি রইল না। এই হাতের মালিকটি পাছে না বেহাত হয়ে যায় সেজন্যে তড়িদ্বেগে জ্বলন্ত মশাল হস্তে রন্ধ্রপথে সে নেমে পড়ল। চিন সানাবা কিন্তু ততক্ষণে ছিদ্রপথ অতিক্রম করে বাইরে এসে পগার পার।

এখন ইটিভেনের বাবা দেখলে, চিন সানাবা যে-রকম নাছোড়বান্দা তাতে শেষ পর্য্যন্ত না একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসে। এমনিতেই তো ব্যাপার অনেকদূর অবধি গড়িয়েছে, এখন অবিলম্বে এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। সোমত্ত আইবুড়ো মেয়েকে নিয়ে এ ভাবে তো আর বাস করা চলে না। তার বিয়ে যদি দিয়ে দেওয়া যায় তা হলে তাকে আর কোন ঝক্কি পোয়াতে হবে না। সে স্থির করলে ইটিভেন সেরে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সাংগ্রাটিঙ্গু গ্রামের টিনিউরের হাতে সম্প্রদান করবে।

দিনকয়েকের মধ্যেই ইটিভেন সুস্থ হয়ে উঠল। তখন তার বাপ মা তার বিয়ের তোড়জোড় সুরু করে দিলে। ইটিভেন দেখলে তার সর্ব্বনাশ হতে চলেছে। বিয়ের পর কোথায় কোন্ দূর পাহাড়ের কোলে ভিন্ গাঁয়ে তাকে চলে যেতে হবে—ফলে চিন সানাবার সঙ্গে হবে তার চিরবিচ্ছেদ। বিয়ের পর জীবনে হয় তো আর এক বারও তাকে সে দেখতে পাবে না। যদি তাই হয় তা হলে সে বাঁচবে কেমন করে। কাজেই এ বিয়েতে সে প্রবল আপত্তি জানালে। বাপের হাতে পায়ে ধরে কেঁদে কেটে কাকুতিমিনতি করে বললে —"বাবা, আমায় যার তার হাতে সঁপে দিয়ো না। আমি বরং সারাজীবন আইবুড়ো অবস্থায় তোমার বাড়ীতে থেকে তোমার জুমক্ষেতে কাজ করব।"

বাপের মন কিন্তু গলল না, সে তার কথায় কান না দিয়ে বিয়ের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করবার জন্যে একেবারে উঠে পড়ে লেগে গেল। যথাসময়ে বরপক্ষের লোকেরা পাকা দেখবার জন্যে কনের বাড়ীতে এসে হাজির হ'ল, এবং বিয়ের শুভ দিনও যথারীতি অবধারিত হ'ল।

বিবাহ অনুষ্ঠান যে দিন হবার কথা ঠিক সেই দিন ঘটল এক শোচনীয় দুর্ঘটনা। ইটিভেনের হ'ল পদস্খলন—পাপের পথে নয়, গ্রামের পথে। কি কাজে সে এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায় যাচ্ছিল, হঠাৎ পা পিছলে রাস্তার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। দেহে তার এমন চোট লাগল যে, নিজের চেষ্টায় তার ওঠবার ক্ষমতা রইল না। পথিপার্শ্বে পড়েই যন্ত্রণায় সে কাতরাতে লাগল। সুন্দরী তরুণীর আর্ত্তনাদে বিচলিত হয়ে একজন পথচারী পুরুষ তাকে টেনে তোলবার জন্যে এগিয়ে এল। কিন্তু তার গুরুভার বলিষ্ঠ দেহকে একচুল নড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না। অনেকক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে রাস্তার পাশেই বসে পড়ে সে হাঁফাতে লাগল। দেখতে দেখতে ইটিভেনের চারপাশে স্ত্রীপুরুষের ভিড় জমে গেল, সবাই ভাবতে লাগল এই রূপলাবণ্যবতী যুবতীর দেহ না জানি কত শক্তির আধার। সমবেত যুবকদের মনে তখন শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে এই শক্তিময়ী তরুণীর মন জিতে নেবার জন্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগল। এক একজন করে বীরদর্পে এগিয়ে গিয়ে তাকে টেনে তুলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিফলমনোরথ হওয়ায় লজ্জায় অধোবদন হয়ে হয়ে একে একে সবাই সে স্থান পরিত্যাগ করে চলে গেল।

শেষ পর্য্যন্ত অকুস্থলে এসে উপস্থিত হ'ল শালপ্রাংশু মহাবলী চিন সানাবা। এসেই সবল বাহুবন্ধনে বেষ্টন করে ইটিভেনকে সে অনায়াসে অবলীলাক্রমে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিলে।

ইটিভেনের বাপ যখন সকল কথা শুনলে তখন চিন সানাবার ওপর তার মনের বিরূপভাব কতকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হ'ল, সে ভাবলে এই বীর যুবককে জামাই করতে পারলে ভাল হ'ত। কিন্তু তখন টিনিউরের সঙ্গে ইটিভেনের বিয়ের প্রস্তাব অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে, আর তা বাতিল করা চলে না; করলে লোকের কাছে মুখ থাকে না। কিন্তু ইটিভেনকে সঙ্কটজনক অবস্থা থেকে উদ্ধার করে চিন সানাবা তার যে উপকার করেছে সেটার কোনো প্রতিদান না দিলে সে যে তার নিকট ঋণী থেকে যাবে। এখন, ইটিভেনের বাবা কি করে চিন সানাবার ঋণ শোধ করতে পারে তা স্থির করবার জন্যে গাঁয়ের মাতব্বরদের এক বৈঠক বসল। অনেক সলাপরামর্শ করে তারা পাতি দিলে যে, বিবাহ-অনুষ্ঠানের পরবর্ত্তী আমুং* অর্থাৎ কর্ম্মবিরতি দিবস গুলোতে চিন সানাবাকে ইটিভেনের সাহচর্য্যে সাত দিন থাকবার অধিকার দিতে হবে, তা হলেই নাকি ইটিভেনের বাপ ঋণমুক্ত হতে পারবে।

*'আমুং' তিথি বলতে সেই দিনগুলোকে বুঝায় যখন পূজাপার্ব্বণ বা বিবাহ-উৎসবাদি উপলক্ষে কোন নাগা গ্রামের লোকেদের পক্ষে নিজ গ্রামের সীমানার বাইরে কোথাও কাজকর্ম্ম করা নিষিদ্ধ

আও নাগাদের সমাজে বিয়ের পর নবদম্পতিকে নয় দিন যৌন-সম্মিলন থেকে বিরত থাকতে হয়। কোন কোন সম্প্রদায়ের আও মেয়েরা ইচ্ছা করলে বিয়ের পর কয়েক দিন নিজ নিজ পূর্ব্বপ্রণয়ীর সহিত সম্মিলিত হতে পারে।

ওদের জীবনে লাগল ক্ষণবসন্তের স্পর্শ—দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল যেন একটি দীর্ঘ মধুর মুহূর্তের মত।

তারপর ওদের জীবনে এল চিরবিচ্ছেদের পালা, পরস্পরের সান্নিধ্যে আসবার সুদূরতম সম্ভাবনাও এই প্রণয়িযুগলের আর রইল না।

এই বিচ্ছেদে এদের ভালবাসা কিন্তু তিলমাত্রও হ্রাসপ্রাপ্ত হ'ল না। শ্বশুরবাড়ীর নূতন পরিবেশের সঙ্গে ইটিভেন নিজেকে কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারলে না। দিনরাত উদাস মনে বসে বসে অনুক্ষণ সে শুধু চিন সানাবারই স্মৃতির অনুধ্যান করত। ফলে ঘর-সংসারের কাজে তার গাফিলি হতে লাগল। শ্বশুর-পরিবারের লোকেদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় জীবন তার দুর্ভর হয়ে উঠল।

ভাবতে ভাবতে শেষে সে শক্ত অসুখে পড়ল। অবস্থা তার এমনি সঙ্কটাপন্ন হয়ে দাঁড়াল যে, সকলেরই মনে হ'ল এই রোগশয্যাই হবে তার শেষ শয্যা। অন্তিম শয্যায় অচৈতন্য অবস্থায় সে শুধু চিন সানাবার নামই উচ্চারণ করতে লাগল। স্ত্রীর এ অবস্থা দেখে টিনিউরের মনে জাগল গভীর অনুকম্পা। সে নিজে গিয়ে চিন সানাবাকে ইটিভেনের রোগ-শয্যাপার্শ্বে নিয়ে এল। কিছুক্ষণ পরেই প্রিয়তমের কোলে মাথা রেখে ইটিভেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

মেয়েকে শেষ দেখা দেখবার জন্যে ইটিভেনের বাপও জামাইয়ের বাড়ীতে এসেছিল।

চিন সানাবা, ইটিভেনের স্বামী টিনিউর আর ইটিভেনের বাপ—এরা তিন জনেই ইটিভেনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। ইটিভেনের মৃত্যুর পর একই ব্যথায় ব্যথিত এই তিন জন পরস্পরের প্রতি হিংসা দ্বেষ ক্রোধ সবকিছু ভুলে গিয়ে মিলে মিশে তার শেষকৃত্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার আয়োজনে রত হ'ল।

শবদেহকে কাপড়-চোপড়ে মুড়ে বহির্বাটিতে একটা মাচার উপরে রেখে তারা তিনজনে জঙ্গলের ভেতরে চলে গেল কাঠ আনতে।

ঐ কাঠ মাচার নীচে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। শবদেহ আছে অনেক ওপরে। সেই জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড-সমূহ থেকে উত্থিত ধোঁয়ায় শবদেহটি শুকাতে থাকবে। এমনিভাবে দিনের পর দিন ধূমলিপ্ত হয়ে শবদেহ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলে পর সেটিকে গ্রাম্য পথের পাশে নির্ম্মিত শব-মঞ্চের ওপর নিয়ে গিয়ে সেখানে রেখে দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানাদির যাতে কোনো ত্রুটি না হয় সেদিকে তিন জনেরই সজাগ দৃষ্টি।

জঙ্গলের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে তারা তিন জনে অবশেষে দৈবচক্রে সেই গাছটির নীচে এসে হাজির হ'ল যেখানে একদা নিবিড় কল ভক্ষণান্তে ইটিভেন আর চিন সানাবা নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরের বুকে অশ্রু বিসর্জ্জন করেছিল।

গাছটি মরে গেছে—খসে পড়েছে তার পত্রাভরণ, শুকিয়ে গেছে তার শাখাপ্রশাখায় সঞ্চিত প্রাণরসধারা।

বিগত দিনের স্মৃতিবিজড়িত গাছটির পানে তাকিয়ে চিন সানাবার বুকের ভেতরটা যেন দুঃসহ ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল।

তারা তিন জনে গাছটাকে কোপাতে কোপাতে ভূপাতিত করলে। তার পর বাড়ীতে বয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে সেটাকে তিনটি অংশে বিভক্ত করলে। চিন সানাবা সব চেয়ে বড় খণ্ডটি ঘাড়ে তুলে নিলে। সেই বিরাট কাষ্ঠখণ্ডকে যখন সে অবলীলাক্রমে বয়ে নিয়ে চলল তখন সে যে কত বড় শক্তিধর তা বুঝতে ইটিভেনের বাপের বাকী রইল না। নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় এই শক্তিমান পুরুষের জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে বলে ইটিভেনের বাপের বড় মনস্তাপ হতে লাগল।

ইটিভেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে চিন সানাবা নিজ বাড়ীতে ফিরে এল। তার নিকট এখন বেঁচে থাকা সম্পূর্ণ নিরর্থক বলে মনে হতে লাগল।

কিন্তু বেশী দিন তাকে দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হ'ল না। তাকেও ধরল কালব্যাধিতে এবং ইটিভেনের মৃত্যুর মাত্র ছয় দিন পরে সেও তার অনুগমন করলে।

চিন সানাবার বাপ মা শবদেহটিকে ধূমশুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে বহির্বাটিতে মাচার ওপরে রেখে বহ্নি নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে।

হঠাৎ গ্রামবাসীরা দেখে অপূর্ব্ব দৃশ্য:

কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি ধীরে ধীরে উপরে উঠে দক্ষিণমুখী হয়ে ইটিভেনের শবদেহের নিম্নস্থ অগ্নিকুণ্ডোত্থিত ধূমপুঞ্জের সহিত গিয়ে মিশল। শেষে মনে হতে লাগল নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ দুটি কালো ছায়ামূর্ত্তি যেন সুদূর আকাশ-পথে পাড়ি জমিয়েছে।

মেয়েপুরুষ সবাই ঊর্দ্ধপানে তাকিয়ে রইল অবাক বিস্ময়ে। সবাই বলাবলি করতে লাগল, "ঐ যাচ্ছে ইটিভেন আর চিন সানাবা। এদের প্রেম ছিল খাঁটি, তাই তো এরা স্বর্গে চলে গেল।"...

যথাসময়ে চিন সানাবা আর ইটিভেনের বাপ মা শবদেহ দুটিকে গ্রামপথের পার্শ্বস্থ সংকারভূমিতে নিয়ে গিয়ে একই শবমঞ্চের উপর পাশাপাশি স্থাপিত করলে।*...

ইটিভেন আর চিন সানাবার প্রণয় গাঁয়ের অনেকেরই

* আওদের মৃতদেহ এমনি ভাবে মঞ্চের উপরে পড়ে থেকে পচে গলে শেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ঈর্ষ্যার উদ্রেক করেছিল। বেঁচে থাকতে এরা তাদের কম নাজেহাল করে নি। মরবার পরও এই সব দুশমনরা তাদের জ্বালাতন করতে লাগল।

তুকতাক তন্ত্রমন্ত্র জানা এক দুষ্ট ব্যক্তি একদিন সৎকার-ভূমিতে এসে ইটিভেন আর চিন সানাবার শবদেহের মাঝখানে একটি বিচালি ঘাসের আগা রেখে চলে গেল।

সেদিন রাত্রে ইটিভেন তার বাবাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললে যে, তার এবং তার প্রণয়ীর মধ্যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাটকায় মহীরুহ—তাই তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারছে না।

পরদিন তার বাবা সৎকারভূমিতে এসে তাদের শবমঞ্চ তল্লাস করে তৃণখণ্ডটিকে আবিষ্কার করলে। সেটিকে সেখান থেকে অপসারিত করে সে বাড়ীতে চলে এল।

আর এক দিন অন্য এক দুশমন একটা ফাঁপা বাঁশের চোঙ জল দিয়ে ভর্ত্তি করে তাদের দু'জনের মাঝখানে রেখে গেল।

আগেকার মত এবারও ইটিভেন তার বাবাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললে, এক দুস্তর নদী তাকে চিন সানাবার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

তার বাপ এবারও এসে দেখলে তাদের শব মঞ্চের মাঝখানে পড়ে আছে একটি বাঁশের চোঙ—সেটাকে সে সরিয়ে ফেললে।

এর পর থেকে ইটিভেন আর কখনও স্বপ্নে তার বাপের নিকট আবির্ভূত হয় নি।...

একথা শুনে সবাই বুঝতে পারলে যে, এতকাল পরে যথার্থই তাদের সকল জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হয়েছে। নানা দুর্গতিভোগের পর অবশেষে পরলোকে তারা নিরবচ্ছিন্ন মিলনানন্দ উপভোগ করছে।...তারা সুখে আছে।

গল্প তো শেষ হ'ল এখন সার কথাটি শোনো। কোনো প্রেমিক-প্রেমিকা যদি পরিণীত হতে কৃতসঙ্কল্প হয় তা হলে ইচ্ছে করলে তুমি তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রতিনিবৃত্ত করবার প্রয়াস পেতে পার, কিন্তু মনে রেখো জোরজবরদস্তি করে তাদের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ সৃষ্টির চেষ্টা শুধু যে অন্যায় তাই নয়, এটা হচ্ছে চূড়ান্ত রকমের বোকামি।

প্রাগৈতিহাসিক নাম-তত্ত্ব

শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই, তত্ত্বভূষণ

প্রবাসী মাঘ ১৩৫৪ ২য় খণ্ড চতুর্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গিরিধারী রায়চৌধুরী মহাশয় "প্রাগৈতিহাসিক বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্গদেশের কতকগুলি স্থান ও নদীর নামের মৌলিক তথ্যপূর্ণ অর্থ-বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার তথ্যের মূলভিত্তি অষ্ট্রিক জাতি-গোষ্ঠী এবং তাহাদের ভাষা। প্রাচীন বঙ্গদেশ ও কামরূপ, তথা উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের অধিকাংশ স্থানের উপর অষ্ট্রিক ব্যতীত বড়ো জাতির কৃষ্টির প্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়, এবং অনেকগুলি স্থান ও নদীর নামের মধ্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে আভাষ দিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

'প্রবাসী'র উপরোক্ত সংখ্যায় "দেবীর বোধন ও বিসর্জ্জন" প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে অষ্ট্রিক জাতি চীন মহাদেশের যে অঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, সেই দেশ থিউচ থিচ বা বর্ম নামে অভিহিত হইত। অদ্যাপি উত্তর বর্ম্মার অধিবাসীরা চীনদেশকে থিও(চ) বলে। সেই সময় সেই দেশে চাও জাতির প্রাধান্য ছিল বলিয়া সেই দেশাগত লোকেরা চাওথিচ, চোহ্‌থিচ, জোহ্‌থিচ এবং পরে সংস্কৃতে জ্যোতিষ নামে পরিচিত হইয়াছিল; এবং তাহাদের দ্বারা অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চল পূর্ব্ব বা প্রাগ্‌জ্যোতিষ, মধ্যজ্যোতিষ এবং উত্তর-জ্যোতিষ নামে অভিহিত হইয়াছিল। কামরূপ, মধ্যপ্রদেশ ও আফগানিস্থানে উহাদের তিনটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, এবং প্রতি অঞ্চলে ভারতবর্ষের প্রথম কেন্দ্র প্রাগ্‌জ্যোতিষের নামানুসারে নগর বা কেন্দ্র স্থাপন করায় মহাভারতে উত্তর-ভারতের অনেক স্থানে প্রাগ্‌জ্যোতিষের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ছোটনাগপুর অঞ্চলের অষ্ট্রিক জাতির সম্প্রদায়বিশেষ নিজের জাতির আদি নাম চাওথিচ হইতে চাওথিচিয়াল, চাওথিয়াল, চাওতাল বা সাঁওতাল নামে পরিচিত হওয়া সম্ভব বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

মুঙ শব্দের অর্থ দেশ। এই শব্দ চীন, টাই আদি জাতির মধ্যে বর্ত্তমানেও প্রচলিত। আদিতে চীন দেশ হইতে আগত আসামের আহোম জাতিরা রাজাকে চাওয়া (চা, চো), এবং মন্ত্রীকে বুং মুঙ্ (দেশের প্রধান ব্যক্তি) বলিত।

'লাও', 'লা' শব্দের অর্থ বিস্তীর্ণ। মুঙ লাও, মুঙ লা শব্দের অর্থ বিস্তীর্ণ দেশ। চীনদেশের পশ্চিমে অবস্থিত বিস্তীর্ণ দেশ খণ্ডের মঙ্গোল, বা মঙ্গোলিয়া নামকরণের মূলে এই মুঙ লাও থাকা সম্ভবপর।

'খা' শব্দের অর্থ প্রস্রবণ, বা হ্রদ; নদী আদির সীমাবদ্ধ জল। যে নদীর জল বার মাস প্রবাহিত হয় না, সেই নদীর নামের পরে বা পূর্ব্বেও 'খা' যুক্ত থাকে। চীন দেশে চাই-খা, মেইখা নামক নদী আছে। মণিপুর দেশে 'লগতাক' নামক ৮ মাইল দীর্ঘ ও ৫ মাইল প্রস্থ একটি বৃহৎ হ্রদ আছে। এই বিস্তীর্ণ হ্রদযুক্ত দেশের নাম ম্যুঙ্-খা-লা। বর্ম্মীরা উহাকে "ম্যুঙক্লা" উচ্চারণ করিত। ইহা হইতেই মণিপুরের প্রাচীন নাম মেখলি বা মেকলি দেশ। 'খা-লা'র তীরবর্ত্তী স্থানের লোক খালা-ছাই (ছাই; ছা = সন্তান) মণিপুরী জাতির একটি শাখা।

চীন-পর্ব্বতমালাবাসী পার্ব্বত্য জাতিরা নিজেকে লু, চোহ্, লাই বলে। বর্ত্তমান মণিপুর দেশ পূর্ব্বে চীন-পার্ব্বত্য জাতির অধিকারে ছিল। তখন এই দেশের অপর নাম ছিল মুঙ্-লাই বা মুঙ্-লু। অদ্যাপি আসাম ও শ্রীহট্ট কাছাড়ের লোকেরা মণিপুরকে মগলু বা মগলাই দেশ বলে, এবং মণিপুরের অধিবাসীকে মেই-মগলাই অর্থাৎ মগলাই দেশের মানুষ বলে। মি, মেই = মানুষ।

'লু' জাতির এক শাখা লু-ছাই অর্থাৎ 'লু'-র সন্তান। ইহারা নিজেকে মি-চোহ্ শব্দ হইতে মি-জোহ্ বা মিজো বলে। চোহ্ বা জোহ্ শব্দ পরবর্ত্তীকালে পর্ব্বত বা উচ্চভূমি অর্থেও ব্যবহৃত হইত। সুতরাং মিজো শব্দের অর্থ পর্ব্বত বা উচ্চভূমিবাসী -highlanders।

বড়ো ভাষায় "হা" শব্দের অর্থ সমতল ভূমি, মাটি। বাঙ্, বঙ্ শব্দের অর্থ প্রচুর, মাই শব্দের অর্থ ধান। প্রচুর ধান্যযুক্ত স্থানের নাম মাই-বাঙ্ বা মাই-বঙ্—উত্তর কাছাড় পর্ব্বতের মধ্যে কাছারী রাজার প্রাচীন নগর। এখন সেখানে একটি রেল ষ্টেশন আছে।

প্রচুর সমতল ভূমিযুক্ত স্থানের নাম—হা-বাঙ, হা-বঙ্ বা হাবুঙ। আসামের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রাচীনকালে হাবুঙ রাজ্য ছিল। ইবন্-বতুতার ভ্রমণ-কাহিনীতেও হাবুঙ রাজ্যের বিবরণ আছে।

বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিযুক্ত স্থানের নাম লা-বাঙ্ বা লা বঙ্—দার্জ্জিলিঙের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র শহর। ঠিক একই অর্থে বাঙ্‌লা বা বাঙলা শব্দও সিদ্ধ হইয়াছে।

চীন দেশে সর্ব্বপ্রথম ধান্যের চাষ হয়। অষ্ট্রিক জাতিরা কচু, হলুদ আদির সহিত ধান্যের চাষও ভারতবর্ষে প্রথম প্রবর্ত্তন করে। উচ্চভূমি খুঁড়িয়া যে চাষ করা হইত তাহার নাম জোহ্-মোহ্ বা জুম খেতি। মোহ্ শব্দের অর্থ খনন করা। যে অস্ত্র দ্বারা মাটি খুঁড়া হইত, তাহার নাম মোহ্-খিউ (কোদাল)।

উচ্চভূমিতে উৎপন্ন এক প্রকার ক্ষুদ্র ধান্যের নাম—জোহা (কাটারি ভোগের মত)। বিস্তৃত সমতল ভূমিতে উৎপন্ন ধান্যের নাম—লাহা বা লাহি; অথবা হা-লা বা হালি। হালি হইতে খুব সম্ভব 'শালি' শব্দের উৎপত্তি। বঙ্গদেশে যে ধান্যকে শালি ধান্য বলা হয়, আসামে বর্ত্তমানেও তাহাকে লাহি ধান বলে।

কা-মেই বা কুমাই শব্দের অর্থ মাতা। ক্রিয়াবাচক "খা" শব্দের অর্থ প্রসব করা। খাসিয়াদের মধ্যে এই দুই শব্দ বর্ত্তমানেও প্রচলিত। গৌহাটির নীলাচল পর্ব্বতে প্রস্তরগাত্র ভেদ করিয়া নির্গত প্রস্রবণে অষ্ট্রিকরা প্রতিবৎসর ধান্য রোপণের পূর্ব্বে ভূমিদেবী রজস্বলা হওয়ার উৎসব করিত। ঐ স্থানের নাম ছিল ক'মেই-খা। ইহারই সংস্কৃত রূপ কামাখ্যা। প্রাচীন অষ্ট্রিক রীতি অম্বুবাচী নামে এখনও সেখানে পালিত হয়।

আসামের পণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুক্ত বাণীকান্ত কাকতি, এম্-এ, মনে করেন, অষ্ট্রিক ভাষার—কামই (দৈত্য), কামইট্, (ভূত), কামেট্, কমুউচ, খম্চ্ (মৃত দেহ) আদি শব্দ হইতে কামাখ্যা শব্দের উৎপত্তি সম্ভবপর। কিন্তু ইহা বড়ই কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়।

অষ্ট্রিক জাতির পরে হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরস্থ দেশ হইতে "বড়ো" জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ইহারা প্রথমতঃ কাবুলীওয়ালাদের মত চীন দেশজাত রেশম বস্ত্র পৃথিবীর নানাস্থানে এবং ভারতবর্ষে বিক্রয় করিতে আসিত। 'ছের' বা 'ছেরেছ্' শব্দের অর্থ রেশম বস্ত্র। এই শব্দ হইতেই 'শাড়ী' শব্দের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব।

ছেরেছ্ ব্যবসায়ীরা ছেরাইটিচ্, কিরাইটিচ্, কিরাতিয়া বলিয়া পরিচিত ছিল। এই শব্দ ভারতবর্ষে 'কিরাত' রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করিবার পর ইহারা সর্ব্বদা পার্ব্বত্য অঞ্চলে বাস করিত এবং রেশমপোকা পালন করিত। এইজন্যই কিরাত জাতি অর্থে পার্ব্বত্যজাতি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং অমরকোষকার লিখিয়াছেন—"কিরাতা পর্ব্বতবাসিনঃ।"

বড্ শব্দের অর্থ বর্ষ বা বাসভূমি। পরবর্ত্তীকালে যে অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা বেশী হইয়া উঠিয়াছিল, সেই অঞ্চলের নাম হয় বুদ্ধ্ট (বৌদ্ধলামা) বড্; এবং পরে উহা তিব্বত হইয়াছে। এই ভাবে বিস্তীর্ণ বড্ দেশে হোর্বড্, কোর্বড্, ইলাবড্ আদি অনেক খণ্ড ছিল।

বড়ো ভাষায় 'ফিছা' শব্দের অর্থ সন্তান। এই শব্দের সহজ রূপ—ছা, ছাই, ছি শব্দের অর্থও সন্তান। কামাখ্যাতীর্থের উপাসক সম্প্রদায়কে বড়োরা খাঁ-ছাই বা খা-ছি বলিত। ইহারাই বর্ত্তমানে খাশি, বা খাশিয়া জাতি। হোরবড্ হইতে আগত দল হোর্-ছাই, বা হোজাই—কাছারী জাতির এক সম্প্রদায়। কোরবড্‌বাসী এক সম্প্রদায় চতুর্থ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় কোছার বা কোছা রাজ্য স্থাপন করে।

তাহাদেরই একদল ভারতবর্ষে কোচ্ বা কোচ নামে পরিচিত হইয়াছে কি না ভাবিবার বিষয়।

অষ্ট্রিক জাতিরা পৃথিবীতে শস্যাদি উৎপন্নের মূলে স্ত্রী-শক্তির কল্পনা করিত, বড়ো জাতিরা ইহার মূলে পুরুষ-শক্তির কল্পনা করিত। বৃক্ষ, লতা, শস্যাদি পৃথিবী হইতে সোজা ভাবে নির্গত হয়। সুতরাং তাহারা সোজাভাবে প্রোথিত প্রস্তর-খণ্ড, মাটির ঢিবি, অথবা মনসাবৃক্ষের ডালকে সৃষ্টির মূল পুরুষ-শক্তি রূপে পূজা করিত। অষ্ট্রিক জাতির কামাইখার সন্নিকটে এক পর্ব্বতের উপর সেই প্রতীক প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার নাম লুদই-ফায়া। লুদই=পুরুষাঙ্গ; ফায়া, ফা= দেবতা। অষ্ট্রিক ভাষায় 'কা' স্ত্রীলিঙ্গ এবং 'উ' পুংলিঙ্গ বাচক উপসর্গ। অষ্ট্রিকরা ইহার নাম দিল উ-মাই-লুদই। ইহা ক্রমে উমালুদ, উমানুদ রূপে পরিণত হইয়া সংস্কৃতে উমানন্দে পরিণত হইয়াছে। উমানন্দ কামাখ্যার স্বামী এবং এখনও প্রতি বৎসর কামাখ্যার সহিত তাঁহার বিবাহোৎসব সম্পন্ন হয়।

দুই শক্তিসম্পন্ন প্রবল জাতির দুইটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ এক স্থানে অবস্থিত হওয়ায় এই স্থানের যুক্ত নামকরণ হইল—কামাই লুদইফা। পরে ইহার সংক্ষেপ রূপ হইল—কামলুদ, কামরুদ, কামলু, কামরু; কামলুফা, কামলুফ, কামরূপ। হিউয়েন্থচাঙের কা-ম-লু-প, কা-ম-লু; অলবেরুনির কামরু; মুসলমান লেখকদের কামরুদ, কামারু লেখার মূলকারণ ইহাই।

ফায়া=পুরুষদেবতা; ক্রায়া=স্ত্রীদেবতা। ব্রা=প্রধান দেবতা; ক্রই=প্রধানা দেবী। ব্রা-ক্রই পরে বুড়া বুড়ী হইয়া শিব-দুর্গাতে পরিণত হইয়াছেন।

ভূমির প্রধান দেবতা, এই অর্থে হা-ব্রা। কলিকাতা ভিন্ন আসামের গোয়ালপাড়া, নগাঁও প্রভৃতি জেলাতেও স্থানে স্থানে হাব্রা ঘাট, হাব্রা বাজার আছে।

হা-খা-লা (লি); বিস্তীর্ণ বদ্ধজলবিশিষ্ট স্থান—হাগালি, হুগালি, হুগলি হইতে পারে। মহাবিষুব সংক্রান্তির সময় পৃথিবীর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য আসামবাসীরা যে বিহুগীত গায়, উহার নাম হা-হা-রোয়েই—মাটির সন্তানের গীত। ইহার বর্ত্তমান রূপ হুহরি বা হুচুরি।

লুাঙ্ শব্দের অর্থ গভীর, জ্যোতির্ম্ময়। 'মা' শব্দের অর্থ বৃহৎ। খা-লুাঙ্—গভীর হ্রদ বা গহ্বর খারুঙ, খরুঙ, কুরুঙ। বৃহৎ গভীর হ্রদ বা পরিখাযুক্ত স্থান খালুাঙমা বা খলঙমা বর্ত্তমানে খরংমা। ত্রিপুরার প্রাচীন রাজবংশের রাজধানী খলঙমা বর্ত্তমানে খরংমা নামে পরিচিত। উত্তর কাছাড় জেলায় হাফলং হইতে ৪০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বর্ত্তমানেও প্রাচীন রাজবাড়ীবেষ্টিত গভীর পরিখার নিদর্শন রহিয়াছে।

এই ভাবে খা-লা-ল্যুাঙ্—ক্লাল্যুঙ, কালাল্যুঙ কালিঙ, *কলিঙ্গ সম্ভব কিনা বিবেচ্য। চিল্কা হ্রদ দৃষ্টে এই নাম হইতে পারে।*

ঞি=ক্ষুদ্র হ্রদ; ওয়া=আবৃত; বঙ্=প্রচুর। প্রচুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদযুক্ত স্থান=ওয়াঙ, আঙ, অঙ্, অঙ্গ দেশ। চাও, চোহ্, চো=স্বর্গ; মা=প্রধান। স্বর্গের প্রধান দেবতা=চোহ্মা বা চোম্। চীন দেশের চোহ্মা বা লামা (hamaism) ধর্ম্ম এবং আহোম-দের চোম-দেউ, একই অর্থবাচক। এই একই অর্থবাচক শব্দ হইতে সুক্ষ্ম হওয়া সম্ভব।

জ্যোতির্ম্ময় ভূমিদেবতার স্থান হা-ফা-লুাঙ বা হাফলং। 'রি' শব্দের অর্থ পর্ব্বত; মি, মেই শব্দের অর্থ মানুষ। খশ জাতীয় মানুষের অধিকৃত পর্ব্বত—খশ-মি-রি, খশমির বা কাশ্মীর।

পার্ব্বত্য মানুষ এই অর্থে মি-কি (বা গি—সম্বন্ধবাচক)—রি=মিকির আসামের পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ। গারো-পাহাড়ের প্রত্যেকটি পাহাড়ের নামের পূর্ব্বে কোনও ব্যক্তির নাম এবং শেষের দিকে 'গিরি' শব্দ যুক্ত আছে, যেমন—রংরেং গিরি। ইহা প্রকৃত পক্ষে রংরেং-গি-রি অর্থাৎ রংরেং নামক দলপতির অধিকৃত পর্ব্বত। এখানে গি—সম্বন্ধসূচক অব্যয়।

মা-হা-রি—বৃহৎ পর্ব্বতময় ভূমি=মাহার—মাহুর, উত্তর কাছাড় জেলায় একটি স্থান, একটি রেলষ্টেশনও সেখানে আছে।

লা-হা-রি—পর্ব্বতময় বিস্তীর্ণ ভূমি=লাহার, লাহুর, লাহোর।

লাও-রি=বিস্তৃত পর্ব্বতময় স্থান=লাওর, লাওড়, লাউড়।

লা-রি= ঐ =লার, রার, রাঢ়।

ব্রা+খা+রি=বারাখার=বরাকর।

অষ্ট্রিক জাতির যে শাখাকে ইংরেজীতে গোন্দ (Gond) বলা হয়, তাহারা নিজেকে গোঁড় বলে। ছোট নাগপুরে এবং আসামের চা বাগানের মজুরদের মধ্যে অনেক গোঁড় জাতীয় মানুষ আছে। গোঁড়দের আদি প্রধান কেন্দ্র গৌড় হওয়া সম্ভব।

টিয়েঙ্ বা টিয়েন্ শব্দের অর্থ রাজ্য। চাও জাতির অধিকার কালে চীন মহাদেশের এক অঞ্চলে ছিন্ (T'sin) বংশের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। পরে ছিন্ বংশ প্রবল হইয়া সমগ্র দেশ অধিকার করার পর ঐ দেশ চীন দেশ নামে বিখ্যাত হয়। আদিতে ছিন্ রাজ্য হইতে আগত অষ্ট্রিক জাতির শাখা ছিন্টেঙ নামে পরিচিত। ইহারা পরে জিন্টেঙ, জিন্টিয়া এবং বর্ত্তমানে জৈন্তিয়া নামে পরিচিত, এবং তাহাদের রাজ্যের নাম জিন্তা বা জৈন্তা।

কামাইখা স্থানের সংলগ্ন রাজ্য খণ্ডের নাম কামাইটিয়েন বা কামাইতা এবং পরে উহা কমতা নামে বিখ্যাত হয়।

বঙ্গাধিপতি কুমার পালের সেনাপতি কামরূপ রাজ্য জয় করিয়া কামরূপ জেলায় গৌহাটির সন্নিকটে বৈদ্যেরগড় নগর স্থাপন করেন এবং রাজ্যের নাম কমতা রাখেন। পরে পূর্ব্ব অঞ্চল ত্যাগ করিয়া তাঁহার বংশধরেরা রংপুর জেলায় রাজধানী স্থাপন করেন, এবং উহার নাম কমতাপুর রাখেন।

অষ্ট্রিক ভাষায়—তু, তুয়েই, তিউ, তয়া এবং বড়ো ভাষায় —ডি, টি, তি শব্দের অর্থ জল।

লাও-তু=বিস্তৃত জলরাশিপূর্ণ নদী—লাওতু, লুইত, লোহিত; ডি-লাও, টি-লাও, তিলাও—একই অর্থবাচক। এই সব নাম আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছিল; এবং প্রাচীন গ্রন্থে এই সমস্ত নামের উল্লেখ আছে।

ডি-মা-লা=বিস্তৃত বৃহৎ নদী—ডিমলা (রংপুর জেলার নদী)।

মা-লা-ডি-হা=বৃহৎ ও বিস্তৃত নদীর তীরস্থ ভূমি—মালদহ।

ডি-মা-ছা=বৃহৎ নদীর সন্তান—ডিমাছা বা দিমাছা। ঐ নদীর তীরস্থ নগর—ডিমাপুর, দিমাছপুর।

টি-চাও-তিয়েন—স্বর্গীয় নদীর তীরস্থ রাজ্য—তিচাতা বা তিস্তা। পরে রাজ্যের নাম হইতে নদীর নাম হইয়াছে। অথবা—টি-ছা-তাও=জল শাবক সিংহ—সিংহ শাবকের ন্যায় শক্তিশালী নদী—তি-ছা-তা বা তিস্তা।

পার্ব্বত্য চীন জাতির ভাষায় নাঙ্ শব্দের অর্থ সূর্য্য বা পূর্ব্ব। নাঙ্‌ছি- পূর্ব্বদিক; চাঙ্‌ছি—দক্ষিণ দিক্। নাঙ্‌গা —পূর্ব্বদিক হইতে আগত; নাঙ্-দা—পূর্ব্বদিকে গত। পূর্ব্বদিক হইতে আগত মানুষ নাঙ্-গা বা নাগা। নাগারা পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ হইতে আসামের দিকে আসিয়াছিল।

'লিউ' শব্দের অর্থ মাঠ। চাঙ-ছি-লিউ—দক্ষিণ দিকের মাঠ বা দেশ—চাঙ্‌ছিল। এখনও শ্রীহট্ট কাছাড়ের লোকেরা লুসাই পাহাড়কে চাঙ্‌ছিল বলে।

চাঙ্‌ছিল যাইবার সময় মধ্যপথে যে বন্দর বা স্থান পাওয়া যায় তাহার নাম ছি-লিউ-চাঙ্—ছিলিচাঙ, ছিলচাঙ, ছিলচার (বর্ত্তমানে শিলচর)। এখনও আইজল যাইতে হইলে শিলচরে নৌকায় উঠিতে হয়।

শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী মহাশয় মনে করেন যে, প্রাচীন ডবকা রাজ্যই বর্ত্তমান ঢাকা। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রস্তরস্তম্ভে কামরূপ-ডবাক-নেপাল-কর্তৃপুর—প্রত্যন্ত রাজ্যের নাম আছে। আসামের নগাঁও জেলায় যমুনা নদীর তীরে ডবকা নামক একটি স্থান আছে। ঐ অঞ্চলে প্রবন্ধ-লেখক কর্তৃক অসংখ্য প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপেশ্বর মহাভূতি বর্ম্মার একটি শিলালিপি; এবং ১২২৩ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বসুন্দর দেব নামক রাজার একটি শিলালিপিও আছে। শেষোক্ত লিপিতে স্থানের নাম "ডাবেকা" বলিয়া লেখা আছে। সুতরাং আসামের ডবকাই যে প্রাচীন ডবাক রাজ্য ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ঢেক্কর নামক একটি পবিত্র স্থানের উল্লেখ আছে। ঢেক্কর প্রাকৃত ঠক্কর (ঠাকুর) হইতে উদ্ভূত। ঠক্কর বংশীয় বৌদ্ধ নৃপতির রাজ্য ঢেক্কর। আসামের গোয়ালপাড়া জেলায়ও তাহাদের একটি রাজ্য ছিল। ঐ অঞ্চলকে লোকে এখনও ঢেকর এবং তৎস্থানবাসীকে ঢেকেরী বলে। ঢাকা একদিন বৌদ্ধতান্ত্রিকদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, এবং তখন সেই রাজ্যের নাম ঢেক্কর ছিল বলিয়া অনুমান হয়। ঢেক্কর হইতে ঢাকা নামকরণ সম্ভবপর।

সান্ত্বনা

শ্রীতুলসীদাস মুখোপাধ্যায়

লতিকা তরুরে ধিরি বলে কানে কানে
"তোমারে তুষিছে পাখী সুমধুর গানে;
আমারে করুণা করি দিয়াছ আশ্রয়
কি দিয়ে করিব সেবা মনে নাহি লয়।

একি শুধু নাগপাশ মম আলিঙ্গন?
নিভৃত মরম আশা শুধুই স্বপন?"
তরু বলে, "ওগো লতা খেদ কেন তব
বসন্ত প্রভাতে ফুল দিও নব নব।"

পাঁচ দিনের ছুটিতে মহাবলেশ্বর

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী

পার্ব্বত্য দেশের উপর আমার একটা স্বাভাবিক টান আছে, তাই বোম্বাইয়ে থাকি অথচ মহাবলেশ্বরে যাই নাই এ কথা মনে হতেই ব্যথা পেতাম। সেইজন্য যখন বন্ধুবর পিটার আব্রাদে এক মাসের ছুটিতে মহাবলেশ্বরে গিয়ে সাদর আহ্বান জানালেন তখন এ সুযোগ এক রকম লুফেই নিলাম।

স্থির হ'ল ২৩শে নভেম্বর রাত্রে রওনা হয়ে পরের দিন সকালে মহাবলেশ্বরে পৌছনো যাবে। আমার সহযাত্রীদ্বয়ের মধ্যে একজন পারসী, শ্রীযুক্ত চিচপার, আর একজন খ্রীষ্টান শ্রীযুক্ত ডি মেলো।

পুণায় পৌছলাম ভোর ৫টার সময়। এখান থেকে মোটর-বাসে যেতে হবে মহাবলেশ্বর পর্য্যন্ত। পুণায় এলেই অতীতের স্মৃতিতে আমার মন ভরে ওঠে। এই সেই পুণ্য নগর, যেখানে মারাঠা-গৌরব পেশোয়াদের রাজধানী ছিল। কত বীরত্বের, কত চক্রান্তের লীলাভূমি এই পুণা। গৌরবোজ্জ্বল বিগত দিনের সাক্ষীস্বরূপ আছে মাত্র পেশোয়া-প্রাসাদের শূন্য ভিত্তি আর আছেন পেশোয়াদের আরাধ্যা দেবী পার্ব্বতী। বর্ত্তমান কালেও পুণা নগণ্য নয়। দক্ষিণ-ভারতের অন্যতম প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র পুণা, এই পুণাই ছিল মহামতি গোখলে আর লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের কর্ম্মক্ষেত্র। এখানকার যারবেদা জেল ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই কারাগারেই অনশনব্রতী মহাত্মার শয্যা-পার্শ্বে ছুটে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কত দেশকর্ম্মীর নিরানন্দ দিনগুলি এই কারাপ্রাচীরের আড়ালে কেটে গেছে। আবার এই পুণারই উপকণ্ঠে মহামান্য আগা খাঁয়ের প্রাসাদে মহাত্মা গান্ধীর সহধর্ম্মিণী কস্তুরবা আর তাঁর প্রিয় সহচর মহাদেব দেশাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আজও প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে তাঁদের চিতাবেদী মহাত্মাজীর স্বহস্তলিখিত 'হে রাম' আর 'ওঁ' চিহ্ন বুকে নিয়ে বিরাজ করছে। পুণায় পুণ্যার্থীর ভিড় যদি না-ও হয় দেশপ্রেমিকদের ভিড় হবেই।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই আমরা একটা বাসে চাপলাম। প্রায় ছ'টার সময় বাস ছাড়ল। তখনও চারদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন—পথে যানবাহন বা লোকচলাচল আরম্ভ হয় নাই। প্রায় সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাস এসে পৌছল একটা গঞ্জের মত জায়গায়। নাম ঠিক মনে নেই, খুব সম্ভব সুরুল। বোম্বাইয়ের তুলনায় এ জায়গাটা অনেক ঠাণ্ডা।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই বাস আবার চলতে সুরু করল। রাস্তা এঁকেবেঁকে উঠেছে পাহাড়ের গা বেয়ে, তবে এখনও রীতিমত চড়াই সুরু হয় নাই। পুণা থেকে মহাবলেশ্বর ৭৫ মাইল হলেও একটানা চড়াই নয়—অনেকটা সিঁড়ির ধাপের মত। কিছুদূর চড়াই, আবার খানিকটা প্রায় সমতল পথ। পথ এক জায়গায় টানেলের ভিতর দিয়ে গিয়েছে—নেহাৎ কম লম্বা নয় টানেলটা। টানেলের ভিতর দিয়ে আগে ট্রেনে গিয়েছি, কিন্তু মোটরে এই প্রথম। একটা নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল। আরও অনেকগুলি চড়াই পার হয়ে বাই (Wai) বলে একটা ছোট শহরে এসে বাস থামল। উর্দ্ধগামী সর্পিল পথ সরীসৃপগতি দার্জ্জিলিং শিলঙের পথের কথা মনে করিয়ে দেয়—তবে পাহাড়ের গায়ে সে রকম জঙ্গল নেই। বাই সাতারা জেলায় ১৯৪২ সালের আন্দোলনে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে।

বাই-এর পরই আবার চড়াই পথ। নীচে সমতল জায়গায় বাইকে দেখা যাচ্ছে ঠিক ছবির মত। এমনিতর নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা পাঁচগণিতে এসে পৌছলাম।

পাঁচগণি বাই থেকে আট মাইল, দূরে পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট্ট শহর। গান্ধীজী মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকতেন। বাস এসে দাঁড়াল ছোট বাজারের মধ্যে বাস আপিসের সামনে। শুনলাম ছাড়তে একটু দেরী হবে। ভালই হ'ল। নেমে একটু হাত-পা ছড়ানও যাবে আর পাঁচগণির বাজার ঘুরে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন করা যাবে। বাজারটি অতি সাধারণ, স্কোয়াশ আর র্যাজবেরীর আমদানী প্রচুর। সেদিন রবিবার, স্কুলের ছুটি। ছেলেমেয়েরাও ভিড় করে এসেছে বাজারে। কারও কারও হাতে হকি বা ক্রিকেট ব্যাট, বল, গুলতি টিফিনের পাত্র, গল্পের বই ইত্যাদি ছুটির দুপুর কাটাবার নানা উপকরণ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাসিখুশীভরা ছেলেমেয়েগুলিকে দেখে বেশ লাগল।

কিছুক্ষণ বাজারে ঘুরে বেড়িয়ে আমরা বাসে চড়ে বসলাম। যথাসময়ে বাস ছেড়ে দিলে। বাতাসের শৈত্য, লোকজনের গরম পোশাক-পরিচ্ছদ আর হাবভাব থেকে এখন স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে যে হিল ষ্টেশনে এসেছি। আধ ঘণ্টাখানেক পরেই মহাবলেশ্বরের ঘরবাড়ী দেখতে পাওয়া গেল। পথের দু'ধারে মাঝে মাঝে অজস্র বুনো গোলাপ ফুটে রয়েছে—গন্ধ নাই, কিন্তু দেখতে অতি চমৎকার। কাছে দূরে পাইনগাছও চোখে পড়ছে মাঝে মাঝে, সিলভার পাইনই বেশী। মহাবলেশ্বরে ঢুকবার মুখেই একটা সুন্দর ঝিল আছে, লম্বা একফালি জল, যেন পাহাড় আর সবুজ বনের ফ্রেমে বাঁধান। দু'চারখানা নৌকাও বাঁধা রয়েছে. যারা জলবিহার করতে চায় তাদের জন্যে। এর পরই

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভ উপলক্ষে ১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭) তারিখে দিল্লীর পুরনো লালকেল্লায় বিরাট জনতা

স্বাধীনতা দিবসে (১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭) লালকেল্লায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন

অনেকখানি খাড়াই রাস্তা পার হয়ে প্রায় সাড়ে দশটার সময় বাস গন্তব্য স্থানে এসে থামলে পর আমরা নেমে পড়লাম। সমতল দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে এখানকার আবহাওয়ার কত তফাৎ। এই পার্ব্বত্য অঞ্চলের শীতল বাতাস সমস্ত শরীরকে স্নিগ্ধ করে দেয়। জিনিষপত্র নিয়ে বেরিয়েই দেখি বন্ধু লম্বা লম্বা পা ফেলে আসছেন আমাদের প্রত্যুদ্গমন করবার জন্যে।

কাছেই বাড়ী, পৌঁছতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। বন্ধুপত্নী রান্নাঘরে ব্যস্ত, তিনিও হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন আমাদের সাড়া পেয়ে। বাসাটি কিন্তু বেশ পেয়েছেন বন্ধুবর। আসবাবসমেত দুখানা বেশ বড় শোবার ঘর, প্রত্যেকটির সঙ্গে বাথরুম, সামনে চওড়া বারান্দা, প্রকাণ্ড উঠান, উঠানের অপর পাশে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর। ভাড়া ৭৫৲ টাকা। শুনলাম এটা মহাবলেশ্বর ভ্রমণের 'সীজ্‌ন্' নয় তাই অনায়াসে এত সস্তায় পেয়েছেন। নইলে বাড়ী পাওয়া মুশকিল হয়। যে বাড়ীতে আমরা উঠেছি তার এক সীজনের ভাড়া (মার্চ্চ ১৫—জুন ১৫) ৩৫০৲ টাকা।

দুপুর বেলা, সবাই বসে ভাবী ভ্রমণের প্রোগ্রাম ঠিক করছি এমন সময় এক চিঠি এল সুসংবাদ নিয়ে—আরও তিন জন অতিথি সন্ধ্যার বাসে আসছেন। তিন জনই মহিলা, ডাকসাইটে (M. D.) ডাক্তার, এক জন আবার নাকি F.C.P.S। বন্ধু দেখছি ব্যালেন্স অব পাওয়ারের থিয়োরীতে বিশ্বাস করেন। তা করুন ক্ষতি নাই, আমি কিন্তু মনে মনে এম্-ডি উপাধিধারিণী তিন জন লেডি ডাক্তারের রাশভারী মূর্ত্তি কল্পনা করে খুব স্বস্তিবোধ করছিলাম না।

সন্ধ্যার বাসের সময় হ'ল, সবাই মিলে ষ্টেশনে গেলাম সম্মানিতা অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্যে। বাস এল, কিন্তু লেডী ডাক্তাররা কই? সামনের সীটে যে তিন জন বসে আছেন তাঁদের চেহারা আর চালচলন দেখে মনে হ'ল তাঁরা লেডী ডাক্তার হতেই পারেন না, কিন্তু তা ছাড়া আর কাউকে দেখছিও না তো। বেশীক্ষণ সন্দেহ-দোলায় দুলতে হ'ল না। বন্ধু আর বন্ধু-পত্নী হাসিমুখে এগিয়ে গেলেন ওই তিনটি তরুণীর দিকে, তাঁরাও নেমে এলেন বাস থেকে, কলহাস্যে চারদিক মুখরিত করে। এঁরাই তা হলে প্রতীক্ষিত লেডী ডাক্তারত্রয়ী! কই ভাবভঙ্গী তো কারুরই সে রকম গুরু-গম্ভীর নয়! আর পাঁচটি মেয়ের মতই তাঁরা নূতন জায়গায় আসার আর বন্ধুমিলনের আনন্দে ঝলমল করছেন। বন্ধু আলাপ করিয়ে দিলেন—'এঁরা আমাদের পুরনো বন্ধু ফ্রান্সিস ডি. মেলো, মিস্ চিচগার আর চক্রবর্ত্তী, আর এঁরা হচ্ছেন শ্রীমতী মুরিয়েল ভালাভারেস, কেট উডওয়াডিয়া, আর ফ্রিডা ব্রাগাঞ্জা।' একটু নুয়ে আর একটু হেসে "হা ডু ডু" করে সবাই বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। নূতন পরিচয়ের আড়ষ্টতা আর লেডী ডাক্তার ভীতি কাটতে দেরী হ'ল না।

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও মহাবলেশ্বর বোম্বাই লাটের গ্রীষ্মাবাস ছিল, তা সত্ত্বেও এটা আসলে একটা গণ্ডগ্রাম বৈ আর কিছু নয়। স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা তিন-চার হাজার হবে কিনা সন্দেহ। শুনলাম সীজনের সময় আরও পাঁচ-ছয় হাজার লোক বেড়াতে আসেন এখানে। তখন নাকি জায়গাটা গম্ গম্ করে। স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা কিন্তু মহাবলেশ্বর থেকে পাঁচগণিতে বেশী। মহাবলেশ্বরের অত্যধিক বৃষ্টিপাতই এর কারণ মনে হয়। পাঁচগণি মহাবলেশ্বর থেকে মাত্র বার মাইল দূর হলেও মহাবলেশ্বরের তুলনায় এখানে বৃষ্টিপাত অনেক কম্—বৎসরে ৬০-৭০ ইঞ্চি। সেইজন্যেই স্কুল, স্বাস্থ্যনিবাস ইত্যাদি সবই পাঁচগণিতে।

বর্ত্তমান মহাবলেশ্বর শহর গড়ে উঠেছে মাত্র সোয়া শত বৎসর পূর্ব্বে। মেজর লডউইক ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে আসেন। এখানকার নিসর্গ-শোভা, আর তাঁর স্বদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে এখানকার আবহাওয়ার সাদৃশ্যের জন্য তিনি তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুদের কাছে এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এর পর ধীরে ধীরে এটা ভারতপ্রবাসী য়ুরোপীয়দের স্বাস্থ্য-নিবাস আর অবকাশ যাপনের অন্যতম প্রধান স্থানে পরিণত হয়। কোম্পানী বাহাদুর এই স্বাস্থ্যকর শহরটির উপর নিরঙ্কুশ অধিকার পাবার জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠেন এবং ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে পেঠাবাভালার বিনিময়ে সাতারার রাজার কাছ থেকে মহাবলেশ্বরের অধিত্যকার পুরোপুরি দখল লাভ করেন। ক্রমে বাজার আর শহর গড়ে ওঠে। ভারতীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম আসেন পারসীরা, যেমন তাঁরা এসেছিলেন সুরাট অঞ্চল থেকে বোম্বাইয়ে। কিন্তু এই শহরের গোড়াপত্তনে চীনাদের অবদানও কম নয়। বোম্বাই প্রদেশের পুণা আর থানা অঞ্চল ছিল অন্তরিত (interned) চীনাদের আটক রাখার জায়গা। সেখান থেকে তাদের আনা হয় মহাবলেশ্বরে। তারাই নূতন নূতন ফলমূল আর শাকসব্জীর বাগান তৈরি করে, রাস্তা আর রাস্তার দু'পাশে ঘরবাড়ী নির্ম্মাণপূর্ব্বক শহরের শ্রীসম্পাদন করে। এখনও তাদের স্মৃতি বিজড়িত আছে এখানকার দু' একটা জায়গার আর দু' চারটে পুরানো বাড়ীর সঙ্গে।

মহাবলেশ্বরে হোটেল আর বোর্ডিং হাউস আছে অনেক-গুলি—হিন্দু, মুসলমান, পারসী, ইউরোপীয়, সব রকম। তা ছাড়া বাড়ী আর বাংলোও ভাড়া পাওয়া যায়। তবে এখানে আসতে হ'লে আগে থেকে থাকার বন্দোবস্ত করে আসাই ভাল, হোটেল, বোর্ডিঙে স্থান না পেয়ে যাত্রীদের অসুবিধায় পড়তে হতে পারে।

পরের দিন সকাল থেকে আমাদের ঘুরে বেড়াবার পালা। এখানে সস্তায় ভাল সাইকেল ভাড়ায় পাওয়া যায়—ঘণ্টায় দু' আনা ভাড়া। ঠিক হ'ল আমরা বেশীর ভাগ বেড়াবো সাইকেলেই। শ্রীমতী মুরিয়েল আগে কয়েকবার

মহাবলেশ্বরে এসেছেন, তিনি আর বন্ধু শ্রীভ্রাদে মোটামুটি গাইডের কাজ করবেন। মহাবলেশ্বরের অবিত্যকা পশ্চিমে কঙ্কণ উপকূল আর পূর্ব্বে দক্ষিণাপথের মালভূমির মাঝখানে খাড়া দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে। এর উচ্চতা মোটামুটি ৪০০০ থেকে ৪৫০০ ফুট; পশ্চিম দিকটায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশী, পূর্ব্ব দিকে বৃষ্টি প্রায় হয় না বললেই চলে। মহাবলেশ্বরের বার্ষিক বারিপাত ২৫০-৩০০″ ইঞ্চি, ১২ মাইল পূর্ব্বে পাঁচগণিতে ৬০-৮০″ ইঞ্চি আরও ৮ মাইল পূর্ব্বে বাই, সেখানে বৎসরে ২০″ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি হয় না।

মহাবলেশ্বরের যে সকল জায়গা থেকে নিসর্গ-শোভা সব চেয়ে ভালরূপে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোকে 'পয়েন্ট' বলে। যাত্রীরা কেউ সাইকেলে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ মোটরে বা পায়ে হেঁটে এই সমস্ত পয়েন্টে গিয়ে নয়নমনের তৃপ্তি সাধন করেন। সহ্যাদ্রির দৃশ্য দেখতে হলে মহাবলেশ্বরের চেয়ে ভাল জায়গা আর আছে বলে মনে হয় না। এ ছাড়া এখানে কয়েকটা মারাঠা দুর্গের ভগ্নাবশেষও আছে।

প্রথমেই আমরা এলফিনষ্টন পয়েন্ট আর আর্থার সীটে যাব স্থির হ'ল। আর্থার সীট বাজার থেকে প্রায় ৮ মাইল। সাইকেলে রওনা হলাম। শুনেছিলাম মহাবলেশ্বরে বিষাক্ত সাপ খুব বেশী; মাইলখানেক যেতে না যেতেই দেখি হাত তিনেক লম্বা এক সবুজ রঙের সাপ রাস্তার মাঝে শুয়ে বোধ হয় রৌদ্র সেবন করছে। পাঁচ গজ দূরে থেকেও আমি চিনতে পারি নি যে ওটা সাপ। দেখতে সাপের মত হলেও সবুজ রঙের জন্যে মনে করেছিলাম তালপাতার একটা ফালি বা কোনও লতা পড়ে আছে। ইচ্ছে হ'ল সাইকেলটা চালিয়ে দিই জিনিষটার ওপর দিয়ে। আবার কি মনে করে পাশ কাটিয়ে গেলাম। কাছে যেতেই সাপটা সুন্দর ভঙ্গীতে মাথা উঁচু করল। পরে এক জন লোককে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম যে ও সাপের নাকি বিষ নাই। আরও কিছু দূর গিয়ে অন্য জাতের আর একটা ছোট সাপ রাস্তার ওপর মরে পড়ে আছে দেখলাম। সঙ্গীরা সব আগে চলে গিয়েছেন। আমি সাইকেলে আর এক জনকে নিয়ে যাচ্ছি বলে পিছনে পড়েছি। ক্ষেত্র-মহাবলেশ্বর বা আদি-মহাবলেশ্বর পর্য্যন্ত যাবার পর রাস্তা খুব চড়াই দেখে সাইকেলটা সেখানে রেখে বাকী পথটা হেঁটে যাওয়া স্থির করলাম। এলফিনষ্টন পয়েন্ট সেখান থেকেও প্রায় তিন মাইল। এই ঠাণ্ডাতেও গলদঘর্ম্ম হয়ে যখন এলফিনষ্টন পয়েন্টে পৌঁছলাম তখন চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্য দেখে পরিশ্রম সার্থক মনে হ'ল। এই পয়েন্ট থেকে সম্মুখে আর আশপাশে দিগন্ত-বিস্তৃত অসংখ্য পর্ব্বতমালা আর উপত্যকার যে দৃশ্য চোখে পড়ে তার তুলনা হয় না। এই ভীষণ অথচ মনোরম দৃশ্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্থান কাল সব ভুলে যেতে হয়। ডান দিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটি ক্ষীণতোয়া নদী এঁকে-বেঁকে চলেছে অজানার উদ্দেশে—দু'পাশে পাহাড় কেটে বেশ একটু উপত্যকাভূমির মত সৃষ্টি করে নিয়ে। নদীটির নাম সাবিত্রী।

এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে এগিয়ে চললাম, আর্থার সীটের দিকে। রাস্তা ডান দিকে বেঁকে চলে গিয়েছে, সঙ্গীরা পথ-নির্দ্দেশের জন্য তীর-চিহ্ন এঁকে রেখে গিয়েছেন পথের ওপর। এখন আর ক্লান্তি নাই, নূতন উৎসাহে আবার চড়াই ভেঙে চলেছি।

পথে সাবিত্রী পয়েন্ট আর ক্যাস্‌ল রক্ পার হয়ে রাস্তার শেষে এসে পৌঁছলাম। সাবিত্রী পয়েন্ট আর ক্যাস্‌ল রক থেকে দিগন্তবিস্তৃত ঘাট পর্ব্বতমালার দৃশ্য আর পায়ের নীচে অতলস্পর্শ খদ চোখে পড়ে। রাস্তা শেষ হয়েছে বাজার থেকে ৭½ মাইলের মাথায়। এখান থেকে পায়ে হাঁটা পথে যেতে হবে আর্থার সীট ইত্যাদি জায়গাগুলিতে। সঙ্গীদের দেখতে পেলাম না—তবে তাঁদের সাইকেলগুলো পড়ে আছে দেখলাম। একটা সাইকেলকে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে লতাপাতা দিয়ে আড়াল করে রেখে তারস্বরে চিৎকার করলাম বারকতক। প্রতিধ্বনি এল ফিরে ফিরে, কিন্তু সঙ্গীদের সাড়া পেলাম না। হাঁটাপথ আছে দুটো, দু'দিকে গিয়েছে। কোন্‌টা অনুসরণ করব ঠিক করতে পারছি না—তীরচিহ্নও দেখছি না। অগত্যা বাঁ-দিকের পথটা ধরে নীচে নেমে চলতে লাগলাম। সেখান থেকে নীচে তাকালে চোখে পড়ে—দু'পাশে পাহাড় যেন মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মাঝখান দিয়ে সাবিত্রী বয়ে চলেছে। কিন্তু সেখানেও বন্ধুদের দেখা পেলাম না। তখন সে পথ ছেড়ে আবার উপরে উঠে অন্য পথ ধরে চললাম উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে করতে। এবার সাড়া পেলাম—জঙ্গল ভেদ করে, খানিকটা নীচের থেকে। আর বিশ গজ গিয়েই আর্থার সীট। কি ভয়ঙ্কর অথচ কি সুন্দর জায়গা! পাহাড়ের গা থেকে যেন একটু ছোট কার্ণিশ বেরিয়েছে, পাঁচ-ছয় জন লোক কোনরকমে দাঁড়াতে পারে। লোহার নড়বড়ে রেলিং দিয়ে ঘেরা। পায়ের নীচে প্রায় ৩০০০ ফুট গভীর খদ, বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মাথা ঘুরে যায়। দু'পাশে বাহু মেলে আছে দুটো পাহাড়। আমরা দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছি, এমন সময় সঙ্গীরা হৈ হৈ করতে করতে উঠে এলেন। এক জন স্থানীয় লোককে গাইড নিয়েছেন দেখলাম। তাঁরা আর্থার সীট আগেই দেখেছেন এখন আসছেন 'উইন্‌ডো' থেকে। উইন্‌ডো হ'ল আর্থার সীটেরই ঠিক নীচে দু'পাশে নিরেট পাথরের মধ্যে একটা জানালার মত ফাঁক। গাইডকে সঙ্গে নিয়ে আমি চললাম উইনডো দেখবার জন্যে, সঙ্গীরা সেখানে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। পিচ্ছিল পাহাড়ের গা বেয়ে অতি সন্তর্পণে গিয়ে

পৌঁছলাম সেখানে। সেখান থেকে বাঁ-দিকে, উপরে, নীচে সর্ব্বত্রই দেখতে পাওয়া যায় হাজার হাজার ফুট খাড়া পাথরের দেয়াল, আর সম্মুখে সুদূরপ্রসারিত সাবিত্রী উপত্যকা। ফিরে আসবার পথে কতকগুলো সিলভার কার্ণের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এলাম সঙ্গীদের হাতে সাদা উল্‌কী পরাবার জন্যে। এই কার্ণের পাতার নীচের দিকে থাকে সাদা চকের গুঁড়োর মত একরকম জিনিষ। হাতের উপর রেখে চাপ দিলেই চমৎকার ছাপ ওঠে।

এবার বাড়ী ফেরার পালা। সবাই তৃষ্ণার্ত্ত। গাইড বললে, 'কাছেই একটা ঝরণা আছে, জল খুব ভাল।' সঙ্গে বিস্কুট ছিল সেখানে গিয়ে তাই দিয়ে জলযোগ করে উপরে উঠে এলাম। তখন দেখলাম যে, আমরা প্রথমে যে রাস্তা দিয়ে কিছুদূর গিয়েছিলাম সেটা দিয়েও আর্থার সীটে যাওয়া যায়—দুটো পথ একই জায়গায় মিলেছে। আড়াল-করা সাইকেলটা আবিষ্কার করতে বন্ধুদের একটুও দেরী হ'ল না, বুঝতে পারলাম যে বিংশ শতাব্দীর মেয়েদেরও পেটে কথা থাকে না। সেখান থেকে অন্য সবাই সাইকেলে রওনা হলেন, আর গাইড আমাকে সোজা পথে আদি মহাবলেশ্বরে নিয়ে চলল। এই পথে আদি মহাবলেশ্বর মাত্র দেড় মাইল। পৌঁছতে দেরী হ'ল না। আদি মহাবলেশ্বরও বেশ চমৎকার জায়গা। সময় কম বলে ভাল করে দেখা হ'ল না। আর্থার সীট থেকে সোজা পথে পৌঁছলাম একটা বড় মন্দিরের পিছনে। শুনলাম এটি "উগম মন্দির"; "কৃষ্ণা মন্দির"ও বলে এটিকে। মন্দিরের কারুকার্য্যে কোন বিশেষত্ব নাই। অন্য কোন জায়গা থেকে এনে রেখে দেওয়া একটা কালো পাথরের বেস রিলিফে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি ছাড়া অন্য কোন মূর্ত্তিও নাই। পশ্চিমের দেয়াল ফুঁড়ে পাঁচটি নালা দিয়ে জল ভিতরে এসে প্রথমে একটা বড় কুণ্ডে, তার পর পাথরে তৈরি গোমুখ দিয়ে আর একটা কুণ্ডে পড়ছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, এই পাঁচটা নালা নাকি কৃষ্ণা, সাবিত্রী, কোয়েনা প্রভৃতি পাঁচটি নদীর জল এবং মন্দিরটি কৃষ্ণানদীর মন্দির। মন্দিরের সামনে একটা ধর্ম্মশালা আছে। এখানে আরও কয়েকটি মন্দির আছে, তার মধ্যে একটি মহাবলেশ্বর শিবের মন্দির। এই শিবের নামেই জায়গাটার নাম হয়েছে মহাবলেশ্বর। মহাবলেশ্বর শিবের সম্বন্ধে একটি সুন্দর পৌরাণিক কাহিনী আছে।

এখানে মহাবল আর অতিবল নামে দু'জন রাক্ষস বাস করত। তাদের উৎপাতে মুনি-ঋষিরা নির্ব্বিঘ্নে তপশ্চরণ বা যজ্ঞাদি করতে পারতেন না। তাই তাঁরা মহাবল আর অতিবলের নিধনের জন্য বিষ্ণুকে গিয়ে ধরলেন। বিষ্ণু রাজী হয়ে অতিবলকে মারলেন, কিন্তু বড় ভাই মহাবল সত্যিই মহাবল—বিষ্ণুশক্তিকে তাঁর কাছে হার মানতে হ'ল। তখন বিষ্ণু মোহিনীমূর্ত্তি ধরে মহাবলকে কাবু করে তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করলেন। মহাবল বর দিতে রাজী হলেন, মোহিনী বললেন—মহাবলকে মরতে হবে। প্রার্থনা শুনে মহাবল অবাক, কিন্তু কথা দিয়ে ত আর কথা ফিরান চলে না। মহাবল মরলেন; কিন্তু আগে কবুল করিয়ে নিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর অতিবল আর মহাবলের স্মৃতি রক্ষার জন্যে তাঁদের শিবরূপে পূজা করতে হবে। সেই থেকে মহাবলেশ্বর আর অতিবলেশ্বরের পূজা চলে আসছে। শিবরাত্রির সময় এখানে খুব বড় মেলা হয়।

আদি মহাবলেশ্বর থেকে সাইকেল নিয়ে যখন বাসায় ফিরলাম তখন বেলা প্রায় তিনটা।

আহার ও একটু বিশ্রামের পর "বম্বে পয়েণ্ট" দেখতে গেলাম। বম্বে পয়েণ্ট খুব কাছেই, বাজার থেকে মাত্র ১-মাইল, গবর্ণমেণ্ট হাউসের পিছনে। সূর্য্যাস্ত দেখবার জন্যে এখানে প্রতিদিন বহু লোকের সমাগম হয়। বহুদূরে সমুদ্রের গর্ভে সূর্য্যাস্তের দৃশ্য যেমন উপভোগ্য, তেমনি নয়নমুগ্ধকর পাহাড় আর জঙ্গলের দৃশ্য। এখান থেকে কোয়েনা নদীর

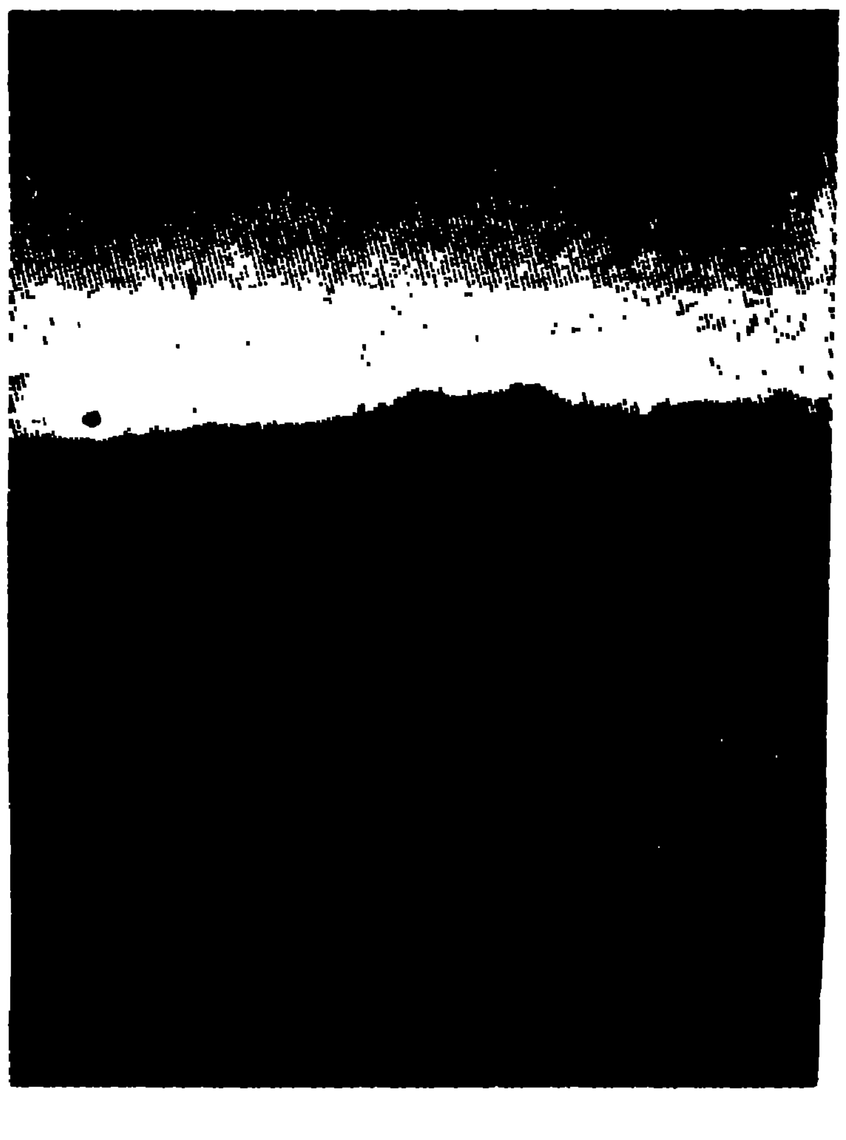

১নং চিত্র। স্যাণ্ডেল ব্যাক

উপত্যকা প্রতাপগড়ের দুর্গ আর স্যাণ্ডেল ব্যাক পাহাড়ের দৃশ্য সত্যিই মনোরম। (১ নং চিত্র)

আর একটি রমণীয় স্থান হচ্ছে 'লডউইক' আর 'সিডনী' পয়েণ্ট। এই পয়েণ্ট দুটিও খুব দূরে নয়—বাজার থেকে তিন মাইলেরও কম। এখান থেকেও কিটজেরাল্ড ঘাটের গা ঘেঁষে প্রতাপগড় হয়ে মাহাড় যাবার রাস্তা, প্রতাপগড়ের দুর্গ, এলফিনষ্টন পয়েণ্ট এই সব চমৎকার দেখতে পাওয়া যায়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে লডউইক সাহেব নাকি এখানেই প্রথম আসেন। সেই স্মৃতিকে স্থায়ী করবার জন্যে জায়গাটির নামকরণ করা হয়েছে লডউইক পয়েণ্ট, একটা স্তম্ভও রয়েছে

নজরে পড়ল। এখান থেকে একটু এগিয়েই সিডনী পয়েন্ট, একটা সরু লম্বা পাহাড়ের ফালির শেষপ্রান্তে। লডউইক পয়েন্ট যেন অঙ্গুলীসঙ্কেতে নীচের খদ আর সম্মুখের পাহাড়ের সারি দেখিয়ে দিচ্ছে। পাহাড়ের অঙ্গুলী সদৃশ অংশটি প্রায় দু ফার্লং লম্বা আর কোথাও আট-দশ ফুট, কোথাও বা কিছু বেশী চওড়া। একটু অসাবধান হইলেই আর রক্ষা নাই, নীচে ২০০০ ফুটের খদ। আমি সাইকেল চড়ে সিডনী পয়েন্ট পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম বলে সঙ্গীদের সে কি ভৎর্সনা !

মঙ্গলবার মহাবলেশ্বরের হাটবার। দুপুর পর্য্যন্ত কেনা-কাটা করা হ'ল। লেডী ডাক্তাররা, বিশেষ করে শ্রীমতী কেটি কলা, টমেটো, গাজর ইত্যাদি ভাইটামিনযুক্ত খাদ্যদ্রব্য কিনে বিতরণ করতে লাগলেন এক পাল ছেলেমেয়ের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। উঃ, সে কি ভিড় ! ওদের চেহারায় নাকি ভাইটামিনের অভাব ফুটে বেরুচ্ছে, সেটা যতদূর সম্ভব পূরণ করে দিতে চান লেডি ডাক্তাররা। শহরেই জন্ম এবং শহরেই এঁরা মানুষ, অবস্থাও সচ্ছল, সত্যিকারের ভারতবর্ষের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয় নাই ওঁদের।

মহাবলেশ্বরের মত এত প্রার্থী আমি আর কোথাও দেখি নাই। সবাই যে ভিখারী তা নয়। অনেকে হয় তো কাছাকাছি কোন গ্রামে থাকে, বাজারে এসেছে বিকিকিনি করতে। পথে বিদেশী আগন্তুক দেখলেই 'সাব বখশিশ' অথবা 'বাঈ বখশিশ' বলে হাতটা বাড়িয়ে দেয়। এটা যেন ওদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অনেক সময় দেখা যায় 'সাব বখশিশ' বলে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে এক মুহূর্ত্তও না দাঁড়িয়ে যে যার পথে চলে গেল।

অপরাহ্নে গেলাম লিঙ্গমালা দেখতে, বাজার থেকে প্রায় চার মাইল দূরে এই জায়গাটা। প্রথম তিন মাইল পাঁচগণির রাস্তা দিয়ে গিয়ে দেখি ডান দিকে একটা কাঁচা রাস্তা বেরিয়ে গিয়েছে লিঙ্গমালার দিকে। লিঙ্গমালা হ'ল মহাবলেশ্বরের "কিচেন গার্ডেন"—সব্জীর বাগান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে গবর্ণমেণ্ট এখানে কুইনাইনের চাষের চেষ্টা করেছিলেন। বহু পরীক্ষা আর অর্থব্যয়ের পর অসম্ভব বলে সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়েছে। বাগানের তত্ত্বাবধায়কের বাংলো আর আপিস-বাড়ী এখনও রয়েছে দেখলাম। এগুলো এখন বনবিভাগের কাজে লাগছে। এই বাংলোগুলি ছাড়িয়ে আর একটু গেলেই ভেনিয়া জলপ্রপাত—ভেনিয়া নদী সগর্জ্জনে পাহাড় থেকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্রপাতের মুখোমুখি উঁচু পাহাড়ে দাঁড়িয়ে এর সমস্তটা দেখতে পাওয়া যায়। প্রপাতটি সিঁড়ির ধাপের মত। দু'ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে তুষার-শুভ্র জলরাশি নীচে গড়িয়ে পড়ছে। বৃষ্টির পর যখন জলের তোড় বাড়ে তখন নাকি ধাপগুলো থাকে না।

বুধবার। ঠিক হ'ল প্রতাপগড় দুর্গ দেখতে যেতে হবে। এই প্রতাপগড়েই শিবাজী আফজল খাঁকে 'বাঘনখ' দিয়ে বধ করেন। প্রতাপগড় মহাবলেশ্বর থেকে মাত্র দশ মাইল। ট্যাক্সি একটার বেশী পাওয়া গেল না—অথচ যাত্রী আমরা সাড়ে আট জন। আট জন বয়স্ক আর এক জন বালক। ঠিক হ'ল দু'জন যাবেন সাইকেলে আর বাকী সবাই ট্যাক্সি করে—ভাড়া ২৫৲ টাকা। শ্রীযুক্ত ডি মেলো আর আমি সাইকেলে গেলাম। ঢালু রাস্তা, দুই ধারে ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নেমে গিয়েছে পাক খেয়ে খেয়ে। ট্যাক্সির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পৌঁছলাম প্রতাপগড়ের পাদদেশে বাড়া ডাক-বাংলোতে। সেখান থেকে পাহাড়ের প্রায় দেড় মাইল উপরে দুর্গ। (২ নং চিত্র) যাঁরা হেঁটে উঠতে অপারগ তাঁরা ইচ্ছা করলে চেয়ার' ভাড়া করে যেতে

২ নং চিত্র

পারেন—চার জন লোকে ঘাড়ে করে নিয়ে যাবে। ভাড়া পরিশ্রমের তুলনায় খুবই কম—চার টাকার মত। আত্রাদে-পত্নীর পক্ষে হেঁটে উঠা অসম্ভব, তাঁর জন্যে একটা চেয়ার নিয়ে আমরা হৈ হৈ করে গিরি আরোহণ সুরু করলাম। অপর মহিলারা কিছুদূর গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে চেয়ারে উঠবেন এই আশায় আরও দু' দল লোক দুটি চেয়ার নিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সবটা পথ এল। কিন্তু তাদের আশাপূর্ণ হ'ল না। পথ খুব খাড়াই এবং দুরারোহ হলেও মহিলারা অতি সহজেই উপরে উঠে গেলেন। দলের মধ্যে শ্রীমতী ম্যুরিয়েল দুর্গে পৌঁছলেন সকলের আগে প্রায় সবটা পথ ছুটতে ছুটতে। তাঁর উৎসাহ আর সহিষ্ণুতার কাছে পুরুষদেরও হার মানতে হয়। হাসিতে আনন্দে উজ্জ্বল এই ভদ্রমহিলা পরিচিত অপরিচিত সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি অনায়াসে আকর্ষণ করতে পারেন। 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা' সাবধানীদের এই বাক্য আমাদের

সঙ্গিনীদের কারও সম্বন্ধেই খাটে না—শ্রীমতী ম্যুরিয়েলের বেলায় তো নয়ই।

প্রতাপগড়ের দুর্গ দুর্গম হলেও দর্শকের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। তা ছাড়া এই দুর্গের প্রধান প্রবেশ-দ্বার, চার দিকের প্রাচীর আর দুর্গের মধ্যে শিবাজীর আরাধ্যা দেবী ভবানীর মন্দির ছাড়া এখন আর কিছু দ্রষ্টব্যও নাই। মন্দিরটির যথোপযুক্ত সংস্কারের জন্যে বেশ ভালই আছে। মন্দিরের সম্মুখেই সুদীর্ঘ নাটমন্দির আর তার দুই পার্শ্বে দুইটি স্তম্ভ।

৩ নং চিত্র

(৩নং চিত্র) মন্দির আর নাটমন্দিরের সামনেই যাত্রীদের বিশ্রামাগার। এখান থেকে কোয়েনা উপত্যকা, ফিট্‌জেরাল্ড আর রদগণ্ডি ঘাট ছবির মত দেখা যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে দুর্গের বাহিরে খানিকটা নীচে প্রায় আধ মাইল দূরে একটু সমতল যায়গা—সেখানে দুটি ঘর। এই সমতল স্থানেই শিবাজী আর আফজল খাঁয়ের সাক্ষাৎ হয়। এখানে আফজল খাঁ আর তাঁর এক জন সহচরের সমাধি আছে। এর পরই চোখে পড়ে ঠিক মন্দিরের সামনে দু'ধারে পাথরের দেয়াল-ঘেরা উঁচু সরু রাস্তার মত একটি স্থান। (৪নং চিত্র)। দুর্গের লোকেদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওরই শেষ প্রান্তে উঁচু ঢিবিটার নীচে আফজল খাঁয়ের মস্তক প্রোথিত হয়েছিল, দেহটা রাখা হয়েছিল নীচের সমাধিতে।

পাহাড়ের উপরের স্নিগ্ধ বাতাসে অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লান্তি দূর হ'ল, তখন জঠরাগ্নির দহনজ্বালা অনুভব করতে লাগলাম। দুর্গের লোকদের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল যে দুধ, ডিম, চা এমন কি চিনিও পাওয়া যেতে পারে। ইচ্ছা করলে তৈরি চাও পাওয়া যাবে। টাকায় দু'সের খাঁটি দুধ! আর আমাদের পায় কে। উনুন আর কাঠকুটোও পাওয়া গেল। সঙ্গের ডাক্তারনীরা আর যাই হোন লেডী তো, কাজেই দুধ জ্বাল দেওয়া, চা তৈরী আর ডিম সিদ্ধ হতে দেরী হ'ল না। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে ছিল বিস্কুট, মাখন আর চীজ। মধ্যাহ্নভোজন হ'ল ভালই। তার পর আমরা বেরুলাম দুর্গ প্রদক্ষিণ করতে, সঙ্গে এক জন গাইড। দেখবার বিশেষ কিছুই নাই—চারদিকে ঘাট পর্ব্বতমালার দৃশ্য এ ছাড়া শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী স্থাপিত হনুমান-মূর্ত্তি, কেদারেশ্বর শিব, দু'একটা পুরানো কামান এই সব দেখে প্রাচীরের গা বেয়ে ঘুরতে লাগলাম। গাইড বললে ওদিকে দেখবার আর কিছু নাই, কেউ যায়ও না ওদিকে।

প্রদক্ষিণ···একটু বিশ্রাম···তার পরই প্রত্যাবর্ত্তনের পালা। আঁদ্রাদে, কেটি, ম্যুরিয়েল আর আমি চললাম আফজল খাঁয়ের সমাধি দেখতে, দলের অন্য সবাই সোজা নেমে গেলেন নীচে ডাক-বাংলোর দিকে। সমাধিমন্দিরের চারদিকের দরজাই বন্ধ, রক্ষককেও খুঁজে পাওয়া গেল না। সার্শির জানালা, ভিতরটা অবশ্য দেখতে অসুবিধা হ'ল না। পাশাপাশি দুটি সমাধি সিল্কের কাপড় দিয়ে ঢাকা। ছাদ থেকে অসংখ্য বাতির গ্লোব আর ঝাড় ঝুলছে, পাখা, ময়ূর-পুচ্ছের চামর ইত্যাদিও আছে। আজ এ স্থান নীরব, জনমানবহীন। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের আর একদিনের ঘটনা কল্পনার চোখে দেখতে লাগলাম। সমস্ত প্রতাপগড় দুর্গ এখান থেকে যেমন স্পষ্ট আর সুন্দর দেখতে পাওয়া যায় তেমন আর কোন জায়গা থেকে নয়।

৪ নং চিত্র

সঙ্গীরা নীচে অপেক্ষা করছেন, কাজেই তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলাম। ডাক বাংলোয় এসে সুস্বাদু ঠাণ্ডা জল পানের পর

সুরু হ'ল প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন। কথা হ'ল সাইকেলে ফিরবেন কে কে? সবাই এলেন এগিয়ে। কিন্তু এগিয়ে এলেই তো হয় না, দশ মাইল খাড়া চড়াই, সাইকেল ঠেলে হেঁটে উঠতে হবে। বহু বিতর্কের পর স্থির হ'ল সাইকেল মোটরের পিছনে বেঁধে দিয়ে ব্রাঁদ্রাদে আর শ্রীমতী ম্যুরিয়েল হেঁটে আসবেন। বাকি সবাই আসবেন মোটরে। আমরা সবাই ফিরে এসে চা-পর্ব্ব সেরে যখন গল্প করছি তখন বেলা প্রায় চারটা —পদচারী দু'জন এসে পৌঁছলেন। পথশ্রমে তাঁদের গা দিয়ে ঘাম ছুটছে, চোখমুখ লাল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মুখের হাসি যাত্রার সুরুতে যেমন ছিল তেমনি আছে। উপরন্তু আছে কাঁধের উপর গন্ধমাদনের বোঝা—পথে যেখানে যত রকমের ফুলগাছ দেখছেন তার শুধু ফুল নয়—একটা করে ডাল ভেঙে নিয়ে এসেছেন। সরবে তাঁদের অভিনন্দন জানানো হ'ল। গৃহকর্ত্রী গেলেন চা দিয়ে তাঁদের ক্লান্তি দূর করার বন্দোবস্ত করতে।

সন্ধ্যাবেলা। রেশনের কেরোসিন তেল ফুরিয়ে গিয়েছে, সপ্তাহ শেষ না হলে তেল পাওয়া যাবে না। আমরা মোমবাতি জ্বেলে তাস খেলছি। হার-জিতের সঙ্গে সঙ্গে টকি আর লক্ষেপ্লেস হাতবদল হচ্ছে বলে আলোর অভাব থাকলেও বাড়ীটা নীরব নয়। এমন সময় রেশনিং আপিসের এক কর্ম্মচারী এবং আর এক জন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত।

ব্যাপার কি?

'রেশন-কার্ডে এই বাড়ীর এক জন মহিলা নিজেকে ডাক্তার বলে প্রকাশ করেছেন, তিনি আছেন কি?'

আমাদের এক জন বলে উঠলেন—এক জন কেন তিন তিন জন লেডী ডাক্তার আছেন, M. D., F. C P. S.—এই সব। কাকে চাই আপনাদের?

ভদ্রলোক দুটি তো লেডী ডাক্তারের প্রাচুর্য্যে আর উপাধির বৈচিত্র্যে প্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। রেশন আপিসের ভদ্রলোক বললেন—'দেখুন, আমরা এসেছি ভারী বিপদে পড়ে।' 'ইনি'—সঙ্গের ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে—'আমার বন্ধু, অমুক হোটেলের মালিক। এঁর স্ত্রী অসুস্থ কিন্তু এখানে তো লেডী ডাক্তার নেই। এখন আপনাদের মধ্যে যদি দয়া করে কেউ একবার আসেন তবে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব,' ইত্যাদি।

ডাক্তাররা তো যেতে রাজী, কিন্তু অসুবিধা এই যে সঙ্গে ষ্টেথেস্কোপটা পর্য্যন্ত নেই। সেটা জোগাড় করে আনলেই তাঁরা সানন্দে যথাসাধ্য করবেন একথা জানান হ'ল। তখন আগন্তুকদের এক জন গেলেন ষ্টেথেস্কোপের সন্ধানে, আর এক জন বসে গল্প করতে লাগলেন। প্রথমেই প্রশ্ন করলেন—মোমবাতি জ্বেলেছি কেন। এতে কি আলো হয়?···ও তাই নাকি, তেলের অভাবে বাতি জ্বলছে না। আমি গিয়েই আমার ওখান থেকে ছুটো বাতি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমরা মুখে ভদ্রতা বজায় রাখার জন্যে বললাম—তাঁর নিজের অসুবিধা করে আমাদের সাহায্য করার দরকার নাই। বাতি দিতে চেয়েছেন তার জন্যেই তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। তার পর যা হয়ে থাকে তাই হ'ল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের ঘরে জ্বলল বড় টেবিল-ল্যাম্প। বাতির অভাব ঘুচল—আমরা বললাম এটা হ'ল ডাক্তারের ভিজিট।

বৃহস্পতিবার। আজ আমরা রওনা হব। আমরা মানে ডি মেলো, চিচগার আর লেখক। স্থির হ'ল সন্ধ্যার বাসে সোজা পুণায় না গিয়ে আমরা সবাই বেরব সকালের বাসে। সমস্ত দিন পাঁচগণিতে কাটিয়ে আমরা তিন জনে চলে যাব নেমে পুণার দিকে আর অন্য সবাই ফিরে যাবেন মহাবলেশ্বরে। সকাল সাড়ে আটটায় বাস; পিকনিকের জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠে বসলাম সবাই। বাস ছেড়ে দিলে, একবার পিছন দিকে চেয়ে বিদায় নিলাম পাঁচ দিনের পরিচিত মহাবলেশ্বরের কাছে; মনে মনে বললাম 'পুনরাগমনায় চ'। আট মাইলের মাথায় এসে শ্রীমতী কেট, চিচগার আর ডি মেলো নেমে পড়লেন। কাছেই এক পারসী ভদ্রলোকের ফল আর ফুলের বাগান আছে, নাম Bhillard Estate, সেটা দেখবার জন্যে আমরা পাঁচগণিতে গিয়ে মালপত্র বাস আপিসে রেখে সাইকেলে ফিরে আসব ঠিক হ'ল। ব্রাঁদ্রাদে-পত্নী আর তাঁর সঙ্গী হিসাবে শ্রীমতী ফ্রিডা রয়ে গেলেন পাঁচগণিতে আর আমরা বাকী তিন জন তিনখানা সাইকেল ভাড়া করে রওনা হলাম Bhillard Estate-এর উদ্দেশে। বাগানটি পাঁচগণি মহাবলেশ্বরের রাস্তা থেকে প্রায় মাইলদেড়েক দূরে। পথে মাঝে মাঝে গোলাপের পাঁপড়ি পড়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারছিলাম যে ঠিক পথেই চলেছি। বাগানে এসে পৌঁছলাম, পূর্ব্ববর্ত্তীরা অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্যে। বাগানটি বেশ বড়। কচুরীপানা আর পেয়ারা থেকে আরম্ভ করে নীল পদ্ম আর আপেল পর্য্যন্ত দেশী-বিদেশী অনেক রকম ফুল আর ফলের গাছের সংগ্রহ আছে সেখানে, মায় তেজপাতা আর কর্পূর গাছসুদ্ধ। সংগ্রহ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হিসাবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মত নয়। বাগানের পর্য্যবেক্ষক সুন্দর বাঁধানো ভিজিটার্স বুক নিয়ে এল। তার প্রতি পৃষ্ঠায় সে কি প্রশংসার বহর—গুজরাটী, কন্নাড়ী, ইংরেজী, মারাঠি নানা ভাষায় লেখা। তবে একটা কথা, বর্ষার পর নূতন করে বাগানের আরম্ভ হতেই আমরা এসেছি। বসন্তকালে হয়তো জায়গাটা সত্যই ভূস্বর্গে পরিণত হয়। শ্রীমতী ম্যুরিয়েল বোটানির ডিগ্রীধারিণী। তিনি আমাদের সকলের হয়ে দু'লাইন মন্তব্য লিখলেন গোলাপের প্রশংসা করে—আমরা সবাই সায় দিয়ে সই করলাম। তখন কে

একজন আমাকে বলে উঠলেন—খাতার মধ্যে বাংলা লেখা নাই, তুমি কিছু লিখে দাও না কেন বাংলাতে। কি লিখি ভাবতে ভাবতে লিখলাম—সুদূর বাংলাদেশ থেকে এসে জায়গাটা ভালই লাগল—বিশেষ করে পাহাড়ের উপরে প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম।

আর কিছুক্ষণ বাগান-রক্ষকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে আমরা রওনা হলাম। বাস কোম্পানীতে গিয়ে খবর পেলাম যে শ্রীমতী সিসি (আঁদ্রাদে-পত্নী) আর ফ্রিডা পিকনিকের সব সরঞ্জাম নিয়ে বেবি পয়েণ্টে আমাদের জন্ত অপেক্ষা করছেন।

বেবি পয়েণ্ট থেকে নীচে কৃষ্ণা নদীর উপত্যকা আর বাই (Wai) ঠিক ছবির মত দেখতে।

পাঁচগণি জায়গাটিও বেশ মনোরম। এখানে হিন্দু, পারসী, মুসলমান আর য়ুরোপীয়দের জন্তে আলাদা আলাদা হাই স্কুল রয়েছে দেখলাম। পাঁচগণিতে আমার সব চেয়ে ভাল লাগল শহরের পূর্ব্বপ্রান্তে, পার্কের ঠিক পরেই বিশাল কালো পাথরের পাহাড়টি। খাড়া দেয়াল, উপরটা সমতল, যেন এক অতি বিরাট ভোজের টেবিল পাতা রয়েছে। ওর উপর উঠে যে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় তাতে রসনার তৃপ্তি হয় না এ কথা ঠিক, কিন্তু তার চেয়েও যে তৃপ্তি স্থায়ী—চোখের আর মনের তৃপ্তি—সেটা হয় প্রচুর পরিমাণে।

প্রায় পাঁচটার সময় মহাবলেশ্বর যাত্রীদের বাস এল। পাঁচ দিনের পরিচয়ও যে কত নিবিড় হতে পারে তা অনুভব করলাম বাস ছেড়ে চলে যাবার পর। ছ'টার সময় আমাদের বাস ছাড়ল। যথাসময়ে এসে পৌছলাম পুণায়, তার পর বোম্বাইয়ে। দৈনন্দিন কর্ম্মের চাকা আবার ঘুরতে লাগল যথাপূর্ব্বং। নূতনত্বের মধ্যে মনে জেগে আছে পাঁচ দিনের স্মৃতি।

অবজ্ঞা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

নমি অবজ্ঞা, তোমারি আদর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে
বনের ফুলকে এমন করিয়া আঁধারে ফুটাবে কে ?
খরদৃষ্টির আলোক রুদ্ধ করি,
তব আলেখ্য লও অলক্ষ্যে গড়ি,
সাগরের তলে মুক্তাকে ভর অতুল মাধুর্য্যে।

২

প্রতিভাকে রাখে কণ্টকে ঘেরি' তোমার আবেষ্টনী
খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, দূরে সরে যায় তুচ্ছ তাহারে গণি'
জানে—ধ্যানী, জ্ঞানী, সাধু শিল্পীর দল—
সব সাধনায় তুমি সেরা সম্বল,
আশীবিষ হয়ে আগুলিয়া রাখো উজ্জল মাণিক্যে।

৩

আনো 'কবীরে'র কুটির-দুয়ারে কামিনী ও কাঞ্চন
কুঞ্চিত নাসা, এসে ফিরে যায় সাবধানী লোকজন।
পরশমণিরে দাও কঙ্করে ঢাকি'
দিতে পথিকের লুব্ধ আঁখিরে ফাঁকি
'ঘৃন্থ' দিয়া রাখো বর্দ্ধনশীল মি ঐশ্বর্য্যেছু।

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

প্রথম রবির উদয়ের ক্ষণে সিঁদুর বরণ পূর্ব্বাচল
তমসা পলায় সুদূর-দিগন্তরে
মণি-মুক্তায় আল্‌পনা আঁকে শিশির-সিক্ত দূর্ব্বাদল
বিহগেরা গায় পুলকিত অন্তরে।

নূতন প্রভাতে বরণ করিতে সাজিছে প্রকৃতি সুন্দরী
ধরণীর বুকে সবুজ আস্তরণ,
মৃদুল পবন পুলকে বহিছে সুবাসিত ফুল-মঞ্জরী
প্রাণ-মাধুর্য্যে করিছে সন্তরণ।

তমোঘন নিশা দু'শো বছরের লাঞ্ছনা ব্যথা রিক্ততার
শত অপমান অধীনতা-শৃঙ্খল—
শতাব্দী ধরি' বেদনার দাহে আঁখিযুগ ক্ষোভে সিক্ত মা'র
পাণ্ডুর গালে তপ্ত নয়ন-জল!

স্বাধীনতা-রবি লোহিত আভায় আঁধারিমা হ'ল খণ্ডিত
শতাব্দীভরা বেদনার অবসান,
গান্ধী-সুভাষ জহরলালের মহিমার রাগে রঞ্জিত
দেশজুড়ে ওঠে স্বাধীনতা-জয়গান!

গৈরিক সাদা-সবুজবক্ষে অশোক-চক্র লাঞ্ছিত
বিজয়-কেতনে শোভিত উর্দ্ধাকাশ
কত দধীচির আত্মাহুতির—কত পূত-স্মৃতিমণ্ডিত
'স্বাধীন ভারতে' জাগিল কি উল্লাস।

সমগ্রতাবাদী বা গেস্টাল্ট্ মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতই সমগ্রতাবাদী (Gestalt) মনোবিজ্ঞানেরও জন্ম হয়েছিল বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে মনোবিজ্ঞানকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল তার বিষয়বস্তু ছিল সচেতন মন বা চেতনা, এবং তার পদ্ধতি ছিল অন্তর্নিরীক্ষণ (Introspection)। আমার মনে যে সচেতন প্রবাহ চলেছে তারই যথাযথ বর্ণনা হ'ল এই পদ্ধতির মূল কথা। মনোবিজ্ঞানী এলেন, এসে আমাকে বিশেষ কোন একটি কাজ দিলেন। সেই কাজের সময়ে আমার মনের যে অবস্থা আমি উপলব্ধি করেছি, বিনা বিশ্লেষণে ও মন্তব্যে তারই যথাযথ বর্ণনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল এই সময়ের মনোবিজ্ঞান। বিস্তৃত বিশ্লেষণ না ক'রে সংক্ষেপে বলতে গেলে উক্ত মনোবিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে এই :—(১) মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হ'ল সচেতন মন ও তার বৃত্তিসমূহ; (২) মনের প্রত্যেক বৃত্তিই কতকগুলি ক্ষুদ্রতর উপাদানের সংযোগে গঠিত। আমাদের প্রত্যয় অনুভূতি ইত্যাদি এক একটি যৌগিক পদার্থ, এবং এদের জানতে হলে বিশ্লেষণ ক'রে ঐ উপাদানগুলিকেই প্রথমে জানতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর নাম হ'ল 'মানসিক রসায়ন আদর্শ' বা 'Mental Chemistry Ideal'। (৩) এর পদ্ধতি হ'ল অন্তর্নিরীক্ষণ। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই মনোবিজ্ঞানের নাম দেওয়া হয় Structural Psychology, বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে অবয়বী মনোবিজ্ঞান। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এর প্রতিবাদ হ'ল, এবং নানা প্রকার গবেষণা ও পরীক্ষার ভিত্তিতে বলা হ'ল যে, প্রথমতঃ মন একটি অবিভাজ্য সক্রিয় পদার্থ, দ্বিতীয়তঃ অন্তর্নিরীক্ষণ দ্বারা শুধু মাত্র চেতনা নিয়েই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না। মনের বাইরে মানুষের কার্য্য সম্পাদনাকেও এর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এই দুই প্রতিবাদ থেকেই জন্ম নিল আধুনিক মনোবিজ্ঞান। কিন্তু এই প্রতিবাদের ব্যাপারে আবার আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনৈক্য দেখা গেল। তাদের প্রতিবাদের ফলে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও ভিত্তি থেকে নূতন নূতন পদ্ধতিরও সৃষ্টি হ'ল সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞান এদের অন্যতম।

সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানের বিদ্রোহ ছিল প্রধানতঃ জার্ম্মান দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক Wundt-এর বিরুদ্ধে। Wundt বলেছিলেন যে, আমাদের অভিজ্ঞতা সৃষ্ট হয় কতকগুলি উপাদান-সংযোগে। আমাদের প্রত্যেকটি ধারণা অনুভূতি সবই ইত্যাদি এক একটি যৌগিক বস্তু। অতএব মনোবিজ্ঞানের কর্ত্তব্য হ'ল এই যৌগিক বস্তুটির উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করা, এবং পরে লক্ষ্য করা যে কি নিয়মে ও কি ভাবে সেই উপাদানগুলি সংযুক্ত হয়েছে। আগে বিশ্লেষণ ও পরে সংযোজন—এই পদ্ধতির দ্বারা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন মূল নীতি আবিষ্কার করাই ছিল Wundt-এর উদ্দেশ্য। এই মনোবিজ্ঞানকে সমগ্রতাবাদ আখ্যা দিলে 'ইট ও চুণ সুরকির মনোবিজ্ঞান'। ('Brick and Mortar Psychology')। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার বিভিন্ন উপাদানগুলি যেন ইট, যাকে চুণ সুরকির দ্বারা একত্রে গ্রথিত করে বিশেষ এক অভিজ্ঞতার সৌধ গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠল চুণ সুরকি সম্বন্ধে। কি সেই 'চুণ সুরকি' যার দ্বারা উপাদানগুলি বিশেষ একটা রূপ নিয়ে গড়ে উঠতে পারে?—এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ঠিক এই সময়েই এল আর একটি জিনিষ। Envenfel ও অন্যান্য কয়েকজন পরীক্ষা করে বললেন যে-কোনও সম্পূর্ণাঙ্গ বস্তুর এমন একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে যা নাকি তার উপাদানসমূহ থেকে পুরোপুরি আলাদা। যে-কোন বস্তুর এই বৈশিষ্ট্যটির নাম এরা দিলেন 'সমগ্রতাধর্ম্ম' (Gestalt quality)। যেমন সঙ্গীতের কোন একটি সুর নির্ভর করে স্বরগ্রামের পর্দ্দার উপর। কিন্তু স্বরগ্রামের পর্দ্দাগুলিকে আলাদা করে নিলে সেই বিশেষ সুরটির কোন চিহ্নই সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেন না ঐ সুরটি নির্ভর করে স্বরগ্রামের বিশেষ গঠনপদ্ধতির উপর। ঐ গঠনটি বদলে দিলে একই স্বরগ্রাম নিয়েও সুরটি বদলে যাবে। অর্থাৎ সঙ্গীতের এমন একটি স্বতন্ত্র রূপ আছে যাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তা হলে সমগ্রতার এই বৈশিষ্ট্য তার উপাদানের চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয়। এই সত্যটির উল্লেখ করে সমগ্রতাবাদীরা বললেন যে, অভিজ্ঞতার উপাদান বিশ্লেষণ করা মনোবিজ্ঞানের কাজ নয়; তার একমাত্র কর্ত্তব্য হ'ল এই সমগ্রতার নিজস্ব কোন নীতি আছে কিনা এবং কেনই বা বিশেষ অবস্থায় সমগ্রতার বিশেষ একটি রূপ দেখা যায়, তারই অনুসন্ধান করা। কেন না Wundt-এর ব্যবহৃত বিশ্লেষণ পদ্ধতি বর্জ্জন করলেও সমগ্রতাবাদীদের মতে মানসিক ঘটনাসমূহেরও একটি নীতি আছে, যার নাম হ'ল 'সমগ্রতা নীতি' ('wholeness law')। এই নীতিতে বলা হ'ল যে, মানুষ যখন কোন উদ্দীপনে সাড়া দেয়, তখন সেই সাড়া বিচ্ছিন্ন ভাবে আসে না; সে হ'ল সমগ্র পরিস্থিতির প্রতি, সমগ্র শরীরী (organism-as-a-whole) থেকে উদ্ভূত একক প্রতিক্রিয়া। যেমন, এক জন

শিক্ষক বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাঁর সামনে যে জিনিষটি রয়েছে তা বিশেষ কোন একটি ছাত্র নয়—সমস্ত ছাত্রসমূহের নির্ব্বিশেষ সংহত একটি রূপ, যার নাম হ'ল ক্লাস। সেই সংহত ও একক পরিস্থিতির একটি বৈশিষ্ট্য আছে, এবং তারই দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষক তাঁর বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই বৈশিষ্ট্যটিকে জানতে হলে যে সুপরিচালিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক গবেষণা আবশ্যক, একথা সমগ্রতাবাদীরা অস্বীকার করেন না। বরং নানা পরীক্ষার ফলেই তাঁরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

১৯১২ সনে এঁদের শীর্ষস্থানীয় Wertheimer একটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করেছিলেন। কোন জিনিষের 'গতি' (motion) সম্বন্ধে আমাদের কি করে প্রত্যয় (perception) জন্মে, এই ছিল তাঁর পরীক্ষার বিষয়। তিনি দেখলেন যে আমরা যখন কোন বস্তুকে গতিশীল দেখি, তখন সেই গতি আমাদের নিকট একটি প্রবহমাণ একক (continuous whole) রূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে, এবং পর পর কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বিন্দুর যোগে গতির যে ধারণা তা ভুল। কোন একজন ধাবমান ব্যক্তিকে হয়তো আমরা দেখছি। সে ক্ষেত্রে ঐ লোকটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ একটি একক গতিই আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। কিন্তু ঐ সময়ে যদি ক্যামেরা দ্বারা ঐ লোকটির পর পর কতকগুলি ফটো নেওয়া যায় তা হলে তার হাত-পা ইত্যাদিকে এমন কতকগুলি অবস্থায় দেখা যাবে যা আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি। অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন অংশগুলিকে অতিক্রম করে গতির একটি নিজস্ব অস্তিত্ব আছে, এবং তাকেই আমরা দেখে থাকি। বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন অংশগুলি এই প্রকারের দেখার জন্য অনাবশ্যক। যে-কোন ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনায় মস্তিষ্কের সাড়া দেওয়াকে যদি বলা যায় সংবেদনা (sensation), তা হলে গতিকেও একটি সংবেদনা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। 'সমগ্রতা'নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে এই ভাবে নানা প্রকার পরীক্ষা করে এরা প্রমাণ করেছেন যে, স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে যে-কোন একটি স্নায়ু বাইরের উদ্দীপনে উত্তেজিত ও সক্রিয় হলেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্নায়ুগুলিও উত্তেজিত ও সক্রিয় হয়ে উঠে একটি মণ্ডলীর সৃষ্টি করে। এখন, কাজ হ'ল প্রধানতঃ এই উদ্দীপনমণ্ডলীকে নিয়ে। বিচ্ছিন্ন ও স্থানীয় একক উদ্দীপন এখানে অর্থহীন। শারীর-বিজ্ঞানের দিক থেকে এ যেমন সত্য, ঠিক তেমনই সত্য এটি মনোবিজ্ঞানের দিক থেকেও। যখন আমরা কোন বস্তুকে দেখি তখন সাধারণতঃ দুটি ব্যাপার ঘটে থাকে। প্রথমতঃ, বস্তুটির আকৃতির একটি ছাপ (image) আমাদের চোখের উপর পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ ছাপটির একটি অর্থ ও তাৎপর্য্য আমরা অনুভব করি। একটি মানুষের ছায়া যখন চোখে পড়ে তখন সে শুধু ছায়াই থাকে; কিন্তু তাকে মানুষ বলে চিনি বা জানি মাত্র তখনই যখন তার সঙ্গে আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক ধারণা আমরা যোগ করে দিই। মনে করা যাক, চোখ খুলেই আমরা দেখছি সাদা একটি পটভূমির উপর কতকগুলি কালো বিন্দু। বিন্দুগুলিকে আমরা বিচ্ছিন্ন ভাবে উপলব্ধি করি না। পরস্পরের মধ্যে বিশেষ একটি যোগসূত্র সমন্বিত বিশেষ একটি সংহত, একক ও অর্থপূর্ণ সমগ্র (coherent whole) রূপে বিন্দুগুলি আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে। সর্ব্বত্র ও সব সময়েই পটভূমির চেয়ে তার উপরকার এই সংহত, সমগ্র রূপটিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন কি মাঝে মাঝে ফাঁক ও বিরতি (gap) বিশিষ্ট যদি কোন একটি আকৃতি (figure) অঙ্কন করা যায়, তা হলেও ঐ ফাঁকগুলিকে উপেক্ষা করেই আমরা আকৃতিটিকে একটি সমগ্ররূপে দেখে থাকি। এর কারণ হ'ল স্নায়ুমণ্ডলী ও মনের 'সমগ্রতা'-নীতি। এই নীতির ফলে সব কিছুরই ফাঁক বা শূন্যতা কিংবা অসম্পূর্ণতাকে তুচ্ছ করা মানুষের একটি বিশেষ প্রবণতা এবং সমগ্রতাবাদীরা মনে করেন যে, এই প্রবণতা মস্তিষ্কের গতিধর্ম্মেরই (dynamics of brain activity) পরিচায়ক। মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যই এই যে কোন অসম্পূর্ণতার মধ্যে সে স্থির থাকতে পারে না। কেননা কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা থাকলেই মস্তিষ্কক্রিয়ার সাম্য নষ্ট হয়ে এক প্রকার চঞ্চলতা জেগে ওঠে, এবং এই অসম্পূর্ণতা দূর হলেই আসে সাম্য ও স্থৈর্য্য।

কোন বিষয়ের প্রত্যয় আমাদের মধ্যে কি ভাবে জন্মে ও প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কি জিনিষ আমরা পাই, সে বিষয়ে সমগ্রতাবাদের মতামত নিয়ে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি। এরই ভিত্তিতে আচরণ সম্বন্ধেও এঁরা যা বলেন তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আচরণবাদীদের উদ্দীপন-সাড়া (stimulus response) মতবাদ এঁরা পছন্দ করেন না। এঁরা বিশ্বাস করেন না যে, কোন আচরণকে শুধুমাত্র উদ্দীপন-সাড়া নীতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। জন্মের মুহূর্ত্ত থেকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রতিক্ষেপ ক্রিয়ার (Reflex action) পুনঃ পুনঃ অনুবৃত্তির ফলে তারাই শেষ পর্য্যন্ত আমাদের আচরণে দাঁড়িয়ে যায়—আচরণবাদীদের একথা এরা অস্বীকার করেন। অতি শৈশব অবস্থায় আমাদের আচরণের শৃঙ্খলা থাকে অপরিণত, এবং ক্রমাগত আবেষ্টনীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে সংবেদক (sensory) ও গতিসঞ্চালক (motor) এই দুই দিক থেকেই সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে সে সমগ্র শারীরিক একক আচরণ হয়ে দাঁড়ায়। আচরণবাদীদের মধ্যে অনেকের ধারণা ছিল যে, আচরণ সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষার জন্য আবেষ্টনীর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোন প্রয়োজনই নেই। অর্থাৎ আবেষ্টনীকে বাদ দিয়েও আচরণের বিচার ও বিশ্লেষণ চলতে পারে। সমগ্রতাবাদ

একথা স্বীকার করল না। সমগ্রতাবাদীরা বললেন যে, আবেষ্টনীর প্রতি প্রাণীর যে গতিসঞ্চালক ক্রিয়া তাকে পরীক্ষা করব অথচ সেই আবেষ্টনী সম্বন্ধে উদাসীন থাকব, এ ধরণের কথা হাস্তকর। সংবেদন ও প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে সেই আবেষ্টনী প্রাণীর কাছে কি ভাবে প্রতিভাত হয়, অন্তত: সেটুকু না জানলে তার কোন আচরণেরই তাৎপর্য্য আমরা উপলব্ধি করতে পারব না। আচরণ অথবা আবেষ্টনী এর কোন একটিকেই অন্যটি থেকে আলাদা করা যায় না—কেননা তাদের মধ্যে বিশেষ যোগাযোগ আছে এবং সেই যোগাযোগ থেকেই জন্ম নেয় প্রাণীর একক আচরণ। এই একক আচরণ গোড়া থেকেই বিশেষ এক উদ্দেশ্ত-অভিমুখী। অবশ্য উদ্দীপন-সাড়ার মধ্যে যে সংযোগ আছে সেকথা এঁরা অস্বীকার করেন না। এঁরা বলেন, শুধুমাত্র সেই সংযোগের সাহায্যেই মানুষের সমস্ত আচরণের ব্যাখ্যা করা যায় না। একটা উদাহরণ দিয়ে এঁদের একজন এই কথাটা চমৎকার বুঝিয়েছেন। ডাক বাক্সে ফেলবার উদ্দেশ্তে একখানি চিঠি পকেটে নিয়ে আমি বেরিয়েছি। আমার সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে আমার চারদিকে। কোন জায়গায় একটি ডাক বাক্স দেখতে পেয়েই তার মধ্যে চিঠিখানা ফেলে দিলাম। এখানে উদ্দীপন হ'ল ডাক বাক্স; আর তার সাড়া হ'ল পকেট থেকে বের করে চিঠিখানা সেই বাক্সে ফেলে দেওয়া। আচরণবাদীদের মতে অভ্যাসের দ্বারা উদ্দীপন-সাড়ার সংযোগ দৃঢ় হয়। আর, এ কথা সত্য হলে বলতে হয় যে, দ্বিতীয় আর একটি ডাক বাক্স দেখলেই আমার হাতখানা আপনা থেকেই পকেটের মধ্যে চলে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না; বরং ও বিষয়ে সাধারণত: আমরা ভুলেই যাই। এই যুক্তি থেকে সমগ্রতাবাদীরা বলেন যে, উদ্দীপন-সাড়া-সংযোগকে আমাদের আচরণের ভিত্তি বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না। বরং বলা যেতে পারে যে, এক প্রকার উত্তেজনা (tension) থেকেই আচরণের জন্ম। মস্তিষ্কের ধর্ম্মই এই যে, তার প্রতিটি ক্রিয়া চলে একটি সম্পূর্ণ বৃত্তের আকারে। চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলে দেওয়াতে সেই বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়ে উত্তেজনার উপশম হয়েছে। এই জিনিষটিকে এরা নাম দিলেন 'শূন্ত স্থান পূরণ'—(closing the gap) নীতি। আমাদের আচরণ ইত্যাদির ধর্ম্মই এই যে, তারা সব সময়েই সম্পূর্ণতাপ্রবণ। অর্থাৎ যে-কোন আচরণই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা সম্পূর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের শান্তি নেই। এই অশান্তির ভাবটাই কর্ম্মের শূন্তস্থান; এবং একেই পূরণ করার দিকে আমাদের স্বাভাবিক ঝোঁক, এবং পূরণ হয়ে গেলে আমরা শান্তি পাই। একদল ছাত্রকে একবার কতকগুলি ছবির নক্সা আঁকতে দেওয়া হয়েছিল। তারা কাজ আরম্ভ করে দিলে, তাদের কাছে গিয়ে তাদের কাজে বাধা দেওয়া হ'ল। পরে সেই সমগ্র দলটির প্রত্যেককেই সে কি কি করেছে তার বিবৃতি দিতে বলা হয়। ফলে দেখা গেল যে, যাদের কাজে বাধা দেওয়া হয়েছিল তারা নিজ নিজ কাজের শতকরা নব্বই ভাগ স্মরণ করতে পারে, অথচ যাদের কোন রকম বাধা দেওয়া হয় নি তারা প্রায় কিছুই মনে করতে পারে না। এর থেকেও 'সমগ্রতা'নীতির সমর্থন পাওয়া যায়। যে-কোন কাজ একবার আরম্ভ হলে তা অসম্পূর্ণ অবস্থায় মাঝখানে থেমে থাকতে পারে না। সে সম্পূর্ণতার দাবি করে। ফলে সৃষ্টি হয় উত্তেজনার—তাকে আমরা ভুলি না। কিন্তু যা শেষ হয়ে গেছে, যার মধ্যে কোন উত্তেজনার অবকাশ নেই, তা আমরা ভুলে যাই।

এই থেকে এসে পড়ে শিক্ষার প্রশ্ন। কোন কাজ আমরা কোন্ নীতি অনুসারে শিখি, এবং তার বৈশিষ্ট্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর এঁরা দিলেন 'সমগ্রতা'নীতির সাহায্যে। এঁদের মতে শিক্ষার প্রথম কথা হ'ল অভিপ্রায় বা লক্ষ্য (goal)। আচরণবাদীদের মতে আমাদের সমস্ত শিক্ষার মূলই হ'ল 'উদ্যম ও ব্যর্থতা' পদ্ধতি (trial and error method)। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা না নিয়ে নিতান্ত আন্দাজের দ্বারা পরিচালিত আমাদের যে-সমস্ত আচরণ দৈবাৎ অভিপ্রেত সফলতা লাভ করতে সমর্থ হয় তারাই টিকে যায় এবং অন্ত সব ব্যর্থ আচরণ আপনা থেকেই অবলুপ্ত হয়ে যায়। এই ভাবেই গড়ে ওঠে আমাদের জীবন। চিন্তা ও যুক্তি-ক্রিয়ার ব্যাখ্যাও এঁরা দিতে চাইলেন এই দিক থেকে। বললেন, মানুষের উপর পারিপার্শ্বিকের প্রভাব যথেষ্ট; এবং এই প্রভাবের প্রতিক্রিয়াও বহুবিধ। আর, এই প্রভাব ও তার প্রতিক্রিয়াকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠে মানুষের চিন্তা ও যুক্তি—অর্থাৎ চিন্তা এবং যুক্তিও একপ্রকার শারীরিক আচরণ। অন্যান্ত দৈহিক আচরণের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, এ দুটো থাকে শরীরের অভ্যন্তরে, এবং এগুলোকে দেখা যায় না। মোটের উপর নিম্ন স্তরের প্রাণী থেকে মানুষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই মূল কথা হ'ল আচরণ—মন ও মানসিক বৃত্তিসমূহের ভিত্তিও এই আচরণের মধ্যেই। বাইরের জগৎ থেকে উদ্দীপন এসে স্নায়ুমণ্ডলীকে উদ্দীপ্ত করে, ফলে প্রাণীসমূহের মধ্যে দেখা দেয় শারীরিক প্রতিক্রিয়া। আচরণবাদীদের মতে, এই উদ্দীপন ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগেই আমাদের সমগ্র ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত। সমগ্রতাবাদীদের মতে শিক্ষার মধ্যে এই প্রকার কোন যান্ত্রিক পদ্ধতি নেই। কেননা আমাদের আচরণ অনুষ্ঠিত হয় কোন এক বিশেষ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। নিম্ন স্তরের প্রাণীর মধ্যে এই লক্ষ্য অনেকটা সরল; মানুষের ক্ষেত্রে তা যেমন বহুমুখী তেমনই জটিল। অবশ্য এর থেকে এ কথা মনে করা সঙ্গত হবে না যে, যে কোন একটি শিক্ষার ব্যাপারে একাধিক লক্ষ্য

থাকে। সমগ্রতাবাদীদের মতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যবস্তুটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। বিশেষ কোন লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে তারই আলোকে সমগ্র পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সামগ্রিক ভাবে শরীরী জীবের যে একক প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ তাকেই এঁরা বলেন শিক্ষা। আর এই শিক্ষার সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি, সমগ্র পারিপার্শ্বিকের ঘটনাসমূহ ও তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ সম্বন্ধে বিশেষ বোধ থেকে জন্মে উপস্থিত পরিস্থিতির সুস্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান। অর্থাৎ উপস্থিত পারিপার্শ্বিক বা পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ ও অর্থ উপলব্ধি করাই হ'ল জ্ঞান, বা অন্তর্দৃষ্টি। সমগ্রতাবাদীরা শিম্পাঞ্জি ইত্যাদি জন্তু নিয়ে পরীক্ষা করে এই অন্তর্দৃষ্টির যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন।

উপরে যে কথা বলা হ'ল তার থেকে বোঝা যাবে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমগ্রতাবাদীরা প্রত্যয়কে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আমরা আগেই দেখেছি, এঁদের মত এই যে, কোন কিছুই আমরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখি না। সবকিছুই আমাদের প্রত্যয়গোচর হয় বিশেষ এক সংহত ও সমগ্র রূপে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রত্যয়ের এই বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। আমার লক্ষ্য এবং বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রয়েছে এক বিচ্ছেদ বা ফাঁক। এই বিচ্ছেদ বা ফাঁক পূরণ করে লক্ষ্য ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ একটি রূপ প্রত্যক্ষ করাই শিক্ষার মূল। মনে করা যাক্ যে 'ক' ও 'খ' দুটি ছোট বাক্স আছে; এবং 'খ'-এর মধ্যে আছে কিছু খাবার। 'ক'-এর রং গাঢ় লাল, ও 'খ'-এর রং ফিকে লাল। একটি বিড়ালকে সেখানে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। কিছুক্ষণ পরে বিড়ালটি যখন জেনে যাবে যে খাবার আছে 'খ'-বাক্সে তখন সে ঐ বাক্সটির আশে পাশেই ঘুরতে থাকবে। এই অবস্থায় বিড়ালটির অনুপস্থিতিতে তার অলক্ষ্যে 'ক'-বাক্সটি সরিয়ে তার জায়গায় আর একটি 'গ'-বাক্স রেখে দেওয়া হ'ল এর রং 'খ'-এর চেয়েও অধিকতর ফিকে লাল। এই বার দেখা গেল যে বিড়ালটি 'খ'-এর কাছে যাচ্ছে না। যাচ্ছে 'গ'-এর কাছে। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে বিশেষ কোন কিছুর সঙ্গে উদ্দীপন-সাড়া-সংযোগ প্রধান নয়; প্রধান হ'ল পরিস্থিতি সম্বন্ধে চেতনা, ও পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধবোধ। এখানে সেই বোধ হচ্ছে—'একটি আর একটির চেয়ে কম লাল' এই প্রত্যয়।

এই জাতীয় নানা যুক্তি ও প্রমাণ সাহায্যে এঁরা দাবি করেন যে, নিম্নস্তরের প্রাণী থেকে মানুষ পর্য্যন্ত—সামাজিক জীবনে অথবা মানসিক জীবনে সর্ব্বত্রই এদের 'সমগ্রতা'নীতি বর্ত্তমান ও কার্য্যকরী। জীবন ও জগতের সত্য পরিচয় পেতে হলে তাকে অধ্যয়ন করতে হবে এই দিক থেকে। সেই জন্যই মনোবিজ্ঞান আলোচনা করতে গিয়ে মানুষের সামাজিক মনোবিজ্ঞানের আলোচনাও আজ অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা মানুষ শুধুই মানুষ নয়, সে সামাজিক মানুষ। অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার বাইরে সমাজ নামে নৈর্ব্যক্তিক বস্তুটির একটি বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র সে, এবং এই বৃহত্তর পটভূমিকা ভিন্ন তাকে সমগ্রভাবে জানা সম্ভব নয়। এই হ'ল সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানের বাস্তব মূল্য।

এক ও একাকী

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

জীবনের যাত্রা যবে সুরু হ'ল প্রথম প্রভাতে
বন্ধুর পথের মাঝে, বন্ধু সবে দেখাইল পথ।
উল্লাসের কলরোলে মনে হ'ল, আনন্দ-সম্পদ
আলোকে পুলকে প্রেমে মেশামেশি দিবসে ও রাতে।
কোথা আজ সাথী যারা! জীবনের দূরগামী রথ
চলিয়াছে ভিন্ন মুখে, রচিতেছে দূর ব্যবধান;
সঙ্গী যারা ক্ষণেকের মৃদু হাসি' কোথা ধাবমান
কেহ নাহি জানে তাহা। প্রসারিত সীমাহীন পথ।

কত কে যে বাসি' ভালো হাতে মোর পরাইল রাখী,
কারা যেন গেয়ে গেল জীবনের হাসি-ভরা গান,
কে যেন পথের প্রান্তে থামিল যে নত করি' আঁখি
সচকিত করি' মোর যৌবনের উচ্ছ্বসিত প্রাণ,
কত পান্থ অবিশ্রান্ত করে কত মান অভিমান,—
সব ভুল, সত্য শুধু—তুমি এক আমিও একাকী।

সংঘাত

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

এমন বিপদেও কি মানুষ পড়ে! অথচ বিয়ের পূর্ব্বে কথাটা একবারও ভেবে দেখা হয় নি। একটা রঙিন স্বপ্ন এবং মধুর কল্পনায় সারা মন আচ্ছন্ন ছিল।...

বর্ত্তমানে বিপত্তি দেখা দিয়েছে আমার পুত্রকন্যাকে নিয়ে। বেবী, বাপ্পার দৌরাত্ম্য আমাকে পাগল করে তুলেছে। কোন দিক দিয়েই আমার কল্পনার জীবনের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। মন বিদ্রোহ করতে চায় কিন্তু এমনি মজা যে, ওরা কাছে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালে বুকটা ভরে ওঠে। গলা জড়িয়ে ধরে গালের উপর গাল রাখলে এক অপূর্ব্ব অনুভূতিতে দু'চোখ বুজে আসে। মুহূর্ত্তে বিশ্বসংসার বড় সুন্দর হয়ে দেখা দেয়।

কাজের জিনিষ কখনও এক স্থানে খুঁজে পাবার জো নেই। কালির দোয়াত, কাগজের প্যাড যখন-তখন অদৃশ্য হচ্ছে। কাগজ দিয়ে তৈরি হয় শ্রীমান্ বাপ্পার নৌকা, আর কালিতে ছোপানো হয় শ্রীমতী বেবীর পুতুলের কাপড়। ব্যাপারটা ধরা পড়ে শ্রীমানের সরোষ গর্জ্জনে। শুধু নৌকায় তার চলবে না—কাপড়গুলোও চাই। কন্যাটির সেইখানেই প্রবল আপত্তি। আর এই নিয়েই ওদের ঝগড়ার সৃষ্টি।

মাথায় একটি চমৎকার প্লট দানা বেঁধে উঠেছিল—ঠিক সময় বুঝেই এই বিঘ্ন। উঠে আসতে হ'ল। বস্তুতঃ এই দুর্দিনের বাজারে এ ক্ষতিকে নিতান্ত অবহেলার যোগ্য মনে হ'ল না। মেয়ের পিঠে খা কয়েক বসিয়ে দিলাম। ছেলের পানে রক্ত চক্ষে তাকালাম। তার মুখে গাম্ভীর্য্য ও মৃদু হাসি যুগপৎ খেলা করে চলেছে। আর সেই সঙ্গে আধ আধ কণ্ঠের আহ্বান। আমার গাম্ভীর্য্য সে বরদাস্ত করতে পারছে না। মেয়েটার চোখ দিয়ে সেই থেকেই জল গড়াচ্ছে। নিজেকে বড় দুর্ব্বল এবং অসহায় মনে হ'ল। এবং শেষ পর্য্যন্ত রাগটা গিয়ে পড়ল স্ত্রীর উপর। অনুযোগ দিয়ে বললাম, তোমার অন্যায় প্রশ্রয় পেয়েই ওরা এমন হয়েছে।

আমার আকস্মিক আক্রমণে স্ত্রী বিস্মিত হলেন, বললেন, অত চেঁচাচ্ছ কেন? হ'ল কি তোমার?

তেমনি উচ্চ কণ্ঠেই জবাব দিলাম, অকারণে চিৎকার করছি না। তোমার ছেলেমেয়েরা আমার দেখছি ঘরছাড়া না করে ছাড়বে না। অসহ্য হয়ে উঠেছে।

স্ত্রী সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, মিথ্যে চেঁচিয়ো না। রাগ করবার অধিকার শুধু তোমার একলারই নেই। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, তেড়ে এসেছ, অথচ ব্যাপারখানা যে কি তা আমি জানিই না।

ঘটনাটি সংক্ষেপে স্ত্রীর কাছে বর্ণনা করে গেলাম। তিনি হেসে উঠে নিতান্ত সহজ কণ্ঠে বললেন, এই কথা! অবুঝ বলেই করেছে। বুঝতে শিখলে আর করবে না।...

তিনি মুহূর্ত্তকাল থেমে পুনরায় বললেন, আচ্ছা দিনে রাতে কতখানি সময় ওদের নিয়ে তোমার কাটাতে হয় শুনি যে, এইটুকুতেই হৈ চৈ সুরু করেছ। সব ছেলে-পিলেরাই এমন করে থাকে; তা বলে তোমার মত এমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড কোথাও চোখে পড়ে না।

স্ত্রী একতরফা রায় দিয়ে খালাস। কিন্তু ওদের ছোট-বড় নানা উপদ্রব যে আমায় দিন দিন কতরকমে অতিষ্ঠ করে তুলেছে এ কথাটা তাকে বোঝাব কেমন করে!

একটা ঠাণ্ডা রকমের জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হতেই পুনশ্চ বাধা পেলাম বেবীর করুণ আর্ত্তনাদে। স্ত্রী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে গেলেন এবং অনতিবিলম্বে আমার পাশে এসে দাঁড়াল অশ্রুকলঙ্কিত মুখে শ্রীমান্ বাপ্পা। চোখে মুখে এক অদ্ভুত অসহায় ভঙ্গী করে সে তার মা এবং দিদির বিরুদ্ধে নালিশ জানালে, বাবা...মা...দিদ্দা...কান্নায় ও ভেঙে পড়েছে। কোলে তুলে নিলাম, কিন্তু কান্নার বেগ তার তাতে আরও সহস্র ধারায় ভেঙে পড়ে।

ওর পিঠে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সান্ত্বনার ছলে বললাম, মা আর দিদি কি করেছে বাপ্পা?...

এ প্রশ্নের উত্তর বাপ্পা দিতে পারে না—শুধু বার বার আমার বুকের মধ্যে মুখ ঘষতে থাকে।

এতক্ষণে স্ত্রীও এসে উপস্থিত হয়েছেন। একবার অপরাধী পুত্রের প্রতি, আর একবার আমার প্রতি দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তিনি অকস্মাৎ জ্বলে উঠলেন, অন্যায় ত শুধু আমিই করি কিন্তু এটা হচ্ছে কি শুনি।

বিস্মিত হলাম। অর্থাৎ?...

স্ত্রী বেবীকে আমার সম্মুখে টেনে এনে তার একখানা হাত চোখের সম্মুখে তুলে ধরে আর একবার গর্জ্জে উঠলেন, চেয়ে দেখ তো কেমন করে দাঁত বসিয়েছে জানোয়ার ছেলে।

দেখেছি...জবাব দিলাম, কিন্তু এর মধ্যে আমাকে টেনে আনা কিসের জন্য?

স্ত্রী তেমনি উচ্চ কণ্ঠে বললেন, নয় কেন? আমি যখন শাসন করছি, তুমি প্রশ্রয় দেবে কেন?...

এতটা হিসেব করে অবশ্য আমি দেখি নি কিন্তু তার জন্য অত রাগ করবারও কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না। তথাপি একবার বাপ্পাকে ধমক দিতে হ'ল। প্রশ্রয় আমি কোনমতেই দিতে পারি না। কিন্তু মন জানে নিজেকে কতবড় ছলনা করলাম।

বাপ্পা এতক্ষণে আমার কোল থেকে নেমে পড়েছে। সে বার কয়েক আমার এবং তার মার মুখের পানে চেয়ে দেখলে, তার দিদির দংশিত হাতখানাও একবার আড়চোখে দেখে নিলে। তারপর পায় পায় বেবীর দিকে এগিয়ে গিয়ে তার একখানি হাত ধরে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। বেবীর মুখে যেন ঈষৎ হাসি ফুটে উঠেছে মনে হ'ল।

স্ত্রী বললেন, শাসন করলে না?

জবাব দিলাম, সে অবকাশ পেলাম কোথায়। যেমন শিক্ষা দিচ্ছ তেমনি তো হবে?

এবারে রাগের পরিবর্ত্তে একটি মধুর কটাক্ষ উপহার দিয়ে তিনি খুশীমনে প্রস্থান করলেন।

বেবী এবং বাপ্পার পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মেয়েটাকে তাড়না করেছি—কথাটা ভুলি নি। মনটা সেই থেকেই বিমর্ষ হয়ে আছে। যত অভিযোগই আমার থাক না কেন, ওদের ছেলেমানুষি যাবে কোথায়। বেবী এসে পিঠ ঘেঁষে দাঁড়াল। আদর করে কাছে ডাকলাম। বাপ্পার তা সহ্য হ'ল না। বেবীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তার স্থান দখল করে নিলে। অথচ ওদের একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনের এক মুহূর্ত্তও চলে না। ছায়ার মত একে অপরকে অনুসরণ করে।

বেবী একটু সরে দাঁড়িয়ে হেসে বললে, জান বাবা, বাপ্পাটা বড্ড হিংসুটে হয়েছে। আমার জলের গ্লাস, খাবার থালা, বসবার আসন সব নিয়ে খালি ঝগড়া করবে। ছেলেমানুষ কিনা বুদ্ধি নেই। কথা বলতে পারে না, আবার নালিশ করা চাই। বলে, মা…দিদা…উম্…। বেবী হেসে গড়িয়ে পড়ল। উম্ কি জান বাবা?

ঘাড় নেড়ে জানালাম, মোটেই নয়—

বাপ্পা নিঃশব্দে আমার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। আলোচনাটা যে তারই সম্বন্ধে হচ্ছে সেটা সে বিলক্ষণ অনুমান করে নিয়েছে। ওর চোখমুখের স্নিগ্ধ লাজুক ভঙ্গীটি তা আমায় জানিয়ে দিলে।

বেবী পাকা বুড়ীর মত পুনরায় হাতমুখ নেড়ে সুরু করলে, উম্ মানে—দিচ্ছে না। বোকা হাবা ছেলে। এত বড়টি হ'ল এখনও কথা বলতে পারে না। জান বাবা, আমি যখন বাপ্পার চেয়েও ছোট ছিলাম তখন থেকেই সব কথা বলতে শিখেছি। সত্যি কথা বাবা…তুমি মাকে জিজ্ঞেস করে দেখো।

বেবীর মুখে খৈ ফুটতে সুরু হয়েছে। বাধা না দিলে কতক্ষণে বিরাম ঘটবে তা একমাত্র অন্তর্যামী জানেন। এই ভয়ে ওকে নিয়ে আমি কোথাও যেতে চাই না। মাঝে মাঝে বড় অপ্রস্তুত হতে হয়।

বেবী একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে আমি হেসে বললাম, জানি বইকি মা, আমিও জানি। তোমার মা আমাকেও বলেছেন।

বেবী মহাখুশী। কিন্তু বাপ্পা বোধ করি, আর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করলে না। সেও মুখ খুললে। শব্দটায় অনাবশ্যক একটা টান দিয়ে দীর্ঘতর করে বাপ্পা বললে, বাব্বা আ…

সে তার কচি হাতে আমার থুতনি স্পর্শ করে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। মুখ ফেরাতেই সে তার নিজের গালে হাত দিয়ে বললে, মা…

বেবী পুনরায় হেসে উঠে বলে, মার নামে নালিশ করা হচ্ছে। গাল টিপে দিয়েছে কিনা। জান বাবা, বাপ্পার একটুও লজ্জা নেই। মা বলছিল আমার হাতে যাচ্ছে করে দিতে আর ও চিমটি কেটে দিলে। কম দুষ্টু মনে করেছ ওকে।

বাপ্পা পুনরায় মুখর হয়ে উঠেছে। এবারে সে তার দিদিকে ইঙ্গিতে দেখাল। ওর ভাষা অস্ফুট বলেই প্রতিবাদটা তেমন সহজবোধ্য হয় না, কিন্তু তাই বলে ওর চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। মনে একটা কৌতূহল দেখা দিলে। দিদির বিরুদ্ধে ওর কিসের নালিশ।

বেবীকে জিজ্ঞেস করি, বাপ্পা কি শুধু শুধুই…কথাটা শেষ করবার আমি অবকাশ পেলাম না। পুনরায় স্ত্রীর আবির্ভাব। আমার মুখের কথাটা এক প্রকার কেড়ে নিয়ে প্রশ্নের জবাবটা তিনিই দিয়ে দিলেন, তোমার মেয়েটিও কিছু কম যান না। জলের ছিটে প্রথমে ওই দেয়—আঁচড়, কামড়টাও তাই ওরই অদৃষ্টে জোটে।

মার অভিযোগে বেবী সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। বাপ্পা আমার পাশ থেকে সরে গিয়ে নির্ব্বিকার মুখে তার মার আঁচল ধরে দাঁড়াল।

স্ত্রী বললেন, ওদের নিয়ে বসে থাকলেই হবে নাকি? বাজার যেতে হবে না?

হেসে উত্তর দিলাম, তোমার হাতে বুঝি আর নূতন কোন কাজ নেই?

স্ত্রী জ্বলে উঠলেন, বাজে কথা বলো না। দিনরাত তুমিই ওদের আগলে থাক কিনা? বলতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত ছিল।

লজ্জা বোধ করি সত্যিই আমার নেই, নইলে হাসি মুখে পুনরায় বলি কেমন করে, কথাটা তুমি যে ভাবেই বলে থাক, নেহাত মিথ্যে বল নি। তোমার সংসারের জোয়াল কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে অনেক কিছুই ছাড়তে হয়েছে।

স্ত্রী রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেললেন। বললেন, এটা একটা খুব দামী কথা নয়। কিন্তু বাজে কথা রেখে সত্যিই এবারে ওঠ। বন্ধুদের খেতে বলেছ সে কথাটাও কি আমায় মনে করিয়ে দিতে হবে?

বললাম ভুলব কেন—কিন্তু সে তো ওবেলা।

স্ত্রী বললেন, তা হলেও বাজারটা এ বেলাই করে রাখতে হবে।

উঠতে হ'ল। এর পরে প্রতিবাদ করা বৃথা।

বাজার করে ফিরে আসতে সর্ব্বপ্রথম দেখা হল বেবীর সঙ্গে। ও বোধ করি আমার অপেক্ষায় সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে আসতে দেখে একটু এগিয়ে গিয়ে বললে, তুমি চলে যেতে একটা ভীষণ ব্যাপার হয়েছে বাবা…বাপ্পা—

কথাটা পুরোপুরি না শুনেই অচমকা চমকে উঠলাম। কোন কারণই হয়ত নেই। তথাপি মাঝে মাঝে এমন হয়। অকারণ আশঙ্কায় ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, কি হয়েছে বাপ্পার?

বেবী আমার প্রশ্নে একটু বিব্রত কণ্ঠে বললে, বা রে—বাপ্পার কিছু হয় নি ত।—

আশ্বস্ত হলাম। বুকের ভিতরটা তখনও কেমন করছিল। কিন্তু হাসিমুখে বেবীকে বললাম—তা হ'লে তোমার ভীষণ ব্যাপারখানা কি মা?

বেবীর মুখেও হাসি দেখা দিয়েছে। বললাম, দাদুর সঙ্গে বাপ্পা আজ ঘুষোঘুষি করেছে।

তেমনি হাসিমুখেই জবাব দিলাম, এই মাত্র?—

বেবী বলে চলল, আর তোমার টেবিলের উপর উঠে একটা বই থেকে দুটো ছবি ছিঁড়েছে। আর তোমার ফাউন্‌টেন্‌ পেনটা জানলা দিয়ে একেবারে রাস্তায়—

বাজার করা আমার মাথায় উঠেছে। কালো বাজারে দ্বিগুণ মূল্যে কলমটি আমার কিনতে হয়েছে। স্ত্রী এসে বেবীকে ধমক দিলেন, একটি মিনিট তোমার সবুর সইল না। একটু থেমে তিনি পুনরায় বললেন, সত্যিই বড় দুরন্ত হয়েছে ছেলেটা। তবু ভাগ্যি কলমটা জখম হয় নি। আর তোমাকেও বলতে হয়, ছেলেপিলের ঘরে কাজের জিনিষ অমন যেখানে সেখানে ফেলে রাখাই বা কেন?

প্রতিবাদ করলাম না। যে আশার-বাণী তিনি শোনালেন এতটা শুনবার ভরসা আমার ছিল না। ঘরে বাইরে স্বাভাবিক জীবন যাপন এমন একটা জটিল সমস্যায় এসে আজ দাঁড়িয়েছে যে ভাল কিছু চিন্তা করতেও যেন ভুলে গেছি। শয়নকক্ষে ফিরে এলাম। বেবীও আমার সঙ্গে এসেছে। বাপ্পা তখন নিরুপদ্রবে ঘুমাচ্ছে। নিষ্কলঙ্ক, শুভ্রসুন্দর একখানি মুখ। দেখে বুঝবার উপায় নেই যে ওর ঐ ক্ষুদ্র মস্তকে এতখানি দুষ্টবুদ্ধির স্থান আছে। অথচ ওর দৌরাত্ম্যে সর্ব্বদা আমাদের ত্রস্ত থাকতে হয়।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম। লেখাটা যদি আজ শেষ করতে পারি। আগামী কাল সাহিত্য-সভায় একটা গল্প পড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। বেবীকে তার মার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অসমাপ্ত লেখার খাতাটা নিয়ে বসলাম। লেখাটা বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছিল। সহসা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে বাধা পেলাম কাপড়ের একপ্রান্তে মৃদু আকর্ষণে। নীরবে চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বাপ্পা। দৃষ্টি-বিনিময় হতেই মৃদুকণ্ঠে ডাকল। এ ডাকের মাধুর্য্যকে অবহেলা করতে পারি না। হাসিমুখে সাড়া দিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলাম। সম্মুখে পড়ে আছে আমার অসমাপ্ত গল্পের খোলা পৃষ্ঠা, কোলের উপর শ্রীমান্ বাপ্পা। এর কোন্‌টা আজ আমার অধিক প্রিয় এটা এক বিরাট সমস্যা আমার কাছে। অনেক ভেবেছি, সমাধান হয় নি। শুধু নিজের অসহায় অবস্থাটাই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাপ্পা আমার হাতের কলমটির প্রতি একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে আমার বুকে মুখ লুকাল। সম্ভবত কিছুক্ষণ পূর্ব্বের অনুষ্ঠিত অপরাধটির কথা তার মনে পড়েছে। মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম—বাপ্পা—

বাপ্পা মুখ তুললে না, কিন্তু ততোধিক মৃদুকণ্ঠে সাড়া দিলে—উঁম্—

ওর মাথায় সস্নেহে হাত রাখলাম।

বেবী পুনরায় এসে দেখা দিয়েছে। দূর থেকেই সে হাঁক দিলে, বাবা জলদি চলো। মা তোমায় এক্ষুণি ডাকছে।

বাপ্পার প্রতি চোখ পড়তেই সে অন্য প্রসঙ্গে এল। বলল, ইস্—বাবার কোলে চড়ে বসা হয়েছে। কলম ফেলে দিয়ে আবার আদর কাড়া হচ্ছে। কম দুষ্টু তুমি হও নি বাপ্পা।

বাপ্পার কোন সাড়াশব্দ নেই। শুধু ওর মুখ ঘষার স্পর্শ বুকের উপর অনুভব করলাম। কিন্তু ওদিকে মনোযোগ দেবার অবসর পেলাম না। বেবী আর এক দফা তাগিদ দিলে।

রাত্রের খাওয়া দাওয়া নিয়েই সম্ভবত কোন আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, নতুবা স্নান-আহারের তাগিদ এটা—কোনটাকেই অবহেলা করা চলে না।

সেদিন আমার ব্যক্তিগত কোন কাজই আর হ'ল না। স্ত্রী রান্নায় ব্যস্ত আছেন। বেবী, বাপ্পার উপর চোখ রাখার ভার দিয়েছেন আমায়। কিন্তু এই দুরূহ কাজের চেয়ে আমাকে রান্নার ভারটা দিলে খুশী হতাম।

স্ত্রী বললেন, শৈলজাবাবু মাছের পাতুরী বেশী পছন্দ করেন বলছিলে না? আর সঞ্জয় বাবু কচি পাঁঠার ঝোল?

হেসে জবাব দিলাম, খবরটা তুমি ঠিকই পেয়েছ।

স্ত্রী পুনশ্চ জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু যোগানন্দ বাবু অথবা পঙ্কজ বাবুর কথা ত কিছু বললে না?

প্রশ্ন করলাম, হঠাৎ এ খবরে তোমার আগ্রহ কেন বল ত?

স্ত্রী বললেন, যাঁরা খাবেন তাঁদের রুচি মত ব্যবস্থা করতে চাই। খেয়ে ওঁরা আনন্দ পেলেই আমাদের তৃপ্তি।

কথাটা তিনি মিথ্যে বলেন নি। বললাম, যোগানন্দ বাবু আর পঙ্কজ বাবু ভাল রান্নার ভক্ত। তা সে যাই হোক।

* * *

আয়োজন শ্রীমতী আজ ভালই করেছেন। ওঁরাও খেয়ে খুশী হয়েছেন। খাওয়ার তদারক করছিল বেবী। আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত সে ঘরের একপাশে ঠায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সকলের খাওয়া নিরীক্ষণ করছিল। শৈলজাবাবু দাঁতের ব্যথায় খেতে একটু অসুবিধা বোধ করছিলেন। বেবীকে তাঁরই সম্বন্ধে বেশী কুতূহলী মনে হ'ল। শঙ্কিত হলাম। হঠাৎ আবার কি প্রশ্ন করে বসে। প্রশ্ন অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত করে নি, কিন্তু সকলের খাওয়ার গতি, স্থিতি এবং ইতি সে বেশ ভাল করেই লক্ষ্য করেছে। টের পেলাম কিছুক্ষণ পরে তার মার কাছে বিশদ বর্ণনা দিতে শুনে।

বেবী তার মাকে বলছিল, জান মা, ঐ যে খুব লম্বা দেখতে, বেশ মিষ্টি করে আস্তে আস্তে কথা বলেন—ঐ যে মস্তবড় গোঁফ যাঁর, তিনি মাছের পাতুরী খেলেন সবার শেষে, তিনি আবার একগালে খাচ্ছিলেন মা।...

একটু থেমে খানিক দম নিয়ে পুনরায় বললে, কেউ কিছু ফেলে দেয় নি মা। বাবাকে বলে, চমৎকার হয়েছে সব কটি রান্না।

লক্ষ্য করলাম স্ত্রীর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বেবীকে ধমক দিতে গিয়েও তাই আত্মসম্বরণ করতে হ'ল আর একখানি আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে।

স্ত্রী বললেন, ভদ্রলোক দাঁতের ব্যথায় ভাল করে খেতে পারেন নি—আর একদিন ভাল করে ব্যবস্থা কর।

হেসে জবাব দিলাম, এ কি তাদের প্রশংসাপত্রের প্রত্যুত্তর নাকি?

স্ত্রী বললেন, তা যাই তুমি বলনা কেন, মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, খেয়ে যাঁরা তৃপ্ত হন তাদের খাইয়ে আনন্দ পাওয়া যায়।

এই স্পষ্ট স্বীকৃতির পরে আর বলবার কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু আমার পাকা মেয়ে বেবীটাকে নিয়ে আমি কি করি বুঝে উঠতে পারছি না। ওর এই তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং বিশদ বর্ণনা সেদিন আমায় রীতিমত বিব্রত করে তুলেছিল। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা একটা সহজ পরিহাসের রূপ নিয়ে পরিসমাপ্ত হয়েছিল।

আর ছেলেটার কথা? সে আর কত বলব। মোট কথা একটি আস্ত খুদে শয়তান। কি যে ও বোঝে আর কি যে বোঝে না তা আজও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। শুধু মাঝে মাঝে ডাক ছেড়ে বলতে ইচ্ছে হয়, আর পারি না, আর পারি না।

জীবনের প্রতিটি ধাপে ওরা যদি এমনি করে বিভ্রাট বাধিয়ে তোলে তা হলে আমি যাই কোথা। আমার স্নান-আহার থেকে আরম্ভ করে আপিস যাওয়া পর্য্যন্ত নিরুপদ্রব নির্ব্বিঘ্নে ঘটে ওঠে না। স্নানাহার পর্য্যন্ত কোন রকমে মানিয়ে নেওয়া চলে কিন্তু কাঁধে করে আপিস নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ঘরে ফিরে এসেও এক মুহূর্ত্ত নিরিবিলি থাকবার উপায় নেই। রাস্তা থেকেই পিছু নেবে। অথচ আমার দুঃখের কথা কাউকে বলবার উপায় নেই। সাহিত্যচর্চ্চা মাথায় উঠেছে।

স্ত্রীকে বললে, তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। বলেন, এদের চেয়ে তোমার সাহিত্য-চর্চ্চাটা বড় হ'ল বুঝি? যাই বল, তোমার বিয়ে করা উচিত হয় নি।

কোনটা বড়, আর কোনটা ছোট তার বিচার আমি করছি না। কিন্তু এরই নাম যদি সংসারধর্ম্ম হয় তবে এ ধর্ম্মকৃত্য আমার না করাই উচিত ছিল। অষ্টপ্রহর শুধু একই চিন্তায় বেতালা পাক খাচ্ছি। এক দিকে স্নেহ, অপর দিকে প্রতিষ্ঠা—দু'দিক থেকে আমাকে নিরন্তর টানছে। জীবনের ঘোরতর বিপর্য্যয়ে আমি দিশেহারা হয়ে গেছি।

* * *

সংসারের এই বহুমুখী পরিবর্ত্তন, তার সুখ, তার দুঃখ, কলহ-মীমাংসা, শিশুর কলহাস্য, তাদের দৌরাত্ম্য এর কোন কিছুকেই উপেক্ষা করা চলে না। বরং এর ব্যতিক্রমটাই অস্বাভাবিক। মানুষের মনের এটাই যে গোপন শাশ্বত কামনা, জীবনধারণের অপরিহার্য্য অঙ্গ তা টের পেলাম দিন কয়েক পরে।

আপিস থেকে ফিরে এসে কড়া নাড়তে ভৃত্য দরজা খুলে দিলে। একটু বিস্মিত হলাম। এ কাজটি বেবীই নিয়মিত করে থাকে। কোন দিন কোন কারণেই এর ব্যতিক্রম হয় নি। বুকের মধ্যে কেমন উদ্বেগ বোধ করলাম, অথচ ভরসা করে ভৃত্য কেষ্টকেও কোন কথা জিজ্ঞেস না করে নিঃশব্দে অগ্রসর হয়ে চললাম। সিঁড়ির মুখেও আর একখানি কচি মুখের সাদর আহ্বান কানে এল না। একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমায় ক্ষণকালের জন্য অচল করে রাখলে। কিন্তু পরক্ষণেই অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে নিজের ঘরে এসে উপস্থিত হলাম। সেখানেও এক অখণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করছে। বেবী একবার চোখ তুলে আমার প্রতি চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। কথা বলতেও সে আজ ভুলে গেছে যেন। স্ত্রী বাপ্পার মাথায় আইস-ব্যাগ ধরে একাগ্র দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে আছেন। একটি বেলার ব্যবধানে আমার নিজের সংসারকেও আর চিনবার উপায় নেই। সব ওলটপালট হয়ে গেছে। সারাদিন পরিশ্রম করে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের আনন্দ আমার এক মুহূর্ত্তে বিলীন হয়ে গেল। কোথা থেকে যেন দুখানি অদৃশ্য

হাত এসে সবলে আমার কণ্ঠ চেপে ধরেছে। একসঙ্গে অনেক কথা চিন্তা করতে গিয়ে বড় অবসন্ন বোধ করলাম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কি এমন হতে পারে ছেলেটার! বসে বসে আকাশপাতাল ভাবছি। স্ত্রী এসে নিঃশব্দে পাশে দাঁড়ালেন। বললেন, একবার ডাক্তারবাবুর কাছে তাড়াতাড়ি যাও। জ্বরটা আবার বেড়ে চলেছে।—আমি প্রশ্ন করতে গেলাম। স্ত্রী বাধা দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন, ডাক্তারের কাছে শুনে নিও। এখন এক মুহূর্ত্ত নষ্ট করো না। যাও।

উঠে দাঁড়ালাম। চোখের সামনে কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকছে। কোন কথাই ওরা বলছে না। আশঙ্কা তাই আরও দুর্ব্বার হয়ে উঠেছে।

ডাক্তার এলেন, চলে গেলেন মৌনগম্ভীর মুখে। ব্যবস্থা-পত্রের ত্রুটি করেন নি অবশ্য। স্ত্রীর আজ আর এক মূর্ত্তি চোখে পড়ল। মমতাময়ী ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। ঘড়ির কাঁটায় তাঁর সজাগ দৃষ্টি।

আমার কিন্তু সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।...কোন কাজেই সাহায্য করতে পারছি নে। মন বলে তাতে কাজের চেয়ে অকাজই করে ফেলব। শুধু অদূরে নিঃশব্দে বসে আছি।

বাপ্পা তার দিদির বিরুদ্ধে সারা দিনের অভিযোগগুলি নিয়ে আমার কাছে এসে উপস্থিত হয় নি। বেবীও তার পাল্টা জবাব দেবার জন্ত ছুটে আসে নি। খাটের উপর আমাকে ওরা সম্পূর্ণ একলা থাকবার অবকাশ দিয়েছে। কতদিন মনে মনে নিরুপদ্রব একাকিত্ব কামনা করেছি—আমার রচনা-চর্চ্চায় ব্যাঘাত করার তাড়না করেছি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আগাগোড়া নিজেকেই আমি ঠকিয়ে এসেছি, নইলে এই মুহূর্ত্তে ঐ শিশুকণ্ঠের কলহাস্য, নিঃসঙ্কোচ দৌরাত্ম্য, প্রতি কাজে পায় পায় ঘুরে বেড়ানোকেই আমার সমগ্র সত্তা এমন একান্তভাবে কামনা করছে কেন? অসহ্য হয়ে উঠেছে এই হিমশীতল স্তব্ধতা। এর মধ্যে প্রাণ কোথায়! বেঁচে থাকবার সঞ্জীবনীসুধা কোথায়!

বাপ্পার মুখের প্রতি একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। যদি এই মুহূর্ত্তে একবার চোখ খুলে তাকায়! ওর মুখে যদি তেমনি মিষ্টি এক টুকরো হাসি ফুটে ওঠে, আর সেই সঙ্গে একটি অতিপরিচিত আহ্বান!...

শিশুকণ্ঠের ডাক শুনবার জন্তে অন্তরাত্মা আমার উন্মুখ হয়ে উঠল। কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। শুধু দেয়াল-ঘ রাত দশটার সঙ্কেত জানালে।

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

ক্যানাডা

৮ই জানুয়ারী বুধবার নিউইয়র্ক ত্যাগ করিব। প্রত্যুষে প্রস্তুত হইয়া নীচে আসিয়া হোটেলের পাওনা চুকাইতেছি এমন সময় ওয়েবষ্টার আসিয়া বলিল, তাহার যাওয়া হইবে না। রাত্রে তাহাকে যে প্রতিলিখনের কাজ দিয়াছিলাম তাহা সে স্বীয় কক্ষে বসিয়া টাইপ করিয়া ভোজনের পর আমাকে দিয়া গিয়াছিল। তারপর তাহার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। সে বলিল, "আপনাকে কাগজগুলি দিয়া ঘরে ফিরিয়া দেখি টাইপ-রাইটার যন্ত্রটি নাই। ম্যানেজারকে ফোনে জানাইলাম। ম্যানেজার যন্ত্রহস্তে নিষ্ক্রমণকারী চোরকে ধরিয়া পুলিশে দিলেন। যন্ত্রটি পুলিশের কাছে আছে। বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বে পাওয়া যাইবে না। পুলিশের আদেশে আমাকে অদ্য তাহাদের আপিসে যাইতে হইবে। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া বৈকালের ট্রেনে রওনা হইব।" ওয়েবষ্টার বিমানের নগর-কার্য্যালয় পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে গেল এবং আমাকে বিমানঘাটি-গামী বাসে উঠাইয়া দিয়া হোটেলে ফিরিল।

লাগার্ডিয়া বিমানঘাটী হইতে সকাল ৯টায় বিমান উড়িল। নিউইয়র্ক শহরের উপর দিয়া উড়িয়াছি।

আকাশ হইতে নিউইয়র্ক শহরের একটি বিশেষ রূপ দৃষ্ট হয়। ২৫।৩০ তালা বাড়ীর পঙ্‌ক্তি। মাঝে মাঝে এক একটি বাড়ী যেন আকাশ ছুঁইবার জন্ত সহসা উঠিয়া পড়িয়াছে। শহরকে পিছনে ফেলিয়া দ্রুতবেগে ছুটিয়াছি। পরিষ্কার দিন। সুন্দর রৌদ্র উঠিয়াছে। নীচে দিগন্তবিস্তৃত বরফ রাশি তাপহীন উজ্জ্বল দিবালোকে রজত-সিকতার মত জ্বলিতেছে। মাঝে মাঝে হ্রদ। হ্রদের জল বরফ হইয়া গিয়া রূপার মত শোভা পাইতেছে। মাঝে মাঝে হিমকণা-স্তূপ বালিয়াড়ির মত দাঁড়াইয়া রজতগিরির মত মনোজ্ঞ দেখাইতেছে। আকাশ হইতে দেশের এই অদ্ভুত রূপ বড়ই অপরূপ মনে হইতেছে। কৈলাসবিহারী মহাদেব যেন বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে ধ্যানমগ্ন। আবনি, প্লাটসবার্গ ও রাসেলা নামক তিনটি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া দুপুরে অটোয়ার বিমান ঘাটিতে নামিলাম। নিউইয়র্ক হইতে আকাশপথে অটোয়ার দূরত্ব ৩৯৮ মাইল। বিমানঘাটি হইতে অটোয়া

নগরী বশ মাইল। হোটেলে যখন পৌঁছিলাম তখন একটা পনর মিনিট।

হোটেলটির নাম লর্ড এলগিন হোটেল। এলগিন ষ্ট্রীটের উপর অবস্থিত। নূতন হোটেল। খুব বড়। বন্দোবস্ত সবই মার্কিনী ধরণের। অদূরেই অটোয়া নদীতীরে পার্লামেণ্ট ভবন ও তাহার দুই পার্শ্বে সরকারী মূল আপিসগুলি অবস্থিত।

অটোয়া নগরী অটোয়া নদীর দক্ষিণ তীরে। নদীটি কিবিক ও অণ্টেরিও প্রদেশদ্বয়ের সীমানা নির্দ্দেশ করিতেছে। অটোয়া নগরী অণ্টেরিও প্রদেশে। নদীর ওপারে হাল নগরী কিবেক প্রদেশে।

নদীতীরবর্ত্তী একটি টিলা বা ছোট পাহাড় নদীগর্ভে খানিকটা আগাইয়া গিয়াছে। এই টিলার উপর পার্লামেণ্ট ভবন। তাহার দুই হাতলে দুইটি বড় বড় বাড়ী। এই বাড়ী দুইটির মধ্যে সরকারী মূল আপিসগুলি অবস্থিত। বাড়ী দুইটি ঈষ্ট ব্লক ও ওয়েষ্ট ব্লক নামে পরিচিত। টিলাটির উপর হইতে অটোয়া নদীর এবং ওপারের হাল সহরের দৃশ্য পরম মনোজ্ঞ। পার্লামেণ্ট ভবনটি সুদৃশ্য, নিপুণ স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। ছাতের উপর উঁচুনীচু সুন্দর চূড়াশ্রেণী। ঘড়ির চূড়াটি সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

পার্লামেণ্ট পাহাড়ের পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া রিডো ক্যানাল অটোয়া নদী হইতে নির্গত হইয়াছে। খালের মুখে বিরাট লৌহ-দরজা। ইহাদ্বারা জলের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। খালটি অটোয়া নগরীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বহুদূরে অণ্টেরিও হ্রদে মিলিত হইয়াছে।

পার্লামেণ্ট ভবনের নিকটে খালের ওপারে রেল-কোম্পানী পরিচালিত বিখ্যাত 'শাটো লড়িয়ে' নামক সুদৃশ্য হোটেল। তাহারই সম্মুখে রেল-ষ্টেশন।

অটোয়া ছোট শহর। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস অনুসারে এখানে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৫১ জন লোকের বাস।

সমগ্র ক্যানাডার রাজধানী হিসাবেই এই শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া ইহার বিশেষ গুরুত্ব নাই।

নগরটি মার্কিনী পদ্ধতিতে সমান ও সমান্তরাল পথশ্রেণীদ্বারা পরিশোভিত। কিন্তু রাস্তাগুলির নাম বিলিতী রীতিতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নামানুসারেই হইয়াছে। এখানে ইংরেজী ভাষায় মার্কিনী ইডিয়ম ব্যবহৃত হয়। বানান বিলিতী, কিন্তু উচ্চারণ মার্কিনী। ইহারা ট্রামকে ষ্ট্রীটকার, লিফ্‌টকে এলিভেটর এবং ফুটপাথকে সাইড ওয়াক্‌ বলে। ইহাদের জীবনযাত্রার মান মার্কিনী মান অপেক্ষা কিছু নীচু, কিন্তু প্রণালীটি সম্পূর্ণ মার্কিনী। ইহাদের খাদ্যতালিকা ও রন্ধনপ্রণালী সম্পূর্ণ মার্কিনী। হোটেলে আমেরিকার মতই রকমারি খাদ্য দেখিয়াছি। তবে মূল্য নিয়ন্ত্রিত বলিয়া আমেরিকা অপেক্ষা কম—মাত্র খানা তিন পদে সীমাবদ্ধ। প্রতি পদের পরিমাণ আমেরিকা হইতে কম। ক্ষীর-সংযোগে তাপে সিদ্ধ বৃহদাকার এক একটি আপেল এখানকার একটি উপাদেয় খাদ্য। কোন কোন ফলের রস এখানে আমেরিকার চেয়েও স্বাদুতর। মাছের স্বাদ বাংলার মাছের মত না হইলেও আমেরিকার মাছ হইতে ভাল বলিয়া মনে হইত।

এখানকার শাসনব্যবস্থা মার্কিন-প্রথায় চলিলেও, শাসন-যন্ত্রের কাঠামো বিলাতী পদ্ধতিতে প্রস্তুত। ইংলণ্ডের রাজার নামে সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। বিলাতী পার্লামেণ্টের যাবতীয় নীতি ও পদ্ধতি ইহারা নিজেদের পার্লামেণ্টে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুকরণ করে। আমেরিকায় দেখিয়াছি ইংলণ্ডের নজির কেহ জানেও না, স্মরণও করে না। এখানে সমস্ত আলোচনায় ইংলণ্ডের নজির প্রথমে উত্থাপিত হয়। বিলাতী সভ্যতার সঙ্গে নিজেদের যোগ রাখিবার জন্য ইহারা সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন। পাছে ধনী ও শক্তিশালী আমেরিকার চাপে ইহারা একেবারে মার্কিন বনিয়া যায় এ ভয় ইহাদের মনে সতত জাগরূক। ইংলণ্ডকে ইহারা মুক্তহস্তে সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু ইংলণ্ডের এতটুকু হস্তক্ষেপও ইহারা সহ্য করিবে না।

গত যুদ্ধের পর ক্যানাডার এক নবজাগরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ব্রিটিশ জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ক্রমবর্দ্ধমান ক্যানাডা অদূরভবিষ্যতে সাম্রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হইবে ইহা অনেকেই মনে করিতেছে। সেজন্য ক্যানাডা আজ চাহিতেছে স্বতন্ত্র নাগরিক অধিকার, স্বতন্ত্র জাতীয় সঙ্গীত। সাম্রাজ্যের নাগরিকত্ব বজায় রাখিয়াও সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির স্বতন্ত্র নাগরিক অধিকারের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তজ্জন্য লণ্ডনে এক সম্মেলন হইয়া গেল। ক্যানাডার স্বতন্ত্র জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার জন্য স্থানীয় পার্লামেণ্টে একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে।

প্রতিবেশী আমেরিকার অনতিক্রমণীয় প্রভাব, ইংলণ্ডের সভ্যতার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ এবং নবজাগ্রত আত্মপ্রত্যয় ও স্বাতন্ত্র্যবোধ—এই ত্রিধারায় সংমিশ্রণ আজ ক্যানাডার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। ক্যানাডার জীবন-নদী আজ এই তিনটি ধারায় পরিপুষ্ট হইতেছে।

ক্যানাডায় অপর একটি লক্ষণীয় বিষয় ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা এবং কৃষ্টির যুগপৎ সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা। ফরাসী ভাষা ও সংস্কৃতি কিবেক প্রদেশেই সীমাবদ্ধ। সেখানকার সরকারী কার্য্য ও শিক্ষা ফরাসী ভাষায় চলে। স্থানীয় অধিবাসি-গণের ধর্ম্ম ও ব্যক্তিগত আইন ফরাসী কৃষ্টিকে অনুসরণ করে। অন্য সমস্ত প্রদেশে ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী কৃষ্টি অনুসৃত

হয়। অটোয়া মিউনিসিপ্যালিটির কাজ চলে ইংরেজী ভাষায়। নদীর ওপারে হাল শহরে মিউনিসিপ্যালিটির কাজ চলে ফরাসী ভাষায়। জাতীয় পার্লামেণ্টে উভয় ভাষাই চলে। প্রত্যেকটি আইন দুই ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। পর্য্যায়ক্রমে ইংরেজী ভাষাভাষী ও ফরাসী ভাষাভাষী স্পীকার নির্ব্বাচিত হন। সরকারী দপ্তর হইতে প্রেসনোটগুলি উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। ষ্টেনোগ্রাফার বা প্রতিলেখকগণের উভয় ভাষায় দক্ষতা প্রয়োজন। প্রতিযোগিতায় ফরাসী ভাষাভাষিগণ স্পষ্টতঃই পিছাইয়া পড়িতেছেন। কিবেক প্রদেশের বাহিরে তাহাদের কোন প্রভাব নাই।

ওকালতি, ডাক্তারী প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফরাসী ভাষাভাষিগণের বিশেষ খ্যাতি থাকিলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজী ভাষাভাষিগণই দ্রুত আগাইয়া যাইতেছেন। কিবেক প্রদেশেও বড় বড় ব্যবসাক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষাভাষিগণেরই অনেক বিষয়ে প্রাধান্য। সেখানকার ফরাসী ভাষাভাষিগণের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজী শেখেন। ফরাসী ভাষাভাষিগণ তাঁহাদের ভাষা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ। তাঁহাদের শিক্ষাব্যবস্থা, ধর্ম্ম এবং ব্যক্তিগত আইন বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ ব্যগ্র। অনেকের মতে এবিষয়ে অতিব্যগ্রতাই ফরাসী ভাষাভাষিগণের পিছাইয়া পড়িবার কারণ। ফ্রান্সের ফরাসীগণ সপ্তদশ শতাব্দীর পর দ্রুত আগাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে যাঁহারা সুদূর ক্যানাডায় আসিলেন তাঁহারা যে কৃষ্টিকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন তাহাকে এত দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া রহিলেন যে তাঁহাদের অগ্রগতি অসম্ভব হইয়া পড়িল।

ক্যানাডা আয়তনে ৩৬,৯০,৪১০ বর্গমাইল; অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রায় আড়াই গুণ। ক্যানাডার জনসংখ্যা ১ কোটি ২১ লক্ষ অর্থাৎ ভারতবর্ষের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাগের এক ভাগ। দেশের উত্তরাংশ জনশূন্য বলিলেই হয়। জনবসতি মার্কিন সীমান্তের কয়েক মাইলের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। শ্বেতকায় জাতি আটলাণ্টিক হইতে সেণ্ট লরেন্স নদী দিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিয়াছে। বিরাট্ হ্রদমালা অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে বসতি বিস্তার করিয়াছে। উত্তরাংশে এখনও শুধু আদিম অধিবাসিগণের বাস বলিলেই চলে। নয়টি প্রদেশ এবং দুইটি টেরিটরি লইয়া ক্যানাডা দেশ। ইহাদের আয়তন ও জনসংখ্যা এইরূপ:

প্রদেশ বা টেরিটরির নাম	ভূমি ভাগের আয়তন (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা	প্রতি বর্গমাইলে জনবসতির গাঢ়তা
প্রিন্স এডোয়ার্ড দ্বীপ	২,১৮৪	৯৫,০৪৭	৪৩'৫২
নোভা স্কটিয়া	২০,৭৪৩	৫,৭৭,৯৬২	২৭'৮৬
নিউ ব্রান্সউইক	২৭,৪৭৩	৪,৫৭,৪০১	১৬'৬৫
কিবেক	৫,২৩,৮৬০	৩৩,৩১,৮৮২	৬'৩৬
অণ্টেরিও	৩,৬৩,২৮২	৩৭,৮৭,৬৫৫	১০'৪৩
মনিটোবা	২,১৯,৭২৩	৭,২৯,৭৪৪	৩'৩২
সাস কাচেওয়ান	২,৩৭,৯৭৫	৮,৯৫,৯৯২	৩'৭৭
আলবার্টা	৩,৪৮,৮০০	৭,৯৬,১৬৯	৩'২০
ব্রিটিশ কলম্বিয়া	৩,৫৯,২৭৯	৮,১৭,৮৬১	২'২৮
প্রাদেশিক মোট	২০,০৩,৩১৯	১,১৪,৮৯,৭১৩	৫'৭৪
ইয়ুকন টেরিটরি	২,০৫,৩৪৬	৪,৯১৪	০'০২
উত্তর-পশ্চিম "	১২,৫৩,৪৩৮	১২,০২৮	০'০১
সমগ্র ক্যানাডা	৩৪,৬২,১০৩	১,১৫,০৬,৬৫৫	৩'৩২

জনসংখ্যার শতকরা ৫৪'৩৪ ভাগ শহরবাসী। ক্যানাডার সর্ব্বাপেক্ষা বড় শহর মন্ট্রিয়লে ৯ লক্ষ লোকের বাস। দ্বিতীয় শহর টরণ্টোতে সাড়ে ৬ লক্ষের কিঞ্চিদধিক লোক বাস করে। ইহাদের পরেই ভ্যানকুবার শহর। সেখানকার অধিবাসীর সংখ্যা পৌনে তিন লক্ষ। লক্ষাধিক লোকযুক্ত আরও ৫টি শহর আছে; যথা উইনিপেগ, হ্যামিলটন, অটোয়া, কিবেক ও উইণ্ডসর। উইনিপেগ মনিটোবা প্রদেশে কিবেক, কিবেক প্রদেশে এবং অপর তিনটি অণ্টেরিও প্রদেশে অবস্থিত। এই সমস্ত জনসংখ্যা ১৯৪১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী। বর্ত্তমানে সবগুলি শহরের জনসংখ্যাই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ক্যানাডায় আদিম অধিবাসিগণ জনসংখ্যার মাত্র ১'২৮ শতাংশ, এশিয়াটিক জাতি '৬৪ শতাংশ। বাকী ইউরোপীয় জাতি। তন্মধ্যে ব্রিটিশ বংশীয়গণের অনুপাত ৪৯'৬৮ শতাংশ এবং ফরাসী বংশীয়গণের অনুপাত ৩০'২৭ শতাংশ। ইহার পরেই জার্ম্মান বংশীয়গণের স্থান, ইহাদের অনুপাত মাত্র ৪'০৪ শতাংশ।

গত যুদ্ধে ক্যানাডায় উৎপাদন দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৯ সনে দেশের উৎপাদনের গ্রস মূল্য ও নীট মূল্য যথাক্রমে—৫৬৩,০৪,৭৬,৭৪২ ডলার ও ৩১৪,৯১,৭২,৯১৩ ডলার ছিল। ১৯৪৩-এ উৎপাদনের গ্রস ও নীট মূল্য দাঁড়ায় ১২০২,৩৯,৫২,৫০১ ও ৬৩২, ৫৪,৫৮,৩৩৭ ডলার।

নীট মূল্যের ৩৯'২৩ শতাংশ ছিল কৃষি, বন, মৎস্য, খনিজ প্রভৃতি প্রাথমিক উৎপাদন এবং ৬৭'২৭ শতাংশ ছিল শিল্প প্রভৃতি মাধ্যমিক উৎপাদন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন প্রদেশের উৎপাদনের নীট মূল্যের অনুপাত ছিল এইরূপ:—

অণ্টেরিও	৪১'৪৫ শতাংশ
কিবেক	২৯'২২ "
ব্রিটিশ কলম্বিয়া	৮'৯৩ "

সাস কাচেওয়ান	৫·২৭ শতাংশ
আলবার্টা	৫·০৮ „
মনিটোবা	৪·৫২ „
নোভা স্কটিয়া	২·৯৭ „
নিউ ব্রান্সউইক	২·১২ „
প্রিন্স এডোয়ার্ড দ্বীপ	০ ৩২ „
ইয়কন ও উত্তর-পশ্চিম টেরিটরি	০·১২ „
	১০০·০০

ক্যানাডার বহির্বাণিজ্যে তাহার কৃষিজাত, জান্তব, বনজ এবং খনিজ দ্রব্যেরই প্রাধান্য। গম, বার্লি ও ওট প্রভৃতি কৃষিজাত বস্তু, মাংস, ডিম, মৎস্য, চিজ ফার ও দুগ্ধ প্রভৃতি জান্তব বস্তু; কাঠ, এস্‌বেষ্টস্‌, কাগজ ও কাগজের পাল্‌প্‌ প্রভৃতি বনজ বস্তু, নিকেল, এলুমিনিয়ম, তামা ও জিঙ্ক প্রভৃতি খনিজ বস্তু প্রভূত পরিমাণে এদেশ হইতে বিদেশে চালান যায়। যুদ্ধের সময় এই সমস্ত বস্তুর বাহিরের চাহিদা খুব বাড়িয়া যায়। অধিকন্তু অনেক যুদ্ধসরঞ্জামের কারখানা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে যুদ্ধকালে ইহাদের রপ্তানি পরিমাণে দ্বিগুণ এবং মূল্যে তিন গুণ বাড়িয়া যায়। আমেরিকার মত ইহাদেরও আমদানী অপেক্ষা রপ্তানি অনেক বেশী। ফলে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধোত্তর কালে ধারে মালসরবরাহ করিবার নানারূপ বন্দোবস্ত ইহাদিগকে করিতে হইয়াছে।

ইহাদের বহির্বাণিজ্যে আমেরিকার স্থান সর্ব্বোচ্চে। তার পরই ইংলণ্ডের স্থান। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা ইহাদের সমগ্র রপ্তানিদ্রব্যের ৭৫·৮ শতাংশ ক্রয় করিয়াছে এবং ইহারা নিজেদের সমগ্র আমদানীর ৩৭·২ শতাংশ আমেরিকার নিকট হইতে পাইয়াছে। ঐ বৎসর ইহারা ইংলণ্ডের নিকট হইতে পাইয়াছে নিজেদের সমগ্র আমদানীর ৮·৯ শতাংশ এবং ইংলণ্ডকে সরবরাহ করিয়াছে সমগ্র রপ্তানির ২৯·৯ শতাংশ। ফার, ইণ্ডিয়ান ও এস্কিমো লইয়াই তুষারময় উত্তর ক্যানাডা। দক্ষিণ ক্যানাডার প্রদেশগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়। আটলান্টিক তীরবর্ত্তী অঞ্চল, মধ্য ক্যানাডা, প্রিয়ারী অঞ্চল এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল।

নোভাস্কটিয়া, নিউব্রান্সউইক ও প্রিন্স এডোয়ার্ড দ্বীপ আটলান্টিকের তীরবর্ত্তী। নোভাস্কটিয়া কয়লা, আপেল ও মাছের জন্য বিখ্যাত। হ্যালিফ্যাক্স ইহার প্রধান বন্দর। নিউব্রান্সইক বনসম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে অনেক পাল্‌প তৈরির কারখানা আছে। চাষ ও পশু-পালন ক্ষুদ্র প্রিন্স এডোয়ার্ড দ্বীপের বড় ব্যবসা। ফারের জন্য শৃগাল পালনের একটি সুবৃহৎ ফার্ম্ম এই দ্বীপে অবস্থিত। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করিল তখন আমেরিকার অনেক 'রাজভক্ত' নাগরিক আমেরিকার সংস্রব ত্যাগ করিয়া নোভাস্কটিয়া ও নিউব্রান্সউইকে বসতি স্থাপন করেন।

সেণ্ট লরেন্স উপত্যকার কিবেক ও অণ্টেরিয়ো প্রদেশ লইয়া মধ্য-ক্যানাডা। শিল্পে ও বাণিজ্যে এই দুইটি প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী। অণ্টেরিওর খনিজসম্পদ প্রসিদ্ধ। মধ্য-ক্যানাডাই পূর্ব্বে ক্যানাডা নামে পরিচিত ছিল। এইখানেই ইংরজ-ফরাসী প্রতিযোগিতা এক সময় তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। এখান হইতেই ইংরেজী ভাষাভাষিগণ ক্রমশঃ প্রিয়ারি অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। মনিটোবা, সাসকাচেওয়ান ও আলবার্টা লইয়া প্রিয়ারি অঞ্চল। এই অঞ্চলে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে গম, বার্লি, ওট প্রভৃতি প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। সুপিরিয়র, মিশিগ্যান, হুরণ, ঈরী ও অণ্টেরিও নামে পাঁচটি বিরাট হ্রদ এই অঞ্চলে অবস্থিত। তন্মধ্যে মিশিগ্যান হ্রদটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত। অপর চারিটি ক্যানাডায়। হ্রদগুলি পরস্পর সংযুক্ত এবং সেণ্ট লরেন্স নদীর সহিত মিলিত। সুপিরিয়রের তীরে পোর্ট আর্থার ও ফোর্ট উইলিয়ম নামক বন্দর দুইটি হইতে প্রচুর গম এই হ্রদমালা দিয়া ষ্টীমারযোগে পূর্ব্বাভিমুখে চালান দেওয়া হয়। এই পথ বৎসরে আট মাস খোলা থাকে। প্রিয়ারি অঞ্চলের দিগন্ত প্রসারী প্রান্তর পর্য্যায়ক্রমে বরফে ও ফসলে ঢাকা থাকে। এখানে দুঃসহ শীতে বরফে সব একাকার হইয়া যায়। মার্চ্চ মাসে বরফ গলিতে সুরু করে। গ্রীষ্মে সমস্ত প্রান্তর শস্যপূর্ণ হইয়া কৃষককূলের মনের সহিত তাল রাখিয়া আন্দোলিত হইতে থাকে। আগষ্ট মাসে হিমসমাগমের ভয়ে ফসল কাটিয়া দ্রুত ঘরে তুলিতে হয়। দাম ভাল থাকিলে শীতের প্রকোপ এড়াইবার জন্য কৃষকগণ সপরিবারে দক্ষিণে বা পশ্চিমে যাইবার আশা পোষণ করে; নচেৎ তুষারের মধ্যে স্ব-গৃহেই তাহাদিগকে শীতঋতু যাপন করিতে হয়।

আলবার্টা প্রদেশে প্রচুর কয়লা ও পেট্রল উৎপন্ন হয়। আলবার্টায় দুইটি জাতীয় পার্ক আছে। শরৎকালে আমোদ-প্রমোদের জন্য এখানে বহু জনসমাগম হয়। হরিণ ও ভল্লুক এখানকার জঙ্গলে নির্ভয়ে বিচরণ করে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শতসহস্র হ্রদে মাছ ধরা খুব আনন্দদায়ক। এই প্রদেশেই ক্যানাডীয় 'রকি' বা পর্ব্বতশ্রেণীর আরম্ভ। ইহার সৌন্দর্য্য বিশ্ববিখ্যাত।

ইহার পরেই প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্ত্তী বৃটিশ কলম্বিয়া প্রদেশ। এখানকার দীর্ঘ ডগলাস ফার বৃক্ষমালা পরম রমণীয়। রকমারি খনিজ সম্পদে প্রদেশটি সমৃদ্ধ। এখানে শীত দুঃসহ নয়; প্রশান্ত মহাসাগরের স্যামন মাছ বেশ সুস্বাদু। অভিজাত সম্প্রদায় বিলাতী আচার-ব্যবহারের সবিশেষ পক্ষপাতী। ব্রিটিশ কলম্বিয়া ক্যানাডার মধ্যে বিলাতী আদর্শ দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবিত প্রদেশ।

অটোয়া পৌঁছিয়া মধ্যাহ্নভোজনান্তে একটু বাহির হইলাম। তাপ শূন্যের নীচে। বাহিরে যাওয়া রীতিমত দুষ্কর। রাস্তা জনশূন্য। প্রয়োজন না থাকিলে কেহ বাহির

হয় না। বাহির হইলে দ্রুত ট্রাম বা বাসে গিয়া চড়ে। চারি দিকে শুধু বরফ। নদী, খাল, লেক, পার্ক, রাস্তা, ঘাট, মাঠ সব গভীর বরফে ঢাকা। বৎসরে ১০৮ ইঞ্চি বরফ পড়ে। প্রায় সবটাই ৩।৪ মাস ধরিয়া পড়িয়া শেষ হয়। প্রায়ই বরফ পড়িতেছে। শহরের রাস্তা পরিষ্কার রাখা কঠিন। প্রশস্ত রাস্তাগুলির সবটা পরিষ্কার রাখা অসম্ভব। মোটর এবং মানুষ চলিবার মত একটু সরু পথ পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করা হয়। হাঁটিবার সময় দু'পাশে উঁচু বরফের স্তূপ। কোথাও হাঁটু সমান, কোথাও বা কাঁধসমান উঁচু। তাপ সাধারণতঃ ১০।১৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত ওঠে; এবং শূন্যের ১০।১৫ ডিগ্রী নীচে পর্য্যন্ত নামে। ৩০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিলেই বরফের বদলে বৃষ্টি পড়ে। এ সময় বৃষ্টি কদাচিৎ হয়। বৃষ্টি হইলে পথঘাট বড় খারাপ হয়। সাধারণতঃ বরফ সাদা ধুলার মত বা উজ্জ্বল বোরিকের গুঁড়ার মত একদম শুকনা। কিন্তু তাহার উপর বৃষ্টির জল পড়িবামাত্র জমিয়া শক্ত ও পিচ্ছিল হইয়া যায়। একটা শক্ত ও পালিশ বরফের পাতে সকল স্থান আচ্ছাদিত হইয়া যায়। তাহার উপর দিয়া পা টিপিয়া হাঁটা বেশ বিপজ্জনক। এরূপ জমাট বরফ সাফ করাও কষ্টকর। গুঁড়ি বরফ বৃহদাকার যান্ত্রিক পাখার হাওয়া দিয়া উড়াইয়া লরি বোঝাই করিয়া সরাইয়া ফেলা হয়। কিন্তু জমাট বরফ গাঁইতি দিয়া কাটিয়া সরাইতে হয়। ছাদে গাছে বৃষ্টির জল পড়িয়া গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে বরফ হইয়া যায়। গাছপালা যে এত নিঃস্ব হইতে পারে তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না। শরৎকালে ক্যানাডার পুষ্পপল্লবসমৃদ্ধ তরুরাজির অপার ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়াছি ও চিত্রে দেখিয়াছি। কিন্তু এ যে নগ্ন নিঃস্ব কৃশকায় ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীর দল। সম্পূর্ণ স্পন্দহীন ও নিঃসঙ্গ। অনেক কষ্টে অল্প ভ্রমণ করিয়া হোটেলে ফিরিলাম। সন্ধ্যায় ওয়েবষ্টার আসিয়া পৌঁছিল।

পরদিন আমার আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া সকাল দশটায় অর্থ-বিভাগের ডেপুটি মিনিষ্টার ডাঃ ডব্লু, সি, ক্লার্কের সহিত মিলিত হইলাম। আমাদের পরিভাষায় ইনি অর্থ-বিভাগের সেক্রেটারী। ক্লার্ক তাঁহার দুই জন সহকর্ম্মীর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। এক জন ডাঃ এ, কে, ইটন ট্যাক্স বিষয়ে বিশেষজ্ঞ; অপর জন আর, বি, ব্রাইস বাজেট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডে ক্যানাডার প্রতিনিধি। ঐ বোর্ডে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি শ্রীযুত সুন্দরেশনের সঙ্গে ইঁহার বিশেষ পরিচয় আছে। ঐ দিনই পরে রাজস্ববিভাগের ডেভিড সিম ও ভি, সি মার্ডক্যানের সঙ্গে আলাপ হইল। এখানে অর্থ-বিভাগ কর নির্দ্ধারণ করে; রাজস্ব বিভাগ কর আদায় করে।

ক্যানাডিয়ানগণের সৌহার্দ্দ্য অতুলনীয়। ইহারা সদালাপী এবং বিদেশীকে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিতে উন্মুখ। ক্লার্ক আমাকে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া নিকটবর্ত্তী রিডো ক্লাবে লইয়া গেলেন। এখানে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণ মধ্যাহ্নভোজন উপলক্ষ্যে মিলিত হন। আমরা চারি জনে একসঙ্গে খাইলাম। ক্লার্ক, ইটন, এখানকার ন্যাশনাল হারবার বোর্ডের অধ্যক্ষ বি, জে, রবার্ট এবং আমি। ভোজনান্তে বসিবার ঘরে অনেকের সঙ্গে পরিচিত হইলাম। তন্মধ্যে এক জন সপ্ততিবর্ষীয় বৃদ্ধ। ইনি এদেশের বিমানপথ-উন্নয়নের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী; ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় বার্ণ কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন।

আমার নিকট কলিকাতার বিরাট হর্ম্ম্যমালা ও উপভোগ্য শীতঋতুর কথা শ্রবণে ক্লার্ক যখন বিস্ময় প্রকাশ করিতেছিলেন তখন বৃদ্ধ আমাকে সমর্থন করিয়া এবং প্রশংসমান কণ্ঠে কলিকাতা নগরীর বিরাটত্ব এবং সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া ক্লার্ককে বিস্মিততর করিয়া তুলিতেছিলেন। রবার্টস আগামী সপ্তাহে ভ্যানকুবার বন্দর পরিদর্শনে যাইবেন। আমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ এবং আমাকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। তিনি ভোজনান্তে আমাকে পার্লামেণ্ট-ভবনে লইয়া গিয়া লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। লাইব্রেরিয়ান বৃদ্ধ। নাম হার্ডি। পরমোৎসাহে তন্ন তন্ন করিয়া সমগ্র লাইব্রেরি ও পার্লামেণ্ট-ভবনটি আমাকে দেখাইলেন ও পার্লামেণ্টের সমস্ত রীতিনীতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। নীচে তাঁহার নিজের ঘরে লইয়া গিয়া সেখান হইতে তুষারাবৃত অটোয়া নদী ও ওপারের হাল শহরের রমণীয় দৃশ্য দেখাইলেন। তাঁহার সঙ্গে ঘড়ির চূড়ার উপর গিয়া সেখান হইতে শহরের চারি দিকের সুন্দর রূপ দেখিলাম। অটোয়া নদীর পরপারে দূরে গাতিনো পর্ব্বতমালা। সেখানে শীতে স্কি খেলার খুব ভাল ব্যবস্থা। তিন-চার হাত লম্বা সরু নৌকাকৃতি নীচে-চাকাযুক্ত স্কি-দ্বয়ের উপর পা বাঁধিয়া খেলোয়াড়গণ যখন পর্ব্বতশীর্ষ হইতে খাড়া মসৃণ বরফের পথ দিয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া ঘণ্টায় ৪০।৫০ মাইল বেগে নিম্নে অবতরণ করে তখন দর্শকের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। স্কি-খেলায় ক্যানাডিয়ানগণের বড় নাম। ইউরোপে সুইজারল্যাণ্ড এবং নরওয়েতেও স্কি-খেলার বিশেষ খ্যাতি।

ঘড়ির চূড়ায় ঘড়ির নীচে একটি ঘরে একখানি বড় বই সুরক্ষিত দেখিলাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যত ক্যানাডাবাসী মারা যায় তাহাদের নাম বইখানিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। রোজ এক পৃষ্ঠা করিয়া উল্টান হয়। কবে কোন্ পৃষ্ঠা উল্টানো হইবে তাহা ঠিক করিয়া দেওয়া আছে। ঐ পৃষ্ঠায় যাহাদের নাম আছে তাহাদের আত্মীয়গণ সেই দিন আসিয়া লেখা দেখিয়া দেশের জন্য মৃত প্রিয়জনকে স্মরণ করেন। বৃদ্ধ গদগদ ভাবে স্বীয় পিতার কথা বলিলেন। তাঁহার

পিতা ব্রিটিশ আর্মিতে ছিলেন; বহু বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন। গীতার প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। তিন-চার বৎসর আগে প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যহ গীতা পড়িয়াছেন। ঁহার নিকট হইতে কয়েকখানা বই লইয়া তাঁহার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইয়া হোটেলে ফিরিলাম, তখন ঝুর ঝুর করিয়া বরফ পড়িতেছিল—শেফালিকা বৃক্ষ হইতে শরতের প্রভাতে যেরূপ শেফালি ফুল অবিরত ঝরিয়া পড়ে অনেকটা সেইরূপ। কোট ও টুপির উপর হইতে মাঝে মাঝে বরফ ঝাড়িতে ঝাড়িতে তুষারাস্তীর্ণ পথে পা টিপিয়া টিপিয়া হোটেলে পৌঁছিলাম।

আমেরিকায় যে হোটেলগুলিতে ছিলাম সেখানে খাবার ঘরে প্রত্যেককে বা প্রত্যেক দলকে আলাদা টেবিলে বসাইয়া দেয়। অন্য লোককে সে টেবিলে বসায় না। কাজেই খাবার টেবিলে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ হয় নাই। এ হোটেলে অপরিচিত লোকের সঙ্গে এক টেবিলে খাইতে হয়। ১১ই জানুয়ারী শনিবার প্রাতরাশের সময় ফ্লোরিডার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে ইঁহার জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। ইনি বলিলেন, "ভারতের প্রাচীন ইতিহাস কিঞ্চিৎ পড়িয়াছি। আধুনিক ইতিহাস জানি না। আপনাদের সঙ্গে ব্রিটিশের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানিবার খুব ইচ্ছা হয়।"

আমি বলিলাম, "আলেকজাণ্ডারের সময় হইতেই বিদেশীয়গণ ভারত আক্রমণ করিয়াছে।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "কিন্তু গ্রীকদের ত আপনারা দশ বৎসরের মধ্যেই বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তাই নয় কি?"

আমি, "হাঁ, ঐ রূপই হইবে। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাস ভারতসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের হাতে পরাজিত হন।"

ভদ্রলোকটির প্রশ্ন আমার কাছে বড় নূতন ঠেকিল।

গ্রীকেরা দশ বৎসরের বেশী ভারতে থাকিতে পারিল না, ইংরেজ দেড় শত বৎসর থাকিল কিরূপে? আমরা ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পড়ি তাহাতে এ প্রশ্নও নাই, তার উত্তরও নাই।

এ বরফের রাজ্যে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া বরফ ঠেলিতে ঠেলিতে পথ চলিতে হয়। বাহির হইলেই মনে হয় কতক্ষণে ঘরে ঢুকিব। গৃহমাত্রেই কেন্দ্রীয় তাপ-ব্যবস্থা থাকায় ঘরের মধ্যে বিশেষ অসুবিধা নাই। এই শীতে বড় বড় বাড়ী গরম রাখিতে যে ইঞ্জিন চালাইতে হয় তাহাতে মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ডও ঘটিয়া যায়। কাগজে দেখিতেছি আমেরিকার কয়েকটি হোটেলে পর পর আগুন লাগিয়া লোক মারা গেল। তাহা লইয়া সে দেশে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। শিকাগোর যে হোটেলে আমি ছিলাম সেই রাফ্‌স্টোন হোটেলেও আগুন লাগিবার সংবাদ পাইলাম। তবে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। আমার ঘরে বসিয়া বসিয়া এলগিন রোডের তুষারাবৃত দৃশ্য দেখিতাম। ঝুর ঝুর করিয়া বরফ পড়িতেছে—হাওয়া আপিসের পূর্ব্বাভাসের অভ্রান্ততা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। কখন বরফ পড়িবে বা কখন বৃষ্টি হইবে কাগজে ও রেডিওতে তাহা ঠিক বলিয়া দিতেছে। চারি দিক বরফে একাকার। শরতের অটোয়ায় পুষ্পপল্লবমণ্ডিত প্রকৃতির রঙের খেলা নাকি অদ্ভুত। কিন্তু হিমাবৃত প্রকৃতির আভরণহীন সর্ব্বশুভ্র রূপও অপরূপ।

১২ই জানুয়ারী রবিবার ইহাদের আর্ট গ্যালারী ও মিউজিয়ম দেখিতে যাই। আর্ট গ্যালারীতে বেশী ছবি নাই। ইউরোপীয় শিল্পিগণের ছবিই বেশী। একজন ক্যানাডিয়ান শিল্পী প্রকৃতির শারদীয় রূপ ও শীতের রূপ একত্র প্রদর্শনেচ্ছু হইয়া 'অক্টোবরে তুষারপাত' এই নাম দিয়া একটি সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন। চিত্রে বিচিত্র পুষ্পপল্লবশোভিত তরুলতার মস্তকে শুভ্র তুষার সন্নিবেশ সুন্দর দেখাইতেছে। মিউজিয়মটি ছোট; কিন্তু অতীত যুগের প্রস্তরীভূত গাছ ও জানোয়ারের কঙ্কালগুলি দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। গাছ পাথর হইয়া গিয়া স্বকীয় রূপ বজায় রাখিয়া পাহাড়ের মধ্যে কিরূপে অন্তর্নিহিত থাকে তাহা দেখিতে খুব ভাল লাগিল। গাছের গুঁড়িটি ঠিকই আছে, কিন্তু পাথর হইয়া গিয়াছে। গাছটি নাকি বিশ কোটি বৎসর পূর্ব্বেকার। অনেক মাছের কাঁটা রহিয়াছে। সেগুলিও পাথর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আকারের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এগুলির বয়স পনর-বিশ কোটি বৎসর।

পূর্ব্বে পৃথিবীতে ডাইনোসার নামে এক জাতীয় অতিকায় সরীসৃপ বাস করিত। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে তন্মধ্যে উহাই নাকি বৃহত্তম ও হিংস্রতম। অন্ততঃ ৬ কোটি বৎসর হইল ইহা পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। কয়েকটি ডাইনোসারের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল এই মিউজিয়মে আছে। একটি কঙ্কাল লম্বায় ত্রিশ ফুট। এই সব প্রস্তরীভূত মাছ, গাছ ও জানোয়ার ক্যানাডার পাহাড় কাটিয়া পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি আধুনিক জানোয়ারের মৃতদেহও এখানে রক্ষিত আছে। উত্তর মেরুর ভল্লুক বা শিয়াল একদম সাদা ও খুব লোমশ। বন্য মহিষগুলি ভীষণ। এক রকম গরু দেখিলাম। নাম কস্তুরী গরু (musk ox); সেগুলি কাটিলে নাকি কস্তুরীর মত সুগন্ধ নির্গত হয়। একটি ঘরে নানা রকমের খনিজ পদার্থ সাজান আছে। একটা বেশ বড় হীরক দেখিলাম।

পরদিন ব্যাঙ্ক অব ক্যানাডায় যাইতে হইল। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, সম্পূর্ণ সরকারী। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে অর্থ ও করবিষয়ক সম্পর্ক লইয়া কিছুদিন যাবৎ খুব আলোচনা চলিতেছে। এ বিষয়ে অর্থবিভাগের একটি স্থায়ী শাখা আছে। ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেলটন এই

শাখার কর্ণধার। আপিসটি ব্যাঙ্কের বাড়ীতে অবস্থিত। এই শাখার কার্য্য দেখিবার জন্যই আমাকে এই বাড়ীতে যাইতে হইত। প্রবেশকালে উপরে যাইয়া আমাকে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিতে হইল। সেখানে আগন্তুকদের অভ্যর্থনার্থ যে দীর্ঘকায় ভদ্রলোকটি উপবিষ্ট ছিলেন তিনি নানারূপ আলাপে আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি ডিউক অব কনটের অন্যতম খাস কর্মচারীরূপে ভারতবর্ষে গিয়াছিলাম। ভারতবর্ষ সুন্দর দেশ। সেখানকার রাজন্যবর্গের আর শিকারের তুলনা হয় না। দিল্লীতে অদ্ভুত জাঁকজমকপূর্ণ যে মাচ দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নয়। বিরাট হল। অনুপম তার সজ্জা। সহস্র স্থির বিদ্যুতালোকে গৃহটি সমুজ্জ্বল। রাজন্যবর্গের পোষাকের শোভা বর্ণনাতীত। বিচিত্র রঙ, অসম্ভব চাকচিক্য, মাথায় বহুমূল্য মণিমাণিক্য-খচিত পাগড়ি। আলোক-রশ্মিসম্পাতে সেই মণিমাণিক্যসমূহ অদ্ভুত লাবণ্য বিকীরণ করিতেছে। উপরের ব্যালকনী হইতে দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতেছিলাম। মধ্য-প্রদেশের জঙ্গলে যে মহাসমারোহপূর্ণ শিকারের আয়োজন হইয়াছিল তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। ঐ যাত্রায় আমরা সিঙ্গাপুরেও গিয়াছিলাম। সেখানে আমি খুব বড় একটা সাপ মারি। চামড়াটি এখনও আমার কাছে আছে।"

পরের দিন আমি ব্যাঙ্কে যাইয়া দেখি ভদ্রলোক সযত্ন-রক্ষিত দীর্ঘ চামড়াটি আমাকে দেখাইবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছেন। ভদ্রলোকটি ভারতবর্ষের সুখ্যাতিতে মুখর। তাঁহার কাছে রাজন্যবর্গ ও শিকার লইয়াই ভারতবর্ষ।

সেদিন রাত্রে খাবার টেবিলে দুটি ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। একজন ভ্যানকুবার নিবাসী, ধাতুবিদ্যায় সুপণ্ডিত। অপর জন মার্কিন; বহুদিন ক্যানাডার আটলান্টিক উপকূলে বাস করিয়াছেন। ভদ্রলোকদ্বয় পরস্পর পরিচিত। ক্যানাডিয়ান খনিবিদ্যা ও ধাতুবিদ্যা সংসদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে প্রথমোক্ত ভদ্রলোকটি অটোয়ায় আসিয়াছেন। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি ব্যবসায় উপলক্ষে আগত। প্রথম ভদ্রলোকটি বেশ আলাপী। গান্ধীজীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার মুখে গান্ধীজীর বিপুল প্রভাবের কথা শুনিয়া প্রশ্ন করিলেন, "যন্ত্রশক্তির বিরোধী হইয়া আপনারা কিরূপে উন্নতি করিবেন? যন্ত্রশক্তির ব্যবহার ছাড়া লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা অসম্ভব।"

জবাবে বলিলাম, "যন্ত্রশক্তির প্রতি গান্ধীজীর অবশ্য নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে। কিন্তু যন্ত্রশক্তির প্রতি গান্ধীজীর বিরোধিতা দ্বারা তাঁহার মহত্ত্বের পরিমাপ করা চলে না। গান্ধীজী ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত প্রতীক। সত্য ও অহিংসা তাঁহার নিকট নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ, সরল এবং প্রাণদায়ক। সম্পূর্ণ সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে ভারতের মত এত বড় একটি আত্মবিস্মৃত জাতিকে তিনি স্বাধীনতা-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া সাফল্যের দ্বারদেশে লইয়া আসিয়াছেন। পৃথিবীতে ইহার তুলনা আছে কি?"

ক্যানাডার তথা অটোয়ার কথা উঠিল। আমি অটোয়ার মিউজিয়মের কথা বলিলাম। এদেশের খনিজ ও বনসম্পদের বিষয়ে আলোচনা চলিল। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বলিলেন, "এদেশের বনসম্পদের ধ্বংসসাধনই চলিতেছে। সংরক্ষণের বন্দোবস্ত নাই। এদেশের কৃষিও প্রায় খনির মত। সেখান থেকে সম্পদ তুলিয়া লওয়া হইতেছে। সংরক্ষণের কোন চেষ্টা নাই।" ধাতুবিদ্ আমাকে ভারতবর্ষের খনির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দু-এক কথায়ই বুঝিলাম ভারতের খনি সম্বন্ধে ইনি আমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন। কোলারের স্বর্ণ-খনি সম্বন্ধে ইনি অনেক কথা বলিলেন। নিজ বিষয়ে ইঁহার বিশেষ দখল। বলিলেন, "আমাদের খনিজ সম্পদ কিরূপ দ্রুতবেগে ক্ষয় পাইতেছে সেই সম্বন্ধে কাল সংসদে আমি একটি প্রবন্ধ পড়িব। কয়লা, লৌহ প্রভৃতি তো অফুরন্ত নয়। যদি নিঃশেষ হইয়া যায়।"

আমি। "অপব্যয় অবশ্য পরিহার্য্য। তাই বলিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইবার পক্ষপাতী আমি নই। সব ফুরাইয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কায় এখনই হাত পা গুটাইবার বা নিজেদের উন্নতি-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিবার বুদ্ধিকে আমি সুবুদ্ধি বলিব না।" প্রথম। "কিন্তু যে ভাবে ব্যয় চলিতেছে তাহাতে ধাতুগুলি ফুরাইয়া যাইবেই। নূতন খনি আবিষ্কারেরও তো একটা সীমা আছে। আপনি মিউজিয়মে যে বিরাটকায় ডাইনোসার দেখিয়াছেন তাহারা তো স্বাভাবিকই লুপ্ত হইয়াছে। আমাদেরও তো অনুরূপ গতি হইতে পারে।"

আমি। বিজ্ঞান আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করিবে কেন? বিজ্ঞান দিবে সাহস। আমরা তো জ্ঞানের সীমানায় পৌঁছাই নাই। কোন কোন বৈজ্ঞানিক অঙ্ক কষিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে এতদিন বাদে সূর্য্যের আলো ফুরাইয়া যাইবে। তাই বলিয়া কি এখনই নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িব?" প্রথম (সোৎসাহে)—"যখন সূর্য্যের আলো ফুরাইবে তখন ধাতুবিদ্‌গণ ধাতুদ্বারা আলোক সৃষ্টি করিবে।"

আমি। "ইহাই তো বৈজ্ঞানিকের মত কথা? সেইরূপ যত দিনে আপনার কয়লা বা লৌহ ফুরাইবে তত দিনে আণবিক শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইলেকট্রনের সজ্জা বদলাইয়া এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করাও সম্ভব হইবে।" আমাদের খাওয়া অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গিয়াছিল, ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আজ আমরা পৃথিবীর তিন দিকের তিনটি লোক একত্র আহার করিয়া ও নানাবিধ সদালাপ করিয়া পরম পরিতোষলাভ করিলাম। ভ্যানকুবারে প্রে পয়েণ্টে একটি খনিজ দ্রব্যের মিউজিয়ম আছে। আপনি ভ্যানকুবারে গিয়া সেটি অবশ্য দেখিয়া যাইবেন।"

পরস্পর সম্ভাষণ জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত-সার—তৃতীয় শতক

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

রবীন্দ্র-সঙ্গীত-সারের তৃতীয় শতক এবার কিঞ্চিৎ বিলম্বে তাঁর সঙ্গীতভক্তদের কাছে উপস্থিত করলাম। গত দুই বৎসর তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যেই এই গীতাঞ্জলি নিবেদন করে এসেছি, কিন্তু এ বছর নানা কারণে "যাবার সুরে আসার সুরে" একাকার হয়ে গেল।

আধুনিক গান সম্বন্ধে আমার অনভিজ্ঞতার কথা পূর্ব্বেই স্বীকার করেছি। তাই সে বিষয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডকেই আমার প্রধান অবলম্বন করতে হয়েছে এবং রেকর্ডে ওটা যে জনপ্রিয়তার একটা লক্ষণ, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই; রেকর্ড অনেকটা ভোটের কাজ করে। তবু রবীন্দ্র-সঙ্গীত-ভক্তদের কাছে আবার আমার সেই পুরনো আবেদন জানাচ্ছি, যেন এই তিন শতকের ভিতরে যে সকল শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত তাঁদের মতে ধরা হয় নি, তার একটি তালিকা করে আমাকে পাঠিয়ে অদূর ভবিষ্যতে চতুর্থ শতক সঙ্কলন করবার সাহায্য করেন।
শান্তিনিকেতন, শ্রাবণ, ১৩৫৫।

পূজা

১। অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
২। তুমি একলা ঘরে বসে বসে
৩। অন্তর মম বিকশিত
৪। আমার গোধূলি লগন এলো
৫। জয় তব বিচিত্র আনন্দ
৬। তিমির দুয়ার খোলো
৭। তুমি কেমন করে গান করো
৮। তুমি নব নব রূপে
৯। তুমি যে সুরের আগুন
১০ তোমায় নতুন করে
১১ তোমার আনন্দ ঐ
১২ তোমার সুরের ধারা
১৩ দাঁড়িয়ে আছ তুমি
১৪ দিনের বেলা বাঁশী তোমার
১৫ নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
১৬ প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে
১৭ বাজাও তুমি কবি
১৮ মধুর তোমার শেষ
১৯ মনোমোহন গহন
২০ যে তরণীখানি ভাসালে .
২১ যে রাতে মোর দুয়ারগুলি
২২। হবে জয় হবে জয়
২৩। হে চিরনূতন
২৪। ধীরে বন্ধু ধীরে
২৫। সবাই যারে সব দিতেছে
২৬। আবার যদি ইচ্ছা কর
২৭। গানের ঝরণাতলায়
২৮। বাহিরে ভুল হানবে যখন
২৯। আমি যখন ছিলেম অন্ধ
৩০। আমি কান পেতে রই

প্রেম

১। আমার একটি কথা বাঁশী জানে
২। আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল
৩। আমি রূপে তোমায়
৪। কী রাগিণী বাজালে
৫। কে দিল আবার
৬। দিনশেষের রাঙা মুকুল
৭। দিন পরে যায় দিন
৮। বড় বেদনার মত
৯। বাজিল কাহার বীণা
১০। বিদায় করেছ যারে
১১। স্বপনে দোঁহে
১২। মনে রবে কিনা রবে
১৩। কেন সারাদিন ধীরে ধীরে
১৪। আজি দক্ষিণ পবনে
১৫। আমি চাহিতে এসেছি
১৬। রাতে রাতে আলোর শিখা
১৭। একলা বসে হেরো তোমার ছবি
১৮। এই উদাসী হাওয়ার
১৯। কে আমারে যেন এনেছে
২০। নিশীথে কি কয়ে গেল
২১। ওগো ডেকো না
২২। বনে যদি ফুটল কুসুম
২৩। আর নাইরে বেলা
২৪। আজি গোধূলি লগনে
২৫। লিখন তোমার
২৬। আমার প্রাণের মাঝে
২৭। সুন্দর হৃদি রঞ্জন তুমি
২৮। ভালবেসে সখি নিভৃত যতনে

প্রকৃতি

১। আজ বারি ঝরে
২। আজি ঝড়ের রাতে
৩। আধেক ঘুমে
৪। আবার এসেছে আষাঢ়
৫। আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
৬। এবার উজাড় করে
৭। এসো নীপবনে
৮। ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে
৯। ঝরা পাতা গো
১০। কে রয় ভুলে
১১ নিবিড় অমা তিমির হতে
১২ বসন্তে ফুল গাঁথল
১৩ বাকি আমি রাখব না
১৪ বাদল বাউল
১৫ বিশ্ববীণারবে
১৬ মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
১৭ শাঙন গগনে
১৮ এসো গো, জেলে দিয়ে যাও
১৯ কত যে তুমি মনোহর
২০ বন্ধু রহো রহো সাথে
২১ ফাগুনের শুরু হতেই
২২ দখিন হাওয়া জাগো
২৩ আমার বনে বসে
২৪ বসন্ত তার গান
২৫ নিশীথ রাতের প্রাণ
২৬। চক্ষে আমার তৃষ্ণা
২৭। আঁধার অম্বরে
২৮। আজি তোমায় আবার

স্বদেশ

১। আনন্দধ্বনি জাগাও
২। আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু
৩। ওরে নূতন যুগের ভোরে
৪। একবার তোরা মা বলিয়া ডাক

বিবিধ

১। আমার নাই বা হোলো
২। তোমার আসন শূন্য
৩। প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়
৪। ওরে সাবধানী পথিক
৫। এই তো ভালো লেগেছিলো
৬। সে কোন্ বনের হরিণ
৭। তারায় তারায় দীপ্ত শিখা
৮। এম্‌নি করে যায় যদি দিন
৯। মাটির প্রদীপখানি
১০। মধুর মধুর ধ্বনি বাজে

পূজা—	৩০
প্রেম—	২৮
প্রকৃতি—	২৮
স্বদেশ—	৪
বিবিধ—	১০
মোট—	১০০

রাজা রামমোহন ও বর্ত্তমান ভারত

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। নবযুগের সন্ধিক্ষণে, ভারতের ইতিহাসের এক সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে তাঁহার আবির্ভাব ঘটে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল সাম্রাজ্য যখন ছিন্ন-ভিন্ন, ইসলাম সংস্কৃতি ক্রমশঃ অপস্রিয়মাণ, নব বৈদেশিক শক্তির অভ্যুদয়ে দিগন্ত সন্ত্রস্ত, আমাদের মাতৃভূমি বিশৃঙ্খল ঘটনাবর্ত্তে তখন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। তাই ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহনের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। রোমঁ্যা রোলাঁ বলেন, এই প্রাচীন মহাদেশে নবযুগের উদ্বোধনকারী রাজা রামমোহন ছিলেন অসাধারণ পুরুষ। ষাট বৎসরেরও কম, (১৭৭৪-১৮৩৩) অল্প পরিসর জীবনের মধ্যে তিনি প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মবাদ হইতে নবীন ইউরোপের বিজ্ঞান পর্য্যন্ত অধিগত করিয়াছিলেন।

হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে রামমোহন এক সম্ভ্রান্ত ধনবান, গোঁড়া ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কেহ কেহ বাংলার নবাবের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার পিতামহ নবাব সিরাজউদ্দৌলার অধীনে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ কোনও নবাব কর্ত্তৃক 'রায়' উপাধিদ্বারা ভূষিত হন। তদবধি কৌলিক উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে 'রায়' ব্যবহৃত হইত। রামমোহনের পিতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব, এবং মাতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন গোঁড়া শাক্ত। তাঁহার

পিতা পুত্রকে অতি যত্নের সহিত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন। মাতা তারিণী দেবীর সুনির্ম্মল পবিত্র চরিত্র রামমোহনও উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। স্বগৃহে রামমোহন তৎকালীন রাজভাষা ফারসী শিক্ষা করিতেন। তিনি আরবী ভাষাও অধিগত করেন। উক্ত ভাষায় তিনি ইউক্লিড ও এরিষ্টল হইতে আরম্ভ করিয়া কোরান পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ষোল বৎসর বয়সে ফারসী ভাষায় এক পুস্তক লিখিয়া তিনি উহাতে হিন্দু পৌত্তলিকতার অসারতা প্রতিপাদন এবং হিন্দুধর্ম্মের সংকীর্ণতার সমালোচনা করেন। ইহার ফলে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করেন।

তৎকালীন প্রথা অনুসারে অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু প্রথমা স্ত্রী লোকান্তরিতা হইলে তিনি পর পর দুই বার দারপরিগ্রহ করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি ইংরেজী, হিব্রু, গ্রীক ও লাটিন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

প্রচুর ধনসম্পদ সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন স্থলে কালেক্টর জন ডিগবীর অধীনে কাজ করেন। অতঃপর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সহায়তায় তিনি সতীদাহ-প্রথার বিলোপসাধন করিতে সমর্থ হন।

দিল্লীর সম্রাট রামমোহনকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সম্রাট রাজা রামমোহনকে রাজদূতরূপে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। হাউস অফ্ কমন্সের যে চার্টারে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায়-সঙ্ঘ হইতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়—সেই চার্টার প্রণয়ন কালের বিতর্কে যোগদানের জন্যই তথায় গমন করেন।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে রাজা চতুর্থ জর্জের রাজ্যাভিষেক দিবসে রামমোহনকে বৈদেশিক রাজদূতের আসন দান করিয়া সম্মানিত করা হয়। রাজা চতুর্থ উইলিয়মের সভাসদ্‌গণের নিকটেও তাঁহার পরিচয় প্রদান করা হয় এবং রাজপুরুষগণ কর্তৃক অতীব সম্মানের সহিত তিনি গৃহীত হন। তিনি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, ব্রিটিশ ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি প্রভৃতি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক সসম্মানে অভ্যর্থিত হন।

ইংলণ্ড যাত্রার পথে রামমোহন দুই-এক ঘণ্টার জন্য উত্তমাশা অন্তরীপে অবতরণ করেন। জাহাজে ফিরিবার কালে একটি দুর্ঘটনা হয়। জাহাজের সিঁড়িটি দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন ছিল না। সেইজন্য উঠিবার সময় তিনি সিঁড়ি হইতে পড়িয়া যান এবং আঠার মাস তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। জীবনে আর কখনও তিনি সম্পূর্ণভাবে সারিয়া উঠিতে পারেন নাই—একটু খোঁড়া হইয়া যান। বেন্থাম প্রভৃতি ইংলণ্ডের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার বন্ধু ছিলেন। কলিকাতায় ইতঃপূর্ব্বেই উইলসন, কোলব্রুক এবং আরো অন্যান্য ইউরোপীয় মনীষীগণ তাঁহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রামমোহনের ইংরেজী জীবনীকার মিস্ এস. ডি, কোলেটের মতে রামমোহন প্রাচীন ইংলণ্ডের হৃদয় হইতে নবীন ইংলণ্ডের অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করেন। নবীন ইংলণ্ড তাঁহার মধ্য দিয়া নব্য ভারতের সহিত পরিচিতি লাভ করে।

রাজা রামমোহনের ইংলণ্ড-গমনের ফল হইয়াছিল সুদূর-প্রসারী। ম্যাক্সমূলারের কথায়, "বিদগ্ধ এবং তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা বিশ্বের মিলনবৃত্তটি সুসম্পূর্ণ করিবার জন্য রাজা রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্যে আগমন করেন। অতঃপর এই বৃত্ত হইতে বিদ্যুৎপ্রবাহের ন্যায় প্রাচ্য ভাবধারা প্রতীচ্যে এবং প্রতীচ্যের ভাবধারা প্রাচ্যে গমনাগমন করিতে লাগিল। আমাদিগকে ইহা পুনরায় সেই সনাতন ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিল। তথাকথিত প্রচলিত ধর্ম্মপদ্ধতির স্থলে ইহা আমাদিগকে সহজ এবং পবিত্র ভাবধারায় নূতন আশার আলোকে উদ্বুদ্ধ করিল। অতীত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ যে-কোন প্রাচীন কাহিনী হইতে ইহা আমাদিগকে অত্যধিক পরিমাণে সত্যলাভের দুঃসাহসিক পথের দিকে চালিত করিল।" স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "আজিকার ভারতবর্ষে যে এতটুকু জীবন, এতটুকু প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়, এই স্পন্দন সেই দিন সঞ্চারিত হইয়াছিল, যেদিন রাজা রামমোহন অন্যান্য জাতির সহিত মিলিত হইবার জন্য ভারতের এই একাকিত্বের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমুদ্রপারে যাত্রা করিয়াছিলেন।" ভারতবর্ষকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি নানাভাবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। আমাদের সম্মুখে তিনি এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন।" রাজা রামমোহন ফ্রান্স পরিদর্শন করিয়াছিলেন। আমেরিকায় যাইবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। কিন্তু সহসা মস্তিষ্ক-পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে দেহত্যাগ করেন। ইংলণ্ড-গামী ভারতীয়দের পক্ষে ব্রিষ্টল তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ। ব্রিষ্টলের আর্ণসভেল সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার একটি স্মৃতি-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃত সমাধিক্ষেত্র ষ্টেপলটন গ্রোভ হাউসে।

স্মৃতিফলকে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহনের জীবনী ও কার্য্যাবলী অতি সুন্দর ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণিত আছে—"ইহার নীচে আজীবন ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী এবং বিবেকবান এক ব্যক্তির দেহাবশেষ সংরক্ষিত হইয়াছে। আন্তরিক ভক্তির সহিত তিনি তাঁহার সমগ্রজীবন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সহজাত বিপুল মেধাশক্তির বলে তিনি বহু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন; এবং তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম ছিলেন। সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক এবং ইহলৌকিক দিক দিয়া ভারতের উন্নতিকল্পে সতীদাহপ্রথা এবং পৌত্তলিকতা

নিবারণ করিবার জন্ত, ভগবানের মহিমা প্রচার এবং মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্ত তাঁহার অবিরত চেষ্টার কথা তাঁহার দেশবাসী সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছে।"

দীনবন্ধু সি. এফ. এণ্ড্রুজ তাঁহার ইংরেজী পুস্তকে* যথার্থই বলিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন তাঁহার সমসাময়িকদিগের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পুনর্মিলনের তিনি ছিলেন প্রথম উদ্গাতা। রামমোহন বাংলা গদ্যের জনক-স্বরূপ। ভারতবর্ষে তিনিই দেশীয় সংবাদপত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সংবাদপত্রকে তিনি স্বাধীনতার সংরক্ষক রূপে বিশ্বাস করিতেন। তাই যখন সরকারী লাইসেন্স ব্যতীত সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া আইন জারী হইল, তখন রামমোহন সুপ্রীম কোর্টে এই আইনের প্রত্যাহার দাবী করিয়া একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। ব্যাকরণ, ভূগোল, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তকের অন্যতম আদি প্রণেতা। ভারতের রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিতও তিনি গভীর ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। প্রধানতঃ রামমোহনের সংস্পর্শে আসিয়াই মেরী কার্পেন্টার ভারতে আগমন করতঃ ভারতীয় নারীগণের কল্যাণার্থে আপনার কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত করেন।

রামমোহন ছিলেন স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক। তাঁহার বন্ধু ব্যাপ্টিষ্ট মিশনরী উইলিয়ম এডাম তাঁহার এই স্বাধীনতা-স্পৃহা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"তিনি হয় স্বাধীন হইবেন, নচেৎ কিছুই হইবেন না। শুধু কর্ম্মের স্বাধীনতা নহে, চিন্তার স্বাধীনতা—এই স্বাধীনতাপ্রিয়তা ছিল তাঁহার অন্তরের এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্ত এই আন্তরিক কামনা, আপনার মানসিক স্বাধীনতায় অপরের বিন্দুমাত্র হস্ত-ক্ষেপের বিরুদ্ধে এই অসহনীয় মনোভাবের ফলেই অপরের স্বাধীনতা রক্ষার দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন কি, যাঁহাদের সহিত তাঁহার প্রবল মতভেদ ছিল, তাঁহাদের প্রতিও তাঁহার এইরূপ মনোভাব বিদ্যমান ছিল। স্বেচ্ছাচারী নৃপতির নিকট হইতে নেপল্সের অধিবাসিগণ যখন অভীপ্সিত শাসন-তন্ত্র আদায় করিতে ব্যর্থমনোরথ হইল, আয়ার্লণ্ডের জন-সাধারণ যখন ব্রিটিশ সরকারের অবিচারে অত্যাচারে পর্য্যুদস্ত তখন রামমোহনের সহানুভূতি সর্ব্বদা তাহাদের জন্ত উৎসারিত হইত। ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যে তিনি এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তৎকালে উহা ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করিতে বা আলোচনা করিতে পারিতেন না। স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সংবাদ শ্রবণে তিনি উল্লসিত হৃদয়ে কলিকাতার টাউনহলে এক ভোজ-সভা আহ্বান করেন। রামমোহন বিশ্বাস করিতেন, অপরাপর সভ্য জাতির ন্যায় ভারতবাসীরও উন্নতির সুনিশ্চিত সম্ভাবনা আছে। জাতি হিসাবে এশিয়াবাসীরা যে হীনতর এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। এশিয়াবাসীদের স্বাধীনতা ভাব-ধারার ফলে মানবজাতির অধঃপতন হইয়াছে, কোনও খ্রীষ্টান এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। তাহার সহিত তর্কপ্রসঙ্গে রাম-মোহন স্মরণ করাইয়া দেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের সকল প্রাচীন সাধু ও মহাপুরুষগণ, এমন কি, স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট পর্য্যন্ত এশিয়ায় জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যুগের প্রধান প্রধান প্রগতিশীল আন্দোলনের মূলে ছিলেন রাজা রামমোহন। তৎকালীন বহু সমস্যা তিনি সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার জীবনের প্রধানতম কৃত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তন। তাঁহার জীবনের অসমাপ্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া এক শতাব্দীর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ উহার পূর্ণতাসাধন করেন। ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ছিল গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও অনুকরণ-প্রবৃত্তি হইতে দেশবাসীকে মুক্ত করিয়া উদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা।

ধর্ম্মের দিক দিয়া রামমোহন ছিলেন একেশ্বরবাদী হিন্দু। তথাপি সকল ধর্ম্মের সত্যকে তিনি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতেন। তাঁহার মত ছিল উদার, সার্ব্বজনীন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী প্রভৃতির ধর্ম্মবিশ্বাস সেই সার্ব্বজনীন বিশ্বাসেরই বিভিন্ন রূপমাত্র। কাউণ্ট গবলেট ডি আল্ভিয়েলা তাঁহার ইংরেজী পুস্তকে* বলিয়াছেন, "রামমোহন হিন্দুদের মধ্যে বৈদান্তিক, খ্রীষ্টানদের মধ্যে খ্রীষ্ট বিশ্বাসী এবং মুসলমানদিগের মধ্যে আল্লাবিশ্বাসী হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। এই উদারতা তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের মতই গভীর ও সত্য ছিল। বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা ব্রাহ্ম-সমাজের দান।" অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ম্‌স্ বলেন, "তুলনা-মূলক ধর্ম্মবিজ্ঞানের আলোচনায় রাজা রামমোহনই ছিলেন সর্ব্বপ্রথম প্রকৃত উৎসাহী অনুসন্ধিৎসু। কিন্তু সকল সিদ্ধির উর্দ্ধে ছিল রাজার অসাধারণ ধর্ম্মাশ্রয়ী ব্যক্তিত্ব। তাঁহার জীবনের মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম্ম।" রোঁমা রোঁলা বলেন, "প্রাত্যহিক জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখিয়াই রাজা অধ্যাত্মজীবনের সর্ব্বোচ্চ স্তরে উপনীত হইয়া-ছিলেন। দৈহিক এবং মানসিক গঠনে তিনি রাজকীয় ভাবে মণ্ডিত ছিলেন। রামমোহন ছিলেন একাধারে আদর্শবাদী ও কর্ম্মবীর; বিরাট ব্যক্তিত্বশালী, তেজস্বী অশ্বের ন্যায় প্রতিভা-সম্পন্ন।"

ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া তাঁহার ইংরেজী পুস্তকে † লিখিয়া-ছেন, "ভারতের সর্ব্বপ্রথম জাতীয় জাগরণ রাজা রামমোহনের

Rise and growth of the Congress by C. F. Andrews.

**Contemporary Evolution in Religious Thought* by Count Goblett D'Alviella.

†*History of Indian National Congress* by Dr. Pattavi Sitaramyya.

প্রভাবেই হইয়াছিল।" টম্‌সন্‌ এবং গ্যারেট তাঁহাদের ইংরেজী-গ্রন্থে* রাজা রামমোহনকে ছুইটি বিদেশী জাতির (ভারত-বাসী ও ব্রিটিশের) মিলন সংস্থাপকরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই মিলনের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলন সম্ভাবিত হইয়াছিল। রামমোহনের জীবনচরিত লেখক কোলেট তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বলেন, "ইতিহাসে রামমোহন যেন একটি জীবন্ত সেতু। এই সেতুর উপর দিয়া ভারতবর্ষ তাঁহার অপরিমেয় অতীত হইতে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রাচীন জাতিবিচার ও বর্ত্তমান মানবতাবাদ, কুসংস্কার এবং বিজ্ঞান, স্বেচ্ছাচারিতা ও গণতন্ত্র, অচল বিধিপ্রথা এবং প্রগতি, বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস ও অস্পষ্ট অথচ পবিত্র সত্য ধর্ম্মানুরাগ ইহাদের পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী দুস্তর ব্যবধানের উপরে রামমোহন ছিলেন খিলানস্বরূপ। স্বজাতিগণের মধ্যে তিনি ছিলেন মধ্যস্থস্বরূপ। বহুপ্রাচীন সংস্কার ও নবযুগের আলোকপ্রাপ্ত চিন্তাধারার দ্বন্দ্বে তিনি একাকী দুঃসহ সাধনার দ্বারা সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছিলেন।" "বিভিন্ন জাতির বিশ্বাস ও সংস্কৃতির মিলনের ফলে যে নবজাগরণ আসিয়াছিল তিনি ছিলেন তাহার প্রতীক-স্বরূপ। এই নবজাগরণের অনুসন্ধিৎসা, প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি সমালোচনামূলক অথচ শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি এবং বিপ্লবের প্রতি বিক্ষোভিত, এমন কি, ভীরুতাপ্রণোদিত অনিচ্ছার তিনি ছিলেন প্রতিমূর্ত্তি।" কিন্তু রামমোহনের জীবনে আমরা ভারতে যে অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহা পূর্ণ হইয়াছে। তৎপ্রবর্ত্তিত সমগ্র আন্দোলনটির মূল শক্তি ধর্ম্ম। বহুস্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র তাঁহার অন্তরের বিশ্বাস তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। প্রাচীন হিন্দু চিন্তাধারার পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া নূতন ভাবধারার সিঞ্চনে এক নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ প্রতিবেশের মধ্যে তাঁহার জীবন সেই প্রাচীন সংস্কৃতি অবলম্বন করিয়াই পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। "রাজা শুধু একজন পাশ্চাত্যমনা ভারতবাসী অথবা ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত কৃত্রিম হিন্দু ছিলেন না; আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তিনি ছিলেন একজন ইউরেশিয়ান। আমরা যদি তাঁহার জীবনধারার ক্রমবিবর্ত্তন লক্ষ্য করি, তবে দেখিতে পাইব যে প্রাচ্য চিন্তাধারা হইতে তাঁহার মানস পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্য দিয়া এমন এক স্থলে গিয়া পৌঁছিয়াছে, যেখানে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অপেক্ষাও বৃহত্তর ও মহত্তর ভাবধারার সৃষ্টি হইয়াছে। আপনার অন্তর-ধর্ম্মের সহায়তায় সর্ব্বত্র তিনি ঐক্য রক্ষা করিয়াছেন এবং ঐক্যই তাঁহার প্রগতিবাদী আন্দোলনের মূল শক্তি জোগাইয়াছে। ধর্ম্মই তাঁহাকে সকলের সহিত সংযুক্ত করিয়াছিল, সেই সঙ্গে সংযতও করিয়াছিল এবং তাঁহার আন্দোলনের প্রেরণাও প্রসার সাধন করিয়াছিল।" "রামমোহনের জীবন নব্যভারতের নিকট উৎসাহ ও শিক্ষার উৎসস্থল এবং আদর্শ-স্বরূপ।"

"ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের ভাগ্যে যাহাই থাকুক না কেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই যে, তাহার ভবিষ্যৎ রামমোহনের জীবন ও কার্য্যাবলীদ্বারা বহুলপরিমাণে প্রভাবিত হইবে। শুধু ভারতের ভবিষ্যৎই নহে, আমরা আজ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অপূর্ব্ব মিলনতীর্থে দণ্ডায়মান। ইউরোপ এবং এশিয়ার উন্নতিশীল মানবসমাজ পূর্ব্বে প্রায়ই বিবদমান ছিল। উভয়েই আজ ধীরে ধীরে সংযত হইয়া মানবকল্যাণের সাগরে মিলিত হইবার জন্য একসঙ্গে অগ্রসর হইতেছে। প্রাচ্যের রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক সমস্যাবলীর সম্মুখে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলিও অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়। রাজা রামমোহনের ব্যক্তিত্ব এই অনন্ত সমস্যাগুলির সম্মুখে আরও উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। ভবিষ্যদ্বক্তা না হইলেও তিনি ভবিষ্যতের অসীম সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করিয়া গিয়াছেন।"

* Rise and Fulfilment of British Rule in India by Thompson and Garret.

ভারতবর্ষীয় মুদ্রানীতি

শ্রীবিমলাকান্ত সরকার

ভারতের মুদ্রানীতি একটি অভিনব পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে ইহার মূল তথ্যগুলি জানা দরকার। পৃথিবীর বহু দেশে 'সোনা' ও 'রূপা' দুই-ই মুদ্রার উপাদান হিসাবে বহুকাল যাবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু রূপার দর ক্রমশঃ কমিতে থাকায় এবং দুইটি ধাতুই মুদ্রারূপে একই সময় ব্যবহৃত হওয়ায় নানা বিভ্রাট প্রকট হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সভ্যজগতের অধিকাংশ দেশেই মুদ্রা হিসাবে রূপার ব্যবহার স্থগিত করা হইল। ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে রাজত্ব চলিয়া যাওয়ার কিছুকাল পর হইতেই (১৮৬৪ খ্রীঃ) মোটের উপর 'রূপা'ই মুদ্রার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হইত অর্থাৎ 'টাকা'ই চলতি মুদ্রা ছিল, সোনা নয়। কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা (ইংরেজী গিনি) গবর্ণমেণ্টের কাছে দিলে তাহাও লওয়া হইত। তখন ১০৲ টাকা একটি গিনির মূল্য ধার্য্য

ছিল। ভারতের সহিত ইংলণ্ডের দ্রব্যাদির আদানপ্রদান ত ছিলই, তদুপরি ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারীদের মাহিনা ইত্যাদি দেওয়ার জন্য মোটা টাকার ব্যবস্থা করিতে হইত। যে কারণে বহু দেশে মুদ্রা হিসাবে 'রূপা'র প্রচলন বন্ধ করা হইল সেই কারণে এখানেও তাহার ব্যবহারের অসুবিধা হইতে লাগিল। 'রূপা'র যে দরে তখন ১০৲ টাকায় ১ গিনি দেওয়া যাইত, রূপার দর খুব কমিয়া গেলে 'টাকা' হয়ত বিশেষ্ ভাবে নির্দ্ধারিত ১ গিনির ভগ্নাংশ, ধরা যাক, (১/১০ স্থলে) ১/২০-তে দাঁড়াইয়া যাইত। ভারতের উল্লিখিত দেনা পরিশোধকল্পে, ভারত হইতে গ্রেট ব্রিটেনে যদি ৩ কোটি স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইতে হইত তাহা হইলে ৩০ কোটি টাকার স্থলে ৬০ কোটি টাকা পাঠান দরকার হইত। সুতরাং সরকারের তরফ হইতে অনেক অতিরিক্ত টাকা 'বাজেটে' ধরিতে হইত এবং সেই অনুসারে রাজস্বের বা করবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইত। 'রূপা'র দরের এই গোলযোগ কিরূপে নিবারণ করা যায় তাহা স্থির করিবার জন্য ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হার্শেল কমিটি নামে একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়। এই কমিটির নির্দ্ধারণক্রমে মুদ্রার উপাদান হিসাবে ও শিল্পের ধাতু হিসাবে 'রূপা'র মূল্য এক রহিল না। যে ধাতু মুদ্রার উপাদান, সাধারণতঃ মুদ্রা হিসাবে এবং শিল্পদ্রব্যের ধাতু হিসাবে তাহার মূল্য এক থাকে আর উক্ত ধাতু টাকশালে লইয়া গেলে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে তাহাকে মুদ্রায় রূপান্তরিত করা হয়। এক্ষেত্রে বলা হইল যে, ভারতে স্বর্ণমানই প্রচলিত হোক, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন না হইয়া রূপার টাকাই চালু থাকুক এবং তাহার মূল্য বজায় রাখিবার জন্য বিধিমত ব্যবস্থা করা হোক। এই ব্যবস্থার ফলে দাঁড়াইল এই যে, টাকশালে কি 'সোনা' বা কি 'রূপা' লইয়া গেলেই মুদ্রা করিয়া দেওয়ার প্রথা উঠিয়া গেল। ১৫৲ টাকায় এক গিনি অথবা ১ শিলিং ৪ পেনিতে এক টাকা—এই বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় হার ঠিক করা হইল। ১৮৯৮ খ্রীঃ ফাউলার কমিটি নামে আর একটি কমিটি গঠিত হইল এবং সেটির সুপারিশ অনুসারে ভারতে ঠিক স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত না হইয়া একটু ব্যতিক্রমের সৃষ্টি হইল। বৈদেশিক বিনিময়-হার পূর্ব্বের ন্যায় রহিল (১৫৲ টাকায় সভ্‌রেন)। তাঁহাদের বিধান অনুসারে টাকশালে 'সোনা"র টাকা যথেচ্ছ পরিমাণে তৈয়ারী হওয়ার ব্যবস্থা বাতিল হইয়া গেল। স্থির হইল যে, দরকার না হইলে অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের হাতে প্রচুর সোনা না আসিলে নূতন করিয়া 'রূপা'র টাকা তৈয়ারী হইবে না এবং রূপার দর অনুসারে খুশীমত টাকা টাকশালে তৈয়ারী হইবে না। সভ্‌রেন আইনতঃ দাবি মিটাইবার মুদ্রায় পরিগণিত হইল। রূপার স্থলে যদি কেবল কাগজের 'টাকা' তৈয়ারী করা হইত এবং তাহার একটি ইচ্ছামত মূল্য স্থির করা হইত তাহা হইলে যেমনটি হইত এই নূতন ব্যবস্থায়ও অনেকটা সেইরূপ হইল—অর্থাৎ ১৲ টাকায় ৫ শিলিং অথবা ৬ পেনি পাওয়া যাইবে, ইহা ঠিক করাও কিছু অবৈধ হইত না। 'রূপা'র টাকার প্রচলন ছিল, সুতরাং কাগজের স্থলে 'রূপা'ই 'টাকা'র উপাদান হইল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে টাকার ওজন ১৮০ গ্রেন অথবা ১ তোলা নির্দ্ধারিত আছে, তন্মধ্যে ১৬৫ গ্রেন খাঁটি রূপা দেওয়া হইত। 'টাকা'কে ইচ্ছামত মূল্য দেওয়া হইল বটে, কিন্তু ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে ১৬৫ গ্রেন 'রূপা'র মূল্য ১ শিলিং ৪ পেনি অপেক্ষা বেশী হইবে না। কেননা তাহা হইলে লোকে 'টাকা' গলাইয়া ফেলিতে পারিবে। যে সময় 'টাকা'র মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইল সে সময় রূপার মূল্য খুবই কমিয়া গিয়াছিল, এবং পূর্ব্বের নিয়ম অনুসারে 'রূপার টাকার মূল্য ১ শিলিং ২ পেনি (১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে) ছিল। সুতরাং সকল দিক হইতে ঐরূপ মূল্য নির্দ্ধারণ অসমীচীন মনে করা হইল না। একথা সহজেই বুঝা যাইবে যে এরূপ ব্যবস্থায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত "রূপা"র দর আউন্স প্রতি ৪৩ পেনি অর্থাৎ ৩ শিলিং ৭ পেনি অপেক্ষা বেশী না হয়, ততক্ষণ কিছু গোলমাল হওয়া সম্ভব নয়—তাহা অপেক্ষা বেশী হইলেই লোকে গলাইয়া বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে। এই যে মুদ্রামানটি ঠিক করা হইল, ইহাকে স্বর্ণস্বরূপ বা স্বর্ণকল্প মান[১] (Gold Exchange Standard) বলা যাইতে পারে। ইহাতে 'সোনা' সাধারণতঃ প্রচলিত মুদ্রা হইল না, কিন্তু মুদ্রার ভিত্তিস্বরূপ হইল। শুধু 'রূপা'র মূল্য পরিকল্পিত মান হইতে বেশী না হইলেই যে ইহাকে চালু রাখা হইবে তাহা নয়, আরও কতকগুলি ব্যবস্থা প্রযুক্ত হওয়া দরকার। ইহা বুঝিতে হইলে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ধরা যাক, ইংলণ্ডে "ক" দল ভারত হইতে কিছু জিনিষ আমদানী করে এবং "খ" দল কিছু জিনিষ ভারতে রপ্তানী করে। তেমনই ভারতে "গ" দল ইংলণ্ডের "ক" দলকে জিনিষ পাঠায় এবং "ঘ" দল ইংলণ্ড হইতে ভারতে জিনিষ আমদানী করে "খ" দলের মারফতে। "খ" দলকে ভারতে টাকা পাঠাইতে হইবে, সুতরাং তাহারা তাহাদের দাবীর বিল কোনও এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের নিকট ভাঙ্গাইতে পারে। এই বিল ভাঙানী ব্যাঙ্কগুলি অন্যান্য কাগজপত্র যথা বিক্রীত জিনিষপত্রের দামের তালিকা, (Invoice) তাহাদের জাহাজে পাঠাইবার রসিদ-পত্রাদি (Bill of lading) দেখিয়া ঠিকমত বুঝিয়া সুদের টাকা

১। ইহার অর্থ এই যে, এক দেশের মুদ্রা 'সোনা'তে পরিবর্ত্তিত না হইয়া অন্য দেশের মুদ্রাতে পরিবর্ত্তিত করা হইবে। মুদ্রা প্রচলন-ব্যবস্থার কর্ত্তৃপক্ষ—এক্ষেত্রে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট—একটি ভাণ্ডার রাখেন যাহা অন্য দেশটির মুদ্রাতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এবং উক্ত ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষ 'সোনা' দরকারমত কেনাবেচা না করিয়া পরদেশীয় মুদ্রা কেনাবেচা করেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইহা গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রা—পাউণ্ড ষ্টার্লিং।

কাটিয়া "খ"-কে পাওনা টাকা দিয়া দিল এবং অন্যান্য দরকারী কাগজপত্রের সহিত বিলগুলি ভারতীয় প্রতিনিধির নিকট পাঠাইয়া দিল। যখনই জিনিষগুলি ভারতে পৌঁছিতে পারে জানা গেল, তখনই খবর পাইবামাত্র টাকা ভারতীয় "ঘ" দল চুকাইয়া দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে মালের রসিদ ইত্যাদি লইয়া বন্দর হইতে (অথবা ঐ ব্যাঙ্ককে মাল ছাড়াইবার ক্ষমতা দেওয়া থাকিলে ব্যাঙ্কের গুদাম হইতে) মাল ছাড়াইয়া লইল। ইহাতে "ঘ" কে কোনও 'সোনা'র টাকা ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইল না। পক্ষান্তরে এমনি ভাবে "গ" দলও ভারতে বসিয়াই বিনিময়-ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা পাইতে পারে। বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি এইরূপ ব্যবস্থা সহজেই করিতে পারেন, কারণ যাহা একদলকে দিতে হইতেছে তাহা তাহারা অপর দলের নিকট হইতে লইতেছেন এবং একযোগে "ক" ও "খ" ও অপর দেশে "গ" ও "ঘ" দলকে নিজের নিজের দেশের টাকার দাম দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন—"খ" দলের নিকট বিল লইয়া ভারতে "ঘ" দলের নিকট টাকা আদায় হইতেছে এবং "গ" দলের নিকট বিল লইয়া ইংলণ্ডে "ক" দলের নিকট টাকা উশুল হইতেছে। যদি আমদানীর পরিমাণ উভয়ক্ষেত্রে রপ্তানীর সমান হয় তাহা হইলে সোনা একেবারেই পাঠাইতে হইবে না, কিন্তু যদি আমদানী ও রপ্তানী সমান না হয় তাহা হইলে এক দেশকে অপর দেশে সোনা পাঠাইতে হইবেই। সুতরাং সোনা পাঠাইবার খরচ বাবদ বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি কিছু পাওনা ধরিয়া লইবেন। এই হেতু যদি ১৲ টাকার বিনিময়-হার ১ শিলিং ৪ পেনি হয় তাহা হইলে ভারত হইতে পণ্যদ্রব্য বেশী রপ্তানী হইলে অর্থাৎ ইংলণ্ড হইতে সোনা পাঠান দরকার হইলে ১৲টাকার মূল্য, সোনা পাঠানো খরচ পর্য্যন্ত বেশী হইতে পারে এবং ভারত হইতে সোনা পাঠানো দরকার হইলে ১৲ টাকার মূল্য, সোনা পাঠানো খরচ পর্য্যন্ত কম হইতে পারিবে, সুতরাং ১৲ টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪$\frac{1}{8}$ পেনি হইতে ১ শিলিং ৩$\frac{2}{3}$ পেনি পর্য্যন্ত কমবেশী হইতে পারে। স্বর্ণস্বরূপ মানে সোনার ব্যবহার যত কম করা যায় তাহার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৯৯ সালের কমিটি যদিও 'সোনা'র টাকশালের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। ১৯১৩ সালে চেম্বারলেন কমিশন 'সোনা'র পরিমিত ব্যবহারে সন্তোষই প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত পুরানো ব্যবস্থা অনুসারে সোনার পরিবর্ত্তে টাকা দিতে গবর্ণমেণ্ট সকল সময় বাধ্য ছিলেন, কিন্তু টাকার পরিবর্ত্তে সোনা (বিশেষতঃ স্বদেশীয় বিনিময়-ব্যবহারের জন্য) দিতে সরকারের তরফে কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না। উক্ত স্বর্ণমান ব্যবস্থাযুক্ত দেশগুলিতে বিনিময়-হার ঠিক রাখিতে হইলে মুদ্রার পরিবর্ত্তে সোনা লইয়া পাঠানোর যেমন সুবিধা এখানে সে ব্যবস্থা রহিল না। ভারত হইতে ব্রিটেনে রেলওয়ে প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য যে টাকা দেনা করা হইয়াছিল তাহার সুদ, ব্রিটিশ অফিসারগণের পেনসন প্রভৃতি বাবদ বাৎসরিক প্রায় ৪৫ কোটি টাকা পাঠান দরকার হইত; সুতরাং সাধারণতঃ যে বিনিময়-হার ঠিক করা হইল দেখা গেল তাহা চালু রাখার জন্য ভারত হইতে ব্রিটেনে রপ্তানী আমদানী অপেক্ষা বেশী হওয়া দরকার; তাহা যদি না হয় এবং সোনা চাহিদামত পাইবার ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহা হইলে বিনিময়-হার টিকিবে কি করিয়া? বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি হয়ত আগাম দিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে ঐ হার যথেচ্ছ কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহার ফলে ১৲ টাকায় ১২ পেনি হইয়া যাইতে পারিত এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও অচল হইয়া যাইত। সোনারও যথেচ্ছ ব্যবহার না হয় অথচ বিনিময়-হার ঠিক থাকে এ উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট দরকারের সময় নিয়মিত হারে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য সোনা বিক্রয়ের পরিবর্ত্তে (Reverse Council Bill) বিপরীত উপায়ে দাবীর আদায়ী কাগজ যাহাতে বিক্রয় করেন তাহার ব্যবস্থা হইল।২ যখন রপ্তানী বেশী হয় তখন ব্রিটেনে ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মসচিব (Secretary of Sate for India) দাবীর আদায়ী কাগজ (Council Bill) সেখানে বিক্রয় করিবেন এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্ব উদাহরণ মত "ক" "খ"এর রপ্তানী অপেক্ষা বিলাতে বেশী জিনিষ আমদানী করিল। সুতরাং তাহার দামের জন্য কাউন্সিল বিল সোনা বা সেখানকার প্রচলিত মুদ্রা দিয়া ক্রয় করিয়া ভারতে "গ"এর নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল এবং "গ" তাহা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট ভাঙ্গাইয়া টাকা পাইল। কাউন্সিল বিল বাবদ প্রায় ৪৫৲ কোটি টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া গেলে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মসচিব ভারতের দেনা পরিশোধকল্পে তাহা ব্যয় করিতে পারেন। তদপেক্ষা বেশী বিক্রয় করিতে হইলে তাহা ভাবী প্রয়োজনে ব্রিটেনের ভারতীয় স্বর্ণভাণ্ডারে জমা থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। অপর পক্ষে যদি ভারতে "গ"এর রপ্তানী "ঘ"এর আমদানী অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে ভারত গবর্ণমেণ্ট টাকার পরিবর্ত্তে রিভার্স কাউন্সিল বিল বিক্রয় করিবেন এবং "ঘ" তাহা "খ"এর নিকট পাঠাইয়া দিলে ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মসচিবের (Secretary of State) নিকট ভাঙ্গাইয়া গ্রেট ব্রিটেনে সোনা অর্থাৎ জিনিষের দাম পাইয়া যাইবেন। এই নিমিত্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মসচিবের তত্ত্বাবধানে একটি স্বর্ণভাণ্ডার স্থাপিত হইল। টাকায় রূপার অংশ এবং দাম মুদ্রার তুলনায় খুব কম থাকায় লাভের অংশ হইতে এবং কাউন্সিল বিল বিক্রয় হইতে এই ভাণ্ডারটির সৃষ্টি হইল। এই ভাণ্ডারটি কেবল নব-প্রবর্ত্তিত মুদ্রাবিনিময় হার ঠিক রাখিবার জন্যই খোলা হইল

২। অসুবিধা না হইলে সভরেন বিক্রয় করিতে পারিবেন ইহাও ব্যবস্থা ছিল।

এবং ইহার সঞ্চিত অর্থ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ব্যয়িত হইত না। কেবলমাত্র একবার ১·৬৫ কোটি টাকা রেলওয়ের জন্ত খরচ করা হইয়াছিল। ১৯২২-২৩ সাল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠিত হওয়া পর্য্যন্ত ৪০ মিলিয়ন পাউণ্ডের অতিরিক্ত অর্থ গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের সহিত যুক্ত হইত। তাহা হইলে বুঝা গেল এই স্বর্ণস্বরূপ মানের দুইটি প্রধান আবশ্যক উপাদানে৩ "টাকার" রূপার মূল্য বিনিময়-মূল্য হইতে বেশী হওয়া চলিবে না;৪ এবং যেহেতু যথেষ্ট "সোনা" আহরণের ব্যবস্থা নাই সুতরাং সাধারণতঃ ভারতের রপ্তানী বেশী হওয়া দরকার। গবর্ণমেণ্টের নিকট বিদেশী মুদ্রা বিক্রয় করিবার যথেষ্ট সামর্থ্য না থাকিলে মুদ্রাবিনিময় হার বজায় রাখা সম্ভব নয়।

১৯১৪ সনের বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথম সর্ত্তটি ভাঙিয়া যায়; তখন রূপার মূল্য এত বেশী হইয়া গেল যে "টাকা"র রূপা ১ শিলিং ৪ পেনি অপেক্ষা বেশী দামী হইল এবং বিনিময়-হার ৩ শিলিং ৪ পেনি পর্য্যন্ত বাড়িয়া গেল। ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মসচিব তখন প্রভূত পরিমাণে কাউন্সিল বিল বিক্রয় করিতেছিলেন এবং ভারতের রপ্তানীকারীদিগকে টাকা দিবার নিমিত্ত প্রচুর রূপার টাকার ব্যবস্থা আমেরিকা হইতে রূপা আমদানী করাইয়া করিয়াছিলেন এবং বিনিময়-হার বাধ্য হইয়া বাড়াইতেছিলেন। এইজন্য ১৯২০ সালে বেবিংটন স্মিথ কমিটি বিনিময়-হার ২ শিলিঙে স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রূপার দাম হঠাৎ কমিয়া গেল এবং সমস্ত ব্যবস্থাও ভণ্ডুল হইল। পুনরায় হিলটন ইয়ং কমিশন নিযুক্ত হইল, ১৯২৬ সনে উক্ত কমিশনের মতামত প্রকাশিত হইল। ইহার পূর্ব্বে যে মুদ্রামান ছিল তদনুসারে ভারতের মুদ্রাকে গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রাতে যথেচ্ছ পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভারতের রাষ্ট্রীয় সচিবের স্বর্ণভাণ্ডার অধিকাংশই কোম্পানীর বা গবর্ণমেণ্টের কাগজে লগ্নী করা ছিল। দরকার হইলে ইহা ভাঙ্গানোর অসুবিধা ছিল না। নূতন কমিশন গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রার সহিত সম্বন্ধ ঠিক রাখিলেন না অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রার পরিবর্ত্তে গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রা দিবার যে রীতি চালু ছিল তাহা বজায় না রাখিয়া নব মুদ্রানীতির প্রবর্ত্তন করিলেন। তদনুযায়ী নির্দ্ধারিত হইল যে, ভারতীয় মুদ্রামান স্বর্ণমানই, কিন্তু প্রচলিত মুদ্রা টাকাই থাকিবে। ঐ টাকাটা রূপার না হইয়া যদি কাগজের হয় তাহা হইলে, যেমন গ্রেট ব্রিটেনে স্বর্ণমান থাকা সত্ত্বেও "পাউণ্ডে"র নোট আছে—তেমনি "টাকা"কে ৮·৪৭ গ্রেন "সোনা" ধরা হইলে ১৩·৩৭ টাকায় এক পাউণ্ড (£) হইবে। ইহার ফলে পূর্ব্বোল্লিখিত অসুবিধাসমূহ আর রহিল না অর্থাৎ অন্যান্য দেশের ন্যায়, দরকার হইলে টাকার পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সোনা কিনিবার ব্যবস্থা হইল—তবে স্থির হইল যে তাহা সাধারণতঃ ৪০০ আউন্স অপেক্ষা কম হইবে না। এই ব্যবস্থা অনুসারে গ্রেট ব্রিটেনের সহিত বিনিময়-হার ১৲ টাকায় ১ শিলিং ৬ পেনি নির্দ্ধারিত হইল। গবর্ণমেণ্ট ১৯২৭ সনের মুদ্রাবিষয়ক আইনে এই নির্দ্দেশ অনুযায়ীই ব্যবস্থা করিলেন, তবে ক্ষেত্রবিশেষে সোনার পরিবর্ত্তে অন্য দেশীয় মুদ্রা বিক্রয়-ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত হইল। কার্য্যতঃ কিন্তু ইহা বেশী দিন বলবৎ রহিল না, কারণ ১৯৩১ সনে গ্রেট ব্রিটেনে স্বর্ণমান উঠিয়া গিয়া বিধিবদ্ধ মুদ্রামান প্রবর্ত্তিত হইল। অপর পক্ষে ভারতের সহিত ব্রিটেনের পূর্ব্বোল্লিখিত সুদ ইত্যাদি দেয় টাকা লইয়া একটি অর্থনৈতিক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল বলিয়া কেবল "সোনা" না দিয়া ঐ দেশের মুদ্রা দেওয়াই বেশী সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইল, কেন-না সে দেশের মুদ্রার মূল্য তখন কমিয়া গিয়াছে এবং "সোনা" দিয়া দেনা শোধ করিতে গেলে ভারতের অনর্থক ক্ষতি হইত। এই সমস্ত কারণে ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব্বের ন্যায় ১ শিলিং ৬ পেনি হারই বহাল রাখিয়া গ্রেট ব্রিটেনের ষ্টার্লিঙের সহিত ভারতীয় মুদ্রার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল এবং তাহা আইনতঃ বলবৎ হইল।

এখন পর্য্যন্ত মোটের উপর এই ব্যবস্থাই চালু আছে, কেবল দুই-একটি নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯৩৪ সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক্ট দ্বারা গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রা কেনাবেচার ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর বর্ত্তিয়াছে। ভারতেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের "টাকা"র পরিবর্ত্তে "ষ্টার্লিং" বিক্রয় এবং ষ্টার্লিঙের পরিবর্ত্তে "টাকা" বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।৫ কাউন্সিল বিল বা রিজার্ভ কাউন্সিল বিক্রয়ের প্রথা উঠিয়া গিয়াছে এবং বিক্রীত মুদ্রা সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ডনে "বিলি" করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্বর্ণভাণ্ডার এবং তাহার সহিত অন্যান্য ভাণ্ডার রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরই অধীন হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দুইটি বিভাগ আছে—একটি ব্যাঙ্কিং বিভাগ ও অপরটি "নোট" প্রচলন বিভাগ। ব্যাঙ্কিং বিভাগই বিদেশী মুদ্রা কেনাবেচার ভার লইয়াছে এবং দরকার হইলে নিম্নোক্ত তিন রকমের ভাণ্ডার হইতে টাকা সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতে পারে।

(১) বিদেশে লগ্নী করা ষ্টার্লিং—ইহা গ্রেট ব্রিটেনেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে লগ্নীকৃত থাকে; (২) ইহা অপ্রচুর হইলে "নোট" প্রচলন বিভাগ হইতে "সোনা" বা ব্রিটেনের মুদ্রার লগ্নী করা কাগজ আগাম লইতে পারে; (৩) তাহাতেও সঙ্কুলান না হইলে বিলাতের মুদ্রায় ঋণ তুলিতে পারে।

৩। অধিকাংশই, আর উৎপাদনকারী কাগজে লগ্নীকৃত থাকিত।

৪। ১৯১৮ সালের Pittman Act অনুসারে ২০০ মিলিয়ন আউন্স রৌপ্য বিক্রয় করিয়াছিল।

৫। ষ্টার্লিং (অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের চলিত মুদ্রা যাহা এখনও বিধিবদ্ধ মুদ্রামাত্রই আছে) বিক্রয় করার দর সব চেয়ে কম ১ শিলিং ৫$\frac{৪৯}{৬৪}$ পেনি টাকা প্রতি এবং "টাকা" বিক্রয় দর সব চেয়ে বেশী ১ শিলিং ৬$\frac{৩}{১৬}$ পেন্স টাকা প্রতি।

ইতিপূর্ব্বে টাকায় যে "রূপা" থাকিত ১৯৪০ সনে তাহা আরও কমাইয়া দিয়া অর্দ্ধেক রূপা ও অর্দ্ধেক খাদ (½ তোলা বা ৯০ গ্রেন প্রত্যেক অংশে) করা হইয়াছিল। কিছুকাল হইল "টাকা" যে একেবারেই রূপাবিবর্জ্জিত হইয়াছে এ কথা সকলেরই জানা আছে। যে কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুদ্রামান ভাঙ্গিয়া যায় এখন সে অঘটনের আশঙ্কা আর রহিল না।

গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রার সহিত এইরূপ ভারতের "টাকা"র সম্বন্ধ অনেকের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ দেশীয় বাণিজ্যের তুলনায় অনেক কম, সুতরাং বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সর্ব্ববিধ মুদ্রানীতিই অন্য দেশের মুদ্রানীতির সহিত জড়িত থাকাটা যে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর এ ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর—গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রাস্ফীতি অপেক্ষা ভারতের মুদ্রাস্ফীতি অনেক বেশী হইয়াছিল, সুতরাং মোটামুটি হিসাবে এখানকার মুদ্রামূল্য অপেক্ষাকৃত কম হওয়াই ছিল সঙ্গত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে মুদ্রার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনিতে আবদ্ধ থাকায় তাহা আশানুযায়ী হ্রাস প্রাপ্ত হইল না।৬ এই নূতন ব্যবস্থায় যাঁহারা আশ্বাস্বিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের মত এই যে, মুদ্রার মূল্য যদি একান্তই বাঁধিয়া দিতে হয় তাহা চিরকালের জন্য না করিয়া কিছু দিন অন্তর অন্তর তথ্যানুসন্ধান পূর্ব্বক যাহাতে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করা যায় সেই দিকে অবহিত হওয়া উচিত।

যাহা হউক, ভারতও আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডারের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায় কতগুলি নূতন নিয়মের অধীন হইয়াছে। ভারতকে ঐ ভাণ্ডারে ৪০০ মিলিয়ন ডলার রাখিতে হইয়াছে। ঐ ভাণ্ডারের নিয়ম অনুসারে সদস্য শ্রেণীভুক্ত দেশসমূহের স্ব-স্ব মুদ্রা থাকা দরকার—সুতরাং এই ব্যবস্থার দরুন ভারতের মুদ্রাও গ্রেট ব্রিটেনের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিল না—এই নীতি অনুসারে ১৯৩৪ সনের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক্টের ৪০ ও ৪১ ধারা ১৯৪৭ সনে বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। "টাকা"র মূল্য ১৯২৭ সনের মুদ্রাবিষয়ক আইনের ন্যায় "সোনা"র নির্দ্দিষ্ট ওজনের৭ মূল্যের সমান ধরা হইবে এবং তদনুসারে অন্য দেশের মুদ্রার সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিবে। "টাকা" পূর্ব্বের ন্যায় চলিত মুদ্রাই রহিল, সুতরাং ভারতের পক্ষে আমদানী রপ্তানী করা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে গবর্ণমেন্টের মারফতে বা অন্য লগ্নীকরা "কাগজ"পত্রের দ্বারা সোনা কেনাবেচাই সুবিধাজনক। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারে এইরূপ নানা দেশের কাগজাদি কিনিয়া রাখার ব্যবস্থাও আছে। আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রা ষ্টার্লিং (প্রতিবার ন্যূনাধিক ১০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের) কেনাবেচা করিতে পারিত; এখন তাহার যে কোনও দেশের মুদ্রা ন্যূনাধিক ২ লক্ষ টাকা মূল্যের, ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষমতা রহিল। ইহাতে যদিও আইনের দিক দিয়া কিছু প্রভেদ হইল এবং ভারতের নিজস্ব মুদ্রাও হইল, তথাপি কার্য্যতঃ বিশেষ তফাৎ হওয়ার সম্ভাবনা কিছুকালের জন্য কম, কারণ গ্রেট ব্রিটেনে ভারতের যে "ষ্টার্লিং" মজুত আছে তাহা দ্বারা সে অন্যান্য দেশের মুদ্রা কিনিবার অধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে নূতন করিয়া অন্য দেশের মুদ্রা কিনিবার ক্ষমতালাভের বিশেষ সম্ভাবনা নাই। এই ব্যবস্থায় পূর্ব্বাপেক্ষা একটু পৃথক দরে গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রা কেনাবেচা হইবে—সর্ব্বোচ্চ মূল্য ১ শিলিং $6\frac{3}{16}$ পেনি ও সর্ব্বনিম্ন মূল্য ১ শিলিং $5\frac{49}{64}$ পেনি। বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্টের বিধি-নির্দ্দেশের ক্ষমতা থাকিবে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

৬। হিল্টন ইয়ং কমিশনের সুপারিশ ক্রমে ১৯২৭ সনের আইন ও ১৯৩১ সনের গবর্ণমেন্টের আদেশ অনুসারে।

৭। আমেরিকার এক ডলার সমান এখন ১৫'২৩ গ্রেন থাকে। ৩৩০৮৫২ 'রুপি'; ডলার ২৫ ৮ গ্রেন 'সোনা' থাকিত।

তারা ও আমরা

শ্রীনীলরতন দাশ

যুগে যুগে যারা করিল মোদের মুক্তির সন্ধান,
মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত তারা বিদ্রোহী সন্তান।
সাবধানী মোরা সভয়ে যখন প্রচারি শান্তিবাদ,
অগ্নিমন্ত্রে তাহারা তখন নির্ভীক উন্মাদ,
মোরা যবে খুঁজি আরামশয্যা, নিরাপদ গৃহকোণ,
শান্তির নীড় স্নেহের কুটীর পিতামাতা ভাইবোন,—
তাহারা তখন ছাড়িয়া স্বজন পথে পথে বাঁধে ঘর,
দুর্গম পথে দুর্য্যোগ সাথে চলে যে নিরন্তর!
আমরা যখন মুক্ত আলোতে বিলাসে আত্মহারা,
তাহারা তখন করে যে বরণ অন্ধকারের কারা।
আমরা আরামে ভোগের পাত্র ভরি নানা উপচারে,
তিলে তিলে প্রাণ তারা করে দান অনাহারে কারাগারে।

মোরা যবে পরি দাসত্ব-বেড়ী, তারা ভাঙে শৃঙ্খল;
রুদ্ধদুয়ারে থাকি যবে মোরা, তারা খোলে অর্গল।
মোদের মুক্তি-পাত্রখানিকে ভরে দিতে সুধা-ধারে
সকল রকমে রিক্ত যে তারা করে দেয় আপনারে।
মোদের আকাশে দেখিবার আশে নূতন সূর্য্য-ভাতি
জাগিয়া তাহারা কাটায় যে কত অমাবস্যার রাতি!
আমাদের লাগি সোনার ফসল ফলাইতে তারা হায়,
রক্তশোণিতে সিক্ত করে যে ঊষর মৃত্তিকায়!

আমাদের গৃহে জ্বলেছে দীপালি, টুটিয়াছে বন্ধন;
অগ্নিসাধক তারা সে আলোর যোগায়েছে ইন্ধন।
মোদের ভাগ্য-আকাশে আজিকে নূতন সূর্য্যোদয়,
যারা এনে দিল আলোর জোয়ার, গাহি তাহাদের জয়!

বাংলার শিশু-সাহিত্য

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

এখানকার ছেলেমেয়েরা একবার তাহাদের সাহিত্যসভায় একজন প্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল। তিনি ছিলেন তাহাদের সভাপতি। সভা ভঙ্গের পর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন : উনি কে? উত্তর দেওয়া হইল : উনি প্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত—। প্রশ্নকর্ত্তা একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন : শিশু-সাহিত্যিক! চুলে ত পাক ধরেছে দেখছি, কিন্তু এখনও ওর শিশুত্ব ঘুচল না।

কেবল ওই প্রশ্নকর্ত্তাই নয়, আমাদের দেশের অনেকেরই ধারণা,—শিশু-সাহিত্যিকরাই ক্রমে হাত পাকিলে বড়দের সাহিত্যিক হয়। শিশু-সাহিত্যিকরা কৃপার পাত্র, কারণ তাঁহারা শিশুদের জন্য নগণ্য রূপকথা, কবিতা, গল্প—এই সব লেখেন। তাঁহারা যাহা লেখেন, তাহাতে খুব পড়াশুনা বা ধীশক্তির প্রয়োজন হয় না; এক কথায় তাঁহারা বড়দের জন্য লিখিতে না পারিয়াই শিশুদের লেখক হন।

কিন্তু শিশু-সাহিত্য নারিকেলের মত নয় যে, কচিতে উহা ডাব এবং পরে উহা ঝুনায় পরিণত হইবে। শিশু-সাহিত্য চিরকাল শিশু-সাহিত্যই থাকে—উহা বড়দেরও পাঠ্য হইতে পারে, তবে তাহা ক্রমোন্নতির ফল নয়। প্রকৃত শিশু-সাহিত্য লেখা কৃতিত্বের পরিচয়। শিশুর মন জানিতে না পারিলে কখনও শিশু-সাহিত্যিক হওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের মন ছিল চিরতরুণ, চিরসুন্দর, তাই তিনি বৃদ্ধ বয়সেও শিশুদের জন্য সাহিত্য রচনা করিতে পারিয়াছিলেন।

শিশু-সাহিত্য যাঁহারা সৃষ্টি করেন, তাঁহারা বড়দের জন্যও যে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিবেন না এমন কোন কথা নাই; পক্ষান্তরে বড়দের সাহিত্যিক হইলেই যে তিনি অতি সহজে শিশুদের জন্য লিখিতে পারিবেন ইহা মনে করা ভুল।

শিশু-সাহিত্য ও শিশু-সাহিত্যিকদিগের সম্বন্ধে আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোকেরও ধারণা সুস্পষ্ট নয়। ইহা অতীব দুঃখের বিষয়।

শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎ পুরুষের জন্য যাঁহারা সাহিত্য রচনা করেন, তাঁহাদের দায়িত্ব বড়দের সাহিত্য স্রষ্টার দায়িত্ব হইতেও গুরুতর। এইজন্য ইঁহারা বরেণ্য।

শিশুকালে জীবনের আদর্শ, ভাবধারা ও চিন্তা পদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত না করিলে ভাবীবংশীয়েরা দেশকে অবনতির পথেই টানিয়া লইবে। শৈশবে ও বাল্যে প্রতি ঘণ্টায় মানবশিশু যাহা শিখে, প্রাপ্তবয়স্ক কেহ পূর্ণ বৎসরেও তাহা শিখেন না। শৈশবের পেলব মনের বেলাভূমিতে যে চরণ-চিহ্ন পড়ে, কালের গুরুচাপে ক্রমে উহা কঠিন শিলাস্তূপে পরিণত হয় এবং পরবর্ত্তীকালে প্রাক্-যৌবন যুগের সেই 'ফসিল'টিকে বহন করা ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকে না। মনীষী রোলাঁ তাই বলিয়াছেন, "...And average man dies at the age of twenty."

এই বিংশ বৎসরের মধ্যে জীবনকে সে যে দৃষ্টি-ভঙ্গিমায় দেখিল, তাহা ভিন্ন জগতের অপর রূপ তাহার চক্ষে আর পড়িবে না,—ঐ একটি দৃষ্টিভঙ্গীর রোমন্থন চলিবে অবশিষ্ট জীবনে।

শিশু-সাহিত্যের বয়স কত?

সাধারণে উত্তর করিবেন—শিশুর বয়সই বা কত যে তার সাহিত্যের আবার একটা বয়স থাকিবে? এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাণীই উদ্ধৃত করা যাক :

"ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মত পুরাতন আর কিছুই নেই। দেশকাল, শিক্ষা-প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত-সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন-চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন, কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজ-কৃত রচনা।"

শিশু-সাহিত্যও এই দিক দিয়া অতি পুরাতন অথচ চির নূতন।

কিন্তু এই দেশের শিশু-সাহিত্য লিপিবদ্ধ হইল কোন্ সময় হইতে?

বাংলার শিশু-সাহিত্য বলিয়া যাহা পরিচিত, তাহা নিতান্ত আধুনিক। অথচ জগতের প্রথম গদ্য শিশু-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এই ভারতবর্ষে, বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রে। বিদ্যাসাগর বাংলা শিশু-সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন করেন তাঁর "কথামালায়।"

শিশুদের ঊষাযুগে প্রভাত-সূর্য্যের মত কিরণ-সম্পাত করেন শিশুর জননী; কারণ তাঁর সাহচর্য্যেই শিশুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় অতিবাহিত হয়। স্বর্গের নন্দন-চ্যুত এই শিশু-মঞ্জরীটি নূতন করিয়া ধরণীর সঙ্গে রাখীবন্ধন করিতে চায়—নূতন আশা ও রঙীন রথে অজানার পথে তাহার অভিযান। এই রথের কাণ্ডারী কখনও মাতা, কখনও দিদিমা, কখনও ঠাকুরমা বা ঠাকুরদাদা।

বাংলার শিশু-সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই "ছড়া"-সাহিত্যের কথা উঠে।

ছড়ার উৎপত্তির ইতিহাস লোকচক্ষুর অন্তরালে। কোন্ ছড়াটির কে রচয়িতা তাহা বুঝিবার জন্ত পদকর্ত্তা কোনও উপায় রাখেন নাই। বস্তুত এই সকল ছড়ার যেমন সৃষ্টিও নাই, তেমনি লয়ও নাই। একের মুখ হইতে অপরের মুখে এই ছড়া-গানগুলি ভাসিয়া বেড়াইয়াছে তরঙ্গের মুখে তরণীর মত, এবং দোলায়িত তরণীর মতই কণ্ঠ হইতে কণ্ঠান্তরে যাইয়া কালনদীর উত্তাল বীচিভঙ্গকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সম্মুখের পথে ছড়া-তরণী চলিয়াছে। এই ছড়াগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ইহার সরলতা ও স্বতস্ফূর্ত্ততা। সাবলীল ভঙ্গীতে ইহার একের পর আর এক চিত্র আঁকা হইয়া যাইতেছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পূর্ব্ব-গগনে যেরূপ দিগন্তরেখার লালরঙের সহিত মধ্যাকাশের নীলবর্ণের ঠিক বিভেদ-রেখাটির কোনও ঠিকানা মিলে না, এই ছড়াচিত্রগুলিও সেরূপ স্পষ্টসীমার বন্ধনে আবদ্ধ নহে। মেঘে মেঘে মিলাইয়া যাওয়ার মত এই রঙীন ছবিগুলি একের সহিত অপরটি নিঃশেষে মিলাইয়া যায়। অর্থের বন্ধনে কঠিন পৃথিবীর সহিত ইহারা সর্ব্বদা যুক্ত নয়, অর্থভারহীনতা ও অসঙ্গতির যুক্ত পক্ষে ভর করিয়া ধরণীর ধূলিস্পর্শ হইতে বহু ঊর্দ্ধে উন্মুক্ত উদার আকাশে এই ছড়ার বিচরণ!

"আসন পিঁড়ি পান পিঁড়ি আয় রঙ্গ রাধা,
হলুদ-বনে কলুদ ফুল, তারা নামে টগর ফুল;
আয়রে তারা হাটে যাই, প্যান গুয়োটা কিনে খাই,
কচি কুমড়োর ঝোল্,
ওরে জামাই গা তোল্!"

ছড়াটির বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, কোনও ছত্রটির সহিত কোনও ছত্রটির সামঞ্জস্য নাই; সামান্ত শব্দ-সাযুজ্য অথবা অর্থ-সামঞ্জস্যে এক দৃশ্য হইতে অনায়াসে অপর দৃশ্যটির আবির্ভাব হইতেছে। হাটে গিয়া সর্ব্বপ্রথমেই পান কিনিয়া খাইতে দেখিলে আমরা যতটা আশ্চর্য্যান্বিত না হইব, ততোধিক হইব তাম্বুল ভক্ষণান্তে কচি কুমড়োর ঝোলের প্রসঙ্গে; তাহাও যদিবা সহ্য হয়—ইহার মধ্যে সহসা জামাইয়ের গাত্রোত্তোলনের কথা আসিল কোন্ সূত্রে? এইরূপ অর্থহীন কবিতাটিতে যদি কবি একটু অনুপ্রাসের অবতারণা করিলেন অমনি আসিয়া জুটিল "বটানী" বহির্ভূত এক সৃষ্টিছাড়া শব্দ "কলুদ-ফুল"!

এইরূপ কতকগুলি ছড়া আছে যাহার কোনই অর্থ হয় না; এগুলি সম্পূর্ণ ঘুম-পাড়ানী গান।

"ইচিং বিচিং জামাই কিচিং
তায় প'ল্লো মাকড় বিচিং!
মাকড়েরা নড়ে চড়ে;
এলের পাত, চেলের পাত,—
ঠাকুর দিলেন জগন্নাথ!"

এমনই ঘুমপাড়ানী গানের নৌকায় মায়ের কোলে খোকাবাবু যখন ধীরে ধীরে স্বপ্নরাজ্যের কুহেলিকায় পাল তুলিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলিয়াছেন তখন ঐ ছড়ার তরণীতে যদি অর্থভার চাপাইয়া দেওয়া যায় তবে খোকনবাবুর ময়ূরপঙ্খীর তো ভরাডুবি হইবেই!

"প্রাচীন ঋগ্বেদ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের স্তবগান উপলক্ষ্যে রচিত—আর মাতৃহৃদয়ের যুগলদেবতা খোকাখুকুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি।" (রবীন্দ্রনাথ)

সত্যই মুগ্ধ-হৃদয় বন্দনাকারিগণ যুগে যুগে এমনি ছড়ার ডালি সাজাইয়া যজ্ঞ-দেবতার চরণে অঞ্জলি দিয়াছেন, যে দেবতারা মায়েদের শিবপূজার বেলা "ইচ্ছা হয়ে" মনের মন্দিরে আপনার পাদপীঠ রচনা করিয়াছিল! সে স্নেহাঞ্জলির সাহিত্যকুসুমে অর্থের কীট বাসা বাঁধে নাই, যুক্তির ক্লেদ স্পর্শ করে নাই।

তাহার পর ছড়ার মিষ্ট তরলতার মাঝে স্নেহের সূত্রটিকে অবলম্বন করিয়া অর্থ দানা বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। চাঁদামামার টিপের পরিবর্তে মাছের মুড়ো, ধানের কুঁড়ো, কাল গরুর দুধ ও দুধ খাইবার বাটি ঘুষ দিবার প্রস্তাব হইতে লাগিল। "খাদু এত বড় রঙ্গ" নামে যে ছড়াটি প্রচলিত তাহার অর্থসামঞ্জস্য, শব্দ-বৈচিত্র্য ও পরিণতি (climax) লক্ষ্য করিলে এই ছড়াগুলিকে আর প্রলাপ-পর্য্যায়ে ফেলা চলে না।

"দোল দোল দোলুনি, রাঙ্গা মাথায় চিরুণী
বর আস্‌বে এখনি, নিয়ে যাবো তখনই
কেঁদে কেন মরো।
আপনি বুঝিয়া দেখো কার ঘর করো॥"

কবিতার শেষ ছত্রের ইঙ্গিতটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। আর একটি ছড়ার উল্লেখ না করিয়া এই ছড়া-প্রসঙ্গ সমাপন করিতে পারিতেছি না।

"ও পারেতে কালো রঙ বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকটুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে॥
এ মাসটি থাকো দিদি কেঁদে ককিয়ে
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্কী সাজিয়ে।"

এই প্রবাসী অজ্ঞাতনাম্নী মূর্খ মেয়েটির প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "সম্প্রতি যাঁহারা বঙ্গভাষার বিশুদ্ধি-রক্ষাব্রতে ভাষাগত প্রথা এবং পুরাতন সৌন্দর্য্যগুলিকে বলিদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ভরসা করি তাঁহারাও মাঝে মাঝে স্নেহবশতঃ আত্মবিস্মৃত হইয়া ব্যাকরণ লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভগিনীকে ভাই বলিয়া থাকেন,...সে হতভাগিনী স্বপ্নেও জানিত না তাহার সেই একদিনের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনধ্বনির সহিত এই ব্যাকরণের ভুলটুকুও জগতে চিরস্থায়ী হইয়া যাইবে। জানিলে লজ্জায় মরিয়া যাইত"

বিশ্বের ঘরে ঘরে মাতৃস্নেহের পুণ্য গঙ্গোদকে শিশুদেবতার অঞ্জলিরূপে যে ছড়াগুলির সৃষ্টি হইয়াছে, জগতের সাহিত্যে তাহা সৃষ্টির প্রথম শিশুর মতই অপরিবর্তনীয় পুরাতন, আবার সেই শিশুর মতই নিত্যনবীন। বিশ্বের nursery rhyme হইতে বাংলা ছড়ার এইমাত্র বৈশিষ্ট্য যে, "শিশুদেবতার অতি অদ্ভুত অসঙ্গত অর্থহীন চালচিত্রের মধ্যেই স্বর্গের দেবতা কখন অলক্ষিতে শিশুর সহিত মিশিয়া আপনি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।" (রবীন্দ্রনাথ)

ছড়াসাহিত্যের পরেই রূপকথার আসন, শিশুসাহিত্যের রাজসভায় মন্ত্রীর আসনের পরে কোটালের আসনের মত। অসঙ্গতি ও অভাবনীয়তা রূপকথারও প্রধান গুণ। আবার প্রত্যেকটি রূপকথার সহিত প্রত্যেকটির কিছু না কিছু সামঞ্জস্য থাকিয়া যায়। একই রাজপুত্র-রাজকন্যা, মন্ত্রী-কোটাল-সওদাগর-পুত্র, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, পক্ষীরাজের সমাবেশে ; একই দুয়োরাণীর ব্যথা ও সুয়োরাণীর হিংসায়, একই রাক্ষসের হাঁউ-মাউ-খাঁউ ধ্বনিতে সকল গল্পই পরিপূর্ণ। কিন্তু তবুও সেখানে চৌর্য্যাপরাধের বিরুদ্ধে কেহ পুলিস, ডিটেক্‌টিভ্ মোতায়েন রাখে নাই। "এক যে ছিল রাজা" বলিলে কেহ প্রশ্ন করে না, রাজার কি নাম, কোথায় রাজা, কোন্ শতাব্দীর রাজবংশ ? কিন্তু এই প্রশ্নহীনতা কৌতূহলের অভাববশতঃ নয়—পরমুহূর্তেই প্রশ্ন হয় "তারপর ?" এই তারপরের রথে গল্প পক্ষীরাজের মতই উদ্দাম গতিতে আগাইয়া চলে। সেখানে সর্পদংশনে মৃত মোবারকের পুনর্জীবনের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে উপসংহারে দিদিমাকে কলম ধরিতে হয় না ; সেখানে আনন্দের মঠ রচনা করিতে হইলে ইতিহাসের পাতা খুলিয়া সন-তারিখ সমেত সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বিবরণে মুখবন্ধে সমালোচকের মুখ বন্ধ করিতে হয় না। সেখানে সবাই জানে সোনার কাঠি, রূপার কাঠির গুণ—সবাই জানে রাজকন্যার হাসিতে ফোটে মাণিক, কান্নায় ঝরে মুক্তা।

রূপকথার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, যুগে যুগে মানুষ শিশুর রূপ ধরিয়া জননীর ক্রোড়ে ফিরিয়া আসে, বারে বারে একই কাহিনী তাহারা শুনে, সন্ধ্যাপ্রদীপের স্থির শিখাটির পার্শ্বে চুপ করিয়া গালে হাত দিয়া—তাহারা যখন রাজপুত্রের গল্প শুনে তখন অজ্ঞাতসারেই তাহারা রাজপুত্রের সহিত আপনার বৈষম্যটি হারাইয়া ফেলে। আপন মনে তাহারাও যেন রাজপুত্রের মতই পক্ষীরাজের পিঠে নীল আকাশের বুকে অভিযানে বাহির হয় ;—অচিনপুরের বন্দিনী রাজকন্যাকে পাষাণকারার বাহিরে আনিতেই হইবে।

"এইটেই হচ্ছে মানুষের সব গোড়ার রূপকথা, আর সব শেষের। পৃথিবীতে যারা নতুন জন্মেছে, দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জয়, আর ছোট্ট মানুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করছে বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব।" (রাজপুত্তুর—রবীন্দ্রনাথ)

সংসারের বুকে বারে বারে মায়ের কোল আলো করিয়া এমনি রাজপুত্তুরের দল সাতরঙা আশায় রঙীন মন লইয়া আশ্রয় লয় যেন রামধনু-রঙের প্রজাপতির ঝাঁক। রাজকন্যার সন্ধান মিলে, হয়তো কুচবরণ কন্যা না হইয়া বাস্তবে মেঘবরণ কন্যাই দেখা দেয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাজপুত্রের বাধা কিছু কমে না। সামনে থাকে তেমনি সাত-সমুদ্দুর, স্বপ্নের ঢেউ তোলা সুবিস্তৃত নীল ঘুমের মত, রাক্ষসের দল টিকুজি-কুষ্ঠী-জাত ও বরপণের পাষাণ-প্রাচীর তুলিয়া রাজকন্যাকে সুদুর্লভ করিয়া রাখে। তেমনি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা উপেক্ষা করিয়া রাজপুত্র অগ্রসর হন, কিন্তু বাস্তবের রূপকথাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় বিয়োগান্ত। সমাজপতি ও অভিভাবকদের হাঁউ-মাউ-খাঁউ-এর মধ্যে রাজপুত্রের ক্ষীণ কণ্ঠের প্রতিবাদ ডুবিয়া যায়, রাজকন্যার হাসিতে মাণিক ফোটে না, শুধু কান্নাতেই মুক্তা ঝরিতে থাকে। দক্ষিণারঞ্জনের "ঠাকুর মার ঝুলি"তে, অবনীন্দ্রনাথের "ক্ষীরের পুতুলে" এমনি রাজপুত্রের কাহিনী শিশু-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

অদ্ভুত গল্প বলিতে বলিতে শেষ ছত্রে আসিয়া সহসা শ্রোতাকে জানান হয় যে "এটি একটি স্বপ্নকাহিনী", বিশ্বের শিশু-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধারা। এলিসের আজবদেশের অভিযানে, কঙ্কাবতীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এমনই স্বপ্নরাজ্যের খবর পাই। "হ-য-ব-র-ল" গল্পও ঐ ভাবে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

সংসারের স্বাভাবিক নিয়মগুলিকে বিপরীত ভাবে দেখিতে শিশুমনের ভারি একটি আনন্দ। ইচ্ছা-ঠাকরুণের বরে যখন সুবলচন্দ্র সুশীলচন্দ্রের অনুকরণে "ড্যাং-গুলি" খেলিতে গিয়া ভূশয্যা গ্রহণ করেন তখন শিশুর দল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। খাণ্ডি বুড়ীর কালনাবাসী দিদি শাশুড়ীদ্বয়ের আচরণে আনন্দিত হয় নাই এরূপ বাঙালী-শিশু বিরল। কাহিনীর সমষ্টি বলিয়াই সুকুমার রায়ের "আবোল-তাবোল" সৃষ্টিছাড়া হযবরল ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখাগুলি অমর হইয়া আছে।

ইহার পরই আসে শিশু-সাহিত্যের তৃতীয় ভাগের কথা—কিশোর সাহিত্য। শিশু ক্রমে নিজেই বই পড়িতে শিখিল। পারিপার্শ্বিকের বাতাবরণে এখন আর সে সেই চিরসরল চিরনবীন শিশুটি নাই। সামান্য বস্ত্রখণ্ডকে খোকা করিয়া দুধ খাওয়াইবার মত চিন্তার প্রসারতা ও মনের সারল্য সে হারাইয়াছে। গল্পের ভিতরে আসিয়াছে অর্থের অনুসন্ধান, এ্যাডভেঞ্চারের ইচ্ছা, বাস্তবের দুর্জয়কে জয় করিবার বাসনা। যুগ-শিক্ষার হাওয়ায় সে বুঝিতে শিখিয়াছে রাক্ষস-পরিবেষ্টিত রাজকন্যা কল্পনামাত্র, কিন্তু ক্যানিবলে-ঘেরা আফ্রিকার হীরক-

খনি আরও বাস্তব। পক্ষীরাজের পিঠে বা পুষ্পকরথে এক পদও যাওয়া সম্ভবপর নয়, কিন্তু "বেলুনে পাঁচ সপ্তাহের" মহাদেশ অতিক্রম করা সম্ভব। তাই সেকালে যেমন একই রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র--কোটালপুত্রে বিভিন্ন গল্পের সৃজন সম্ভবপর ছিল, একালে তেমনি একই বিমল-কুমার-বাঘা-রামহরিরা, একই ব্লেক ও স্মিথ নানা গল্পের সৃষ্টি করিতেছে। নূতন শিক্ষার প্রভাবে শিশুদলের চিন্তাধারার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য, তবু 'আঁখির কোণে' সেই গল্পপিপাসু দৃষ্টিটি আজিও সাক্ষ্য দিতেছে, অতীত কালেও যে চাহনি শিশুর চক্ষে ফুটিয়া উঠিত! তাই কিশোর-সাহিত্যে আমরা পূর্ব্ববর্ণিত সেই রূপকথাই রূপকের আবরণে শুনিয়া যাই। এখানে রাজকন্যা রূপ লইয়াছেন স্বর্ণখনির কিম্বা "যখের ধনের"। রাক্ষসেরা দেখা দিয়াছে ডাকাতের সাজে, কিম্বা অসভ্য এ্যাবরিজিনিস্‌দের বেশে।

বাংলার শিশু-সাহিত্যের একটি প্রধান অভাব—অনুবাদ-সাহিত্য। আশ্চর্য্য দ্বীপ, সাগরিকা, অজ্ঞাত দেশ, অজ্ঞাত জগৎ, টমকাকার কুটীর, বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ প্রভৃতি কয়েকটি ভিন্ন অধিকাংশই তৃতীয় শ্রেণীর অনুবাদ হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে মূল গল্পগুলি যে সমাজের—আমাদের সমাজের সহিত তাহার এতই পার্থক্য যে বাঙালীরা, বিশেষতঃ বাঙালী শিশুরা এই সমাজগত বৈষম্যের জন্য গল্পের বিষয়-বস্তুটিকে অনুধাবন করিতে পারে না। ফরাসী বা রাশিয়ান সাহিত্য হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করা শক্ত নহে, কিন্তু যে-কোনও ইউরোপীয় ভাষা হইতে শিশুবোধ্য বাংলা-ভাষায় পরিবর্ত্তন সাধন অত্যন্ত কঠিন। "জিন্দের বন্দী"র মত আমূল পরিবর্ত্তন ভিন্ন শিশু-সাহিত্যেরও গত্যন্তর নাই। অথচ অনুবাদ-সাহিত্যের প্রসার জাতীয় জীবনের উন্নতির পরিচায়ক।

নূতন যুগের নূতন হাওয়ায় সকল অবস্থারই পরিবর্ত্তন হইতেছে। পরিণতদের সাহিত্য দিনে দিনে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিশোর-সাহিত্যেও 'সাইরেন', 'বোমা', 'ইত্যা-কুমী'র প্রসঙ্গ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শুধু এই মন্বন্তরের যুগে আজও

"ছেলেটির যেম্‌নি কথা ফুটুল অম্‌নি সে বল্‌লে, গল্প বল!"

দিদিমা বল্‌তে সুরু করলেন, 'এক রাজপুত্তুর, কোটালের পুত্তুর, সদাগরের পুত্তুর—'

গুরুমশাই হেঁকে বললেন, "তিন-চারে বারো।"

কিন্তু তখন তার চেয়ে বড় হাঁক দিয়েছে রাক্ষসটা, 'হাঁউ-মাউ-খাঁউ' নামতার হুঙ্কার ছেলেটির কানে পৌঁছায় না।"

(গল্প—রবীন্দ্রনাথ)

শিশু-সাহিত্য একটি বিশিষ্ট শাখা মাসিক-পত্রিকা। সর্ব্ব-প্রথমেই "বালকে"র নাম, তার পর ক্রমে সন্দেশ, মৌচাক, শিশুসাথী, রংমশাল, রামধনু, কিশোর-বাংলা শিশু মনের খোরাক জোগাইয়াছে। উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার রায় চৌধুরী এ পথের কাণ্ডারী। অধুনা সাপ্তাহিকের বিভাগে 'আনন্দমেলা', 'পাততাড়ি' প্রভৃতি আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। শিশু-সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন সাহিত্য-সেবীর নাম উল্লেখযোগ্য, কিন্তু "হংসরূপী রাজপুত্র", "একাদশ সহস্ররজনীর" রচয়িতা হইতে অতি আধুনিক লেখকের সুদীর্ঘ তালিকায় কাহাকে বাদ দিয়া কাহার উল্লেখ করিব। রামায়ণ বাংলার শিশু-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন! সেই কৃত্তিবাস হইতে "শিশু" রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ বা আধুনিক শিশু-সাহিত্যিক কাহার প্রসঙ্গ আনিব এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শিশুদের জন্য যেমন-তেমন গল্প রচনা এমন কি কঠিন। কিন্তু "সেই যেমন-তেমন ভাবটি পাওয়া সহজ নহে। এইজন্য ছড়া জিনিষটা যাহার পক্ষে সহজ তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ কিন্তু যাহার পক্ষে কিছু মাত্র কঠিন তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য।"—(রবীন্দ্রনাথ)

তাই নূতন ছড়ার আর সৃষ্টি হইতেছে না। সংসারের দৈনন্দিন কার্য্যে প্রতিমুহূর্ত্তে যুক্তিযুক্ত থাকিয়া যুক্তিহীন গল্প বানাইবার ক্ষমতা আমরা হারাইয়া ফেলি। তাই জাপানী বাহিনী আসাম-প্রান্তে সদলবলে উপস্থিত সংবাদপত্রে একথা পড়িয়াও অতীতের কোন নজির ধরিয়া বঙ্গ-জননীরা আজিও খোকাবাবুকে ঘুম পাড়াইতেছেন—

"খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে।"

যুগে যুগে দিগম্বর, আশুতোষ, শিশুভোলানাথের দল বঙ্গমাতার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিতেছে; প্রতিবারেই তাহারা আসিয়া শুনিতেছে বুলবুলিতে ধান খাইয়া গিয়াছে,—সুতরাং খাজনা দেওয়া হয় নাই! অর্থনৈতিক এত বড় দুঃসংবাদ শুনিয়াও তাহাদের বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নাই, পরন্তু পরক্ষণেই আদেশ হইতেছে "গল্প বল!"

আবার সেই আদেশ চিরনবীন চিরপুরাতন গল্প "এক যে ছিল রাজা—"

আবার সেই শিশুকণ্ঠের—"তারপর?"

এই তারপরের পর তার পর গাঁথিয়া বাংলার শিশু-সাহিত্যের যে বিনিসূতার মালাটি রচিত হইতেছে প্রতি জননীই তাহা শুধু আপন শিশুভোলানাথের কণ্ঠেই দোলাইয়া দেন, অন্তরীক্ষে প্রবীণ ভোলানাথ স্নেহের হাসি হাসিয়া থাকেন।

শিশু-সাহিত্যের উদ্ভব শিক্ষার ভিতর দিয়া নয়, প্রধানতঃ আনন্দের ভিতর দিয়া। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছু-কাল পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ণিমা অভিভাষণে সত্যই বলিয়াছিলেন: রূপকথার ও গল্প বলার যুগ চলিয়া গিয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবার এখন খুব কমই আছে। কাজেই, ছোটদের রূপকথা ও গল্প বলিবার লোকাভাব। আগে ছেলেমেয়েরা ঠাকুরমা, দিদিমা

কি দাদা মহাশয়কে ঘিরিয়া সন্ধ্যাবেলা নানা রকমের গল্প, রূপকথা শুনিত ; এখন তার বদলে তাহাদের মাষ্টার মহাশয়ের নিকট নীরস ধারাপাত বা বানান শিক্ষা করিতে হয়।

ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। এইজন্ত শিশু-মনের খোরাক যোগাইবার ভার এখন একমাত্র শিশু-সাহিত্যিকের উপরই পড়িয়াছে এবং স্বাধীন ভারতে সে দায়িত্ব আরও গুরুতর।

জাতিভেদ

শ্রীনীলিমা সরদার

প্রাচীনকালে যখন হিন্দু সভ্যতা বিশ্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিল তখন জাতিভেদ থাকিলেও কদর্থকারী সমাজ-পতিরা ছিলেন না বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি-বর্ণ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলেও কুলগত ছিল না। সকলেই তখন স্ব স্ব গুণকর্ম্মের দ্বারা বিশেষ বিশেষ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইত। ইহা হইতেই প্রাচীন ধর্ম্মব্যবস্থার উদারতা দৃষ্টিগোচর হয় : জন্ম কাহারও উন্নতির অন্তরায় ছিল না। দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে নিষাদপুত্র বলিয়া ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার চরিত্র মহনীয় হইয়া উঠে নাই।

যোগ্যতা অনুসারে সকলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি শ্রেণীর অধীন হইত, ফলে প্রত্যেকেই উচ্চবর্ণ লাভের জন্য উত্তরোত্তর গুণপ্রকর্ষে যত্নবান ছিল। ইহা গণচেতনা প্রবুদ্ধ করিতে কত যে সাহায্য করিত তাহা আমাদের শাস্ত্র-পাঠে উপলব্ধ হয়।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" ৪।১৩

গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারে আমি চারিটি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। গুণ এবং কর্ম্মানুসারে চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ নিম্নলিখিতরূপ : (১) সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণ ; তাহার কর্ম্ম শমদমাদি। (২) সত্ত্বসংযুক্ত রজঃগুণপ্রধান ক্ষত্রিয় ; তাহার কর্ম্ম শৌর্য্যাদি। (৩) তমঃসংযুক্ত রজঃগুণপ্রধান বৈশ্য ; তাহার কর্ম্ম কৃষ্যাদি। (৪) রজঃগুণ সংযুক্ত তমঃপ্রধান শূদ্র ; তাহার কর্ম্ম শুশ্রূষাদি।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়ং তপ-আর্জ্জবম্ ॥১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগো শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেম্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥৩

(গীতা ১৬।১-৩)

এইগুলি দৈবী সম্পদ। অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণের সম্পদ। শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব: জ্ঞান বিজ্ঞান আস্তিক্য এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥

(গীতা—১৮।৪২)

ইহা হইতেই প্রতীতি হয়, সে যুগের ব্রাহ্মণ কত উচ্চ স্তরের ব্যক্তি। বহু পুরাণাদিতে দেবগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-স্তব দৃষ্ট হয়। মহাভারতেও শান্তিপর্ব্বে ভীষ্মের বাক্যে ইহারই প্রতিধ্বনি :

নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং
যথৈকতা সমতা সত্যতা চ।
শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জ্জবং
ততস্ততশ্চ পরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ ॥

(শান্তি ১৭৫।৩৭)

মহাভারতের বনপর্ব্বে বর্ণিত আছে—অহঙ্কারী নহুষ অগস্ত্যের শাপে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর অগস্ত্যের নিকট শাপনাশের জন্য কাকুতি মিনতি করিলে অগস্ত্য বলিলেন—

"ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবেন।" পরে যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন কালে নহুষ বলিতেছেন—

ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্রাজন বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির।
ব্রবীহ্যতিমতিং ত্বাং হি বাক্যৈরনুমিমীমহে ॥২০

হে রাজা যুধিষ্ঠির, বলুন ব্রাহ্মণ কে? এবং জ্ঞেয় কি?

যুধিষ্ঠির বলিলেন—

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।

হে সর্পশ্রেষ্ঠ! সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অনৃশংসতা, তপস্যা এবং ঘৃণা এইগুলি যাহাতে বর্তমান তিনিই ব্রাহ্মণ।

শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষণং দ্বিজে তু তন্ন বিদ্যতে।
নবৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥২৫
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥২৬

শূদ্রের লক্ষণ ব্রাহ্মণে থাকে না এবং ব্রাহ্মণের লক্ষণ শূদ্রে থাকিতে পারে না। হে সর্প, ব্রাহ্মণের লক্ষণ যাহাতে থাকে তিনি ব্রাহ্মণ এবং যাহাতে থাকে না সে শূদ্র। ব্রাহ্মণগুণযুক্ত শূদ্র, শূদ্র নয় এবং শূদ্রগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নয়। শমাদিযুক্ত শূদ্রও ব্রাহ্মণ এবং কামাদিযুক্ত ব্রাহ্মণও শূদ্র।

সর্প বলিলেন—

যদি তে বৃত্ততো রাজান্ ব্রাহ্মণঃ প্রসমীক্ষিতঃ।
বৃথা জগতি তদায়ুষ্মন্ কৃতির্যাবন্নবিদ্যতে ॥৩০

হে আয়ুষ্মন্, যদি আপনি বৃত্তির দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব নির্দ্ধারণ করেন তাহা হইলে বৃত্তিহীন ব্রাহ্মণের জাতি বৃথা হইয়া পড়ে।

যুধিষ্ঠির বলিলেন—

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহাসতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং পুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ ॥৩১

হে মহামতি মহাসর্প! এবংবিধ ব্রাহ্মণের মনুষ্যত্বই জাতি। কারণ সমস্ত বর্ণের সাঙ্কর্য্য বশতঃ জন্মের দ্বারা বর্ণ নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়। ইহাই আমার মত। সর্ব্ব বর্ণের মনুষ্যগণ সর্ব্ব বর্ণের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করেন। আরও—বাক্য, মৈথুন, জন্ম এবং মৃত্যু সকল বর্ণের মনুষ্যগণেরই সমান। অতএব বৃত্তিদ্বারা বর্ণ নিরূপিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

সর্ব্বেসর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্মমরণঞ্চ সমং নৃণাম্ ॥৩২

মনুষ্য জন্মগ্রহণের পর সংস্কৃত হইলে সাবিত্রীই তাহার মাতা এবং আচার্য্যই তাহার পিতা। সংস্কৃত হইয়া যদি সে ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ না করে তাহা হইলে সংস্কারের পূর্ব্বে সে যেরূপ শূদ্র ছিল পুনরায় সেইরূপ শূদ্রই হয়। সংস্কারের কোনই ফল হয় না। সংস্কৃত হইয়া বৃত্তিযুক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ হয়, ইহা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি।

প্রাঙ্ নাভি বর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে ॥৩৪
কৃত্যাঃ পুনর্বর্ণা যদি বৃত্তং ন বিদ্যতে।
শঙ্করস্তত্র নাগেন্দ্র বলবান প্রসমীক্ষিতঃ ॥৩৬
যত্রেদানীং মহাসর্প সংস্কৃতং বৃত্তমিষ্যতে।
তং ব্রাহ্মণমহং পূর্ব্বমুক্তবান ভুজগোত্তম ॥৩৭।১৮০

আলোচনার শেষে নহুষ স্বীকার করিলেন—সত্য, দম, তপঃ, দান, অহিংসা ইত্যাদিই ব্রাহ্মণত্বের সাধক; কুল কিম্বা জাতি দ্বারা মনুষ্য ব্রাহ্মণ হয় না। যথা—

ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণত্বং চ যেন ত্বাহমচুচুদম্।
সত্যং দমস্তপো দানমহিংসা ধর্ম্মনিত্যতা।
সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতি ন কুলং নৃপ।

বনপর্ব্ব ১৮১।৪২-৪৩

বর্ত্তমানে ইহার বিপরীত অর্থাৎ কুল অনুসারেই বর্ণ বিচার। ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ, সে ব্যক্তি নিন্দিতচরিত্রই হউন আর শাস্ত্রজ্ঞানহীনই হউন। শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণত্বগুণযুক্ত ব্যক্তি বর্ত্তমানে দুর্লভ। কোনও রকমে উপনয়ন-সংস্কারের পরই তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণত্বগুণযুক্ত ব্যক্তিকে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-সমাজ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার ত করেনই না, উপরন্তু "ধর্ম্ম গেল" "ধর্ম্ম গেল" বলিয়া রব তুলেন। একবারও চিন্তা করেন না যে অপর কেহ গুণবান্ হইলে তাঁহার সদ্‌গুণাবলী কিম্বা ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইবে কেন? এক ব্যক্তি বিদ্বান্ হইলে অপর ব্যক্তির বিদ্যা ক্ষীণ হইবে কেন? সঙ্কীর্ণতা এবং ঈর্ষ্যাই আজ ব্রাহ্মণজাতির পতনের মূল কারণ। যাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত ব্রাহ্মণের গুণ বর্ত্তমান তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আত্মগোপন করিয়া আছেন। তাঁহারা চেষ্টা করিলে হিন্দুধর্ম্মকে পুনরায় পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন।

পুরাকালে ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত ব্যক্তিই যে ব্রাহ্মণ হইতেন তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদের জাবালা-পুত্র সত্যকামের উপাখ্যান হইতেই জানা যায়। সত্যকাম গুরুর নিকট গমন করিলে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার গোত্র কি?" সত্যকাম মাতার নিকট গোত্র জানিতে চাহিলেন। মাতা বলিলেন—"তাত, যৌবনে আমি বহুচারিণী ছিলাম, অতএব আমি জানি না তোমার গোত্র কি; আমার নাম জাবালা, তোমার নাম সত্যকাম—ইহাই তোমার পরিচয়।

বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে
ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ
যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৪।৪।২)

জাবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি
স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথা।

(ঐতরেয় ৪।৪।২)

অনন্তর সত্যকাম গুরুকে উপরোক্ত বাক্যই বলিলেন। গুরু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সমিধ আনিতে আদেশ করিলেন। গুরু গৌতম বালকের অকপট সত্যভাষণই তাহার ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণরূপে গণ্য করিলেন। পরবর্ত্তীকালে এই সত্যকাম বিখ্যাত ঋষি হইয়াছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে উপকোশল বিদ্যায় গুরু সত্যকাম শিষ্য উপকোশলকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিতেছেন—

"য এষোঽক্ষিণি পুরুষোদৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচ। এতদমৃতং এতদ্ ব্রহ্ম।"

রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের তপোবল দর্শনপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ের বাহুবল অপেক্ষা তপোবলকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এ বৃত্তান্ত সর্ব্বজনবিদিত।

বেদব্যাস ধীবর-কন্যা সত্যবতীর পুত্র; কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বজনস্বীকৃত। মাতা নীচবংশীয়া হইলেও তাঁহার

ব্রাহ্মণ হইতে বাধা হয় নাই, অবশ্য তাঁহার পিতা ছিলেন পরাশর ঋষি। পরাশর শ্বপচকন্যার সন্তান।

একই পিতার চারি পুত্র চারি বর্ণেরও দেখা যাইত। গৃৎসমদ ক্ষত্রিয় বংশজাত। তাঁহার পুত্র শুনক। হরিবংশে দেখা যায় শুনকের পুত্রগণ কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ শূদ্র। ক্ষত্রিয় ভর্গের সন্তানেরাও চারি বর্ণের ছিল। প্রতীপের পুত্র দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। তন্মধ্যে দেবাপি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

"দেবাপিঃ খলু বাল এবারণ্যং বিবেশ।"

(মহা. আদিপর্ব্ব ৯৫।৪৫)

"দেবাপিশ্চ প্রবব্রাজ তেষাং ধর্ম্মহিতেপ্সয়া।

(মহা. আদি ৯৪।৬২)

রাজা সংবরণ সূর্য্যকন্যা তপতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র কুরু। মহাতপস্বী কুরু যে স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন সেই স্থানই কুরুক্ষেত্র তীর্থে পরিণত হয়।

"কুরুক্ষেত্রং স তপসা পুণ্যং চক্রে মহাতপা।"

(মহা. আদি ৯৪।৫০)

ক্ষত্রিয় জনক রাজাও ঋষি হইয়াছিলেন। ব্যাসদেব স্বীয় পুত্র শুকদেবকে ধর্ম্মোপদেশ লাভের জন্য রাজর্ষি জনকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা আছে। শুকদেব মনে করিলেন—আমি আজন্ম সন্ন্যাসী আর ধর্ম্মোপদেশ লাভের জন্য পিতা আমাকে একজন রাজার নিকট পাঠাইতেছেন কেন? শুকদেব জনকের নিকট উপস্থিত হইলে রাজর্ষি তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার মনের সন্দেহ জানিলেন। অনন্তর যখন উভয়ে তত্ত্বালোচনায় ব্যস্ত তখন সংবাদ আসিল রাজধানীকে বেষ্টন করিয়া অকস্মাৎ সর্ব্বগ্রাসী অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শুকদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার অপর কৌপীনটি আপনার গৃহাভ্যন্তর হইতে আনয়নার্থ ধাবিত হইলেন। কৌপীন লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন জনক রাজা তেমনই নির্ব্বিকার। তাঁহার সুন্দরী মিথিলা নগরীকে অগ্নি গ্রাস করিতেছে; কিন্তু তিনি কিছুমাত্র বিচলিত নন। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। তিনি নিজ কৌপীনাসক্তিতে লজ্জিত হইলেন; এবং রাজর্ষির নিকট আপনার সন্দেহের কথা জানাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

উপনিষদেও দেখা যায় বহু রাজা ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোপদেশ দিয়াছেন। অতএব গুণবিচারেই ব্রাহ্মণও শূদ্র এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইত।

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতি ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তি স্থিতশ্চ শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বঞ্চ গচ্ছতি॥

(ঐ ২৩৩।৫৬, ৫৭)

মহাভারতে বনপর্ব্বে যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিলেন, কিসের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণিত হইবে? যুধিষ্ঠির যাহা উত্তর দিলেন তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত বাক্যেরই প্রতিধ্বনি। যুধিষ্ঠির বলিলেন—

শৃণু যক্ষ কুলং তাত ন স্বাধ্যায় ন চ শ্রুতম্।
কারণং হি দ্বিজত্বে চ বৃত্তমেব ন সংশয়ঃ॥
বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষ্যং ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
অক্ষীণবৃত্তো ন ক্ষীণো বৃত্ততস্তু হতো-হতঃ॥
চতুর্ব্বেদোঽপি দুর্বৃত্তঃ স শূদ্রাদতিরিচ্যতে।
যোঽগ্নি হোত্রপরো দান্তঃ স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

(বনপর্ব্ব—৩১২।১০৮,১০৯,১১১)

"নিষাদ-স্থপতিং যাজয়েৎ" এই বাক্যের "নিষাদ স্থপতি" শব্দের সমাস নির্দ্ধারণকালে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন মুক্তাবলীতে বলিয়াছেন—

অতএব নিষাদ স্থপতিং যাজয়েদিত্যত্র ন তৎপুরুষঃ লক্ষণাপত্তেঃ, কিন্তু কর্ম্মধারয়ঃ লক্ষণাভাবাৎ। ন চ নিষাদস্য সঙ্কর জাতি বিশেষস্য বেদানাধিকারাৎ যাজনাসম্ভব ইতি বাচ্যম্, নিষাদস্য বিদ্যাপ্রযুক্তেস্তত এব কল্পনাৎ।

নীলোৎপল এই স্থলে কর্ম্মধারয় সমাসে নীলা ভিন্ন উৎপল এইরূপ অর্থ হইলে এ স্থলে লক্ষণা নাই। অতএব "নিষাদ স্থপতিকে যাজন করিবে" এ স্থলে তৎপুরুষ সমাস নহে, কেননা তৎপুরুষ সমাসে লক্ষণা করিতে হয়। শক্যার্থ সম্ভব হইলে লক্ষ্যার্থ হইতে পারে না। সেইজন্য ইহা কর্ম্মধারয় সমাস। নিষাদ সঙ্কর-জাতি বলিয়া বেদে তাহার অধিকার নাই, অতএব তাহার যাজন অসম্ভব ইহা বলিতে পার না। কেননা, নিষাদ স্থপতিকে যাজন করিবে এই বাক্য হইতেই তাহার বিদ্যাপ্রযুক্তি মানিয়া লওয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমান অবস্থায় নারীও শূদ্রশ্রেণীভুক্তা। ব্রাহ্মণ্যগুণযুক্ত হইলে নারীই বা ব্রাহ্মণ হইবে না কেন? পুরাকালে ইহারও ব্যতিক্রম দেখা যাইত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ে গার্গীকে তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মোপদেশ দিতেছেন—

"এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্।"
"এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।"
"তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যাদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ।"

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী ছিলেন--মৈত্রেয়ী এবং গার্গী। আশ্রম ত্যাগ করিয়া বনগমনকালে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সম্পত্তি দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া দুই স্ত্রীকে সমভাবে বণ্টন করিতে উদ্যত হইলে গার্গী বলিলেন, প্রভু এই সমস্ত সম্পত্তিতে আমার প্রয়োজন নাই। ইহা একদিন নষ্ট হইবে। আমাকে এরূপ সম্পত্তি দান করুন যাহা কখনও নষ্ট হইবে না। আমাকে আপনার

ব্রহ্মবিদ্যার অংশ দান করুন। অনন্তর গার্গীকে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণের উপযুক্ত দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিলেন।

বেদের বহু মন্ত্র নারী কর্ত্তৃক রচিত। সামবেদ সংহিতার বহু মন্ত্রের রচয়িত্রী ইন্দ্রমাতৃগণ।

"ত্বমিন্দ্রবলাদপি মহসো জাত ওজসঃ।
ত্বং সন্ বৃষণ্ বৃষেদসি॥

(ঐন্দ্রপর্ব্ব)

দেবীসূক্তের মন্ত্রগুলিও নারী রচিত। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ এই মন্ত্রগুলির রচয়িত্রী—

"অম্ভৃণস্য ঋষেদুর্হিতা বাঙ্ নাম্নী ব্রহ্ম বিদুষী স্বাত্মানমস্তৌৎ। অতঃ সা ঋষিঃ।"

গোভিল-গৃহ্যসূত্রে বিবাহ-প্রকরণে যজ্ঞোপবীতধারিণী কন্যার উল্লেখ আছে।—

"প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীমভ্যুদানয়ন্ জপেৎ
সোমোঽদদৎ গন্ধর্বায়েতি।"

(২ প্র পাঠক ১ম খণ্ড ১৯ সূত্র)

অন্যত্রও দেখা যায় পুরাকালে কুমারীগণের মৌঞ্জি বন্ধন, বেদ অধ্যয়ন এবং সাবিত্রী বাচন প্রচলিত ছিল। তাহারা পিতা পিতৃব্য কিংবা ভ্রাতার নিকটই অধ্যয়ন করিত। অপর

নেতাজীর অনুসরণে

বাংলার বিখ্যাত ঘৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার "শ্রী" মার্কা ঘৃতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিষ্প্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 'শ্রী' ঘৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ঘৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ ঘৃত যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা ঘৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

কাহারও নিকট নয়। তাহারা গৃহেই ভিক্ষা করিত। তাহাদের অজিন, চীর এবং জটাধারণ নিষিদ্ধ ছিল।—

"পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জি বন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যয়নঞ্চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথা॥
পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ।
স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষ্যচর্য্যা বিধীয়তে॥
বর্জ্জয়েদজিনং চীরং জটাধারণমেব চ।"

(যমঃ)

"দ্বিবিধাঃ হি স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্য বধ্বশ্চ।"

(হারিতঃ)

স্ত্রী দ্বিবিধ। ব্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যবধূ। অতএব স্ত্রী-পুরুষরূপেই বা শাস্ত্রাধিকারের তারতম্য কোথায়? স্ত্রীই হউন বা পুরুষই হউন গুণানুসারেই বর্ণ বিভাগ হওয়া উচিত।

পিতা চুরি করিয়াছে বলিয়া পুত্রের সাধু হইতে বাধা কি? যাহার পিতা কিংবা মাতা চুরি করিয়াছেন তাহার পুত্রকেও চুরি করিতেই হইবে কোন্ হীনবুদ্ধি ব্যক্তি এরূপ ব্যবস্থা দিবে? নীচ কর্ম্মে উপদেশ দেওয়া কিংবা প্রবৃত্ত করার জন্য চোরকে দণ্ড না দিয়া সমাজপতিরই দণ্ডনীয় হওয়া উচিত। অপর পক্ষে পিতা গুণবান হইলে পুত্রও গুণবান হইবেই এরূপ প্রতিজ্ঞা কিরূপে সম্ভবে? অহরহ ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। অতএব সকলেরই জন্য পথ উন্মুক্ত থাকুক—যে সাধনার দ্বারা যতদূর অগ্রসর হইবে সে তদ্বর্ণভুক্ত হইবে। যে কেহ ব্রাহ্মণ্য গুণযুক্ত হইবে উদারমতি বিচক্ষণ ব্রাহ্মণগণ তাহাকেই জয়মাল্য দিয়া অভিনন্দিত করিবেন। তাহাতেই তাঁহাদের যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণিত হইবে, এবং হিন্দু সমাজ এক অখণ্ডরূপে লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইবে।

কৃত্তিবাস রচিত

সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামা

স্বনামধন্য ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সুবিখ্যাত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট

অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল

কোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশবর্জিত মূলগ্রন্থ অনুসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় সুসম্পূর্ণ! ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আঁকা রঙীন ষোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি আছে। রঙীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিত্রশালা হইতে সংগৃহীত ছবির অনুলিপি। অন্যান্য বহুবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বর্মা, নন্দলাল বসু, সারদাচরণ উকীল, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর, অসিতকুমার হালদার, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র দে প্রভৃতির সুনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত।

জ্যাকেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইণ্ডিং মূল্য ১০৸০, প্যাকিং ও ডাকব্যয় ১৲

প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নম্বরসহ সত্বর আবেদন করুন! এই সুযোগ সর্বপ্রকার দুর্মূল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না।

প্রবাসী কার্য্যালয়—১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বাঁধনহীন শ্রাবনধারা ঝরে গগন বেয়ে

আকাশ আর বসুন্ধরা উঠেছে গান গেয়ে

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
GE 7300—রবীন্দ্র-সঙ্গীত
অচেনাকে ভয় কি আমার
ধ্বনিল আহ্বান

দেবব্রত বিশ্বাস ও
কুমারী গীতা নাহা
GE 7301—রবীন্দ্র-সঙ্গীত
আগুনের পরশমণি
অনেক দিনের শূন্যতা

গৌরী চট্টোপাধ্যায়
GE 7302—রবীন্দ্র-সঙ্গীত
আমার হিয়া মাঝে
ধরা দিয়েছি গো

কালোবরণ দাস ও সম্প্রদায়
GE 7303—জাতীয় সঙ্গীত
ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা
পনেরোই আগষ্ট আজ

রেকর্ড নাট্য
মহাত্মা গান্ধী
GE 7295—99
পাঁচখানি রেকর্ডে মহাপুরুষের জীবনী

বিমল ভূষণ
GE 7304—আধুনিক
নাই বা গেলে এখনি গো
মধু বসন্ত জেগেছিল

তারাপদ লাহিড়ী
GE 7306—পল্লী সঙ্গীত
ঘর ঘর কইর‍্যা মল্যাম
বাপরে বাপ জান বাঁচানো হলো দায়

আব্দুল মজিদ তালুকদার
GE 7307—পাকিস্তান-জাতীয়
গাওরে পাকিস্তানের গান
মরুভূমে ফুটল ফুল

স্বর্ণা দেবী
GE 7308- আধুনিক
জাগালে পাওয়ার আশা
যত দূরে থাকো

কুমারী অমিতা রায়
GE 7309—ছেলে ভুলানো ছড়া
ঘুম পাড়ানী মাসি পিসী
আয় আয় আয় আয়

নচিকেতা ঘোষ
GE 7305—আধুনিক
(জানি) আজ তুমি ভুলে গেছ
যে প্রেম নীরবে কাঁদে

কলম্বিয়া

গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড

CB/8/48

পুস্তক-পরিচয়

তিন বুদ্ধস্থান—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। মহাবোধি সোসাইটি, ৪-এ, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০ টাকা।

মলাটে 'তিন বুদ্ধস্থান' কিন্তু ভিতরে বইখানি 'তিন বৌদ্ধস্থান' নামে অভিহিত। তক্ষশিলা, রাজগৃহ ও অজন্তার ইতিহাস এবং শিল্পমহিমার কাহিনী গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের এই তিন বৌদ্ধ তীর্থে গ্রন্থকার ভ্রমণ করিয়াছেন এবং নানা ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক পুস্তকের সাহায্যে তাঁহার প্রত্যক্ষ-দর্শনের অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করিয়া পাঠককে উপহার দিয়াছেন। ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ ভূমিকায় বলিতেছেন, "এসিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ আজ নূতন সম্ভাবনায় দীপ্ত, তাই সাধারণ নরনারীদের এই রকম গ্রন্থের সাহায্যে উদ্বুদ্ধ করার সময় এসেছে।" খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যান্ত সহস্র বর্ষ ধরিয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, পারসীক, গ্রীক, শক, কুষাণ প্রভৃতি সভ্যতার সংমিশ্রণ তক্ষশিলায় ঘটে। ভগবান বুদ্ধের লীলাক্ষেত্র মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহ। রাজগৃহ ও নালন্দার ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভ খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। নিজাম রাজ্যের উত্তর সীমায় অবস্থিত অজন্তার গুহাগুলি অপূর্ব্ব শিল্প, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যের নিদর্শন। অজন্তার 'প্রাচীর-চিত্রাবলী চিরদিন দর্শকের মনে আনন্দ ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিবে। ছাপা ও নামের ভুলগুলি সংশোধন করিলে গ্রন্থখানি পরবর্ত্তী সংস্করণে আরও সুষ্ঠু হইয়া উঠিবে। গ্রন্থকারের বর্ণনা পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত করে।

বিবস্ত্র মানব—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপর ফ্রয়েডের প্রভাব নিতান্ত অল্প নয়। আজকালকার বাংলা সাহিত্যেও সে প্রভাব কিঞ্চিৎ অনুভব করি, তবে তাহা পরোক্ষ। কিন্তু বর্ত্তমান উপন্যাসখানিতে প্রত্যক্ষভাবে মনোবিজ্ঞানের আমদানি করা হইয়াছে। মানবের মন সামাজিক আবরণে আবৃত। মনোবিকারে নিরাবরণ মনের সাক্ষাৎ পাই। এই হিসাবে বিবস্ত্র কথাটি প্রযুক্ত হইয়াছে। লেখক উপন্যাসের নূতন উপকরণ সংগ্রহের অভিপ্রায়ে এই নব-বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছেন। "বিবস্ত্র মানবে" বহু মনোব্যাধিগ্রস্ত নরনারীর সমাবেশ করা হইয়াছে। লেখকের প্রচেষ্টায় সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ফ্রয়েড মনোবিকারের গবেষণা সুরু করিয়া মনের গহনতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। নির্জ্জন মনের আবিষ্কার তাঁহারই। কাজেই সংসারের সাধারণ মানুষের মন লইয়া লিখিলেও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস লেখা চলিত। যাহা হোক মনোবিকার-গ্রস্ত এতগুলি চরিত্র একত্র করিলেও গল্পটির আকর্ষণ আছে। মোটামুটি-ভাবে মানবেন্দ্রকে উপন্যাসের নায়ক বলিয়া ধরিতে পারা যায়। গল্পের পরিকল্পনার পক্ষে অপরিহার্য্য হইলেও পরিশেষে নায়কের অন্তর্দ্ধান পাঠকের মনে একটু অসমাপ্তির স্বাদ রাখিয়া যায়। বিস্তৃত ভূমিকাটি না লিখিলে ভাল হইত। উপন্যাসখানি অভিনবত্বের সন্ধানী পাঠককে আকৃষ্ট করিবে। গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া গ্রন্থকার নাম করিয়াছেন। পৃথ্বীশচন্দ্রের রচনারীতি প্রশংসনীয়।

প্রকাশিত হইল—
ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
জনপ্রিয় উপন্যাস
স্বর্গ হইতে বিদায়
(দ্বিতীয় সংস্করণ)
মনস্তত্ত্বমূলক
* সুবৃহৎ গ্রন্থ *
অপূর্ব্ব প্রচ্ছদপট
*
মূল্য ন' সিকা

—রচনা-পারিপাট্যে, অঙ্গসৌষ্ঠবে প্রত্যেকটি বই অতুলনীয়—

প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের উপন্যাস
ইহাই সত্য … ৩৲
আর্ত্তনাদ … ২৷৷০
জনতার ইঙ্গিত … ২৲
রামপদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
নিঃসঙ্গ … ৩৷৷০
বিমল মিত্রের গল্পগ্রন্থ
দিনের পর দিন … ২৲
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ
ভাঙা বন্দর … ২৲
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ
হলুদ পোড়া … ২৲
আমিনুর রহমানের গল্পগ্রন্থ
পোষ্টকার্ড … ২৲
আশালতা দেবীর উপন্যাস
কলঙ্কের ফুল … ১৷০

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
হৃদয় দিয়ে হৃদি … ২৷০
মধুরাতি জাগর … ২৷৷০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
ক্রৌঞ্চ-মিথুন … ২৷৷০
(৫ম সংস্করণ)
প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর উপন্যাস
রাতের স্বপন (৩য় সং) ২৷০
অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের হাসির গল্প
'সকলি গরল ভেল' ২৲
রাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর উপন্যাস
কো-এডুকেশন … ১৷০
আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস
প্রেম ও প্রয়োজন (যন্ত্রস্থ)

সুধাংশুকুমার গুপ্তের
বিদেশী শ্রেষ্ঠ গল্প-সঙ্কলন
সেরা লিখিয়েদের সেরা গল্প (১ম খণ্ড) … ১৲
ছেলেদের পড়বার
বিশু মুখোপাধ্যায়ের
সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায় ১৲
(Toilers of the Sea)
সুধাংশুকুমার দাশগুপ্তের
লাসার অভিশাপ … ৸৵০
বুদ্ধদেব বসুর
কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড ৸৵০
সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
ডাকাতের সর্দ্দার … ৸৵০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
আকাশের আতঙ্ক … ৸৵০

কমলা পাবলিশিং হাউস • ৮/১এ, হরি পাল লেন, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট; কলিকাতা

মহাজিজ্ঞাসা

লুই ফিশারের নাম আজ আর কোনো মহলের কাছেই অপরিচিত নয়, তেমনি অপরিচিত নয় তাঁর '*The Great Challenge*' বইটির নাম। 'মহাজিজ্ঞাসা' তারই অনূদিত সংস্করণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক তথা সামাজিক বিবর্তন যে গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চলেছে তার ইতিহাস জানা প্রয়োজন আজ সকলেরই। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ এখনও প্রচুরভাবে প্রচারিত হয়নি। লুই ফিশার অত্যন্ত স্পষ্ট ও নির্মম-ভাবে আলোচনা করেছেন বলে আজকের দিনে এ-বইয়ের প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

বিষয়সূচী: ডানকার্ক ও তারপর,
আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান,
নূতন দৃষ্টিতে ষ্টালিন ও হিটলার,
ভবিষ্যবাণী,
লিট ভিনভ্‌ও জোসেফ ই ডেভিস,
ব্রিটিশ জনগণ ও চার্চিলের ইংলণ্ড,
ভবিষ্যতের আবির্ভাব,
দক্ষিণ থেকে ভারতে,
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন,
ভারতের সমস্যা,
ভারতে ব্রিটিশ শাসন,
প্যালেষ্টাইনে নিরুদ্বেগ দশদিন।

লুই ফিশার

প্রথম পর্ব। দাম চার টাকা॥

পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও

বৌদ্ধধর্ম্ম

মননশীলতার পরিচয় আধুনিক বাঙালী সমাজের কাছে আজ আর নতুন করে দেবার নেই। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা, এতদিন পর্য্যন্ত তা প্রাচীন সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ ছিলো। সম্প্রতি বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত তাঁর প্রবন্ধগুলোকে একত্র সংকলিত করা হচ্ছে এই গ্রন্থে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের প্রতি যাঁর সামান্যমাত্রও শ্রদ্ধা আছে, এ গ্রন্থ তাঁর কাছে যে শুধু অমূল্য সম্পদ ব'লে বিবেচিত হবে তা-ই নয়, ভারতবর্ষের ইতি-হাসের প্রত্যেকটি পাঠকই এ-গ্রন্থকে অপরিহার্য্য বলে গ্রহণ করবেন।

বিষয়সূচী: বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাহার গুরু কে; নির্ব্বাণ; নির্ব্বাণ কয় রকম; কোথা হইতে আসিল; হীনযান ও মহাযান; মহাযান কোথা হইতে আসিল; সহজযান; বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপাত; বৌদ্ধধর্ম্ম কোথায় গেল; এখনও একটু আছে; উড়িষ্যার জঙ্গলে; জাতক ও অবদান; দলাদলি; মহাসাঙ্ঘিক মত; থেরাবাদ ও মহাসাঙ্ঘিক; মানুষ ও রাজা। দাম তিন টাকা॥

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের যে গৌরবময় অধ্যায় আজ পর্য্যন্ত

ধর্ম্মবিজয়ী অশোক

বাংলাভাষায় রচিত হয়নি, একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেন সেই অধ্যায়কেই প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থে। অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসায় ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটনে যে আন্তরিকতার পরিচয় লেখক এখানে দিয়েছেন, তা তাঁর মতো নিষ্ঠাপরায়ণ ঐতিহাসিকের পক্ষে স্বাভাবিক হলেও, পাঠকের পক্ষে বিস্ময়ের বিষয়। এই গ্রন্থে প্রবোধচন্দ্র সেনের সার্থক সত্যানুসন্ধানের পরিচয় মিলবে। দাম তিন টাকা॥

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
অচিরপ্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থ

প্রাচীন প্রাচী

তিনটি সুদীর্ঘ কবিতা—এশিয়া, ভারতবর্ষ, বাংলা। কবিতা তিনটি ইতিপূর্ব্বে যখন প্রকাশিত হয়েছিলো, তখন যাঁরা পড়েছিলেন, তাঁরাই জানেন, বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এ যেমন অভিনব তেমনি অনবদ্যও। কাব্যরসিকমাত্রেই 'প্রাচীন ও প্রাচী' সংগ্রহ করবেন॥

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা-১৩

রাজকৃষ্ণ রায়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—৪০। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ রায় পরলোক-গমন করেন। মাত্র ৪৪ বৎসর ব্যাপী জীবনে তিনি যে রচনাসম্ভার রাখিয়া গিয়াছেন তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় আশী। তিনি নাট্যকাররূপেই খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গল্প, উপন্যাস, খণ্ডকাব্য, গীতিকবিতা, নাটক, প্রহসন, ঐতিহাসিক অভিধান, ইতিহাস প্রভৃতি সকলপ্রকার রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মূল সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের সরল পদ্যানুবাদ তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি। বাংলায় গদ্য-কবিতার সূচনা তাঁহার রচনাতে দেখিতে পাই। রাজকৃষ্ণ এবং গিরিশচন্দ্র সমকালেই নাটকে ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন। এক সময়ে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' প্রভৃতি নাটক রঙ্গমঞ্চের এক প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল। এই বহুমুখী প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে বাঙ্গালী নিজেকেই শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে। এখানি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। এ সংস্করণে বহু নূতন উপকরণ সংযোজিত হইয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প - পরিবেশক—শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ২।০ ও ৩৲ টাকা।

পরিবেশক বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা অবিকৃত রাখিয়া ছোটদের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের গল্পরূপ দিয়াছেন। ল্যাম্বস্ টেলস জাতীয় এই ধরণের গল্প বাংলাতে সমাদৃত হইবে বলিয়া মনে হয়। যে সব লেখা 'ক্লাসিক্স'এর পর্য্যায়ে পড়ে তাহাদের সঙ্গে পরিচয় থাকলে জাতীয় সংস্কৃতির ধারা অনুসরণ করিতে পারা যায় এবং বাংলা সাহিত্যের সহিত প্রীতিবন্ধনও গভীর হয়। এই ধরণের প্রয়াসমাত্রই প্রশংসনীয়। এই সংগ্রহে—আনন্দমঠ, কপালকুণ্ডলা, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরাণী ও রাধারাণীর গল্পরূপ আছে। লেখার সঙ্গে রেখার সংযোগও আছে, এগুলি ছোটদের পক্ষে অপরিহার্য্য।

ভাঙাগড়া—শ্রীকুমারেশ ঘোষ। রীডার্স কর্ণার, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। দাম ২।০ টাকা।

লেখক জানাইয়াছেন—১৯৩৯ সালের লেখা এই উপন্যাসখানি ছিল বিশুদ্ধ প্রেমোপাখ্যান। কিন্তু সাহিত্যের বাজারে প্রেমের ছড়াছড়ি দেখিয়া তিনি এটিকে যুদ্ধোত্তর যুগের সমস্যামূলক (সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি) সামাজিক উপন্যাসে রূপান্তরিত করিয়াছেন।

কিন্তু আধুনিক যুগে প্রেমোপাখ্যান মাত্রই যে পরিত্যাজ্য এ বিশ্বাস অনেকের নাও থাকিতে পারে। রসগ্রাহী পাঠক গল্পের মধ্যে সাম্প্রতিক কালের ছবি প্রতিফলিত দেখিতে চান—তাহাতে প্রেম এবং সমস্যা কোনটিকেই আধুনিক যুগ হইতে বাদ দেওয়া চলে না। দুই বস্তুর সংমিশ্রণে যে ছবিটি ফুটিয়া উঠে রস-বিচারে তাহা উত্তীর্ণ হইলেই গল্পটি সার্থক হয়। পরস্পর-বিচ্যুত ঘটনা মনে রেখাপাত করিতে পারে না।

আধুনিক যুগের সমস্যায় প্রেম কেন্দ্রচ্যুত নয়—তার প্রকাশভঙ্গিটি শুধু বিচিত্র। জীবন-দর্শনের দ্বারা সেই বিচিত্র অনুভূতিকে রসহানি না ঘটাইয়াও প্রকাশ করা সম্ভব।

যাহা হউক, এই উপন্যাসে লেখক গড়িবার ইঙ্গিত যথেষ্ট দিয়াছেন—সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। তবে নূতন লেখার দুর্ব্বলতা তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই অর্থাৎ গল্পটিকে সমস্যাগুলির সহিত সুষ্ঠ ভাবে খাপ খাওয়াইতে

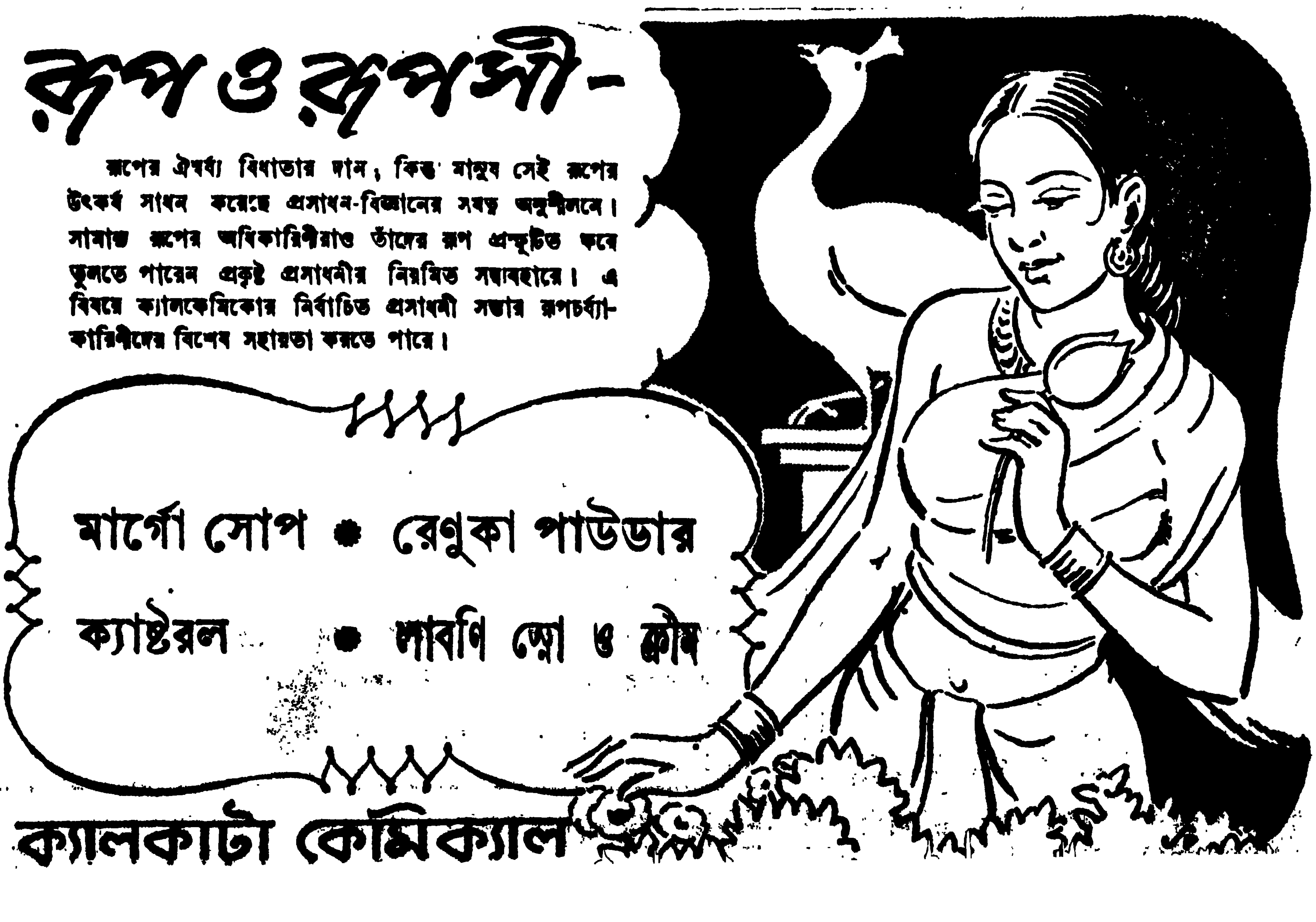

বীজ, গাছ ও ফুল গ্লোব নার্শরীতেই ভাল

কয়েকটি বাছাই সব্জী বীজ সবেমাত্র আমদানী হইয়াছে

প্রতি আউন্সের মূল্য

বাঁধাকপি গ্লোব গ্লোরী ২৷৷০, বাঁধাকপি একষ্ট্রা আর্লি এক্সপ্রেস ২৷৷০, বাঁধাকপি মাউণ্টেনহেড ড্রামহেড ২৷৷০, ফুলকপি আর্লি ও লেট গ্লোবল ৯৲, ফুলকপি গ্লোব, বেটার ৪৲, চিনেকপি ২৷৷০, ওলকপি ১৷৷০, বীট লাল গোল ১৷৷০ (প্রতি পাউণ্ড ১৮৲), শালগম ১৲ (প্রতি পাউণ্ড ১২৲), লেটুস ১৷৷৵০, মূলা বোম্বাই ১নং লাল ৷৷০ (প্রতি পাউণ্ড ৬৲), মূলা লাল গোল ১৲, টমেটো পারফেকশন ২৸০, পেঁয়াজ বোম্বাই ৷৷০ (প্রতি পাউণ্ড ৬৲), গাজর আমেরিকান ১৵০ (প্রতি পাউণ্ড ১৩৷৷০), ফ্রেঞ্চ বীন ৵০ (প্রতি পাউণ্ড ১৷৷০), সিলেরী ১৷০, বেগুন আমেরিকান ২৲, মটর আমেরিকান ৵০, (প্রতি পাউণ্ড ১৷৷০), মরশুমী উৎকৃষ্ট ফুল বীজ (একশত রকম) প্রতি প্যাকেট ৷৷০, শশা (শীতের) ৪৲।

দেশী সব্জী বীজ

প্রতি আউন্সের মূল্য

বেগুন ১৲, লঙ্কা ২৲, উচ্ছে ।৵০, করলা ২৲, কাঁকুড় ফুটি ।০, কুমড়া মিষ্ট ।০, চালকুমড়া ।০, খরমুজা ৷৷০, খেড়ো দিলপছন্দ তিণ্ডা ১৲, চিচিঙ্গা ১৷৷০, ঝিঙ্গা ।০, ঢেঁড়স ।৵০, তরমুজ ৷৷০, ধুন্দুল ।০, পামকিন ১৷৷০, ভুট্টা ।০, লাউ ।০, শশা ৷৷০, স্কোয়াস ২৲, পালম ৵০, শাঁকআলু ।০, নটেশাক ৷৷০, ডেঙ্গোডাঁটা ।০, পুঁইশাক ।০, সীম ৷৷০, বিঙ্গা ১২ পাতা ২৲।

অন্যান্য বীজ

প্রতি মণের মূল্য

ধঞ্চে ৩০৲, শণ ৩০৲, পাটবীজ ৮০৲ (পাটবীজ ১নং স্পেশাল প্রতি সের ৫৲)। এখন হইতে অগ্রিমসহ অর্ডার বুক করুন; নতুবা হতাশ হইবেন।

সুবিখ্যাত চারা ও কলম

আমাদের নির্বাচিত প্রতি ওজনের মূল্য—আম ১৫৲, লিচু ১৫৲, লেবু ১০৲, কমলালেবু ১০৲, কলা ১০৲, পেয়ারা ৮৲, জামরুল ৮৲, নারিকেল ১০৲, গোলাপজাম ৫৲, কাঁঠাল ৪৲, কদবেল ২৷৷০, জলপাই ৮৲, ডালিম ৮৲, আমড়া বিলাতি ৫৲, সপেটা ১০৲, নারিকেলী কুল ১০৲, লকেট ১০৲, বাতাবীলেবু ১০৲, চাঁপা ৫৲, ম্যাগনোলিয়া ২৫৲, জবা ১০৲, রঙ্গণ ১০৲, পামগাছ ৮৲, ক্রোটন ৮৲, ঝাউগাছ ৮৲, লতানে ফুলগাছ ১০৲, সুপারি ২৷৷০, সুগন্ধি ও বড় জাতীয় গোলাপের কলম ১০৲।

কৃষিলক্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদক ও গ্লোব নার্শরীর সত্বাধিকারী
শ্রীঅমরনাথ রায়, এফ, আর, এইচ, এস্ (লণ্ডন) প্রণীত

কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কৃষি-পুস্তক

১। বাংলার সব্জী	... ২৷৷০	৫। সরল পোলট্রী-পালন	২৷৷০
২। চাষীর ফসল	... ২৷৷০	৬। সরল সারের ব্যবহার	১৷৷০
৩। আদর্শ ফলকর	... ২৷৷০	৭। মাছের চাষ	... ১৷৷০
৪। পুষ্পোদ্যান	... ২৷৷০	৮। পশুখাদ্যের চাষ	১৷৷০

ক্যাটলগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

দি
গ্লোব নার্শরী
নিউ মার্কেট, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, শিয়ালদহ ষ্টেশন
কলিকাতা

হাওড়া ষ্টেশনেও দোকান আছে।

পারেন নাই। দু-একটি চরিত্র যেন অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে, এবং 'সোনার বাংলা' আবৃত্তি অভিনয়টি ভাল হইলেও গল্পের ভার বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দেশীয় রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পুস্তকালয়, ২৯ রামানন্দ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৫৯, মূল্য চার টাকা।

ভারতের ইংরেজ আমলের দেশীয় রাজ্যগুলির ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইহাদের মধ্যে সূর্য্য বা চন্দ্রবংশ হইতে উৎপত্তি দাবি করেন এরূপ রাজবংশ হইতে ইংরেজের রাজ্যারম্ভের সময়কার নগণ্য জমিদার, এমন কি ডাকাতের সর্দার পর্য্যন্ত রহিয়াছেন। ইংরেজ সযত্নে ইহাদের পোষণ করিয়াছিল নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য। সংখ্যায় ইহারা ছিল ৬০০ শতের অধিক যদিও উল্লেখযোগ্য বড় রাজ্যের সংখ্যা বেশী নয়। লেখক এই গ্রন্থে কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, উড়িষ্যার রাজ্যগুলি (নয়াগড়, ঢেন্‌কনাল, তালচের, আটগড়, পল্লহরা, কেঁওঝড় এবং রণপুর), রাজকোট, ত্রিপুরা এবং কুচবিহার রাজ্যের প্রজা-আন্দোলনের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য এই সকল আন্দোলনের খবর বাহির হইতে খুব বেশী পাওয়া সম্ভব নহে, তবু লেখক যে যথেষ্ট পরিমাণ সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পর হইতে দেশীয় রাজ্যের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ইহাদের সংখ্যা কমিয়া এক-দশমাংশ হইয়া গিয়াছে। কয়েকটা রাজ্য-সমবায় গঠিত হইয়াছে। কাশ্মীরে ও হায়দরাবাদে সংগ্রাম চলিতেছে। ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণের অবদান নগণ্য নহে। লেখক এই গৌরবময় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকসাধারণের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। ভবিষ্যৎ সংস্করণে অবশ্য নূতন করিয়া অনেক জিনিষ লিখিতে হইবে। কারণ দেশীয় রাজ্যের সাম্প্রতিক ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের পাঠকগণের নিকট এই পুস্তক আদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

উদ্বাস্তু—শ্রীদেবদাস ঘোষ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৲।

রামলাল সে যুগের মানুষ। বিরাট দেহ এবং প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তির অধিকারী। রাজসরকারে সামান্য বেতনে চাকুরী করে এবং ছুটি-ছাটা পাইলেই হাঁটাপথে গ্রামের দিকে রওনা হয়। পিতৃপুরুষের ভিটার প্রতি তার দুর্নিবার আকর্ষণ। রামলাল স্বোপার্জ্জিত অর্থে মাথাগোঁজার মত একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে তার স্বস্তি ছিল না। তার একান্ত বাসনা ছিল নিজে একখণ্ড জমি ক্রয় করিবে—যে মাটিতে ফলিবে রাঙ্গা ধান। ধান, খড়, মরাই···হাল হেলে যে গৃহস্থের নাই সে আবার গৃহস্থ কিসের। ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে রামলালের জীবনের কোন আকাঙ্ক্ষাই অতৃপ্ত রহিল না। জমিভরা ফসল, গোয়ালভরা গরু মরাইভরা ধান—পল্লীচাষীর জীবনে যা কিছু কাম্য সবই সে অর্জ্জন করিয়াছে—ভোগ করিয়াছে।

রামলালের পরে সুরু হইল বিহারীলাল, চুণীলাল, শ্যামলাল এবং সর্ব্বশেষে পিয়ারীলালের পালা। শ্যামলালের জীবনের অর্দ্ধেক সে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের দিক হইতেই বিপর্য্যয় দেখা দিল এবং সেই বিপর্য্যয়ের পূর্ণগ্রাসে পিয়ারীলাল সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। সেকাল এবং একালের মানুষের জীবনযাত্রার পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মাটি ও চাষীকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসখানি লিখিত হইয়াছে। নিরক্ষর চাষাদের কর্ষিত জমির প্রতি যে কি গভীর ভালবাসা একথা লেখক কৃতিত্বের সহিত দেখাইয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠকসমাজে আদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

পৃথিবীর জাতীয় সঙ্গীত—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত। আই-এ-পি. এণ্ড কোং লিঃ। ৮সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট আনা।

ভারতবর্ষ, চীন, ইংলণ্ড, সার্বিয়া, তুরস্ক, আয়র্লণ্ড, ইতালী, রাশিয়া, বেলজিয়ম, মন্টেনেগ্রো, ফ্রান্স, জাপান, জার্ম্মানি, অষ্ট্রেলিয়া—এই চৌদ্দটি দেশের জাতীয় সঙ্গীতের সংগ্রহ। কয়েকটি বৈদেশিক সঙ্গীতের অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের, কয়েকটি গ্রন্থকারের। অনুবাদগুলি সরস এবং হৃদয়গ্রাহী।

প্রভাতী—ডাঃ হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। রায়চৌধুরী এণ্ড কোং, ১১৯ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

কয়েকটি সরল, অনাড়ম্বর পদ্য।

বৈজয়ন্তী—নিশিকান্ত। আশ্রম লাইব্রেরী, পণ্ডিচেরি। মূল্য ১৷৹।

আধুনিক বাংলা কবিতায় নিশিকান্ত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় গভীর উপলব্ধি ও আন্তরিক অনুভূতির পরিচয় আছে। ভাষা ও ছন্দ সংযত, বলিষ্ঠ এবং সাবলীল। 'বৈজয়ন্তী'র সূচনা ভারতের মুক্তিসঙ্গীতে। বর্ত্তমান সভ্যতার আত্মঘাত ও ভাবী যুগ-পরিবর্ত্তনের আভাস অনেক কবিতার মর্ম্মবাণী।

কবিতাবলী—সংস্কৃত ও প্রাকৃত নারীকবিগণ কর্ত্তৃক রচিত। শ্রীরমা চৌধুরী কর্ত্তৃক অনূদিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

মোট ১৫৮টি কবিতার বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে নারীর শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক অধিকার কিরূপ ছিল, কবিতাগুলি হইতে তাহার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। 'রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণে' গ্রন্থকর্ত্রী ঐ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। মনে হয়, তখনকার জীবন সহজ ও সরল ছিল; তাহা সংসারবিমুখও ছিল না, উচ্চ আদর্শবর্জ্জিতও ছিল না। তাহাতে আধ্যাত্মিকতা এবং আধিভৌতিকতার একটা সামঞ্জস্য ছিল। গ্রন্থকর্ত্রীর আলোচনা সারগর্ভ এবং অনুবাদ প্রাঞ্জল।

ভোরের পাখি—নিশিকান্ত। এম্. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ। ১ সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹।

"নীল অমরার নীড় হতে আজ এসো আমার ধূলার কুলায়,
এসো আমার আশার পাখি, আকাশ-চাওয়া বাণী
স্তব্ধ শৈলশিখর হতে আনো অচল নিথরতায়
নীরব জ্যোতির সুরের শিখায় জ্বালাও জীবনখানি।"

জীবনের ঊর্দ্ধমুখী শিখা অধিকাংশ কবিতাকে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। 'হংসকৃপাণ', 'সহর' প্রভৃতি কবিতায় কবি বস্তুরূপের যাথার্থ্যকে উপেক্ষা করিয়া ভাবরূপকে মূর্ত্তি দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার এই 'ইম্প্রেশনিষ্ট'-ভঙ্গীতে নূতনত্ব আছে।

নোতুন পৃথিবী—শ্রীসন্তোষকুমার চন্দ। সংস্কৃতি প্রকাশনী। বরিশাল। চার আনা।

বইখানি ছোট, কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়। ইহার কবিতাগুলি ভাবে, ভাষায়, ছন্দে সুমধুর।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি'

শরতের অরুণ আলোর অঞ্জলির দান নিতে হলে চাই সবল, সুস্থ, নীরোগ দেহ।

অথচ এই ঋতু পরিবর্তনের সময় নীরোগ দেহ অত্যন্ত বিরল! দেহকে নীরোগ রাখবার জন্য সবচেয়ে পরিশ্রম করতে হয় লিভারকে। তাই **কুমারেশ** লিভার ও পেটের সকল পীড়া নিশ্চিতরূপে নিরাময় করা ছাড়াও লিভারকে শক্তিশালী করে দেহকে নীরোগ রাখে।

কুমারেশ

দি ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ

সালকিয়া :: হাওড়া

দম্পতি (৪র্থ সংস্করণ)—শশিকুমার সেন গুপ্ত। প্রাপ্তিস্থান—এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৫৲ টাকা।

বাংলা-সাহিত্যে যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে ডাঃ শশিকুমার সেনগুপ্তের দম্পতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বস্তুতঃ এই পুস্তকের আগাগোড়া শালীনতা ও ভাষার শুচিতা বজায় রাখিয়া লেখক যে সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। যৌন-তত্ত্বের মত জটিল বিষয়ের আলোচনায় পরলোকগত গ্রন্থকার যোগ্য অধিকারী ছিলেন। 'দম্পতি'র উপক্রমণিকা অধ্যায়ে বিশদভাবে এবং পুস্তকটির অন্যান্য বহু স্থানে দম্পতিকে এই কথাই তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, কামশাস্ত্র-আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সংযমশিক্ষা। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত আর কোন যৌনতত্ত্ববিষয়ক পুস্তকে সংযমের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। দাম্পত্য-ব্যবহার এবং উপচারাদির কথা বলিতে গিয়া লেখক বিশেষভাবে কামসূত্রপ্রণেতা বাৎস্যায়নের উপরেই নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার মতে—"বাৎস্যায়ন যে সকল ব্যবস্থা, উপদেশাদি দিয়াছেন তাহাদের মূলতত্ত্বগুলি সর্ব্বকালোপযোগী।" আধুনিক কালে যাঁহারা বাৎস্যায়নকে খাটো করিয়া পাশ্চাত্ত্য যৌনতত্ত্ববিদদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন এবং তাঁহার কামশাস্ত্রকে অশ্লীল বলিয়া নাক সিটকান, বর্ত্তমান পুস্তকের 'উপক্রমণিকা' অধ্যায়টি তাঁহাদের বিশেষ ভাবে প্রণিধাণযোগ্য। কামসূত্রের উপসংহারে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন "অস্য শাস্ত্রস্য তত্ত্বজ্ঞো ভবত্যে জিতেন্দ্রিয় যঃ"—অর্থাৎ এই শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। সাধারণ পাঠকের ভ্রান্তি নিরসনের জন্য লেখক কামসূত্রের 'ত্রিবর্গ প্রতিপত্তি' নামক অধ্যায়টি আগাগোড়া অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। লেখকের পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এ দুইয়েরই পরিচয় এই পুস্তকে আছে। একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের লেখা বলিয়া এই পুস্তকে যৌন-স্বাস্থ্য এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এমন কতকগুলি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে যাহা বাজারে প্রচলিত অন্যান্য যৌনতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে নাই। পুস্তকের ভাষা আদ্যোপান্ত গুরুগম্ভীর, অথচ প্রাঞ্জল এবং বক্তব্য বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী। যে সকল দম্পতি ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সাধনা করিয়া গার্হস্থ্য-জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে চান, শশিবাবুর পুস্তক তাহাদিগকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিবে।

পুস্তকের ৪র্থ সংস্করণ লেখকের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছে।

নতুন পাঠশালা—শ্রীবীরেন দাশ। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত বুনিয়াদি শিক্ষা বা Basic Education লইয়া আজ দেশের শিক্ষিত-মহলে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। অনেক শিক্ষাবিদ্ আজ একথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় মস্তিষ্কের সহিত হাতের যোগ না থাকায় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না। অনেক চিন্তাশীল দেশহিতৈষীর অভিমত এই যে, স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের বনিয়াদকে যদি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তাহা হইলে এদেশের গ্রামে গ্রামে বুনিয়াদি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দিকে রাষ্ট্রপরিচালকদের মনোযোগী হইতে হইবে।

'নতুন পাঠশালা'র লেখক শ্রীবীরেন দাশ চলচ্চিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। কিছুকাল আগে Basic Education লইয়া একটি Documentary Film বা শিক্ষামূলক চিত্রের গল্প তৈরি করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। এই সময় বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন মানসে তিনি কয়েকটি বুনিয়াদি শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেই অভিজ্ঞতা এবং গ্রাম্য পাঠশালা সম্বন্ধে নিজের বাল্যস্মৃতি এ দুটিকে মিশাইয়া তিনি বর্ত্তমান উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন। রাঙামাটি গ্রামের জমিদারের ছেলে সুরথ স্বগ্রামে বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া কি দারুণ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত কিরূপে সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রমপূর্ব্বক 'নতুন পাঠশালা' স্থাপন করিয়া ছাত্রদের প্রকৃতি এবং গ্রামের শ্রী ফিরাইয়া দিল এবং ছাত্রেরা কেমন দৃঢ়তার সহিত সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিয়া নিজেদের দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। বীরেনবাবু একজন ওস্তাদ গল্প বলিয়ে। কাহিনীটি তিনি এমনি চিত্তাকর্ষকভাবে বলিয়াছেন যে, তাহা পাঠকের মনকে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায় এবং গল্পটি যে উদ্দেশ্যমূলক সেকথা মনেই থাকে না।

উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসকে রসোত্তীর্ণ করা দুরূহ ব্যাপার। বীরেনবাবু সেই কঠোর পরীক্ষায় অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। স্বাধীন ভারতে আজ জাতিগঠনমূলক কার্য্যের দিকে দেশবাসীর ঝোঁক পড়িয়াছে। এমন সময়ে বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্ত্তনে উৎসাহী ব্যক্তিগণ 'নতুন পাঠশালা' হইতে কার্য্যকরী পন্থার হদিস পাইবেন।

বাংলা বর্ষলিপি—(১৩৫৫) সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী। সংস্কৃতি বৈঠক ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস। মূল্য দুই টাকা।

সংস্কৃতি বৈঠক ১৩৫১ সন হইতে প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে এক এক খণ্ড বাংলা বর্ষলিপি প্রকাশিত করিয়া বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছেন। এই বাংলা 'ইয়ার বুক' স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বাংলার ঘরে ঘরে বিশেষ সমাদরলাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের (৫ম বর্ষ) বর্ষলিপি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বার অপেক্ষা সুসম্পাদিত ও ঢের বেশী চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। রাজনৈতিক দিক দিয়া ১৯৪৭ সালটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বৎসরেই ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অধীনে ভারত ডোমিনিয়ন জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা, বাংলা ও পঞ্জাব বিভাগ ইত্যাদি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ে সাধারণ পাঠকদের যাহাতে মোটামুটি জ্ঞানলাভ হয় সেইজন্য সম্পাদকমণ্ডলী বাংলা বর্ষলিপিকে প্রচুর তথ্যসম্ভার সমৃদ্ধ করিয়া ঢালিয়া সাজিয়াছেন। পুস্তকখানি শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই পক্ষে বিশেষ উপযোগী, তবে সাংবাদিকদের নিকট এরূপ একখানি সময়োপযোগী পুস্তক অপরিহার্য্য বলিয়াই গণ্য হইবে।

প্রবাসীতে প্রথম বৎসরের বাংলা বর্ষলিপির সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা 'বর্ত্তমানের বিশিষ্ট বাঙালী' নামক অধ্যায়টির ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান বৎসরের বর্ষলিপিতে নামের তালিকা বড় হইয়াছে বটে, কিন্তু মনে হয় যেন এমন কয়েক জন বিশিষ্ট বাঙালীর নাম বাদ পড়িয়াছে এই অধ্যায়ে উল্লিখিত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের পাশে স্থান পাইবার যোগ্যতা যাঁহাদের আছে।

শ্রীশ্রীমনসা পূজা ও কথা—ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্ত্তী প্রাপ্তিস্থান, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ আনা।

মনসাপূজা বাংলাদেশের বিশিষ্ট পূজাপার্ব্বণসমূহের অন্যতম। বাংলাদেশে এই পূজার বহুল প্রচলন আছে। চাঁদসদাগর ও মনসার কাহিনী পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে বর্ণিত আছে। তদবলম্বনে ময়মনসিংহের নারায়ণ দেব এবং বংশীদাস, বিজয় গুপ্ত প্রমুখ কবিগণ মনসামঙ্গল, মনসার পাঁচালী ইত্যাদি রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকে ভক্তিতীর্থ মহাশয় মনসাপূজার ধ্যান এবং বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত পদ্মপুরাণের সার সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। বাংলাদেশে ঘরে ঘরে মূর্ত্তি গড়িয়া অথবা ঘট স্থাপন করিয়া মনসাপূজা হয়। এই পুস্তকখানি মনসার ভক্তদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। পুস্তকের 'প্রারম্ভ' অধ্যায়ে লেখক ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নাগপূজার প্রচলন সম্বন্ধে যে-সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা প্রভূত পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং গভীর গবেষণাপ্রসূত।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

কৈকেয়ী ও মন্থরা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীরণবীর শকসেনা

শারদোৎসব

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৮শ ভাগ ২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৫৫ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

গান্ধী জয়ন্তী

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে বেতার-বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু বলেন :—

"যাঁহাকে আমরা জাতির পিতা বলিয়া অভিহিত করি তাঁহার জন্য বিশেষভাবে উৎসর্গীকৃত দিনে আমি আর আপনাদের কি বলিব ? ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ যাত্রাপথে সকলের ন্যায় একজন তীর্থযাত্রী, যে গুরুর পদতলে বসিয়া ভারতের সেবা এবং সত্যধর্ম্ম শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল সেই জওহরলালরূপেই আজ আপনাদের নিকট কিছু বলিব, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়।

"কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবন নয় সাধারণ ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য দেশের সহিত ব্যবহারে তিনি আমাদের সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিতে এবং স্পষ্টবাদী হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মানুষের আত্মসম্মান ও শ্রমের মর্য্যাদা সম্বন্ধেও তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন। ঘৃণা এবং হিংসা হইতে ঘৃণা, হিংসা এবং ধ্বংসই আসে—এই পুরাতন শিক্ষারই তিনি পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। সুতরাং তিনি আমাদের নির্ভীকতা, ঐক্য, সহিষ্ণুতা ও শান্তির পথ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন।

"গত বৎসরাধিককালে ভারতে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত, কারণ ঐগুলি অন্যায়। কিন্তু কাশ্মীর ও হায়দরাবাদে যাহা করিয়াছি ও করিতেছি তাহার জন্য আমাদের কোনও দুঃখ নাই ; আমরা যদি হায়দরাবাদ ও কাশ্মীরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিতাম তবে আরও বেশী দুঃখ কষ্ট ও হাঙ্গামা দেখা দিত। কাশ্মীরকে রক্ষা করিবার জন্য অথবা জঘন্য ষড়যন্ত্র হইতে হায়দরাবাদের অধিবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য যদি ভারতবর্ষ অগ্রসর না হইত তবে লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিত না।

"অন্যান্য দেশে যাহাই ঘটুক না কেন, আমরা যেন শান্ত এবং গান্ধীজীর শিক্ষার প্রতি অবিচল থাকিতে চেষ্টা করি। তাঁহার প্রতি যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে নিজেদের প্রতিও আমরা বিশ্বাস রাখিতে পারিব এবং তাহাতে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির মঙ্গলই হইবে।"

ঐদিনই দিল্লীর জনসভায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে রাষ্ট্রনৈতিক গগনে গান্ধীজীর আবির্ভাবের উল্লেখ করিয়া তিনি আরও বলেন :—

"তাঁহার প্রথম মন্ত্র ছিল "ভয় পাইও না।" এই মন্ত্রে লোকের মনে নূতন আশা দেখা দিল ; দেশের অবস্থাও অনেক পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার আদর্শ আমি এবং গবর্ণমেণ্ট অনুসরণ করিতেছি। অবশ্য সর্ব্বদা আমরা তাঁহার উচ্চ আদর্শের সম্মান রক্ষা করিতে পারি নাই।"

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু বলেন :—

"জীবনের শেষ কয়মাস আমরা গান্ধীজীকে খুবই দুঃখ দিয়াছি। সেজন্য আমরা যথোচিত অনুতপ্ত হইয়াছি কি-না জানি না। তিনি বলিতেন, আমার আর বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা নাই। চতুর্দ্দিকে ঘৃণা বিদ্বেষ লইয়া বাঁচিয়া থাকা গান্ধীজীর পক্ষে অসহনীয় ছিল। সুতরাং গান্ধীজীর জন্য দুঃখ করিবার সময়ে আমাদের মনে রাখিতে হইবে তাঁহার দেহও নশ্বর ছিল। কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য রহিয়া গিয়াছে। তিনি জীবিত থাকিতে যে আলো বিচ্ছুরিত হইত, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার উপদেশ হইতে যে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহা আমাদের পথ প্রদর্শন করিবে। গান্ধীজীর মৃত্যুতে সে আলো ম্লান হয় নাই।"

"তাঁহার মহত্ত্বের কথা, তাঁহার গৌরবময় সাফল্যের কথা অধিক বলিয়া লাভ নাই। আমরা যখন বলি, তিনি আমাদের বাপু, জাতির জনক, আমরা যাহা কিছু পাইয়াছি, তাঁহারই জন্য পাইয়াছি ইহাই যথেষ্ট।"

মহাত্মাজীর পূর্ণাঙ্গ জীবন জাতির পক্ষে কত দূর কল্যাণময় ছিল সে কথা আজ আমাদের অভাব-অভিযোগপূর্ণ দুঃখ-জর্জর-ক্লিষ্ট দেশের জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিরোধানের মধ্যেও তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিষ নিজে ধারণ করিয়া জাতির অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আজ হায়দরাবাদের সমস্যা যে এইরূপে, বিনা রাষ্ট্রবিক্ষোভে, পূরণ করা সম্ভব হইল তাহার কারণ মহাত্মাজীর আত্মাহুতি।

মহাত্মাজীর আত্মা ও চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল ও হিংসাবর্জ্জিত ছিল বলিয়াই তিনি অন্যের দোষ ক্ষমা করিয়া তাহার গুণের সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেন ; নিজের মধ্যে অহঙ্কারের

লেশমাত্র ছিল না বলিয়া অপরকে হেয়জ্ঞান করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। নিজের বিশ্বাস পূর্ণরূপে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই অপরের বিচারের সময় তিনি তাহার মধ্যে যাহা অসত্য তাহাকে বর্জ্জন করিয়াও যেটুকু সত্য তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাঁহার শিষ্যবর্গ যদি তাঁহার পথ সত্য সত্যই অবলম্বন করিয়া চলিতেন তবে দেশে আজ আশার আলো উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত।

তিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে অহিংসাব্রতী ছিলেন। কিন্তু আমরা নিজের অভিজ্ঞতায় সাক্ষ্য দিতে পারি যে তিনি বীরত্বের সম্মানদানে হিংসা-অহিংসার মধ্যে কঠোর প্রভেদ করিতেন না। ১৯৪৫ সালে মগনলাল বাগরী নামক বিপ্লববাদী যখন ধৃত হইয়া নাগপুরের বিচারালয়ে চরম দণ্ডের সম্মুখীন হয় তখন মহাত্মাজী তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য সেখানকার এক প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান ব্যবহারাজীবকে বিশেষ অনুরোধ করেন এবং সকল ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দেন। ব্যবহারাজীব বলেন: "বাপুজী, ইসনে তো অহিংসা ছোড় কর দুসরা রাস্তা লিয়া, তো ফির ইনকো আপ মদত দেনা কেঁও চাহতে হঁয়?" আমরা আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার উত্তর শুনিলাম "ভাই, হিম্মত তো দেখলায়া? হিম্মত কি কদর দেনা তো চাহিয়ে?" বস্তুতঃ পক্ষে বীরত্বের সম্মান তিনি সর্ব্বদাই সকল ক্ষেত্রে করিতেন। মেদিনীপুরের ১৯৪২-৪৫ সালের অসহযোগ সংগ্রাম কালে অনেক ক্ষমতালোভী নেতার চক্রান্তে দলবিচ্ছেদ ও বিশেষ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, যাহার ফল অত্যন্ত বিষময় হইয়া উঠে। মহাত্মাজীর মেদিনীপুর যাত্রার পূর্ব্বে ঐ নেতার দল মহাত্মাজীর নিকট বিপক্ষদলের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্য্যের অভিযোগ করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন। সেই দলের কয়েকজন আমাদের নিকট আসিলে আমরা তাঁহাদের বলি মহাত্মাজীকে অকপটে সমস্ত সত্য ঘটনা বলিতে। তাঁহারা ঐ পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, অসহযোগ সংগ্রামের সমস্ত বিবরণ মহাত্মাজীকে নিবেদন করেন। বলা বাহুল্য, মহাত্মাজীর বিচারে বীরত্বের সম্যক্ উপলব্ধি দেখা যায়। আজ এমন কে আছেন যিনি ঐরূপ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে সমর্থ?

বাঙালী যুবশক্তির সমাদর

মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের পরে সুহরাবর্দ্দি মন্ত্রিসভার কলিকাতা দখলের জন্য সশস্ত্র অভিযানের সময় প্রায় দুই হাজার বাঙালী যুবক ও কিশোর জীবনমরণ পণ করিয়া যুদ্ধদানে তৎপর হয়। কলিকাতার হিন্দু সাধারণের ধন, প্রাণ এবং স্ত্রীলোকের মান-ইজ্জত রক্ষার অন্যতম কারণ উহাদের প্রবল প্রতিরোধ-সংগ্রাম। বঙ্গবিভাগের পর প্রধানমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে অনুরোধ করা হয় যেন ঐ সকল যুবককে সশস্ত্র পুলিস ও সামরিক বিভাগে গ্রহণ করিয়া দেশের শাসন রক্ষণে নিযুক্ত করা হয় কেননা অন্যথায় উহারা বিপথে যাইতে পারে। প্রফুল্লবাবু তাঁহার একান্ত নিজস্ব দিব্যজ্ঞানের আলোকে বিপরীত ব্যবস্থা করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের হাতে পুলিস রহিয়াছে ছয় মাসের অধিক। নিম্নলিখিত সংবাদ কিরণবাবু নিশ্চয়ই জানেন। আমরা দেখিতে চাহি এ বিষয়ে তিনি কি করেন কেননা তাহাতেই তাঁহার ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে।—

"২৭শে সেপ্টেম্বর ভোর তিনটার সময় একজন পুলিস ইন্সপেক্টর দলবল সহ ২৭।৩ বৈঠকখানা রোডের শ্রীকবীন্দ্রভূষণ সেন বরাটের গৃহে হানা দেন। খানাতল্লাসীর জন্য দমকলের মই দিয়া পুলিস তেতলা বাড়ীর ছাদে উঠে। বিবরণে প্রকাশ, ছাদে লোকের পায়ের শব্দ পাইয়া চোর মনে করিয়া বাড়ীর মালিকের পুত্র শ্রীসুধীর সেন শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসে এবং পুলিসের গুলি খাইয়া পড়িয়া যায়। গুলির শব্দ শুনিয়া সুধীরের বড়ভাই পুলিসকে প্রশ্ন করিলে তাহার প্রতিও গুলি ছোঁড়া হয় বলিয়া প্রকাশ। সৌভাগ্যক্রমে সে আহত হয় নাই। আহত সুধীর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। বড়ভাইটি আছেন পুলিসের হেপাজতে।"

পূর্ব্ববঙ্গের "পাকিস্থানী" মতিগতি

মুর্শিদাবাদ জেলার কংগ্রেসী পত্রিকা "গণরাজ"-এ নিম্নলিখিত বিবরণ ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে,—

> মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে পাকিস্থানী জুলুম যে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একথা আমরা বহু পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি। স্বাধীনতা লাভের পর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল; কিন্তু অবস্থার ত কোন পরিবর্ত্তন হইলই না, উপরন্তু 'র‍্যাডক্লিফ' রোয়েদাদ অনুসারে সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলের যে সকল চর মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত, তাহা পাকিস্থানী সরকারের দখলে থাকা অবস্থায় উভয় ডোমিনিয়নের প্রধান সচিবদ্বয় একত্রে মিলিত হইয়া 'status quo' রক্ষা করিবার যে চুক্তি সম্পাদন করিলেন, তাহার ফলে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য কতিপয় চর হইতে জেলার অধিবাসিগণ বিতাড়িত হইবার ফলে সুতি, সমসেরগঞ্জ, রাণীনগর, জলঙ্গী প্রভৃতি থানার অধিবাসিগণের একাংশ তাহাদের পৈতৃক বাসভূমি হইতে যে বিতাড়িত হইলেন এবং অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত হইলেন, তাহা অস্বীকার করিবে কে? পূর্ব্ব পাকিস্থানের সরকার সীমানির্দ্ধারণ ব্যাপারে ভারত-রাষ্ট্রের নিকট সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিবার যে আকুল আহ্বান জানাইয়াছিলেন, তাহাতে সাড়া দিয়া ভারত-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার তাঁহাদের উদারতারই পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু পাকিস্থানী সরকার তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রচলিত রীতি অনুসারে কোন চুক্তিই প্রতিপালন করেন নাই। তাই বার বার আমরা চুক্তি-ভঙ্গের দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি তাঁহাদের মেসিনগানধারী ষ্টীমারকে মুর্শিদাবাদ জেলার বুকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে। আমরা দেখিয়াছি যে তাঁহাদের সশস্ত্র রক্ষী আমাদের রাণীনগর থানার রামনগর, দোয়েম-কানুন, বাঁশগাড়া ও বেগমপুর মৌজায় অনধিকার প্রবেশ

করিয়া গরীব নিরীহ প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছে—এমন কি আমাদের পাহারারত রক্ষীবাহিনীর উপর গুলি ছুড়িতেও সাহসী হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি পাকিস্থানী সরকার অন্যায়ভাবে অকারণে নূরপুর সীমান্ত হইতে আমাদের সশস্ত্র রক্ষীবাহিনীকে গ্রেপ্তার করিয়া ন্যায়-নীতির সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে।

ইহা পাঠ করিয়া ইহাই মনে হয় যে পাকিস্থানের নূতন রাষ্ট্রপাল জনাব খাজা নাজিমউদ্দিন ও পূর্ব্ববঙ্গের নূতন প্রধান মন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন যে সব ভরসার কথা আমাদের শুনাইতেছেন, তাহার উপর অনেক দিন নির্ভর করিয়া থাকা যাইবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব্বেও সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থানী বর্ব্বরতার যে বহিঃ-প্রকাশ হইয়াছে পশ্চিম পাকিস্থানে ও কাশ্মীর রাজ্যে তাহার ফল উভয় রাষ্ট্রের নাগরিকবর্গকে ভোগ করিতে হইবে। পূর্ব্ববঙ্গে অন্তরটিপুনী দিয়া হিন্দুর সম্মানের ও স্বার্থের উপর নিয়ত আঘাত করা হইতেছে। এই অবস্থায় যদি 'গণরাজ' পত্রিকায় বর্ণিত কার্য্য-কলাপ চলিতে থাকে তবে ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্তে যে-কোন দিন আগুন জ্বালিয়া উঠিতে পারে। ইহা আমরা চাই না। কারণ ভারতবাসীর নিজেদের মধ্যে হানাহানি করিয়া যে স্বাধীনতা আসিয়াছে আমাদের দুয়ারে তাহা বিমুখ হইয়া চলিয়া যাইবে যদি এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার ভাব না থাকে। জনাব নুরুল আমিনকে এই কথাটাই মনে রাখিতে বলি। ভারতরাষ্ট্র পাকিস্থানের শত্রু এই কথা শুনাইতে শুনাইতে একদিন সত্যই "বাঘ" আসিয়া পড়িতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী বেশী দিন লাগাম কষিয়া রাখিতে পারিবেন না। লোকের সহ্যেরও একটা সীমা আছে।

বাঙালীর সামরিক বৃত্তি

হায়দরাবাদ রাজ্যের রাজাকার গুণ্ডামি দমন করিবার জন্য যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল তাহা প্রায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হয়। ইহার মধ্যে দুই দিকের নেতৃত্ব করেন দুই জন বাঙালী সৈন্যাধ্যক্ষ—ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চৌধুরী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রুদ্র; আকাশ-পথের আক্রমণে বিমানাধ্যক্ষ মুখার্জ্জি নেতৃত্ব করেন। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই তিন জন বাঙালী প্রধানকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, এবং তাঁহাদের কৃতিত্বের গৌরব বাঙালী জাতির প্রাপ্য বলিয়া দাবি করেন। তাঁহার বিবৃতিটি উত্তর-ভারতের কোন কোন সাংবাদিকের মনঃপূত হয় নাই; এই বিবৃতির মধ্যে তাঁহারা প্রাদেশিকতার ইঙ্গিত পাইয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। এই বিবৃতি পাঠ করিয়া আমাদের মনে কিন্তু অন্যভাবে দুঃখের উদয় হইয়াছিল। সৈন্যাধ্যক্ষ চৌধুরী, সৈন্যাধ্যক্ষ রুদ্র ও বিমানাধ্যক্ষ সুব্রত মুখার্জ্জির কৃতিত্বে আমরা গৌরব অনুভব করি। কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ, নৌ-সেনাধ্যক্ষ ও বিমানাধ্যক্ষের আজ্ঞায় বাঙালী সৈনিক, বাঙালী নৌ-সেনা ও বাঙালী বৈমানিক চলিলে ততোধিক গৌরব অনুভব করিতাম। সৈন্যাধ্যক্ষ, নৌ-সেনাধ্যক্ষ ও বিমানাধ্যক্ষের কৃতিত্বে একটা জাতির ক্ষত্রিয় বৃত্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। এইরূপ অসমান উন্নতিতে জাতির পক্ষে উৎফুল্ল হইবার কোন কারণ নাই।

ইংরেজের আমলে বাঙালীর কপালে "অ-সামরিক জাতি" বলিয়া একটা কলঙ্কের ছাপ লেপিয়া দেওয়া হইয়াছিল। চৌধুরী, রুদ্র, মুখার্জ্জি, সেন প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর দু-চার জন সামরিক জীবনে সাফল্য অর্জ্জন করিলে, বাঙালী জাতির মধ্যে সামরিক বৃত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে না। যখন লক্ষ লক্ষ বাঙালী সামরিক বৃত্তির নানা বিভাগে যোগদান করিবে তখনই বাঙালী সমরাধ্যক্ষবর্গের গৌরব বংশানুক্রমে সংক্রামিত হইবে। এইভাবে বিষয়টা বিচার করিলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সম্মুখে বিরাট কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে। স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের রক্ষা-কল্পে কেবল বাঙালী সমরাধ্যক্ষের আবির্ভাব হইলে চলিবে না। প্রত্যেক বাঙালীকে অস্ত্রধারণক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে; প্রত্যেক বাঙালীকে ভারতরাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বর্ত্তমান যুগোপযোগী সামরিক শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শী করিয়া তুলিতে হইবে। এই বিষয়ে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রি-মণ্ডলীর অপদার্থতার কথা আমরা জানি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রি-মণ্ডলী ৭০০ শত জাতীয় রক্ষী বাহিনীর সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে পারিবেন না; ১৭০০, ১৮০০ শত লোককে বাঙালী পল্টনে ভর্ত্তি করিবার সংবাদ প্রচার করিয়া কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে এই ধারণার সৃষ্টি করিলে চলিবে না। কথা ছিল যে ৬,০০০ হাজার পল্লীবাসীকে এক বৎসরের মধ্যে সামরিক অ, আ, ক, খ শিক্ষাদান করিয়া তাহাদের গৃহে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। তাহাদের গ্রাম পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব্ব-সীমান্তে অবস্থিত। এই সীমান্তরক্ষার প্রথম চোট্‌টা তাহাদের উপরই পড়িবে।

মুর্শিদাবাদের "গণরাজ" পত্রিকা হইতে সংবাদ ও মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে আমাদের পূর্ব্ব-সীমান্তের প্রতিবাসী "পাকিস্থানীরা" খুব শান্তিপ্রিয় লোক নহে। বিগত এক বৎসরের মধ্যে তাহারা নানাভাবে আমাদের পূর্ব্ব-সীমান্তের গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার করিয়াছে। তাহা বন্ধ করিতে পশ্চিম বাংলার গ্রাম্য-অঞ্চলের লোককে সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাদের পৃষ্ঠ-রক্ষা করিবে রীতিমত সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী সৈনিক, নৌ-বাহিনী ও বৈমানিক। এই ত্রিবিধ শিক্ষার কি আয়োজন করা হইতেছে তাহা জানিবার অধিকার আমাদের আছে। এই বিষয়ে দায়িত্বটা কাহার—কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের না পশ্চিমবঙ্গ গবর্ন্মেণ্টের? চূড়ান্ত দায়িত্ব ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ গবর্ন্মেণ্টের দায়িত্বটা কোন্‌খানে আরম্ভ ও কোন্‌খানে তাহার শেষ হইয়াছে, তাহা আমাদের জানিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ন্মেণ্ট একটি বিরাট প্রচার বিভাগ পোষণ করিতেছেন। তাহাদের টাইপ করা প্রচার-পত্র মাঝে মাঝে

আমরা পাইয়া থাকি। কিন্তু আমাদের মনে পড়ে না যে বাঙালীর মধ্যে সামরিক বৃত্তি উজ্জীবিত করিবার কোন চেষ্টার সংবাদ এই প্রচার বিভাগের নিকট হইতে পাইয়াছি। প্রধান মন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনে ছিটেফোঁটা সংবাদ যাহা পাই তাহা অকিঞ্চিৎকর। আর পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের সভ্যবৃন্দের গুণের কথা বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। সামরিক জীবন সম্বন্ধে যে একটা কলঙ্ক বাঙালীর কপালে দাগিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য কোন উদ্যোগ তাঁহাদের মধ্যে ত দেখিতে পাই না। এই কলঙ্ক মোচনের চেষ্টা করিবে কে তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়।

পশ্চিম বাংলা ও বিহারের সীমান্ত অঞ্চল

পশ্চিম বাংলা ও বিহারের মধ্যে সীমান্ত-অঞ্চল লইয়া একটা বিতর্ক চলিতেছে। এই বিষয়ে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী, পশ্চিম বাংলার পরিষদের সভ্যবৃন্দের বিরুদ্ধে আমাদের একটা অভিযোগ আছে। সেই অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গ হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রেরিত সভ্যবৃন্দের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য। আমাদের অভিযোগ তাঁহাদের সকলের নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধে, এই বিষয়ে তাঁহাদের অসহায়তার বিরুদ্ধে। বিহার-পরিষদে বিহারী মন্ত্রিমণ্ডলী ও সভ্যবৃন্দ এই সম্বন্ধে অধিক সজাগ বলিয়া মনে হয়। এই সেদিন মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় ত আমাদের সকলকে শাসাইয়া দিয়াছেন এবং একজন সভ্য বাংলাদেশের মালদহ জেলার উপর একটা দাবী পেশ করিয়া রাখিয়াছেন। আর পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রি মহাশয়গণ এই বিষয়ে নীরব; পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের সভ্যবৃন্দের বক্তৃতা-শক্তি নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা ও গণ-পরিষদের বাঙালী সভ্যবৃন্দ গত আট মাস পর্য্যন্ত ঘুমের ঘোরে ছিলেন। উৎকলের প্রতিনিধি শ্রীবিশ্বনাথ দাসের প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন সম্বন্ধে তাঁহার অনিচ্ছার কথা একটু রূঢ়-ভাবে, বোধ হয়, প্রকাশ করেন। বাঙালী সভ্যবৃন্দের টনক তাহার পূর্ব্বেই নড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গণ-পরিষদের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভাষার ভিত্তিতে দাক্ষিণাত্যের প্রদেশসমূহ পুনর্গঠন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন; সেই কমিশনের কার্য্যাবলী হইতে উত্তর-ভারতে কোন সীমান্তের অদল-বদল করার প্রশ্নটাকে সাবধানতার সহিত এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে। বাঙালী সভ্যবৃন্দ একটু ব্যাপকতর মীমাংসার জন্য গণ-পরিষদের সভাপতির নিকট একখানি পত্র লিখেন; তাহার উত্তরে এমন একটা সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে যে বাঙালী সভ্যগণ ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর নিকট একটা অভিযোগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকেও এই বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য আর একখানি পত্র দিয়াছেন। তাহার কোন সদুত্তর পাওয়া গিয়াছে কিনা তাহা আমরা জানি না। পণ্ডিত জবাহরলালের নিকট লিখিত পত্রে ব্যাপারটার মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"প্রিয় মহাশয়,

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ বিভাগ সম্পর্কে ১৯৪৮ সালের ৩০শে আগষ্ট তারিখে শ্রীবিশ্বনাথ দাসের প্রশ্নের উত্তরে আপনি লিখিতভাবে পরিষদে যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি।

এই বিশেষ সমস্যাটি সমাধানের জন্য বর্ত্তমানে কোন কাজ করা সম্পর্কে গবর্ন্মেণ্টের অনিচ্ছার বিষয় আমরা অবগত আছি। কিন্তু কয়েকটি অঞ্চল সম্বন্ধে এই বিষয়ে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরল ও মহারাষ্ট্র এই চারিটি নূতন প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ও তৎসম্বন্ধে একটা রিপোর্ট দিবার জন্য গণ-পরিষদের সভাপতি যে কমিশন গঠন করিয়াছেন, গবর্ন্মেণ্ট তাহা সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত কমিশন কাজ আরম্ভ করিয়াছে। আমরা বলিতে চাহি যে, বিহারের বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল সম্পর্কিত সমস্যাটিও বর্ত্তমানে স্থগিত রাখা উচিত নয়। বাংলা-বিহার সমস্যা ভাষাগত প্রদেশ গঠন সমস্যার অংশবিশেষ। বিহারের বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল বাংলার (বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলার) অন্তর্ভুক্ত করার দাবী ভাষার ভিত্তিতে কয়েকটি নূতন প্রদেশ গঠনের দাবীর ন্যায়ই পুরাতন।

গণ-পরিষদের কোন প্রস্তাব বা নির্দ্দেশ অনুসারে সভাপতি মহাশয় এই কমিশন নিযুক্ত করেন নাই; যদিও খসড়া প্রণয়ন কমিটির একটা নির্দ্দেশ অনুসারে এই কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছে, এরূপ একটা ইঙ্গিত আছে। খসড়া প্রণয়ন কমিটি নূতন শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী করার পূর্ব্বে নূতন প্রদেশসমূহ গঠন করার কথা বলিয়াছেন। ১৯৩৫ সালের ভারত আইনের ২৯০ ধারা অনুযায়ী একমাত্র গবর্ন্মেণ্টই তাহা করিতে পারেন। আমরা এই শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নটি তুলিতাম না। কিন্তু বিহার ও পশ্চিম বাংলার সীমানা নির্দ্ধারণের সমস্যাটি কমিশনের কার্য্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য গণপরিষদের সভাপতিকে যে অনুরোধ করিয়াছিলাম সেই অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় আমাদের এই শাসন-তান্ত্রিক সমস্যাটির উল্লেখ করিতে হইয়াছে। আমরা বলিতে চাই যে গণ-পরিষদের সভাপতি কমিশন নিযুক্ত করিলেও প্রয়োজন বোধে তাহার কর্ম্মসূচী বাড়াইবার বা সঙ্কোচ করিবার অধিকার গবর্ন্মেণ্টের আছে। ১৯৪৮ সালের ২৫শে আগষ্ট তারিখে গণ-পরিষদের সভাপতির নিকট যে পত্র আমরা লিখিয়াছিলাম তাহার প্রতিলিপি আপনার নিকটেও প্রেরিত হইয়াছিল। গণ-পরিষদের সভাপতি মহাশয় আমাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া যে উত্তর দিয়াছেন, কমিশনের কার্য্য-সূচী বাড়াইয়া বাংলা-বিহারের সমস্যাটা তাহার

অন্তর্ভুক্ত করিবার যে দাবী আমরা করিয়াছিলাম তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা আমরা পাইয়াছি। কমিশন কেবল নূতন প্রদেশ কয়টি গঠন সম্পর্কে তদন্ত করিবেন, এই কথাটা আমাদের জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই অবস্থায় ১৯৩৫ সালের ভারত আইনের ২৯০ ধারা অনুসারে গবর্ণমেণ্টই কেবল পশ্চিম বাংলা ও বিহারের সীমানা পুনঃ নির্দ্ধারণের জন্য কাজ করিতে পারেন। যখন গণ-পরিষদ এই বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই, তখন এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এবং অবস্থা উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি।

বর্ত্তমান সঙ্কটজনক সময়ে গবর্ণমেণ্টকে বিপদে পড়িতে হয় এইরূপ কোন কিছু করিতে আমরা চাহি না বা এরূপ কোন প্রস্তাবও করিতে চাহি না। বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলার প্রতি বর্গ মাইলে লোক সংখ্যা প্রায় ৮০০ শত হওয়ায় এবং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ক্রমাগত আশ্রয়-প্রার্থী আসায়, পশ্চিম বাংলার সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণের সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সমগ্র ভারতে ভাষাগত ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্বিভাগের প্রশ্নটি যদি বর্ত্তমানে স্থগিত রাখা হইত তাহা হইলে আমরা অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধানের জন্য চাপ দিতাম না। এইরূপ ক্ষেত্রে আমরা দুইটি প্রতিশ্রুতি চাহিতাম। প্রথমতঃ, বিহারের বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চলের ভাষাগত বর্ত্তমান অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য কোন কিছু করা হইবে না, এবং ভবিষ্যতে বিহারের বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিম বাংলার সহিত যুক্ত করা সম্পর্কে বাধা সৃষ্টি হইতে পারে, নূতন শাসনতন্ত্রে সেইরূপ কোন বিধান বা নির্দ্দেশ থাকিবে না।

শীঘ্রই এই পত্রের উত্তর পাইলে বাধিত হইব।"

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর নিকট হইতে এই পত্রের কোন সদুত্তর পাওয়া গিয়াছে কিনা জানি না; গণ-পরিষদের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কোন্ যুক্তি দেখাইয়া বাঙালী সভ্যগণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহাও আমরা জানি না। কোন সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হইলে, তাহা আমরা দেখি নাই। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর (৩রা আশ্বিন) তারিখের "হরিজন" পত্রিকায় পুরুলিয়ার কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে; তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহারা কোন প্রকাশ্য আন্দোলনের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা কংগ্রেসের সর্ব্বোচ্চ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের হাতে এই সমস্যার মীমাংসার ভার দিয়াছেন, ন্যায় ও কংগ্রেসের বহু বিঘোষিত নীতির উপর নির্ভর করিয়া কংগ্রেস নেতৃবর্গ তাহা মীমাংসা করিয়া দিবেন, এই ভরসা অতুলবাবু করেন। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী, পশ্চিম বাংলার পরিষদের সভ্যবৃন্দ, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিবর্গ—সকলেই মনে হয় এরূপ একটা ভরসায় বুক বাঁধিয়া আছেন। তাঁহাদের ভরসা সার্থক হউক। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে এরূপ ভাবে সদ্ভাবের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া চলা যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। কামড়াইতে নিষেধ করা হইয়াছিল বলিয়া ফোঁস করিতে ত কোন নিষেধ ছিল না—এরূপ একটা গল্প "রামকৃষ্ণ কথামৃতে" পড়িয়াছি। এই গল্পের শিক্ষা ছিল যে, বিদ্বিষ্ট লোককে হিংসা হইতে দূরে রাখিতে হইলে একটু ভয় দেখাইতে হয়। সেইরূপ রাষ্ট্রকেও অন্যায়ের পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে হইলে জনমতের রুদ্র-মূর্ত্তির প্রয়োজন হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের ও কর্ণাট প্রদেশের নেতৃবর্গ ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারবৃন্দের কানে এরূপ একটা সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের বাঙালী সভ্যবৃন্দের কি এই কথা অজানা?

গৌহাটির ঘটনার স্বীকৃতি

গৌহাটিতে গত মে মাসে অসমিয়রা বাঙালীদের উপর চড়াও হইয়া যে গুণ্ডামি করে তাহার ফলে একজন বাঙালী নিহত এবং ৪০ জন আহত হয় এবং লুণ্ঠিত ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮১,৯৪৫।৶০ আনা। সম্প্রতি আসাম ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে রাজস্বসচিব শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী এই তথ্য স্বীকার করিয়াছেন। যাহারা দাঙ্গা বাধাইয়াছিল এবং লোকজন আহত ও সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মামলা চালানো হইতেছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে মেধী মহাশয় বলিয়াছেন যে তদন্তে সমস্ত অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হইয়াছে কিন্তু কোন লোকের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ নাই বলিয়া মামলা চালানো যাইবে না। গৌহাটির দুইটি ডাক্তারখানা এই দাঙ্গায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যাহারা ডাক্তার-খানাটি ভাঙিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৬ ধারানুসারে ৬৪ (৫) নং মামলা দায়ের করা হয়; তদন্তে অভিযোগ সত্য বলিয়া জানা যায়—এতগুলি কথা স্বীকার করিয়াও মেধী মহাশয় তাঁহার জবাবে সার কথা এই বলিলেন যে "প্রমাণ নাই" (No evidence)।

আসাম গবর্ণমেণ্ট দাঙ্গাকারী আসামীদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন—লোকের মনে অতঃপর এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়াই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। গৌহাটির ঘটনা এবং উহাতে সংশ্লিষ্ট দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে সত্য প্রতিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও সরকারের দয়ায় তাহাদের "প্রমাণাভাবে" মুক্তিলাভ হইতে আসামবাসী বাঙালীদের অসহায় অবস্থা যে কতদূর গভীর তাহা বুঝা যায়।

পূর্ব্বাচল প্রদেশ

আসামের প্রাদেশিক বিদ্বেষে জর্জ্জরিত হইয়া সেখানকার বাঙালীরা যে স্বতন্ত্র কংগ্রেস প্রদেশের দাবী তুলিয়াছিলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিগত অধিবেশনে তাহা অনুমোদন করা হয়। স্থানীয় লোকদের দাবী অনুসারে কাছাড়, ত্রিপুরা, মণিপুর ও লুসাই পাহাড় লইয়া একটি আলাদা কংগ্রেস প্রদেশ পূর্ব্বাচল প্রদেশ নামে গঠিত হয়। ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্তের কয়েক দিন পরে অকস্মাৎ কংগ্রেস-সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজে এক আলাদা হুকুমনামা জারী করিয়া ঐ অনুমোদন বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

পূর্ব্বাচল প্রদেশ লইয়া যাঁহারা আন্দোলন করিতেছেন দেখা যাইতেছে তাঁহারা স্বতন্ত্র কংগ্রেস প্রদেশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিতেছেন। হয়ত তাঁহারা ভাবিতেছেন যে একবার উহা কংগ্রেস-প্রদেশে পরিণত হইলে উহাকে শাসন-তান্ত্রিক প্রদেশ রূপে পৃথক করিয়া লইতে বিলম্ব বা অসুবিধা হইবে না। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দীর্ঘকাল যাবৎ কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে ভাষার ভিত্তিতে অন্ধ্র, তামিলনাদ, কর্ণাটক প্রভৃতি প্রদেশের অস্তিত্ব রহিয়াছে কিন্তু ঐগুলি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার চেষ্টা কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ করেন নাই। ভারত-শাসন আইনের যে ধারা অনুসারে এখন অন্ধ্রকে আলাদা করা হইয়াছে সেই ধারায় অন্যান্য প্রদেশকেও তাঁহারা পৃথক করিতে পারিতেন সে ক্ষমতাও তাঁহাদের হাতে অনেক দিন যাবৎ আসিয়াছে। নূতন রাষ্ট্রবিধিতে প্রদেশ পুনর্গঠন সম্বন্ধে যে কঠোর ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে আসামের বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া নূতন প্রদেশ গঠন, বাংলা-বিহারের পূর্ব্বাঞ্চল পুনঃ-প্রাপ্তির ন্যায় অসম্ভব হইয়া উঠিবে। নূতন প্রদেশ গঠন করিতে হইলে তীব্র আন্দোলনের দ্বারা নূতন রাষ্ট্রবিধি প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে তাহা করিতে হইবে, নতুবা আর উহা হইবে না। গোয়ালপাড়া, গারো পাহাড় এবং খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়কেও পূর্ব্বাচল প্রদেশ হইতে বাদ দেওয়া উচিত নহে।

পূর্ব্বাচল প্রদেশের উদ্যোক্তারা উহাকে কংগ্রেস প্রদেশে পরিণত করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিবার আরও দুইটি কারণ থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, তাঁহারা হয়ত ভাবিতেছেন যে পূর্ব্বাচল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হইতে পৃথক হইলে তাঁহারা নিজ এলাকার সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনয়ন দেওয়ার স্বাধীনতা লাভ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে যেখানে একটি শাসন-তান্ত্রিক প্রদেশে দুইটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সেখানে নির্ব্বাচনে মনোনয়ন দানের জন্য ইলেকশন-ট্রিবিউনাল গঠিত হইবেই এবং আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভোটের জোর তাঁহাদের চেয়ে বেশী থাকিবেই। মুসলমান ভোটারের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে নিজের দলের হিন্দু আমদানী করিয়া কংগ্রেস কমিটি কবলিত করার যে দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ মহাশয় দেখাইয়া গিয়াছেন, পার্ব্বত্য জাতির নাম করিয়া অসমিয়া আমদানী করিয়া ঠিক সেই ব্যাপার আসাম কংগ্রেসের নেতারা করিবেন না এটা মনে করা মারাত্মক ভুল হইবে। তিন জন সদস্য লইয়া গঠিত ইলেকশন-ট্রিবিউনালে পূর্ব্বাচল একটার বেশী আসন কিছুতেই পাইবে না এবং ফলে মনোনয়ন কোন্ দিক দিয়া প্রবাহিত হইবে তাহাও অনুমান করিয়া লওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা হয়ত ভাবিতে পারেন যে পূর্ব্বাচল কংগ্রেস আলাদা হইলে তাঁহারা আসাম ব্যবস্থা-পরিষদের ঐ এলাকার সদস্যদের আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক প্রদত্ত নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে পৃথক নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। এটাও মারাত্মক ভুল ধারণা। একই ব্যবস্থা-পরিষদের দুই দল সদস্যকে দুই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দুই প্রকার নির্দ্দেশ দিলে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সভায় তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে, এবং সেখানে ভোটে জিতিবে পূর্ব্বাচল প্রদেশ নয়, আসাম।

গৌহাটির ঘটনার পরও যদি আসামবাসী বাঙালীদের চৈতন্য সম্পাদিত না হয়, এখনও যদি তাঁহারা নিজ নিজ স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দেন এবং দল ও দলীয় 'নমিনেশনের' কথাই বেশী করিয়া ভাবিতে থাকেন তবে তাঁহাদের আরও অনেক লাঞ্ছনা সহিতে হইবে। আন্দোলনটা সবেমাত্র জমিয়া উঠিয়াছে, এখন একটু জোর দিলে সাফল্যলাভ এবং স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চল প্রত্যর্পণের আন্দোলন এবং পূর্ব্বাচল প্রদেশ গঠনের আন্দোলন একই সঙ্গে তীব্র ভাবে চলা উচিত ছিল; বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে এখনও তাহা হইল না।

ভারতরাষ্ট্রের ব্যয়-বাহুল্য

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার বিগত অধিবেশনে শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথের প্রশ্নের উত্তরে ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু আমাদের রাষ্ট্রপালের (গবর্ণর-জেনা-রেলের) বেতন ও তাঁহার উচ্চপদের আনুষঙ্গিক ব্যয়ের বহর সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দান করেন। সেই বিবৃতি পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, রাষ্ট্রপালের বেতন ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ মাসিক ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকার অধিক ব্যয় হয়। গান্ধী-জীর আদর্শ-পূত রাষ্ট্রের পক্ষে এই ব্যয় অপব্যয়, ইহা কতটা যুক্তিসহ তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। তাহা ছাড়া একটা প্রশ্ন তুলিলে চলিবে না। ইংরেজের আমলে আমরা এই বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছি যে আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে ইংরেজের দরাজ-হাতে ব্যয়ের বহর সহ্য করা অসম্ভব; বিদেশী বলিয়াই ইংরেজ এইরূপভাবে আমাদের

শোষণ করিতেছে। এই প্রতিবাদ মনে করিয়া রাখিবার লোকের অভাব এখনও আমাদের দেশে হয় নাই। সেইজন্য পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে আমৃতা-আমৃতা করিয়া রাষ্ট্রপালের ব্যয়ের সপক্ষে অনেক কথাই বলিতে হইয়াছে—রাষ্ট্রপালের পদের একটা মর্য্যাদা আছে; সেই মর্য্যাদা ভারত-রাষ্ট্রের মর্য্যাদা হইতে পৃথক করা যায় না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই যুক্তিতে দেশের লোকের মনে কোন সান্ত্বনা আসে নাই; পণ্ডিত নেহরু সান্ত্বনা পাইয়াছেন, এরূপ মনে করিয়া তাঁহার উপর অবিচার করিতে চাই না।

কিন্তু এইরূপ প্রশ্নোত্তরে এই বিষয়ের মীমাংসা হইবে না। গত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হয় নাই; কেহই এরূপ কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন না, এবং দেশের লোক ভাবিয়া কোন উত্তর পাইতেছে না কেন আমাদের অবস্থার মত দেশে রাষ্ট্রের ব্যয় সম্বন্ধে এরূপভাবে পুরাতন রীতি (ইংরেজের আমলের রীতি) চলিতে দেওয়া হইবে। দিল্লী আমাদের পক্ষে বহুদূর; সেখানে ব্যয়ের বহর কি তৎ-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা করিতে হয় লোকের কথা শুনিয়া। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে কলিকাতা নগরীর লালদীঘির পাড়ে ও আলীপুর এণ্ডারসন হাউসে যে ব্যয়বাহুল্য দেখিতে পাই তাহা আমাদের চিন্তার পক্ষে পীড়াদায়ক। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন বাঙালী সভ্যের বিবৃতি হইতে ও নানা জনের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপ করিয়া নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া যায়। ইংরেজ আমলে সেক্রেটারীয়েটে (বেঙ্গল) ২৭৫০৲ টাকা বেতনের সেক্রেটারীর পদ ছিল মাত্র ছয়টি। অবিভক্ত বাংলার জন্য ভারত-সচিব এই বেতনের ছয়টির বেশী পদ রাখিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। মুসলিম লীগ গবর্মেণ্ট এই নির্দ্দেশ অমান্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে বিভক্ত পশ্চিম বাংলার ব্যবস্থা এ বিষয়ে কি প্রকার হইয়াছে? বর্ত্তমানে এক-তৃতীয়াংশ বাংলায় ২৭৫০৲ টাকার সেক্রেটারীর পদও দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়া হওয়া উচিত ছিল দুইটি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা দ্বিগুণ বাড়িয়া হইয়াছে বারটি। এতদিন একজন সেক্রেটারী জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং শিক্ষা বিভাগের কাজ করিয়াছেন, এখন কাজ কমিয়াছে, কিন্তু আলাদা তিন জন সেক্রেটারী করা হইয়াছে এবং শেষোক্ত দুই বিভাগের সেক্রেটারীদ্বয় প্রত্যেকে পাইতেছেন ২৭৫০৲ টাকা। এতদিন সমবায় ও পুনর্ব্বসতি বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন একজন, বেতন ২৭৫০৲ টাকা। এবার হইয়াছেন দুই জন—প্রত্যেকের বেতন ২৭৫০৲ টাকা। ফাইনান্স বিভাগে এতদিন সেক্রেটারী ছিলেন একজন, বেতন ২৭৫০৲ টাকা; এবার একজন সেক্রেটারী এবং একজন স্পেশাল অফিসার বসানো হইয়াছে—প্রত্যেকের বেতন ২৭৫০৲ টাকা। সেক্রেটারীর বেতন এক ধাপে ৮০০৲ টাকা হইতে বাড়িয়া ২৭৫০৲ টাকা হইয়াছে। বর্ত্তমান ফাইন্যান্স সেক্রেটারীকে বসানো হইয়াছে আর একজনের দাবি অতিক্রম করিয়া। 'গোলমাল' বন্ধ করিবার জন্য 'দাবি-অতিক্রান্ত' কর্ম্মচারীর বেতনও ২৭৫০৲ টাকা করা হইয়াছে।

আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের বাঙালী কংগ্রেসী কর্ণধারবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—'এইজন্যই কি ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই ও "নেতাজী" দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন?' যদিও এইরূপ প্রশ্ন করিতে আমাদের লজ্জা হয়।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন

ইংরেজ এবং মুসলিম লীগ আমলে সাম্রাজ্যবাদী এবং সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। কমিশনের সুপারিশ নাকচ করিয়া উচ্চপদে লোক নিয়োগ তখনকার গবর্মেণ্টের রেওয়াজ ছিল, কারণ উচ্চতম পদগুলিতে নিজস্ব লোক বসাইতে না পারিলে জাতীয় স্বার্থের স্থলে সাম্রাজ্যবাদী বা দলগত স্বার্থ বজায় রাখা যায় না। কমিশনের সিদ্ধান্ত পদে পদে নাকচ করিলে খারাপ দেখায় বা উহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে সমালোচনার সৃষ্টি হয় বলিয়া কমিশনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যও একটি পন্থা আবিষ্কৃত হয়। ছয় মাসের কম সময়ের জন্য লোক নিয়োগ করিলে কমিশনের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না বলিয়া বড় বড় পদে ছয় মাসের নামে লোক নিয়োগ করা হইত; তারপর ক্রমাগত তাহাদের কার্য্যকাল চার মাস ছয় মাস করিয়া বাড়াইতে বাড়াইতে বছর দুয়েক তাহাদিগকে দিয়া কাজ করাইয়া শেষে এমন অবস্থায় উহা কমিশনের নিকট পাঠানো হইত যে ঐ নিয়োগ অনুমোদন ভিন্ন কমিশনের পক্ষে গত্যন্তর থাকিত না। এই চালাকিটা মুসলিম লীগ আমলে খুব বেশী পরিমাণে হইয়াছে। লীগের যে নেতারা এখানে ইহা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা পাকিস্থান গবর্মেণ্টে সমাসীন হওয়ার পর কিন্তু আর এই কাজ করেন না। পাকিস্থান গবর্মেণ্ট উচ্চতম পদে লোক নিয়োগ সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়াকড়ি করিতেছেন। সতর বৎসরের অভিজ্ঞতা না থাকিলে কাহাকেও ডেপুটি সেক্রেটারী করা হয় না এবং ২০ বৎসরের কম অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন লোককে সেক্রেটারী করা হয় না। কোন মন্ত্রী নিজের ইচ্ছামত সেক্রেটারী লইতে পারেন না। সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী প্রভৃতি বাছিয়া দিবার জন্য একটি বোর্ড আছে। ঐ বোর্ডের সিদ্ধান্ত পাল্টাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। অন্যান্য উচ্চপদে লোক নিয়োগ সম্পর্কে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

নিজের দেশে পাকিস্থান যাহা করিতেছে, নিজের দেশে আমরা কিন্তু তাহা করিতেছি না; বরং হিন্দুরাজ্যে আত্ম-

প্রতিষ্ঠার জন্য লীগ এখানে যে সব কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছে, সেইগুলিই এখানে এখনও অনুসৃত হইতেছে। বহুসংখ্যক নিয়োগে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে ফাঁকি দেওয়া হইতেছে। এখানে দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সরকারী বাস পরিচালনার জন্য একটি নূতন পদ সৃষ্টি হইল এবং উহার বেতন নির্দ্ধারিত হইল ১২৫০৲ টাকা; ছয় মাস বাদে উহা বাড়িয়া ১৫০০৲ টাকা হইবে। অথচ এই পদ পূরণের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে সুযোগ দেওয়া হইল না, কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল না, লোক নিযুক্ত হইয়া কাজে লাগিয়া গেল। ক্রয়শুল্ক আপিসের একজন এসিষ্টাণ্ট কমিশনার দুর্নীতিদমন বিভাগের তদন্তে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শেষে চাণক্যনীতি অনুসরণ করিয়া আট মাসের ছুটি লইয়া বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থলে আট মাসের জন্য লোক নিযুক্ত হওয়ার কথা এবং নিয়মানুসারে উহার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুমোদন আবশ্যক। কিন্তু কমিশনকে না জানাইয়া সেখানে লোক নিয়োগ করা হইয়া গিয়াছে। ক্রয়শুল্ক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কেন এরূপ করিলেন তাহার কারণ আছে। ঐস্থানে মাসখানেক পূর্ব্বে আর একটি এসিষ্টাণ্ট কমিশনা'রের পদ খালি হয়। ইঁহারা যাঁহাকে সুপারিশ করিয়াছিলেন কমিশন তাঁহাকে অযোগ্য বিচার করিয়া তাঁহার চেয়ে জুনিয়র এক জনকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। মাত্র এক মাস পূর্ব্বে কমিশন যাঁহাকে বাতিল করিয়াছেন তাঁহার নাম আবার ঐ এসিষ্টাণ্ট কমিশনার পদেরই জন্য পাঠানো নিরাপদ নহে মনে করিয়াই হয়ত এবার তাঁহাকে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা হইয়াছে। আমাদের মতে ক্রয়শুল্ক বিভাগীয় কর্ত্তাদের এই কাজ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মর্য্যাদার হানিকর হইয়াছে এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত। কমিশনের সদস্যেরা এখনও যদি কমিশনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অপারগ হন, এবং তাঁহাদের যদি এখনও এইভাবে অবজ্ঞাত হইতে হয় তবে আমরা বলিব যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন তুলিয়া দিয়া জনসাধারণকে একটা বড় খরচ হইতে অব্যাহতি দেওয়াই ভাল।

দুষ্প্রাপ্য বস্ত্র

বস্ত্র এখনও জনসাধারণের নিকট যথাপূর্ব্ব দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্ম্মূল্য রহিয়া গেল। এদিকে পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। বস্ত্রপ্রাপ্তির আশ্বাস লোকে অসংখ্য বিবৃতি মারফত পাইয়াছে এবং পাইতেছে, কিন্তু আসল বস্তুর দেখা এখনও মিলে নাই।

কাপড় লইয়া ভারত-সরকার কিছুতেই যেন মনস্থির করিতে পারিতেছেন না। ভারতীয় পার্লামেণ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সরকার কর্ত্তৃক আটক বস্ত্র ও সূতার ভবিষ্যৎ মূল্য সম্পর্কে সরকারী কার্য্যক্রম বিবৃত করেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে গত ৩০শে জুলাই সমস্ত মিলের গুদামজাত কাপড় সরকার আটক করিয়াছেন এবং মিল কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহাদের গুদামজাত বস্ত্র সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সরকারকে সরবরাহ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মিল কর্ত্তৃপক্ষ যে তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যাইতেছে প্রায় ৪,১৭,৩০০ গাঁইট কাপড় আটক করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার কেবল মিলের কাপড় আটকাইয়াছেন, ব্যবসায়ীদের কাপড়ে তাঁহারা হাত দেন নাই, উহা আটক করিবার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারসমূহের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই কাপড়ের পরিমাণ কত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ তাহা বলিতে পারেন নাই,কারণ প্রাদেশিক সরকারেরা উহা ভারত-সরকারকে এখনও জানান নাই। ভারত-সরকার কর্ত্তৃক আটক গাঁইটগুলির মধ্যে ১,৫৭,০০০ গাঁইট বিলি করিবার জন্য ইতিমধ্যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়া গিয়াছে।

কাপড়ের দাম সম্বন্ধে ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে টেক্সটাইল বোর্ডের সুপারিশের যথোপযুক্ত মর্য্যাদা রাখিয়া সাময়িক ভাবে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। আমাদের মতে মূল্য নির্দ্ধারণের ভার টেক্সটাইল বোর্ডের উপরেই সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিলে ভাল হইত। তাহাতে ব্যবসায়ী বা জনসাধারণ কাহারও বলিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু এই দায়িত্ব শেষ পর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মচারী এবং মিল মালিকদের উপর অর্পিত হওয়ায় দাম চড়া করিয়া ধরা হইয়াছে এবং জনসাধারণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। চিনি, কয়লা প্রভৃতির মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে ব্যবসায়ীদের অন্যায় আবদার এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত সমর্থনকে প্রাধান্য দিয়া চলিয়াছেন, কাপড়ের বেলাতেও তাহাই ঘটিতেছে বলিয়া লোকে সন্দেহ করিতেছে।

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের মতে কাপড় চালান সম্পর্কে আন্তঃপ্রাদেশিক বাধানিষেধই বস্ত্রসঙ্কটের জন্য দায়ী নহে। এরূপ নিষেধ না থাকিলে সীমান্ত পার হইয়া কাপড়ের চোরাকারবার বাড়িয়া উঠিবে। শিল্পসচিব যাহাই বলুন, এই বাধানিষেধও বিশেষ নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ দেখাই গিয়াছে যে কাপড় চালান সম্বন্ধে প্রচুর কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও পূর্ব্বপঞ্জাব, বোম্বাই এবং পশ্চিমবঙ্গ হইয়া বহু কাপড় পাকিস্থানে গিয়াছে; শুধু তাহাই নয়, পাকিস্থান হইয়া চীন হইতে আরব পর্য্যন্ত সমগ্র এশিয়ায় ভারতীয় কাপড় চোরাই চালান গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্ত্তী কয়েকটি জেলায় কাপড় চালান সম্বন্ধে কঠোরতা অবলম্বনের পর পাকিস্থানী চালান কতকটা কমিয়াছে, কিন্তু বন্ধ হইয়াছে ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। কাপড় চালান কাহারা দেয় গবর্ণমেণ্ট তাহা জানেন না, বা গোয়েন্দা লাগাইয়া এক সপ্তাহের মধ্যে জানিতে পারেন না ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। আসামে কাপড় পাঠাইবার দাবি করিয়া বড়বড় ব্যবসায়ী পাকিস্থানে চোরা-

কারবার চালাইয়াছে, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও এখানকার ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট পুলিস উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা মাত্র করেন নাই। পাকিস্থানে কাপড়ের ব্যাপক চোরাকারবার চালাইতে গেলে যে অর্থ, বস্ত্র-ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা এবং সংগঠন থাকা আবশ্যক, কলিকাতায় বেশী লোকের তাহা নাই। ইহাদের খাতাপত্র এবং কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করিলে কাপড়ের চোরাকারবারের মূলশুদ্ধ ধরিয়া টান পড়িবে এবং এরূপ লোকের সংখ্যা মোটেই বেশী নহে।

ভারত-সরকারের নূতন বস্ত্রনীতি কার্য্যকরী করিবার জন্য ডাঃ মুখোপাধ্যায় একটি নূতন বিল পার্লামেণ্টে পাস করাইয়া লইয়াছেন। উহাতে অপরাধীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিলটির একটি ধারায় বলা হইয়াছিল যে কোন ব্যক্তি চোরাকারবারী প্রমাণিত হইলে আদালত তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন। দক্ষিণ-ভারতের দুই জন সদস্যের প্রস্তাব ক্রমে এই ধারা বদলাইয়া এরূপ করা হইয়াছে যে, অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী আদালত সমগ্র সম্পত্তি অথবা উহার অংশ বিশেষ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষের দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী এবং সরকারী কর্ম্মচারী উভয়েই বুঝিয়া লইয়াছে যে তাহাদের প্রতি অনুকম্পাশীল লোকের অভাব নাই। আজকাল নিম্ন আদালতে দণ্ডিত হইলেও হাইকোর্টে উহারা খালাস পাইয়া যাইতেছে। চোরাকারবারীর মামলার বিচার সমগ্র ভাবে না হইয়া উহাদের সপক্ষে আইনের ফাঁক বাহির করিয়া সেই রন্ধ্রপথে উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে দুর্নীতি কখনও বন্ধ হইতে পারে না। সন্দেহের সুযোগে ইহাদিগকে মুক্তিদান তো আরও মারাত্মক। ইহাদের টাকার জোর, সমাজে প্রতিষ্ঠা অসাধারণ; মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে ইহাদের বন্ধুতা যথেষ্ট। পার্লামেণ্টে এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহে ইহাদের প্রভাবশালী প্রতিনিধিবৃন্দ রহিয়াছেন। অপরাধ অনুষ্ঠানের সময় ইহারা উচ্চতম ডিগ্রীপ্রাপ্ত অডিটার এবং একাউণ্টাণ্ট, পুলিস প্রভৃতির সাহায্য পায়। ধরা পড়িবার পর আদালতের সর্ব্বোচ্চ উকীল-ব্যারিষ্টারেরা ইহাদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং অনেক জজ সাহেব ইহাদের প্রতি যে অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতেও অনেক সমাজদ্রোহী অকারণে নিস্তার পাইয়াছে মনে হয়। ইহাতে চোরের সাহস বাড়িয়াছে এবং জনসাধারণ হতাশ হইয়া পড়িতেছে।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে সর্দ্দার প্যাটেল দুর্নীতিদমন আইন পাস করিয়া দিয়াছিলেন। সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি নিবারণের জন্য উহা পাস করা হয়। অসৎ সরকারী কর্ম্মচারীরাই দেশের সর্ব্ববিধ দুর্নীতি এবং চোরাকারবারের জন্য; ইহারা সায়েস্তা হইলে চোরাকারবার বন্ধ হইতে কিছুমাত্র দেরী লাগিবে না। কিন্তু দুর্নীতি দমন আইন কাগজী হইয়াই রহিল। বাংলাদেশে বহু আন্দোলনের ফলে চোরাকারবার বিল যদি বা ব্যবস্থা-পরিষদে পাস হইল তো ভারত-সরকার উহা আটকাইয়া রাখিলেন। আন্দোলন বন্ধ না হওয়ায় উহা অর্ডিনান্সরূপে জারী হইল কিন্তু ঐ অর্ডিনান্স অনুসারে একটি মামলাও দায়ের হইল না; চোরাকারবার দমন তো বহু দূরের কথা। রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় যে সকল সেক্রেটারী কঠোর হস্তে দমননীতি প্রয়োগ করিয়া এবং নির্ব্বিচারে গ্রেপ্তার চালাইয়া অসংখ্য নিরপরাধ পরিবারকে পথের ভিখারী করিয়াছিল, আজ সেই সিভিলিয়ানেরাই চোরাকারবার এবং দুর্নীতিদমন আইন কঠোর হস্তে প্রয়োগের বিরোধী, এই কারণে যে তাহাতে বুঝি বা কাহারও প্রতি অবিচার ঘটে। উপযুক্ত সন্দেহে দণ্ডদান চোরাকারবার এবং দুর্নীতি দমনের মূল সূত্র হইলে তবেই এই পাপ বন্ধ হইতে পারে। সন্দেহের সুযোগ, আইনের কাঁকড়া প্রভৃতি ইহাদের সপক্ষে গেলে কোন দিনই দুর্নীতি দূর হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগ

এই বৎসরের পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে শিক্ষা বিভাগের প্রতি খুব সুবিচার করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মোট ৩১'৯ কোটি টাকা রাজস্বের মধ্যে শিক্ষা-খাতে মাত্র ২'১ কোটি টাকা—অর্থাৎ মোট ব্যয়ের শতকরা ৬'৭ অংশ মাত্র বরাদ্দ করা হইয়াছে। এমন কি উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যে ৮৪ লক্ষ টাকা সাহায্য করা হয় তাহা পর্য্যন্ত এই ২'১ কোটি টাকার মধ্যে ধরা হইয়াছে। ফলে এই প্রদেশের শিক্ষা-বিষয়ক খরচের পরিমাণ একেবারে নিম্নতম স্তরে নামিয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে এ কথা স্মরণ করা উচিত যে দশ বৎসর আগে মুসলিম লীগের আমলেও মোট রাজস্বের শতকরা দশ ভাগেরও অধিক শিক্ষা বিভাগের জন্য ব্যয়িত হইত, অবশ্য দুর্ভিক্ষের সময় ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল। শিক্ষার জন্য বোম্বাই প্রদেশ তাহার রাজস্বের প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ, মধ্যপ্রদেশ শতকরা ১৫ ভাগের অধিক, মাদ্রাজ শত করা ১৪ ভাগের অধিক, এবং যুক্তপ্রদেশ শতকরা ১০ ভাগে অধিক খরচ করে। এই সকল প্রদেশের রাজকভাণ্ডারে যুদ্ধের বৎসরগুলিতে প্রচুর বাড়তি টাকা জমা হইয়াছে যাহা এখন জাতিগঠনমূলক কার্য্যে ব্যয়িত হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু এই দুর্ভাগা প্রদেশের নিজস্ব তেমন কোন বাড়তি টাকা নাই। উপরন্তু আয়কর রাজস্বের দিক দিয়াও ইহার খুব সুবিধা হয় নাই। আশা করা যায় যে প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে ইহার রাজস্বের অন্ততঃ-শতকরা দশ ভাগ শিক্ষা সম্প্রসারণকল্পে ব্যয় করিবার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করিবেন।

আমরা জানিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম, কেন্দ্রীয় সরকার ইহাই স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান বৎসরে পশ্চিমবঙ্গকে স্বীয় রাজস্ব

হইতেই উন্নয়ন পরিকল্পনার ৮৪ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা আশা করি যে বর্তমান রাজস্ব মন্ত্রী যিনি এক সময় কেন্দ্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কৃষি মন্ত্রী ছিলেন—বিষয়টি সম্বন্ধে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিবেন এবং বর্তমান বৎসরে শিক্ষা উন্নয়নকল্পে যে ৮৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে তাহা আর ছাঁটাই করিবেন না। পশ্চিম বঙ্গকে স্বীয় রাজস্বাদি হইতে উপরোক্ত অর্থের ব্যবস্থা করিবার জন্ত চাপ দিয়া যদি কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে তাহা অর্থনৈতিক বিষয়ে দূরদৃষ্টির পরিচায়ক হইবে না। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজন দীর্ঘকাল যাবৎ অনুভূত হইতেছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে শিক্ষা এবং রাজস্ব মন্ত্রীরা এ বিষয়ে প্রগতিশীল মনোভাব অবলম্বন করিবেন।

মাধ্যমিক বিভালয়সমূহের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির উন্নয়নকল্পে মাধ্যমিক শিক্ষাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্ত যে চেষ্টা সুরু হইয়াছে আমরা উহাকে অভিনন্দিত করি এবং বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি যে মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার পরিবর্তন সাধন করিবার জন্ত যে সাহায্যমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহার প্রতিও আমাদের আন্তরিক সমর্থন জানাই। ইহা বলাই বরং অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইবে যে, বর্তমান পদ্ধতি আদৌ কোন মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং এ পর্য্যন্ত অনেকটা খামখেয়ালী ভাবে অর্থ-সাহায্যাদিও বিতরণ করা হইয়াছে। প্রায় ১৫০টি স্কুলের মধ্যে মাত্র ৩১৫টি স্কুল এখন সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে। মনে হয় যে এই ব্যবস্থায় কয়েকটি সচ্ছল অবস্থার বিভালয়েরই উপকার হইতেছে এবং পল্লী অঞ্চলের যে সকল বিভালয়ের সাহায্য পাইবার দাবী অধিক সেগুলি উপেক্ষিত হইতেছে। নূতন স্কীম অনুসারে গবর্মেণ্ট প্রাথমিক অবস্থায় অতিরিক্ত তের লক্ষ টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত আছেন, গবর্মেণ্টের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেকটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিভালয়ে (aided school) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপযুক্ত ব্যবস্থার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে :

১। যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের যথোচিত তত্ত্বাবধান ;

২। বেতনের ন্যূনতম হার নির্দ্ধারণ এবং শিক্ষকদের জন্ত Provident Fund বা সঞ্চয়-ভাণ্ডারের ব্যবস্থা করা।

৩। ছাত্র এবং শিক্ষকদের সংখ্যানুযায়ী একটা যুক্তি-সঙ্গত অনুপাত নির্দ্ধারণ। মোট সংখ্যার অনুপাত হইবে ১ : ২০।

৪। বর্তমান বেতনের হার কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করিতে হইবে কিন্তু দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের উপযুক্ত কনসেশনের ব্যবস্থা থাকিবে।

৫। স্কুলের মর্য্যাদা অনুযায়ী অবস্থান স্থল, বাড়ী, খেলার মাঠ এবং [illegible]

৬। যোগ্য পরিচালন-ব্যবস্থা।

এই প্রদেশের ইতিহাসে এই প্রথম প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকদের প্রেডযুক্ত বেতনের হার বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আশার কথা যে, বিলম্বে হইলেও ক্লাসগুলির আয়তন এবং শিক্ষকদের গুণপনা ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। বর্তমান জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়বাহুল্যের কথা বিচার করিয়া দেখিলে অবশ্য নির্দ্ধারিত বেতনের হার যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা উচিত যে যদি কোন বিভালয়ের পরিচালকবর্গ অধিকতর উচ্চহারে বেতন দিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে সরকার তাঁহাদের আংশিক ব্যয়ভার বহন করিবেন। এই স্কীম কতকগুলি সুদৃঢ় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা সমর্থনযোগ্য।

পশ্চিম বাংলার লোক-সংগঠন

ভারত বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সমস্তাসমূহের মীমাংসার পথ প্রায় দুরতিক্রম্য হইয়া উঠিয়াছে। সংযুক্ত বাংলায় খাওয়া-পরার জন্ত অন্ত প্রদেশ বা দেশের উপর নির্ভর করিতে হইত। বঙ্গ বিভাগের ফলে সেই পর-নির্ভরতা বাড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে এই কথা বলা যায়, যে শক্তির বলে মানুষ, সমষ্টিবদ্ধ মানুষ, বাঁচিয়া থাকে, সেই শক্তির অভাব আমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে। কলিকাতা নগরীর ঐশ্বর্য্য আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি দিতেছে না। এবং আমাদের রাষ্ট্র-নেতা ও সমাজ-নেতৃগণের এই সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা আছে কিনা সেই বিষয়ে আমাদের মনে নানা সন্দেহের উদয় হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার পরিষদে একটি আইন পাস হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের ভূমির উন্নতির জন্ত। প্রদেশ-পালের নামে আদেশ গিয়াছে প্রতি জেলায় কর্তৃপক্ষের নিকট খালি জমির খোঁজ করিবার জন্ত। এই জমির উপর নূতন শহর গড়িয়া তোলা হইবে যাহা হইবে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ এই পরিকল্পিত শহরের অধিবাসীরা এই নগরমণ্ডলীর উৎপাদিত সম্পদ হইতে নিজেদের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। এতদর্থে নদীয়া কৃষ্ণনগর শহরের নিকট, কলিকাতার নিকটবর্তী চাকুরিয়া অঞ্চল ও যাদবপুরের পথে যোধপুর ক্লাবের পার্শ্ববর্তী স্থানে ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর শহরের রেল-লাইন ও সেনা-নিবাসের নিকটবর্তী ৬০০ বিঘা খাস মহল জমির উপর শহর গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা তৈয়ার হইতেছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকেও এই কার্য্যে সহযোগিতা করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

[illegible]

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রয়োজন কি—কৃষির বিস্তার না শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ? কোন্‌টা অনতিবিলম্বে প্রয়োজন তাহা স্থির না হইলে এই প্রদেশে লোক-সংগঠনের চেষ্টা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা আছে। খাদ্য ও সম্পদের জন্ত পশ্চিমবঙ্গের নদী-নালা সংস্কৃত করিয়া দেশে কৃষির বিস্তারের উপর সমস্ত উন্নতির চেষ্টা নির্ভর করিতেছে, এই বিষয়ে কি কোন তর্কের অবসর আছে ? পশ্চিম বাংলায় শিল্পপ্রতিষ্ঠার অবসর কতটা আছে ; এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়াও প্রয়োজন। শিল্পের জন্ত প্রয়োজন মূলধনের, কাঁচা মালের, শ্রমিকের। পশ্চিম-বঙ্গের বাঙালীর মূলধন কি পরিমাণ খাটিতেছে, বিশেষজ্ঞগণ তাহা বলিতে পারেন। এখানে বঙ্গের এমন বিশেষ কি কাঁচা মাল আছে, যাহা খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নহে। পশ্চিমবঙ্গে যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান চলিতেছে, তাহার অধিকাংশ শ্রমিক ত অ-বাঙালী। পরিকল্পিত শহরসমূহ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত লোকের আশ্রয়স্থল হইতে পারে। এই আগত ১৫।২০ লক্ষ লোকের মধ্যে বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহারা কি শারীরিক পরিশ্রম করিয়া শিল্পের সেবা করিতে পারিবেন ? এবং এই জন-সমষ্টিকে গ্রামের আবহাওয়ার মধ্যে না বসাইতে পারিলে সমাজ-জীবনে এমন একটা বিপর্য্যয় দেখা দিবে যে রাষ্ট্রের পক্ষে তার তাল সামলাইবার চেষ্টা কঠিন হইবে। বর্ত্তমান যুগে রাষ্ট্রকে সর্ব্বকার্য্যে অগ্রণী হইতে হইবে, সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার নিয়ামক হইতে হইবে। পশ্চিম-বঙ্গের বিশেষ অবস্থায় এই দায় বিশেষভাবে অপরিহার্য্য। সুতরাং বড় বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পশ্চিম বাংলার শাসক সম্প্রদায়কে স্থির করিতে হইবে কোন্ কাজে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে হাত দিবেন—কৃষি-বিস্তারে না শিল্প-প্রতিষ্ঠায় ? এই দুইটার মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ স্থির করিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

কৃষি-বিভাগের প্রচার পত্রিকা

কৃষিবিদ্ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র "খাদ্য-উৎপাদন"—এই নামে একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন। কৃষক-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে নানা সমস্যার আলোচনা এই কাগজে হয় বলিয়া ইহার একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। গত ১৬ই ভাদ্র তারিখের "খাদ্য-উৎপাদনে" সরকারী কৃষি-বিভাগের যে কৃতিত্বের নমুনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হাসির খোরাক যোগাইবে বলিয়া আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

> সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-বিভাগের একখানি সচিত্র প্রচার পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পত্রিকাখানির নাম "অধিক খাদ্য উৎপাদন আন্দোলন—১৯৪৮-১৯৪৯।" আমরা আর্ট জানি না, বুঝি না ; সুতরাং চিত্রগুলি সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। ভাষা সম্বন্ধেও নীরব রহিলাম। কিন্তু দুই-একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। 'কাওপীর' বাংলা করা হইয়াছে—এক প্রকার কড়াই শুঁটি ; কৃষকগণ "এক প্রকার কড়াই শুঁটি" কথার দ্বারা কি বুঝিবেন জানি না ; "কাওপীর"-এর বাংলা প্রতিশব্দ আমরা জানি বলিয়াই ইহা বুঝিতে পারিলাম। খুবই দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয় যে কৃষি বিভাগের পরিচালক-গণ জানেন না, "কাওপীর"-এর বাংলা হইতেছে বরবটি। দ্বিতীয় ইংরেজী কথাটি দেওয়া হইয়াছে "সান হেম্প" ; ইহার কোন বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া হয় নাই ; খুব সম্ভব ইহা যে কি রকম বস্তু তাহা প্রবন্ধের রচয়িতা মহাশয় জানেন না ; জানিলে হয় ত লিখিতেন "এক রকম—"। তাঁহাকে জানাইতেছি যে সান হেম্পের বাংলা হচ্ছে—শণ পাট। তৃতীয় কথাটি হচ্ছে হাড়ের গুঁড়া একটি কৃত্রিম সার। এইরূপ পত্রিকা মুদ্রিত ও বিতরিত করিয়া কোন ফলই হয় না ; কেবল অর্থ নষ্ট হয়।

জাহাজ নির্ম্মাণ ও নৌ-বাহিনী

শুনিতেছি পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট কলিকাতা নগরীর নিকটে জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানা ও ডক নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবার জন্ত একটি প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা কি উত্তর পাইয়াছেন জানি না। গত ৯ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট) তারিখে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে যে প্রশ্নোত্তরের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া মনে হয় যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট জাহাজ নির্ম্মাণ কার্য্যটা নিজের হাতে রাখিতে চান। ঐ তারিখে বাণিজ্য-মন্ত্রী শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী জাহাজ নির্ম্মাণ ও জাহাজী ব্যবসায় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নীতির বর্ণনা করেন। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং, ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং ও ভারত লাইনস্ লিমিটেড এই তিনটি কোম্পানীর হাতে ভারতরাষ্ট্রের জাহাজী ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এই সকল কোম্পানী রাষ্ট্রের সাহায্য পাইবে ; রাষ্ট্র হইতে মূল ধন জোগান হইবে কিনা, তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট অভিমত পাওয়া যায় নাই। বে-সরকারী এই সব কোম্পানীর কর্ম্ম-কর্ত্তারা জাহাজ নির্ম্মাণ করিবেন না। ভারতের উপকূলে ও অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের জাহাজের স্থান প্রসার করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

এই সম্পর্কে একটা প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জাহাজ-নির্ম্মাণ ও জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতির উপর নৌ-বাহিনীর উন্নতি নির্ভর করে। জাহাজী ব্যবসায়ে নিযুক্ত খালাসীরাই নৌ-বাহিনীর গোড়া-পত্তন করে। এই নৌ-বাহিনীর নির্ম্মাণ সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। এখন পর্য্যন্ত আমরা ইংরেজের অভিজ্ঞতার হাত ধরা হইয়া আছি। ইংরেজ আমলে জাহাজী ব্যবসায়ে ও নৌ-বাহিনীতে যে খালাসী নিযুক্ত হইত

শ্রেণীর ভাগই সেই অঞ্চলের মুসলমান যাহা বর্ত্তমানে 'পাকিস্থান' রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। এক ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও শ্রীহট্ট হইতেই প্রায় ৬০।৭০ হাজার খালাসী রংরুট করা হইত। কলিকাতার বন্দর হইতে যে সব জাহাজ সমুদ্র-পথে দেশ-বিদেশে গমন করে তাহাদের খালাসী এখন পর্য্যন্ত এই চারিটি জেলা হইতে আসে। এই অবস্থায় কলিকাতায় জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা ও ডক নির্ম্মাণ করিলেই বাঙালীর বুদ্ধি ও শ্রমের সার্থকতা হইবে না। এই জাহাজ চালাইবার জন্য খালাসী চাই। এই খালাসী আসিবে কোথা হইতে ?

সমুদ্রগমন সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের একটা সংস্কার বা কুসংস্কার খালাসী রংরুট বিষয়ে হিন্দুর পক্ষে একটা বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ব্ববঙ্গের যে শ্রেণীর মুসলমান খালাসী হইবার জন্য কলিকাতা নগরীর খিদিরপুর অঞ্চলে ভীড় জমাইয়া থাকে, তাহাদের সম-শ্রেণীর হিন্দুরা এই বৃত্তির দিকে ছুটিয়া আসিবে, এরূপ ধারণা আমাদের নাই। তাহার কারণ হিন্দু সমাজের সামাজিক রীতি একরূপ ; ঘর-মুখো প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অন্যরূপ। কারণ যাহাই হউক, যে অভাবের তাড়নায় পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান জাহাজী ব্যবসায়ের কল্যাণে 'মানুষ' হইয়া উঠিতেছে, সেরূপ অভাবের মধ্যে না পড়িলে বাঙালী হিন্দু "চাঁদ সদাগরে"র অনুকরণে সপ্তডিঙ্গার স্মৃতি ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্রনায়কগণ এই বিষয়ে একটু চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। বাঙালী, কাওরা, জেলে, ঢুলে, নমশূদ্র ইত্যাদি নানা শ্রেণীর মধ্যে জলের ভয় কম। তাহাদের মধ্যে ঠিক মত প্রচার করিলে তাহারাও লস্কর খালাসী হইয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করার পথ পায় এবং ভারত-সরকারের নৌসেনায় রংরুটের একটা নূতন ক্ষেত্র খুলিয়া যায়।

ভাষা ও লিপির যুদ্ধ

শ্রাবণ মাসের "বাংলার শিক্ষক" মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রবন্ধে কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন : "যদি বাঙালী-বিদ্বেষ বশতঃ কোন ভারতীয় ছাত্র বাংলা পড়িবে না মনস্থ করে অথবা কোন প্রদেশ যদি বাংলা ভাষাকে বিদূরিত করে তবে বাংলা ভাষার কোন ক্ষতি হইবে না ; স্বদেশের সাহিত্য-শিক্ষার্থীরই ক্ষতি হইবে।" এই সম্পর্কে তিনি অহম্ ভাষাভাষী লোকসমষ্টির একাংশের উৎকট মনোভাবের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন : "আসামে অসংখ্য বাঙালী বাস করেন...কিন্তু স্বাধীনভাবে নিজেদের মাতৃভাষা অনুশীলন করিতে পারিবেন না, নিজের ভাষা প্রকাশ্য স্থলে ব্যবহার করিতে পারিবেন না অথবা মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন না—এ ব্যবস্থা হইলে ভারতে মানুষের চরম পরাধীনতার প্রতিষ্ঠা [illegible] হইবে।" কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে আমাদের দেশের চিন্তানায়কগণও এইরূপ উৎকট মনোভাব পোষণ করিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে মহা-পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয়ের একটি বিবৃতির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। এলাহাবাদের দৈনিক "লিডার" পত্রিকায় ২৯শে আগষ্ট তারিখে চার কলমব্যাপী এই বিবৃতিটি প্রকাশিত হইয়াছে।

গত জুলাই মাসে গান্ধীজীর কথা প্রতিধ্বনিত করিয়া ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু মাদ্রাজে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। রাষ্ট্রের ভাষা ও লিপি সম্বন্ধে তিনি "হিন্দুস্থানী" ভাষার সমর্থন করেন ; তাহা লিখিত হইবে দুই লিপিতে—দেবনাগরী ও উর্দ্দুতে। মহা-পণ্ডিতের বিবৃতি তারই প্রতিবাদ। যে ভাষায় তিনি তাহা করিয়াছেন, তাহা যুদ্ধ-ঘোষণার সমান। পণ্ডিত জবাহরলালের কলরব (uproar) হিন্দীকে তার আসন হইতে টলাইতে পারিবে না ; এমন পরাক্রমশালী কেহ কি আছেন যিনি সব প্রদেশে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—হিমাচল প্রদেশ, যুক্ত-প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মালব্য-রাজস্থান ও মৎস্যপ্রদেশ—সেই উচ্চপদ হইতে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিবেন ?" এইরূপ চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। "মহান ব্যক্তিগণ" এই চেষ্টা যে করেন নাই তাহা নয়। কিন্তু সংখ্যা-গরিষ্ঠের দুর্ব্বার মত গোবিন্দ-বল্লভ পন্থের মন্ত্রীসভাকে বাধ্য করিয়াছে হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে অবলম্বন করিতে।

রাহুলজী পণ্ডিত জবাহরলালকে বিদ্রূপ করিয়াছেন যে তিনি গ্রন্থকার হইয়াও "জনতার ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই" এবং উর্দ্দু লিপিতে ও দেবনাগরীতে লিখিত হিন্দুস্থানী ভাষার সমর্থনের পশ্চাতে একটা কূটবুদ্ধি লুকায়িত আছে। ইংরেজী ভাষার প্রাধান্যকে বজায় রাখিবার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে। আর একটা প্রভাব কাজ করিতেছে। যুক্তপ্রদেশের কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের (noble class families) হিন্দী সম্বন্ধে যে অবহেলার ভাব ছিল তাহা আজও বিদ্যমান আছে ; সেই পবিত্র আবহাওয়ায় (holy atmosphere) মধ্যে যাঁহারা বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন তাঁহারাই আজ হিন্দীর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না।

হিন্দী বনাম উর্দ্দুর মোকদ্দমায় যে মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে তার পরিণতি দেখিতেছি মনান্তরে গড়াইয়া যাইবে। রাহুল-জীর মত পণ্ডিত লোক যে ভাষায় হিন্দুস্থানীর সমর্থকদের আক্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার চেলা-চামুণ্ডারা কি করিতেছেন তাহার পরিচয় পাই বিহারের বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চলে। অসংখ্য সমস্যাসঙ্কুল ভারতরাষ্ট্রে ভাষা ও লিপি লইয়া একটা রীতিমত যুদ্ধ চলিবে দেখিতেছি। রাষ্ট্রের পরিচালক যাঁহারা তাঁহারা [illegible]

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদ

ভারতরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদের আদালতে দুইটি নালিশে ফরিয়াদিরূপে উপস্থিত হইয়াছে; একটিতে আসামীরূপে। দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসক-গোষ্ঠির বিরুদ্ধে নালিশ পুরাতন হইলেও নূতন করিয়া আবার ইহা আনা হইয়াছে, কারণ পুরাতন অত্যাচার এখনও চলিতেছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি দাবী করে যে এই নালিশ খারিজ করিয়া দেওয়া হউক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদ এই দাবী গ্রহণ করে নাই; নালিশটাকে নথিভুক্ত রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়াছে। যে বর্ণবিদ্বেষে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দোষী, সেই দোষে অভিযুক্ত হইয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ গবর্ণমেণ্টকে কেন কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইবে, এবং হইলে যুক্তরাষ্ট্র কেন তাহার পক্ষ হইয়া দুইটি কথা বলিবে না, এই বিষয়ে একটা রহস্য থাকিয়া যাইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত দক্ষিণ-আফ্রিকা মোকদ্দমায় হারিয়া যাইবে কিনা, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কোন কথা বলা কঠিন। তাহারা ত শাসাইয়া রাখিয়াছে যে তাহাদের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলাইলে তাহারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

ভারতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় নালিশ পাকিস্থানের বিরুদ্ধে। এই দুই রাষ্ট্র উভয়েই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদের সভ্য। এই প্রতিষ্ঠানের আইন অনুসারে কোন সভ্য অন্য সভ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে পারে না। এই আইনের আশ্রয়ে ভারতরাষ্ট্র পাকিস্থানের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করিয়াছে যে, ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীর রাজ্যের বিরুদ্ধে পাকিস্থান রাষ্ট্র তাহার সৈন্যবাহিনী ও গুণ্ডাবাহিনীকে লেলাইয়া দিয়াছে, তাহারা কাশ্মীর রাজ্যের প্রজার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে, ঘরবাড়ী পুড়াইয়া দিয়াছে এবং স্ত্রীলোকের উপর পশুসুলভ অত্যাচার করিয়াছে। গত জানুয়ারি মাসে এই নালিশ দায়ের করা হইয়াছিল; প্রায় পাঁচ মাস তাহার শুনানী চলে। এই সম্বন্ধে "পাকিস্থানের" পররাষ্ট্র-মন্ত্রী জনাব জাফর-উল্লা খাঁ অনেক কূটতর্ক করেন; অনেক মিথ্যা কথা বলেন; কাশ্মীরে "পাকিস্থান" সৈন্যের উপস্থিতি স্রেফ্ অস্বীকার করেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদের এই কথাটা বুঝা উচিত ছিল যে "পাকিস্থান" রাষ্ট্রের এলাকা অতিক্রম না করিয়া পশ্চিম সীমান্তের গুণ্ডাবাহিনী কোন প্রকারে কাশ্মীর আক্রমণ করিতে পারে না; তাহাদের অগ্রসর হইতে দেওয়াই কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণে সাহায্য করার সামিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদ এই কথা জানিয়া এবং বুঝিয়াও বোকা সাজিয়াছে এবং জ্ঞান-পাপীর মত আচরণ করিয়াছে। এই বিষয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের দায়িত্ব ও দোষই বেশী। কেন তাহারা ন্যায়ের পথে চলিতে পারিল না; কোন্ স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় তাহারা "পাকিস্থানে"র অন্যায়কে প্রশ্রয় দিল এবং কাশ্মীর-রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের যন্ত্রণা বিলম্বিত করিল, তাহা আমরা জানি-না।

সে যাহাই হউক, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সহায়তায় "পাকিস্থানের" মুখ রক্ষা হইল; সরেজমিনে তদন্ত করিয়া কে দোষী কে নির্দ্দোষী তাহা স্থির করিবার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। ভারতরাষ্ট্র মোকদ্দমায় হারিয়া গেল; "পাকিস্থানীরা" এইরূপে প্রশ্রয় পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে অন্যায় করিয়া চলিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদ কর্তৃক প্রেরিত কমিশন করাচী দিল্লী শ্রীনগরে মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিল; তাঁহাদের বক্তব্য শুনিল; "পাকিস্থানী" সৈন্যবাহিনী ও গুণ্ডাবাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত অঞ্চলে ঘোরাফেরা করিল; অত্যাচরিত লোকের মুখে তাহাদের দুঃখের কথা শুনিল। দেখিয়া-শুনিয়া, "পাকিস্থান" রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের মুখে তাহাদের সৈন্যবাহিনীর কাশ্মীর আক্রমণে সহায়তার স্বীকৃতি শুনিয়া এবং স্বচক্ষে তাহার প্রমাণ দেখিয়াও "পাকিস্থানের" বিরুদ্ধে কোন শাস্তির প্রস্তাব করিতে পারিল না। তৎপরিবর্ত্তে দুই পক্ষের আক্রমণকারী ও আক্রান্তের নিকট যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ জানাইল। ভারতরাষ্ট্র তাহা স্বীকার করিল; আক্রমণকারী "পাকিস্থান" নানা কূট-তর্ক তুলিয়া তাহা অস্বীকার করিয়া বসিয়া আছে। তাহাতে তাহার কোন লজ্জা নাই; শাস্তির ভয়ও নাই। কারণ তাহার পশ্চাতে আছে ব্রিটেনের গোপন উৎসাহ এবং এই উৎসাহে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধন প্রদান। কমিশন ফিরিয়া গিয়াছে পূর্ব্বতন রাষ্ট্রসঙ্ঘের শ্মশানে, জেনেভা নগরীতে বসিয়া রিপোর্ট লিখিতেছে। এবং আরও কিছু কমতালাত করিয়া কাশ্মীরে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া শোনা যায়।

ভারত সংক্রান্ত তৃতীয় নালিশে ভারতরাষ্ট্রকে আসামীরূপে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। ফরিয়াদি নিজাম বাহাদুর। পাঁচ দিন ভারতরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করাইয়া তাঁহার যুদ্ধের স্বাদ মিটিয়াছে; তিনি পূর্ব্বতন লায়েক আলী মন্ত্রিমণ্ডলীর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিয়া নিজের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ করিতে চান, এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ তাহার নালিশ উঠাইয়া লইতে চান। কিন্তু তাঁহার পুরাতন পার্ষদবর্গ এত সহজে হাল ছাড়িতে চায় না; তাহারা নিজামবাহাদুরের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া মোকদ্দমা চালাইয়া যাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প। খুঁটির জোরে ভেড়া নড়ে; তাহাদের খুঁটি হইল সেই চক্রান্তকারিগণ যাহারা কাশ্মীরের ব্যাপারটাকে এরূপভাবে ঘোরাল করিয়াছে। নিজামবাহাদুরকে জোর করিয়া মোকদ্দমা তুলিয়া লইবার জন্য বাধ্য করা হইয়াছে, এই অজুহাতে হায়দরাবাদের ঘটনাকে নথি হইতে খারিজ করিয়া

দিবার একটা চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টার মূলে যে ব্রিটিশের হাত আছে, এই বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। সরকারী ভাবে ভারতরাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে জড়িত না হইয়া পড়ার একটা ভান চলিতেছে; এই ভানের মধ্যেও ব্রিটেনের স্বার্থ আছে। পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন এই কথাটাই স্পষ্টভাবে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর (১লা আশ্বিন) তারিখে আমাদের শুনাইয়াছেন। হায়দরাবাদ রাজ্য একটা রাষ্ট্র কিনা, এই বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসার পূর্ব্বে আমাদের একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অনেক দেশ সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন উঠিতে পারে এবং হায়দরাবাদকে রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে আমাদের পক্ষে সুবিধা হইবে না, একটা নজির থাকিয়া যাইবে যাহা আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হইতে পারে। "...On the question of it (Hyderabad) being a state or not a state, I have always to keep in mind that there are other cases even within the empire, for which it might create a precedent...." এত সাবধানতা সত্ত্বেও মিঃ বেভিন তাঁহার বা ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠির প্রকৃত মনোভাব চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। তিনি ভারতরাষ্ট্রের মধ্যে একটা যোদ্ধ-মনোভাবের আবিষ্কার করিয়া (I regret, as every one must, that in this new Dominion a war-like spirit has developed) হায়দরাবাদ সম্পর্কে আমাদের আক্রমণকারী রাজ্য বলিয়া একটা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

এই বিষয়ে দুঃখ করিয়া লাভ নাই। এইরূপ অভিযোগ, মিথ্যা অভিযোগ, আমাদের বিরুদ্ধে ইংরেজের পক্ষ হইতে আসিবে এবং ইংরেজের ফেউ ধরার লোকের অভাব হইবে না। এমন কি ইংরেজের বিরুদ্ধপক্ষীয় সোভিয়েট রাষ্ট্র হইতে প্রচার করা হইতেছে যে ভারতরাষ্ট্র এখন হইতেই পূর্ব্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনা করিতেছে। সুতরাং মিঃ বেভিনের ব্যবহারে আমাদের উত্তেজিত হইলে চলিবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার হুমকি

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদের অধিবেশন চলিতেছে ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারিসে। ভারতরাষ্ট্র দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ লইয়া আবার উপস্থিত হইয়াছে। এই বিষয়ে আলোচনা স্থগিত রাখা হইয়াছে; দক্ষিণ আফ্রিকার এই আবদার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদের বর্ত্তমান অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে। এই আবদার সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার মনোভাব এইরূপ: এই রাষ্ট্রের লোক সংখ্যা ১ কোটির কিছু বেশী। তাহার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসী বান্টু জাতির সংখ্যা প্রায় ৭৫ লক্ষ; উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া-বসা শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। ভারতবাসীর সংখ্যা মাত্র ২ লক্ষ ৫০ হাজার। ২৫ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করিয়া আছে; অ-শ্বেত কেহ কোনরূপ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করিবে, এই কথায় তাহারা শিহরিয়া উঠে। কামান-বন্দুক, গোলাগুলির অধিকার তাহাদের হাতে বলিয়া তাহারা ন্যায় ও সুবিচারের উপর পদক্ষেপ করিয়া স্পর্দ্ধায় চলিয়া যাইতে পারিতেছে। "রাষ্ট্র ও সমাজে শ্বেত ও অ-শ্বেতের মধ্যে সাম্যের কোন স্থান নাই"—এই কথা বলিয়াও দক্ষিণ আফ্রিকার এই শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় দুনিয়ার বুকে সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে। এই অন্যায় সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে বর্ত্তমান জগতে শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহ গায়ের জোরে ও বিজ্ঞানের কল্যাণে দুনিয়ার উপর নবাবী চালাইয়া যাইতেছে। এই সাহসেই দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থ-সচিব মিঃ এরিক লোউ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদকে শাসাইয়াছেন যে যদি ভারতবর্ষের অভিযোগ স্বীকার করিয়া লওয়া হয় বা তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা চলিতে দেওয়া হয় তবে "দক্ষিণ আফ্রিকা জাতিপুঞ্জ সংসদ পরিত্যাগ করার কথা বিবেচনা করিতে বাধ্য হইবে।" এবং এই হুমকিতে উহারা ভারতবর্ষের অভিযোগ সম্বন্ধে সব আলোচনা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। এই সংবাদে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। ইটালি ও জাপান এইরূপ হুমকি দেখাইয়াই আবিসিনিয়া ও মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়াছিল। দশ বৎসর যাইতে না যাইতে আমাদের সেইরূপ একটা অন্যায়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। পূর্ব্বতন রাষ্ট্রসঙ্ঘ (লীগ অব্ নেশুনস্) যেরূপভাবে ব্যর্থতায় বিলীন হইয়া গিয়াছিল, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদ (ইউনাইটেড নেশুনস্ অরগেনিজেশন) কি সেই পথেই চলিতেছে না? এই প্রশ্ন তুলিয়া কোন সান্ত্বনা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু বিশ্ব-বিধানে অন্যায়, অবিচার ও অহমিকা স্থায়ী হয় না। তাহার জন্য রক্ত-গঙ্গা বহিয়া যায়, ইহা জানি। মানব-প্রকৃতি এই রক্ত-ক্ষয়ে অগ্রসর হয়, তবুও অন্যায়কে সহ্য করে না। ইহাও ইতিহাসের সাক্ষ্য।

গৃহাবাসের সমস্যা

"সংগঠন" জাতিগঠন কর্ম্মের একমাত্র মাসিক মুখপত্র। খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্ম্মী শচীন্দ্রনাথ মিত্র ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং শ্রীমতী অংশুরাণী মিত্র ইহার সম্পাদিকা। গঠনমূলক কর্ম্ম সম্বন্ধে এই পত্রিকাটির মতের মূল্য আছে। ভাদ্র মাসের সংগঠনে গৃহাবাসের সমস্যা সম্বন্ধে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। উহাতে বলা হইয়াছে যে "যদিও মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের মত ভারতের কুটীর ও অট্টালিকা শত্রুবিমানের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি ভারতের জনসাধারণের জন্য বাসোপযোগী গৃহাবাসের সমস্যা আছে। ইহা দৈন্যপ্রস্ত ভারতের বহু

পুরাতন সমস্যা। স্বাধীন ভারতে জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা অনুসারে বহু নগর, উপনগর, কারখানা, উপনিবেশ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজনও দেখা দিয়াছে। সুতরাং গৃহ নির্ম্মাণের উপাদান কোথা হইতে আসিবে, ইহা এক সমস্যা। সিমেন্ট, কংক্রীট, রঙ, ইস্পাতের সরঞ্জাম ইত্যাদি গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ স্বদেশে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় না, এবং বিদেশ হইতেও বিশেষ পরিমাণে পাইবার উপায় নাই কারণ সেখানেও এ বিষয়ে সমস্যা বর্ত্তমান। পাকিস্থান হইতে আগত শরণার্থী সমাজের জন্য গৃহাবাস নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়া সমস্যা ও অভাব আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না, এ ক্ষেত্রে কেন গবর্ন্মেণ্ট এবং জনসাধারণ স্বয়ং-সম্পূর্ণতা ও আত্মনির্ভরতার সহজ আদর্শটি ভুলিয়া রহিয়াছেন। দেশে মাটির অভাব নাই, বাঁশ খড় কাঠও পাওয়া যায়। সুরুচি থাকিলে এবং দেশের ইঞ্জিনিয়ার সমাজ কতকটা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়া সাহায্য করিলে, ঐ উপাদান দিয়াই সুশ্রী ও স্বাস্থ্যসম্মত গৃহাবাস লক্ষ লক্ষ রচিত হইতে পারে। পণ্ডিত নেহরু একবার এ বিষয়ে জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার কোন ফল হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু সঙ্কটকালেও যদি আত্মনির্ভরতার এই সকল সহজ পন্থা গ্রহণ না করিয়া আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তবে চৈতন্য হইবে কবে ?"

বাংলা-সরকারের পুনর্ব্বসতি বিভাগের পক্ষে এই মন্তব্যটি অবশ্যপাঠ্য বলিয়া আমরা মনে করি।

ক্লাবের জমি ও বাড়ীর জমি

কলিকাতায় টালিগঞ্জে ইংরেজদের দুইটি বড় ক্লাব আছে—যোধপুর ক্লাব এবং গল্‌ফ ক্লাব। তদ্ব্যতীত একটি রেসকোর্স রহিয়াছে। যোধপুর ক্লাবের এলাকা প্রায় ৩০০ বিঘা এবং গল্‌ফ ক্লাবের প্রায় ১১০০ বিঘা। কলিকাতার বুকের উপর এই পরিমাণ জমি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরেজের খেলাধূলার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা ছাড়া তাঁহাদের আরও অনেকগুলি বিস্তীর্ণ জমিসমেত ক্লাব আছে, গড়ের মাঠ তো আছেই। কয়েক বৎসর আগে বাংলা-সরকারের কর্ম্মচারীরা একটি সমবায় গৃহনির্ম্মাণ সমিতি গঠন করিয়া যোধপুর ক্লাবের জমিটা উহার মালিকের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ক্লাবের ইজারা ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত আছে বলিয়া দখল লইতে পারেন নাই। ইজারার সর্ত্তানুসারে যোধপুর ক্লাব আরও পনর বৎসর উহার মেয়াদ বাড়াইবার দাবি করিতে পারেন এবং সেই দাবি তাঁহারা তুলিয়াছেন। ইহাতে সমবায় সমিতি কলিকাতার বাসস্থান সমস্যা সমাধানের পথে যেটুকু অগ্রসর হইয়াছেন তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অনেক ইংরেজ দেশে চলিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহাদের খেলার অনেক স্থান রহিয়াছে। তাহার জন্য শহরের উপরে বাসোপযোগী এতগুলি জমি আটকাইয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে।

এ বিষয়ে সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় গবর্ন্মেণ্টের নিষ্ক্রিয়তা। যোধপুর ক্লাবের কর্ত্তাব্যক্তিদের আপত্তির ফলে জমি-গরীবদের ভিটামাটি এবং চাষের জমি হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য ল্যাণ্ড একুইজিশন আইনের প্রয়োগ হৃদয়হীনতার সহিত যে ইংরেজেরা করিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহারাই এই আইনের কবল হইতে নিজেদের ক্লাবের জমি বাঁচাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন এই দৃশ্য বিচিত্র হইতে পারে, কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট এই কার্য্যে সঙ্কুচিত হইতেছেন ইহাই আশ্চর্য্য। অনাবশ্যক যোধপুর এবং গল্‌ফ ক্লাব তুলিয়া দিয়া ঐ জমি অবিলম্বে অত্যাবশ্যক বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য সরকারের দখল লওয়া কর্ত্তব্য ; দুইটা রেসকোর্সের একটাতে সাহেবদের গল্‌ফ খেলার স্থান করিয়া দিলেই যথেষ্ট।

সরকারী কর্ম্মচারীদের গৃহনির্ম্মাণ সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা বে-সরকারী লোকদেরও ঐ স্কীমের সুযোগ লইতে দিবেন। তাহার জন্য তাঁহারা যোধপুর ক্লাব-সংলগ্ন আরও কিছু জমি দখল লইতে চাহেন। ঐগুলি কলিকাতার পেশাদার কয়েকজন অবাঙালী কাটকাবাজের জমি এবং ইহারাও ঐ সব জমি অতিরিক্ত চড়াদরে বিক্রয় করিবার লোভে সমবায় সমিতিকে ছাড়িতে রাজি হইতেছেন না। ল্যাণ্ড একুইজিশন আইন অনুসারে এই জমিগুলিও উহাদের কেনাদামে দখল লইয়া সমবায় সমিতির হাতে অর্পণ করা সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য। সরকারী কর্ম্মচারীদের এই সমবায় সমিতির কার্য্য অবিলম্বে সফল হওয়া উচিত এইজন্য যে উহার সাফল্য দর্শন করিলে অনুরূপ সমবায় সমিতি গঠনের দ্বারা গৃহসমস্যা নিবারণে লোকের উৎসাহ জন্মিবে এবং দেশের মঙ্গলের জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজন।

শরণার্থী ছাত্রদের উপর চাপ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারকে সভাপতি করিয়া শরণার্থী ছাত্রদের সাহায্যের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। ছাত্রদের পড়াশুনার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় অর্থ-সাহায্য এবং থাকিবার স্থান সংগ্রহ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের সহিত দরবার করাই কমিটির প্রধান কাজ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। যে সভায় কমিটি গঠিত হয় সেখানে জনৈক বক্তা বলেন যে, প্রায় ৯০০ ছাত্র বস্তিতে অবর্ণনীয় দুর্দ্দশার মধ্যে বাস করিয়া পড়াশুনা চালাইতে বাধ্য হইতেছে। কলিকাতা শহরের উপকণ্ঠে বহু জমি আছে। সেখানে বাঁশ খড় কাঠ দিয়া মাটির ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিলে অনেকের থাকার সুবিধা হইতে পারে। পাকা বাড়ী ছাড়া থাকা চলিবে না এমন কোন কথা নাই, শরণার্থীরা মাটির ঘরে থাকিতে আপত্তি করিবে ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাহারা কলিকাতায় পড়ে তাহাদিগকে শহরের কলেজে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত এবং যথাসম্ভব অপর সকলকে বিভিন্ন মফস্বল কলেজে ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। সিমেন্ট লোহার আশায় বসিয়া না থাকিয়া সেখানেও অনায়াসে মাটির ঘর তৈরি করিয়া লওয়া যায়।

উপরোক্ত সভায় অধ্যাপক প্রমথরঞ্জন মজুমদার শরণার্থী

যাহা বিশ্ববিদ্যালয় অনায়াসে দূর করিতে পারেন। তিনি বলিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় এই সব ছাত্রের নিকট হইতে ২০৲ টাকা 'মাইগ্রেশন ফী' এবং ৫৲ টাকা 'লেট ফী' আদায় করিতেছেন। সর্ব্বাস্বান্ত পরিবারগুলির উপর এটা একটা বড় বোঝা। আসলে ইহারা সকলেই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র; রাষ্ট্রবিপ্লবে ইহারা পাকিস্থানে পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইয়াছে এবং বোর্ডের পরীক্ষার ফল দেরীতে বাহির হইয়াছে বলিয়া ইহাদের নিকট হইতে 'লেট ফী' আদায় করা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ছাত্রদের নিকট হইতে এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কারণ আমরা বুঝিতে অক্ষম। বদান্ততাটা অপরের উপর দিয়া যাক, আমার স্বার্থ ষোল আনা বজায় থাকুক এই মনোভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শোভন হয় না।

ছোয়েবুল্লা খাঁ

নিজাম রাজ্যের রাজাকার-বর্ব্বরতার শেষ হইয়াছে। কিন্তু তাহারা রাজ্যের জীবনে যে বিপর্য্যয় আনিয়াছে, মানুষের মনকে যেরূপভাবে বিষাক্ত করিয়াছে, সেই বিষ-ক্রিয়া দূর হইতে এখনও অনেক দিন লাগিবে। সেই বিষের উৎসমুখ মুসলমান সমাজের সংকীর্ণতার মধ্যে নিহিত, যে সংকীর্ণতার দরুন তাহারা ভারতবর্ষকে সাত-আট শত বৎসরের মধ্যে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে পারিল না। সকল মুসলমানই এই দোষে দুষ্ট ছিলেন না বা এখনও নাই। কিন্তু এই ব্যতিক্রম সংখ্যায় এত কম যে তাঁহারা মুসলমান সমাজের চিন্তার ও কর্ম্মের উপর কোন প্রভাব স্থাপন করিতে পারেন নাই বা পারিতেছেন না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বাদশাহ আকবরের ন্যায় প্রবল প্রতাপ তীক্ষ্ণধী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একছত্র সম্রাটেরও ব্যর্থতার কথা বলা যায়। হায়দরাবাদ রাজ্যের সাংবাদিক ছোয়েবুল্লা খাঁও এই পর্য্যায়ভুক্ত। সাম্প্রদায়িক সমন্বয়প্রয়াসী এই যুবক রাজাকারের হাতে বিনষ্ট হইয়াছেন। কাসিম রেজভি নাকি হুকুমজারী করিয়াছিল যে, যে মুসলমান হায়দরাবাদ রাজ্যে মুসলমান প্রভুত্বের বিরুদ্ধে কথা কহিবে, তাহার হাত পা কাটিয়া পরে হত্যা করা হইবে। ছোয়েবুল্লা খাঁকে এই ভাবে হত্যা করা হয়।

হায়দরাবাদ রাজ্যে যে অত্যাচার ও গণতন্ত্রবিরোধী কার্য্যকলাপ চলিতেছিল তাঁহার নিজের "ইম্‌রোজ" পত্রিকায় দিনের পর দিন তাহার বিরুদ্ধে ভৎর্সনা করা হইতেছিল। সেইজন্য তিনি শাসকশ্রেণী ও তাহাদের পৃষ্ঠপোষিত রাজাকার গুণ্ডাদের চক্ষুশূল হইয়া পড়েন। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া যৌবনের প্রারম্ভ হইতে তিনি নিজামশাহী রাজ্যের অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে তাঁহার জন্ম; ২৯ বৎসর বয়সে তিনি গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারাইলেন। "তাজ" নামক উর্দ্দু সাপ্তাহিকে তাঁহার সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হয়। সরকারের আদেশে যখন তাহা বন্ধ হইয়া যায় তখন তিনি শ্রীনরসিংহ রাও পরিচালিত "রায়ত" দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে কার্য্য করেন। সরকারী ও রাজাকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকাখানিকেও গলা টিপিয়া মারা হয়। তারপর "ইমরোজের" আবির্ভাব।

ছোয়েবুল্লা খাঁ বীরের মত বাঁচিয়াছিলেন; মৃত্যুও হইল তাঁহার বীরের মত। স্বাদেশিকতার সেবায় কতটা আত্ম-ভোলা হইলে নিজের সমাজের বিরুদ্ধে লোকে যাইতে পারে, তাহার মাহাত্ম্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ছোয়েবুল্লা খাঁর স্বেচ্ছামৃত্যু ভারতরাষ্ট্রের মুসলমানের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া গেল; ভারতরাষ্ট্রের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া গেল। এই ত্যাগ তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জীবনে সান্ত্বনা আনিবে। তাঁহার দুইটি সন্তান এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের মনকে বিশুদ্ধ করিবে। তাহারাই হইবে ভারতরাষ্ট্রের স্রষ্টা; ভারতপন্থার প্রচারক।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-মৃত্যুবার্ষিকী

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পঞ্চম মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৩ই আশ্বিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে এক স্মৃতিসভা হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন বলেন—"প্রবাসী পত্রিকার সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত রামানন্দ বাবু নিজে আড়ালে থাকিয়া অন্যের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেন। চিন্তাশীল পাঠকদের কাছে প্রবাসী ছিল অপরিহার্য্য।"

শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন বলেন—রামানন্দবাবু ছিলেন অপূর্ব্ব মনীষাসম্পন্ন কর্ম্মযোগী। অন্ধদের শিক্ষার জন্য অক্ষর এবং বালকবালিকার শিক্ষার জন্য সচিত্র বর্ণপরিচয় তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিয়া তিনি শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় ছিল আকাশের মত উদার এবং মনীষা ছিল সাগরের মত গভীর।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সভাপতির বক্তৃতায় বলেন—"দাসী" পত্রিকার সম্পাদকরূপে রামানন্দবাবু মেয়েদিগকে সেবাপরায়ণতায় উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি প্রদীপ, প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সাংবাদিক সাধুতা সকলের অনুকরণীয়। তাঁহার সম্পাদকীয় মন্তব্যে গভীর জ্ঞান শুধু নয়, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং দেশ ও জাতির প্রতি গভীর ভালবাসার পরিচয় থাকিত। সেই আদর্শ আজ একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার সাংবাদিকতার আদর্শ আমাদের কাছে ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। কোন দিন তিনি স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া সাংবাদিকের কাজ করেন নাই। সাংবাদিক হিসাবে তিনি শিক্ষকের কাজ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় ২২শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর) হইতে ৪ঠা কার্ত্তিক (২১শে অক্টোবর) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র-টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্য্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

অবস্থা ও ব্যবস্থা

শ্রীবিমলাচরণ দেব

"অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা" আমাদের দেশের একটা প্রাচীন প্রবাদবাক্য। এই অল্পাক্ষরের মধ্যে কতকালের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা অন্তর্নিহিত এবং এই "অভিজ্ঞতা" সবটাই মিষ্ট নহে। কারণ অভিজ্ঞতা বলে যে, অবস্থা বুঝিয়া যদি ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলেই কল্যাণ হয়। আর, অবস্থা না বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলে বা অবস্থা বুঝিয়াও একটা কাল্পনিক লোকের ভাবে আবিষ্ট হইয়া ব্যবস্থা করিলে অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। কল্পলোকের দোহাই পাড়িলে সে অকল্যাণ রোধ করা যায় না।

তাই যখন মহাভারতে পাইলাম "ধর্মো হ্যাবস্থিকঃ স্মৃতঃ" বড় আনন্দ হইল।

এখন "ধর্ম" কি? সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি সম্প্রদায়বিশেষের এক প্রকার বিশ্বাস। যথা—হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম ইত্যাদি। বস্তুতঃ "ধর্ম" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত মূল অর্থ হইতেছে "যাহা ধারণ করিয়া রাখে, যাহা মানুষ তথা সমাজকে অবসন্ন হইতে দেয় না।" প্রকৃতই, যখন মানুষ সংসারের ও নিজ মনের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতে "কান্দিশীকো ভয়দ্রুতঃ" হইয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে তখন সে অবসন্ন হয় ও নাশের দিকে যায়। সে সময়ে যদি সে এমন কোনও অবলম্বন পায় যাহাকে ধরিয়া সে দাঁড়াইতে পারে, সে বাঁচিয়া যায়। এই অবলম্বনই আদিম "ধর্ম"।

আমার মনে হয় প্রাকৃতিক শক্তির উদ্দাম অভিব্যক্তিই আদিম "ধর্মে"র মূল। যখন প্রবল ঝড় বহে, যখন প্রবল ঝড়ে দুইটা বৃক্ষশাখা ঘৃষ্ট হইয়া অগ্ন্যুৎপাদন করে এবং সেই অগ্নিতে সমগ্র বন দগ্ধ হইয়া যায়; যখন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত হয় এবং জীবজন্তু অসহায় ভাবে ভাসিয়া চলিতে থাকে, তখন এই সমস্ত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের শক্তি যে অবারণীয় তাহা অনুভব করিয়া মানুষ বিহ্বল ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। তখন সে স্বভাবতঃই মনে করে যে, যদি সে এই বায়ুর নিয়ামক শক্তি, এই বৃষ্টির নিয়ামক শক্তি, এই অগ্নির নিয়ামক শক্তির শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই অ-প্রাকৃত (supernatural) শক্তি প্রসন্ন হইবে ও তাহাকে রক্ষা করিবে। এইরূপে সে যখন যে শক্তির শরণাপন্ন হয়, স্বভাবতঃই সে সেই শক্তিকে সর্বময় সর্বপ্রধান বলিয়া স্তুতি করে। পরে কালক্রমে সে অনুভব করে যে, সে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির যে উপাসনা করিতেছে, সে সমস্ত এক মহাশক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। তখন সে এই এক মহাশক্তির অস্তিত্ব ও সর্বব্যাপিত্ব অনুভব করিয়া তাহাকেই অবলম্বন করে। এইরূপে মানুষ "বহুদেব" হইতে "একদেব" ধারণায় উপস্থিত হয়। ক্রমে একান্ত প্রণিধান দ্বারা বুঝে যে, যাঁহাদের "বহু" মনে করিতেছে তাঁহারা তত্ত্বতঃ "এক" এবং এই "এক"ই বিভিন্ন অভিব্যক্তি দ্বারা "বহু" রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। যাহাই হউক, মানুষ এই "বহুদেব" ও এই "একদেব" অবলম্বনেই বিভ্রান্ত অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্থৈর্য্য লাভ করে।

এই অবস্থাতেই স্তব, স্তুতি, পূজাদির উৎপত্তি। এদেশে এই স্তব-স্তুতি পূজা ক্রমে যাগযজ্ঞ, শ্রৌত, স্মার্ত, গুহ্যাদি ক্রিয়ারূপে পরিণত হয়। ইহাই হইল "অ-প্রাকৃত ধর্ম"।

ধর্মের অপর এক রূপ আছে—"সমাজধর্ম।" যখন মনুষ্য-মিথুন একেলা থাকে, তখন অপর কোনও জন্তু-মিথুন হইতে তাহার বিশেষ প্রভেদ থাকে না। এমন কি, প্রথম প্রথম যখন একাধিক মনুষ্য-মিথুন একত্র অবস্থানাদি করে তখনও স্থায়ী বন্ধন কিছুমাত্র থাকে না। স্বল্পমাত্র কারণে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখনও "সমজ" মাত্র। কিন্তু ক্রমে মনুষ্য-মিথুনেরা সংঘবদ্ধ হয়। তখন নিয়মাদির আবির্ভাব হয়। ঐ নিয়মাদির দ্বারা নবগঠিত সংঘ চালিত হওয়ায় ঐ নিয়মগুলিই সংঘকে স্থায়ী বন্ধনের দ্বারা ধারণ করে এবং বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে রক্ষা করে। এই স্থায়ী বন্ধনই "সমজ"কে "সমাজ"-এ পরিণত করে। এই নিয়মগুলিই "সমাজধর্ম"।

কালক্রমে পূর্বোক্ত প্রাকৃত ধর্ম সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করিয়া ব্যাপকতর "সমাজধর্মে"র অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ঐ যুক্তধর্ম সমাজের সর্বাঙ্গীণ বন্ধনের সৃষ্টি করে। এই যুক্তধর্মই শুধু "ধর্ম" বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য, কারণ এই যুক্ত ধর্মই সমাজকে সর্বতোভাবে সর্বপ্রকারে ধারণ করিয়া রাখে।

হিন্দুগণের নীতির বিশেষত্ব এই যে উহাতে "ধর্ম" অর্থে পূর্বোক্ত দুই ধর্মের যুক্তরূপ বুঝায়। প্রতীচ্যের religion শব্দ আমাদের "ধর্মে"র ঠিক প্রতিশব্দ নহে। প্রতীচ্যের religion পূর্বোক্ত "অ-প্রাকৃত ধর্ম" মাত্র বুঝাইয়া জাতির জীবনের অংশমাত্রে আবদ্ধ। হিন্দুর "ধর্ম" জাতিকে সর্বাঙ্গীণ ব্যাপিয়া আছে।

"অ-প্রাকৃত ধর্ম", "সমাজ ধর্ম" ও তাহাদের যুক্তরূপের (বা "ধর্মে"র) উদ্ভবের মূলসূত্র বলিলাম। বলা বাহুল্য,

মূলসূত্র এক হইলেও সকল সমাজে উহাদের কেহই একই আকারে আবির্ভূত হয় না। সংসারের সকল জিনিষের মত "ধর্ম"ও একাধিক কারণ দ্বারা সঙ্ঘটিত। উৎপত্তির সময় যে সমস্ত কারণ যে ভাবে সক্রিয় থাকে, তদ্দ্বারাই "ধর্মে"র আকার নিয়মিত ও নির্ধারিত হয়। কারণসমূহ একই ভাবে বা পরিমাণে বা শক্তিতে সকল সমাজে কোনও সময়েই থাকে না ও থাকিতে পারে না। এইজন্য "ধর্মে"র আকার কোনও দুই সমাজে ঠিক এক হইতে পারে না। কিছু না কিছু পার্থক্য থাকিবে। এই পার্থক্যের প্রধান কারণ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু ও জাতি (Ethnology or race) ; বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায় যে, তৎকালীন সমগ্র অবস্থা অর্থাৎ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, জাতি, অপরাপর জাতির সহিত নৈকট্য বা দূরত্ব প্রভৃতি নানাপ্রকার অনুকূল ও প্রতিকূল কারণের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া যে নিয়মসমষ্টি হয়, তাহাই "ধর্ম"। সমগ্র "অবস্থা" দ্বারা নিয়মিত ও নির্ধারিত হয় বলিয়া "ধর্ম" সত্যই "আবস্থিক"।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে অবস্থার পরিবর্তন হইলে "ধর্ম"ও তদনুরূপ পরিবর্তিত হয়। এক অবস্থায় যাহা "ধর্ম" অপর অবস্থায় অর্থাৎ পূর্বাবস্থা পরিবর্তিত হইলে তাহা আর "ধর্ম" থাকে না, তাহা "অ-ধর্ম" হইয়া পড়ে। "অ-ধর্ম" অকল্যাণের আকর। যেমন, ব্যক্তিগত ভাবে বলি, আজ আমার শরীর বেশ সুস্থ, এক প্রকারের আহারাদি আমার শরীরের পক্ষে অনুকূল, অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিধান করে। অবস্থানুযায়ী বলিয়া ইহা "ধর্ম"। আগামী কাল যদি আমার শরীর সুস্থ না থাকে, তাহা হইলে পূর্বদিনের আহারাদি আমার শরীরের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে না, বিশেষ প্রতিকূল হইবে। পরিবর্তিত অবস্থাতে পূর্ববৎ আহারাদি করিলে স্বাস্থ্যের হানি, এমন কি প্রাণনাশ পর্যন্ত, হইতে পারে। অবস্থানুযায়ী নহে বলিয়া ইহা "অ-ধর্ম" এবং সেইজন্যই অকল্যাণের কারণ। যদি বাঁচিতে হয়, নিজ সত্তার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হয় তাহা হইলে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থার সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হইবে। তাহা না করিলে বিনষ্ট হইতে হইবে। ইংরেজীতে বলে "Adapt or perish"। হনুমান নিজ চিরজীবিত্বের কারণ ভীমকে বলিয়াছিলেন—"যুগং সমনুবর্তামি কালো হি দুরতিক্রমঃ"।

"ধর্ম" ও "অ-ধর্ম" সম্বন্ধে এই মূল ভিত্তিগত সত্য মনে রাখিয়া আমাদের দেশের "অ-প্রাকৃত ধর্ম" সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলি। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের আদিম "অ-প্রাকৃত ধর্ম" ক্রমে যাগযজ্ঞাদি রূপে পরিণত হয়। ক্রমে অনুষ্ঠানের প্রাবল্য ঘটায় ক্রিয়ার উদ্দেশ্য চাপা পড়িয়া গেল। এই পরিণতিতে সাহায্য করিল নানাপ্রকার খুঁটিনাটি বিধিনিষেধের আবির্ভাব। এই ভাবে ও ক্রমবর্ধমান বিধিনিষেধের আবরণে ও চাপে অ-প্রাকৃতিক ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য (অর্থাৎ সর্বনিয়ন্ত্রী শক্তির অনুভূতি ও মনন) অন্তর্হিত হইয়া সমস্ত ব্যাপারটা একটা প্রাণহীন ক্রিয়াকাণ্ডে পরিণত হইল। এইরূপ বিধিনিষেধের দুই একটা উদাহরণ দিই—অমুক দ্রব্য সম্মুখে রাখিতে হইবে, বামে বা দক্ষিণে রাখিলে সমস্ত মাটি; জল মাটিতে ফেলিবে, কোনও পাত্রে ফেলিলে সর্বনাশ; খবরদার, "মালা" বলিবে না, "স্রজ্" বলিবে, যদি ভুল করিয়া "মালা" বলিয়া ফেল, থুড়ি থুড়ি বলিয়া "স্রজ্" বলিবে, ইত্যাদি। এই সব খুঁটিনাটি সম্বন্ধে সাবধান হইতে সমস্ত মন ব্যস্ত রহিল। আসল কাজের জন্য কিছুই রহিল না।

এইরূপে ধর্মে গ্লানি আসিল। ধর্মে গ্লানি আসিলেই ভগবানের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এখানে আবির্ভাব হইল বুদ্ধদেবের। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান ইহা নহে। মোটামুটি বলা যায় যে, বুদ্ধদেব তদানীন্তন বেদের অক্ষরমাত্র ও বিধিনিষেধ দ্বারা জটিলীকৃত ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ধর্মের সারতত্ত্ব, অর্থাৎ শীল ও আচার, প্রচার করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি মৈত্রীভাবনা, করুণাভাবনা, অহিংসা প্রভৃতির মূলসূত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ কথা কোথাও পাই না যে, তিনি মৈত্রীভাবনা, অহিংসাদি প্রয়োগ অবস্থানির্বিচারে করিতে বলিয়াছিলেন। বরং পাই যে, যখন মগধসেনাপতি সিংহ তাঁহার নিকট অহিংসা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তখন তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, যেখানে হিংসা করিলে অনেক লোকের উপকার হইবে, সেখানে হিংসা অবশ্যকর্তব্য। বলা বাহুল্য, ইহাই "অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা", ইহাই "ধর্ম"।

কিন্তু কালক্রমে তাঁহার পরবর্তী লোকেরা "অবস্থা"র সহিত "ধর্মে"র সম্পর্ক ভুলিয়া গেল। অবস্থা বিচার নাই, স্থান অস্থান বিচার নাই; সর্বত্র সর্বকালে মৈত্রীভাবনা, করুণাভাবনা, অহিংসাদি "ধর্ম", ইহাই প্রচার হইতে লাগিল। অবস্থাবিশেষে যে মৈত্রীভাবনা, অহিংসাদি পরম অধর্ম, তাহা কেহ ভাবিল না।

এইরূপ প্রচার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার হয় ত প্রথমে করিতে পারে নাই। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ইহার প্রভাব খুব বিস্তৃত হইয়াছিল। জনসাধারণের মধ্যে চিন্তাশক্তি বিশেষ থাকে না। চিন্তাশক্তির অভাবে মানসিক জড়তা ও তৎপ্রসূত "গড্ডলিকা-

বৃত্তি' অবশ্যম্ভাবী। জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ বিকৃত বৌদ্ধভাবগুলির প্রচার ও প্রসারই বৌদ্ধগণের সম্প্রদায়রূপে অস্তিত্ব নাশের অন্যতম ও প্রধান কারণ। সহাবস্থান জন্য বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ও প্রাচীনপন্থী হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ভাবের অবশ্যম্ভাবী আদান-প্রদান হইয়া দুই সম্প্রদায়ে ক্রমে এরূপ ভাবসমীকরণ হইয়া গেল যে, বৌদ্ধসম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকার আবশ্যকতা রহিল না এবং ক্ষুদ্রতর বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বৃহত্তর হিন্দুসম্প্রদায়ে অনায়াসে মিলিয়া গেল। যে বুদ্ধ প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিরোধী ছিলেন, যাঁহাকে মহাভারতে এক স্থলে "চৌর" পর্যন্ত বলা হইয়াছে, হিন্দু বৌদ্ধ মিশিয়া গেলে সেই বুদ্ধই হিন্দুর দশাবতার মধ্যে কৃষ্ণকে সরাইয়া তাঁহার স্থানে বসিলেন।

শুনিতে পাই অনেকে বলেন যে, এই বৌদ্ধ প্রভাবের যুগ নাকি আমাদের ইতিহাসে সর্বোজ্জ্বল যুগ। এই যুগের সাহিত্য, দর্শন, কলা, স্থাপত্য, নাগার্জুনাদির রসবিদ্যাচর্চা প্রভৃতি আমাদের জাতির পক্ষে নাকি চিরস্মরণীয়। সাহিত্যাদি সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি (কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রৌঢ়ীবাদ হইলেও) প্রতিবাদ করিতেছি না। কিন্তু ঐ যুগ আমাদের দেশের "সর্বোজ্জ্বল যুগ", ইহা ঠিক নহে।

"লাভ"-এর কথা বলিলেই "লোকসান"-এর কথা আসে। সাহিত্যাদি সম্বন্ধে বৌদ্ধযুগে লাভের কথা শুনিলাম। লোকসান কিছু হইয়াছিল কি? দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা বেশী?

দুই-একটা কথা বলি—Transfusion of blood নাকি আধুনিক পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটা বড় অবদান। কিন্তু বোধ হয় অনেকে খবর রাখেন না যে, চরক সংহিতায় Transfusion of blood-এর ব্যবস্থা আছে, সদ্যোহত ছাগের রক্তদ্বারা। অনেকেই জানেন যে, সুশ্রুতসংহিতা প্রধানতঃ শল্যতন্ত্রের গ্রন্থ, এদেশের Surgeon's Handbook বলিলেই হয়। সুশ্রুত মতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের আট তন্ত্রের প্রথম তন্ত্র "শল্য"। ইহাতে এত প্রকার শল্য তন্ত্রের যন্ত্রাদির (surgical instruments and appliances) বর্ণনা আছে যে, আশ্চর্য্য হইতে হয়। কিন্তু এই সমস্তই ও এই প্রকারের আরও কত কিছু লোপ পাইয়াছে, যত দুর মনে হয়, "অহিংসা"র বিকৃত বৌদ্ধ প্রচারে।

কিন্তু এই বিকৃত বৌদ্ধ প্রচার সর্বাপেক্ষা অনিষ্ট করিয়াছে আর এক ভাবে—"অহিংসা, মৈত্রীভাবাদি অবস্থা নির্বিচারে কর, ইহাই পরম ধর্ম", এই নীতি নিরন্তর প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে সম্মোহিত করিয়া, ভূতাবিষ্টের মত করিয়া, সমগ্র জাতিকে যুদ্ধবিমুখ ও নির্বীর্য্য করিয়াছে। এই ভাবে বিকৃত বৌদ্ধ প্রচার জাতীয় জীবনের মর্মস্থলে যে অতি ক্রূর ও গভীর আঘাত হানিয়াছে, তাহা স্থির ভাবে ভাবিয়া দেখিলে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইহার ফলে সমগ্র জাতি একান্ত যুদ্ধবিমুখ ও সর্বাবস্থায় অবস্থা-নির্বিচারে শান্তিকামী (peace at any price) হইয়া পড়ায় আমাদের জাতীয় দুর্দশা, যাহা আজও কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। বৌদ্ধ প্রভাবের যুগ আমাদের ইতিহাসে জাতীয় সর্বনাশের যুগ।

ভারতের বাহিরেও দেখি, মোঙ্গল জাতির যে অংশ মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিল, তাহারা কি ভাবে বিশ্ব বিজয় করিয়াছিল। আর—বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চীনের অবস্থা!

যদি মানুষের মত অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চাও, শান্তিবাদী হইলে চলিবে না, ইতিহাস একবাক্যে ইহা বলে।

বৌদ্ধ প্রভাব বঙ্গে খুবই বেশী হওয়ায় এখানে বৈদিক ধর্ম একেবারে লোপ পাইয়াছিল। পরে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের চেষ্টা হয় পশ্চিম অঞ্চল হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু ইহারই পরে আর এক আবির্ভাব হইল—রঘুনন্দন। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য রঘুনন্দন প্রচার করিলেন—দেশে ব্রাহ্মণ অটুট আছে, কাল-বিপর্যয়ে অনেক কিছু গিয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের কোনও ক্ষতি হয় নাই, ব্রাহ্মণকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। কিন্তু সেই কাল-বিপর্যয়েই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সমস্ত শূদ্র হইয়া গিয়া শূদ্রের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পরিচারকের) সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার এই মতের "প্রমাণ" কি, এ কথা তুলিলেই "সদ্যোজাত সংহিতা"র গল্প মনে পড়ে।

তখন দেশের পণ্ডিত সমাজের এরূপ হীন অবস্থা যে রঘুনন্দনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার লোক নাই। এক মাত্র রঘুনাথ শিরোমণির কথা শুনা যায়, যিনি কথঞ্চিৎ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন নিজ প্রণীত "তত্ত্ব" অনুসারে পুত্রের উপনয়ন দিয়া রঘুনাথের নিকট লইয়া গেলে তাঁহার ঐ পুত্র রঘুনাথকে অভিবাদন করিলেন। কিন্তু রঘুনাথ প্রত্যভিবাদন না করায় রঘুনন্দন ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—"ব্রাহ্মণ আপনাকে অভিবাদন করিলেন, আপনি প্রত্যভিবাদন করিলেন না।" রঘুনাথ তখন বলিলেন—"তোমার 'তত্ত্ব' অনুসারে তোমার পুত্রের উপনয়ন হইয়াছে কিন্তু আমার উপনয়ন তোমার 'তত্ত্ব' অনুসারে হয় নাই। তাহা হইলে তোমার পুত্র যদি ব্রাহ্মণ হয়, আমি ব্রাহ্মণ নহি। আবার আমার যে প্রথায় উপনয়ন হইয়াছে, তোমার পুত্রের সে প্রথায় উপনয়ন হয় নাই। তাহা হইলে আমি যদি ব্রাহ্মণ হই, তোমার পুত্র ব্রাহ্মণ নহে। এ অবস্থায়, হয় আমি উহার অভিবাদনের যোগ্য নহি বা তোমার পুত্র আমার প্রত্যভিবাদনের যোগ্য নহে, এমন কি আমাকে

অভিবাদন করিবার অধিকার তাহার নাই।" ইহার ফলে রঘুনন্দনের উপনয়ন সম্বন্ধে "তত্ত্ব" চলিত হয় নাই।

কিন্তু প্রতিবাদের অভাবে রঘুনন্দনের এই ব্রাহ্মণ-শূদ্র মত চলিয়া গেল। প্রতিবাদের অভাবের কারণ অনুমান-সাপেক্ষ।

অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্তর হইতে নিরন্তর প্রচারের ফলে সম্মোহন হইল। জনসাধারণ সম্মোহিত হইয়া সত্যই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইল। ব্রাহ্মণ বলিল—"শাস্ত্র সব আমার, আমি যখন যাহা বলিব, তাহাই শাস্ত্র তোমরা বেদাদি শাস্ত্র পড়িলে অনন্ত নরকে যাইবে; ওঁকার উচ্চারণ করার অধিকার কেবল আমাদের এবং তোমরা উহা উচ্চারণ করিলে তোমাদের জিহ্বা খসিয়া পড়িবে"—(এই শেষ কথাটি বাল্যকালে আমি এক নিরক্ষর রুটিওয়ালা "ব্রাহ্মণ"কে বলিতে শুনিয়াছি) ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্যে শাস্ত্রাদিতে প্রক্ষেপের কথাও অবিদিত নহে। Herrenvolk পন্থ প্রতীচ্যের অবদান নহে।

এইরূপে দেশের জনসাধারণের মনে পরাভূত মনোবৃত্তি (inferiority complex) জন্মাইয়া দেশের কি পরিমাণ অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা সহজে অনুমেয়।

বাংলা শক্তিপূজার দেশ। সহজে কাবু হইতে চাহে না। রঘুনন্দনের "তত্ত্ব" মানিয়া লইয়া বাঙালী ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় মনোবৃত্তি লুপ্ত হইল না। তাই সীতারাম, মেনাহাতি, প্রতাপাদিত্য প্রমুখ ব্যক্তিগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিপুল-বিক্রমে লড়িয়া দেশের জাতির অস্তিত্ব সগৌরবে রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিধাতা বিরূপ। চৈতন্যের উদয় হইল। চৈতন্যের সমর্থকেরা বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার আবির্ভাব না হইলে সারা বাংলা মুসলমান হইয়া যাইত। হয় ত। কিন্তু পঞ্জাবেও ত ঐ অবস্থা, মুসলমানদিগের প্রচণ্ড চাপ। সেখানে ঠিক চৈতন্যের সময়ই নানকের আবির্ভাব। দুই জনে সমসাময়িক। কিন্তু এক দিকে নানক ও তাঁহার শিখ এবং অপর দিকে চৈতন্য ও তাঁহার বৈষ্ণব! Look on this picture and on this! এই পার্থক্যের কথা ভাবিলে মনে পড়ে "মাটির গুণে"র গল্প!

চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের মূল মন্ত্র "অহেতুকী প্রেম"—"সর্বাবস্থায় নির্বিচারে প্রেম বিলাও," "মেরেছ কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দিব না?" আর, আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম বলে, "অবস্থা-বিশেষে প্রেম পরম ধর্ম"—কিন্তু ইহাও বলে, "যদি অত্যন্ত পূজ্য বেদান্তপারগ ব্যক্তি তোমার বিরুদ্ধে আততায়ীরূপে আসেন সে অবস্থায় তাহাকে হত্যা করিবে, তাহাতে দোষ নাই।"

কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম যে অবস্থা-বিশেষের উপর নির্ভর করে, ইহা ভুলিয়া যাওয়ার মত মারাত্মক ভুল আর হইতে পারে না। এইখানে কাশ্মীরের অন্তর্গত দরদিস্থানের একটি প্রবাদ বাক্য মনে পড়িতেছে—"রাজার সম্মুখ দিয়া বা ঘোড়ার পিছন দিয়া চলিবে না, লাথি খাইবে।"

চৈতন্যপ্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম নির্বীর্য নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছিল। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য এরূপ যে, এই নির্বিচার প্রেমের ভাব ও ভাবালুতা সারা সমাজকে ক্রমে আবিষ্ট করিয়াছে। এই প্রেমপন্থ দেশের উদগ্র জাগ্রত ভাবকে বিদায় দিয়া তৎস্থলে আনিয়া দিয়াছে "ভাব লাগা"—মানসিক অবসাদ ও অবনতি। প্রমাণের আবশ্যকতা নাই, শুধু একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখ।

আরও কি করিয়াছে? যে দেবতা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, যাঁহার এক হস্তে যুদ্ধবাদ্য শঙ্খ, অপর দুই হস্তে প্রচণ্ড আয়ুধ, চক্র ও গদা এবং শেষ হস্তে ক্ষত্রিয়বীর্যার্জিত পদ্ম-উপলক্ষিত শ্রী; যিনি প্রতোদমাত্র অবলম্বনে ভীষ্মের মত যোদ্ধার সহিত যুদ্ধের জন্য উদ্দাম বেগে ধাবমান হইয়াছিলেন, তাঁহার হাতে দিল বেণু ও মাথায় দিল প্রেমের পসরা! কি মর্মান্তিক রূপান্তর!

প্রেমে গদগদ করিয়া দেশকে নির্বীর্য্য করার জন্য চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম এদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

আশ্চর্য এই যে, এখনও এদেশে আর এক আকারে এই অহেতুকী সর্বাবস্থায়, অবস্থা যাহাই হউক, প্রেমের পর্ব জোর চলিতেছে। কেহ তোমাকে কাপুরুষের মত ছুরি মারিলে তাহাকে প্রেম করিবে। তোমার বাড়ী লুঠ করিয়া আগুন দিলেও ঐ ব্যবস্থা। এক পয়সাও পাইবার অধিকার না থাকিলেও তাহাকে "কোরা চেক" লিখিয়া দিয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইবে। অবস্থা বিবেচনার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল প্রেম করিবে।

চৈতন্যের প্রেমপন্থে শ্রীকৃষ্ণের দারুণ রূপান্তর হইয়াছিল বলিয়াছি। বর্তমান প্রেমপন্থে আর এক ক্ষত্রিয় বীরের শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। যে দিন প্রথম "রামধুন" শুনি তখনই মনে হইল যে, এ সুর খুবই চেনা, কোথায় শুনিয়াছি? ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল। মনশ্চক্ষে একখানি ছবি ভাসিয়া উঠিল। রাস্তার ধারে ছিন্নবস্ত্র পরিহিত হিন্দীভাষী ভিক্ষুক প্রসারিত পাণি দক্ষিণ হইতে বামে ও বাম হইতে দক্ষিণে সঞ্চালিত করিয়া করুণ সুরে কম্পিত কণ্ঠে গাহিতেছে—"একঠো আধেলা দেলা দে রা—া—া—ম!" হায় রাম! যে রামকে স্মরণ করিলেই

মনে পড়ে, "রাঘবং রাবণারিম্‌"; দুর্ধর্ষ, ত্রৈলোক্যবিজয়ী, দেবদানবগন্ধর্বাদির যমস্বরূপ, লোকরাবণ রাবণকে যে রাম যুদ্ধে সবংশে নিধন করিয়াছিলেন; যিনি কটাক্ষমাত্রেই মদ-দৃপ্ত পরশুরামের দর্প ও তেজ হরণ করিয়াছিলেন, সে রামের সম্বন্ধে গানের সুর হইল "একঠো আধেলা দেলা দে রা—া—া—ম"! যদি রামের নামে গান বাঁধ, ত এমন গান বাঁধ যাহার শব্দে ভূত প্রেত পালাইবে ও ভক্তজনের মনে অতুল সাহস আসিবে। আমাদের 'বন্দেমাতরম্‌' গর্জনের কথা মনে পড়ে। ঐ গর্জন শুনিলে আমাদের শত্রুদের মানসিক অবস্থা কি হইত এবং এখনও হয়, জানিতে বাকি নাই।

আর এই নব প্রেমপন্থ ও কাঁদুনী সুরে রামের গান কখন? যখন দেশের ও জাতির অবস্থা-সঙ্কট; সূতিকাগারে নবজাত রাষ্ট্রকে বালগ্রহে ঘেরিয়াছে। যখন ইংরেজ অখণ্ড ভারতকে ৬০২ টুকরায় ভাগ করিয়া দিয়া মজা দেখিতেছে (অর্থাৎ ৬০০ "ষ্টেট", ইণ্ডিয়া ও ইংরেজের শেষ ঘাঁটি পাকিস্থান); যখন সর্বপ্রাণেন আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে; যখন আমাদের সামান্য মাত্র দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শত্রু অতিরিক্ত সাহসে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে; যখন নিজেকে শান্তিবাদী প্রচার করার একমাত্র ফল শত্রুর আক্রমণ আকর্ষণ করা, সেই সময়ে এই প্রেমপন্থ ও এই গান? মনে পড়ে আমাদের "স্বাধীনতা" লাভের সময় বরাবর একখানা ইংরেজী কাগজ ঈষৎ চাপা উল্লাসের সহিত লিখিয়াছিল, "Henceforth it will not be our hands which will be dyed with Indian blood."

দেশের এই অবস্থার মত ব্যবস্থা হইতেছে কি? বরং দেখিতেছি যে দেশে কিছুকাল ধরিয়া একটা অলক্ষণ দেখা দিয়াছে—"অর্থকরী রাজনীতি" অর্থাৎ যে রাজনীতির শরণ লইলে রাতারাতি ভিক্ষুক ক্রোরপতি ও অজ্ঞাতকুলশীল অভিজাত বনিয়া যায়। এই "অর্থকরী রাজনীতি" আর কিছুই নহে—প্রেমপন্থের দোহাই দিয়া বৈশ্য ও শূদ্রবৃত্তি। নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য দেশ ও জাতিকে বলি দেওয়া।

আজিকার অবস্থা দেখিয়া মনে পড়িতেছে যখন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় মনোবৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙালীর ছেলে প্রবল পরাক্রান্ত স চাকর-খিদ্‌মদ্‌গারে ইংরেজের সহিত অসমান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেশের মাটিতে প্রথম যে রক্ত পড়িল তাহা এই বিশুদ্ধ মনোবৃত্তিসম্পন্ন বাঙালীর ছেলের। তাহারা এই "অর্থকরী রাজনীতি"র ধার ধারিত না। তাহাদের রক্তে পঙ্কিল দেশের মাটি হইতে আওয়াজ উঠিতেছে—দেশের সঙ্কট-অবস্থা দেখ। এখন একমাত্র ব্যবস্থা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় মনোবৃত্তির আবাহন সমগ্র জাতিতে! এই ক্ষত্রিয় মনোবৃত্তিতে "আমি দীন, আমি হীন" বা "প্রেমের" স্থান নাই। দেশের পরিপন্থী যে-ই হইবে তাহাকে নির্মমভাবে ধ্বংস করিতে হইবে। "অর্থকরী রাজনীতি" দূর করিয়া এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্যবস্থা কর।

তোমার সাধনা বজ্র-কঠোর হোক

শ্রীকমলরাণী মিত্র

তবু ঘোচে নাকো শঙ্কা ও সংশয়,
তিমির-রাত্রি বুঝি বা হ'ল না শেষ!
—তবু দিকে দিকে ধ্বনি উঠে জয় জয়
ভবিষ্যতের নিশ্চিত নির্দেশ॥
চরম-লক্ষ্যে বাকী আছে আরো পথ,
আরো পথ-চলা আরো দৃঢ়তর পায়ে—
তবুও চলিছে ঘর্ঘর জয়রথ,
বিজয়-পতাকা গর্বে উড়িছে বায়ে!
মহা-ভারতের অমোঘ অভয় বাণী
নিখিল-বিশ্বে আলোকের বর্তিকা—
মুক্তি-তীর্থে পথিক অগ্রগামী
জ্বালো সে-আলোক লক্ষ দীপ্ত শিখা!
সাধনা তোমার বজ্র-কঠোর হোক
ত্যাগ-সত্যের স্বার্থবিহীন ব্রতে,
তোমার পুণ্যে পুণ্য পিতৃলোক
তৃপ্তি লভিবে সপ্ত-স্বর্গ হ'তে॥
করজোড়ে করি আলোকের বন্দনা,
উদয়-শিখরে রাখিনু নমস্কার;—
তবু সংশয় করিছে অন্যমনা—
এখনো বুঝি বা ঘোচে নি অন্ধকার!

প্রবাহ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

৪

পরদিন প্রত্যুষে।...

মৃন্ময় প্রাত্যহিক ঊষাভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া এই মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছে। দেশে ফিরিলে এটা তার নিত্যকর্ম। অল্পক্ষণেই মুখ হাত পা ধুইয়া একখানা বই খুলিয়া বসিল। গত রাতটা তার একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। কালো বিড়ালটার জলজলে দুটো চোখ, রোগা বৌটার দাঁত-বাহির-করা হাসি বহুক্ষণ তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর কখন এক সময় যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তার নিজেরই হুঁস নাই। কিন্তু প্রত্যুষে ঘুম ভাঙিতে অতি সহজেই সে আবিষ্কার করিল যে, গত রাত্রের মনের উপরকার সে পাষাণভার আজ আর নাই।

যেমন হীরু নাপিত তেমন রাধু বোষ্টম। ভয় দেখাইতে কেহই কম যায় না। আর তেমনি তার মনের জোর। মৃন্ময় একলা একলাই খানিকটা হাসিল।

মা আসিয়া শুধাইলেন, তোর চা এখানে পাঠিয়ে দেব মিনু?

মৃন্ময় বলিল, দাও মা।

মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, চায়ের সঙ্গে কি খাবি? গোটা কয়েক মুড়ির মোয়া দেব? কাল করেছি।

মৃন্ময় কহিল, আপত্তি নেই মা, কিন্তু নারকেল কোরা দিতে ভুলো না যেন।

মা চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আহার্য্য ও চা টেবিলের উপর রাখিয়া গেলেন।

মৃন্ময় রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি"র পাতা উল্টাইতেছিল এবং মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেছিল। মঞ্জুষার আকস্মিক আগমনে বইখানা মুড়িয়া রাখিয়া স্মিতহাস্যে কহিল, এত সকালে তুমি?

মঞ্জুষা কহিল, চা খেতে এলাম। কিন্তু কাল তুমি গেলে না কেন মিনুদা?

মৃন্ময় বলিল, নানা কারণে হয়ে ওঠে নি। আজ যাব। একটু থামিয়া অকস্মাৎ প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হইল। কহিল, তোমাকেই যে এতক্ষণ মনে মনে চাইছিলাম এ কথাটা তুমি কাছে আসতেই আরও পরিষ্কার হয়ে গেল মঞ্জু।

বিস্মিত চোখে মৃন্ময়ের মুখের পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া মঞ্জুষা কহিল, তার মানে?

মৃন্ময় কহিল, রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠিখানা পড়ছিলাম।

মঞ্জুষা বলিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু তার সঙ্গে আমার আসার সম্পর্ক কি?

মৃন্ময় কহিল, এ সব বই একলা পড়ে আনন্দ পাওয়া যায় না মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, কিন্তু আমার এখনও চা খাওয়া হয় নি। তা ছাড়া ঐ সব জটিল তত্ত্ব আমি বুঝিনে, ভালও লাগে না। মঞ্জুষা আর অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। মৃন্ময় চেয়ারটা ঘুরাইয়া দুয়ারের দিকে মুখ করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল এবং খানিকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া অত্যন্ত বিরক্ত ভাবেই সে উঠিয়া পড়িল। মঞ্জুষার সাক্ষাৎ মিলিল ভাঁড়ার-ঘরে। মৃন্ময়ের মায়ের নিকট বসিয়া সে নির্ব্বিকার ভাবে কুটনা কুটিতেছে ও মাঝে মাঝে নিতান্ত অভিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছে।

মৃন্ময় দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইতেই মা কহিলেন, তোর আবার কি চাই মিনু?

অকস্মাৎ মৃন্ময়ের মুখ দিয়া বাহির হইল, আর দুটো মুড়ির মোয়া। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অন্য কথা পাড়িল, কিন্তু কাকে দিয়ে কি করাচ্ছ মা!

মা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের পানে চাহিলেন।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, অভ্যাসের গুণে হাতের আধখানা ও যদি নামিয়েই দেয় তখন কিন্তু দোষের বোঝা তোমার মাথায়ই পড়বে।

এ এক আচ্ছা পরিহাস বটে! মা হাসিয়া কহিলেন, তোর অন্য কোন কথা না থাকলে এখন যেতে পারিস। মোয়া আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মৃন্ময় আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না।

খানিক পরে মঞ্জুষা আসিয়া যখন মৃন্ময়ের ঘরে প্রবেশ করিল তখন সে চোখ বুজিয়া কি চিন্তা করিতেছে। মঞ্জুষার আগমন টের পায় নাই।

মঞ্জুষা কহিল, অতগুলো মোয়া পড়ে আছে আর মোয়ার নাম করে মিছিমিছি যা নয় তাই বলে এলে।

মৃন্ময় চোখ চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, মিথ্যা সকলের কাছেই পীড়াদায়ক মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, এ তোমার অন্যায় রাগ মিনুদা। যা সত্যিই আমি বুঝি না, তা কেমন করে তুমি আমার জোর করে ভাল লাগাবে। তোমার নানুদার কবিতা শোনাতে চাইলে ত কখনো ভাল না লাগার দোহাই দিয়ে আমি পালিয়ে যাই না।

যে যেমন লোক তার ভাল লাগাটাও ঠিক তেমনি হয়ে থাকে। এ সোজা কথাটা যদি না বোঝ তবে আমি কি করি।

মৃন্ময় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, তোমায় বলতে ভুলেছি, কাল নান্টুর চিঠি পেয়েছি।

মঞ্জুষা কহিল, এই প্রায় চার বছর সে নিরুদ্দেশ হয়েছে আর এত দিন পরে তার মনে পড়ল! কোথায় আছে সে? লিখেছে কি?

মৃন্ময় কহিল, জানি না। ঠিকানা দেয় নি। লিখেছে, প্রয়োজনমত জানাবে, কিন্তু কভারে ছাপ দেখলুম এক পাহাড়িয়া অঞ্চলের। ওখানে নাকি সে বেশ আছে। স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন ওর গতি। তার অবাধিত চিন্তার পথে কেউ বাধার সৃষ্টি করে না। ওখানে কোন এক ধনী পাহাড়িয়া মেয়েকে নান্টু বাংলা শেখায়। ওর প্রয়োজনের অতিরিক্ত তারাই দিয়ে থাকে।

মঞ্জুষা কহিল, নান্টুদার বাড়ীতে এ খবর দিয়েছ?

মৃন্ময় কহিল, না। নান্টুর খবর গোপন রাখতে সে বিশেষ করে আমায় অনুরোধ করেছে। ওর খোঁজ করতে গেলে লাভ কিছু হবে না। মাঝে থেকে তাকে আবার নুতন পথের সন্ধানে বেরুতে হবে। ঘরকে সে নাকি ছাড়বার জন্তেই ছেড়েছে, ফেরবার জন্তে নয়। ওখানে সে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। জায়গাটাও চমৎকার।

মঞ্জুষা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের কথা কিছু লেখে নি?

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, লিখেছে বৈ কি। তোমার কথা নিয়ে প্রায় পাতাখানেক ভরিয়ে ফেলেছে। লিখেছে—মঞ্জু এখন কত বড়টি হয়েছে। আগের মত এখনও ময়ূর, খরগোস আর ডল নিয়ে মেতে থাকে কিনা? তেমনি করে কথায় কথায় তোর ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে কিনা। দুষ্টুমি করলে কান মলে দিই কিনা…

মঞ্জু হাসিয়া ফেলিল, কহিল, সব কথা মনে আছে ত বেশ!

মৃন্ময় পুনশ্চ কহিল, লিখেছে, এখানে সকলে আমায় মাথায় করে রেখেছে। এতটা আমার ভাল লাগে না। এর চেয়ে মঞ্জুর মত একটি মেয়ের প্রয়োজন আমার বেশী, যে কথায় কথায় অভিমান করে কথা বন্ধ করতে পারে…রাগ করে কিল চড় দিতেও যার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। এমনি একটি সহজ সঙ্কোচহীন মেয়েকে যদি পেতাম তা হলে দিনগুলি আমার আরও মধুর হয়ে উঠত।

মৃন্ময় থামিল। একটু হাসিয়া কহিল, পাগল আর কাকে বলে। ওর ধারণা তুমি এখনও ঠিক তেমনিই আছ। তেমনি সহজ আর তেমনি সরল। বয়োধর্মকে পর্য্যন্ত নান্টু ভুলতে বসেছে। ও সব দিক দিয়েই কবি হয়ে উঠেছে। সে যাই হোক নান্টু কিন্তু মঞ্জুকে খুব ভালবাসে। মঞ্জু তার প্রবাস-বাসের একটা সচেতন চিন্তা।

মঞ্জুষা রাগ করিয়া কহিল, এ সব তোমার গায়ের জোরের কথা। অন্তায় কথা অসঙ্গত কথা।

মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখে কহিল, মঞ্জু রাগ করেছ। কিন্তু সত্যিই এতে বিরক্ত হবার কিছু নেই। একটু ভেবে দেখলে তুমিও একথা বুঝতে পারবে। নান্টু-বর্ণিত মঞ্জুষা মৃন্ময়ের ঘাড়ে চড়ে। প্রয়োজনমত কিল-চড় দেয়—দিনের মধ্যে পাঁচ-বার আড়ি করে, সাত বার ভাব করে। তাকে ভালবাসা মানে নিতান্তই স্নেহ করা। বয়সের তফাতেই ওর রূপ আলাদা হয়—এ সাধারণ কথাটাও তুমি বুঝবে না এ আমি কেমন করে জানব।

মঞ্জুষা তথাপি নীরব।

মৃন্ময় পুনরায় একটু ঠাট্টার ভঙ্গিতে কহিল, তোমাকে দোষ দেব না, কারণ তোমার আসল ব্যাধি কোথায় সে আমি জানি।

মঞ্জুষা কহিল, ডাক্তারী বিদ্যেটাও আয়ত্ত করেছ দেখছি, কিন্তু আমার যতদূর বিশ্বাস এখনো শিক্ষানবিশী চলছে। তাই বলছিলাম যে, রোগনির্ণয়ের আগে দু'এক জন অভিজ্ঞের সাহায্য নিয়ো, তাতে হয়তো অনেকের যন্ত্রণার লাঘব হবে।

মৃন্ময় হাসিমুখে উত্তর দিল, কিন্তু যে ইচ্ছে করে কেউটে সাপের মুখে হাত ঠেকিয়ে যন্ত্রণাকে ডেকে আনে তার জন্তে কোন বিধি-ব্যবস্থাই চলে না। না হাতুড়ের না অভিজ্ঞের।

মঞ্জুষা হাসিয়া ফেলিল। মৃন্ময়ের কানের কাছে মুখ আনিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, ইচ্ছে করে কেউ কেউটে সাপের মুখে হাত দিতে যায় না মিনুদা, যদি না এর পেছনে বড় কোন আকাঙ্ক্ষা লুকানো থাকে। মঞ্জুষা ক্ষণিকের জন্ত থামিয়া পুনরায় কহিল, সেপ্‌টিক হবার কোন আশঙ্কা নেই জেনেও যারা কাটা-ঘায়ে টিংচার আইডিন লাগায়, তারা অত্যধিক হুঁসিয়ার হলেও যার প্রয়োগ করা হয় তার কাছে তা যন্ত্রণাদায়ক হয় যে মিনুদা।

মৃন্ময় কহিল, সামান্ত একটু কাঁটার আঁচড়ে যারা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় তাদের সম্বন্ধে তুমি কি বিধান দেবে মঞ্জু?

মঞ্জুষা রাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আমি জানি না।…সে প্রস্থানোদ্যত হইতেই মৃন্ময় তাহাকে বাধা দিল, কহিল, যেয়ো না মঞ্জু, দরকার আছে।

মঞ্জুষা থামিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মৃন্ময়ের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। মৃন্ময় নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া আছে। মঞ্জুষা দুখানি হাত আলগোছে তার দুই কাঁধের উপর রাখিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, কি—ডাকলে কেন?

মৃন্ময় তথাপি নীরব।

মঞ্জুষা আরও একটু ঘন হইয়া দাঁড়াইল। মৃদু কণ্ঠে কহিল, কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? চলে যাব নাকি? চোখ দুটি ওর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কপালে ফুটিয়া উঠিয়াছে ঘর্ম্মবিন্দু।

মৃন্ময় তার কাঁধের উপরে ন্যস্ত মঞ্জুর দুখানি হাতে ঈষৎ চাপ দিয়া কহিল, দুটো মোয়া খেয়ে যাও মঞ্জু।

মঞ্জুষা সহসা তার হাত টানিয়া লইয়া কহিল, না···আমি যাই। সে দ্রুত প্রস্থান করিল।

মৃন্ময় কতকটা বিস্মিত এবং বিহ্বল দৃষ্টিতে মঞ্জুষার দ্রুত অপস্রিয়মাণ মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিল।

৫

এই ঘটনার দিন কয়েক পরে মঞ্জুষার সাক্ষাৎ মিলিল মৃন্ময়ের শয়নকক্ষে। মৃন্ময় তখন ঘরে ছিল না। শয্যার উপর খানকয়েক বই ইতস্ততঃ ছড়ান ছিল। মূর্ত্তিমান বিশৃঙ্খলা। মঞ্জুষা আপন মনে গজ গজ করিতেছিল, মিনু-দা যেন কি! এর মধ্যে আবার মানুষ থাকতে পারে। যত বাবুয়ানা জামা-কাপড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জুষার হাত দুখানিও সক্রিয় হইয়া উঠিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বইগুলি টেবিলের উপর তুলিয়া রাখিতে গিয়া সে আবিষ্কার করিল নান্টুর একখানি সুদীর্ঘ পত্র। মঞ্জুষার মন কুতূহলী হইয়া উঠিল। এই চিঠি লইয়াই মৃন্ময় সেদিন কত না আজেবাজে বকিয়াছিল! তা ছাড়া নান্টুর খাপছাড়া জীবনযাত্রাকে মঞ্জুষা খানিকটা যেন করুণার চোখে দেখে।

নান্টু লিখিয়াছে—অনেক দিনের একটা পুরনো কথা আজ বার বার মনে পড়ছে। খুব ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছি। বাল্যকালটা হয়তো সেইজন্যই খুব আদরে কেটেছে। লোকে বলত—অভাগা। যাঁদের মা আছে সেই সব ছেলের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে গিয়ে মনে মনে হেসেছি, আর যারা আমায় কৃপার চক্ষে দেখেছে তাদের বলেছি নির্ব্বোধ। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে তারা মিথ্যে বলত না। মার স্নেহের কোল যদি আজ আমার অপেক্ষায় খালি থাকত কি সাধ্য ছিল আমার এমনি করে ভেসে বেড়াবার। তুমি হয়তো এক্ষুনি প্রতিবাদ করে বসবে, বলবে আমার দাদার কথা, আমার বৌদির কথা যাঁরা আজও আমায় স্নেহ করেন। করেন না এমন কথা আমি বলছিনে, কিন্তু সাংসারিক অভাব-অনটনের চাপে তাদের স্নেহের রূপ বদলে গেছে। তাদের প্রীতি আজ আমার উপার্জ্জিত অর্থের প্রয়োজনে স্বভাবধর্ম্মকে ভুলেছে। আমি খামখেয়ালী—উপার্জ্জনের প্রতি কোন দিনই আমার তেমন আগ্রহ নেই, কিন্তু অভাবের সংসার সে কথা শুনবে কেন। সে তার অসংখ্য দাবি নিয়ে আমার পিছনে তাড়া করছিল। কিন্তু আমাকে যে নিজের মত করে বাঁচতে হবে তাই গৃহত্যাগ করেছি। তার পর সুরু হ'ল নিজেকে নিয়ে ভেসে বেড়ান। দীর্ঘ চার বৎসরের ঘোরাফেরার পর স্থির হয়ে দাঁড়াবার একটা আশ্রয় পেতেই সর্ব্বপ্রথম তোমার কথা মনে পড়ল। ভেবেছিলাম আর হয়তো উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে হবে না, কিন্তু জীবনের সূচনায় যে দুর্ভাগা জীবনসংগ্রামে হেরে গেছে তার ভবিষ্যৎ সাধারণতঃ একটু অন্ধকারই হয়ে থাকে। আমিও তার থেকে বাদ পড়ি নি।

তুমি হেসো না মিনু। এ আমার ভাবপ্রবণতা নয়। জীবনের একটি অতি সত্য অনুভূতির কথা তোমাকে জানাচ্ছি। আমি বড় আঘাত পেয়েছি, যার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তাই এর আকস্মিকতা আমায় পাগল ক'রে তুলেছে। আমি কবিতা লিখি। মেয়েপুরুষের মনের বহু অলি-গলির সন্ধান আমার জানা এমনি একটা অকারণ দম্ভ আমার মধ্যে ছিল। আমার নির্ব্বোধ অহঙ্কারই আমার সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছে। আমি হেরে গেছি এক সহজ সরল পাহাড়ী মেয়ের কাছে।

চন্দনাকে আমি বাংলা পড়াতাম। মেয়েটির চালচলন, কথাবার্ত্তা সব কিছুর মধ্যেই একটা সুষ্ঠু ভাব ছিল। আঁটসাঁট বলিষ্ঠ গড়ন। তার পরিপূর্ণ যৌবন কোথাও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়, আপন মহিমায় তা সুপ্রকাশ। চোখে বিলোল কটাক্ষ নেই, রুদ্রমধুর ভাবে তা উজ্জ্বল। জ্বালা নেই, আছে দ্যুতি। চন্দনাকে আমার বড় ভাল লেগেছিল।

ওকে দূর থেকে দেখতে ভাল লাগে, কাছে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা করতে বুক কাঁপে। অথচ অনাবশ্যক রূঢ়তা না আছে তার কোন কাজে, না কথায়।

এই বিচার-বুদ্ধি যদি প্রথম থেকেই আমার থাকত, হয়ত আজ আবার আমাকে নতুন করে অজানার পথে পা বাড়াতে হ'ত না। কিন্তু আমার লোভী মন আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। চন্দনার অকপটতা আমার ভাবপ্রবণ মনকে উদ্বেলিত করেছে।

দুর্ব্বল মন যখন এমনি এক সন্ধিক্ষণে দোলায়মান, চন্দনার সাগ্রহ আহ্বান এল। তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। পাহাড়িয়া নদী মূর্ত্তিমতীর তীরে এসে দু'জনে উপস্থিত হলাম। এমন ত আরও কত দিন এসেছি, কিন্তু আজকের দিনের বিভ্রান্তি আমার জীবনকে তিক্ত করে দিয়েছে। একখানা বড় পাথরের উপরে দু'জনে পাশাপাশি বসেছি। পাড়াগাঁয়ের গল্পে ওকে মাতিয়ে তুলেছি। কখনও বিস্ময়ে বড় বড় চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে, কখনও হেসে গড়িয়ে পড়ে। আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই।

চন্দনা প্রশ্ন করে, মাষ্টার বাবু তুমি দেশে যাও না কেন?

কি উত্তর দেব। বলি, দেশে আমার কেউ নেই। আমি একেবারে একা।

অনুকম্পায় চন্দনার চোখ দুটি ছল ছল করে ওঠে। জিজ্ঞেস করলে, তুমি বিয়ে করবে না মাষ্টারবাবু?

হেসে জবাব দিলাম, না। আমার প্রয়োজন নেই।

চন্দনা কথা বললে না, মুখ নত করলে।

দু'হাতে তার মুখ তুলে ধরলাম, চোখে তার জল।

অবাক হয়ে গেলাম, এবং সেই মুহূর্তে নিজেকে বড় বেশী দুর্ব্বল বলে মনে হ'ল। বুকের মধ্যে উষ্ণ রক্তস্রোত উদ্দাম হয়ে উঠেছে। আমি ভুল করলাম।

চন্দনার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য জলে উঠল, কিন্তু কথায় তার প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ পেল না। শান্ত মৃদুকণ্ঠে সে বললে, 'মাষ্টারবাবু, তুমি দেশে চলে যাও। আমি তোমায়…' তাকে বাধা দিলাম, আমি ভুল করেছি চন্দনা।

চন্দনা যে কত কঠিন তা এবারে বোঝা গেল। সে বিকৃত কণ্ঠে বললে, ভুল তুমি কর নি—আর সেইজন্তেই তোমাকে যেতে হবে। আমার কথার অবাধ্য হয়ো না। তা হলে নিজের আরও ঢের বেশী অনিষ্ট তুমি করবে।

আমি পুনরায় একটা কৈফিয়ৎ দেবার জন্য প্রস্তুত হতেই চন্দনা আমায় থামিয়ে দিয়ে, তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বললে, তোমার দোষ কি মাষ্টারবাবু—বোনের স্নেহ ত কোন দিন পাও নি…

আমারই শেখান কথা আজ আমার উপর প্রয়োগ করেছে।

চন্দনার বাবার কাছে আমি চির বিদায় প্রার্থনা করেছি, কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করতে চান নি। চন্দনা বলে, বাংলা ভাষার উপর সে শ্রদ্ধা হারিয়েছে। যেটুকু আয়ত্ত করেছে তাও সে ভুলে যেতে চেষ্টা করবে।

নিজেকে পুনরায় ধিক্কার দিলাম। এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকবার ইচ্ছা নেই। আগামী কাল কোথায় থাকব তা জানি না।

ইতি— নান্টু

মঞ্জুষা বার বার চিঠিখানা আগাগোড়া পড়িল। মনে মনে নান্টুকে অনুযোগ দিল। ছি ছি নান্টুদা এমন চঞ্চলমতি। আর চন্দনা…কি জানি কেমন মেয়ে সে!…

মৃন্ময় ইতিমধ্যে বারকয়েক ঘরের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া গিয়াছে। মঞ্জুষা তাহা টের পায় নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়া কথাটা সে মঞ্জুকে জানাইয়া দিল।

মঞ্জুষা হাসিয়া কহিল, সত্যিই বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। নান্টুদার চিঠিটা পড়ছিলাম। নান্টুদা যেন কি! একটা উচিত-অনুচিত জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই।

মৃন্ময় কহিল, উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন এখানে না তোলাই ভাল। মানুষের মনের বিচিত্র গতি কখন যে কোন্ পথ অনুসরণ করতে চায় তা বোঝা বড় শক্ত ব্যাপার। তোমার দাদার বিষয় নিয়েও এতক্ষণ এই সব কথাই হচ্ছিল।

মঞ্জুষা কহিল, আমাদের বাড়ী থেকেই আসছ বুঝি?

মৃন্ময় কহিল, হ্যাঁ।

মঞ্জুষা কহিল, দাদার সম্বন্ধে মার সঙ্গে বুঝি আলোচনা হচ্ছিল?

মৃন্ময় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হুঁ…তিনি কি বলেন জান? ছেলের অন্যায়কে তিনি অস্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁর মতে তাকে ত্যাগ করা কিছুতেই উচিত হয় নি।

মঞ্জুষা কহিল, কিন্তু তাকে পুরোপুরি ত্যাগ বাবা ত করেন নি। মাসে মাসে পাঁচ শ' করে তা হলে দিয়ে যাচ্ছেন কিসের জন্য। অথচ মা কিছুতেই বুঝবেন না। অনেক চেষ্টা করেও বোঝাতে পারি নি।

মৃন্ময় কহিল, আমিও পারি নি। ঠিক এই কারণেই তোমার বার বার বলা সত্ত্বেও এতদিন যাই নি। তিনি বলেন তোমার দাদার পাওনা মাত্র পাঁচ শ' টাকায় শেষ হয়ে যায় না। উপরন্তু তিনি যেন বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে আমায় উদ্দেশ করে বললেন যে, সবাই মিলে আমরা তোমার দাদার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছি। এই ভয়ই আমার সবচেয়ে বেশী ছিল মঞ্জু।

মঞ্জুষা মৃদুকণ্ঠে কহিল, মার কথায় তুমি দুঃখিত হয়ো না মিনুদা। নইলে বাবাকেও মা বুঝবার চেষ্টা করেন না। আমার মুখে হয়ত এসব কথা ঠিক শোভন হচ্ছে না। তবুও না ব'লে পারছি না যে, বাবা, আমার বাবা বলেই আজও দাদার কথা তিনি ভাবছেন। সকলেই বাবার নির্লিপ্ত ভাবটা লক্ষ্য করে, কেউ তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে না। আমার মা পর্য্যন্ত না। আর এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক। মা বলেন, মায়াদয়া বাবার শরীরে নেই। আচ্ছা মিনুদা, দুঃখ প্রকাশের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কি খালি চোখের জল ফেলা? যে আঘাত দিনে দিনে একটা লোকের স্বভাব পর্য্যন্ত বদলে দিয়েছে তা লোকের চোখে পড়ে না কেন?

মঞ্জুষা থামিল। তার দুই চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল।

মৃন্ময় নিঃশব্দে বসিয়া আছে।

মঞ্জুষা পুনরায় কহিল, বাবার মুখের পানে তাকাতে আমার ভয় করে মিনুদা। মার কাছে গেলে উঠি হাঁপিয়ে। তাই যখন তখন তোমার কাছে ছুটে আসি। বাড়ীর আবহাওয়া আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।

মৃন্ময় এতক্ষণে পুনরায় কথা কহিল, তোমার মাকে দোষ দেওয়া বৃথা। সব মা-ই ঠিক এই কথা বলতেন। তর্কবিচার নেই, কোন বিধান নেই, এমনি যুক্তিহীন তাদের দুর্ব্বলতা—মেয়েদের মাতৃত্ব। অথচ এই নিয়েই তাদের গর্ব্বের অন্ত নেই।

মঞ্জুষা স্থির দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার চোখে মুখে কেমন এক প্রকারের বিস্ময়। তার এই ভাবপরিবর্ত্তন মৃন্ময়ের দৃষ্টি এড়াইল না। সে পুনরায় কহিল,

কোন ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ্য করে একথা আমি বলি নি। নইলে কে না জানে যে, পৃথিবীতে মানুষ বলে পরিচয় দিতে গেলে মেয়েদের আঁচল ধরেই সকলকে উঠে দাঁড়াতে হয়। ওদের বুকের কোমল, বৃত্তিগুলিই আমাদের বেঁচে থাকবার শ্রেষ্ঠ উপকরণ।

মঞ্জুষা একটু হাসিয়া কহিল, যদি তোমার কথাই সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় তা হলেও কি মেয়েদের গর্ব্ব করবার মত কিছু নেই মিনুদা। যে দুর্ব্বলতা মানুষ সৃষ্টি করে তা কি এতই উপেক্ষার বস্তু? কিন্তু তর্ক থাক। অনেকক্ষণ এসেছি এখন যাই।

মৃন্ময় কহিল, আর একটু বসবে না?

মঞ্জুষা কহিল, না। আর একদিন তোমার কথা রাখব।

মৃন্ময় কহিল, যে কাজে হাত দিয়েছিলে তাও কি শেষ না করেই যাবে? না সেটাও আর এক দিনের জন্যে মুলতুবী থাকবে।

মঞ্জুষার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, কহিল, আজকের জন্যে না হয় একটু স্বাবলম্বী হলে। সময়ের খেয়াল ছিল না। তুমি রাগ করো না মিনু-দা—একটু থামিয়া মঞ্জু পুনরায় কহিল।

মৃন্ময় হাসিমুখে কহিল, রাগ করব কেন। তা ছাড়া সব অবস্থার সঙ্গেই আমি মানিয়ে চলতে পারি। কিছু অসুবিধে হয় না।

মঞ্জুষা কহিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। মঞ্জুষা ক্ষণকাল পরে পুনরায় কহিল, তোমার কলকাতা যাবার দিন ত প্রায় ঘনিয়ে এল। বিকেলে একবার যেয়ো। সত্যি নিজেকে বড় একলা মনে হয়।

মৃন্ময় প্রতিশ্রুতি দেয়। মঞ্জুষা প্রস্থান করে।

ইহারই দিন কয়েক পরে মৃন্ময় গ্রাম ত্যাগ করিল।

৬

প্রায় দেড় বছর পরে।

এই দীর্ঘ সময়টা মৃন্ময়ের এক প্রকার ভালই কাটিয়াছে। ইতিমধ্যে বারতিনেক সে গ্রামে গিয়াছে। গ্রামের সে দিন আর নাই। ও তরফের বড়বাবুর বিরাট কারখানা এ তরফের বহু ক্ষয়ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাড়ি, বাগদী ও নমঃশূদ্রপাড়ার জোয়ান পুরুষরা বড়বাবুর জয়গানে গ্রামকে সরগরম করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু তাদের গৃহলক্ষ্মীরা দিবারাত্র অভিশাপ দিয়া চলিয়াছে। বড়বাবুর কারখানা পয়সা দেয় ভাল। তিনি সজ্জন ব্যক্তি। জনমজুরদের সুখ-সুবিধার প্রতি তাঁর প্রখর দৃষ্টি। কারখানার সঙ্গে তিনি শরাবখানা খুলিয়াছেন। মজুরদের সপ্তাহান্তে বেতনের বার আনা কারখানারই দিয়া আসিতে হয়। গৃহলক্ষ্মীদের অভিশাপ বোধ করি সেইজন্যই। শান্তি গিয়াছে, অভাব বাড়িয়াছে। খবরগুলি মঞ্জুষার চিঠিতে মৃন্ময় জানিয়াছে এবং গত বার দেশে গিয়াও নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। গ্রামকে মৃন্ময় ভালবাসে। বিশেষ করিয়া এই শ্রেণীর জীবন্ত মানুষ-গুলিকে, যারা গ্রামের হৃৎস্পন্দনস্বরূপ, প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য। শত অভাব, শত অনটনের মধ্যেও যারা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া লড়াই করিতে পারিত আজ তাহারা কারখানার শ্রমিক—শরাবখানার দাস। ভাবিতেও মৃন্ময় ব্যথিত হয়। ইচ্ছা হয় উহাদের মধ্যে ছুটিয়া যায়। ওদের বর্ত্তমান জীবনের কদর্য্য দিকটা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, কিন্তু সময় কোথায়। আর কয়েকটা মাসের ব্যবধানে তার হাতে পর্য্যাপ্ত সময় দেখা দিবে। তখন—

রুদ্ধ জানালাটা সশব্দে খুলিয়া যাইতে মৃন্ময়ের চিন্তাধারায় বাধা পড়িল। বাহিরে বেগে বাতাস বহিতেছে। দুর্য্যোগ-দিন। আকাশে স্তবকে স্তবকে সাদা মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে—কোথাও কালো মেঘের জমাট স্তূপ। হোষ্টেলের ছেলেরা অনেকক্ষণ হইল দল বাঁধিয়া সহরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে বাহির হইয়াছে। এত জল নাকি দশ বৎসরের মধ্যে হয় নাই। মৃন্ময় কতকটা দলছাড়া। কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খল মাতা-মাতির মধ্যে সে নাই। নিজের পড়াশুনা লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু আজিকার এই বর্ষণক্লান্ত আকাশ উন্মত্ত প্রকৃতি তাহাকে আনমনা করিয়া তুলিয়াছে। মনে পড়িতেছে মঞ্জুষাকে, গ্রামকে আর তার অসহায় সন্তানদের। সেই সঙ্গে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে তার বহু সহপাঠী। বি-এ পরীক্ষার পর তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। বিমান ফেল করিয়াছে। অশোক কোন রকমে তরাইয়া গিয়াছে। নিতান্ত সাদাসিধা ছেলে সুশীল গিয়াছে বিলাত। অঙ্কশাস্ত্রে ক্লাসের মধ্যে যে ছিল সকলের চেয়ে কাঁচা, সে গিয়াছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে। আর সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, দুলাল গিয়াছে ডাক্তারি পড়িতে। অথচ দিনে দুপুরে ভূতের ভয়ে সে কাঁপিত। ডিসেক্‌সন ক্লাসে জ্ঞান না হারাইলে রক্ষা!

মৃন্ময়ের চিন্তার সূত্র পুনরায় ছিঁড়িয়া গেল। শ্রীমান দেবল আসিয়াছে। দেবল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, আপনি গেলেন না মৃন্ময়বাবু—আজকের বেড়ানটা সত্যই উপভোগ্য হয়েছে।

মৃন্ময় একটু হাসিল। জবাব দিল না।

দেবল কহিল, আপনি হাসছেন! কিন্তু জীবনে এও এক চমৎকার রোমান্স। আমাদের বাঙালী জীবন এমন একঘেয়ে এবং বেসুরো যে…

মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখে কহিল, আপনার বক্তৃতা সেদিন ইউনিভারসিটি ইনষ্টিট্যুটে শুনেছি, চমৎকার বলেন আপনি।

দেবল বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, এই এক আপনার মত

দোষ। নিজে পছন্দ করেন না বলে আর কাউকে তা আলোচনা করতেও দেবেন না। সে চলিয়া গেল।

এদের এই হৈ চৈ মৃন্ময়ের আজ ভাল লাগিতেছিল না। নির্জ্জনে চিন্তায় সময় কাটাইতে পারিলেই ভাল হয়। কিছু দিন যাবৎ প্রতিনিয়তই সে ভাবিতেছে। মঞ্জুষার মার অবস্থা নাকি মোটেই ভাল নয়। যে-কোন মুহূর্ত্তে একটা কিছু ঘটিয়া যাইতে পারে। ফলে মঞ্জুষার সহিত বিবাহ ব্যাপারটা অনতিবিলম্বে চুকাইয়া ফেলিতে উভয় পক্ষ হইতে তাগিদ আসিয়াছে। মঞ্জুষাকে বিবাহ—কথাটা যে আজ নূতন করিয়া সে ভাবিতেছে তা নয়। মৃন্ময়ের অন্তরের অনেকখানি জুড়িয়া সে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এম্-এ পাস না করিয়া সে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। এ কথাটা সে পরিষ্কার করিয়াই তার বাপমাকে জানাইয়া দিয়াছে।

মঞ্জুষার নিকট মৃন্ময়কে নিয়মিত চিঠি দিতে হয়। মঞ্জু বেপরোয়া। সঙ্কোচের ধার ধারে না। চিঠির উত্তর দিতে বিলম্ব হইলে নানা অনুযোগ এবং লম্বা লম্বা উপদেশ বর্ষিত হয়। মৃন্ময়ের হাসি পায়। আমোদ লাগে। মঞ্জুষা তার গোপন চিন্তায় দেখা দেয়—দেখা দেয় মৃন্ময়ের মনের নিভৃতে। মুখে তার নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ করে না। তার আশেপাশের সকলকেই সে জানে। মঞ্জুষার চিত্তবৃত্তিকে টানিয়া ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া সকলে বিচার করিতে বসিবে একথা ভাবিতেও নিদারুণ বিতৃষ্ণায় মৃন্ময়ের মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। কথায় কথায় মঞ্জুষাকে লইয়া উহারা বিদ্রূপ করিবে, তার সারল্যকে ছলনা অথবা বাড়াবাড়ি বলিয়া উপহাস করিবে, কিংবা মুখে মুখে তার কথা আলোচিত হইবে এ যেন নিতান্তই একটা সস্তা নাটকীয় ব্যাপার। স্নেহের পাত্রীকে সাধারণের চোখের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া যাহারা বাহাদুরি নেয় মৃন্ময় সে শ্রেণীর নয়।

দেবল আসিয়া পুনরায় দেখা দিল, কহিল, বলতে ভুলে-ছিলাম—মাপ করবেন।

মৃন্ময় বিস্মিত চোখে দেবলের মুখের প্রতি চাহিল।

দেবল কহিল, আপনার বড়লোক বন্ধু সুনির্ম্মল বাবু এসে ফিরে গেছেন।

মৃন্ময় কহিল, কিন্তু আমি ত সারাদিন কোথাও বেরুই নি।

দেবল কহিল, সে খবর আমার রাখবার কথা নয়। মোটের উপর তিনি এসেছিলেন এবং এই চিঠিখানা আপনাকে দেবার জন্ত রেখে গেছেন। দেবল হাত বাড়াইয়া চিঠিখানি মৃন্ময়কে দিল।

মৃন্ময় আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল। দেবল বিনা বাক্যব্যয়ে মৃন্ময়ের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার চিঠিখানার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল, আছেন বেশ। আমাদের দুর্ভাগ্য তাই কোন বড়লোক বন্ধু নেই। দেবল প্রস্থান করিল।

সুনির্ম্মলের বাড়ীতে হঠাৎ এমন কি উৎসব দেখা দিল যার জন্ত এই সাদর আহ্বান! কিঞ্চিদধিক দেড় বৎসরের কলিকাতা বাসকালে তাহাকে বহু বার সুনির্ম্মলের বাড়ী যাইতে হইয়াছে যদিও সে তার গতিবিধি বহির্বাটী পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল। স্বেচ্ছায় কোন দিন সে কারুর বাড়ী যায় নাই। সুনির্ম্মলের বাড়ীতেও নয়। অতীতেও সে ডাকিয়াছে, আজও আমন্ত্রণ জানাইয়াছে। কিন্তু দুইয়ে তফাৎ অনেক। এ আহ্বান যুক্তি-বিচার দ্বারা এড়ান যাইবে না। দেখা না করিয়া চিঠি রাখিয়া যাওয়ার ইহা ছাড়া আর কি কারণ থাকিতে পারে। বড় লোকের একমাত্র ছেলে। সবই ওর কেমন খাপ-ছাড়া। মৃন্ময়ের সহিত কোথাও ওর এতটুকু মিল নাই। তথাপি সে তাহাকে এড়াইতে পারে না। পরীক্ষার ওজুহাতে এবারে পূজায় বাড়ী যাওয়া পর্য্যন্ত বাতিল করিয়া দিয়াছে। মাতার সকরুণ আহ্বান, মঞ্জুষার স্পষ্ট মিনতি সে খণ্ডন করিয়াছে। মঞ্জুষা ত সেই হইতে চিঠি লেখাও বন্ধ করিয়াছে। অথচ সুনির্ম্মল আসিয়া সেই মহামূল্য সময়ের উপর যখন তখন ভাগ বসাইতেছে। তাড়াইলেও যাইবে না। কটূক্তি করিলে মুখ টিপিয়া হাসে। ইহাকে লইয়া সে কি করিতে পারে।

খাবার তাগিদ আসিয়াছে। মৃন্ময়কে উঠিতে হইল।

ক্রমশঃ

চৈতন্য-লীলা [শ্রীঅমূল্যগোপাল সেন

বাংলার চিত্রশিল্প ও কয়েকজন শিল্পী

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রশিল্প নিয়ে আলোচনা যতটা দরকার, বাংলাদেশে ততটা হয় না। অথচ প্রতিভার ছাপ যাদের ছবিতে রয়েছে তাঁদের ছবি নিয়ে আলোচনা হলে তাঁরা যে উৎসাহিত হন তাতে সন্দেহ নেই। সমঝদার ব্যক্তির উৎসাহে শিল্পীর মনে ভাল ছবি আঁকার স্পৃহা বাড়ে, অনুপ্রেরণা আসে—নইলে অবসন্ন মনে কর্ম্মের প্রেরণা জাগে না—মনের সৃষ্টিপ্রেরণার উৎস ক্রমশঃ শুকিয়ে আসে। সাধারণতঃ খ্যাতিমান শিল্পীদের বা তাঁদের চিত্রকলার আলোচনা অল্পস্বল্প হয়, কিন্তু যাঁদের খ্যাতি কম তাঁদের ভাল চিত্রেরও আলোচনা আমাদের দেশে বড় একটা হয় না। বর্ত্তমান যুগকে অতিপ্রচারের যুগ বলা যেতে পারে। মুদ্রাযন্ত্রের সুলভ-প্রচার, দৈনিক ও মাসিক কাগজে বিজ্ঞাপনের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও বাংলার চিত্র-শিল্পীর প্রতিভার উপযুক্ত সমাদর হচ্ছে না। দোষ হয়ত দেশের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির যাতে শিল্পকলার উপযুক্ত মর্য্যাদা নেই। তাই কলা-শিল্পের প্রতি অনুরাগ দেশের লোকের মনে ব্যাপকভাবে আজও জাগে নি। ওদিকে, ভাল ছবি এঁকে সচ্ছলভাবে জীবিকার সংস্থান করা অধিকাংশ চিত্রকরের পক্ষে সুকঠিন। অর্থনৈতিক দুরবস্থার চাপে আর উৎসাহের অভাবে অনেক শিল্পীরই ছবি আঁকার স্বাভাবিক প্রবণতা ও শক্তি ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ কলিকাতার বড় বড় চিত্রপ্রদর্শনীতে ভাল ছবির সংখ্যা কম দেখা যাচ্ছে, ভাল ছবি বিক্রীর পরিমাণও কমে যাচ্ছে, ছবির যথাযোগ্য বিচারও হচ্ছে না। বহু পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি সৃষ্টি হিসাবে সার্থক কিনা, সে বিষয়েও রসজ্ঞ ব্যক্তিদের সন্দেহ রয়েছে।

বাংলার চিত্রকলার খ্যাতি শুধুমাত্র ভারতে নয়, পাশ্চাত্ত্যের বহু দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। ভারত-শিল্পের

রবীন্দ্রনাথ [শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাউল [শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এই প্রচার ও প্রসারের মূলে রয়েছে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্র-নাথের প্রতিভা। অবনীন্দ্রনাথ তো শুধুমাত্র স্রষ্টা নন, শিল্পীর মনে রূপসাধনার উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে কি করে তাকে সার্থক সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত করতে হয় সে দিক দিয়েও তিনি অদ্বিতীয়। ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর মানসিক স্বাতন্ত্র্যের গতি অনুধাবন করে, তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে তিনি তাদের হাতে-কলমে শিক্ষাদান করেছেন। তাঁরই নির্দ্ধারিত পথ অনুসরণ করে বাংলার চিত্রকলা বিশ্বে বিশিষ্ট আসন পেয়েছে। বাংলার এই প্রতিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে শিল্পীর প্রাণে উৎসাহ অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তার রূপসৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে। বিদেশীর শাসন-শৃঙ্খল আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির নানা পথ এত কাল রুদ্ধ করে রেখে দিয়েছিল। পরাধীনতার এই নাগপাশ থেকে আজ আমরা মুক্তিলাভ করেছি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশকে উন্নত করে গড়ে তুলবার নানাবিধ উদ্যোগ-আয়োজন চলছে। শিল্প-কলার ক্ষেত্রেও এ উদ্যম প্রসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নিজস্বতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ যাদের চিত্রসৃষ্টিতে বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে এমনি কয়েক জন শিল্পীর শিল্পকলার আলোচনা প্রসঙ্গে দেশবাসীর মধ্যে যে বস্তুর অভাব মনকে পীড়িত করেছে সে সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বললাম। ১৯৩২ সালে চিত্রকর্ম্ম শেখার মানসে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগে যোগদান করি। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বৎসরই ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি শান্তিনিকেতন কলাভবনে নন্দবাবুর কাছে শিক্ষালাভ করেন; তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মুকুল দে-ই বোধ হয় তাঁকে বেছে নিয়েছিলেন। এর পূর্ব্বে ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী ঈশ্বরীপ্রসাদ। সত্যেন্দ্রবাবু গুরুর সার্থক শিষ্য। চিত্র-রচনার আঙ্গিক হিসেবে ইনি প্রচলিত ভারতীয় পদ্ধতিরই অনুসরণ করে চলেছেন—রসোপলব্ধির সুষ্ঠু প্রকাশেই এর ছবির সার্থকতা। এঁর আঁকা ছবিগুলিতে স্নিগ্ধ রং এবং লীলায়িত রেখার সমাবেশে যে কমনীয় রসঘন পরিবেশ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, অতি সহজেই তা রসজ্ঞ মনের তন্ত্রীতে সাড়া জাগিয়ে তোলে। সত্যেন্দ্রবাবুর আঁকা—"যশোদা ও কৃষ্ণ", "মা ও ছেলে", "বাউল", "ভোজ", "কাবুলিওয়ালা ও মিনি" ইত্যাদি ছবি রসিক-সমাজে সমাদৃত হয়েছে। শিক্ষক

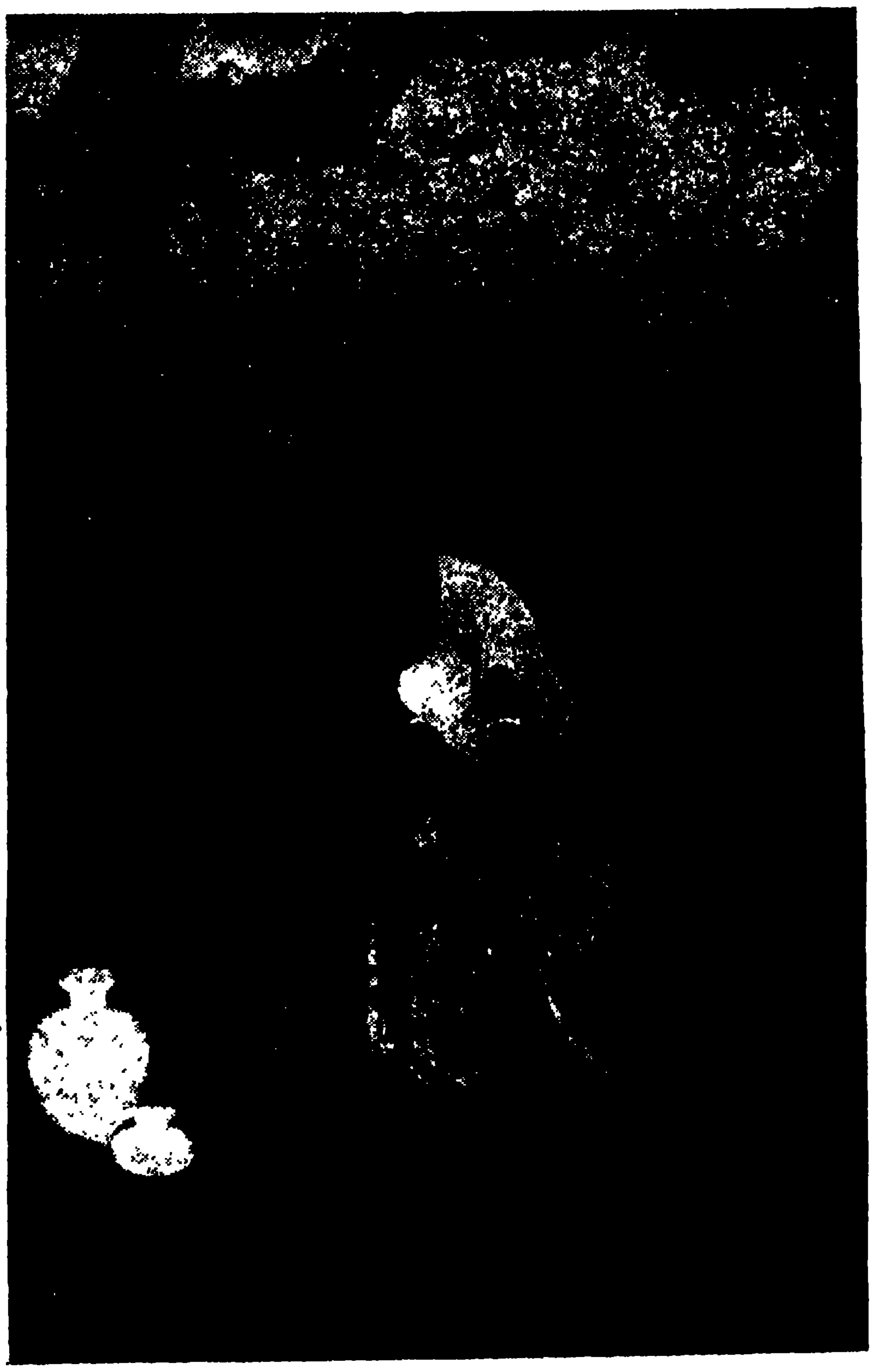

সান্ধ্য অবগাহন [শ্রীহেরম্বকুমার গাঙ্গুলি

মূষিক-বাহন [শ্রীপ্রিয়প্রসাদ গুপ্ত

হিসাবেও তাঁর কার্য্য সার্থক। প্রাচীনকালের গুরু-শিষ্যের আদর্শকে তিনি নিজের জীবনে মেনে নিয়েছেন। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁর কয়েকজন ছাত্র বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করতে পেরেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ একদা অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের অনুরোধে কলিকাতা আর্ট স্কুলে ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগকে গড়ে তুলেছিলেন। এখানেই তাঁর ছাত্র ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, নন্দলাল, শৈলেন দে, সমরেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি— এখানেই সুরু হয়েছিল বাংলার চিত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবনের সাধনা।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় আর্ট স্কুলে পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে ছবি আঁকার রেওয়াজ কমে যেতে দেখেছি—তার বদলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিষয়বস্তু করে খুব ছবি আঁকা চলত। আমরা তখন নেচার থেকে খুব স্কেচ করতাম— যেমনটি দেখতাম, ঠিক তেমনি করতে চেষ্টা করতাম। নানা রকম ভঙ্গীতে মানুষের, জীবজন্তুর স্কেচ করতাম—আবার গাছপালা, কুঁড়েঘর এবং নানা প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির ছবিও আঁকতাম। তখনকার অধ্যক্ষ মুকুল দে এবং প্রধান শিক্ষক রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এ বিষয়ে খুব উৎসাহ দিতেন। এর ফলে বাংলার সমাজ-জীবনের বিষয়বস্তু নিয়ে প্রচুর ছবি আঁকা হ'ত। প্রচলিত ভারতীয় পদ্ধতিতেই সেগুলো অঙ্কিত হ'ত, তবে আলো-ছায়ার সমাবেশ এবং পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার থাকত। পৌরাণিক কাহিনী নিয়েও যে ছবি আঁকা হ'ত না তা নয়। মানুষের মডেল সামনে রেখেও আঁকতাম—সাপুড়ে, বাউল এমনি যারা 'বেছে বেছে মডেল নিতাম। পুরোপুরি ভারতীয় পদ্ধতিতেই আঁকতাম। এ রকম করে আঁকাতে ড্রয়িং বেশ জোরালো হ'ল, আর প্রচলিত পদ্ধতির গতানুগতিকতার প্রভাব থেকেও খানিকটা মুক্ত হওয়া গেল। সেই সময়কার আব্দুল মৈনের আঁকা "অশ্ব পৃষ্ঠে জাহাঙ্গীর" ছবিটি এত ভাল হয়েছিল যে তার ছাপ এখনো মনে আছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর বর্শাহস্তে অশ্ব-পৃষ্ঠে বনমধ্যে শিকারের অন্বেষণে বহির্গত হয়েছেন, এই হচ্ছে ছবির বিষয়বস্তু। মুঘল-পদ্ধতির অনুকরণে ছবিটি আঁকা, নিখুঁত ড্রয়িং—খুব ভাবব্যঞ্জক। ইন্দু রক্ষিতের "কলিকাতা শহরের রাস্তা" স্কেচ থেকে আঁকা ছবি ; এ ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে ভারতীয় পদ্ধতিতে যে এত ভাল ছবি আঁকা যেতে পারে, এক সময় তা ভাবতেই পারা যায় নি। উক্ত ছবিতে কিন্তু, বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং বাস্তবধর্ম্মী অঙ্কনশৈলীর সমন্বয় মোটেই দৃষ্টিকটু হয় নি। সত্য মজুমদারের "তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর টিকিট কাটার দৃশ্য", "জাহাজের যাত্রী," "বাজার ঘাটের নৌকা" প্রভৃতি মানুষের সহজ সরল দৈনন্দিন জীবনের বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা ছবিগুলিতে অভিনব শিল্পদৃষ্টি এবং আঙ্গিকের কি অনায়াস অভিব্যক্তি! শুধুমাত্র গতানুগতিক আঙ্গিকের অনুকরণ না করাতে শিল্পীর অন্তরের রসানুভূতির পরিচয় ছবিগুলিতে কোথাও ব্যাহত হয় নি। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এদের আঁকা ছবিগুলি মনোরম। এঁরা

মিনি ও কাবুলিওয়ালা [শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনকে স্বীকার করে নিয়েছেন—তাই এঁদের ছবিতে চিরন্তন প্রাণধর্ম্ম রূপায়িত হয়ে উঠেছে। সত্যেন্দ্র বাবুর তদানীন্তন ছাত্রদের মধ্যে সত্য মজুমদার, ত্রিপুরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কমলারঞ্জন ঠাকুর, অমূল্য সেন, হেরম্ব গাঙ্গুলী, প্রিয়প্রসাদ গুপ্ত, ধীরেন্দ্র ব্রহ্ম প্রভৃতির ছবি বিশেষ করেই উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান লেখকও এই গুণী শিল্পীর কাছে শিল্পচর্চ্চা করে হাত

ফকিরের আস্তানা [শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

পাকাবার চেষ্টা করেছিলেন। অমূল্য সেনের আঁকা চৈতন্যের চিত্রাবলী এবং রাধাকৃষ্ণের ছবিগুলি রচনা-নৈপুণ্যে সুধীসমাজে খুবই আদৃত হয়েছে। এটা আশা করা অসঙ্গত নয় যে, উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষাদানের ফলে একদা এদের শিল্পসৃষ্টি সার্থক হয়ে উঠবে—এদের প্রতিভার অবদানে বাংলার শিল্পকলার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে।

আর্ট স্কুলে তখন ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন যাঁরা শিখতেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রাচ্য চিত্রকলা পদ্ধতিতে ছবি এঁকে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে সুশীল সেন, সমর ঘোষ, রাধাচরণ বাগচী, বাসুদেব রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অধ্যক্ষ মুকুল দে এবং রমেন্দ্রবাবু তখন ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগের উপর বিশেষ ভাবে নজর রাখতেন এবং ছাত্রদের মধ্যে কর্মোৎসাহ ও তাঁদের মনে নূতনের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করতেও তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন। রমেন্দ্রবাবু নিজের অঙ্কন-রীতিকে বিশেষ আঙ্গিকের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি, ছাত্রেরাও যাতে পুরাতনের মোহ ত্যাগ করে নিজ নিজ শিল্পসৃষ্টিতে নূতন রূপ দিতে পারে সে বিষয়ে তাদের নির্দ্দেশ দিতেন ও সহায়তা করতেন। আর্ট স্কুলে বাস্তবজীবনের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে ছবি আঁকার রেওয়াজ সম্ভবতঃ ঐ সময় থেকেই বেশী করে আরম্ভ হয়।

হাতে কলমে চিত্রকর্ম্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের শিল্পকলার ইতিহাস এবং ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকলার অঙ্কন-পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য এবং রূপ ও রস ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আর্টস্কুলগুলিতে থাকা দরকার। বিশেষ করে আমাদের প্রাচীন ভারতের চিত্রকলা চর্চ্চার রূপ, রীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে, প্রাচীনকালের গুণী শিল্পীদের আঁকা ছবি—বিশেষতঃ "অজন্তা", "রাজপুত" ও "মুঘল" পদ্ধতির আঙ্গিক ও আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের যথোচিত শিক্ষার প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেই বলেই চিত্রচর্চ্চায় আমাদের দৃষ্টির প্রসারতা বৃদ্ধির সুযোগ হয় না। চিত্রশিল্পীদের মধ্যেও অনেকেরই যখন বিভিন্ন পদ্ধতির সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান নেই, তখন অন্যে পরে কা কথা। এই শোচনীয় উদাসীনতা দেশের শিল্পকলার অগ্রগতি অনেকটা ব্যাহত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

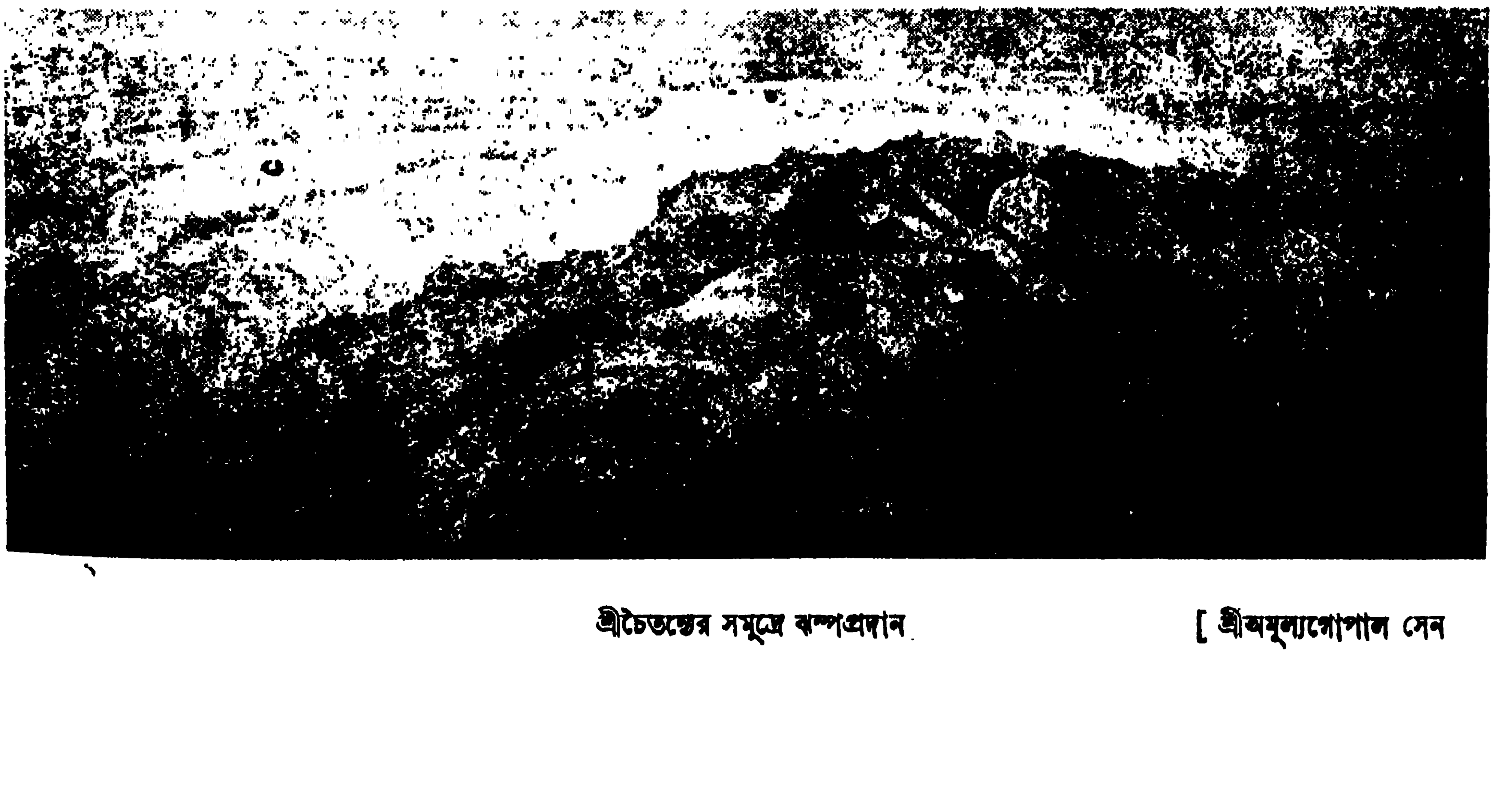

শ্রীচৈতন্যের সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান [শ্রীঅমূল্যগোপাল সেন

বাংলা লিপি

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

প্রতিবেশীকে গিয়ে বললাম, "মশায়, আপনার কুকুরটার চীৎকারে পাড়ার লোকে সারারাত ঘুমোতে পারে না, এর একটা বিহিত কিছু করুন।" তিনি বললেন, "আরে, এ ত খুব সোজা কথা। এর জন্যে সাত সকালে আমার কাছে ছুটে আসবার দরকার কি ছিল? তোমরা সব কানে তুলো গোঁজো।" তুলো গুঁজে রেখে দেবার জন্যেই যে ভগবান্ কান-দুটো আমাদের দেন নি, সেকথা কিছুতেই তাঁকে বোঝাতে পারলাম না।

তেমনি, বাংলা লিপির সংস্কারের কথা তুললেই যাঁরা সর্ব্বাগ্রে বানান বদলাবার পরামর্শ দেন, তাঁরাও আমাদের সৎপরামর্শ দেন না।

এঁরা বলেন, "৫০০টি টাইপ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছ ব'লে অভিযোগ করতে এসেছ, তা ত খাবেই; তোমাদের যেমন বুদ্ধি! ই ঈ দুটো, উ ঊ দুটো, ন ণ দুটো, য জ দুটো, শ ষ স তিনটের দরকার কি শুনি, এক-একটাতেই যখন কাজ চলতে পারে? রি, অই, অউ, ক্‌খ, গ্‌গঁ লিখলেই যখন চলে তখন ঋ, ঐ, ঔ, ক্ষ, জ্ঞ, এই অক্ষর ক'টাকে রেখেছ কেন অকারণ? আবার রেফ লাগিয়েছ কি দ্বিত্ব। তোমাদের দুর্ভোগ হবে না ত কার হবে?"

কথাটা এত লোকের কাছ থেকে এত বেশী শুনতে হয় যে, যা হোক একটা নিষ্পত্তি হয়ে এ আলোচনা এবারে শেষ হয়ে যাওয়া দরকার। একই ধরণের কথা ক্রমাগত কত আর শোনা যায়?

বাস্তবিক, একটা কুকুরের মুখে একটা muzzle না পরিয়ে পাড়ার ছেলেবুড়ো সকলের দুটো ক'রে কানে তুলো গুঁজবার পরামর্শ যতখানি মূল্যবান্, লিপিসমস্যা-সমাধানের উদ্দেশ্যে বানানগুলো বদলে দেবার পরামর্শের মূল্য ততখানিও নয়।

প্রথমতঃ, বাংলা লিপির যে ধরণের যতটা সংস্কার আমাদের প্রয়োজন এবং কাম্য, বানানের কিছুমাত্র অদলবদল না ক'রেও তা যে করা সম্ভব, বর্ত্তমান প্রবন্ধেই তা আমি প্রমাণ করতে পারব আশা করছি।

দ্বিতীয়তঃ, বানানের যত সরলীকরণই আমরা করি, তাতে আমাদের লিপিসমস্যার মীমাংসা কিছুই হবে না। ৫০০ থেকে কমিয়ে টাইপের সংখ্যা ৪৯০ করবার জন্যে বাংলা বানানে বিপ্লব বাধিয়ে দেবার প্রস্তাবটাকে অত্যন্ত হাস্যকর বেহিসাব ব'লে মনে করি। এতে ভাষার একেবারে ভিত্তিমূলে ভাঙন ধ'রে যাবে; তা ছাড়া, এই উপায়ে টাইপের সংখ্যা কমিয়ে যদি ২৫০, ১৫০ এমন কি ১০০-তেও নামিয়ে আনা যায়, যে-সমস্ত প্রয়োজনে লিপি-সংস্কার চাচ্ছি তার বেশীর ভাগ তাতেও মিটবে না।

তৃতীয়তঃ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী, গভীর এবং ব্যাপক ক্ষতি না ঘটিয়ে বানানের এই জাতীয় সরলীকরণ সম্ভব নয়।

এবারে আমার এই তিন দফা বক্তব্যের ভিতর শেষ দফাটি নিয়ে আলোচনা সুরু ক'রে প্রথম দফাটিতে গিয়ে শেষ করা যাক।

বানানের সরলীকরণ থেকে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের কি জাতীয় ক্ষতি কতখানি হতে পারে তার কিছু আভাস দেবার চেষ্টা করছি।

(১) বাংলায় তৎসম শব্দ ব'লে কিছু প্রায় আর বাকী থাকবে না; ফলে, তাদের আত্মীয়তার সূত্র ধ'রে নূতন নূতন তৎসম শব্দ আজ যেমন ভাষার ভিতর-মহলে অবাধ প্রবেশাধিকার পাচ্ছে, অতঃপর তা আর পাবে না। 'জ্ঞান' রয়েছে ব'লে 'জিজ্ঞাসা'কে নিতে দ্বিধা করবার কিছু থাকে না; কিন্তু গ্যানের হাত ধ'রে জিগ্‌গাঁশা এলে তাকে প্রশ্ন করতেই হবে, তুমি কে হে বাপু?

(২) সংস্কৃত যে শব্দসম্ভারকে আমাদের পরিবারভুক্ত ক'রে নিয়ে আমরা ভাষার আসর জমিয়েছি, তারা নিজেদের কৌলিক আচারের অনেকখানিকেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে; ফলে, বাংলা ব্যাকরণের অনেকখানিই আসলে সংস্কৃত ভাষারই ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণ আমাদের খুব অল্পই আর কাজে লাগবে ব'লে আমাদের দুর্ভোগের শেষ থাকবে না। নূতন সন্ধিসূত্র রচনা করতে হবে শ-দুএক, নয়ত দুরান্ত হয়ে যাবে দুরন্ত, একেশ্বরবাদ হয়ে যাবে একিশ্‌শরবাদ, পিত্রালয় হয়ে যাবে পিত্র্যালয়। প্রত্যয়াদির নূতন সূত্র রচনা করতে হবে হাজারখানেক, তা না হলে গ্যানের সঙ্গে জিগ্‌গাঁশার, জোগের সঙ্গে বিয়োগের, ভায়ের সঙ্গে নেজ্জের, শ্‌শঁরণের সঙ্গে স্রিতির, বাশের সঙ্গে বস্ত্রের, বুবেক্ষিয় সঙ্গে অব্যক্তের কোনোও সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ ছাড়া অন্য বিপদ্‌ও অনেক আছে।*

(৩) সন্ধি ক'রে ও প্রত্যয়-উপসর্গাদি জুড়ে তৎসমমূলক নূতন শব্দ গঠন প্রায় বন্ধ হবে।

(৪) চেহারাটা আলাদা ব'লে, সংস্কৃত থেকে এমন অনেক শব্দ আমরা নিয়েছি, নিতে পেরেছি, যার উচ্চারণটা ভিন্নার্থক

* "বাংলা বানানের ভূমিকা", দিগন্ত, ১৩৫৫।

অন্ত বাংলা অথবা সংস্কৃত শব্দেরই মত। চেহারাটাও এক হয়ে গেলে এই শব্দগুলির ব্যবহার স্বাভাবিক নিয়মে ভাষায় ক্রমশঃ কমে আসবে, যে কারণে ঘোড়া অর্থে 'হয়' কথাটা বাংলায় এখন আর চলে না। শূর ও সুর এ দুটোকেই যদি শুর লিখতে হয়, তা হলে সুরের জন্যে শুর রেখে শূর বোঝাতে বীর বলতেই চেষ্টা করব। দীনকে দিন, বীণাতারকে বিনাতার, পীঠকে পিঠ, বলীকে বলি, বিকৃত এবং বিক্রীত দুটোকেই বিক্রিত, যমককে জমক, সূচীকে শুচি, নিঃসঙ্গ ও নিঃসংজ্ঞকে নিঃশঙ্গ, যদি আমাদের লিখতে হয়, তবে যে কথাটা কম চলে অন্ততঃ সেটার জন্যে সমার্থক অন্য কথাই খুঁজব। এক উচ্চারণের এই জাতীয় দ্ব্যর্থক আলাদা চেহারার শব্দ ভাষায় অনেক আছে ব'লে ভাষার শব্দসম্পদ্ এতে কমবে। অন্যদিকে, দ্ব্যর্থক শব্দ ভাষায় বেশী হ'লে শিক্ষার্থীর পরিশ্রম বাড়ে। আমরা বাংলা-ভাষাটাকে শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ করতে চাই, দুরূহতর করতে চাই না।

(৫) ব্যুৎপত্তিবিচারে শব্দার্থগ্রহ অনেক ক্ষেত্রেই আর হবে না। যাওয়া যদি জাওয়া হয়ে যায়, যা ধাতু হবে জা, যাত হবে জাত এবং জন্ম-জাত-র সঙ্গে তার তফাৎ কিছু থাকবে না ব'লে, অগ্রজ যে আগে জন্মেছে, না যে আগে চ'লে গিয়েছে তা বোঝা যাবে না।

(৬) হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের বিচারে বাংলায় কবিতা রচনা কমবে। যা-ও বা লেখা হবে, তাতে ঈ, ঊ থাকবে না ব'লে ধ্বনি-বৈচিত্র্যের বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না।

"সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সে হো পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥"

"মণিময় মঞ্জির পায়।
দূরহি তেজি চলি যায়॥"

"নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
সারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥"

"ক্ব্টি কি কহব কানাই।
ক্ব্রত তুয়া বিনু রাই॥"

"দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর।
পীত তীত রহুঁ শীখর-কোর॥"

"ক্ব্মরি দাদুরি বোল।
ক্ব্লত মদন-হিলোল॥"

"ডাকে ডাহুক ঝমক ঝমকল
ঝারি ঝলকত ঝারিয়া।
ডিণ্ডিমান্বিত মণ্ডূকীবর
ময়ূর নাচত সাজিয়া॥"

"কত শত সুন্দর নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ ভূষি' ও।
পড়ি' জলনীলে ধবল সৌধ ছবি
অনুকারিছে নভ-অঙ্গন ও॥"

"নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল হিমাচল
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী।"

"পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।"

"ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে
পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে,
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল
নত নয়নে অনিমেষে।"

"সকল যোগী সকল ত্যাগী,
এস দুঃসহ দুঃখ ভাগী,
এস দুর্জ্জয় শক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।
এস জ্ঞানী, এস কর্ম্মী, নাশ ভারত লাজ হে।"

এ সব জিনিষ আর চলবে না। নূতন আর লেখাই যে চলবে না কেবল তা নয়, পুরাণো জিনিষগুলিকেও আর নূতন ক'রে ছাপতে পারা যাবে না।

(৭) ভাষার ধ্বনি-বৈচিত্র্য ক্রমে কমবে।

অর্থাৎ, সব মিলিয়ে বাংলা ভাষাটার যা চেহারা হবে তা একেবারে চমৎকার।

এর'পরে দেখা যাক, এ সমস্ত ক্ষতি স্বীকার ক'রে নিয়েও বানানের সরলীকরণ যদি আমরা করবই স্থির করি, তাতে আমাদের আজকের দিনের লিপি-সমস্যার মীমাংসা কিছুমাত্র হবে কি না, এবং যদি হয় ত কতটা হবে।

বাংলা লিপির সবচেয়ে বড় সমস্যা, এর অক্ষর বা ধ্বনি-চিহ্নের অকারণ বাহুল্য। কয়েক শ টাইপের মধ্যে থেকে, আঙুলে ক'রে গোনা যায় এমন কয়েকটিকে বাছাই ক'রে বাদ দিয়ে আমাদের লাভ ঠিক ততটাই হবে, ঘর-ভর্ত্তি মশার ঝাঁকের দু'তিনটাকে মেরে বাকীগুলোর কামড় খাওয়াতে যতটা লাভ।

বাংলা লিপির আর-এক সমস্যা, এর ঠাটটা ধ্বনি-অনুসারী, কিন্তু কার্য্যতঃ এ লিপি সর্ব্বত্র ধ্বনি-অনুসারী নয়। বানানের সরলীকরণ হলে প্রাজ্ঞকে প্রাগ্‌গঁ, রক্ষাকে রক্‌খা, ইন্দ্রকে ইন্দ্‌র, পদ্মকে পদ্দঁ, মাতৃকে মাত্রি, খাদ্যকে খাদ্দ লিখে, লিপির ধ্বনি-অনুসারিত্ব কিছু বাড়ালাম মনে ক'রে আত্মপ্রসাদ হয়ত আমরা অনুভব করতে পারি। কিন্তু দীর্ঘস্বর লুপ্ত হবে ব'লে যে-সব ক্ষেত্রে এখন আমরা স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণটাই ক'রে থাকি, সে-সব ক্ষেত্রে লিপির ধ্বনি-অনুসারিত্ব কমবে। চিহ্ন-হীন ব্যঞ্জন সংকেতে সর্ব্বত্র অকারান্ত, কিন্তু বাংলায় কোথাও অকারান্ত, কোথাও হসন্তবৎ, কোথাও তার অল্পবিস্তর ওকার-

ঘেঁষা উচ্চারণ। বাংলা লিপি ধ্বনি-অনুসারী হবার পথে এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা, কারণ বাংলা শব্দের মোট সংখ্যা যদি ৬০,০০০ হয় ত তার মধ্যে অন্ততঃ ৮০,০০০ চিহ্ন-হীন ব্যঞ্জনের ব্যবহার রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বানানের সরলীকরণ ক'রে এদিক্ দিয়েও লাভ আমাদের প্রায় কিছুই হবে না। অকারান্ত উচ্চারণ বোঝাতে ওকার দেওয়া চলবে না, কারণ সেটা মিথ্যাচার হবে। ওকার-ঘেঁষা অকার উচ্চারণ ওকার দিয়ে বোঝাতে গেলে ব্যাধির চেয়ে চিকিৎসাটা বেশী মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। গ্রথিত-প্রোথিত একাকার হয়ে যাবে; মহানুভব, মহার্ণব, মহারণ্য হয়ে যাবে মোহানুভব, মোহার্নব, মোহারন্য। মোহের অনুভব, মোহের অর্ণব, মোহরূপ অরণ্যের সঙ্গে তাদের আর কোনোও পার্থক্য থাকবে না। চিহ্নহীন ব্যঞ্জন বাংলায় যেসব ক্ষেত্রে হসন্তবৎ উচ্চারিত হয় তার সর্ব্বত্র উচ্চারণটা পুরোপুরি হসন্ত নয় ব'লে হস্ চিহ্নের ব্যবহারও মিথ্যাচারের সামিল হবে। হসন্তবৎ উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে সর্ব্বত্র হস্ চিহ্ন ব্যবহারের অন্য অনেক বিপদ্‌ও আছে।*

বাংলা লিপির আরও এক সমস্যা, এ লিপি তিন থাকে লেখা হয়ে বড্ড বেশী জায়গা জোড়ে। ই, ঈ, উ, ঊ, ঐ, ঔ, ইকার, ঈকার, ঐকার এবং ঔকারের আঁকড়িগুলো, ট-ঠ-এর ল্যাজ দুটো, রেফ ও চন্দ্রবিন্দু, এইগুলির স্থান উপরতলায়; উকার, ঊকার, ঋকার, ৯কার, ্কার ও হস্‌চিহ্ন থাকে নীচতলায়; বাকী সব অক্ষর মাঝের তলায়। ট-ঠ-এর ল্যাজ ছেঁটে দেওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন উপরতলাটাকে রাখতেই হবে; মাঝের তলাটার ত কথাই নেই; একমাত্র নীচতলাটাকে বাদ দিয়ে চলে কিনা দেখা দরকার। বানানের সরলীকরণ হলে ঊকার, ঋকার, ৯কার, ্কার অবশ্য বাদ পড়বে, কিন্তু উকার এবং হস্ চিহ্নের ব্যবহার থাকবে ব'লে নীচতলাটাকে আমরা ছাড়তে পারব না। অতএব সরলীকরণ থেকে এদিক্‌কার লাভও কিছুই আমাদের হবে না।

বাংলা লিপির বিরুদ্ধে এও আর-এক অভিযোগ, যে এর কোনোও কোনোও ধ্বনিচিহ্ন, যেমন ইকার-ঈকার, অন্য ধ্বনি-চিহ্নের ঘাড়ের উপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ছাপাখানায় এ জন্যে যে শিং বাগানো টাইপ ব্যবহার করা হয় সে টাইপ ভাঙে বড় বেশী, আর টাইপরাইটারে ক্রমাগত back-shift চেপে চেপে ছাপতে হয় ব'লে কাজ একটুও এগোয় না। বানানের সরলীকরণ থেকে এ সমস্যার কোনোও মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়।

এর পর নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছতে পারি, যে, লিপিসমস্যা সমাধানের জন্যে বানানের সরলীকরণ করবার পরামর্শটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক, বাজে পরামর্শ।

এবারে আমি দেখাব, যে, বানানের কিছুমাত্র অদলবদল না ক'রে, বাংলা ভাষার ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ বজায় রেখে, এবং বাংলা লিপির যেটা character বা স্বধর্ম, সেটাকে একটুও নষ্ট হতে না দিয়ে আমাদের এই লিপি-সমস্যার সমাধান কেবল যে সম্ভব তা নয়, অত্যন্তই সহজসাধ্য।*

এজন্যে সকলের আগে এবং সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, একটি অকার চিহ্ন গ্রহণ করা। সংস্কৃত লিপিতে অকারের প্রয়োজন নেই, কারণ সে লিপিতে চিহ্নহীন ব্যঞ্জন মাত্রেই সর্ব্বত্র সমভাবে অকারান্ত উচ্চারিত হয়। বাংলায় চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সর্ব্বত্র অকারান্ত নয় ব'লে, একটি অকার-চিহ্নের অভাব উপস্থিত হয়েছে। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার মত ক'রে অনেকে তাই আজ চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের অকার উচ্চারণ নির্দ্দেশ করবার জন্যে কোথাও কোথাও ওকার প্রয়োগ করছেন, কেউ বা তার হসন্তবৎ উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে স্থানে অস্থানে হস্‌চিহ্ন ব্যবহার করছেন। এ কাজ যদি সর্ব্বত্র করা চলত তা হলেও না-হয় বুঝতাম, কিন্তু কেন যে সেটা করা যায় না তা অন্যত্র বিশদভাবে বলেছি।

বাংলায় যে-সমস্ত ধ্বনির উচ্চারণ নেই তাদের জন্যেও একাধিক স্বতন্ত্র অক্ষর বা ধ্বনিচিহ্ন রয়েছে, আর যে অকারান্ত ধ্বনি আমাদের প্রায় প্রত্যেকটি কথায়, তার জন্যেই কোনোও চিহ্ন নেই, এটা যে ভিন্ন দেশীয় লোকের কাছে কতখানি অদ্ভুত ঠেকতে পারে একটু চিন্তা করলেই সেটা বোঝা যায়। কিন্তু বিদেশীয়েরা কি ভাবছে ব'লে নয়, আমাদের নিজের গরজেই অকার চিহ্ন একটি আমাদের নেওয়া উচিত।

অক্ষর থেকে মাত্রা টেনে যেখানে আমরা অক্ষরান্তরে চ'লে যাই সেইখানে ছোট একটি v চিহ্নকে অকাররূপে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা চলে। আকারের সঙ্গে অকারের আকৃতিগত যে একটু সাদৃশ্য থাকা বাঞ্ছনীয়, এর মধ্যে সেই সাদৃশ্য অল্প একটু পাওয়া যাবে; চিহ্নটি দেখতেও কিছু মন্দ নয়। সূক্ষ্ম-কোণ সম্বলিত ত্রিভুজ, কি বাংলা-লিপির অনেক অক্ষরের উপাদান; সেদিক্ থেকে দেখলেও স্বীকার করতেই হবে যে, আমার প্রস্তাবিত ধ্বনিচিহ্নটি, যা একটি সূক্ষ্মকোণ সম্বলিত ছোট ত্রিভুজ ছাড়া আর কিছুই নয়, খুব বেশী পরিমাণে বাংলা লিপির ধাতেরই জিনিষ। যে ধকারটা কাত হয়ে বসে, সেইটেই যেন উপরে উঠে চিত হয়ে বসবে। নাগরী

* "বাংলা বানানে অ এবং অকার," বিশ্বভারতী পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা।

* "বাংলা লিপির সংস্কার," বিশ্বভারতী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। "নূতন বাংলার বর্ণমালা", বিশ্বভারতী পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

লিপিতে এ চিহ্নটি হয়ত তত মানানসই হবে না, কেননা, নাগরী লিপিতে সূক্ষ্মকোণ জিনিষটার একান্তই অভাব। এই চিহ্নটি লেখাও সহজ, টানালেখায় লাইনটাকে অল্প একটু কাঁপিয়ে দিলেই অকার হয়ে যাবে, বাংলা লিপির একটানা মাত্রাসমাবেশের একঘেয়েমিও এতে কাটবে। নূতন একটি ধ্বনিচিহ্ন যে ব্যবহার করতে হচ্ছে, কিছুদিন পরে কারও আর তা বিশেষ মনেই থাকবে না; আর বাস্তবিক, বাংলায় অকারান্ত ধ্বনি এত বেশী, যে, খুব সহজে লেখা যায় এমন চিহ্নই অকাররূপে আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

সংস্কৃত সন্ধিসূত্র ইত্যাদির ব্যবহার যাতে অব্যাহত থাকে, সেজন্যে সূত্র রচনা করতে হবে, যে, তৎসম শব্দগুলির অকার বাংলায় কোথাও অকারান্ত, কোথাও হসন্তবৎ উচ্চারিত হয় ব'লে বাংলা লিপিতে সেই উচ্চারণ অনুযায়ী অকারান্ত ব্যঞ্জন ও চিহ্নহীন ব্যঞ্জন ব্যবহার ক'রে লেখাও হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সর্ব্বত্রই হবে হসন্তবৎ। যুক্তাক্ষরের প্রথম অক্ষর বিযুক্ত অবস্থায় হস্‌চিহ্নিত হওয়া উচিত, কিন্তু তার দরকার কিছু নেই। কেবল ব্যাকরণ-বিভ্রাটের সৃষ্টি যাতে না হয়, সেজন্যে আরও একটি নিয়ম রচনা করতে হবে এই ব'লে যে, একযোগে লেখা হলে পূর্ব্বপদের হসন্তবর্ণ হস্‌চিহ্ন ত্যাগ করে।

ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে আমাদের প্রায় একমাত্র এবং খুব বেশী অসুবিধার কারণ যুক্তব্যঞ্জনগুলি। একটি অকার চিহ্ন গ্রহণ করলে দুটি বা তিনটি ব্যঞ্জনকে একত্র জুড়ে স্বতন্ত্র অক্ষর তৈরি করবার প্রয়োজন আর থাকবে না। যে বর্ণ স্বরান্ত নয় তাকেই হসন্তবৎ ব'লে চিনতে পারছি, সুতরাং স্বরান্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বেকার একটি বা দুটি চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের হসন্তবৎ উচ্চারণ তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজে থেকেই যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি হচ্ছে।

যে যুক্তাক্ষর কয়টিকে ছেড়ে দেওয়া যাচ্ছে না, তারা হচ্ছে ক্ষ, জ্ঞ আর ঞ্জ। কারণ মিলিত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি এদের প্রচলিত বাংলা উচ্চারণের মত নয়। আমার ছেলেবেলায় বর্ণ-পরিচয়ের বইয়ে অন্য ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সঙ্গে ক্ষ-কেও জায়গা দেওয়া হ'ত, অন্য যুক্তব্যঞ্জনগুলির থেকে তার স্বাতন্ত্র্যের এই যে স্বীকৃতি, এটা খুবই সমীচীন ছিল। এই স্বাতন্ত্র্য জ্ঞ পুরামাত্রায় এবং ঞ্জ কিছু পরিমাণে দাবি করতে পারে। ঞ-র অন্য ব্যঞ্জননিরপেক্ষ ব্যবহার বাংলায় এখন আর নেই, তা ছাড়া জ্ঞ ভিন্ন অন্য সমস্ত যুক্তবর্ণে তার উচ্চারণ ন, তাই ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ ইত্যাদিকে এই স্বাতন্ত্র্য দেওয়া যেতে পারে না। ঙ-র উচ্চারণ বাংলায় সর্ব্বত্রই অনুস্বারের মত ব'লে যে যুক্তব্যঞ্জনগুলিতে ঙ রয়েছে, সেগুলিরও এই স্বাতন্ত্র্যের উপরে কোনোও দাবি নেই।

একই কারণে, অর্থাৎ স্থানবিশেষে উচ্চারণ-বৈকল্য হয় ব'লে ম ফলা য ফলাকে রেখে দিতে হবে। এতে আর-একটা সুবিধা এই হবে যে স্মাট্‌স্ লিখতে ম, সুস্মিতা লিখতে ম ফলা, হ্যাঁ লিখতে য়, সহ্য লিখতে য ফলা ব্যবহার করতে পারব। মনে রাখতে হবে, ম ফলা যফলা মূল অক্ষরের সঙ্গে লেপ্‌টে বসবে না, বেশ ভদ্রলোকের মত পাশ ঘেঁষে আলাদা হয়ে বসবে।

বাংলায় অন্তস্থ ব এবং বর্গীয় বকে আমরা মিশিয়ে ফেলেছি। এ অবস্থার প্রতিকার সহজ নয় কিন্তু যুক্তবর্ণে অন্তস্থ ব-এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ রয়েছে, যেমন স্ব, আশ্বাস, বিশ্ব, কচিৎ, অশ্বয়, দ্বিত্ব, ইত্যাদি। অন্তস্থ ব-এর উচ্চারণ নির্দ্দেশ করবার জন্যে, 'ব়' এই অক্ষরটিকে যদি আমরা অন্তস্থ ব-এর বৈকল্পিক রূপ হিসাবে গ্রহণ করি তাহলে ব ফলা রাখতে হয় না। অনেক সময় প্রতিবর্ণীকরণের কাজে ব় অক্ষরটির আমাদের প্রয়োজন হয়, অনেক ছাপাখানায় সে কারণে এই অক্ষরটি আজকাল থাকেও দেখতে পাই। ব ফলা ছেড়ে ব় রাখবার এই সুবিধার জন্যে আমি ব়-এরই পক্ষপাতী। ব-ফলার উচ্চারণ যদিও বাংলায় দ্বিত্বের মত অনেকটা, কিন্তু অন্য ব্যঞ্জন-নিরপেক্ষ অন্তস্থ ব উচ্চারণ বাংলায় নেই ব'লে যুক্তবর্ণে তার উচ্চারণ-বৈকল্য ঘটে একথা বলা চলে না। তা ছাড়া, বিশ্ব, বিদ্ব, এই কথাগুলিতে অন্তস্থ ব-এর ঠিক উচ্চারণটা কেউ যদি ভুল ক'রে ক'রেই ফেলেন, তাতে খুব বেশী ভয় পাবার কিছু কি আছে?

চিহ্নহীন সমস্ত ব্যঞ্জনেরই উচ্চারণ হসন্তবৎ হবে বলে ৎ-কে রাখবার দরকার কিছু থাকবে না। শৃগাল, স্নান ইত্যাদি কথায় শ-স এর দন্ত্য উচ্চারণ একটি ফুটকি যোগ ক'রে নির্দ্দেশ করা চলবে। চ বর্গের দন্ত্য উচ্চারণ এবং প বর্গের দন্তৌষ্ঠ্য উচ্চারণ এই উপায়েই এখন নির্দ্দেশ করা হয়ে থাকে।

ছাপার কাজে ড়, ঢ়, য় চলবে। টাইপ-রাইটারের অক্ষর-সংখ্যা কমাতে হলে ড, ঢ, এবং য-কেই বিন্দুযুক্ত ক'রে এদের কাজ চালানো যেতে পারে।

চন্দ্রবিন্দু যদি মাথার উপর থেকে নেমে মূল বর্ণের ডান পাশ ঘেঁষে মাঝতলাতে এসে বসেন, তা হলে সব দিক্ দিয়েই ভাল হয়।

সমস্ত রকমের ব্যঞ্জনধ্বনির জন্যে এই কয়টি অক্ষরকে রাখলেই তা হলে আমাদের চলে :

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ
ব ভ ম য র ল ব় হ শ ষ স ড় ঢ় য় ং ঃ ঁ ক্ষ জ্ঞ ঞ্জ ্য ্ . ়

অর্থাৎ, মোট ৪৫টি।

উ-কারের ছোঁওয়া লাগলে গ, শ এবং হ-এর চেহারাই এখন বদলে যায়। সেটা কিছু সমস্যাই নয়। ছোঁওয়া এর পর আর লাগবে না।

স্বরবর্ণমালা নিয়ে আমাদের এখন সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগ

এইজন্তে, যে, ব্যঞ্জননিরপেক্ষ ব্যবহারের জন্ত অ আ প্রভৃতি একপ্রস্থ পূর্ণাবয়ব স্বরবর্ণ, আকার ইকার প্রভৃতি দ্বিতীয় একপ্রস্থ সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনিচিহ্ন এবং সংক্ষিপ্ত চিহ্নগুলির ভিতরে আবার দু-তিন রকমের উকার, ঊকার, ঋকার মিলিয়ে অকারণ অনেকগুলি ধ্বনিচিহ্ন আমাদের ব্যবহার করতে হয়। তার উপরে সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনিচিহ্নগুলির মধ্যে আকার ও ঈকার ছাড়া অন্ত সব কয়টিই ধ্বনিক্রম অনুসারে তাদের যেখানে বসা উচিত, অর্থাৎ মূলবর্ণের ডাইনে, না ব'সে কেউ বা বসে উপরে, কেউ বা নীচে, কেউ বাঁদিকে, কেউ দু'দিক্ জুড়ে, কেউ আবার তিন দিক্ জুড়েও বসে।

দু'প্রস্থ স্বরধ্বনিচিহ্ন রাখব না স্থির ক'রে আমাদের ভাবতে হবে, মূলবর্ণ ও সংক্ষিপ্ত ধ্বনিচিহ্নের মধ্যে কোন্‌গুলিকে রেখে কোন্‌গুলিকে ছাড়ব। স্বতন্ত্রভাবে স্বরবর্ণের যত ব্যবহার, ব্যঞ্জন-সহযোগে অর্থাৎ আকার ইকার প্রভৃতি রূপে তাদের ব্যবহার বহুগুণ বেশী; তদুপরি আকার ইকার লেখা সহজ, তারা জায়গা জোড়ে কম; তাদের কিছুতেই ছাড়া চলতে পারে না। লিপিকারের কাজকে সহজ করাই লিপিসংস্কারকের কর্ত্তব্য, কঠিনতর ক'রে তোলা নয়। অন্তদিকে, জায়গা এত কম জোড়ে ব'লেই, স্বতন্ত্র, অর্থাৎ ব্যঞ্জন-নিরপেক্ষ, স্বরবর্ণের কাজে আকার ইকার ব্যবহার করতে গেলে অত্যন্ত সেটা বিশ্রী দেখতেও হয়, এবং বাংলা লিপির বৈশিষ্ট্যও তাতে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

সবদিক্ কিসে রক্ষা হয় তার ইঙ্গিত বাংলা লিপিতেই একটি এবং নাগরী লিপিতে কয়েকটি রয়েছে। বাংলায় যেমন অ-তে আকার দিয়ে আ হয়, নাগরীতেও তাই হয়, তদুপরি অ-তে ওকার ঔকার যোগ ক'রে ও-ঔয়ের কাজও নাগরীতে দিব্যি চ'লে যাচ্ছে, বাংলাতেও চলতে পারে, এবং কয়েকটির কাজ যদি চলে ত বাকীগুলিরই বা কেন চলবে না? স্বরধ্বনির বাহন হবে অ; বাংলা অক্ষরগুলির মধ্যে রেখা-চিত্রের যা উপাদান, সরলরেখা, সূক্ষ্ম-কোণ, বৃত্তাংশ এবং ফুটকি, তার সবই এর মধ্যে রয়েছে; ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরান্ত হলে অ লোপ পাবে। সেবাগ্রামে basic হিন্দীর পাঠ্যপুস্তক এই রীতি অনুসরণ ক'রে ছাপা হচ্ছে, তাতে কারও কোনোও অসুবিধা হচ্ছে ব'লে এখন পর্য্যন্ত ত শুনিনি। আজ থেকে ঠিক চার বৎসর আগে বিশ্বভারতী পত্রিকার মারফৎ এই প্রস্তাব এবং একটি অকার চিহ্ন গ্রহণের প্রস্তাব আমি করে-ছিলাম; কিন্তু বাংলাদেশের সুধীজনের দৃষ্টিতে আমার সে লেখাটা পড়েছে ব'লে মনে হয় না।

৯কারের ব্যবহার বাংলায় নেই, কিন্তু সংস্কৃতের উদ্ধৃতি ইত্যাদির জন্তে একে রাখতে হবে। ৯, এই সংখ্যাচিহ্নটি দিয়ে ৯কারের কাজ, আর ঋকারের দ্বিত্ব ক'রে ৠকারের কাজ যদি চালানো যায়, তা হলে অকার চিহ্নটিকে এবং স্বরধ্বনির বাহনরূপী অ-কে হিসাবে ধরে বাংলা স্বরবর্ণমালার সংখ্যা দাঁড়ায় ১২। মোট অক্ষরের সংখ্যা হয় ৫৭। যদি ফুটকি যোগ ক'রে ড়, ঢ়, য় নিষ্পন্ন করতে আপত্তি না থাকে ত টাইপ-রাইটারের কাজ ৫৪টি অক্ষর হলেই স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। বড় হাতের ও ছোট হাতের অক্ষর মিলিয়ে এবং dip-thong দুটিকে নিয়ে রোমকলিপির বর্ণমালার সংখ্যা ৫৬।

এর পর ধ্বনিক্রমের কথা।

আকার আর ঈকারকে নিয়ে ধ্বনিক্রমের গোলযোগ কিছু নেই, কেবল ঈকারের আঁকড়িটা অন্ত অক্ষরের এলাকায় ঝুঁকে না পড়ে সেটা দেখলেই হ'ল। ইকারের আঁকড়ির সম্বন্ধেও বক্তব্য সেই একই, তবে ইকারটাকে আগে বাঁদিক্ থেকে ডাইনে নিয়ে এসে তার আঁকড়ির ঝোঁকটাকে বাঁদিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

উকার, ঊকার ও ঋকারকে নীচতলা থেকে মাঝতলায় তুলে এনে মূলবর্ণের পায়ের কাছে ডানদিক্ ঘেঁষে বসিয়ে দিলেই কাজ চ'লে যাবে। রু-রূ লিখতে আমরা যে উকার ঊকার ব্যবহার ক'রে থাকি, সে দুটিকে নিলে টানা লেখার সুবিধা অনেক বাড়ে এবং অক্ষর-সমাবেশের দিক্ থেকেও সেটা ভাল হয়। তবে অনভ্যাসের জন্তে অক্ষরজ্ঞ লোকদের প্রথম প্রথম খুব অসুবিধা হবে তাতে। পরিবর্ত্তন যত কম ক'রে লিপি-সংস্কার করা সম্ভব, তাই আমাদের করতে চেষ্টা করা উচিত।

একারটাকে ও ঐকারটাকে ডানদিকে সরিয়ে এনে তাদেরও ঝোঁক বাঁদিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু বাংলা বাঁদিক্ থেকে ডাইনে লেখা হয় ব'লে, উল্টোদিকে ঝোঁক, এমন অক্ষর লিখতে লিপিকারের অসুবিধা। ইকার-ঈকারের এই অসুবিধা নেই, কারণ টানা লেখায় প্রস্তাবিত ইকারের আঁকড়ির টানকে স্বচ্ছন্দেই ডানদিকে ঘুরিয়ে আনা যাবে, আর ঈকার সাধারণতঃ বাঁদিক্ থেকে ডাইনেই লেখা হয়ে থাকে।

নাগরী একার ঐকার নেওয়া চলতে পারে। কিন্তু এখনকার মত অন্ত অক্ষরের মাথার উপরে তারা বসতে পাবে না ব'লে মাঝতলাটার সবটাই একেবারে ফাঁকা পড়ে থাকবে, ফলে, বাংলা এখন যেমন ঠাস্যাঠাসি হয়ে লেখা হয় তা আর হবে না। এ অসুবিধাটা নাগরী ওকার-ঔকারের নেই। কিন্তু নাগরী ও-কার যদি আমরা নিই তা হলে তার সঙ্গে যাতে গোল না বাধে এই জন্তে ই-কারের আঁকড়িটাকে বদলে ই-র আঁকড়ির ধরণের ক'রে নেওয়া প্রয়োজন হবে।

এ-ঐ-ও-ঔ লিখতে এখনকার এ-কার ঐ-কার ও-কার ঔ-কারের চেয়ে বেশী সময় লাগে না; সেইজন্তে মনে হয়, এইগুলিকেই একটু বদলে অথবা বেশ খানিকটা ছোট ক'রে লিখে এ-কার ঐ-কার ও-কার ঔ-কারের কাজ যদি আমরা

চালাই, কোনও দিক্ দিয়েই অসুবিধা কিছু হয় না। ছোট ক'রে লিখবার কথায় মনে পড়ল, আমার প্রস্তাবিত লিপিতে মূল বর্ণগুলি এবং অ যদি ধ'রে পাঁচ মাত্রা স্থান জোড়ে, অ-কার আ-কার ই-কার ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনিচিহ্নগুলি এবং অনুস্বার-বিসর্গ-চন্দ্রবিন্দু, য-ফলা, র-ফলা ও হস্‌চিহ্ন ন্যূনাধিক ½ মাত্রা স্থান জুড়বে। টাইপরাইটারের key-board-এ এদের কথা ভেবে এক সার চাবির জন্যে আলাদা level-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পরিচয়ের সীমানা খুব বেশী ছাড়িয়ে না গিয়ে সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনিচিহ্নগুলির চেহারা মোটামুটি যত রকমের হতে পারে ব'লে আমার মনে হয়েছে তার একটা ছক এবারে দিচ্ছি :

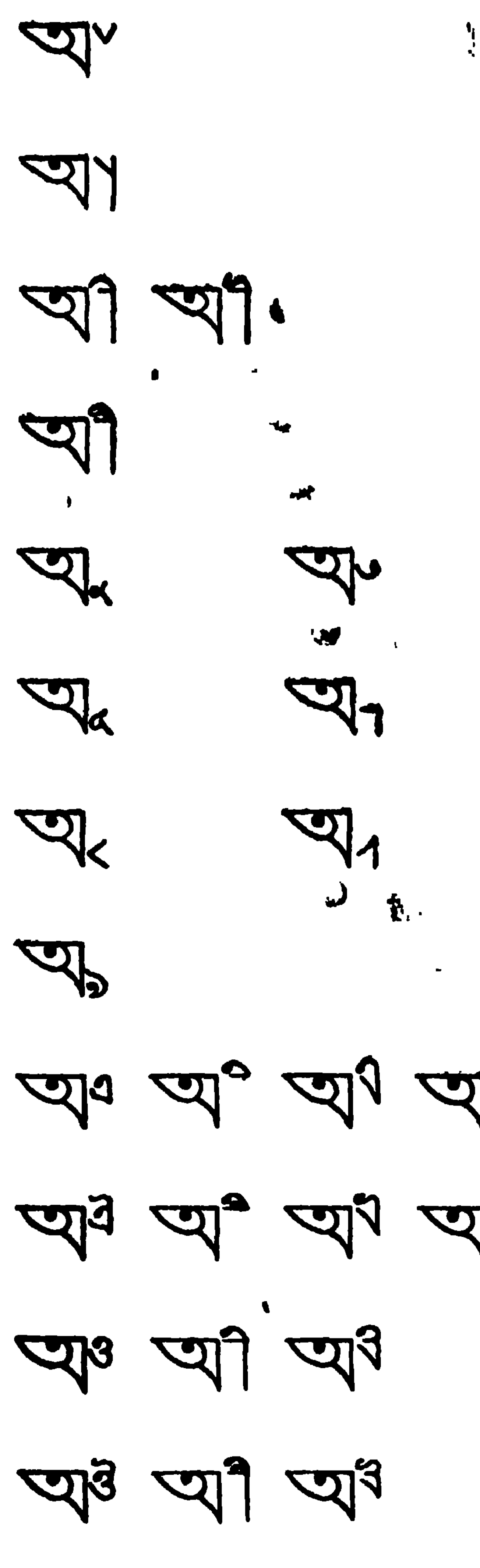

এর মধ্যে একেবারে প্রথম সারের অক্ষরগুলোর আমি পক্ষপাতী।

এই অক্ষরগুলিকে আমাদের স্বরবর্ণমালা ব'লে গ্রহণ করলে বাংলা লিপি সম্পূর্ণ বাংলা লিপিরই জাতের থেকে যাবে এবং অন্যের দ্বারস্থ তাকে হতে হবে না। c, এই চিহ্নটি কেবল আমাদের লিপির থেকে বাদ পড়বে ; v, এই একটি মাত্র নূতন চিহ্ন আমরা নেব। উ, ঊ থাকবে না, কিন্তু ড থাকবে, আঁকড়িও থাকবে। ই যাবে, কিন্তু হ থাকবে ; ঈ-র হাড়গোড় ভাঙা চেহারাটার আদল দ-এর মধ্যে রয়ে যাবে খানিকটা। যুক্তাক্ষর থাকবে না ব'লে ত্র, ক্র, ত্ত, ক্ত বাদ পড়বে, কাজেই এ এবং ও যদি যায় ত একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েই যাবে, কিন্তু অক্ষর দুটি সুদৃশ্য ; আমার প্রস্তাবিত স্বরবর্ণ-মালা গৃহীত হলে এদেরকেও ছাড়তে হবে না। ব্যাবৃত এ বোঝাবার জন্যে এ-র দাড়িটাকে টেনে নীচ অবধি নামিয়ে দিতে পারা যাবে ; যেন এ-কার এবং আকার মিলিয়ে তৈরি হবে অক্ষরটা ; ব্যাবৃত এ-র উচ্চারণও সেই জাতীয়ই ত বটে। সূত্র হবে : তৎসম শব্দের একার এবং এ বাংলায় দু'রকমে উচ্চারিত এবং দুরকম লেখা হয়ে থাকে। হাতের লেখায় এ-ঐ-ও-ঔকে ছোট ক'রে লিখতে কেউ না চান, লিখবেন না ; ই-কার ঈ-কারের, ঐ-কার ঔ-কারের আঁকড়ি হাতের লেখায় অন্য অক্ষরের উপরে চ'লে এলেও কিছুই এসে যাবে না ; উ-কার, ঊ-কার, ঋ-কার ও হস্ চিহ্ন এখনকার মত ক'রেই লেখা চলবে।

যাঁরা বাংলা লেখাপড়া জানেন, তাঁরা অ-কার চিহ্নটিকে একবার দে'খে নিলেই প্রস্তাবিত নূতন লিপির লেখা অনর্গল পড়তে পারবেন, অনায়াসে লিখতেও পারবেন। নাগরী লিপি একটানে লেখা যায় না, বাংলা সে তুলনায় অনেক বেশী একটানা লেখা যায়, প্রস্তাবিত লিপিও ততটাই বা তার চেয়েও বেশী একটানা লেখা চলবে।

নূতন শিক্ষার্থীদের আর দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে হাবুডুবু খেতে হবে না। পুরুষানুক্রমিক অশিক্ষায় দুর্বলবুদ্ধি, এদেশের লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর লোক এর পর দেশের ভাষার বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় সাধন করতে দলে দলে এগিয়ে আসবে। মাত্র ৫৭টি অক্ষর, ১০টি সংখ্যাচিহ্ন এবং বিরামচিহ্ন কয়েকটি আয়ত্ত করতে পারলেই তাদের বাংলা পাঠ-পরিচয় সমাপ্ত হবে। যে-সমস্ত বই নূতন লিপিতে ছাপা হয়ে উঠবে না বা ছাপা হতে দেরি হবে, পূর্ণাবয়ব গোটাপাঁচেক স্বরবর্ণ, একার চিহ্নটি যার সঙ্গে আকার এবং আঁকড়ি জুড়ে ঐকার ওকার এবং ঔকার তৈরি হয়, রফলা, রেফ এবং চার-পাঁচটি যুক্তাক্ষর চিনে নিলেই সে সমস্ত বইও তারা পড়তে পারবে ; বাকী যুক্তাক্ষরগুলিতে যুক্ত অক্ষরগুলির চেহারা বেশ স্পষ্ট, যেজন্যে যুক্তাক্ষর আর থাকবে না বলে দুঃখ করবার আমাদের কিছু নেই। অক্ষরগুলি জড়াজড়ি করে তালগোল না পাকিয়ে পাশাপাশি বসলে যদি আমাদের কাজ চলে ত চলুক না ? সজ্জল, আহ্বান লিখতে চ-ছ এবং হ-বকে পাশাপাশি বসিয়েই এখনও অনেকে লিখে থাকেন।

যুক্তাক্ষর থাকবে না এবং অকার, উকার, ঊকার ঋকার,

চন্দ্রবিন্দু, হস্‌চিহ্ন পাশে বসবে বলে প্রস্থের দিকে জায়গা জুড়বে খানিকটা বেশী ; কিন্তু প্রস্তাবিত লিপি তিন থাকের বদলে দুই থাকে লেখা হবে ব'লে হরেদরে আমাদের পুষিয়ে যাবে।

পূর্ব্বেও বলেছি, আবার বলছি, আমার প্রস্তাব গৃহীত হলে ছাপাখানার মালিকদের এক পয়সা খরচ হবে না। গোটাদশেক নূতন টাইপ ঢালাই করিয়ে নিতে যা খরচ পড়বে, বর্জ্জিত অক্ষরগুলির টাইপ ওজনদরে বিক্রয় ক'রে তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁরা লাভ করবেন।

প্রস্তাবিত লিপিতে টাইপরাইটার, লিনোটাইপ, টেলিগ্রাফ, টেলিপ্রিণ্টার প্রভৃতির কাজ অনায়াসে চলবে। এক কথায়, যে-লিপি আজ তার অসংখ্য অযোগ্যতা, অসম্পূর্ণতা, জটিলতা, বিশৃঙ্খলতা প্রভৃতি নিয়ে মধ্যযুগীয় লিপির পর্য্যায়ে পড়ে রয়েছে, কোথাও কোনোও বিপ্লব না বাধিয়ে, কারও কোনোও অসুবিধা না ঘটিয়ে এক দিনে তাকে সমস্ত দিক্ দিয়ে সুসম্পূর্ণ ও বর্ত্তমানকালোপযোগী ক'রে নেওয়া যেতে পারে। এ লিপি যে সর্ব্বতোভাবে আমাদের পক্ষে রোমক লিপি অপেক্ষাও ঢের বেশী কাজের হবে, সংস্কৃত এবং সংস্কৃতমূলীয় ভাষাগোষ্ঠীর বর্ণমালার শ্রেষ্ঠতা যে কি নিয়ে এবং কোথায় তা যাঁরা জানেন, তাঁদের সেটা আর ব'লে বুঝিয়ে দিতে হবে না।

রাজস্থানী সাহিত্যে বীররস

অধ্যাপক শ্রীঅযোধ্যানাথ শাস্ত্রী

ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যে রাজস্থানী সাহিত্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। রাজস্থানী সাহিত্যে যে উদ্দীপনাপূর্ণ ভাবধারার সন্ধান পাওয়া যায় তাহা কেবল রাজস্থানেরই নয়, সমস্ত ভারতের পক্ষেই অতি গৌরবের বিষয়। রাজস্থানী কবিদের বীররসাত্মক কবিতা এত সুন্দর ও এত উন্নত যে তাহার সমকক্ষ কবিতা ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় বিরল। ইহার কারণ এই যে, রাজস্থানী কবিরা কেবল নিজেদের কল্পনা-বলেই ঐরূপ কবিতা রচনা করেন নাই, প্রত্যুত সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াই তাঁহারা লিখিয়াছেন। রাজস্থান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর-প্রসূ ভূমি। যুদ্ধবিগ্রহ তত্রত্য ক্ষত্রিয়দের একটি দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে নৃপতিদের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য কবিগণ উপস্থিত থাকিতেন। কেবল উৎসাহ-দানেই তাঁহাদের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না ; অবসর পাইলে, তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া তাঁহারা শত্রুর শিরচ্ছেদ করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না।

সেইজন্যই রাজস্থানী ভাষায় এত সুন্দর বীররসপ্রধান কাব্য রচিত হইতে পারিয়াছে। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় যে কাব্যের অভাব তাহা নহে ; তবে সেগুলিতে মুখতঃ রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়কে অবলম্বন করিয়া কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ভক্তি-কাব্যের সৃষ্টিও রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছে। বাংলা ভাষায়ও চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ স্ব স্ব কাব্যে ভক্তি-ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। আমাদের ভক্ত কবিগণ যে স্থলে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতরভাবাপন্না গোপিনীদের অশ্রুবারিধারায় কাব্যাঙ্গন সিক্ত করিয়াছেন, সেস্থলে রাজস্থানী কবিগণ, শাক্তগণের শতধাখণ্ডিত শরীর ও ছিন্ন-মস্তক হইতে নিঃসৃত শোণিতে যুদ্ধক্ষেত্র রঞ্জিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। রাজস্থানী কবিদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও এক সময় বলিয়াছিলেন—"ভারতের প্রত্যেক প্রান্তেই ভক্তিরসের কাব্য পাওয়া যায়, রাধা-কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক প্রান্তই উচ্চ কিম্বা নিম্নস্তরের সাহিত্য উৎপন্ন করিয়াছে ; কিন্তু রাজস্থান নিজের রক্ত প্রবাহ করিয়া যেরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার তুল্য সাহিত্য অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।"

ভাষা :—রাজস্থানী কবিগণ দুই প্রকার ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন—(১) পিঙ্গল ও (২) ডিঙ্গল ভাষায়। মীরাবাঈ, বৃন্দ ও বিহারী প্রভৃতি কবিগণ পিঙ্গল ভাষায় লিখিয়াছেন এবং চন্দবরদাঈ, দুরশাজী, পৃথ্বীরাজ প্রমুখ কবিগণ ডিঙ্গল ভাষায় লিখিয়াছেন। ভক্ত কবিদের মধ্যে মীরা এবং শৃঙ্গারী কবিদের মধ্যে বিহারীর স্থান অতি উচ্চ। মীরার কৃষ্ণ-ভক্তির গীত কোন্ হিন্দু নরনারীর হৃদয়ে না ঝঙ্কৃত হইয়া থাকে ? তবে আমরা প্রস্তাবিত প্রবন্ধে বীর-রস-প্রধান কাব্য সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। বীর-রস-প্রধান কাব্য প্রায় ডিঙ্গল ভাষাতেই লিখিত।

ডিঙ্গল-ভাষা ও তাহার উৎপত্তি :—ডিঙ্গল ভাষা রাজস্থানের কথিত ভাষারই সাহিত্যিক রূপ। পিঙ্গল ভাষার অপেক্ষা ইহা অধিক প্রাচীন, সাহিত্যগুণ-সম্পন্ন ও ওজঃগুণবিশিষ্ট। ইহার উৎপত্তি অপভ্রংশ হইতে হইয়াছে। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ও প্রাকৃত হইতে অপভ্রংশ ভাষার উৎপত্তি। ষষ্ঠ কিম্বা সপ্তম বিক্রম-শতকে অপভ্রংশই লোক-ভাষার রূপ ধারণ করিয়াছিল। ভাষাতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, বিক্রমের সপ্তম শতক হইতে দশম শতক পর্য্যন্ত কেবল রাজস্থানেই নয়, সমস্ত উত্তর-ভারতে

এই অপভ্রংশই লোক-ভাষার রূপ ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ইহাও প্রাকৃতের ন্যায় সাহিত্যিকতার গণ্ডীতে আবদ্ধ হইলে, এই অপভ্রংশ হইতে আবার তিনটি উপভাষার সৃষ্টি হইল—(১) নাগর; (২) উপনাগর ও (৩) ব্রাচড়। নাগর অপভ্রংশ হইতেই রাজস্থানী ভাষার জন্ম। আর রাজস্থানী ভাষার যে সাহিত্যিক রূপ তাহাই হইল ডিঙ্গল-ভাষা।

ব্যুৎপত্তি:—ডিঙ্গলের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক বিদ্বানের অনেক মত।

(১) ডক্টর এল. পি. ট্যাসিটরী বলিয়াছেন,—"ডিঙ্গলের আসল অর্থ অনিয়মিত কিম্বা চাষার ভাষা। ব্রজভাষা পরিমার্জ্জিত ও সাহিত্য-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল; কিন্তু ইহা তাহার বিপরীত—অপরিমার্জ্জিত ও অনিয়ন্ত্রিত ছিল বলিয়া ইহাকে ডিঙ্গল বলা হইত।"১

(২) ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন,—"প্রারম্ভে এই ভাষার নাম 'ডগল' ছিল, পরে "পিঙ্গল" শব্দের সহিত অক্ষর-মিলন করিবার জন্য ইহার নামকরণ "ডিঙ্গল" করা হইয়াছে।"২

দুইটি মতই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সাহিত্যিক রূপ পাইবার পরেই যখন ইহা "ডিঙ্গল" নামে প্রসিদ্ধ হইল, তখন ইহাকে অশিক্ষিত চাষীর ভাষা বলা চলে না। আর "ডগল" বলারই বা কি অর্থ? ডগল শব্দের অর্থে মাটির ঢেলা বুঝায়। মাটির ঢেলার মত রুক্ষ ও অনিয়ন্ত্রিত বলাও সঙ্গত মনে হয় না। কারণ চতুর্দ্দশ শতকের ব্রজ ভাষাকে অনিয়ন্ত্রিত বলা চলে না। রাজস্থানীর কথিত ভাষা অপেক্ষা ইহা অবশ্যই পরিমার্জ্জিত ছিল নচেৎ সাহিত্যিক রূপেই বা পরিণত হইল কেন?

(৩) স্বামী পুরুষোত্তম দাস বলিয়াছেন,—"ডিম্+গল হইতে ডিঙ্গল শব্দ হইয়াছে। ডিম্ শব্দের অর্থ ডমরুর ধ্বনি। ডমরু বাজিলে ডিম্ ডিম্ শব্দ হয়, এবং ইহা রণচণ্ডীর আবাহন করিয়া থাকে। ডমরুর ধ্বনি শুনিলে বীর-হৃদয়ে অপূর্ব্ব উৎসাহ জাগ্রত হয়। মহাদেব বীর-রসের দেবতা, আর মহাদেবের বাদ্য ডমরু। কণ্ঠ হইতে যে কবিত্বময়ী ভাষা বহির্গত হইয়া ডিম্ ডিম্ ধ্বনির মত বীর-হৃদয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি করে, সেই ভাষাকে ডিঙ্গল-ভাষা বলা হয়। ডিঙ্গল-ভাষায় এইরূপ কবিতারই প্রাধান্য।৩

কেহ কেহ বলেন যে, ডিঙ্গল প্রথমে চারণ ও ভাটদের ভাষা ছিল। উহারা নিজ নিজ আশ্রয়দাতাদের কার্য্যকলাপের, শৌর্য্য-পরাক্রমের বর্ণনা অতিশয়োক্তিপূর্ণ ভাষায় করিত। অর্থের লোভে কাপুরুষকে শূর, কুরূপকে সুরূপ, মূর্খকে পণ্ডিত, কৃপণকে অতি দাতারূপে বর্ণনা করা তাহাদের স্বভাব ছিল। আসলে কবিতা রচনা করা ছিল তাহাদের জীবিকা। যেরূপ বর্ণনা করিবার নিমিত্ত যে আশ্রয়দাতা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিত, তাহার ঠিক সেইরূপ বর্ণনা করা হইত। সেইজন্য অতি ভাষণ করা অর্থে বর্ত্তমান ডীঙ্গ শব্দ হইতে ডীঙ্গল ব্যুৎপন্ন হইল। যাহার দ্বারা অতিশয়োক্তিপূর্ব্বক বর্ণনা করা হয়, সেইরূপ ভাব-ব্যঞ্জনায় ডীঙ্গল শব্দ প্রযুক্ত হইতে লাগিল। যেমন শীতল, শ্যামল শব্দের অর্থে শীতযুক্ত ও শ্যামযুক্ত বুঝায় সেইরূপ ডীঙ্গযুক্ত অর্থে প্রযুক্ত ডীঙ্গল শব্দ পরে ডিঙ্গল হইল। আজ পর্য্যন্ত রাজপুতানার বৃদ্ধ চারণ-ভাটগণ "ডীঙ্গল" এইরূপ দীর্ঘ ঈকারযুক্ত রূপই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ডিঙ্গল শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ অনেক মত দেখা যায়।

ডিঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিকতা:—একাদশ ও দ্বাদশ শতকের মধ্যে ডিঙ্গল কাব্য অতি অল্প মাত্রায় রচিত হইয়াছিল। উপরন্তু যাহা রচিত হইয়াছিল, তাহা সাধারণ কোটির। মুসলমানের আক্রমণ হওয়ার পর হইতেই ডিঙ্গল কাব্যের ইতিহাস আরম্ভ হয়। সঙ্কট হইতে দেশরক্ষা করিবার নিমিত্ত, সে সময়ে রাজা-মহারাজাদের অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় করিতে হইত। স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই সৈন্য-বল ও শস্ত্রবল মজুত রাখিতে হইত। ইহার সঙ্গে কবিদেরও প্রয়োজন হইত। তাহাদের কাজ ছিল বীর-রসপূর্ণ কবিতার দ্বারা যোদ্ধাদের প্রোৎসাহিত করা। যোদ্ধাদের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করিবার জন্যই ডিঙ্গল কাব্যের সৃষ্টি। ঐ সময়ে ঐরূপ কাজ প্রায় চারণ-ভাটরাই করিত। তাহারা উচ্চশ্রেণীর কবি তো ছিলই, যোদ্ধা হিসাবেও কম যাইত না। প্রয়োজন হইলে শত্রুদের সম্মুখীন হইয়া সংগ্রাম-নৈপুণ্য দেখাইত। চন্দর বরদাঈ, দুরশাজী প্রভৃতি কবিগণ এই শ্রেণীর ছিলেন। ইঁহারা ধনসম্পদ লাভ ও প্রতিষ্ঠা লিপ্সায় কাব্য-কলা-কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য অনেক সময় ব্যয় করিতেন, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্যলাভ করিতেন। প্রারম্ভে ডিঙ্গল ভাষায় কাব্য-রচনা চারণ-ভাটদেরই একচেটিয়া ছিল বটে, কিন্তু যখন ইহার সম্মান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরাও ঐ ভাষায় কাব্য-রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—জ্যোতিষ, বেদান্ত, ধর্ম্ম, নীতি ও শালিহোত্র আদি বিষয়েও অনেক গ্রন্থ এই ভাষায় লেখা হইল।

মহাকবি চন্দরবরদাঈ—ডিঙ্গল ভাষার সুপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন কবি চন্দরবরদাঈ জাতিতে ভাট ছিলেন। লাহোরে ইঁহার জন্ম। চন্দের জন্মকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কথিত আছে যে, ইঁহার আশ্রয়দাতা পৃথ্বীরাজ ও ইনি একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথ্বীরাজের জন্মকাল বৈক্রম সম্বৎ ১২০৫। তাহা

(১) *Journal of the Asiatic Society of Bengal* Vol X, No 10, p, 376.

(২) Preliminary report on the operation in search of MSS. of Bardic chronicles, p. 15.

(৩) নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা, ভাগ ১৪, পৃ. ১২২।

হইলে চন্দের জন্মকাল ইহার কাছাকাছি সময়েই বুঝিতে হইবে।

আজমেরের চৌহান বংশীয় ক্ষত্রিয়দের সহিত ইঁহার পূর্ব্ব-পুরুষের সম্বন্ধ ছিল। ঐরূপ পরম্পরাগত সম্বন্ধ থাকায় শৈশবকাল হইতেই পৃথ্বীরাজ চৌহানের সহিত চন্দের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। পৃথ্বীরাজের মতই ইনিও অশ্বারোহণে, অসি-সঞ্চালনে ও তীর নিক্ষেপে অতিশয় দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজও ইঁহাকে রাজ-কবিরূপে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ইনি যুদ্ধক্ষেত্রে ওজস্বিনী কবিতা রচনার দ্বারা আশ্রয়-দাতা পৃথ্বীরাজ ও তাঁহার সৈনিকগণকে প্রোৎসাহিত করিতেন এবং অবসর পাইলে স্বীয় রণনৈপুণ্যের পরিচয়ও দিতেন। চন্দরবরদাঈ ব্যাকরণ, সাহিত্য, ষড়ভাষা, ছন্দঃশাস্ত্র, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ ও সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ইনি "পৃথ্বীরাজ রাসো" নামক পৃথ্বীরাজের সুবৃহৎ জীবনকাহিনী রচনা করেন। "পৃথ্বীরাজ রাসো" গ্রন্থের বিশদ আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; তবে সংক্ষেপে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে "পৃথ্বীরাজ রাসো" উৎকৃষ্ট মহাকাব্যসমূহের সগোত্র। ইহাতে প্রায় এক লক্ষ কবিতা দৃষ্ট হয়। ইহার ভাষায় সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের সংমিশ্রণ দেখা যায়, কোন কোন স্থানে আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষার শব্দও দেখা যায়। বীর-রস-প্রধান এরূপ সুন্দর মহাকাব্য দুর্লভ।

পৃথ্বীরাজের সঙ্গে গজনীদেশের শাহবুদ্দীন ঘোরীর যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধের জীবন্ত বর্ণনা এই মহাকাব্যে পাওয়া যায়। উদাহরণের জন্য চন্দরবরদাইয়ের একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, পাঠকগণ ইহা হইতে তাঁহার রচনা-নৈপুণ্যের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন—

কবিতাটি এইরূপ—

মচে কুহকুহং বহৈ সার সারং
চমকৈঁ চমকৈঁ করারং সুধারং।
ভভকৈ ভভকৈ বহৈ রত্তধারং
সনকৈঁ সনকৈঁ বহৈঁ বাণ-ভারং॥

হবকৈঁ হবকৈঁ বহৈঁ শেল-ভেলং
হলকৈঁ হলকৈঁ মচী ঠেল ঠেলং।
কুকৈঁ কুক কুটি সুরতান ঠানং
বকী জোগ-মায়া সুরং অপ্রথানং॥

বহৈ চট্টপট্টং উলট্টং উলট্টং
ভুলট্টী ধরৈ অর অপ্পং উহট্টং।
দডক্কং বক্কৈ সদ মধ্যং সুটট্টং
কডক্কং বক্কৈ সেন-সেনা সুঘট্টং॥

বহৈ হথ্য পরমার সিরদার সারং
পরে সেন গোরী বহৈ বও ধারং।
পর্য়ো খাঁ নিসুরত্তি সেনা সহিত্তং
হুওঁ সুর মধ্যান দিল্লেস জিত্তং॥

মচে কুহ কুহং—(যুদ্ধে) হটগোল মাচিয়া গেল।

বহৈ সার সারং—সর্ সর্ শব্দ করিতে করিতে তরবারি চলিতে লাগিল। করারং সুধারং তীক্ষ্ণধার (অসি) চমকাইতে লাগিল। ভভকৈ ভভকৈ বহৈবও ধারং—খল্ খল শব্দ করিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সনকৈঁ সনকৈ বহৈ বাণ ভারং—সন্ সন্ শব্দ করিতে করিতে বাণ সমুদায় চলিতে লাগিল হবকৈঁ হবকৈঁ বহৈ শেল ভেলং—শল্য (অস্ত্রবিশেষ) হবক হবক করিয়া শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট ও তথা হইতে নির্গত হইতে লাগিল। হলকৈঁ হলকৈঁ মচী ঠেল ঠেলং—হায় হায় ও ধাক্কাধাক্কি হইতে লাগিল। কুকৈঁকুক কুটী সুরতান ঠানং—সুলতানের সৈন্য মধ্যে হাহারব আরম্ভ হইল।

বহৈ চট্টপট্টং উলট্টং উলট্টং—(বীরগণ) অত্যন্ত ত্বরা সহকারে উলটে পালটে (সামনে ও পশ্চাতে) বাণ চালাইতে লাগিল। ডক্কং বক্কৈসদ—ধনুক হইতে টঙ্কার শব্দ উত্থিত হইল। মধ্য সুটট্টং—(ধড় হইতে পৃথক হইয়া) গাদা গাদা ছিন্ন-মস্তক একত্রিত হইয়া গেল। কডক্কং বক্কৈ সেন-সেনা—সেনাদলের মধ্যে কড়াকা বাজিয়া উঠিল, অর্থাৎ আতঙ্ক বিস্তীর্ণ হইয়া গেল। সেনা সুঘট্টং—সৈন্যসমূহে সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইল।

বহৈ হথ্যপরমার সরদার সারং—পরমারবংশীয় ক্ষত্রিয়দের যাঁহারা সর্দ্দার, তাঁহাদের হাত তীব্র বেগে চলিতে লাগিল। পরে সেন গোরী—শাহবুদ্দীন গোরীর সৈন্য পতিত হইল। বহৈবও ধারং—রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। পর্য়ো খাঁ নিসুরত্তি সেনা সহিওং—(সেনাপতি) নিসুরত্তি খাঁ সৈন্য সহিত (ভূ-পৃষ্ঠে) পতিত হইল। হুওঁসুর মধ্যান দিল্লেসজিত্তং—মধ্যাহ্নকাল হইতে না হইতেই দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজের বিজয় লাভ হইয়া গেল।

এইরূপ বহু কবিতা আছে যাহা পাঠ করিবামাত্র পাঠকের হৃদয়ে বীররসের উদ্রেক হয় এবং প্রাচীন ভারতীয় শূরগণের অক্ষয়-কীর্ত্তির স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

(১৮১৩-১৮৮৫)

হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের প্রখ্যাত ছাত্রগণের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি নিজ কর্ম্ম ও আচরণ দ্বারা বাঙালী সমাজের অসাড় দেহে চেতনা সঞ্চারে সহায়তা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহন যৌবনে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা হইয়া যান। তিনি বরাবর হিন্দুর প্রচলিত ধর্ম্ম এবং রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, হিন্দু সমাজও তাঁহাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমা করিতে পারে নাই। তথাপি এতদুভয়ের সংঘাতে যে অমৃতের উদ্ভব হয় তাহা দ্বারা বঙ্গসমাজ নবজীবন লাভ করে এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করিয়া তোলে। এ দিক দিয়া কৃষ্ণমোহনের কার্য্যাবলী বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কৃষ্ণমোহন ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে কলিকাতার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জীবনকৃষ্ণের তিন পুত্রের মধ্যে কৃষ্ণমোহন মধ্যম, জ্যেষ্ঠের নাম ভুবনমোহন এবং কনিষ্ঠ কালীচরণ। কৃষ্ণমোহনের শৈশব ও কৈশোর নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে। কিন্তু এই দারিদ্র্যদোষ তাঁহার অন্তর্নিহিত গুণরাশিকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই।

পাঁচ বৎসর বয়সে কৃষ্ণমোহনের হাতে খড়ি হয়। ইহার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি ডেভিড হেয়ারের ঠনঠনিয়ার পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। ১৮২৪, ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষ্ণমোহন হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি ইংরেজীর সঙ্গে সংস্কৃতও রীতিমত অধ্যয়ন করেন। ১৮২৮ সনের প্রথমে তিনি কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং এই বৎসরের মাঝামাঝি মাসিক ষোল টাকার একটি বৃত্তি লাভ করেন। কলেজের অধ্যয়ন শেষ করিবার পরও যাঁহারা উচ্চতর বিদ্যা আয়ত্ত করিতে রত থাকিতেন তাঁহাদের জন্যও এইরূপ বৃত্তির ব্যবস্থা হইল। রাধানাথ সিকদার এইরূপ বৃত্তিভোগী ছিলেন।

এই সময়, দিল্লী কলেজে মাসিক আশী টাকা বেতনে একটি শিক্ষকতা কর্ম্মের প্রস্তাব আসিলে কৃষ্ণমোহন ইহা গ্রহণে সম্মত হন। কিন্তু কলিকাতার 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন' দিল্লীর স্থানীয় কমিটির প্রস্তাবে মত না দেওয়ায় ইহা বাতিল হইয়া যায়। ইতিমধ্যে কৃষ্ণমোহনের বিবাহ হয়। ১৮২৯ সনের ১লা নবেম্বর কলেজীয় শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেন। ইহার পর তিনি স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। লোকে এই স্কুলটিকে হেয়ার সাহেবের স্কুল বলিত। কৃষ্ণমোহন ছাত্রাবস্থায় ডেভিড হেয়ারের নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করেন—এখানে এ কথার উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি ১৮৪৯, ১লা জুন হেয়ার স্মৃতিসভায় স্বয়ং বলিয়াছেন—

". . . I may perhaps venture to say that I was indebted to him for a longer period than any in this assembly. At the age of six I became his boy—an honor which I continued to enjoy as long as any other friend now present in this hall."*

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (যৌবনে)

[কোলসওয়াদি গ্রাণ্ট কর্ত্তৃক অঙ্কিত

হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর শিক্ষায় ছাত্রগণ এক নূতন প্রেরণা লাভ করিলেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে ছাত্রেরা প্রত্যেক বিষয়ই যুক্তি দ্বারা পরখ করিয়া লইতে আরম্ভ করেন। ১৮২৯ সনে তাঁহারা ডিরোজিওর সভাপতিত্বে একাডেমিক এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখানে ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, দেশপ্রেম প্রভৃতি নানা বিষয়েরই আলোচনা হইত। কৃষ্ণমোহন ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন না,

---

* *A Discourse delivered at the Hindu College on the Hare Anniversary, June 1, 1849.* By K. M. Banerjee,

এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। কিন্তু ডিরোজিওর শিক্ষা এবং এসোসিয়েশনের প্রভাব তাঁহার উপরও পড়িয়াছিল। কৃষ্ণমোহনের একটি জীবন-কাহিনী † ১৮৪২ সনের অক্টোবর সংখ্যা 'ইণ্ডিয়া রিভিয়ু'তে প্রকাশিত হয়। অনেকের বিশ্বাস, এই কাহিনীটি কৃষ্ণমোহনের স্ব-রচিত। ইহা হইতে উক্ত বিষয় আমরা সবিশেষ জানিতে পারি। তৎকালীন ছাত্রসমাজ তথা কৃষ্ণমোহনের উপর ডিরোজিওর

ডেভিড হেয়ার

শিক্ষা এবং আলোচনার প্রভাব সম্বন্ধে ইহাতে এই মর্ম্মে লিখিত হইয়াছে,—

"এই সময় হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দর্শন (Metaphysics) আলোচনার ধুম পড়িয়া যায়। কলেজের সহকারী শিক্ষক মিঃ এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি ছাত্রদের মনেও এই বিষয়ে প্রেরণা দিতেন। কৃষ্ণমোহন কলেজে ডিরোজিওর নিকট কখনও পড়েন নাই, তিনি এই সময় কলেজের বাহিরেই ছিলেন। তথাপি তাঁহাকেও ডিরোজিও প্রবর্ত্তিত আলোচনার ছোঁয়াচ লাগে; এবং তিনি নব্য হিন্দু সংস্কারক দলে যোগ দিয়া তাঁহাদের আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। এই সকল যুবক আপনাদের সত্যের বন্ধু এবং মিথ্যার শত্রু বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহারা দর্শন আলোচনায় নিবিষ্ট হইলেন এবং ঘোষণা করিলেন তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য হিন্দু পৌত্তলিকতার বিলোপ সাধন। তাঁহারা নৈতিক আদর্শের উপরেই জোর দিতেন। যদিও খেয়াল ব্যতীত অন্য কোন উচ্চতর ভাবধারায় তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হন নাই, তথাপি তাঁহারা সকল রকম পাপকর্ম্ম ত্যাগ করিতে এবং মনুষ্য-প্রকৃতির কলুষিত বাসনাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিতে লাগিয়া গেলেন। দেশবাসীরা তাঁহাদের নিকট দুইটি কারণে অবজ্ঞার বিষয় ছিল—(১) পৌত্তলিকতা এবং (২) পাপকর্ম্ম ও দূষিত চরিত্র। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সোৎসাহে ও সাহসের সঙ্গে অভিযান চালাইবার জন্য তাঁহারা পরস্পরের সহিত পাল্লা দিয়া চলিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন, প্রচলিত ধর্ম্মের রীতি-নীতি মানিয়া চলিলে তাঁহাদের মর্য্যাদাহানি ঘটিবে। যে-সব বিষয় কতকটা মানিয়া চলা আবশ্যক (যেমন, পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে শ্রদ্ধাভক্তি বা সম্মান-প্রদর্শন), তাহা নিতান্ত কাপুরুষের কর্ম্ম বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করিতে লাগিলেন।"

"হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিও নব্যদলের বিরোধিতা খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠে। বন্ধুদের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনও কয়েক রাত্রি কলিকাতার বড় বড় রাস্তায় ঘুরিয়া খ্রীষ্টান পাদ্রীদের নানা ভাবে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইলেন। তাঁহারা কখনও গস্‌পেল প্রচার করিবার ভান করিতেন, কখনও পাদ্রীদের বাংলা শব্দের ভুল উচ্চারণ অনুকরণ করিতেন, কখনও বা ভাষার বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যাংশ-গুলির ভুল প্রয়োগ দর্শাইয়া দিতেন।"

শীঘ্রই নব্যদলের একখানি মুখপত্রের প্রয়োজন অনুভূত হইল। এ সম্বন্ধে উক্ত কাহিনীতে আছে,—

"প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরিচালনায় ১৮৩১ সনে 'রিফর্ম্মার' সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইনি সংস্কারপন্থী ছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের সবকিছুরই বিরোধিতা করিতে হইবে (যাহা নব্যদল করিত), ইহা তিনি চাহিতেন না। নব্যদলের কোন মুখপত্র ছিল না। এ অভাব মিটাইবার জন্য ঐ বৎসর মে মাসে [১৭ই মে] কৃষ্ণমোহন 'এন্‌কোয়ারার' নামে একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। হিন্দুধর্ম্মের সমুদয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান হইত বলিয়া রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ইহার উপর ভীষণ খাপ্পা হইয়া উঠিল। সম্পাদক ও সাহায্য-কারীদের উপর গালিগালাজ বর্ষিত হইতে লাগিল।"

কৃষ্ণমোহনের গৃহেও নব্যদল সমবেত হইতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিতেন। তাঁহারা খাদ্যখাদক সম্বন্ধে কোনরূপ বাছ-বিচার করিতেন না। একদা তাঁহাদের মধ্যে এক জন প্রতিবেশীর গৃহে এক খণ্ড গো-হাড় নিক্ষেপ করেন। ইহার ফলে ঐ অঞ্চলে ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। হিন্দুর গৃহে গো-মাংস ভক্ষণ এবং তথা হইতে প্রতিবেশী হিন্দুর গৃহে গো-হাড় নিক্ষেপ—এ সব কথা পল্লবিত

† ৪৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় বর্ত্তমান লেখকের "কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়" প্রবন্ধে (পৃ. ১৪-৩৫) ইহার বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।

হইয়া শহরময় ছড়াইয়া পড়িল। ঠিক ঐ সময়টিতে কৃষ্ণমোহন গৃহে না থাকিলেও বন্ধুদের অপরাধ তাঁহার উপর বর্ত্তিল। সমাজ-নেতাদের চাপে পড়িয়া তাঁহার অভিভাবকেরা তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্ত ধরিয়া বসিলেন। কৃষ্ণমোহন এই অন্তায় আদেশ মানিতে রাজী হইলেন না। অগত্যা তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে হইল। ইহার পর তিনি এক বন্ধুর গৃহে আশ্রয় পান। কিন্তু সেখানেও বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না, হিন্দু মহলায় কেহ তাঁহাকে ঘরভাড়াও দিল না। কৃষ্ণমোহন শেষে এক ইউরোপীয়ের বাড়ীতে বাসা ভাড়া করিয়া সেখানে চলিয়া যান, পত্রিকাও সেখান হইতে বাহির করিতে থাকেন। তিনি উক্ত ব্যাপারের জন্ত শুধু হিন্দু ধর্ম্ম নহে, আত্মীয়-স্বজন হইতেও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন।

গৃহত্যাগের অব্যবহিত পরেই, ১৮৩১ সনের নবেম্বর মাসে কৃষ্ণমোহন *The Persecuted* নামে একখানা পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখিয়া প্রকাশ করিলেন। হিন্দু যুবকদের নামে ইহা উৎসর্গীকৃত হয়। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ গুরু-পুরোহিত এবং তথাকথিত পণ্ডিতদের দৌরাত্ম্য ও ভণ্ডামি এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দুর্নীতি, ব্যভিচার প্রভৃতিতে আসক্তির বিষয় এই নাটকে বর্ণিত হয়। পুস্তকখানি ঐ সময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে আলোচিত হয়। বলা বাহুল্য, খ্রীষ্টানগণ ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে কৃষ্ণমোহন পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফের সঙ্গে পরিচিত হইলেন। ডাফ উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া খ্রীষ্টতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। বৎসরখানেক এইরূপ উপদেশ ও শিক্ষালাভের দরুন কৃষ্ণমোহন ধীরে ধীরে খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরাগী হইয়া উঠেন। শেষে নিজ 'এন্‌কোয়ারার' পত্রে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্কল্পের কথাও তিনি ব্যক্ত করিলেন। ১৮৩২ সনের ১৬ই অক্টোবর ডাফের গৃহে তৎকর্ত্তৃক কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বন্ধুবর গোবিন্দচন্দ্র বসাককে এই উপলক্ষ্যে তিনি নিম্নের পত্রখানি লিখিয়াছিলেন,—

Wednesday, 16th October, 1832.

My dear friend,

Through the mercy of a Gracious Providence, I intend being baptized this evening at the house of the Rev. A. Duff, and as you were one of those with whom last year about this time, I began first to examine the claims of Christianity, it will give me great pleasure to see you witness my declaration before God and man, of what is now my faith, and my admission into the visible Church of Christ.

Your most affectionate friend,
Krishna Mohana Banerjea.*

পাদ্রী ডাফ স্কচ চার্চ্চ ভুক্ত ছিলেন। দীক্ষা গ্রহণান্তর যুক্তিবাদী কৃষ্ণমোহন স্কচ চার্চ্চের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিলেন না। ডাফ কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইলেও স্কচ চার্চ্চের অনুবর্ত্তী না হইয়া তিনি চার্চ্চ অফ ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। ইহার জন্ত তাঁহাকে ডাফ এবং তাঁহার অনুচরবর্গের নিকট কম নিন্দিত হইতে হয় নাই।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

কৃষ্ণমোহন এত দিন হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষকতা-কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাঁহাকে এই পদ ত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর তিনি চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটির কলিকাতা কমিটি কর্ত্তৃক মির্জ্জাপুর ইংরেজী স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিয়োজিত হইলেন। হেয়ার সাহেবের স্কুলে খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এই স্কুলে খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা পাঠ্য বিষয়ভুক্ত। কাজেই কৃষ্ণমোহন স্বীয় অভিরুচি অনুযায়ী এখানে ছাত্রদের শিক্ষাদানের সুযোগ পাইলেন। তিনি এ সময় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে এতই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন যে, ১৮৩৩ সালে ব্রজনাথ ঘোষ নামে এক অপরিণতবয়স্ক ছাত্রকে খ্রীষ্টান করিবার জন্ত

* *Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India, etc.* By Ramgopal Sanyal. Part I. 1894. Pp. 8, 9.

পিতৃগৃহ হইতে লইয়া আসেন। ইহা লইয়া কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা হয় এবং কৃষ্ণমোহন বিচারপতি সার এডওয়ার্ড রায়ানের বিচারে ব্রজনাথকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। কৃষ্ণমোহন ইহার পর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণে বাহির হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া ১৮৩৫ সনে নিজ স্ত্রীকে তদীয় পিতৃগৃহ হইতে আনিয়া খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিলেন।

চার্চ মিশনরী সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে ১৮৩৬ সন নাগাদ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় কৃষ্ণমোহন স্কুল হইতে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আর্কডিকন ডিয়াল্‌ট্রি তাঁহার এক জন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারই সহায়তায় বিশপ কলেজে একটি বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি সেখানে কয়েক মাস অধ্যয়নে রত থাকেন। শেষে ১৮৩৭ সনে বিশপ কলেজের সংলগ্ন বেগম সমরুর গীর্জ্জায় পাদ্রী হইলেন। ১৮৩৮ সালের শেষ দিকে কলেজে প্রাচ্য বিত্তার আলোচনাতেও তিনি রত হন। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। অন্যান্যের সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীচরণকে তিনি এখানে বসিয়াই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন।

ডাক, ডিয়াল্‌ট্রি প্রমুখ সে যুগের খ্যাতনামা পাদ্রীগণ হিন্দু সমাজে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে সতত ব্যাপৃত ছিলেন এবং তাঁহাদের কার্য্যে কৃষ্ণমোহন দক্ষিণহস্ত স্বরূপ বিবেচিত হইলেন। হিন্দু কলেজের যুব-ছাত্রদের মধ্যে খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারের জন্ত ইহার সম্মুখভাগেই—বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের সীমানার মধ্যে একটি গীর্জ্জা স্থাপনের আয়োজন হইল। আরও স্থির হইল যে, এখানে কৃষ্ণমোহন পাদ্রীর কার্য্য করিবেন। বিষয়টি প্রথম দিকে খুবই গোপন রাখা হয়। পরে যে দিন ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের কথা সেই দিন প্রাতঃকালে এ বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখনই হিন্দু কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট গমন করিয়া এ বিষয়ের প্রতিবাদ জানাইলেন। তিনিও কালবিলম্ব না করিয়া লর্ড বিশপকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে দিয়া ইহা বন্ধ করিয়া দিলেন। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ ঐ স্থানের পরিবর্ত্তে হেদুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পাদ্রীদের এক খণ্ড ভূমি ক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিলেন। প্রস্তাবিত গীর্জ্জা এইখানেই প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিল। ১৮৩৯, ২৭শে সেপ্টেম্বর গীর্জ্জার দ্বার উন্মোচন হয়, ইহার নামকরণ হইল ক্রাইষ্ট চার্চ্চ। কৃষ্ণমোহন ইহার ভারপ্রাপ্ত হইয়া ঐ বৎসরই আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হইলেন। নিজ অভিরুচি মত খ্রীষ্টধর্ম্মালোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র এতদিনে তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

কৃষ্ণমোহন ১৮৫২ সন পর্য্যন্ত প্রায় তের বৎসর ক্রাইষ্ট চার্চ্চের আচার্য্য-পদে বৃত থাকেন। এখানে তিনি বরাবর বাংলায় প্রার্থনা করিতেন। কিছুকাল যাবৎ প্রতি রবিবারে তিনি যে প্রার্থনা করিলেন তাহা একত্র করিয়া তিনি ১৮৪০ সনে 'উপদেশ কথা' নামে প্রকাশ করেন। এই বৎসর স্ত্রী-শিক্ষার উপরেও ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দুই শত টাকা পুরস্কার পান। কিন্তু কি বক্তৃতা কি রচনা প্রত্যেকটিতেই তিনি খ্রীষ্ট-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে ক্রটি করেন নাই। তিনি ১৮৩৯ সনে পাদ্রী ডিয়াল্‌ট্রির সঙ্গে কৃষ্ণনগরে গিয়া বহু শত হিন্দুকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ডাক, ডিয়াল্‌ট্রি প্রমুখ শ্বেতাঙ্গ পাদ্রীদের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনও গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে হিন্দু সমাজে খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচার এবং হিন্দু সন্তানগণকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষাদান ব্যাপারে অত্যধিক তৎপর হইয়া উঠেন। রামমোহন রায়কে কৃষ্ণমোহন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেও তৎপ্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম বা বৈদান্তিক ধর্ম্মের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী-সভার কার্য্যকলাপ তাঁহার তীব্র সমালোচনার হাত হইতে নিস্তার পায় নাই। তত্ত্ববোধিনী-সভার সভ্যগণ বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনাকালে প্রতীচ্য যুক্তিবাদের আশ্রয় লইতেন, এইজন্ত ইহাকে বিলাতী বেদান্তবাদ বলিয়া কৃষ্ণমোহন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেন না। পাদ্রী ডাক *India and India Missions* শীর্ষক এক পুস্তক লিখিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কশাঘাত করিতে কসুর করেন নাই। এইরূপে যখন শ্বেতাঙ্গ পাদ্রীগণ এবং কৃষ্ণমোহন প্রমুখ ধর্ম্মান্তরিত খ্রীষ্টানেরা হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজকে নানা ভাবে আক্রমণ করিতে থাকেন তখন হিন্দু সমাজেও ইহার প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল। পাদ্রীগণ তাঁহাদের অবৈতনিক স্কুলগুলিকে খ্রীষ্টানীর কেন্দ্র করিয়া তুলেন। হিন্দুনেতৃবর্গও অনুরূপ অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া খ্রীষ্টানীর স্রোত রোধ করিতে প্রয়াসী হন। পূর্ব্বে সরকার খ্রীষ্টান পাদ্রীদের বড় একটা আমল দিতেন না। এ সময় কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিশেষ করিয়া শিক্ষা ব্যাপারে তাহাদের পরামর্শ গৃহীত হইতে লাগিল। কৃষ্ণমোহনের সহায়তায় হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৪৩ সনে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে কৃষ্ণমোহন স্বয়ং ১৮৫১ সনের ১০ই জুলাই খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা দেন। চতুর্থ দশকে হিন্দু কলেজের কোন কোন শিক্ষক ও ছাত্রদের মাঝে মাঝে খ্রীষ্টান হওয়ার দরুন কলেজের অধ্যক্ষ-সভা এবং কাউন্সিল অব এডুকেশনের মধ্যে খিটিমিটি উপস্থিত হইত। অধ্যক্ষ-সভা চাহিতেন যাহাতে হিন্দু ব্যতীত অন্ত কেহ কলেজের সংস্পর্শে না আসে। কাউন্সিল অব এডুকেশন ইহাকে সকল শ্রেণীর বিত্তাগার করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। খ্রীষ্টান আন্দোলনের শেষ পরিণতি হইল ১৮৫০ সনে দেশীয় খ্রীষ্টানদের সপক্ষে 'লেকস লোসি' বা ধর্ম্মান্তরিতদের পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার-দানমূলক আইনের মধ্যে। খ্রীষ্টান প্রচারক এবং হিন্দু সমাজের মধ্যে সংঘর্ষ হেতু কতকগুলি সুফলও ফলিয়াছিল। হিন্দু সমাজের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন গলদের দিকে

সমাজপতিগণের দৃষ্টি পড়ে এবং তাঁহারা সময়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া ইহাকে দোষমুক্ত করিয়া তুলিতে উদ্যোগী হন। কৃষ্ণমোহন প্রমুখ খ্রীষ্টান প্রচারকগণের আক্রমণাত্মক কার্য্যের ফলেই ইহা দ্রুত সম্ভব হইয়াছিল বলিতে হইবে।

কৃষ্ণমোহন কায়মনে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে রত হইলেও এই সময়ে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনায়ও মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের সতীর্থগণের সঙ্গে একযোগে তিনি এ সকল কর্ম্মে লিপ্ত হন। ১৮৩০ সনে ডেভিড হেয়ারকে কলিকাতার ছাত্রসমাজ একখানি মানপত্র দেন। কৃষ্ণমোহন এ বিষয়ে বিশেষ তৎপর ছিলেন। এইজন্য অনুষ্ঠিত একটি সভায় তিনি সভাপতিত্বও করেন। ১৮৩৪-৩৫ সালে শিক্ষার বাহন লইয়া যে বিতর্ক উপস্থিত হয় তাহাতে নব্যবঙ্গ, বিশেষ ভাবে কৃষ্ণমোহন যোগদান করেন। তাঁহার এবং ডক্টর টাইটলারের মধ্যে এই সম্পর্কে ঘোরতর বাদ-প্রতিবাদ হয়। ইহা হইতে জানা যায়, তখন ইংরেজীর সমর্থন করিলেও কৃষ্ণমোহনের ধারণা ছিল—বাংলা একদা শিক্ষার বাহন হইবে। শত বর্ষ পরে কৃষ্ণমোহনের এই ধারণা কতকটা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার প্রথম অধিবেশনে ১৮৩৮ সনের ২৩শে মে কৃষ্ণমোহন ইতিহাস পাঠের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। যুবকগণের মধ্যে পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়সমূহে জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে এই সভা গঠিত হইয়াছিল। কৃষ্ণমোহন সংঘবদ্ধ ভাবে কার্য্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির সহযোগে রামগোপাল ঘোষ প্রধানতঃ রাজনৈতিক আলোচনার জন্য ১৮৪২ সালে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামে একখানি দ্বিভাষী পত্রিকা বাহির করেন। কৃষ্ণমোহন ইহার একজন নিয়মিত লেখক নির্ব্বাচিত হন। ইহার পর বৎসর ১৮৪৩ সনের ২০শে এপ্রিল তারিখে জর্জ্জ টমসনের সহায়তায় বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা একটি পুরাপুরি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইহার উদ্যোক্তা এবং পরিচালকদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন ছিলেন এক জন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পরে কৃষ্ণমোহন স্বয়ং একাধিক সংবাদপত্র সম্পাদনা করেন। 'সংবাদসুধাংশু' ১৮৫০, ৭ই সেপ্টেম্বর তাঁহারই সম্পাদনায় বাহির হয়। জন ক্লার্ক মার্শম্যান বিলাত গেলে তাঁহার স্থলে কৃষ্ণমোহন ১৮৫২ সনে 'গবর্ণমেণ্ট গেজেটে'র (বাংলা) সম্পাদক হইলেন। ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষা কল্পে আদায়ী চাঁদার দ্বারা হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড গঠিত হয়। উৎকৃষ্ট বাংলা প্রবন্ধ-লেখকদের ইহা হইতে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করা হইত। কৃষ্ণমোহন ইহারও এক জন পরিচালক ছিলেন। প্রতি বৎসর ১লা জুন তারিখে হেয়ার স্মৃতি-সভা হইত। কৃষ্ণমোহন ইহার একাধিক সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন, সভাপতিত্বও করিয়াছিলেন। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দিবার জন্য সে যুগে উৎকৃষ্ট পুস্তকের অভাব ছিল। কৃষ্ণমোহন 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (ইংরেজী নাম—*Encyclopaedia Bengalensis*) নামে খণ্ডে খণ্ডে কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ইহার ইংরেজী-বাংলা এবং বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' ১৮৪৪ সনে প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণমোহন ইহারও লেখক শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

আলেকজাণ্ডার ডাফ

কৃষ্ণমোহন ক্রাইষ্ট চার্চ্চ হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নিকট একটি সরকারী কর্ম্মের প্রস্তাব আসে, তিনি ইহা গ্রহণ করেন নাই। এই বৎসরেই তিনি শিবপুরে বিশপ কলেজের দ্বিতীয় অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন। এই পদে তিনি একাদিক্রমে ষোল বৎসর অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৮৬৮ সনে উহা ত্যাগ করেন। বিশপ কলেজে অধ্যাপনা কালে যে প্রচুর অবসর পান তাহা তিনি সাহিত্যচর্চ্চায় সম্যক্ রূপে নিয়োজিত করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কৃষ্ণমোহন বিশপ কলেজে আট হাজার টাকা দান করেন। বঙ্গ-ভাষায় খ্রীষ্ট-গ্রন্থ প্রকাশ এবং দরিদ্র ছাত্রদের পঠনপাঠনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে এই অর্থ প্রদত্ত হয়।

বীটন সাহেবের মৃত্যুর (১৮৫১, ১৩ই আগষ্ট) পর ডাঃ

মৌএটের চেষ্টায় পরবর্তী ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতায় তাঁহার নামের সঙ্গে জড়িত হইয়া 'বীটন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। সমসাময়িক রাজনীতির আলোচনা এখানে নিষিদ্ধ ছিল। শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা এখানে হইত। কলিকাতার পদস্থ ইংরেজ এবং বাঙালীগণ ইহার সঙ্গে যুক্ত হন। ইংরেজ ও বাঙালীর ইহা একটি প্রকৃষ্ট মিলন-ক্ষেত্র হইল। কৃষ্ণমোহনও ইহার এক জন বিশিষ্ট সভ্য হইলেন। ১৮৬৭ সনে তিনি ইহার সহকারী সভাপতি হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংস্কৃত কাব্য, হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন, উচ্চশিক্ষায় প্রাচ্য বিদ্যার স্থান* প্রভৃতি নানা বিষয়ে কৃষ্ণমোহন এই সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'কেমিলি লিটারারি ক্লাব' নামে আর একটি সাহিত্য-সংঘ ১৮৫৭ সনের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণমোহন ইহার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হইলেন। ১৮৬৫ সনে অষ্টম বার্ষিকীতে তিনি ইহার সভাপতির কার্য্য করেন। এই সভাও ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের একটি মিলনস্থল হইয়াছিল এবং এখানে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হইত। কৃষ্ণমোহন এই ক্লাবেও বহু বার প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত জেনারেল এসেম্ব্লি ইন্‌ষ্টিটিউশন, সেণ্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানেও ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে তিনি বক্তৃতা দিতেন।

প্রায় প্রতিষ্ঠা অবধিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের যোগাযোগ ঘটে। তিনি ১৮৫৮ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের মেম্বর নিযুক্ত হন। একবার তিনি "Faculty of Arts"-এর ডীন বা সভাপতি হইয়াছিলেন (১৮৬৭)। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটেরও তিনি সদস্য হন। শিক্ষণীয় বিষয়াদি নির্দ্ধারণে এবং পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনে কৃষ্ণমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে প্রথমাবধি বিশেষ রূপে সাহায্য করিতেন। প্রবেশিকা হইতে বি-এ পর্য্যন্ত বাংলা ও সংস্কৃতে তিনি বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষক ছিলেন। উড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি দেশভাষার পরীক্ষাও তিনি মাঝে মাঝে গ্রহণ করিতেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ উঠিয়া গেলে, সিবিলিয়ানদের দেশীয় ভাষাদি শিক্ষা দানের জন্য "বোর্ড অফ একজামিনার্স" গঠিত হয়। কৃষ্ণমোহন মাসিক দুই শত টাকা বেতনে এক জন 'একজামিনার' নিযুক্ত হন। তিনি সিবিলিয়ানদের বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী পরীক্ষা লইতেন।

কৃষ্ণমোহন হিন্দুকলেজে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য বিদ্যার যেমন, প্রাচ্য বিদ্যারও তেমনি পক্ষপাতী ছিলেন এবং বরাবর প্রাচ্য বিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছেন। বিশপ কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি সবটুকু অবসর ইহার চর্চ্চায় অতিবাহিত করেন বলা চলে। বিশপ কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণের পূর্ব্ব বৎসর ১৮৫১ সনে ইংরেজী অনুবাদসহ সংস্কৃতে 'পুরাণ সংগ্রহ' প্রকাশ করেন। ইহার পর হইতে তিনি সংস্কৃত তথা প্রাচ্য বিদ্যার চর্চ্চায় যে পুরাপুরি মনোনিবেশ করেন বীটন সোসাইটি এবং কেমিলি লিটারারি ক্লাবে পঠিত প্রবন্ধগুলি হইতে আমরা তাহার আভাস পাইয়াছি। কৃষ্ণমোহন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত এবং বেদের প্রামাণ্যতা সম্পর্কে ইংরেজীতে আলোচনামূলক *Dialogues on the Hindu Philosophy* প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকখানি তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 'ষড়্‌দর্শন সংবাদ' নামে ইহার বঙ্গানুবাদ ১৮৬৭ সনে প্রকাশিত হয়। প্রাঞ্জল বাংলায় জটিল বিষয়ের আলোচনার এখানি একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কৃষ্ণমোহন পরেও শাস্ত্রচর্চ্চা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ১৮৭৫ সনে 'ঋগ্‌বেদ সংহিতা'র কতকাংশ স্বকীয় টীকা এবং বেদপাঠ সম্পৃক্ত একটি ভূমিকাসহ প্রকাশিত করেন। এই বৎসরই তাঁহার বিখ্যাত *Arian Witness* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বেদে যাহার ইঙ্গিত, বাইবেলে তাহার অভিব্যক্তি—পুস্তকখানিতে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে। পুস্তকখানি খ্রীষ্টান দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লিখিত হইলেও ঐ সময় সুধীজনের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করে। এখানি তাঁহার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ইহার যে-সব সমালোচনা হয় তাহার নিরিখে ১৮৮০ সনে ইহার পরিপূরক স্বরূপ তাঁহার আর একখানি পুস্তক বাহির হয়। ছাত্রদের সংস্কৃতচর্চ্চার সুবিধার জন্য কৃষ্ণমোহন রঘুবংশের কতকাংশ কুমারসম্ভব এবং ভট্টিকাব্য সংস্কৃত টীকা ও ইংরেজী অনুবাদসহ প্রকাশিত করেন। তাঁহার টীকা যে বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ তাহা বলাই

*এই বিষয়ে কৃষ্ণমোহনের অভিমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,—

"Academic education for natives must, for years to come, comprise *both* English and Oriental literature; the one for introducing, the other for naturalising the enlightenment of Europe in Asia.

"It should not be *exclusively* English, it must have Sanscrit or Arabic by its side—for even the subtleties of which the late Ram Mohun Roy spoke are worth our study with a view to arrive at an accurate knowledge of the *mind* of our ancestors. The Sanscrit language and grammar have also an intrinsic value in a philological point of view, and throw much light on the origin of the human species and human language. The purity of the vernacular again depends in a great measure on the proper cultivation of Sanscrit. No scheme of education would be of much value that excludes the Oriental element from its higher offices."

—*The Proceedings and Transactions of the Bethune Society from November 10th 1859 to April 20th 1869*: "The proper place of Oriental Literature in Indian Collegiate Education." (A Lecture read before the Bethune Society, in February, 1868).

বাহুল্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৬ সনে মার্চ মাসে রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং মনিয়র উইলিয়মসের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনকেও 'অনারারি ডক্টর অব ল' উপাধিতে ভূষিত করেন। উপাধিদান কালে ভাইস-চ্যান্সেলর আর্থার হব্‌হাউস কৃষ্ণমোহনের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেন এখানে তাহা উল্লেখ করিতেছি,—

"He, too, has laboured long, honourably and successfully at the literature of his country. Of his *Dialoques on Hindu Philosophy*, it has been said by Dr. Hull that they are a 'mine of new and authentic indications.' His Bengal Encyclopaedia and other works have greatly advanced our knowledge of Indian literature, politics and religion. I may add that one who has left a revered name in this country, the late Bishop Cotton, when advocating the institution of Honorary Degrees, since 15 years ago, mentioned even then the name of Mr. Banerjea as a conspicuous example of those who might fitly receive such a Degree."*

কৃষ্ণমোহন ১৮৬৮ সনে বিশপ কলেজের অধ্যাপক-পদ ত্যাগ করেন। পেন্সন প্রাপ্ত হওয়ায় আর্থিক দুশ্চিন্তা হইতে তিনি অনেকটা মুক্তি পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহনের পাণ্ডিত্যের কথা বিদেশী পণ্ডিত মহলেও জানাজানি হইল। এই সময় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বোডেন প্রোফেসর' পদে তাঁহাকে নিয়োগের প্রস্তাব হয়, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। এই পদে ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসন দীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন। দেশ-বিদেশের বুধমণ্ডলীতেও কৃষ্ণমোহন যোগ্য আসন পাইলেন। ১৮৬৪ সনের ৪ঠা জুলাই তারিখে কৃষ্ণমোহন ও বিদ্যাসাগর মহাশয় বিলাতের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। কৃষ্ণমোহন বঙ্গের এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হইয়া পড়েন। তিনি নিজে দশটি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন—বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, উড়িয়া, ফারসী, উর্দ্দু, ইংরেজী, লাটিন, গ্রীক ও হিব্রু। সুতরাং সোসাইটির ভাষাতত্ত্ব বিভাগে কৃষ্ণমোহন বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ই. টমাস প্রভৃতিও তাঁহার সহিত কার্য্য করেন। কৃষ্ণমোহন কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিরও এক জন সদস্য ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে বঙ্গভাষার উন্নতি বিধানার্থ যে 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' হয় তাহাতেও তিনি যোগ দিতেন। বাংলা ভাষার উন্নতিমূলক যে-কোন প্রচেষ্টাই তাঁহার আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিত।

কৃষ্ণমোহন পূর্ব্বোক্ত বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির এক জন উৎসাহী সভ্য ছিলেন বটে, কিন্তু পৌরসংস্কার কি রাজনৈতিক কার্য্যে সাক্ষাৎ ভাবে এতদিন যোগদান করেন নাই। বিশপ কলেজ হইতে অবসর গ্রহণের পর কিছুকালের মধ্যেই তিনি এই দুই বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হন। কৃষ্ণমোহন বিদেশীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও, আচারে আচরণে সম্পূর্ণ স্বদেশী ভাবাপন্ন ছিলেন। ভারতবর্ষের যাবতীয় উন্নতির

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (বার্দ্ধক্যে)

পক্ষে যে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ প্রয়োজন ইহা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন, এবং এই বিশ্বাস বলেই গত শতাব্দীর সপ্তম দশকের প্রত্যেক রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিয়া লন। শিশিরকুমার ঘোষের ইণ্ডিয়ান লীগের (১৮৭৫, সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত) তিনি সভাপতি হইলেন। তাঁহার সভাপতিত্ব কালে লীগের আনুকূল্যে এবং সরকারী ও বেসরকারী অর্থে কলিকাতায় একটি কারিগরি-বিদ্যা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়। আনন্দমোহন-সুরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত (১৮৭৬, জুলাই) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত-সভারও তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থা-দর্পণ প্রণেতা শ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার ইহার প্রথম সভাপতি হন। সিভিল সার্বিসে ভারতীয় নিয়োগ, দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন, অস্ত্র আইন প্রভৃতির বিরুদ্ধে উক্ত সভা যে সব আন্দোলন চালান বৃদ্ধ কৃষ্ণমোহন সে সকলেরই পুরোভাগে ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

* *Convocation Address*, Vol. I, pp. 342-3. Calcutta University.

তথা জমিদার সম্প্রদায়ের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও মুদ্রাযন্ত্র আইনের প্রতিবাদে ১৮৭৭ সনে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভা হয়, তাহাতে কৃষ্ণমোহন সভাপতিত্ব করেন। আবার এই আইন তুলিয়া লওয়া হইলে ১৮৮২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে টাউন হলে যে সভা হইল তাহাতেও তিনি সভাপতি হইলেন। ভারত-সভা সিবিল সার্বিস, মুদ্রাযন্ত্র আইন, অস্ত্র আইন প্রভৃতি সম্পর্কে বিলাতের জনসাধারণকে ভারতীয় মতামত অবগত করাইবার জন্য লালমোহন ঘোষকে প্রেরণ করেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে ১৮৮০ সনে ৪ঠা মার্চ্চ তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এক বিরাট জনসভা হয়। ইহাতেও কৃষ্ণমোহন পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ সনে প্রধানতঃ ইণ্ডিয়ান লীগের আন্দোলনের ফলে কলিকাতা করপোরেশনে নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কৃষ্ণমোহন এই নবগঠিত করপোরেশনে একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। এখানেও তিনি সোৎসাহে কার্য্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস পালের সঙ্গে পৌরসভায় প্রায়ই তাঁহার মতদ্বৈধ হইত। কৃষ্ণদাস তাঁহাকে "hoary-headed Padre" বা 'পক্বকেশ পাদ্রী' বলিয়া নিজ 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেন। ১৮৮৩ সনে স্বদেশে ও বিদেশে রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনার জন্য বঙ্গে একটি ন্যাশনাল ফণ্ড বা 'জাতীয় ভাণ্ডার গঠিত হয়। এই ফণ্ডের টাকা তৎকালীন সরকারী ব্যাঙ্ক (ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল) গচ্ছিত রাখিতে অস্বীকৃত হইলে কৃষ্ণমোহন সভাপতি রূপে স্বয়ং গিয়া আমানত রাখিয়া আসেন। তাঁহার নিকট অসম্মতি প্রকাশ করিতে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ভরসা পান নাই। সুরেন্দ্রনাথ *A Natio i in Making* পুস্তকে (পৃ. ৬১) কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে যথার্থই লিখিয়াছেন,—

"The Rev. Krishna Mohan Banerjea (better known as K. M. Banerjea) was among the earliest recruits to Christianity. A scholar and a man of letters, it was not till late in life that he began to take an active part in politics. He was associated with the Indian League and became president of the Indian Association . . . He was then past sixty; and though growing years had deprived him of the alertness of youth, yet in the keenness of his interest, and in the vigour and outspokenness of his utterances, he exhibited the ardour of the youngest recruit to our ranks. Never was then a man more uncompromising in what he believed to be the truth, and hardly was there such amiability combined with such strength and firmness."

সুরেন্দ্রনাথের এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে কৃষ্ণমোহনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাপকর্ম্ম, কুসংস্কার, দুর্নীতি প্রভৃতির প্রতি ঘৃণা এবং সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা—ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহারই শিক্ষাগুণে নব্যদল এই কয়েকটি গুণের অধিকারী হন। কৃষ্ণমোহনের জীবনে এ সমস্তই পরিষ্কার রূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণান্তর তাঁহার মধ্যে আস্তিক্যবুদ্ধিও জাগ্রত হয়। স্বদেশ-প্রেম তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। স্ব-সমাজের আবর্জ্জনা দূর করিয়া এবং বিদেশের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট সকলই গ্রহণ করিয়া আমরা স্বদেশকে বিশ্বসভায় উন্নত মস্তকে দাঁড় করাইব—কৃষ্ণমোহনের অভিপ্রায় এইরূপ ছিল। জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ সকলই আমাদের নিজস্ব। আমাদের এই নিজস্ব সম্পদ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তিনি বরাবর সচেষ্ট ছিলেন। সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা দ্বারা তিনি দেশবাসীর অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। স্বদেশপ্রেমিক হইলেও কৃষ্ণমোহন যখনই সমাজকে আঘাত দেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করিয়াছেন, কোনরূপ দৌর্ব্বল্যবশতঃ তাহা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি প্রখর আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। খ্রীষ্টান পাদ্রীমহলেও যখন বর্ণগত বিভেদের সন্ধান পাইয়াছেন তখনও তিনি ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। ১৮৪৭ সনে কলিকাতার বিশপ তাঁহাকে সহকারীদের মধ্যে প্রথম স্থান দিলেও তাঁহার অধস্তন শ্বেতাঙ্গ সহকারীর সঙ্গে বেতনের তারতম্য করিলে তিনি ঐ পদ গ্রহণে অসম্মত হইলেন। শেষ জীবনে রাজনৈতিক কার্য্য পরিচালনেও তিনি অনুরূপ তেজ ও আত্মমর্য্যাদা দেখাইয়া গিয়াছেন। ১৮৮৫ সনের ১১ই মে কৃষ্ণমোহনের কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটে। তাঁহার মৃত্যুতে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই আত্মীয়বিয়োগের বেদনা অনুভব করিয়াছিল।

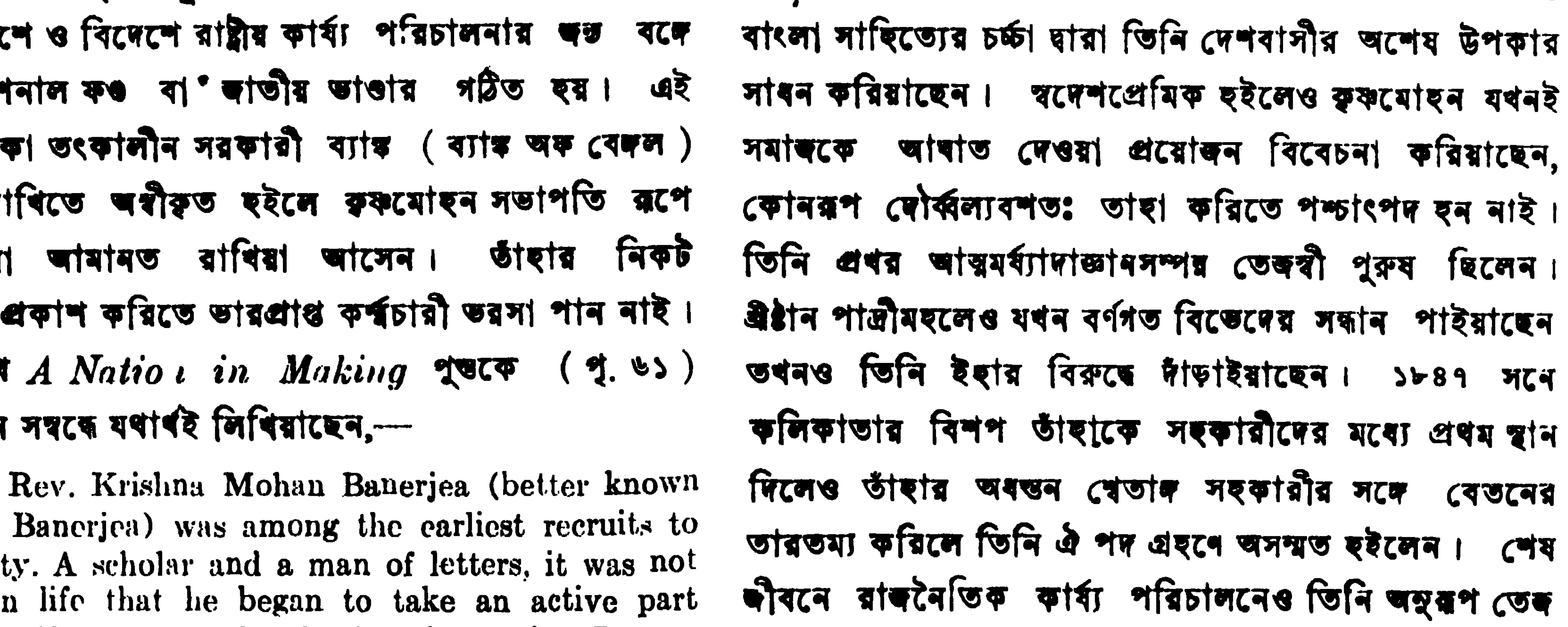

বাতিল পরীক্ষার কাহিনী

পরিমল গোস্বামী

কয়েক বছর আগে কোনো একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে বই-টোকা অপরাধে সমস্ত পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়। কিন্তু কেন হয় তা হয় তো অনেকেই জানেন না। আমি বহু চেষ্টা করে সেটি আবিষ্কার করেছি। ঘটনাটি যে রকম ঘটেছিল আমি যথাসাধ্য বর্ণনা করছি।

পরীক্ষার প্রশস্ত হল। প্রায় দুশো পরীক্ষার্থী নিজ নিজ আসনে বসে গেছে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব থেকেই। তাদের খাতা বিতরণ পর্ব শেষ হয়ে গেছে, এবারে প্রশ্নপত্র আসছে।—প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র।

কিন্তু কালের কি রকম দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে, আশ্চর্য! যে কোনো লোকই এটা বুঝতে পারবে, কারণ আজকের দিনের পরীক্ষার্থীরা যে রকম চিন্তাশূন্য, ভয়ভাবনাশূন্য, আসন্ন প্রশ্নপত্রের অব্যবহিত পূর্বেও যেমন উদ্বেগশূন্য এবং যে রকম বেপরোয়াভাবে স্ফূর্তিযুক্ত তা অন্ততঃ প্রবীণ দর্শকের দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়।

পূর্বে তো এ রকম ছিল না। তখন পরীক্ষার্থীরা ইষ্ট-দেবতাকে বা গুরুজনকে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়ে জীবনের এই প্রথম ক্রান্তিমুহূর্তের জন্যে শান্ত গম্ভীর শুচিচিত্তে এসে অপেক্ষা করত। তখন পরীক্ষার্থীদের অনেকেরই হাতে বাঁধা থাকত সর্বসিদ্ধি মাদুলী, অথবা কানে গোঁজা থাকত আশীর্বাদী বিল্বপত্র। কিন্তু আজকের দিনে ওসব আর দরকার হয় না। এখন পরীক্ষার্থীদের পকেটে থাকে টোকার জন্যে বই আর জামার নিচে থাকে ছোরা। এখন পরীক্ষায় পাস করার জন্যে রাত জেগে পড়তে হয় না; ব্রাহ্মী ঘৃত, ফসফো-লেসিথিন, মৃতসঞ্জীবনী, এগফ্লিপ অথবা অম্বান খেতে হয় না। এখন পরীক্ষার পূর্বদিন পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে সিনেমা দেখা চলে।

নিরপেক্ষ দর্শক বলবেন দুই-ই অভিশাপ। পরীক্ষার্থীরা একটিকে ত্যাগ করে আর একটিকে গ্রহণ করেছে। বস্তুতঃ একটির অনিবার্য পরিণতি অন্যটি, 'সুবর্ণ মধ্যমের' স্থান এর মধ্যে স্বভাবতই থাকতে পারে না, কেননা সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে নৌবিদ্রোহ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। কে জানে হয় তো পরীক্ষার্থীদের এই বেপরোয়া ঔদাসীন্য অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে একটি বড় রকমের ছাত্র-বিদ্রোহেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে!

এই কথাগুলো লেখকের নয়, পরীক্ষার হলের যাবতীয় হৈহল্লার মধ্যে সমীরণ একা গম্ভীরভাবে এই সব ভাবছিল। সে সম্মুখে খাতা নিয়ে প্রশ্নপত্রের জন্যে অপেক্ষা করছিল আর সবারই সঙ্গে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় এই কেন্দ্রে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক যে সব প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ছিল সমীরণ তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু শুধু যে সেই কারণেই সে চিন্তাশীল তা নয়, চিন্তার অন্য কারণ ছিল।

যথাসময়ে প্রশ্নপত্র বিলি হয়ে গেল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পরীক্ষাগৃহ যেন বাজারে পরিণত হ'ল। প্রথম ফিস-ফিস, তার পর একটু জোর, তার পর খোলাখুলি আলোচনা। নজরদারের চক্রাকার দৃষ্টি-পথকে অনুসরণ করতে করতে শব্দতরঙ্গ যেন সাইক্লোনের মত সমস্ত হল-ঘরে চক্রাকারে ঘুরছে। নজরদারের দৃষ্টি বাহ্যতঃ অতি সতর্ক, কিন্তু কেন যেন ঠিক দর্শনীয় মুহূর্তটি তার দৃষ্টি বার বার এড়িয়ে যেতে লাগল। নকল করা এবং নকল ধরার ব্যবস্থা, এ দুইয়ের মধ্যে এই রকম লুকোচুরির সম্পর্কটাই শোভনীয়, এবং এটাই প্রচলিত রীতি। কিন্তু তবু যারা ধরা পড়ে তারা যেন ধরা পড়তেই এসেছে। নইলে সর্বক্ষণ কেউ বই খুলে রাখে সম্মুখে? কখন খুলতে হবে, কখন লুকোতে হবে তার একটা প্রচলিত রীতি আছে—এই রীতি মেনে চললে পরীক্ষার্থী নিরাপদ এবং

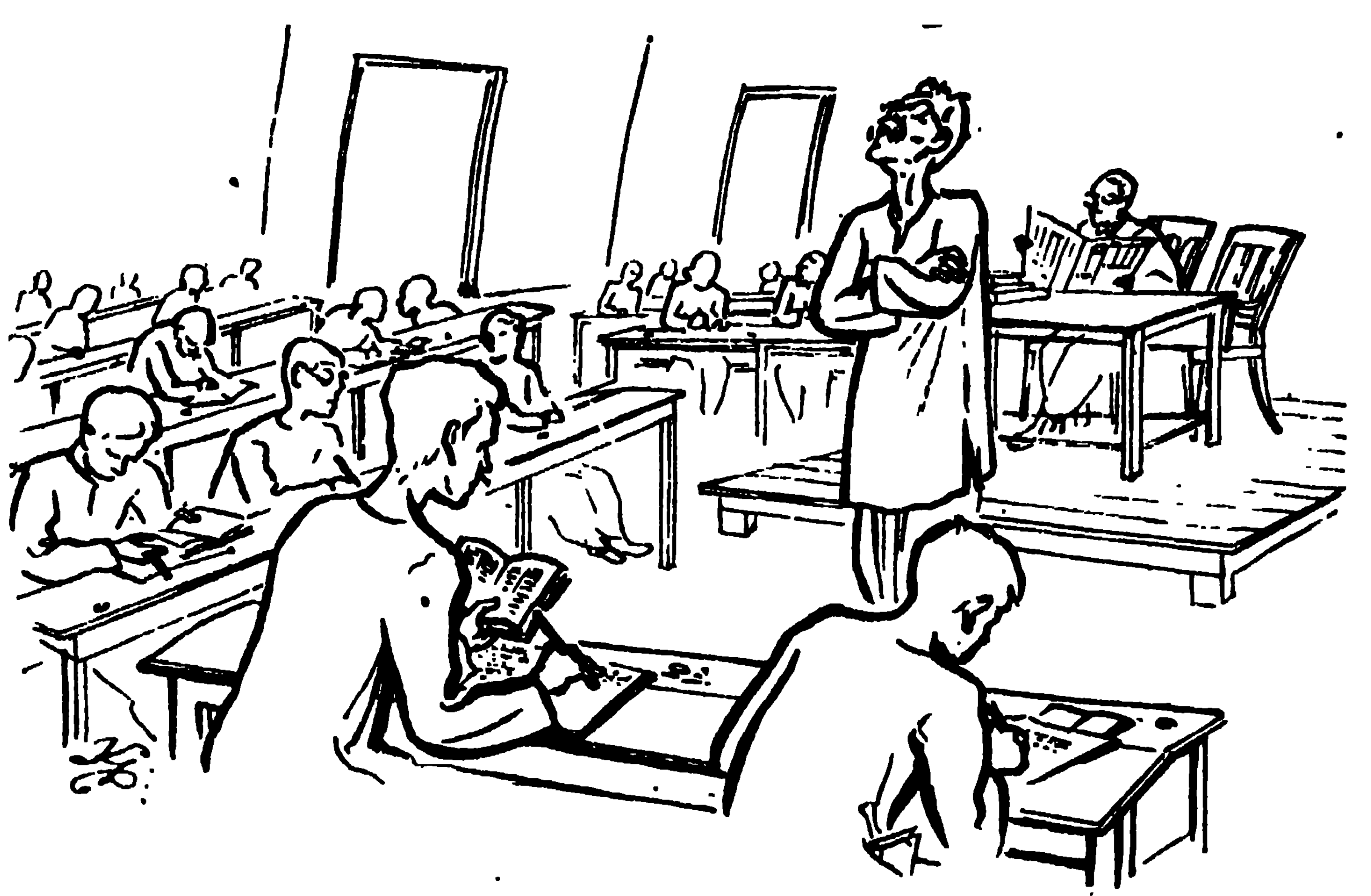

এই বিশুদ্ধ বিদ্রূপের একমাত্র জবাব—সমীরণকে অবিলম্বে বের করে দেওয়া, কিন্তু তা পারা গেল না। কথাটার মধ্যে এমন একটি ব্যক্তিত্ব ছিল যা অগ্রাহ্য করা সম্ভব হল না। তার উচ্চারণের গাম্ভীর্যপূর্ণ ভঙ্গিতে তাকে দায়িত্বহীন বালক মনে করা গেল না। তাই অত্যন্ত অবাঞ্ছিত এবং অশোভন হলেও আযুক্ত আধিকারিক তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিলেন। বললেন, "তোমার কি বক্তব্য আছে বল।"

সমীরণের মুখচোখের ভাব দীপ্ত হয়ে উঠল, নাকের নিচের হ্রস্ব গোঁফ

নজরদারও নিশ্চিন্ত। এই রীতি লঙ্ঘন করলে নজরদার তাকে ধরবেই, এবং তাতে তার অপরাধও হবে না।

আর সবচেয়ে বিস্ময়, ধরা পড়ল সমীরণ! সে নজরদারকে আদৌ গ্রাহ্য করে নি। তাই ধরা পড়া সত্ত্বেও অন্য পরীক্ষার্থীরা তার প্রতি সহানুভূতি দেখাল না, কারণ তারা বহু আগে থেকেই তাকে অতটা দুঃসাহসী হতে নিষেধ করেছিল। কারণ এতে তাদেরও বিপদ ছিল। একজনের ধরা পড়া মানে তাদের কিছুক্ষণ টোকা বন্ধ। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে ঘটনাটি ঘটল প্রথমার্ধের শেষ ঘণ্টা বাজার কয়েক মুহূর্ত আগে। হয় তো নজরদার ইচ্ছে করেই দেরিতে ধরেছে। মাঝখানে ধরলে গোলমালে অন্যদের কিছু অসুবিধা হ'ত।

সমীরণের ধরা পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টা বেজে গেল। পরীক্ষার্থীরা বেরিয়ে গেল একঘণ্টার বিরাম ভোগ করতে। অন্যদিকে খাতা বই এবং পরীক্ষার্থী-সমীরণ গেল আযুক্ত আধিকারিকের ঘরে (পাঠক, মাপ করবেন, কথাটি সরকারী পরিভাষা থেকে গৃহীত)। সেখানে সমীরণের পরীক্ষা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হবে না কেন তার কৈফিয়ৎ চাওয়া হ'ল তার কাছে এবং একজনকে ধরায় সমস্ত ছাত্রের বিদ্রোহ আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গে থানার দারোগাকে ডেকে পাঠানো হ'ল।

সমীরণ গম্ভীর ভাবে এবং অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে বলল, "আমি তো কিছু অন্যায় করি নি।"

কথাটি এমন একটি অপ্রত্যাশিত দৃঢ়তা, আত্মপ্রত্যয় এবং আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চারিত হ'ল যে আযুক্ত আধিকারিক হঠাৎ তার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারলেন না।

সমীরণ বলল, "আপনাদেরই অপরাধের জন্যে আমাকে শাস্তি দিতে চান?"

জোড়া উৎসাহে কাঁপতে লাগল, মনে হ'ল সে যেন কিছু বলার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছে। সে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কলক আযুক্ত আধিকারিকের চোখে বিঁধিয়ে প্রশ্ন করল, "আমার যা বলবার আছে শুনবেন সত্যিই?"

আযুক্ত আধিকারিক গম্ভীর সুরে উত্তর দিলেন, "তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।"

"কিন্তু আমাকে এখনও একটু বসতে অনুমতি দেওয়া হয় নি।"

"তুমি বসতে পার।"

ইতিমধ্যে দারোগা এসে পৌঁছলেন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে। তিনিও বসে শুনতে লাগলেন ব্যাপার কি।

সমীরণ পাশের খালি চেয়ারটাতে বসে বলল, "বেশ, তা হলে শুনুন। কিন্তু আমি প্রথমেই বলি, পরীক্ষার হল-এ নজরদারের ব্যবস্থাটা মন্দ নয়, কিন্তু তাকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে অতি উৎসাহী হতে নিষেধ করা উচিত ছিল আপনাদের। কারণ এখানে পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য পরীক্ষা পাস করা, সে জন্যে তারা যথারীতি টাকা জমা দিয়েছে।"

"অতএব তারা কিছু না শিখে নকল করে পাস করবে?" —আযুক্ত আধিকারিক প্রশ্ন করলেন।

সমীরণ বলতে লাগল, "এ ভাবে পাস করে কেউ যে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক লোক হয়েছে তার প্রমাণ নেই, পক্ষান্তরে যারা দেশের শত্রু তাদের মধ্যে অনেকেই হয় তো নকল না করে পাস করেছে। সুতরাং দুয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু শেখার কথা যে বলছেন, তাই যদি এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ত তা হলে নোট মুখস্থ করে পাস করা সম্ভব হয় কি করে? বলতে পারেন সে কথা? পারেন না। কিন্তু শেখানোই যদি আপনাদের উদ্দেশ্য হ'ত তা হলে শিক্ষাপদ্ধতি

বং পরীক্ষার পদ্ধতি এ রকম থাকত না। না শিখে পাস করায় যদি আপনারা বাধা দিতেন তা হলে বিশ্ববিদ্যালয় টাকার অভাবে কবে উঠে যেত। কিন্তু সে কথা যাক। ধরা যাক, কিছু শেখাই উদ্দেশ্য। কিন্তু তবু আজ যে ষাট হাজার পরীক্ষার্থী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের মধ্যে পাস করবে অনুমান চল্লিশ হাজার, এবং তাদের মধ্যেও বেকার হয়ে বসে থাকবে অন্তত বিশ হাজার। তারা নানা জায়গায় চাকরির চেষ্টা করে বেড়াবে এবং সেই চেষ্টার ফলে ঐ বিশ হাজার ছেলের মধ্যে দু চার শ ছেলে হয় তো চাকরি পাবে। কিন্তু সে চাকরির সঙ্গে শিক্ষার কোনো সম্পর্ক থাকবে না তাদের। সুতরাং এই যদি অবস্থা তবে কিছু শেখার উপর অতিরিক্ত জোর কেন দিচ্ছেন আপনারা? আর এখন যদি কিছু শেখেও, তবে ক'দিন তা মনে থাকবে? এবং এ বিষয়ে শুধু প্রবেশিকা পরীক্ষা কেন, যে-কোনো পূর্বে পাস করা এম এ-কে হঠাৎ আবার এম-এ পরীক্ষায় বসিয়ে দিন দেখবেন পাস করতে পারবে না। অবশ্য হাজার হাজার ছেলের মধ্যে দু' একজন ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু আমি তাদের কথা বলছি না। আজকের কিছু শেখা, চর্চার অভাবে কালই ভুল হয়ে যাবে। আর হাজার হাজার ছেলে বেকার বসে থেকে শিক্ষার চর্চা রাখবে কিসের গরজে?"

সমীরণ বলে যেতে লাগল, "যারা সমস্ত জীবন সাহিত্য-ব্যাকরণ নিয়ে থাকবে, তারা সাহিত্য-ব্যাকরণ শিখুক, কিংবা যারা ইতিহাস-ভূগোল চর্চা করবে একমাত্র তারাই ইতিহাস-ভূগোলে জ্ঞান লাভ করুক। তারা এদের মধ্যে শতকরা একজন কিংবা তারও কম। কিন্তু সেই অনিশ্চিত একজনের জন্যে এত ছেলের পাস করার আনন্দ নষ্ট করা কি উচিত? কারণ যারা নকল করে পরীক্ষা দিচ্ছে তারা যদি বুঝে থাকে প্রবেশিকা পাস করলেই তারা দশ-বিশ টাকার চাকরি পেলে খুশী থাকবে এবং না পেলেও আর পড়বে না, তবে তারা যে শেখা দু'দিনে নিশ্চিত ভুলে যাবে সেই-শেখার জন্যে পরিশ্রম করবে কেন? তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কি বলেন নি যে পরীক্ষার খাতায় প্রশ্ন লেখার জন্যে বিদ্যাকে কণ্ঠে বহন করাও যা, চাদরের নিচে বহন করাও তা? তবে এই আত্মপ্রবঞ্চনা কেন? তবে এই ভণ্ডামি কেন? আপনি কি Stephen Leacock-এর মূল্যবান কথাটি জানেন না যে 'Every man has somewhere in the back of his head the wreck of something which he calls education?'

"আপনি জানেন না নতুন ভারতবর্ষে শিক্ষার ধারা আগা-গোড়া না বদলালে দেশ উৎসন্নে যাবে? দেশে কর্মঠ স্বাস্থ্যবান লোকের দরকার এখন। দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলের সম্মুখে শত রকমের কর্মক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিতে হবে, দেশের বেকার সমস্যা মেটাতে হবে, এমনি অবস্থায় এই মিথ্যা শিক্ষার নামে আপনারা ঠিক উল্টোটাই করছেন—অকর্মণ্য ছেলে, স্বাস্থ্যহীন ছেলে এবং বেকার ছেলের সংখ্যা বাড়াচ্ছেন। এমনি অবস্থায় এই শিক্ষার যে কোনো দামই এখন নেই সে কথা অবশ্যই বোঝেন, সুতরাং এ শিক্ষার যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ সার্টিফিকেট পাওয়া তা যত সহজে পাওয়া যায় ততই ভাল নয় কি?"

সমীরণ এমন আবেগের সঙ্গে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল যে আযুক্ত আধিকারিক এর মাঝখানে কোনো কথা বলার সুযোগ পান নি, কথাও খুঁজে পান নি। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল তাঁর কর্তব্য আরক্ষের (আমার কথা নয়, সরকারী পরিভাষা) হাতে সমীরণকে সমর্পণ করা। কারণ তাঁর মনে একটা ঘোর সন্দেহের উদয় হয়েছিল প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর মুখে এই সব কথা শুনে।

সমীরণের তা না বোঝবার কথা নয়। তাই সে তাঁর সন্দেহকে তার নিজের যুক্তির সমর্থক হিসাবে ব্যবহার করার সুবিধা পেয়ে গেল। সে বলল, "আমার কথা যে কত সত্য তা আপনার মুখের ভাব দেখে আরও বেশি বোঝা যাচ্ছে। আপনি আমাকে সন্দেহ করেছেন। অর্থাৎ গৌণভাবে আপনি এই কথাই বলতে চাচ্ছেন যে প্রবেশিকা পরীক্ষা যে দেবে সে তো মূর্খ, সে আবার এত কথা বলবে কোত্থেকে। অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী যে কিছুই জানে না, এ কথা এক রকম ধরেই নিয়েছেন। ভালই করেছেন। শুধু আত্মপ্রবঞ্চনাটি ঠিক রেখে তাদের নকল করায় বাধা দিচ্ছেন। এটা কিন্তু ভাল করছেন না।"

এই কথাগুলো বলতে বলতে সমীরণ হো হো করে হেসে উঠল হঠাৎ। কিন্তু হাসতে গিয়ে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদয় হ'ল।

হঠাৎ তার নাকের নিচে থেকে গোঁফ জোড়া খুলে পড়ে গেল। স্তম্ভিত আয়ুক্ত আধিকারিক নিজেকে এই গুরুতর বিদ্রূপের সম্মুখে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করতে লাগলেন, কিন্তু তথাপি কিছু বলবার তাঁর ক্ষমতা ছিল না, সমীরণের প্রবলতর ব্যক্তিত্বের কাছে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

সমীরণ কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে হাসতে হাসতেই বলল, "আপনি যে সন্দেহ করছিলেন আমার বিদ্যা প্রবেশিকা বিদ্যার চেয়ে কিছু বেশি তাতে প্রমাণ হয় আপনি অন্ততঃ গ্রাজুয়েট। আপনার বিদ্যা ঐ টুকুই যা কাজে লাগল।"

আয়ুক্ত আধিকারিক আরও ঘাবড়ে গেলেন ওর কথা শুনে। তিনি দারোগার দিকে চাইলেন। দারোগা তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

সমীরণ বলল, "কোন্ নীতি রক্ষার জন্যে পরীক্ষা ধরে এই নজরদারী? বরঞ্চ আমাদের সম্মিলিত চেষ্টা হওয়া উচিত এই শিক্ষাকে এইভাবে বিদ্রূপ করা—এর মূলে কুঠারাঘাত করা, এর অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ করে দেওয়া। সুতরাং সবাইকে নকল করতে দিন। অবশ্য অনেকে সুযোগ পেলেও করবে না, তারা ভাল ছেলে, কিন্তু তারা ষাট হাজারের মধ্যে ষাট জন। বাকী উনপঞ্চাশ হাজার ন'শো চল্লিশ জনকে বই খুলতে দিন।

আয়ুক্ত আধিকারিক ক্রমশই সমীরণের উপর সশ্রদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলেন এবং বললেন, "তুমি···ইয়ে···আপনি এত জেনে —অর্থাৎ আপনি নিশ্চয় অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিচ্ছেন।"

সমীরণ বলল, "অবশ্যই দিচ্ছি। কারণ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এমনই নির্বোধ যে কোথায় টুকতে হবে তা জানে না, আর আমি এম-এ পাস করেও না টুকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করতে পারব না জেনেই টুকছি। কোথায় টুকতে হবে এম-এ পাস করে এই চতুরতাটি লাভ করেছি, আমার এম-এ পাসের সার্থকতা এইখানে।"

পরবর্তী পরীক্ষা শুরু হওয়ার ঘণ্টা বাজল। আয়ুক্ত আধিকারিক নজরদারদের নির্দেশ দিলেন, "টুকতে কাউকে বাধা দিও না।" দারোগা বললেন, "আমারও তাই মত। যদি দরকার হয় আমার কনষ্টেবল এ কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে।"

আয়ুক্ত আধিকারিক বললেন, "ধন্যবাদ, সে আর দরকার হবে না।"

ভারতের খনিজ সম্পদ—রত্নরাজির কথা

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্রীঅরুণকুমার রায়

রত্নরাজি খনি হইতে উৎপন্ন হয়। ঔজ্জ্বল্যে ও শোভায় ইহা অতুলনীয়। রত্নসমূহ অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হয়—দেহের শোভা বর্দ্ধিত হওয়ার পরে ইহাদের স্থান কোষাগারে। রাজা মহারাজাদের পরাক্রম, খ্যাতি ও আর্থিক বল—কে কত রত্নরাজির অধিকারী তাহাদ্বারাই নিরূপিত হইত। রত্নের গুণ তিনটি—মনোহারিতা, কঠোরতা, দুর্লভতা। সৌন্দর্য্যে ইহার তুলনা নাই—ব্যবহারেও ইহার নিজস্ব প্রকৃতির কোনরূপ অপকর্ষ হয় না। রত্ন সুকঠিন—যে-কোন কঠিন জিনিষ ইহা দ্বারা কাটা যায়, কিন্তু ইহার নিজের তীক্ষ্ণতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, কাঠিন্য নষ্ট হয় না। খাঁটি রত্ন সহজলভ্য নহে। দুষ্প্রাপ্য মণিরত্ন লাভের জন্য রাজামহারাজাদের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী পুরাণে বর্ণিত আছে। স্যমন্তক মণি লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত জাম্বুবানের যুদ্ধ এবং পরে স্যমন্তক মণিসহ সুন্দরী জাম্ববতী লাভ পৌরাণিক-কাহিনী হইলেও রত্নের দুষ্প্রাপ্যতা-জনিত মূল্যবৃদ্ধির কথাই প্রমাণিত করিবে। প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইলে ইহাদের মূল্য কমিয়া যাইত সন্দেহ নাই, কিন্তু খাঁটি রত্নের অপ্রতুলতা খুব বেশী। উপরত্নের উৎপত্তি বেশী তাই মূল্যও কম। চুণী এবং পান্না অন্যান্য রত্নের তুলনায় অধিকতর মূল্যবান—উৎপন্নও কম হয়, আর সহজলভ্যও নহে। চুণী ও পান্নার তুলনায় হীরক বেশী উৎপন্ন হয় কিন্তু ইহার দাম কমে না। অর্থসম্পদে বলীয়ান্ এক ধনিকগোষ্ঠী পৃথিবীর হীরকের বাজার অধিকার করিয়া আছে, হীরকসমূহ তাহাদের কুক্ষিগত। তাই হীরকের মূল্য বেশী।

ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল হইতেই রত্নপ্রসূ আখ্যা লাভ করিয়া আসিয়াছে। মোগল সম্রাট্‌দের রত্নসম্পদের কাহিনী প্রবাদে পরিণত: সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন প্রভৃতি ছিল বিপুল ঐশ্বর্য্যশ্রীমণ্ডিত। ফরাসী ভ্রমণকারী টাভার্ণিয়ে রত্নব্যবসায়ী ছিলেন। ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া তাঁহার সজাগ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল সম্রাটের অতুলনীয় রত্নসম্পদের দিকে।

১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হীরকের ন্যায় শ্রেষ্ঠ রত্নের বাজার ভারতবর্ষেরই একচেটিয়া ছিল। সুলতান মাহ্‌মুদ হইতে আরম্ভ করিয়া নাদির শাহ্, আহ্‌মেদ শাহ্ দুরানী এবং সর্ব্বশেষে ইংরেজকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল ভারতের অপরিসীম রত্নরাজি। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে শোণিত-পিপাসু নাদিরশাহের আক্রমণ মোগল সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হানিল।

তাহাতে ক্ষতবিক্ষত ভারতের বুক হইতে প্রবাহিত রক্তস্রোতে ভাসিয়া গেল রত্নখচিত ময়ূর সিংহাসন আর রত্নশ্রেষ্ঠ কোহিনুর। পঞ্জাবকেশরী পারস্যের শাহের হাত হইতে কোহিনুর উদ্ধার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হতভাগ্য পুত্র দলীপসিংহ সে রত্ন রক্ষা করিতে পারিলেন না। ইংরেজের হস্তে পরাজিত হইয়া, ইংরেজের বৃত্তিভোগী হইয়া তিনি লণ্ডনে প্রেরিত হইলেন—বণিকের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে কোহিনুর মণি রক্ষা পাইল না। হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে কোহিনুর এখন ইংরেজ সরকারের অধিকারে। তিরৌনির যুদ্ধের পর হইতেই রত্নসম্পদসমূহের শিকড় ভারতের মাটি হইতে শ্লথ হইতে লাগিল। স্বাধীনতা হারাইবার ফলেই এই অবস্থা দাঁড়াইল। প্রাচীনকাল হইতেই যে ভারতবর্ষ তাহার রত্নসম্পদের জন্য সমগ্র পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, সেই খ্যাতি বিলুপ্ত হইতে বসিল। ব্রহ্মদেশ ও সিংহলকে বাদ দিলে রত্নসম্পদে ভারতবর্ষ অধুনা খুবই দরিদ্র। বর্ত্তমানে খনিজ রত্নদ্বারা ভারতবর্ষ যাহা পাইতেছে তাহার মূল্য অর্দ্ধ লক্ষের বেশী হইবে না। ভারতের খনিজ রত্নসম্পদ বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে পড়ে:

কাশ্মীরে উৎপন্ন নীলা, মধ্যপ্রদেশে উৎপন্ন হীরক এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন নানাপ্রকার উপরত্ন। চুনী এবং নীলা ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হয়।

হীরক—হীরকের উপাদান বিশুদ্ধ কার্ব্বন—ইহার কঠোরতাও অন্য সকল রত্ন হইতে বেশী। উৎকৃষ্ট হীরক স্বচ্ছ, বর্ণহীন—ঈষৎ নীলাভ। নিকৃষ্ট হীরক কিঞ্চিৎ হরিদ্রাবর্ণের। হীরকের উপর আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হইলে রামধনুর ন্যায় নানা রঙের খেলা চলে। কোন বিশেষ স্থানকে কেন্দ্র করিয়া হীরক জন্মলাভ করে না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ইহাদের জন্ম। কৃত্রিম উপায়ে হীরক প্রস্তুত করা দুঃসাধ্য; তাই মানুষ কৃত্রিম হীরক প্রস্তুতিতে বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ময়সন প্রণালীতে হীরক-বিন্দু প্রস্তুত হওয়ার ফলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাজারে ইহাদের চাহিদা নাই। স্বচ্ছ নীলাভ হীরকখণ্ড রত্নগুণের অধিকারী; নিকৃষ্ট কালো হীরক (bort) অন্য প্রকার কাজে লাগে। কালো হীরকদ্বারা কাচ কাটিবার কলম তৈরি এবং পাথর বিদীর্ণ করা যায়। হীরকের গুঁড়া দ্বারা হীরক কাটা আর পালিশ করা হয়।

ভারতবর্ষে এক সময় গোলকুণ্ডা ছিল হীরকের শ্রেষ্ঠ আকর; কিন্তু গোলকুণ্ডার রত্নরাজি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। এক সময়ে গোলকুণ্ডার হীরকের বাজার সমগ্র পৃথিবীর বণিকদের প্রলুব্ধ করিত—নানা পর্য্যটকের বর্ণনাতেও ইহা পাঠ করা যায়। মাদ্রাজ প্রদেশের করনুল, কডাপা ও বেলারি জেলায় অল্পস্বল্প হীরক পাওয়া যায়। বিহার প্রদেশের পালামৌ অঞ্চল, উড়িষ্যার সম্বলপুর ও চান্দা জেলায়, মহীশূর রাজ্যের অনন্তপুর জেলাতেও কিছু কিছু হীরক পাওয়া যায়।

দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরকই এখন এদেশে বেশী চলে। জগদ্বিখ্যাত হীরকখণ্ডগুলি এক সময় এদেশেরই সম্পত্তি ছিল। তন্মধ্যে কোহিনুর, দি গ্রেট মোগল; টাভার্নিয়ে-বর্ণিত ডিউক অব টাসকানি, পিট বা রিজেন্ট, অর্লফ, স্যান্সি, মুন অব দি মাউন্টেন, নিজাম, হোপ ডায়মণ্ড প্রভৃতি বিখ্যাত। অরলফ হীরকখণ্ড জগতের শ্রেষ্ঠ হীরকখণ্ডগুলির অন্যতম। কথিত আছে, মহীশূরের কোন এক দেবমন্দির হইতে ইহা অপহৃত হইয়াছে। মুন অব দি মাউন্টেন নামক হীরকখণ্ডকে অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্যের সহিত নাদিরশাহ্ পারস্যে লইয়া গিয়াছিলেন; এই হীরকখণ্ড পরে রুশ সরকারের ধনাগারে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন হাতবদল হওয়ার পরে কোহিনুর এখন ইংরেজ সরকারের অধিকারে। ভারতের রাজনৈতিক দুর্য্যোগের ঘূর্ণিপাকে হীরকের ন্যায় মূল্যবান সম্পদরাজি ইউরোপে পৌঁছিয়াছে।

চুনী এবং নীলা:—চুনী, পদ্মরাগ ও মাণিক্য নামে এবং নীলা, নীলকান্ত, নীলক, ইন্দ্রনীল প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত। এই দুই রত্নের উপাদানই এলিউমিনা বা এলিউমিনিয়ম অক্সাইড্। চুনী এবং নীলা কুরুবিন্দের রঙ-ধর্ম্মবিশিষ্ট বিভিন্ন রূপান্তর। নিকৃষ্ট এবং অস্বচ্ছ কুরুবিন্দ চুনী এবং নীলা জাতীয় রত্নাদি পালিশ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। শ্রেষ্ঠ চুনী কপোতরক্তবর্ণ—টকটকে লাল; অন্যান্য চুনীর বর্ণে লাল রঙের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। রক্তবর্ণ বিশুদ্ধ কুরুবিন্দ চুনী নামে কথিত, অন্যান্য বিশুদ্ধ কুরুবিন্দ নীলা নামে কথিত। নীলার বর্ণ অতি উজ্জ্বল নীল।

উত্তর ব্রহ্মের চুনীর খনি হইতে পৃথিবীর নানা স্থানে চুনী সরবরাহ করা হয়। কপোতরক্তবর্ণের চুনী ব্রহ্মদেশেই পাওয়া যায়। ১৯১৮ সালে যেদিন সরকারীভাবে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইল সেই দিন ব্রহ্মদেশের খনিজ অঞ্চলে কয়েক খণ্ড চুনী পাওয়া গিয়াছিল। উহার একটি খণ্ডের নাম দেওয়া হইল 'শান্তি-চুনী'। ঐ এক খণ্ড মাত্র চুনীই তিন লক্ষ টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছিল।

বর্ণের বৈসাদৃশ্য থাকিলেও চুনী এবং নীলা একই কুরুবিন্দ জাতীয়—ইহারা কুরুবিন্দের উচ্চবর্ণের সগোত্র। চুনীর সহিত নীলার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। উত্তর-ব্রহ্মে যেখানে চুনী পাওয়া যায়, নীলাও সেইখানে পাওয়া যায়।

সিংহল দ্বীপেও নীলার আকর আছে। রত্নপ্রসূ হিসাবে সিংহলের খ্যাতি আছে। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ওজনের নীলা সিংহলেই পাওয়া গিয়াছে। রত্ন-রপ্তানীর দিক হইতে সিংহলের বাৎসরিক আয় প্রায় ৮।৯ লক্ষ টাকা হইবে।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দিক হইতে কাশ্মীরে নীলা পাওয়া

যাইতেছে। সেখানকার নীলা গ্র্যানাইট প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে অবস্থান করে। নীলার সহিত কিছু কিছু নিষ্প্রভ চুণী এবং উপরত্নও পাওয়া যায়। কাশ্মীরী নীলার বর্ণসম্পদ অতি উচ্চ শ্রেণীর। কাশ্মীরী নীলাতে যেন আকাশের নীলিমা মূর্ত্ত হইয়া আছে।

সৌগন্ধিক :—ম্যাগনিসিয়ম্-এলিউমিনিয়াম্ অক্সাইড সৌগন্ধিকের উপাদান। চুণীর সহিত ইহার বর্ণ-সৌসাদৃশ্য এত ঘনিষ্ঠ যে সৌগন্ধিককে অনেক সময় চুণী বলিয়া ভুল করা হয়। একটু পরীক্ষা করিলেই এই ভুল ধরা পড়িয়া যায়। সৌগন্ধিক চুণীর ন্যায় শক্ত নহে এবং ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব চুণী হইতে কম। স্ফটিক-স্তরের মধ্যে সৌগন্ধিক খুবই উজ্জ্বল এবং খাঁটি রত্নের ভিতরে বর্ণৈশ্বর্য্যও দেখা যায়। কৃত্রিম উপায়ে সৌগন্ধিক নির্ম্মাণকার্য্য খুবই চলিতেছে, কিন্তু কৃত্রিমতা সহজেই ধরা পড়িয়া যায়।

সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশে সৌগন্ধিক পাওয়া যায়—ভারতেও অল্পবিস্তর উৎপন্ন হয়। চুণীর ন্যায় উজ্জ্বল সৌগন্ধিক অনেক বেশী মূল্যে বিক্রীত হয়। মাদাগাস্কার, অষ্ট্রেলিয়া, আফগানিস্থান এবং ব্রেজিলে সৌগন্ধিকের আকর আছে।

বৈদূর্য্য :—এলিউমিনিয়ম অক্সাইড ইহার উপাদান। ঈষৎ মলিন পীত আভা, পিঙ্গল ও সবুজের বিচিত্র বর্ণসমাবেশে বৈদূর্য্যের জন্ম। বৈদূর্য্য-রত্নকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(ক) পীত ও সবুজ বর্ণের বৈদূর্য্যকে অনেকাংশে অলিভিনের সহিত ভুল করা হয়। অলিভিন এক প্রকারের পীত ও সবুজ বর্ণের রত্নবিশেষ।

(খ) 'বিড়ালাক্ষ'—অন্ধকারে বিড়ালের চক্ষু যেমন জ্বলে বিড়ালাক্ষ-বৈদূর্য্যের আভা অনেকটা সেই প্রকারের। ঈষৎ হরিতাভ, পিঙ্গল ও সবুজ এক প্রকার মসৃণ রেশমের অভ্যন্তরে ইহার স্বভাবজাত সৌন্দর্য্য সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশোন্মুখ। গোল পৃষ্ঠ করিয়া কাটিলে মধ্যে একটি উজ্জ্বল রেখা দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন দিক হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে হইবে যে রেখাটি একই কক্ষে বিচরণ করিতেছে। বিড়ালাক্ষের জনপ্রিয়তা খুব বেশী।

(গ) আলেকজাণ্ড্রাইট নামে বৈদূর্য-রত্নের আর একটি শ্রেণী আছে। দিনের আলোতে ইহাকে গভীর সবুজ বর্ণের দেখায়, কিন্তু কৃত্রিম আলোতে ইহা ঘন রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষে কইম্বাটুর ও কাডায়ম জিলায় বৈদূর্য্য-রত্ন কিছু কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু খাঁটি বৈদূর্য্যের পর্য্যায়ে ইহারা পড়ে না। উড়িষ্যার কটক জেলায় বৈদূর্য্য পাওয়া যায়। সিংহল, উরাল পর্ব্বত ও ট্যাসম্যানিয়াতে আলেক্জাণ্ড্রাইট শ্রেণীর বৈদূর্য্য পাওয়া যায়।

বেরিল :—বেরিলিয়ম্ এলিউমিনিয়ম্ ইহার উপাদান। দুইটি অমূল্য রত্ন বক্ষে ধারণ করিয়া বেরিলরত্ন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী—একটি পান্না, আর একটি একোয়ামেরিন, মরকত, হরিৎমণি, গারুত্মত প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পান্না অভিহিত। কৃত্রিম আলোকে পান্না এবং একোয়ামেরিন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। দুষ্প্রাপ্য রত্ন হিসাবে ইহাদের যথেষ্ট আভিজাত্য আছে।

বেরিলজাতীয় স্ফটিকস্তর বহু মণ ওজনের পাওয়া যায়; কিন্তু রত্ন পর্য্যায়ে ইহারা স্থানলাভ করে না। এই জাতীয় বেরিল এলিউমিনিয়মের সহিত যুক্ত হইয়া এক প্রকার কঠিন ধাতু সৃষ্টি করে। এই বর্ণসঙ্কর ধাতু অর্ণবযান ও ব্যোমযান নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে নেলোর জেলায়, বিহার প্রদেশে এবং কাশ্মীরে বেরিলের আকর আছে। অভ্রস্তরের মধ্যেও বেরিল পাওয়া যায়। মাদ্রাজ প্রদেশে কইম্বাটুর জেলায় এবং মহীশূরেও এই রত্ন পাওয়া যায়। রাজপুতানায় নিকৃষ্ট স্তরের বেরিল পাওয়া যায়। সিংহল-দ্বীপও এই রত্নের জন্মদান করে।

পোখরাজ :—এলিউমিনিয়ম্-ফ্লুওসিলিকেট্ পোখরাজের উপাদান। অন্য রত্নের তুলনায় ইহা কতকটা সহজলভ্য। বর্ণ হরিতাভ। বর্ণ বৈচিত্রের জন্য ইহা অনেক সময় দুষ্প্রাপ্য রত্ন-শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত। অস্বচ্ছ পোখরাজ রত্ন পর্য্যায়ে পড়ে না। নিকৃষ্ট পোখরাজ অন্য ধাতুকে পালিশ ও চূর্ণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মদেশের তাভয় জেলাতে টিনের সহিত পোখরাজ পাওয়া যায়। সিংহল দ্বীপেও পোখরাজ উৎপন্ন হয়।

তামড়ি :—রত্নের মধ্যে সহজলভ্য, বাজারে আমদানীও বেশী এবং মূল্যও অন্য রত্নের তুলনায় কম। ইহা এলামাণ্ডাইট্ জাতীয়। উজ্জ্বল গাঢ় লাল রং, একটু বেগুনী আভা-বিশিষ্ট। নিকৃষ্ট তামড়ি চূর্ণ করিয়া উৎকৃষ্ট রত্নরাজিকে মসৃণ করা হয়। ঘড়ির চক্রধরসৃষ্টিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

রত্নগুণসমন্বিত তামড়ি বেশী পাওয়া যায় না—উহার নিকৃষ্ট শ্রেণীই সহজলভ্য। বিহার প্রদেশে, উড়িষ্যা প্রদেশের মহানদীর বালুকারাশিতে তামড়ি পাওয়া যায়। হাজারিবাগে তামড়ির বড় বড় খণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহাদিগকে রত্ন-পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না। মাদ্রাজে কৃষ্ণানদীর তীরে বালুপ্রবাহে ইহারা সংগুপ্ত থাকে। সালেম, নীলগিরি ও নেলোর জেলায় রক্তবর্ণ তামড়ি এবং ত্রিবাঙ্কুর জেলায় বর্ণসম্পদশালী তামড়ির সন্ধান পাওয়া যায়। রাজপুতানাতে উদয়পুর ও জয়পুর রাজ্যে, আরাবল্লীর গিরিশ্রেণীতে তামড়ির আকর দৃষ্ট হয়। আজমীর, জয়পুর, কিষণগড় ও শাহপুরে এক প্রকার তামড়ি পাওয়া যায়। কিষণগড়ে প্রাপ্ত তামড়ি ভারতবর্ষের যাবতীয় তামড়ির মধ্যে রত্নসম্পদে শ্রেষ্ঠ। দক্ষিণ-ভারতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা অলঙ্কার প্রভৃতির জন্য মাদ্রাজে প্রেরিত হয়।

অলিভিন :—এই রত্ন জহরীদের নিকট পেরিডট্ নামে পরিচিত। পেরিডটাইট্ আগ্নেয় শিলায় ইহার জন্ম। সবুজ, পীত, পিঙ্গল ও রক্তবর্ণের বিচিত্র পরিবেশ ইহার মধ্যে দৃষ্ট হয়। চুনা-পাথরের মধ্যেও এই রত্ন দেখা যায়। ব্রহ্মদেশে চুণীর আকরে, চুণীর সঙ্গে একত্রে অলিভিন দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে এই রত্ন পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। রত্নগুণসমন্বিত অলিভিন মিশরের উপকূল হইতে দূরে সেণ্টজন দ্বীপে এবং সিংহল, কুইন্সল্যাণ্ড, ব্রেজিল ও নিউ মেক্সিকোতে পাওয়া যায়।

জেড বা পীলু :—নানাপ্রকারের বিচিত্র কারুকার্য্য এই রত্নের উপর করা যায়। জেড্ রত্ন নানাবর্ণের হয়, সাধারণতঃ ফিকে সবুজ। জেডাইট্ এবং নেফ্রাইট এই দুই শ্রেণীতে এই রত্নকে বিভক্ত করা যায়। জেডাইট্ ফিকে সবুজ—নেফ্রাইটের বর্ণ পত্র-সবুজ। জেডাইট বিভিন্ন অলঙ্কারণে খচিত হইয়া সেগুলিকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করে।

জেডরত্নের উপর চীনাদের অগাধ বিশ্বাস। তাহাদের মতে এই রত্ন বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন, ধারণ করিলে সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়। রত্নধারণ সম্পর্কে ভারতীয়দের সংস্কারও কম নহে—উপযুক্ত রত্ন ধারণ করিতে পারিলে দুর্দ্দিন দূর হইয়া সুদিনের উদয় হইবে এদেশের অনেকেই ইহা বিশ্বাস করেন।

উত্তর-ব্রহ্ম হইতে জেড সরবরাহ করা হয়। রেঙ্গুন হইতে জাহাজে চীনদেশের নানা বাজারে জেড চালান হয়। এই রত্নের কারুশিল্পে চীনারা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। চীনদেশের বাজার ওঠা-নামার উপর জেডের ব্যবসা বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

গোমেদ :—গোমেদের খ্যাতি অন্যান্য রত্নের তুল্য নহে। ঔজ্জ্বল্যে ইহা প্রায় হীরকের কাছাকাছি। সবুজ, হলুদ, পিঙ্গল, কমলালেবুর রঙ প্রভৃতির ন্যায় নানা বর্ণের গোমেদ পাওয়া যায়। কমলালেবু বর্ণের গোমেদের আদর বেশী। জারকোনিয়ম্-সিলিকেট্ উপাদানে ইহাদের জন্ম। তাপে ইহা বর্ণহীন হয়। বর্ণশোভার দিক হইতে সিংহলে উৎপন্ন একপ্রকার গোমেদকে 'মাতারা হীরক' বলা হয়।

পাথরের নুড়ির সঙ্গে বারিবাহিত স্ফটিকস্তরে এবং পললস্তূপে গোমেদ অবস্থান করে। সিংহল, শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে গোমেদের জন্ম। কেলাসিত শিলাতে নেফিলিনের সঙ্গেও গোমেদ অবস্থান করে। এই প্রকারের গোমেদ কাদায়ম্, কইম্বাটুর জেলা এবং ত্রিবাঙ্কুরে দেখা যায়। মাদ্রাজ প্রদেশের ত্রিচিনোপল্লীতে এবং বিহারে হাজারীবাগ জেলার দোনচাঁচ নামক স্থানে গোমেদ পাওয়া যায়। ত্রিবাঙ্কুর মিনারাল কোম্পানী ত্রিবাঙ্কুরের সমুদ্রোপকূলে বালুকারাশির মধ্যে প্রচুর গোমেদ আবিষ্কার করিয়াছে। উপরোক্ত কোম্পানী গ্রেট ব্রিটেন, জার্ম্মানী, যুক্তরাষ্ট্র এবং আফ্রিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে গোমেদ রপ্তানী করিতেছে। গোমেদ-ধারণে গ্রহশান্তি হয়, ভারতীয়দের মধ্যে এ বিশ্বাস খুব আছে।

স্ফটিক বা কো-অর্টস্ :—উপরত্ন পর্য্যায়ভুক্ত। ইহা অলঙ্করণের শোভা বৃদ্ধি করে। আগ্নেয় শিলাগর্ভে সাধারণতঃ ইহার জন্ম—সিলিকন্-অক্সাইড ইহার উপাদান।

কেলাসিত স্ফটিককে নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—গোলাপী স্ফটিক, ধোঁয়াটে স্ফটিক, ব্যাঘ্রচক্ষু ও বিড়ালাক্ষ স্ফটিক। কেলাস প্রচ্ছন্ন স্ফটিককে নিম্নলিখিত নাম দেওয়া হয় :—ক্যাল্‌সিডনী, কারনেলিয়ান্ বা রুধিরাখ্য, অ্যাগেট, ওনিকস ও ফ্লিণ্ট। কারনেলিয়ান বা রুধিরাখ্য রক্তবর্ণের। অ্যাগেট সাদা, ধূসর, পিঙ্গল প্রভৃতি বর্ণের হয়। ওনিকস বিভিন্ন বর্ণের স্তর বা রেখাযুক্ত। ফ্লিণ্ট অস্বচ্ছ—প্রাচীনকালে অস্ত্র নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত। ইহার ঘর্ষণে অগ্নিও প্রজ্বলিত করা হয়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে স্ফটিক পাওয়া যায়। গোলাপীস্ফটিক উড়িষ্যার সম্বলপুরে মেলে। বোম্বাই প্রদেশের তাম্বারাতে যে স্ফটিক পাওয়া যায়, কাম্বে উপসাগর দিয়া তাহা বিদেশে রপ্তানী করা হয়। মধ্যপ্রদেশের চিন্দওয়ারাতে, হায়দরাবাদের বরঙ্গল জেলায়, মাদ্রাজের গোদাবরী জেলার রাজমহীতে এবং তাঞ্জোরে 'ভেল্লাম হীরক' নামে একপ্রকারের স্ফটিক পাওয়া যায়। দিল্লীতে 'দিল্লী স্ফটিক' নামে এক প্রকারের স্ফটিক আছে। ইহা দ্বারা সুন্দর নেকলেস প্রস্তুত করা হয়। জামীরা নামক স্ফটিক বিহারের সাঁওতাল পরগণায় এবং মধ্যপ্রদেশে পাওয়া যায়। কাম্বের বাজারে অ্যাগেট ও কারনেলিয়ান্ কাটা হয়। মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে, যুক্তপ্রদেশের বান্দায় এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে অ্যাগেট কাটিয়া অলঙ্কারে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়। ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে কাম্বে হইতে অ্যাগেটের খুচরা চালান যায়। সুলভ রত্ন হিসাবে স্ফটিকের ব্যবসায় কাশ্মীরের বাজারে খুব চালু।

ওপাল :—রত্ন হিসাবে ওপাল খুব জনপ্রিয় না হইলেও ব্যবহারে ইহার জনপ্রিয়তা দিন দিনই বাড়িতেছে। অকেলাসিত সিলিকা এবং তাহার সহিত কিছু জলের সংমিশ্রণে ইহার জন্ম। ওপালে বিভিন্ন রং দৃষ্ট হয়। ইহার কঠোরতা কম, প্রায় কাঁচের তুল্য। বোম্বাই, মধ্য-প্রদেশ, হায়দরাবাদ এবং মাদ্রাজে ওপাল পাওয়া যায়।

তারকুস্ :—উজ্জ্বল নীলবর্ণের। কাঁচাসোনার পরিবেশে সংস্থাপিত হইলে ইহার মনোহারিত্ব বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। ভারতবর্ষে আজমীঢ় পাহাড়ে এবং রামগড়ে তারকুস্ রত্ন পাওয়া যায়। পারস্য ও মিশরেও তারকুসের বহুল প্রচলন আছে।

চন্দ্রকান্ত :—চন্দ্রকান্ত এবং এমাজন্‌ষ্টোন অর্থোক্লাস রত্ন পর্য্যায়ভুক্ত। রত্ন-গুণ-সমন্বিত অর্থোক্লাস স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। চন্দ্রকান্ত মণি বর্ণহীন, কিন্তু ভিতরে তাকাইলে আকাশের মেদুরতা কতকটা প্রকাশ পায়। এমাজনের বর্ণে একটা আমেজ আছে—জেডের ন্যায় ফিকে সবুজ। মহিলাদের ব্রোচ ও পেণ্ডেণ্টে খচিত হইলে অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হাজারিবাগ জেলার ডোমচাচের দুই মাইল দক্ষিণে এবং কাশ্মীরের কোন কোন স্থানে এমাজন্ ষ্টোন্ পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের রত্নরাজির সমৃদ্ধির কথা প্রবাদের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে। ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতির রত্নসম্ভার ভারতেরই সম্পত্তি ছিল। রামায়ণে রাবণের যে স্বর্ণ-লঙ্কার বর্ণনা দৃষ্ট হয় খনিজ রত্নসম্ভারের প্রাচুর্য্য তাহার প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ। ভারতের এই রত্নসম্পদ লুণ্ঠকের লুণ্ঠন-প্রবৃত্তিকে উদ্দীপিত করিয়াছে; শোণিত-পিপাসুকে রত্নরূপ শোণিতের আস্বাদে উন্মত্ত করিয়াছে; সাম্রাজ্যবাদের সর্ব্বভুককে বিশ্বগ্রাসী দাবানল জ্বালাইতে ইন্ধন জোগাইয়াছে। বণিকের লুব্ধ দৃষ্টিতে লালসার সৃষ্টি করিয়া ভারতের রত্নভাণ্ডারকে নিঃশেষিতপ্রায় করিয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে যাহা চলিয়া গিয়াছে জাতীয় সরকারের তাহা আজ ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ভারতবর্ষে প্রকৃতির দান এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। ভারতে উৎপন্ন খনিজ শিল্পের 'জাতীয়করণ' করিতে হইবে। রত্ন-প্রসূ সিংহল ও ব্রহ্মের সহিত মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে। ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মুনাফা বন্ধ করিয়া রত্ন-শিল্পের প্রচুর লাভকে বিভিন্ন জাতীয় শিল্পপ্রসারের মূলধন হিসাবে ব্যবহার করা এখন সমীচীন।

প্রেম

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

আমার প্রেম ত নয় লঘুপক্ষ মেঘ—
উড়ে যায় হালকা হাওয়ায়,
অন্তরে বাহিরে নেই একটু আবেগ
কথা কয় ভীরু ইশারায়;
শাসন-অঙ্গুলি দেখে নত করে আঁখি,
নিজেকে নিজে সে দেয় হীনতম ফাঁকি,
গোপনে লুকায়ে রাখে যা-কিছু কামনা,
পদে পদে মানে পরাজয়,
জীবন-নিকুঞ্জে করে জঞ্জাল রচনা,
দেবালয়ে ভীরুর আশ্রয়।

বরষার মেঘ নয় আমার এ প্রেম—
জলভারে ঝরে ঝরে পড়ে,
কিছু সে পাবার আগে হৃদয়ের হেম
সবটুকু দেয় শূন্য করে;
কিছু তার দাবি নেই,—কেবল মিনতি,
করজোড়ে জনে জনে করুণ বিনতি,
নিজেকে বিলায়ে দিয়ে পায় পরিতোষ—
ক্ষুদ্র লাভে আনন্দে মুখর,
সলজ্জ জীবনে তার অনন্ত সন্তোষ,
ভাগ্য'পরে পরম নির্ভর।

আমার প্রেমের বাস পশ্চিম আকাশে,
ঝটিকায় তার পরিচয়,
ঘনকৃষ্ণ ভ্রূকুটিতে মহাদম্ভে হাসে,—
বিশ্বে জাগে ভয়ার্ত্ত বিস্ময়;
করে না করুণা কারে—নেই কোমলতা,
লাজে না মিনতিভরা ম্লান সুরে কথা,
আমার প্রেমের লাস্য ঝড়ের মতন—
শূন্য থেকে শূন্যে যায় ছুটে,
স্রষ্টা ও সৃষ্টির যত শাসন-বাঁধন
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে টুটে টুটে।

আমার পরশে সখি, তব দেহলতা
শ্যামরূপে হবে মহীয়ান্,
আমার অন্তরে আছে আত্মার বারতা
কণ্ঠে আছে সুন্দরের গান।
ঝড় আসে, ঝড় যায়, নিয়ে যায় সাথে
পুঞ্জিত জঞ্জাল যত আছে আঙিনাতে,
পিছে তার রেখে যায় শ্যাম সমারোহ
শিশুসম পবিত্র সুন্দর,—
তেমনি আমার প্রেম অনন্ত বিরহ
দিয়ে যায় পুরায়ে অন্তর।

আমার এ খোড়ো প্রেম জানে না কাঁদন—
আঁখিজলে শয্যা সিক্ত করা,
স্বীকার করি না আমি মৃত্যুর শাসন—
বেঁচে বেঁচে পদে পদে মরা;
সৃষ্টিকে আমার প্রেম প্রাণবন্ত করে
নতুনের গান গায় বিরহ-প্রান্তরে
বুকের ব্যথাকে রাখে কোলের উপর—
আগামীর গড়ে ইতিহাস,
আমার তুলনা সখি, ভোরের ভাস্কর—
ঝটিকায় প্রেমের প্রকাশ!

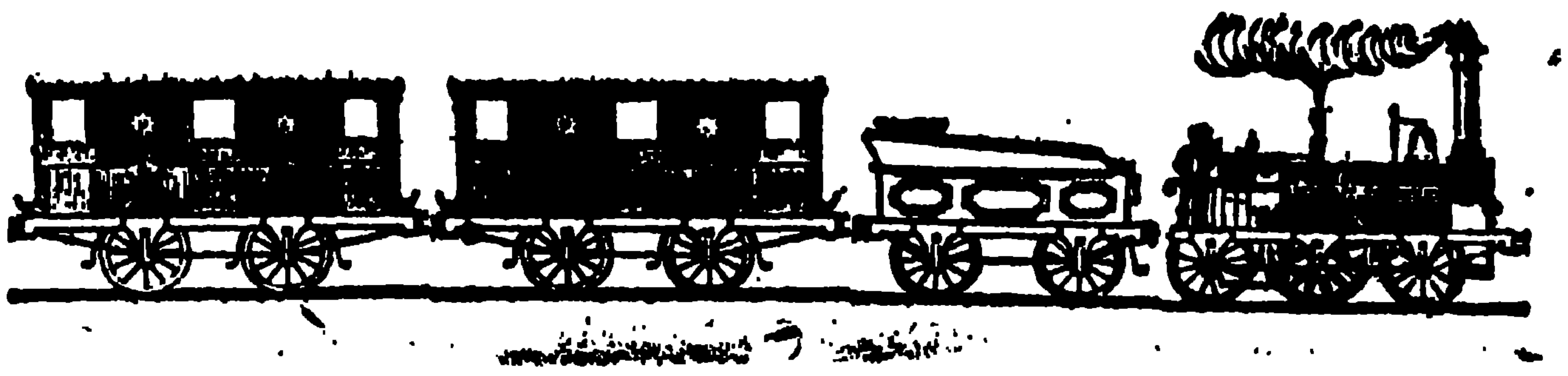

রেলগাড়ী — —'সত্যার্ণব,' ফেব্রুয়ারি ১৮৫১

সেকালের সচিত্র বাংলা পত্র-পত্রিকা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, ইংরেজ আমলে, বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। তাহার ফলে জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ সুরু হয়, সংবাদপত্র প্রকাশ উহার একটি দিক্। বাংলা দেশের—তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র ইংরেজী ; উহা জেম্‌স অগষ্টাস্ হিকীর (Hicky) 'বেঙ্গল গেজেট,' প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—২৯ জানুয়ারি ১৭৮০।

লর্ড বেকন —'সত্যার্ণব,' জুলাই ১৮৫০

বাংলা দেশে বাংলা সাময়িক-পত্রের উদ্ভব ইহারও ৩৮ ৎসর পরে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাংলা ভাষায় ্রিত প্রথম সাময়িক-পত্র জন্মলাভ করে। ইহা শ্রীরামপুর ্শন কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন' নামে একখানি মাসিক-ত্র, সম্পাদক—জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

'দিগ্দর্শন' প্রকাশিত হইবার দুই মাসের মধ্যে একেবারে ই-দুইখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের উদয় হয়। একখানি ্রামপুর হইতে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ,' প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৩ মে ১৮১৮ ; অপরখানি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্দ্র রায়-পরিচালিত

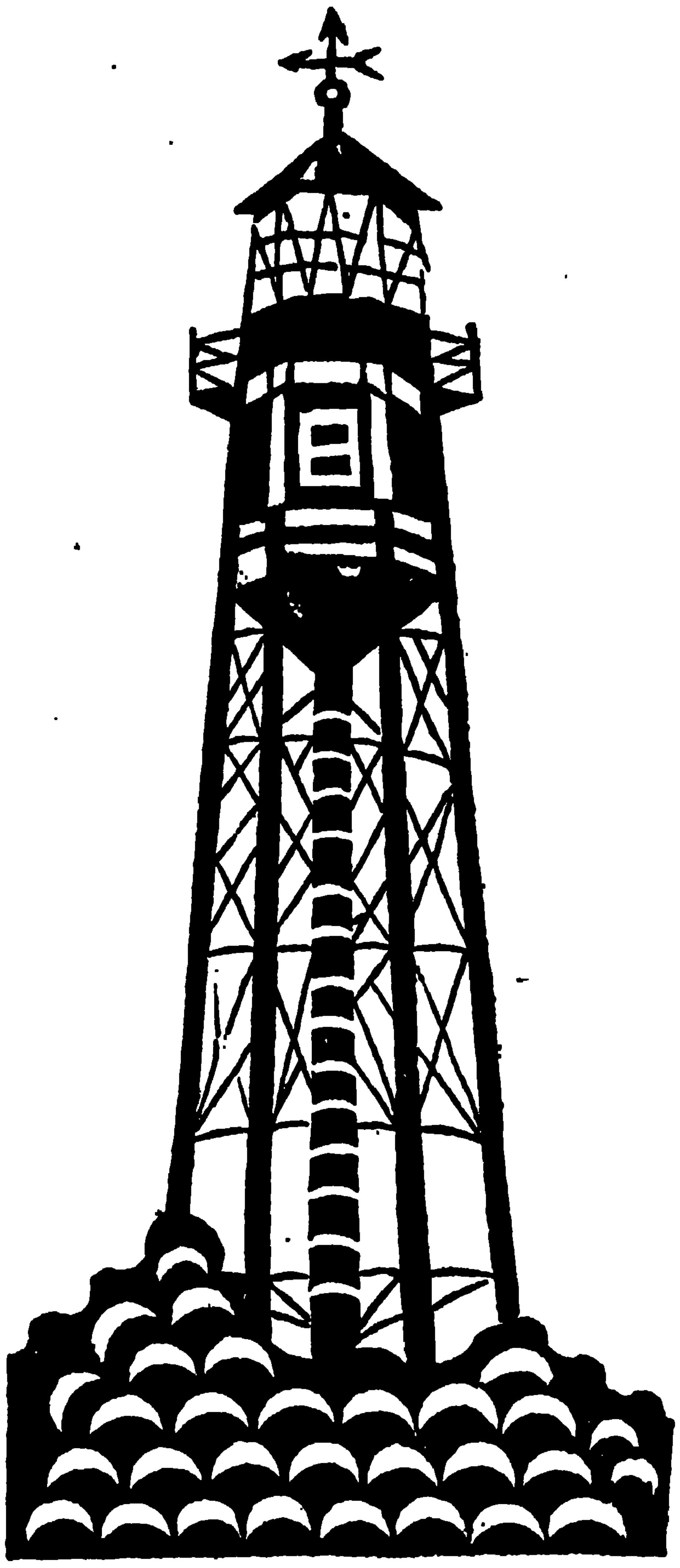

"জাহাজ-পথদর্শক দীপাগার" —'সত্যপ্রদীপ,' ১৮ মে ১৮৫০

'বেঙ্গল গেজেটি,' কলিকাতা হইতে আনুমানিক জুন মাসে প্রকাশিত হয় ; এই 'বেঙ্গল গেজেট'ই বাঙালী-পরিচালিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

ক্যাম্বেলের মডেল ডেপুটি —'অমৃত বাজার পত্রিকা,' ২ মে ১৮৭২

এই সকল পত্রে চিত্রের নামগন্ধ ছিল না, থাকিবার কথাও নয়। এদেশের শিল্পীরা তখন সবেমাত্র অপেক্ষাকৃত সহজ ধাতু ও কাঠ খোদাই শিল্পের আশ্রয় লইয়াছেন। আমরা এই ধাতু ও কাঠ খোদাই চিত্রের প্রথম নিদর্শন পাই—১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গলে'। ক্রমশঃ পুস্তকের গণ্ডী ছাড়াইয়া পত্র-পত্রিকায় চিত্র দেখা দিতে আরম্ভ করিল।

মাসিক-পত্রে সর্ব্বপ্রথম চিত্রের দর্শন পাই—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ (৩য় ভাগ) হইতে ইহাতে মাঝে মাঝে চিত্র প্রকাশিত হইত। ইহার পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, পাদরি লং-সম্পাদিত 'সত্যার্ণব' পত্রের জন্ম। এই মাসিক-পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় একখানি করিয়া কাঠ-খোদাই চিত্র এবং দ্বিতীয় বর্ষ হইতে সকল সংখ্যায় এক বা একাধিক চিত্র সন্নিবিষ্ট হইত।

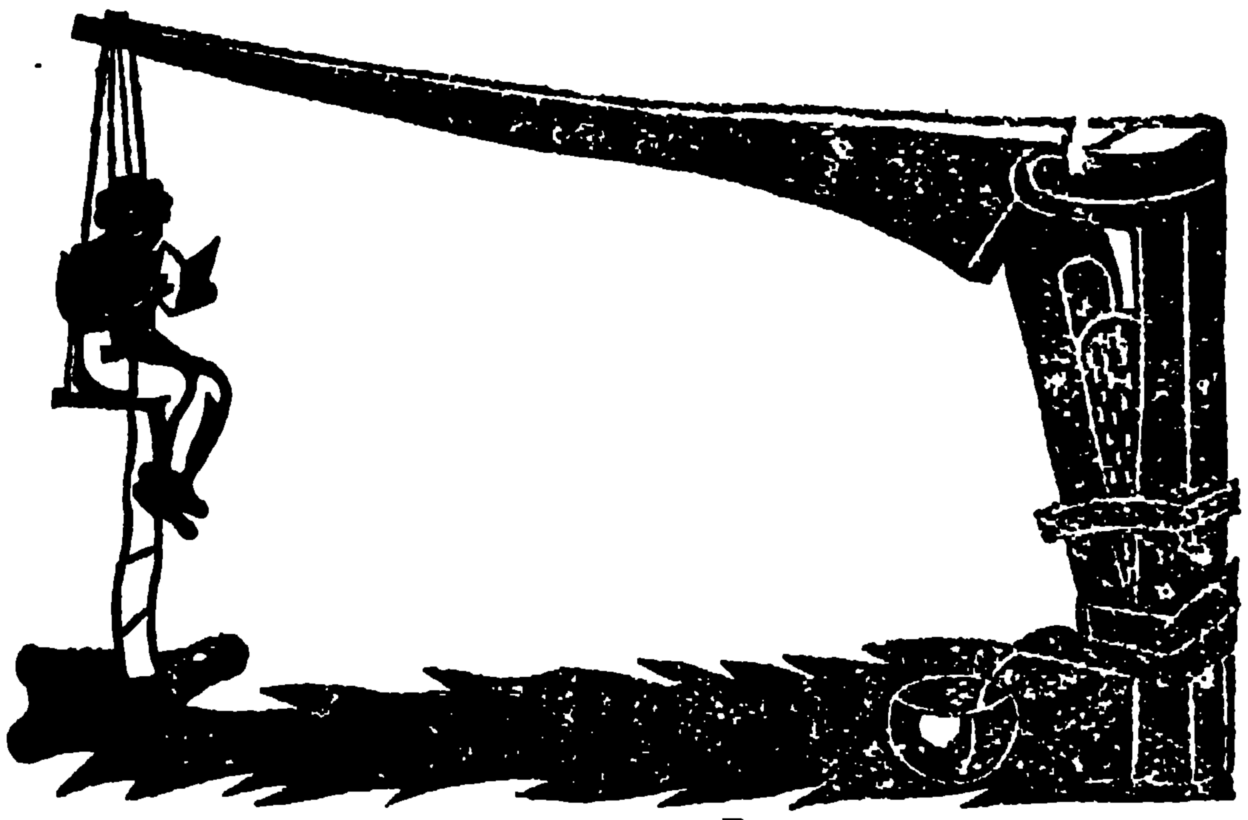

তৈলের ঘানি —'সত্যপ্রদীপ,' ৪ জানুয়ারি ১৮৫১

কিন্তু বাংলা "সচিত্র মাসিক পত্রিকা" বলিতে সচরাচর আমরা যাহা বুঝি, তাহা প্রকাশিত হয় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। ইহার নাম—'বিবিধার্থ-সংগ্রহ,' সম্পাদক—স্বনামধন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রকাশক—ভার্ণাকিউলার লিটারেচার কমিটি বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ। ইহার আদর্শ ছিল বিলাতের 'পেনি ম্যাগাজিন'; "আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের পাঠযোগ্য করণার্থে উক্ত পত্র অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক, এবং তত্রত্য প্রস্তাবিত বস্তু সকলের বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাকিবেক।" শৈশবে রবীন্দ্রনাথকে ইহা মুগ্ধ করিয়াছিল; তিনি 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন: "রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক-পত্র বাহির করিতেন।...বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুসি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড় চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের উপর চীৎ হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে। এই ধরণের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন?"

অনিয়মিত ভাবে প্রচারিত হইয়া ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' লুপ্ত হয়। ইহার অভাব পূরণার্থ দুই বৎসর পরে (ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩) রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় 'রহস্য-সন্দর্ভ' প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহাও একখানি পুরাদস্তুর সচিত্র মাসিক পত্রিকা। "চিত্রপট যে মনের সংস্কারক তাহা নব্য তত্ত্বানুসন্ধায়িরা স্থির করিয়াছেন; অতএব সময়ে সময়ে উত্তম চিত্রদ্বারা চিত্তানুরঞ্জন করাও ইহার উদ্দেশ্য; তদর্থে এই পত্রের প্ররোচক বঙ্গানুবাদক সমাজের আদেশে বহু শত ছবি বিলাত হইতে আনীত হইয়াছে, তাহার প্রকাশে বোধ হয় অনেকেই পরিতৃপ্ত হইবেন।"

সাপ্তাহিক-পত্রে আমরা প্রথম চিত্রের দর্শন পাই—'সত্যপ্রদীপে'। ইহা শ্রীরামপুর মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র; ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—৪ মে ১৮৫০। সম্পাদক প্রথম সংখ্যায় প্রতিজ্ঞা করেন যে, "পদার্থ ও শিল্প প্রভৃতি বিদ্যা সম্পর্কীয় নানারূপ প্রস্তাব বিদ্যার্থি মহাশয়েরদের সন্তোষার্থে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব তন্মধ্যে যে২ কথা সহজে বোধগম্য নহে ব্যাখ্যার্থে তাহার প্রতিবিম্ব কখন কখন প্রকাশ হইবেক।"

ইহার ছয় বৎসর পরে, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকার আবির্ভাব। উহা—'অরুণোদয়'; সম্পাদক—রেঃ লালবিহারী দে। 'অরুণোদয়ে'র প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় একখানা করিয়া ছবি থাকিত।

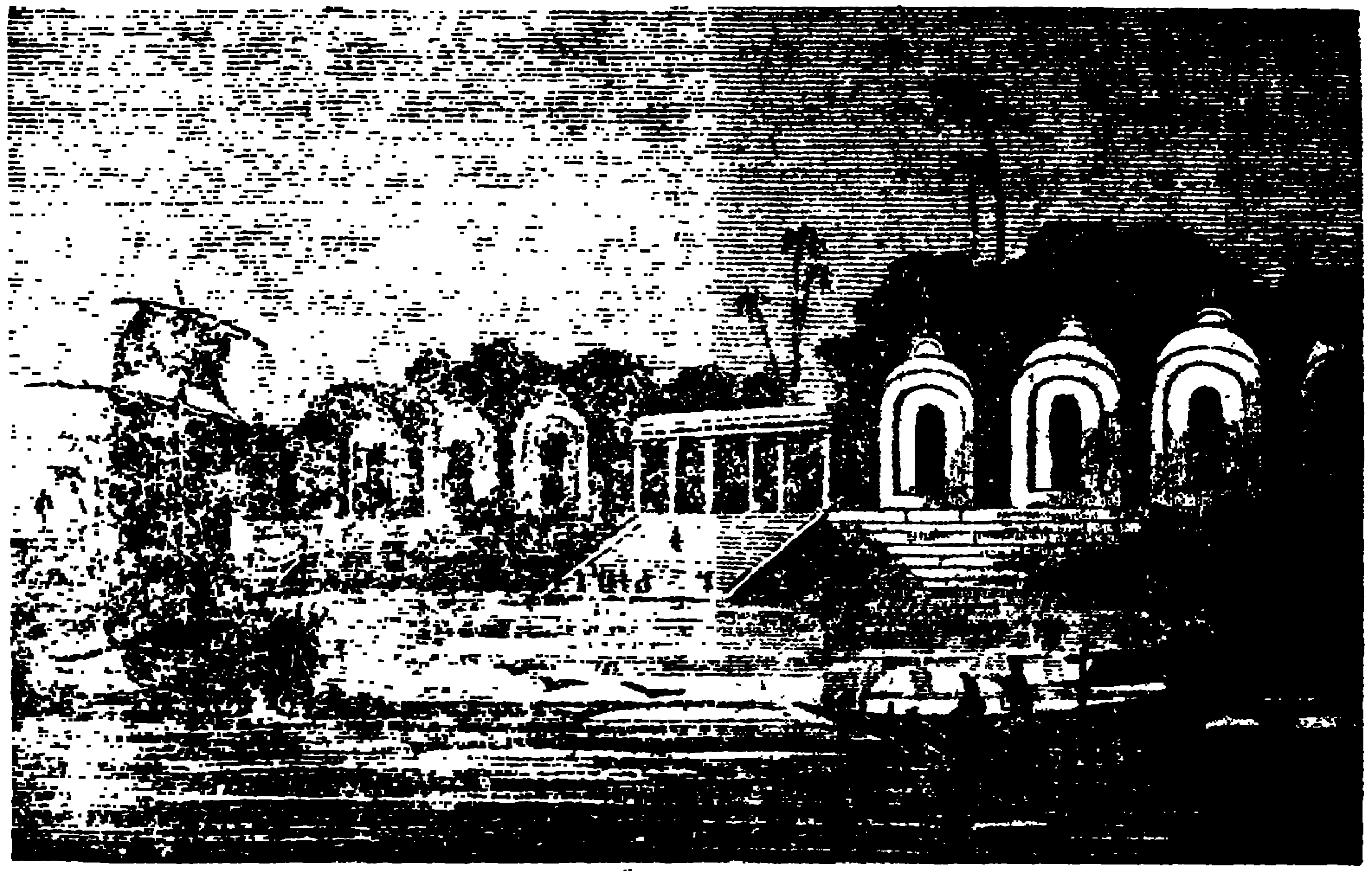

ভাগীরথী-তটে ['রহস্য-সন্দর্ভ,' শ্রাবণ ১৯২০ সংবৎ

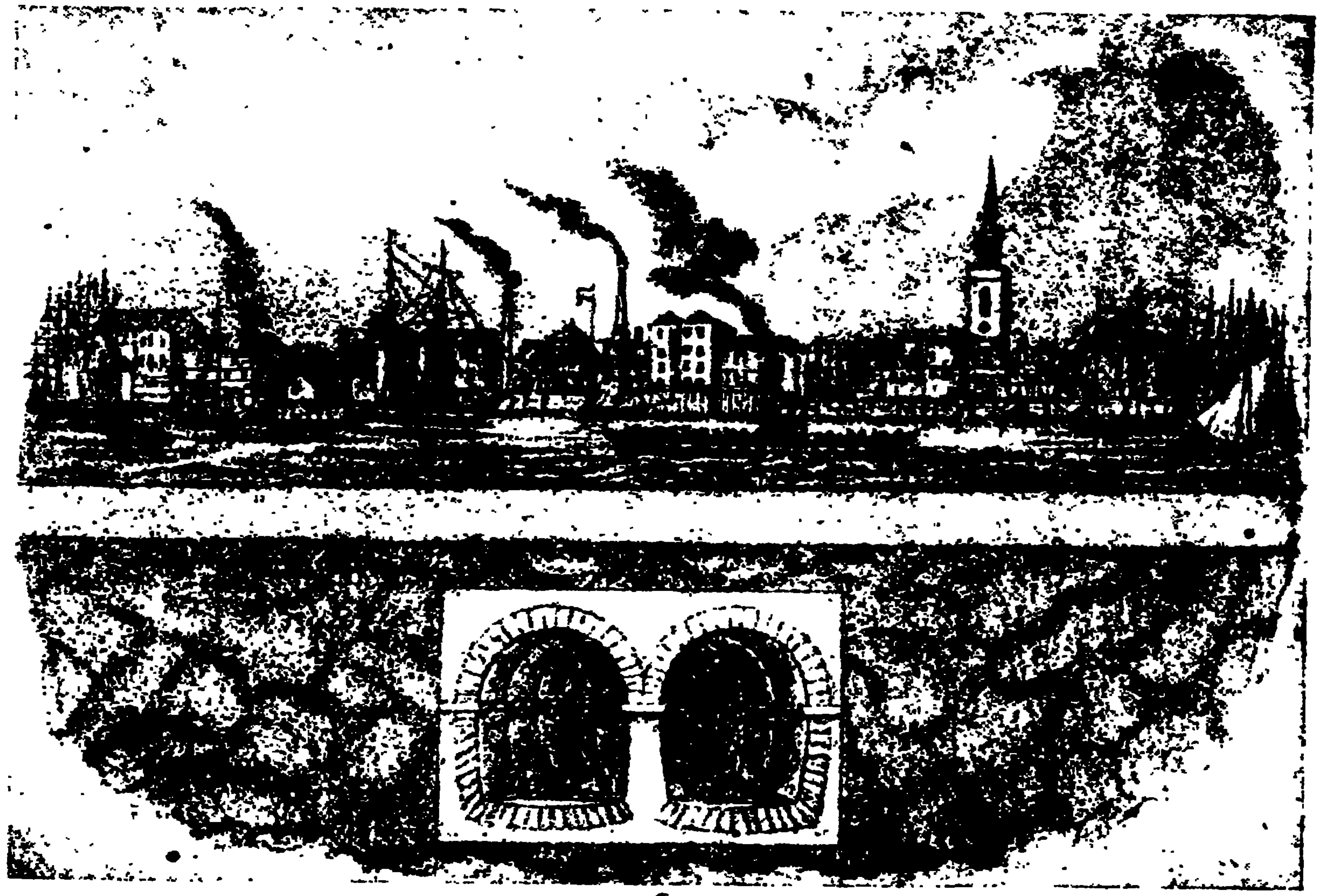

টেম্‌স নদী-তলের সুড়ঙ্গ ['বিবিধার্থ-সংগ্রহ,' মাঘ ১৭৭৩ শক

বৃক্ষ ['অরুণোদয়,' ১ অক্টোবর ১৮৫৭

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে 'সচিত্র ভারত সংবাদ' নামে আরও একখানি পাক্ষিক পত্রের উদয় হয়। "এই পত্রের প্রতি খণ্ডে দুইখানি করিয়া প্রতিমূর্ত্তি থাকিবেক, ঐ প্রতিমূর্ত্তি সকল বিখ্যাত ইংরাজ ও বাঙ্গালি লিথোগ্রাফার এবং এনগ্রেভারদিগের দ্বারা প্রস্তুত করান হইতেছে।"

অতঃপর আমরা সাময়িক-পত্রে চিত্রের দর্শন পাই—শিশির-কুমার ঘোষ-সম্পাদিত 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য়। ইহা প্রথমে সাপ্তাহিক পত্ররূপে বাংলা ভাষায় প্রচারিত হয়; ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় মাঝে মাঝে ব্যঙ্গচিত্র স্থান পাইত। ১৮৭২ সনের ২৮এ ফেব্রুয়ারি পত্রিকা-সম্পাদক লেখেন :—"এবারে আমরা নূতন এক প্রকার বিবিধ পাঠকগণকে উপহার দিলাম। ছবিটি তত ভাল হয় নাই, কিন্তু এই প্রথম। এতদ্দেশে যত ভাল হইতে পারে তাহার চেষ্টার ক্রটি করিব না। তবে প্রতি সপ্তাহে কি প্রতি মাসে কি আদবে আর ছবি দিতে পারি না পারি তাহা সাধারণের উৎসাহের উপর নির্ভর করে। একটি ছবি খুঁদিতে অনেক ব্যয়।"

বনমানুষ ['তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১ পৌষ ১৭৬৭ শক

১৮৭২ সনের ২রা মে তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় যে কার্টুনটি প্রকাশিত হয়, তাহার বিষয়—ছোট লাট ক্যাম্বেলের মডেল ডেপুটি। এ সম্বন্ধে রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—"লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সার জন ক্যাম্বেলের মাথায় ঢুকলো যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর জন্য এমন একটা সার্ভিস তৈরি করতে হবে, যাতে এক-একজন এক-একটা বিদ্যাকল্পদ্রুম হ'তে পারে। সাধারণ কেতাবি বিদ্যে ত থাকবেই, তার ওপর একটু কেমিষ্ট্রি, একটু বোট্যানি, সারভেয়িং, জিম্‌ন্যাষ্টিক, সাঁতার ইত্যাদি ইত্যাদি। সুরসিক শিশিরবাবু ক্যাম্বেলি সম্বন্ধে রহস্য কোরে তাঁর 'অমৃত বাজারে' একটি কার্টুন ছাপান, জিমন্যাষ্টিকের পোষাক-পরা, কোমরে একটি পিছন-দিকে-ঝোলান শিকলি আর কানে একটি চিম্‌টে (চিম্‌টেটা হচ্ছে কম্পাস)।"

সচিত্র বাংলা পত্র-পত্রিকার কথা আপাততঃ এইখানেই শেষ করিলাম। প্রবন্ধে যে-সকল পত্র-পত্রিকার উল্লেখ করিয়াছি তাহার প্রায় সবগুলিই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হইয়াছে।

চম্পক

শ্রীরমেশ দাশ

দোলে চম্পক মণিকাঞ্চন সম
বিদারি গভীর নিবিড় ছবির তম—
শাওন গগনে মেঘের নয়নে কনক বিজলী লিখা
অমা রজনীর মন্দির-ঘরে হিরণ প্রদীপশিখা।
দোলে চম্পক দোলে
অমাবস্যার কোলে
তারাক্রান্ত বক্ষের মাঝে মুক্তির নিঃশ্বাস
ব্যর্থসাধন মনের গহনে সঞ্চিত বিশ্বাস।

চম্পক দোলে রে
তমসার কোলে রে—
সৃষ্টিপাগল বৈজ্ঞানিকের মহান্ আবিষ্কার
বুদ্ধ যীশুর নয়নের পাতে মুক্ত ঝরণধার।
দোলে চম্পক দল
গন্ধে বিচঞ্চল
স্বর্ণ জ্যোতিতে হইয়া জ্যোতির্ম্ময়
কঠিন গহন অমানিশা করি জয়।

বিদ্রোহী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

একমাত্র ছেলে সুরপতি বাপের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারলে না। হাড়কৃপণ মহীপতির লক্ষ্মীর উপর অচলা ভক্তি। তাঁকে কায়েমি ভাবে বেঁধে রাখবার যত কিছু আয়োজন তার লেশমাত্র ত্রুটি সে করেনি। লক্ষ্মী যদি বা স্থাণুত্বের লক্ষণ প্রকাশ করলেন—ছেলে বেঁকে বসল। বললে, যে গাঁয়ে বাস করছি তার ভাল-মন্দ দেখতে হবে না!

যুক্তি দিলে মহীপতি, গাঁ তো মানুষ নয়—তার আবার ভালমন্দ কি।

তর্ক তুললে সুরপতি, মানুষ নিয়েই গাঁ, সেই মানুষ না বাঁচলে গাঁয়ের রইল কি! একটা হাসপাতাল দিন।

ইঃ—আমার গায়ের রক্ত-জল-করা টাকা—

টাকা আপনার নয়—প্রজাদের কাছে খাজনার দরুন—সুদের দরুন আদায় করেন নি?

বেশ করেছি। চড়ে উঠল মহীপতি। এ হ'ল উপার্জ্জন। কে উপার্জ্জন করে না শুনি?

আমি এ রকম উপার্জ্জন করব না।

তা করবে কেন! সব ক'টা পাস দিইয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করলাম কিনা—পরের গোলামি না করলে চলবে কেন! আইন শিখেছ বিষয়-সম্পত্তি বজায় রাখবে বলে—কোর্টে মক্কেল খোঁজবার জন্ত নয়।

সুরপতি বললে, এ অধর্ম্মের উপার্জ্জন।

মহীপতি চীৎকার করে উঠল, বটে! দূর-হ আমার সামনে থেকে।

সুরপতি চলে গেল সামনে থেকে। কিছুক্ষণ পরে জানা গেল সে গৃহত্যাগ করেছে।

২

ছেলে গৃহত্যাগ করলে—ছেলেকে ত্যাগ করতে পারলে না মহীপতি। ভাবলে—জোয়ান বয়সের ছেলেরা ও রকম একগুঁয়ে হয়েই থাকে। সে-ও একদা বাপের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিল। বাপ ছিলেন উদার। দীয়তাং ভুজ্যতাং পালপার্ব্বণ উপলক্ষে চলতই বাড়ীতে। লক্ষ্মী চঞ্চলা হতেই মহীপতি করেছিল প্রতিবাদ। বৃদ্ধ ওর একগুঁয়েমি দেখে দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন, আর কেন—আমায় কাশী পাঠিয়ে দে। এ বিষ গলায় জমিয়ে নীলকণ্ঠ হবার সাধ্যি আমার নেই—আমায় রেহাই দে।

বাপকে মুক্তি দিয়েছিল মহীপতি। লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠার অতঃপর কারেম দাপে ও সকলকায় হয়েছে। সেই লক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দেওয়ার বেদনা সুরপতি বুঝবে কেন! যাক না চলে—ফিরে আসতেই হবে। সংসার বড় কঠিন স্থান। এর আকাশে ভাবের ফানুস উড়িয়ে চিরটা কাল নিরুদ্বিগ্নে কাটে না কারও। সুরপতি অবশ্যই ফিরে আসবে।

আপন মনে হাসলে মহীপতি।

৩

সত্যই সুরপতি ফিরে এল। ফিরে এল গ্রামে, বাপের প্রাসাদে উঠল না সে। সে প্রজাদের ডেকে বললে, কেন সহ্য কর তোমরা এই পীড়ন? তোমাদের সর্ব্বনাশ করে যে ফুলে উঠেছে—সে তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল দেখতে বাধ্য। ইচ্ছেয় না দেয় জোর করে আদায় কর তোমাদের পাওনা।

মহীপতি দেখলে, এ তো মন্দ নয়। তার পয়সায় আইন শিখে বিষয়সম্পত্তি বজায় রাখা দূরে থাক—লক্ষ্মীকে উৎখাত করবার চেষ্টা করছে সুরপতি। অকৃতজ্ঞ সন্তান!

মহীপতি ফন্দী আঁটতে লাগল কি করে রেহাই পাবে এই সঙ্কট থেকে। চক্ষুলজ্জা বশতঃ সোজা পথটি বেছে নিতে পারল না। বাহ্যিক আচরণটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম ও সংযত করল সে—আর সেই সঙ্গে অন্তরের অন্তস্তলে পীড়ন অনুভব করল—শোণিতগত মোহের প্রচ্ছন্ন রূপই হোক কিংবা পিণ্ডগত দাবিই তার পিছনে থাকুক। আদেশটা অনুরোধের রূপ নিল।

সুরপতি বললে, আপোষ নেই—লক্ষ্মীকে লুটে নেবার কাজে বাধা দেব আমরা—জীবনপণ।

মহীপতিও কঠিন হয়ে উঠল—চক্ষুলজ্জা অতঃপর কেটে গেল।

এক দিন সুরপতি গ্রামের রঙ্গমঞ্চ থেকে সহসা অপসৃত হ'ল।

৪

বছরখানেক বাদে মহীপতি দেখলে, জমিদারির শাসনদণ্ড তার হাত থেকে খসে পড়ছে—মনের সাহস বাহুর শক্তির সঙ্গে অন্তর্হিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক নিয়মে যৌবনের পর জরা আসে—সম্পদের উদয় বিলয় এই নিয়মেরই অঙ্গ। লক্ষ্মী হয়ত চঞ্চলা হয়েছেন নতুবা একমাত্র ছেলের মতিগতি এমন হবে কেন?

মৃত্যুশয্যায় ছেলেকে অজ্ঞাতবাস থেকে আনিয়ে বললে, তোমারই জন্ত আমার এতকালের সঞ্চয়। ইচ্ছে হয় রাখ, ইচ্ছে হয় নষ্ট কর। আমি থাকব না—তুমিও থাকবে না—কিন্তু চৌধুরীবংশ থাকবে।

সুরপতি মৃদুস্বরে বললে, কিছুই থাকে না বাবা, মানুষের মত বংশের আয়ুও সীমাবদ্ধ।

মহীপতি বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল সুরপতির দিকে। চোখের কোণটা তার চক্ চক্ করে উঠল। বুক ঠেলে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘনিশ্বাস। মৃদুস্বরে বললে, তারা—তারা।

তারপর চোখ বুজল—আর চাইল না।

৫

সুরপতি সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। যে আদর্শকে ধ্রুবতারা করে সে বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল—সেই আদর্শ স্পষ্টতর হ'ল তার আচরণে। দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন—পাঠাগার প্রতিষ্ঠা—বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন—জলকষ্ট নিবারণ—যা সাধ্যে ও কল্পনায় ছিল—সুরপতি ত্রুটি করলে না কিছুই। প্রজারা ধন্য ধন্য করলে। সবাই বলে, রাম-রাজত্বের নমুনা আমরা গাঁয়ে বসেই পাচ্ছি—আমরা সুখী।

সুরপতি আত্মপ্রসাদ লাভ করল। ভাবলে, যা আমার সাধ্যায়ত্ত সবই করলাম—এতে মানুষ সন্তুষ্ট হবে না কেন।

কিন্তু এক দিন তার ভুল ভাঙল।

বেলা মধ্যাহ্ন; আহার সেরে অন্দরের গলিপথ দিয়ে আসছিল সদরে। তার প্রসঙ্গ কানে যেতেই থমকে দাঁড়াল একটু। উমাপতি ও অরুন্ধতী—তারই ছেলেমেয়ে—তর্ক করছে পাশের ঘরে। তর্কটা চলছে গতকাল আর বর্ত্তমান নিয়ে।

অরুন্ধতী বলছে, যাই বল দাদা—বাবা এসব বিষয়ে উদার।

উমাপতি উত্তর দিলে, না, উনি রক্ষণশীল। দু'কালের সঙ্গে মিলিয়ে পথ চলতে চান।

তাতে ক্ষতিটা কি? অরুন্ধতীর কণ্ঠ।

ক্ষতি এই—আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে পিছুতে পারি না—সামনে আমাদের এগুতেই হবে। পাহাড় থেকে নেমে জল কখনও পাহাড়ে ফিরে যায়?

মানুষ জল নয়।

মানুষ সজীব—তাই কালের গতিতে সে এগিয়ে চলবে। বাবা রক্ষণশীল না হলে এই প্রাসাদ এতদিন গরীবদের ছেড়ে দিতেন।

চমকে উঠল সুরপতি। এরা বলে কি! প্রাসাদই যদি ছাড়ব তো দেশের মঙ্গল করব কি দিয়ে। অর্থ হচ্ছে ক্ষমতা—যার সুষ্ঠু প্রয়োগ সমাজকে সুস্থ রাখে—অপপ্রয়োগ সমাজকে বিষাক্ত করে।

সেই উত্তরই দিলে অরুন্ধতী, বাবা তো টাকাকে আটকে রেখে সমাজকে বিষিয়ে তুলছেন না?

কিন্তু ক্ষমতা ওঁকে পেয়ে বসেছে। ক্ষমতার ওপর ওঁর মোহ জন্মেছে—একে বিশ্বাস করা কঠিন।

কি যে বল—সব ছেড়ে ছুড়ে ফকিরী নিলেই বুঝি সমাজের মঙ্গল করা যায়?

না রে—ক্ষমতা যখন পেয়ে বসে—তখনই তাকে ভয় করি। বাবা হয়ত কারো অনিষ্ট করেন নি—কিন্তু উপরে বসে আদেশ করবার ইচ্ছা ওঁর বেড়েই চলেছে।

সুরপতি সরু পথটুকু অতিক্রম করে বৈঠকখানায় এল। চিন্তাযুক্ত—সন্দেহমলিন। এরাও তার আচরণকে সন্দেহের চোখে দেখছে—তাকে মনে করছে ক্ষমতাপ্রিয়! এরা কি জানে না—তার বিদ্রোহের ইতিহাস?

৬

উমাপতি ও অরুন্ধতীকে ডেকে সুরপতি বললে, স্পষ্ট আর সত্য কথা আমি ভালবাসি। সত্য করে বল ত—আমার আচার-আচরণ সম্বন্ধে তোমাদের মনে কোনও সন্দেহ হয়েছে? আর কেনই বা হ'ল সন্দেহ।

ওরা ভাইবোনে দৃষ্টি বিনিময় করলে।

অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি বললে, না বাবা, আপনার কাজের ভুল ধরব—এমন স্পর্দ্ধা—

না—না—স্পর্দ্ধার কথা নয়। ভুল সকলেরই হয়। এক কালের কর্ত্তব্য—আর এক কালে কর্ত্তব্য থাকে না। ছেলের পানে চেয়ে বললে, তুমি কি বল উমা, থাকে?

উমাপতি মৃদুস্বরে বললে, সবাই যদি তা বুঝত!

আমায় বুঝিয়ে দাও তোমরা—

অরুন্ধতী ইঙ্গিতে নিষেধ করলে উমাপতিকে।

উমাপতি বললে, সে বোঝানো শক্ত। আপনারা যা জন্মগত ন্যায় ও সত্য বলে জেনে এসেছেন—

শোন উমা! সুরপতির স্বর দৃঢ় হ'ল—আত্মপ্রত্যয়ে। বললে, যা সত্য—তা চিরকালের সত্য। আর সেই অনুযায়ী যে কাজ করা যায় তা ন্যায়।

উমাপতি বললে, এক যুগের বিধান অন্য যুগে—অচল।

বিধান কালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরি—কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করবে না কোন যুগ। সুরপতির কণ্ঠস্বরে ঘরখানা গম গম করে উঠল।

উমাপতি বলল, একটা কথা বলব—রাগ করবেন না?

এ কথায় দুঃখ পেলাম উমা—তোমাদের সে শিক্ষা দিয়েছি কি কোন দিন?

উমাপতি লজ্জিত হয়ে মাথা নামালে। বললে, তাই আমাদের যথেষ্ট সাহস বেড়েছে।

সুরপতি তার লজ্জা দেখে মনে মনে প্রসন্ন হ'ল। বললে, বল কি বলবে।

ধরুন বিয়ের কথা।...মাথা না তুলেই সে এক নিঃশ্বাসে বলে চলল, আজ আমি যদি—ভিন্ন জাতের মেয়েকে বিয়ে

কন্নি—কিংবা বিয়ে না করেও কাউকে বেছে নিই সঙ্গিনী হিসাবে—সইতে পারবেন আপনি ?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন—স্তম্ভিত করে দিল সুরপতিকে। সমাজগত এই প্রশ্নটি যে এমন জটিল হবে—এ কল্পনা সে করেনি স্বপ্নেও। কিন্তু মুহূর্ত্তে তার সে ভাব কেটে গেল। বললে, ভিন্ন জাতের কথা বলছ কেন ? তার মনে হ'ল, তার গলা দিয়ে আর কারও ধ্বনি বার হচ্ছে।

উমাপতি বললে, স্বজাতির সঙ্গে বিয়ে এক কালের বিধান সত্য আর ন্যায়ের উপর গড়া বিধান—কিন্তু বাবা, আজ যদি কেউ বলে, মানুষের আবার জাতি কি—সে তো একই জাতি—

বাধা দিলে সুরপতি। এক জাতি বললেই সমস্যাটা মিটল না উমা। কর্ম্মভেদে—জাতিভেদে—এ বিধান বহু কালের আর সব কালের। কর্ম্মের ব্যাখ্যা নানান রকম হতে পারে কিন্তু বিভাগটা যে গুণগত। তোমাদের সাম্যবাদী সোভিয়েটও সেই বিধান মেনে নিয়েছে।

সোভিয়েটের কথা থাক, কিন্তু মানুষ জাতিভেদ মানবে কেন স্বইচ্ছায় ? বিভাগ এলেই আসবে প্রভুত্বের ইচ্ছা। ও নীচু—আমি উঁচু—এই অহঙ্কার থেকেই—অকল্যাণের সৃষ্টি হবে।

সুরপতি বললে, ভেবে দেখি—দিনকতক পরে তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দেব।

উমা বললে, এটা আমাদের প্রশ্ন নয়—জীবন-মরণের সমস্যা। এই সত্যকে যতক্ষণ স্বীকার করতে না পারব আমরা—ততক্ষণ আমাদের কল্যাণ নাই।

আচ্ছা, ভেবে দেখি। অসহিষ্ণু কণ্ঠে সুরপতি বললে, বিভাগটা মানুষের ইচ্ছায় সৃষ্টি হয় নি—ওটা আসতে বাধ্য।

৭

ভাবতে লাগল সুরপতি। গভীর অভিনিবেশ সহকারে প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা দিক দিয়ে বিচার করলে কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারলে না—এক দিন স্বইচ্ছায় যে গোষ্ঠী-আনুগত্য স্বীকার করেছিল অরণ্যচারী মানুষ, তা ভেঙে দেবার ইচ্ছা কেন জাগছে তার মনে। বহু দুঃখ কষ্ট বিপদ অসুবিধা সয়েই মানুষ বেছে নিয়েছিল এই প্রথা। তার পর সভ্যতা সংস্কৃতির আলো জ্বেলে সে বহু দূর অগ্রসর হয়েছে। সুন্দর পৃথিবী আজ পূর্ণত্বের পথে। এরা ভাঙতে চায় এই সভ্যতাকে—নষ্ট করতে চায় সংস্কৃতিকে। মানুষের আদি কামনায় যা প্রতিষ্ঠিত—তারই পূজারী হ'ল এরা। এই যদি স্বাধীনতার অর্থ হয়, যদি কল্যাণের ভিত্তি হয় তা হলে অন্ধকার যুগের মানুষরা কি দোষ করেছিল!

সামাজিক এই বিপ্লবকে কিছুতেই স্বীকার করতে পারলে না সুরপতি। ধনসাম্যবাদ আনতে হলে—পুরাতন সমাজ-ভিত্তিতে আঘাত করতেই হবে—এ যুক্তি দুর্ব্বল বলে মনে হচ্ছে। বিভাগের বিধানটা আপনি পড়ে নি আকাশ থেকে—অমনি গজায় নি মাটি থেকে—ওটা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল—স্বতঃস্ফূর্ত্ত। নানা দিক প্রসারী প্রজ্ঞাকে অস্বীকার করা চলে না। শ্রেণীভেদ হবেই। উদ্ভিদ-জগতে এর দৃষ্টান্ত আছে—প্রাণী বা পক্ষী জগতেও দৃষ্টান্ত আছে। এই পরীক্ষার প্রথম পর্য্যায়ে রাশিয়াও উত্তীর্ণ হতে পারে নি। তার মজুরের আর বাস্তকারের আয়ের তফাৎ আকাশ-পাতাল। সম-অধিকারবাদ মেনে নিয়েও—সেখানে কেউ চড়ছে মোটরে—কেউ হাঁটছে পায়ে। আসল কথা, ওটা হ'ল বাহ্যিক অংশ। কল্যাণ যা গড়ে—তা অন্তরের প্রসারে—দরদে। সেবার ব্যাকুলতা না জাগলে জন-কল্যাণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

উমারা ভুল বুঝেছে—ওদের বিদ্রোহের পিছনে নাই কোন সুচিন্তিত প্রণালী—কিংবা লক্ষ্যে পৌঁছবার নাই কোন সুনির্দ্দিষ্ট বিন্দু।

৮

কয়েক দিন চিন্তার পর উমাপতিকে ডেকে পাঠালে বৈঠকখানায়। চাকর খবর নিয়ে এল—তিনি দেশে গেছেন। দেশ মানে পাড়াগাঁয়ে? কেন? কেন'র উত্তর একখানি সংক্ষিপ্ত পত্রে জানিয়েছে উমাপতি। লিখেছে:

বাবা, পরীক্ষা দিতে চললাম। আপনার উত্তর যাই হোক—আমাকেও নিজের কাজের দ্বারা উত্তর পেতে হবে। সর্ব্বপ্রথমে ভাঙব সামাজিক প্রথাকে। আপনারা যাকে হরিজন বলেন, তেমন বংশের কোন মেয়েকে সঙ্গিনী করে কাজে নামব। যাদের কল্যাণ করব—তাদের দূরে রেখে খানিকটা ভক্তি সম্ভ্রম আর মর্য্যাদা আদায় করব না—এই স্থির করেছি। ওরা যে ওরা—আমরা যে আমরা এটা মুছে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। পারি কিংবা হারি—সে জবাব ভবিষ্যতের থাকুক।

স্তম্ভিত সুরপতির বাঙনিষ্পত্তি হ'ল না—এমন আঘাত সে প্রত্যাশা করে নি।

অরুন্ধতীকে ডেকে চিঠিখানি তার হাতে দিয়ে বললে, পড়।

অরুন্ধতী চিঠি পড়তে লাগল, সুরপতি একদৃষ্টে তার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করতে লাগল।

চিঠি পড়ে সেখানা ভাঁজ করে অরুন্ধতী নিরুত্তরে বাপের হাতে ফিরিয়ে দিলে, কোন মন্তব্য করলে না।

সুরপতির বিস্ময় বাড়ল। বললে, তুই যে কিছু বললি না অরু ?

আমি! চমকে উঠল সে। বুঝি সঙ্কোচ লজ্জায় মুখখানি ওর ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল। ঠিক মাথা নামিয়ে নয়—মুখ

ফিরিয়ে ধীরে ধীরে উত্তর দিলে, বেশ ত, দাদা পরীক্ষা করুক না।

এ পরীক্ষার কোন মানে হয়!

পরীক্ষার মানে আর কি—তা ফলের উপরই নির্ভর করে।

ওকে সমর্থন করছ তুমি! ক্ষোভে বিস্ময়ে সুরপতির কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হ'ল।

আপনি তো আমাদের ভালমন্দ বেছে নেবার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন বাবা। একটু থেমে বললে, দাদা প্রায়ই বলত—যে পৃথিবী সম্পূর্ণ হ'ল সে পৃথিবী আমাদের নয়। কিছু করবার না থাকলে বেঁচে থাকবার অর্থ কি!

ভিতরের অবরুদ্ধ বাষ্প প্রবল প্রতিবাদে ফেটে পড়তে চাইল—অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করল সুরপতি। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল অরুন্ধতীর দিক থেকে। সে দৃষ্টিতে আগুনের উত্তাপ কখন বাষ্পে রূপান্তরিত হয়েছে—বুঝতে পারে নি সে।

সুরপতি ভাবলে, এই ধরণের পরীক্ষার অর্থ যাই হোক—এটা মানুষের স্বভাব। বিদ্রোহটা মানুষের প্রবৃত্তিগত একটি জিনিষ—যা যুক্তি কিংবা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়—যার হেতু খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র!

হয়ত ঠিক কথাই বলেছে উমা। জগৎ সম্পূর্ণ ও সুন্দর হলে মানুষের করণীয় কিছু থাকবে না বলেই—এই প্রবল বৃত্তি মানুষের অন্তরে রয়েছে। তবু একে মেনে নেওয়া···

দৃঢ় সঙ্কল্পে সে ঘাড় নাড়লে, না, উমাপতিরা ভুলই বুঝেছে—।

পরম ক্ষণ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

এ-পার ও-পার, দু-জনে যে আজ দু-পারের অধিবাসী;
মধ্যে উথলে অশ্রু-সাগরে লবণ-অম্বুরাশি।
দিগন্তলীন অসীমে কোথায় অবলম্বন পাই,
স্মৃতির সেতু যে রচনা করিয়া চলি চিরদিন তাই।
একবার শুধু আসে মানুষের জীবনে পরম ক্ষণ,
তার পর সারা-জীবন ভরিয়া তাহারি অন্বেষণ।
হৃদয় কেবলি হৃদয়ে জানায় সকরুণ আহ্বান,
বৃথা এ মিনতি, নিয়তি সেথায় নিয়ত বর্ত্তমান।
নিঠুর পরিহাস,
এ জীবন চির-পরিচিতে খুঁজে না-পাওয়ার ইতিহাস।

একদা সে কবে আসিয়াছিলাম তুমি আমি কাছাকাছি,
মনে হ'ল কোন্ স্বপ্নের মাঝে যেন আজ জাগিয়াছি।
নবীন সূর্য্যে সোনার দীপ্তি, চন্দ্র কিরণে মায়া,
চরণ-ছন্দ-নন্দিত পথে ছবি এঁকে যায় ছায়া।
যে গান শুনি নি অন্তর-তারে বাজে তার ঝঙ্কার
পুষ্পে পুষ্পে বর্ণ-সুষমা, বাতাসে গন্ধভার।
কিছু নাই আজ অসম্পূর্ণ, সবি হ'ল সুন্দর,
প্রতিদিবসের প্রকৃতিতে এ কি ঘটিল রূপান্তর!
আসে দিন একবার,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে মিলে গিয়ে সব হয়ে যায় একাকার।

সে সুর মিলায়, সে আলো মিলায়, ঝরে না জ্যোৎস্নারাশি,
নিপীড়িত বীণা কেঁদে থেমে যায়, বাজে না ব্যাকুল বাঁশী।
বন্দী হৃদয় গুমরিয়া মরে, কোথা আনন্দময়
অকস্মাতের রহস্য-ভরা সে পরম বিস্ময়।
সহসা দেখি যে তুমি কাছে নাই, দূরে—বহুদূরে আমি,
ধরণীর বুকে কুজ্ঝটিকার আবরণ আসে নামি।
ভুবন-ভরা সে মাধুরীর আর মেলে না কো সন্ধান,
দু-জনের মাঝে অপার সাগর, অলঙ্ঘ্য ব্যবধান।
দিন যদি ফিরে আসে!
মথিত চিত্ত নিশ্বসি উঠে, অদৃষ্ট শুধু হাসে।

তুমিও একাকী, আমিও একাকী, জানি জানি, তবু জানি,
অন্ধকারের বুকে ফুটে উঠে নব-আলোকের বাণী।
হয়ত জীবনে অপূর্ণ থাকে মর্ত্ত্যভূমির আশা,
মিলন ক্ষণিক, মনে রেখো তবু ভুল নয় ভালবাসা।
বৃথা প্রতীক্ষা, হয়ত জীবনে ফেরে না পরম ক্ষণ,
একেলা মানব কেঁদে কেঁদে ফেরে, বিরহ চিরন্তন।
সেই নিঠুর দ্বন্দ্বে হয়ত অদৃষ্ট জয়ী হয়,
ভালবাসা তবু ভাগ্যের কাছে মানে না কো পরাজয়।
হোক্ এই বিধিলিপি!
চির-বিরহের বহ্নি-দহনে প্রেম হয় চিরজীবী।

মধ্যভারতের গৌড়রাজসভায় বাঙালী পণ্ডিত

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গলার বাহিরে সুদূর আগ্রানগরীর নিকটে এক "গৌড়-রাজ্যে"র অস্তিত্ব যেমন আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তেমনই অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় সেই গৌড়-রাজগণের প্রশস্তিকার "গৌড়ীয়" অর্থাৎ বাঙালী মহাকবি এবং মহাপণ্ডিত দুই জনের কথাও বাঙ্গলাদেশে আজ সমুচিত গৌরব ও প্রচারলাভে বঞ্চিত হইয়া আছে। এ বিষয়ে প্রবন্ধান্তরে আমরা যে সূচনা করিয়াছি (প্রবাসী, পৌষ ১৩৫৪, পৃ. ২৪৪-৫) তাহারই বিবৃতি বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল।

গৌড়ক্ষত্রিয়: রাজপুতানার ইতিহাস পাঠে জানা যায় "৩৬ রাজকুলে"র মধ্যে একটি হইল 'গৌড়' (টডের রাজস্থান, ১ম খণ্ড, ৭ম অধ্যায়)। এই ক্ষত্রিয়বংশের আদিস্থান ছিল আজমীর এবং ইহা পাঁচ শাখায় বিভক্ত ছিল। চিতোর-রাজ খোমানের রাজত্বকালে (৮১২-৩৬ খ্রীঃ) খোরাসান-পতি (আলমামুন) চিতোর আক্রমণ করিলে যাঁহারা চিতোর-রাজের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে "আজমীরের গৌড়"দের উল্লেখ আছে (ঐ, মেবারকাহিনী, ৪র্থ অধ্যায়)। টড সাহেব লিখিয়াছেন, পৃথ্বীরাজের সময় একজন গৌড়নরপতি মধ্যভারতে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে শেষ গৌড়নরপতি "রাধিকা-দাস" সিন্ধিয়ার হস্তে পরাজিত হন এবং গৌড়রাজ্যের রাজধানী "শিওপুর" (অধুনা গোয়ালিয়রের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত) তাঁহার অধিকারে চলিয়া যায়—তৎকালে ঐ গৌড়রাজ্যের রাজস্ব ছিল প্রায় ১২ লক্ষ মুদ্রা। পরাজিত গৌড়রাজ ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরম বৈষ্ণব হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। টড সাহেবের মতে বাংলার আদিরাজগণও এই গৌড়বংশীয় ছিলেন এবং তদনুসারেই বাঙ্গলার রাজধানী গৌড় আখ্যা লাভ করিয়াছিল।

কৃপারামের গৌড়রাজ্য: এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব রাজা ও রাজ্যের নাম "রামপ্রকাশ" নামক স্মৃতিগ্রন্থের প্রারম্ভে সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল (Eggeling: *Ind. Off. Cat.* p 50)। রামপ্রকাশের দুইটি মাত্র প্রতিলিপি লণ্ডনে রক্ষিত আছে, (*ib*, pp. 503 & 531) একটি বঙ্গাক্ষর ও একটি নাগরাক্ষর। গত ১৯৩৯ সনে নবদ্বীপের সাধারণ পাঠাগারে আমরা এই দুর্লভ এবং মূল্যবান্ গ্রন্থের একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আবিষ্কার করি—নাগরাক্ষর পত্রসংখ্যা ৪৪৯। প্রারম্ভের তৃতীয় শ্লোকে গ্রন্থসম্পাদক শিবভক্ত রাজা কৃপারামের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া লিখিত হইয়াছে:

> যদ্বুদ্ধিঃ সদসদ্বিবেকনিপুণা প্রাগেব জাগ্রদ্যশো-
> জাহাঙ্গীর-মহীমহেন্দ্রগণিতা শ্রৈষ্ঠ্যেন সদ্বুদ্ধিষু।

অর্থাৎ—তাঁহার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিকৌশল সম্রাট্ জাহাঙ্গীরও প্রশংসা করিতেন। পঞ্চম শ্লোকে তাঁহার পুত্র গোবর্দ্ধনের বীরত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। ষষ্ঠ শ্লোকটি এই:—

> শ্রীমদ্ভূপসমূহবন্দিতপদ-শ্রীসাহজাহাঁ-কৃপা-
> পাত্রং যাদবরায়-বর্ম্মতনয়ো মাণিক্যচন্দ্রান্বয়ঃ।
> গৌড়ক্ষত্রকুলোদ্ভবো ভুবি কৃপারামাভিধো ভূমিপো
> গ্রন্থং ধর্ম্মকৃতাং কৃতে রচয়িতুং তস্মিন্ মনো যো দধৌ॥

অর্থাৎ—গৌড়ক্ষত্রিয় মাণিক্যচন্দ্রের বংশধর যাদবরায়ের পুত্র রাজা কৃপারাম সম্রাট সাহজাহানের কৃপাপাত্র ছিলেন এবং ধর্ম্মনিষ্ঠদের জন্ত এই গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেন।

গৌড়রাজ্যের অবস্থান: কৃপারামের গৌড়রাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা লণ্ডনস্থ পুথির বিবরণ হইতে জানা যায় না। নবদ্বীপের পুথির শেষে যে পুষ্পিকা আছে তাহাতে ৬ শ্লোকে যুবরাজ গৌড়-গোবর্দ্ধন, রাজা কৃপারাম ও গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা "ভট্টাচার্য্য শতাবধানে"র স্তুতির পর গ্রন্থসমর্পণ বর্ণিত হইয়াছে এবং তৎপর নিম্নলিখিত সমাপ্তি বাক্যে গ্রন্থ, গ্রন্থকার, রচনাকাল ও লিপিকারের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে:—

ইতি গৌড়-ক্ষত্রকুলাবতংস-যাদবরায়াত্মজ-মাণিক্যচন্দ্রান্বয়-মহামতিক-পরমজ্ঞানি-বিরাজমানমানোন্নত-কীর্ত্তিপ্রতাপোর্জ্জিত-নৃপতি-শ্রীকৃপারামা (+ সুনীত-শ্রীশতাবধানভট্টাচার্য + এই অংশ পরে পার্শ্বে সংযোজিত হইয়াছে) বিরচিতঃ কালতত্ত্বার্ণব-সন্তরণোপায়সেতুভূততিথ্যাদিকালনির্ণায়কো রামপ্রকাশনামা গ্রন্থঃ সমাপ্ত ইতি সংবৎ ১৭০৪ বর্ষে কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ রবিবারান্বিতায়াং বৃশ্চিকলগ্নে শুভস্থানে "ইন্দুরখী"-নামনগরে॥

শ্রীকৃপারামনামগৌড়রাজ্যে তস্যাত্মজ-শ্রীগোবর্দ্ধন-গৌড়রাজ্যে তস্যাত্মজ-শ্রীপহারসিংহগৌড়রাজ্যে শুভং॥

মাধ্যন্দিনীয়শাখায়াং যজুর্বেদাধ্যায়ি-শ্রীমহাযাজ্ঞিক-বাধাগ্নি-হোত্রিণাং স্বীয়াত্মজশ্রীদুর্বাসোগ্নিহোত্রিণঃ পাঠার্থং শুভং পুস্তক-মিদং লিখিতং। "অন্তর্বেদি"স্থ-বিপহলী গ্রামীয়শুক্লাভিধায়িনা।

> যাদৃশং পুস্তকং দৃষ্টং তাদৃশং লিখিতং ময়া।
> যদি শুদ্ধমশুদ্ধং বা মম দোষো ন বিদ্যতে॥ শুভং॥

সর্ব্বশেষে বাঙ্গলা অক্ষরে শেষ স্বত্বাধিকারীর নাম লিখিত আছে:—শ্রীআনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্যস্য পুস্তকমিদং শাং গুপ্তপাড়া মিরডাঙা।

যে সকল তথ্য এস্থলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা সাবধানে নির্ণয় করা আবশ্যক। এই বিরাট গ্রন্থ রাজা কৃপারামের নামেই প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রতিলিপিকার এ স্থলে এবং গ্রন্থমধ্যেও প্রত্যেক প্রকরণের শেষে (৫৮।১, ৯৪।২,

৩৭৪।২, ৩৯৫।২ প্রভৃতি পত্রে) "কৃপারাম-বিরচিতঃ" স্থলে "কৃপারামাহূনীত-শ্রীশতাবধান-ভট্টাচার্যবিরচিতঃ" পাঠ যোজনা করিয়া প্রকৃত রচয়িতার সম্বন্ধে সকল সন্দেহের নিরসন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, সময়নির্দেশটি (১৭০৪ সম্বৎ কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমী রবিবার অর্থাৎ ২৪ অক্টোবর ১৬৪৭ খৃঃ *) গ্রন্থ-রচনারই বটে, প্রতিলিপির নহে। কারণ প্রতিলিপির অক্ষর ও কাগজ খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। তৃতীয়তঃ, "ইঁন্দুরখী"-নগরে বসিয়া গ্রন্থকার শতাবধান ভট্টাচার্য্য রচনা সমাপ্ত করেন। "গৌড়রাজ্যে"র অন্তর্গত এই নগর গোয়ালিয়র রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে এখনও বিদ্যমান থাকিয়া ঐ চিরবিলুপ্ত রাজ্যের অবস্থান সূচিত করিতেছে। চতুর্থতঃ, ১৬৪৭ সনে রাজা কৃপারাম প্রাচীন হইয়াছিলেন, তাঁহার পৌত্র "পহার-সিংহ"ই বোধ হয় তখন প্রাপ্তবয়স্ক। অন্তর্বেদির লেখক-লিখিত অগ্নিহোত্রির এই গ্রন্থ কি করিয়া গুপ্তিপাড়ায় আসিল তাহার রহস্য দুর্জ্ঞেয় হইলেও অনুমেয়। গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে ভাদ্র মাসে অগস্ত্যোদয়ের গণনা বিবৃত হইয়াছে। অগস্ত্যোদয় বর্ষাকালের অবসান সূচনা করে। গ্রন্থকার এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মূল্যবান্ মন্তব্য করিয়াছেন:—

এবঞ্চ "অর্গলায়াং" মহারাজ-চক্রবর্ত্তিনগরে ষড়ঙ্গুলপরিমিতা তত্র মধ্যাহ্নে শঙ্কুছায়া ৬ ভবৃতি। ...সিংহস্থসূর্য্যস্য ২০-তমাংশানন্তরে নিশান্তে অর্গলাপুরে অগস্ত্যোদয়ঃ। "লাহাম্বির"-মধ্যেপি ভূপতি-কৃপারামরাজধান্যাং প্রায়স্তথৈবেতি। (৪৩১-২ পত্রে) অর্গলা সম্রাট সাহজাহানের রাজধানী আগ্রানগরীর দেবভাষায় রূপান্তর। বুঝা যায় গ্রন্থকার রাজা কৃপারামের সহিত আগ্রায় গমন করিয়া স্বয়ং মধ্যাহ্নসূর্য্যের শঙ্কুছায়া নিরূপণ করিয়াছিলেন। কৃপারামের রাজধানী লাহাম্বিরও আগ্রার দক্ষিণে গোয়ালিয়র রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে উল্লিখিত ইঁন্দুরখীর দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। সুতরাং রাজা কৃপারামের "গৌড়রাজ্যে"র অবস্থান সম্বন্ধে অতঃপর সকল সন্দেহ নিরস্ত হয়। টড লিখিত শিবপুরের গৌড়রাজ্যের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

শতাবধানের পূর্ব্বপুরুষ:—রামপ্রকাশ গ্রন্থে শতাবধান ভট্টাচার্য্য স্বয়ং নিজের কিছুমাত্র পরিচয় দেন নাই। তৎপুত্র চিরঞ্জীব "বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী" গ্রন্থে শতাবধানের অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিলেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ পরিত্যাগ করিয়াছেন—কেবল রাঢ়ীয় কাশ্যপগোত্র দক্ষের বংশে শতাবধানের পিতা "কাশীনাথ সামুদ্রিকাচার্য্যে"র নামোল্লেখ করিয়াই শেষ করিয়াছেন। এই সামান্য কুলপরিচয়ও অন্যত্র দুর্লভ (cf. M. Chakravarti: J. A. S. B, 1915, p. 291) এবং চিরঞ্জীব তজ্জন্য ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার প্রদত্ত ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া আমরা একাধিক রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে কাশীনাথ পর্য্যন্ত সমস্ত পূর্ব্বপুরুষের নাম ও প্রচুর পারিবারিক পরিচয়াদি বিবরণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি—তাহার সারসঙ্কলন লিখিত হইল। চট্টোপাধ্যায়-বংশের আদিকুলীন বহুরূপ (ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী, পৃ. ১), তৎপুত্র গাঙ্গী (ঐ, পৃ. ৫), তৎপুত্র সর্ব্বেশ্বর "অবসথী" (পৃ. ৯), তৎপুত্র অচ্যুত (পৃ. ১৬), তৎপুত্র নীলাম্বর, তৎপুত্র হরি, তৎপুত্র চণ্ডীদাস (ভৈরবী মেল) তৎপুত্র শ্রীকর, তৎপুত্র বৈষ্ণব মল্লিক, তৎপুত্র গোপীনাথ, তৎপুত্র অনন্তাচার্য্য ('অকৃতী' অর্থাৎ কুলহানি), তৎপুত্র কাশীনাথ "সামুদ্রাচার্য্য", তৎপুত্র শতাবধান ভট্টাচার্য্য (আদিকুলীন হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ—সাঙ্কাডাঙ্গার কুলপঞ্জী ২১৪ পত্র ও জয়ন্তীপুর ২১৬।১ পত্র)। শতাবধানের মাতুলবংশ নবদ্বীপের একটি প্রসিদ্ধ বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী—গয়ঘড়ী দিবাকর মিশ্রের সন্তান কাশীনাথ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন (প্রায় ১৫৫০ খ্রীঃ)। তাঁহার তিন জামাতা, প্রথম কাশীনাথ সামুদ্রিকাচার্য্য, দ্বিতীয় ভবানন্দ মজুমদারের পুরোহিত গাঙ্গুলী রাঘব চক্রবর্ত্তী ও তৃতীয় চট্ট গোপীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার—শেষোক্ত ব্যক্তি শতাবধানের পরমগুরু কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমের দৌহিত্র ছিলেন।

শতাবধানের প্রতিষ্ঠা:—চিরঞ্জীবের বর্ণনানুসারে শতাবধান বাল্যকালেই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত হইয়াছিলেন:—

বাল্যেঽধীত্য সমস্তশাস্ত্রমতিতঃ সিদ্ধান্তবাগীশতঃ
বাগীশপ্রতিমো বভূব বিজয়ী বাদেষু বিদ্যাবতাম্।

(বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী ১।১০) তাঁহার উপাধির ব্যাখ্যা অন্যত্র দ্রষ্টব্য (ঐ, ১।১১-৩, প্রবাসী, পৌষ ১৩৫৪ পৃ. ২৪৪)। এই "অনন্যসাধারণ শক্তিশালী" পণ্ডিত প্রথমতঃ নবদ্বীপেই অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কারণ চিরঞ্জীবের "বাল্যে" রচিত মাধবচম্পূ গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে, চিরঞ্জীব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং তৎপর বহুকাল কাশীতে যাপন করেন:—

বাগ্‌দেবীবদনাদনাদিরচনাবিন্যাসদীব্যন্নব-
দ্বীপপ্রাপ্তজনেরনেকদিবসং বারাণসীবাসিনঃ।

(শ্লোকটিতে একটিমাত্র পদে নবদ্বীপের অপূর্ব্ব স্তুতিবাদ আছে—কে নবদ্বীপ সাক্ষাৎ সরস্বতীর মুখনির্গত নিত্য বাঙ্ময়ের রচনাবিন্যাসে শোভমান ছিল)। আমাদের অনুমান হয় শতাবধানের অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ বার্দ্ধক্যে কাশীগমন কালে দিগ্‌বিজয়ী শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন—ইহা প্রায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। কাশী হইতে ধর্ম্মপরায়ণ রাজা কৃপারামের আহ্বানে শতাবধান পরে সুদূর গৌড়রাজ্যে যাইয়া প্রতিষ্ঠা

* ২৪ অক্টোবর ১৬৪৭ রবিবারই বটে কিন্তু শুক্লাষ্টমী নহে শুক্লাসপ্তমী। সম্ভবতঃ লিপিকার সপ্তম্যাং স্থলে ভুল করিয়া অষ্টম্যাং লিখিয়াছেন। লক্ষ্য করিতে হইবে, এই তারিখ সম্রাট সাহজাহানের রাজত্বকাল মধ্যেই পড়ে।

লাভ করেন। চিরঞ্জীব তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থের শেষে পরিচয় প্রদানকালে পিতার প্রতিষ্ঠার কথা লিখিয়াছেন :—

দ্বৈতাদ্বৈতমতাদিনির্ণয়বিধিপ্রোদ্বুদ্ধবুদ্ধিঃ শ্রুতো

ভট্টাচার্য্যশতাবধান ইতি যো গৌড়োদ্ভবোঽভূৎ কবিঃ।

(অর্থাৎ যিনি কবি হইয়াও শাস্ত্রীয় মতে ভেদ ও ঐক্যমত্যাদি মীমাংসায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখাইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন)। রামপ্রকাশের শেষে স্বয়ং গ্রন্থকারও তাঁহার কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন :—

ভট্টাচার্য্য-শতাবধানকৃতিনি ন্যায়াদিশাস্ত্রার্থবিদ্-

বর্য্যে দ্বৈতমতে তদেকতরতো নির্ণায়কে ভূরিশঃ।

(৫ম শ্লোক)

(অর্থাৎ কৃতী গ্রন্থকার ন্যায়াদিশাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং মতভেদস্থলে একতরপক্ষে মীমাংসা বহুবার করিয়াছেন।)

রামপ্রকাশ রচনা :—এই বিরাট্ গ্রন্থরচনায় বহুকাল অতীত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তিনি রাজার নিকট প্রচুর সম্পত্তিও লাভ করিয়াছিলেন। প্রারম্ভের ৭ম শ্লোকে

ন্যায়াদিশাস্ত্রেষু কৃতশ্রমস্য স্মৃত্যর্থদৃষ্টেরিতগৌড়ভূতেঃ।

গ্রন্থেঽত্র নানামতনির্ণয়াপ্ত্যা শতাবধানস্য কৃতির্মুদে স্যাৎ॥

"ইতগৌড়ভূতেঃ" পদে (অর্থাৎ যিনি গৌড়রাজের নিকট সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন) তাহার স্পষ্ট সূচনা আছে। সম্পত্তির লোভই তাঁহার দূরদেশে আগমনের অন্যতর কারণ ছিল সন্দেহ নাই। আকবর হইতে সাহজাহানের সময় পর্য্যন্ত মোগল সম্রাটদের হিন্দুর শাস্ত্র ও ধর্ম্মের প্রতি প্রকট সহানুভূতি দেশীয় রাজগণকে এবং তাঁহাদের আশ্রিত পণ্ডিতগণকে রাজধানীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। শতাবধানের এই গ্রন্থ বঙ্গের বাহিরে রচিত হইলেও তিনি জন্মভূমির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নাই—বাঙ্গলার গ্রন্থসমূহ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বিচার করিয়াছেন। প্রারম্ভের ১০ম শ্লোকে তাঁহার উপজীব্য প্রমাণ-গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :—

হেমাদ্রি-মাধবাদীনাং গৌড়ানাং তত্ত্বদর্শিনাং।

সম্মতং সমভিজ্ঞায় গ্রন্থোঽয়ং পরিনির্ম্মিতঃ॥

"তত্ত্বদর্শী" গৌড়ীয় গ্রন্থকারদের মধ্যে আচার্য্যচূড়ামণি (৪১৫।১ পত্র), সময়প্রকাশকার (৪১১।২) ও পরিশিষ্ট-প্রকাশকার নারায়ণোপাধ্যায় (৩৬১।২), গৌড়ীয়কাল-কৌমুদীকার (৩২৭।১) ও স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের (৪৩৫।১) নাম উল্লেখযোগ্য। অন্য গ্রন্থের মধ্যে স্মৃতিদর্পণ (৪৪৩।২) ও মেধাতিথির জ্যোতির্নিবন্ধ (৪০৪।১) অতিদুর্লভ। রামপ্রকাশ গ্রন্থ বাঙ্গলাদেশেও প্রচারিত হইয়াছিল—গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের স্মৃতির টীকায় এবং কাশীনাথ তর্কালঙ্কার রচিত প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থাসংগ্রহে (২য় সং পৃ. ২৫) আমরা রামপ্রকাশের উল্লেখ দেখিয়াছি। এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়া উচিত।

গৌড়রাজ্যে বাঙ্গালী উপনিবেশ ?

শতাবধান একাকী সুদূর গৌড়রাজ্যে গিয়াছিলেন মনে হয় না। তাঁহার সঙ্গে কিম্বা পূর্ব্বে বহু বাঙালী সেখানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে। বোধ হয় রাজধানীর সান্নিধ্যে বাস করিয়া ব্যবসায় চালাইবার উদ্দেশ্যে কোন কোন বাঙালী বণিকশ্রেণী সেখানে গিয়াছিলেন।

প্রত্নতত্ত্ববিভাগের J. D. Beglar সাহেব ১৮৭১-২ খ্রীষ্টাব্দে লাহারির (Lahar) এবং ইন্দুরখী (Indurakhi) উভয় স্থানই প্রত্নকীর্ত্তির অনুসন্ধানে পরিদর্শন করিয়াছিলেন। লাহারিরে মারহাট্টা আমলের কতিপয় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া তিনি প্রাচীনতর কিছু দেখেন নাই। কিন্তু ইন্দুরখীতে প্রাচীন বহু কীর্ত্তির মধ্যে তিনি কতিপয় ইষ্টক-গৃহের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

"At Indurakhi there are some *Chhatris* with curved eaves and ridges to the roofs, like the thatched houses and curve-ridged temples of Lower Bengal." (*Arch. Survey. of India*, vol. vii—Bundelkhand and Malwa—p. 38)

অর্থাৎ, বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ "জোড় বাঙ্গলা" ধরণের মন্দিরের আদর্শে এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। লক্ষ্য করিতে হইবে শতাবধান ইন্দুরখীতে বসিয়াই রামপ্রকাশ রচনা শেষ করিয়াছিলেন। তিনি রাজা কৃপারামের চরিত্র যেরূপ উজ্জ্বল ভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় ঐ রাজার আচরণে আকৃষ্ট হইয়াই বহু লোক তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিল এবং তন্মধ্যে বাঙালীও অনেক ছিল। আত্মবিস্মৃত অবস্থায় কোন বাঙালীর বংশধর এখনও ঐ অঞ্চলে থাকা অসম্ভব নহে—এ বিষয়ে যাঁহাদের সুযোগ আছে তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া তথ্য প্রকাশ করিলে বাঙ্গলার বাহিরে বাঙালীর কীর্ত্তি রক্ষার উপায় হয়।

রাজা কৃপারামের তিরোধান :—১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রকাশ রচনার সমাপ্তিকালে রাজা কৃপারাম, তৎপুত্র গোবর্দ্ধন ও তৎপুত্র পহারসিংহ তিন জনই জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই গৌড়রাজ্যে একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল অনুমান হয়, কৃপারামের মৃত্যুতেই হউক অথবা শত্রুর আক্রমণেই হউক। রামপ্রকাশের উপলভ্যমান তিনটি প্রতিলিপিই কালবিষয়ক, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে স্পষ্ট লিখিত আছে রামপ্রকাশের অন্যান্য খণ্ডও রচিত হওয়ার কথা ছিল :—

অথ শ্রাদ্ধস্বরূপং শ্রাদ্ধপ্রভেদাঃ শ্রাদ্ধস্য নিত্যনৈমিত্তিককাম্যভেদাদিকং চ "শ্রাদ্ধকাণ্ডে রামপ্রকাশে" বক্ষ্যতে (৩৫১।২ পত্র)।

জলশুদ্ধৌ বিশেষান্তরং চ "শ্রাদ্ধাদিকাণ্ডে রামপ্রকাশে" অবধাতব্যম্ (৪৩০।২)। কিন্তু রামপ্রকাশের শ্রাদ্ধাদিকাণ্ড এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এবং খুব সম্ভবতঃ রচিতই হয় নাই।

না হওয়ার কারণ কৃপারামের মৃত্যু এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খলা হওয়াই সম্ভব। চিরঞ্জীবের একটি শ্লোক হইতে জানা যায় শতাবধান কাশীতেই স্বর্গী হইয়াছিলেন :—

সোঽহং পুরা সমধিগত্য পিতুঃ প্রসাদং
ত্রৈশ্লোক্যতাং গতবতঃ শিবরাজধান্যাং।
যত্নাদধীতমনধীতমথাপি শাস্ত্রম্
অধ্যাপয়ামি নিভৃতং নিপুণং বিচার্য্য ॥
(বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী ১।২১)

তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তির সময় ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে নহে, চিরঞ্জীবের গ্রন্থাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্যদ্বারা এইরূপ অনুমান হয়।

চিরঞ্জীবের গ্রন্থাবলী : (১) শৃঙ্গারতটিনী : যৌবনসুলভ শৃঙ্গাররসে পরিপূর্ণ মনোহর ও কবিত্বপূর্ণ নানা ছন্দে ১২০ শ্লোকে এই খণ্ডকাব্য রচিত। ইহাই সম্ভবতঃ তাঁহার প্রথম রচনা। ইহাতে কোন পৃষ্ঠপোষক রাজার নাম নাই। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

২। বৃত্তরত্নাবলী ছন্দের ক্ষুদ্র গ্রন্থ, রাজা যশবন্ত সিংহের জন্য লিখিত। ১৭৫৫ শকে (১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত (১৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)।

৩। মাধবচম্পূ : ৫ উচ্ছ্বাসে বিভক্ত এই চম্পূকাব্য একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে—ইহা কবির "বাল্যে" রচিত হইয়াছিল। ইহাতেও কোন পৃষ্ঠপোষক রাজার নাম নাই।

৪। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী : ৮ তরঙ্গে বিভক্ত এই সুপ্রসিদ্ধ চম্পূকাব্য বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা কবির পরিণত বয়সের রচনা, কারণ তিনি একটি শ্লোকে লিখিয়াছেন নানা শাস্ত্রে বহুতর গ্রন্থ রচনার পর ইহা রচিত হইয়াছিল।

ন্যায়াদিশাস্ত্রেষু ময়া কৃতা যে কাব্যেষু যে বা রুচিরাঃ প্রবন্ধাঃ।
ভবন্তি বিজ্ঞাসু চ যাসু যাসু যে যে বুধাস্তৎপারপোষকাস্তে ॥১।২২

চিরঞ্জীবকৃত ন্যায়াদিশাস্ত্রের কোন গ্রন্থই এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই গ্রন্থেও কোন পৃষ্ঠপোষকের নাম নাই।

৫। তাজিকরত্ন : জ্যোতিঃশাস্ত্রের গ্রন্থ, কিন্তু ইহা আমরা এখনও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি নাই।

৬। দুর্গোৎসবপদ্ধতি : গুপ্তিপাড়ানিবাসী এক ভদ্রলোকের নিকট ইহার প্রতিলিপি ছিল, কিন্তু তাহা হারাইয়া গিয়াছে।

৭। কাব্যবিলাস : অলঙ্কার শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, সম্প্রতি কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার সর্ব্বশেষ রচনা; কারণ ইহাতে শৃঙ্গারতটিনী, মাধবচম্পূ ও বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাঁহার রচিত অপর দুইটি অনাবিষ্কৃত রচনার উল্লেখ আছে—হৃদয়কল্পলতা ও শিবস্তোত্র। ইহা কোন রাজার পোষকতায় রচিত না হইলেও ইহাতে উদ্ধৃত কবির স্বরচিত শ্লোকাবলীর মধ্যে বহু রাজার প্রশস্তি পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের একটি প্রতিলিপির তারিখ ১৭৩২ সম্বৎ (অর্থাৎ ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ—L. 4125)। সুতরাং ১৬৭০ সনে চিরঞ্জীব বার্দ্ধক্যে গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়াছিলেন ধরা যায়। তৎপূর্ব্বে বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী ও তাহারও পূর্ব্বে বহুতর গ্রন্থ রচনা হইয়া গিয়াছে ও তাঁহার পিতারও মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের পরীক্ষিত চিরঞ্জীবের সমস্ত গ্রন্থেরই মঙ্গলাচরণ সুপ্রসিদ্ধ "তমোগণবিনাশিনী" শ্লোক এবং শেষে "দ্বৈতাদ্বৈত" শ্লোকের তত্তদগ্রন্থানুযায়ী পাঠ পরিবর্তন মাত্র।

রাজা যশবন্ত সিংহ :—বৃত্তরত্নাবলী গ্রন্থের বহুতর উদাহরণ শ্লোকে এই রাজার সম্বোধন আছে—তাঁহার পরিচয় অতি স্পষ্টাক্ষরেই গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। শ্রীগোবর্দ্ধনভূপনন্দন (২য় শ্লোক), কৃপারামৈকবংশধ্বজ (৪র্থ শ্লোক) এবং (প্রতি পৃষ্ঠায়) পুনঃ পুনঃ "গৌড়" শব্দের প্রয়োগ হইতে তাঁহাকে এক্ষণে অনায়াসে জানা যায়। তিনি পহার সিংহের কনিষ্ঠ ভাই কিম্বা নামান্তর। চিরঞ্জীব কাশীতেই অধ্যাপনা করিতেন, কিন্তু সম্ভবতঃ কিছুকাল গৌড়রাজ্যে পিতার স্থলে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং সেই সময়েই বৃত্তরত্নাবলী রচিত হইয়াছিল—রচনাকাল প্রায় ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইবে। কাব্যবিলাসেও যশবন্তের স্তুতি আছে (পৃ. ৪০, ৫০) এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য রাজাদেরও স্তুতি আছে। তিনি ধারাবাহিক গৌড়রাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন না নিশ্চিত। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই যশবন্তকে নবাব সুজাউদ্দীনের (১৭২৭-৩৯ খ্রীঃ) ঢাকাস্থিত নায়েব দেওয়ানের সহিত অভিন্ন ধরিয়া (Notices, III, No. 280) বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন—চিরঞ্জীব ১৭০০ সনের বহু পূর্ব্বেই স্বর্গী হইয়াছিলেন। কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের পুত্র যশোমন্ত সিংহও (১৭১১-৪৮ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি সন্দেহ নাই (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৭, পৃ ১৩৫ দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ চিরঞ্জীব কাশী এবং উল্লিখিত গৌড় রাজ্য ছাড়িয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

রাজস্তুতি :—কাব্যবিলাসে নিম্নলিখিত রাজাদের স্তুতি পাওয়া যায় :—মৃত রাজা মানসিংহ (পৃ. ৪৯), মৃত রাজা বিজয়সিংহ (পৃ ৩৯), মৃত রাজা কৃপারাম (পৃ. ১৮), রাজা জয়সিংহ (পৃ. ৪৫) কীর্ত্তিসিংহ (পৃ. ৫০) এবং রাজা হৃদয় (পৃ. ১৬, ১৯, ৩৫, ৪৬)। ইঁহাদের কাঁহারও সভায় তিনি গৌড় রাজ্যের বিপর্য্যয়কালে আশ্রয় লইয়াছিলেন অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ তদ্রচিত (হৃদয়-) কল্পলতা গ্রন্থ হৃদয় রাজার সভায় লিখিত বলিয়া অনুমান হয়। এই হৃদয় (একস্থলে 'হৃদয়েশ' আছে পৃ. ১৯) গড়মণ্ডলের রাজা হৃদয়েশ্বর কি না বিবেচ্য। জয়সিংহকে ৺শাস্ত্রী মহাশয় দ্বিতীয় জয়সিংহ ধরিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রমাণাবলী দৃষ্টে তাঁহাকে সুপ্রসিদ্ধ মির্জ্জা রাজা জয়সিংহ হইতে অভিন্ন ধরাই যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে কাব্যবিলাস গ্রন্থ ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মির্জ্জা রাজার মৃত্যুর

পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। শতাবধান ও তৎপুত্র চিরঞ্জীব যেরূপ অসামান্ত প্রতিভাশালী ছিলেন তাহাতে আমাদের ইহাও অনুমান হয়, কাশীতে উক্ত মির্জা রাজা জয়সিংহ দ্বারা রাজকুমারদের শিক্ষার জন্ত প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন চিরঞ্জীব এবং সেখানেই তিনি বিভিন্ন রাজপুত্রদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। Tavernier সাহেব ১৬৬৫ সনের ডিসেম্বর মাসে পরিদর্শন করিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ দিয়াছেন। বেণীমাধবের মন্দিরের পশ্চিম ভাগে ইহা অবস্থিত ছিল বলিয়া জানা যায়। এই সময়ে চিরঞ্জীব যে কাশীর একজন সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক ছিলেন তাহা বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক হইতে বুঝা যায়।

শতাবধানের বংশধর :—শতাবধানের মূল বাড়ী হুগলী জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ গুপ্তপল্লী অর্থাৎ গুপ্তিপাড়া গ্রামে ছিল। ১৬৬৯ সনের আগষ্ট মাসে ধর্ম্মান্ধ সম্রাট্ আওরঙ্গজেব কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করিয়া হিন্দুমাত্রেরই মনে যে ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল তাহার ফলে বহু লোক কাশী ত্যাগ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। এই সময়ে বহু বাঙ্গালীও পশ্চিমাঞ্চল হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া থাকিবে—সহর অপেক্ষা গ্রামই তখন কতকটা নিরাপদ ছিল। চিরঞ্জীব কিম্বা তাঁহার পুত্রগণ এই সময়েই প্রায় ৭০ বৎসর কাশী ও গৌড়রাজ্যে বাস করার পর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ সাধক ও কবি মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার ১৫৯৪ শকাব্দে (১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে) "শ্যামাকল্পলতিকা" রচনা করেন। গুপ্তিপাড়ায় প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে চিরঞ্জীব মথুরেশের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ. ৯৪৮)। চিরঞ্জীবের অধস্তন বংশে দীর্ঘকাল পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল ; আমরা কতিপয় নাম সংগ্রহ করিয়াছি। ব্রজদেব তর্কবাগীশ শূদ্রমণি জমীদার মনোহর দত্ত ও গঙ্গাধর দত্তের নিকট ১১২৭ সনের ৫ ভাদ্র (১৭২০ খ্রীঃ) প্রভৃত নিষ্কর-ভূমি দান পাইয়াছিলেন (বর্দ্ধমানের ২৫৩৩ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)। ব্রজদেব এবং তাঁহার দায়াদ বিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী বর্দ্ধমানরাজ চিত্রসেনেরও দানভাজন ছিলেন। ব্রজদেবের পৌত্র রাজারাম সিদ্ধান্ত রাজা তিলকচাঁদের নিকট ভূমি দান পাইয়াছিলেন। ১২০৯ সনে এই বংশে উক্ত রাজারাম, রঘুনন্দন ন্যায়পঞ্চানন ও রঘুবীর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি জীবিত ছিলেন। ১৮৯৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে অশীতিপরবৃদ্ধ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নিঃসন্তান পরলোকগত হইলে এই ভারতবিখ্যাত মহাপণ্ডিতের বংশ বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইংরেজ রাজত্বে ভারতে ধনতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার এ জাতীয় সদ্যঃ ফল ধরে ধরেই ফলিয়াছে। কেবল চিরঞ্জীব কেন, যাঁহাদের গ্রন্থরত্ন এক সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র সমুচিত সমাদরের সহিত অধীত হইত এইরূপ শত শত মহাপণ্ডিতের নাম ও বংশ মহাপ্রলয়ের আবর্ত্তনে পড়িয়া যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই বংশের সংযোগ কাশী ও গৌড় রাজ্যের সহিত সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নাই। তজ্জন্যই রামপ্রকাশের পূর্ব্বোল্লিখিত পুথিটি গুপ্তিপাড়ায় আসিতে পারিয়াছিল। কালক্রমে এই পুথি কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে স্থানপ্রাপ্ত হয়। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ইহা ও অপরাপর বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ রাজবাটী হইতে গঙ্গাপ্রাপ্তি হওয়ার উপক্রম হইলে নবদ্বীপের একজন গ্রন্থরসিক পণ্ডিতের চেষ্টায় পাঠাগারে লোকলোচনের গোচর হইয়া অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্যাবিষ্কারের সহায়ক হইয়াছে।

এবার অবগুণ্ঠন খোলো

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভুলে যাওয়া মোর কথাগুলি এলো স্মরণের উপকূলে
শুভ শরতের প্রথম সুরের হিন্দোলে দুলে দুলে।
শ্যামাবনানীর বসনপ্রান্তে জোনাকির পাখা জ্বলে,
নীল আকাশের অঙ্গন ভরি আলোকের খেলা চলে।
ক্ষণমিলনের আবেশে আবেগে শিহরিছে কলেবর,
বাসর-রাত্রি এসেছে রচিতে বিনম্র অবসর।
কুত ঘর ছেড়ে কত ঘর পেতে জানা হোতে অজানায়
মনোহরণের লুকোচুরি খেলা মদবিহ্বল বায়।

তুমি যেন ছবি কবিতায় ঢাকা, ভাবের তুলিতে আঁকা,
আপনার মাঝে করেছ রচনা আনন্দ রূপরাকা।
মাধুর্য্য দিয়ে তনু-লাবণ্য করেছ যে প্রসাধন,
তোমারে ঘেরিয়া বন-লতিকার নির্জ্জনে নীরাজন।
তোমারে হেরিয়া মনে হয় মোর সবি সুন্দরতম,
ভরাভাদ্রের তটিনীর সম এসেছ সম্মুখে মম।

জীবন-পথের আবেগ-আকুল স্বপনের সঙ্গীতে
ফুটিতেছে আশা কুসুমের সম হৃদয়ের নিভৃতে।
বিনা পরিচয়ে মম অন্তরে চঞ্চল ঢেউ তুলি
তোমার কণ্ঠ হবে কি মুখর চমকিয়া ক্ষণগুলি ?
ফুল-উৎসব মন্থর হ'ল মর্ম্মর ধ্বনিয়াছে,
এবার অবগুণ্ঠন খোলো : এসো তুমি মোর কাছে

সেঙ্গোরার পথে

শ্রীগৌরমোহন দাস দে

[সেঙ্গোরা মালয়দেশের সুদূর উত্তরে ও শ্যামদেশের দক্ষিণে শ্যাম উপসাগরের ধারে অবস্থিত। এখানে সাধারণতঃ লোকেরা যাতায়াত করে না, কারণ এই পথ একটু বিপৎসঙ্কুল। এখান থেকে ব্যাঙ্কক যাবার রাস্তা নেই, তবে হাজাই দিয়ে ট্রেনে করে যেতে পারা যায়। প্রথমে এ রাজ্যটি চীনের রাজার অধীনে ছিল, পরে শ্যামের রাজা এটিকে দখলে আনেন। টাইপিং থেকে এর দূরত্ব প্রায় ২১০ মাইল।]

এই সেদিন মেজর নাথের সঙ্গে পেনাং ঘুরে এলাম। ভদ্রলোক রাস্তাঘাট চেনেন না, কোথায় কি দেখবার জিনিষ তাই জানতে একদিন আমায় ফোন করলেন। আমি তখন কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম। ভদ্রলোকের বাড়ী ঢাকায়। কথাবার্তায় সহজেই লোককে আপনার করে নেন। কথায় কথায় শ্যামদেশের কথা উঠল। তাঁর মুখে সেখানকার চিত্তাকর্ষক বর্ণনা শুনে আমি ভাবলাম যে, শ্যামদেশে খানিকটা ত এগিয়ে গিয়েছিলাম একবার, এবার আরও ভিতরে ঢুকে দেখা যাক। তাই আগামী সপ্তাহে সেঙ্গোরা যাওয়া স্থির করে ফেললাম। আমার আসল গন্তব্য-স্থলের কথা কিন্তু, কাউকেও জানালাম না। আমার মেজরকে জানিয়ে দিলাম "আলোরষ্টার" পরিদর্শন করতে যাব—অনুমতি পাওয়া গেল। কিন্তু মনোমত সঙ্গী হিসাবে কাকে নেওয়া যায় তাই বসে বসে ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি গুর্খাটুপি মাথায় দিয়ে ব্রজেন চক্রবর্তীমশায় এসে হাজির। ভদ্রলোক জাপানীদের আমলেও এখানে ছিলেন। বলতেই রাজী হয়ে গেলেন, তিনি আমায় আবার আগের দিন ফোন করে জানাবেন বলে গেলেন। কিন্তু যদি কোনো কারণে তাঁর যাওয়া না হয় সেজন্য পাশের ইউনিটের হাবিলদার ক্লার্ক বিনয় গুপ্তকে ডেকে বললাম। গুপ্তও রাজী হয়ে গেল। সেদিন বিকালে ইপো শহর থেকে ফোন পেলাম যে চক্রবর্তী মশায় পরদিন সকাল ১১টায় আমার ইউনিটে পৌঁছবেন।

পরদিন যথাসময়ে চক্রবর্তী মশায় ও গুপ্তভায়া এসে হাজির। খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা তিনজনে জিপে করে বেলা বারটায় পেনাং-এর পথে রওনা হলাম। সেঙ্গোরা যাবার দুটো রাস্তা আছে। পেনাং-এর পথে গেলে বেশ আরামে যাওয়া যায়। আর সেলামা দিয়ে গেলে বেশ বেগ পেতে হয়।

হুড খুলে দিয়ে চলেছি। দিনটা বেশ মেঘলা। আমরা ক্রমাগত গ্রামের পর শহর, শহরের পর গ্রাম পার হয়ে পেনাং-এর মাইল দশেক আগে এসে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে হঠাৎ দেখলাম মজুমদার মশায় একটা ভ্যান গাড়ীতে বসে টাইপিং-এর পথে চলেছেন। চক্রবর্তী মশায় চেঁচিয়ে গাড়ী থামালেন। মজুমদার মশায়ের টাইপিং-এ যাওয়া হ'ল না, আমাদের গাড়ীতে এসে বসলেন। আমরা 'বাটার ওয়ার্থ' পার হয়ে ডানদিকে মোড় নিলাম। এই দিক দিয়েই 'আলোরষ্টার' যাওয়া যায়। আমরা সোজা বেরিয়ে গেলাম। দু-পাশে ধানের ক্ষেত, বাঁদিকে চলেছে একটানা পাহাড়শ্রেণী, ডাইনে আতপপাতায় ছাওয়া মালয়ী ও চীনাদের ছোট ছোট কুটীর। খানিকদূর এগোবার পর আমরা বাঁদিকে একটা মোড়ের কাছে এসে পৌঁছলাম। এখানে জাপানীদের একটা উড়োজাহাজের আস্তানা ছিল। ডানদিকে অনতিদূরে কতকগুলো উড়োজাহাজ ডানা মেলে রয়েছে দেখলাম। এখানে আসার পর আমি নিজেই ষ্টিয়ারিং ধরে জিপ চালাতে সুরু করলাম। বেশ খানিকটা রাস্তা অতিক্রম করে আমরা 'কেপলাবেটাস্' বলে একটি গ্রামে এসে পড়লাম। বাড়ীগুলো ইট ও কাঠের তৈরি। এখানকার বেশীর ভাগ বাসিন্দাই চীনা ও মালয়ী। দু-এক ঘর পঞ্জাবীও দেখতে পাওয়া গেল। বাঁদিককার রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। আবার সুরু হ'ল দু'ধারে সুবিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে নারিকেলবনও নজরে পড়তে লাগল। আমরা আরও কয়েক মাইল এগিয়ে মুদা নদীর কাছে এসে পড়লাম। এখানে আমাদের একটা সাঁকো পার হতে হ'ল। বেশ বড় সাঁকো। দু'দিকে দুটো ফটক আছে। দু' একটি কোঠাবাড়ী বাঁদিকে রয়েছে। এখানে ফেডারেটেড্ মালয় ষ্টেটসের শুল্ক আদায়ের একটি আপিস দেখলাম। আমরা এতক্ষণ প্রভিন্স-ওয়েলেস্লিতে ছিলাম, এই সেতুটা পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই 'কেদা' রাজ্যে এসে পড়লাম। এটি একটি আনফেডারেটেড-ষ্টেটস, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩৬৪৮ বর্গ-মাইল। এখানকার প্রসিদ্ধ 'জেরাই' পর্ব্বতশৃঙ্গ ৭০০০ ফুট উচ্চ। সমগ্র মালয়ের মধ্যে এখানেই সবচেয়ে বেশী ধানের চাষ হয়, এখান থেকেই এই ধান কেদার সুলতানের অনুমতি নিয়ে মালয়ের সব জায়গায় চালান যায়। এ রাজ্যের সুলতান মুসলমান, রাজধানী 'আলোরষ্টার'। তবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে থেকে তিনি রাজ্যশাসন করেন। একজন বৃটিশ এডভাইসর এখানে নিযুক্ত আছেন।

এদিকে রাস্তার দৃশ্য প্রায় সর্ব্বত্রই এক। রাস্তার উভয় পার্শ্বে ধান্যক্ষেত্রের প্রাচুর্য্য বাংলাদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উঁচু রাস্তার ওপর দিয়ে মোটর চালিয়ে আমরা চলেছি। বহুদূরে ডান দিকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। নীল পাহাড়ের পটভূমিকায় ধান্যক্ষেত্রের সবুজ সমারোহ চোখ

জুড়িয়ে দিচ্ছে। আরও কিছুদূর এগিয়ে আমরা 'টিকাম বাটু' বলে এক গ্রামে এসে পৌঁছলাম। গ্রামটি বেশ ছোট, এখানেও চীনা ও মালয়ীদের বাস। এখানে নারিকেল গাছ প্রচুর। আমরা 'কাম্পং পাদাং' নামে আরো একটি গ্রাম পার হয়ে 'সুঙ্গিপাটানির' দিকে এগিয়ে চললাম। এ অঞ্চল থেকে রবারের ক্ষেত আরম্ভ হ'ল। বেশীর ভাগ তামিল কুলীরা এখানে কাজ করছে। বেলা সাড়ে তিনটায় আমরা সুঙ্গিপাটানিতে এসে পৌঁছলাম। এটি কেদা-রাজ্যের মধ্যে একটি বড় শহর। এরই নিকটে চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রথমে ভারতীয়েরা এসে বসবাস করেন এবং মালয়ে হিন্দুধর্ম্ম বিস্তার লাভ করতে থাকে। পরে পঞ্চম শতাব্দীতে রাজা বুদ্ধগুপ্ত এখানে বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করে দিয়েছিলেন—কিন্তু সে সব এখন কালের গর্ভে বিলুপ্ত হয়েছে। তার কোন নিদর্শন এখানে দেখতে পাওয়া গেল না।

শহরের ভেতরে প্রবেশ করে দেখি রাস্তার পাশেই সারি সারি দোকান, প্রশস্ত রাজপথের মাঝখানে ছোটবড় গাছের সারি শহরের শোভা বৃদ্ধি করেছে। চৌমাথায় মালয়ী পুলিস পাহারা দিচ্ছে। সুমুখের রাস্তা ধরে বরাবর চলতে লাগলাম। রাস্তার মাঝখানে প্রকাণ্ড 'টাওয়ার ক্লক' একটা রয়েছে। বাঁদিকে অনতিদূরে হংকং সাংহাই ব্যাঙ্কের বিরাট ভবন দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও আমাদের সৈন্তেরা পাহারা দিচ্ছে, কোথাও বৃটিশ মিলিটারী এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের সাইন-বোর্ড লাগানো আপিসে লোকের ভিড়। আরও একটু এগোবার পর সিভিল হাসপাতালের কাছে এসে পৌঁছলাম। হাসপাতালটি প্রকাণ্ড, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ছোট মিলিটারী প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্রও রয়েছে। সুঙ্গিপাটানির দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখে আমরা শহর পরিত্যাগ করে এগিয়ে চললাম।

এবার পথের দৃশ্য ভিন্ন প্রকার। দু'ধারে সারবাঁধা রবারের বন। মাইল চারেক যাবার পর আমরা একটা নদী পার হলাম। বনের ভেতর এখানে সেখানে দু-একটা বাড়ী মাঝে মাঝে দেখা যায়—মালয় দেশের আসল চেহারাটি এবার নজরে পড়লো। এবার সুরু হল পল্লীলক্ষ্মীর সিঁদুর-মাখানো সিঁথিরেখার মত রাঙা মাটির পথ। নদীর পারেই একটা ছোট গ্রাম, ঘরগুলো ইট আর কাঠের তৈরি। গ্রামটির নাম 'সুঙ্গি লালাং'। মাইল ছয়েক যাবার পর রবারবৃক্ষের বন আবার ঘন হয়ে এল—দু'পাশে ঋজু দীর্ঘ সমুন্নত রবার-বৃক্ষের সারি—মাঝে মাঝে তামিলদের ছোট ছোট মন্দির রয়েছে। এদিককার রাস্তা খুব আঁকাবাঁকা হ'লেও সুগম। অনেকগুলো পুল পার হয়ে আমরা 'বেডং' শহরে এসে ঢুকলাম। বৃটিশরা সাফল্যের সহিত পশ্চাদ্‌পসরণ করবার সময়ে সব কয়টি পুল ভেঙে দিয়ে কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ভারতীয়দের সাহায্যে জাপানীরা

জোহরের রাজধানী জোহরবারুতে সুলতানের প্রাসাদ। পাশেই মালাক্কা প্রণালী

তা মেরামত করে ফেলে। বাঁদিকে 'বেডং' শহর দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে বি, এম-এর মেডিক্যাল রিলিফ ক্যাম্প আছে। শোনা গেল, এটি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ম্মির ক্যাম্প ছিল। 'বেডং' শহর পার হয়ে সাড়ে চৌদ্দ মাইল আসবার পর আমরা 'গুরুণ' নামক একটা গ্রামে এসে পড়লাম। সুমুখের দিকে দু-একটা বড় পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে সুপারি গাছের সারি আর আমবাগান বেশ একটুখানি দৃশ্য-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে কোথাও দিগন্ত প্রসারিত ধানের ক্ষেত; কোথাও বা নীল পাহাড় সুনীল আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে মেঘ-রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে গরীব মালয়ী ও চীনা চাষীদের ছোট ছোট কুটির নজরে পড়ছে। এখানে এক জায়গায় মিলিটারী লরী সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। কয়েক মাইল আসবার পর একটা গ্রামে এসে পৌঁছলাম সেটির নাম 'কোটা সারাং সিমুট'। বস্তীগুলো সবই নোংরা—রাস্তার দুপাশে পচা খাল, আর মাঝে মাঝে আতা গাছের সারি। কিছু পরে আমরা 'সিম্পাং আম্পাট' গ্রামে এসে পড়লাম। এখান থেকে 'আলোরষ্টার' মাত্র সাত মাইল হবে। এরই একটু ভেতরে 'টোকাই' রেল ষ্টেশন। প্রণালী এখান থেকে খুবই কাছে। ধানের ক্ষেত দু'পাশে সমানে চলেছে—আশেপাশে মালয়ীদের বস্তিও বিস্তর। কেউ কেউ খালের নোংরা জলে স্নান করছে। মাঝে মাঝে জলের কলের পাইপও রয়েছে। মালয়ী মেয়েরা সেগুলো থেকে কলসীতে করে পানীয় জল নিয়ে যাচ্ছে। বেলা প্রায় সাড়ে চারটায় আমরা 'আলোরষ্টার' শহরে এসে পৌঁছলাম। পূর্ব্বব্যবস্থা অনুযায়ী আমরা ফিল্ড এম্বুলেন্সের মেসে গিয়ে উঠলাম। সেখানে রাত্রিটা বেশ কাটল। ভোরবেলা উঠেই মুখ-হাত ধুয়ে প্রস্তুত হওয়া গেল। হাইজিন অফিসার

মালয়ে টিনের খনি

ক্যাপ্টেন লুই যথাসময়ে আমাদের দলে এসে জুটলেন। প্রাতরাশ সেরে আমরা পাঁচ জনে জিপে ক'রে রওনা হলাম। বাঁদিকে ব্রিটিশ রেসিডেন্সী। ডান দিকে বড় বড় বাড়ী—সবই মিলিটারী আস্তানা। প্রবাসী ভারতীয়দের দু'চারটি বাড়ী-ঘর নজরে পড়ল। রাস্তার অনতিদূরেই দাঁড়িয়ে আছে একটা মসজিদ্। আমরা রেললাইন পার হয়ে এগিয়ে চললাম। বাঁদিকে খুব বড় একটা চালের কল। মাইল দু-এক যাবার পর আমরা ডান দিকে এরোড্রোম দেখতে পেলাম। উড়ো-জাহাজের সারি যেন অতিকায় পাখীর মত ডানা গুটিয়ে পাহাড়ের কোলে বিশ্রাম করছে। এদিকের রাস্তাটা বাঁ-দিকে বেঁকে বরাবর চলে গেছে সেঙ্গারার দিকে।

রাস্তার দৃশ্য সর্ব্বত্রই এক—উভয় পার্শ্বে সেই সবুজ ধান্য-ক্ষেত্রের অনন্ত প্রসার। এই ধান-ক্ষেতের প্রাচুর্য্য দেখে দেশটিকে তো অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার বলেই মনে হয়। কিন্তু মালয়ীরা শুধু চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক তারা নয়। মাঝে মাঝে অবশ্য রবার-ক্ষেতও আছে। মাইল দশেক যাবার পর আমরা সিত্রা-ডেস্‌টিটিউট ক্যাম্পে এসে পৌঁছলাম। এখানে ইণ্ডিয়ান স্থাশনাল আর্ম্মির ক্যাম্প ছিল। এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের জাতীয় বাহিনীর কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করে গর্ব্বে আমার বুক ভরে উঠল। এদিকটায় খুব ম্যালেরিয়া। শ্যামদেশ থেকে যে সব কুলী আসে তাদের এখন এখানে থাকতে দেওয়া হয়। ভারতীয় কুলীদের সংখ্যাও এখানে নেহাত কম নয়। এখান থেকে ধানের-ক্ষেত বড় একটা নজরে পড়ে না—দুধারে শুধুই ছেদহীন নিবিড় রবার-বন। এবার আমরা 'সিত্রা' শহরে এসে পৌঁছলাম।

কতকগুলো মালয়ী পল্লী পার হয়ে আমরা চাংলুন শহরের দিকে এগিয়ে চললাম। এ দিকটায় শুধু রবার-বন—দূরে এখানে সেখানে আরণ্য বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন পাহাড়ের সারি দাঁড়িয়ে। এখানে কেদা রবার প্ল্যানটেশন্ ষ্টেট আছে। এখানকার অধিকাংশ ষ্টেটই হয় চীনাদের না হয় ব্রিটিশদের দখলে। এ দিককার রাস্তাটা বেশ উঁচুনীচু একটু দূরে চীনাদের কবর। এখান থেকে চাংলুন শহর আরম্ভ হ'ল।

শ্যামের সীমানা এখান থেকে এখনও আট মাইল হবে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি দু'ধারে বাঁশবন আর রবার-বন যেন সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে। আমরা কিছু পরে 'বুকিট কায়ু হিটাম' নামক গ্রামে এলাম। দু'পাশে পাহাড়ের গায়ে রবার-ক্ষেত। আমরা এসব ছাড়িয়ে চললাম। মাইল দুই যাবার পর আমরা শ্যামের সীমানায় এসে পড়লাম। এখানে একটা সাইনবোর্ড রয়েছে, তাতে লেখা আছে 'সাদাও বাউণ্ডারি-পোষ্ট', মিলিটারী অফিসার দেখে গেট্ বিনা আপত্তিতে খুলে দিলে। সামনেই রাস্তার মাঝখানে শ্যাম ও মালয়ের সীমানা-নির্দ্দেশক একটি স্তম্ভ। এদিকে ভীষণ যুদ্ধ হয়ে গেছে। ডানদিকে কারা যে যুদ্ধ করবার জন্যে 'পিলবক্স' তৈরি করেছিল তা বুঝতে পারলাম না। আলোরষ্টার থেকে শ্যামের সীমানা পর্য্যন্ত দূরত্ব ত্রিশ মাইল। এদিকে বেজায় ধুলো। প্রায় সবগুলো সাঁকো বোমা-বর্ষণের ফলে ভেঙে গিয়েছিল। জাপানীরা সবই পুনর্নির্ম্মাণ করেছে দেখলাম, তবে স্থায়ী হবে ব'লে মনে হয় না—কারণ সবই কাঠের তৈরি। খানিকদূর এগিয়ে আসবার পর আমরা খাউং-ক্য়ান নামে একটা ছোট্ট গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রাম-প্রান্তস্থ একটা ভাঙা পুল পেরিয়ে আমরা 'গ্রামছাড়া রাঙা-মাটির পথ' ধরে জীপ চালিয়ে চললাম। এখান থেকে বেশ একটুখানি বৈচিত্র্যময় দৃশ্য সুরু হ'ল। রক্তের মত রাঙা লাল মাটির পথ সুদূরের পানে উধাও হয়ে চলে গেছে—নিম্নে প্রবহমাণ ছোট ছোট নদীসমূহের শুভ্র জলধারা রজতরেখায় মত দৃশ্যমান। মাঝে মাঝে ধানক্ষেত, নারিকেল গাছ, সুপারি গাছ, আম গাছ ও ট্যাপিওকা গাছ ইত্যাদির নিবিড় বন। রাস্তার দু'পাশে কোথাও বা রাস্তার লাল আর বনের সবুজের এক অপূর্ব্ব সুসঙ্গতি। এখানে সবচেয়ে বেশী নজরে পড়ল রবার-বন। রবার গাছের সারি যেন দু'পাশে পদাতিক সৈন্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। আমরা কিছুক্ষণ বাদে 'সাদাও' শহরে এসে পড়লাম। সাদাও শহরে একটা গেট রয়েছে। এখানেও খানাতল্লাসীর পরে বহিরাগতদের শহরে ঢুকতে দেয়। আমাদের এ সবের বালাই নেই। পুলিসরা শহরে টহল দিচ্ছে, সবাই শ্যামদেশীয়। শহরে নানা বেশধারী বিভিন্ন জাতের লোক দেখলাম। থাইবাসীরা দেখতে ঠিক মালয়ীদের মতই, নাকের ডগাটা যা একটু মোটা, তা ছাড়া আর সব দিক দিয়ে বেশ সাদৃশ্য আছে। সুন্দর চেহারাওয়ালা দু'চার জন লোকও নজরে পড়ল।

এদিক থেকে একটা রাস্তা গেছে পেডাং-বেসারের দিকে। এটি একটি রেল ষ্টেশন, 'পার্লিস' রাজত্বের মধ্যে পড়ে। কতক-গুলো ছোট গ্রাম পেছনে রেখে আমরা খাউংনাগী শহরে এসে পৌঁছলাম। এটি একটি বড় শহর। এখানে আমরা দুটো রেল-লাইন পার হলাম। ডানদিকে রেল-লাইন, বাঁদিকে পাহাড়। এই লাইনটা হাজাই শহরের দিকে চলেছে—এটা

মালয় দৃশ্যাবলী

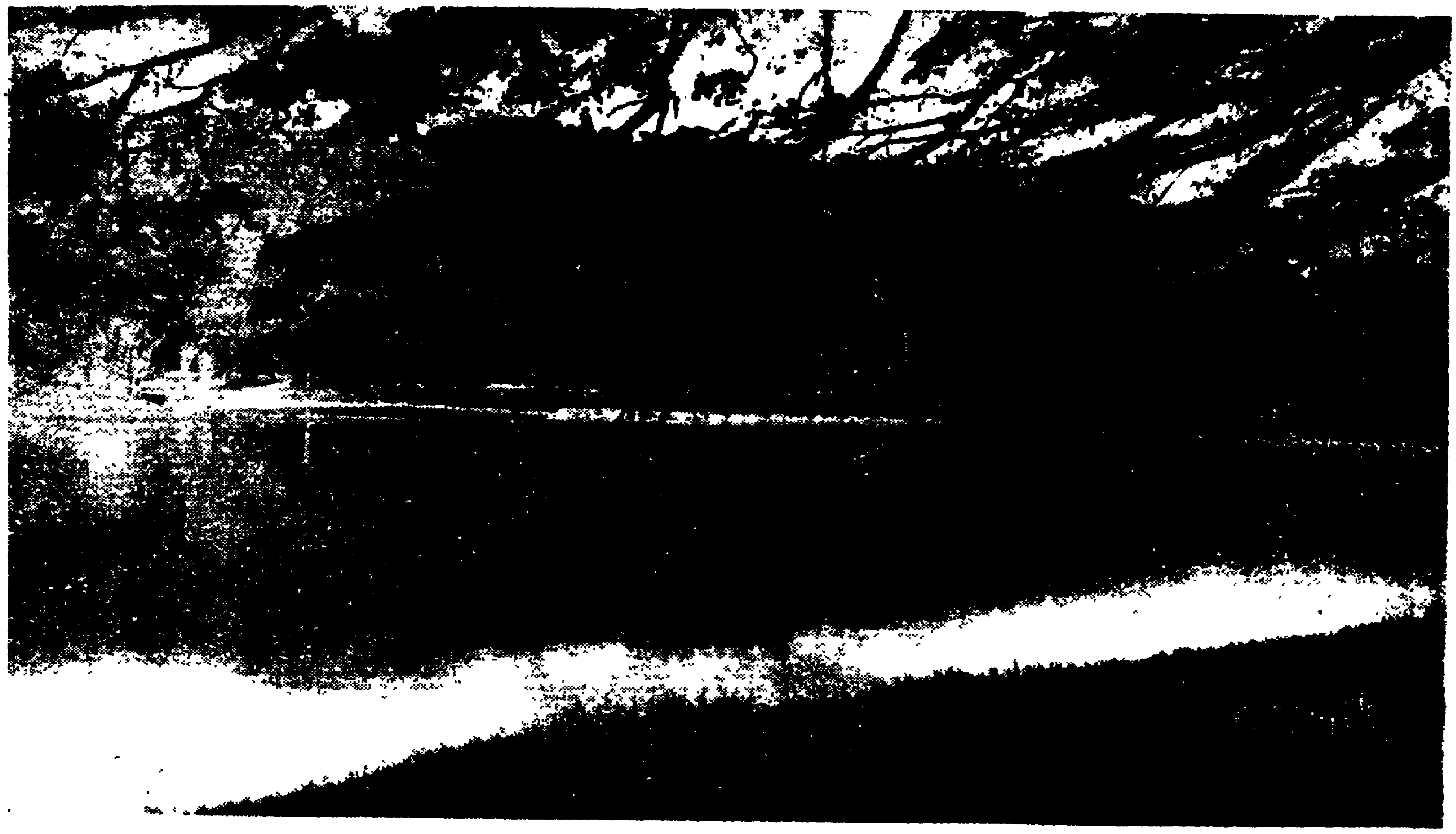

হ্রদ, কোয়ালা লাম্পুর

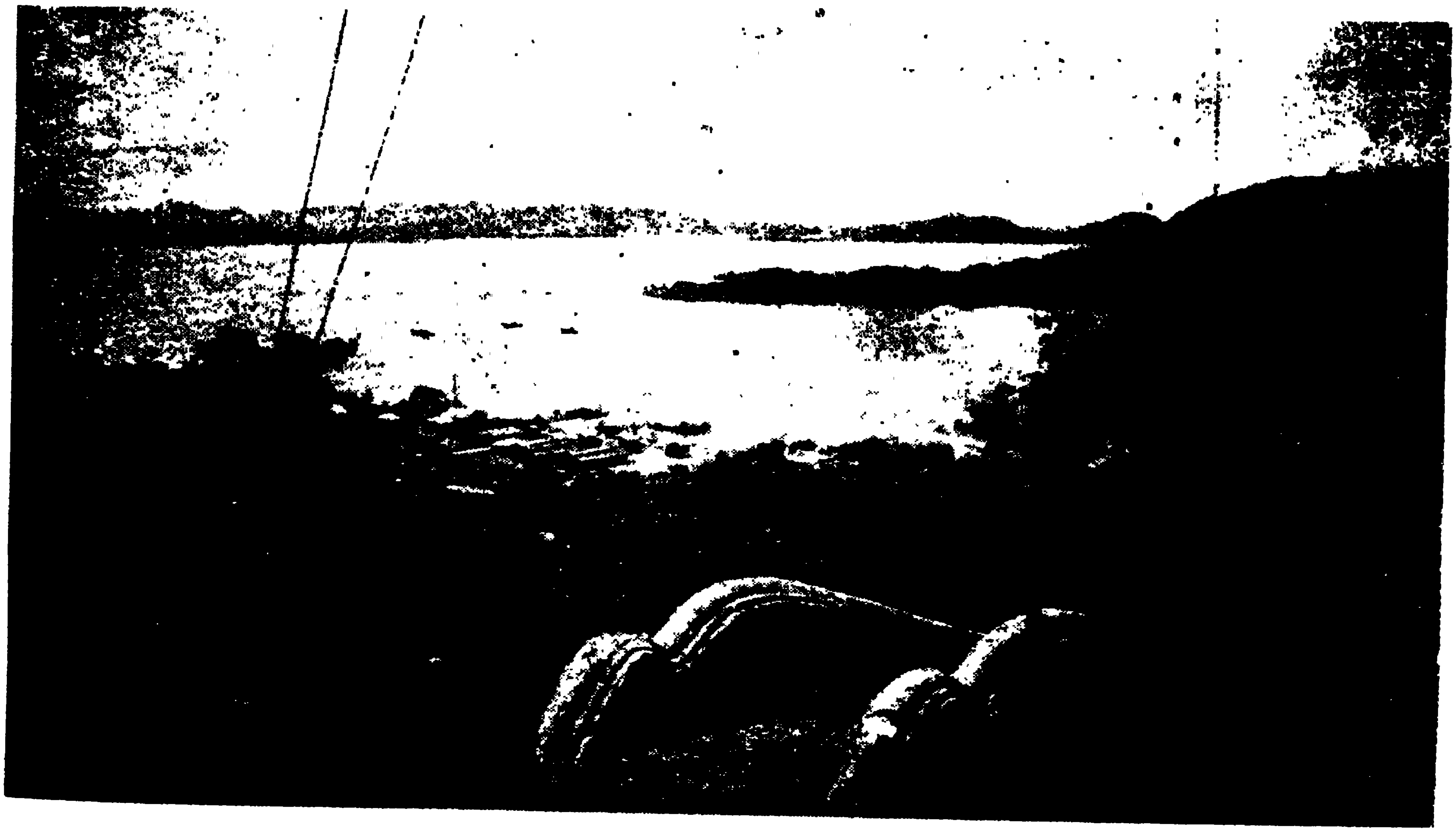

সেঙ্গোরার পথে শ্যাম উপসাগরের দৃশ্য

বাদশাহ আলমগীর [শ্রীপ্রিয়প্রসাদ গুপ্ত

চতুরাশ্রম [শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

সেঙ্গোরার পথে শ্যাম উপসাগরের ধারে রেষ্ট হাউস

শ্যাম ষ্টেটের রেলওয়ে। আরম্ভ হয়েছে পাডাং বেসার থেকে। এটি মিটারগজ লাইন। আমরা 'ব্যাট্ট' নদী পার হয়ে সাহা-থুংলুঙ শহরে এসে পড়লাম। এখান থেকে সেঙ্গোরা ৪৬ মাইল।

'ওয়াটু' নামক একটি নদী অতিক্রম করে আমরা একটা রেল-লাইনের নিকট এসে পড়লাম। রেল লাইনটি 'কোটাবারু'র দিকে চলে গেছে। কোটাবারু ও সেঙ্গোরাতে জাপানী সৈন্যেরা প্রথম অবতরণ করে মালয়দেশ অধিকার করে। ডানদিককার রাস্তাটা ধরে সোজা এগিয়ে চললাম। খানিকটা আসবার পর আমরা একটা জংশনে এসে গেলাম। এখান থেকে বাঁদিকের রাস্তা ধরে বরাবর গিয়ে হাজির হলাম 'হাজাই' শহরে। এখানে একটি সিকিউরিটি আপিস আছে। সেখানকার এক সার্জ্জেন্টের কাছ থেকে মজুমদার মশায় ১০ ডলারের টিকল (শ্যামদেশীয় মুদ্রা) ভাঙ্গিয়ে নিলেন। সাত টিকল এক ডলারে পাওয়া গেল, বাজারে এক ডলারে ছয় টিকল হিসাবে নেয়। আমি ক্যাপ্টেন দত্তের কাছ থেকে ত্রিশ টিকল নিয়ে এসেছিলাম।

রাস্তাটি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। বড়জোর ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে জিপ চালান যেতে পারে। রাস্তায় আমরা দু-একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম। একজন ছোট একটি ছেলের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন—নেতাজীর ফটো ছেলেটির বুকে আঁটা রয়েছে। প্রথমেই 'জয় হিন্দ' বলে সম্ভাষণ করা হ'ল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পাঞ্জাবী ছাড়া ভারতের আর কোনও জাতের লোক এখানে আছেন কিনা? আমার প্রশ্নের যে জবাব পেলাম তাতে শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠল। ইনি বললেন, "এখানে পাঞ্জাবী কি গুজরাটি বলে কোন জাত নেই, আমরা সকলেই ভারতবাসী।" বুঝলাম নেতাজীর আদর্শ এখানকার আকাশে-বাতাসে মিশে রয়েছে। তাই তো এখানকার ভারতীয়েরা সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে উদার দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করতে পেরেছেন। ভারতীয় বলতে গর্ব্বে এঁদের বুক ফুলে উঠে। আর খাস ভারতবর্ষে আমরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করে চলছি, সাম্প্রদায়িকতা আর প্রাদেশিকতা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে মেতে উঠেছি। আমরা বাজার ঘুরে হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সারতে গেলাম। খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকলে দাম দিতে গিয়ে দেখি খুব সস্তা—চার জনের খাওয়া-খরচ পড়ল মাত্র ছয় ডলার। শ্যামে এখনও খাবার খুব সস্তা, ভাল মুরগী দুই থেকে আড়াই ডলারে পাওয়া যায়। আর মালয়ে ছয় থেকে সাত ডলার—সেখানে খাওয়া থাকা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। কাকেও বকশিশ দিতে গেলে পাঁচ ডল'রের কমে কিছুতেই পারা যায় না। টাকা হ'লে পাঁচ টাকা দিলেই ব্যস্। হাজাই শহরের পাশে রেল-ষ্টেশন—এখান থেকে রেলে 'কোটাবারু' ও 'ব্যাঙ্কক' যাওয়া যায়। এটি বহুদিনকার পুরানো শহর, ধুলো উড়ছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মোটেই নয়, চীনা অধিবাসী এখানে খুব বেশী। বড় বড় দোকানগুলো সবই চীনাদের। মালয়ীরা সংখ্যায় এখানে খুব কম। এখানে আর একটি জাত আছে তারা চীনা ও শ্যামজাতির মিশ্রণে সমুৎপন্ন বর্ণসঙ্করজাত। দেখতে এরা বেশ। আমরা সাড়ে তিনটায় সেঙ্গোরার পথে পাড়ি দিলাম।

লেকের ধারে 'না-খোলা' বাজার ও কাঠের বাড়ী। এখানে আমেরিকানরা বোমাবর্ষণ করে অনেক বাড়ীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে

মোড়ের মাথায় এসে বাঁদিককার রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে চললাম। আকাশে মেঘ করেছে। ক্রমে একটু একটু বৃষ্টিপাত সুরু হ'ল। এখান থেকে আবার রাস্তার দুধারের সবুজ-শোভা চোখ জুড়িয়ে দিতে লাগল। মাইলের পর মাইল জুড়ে বরাবর চলেছে ধানক্ষেত। একটু দূরে গিয়ে আমরা রেল-লাইন পার হলাম। এবার আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। প্রবল বারি-বর্ষণে দূরের আকাশের নীলিমা আর দু'ধারের ধানক্ষেতের শ্যামল শোভা ঝাপসা হয়ে এল। বারিধারাসিক্ত পথের উপর দিয়ে জিপ চলল দ্রুতবেগে। হাজাইয়ের মোড় থেকে সেঙ্গোরা আঠার মাইল। পথে অনেকগুলো নদী পার হতে হ'ল, এবার নৈসর্গিক দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন হয়েছে—মাঝে

লেকে জেলেদের মাছ ধরবার পাগার

মাঝে জঙ্গল, দূরে পাহাড়ের শ্রেণী সমুন্নত শিরে দাঁড়িয়ে। প্রবল বারিপাতের ভেতর দিয়ে জিপ চালিয়ে আমরা বেশ খানিকটা রাস্তা এগিয়ে এলাম। বৃষ্টি এখন থেমে গেছে। বাঁদিকে দূরে পাহাড়ের মাথায় শ্যামদেশের বৌদ্ধ প্যাগোডার চূড়া দেখতে পাওয়া গেল। কাজবর্ষণ আকাশের পটে অভ্রভেদী মন্দিরচূড়ার স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করলে। রাস্তার পাশে শ্যামবাসীদের দু-একখানা বাড়ী। ডানদিকে উন্নত পাহাড়শ্রেণী সুদূর দিগন্তের পানে উধাও হয়ে চলে গেছে। আমরা একটা বড় নদী পার হয়ে সেঙ্খোরায় ঢুকে পড়লাম।

শহরের সর্ব্বত্র ছোট ছোট বাংলো ও আতপ-পাতায় ছাওয়া বাড়ী। রাস্তার বাঁদিকে বৌদ্ধ মন্দির। মন্দির-চত্বরে পীতবসনপরিহিত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বসে আছেন। আশেপাশে দণ্ডায়মান মন্দিরের মত আকৃতিবিশিষ্ট কতক-গুলো স্তম্ভ বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কোন বৌদ্ধ পুরোহিতের মৃত্যু হ'লে পর তাঁর মৃতদেহ দাহ করে ভস্মাবশেষ মাটিতে পুঁতে এ ধরণের স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হয়। আমরা এসব দেখে ডান দিককার একটা রাস্তা দিয়ে শ্যাম উপসাগরের অভিমুখে এগোতে লাগলাম। বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে সোজা সেঙ্খোরার লেকে যাওয়া যায়। যাবার পথে একটি বড় রেষ্ট হাউস নজরে পড়ল। এখানে যাত্রীদল এসে থাকতে পারে, অবশ্য খরচ তাদের নিজেদেরই দিতে হয়। রাস্তার দু'ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, এখানে সেখানে ছোট ছোট বাংলো। আমরা এসব ছাড়িয়ে একেবারে শ্যাম উপসাগরের ধারে এসে পৌঁছলাম। এখানে অনেক লোকের ভিড়। শ্যামদেশীয় ভদ্র-পরিবারের মেয়েরা অনেকে এখানে বেড়াতে এসেছেন। সাঁতার কাটার মতলবে আমরা চারজনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম শ্যামসাগরের সুনীল জলে। স্নানান্তে তীরে উঠে আমরা একটি শ্যামদেশীয় ছেলেকে গাইড করে এগিয়ে চললাম। এখানে একটি ছোট পাহাড়ের উপর একটি সুন্দর বাগান নজরে পড়ল—তিন জনেই উপরে উঠে গেলাম। সামনে একটা কামান রয়েছে, বিশেষ কিছুই দেখবার নেই। ওপরে একটা চাচারীয় সুন্দর বাংলো আছে। একজন শ্যামদেশীয় ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী বাংলোর বহিঃপ্রাঙ্গণে বেড়াচ্ছিলেন। স্থানীয় কয়েকটি তথ্য জানবার জন্তে তাঁদের প্রশ্ন করলাম। কিন্তু তাঁরা কেউ ইংরেজী জানেন না—উত্তর দিতে পারলেন না। সেখান থেকে নেমে এসে গাইড ছোকরাটিকে নিয়ে জিপে চেপে বসে আমি নিজে জিপ চালাতে আরম্ভ করলাম। ছেলেটির নাম নিশীথ রতন কোট্ট। তার বাড়ী লেকের ধারে—বাপ মা দুজনেই বেঁচে আছে। ছেলেটি ব্যাঙ্ককে পড়তে গিয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ বাধতেই সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়। আমরা দূর থেকে প্যাগোডা দেখলাম, পাশেই লাইট হাউস ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এখানে মিত্রপক্ষীয় সৈন্তেরা ভীষণ বোমাবর্ষণ করেছে। আমরা 'কেপে'র পাশ দিয়ে জিপ চালিয়ে বরাবর লেকের ধারে গিয়ে হাজির হলাম। লেকটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০ মাইল, এখানে অনেক জেলের বাস। লেক থেকে মাছ ধরে এরা জীবিকা উপার্জ্জন করে। এই বিরাট হ্রদটিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন বললে অত্যুক্তি হয় না। হ্রদতটে দাঁড়িয়ে আমরা তার শোভা অবলোকন করতে লাগলাম। ওপারে ধূসর পাহাড় উন্নতশিরে দণ্ডায়মান, সম্মুখে নীল বারিরাশির অনন্ত প্রসার, দৃষ্টি যেন সেই নীলিমায় অবগাহন ক'রে ধন্ত হয়। পাহাড়ের কোলে জেলেদের ছোট ছোট ঘরগুলো যেন ছবির মত দৃশ্যমান। প্রকৃতি এদিকটায় সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে রেখেছেন বটে, কিন্তু মানুষ এখানকার লোকালয়ের শ্রীসম্পাদনে বড়ই উদাসীন। লেকের ধারেই নোংরা পল্লী। এত সুন্দর লেক—প্রকৃতির রূপ এখানে এত নয়নানন্দকর, কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন। মনে হয় এরা প্রায় সকলেই অত্যন্ত দরিদ্র। শ্যাম-গবর্ণমেণ্ট এ অঞ্চলের উন্নতি বিধানে কেন যে মনোযোগী নন তা বুঝা দুষ্কর। এর পাশে 'নাখোনা' বাজার। এর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললাম ; মাঝে মাঝে লেকের দিকে ঘরবাড়ী বোমার আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সেগুলোকে এরা আবার মেরামত করতে আরম্ভ করেছে। শ্যামবাসীদের সংখ্যা এখানে খুব বেশী, ভারতীয়দের সংখ্যা এদের অনুপাতে খুব কম। লেকের ধার দিয়ে চলেছি, থৈ থৈ করছে লেকের জল, দূরে কালো পাহাড়ের কোলে সাদা মেঘের লুকোচুরি খেলার আর অন্ত নেই। লেকের জলে জেলে ডিঙিতে করে জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরছে। এরাও 'পাগার' করে মৎস্ত শিকারে ওস্তাদ। লেকের মধ্যে বড় বড় জঙ্ক (বড় নৌকা) ভাসছে। আসবার সময় শ্যাম উপসাগরের ধারে একটা জলমগ্ন জাহাজ দেখলাম। গাইড ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, ওটা জাপানী জাহাজ—নিজেদেরই মাইনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ডুবে গেছে। এত বড়

ডোরিসান ফল হাতে একটি মালয়ী মেয়ে

হ্রদ এদেশে আর আছে কিনা সন্দেহ। এই হ্রদ সাগরের মত বিরাট, সুদূরপ্রসারিত। এর বারিরাশি অন্তরীপের কাছে গিয়ে মিশেছে। জাহাজ অনায়াসে এর মধ্যে ঢুকতে পারে। রাস্তার ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছে একটি বৌদ্ধ মন্দির। শ্যামদেশবাসীরা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। মালয়ীদের মত এদের পরণেও সারং ও কুবায়া। কেনাকাটা করবার জন্যে বাজারে নামলাম। বাড়ীতে কবে ফিরব মেয়ে দুটি হয়ত তারি প্রতীক্ষা করে অধীর আগ্রহে দিন গুনছে। তাদের জন্যে একটি শ্যামদেশীয় ছাতা, বেতের তৈরি ছোট্ট বাহারে ব্যাগ ইত্যাদি কিনলাম। দোকান থেকে ফিরছি, দেখি চক্রবর্ত্তী-মশায় একটা দোকানে বসে বসে গল্পগুজবে মেতে উঠেছেন। আমি ভেতরে ঢুকলাম। দোকানদার ভদ্রলোক পঞ্জাবী মুসলমান। 'জয় হিন্দ' উচ্চারণ ক'রে আমায় অভ্যর্থনা করলেন। আমিও জয় হিন্দ বলে তাঁকে প্রত্যভিবাদন জানালাম। নেতাজীর হরেক রকমের ফটো ছোট ঘরটার প্রায় সব জায়গায়। নেতাজী সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল তাঁর সঙ্গে। নেতাজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তির অন্ত নেই। এঁর ধ্রুব বিশ্বাস নেতাজী মারা যান নি। যত দিন না ভারত স্বাধীন হয় তত দিন তিনি মরতে কখনও পারেন না, তিনি বললেন যে নেতাজী এখানে কোনদিন পদার্পণ করেন নি; কিন্তু তাঁকে দেখবার জন্যে স্থানীয় সকল ভারতীয়ই ব্যাঙ্ককেই অনুষ্ঠিত এক সভায় গিয়েছিলেন। ক্ষুদ্র দোকানের সামান্য দোকানদার, কিন্তু নেতাজীর আদর্শে তাঁর হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ঘুচে গেছে। বাস্তবিকই তিনি বড় মনের অধিকারী হয়েছেন। এঁর সান্নিধ্যে গিয়ে নেতাজীর মাহাত্ম্যকে যেন নূতন করে উপলব্ধি করলাম—কিছুক্ষণ পরে চলে আসবার সময় মনে হ'ল যেন নিতান্ত আপনার জনকে ছেড়ে যাচ্ছি।

ফেরবার পথে দেখি একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। পথিপার্শ্বে লোকের পর লোক ভক্তিভরে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই একটা বৌদ্ধ মন্দির নজরে পড়ল—ভেতরেও বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। সেটা তৈরি হয়েছে—থাই সাল ২৪৮৬ অব্দে (বৌদ্ধ যুগের সাল)। আমরা যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই আবার পাড়ি জমালাম। বাঁদিক দিয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একটা পথ চলে গেছে—সেই পথে মাইল তিনেক যাবার পর 'কাউসেং চেজার' পাহাড় দেখা যায়—এখানকার দৃশ্য বড়ই মনোরম।

মৃত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্দেশে নির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। জনমানবশূন্য রাস্তার ওপর দিয়ে জিপ চালিয়ে আমরা চলেছি। বেশ ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়েছে। নির্জ্জন বনপথে রাতচরা পাখীর কর্কশ কণ্ঠ শুনে গা-টা ছম্ ছম্ করে ওঠে। আমাদের জিপের আলো পড়ে নীঃছাড়া পাখীদের চোখগুলো জ্বলছে। পল্লীর পথে বনবিড়াল আর শেয়ালের আনাগোনার অন্ত নেই। আমাদের ভয় চীনা ডাকাতের কথা ভেবে। তাদের পাল্লায় পড়লে প্রাণ বাঁচানই হবে দায়। চীনা দস্যুরা টাইপিং-এর

বর্মাঞ্চলে দিনের বেলায়ই টাকার লোভে লোককে গুলি করছে এমন কথা হামেশাই শোনা যায়। এদের কাছে অনেক অস্ত্রশস্ত্র আছে। ব্রিটিশরা প্রথমে পরাজিত হয়ে এ-দেশ ত্যাগ করবার সময় এদের হাতে অনেক অস্ত্র দিয়ে যায়—জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলে। আবার জাপানীরা যখন আত্মসমর্পণ করলে তখন এদের প্রচুর অস্ত্র দিয়ে যায়—ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই চালাবে বলে।

ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল বেগে জিপ চালিয়ে চলেছি। ভয়ের কারণ থাকা সত্ত্বেও আমরা মোটেই ভীত হই নি। কেননা আমরা পাঁচ জন ছিলাম—আর তার ওপর 'ষ্টেনগান' বত্রিশটা, তাতে গুলি পোরা আছে। যদি আশঙ্কার কোন কারণ ঘটে তা হলে স্থির করলাম—বেমালুম গুলি চালাব। খানিকটা দূর গিয়ে এক পুলের কাছে গাড়ী থামালাম। চীনাদের মালবাহী দু-একখানা গাড়ী দেখতে পাওয়া গেল। জিপে তেল-জল দিয়ে আবার ষ্টার্ট দিলাম। রবার-ক্ষেতে পুঞ্জীভূত নিবিড় অন্ধকার—আকাশ মেঘে ঢাকা। এবার সুরু হ'ল বন্ধুর পথ। সামনে নানা জায়গায় গর্ত্ত রয়েছে। পথ খারাপ বলে এখন আস্তে আস্তে চালাতে হচ্ছে। জিপের গর্জ্জন ছাপিয়ে নীচেকার প্রবহমাণ নদীর কল-ধ্বনি কানে এসে প্রবেশ করছে। মাঝে মাঝে উড়ন্ত চামচিকাগুলো গাড়ীর গায়ে এসে ধাক্কা খাচ্ছে। আকাশে চন্দ্র-তারা মেঘে আচ্ছন্ন অথচ মজুমদার মশায়ের—"যে লগনে জনম আমার আকাশে চাঁদ ছিল" আরম্ভ হ'ল। আমরা রাত সাড়ে নটায় 'আলোরষ্টারে' এসে পৌছলাম। পরের দিন কুলিম হ'য়ে আমরা টাইপিং-এ ফিরব মনস্থ করলাম।*

---

* লেখকের "মহাযুদ্ধের পর মালয়" নামক পুস্তকের একটি অধ্যায়।

প্রবাসীর শরৎ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

কত, কত দিন
হেরেছি তোমার স্বপ্ন বিরামবিহীন—
আজ তুমি যবে
বাংলার জলে স্থলে আকাশে গৌরবে
শোভিবে—রব' না আমি যোগ দিতে তোমার উৎসবে।

আজিকে যখন
শেফালী কমলদলে পরম লগন
বিকশি' উঠিবে সুখে, স্মৃতিপটে আঁকি'
লব' তব রূপ খানি—তবু কিছু বাকী
রয়ে যাবে, আকস্মিক বেদনায় মাখি'।

পরাণ অসহ হবে, তারি মাঝে করিব সন্ধান
সুরভি নিঃশ্বাস তব বাণীহীন গান;
আনন্দের উন্মাদনা লাগে,
সুগোপনে জাগে
সে আশ্বাস যারে তুমি ছড়াতেছ দূরে অনুরাগে।

আমি তাই হেথা
একাকী উদাস মনে মৌনে চাপি ব্যথা,
ভাবিব যেথায় আছি এক খণ্ড মোর দূর দেশ,
অনন্ত অশেষ,
রয়েছে আমারে ঘিরে—চিন্ময়ের প্রিয় পরিবেশ।

চকিত নিমেষে
প্রবাসের বিরহীর ব্যথা যাবে ভেসে।
দূর হ'তে কাছে আসা পূর্ণ পূর্ণ হবে—
গভীর নীরবে।
তোমার শারদ শোভা মোর বিশ্বে রাজিবে গৌরবে।

সঙ্কটত্রাণ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

রাস্তার উপর থেকে খেয়ো কুকুরটাকে কোলে তুলে নিলে ছবিলাল। কাপড়ের খুঁট দিয়ে সেটার ক্ষতের পুঁজ মুছাতে মুছাতে বললে—এ্যাঃ শালা, একদম পইচ্যা গেছছ। চল বাড়ীত চল, অখন দেখি তোর বরাত আর ওস্তাদের কিরপা।"

পাটক্ষেতের পাশ দিয়ে সঙ্কীর্ণ কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল রাস্তা। মানুষ-প্রমাণ উঁচু পাটগাছের সারি সমস্ত পৃথিবীটাকে দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছে। অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে পথ চলতে লাগল ছবিলাল। খানিক দূর যাবা'র পর বাঁ-দিকে পড়ল একটা পচা খাল, সেটার পাড়ে ঘন গাছপালা আর লতাগুল্মের গভীর জঙ্গল। খালে জল এক-হাঁটুর বেশী নয়। বদ্ধ জলে লতাপাতা পচে এমনি একটা উৎকট দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে যে সেখানে খানিকক্ষণ থাকলেই সুস্থ মানুষের দম বন্ধ হয়ে আসে। লতাগুল্মের আড়াল থেকে সাপ-খোপ মাঝে মাঝে খালের জলে লাফিয়ে পড়ে।

খালের ঘোলা জলে গুটিকতক ডুব দিয়ে নিলে ছবিলাল, সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেহমন তার চাঙ্গা হয়ে উঠল। লোকটা অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া বটে! বাইরের মুক্ত বাতাসে তার হাঁফ ধরে গিয়েছিল, কিন্তু এখানকার দূষিত আবহাওয়া তার দেহ-মনে যেন সঞ্জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করলে। সকল রকম বীভৎসতার মধ্যেই ওর উৎকট উল্লাস।

খালের একধার দিয়ে একটা সুঁড়ি রাস্তা বরাবর একটা টিলার ওপরে উঠে গেছে। সেখানে চামারদের বস্তি। বাড়ীগুলো একেবারে গায়ে গায়ে লাগাও। পায়রার খোপের মত ঘরগুলোতে জানালাদির বালাই নেই—আলো-বাতাসের প্রবেশপথ রুদ্ধ। কোন কোন বাড়ীর উঠানে পড়ে রয়েছে মরা গরু। পচা চামড়ার দুর্গন্ধে বস্তিটা ভরপুর। পৃথিবীর সমস্ত নোংরামি যেন চর্ম্মকারদের এই ক্ষুদ্র পল্লীটিতে পুঞ্জীভূত।

নিজের বাড়ীর উঠানে গিয়ে বাজখাঁই গলায় হাঁক দিলে ছবিলাল—"মঙ্গলী, ঘর নি আছছ্?" সঙ্গে সঙ্গে যে বিকটাকৃতি স্ত্রীলোকটি আঙিনায় এসে দাঁড়াল প্রথম দৃষ্টিতে তাকে প্রেত-লোকের অধিবাসিনী বলেই মনে হয়। বলা-বাহুল্য, মঙ্গলী নাম্নী এই স্ত্রী-জাতীয়া জীবটি ছবিলালের স্ত্রী। একেবারে রাজযোটক তাতে সন্দেহ নেই। মঙ্গলী মাঢ়ীশুদ্ধ দাঁতগুলো বের করে হেসে বললে—"এইডারে আবার কই থেইক্যা লইয়া আইলে।", দাওয়ায় বসে ছবিলাল বললে—"ইডা রাস্তাত পইড্যা পইড্যা কুকানি জুইরা দিছিল। লইয়া আইলাম। দেখি অখন গুরুর কিরপা।"

ছবিলাল জাতিতে চামার হ'লেও জাত-ব্যবসা করে না। লোকটা গুণী। গাছগাছড়া আর লতাপাতা দিয়ে ক্ষত-চিকিৎসা করে সে জীবিকা অর্জ্জন করে। এ বিষয়ে সারা মুলুকে তার জুড়ি নেই। রোজগারও হয় বেশ, স্বামী-স্ত্রী দু'জনের সংসার স্বচ্ছন্দেই চলে যায়। পথ থেকে কুড়িয়ে ঘা-ওয়ালা জন্তুগুলোকে বাড়ীতে এনে নিরাময় করা ওর এক বাতিক—ক্ষত সারানো ওর পেশাও বটে, আবার নেশাও বটে।

ছবিলালের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দৈত্যের মত বিরাট তার দেহ। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুলে জট পাকানো। লোকটা আবার গন্নাকাটা, কাটা ঠোঁটের ফাঁকে বের হওয়া লম্বা ধারালো দাঁতগুলো দেখলে মুখখানাকে তার হিংস্র জন্তুর মুখ বলেই মনে হয়। সব চেয়ে ভীষণ তার ভাঁটার মত গোল, লাল লাল দুটো চোখ। লোকটা যখন রেগে যায় তখন সেগুলো যেন হিংস্র শ্বাপদের চোখের মত জ্বলতে থাকে।

ছবিলালের জীবনও বৈচিত্র্যময়। সংসারে একমাত্র বন্ধন ছিল তার মা। সেই মা মারা যাওয়ার পর হঠাৎ এক দিন বাড়ী থেকে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। নানা জায়গায় ভবঘুরের মত কাটিয়ে অবশেষে কামরূপ কামাখ্যায় গিয়ে বহুদিন এক সন্ন্যাসীর চেলাগিরি করে। গুরু শিষ্যের উপর (সম্ভবতঃ গঞ্জিকা প্রস্তুত এবং সেবনে দক্ষতা দেখে) খুব তুষ্ট হন এবং নানা গাছগাছড়ার গুণাগুণ এবং ক্ষত আরোগ্য করবার বিদ্যাটি তাকে খুব ভাল করে শিখিয়ে দেন। হঠাৎ এক দিন গুরুকে না জানিয়ে সে দেশে রওনা হয়। গ্রামে এসে প্রথমে সে উদাসীনের মতই থাকত। সারাদিন সে শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াত, রাতটা কাটিয়ে দিত এক ভাঙা শিব-মন্দিরের প্রাঙ্গণে শুয়ে। ক্রমে ক্ষত-চিকিৎসায় তার কৃতিত্বের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং সব জায়গায়ই তার বেশ খাতির হ'তে লাগল।

অবশেষে এই ছন্নছাড়া জীবনের ওপর তার বিরক্তি ধরে গেল—সে সংসারী হ'ল। মেয়েরা সবাই তাকে ভয় করত, তার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলত। কিন্তু মঙ্গলী মেয়েটি কি সুনজরেই যে তাকে দেখলে! সে স্বেচ্ছায় তার ঘর করতে রাজী হ'ল। তার পর এক দিন তাদের বিয়ে হয়ে গেল। মঙ্গলীকে নিয়ে ছবিলাল প্রৌঢ় বয়সে ঘর বাঁধলে।

ছবিলালের বাড়ী যে খালটার পাড়ে তার অনতিদূরে মাতলা নদীর তীরে শ্যামচন্দ্রপুরের জমিদারের কাছারি। কাছারির বাংলোর বারান্দা থেকে দেখা যায় নদীর ওপারে দিগন্ত-প্রসারিত ধানক্ষেতে সবুজের বিপুল সমারোহ—নদীমাতৃক

দেশের সন্তানদের হৃদয়কে আশায় আনন্দে আন্দোলিত করে ধানগাছগুলো দিন দিন হতে থাকে পরিপুষ্ট, প্রবর্দ্ধমান।

পল্লীর স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রাকে বিপর্য্যস্ত করে হঠাৎ এল পঞ্চাশের মন্বন্তর—অন্নপ্রাচুর্য্যের দেশে সুরু হ'ল নিদারুণ অন্নাভাব। অনাহারে থেকে থেকে লোকেরা ধীরে ধীরে হয়ে উঠল নির্ম্মম, দয়ামায়াহীন। মানুষের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির কাছে তার হৃদয়ের সুকুমারবৃত্তি তুচ্ছ হয়ে গেল।

আশপাশের গ্রামগুলোর কেউ কেউ উপায়ান্তরবিহীন হয়ে ভিটে ছাড়তে বাধ্য হয়। নৌকা করে কাছারিতে এসে নিজ নিজ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সেখানে রেখে তারা অজানার পথে পাড়ি জমায়।

কাছারির বেশীর ভাগ কর্ম্মচারীই বিদেশাগত। সবাই মোটা টাকা রোজগার করেন, ফলে দুর্ভিক্ষের মধ্যেও তাঁদের সচ্ছল স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় না। প্রত্যেকেই সাধ্যমত একটি দুটি পিতৃমাতৃপরিত্যক্ত ছেলেমেয়েকে আশ্রয় দেন।

লোকমুখে কথাটা মেহেদীর হাওরের ওপারের রাধাপুর গ্রামে গিয়েও পৌছল।

একটি কায়স্থ-পরিবারের স্বামী-স্ত্রী নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রী করে কোনমতে নৌকা-ভাড়াটা যোগাড় করে এক দিন শ্যামচন্দ্রপুর কাছারিতে এসে উপস্থিত হ'ল। সঙ্গে তাদের পনর ষোল বৎসরের একটি মেয়ে—মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সারা গায়ে তার দগদগে ঘা—মুখখানি বীভৎস বিকৃত। দেহে তার যৌবন-লক্ষণের লেশমাত্র নাই—দেখলে মনে হয় বয়স সাত আট বৎসরের বেশী নয়।

যতদিন অন্নাভাব ছিল না, ততদিন এই গলিত ক্ষতযুক্ত বিকটদর্শন মেয়েটিই ছিল বাপ-মায়ের নয়নের মণি—কিন্তু আজ এই অনাবশ্যক বোঝার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে দু'জনেই তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। কেউ আশ্রয় দেয় ভাল, নইলে মাতলা নদীতীরে মেয়েটিকে পরিত্যাগ করে অকূলে তরী ভাসাতেই তারা বদ্ধপরিকর।

মেয়েটির চেহারা দেখেই কাছারির কর্ম্মচারীরা সবাই নাক সিঁটকালেন—আশ্রয় তার কোথাও মিলল না।

বিফলমনোরথ হয়ে স্বামী-স্ত্রী মেয়েটিকে নিয়ে নদীতীরে একটা গাছতলায় এসে বসল। শুষ্ক দ্বিপ্রহর—রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, বায়ুর গতি রুদ্ধ, নদীতে তরঙ্গ নেই। আকাশ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে একটা তীব্র জ্বালা—খর রৌদ্রদাহে সমস্ত প্রকৃতি যেন মূর্চ্ছাতুরা।

খানিক জিরিয়ে নিয়ে মেয়েটিকে সম্বোধন করে বাপ বললে—"লক্ষী, তুই এখানে খানিকক্ষণ থাক, আমরা বাজার থেকে একটু ঘুরে আসছি।"

মেয়েটি চিঁ চিঁ করে বললে—"বেশী দেরি করো না, বাবা। একলা আমার ভয় করবে।"

বাপ তার রুখু মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—"আরে পাগলী, ভয় কিসের—এই আমরা এলাম বলে।"

মেয়েটিকে ফেলে তারা চলে গেল। ঘুরপথে নদীর ঘাটে গিয়ে তারা নৌকায় উঠল। মাঝি নৌকা ছেড়ে দিলে।

এদিকে বহুক্ষণ কেটে গেলেও বাপ মা যখন ফিরে এল না, মেয়েটির তখন কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। শেষে সে একেবারে ককিয়ে কান্না জুড়ে দিলে। শেষে অবসন্ন হয়ে নির্জীব জড় পদার্থের মত গাছতলায় শুয়ে পড়ে কোঁপাতে লাগল।

ছবিলাল এদিক দিয়ে আসছিল ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে করতে—সম্ভবতঃ রাস্তায় কোথাও ঘাওয়ালা কুকুর বা অন্য জানোয়ার পড়ে আছে কিনা তার চক্ষু দুটি তারই সন্ধান করছিল। হঠাৎ একটু দূরের থেকে গাছতলায় শায়িত মেয়েটির পানে নজর পড়তে তার মনে হ'ল, একটা মৃতদেহকে শকুনির পাল যেন ঠুকরে খেয়ে গেছে। কুতূহলী হয়ে সে কাছে এগিয়ে এল। মেয়েটির পানে তাকিয়ে বুঝতে পারলে সে মৃত নয়, বিকৃত বিশীর্ণ দেহের মধ্যে ক্ষীণ প্রাণটুকু তার ধুকপুক করছে।

ঘেয়ো জানোয়ারের সন্ধানে বেরিয়ে যে ঘা-ওয়ালা বালিকাটির সামনে এসে পড়ল ছবিলাল সে পথকুকুরদেরই সগোত্র—তেমনি গৃহ থেকে বিতাড়িত এবং অসহায়। রাস্তায় পড়ে মরাই তারও অদৃষ্টলিপি—আর ছবিলালের কাছে কুকুরে আর মানুষে কোনও প্রভেদ নেই, উভয়ের সম্বন্ধে তার একই মনোভাব। লোকটা একেবারে গীতায় বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের মত সর্ব্বত্র সমদর্শী।

ছবিলাল যুক্তিবিচার করে কোনও কাজ করে না, চলে ঝোঁকের মাথায়। হঠাৎ তার মাথায় চাপল এক খেয়াল। মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে সে হন্ হন্ করে নিজ বাড়ীর পানে রওনা হ'ল।

দিন-রাত ক্ষতের যন্ত্রণায় মেয়েটার কাতরানির আর অন্ত নেই। তার উপর অপরিচিত অভিনব পরিবেশের মধ্যে এসে সে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। ছবিলাল শিয়রে এসে বসলেই সে কেমন যেন অসহায়ের মত ফ্যাল ফ্যাল করে তার পানে তাকিয়ে থাকে। ছবিলালের হৃদয়ে সুকুমারবৃত্তির কোনও বালাই আছে এ অপবাদ তার অতিবড় শত্রুতেও দিতে পারবে না। সুতরাং মেয়েটির শোচনীয় অবস্থা তার হৃদয়ে দয়া, মায়া বা করুণার উদ্রেক মোটেই করে না। কিন্তু তার মাথায় কেমন যেন একটা নেশা চেপে যায় যে, মেয়েটিকে তার নিরাময় করে তুলতেই হবে। গুরুর কৃপায় যে বিদ্যাটি সে আয়ত্ত করেছে তারই সাহায্যে মেয়েটিকে আরোগ্য করে নিজের ক্ষমতাটা সে একবার পরখ করে নিতে চায়।

সে বুঝতে পারলে মেয়েটির ক্ষত দুরারোগ্য, জটিল—কিন্তু জটিল বলেই তার জেদ আরও বেড়ে গেল। গুরুর নাম স্মরণ করে সে তার চিকিৎসায় রত হ'ল। নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়ে গাঁয়ের বন-বাদাড় ঘুরে কত রকম লতা-পাতা আর গাছ-গাছড়া যে বাড়ীতে এনে জড়ো করতে লাগল তার আর অন্ত নেই।

মাস দুই চিকিৎসার পরে দেখা গেল অপ্রত্যাশিত ফল—ক্ষত ধীরে ধীরে শুকিয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে ক্রমে মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। ছবিলালের ওষুধের গুণে ক্ষতের দাগ-গুলোও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল।

ছবিলালের চিকিৎসায় পিতামাতা কর্ত্তৃক পথ-প্রান্তে ফেলে যাওয়া এই মেয়েটির যেন পুনর্জ্জন্ম হ'ল।

তারপর বাঁধভাঙা বন্যার জল যেমন হঠাৎ এক দিন অতর্কিতে বিপুল প্লাবনে এসে খাল বিল নদীনালা পুষ্করিণীকে পরিপূর্ণ করে তোলে তেমনি যৌবন আর স্বাস্থ্যের জোয়ার এসে এই কিশোরীর রোগজীর্ণ দেহকে অপরূপ লাবণ্যশ্রীতে মণ্ডিত করে তুলল। তার যেন নব কলেবর প্রাপ্তি হ'ল। এই জীর্ণ আবরণের অন্তরালে কোথায় লুকিয়ে ছিল এতদিন এই নিরুপম রূপরাশি যা দেখলে চমক লাগে, মনে জাগে প্রবল মোহ।

ধ্বংসের হাত থেকে বিধাতার একটি নিপুণ সৃষ্টিকে রক্ষা করেছে ছবিলাল—তার আত্মপ্রসাদের আর পরিসীমা রইল না। ছবিতে তুলিকার শেষ পরশ বুলিয়ে শিল্পী যেমন আত্মহারা হয়ে আপন সৃষ্টি নিরীক্ষণ করে তেমনি ভাবে মুগ্ধ বিস্ময়ে বারবার সে মেয়েটির স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল পরিপুষ্ট নিটোল দেহের পানে তাকায়—তার সকল ইন্দ্রিয় যেন চক্ষুময় হয়ে মেয়েটিকে গিলতে থাকে।

চোখে ওর নেশা লাগল কি?

নেশাই বটে! ছবিলালের চোখে পৃথিবীর রং বদলে গেল, তার হৃদয়ে জাগল রূপের ক্ষুধা। কিন্তু ছবিলালের ক্ষুধা—সে তো মানুষের ক্ষুধা নয়—সে যে দানবের ক্ষুধা! যে-বস্তুর উপর তার প্রলুব্ধ দৃষ্টি পড়েছে তাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রাস না করা পর্য্যন্ত তো সে বুভুক্ষার উপশম হবে না।

ছবিলাল ভাবে, মেয়েটিকে যে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। তার স্বাস্থ্য রূপ যৌবন সব কিছুই ফিরে এসেছে তার অক্লান্ত চেষ্টায়—সুতরাং মেয়েটির উপর সম্পূর্ণ অধিকার তারই।

ছবিলাল স্থির করলে মেয়েটিকে সে বিয়ে করবে। মনের কথাটি সে একদিন খুলে বললে।

শুনে ছবিলালের স্ত্রী হয় ঈর্ষান্বিত আর মেয়েটি আতঙ্কে শিউরে উঠে। নিজের অদৃষ্টের কথা সে ভাবে।

বয়স তার ষোল বৎসর মাত্র, কিন্তু এরই মধ্যে তার জীবনটাকে নিয়ে বিধাতার যে নিষ্ঠুর লীলা সুরু হয়েছে তার অবসান হবে কবে? ছোটবেলা থেকে বিনাদোষে সকলের ঘৃণা কুড়িয়ে কাটছিল তার দিন। হঠাৎ একদিন নৌকা করে বাপ মা তাকে শ্যামচন্দ্রপুর কাছারির নিকটে মাতলা নদীতীরে পরিত্যাগ করে কোথায় চলে গেল। কি তার অপরাধ তাও রইল তার অজানা। দৈবচক্রে আশ্রয় জুটল এক চর্ম্মকারগৃহে যেখানকার শুকারজনক আবেষ্টনে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। এই নরকেই কি তাকে থাকতে হবে চিরকাল। বিধাতার অভিশাপ-স্বরূপ যেন তার দেহে হঠাৎ এসেছে স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্য। এই দেহভরা রূপলাবণ্য নিয়ে কোথায় গিয়ে আত্মগোপন করবে সে।

পূর্ব্বজীবনের সঙ্গে পড়েছে তার পূর্ণচ্ছেদ। এখন সে আর বাপমায়ের আদরের লক্ষ্মী নয়, ছবিলালের দেওয়া নিদানী নামে, তারই আশ্রিতারূপে শ্যামচন্দ্রপুরের চর্ম্মকার-পল্লীতে আর আশেপাশে তার পরিচয়।

যে বয়সে মেয়েরা স্বপ্ন দেখে সেই যৌবনোন্মেষ কালে তাকে ঘিরে রইল রূঢ় নিষ্ঠুর জুগুপ্সিত বাস্তব পরিবেশ। যে লোকটার আশ্রয়ে সে আছে তাকে দেখলেই তার গা ঘিন ঘিন করে, তার চোখে লুব্ধ ক্ষুধাতুর দৃষ্টি দেখে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। ওর হাত থেকে কি আত্মরক্ষা করতে পারবে সে! ছবিলালের ভেতরকার যে পশুটা আজ জেগে উঠেছে তার কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কি?…

ওদিকে ছবিলালের কাজকর্ম্ম সব গেছে চুলোয়। দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়ার সন্ধানে আর সে বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় না, চব্বিশ ঘণ্টা নিদানীকেই আগলে বসে থাকে। যেখানেই নিদানী যায় সেখানেই ছায়ার মত সে তাকে অনুসরণ করে। লোকটার চোখে সব সময় কেমন একটা ক্ষুধিত, জ্বালাভরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ওই চোখ দুটার পানে তাকালেই নিদানীর বুকের ভেতরটা পর্য্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠে।…

মাতলার তীরে একটা নিরালা জায়গায় এসে চুপ করে বসে ছিল নিদানী, হঠাৎ একটা উচ্চ হাস্যের শব্দে সে চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখে সামনেই দাঁড়িয়ে মূর্ত্তিমান দুঃস্বপ্নের মত ছবিলাল। আশ্চর্য্য! লোকটা কি তাকে দু'দণ্ডের জন্যেও সোয়াস্তি দেবে না।

বাজখাঁই গলাকে সাধ্যমত মোলায়েম করবার চেষ্টা করে ছবিলাল ঈষৎ অনুনয়ের সুরে বললে—"নিদানী, তুই আমারে এমুন কইর‍্যা এড়াইয়া চলিস কেরে? তুই এহানে আইয়া বইয়া রইছ আর তরে আমি সারাডা গা তুকাইয়া বেড়াইতাছি। ক নিদানী, আমারে তর ডরডা কিয়ের? আমি কি বাঘ না ভাল্লুক যে তরে গপ কইর‍্যা গিল্যা ফালাইমু। কথা হুন, তুই আমারে বিয়া কর, হেরে মড়লী-ভারে খেদাইয়া দিয়া দুইজনে সুখে থাকুম। শিব ঠাউরের

কিরপায় রুজিরোজগার আমার ভালই হয়। আরে খাটতে পারলে ছবিলালের পয়সা মারে কেডা।"

নিদানী নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগল, মনে মনে বললে—"তুমি বাঘ ভালুকের চেয়েও ভীষণ। তাদের হাত থেকে বাঁচোয়া আছে। কিন্তু তোমার কবল থেকে নিস্তার নেই।" প্রকাশ্যে শুধু বললে—"তুমি আমার বাপের সমান।"

আকাশ ফাটা অট্টহাস্য করে উঠল ছবিলাল। একটা বক নিকটেই মৎস্যশিকারের আশায় ধ্যানস্থ হয়ে অপেক্ষা করছিল, সেটা পর্য্যন্ত চমকে উঠে একটু দূরে সরে গেল। একটু চুপ করে থেকে ছবিলাল বললে—"ও, বুঝছি ভাইল খারাকথারা গলব না। বা-প, আচ্ছা কেমন বাপ তা টের পাবি।"

বলে নিদানীর পানে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে গেল।

ইতিমধ্যে ছবিলালের সংসারে দেখা দিয়েছে দারুণ বিপর্য্যয়। নিদানীর প্রতি ছবিলালের ক্রমবর্দ্ধমান আসক্তি দেখে নিদারুণ ঈর্ষায় মঙ্গলীর মনটা বিষিয়ে উঠল। সময় সময় ছবিলালের মারধোর সত্ত্বেও তার জীবনটা তো কাটছিল বেশ—সে মনের সুখেই ছিল, কিন্তু কোথা থেকে এই হতভাগা মেয়েটা উড়ে এসে জুড়ে বসে সবকিছু পণ্ড করতে বসেছে। নিদানীর কাছে ছবিলালকে দেখলেই তার সমস্ত শরীরে যেন জলুনি ধরে যায়—কোনো না কোনো অছিলায় সে তাদের সামনে এসে হাজির হয়। তার এ অবাঞ্ছিত উপস্থিতিতে ছবিলালের শরীর রাগে রি রি করতে থাকে। যখন ছবিলাল বাড়ীতে থাকে না তখন সে যেন বাঘিনীর মত নিদানীর উপরে লাফিয়ে পড়ে। টেনে হিঁচড়ে আঁচড়ে কামড়ে সে তাকে একেবারে নাজেহাল করে তোলে, গলা সপ্তমে চড়িয়ে চেঁচাতে থাকে—"আবাগী, আমার সব্বনাশ করতে আইছস—যা আমার বাড়ী থনে অখনই বাইরইয়া যা।"

নিদানীও তো এই মুহূর্ত্তেই বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কোথায় যাবে সে! এ সংসারে তার আশ্রয় কোথায়!

মঙ্গলীর নিরন্তর সতর্ক প্রহরায় ছবিলাল অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মেজাজটা তার এমনিতেই চটে ছিল হঠাৎ মঙ্গলী তার কাছে এসে খেঁকিয়ে উঠল—"অই আপদডারে, নিদানীডারে বিদায় কইরা দে। না অইলে ও আমার সংসার জ্বালাইয়া খাইব।"

কথাগুলো শুনে ছবিলাল রাগে একেবারে কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হয়ে উঠল। সজোরে ধাক্কা মেরে মঙ্গলীকে সে মাটিতে ফেলে দিলে। তারপর সে কি বেদম প্রহার! মঙ্গলীর হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যায় বুঝি। খুব একচোট মার দিয়ে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে ধরে তাকে খালের পাড়ে টেনে নিয়ে এসে প্রচণ্ড এক লাথি মেরে বললে, "যা বাইরইয়া যা, আমার বাড়ীতে আর আইছ না।"

মঙ্গলী ধীরে ধীরে উঠে বসল, বিড় বিড় করে বললে, "চললাম কিন্তু এর সাজা ভগমান তরে দিব।"

খাল পেরিয়ে, মেঠো রাস্তা ধরে সে চলতে লাগল। পাট-ক্ষেতের আড়ালে মঙ্গলীর অপ্রস্রিয়মাণ মূর্ত্তিখানির পানে তাকিয়ে নিদানী ভাবছিল, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে ছবিলালের আশ্রয় ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়!—হঠাৎ চোখ তুলে দেখে এক জোড়া জ্বলন্ত চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টি তার ওপরে নিবদ্ধ।

মঙ্গলী চলে যাওয়ার পর নিদানীর নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হতে লাগল। এতদিন তবু তার এবং ছবিলালের মধ্যে এমন একটা আড়াল ছিল যেখানে নিজেকে সে কতকটা নিরাপদ মনে করত। কিন্তু এখন সে আড়াল টুটে গেছে। নিদানীর মনে হ'ল, সে যেন এক অতলস্পর্শ গহ্বরের একেবারে প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে—অচিরেই সেই অন্ধকার গহ্বরে পতন তার অনিবার্য্য। এমন কোন অবলম্বন নেই যা আঁকড়ে ধরে সে আত্মরক্ষা করতে পারে।...

ক্রমে ক্রমে ছবিলালের ভোগবাসনা হয়ে উঠল দুর্দ্দমনীয়। এক মুহূর্ত্তও সে নিদানীর কাছছাড়া হয় না। খালের ধারে, নদীর তীরে, ভাঙা দেউলে পাশে যেখানেই গিয়ে বসে নিদানী, সেখানেই ধাওয়া করে ছবিলাল। কোথায় যাবে নিদানী, পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্য্যন্তও বুঝি ছবিলালের সন্ধানী চক্ষু দুটি তাকে অনুসরণ করে ফিরবে—তার বিকৃত কামনার হাত থেকে নিদানীর নিস্তার নেই।

ভোগাকাঙ্ক্ষায় ছবিলালের দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু উন্মুখ, কিন্তু সেজন্যে তার তাড়াহুড়া নেই। করায়ত্ত শিকার সম্বন্ধে শিকারী যেমন নিশ্চিন্ত থাকে, নিদানী সম্বন্ধে তার মনোভাবও অনেকটা তেমনি ধরণের।

তা ছাড়া দীর্ঘকাল সন্ন্যাসীর চেলাগিরি করে কাটানোর ফলে এটুকু ধর্ম্মজ্ঞান তার আছে যে অবৈধ ভাবে সে নিজের ভোগবাসনা চরিতার্থ করবে না, বিবাহদ্বারা সম্পর্কটাকে বৈধ করে নেবে।

জোর-জবরদস্তি করলে পাছে সব ভেস্তে যায় সেজন্যে সে তার প্রতি অত্যন্ত মোলায়েম ব্যবহার সুরু করলে। নিদানীর মনোরঞ্জন করবার জন্যে তার চেষ্টার আর অন্ত রইল না। সাধ্যাতিরিক্ত খরচ করে আয়না, চিরুণী, গন্ধতৈল ইত্যাদি কত জিনিষই না সে নিয়ে আসতে লাগল!

কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে ছবিলালের দেরী হ'ল না। সে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করতে পারলে নিদানী তার 'পরে কখনো প্রসন্ন হবে না।

তার ভাবান্তর দেখা দিল। মুখখানা আষাঢ়ের আকাশের

মত গম্ভীর থমথমে। গত এক বৎসরের মধ্যে ছবিলালের এমন মূর্ত্তি নিদানী দেখে নাই। সে যেন সাংঘাতিক একটা কিছু করতে বদ্ধপরিকর। তবে কি তার সর্ব্বনাশের চরম মুহূর্ত্ত সমাগত।

সে দিনরাত একান্ত মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করতে লাগল—"হে ভগবান, এ পিশাচের হাত থেকে আমায় বাঁচাও, এ নরকপুরী থেকে আমায় উদ্ধার কর।"

ভগবান বোধ করি অসহায় মেয়েটির কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করলেন। মুশকিল আসানের একটা উপায় অচিরেই হ'ল। কাছারির ডাক্তারের ছেলে সুনীল নিয়েছিল যুদ্ধের কণ্ট্রাক্ট। দেখতে দেখতে বরাত তার ফিরে যায়। সৈন্য-বিভাগের জন্যে নারী সরবরাহ করে সুনীল কর্ত্তাদের নেক-নজরে পড়ে এবং এইটেই নাকি তার ভাগ্যপরিবর্ত্তনের মূল কারণ। নারী-সংগ্রহে সুনীলের যোগ্যতা অপরিসীম। কোথায় কোন্ সরবরাহযোগ্য এবং উপভোগ্য নারী আছে তাদের নামধাম সবকিছু তার নখদর্পণে।

নিদানীর উপর পড়ল তার নজর এবং ছকুল থেকে এই স্ত্রীরত্নটিকে উদ্ধার করে সৈন্যবিভাগের কর্ত্তাদের উপঢৌকন দেবার জন্যে সে তৎপর হয়ে উঠল। মেয়েটাকে পেলে ওরা যে কি রকম লুফে নেবে এবং ফলে সে কি মোটা দাঁও মারবে তাই সে ভাবতে লাগল।…

ছবিলাল বাড়ী নেই, একথা জেনে একদিন সন্ধ্যার পরে সুনীল তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল। ছবিলাল গিয়েছিল রঘুনন্দন পাহাড়ের জঙ্গলে দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়ার সন্ধানে।

নিদানী ছিল ঘরের ভিতরে, সুনীলের ডাকে বেরিয়ে এল। সুনীল শোনালে তাকে আশার বাণী—এই নরক থেকে তাকে সে উদ্ধার করতে চায়। তাকে নিয়ে সে চলে যাবে শহরে। সেখানে মোটা মাইনেতে হবে তার যুদ্ধের চাকরি। ভদ্র-সমাজে সুখে স্বচ্ছন্দে খেয়ে-পরে মানুষের মত সে বাঁচতে পারবে।

সুনীলের কথায় নিদানী স্বপ্ন দেখতে লাগল…এই নরকাগার থেকে সত্যি কি হবে তার মুক্তি, অন্ধকারের ওপারে বাস্তবিকই কি তার জন্যে অপেক্ষা করছে আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! এতকাল পরে এল কি তার মুক্তিদাতা—ছবিলালের বিকৃত কামনার হাত থেকে তাকে উদ্ধার করতে। এক মুহূর্ত্তে সে মনস্থির করে ফেললে, আজই সে সুনীলের সঙ্গে এখান থেকে চলে যাবে। একবার মনে হ'ল এ জায়গা থেকে অন্যত্র গিয়ে সে তো আরো দুর্গতির মধ্যে পড়তে পারে। কিন্তু আর ভাববার সময় নাই। একথা সে বুঝতে পেরেছে যে, ছবিলালের কামনার লেলিহান শিখা থেকে আর সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। আজ ছবিলাল বাড়ীতে নেই, বহু-দূরে গেছে—ফিরতে রাত হবে অনেক। এমন সুযোগ আর আসবে না। কাজেই তাকে এ স্থান পরিত্যাগ করতে হবে এই মুহূর্ত্তেই। সুনীলের পায়ের তলায় পড়ে সে ডুকরে কেঁদে বলে উঠল,—"আপনি আমায় এক্ষুনি এ নরক থেকে নিয়ে যান, আমায় বাঁচান।"

সুনীল নিদানীকে সান্ত্বনা দিলে। তারপর তাকে নিয়ে ছবিলালের বাড়ীর পেছন দিককার জনহীন সুঁড়ি পথ ধরে টিলার নীচে নেমে এল। খাল পেরিয়ে, পাট-ক্ষেতের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে চলতে চলতে নদীর ঘাটে পৌঁছে নৌকায় চড়ে বসল।' নিদানীর হ'ল মুক্তিস্নান—পেছনে পড়ে রইল পচা খাল, এক বৎসরের দুঃখদুর্গতির স্মৃতিবিজড়িত ছবিলালের কুঁড়েঘর, চামারহাটির নোংরা ঘরবাড়ী, আর খালপাড়ের বন-ঝোপ। নৌকা চলল শহরের পানে।…

ওদিকে রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হলে পর ছবিলাল ফিরে এল ঘরে। অভ্যাসমত ডাকলে—'নিদানী!' কেউ সাড়া দিলে না। ঘরে ঢুকে তাকে না দেখে সে আশ্চর্য্য হ'ল। সারাটা বাড়ী পাতি পাতি করে খুঁজল, কিন্তু কোথাও তার পাত্তা নেই। ছবিলালের মনটা দমে গেল, তবে কি পাখী শিকলি কেটেছে! ঘরের ভিতরটা ভালো করে পর্য্যবেক্ষণ করে বুঝল তার সন্দেহ অমূলক নয়। নিদানীর সব কাপড়চোপড়, মায় আয়না চিরুণী পর্য্যন্ত কিছুই নেই।

হঠাৎ যেন ছবিলালের নিজেকে নিতান্ত অসহায়, অত্যন্ত একা মনে হতে লাগল—সংসারটা যেন এক অপরিমেয় শূন্য-তায় ভরে উঠেছে। এতদিন পরে আজ মঙ্গলীর কথা মনে পড়ে তার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। বৌটা বাস্ত-বিকই তাকে ভালবাসত, কিন্তু একটা অসম্ভবের নেশায় সে নির্ম্মমভাবে প্রহার করে তাকে তাড়িয়ে দিলে।

সে বুঝল, মঙ্গলীর অভিশাপ এতদিনে ফলতে সুরু হয়েছে। তার সংসারের খেলাঘর এবার ভাঙল—এ ভাঙা ঘর আর জোড়া লাগবে না।

হঠাৎ তার চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। এই তার জীবনে প্রথম দুঃখানুভূতির উত্তপ্ত অশ্রুবিন্দু।

* * *

এদিকে সুনীলের নৌকা এতক্ষণে মাতলা ছাড়িয়ে তিতাস নদীর বুকের ওপর দিয়ে চলেছে। রাত হয়েছে গভীর, আকাশে প্রকাণ্ড একখানি কাঞ্চন-থালার মত চাঁদ উঠেছে। দিগন্তপ্রসারিত তিতাসের রূপালি জলধারার উপর দিয়ে যেন জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। নৌকার গায়ে ঢেউয়ের আঘাতে বড় মধুর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে।

নৌকার ছইয়ের বাইরে গিয়ে বসল সুনীল, বড় মিষ্টি করে ডাকলে—"নিদানী, ঘুমিয়েছ না জেগে আছ?"

"ঘুম আসছে না আমার…কিন্তু নাম তো আমার নিদানী নয়, ওটা ছবিলালের দেওয়া নাম।"

"তবে কি নাম তোমার—তোমার জীবনের কথা একটু-আধটু জানি, কিন্তু সব তোমার নিজের মুখে শুনতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।"

"বাপ মায়ের দেওয়া নাম আমার লক্ষ্মী। আমার জীবনের কথা শুনে কি-ই বা লাভ! একটানা দুঃখের জীবন আমার। কিন্তু কত বড় সর্ব্বনাশের হাত থেকেই না আপনি আমায় বাঁচিয়েছেন।"—কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর।

"লক্ষ্মী, একটু কাছে সরে এসো"—সুনীলের গলাটা যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সে লক্ষ্মীর হাত ধরে মৃদুভাবে আকর্ষণ করলে।

একটু অবাক হয়ে সুনীলের মুখের পানে তাকালে লক্ষ্মী। চোখ দুটোতে তার কেমন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি! লক্ষ্মীর বুক দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল, তার মনে হ'ল এই চাউনির সঙ্গে ছবিলালের লালসাতুর দু'টি চক্ষুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। ছবিলালের সঙ্গে সুনীলের শান্ত ভদ্র চেহারা, তার পোশাক-পরিচ্ছদ চলন-বলন সবকিছুরই কতই না পার্থক্য, অথচ মনের চেহারা যে দু'জনেরই এক, তারই প্রতিফলন সে দেখলে সুনীলের কামনাপ্রদীপ্ত দুই চক্ষে।

সে তীব্র দৃষ্টির সম্মুখ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে লক্ষ্মী। জ্যোৎস্নার প্লাবন তার মুখখানিকে অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। কিন্তু জ্যোৎস্নাধৌত আকাশের এককোণে পুঞ্জীভূত কালো মেঘের মত, তারও শুভ্র সুন্দর আননে ঘনিয়ে এসেছে সুগভীর দুশ্চিন্তা আর অজানা আশঙ্কার কালো ছায়া।...

সুনীল আরো একটু ঘন হয়ে বসল। নিরীহ শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে হিংস্র পশুর মত অবস্থা তার।

লক্ষ্মী একবার একান্ত অসহায়ভাবে সুনীলের মুখের পানে তাকালে, পরক্ষণেই ঊর্দ্ধমুখী হয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। সদ্যোদ্ভিন্ন যৌবনে তার কত জ্যোৎস্নারজনী অশ্রুজলে ব্যর্থ হয়ে গেছে, আজ প্রথম সুরু হয়েছিল চন্দ্রিকাস্নাত নিশীথে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার পালা—বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সে-স্বপ্ন ভেঙে গেল।

কিন্তু লক্ষ্মীর দৃঢ় সঙ্কল্প। প্রাণ থাকতে সুনীলের পশুসত্তার কাছে আত্মসমর্পণ সে করবে না। অদৃষ্ট তার জীবনটাকে নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলেছে, কিন্তু প্রতিকূল ভাগ্যের কাছে পরাজয় স্বীকার সে করবে না। যদি উপায়ান্তর না থাকে তা হলে খরস্রোতা তিতাসের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে চরম সঙ্কটের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে।...

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার প্রয়োজন হ'ল না।...প্রবৃত্তির তাড়নায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে নিজের আখেরের লাভের আশা মাটি করবে, সুনীল তেমন ছেলেই নয়। যখন সে নিজের ভুল বুঝতে পারলে তখন ছইয়ের ভেতরে গিয়ে নিদ্রার আয়োজন করলে। নৌকার বাইরে জেগে বসে রইল লক্ষ্মী। সকালবেলা তিতাস নদীর বারিরাশিকে রাঙিয়ে সূর্য্য উঠল পূর্ব্বাকাশে।

নদীতীরস্থ বনঝোপের কাছে একটা নিরালা জায়গায় মাঝি শেষরাত্রে নৌকা বেঁধে নিদ্রা দিয়েছিল—এখনো আরামে ঘুমোচ্ছে। ওদিকে ছইয়ের ভেতর সুনীল গভীর নিদ্রায় অচেতন।

লক্ষ্মী তখনো বাইরে ঠায় বসে আছে—চোখে তার অতন্দ্র রজনী যাপনের সুগভীর ক্লান্তি, এক রাত্রিতে বয়স যেন তার দশ বৎসর বেড়ে গেছে।...

ভোরের আলো নৌকার ছইয়ের ভেতরে এসে পড়েছে। সুনীলের সুষুপ্ত মুখের পানে তাকিয়ে লক্ষ্মী শিউরে উঠল—তার নিঃশ্বাসে যেন বিষ-বাষ্পের স্পর্শ। লক্ষ্মীর সমস্ত শরীর জ্বালা করতে লাগল—একেই সে ভেবেছিল তার মুক্তিদাতা। লোকটা ভদ্রবেশী বর্ব্বর, ছবিলালের চেয়েও নীচ প্রকৃতির। ওকে বিশ্বাস করেই লক্ষ্মী সর্ব্বনাশের সম্মুখীন। এই মুহূর্ত্তে ওর বিষাক্ত সংস্পর্শ পরিহার করতে না পারলে তার যেন আর বাঁচোয়া নাই।

তড়িদ্বেগে নৌকা থেকে তীরে নেমে এল লক্ষ্মী, তারপর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বেত-কাঁটার জঙ্গল ভেঙে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। কাঁটায় তার গায়ের চামড়া ছড়ে যেতে লাগল। কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, সে যেন নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাইছে।

জঙ্গল পার হয়ে সে এক সুদূরপ্রসারী প্রান্তরের বুকে এসে পড়ল। অনন্তবিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ—দিগন্তের শেষসীমা পর্য্যন্ত দৃষ্টি কোথাও প্রতিহত হয় না। চতুষ্পার্শ্বে আকাশ নত হয়ে প্রান্তরের বুকে নেমে এসেছে—পৃথিবীর উপরে যেন আকাশের নীলাঞ্চলের ঘেরাটোপ দেওয়া।...

লক্ষ্মীর নিশি-জাগরণক্লান্ত দেহে আর তিলমাত্র শক্তি নেই। গভীর শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে সে একটা গাছতলায় বসে পড়ল।

সুমুখে প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে পায়ে চলার পথ। মাঠ পেরিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে, খাল, বিল, জলা-ডোবা ডিঙিয়ে সে পথ যেন কোন্ সুদূরের পানে উধাও হয়ে চলে গেছে।

গাছতলায় বসে লক্ষ্মী সেই দূরবিসর্পিত পথ-রেখার পানে উদাসনয়নে তাকিয়ে রইল...

সেকালে বাঙালীর শক্তিচর্চ্চা

শ্রীশান্তি পাল

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের বহু স্থানে বাঙালী জাতির বীরত্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামায়ণ ও মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের বাঙালী রাজাদের কীর্ত্তিকলাপ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের অনেক কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে। 'বৃহৎ বঙ্গের' ভূমিকার এক স্থানে বলা হইয়াছে—"বঙ্গীয় নৃপতিগণ রণতরীতে আরোহণ পূর্ব্বক রঘুর দিগ্বিজয়ে বাধা দিয়াছিলেন এবং সেই যুদ্ধ এরূপ ঘোরতর হইয়াছিল যে, যুদ্ধ জয় করিয়া রঘু গঙ্গামধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্জে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন। ......যে সমুদ্রগুপ্ত আসমুদ্র হিমাচল জয় করিয়াছিলেন তাঁহাকেও বঙ্গদেশ জয় করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিনিও এই দুরূহ কার্য্য সমাধা করিয়া সাগর-সঙ্গমে একটি স্মারক জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন।"

খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে রচিত বিভিন্ন কাব্যে গৌড়ের পাল ও সেন রাজগণের শৌর্য্য বীর্য্য ও শক্তিমত্তার নানা কাহিনী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের ভূমিকায় এক স্থানে বলা হইয়াছে—"বঙ্গদেশ যখন স্বাধীন ছিল, পালবংশীয় রাজগণ যখন গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, যখন বাঙালী বীরের পদভরে বঙ্গভূমি কাঁপিত—বঙ্গের সেই শুভ সময়ে ধর্ম্মমঙ্গলের উৎপত্তি হয়। ধর্ম্মমঙ্গলে মল্লদিগের লড়াই ও অশ্বাদির চালনার সজীব বর্ণনা দেখা যায়। অশ্বে আরোহণ করিয়া কোমল অঙ্গে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া বাঙালী বীর রমণীর ধনুর্ব্বাণ হস্তে যুদ্ধে গমন—কোন্ কাব্যে এ নয়ন মনোহর দৃশ্য আছে?"

অতি প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া এবার পরবর্ত্তী কালের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। চতুর্দ্দশ শতকে বাঙালীর ছেলেরা যে আখড়ায় গিয়া দেহানুশীলন, শস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি নানা প্রকার শক্তিচর্চ্চা করিত, এ তথ্য আমরা অনাদিমঙ্গলেও পাইতেছি। তখনকার যুগে বাংলাদেশে রাজকুমারদের বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত শক্তিচর্চ্চা করিতে হইত। আমরা রাজা কর্ণসেনের উক্তিটি এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম:

"বিদ্যা বিনে গতি নাই জানে সর্ব্বজনে,
রাজপুত্র হইলে চাই শিখাইতে রণে।
ডাকয়ে আনিল রাজা জয়পতি মণ্ডলে,
কোথা আছে মল্লবীর কহিবে তৎকালে।
এমন বিস্তর মল্ল আছে এইখানে,
জগতে কহিলে তার নাম নাহি জানে।
রমতী শহরে আছে মল্ল সারেঙ-ধল,
যার বাহুর হস্তে ধরে বাইশ হাতীর বল।"

এই কয়েকটি পঙ্ক্তির মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, তৎকালে রাজারা যেমন রাজপুত্রদের যথোচিত বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন, তেমনই শারীরিক শক্তিচর্চ্চা ও রণকৌশলাদি শিখাইতেও যত্নবান হইতেন; মল্লবীরগণ রাজ্যের সাধারণ প্রজা হইলেও বঙ্গাধিপগণ তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করিতেন; রাজা তাঁহার মণ্ডলকে উৎকৃষ্ট মল্লের সন্ধান করিতে বলিতেছেন। মণ্ডল রাজাকে সারেঙ ধলের কথা বলিলেন।

"আজ্ঞা কহি কোটালিয়া করিল গমন,
মল্লের নিকটে গিয়া দিল দরশন।
আখড়াশালেতে খেলে মাল সারেঙ-ধল,
চারিদিকে পড়েছে পাষাণ জগদ্দল।
নিরবধি আখড়া সদাই ঠাট বাট,
চারিদিকে প'ড়ে আছে পাষাণ মাল কাঠ।"

এই কয়েকটি পঙ্ক্তির মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, রাজার আজ্ঞায় কোটাল অর্থাৎ পুলিশ কর্ম্মচারী মল্লের সন্ধানে বাহির হইল। এখানে আমরা তৎকালীন আখড়ার একটি উত্তম বর্ণনা পাইতেছি। তাহাতে দেখা যায় সেই আখড়া কোন অংশেই আধুনিক 'জিমন্যাসিয়াম' অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। পাষাণ, গদা, মাল কাঠ, ঠাট-বাট ইত্যাদি বিবিধ সরঞ্জাম এবং মল্লক্রীড়ার অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যগুলিও তথায় রহিয়াছে। তারপরে:

"বার দিয়া বসেছে ভূপতি কর্ণসেন,
মল্লগুরু আসিয়ে সম্মুখে দেখা দেন।
মাল সব আড়ালে দাঁড়াল সারি সারি,
তাল কিম্বা শাল গাছ তুলনা দিতে নারি।"

রাজসভায় মল্লগুরু সারেঙ-ধলের আবির্ভাবের কথা এস্থলে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গুরু সারেঙ-ধল রাজ-সমীপে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার শিষ্যেরা সারি সারি অন্তরালে দাঁড়াইলেন। শেষের দুই পঙ্ক্তিতে তাঁহাদের উন্নত বলিষ্ঠ দেহের একটি নিপুণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানে তাঁহাদিগকে তাল ও শাল গাছের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সুঠাম বাঙালী মল্লের দেহের তুলনা আর কিসের সহিত হইতে পারে?

অনাদিমঙ্গলে 'আখড়াপালা' ও 'মালবধ' পালার মধ্যে আমরা বাঙালী বীরজননীর একটি সুন্দর চিত্র পাই। তাহার কয়েকটি ছত্র এ স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না:

"হেনকালে রঞ্জাবতী করে নিবেদন,
লাউসেন কর্পূরে শিখাইবে রণ।
সঁপিলাম বাছা দুটি তোমার ওই পায়,
সর্ব্বকালে শুনিয়াছি গুরুর আছে দায়।
রঞ্জা বলে বাছাধন খেলা কর দূর,
মিলায়েছে মল্লগুরু অনাস্ত ঠাকুর।
এক মনে সেবা কর গুরুর চরণ,
গুরুভক্তি বিদ্যালাভ কহে সর্ব্বজন।
কড়ি খেলা পাশা খেলা অতি অলক্ষণ,
পাশা খেলে দুঃখ পাইল পাণ্ডব পঞ্চজন।"

* * * *

হনুমান সরণ শিখান হাতে হাতে,
চলন বুলন গতি উলম্ফন পাতে।
এগোয় পেছোয় দোঁহে উরুতে চাপড়,
দুটি হাত বুকেতে গুরুর পায়ে গড়।
চাকার ভাঙরি প্রায় ঘুরে পায় পায়,
আশি হাত লাফ দিয়ে গড়াগড়ি যায়।
বিক্রমে বিবিধ প্যাঁচ শিখে দুটি ভাই।
দন্তে চিবাইয়া ভাঙে লোহার কলাই।
নিঙাড়িয়া সরিষা মাথায় মাখে তেল,
চাপড়ে ভাঙিল লোহার পাঁচ বেল।
ধনুকবিদ্যা অসিবিদ্যা ফলক লাঠারি,
শিখাল অনেক বিদ্যা কহিতে না পারি।
গজবাজিবিদ্যা আর রথের চালনা,
লাউসেন কর্পূর দোঁহার পুরিল বাসনা।"

এই উদ্ধৃতাংশে আমরা তখনকার দিনের গুরুভক্তি, কড়ি-পাশা প্রভৃতি খেলার অপকারিতা, নানা প্রকার দৈহিক কসরৎ ও সেগুলির পরীক্ষা ইত্যাদির নিখুঁত বর্ণনা পাইতেছি। প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে দেখি জননী পুত্রকে গুরুর হস্তে সঁপিয়া দিবার কালে তাহাকে গুরুভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। রামায়ণ মহাভারতে আমরা জ্ঞান-গুরু ও অস্ত্র-গুরুর বহু বৃত্তান্ত পাইয়াছি; এখানেও মল্লবিদ্যা ও রণবিদ্যা শিক্ষাদাতা গুরুর কথা পাওয়া গেল। আমরা দেখিলাম, গুরুর নিকট লাউসেন ও কর্পূর মল্লযুদ্ধ, ধনুর্বিদ্যা, অশ্ব ও হস্তী চালনা, রথচালনা, অসি-ভল্ল চালনা প্রভৃতি বিচিত্র শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন।

লাউসেন ও কর্পূরসেনের শক্তিমত্তার কথা সেকালে দেশের সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই দুই ভাইয়ের বীরত্ব-কাহিনীতে মঙ্গলকাব্য পরিপূর্ণ। সেকালে ভাটেরা নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে মঙ্গলকাব্যের পদগুলি সুর-লয়ে গান করিয়া বাঙালী যুবকদের শক্তিচর্চ্চায় উৎসাহিত করিত। মুকুন্দরাম বিরচিত চণ্ডীমঙ্গলেও আমরা কালকেতুর শক্তিমত্তার একটি চমৎকার বর্ণনা পাইতেছি।

"সহিয়া শতেক ঠেলা যার সঙ্গে করে খেলা
তার হয় জীবন সংশয়,
যে জন আঁকড়ি ধরে আছাড়ে ধরণী পরে
ডরে কেহ নিকটে না রয়।

* * *

ইচ্ছা হয় যেই দিনে বনে যায় বাপ সনে
আগে ধায় জিনিয়া পবনে,
ভাড়িয়া হরিণ ধরে কি কাজ ধনুক শরে
বিত্তা হেতু ব্যাধ চিন্তে মনে।"

উপরোক্ত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, চণ্ডীকাব্যের সময়েও নিয়মিত শক্তি-চর্চ্চা হইত। পিতৃপিতামহেরা বংশধরদের বীরত্বসূচক কার্য্যে কিরূপ উৎসাহিত করিতেন কালকেতুর জীবনকথাই তাহার প্রমাণ। রাঢ়-বঙ্গে বরেন্দ্রভূমিতে যখন বাঙালীর বাহুবলে নূতন নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হইতে বঙ্গসন্তানেরা ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে আখড়ায় গিয়া শরীর-চর্চ্চা করিতেন, শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। বাঙালীর বাহু তখন দুর্ব্বল হয় নাই, তাহার হাতে অসি তখন ঝন ঝন করিয়া বাজিয়া উঠিত। তখনকার দিনে বাংলার ঘরে ঘরে বীর-সন্তানদের আবির্ভাব হইত।

মনসামঙ্গলের একস্থলে যুদ্ধে লক্ষীন্দর কি ভাবে প্রচণ্ডকে বন্দী করিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত আছে। বাংলার বণিক-সন্তানেরা যে রণবিদ্যায় পারদর্শী হইতেন, লক্ষীন্দরের কাহিনী হইতে আমরা তাহা জানিতে পারিতেছি। মনসা-ভাসানের কবি বলিতেছেন:

"লক্ষীন্দর যুদ্ধ তবে দিল পাছে থাকি
ধাইয়া চলিল যুদ্ধে যতেক ধানুকী।
ভূপতিকে রুষিলেক বন্দুক ভরিয়া,
প্রচণ্ডের সৈন্য মধ্যে চলিল ধাইয়া।
হাতে অস্ত্র করি সৈন্য ধাইল সত্বর,
ঘোড়ার উপরে চড়ি হাতে ধনুঃশর।
নানা অস্ত্রে প্রহারিল মুষল মুদ্গর,
বিঁধিয়া প্রচণ্ড সৈন্য করিল জর্জ্জর।"

বাংলাদেশের বারভুঁইয়াদের মধ্যে বহু বীরের নাম আমরা ইতিহাসে পাই। মাহেন্দ্রদেব, লক্ষণমাণিক্য, চাঁদ রায়, প্রতাপ রায়, মুকুন্দ রায়, রামচন্দ্র রায়, সীতারাম রায় প্রমুখ ভুঁইয়াদের শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা সুবিদিত। পর্তুগীজ ও আরাকানবাসীরা যখন বাংলাদেশে ভয়ানক উৎপাত করিত তখন তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য বাংলার ভুঁইয়াদের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। সে সময় বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবার জন্য হিন্দু ও পাঠানেরা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া বহু লড়াই করিয়াছিল। বাঙালী

সৈন্তরা সংগ্রামনৈপুণ্যে যে-কোনও স্বাধীন জাতির সৈন্তদের চেয়ে ন্যূন ছিল না। ভাদুরীয়ার রাজা অনুপনারায়ণ ও তৎপুত্র মুকুন্দনারায়ণ শের শাহের পক্ষ লইয়া বহুবার যুদ্ধ করেন। তাঁহাদের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া শের শাহ্ রাজাকে প্রচুর জায়গীর দান করেন। মুকুন্দনারায়ণের সৈন্তবাহিনীর বাঙালী সড়কিওয়ালা লাঠিয়াল ও তীরন্দাজরা ছিল ওস্তাদ যোদ্ধা। ঐ সকল লাঠিয়াল, সড়কিওয়ালা ও তীরন্দাজেরা অনেক সময়েই বন্দুকধারীদিগকে পরাস্ত করিত।

ভূঁইয়াদের রাজত্বকালে লাঠি বা তলোয়ারের জোরে বাঙালীরা দুর্দ্দান্ত, দস্যুদিগকে শায়েস্তা করিত। মেনারাম ও ধনারামের অনেক বীরত্বের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। মেনারাম তৎকালীন বাঙালীদের মধ্যে অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। রাজা সীতারাম রায় তাঁহাদের আদর করিয়া 'মেনাহাতী' ও 'হামলাবাঘ' বলিয়া ডাকিতেন। দুর্গাদাস সেন মহাশয় তদ্‌রচিত 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থের এক স্থানে মেনারামের বীরত্বপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"ভুমরাই পরগণার মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। মৈত্রপত্নীর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা শুনিয়া দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহাকে হরণ করিতে যায়। মৃত্যুঞ্জয় তাহার সন্ধান পাইয়া সীতারামের এলাকায় পলায়ন করিলেন। দুর্ব্বৃত্তেরা ভূষণায় প্রবেশ করিয়া মৈত্রপত্নীকে হরণ করিল। মৈত্র গিয়া সীতারামের নিকট ধরনা দিলেন। সীতারাম আহার করিতে যাইতেছিলেন, তিনি অমনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মৈত্রপত্নী উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। মেনা ধনা অতি ত্রস্ত সৈন্ত লইয়া গিয়া পথিমধ্যেই অপহারকগণকে বিনাশ করিল। নিহত পামরদিগের মুণ্ডদ্বারা মুণ্ডমালা গাঁথিয়া মেনারাম ও ধনারাম গলায় পরিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় মৈত্রপত্নীকে লইয়া মেনা-ধনা মহম্মদনগরে প্রত্যাগমন করিল। মেনা-ধনা মুণ্ডমালা পরিয়া সঙ্গেতে 'জয় সীতারাম' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।"

মেনা-ধনার অধীনে সে সময় পঁচিশ হাজার হিন্দু ও আট হাজার মুসলমান সৈন্ত ছিল। ঐ সকল সৈন্তের মধ্যে বাঙালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, চণ্ডাল, জেলে, জোলা, মাহিষ্য ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পাঠান প্রভৃতি প্রায় সকল জাতির লোক ছিল। তাহাদের মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ছিল না। সকলেই রাজা সীতারামের জন্ত প্রাণপণ করিয়া লড়াই করিত। সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিম, যে-সকল বাঙালী সৈন্ত লইয়া ইংরেজদিগের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন, তাহাদের বীরত্ব-কাহিনী আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হইয়া আছে। শ্যামসুন্দর, মোনাহাতী, মধুরায়, মোহনলাল প্রভৃতি বাঙালী সেনাপতিদিগের শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা বাঙালী জাতি কখনো বিস্মৃত হইবে না। ইংরেজদিগের সৈন্তবাহিনীর মধ্যেও প্রথম প্রথম অনেক বাঙালী যোদ্ধা ছিল।

বাঙালী সৈন্তেরা যুদ্ধক্ষেত্রে কিরূপ অপরাজেয় ছিল তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা আমরা 'বৃহৎ বঙ্গে'র ভূমিকা হইতে এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—"ইণ্ডিয়ান আরমালের চতুর্থ অধ্যায়ে বিশপ হিবার লিখিয়াছেন—যে মুষ্টিমেয় সৈন্ত লইয়া লর্ড ক্লাইভ এরূপ আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই বাঙালী ছিল—That little army with which Clive did such wonders was raised chiefly from Bengal……" ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ঐতিহাসিক বর্ণ্টন লিখিয়াছিলেন—"বাঙালীরা বহু রণক্ষেত্রে প্রমাণ করিয়াছে যে তাহারা সাহসিকতায় য়ুরোপীয় সৈন্তদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।" ওয়াল্টার হ্যামিল্টন লিখিয়াছেন—"আমাদের ভারতীয় যুদ্ধসমূহের ইতিহাসের আদিপর্ব্বে আমাদের বহু সেনাবাহিনী প্রধানতঃ বাঙালী সৈন্তদের লইয়াই গঠিত হইয়াছিল এবং যুদ্ধে তাহারা যথেষ্ট সাহস ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।"

তখনকার দিনে অর্থের দ্বারা সকল সময়ে জমিদারী ক্রয় করা যাইত না। নবাব-সরকার বা স্বাধীন ভূঁইয়াদের দরবারে চাকুরী কিম্বা ডাকাতি এই দুইটি উপায়ে সহজে জমিদারীর মালিক হওয়া যাইত। বাংলার জমিদারদিগের মধ্যে অনেকেই শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ডাকাত-সর্দ্দার বেণীমাধব রায়ের অনেক বীরত্ব ও দুঃসাহসের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় দখল থাকায় সকলে বেণীমাধবকে 'পণ্ডিত ডাকাত' বলিয়া ডাকিতেন। কথিত আছে তাঁহার স্ত্রীকে দুর্ব্বৃত্তেরা চুরি করায় তিনি সংসারের উপর বিরূপ হইয়া উঠেন এবং শেষে ডাকাতি আরম্ভ করেন। তিনি উত্তরবঙ্গে 'চলন বিল' নামক একটি বিলের মধ্যে এক দ্বীপে আশ্রয় লইয়া একটি ডাকাতের দল গঠন করেন। সেখানে তিনি একটি কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে দুর্ব্বৃত্তদের ধরিয়া আনিয়া সেই কালীর সম্মুখে বলি দিয়া মৃতদেহগুলিকে তিনি চলনবিলের মধ্যে ফেলিয়া দিতেন। হিন্দুরা আজিও ঐ স্থানটিকে পণ্ডিত ডাকাতের ভিটে এবং মুসলমানেরা শয়তানের ভিটে বলে। বেণীমাধবের ভয়ে হিন্দু-মুসলমান সকলেই সন্ত্রস্ত থাকিত। তাঁহার ডাকাতদলকে দমন করিতে গিয়া বাদশাহী ফৌজ হয়রান হইয়া পড়িয়াছিল।

বেণী রায়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি পতিত হিন্দুদের আশ্রয় দিয়া স্বধর্ম্মে টানিয়া আনিতেন। যাঁহারা বিপদে পড়িয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিত, তাঁহাদের তিনি সাদরে গ্রহণ করিতেন। তাঁহার দলে বহু পতিত হিন্দু ও মুসলমান আশ্রয় পাইয়াছিল। সকল ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। কথিত আছে যে, তখনকার দিনে আসাম প্রদেশে ধর্ম্মান্তরিত-

দের এক অভিনব উপায়ে পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করা হইত। দুর্গাদাস লিখিতেছেন—"আসামে ব্রাহ্মণ ও রাজবংশী ভিন্ন হিন্দুর অন্ত বিভাগ নাই। এজন্ত তথায় ভিন্নধর্ম্মীদিগকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করিবার প্রথা বরাবর প্রচলিত আছে। এখানে ভিন্নধর্ম্মীর লোকদিগকে হিন্দু করিবার রীতি এই যে, ব্রাহ্মণ কিম্বা অধিকারীর উপদেশমত ভক্ত করেকবার 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিয়া গোবর-জলে স্নান করে। তারপর মাটিতে পড়িয়া দেববিগ্রহ প্রণাম করিয়া নির্ম্মাল্য মাথায় লইয়া দেবতার প্রসাদ ও চরণামৃত সেবন করিলেই বিশুদ্ধ হিন্দু অর্থাৎ রাজবংশী হয়।" বলা বাহুল্য, বেণী রায়ও এই পন্থা অবলম্বন করিয়া অনেক স্বধর্মচ্যুত হিন্দুকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

বাঙালীর শারীরিক বল ও অস্ত্রচালনায় নৈপুণ্যের কথা বলিয়াছি। এবার বাঙালীরা কামান দাগিতে ও জাহাজ চালাইতে কিরূপ দক্ষ ছিল সেই সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। সেকালে প্রত্যেক বড় বড় ভূঁইয়ারই দুর্গমধ্যে প্রচুর দেশী কামান রাখা হইত। শ্রীপুর, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে কামান নির্ম্মাণের বিরাট কারখানা ছিল। সাগরদ্বীপ, জাহাজঘাটা, ধুমঘাট, চকশ্রী, দুধলা, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানে জাহাজ তৈয়ারী ও মেরামত হইত। সন্দীপে নৌশক্তির একটি বড় আড্ডা ছিল। মোগলেরা নৌয়ারা পোষণের জন্ত কতকগুলি স্বতন্ত্র জায়গীর রাখিতেন। ঢাকা সমস্ত বাংলার নৌয়ারার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ঢাকা ছাড়া হুগলী, যশোহর প্রভৃতি স্থানেও নৌনির্ম্মাণ চলিত; গৌড়, সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বড় বড় বন্দরও ছিল। সেই সকল বন্দরে বহু বাঙালী নৌয়ারার নানা সেরেস্তায় দক্ষতার সহিত কাজ করিতেন।

ভূঁইয়ারা আবার নানা আকারের নৌয়ারা রাখিতেন। কার্ভুস, কোশা, জলা, গ্রাব, পরিন্দা, বালাম, খাওার প্রভৃতি বড় বড় নৌকা ও জাহাজ সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতেন। লক্ষণমাণিক্যের রাজত্বকালে আরাকানের মগেরা প্রায়ই বঙ্গোপসাগরের ধারে ধারে লুঠতরাজ করিতে আসিত। লক্ষণমাণিক্যকে তাহাদের সহিত বহুবার জলপথে লড়াই করিতে হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের সুযোগ্য সেনাপতি শঙ্কর চক্রবর্ত্তী এবং সূর্য্যকান্তের বীরত্বের কাহিনীও সুবিদিত।

সেকালে বাংলাদেশে বিভাচর্চ্চা অপেক্ষা দৈহিক শক্তিচর্চ্চার মূল্য কম ছিল না। কথিত আছে যে, দাঁতোড়ের নাবালক রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণকে সকল রকম শক্তিচর্চ্চায় পারদর্শী করিবার জন্ত দেওয়ান গোকুলচন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তিনি রাজপুত্রকে শস্ত্রচর্চ্চায় সুদক্ষ করিবার ভার সেনাপতি কামতার খাঁর উপর অর্পণ করেন। কামতার রাজপুত্রকে অতিশয় যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে থাকেন। ফলে তিনি অল্পকালমধ্যেই কুস্তি, অস্ত্রচালনা ইত্যাদিতে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। ভূঁইয়াদের রাজত্বের একশত দেড়শত বৎসর পরেও বাঙালীদের মধ্যে কুস্তিচর্চ্চা কিরূপ হইত তাহার একটু নমুনা আমরা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' হইতে এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"১৯ অগ্রহায়ণ, ১২৪৩, শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। বিহিত বিনয় পুরঃসর নিবেদন মিদং। সংপ্রতি শহর কলিকাতার সন্নিহিত ৺ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী বালি নামক গ্রামে অভিনব জনৈক কুস্তিগীর মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক যাঁহার ভোজনের বৃত্তান্ত ইহার পূর্ব্বে শ্রাবণ মাসীয় চন্দ্রিকা ও পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্র প্রভৃতিতে উত্তমরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি যেরূপ ঐ কুস্তিগীর বিভায় নিপুণ হইয়াছেন তদ্বিস্তর বর্ণন বাহুল্য যে ঠিক কিন্তু এতদ্রূপ বলবান গুণজ্ঞ ব্যক্তিকে সর্ব্বসাধারণকে বিশেষ এ সকল বিভাতে সুপণ্ডিত জনগণকে জ্ঞাত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অস্মদাদির বোধ হয় যে এতৎ প্রদেশস্থ অতি বিখ্যাত রাধাগোয়ালা ও তাহার পুত্রদ্বয় এবং আর আর বিলক্ষণ বলবান ও যাঁহারা এমত কুস্তিগীর কার্য্যে প্রকৃত দক্ষ এমত ব্যক্তিদিগকেও তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিয়া দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে পারেন এবং যেরূপ কর্ম্ম বিষয়ে তাহা তিনি প্রকৃষ্টরূপে অবগত আছেন। এইক্ষণে যে কেহ উক্ত বিভা শিক্ষা করিতে অথবা এতদ্বিষয়ে কোন বিশেষ উপদেশ লইতে প্রার্থনা রাখেন তবে তিনি ঐ নবীন কুস্তিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গমন করিলে অথবা লিপি প্রেরণ করিলে অবশ্য তাবদ্বৃত্তান্তাবগত হইতে পারিবেন। এবং এতমহানগরস্থ ভাবদৈশ্বর্য্যশালী মহাশয়দিগের অস্মাদির বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন এই যে কোন মহাশয় যাঁরং বহির্দ্বারের সমুহবলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর ব্যক্তিদিগকে দ্বারপালের কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন যদ্যপি তাহারদিগের দ্বারা ঐ পূর্ব্বোক্ত নবীন কুস্তিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরীক্ষা লইতে মনস্থ করেন তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বালি গ্রামের দক্ষিণ পল্লীস্থ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট লিপি প্রেরণ করিলে আমরা অত্যন্ত বাধিত হইয়া ঐ কুস্তিগীর মহাবল পরাক্রমকে তৎক্ষণাৎ তন্মহাশয়ের সমীপস্থ করিব। অতএব হে সম্পাদক মহাশয় আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বার্ত্তা দর্পণে অর্পণ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি—কস্যচিৎ বালি নিবাসী দ্বিজাদিসমূহ সজ্জন গণনাং।"

সেকালে বাংলাদেশে বীরাঙ্গনার অভাব ছিল না। এক সময় রাণী ভবশঙ্করীর ন্যায় মহীয়সী মহিলা এই বাংলাদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভবশঙ্করী পুরুষদিগের ন্যায় রীতিমত শক্তিচর্চ্চা ও যুদ্ধবিভার অনুশীলন করিতেন। তিনি অসিক্রীড়া করিতেন, তল্ল ও তীর ছুঁড়িতেন এবং অশ্বারোহণে সুদক্ষ ছিলেন। বাংলার এই বীরাঙ্গনা পাঠান সেনাপতি ওসমানের

সহিত সম্মুখযুদ্ধে যে বীরত্ব প্রকাশ করেন তাহাতে রাজা মানসিংহ খুশী হইয়া তাঁহাকে নানা উপঢৌকনাদি প্রদান করেন।

তখনকার দিনে বাংলাদেশে সাধারণ গৃহস্থের মেয়েরাও শক্তিচর্চ্চা করিতেন। তাঁহারা যে আখড়ায় গিয়া লাঠি-খেলা অসিক্রীড়া ভল্ল ও তীর নিক্ষেপ প্রভৃতি শিখিতেন তাহার যথেষ্ট নজির আছে। আমরা পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল নিবারণার্থে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' হইতে কয়েক পংক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—২৬ চৈত্র, ১২৩৩। কুস্তি লড়াই। সংপ্রতি মোং পাতরিয়াঘাটা নিবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাটির সম্মুখে প্রত্যহ বৈকালে বালিকা প্রভৃতির মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে তত্রস্থ বাঙ্গালির বালক প্রভৃতি দুই ২ জন এক ২ বার মল্লযুদ্ধ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ বালিকাদিগের যুদ্ধ সন্দর্শনে কে না আহ্লাদিত হন? কিন্তু যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহারা পরাজয় হইলে গণ্ডগোল করিবার উদ্যোগ করে; কিন্তু দেওয়ানজি মহাশয়ের শাসনেতে কেহ কোন বিবাদ করিতে পারে না।"

সেকালের বাংলার মেয়েরা যে কিরূপ সাহসী ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বসম্পন্ন ছিলেন তাহার নিদর্শনস্বরূপ 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা' হইতে একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি—স্ত্রী-লোকের সাহস। কলিকাতা পূর্ব্ব-দক্ষিণ বাদাবনের অন্তঃপাতী জয়নগরের নিকট চৌরমহল নামে এক স্থান আছে সেখানে অধিক লোকের বসতি নাই, কেবল অতিশয় বন এবং ব্যাঘ্র-ভীতিও অতিশয়। এক গৃহস্থের স্ত্রী নব প্রসূতা, তাঁহার স্বামী প্রাতকালে কর্ম্মান্তরে গেলে ঐ স্ত্রী আপন গৃহের পিড়াতে অগ্নি করিয়া দ্বার শক্তরূপে দিয়া বালক লইয়া থাকিল। এক প্রহরের সময় এক ব্যাঘ্র আসিয়া ঐ গৃহ প্রবেশের উদ্যোগে গৃহের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ স্ত্রীলোক ব্যাঘ্রের ঐ সকল উদ্যোগ দেখিয়া নানারূপ ভাবিতে বিশেষতঃ এ সময় যদি আপন স্বামী আসে তবে তাহাকে এই ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিবে এই রূপ নানা চিন্তা করিতেছে ইত্যবসরে ব্যাঘ্র কোন দিগে দ্বার না পাইয়া লম্ফ দিয়া পিড়ার চালে উঠিয়া চালের খড় উঠাইয়া যৎকিঞ্চিৎ দ্বার করিয়া মুখ দিল। কিন্তু মুখ প্রবেশ হইল না। পরে পশ্চাতের দুই পা ও লাঙ্গুল অগ্রে দিল এই সময় ঐ স্ত্রী জীবন আশা ত্যাগ করিয়া আপন নিকটস্থ শীত নিবারক কাঁথার এক ভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অল্পে অল্পে ব্যাঘ্রের মার্গেতে ধরিল। তখন ব্যাঘ্র ব্যস্ত হইয়া পুনরুত্থানের চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু দশ আনা শরীর নিরালম্বনে দোদুল্যমান হওয়াতে উত্থানে সমর্থ হইল না। পরে প্রলয়-কালীন গর্জ্জনতুল্য বার বার বৃহৎ শব্দ করিতে লাগিল ইহাতে গ্রামস্থ লোকেরা ভীত হইয়া স্ব স্ব গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া গৃহ

মধ্যে থাকিল। ঐ স্ত্রী ক্রমে ক্রমে গৃহ দাহ না হয় কেবল ব্যাঘ্র দগ্ধ হয় এইরূপ অগ্নি জ্বালাইতে লাগিল। কিছুকাল পরে ব্যাঘ্র নিঃশব্দ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল দুই ঘণ্টা পরে গ্রামস্থলোক গৃহ হইতে বাহির হইয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া পাঁচ সাত দশ জন একত্র হইয়া ক্রমে ক্রমে ঐ স্থানে আসিয়া বিশেষ দেখিল। সে সময় ঐ স্ত্রীর স্বামীও আইল পরে ব্যাঘ্রকে চাল হইতে নামাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।" সমাচার দর্পণ, ২রা মার্চ্চ, ১৮২২।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সঙ্কলিত "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" শীর্ষক পুস্তকে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙালীদের সাহস ও বীরত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ পাইতেছি—

"পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙালীরা এত দুর্ব্বল ছিল না, রক্তপাত দেখিলে তাহাদের মূর্চ্ছা হইত না, শত্রুর নাম শুনিলে আতঙ্ক উপস্থিত হইত না, গ্রামে গ্রামে ব্যায়াম-চর্চ্চার স্থান ছিল, গ্রামে গ্রামে একজন বিখ্যাত সর্দ্দার ছিল, ভদ্রলোকেরা পালোয়ান আখ্যা গ্রহণ করিতে লজ্জিত হইত না। কথায় কথায় লাঠালাঠি হইত ও মাথা ভাঙাভাঙি এবং হস্তপদ অস্ত্রাঘাত দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হওয়া লোকের নিকট তত গুরুতর বিষয় বলিয়া বোধ হইত না। প্রতি রাত্রে ভদ্র অভদ্র সকলে একত্রিত হইয়া লাঠি, তরবার, বল্লম প্রভৃতি খেলা শিখিত। দশ জন একত্রিত হইলে কেবল ঐ গল্প ঐ কথা হইত। সকলের গৃহে দুই চারখানি তরবার, দশ-বার-গাছা বল্লম থাকিত, বাড়ীর একজন না একজন লাঠি তলোয়ার বা বল্লম খেলিতে জানিতেন। ইংরেজদিগের কঠোর শাসনে এ দেশের সে ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে কিন্তু তখন সমাজে যে জীবনী-শক্তি ছিল সেটা সেই সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে"—অমৃত বাজার পত্রিকা, ৫ ডিসেম্বর ১৮৭২।

ইদানীং আমরা রাষ্ট্রীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছি। এ অধিকার রক্ষা করিতে হইলে যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন শক্তিচর্চ্চা তাহাদের অন্যতম। দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তিতে শক্তিমান না হইলে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য পরাক্রমশালী জাতিসমূহের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছু হটিয়া যাইব। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, স্বাধীনতা পাওয়া যত কঠিন, তাহা রক্ষা করা ততোধিক দুরূহ।

মায়ের কর্ত্তব্য

শিশুপালনের সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন শিশুদের দৈহিক সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি$_{১}$, বি$_{২}$র সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দন্তোদ্গমের সময়, সেবন করান উচিত।

বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী:—শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্ণতা, দুধ তোলা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, রুগ্নতা, ব্রঙ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি।

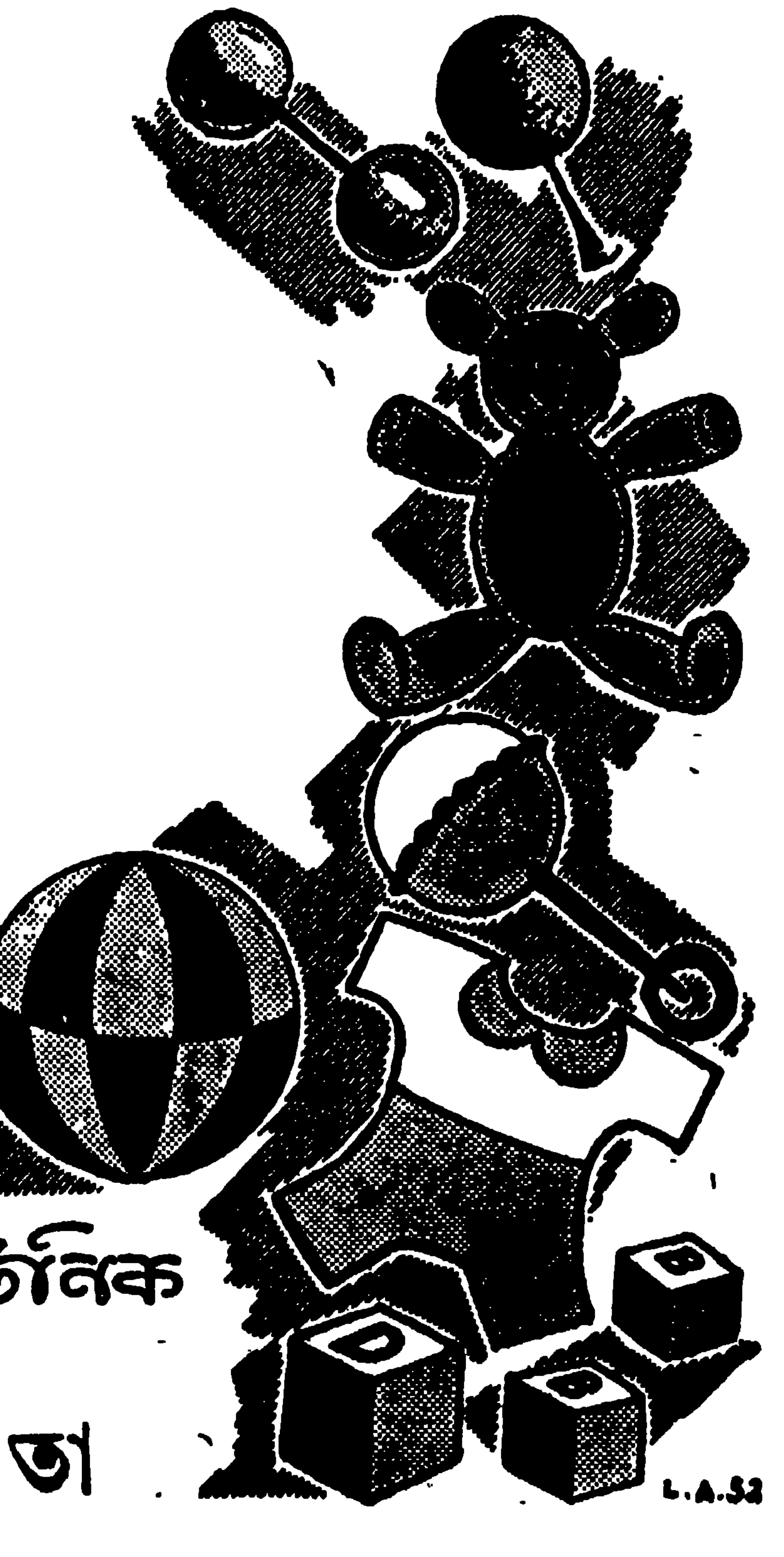

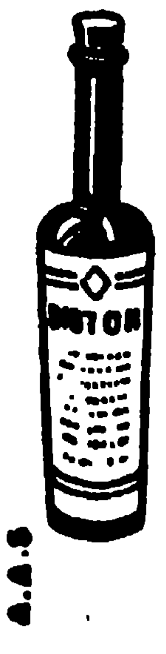

শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য

বিবটন

একটি পূর্ণাঙ্গ টনিক

লিষ্টার এণ্টিসেপটিকস্ • কলিকাতা

চৈতন্যপূর্ব্ব যুগের বৈষ্ণব কাব্য-কথা

শ্রীরবীন চৌধুরী

(১)

সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা পড়েন, এটা তাঁদের চোখে পড়বেই যে, প্রাচীন আমলে পৃথিবীর প্রায় সবকয়টি দেশেই ধর্ম্ম ও সাহিত্য যমজ ভাই-বোনের মত একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। পেরিক্লীস যুগের গ্রীক কাব্য-নাটক, প্রাচীন ভারতের বৈদিক সাহিত্য, প্রাক্-চতুর্দ্দশ শতকের ইংরেজী কাব্য-কথা—কোথাও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। জাপানী সাহিত্যও গড়ে উঠেছিল একদিন সিন্টো ধর্ম্মকে কেন্দ্র করে। পাল, সেন ও চৈতন্যপূর্ব্ব যুগের আমাদের প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ভিত্তিও তৈরী হ'ল সহজযান বৌদ্ধ, হিন্দু আর আর্য্য, অনার্য্য মিশ্রণে উদ্ভূত যত লৌকিক দেবদেবীদের ইট-কাঠ-পাথর দিয়ে। চর্য্যা ও বৌদ্ধ-দোহাবলীতে সহজযান মতের ছাপ, অনার্য্য চরিত্রের মঙ্গল কাব্যগুলিতে সেই চণ্ডী-মনসা ঠাকরুণদের বিবাদ বিসংবাদ, ধর্ম্ম-ঠাকুরের মাহাত্ম্য—লৌকিক দেবতাদের কত কীর্ত্তি, কত কাহিনী লিপিবদ্ধ। আর সমুন্নত হিন্দুধর্ম্মকে নিয়ে যেসব ছড়া, গাথা, কাব্য, পুরাণ লেখা হয়েছে, তাদের সংখ্যা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত বললেও অত্যুক্তি হবে না।

বিশাল জট-মাথা বটগাছকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে যেমন পাখীদের নীড়ের রচনা চলে, পুরাকালে ধর্ম্মকে অবলম্বন করে তেমনি গড়ে উঠেছিল সাহিত্য। ধর্ম্মের আলবাল থেকে রস আকর্ষণ করে আশ্রম-সহকারের মত সে লাভ করেছিল শ্যামশ্রী। এর কারণটাও সোজা। সে যুগটা ছিল ধর্ম্মের যুগ, সমাজের মুখ্য চেতনা ছিল ধর্ম্ম-চেতনা। সুতরাং সে আমলের কাব্য-কলা হ'ল ধর্ম্মমুখী।

একথা সকলেই মানেন যে, যা আমি ভাবি, অনুভব করি, তারই রূপায়ণ আমার কাব্যে আমার সাহিত্যে। আবার আমার কথা হচ্ছে, আমার সময়ের কথা, আমার দেশের কথা—স্থান ও কাল হতে আমি বিচ্ছিন্ন নই। সুতরাং সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের যোগ মায়ের সঙ্গে ছেলের যোগের মত, একেবারে নাড়ীতে নাড়ীতে। আর সেকালের সাহিত্য-বাসর তাই জাঁকিয়ে বসেছে—ধর্ম্ম।

ঠিক এই কারণে জয়দেবের গীত-গোবিন্দের সময় জেনেও যদি কেউ মনে করেন যে, পঞ্চদশ শতক-পূর্ব্ব প্রাচীন বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ছিল না, তবে আমরা তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা করতে

ন তু ন ব ই রী ডা র্স

শি ব রা ম চ ক্র ব র্ত্তী র ন তু ন ব ই

আমার লেখা

শিবরামবাবুর অনেক গল্প, কবিতা, হাসির কবিতা ও রসরচনা একত্র করে এইমাত্র বেরুলো। বাংলা ভাষায় এই ধরণের 'ওম্‌নিবাস' বই এই প্রথম। বিচিত্র রসের লেখা—বিখ্যাত শিল্পী শৈলবাবুর কার্টুনে বিচিত্রিত—প্রচুর হাসি আর আনন্দের পরিবেশ। লেখার সংখ্যা সবশুদ্ধ চুয়াত্তর—এর কোনো লেখাই লেখকের আগের বইয়ের সংকলিত নয়—গ্রন্থাকারে এই প্রথম প্রকাশ। অজস্র ছবি, (মোট ৪৫খানা), শোভন সাজসজ্জায় বিপুল আয়তনের বই—দাম মাত্র সাড়ে চার টাকা।

বন্ধু চেনা বিষম দায়!

আহারে-বিহারেই বন্ধুর পরিচয়, বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা কেউ কেউ বলেন। আবার কারো কারো মতে, হাড়ে হাড়েই নাকি চেনা যায় বন্ধুদের। মোটের উপর বন্ধুর পথ সর্ব্বদাই বন্ধুর—যেমন মজার তেমনিই মজানোর; শিবরামবাবু এই বইয়ে ইস্কুলের থেকে সাহিত্যকুলের—তাঁর সব রকমের বন্ধুর গল্পই বলেছেন—তার মধ্যে রাজা-মহারাজা, রাজহস্তী, মিস্ত্রিমজুর, CALL-কারখানার কারিগর, বীমার দালাল, পকেটমার কেউ বাদ নেই। ছোটদের জন্যে বইটি লেখা হলেও, হাসতে মানা না থাকলে বড়দের পড়তে কোনো বাধা নেই। দাম দেড় টাকা মাত্র।

তুন বই ● রীডার্স ● কর্নার ● কলিকাতা

● কর্নার ● ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

পারব না। সাহিত্য যদি সমাজ-বৃক্ষের অমৃত-ফল হয়, তবে চৈতন্যের আগে বৈষ্ণব সাহিত্যের রচনা হয়ে থাকলে, মানতেই হবে বাংলার সমাজ-নদীতে তখন বৈষ্ণবতার প্রবাহ ছিলই। আজকের মত লাখ লাখ মন্দির না উঠলেও, সেকালের সমাজ-চত্বরে শানবাঁধানো দু-চারটে কৃষ্ণ-মন্দির দেখা যেতই।

আর আসলে হয়েও ছিল তাই। সেদিনের ধর্ম্মাশ্রয়ী সাহিত্যের বেশ মোটা একটা অংশ রাধাকৃষ্ণের লীলা-কীর্ত্তনে মুখরিত হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণলীলা বাংলার মাটিতে এল কি ভাবে, ছড়াল দেশের নগরে পল্লীতে—দিগন্তচুম্বিত প্রান্তরে, উঠল একে একে তার দেবায়তন, এসব কথা না জানলে ঐ শ্রেণীর সাহিত্য-রচনার হেতু বোঝা যাবে না। আগে আমরা তাই কৃষ্ণলীলার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তার পর বৈষ্ণব-লেখার ছোট এক ফিরিস্তি দেব।

(২)

সকলেই জানেন উত্তর-ভারতেই বৈষ্ণবদের তীর্থ মথুরা, বৃন্দাবন। রাধাকৃষ্ণের যত লীলা ওখানকারই যমুনাতটে, যমুনা-জলে, পর্ব্বতের পাদদেশে, অরণ্যে। একথা জানেন বলেই তাঁরা মনে করেন, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উদ্ভবও বুঝি ঐ ভূখণ্ডে। কিন্তু উক্ত ধর্ম্মের উৎস বোধ হয়,ওখানে নয়। পদ্মপুরাণে নারদ-ঋষির কাছে যুবতী ভক্তি বলছেন যে, দ্রাবিড়েই তাঁর জন্ম। মহারাষ্ট্র, গুর্জ্জর প্রভৃতি দেশ ঘুরে তিনি ক্ষীণা ও খণ্ডিতাঙ্গী হয়েছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনের ভূমি স্পর্শমাত্র ফিরে পেলেন আবার নবযৌবন। ভাগবত লেখারও আগে দাক্ষিণাত্যে আলওয়ার সম্প্রদায় বৈষ্ণবদের মতই জ্ঞানমার্গ ছেড়ে প্রপত্তিমার্গ আশ্রয় করেছিলেন। তাঁরা নামগান করতেন, নায়িকাভাবে মধুর ভাবের উপাসনা করতেন আর উপাসনাকালে দেহে তাঁদের সাত্ত্বিক ভাবের উন্মেষ হ'ত। তামিল ভাষায় যে সব কবিতা এঁদের রয়েছে, বৈষ্ণব-কাব্যের তারা নিকট-আত্মীয়। ভাগবতও বোধ হয় ওখানেই লেখা হয়ে থাকবে। দক্ষিণা-পথের নদী-গিরি-বনের যে স্পষ্ট ছবি ওতে রয়েছে, তাতে একথাই মনে হয়। ভাগবত সম্পর্কে ফারকুহার সাহেবেরও এই মত। (অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের ভূমিকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন)। মোট কথা, যেখানেই ঐ ভক্তিধর্ম্মের উদ্ভব হোক, বিন্ধ্যের দক্ষিণ-পারের পূর্ব্ব-পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার দেশেই হোক বা উত্তরের গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সমতলখণ্ডেই হোক, বাংলায় তা এসেছে আর্য্যাবর্ত্ত থেকে। পঞ্চোপাসক আর্য্যেরা যেদিন পা দিলেন এদেশে—শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ধর্ম্মমতের মত বৈষ্ণবতাও এল বাংলায়।

মফঃস্বলে বসিয়া কলিকাতার দরে বই কিনুন

যে কোনও প্রকারের এবং বিভিন্ন প্রকাশকের নাটক, নভেল, ধর্ম্মগ্রন্থ, ভ্রমণকাহিনী, ব্যবসায় বাণিজ্য, চিকিৎসা ও আইনের পুস্তকাদি, স্কুল-কলেজের ও উপহারের জন্য যে কোনও ভাষায় দেশী ও বিলাতী ভাল ভাল পুস্তক আমরা সযত্নে কলিকাতার দরে সত্বর সরবরাহ করিয়া থাকি। লিখিলে লাইব্রেরী ও উপহারের জন্য নানাবিধ নূতন নূতন পুস্তকের সন্ধান বিনামূল্যে দিই। অর্ডারের সহিত মূল্যের অর্দ্ধাংশ দিলেই সমস্ত পুস্তক ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। প্যাকিং, সরবরাহ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। লিখুন :

কুণ্ডু পাব্লিসিটি সোসাইটী অব ইণ্ডিয়া
(পাব্লিকেশন এণ্ড বুক-সেলিং ডিপার্টমেণ্ট)
১৪৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

আর্য্যেরা কবে প্রথম আমাদের বাংলার পলিমাটিতে এলেন ঘর বাঁধতে, তা ঠিক বলা যায় না। অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখেছেন, "কোন্ সময় থেকে বাংলাদেশে আর্য্যদের বসতি আরম্ভ হয়, তা ঠিক করে বলা শক্ত। তবে মৌর্য্য সম্রাটদের শাসনকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে যে অন্ততঃ উত্তরবঙ্গে আর্য্যদের উপনিবেশ ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে।" (প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী)। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বঙ্গসমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা বোঝা যায় ঐ শতাব্দীর শিলালিপি থেকে। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের লিপিতে দেখি, পুষ্করণ-অধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা নিজেকে চক্রস্বামীর (বিষ্ণুর) দাসানুদাস বলছেন। তার পর গুপ্ত আমলেও বৈষ্ণবতার জয়ডঙ্কা বেজেছে। পরম-ভাগবত গুপ্ত সম্রাটরা বাংলার দেবায়তনে অনেকগুলি বিষ্ণু-মন্দির যোগ করেছেন। কিন্তু এ আমল পর্য্যন্ত চলেছে যেন শিবহীন যজ্ঞ। যে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিস্তার হ'ল আকাশের মত—আর যে আকাশের নীল চন্দ্রাতপ ঘিরে অসংখ্য নক্ষত্রের মত ফুটল অসংখ্য কবিতা, খ্রীষ্টীয় পঞ্চ শতক পর্য্যন্ত সে কৃষ্ণের পূজা হয় নি বৈষ্ণব দেউলে, চাঁদোয়ার নীচে কথকতা চলে নি তাঁর লীলা-কাহিনীর।

অনেকের হয়ত সংশয় জাগতে পারে এই ভেবে যে কৃষ্ণ ত বিষ্ণুরই নামান্তর। কিন্তু কৃষ্ণ আর বিষ্ণুর মধ্যে বৈষ্ণবেরা বিভিন্নতা দেখেন। তাঁদের মতে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন কৃষ্ণের অংশমাত্র বিষ্ণু, তাঁর বহু অবতারের অন্যতম অবতার। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত *History of Bengal*-এর ১ম খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) গুপ্ত আমলের বিষ্ণু—বৈদিক বিষ্ণু ও পাঞ্চরাত্রদের নারায়ণের সমন্বয়, ভাগবতোক্ত কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিরাট পার্থক্য।

কৃষ্ণপূজার সূত্রপাত হয়ত হয়েছিল ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে, কারণ পাহাড়পুরে রাধাকৃষ্ণের যে যুগলমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তার সময় সপ্তম শতক। অধ্যাপক বাগচীরও এই মত। (History of Bengal-এ ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তবে *Vaisnava Faith and Movement* গ্রন্থে অধ্যাপক সুশীলকুমার দে অনুমান করেছেন যে, পালরাজাদের সময়েই অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে

ভাগবতের ভক্তিধর্ম্ম পুষ্টিলাভ করে বাংলায়, গুপ্ত-আমলে কৃষ্ণ-পূজার প্রচলন ছিল না। কৃষ্ণ-পূজার আরম্ভ-কালটা পিছিয়ে গেলেও সুশীলবাবুর অনুমানটা নিছক "প্রত্নতাত্ত্বিক" মনে হয় না, কিন্তু যাঁরা বলেন এদেশে, কর্ণদেব ও কর্ণাটগণ ভক্তি-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন তাঁদের একথা বলবার কারণ কি, ঠিক বুঝা যায় না।

সে যাই হোক, এই কৃষ্ণলীলার গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে পৌরাণিক ঐরাবতের মত আর দাঁড়াতে পারল না কোন রাজ-বংশ, কোন রাজধর্ম্ম। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাং যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে প্রবলতর দেখেছিলেন, বৌদ্ধ, পাল আমলেও তারা ধারা ব্যাহত হ'ল না দুটো কারণে। প্রথমতঃ পাল সম্রাট্‌রা বৌদ্ধ হ'লেও হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। গৌড়-বঙ্গের শেষ পাল সম্রাট্ রামপালদেবও জাহ্নবীনীরে বিষ্ণুপদ ধ্যান করতে করতেই দেহত্যাগ করেছিলেন। আর দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে—ধর্ম্মকলহে বঙ্গদেশের চিরকালীন অনাসক্তি। এই বাংলায় কোনকালে ধর্ম্ম নিয়ে Crusade বা জেহাদ চলে নি। ভিন্সেট স্মিথ বলেছেন বটে যে, সপ্তম শতাব্দীতে শৈব শশাঙ্ক বোধিদ্রুম ধ্বংস করেছিলেন এক দিন, কিন্তু এরকম দৃষ্টান্ত বড় বেশী চোখে পড়ে না। নইলে যে বৌদ্ধধর্ম্ম অষ্টম শতকেই উত্তর-ভারত হতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, হিন্দু সেনরাজাদের যুগ পার হয়ে বাংলার সমাজ আঁকড়ে তা চৌদ্দ শতক পর্য্যন্ত টিকে থাকতে পারত না।

খ্রীষ্টীয় সাত শ পঞ্চাশ হতে বার শ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস ত হিন্দুধর্ম্মের ক্রমোন্নতির ইতিহাস, আর হিন্দু-দেবগণের মধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্যলাভের ইতিকথা। এই সাড়ে চার শ বৎসরের যে মূর্ত্তিগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলি একথার পোষকতাই করবে।

পাল আমলের পর যে সেন-বংশ সুরু হ'ল, সে বংশের সম্রাট্‌গণের অনেকেই ছিলেন বৈষ্ণবমতাশ্রয়ী। আর বর্ম্মণ রাজারা ত প্রায় সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন। অবশ্য সেন-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন এবং প্রসিদ্ধ লক্ষ্মণ সেন ছিলেন শৈব। কিন্তু বিজয় সেনের কথা বাদ দিলে বলা যায় যে লক্ষ্মণ সেনের শৈবত্ব বাংলার সমাজে বৈষ্ণবতার অগ্রগতির পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষতিকর হয় নি। বরং কুলদেবতা সদাশিবের পূজা করলেও তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল কৃষ্ণেরই প্রতি। রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী নিয়ে নিজে তিনি একাধিক বৈষ্ণব পদ রচনা করে-ছিলেন শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে, আর রাজকবি জয়দেব মিশ্রকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন বাংলার অমর কাব্য গীত-গোবিন্দ।

দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে যে তুর্কী অভিযান সুরু হ'ল, তারই আঘাতে অপম্রিয়মাণ বৌদ্ধধর্ম্মকে আরও তাড়াতাড়ি ছাড়তে হ'ল বাংলার দেবস্থান। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এত দিন পর্য্যন্ত বঙ্গসমাজে আর্য্য অভিজাত সম্প্রদায় ও অনার্য্য জনসাধারণের যে ধারা পাশাপাশি চলেছিল উদযান ও অন্নজানের মত, এই প্রচণ্ড সংঘাতে তার পরিণতি হ'ল জলে, দুর্ব্বার দ্বিমুখী স্রোতধারা মিলল একবেণী নদীতে। আর সেই মিলিত মহাজাতি আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য মাথায় নিতে দাঁড়াল যে মন্দির-প্রাঙ্গণে, তার পাষাণ-চত্বর হতে এক শ' আট দেউলই উঠেছে এক শ' আট হিন্দুবিগ্রহ নিয়ে।

এই কারণে এতদিন 'চৈত্রের শীর্ণ নদীর মত ঝাউমূল সিক্ত করে ঝিরিঝিরি বয়ে চলেছিল যে বৈষ্ণব-ধারা, দ্বাদশ শতকের পর তারই খাতে এল কৈশোরের প্রাণ-চাঞ্চল্য।' তারপর ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে একদিন চৈতন্যের জন্ম হ'ল। যে কৃষ্ণলীলা-কাহিনীতে আগে এসেছিল জোয়ার, এবার তাতে দেখা দিল বন্যা। শুধু নদে নয়, শান্তিপুর নয়, সমগ্র বঙ্গদেশ তারপর ভেসে গেল নাম-কীর্ত্তনে, লীলা-কাহিনীর কথকতায়, রচনায়।

বৈষ্ণবতার এই জোয়ার ছিল বলেই চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে উত্তর-ভারতে সুরদাস লিখলেন পদাবলী, নানক লিখ-লেন, 'গোবিন্দ ভজন বিনে বৃথা সভ কাম।' প্রাচীন বাংলার রাজভাষা সংস্কৃতে লেখা হ'ল লক্ষ্মণ সেনের একাধিক কবিতা শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে, কেশব সেনের পদ, জয়দেবের অমর কাব্য গীত-গোবিন্দ আর যে মাগধী অপভ্রংশ হতে ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে সৃষ্টি হ'ল বাংলা ভাষার (অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে), সেই অপভ্রংশ সাহিত্যও মুখর হল লীলাগানে। প্রাকৃত-পৈঙ্গলে রয়েছে রাধাকৃষ্ণের নৌকা-লীলার পদ:

উপহারের সেরা বই

বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকর্ম্মী

কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র

চার অধ্যায়ে সমাপ্ত ঘটনাবহুল "বিপ্লবী-জীবন"এর সুবৃহৎ ইতিহাস। সর্ব্বত্র প্রশংসিত। মূল্য ছয় টাকা।

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

কিশোরদের বিশ্বকবি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর জীবন-কথা। মূল্য দু' টাকা।

সুভাষিণী দেবী ও উপেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রণীত

কাটিং ও সূচি-শিল্প শিক্ষা

(তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য দু' টাকা চার আনা

নালন্দা প্রেস

১৫৯-১৬০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

আয়ে রে বাহহি কাহ্নু নাব ছোটি ডগমগ কুগতি ম দেহি।
তই ইথি নইহি সন্তার দেই জো চাহহি সো লেহি ॥

বাংলা-ভাষায় এই লীলা-কাহিনীর প্রথম কথক কে, বলা শক্ত। ১১২৯-১১৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় চালুক্য-বংশের রাজা সোমেশ্বর ভূলোকমল্লের নির্দ্দেশে রচিত মানসোল্লাস গ্রন্থে যে পদটি রয়েছে, 'ছাড় ছাড় মই জাইবো গোবিন্দ সহ খেলন নারায়ণ জগহকেরু গোঁসাঈ'—এইটিই প্রাচীনতম নিদর্শন বলে আমার মনে হয়। *Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে দীনেশচন্দ্র সেন কিন্তু সংস্কৃত চন্দ্রচূড়চরিতের লেখক বাঙালী উমাপতি ধরকেই রাধাকৃষ্ণ লীলার প্রথম কথক বলে অনুমান করেছেন।

উমাপতি নামে এক মৈথিল কবি ছিলেন, বঙ্গ ও মিথিলায় যাঁর অনেক বৈষ্ণব পদ চলিত রয়েছে। অধ্যাপক Aufrecht সাহেব এঁর কাল নির্দ্ধারণ করেছেন একাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে। দীনেশ বাবুর মতে এই উমাপতিই বাঙালী উমাপতি ধর। তাঁর বিশ্বাস বাঙালী উমাপতি ধর যখন বিজয় সেনের সভাকবি এবং সেজন্য তাঁর সময় যখন এগার শতক, তখন উভয় কবি অভিন্ন এবং মৈথিল উমাপতি আসলে মিথিলার কবি নন, তিনি বাংলারই ঐ উমাপতি ধর, চন্দ্রচূড়-চরিতের লেখক।

দুই কবির আবির্ভাবকাল একই সময়ে হ'লে, তাঁদের অভিন্ন মনে করবার কারণ আছে, কিন্তু তা নয়। উমাপতি ধর বিজয় সেনের সভাকবি হ'লেও, তাঁর সময় দ্বাদশ শতাব্দী হয়। *History of Muslim Rule in India* নামে ঈশ্বরীপ্রসাদের যে ইতিহাস রয়েছে তার দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে মনে হয় বিজয় সেনের আমল দ্বাদশ শতক। তা ছাড়া উমাপতি ধর আসলে ছিলেন লক্ষ্মণসেনের সভাকবি এবং ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে তাঁর সময় ১১৭০ থেকে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থে অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছেন, "উমাপতি ধর দীর্ঘজীবী ছিলেন। ইনি লক্ষ্মণসেন দেবের পিতা বল্লালসেন দেবেরও মন্ত্রিত্ব করেছিলেন।" তা হ'লেও চন্দ্রচূড়চরিতের কবিকে দ্বাদশ শতকেই ফেলতে হবে কারণ বল্লালসেনেরও রাজ্যকালের আরম্ভ ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে।

চৈতন্যপূর্ব্ব বৈষ্ণব কাব্য-ভাণ্ডার যাঁদের মণিমাণিক্যে পূর্ণ হয়েছে, সে সব প্রাতঃস্মরণীয় কবির মধ্যে এবার প্রথমেই নাম করা যাচ্ছে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের। সত্য বটে, বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, কিন্তু তাঁকে বুঝেছে ত বাঙালী। আর চণ্ডীদাসের গান ত আজ মাঝিমাল্লাদেরও মুখে। কিন্তু পদাবলীর এই চণ্ডীদাস কি প্রাচীন বাংলার ? চৈতন্য কি এঁরই পদাবলীর রসাস্বাদন করেছিলেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তবে আমাদের মনে হয়, চৈতন্যদেব এঁর পদাবলী শোনেন নি। 'সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' প্রভৃতি পদের কথক এই চণ্ডীদাস তাঁর পরবর্ত্তী [illegible]। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুর মতামত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। (তাঁর 'দীন-চণ্ডীদাস' পুস্তকের ১ম খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য) চৈতন্য যে চণ্ডীদাসের পদ শুনে মুগ্ধ হতেন, তিনি বড়ু-চণ্ডীদাস এবং তাঁর রচনা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই মহাপ্রভু স্বরূপ ও রামানন্দসনে রাত্রিদিন শুনতেন—অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুর এই মত এবং আমাদেরও মনে হয় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রস আস্বাদন করা শুধু মহাপ্রভুর পক্ষে নয়, যে কোন বিদগ্ধ জনেরও পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন নিকৃষ্ট কাব্য ত নয়ই, বরং তার বংশী ও বিরহখণ্ডে আছে বড়ু-চণ্ডীদাসের কবি-প্রতিভার হীরক-দীপ্তি। সাহিত্য-পরিষদ থেকে টীকা-টিপ্পনী সহ বসন্তবাবুর সম্পাদনায় এর যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তা পড়লে সকলেরই একথা মনে হবে।

চণ্ডীদাসের পর নাম করা যায় মালাধর বসুর। এঁর উপাধি ছিল গুণরাজ খাঁন এবং ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ইনি লিখেছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়'। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় এই গ্রন্থের যে সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে রয়েছে মালাধর ও তাঁর কাব্যের বিস্তৃত পরিচয়।

রামানন্দ কিংবা রূপ-গোস্বামীর মত চৈতন্যের সমসাময়িকদের নাম আমরা আর করব না। তবে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আবির্ভাব সত্ত্বেও রাধাকৃষ্ণলীলা নিয়ে সেদিনের বাংলায় আর কেউ কাব্য লেখেন নি, এরূপ বিশ্বাস হয় না। সেদিন রাধাকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যে অজস্র লেখা চলেছিল তার প্রমাণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

দা'-গোঁসাই ও আরো গল্প

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত

বাংলা সাহিত্যে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছোট গল্প এ পর্য্যন্ত বের হয় নাই।
মূল্য—তিন টাকা

মহামানব গ্রন্থমালা—১ম খণ্ড

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত

যাঁরা নিজে বড় হয়ে জাতি ও দেশকে বড় করেছেন, তাঁদের
সাহিত্য-রসপুষ্ট গৌরবময় কাহিনী। মূল্য—দেড় টাকা

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের "মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত"-এর সংক্ষিপ্ত
কিশোর সংস্করণ। মূল্য—পাঁচ সিকা

আজব-দেশের গুজব-কথা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত

ছোটদের মনভুলান এত সুন্দর গল্পের বই আগে আর বের হয় নাই।
সুরেনবাবুর লেখার সাথে শিল্পী ইন্দু গুপ্তের আঁকা ছবি
বড় সুন্দর মানিয়েছে। মূল্য—এক টাকা

ক্যালকাটা বুক ষ্টোরস্

৪।৫সি, হেরম্ব দাস লেন, কলিকাতা ৯

পুস্তক-পরিচয়

আজিকার ভারত—রজনী পাম দত্ত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; ২৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য—তিন টাকা মাত্র।

এই পুস্তকখানি গ্রন্থকারের লিখিত বৃহত্তর *India Today* নামক বইয়ের বাংলা সংস্করণ। গ্রন্থকার ব্রিটেনের বামপন্থী চিন্তা-নায়কবর্গের অন্যতম বলিয়া পরিচিত। তাঁহার পিতা ছিলেন বাঙালী; কলিকাতার দত্ত পরিবারের বংশধর; তিনি ইংলণ্ডে জীবনের শেষাংশ কাটাইয়াছিলেন। গ্রন্থকারের মা ছিলেন সুইডেনবাসিনী। এই গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রে লেখক তাঁহার পিতার নিকট রাজনীতিক প্রথম পাঠের জন্য ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। চিরাচরিত চিন্তাধারা ও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম রামমোহন রায় আরম্ভ করিয়াছিলেন তার পরিণতির সাক্ষীরূপে বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একজন বংশধর উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন তাহা ভারতব্যাপী ঐতিহাসিক বিপ্লবের অন্য একটা প্রমাণ মাত্র। উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত যাহা করিয়াছিলেন স্বদেশে বাস করিলে তাহার অধিক কিছু করিতেন কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ চিন্তাশীল ভারতবাসী এই বিপ্লবের ধারকরূপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধিকার শিথিল করিয়া দিয়াছে। উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত সেই যুগের লোক।

ব্রিটিশ-শাসনের আমলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবনতির ইতিহাস ও তার প্রমাণ এই বইখানিতে পরিবেশিত হইয়াছে—এই ইতিহাস আমাদের অজানা ছিল না; ব্রিটিশ ও ভারতবর্ষীয় ঐতিহাসিকবৃন্দ এক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক সমাজ-তন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যাখ্যাতা কার্ল মার্কস ও নরম্যান এন্‌গেল্‌স-এর দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, ব্রিটিশ-শাসন ও শোষণের ফলে যে অর্থনৈতিক অবনতির সূচনা হয় তার বিশদ বর্ণনা এই বইয়ে আছে। এই প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এবং একখানি বইয়ের মধ্যে তাহা সন্নিবেশিত করিয়া আমাদের—সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদের—উপকার সাধন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে দাদাভাই নৌরজী, মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে, রমেশ-চন্দ্র দত্ত এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে অসন্তোষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ রূপে ফুটিয়া উঠে, তার অর্থনীতিক কারণ এই ইতিহাসের মধ্যে আছে। অর্থনীতিক অবনতির ফলে সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে বিপ্লব ও বিপর্য্যয় দেখা দেয়, এই বইয়ে তাহাই মাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভাবের রাজ্যে, চিন্তা জগতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে রজনী পাম দত্ত বিশেষ কিছু বলেন নাই। তার পরিচয় না জানিলে "আজিকার ভারত"কে সম্যক্ জানিতে পারা যায় না।

আর একটা কথা। ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এমন কোন আচার-আচরণ ছিল যাহা দেশের জীবনকে দুর্ব্বল করিয়া পরদেশীর পদানত করিবার সুযোগ করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-শক্তি কেন এই ছত্রভঙ্গের নিবারণ করিতে পারিল না, তার কারণ না বলিতে পারিলে ভারত-ইতিহাসে একটা রহস্য থাকিয়া যায়। শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভেদ ও বিরোধ ভারতবর্ষের একচেটিয়া নয়। অন্যান্য দেশেও তাহা ছিল। কিন্তু তাহা পরদেশীর শাসন ও শোষণ ডাকিয়া আনিতে সক্ষম হয় নাই। ভারতবর্ষের বেলায় এই ব্যতিক্রম দেখা দিল কেন? রজনী পাম দত্তের বইয়ে এই প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। সুতরাং "আজিকার ভারত" আমাদের জ্ঞান-রাজ্যের পরিধি বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

নেতাজীর অনুসরণে

বাংলার বিখ্যাত ঘৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার "শ্রী" মার্কা ঘৃতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিষ্প্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 'শ্রী' ঘৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ঘৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ ঘৃত যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা ঘৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

চিরন্তনী—শ্রীসুষমা সেনগুপ্ত। এনাক্ষী গ্রন্থ-মন্দির, ১৫৭ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। মূল্য—১।০

গল্প-সংগ্রহ সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া লেখিকা পাঁচটি কাহিনী পরিবেশন করিয়াছেন। দেশ ও আচার-ব্যবহারের পার্থক্য-সত্ত্বেও ধৈর্য্য ও ক্ষমাময়ী নারীর অন্তরে যে চিরন্তনী বৃত্তি অন্তঃশীলা ফল্গুর মত প্রবাহিত তারই ব্যথা-বেদনা প্রতিটি গল্পে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীর মধ্যেই আছেন চিরকালের সীতা, সাবিত্রী, শবরী, অরুন্ধতীরা। ক্ষমা, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও অনুরাগের আলোকে তাঁরা বার বার উজ্জ্বল হইয়া উঠেন।

রচনা ভাবানুযায়ী প্রাঞ্জল এবং মিষ্ট। সবচেয়ে প্রশংসার কথা অকপট দরদ দিয়া কাহিনীগুলি রচিত এবং সেই কারণে প্রত্যক্ষ-দর্শনের অনুভূতি-রসে মন ভরিয়া উঠে—চক্ষুতে অশ্রুবাষ্প ঘনায়।

মাতৃমন্দির

২৬-এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গর্ভাবস্থায়, নিরাপদে থাকা, প্রসব এবং শিশু রক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়।

মানদা দেবী, লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট

পাকিস্থানের পত্র—শ্রীনীহাররঞ্জন ঘোষাল। দি ফিনিক্স প্রেস লিমিটেড। ৫৬, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২।০

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল। বাংলার যে বিস্তীর্ণ আবাদী জমির উপরে দু'ফুট চওড়া একটি কাটা-নালার সীমারেখায় বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা রূপরূপে প্রকাশিত হইল, একদিকে তার সুরাজপুর পূর্ব্ব-পাকিস্থানী (পাকিস্থান নহে) গ্রাম, অন্য দিকে রাজপুর—ভারতবর্ষের সুর।

যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন—দু'ভাগে বিভক্ত ভারতবর্ষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘুমাইয়া বাঁচিবেন—তাঁহাদের আশা যে নিত্য-দেখা দুঃস্বপ্নে নিদ্রাহীন রাত্রিকে সুদীর্ঘতর করিতেছে—তাহারই আভাস পাকিস্থানের পত্রে পাওয়া যায়। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ভিত্তিপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রাজনীতি, সমাজনীতি ও মনুষ্য-চরিত্রের ফাঁকে ফাঁকে বহু জিনিষ—অনুসন্ধানী দৃষ্টির দ্বারা লেখক আবিষ্কার করিয়াছেন এবং শ্লেষ মিশাইয়া ইঙ্গিতে ও স্পষ্ট ভাষণে সেগুলি বিশ্লেষণ ও ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সব দোষত্রুটি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লেখকের ভাষার ধার আছে, ব্যঙ্গোক্তির তীক্ষ্ণতা সোজা মর্ম্মস্থানে আঘাত করে—এবং বাস্তব অনুভূতিও লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবের মধ্যে কল্পনার যথেচ্ছ প্রসার ঘটাইয়াছেন লেখক—যেগুলি উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাহুল্য বলিয়া বোধ হয় না। পত্রের বর্ণনাংশে যে ত্রুটি বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে সেটি এই যে, যে সমস্ত ঘটনা দ্রষ্টার অগোচরে ঘটিতেছে—প্রত্যক্ষদর্শনের হুবহু বর্ণনাতে তাহা ভারাক্রান্ত। ইহা রসাভাসের লক্ষণ।

লেখক লালা মিঞা ও মালতীকে লইয়া স্বপ্নজাল বুনিয়াছেন। সুরাজপুর ও রাজপুরের সীমারেখা-চিহ্নিত দু'ফুট চওড়া খাদটি এদের দেশ-কাল-ধর্ম্ম অতিক্রান্ত প্রেমের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে কিনা সে ভবিষ্যদ্বাণী আজিকার দিনে সম্ভব নয়। কিন্তু কল্পনার জগতে লালা মিঞার মত নায়কেরা আশা-আশ্বাসহীন বর্ত্তমানকে যে খানিকটা উদ্ভাসিত করে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। না-পত্র না-উপন্যাস জাতীয় এই রচনার মধ্যে বলিষ্ঠ একটি ভঙ্গী আছে—ব্যক্তিনিরপেক্ষ হইলে যাহার প্রকাশ অসাধারণ বলিয়া স্বীকৃত হইত। ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিচারের প্রধান বাধা অবশ্য স্ব-সম্পর্কিত (ব্যক্তি, জাতি বা ধর্ম্মগত) ক্ষয়ক্ষতির উত্তেজনা। আকস্মিক আঘাতে সুকুমার বৃত্তিগুলি আহত হইলে—চিন্তার কেন্দ্রস্থানটি বিচলিত হইবেই এবং রঙের পোঁচ এ সব ক্ষেত্রে গাঢ় হইয়াও থাকে। রচনায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থাকিলেও—বাস্তব-নিষ্ঠা সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই। লালা মিঞারা শরৎচন্দ্রের ভাষায় কথা বলিলে, কিংবা মালতীরা রবীন্দ্রনাথের নায়িকাদের মত বিতর্ক তুলিলে পত্রের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বেমানান বোধ হয়। সঙ্কীর্ণ উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সেই কথা। অবশ্য আশাবাদের কথা স্বতন্ত্র।

যাহা হউক, পাকিস্থানের পত্র নাটকের রস-উপভোগকে বঞ্চিত করিবে না। স্পষ্ট কথা—বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে প্রকাশ করার কৃতিত্ব লেখকের আছে, এবং বাংলা সাহিত্য ভবিষ্যতে তাঁহার কাছে অনেক কিছু আশা করিতেছে।

প্রচ্ছদপট প্রশংসার্হ।

কালের যাত্রা—শ্রীযতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—দেড় টাকা।

স্বর্গধামে একরাত্রি, মাটির মায়া, ভবিতব্য, অসতী, কেবলের প্রেম, কালের যাত্রা, হনলুলু ফিল্মস্ লিমিটেড প্রভৃতি দশটি গল্প এই সংগ্রহে আছে। কয়েকটি গল্পে বাস্তবের ব্যথা ও কল্পনার মায়াজাল বোনা হইয়াছে এবং কয়েকটিতে লঘু পরিহাসের চেষ্টা আছে। বর্ত্তমান কালের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে না পারিলে জীবন যে দুর্ব্বহ হইয়া উঠে-কালের যাত্রা গল্পে এই তথ্যটি পরিস্ফুট হইয়াছে। বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে লেখকের কৃতিত্ব দেখা যায়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

হেমন্তের কুহেলি গুণ্ঠনতলে

হেমন্ত ঋতু একদিকে নিয়ে আসে প্রাচুর্য্যের পসরা, ক্ষেত্রলক্ষ্মীর দান শস্যসম্পদ, অন্যদিকে নিয়ে আসে রিক্ততার আহ্বান—আসন্ন শীতের আভাস।

এই হঠাৎ ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানুষের শরীরকে খাপ খাওয়াবার জন্যে সবচেয়ে পরিশ্রম করতে হয় লিভারকে। তাই লিভার সম্পূর্ণ সুস্থ ও শক্তিশালী না থাকলে এ সময়ে নানা রোগের আক্রমণ অনিবার্য্য।

কুমারেশ উদরাময়, অজীর্ণ প্রভৃতি লিভার ও পেটের সকল পীড়া নিশ্চিতরূপে আরোগ্য ত করেই—সেই সঙ্গে লিভারকে শক্তিশালী ক'রে অন্য রোগের আক্রমণও প্রতিরোধ করে।

কুমারেশ

দি ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ

সালকিয়া :: হাওড়া

সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। নালন্দা প্রেস, ১৫৯-৬০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা।

বইখানির উপযুক্ত নামকরণই হইয়াছে, কেননা দেশে যাঁহারা সুভাষচন্দ্রের সহকর্ম্মী হইবার এবং তাঁহাকে অতি নিকটে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগলাভ করিয়াছিলেন তাঁহারাও দেশ হইতে দূরান্তরে পূর্ব্ব-এশিয়ার অপূর্ব্বকর্ম্মী নেতাজীর বিরাটত্বে অভিভূত হইয়া পড়েন। নিকটের এবং দূরের সুভাষচন্দ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য যে নাই গ্রন্থকার ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। দেশবন্ধুর অনুগামীরূপে যে সুভাষচন্দ্রের উন্মেষ হইয়াছিল পূর্ণবিকশিত নেতাজীরূপে পূর্ব্ব-এশিয়ার এবং পূর্ব্ব-ভারতের আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তে তাঁহাকেই আমরা দেখিতে পাই। গ্রন্থকার কলিকাতা বিদ্যাপীঠের কর্ম্মী হিসাবে এবং অন্যান্য নানা সূত্রে সুভাষচন্দ্রের সাহচর্য্যলাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সুকবি এবং সুলেখক। তাঁহার তুলিকায় দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র এবং কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের প্রথম ভাগ অভিজ্ঞতাপ্রসূত রচনা বলিয়া শেষার্দ্ধ অপেক্ষা আমাদের অধিক আকৃষ্ট করে। শেষার্দ্ধে আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ এবং নেতাজী সম্বন্ধে উদ্‌ঘাটিত তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুভাষচন্দ্রের দুইখানি পত্রের অনুলিপি, তাঁহার লেখা 'তরুণের আহ্বান', 'দলাদলির হোক অবসান' এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ' পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। নেতাজীর কথা যতই শুনি ততই শুনিতে আগ্রহ হয়। এই সুলিখিত সুবৃহৎ গ্রন্থখানি পাঠকের আকর্ষণের বস্তু হইবে।

চৌধুরীদের বৌ—শ্রীনীহারকুমার পালচৌধুরী। প্রকাশক—শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৩, জোড়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বইখানি নাটিকা। চৌধুরী-পরিবারে জমীদারী লইয়া দুই ভাইয়ে মামলা বাধিয়াছে। মুখ দেখাদেখি নাই। বড় ভাইয়ের শ্বশুর এটর্ণি। তিনিই এ মামলার মূল। ছোটর পক্ষ বড়-বৌকে সাক্ষী মানিয়াছে। বড় বৌ মৃণাল মিথ্যা বলিবে না। সাক্ষ্য না দিলেও বিপদ, কেন না তাহাতে মামলার রায় ছোটর পক্ষেই যাইবে। ছোট-বৌ মিনতি শিক্ষিতা মেয়ে। দেশের মন্দিরে ছেলের চুল দিতে গিয়া সে দেখিল মামলার ফলে চৌধুরীদের কীর্ত্তি লুপ্ত এবং জমীদারী ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। মিনতি ফিরিয়া আসিয়া স্বামী-সহ বাড়ী গিয়া স্নেহময়ী বড়-জা মৃণালের কাছে বলিল, "তুমি নাকি সাক্ষ্য দিতে রাজী হয়েছ দিদি?" মৃণাল বলিল, "ভুলে গেলি ছোট-বৌ, চৌধুরীদের বড়-বৌ সাক্ষ্য দেয় না।" মিনতি বলিল, "মামলা আমরা তুলে নিয়েছি দিদি। আমরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।" তার পর দুই ভাইয়ে মিলন হইয়া গেল। এইটুকু গল্পাংশ। এই বিষয়বস্তু লইয়া লেখক চৌধুরীদের দুই বৌয়ের চরিত্র নাটিকায় চিত্তাকর্ষকভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

বাংলার আধুনিক গল্প—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত। ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী, ২১৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

পুস্তকখানি সঙ্কলনগ্রন্থ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রমেশচন্দ্র সেন, রামপদ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর রায়, জগদীশ গুপ্ত, সুশীল জানা, সমুদ্ধ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ আটাশ জন লেখকের আটাশটি ছোট গল্প ইহাতে আছে। লেখকদের মধ্যে অনেকেই খ্যাতনামা এবং অনেকগুলি গল্পই সুপাঠ্য। আজকাল কয়েকখানি গল্পসঙ্কলন বাহির হইয়াছে। কোনটির অপেক্ষা ইহা অল্প মনোরম নহে। বইখানি হইতে

প্রকাশিত হইল—

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস

স্বর্গ হইতে বিদায়

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

মনস্তত্ত্বমূলক
* সুবৃহৎ গ্রন্থ *
অপূর্ব্ব প্রচ্ছদপট
*
মূল্য ৪' সিকা

অঙ্গসৌষ্ঠবে প্রত্যেকটি বই অতুলনীয়

প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের উপন্যাস
ইহাই সত্য ... ৩৲
আর্ত্তনাদ ... ২॥০
জনতার ইঙ্গিত ... ২৲

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
নিঃসঙ্গ ... ৩॥০

বিমল মিত্রের গল্পগ্রন্থ
দিনের পর দিন ... ২৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ
ভাঙা বন্দর ... ২৲

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ
হলুদ পোড়া ... ২৲

আমিনুর রহমানের গল্পগ্রন্থ
পোষ্টকার্ড ... ২৲

আশালতা দেবীর উপন্যাস
কলঙ্কের ফুল ... ১।০

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
হৃদয় দিয়ে হৃদি ... ২।০
মধুরাতি জাগর ... ২॥০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
ক্রৌঞ্চ-মিথুন ... ২॥০
(২য় সংস্করণ)

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর উপন্যাস
রাতের স্বপন (৩য় সং) ২।০

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের হাসির গল্প
'সকলি গরল ভেল' ২৲

রাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর উপন্যাস
কো-এডুকেশন ... ১।০

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস
প্রেম ও প্রয়োজন (যন্ত্রস্থ)

সুধাংশুকুমার গুপ্তের
বিদেশী শ্রেষ্ঠ গল্প-সঙ্কলন
সেরা লিখিয়েদের সেরা গল্প (১ম খণ্ড) ... ১৲

ছেলেদের পড়বার

বিশু মুখোপাধ্যায়ের
সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায় ১৲
(Toilers of the Sea)

সুধাংশুকুমার দাশগুপ্তের
লাসার অভিশাপ ... ৸৵০

বুদ্ধদেব বসুর
কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড ৸৵০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
ডাকাতের সর্দ্দার ... ৸৵০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
আকাশের আতঙ্ক ... ৸৵০

পাব্‌লিশিং হাউস • ৮/১এ, হরি পাল লেন, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট:

গল্পগ্রন্থ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

মহানগর

দ্বিতীয় সংস্করণ। দুই টাকা।

সুবোধ ঘোষের

পরশুরামের কুঠার

দ্বিতীয় সংস্করণ। দুই টাকা।

শুক্লাভিসার

দুই টাকা চার আনা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের

ফসল

দ্বিতীয় সংস্করণ। এক টাকা চার আনা।

ঋণ

এক টাকা সাড়ে ছয় আনা।

নতুন দিনের কাহিনী

দুই টাকা।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

পতাকা

দুই টাকা।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

খেলনা

দেড় টাকা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের

নয়নচারা

দেড় টাকা।

উপন্যাস

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের

বৃত্ত

এক টাকা এগারো আনা।

মরামাটি

দ্বিতীয় সংস্করণ। দুই টাকা চার আনা।

দিনান্ত

দ্বিতীয় সংস্করণ। সাড়ে তিন টাকা।

কল্যাণীয়েষু

দ্বিতীয় সংস্করণ। তিন টাকা।

রাত্রি

পাঁচ টাকা।

কল্লোল

পাঁচ টাকা।

শৈলেন ঘোষের

তিনরঙ

দুই টাকা।

প্রাচীন প্রাচী

তিনটি সুদীর্ঘ কবিতা—এশিয়া, ভারতবর্ষ, বাংলা। কবিতা তিনটি ইতিপূর্ব্বে যখন প্রকাশিত হয়েছিলো, তখন যাঁরা পড়েছিলেন, তাঁরাই জানেন, বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এ যেমন অভিনব তেমনি অনবদ্যও। কাব্য-রসিকমাত্রেই **সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের** এই নবতম কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ করবেন। **দাম দেড় টাকা॥**

মহাজিজ্ঞাসা

লুই ফিশারের বিখ্যাত গ্রন্থ '*The Great Challenge*'-এর বাংলা অনুবাদ। বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির এর চেয়ে নিরপেক্ষ ও নির্ম্মম আলোচনা এ-যুগে আর কেউ করেনি।

প্রথম পর্ব্ব। দাম চার টাকা

বৌদ্ধধর্ম্ম

এশিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রাচীন সংস্কৃতির উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও বিবর্ত্তন সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনাগুলো এই প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো।

দাম তিন টাকা

ধর্ম্মবিজয়ী অশোক

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের যে গৌরবময় অধ্যায় আজ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি, একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেন সেই অধ্যায়কেই প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থে।

দাম তিন টাকা

গান্ধী-সাহিত্য

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের

গান্ধী পরিকল্পনা

দুই টাকা।

গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা

দুই টাকা।

ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম

বারো আনা।

শিক্ষার বাহন

নয় আনা।

জীবনী ও মতবাদ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের

কার্ল মার্ক্স

দ্বিতীয় সংস্করণ।

সুবোধ ঘোষের

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ডারুইন

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

রুশো

প্রতি খণ্ড এক টাকা দুই আনা।

পূর্ব্বাশা সিরিজ:

ভারতীয় নারী ও সমাজ; ধর্ম্ম ও নীতি; সমাজ ও সাহিত্য; সমাজ ও সংস্কৃতি; সমাজ ও বিজ্ঞান, সঙ্গীত ও সমাজ; অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ। প্রতি খণ্ড চার আনা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড

পি ১৩, গনেশ চন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩

আধুনিক গল্পের ধারা এবং রচনা-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য পাঠকের নিকট প্রতীয়মান হইয়া উঠিবে। সঙ্কলন পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বর্ষপঞ্জী ১৩৫৫ —শ্রীবিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, এস. আর. সেনগুপ্ত এণ্ড কোং, ২৫।এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা। মূল্য ৩।• টাকা, পৃষ্ঠা ৪৯৬।

বর্ত্তমান জগতে কেবল বিশেষজ্ঞ হইলেই চলে না, প্রত্যেকের পক্ষেই সকল বিষয়ের কিছু কিছু জানিবার প্রয়োজন হয়। দৈনন্দিন পত্রিকা পাঠকালেও শিক্ষিত পাঠক সর্ব্ববিষয়েরই অল্পবিস্তর জ্ঞানের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন। অল্প শিক্ষিতের ত কথাই নাই। অথচ সকলের পক্ষে, এমন কি কাহারও পক্ষে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়। এই অসুবিধা এতদিন দূর করিয়াছে ইংরেজী 'ইয়ার বুক' গুলি। বর্ত্তমানে আমরা ইংরেজী ভাষার সাহায্য ছাড়াই যাহাতে সকল বিষয়ে জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারি সেদিকে সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু অত্যাবশ্যক জ্ঞানের বিভাগে গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম এবং যাহাও আছে তাহাও ইংরেজী 'ইয়ার বুকে'র সহিত তুলনীয় নহে। সুতরাং বর্ত্তমান 'বর্ষপঞ্জী'খানিতে বাংলা সাহিত্যের বহুদিনের একটি অভাব দূর করিয়া বাঙালী পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করার প্রচেষ্টাকে সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। ইহাতে যে সকল বিষয় স্থান পাইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এই—আমাদের পতাকা, জাতীয় পতাকার ইতিহাস, সালতামামী, পৃথিবীর ঘড়ি, বিদেশে ভারতীয়দের সংখ্যা, কয়েকটি স্বাধীনতার তারিখ, ঘটনাপঞ্জী (বিগত বৎসরের), ভৌগোলিক বিবরণ, ভারতীয় আদমসুমারী (১৯৪৯), দেশীয় রাজ্য, ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন ও দেশ বিভাগ, ভারতীয় স্বাধীনতার সনদ, গণপরিষদ, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের খসড়া, ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মহাত্মা গান্ধী, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী, ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের নাম, বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলী, ভারতে বিদেশীয় প্রতিনিধিগণ, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীদের নাম ও শাসন-ব্যবস্থা, পাকিস্থান ডোমিনিয়ন, সাহিত্য ও চারুশিল্প, ভারতীয় বিজ্ঞান, নোবেল পুরস্কার, যানবাহন, ভারতীয় রেলপথ, বিমানপথ, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, জনস্বাস্থ্য, ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থা, ভারতীয় অর্থনীতি, ভারতের যন্ত্রশিল্প, শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা, ভারতীয় চা শিল্প, ভারতের খনিজ সম্পদ, খাদ্য সরবরাহের অবস্থা, সেচ-ব্যবস্থা, ভারতে গৃহপালিত পশু, ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়, বীমা বিবরণ, খেলাধূলা, বৃহত্তর বঙ্গ-আন্দোলন, ভারতীয় সংবাদপত্র, যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি, পশ্চিমবঙ্গ শিল্পদপ্তর, কর্ম্মসংস্থান-সভ্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা, সাধারণ জ্ঞান, জাতিসঙ্ঘ (U. N. O), সঙ্গীত ও নৃত্য, ভারতীয় শিল্পের ইতিকথা, প্যালেষ্টাইন, কলিকাতা ও কর্পোরেশন, কলিকাতার যানবাহন, কলিকাতার ট্রাম ও দমকল এবং ব্যক্তিপরিচয় (Who's Who)।

বাংলাভাষায় এইরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বল্পমূল্য বর্ষপঞ্জী গৃহী, ব্যবসায়ী, ছাত্র, শিক্ষক, সমাজপতি, রাষ্ট্রচালক, কংগ্রেস ও শ্রমিককর্ম্মী, সাহিত্যিক, শিল্পী ইত্যাদি সকল শ্রেণীর কাজে লাগিবে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে ইহার বহুলপ্রচার কামনা করি।

ডোমিনিয়ন ভারতের পথ-রেখা —শ্রীভূতনাথ ভৌমিক। ভারতী বুক ষ্টল, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৫৫, মূল্য ২।• টাকা।

বর্ত্তমান পুস্তকে লেখক ষোলটি অধ্যায়ে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন, প্রথম মহাযুদ্ধ ও কংগ্রেস, অহিংসা ও অসহযোগ, কংগ্রেস ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, আগষ্ট বিপ্লব, আজাদ হিন্দ্ সরকারের সশস্ত্র অভিযান, সিমলা সম্মেলন, নৌবিদ্রোহ, বৃটিশ মন্ত্রী মিশন, স্বাধীনতালাভ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই

পূজার সেরা সওদা

কলম্বিয়া মেসিন

নূতন মডেলের মেসিন এসেছে,

ডীলারের কাছে দেখুন।

কলম্বিয়া ও রিগ্যাল

— পিন —

স্বর স্পষ্ট বাজে, রেকর্ড দীর্ঘস্থায়ী রাখে।

ছেলেমেয়েদের আনন্দদায়ক ইংরাজি রেকর্ড

কিড কর্ড রেকর্ড

(KID KORD RECORD)

পূজার রেকর্ডের তালিকা রেকর্ডের দোকানে পাবেন

কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী লিঃ

কলিকাতা — বোম্বাই — দিল্লী — লাহোর — করাচী

লেখক কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিষয়বস্তুর বিচার করিয়াছেন। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ইতিহাস ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে হইলেও সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাঁহাদের পক্ষে বড় বড় পুস্তক পাঠ করিয়া এদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস জানিবার সময়ের অভাব তাঁহারা এই পুস্তক হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। লেখকের লিখন-ভঙ্গীতেও কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। জটিল ঐতিহাসিক তথ্যাবলীকে কি ভাবে সরল ও সরস করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হয়—'মুসলিম লীগ ও পাকিস্থান' নামক অধ্যায়ে লেখক তাঁহা দেখাইয়াছেন। স্থানে স্থানে কংগ্রেস-নীতির দুর্ব্বলতা দেখাইতে গিয়া লেখক নিজের নির্ভীক মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে অথচ কংগ্রেসভক্তি ক্ষুন্ন হয় নাই। এইরূপ পুস্তক দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস পাঠকদের নিকট আদৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

পুতুল পুরী—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। কলিকাতা।

পুতুল-পুরীর সকলেই পুতুল—রাজা উজীর থেকে গাড়োয়ান পর্য্যন্ত। তারা কেউবা কাঠের কেউবা মাটির। এদেরই লইয়া পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। কোথাও যুক্তাক্ষর ব্যবহার করা হয় নাই। আমাদের দেশে এই শ্রেণীর পুস্তক বেশী নাই। শিশুদের জানিবার আগ্রহ মিটিবার পক্ষে এই সুলিখিত ও সুচিত্রিত পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

লেখক ইন্দুর-মাতা ও তার সন্তানদের লইয়া একটি চমৎকার গল্প রচনা করিয়াছেন। ইহাতে গল্পও যেমন আছে—শিক্ষা পাইবার উপকরণের অভাবও তেমনি নাই।

পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের ভাল লাগিবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

রবি-তর্পণ—শ্রীসত্যেনন্দ্রনাথ জানা। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

কয়েকটি কবিতা এবং 'পঁচিশে বৈশাখ,' 'বাইশে শ্রাবণ' ও 'স্বপ্ন-দাহ' নামক নাটিকাত্রয়ের মধ্য দিয়া লেখক কবিগুরুর প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। 'পরিচায়িকা'য় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস লিখিয়াছেন "শ্রদ্ধায় যাহা দেওয়া হইয়াছে, চুলচেরা বিচার করিয়া কেহই তাহার অমর্য্যাদা করিবেন না। প্রাণের আবেগ ও আকুতি কবিতাগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; নাটকগুলিও কবি-হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্বেল।"

এই স্মৃতি-তর্পণ পুস্তকখানি পাঠকমহলে সমাদৃত হইবে।

বিদ্রোহ (নাটক)—শ্রীসুধেন্দু রায়। 'ঝরণা প্রেস', ৯০, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা।

একখানি সামাজিক নাটক। অজস্র বানান-ভুল সম্বলিত দুর্ব্বল রচনা। সংলাপের সাহায্যে একটি কাহিনী গড়িয়া তুলিলেই যে নাটক হয় না লেখকের তাহা স্মরণ রাখা উচিত।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

চন্দ্রায়ণ—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চৌধুরী। প্রকাশক—শ্রীকমলকৃষ্ণ চৌধুরী ১০০নং, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯। ২১০ পৃ. মূল্য ২৲ টাকা।

চন্দ্রবাবুর বিচিত্র জীবন-কাহিনী, তাই গ্রন্থকার উপন্যাসের নামকরণ করিয়াছেন 'চন্দ্রায়ণ'। চন্দ্রবাবুর জীবনীর "জীবন্ত ইকনমিক্‌স্‌" নামকরণও আলোচ্য উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। মলাটের উপর শোয়েডাগন প্যাগোডার রঙীন চিত্রখানি ও ভিতরে বুদ্ধদেবের একখানি চিত্র ঘটনাস্থল যে ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন তাহাও কৌশলে ব্যক্ত করিতেছে। সুতরাং এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপন্যাসখানি সাধারণ পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিবে নিশ্চয়। চন্দ্রকান্তবাবুর পিতামহ পঁচিশ হাজার টাকা সালিয়ানার মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন, জ্ঞাতি ও বন্ধুদের চক্রান্তে কিন্তু তাঁহার জমিদারী

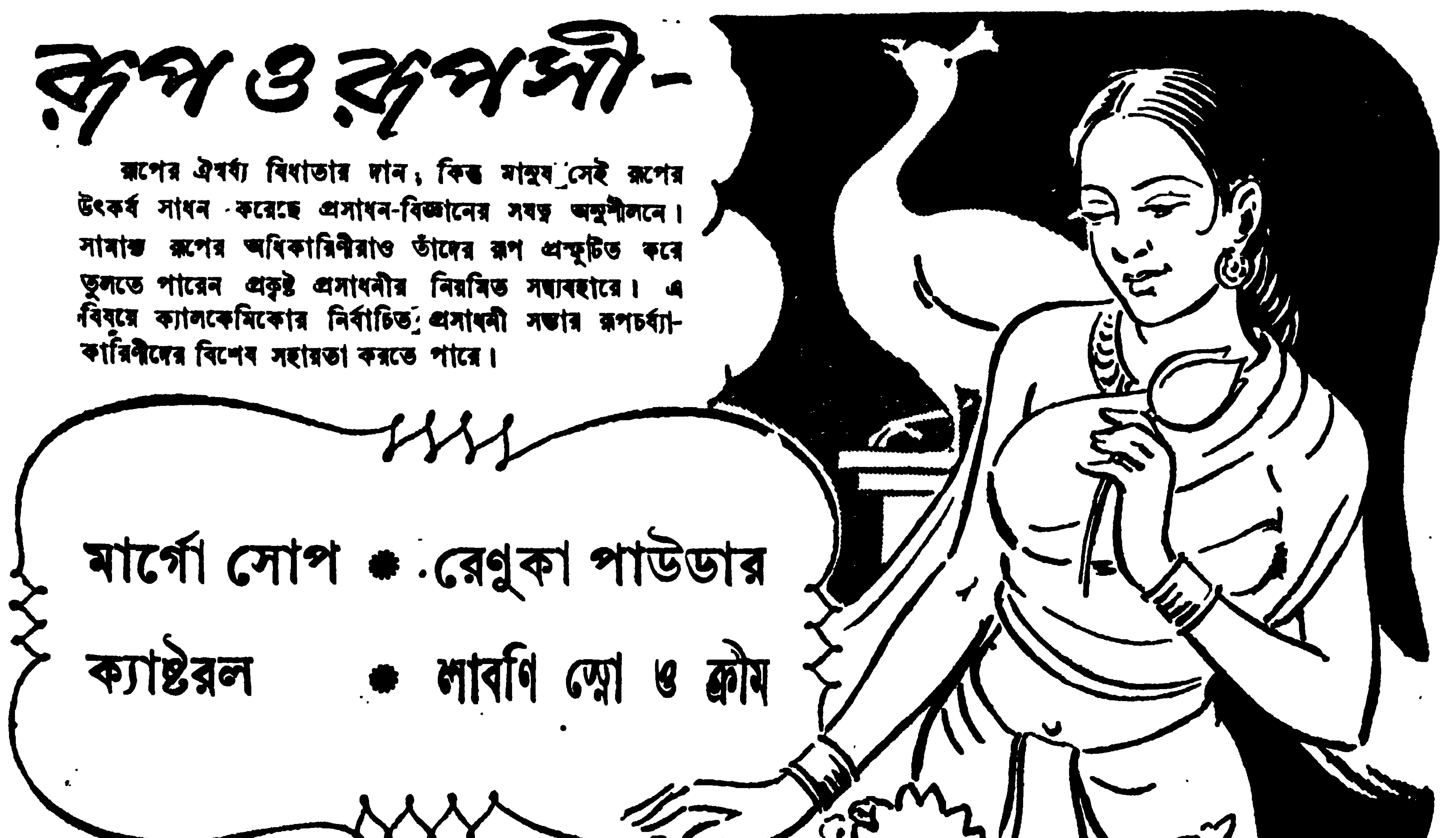

নিলাম হইয়া যায়। চন্দ্রবাবুর বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর তখন তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হন, কিন্তু দারুণ দুর্দৈবের মধ্যেও তিনি হতাশ না হইয়া কুড়ি বৎসর বয়সে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও ভগবানে অটুট নির্ভরতা সম্বল করিয়া একটি সামান্ত চাকুরী লইয়া রেঙ্গুন বন্দরে উপনীত হন এবং সেখানে ভাগ্যান্বেষণে সদাজাগ্রত থাকিয়া প্রথমে আধুলি মাত্র সম্বল অবস্থা হইতে ক্রমে বর্ম্মার নানা লাভজনক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত হইয়া শেষে আড়াই লক্ষাধিক টাকার মালিক হন এবং তখনও তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা অটুট থাকে। যাঁহারা ঘটনাবহুল উপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন বইখানি তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

চলচ্চিত্র—শ্রীবীরেন দাশ। ভারত বুক এজেন্সী। ২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

চলচ্চিত্রের টেকনিক অথবা কলা-কৌশল সম্বন্ধে সাধারণের বিশেষ কিছুই জানা নাই। এ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় খুব বেশী আলোচনাও হয় নাই। পর্দায় যে ছবি দেখিয়া দর্শকেরা আনন্দলাভ করে তাহার ভিতরকার খবর জানিবার জন্য তাহাদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বীরেনবাবুর চলচ্চিত্র হইতে সেই কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে এবং সিনেমার ছবি কি করিয়া তৈরি হয় সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মিবে। পুস্তকখানিতে লেখকের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও জটিল বিষয়কে গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা—এ দুয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ-প্রণালী, ডকুমেণ্টারি বা শিক্ষামূলক চিত্র, ছোটদের উপযোগী চলচ্চিত্র ও প্রদর্শনী, চলচ্চিত্রের ইতিহাস, সোভিয়েট চলচ্চিত্র, মস্কো চিত্র নাট্য ষ্টুডিয়ো ইত্যাদি, চলচ্চিত্রের বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বাংলাভাষায় সিনেমা সম্বন্ধে দুই একখানা বই আছে বটে, কিন্তু উহার ব্যবহারিক দিক লইয়া এমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক আলোচনা অন্য কোন পুস্তকে নাই। যে সকল নূতন গল্প-লেখক সিনেমার গল্প লিখিয়া অর্থ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিতে চান তাঁহারা এই পুস্তকে অনেক উপদেশ পাইবেন।

কয়েকটি বিদেশী গল্প—শ্রীগোপাল ভৌমিক। সরস্বতী লাইব্রেরী। সি ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিঃ। মূল্য ২৸০ আনা।

শ্রীযুক্ত গোপাল ভৌমিক বর্ত্তমান পুস্তকে যোলটি বিদেশী গল্পের অনুবাদ করিয়া বাঙালী পাঠকপাঠিকাদের রসপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে ইউরোপ আফ্রিকা এবং আমেরিকা এই তিনটি মহাদেশেরই কতকগুলি ভাল গল্প একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ছাড়া ইহাতে প্যালেষ্টাইনের একটি ইহুদী গল্প, দক্ষিণ আফ্রিকার একটি গল্প এবং আমেরিকার একাধিক গল্প আছে। লেখক অনুবাদকে মূলানুগত করিবার জন্য সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি গল্পগুলিকে "ভাষান্তরিত করিয়াছেন, রূপান্তরিত করেন নাই।" পুস্তকটিতে আলেকজাণ্ডার কুপ্রিন, শেখভ, ষ্টেইনব্যাক প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের মাত্র চারিটি গল্প স্থান পাইয়াছে, বাকী লেখকেরা এদেশে তত পরিচিত নহেন—কিন্তু তাঁহাদের রচনায় প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রহিয়াছে। মোসে স্মিল্যানস্কির লেখা লতিফা নামক গল্পটি শুধু এই গল্পসংগ্রহের নহে, বিশ্ব-সাহিত্যের একটি সেরা গল্প বলিয়া গণ্য হইবে। স্বল্প দু' একটি কথায় ইহাতে যে বেদনা-করুণ চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা পাঠকের মনের পটে চিরতরে আঁকা হইয়া যায়। নিপুণ জহুরীর মত গোপালবাবু বিশ্ব-সাহিত্যের কতকগুলি উজ্জ্বল মণিরত্ন খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়া বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। এজন্য তিনি গল্প রসিকমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

ডক্টর মতিলাল দাশ

শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্র। ডাঃ দাশ এম. এ পাস করিয়া তিন বৎসর অধ্যাপকতা করেন, পরে ১৯২৯ সালে মুন্সেফ হন। ১৯৩৬ সালে তিনি ইউরোপের বিচার-পদ্ধতি অনুশীলন ও পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি-কেন্দ্রে ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্মধারা সম্বন্ধে নানাবিধ বক্তৃতা করেন। ডাঃ দাশ একজন সাহিত্যিকও বটেন। বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি পাঠকমহলে সুপরিচিত হইয়াছেন।

হেমন্তকুমারী দেবী

যশোহর মাগুরার অন্ধ ঔপন্যাসিক ও স্বদেশসেবক পরলোকগত যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের পত্নী এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্যের মাতা হেমন্তকুমারী দেবী গত ১লা আশ্বিন হুগলী চাঁপদানীতে ৮০ বৎসর বয়সে লোকান্তরিতা হইয়াছেন। স্বদেশপ্রীতি, দানশীলতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর জন্য তিনি বহু লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলনে তিনি স্বামীর পাশে দাঁড়াইয়া কাজ করিয়াছিলেন। মহম্মদপুরে অনুষ্ঠিত সীতারাম উৎসবেও তিনি যদুনাথের কর্ম্মসঙ্গিনী ছিলেন। এমনি ভাবে তিনি সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশপ্রেম বাংলার নারীদের হৃদয়ে প্রেরণার সঞ্চার করিবে।

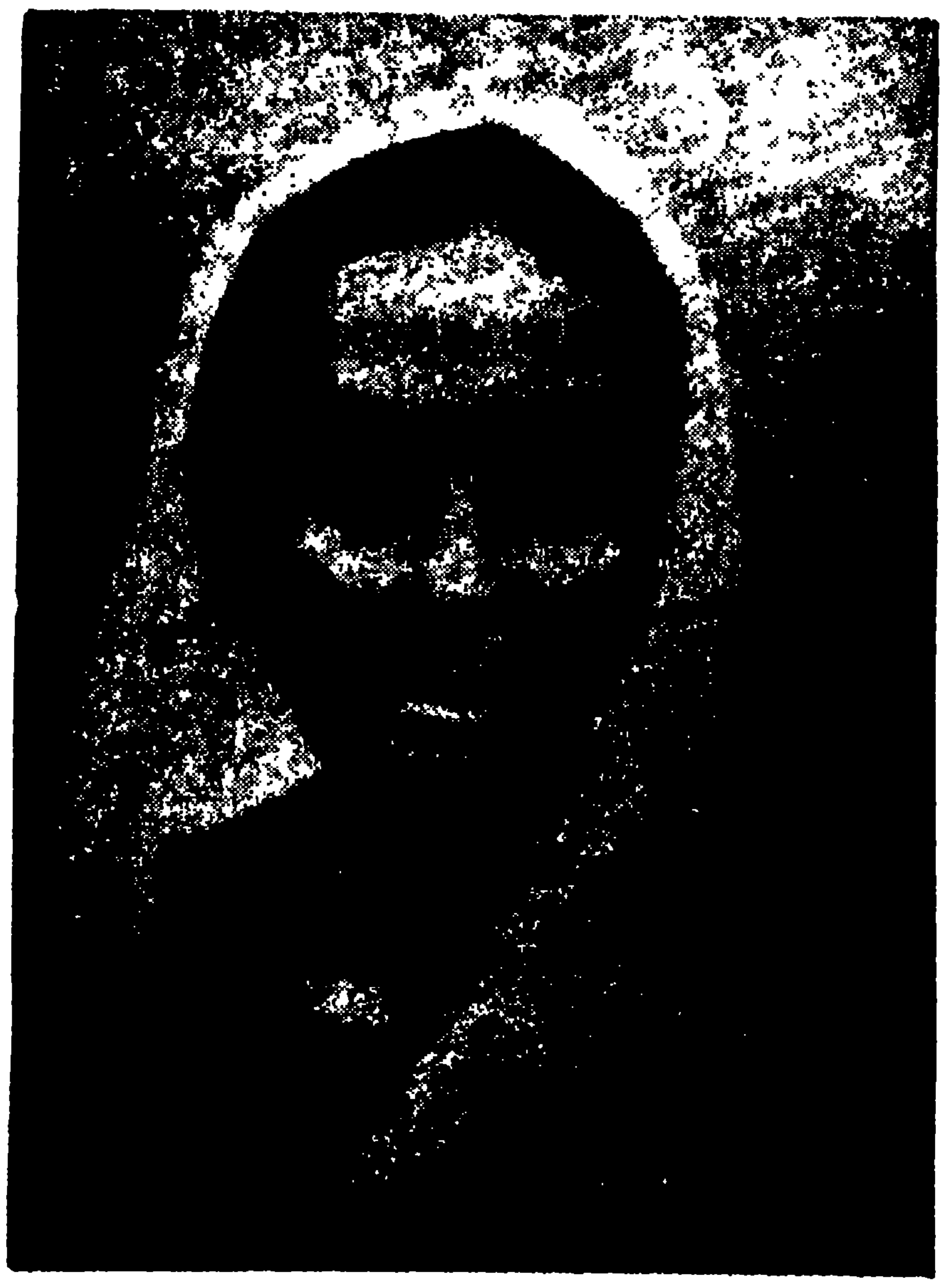

হেমন্তকুমারী দেবী

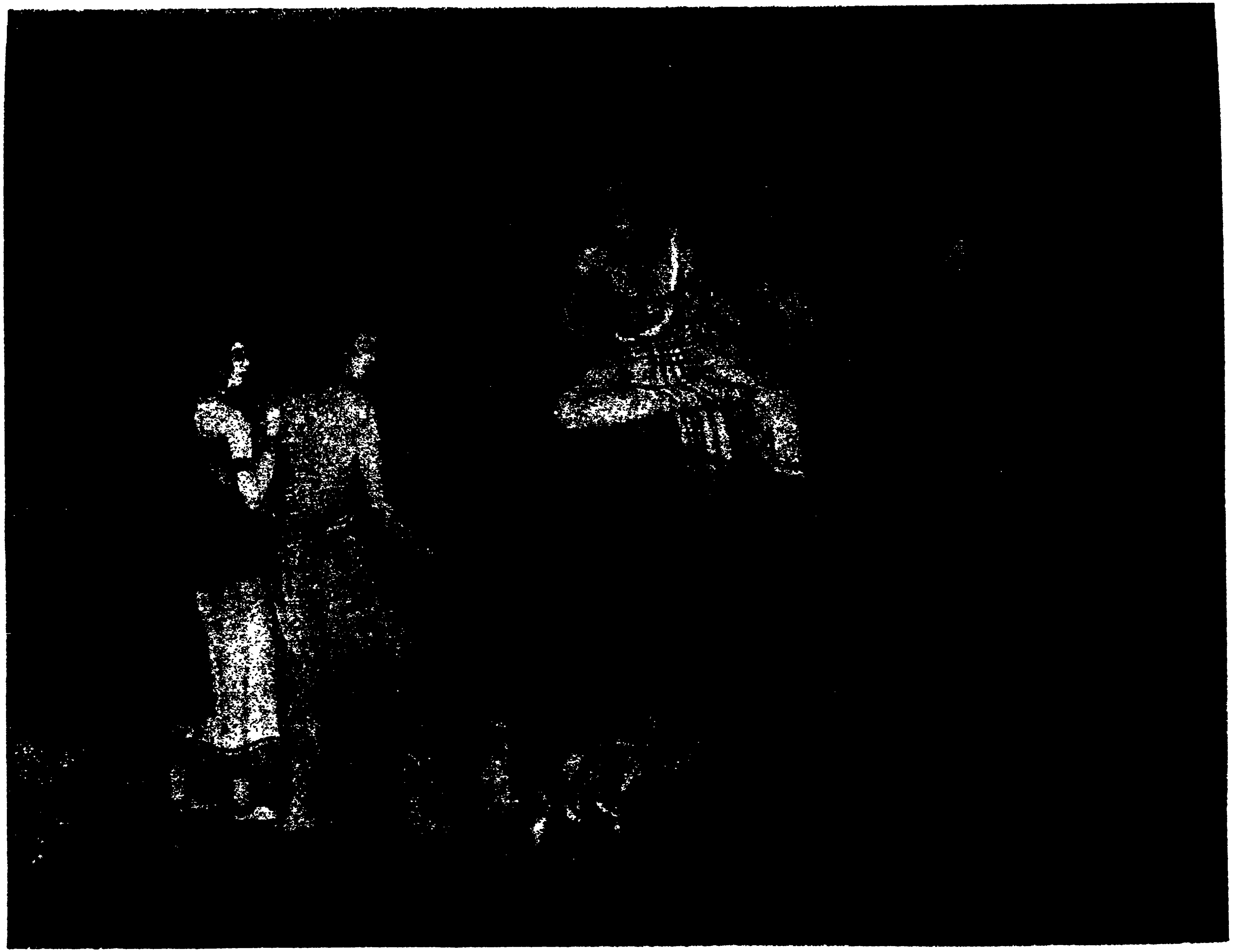

অশোক ও কুণাল

শ্রীরণবীর শকসেনা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

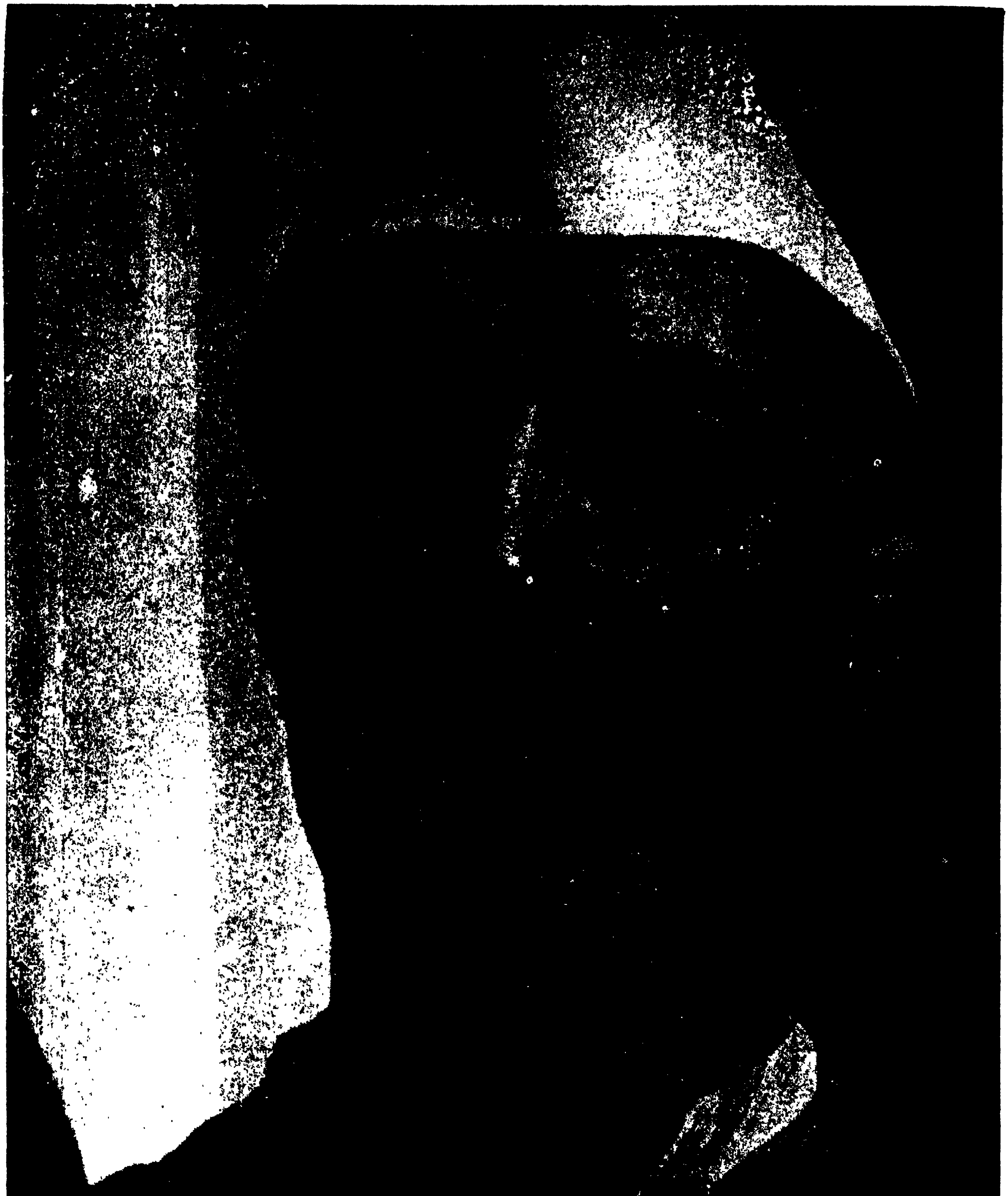

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনেতা

গত মাসে দুই জন রাষ্ট্রনেতার জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে, প্রথমে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ৭৪তম জন্মোৎসব, পরে পণ্ডিত নেহরুর ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষে। এই দুই জন এখন ভারত-রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ পদাধিকারী এবং আমাদের রাষ্ট্র-নায়ক। বর্ত্তমানে ইঁহাদেরই বুদ্ধিমত্তা ও পরিচালনার উপর ভারত-রাষ্ট্রের প্রগতি ও পুষ্টি নির্ভর করে। উভয় উৎসবে সমস্ত দেশবাসী ইঁহাদের দীর্ঘজীবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি কামনা করিয়াছে এবং আমরাও তাহাতে যোগদান করিতেছি।

এই দুই জনই বাংলার বাহিরের লোক এবং দুই জনই বাংলার সহিত বিশেষ পরিচয় রাখেন নাই। পণ্ডিত জবাহর-লাল তো তাঁহার এক পুস্তকে বাংলা সম্পর্কে অজ্ঞতা স্বীকারই করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি এক বক্তৃতায় সর্দার বল্লভভাইও বাংলার সম্পর্কে জ্ঞানের বিশেষ অভাব দেখাইয়াছেন। রাষ্ট্র-চালকের পক্ষে কোনও প্রদেশ সম্পর্কে অজ্ঞতা বা ঔদাসীন্য বিচক্ষণতার পরিচায়ক নহে। আমরা আশা করি, তাঁহারা দুই জনেই অদূরভবিষ্যতে তাঁহাদের এই জ্ঞানের অভাব দূর করিতে সমর্থ হইবেন। বাংলাদেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলদায়ক এ কথা তাঁহারা না বুঝিলে বাংলা তথা ভারত-রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ বিঘ্নসঙ্কুল হইবে।

বাংলার দিক হইতে আমাদের বুঝা প্রয়োজন যে, আমরা কাহারও নিকট সাহায্য বা সহানুভূতিপ্রার্থী হইয়া যত দিন থাকিব তত দিন আমাদের আশা-ভরসা কিছুমাত্র থাকিবে না। যদি আমরা নিজ শক্তিবলে আমাদের দাবি আদায় করিতে পারি তবেই আমাদের মঙ্গল, নতুবা নহে। বাংলার যুবক-দের ভবিষ্যৎ ক্রমেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, তাঁহাদের যদি চেতনা এখনও না হয়, যদি এখনও তাঁহাদের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার গতি রুদ্ধ না হয়, তবে তাঁহারা দাঁড়াইবেন কোথায়? পরের উপর দোষ দিয়া মনকে হয়ত তুষ্ট করা যায়; কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন চলে না। একথা তাঁহাদের বুঝিবার সময় হইয়াছে। তাঁহারা একথা না বুঝিলে বাংলা চিরদিন অন্য সকল প্রদেশের নিকট তাচ্ছিল্যের বস্তু হইয়া থাকিবে।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন

ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গের, বিশেষ করিয়া পণ্ডিত জবাহর-লাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অবিবেচনার ফলে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্নটাকে আজ একটা সমস্যায় পরিণত করা হইয়াছে। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ভাবপ্রবণ বলিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তার মাঝে মাঝে যে অসংযমের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা আমাদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে। সর্দার বল্লভভাইয়ের এই দুর্ব্বলতা আছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। কিন্তু তিনিও মুখের লাগাম খুলিয়া দিয়াছেন। নাগপুরের একটি বক্তৃতায় তিনি প্রাদেশিকতার নিন্দা করিতে গিয়া বাংলাদেশকে টানিয়া আনিয়াছেন—"বাংলাদেশে যাও, তথায় দেখিবে বিহার-বাংলা, আসাম-বাংলার ঝগড়া।" সর্দারজী কেন তাঁহার ঘরের কাছের দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টি দিতে পারিলেন না, তাহার কারণ আমরা জানি না। সংযুক্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশ গঠন লইয়া যে বাদানু-বাদের সৃষ্টি হইয়াছে, বোম্বাই নগরী সংযুক্ত মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে কিনা এই বিষয়ে গুজরাটি-মারাঠীর মধ্যে যে বিতণ্ডার উদয় হইয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে নাগ-পুরের শ্রোতৃবর্গ ব্যাপারটা অধিক বুঝিতে পারিতেন। সে যাহাই হউক, এই বিষয়ে শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালা "হরি-জন" পত্রিকার ৩১শে অক্টোবর (১৪ই কার্ত্তিক) সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে প্রশ্নটাকে অকারণ জটিল করা হইতেছে এই কথাটাই স্পষ্ট হইয়া উঠে। নিম্নে তাহা তুলিয়া দিলাম:

> "মহারাষ্ট্রপ্রদেশ গঠনের বিষয়ে ও তাহার সঙ্গে বোম্বাই শহরের কি সম্পর্ক হইবে সে বিষয়ে ভ মধ্যে এবং ধ্বনিতে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা যাইতেছে। ইহা লইয়া এত উত্তেজনা ও বাদানুবাদ হইতেছে কেন তাহা আমি বুঝিতে পারি না। শেষ পর্য্যন্ত যাহাই হোক না কেন প্রদেশ ত আর পাকিস্থান বা লঙ্কার মত স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়াইতেছে না, অথবা কোন বিশেষ প্রদেশের অধিবাসী

না হইলেও যে কোন ভারতীয় সেই প্রদেশে বসবাস করার অধিকার হইতে বিচ্যুত হইতেছে না। কোন প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট এইমাত্র বলিতে পারে যে, যে সকল লোক সেখানে বসবাস করিতে চায় বা তাহার পৌর কার্য্যকলাপে অংশ লইতে চায় তাহাদের অফিস-সংক্রান্ত চিঠিপত্র বা কথাবার্ত্তায় ঐ প্রদেশের ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বোম্বাই শহর যদি প্রস্তাবিত মহারাষ্ট্র প্রদেশের অন্তর্ভুক্তই হয় তাহা হইলেও বোম্বাই-এ এখন যে সকল ভারতীয় বাস করিতেছে তাহাদের সেখান হইতে তাড়ানও যাইবে না কিংবা তাহাদের বিদেশী বলিয়া গণ্যও করা হইবে না। কেবল এই পর্য্যন্ত দাবী হইতে পারে যে কালক্রমে তাহাদের মারাঠী ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন গায়কোয়াড় ও বরোদা, সুরাট এবং আহমদাবাদের মহারাষ্ট্রীয়েরা গুজরাটি গ্রহণ করিয়াছে। তাহা করা খুব কঠিন নয়।"

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই ভাবে এই কথাটাকে বুঝিতেছেন না কেন, তাহা দেশের লোকের জানা প্রয়োজন। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা চীৎকার তুলিয়াছেন "সর্ব্বনাশ হইল; সাম্প্রদায়িকতার কল্যাণে যেমন ভারত-বিভাগ হইয়াছে, সেইরূপ ভাষাগত পার্থক্যে (প্রাদেশিকতায়) ভারত-রাষ্ট্র ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িবে।" এই চীৎকারের পিছনে কোন যুক্তি আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বিহার-বাংলার বিতণ্ডাটার উল্লেখ করিতে চাই। ১৯১২ সালে যখন বিহার প্রদেশ সংগঠনের প্রয়োজনে কয়েকটি বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্চল বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হয়, তখন বিহার প্রদেশের নেতৃবর্গ জানিতেন যে এই ব্যবস্থা বেশী দিন টিকিতে পারে না। বিহারের প্রয়োজন ফুরাইলে, রাজস্বের প্রয়োজন ফুরাইলে, এই অঞ্চলগুলি বাংলার কোলে ফিরিয়া আসিবে। ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে বিহারের নেতৃবৃন্দ এই প্রত্যর্পণের দাযিত্বটা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৯৩১ সালে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ মানভূম জেলা সম্মেলন উপলক্ষে সভাপতিরূপে একটি প্রস্তাব পেশ করেন; তাহার মধ্যে এই স্বীকৃতি ছিল যে মানভূম জেলার বঙ্গভাষা-ভাষী লোক-সমষ্টির সংখ্যা শতকরা ৮৯ জন। আজ বিহারের নেতৃবর্গ এই সব কথার উপর চাপা-চাপা দিবার উদ্দেশ্যে এমন একটা চীৎকার তুলিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় শাসকবৃন্দ পর্য্যন্ত ভড়কাইয়া গিয়াছেন; বাংলার ন্যায্য দাবি স্বীকার করিয়া লইতে সাহস পাইতেছেন না। কারণ তাঁহারা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বিরক্ত করিতে পারেন না।

গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় কংগ্রেসের বিধানে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ সংগঠনের ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছিল; সেইজন্যই এতগুলি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসের মানচিত্রে দেখা দিয়াছে। ইংরেজের আমলে যে প্রদেশ বিভাগ হইয়াছিল, কংগ্রেস প্রদেশের সংখ্যা তাহার দ্বিগুণ হইতে বেশী। এই কংগ্রেসী বিধানকে অবলম্বন করিয়া ভারত-রাষ্ট্রের প্রদেশ বিভাগ অতি সহজেই হইতে পারে। সেই কার্য্য আরম্ভ করিবার পথে কোন বাধা নাই, এবং আজ যে বাধা দেখা দিয়াছে তাহার সৃষ্টি-কর্ত্তা পণ্ডিত জবাহরলাল ও সর্দ্দার বল্লভভাই। কিশোরলালজী দেখাইয়াছেন এই কাজ কত সহজ এবং আমরা এখনও আশা করি যে ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারবৃন্দ এই সহজ কথাটা বুঝিবেন। না হইলে তাঁহাদের ভাগ্যে অনেক দুর্গতি আছে; স্বখাদ সলিলে তাঁহাদের ডুবিয়া মরিতে হইবে। দেশের লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগের বিরুদ্ধে নেহরু-প্যাটেলও বেশী দিন টিঁকিয়া থাকিতে পারিবেন না।

বাঙালী-অবাঙালী

খণ্ডিত বাংলায় বাঙালীর আত্মরক্ষার চেষ্টাকে বাংলার বাহিরে এক শ্রেণীর লোক অবাঙালী বিতাড়ন বলিয়া প্রচার করিতেছেন এবং বাংলাদেশেই কেহ কেহ ইহাকে প্রাদেশিকতা মনে করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইতেছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থ যাঁহাদের সর্ব্বস্ব তাঁহাদের পক্ষে ইহা সাজে, তাঁহাদের পক্ষে এই মনোভাব সম্ভবও বটে। ভারতবর্ষের বিশেষ একটি প্রদেশ সকল প্রদেশের ভাগ্যান্বেষীর শিকার-ক্ষেত্র হইয়া থাকিবে, তাহাতে আপত্তি করিলেই উহা হইবে ঘোরতর জাতীয়তা-বিরোধী কাজ—এইটাই যেন বাংলার নিয়তি হইয়া দাঁড়াইতেছে। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালীকে স্বাবলম্বী হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। আজও বাঙালী কাপড়ের জন্য মাড়োয়ারীর, তেলের জন্য যুক্তপ্রদেশের, দুধের জন্য বিহারীর, ঘিয়ের জন্য বোম্বাইয়ের, এবং জীবনযাত্রার অনুরূপ বহু অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য ভিন্ন প্রদেশের মুখাপেক্ষী যানবাহনের জন্য বাঙালী পাঞ্জাবীদের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার প্রথম ফলস্বরূপ বাঙালীকে প্রত্যেকটি ভেজাল খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে হইতেছে। ঘিয়ের নামে দালদা, সরিষার তেলের নামে বিষাক্ত ভারামিরা বীজের তেল, দুধের নামে মিল্ক পাউডার, এরারুট এবং ময়লাজলের মিকশ্চার ইত্যাদি সেবন করিতে হইতেছে। এই উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া অবাঙালীরা বাংলাদেশ হইতে কি পরিমাণ অর্থ দেশে পাঠাইতেছে পোষ্টাপিসে কিছুক্ষণ দাঁড়াইলেই তাহা বুঝা যাইবে। আগে যাহারা দশ বিশ টাকা মনি অর্ডারে পাঠাইত এখন তাহারাই তিন চার পাঁচ শত টাকা ইন্সিওর করিয়া পাঠায়। বাঙালী স্বাবলম্বন এবং

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য এই টাকাটা দেশে রাখিবার চেষ্টা করিলে প্রাদেশিকতা কিরূপে হয় তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

সর্দার প্যাটেল নাগপুরের বক্তৃতায় বাঙালীর উপর কটাক্ষ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে বাঙালীরা শিখ ট্যাক্সিওয়ালাদের তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ট্যাক্সিওয়ালাদের এক সভায় বক্তৃতা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যেন পাঞ্জাবী-বাঙালীতে একটা শত্রুতা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার জন্য বাঙালীই প্রধানতঃ দায়ী। শ্রীসত্যেন মুখার্জ্জি মোটর ভেহিকেল আপিস হইতে অপসারিত হওয়ার পর কলিকাতার রাজপথে ট্যাক্সি ও বাসচালকদের ব্যবহার কিরূপ দাঁড়াইয়াছে সে সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা এই বিরোধের মূল কারণ বুঝিতে পারিবেন। ইহাদের সংখ্যা বেশী নয়, কিন্তু প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোকের সংস্পর্শে ইহাদিগকে আসিতে হয়। কাজেই এক জন পাঞ্জাবীর দুর্ব্যবহারে বহুসংখ্যক বাঙালী ক্রুদ্ধ হয় এবং ইহা হইতেই একটা বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। মিটারের উপর অতিরিক্ত দাবী, অল্প দূর যাইতে না চাওয়া প্রভৃতি ট্যাক্সিচালকের দোষ। কিন্তু বাস-চালকদের দোষ অতি মারাত্মক। ট্রামের সহিত ইহাদের যেন একটা মজ্জাগত বিরোধ, কোন-না-কোন প্রকারে ট্রামের গতিরোধ করিতে পারিলেই ইহাদের আনন্দ। ট্রাম আটকাইয়া বাস চালানো রীতিমত রেওয়াজ হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি একটি শোচনীয় ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সার্কুলার রোডে মির্জ্জাপুরের মোড়ের একটু আগে উত্তরগামী একটি ট্রামকে থামিতে বাধ্য করিবার জন্য উত্তরগামী একটি বাস ট্রামের ডান দিক হইতে রাস্তার বাম দিকে যাওয়ার জন্য তীব্রগতির উপর অকস্মাৎ বাম দিকে মোড় ফিরে। বাসের দরজায় একটি লোক বাহিরে ঝুলিয়াছিল। সংঘর্ষ এড়াইবার এবং লোকটিকে বাঁচাইবার জন্য ট্রাম তৎক্ষণাৎ থামে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও লোকটি ট্রামের সহিত ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া যায় এবং গুরুতররূপে আহত হয়। ট্রাম না থামাইতে পারিলে লোকটি চূর্ণ হইয়া যাইত। রাস্তার ডানদিক এবং সম্মুখ সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল; নিছক চলতি ট্রাম থামিতে বাধ্য করা ছাড়া বাসটির এই দ্রুত মোড় ফির'নোর কোন কারণ ছিল না। বাসের নম্বর এক জন কনেষ্টবল টুকিয়া লয় এবং ট্রামের দুই জন যাত্রী সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য নাম-ঠিকানা দেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এক জন বাস-চালকের দোষে এরূপ একটি ঘটনা ঘটিল, কিন্তু ট্রামের যাত্রী এবং স্থানীয় বহু লোকের মন ইহাতে পাঞ্জাবীদের উপর বিষাইয়া রহিল। ট্রাম আটকাইবার জন্য রাস্তার মাঝখানে বাস থামাইয়া যাত্রী লওয়া ও নামানো মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক, কিন্তু সমানে ইহাই চলিতেছে। মোড়ে মোড়ে আকণ্ঠবোঝাই বাস পর্য্যন্ত অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড় করাইয়া আরও যাত্রী আহ্বান এবং তার পর বেপরোয়া ছুটিতে গিয়া দুর্ঘটনা ঘটানো আজকাল খুব বেশী আরম্ভ হইয়াছে। গরমের দিনে বিশেষভাবে এই একটি ব্যাপার লইয়া প্রায় প্রত্যেক বাসে ঝগড়া হয় এবং বাঙালী যাত্রীরা ইহার জন্য চালক পাঞ্জাবী সমাজকে আশীর্ব্বাদ করে না ইহা নিশ্চিত। পুলিসের তরফ হইতে মোটর ভেহিকেল এবং হেডকোয়ার্টার্সের ট্রাফিক বিভাগ এই অন্যায় বন্ধ করিতে পারে, কিন্তু দুইটিতেই এত অযোগ্য লোক বসানো হইয়াছে যে নালিশ করিয়াও কোন ফল হয় না এবং ট্যাক্সি ও বাসওয়ালারা ইহা বুঝিয়া লইয়াছে বলিয়াই এত উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতায় পাঞ্জাবী সমাজপতিরা অগ্রসর হইয়া এটা বন্ধ করিলে পাঞ্জাবী-বাঙালী বিরোধ অল্প দিনে দূর হইয়া যাইবে। বাঙালী এই ক্ষেত্রেও স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করিতেছে সত্য, কিন্তু ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে এখানে উভয়েরই স্থান হওয়া কঠিন নয়। তবে তাহার জন্য সদ্ভাব আবশ্যক। পঞ্জাবকে বাঙালী চিরদিন বন্ধু মনে করিয়াছে, কিন্তু প্রতিদানে অনেক সময় যাহা পাইয়াছে তাহাকে ঠিক মিত্রতা বলা যায় না।

কলিকাতায় দুর্গোৎসব

দুর্গাপূজার ভাব ও ব্যঞ্জনার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা চূড়ান্ত। কলিকাতা মহানগরীতে বারোয়ারী দুর্গাপূজার যে ব্যবস্থা জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে সেই ভাবের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সেইজন্য "নব-সঙ্ঘ" পত্রিকার ১৫ই কার্ত্তিকের সংখ্যায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় বড় দুঃখে লিখিয়াছেন: "এত বড় সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবে কে কত প্রকারে প্রতিমার সাজসজ্জা করিল, কতখানি আমোদ-প্রমোদ-কৌতুকের ব্যবস্থা করিল, প্রদর্শনী কাহার কত বড় হইল, তরুণেরা ইহা ব্যতীত দেশের ও দশের কল্যাণ করিলেন কতটুকু?" আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতার বাগবাজার, সিমলা প্রভৃতি দুর্গাপূজার আয়োজনে প্রত্যেকটিতে প্রায় বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমরা কিন্তু টাকার হিসাবের দিক দিয়া ব্যাপারটার বিচার করিতে চাই না। যে উন্মাদনা প্রকাশ আমরা এই পূজা উপলক্ষে লক্ষ্য করিয়াছি তাহা আমাদের ভাবাইয়া তুলিয়াছে। জাতির জীবনে উৎসবের প্রয়োজন আছে; জাতির মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য, গতানুগতিক জীবনে পরিবর্ত্তন আনিবার জন্য দুর্গাপূজার মত উৎসবের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ দেখাইয়া গিয়াছেন যে তাঁহারা মানব-মনের স্বাভাবিক বুভুক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। সেইজন্যই তাঁহারা উৎসবের উপর আধ্যাত্মিকতার ছাপ দিয়া জাতিকে বাহ্যিক উন্মাদনার হাত হইতে মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।...

আজ আমরা সে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছি; সার্বজনীন উৎসবের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য তাচ্ছিল্য করিয়া কলিকাতার হিন্দুসমাজ বাহ্যিক আড়ম্বরে মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাতে কিছুমাত্র সংযম নাই। দুর্গাপূজার ভাব ও ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকিলে এরূপটি হইতে পারিত না। এর পরিণতি কোথায় তৎসম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য আমরা সমাজপতি-গণের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি। ভারত রাষ্ট্রের শাসক সম্প্রদায়েরও এই বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে। স্বাধীন ভারতে নূতন যুগের মানুষ তৈয়ার করিবার দায়িত্ব তাঁহাদের। তাহার জন্য প্রয়োজন নূতন শিক্ষার ও নূতন ব্যবস্থার। অনেক পুরাতন প্রথা বাতিল হইয়া গিয়াছে; অনেক পুরাতন ব্যবস্থা নব কলেবর ধারণ করিয়াছে; অনেক পুরাতন তত্ত্বের নূতন ব্যাখ্যা স্বীকৃত হইয়াছে; পুরাতনের মধ্যে বহু চিরন্তন সত্য খুঁজিয়া বাহির করা হইয়াছে। চিন্তাজগতে ও কর্ম্মজগতের মধ্যে যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মধ্যে পড়িয়া সমাজ-মন বিভ্রান্ত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব কাহার, এই প্রশ্নই আমরা দেশের লোককে করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গে সামরিক শিক্ষা

বাঙালীর কপালে ইংরেজ-রাজ যে কলঙ্কের ছাপ—"অসামরিক জাতি"—দাগিয়া দিয়াছিল তাহা মুছিয়া ফেলিবার কোন চেষ্টা আমরা দেখিতেছি না বলিয়া প্রতি মাসে জনমতকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেছি। কেন্দ্রীয় নেহরু-সচিব-মণ্ডলী যেমন দিনগত পাপক্ষয় করিয়া যাইতেছেন পশ্চিমবঙ্গের রায়-মন্ত্রিমণ্ডলীও তাহার অনুসরণ করিতেছেন। ইংরেজের হাত হইতে যে কাঠামোটা নেহরু-মন্ত্রিমণ্ডলী পাইয়াছিলেন, তাহা নাড়াচাড়া করিয়াই তাঁহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন; কাশ্মীরের রক্ষার প্রয়োজনে, "পাকিস্থান" বর্ব্বরতার হাত হইতে কাশ্মীরকে রক্ষা করিবার জন্য, ভারতের জনশক্তির সংগঠনে তাঁহারা কোন উৎসাহের সৃষ্টি করিতে পারিতেছেন না; হায়দরাবাদ রাজ্যের "রাজাকর"-বিভীষিকা দূর করিবার পর তাঁহারা যেন আরও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা গতানুগতিক জীবনের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে বাংলার ভবিষ্যতের বিষয়ে বিশেষ নৈরাশ্যের কারণ জন্মাইবেন।

সত্যই চিন্তিত হইবার কারণ আছে। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল নাগপুরে গর্জ্জন করিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্থানের প্রতি যেরূপভাবে উদ্যতদণ্ড হইয়াছেন, তার প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করিতেছি। পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নুরুল আমিন ত "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী" এই প্রতি-উত্তর করিয়াছেন, এবং আমরা ভাবিতেছি যুদ্ধের এই জল্পনার মধ্যে ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভার বিশেষ কর্ত্তব্য আছে কি? নিশ্চেষ্ট হইয়া শিখ, গাড়োয়ালী, গুর্খা, মারাঠা সৈন্যের ভরসায় নিরুদ্বেগে নিদ্রার কথা তাঁহারা কখনই ভাবিতে পারেন না। অন্য সকল প্রদেশের মধ্যে নিজস্ব শিক্ষিত সৈন্য আছে, যাহারা সামরিক শিক্ষালাভের পর ছুটি বা পেন্সন পাইয়াছে। উপরন্তু অনেক প্রদেশে "প্রান্তিক রক্ষীদল" হিসাবেই হাজার হাজার যুবক সামরিক শিক্ষালাভ করিতেছে। আমাদের এই প্রদেশ সীমান্তের উপর, অথচ এখানে না আছে সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত "রিজার্ভ", না আছে সুগঠিত রক্ষীদল।

সামরিক শিক্ষার উদ্যোগ-আয়োজনের জন্য যে উৎসাহ বা সাহসের প্রয়োজন তাহার অভাব বাঙালীর মধ্যে আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি না। চৌধুরী, রুদ্র, আকাশ-যুদ্ধে কৌশলী মুখার্জ্জীর মত যুদ্ধপটু সেনাধ্যক্ষ থাকিতে এই অজুহাত উঠিতেই পারে না। মাদ্রাজী সাংবাদিক কাশ্মীর রণাঙ্গনে বাঙালী সৈন্যাধ্যক্ষের উপস্থিতি ও বাঙালী সৈন্য-বাহিনীর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যবোধ করিয়াছেন। এই অসম উক্তির কারণ সুবিদিত। তাহা দূর করিতে হইলে বাঙালী সৈন্যাধ্যক্ষকে আনিয়া বাঙালী সৈন্যকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে সেই পথে বাধা কোথায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে তাহা আমাদের জানাইতে হইবে। সাপ্তাহিক সাংবাদিক-বৈঠকে প্রশ্নোত্তর করিয়া এই বিষয়ে দেশের লোকের অস্পষ্ট ধারণা সব স্পষ্ট করিয়া লইতে হইবে। লোকশিক্ষার ইহাও একটা অঙ্গ।

এই ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব হইবে কেন তাহা আমরা জানি না, এবং বিলম্বের সম্ভাবনা থাকিলে তদ্দিন আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে দেওয়া হইবে কেন? সামরিক শিক্ষার পক্ষে লোক-সংগ্রহ প্রাথমিক কর্ত্তব্য। এই উদ্যোগ-পর্ব্বের জন্য কি সংগঠকের অভাব? বাংলাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন ও সন্ত্রাসনবাদের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এই অপবাদ অস্বীকার করিবেন। যে সংগঠন-শক্তি ইংরেজের দাপটে ভাঙিয়া পড়ে নাই, তাহার সদ্ব্যবহার হইতেছে না কেন তাহা আমরা জানিতে চাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বাল্যাবস্থায় তাহার সামরিক শক্তি সংগঠন করিয়াছিলেন এক বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী লিয়ন্ ট্রট্স্কী; তাঁহার সামরিক শাস্ত্রে কোন জ্ঞান ছিল বলিয়া আমরা শুনি নাই। তবুও তিনি রাষ্ট্রের কর্ণধার লেনিনের আগ্রহে এই অনভ্যস্ত কর্ত্তব্যের ভার লইয়াছিলেন। জোসেফ ষ্টালিনও এই পর্য্যায়ভুক্ত সামরিক শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। কিন্তু এই দুই জনই সোভিয়েট রাষ্ট্রের সামরিক সংগঠনের স্রষ্টা।

সুযোগ ও সুবিধা পাইলে বাঙালী বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী অনুরূপ অসাধ্যসাধন করিতে পারেন। সেই সুযোগ সুবিধা তাঁহাকে কেন দেওয়া হইতেছে না ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে আমরা তাহার একটা সদুত্তরের অপেক্ষা করিতেছি। মাঝে একবার শুনিয়াছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গে

পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার এই সংগঠন-কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। মন্ত্রী মহাশয়ের যৌবনের উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা আমাদের জানা থাকায় আশা ছিল যে এবার কাজ সত্য সত্যই দ্রুত অগ্রসর হইবে। কিন্তু যেরূপে সমস্ত কাজ পিছাইয়া যাইতেছে তাহাতে আমাদের সমস্ত ভরসার বনিয়াদ শিথিল হইয়া গিয়াছে। অথচ এই বিষয়ে মুখ বুঁজিয়া থাকিতেও পারিতেছি না। বাঙালীর কলঙ্ক মোচনের জন্য সামরিক বৃত্তির পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন; ভারত-রাষ্ট্রের পূর্ব্ব-সীমান্ত রক্ষার জন্য বাংলাদেশে সামরিক বিদ্যা ব্যাপকভাবে প্রসারেরও আবশ্যক। কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় যে যুবশক্তি কর্ম্মাভাবে স্লোগানব্রতী হইয়া পড়িয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে যে ক্ষাত্র-বীর্য্য অনাদৃত শ্রেণীর মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত ধিকিধিকি জ্বলিতেছে, তাহার সংগঠনের জন্য সুদূর দিল্লীর দিকে চাহিয়া থাকিলে বাঙালী কোন মন্ত্রিমণ্ডলীকে ক্ষমা করিবে না। আর একবার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে এই কথাটাও মনে রাখিয়া চলিতে অনুরোধ করিতে চাই যে, যে মন্ত্রীর উপর এই কাজের ভার তিনি দিয়াছেন তাঁহার অন্য ভার লাঘব করিয়া হউক বা যে প্রকারে হউক এই সামরিক শিক্ষার দ্রুত প্রগতির দিকে তাঁহার একান্ত চেষ্টার পথ যেন মুক্ত রাখা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নতিবিষয়ক পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা সরকারী দপ্তরখানায় নানা বিভাগের আলমারীতে জমা রহিয়াছে; উন্নতিকামী অনেকের পরিকল্পনা সেই স্থানে আসিয়া জমা হইতেছে। এক দামোদর উপত্যকার উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাড়া আর কোনটি হাতে লওয়া হয় নাই, এখনও কাগজের আঁচড়ের অবস্থায় তাহা আছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে একটি কথা মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলীর মাথায় বসিয়া আছেন এক জন বিচক্ষণ ডাক্তার; পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্ব-অঙ্গে ব্যথা দেখিয়া কোথায় ঔষধ দিবেন, তাহা ভাবিয়া তিনিও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন। আর অনেকগুলি মন্ত্রীপ্রবর "নোকরসাহীর" (bureaucracy) কেতাদুরস্ত ফাইলের উপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখিয়া, সংক্ষিপ্ত নাম দস্তখত করিয়া দিন কাটাইতেছেন। তাঁহারা "নোকরসাহীর" চোখে দেখেন, তাহাদের কানে শুনেন, নিজের কোন পরিকল্পনা আছে বা তাহার পক্ষে উৎসাহ আছে, কাজ দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দুই-একটা পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। ১৯৪৪ সাল হইতে হরিণঘাটায় বাংলাদেশের দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটি "খাটাল" প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ হয়; এই চারি বৎসরে সেই স্থানে একটি গরুও যায় নাই। খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত দাবি এই বিষয়ে একটা কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশপত্র সরকারী দপ্তরখানায় পেশ করিয়াছিলেন; তাহা আলোচনার পর্য্যায়ের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। অথচ বোম্বাই প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলী অনুরূপ একটা পরিকল্পনার রূপ দিতেছেন বোম্বাই নগরী হইতে ২০ মাইল দূরে আরে গ্রামে। এই কাজে ২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে, এবং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহারা এই টাকা শোধ করিয়া দিবেন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-মন্ত্রী শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা বর্ত্তমান যুগের বিরাট্ বিরাট্ পরিকল্পনার উপর শ্রদ্ধাবান নহেন; কিন্তু এই সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কোন পরিকল্পনা আছে বলিয়া শুনি নাই, এবং সেই পরিকল্পনাকে রূপ দিবার উৎসাহ আছে, তাহার কোনও পরিচয় পাই নাই। ফলে তিনি নেতিবাচক নীতি অনুসরণ করিয়া যাইতেছেন।

এখন শিক্ষা-মন্ত্রীর কথা বলা যাউক। রায় শ্রীহরেন্দ্র চৌধুরীকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অনেক আশা করিয়া মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়াছেন অনেক কাঠখড় নাড়িয়া। কিন্তু এতদিন চলিয়া গেল তবুও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে বিশেষ ভাবে কোন বিষয়ে তাঁহার কোন উৎসাহ-আবেগ আছে, বা কোন বিশেষ পরিকল্পনার জন্য তাঁহার বিশেষ চেষ্টা আছে। সুতরাং শিক্ষার উন্নতির জন্য নানা পরিকল্পনা জট পাকাইয়া গিয়াছে। উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আছে; তাঁহারা চীৎকার করিয়া নিজের পাওনাগণ্ডা আদায় করিয়া লইবে। গণ-শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য মন্ত্রিমণ্ডলীকে বিব্রত করিবার লোক দেখিতেছি না। সুতরাং মন্ত্রীপ্রবর বুনিয়াদি শিক্ষা কমিটি ও "বয়স্ক শিক্ষা" পরিকল্পনা কমিটি এই দুইটি কমিটি নিয়োগ করিয়া দিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ স্নেহময় দত্ত সব্যসাচী বলিয়া কোন পরিচয় পাই নাই। ভাল লোক বলিয়া তিনি অজাতশত্রু হইতে পারেন; মিষ্ট কথায় সকলকে তুষ্ট করিয়া রাখিবার কৌশল তাঁহার বেশ জানা আছে। কিন্তু শিক্ষার নানা পরিকল্পনার চাপে তিনি তলাইয়া যাইতেছেন বলিয়া মনে হয়। অথচ তাঁহার বলিবার সাহস নাই যে নূতন লোকের উপর এই কর্ম্মভার দেওয়া হউক। যে পরিকল্পনাই তাঁহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হউক, তাহা তিনি সুবোধ ও সুশীল বালকের মত মাথা পাতিয়া লইতেছেন।

মন্ত্রী মহাশয়েরও ভ্রূক্ষেপ নাই যে একজন লোক এত কাজ সুষ্ঠুভাবে করিতে পারে কিনা। "বয়স্ক শিক্ষার" কথাই ধরা যাউক। এই সম্বন্ধে কমিটি একটা রিপোর্ট দিয়াছেন শুনিয়াছি। এই রিপোর্ট প্রস্তুতিতে মুসলমান সভ্যগণের কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই, অথচ মিঃ রেজাউল করিমের মত জাতীয়তাবাদী মুসলমান এই কমিটির সভ্য আছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী "বয়স্ক শিক্ষা"র জন্য শিক্ষকদের একটা বিশেষ ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করিবার কথা; ১৫ই নবেম্বর হইতে

শিক্ষকদের শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইবার কথা ছিল। তাহার কোন হদিশ পাওয়া যাইতেছে না, অথচ মহিলা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষয়িত্রীগণ ছুটি লইয়া বসিয়া আছেন ১৫ই নবেম্বর নূতন পাঠ আরম্ভের জন্য। এই গড়িমসির নানা কারণ সম্বন্ধে একটার কল্পনা করিতে পারি। "বয়স্ক শিক্ষা"র ব্যবস্থাটি কার্য্যকরী করার দায়িত্ব শিক্ষা বিভাগে ডিরেক্টরের উপর পড়িয়াছে; তাঁর অবস্থা উপরে বর্ণনা করিয়াছি। কমিটি এই বিষয়ে অপর কোন প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করিতে পারেন নাই, যাহার সভ্যগণ "বয়স্ক শিক্ষাকে" একটা ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন বা করিতে প্রস্তুত আছেন। কমিটি প্রস্তাব করিয়াই খালাস, এবং অন্য কোন কাঁধের অভাবে ডাঃ স্নেহময় দত্তের কাঁধে গিয়া জোয়ালটা পড়িয়াছে। "নোকরসাহীর" গদাই-লস্করী চালের কথা জানিয়া শুনিয়াও কমিটি এতদপেক্ষা কোন কার্য্যকরী প্রস্তাব করিতে পারেন নাই। ফলে এই পরিকল্পনাটাও পিছাইয়া যাইতেছে।

ইহার জন্য জনমতের নিকট দায়ী শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্র চৌধুরী। তিনি কিন্তু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পক্ষছায়ার নীচে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন। কৃষি-মন্ত্রী ও শিক্ষা-মন্ত্রীই কেবল "নোকরসাহীর" হাত ধরা নয়। তাঁহাদের সহযোগীদের অবস্থাও এইরূপ বা ততোধিক শোচনীয়। সকলেই দিন গুনিতেছেন। অতীতের নিশ্চেষ্টতার বেড়া ভাঙ্গিবার শক্তি কাহারও নাই। যে বিপ্লবী ভাবের দাপটে ইংরেজ সরিয়া গিয়াছেন; সেই ভাব-সম্পদ দু-এক জন ছাড়া কাহারও স্বোপার্জ্জিত নয়।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করিতে আমরা কোন আনন্দ পাই না। তবুও কর্ত্তব্যের দায়ে তাই করিতে হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার জন্য সাহায্য, পুনর্ব্বসতি ও সমবায়সচিব শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি সম্প্রতি একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। সম্মেলনে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি লইয়া দীর্ঘ আলোচনা হয়, কিন্তু কোন সুচিন্তিত ও সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার পরিচয় উহাতে পাওয়া গেল না। সাংবাদিক সম্মেলন বলিতে আজকাল সরকারী ঘোষণা বা মন্ত্রীমহাশয়দের পরিকল্পনা প্রচারের যে বৈঠক বুঝায়, উক্ত সম্মেলনও তাহাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

মাইতি মহাশয় যুক্তপ্রদেশের সমবায় ব্যবস্থার প্রশংসা করিয়া বলেন যে, তথায় বীজাগারকে কেন্দ্র করিয়া 'মাল্টি-পারপাস' সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে, বীজ সার এবং কৃষির যন্ত্রাদি সরবরাহ করা উহার কাজ। এই সমিতি গঠনে তথাকার কৃষি বিভাগ ও কংগ্রেস-কর্ম্মীরা সাহায্য করিয়াছেন একথাও তিনি বলেন। দুঃখের বিষয়, মাইতি মহাশয় তাঁহার নিজের প্রদেশের সমবায় বিভাগের কোন কৃতিত্বের বা প্রশংসাজনক কার্য্যের কথা বলিতে পারেন নাই। সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে বুঝা গিয়াছে যে, কৃষি সমবায় সম্বন্ধে সরকারের উল্লেখযোগ্য কোন কাজ নাই। মামুলী খয়রাতী সাহায্য, কৃষি-ঋণ দান এবং টেষ্ট রিলিফ ছাড়া আর কিছুই করা হয় নাই। অর্থাৎ সমবায় সমিতিগুলিতে বিপুল অর্থ ঢালা এবং সেটা সাধারণতঃ চোরের উদরপূর্ত্তি ও ভিক্ষুক-পোষণেই খরচ হইয়া গিয়াছে; কৃষি সমবায় সমিতির প্রধান যে উদ্দেশ্য কৃষককে স্বাবলম্বী করা এবং তাহার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য দান, সে দিকে বিশেষ কোন নজর দেওয়া হয় নাই। খয়রাতী সাহায্য, কৃষি-ঋণ দান এবং টেষ্ট রিলিফ প্রভৃতি কার্য্যে সরকারী কর্ম্মচারীর উৎসাহিত হওয়ার কারণ আছে; ইহাতে সুবিধা অনেক। প্রথমতঃ কাজ দেখাইবার ঝঞ্ঝাট নাই, খরচ দেখাইলেই হইল; দ্বিতীয়তঃ, হিসাবের অঙ্ক এদিক ওদিক করিয়া দু' পয়সা হাতে আনিবার বিলক্ষণ সুযোগ আছে; তৃতীয়তঃ, কাঁচা টাকা দাতব্য করিবার ক্ষমতা হাতে থাকায় দল পাকাইয়া মোড়লী করিবার সুবিধা, উপরওয়ালারা যেখানে নিদ্রামগ্ন সেখানে ইহাতে অসুবিধারও কোন কারণ নাই; তার উপর যদি ইহাতে উপরিস্থ প্রভুদের আর্থিক বা রাজনৈতিক কোনরূপ স্বার্থ থাকে তবে তো কথাই নাই। সমবায় সমিতির নামে যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে তাহার গত কয়েক বৎসরের প্রকৃত হিসাব খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিলে অনেক তথ্য প্রকাশ পাইবে। ১৫ই আগষ্টের পর এটা বন্ধ হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই; সে চেষ্টাও দেখা যায় না। যে টাকা ইহাতে অপচয় হইয়াছে তাহা দিয়া সার কিনিয়া গ্রামের মাঠে মাঠে ছড়াইয়া দিয়া আসিলে অন্ততঃ একটা বড় ফল পাওয়া যাইত, বাংলার খাদ্যাভাব ঘুচিত।

মাইতি মহাশয় ১৯৪৮ সালের ৬ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতা মহানগরীর সাংবাদিকবৃন্দকে আহ্বান করিয়া সমবায় সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বড় বড় পত্রিকা মারফত উহা প্রচারিত হইয়াছে। দুইটি স্থানের অধিবাসীদের উদ্যমের দুইটি উদাহরণও তিনি দিয়াছেন—আমাদের বিশ্বাস এরূপ উদাহরণ আরও পাওয়া যাইবে এবং সন্ধান লইলে দেখা যাইবে যে, ইঁহারা প্রায়ই সরকারী সাহায্য ছাড়া সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন; সাফল্য লাভের পর সরকারী কর্ত্তারা বাহাদুরী লইতে অগ্রসর হইয়াছেন এই মাত্র। হুগলীর কয়েকটি গ্রামে এরূপ উদ্যমের কথা আমরা জানি। সেখানে কয়েকটি গ্রামে সমবায় সমিতির চেষ্টায় ম্যালেরিয়া বিতাড়ন এবং গ্রাম পরিষ্কার আরম্ভ হইয়াছে। সরকারের নিকট ইঁহারা কোন

রূপ সাহায্য চাহিতে যাইবেন না, এই সঙ্কল্প লইয়াই ইঁহারা কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম ইঁহাদের দেখাদেখি উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে। গ্রামগুলিকে পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর এবং স্বাবলম্বী করা ইঁহাদের উদ্দেশ্য; তাহার জন্য ইঁহারা সরল এবং অনাড়ম্বর গ্রাম্য জীবনকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। সকলের আগে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং মনুষ্যত্ব; শহরের বিলাসিতা ও বৈভব জাতির পক্ষে মঙ্গলকর নহে, ক্ষতিকর—এই কথাটাই নিজেদের দৃষ্টান্ত দিয়া ইঁহারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সরকারের উচিত এই সব প্রচেষ্টার সন্ধান লওয়া এবং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ইঁহাদিগকে সাহায্য করিয়া এই সব শুভ প্রচেষ্টাকে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দেওয়া।

সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয়তার বক্তৃতা পঞ্চাশ বৎসর আগে হইয়া গিয়াছে; এখন আর তাহার প্রয়োজন নাই। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশ সমবায় সমিতিকে জাতীয় জীবনের, বিশেষতঃ আর্থিক জীবনের একটি অতি বড় অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রয়োজনানুসারে সমবায় সমিতির রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু কোন দেশই উহার মূল লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সমবায় সমিতি মানুষকে স্বাবলম্বী করিবে, পরস্পরের বিপদে পারস্পরিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিবে, সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের দ্বারা ধনী বণিক ও চোরাকারবারীর কবল হইতে সকলকে মুক্ত করিবে—খয়রাতী সাহায্যের নামে ভিক্ষুক পোষণ কেন্দ্রে পরিণত হইবে না। এ দিক দিয়া স্বাধীন বাংলার সমবায় সমিতি গত পনের মাসে এক পদও অগ্রসর হইয়াছে বা হইবার চেষ্টা করিয়াছে, মাইতি মহাশয় তাহার কোন পরিচয় দিতে পারেন নাই।

বাংলার সমবায় সমিতির উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উহার গোড়ার গলদগুলিকে দূর করিতে হইবে। প্রথমেই সমবায় বিভাগটিকে সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি হইতে পৃথক করিয়া একটি স্বতন্ত্র দপ্তরে পরিণত করিয়া আধুনিক সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এক জন কর্ম্মঠ লোকের উপর উহার ভার দেওয়া দরকার। তারপর দরকার সমবায় সমিতির কোথায় কি ভাবে দুর্নীতি প্রবেশ করে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান এবং সর্ব্ববিধ দুর্নীতির মূল উৎপাটন। ইহা না করিয়া আমরা কেবল 'ইউনি-পারপাস' 'মালটি-পারপাসে'র জাবর কাটিতে থাকিব এবং বিশ্বশুদ্ধ সকলে এই পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।

কলিকাতা পুলিস

কলিকাতার পুলিস সম্বন্ধে আমরা অনেক অপ্রিয় মন্তব্য করিয়াছি; দেখা যাইতেছে কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতে বিচলিত হন নাই এবং আমাদের আশঙ্কাই ক্রমশঃ সত্যে পরিণত হইতেছে। কলিকাতা প্রায় অরক্ষিত শহরে পরিণত হইতে চলিয়াছে। স্বাধীনতালাভের পর আমরা আশা করিয়াছিলাম যে কলিকাতা পুলিস লণ্ডন মেট্রোপলিটান পুলিস এবং নিউইয়র্ক পুলিসের সহিত তুলনীয় হইবে; আমাদের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট বিলাতের স্কটলণ্ড ইয়ার্ড এবং আমেরিকার এফ-বি-আইয়ের সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবে। কিন্তু প্রথম হইতেই পুলিসের উচ্চতম পদগুলিতে অযোগ্য এবং দেশের বিরুদ্ধাচরণের কুখ্যাতিসম্পন্ন লোক নিয়োগ এবং শহরের ও গ্রামের পুলিস একাকার করিয়া এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহার ফলে পুলিসের যেটুকু দক্ষতা ইংরেজ আমলে ছিল তাহাও রসাতলে গিয়াছে। এখন একটা খুন বা ডাকাতির কিনারা হওয়া তো দূরের কথা, বাসার চাকরের চুরি প্রভৃতিও ধরা পড়ে না। পুলিসের এখন প্রধান কাজ হইয়াছে রাস্তায় হকার এবং গরু তাড়ানো, কলার খোসা সরানো এবং মাসে মাসে সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করিয়া নিজেদের গুণকীর্ত্তন। গত এক বৎসরে কলিকাতায় কয়টা খুন, ডাকাতি, চুরি এবং পকেটমার হইয়াছে এবং কয়টা অপরাধী ধরা পড়িয়া দণ্ডিত হইয়াছে তাহার একটা হিসাব প্রকাশ হওয়া দরকার, হইলে বর্ত্তমান পুলিসের কৃতিত্ব বুঝা যাইবে।

পুলিসের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষের যোগ্যতা নাই কিন্তু ক্ষমতা-লোভ আছে এবং তাহার জন্য দলাদলি অত্যন্ত বাড়িয়াছে। পুলিসে দলাদলি দেশের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। দল পাকাইবার স্বার্থে প্রিয়পাত্রদের উচ্চপদে নিয়োগ এবং উপযুক্ত লোকদের ন্যায্য দাবি অস্বীকার করা হইতেছে এবং ইহাতে পুলিস-বাহিনীর মনোবল কমিয়া গিয়াছে। প্রমোশন-প্রাপ্ত প্রিয়পাত্রেরা কাজ জানে না, শিখিয়া লইবার যোগ্যতাও ইহারা দেখাইতে পারে নাই; পুরানো দক্ষ লোকেরা ন্যায্য প্রাপ্য উন্নতিতে বঞ্চিত বলিয়া কর্ম্মবিমুখ। ফলভোগ করিতেছে দেশের লোক। সর্ব্বরোগহর দাওয়াই কারফিউ প্রয়োগ করিয়া মানুষকে ঘরে আটকাইয়া শান্তিরক্ষা এক কথা, স্থানীয় তরুণ দলের সহযোগিতা অর্জ্জন করিয়া পুলিস ও স্থানীয় তরুণ দলের সহযোগিতায় অপরাধ বন্ধ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। মহরমের শোভাযাত্রা লইয়া যাহা ঘটিয়াছে গোয়েন্দা পুলিসের দক্ষতার লেশমাত্র থাকিলে অনেক আগে তাহার সন্ধান মিলিত। মহরমের মিছিলে গোলযোগ ঘটিলে তাহা রাজাবাজার হইতে মাণিকতলার মধ্যে ঘটে ইহা জানা কথা। এই এলাকার সঙ্ঘবদ্ধ তরুণ দলগুলির প্রতিনিধিদের ডাকিয়া পুলিস কমিশনার যদি তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন তাহা হইলে গোলযোগ কিছুতেই ঘটিতে পারিত না। পুলিস এখন আমাদের, সুতরাং তরুণ দলের ইহাতে আপত্তির কারণ থাকিত না।

কিন্তু তাঁহার মত পুলিস কমিশনারের উপর যে শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকা আবশ্যক বর্তমান কমিশনারের উপর নানা কারণে তাহা নাই এবং থাকিতে পারে না। তিনি নিজেও বোধ হয় ইহা জানেন এবং এইজন্যই তিনি লাঠিবাজী, গুলিচালনা এবং কারফিউ জারীর প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। স্থানীয় পুলিস অধ্যক্ষ সত্যেন মুখার্জ্জী বা অবনী গুপ্তের হাতে ক্ষমতা থাকিলে তাঁহারা ইহা পারিতেন এবং করিতেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু গত পুলিস কনফারেন্সে বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষের আশ্রিতবাৎসল্য, আত্মীয়প্রীতি এবং সাধারণ দুর্নীতিপরায়ণতার বিরুদ্ধে তীব্র ও প্রকাশ্য প্রতিবাদ করার পর হইতে পুলিস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট সত্যেন মুখার্জ্জি, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট অবনী গুপ্ত এবং সেক্রেটারী হিমাংশু গুপ্ত কর্ত্তাদের চক্ষুশূল হইয়া রহিয়াছেন। ফলে জনসাধারণ কলিকাতা পুলিসের সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ এই তিন জন অফিসারের আন্তরিক সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

বর্ত্তমান পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের অযোগ্যতার মূল কারণ তিনটি: (১) বেঙ্গল পুলিস হইতে প্রিয়পাত্রদের আনিয়া কলিকাতা পুলিসে ভর্ত্তি করা, তাহাদিগকে অন্যায় ভাবে প্রমোশন দেওয়া এবং তজ্জনিত বিরোধ, (২) এই দলাদলিতে এংলো-ইণ্ডিয়ানদের সাহায্য লাভের জন্য তাহাদিগকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত সুবিধা দান এবং দুর্নীতিপরায়ণতা সত্ত্বেও উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ, এবং (৩) পানাসক্তি। তৃতীয় দোষটি ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় বৈদেশিক দূতাবাসের ভোজসভায় মদ একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ; ভারত-সরকার সুরাপান নিবারণী নীতি অনুসারে সমস্ত ভারতীয় দূতাবাসের ভোজসভা প্রভৃতিতে মদ্যপান নিষিদ্ধ করিয়াছেন। অথচ কলিকাতার লালবাজার ঘাঁটিতে মদ্যপান অবাধে চলিতেছে এবং জনসাধারণ তাহার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। লালবাজারে ডেপুটি কমিশনার এবং এংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জ্জেণ্ট প্রভৃতির জন্য একটি মদ্য-ভাণ্ডার আছে; তিন জন সার্জ্জেণ্ট সেখানে প্রতিদিন মদ বিক্রয়ে নিযুক্ত থাকে এবং এই কাজ ইহাদের পুলিস-ডিউটির অন্তর্ভুক্ত। ঘটা করিয়া গ্রামের দুইটি তাড়ির দোকান বন্ধ করার আগে লালবাজারের 'বার' বন্ধ হওয়া উচিত। পুলিস-মন্ত্রী কি ভাবে ইহা চলিতে দিতেছেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

হেড কোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনার এখনও বিশেষ যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই। ট্রাফিক কণ্ট্রোলের ভার তাঁহার উপর; তাঁহার আমলে রাস্তায় দুর্ঘটনা কিছুমাত্র কমে নাই। আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে কলিকাতার কোন একটি ক্লাবের ম্যানেজারির ভার লইয়া সম্প্রতি তিনি দিল্লী গিয়াছিলেন। কলিকাতার দ্বিতীয় পুলিসম্যান ক্লাবের ম্যানেজারির ভার লইয়া মফঃস্বলে যান, এটা নূতন সংবাদ বটে। কনষ্টেবল সংগ্রহের ভার ইঁহার উপর। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ ইনি বাঙালী কনষ্টেবল নিয়োগ বন্ধ করিয়া হিন্দুস্থানী ভর্ত্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং চারি শতাধিক নিয়োগ ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। এটা কি কারণে ও কাহার পরামর্শে তিনি করিয়াছেন আমরা জানি না। বাঙালী কনষ্টেবলেরা যদি অযোগ্য হয় তবে যোগ্য লোক সংগ্রহ এবং কঠোর তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল। বিহারী নিয়োগের কৈফিয়ৎ স্বরূপ এই কথা বলা হইয়াছে যে বর্ত্তমান হিন্দুস্থানী কনষ্টেবলদের কিছু কিছু আত্মীয়-স্বজনকে ফোর্সে লওয়া উচিত বলিয়া এই ব্যবস্থা করা হইল। পুলিস-মন্ত্রী ইহা জানেন কি না, জানিলে ইহা অনুমোদন করিয়াছেন কি না, না জানিলে কেন তাঁহাকে নিয়োগব্যাপারে এত বড় একটা পরিবর্ত্তনের কথা জানানো হয় নাই তাহা প্রকাশ হওয়া উচিত। পুলিস ট্রেনিং স্কুল, ডাকাতি দমন বিভাগ এবং পোর্ট পুলিস সম্বন্ধে যে সব সংবাদ আমাদের নিকট আসিতেছে তাহা বস্তুতঃই আপত্তিজনক। রেলে চোরাই চালান একটু কঠিন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া পোর্টে তৎপরতা বাড়িয়া গিয়াছে কি না সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া দরকার।

কলিকাতা পুলিসকে লণ্ডন বা নিউইয়র্ক পুলিসের তুল্য করিয়া গড়িবার লোক নাই, আমাদের যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহাই লইয়া কোনরূপ চলিতে হইবে এই ধারণা আমরা সমর্থন করি না। শ্রীসত্যেন মুখার্জ্জি প্রমুখ যে সকল কর্ম্মচারী চরিত্রবল ও দক্ষতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের উপর পুলিস সংস্কার ও সংগঠনের দায়িত্ব অর্পিত হইলে কলিকাতা পুলিসের চেহারা ফিরিয়া যাইবে এ কথা শুধু আমরা নহি, শহরসুদ্ধ লোক বিশ্বাস করে। উপযুক্ত সহকর্ম্মী ও সহকারীর অভাব তাঁহাদের হইবে না; প্রয়োজনীয় লোক তাঁহারাই বাছিয়া লইতে পারিবেন।

কলিকাতায় মহরম

কলিকাতায় মহরম এবার শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে নাই। শেষদিনে বিলক্ষণ গোলযোগ হইয়াছে, পুলিস গুলি চালাইয়াছে এবং পাঁচ জন নিহত ও আশী জনের বেশী আহত হইয়াছে। অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে যায় নাই এবং ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে।

এবারকার এই গোলযোগ একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিছুদিন যাবৎ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নূতন করিয়া লোক আসা আরম্ভ হইয়াছে। ইহা লইয়া যে বাদানুবাদ চলিতেছে তাহাতে হিন্দুদের প্রতি পাকিস্থানীদের মনোভাব তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। পাকিস্থান হইতে সমস্ত হিন্দু বিতাড়িত হইবে অথচ ভারতবর্ষে যে শ্রেণীর মুসলমান গত সাধারণ নির্ব্বাচনে পাকিস্থানের পক্ষে ভোট দিয়াছে এবং

পাকিস্থান অর্জনের জন্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করিয়াছে তাহারা এখানে পঞ্চমবাহিনী-স্বরূপ বসবাস করিতে থাকিবে এটা কেহই পছন্দ করিতেছে না। সংবাদপত্রসমূহ অত্যন্ত গুরুতর জাতীয় সমস্তায় তার এই বিষয়টিকেও এড়াইয়া চলিতে থাকিলেও ইহাই বর্তমানে কলিকাতা শহরের ঘরে ঘরে প্রধান আলোচনার বিষয়। হিন্দু-মুসলমান সমস্তার সমাধান-কল্পে ভারতবাসী ভারত-বিভাগে রাজী হইয়াছিল কিন্তু তাহা যখন হইল না, মুসলমান নিজের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল, কিন্তু ভারতের মাইনরিটি সমস্তা মিটিল না, বরং বাস্তত্যাগী রূপ আর এক প্রবল এবং নূতন সমস্তা দেখা দিয়া ভারতবাসীর স্বাভাবিক জীবনে বিপর্য্যয় স্বষ্টি করিল—এটা কেহই প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। পাকিস্থান যখন পাকিস্থান-খণ্ডের হিন্দুদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে না, হিন্দু বিতাড়নেই যদি সে বদ্ধপরিকর হয়, তখন পাকিস্থান গ্রহণের অবশ্তম্ভাবী ফলস্বরূপ লোকবিনিময় পাকিস্থানকে মানিতেই হইবে। বর্তমানে যে একতরফা হিন্দু বিতাড়ন চলিতেছে তাহা কিছুতেই চলিতে পারে না—এইটাই এখন সাধারণ লোকের মনোভাব দাঁড়াইয়াছে এবং সর্দার প্যাটেলের সাম্প্রতিক বক্তৃতায় কতকটা এই মনোভাবই প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ 'সেকুলার' বা ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইবে—এই মনোভাব তাহার বিরোধীও নহে। জাতীয়তাবাদী এবং জমিয়ৎ-উল-উলেমার মুসলমানেরা পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমরা সাদরে স্থান দিব ; পাকিস্থানে এই শ্রেণীর মুসলমানেরা চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন, তাঁহারাও ভারত-খণ্ডে চলিয়া আসিলে আমরা অভ্যর্থনা করিয়া লইব, কিন্তু পাকিস্থানের পক্ষে যে সব মুসলমান ভোট দিয়াছে এবং লড়িয়াছে তাহাদিগকে কিছুতেই স্থান দিব না—এইটাই ক্রমশঃ গণদাবীরূপে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই মনোভাব সংবাদপত্রে প্রকাশ হইতে দেওয়া হইতেছে না কিন্তু গবর্ণেণ্টের ইহা অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য করা উচিত হয় নাই।

এই অবস্থায় এবার মহরম আসিয়াছে। গত বৎসর ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির করিয়াও বন্ধ করিতে হইয়াছে, এবার উহার নাম করাও সম্ভব হয় নাই—এটাও লোকে পথে ঘাটে বলিতেছে। গত বৎসর মহরমের অল্প আগে কলিকাতায় মহাত্মা গান্ধী অনশনে থাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিলের স্মৃতি টাটকা থাকা সত্ত্বেও কোন গোলযোগ হয় নাই। এবার মহাত্মা গান্ধী নাই। এই কারণে বিশেষ ভাবে গবর্মেণ্টের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। দুই বৎসর আগে লীগ আমলের শেষ মহরমে বিজ্ঞান কলেজের সম্মুখ হইতে সুকিয়া ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত লীগ-চমূর এবং লীগ-পুলিসের যে তাণ্ডব নৃত্য ঘটিয়াছিল তাহাতে অত্যন্ত নৃশংস ভাবে দুইটি বালক গুলি বিদ্ধ হইয়া নিহত হয় এবং অনেকে আহত হয়। সে স্মৃতিও একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। সে হিসাবে এই এলাকাটুকুতে খুব কড়া পাহারা রাখা উচিত ছিল। গোলযোগ ঠিক কেন বাধিয়াছিল এবং কাহারা বাধাইয়াছিল গবর্ণেণ্ট তাহা বলিতে পারেন নাই, আমরাও তাহা জানি না। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই এটা উপলব্ধি করিয়াছেন যে সতর্কতার প্রয়োজন এবার খুব বেশী ছিল, তার অনেক সঙ্গত কারণও ছিল, কিন্তু কিছুই করা হয় নাই। পুলিস পূর্ব্বাহ্নে কোন সংবাদ লয় নাই এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে নাই—করিলে গোলযোগ ঘটিত না এবং ইহার জন্ত প্রধানতঃ দায়ী গোয়েন্দা-বিভাগ এবং পুলিস কমিশনার—এই অভিযোগ যাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদিগকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। অজ্ঞাত-পরিচয় দুষ্টলোকের ("unknown miscreants") ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সাফাই গাওয়া পুলিসের কাজ নয়, পুলিসের কর্তব্য সময় থাকিতে দুষ্ট লোকদের ষড়যন্ত্রের সংবাদ লওয়া এবং দুষ্ক্রিয়া নিবারণ করা। বর্তমান গোয়েন্দা-বিভাগ এবং পুলিস কমিশনার পুলিসের এই প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের এবিষয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

কলিকাতা টেলিফোন-কেন্দ্রে অগ্নিকাণ্ড

অল্পদিন পূর্ব্বে টালায় জলকল অচল করিবার একটি বিশেষ চেষ্টা হয়। চেষ্টা প্রায় ফলবতী হইয়াছিল কেবলমাত্র ধ্বংসকারী দলের প্রধান চালকবর্গ তাঁহাদের অভ্যাসমত একটু আগেই সরিয়া পড়ায় তাঁহাদের চেলাচামুণ্ডেরা দ্রুত কাজ নিকাশ করিতে পারে নাই। কর্তৃপক্ষ টের পাইয়া পুলিসের দল আনিয়া ধ্বংসকারীদিগের উদ্যমে বাধা দেওয়ায় এবং ধ্বংসকারীদিগের মনে সাম্প্রদায়িক কলহের ভয় হওয়ায় ব্যাপারটা সময়মত আটক পড়ে এবং কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত চেষ্টায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মোটামুটি মেরামতি কাজ শেষ হইয়া যায়। টালায় যাহারা জল-সরবরাহ বন্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদের প্রধান চালক দুই জন বাঙালী হিন্দু এবং রাষ্ট্রবিধ্বংসে চেষ্টিত দলবিশেষের চাঁই। কর্মীরা ছিল শতকরা ৯০ জন পাকিস্থান অধিবাসী অহিন্দু। বলা বাহুল্য, গোয়েন্দা পুলিস আগে হইতে খবরও দেয় নাই এবং ঐ চালকদ্বয়কে এখনও ধরিতেও পারে নাই।

ঐ ঘটনার পূর্ব্বেই সমস্ত শহরেই পথে ঘাটে গুজব ছিল যে কম্যুনিষ্টরা প্রথমে কলিকাতার জলকল, বিদ্যুৎকল, টেলিফোন ও রেডিও বিকল করিবে, তারপর ৮ই-৯ই নবেম্বর বা তাহার কাছাকাছি কলিকাতায় প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করিবে। পুলিস বিভাগে সে খবর পৌঁছাইয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু তাহার অল্পদিন পরেই টেলিফোন বিভাগের কলিকাতা কেন্দ্রে বিষম অগ্নিকাণ্ড ঘটিল, যাহার ফলে শহরের কাজ-কারবার, শাসনরক্ষণ সকল কাজেই বিষম বাধা পড়িল এবং রাষ্ট্রের প্রায়

ছয় কোটি টাকা লোকসান হইল। ঘটনা ঘটিলও অতি অদ্ভুত ভাবে। আগুন ধরিল একেবারে চারিতলায়। যে ঘরে আগুন লাগিল সেখানে ২৫ জনের একজনও রবার পোড়া গন্ধ পাইল না, হঠাৎ এক জন মাত্র দেখিল দুই হাত উঁচু আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। সে আগুন অগ্নিনির্ব্বাপক-যন্ত্রে নিবিল না ইহাও আশ্চর্য্য। অবশ্য পেট্রোল বোমা বা থারমিটজরা আগের বোমার আগুন উহাতে নিভে না। তাহার পর দমকল আসিতে অল্প দেরী হয় এবং তাহা চলিতে সামান্য দেরী হয়। অথচ সব পুড়িয়া শেষ হইল। ইহা কি দৈবদুর্ব্বিপাকের লক্ষণ?

বাংলায় ধর্ম্মঘট

কলিকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন যাবৎ ধর্ম্মঘটের হিড়িক চলিতেছে এবং ধর্ম্মঘট এবার প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত বাঙালী কর্ম্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যাঙ্কে ধর্ম্মঘট ইহার মধ্যে ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে। রেশনের বরাদ্দ ক্রমেই কমিতেছে, ফলে বাহির হইতে খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইতেছে, খরচও বাড়িতেছে। গত পাঁচ বৎসরের দুর্ম্মূল্যতার বাজারে বাঁধা আয়ের মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারীদের দুর্দ্দশা অতি শোচনীয় হইয়া রহিয়াছে, তদুপরি আবার এক দফা মূল্যবৃদ্ধিতে ইহারা প্রায় দিশাহারা হইবার উপক্রম হইয়াছে।

এই অবস্থার সুযোগ যাহারা লইবার তাহারা পূর্ণমাত্রায় লইতেছে এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানহীন বহু মধ্যবিত্ত পরিবার পতঙ্গের ন্যায় আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে। উস্কানিদাতাদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট এবং কম্যুনিষ্টদের সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রমিক-নেতারা রহিয়াছেন। ইঁহাদের উস্কানিতে ধর্ম্মঘট হইতেছে এবং ফলে কর্ম্মচারীদের আধপেটা খাওয়ার যে সংস্থানটুকু ছিল তাহাও নষ্ট হইতেছে। ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের আয় কম, দায়িত্ব বেশী, কাজের সময়ও বেশী, সুতরাং অসন্তোষ তাহাদের মধ্যে বেশী হইবে ইহা স্বাভাবিক। অনেকগুলি ব্যাঙ্ক অল্প-দিনের মধ্যে বন্ধ হওয়ায় বেকার ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং ইহাতে ব্যাঙ্ক মালিক ও পরিচালকদের সুবিধা হইয়াছে। লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ক পাঁচ শ' কর্ম্মচারী বরখাস্ত করিয়া পাঁচ হাজার নূতন কর্ম্মপ্রার্থীর দরখাস্ত পাইয়াছেন। ধর্ম্মঘটের পিছনে গণ-সমর্থন বা রাষ্ট্রের সমর্থন কোনটাই নাই এবং ইহার ফলে ধর্ম্মঘটের সাফল্যজনক পরিণতির আশা সুদূরপরাহত। এই অবস্থায় বিনা ধর্ম্মঘটে ন্যায্য দাবি আদায়ের চেষ্টা করা উচিত ছিল, কিন্তু যাহারা বর্ত্তমানে জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করিয়া ভারতবর্ষকে চীন দেশে পরিণত করিবার চেষ্টায় আছে তাহারা উহা করিবে না, যেন-তেন-প্রকারে ধর্ম্মঘট বাধাইয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিই ইহাদের কাম্য।

ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীরা শিক্ষিত, কিন্তু নানা দুর্ব্বিপাকে এমনই বিভ্রান্ত হইয়াছেন যে এটা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘটের পরিণাম অতি শোচনীয় হইয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন উহাকেই "সাফল্যজনক" ধর্ম্মঘট বলিয়া অভিহিত করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। কম্যুনিষ্টদের বেনামদার বাঙালী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাটি নিজের চাকুরি বাঁচাইয়া মধ্যবিত্ত বাঙালী কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটে উত্তেজিত করিয়াছেন এবং তাহাদ্বারা বাঙালী সমাজের যে অনিষ্ট করিয়াছেন এতদিনে তাহা সকলের বুঝা উচিত ছিল। অবাঙালী প্রতিষ্ঠানের চাকুরিতে বাঙালী নিয়োগ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। তাহার জন্য প্রধানতঃ এই ব্যক্তির অদূরদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা দায়ী। সম্প্রতি ইনি আর একটি নূতন সর্ব্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ব্রতী হইয়াছেন। এই চেষ্টা কম্যুনিষ্ট বেনামীতে আর একটা চাল কি না সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া উচিত। মাদ্রাজ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে কম্যুনিষ্টদল কর্ত্তৃক সভাপতিত্বে ইঁহার নিয়োগ হইতে সুরু করিয়া আজ পর্য্যন্ত এই ব্যক্তির কার্য্য-কলাপ দেশের পক্ষে অনিষ্টকর এবং কম্যুনিষ্টদের পক্ষে লাভজনক হইয়াছে। নূতন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন চেষ্টা যোগ-সাজসের ব্যাপার কি না সে সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

গবর্ণমেণ্ট ট্রাইবুনালের মারফত তদন্ত এবং এওয়ার্ড কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা শ্রমিক এবং কর্ম্ম-চারীদের প্রতি তাঁহাদের শুভেচ্ছার পরিচয় সন্দেহ নাই। ভারত-সরকারও এতদিনে আমদানী দ্রব্যের উপর কড়াকড়ি হ্রাস করিয়া জিনিষপত্রের দ্রুত মূল্য হ্রাসে মনোযোগী হইয়াছেন। এমতাবস্থায় কর্ম্মচারীরা আর একটু ধৈর্য্য ধারণ করিলে ভাল করিতেন। লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী এবং ম্যানেজার উভয় পক্ষের বিবৃতি হইতে যে সব তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে কর্ম্মচারীদের অধৈর্য্য এবং অবিবেচনাই বেশী প্রকাশ পাইয়াছে। এই উপলক্ষে সমস্ত ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘট করাইবার যে চেষ্টা হইতেছে তাহা শুভ ফলদায়ক হইবে না। রাষ্ট্র এবং জনসাধারণ যেখানে ধর্ম্মঘটের বিরোধী সেখানে ধর্ম্মঘট ব্যর্থ হইতে বাধ্য এবং এরূপ করিতে থাকিলে বাঙালীর কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। রাষ্ট্র-বিপ্লবে বহুজন যেখানে সর্ব্বস্বান্ত ও পথের ভিখারী হইয়াছে সেখানে সচ্ছলতা দাবি করিতে গিয়া আধপেটার সংস্থান নষ্ট করিয়া বেকার হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, একথা মনে রাখিলে বর্ত্তমান কষ্ট সহনীয় হইতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা

"বরিশাল হিতৈষী" লিখিতেছেন:

"আজিকার বড়লাট তদানীন্তন পূর্ব্ব বাংলার উজিরে

আজম খওয়াজা নাজিমউদ্দীন চাটগাঁমহলে ঘোষণা করিয়া গেলেন চাউলের দাম ৩৫৲ হইতে ২২৷০ টাকায় আনিবই—কিন্তু আজ তাহা ৪২৲—৪৫৲। আজিকার উজিরে আজম নুরুল আমিন বলিয়াছেন—পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ হইবে না। আর স্বচক্ষে তৈলসিক্ত মলিন ন্যাকড়া-জড়ান প্রেতমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে।

"আল্লার ওয়াস্তে দুইখানি পয়সা দাও মা—দুই পয়সার মুড়িতে তো পেট ভরে না।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন কাহারও উপর দোষারোপ না করিয়া লেখে—৫টির ১টি গিয়াছে, চারিটি ভূঁয়ে গড়াগড়ি দেয়, আমার পথ আত্মহত্যা ব্যতীত আর কিছু নাই।

হাসপাতালে ও কঙ্কাল হক রাস্তার ফুটপাতে পড়িয়া বালকদ্বয় যখন আর্ত্তনাদ করিয়া "ও আল্লা—এক মুঠ ভাত দাও" বলে।

গৃহস্থ যখন তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত মুসুরি ডাইল ১৵০ আনার স্থলে ৸/০ আনায় বিক্রী করিতে আসিয়া বলে বাবু আজ পেটের দায় ঘর খালি করিতেছি।

রাজপথে ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত জনবহর যখন দৃষ্টি আহত করে—

তদুপরি পাকিস্থানের উজিরে আজম যখন বলেন ল্যাংটা থাক—আর ক্ষুধায় মর, যুদ্ধ-সম্ভার সংগ্রহ অব্যাহত চলিবে।

মর্ম্মে যখন মত্ত ক্রোধ সর্পসম কোঁসে—
'তখনও ভাল মানুষ সেজে
বাঁধান হুকা যতনে মেজে
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে'
মুখে ভদ্রতার বাণী বলিতে হইবে ?"

এই বর্ণনার মধ্য হইতে যে চিত্র আমাদের চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠে, তাহা ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষেও ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। কারণ প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগিলে আমাদেরও সাবধান হইতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দলে দলে হিন্দুরা চলিয়া আসিতেছেন এই কথাটাই আমরা কলিকাতা শহরে থাকিয়া শুনিতেছি। কিন্তু আমরা খবর রাখি না কত মুসলমান অভাবের তাড়নায় উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে পশ্চিম বাংলায় আসিয়া পড়িতেছে; এখানে ইহারা আগামী ফসলের অপেক্ষায় দুই-তিন মাসের জন্য আসিতেছে, এই সময়টা এখানে কাটাইয়া ইহারা ফিরিয়া যাইবে নিজ দেশে। যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে এখানে একটা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইহারা দেশে টাকা পাঠাইয়া দিবে যেমন পাঠায় ওড়িয়া, বিহারী, পশ্চিমা। সেইজন্য দেখিতে পাই কলিকাতার দমকল বিভাগে, কলিকাতার জলের কলে নোয়াখালির মুসলমানকে। কারণ পশ্চিম বাংলার হিন্দু-মুসলমান এই সব বৃত্তির সেবা করিতে পারিতেছে না। আজ যখন পূর্ব্ববঙ্গ অন্য রাষ্ট্রের, বিরোধী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়িবে। এই কথাটা এই দুই রাষ্ট্রের শাসকবর্গের মনে করা উচিত।

মেদিনীপুর কলেজ

মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সর্ব্বপ্রধান সংখ্যাগুরু জেলা। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে মেদিনীপুরের স্ত্রী-পুরুষের আত্মত্যাগ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই জেলা অনগ্রসর—যদিও প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই বিষয়ে গোড়াপত্তন হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বসুর কর্ম্মস্থল মেদিনীপুরে, সেই শহরের স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে তিনি বহু বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। সেই স্কুলই কালে কলেজে পরিণত হয় এবং আজও তাহা টিঁকিয়া আছে ব্রিটিশ আমলের বিমাতার মত ব্যবহার সত্ত্বেও। এই ইতিহাসই মেদিনীপুর কলেজের প্রাক্তন ছাত্রসংঘের একটি বিবরণী পুস্তিকা হইতে জানিতে পারি। পূর্ব্বের আমলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুর কলেজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইত। ১৯২৩ সনে মেদিনীপুর মিউনিসিপালিটির হাত হইতে এই কলেজের ভার গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করেন, এবং অনেক সময় তাঁহাদের পক্ষ হইতে স্বীকার করা হয় যে কলেজটি গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট-পরিচালিত স্কুলে বা কলেজে শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য যেরূপ ব্যয় করা হয় তাহা অন্যান্য স্কুল বা কলেজ হইতে বেশী, শিক্ষক বা অধ্যাপকবৃন্দ অধিক মাহিনা পান ও তাঁহাদের পেন্সনের ব্যবস্থা থাকে।

কিন্তু সরকারী কলেজ রূপে স্বীকৃত হইয়াও মেদিনীপুর কলেজ এই সব সুবিধায় বঞ্চিত ছিল। একটা দৃষ্টান্ত দিলে এই অসম আচরণ লোকচক্ষে স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। ১৯৪৩-৪৮ সনের মধ্যে মেদিনীপুর কলেজে ব্যয় হইয়াছে ৩ লক্ষ ২৪ হাজার ৯ শত টাকার কিঞ্চিদধিক। সেই সময়ের মধ্যে কৃষ্ণনগর কলেজে ব্যয় হইয়াছে ৬,৭৮,০০১ টাকা, হুগলী কলেজে ৭,১৩,৯৭৩ টাকা। এর মধ্যে গবর্ণমেণ্টের দান ছিল ক্রমান্বয়ে—৭৪,৮১৮ টাকা, ৫,০০,২৬৭ টাকা, ৫,৯৮,৭২৪, টাকা।

আজ অতীতের কথা লইয়া তর্ক তুলিব না। মেদিনীপুর কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সঙ্ঘের দাবী যে পরিষ্কার ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকার করিয়া লউন—এই কলেজের পরিচালনা তাঁহাদের একটা দায়—এবং এই দায়িত্ব স্বীকার করিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। ১৯৪৭ সনের ১৫ই

আগষ্টের পর এই পনের মাসের মধ্যে এই দাব স্বীকৃত হইল না কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। পশ্চিমবঙ্গের আইন-পরিষদে মেদিনীপুরের সভ্যসংখ্যা প্রভাব-প্রতিপত্তিতেও নগণ্য নয়। মন্ত্রিসভার উপর তাঁহারা কেন চাপ এত দিন দিতে পারিলেন না, তাহা আমরা জানি না। ব্রিটিশ আমলের অনুরূপ অবহেলা তাঁহারা আজ সহ্য করেন কেন ?

এই উপলক্ষে মেদিনীপুরের জাগ্রত জনমতের নিকট আমরা একটি নিবেদন জানাইতে চাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহারা যে দৃঢ়তা ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন তা শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত করিলে গবর্ন্মেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে পাঁচ বৎসরের মধ্যে মেদিনীপুর নবকলেবর ধারণ করিবে। সেই শক্তি মেদিনীপুরের আছে বলিয়াই আমরা এই নিবেদন জানাইতে সাহস করিতেছি।

লোক-সংখ্যা ও খাদ্য-উৎপাদন

কলিকাতার "নিউ রিভিউ" নামক মাসিক পত্রের নবেম্বর (১৯৪৮) সংখ্যায় লোক-সংখ্যার উপর খাদ্য-উৎপাদনের প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক মিঃ ধর্ম্ম ভানু বর্ত্তমান সংখ্যা-শাস্ত্রীগণের ও নৃতত্ত্ববিদ্‌বর্গের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে খাদ্য-উৎপাদনের তুলনায় লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে বিপ্লবের আবির্ভাব হয়; যুগে যুগে দেশে দেশে তার প্রমাণ আছে। লোকে নিজের পিতৃভূমি ও বাস্তু ত্যাগ করে অনেক সময় খাদ্যের অভাবে; ধর্ম্মের নির্যাতন এইরূপ স্থানত্যাগে একটা গৌণ স্থান অধিকার করে। ব্রিটেন হইতে আমেরিকায় গিয়া যে সব উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা উক্ত দুইটি অবস্থার ফল; অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ধ্বংস করিয়া শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপন আমেরিকার তাম্র-বর্ণ "ইণ্ডিয়ান"দের ধ্বংস-লীলার পুনরাবৃত্তি মাত্র। আজ চীন জাতির ও ভারতীয় জাতির ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা শ্বেতাঙ্গ অধিকৃত দেশের দিকে রওয়ানা হইয়াছে; শ্বেতাঙ্গেরা বাঁধ বাঁধিয়া তাহাদের আগমন আটকাইবার চেষ্টা করিতেছে যেমন করিতেছে আসামের লোকেরা বাঙালীর আগমন ঠেকাইয়া রাখিতে। এসব চেষ্টা সার্থক হইবে কিনা জানি না। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে ঘন-বসতি অঞ্চলের লোকেরা স্বল্প-বসতি অঞ্চলের উপর চাপ দিবেই। সংখ্যা-শাস্ত্রী ও নৃতত্ত্ববিদ্‌ কুক্‌জিনস্কি (Kuczynski) ইতিহাসের এই অমোঘ বিধানের সপক্ষে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

মিঃ ধর্ম্ম ভানু এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটা তথ্যের উল্লেখ করিয়া ভাল করিয়াছেন। অনেক অর্থনীতিবিদ্‌ এই কথাটা প্রচার করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে। তিনি পঞ্চাশ বৎসরের (১৮৮১-১৯০১) লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির হিসাবের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে একথা বিচারসহ নহে। এই সময়ের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৬৬ জন; বিলাতের ৫০ জন; জাপানের ৭২ জন; নিউ জিল্যাণ্ডের ১৭২ জন; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ১৮৬ জন; ও ভারতবর্ষের (ব্রহ্মদেশ বাদে) মাত্র ৩৬ জন করিয়া।

আর একটা হিসাব তিনি দিয়াছেন যাহা জানিয়া রাখিলে ভাল হয়। ১৬০০ সনে ব্রিটেনের জনসংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ; ১৮০১ সালে তাহা বাড়িয়াছে দেখা যায় ৮৮ লক্ষে; ১৮৮১ সনে ইহা তিন গুণ বাড়িয়া ২ কোটি ৫৯ লক্ষে দাঁড়ায়; ৫০ বৎসর পরে, ১৯৩১ সনে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩ কোটি ৯৯ লক্ষে; ১৯৪১ সনে ৪ কোটি ১০ লক্ষে। প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরে বিলাতে আট গুণ লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের হিসাবে দেখা যায় চারি গুণ বৃদ্ধি—১৬০০ সনে ১০ কোটি; ১৮০১ সনে ১৮ কোটি ৫০লক্ষ; ১৮৮১ সালে ২৫ কোটি ৩৮ লক্ষ; ১৮৩১ সালে ৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ; ১৯৪১ সনে ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ।

আমাদের দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৪৩ সনে ৭৭ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়; ১৯৪৭ সনে তাহা বাড়িয়া যায় প্রায় ১০০ কোটি টাকায়। এই সংখ্যায় প্রমাণিত হয় গবর্ন্মেণ্টের খাদ্যবৃদ্ধি-আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে। এক সময়ে আমাদের দেশের লোকের ৭।৮ কোটি লোক আধ-পেটা খাইয়া থাকিত। লেখকের মতে তাঁহারা এখন ত দু-বেলা খাইতেছে। তাই দেশের খাদ্য-উৎপাদনে কুলায় না।

পূর্ব্বাচল প্রদেশ

গত সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি "পূর্ব্বাচল প্রদেশ" নামে একটি নূতন কংগ্রেস প্রদেশের সংগঠন ঘোষণা করেন। হঠাৎ তৎসম্বন্ধে সব কার্য্যকরী ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেওয়া হয় এক সপ্তাহের মধ্যে। গত দুই-তিন (২৬-২৮ কার্ত্তিক) দিনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্য একটি অধিবেশন অধিষ্ঠিত হয়; তাহাতে "পূর্ব্বাচল প্রদেশের" প্রস্তাব একেবারে বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব ও পরের এই দুইটি কার্য্যের সঙ্গতি সম্বন্ধে কোন কারণ দেখানো হয় নাই। সুতরাং কল্পনা করিয়া তর্ক করিতে হয়। সে চেষ্টা আমরা করিব না।

একটা কথা বলিতে চাই। অবস্থার দাস মানুষ। ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব সীমান্তে যে অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে তৎসম্বন্ধে সজাগ থাকিলে এই "পূর্ব্বাচল প্রদেশের" প্রস্তাব এমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে তৎপর হইতেন

না। এই অবস্থা সৃষ্টি হইতেছে পূর্ব্ববঙ্গে। এই "পাকিস্থান" প্রদেশের ২৫।৩০ লক্ষ হিন্দু তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষের বাসভূমি ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। যেদিন ভারত-বিভাগ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন সেদিন হইতে নেহরু-প্যাটেল প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবর্গ পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সম্বন্ধে একটা দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। মনে-প্রাণে এই স্বীকৃতি না থাকিলে নাগপুরে সর্দার প্যাটেল এমন করিয়া মিঃ নুরুল আমিনের গবর্মেণ্টকে শাসাইতেন না।

এই দায় স্বীকার করিয়া ভারত-রাষ্ট্রের পরিধির মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুর জন্য জায়গা করিয়া দিতে হইবে। আসামের মন্ত্রিমণ্ডলী এই দায়ের অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের অজুহাত এই যে, আসামে এত জমি নাই। অথচ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী সদস্য, আসাম পরিষদের কংগ্রেসী দলের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বলিতেছেন যে কেবল মাত্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ই আরও ১ কোটি লোকের বসতি স্থাপিত হইতে পারে।

আসামী নেতৃবর্গের বাঙালী হিন্দুদের আমল না দিবার কারণ থাকিতে পারে। সেই বিষয় লইয়া এখানে তর্ক তুলিব না। কিন্তু ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই ইহাদের স্থান করিবেন কোথায়? দুই এক লক্ষ হইলে কথা ছিল না। যে ২৫।৩০ লক্ষ হিন্দু নিজের উদ্যোগে আসিয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এই চাপ সহ্য করা কঠিন। এই স্থান সংকুলানের উদ্দেশ্যেই "পূর্ব্বাচল প্রদেশের" প্রস্তাব হইয়াছিল। কাছাড়, ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্যে কত লোকের স্থান সঙ্কুলান হইত তৎসম্বন্ধে সঠিক হিসাব দেখি নাই। ৫।১০।১৫ লক্ষ হইলেই মন্দ কি। এই সুযোগের সম্ভাবনা এমনভাবে নষ্ট করা হইল কেন তাহা আমাদের জানিতে হইবে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে প্রশ্ন করিয়া এই মনোভাবের পরিচয় পাইতে হইবে।

একটা কথা ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। এই সমস্যাকে ধামাচাপা দিলে চলিবে না। তাহাতে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়া ভারত-রাষ্ট্র বিপন্ন হইবে। ম্যাক্‌ডোনাল্ডী রোয়েদাদের সময়ের "না গ্রহণ না বর্জ্জন" নীতির পরিণতি কি হইয়াছে, তাহা আজ সর্ব্বজনবিদিত। "পাকিস্থানীদের" ফুসলাইয়া কিছু আদায় করিতে গেলে, এমন মূল্য দিতে হইবে যাহা ভারত-বিভাগ হইতে কম হইবে না। ভারত-বিভাগের পূর্ব্বে নানা আশ্বাসের সম্যক্ ব্যর্থতার কথা মনে রাখিয়া সকলকে সাবধান হইতে হইবে।

জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর যে শান্তি ও প্রাচুর্য্যের আশা করিয়া পৃথিবীর লোকে উৎসাহী হইয়াছিল তাহা এই তিন বৎসরে বিলীন হইয়া যাইতেছে। পরাজিত জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিন নগরী লইয়া যে ঠেলাঠেলি চলিতেছে তাহাই তাহার নানা বহিঃপ্রকাশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই ঠেলাঠেলি গত মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে চলিতেছে, তাহা থামাইবার জন্য মস্কো নগরীতে পাশ্চাত্য শক্তিত্রয়ের দূতগণ সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্ব্বাধিনায়ক ষ্টালিনের সঙ্গে দেখা করিয়া একটা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু ফল তাহাতে কিছুই হয় নাই। দুই পক্ষই এইজন্য পরস্পরকে দোষ দিতেছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের যে অধিবেশন চলিতেছে তাহার সম্মুখে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই ত্রি-শক্তির পক্ষ হইতে নালিশ রুজু করা হইয়াছে যে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ বার্লিন অবরোধ করিয়া পৃথিবীর শান্তি বিপন্ন করিতেছে। এই অভিযোগের শুনানী উপলক্ষে আর এক দফা গালাগাল দুই পক্ষ হইতে আমরা শুনিয়াছি; তাহার মধ্যে না পাইলাম কোন সংশোধনের উপায় সম্বন্ধে নূতন আলো, না পাইলাম কোন বিশিষ্ট নির্দ্দেশ।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টা এই বিরোধে অচল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কারণ সম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের পত্নী শ্রীমতী ইলেনর রুজভেল্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য।

"জার্ম্মানীকে কেন্দ্র করিয়া আজ সুরু হইয়াছে একটি আদর্শগত সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মীমাংসা শান্তিপূর্ণ উপায়েও হওয়া সম্ভব যদি আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক আদর্শনিষ্ঠা বজায় রাখিতে সক্ষম হই।

"নিজেদের দেশে রাশিয়া যত ইচ্ছা তাহার রাষ্ট্রিক আদর্শ প্রসার করিতে পারে এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত বন্ধুত্বও করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া সে যে এই সকল দেশের রাষ্ট্রিক আদর্শ এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবে ইহা কখনই হইতে পারে না। যদি সোভিয়েট-মতবাদ কাহারও ভাল লাগে তাহারা স্বেচ্ছায় তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে—কিন্তু এই মতবাদকে জোর করিয়া কাহারও ঘাড়ে চাপাইবার অধিকার নিশ্চয়ই কাহারও নাই।

"গণতান্ত্রিক প্রথা অনুসারে প্রত্যেক লোকই স্বাধীন ভাবে নিজের মত ব্যক্ত করিতে পারে। অধিকাংশের মত অনুসারে রাষ্ট্রব্যবস্থা চালনা করাই গণতন্ত্রের মূল কথা এবং বলপ্রয়োগে কাহাকেও শাসন করা নীতিবিরুদ্ধ।

সেইজন্যই আজ জগতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন এত বেশী।

"আজ জাতিসঙ্ঘই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম।"

এই "মাধ্যমের" কথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু কাজে কেহই তাহার রূপ দিতে রাজী নন। সোভিয়েট সংবাদ-পত্র পড়িলে মনে হয় যে আমেরিকার ধনী সম্প্রদায় আজ পৃথিবী শোষণ করিবার অভিপ্রায়ে অভিযান সুরু করিয়াছে। সোভিয়েট প্রভাবের বহির্ভূত অঞ্চলগুলি এই বিশ্ব-শোষণের ক্রীড়নক; কেহ বুঝিয়া—কেহ অজ্ঞাতে। ভারতবর্ষ নাকি শেষোক্ত পর্যায়ে পড়িয়াছে। কিন্তু এই অভিযোগের মধ্যেও বর্তমান সঙ্কট হইতে উদ্ধারের পথের কোন সন্ধান পাইলাম না। পরস্পরের গায়ে কাদা ছিটাইলে বিবাদের মীমাংসা হয় না।

এই কথাটা বুঝিয়াও মানুষ কোন দিন সংযত ব্যবহার করিতে পারিল না। আজ যখন বিজ্ঞানের কল্যাণে বিশ্বের সকল দেশের মধ্যে দূরত্ব সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইতেছে, তখন পরস্পর ঠোকাঠুকির সুযোগ যেন আরও বাড়িয়া চলিতেছে। তবে কি বলিতে হইবে যে দূরকে নিকট করিবার যে উপায়গুলি আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলা হউক। পৃথিবীর লোক সপ্তদশ শতাব্দীর অবস্থায় ফিরিয়া যাউক যখন সমুদ্র-পথ ছিল প্রায় অগম্য; আকাশ-পথ ছিল কল্পনার অতীত। সে অবস্থায় ফিরিয়া গেলে যদি পৃথিবীতে হানাহানির অবসর কমিয়া যায় তবে আমাদের দুর্বুদ্ধিকে তাহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বর্তমান যুগের মানুষ এই ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইবে না, তাহাও জানি। সুতরাং বিশ্ব-যুদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতে থাকুক; ভাবজগতে চিন্তাজগতে তর্কের স্রোত বহিতে থাকুক। ইতিহাস বলিতে থাকুক মানুষ ঠেকিয়াও শিখে না; শিক্ষা করিবার, সাবধান হইবার শক্তি তাহার নাই; তাহার সৃষ্টিকর্তা এই গুণটি তাহার প্রকৃতির মধ্যে দেন নাই।

জাপানী সামরিক নেতৃবৃন্দের বিচার

নুরেনবুর্গ নগরীতে জার্মানীর সামরিক নেতৃবৃন্দের বিচার হইয়াছিল; তাহার মধ্যে প্রধানগণের হইয়াছিল ফাঁসি; বন্দুকের গুলীতে হত্যা করার সম্মানটা তাঁহাদের দেওয়া হয় নাই। সে কথা লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ জাপানী সামারিক নেতৃবৃন্দের বিচার আমাদের মনে করাইয়া দিয়াছে যে বিজয়ী শক্তিপুঞ্জ তাঁহাদের হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া যাইতে চান না; তাঁহাদের রাষ্ট্র-বিধানে তাহা মজ্জাগত করিয়া রাখিতে চান। ১১ জন বিচারক লইয়া এক মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল; তাহার মধ্যে ছিলেন একজন বাঙালী বিচারক, তাঁহার নাম শ্রীরাধাবিনোদ পাল। অধিকাংশ বিচারকেরা রায় দিয়াছেন যে অভিযুক্ত জাপানী সামরিক নেতৃবৃন্দ বিশ্ব-শান্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছিলেন; যুদ্ধ পরিচালনার মধ্যে যে হিংস্রতা অপরিহার্য্যরূপে বিদ্যমান, তাহার অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা শত্রুপক্ষের প্রজাবৃন্দের ও বন্দী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালনা করিবার জন্য প্ররোচনা দিয়াছিলেন ও নানাক্ষেত্রে সেই নিষ্ঠুরতার সমর্থন করিয়াছিলেন। এই অপরাধে ৬ জনের হইয়াছে ফাঁসির হুকুম; ১৪ জনের হইয়াছে দ্বীপান্তরের আদেশ।

বিচারক-মণ্ডলীর সভাপতি অষ্ট্রেলিয়ার সার উইলিয়ম ওয়েব রায়ে বলিয়াছেন যে প্রধান অপরাধী জাপ সম্রাট্ হিরো-হিতোকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা প্রয়োজন ছিল; ফরাসী জজ বেরনারও সেই অভিমত প্রকাশ করেন, কিন্তু স্বতন্ত্র রায়ে বলেন যে উপস্থিত অপরাধীরা জাপ রাষ্ট্রনীতির ক্রীড়নক মাত্র; সুতরাং তাঁহাদের অব্যাহতি দেওয়া উচিত। ডাচ বিচারপতি ডাঃ রোলিংও স্বতন্ত্র রায় দেন; তাঁহার অভিমতের বর্ণনা সংবাদপত্রে দেওয়া হয় নাই। তিনি ৬ জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ সমর্থন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ডাঃ রাধাবিনোদ পাল সকলকে নির্দ্দোষ বলিয়া রায় দিয়াছেন। এই অভিমতের সমর্থনে তিনি কি বলিয়াছেন তাহা ঠিক ঠিক বুঝা যাইতেছে না। যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা পাইয়াছি তাহা পড়িয়া মনে হয় বর্তমান আন্তর্জাতিক বিধানানুসারে এরূপ হিংসা-নীতি অপরিহার্য্য বলিয়া তিনি মনে করেন।

যে তিনটি স্বতন্ত্র রায় উপস্থিত করা হয় তাহা আদালতে পাঠ না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় আমরা জানিতে পারিব না কোন্ কোন্ কারণ দর্শাইয়া তিন জন বিচারপতি তাঁহাদের আট জন সহযোগীর মতের বিরুদ্ধে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিলেন। সে যাহাই হউক, এই কথা বুঝিবার পক্ষে কোন অস্পষ্টতার বাধা নাই যে বিজয়ী শক্তিপুঞ্জ যে নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন, জাপানী সামরিক নেতৃবৃন্দ তাহা হইতে এমন ভাবে বিচ্যুত হন নাই যে তাঁহাদের বিশ্বের জনমতের সম্মুখে দোষী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে। ডাঃ রাধাবিনোদ পালের রায় সাক্ষ্য দিতেছে যে, এশিয়ার ২৫।৩০ কোটি লোক টোকিয়ো নগরীর এই বিচারকে 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতির প্রয়োগ বলিয়া মনে করে। জার্মানী ও জাপান বিজয়ী হইলে উইনষ্টন চার্চ্চিল, ষ্টালিন, জেনারেল মার্শাল, জেনারেল আইসেন-হাওয়ার, জেনারেল জুকভ প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতা ও সামরিক নেতৃবৃন্দের বিচার হইত এবং তাঁহাদের নিয়োজিত বিচারকমণ্ডলী পরাজিত নেতৃবৃন্দের প্রতি অনুরূপ দণ্ডাদেশ দিতেন। লাটিন ভাষায় একটা কথা আছে যাহার অর্থ এরূপ দাঁড়ায়—'যখন যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠে, তখন আইন হইয়া যায় নীরব।' বর্তমান সভ্যতার কর্ণধারগণ যে রাষ্ট্রনীতির পূজক ও ধারক তাহার কথা মনে করিয়া যীশুর কথা স্মরণ করাইয়া দিতে

ইচ্ছা হয়—তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপী তাহারাই কেবল অপরাধীর উপর লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতে পার। গান্ধীজী ছাড়া এরূপ কোন লোক-নেতার নাম ত আমাদের মনে পড়ে না যিনি মনেপ্রাণে অহিংসাব্রতী বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে পারেন। মুরেনবুর্গে ও টোকিয়োর বিচার ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিবে বিশ্ব-মানবের শুভ-বুদ্ধির দুয়ার হইতে। ডাঃ রাধাবিনোদ পালের স্বতন্ত্র রায়ের ফল শেষ পর্য্যন্ত হয়ত কিছুই হইবে না, কিন্তু তথাপি তাঁহার স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য এবং ন্যায় বিচারের মূল নীতির অকপট অভিব্যক্তির জন্য তাঁহাকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

খুরসেদ নরিম্যান

খুরসেদ নরিম্যানের মৃত্যুতে দেশ এক জন লোক-নেতা হারাইল। তিনি স্বাধীন ভারতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। দাদাভাই নৌরজী, ফিরোজ শাহ মেহতা, দিনশাহ ওয়াচা প্রভৃতি কংগ্রেস আন্দোলনের প্রবর্ত্তকবর্গের উত্তরসাধকরূপেই খুরসেদ নরিম্যান স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় রাজনীতিক জীবনে স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি গতানুগতিকভাবে শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণ করেন। আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়া কিন্তু তিনি এমন একটা অন্যায়ের প্রতিকারে হস্তক্ষেপ করিলেন যাহা যুবকের পক্ষে সহজ ছিল না। সমুদ্রবক্ষ হইতে জমি উদ্ধার করিবার জন্য বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া বোম্বাই নগরীর পরিধি বৃদ্ধি করা হইতেছিল। এই কার্য্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইতেছিল। হার্ভে নামক এক জন শ্বেতাঙ্গের উপর কার্য্যের ভার ছিল। খুরসেদ নরিম্যান সংবাদ পান যে এই বিরাট কার্য্যের মধ্যে ঘুষ প্রভৃতি নানাবিধ অনাচার চলিতেছে। নিজের দায়িত্বে লোকসমক্ষে তিনি এই সংবাদ প্রকাশ করেন। ফলে হার্ভেকে বাধ্য হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনিতে হয়। বোম্বাইয়ের গবর্মেণ্ট এই মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন, এবং যুবক নরিম্যান সততার পক্ষে যুদ্ধ করেন। বিচারে তাঁহার অভিযোগ প্রমাণিত হয়। এই বিজয়ে তিনি লোকনেতার আসনে উন্নীত হন। বিশেষ করিয়া বোম্বাইয়ের যুবক শ্রেণী তাঁহাকে নেতৃত্ব পদে বরণ করে। এই উপলক্ষে তিনি দেশের রাজনীতিক অগ্রগামী দলের পরিচয়লাভ করেন, এবং অতি সহজেই তাহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এই সময়েই সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে নরিম্যানের সহযোগিতার সূচনা হয়।

বর্ত্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রথমার্দ্ধে বোম্বাইয়ের রাজনীতিক জীবনে নরিম্যানের প্রভাব অনন্যসাধারণ ছিল। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিঠলভাই যখন বোম্বাই ছাড়িয়া আসেন তখন সকলেই আশা করিতেছিল যে খুরসেদ নরিম্যান তাঁহার স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু নিয়তির বিধান অন্যরূপ। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে তিনি সহযোগিতা বজায় রাখিতে পারিলেন না। এই বিষয়ে দোষ-গুণের বিচার করিয়া ফল নাই। যে পদে শ্রীখের (বোম্বাইয়ের প্রধানমন্ত্রী) আজ অধিষ্ঠিত, সেই পদ ছিল খুরসেদ নরিম্যানের প্রাপ্য। তিনি তাহা লাভ করিতে পারিলেন না, এবং রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িলেন। মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে তিনি বোম্বাই নগরীর মিউনিসিপালিটিতে কংগ্রেসী দলের নেতৃত্ব পদে বৃত হন। এই সংবাদে আমরা আশা করিয়াছিলাম যে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে খুরসেদ নরিম্যান তাঁহার যোগ্য পদ লাভ করিবার সুযোগ পাইবেন। মৃত্যু দেশের লোকের সেই আশায় বাদ সাধিল।

নরেন্দ্রনাথ শেঠ

৭১ বৎসর বয়সে এই বাঙালী বিপ্লবী-প্রধান দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইংরেজ রাজত্বের অত্যাচার অবিচার তাঁহার পরিবারবর্গের উপর নির্ব্বিচারে পড়িয়াছে, কিন্তু ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্রোহী মন কোন দিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর প্রায় চৌদ্দ মাস তিনি বাঁচিয়াছিলেন। যে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ও সংগঠনের সুযোগ আমরা লাভ করিয়াছি তৎসম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের মনে কোন মোহ ছিল না। সেই মনোভাবের কারণটি ধরিতে পারিলে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার একটি অর্থ পাওয়া যাইবে।

যে পরিবারে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা কলিকাতার আদি বাসিন্দা। শেঠ-বসাক-লাহা-আঢ্য পরিবার ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিয়া কলিকাতা সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। সেইজন্য তাঁহাদের শ্বেতাঙ্গ সওদাগর শ্রেণীর তাঁবেদারী করিতে হইয়াছিল; কারণ বলিতে গেলে কলিকাতার বন্দর তাঁহাদেরই সৃষ্টি। ইংরেজের সঙ্গে যে শিক্ষা ও সাধনা আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে এই সব হিন্দু শ্রেণীর বিশেষ কোন প্রাণের যোগ ছিল না যেমন হইয়া উঠিয়াছিল রামমোহন-মধুসূদন-ভূদেব-পরিবারের সঙ্গে। নরেন্দ্রনাথের পিতা রাজেন্দ্রনাথ ইংরেজী শিক্ষার দ্বিতীয় যুগের অন্তর্বর্ত্তী ছিলেন; চন্দ্রমাধব ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী ছিলেন; তাঁহার পুত্রেরা সকলেই বর্ত্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু এই শিক্ষা তাঁহাদের প্রাচীন সংস্কারকে দুর্ব্বল করিতে পারে নাই; কোন কোন দিক হইতে এই শিক্ষা তাহা দৃঢ় করিয়াছিল; রক্ষণশীলতার সঙ্গে স্বাদেশিকতার একটা নূতন যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার কল্যাণে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের নিকট হইতে আমরা নূতন করিয়া ভাবিতে পাই যে আমাদের সংস্কৃতি ও

রীতিনীতি একেবারে বাজে জিনিস নয়; তাঁহাদের মধ্যে সত্য বস্তু ছিল ও আছে। পাশ্চাত্য জগতের এই আবিষ্কারে আমাদের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস ফিরিয়া আসে; ইংরেজ-নিরপেক্ষ হইয়া চলিবার সাহস দেখা দেয়। যে যুগে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, তাহা এই ভাব-বন্যার যুগ। সুতরাং তিনি কোন দিনই সমাজ-সংস্কারপন্থী হইতে পারিলেন না; "ফেরঙ্গ" ভাব ও সংস্কৃতির বাহক, ধারক ও প্রচারক বিদেশী শাসন-ব্যবস্থার মূলচ্ছেদ না করিতে পারিলে ভারতে প্রকৃত "স্বরাজ" আসিতে পারে না এই বিশ্বাসের অনুপ্রেরণায় নরেন্দ্রনাথ হইয়াছিলেন রাজনীতিক বিপ্লবী। এই বিশ্বাসের মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন পশ্চিম ভারতে বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক, পূর্ব্ব-ভারতে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং বাংলাদেশে তাঁহার বাণী-মূর্ত্তি ছিল "সন্ধ্যা" পত্রিকা।

এই পত্রিকাকে অবলম্বন করিয়া যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তাহার মধ্যে নরেন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। সুতরাং "কালী মায়ীর বোমার" আহ্বানে সাড়া দিতে তাঁহার মনে কোন দ্বিধা দেখা দেয় নাই। তাঁহার উদাহরণে কলিকাতার আদি নাগরিকগণের মধ্যে অনেকেই অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া সন্ত্রাসবাদকে সাহায্য করিয়াছিলেন; তাঁহার অনুপ্রেরণায় কলিকাতার "গুণ্ডা" শ্রেণী পুলিশকে পিটাইতে সাহস পাইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার সমস্ত পরিবার বিপন্ন হইয়াছিল; বসন্ত চ্যাটার্জ্জিকে হত্যার চেষ্টায় তাঁহার পরিবারের ১৩ জনকে একদিনে গারদের পশ্চাতে নিরুদ্দেশ হইতে হয়; তাঁহাকে কুতুবদিয়ার চরে সাপ-কুমীরের মধ্যে নির্ব্বাসিত হইতে হয়। বৃদ্ধ পিতা রহিলেন একা বাড়ীতে প্রায় ৫০।৬০টি মহিলা ও নাবালকের অভিভাবকরূপে, অন্নদাতারূপে। দুই-তিন বৎসর পরে নরেন্দ্রনাথ যখন কয়েকখানি হাড় লইয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন দেশে নূতন রাজনীতিক চিন্তা ও কর্ম্মপ্রবাহের বান ডাকিয়াছে; বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে এক বৃহদংশের মনে সংশয় জাগিয়াছে। এইরূপ সংশয়ী মন লইয়াই তাঁহারা গান্ধী-আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্তু তাঁহাদের "মেজ-দাকে" তাঁহার মধ্যে পাইলেন না। কারণ আত্মশুদ্ধি করিয়া, নিজের সমাজ-সংস্কার করিয়া শক্তি অর্জ্জন করিবার জন্য যে কর্ম্মক্ষেত্রে গান্ধীজী আমাদের আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা নরেন্দ্রনাথের সহজাত সংস্কারের বিরোধী ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের চিন্তা-নায়ক ও কর্ম্মবীরগণ যাঁহারা গান্ধী-যুগে বাঁচিয়া ছিলেন, তাঁহারা কেন গান্ধীতন্ত্র অবলম্বন করিতে পারিলেন না তাহার কারণ এই ভাব-সাংঘর্ষ্যের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে অন্যায় হইবে না। ব্যক্তিগত মতামত ইহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র; ব্যক্তিগত ত্যাগ-মাহাত্ম্য এই বিরোধে ম্লান হইয়া যায়; এক অশরীরী উন্মাদনায় পথ-মন আপনার পথ করিয়া লইয়া সংস্কারকের সব চেষ্টা বিকৃত করিয়া দেয়। নরেন্দ্রনাথের জীবন তাহার আর একটি প্রমাণ। এই বিচারের মধ্যেও তাঁহার ত্যাগ আমরা ভুলিতে পারি না। সেই ত্যাগের স্মৃতির প্রতি দেশের ঋণ অপরিশোধনীয়। নরেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গের সহিত দেশের লোকের মন সমদুঃখী। আমরাও সমভাবে এই দুঃখের ভাগ লইতেছি।

বেঞ্জামিন হর্নিম্যান

ভারতবাসী এক জন ইংরেজ-বন্ধু হারাইল। মিসেস এনি বেসান্ত, চার্লস এণ্ড্রুজ ও উইলিয়ম পিয়ারসন ছাড়া এমন কোন ইংরেজের নাম আমরা জানি না যিনি হর্নিম্যানের মত মনে প্রাণে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কামনা করিয়াছেন এবং তাহার জন্য আত্মভোলা হইয়া আপনার সর্ব্বস্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। স্বদেশী যুগে হর্নিম্যান কলিকাতার "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন; সম্পাদক ছিলেন রাটক্লিফ, অল্প সময়ের জন্য এই ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকাখানি ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল। তারপর যথাপূর্ব্বং তথা পরম্। ছয়-সাত বৎসর পর সর ফিরোজ শাহ মেহতার আহ্বানে হর্নিম্যান তাঁহার দৈনিক পত্রিকা "বোম্বে ক্রনিকলে"র সম্পাদক হইয়া চলিয়া যান এবং এই সুযোগে তাঁহার সাংবাদিক ও রাজনীতিক জীবন নানাভাবে বিকশিত হয়। তিনি কয়েকজন যুবক ভারতবাসীকে এইরূপে গড়িয়া তুলেন যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজ ভারতবর্ষের সাংবাদিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রের কর্ণধার হইয়া আছেন।

মিসেস এনি বেসান্ত যখন "হোমরুল লীগ' (Home-Rule League) নামক রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ১৯১৬-১৭ সালে ভারতব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি করেন তখন পশ্চিম-ভারতে হর্নিম্যান এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রাউলাট বিল ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্যুৎগর্ভ লেখনীর আঘাতে ভারতবর্ষের ইংরেজ আমলাতন্ত্র এরূপ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে যে, আমাদের দেশের বাহিরে তাঁহাকে নির্ব্বাসনে পাঠানো হয়। প্রায় সাত বৎসর বিলাতে কাটাইয়া হর্নিম্যান এই দেশে ফিরিয়া আসেন। এই কয় বৎসরে তিনি মনে প্রাণে আমাদের "স্বদেশী" বনিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া তিনি পূর্ব্বের সুযোগ লাভ করিতে পারেন নাই। অনেক পত্রিকা তাঁহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনী পূর্ব্বের ন্যায় শাণিত ছিল। মতামত সম্বন্ধে একটা কঠোর ভাব ছিল বলিয়া হর্নিম্যান লোকের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া চলিতে জানিতেন না। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁহার চরিত্রের গৌরব ও তাঁহার সাংসারিক অসাফল্যের কারণ। আজ তাঁহার জীবনের নানা কথা স্মরণ করিয়া ভারত-বন্ধু এই ইংরেজের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

জয়দেবের লবঙ্গাদি বসন্ত-পুষ্প

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

জয়দেব গীত-গোবিন্দের আরম্ভে মঙ্গলাচরণ করিয়া রাধা-কৃষ্ণের বিহার বর্ণনা করিয়াছেন। কোথায় বিহার? বৃন্দাবন-বিপিনে। কখন বিহার? বসন্তে!

বৃন্দাবন-বিপিন-প্রত্যক্ষ-যোগ্য। কিন্তু বসন্ত প্রত্যক্ষ-যোগ্য নয়। জ্যোতিষীরা বসন্তকালের চন্দ্র দেখিয়া বলিয়াছেন, ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে বসন্ত ঋতুর আরম্ভ। ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে চৈত্রী পূর্ণিমা, এবং চৈত্রী পূর্ণিমা হইতে বৈশাখী পূর্ণিমা, এই দুই মাস বসন্ত। ফাল্গুনী পূর্ণিমা ও দোল পূর্ণিমা একই। কিন্তু কবি পাঁজি দেখেন না। প্রকৃতির অবস্থা দেখিয়া ঋতু গণনা করেন। এই কারণে জয়দেব বসন্তের প্রাকৃতিক লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। সে সময় বৃক্ষের নবপল্লব উদ্গত হয়, পুষ্প প্রসূত হয়, সুখস্পর্শ মলয় সমীর বহিতে থাকে, কোকিল কুহু কুহু রব করিতে থাকে, অলিকুল গুঞ্জন করিতে থাকে। আর প্রবাসী জনের চিত্ত চঞ্চল হয়। বসন্তে চারি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হয়, কেবল রসনার হয় না। যখন উক্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তখন বসন্ত। বসন্ত রাধাকৃষ্ণের বিহার-কাল। তখন যে বসন্ত, কবি তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

গীত-গোবিন্দে দ্বাদশ সর্গ। তিনি দ্বাদশ বসন্ত-পুষ্প বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমে

ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ কুটিরে ॥

সতীশচন্দ্র রায় কৃত পদ্যানুবাদ—

ললিত-লবঙ্গ-লতা আলিঙ্গিয়া, কোমলতা
লয়ে বহে মলয় পবন;
ভ্রমর-ঝঙ্কার সনে পিককুল কল-স্বনে
নিনাদিত নিকুঞ্জ ভবন।*

লবঙ্গ-লতা কেমন গাছ? পূজারি গোস্বামী কিম্বা সতীশবাবু কিছুই লেখেন নাই। এক পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন, লতা-বিশেষ। প্রচলিত সংস্কৃত কোশে নামটি নাই। শব্দকল্পদ্রুমে আছে, লতা-বিশেষ। মধুকর ভ্রমর নয়, মধুমক্ষিকা; কুটিরকে ভবন বলিতে পারা যায় কি? কুঞ্জ লতাগৃহ, কুটির পর্ণশালা। ঠিকই হইয়াছে।

চৌদ্দ পনর বৎসর হইল, বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" পড়িতেছিলাম। কবি তিন চারি স্থানে লবঙ্গের অর্থাৎ লবঙ্গপুষ্পের নাম করিয়াছেন। এক স্থানে আছে—

ফুটিল গুলাল মাহ্লী মালতী মাধবীলতা
লবঙ্গ দোলঙ্গ নেআলী।
শেবতী কনকযূথী সুথী কনক কেতকী
পারলি দুলালী ॥

বসন্তকালের বর্ণনা। এইরূপ উল্লেখ দেখিয়া লবঙ্গ ফুলের গাছ চিনিতে যত্ন করিয়াছিলাম। দেখি, কেবল চণ্ডীদাসে নয়, পূর্ববঙ্গের "পদ্মাপুরাণে", ভবানন্দের "হরি-বংশে", উত্তর বঙ্গের "চণ্ডিকা বিজয়ে" লবঙ্গ-পুষ্পের উল্লেখ আছে। দক্ষিণরাঢ়ের জয়ানন্দ লিখিয়াছেন,—"নারেঙ্গ দোলঙ্গ বিল্ব লবঙ্গান্তস্পুরে।" অতএব লবঙ্গলতা বহুজ্ঞাত সুলভ লতা, অন্তঃপুরেও রোপিত হইত। এমন গাছ বিলুপ্ত হইতে পারে না; এখনও আছে। কিন্তু অন্য নামে আছে।

সংস্কৃত কোশে ও বৈদ্যক কোশে লবঙ্গ সুপরিচিত সুগন্ধি দ্রব্য। ইহার অপর নাম শ্রীপুষ্প, ইহা লবঙ্গতরুর শুষ্ক মুকুল। পূর্বে মালয়-দ্বীপ হইতে আসিত, এক্ষণে আফ্রিকার পূর্বদিগ্‌বর্তী জাঞ্জিবার নামক দ্বীপ হইতে আসিতেছে। মান্দ্রাজে ও সিংহলে লবঙ্গ-তরুর উদ্যান হইতেছে। লবঙ্গতরু জামগাছের তুল্য মাঝারি তরু। উক্ত কবিদের লবঙ্গলতা তরু হইতে পারে না। আমরা জানি একের সাদৃশ্যে অন্যের নাম হয়। লবঙ্গলতার কোন্ বিষয়ে হইতে পারে? লবঙ্গতরুর ফুলের আকারে ও গন্ধে লবঙ্গলতার ফুলের সাদৃশ্য থাকিবার কথা। বহুজ্ঞাত এমন ফুল কি হইতে পারে? যূথী (জুঁই ফুল) ভিন্ন আর কোন ফুল মনে হইতেছে না। শ্বেত যূথীর নাম লবঙ্গ হইয়াছিল। কারণ দেখিতেছি উভয়ের আকারে ও গন্ধে সাদৃশ্য আছে। আরও দেখিতেছি যেখানে লবঙ্গ নাম আছে সেখানে যূথী নাম নাই। যূথী দুই প্রকার। যূথী (শ্বেত যূথী) ও হেমযূথী। হেমযূথীর পুষ্প পীতবর্ণ। অমর কোশে নাম হেম পুষ্পিকা। চণ্ডীদাসে ইহার নাম কনক যূথী। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় চণ্ডীদাসের উল্লেখিত বৃক্ষ-নির্ণয়ে লবঙ্গ-পুষ্প চিন্তা করিয়াছি। সেখানে একটা ভুল করিয়াছি। লিখিয়াছি, রঘুনন্দনে যূথীর নাম লবঙ্গ আছে। পরে দেখিয়াছি রঘুনন্দনে নয়, কালিকাপুরাণে (১৪।৪২)

---

* গীত-গোবিন্দ সংস্কৃত মূল, পূজারি গোস্বামীর টীকা, পদ্যানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত। সতীশচন্দ্র রায় এম-এ সম্পাদিত। কলিকাতা ১৩১৯।

আছে,—"লবঙ্গ-বল্লী সুরভির্গন্ধেনোদ্বাস্যমারুতম্" (লবঙ্গলতা পুষ্প সুরভি গন্ধ দ্বারা পবনকে সুবাসিত করিয়া)। ইহা বসন্তকালের বর্ণনা। চণ্ডীদাসও বসন্তে লবঙ্গফুল ফুটিতে দেখিয়াছিলেন। জুঁইফুল বর্ষাগমে ফুটে, কিন্তু জল পাইলে চৈত্র-বৈশাখেও ফুটিতে দেখিয়াছি।

বিদ্যাপতি বসন্তপুষ্প বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সে সব জয়দেব হইতে লইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥"

জয়দেবের ললিত লবঙ্গলতা কি কুসুমিত হইয়াছিল? হইয়াছিল বলিতে শঙ্কা নাই। কারণ জয়দেব পরে পরে আরও তেরটা বৃক্ষের পুষ্প বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লবঙ্গলতা প্রথমে ধরিয়াছেন। বসন্তের এক নাম পুষ্প-সময়। তিনি পুষ্পশূন্য কোন বৃক্ষের নাম করেন নাই। জয়দেবের টীকায় পূজারি গোস্বামীও লবঙ্গলতাকে পুষ্পিত মনে করিয়াছেন।

লবঙ্গ, লতা-বিশেষ। যে গাছ সোজা দাঁড়াইতে পারে না, বাঁকিয়া নুইয়া পড়ে, অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে গাছ লতা (সং লা ধাতু গ্রহণে)। আর, যে লতা জড়াইয়া জড়াইয়া উঠে তাহা বল্লী। (সং বল্ ধাতু আবরণে)। লবঙ্গলতার তনু সুকুমার। বসন্তাগমে ইহার নবোদ্গত শাখা ও পল্লব চিক্কণ হরিৎকান্তি হয় এবং পরস্পর জড়াইতে জড়াইতে যূথে যূথে ক্ষুদ্র সুগন্ধ পুষ্প প্রসব করে। মলয় সমীর গন্ধবহ হইয়া থাকে।

কালিকা-পুরাণ কামরূপে প্রণীত হইয়াছিল। যে অংশে লবঙ্গবল্লীর উল্লেখ আছে, সে অংশ অষ্টম খ্রীষ্ট শতাব্দে রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত কোশে লবঙ্গের এই দ্বিতীয় অর্থ গৃহীত হয় নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। চণ্ডীদাসের মালতী দ্ব্যর্থ হইয়াছে, (পরে পশ্য)। তিন শত বৎসর পূর্বেও বঙ্গীয় কবিকুল যূথী না বলিয়া লবঙ্গ বলিতেন। কি কারণে লবঙ্গ নাম পরিত্যক্ত হইল, বঙ্গীয় কাব্যামোদী চিন্তা করিবেন।

এখানে বড়ু চণ্ডীদাসের প্রথমোক্ত কয়েকটি বসন্তপুষ্পের পরিচয় করি। "ফুটিল গুলাল মাহ্লী মালতী মাধবীলতা, লবঙ্গ দোলঙ্গ নেআলী"। গুলাল লাল গোলাপ মনে করি। 'গুল' ফার্সী শব্দ অর্থ ফুল। বিশেষার্থ গোলাপ ফুল। গুল+আব=গুলাব, ফুলের জল। গোলাপের সংস্কৃত নাম সেবন্তী (সেঁঅতি) চণ্ডীদাসে শেবতী! চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে" গুলাল ব্যতীত আরও কয়েকটা আরবী ফার্সী শব্দ আছে। মাহ্লী, উচ্চারণ মাল্হী। বাংলা ভাষায় ফলাযুক্ত হ থাকিলে প্রথমে ফলা, পরে হ উচ্চারিত হয়। আমরা লিখি আহ্লাদ পড়ি আল্হাদ। মাহ্লী, মাল্হী অর্থাৎ মল্লী (বা মল্লিকা)। মালতী বলিলে বর্তমানে বঙ্গীয় পাঠক বৃক্ষারোহী মালতী লতা বুঝিয়া থাকেন। সাধারণ পাঠকের কথা দূরে থাক, বিচক্ষণ ভূয়োদর্শী আয়ুর্বেদবেত্তা কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত তাঁহার "বনৌষধি দর্পণে" মালতীকে বৃক্ষারোহী মালতী লতা বুঝিয়াছেন। তিনি বিভ্রান্ত হইয়া আয়ুর্বেদোক্ত মালতীর লক্ষণের সহিত মিলাইতে পারেন নাই। মালতী লতা বর্ষার শেষে পুষ্পিত হয়, তাহার গন্ধে সন্ধ্যাকালে চারি দিক আমোদিত হয়। "ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল, পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল।" ইহা এই লতা মালতী। সংস্কৃত কোশে কিম্বা বৈদ্যক কোশে এই মালতীর উল্লেখ নাই। অমর কোশে "মালতী সুমনাজাতিঃ" জাতির বাংলা নাম জাই ওড়িয়া নাম জাই, হিন্দী নাম চাম্বেলী, চামেলী। জাতি ও মালতী একই ফুল। একটা গানে আছে—"জাতি যূথী বেলফুল ফুটিল মল্লিকা ফুল।" এই গীতরচয়িতা ঠিকই লিখিয়াছেন। জাতিকেও লতা বলিতে পারা যায়, কিন্তু এই গাছ প্রথমে সোজা উঠে, পরে দীর্ঘ হইয়া নুইয়া পড়ে। জাতি পাথুরে কাঁকুরে মাটিতে সহজে জন্মে ও প্রচুর ফুল ধরে। সচরাচর বর্ষার শেষে ও শরতে ফুল ফুটে। কিন্তু জল পাইলে ফাল্গুন মাসেও ফুটিতে দেখিয়াছি। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে" বৃক্ষারোহী মালতী লতার নাম মধুমালতী। সেখানে আছে "মালতী মধুকর।" ওড়িয়াতেও মধুমালতী। কেহ কেহ না জানিয়া আর এক লতাকে মধুমালতী কেহ বা লবঙ্গলতা বলেন। সে লতা তরু আশ্রয় করিয়া ঝুলিতে থাকে। গ্রীষ্মকালে তাহার সুগন্ধ থোবা থোবা ফুল হয়। প্রথমে সাদা, পরে গোলাপী, পরে রক্তবর্ণ হয়। এই কারণে ইহার নাম রঙ্গিলা হইয়াছে। গাছটি বিদেশী, মালয়দ্বীপ হইতে আনীত। কিন্তু কোন মালতী ফুলের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই। গন্ধে ও আকারে বরং জুঁই ফুলের সহিত সাদৃশ্য আছে।

চণ্ডীদাসের অপর কয়েকটি ফুল চিনিতেছি। মাধবী লতা প্রসিদ্ধ বৃক্ষাশ্রয়ী লতা। দোলঙ্গ, সংস্কৃত নাম মাতুলুঙ্গ। কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত মাতুলুঙ্গের বাংলা নাম টাবা বলিয়াছেন। কিন্তু টাবা অন্য নেবু। মাতুলুঙ্গের এক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাম বীজপূরক, হিন্দীতে বিজৌরা; উত্তর ভারতে আছে, আজিকালি বঙ্গদেশে এই নেবু প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকে পাতি নামে অতিশয় অম্ল নেবু চিনে। কিন্তু নামে ভুল করিতেছে। পাতি শব্দের অর্থ সামান্য। কলিকাতা অঞ্চলে গোল

নেবুকে পাতি বলে। ইহার ছাল কাগজের মত পাতলা। এই নেবুর নামই কাগজী হওয়া উচিত। ঢাকায় তাহাই আছে। কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে যে নেবুকে কাগজী বলে তাহার ছাল পুরু। ফল সুঘ্রাণ অণ্ডাকার। আয়ুর্বেদে এই সুঘ্রাণ অণ্ডাকার নেবুর নাম 'নিম্বু'। ঢাকায় ইহারই নাম 'লেবু'। পশ্চিমবঙ্গে কাগজী এই ভুল নামের পরিবর্তে 'নিম্বু' রাখা উচিত। কিন্তু পূর্বকালে দোলঙ্গ নেবু প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার সদৃশ এক জাতির নাম ছোলঙ্গ। ঢাকায় ছোলঙ্গ অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে, ছাল পুরু, ফুল সাদা, দলের বহিঃপৃষ্ঠে লাল ছিটা আছে। কবিরাজ মহাশয়েরা ঔষধে প্রয়োগ করেন [পরে জয়দেবের করুণ পশ্য]। ফল বড় ও লম্বা। রস নাতি অম্ল।

নেআলী সংস্কৃত নাম নেপালী; অন্য প্রসিদ্ধ নাম নবমালিকা। জয়দেবও নব মালিকার নাম করিয়াছেন, পরে দেখা যাইবে।

জয়দেব অপর যে সকল বসন্ত-পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি সে সকল উত্তমরূপে চিনিতেন। প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ দিয়াছেন। একে একে দেখিতেছি। ২। বকুল অলিকুলসঙ্কুল কুসুমসমূহে শোভা পাইতেছে। এককালে বকুলের বহু পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। বকুল ফুলের গন্ধ মধুর নহে। বকুলের এক সংস্কৃত নাম মদ্যগন্ধ। ৩। তমাল। কবি লিখিয়াছেন তমালের নবদলের সহিত মৃগমদসৌরভ পুষ্প উদ্ভূত হইয়াছে। বসন্তের আরম্ভে নূতন পত্র ও পুষ্প হয়। কিন্তু পুষ্পের গন্ধ মৃগমদ তুল্য কিনা বলা কঠিন। মৃগনাভির গন্ধ অতিশয় মৃদু. তমাল পুষ্পের গন্ধও অতিশয় মৃদু। ৪। কিংশুক। পলাশ ফুল নারঙ্গ বর্ণ ও নখতুল্য বক্র। কবি ইহাকে মদনের যুবজন-হৃদয়-বিদারণ নখ কল্পনা করিয়াছেন। ৫। নাগকেশরের কুসুম কবির নিকট মদন মহীপতির ছত্রের হেমদণ্ড। নাগ পীতবর্ণ কেশর আছে বলিয়া নাগকেশর, বাংলায় নাগেশ্বর। পুষ্প চতুর্দল, ছত্রের বস্ত্র, মধ্যস্থলে পীতবর্ণ কেশর, পুষ্প সুগন্ধ। বঙ্গদেশে নাগেশ্বরের গাছ সুলভ নয়। ৬। পাটলি। পাটলি বঙ্গদেশে দুর্লভ। বড়ু চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনে পারলি (পাটলি) বৃক্ষ ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, পাটলি নাই কিন্তু কন্যার পারুল নাম বহু প্রচলিত। উত্তরবঙ্গে পারুল আছে। পাটলি হইতে নগরের নাম পাটলিপুত্র। পাটলির ফুল সুগন্ধ গাঢ় নীল-রক্তবর্ণ, এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি দীর্ঘ নল। কবি পাটলি পুষ্পকে মদনের তূণ কল্পনা করিয়াছেন। পুষ্পের মুখে যে অলিকুল, তাহা কবির চক্ষে মদনের বাণ। পাটল শব্দের অর্থ শ্বেত-রক্ত। ইহা হইতে কোন কোন বঙ্গীয় ও মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত পাটলিকে গোলাপ ফুল মনে করিয়াছেন। জয়দেব তাঁহাদের ভ্রম দূর করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতি. পাটলি বর্ণনা জয়দেব হইতে লইয়াছেন। বঙ্গদেশে পাটলি কেন অনাদৃত হইল? ৭। করুণ। করুণ বিগতলজ্জ হইয়া পুষ্পচ্ছলে হাসিতেছে। শব্দ কল্পদ্রুমে ইহার বাংলা নাম করুণা লেবু লিখিত আছে। এই নাম দৈবাৎ অন্য এক পুস্তকে পাইয়াছি। কিঞ্চিদধিক শত বর্ষ পূর্বে ডেনমার্ক দেশীয় ভয়েট্ (Voigt) নামে এক ডাক্তার হাওড়া শিবপুরে প্রসিদ্ধ উদ্যানে পালিত বৃক্ষনাম-মালা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাহাতে করুণ নেবুর বাংলা নাম কোর্ণ নেবু লিখিত আছে। ইহা মাতুলুঙ্গের এক জাতি। ইহাই ছোলঙ্গ। পুষ্প সুগন্ধ। সতীশবাবু বাতাবি নেবু মনে করিয়াছেন। কিন্তু জয়দেবের কালে এদেশে বাতাবি ছিল না। Batavia নগরের নাম হইতে বাতাবি। বাতাবি ফুলের সৌরভ অন্যফুলে দুর্লভ। মাতুলুঙ্গ অর্থাৎ দোলঙ্গ ও ছোলঙ্গ ফুলের সৌরভ মৃদু। ছোলঙ্গ নাম "চৈতন্যচরিতামৃতে" আছে। ৮। কেতকী। কবি দন্তরিত বিশেষণ দিয়াছেন। কেতকীর মুখ কেমন? কুন্তাকৃতি। কুন্ত কোঁচ—সূক্ষ্মাগ্র ক্ষেপণাস্ত্র। কবির চক্ষে বিরহীজনের চিত্ত ভেদ করিতেছে। ৯। মাধবী। সৌরভ দ্বারা 'ললিত' হইয়াছে। ১০। নব মালিকা। বাংলা নাম নেআলী। "সপ্তলা নব মালিকা" অমর কোশে। কিন্তু এই নাম হইতে 'নব মালিকা' চিনিতে পারা যায় না। কেহ কেহ নব মালিকা ও নব মল্লিকা এক মনে করিয়াছেন। কালিদাসের শকুন্তলা স্বামিগৃহে যাইবার সময় লতাভগিনী সহকার বধূ নব-মালিকার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। আমি ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের প্রবাসীতে নবমালিকা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। নবমালিকা বৃহৎ লতা, আশ্রয়-তরুর শাখা মাল্যের আকারে বেষ্টন করে। মল্লিকাও করে। মল্লিকা একপুট, বেলী দ্বিপুট। অমর কোশের কোন কোন টীকাকার লিখিয়াছেন নব মালিকা সপ্তদলা, এই হেতু সপ্তলা। বৈদ্যক কোশে পাইতেছি নবমালিকা শিখরিণী ও সুচিমল্লিকা, অর্থাৎ দলের অগ্রভাগ সুচিতুল্য। নেপালী নাম হইতে পাইতেছি ইহা পাহাড়ে, বনভূমিতে জন্মে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি এখানে (বাঁকুড়া নগরে) পশু চিকিৎসালয়ে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত এক লতা দেখিয়াছিলাম। এখন সে গাছটি নাই। উদ্যান-স্বামী এক পাহাড়ো স্থান হইতে আনিয়াছিলেন। ১১। চূত; আম্র মুকুলিত। মাধবী লতা তাহার শাখা আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। ইহা কবিদিগের এক প্রিয় উপমা ছিল। (১২) দর-বিদলিত মল্লী-বল্লী ঈষৎ বিকশিত মল্লী-বল্লী। এই মল্লী-বন মল্লিকা,

কারণ ইহাকে বল্লী বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বৃক্ষারোহী লতা। বেলীও লতার আকার ধরে, কিন্তু বনমল্লিকার তুল্য নয়। বনমল্লিকারই এক নাম নবমল্লিকা। ইহা স্বীকার করিলে জয়দেবের মতে নবমালিকা আর নবমল্লিকা পৃথক গাছ। কবি লিখিয়াছেন মল্লীর পরাগদ্বারা যেরূপ বস্ত্র সুবাসিত হয়, কাননও সেইরূপ সুবাসিত হইয়াছে। এখানে কবি একটু ভুল করিয়াছেন, মল্লীর পরাগ দ্বারা নহে, দল হইতে বিকীর্ণ সৌরভ দ্বারা সুবাসিত হয়। এ বিষয়ে জাতি পুষ্প শ্রেষ্ঠ। চম্পক পুষ্প দ্বারাও বস্ত্র বাসিত হইত।

কবি বসন্তের আর দুইটি পুষ্পবৃক্ষের নাম করিয়াছেন। (১) অশোক। সকলের পরিচিত বৃক্ষ। বসন্তে ইহার তাম্রবর্ণ নবপল্লব এবং প্রথমে নারঙ্গ পরে রক্তবর্ণ পুষ্পগুচ্ছ. গাঢ় হরিৎ পত্রের মধ্যে উদ্গত হইয়া সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাত্রিকালে পুষ্পের মৃদু গন্ধ পাওয়া যায়। (২) কদম্ব নামে দুই বৃক্ষ বুঝায়। বাংলায় বলে কেলি কদম্ব, কদম্ব। উভয়েরই পুষ্পমঞ্জরী বৃত্তাকার। কেলি কদম্বের ছোট, কদম্বের বড়; কেলি কদম্বের পুষ্প সুগন্ধ, বসন্তে ফুটে। ইহার সংস্কৃত নাম নীপ ও ধূলি কদম্ব। কদম্ব বর্ষাকালে ফুটে, ইহার সংস্কৃত নাম ধারা কদম্ব ও রাজকদম্ব।

কবি বর্ণিত এই চতুর্দশ পুষ্পের মধ্যে কিংশুক নির্গন্ধ। বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম—

"দেখিতে কিংশুক পুষ্প অতি মনোহর।
গন্ধ বিনা কেবা তার করে সমাদর?"

পলাশ জাঙ্গল বৃক্ষ। শুষ্ক ভূমিতে যত্র তত্র জন্মে। কেতকীও জাঙ্গল, অযত্নে বহুস্থান ব্যাপিয়া বাড়িতে থাকে। তমালও বিনা যত্নে জন্মে। অপর একাদশ বৃক্ষ উদ্যান-পালিত। জয়দেব কাহার উদ্যানে নাগকেশর ও পাটলি বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন?

ইদানীং পুষ্পোদ্যান দেখিতে পাই না। কদাচিৎ কোথাও কদম্ব, কনকচাঁপা জন্মিতেছে। কদাচিৎ কোথাও যত্নপূর্বকক চম্পক ও নাগকেশর পালিত হইতেছে। কিন্তু পুষ্পোদ্যান কোথায়, যেখানে নানাবিধ সুগন্ধ প্রসিদ্ধ পুষ্প পাওয়া যায়? গ্রামে গ্রামে দেউল আছে, বিগ্রহের পূজা হইতেছে, কিন্তু পুষ্পোদ্যান কই? কোথাও কোথাও করবী, জবা, কৃষ্ণচূড়া বিদেশাগত গোলঞ্চ ও কলিকা ফুল দেউলের সংলগ্ন ভূমিতে আছে। কিন্তু নানাবিধ ফুলগাছ রোপিত হইতে দেখি না। শাদা ফুল ব্যতীত সরস্বতী পূজা হয় না। কোথাও কোথাও শাদা বকফুলে পূজা হয়। অনেক স্থলে বিদেশী পীতবর্ণ গাঁদাফুলে পূজা হইতেছে। ঢাকায়, ফরিদপুরে, বরিশালে পলাশ ফুলে পূজা হইতেছে। শ্বেতপুষ্পের এমন অভাব। যেখানে নিকটে বন আছে সেখানে বন্য শ্বেত পুষ্পদ্বারা সরস্বতী পূজা হইয়া থাকে। কুন্দ শ্বেতবর্ণ, ইহা মাঘ মাসে ফুটে, এই কারণে ইহার নাম মাঘ্য। গাছ সুদৃশ্য, ফুলের গন্ধ মনোহর। বর্ষাকালেও কুন্দের ফুল ফুটে। এইরূপ সরস্বতী পূজার নিমিত্ত দ্রোণ পুষ্পও আছে। অতি শ্বেত গোলাপ, শীতকালে ফুটে। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, পরের উদ্যানের পুষ্পে দেবদেবীর পূজা নিষিদ্ধ। উত্তম ব্যবস্থা ছিল। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে সেকালে গ্রামে গ্রামে দেবালয়ের সন্নিকটে পুষ্পোদ্যান থাকিত। কলিকাতা মহানগরী। সেখানে চক্ষু কর্ণ পরিতৃপ্তির বহুবিধ আয়োজন আছে। কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কিছুই নাই। 'পারক্' নামে আরাম আছে, কিন্তু সুগন্ধ পুষ্পবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশবন্ধু পারক্ বৃহৎ, কিন্তু ফুলের গন্ধ কখনও পাই নাই। 'কর্জন গার্ডেন' ছেলেখেলার উদ্যান, 'ইডেন্ গার্ডেনে' বসন্তে ও বর্ষাকালে গিয়াছি, কিন্তু ফুলের গন্ধ পাই নাই। কলেজ চত্বর (স্কয়ার) সুন্দর, ইহার সরোবর সুন্দর, কিন্তু নিরাভরণ, কমল-কুমুদ নাই। চত্বরে বড় বড় গাছ আছে, কিন্তু সুগন্ধ পুষ্প কই? বসন্তে বিবিধ বর্ণের পুষ্পের সুষমা, বিবিধ সৌরভ ও পক্ষীর কাকলি, কলিকাতার তুল্য কৃত্রিম নগরীতে দুর্লভ।

ভবানী তাঁহার খেলাঘর বহুবিধ আকারের, বর্ণের ও গন্ধের পুষ্পদ্বারা সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহারা হতভাগ্য যাহারা দেখিতে পায় না, বলিয়া না দিলে গন্ধ পায় না।

লিপি

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

সূর্য্যদেব, রশ্মিদীপ্ত তীক্ষ্ণ তরবার,
মেঘলোকে ঝলসিত হোক এইবার।
অবরোধ অন্ধকারে তীক্ষ্ণধার হানো,
উজ্জ্বল আলোর বন্যা আনো তুমি আনো।
সূর্য্যদেব, দীপ্তরশ্মি বিকীর্ণ অনল!
কালো মেঘ গলে হোক নব-ধারা-জল।

ফোটে যেন মাঠে ধান, প্রাণে করে গান,
মৃত্যু, মারী কৃষ্ণছায়া হোক অবসান।
পথ হোক লক্ষ পদপাতে মুখরিত,
অগণন জীবনের তরে অবারিত।
দেখা দিক আদিগন্ত আলোর আকাশ,
রৌদ্রদীপ্ত বাঁচিবার উজ্জ্বল উল্লাস।

স্বরাজ···রেলে

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

কুমুদবন্ধু বি. এ. রেলওয়ের পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে কাজ করিতেছিলেন। চেষ্টা-চরিত্র করিয়া বদলির হুকুমগুলা রদ করাইয়া সতের বৎসর এক জায়গায় কাটিল; দু-পয়সা পাইতেন, শহরে জায়গাজমি কিনিয়া বাড়ী-বাগান করিয়া বেশ গুছাইয়া লইয়াছিলেন, এমন সময় গোলমাল আরম্ভ হইল। কলিকাতা, ঢাকা, নোয়াখালি; তাহার পর পার্ব্বতীপুরেও দু-একটা মারামারি গোছের ধাক্কায় সাক্ষাৎ পরিচয় দিয়া গেল। তাহার পর আসিল স্বাধীনতার সঙ্গে দেশ-বিভাগ এবং সেই সঙ্গে লোক-বিভাগও; কর্ম্মচারীদের বলা হইল তোমরা কে কোন্‌দিকে থাকিতে চাও বাছিয়া লও। পরাধীনতার আমলেই পাকিস্থানী স্বাধীনতার নমুনা পাওয়া গিয়াছিল, কুমুদবন্ধু হিন্দুস্থানের সপক্ষে নাম লিখাইলেন। কিছুদিন পত্রাচারে কাটিল, তাহার পর যখন এদিকেও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, ওদিকেও আশার কোন লক্ষণ নাই, এমন সময় যুক্তপ্রদেশের একটি বড় রেল আপিস হইতে ডাক পড়িল, পার্ব্বতীপুরের সতের বৎসরের বাস উঠাইয়া কুমুদবন্ধু সপরিবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিতান্ত কম নয়—নিজে, স্ত্রী, দুইটি কন্যা, চারিটি পুত্র—বছর দশের মধ্যে; বিধবা এক দিদি, তাঁহার একটি ছোট দৌহিত্র।

আসিয়াই একেবারে অকূলে পড়িলেন।

প্রথম সপ্তাহটা প্ল্যাটফর্ম্মে কাটাইতে হইল। তাহার পর ওয়েটিং-রুমের সামনের বারান্দায়। দিদি মহামায়া খুব শক্ত মেয়েমানুষ, কিন্তু তিনিও এক সপ্তাহের অধিক অগ্রসর হইতে পারিলেন না; তবে লড়াইয়ের জন্য পা পুঁতিবার একটা জায়গা পাইলেন এবং দুই দিন পরেই ওয়েটিং রুমের একটি কোণ স্বীয় পরিবারের জন্য দখল করিলেন।

কোন ব্যবস্থা নাই, অসংখ্য লোক পূর্ব্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রতিদিনই আরও আসিতেছে। কাহারা ডাকিতেছে, কি উদ্দেশ্যে, কিছুরই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সকালবেলায় উঠিয়া মহামায়া তোলা উনানে ওয়েটিং-রুমের মধ্যেই রান্নার ব্যবস্থাটা করিয়া ফেলেন, দুইটি কোনরকমে নাকে মুখে গুঁজিয়া কুমুদবন্ধু সেই যে বাহির হন, ফেরেন একেবারে সন্ধ্যার সময়। ইহার মধ্যে কত আপিস ঘোরেন, কত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—কোনো ফলই হয় না। রেলটার অব্যবস্থার কথা পূর্ব্বে শোনা ছিল, কিন্তু সেটা যে এ ধরণের কিছু হইতে পারে এমন জানা ছিল না। মাসখানেক ওয়েটিং-রুমে কাটিল, পশ্চিমের শীত বেশ ভাল করিয়া ঝাঁকিয়া আসিতেছে, দিদির মেজাজ অত্যন্ত বিগড়াইয়া যাইতেছে, প্রত্যহই ওয়েটিং-রুমটায় রান্নাঘরের ধোঁয়া জমিয়া উঠিলে ষ্টেশন মাষ্টার থেকে ষ্টেশনের যত কর্ম্মচারী আসিয়া দরজার বাহিরে জমা হয়, ওদিকে মহামায়াও আসিয়া দাঁড়ান, গাছকোমর বাঁধা, হাতে খুন্তি, মুখে তুবড়ি ছুটিতে থাকে—"ড্যাকরারা, অলপ্পেয়েরা, ডেকে এনে না দেবে চাকরি, না দেবে থাকবার জায়গা, ঐ ম্লেচ্ছ কাপড়-চোপড় নিয়ে আমার রান্নাঘরের চৌকাঠের এদিকে পা দিলে একধার থেকে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব! আয় না, হিম্মৎ থাকে আয়!"

এংলো-ইণ্ডিয়ান ষ্টেশন মাষ্টার একবার দায়ে খালাস হওয়া গোছের চেষ্টা করিয়া সরিয়া পড়ে, বেচারাদের দুর্দিন পড়িয়াছে, এখন সবই সম্ভব, দেশী কর্ম্মচারীরাও একে একে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়, মহামায়াই রোজ জেতেন, কিন্তু এ ভাবে আর চলে না। কুমুদবন্ধুর কতবার মনে হইয়াছে আবার পার্ব্বতীপুরে গিয়াই যেমন করিতেছিলাম সেইরূপ চাকরি করি, কিন্তু কয়েকবারই সন্ধান লইয়া জানিয়াছেন ও-পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এদিকে এরা মুসলমানদের জন্য দুয়ার খুলিয়া রাখিলেও, ওদিকে ওরা অর্গলিত করিবারও হাঙ্গাম রাখে নাই, দুয়ারের জায়গায় দেয়াল তুলিয়া দিয়াছে, আর কোন আশাই নাই।

শীত প্রচণ্ড হইয়া আসিল, হাতের পয়সাও ফুরাইয়া আসিয়াছে, অবশেষে তিক্তবিরক্ত হইয়া কুমুদবন্ধু চাকরির আশা ত্যাগ করিয়া নিতান্তই অদৃষ্টের ওপর নিজেদের ছাড়িয়া বাড়িতে ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছেন, এমন সময় পার্ব্বতীপুর আপিস ঘুরিয়া তাঁহার হাতে একখানি বড় খাম আসিয়া পড়িল। খুলিয়া দেখিলেন—তাঁহার চাকরি হইয়াছে এই ষ্টেশনেই হিসাবের সেরেস্তায়; বাসাও ঠিক হইয়াছে, একখানি চার চাকার, অর্থাৎ সবচেয়ে যা ছোট সেই রকম মালগাড়ি। কুমুদবন্ধু ওটাকে লেখা-পড়া করাইয়া আট চাকার করাইয়া লইলেন, এর পিছনে এংলো-ইণ্ডিয়ান ষ্টেশন মাষ্টার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের যে অক্লান্ত চেষ্টা ছিল এটুকু না বলিলে অধর্ম্ম হয়, অবশ্য তাহার পিছনে ছিল মহামায়ার ক্ষুরধার জিহ্বা।

ওয়েটিং-রুম ছাড়িয়া সকলে নূতন সচল বাসায় গিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।

২

একেবারেই অভিনব ধরণের পল্লী। বিরাট ষ্টেশন-প্রাঙ্গণের একধারে এমন প্রায় দেড়শ'খানা মালগাড়ী, চার

চাকার, ছয় চাকার, কয়েকখানা আট চাকারও, ঐ এক একখানা বাড়ি। অসহ্য কষ্ট, জায়গা নাই, দিনের বেলায় তাতিয়া উঠে, শীতের দিন বলিয়া আরামের না হইলেও খুব বেশী কষ্টও হয় না, কিন্তু রাত্রে অসহ্য; প্রায় সবই পূর্ব্ববঙ্গের লোক, পশ্চিমের নিদারুণ শীতে যেন জমিয়া যাইবার মত হয়। কয়লাও প্রচুর নয়, সন্ধ্যার একটু আগে প্রত্যেক বাসার সামনে সারি সারি তোলা উনুনে আগুন জ্বলিতে থাকে, সমস্ত পাড়াটা ধুমে ধুম্রাকার হইয়া ওঠে; উনুন ধরিলেই সেগুলা গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া যায়, তাহাতে রান্না, তাহাতেই যতটা সম্ভব তাপ সঞ্চয়। শেষ রাত্রে শীতে আর কাহারও ঘুম হয় না, সবাই গুটিসুটি মারিয়া বসিয়া থাকে।

তবুও মানুষ পরের দুরবস্থা দেখিয়া আশ্বাস পায়, শত শত লোক প্ল্যাটফরমে পড়িয়া আছে, এ তবুও তো একটা আচ্ছাদন। দিনের বেলা এই দুঃখের জীবন থেকে যতটা পারে রস নিংড়াইয়া লয় লোকেরা, ছেলেরা ছুটোপুটি করে, গৃহিণীরা বৌ-ঝিয়েরা এ বাসা সে-বাসা ঘুরিয়া আলাপ করিয়া বেড়ায়, কোয়ার্টাসের জন্য কোথায় কোথায় ইট পড়িতেছে সেই সব আলোচনা লইয়া আশায় বুক বাঁধে।...মানুষের সবই সয়, তা ভিন্ন এটা বিশেষ করিয়া সহিবারই যুগ, একটা কল্পনার ভবিষ্যৎ গড়িয়া লইয়া মানুষ কল্পনাতীত এই বাস্তব বর্ত্তমানকে ভুলিতেছে। কুমুদবন্ধুর পরিবারও ধীরে ধীরে এই দলে মিশিয়া যাইতেছে। পঞ্জাবে যা কাণ্ড হইতেছে সে হিসাবে এ ত স্বর্গ, পার্ব্বতীপুরের কথা আর ভাবাও যায় না।

কিন্তু এ স্বর্গও কপালে বেশী দিন টিকিল না।

প্রথমটা বাদ সাধিল পয়েন্টস্‌ম্যান রামদিন, পাইলট ড্রাইভার করিম শেখের সহযোগিতায়। অবশ্য ভুল করিয়াই, তবে সে-ভুলেও এই রেলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে।

বাসাগুলি ষ্টেশন-প্রাঙ্গণের নিতান্ত একদিকে পড়িয়া আছে বটে তবে একেবারে যে স্থাণু এমন নয়। লাইনের ওপর মাঝে মাঝে চলাফেরা করে। প্রত্যহ নূতন বাসা আসিতেছে, তাহাদের জায়গা দিতে হয়, রোজই দু'একখানা করিয়া পুরানো বাসা স্থানান্তরিত হইতেছে, হয়ত কেহ অন্য ষ্টেশনে বদলি হইল, হয়ত কোন বাসার অধিকারী পাকা কোয়ার্টার্স পাইল, তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। ডিপার্টমেন্টে হুকুম দেয়, পয়েন্টস্‌ম্যানের নির্দ্দেশে পাইলট ইঞ্জিনে কাজটা সম্পন্ন করে। ছেলেমেয়েরা, বধূ-গৃহিণীরা মাঝখান থেকে খানিকটা গাড়ি চড়ার আনন্দ উপভোগ করিয়া লয়। এমনও হয় কর্ত্তা আপিস থেকে আসিয়া দেখেন বাসা নাই, হয়ত লাইনের ভেতরের দিকের একটি বাসা অন্য ষ্টেশনে বদলি হইয়াছে, তাঁহার বাসাটিকে পথ ছাড়িয়া অন্য লাইনে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। খানিকক্ষণ পরে পাইলট ইঞ্জিন আবার ন্যাজে করিয়া আনিয়া রাখিয়া গেল।

এই রকম কিছু একটা ব্যাপার কুমুদবন্ধুর বাসা লইয়াও হইতেছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলায়।—

পয়েন্টস্‌ম্যান রামদিনের ডিউটির শেষ দিক এটা, এইটুকু শেষ করিয়া নিজের বাসায় যাইবে, এক লোটা ভাঙ তৈয়ার আছে সেবন করিয়া দড়ির খাটিয়ায় গা এলাইয়া দিবে; একটু ব্যস্ত আর অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। পাইলট করিম শেখের ডিউটির এই আরম্ভ, একটু বাঁধা-মাত্রার নেশা করিয়া কাজে নামে, কাজ করিতে করিতে সেটা কাটিয়া যায়; ঠিক কাটার অবস্থাটা এখনও দাঁড়ায় নাই।

কুমুদবন্ধু আপিস থেকে ফিরিয়া একটু জলযোগ করিয়া এই সময়টা ক্লাবে যান, সেখানেই গেছেন। শীত বেশ জমিয়া আসিয়াছে। লোহার উনুনটা ধরিয়া গেছে, সেটাকে গাড়ির মধ্যে তুলিয়া দু'দিককার ঝাঁপ বন্ধ করিয়া রান্নার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় রামদিনের গলার 'হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার!' শব্দ হইল এবং পাইলট আসিয়া আস্তে আস্তে গাড়িটার সঙ্গে যুক্ত হইল। মহামায়া দরজার ফাঁক দিয়া মুখটা বাড়াইয়া বলিল,—"কে, রামদিন? আমরা রান্না আরম্ভ করেছি, আস্তে নাড়াচাড়া করতে বলো ড্রাইভারকে।"

"আপনি মজেসে রসুই করুন মাইজি, কুছু ভয় নেই"—বলিয়া রামদিন কাপলিংটা বসাইয়া দিল, ইঞ্জিন ধীরে ধীরে বাসা লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

খানিকটা দূরে অন্য একটা লাইনে গাড়িটাকে দাঁড় করাইয়া ইঞ্জিনটা আবার এই লাইনে প্রবেশ করিল, কুমুদবন্ধুদের পাশের গাড়িটা জুড়িয়া আবার সেই ভাবে বাহির করিয়া লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মের কাছাকাছি একটা লাইনে রাখিয়া আসিল। অন্য দুই-তিনটা লাইনে প্রবেশ করিয়া আরও গোটাকতক গাড়ি লইয়া ঐ রকম টানা-পোড়েন করিল, ততক্ষণে রাত্রি হইল, রামদিনের ডিউটি শেষ হইয়া আসিল, পরের পয়েন্টস্‌ম্যান রামচরিত্তরকে কোথায় কোন্ গাড়ি যাইবে, কোন্ গাড়ি বাহির হইবে সব বুঝাইয়া দিয়া নিজের কোয়ার্টাসে চলিয়া গেল।

৩

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় এই মাস দুয়েকের অভ্যাসমত ইয়ার্ডের বিদ্যুতের আলো আর টর্চ্চের সাহায্যে লাইন ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া যথাস্থানে আসিয়া কুমুদবন্ধু সেজ ছেলের নাম ধরিয়া ডাকিলেন—"ওবিনেশ!"

অবিনাশ দোরের কাছে কিছু জিনিসপত্র থাকিলে সরাইয়া লইবে তাহার পর কুমুদবন্ধু গাড়িতে উঠিবেন, এই হইতেছে প্রাত্যহিক ব্যবস্থা, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। দারুণ শীত, আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া হি-হি করিতে করিতে কুমুদবন্ধু আবার হাঁকিলেন—"ওবিনেশ, শুনছিস না জিনিসগুলো সরিয়ে নে, উঠব..."

বন্ধ দরজা খুলিয়া উঠিতে যাইবেন, ভিতর থেকে একটি পশ্চিমা ছেলে বলিল—"ই গাড়ি নেঁাহ।"

"তবে!"—বলিয়া কুমুদবন্ধু তিন হাত পিছাইয়া আসিলেন। ঠাহর করিয়া দেখিলেন এটা তাঁহার পাশের গাড়িটা, পাশাপাশি তিনটা আট চাকার লম্বা গাড়ি ছিল, তাই ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন দারুণ শীতের এই জবড়জঙ্গ অবস্থায়। সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু শীত ছাড়িয়া গিয়া কালঘাম ছুটিল—তাহা হইলে তাঁহারটা কোথায়?

সেই ছেলেটিকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আমারটা কোথায় তা হলে?"

"শাণ্টিংসে লে গিয়া।"

"কখন?"

"সামকো।"—অর্থাৎ সন্ধ্যার সময়

"কোথায়? কোন্ দিকে? এখনও ফেরেনি কেন?"

ছেলেটি তিনটি প্রশ্নের কোনটিরই উত্তর দিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কুমুদবন্ধুর মুখ দিয়া কোন প্রশ্ন সরিল না। এরকম ব্যাপার এখানে কয়েকবার হইয়াছে, একবার তিনিও ভুক্তভোগী, কিন্তু সে কয়েক মিনিটের জন্য, বড় আধঘণ্টা; আপিস হইতে আসিয়া দেখেন বাসা নাই, তাহার পর তখনই আবার পাইলট ইঞ্জিন রাখিয়া গেল। এ যে সন্ধ্যা থেকে উধাও, রাত ন'টাতেও দেখা নাই!

তৃতীয় গাড়িটা এক জন বাঙালীর, এক আপিসেই কাজ করেন, কুমুদবন্ধু বাবু সামনে গিয়া ডাকিলেন—"গোপেশবাবু!"

গাড়ির দরজা খুলিয়া গোপেশবাবু মুখ বাহির করিলেন।

"আমার গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না মশাই!"

"তার মানে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনলাম সন্ধ্যের সময় শাণ্টিংএ নিয়ে গিয়েছিল—নিশ্চয় মিশিরজীর গাড়িটা বের করবার জন্যে, তাঁর ত বদলি হয়ে গেল?—সেই থেকে এখন পর্য্যন্ত ফিরে আসে নি—সব নেশাখোরদের কাণ্ড, কারুর ত নজর নেই এদিকে…"

"কাছাকাছি ইয়ার্ডটা দেখেছেন?"

"না, দেখি নি এখনও, এই শুনলাম সুরজপ্রসাদবাবুর ছেলের কাছে?"

"দাঁড়ান, আসছি।"

ওভারকোট, র‍্যাপার, কম্ফর্টারে আপাদমস্তক ঢাকিয়া গোপেশবাবু নামিয়া আসিলেন। দুই জনে কাছাকাছি সমস্ত ইয়ার্ড খুঁজিলেন, তাহার পর দূরেও; পয়েণ্টস্‌ম্যান, পাইলট ড্রাইভার দুই জনকে প্রশ্ন করিলেন, গাড়ির কিন্তু কোন হদিস পাওয়া গেল না। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হয়রাণ হইয়া অবশেষে ইয়ার্ডের এক প্রান্তে দেখা গেল একটি আট চাকার গাড়ি একক দাঁড়াইয়া আছে। আশায় বুকটা ধড়াস ধড়াস করিয়া উঠিল, তাহার পর দুই জনে আগাইয়া নম্বরের উপর টর্চ্চ ফেলিয়া দেখেন মিশিরজীর গাড়িটা। ডাকাডাকি করিয়া মিশিরজীকে তুলিলেন, খবর পাইলেন পার্শেল এক্সপ্রেসের পেছনে তাঁহার গাড়ীটা আজ জুড়িয়া তাঁহার নূতন কর্ম্মস্থানে পৌঁছাইবার কথা ছিল, কিন্তু জোড়ে নাই। কারণটা জিজ্ঞাসা করায় এই রেলওয়েটাকে একটা কুৎসিত গালাগাল দিয়া বলিলেন—কারণ তিনি জানেন না, শুধু এইটুকুই জানেন এ রেলে সবই সম্ভব, যবে খুশী লইয়া যাইবে, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছেন।

কি সর্ব্বনাশ যে হইয়াছে বুঝা গেল দুই জনে ষ্টেশনে ছুটিলেন। ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিয়া জানাইলেন—তাঁহার গাড়ীটা ভুলক্রমে সাতটা বাইশের পার্শেল এক্সপ্রেসে যুক্ত হইয়া ষ্টেশন ছাড়িয়া গিয়াছে, সন্ধান লইয়া সেটাকে আটকানো দরকার। সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত বলিয়া গেলেন।

এ ধরণের বা এর চেয়েও গুরুতর এত ব্যাপার নিত্য হইতেছে এ রেলে যে, ষ্টেশন মাষ্টারের মুখে বিশেষ কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। অলসভাবে টেলিফোনটা তুলিয়া লইয়া ডাকিলেন—"হ্যালো, কনট্রোল!…"

সাড়া পাওয়া গেলে প্রশ্ন করিলেন—

"সেভেন্‌টি-সিক্স ডাউন পার্শেল এখন কোথায়?"

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা, গাড়ীটা সব জায়গায় ধরে না, চার ঘণ্টায় অনেকগুলি ষ্টেশনই পার হইয়া গিয়াছে, কনট্রোল একটু অনুসন্ধান করিয়া সঠিক অবস্থানটা জানাইল, রাস্তায় আছে আর মিনিট পাঁচেক পরেই একটা বড় ষ্টেশনে পৌঁছিবে।

ষ্টেশন মাষ্টার ব্যাপারটা জানাইলেন—অমুক নম্বরের গাড়ী অমুক ষ্টেশনে যাইবার কথা, তাহার স্থানে ভুলক্রমে অমুক নম্বরের গাড়ী চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে খুলিয়া লইয়া পরবর্ত্তী এক্সপ্রেস বা কোন প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে জুড়িয়া পাঠাইয়া দিতে হইবে। নির্দ্দেশটুকু দিয়া ফোন ছাড়িয়া তিন জনে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া রহিলেন। একটু যে গল্প হইল তাহাতে ষ্টেশন মাষ্টার জানাইলেন—"ও গাড়ী এখন বিশ-বাঁও জলে।"

"কেন?"

একটু হাসিয়া নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলিলেন—"এই দেখুনই না, এটা কি রেল ভুলে যাচ্ছেন যে, এর নামই পড়েছে ওল্ড টায়ার্ড…"

এমন সময় টেলিফোনটা বাজিয়া উঠিল, ষ্টেশন মাষ্টার তুলিয়া লইয়া সাড়া দিলেন—"হ্যালো…ইয়েস…তাই নাকি? …তা হ'লে?…বেশ, পার্টি বসে আছেন ততক্ষণ…খোঁজ নিয়ে বলুন।"

টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া কতকটা বিজয়ের হাসি হাসিয়াই বলিলেন—"ঐ নিন, সে গাড়ী পৌঁছোয়ই নি ও ষ্টেশনে। আপনাকে বললাম না?"

"পৌঁছোয় নি! তা হলে?"—কুমুদবন্ধু একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

"থামুন খোঁজ নিচ্ছে। এ ষ্টেশনে আবার গার্ডের বদলি হ'ল, আগেকার গার্ড রানিং-রুমে চলে গিয়েছে, তার কাছে লোক পাঠানো হয়েছে।"

"কিন্তু সে তো সমস্ত চার্জ্জ বুঝিয়ে যাবে···"

"বোধ হয় এটা ছেড়ে গিয়েছে···রেলটা যে কি ভুলে যাচ্ছেন যে আপনি—এর আগেকার নাম রেখেছিল—বদমাইস, নালায়েক···"

এমন সময় টেলিফোনে শব্দ হইল—ষ্টেশনমাষ্টার আবার তুলিয়া লইলেন—

"হ্যালো ?···আচ্ছা···বেশ···আচ্ছা···আচ্ছা···"

টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া সেই রকম নিরুদ্বেগ কণ্ঠে জানাইলেন টেলিফোনে বলিতেছে—এ ষ্টেশন ছাড়িয়া পরের ষ্টেশনে পৌছাইতে গাড়ীর শেষের দিকের মালগাড়ী থেকে একটা কান্নাকাটি হটগোল ওঠে। ষ্টেশনের সবাই জড়ো হইয়া টের পায়—এক গাড়ীর বদলে অন্য গাড়ী জুড়িয়া লইয়া চলিয়াছে পার্শেলটা। গাড়ীটাকে কাটিয়া ষ্টেশনের সাইডিঙে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এদিকে ওমুখো আর গাড়ী নেই, একেবারে শেষ রাত্রির দিকে এক্সপ্রেস, তাহাতেই জুড়িয়া ফেরত দেওয়া হইবে।

আর কিছুই তাহা হইলে করিবার নাই। বেশী দূর নয়, এদিক থেকে ধরিলে ছয়টা ষ্টেশন পরেই, কিন্তু ডাউনেরও কোন গাড়ী নাই যে, কুমুদবন্ধু গিয়া পরিবারের সঙ্গে মিলিত হন। মালগাড়ী থাকিলেও চলিত, কিন্তু খবর পাইলেন যে তাহাও আর নাই; একটা ছিল, মিনিট দশ হইল ছাড়িয়া গিয়াছে।

ষ্টেশনমাষ্টার আর একটা খবর দিলেন। এই ধরণের দুর্ঘটনার সম্প্রতি বাড়াবাড়ি হওয়ায় এর জন্য আপিসে একটা বিভাগই খোলা হইয়াছে, সকাল ছয়টা হইতে বসে। এক্সপ্রেসে যদি মালগাড়ীটা আসিয়া না পড়ে, কুমুদবন্ধু যেন আপিসেই খবর নেন, কেননা সকাল থেকে ষ্টেশন কর্ম্মচারী-দের হাতে কাজের চাপ, ইচ্ছা থাকিলেও এই রকম টেলিফোন ধরিয়া সাহায্য করিতে পারিবে না। আপিসটার সন্ধানও দিয়া দিলেন।

কুমুদবন্ধু একটু ভীত ভাবেই বলিলেন—"সকালের এক্স-প্রেসে নিশ্চয় এসে পড়বে···"

ষ্টেশন মাষ্টার শুধু একটু মুচকি হাসিলেন, বলিলেন—"এসে পড়ে ভালই, আপনাকে আর আপিসে দৌড়াতে হবে না।"

৪

এক্সপ্রেসটা পৌছবার সময় পাঁচটা, সাড়ে সাতটায় আসিল। মালগাড়ীটা নাই। কুমুদবন্ধু চারিটা থেকে আসিয়া বসিয়া আছেন, অবসন্ন শরীরে নূতন আপিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

একটি ছোট ঘর, মাঝখানে টেবিলের সামনে এক জন অত্যন্ত স্থূল আধ-বুড়ো-গোছের ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, বাঙালীই। অন্য একটি টেবিলে মুখোমুখি হইয়া দুই জন পশ্চিমা ছোকরা কেরাণী, এক জন টাইপিং লইয়া আর এক জন কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত রহিয়াছে। শীতের সকাল, তায় নূতন আপিস, এখনও অনেকে সন্ধানই জানে না, তবুও কাউণ্টারে পাঁচ-সাত জন লোক ভিড় করিয়া রহিয়াছে।

কুমুদবন্ধু দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমি রেলেরই লোক, এই ষ্টেশনেই থাকি, ভিতরে আসতে পারি কি ?"

"আসু-ন"—ভদ্রলোক টানিয়া কথাটা বলিয়াই কাশিতে আরম্ভ করিলেন, সেই অবস্থাতেই ডান হাতটা সামনের চেয়ারের দিকে বাড়াইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। গলায় একটা কম্ফর্টারের ওপর র‍্যাপার জড়ানো, কাশিটা থামিলে ছুটাকেই আরও টানিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি ব্যাপার ?"

"একটা বড় বিপদে পড়া গেছে—ইয়ে, পাকিস্থান থেকে এসেছি, আছি মালগাড়ীতে, কাল সন্ধ্যেয় সেটা পার্শেল এক্সপ্রেসে···"

"টেনে নিয়ে গেছে ?···প্রাতর্বাক্যে বলা ঠিক নয়, কিন্তু আর আশা নেই···

"আশা নেই কি মশাই!"

ভদ্রলোক টানিয়া টানিয়া কথা বলেন, এদিকে একটা তন্দ্রাচ্ছন্নভাব লাগিয়া আছে, তুড়ি দিতে দিতে হাই তুলিলেন, তাহার মাঝখানেই কাশি আসিয়া পড়িল, সব শেষ হইলে বলিলেন—"আত্মারাম, লষ্ট্ ওয়াগন্‌স্‌কা ফাইল সব উতারো তো।"

কুমুদবন্ধু লক্ষ্য করিলেন আপিস নূতন হইলেও ফাইলের গাদা লাগিয়া গেছে এরই মধ্যে, এক জন কেরাণী উঠিয়া কাঠের র‍্যাক্ থেকে এক থাক্ নামাইয়া আনিল। ভদ্রলোক সেই রকম অলস কণ্ঠে বলিলেন—"ঐ দেখুন, বিশ্বাস না হয়—পঁয়ত্রিশখানা মালগাড়ী সমস্ত লাইনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মা-বাপ নেই···ক্লাসিফিকেশন্, আত্মারাম···?"

"টেন্ উইথ্ ফ্যামিলি হুজুর, অলেভুন উইথ্ ফ্রেট্, ফোরটিন এম্‌প্‌টি···"

"ঐ নিন—দশখানা আপনার মতন পরিবার নিয়ে, এগার-খানার মাল, বাকি খালি। ···প্যাঁকাল মাছের মতন পিছলে পিছলে বেড়াচ্ছে সমস্ত লাইনে, ধরবার উপায় নেই, আজ খোঁজ পেলেন এই পাশের ষ্টেশনে, ধরবেন ক্যাঁক করে, কাল খবর এল এক শ' মাইল দূরে একটা সাইডিঙে পড়ে আছে···"

হাই তুলিয়া কাশিয়া কম্ফর্টার, র‍্যাপার টানিয়া দিয়া বলিলেন—"খেলে কচুপোড়া; বুড়ো বয়সে বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে এসে এক ছেঁড়া জাতা হাতে দিয়ে···তার পর আর কিছু পেয়েছেন খবর, না ঐ পর্য্যন্ত ?"

কুমুদবন্ধুর মুখ একেবারে শুকাইয়া গেছে, বলিলেন—"কাল রাত্তিরে খবর পাওয়া গেল এখান থেকে পাঁচটা ষ্টেশন আগে একটা সাইডিঙে পড়ে আছে—এদিককার নামগুলোও মনে থাকে না—পার্শেলের কাষ্ট ইপেক্ আর কি—ঠিক ছিল সকালের এক্স্প্রেসে জুড়ে নিয়ে আসবে, তা আসে নি।"

ভদ্রলোক অলস ভাবে টেলিফোনটা তুলিয়া লইলেন, ডাকিলেন—"হ্যালো কণ্ট্রোল!···" সাড়া পাওয়া যাইতে আগাগোড়া সমস্ত খবরটা দিয়া গেলেন। তাহার পর টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া বলিলেন—"খোঁজ নিচ্ছে।"

একটু যে সময় পাওয়া গেল তাহাতে নিজের দুঃখের কথা তুলিলেন—নাম অনুকূল ভাদুড়ী—রিটায়ার করিয়া বসিয়াছিলেন—ছোট মেয়েটির বিবাহ দিয়া এইবার দু'জনে কাশীবাসী হইবেন, আবার ডাকিয়া: এই ক্যাসাদ—হাতে আছে পাত্রটাত্র একটা?—এই পেটে একটু বিদ্যে থাকে—কিছু জমি-জমা—নেহাত চাকরির ওপরই না ভরসা···"

এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। তুলিয়া বলিলেন—"হ্যালো!··আচ্ছা···ঠিক···"

রাখিয়া দিয়া একটু বিস্ময়ের হাসি হাসিয়াই বলিলেন—"ঐ নিন্, যা বলেছিলাম—সে গাড়ী ও ষ্টেশনে আর নেই···"

"বলেন কি!—নেই?···আমি ভেবেছিলাম বুঝি ভুলে···"

"নেই।···তার কারণ হয়েছে, হাণ্ড্রেড্ টোয়েণ্টি সিক্স ডাউন্ গুড্স্ রাত আড়াইটের সময় শান্টিং করতে করতে ভুল করে তুলে নিয়ে গেছে।"

"তার পর!"

"কোন্ ষ্টেশনে ড্রপ করলে খবর পেতে দেরি হবে, এক এক করে জিগ্যেস করবে তো?"

বহু দূরে দুইটা ষ্টেশনের নাম করিয়া বলিলেন, মালগাড়ীটা এখন সেই দুইটার মাঝখানে, ঘণ্টা দুয়েক তার কোন খবর নাই, হয়তো ইঞ্জিন ফেল করিয়া মাঝ পথে দাঁড়াইয়া আছে।"

তাহার পর একটু নিম্ন কণ্ঠে বলিলেন—"কেলই কি করে সব সময় মশাই? মাঝপথে দাঁড় করিয়ে এটা ঠুকছে ওটা ঠুকছে, ওদিকে ওয়াগনকে ওয়াগন্ খালি করে মাল সরিয়ে দিচ্ছে—ট্রুক্স্!···আমরাই কিছু করতে পারলাম না।"

উপায় নাই, একবার আপিসে বাহির হইবার সময় এদিক হইয়া যাইতে বলিলেন—যত দূর সম্ভব খোঁজখবর লইয়া রাখিবেন। মেয়ের বিবাহের কথাটা মনে রাখিতে বলিলেন—"আমরা হলাম ভাদুড়ী—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—বাগচি, সান্যাল—মানে ভাদুড়ী ছাড়া আর যা হয়—ছেলেটির যেন খাওয়ার-পরবার একটু সংস্থান থাকে···"

৫

এগার দিন হইয়া গেছে গাড়ীর কোন সন্ধান নাই; ঠিক যে সন্ধান নাই এমন নয়, পাওয়া যাইতেছে খবর, সব ব্যবস্থা ঠিক, আবার কি করিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, আজ এক জায়গায়, কাল হয় তো দেড়শ' মাইল দূরে। খানতিনেক চিঠিও পাইলেন, হতাশায় ভরা, আর গালাগালি—রেলওয়েকে আর এমন রেলওয়েতে কাজ করার জন্য অনুকূলকেও।

অনুকূলও একেবারে আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বারদুয়েক সব ঠিকঠাক করিয়া নিজে পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আগেই গাড়ী উধাও হইয়াছে, একেবার সামনের দিকেই, একবার এদিকে আসিয়া পাশের একটা জংশন ষ্টেশন হইয়া ব্রাঞ্চ লাইনে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

হতাশায় হতাশায় এমন অবস্থা হইয়াছে যে একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গেছে আর ইহজন্মে পাওয়া যাইবে না। দিনে তিন-চারবার করিয়া আপিসে যান, খোঁজ পান অমুক ষ্টেশনে রহিয়াছে, তাহার পর আবার নিরুদ্দেশ; অনুকূলবাবু নির্ব্বিকার কণ্ঠে মেয়ের জন্য পাত্রের কথা তোলেন। সর্ব্বোচ্চ অফিসার পর্য্যন্ত চিঠি লিখিয়া লিখিয়া হয়রাণ হইয়া গেছেন, সবগুলা অনুকূলবাবুর আপিসে আসিয়া জমা হয়। একটা ফাইল খোলা হইয়াছে, সেটা দিন দিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। এদিকে ফাইলের সংখ্যাও পঁয়ত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাউণ্টারে লোকদের ভিড়, গুলতন গেছে বাড়িয়া।

মরিয়া হইয়া এক ঝোঁক গাড়ীর সন্ধান লইতে লইতে এক নাগাড়ে পাঁচ দিন সমস্ত লাইনটা এমুড়ো ওমুড়ো চষিয়া ফেলিলেন, ধরা গেল না। পশ্চিমের শীতে, অনিয়মে শরীর ভাঙিয়া গিয়াছে, আবার হেড কোয়ার্টারে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর ব্যাপারটা চরমে আসিয়া ঠেকিল।

একদিন নিজের আপিসে চেয়ারে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, পাশের সঙ্গী কেরাণীরা যখন যাহার অবসর হইতেছে সান্ত্বনা দিতেছে—গাড়ী যখন লাইনের ওপরই আছে, ভয় কি?—একদিন না একদিন পাওয়া যাবেই··এ তো সমুদ্র নয়, কোথায় ডুবে ডুবিল, কোথায় পাহাড়ে ঠোক্কর লাগিল···এ যতই কিছু হোক, বাঁধা লাইন ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না··· ঐ তো পঞ্জাবে পরিবারকে পরিবার নষ্ট হইয়া গেল, এ তো তাহার চেয়ে ঢের ভাল···ধরা যাক, যদি নাই আর দেখা হয়, বাঁচিয়া তো থাকিবেই সবাই···

এমন সময় অনুকূলবাবুর পিয়ন আসিয়া খবর দিল বাবু সেলাম দিয়াছেন।

কাশিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই দক্ষিণ হাতটা বাড়াইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বেগটা থামিলে র‍্যাপার আর কম্ফর্টার ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া বলিলেন—"নিন মশাই, টেনে তুলেছি, এ সব ব্যাপারে অত হেদুলে চলে? এইবার গিন্নী এসে পৌঁছুলে একটা ভোজ দিয়ে দিন···"

নিজের রসিকতায় হাসিতে গিয়া আবার একচোট কাশি আসিয়া পড়িল।

কুমুদবন্ধু বাবু ব্যাকুল আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন—"এসে গেছে ?"

"এসে গেছেই বলতে পারেন ; টু ডাউন এক্সপ্রেস নেক্সট্ স্টপেজ থেকে তুলে নিয়ে ষ্টার্ট করেছে...মাঝে পাঁচটা ষ্টেশন।"...

ঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন—"আর আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বে..."

"তা হলে উঠি আমি..."

"আরে বসুন, আধ ঘণ্টা বললাম বলে কি আধ ঘণ্টাই ভেবেছেন নাকি ?" হয় তো শুনবেন কোথাও ইঞ্জিন ফেল করে বসে আছে, কিম্বা কোন ষ্টেশনে লাইন ক্লিয়ারই পায় নি, ছিলেন বি. এ. আর.-এ, এসব কাণ্ড তো জানা নেই।...পেলেন পাত্রের খোঁজ ? মেয়েটিকে তো আর রাখা যায় না ; এই দেখুন না, গিন্নি যা চিঠি লিখেছেন তাতে পতি-গুরুর গুরুত্ব আর কিছু রাখেন নি। আমরা হলাম ভাদুড়ী—এটুকু মনে রাখতে হবে, বাগচি, সাণ্ডাল..."

কোন রকমে মুক্ত হইয়া যখন ষ্টেশনে আসিয়া পৌছেন দেখেন গার্ডের গাড়ীর দিকে একটা তুমুল জটলা, এক রকম ছুটিতে ছুটিতে গিয়াই উপস্থিত হইলেন।

ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া দেখেন একটা রেলের সাঁওতালী কুলীর পরিবার, মেয়ে, মাগী, আণ্ডাবাচ্চা মিলাইয়া আট দশ-জন ; বলা নাই, কওয়া নাই, তাহাদের নিজের ষ্টেশন থেকে টানিয়া আনিবার জন্ত একধার থেকে সবাই মিলিয়া অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতেছে, একটা লোক কাপলিংটা খুলিয়া গাড়ীটাকে ছাড়াইয়া লইতেছে।

আপিসে আসিয়া খবর পাইলেন, সেই ষ্টেশনেই আপ্ পার্শেল এক্সপ্রেসটা দাঁড়াইয়া ছিল, টু ডাউন পৌছিবামাত্র কুমুদবন্ধুর গাড়ীটা জুড়িয়া লইয়া উল্টা দিকে চলিয়া গিয়াছে।

৬

শরীর গেছে, মন দিন দিনই ভাঙিয়া পড়িতেছে ; ওদিকে কুড়ি বৎসরের তিল তিল করিয়া সঞ্চয় করা সম্পত্তি নষ্ট হইল, তাহার পর এই—একেবারে মূলে হাভাত। বৈরাগ্য অনেক দিন থেকেই প্রবেশ করিয়াছিল মনে, ক্রমে ক্রমে উগ্র হইয়া উঠিল।

আর অনুকূল বাবুর আপিসেও যান না, নিজের আপিসে গিয়া টেবিলের সামনে বসিয়া সান্ত্বনা শোনেন, ছুটি হইলে উঠিয়া আসেন। ওয়েটিং-রুমের একটা কোণে পড়িয়া থাকেন, হোটেলে নেহাত প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত এক মুঠা খান।

দিন আষ্টেক পরের কথা। এক জন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন কুমুদবন্ধু, তিনি তত্ত্বজ্ঞান দিয়াছেন সমস্ত জীবনটাই এই রকম বৃথা অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ানো ; ঠিক হইয়াছে সব ত্যাগ করিয়া এই দিক দিয়াই গিয়া হিমালয়ে উঠিবেন। কাজে ইস্তফা দিয়া সকাল সকালই আপিস হইতে বাহির হইয়া গেটের কাছে আসিয়াছেন, ডাক পিয়ন প্রবেশ করিতেছিল, হাতে একটা চিঠি দিল, খামের ওপর অনেকগুলি মোহরের ছাপ। কুমুদবন্ধু তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলিয়া পড়িলেন—

পার্ব্বতীপুর
সোমবার

আশীর্ব্বাদ জানিবা,

আমরা অনেক কষ্টে তিন দিন হইল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বাড়ীর চারখানা দরজা আর দুইটা জানালা খুলিয়া লইয়া গিয়াছে ; তাহার পরই পাড়ায় পুলিস মোতায়েন হয়, আর কিছু করিতে পারে নাই। এখানে আর হাঙ্গামাও কিছু নাই ; শোনা যাইতেছে এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে পশ্চিমা মোল্লাদের বনিতেছে না। কাল কলিমুদ্দি আসিয়া অনেক দুঃখ করিল—বলিল—মা ঠাকরুণ, যখন এয়েছেন আর যাবেন না, ওরা আপনাদের তাড়িয়ে—আমাদেরও তাড়াবে। কলিমুদ্দির ছেলে তো কালেজে লেখাপড়া করিতেছে, সেই নাকি ভেতরের কথা টের পাইয়া এই সব বলিয়াছে।

আমায় চিঠি লিখিয়া দিল অম্বিকার ছেলে ললিত। উহারাও আসাম থেকে ফিরিয়া আসিয়াছে। বলে তাদের চেয়ে ঘরের মুসলমান ঢের ভাল। তারা বাঙালীকে একে-বারে পছন্দ করে না।

যাই হোক, তুমি পত্রপাঠই ইস্তফা দিয়া চলিয়া আসিবে, আর ও মুখের চাকরীতে কাজ নাই—যা আছে তাহাতেই চলিয়া যাইবে। আমরা কি করিয়া পরিত্রাণ পাইয়া পলাইয়া আসিয়াছি এক ভগবানই জানেন, চিরদিনই বোধ হয় রেলে রেলে ঘুরিতে হইত।

আমরা শরীর গতিকে ভাল। ফসল ভাল হইয়াছে, কলিমুদ্দি, পাঁচু সেখ, জয়নাল, সাতকড়ি মণ্ডল সবাই বলিতেছে আমাদের অংশ আমরা পাইব।

তুমি চলিয়া আসিতে বিলম্ব করিবা না। পুনরায় আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি আশীর্ব্বাদিকা

দিদি

শিক্ষায় হস্তশিল্পের স্থান

শ্রীউষা বিশ্বাস, এম-এ, বি-টি

সাধারণতঃ আমরা আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করি—কথায়, চিত্রে অথবা অন্য কোনও কারুশিল্পে। লেখক তাঁর ভাবসমূহ ফুটিয়ে তুলতে চান তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে, চিত্রকরের ভাব রূপ পায় তাঁর আঁকা ছবির মধ্যে—ভাস্করের ভাব-কল্পনার বিচিত্র অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় তাঁর গড়া মূর্ত্তিতে। এমনি ভাবে কত বিচিত্র উপায়ে আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে প্রয়াস পাই। আমাদের মনে কত চিন্তা, কত ভাবেরই উদয় হয়। তার খবর বাইরের জগতের কেউ জানতেই পারে না, যতক্ষণ না সেগুলি মূর্ত্ত হয়ে ওঠে—ভাষায়, চিত্রকলায় অথবা কোনও কারুশিল্পে। মানুষের এই ভাবপ্রকাশের শক্তিটি বিধি-দত্ত। এ ক্ষমতা সকলের সমান থাকে না। প্রকাশ-শক্তির অভাবে আমাদের কত ভাবই অব্যক্ত থেকে যায়—পরে মন থেকেও সেগুলি আস্তে আস্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে বিলীন হয়ে যায়। এক জন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেছেন—"No impression without expression"—অর্থাৎ আমাদের মনের কোন ভাবধারণাই স্পষ্ট ও স্থায়ী হতে পারে না যদি না আমরা সেটিকে একটি বাহ্যিক রূপ দিতে সক্ষম হই। বাস্তবিকই কথাটি খুব ঠিক। "কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে"—শিশুর স্ফুটনোন্মুখ মনেও তেমনি কত ভাবেরই উন্মেষ হয়। তার প্রকাশ করবার শক্তি বয়স্কদের চেয়ে ঢের বেশী সীমাবদ্ধ। সেইজন্যে তার আত্ম-প্রকাশের শক্তির উৎকর্ষ সাধন করবার দিকে প্রথম থেকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। নইলে তার ক্ষুদ্র মনটি পঙ্গু ও অক্ষম হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কোনও পেন্সিল, কলম বা খড়ি পেলেই শিশু তাই দিয়ে "হিজিবিজি" কাটে—কিছু লিখতে বা আঁকতে চেষ্টা করে। জননীরা অনেক সময়েই ছোট শিশুর আত্ম-প্রকাশের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের গুরুত্ব ঠিক বুঝতে পারেন না—তাঁরা তাকে ভর্ৎসনা করেন, ঘর নোংরা করছে বা কাগজ নষ্ট করছে বলে। সুতরাং অনেক সময়েই শিশুর আত্মপ্রকাশের প্রথম প্রয়াস অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়—সমুচিত উৎসাহের অভাবে। এইজন্যেই শিশুর শিক্ষায় হস্তশিল্পের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। হস্তশিল্প শিক্ষা দ্বারা শিশুকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ ও সুবিধা দিতে হবে—শুধু ভাষাশিক্ষার দ্বারাই নয়। হস্তশিল্পের সাহায্যে শিশুর কতকগুলি সহজাত বৃত্তিকেও ফুটিয়ে তোলা অনায়াসসাধ্য হয়। এমনি করে সে শৈশব থেকেই হস্তশিল্পে নৈপুণ্য লাভ করবার সুযোগ পাবে—পরে ভবিষ্যৎ জীবনেও কর্ম্মকুশল হয়ে উঠতে শিখবে।

ভাষার সাহায্যেই আমরা প্রধানতঃ আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করে থাকি। কথা-শিল্পী তাঁর বিচিত্র কথা-নৈপুণ্যের মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তোলেন কাহিনীর অপরূপ ছবিগুলি। কিন্তু আমাদের মনের ভাবগুলি স্পষ্টতর ও অধিকতর স্থায়ী হয়, যখনই আমরা সেগুলিকে একটি বাহ্যিক, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপ দিতে সক্ষম হই। ভাষার সাহায্যে যে ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা যায় তা অনেক বেশী স্পষ্ট, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও চিত্তাকর্ষক হয় যদি সেইটিই চিত্রে, ভাস্কর্য্যে অথবা কোনও কারুশিল্পে রূপ পরিগ্রহ করে। এইজন্যই আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে হস্তশিল্পকে শিক্ষাদানের একটি সুষ্ঠু উপায় বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। পুঁথিগত জ্ঞান আহরণ করাই বর্ত্তমান শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বর্ত্তমানে শিক্ষা শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষার দ্বারা শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে—তার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন শক্তি ও সম্ভাবনা অস্ফুট, সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান আছে তাকেই সম্যক্‌রূপে বিকশিত করে তোলাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এইজন্যেই আধুনিক শিক্ষায় ইন্দ্রিয়গুলির সম্যক্ অনুশীলনের (Sense-training) উপর শিশুর ভবিষ্যৎ শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করা হয়। বিদ্যালয়ে শিশু শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই শিক্ষালাভ করবে না—তাকে শুধু শ্রোতা হলেই চলবে না। তাকে একাধিক ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন করে "হাতেকলমে" শিখতে হবে। সে যা শুনবে সেগুলি যদি সে চোখে দেখবার ও হাত দিয়ে স্পর্শ করবারও সুযোগ পায়, তা হলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করা ও মনে রাখা তার পক্ষে কত বেশী সহজ হবে। তার ধারণাগুলিও তা হলে কত দৃঢ়তর, এবং স্পষ্টতর হবে। এই রকম করে বিদ্যালয়ে হস্তশিল্পের সাহায্যে শিশুকে একাধিক ইন্দ্রিয়ের চর্চ্চা করে শিখবার সুযোগ দেওয়া যায়। বিদ্যালয়ের পাঠসমূহ শিশুর কাছে নিতান্ত নীরস ও অর্থহীন বলে মনে হবে যদি না বিষয়বস্তুর প্রতি তার মনে ঔৎসুক্য এবং আগ্রহ জাগানো যায়। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া দরকার শিশুর মনে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মানো—তার কৌতূহল উদ্দীপিত করা। এই জন্য বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন পাঠগুলি যথাসম্ভব মনোজ্ঞ ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করতে চেষ্টা করতে হবে। তা হলে শিশুর মন স্বতঃই পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং শিক্ষকের কাজও অনেক সহজ হয়ে যাবে।

আমরা জানি শিশুরা ছবি, বিশেষ করে রঙীন ছবি খুব ভালবাসে। তাই তাদের মনকে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে—সুরঞ্জিত চিত্রের সাহায্যে। শিক্ষাদান কালে শিশুদের মনে অনেক নূতন জিনিষ সম্বন্ধে এমন ধারণা জন্মাতে হবে যা তারা কখনও চোখে দেখে

নি। তাদের কল্পনা-শক্তিও পরিণতবয়স্কদের চেয়ে অনেক বেশী সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে প্রকৃত জিনিষ দেখিয়ে শিশুদের শিক্ষা দিতে পারলেই ভাল হয়। কিন্তু অনেক সময়ে তা আদৌ সম্ভবপর হয় না। এই রকম স্থলে সেই জিনিষগুলির 'আদর্শ' (model) যদি আমরা মাটি অথবা অন্য কোনও পদার্থ দিয়ে গড়ে দেখাতে পারি তা হলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি কতকটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও সরস করে তুলতে পারা যাবে। 'আদর্শ' গড়ে বিষয়গুলি বোঝানো সম্ভব না হলে সেগুলি ছবিতে এঁকে দেখাতে পারলেও পাঠগুলি ছেলেমেয়েদের কাছে অনেক সহজ ও বোধগম্য হয়। এহেতু আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ববিদেরা যথাসম্ভব ছবি, চার্ট, আদর্শ ইত্যাদি প্রদীপনের (illustration) সাহায্যে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া সমীচীন মনে করেন। শিশুরা চঞ্চল, ক্রীড়াশীল ও কর্ম্মপ্রিয়। কিছু না করে শুধু স্থিরভাবে বসে শিক্ষকের নীরস উপদেশ শুনে যাওয়া তাদের পক্ষে কষ্টকর। শিক্ষক যদি ছবি, চার্ট, আদর্শ ইত্যাদির সাহায্যে পাঠ্য বিষয়ের নীরস তথ্যগুলি সরস, ও প্রত্যক্ষগোচর করে তুলতে প্রয়াস পান তা হলে তাঁর পক্ষে শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করাও অনেক সহজ হয়। পাঠদান কালে শিশুদের যথাসম্ভব কাজে ব্যাপৃত রাখতে এবং তাদের কৌতূহল সজাগ রাখতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা অমনোযোগী হবার সুযোগ না পায়। ছবি, চার্ট, আদর্শ ইত্যাদি শিশুদের শুধু দেখালেই হবে না—প্রশ্ন দ্বারা শিক্ষক এইগুলি সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করবেন—তাদের যুক্তি ও কল্পনা প্রয়োগ করে উত্তর দেবার সুযোগ দিবেন—তাদের চিন্তা করে উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন।

শিশুরা বৈচিত্র্যপ্রিয়। একই রকম কাজ তারা বেশীক্ষণ করতে মোটেই ভালবাসে না, বিরক্ত বোধ করে। একরকম কাজ তাদের বেশীক্ষণ করতে দেওয়া সমীচীন নয়। বিদ্যালয়ে নিম্নতম শ্রেণীগুলিতে প্রত্যেক পাঠের পরে শিশুদের কিছু হাতের কাজ, খেলা, অভিনয়, অথবা ব্যায়াম করতে দিলে ভাল হয়। পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের মত শিশুরাও চায় আত্মপ্রকাশ করতে—তাদের মনের ভাবগুলিকে একটি বাহ্যিক রূপ দিতে —কোনও কিছু লিখতে, আঁকতে বা গড়তে। তাদের সে চেষ্টা কার্য্যতঃ যতই ব্যর্থ হোক না কেন, সেদিকে তাদের মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই। তাদের হাতে খড়ি, পেন্সিল বা কলম দিলে তারা তাই দিয়ে খুশীমত কত কি আঁকতে বা লিখতে চায়। মাটি পেলে তা দিয়ে তারা কত কি গড়তে চায়। এতে করে তাদের স্বাভাবিক আত্ম-প্রকাশের চেষ্টাই সূচিত হয়। এই সৃজন-স্পৃহা তাদের একটি সহজ বৃত্তি। তারা তাদের অনভ্যস্ত, অপটু হাত দিয়ে হয় তো কিছুই ঠিকমত আঁকতে বা গড়তে পারে না। তবু এতেই তাদের কত আনন্দ! এমনি করেই তাদের সৃজন-স্পৃহা, কর্ম্ম-স্পৃহা চরিতার্থ হয়। বিদ্যালয়ে এমনিভাবে শিশুদের নানা রকম হাতের কাজ করতে দিয়ে তাদের সৃজন-স্পৃহাকে জাগিয়ে তুলতে হবে—তাদের আত্ম-প্রকাশের সুযোগ ও সুবিধা দিতে হবে। তাদের উদ্ভাবনী শক্তিটি বিকশিত করে তুলতে হবে। এই হস্তশিল্পের মধ্য দিয়েই তাদের অন্যান্য শক্তিগুলিকেও ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে হবে। হস্তশিল্প শিক্ষাদান দ্বারাই তাদের সৌন্দর্য্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে—তাদের বিবিধ রঙের জ্ঞান, বর্ণসমন্বয়, অনুপাত, গঠন-সৌষ্ঠব ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হবে। তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করতে শিখবে—বুঝবে পরিচ্ছন্নতা সৌন্দর্য্যেরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। হস্তশিল্প শিক্ষাদ্বারা শিশুদের পর্য্যবেক্ষণ, স্মৃতি ও কল্পনাশক্তিরও উৎকর্ষ সাধিত হবে। তাদের আঙুলের জড়তা দূর হবে—তারা হস্তশিল্পে নৈপুণ্যলাভ করবে। তারা মনোনিবেশ সহকারে কাজ করতেও অভ্যস্ত হবে। বিদ্যালয়ে শিশুরা হস্তশিল্পের সাহায্যে অনেক বিষয় 'হাতেকলমে' শিখবারও সুযোগ পাবে। অনেক শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের ধারণা স্পষ্টতর হয়, যদি সেগুলি তাদের পুনরায় চিত্রে অথবা আদর্শে প্রকাশ করতে দেওয়া যায়। এতে তারা স্মৃতি ও কল্পনা উভয় শক্তিই নিয়োগ করতে পারবে। এই রকম করে হস্তশিল্পকে একটি প্রকৃষ্ট শিক্ষাদান-প্রণালীতে পরিণত করা যায়। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণতঃ হস্তশিল্প একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় মাত্র বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয়ই হস্তশিল্পের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যায়।

বর্ত্তমানে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে সচরাচর যে রকম হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে আসল উদ্দেশ্য ঠিকমত সাধিত হয় বলে মনে হয় না। এখনও এমন অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে হাতের কাজ প্রায় শিখানোই হয় না বললে চলে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা হস্তশিল্প শিক্ষা দেবার কোনও প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেন না। মনোবিজ্ঞানসম্মত কোনও ধারাবাহিক পদ্ধতি অবলম্বনে হস্তশিল্প শিক্ষা দেবার প্রয়াস কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। কোন্ বয়সের শিশুর পক্ষে কিরূপ হাতের কাজ উপযোগী সে সম্বন্ধেও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নেই। তাঁরা গতানুগতিকভাবে হাতের কাজ শিখিয়ে যান—শিশুদের দৈহিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী হস্তশিল্প শিক্ষা দেবার কোন চেষ্টাই করেন না। হস্তশিল্প শিক্ষা দেবার একটি সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হওয়া বিশেষ দরকার। হস্তশিল্পকে একটি বিশেষ শিক্ষাদান-প্রণালীতে পরিণত করতে হলে অবশ্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকেই কিছু কিছু হস্তশিল্প শিখতে হবে। তা সত্ত্বেও প্রত্যেক বিদ্যালয়েই অন্ততঃ এক জন বিশেষজ্ঞ থাকা দরকার।

বিদ্যালয়ে শিশুদের চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেবার আগে তাদের নানা রকম জিনিষ গড়তে বা তৈরি করতে শেখাতে হবে। তারা মাটি দিয়ে বল, কমলালেবু, কলা, আম, বিলিতী-বেগুন ইত্যাদি প্রথমে গড়তে শিখবে। এই সময়ে তাদের কাগজ কেটে অথবা কাগজ ভাঁজ করে নানা রকম জিনিষ তৈরি করতেও শিখানো যায়। সুন্দর সুন্দর রঙীন ছবি কাটতে দিলেও শিশুরা খুব আমোদ পায়। এই ছবিগুলি পরে এক একটি খাতায় সেঁটে এলবাম প্রস্তুত করলে বেশ ভাল হয়। রঙীন কাগজের উপর শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা দাগ দিয়ে দেবেন—শিশুরা সেগুলি নানা রকম ফল, ফুল, পাতা ও জীবজন্তুর আকারে কাটবে। পরে এই গুলি দিয়ে প্রকৃতি-পঞ্জিকা, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের চার্ট, গল্পের চার্ট ইত্যাদি তৈরি করা যেতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা ছবি এঁকেও শিশুদের সেগুলি বেশ সুন্দর পরিষ্কার করে কাটবার নির্দেশ দিতে পারেন। সেই ছবিগুলিই খাতায় সেঁটে এলবাম তৈরি করা যায় অথবা সেগুলি বড় কাগজে সেঁটে নানা রকম চার্টও প্রস্তুত করা যায়। ছবি আঁকতে শেখাবার আগে এই রকম করে ছবির প্রতি শিশুদের অনুরাগ বৃদ্ধির চেষ্টা করলে ভাল হয়। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা রেখাচিত্রের উপর শিশুদের রঙ দিতে বলবেন। এই রেখাচিত্রগুলি তাঁরা নিজেরা এঁকে দিতে পারেন। শিশুরা যেখানে যে রকম রঙ দেওয়া দরকার সেখানে সেই রকম রঙ দেবে। এই রকম করে তাদের রঙের জ্ঞান দেওয়া হবে। তারা রঙ চিনতে শিখবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ-সমন্বয় করতেও শিখবে। এই সঙ্গে তাদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিরও অনুশীলন করা হবে। তারা প্রকৃত জিনিষের রঙ দেখে ছবিতে রঙ দিতে চেষ্টা করবে। রঙীন কাগজ কেটে কেটে শিশুদের কখনও কখনও তাই দিয়ে খাম, শিকল, পাখা ইত্যাদি জিনিষ তৈরি করতে দেওয়া যায়। কাগজ খুব সরু সরু করে কেটে সেগুলি পাটির মত করে বুনতে দিলেও শিশুরা খুব আমোদ অনুভব করে। কাগজ ভাঁজ করে তাদের নৌকা, দোয়াত, এবং কামরাঙ্গা ইত্যাদি নানা রকম ফল তৈরি করতে দেওয়া যেতে পারে। খালি দেশলাইয়ের বাক্স, সিগারেটের বাক্স, পুরানো কাপড় ইত্যাদি অনাবশ্যক জিনিষ দিয়ে শিশুদের নানা রকম খেলনা তৈরি করতে শেখানো চলে। খেজুরপাতা কেটে তাই দিয়ে পাখা, ব্যাগ ইত্যাদি বোনাও শেখানো যেতে পারে। হস্তশিল্প শিক্ষা দেবার সময়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা এই রকম করে বৈচিত্র্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন—শিশুদের সব সময়ে একই রকম হাতের কাজ করতে দেবেন না। শিশুরা যেন সর্ব্বদা বুঝতে পারে তারা যে কাজ করছে তার দ্বারা বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে। তাদের তৈরি জিনিষগুলি যথাসম্ভব কাজে লাগানো দরকার। তাদের কাটা অথবা তাদের রঙ-দেওয়া ছবি ইত্যাদি দিয়ে প্রকৃতি-পঞ্জিকা, এলবাম, চার্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করলে হাতের কাজ করতে তাদের আরও উৎসাহ হবে। মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে হস্তশিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। তাতে শিশুদের তৈরি জিনিষগুলি দেখানো হলে তাদের উৎসাহ আরও বাড়বে।

সাধারণতঃ ছয় বা সাত বছরের আগে শিশুদের হাতের ও চোখের ক্ষুদ্রতর পেশীগুলির সামঞ্জস্য সাধিত হয় না। এই সময়ে তাদের কোনও উপকরণাদির (apparatus) সাহায্য না নিয়ে ইচ্ছামত বাহু সঞ্চালন করে আঁকতে দিতে হয়—ইংরেজীতে যাকে free arm drawing বলে। এই রকম করে শিশুরা যাতে তাদের হাতের মাংসপেশীগুলিকে স্ববশে আনতে পারে সে বিষয়ে সাহায্য করতে হবে, এতে তাদের চোখের দৃষ্টিও ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসবে। এই সময়ে তাদের 'মাস ড্রয়িং' শিক্ষা দিতে হয়। তারা কোনও একটি বিশেষ আদর্শ দেখে কাগজে রঙ ঘষে ঘষে সেই আকারের জিনিষ তৈরি করবে। একেই 'মাস ড্রয়িং' বলে। এই রকম অঙ্কনে কোনও সীমা-রেখা (outline) থাকে না। ছবির মাঝখান থেকে আরম্ভ করে বাইরের দিকে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিনিষটির আকার গঠন করতে হয়। রঙীন খড়ি বা পেন্সিলটি মাঝখানে ধরতে হবে এবং যে পর্য্যন্ত না জিনিষটির আকৃতি ঠিক হয় সেই পর্য্যন্ত রঙ ঘষতে হবে—ডান দিক থেকে বাঁ দিকে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রঙ ঘষে যেতে হবে। এই রকম করে শিশুদের রঙীন খড়ি বা পেন্সিল দিয়ে রঙ ঘষে ঘষে আম, কলা, শশা, পেঁপে, বিলিতী বেগুন, কমলালেবু ইত্যাদি ফল, নানা আকারের পাতা প্রভৃতি জিনিষ আঁকতে দেওয়া যায়। পেন্সিল বা তুলি ব্যবহার করতে দেবার আগে তাদের রঙীন খড়ি দিয়ে আঁকতে দিলেই ভাল হয়।

কোনও একটি জিনিষের সমগ্র রূপটিই প্রথমে আমাদের মনে মুদ্রিত হয়—পরে তার পৃথক পৃথক অংশের সূক্ষ্মতর বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের লক্ষ্যীভূত হয়। তেমনি ছোট শিশুর মনও কোনও একটি জিনিষের মোটামুটি আকার ও গঠনই আগে ধরতে পারে। চিত্রাঙ্কন ও আদর্শগঠন (modelling) শিক্ষা দেবার সময় এই কথাটি আমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে। এই বয়সের শিশুদের কাছ থেকে আমরা কোনও সূক্ষ্ম কাজ আশা করতে পারি না। তারা যা আঁকবে বা গড়বে তার মোটামুটি গঠন ও আকারটি ঠিক হয়েছে কিনা তাই আমরা দেখব। "মাস ড্রইং" শিক্ষা দেবার পরে তাই শিশুদের রেখাচিত্র আঁকতে শেখাতে হবে। রেখাচিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেবার সময় তাদের প্রথমে যে সাধারণ জিনিষ আঁকতে শেখাতে হবে সে কথা বলাই বাহুল্য। এই সময়ে তাদের কতকগুলি ইংরেজী ও বাংলা অক্ষর দিয়ে নানা রকম নক্সা আঁকতে শেখানো যায়। এতে করে শিশুদের

চিত্রাঙ্কন ও হস্তলিপি দুইটি বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হবে। এই নক্সাগুলিই পরে সূচীকর্ম্মে, বই, খাতা, এলবাম ইত্যাদির মলাটে এবং অন্যান্য জিনিষে ব্যবহার করা যায়।

শিশুদের সর্ব্বদাই আসল জিনিষটি দেখে আঁকতে ও গড়তে দেওয়া উচিত। তা হলে তাদের পর্য্যবেক্ষণশক্তির উৎকর্ষ সাধিত হবে। এই রকম করে জিনিষ দেখে আঁকবার বা গড়বার কিছু অভ্যাস হ'লে তাদের স্মৃতি থেকেও কিছু কিছু আঁকতে বা গড়তে বলতে হবে। এই উপায়ে তাদের স্মৃতিশক্তিরও কিঞ্চিৎ অনুশীলন হবে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা মাঝে মাঝে শিশুদের কল্পনা থেকেও কিছু কিছু আঁকতে নির্দ্দেশ দেবেন। তাঁরা কোনও একটি গল্প বলে কল্পনা থেকে শিশুদের একটি ছবি আঁকতে বলতে পারেন। এই রকম করে শিশুরা কল্পনা-শক্তিও প্রয়োগ করতে শিখবে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা চিত্রাঙ্কনে শিশুদের কোনও মৌলিকতা দেখলেই উৎসাহ দিতে ক্রটি করবেন না। প্রথম থেকেই তাঁরা আর একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন, ছেলেমেয়েরা যেন অতিরিক্ত 'রবার' ব্যবহার না করে—এটি বড়ই খারাপ অভ্যাস। পুনঃ পুনঃ অঙ্কনের দ্বারাই শিশুদের হাত ও চোখ ঠিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তখন তাদের 'রবার' ব্যবহার করা দরকারই হবে না। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা যেন হাতের কাজ শিক্ষা দেবার সময়ে সর্ব্বদাই কোনও একটি বাঁধাধরা বিষয়-তালিকা (Syllabus) অনুসরণ না করেন। শিশুরা স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে নূতন কিছু আঁকলে বা গড়লেই তাদের উৎসাহ দিতে চেষ্টা করা উচিত। ছেলেমেয়েরা পেন্সিল দিয়ে রেখা-চিত্রাঙ্কনে কিছু অভ্যস্ত হলে তাদের ক্রমেই কঠিনতর বিষয় আঁকতে শেখাতে হবে। ক্রমে তাদের অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর কাজও করতে দিতে হবে। সেই রকম আদর্শগঠনেও তাদের বস্তু-বিশেষের সূক্ষ্মতর আকৃতি ও গঠন-বৈশিষ্ট্য শেখাতে হবে। শিশুদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাংসপেশীগুলি ক্রমশঃ বশে আনীত হয়; তাই তাদের পক্ষে তখন সূক্ষ্মতর কাজ করাও সহজ হয়। তারা অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয় অঙ্কনে কিছু অভ্যস্ত হলে ক্রমশঃ তাদের আলো-ছায়ার (light and shade) জ্ঞান, দূরত্ব অনুযায়ী জিনিষের আয়তনের তারতম্য ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা জন্মাতে হবে। পরে তাদের রঙ ও তুলি ব্যবহার করে ছবি আঁকতে শেখাতে হবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক হস্তশিল্প ছাড়াও ছেলেমেয়েদের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি প্রয়োজনীয় কারুশিল্প শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। সংসারের অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষও তাদের তৈরি করতে শেখানো যায়—যেমন তাল বা খেজুর পাতার পাখা, বাস্কেট বোনা, বেত বা বাঁশ দিয়ে নানা রকম জিনিষ বোনা, তাঁতে গামছা তোয়ালে ঝাড়ন গালিচা ইত্যাদি বোনা, চামড়ার কাজ, মাটির কাজ, খাম তৈরী করা, বই বাঁধানো, নারকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি, পাপোষ তৈরি করা ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে কোনও একটি বিশেষ কারু-শিল্প শিখে ছেলেমেয়েরা পরে ভবিষ্যৎ জীবনেও এর সাহায্যে কতকাংশে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারে। অনেক ছাত্রছাত্রী হয় তো পড়াশুনায় আদৌ মনোযোগী নয়, অথবা তাদের মেধা বা স্মৃতিশক্তি এতই কম যে, তারা জ্ঞানার্জ্জনে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারবে না। এই সব ছেলেমেয়েকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা দেবার বৃথা চেষ্টা না করে কোনও হাতের কাজ শেখালে অভিভাবকদের অযথা অর্থ নষ্ট হয় না। অনেক সময়েই দেখা যায় এই সব ছেলেমেয়েরা হাতের কাজে বেশ পটু হয়। এক্ষেত্রে এদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা দেবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, পিতা মাতা বা অন্য অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখা উচিত ছেলে মেয়েদের মনের স্বাভাবিক গতি বা প্রবৃত্তি কোন্ দিকে। তাদের স্বাভাবিক রুচি ও প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করা বিশেষ দরকার।

আজকের দিনে একান্ত পুঁথিগত বিদ্যার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। শিশুদের শুধু কতকগুলি "পুস্তকের কীট" করে গড়ে তোলাতে যে বিশেষ কোনও সার্থকতা নেই একথা অনেকেই অনুভব করছেন। পুস্তকের মধ্যে যে অশেষ জ্ঞানরাশি যুগযুগান্তর ধরে সঞ্চিত হয়ে আসছে তা থেকে বিদ্যা আহরণ করবার স্পৃহা যেমন শিশু-মনে জাগিয়ে তুলতে হবে তেমনি তাদের প্রস্তুত করতে হবে প্রাত্যহিক জীবনের কঠিন সমস্যাগুলির সম্মুখীন হবার জন্যেও। শিশুর সামনে রয়েছে তার অনাগত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—সেই ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে কি জটিল সমস্যা প্রচ্ছন্ন আছে তা কে জানে! তাই জীবনের প্রভাত থেকেই তাকে গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যৎ জীবনের দায়িত্ব বহনোপযোগী করে—তাকে শৈশব থেকেই শিক্ষা দিতে হবে কর্ম্মতৎপরতা। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার প্রাত্যহিক জীবনের কার্য্য-কলাপের সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষার যথাসম্ভব সামঞ্জস্য থাকে। শিশুর কার্য্যকরী শক্তিগুলি সম্যক্‌রূপে বিকশিত করে তোলাও বিদ্যালয়ের শিক্ষার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। নতুবা তার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। হস্তশিল্প শিক্ষার দ্বারা শিশুরা শ্রমের মর্য্যাদা বুঝতে শিখবে—তারা বুঝবে নিজের হাতের কাজে কোনও অপমান বা গ্লানি নেই। তারা কায়িক শ্রমকে হেয় জ্ঞান করবে না। তারা বুঝবে তাদের নিত্যব্যবহার্য্য অত্যাবশ্যক জিনিষগুলি অপরের কায়িক পরিশ্রমেরই ফল। আধুনিক বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনায় হস্তশিল্পকে যে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে তা খুবই সুখের বিষয়। অদূর ভবিষ্যতে এই অভিনব পরিকল্পনা অনুযায়ী বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেশে গড়ে উঠবে এবং বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষার ধারাও বদলে যাবে। তাতে করে অন্ততঃ ছেলেমেয়ে-দের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটবার সম্ভাবনা কমে যাবে। জীবনের সুরু থেকেই শিশুরা শিখবে শ্রমের মর্য্যাদা, আত্মনির্ভরশীলতা ও কর্ম্মতৎপরতা।

‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের রস

শ্রীগোপাললাল দে

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারম্ভে কবি মধুসূদন সরস্বতী দেবীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, ‘গাইব মা বীররসে ভাসি, মহাগীত।’ সুতরাং পাঠকের মনে করা স্বাভাবিক যে কবি বীররসকেই কাব্যের প্রধান রসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ‘সাহিত্যদর্পণ’-প্রণেতা কবিরাজ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ‘শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে।’ ‘অঙ্গী প্রধানঃ’, অতএব কবিরাজের মতে মহাকাব্যের প্রধান রস হইবে শৃঙ্গার, বীর এবং শান্তাদির মধ্যে একটি। অপর আটটি রস এবং অপরাপর সঞ্চারীরস সেই অঙ্গীরসের পোষকতা করিবে। টীকাকার ভট্টাচার্য্য বলিতেছেন, ‘শান্তানামিতি বহুবচনাৎ করুণোঽপি গৃহ্যতে। তেন করুণ প্রধানস্য রামায়ণস্য মহাকাব্যত্ব সিদ্ধিঃ।’’ অতএব করুণরসও কাব্যের অঙ্গীরস হইতে পারে।

‘মেঘনাদবধে’র প্রারম্ভে প্রথম চার পংক্তির মধ্যে কবি ‘বীর’ শব্দটি তিন বার ব্যবহার করিয়াছেন, এমন ক্ষেত্রে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কবি স্বীয় কাব্যখানিকে বীররসের কাব্যরূপে রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহাই করিয়াছেন। এখন কাব্যটি আদ্যোপান্ত বিচার করিয়া দেখা যাক কবির পোষিত আশা পূর্ণ হইয়াছে কি না।

প্রথম সর্গে দেখি বীরচূড়ামণি বীরবাহু সম্মুখ সমরে পড়িয়া হত হইয়াছেন, লঙ্কার রাজসভায় শত শত পাত্র-মিত্র নতমস্তকে বসিয়া আছেন এবং রাবণ পুত্রশোকে বাক্যহীন, তাঁহার ‘ঝর ঝর ঝরে অবিরল অশ্রুধারা।’ দূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে তিনি ‘হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর চূড়ামণি!’ বলিয়া বিলাপ করিয়া বলিতেছেন,

‘নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখরণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?’

সুতরাং পুত্রশোককাতর পিতার করুণ শোকদৃশ্যে কাব্যের অবতারণা। তখনই তিনি বুঝিয়াছেন, ‘একে একে শুকাইছে ফুল. এবে নিবিছে দেউটি।’ প্রাসাদশিখর হইতে রাবণ রণক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তখনও তাঁহার বাক্য ও চেষ্টা করুণরসেরই সৃষ্টি করিয়াছে। করুণরসের অন্তর্নিহিত ভাব ‘শোক’ এবং বীররসের ভাব ‘উৎসাহ’। সেতুবন্ধ সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি পড়ায় রাবণ প্রথমতঃ সমুদ্রকে যথেষ্ট বিদ্রূপ করিলেন এবং পরে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন,

‘উঠ বলি, বীরবলে এ জাঙ্গাল ভাঙ্গি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা।’
‘এই কি সাজে তোমারে অলঙ্ঘ্য, অজেয় তুমি?’
‘কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে বীতংসে;’

কবি এইখানে কিছু বীররসের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও যেন অসহায় রাবণের করুণ অনুনয়ের সুরে ভরা।

তাহার পরেই দেখিতে পাই এক বিচিত্র দৃশ্য, ‘প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।’ সখী-সনাথা চিত্রাঙ্গদার বেশবাস, চেষ্টা এবং বাক্যাবলী একটি চরম করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সর্গের মাঝের দিকে দেখি লঙ্কার রাজলক্ষ্মী ‘ফিরায়ে বদন ইন্দুবদনা ইন্দিরা বসেন বিষাদে দেবী।’ তিনি বলিতেছেন, লঙ্কায় ‘প্রতি গৃহে কাঁদে পুত্রহীনা মাতা, দূতি পতিহীনা সতী।’ প্রমোদ উদ্যানে, শেষের দিকে দেখি, ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলাকে। কবি এই অংশে একটি উপভোগ্য বীররসের সৃষ্টি করিয়াছেন,

‘বামাবৃন্দ নবীন যৌবন
মদে মত্ত ফেরে সবে, মাতঙ্গিনী যথা মধুকালে।’

‘ছিঁড়িয়া কুসুমদাম রোষে মহাবলী মেঘনাদ’ লঙ্কায় চলিয়া গেলেন। রাবণ সেখানে যুদ্ধযাত্রায় সাজিতেছেন ‘বীরমদে মাতি’—এই বীররসের দৃশ্যে পিতাপুত্রের মিলনের ফলে ক্ষণিকের করুণ দৃশ্যের পরেই বন্দীদের বন্দনায় পাই, ‘ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে রঘুপতি।’ সুতরাং করুণরসে আরম্ভ হইয়া প্রথম সর্গ বীররসে শেষ হইল।

দ্বিতীয় সর্গের আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, সমগ্র সর্গটি জুড়িয়া লঙ্কা হইতে ইন্দ্রালয়, তথা হইতে কৈলাস, সর্ব্বত্র মেঘনাদকে বধ করিবার জন্য দেবগণের ষড়যন্ত্র, তাহার মধ্যে বীররসের কিছুমাত্র অবকাশ নাই। ষড়যন্ত্রের হীনতার মধ্যে বীরসের অবসরই বা কোথায়? সমগ্র সর্গে নিয়তির হস্তে ক্রীড়নকস্বরূপ একটি অসহায় বীরপুরুষের ঘনায়মান বিপদ সহানুভূতিশীল পাঠকের মনকে বিষাদব্যথায় ক্লিষ্ট করিয়া তুলে।

তৃতীয় সর্গের প্রারম্ভে প্রমীলার বিরহব্যথা মধুর ভাবজনিত শৃঙ্গাররসকেই রূপ দিয়াছে। অতঃপর কাতরতা ত্যাগ করিয়া প্রমীলা সখীগণের সঙ্গে সবলে লঙ্কা-প্রবেশের সংকল্প করিলেন।

‘দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃকুল বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী;
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?

পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?'

বীররসের একটি উজ্জ্বল চিত্র আমরা এইখানে পাইলাম।

'অগ্নিশিখা তেজে, চলিলা প্রমীলা দেবী বামা দলবলে !'

মেঘনাদবধ কাব্যে রাম-চরিত্রের মহত্ত্ব বোধ হয় এই একটি স্থানেই একবার প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ একবারই। উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াই তাহা যেন চিরতরে ম্লান হইয়া গিয়াছে; আর সে মহত্ত্বের সন্ধান মিলে না। রাম প্রমীলাকে সসম্মানে বিনা বাধায় লঙ্কা-প্রবেশের অনুমতি দিলেন। প্রমীলা চলিলেন,

'তার পাছে শূলপাণি, বীরাঙ্গনা মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশীকলা যথা !'

বীররসের এমন অপূর্ব্ব চিত্র মেঘনাদবধ কাব্যে আর দ্বিতীয়টি নাই।

ইন্দ্রজিতের সহিত প্রমীলার মিলনে কবি আবার আদি রসের চিত্র আঁকিয়াছেন। এই মাত্র যে নারী 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া রামচন্দ্রের সৈন্যদের সম্মুখসমরে আহ্বান করিতেছিল সে-ই এখন প্রিয়তমসমাগমে বিগলিতচিত্ত হইয়া বলিতেছে, 'ভববিজয়িনী দাসী; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে'। পরিবর্ত্তনটি দ্রুত হইলেও অসঙ্গত হয় নাই। মনোহারী মিলনদৃশ্যে পাঠকের চিত্ত একটু রসসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে যে পরম শোচনীয় ঘটনা অনতিবিলম্বেই ঘটিবে পার্ব্বতীর মুখে তাহার পূর্ব্বাভাস পাইয়া পাঠকের মন বিষাদে পূর্ণ হইয়া যায়। করুণ রসে সর্গটি শেষ হয়।

চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে যুদ্ধোদ্যমে ব্যস্ত লঙ্কায় একটা উৎসবের মত ভাব দেখা যায়। এই অংশে কিয়ৎপরিমাণ তরল ভাবের বীররসের সঞ্চার দেখা যায়, তাহা ঘনীভূত হইয়া বৈশিষ্ট্য লাভ করে নাই। আবার এদিকে উক্ত সর্গ-মধ্যে অপহৃতা, অশোক বনে লাঞ্ছিতা, বিরহিণী সীতার দুঃখের অন্ত নাই—'কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে'। তাঁহার করুণ ক্রন্দন উপোদ্ঘাতের বীররসকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। সীতা ও সরমার কথোপকথন করুণ রসের নির্ঝরিণী। মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্য-সৃষ্টিতে, তথা বাংলা কাব্যসাহিত্যে ইহা করুণ রসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বরূপ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, এই কারণেই কাব্যবর্ণিত ঘটনার পক্ষে দৃশ্যতঃ সম্পর্কশূন্য হইলেও এই অংশ মেঘনাদবধের অমূল্য সম্পদ।

পঞ্চম সর্গে দেবকুলপ্রিয় লক্ষ্মণ দেবতাদের আদেশে এবং তাঁহাদের দ্বারা রক্ষিত হইয়া শিবপূজায় বসিলেন। রাম তাঁহাকে বিদায় দিলেন. অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরে। তাঁহার বাক্যে বা কার্য্যকলাপে সময়োচিত উৎসাহ-উদ্দীপনার কিছুমাত্র ভাবও দেখা যায় না। রাম বার বার চিন্তা করেন, নিষেধ করেন, দেবতাদের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, আত্মশক্তিতে বা লক্ষ্মণের পৌরুষের উপর নির্ভর করিবার মত মানসিক দৃঢ়তা তাঁর নাই।

লক্ষ্মণ লঙ্কার উত্তর দ্বারে চণ্ডীর দেউলে একাকী গেলেন, বহু প্রলোভন এবং ভয়ও জয় করিলেন, কিন্তু তিনি জানেন যে তিনি দেবকুলপ্রিয় ও দেবাশ্রিত এবং তাহাই তাঁহার সাহসের ভিত্তি; তাই লেখনীমুখে কবি লক্ষ্মণের বহু বীরত্ব ও সাহসিকতার বর্ণনা দিলেও এই সর্গের বীররসের চিত্র আসলে অবাস্তব অভিনয়ের মত হইয়া গিয়াছে। পাঠকের চিত্ত তদ্দ্বারা অভিভূত হয় না। বরং উক্ত সর্গের স্থানে স্থানে রৌদ্র-রসের যে চিত্র আছে তাহা পাঠকচিত্তকে প্রভাবিত করে।

ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণ বিভীষণের সহায়তায় দেব-মায়াবলে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়া গুপ্তঘাতকের মত ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করিলেন। লক্ষ্মণ ও বিভীষণের চরিত্র যতদূর মসীলিপ্ত হওয়া সম্ভব, তাহা এইখানে হইয়াছে। গুপ্ত ঘাতকের কর্ম্মে বীররসের কোন অবসরই নাই। এই অংশে অতি অল্প পরিসরের মধ্যে ইন্দ্রজিতের বাক্য ও কার্য্যকলাপ আশ্চর্য্য মহিমময়। এই স্বল্পকালস্থায়ী অসম যুদ্ধের ফলে ইন্দ্রজিৎ শাশ্বত কালের মহাবীরগণের তালিকায় স্থান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সকল বীরত্বকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে অবস্থাঘটিত একটি সুগভীর কারুণ্য। দরদী কবির হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে তাহা স্বতঃ উৎসারিত। গুপ্তঘাতকের হস্তে ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলেন বটে, কিন্তু রস-বিচারের দিক দিয়া কাব্যটিকে একেবারে অমৃতধারায় নিষিক্ত করিয়া দিয়া গেলেন।

সপ্তম সর্গে পুত্রশোকার্ত্ত রাবণের যুদ্ধসজ্জায় এবং দেবগণের সহিত রণে বীররস সত্যই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

'স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি,
সরোষে গর্জ্জিয়া রাজা কহিলা গভীরে;
চালাও। হে সূত, রথ যেথা বজ্রপাণি
বাসব।"

রাবণের রথ চলিল, কার্ত্তিকেয় বিনাযুদ্ধে পথ ছাড়িলেন, ইন্দ্র আহত ও শক্তিহীন হইয়া পলাইলেন; রামকে তখনকার মত পাশ কাটাইয়া রাবণ লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে ছুটিলেন এবং তাঁহাকে অব্যর্থ শক্তিশেলে আহত করিলেন। কবি এই স্থানে সার্থক যুদ্ধবর্ণনার দ্বারা একটি অপূর্ব্ব বীররসপূর্ণ কাব্যাংশের সৃষ্টি করিয়াছেন। রাবণের বীরত্বের চরম বিকাশ সপ্তম সর্গে।

অষ্টম সর্গে শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণকে লইয়া রাম ও বানরগণের বিলাপে অবিমিশ্র করুণ রসই উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। রামের নরকদর্শনদৃশ্যে বীভৎসরসের অবতারণা হইয়াছে, দশরথের সহিত রামচন্দ্রের মিলনে সঞ্চারীরসে বাৎসল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

নবম সর্গে মৃত ইন্দ্রজিতের শোকযাত্রার যে একটি সুমহান্ শোকগাম্ভীর্য্যপূর্ণ বর্ণনা আছে তাহা পাঠকের চিত্তকে যুগপৎ গাম্ভীর্য্যে এবং কারুণ্যে পূর্ণ করিয়া দেয় এবং মনে যেন চির দিনের জন্য একটা ছাপ রাখিয়া যায়। দরদী পাঠক-চিত্তে অনবরত ধ্বনিত হইতে থাকে কাব্যের সর্ব্বশেষ দুইটি ছত্র, 'বিসর্জ্জি' প্রতিমা যেন বিজয়া-দিবসে, সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।'

এখন সতর্ক বিচার করিয়া বলিলে বলিতে হয়, সমগ্র কাব্যে প্রধানতঃ বীর ও করুণরস স্থান পাইয়াছে এবং তাহা-

রের গভীরতা, ব্যাপকতা এবং চিত্তদ্রবকারী শক্তির বিচারে কাব্যটিকে অবশ্যই বীররসাত্মক না বলিয়া করুণ-রসাত্মক বলিতে হয়। যদিও কবি আদিতে বীররসের কাব্য লিখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন তথাপি কার্য্যতঃ তিনি কাব্যটিকে করুণ রসোত্তীর্ণই করিয়াছেন।

হয়ত বা তাঁহার মনে এই ইচ্ছাই ছিল ; কারণ কাব্যটির যখন আরম্ভ, তখন কবি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন, "Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with 'Vira ras'. Let me write a few epiclings and thus acquire a pucca fist."

বীররসাত্মকই হউক আর করুণরসাত্মকই হউক, কাব্যটি যে ট্র্যাজেডি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্ত্য আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন, 'সার্থক ট্র্যাজেডির জন্য চাই নায়কের সুমহান্ বিরাট্ ব্যক্তিত্ব। নায়ক যত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইবে— ট্র্যাজেডি হইবে তত গভীর।' হয়ত সেই কারণেই বীররসের অবতারণা দ্বারা কবি তাঁহার করুণরসাত্মক ট্র্যাজেডির নায়কের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা ট্র্যাজেডির গভীরতা ও বিরাটত্বকে রূপদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এদিকে, রামায়ণ-কথা চিরকরুণ ; এমনও হইতে পারে যে সেই কাহিনীকে বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করার ফলেই গোড়ায় ইচ্ছা থাকিলেও এবং মূলতঃ 'পুটপাকো প্রতিকাশো রামস্য করুণোরসঃ'কে ত্যাগ করিলেও কবি সেই করুণরসের জারক প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারিলেন না।

ওদিকে স্বধর্মভ্রষ্ট, সমাজচ্যুত, আত্মীয়স্বজন-পরিত্যক্ত, ভাগ্যবিড়ম্বিত কবির পক্ষে করুণরসই তো স্বাভাবিক রস। মধুসূদনের বাহিরের সাহেবী পোষাক ও চালচলনের আড়ালে তো লুকানো ছিল খাঁটি একটি বাঙালী-চিত্ত। সে যুগে বিদ্যাসাগর ছিলেন বাঙালী পোষাকপরা সাহেব; আর মাইকেল ছিলেন সাহেবী পোষাকপরা বাঙালী। তাই ষষ্ঠ সর্গ শেষ করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন—'It cost me many a tear to kill him.'

আবার এমনও হইতে পারে যে লিখিতে আরম্ভ করিয়া কবির "মনে ছিল এক, হয়ে গেল আর'। কেননা কিছুদিন পরেই কবি আর একখানি পত্রে লিখিয়াছেন— 'I never thought I was such a fellow for the pathetic.' করুণরস-রচনার সার্থকতা বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল। তবে কি করুণ রসসৃষ্টিই প্রারম্ভে উদ্দিষ্ট ছিল? অথবা দৈবক্রমে তাহা আসিয়া পড়িল এবং অবশেষে অর্দ্ধ-অচেতন ভাবাবিভূত কবি নিজ অপ্রয়াসলব্ধ সার্থকতায় বিস্মিত হইয়া নিজেকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,'কিমিদং ব্যাহৃতম্ ময়া?'—এ আমি কি লিখিলাম? এমন করুণ রসাত্মক কাব্য লিখিতে পারি তাহা ত জানিতাম না!

কয়েকটি ক্ষুদ্র কাব্য লিখিয়া হাত পাকাইয়া একখানি মহাকাব্য লিখিবার আকাঙ্ক্ষা কবির ছিল। 'মেঘনাদবধ' কাব্য হয়ত তাহাদেরই একখানি। তিনি লিখিয়াছিলেন, সুযোগ-সুবিধা, উপযুক্ত অবসর এবং যোগ্য বিষয়বস্তু পাইলে 'I could have made a regular Iliad'। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে কবি-কল্পিত সেই মহাকাব্য অলিখিতই রহিয়া গেল। রোগ শোক, দারিদ্র্য, অনবসর কবির সংকল্পকে সত্যে-পরিণত হইতে দিল না।

দুর্লভ

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

ভাললাগা পাছে ভালবাসা হয়ে পড়ে
ছিলাম সভয়ে প্রাণের কবাট এঁটে,
মনের অঙ্গনে দিই-নি আসন পেতে
এলে যবে দূর দুর্গম পথ হেঁটে।
মুক্ত অধরে সুধা প্রলেপের নিচে
জানি হলাহল সমুদ্র উথলিছে,
সারা সংসার মরুতে কোথাও
পানীয় পাই না খুঁজি—
প্রাণের অপার পিপাসা যাহাতে মেটে।
দুর্লভ প্রেম দুয়ারে যেদিন এলো
থরথর করে কাঁপিয়া উঠিল বুক,
ধরিতে গেলাম বাড়ায়ে ব্যাকুল পাণি—
মূল্য শুনিয়া ভয়ে শুকাইল মুখ।
সকল অতীত, সকল ভবিষ্যৎ
ফেলে দিতে হবে জীর্ণ বস্ত্রবৎ,
নিরুদ্দেশের পথে যেতে হবে
অজানার হাত ধরি,
পাথেয়—তাহারি "মোনালিসা" হাসিটুক।

তিমির রাত্রে প্রলয় ঝঞ্ঝা এসে
বনস্পতিরে উড়ায়ে লইতে চায়,
শত-শাখা কোটিপত্রে আন্দোলিয়া
প্রাণপণে তরু প্রতিরোধ করে তায়।
সে জানে কেবল উন্মূল হওয়া সার,
গতির আশায় দুর্গতি হবে তার,
ধ্বংস-পাগল ঝটিকা শোনে কি
পাদপের প্রতিবাদ ;—
তার আনন্দ পরের দুর্দ্দশায়।
আমার প্রতিটি স্নায়ুতে জাগায়ে দিলে
প্রমত্ত বেগ প্রচণ্ড ঝটিকার,
জানি ক্ষণপরে তুমি উড়ে যাবে দূরে,
উড়ায়ে নেবে না এ পাষাণ দেহভার।
তবু যে একদা বুকে দিয়েছিলে দোলা,
জানি তার স্মৃতি জীবনে যাবে না ভোলা,
পথিক পবন কাছে এলে কভু
বনাশ্রয়ী বিটপীর
শুষ্কপর্ণে গুমরিবে হাহাকার।

শেয়ালের সভা

"বন্ধুগণ! সকলেই বলে ঐক্য এবং চীৎকার উন্নতির উপায়। বন্ধুগণ! আমরা সমস্বরে চীৎকার করিতে কখনই ত্রুটি করি নাই। মানুষ ত হইতে পারিলাম না!" ('পঞ্চা-নন্দ,' ২য় কাণ্ড, ৩য় সংখ্যা)

সেকালের সাময়িক-পত্রে ব্যঙ্গচিত্র

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৭২ সনে শিশিরকুমার ঘোষ 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে সর্ব্বপ্রথম ব্যঙ্গচিত্রের অবতারণা করেন। এরূপ একখানি চিত্র—"ক্যাম্বেলের মডেল ডেপুটি" আমরা গত বারে প্রকাশ করিয়াছি।

ইহার দুই বৎসর পরে বিলাতী *Punch*-এর অনুকরণে ব্যঙ্গচিত্র-সম্বলিত দুইখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথমখানি 'হরবোলা ভাঁড়'; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—জানুয়ারি ১৮৭৪; পরিচালক—দুর্গাদাস দ্বর। প্রতি সংখ্যায় পূর্ণপৃষ্ঠা চার-পাঁচখানি লিথো-চিত্র মুদ্রিত হইত। 'গৌরচন্দ্রিমা'য় ভাঁড় বলিতেছেন:—

"কেন আমি আসরে নামলেম, উদ্দেশ্য আমার কি, কার্য্যই বা কি, সেই কথা এখন বলি। সমাজের ছবি চিত্র কোর্‌বো;—এক পৃষ্ঠে ছবি, এক পৃষ্ঠে দর্পণ।—ছবি দেখে যাঁহারা তুষ্ট হবেন, দর্পণে তাঁহারা পবিত্র মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব অবশ্যই দেখ্‌তে পাবেন। আর আমার ছবিতে যাঁহারা রুষ্ট হবেন, তাঁহারা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তি দর্পণেই দেখ্‌বেন।"

'হরবোলা ভাঁড়' ২য় সংখ্যা হইতে দ্বিভাষিক পত্রে—"A Monthly Anglo-Vernacular Illustrated Comic Journal"-এ পরিণত হয়; নামকরণ হয়—"The Indian Punch· হরবোলা ভাঁড়"।

"হরবোলা ভাঁড়ে"র কয়েক দিন পরেই—১৮৭৪ সনের ৩১এ জানুয়ারি 'বসন্তক' আবির্ভূত হয়। ইহা "প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে" প্রকাশিত হইত। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত:—

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং,
মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং,
প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাক্তকণ্ঠং॥

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পত্রিকার ১ম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—

"লোকের এই রকম স্বভাব, যে, কেহ এক জন নিকটে আসিলে অগ্রে ঐ আগন্তক ব্যক্তির নাম ধাম কর্ম্মাদির বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং সভ্য-

Bridging the Chasm between the two Races
"ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে মিলন-সেতু" ('হরবোলা ভাঁড়')

সমাজেরও মনঃ আমার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হয়েছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করি, আমি যাত্রাওয়ালার সঙের দাদার মতন নই, যে, ফড়্ ফড়্ কোরে না জিজ্ঞাসা কোত্তেই আত্মপরিচয় দিতে থাক্‌বো। আর, যাঁরা ভদ্র, তাঁরা কি আপনি পরিচয় দেন? অপরের দ্বারা পরিচয় দেওয়াই তাঁহাদের নিয়ম। অতএব আমি ভাটের মত আপনার কুলজী না পোড়ে এই-মাত্র বলিতেছি, যে, সভ্যগণ আমার বসন্ত-পঞ্চমীর পর উদয়েই নাম বুঝিবেন এবং এই কীর্ত্তিতেই বৃত্তি জানিবেন।"

সুচারু যন্ত্রালয় (৩৩৬ নং চিৎপুর রোড) হইতে 'বসন্তক' প্রকাশিত হইত। 'হরবোলা ভাঁড়ে'র ন্যায় ইহারও প্রত্যেক সংখ্যায় চার-পাঁচখানি বড় লিথো-চিত্র থাকিত। চিত্রগুলি নিমতলা-নিবাসী গিরীন্দ্রকুমার দত্তের অঙ্কিত বলিয়া মনে হয়। 'বসন্তক' সম্পাদন করিতেন সুচারু যন্ত্রালয়ের অধিকারী প্রাণনাথ দত্ত; তিনি এই সময়ে নবপর্য্যায় 'রহস্য-সন্দর্ভ'ও পরিচালন করিতেন।

অতঃপর ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসে (ইং ১৮৭৮) সুরসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চুঁচুড়ার সাধারণী যন্ত্র হইতে 'পঞ্চা-নন্দ' নামে "রস-প্রধান পত্র ও সমালোচন" প্রকাশ করেন। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—

"এই ত ভবের হাটে রসের পসরা মাথায় উপস্থিত হওয়া গেল! এই ত ভবসাগরে রঙ্গিল পান্‌সী ভাসান গেল! এই ত ভবের বাদিতে আত্ম-বোধন করা গেল! এই ত ভবের আসরে নামা গেল! এই ত ভবলীলা আরম্ভ হইল! এখন দেখা যাউক—তোমারই এক দিন, কি আমারই এক দিন!

পঞ্চা-নন্দ বাহির হইল, লোক-সমাজে এই অলোক-সামাজিক—অলোকসামান্যই বলিতাম, কিন্তু তাহা হইলে অনুপ্রাস ভঙ্গ হয়—এই অলোক-সামাজিক বর্ত্তিকা এখন নয়নানন্দদায়িনী হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এ আলোক কত দিন অন্তরে ভারত-উজ্জ্বল করিবে? সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হন, কিন্তু সূর্য্যের আলোক অতি তীব্র—অসূর্য্যম্পশ্যরূপা! চন্দ্র ক্রমে ক্রমে কলা প্রদর্শনপূর্ব্বক মাসে এক-বার মাত্র পূর্ণমাত্রায় আত্মবিকাশ

করেন; তদ্ভিন্ন, পুরাতন কাহিনী অনুসারে চন্দ্রের কলঙ্ক আছে! নিত্য নৈমিত্তিক গৃহস্থের প্রদীপ—
"সুবর্ণ দেউট যথা তুলসীর মূলে"—
মিট্ মিট্ করিয়া জলে, বাতাসে নিবিয়া যায়, এবং টিকা

ধরাইবার সময়ে দীপ হাতে উপস্থিত হয়। তবে এ আলোক কেমন ?

['বসন্তক'

এ আলোক কেমন ? গভীর ভাবে এই গুরু প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা বাধ্য। এ আলোক—বলিয়াই কেলি—এ আলোক করাল কাদম্বিনীর অম্বরবিদারিণী সৌদামিনী সদৃশ ; ভৈরবী শ্যামার সমর-রঙ্গ-কালীন হাসির মত ! ইহাতে জগৎ চকিত হইবে, স্তম্ভিত হইবে, ঘন বিকম্পিত হইবে, মোহিত হইবে ! ভয়ে বিহ্বল হইবে, অথচ আনন্দে অধীর হইবে। তবে আমাদের মুখে এ কথা শোভা পায় না ! নাই পাইল, লেখা ত জমিয়া গেল ! যাহা হইবে তাহা হইবে। অদৃষ্টবাদ, কারণবাদ, বিবাদ, বিসম্বাদ কিছুতেই তাহার প্রতিবাদ হইবে না।

অসময়ে যে বন্ধু, সেই বন্ধু—"শ্মশানেচ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।"—পঞ্চা-নন্দ সেই অসময়ের বন্ধু, পঞ্চা-নন্দ সেই শ্মশান বন্ধু। ষড়্‌দর্শনের লোপে ভারতে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল ; ঔরস পুত্রের অভাবে আরও একাদশ প্রকার পুত্রের ব্যবস্থা মনুসংহিতায় আছে ; সেই জন্ত ষড়্‌দর্শনের অভাব দূরীকরণ জন্ত বঙ্গ-দর্শন, আর্য্য-দর্শন শ্যাম-দেশোদ্ভব যমজ ভ্রাতার ন্যায় কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। এখন তাঁহাদেরও অন্তিম দশা—মুখ ব্যাদান করেন বটে, কিন্তু সে খাবি খাওয়ার জন্ত—আর কি নীরব থাকিবার সময় ? অতএব উঠ বন্ধুগণ উঠ ! জাগ ভারতের হিতব্রত, জাগো !—পঞ্চা-নন্দ স্বয়ং উপস্থিত। (এখানে বুঝিতে হইবে)—অতএব উপস্থিত।

পঞ্চা-নন্দ মুমূর্ষু দেহে জীবন সঞ্চার করিবে, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিবে, অর্থাৎ যাহারা পত্রিকার গ্রাহক হইয়া মূল্য না দেয়, তাহাদিগকে খুব—খুব শক্ত—আরও শক্ত—আশীর্ব্বাদ করিবে। দীর্ঘায়ুরস্তু !

'বঙ্গ-দর্শন' প্রভৃতি সাময়িক পত্র ; সেই জন্ত মাসে মাসে দেখা দিবার আশ্বাস দিয়াছিল। পারে নাই, কারণ বাঙ্গালী—স্ত্রী-জাতি। স্ত্রী-জাতির এমন প্রতিজ্ঞা থাকে না ; প্রথম প্রথম দুদিন দশ দিন, তাহার পরে—ভগবান্‌কি হাত !

পঞ্চা-নন্দ দুঃসময়ের বন্ধু, সেই জন্ত অসাময়িক, যখন ফুরসৎ, তখনি সাক্ষাৎ। পঞ্চা-নন্দ স্ত্রীলোক নহে।

পঞ্চা-নন্দের দর্শনী—যে বার যেমন মর্জ্জি। আধুনিক "দর্শন" সমূহের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কেহ কেহ দিয়া থাকেন ; সে শ্রেণীর লোককে এইমাত্র বলা যাইতেছে যে তাঁহারা যখন চব্বিশ মাসে বৎসর গণনা করিয়া পরিতুষ্ট,

বাজে সাত, লাক্ সাত, লাক্ সাত, লাক্
নেবো বাজার, কোর্‌বো ব্যাপার, হবে সবে তাক্
মোদের বেরিং বেঁচে থাক্। ('বসন্তক')

তখন পঞ্চা-নন্দকেও যাহা ইচ্ছা দিয়া রাখিতে পারেন, অগ্রাহ্য হইবে না !

এমন আশীর্ব্বাদ করি এই ভক্তির মুক্তা, দেবতার ইন্দ্র, নন্দনের পারিজাত, স্নেহের পঞ্চা-নন্দ—দীর্ঘজীবী হইয়া নিজের আয়ুবৃদ্ধি এবং যশোবৃদ্ধি এবং অর্থবৃদ্ধি এবং সর্ব্বসমৃদ্ধির কামনা করিতে রহুন।—এমেন্।"

কিন্তু প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর 'পঞ্চা-নন্দ' ধূমকেতুর মত সাহিত্যাকাশ হইতে সহসা অদৃশ্য হন।

১৮৭৯ সনে ইন্দ্রনাথ ভবানীপুরে বাসা করেন। এই সময় স্থানীয় যুবকবৃন্দ—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি 'পঞ্চা-নন্দ' পুনঃপ্রকাশের জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন; তাঁহারাই কাগজ চালাইবেন, ছাপাইবার সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দেওয়ায় ইন্দ্রনাথ লিখিতে সম্মত হন। পুনর্জ্জীবিত 'পঞ্চা-নন্দ' এবার দেড় বৎসর এই ভাবে চলিয়াছিল :—

—১ম কাণ্ড :

১ম সংখ্যা (পাক্ষিক) ভবানীপুর সুধাকর প্রেস ১৬ মাঘ ১২৮৬ (২৯-১-৮০)
১১শ " (মাসিক) বর্দ্ধমান, বর্দ্ধমান প্রেস ১২৮৭ সাল (১৯-১-৮১)
১২শ " " " " (৮-২-৮১)

—২য় কাণ্ড :

১ম সংখ্যা (মাসিক) বর্দ্ধমান, বর্দ্ধমান প্রেস ১২৮৭ সাল
৩য় " " " ১২৮৮ সাল
৪র্থ " " " " (৩০-৮-৮১)
৫ম-৬ষ্ঠ " " " " (২০-৬-৮২)

সিংহ, নেকড়ে বাঘ ও মেষপাল
(বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশ হইতে উদ্ধৃত)

সিংহ। (একতম মেষের পেট চিরিতেছেন, এমন সময় নেকড়ে বাঘের প্রবেশ) তুমি কে?
নেকড়ে। হুজুর আমি ক্ষুদ্র জমিদার। (মেষপালের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) এগুলি কি মহারাজের খাশের প্রজা?"
সিংহ। হাঁ, ইহারাই আমার মেদিনীপুরের প্রজা। তোমার প্রয়োজন কি?
নেকড়ে। ধর্ম্মাবতার! আমি প্রজাপালন শিখিতে আসিয়াছি। ('পঞ্চা-নন্দ', ২য় কাণ্ড, ১ম সংখ্যা)

'পঞ্চা-নন্দে' মাঝে মাঝে ব্যঙ্গচিত্র থাকিত, কিন্তু ইহা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয় নাই; ইহার শেষ যুগ্ম-সংখ্যাটির মলাটে আছে :—"দ্বিবল খণ্ড…পঞ্চা-নন্দ অর্থাৎ যাহা পণ্ডিতে বুঝিতে নারে মূর্খে লাগে ধন্দ। রস-প্রধান অসাময়িক পত্র ও সমালোচন।"

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের অনেক প্রাথমিক রচনা—যেমন, 'বঙ্গীয় সমালোচক' প্রথমে 'পঞ্চা-নন্দে' (৭ম সংখ্যা, ১৬ বৈশাখ ১২৮৭) স্থান পাইয়াছিল। 'স্বর্ণলতা'-রচয়িতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও ইহার লেখক ছিলেন। ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (১ বৈশাখ ১২৮৭) প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :—"প্রকৃতি। বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা।" 'প্রকৃতি'র সম্পাদক ছিলেন—কাব্যবিশারদ।* 'পঞ্চা-নন্দে'র ৩য় সংখ্যায় (১৫ ফাল্গুন ১২৮৬) মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ : "কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমরা 'কল্পনা লতিকার' নাম 'কল্পলতা' রাখিলাম এবং 'স্বর্ণলতা' প্রণেতা ইহার সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিলেন। শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কার্য্যাধ্যক্ষ।" তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৭ম সংখ্যা হইতে 'কল্পলতা'র সম্পাদক হন জানা যাইতেছে; কারণ ২য় সংখ্যায় (১ ফাল্গুন ১২৮৬) মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে পাইতেছি : "কল্পলতার ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে।"

'পঞ্চা-নন্দ' সত্য সত্যই "জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ, সরস ব্যঙ্গ, তীব্র বিদ্রূপ এবং পবিত্র আমোদের খনি" ছিল। ইহার বহু রচনা ইন্দ্রনাথের 'পাঁচু ঠাকুর' গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক এগুলির সরস রহস্য উপভোগ করিতে পারেন।

আমরা ব্যঙ্গচিত্র-সমন্বিত তিনটি মাত্র সাময়িক-পত্রিকার সামান্য পরিচয় দিলাম। এই জাতীয় আরও পত্র-পত্রিকা সেকালে বাহির হইয়া থাকিবে।

* পঞ্চম সংখ্যার (১২ চৈত্র ১২৮৬) 'প্রকৃতি'র বিজ্ঞাপনের সহিত ভবানীপুর সুধাকর প্রেসে মুদ্রিত, নেহালচাঁদ-রচিত 'জেনানা জওয়ান' নামক "অভিনব রহস্য কাব্যে"র বিজ্ঞাপন আছে; ইহা খুব সম্ভব ছদ্ম নামে কাব্যবিশারদের রচনা।

প্রবাহ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

৭

পর দিন বেলা চারিটা নাগাদ সুনির্ম্মলের মোটর আসিয়া হোষ্টেলের সম্মুখে দাঁড়াইল। ড্রাইভারকে সরাসরি ফেরত পাঠাইতে পারিলেই সে খুশী হইত। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা সম্ভব হইল না। তাহাকে যাইতে হইল। ড্রাইভার মৃন্ময়কে সুনির্ম্মলদের বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল। তাহাকে রীতিমত ব্যস্ত মনে হইল।

সুনির্ম্মলকে সাক্ষাৎ বাহির মহলেই পাওয়া গেল। এক-মুখ হাসিয়া সে অগ্রসর হইয়া আসিল, কহিল, এসেছ তা হলে ?

মৃন্ময় জবাব দিল, কাল দেখা না করে ওভাবে একটা চিঠি রেখে এলে কেন ?

সুনির্ম্মল হাসিয়া কহিল, কারণ তোমার সঙ্গে বসে তর্ক করবার সময় কাল আমার হাতে ছিল না।

মৃন্ময় মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া কহিল, ও···কিন্তু এই জরুরী তলবের কারণ জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?

সুনির্ম্মল কহিল, জিজ্ঞেস তুমি যথাস্থানেই করো। আজকের নিমন্ত্রণ আমার নয়, আমার বোন রুবীর। তার আজ জন্মদিন।

মৃন্ময় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, এ ভাবে আমায় অপ্রস্তুত করা তোমার উচিত হয় নি সুনির্ম্মল। তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা হলেও—এই সব সামাজিক ব্যাপারে—ছি ছি সুনির্ম্মল, তোমার একটু কাণ্ডজ্ঞান পর্য্যন্ত নেই।

সুনির্ম্মল কথাটা মানিয়া লইয়া কহিল, ও জিনিষটা আমার চিরদিনই একটু কম। কিন্তু আপাততঃ তুমি ওপরে যাও, আমি কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যাচ্ছি।

মৃন্ময় বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, তুমি বেরিয়ে যাবে আর আমি···

সুনির্ম্মল কহিল, তাতে কিছু অসুবিধা তোমার হবে না। রুবী রয়েছে তার বন্ধু-বান্ধবীরা রয়েছেন। দেখতে দেখতে আমি এসে পড়বো।

বাধা দিয়া মৃন্ময় কহিল, তার চেয়ে আমি এখানেই তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

সুনির্ম্মল কহিল, সেটা তোমার ইচ্ছে অবশ্য রুবীর যদি কোন আপত্তি না থাকে।

রুবী দেখা দিল। সুনির্ম্মল তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, ইনিই মৃন্ময় ভট্টাচার্য্য। তোমার অতিথি। আর এই আমার বোন রুবী। সুনির্ম্মল চোখের পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রুবী দুই করতল একত্র করিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, আপনার কথা দাদার মুখে আমি এত বেশী শুনেছি যে, আপনাকে আর অপরিচিত বলে ভাবতে পারছি না। বহু প্রশংসার সঙ্গে দাদা আপনার গানের প্রশংসা করতেও ভোলেন নি।

মৃন্ময় মৃদু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, সুনির্ম্মল একটা আস্ত পাগল।

রুবী মৃদু হাসিয়া কহিল, কিন্তু মিথ্যাবাদী নয় নিশ্চয়ই।

মৃন্ময় একথার জবাব দিল না।

রুবী কহিল, ভেতরে চলুন।

মৃন্ময় তাহাকে অনুসরণ করিল।···

···কে মৈত্রেয়ী···আয় ভাই। রুনু আসেনি বুঝি! কি হ'ল আবার তার। মৃন্ময়ের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া স্মিতহাস্যে কহিল, বসুন। মৃন্ময় বসিল।

রুবী মৈত্রেয়ীকে বসাইয়া নিজেও তার পাশে বসিয়া অনর্গল বকিয়া চলিল, কি মেয়ে এই রুনু—অসুখ ওর লেগেই আছে। আজ মাথাধরা, কাল টন্‌সিল অপারেশন, পরশু জ্বর জ্বর ভাব। অছিলার আর অভাব নেই। রেণু ত ফোন করে দিয়েই খালাস, বলে, মার শরীর খারাপ। মাদের আবার শরীর ভাল থাকে কবে। কার কথা বলছ লিলিদির—দাদা নিজেই গেছেন আনতে। এসে পড়বে এখুনি। কিন্তু রুনু এলো না, গাইবে কে ?

মৈত্রেয়ীর প্রশ্নে মৃদু কণ্ঠে রুবী কহিল, দাদার বন্ধু। এ ভেরি গুড্ স্কলার। উহাদের কথা আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। রুবীর বান্ধবীর দল আসিতে সুরু করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল রুনু এবং রেণুও আসিয়াছে।

রুবি কহিল, কি ভাগ্যি, আজ বহালতবিয়তে আছ রুনু।

রুনু কহিল, ভাল আর কোথায় রুবী-দি, সর্দ্দি-কাশি লেগেই আছে। গলায় কিছু নেই।

মীরা হেনার চোখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। প্রকাশ্যে কিছু কহিল না। কিন্তু রেণু আবার স্পষ্টবাদিনী, সে থামিল না, কহিল, কি ভাগ্যি গান শিখিনি, নইলে সর্দ্দি-কাশি কি আমাদেরই ছেড়ে কথা কইত!

ছবি মুখে কিছু না বলিলেও প্রকারান্তরে রেণুর কথায়ই সায় দিল। মৃন্ময় বলিয়া যে একটি পুরুষ মানুষ এখানে উপস্থিত আছে তাহা যেন উহারা গ্রাহের মধ্যেই আনিল না। মৃন্ময় গবাক্ষপথে বাহিরে দৃষ্টি রাখিয়া এদের রকমারি কথাবার্ত্তা

ভাসিতেছিল, আর সুনির্ম্মলের বিলম্বের জন্য মনে মনে অনুযোগ করিতেছিল।

এদের কথার ফাঁকে রুবী একবার মৃন্ময়ের নিকট হইতে ঘুরিয়া গেল। মৃদু কণ্ঠে কহিল, আপনি যেন কিছু মনে করবেন না মৃন্ময় বাবু। সামান্য দোষত্রুটি ওরা ক্ষমা করবে না। তাই···থাক ঐ যে দাদাও এসে পড়েছে।

সুনির্ম্মল এতক্ষণে ফিরিল। সঙ্গে আছে লিলি। সকলের দৃষ্টি এক সঙ্গে তার প্রতি আকৃষ্ট হইল। সাধারণ বাঙালী মেয়ের মত স্বাস্থ্যহীন সে নয়। অটুট স্বাস্থ্য এবং যৌবন-লাবণ্য তাকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। মৃন্ময় বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল। ততক্ষণে সুনির্ম্মল মৃন্ময়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। মৃন্ময়ের এই বিমুগ্ধ ভাবটি সুনির্ম্মলের দৃষ্টি এড়াইল না। ঠোঁটের কোণে একটু বাঁকা হাসি মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। লিলিকে কহিল, ইনি মৃন্ময় ভট্টাচার্য্য। আমার বিশিষ্ট বন্ধু। লিলি স্নিগ্ধ হাসিয়া মৃন্ময়কে নমস্কার জানাইল।

লিলিকে দেখাইয়া পুনশ্চ সুনির্ম্মল কহিল, আর ইনি হচ্ছেন লিলি সান্যাল। এবারে বি-এ দেবেন।

লিলি মৃন্ময়ের পাশে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল এবং মৃদু হাসিয়া সুনির্ম্মলকে কহিল, আপনাকে ত অতিথি অভ্যাগতদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে, আমি বরং মৃন্ময় বাবুর সঙ্গেই ততক্ষণ গল্প করছি।

মেয়েদের মধ্যে বেশ একটা চাপা গুঞ্জন উঠিল। লিলি একবার চারি দিকে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়াই ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইল। কিন্তু সব সময় তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামান লিলি পছন্দ করে না। সে অসঙ্কোচে মৃন্ময়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে বদ্ধপরিকর হইল। মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনি চুপ করে আছেন যে?

মৃন্ময় হাসিমুখে কহিল, গল্প করার মত বিষয়বস্তু না থাকলে যা হয় আমার তার থেকে কিছু বেশী হয় নি। আপনি নিজেই বলুন না আমি মিথ্যে বলেছি কিনা?

লিলি সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

রুনু কহিল, লিলিদির সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি।

মীরা কহিল, নিছক অহঙ্কার—

রুনু আরও খানিকটা যোগ করিয়া দিল, তবু যদি না আমরা হাঁড়ির খবর জানতাম।

রেণু বাধা দিয়া কহিল, তা বলে লিলিদিকে শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না।

রুনু কহিল, রেণুর যে বেজায় টান দেখছি।

রেণু মৃদু শ্লেষ সহকারে কহিল, কথাটা মিথ্যে বলো নি রুনু।

আলোচনাটা আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে না দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। রেণুকে ওরা ভয় করে। রেণুর মুখ বড় আলগা। সত্য কথা সোজা করিয়াই বলিতে সে ভালবাসে।

রেণু থামিতে পারিল না। বলিয়া চলিল, অহঙ্কারটা লিলিদির নয়, এ হচ্ছে আমাদের জঘন্য ঈর্ষা। তাকে ছুঁতে পারি না বলেই নিন্দে করা। আর এই অন্যায় কাজে আমাদেরই আনন্দ হয় সবচেয়ে বেশী।

ইহাদের আলোচনার ধরণে রুবী একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। রেণুকে মিনতি করিয়া কহিল, তুই থাম ত রেণু। অমন বড় বড় কথা আমরাও দু-চারটে জানি। রুবী তাহাকে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিত করিল।

রেণু নির্ব্বিকার ভাবে বলিয়া চলিল, শুধু জানা থাকলেই হয় না রুবী। সময় মত তা প্রকাশ করবার সাহস থাকাও দরকার।···রেণু হয়তো আরও কিছু বলিত, কিন্তু সহসা সীতার আবির্ভাবে সে থামিল। রুবী কহিল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে সীতা?

সীতা কহিল, ওদিকে। লিলিদির ব্লাউসের ডিজাইনটা বড় চমৎকার। একটা নক্সা তুলে নিলাম।

সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

সীতা একটু অপ্রস্তুত হইল, কহিল, ঐ তো তোমাদের দোষ। যেটি তোমাদের মনোমত হবে না সেখানেই করবে ঠাট্টা। বিশ্বাস না হয় দেখে এস ডিজাইনটা।

কিন্তু ডিজাইন দেখিতে যাইতে কেহই আগ্রহ প্রকাশ করিল না। আবহাওয়াটা যেন অকস্মাৎ ঝিমাইয়া পড়িল। কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্য। সুনির্ম্মল আসিয়া পুনরায় হৈ চৈ সুরু করিয়া দিল—হোপলেস! এতটা সময় তোমরা শুধু গাল গল্পেই কাটিয়ে দিলে। না দেখছি একটা হারমোনিয়াম, না সেতার, না এস্রাজ। খাসা! ওদিকেও দেখছি ওরা বেশ গল্প ফেঁদে বসেছে। দুটিই বুক-ওয়ার্ম। মিলেছে ভাল। যেমন মৃন্ময় তেমনি লিলি। এই যে রুনুও এসেছ! তা বলে রেণুকেও আজ ছেড়ে দেওয়া হবে না। কিন্তু তার আগে যন্ত্রপাতিগুলো আনাতে হয়। সুনির্ম্মল অকারণে বিস্তর হৈ চৈ করিল।

রুনুকেই সর্ব্বপ্রথম গাহিতে হইল। ওর গলা বেশ মিষ্টি। টানিয়া টানিয়া গানকে শ্রুতিমধুর করিতে সে পাকা। মেয়েরা ওর বিশেষ ভক্ত। কাজেই পর পর তাহাকেই বহুক্ষণ গাহিতে হইল। তার পর আসিল রেণুর পালা। স্বভাবত সে একটু গলা ছাড়িয়া গায়। অনাবশ্যক মাত্রাগুলিকে দীর্ঘতর করিয়া তোলে না। গায় ভাল। কিন্তু ভক্তের অভাব। কাজেই আরম্ভেই তাহাকে শেষ করিতে হইল, এবং রুনুকেই পুনরায় গাহিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। রুনু হয়ত গান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্তু মাঝখানে

মৃন্ময় এক গোলযোগের সৃষ্টি করিল। কহিল, উনি ত' বেশ গাইছিলেন। ওঁকেই আবার গাইতে বলা হোক না।

রুনু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে এক বার মৃন্ময়ের প্রতি চাহিয়া দেখিল। রেণু অতটা লক্ষ্য না করিয়াই পুনরায় সুরু করিল। কণ্ঠস্বর সুরের উপর নৃত্য করিয়া চলিল। মৃন্ময় একাগ্রভাবে শুনিতে লাগিল। অবশেষে রেণুকেও থামিতে হইল। রুনু পুনরায় অনুরুদ্ধ হইয়াও আর গাহিল না।

সুনির্ম্মল কহিল, রেণু এই অল্প কালের মধ্যে বেশ শিখেছ ত। আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম।

রেণু লজ্জিত ভাবে মাথা নত করিল। রুনুর চোখে জল আসিয়া পড়িল। তার কাছে সুনির্ম্মলের মতামতের একটা বিশেষ মূল্য আছে। সুনির্ম্মল পুনরায় বলিয়া চলিল, সেই বোবা রেণু, যে স্বরগ্রাম করতে পাঁচ বার ঢোক গিলেছে··· জান মৃন্ময়, এরই নাম প্রতিভা। মানুষের মধ্যে যদি এ বস্তু থাকে সামান্য চর্চ্চা করলেই তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। রেণুর মধ্যে লুকান ছিল সেই প্রতিভা।

রেণু হাসিয়া ফেলিল। কহিল, এর পরে কিন্তু সত্যিই লজ্জা পাব নির্ম্মল-দা।

সুনির্ম্মলও হাসিল, কহিল, তা বলে তোমার আর গাইতে বলা হবে না রেণু। এ বারে গাইবেন লিলি। সকলেই একসঙ্গে তাহাকে সমর্থন করিল।

লিলি একটু হাসিয়া কহিল, গান আমি ভাল জানি নে, কিন্তু তা বলে কৃপণ নই। লিলির গানের পরে সুনির্ম্মল আর এক কাণ্ড করিয়া বসিল। মৃন্ময়ের একখানা হাত ধরিয়া কতকটা নাটকীয় ভঙ্গীতে কহিল, মৃন্ময় ভট্টাচার্য্যকে তোমরা শুধু এক জন কৃতী ছাত্র হিসাবেই জান কিন্তু ভগবান যে ওকে দিতে কোন দিক থেকেই কার্পণ্য করেন নি, এবারে তা প্রমাণ হবে।

মৃন্ময় চাপা গলায় কহিল, পাগলামি করো না সুনির্ম্মল।

সুনির্ম্মল থামিতে পারিল না। বলিয়া চলিল, ইনি এক জন ভাল গায়কও। তোমরা অনুমতি দিলে তোমাদের হয়ে আমি ওকে অনুরোধ করতে পারি।

একটা মৃদু গুঞ্জন উঠিল, নিশ্চয় নিশ্চয়। রুনুর গলার আওয়াজ সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

মৃন্ময় স্মিত হাস্যে কহিল, সুনির্ম্মলের বাড়িয়ে বলা স্বভাব। নইলে আপনারাই বলুন ত কলেজ হোষ্টেলে কি আর সঙ্গীত-চর্চ্চা সম্ভব হয়। তা ছাড়া আপনাদের ঐ অরগ্যানে গাইবার তেমন অভ্যাস আমার নেই।

সুনির্ম্মল কি বলিতে যাইতেছিল। তাহাকে থামাইয়া দিয়া রুনু কহিল, আমরা কিন্তু কালোয়াতী শুনতে চাইছি না।

কথা কয়টির অন্তর্নিহিত খোঁচাটি মৃন্ময়কে বিঁধিল কিন্তু সে হাসিমুখেই জবাব দিল, আপনি আমার প্রতি অবিচার করছেন। এখানে যে বাঁয়া তবলা দিয়ে গানের কসরৎ চলছে না সে ত আমি দেখতেই পাচ্ছি। তা ছাড়া···মৃন্ময় মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া যেন একটু রূঢ় কণ্ঠেই কহিল, কার কাছে আমি গানের কসরৎ করব! এ সাধারণ জ্ঞানটুকু আমার আছে।

যে খোঁচা রুনু মৃন্ময়কে দিয়াছিল তার চতুর্গুণ সে ফিরাইয়া দিয়াছে। কথাটা বুঝিয়াই রুনু নীরব রহিল।

মৃন্ময় তার এই কঠোর ব্যবহারে একটু লজ্জিত হইল। মুহূর্ত্তেই সে সুর পাল্টাইয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল, গান-বাজনায় সত্যিই আমি অজ্ঞ। আর সে কথা আমি আগেই আপনাদের জানিয়েছি। তবুও সুনির্ম্মলের কি ছেলেমানুষি দেখুন দেখি। মাঝে থেকে কত কি বাজে বকে আমি নিজেই হলাম অপ্রস্তুত। সত্যই এর কোন আবশ্যক ছিল না। কিন্তু সে যাই হোক, অসৌজন্য যদি কোথাও যা প্রকাশ পেয়ে থাকে তা আপনারা মনে রাখবেন না।

কোন কথায় কি প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল।

সুনির্ম্মল কহিল, তুমি অত্যন্ত প্রগল্‌ভ হয়ে পড়েছ।

মৃন্ময় হাসিয়া এক সঙ্গে অরগ্যানের গোটাকয়েক রিড চাপিয়া ধরিল। মৃন্ময় গাহিয়া চলিল—একের পর এক। কাহারও অনুরোধের অপেক্ষায় রহিল না।

রুনুর মুখে কে যেন এক পোঁচ কালি মাখাইয়া দিল। রেণু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা করিল। আপনি যে কত চমৎকার গান করেন। লিলি কহিল, গানে আপনার সত্যিকারের প্রাণ আছে। রুবী কহিল, দাদা কিন্তু সত্যি সত্যিই মিথ্যা-বাদী নয়। রেণু যেন কিছুতেই থামিতে পারিতেছে না। চাপা কণ্ঠে লিলিকে কহিল, শুধুই কি প্রাণ লিলি-দি! প্রাণের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। কি সর্ব্বনেশে কণ্ঠস্বর।

লিলি রেণুর বাহুমূলে ঈষৎ চাপ দিয়া কহিল, সব কথা সকল সময় বলা চলে না। বলা উচিতও নয়। এ কথাটা বুঝবার মত বয়েস এবং বুদ্ধি তোমার নিশ্চয় হয়েছে রেণু।

রেণু একটু লজ্জিত কণ্ঠে কহিল, আমি কিন্তু কিছু ভেবে বলি নি লিলি-দি।

লিলি হাসিল, কহিল, ভেবে এ কথা কেউ প্রকাশ করে না তা আমি জানি। উভয়ে হাসিয়া ফেলিল।

রুবী জানাইল, আহার্য্য প্রস্তুত।

৮

মৃন্ময় অকস্মাৎ আবিষ্কার করিল যে, এই দুই ঘণ্টায় সে দুটি ছত্রও পড়ে নাই। লিলি, রুনু, রুবি ও মীরার মাঝে যেন খানিকটা একাগ্রতা সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। ওদের শাড়ীর ঝলমলানি, ভাষার সুতীব্র ব্যঞ্জনা, চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণ—এর সবকিছুই চোখের সম্মুখে একটা মায়াজাল বিস্তার করে। সুনির্ম্মলের সুসজ্জিত হল-ঘরের সারি সারি

বৈদ্যুতিক আলোর চোখ ঝলসানো দ্যুতির পাশে' ওরা যেন এক একটি বিদ্যুৎ-ঝলক। মঞ্জুষার সহিত কোথাও এদের একতিল মিল নাই। মঞ্জুষার শান্ত শ্যাম মুখশ্রী, তার লাজনম্র চোখের অকপট দৃষ্টিভঙ্গী মৃন্ময়ের বুকে কোন দিন ঝড় তোলে নাই, কিন্তু একথা সে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারে যে, মঞ্জুষা তার প্রশান্ত বুকের মাঝে নিঃশব্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কোন আলোড়ন নাই, ঝঞ্ঝা নাই; নিঃসঙ্কোচ, নিরুপদ্রব এবং নিঃশব্দ।

মৃন্ময়ের আজ হঠাৎ নিজেকে এ ভাবে যাচাই করিবার বাসনা জাগিল কেন? নিজের অজ্ঞাতেই উহাদের প্রতি হয়তো তাহার খানিকটা দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়িয়াছে। মৃন্ময় সচেতন হইয়া উঠিল। কিসের জন্ত এসব অনাবশ্যক যুক্তি। এ কেমন তার মনের বিলাসিতা! মৃন্ময় নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করে, এদের নিজস্ব বলিতে আছে কি? এদের চালচলন, কথা বলার ভঙ্গী—সবকিছুর মধ্যেই একটা প্রাণহীন উগ্র বৈশিষ্ট্য আছে। চমকপ্রদ—কিন্তু অসার। ওদের মনের খবর সে রাখে না, কিন্তু বাইরের যা, তা মনকে মাতাল করিতে পারিলেও একান্ত ভাবে কাছে টানিতে পারে না। ওরা ক্ষণপ্রভা, মুহূর্ত্তের আনন্দ। ওদের সঙ্গে লইয়া মোটরে হাওয়া খাইতে যাওয়া চলে। পাশে বসাইয়া সিনেমা দেখা যাইতে পারে। টেনিসের পার্টনার করিলেও চমৎকার মানানসই হয়, কিন্তু পল্লীর নিভৃত কোণে একটি শান্ত সুন্দর সংসার রচনা করা সম্ভব নয়। ওরা সব ঝড়ের মত হাওয়া, গ্রাম্য পর্ণকুটির ওদের জন্ত নয়।

সহসা মৃন্ময় আপন-মনেই হাসিয়া উঠিল। এ এক আচ্ছা পরিহাস বটে—যেন উহাদের কেহ তার সহিত সংসার রচনা করিতে উদ্যোগী হইয়াছে—যেন তার জীবনের সহিত জড়াইয়া পড়িতে চাহিতেছে। মৃন্ময় ইংরেজী বইয়ের খানকয়েক পাতা পর পর উল্টাইয়া গেল, কিন্তু তার চিন্তার ধারা অপরিবর্ত্তিত রহিল।

উহাদের মধ্যে লিলির গতিবিধি বেশ সংযত। কথাও কম বলে। ওর ধরণ-ধারণ আলাদা। এই উগ্র পরিবেশের ভিতর হইতেও সুনির্ম্মল নির্ব্বাচনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

অকস্মাৎ মৃন্ময় বই বন্ধ করিয়া রাখিল।

মঞ্জুষার বাবাও রীতিমত ধনী। কিন্তু অর্থের উৎকট তীব্র প্রকাশ কোথাও নাই। বিস্ময় সৃষ্টির অবকাশ তারা দেয় না। যেন সাধারণের এক জন। এক মুহূর্ত্তে মৃন্ময়ের মনটা পদ্মাপাড়ের একখানি শ্যামল পল্লীর পথে ধাবিত হইল। ওখানকার সবই যেন তার চেনা—তার বড় আপন জন। তার জীবনের প্রতিটি ধাপে জড়াইয়া আছে। ওখানে তাকে সঙ্কুচিত হইতে হয় না। দারিদ্র্যের জন্ত কুণ্ঠা দেখা দেয় না। ওখানকার পাখীর গান, নদীর কলতান, জেলেদের জাল ফেলা, নক্ষত্রখচিত আকাশ, পরপারের বৃক্ষশ্রেণীর সুনীল ছায়ারূপ, হিরু নাপিতের কুঁড়েঘর, রাধু বোষ্টমের রামপ্রসাদী সুর, মঞ্জুষাদের তিন মহল বাড়ী—সব যেন গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। একের সঙ্গে অপরের যেন নাড়ীর সম্বন্ধ রহিয়াছে।

মৃন্ময় তন্ময় হইয়া গিয়াছে। গ্রামের অসংখ্য স্মৃতি তার মনকে ঘিরিয়া আছে। তাহার মনে হইল যেন সে নদীর তীরে শ্যাম দূর্ব্বাদলের উপর দেহ বিছাইয়া মঞ্জুষার কোলে মাথা রাখিয়া সাত সমুদ্র তের নদীর পারের গল্পে মাতিয়া উঠিয়াছে। চতুর্দ্দিকের জগৎসংসার যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মঞ্জুষার একখানি কোমল হাত শিথিল ভাবে তার কপালে ন্যস্ত, আর তার কয়েক গুচ্ছ চূর্ণ কুন্তল বাতাসে উড়িয়া আসিয়া মৃন্ময়ের চোখে মুখে মৃদু পরশ বুলাইয়া দিতেছে। বুকে তার কত কথা—যা ভাষার অজস্রতায় গুঞ্জরিয়া উঠিয়াছে। কে আছে তার সাক্ষী। ঊর্দ্ধে উদার-গম্ভীর নীলাকাশ আর নিম্নে পদ্মার খরস্রোত, যাহা অনাদিকাল ধরিয়া কত সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়া চলিবে। কত দিনের এমনি কত মধুর স্মৃতি তার বুকের তলায় ঘুমাইয়া আছে। জীবনের ঐ দিনগুলি তার কাছে অমূল্য। তার মন-মঞ্জুষায় অক্ষয় সম্পদ।

সুনির্ম্মলের গলার সাড়া পাওয়া গেল, মৃন্ময় আছ? ঘরে পা দিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, আঃ! ড্রেডফুল। এই বিকেল বেলাও বই নিয়ে বসে আছ!

মৃন্ময় চোখ তুলিয়া চাহিল। কোন কথা কহিল না।

সুনির্ম্মল পুনরায় কহিল, মেয়েদের কল্পনাশক্তি দেখছি আমাদের চেয়ে ঢের বেশী!

বিস্মিত কণ্ঠে মৃন্ময় বলিল, অর্থাৎ...

সুনির্ম্মল সহাস্যে কহিল, লিলি তোমায় ঠিক চিনেছে। সে বলে, বাহিরমুখো প্রাণী নাকি দেখলেই চেনা যায়। অর্থাৎ তোমার গ্রন্থকীটত্ব সম্বন্ধে কি সে একটা ধারণা করে নিয়েছে। সুনির্ম্মল হো হো করিয়া খানিক হাসিল। কিন্তু তাহাতে মৃন্ময়ের বিস্ময় কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না। সে একটু বাঁকা উত্তর দিল, আমার সম্বন্ধে এই ধরণের আলোচনা ত স্বাভাবিক এবং সুস্থ নয় সুনির্ম্মল। তা ছাড়া আমার সম্বন্ধে তিনি কতটুকু জানেন। কতক্ষণের পরিচয় আমার সঙ্গে তাঁর!

মৃন্ময়ের উক্তির তীক্ষ্ণতায় সুনির্ম্মল সুর পাল্টাইল। কহিল, ভাবটা লিলির হলেও ভাষাটা আমার। কিন্তু তোমার কূট তর্ক থামাও। সত্যি কথা বলতে কি মৃন্ময়, তোমার আইন পড়া উচিত ছিল। সে যাই হোক, এখন এসব বাজে কথা রেখে চলো যাই খানিক বেড়িয়ে আসবে।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, সে রকম ত কোন কথা ছিল না সুনির্ম্মল।

- সুনির্ম্মল কহিল, লিলি অবশ্য বলেছিল—বেড়াবার সময় হয়তো তোমার হবে না। কিন্তু আমি যে ওদের কথা দিয়ে ফেলেছি মিনু।

মৃন্ময় ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, আমার সম্বন্ধে লিলি দেবীর এই ধরণের মতামত প্রকাশ করা যেমন নিরর্থক তোমারও তেমনি কথা দেওয়া অনাবশ্যক। আর তা ছাড়া ওরাই বা কারা যাদের কাছে তোমার কথা রাখতে না পারাটা একটা মস্তবড় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

সুনির্ম্মল রাগত কণ্ঠে কহিল, খামোকা তর্ক করে একটা সীন ক্রিয়েট করো না মৃন্ময়। রুনু, রেণু, রুবি সব তোমার জন্তে মোটরে অপেক্ষা করছে। এর পরে তারা এসে উপস্থিত হলেই কি খুব ভাল হবে।

মৃন্ময় হাসিল। কহিল, তাঁরা যে এখানে আসবেন না বা আসতে পারেন না এ কথা তুমিও জান, কিন্তু আমি ভাবছি তুমি কি ভেবে ওদের এই হোটেল পর্য্যন্ত নিয়ে এসেছ! আশ্চর্য্য···তোমার কি একটা সাধারণ মানসম্মান জ্ঞানও নেই!

সুনির্ম্মল উষ্ণ কণ্ঠে কহিল, না নেই। কিন্তু তুমি কি করবে তাই জানতে চাই।

হাসিমুখে মৃন্ময় কহিল, সে কথা কি আমার বলে দিতে হবে। আমার হয়ে তুমিই বরং তাঁদের কাছে একবার ক্ষমা চেয়ো, কিন্তু তুমি আর দেরি করো না। তাঁরা সব অপেক্ষা করছেন।

সুনির্ম্মল চলিয়া যাইতেই মৃন্ময়কে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করিতে দেখা গেল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে মঞ্জুষার একখানি ছোট ফটো পাইয়াছিল, উহা অপহৃত হইয়াছে। নিশ্চয় ইহা সুনির্ম্মলের কাজ। টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়াই সে কথা কহিতেছিল। মৃন্ময় একটু চিন্তিত হইল। সুনির্ম্মলের ঢাক পেটানো স্বভাব। অবশ্য মৃন্ময়ের ইহাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না। কিন্তু বেচারী মঞ্জুষা হয়তো ওর জানিত মহলে মুখে মুখে আলোচিত হইবে। উহাদের প্রগতিশীল সমাজের আবেষ্টনী হয়তো তাহাকে অকারণে রূঢ় আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। ওদের এই অতি আধুনিকতার সহিত তার খাপ খায় না। তার নিজস্ব একটা নীতি ও মত আছে—যার ব্যতিক্রম সে পছন্দ করে না।

মৃন্ময় উঠিয়া পড়িল। আজ এই মুহূর্ত্তে আর পুস্তকে মনোনিবেশ করা সম্ভব হইবে না, বরং কিছুক্ষণ বেড়াইয়া আসিবার প্রয়োজন সে বোধ করিল। হোটেলের এই দেয়াল-ঘেরা অপরিসর ঘরখানি তার নিকট বিরক্তিকর ঠেকিতেছে।

মৃন্ময় রাস্তা বাহিয়া চলিয়াছে। অগণিত জনস্রোত। একটা প্রাণহীন জাতির নিঃশব্দ পথ-চলা। কারুর মুখে বলিষ্ঠ হাসি নাই। চলমান জনতার নিষ্প্রাণ মিছিল। মৃন্ময় চলিয়াছে। কোথায় কোন ভিখারী দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ত সকরুণ আবেদন জানাইতেছে, সিনেমা বুকিং আপিসে কি পরিমাণ ভিড় জমিয়াছে, হেদোর জলে কে আজ ক্রমাগত দুই দিন ধরিয়া একাদিক্রমে সাঁতার কাটিতেছে—এসব খবর জানিতে তার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। তার চেয়ে পল্লীতে পল্লীতে এবার ধানের ছড়াছড়ি···পদ্মা এবার শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, গ্রামের দুঃখদুর্দ্দশা নাই···তাদের মুখে চোখে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিয়াছে—এ খবর যদি কেহ তাহাকে দেয় মৃন্ময় তাকে খুশিমনে একপেট খাওয়াইয়া দিবে।

মৃন্ময় চমকাইয়া উঠিল, কে···অবিনাশ? বড্ড চমকে উঠেছিলাম। ডাকলে কেন? সাজেস্‌শান চাইছ? হোটেলে যেও। সব কি আর মনে ক'রে বসে আছি। কি বলছ? রেকর্ড ব্রেক করেছে···প্রফুল্ল ঘোষ? তাতে আমার কি। বলতে পার বেকার সমস্যার কোন সমাধানের পথ বেরিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ অন্নচিন্তার সমাধান। কি বলছ? বাঙালী ছেলেরা শুধু স্বপ্ন দেখতে জানে, কাজ করতে জানে না! মিথ্যে কথা। আর এই হীন মিথ্যাই বাঙালীকে তাদের সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক জীবনে দিন দিন দুর্ব্বল করে ফেলছে। তাদের আত্ম-প্রত্যয়ের ভিত্তিকে শিথিল করে দিচ্ছে। না-না অবিনাশ তুমি হেসো না। সত্যিই আমি বাজে কথা বলছি না। কি বলছ কাল যাবে? যেও।

মৃন্ময় দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিল। কিন্তু পুনরায় তাহাকে থামিতে হইল কাঁধের উপর একখানা ভারী হাতের চাপে। সে কি! এবার বাড়ী যাবে না নিশা। পুজোর আর কতোই বা বাকী। পুজোর বাজার করতে বেরিয়েছ? কালই যাচ্ছ তা হলে। কিন্তু আমায় আবার টানছ কেন। বউয়ের জন্তে কাপড় কিনবে?···আ হা হা কে বলছে তোমায় খালি হাতে যেতে।···করছ কি আজকাল? চাকরীর চেষ্টা! বাবার পয়সায় জমিদারী···খানকয়েক বেশী করে নিয়ে যেও বন্ধু!

মৃন্ময় দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিল। আঃ জোর বাঁচিয়া গিয়াছে। অন্তমনস্ক হইবার যো আছে কি। যান্ত্রিক যুগ এটা। যন্ত্রের নব নব আবিষ্কার মানুষের নিরুপদ্রব জীবনে এক বিষম আতঙ্ক। কখন কার ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। মোটর, বাস, লরি, স্থলপথে চলমান দুর্গ, জলে ভাসমান দুর্গ, উভচর দুর্গ, আরও কত কি। মৃন্ময় অন্তমনস্ক ভাবে অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়াছে। আর খানিক পরেই গড়ের মাঠ। ওখানে গিয়া খানিক বিশ্রাম করিয়া লইলে মন্দ হয় না। শহরের মিউনিসিপ্যালিটির এ অঞ্চলের উপর বিশেষ দৃষ্টি আছে। আবর্জ্জনা জমিতে দেয় না। মৃন্ময় মনুমেণ্টের তলায় আসিয়া বসিল। কতকগুলি ছেলেমেয়ে আয়ার সঙ্গে বেড়াইতেছে। দিব্যি স্বাস্থ্য। দেখিতে ভাল লাগে। কত সাহেব মেম বেড়াইতেছে। প্রাণ ভরিয়া

হাসিতেছে। আনন্দের নির্ঝর যেন। মৃন্ময় ভাবে উহাদের কি কোন অভাব নাই, অথবা কোন দুঃখ! জীবনটাকে এরাই উপভোগ করিয়া লইতেছে। এরা পরদেশে আসিয়াও স্বাধীন, আমরা নিজের দেশেও পরাধীন। প্রাণ ভরিয়া একটু হাসিতে পারি না, মন খুলিয়া দুইটা কথা বলিতে পারি না। আমরা নিজেদের ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের দাবি তাই আজ আত্মকলহের ইন্ধন যোগায়। সত্য দাবি মিথ্যার কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন। আলো নাই…শুধু অন্ধকার…নীরন্ধ্র অন্ধকার।

মৃন্ময়কে আজ কি ভূতে পাইয়াছে? সে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে। আজ এই সব এলোমেলো ভাবনা তাহার মনকে নাড়া দিয়াছে কিসের জন্য! অকস্মাৎ সে সুনির্ম্মলকে এর জন্য সর্ব্বতোভাবে দায়ী করিয়া পুনরায় হোষ্টেলের পথে পা বাড়াইল।

পরদিন বৈকাল।

আজও সুনির্ম্মলের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। মৃন্ময়ের বাক্স-পেঁটরার প্রতি দৃষ্টি পড়িতে সে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। জিনিষপত্র সব বাঁধাছাঁদা হইয়া গিয়াছে। মৃন্ময় ঢাকা মেলে আজ রাত্রেই দেশে রওনা হইবে। অথচ গতকালও ঠিক ছিল পূজার অবকাশটা সে এখানেই থাকিবে। সুনির্ম্মল ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিল। বড় দেরি হইয়া যাইবে। তার এমন সাজান প্ল্যানটা শেষ পর্য্যন্ত না বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। তার জীবন-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনেক দুষ্কৃতির কাহিনী অঙ্কিত হইয়া আছে, অর্থ এবং মিথ্যার গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া লক্ষ্যহারা ভাবে ঘুরিয়া মরিতেছে। সুনির্ম্মল আজিও ভদ্র-সমাজে দিব্যি নিরুপদ্রবে মাথা উঁচু করিয়া আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সে নিজেই ধাঁধায় পড়িয়াছে লিলিকে লইয়া। তার জীবনে লিলি ফুরাইয়া গিয়াছে তাই সে আজ মুক্তি চায়। অথচ সহজ পথ নাই। লিলি চালাক মেয়ে। আইনের ঘরে সে তাহাকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লইয়াছে। সহজ পথে মুক্তি নাই বলিয়াই মৃন্ময় তার অন্তরঙ্গ। বন্ধুত্বের বন্ধনের মধ্যে সে তার মুক্তির সন্ধান করিতেছে।

লিলিকে সে ভয় করে। ঐ নির্ব্বাক গম্ভীর মেয়েটি যে কখন কি ভাবে চলে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তাদের মধ্যের সম্বন্ধটা অতি কৌশলে সে কিছুদিনের জন্য চাপা দিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু এই গোপনতার গ্রন্থি যে-কোন মুহূর্ত্তেই সে খুলিয়া ফেলিতে পারে। তখন হয়তো নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে কোন পথই আর খোলা থাকিবে না। কিন্তু লিলির জীবন-পথে যদি মৃন্ময়কে আনিয়া দাঁড় করান যায় তাহা হইলে তার মুক্তির আশা নিতান্ত দুরাশা নয়। নিজের দুষ্কৃতির বোঝা অতি সহজে মৃন্ময়ের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া আইনকে ফাঁকি দেওয়া যায়।

মৃন্ময় কিছুক্ষণ সুনির্ম্মলের চিন্তিত মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া কহিল, অবাক হয়ে গেছ নাকি? হঠাৎ মনটা বেঁকে দাঁড়াল। এতদিনের অভ্যাস না গিয়ে আর করি কি। খামোকা বুড়ো মা বাবাকে দুঃখ দিয়ে লাভ নেই।

সুনির্ম্মল ইতিমধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। সে হাসিয়া কহিল, সে ত নিশ্চয়। কিন্তু তোমার মত লোকের পড়াশুনোর ক্ষতি করে কতখানি যে পূজার আনন্দ ভোগে আসবে সেই কথাই ভাবছি।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, পড়াশুনো দেশেও বেশ চলতে পারে। কিন্তু বেশী দিন আমি গ্রামে থাকব না। তা ছাড়া লিলির ইংরেজী পড়ানোর ভার যখন দিয়েছ তখন বেশী দেরি করা চলতেই পারে না। এই কথাটাই জানতে চাইছ ত।

সুনির্ম্মলের চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মৃন্ময় কহিল, যদি শেষ পর্য্যন্ত কোন কারণে পিছিয়ে পড়ি তা হলেও তোমার ভাবনার কারণ নেই। লিলি তার পড়া-শুনার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন বলেই আমার বিশ্বাস।

সুনির্ম্মল পুনরায় গম্ভীর হইয়া উঠিল, তোমার ঐ দুমুখো কথাবার্ত্তা আমার ভাল মনে হয় না। যা বলবে তা পরিষ্কার করে বলাই তোমার উচিত।

মৃন্ময় শান্ত কণ্ঠে কহিল, যদি পরিষ্কার করে বলাটাই তুমি পছন্দ কর সুনির্ম্মল, তা হলে আমি বলি এ অধমকে রেহাই দাও। তুমি অর্থশালী, ইচ্ছে করলে অনায়াসেই তুমি এক জন অভিজ্ঞ প্রোফেসার তার জন্য নিযুক্ত করতে পার। আমিও সময়ের অপব্যবহার থেকে রেহাই পাই।

সুনির্ম্মল তীব্র কণ্ঠে কহিল, তুমি পয়সা চাও একথা খোলাখুলি বললেই হ'ত।

মৃন্ময় কতকটা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, তুমি আজ সুস্থ নও। আজ তুমি যাও। আমি ফিরে এলে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। বলিয়া, জোর করিয়া মৃন্ময় প্রসঙ্গটা চাপা দিল। সুনির্ম্মল কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ক্রমশঃ

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষার ভিত্তি

শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য

এক কথায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য "জ্ঞানলাভ"—জ্ঞানলাভের মুখ্য উদ্দেশ্য পরা শান্তি লাভ।

জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তি মচিরেণাধিগচ্ছতি—গীতা।

জ্ঞান দ্বিবিধ—পরা ও অপরা

পরা জ্ঞান—পরা বিদ্যা—ভূমা আত্মবোধ। যে জ্ঞানের উন্মেষণ হইলে সীমাবদ্ধ খণ্ডিত জীবন অতিক্রম করিয়া জীব অখণ্ড অনন্ত আনন্দঘন পরম তত্ত্বের বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে; ইহাই সত্যদর্শী পূজ্যপাদ ঋষিগণ কর্তৃক পরাজ্ঞান বা পরাবিদ্যা নামে কথিত হইয়াছে। এই জ্ঞানলাভই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য। মরণশীল মানব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন সে জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়া ধন্য হয়। মানব-জীবন সার্থক হয়।

অপরা জ্ঞান—অপরাবিদ্যা—অনাত্মবোধ

আত্মজ্ঞান বা পরাবিদ্যা ব্যতীত যাবতীয় জ্ঞান, যথা—আয়ুর্বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, অর্থকরী বিদ্যা ইত্যাদি সমস্ত জ্ঞানই অপরা নামে অভিহিত হয়। "পরাজ্ঞান" দ্বারা মানব মোক্ষলাভ করে এবং অপরা জ্ঞানলাভে মানব সর্ব্ববিধ ভোগ ও তজ্জনিত বন্ধনপ্রাপ্ত হয়। মানব-জীবনের সার্থকতা ভোগে নয়, ত্যাগে—প্রবৃত্তি মার্গে নয়, নিবৃত্তি মার্গে—এই শিক্ষাই মানব-জাতির প্রতি ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান।

মাত্র ভোগতৃপ্তিই মানব-জীবনের একমাত্র অভীষ্ট নয়। আহার নিদ্রা মৈথুনই কেবল মানব-জীবনের চরমকাম্য নহে। পশুপক্ষীরাও এই তিনটির আচরণ করে, মানব-দেহ ধারণ করিয়া যাহারা কেবলমাত্র ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিতেই রত তাহারা পশুরই সমান।

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ।
সামান্য মেতৎ পশুভির্নরাণাম্॥
ধর্ম্মোহি তেষাম্ অধিক বিশেষো।
ধর্ম্মহীনা পশুভিঃ সমানাঃ॥—মনু সংহিতা।

দেশকাল পাত্র অনুসারে কর্ম্মধারা নিরূপণ করিবার জন্য পূজ্যপাদ ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে, আজ দেশের সর্ব্বত্রই হাহাকার; ঘরে ঘরে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, অর্থাভাব, জ্ঞানাভাব এবং শিক্ষার অভাব; অভাব—অভাব—অভাব—অভাবের অগ্নিশিখা আজ প্রদীপ্ত হইয়া চতুর্দিকে ধূ, ধূ জ্বলিতেছে। এই অভাবের অভাব কবে হইবে তাহা কে জানে? মানবকুল আজ অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত। এ দুর্দ্দশার মূল কারণ প্রকৃত শিক্ষার অভাব।

পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে আজ আমরা মুক্ত হইলেও আমাদের মধ্যে এত আবিলতা, এত গলদ যে আশু তাহার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন, নহিলে স্বাধীনতার প্রকৃত আস্বাদন লাভ হইবে না, হইতে পারে না। বাহ্যিক আবিলতা দূর করা সহজ, কিন্তু অন্তরের আবিলতা বিদূরিত করা সহজ নয়; অন্তরের আবিলতা তখনই বিদূরিত হইবে যখন দেশের প্রত্যেক শিক্ষক, প্রত্যেক শিক্ষার্থী, প্রত্যেক জননী ও প্রত্যেক সন্তান প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ভারতের আকাশ বাতাস গরিমায় পূর্ণ করিবে। তখন ভারতমাতা তাঁহার প্রদীপ্ত প্রভায় সমগ্র পৃথিবী আলোকিত করিয়া জগতে পুনরায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন; ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

শিক্ষার ভিত্তি

"খাঁটি মানুষ" তৈয়ারী না হইলে, দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না। আমাদের দেশ আধ্যাত্মিকতার দেশ; এ দেশের উন্নতিকল্পে যিনি যে দিক দিয়াই প্রচেষ্টা করুন, যত রকমই দেশহিতকর পরিকল্পনা করুন—এদেশের মজ্জাগত যে ভাবধারা, যে কৃষ্টি, তাহা ভগবৎমূলক। আমরা আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবার দিকে যদি দৃষ্টি না রাখি—ভগবদভিমুখী সমাজ-বিজ্ঞানের দিককে যদি অবহেলা করি, তবে দেশের প্রকৃত কল্যাণের আশা সুদূরপরাহত হইবে।

ভাবী জাতি-গঠনের প্রধান দায়িত্ব মায়েদের। তাঁহাদের ঋতুকালীন আচরণ গর্ভাবস্থায় নিয়মপালন ও প্রসবের পর সন্তান পালন—এই তিনটির উপরেই সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

নারীকে এই সময়ে অবশ্যপালনীয় নিয়মাদি যদি শিক্ষা দেওয়া যায় তবে নারী সহজেই সন্তান-রত্নের 'মা' হওয়ার আশা করিতে পারেন।

ভবিষ্যতের মানুষ দেশকল্যাণকর কার্য্যের প্রথম ও প্রধান সোপান। ইহার মূল ভিত্তি হইবে নারীর শিক্ষা, ঐ শিক্ষার ভিত্তি যতই সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে তদুপরি নির্ম্মিত শিক্ষা-সৌধও ততই দীর্ঘস্থায়ী ও সুরম্য হইবে।

নারীর শিক্ষা

যত দিন দেশের নারীগণ আদর্শ রমণীরূপে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিতা না হন তত দিন সুসন্তান জন্মিবে না। সুসন্তান না

জন্মিলে—সুসন্তানে দেশ পরিপূর্ণ না হইলে দেশের কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না। বহু রক্তদান ও বহু কারাবরণ দ্বারা অর্জ্জিত এই স্বাধীনতা রক্ষা পাইবে না। তাই নারীদের শিক্ষার এত প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে স্কুল কলেজে আমাদের বালিকাদিগকে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ ও সঙ্কীর্ণ; নারীর মানসিক গড়ন ও চারিত্রিক বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রাপ্তবয়স্কা বালিকাগণকে সাধারণ জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই শারীর বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে পালনীয় নিয়মগুলিও যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল নিয়ম না জানায়, পালন না করায় বহু প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়।

চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল স্ত্রীরোগ চিকিৎসায় নিযুক্ত থাকিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, এদেশের মেয়েরা ঋতুকাল, গর্ভাবস্থা ও সন্তান প্রসবান্তে পালনীয় নিয়মগুলি না জানায় এবং বহু ক্ষেত্রে জানিয়াও পালন না করায় অনেকে দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হন ও বহু আকাঙ্ক্ষিত সুসন্তানলাভে বঞ্চিত হন। ঋতুকালে নারীদের যে সকল নিয়মপালন করা একান্ত কর্ত্তব্য তাহা না করায় বহু নারী সারাজীবন জীবন্মৃত অবস্থায় জীবন-যাপন করেন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে—

আর্ত্তবস্রাবদিবসাদ হিংসা ব্রহ্মচারিণী
শয়ীত দর্ভশয্যায়াং পশ্যেদপি পতিং ন চ
করে শরাবে পর্ণে বা হবিষ্যং ত্র্যহমাহরেৎ
অশ্রুপাতং নখচ্ছেদমভ্যঙ্গমনু লেপনম্
নেত্রয়োরঞ্জনং স্নানং দিবা স্বাপং প্রধাবনম্।
অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণং হসনং বহুভাষণং
আযাতং ভূমিখননং প্রবাতঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥

অর্থাৎ রজঃস্বলা স্ত্রী রজঃ নিঃসরণ দিবস হইতে তিন দিন হিংসা করিবে না; ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, কুশাসনে শয়ন করিবে, পতিকে দর্শনও করিবে না, হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। অশ্রুপাত, নখচ্ছেদন, অভ্যঙ্গ অনুলেপন, নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন, স্নান, দিবানিদ্রা, প্রধাবন, হাস্য, বহুভাষণ, পরিশ্রম, অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণ, ভূমিখনন ও প্রবল বাত সেবন—এইগুলি বর্জ্জন করিবে।

প্রসবের পর, সন্তান পালন কিভাবে করিতে হয় তাহা আমাদের দেশের কয়জন জননী জানেন? গর্ভধারিণী হওয়া সহজ, কিন্তু মা হওয়া এত সহজ নয়।

শিশু পালন—শিশুর প্রয়োজনীয়তা

শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ বল ও ভরসা। কিন্তু সেই শিশু যদি সুস্থ ও বলিষ্ঠ না হইয়া রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয়, তাহার দ্বারা জাতির উন্নতি বা দেশরক্ষা—কোন কাজই হয় না। যদি শিশু চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ না হইয়া চরিত্রহীন ও অধার্ম্মিক হয়, সে বংশের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক, দেশের কলঙ্ক হইয়া দাঁড়ায়। সন্তান রুগ্ন ও দুর্ব্বল কিংবা চরিত্রহীন হওয়া যে কি নিদারুণ, সে দুঃখ যে কি মর্ম্মন্তুদ তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অপরে বুঝিবে না।

শিশু এরূপ হয় কেন? এ কথার উত্তর শিক্ষার দোষে।

যে সন্তান জীবনের প্রথম হইতে আহার-বিহার ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে সৎশিক্ষা না পায় সে কখনও সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ হইতে পারে না। সন্তানকে মাত্র আহার ও পোশাক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেই তাহার প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হয় না; সন্তানকে যথারীতি "পালন" করিতে হইলে তাহার স্বাস্থ্যগঠনের সঙ্গে সঙ্গেই চরিত্রগঠনের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। পিতামাতা নিজেরা সৎ হইয়া সদ্দৃষ্টান্ত না দেখাইলে সন্তান সৎ হয় না—হইতে পারে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি গর্ভধারিণী হওয়া সহজ, কিন্তু মা হওয়া সহজ নয়।

বাল্যে মাতৃক্রোড়ে শিশুর যে শিক্ষা আরম্ভ হয় সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাই তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে দেখা যায়। বর্ত্তমানে স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সন্তান অর্থকরী বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইতে পারে, কিন্তু যদি জীবনের প্রথম হইতেই সর্ব্ববিষয়ে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা পালন করিতে শিক্ষা না পায়, কালে সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। এই উচ্ছৃঙ্খলতার জীবন্ত ছবি আজ সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান।

তাই যদি আমরা সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ সন্তান লাভ করিতে চাই, যদি আমাদের সন্তানদের বংশের গৌরব, জাতির গৌরব, দেশের গৌরবস্বরূপ দেখিতে চাই, তো তাহার জীবনের প্রথম দিন হইতেই তাহার আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই সতর্ক হইতে হইবে। এই নির্দ্দেশ যথাযথভাবে পালন করিলে, দেশের প্রতিগৃহ সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ সুসন্তানে পরিপূর্ণ হইবে।

জন্মের প্রথম দিন হইতেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা চলে। বাল্যের শিক্ষা যত সহজে অভ্যাসে পরিণত হয় পরবর্ত্তী কালের শিক্ষা তত সহজে হয় না। বাল্যের শিক্ষা জীবনের সঙ্গে একেবারে একীভূত হইয়া যায়, সে শিক্ষা সহজে ভুলা যায় না, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। স্কুল কলেজে সাধারণ জ্ঞান ও অর্থকরী বিদ্যা লাভ হইতে পারে, কিন্তু অধুনা তথায় মনুষ্যত্ব লাভের শিক্ষা দেওয়া হয় না। ইহা অতীব ক্ষোভের বিষয়।

বাল্যকাল হইতে শিশুকে সংযম শিক্ষা দিতে হইবে এবং ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তিগুলি তাহার কোমল হৃদয়ে যাহাতে উদিত না হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে।

শিশুর শিক্ষা লাভের প্রকৃষ্ট স্থান ও কাল

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জীবনের প্রথম দিন হইতেই আমাদের শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা চলে। পিতৃমাতৃ সন্নিধান এবং পরিজনবেষ্টিত নিজ আলয়ই প্রকৃত শিক্ষালয়। শিশু যখন পাঠশালায় যাইতে আরম্ভ করে তখন তাহার চরিত্র গঠনের দায়িত্ব "গুরু মহাশয়ে"র উপর বহুলাংশে ন্যস্ত হয়। পাঠশালাতে শিশুর "গুরুকরণ" আরম্ভ হয়। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে উপযুক্ত গুরুগুণবিহীন হইয়াও অনেকে গুরুপদবাচ্য হইয়া দাঁড়ান। মনে রাখা উচিত যাঁহার নিজের চরিত্র গঠিত হয় নাই, সেই গুরুমহাশয় জ্ঞানবিহীন শিশুর চরিত্র গঠনের ভার লইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। যিনি নিজের কাম ক্রোধাদি রিপু দমনে অক্ষম তিনি অপরকে রিপু দমনের শিক্ষা দিবেন কিরূপে? কেবলমাত্র মৌখিক উপদেশ দানে অপরের চরিত্র গঠন করা যায় না। অপরের চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায় নিজের চরিত্র গঠিত করিয়া সেই দৃষ্টান্ত অপরের সমক্ষে স্থাপন করা। পিতা মাতা ও শিক্ষকগণের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের শিক্ষাই দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ শিশুতে প্রতিফলিত হয়।

শিশুর নৈতিক শিক্ষা

মনুষ্যত্বের পরিচয় ভোগে নয়, নিবৃত্তিমার্গে। মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যাহারা কেবল মাত্র ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিতে রত তাহারা পশুর সমান।

সন্তানকে চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ করিতে হইলে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে হইবে :—

সংসঙ্গ, সদাচার, সদ্বৎ, সত্যবাদিতা, সরলতা, অহিংসা—পরপীড়া বর্জ্জন, দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সংযম, দানশীলতা, শ্রদ্ধা-ভক্তি ও শৃঙ্খলতা—নিয়মানুবর্ত্তিতা।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার অবসান তখনই সম্ভব যখন সুশিক্ষিত সুসংযত সচ্চরিত্র শিক্ষা-নিপুণ সহৃদয় শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হইবে, যখন স্বাস্থ্যবতী সন্তান পালনে সুনিপুণা জননীগণ দ্বারা প্রতিগৃহ গৌরবান্বিতা হইবে। দেশের প্রকৃত উন্নতি তখনই সম্ভব যখন দেশের যুবকবৃন্দ সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান, ধর্ম্মপ্রাণ ও সুসংযত হইয়া জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

নারী

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

বিস্ময়-বিমূঢ় চিত্তে অকস্মাৎ তোরে হেরিলাম আজি।
হেরিয়াছি বার বার দিবস রজনী, নব সাজে সাজি'
আবির্ভূত হইয়াছ নয়ন-সম্মুখে, মুগ্ধ হই আমি—
যেন স্বপ্ন-লোক হ'তে হে স্বপ্ন-চারিণী আসিয়াছ নামি,
বিথারিয়া মায়া আর বিরচিয়া মোহ ভুলাইলে অয়ি,
মদির-অলস নেত্রে ছুটেছি পিছনে হে ছলনাময়ী!
তোমার ছলনা-মুগ্ধ নয়নে আমার তুমি ছিলে নারী;
মোহ-ভার মুক্ত হ'য়ে হেরিলাম—হাতে অমৃতের ঝারি।

নূতন প্রভাতে তাই আমি নমিলাম। আমার আকাশে
প্রথম উষার আলো যবে ফুটে ওঠে আভাসে আভাসে,
হেরিনু সে আলো আমি বিপুল বিস্ময়ে তোর বুকে শুয়ে;
অমৃতের যে আস্বাদ লভিয়াছি নামে তোর বুকে ছুঁয়ে,
যে গান গাহিয়া ওঠে আমার এ কণ্ঠ, আমি শুনিলাম
জীবনের ঊষালোকে তোর কণ্ঠে সেই গীতি অবিরাম।
ভুলে গেছি সে কাহিনী, ভুলে গেছি ওরে সে পীযূষ-বারি,
আমার প্রভাতে তুমি এনেছিলে সাথে অমৃতের ঝারি।

জীবনের বেলাভূমে একা নহি আমি। মোর খেলা সাথে
বুক-ভরা প্রীতি নিয়ে মুখে নিয়ে হাসি আছে আঙিনাতে
সাথী মোর দিবারাতি। বাদে বিসম্বাদে যদি ভুলে যাই,
ডাগর আঁখিতে তার ফুটে ওঠে ভাষা, ডাকে—আয় ভাই।

দূরে যায় রেখে যায় তবু স্নেহপ্রীতি অকুণ্ঠিত প্রাণ
অযাচিত সেবা-ভরা স্মৃতি-ঘেরা তার অসীম কল্যাণ।
জীবনে সরস করি' স্নেহের পরশ সর্ব্বত্র বিথারি'
মঙ্গল-কামনা-পূত নিয়ে এলে সাথে অমৃতের ঝারি।

পিকবধূ নিয়ে আসে মধু-মাস, আনে দক্ষিণা পবন,
নামে সবুজের ঢেউ, নামে কুসুমিত বন-উপবন,
স্বর্গের মদিরা নামে মোর দুটি চোখে, বুকে ভালবাসা,
কামনার পাত্রখানি পূর্ণ করি' জাগে দুরন্ত দুরাশা :
হেনকালে ফুটে ওঠে নয়ন-সম্মুখে একখানি ছবি,
খুঁজেছিনু যারে আমি অন্তরে বাহিরে, সে প্রিয়-বান্ধবী
ব্রীড়ায় আনত আঁখি দাঁড়ায়ে একাকী মোর দ্বারে নারী
বসন্তের প্রস্ফুটিত মাল্য-সম, হাতে অমৃতের ঝারি।

একটি কলিকা ছোট বুকে আসে নেমে, মুখে হাসি-রাশি
স্বর্গের সুষমা-মাখা, সুধা-ঢালা প্রাণ স্নেহেতে উদ্ভাসি'
বাহু দিয়া কণ্ঠ ঘেরি' তোলে সে কল্লোল তটিনীর মত,
রৌদ্র-তপ্ত বক্ষ-মাঝে আনে সরসতা স্নিগ্ধতা সতত,
সেবায় ভরিয়া রাখে ক্ষুদ্র যে অঞ্জলি, করে কল-গীতি,
মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষা তার, বক্ষ-ভরি' আনে মাধুর্য্য ও প্রীতি,
পূজার নির্ম্মাল্য যেন, মাঙ্গলিক গান শুনি কণ্ঠে তারি,
রূঢ় রুক্ষ জীবনের বেলাভূমে আনে অমৃতের ঝারি।

রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের দায়িত্ব

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

অনেকে আজও ভাবিয়া থাকেন, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছেন। কিন্তু এ কথা আমার বার বার মনে হইয়াছে যে, নোবেল পুরস্কার রবীন্দ্রনাথের যথোপযুক্ত পুরস্কার নহে। কেননা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তুল্য সাহিত্য-স্রষ্টা এ যুগে কোন দেশেই নাই। আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ এবং স্বাদেশিকতায় হয়ত বিচারবুদ্ধি আমাদের অন্ধ, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশেও রবীন্দ্রনাথের যে সম্মান তাহাতে মনে হয়, গোটের পর রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের আবির্ভাব ইউরোপে আর হয় নাই। শরৎ চন্দ্র বলিতেন তিনি সাধারণের ঔপন্যাসিক আর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মত ঔপন্যাসিকদের ও লেখকদের ঔপন্যাসিক এবং লেখক। প্রতিভা যদি নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি হয়, তাহা হইলে এই বিদ্যুৎঝলসিত নিত্য নূতন প্রতিভা যাহা অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া সহস্রবিধ চরিতার্থতায় আপনাকে ও জগৎকে সার্থক করিয়াছে তাহার তুলনা কোথায়? শরৎ চন্দ্রের উক্তি মিথ্যা বিনয়ভাষণ নহে, রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু, সাহিত্যগুরু। সাহিত্যের সকল বিভাগে আপনার সার্থক প্রতিভার ভাস্বর চিহ্ন তিনি বারে বারে আঁকিয়া গিয়াছেন। ভাবে, ভঙ্গীতে, ভাষায়, ষ্টাইলে তাঁহার প্রাণপ্রাচুর্য্যের ক্ষয় ছিল না। নিত্য নূতনরূপে তাহার প্রতিভা বৈচিত্র্য আমরা তাঁহার শেষ জীবনেও দেখিয়াছি। সমালোচক শিরোমণি ড্রাইডেন কবি চসারের সৃষ্টি-প্রাচুর্য্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন—Here is God's plenty। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য।

আমেরিকার দার্শনিক উইল্ ডুরান্ট রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, শুধু রবীন্দ্রনাথের জন্যই ভারত স্বাধীন হইবার যোগ্য। জাতি স্বাধীন হইলে জাতির মনুষ্যত্ব ও সৃষ্টিশক্তি সার্থক ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পাবে। ইহাই স্বাধীনতা লাভের সর্ব্বাপেক্ষা সারবান যুক্তি। সৃষ্টিশক্তি মানুষের অমরতা লাভের উপায়স্বরূপ। পরাধীন ভারতে যখন সৃজনী প্রতিভার পরাকাষ্ঠা রবীন্দ্রনাথে দেখিতে পাই, শ্রেষ্ঠ মানবতা যখন গান্ধীজীর জীবনে প্রতিভাত হয় তখন ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ মনে স্থান পায় না। পরাধীনতার মধ্যেও যে জাতির প্রাণের ধারা এমনই অটুট ও সার্থক সে জাতি কখনও মরিবে না। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের বন্ধুর পন্থা দিয়া এক দিন তাহার আত্মা আপনাকে খুঁজিয়া পাইবেই।

রবীন্দ্রনাথ কবি, কিন্তু তাঁহার মহত্তর রূপ পরিস্ফুট তাঁহার ঋষিত্বে। নূতন সভ্যতার অগ্রদূত হিসাবে তিনি জগতের ইতিহাসের অলিখিত অধ্যায়ে একটা বিরাট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মর্ম্মমূলে গিয়া উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ও তাহাদের ভাল-মন্দের বিচার করিয়াছেন। স্বদেশী সমাজের যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যে বিশ্লেষণ তিনি করিয়াছেন তাহা তাঁহার মত কবি-মণীষীর দৃষ্টিতেই সম্ভব। সেই বস্তুকে ভিত্তি করিয়াই হয়ত একদিন মানুষের আত্মিক মিলনের প্রয়োজনে নূতন সভ্যতা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবে। এমনি করিয়া গান্ধীজীর জীবনাদর্শও হয়ত একদিন জগতের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিবে।

কার্ল মার্কস সভ্যতার যে অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও যান্ত্রিক সভ্যতার পরিণতি কোন্ দিকে তাহার সার্থক ইঙ্গিত তাঁহার লেখার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন জগতের শ্রমিক আন্দোলনের মর্ম্মমূলে তাহা প্রেরণা জোগাইয়াছে। রাশিয়ার আদর্শ কম্যুনিজম; রাশিয়া ইহা প্রবল ভাবে প্রচার করার ভার লইয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্টরা তাহা জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছে। আমাদের দেশেও রুশীয় মতবাদ প্রচারকের অভাব নাই। প্রচারের ফলে যাহা অর্দ্ধ সত্য বা মেকি তাহাও সচল হইতেছে অথচ জগতের সভ্যতাকে নূতন করিয়া গড়িতে পারে যে মহান্ আদর্শ তাহাকে জগতে প্রচার করার দায়িত্ব কেহ মানিয়া লইতেছে না।

এইখানেই ভারতবাসী ও বঙ্গবাসী হিসাবে আমাদের একটা বিরাট দায়িত্ব আছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য অপূর্ব্বসুন্দর। তাহা অনুরাগের সহিত পড়িতে ও বুঝিতে হইবে; দেশের জনসাধারণকে পড়াইতে ও বুঝাইতে হইবে। এজন্য রবীন্দ্র-পাঠচক্রের প্রয়োজন। আবৃত্তিকারক, অভিনেতা, গায়ক ও অধ্যাপকদের মিলন ও সহযোগিতার দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মবাণী দেশের জনসাধারণে বুঝিতে শিখিবে। আমাদের বহু সৌভাগ্য যে আমরা রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক, তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার কথা শুনিয়াছি, কেহ বা তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়াছি। সহস্র বৎসর পরে কত বিদেশী ও স্বদেশী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য অতি অনুরাগের সহিত আলোচনা করিবে কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যের কণামাত্রও তাহারা পাইবে না। এই কারণেই আমাদের দায়িত্বও প্রবল হওয়া চাই। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—প্যারিতে যখন রবীন্দ্রনাথ বেড়াইতে গিয়াছেন এক ফরাসী

মোটরগাড়ী-চালক রবীন্দ্রনাথকে এক হোটেলে পৌঁছাইয়া দেয়। কবির সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জানিতে সে চায়। যখন সে জানিল হিন্দু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার গাড়ীতে চাপিয়াছিলেন সে ভাড়া লইতে অস্বীকার করিল ও জানাইল—রবীন্দ্রনাথের কাব্য সে পড়িয়াছে। জাতি কতখানি সভ্য হইলে তাহার গাড়োয়ানেও বিদেশী মনীষীর লেখা অনুরাগের সহিত পড়িতে শেখে। সকলেরই মনে আছে যে দিন পারি নগরী জার্ম্মানদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় সে দিন পারি রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' অভিনয় চলিয়াছিল। ফরাসী জাতির কৃষ্টি যে এক দিক দিয়া অতুলনীয় ইহা তাহারই পরিচয়। এতখানি শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা, বাঙালী ও ভারতীয় পাঠকদের কবে হইবে? না হইলে আমাদের স্বাধীনতা পুরাপুরি সার্থক হইয়া উঠিবে না। রবীন্দ্রনাথের বিরাট সৌন্দর্য্যবোধ জাতির প্রাণে সঞ্চারিত করিতে পারিলে জাতির জীবন সার্থক হইবে। তাঁহার সাহিত্যে যে প্রাণদ মন্ত্র আছে জাতির জীবনীশক্তি স্ফুরণে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সেই মন্ত্র কি জাতির প্রাণে আমরা সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছি?

অনেকে অভিযোগ করেন রবীন্দ্রনাথ দুর্ব্বোধ্য। এ অভিযোগ কিয়ৎ পরিমাণে সত্য। যে বিরাট প্রতিভা ও মনস্বিতা অপূর্ব্ব প্রাণশক্তি লইয়া কবির পঞ্চদশ বর্ষ হইতে অশীতি বর্ষ পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে বিচিত্র ধারায় আপনাকে সার্থক করিয়াছে তাহার গভীরতা, তাহার বিস্তার, প্রকাশভঙ্গীর অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা আপনা হইতেই তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিকে অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে। এ সাহিত্য বুঝিতে, উপভোগ করিতে সাধনার আবশ্যক। মিল্টনের এক সমালোচক বলিয়াছিলেন টীকার সাহায্য ব্যতিরেকে মিল্টনের কাব্য-রস আস্বাদন করিবার অধিকার পাণ্ডিত্যের শেষ পুরস্কার—last reward of mature scholarship। এ কথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যাঁহারা রবীন্দ্রভক্ত তাঁহাদিগকে যথোচিত সাধনা, ও পরিশ্রম দ্বারা রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস আস্বাদন করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া পঠন-পাঠনের বন্দোবস্ত করা। সঙ্গীত বিদ্যালয়েও দরকার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষ চর্চ্চা ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করা। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরিয়া যাহা লিখিয়াছেন সারা জীবনের সাধনা দিয়াই তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। এই জন্যই মিলিতভাবে জাতীয় মহাকবির সৃষ্টি-প্রতিভার চর্চ্চা ও উপভোগের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কবি ইয়েটস্ বলিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান এক দিন কুলী মজুর চাষী মাঝি সকলেই গাহিবে। আজও সে দিন আসে নাই। দেশে কাগজপত্র, সভাসমিতি, রেডিও প্রভৃতি প্রচুর থাকিলেও প্রচারের পথ যথেষ্ট উন্মুক্ত নয়। বাংলার কবিওয়ালা, বৈষ্ণব কবি, রামপ্রসাদ প্রভৃতির গান অতি সহজেই বাঙালীর নিভৃত গ্রাম্য জীবনে গিয়াও স্থান করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু আজও জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সঙ্গীতস্রষ্টার সুর জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইতে পারে নাই। ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে মজুরও রবীন্দ্রনাথের অনূদিত কবিতার রস গ্রহণ করে অথচ তাঁহার দেশবাসীরা আজও সে রসে বঞ্চিত। শিক্ষার অভাবই দৈন্যের হেতু এ কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু শিক্ষার বন্দোবস্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কর্ত্তব্য হইবে রবীন্দ্র-সাহিত্য ব্যাপকভাবে প্রচারের বন্দোবস্ত করা। শান্তিনিকেতন হইতে যে প্রতিষ্ঠানের মারফৎ লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে সেই লোকশিক্ষা-পরিষৎ যদি রবীন্দ্র-সাহিত্যে আদ্য মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার বন্দোবস্ত করেন ও উপাধির পর যাঁহারা রবীন্দ্র-সাহিত্যে গবেষণা করিতে চান তাঁহাদের সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দেন তাহা হইলে বাঙালী জাতি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিবে। এই পরিষৎ ছাত্রদের জন্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিবেন; সঙ্গে সঙ্গে পাঠনের বন্দোবস্তও করিয়া দিবেন।

এই ধরণের কাজ হইলে জাতি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবে। বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে তাগিদ আসিবে নানা জাতিকে রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্য ও বাণী বুঝাইবার। দেশের যাঁহারা জ্ঞানী ও গুণী তাঁহাদের উপর এই ভার অর্পিবে। অনুবাদ করিয়া, বক্তৃতা দিয়া, নূতন আলোচনা পুস্তক লিখিয়া, গান গাহিয়া, আলোকচিত্রাদির সাহায্য লইয়া রবীন্দ্রনাথের বাণীকে নানা জাতির মনের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

এই কার্য্য করিতে না পারিলে রবীন্দ্রনাথের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হইবে না; জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে তাঁহার যে অবদান, জগতের কল্যাণকামনায় তাঁহার যে সাধনা ও বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্নে সকল শক্তি নিয়োগ তাহা নিতান্তই নিরর্থক হইবে। শক্তি ও দ্বন্দ্বের হানাহানিতে জগৎ আজ ক্লান্ত। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'কে শান্তি দিতে পারে বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর মত মহামানবগণ। ইউরোপ শ্রান্ত ক্লান্ত; তাহার হিংসা লোভ ও সংশয়ের মধ্যে মানবাত্মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই জগতের সুধীমণ্ডলী তাকাইয়া আছেন ভারতের দিকে। রবীন্দ্রনাথ ভারতের সেই বাণীমূর্ত্তি।

কমনওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশন টাসম্যানিয়ার আবেদন শুনিতেছেন। বাম হইতে—উড্, রিচার্ডসন, ফিট্‌জিরাল্ড, কেনেলি, অসবোর্ণ, টাসম্যানিয়ার প্রধান মন্ত্রী কসগ্রোভ, বিন্‌স্, লেখক।

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

অষ্ট্রেলিয়া

১৯৪৭-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার সকাল সাড়ে ছ'টায় সিডনি বিমানঘাঁটিতে নামিলাম।

ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় দূতাবাস হইতে আমার আগমন-সংবাদ জানাইয়া অষ্ট্রেলিয়াস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারকে একটি তার করা হইয়াছিল। সেই তারের একটি নকল আমি ভ্যানকুবারে পাইয়াছিলাম। তারে লেখা ছিল যে, আমি একদিন সিডনিতে বিশ্রাম করিয়া পরদিন ক্যানবেরা যাইব। দূতাবাসের কর্তৃপক্ষ মনে করিয়াছিলেন যে, এত বড় লম্বা ভ্রমণের পর আমি একদিন বিশ্রাম করিতে চাহিব। তারে হাই কমিশনারের ঠিকানা দেওয়া ছিল সিডনি। কিন্তু তিনি থাকেন ক্যানবেরায়। মনে সন্দেহ হইল, ঠিকানায় যখন ভুল আছে তখন হাই কমিশনার মহাশয় সময়মত তারটি নাও পাইতে পারেন। বিমানঘাঁটিতে নামিয়া খোঁজ লইয়া জানিলাম, আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত কেহ ঘাঁটিতে আসে নাই অথবা আমার জন্ত কোন সংবাদও নাই। আমার অনুরোধে ঘাঁটির কর্মচারিগণ টেলিফোন যোগে তাঁহাদের নগরস্থিত কার্য্যালয়ে খবর দিলেন। খবর আসিল সেখানেও আমার জন্ত কোন সংবাদ বা কোন ভদ্রলোক উপস্থিত নাই। ঘাঁটির কর্মচারিগণ বলিলেন, "শীঘ্রই ক্যানবেরাগামী একটি বিমান সিডনি ত্যাগ করিবে। সে বিমানে আপনি স্থান পাইতে পারেন।" তৎক্ষণাৎ টিকিট কিনিয়া হাই কমিশনারকে আমার আগমনবার্ত্তা জানাইয়া তার করিয়া দিলাম। এই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া মালের খোঁজ লইতে লাউঞ্জে গেলাম। ততক্ষণ মাল শুল্ক বিভাগের হেফাজতে আসিয়াছে। সেখানে কয়েকজন সাংবাদিকের পাল্লায় পড়িলাম। অন্যান্ত দেশ হইতে এখানকার সাংবাদিকগণ অধিকতর উৎসাহী। 'আমার কিছু বলিবার নাই।'—একথা বলিলেই অন্তত্র সাংবাদিকগণ চলিয়া গিয়াছেন। করাচীতে যাইবার পূর্ব্বে এক জন সাংবাদিককে আমি কথা দিয়াছিলাম যে, আমি অন্ত কোন সাংবাদিককেও কিছু বলিব না। কিন্তু এখানে সাংবাদিকগণ আমাকে রীতিমত জেরা করিতে সুরু করিলেন এবং আমার ছবি না তুলিয়া ছাড়িলেন না। পরদিন যথারীতি 'সিডনি সান' পত্রিকায় আমার ও আমার দুই জন সহযাত্রীর ছবি দেখিলাম। অপর দুই জনের মধ্যে এক জনের নাম "টেডপুল" এবং দ্বিতীয়ের নাম "জন ক্রেলিন"। টেডপুল মোটর-দৌড়ে খ্যাতিমান। 'জন ক্রেলিন' চৌদ্দ বৎসরের বালক, ইউরোপে পর্বতভ্রমণ কালে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ডাক্তার আলেকজাণ্ডার মিন্‌কাউস্কির জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

৮টায় সিডনি বিমানঘাঁটি হইতে বিমান উড়িল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। মেঘ ও বৃষ্টি ভেদ করিয়া বিমান পরিষ্কার আকাশে উঠিল। ১২০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নয়টায় ক্যানবেরা বিমানঘাঁটিতে নামিলাম। নামিবার সময়

হক্‌সবেরি নদীর পোল—সিডনি

পাহাড়ে ঘেরা বিমানঘাঁটিটির দৃশ্য বেশ ভাল লাগিতেছিল। অদূরে মেষপাল স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বিমানঘাঁটি হইতে সিধা হাই কমিশনারের আপিসে পৌঁছিলাম। যে বাড়ীতে বিমানের নাগরিক কার্য্যালয় তাহারই দোতলায় হাই কমিশনারের আপিস।

শহরের এই জায়গাটির নাম সিভিক সেণ্টার বা নগরকেন্দ্র। এখানে দুইটি সমান্তরাল বাড়ীর লাইন। প্রত্যেক লাইনে দুইটি করিয়া মোট চারিটি বাড়ী। বাড়ীগুলি দোতলা। প্রায় সব ঘরেই দোকান। কোন কোন ঘরে নানা প্রকারের আপিস—জায়গাটি ছোট। দোকানগুলিও খুব ছোট ছোট। মানুষও কম। ইহাই ক্যানবেরা সহরের কেন্দ্রস্থল।

হাই কমিশনারের আপিসে যাইতে তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দাম্‌লের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি মিনিট দশেক পূর্ব্বে আমার তার পাইয়া হোটেল ক্যানবেরায় আমার জন্য স্থান সংগ্রহ করিয়াছেন। দাম্‌লে মহাশয় বলিলেন যে, ওয়াশিংটনের তার পাইয়া তিনি আমার জন্য সিডনিতে এক দিনের মত হোটেল ঠিক করিবার জন্য তাঁহাদের সিডনিস্থ প্রতিনিধি শ্রীযুত সান্যালকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। বলিতে বলিতে টেলিফোন বাজিল। শ্রীযুত সান্যাল সিডনি হইতে ডাকিতেছেন। তিনি সিডনিতে বিমানের নগরস্থিত কার্য্যালয়ে গিয়া আমাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীযুত দাম্‌লের নিকট আমার সরাসরি ক্যানবেরা আগমনের সংবাদ পাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুত দাম্‌লে ট্যাক্সি ডাকিয়া আমাকে হোটেল ক্যানবেরায় পাঠাইয়া দিলেন।

ক্যানবেরা সুন্দর শহর। ইহাকে শহর না বলিয়া উদ্যান বলিলেই ঠিক হয়। এখানে মাত্র চৌদ্দ হাজার লোকের বাস। শহরে মানুষ অপেক্ষা বৃক্ষের সংখ্যা বেশী। বৃক্ষশ্রেণী সুসজ্জিত। নানা প্রকারের নয়নমনোহারী বৃক্ষ। তন্মধ্যে 'উইপিং উইলো' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার শাখাশ্রেণী হইতে কোমল পল্লবহুল দীর্ঘ প্রশাখাগুলি নীচে লুটাইয়া পড়িয়াছে। শহরের উত্তরে 'সিভিক্ সেণ্টার'। দক্ষিণে পার্লামেণ্ট ভবন ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী সরকারী আপিসসমূহ। সিভিক সেণ্টার ও পার্লামেণ্ট ভবনের মধ্যে প্রায় দেড় মাইল ব্যবধান। একটি জনবিরল সুন্দর রাস্তা সিভিক সেণ্টার ও পার্লামেণ্ট-ভবনকে সংযুক্ত করিয়াছে। প্রায় মধ্যপথে ক্ষীণ-কায়া মলোংলো নদী। ইহাই সহরের প্রধান অংশ। ইহার আশে পাশে মাঝে মাঝে সাজান বাড়ীঘর। 'হোটেল ক্যানবেরা' পার্লামেণ্ট ভবনের কাছে। হোটেলে গিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিলাম। একতলা বাড়ী। মধ্যস্থলে বড় চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ। হোটেলটি প্রাঙ্গণকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। ঘরগুলির সামনে ঘুরানো প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দার উপরে টালির ছাত। হোটেলের চারি দিকেও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। তাহাতে সুসজ্জিত তরুশ্রেণী। বহুদিন পরে এইরূপ একতলা বাড়ীতে থাকিলাম। এতদিন দেখিয়াছি পিঁপড়ার সারির মত মানুষ আর নদীর স্রোতের মত মোটরশ্রেণী। বাড়ী একটির ঘাড়ে আর একটি; পাল্লা দিয়া আকাশ ছুঁইতে উঠিয়াছে। এখানে কোন তাড়াহুড়া নাই। মানুষ, গাড়ী বা বাড়ী কেহই ভিড় করিয়া ছুটিতেছে না। অনেকক্ষণ পথ চলিলে একটি মানুষ বা একটি গাড়ী অথবা একটি বাড়ী দেখা যায়। বাড়ী মাটি ছাড়িয়া আকাশে উঠিতে চায় না। মাটির কোলেই শান্তিতে বিশ্রাম করিতেছে। কৃশা মলোংলো নদীর গতিতে কোন তাড়াহুড়া নাই। নির্ম্মল আকাশের নীচে এ যেন প্রকৃতির মায়াপুরী। প্রকৃতির কোলে বসিয়াও তাহার অপ্রমেয় রহস্যের কূলকিনারা না পাইয়া উইপিং উইলো আলুলায়িতকুন্তলা বিরহিণীর মত কাঁদিতেছে।

হোটেলে আসিয়া স্নানাদি সারিয়া পুনরায় হাই কমিশনার আপিসে আসিলাম। বাংলার ভূতপূর্ব্ব লাট শ্রীযুত কেসি সাহেবের চিঠি আমার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি আমাকে তাঁহার মেলবোর্ণের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং এখানকার ট্রেজারী ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুত ম্যাক্‌ফার্লেন মহাশয়ের নিকট আমাকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যে চিঠি দিয়াছেন তাহার একটি নকল পাঠাইয়াছেন। প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে যখন কন্‌জার্ভেটিভ পার্টির হাতে এ দেশের মন্ত্রিত্ব ছিল তখন কেসি মহাশয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন। দাম্‌লে মহাশয় টেলিফোনে আমার আগমন-বার্ত্তা প্রয়োজনীয় আপিসগুলিতে জানাইয়া দিলেন। স্থির হইল ট্যাক্স বিভাগের পি. এস. ম্যাক্‌গভর্ণের সঙ্গে ঐ দিনই দেখা হইবে এবং পরদিন মারেরিভার কমিশনের সি. জে. টেটাজ এবং ট্রেজারী সেক্রেটারী ম্যাক্‌ফার্লেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।

পার্লামেণ্ট ভবনের দুইটি হাতায় দুইটি বাড়ীর মধ্যে সরকারী খাস দপ্তরগুলি অবস্থিত। বাড়ী দুইটি উত্তর ব্লক ও

দক্ষিণ ব্লক নামে পরিচিত। পার্লামেন্ট ভবন একতলা। কিন্তু দপ্তর দুইটি দোতলা। পার্লামেন্ট ভবনের পিছনে একটি টিলা। এই টিলার উপর ভবিষ্যতে বড় করিয়া নূতন পার্লামেন্ট ভবন নির্ম্মিত হইবে। পি. এস. ম্যাকগভর্ণ ও এল. টম্‌সন মহাশয়দ্বয়ের সহিত নানাবিধ আলাপ আলোচনা করিয়া এবং পড়িবার জন্য কয়েকখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

এখানে ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত নৈশ ভোজনের সময়। ৭টার পর কর্মচারিগণের ছুটি। খাদ্যের ও পরিবেশনের ব্যবস্থা ভালই। অভাবের কোন চিহ্ন নাই। একই টেবিলে পরস্পর অপরিচিত লোকেরা খাইতেছে।

এখানে দেখিতেছি সকলেই বেশ আলাপী। খাবার টেবিলে বা খাবার পর লাউঞ্জে অনেকেই আলাপ করিতে আসেন। হোটেলে কয়েকজন সাংবাদিক আছেন। তাঁহারা প্রায়ই নানা বিষয়ে আলাপ করেন। অনেকেই "শ্বেত অষ্ট্রেলিয়া" নীতি সম্বন্ধে আমার মতামত জানিতে চাহেন।

অষ্ট্রেলিয়া বিরাট দেশ। ইহার আয়তন ২৯, ৭৪, ৫১৪ বর্গ মাইল অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ। ইহার জনসংখ্যা মাত্র ৭৫ লক্ষ অর্থাৎ বর্তমানে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলের জনসংখ্যা অপেক্ষা কিছু বেশী। জনবসতি সমুদ্রোপকূলে সীমাবদ্ধ। দেশের অভ্যন্তরে জনবসতি নাই বলিলেই হয়। মাত্র চার-পাঁচটি শহরে দেশের প্রায় অর্দ্ধেক লোকের বাস। সিডনিতে ১১ লক্ষ, মেলবোর্ণে ১০ লক্ষ, ব্রিজবেনে ৫ লক্ষ, এডিলেডে ৩ লক্ষ, এবং পার্থে ২ লক্ষ লোকের বাস। বাংলাদেশে চাষাপ্রতি ৩।৪ একর জমি, আমেরিকায় চাষাপ্রতি ৩।৪ শত একর জমি; আর এখানে চাষাপ্রতি ৩।৪ হাজার একর জমি। অষ্ট্রেলিয়ায় জলের বড় অভাব। জলাভাবে দেশের অভ্যন্তরে চাষের প্রসার সম্ভব হয় নাই। কোথাও জল এত অল্প যে পশুপালনও সম্ভব নয়। 'মেরিনো' জাতীয় মেষ আবিষ্কারের ফলে এদেশের বহু স্বল্পজল স্থানে মেষপালন সম্ভব হইয়াছে। এই জাতীয় মেষগুলি খায় কম; দেখিতে কৃশ। কিন্তু ইহাদের লোম ঘন ও লম্বা। গম, ফল এবং পশম অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান পণ্য।

১৩ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ৯টায় মারে-রিভার কমিশনের আপিসে গেলাম। টেটাজ মহাশয় আমাকে সাদরে স্বাগত করিলেন। তাঁহার নিকট 'মারে' নদীর বিশদ বিবরণ শুনিলাম। মারে এ দেশের বৃহত্তম নদী। ১৬০০ মাইল লম্বা। ডার্লিং, মরুমবিজ ও গুলবার্ণ ইহার প্রধান উপনদী। ইহাদের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৭৬০ মাইল, ১০৫০ মাইল এবং ২৮০ মাইল। ভিক্টোরিয়া রাজ্যের অন্তর্গত 'গ্রেট ডিভাইড' পর্ব্বতমালা হইতে এই নদীগুলি উদ্ভূত। উৎপত্তিস্থল হইতে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার সীমানা পর্য্যন্ত মারে নদী নিউ সাউথ ওয়েলসের সীমানা

বাটলার্স গর্জের নিকট নিউক্লার্ক বাঁধ গাঁথা হইতেছে

নির্দ্দেশ করিতেছে। তারপর সাউথ অষ্ট্রেলিয়ার ভিতর দিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে। এই স্বল্পজল দেশে নদীর জল লইয়া রাষ্ট্রত্রয়ের মধ্যে প্রথম হইতেই বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন থাকায় বিবাদের মীমাংসা দুরূহ ছিল। ১৯০১ সালে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিবাদ-মীমাংসার পথ সুগম হইল। তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে জলের যথাযথ বণ্টন করিবার জন্যই রিভার মারে কমিশনের সৃষ্টি। জলের প্রধান ব্যবহার সেচের জন্য। নদীটিকে মোহানা হইতে এচুকা পর্য্যন্ত নাব্য রাখাও কমিশনের কর্ত্তব্য। যাহাতে ন্যূনতম জলের দ্বারা এই নাব্যতা সম্পাদনের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তজ্জন্য বাঁধ ও দরজা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। নদী যেখানে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে সেখানে ভিক্টোরিয়া হ্রদ অবস্থিত। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার ব্যবহারের জন্য বৎসরে অন্ততঃ একবার এই হ্রদটিকে জলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া কমিশনের কর্ত্তব্য। ভিক্টোরিয়া রাষ্ট্রে অবস্থিত 'হিউম্‌' বাঁধ মারে নদীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাঁধ। সেখানে সম্প্রতি জলশক্তিদ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা চলিতেছে। কমিশন নিজে কোন নির্ম্মাণ-কার্য্যাদি করেন না। কমিশনের অনুমোদন লইয়া রাষ্ট্রগুলি স্ব-স্ব এলাকায় নির্ম্মাণ-কার্য্য করিয়া থাকেন।

টেটাজ মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ শেষ করিয়া ১১টায় সেক্রেটারিয়েটে আসিয়া ট্রেজারী সেক্রেটারী ম্যাকফার্লেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। ম্যাকফার্লেন আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ঐদিন সমুদয় রাষ্ট্রের ট্রেজারী সেক্রেটারীগণ ক্যানবেরায় উপস্থিত ছিলেন। সাড়ে এগারটায় তাঁহাদের সম্মেলন হইবার কথা। ম্যাকফার্লেন আমাকে ঐ সম্মেলনে লইয়া গিয়া সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। কুইন্‌সল্যাণ্ড নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, ভিক্টোরিয়া, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া ও টাস্‌মানিয়ার ট্রেজারী সেক্রেটারীগণ প্রত্যেকেই আমার অভিজ্ঞতার কথা, বিশেষতঃ আমেরিকার কথা শুনিবার

জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন এবং প্রত্যেকেই আমাকে স্ব-স্বরাষ্ট্রে নিমন্ত্রণ করিলেন। অতি সংক্ষেপে আমার মার্কিন মুলুকের অভিজ্ঞতার কথা ইঁহাদের নিকট বিবৃত করিলাম। আমি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান দেখিবার জন্য এদেশে আসিয়াছি 'কমনওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশন' তাহাদের মধ্যে প্রধান। শুনিলাম 'কমনওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশন' আগামী সপ্তাহে টাসম্যানিয়ার রাজধানী হোবার্টে টাসম্যানিয়া সরকারের দরখাস্ত শুনিবেন। টাসম্যানিয়া সরকারের তিন জন প্রতিনিধি ক্যানবেরায় এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ট্রেজারী সেক্রেটারী এইচ. ডি. রবিন্‌সন, ইকনমিষ্ট কে. জে. বিন্‌স্ এবং ব্যবহারজ্ঞ আর. জি. অস্‌বোর্ণ। কমনওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশনের কার্য্য দেখিবার আকর্ষণে ইঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

ঐ দিন সন্ধ্যায় ডাম্‌লেদের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ হোটেল হইতে বাহির হইলাম। এখানে রাস্তায় বাহির হইলেই ট্যাক্সি মিলে না। এক জন ট্যাক্সিব্যবসায়ী আছে। তাহার দোকানে পূর্ব হইতে সংবাদ দিয়া রাখিলে সময়মত যথাস্থানে ট্যাক্সি পাওয়া যাইতে পারে। বাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। রাস্তা জনশূন্য। বাস আসিতে দেরী হইতেছে। জনৈক ভদ্রলোক নিজের মোটরে যাইতেছিলেন। আমার পাশ দিয়া যাইবার সময় সহসা গাড়ী থামাইয়া আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনাকে কোথাও পৌঁছাইয়া দিতে পারি কি?" আমি গন্তব্যস্থানের ঠিকানা বলিলাম। তিনি আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন, "আমি আপনাকে দেখিয়াই বুঝিলাম যে, আপনি বাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সহর হইতে দশ মাইল দূরে আমার বাড়ী। সেখানে আমার চাষ-বাসের ব্যবস্থা আছে। আমি অনেক শূকর পুষি। একবার এক জন ভদ্রলোকের নিকট অনেক শূকরের মাংস বেচিয়াছিলাম। সে কারবারে আমার বেশ লাভ হইয়াছিল।" আমি ভাবিতেছিলাম ভদ্রলোকের ভদ্রতার কথা। ভদ্রলোক আমাদিগকে ডাম্‌লেদের গৃহের অদূরে নামাইয়া দিয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া চলিয়া গেলেন। জনশূন্য রাস্তায় বাড়ীর নম্বর দেখিতে দেখিতে গৃহটি খুঁজিয়া বাহির করিলাম। বহুদিন পর লুচি-তরকারী ও ভাত খাইলাম। ডাম্‌লে-গৃহিণী এদেশে গৃহস্থালীর সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। এখানে ঝি-চাকর পাওয়া যায় না। তিনি ভারতবর্ষ হইতে একটি লোক সঙ্গে আনিয়াছেন। সে-ই রান্না করিয়াছে। খাদ্যদ্রব্য সব সামনে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। নিজেরাই বাঁটিয়া খাইলাম। রেডিওতে দিল্লী কেন্দ্রের হিন্দী গান শুনিলাম। ডাম্‌লে গৃহিণীর আতিথেয়তায় আপ্যায়িত হইয়া হোটেলে ফিরিলাম।

১৪ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার আপিসে বসিয়া ডাম্‌লের সাহায্যে আমার অষ্ট্রেলিয়ার প্রোগ্রাম স্থির করিলাম। এখানে দেখিতেছি হোটেলে স্থান পাওয়া কঠিন ব্যাপার। সোমবার হোবার্টে যাইতে হইবে। সেখানকার হোম-সেক্রেটারী আমার জন্য হোটেলে স্থান সংগ্রহ করিতে না পারিয়া দুঃখ করিয়া তার করিয়াছেন। শেষে কি হোটেলের অভাবে আমার প্রোগ্রাম ব্যাহত হইবে? পরামর্শে মহাশয়ের মাদ্রাজী সেক্রেটারী আয়েঙ্গারের এক বন্ধুর বাড়ী হোবার্টে। তাঁহার পরিবার হোবার্টে থাকে। সেই ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ীতে তার করিয়া আমার জন্য হোটেল খুঁজিতে অনুরোধ জানাইলেন। স্থির হইল আমি হোবার্টে স্থান না পাইলে এডিলেড যাইব। এডিলেডে স্থানপ্রাপ্তির আশা পাওয়া গেল। সেখান হইতে মেলবোর্ণ হইয়া পুনরায় ক্যানবেরায় আসিব। তারপর সিডনি হইয়া কলিকাতা ফিরিব। ডাম্‌লে মহাশয় সাত দিনের ছুটি লইয়া সমুদ্র-তীরে বেড়াইতে যাইতেছেন। সিডনির হোটেলে ঐ দিনই সিট ঠিক করিয়া রাখা হইল। মেলবোর্ণে হোটেল মিলিল না। সেখানে হোটেলের জন্য ক্যানবেরা ট্রেজারী সেক্রেটারীকে অনুরোধ করিতে হইল। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করিতে গিয়া টাকা বা অসুবিধার কথা তিনি যেন না ভাবেন। আমাকে কাজ করিতেই হইবে। দামী হোটেলে কিংবা অসুবিধাজনক হোটেলে আমার আপত্তি নাই। যাহা পান তাহাই যেন বিনা দ্বিধায় তিনি আমার জন্য স্থির করেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার মদের দোকান বন্ধের সময় সম্বন্ধে সিডনিতে গণভোট গৃহীত হইবে। বর্ত্তমানে সন্ধ্যা ছ টায় দোকান বন্ধ হয়। এক দল রাত্রি পর্য্যন্ত দোকান খোলা রাখিতে চান। কাগজে ইহা লইয়া খুব বাদবিতণ্ডা ও প্রচার চলিতেছে। যাঁহারা রাত্রি পর্য্যন্ত দোকান খোলা রাখিতে চান তাঁহারা বলিতেছেন যে এখন ছ টায় দোকানে অসম্ভব ভিড় হয়। পরে আর মদ পাওয়া যাইবে না বলিয়া ঐ সময় লোকে মাত্রাতিরিক্ত রূপে মদ পান করে। কাগজ পড়িয়া মনে হইতেছিল যেন প্রায় সকলের মতেই রাত্রি পর্য্যন্ত দোকান খোলা রাখা উচিত। কিন্তু গণভোটের ফল যখন প্রকাশিত হইল তখন দেখা গেল ছ টায় দোকান বন্ধ করার দল বহু ভোটে জিতিয়াছে। এদেশে মদ্যপানের বহর যেন একটু বেশী দেখিতেছি।

শনিবার হোটেলের লাউঞ্জে বসিয়া পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার ট্রেজারী সেক্রেটারীর সহিত নানা বিষয়ে আলাপ হইল। পার্থে যাইবার জন্য ইনি বার বার আমাকে অনুরোধ করিলেন। দুঃখের সহিত আমাকে এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে হইল। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার বহু বিষয়ে ইঁহার সহিত আলোচনা হইল। ইনি বলিলেন, "সিডনির চেয়ে ভারতবর্ষ আমাদের বেশী কাছে। যুদ্ধের সময় পার্থ হইতে কলম্বো পর্য্যন্ত একটি

বিমান চলিত। সিডনি পৌঁছিতে যত সময় লাগে তার চেয়ে কম সময়ে তখন কলম্বো যাওয়া যাইত।" ভদ্রলোক আরও বলিলেন, "এদেশে অল্প লোকের বাস। বহু দূরে দূরে ছড়ান। সিডনি বা মেলবোর্ণের স্বার্থ পার্থের স্বার্থ হইতে ভিন্ন। সেই জন্য ইঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীও বিভিন্ন। ফেডারেশন হইতে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়াকে পৃথক করিয়া দিবার জন্য সেখানকার বহু লোক যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতের হাউস অব লর্ডসের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন। হাউস অব লর্ডস্ এ বিষয়ে কিছু করিতে পারেন কিনা তাহা অবশ্য তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই।" কেসি সাহেবের কথা উঠিল। এক জন অষ্ট্রেলিয়ান ভারতবর্ষে কিরূপ লাটগিরি করিয়াছেন সেকথা এদেশে আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাঁহার শাসনকালে বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের কিরূপ তীব্রতা ছিল এবং সেজন্য তিনি কতদূর দায়ী, অনেকেই আমাকে এ প্রশ্ন করিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে 'কেসি' মহাশয়ের বিরোধী দলের লোকের সংখ্যাও কম নয়।

শনিবার আয়েন্দারের বন্ধুর বাড়ী হইতে তার আসিল যে, হোবার্টে কোন হোটেলেই স্থান নাই। তবে আমার আপত্তি না থাকিলে 'হলিডিন' নামক 'গেষ্ট-হাউসে' তিনি আমার জন্য স্থান সংগ্রহ করিতে পারেন। আমার অবশ্য আপত্তির কারণ ছিল না। গেষ্ট-হাউস শুনিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে, কাহারও বাড়ীতে গেষ্ট হিসাবে থাকিতে হইবে। পরে দেখিয়াছিলাম 'হলিডিন' হোটেলই। তবে এখানে মদ পরিবেশন করা হয় না। মদ বিক্রয়ের লাইসেন্স বিহীন হোটেল এখানে 'গেষ্ট-হাউস'রূপে পরিচিত।

১৭ই ফেব্রুয়ারী সোমবার সকালে ট্রেজারীতে ম্যাকফার্লন ও তদীয় ডেপুটি 'ওয়াটের' সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিলাম। বেলা ২টা ১৫ মিনিটে হোটেল ত্যাগ করিলাম। আমার বড় থলিটি হোটেলের দারোয়ানের হেফাজতে রাখিয়া গেলাম। ওভার-কোটটিও রাখিয়া যাইব স্থির করিয়াছিলাম। দারোয়ান বলিল, "টাসম্যানিয়া পাহাড়ে দেশ। সেখানে এ সময়েও বেশ ঠাণ্ডা পড়িতে পারে। ওভার-কোটটি সঙ্গে রাখাই ভাল।" তাহার উপদেশমত ওভার-কোটটি সঙ্গে লইয়া যে ভালই করিয়াছিলাম তাহা পরে বুঝিয়াছিলাম।

বেলা ৩টা ১০ মিনিটে বিমান উড়িল। বনাবৃত পর্বত-শ্রেণীর উপর দিয়া উড়িতেছি। বন্ধুরগাত্র ভূমির রূপ কমনীয়, যেন সুকোমল ভেলভেটে মোড়া। ৫টা ২০ মিনিটে মেলবোর্ণ বিমানঘাঁটিতে বিমান নামিল। এখান হইতে দ্বিতীয় বিমানে হোবার্টে যাইতে হইবে। টাসম্যানিয়া অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত একটি দ্বীপ। দ্বীপের অভ্যন্তরভাগ পর্ব্বতসঙ্কুল। সেখানে জন-বসতি নাই বলিলেই হয়। উত্তর ও দক্ষিণ উপকূলে কিছু জন-বসতি আছে। হোবার্ট শহর দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে।

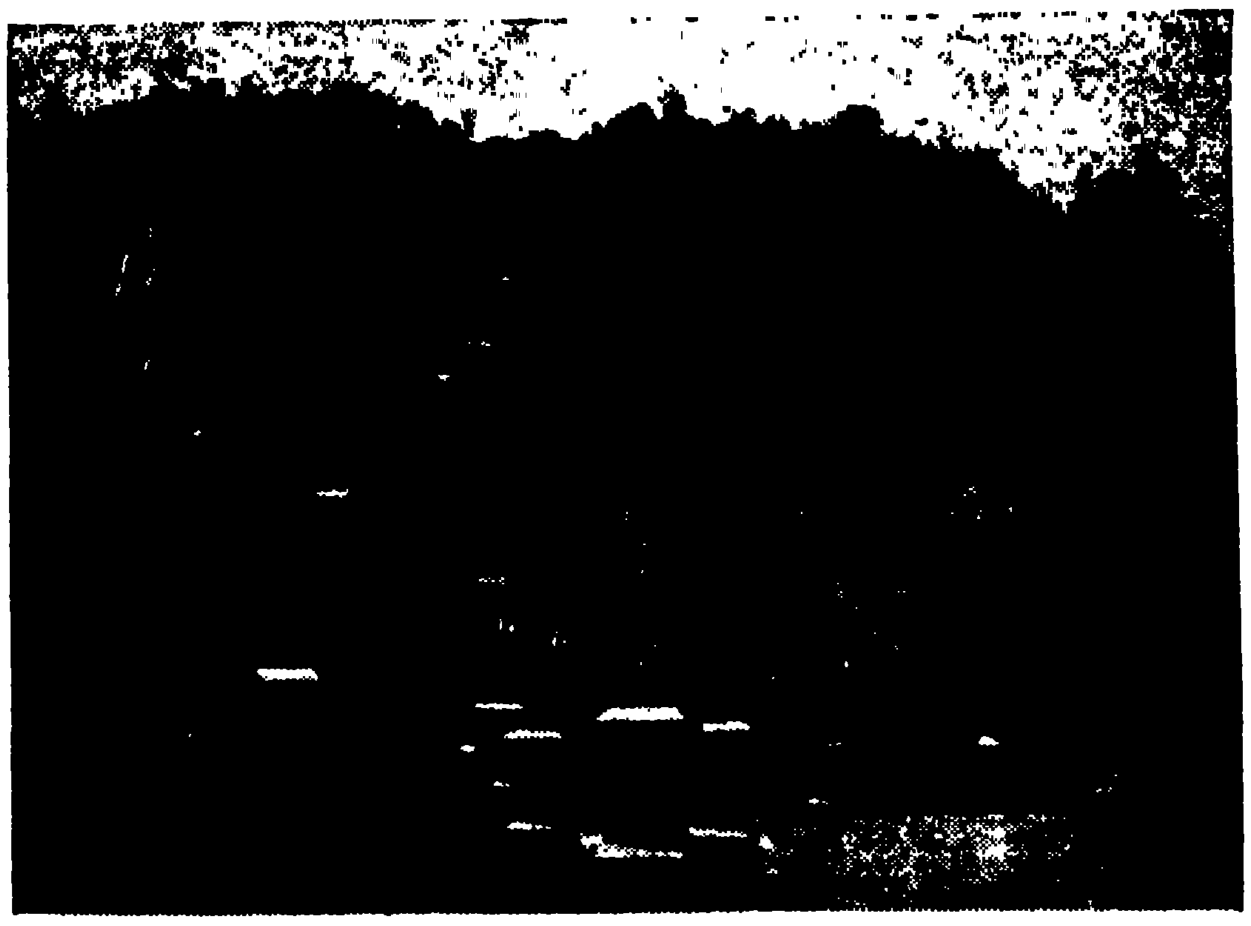

ওয়াডামানা বৈদ্যুতিক শক্তিগৃহের একটি দৃশ্য। খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়া বড় বড় জলের নল নামিয়া আসিয়াছে

মেলবোর্ণের বিমানঘাঁটিটি বেশ বড়। প্রায়ই বিমান নামিতেছে ও উড়িতেছে। হোবার্ট-গামী বিমানে ৭টায় বিমান-ঘাঁটি ত্যাগ করিলাম। সুসজ্জিত শহরের উপর দিয়া উড়িয়া ৭টা ২৫ মিনিটে অন্তরীপ ছাড়িয়া সমুদ্রে পড়িলাম। প্রথমে দু-একটা ছোট ছোট বালির চর। তারপর দিগন্তব্যাপী নীল জল। সন্ধ্যার পূর্বে দেখা গেল আকাশে অপরূপ মেঘের সজ্জা। আকাশের রূপ কোথাও মেদিনীপুরের পাহাড়-প্রস্তরসঙ্কুল প্রান্তরের মত, কোথাও যেন অযুত হস্তীর শোভাযাত্রা। দূরে ভারত মহাসাগরে সূর্য্যদেব অস্তগমন করিতেছেন। ভারত-মাতা তখনও জ্যোতির্ময়ী। তাঁহার শিরোভূষণের জ্যোতি যেন তখনও পশ্চিম-দিগন্ত ভেদ করিয়া ঈষৎ দেখা যাইতেছে। ভাবিতেছি কলিকাতায় এখন বেলা প্রায় ৩টা। গৃহিণীগণ নিজ নিজ গৃহে বিশ্রাম করিতেছেন। পুরুষেরা কর্ম্মস্থলে। এখানে কিন্তু ক্রমশঃ "অন্ধকার নেমে আসে চোখে, চোখের পাতার মত।" অন্ধকারে সব একাকার হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইয়া পড়িয়াছে। চারদিক নিস্তব্ধ। কেবল বিমানের একটানা গর্জ্জন শুনা যাইতেছে। সহসা অনন্ত-অন্ধকার মহাসাগরে জ্যোতিষ্ক সমবায়ের মত হোবার্টের আলোকমালা নয়নপথে পতিত হইল। রাত্রি ৯টা ২৫ মিনিটে এরোড্রোমে নামিয়া ১০টায় হোটেলে পৌঁছিলাম। ডারওয়েন্ট নদীর সেতুর উপর দিয়া নগরে প্রবেশকালে পর্ব্বত-বন্ধুর শহরের আলোক-সজ্জা পরম রমণীয় দেখাইতেছিল।

১৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রবিন্সন, অসবোর্ণ ও বিন্সের সহিত ট্রেজারীতে মিলিত হইলাম। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে 'হোটেলে জায়গা পাওয়া যাইবে না' বলিয়া যে তার গিয়াছে তাহা পাইয়া আমি আর আসিব না। আমার জন্য হোটেলে স্থান সংগ্রহ করিতে না পারায় তাঁহারা লজ্জিত ছিলেন। আমি আসিব না ভাবিয়া দুঃখিতও হইয়াছিলেন।

সহসা আমাকে দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। আমি 'হলিডিনে' আছি শুনিয়া বিন্‌স বলিলেন, "হলিডিন মন্দ জায়গা নয়। তবে আমাদের আপিস হইতে আপনার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট হোটেলেই স্থান খোঁজা হইয়াছিল, এখন এখানে ভ্রমণকারীদের বড় ভিড়। সে হোটেলে স্থান পাওয়া অসম্ভব।" ঐ দিনই কমনওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশনের শুনানী আরম্ভ হইবে। প্রধান মন্ত্রী কমিশনের সভ্যগণকে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করিবেন। সেই ভোজে আমারও নিমন্ত্রণ হইল। পার্লামেণ্ট ভবনের হল ঘরে এই ভোজের ব্যবস্থা। সেখানে প্রধান মন্ত্রী রবার্ট কস্‌গ্রোভের সহিত আমার আলাপ হইল। তিনি যথারীতি কমিশনের সভ্যবৃন্দ ও উপস্থিত মন্ত্রী ও সরকারী কর্ম্মচারিগণের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ভোজসভায় জন পনর ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী আমাকে বলিলেন, "শুনানী শেষ করিয়া কমিশন আমাদের হাইড্রো-ইলেকট্রিক্ সংক্রান্ত কাজগুলি দেখিবার জন্য টাসম্যানিয়ার অভ্যন্তরে সফর করিবেন। আমরা তাঁহাদের সফরের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনি যদি তাঁহাদের সহিত যোগ দেন তবে বিশেষ আনন্দিত হইব।" কমিশনের সহিত ভ্রমণের প্রস্তাবে আমি সানন্দে সম্মত হইলাম। ভোজসভায় শিক্ষামন্ত্রী আমার পাশে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে টাস্‌ম্যানিয়া সর্বাপেক্ষা অগ্রণী। 'এরিয়া স্কুল'গুলি আমাদের বিশেষত্বপূর্ণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এই স্কুলগুলির শিক্ষাপদ্ধতির বিশিষ্টতা সুধীগণের প্রশংসা পাইয়াছে। আপনার একটি এরিয়া স্কুল দেখিবার সময় হইবে কি?"

আমি বলিলাম, আগামী কাল ও পরশু (বুধ ও বৃহস্পতিবার) কমিশনের শুনানী চলিবে। শনিবার কমিশনের সহিত সফরে বাহির হইতে হইবে। শুক্রবারে আমি মুক্ত। যদি ঐ দিনে দেখা সম্ভব হয় তবে অবশ্যই আমি সাগ্রহে আপনাদের এরিয়া স্কুল দেখিতে যাইব।

ভোজনান্তে কমিশনের শুনানী আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথম প্রধান মন্ত্রী কমিশনের নিকট তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিলেন। তার পর বিভাগীয় অধিকর্ত্তাগণ স্ব স্ব বিভাগ সম্বন্ধে বলিলেন। কমিশনারগণ তাঁহাদিগকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী বুধবার স্থানীয় সংবাদপত্র 'মারকারী'তে এই শুনানীর বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইল। খুব বড় অক্ষরে এই বিবরণীর এইরূপ শিরোনামা ছাপা হইয়াছিল: "অষ্ট্রেলিয়ান অর্থ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের ঔৎসুক্য"। বিবরণীর প্রথমেই বড় হরফে এই শুনানীতে বর্তমান লেখকের উপস্থিতির কথা বলা হইয়াছিল। শুনানীর শেষ দিনে কস্‌গ্রোভ মহাশয় টাসম্যানিয়ার একখানি ছবিচিত্রাবলী কমিশনের সমক্ষে উত্থাপিত করিলেন। এক একটি মানচিত্রে দেশের এক একটি সম্পদ বা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মানচিত্রসমূহ রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার বিশেষ সহায়ক। কমিশন এগুলির খুব তারিফ করিলেন, বলিলেন, "অষ্ট্রেলিয়ার কোন রাষ্ট্রে তাঁহারা এইরূপ মানচিত্র দেখেন নাই।" কস্‌গ্রোভ মহাশয় আমাকে কয়েকখানি মানচিত্র উপহার দিলেন। আমি একখানি গ্রহণ করিয়া বলিলাম, "বেশী দিতে হইলে কলিকাতা পাঠাইবার ভার আপনাকেই লইতে হইবে।"

অষ্ট্রেলিয়ায় ছয়টি রাষ্ট্র। তন্মধ্যে কুইনস্‌ল্যাণ্ড, নিউ সাউথ ওয়েলস্ এবং ভিক্টোরিয়া সমৃদ্ধিশালী। টাসম্যানিয়া, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া জনবিরল এবং শিল্পসম্পদে পশ্চাৎপদ। শেষোক্ত রাষ্ট্রত্রয় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্য ব্যতীত অচল। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য-বিতরণ ব্যবস্থা ন্যায়-প্রতিষ্ঠ করিবার জন্যই কমনওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশনের সৃষ্টি।

কোন রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলে কেন্দ্রীয় সরকার দরখাস্তটি কমিশনের নিকট প্রেরণ করেন। কমিশন যথোচিত অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইয়া দেন। কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে প্রার্থী রাষ্ট্রকে সাহায্য প্রদান করেন। এ বিষয়ে কমিশন কতিপয় সুনির্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কমিশনের মতে যদি কোন রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের তুল্য করভার বহন করিবার দায়িত্ব লয় তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যেও অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায়ই তাহার সমানাধিকার। রাষ্ট্র কিরূপ করভার বহন করিবে বা কিরূপ জনহিতকর কার্য্য করিবে সে বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। সাহায্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণেই শুধু কমিশনের সূত্র প্রয়োগ করা হয়। প্রার্থী রাষ্ট্রের করভার কম থাকিলে সাহায্য কম হয় এবং করভার বেশী থাকিলে সাহায্য বেশী হয়। সেইরূপ জনহিতকর কার্য্যের ব্যয় অন্যান্য রাষ্ট্র অপেক্ষা বেশী থাকিলে সাহায্য তদনুপাতে কম হয় এবং কম থাকিলে সাহায্য তদনুপাতে বেশী হয়। রাষ্ট্রের কর্ম্মকুশলতা অনুসারেও সাহায্য কম-বেশী করা হয়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই কমিশন এদেশে কাজ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ইঁহাদের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রার্থী রাষ্ট্র নির্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছে।

মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার কমিশনের শুনানী চলিল। দুই বেলা শুনানীতে উপস্থিত রহিতেছি আর বৈকালে শহরে বেড়াইতেছি।

হোবার্ট শহর ডারওয়েণ্ট নদীর তীরে; সমুদ্র হইতে ১৪ মাইল দূরে। অদূরে ৪১৬৬ ফুট উচ্চ ওয়েলিংটন পর্ব্বত।

পাহাড়ের গায়ে ও উপত্যকার সমভূমিতে সহরটি অবস্থিত। নদীর উত্তর পার্শ্বে এবং সমভূমিটুকুর তিন দিকেই পাহাড়। শহরটি নদীর পশ্চিম পারে। নদী বাঁকিয়া মাঝে মাঝে শহরের ভিতরে চলিয়া আসিয়াছে—স্থলভাগ যেন দুই বাহু বাড়াইয়া নদীর মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। উপকূলভাগ কয়েক স্থলেই এইরূপ শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদের মত বক্র। হোবার্ট বন্দর একটি শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়। পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ অনায়াসে এখানে আসিতে পারে। প্রকৃতির রমণীয় নিকেতনে এই শহরটি অবস্থিত। গাছপালা ঘনসবুজ। রকমারি ফুল। গ্লাডিয়োলা ফুল বড় সুন্দর। পাইন জাতীয় ছোট ছোট গাছ নানা রূপে ছাঁটিয়া কেহ বাড়ীর প্রাচীর তৈরি করিয়াছেন। কেহ নানারূপ তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আকাশ পরিষ্কার, বাতাস বিশুদ্ধ। আবহাওয়া সুখকর। পর্ব্বত-ক্রোড়ে প্রশস্ত নদীতীরে প্রকৃতির লীলা-কুঞ্জে ছবির মত সুন্দর শহর হোবার্ট, শহরের জনসংখ্যা ৭২০০০। বিকালে বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর উপরকার পুলে যাইতাম। ইহা একটি 'পন্টুন' সেতু। সেতুটি বেশ সুন্দর। ইহার উপর হইতে শহরের দৃশ্য পরম রমণীয়। শহরের অনেকে আমাকে বলিত, "এত বড় 'পন্টুন' সেতু পৃথিবীতে আর নাই। আমি কলিকাতার পুরাতন হাওড়ার পুলের কথা বলিয়া সবিনয়ে প্রতিবাদ জানাইয়াছি।

এখানে বড় রাস্তার উপর সরকারের টুরিষ্ট ডিপার্টমেন্টের আপিস। ভ্রমণকারীদের সর্ব্বপ্রকার সংবাদ সরবরাহ করা এবং তাহাদের জন্য নানা দিকে যাতায়াতের বন্দোবস্ত করা এই আপিসের কার্য্য। গ্রীষ্মকালে মনোরম টাসম্যানিয়ায় ভ্রমণকারীদের বড় ভিড়।

বুধবার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট হইতে চিঠি পাইয়া তাঁহার আপিসে গেলাম। তাঁহার সহকারী হিউসের সঙ্গে আলাপ হইল। ঠিক হইল হিউস শুক্রবার সকালে আমাকে একটি এরিয়া স্কুলে লইয়া যাইবেন। সকাল ৮টায় রওনা হইয়া সন্ধ্যায় ফিরিব। পরদিন গ্রাণ্টস্ কমিশনের সহকারী সেক্রেটারী করেষ্টার আমার সহযাত্রী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। করেষ্টার পককেশ হইলেও যৌবনোচিত সজীবতায় সর্ব্বদা প্রফুল্ল এবং সদালাপী।

২০শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অসবোর্ণ আমাকে নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। অসবোর্ণ-গৃহিণী সাদরে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহার রন্ধন তখনও শেষ হয় নাই। মাঝে মাঝে রান্নাঘরে যাইতেছিলেন। সস্ত্রীক এটর্ণী জেনারেল বা আইন মন্ত্রী এবং গ্রাণ্টস্ কমিশনের সভ্যদ্বয়ও এই ভোজে নিমন্ত্রিত ছিলেন। তাঁহারা আমার পরেই আসিলেন। অসবোর্ণের দশ-এগার বৎসরের এক পুত্র বাহিরে খেলিতেছিল। ছেলেটির ম্যাজিকে বড় ঝোঁক। আমি ভারতবর্ষের লোক শুনিয়াই সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "আপনি দড়ির খেলা জানেন?" তাহার মাতা হাসিলেন। বুঝাইয়া দিলেন যে, দড়ির খেলাটি গল্প-মাত্র। ছেলেটির কল্পনায় ভারতবর্ষ ম্যাজিকের দেশ। তাহার জানা দুই-একটি ম্যাজিক আমাকে দেখাইবার জন্য সে খুব ব্যস্ত হইল। একটি ম্যাজিক বেশ ভালই দেখাইল। একটি রবারের নলের মধ্য দিয়া একটি সুতা চালাইয়া দিল। সুতার দুই প্রান্ত নলের দুই দিক দিয়া ঝুলিতে লাগিল। ছেলেটি তখন কাঁচি দিয়া নলটি কাটিয়া দুই টুকরা করিয়া ফেলিল। কিন্তু সুতাটি অখণ্ডই রহিয়াছে। আমরা সকলেই তাহার প্রশংসা করিলাম। ছেলেটি উৎসাহী ও বুদ্ধিমান্। যথাসময় ভোজন সুরু হইল। অসবোর্ণ-গৃহিণী পরিবেশনও করিতেছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে আহার করিতেও বসিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মপটুতা ও রন্ধন-কুশলতার প্রশংসা করিলাম।

রাত্রি প্রায় ১১টায় অসবোর্ণদের নিকট বিদায় লইয়া আমরা সকলে একত্রে বাসে ফিরিলাম। এটর্ণী জেনারেল ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে হোটেলে পৌঁছাইয়া দিবার ভার লইলেন। এটর্ণী জেনারেল যুবক। গ্রাণ্টস্ কমিশনের সভ্য অধ্যাপক উড্ তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত। তিনি অধ্যাপকের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আইন ব্যবসা ছাড়িয়া নূতন রাজনীতিতে আসিয়াছি। আইন ব্যবসা ভালই চলিতেছিল। কিন্তু রাজনীতির বিচিত্র গতি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।" বাস হইতে নামিয়া ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী আমার সঙ্গে হোটেলের দরজা পর্য্যন্ত আসিলেন। দেখিলাম দরজা বন্ধ। ভদ্রমহিলা হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই। যেরূপেই হোক আপনাকে ঘরে ঢুকাইয়া যাইব। না হয় জানালা বাহিয়াই উঠিব।" অনুসন্ধানে দেখা গেল একটা দরজা খোলা আছে। আমাকে 'ভিতরে ঢুকাইয়া' তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার এরিয়া স্কুল দেখিতে যাইব। প্রাতরাশের পর পূর্ব্বনির্দিষ্ট স্থানে হিউস্ ও করেষ্টারের সঙ্গে মিলিত হইলাম। হিউস্-পত্নী আমাদের সঙ্গে যাইবেন। তাঁহাকে তাঁহার গৃহ হইতে গাড়ীতে তুলিয়া লওয়া হইল। হিউস্-পত্নী ভারতবর্ষের কথা তুলিলেন। সোৎসাহে বলিলেন, "আমার ঠাকুর্দ্দা ভারতবর্ষে রেল-কর্ম্মচারী ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক শহরে তাঁহার কর্ম্মস্থল ছিল। আমার এক ভাই (সহোদর নহে) এখনও ভারতবর্ষে রেলের কাজে নিযুক্ত আছেন। (স্বামীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এই ব্যক্তিটির জন্যই আমার ভারতবর্ষে যাওয়া হয় নাই। পিতার সঙ্গে ভারতবর্ষে যাইবার জন্য আমি প্রস্তুত এমন সময়ে ইনি আমাকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন।"

করেষ্টার বলিলেন, "আমার এক ভগিনী গারো পাহাড়ে মিশনরী জীবন যাপন করিতেছেন।"

হিউস্-পত্নী আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তাহাদের ফটো দেখিতে চাহিয়া আমার নিকট তাহাদের ফটো নাই শুনিয়া নিরাশ হইলেন।

আমরা এরিয়া স্কুল দেখিতে জীবষ্টোন গ্রামে যাইতেছি। জীবষ্টোন হোবার্ট হইতে ৩৪ মাইল। ওয়েলিংটন পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠিতেছি। আঁকা-বাঁকা রাস্তা। দূরে ডারওয়েন্ট নদী দেখা যাইতেছে। আরও উপরে উঠিবার পর বহু দূরে সমুদ্র দেখা গেল। সমুদ্র পুনঃ পুনঃ চোখে পড়িতেছে ও আড়ালে যাইতেছে। চারদিকে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে অফুরন্ত ইউক্যালিপ্‌টাস বা গাম গাছের জঙ্গল। পাইন, ফার এবং ওক গাছও যথেষ্ট। মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ ঝোপ। তাহাতে ছোট ছোট লাল ফল পাকিয়া আছে। কোথাও মেয়েরা সেই ফল পাড়িয়া লইতেছে। সেগুলি দ্বারা নাকি জেলি প্রস্তুত করিবে। হুয়নভিল নামক একটি গ্রাম পথে পড়িল। এই গ্রামে একটি স্কুল আছে, স্কুলের বাড়ীটি সুন্দর তখনও স্কুল বসে নাই। হিউস্ সেখানে গাড়ী থামাইয়া চারিদিক ঘুরাইয়া দেখাইলেন। দূরে চারদিকেই পাহাড়। অদূরে হুয়ন নদী—স্বচ্ছতোয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী। নদীর উপরকার সুন্দর একটি সেতু অতিক্রম করিয়া ওপারে গেলাম। অনেক দূর পর্য্যন্ত নদীর ধারে ধারে চলিলাম। পথের পাশে মাঝে মাঝে আপেলের বাগান। বড় বড় আপেলের বাগিচাগুলি দেখিতে বড় মনোরম। আপেল পাকিবার সময় হইয়া আসিয়াছে। এক একটা গাছ যেন আপেলের ভারে ভাঙিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে লাল টুক্‌টুকে ফলগুলি দেখিতে বড়ই লোভনীয়। বেলা সাড়ে বারটায় জীবষ্টোনে পৌঁছিলাম।

প্রধান শিক্ষক স্কুলের পাশেই সপরিবারে বাস করেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন হইয়াছে। ভোজনে বসিলাম। স্কুলের মেয়েরা রান্না করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে দুই জন পরিবেশন করিল। সস্ত্রীক প্রধান শিক্ষক এবং কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী আমাদের সঙ্গে আহার করিলেন। ভোজনান্তে প্রধান শিক্ষক আমাদিগকে ক্লাসে লইয়া গেলেন। পর পর তিনটি ক্লাস দেখিলাম। চৌদ্দ-পনের বছরের ছেলেমেয়েরা পড়া দিতেছিল। ছয়-সাত বছরের ছেলেমেয়েরা কাগজ কাটিয়া বাড়ী বানাইতেছিল। বাড়ীগুলি আমাদিগকে দেখাইবার জন্য তাদের বিশেষ উৎসাহ। আট-নয় বছরের ছেলেমেয়েরা ভূমণ্ডলের ম্যাপ আঁকিতেছিল। প্রধান শিক্ষক আমাকে প্রত্যেক বেঞ্চের কাছে লইয়া গেলেন। আমি নিকটে যাইতেই শিশুগণ "এই ভারতবর্ষ" বা "এই কলিকাতা" বলিয়া নিজেদের অঙ্কিত মানচিত্রে সোৎসাহে আমাকে ভারতবর্ষ বা কলিকাতার অবস্থান দেখাইতেছিল। এতটুকু ছেলেমেয়েরা ভূমণ্ডলের মানচিত্র আঁকিয়াছে দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। অঙ্কন মোটামুটি ভালই হইয়াছে। আমার প্রশ্নের জবাবে তাহারা মানচিত্রের উপর অন্যান্য জায়গাও দেখাইল। প্রধান শিক্ষক বলিলেন, "আমি কাল ইহাদের বলিয়াছিলাম যে কলিকাতা হইতে এক জন ভদ্রলোক তোমাদের দেখিতে আসিতেছেন। তোমরা যদি তাঁহাকে তাঁহার দেশের কথা বলিতে না পার তবে তিনি তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন। বাইরে কয়েকটি ছেলে কোদাল দিয়া খেলার মাঠ পরিষ্কার করিতেছিল। কোথাও ছেলেরা ছুতার মিস্ত্রীর কাজ করিতেছে, কোথাও লোহারের কাজ চলিতেছে কোথাও বা চামড়ার কাজ চলিতেছে। মেয়েরা সেলাই শিখিতেছে। তাহাদের রান্না ও পরিবেশন তো পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কাঠের কাজের শিক্ষক সগর্ব্বে বলিলেন তাঁহার একটি ছাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বেই হোবার্টে একটি বড় দোকানে বেশ ভাল মাহিনায় কাঠের কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিলাম। ভদ্রলোকের নানা বিষয় বেশ জানাশুনা আছে। বলিলেন, "আমরা দেখিয়াছি যে অধিকাংশ ছেলেই স্কুল ছাড়িয়া চাষবাস বা অন্য ব্যবসায়ে চলিয়া যায়। কলেজে খুব কম ছেলেই যায়। কাজেই স্থানীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়াই এই এরিয়া স্কুলের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। শহরের এরিয়া স্কুলে অন্যান্য বিষয় শেখান হয়। এখানে আমরা গৃহনির্ম্মাণ শিখাই, কংক্রিটের কাজ শিখাই, কাঠের কাজ শিখাই। মেয়েরা রান্না শেখে, সেলাই শেখে। ইহারা পরিণত বয়সে যেরূপ জীবন যাপন করিবে তাহার জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত করিয়া তোলাই এরিয়া স্কুলের আদর্শ। স্থানীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়াই ইহাদিগকে আমরা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করি।"

হিউস্ প্রধান শিক্ষককে বলিলেন, "আপনাদের দেশে আসিয়া ইনি স্বহস্তে একটি পাকা আপেল তুলিতে পারিলেন না—ইহাই আমার আপশোষ।"

প্রধান শিক্ষক—"এবার দুর্বৎসর, ফসল দেরীতে হইয়াছে। অন্যান্য বার এতদিনে আপেল পাকিয়া যায়। কিন্তু এবার একটিও পাকে নাই।"

স্কুল-প্রাঙ্গণে অনেকটা সমতল ভূমি। দূরে চারদিকে পাহাড়, বড় বড় ইউক্যালিপটাস গাছ। নানারূপ ফুল গাছ। কতকগুলি বাবলা গাছের মত গাছ দেখিলাম। নাম ওয়াটাল। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যখন ভারতবর্ষের 'বাণিজ্য-যুদ্ধ' সুরু হইয়াছিল তখন শুনিয়াছিলাম যে চামড়া ট্যান করিতে ওয়াটাল গাছের ফলের প্রয়োজন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাই ভারতবর্ষকে এই ফল সরবরাহ করিত। এদেশের খেলা-ধূলা সম্বন্ধে আলোচনা হইল। এখানে নাকি এক পক্ষে ১৮ জন লইয়া ফুটবল খেলা হয়।

বৈকালে সকলে মিলিয়া চা-পান করিয়া ৪টায় জীবষ্টোন ত্যাগ করিয়া ৬টায় হোবার্টে পৌঁছিলাম।

পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারী শনিবার প্রাতরাশের পর হোটেলের পাওনা চুকাইয়া দিয়া বসিয়া আছি। সরকারী হাইড্রো-ইলেকট্রিক কারখানাগুলি পরিদর্শনার্থ রওনা হইতে হইবে। রবিনসন গ্রাণ্টস্ কমিশনের সভ্যগণকে লইয়া আমাকে হোটেল হইতে তুলিয়া লইবেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। আমি গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। দুইটি মোটর গাড়ীতে আমরা আট জন। কমিশনের তিন জন সভ্য, সেক্রেটারী, সহকারী সেক্রেটারী, রবিনসন, হাইড্রো-ইলেকট্রিক কমিশনের চেয়ারম্যান এবং আমি। এ. ডব্লু. নাইট হাইড্রো-ইলেকট্রিকের সভাপতি। ইনি আমাদের অভিযানের নেতা ও পথপ্রদর্শক। ট্রেজারী সেক্রেটারী রবিনসন সরকারের পক্ষে দলের তত্ত্বাবধায়ক। এ. এ. ফিট্‌জিরাল্ড্ গ্রাণ্টস্ কমিশনের সভাপতি। ইনি এদেশের একাউণ্ট্যাণ্ট সভারও সভাপতি। অধ্যাপক জি. এল. উড দ্বিতীয় সভ্য। ইনি মেলবোর্ণ বিশ্ববিত্যালয়ের কমার্স বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। অপর সভ্যের নাম জে. জে. কেনেলি। ইনি পার্থের অধিবাসী। ইঁহারা সকলেই প্রৌঢ়-বয়স্ক। কমিশনের সেক্রেটারী এম্. রিচার্ডসন। ইনি পক্ক-কেশ বৃদ্ধ। সহকারী সেক্রেটারী করেষ্টার পূর্ব্বদিন আমার সঙ্গে জীবষ্টোন গিয়াছিলেন। এ দেশের অভ্যন্তর-ভাগ পার্ব্বত্য মালভূমি। ৩৩০ ফুট উচ্চে একটি বড় হ্রদ আছে। হ্রদটি ২০ মাইল লম্বা ও ১৪ মাইল চওড়া। ইহার নাম গ্রেট লেক। এত উচ্চে এত বড় হ্রদ বিদ্যুৎ-শক্তির একটি বিরাট্ আধার-বিশেষ। এখান হইতে জল নামাইয়া লইয়া পথে যেখানেই একটা খাড়া পাহাড় পাওয়া যায় সেখানেই পর্ব্বতশীর্ষ হইতে সবেগে নিপতিত জলস্রোতের সাহায্যে পর্ব্বতমূলে টারবাইন চালাইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হইয়া থাকে। টারবাইন ঘুরাইয়া দিয়া জলরাশিকে খাল দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়। পরে ঐ জলের অবতরণ-পথে আবার যখন একটি খাড়া পাহাড় পড়ে তখন সেখানে ঐ জলের দ্বারাই আবার একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র চালান হয়। এইরূপে এই হ্রদের জলের দ্বারা ওয়াডামানা নামক দুইটি স্থানে দুইটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে।

গ্রেট লেক ভিন্ন লেক সেণ্ট ক্লেয়ার নামে আর একটি হ্রদও এই পাহাড়ের উপর অবস্থিত। তাহার জলের দ্বারা টেরেলিয়া কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। বাটলার্স গর্জ নামক স্থানে অপর একটি কারখানা স্থাপিত হইতেছে। এই কেন্দ্রটিও সেণ্ট ক্লেয়ারের জলে চলিবে।

এই সমস্ত জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ একটি কমিশনের হস্তে ন্যস্ত। নাইট এই কমিশনের সভাপতি। কমিশন প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতেছেন। ইঁহাদের বিদ্যুৎ-উৎপাদন-প্রচেষ্টা অফুরন্ত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। ভবিষ্যতে সমুদ্রের তলা দিয়া তার চালাইয়া এখান হইতে ভিক্টোরিয়া রাষ্ট্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার কথাও কেহ কেহ চিন্তা করিতেছেন। টাসম্যানিয়ার উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি টাসম্যানিয়ার তথা অষ্ট্রেলিয়ার একটি বড় সম্পদ।

আমরা শনিবার সেণ্ট ক্লেয়ারের কেন্দ্রগুলি এবং রবিবার গ্রেট লেকের কেন্দ্রগুলি দেখিব। সোমবার হোবার্ট ফিরিব এবং ফিরিয়াই আমি মেলবোর্ণ অভিমুখে রওনা হইব।

কামনা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এক সঙ্গে গিয়েছিনু দূর শৈলপুরী,
ধরা যেথা স্বপ্নময় মেঘে কুয়াশায়,
দিনভোর রৌদ্র-ছায়া করে লুকোচুরি—
রাত্রির দীপালি যেথা নগরী সাজায়।
বর্ণে বর্ণে ছেয়ে গেছে নীরস পাষাণ,
ঢেকেছে রুক্ষতা তার শ্যাম আবরণে
শতেক নির্ঝর তারে করাইছে স্নান
মধু হাস্য জাগাইছে তাহার আননে।

নিস্পন্দ পাষাণ আজি এ বক্ষ পঞ্জর,
আসিবে না ছুটি' হেথা গিরিনির্ঝরিণী?
জাগাবে না শ্যাম শোভা আবরি' কঙ্কর,
বাজাবেনা মৌন ভাঙি শিঞ্জন-কিঙ্কিণী?
মৃত্যুর স্তব্ধতা ভাঙি জীবন উচ্ছ্বাস
উঠিবে না হর্ষ ভরে করি' অট্ট হাস?

খোং ফু জু ও চীনের প্রাক্-দার্শনিক যুগ

শ্রীঅজিতরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

চীন দেশের সভ্যতা অতিশয় প্রাচীন। তাহার দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের মধ্যে, প্রথমতঃ ভারতীয় ও শেষের দিকে খ্রীষ্টীয় ভাবধারার প্রভাব যদিও লক্ষিত হয়১ তথাপি তাহার মধ্যে যে নিজস্ব মৌলিকতা নিহিত আছে সেকথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চীন দেশের প্রথম উল্লেখযোগ্য মনস্বী খোং ফু জু২। তাঁহার পূর্ব্বেও অনেক মনস্বী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন না থাকায় তাঁহারা বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। খোং ফু জুর মতবাদে কতটুকু মৌলিকতা আছে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান; এবং ইহা প্রায় নিশ্চিত যে তাঁহার সবটুকু একেবারে নিজস্ব নয়; তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনস্বিগণের নিকট অনেকাংশে ঋণী। খোং ফু জুর সমসাময়িক লাউজু৩। লাউজুর মতবাদও পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষিগণের ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে৪। অন্যতম দার্শনিক ম জু'র বেলায়ও এই কথাই প্রযোজ্য। অন্যান্য অপ্রধান দার্শনিকদের মতবাদ—যেমন কা ও মিং—ইঁহাদেরও সর্ব্বাংশে মৌলিকতা নাই বলিয়াই মনে হয়।

চীন দেশের দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হয় খোং ফু জুর সঙ্গে সঙ্গে। তাঁহার পূর্ব্বে কোন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের অথবা কোন সুবিন্যস্ত মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায় না; প্রকৃতপক্ষে সুবিন্যস্ত ভাবে কোন মতবাদ তখন পর্য্যন্ত বিদ্যমান্ ছিলও না। এই প্রাক্-দার্শনিক যুগ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্ধান পাইতে হইলে কতকগুলি ইতিহাস ও সাহিত্য-গ্রন্থের উপরই মুখ্যতঃ নির্ভর করিতে হয়। কারণ তদানীন্তন চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতে হইলে এই গ্রন্থসমূহই একমাত্র সহায়। তন্মধ্যে সি চিং নামক গ্রন্থখানিতে চাও বংশের রাজার রাজত্বকালের প্রথমাংশে কি কি ঘটিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ আছে। এই সি চিং গ্রন্থ ৩০৫ খানি গীতিকাব্যে পরিপূর্ণ। এই গীতিকাব্যগুলি পাঠ করিলে তৎকালীন চাও বংশের রাজত্বে প্রচলিত আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করা যায়। মু চিং আর একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ; ইহা ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা ও ভাবধারা অবলম্বনে লিখিত। সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত ধর্ম্মযাজকগণের প্রার্থনাসমূহ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চুন চি উ নামক আর একখানি গ্রন্থ আছে। তাহাও ঐতিহাসিক তথ্যবহুল। ইহাতে প্রতি বৎসরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী কালানুক্রমিকভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ছো চুয়ান নামক গ্রন্থখানি পূর্ব্বোক্ত চুন চি উ নামক গ্রন্থেরই টীকা-স্বরূপ। এই গ্রন্থখানিই চীন দেশের প্রামাণিক ও তথ্যপূর্ণ মূল্যবান্ গ্রন্থ। প্রাক্‌দার্শনিক যুগের সর্ব্বশেষ গ্রন্থ সম্ভবতঃ কো ইউ নামক গ্রন্থখানি। ইহাতে বিভিন্ন বিষয়ে কথোপকথনসমূহ সন্নিবেশিত আছে এবং ছো চুয়ানে যে যে বৎসরের ঘটনাসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সেই বৎসরের ঘটনাবলী সংক্রান্ত কথোপকথনই ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।৫ আমাদের মনে হয় এই গ্রন্থ অথবা চুন চিউ নামক গ্রন্থখানি অনেকটা জৈন যুগপ্রধানাচার্য্য গুর্ব্বাবলী নামক গ্রন্থের মত। জৈন গুর্ব্বাবলীতেও এইরূপ কোন্ গুরু কোন্ বৎসরে কি করিলেন তাহা লিপিবদ্ধ আছে।৬

মনীষী খোং ফু জু কে এবং তিনি কি করিতেন সেই সম্বন্ধে চীন দেশের ঐতিহাসিক গ্রন্থ সি চিতে অল্পবিস্তর আলোচনা আছে।৭ তিনি সাংটুং প্রদেশের চু ফু শহরের নিকট লু নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ শুং রাজার বংশধর। কিন্তু কালক্রমে তাঁহারা পিতৃভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং এই লু নামক স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। এই নূতন স্থানে আসিয়া পারিপার্শ্বিক কারণবশতঃ অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থায় তাঁহারা পতিত হন এবং খোং ফু জুকেও এই আর্থিক দুরবস্থার দরুন দুর্ভোগ ভুগিতে হয়; তিনি অবিচলিত ভাবে বহু ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া কোন প্রকারে রাজদরবারে প্রবেশ লাভ করেন। সেখানে স্বীয় অধ্যবসায় বলে রাজার প্রধান অমাত্যের পদ লাভ করেন ও অতিশয় দক্ষতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। কিন্তু রাজ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় তিনি সেই পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তখন তিনি কয়েকজন অনুচরসহ ত্রয়োদশ বৎসর কাল নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং বহু দুঃখ-দৈন্যের সম্মুখীন হন। পরিশেষে জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রাচীন মনীষিগণের গ্রন্থসমূহ অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে থাকেন৮ ও সঙ্গে সঙ্গে অনুচরবর্গকে তদ্বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। এই অনুচরবর্গই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যের স্থান অধিকার করে; মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যসংখ্যা ছিল সহস্রাধিক। তিনি ৪৭৯ খ্রীঃ পূঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন। চু ফু নামক স্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়; এই স্থানে এখনও তাঁহার সমাধিমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

খোং ফু জু চাও বংশের রাজাদিগকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। কারণ এই চাও বংশের রাজন্যবর্গের সময় হইতেই চীন দেশের

সভ্যতা একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। চাও বংশীয় রাজগণের পূর্ব্বে আরও দুই রাজবংশের পতন হয়। এই পতনের কারণ হইতে চাওবংশীয় রাজগণ অশেষ শিক্ষালাভ করেন৯ এবং পতনের কারণ সম্বন্ধে সম্যক্‌ অবহিত হইয়া অতি সন্তর্পণে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। তজ্জন্য রাজ্য ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে ও শিক্ষা-দীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করে। খোং ফু জু-ও এই চাও বংশের রাজগণের গুণে মুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া বলিয়াছিলেন, "চাও বংশীয় রাজন্যবর্গের কি সাংস্কৃতিক গরিমা! এইজন্য আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা অনুকরণ করি।"১০ এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, খোং ফু জুই সর্ব্বপ্রথম সাধারণ ভাবে শিক্ষাদান-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর প্রাচীন গ্রন্থগুলি পাঠ করেন এবং তদ্বিষয়ে শিক্ষাদান করিবার জন্য একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন।১১ এইজন্য চীন দেশের দার্শনিকগণের নিকট তিনি নমস্য; কারণ খোং ফু জুই সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে দার্শনিক আলোচনার প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং তাঁহার সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত হয়।

খোং ফু জু নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। প্রাচীন ছয়খানি বিনয়গ্রন্থ (লিউ, ই—six disciplines) তিনি অতি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন এবং তাহা হইতে সার সঙ্কলন করিয়া বাণী প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার বাণীসমূহ সঙ্ঘের অনুচরবর্গ লিপিবদ্ধ করিতেন। এই লিপিবদ্ধ বাণীসমূহই পরবর্ত্তীকালে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়, এবং ইহা শেষ পর্য্যন্ত খোং ফু জুর দর্শনের মূল ও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হয়। চৈনিক বিনয় গ্রন্থসমূহের লেখক কাহারা সেই সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই। অবশ্য এই বিষয়ে মতভেদ আছে; নব্যসম্প্রদায় মনে করেন যে, এই ছয়টি বিনয়গ্রন্থ খোং ফু জু-র রচনা। কিন্তু ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা চিন্তা করিবার বিষয় বটে। পূর্ব্বোক্ত কো ইউ ও ছু চোয়ান নামক গ্রন্থে কয়েকজন বিশিষ্ট ও খ্যাতিসম্পন্ন লোকের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাতে 'সি চিং', 'সু চিং', 'লি চি' ও 'ই চিং' শীর্ষক বিনয় গ্রন্থসমূহের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, খোং ফু জু এই বিনয় গ্রন্থসমূহের রচয়িতা নন।১২ অন্ততঃ যে আকারে এই গ্রন্থসমূহ আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাদের ত নহেনই।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বিনয়গ্রন্থসমূহের অধ্যয়নে জনসাধারণের অধিকার ছিল না। এই গ্রন্থসমূহ বিশেষ শ্রেণীরই অধিগম্য ছিল।১৩ জনসাধারণ তাহা অধ্যয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। খোং ফু জুও বিনয়গ্রন্থসমূহের দুরূহতার দরুন তাহা হইতে সার সঙ্কলন করিয়া সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করেন।১৪ পূর্ব্বে এই শিক্ষালাভ শ্রেণীবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল। খোং ফু জু সেই বাধা দূরীভূত করিয়া দেন এবং সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষাদান করিতে থাকেন।১৫ বিনয়গ্রন্থসমূহ প্রকৃতপক্ষে সহজবোধ্য ছিল না, এইজন্য সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণের পক্ষে সেগুলি অধিগত করা একেবারে অসম্ভব ছিল। জনসাধারণ যাহাতে এই গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ না থাকেন তাহার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। এইজন্য চীন দেশের জনসাধারণ আজ পর্য্যন্তও কৃতজ্ঞতাসহকারে "মহান্‌ শিক্ষাগুরু" বলিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকে। তিনি যে এই সম্মানলাভের যথার্থই যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

চীনবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে ভিন্নমুখী মতবাদের দরুন চীনদেশ ঘোরতর বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়, তখন 'লি সু'১৬ (খ্রীঃ পূঃ ২১৩ অব্দ) প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত। এইরূপ অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয়—তিনি ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি অতি কৌশল সহকারে এক বিচিত্র আদেশ প্রদান করেন—তাহাতে দার্শনিকবর্গের লিপিবদ্ধ মতবাদসহ মূল্যবান্‌ গ্রন্থাদি অগ্নিদগ্ধ করা হয়। এই আদেশের ফলে চীনদেশের সাংস্কৃতিক উন্নতির পথ বহুলাংশে ব্যাহত হয়। যদিও এই চীনবংশীয় রাজগণ খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মহান্‌ চীন ভূখণ্ডকে সঙ্ঘবদ্ধ ও একত্রিত করেন এবং চীনের অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্ত করেন তথাপি উক্ত প্রধান অমাত্যের ঘোরতর অনিষ্টকারী আদেশ প্রদানের পর হইতে সমগ্র চীনদেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রসারে বাধা উপস্থিত হয়। জনসাধারণের নিকট যে সমুদয় গ্রন্থ ছিল তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য চীন দেশে প্রাচীন শিক্ষাধারা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। রাজকীয় গ্রন্থাগারে যে কয়েকখানি পুস্তক রক্ষিত ছিল তাহাই কেবল আগুনের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং তাহা হইতেই চীনের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ধারার পুনরভ্যুত্থান সম্ভব হয়। ইহার পরই চীনবংশীয় রাজন্যবর্গের অবনতির সূত্রপাত হয় ও অতি অল্পকাল মধ্যেই এই বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে। ইহার পর হানবংশীয় রাজগণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহাদের উদার মতবাদের দরুন পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক মতবাদসমূহের চর্চ্চা পুনরায় আরম্ভ হইতে থাকে। হোইনান দেশের রাজকুমার বিশিষ্ট দার্শনিকগণকে আহ্বান করিয়া অর্থসাহায্য করিতে থাকেন।১৭ এই দার্শনিকগণ রাজকুমারের নামে বিভিন্ন মতসমূহ সঙ্কলিত করেন। এই রাজকুমার আমাদের দেশের ভোজরাজের মত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন; ভোজরাজ পণ্ডিতবর্গকে অর্থসাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।১৮ তাঁহারই অর্থানুকূল্যে যোগসূত্রের উপর

তোঙয়ুত্তি নামক বৃত্তি রচিত হয়। এই বৃত্তির অপর নাম রাজ-মার্ত্তণ্ড।১৯ হোইনান দেশের রাজকুমারের অর্থসাহায্যেও তেমনি একখানি গ্রন্থ রচিত হয়; এই গ্রন্থখানি এখনও হোইনান জু২০ নামে পরিচিত।

এই হানবংশীয় রাজগণের সময় হইতেই খোং ফু জুর দার্শনিক মতবাদের অভ্যুত্থানের সূচনা হয়, এবং চাওবংশীয় রাজাদের সহায়তায় এই মতবাদ উৎকর্ষ লাভ করে। ইহার মূলে একটি কারণ ছিল। তৎকালীন দার্শনিক মতবাদ-সমূহের মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল না। এক দার্শনিক যাহা বলিতেন অন্য দার্শনিক তাহা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতেন। বহু দার্শনিক মতবাদ জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের পরিবর্দ্ধক ও পরিপোষক বটে, তবে তাহাদের মধ্যে যোগসূত্র থাকা আবশ্যক, নতুবা তাহা নিরর্থক বাগবিতণ্ডায়ই পর্য্যবসিত হয়। তাহাতে জ্ঞানের প্রসার ব্যাহত হইয়া থাকে। ভারতেও যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন এক যুগে অনুরূপ অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায় তাহা মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ আছে।২১ চীনদেশে যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা তখন টুং চুং সু নামক জনৈক মহাপুরুষ এই অবাঞ্ছিত অবস্থার অবসান করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হন এবং যাহাতে মাত্র একটি মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাজার নিকট একখানি যুক্তিপূর্ণ লিপি প্রেরণ করেন। তখন হানবংশীয় রাজা উ টির রাজত্বকাল। তাঁহার ওয়ে হি ও উ আন নামে দুই জন বিচক্ষণ অমাত্য ছিলেন। তাঁহারা টুং চুং সুর লিপির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া খোং ফু জুর দর্শন ব্যতীত অন্য সব দর্শনের পঠন-পাঠন একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। তাহাতে খোং ফু জুর দর্শনে পারদর্শী ও আস্থাবান জনগণই একমাত্র রাজপুরুষের পদলাভ করিবার অধিকারী হন। জনসাধারণও রাজসম্মান পাইবার আশায় অথবা অর্থাগমের লোভে "খোং ফু জুর" দার্শনিক মতবাদ আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। খোং ফু জুর দর্শনও এই রাজকীয় সাহায্যলাভ করিয়া বহুলভাবে প্রচারিত হইবার সুযোগ পায়।২২

খোং ফু জুর পূর্ব্বে চীনদেশের জনসাধারণ অলৌকিক ও যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন।২৩ এই বিশ্বাসপ্রবণতা যে কেবল চীনদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে, পৃথিবীর বহু সভ্যজাতির পূর্ব্বাবস্থা অনুসন্ধান করিলে এইরূপ নিদর্শন অনেক পাওয়া যায়।২৪ মনে হয়, ভারতবর্ষেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বৈদিক গ্রন্থে তাহার অল্পবিস্তর সন্ধান মিলে।২৫ বৈদিক ঋষিদের ন্যায় চীনদেশের মহাপুরুষগণও বোধ হয় এক সময়ে প্রকৃতির পূজারী ছিলেন।২৬

বৈদিক দেবতাগণ যেমন মানুষের সুখদুঃখের নিয়ন্তা ছিলেন চীনদেশের দেবগণও অনেকাংশে সেইরূপই ছিলেন২৭। যাঁহারা সৎপথে চলিতেন তাঁহারা দেবতাদের কৃপালাভে সমর্থ হইতেন; যাঁহারা অসৎপথে চলিতেন বা দুষ্কর্ম করিতে চেষ্টা করিতেন তাঁহাদের উপর দুঃখ-দৈন্য ও বিপৎপাত হইত।২৮ কিন্তু কালক্রমে এই মনুষ্যভাবসম্পন্ন দেবতাদের উপর মানুষের বিশ্বাস শিথিল হইতে থাকে; এবং তাহার স্থলে এক অলৌকিক দৈবশক্তির কল্পনার সূচনা হয়; তিনিই বিশ্ব-নিয়ন্তা, সুখ-দুঃখের বিধাতা—তিনিই ঈশ্বর (টি)। কিন্তু এই ঈশ্বর নিরালম্ব অবস্থায় কোথাও থাকিতে পারেন না, তাই তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থানেরও কল্পনা করা হইতে থাকে এবং এই কল্পনা হইতেই স্বর্গের (থিয়েন) রূপ প্রতিভাত হইয়া উঠে। ঈশ্বর যেমন অসীম শক্তিসম্পন্ন, স্বর্গও তদনুরূপ অসীম শক্তির ক্ষেত্র বলিয়া কল্পিত হইতে থাকে। ইহা অসম্ভব কিছু নয়। চীনদেশের জনসাধারণ থিয়েন এবং "টি" উভয়ের কাছেই কৃপাপ্রার্থী ছিলেন। এই উভয়কেই তাঁহারা সমভাবে শ্রদ্ধা ও ভয় করিতেন। কারণ এ দুইয়ের মধ্যে এক জনের কোপে নিপতিত হইলে, "এমন কি রাজ্যভ্রষ্ট হইবারও সমূহ সম্ভাবনা ছিল। একবার এই ঈশ্বরের ভয়ে সিয়ারাজ্যের অধিপতিকে শাস্তি দিতে রাজপুরুষ টাংও সাহস করেন নাই। যদিও এই রাজা বহুবিধ অন্যায় আচরণে লিপ্ত ছিলেন··· তথাপি ঈশ্বরের কোপবৃদ্ধি হইবার ভয়ে সেই রাজাকে শাস্তি দিতে পারা যায় নাই।"২৯ মোট কথা, ঈশ্বরের কৃপাপ্রাপ্ত হইলেই মাত্র রাজগণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন। কখনও কখনও স্বর্গের কৃপাতেও তাহা সম্ভব হইতে পারিত।৩০

কিন্তু সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তাধারার সূচনায় একমাত্র এই জাতীয় স্থূল ভাবনার পরিবেশেই দার্শনিকের মন আবদ্ধ থাকিতে পারে না। দার্শনিক মন এই স্থূল ভাবনার সহজগতিকে অতিক্রম করিয়া চিন্তার জটিল আবর্ত্তে আপনা হইতেই নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। তখন সংশয়াকুল হইয়া মন বিভিন্ন-মুখী চিন্তাধারার সমন্বয়সাধন করিবার জন্য চেষ্টিত হয় এবং সমাধানের একটি মৌলিক সূত্র আবিষ্কার করে। চীনদেশের ভাবধারায় স্বর্গ ও ঈশ্বরের কল্পনার দ্বারা স্থূলভাবে দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ হইতে থাকে। কিন্তু তাহাতেই মনের গতিকে সীমাবদ্ধ না করিয়া আরও সূক্ষ্ম কল্পনার সাহায্যে এই বিশ্বের বৈচিত্র্যের মূল অনুসন্ধান করিতে চৈনিক মনীষিগণ যত্নবান হন। "এই ধরিত্রী সহস্র সহস্র প্রাণীর জীবনদান করিয়াছে এবং তাহাদের জীবনধারণের ভার গ্রহণ করিয়াছে। সুন্দর ও অসুন্দর উভয়েই তাহার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই।···"

এইজন্য প্রত্যেককে এই চিরন্তন নীতির বিষয়ে সচেতন হইতে হইবে—"ইন" ও "ইয়াং" রূপ যে দ্বৈতনীতি বিশ্বের অন্তরালে নিহিত আছে তাহাদের সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ এই সম্বন্ধে সদাজাগ্রত। তাঁহারা এই দ্বৈতনীতিকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিয়া পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হন।"৩১

১। "During the period of Chin, Han, and Tang dynasties China came in contact with India and Chinese civilization and culture had been greatly influenced by Indian culture and civilization."—

অধ্যাপক টান, *Sino Indian Journal* vol. I, part I, পৃঃ ৪৫; পৃঃ ৫২ দেখুন, *Mythology of all races* (Chinese & Japanese). প্রথম দিকের কয়েকটি পৃষ্ঠা দেখুন।

২। ল্যাটিন ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া বলা হয় Confucius.

৩। Waley কৃত *Three Ways of Thought in China*, পৃঃ ২৯।

৪। "As to practice, they accept the orderly sequence of nature from Yin and Yang School, gather the good points of Confucius and Mohists and combine with these the important points of the Schools of Names and Law."—Porter, *Aids to the Study of Chinese Philosophy*, Peiping, ১৯৩৪, পৃঃ ৫১।

৫। *Sacred Books of the East* খণ্ড ৩; *The Chinese Classics*, খণ্ড ৪ ও ৫ দেখুন।

৬। সিংঘী সিরিজ সংকলিত গ্রন্থখানি দেখুন।

৭। এই গ্রন্থের ৪৭তম অধ্যায় দেখুন। ইহাই চীনের প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহা এক শত ত্রিশ অধ্যায়ে পরিপূর্ণ। হানবংশীয় রাজা উ-টির (১৪০-৮৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দ) রাজত্বকাল অবধি ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সুমা টান নামক ঐতিহাসিক (১১০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ) এই গ্রন্থখানি লিখিতে আরম্ভ করেন ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সুমা চিয়েন সেখানি সমাপ্ত করেন চীনের ছয়টি দর্শন সম্বন্ধে এই গ্রন্থে (১৩০ অধ্যায়ে) বহু মূল্যবান্ তথ্য বিদ্যমান আছে। মনে হয় ইহা অনেকটা আমাদের আইন-ই-আকবরীর মত। আইন-ই-আকবরীতেও আমাদের দেশের ষড়দর্শনের মূল তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

৮। "He read the *i* so assiduously that the thongs which bound it wore out three times and said "give me a few more years like this and I will come to a perfect knowledge of the *i*."— "লুন ইউ, ৭, ১৬; দেখুন" *History of Chinese Philosophy* (ফুং কৃত) পৃঃ ৪৪।

৯। "Chow had the advantage of surveying the two preceding dynasties." লুন ইউ, ৩, ১৪।

১০। "How replete is its culture, I follow Chou" লুন ইউ, ৩, ১৪।

১১। "It was only when the times were out of joint that the teachers and scholars set up their teachings and it was in so doing that our master (Confucius) was superior to Yao and Shun."

১২। "Both *Kuo Yu* and *Tso Chuan* records numerous conversations between important personages in which the odes and History are frequently mentioned."—*History of Chinese Philosophy*, পৃঃ ৪৬।

১৩। "This indicates that an education of this sort was acquired by a portion, at least, of the nobility of that time. Confucius was the first man, however, to use the six Disciplines for teaching the common people."— *History of Chinese Philosophy*, পৃঃ ৪৬-৪৭।

১৪। লুন ইউ নামক গ্রন্থখানি দেখুন। এই গ্রন্থ খোং ফু জুর শিষ্যগণ কর্তৃক সংকলিত। ইহা খোং ফু জুর দর্শনের অন্যতম আকর-গ্রন্থ। সুট হিল সাহেব ও লেগি সাহেব ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। *The Chinese Classics* vol. I ও *The Analects of Confucius* (Yokohama সংস্করণ) দেখুন। উপরোক্ত Six Disciplines হইতে পরবর্তী অনেক দার্শনিক মতবাদ উদ্ভূত হইয়াছে The i Wen Chih Chapter of the Chien Hanshu says of the various Philosophic Schools that sprang from the heritage of the Six Disciplines. *History of Chinese Philosophy*, পৃঃ ৪৮।

১৫। ফুং কৃত গ্রন্থের পৃঃ ৪৬-৪৭ দেখুন।

১৬। এই গ্রন্থের পৃঃ ১৫ দেখুন।

১৭। "The book . . . was written . . . by the guests attached to the Court of Liu An, Prince of Huai-nan . . . This book like Lu-Shih Chun Ch'iu is a miscellaneous compilation of all schools of thought." এই গ্রন্থের পৃঃ ৩৯৫ দেখুন এবং ইয়েন পিয়েন লুন নামক গ্রন্থের ৮ অধ্যায় পৃঃ ৫১ পশ্য।

১৮। মেরুতুঙ্গ কৃত প্রবন্ধ চিন্তামণিতে ভোজরাজ বিক্রমাদিত্য ও শিলাদিত্যের প্রশস্তি দ্রষ্টব্য।

১৮। ভোজবৃত্তির পুষ্পিকা।

২০। আমরা যেমন গ্রন্থের পরিবর্তে গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করি, যেমন বলিয়া থাকি শঙ্কর দেখুন, রামানুজ দেখুন, চীনদেশেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রন্থের নামের পরিবর্তে গ্রন্থকারের নামই উল্লেখিত হইয়া থাকে। চীনের জু শব্দ অনেকটা আমাদের জী শব্দের অনুরূপ। এই প্রসঙ্গে সু-উয়েন হি জু নামক চীনদেশের প্রাচীনতম অভিধান পশ্য।

২১। ভারতীয় চিন্তাধারায় মুখ্যতঃ চারিটি যুগ বিদ্যমান। প্রথম বৈদিক যুগ, দ্বিতীয়, ব্রাহ্মণ্যযুগ (যদিও ব্রাহ্মণ্যযুগ আসলে বৈদিক যুগের মধ্যেই পড়ে তথাপি মন্ত্রযুগটিকেই এইস্থানে বৈদিক যুগ বলিয়া ধরা হইয়াছে, আর ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগকেই এইখানে ব্রাহ্মণ্য যুগ বলাই হইয়াছে) তৃতীয় বৌদ্ধ ও জৈন যুগ, চতুর্থ নবপরিবেশে ব্রাহ্মণ্যযুগ। পৃঃ ২৩।

২১। "The teachers of today have diverse standards (tao), men have diverse doctrines and each of the philosophic schools has its own particular position and differs in the ideas which it teaches. Hence it is that the rulers possess nothing whereby they may effect general unification, the Government Statues having often been charged, while the ruled know not what to cling to. I, your ignorant servitor, hold that all not within the field of Six Disciplines or the arts of Confucius, should be cut short; not allowed to progress further. Evil and licentious talk should be put a stop to. Only after this, can there be a general unification and can the laws be made distinct, so that people may know what they are to follow." ছিয়েন হান সু, অধ্যায় ৫৬, পৃঃ ২০-২১।

২৩। চু ইউ, ২, ১।

২৪। "Magic and religion belonging to some department of human experience. Together they belong to the supernatural world, the X-region of experience, the region of mental twilight." Magic includes "all bad ways and religion all good ways of dealing with the supernatural—bad and good, of course, not as we

may happen to judge them, but as the society concerned judge them." Marett, *Anthropology, Home University Library,* পৃ: ২০৯-১১।

২৫। অথর্ব্ববেদ পশু

২৬। Mythology of all races.

২৭। "In ancient times peoples and divine beings did not intermingle. Among the people there were those who were refined and without evils. They were moreover, capable of being equable, respectful, sincere and upright. Their knowledge both in upper and lower ranges was capable of conforming to righteousness. Their wisdom could illumine what was distant with its all pervading brilliance. Their perspicacity could illumine everything. When there were people of this sort the illustrious spirit would descend on them . . . It was through such persons that the regulation of the dwelling places of the spirits, their positions (at the sacrifices) and their order of precedence were affected. It was through them that their sacrifices, sacrificial vessels and seasonal clothings were arranged." চু ইউ,২১১

২৮। "The spirits regardless who is the man, accept only virtue . . . Thus without virtue people will not be harmonious and the spirits will not accept the offerings." ছু চুয়ান, (লেগি সাহেবকৃত) *Chinese Classics* দ্রষ্টব্য। "Heaven confers its decrees on the virtuous . . . Heaven punishes the guilty" সু চিং. পৃ: ৫৫-৫৬

২৯। সু চিং; টাং-এর অভিভাষণ, পৃ: ৮৫

৩০। সি, চিং; ৪-৩; গাথা ৩

৩১। ইউয়ে ইউ, ২, ১।

বিজয়সিংহের সমুদ্রযাত্রা*

শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ

১

মেঘের গুরু গর্জ্জন,
চারিদিকে ঝঞ্চার ঝঙ্কার।
পদতলে ফেনময় ঊর্ম্মির
উচ্ছল উদ্বেগ শঙ্কার।

২

হুঁসিয়ার, যাত্রীরা হুঁসিয়ার,
টলমল্ রণতরী টলমল্,
নাবিকেরা কসে টেনে ধর হাল
ভগবান নেই, আছে বাহুবল।

৩

মৃত্যু সে কিছু নয়,—বিশ্রাম,
কে বলে সে জীবনের মহাভয়?
তারি লাগি নবতর জন্ম,
নব নব জগতের পরিচয়।

৪

আগুয়ান বীরদল, আগুয়ান,
বাজুক না দুর্য্যোগ তূর্য্য।
পেশীময় বক্ষের শক্তি
আনবেই প্রভাতের সূর্য্য।

৫

যৌবন চিরজয়ী চিরকাল,
রক্তের স্ফূর্ত্তিতে উদ্‌গ্রীব।
বিশ্বের বক্ষে সে বিস্ময়
ধ্বংসের পদে সে যে চির-শিব।

৬

হুঁসিয়ার বন্ধুরা, হুঁসিয়ার,
ভেঙে গেছে হাল, যাক্ ধর ফের,
মানুষের বড় নয় ভগবান,
মৃত্যু সে বড় নয় জীবনের।

৭

পশ্চাতে শতশির ঊর্ম্মি,
চারিদিকে ঝঞ্চার শঙ্কা।
বিতাড়িত বন্ধুরা তোল মুখ,
সম্মুখে—সম্মান—লঙ্কা।

৮

আগুয়ান বীরদল, আগুয়ান,
মুছে ফেল কপালের স্বেদজল,
ভয় নেই দেখা যায় দূরে ঐ,
বন্ধুর সিন্ধুর শতদল।

৯

সেথা সব উদ্বেগ অবসান,
অভিরাম অবসর—অবিরল,
আগুয়ান বীরদল, আগুয়ান,
আগুয়ান রাত্রির সেনাদল।

---

* দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া বিজয়সিংহ সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। দুস্তর সমুদ্রের মধ্যে ঝড়ের রাত্রিতে তাঁহার বন্ধুগণ হতাশায় ভাঙিয়া পড়িলে তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইহা কল্পনা করিয়া এই কবিতাটি রচিত হইল।

আত্মঘাতী

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

শেষরাত্রির দিকে পাড়ার কয়েকজন ছোকরা আসিয়া ডাকাডাকি করিয়া ঘুম ভাঙিয়া দিল। ধমকাইয়া উঠিলাম—কি ব্যাপার হে তোমাদের? একটু স্বচ্ছন্দে ঘুমুতে দেবে না নাকি? এই তো অত রাত অবধি বকাবকি করে তবে উঠলে, এখনও কাক ডাকে নি—

হীরু আসিয়া বিছানায় বসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—কাল রাতে রাজেন কাকা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তাহার কথা আটকাইয়া যাইতেছিল।

শুনিয়া গুম হইয়া রহিলাম কিছুক্ষণ। এই রকমটা যে হইতে পারে, কাল সকালে একটু আশঙ্কা হইয়াছিল। উচিত ছিল তাঁহাকে কয়েক দিন চোখে চোখে রাখা। কিন্তু তাহাতে কি শেষরক্ষা করা যাইত? রাজেন কাকা যে সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলাম। ছেলেদের বলিলাম—চলো দেখি কোথায় যেতে হবে।

কোথায় গলায় দড়ি দিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলাম না। দেখি আমার অনুমান ঠিক হয় কিনা।

শ্রাবণের শেষ। রাস্তার জল-কাদা শুকাইবার সময় পায় না। মেঘলা থাকিলে দিনে তালপাকানো রৌদ্র, দুপুরে অসহ্য গুমোট। তবু দেখি আজ শেষরাত্রির দিকে একটু ঠাণ্ডার আমেজ দিয়াছে। অন্ধকার খানিকটা পাতলা হইয়া আসিয়াছে। দুই-একটা পাখী গাছের ডালে বাসায় বসিয়া পাখা ঝাপটাইয়া আলস্য ভাঙিতেছে, জড়ানো গলায় হঠাৎ এক-আধ বার ডাকিয়া উঠিতেছে।

ছেলেদের পিছনে পিছনে গ্রামের সরু হাঁটাপথ ধরিয়া চলিতেছিলাম। পথের দুই পাশে আম-জাম-কাঁঠালের গাছ, আসশেওড়ার ঝোপ, বাঁ দিকে গাছপালার উপর চোখ পড়িতে ফিকে অন্ধকারে দেখিলাম একটা গাছের ডাল হইতে দড়ি বাঁধা রাজেন কাকার দেহটা ঝুলিতেছে। আমাকে দেখিয়া দেহটা যেন ইচ্ছা করিয়াই বনবন্ করিয়া পাক খাইতে লাগিল। মনে মনে হাসিলাম। কাকা মরিয়াও আমার সঙ্গে রসিকতা করিবার অভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই। চোখের ভুল। কিন্তু এরকম চোখের ভুলে বুঝা যায় কাকার আত্মহত্যার সংবাদ অজ্ঞাতসারে আমার মনের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

সকলে হাঁটিতে হাঁটিতে মহেশ-কর্তার বাড়ী ছাড়াইয়া কমল-পুকুরের ঘাটে পৌঁছিলাম। হীরু পথ দেখাইয়া আনিতেছিল। কমল-পুকুরের ঘাট হইতে স্কুল-বাড়ীর মাঠ দেখা যায়। এতক্ষণে অন্ধকার কাটিয়া গিয়া আলো ফুটিয়াছে। ঠিক আলো নয়—আলোর আভাস। স্বদেশীতলার বকুল গাছ চারদিকে ছড়ানো ডালপালা লইয়া একটা অস্পষ্ট ছায়ার মত দেখাইতেছে কমল-পুকুরের এপার হইতে। এ পর্যন্ত আসিয়া আর বুঝিতে বাকী রহিল না রাজেন কাকা আত্মহত্যা করিবার উপযুক্ত বলিয়া কোন্ স্থানটি বাছিয়া লইয়াছেন। সংবাদ শুনিবার পর এই রকমটাই অনুমান করিয়াছিলাম।

ধীরে ধীরে কমল-পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের রাস্তা ধরিয়া স্বদেশীতলার দিকে চলিলাম। স্কুল-বাড়ীর দিক হইতে কুকুরের ডাকের শব্দ আসিতেছে। ঘেউ-উ-উ করিয়া একটানা বিলাপের মত ডাক। ভোরবেলায় কুকুরের কান্নার শব্দ অদ্ভুত লাগিল। স্কুল-বাড়ীর বোর্ডিঙের জন কয়েক ছেলে বকুলগাছের তলায় বেদীটার নীচে বসিয়া আছে। একটা লণ্ঠন তখনও মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। বুঝিলাম ইহারা পাহারা দিতেছে।

বকুলতলায় পৌঁছিলাম। একটা লম্বা উঁচু ডাল গাছের গুঁড়ির চারদিকের বাঁধানো বড় চাতাল ছাড়িয়া অনেকটা সম্মুখে প্রসারিত। সেই ডালের সঙ্গে বাঁধা দড়িতে রাজেন কাকার দেহটা ঝুলিতেছে। চাতালের প্রায় তিন ফুট উপরে পা, মাথাটা সম্মুখের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে।

দড়ি কাটিয়া দেহটা নামাইবার ব্যবস্থা হয় নাই। বোধ হয় ছেলেরা সাহস পায় নাই। নামাইবার বন্দোবস্ত করিতে কিছু সময় গেল। ইতিমধ্যে গ্রামের আরও লোক আসিয়া জড় হইয়াছে সেখানে।

মহেশ-কর্তার ছোট ছেলে যোগেশ জ্যেঠা আসিয়াছেন। তিনি রাজেন কাকার কয়েক বৎসরের বড়, কিন্তু দুই জনে এক সঙ্গে খেলাধুলা করিতেন। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী রায় বাহাদুর চক্রবর্তী আসিয়াছেন। টেকো দারোগা নিবারণ গাঙ্গুলী আসিয়াছে। হেডমাষ্টার হরেন ভৌমিক আসিয়াছেন। দূরে বাড়ী হলেও দেবেন ডাক্তার, নিতাই ঘটক প্রভৃতি গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা আসিয়াছেন।

কি করিয়া খবর পাইয়া ফজলুর দফাদার নছের চৌকীদারকে সঙ্গে লইয়া এরই মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ফজলুর ভিড় হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছে—যেখানে পরশু দিনের সভার সময়ে পতাকা উত্তোলনের জন্য বাঁশ পোঁতা হইয়াছিল সেই বাঁশের কাছে। কঠোর দৃষ্টিতে গম্ভীর ভাবে সে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল, দেশের গবর্ণমেণ্টের

একজন প্রতিনিধির উপযুক্ত কঠিন, অটুট গাম্ভীর্য্য তাহার সারা অঙ্গ, যার মেহেদী-রাঙানো দাড়ী বেষ্টন করিয়া আছে।

দড়ি কাটিয়া দেহ নামাইয়া চাতালের উপর শোয়ানো হইল। গলার দড়ি কাটিয়া ঘাড় সোজা করিয়া দেওয়া হইল। চক্রবর্ত্তী রায় বাহাদুর চাতালের উপর উঠিয়া আসিয়া গায়ের চাদরখানা দিয়া মুখ ও দেহ ঢাকিয়া দিলেন। ছেলেরা একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া দেখিল। পরশু সভায় রাজেন কাকা অনুপস্থিত থাকায় চক্রবর্ত্তী রায় বাহাদুর তাঁহার উদ্দেশে বহু ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন ইহারাই পঞ্চম বাহিনীর সৃষ্টি করে। 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়া তিনি নূতন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

চাহিয়া দেখি যোগেশ জ্যেঠা চাতালের নীচে ঘাসের উপর বসিয়া। তাঁহার দৃষ্টি চাতালের গা'য়ে লেখার উপর আবদ্ধ। বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্—লাল সিমেন্টের উপর বড় বড় অক্ষরগুলি কাটা। চাতালের চারপাশে একই লেখা—বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্।

যোগেশ জ্যেঠার পিতাঠাকুর মহেশকর্ত্তার কীর্ত্তি।

মহেশকর্ত্তা কবে স্বর্গত হইয়াছেন। তাঁহার চেহারা একটু একটু মনে পড়ে। নাতিদীর্ঘ একহারা মানুষ, সাদা ধপধপে রং। হাতের তেলোয়, পায়ের চেটোয় গোলাপী আভা, গালে, কপালে গোলাপী ছোপ, রক্ত যেন ফাটিয়া পড়িবে। পাকা চুলে বাঁ দিকে পরিপাটি করিয়া টেরী কাটা। সাদা, মোটা গোঁফের দুই প্রান্ত চুমরানো। কোঁচানো সরু কালোপাড় কাঁচি ধুতি, গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে বকলস লাগানো পেটেন্ট লেদারের পাম্প-সু। চোখে পাঁসনে চশমা, চশমার সঙ্গে বাঁধা কালো সিল্কের ফিতা গলা বেড়িয়া পাঞ্জাবীর উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

বাষট্টি বছরের ফুল-বাবু মহেশকর্ত্তা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িলেন। সে কি প্রচণ্ড ঝড়! ঘুমন্ত দেশ সে ঝড়ের ধাক্কায় চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। মরা গাঙে বান ডাকিল।

বাঁ হাতে কোঁচার খুঁট ধরিয়া খালি পায়ে গান করিতে করিতে মহেশকর্ত্তা ভাগনী নদীতে চলিয়াছেন রাখীবন্ধনের দিন সকালে—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, (ওরে) দীনদুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই।' মহেশকর্ত্তার পিছনে চলিয়াছে গ্রামের ছেলেছোকরা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, এমন কি ছোট মেয়েরা পর্য্যন্ত হাততালি দিয়া সমস্বরে গাহিতে গাহিতে—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।'

বিলাতী কাপড় পোড়ানো হইল, স্বদেশী ভাণ্ডার নাম দিয়া দেশী কাপড়ের দোকান খোলা হইল, কুস্তি, লাঠিখেলা শিখিবার আখড়া তৈয়ারী হইল।

সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে, বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, লিয়াকৎ হোসেন, অশ্বিনী দত্তের নাম গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সকলের মুখস্থ হইয়া গেল। ফুলার সাহেবের নামে ও লাল পাগড়ী লইয়া ছড়া বাঁধা হইল। নৌকার মাঝি, গরুর রাখাল, গরু-মহিষের গাড়ীর গাড়োয়ান, মুদীর দোকানের ছোকরা, স্কুল, পাঠশালার ছেলেরা এই সব ছড়া গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তার পর আসিল বন্দেমাতরম্, সন্ধ্যা, যুগান্তরের দিন। মজঃফরপুরে বোমা ফাটিবার সংবাদে দেশে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহিয়া গেল।

টেকো দারোগা নিবারণ গাঙ্গুলীর পিতা মহেন গাঙ্গুলী ছিল পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর। গাঙ্গুলী গ্রামে আসিয়া একবার ঘুরিয়া গেল। তার পর মহেশকর্ত্তার বড় ছেলে হরিশ এবং আরও কয়েকজন যুবককে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া সদরে চালান দেওয়া হইল। সকলে মিলিয়া বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে জেলে ঢুকিল। মহেন গাঙ্গুলী ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইয়া গেল।

এবার আসিল মহেশকর্ত্তার মেজ ছেলে সতীশের পালা। কোথায় কাহার মাথার খুলি ফুটা করিয়া দিয়া গ্রামে আসিয়া জেলেপাড়ায় লুকাইয়াছিল। গোপনে খবর পাইয়া মহেন গাঙ্গুলী নিজে আসিল ধরিতে। জাল কাঁধে বিনোদ মাঝিরূপী সতীশের গাঙ্গুলীর হাতে ধরা পড়াটা পছন্দ হইল না। বৈঠার ঘায়ে গাঙ্গুলীর মাথা ফাটাইয়া দিয়া ভাগনী নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তার পর হইতে তাহার আর কোন খোঁজ নাই। কেহ বলে আসামে পলাইয়া গিয়া বর্ম্মায় পাড়ি দিয়াছে, আবার কেহ বলে কালাজ্বরে মরিয়াছে। সকলেরই শোনা কথা।

এবার জেলার সম্মানিত জমিদার, বেষট্টি বছরের ফুলবাবু মহেশকর্ত্তা বাঁ হাতে কোঁচার খুঁট ধরিয়া 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই', গাহিতে গাহিতে জেলে ঢুকিলেন। চারদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

দুই মাস পরে মহেশকর্ত্তা ফিরিলেন। ফিরিয়া এলো-মেলো টেরী ও ঝুলিয়া-পড়া গোঁফের প্রাক্তন শ্রী ফিরাইয়া আনিতে মন দিলেন। জেলে বসিয়া কয়েকটা নূতন ছড়া বাঁধিয়াছিলেন, সেগুলি প্রচার করিতে লাগিলেন।

১৯০৫ হইতে ১৯১২। ভাঙা বাংলা জোড়া দিবার পণ করিয়া বাঙালী এই কয় বৎসরে নিজের ঘরে, সমস্ত দেশে আগুন জ্বালাইয়া দিল। কত ঘর, কত জীবন যে সে আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। ভাঙা বাংলা জোড়া দিবার লড়াইকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হইল স্বাধীনতার সংগ্রাম। মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাব বাংলার সঙ্গে কাঁধ মিলাইল।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ মাস আসিল। নিজের থু থু গিলিয়া

জাতিপুঞ্জ পরিষদের সাধারণ সভার ১৪৬তম পূর্ণ অধিবেশনে বক্তৃতারত ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রী বি. নরসিংহ রাও

প্যারিসের প্যালে ডি শেলিয়টের সভা-কক্ষের সাধারণ দৃশ্য

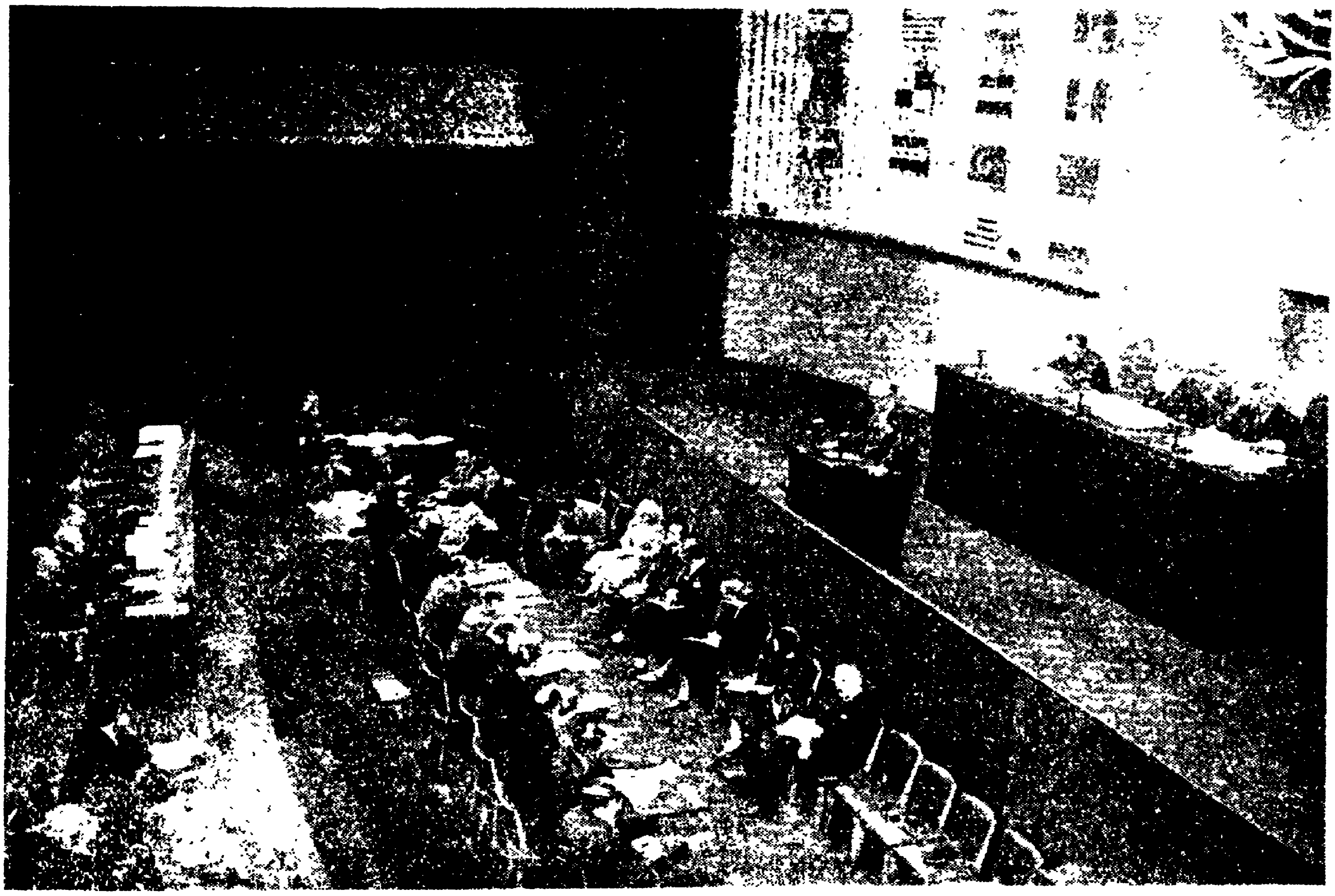

যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ জর্জ্জ সি. মার্শাল জাতিপুঞ্জ পরিষদের সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিতেছেন

মিঃ জর্জ সি. মার্শাল (বামে) ও শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

'সেটেল্ড ফ্যাক্টকে আন্‌সেটেল্ড' করিয়া ইংরেজ আবার ভাঙা বাংলা জোড়া দিল।

দিল্লীর দরবার হইতে যেদিন ভাঙা বাংলা জোড়া লাগিবার কথা ঘোষণা করা হইল সেদিন মহেশকর্তা স্কুলবাড়ীর মাঠে সভা করিলেন। সভার শেষে ঐ দিনটিকে স্মরণীয় করিবার জন্য তিনি মাঠের এক পাশে উঁচু করিয়া বেদী গাঁথিয়া দিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন। প্রশস্ত চাতাল গাঁথা হইল। যোগেশ জ্যেঠা তখন ছোট। তিনি, রাজেন কাকা ও আরও অনেকে মিলিয়া চাতাল গাঁথিবার ইট সুরকী বহিয়াছিলেন, চাতালের মাঝখানে মহেশ-কর্তা নিজের হাতে একটা বকুলের চারা পুঁতিলেন। চাতালের গায়ে লেখা হইল স্বদেশী আন্দোলনের বীজমন্ত্র বন্দেমাতরম্, গুণিয়া ১০৮ বার।

এই চাতালের নাম দেওয়া হইল স্বদেশীতলা।

স্বদেশীতলার চাতালের উপরে শোয়ানো চাদরে ঢাকা রাজেন কাকার মৃতদেহ, নীচে ঘাসের উপর বসিয়া মহেশ-কর্তার উত্তরাধিকারী যোগেশ জ্যেঠা এক মনে চাতালের গায়ের লেখা পড়িতেছিলেন।

১৯১২ হইতে ১৯২০। মহেশকর্তা স্বর্গে গেলেন ১৯১৪ সনে—বড় ছেলে হরিশ হইলেন বাড়ীর কর্তা। ভাগীরথী নদীতীরের শ্মশান হইতে পিতার অস্থিখণ্ড সঞ্চয়ন করিয়া স্বদেশীতলার বকুল গাছের গোড়ায় তামার ঘটে পুঁতিলেন। শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া ছোট ভাই যোগেশকে বলিলেন—তুই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহের সেবা করতে লেগে যা। লম্বা চুল রেখে কণ্ঠি ধারণ করে বোষ্টম হয়ে যা, আর কিছুতে মন দিস না। কণ্ঠিধারী গদগদ চালের বোষ্টম দেখলে শত্রুরা চোখ দেবে না। সবে গেছে, আমারও থাকবার উপায় দেখছি না। বাবার জন্য একটা বছর আবদ্ধ হয়েছিলাম। এত বড় পরিবারটা তলিয়ে যাবে তুই বৈষ্ণব না হলে।

স্বদেশীতলায় একটি ঘর তুলিয়া হরিশকর্তা নাম দিলেন হরিমন্দির। কীর্ত্তন, কথকতা চলিতে লাগিল। বাড়ী ছাড়িয়া সেইখানে আসিয়া আড্ডা গাড়িলেন। যোগেশ জ্যেঠাকে হরিমন্দিরের তত্ত্বাবধানে বসাইয়া দিয়া হরিশকর্তা একদিন ডুব মারিলেন। ভাঙা বাংলা কবেই জোড়া লাগিয়াছে, কিন্তু যে আগুন ভাঙা বাংলা জ্বালাইয়াছিল তাহা প্রজ্বলিত হইতে থাকিল সহস্র শিখায়। ১৯২০ সনে হরিশকর্তা পুড়িলেন সেই আগুনে।

হরিশকর্তার মৃত্যুর পরে সব দায়-দাবি লইয়া স্বদেশী-তলার উত্তরাধিকার বর্তাইল রাজেন কাকার উপর। হরিশ-কর্তার শিষ্য তিনি। মহারাষ্ট্রের কোন অরণ্যসঙ্কুল পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে গুরুর মৃত্যুসংবাদ ও চিতাভস্ম বহন করিয়া গ্রামে ফিরিলেন। সেই চিতাভস্ম স্বদেশীতলায় মহেশ-কর্তার অস্থিখণ্ডের পাশে সমাহিত করা হইল।

আজ স্বদেশীতলায় রাজেন কাকার চিতাভস্ম সমাহিত করিবার দিন আসিয়াছে। কিন্তু সে সম্মান কি মহেশকর্তার উত্তরাধিকারী যোগেশ জ্যেঠা তাঁহাকে দিতে রাজী হইবেন? রাজেন কাকা গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। এ কি হরিশকর্তার শিষ্যের উপযুক্ত মৃত্যু!

গ্রামের লোক জানে সম্প্রতি রাজেন কাকার মাথা খারাপ হইয়াছিল। যে কষ্ট, যে উৎপীড়ন তিনি সারা জীবন সহ্য করিয়াছেন তাহার ফলে অনেক আগেই তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিলে কেহ আশ্চর্য্য হইত না। কিন্তু যখন সকল কষ্ট, সকল সাধনা সার্থক হইল, জাতির স্বপ্ন যখন বাস্তবে পরিণত হইল, দেশের আকাশে বহু ঈপ্সিত স্বাধীনতার তরুণ সূর্য্য দেখা দিল সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মাথা গেল বিগড়াইয়া। আশ্চর্য্যের কথা।

মানসিক ও চারিত্রিক এই ক্লৈব্যের পরিচয় দিবার পর গ্রামের লোক তাঁহাকে সে উচ্চ সম্মান দিতে রাজী হইবে কেন?

হরিশকর্তার শিষ্য রাজেন কাকার দেহে ছিল অসুরের শক্তি। দুঃসাহসের, কষ্টসহিষ্ণুতার সীমা ছিল না। প্রশস্ত ললাট ও আবক্ষ দাড়ির মধ্যে অবস্থিত নাকটি একটু ছোট মনে হইত। চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত রকমের শান্ত ও নিরীহ, মুখের হাসিটুকু ভারি অমায়িক। কে বলিবে এই শ্মশ্রুগুম্ফ লইয়া সৌম্যদর্শন, পরম অমায়িক লোকটি অত্যন্ত পরিহাসপটু, কে বুঝিবে এই শান্ত, নিরীহ খোলসটার ভিতরকার মানুষটি উল্কাপিণ্ড গলা? অনেকেই এই নিরীহ দৃষ্টি ও অমায়িক হাসিতে প্রতারিত হইত।

একবার ধরা পড়িয়া গেলেন জেলে। ভোজপুরী বুলিতে কথা বলিয়া, রামচরিত মানস হইতে দোহা আবৃত্তি করিয়া, সময়ে অসময়ে সীতারাম ভরসা করিয়া করিয়া রাজেন কাকা পণ্ডিতজী ও সাধুবাবা বনিয়া গেলেন। কয়েদী ও ওয়ার্ডার দলের মধ্যে তাঁহার বহু শিষ্য জুটিয়া গেল। পসার জমিয়া গেলে হঠাৎ একদিন তিনি শিষ্যমণ্ডলীকে অকূলে ভাসাইয়া গরাদ ভাঙিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন।

রাজেন কাকা একবার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। সেও এক হাসির ব্যাপার। পুলিসের তাড়ায় পলাইয়া বেড়াইবার সময়ে ছত্রিশগড়ে মান্দালা জেলায় এক ঘাসেরিয়ার গৃহে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। বুড়া ঘাসেরিয়ার ঘরে ছিল দুইটি স্ত্রী। কাকার নিরীহ দৃষ্টি ও অমায়িক হাসিতে ঘাসেরিয়ার অল্পবয়সী দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারটি গলিয়া গেল। দুইখানি বেশী বাজরার রুটি, একটু বেশী করিয়া অড়হরের ডাল ও আমের চাটনীর লোভে কাকাও একান্ত বিগলিত ভাব দেখাইতে লাগিলেন। দুই চারিদিনের মধ্যে ঘাসেরিয়া-পত্নীর আকর্ষণ এমন উগ্র হইয়া উঠিল যে কাকাকে পলায়নের চেষ্টা দেখিতে হইল। এদিকে বুড়া ঘাসেরিয়া প্রথম

পক্ষের রিপোর্ট পাইয়া দ্বিতীয় পক্ষকে ধমকাইতে গিয়া তাহার হাতে দুই-এক ঘা খাইল, বুড়ী চুরাইলের তাড়ানিতে বিশ্বাস করিবার জন্ত। স্বামীদেবতাকে এইভাবে সমঝান দিয়া দ্বিতীয় পক্ষ পা ছড়াইয়া কাঁদিতে ও বুড়ী চুরাইলের উদ্দেশে অশ্রাব্য গালিগালাজ বর্ষণ করিতে লাগিল। কি মনে হইতে হঠাৎ কান্না থামাইয়া রাজেন কাকার কাছে গিয়া তাঁহাকে ধমকাইতে লাগিল। বলিল যে বুড়াবুড়ীর কোন কথায় ঘাবড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলে তাঁহারও বুড়ার হাল হইবে। কাকা মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে ওরকম বেইমানী তিনি করিতেই পারেন না। সে দিনটা কাটিল। পরের দিন কাকা অত্যন্ত বিনীতভাবে দ্বিতীয় পক্ষকে জানাইলেন যে তিনি আমীর লোক ছিলেন এককালে যদিও রামজীর ইচ্ছায় এখন দেওয়ানা হইয়াছেন। তবে দেওয়ানা ফকির হইলেও মানুষের অভ্যাস বড় খারাপ জিনিস। ঘৃতশূন্য বাজরার রুটি খাইয়া খাইয়া তাঁহার আমিরী পেটে দারুণ দর্দ হইয়াছে। ইহার পর লোটা লইয়া বার সাতেক ময়দানে গেলেন, খাটিয়ার উপর লেট হইয়া ঘণ্টা দুই ছটফট করিলেন। শেষতক দবাখানায় যাইবার অনুমতি আদায় করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইলেন।

১৯২১ হইতে ১৯৪১। হঠাৎ এক দিন গ্রামে ফিরিয়া রাজেন কাকা ষষ্ঠীতলার ভাঙা হরিমন্দির মেরামত করাইয়া সেখানে কিছুদিন জাঁকিয়া বসিলেন। দাড়ীতে জটাজুটে চেহারা যাহা হইয়াছে ধুনি জ্বালিয়া বসিলে গ্রামেই হয়ত পসার হইয়া যাইত।

হয়ত বলিবার কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে নামিত হইত। গ্রামের ছেলেরা ইস্কুল কলেজ ছাড়িয়া অনেকে প্রায় সাধুবাবা হইয়া উঠিয়াছিল। সে কি দীন ভাব, মৃদু বচন, সদা উদ্গত-প্রায় অশ্রুর ছায়াপাতে মেদুর দৃষ্টি! চরকা-যজ্ঞ, সূত্রযজ্ঞ, ডাণ্ডী অভিযানের মহড়া, গাঁজার দোকানে পিকেটিং, থানার ও সদরে নোটিশ পাঠাইয়া বে-আইনী বক্তৃতা, শোভাযাত্রা—নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া নূতন খাতে জাতীয় আন্দোলনের স্রোত বহিতে লাগিল।

রাজেন কাকা কিছুদিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া এই সব দেখিতে লাগিলেন। এই সব কার্য্যকলাপের নিগূঢ় মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যাহাতে কাজে লাগিয়া যাইবার একটা সূত্র পান।

ভ্রাতার মৃত্যুর পরে যোগেশ জ্যেঠা বৈষ্ণব ধর্মের চর্চা করিতেছিলেন। নূতন আন্দোলনের কতকটা নিরাপদ রচনাত্মক কার্য্যপদ্ধতির ধারা লক্ষ্য করিয়া আসরে নামিয়া আসিলেন। কাকাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া যোগেশ জ্যেঠা তাঁহার হাতে একটা কিছু কাজ গছাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় মেয়ের বিবাহ দিবার জন্ত মহেশ গাঙ্গুলীর পুত্র টেকো নিবারণ দারোগা গ্রামে আসিল। নিবারণ গাঙ্গুলী মেদিনীপুরে বদলী হইয়া গিয়াছিল এবং ইতিমধ্যেই সেখানে লাঠি চার্জে ধুরন্ধর বলিয়া সুখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। গাঙ্গুলীর মেয়ের বিবাহ আর যোগেশ জ্যেঠা গ্রামের প্রধান ও সমাজ-পতি। কাজেই দুই বিপরীতমুখী ধারাকে ক্ষণকের জন্ত মিলিতে হইল।

উভয়ের সাক্ষাতের সময়ে কাকা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যথারীতি সেই সাক্ষাতের রিপোর্ট দিতে গিয়া বলিলেন—সে একটা অনির্বচনীয় দৃশ্য হে ছোকরা।

একদিকে মহাত্মাজীর আদেশ, অন্য দিকে পেটের দায়, এই দোটানার ফলে গাঙ্গুলী দারোগা দুস্তর সাগরে পড়িয়াছেন, নিবেদন করিলেন। সত্যাগ্রহীদের উপর কত যে নৃশংস অত্যাচার ইংরেজবেটারা করিতেছে দেখিয়া কতবার মনে হইয়াছে দিই ছাড়িয়া গোলামী, বেটাদের লাঠির তলায় মাথা পাতিয়া দিই, দেখি কত মারিতে পারে। চোখে দেখা কর্তা, নিজের চোখে দেখা। মেয়েলোকের মাথায়, সাক্ষাৎ জগজ্জননী মায়েদের মাথায় লাঠি মারিতে গো-খোর, শোর-খোর ম্লেচ্ছ বেটাদের হাত কাঁপে না। সত্যাগ্রহের তেজ কত? শুইয়া বসিয়া লাঠি খাইতেছে, হাত পা মাথা ভাঙিয়া রক্তের নদী, তবু উঠিয়া দাঁড়াইবে না, দৌড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিবে না। স্বচক্ষে এ সব দেখিয়া জীবনে ধিক্কার জন্মিয়াছে আর মহাত্মাজীর উদ্দেশে শতকোটি প্রণাম জানাইয়াছি মনে মনে। গঙ্গুলী দারোগার চোখ হইতে জলের ধারা বহিল।

কাকা নিবারণ গাঙ্গুলীর অনুকরণ করিয়া সাক্ষাতের রিপোর্ট দিলেন, তারপর হাসিয়া আকুল। হাসি থামাইয়া বলিলেন—এই সব ভক্ত বিটকেলের দলে সারা দেশটা ছেয়ে ফেলবে দেখো।

আর কিছুদিন গেলে কাকা অসহযোগীদের কৃপার পাত্র হইয়া দাঁড়াইতেন, কিন্তু হঠাৎ একদিন গ্রাম হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। কোন খবর নাই। বহুদিন পরে ১৯৩১-এর মুখে তেমনি অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চেহারা দেখিয়া অবাক হইলাম। সেই জোয়ান শরীর শুকাইয়া, কালি মারিয়া পোড়া কাঠের মত হইয়াছে। বলিলেন—দেশ পর্য্যটন করে এলাম হে। আগের দিনে গৃহীরা হেঁটে তীর্থ করতেন, সাধুরা কেদারবদরী হতে কন্যাকুমারিকা, দ্বারকা হতে কামাখ্যা, পরশুরাম কুণ্ড পর্য্যন্ত পদব্রজে বেড়াতেন। মহাজনদের পন্থা ধরে আমিও দেশের সঙ্গে পরিচয় করছি। অকৃত্রিম দেশসেবার কাজ হে।

তারপর বলিলেন—গিয়েছিলেম আসামে বেড়াতে। ইচ্ছা ছিল পূর্ব্বসীমান্তের পাতকোই 'পাস' হয়ে উত্তর-বর্মা পর্য্যন্ত ঘুরে আসব। এই পথে খাদ-খাই জাতগুলো ও আসাম-

বিজয়ী বর্মী সৈন্তেরা এসেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমার যাওয়া হয়ে উঠল না। আহোম রাজাদের সাবেক রাজধানী চরদেও, গড়গাঁও ঘুরতে ঘুরতে জ্বর আর আমাশয়ে ধরল। আর একটু বাড়াবাড়ি হলে ওখানেই হয়ে যেত, মীরজুমলার মত ধুঁকতে ধুঁকতে ফেরবার শক্তিও থাকত না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন, মীরজুমলাকে ধুঁকতে হ'ল কেন?

কাকা বলিলেন—সে এক মজার কাহিনী। মহারাষ্ট্রের অরণ্য ও পর্ব্বতে গর্ব্বিত মোগল বাহিনীর এমন লাঞ্ছনা ঘটে নি। শাহজাহান অসুস্থ, ছেলেদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে লড়াই বেধে গেল। সুযোগ বুঝে কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ কামরূপ ও হাজোর ফৌজদারকে তাড়া লাগালেন। ফৌজদার পালালেন গৌহাটিতে। গৌহাটি এর আগে মোগলরা নিয়েছিল। সেখানেও ঠাঁই হ'ল না। আহোম রাজা জয়ধ্বজ গৌহাটির দিকে আসছেন শুনে ফৌজদার গৌহাটি ছেড়ে বাংলায় পালিয়ে এলেন। আহোম সৈন্তদল ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে ঢাকা পর্য্যন্ত এসে লুঠপাট করে চলে গেল। তখন মীরজুমলা এগুলেন পঞ্চাশ হাজার সৈন্ত আর চারশ' রণতরী নিয়ে। এক একখানা গ্রাব বা রণতরীতে সত্তর আশী জন নৌ-সৈন্ত, তের-চৌদ্দটা করে কামান। তিন চার খানা কোশা নৌকা দাঁড় বেয়ে একখানা ভারী গ্রাবকে টেনে নিয়ে যায়। রণতরীগুলোর ভার সব ইউরোপীয় অফিসারদের উপর—পর্ত্তুগীজ আর ওলন্দাজ অফিসার। ইংরেজ তখনও ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারে নাই।

আহোম সৈন্ত ও আহোম নৌ-বাহিনীর খ্যাতি ছিল। কিন্তু তারা পেরে উঠল না। সিমলাগড় ও সাজাবার যুদ্ধে হেরে আহোম রাজা পালালেন নামরূপে; মীরজুমলা ঢুকলেন রাজধানী গড়গাঁওয়ে। চার মাইল প্রশস্ত, ঘন বাঁশবনের প্রাকারে ঘেরা আহোম রাজধানী গড়গাঁওয়ে কাঠ ও খড়ের তৈয়ারী রাজপ্রাসাদে গিয়ে তিনি উঠলেন। তারপর আরম্ভ হ'ল আসল তামাশা। অবিরাম বৃষ্টি—আহোমদের পোড়ামাটি নীতির ফলে রসদের অভাব আর দিনরাত তাদের চোরা আক্রমণ। ঘাঁটি ছেড়ে এক পা বাইরে বেরুবার উপায় নেই চোরা গুলির দাপটে। একবার নৈশ আক্রমণে রাজধানীর অর্দ্ধেক তারা দখল করে বসল। খাভাভাব, রক্ত আমাশয় আর চোরা আক্রমণের ফলে মীরজুমলার সৈন্তদের মধ্যে ঘোর অসন্তোষ দেখা দিলে। আহোম রাজধানীতে প্রায় বন্দী অবস্থা থেকে কোন রকমে পালাতে পারলে মীরজুমলা বাঁচেন, রাজ্যজয় তখন মাথায় উঠেছে। মানরক্ষা গোছের একটা সন্ধি করে ঘরে প্রায় বেহুঁস অবস্থায় তিনি ঢাকা রওনা হলেন, কিন্তু ঢাকায় আর পৌঁছুতে পারলেন না, পথেই মারা গেলেন। সৈন্তদলের অর্দ্ধেকের উপর সাফ হয়ে গিয়েছিল খাভাভাবে আর ব্যারামে। এই শিক্ষালাভের পর দিল্লীর বাদশাহ আর কোন সেনাপতিকে আসাম আক্রমণ করতে পাঠান নাই।"

বাস্তবিক কাকার শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এত দেশ থাকতে ঐ জঙ্গলে কেন গিয়েছিলেন মরতে?

কাকা হাসিলেন। বলিলেন, জঙ্গল বলে কি নিজের দেশে বেড়াব না? তা ছাড়া একটা কৌতূহল ছিল বরাবর। উত্তর-পূর্ব্ব পথে যারা বাইরে থেকে এদেশে এসেছে তাদের আমরা হজম করে নিয়েছি, আর উত্তর-পশ্চিমের পথে যারা এসেছে তারা কিন্তু উল্টে আমাদের হজম করতে চাইছে। তাই এক বার পূব দিকটা দেখতে গিয়েছিলাম।

একটু হাসিয়া বলিলেন, একটা গল্প বলি শোন। রুদ্র সিং, যাঁর আহোম নাম সুক্রংফা, রাজা হলেন বাপ গদাধর সিংহের মৃত্যুর পরে। বৃদ্ধ বয়সে নদীয়া জেলার শান্তিপুরের কাছে মালিপোতার তান্ত্রিক পণ্ডিত কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যের নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন। রাজার খেয়াল হ'ল কাঠ আর খড়ের প্রাসাদ ভেঙে পাকা রাজপ্রাসাদ গড়েন। দেশে ইটের কাজ জানা মিস্ত্রী নেই; কোচবিহার থেকে ঘনশ্যাম নামে বাঙালী স্থপতি এলেন। কয়েক বৎসর আসামে থেকে ঘনশ্যাম অনেকগুলি পাকা মন্দির আর প্রাসাদ তৈয়ারী করে দিলেন। রাজার কাছে প্রচুর পুরস্কার পেয়ে ঘনশ্যাম দেশে ফেরবার জন্ত তৈরী হলেন, হঠাৎ তাঁর কাছে পাওয়া গেল কতকগুলো লেখা কাগজ। তাতে রয়েছে আসাম ও আসামের লোকেদের সম্বন্ধে নানা বিবরণ। আহোম রাজা অনুমান করে নিলেন, মোগলদের হাতে দেবার জন্ত এই বিবরণ সঙ্কলিত হয়েছে। ঘনশ্যামকে সরাসরি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ল। পলাশীর যুদ্ধের চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগেকার ঘটনা। এ থেকে বোঝ আহোমরা কি করে আফগান ও মোগলদের হাত থেকে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল।

আসাম অভিযানের ধকল সামলাইতে বেশ কিছুদিন সময় লাগিল। কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বর হয়। তারপর শরীর একটু ভাল করিয়া সারিতে না সারিতে আবার জেলে প্রবাসের পালা আরম্ভ হইল। শেষ বার যখন জেল হইতে ফিরিলেন শরীর আবার ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অসুস্থ শরীরেও বাহিরে রাখা নিরাপদ নয় মনে করিয়া কর্ত্তারা আবার তাঁহাকে খাঁচায় পুরিলেন। প্রায় মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হইয়া ডাক্তারী সুপারিশে ছাড়া পাইলেন। চিকিৎসা চলিল। যোগেশ জ্যেঠা উপদেশ দিলেন এবার ভাল হইয়া সংসারী হও, পুলিশ হয়ত আর ধরিবে না। কাকা হাসিয়া বলিলেন; গোঁফ ওঠবার আগে থেকে জেলে যাতায়াত সুরু করেছি। এখন গোঁফে সবে পাক ধরেছে। এখনই কি হয়েছে দাদা?

ঠিক কথা। কাকার প্রাণ যেন কচ্ছপের প্রাণ। শক্ত

খোলাটা কুড়ুলের ঘায়ে ভাঙিয়া আলাদা করিয়া দিলেও কচ্ছপ কামড়াইবার জন্য গলা বাড়াইয়া দেয়। কাকার হাঁটুতে বল নাই, হাতে জোর নাই। ১৯৪২-এর জুলাই শেষ হইতেই আকাশ আবার মেঘে ছাইয়া ফেলিল। কাকা বিছানা ছাড়িয়া টুক টুক করিয়া হাঁটিতে সুরু করিলেন, চোখে মুখে উৎসাহের আলো দেখা দিল। ৯ই আগষ্টের পরে ঝড় উঠিল। কাকা আবার ডুব দিলেন। মেদিনীপুর, বালুরঘাট, বিহার,—কোথায় কখন কোন্ কাজে হাত লাগাইলেন তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ অনাবশ্যক মনে করিয়া কাকা আমাদের কাছে সব খুলিয়া বলেন নাই। আন্দোলন চলিতে থাকা কালে আমরা খবর পাইলাম বিহারপ্রান্তে রেল-লাইন উপড়াইবার চেষ্টায় রত এই অজুহাতে তাঁহাকে ধরা হয়। বাস্তবিক তিনি গিয়াছিলেন পাহারাদারী সৈন্যদের অস্ত্র সরাইবার চেষ্টায়। বাংলায় তো রাণাঘাটের কাছে রেল লাইনের কার্য্যে ব্যস্ত মজুরদের উপর হাওয়াই জাহাজ হইতে মেসিনগানের গুলি চলিয়াছিল এই অজুহাতে যে তারা লাইন উপড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। বিচারের অপেক্ষায় জেল হাসপাতালে থাকিবার সময়ে কাকা কি করিয়া অদৃশ্য হইয়া যান এ খবরটাও আমরা পাইয়াছিলাম।

আস্তে আস্তে সে ঝড় থামিয়া আসিল। কয়েক বৎসর পরে হঠাৎ এক দিন খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কাকা গ্রামে দেখা দিলেন। এবার আগষ্ট বিপ্লবের একজন নেতা বলিয়া লোকে তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিল।

এত দিন কোথায় ছিলেন, কি করিতেছিলেন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বলিলেন উড়িষ্যার পাহাড়ে ও জঙ্গলে সাধু সাজিয়া আত্মগোপন করিয়া ছিলেন। চক্রধরপুর হইতে চাইবাসার মধ্য দিয়া কেওঞ্জড়গড়, সেখান হইতে পাল লাহারা। শবর, খোঁদ, মালের, খোরা, জুয়াংদের মধ্যে গুণীন সাজিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বেঙ্গ-কানালের পূর্ব্বে কখনও অগ্রসর হন নাই। পশ্চিমে ছত্রিশগড় পর্য্যন্ত যাইতেন। চিমটে, ঝোলা, কপনী আর জটা সম্বল করিয়া বছর দুই স্বচ্ছন্দ মনে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। সম্বলের মধ্যে একখানা কম্বল আর একখানা বাঘ-ছাল। মধ্যে মধ্যে বহির্জগতের খবর লইবার জন্য বামরা পর্য্যন্ত যাইতেন।

হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—ব্যাটারা ঠ্যাংটা ভেঙে দেওয়াতে বড় অসুবিধে হচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে ভাবতাম, দূর ছাই, সারা জীবনটা ত গেল জেলে আর জঙ্গলে, এবার পছন্দমত একটা শবর, খোঁদ কি জুয়াং মেয়ে দেখে সংসার-ধর্ম করতে লেগে যাই। এর মধ্যে জুয়াং মেয়েগুলোকে ভাল বলতে হবে, জামা জুতো সাড়ী গহনার জন্য জ্বালাতন করত না তারা। কি করে জানলাম একথা ভেবে অবাক হচ্ছ তোমরা। জামাটা সহজ। সাড়ী-টাড়ী প'রে অঙ্গসৌষ্ঠব ঢাকবার তেমন রেওয়াজ নাই কিনা ওদের মধ্যে। আর গহনার মধ্যে দু'চারটে কড়ি, পুঁতি, ঝিনুক কোনমতে যোগাড় করে দিলেই হ'ল। আজকালকের দিনে সহধর্ম্মিণী করতে হলে এর চেয়ে সুপাত্রী কোথায় পাবে বল?

মনের এই সাধ ব্যক্ত করিয়া কাকা হা হা করিয়া হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—একবার বামরা গিয়ে বাংলার দুর্ভিক্ষের খবর পেলাম। কোনও সূত্রে আসাম-প্রান্তে যুদ্ধের যে খবর পেলাম তাতে উড়িষ্যার জঙ্গল থেকে আসামের জঙ্গলে পাড়ি দেবার জন্য মন অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু পাড়ি দিতে পারলাম না। ঝাঁরসাগুদা ষ্টেশনে গাড়ী চড়ে বসেছি কি করে পুলিস সন্ধান পেয়ে রাজা খারসোয়ান ষ্টেশনে ধরল। তারপর ভদ্রক, কটক, বালেশ্বর জেলে কাটল এত কাল।—

১৯৪৬ সনে দেশের উপর দারুণ দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিল। কলিকাতা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, বিহার, পঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ। ষদেশীতলায় ভাঙা হরি-মন্দিরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রাজেন কাকা আকাশপাতাল ভাবেন। কোন্ চক্রীর চক্রে এই উন্মত্ততা সাইমুম বাত্যার মত দেশের উপরে নামিয়া আসিল? এতদিনের সাধনা, জীবনভোর অকথ্য লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন, দুঃখকষ্ট কিসের আশায় হাসিমুখে সহিয়াছেন?

১৯৪৭ আসিল দেশ বিভাগের আলাপ আলোচনা লইয়া। রাজেন কাকা বিরস হাসি হাসিয়া বলিলেন,—ও এই ভেতো বড়ি গেলাবার জন্য এত কাণ্ড তোমাদের? এই জন্য ক্রুশেডার ও আনসার দলের মিলিত অভিযান?

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা উৎসব হইল দুই দেশে। ১৬ই আগষ্ট ভোর হইতে হইতে রাজেন কাকা আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। আমার ঘরে বসিয়া খুব হাসিতে আরম্ভ করিলেন। তারপর হুকুম করিলেন—এই ছোকরা, চা লাও, সন্দেশ লাও জলদী জলদী সে। হাসি বন্ধ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। একটু বাদে বলিলেন—এই ছোকরা, তোর বয়েস কত হ'ল? মহেশকর্ত্তার ভোজ খেয়েছিলি মনে আছে? আরে তখন যে তুই জন্মাস নি। তবে শোন। পাঁচটা খাসী কাটা হ'ল। এক মণ চালের পোলাও হ'ল। পাঁচ মণ সন্দেশ এল। ষদেশীতলার মাঠে ছেলেবুড়ো মিলে রান্না করলে। গাঁয়ের সব লোক খেল। ভাবনী নদীর ওপার থেকে মুসলমান চাষীরা দলে দলে এসে কলার পাত পেড়ে চিঁড়ে, দই, সন্দেশ পেটভরে খেল। ভাঙা বাংলা জোড়া লাগবার উৎসবে সেদিন এই বিরাট ভোজ দিলেন মহেশকর্ত্তা। কেউ কেউ হেসে বলল—কার্জ্জন সাহেবের শ্রাদ্ধ।

আবার বলিলেন—মহেশকর্ত্তার সে সম্পত্তি নেই।

যোগেশদার অবস্থা ভাল নয়। ধর্মকর্ম নিয়ে আছেন, বাইরে বেরুতে চান না। আজ ছোকরা তুই খাওয়াবি আর খাব আমি একা। কর্তারা গোটা দেশটাকে বঁটিতে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বড়, ছোট, মুড়ো টাই টাই করেছেন, আরামসে যে যার ভাগ খাবেন বলে। আনন্দের আজ আর সীমা নেই। বাবা, আজ খাওয়াবে না ত খাওয়াবে আর কবে? যাও যাও জলদী কর, ম্যান।

আগের মত আবার তিনি হাসিতে লাগিলেন। চা খাইতে খাইতে বলিলেন,—তুমি কোন ভাগ নেবে ছোকরা? একটা কথা বলে রাখি শোন। বঁটিতে কাটতে গিয়ে কর্তারা পিত্তটা গেলে ফেলেছেন, সব তেতো মেরে যাবে, কেউ ফুর্তি করে খেতে পারবেন না। কথাটা বলে রাখছি, মনে রেখো।

আমার পিঠে এক থাবড়া মারিয়া বলিলেন—আমার ভাগে কি পড়েছে জানিস? নাড়ীভুঁড়িগুলো। এই বলিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

হাসিতে হাসিতে যাইবার জন্য উঠিলেন। হঠাৎ হাসি বন্ধ করিয়া স্বাভাবিক ভাবে, খুব নিম্নস্বরে বলিলেন—কাল সকালে একবার আমাদের ওদিকে যাস। কথা আছে।

তারপর চলিয়া গেলেন।

রাজেন কাকার অবস্থা দেখিয়া দুশ্চিন্তা হইল। নূতন অবস্থার সঙ্গে তিনি কি ভাবে আপনাকে খাপ খাওয়াইবেন চিন্তা করিয়া কোনমতে স্থির করিতে পারিলাম না। কে তখন জানিত আমার চিন্তা করা বাহুল্য, তাঁহার ব্যবস্থা তিনি স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন?

ফজলুর দফাদার আগাইয়া আসিয়া বলিল—লাস সদরে চালান যাবে। গাড়ী আনতে চৌকীদার যাচ্ছে।

যোগেশ জ্যেঠা মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। আমি রায় বাহাদুর চক্রবর্ত্তীর দিকে চাহিলাম। রায় বাহাদুর দারোগা নিবারণ গাঙ্গুলীর দিকে চাহিলেন। নিবারণ গাঙ্গুলী ফজলুর রহমানের দিকে চাহিল। ফজলুর রহমান ধর্মগুণে দেশের সরকারের প্রতিনিধি, পদোচিত গাম্ভীর্য্য লইয়া সে কাহারও দিকে চোখ ফিরাইল না, স্বদেশীতলার বকুলগাছের মাথার উপর দিয়া অসীম ব্যোমের দিকে চাহিয়া রহিল।

ব্যাপার বুঝিয়া ছেলেদের মধ্যে একটা উত্তেজনার ভাব দেখা দিল। সাদা চাদরে ঢাকা রাজেন কাকার মৃতদেহ কাঁধে তুলিয়া তারলী নদীর তীরে শ্মশানঘাটে যাইবার জন্য তাহারা প্রস্তুত হইল। দফাদার চোখ লাল করিয়া উত্তেজিত ভাবে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের জমিদার যোগেশ জ্যেঠা, রায়বাহাদুর চক্রবর্ত্তী, হেডমাষ্টার হরেন ভৌমিক, টেকো দারোগা নিবারণ গাঙ্গুলী সকলেই হতভম্ব। গাঙ্গুলী তাহাকে বুঝাইবার জন্য কাছে যাইতে দফাদার ফজলুর রহমান এক ধাক্কা দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল। কর্কশ স্বরে বলিল—সরকারী কামে কথা কইলে গেরেপতার করমু মুশাই। নামাও লাস। কয়েকজন ছেলে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—চল তুই আমাদের সঙ্গে, তোর সামনে লাস পোড়াব। সদরে চিঠি দিব তুই দাঁড়িয়ে লাস পুড়িয়েছিস। তাহারা দফাদারকে টানিয়া লইয়া চলিল।

তারলী নদীর ধারে গ্রামের শ্মশানে রাজেন কাকার সৎকার শেষ করিয়া সকলে মিলিয়া জল ঢালিয়া চিতা নিবাইয়া দিলাম। এক টুকরা অস্থি ও কিছু ভস্ম লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। মনের ইচ্ছা সকলে মত করিলে মহেশকর্ত্তা ও হরিশকর্ত্তার ভস্মের মত রাজেন কাকার ভস্মও স্বদেশীতলার সমাহিত করিব।

তাহার আর প্রয়োজন হইল না। পরের দিন সকালে খবর পাইলাম স্বদেশীতলার বেদী নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, একখানি ইটও সেখানে পড়িয়া নাই। এক রাতের মধ্যে এই কাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

ভাবিলাম এ ভালই হইল। মাটি, নদী, আকাশ সবই ভাগ হইয়াছে, শুধু স্মৃতিটুকু আঁকড়াইয়া থাকিয়া কি ফল? সব নিশ্চিহ্ন, লুপ্ত হইয়া যাউক। ভাবিলাম তারলী নদীতেও আর বিদ্রোহী দেশকর্মীর চিতাভস্ম বিসর্জ্জন করিব না। কিন্তু কোথায় লইয়া যাই এই পবিত্র চিহ্নটুকু?

কেশবচন্দ্রের জাতিগঠনের পরিকল্পনা

শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ভারতে ইংরেজ অধিকারের দৃঢ়-ভিত্তি স্থাপিত হইল। ইহার অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই আরম্ভ হইল বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের নব-জাগরণ। 'আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ' এবং 'ফরাসী বিপ্লব' সমস্ত ইউরোপে স্বাধীনতার যে নূতন আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া জনমনে যে নবীন আশা এবং আকাঙ্ক্ষা আনিয়া দিয়াছিল, তাহা ইংরেজ-জাতির সংস্পর্শের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষকেও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিল। বাংলাদেশ সর্ব্বপ্রথম সেই মন্ত্র গ্রহণ করে এবং এই প্রদেশেই সমগ্র ভারতের জাতীয়তাবোধের প্রথম বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। মোটামুটি হিসাবে ইহাকেই জাতীয়তার ক্রমবিকাশের প্রথম যুগ ধরা যাইতে পারে—১৮১০ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পঁচিশ বৎসর। এই যুগকে রাজা রাম-মোহনের যুগও বলা যায়। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আসিয়া দেশকে নবচেতনা দানের ব্রত গ্রহণ করেন; ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পর আসিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং বিদ্যাসাগরের যুগ—১৮৩৫ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি পঁচিশ বৎসর। এই যুগের প্রথম ভাগে ১৮৩৯ সনে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে নূতন জীবনের সাড়া পাওয়া যাইতেছিল, ইংরেজের শাসনব্যবস্থায় এদেশবাসীর মধ্যে একতাবোধ জন্মিতেছিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের মনে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল। ভারতের জাগরণের তৃতীয় যুগ ১৮৬০ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই যুগের ইতিহাসের সহিত কেশবচন্দ্রের জীবন অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত। এই সময়ই আমরা দেখিতে পাই কেশবচন্দ্রের জাতিগঠনের পরি-কল্পনা এবং সেই অনুযায়ী বিবিধ কর্ম্মপ্রচেষ্টা। এই তৃতীয় যুগেই বাংলাদেশের নেতৃত্বে ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক নূতন পর্ব্ব আরম্ভ হয়। এই পঁচিশ বৎসরে ভারতের জাতীয়তবোধ ও ঐক্যবোধ কতদূর দানা বাঁধিয়াছিল, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) প্রথম অধিবেশনেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বিভিন্ন দিক্ হইতে বিশেষ ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই যুগের শেষ ভাগে ভারতের জাতীয়তাবোধ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে এবং অন্যান্য বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে দেশবাসী সচেতন হইতে থাকে।

কেশবচন্দ্রের কর্ম্মজীবনকে সাধারণ ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বিলাত-গমনের পূর্ব্বে প্রথম পর্ব্ব; ১৮৭০ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর দ্বিতীয় পর্ব্ব। প্রকৃতপক্ষে ১৮৬০ সনের পূর্ব্বেই তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইয়াছিল, তবে ঐ বৎসর হইতে তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রকাশ্য পরিচয় পাওয়া যায়। এই সনেই মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে তিনি "Young Bangal, This is for you" নামে *Tracts for the Times* সিরিজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন। এই সিরিজে প্রকাশিত তেরোখানি পুস্তিকা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার মতে চারিত্রিক উৎকর্ষসাধন এবং জীবন্ত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জাতিগঠনের প্রধান উপায়; কোনও দেশ বা জাতি তথা সমগ্র মানবজাতি ধর্ম্ম ও চরিত্রকে অবলম্বন না করিলে উন্নত হইতে পারে না। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই মূল বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন—কোনও বিষয়ে কোনও সময়ে এই আদর্শ হইতে একতিলও বিচ্যুত হন নাই। ১৮৬০ সনেই কেশবচন্দ্র তাঁহার অন্তরঙ্গ সহযোগীদের লইয়া "সঙ্গত সভা" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার আলোচনাদির ভিতর দিয়া তাঁহারা এই কথাই ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পান যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সত্যে, প্রেমে এবং পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, তাহা হইলেই সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র জাতির মধ্যে এই সকল গুণ অর্শিবে।

কেশবচন্দ্রের জাতিগঠনের প্রধান উপাদান ধর্ম্ম ও চরিত্র। জাতিগঠনের দ্বিতীয় সোপান জাতির ঐক্যবোধ। আমাদের একতাবোধের প্রধান অন্তরায় জাতিভেদ। ইহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম সর্ব্বপ্রথমে কেশবচন্দ্র আরম্ভ করেন। ১৮৬২ সনে প্রথম এবং ১৮৬৪ সনে দ্বিতীয় অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কেশবচন্দ্র এক-যোগে বালবিধবাদের প্রতি অবিচারের এবং জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। যদি ভারতবর্ষকে এক করিতে হয় তবে প্রথমেই ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদবৈষম্য দূর করিতে হইবে। এই বিষয়েই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার অনৈক্য উপস্থিত হয়। মহর্ষিদেব উপাসনালয়ে বেদীতে বসিবার অধিকার কেবলমাত্র উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে দিলেন, ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে দিলেন না। কেশবচন্দ্র ইহার প্রতিবাদ করিলেন এবং সকল বর্ণেরই উপাসনার বেদীতে বসিবার অধিকার আছে, এই দাবী গ্রাহ্য না হওয়াতে তাঁহাকে সদলে মহর্ষিদেবের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিতে হইল। উপাসনালয়ে শূদ্রের উপাসনা করিবার অধিকার লইয়া প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে যে সংগ্রাম কেশবচন্দ্র সুরু করিয়াছিলেন তাহাই ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—বর্তমানে সমগ্র ভারতব্যাপী

অস্পৃশ্যদের মন্দিরপ্রবেশ ও পূজার অধিকার লাভ সম্পর্কিত আন্দোলনে।

ইদানীং অস্পৃশ্যতার উপর অতিরিক্ত জোর দিয়া হিন্দু-সমাজকে এক করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যুক্তি এই যে, বর্ণাশ্রমে দোষ নাই, কেবল অস্পৃশ্যতা দূর হইলেই হইল। এইরূপ জোড়াতালি দিয়া সমাজকে এক করিবার চেষ্টা পণ্ড হইতে বাধ্য। উচ্চনীচ ভেদ রহিল, সকল মানুষকে সমান হইতে দেওয়া হইল না—ইহাতে সাম্য আসিতে পারে না। কেশবচন্দ্র জোড়াতালির পথে যান নাই, কারণ তিনি জানিতেন যে ইহাতে জাতিগঠনকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। এই জাতিভেদরূপ পাপ সমাজ হইতে দূর করিবার জন্ত তিনি অসবর্ণ বিবাহ তো সমর্থন করিয়াছিলেনই, উপরন্ত আন্তর্জাতিক (Inter-racial) বিবাহেও তাঁহার পূর্ণ সম্মতি ছিল। যাহাতে এই সকল বিবাহ আইনসঙ্গত হয়, তাহার জন্ত তিনি গবর্ণমেণ্টকে দিয়া ১৮৭২ সনে নূতন বিবাহবিধি প্রবর্ত্তন করাইয়া গিয়াছেন। এই বিবাহবিধিতে জাতিভেদের নামগন্ধ নাই, সকল দেশের সকল বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ এই বিবাহবিধির সাহায্যে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে। সকল জাতি বর্ণকে এক করিয়া এক মহাজাতি-গঠনের যে বিরাট্ একটি পরিকল্পনা কেশবচন্দ্রের মনে ছিল তাহা ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়। বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে যে সকল অসবর্ণ বিবাহ হইতেছে তাহার প্রায় সবগুলিই কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত এই বিবাহবিধি অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে।

অস্পৃশ্যদের স্পর্শদোষ দূর করিয়া হিন্দু সম্প্রদায়ে রাখিবার একটি উপায় বাহির করা হইয়াছে—তাহাদের 'হরিজন' আখ্যা দেওয়া। ইহাতে কি লাভ হইয়াছে তাহা বুঝা কঠিন। কারণ জাতিভেদ-বর্জ্জন মনোভাব পরিবর্ত্তনের উপরেই মূলতঃ নির্ভর করে, যদি সে পরিবর্ত্তন মনে না আসে তো কেবল নামে কিছু আসে যায় না। যত দিন জাতিভেদ সমূলে উৎপাটিত না হইবে তত দিন পর্য্যন্ত ভারতবাসী এক জাতি হইতে পারিবে না, তাহাদের সমাজে 'কাটল' সব সময়েই থাকিবে।

ভারতের মহাজাতি গঠনে সকল প্রদেশের যোগাযোগ, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া একতাবোধ আনিয়া দিবার সূচনা দেখিতে পাই কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রচারের উদ্যমে। ১৮৬৪ সনে, মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে গিয়া তিনি ধর্ম্ম, নীতি, দেশের কল্যাণ, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ে বক্তৃতা ও উপদেশাদি প্রদানপূর্ব্বক ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের হৃদয়ে নব প্রেরণার সঞ্চার করেন। মাদ্রাজবাসীরা তাঁহাকে "The Thunderbolt of Bengal' নামে অভিহিত করিয়াছিল। জাতীয় জীবনকে ধর্ম্ম ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নূতন আদর্শের সূত্রে গ্রথিত করিয়া জাতিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্ত তিনি বার বার এই প্রকার 'প্রচার-যাত্রায়' বাহির হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্য-প্রদেশ এবং বোম্বাই পরিভ্রমণ করেন। ইহাতে বাংলার সঙ্গে ঐ সকল প্রদেশের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ সংস্থাপিত হয় এবং আন্তঃপ্রাদেশিক সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়; সমস্ত ভারতে একতাবোধ জাগ্রত হইতে থাকে।

এই সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার আদর্শ কেশবচন্দ্রের মনে জাগরূক থাকিয়া ভিতরে ভিতরে কাজ করিতেছিল। ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ যে দেশকে খণ্ডিত এবং দুর্ব্বল করে তাহা তিনি জানিতেন। তাই তাঁহার কর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতেই ধর্ম্মসমন্বয়ের আদর্শ তাঁহার চরিত্রে দেখিতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের সারমর্ম্ম ও ধর্ম্মানুভূতি গ্রহণ করিবার মনোবৃত্তি তখন হইতেই তাঁহার ছিল। ১৮৬৪ সনে নভেম্বর মাসে তিনি দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় ত্যাগ করেন। ১৮৬৫ সনে "ব্রাহ্মবন্ধু সভার" একটি বিশেষ অধিবেশনে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান এই তিন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করা হয় এবং উপস্থিত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলাগণ পোপের 'সার্ব্বজনীন প্রার্থনা' (Universal Prayer) গান করেন। ইহা একটি অভিনব অনুষ্ঠান, কারণ সকল ধর্ম্মকে সমান মর্য্যাদা দান করিয়া ধর্ম্মসমন্বয়ের ক্ষেত্র এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলনভূমি সর্ব্বপ্রথমে কেশবচন্দ্রই এই ভাবে প্রস্তুত করেন। মাত্র কিছুকাল আগে মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনাসভায় হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান এই তিন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে নির্ব্বাচিত অংশ পাঠ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—আচার্য্য কেশবচন্দ্র ইহা আরম্ভ করেন প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে। ১৮৬৬ সনে কেশবচন্দ্র বিভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে পাঠ সঙ্কলন করিয়া 'শ্লোকসংগ্রহ' প্রকাশিত করেন; ক্রমে বৌদ্ধ, শিখ, ইহুদী, জরথুস্ত্রীয় এবং চৈনিক ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নির্ব্বাচিত অংশসমূহ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার ভিতরে ছিল ভারতীয় জাতিসংগঠনের এবং সমগ্র মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির উচ্চস্তরে উন্নীত করিবার মহান্ আদর্শ। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মসমন্বয়ের বাণী এই সময় হইতে চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ অভিনব ও গভীরতর তাৎপর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে।

সকল প্রদেশের সঙ্গে আদর্শে এবং ভাবে যুক্ত হইয়া তিনি স্বতঃই দেশের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিলেন এবং বিভিন্ন ধর্ম্ম-মণ্ডলী ও শাস্ত্রকে গ্রহণ ও স্বীকার করায় হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষে কথা বলিবার নৈতিক অধিকার তাঁহার জন্মিল। এই অধিকারের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই তাঁহার ১৮৬৬ সনের "Jesus Christ: Europe & Asia" নামক বিখ্যাত বক্তৃতাতে। ২৮ বৎসরের যুবক কেশবচন্দ্র

এশিয়াবাসীর প্রতি ইউরোপের ঘৃণা, অবিচার এবং অত্যাচারের কথা জ্বালাময়ী ভাষায় ব্যক্ত করিলেন এবং দৃপ্তকণ্ঠে প্রাচ্যের গৌরব ঘোষণা করিলেন। কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কেহ এমন ভাবে এশিয়া এবং ভারতকে আধুনিক জগতে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পান নাই।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে, বিলাত গমনের পূর্ব্বে কেশবচন্দ্রের জাতিগঠন-প্রচেষ্টার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি ১৮৭০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বিলাতযাত্রা করেন এবং অক্টোবর মাসে প্রত্যাগমন করেন। সমগ্র ভারতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের তথা সমগ্র এশিয়ার আধ্যাত্মিকতার সারবার্ত্তা বহন করিয়া তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন এবং বিলাতে যে বাণী তিনি প্রচার করেন তাহা সমগ্র প্রাচ্যের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মর্ম্মবাণী।

দেশে প্রত্যাগমনের পর কেশবচন্দ্রের জাতিগঠন-পরিকল্পনা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৮৭০ সনে, ২রা নবেম্বর, তাঁহার উদ্যোগে Indian Reform Association নামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, 'দেশের সমাজিক এবং নৈতিক উন্নয়ন।' এই কয়েকটি বিভাগে ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়:

১। নারীদের উন্নতি; ২। সাধারণ এবং কারিগরী শিক্ষা (Technical Education); ৩। দরিদ্রদিগের জন্য সুলভ সাহিত্য-প্রচার; ৪। মাদকতা নিবারণ; ৫। বিপন্নদের সাহায্য।

এই বিভাগগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় কেশবচন্দ্রের জাতিগঠনের পরিকল্পনা তখন কিরূপ বহুমুখী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ও দরিদ্রদিগের অবস্থার উন্নয়নের জন্য কেশবচন্দ্রের আন্তরিক ব্যাকুলতা। এই পরিকল্পনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফল এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক 'সুলভ-সমাচার'। ১৮৭০ সনে নবেম্বর মাসে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হয়। সহজ ভাষায়, সাধারণ লোকের উপযোগী, জাতি-গঠনের পরিকল্পনামূলক নানা প্রবন্ধে পরিপূর্ণ 'সুলভ সমাচারে'র প্রকাশ কেশবচন্দ্রের একটি স্মরণীয় কার্য্য। 'কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্রবাণী' পুস্তিকায় সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে ইহা স্পষ্টতই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দরিদ্র এবং সমাজের অবনত ও লাঞ্ছিতদের উদ্বুদ্ধ করিতে যে চেষ্টা 'সুলভ সমাচার' সে-যুগে করিয়াছিল তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। বর্ণে বর্ণে বিভেদ যেমন জাতিকে এক হইতে দেয় না, ধনী-দরিদ্রের ভেদবৈষম্যও তেমনই দেশবাসীকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। সেই বিভেদ দূর করিবার সুস্পষ্ট এবং কার্য্যকরী ইঙ্গিত আজ হইতে ৭৭ বৎসর পূর্ব্বে 'সুলভ সমাচারে'র, ১৮৭১ সনের ২৯শে আগষ্টের সংখ্যায়, "বড়লোক" নামক প্রবন্ধে আমরা দেখিতে পাই। গণ-মানসকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে এমন ভাবে আর হয় নাই। আবার "ভারতবাসীদের মধ্যে একতালাভের উপায় কি?" প্রবন্ধে কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, হিন্দী ভাষাকে ভারতের সর্ব্বজনগ্রাহ্য ভাষা করিতে—উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষের একতাসাধন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার কথা বলেন নাই। রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় ইহার পরে এই মত প্রকাশ করেন, কিন্তু কেশবচন্দ্রই জাতিগঠন পরিকল্পনায় ইহাকে সর্ব্বপ্রথমে স্থান দেন। যখন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কলিকাতায় আসেন তখন কেশবচন্দ্র তাঁহাকে এই পরামর্শ দেন, তিনি যেন ভারতবর্ষের সকলের বোধগম্য করিবার জন্য সংস্কৃতে ধর্ম্মপ্রচার না করিয়া হিন্দীতে করেন। স্বামী দয়ানন্দ এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তখন হইতে হিন্দীতে আর্য্যসমাজের আদর্শ ও বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কেশবচন্দ্র নিজেও বাংলার বাহিরে কখনও কখনও হিন্দীতে বক্তৃতা করিতেন।

এই গণচেতনার উদ্বোধনের মধ্যেও দরিদ্রদের পক্ষে উন্নত হইবার আকাঙ্ক্ষার সংযত প্রচেষ্টা এবং চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যে একান্ত প্রয়োজন কেশবচন্দ্র সেকথা বলিতে ভুলেন নাই। অসংযত, হানিকর উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে গা ভাসাইতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন এবং যাহাতে সুরাপানে আসক্ত হইয়া দরিদ্র লোকেরা নিজেদের সর্ব্বনাশকে না ডাকিয়া আনে তাহার জন্য মাদকতা নিবারণ আন্দোলনে উৎসাহের সহিত যোগ দেন। পরে এই আন্দোলনের নেতা হইয়া সারাজীবন গবর্ণমেণ্টের সহিত মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের আয় লইয়া তুমুল বাদানুবাদ করেন। বিলাতে অবস্থান কালে এই বিষয়ে সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষের আচরণের যে কঠোর সমালোচনা তিনি করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ধর্ম্ম ও চরিত্র—এই দুইটিকে ভিত্তি করিয়া কেশবচন্দ্র জাতিগঠনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ ধর্ম্ম ও চরিত্রকে রাজনীতির বহির্ভূত এবং গঠনমূলক কর্ম্মের সহিত সম্পর্কশূন্য বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে চরিত্রগঠনের মূল্য কতখানি তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। এই যে আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা—অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু অগ্নিমূল্য—এ সকলের প্রধান কারণ 'চোরা কারবার', এবং 'ঘুষের কারবার'; কিন্তু এই চোরা কারবারী ও ঘুষখোর কাহারা? যাহারা অসাধু প্রকৃতি এবং স্বার্থপর। চোরাকারবারী এবং ঘুষখোরকে শাসন বা দমন করিবে কে? ইহার প্রতিকার কোথায়? যতই নূতন আইন করা হোক

না কেন, ইহারা আত্মরক্ষা করিবার জন্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিবে। সুতরাং দেশকে উন্নত করিবার প্রকৃত পন্থা দেশবাসীর চরিত্রগঠনে এবং লোককে সৎ ও নিঃস্বার্থ হইতে শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে। এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই কেশবচন্দ্র দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর যাবৎ জাতীয় চরিত্রের আমূল সংস্কারে প্রবৃত্ত ছিলেন।

ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ যে কেশবচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ক্রমে ক্রমে গভীরতর আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিয়া তিনি দেখিলেন যে সকল ধর্মই সত্য। ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৮১ সালে ২৩শে নভেম্বরের 'Sunday Mirror' পত্রিকায় তিনি লিখিলেন, "Not that there are truths in every religion but all religions are true," অর্থাৎ, "প্রত্যেক ধর্ম্মেই যে কিছু কিছু সত্য আছে, তাহা নহে; সকল ধর্ম্মই সত্য।" ধর্মকে ভারতবাসীদের ও জগতের নানা জাতির প্রগতির মূল ভিত্তি করিবার সঙ্কল্প কেশবচন্দ্রের মনে ছিল? তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক আদর্শে পৃথিবীর সমস্যাগুলির সমাধান করিতে না পারিলে কখনও স্থায়ী মীমাংসা হইবে না। কেবল ভারতবর্ষকে কেন, সমগ্র মানবজাতিকে একতাবদ্ধ করিবার ইহাই একমাত্র মন্ত্র—"One World" বা অখণ্ডজগৎ এই ধারণার ইহাই এক মাত্র ভিত্তি। বর্তমানের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই এখন এই কথাই স্বীকার করিতেছেন যে, বর্তমান জগতের অশান্তি এবং দুর্গতির কারণ আধ্যাত্মিক বিকার। তাঁহারা দেখিতেছেন যে, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উৎকর্ষ ভিন্ন আণবিক স্ফোরকের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আর অন্য কোনো উপায় নাই। গান্ধীজীও বলিয়া গিয়াছেন, "All religions are equally true," অর্থাৎ "সকল ধর্মই সমান ভাবে সত্য।"

প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র জাতিগঠনের যে পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও পরিপূর্ণভাবে কার্য্যকরী হয় নাই। তাঁহার পরিকল্পনা কিন্তু তখন যেমন ছিল আজও তেমনি সত্য। তাঁহার মধ্যে জাতি-বিদ্বেষ ছিল না। গতানুগতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে না গিয়া কেশবচন্দ্র একেবারে মূল ভিত্তি হইতে জাতিগঠনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়া যদি আমরা জাতীয় চরিত্র গঠনের দিকে মনোযোগ দিতাম, তাহা হইলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে দুর্নীতির প্রসার আজ দেখিতেছি; তাহা সম্ভব হইত না। অপিচ কেশবচন্দ্রের ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ গ্রহণ করিয়া যদি হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইত, তাহা হইলে এই দুই সম্প্রদায় আজ রাজনীতির ক্ষেত্রে হিংস্র, রক্তক্ষয়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ না হইয়া পরস্পরের সহযোগী হইত, ভারতবর্ষ এই ভাবে বিখণ্ডিত হইত না, সহস্র সহস্র হিন্দু ও মুসলমান নিহত হইত না, লক্ষ লক্ষ নরনারী লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং বাস্তুত্যাগী সর্বহারা হইয়া আজ পথে আসিয়া দাঁড়াইত না।

ভারত ও পাকিস্থান

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্থান ভারতের সাহায্য ব্যতিরেকে এক বৎসরও চলিতে পারে না, তাহাদের সহিত আমার মত মিলে নাই। পৃথিবীতে এমন অনেক স্বাধীন দেশ আছে যেগুলি পাকিস্থান অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র, জনসংখ্যায় লঘিষ্ঠ এবং প্রাকৃতিক সম্পদে হীন। জনাব জিন্না সাহেব বলিতেন, আকারে এবং জনসংখ্যায় পাকিস্থান পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পঞ্চম এবং মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী। প্রকৃতপক্ষে ২,৩৩,১০০ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এবং ৬ কোটি ৫৬ লক্ষ লোকের বাসভূমি যে একটি অচল রাষ্ট্রে পরিণত হইতে থাকিবে সে কথা জনাব জিন্না সাহেবের মত বিচক্ষণ লোক বুঝিতে পারেন নাই, তাহা সম্ভব নহে।

পাকিস্থানের নানারূপ সুবিধা রহিয়াছে, তাহার কথা ভাবিয়া দেখা দরকার। স্বাধীন রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়া সমুদ্রের সহিত যোগাযোগ রাখিবার জন্য উপযুক্ত বন্দরের প্রয়োজন। এই সমুদ্রের কাছাকাছি চলাচলের দিকে পথ পাইবার জন্য জার্মানী কি চেষ্টা, কি অর্থব্যয় করিয়াছে, কত অনর্থ ঘটাইয়াছে তাহা সুবিদিত। পাকিস্থানের প্রধান বন্দর করাচী। ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল সিন্ধী অমুসলমান ব্যবসায়ীর দল। ভারত বিভাগের পূর্ব্বে বোম্বাই বন্দর থাকা সত্ত্বেও করাচী বন্দরে প্রায় চল্লিশ কোটি টাকার মাল ওঠা-নামা করিত। প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধায় করাচীকে জগতের একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পশ্চিম পাকিস্থানের সমস্ত রপ্তানীযোগ্য কাঁচা-

মাল—বিশেষতঃ তুলা, পশম, চামড়া, হয়ত বা কিছু খাদ্যশস্য, লবণ প্রভৃতি বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য রপ্তানীর বিশেষ সুযোগ এখানে রহিয়াছে। পূর্ব্বপাকিস্থানের প্রধান সম্পদ পাট। ভারতবর্ষে যত পাট হইত তাহার শতকরা ৭৩ ভাগ পড়িয়াছে পাকিস্থানে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে। পাকিস্থানের পক্ষে তুলা ও পাট পাওয়ায় আয়ের একটি প্রধান পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাট আবার ভারতবর্ষের সামান্য অংশে হয়, সর্ব্বত্র হয় না। পাকিস্থানে উৎপাদিত পাটের অধিকাংশ রেল, ষ্টীমার বা নৌকাযোগে কলিকাতায় বিক্রয়ের জন্য পাঠাইতে হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৪১,১৫,০০০ গাঁইট পাট এই ভাবে আসিয়াছে। বাকী পাট লইয়া তাহাদের বিব্রত হইবার কথা। কিন্তু পূর্ব্বপাকিস্থানে চট্টগ্রাম বন্দর রহিয়া গিয়াছে। চট্টগ্রাম বন্দর এখনও খুব উন্নত নয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যখন মনে করা যায় যে ৭,৬৪,০০০ গাঁইট পাট রপ্তানীর পক্ষে তাহা এখনই উপযোগী তখন তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করা চলে না। তাহার উপর চট্টগ্রামে একটি সুবৃহৎ বন্দর স্থাপনের জন্য এবং তাহার বিনিময়ে বিনা বাধায় পাট পাইবার আশায় ইংরেজ-আমেরিকান ধনিকেরা খুব উৎসাহ দেখাইতেছেন। কাঁচা পাট পাওয়ার সুবিধা ছাড়া তাঁহাদের নিয়োজিত মূলধনের উপর বন্দরের খাতে মোটা লভ্যাংশ পাইবার আশাও বর্ত্তমান।

পাটের পরই তুলার কথা। এখানেও পাকিস্থানের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বিদেশে তুলা রপ্তানী করিয়া ভারতের মোটা আয় ছিল, এখন পাকিস্থান তাহার শতকরা ৪০ ভাগ পাইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে আনুমানিক ৯,০০,০০০ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পশমের ক্ষেত্রেও পাকিস্থানের সুবিধা, কারণ পঞ্চনদ ও তাহার উত্তর পশ্চিমস্থ অঞ্চল পাওয়ায় তাহার বিশেষ সুবিধা হইয়া গিয়াছে। খাদ্যশস্য বিষয়ে ভারত অপেক্ষা পাকিস্থানের সুযোগ-সুবিধা বেশী, কারণ সিন্ধু ও পঞ্চনদের সেচব্যবস্থাযুক্ত সমস্ত জমি পাকিস্থানে পড়িয়াছে। পশু-চর্ম্ম ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। যুদ্ধ-পূর্ব্বে ১৯৩৯-৪০ সালে ইহার মূল্য ছিল ৬ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। ইহার অধিকাংশই আজ পাকিস্থানের সম্পত্তি। ভারতের সহিত পাকিস্থানের যে লেনদেন চুক্তি হইয়াছে তাহাতে পাকিস্থান হইতে অন্ততঃ ৪০ লক্ষ খণ্ড চামড়া না লইলে ভারতের বিশেষ অভাব থাকিয়া যায়। পাকিস্থান হইতে অন্ততঃ বিশ লক্ষ মণ লবণ না পাইলে ভারতের অভাব মিটিতে পারে না।

পাকিস্থানের অভাব আছে অনেক এবং কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে গুরুতর পরনির্ভরতা বর্ত্তমান। কাপড়, কয়লা, লোহা, সিমেণ্ট, চিনি প্রভৃতি দ্রব্যাদি পাকিস্থানকে হয় ভারত, না হয় অপর দেশের নিকট কিনিয়া লইতে হইবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পাকিস্থান অত্যন্ত পিছাইয়া আছে।

ভারতবর্ষের আজ যে অবস্থা তাহাতে মারাত্মক হইতেছে খাদ্যাভাব; তাহার পর পাট। অন্যান্য বিষয়ে পাকিস্থান অপেক্ষা ভারতের অবস্থা অনেক ভাল। পেট্রোল ও কেরোসিনের জন্য ভারত এবং পাকিস্থান উভয়েই পরমুখাপেক্ষী। ভারতবর্ষের এইখানে বিষম অসুবিধা। যাহাদের খাদ্য কিনিতে বৎসরে ১২০ কোটি টাকা, পেট্রোল কিনিতে ৪০ কোটি টাকা অপরকে দিতে হয়, তাহার পক্ষে নিজের প্রয়োজনীয় অপরাপর বহু দ্রব্য রপ্তানী করিতে না পারিলে চলে না। জাতির পক্ষে ইহা মহা অকল্যাণের অবস্থা।

নূতন শিল্প সংস্থানে ভারত ও পাকিস্থানের একই অবস্থা; কলকব্জা ও দক্ষ লোক বা বিশেষ জ্ঞানের জন্য সম্পূর্ণরূপে পরের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। তৃতীয় মহাসমরের যে আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে আমেরিকা, ইংলণ্ড সমস্ত লোহা, তামা প্রভৃতি দিয়া যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে ভারত পাকিস্থানকে যে সাহায্য করিতেছে বা করিবার আশ্বাস দিতেছে, তাহা ব্যর্থ বচন মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। তাহা হইলেও পাট এবং কতক পরিমাণে তুলা, পশম ও কাঁচা চামড়ার জন্য পাকিস্থানের উপর নির্ভর করিতে হইলেও, ভারত কাঁচা মালের ক্ষেত্রে পাকিস্থান অপেক্ষা অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছে। পাট ও তুলার ফলন বৃদ্ধি করা কতকাংশে সম্ভব, পাকিস্থানের যে অভাব তাহা পূরণ করা সহজসাধ্য নহে। সুতরাং যদি বাহির হইতে যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় অথবা যথাসম্ভব এখানে তৈয়ারী করিয়া লইবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে পাকিস্থান অপেক্ষা ভারতের সুযোগ অনেক বেশী হইবে।

এক ভৌগোলিক সীমার মধ্যে এতকাল থাকিয়া হঠাৎ ভারত বিভাগ হওয়ায়, মনের দিক দিয়া যাহাই হোক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে দুই পক্ষই বিশেষ বিব্রত ও চিন্তিত। বাংলা বিভাগ অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ দুই ডোমিনিয়নে এক 'সংসারে'র লোক বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং হয়ত রাষ্ট্রপতিদের আদেশে ভাইয়ের বিপক্ষে ভাইকে দাঁড়াইতে হইতে পারে।

পশ্চিম-পঞ্চনদে হিন্দু বা শিখ এবং পূর্ব্ব পঞ্চনদে মুসলমান নাই বলিয়া শোনা যাইতেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হিন্দুশূন্য হইলেও, সিন্ধুতে এখনও দুই লক্ষের উপর অমুসলমান রহিয়াছে। সে হিসাবে পূর্ব্বপাকিস্থানের অবস্থা

সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে অল্পপরিসর স্থানের মধ্যে সোয়া এক কোটি হিন্দু রহিয়াছে। আর সমগ্র ভারতে রহিয়াছে প্রায় সোয়া চার কোটি মুসলমান।

ধর্ম্মের ভিত্তিতে জনাব জিন্না সাহেব ভারত বিভাগ করিয়া তাঁহার সধর্ম্মীদের বেশী উপকার করিলেন কিনা এখনও বুঝিতে পারা যায় না। লোক বিনিময়ের কথা প্রথমে খুব জোর গলায় বলিবার পর শেষে স্ব-সম্প্রদায়ের লোকেদের দুর্দ্দশা দেখিয়া সেই মত শেষে তাঁহাকে পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা যদি দেড় কোটি অমুসলমানকে স্থান দিতে রাজী হই, তাহা হইলে পাকিস্থানকে সোয়া চার কোটি মুসলমানকে আশ্রয় দিতে হয়।

এ অবস্থা মুসলমানেরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে, সুতরাং আর "লোক বিনিময়" বুলি আওড়ায় না। এখন চায় কি ভাবে হিন্দু বিতাড়ন করিয়া তাহাদের ধনসম্পত্তি, জমিজেরাৎ মনের সুখে ভোগ-দখল করিতে পারে। তাই আজ প্রকাশ্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামার বহর অনেক কমিয়াছে, এখন হাতে না মারিয়া ভাতে মারিবার ব্যবস্থা হইতেছে। লোকেরা সদাসর্ব্বদা অত্যাচারের ভয় দেখাইয়া রাখে, অত্যাচার করে না; স্ত্রীলোকদের অপহরণ করা অপেক্ষা বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইয়া আতঙ্কগ্রস্ত রাখে; পথে ঘাটে হিন্দু স্ত্রীলোক দেখিলে, গায়ে হাত দেয় না, মুখভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী করে, অশ্লীল গান করে, নানাপ্রকার অভদ্র ইঙ্গিত করে। জমি-পুকুর দখল করে না, গরু চুরি করে না, ফসল, মাছ ইত্যাদি প্রকাশ্ত ভাবেই লয়; উঠান হইতে দুধ দোহন করিয়া লইয়া চলিয়া যায়। মানী লোকেদের ইচ্ছা করিয়া অসম্মান করে, ঘরে দালানে বসিয়া আত্মীয়স্বজনের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবার সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক হঠাৎ আসিয়া নিকটে বসিয়া আত্মীয়তা প্রকাশ করে, সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক ভয়ে উঠিয়া পালায়, পুরুষরা বিব্রত হইয়া স্থান ত্যাগ করে। ইহাতে কোনও দোষ নাই বলিয়া "কর্ত্তা"কে বুঝাইতে চেষ্টা করে। এরূপ উদাহরণের অভাব নাই।

জিন্না সাহেবের হয়ত লক্ষ্য ছিল, ঘর সামলাইয়া উঠিতে পারিলে তিনি একবার মুসলমান সম্রাটদের রাজধানী দিল্লী-আগ্রার দিকে মুখ ফিরাইবেন। প্রত্যক্ষভাবে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সরাসরি পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া আফগানিস্থান, ইরাণ, ইরাক, আরব, সিরিয়া, তুর্কী, মিশর প্রভৃতি যাবতীয় মুসলমান রাষ্ট্রকে একসূত্রে আবদ্ধ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেন। পাকিস্থান পাইলে এই সুযোগ ঘটিবে বলিয়া তিনি ভারত বিভাগে উত্যোগী হন এবং শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজের সহায়তায় সফলকাম হন।

ভারতবর্ষকে শাস্তি দিবার কথা তাঁহার মনে হইলে তিনি বিশেষ অশান্তি ভোগ করিতেন। ভারতবর্ষকে বিব্রত রাখিতে পারিলে পাকিস্থানের কি সুবিধা হইবে, তাহা তিনিই জানিতেন। আর কিছু না হইলেও ভারত ঘর সামলাইতে ব্যস্ত থাকিলে তিনি বিভিন্ন জাতির সহিত সখ্য স্থাপনপূর্ব্বক পাকিস্থানের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া ভারতীয় রাজন্তবর্গের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও পাকিস্থানের কুক্ষিগত করিতে পারিবেন, ইহাই হয়ত ছিল তাঁহার মনোগত আশা। তিনি এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। আফ্রিদী, ওয়াজিরি, মামুদ, মোহম্মদ লুঠেরা ছাড়িয়া দিয়া ভারতের সহিত যুক্ত কাশ্মীর রাজ্যকে আক্রমণ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে গোপনে, পরে প্রকাশ্তে পাকিস্থানী সৈন্ত ও রণসম্ভার দিয়া আক্রমণকারীদের সাহায্য করা হয়।

তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবস্থা এইরূপ ছিল। পাকিস্থানীদের মতিগতি যেরূপই হউক, ভারতের পক্ষে এই বিভাগ অত্যন্ত বেদনাদায়ক হইলেও গৃহীত চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্থানকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করিয়া বন্ধু প্রতিবেশী হিসাবে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার ইচ্ছা ভারতের ছিল এবং এখনও রহিয়াছে।

পণ্ডিত জবাহরলাল সত্যই বলিয়াছেন, পাকিস্থান এখন মিলিতে চাহিলেও তিনি তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত নন। ভারতবাসী সকলেরই এই এক মত। যত দিন না পাকিস্থান নিজ উগ্র স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিয়া একত্রীভূত হইতে চায়, তত দিন তাহাকে গ্রহণ করিয়া লাভ নাই। কিন্তু বন্ধুভাবে থাকিবার প্রস্তাব যে অত্যন্ত সমীচীন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জিন্না সাহেবের মৃত্যুর পর এই কথা একবার ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিষয়ে ভারত ও পাকিস্থান পরস্পরের নির্ভরতার কথা প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশে উল্লেখ করা হইয়াছে। এক বৎসরের অধিক যখন চলিয়াছে, তখন ভবিষ্যতে খুব অসুবিধা হইলেও হয়ত কোনও রকমে চলিয়া যাইবে। কিন্তু যেখানে একই পরিবারের লোক ভিন্ন ভিন্ন অংশে পড়িয়াছে, যেখানে দৈনন্দিন ব্যাপারে পরস্পরের যোগাযোগ, যেখানে একই ভাষা, একই ভাব, জীবন ধারণের রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ এক, সেখানে ব্যবধান সৃষ্টি করিলে অনেক অসুবিধাই জনসাধারণকে ভোগ করিতে হয়। সেইজন্তই দুই রাষ্ট্রে সম্প্রীতি থাকা উচিত। তাহা হইলে রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া ভারত বিভাগের পূর্ব্বে যেমন ছিল সেইরূপ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা, যানবাহন ও মাল চলাচল, মুদ্রাম মান এক রাখিয়া চলিলে সকল দিক বজায় থাকে।

এখন সকলের চেয়ে বড় প্রশ্ন হইতেছে, পাকিস্থান কালে ভারত দখল করিবার বাসনা মনে মনে পোষণ করে কি না। এই প্রশ্নের উত্তর কি হইতে পারে তাহা বিবেচনা করা যাক।

যদি ভারত আক্রমণের বাসনা থাকে, তাহা হইলে পাকিস্থানের অধিবাসীদের মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া রাখিতেই হইবে। সেই বিদ্বেষকে জীয়াইয়া রাখিতে হইলে মুসলমান ধর্ম্মের উপর অত্যাচার হয়, মুসলমান স্বার্থের হানি করা হয়, ভারতের মুসলমানদের প্রতি অবিচার, অত্যাচার হয়, ভারত পাকিস্থান দখল করিতে চায়, এই সকল ভাব পাকিস্থানের মুসলমানদের মনে জাগরূক রাখিতে হইবে। ইহারই অনুরূপ কথা জগতের অপর মুসলমান জাতিদের মধ্যেও প্রচার করা প্রয়োজন। পাকিস্থানের ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হয় তাহারা ভারতের সহিত সংগ্রাম চায়। তাহা না হইলে এতদিন ভারত যে সৎ ব্যবহার পাকিস্থানের প্রতি করিতেছে, তাহাতে উহার মতি-গতির পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয় নাই।

এখনও বোধ হয় সময় আছে, বন্ধুভাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে থাকিয়া কাজ চালাইবার উপায় এখনও আবিষ্কার করার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যে সকল ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্থান সমান স্বার্থে জড়িত—যেমন আত্মরক্ষা, বিদেশে ভারতীয়ের স্বার্থরক্ষা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-নীতি প্রভৃতি ব্যাপারে একযোগে কাজ করিয়া পাকিস্থানের লাট, পাকিস্থানের নোট, পাকিস্থানের বেতার ও বিবৃতি প্রভৃতির বিশেষত্ব বজায় রাখা চলিতে পারে। মনে সদিচ্ছা থাকিলে এ সকল বিষয়ের মীমাংসাও অতি সত্বর হইতে পারে। অপর দিক দেখিতে গেলে ঘোরতর চিন্তার উদ্রেক হয়। ভারতের দুর্দশা আছে সত্য, কিন্তু পাকিস্তানও খুব সুখে আছে বলিয়া মনে করা যায় না; প্রথমে জুনাগড় রাজ্য লইয়া পাকিস্থান খেলা সুরু করিল। ভারতীয় কূটনীতির নিকট পাকিস্থানকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। কাশ্মীর সংগ্রামের ফলে পাকিস্থান বিব্রত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ওয়াজিরি, মাসুদ প্রভৃতি এবং পাকিস্থানের পাহাড়িয়া সৈন্যদের বিতাড়িত করিতে ভারতকে বেগ পাইতে হইতেছে। কিন্তু শতকরা ৮৩ জন মুসলমানের দেশ বলিয়া যে কাশ্মীর পাকিস্থানে যোগ দিবে অথবা পাকিস্থান লড়াই সুরু করিলেই কাশ্মীরী মুসলমান কাশ্মীরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া, পাকিস্থানে যোগদান করিবে তাহার লেশমাত্র সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। স্যার ফিরোজ খাঁ নুন যে চেঙ্গিস খাঁ বা নাদির শাহের মত ভারতে বন্যার মত ঝাঁপাইয়া পড়িবার ভয় দেখাইয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

ভারত বিভাগের সময় জিন্না সাহেব ভাবিয়াছিলেন ভারতের তিন কোণে তিনটি খুঁটি পুঁতিয়া রাখিলেন, তন্মধ্যে দক্ষিণে যে হায়দরাবাদ রহিল তাহা একদিন সমস্ত দক্ষিণ ভারত জয় করিয়া উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আগত সৈন্যবাহিনীর সহিত মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার সীমানায় মিলিত হইবে। যাহারা ভাবিয়াছিলেন কাশ্মীরের শতকরা ৮৩ জন অধিবাসী মুসলমান বলিয়া কাশ্মীর পাকিস্থানে যোগ দিবে তাঁহারা একথাটা ভাবেন নাই যে, হায়দরাবাদে শতকরা ৮৭ জন হিন্দু অধিবাসী ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগ দিতে পারে। যাহা হউক, হায়দরাবাদ সমস্যার সমাধান হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, অন্ততঃ পাকিস্থানের সুযোগ-সুবিধা যে বাড়ে নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

জনাব জিন্না সাহেবেরও এই সময় এন্তেকাল হইয়াছে; পাকিস্থান এখন ভারতের সহিত শত্রু বা মিত্র ভাবে ব্যবহার করিবার চরমক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে।

পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে আজও কেন শত্রুতা পোষণ করিতেছে, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। গোটা পাকিস্থান হইতে অমুসলমান অপসারণের যে চেষ্টা চলিতেছে তাহার দরুন এবং কাশ্মীর হইতে পাকিস্থানী সৈন্যের এখনও প্রত্যাবর্ত্তনের কোনও লক্ষণ না দেখা যাওয়াতে পাকিস্থান যে দিল্লী আগ্রা চায়, উত্তর-ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সহিত যুক্ত হইয়া বিহার উড়িষ্যা দখল করিতে চায়, সেকথা আর অবিশ্বাস করা যায় না।

এই দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া পাকিস্থান যদি আপনার অধিকারে সন্তুষ্ট থাকিয়া রাজ্যশাসন, প্রজার সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভের চেষ্টায় মন দেয়, তাহা হইলে ভারতের সাহাচর্য্য পাইয়া জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারে।

ভারতের সহিত যুদ্ধে পাকিস্থানের কতদূর সুবিধা হইবে তাহা সমর-বিশেষজ্ঞদের বিচার্য্য বস্তু। কিন্তু একথা বোধ হয় মনে করা ভুল নয়, প্রতিদিনই প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধের ব্যাপারে ভারতের শক্তিসঞ্চয় হইতেছে। আজ ক্ষুদ্র দুইটি ভূখণ্ড বাদ দিলে আসমুদ্র হিমাচল ভারত একটি বিরাট রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। দেশীয় রাজন্যবর্গ ইংরেজের সহায়তায় এতদিন ক্ষতির কারণ ছিল, বর্ত্তমানে তাহারা ভারতের বন্ধু, সহায়। হায়দরাবাদ-যুদ্ধে বরোদার পদাতিক, ত্রিবাঙ্কুরের অশ্বারোহী ভারতের সৈনিকের পাশে পাশে ছিল। প্রকৃত পক্ষে এ বিষয় লইয়া শ্লাঘা করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান।

ভারতের লোকসংখ্যা এবং আয়তন পাকিস্থানের অন্ততঃ ছয় গুণ। তাহার প্রাকৃতিক ও শিল্প-সম্পদ পাকিস্থান অপেক্ষা বিশগুণ বেশী। তাহার উপর পাকিস্থান অমুসলমানদের বিতাড়িত করিয়া ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। বাস্তুত্যাগীরা যে তিক্ততা লইয়া বাস্তু ঘর, সহায় সম্পদ ছাড়িয়া আসিতেছে, যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে তাহারা সেই অনুপাতে তীব্রতা লইয়া পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধ করিবে। তাহার উপর পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধে অমুসলমান অধিবাসীদের কথা ভাবিয়া ভারতীয় ইউনিয়নের যে পথ অবলম্বন করিতে হইত, আজ সমস্ত অমুসলমান পাকিস্থান ত্যাগ করিলে, সে চিন্তার কারণ থাকে না।

অপর পক্ষে ভারতের সীমার মধ্যে সোয়া চার কোটি মুসলমানের বাস। জিন্না সাহেবের উপযুক্ত চেলা স্যার জাফরুল্লা খাঁ তারস্বরে বলিলেন, মুসলমান-স্বার্থের কোনও ক্ষতি হইলে হায়দরাবাদ দখল ত তুচ্ছ কথা, ভারতের সোয়া চার কোটি মুসলমান একযোগে, (like one man) ভারতকে ছিন্নভিন্ন, লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবে। হায়দরাবাদে অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। স্যার জাফরুল্লা দেখিয়াছেন যে, মুসলিম লীগের উত্তেজনায় ক্ষিপ্তপ্রায় এবং ইংরেজের কূটবুদ্ধিতে মোহগ্রস্ত মুসলমান, আর ভারতে সর্ব্বস্বার্থ-সংরক্ষিত নির্ভয়ে বাসকারী মুসলমান একই শ্রেণীর মানুষ নয়। হায়দরাবাদ দখল হওয়া পর্য্যন্ত সারা ভারতে সোয়া চার কোটি মুসলমানের একজনও বিদ্রোহ করে নাই। ইহাতেও কি পাকিস্থানের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে না?

শেষ কথা, পাকিস্থান কি একবার পূর্ব্ববঙ্গের কথা ভাবে না? যদি উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে তাহা হইলে ভারতের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের যোগ অচিরকাল মধ্যেই স্থাপিত হইতে পারে। তখন সারা ভারত কেবল উত্তর-পশ্চিমে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলে তাহার যুদ্ধ করা চলিতে পারে। পাকিস্থান যে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের সহায়তা পাইবে তাহাও ত মনে হয় না।

ভারত-পাকিস্থানে সংঘর্ষ বাধিলে জয়-পরাজয় যাহারই হউক, উভয় রাষ্ট্রেরই নবলব্ধ স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে, যাহারা যুদ্ধ চাহে না সেই নিরীহ লোকেদের কষ্টের সীমা থাকিবে না। যখন সদ্ভাবে থাকিবার উপায় বর্ত্তমান, তখন পাকিস্থানের পক্ষে সর্ব্বদা রণডঙ্কা বাজাইয়া চলা যে কেবল ভারত ও পাকিস্থানের অমঙ্গলসূচক নয়, সারা বিশ্বের পক্ষেই অকল্যাণকর তাহা মনে রাখা উচিত। পাকিস্থান ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করিয়া সখ্যের পথ, মৈত্রীর পথ অবলম্বন করিতে পারে। এখন পাকিস্থান স্বাধীন, ইহার মধ্যে যে-কোনটি গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা তাহার আছে।

সাম্প্রতিক কবিতা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যকে সর্ব্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। আমাদের ভাব, চিন্তা, আদর্শ সব কিছুর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বর্ত্তমান। তিনি আমাদিগকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিতে ও নূতনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার অনুকরণ করিয়া শক্তিমান্ কবিরাও তাঁহারই প্রবর্ত্তিত ধারার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, স্বকীয়তার পরিচয় দিতে পারেন নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অন্ধ অনুকরণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই অনুকরণ বেশ কিছু দিন চলিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল—এক দল তরুণ সাহিত্যিক এই গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দিতে ক্ষান্ত হইলেন। নূতন পথ খুঁজিবার জন্য পথ-সন্ধানীরা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা দেখিলেন, লীলা-সঙ্গিনীর কঙ্কণ-ঝঙ্কার তাঁহাদের মনে তেমন আবেগ-সঞ্চার করিতে পারে না। আকাশ হইতে ধরণী পর্য্যন্ত যে সৌন্দর্য্যের ধারা প্রবাহিত তাহারও উৎসমুখ কে যেন আগলাইয়া বসিয়া আছে। মানুষের আর্ত্তনাদ এখন ইলিয়টের সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে—Give us light—light—light। আজ অন্ন নাই, প্রাণ নাই, মুক্ত বায়ু নাই, আছে অতলগর্ভ অন্ধকার। তাই প্রকৃতি-সর্ব্বস্ব বিশ্বচেতনা অথবা রূপাতীত সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী, এ যুগের কাব্যের উপজীব্য হইতে পারে না। এখন সাহিত্যের শিলা-চত্বরে ফুটিতে চায় বিক্ষুব্ধ, বঞ্চিত জনগণের অন্তর্বেদনা। সাম্প্রতিক কবি সখেদে বলেন,

> 'মৃত্যু কেবল, মৃত্যুই ধ্রুব সখা
> বেদনা শুধুই, বেদনা সুচির সাথী।'

কালের দিক হইতে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী এবং ভাবের দিক হইতে রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তি-প্রয়াসী কাব্যসমূহকেই অতি-আধুনিক কাব্য বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। আধুনিক বাংলা কবিতা যে আধুনিক ইংরেজী কবিতা দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত তাহা কাব্য-রসিকেরা জানেন। অবশ্য মধুসূদনও বিদেশী ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং সাগরপার হইতে প্রচুর উপকরণও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তবুও তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে এবং বিশেষ ভাবে ব্রজাঙ্গনা কাব্যে বাঙালী জীবনের মর্ম্মকথা ও বাংলার গীতিকাব্যের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যও পাশ্চাত্ত্য প্রভাবমুক্ত নহে কিন্তু সেখানেও ঔপনিষদ আধ্যাত্মিকতা এবং বৈষ্ণব কবিতার প্রেমভক্তি ও ভাবার্দ্রতার পটভূমিকায় স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তিই প্রকাশমান।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ রবীন্দ্র-সাহিত্যে নাই,

পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারাকে আত্মসাৎ করিয়াই তিনি তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টিকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন।

কিন্তু সাম্প্রতিক কবিদের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্নরূপ। ইউরোপীয় কাব্যের উৎকট ভাবধারা আমাদের সাম্প্রতিক কবিতার অনেকখানি জুড়িয়া বসিয়া আছে। সাম্প্রতিক কবিরা ইলিয়ট, এজরা পাউণ্ড, ষ্টিফেন স্পেণ্ডার প্রভৃতির নিকট অকুণ্ঠ ভাবে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। ইহার মূলে রহিয়াছে তাঁহাদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও নূতন রচনা-শৈলীর প্রতি অনুরাগ। প্রচলিত ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গী, ছন্দোবদ্ধ পদ, বিষয়বস্তু, চন্দ্র-জ্যোৎস্না-মলয়-মারুত—এক কথায় যাহা কিছু পুরাতন তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারা অভিনব ভাব ও ভাষায় কাব্য সৃষ্টি করিতে চান। এই নূতনত্বের মোহে তাঁহারা নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং জনগত ও সামাজিক পরিবেশের প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ হইয়া অপরিচিত অথবা স্বল্পপরিচিত সমাজ-জীবন হইতে উপজীব্য গ্রহণ করিতে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছেন। ফলে, তাঁহাদের রচনা অনেক স্থলেই সুস্পষ্ট বা স্বতঃস্ফূর্ত হয় নাই। সেগুলিতে অনাড়ম্বরত্বের ভড়ং আছে, কিন্তু আন্তরিকতা নাই, দুরূহ শব্দপ্রয়োগে বহু স্থলেই তাঁহাদের রচনা দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

যুগে যুগে রুচির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পোপের যুগের এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুগের রুচি এক নয়। ভারতচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের যুগের রুচি বিভিন্ন। কিন্তু শুচিতা, সংযম, শালীনতা প্রভৃতি পরিহার করিয়া সাহিত্য-রচনায় উন্মার্গগামী হওয়া যে-কোন যুগের কবিদের পক্ষে অপধর্ম-স্বরূপ। সাম্প্রতিক কবিরা অনেকে রিয়ালিজমের নামে কামার্তির বাস্তব রূপ ফুটাইয়া রসোল্লাস সৃষ্টি করিবার যে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাহা প্রশংসনীয় নহে। যৌন আকর্ষণ অস্বাভাবিক নহে; ইহা সাহিত্যের বিষয়বস্তুও হইতে পারে। তবে ইহার একটা সীমারেখা থাকা প্রয়োজন। মানুষ সময় সময় পশু হয়। তাই বলিয়া তাহার ঐ পশুত্বের জয়ঢাক বাজানোতেই সাহিত্যিকের শক্তির অপব্যবহার হওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শই সাহিত্যের পটভূমিকায় পরিপূর্ণ গৌরবে ফুটিয়া উঠা উচিত। মানুষের একটি বিশেষ বৃত্তির বিদ্যুৎস্ফুরণই কাব্যের একমাত্র উপজীব্য নয়। সত্য শিব ও সুন্দরের লীলাক্ষেত্র মানবজীবনের অখণ্ড মহিমাই রসস্রষ্টার নিপুণ তুলিকায় রূপায়িত হওয়া সমীচীন।

সাম্প্রতিক কাব্য হইতে রোমান্টিক ভাবধারা ক্রমেই লোপ পাইবার পথে চলিয়াছে। সুখের বিষয়, বুদ্ধদেব বসু মাঝে মাঝে প্রেমের কবিতা রচনা দ্বারা ঊনবিংশ শতকের রোমান্টিক ভাবধারাকে কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। বিষ্ণু দে এবং তাঁহার অনুগামী কোনো কোনো কবি কিন্তু পতন ছাড়া প্রেমে আর কিছু দেখিতেই পান না। প্রেমেন্দ্র মিত্র মুটে-মজুরের কবি। সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে ভাবুকতা আছে যথেষ্ট, কিন্তু তাঁহার কল্পনা আত্মকেন্দ্রিক এবং নেতিবাচক। 'জন্মাষ্টমী' কবিতা তাঁহার প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। কিন্তু এ ধরণের কবিতা তাঁহার কাব্যে বড় বেশী নাই। সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশভঙ্গী কেমন যেন উদ্ভট ও খাপছাড়া ধরণের। ফলে তাঁহাদের অধিকাংশ কবিতাই দুর্বোধ্য, এবং ঐগুলি হইতে রস আহরণের চেষ্টা করিতে গিয়া পাঠককে নিরাশ হইতে হয়। সাম্প্রতিক কবিতা সম্বন্ধে চরম কথা বলিবার দিন এখনও সুদূরবর্তী। মানব-সভ্যতা আজ অপ্রকৃতিস্থ। হয়ত এই অপ্রকৃতিস্থ সভ্যতার ধূলি-ধূসরিত পটভূমিকাতেই ভাবীকালে ফুটিয়া উঠিবে নূতন সমাজের অরুণ-রেখা। সে সমাজের সাহিত্য তখন কোন অভিনব রূপপরিগ্রহ করিবে, সাম্প্রতিক কবি তখন কোন্ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া কাব্যরচনা করিবেন তাহা বলিবার সময় এখনও আসে নাই।

সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ শক্তিমান্। অল্প পরিসরের মধ্যে তাঁহাদের বাচনভঙ্গীর সুষ্ঠু প্রকাশ বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। ভাব-ঘন, গাঢ়-সংবদ্ধ, অনাড়ম্বর, ইঙ্গিতময় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মননশীল তাঁহাদের রচনা। তাঁহাদের কেহ কেহ দেশ-বিদেশের কাব্য-সাহিত্যের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত। উন্মার্গগামী না হইলে এবং উপযুক্ত সাধনা থাকিলে ইঁহারা বাংলা কাব্যের মরা গাঙে বান ডাকাইতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের ভাস্বর প্রতিভার যুগেও যে সাম্প্রতিক কবিগোষ্ঠী রসিক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

বৌদ্ধ যুগে গান্ধার

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী

গান্ধার অতি প্রাচীন জনপদ। ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার যুগ হইতে এই দেশটি ভারতবর্ষের অখণ্ড অংশরূপে বিরাজিত। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে এই জনপদ ও তাহার অধিবাসীগণের বিবরণ লিখিত আছে। বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের মত বৌদ্ধ সাহিত্যেও বৌদ্ধ-ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ, অবস্থান, নদ-নদী, জনপদ ও তাহার অধিবাসীগণের বিবরণও তদ্রূপ লিখিত আছে। আজ আমরা এই প্রবন্ধে পালি ও বৌদ্ধ সংস্কৃত-সাহিত্যে গান্ধার জনপদের উল্লেখের কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।

পালি সাহিত্য : অঙ্গুত্তর নিকায়

বৌদ্ধ শাস্ত্র বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম্ম এই তিন পিটকে বিভক্ত। সমবায়ে ইহাদের নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথাক্রমে ইহাদের নাম—(১) দীর্ঘ নিকায় (২) মধ্যম নিকায় (৩) সংযুক্ত নিকায় (৪) অঙ্গুত্তর নিকায় (৫) ক্ষুদ্দক নিকায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মসাহিত্যের মধ্যে নিকায় গ্রন্থমালা সুপ্রাচীন এবং প্রামাণ্য। নিকায় গ্রন্থমালার চতুর্থ গ্রন্থ অঙ্গুত্তরে ষোলটি মহা-জনপদের নাম ও উহাদের ভৌগোলিক অবস্থানের উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধ যুগে ভারতবর্ষ মধ্য ও উত্তর দুই অংশে বিভক্ত ছিল। মধ্য চৌদ্দটি এবং উত্তর অংশ দুইটি জনপদে ভাগ করা ছিল।

অঙ্গুত্তরে উল্লিখিত ষোলটি মহা-জনপদের নাম ও সেগুলির ভৌগোলিক সংস্থান এইরূপ—(১) কাশী (২) কোশল (৩) অঙ্গ (৪) মগধ (৫) বজ্জি (৬) মল্ল (৭) চেদী (৮) বংস (৯) কুরু (১০) পাঞ্চাল (১১) মৎস (১২) শূরসেন (১৩) অশ্বক (১৪) অবন্তি (১৫) গান্ধার (১৬) কম্বোজ।[১] এই ষোলটি মহা-জনপদের মধ্যে চৌদ্দটি মধ্যদেশে এবং অবশিষ্ট দুইটি গান্ধার ও কম্বোজ উত্তর-দেশে অবস্থিত।

মহাবস্তু

মহাবস্তু গ্রন্থেও ষোলটি মহা-জনপদের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু উহাদের নাম উল্লিখিত নাই।[২] বুদ্ধদেব যে যে দেশে পর্য্যটন করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে সেই সেই দেশের নামের উল্লেখ আছে। এই সকল দেশের সহিত অঙ্গুত্তরে উল্লিখিত মহা-জনপদসমূহের সম্পূর্ণ না হইলেও কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ মহাবস্তু গ্রন্থে গান্ধার ও কম্বোজ জনপদের পরিবর্ত্তে শিবি ও দশরণ জনপদের উল্লেখ আছে।[৩]

১। অঙ্গুত্তর নিকায় প্রথম খণ্ড ২১৩ পৃ; চতুর্থ খণ্ড ২৫২ পৃঃ

২। A Study of Mahavastu, p. 9. B. C. Law.

৩। Geograprical Essays, p. 26, B. C. Law.

দীপবংশ ও মহাবংশ

সিংহলদেশের প্রাচীন ইতিহাস দীপবংশ এবং মহাবংশ। উভয় গ্রন্থই বুদ্ধদেবের সময় প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।[৪] মহাবংশ খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে রচিত হয়। মহানাম এই প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থখানি প্রাচীন সিংহলী গদ্যে এবং পদ্যে রচনা করেন।[৫] এই উভয় গ্রন্থে বৌদ্ধ ভারতের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম, মধ্য এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ অংশ, দাক্ষিণাত্য ও সিংহলের বহু জনপদের উল্লেখ আছে। দীপবংশে লিখিত আছে যে, থেরা মহান্তিক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্ত গান্ধার ও কাশ্মীরে প্রেরিত হইয়াছিলেন।[৬] বৌদ্ধযুগে গান্ধার ও কাশ্মীর সংযুক্তরাজ্য ছিল। এই যুগে গান্ধার বলিলে গান্ধার ও কাশ্মীর যুক্তরাজ্য এবং তক্ষশীলা রাজ্যকেও বুঝাইত।[৭] জাতক গ্রন্থেও ইহার সমর্থনযোগ্য বিবরণ আছে। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা গান্ধার জাতকের নামোল্লেখ করিতে পারি। সে যাহা হউক, উভয় গ্রন্থ—দীপবংশ ও মহাবংশে গান্ধার জনপদের উল্লেখ আছে এবং উহা উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত।

শাসন বংশ

শাসন বংশ গ্রন্থেও মহা-জনপদ গান্ধারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দীপবংশ এবং মহাবংশের মত শাসনবংশেও লিখিত আছে—থেরা মহান্তিক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্ত গান্ধার গমন করিয়াছিলেন।[৮]

দীব্যাবদান

দীব্যাবদান গ্রন্থে লিখিত আছে, যূপকাষ্ঠ মহাপদ্ম কর্ত্তৃক গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইলে চারিজন নৃপতি কর্ত্তৃক উহা ধৃত ও রক্ষিত হয়। গান্ধাররাজ ইলপত্র চারিজন নৃপতির অন্ততম।[৯]

মিলিন্দ পঞ্‌হো

মিলিন্দ পঞ্‌হো—প্রাচীন প্রামাণ্য বৌদ্ধ গ্রন্থ। ইহা ভিক্ষু-সূত্র নামেও পরিচিত। এই গ্রন্থখানি কোন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ১০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত।[১০] গ্রন্থখানির রচনা-

---

৪। History of Pali Literature, p. 517, B. C. Law.

৫। History of Pali Literature, p. 522, B. C. Law.

৬। Dipvamsa, Oldenberg p. 53.

৭। Political History of Ancient India p. 93 H. C. Roy Chaudhury.

৮। P. T. S. edition p. 12.

৯। Cowee and Nail p. 60-61.

১০। History of Medieval School of Indian Logic p. 61. M. M. S. C. Vidyabhusan.

কাল সম্বন্ধে মতভেদের অভাব নাই। রিস ডেভিস এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বিশদভাবে ইহার আলোচনা করিয়াছেন।১১ এই গ্রন্থখানি উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃত কিংবা উত্তর-ভারতীয় প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়। মূল গ্রন্থের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। প্রথমে ইহা সিংহলদেশে (পালী ভাষায় অনূদিত হইয়া ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশে) প্রচারিত হয়।১২ চীনা ভাষাতেও অনুবাদিত হইয়া "নাগসেন ভিক্ষুসূত্র" নামে পরিচিত হয়।১৩

প্রত্যোক্ত মিলিন্দ ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজা নামে উল্লিখিত। তাঁহার রাজ্যের সীমা পঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি অলসন্দা (আলেকজেন্দ্রিয়া) নগরে কলসগ্রাম নামক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভিক্ষু নাগসেন কর্ত্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার যে উত্তর পশ্চিম ভারতের অধিবাসী ছিলেন, ইহা তাঁহার গ্রন্থ হইতে অনুমিত হয়। কারণ এই গ্রন্থে পঞ্জাবের বহু নদনদী ও স্থানের নাম উপর্য্যুপরি উল্লিখিত আছে। শুধু তাহাই নহে, উহার নিকটবর্ত্তী বহু দেশ, বন্দর, সুরাট, ভিরুকচ্ছ প্রভৃতি দেশের নামেরও উল্লেখ আছে।১৪

মিলিন্দ পঞ্হো গ্রন্থে সাতাশটি দেশ ও রাজ্যের নামের উল্লেখ আছে। যথা—(১) যবন (২) ভিরুকচ্ছ (৩) চীন (৪) গান্ধার (৫) কলিঙ্গ (৬) কলসা (৭) কুম্ভনগোলা (৮) কাশ্মীর (৯) কোশল (১০) কালা পত্তন (১১) মগধ (১২) মথুরা (১৩) নিকুম্বর (১৪) সগল (১৫) শকেত (১৬) শক দেশ (১৭) সৌভির (১৮) সুরোহ (১৯) বারাণসী (২০) সুবর্ণ দ্বীপ (২১) পাটলীপুত্র (২২) উদিচ্ছ (২৩) বঙ্গ (২৪) ভিলাত (২৫) একোলা (২৬) উজ্জয়িনী (২৭) গ্রীস। এই গ্রন্থেও গান্ধার প্রাচীন জনপদরূপে বর্ণিত।

জাতক সাহিত্য

জাতক গ্রন্থমালা অতি প্রাচীন। বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। জাতক সাহিত্য ভারতীয় ইতিহাসের এক অচ্ছেদ্য অংশ। ইহা হইতে প্রাচীন বৌদ্ধ ভারতের সমাজ-জীবন, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি জ্ঞাত হওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, ইহা হইতে ঐতিহাসিক ভৌগোলিক তথ্যেরও বহু সন্ধান পাওয়া যায়। এই কারণে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে জাতক গ্রন্থমালা মহামূল্যবান। জাতকের গল্পগুলি মহাভগ্গ, চুল্লভগ্গ, মহাভদলন, মহাদেব সূত্র ও অবদান-গ্রন্থে গল্পাকারে স্থান লাভ করিয়া পালি বৌদ্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

অশ্বঘোষ রচিত সূত্রালঙ্কার এবং সেমেন্দ্র রচিত অবদান-কল্পলতা গ্রন্থেও জাতকের গল্পগুলি স্থান লাভ করিয়াছে। জাতক-সাহিত্য মহাযান ও হীনযান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তি রূপেও তদ্রূপ শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছে। জাতক কথাসমূহের জনপ্রিয়তা বৌদ্ধভাস্কর্য্য এবং চিত্রকলার মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

জাতক-সাহিত্যের বহু গল্পে গান্ধার জনপদের উল্লেখ আছে। বাহুল্য বোধে সেগুলি বর্ণনা না করিয়া কেবলমাত্র উদাহরণ-স্বরূপ আমরা কয়েকটির নামোল্লেখ করিলাম। যথা—গান্ধার জাতক, কুম্ভকার জাতক, বসন্তর জাতক, চুতিপালই জাতক, বিদেহ জাতক প্রভৃতি। এই জাতক গল্পগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধ ভারতে গান্ধার অতি প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল।

পালি ভাষায় রচিত উপরি-লিখিত গ্রন্থসমূহে এবং ভিক্ষুসূত্র গ্রন্থে গান্ধার জনপদ ও উহার অবস্থানের কথা যেরূপ লিপিবদ্ধ আছে তাহা বলা হইল। কোন কোন গ্রন্থের মতে গান্ধার জনপদ বৌদ্ধ ভারতবর্ষের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত।

সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য

এইবার আমরা সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে গান্ধার রাজ্যের কথা বলিতেছি। বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রাচীন যুগে বুদ্ধদেবের সময় বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থগুলি পালি ভাষায় রচিত এবং প্রচারিত হয়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তিনটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। এই ধর্ম্মসভার অনুমোদনক্রমে বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ তৎকাল প্রচলিত, পালি ভাষায় রচিত হয়।১৫

গান্ধাররাজ কনিষ্কের রাজত্ব-সময়ে জলন্ধরে এক ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হয়। এই সভা তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় পার্শ্ব এবং বসুমিত্রের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পার্শ্ব সভাপতি হন এবং বসুমিত্র ও অশ্বঘোষ সহসভাপতিত্ব করেন।১৬ পাঁচশত ভিক্ষু পালি ত্রিপিটকের টিকাগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া এই সভায় পাঠ করেন। এই সময় হইতে পালি ভাষার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম-

১১। Milindapanho S. B. E. series, Vol. XXXV.

১২। History of Pali Literature p. 353 B.C. Law.

১৩। Catalogue of Chinese Tripitak, No. 1358 Bunyen Nanjio.

১৪। Sylvain Levy. I. H. Q. 1936. Vol. XII, p. 121, 126, 133.

১৫। History of Medieval Indian Logic, p. 57-59 S. C. Vidyabhusan.

১৬। Encyco Religion and Ethics, Vol. VII p. 652.

গ্রন্থসমূহ প্রণালীবদ্ধ ভাবে রচনার সূত্রপাত হয়।১৭ কনিষ্ক-যুগের পূর্ব্বে কোন বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয় নাই তাহা নহে। কনিষ্ক যুগের ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা বৌদ্ধজগতের শিক্ষা ও মনোভাব প্রকাশের অনুকূল হইবে মনে করিয়া মহারাজ কনিষ্ক এই কার্য্য অনুমোদন করেন।

ইহার একমাত্র কারণ, সংস্কৃত ভাষা দেবভাষারূপে তৎকালীন জনসাধারণের মধ্যে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিল এবং এই যুগে গান্ধার ও উদয়নে সংস্কৃত ভাষাই শিক্ষার প্রধান বাহন হয়।১৮ আরও দেখা যায় যে, মহাযান ধর্ম্মগ্রন্থগুলিও সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং প্রচারিত হইয়া মধ্যএশিয়া, গান্ধার, উদয়ন, কাফাগড় এবং বাহ্লিক দেশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।১৯

১৭। History of Medieval Indian Logic, p. 63. S. C. Vidyabhusan.

১৮। Indian Pandits in the Land of Snow p. 18. S. C. Das.

১৯। *Ibid* p. 28.

অভিধর্ম্ম বিভাষশাস্ত্র

এই গ্রন্থে গান্ধার-রাজ্যের উল্লেখ আছে।২০ এই গ্রন্থখানি কনিষ্ক যুগে জলন্ধরে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় পঠিত হয়।২১ এই সময় হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিশেষ যত্নের সহিত অভিধর্ম্ম গ্রন্থ অধ্যয়ন ও আলোচনা আরম্ভ করেন। এই সময় হইতেই এই গ্রন্থের টীকারচনার সূত্রপাত হয়।২২

সূত্রসংগ্রহ

এই গ্রন্থে গান্ধার-রাজ্যের উল্লেখ আছে। ইহাতে লিখিত আছে, ভিক্ষু সংঘরক্ষক বৌদ্ধজগতের বহুদেশ ভ্রমণ ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে অবশেষে গান্ধার-রাজ্যে উপনীত হন এবং গান্ধার রাজগুরুর পদে অধিষ্ঠিত হন।২৩

উপরোক্ত গ্রন্থ ৩টি আলোচনা করিলে দেখা যায়, বৌদ্ধ যুগেও গান্ধারের প্রাচীনত্ব সুস্পষ্ট।

২০ Nanjio, Chinese catalogue p. 277, No. 1263.

২১। Chinese bundle of Tripitaka, Vol. 7, p. 16.

২২। Encyco Religion and Ethics. Vol. 7.

২৩। Chinese Bundle p. 94, Nanjio p. 302, No. 1252.

মহাতীর্থঙ্কর মহাবীর

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

ভারতবর্ষে বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতে দেখা যায় যে গৌতম বুদ্ধের সময় প্রায় ৬৩টি সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য করেছিলেন এবং জৈন ধর্ম্ম-গ্রন্থাদিতেও দেখা যায় যে, তখন তদপেক্ষাও অধিকসংখ্যক ধর্ম্ম-সংস্থা বিদ্যমান ছিল। কয়েকটি ধর্ম্মসম্প্রদায় বৌদ্ধ-সম্প্রদায় থেকেও প্রাচীন ও বিশাল ছিল।

জৈনসম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থঙ্কর মহাবীর, বেদ যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা খণ্ডন করে নিজের প্রচারিত ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গৌতম বুদ্ধের ন্যায় তিনিও ভিক্ষুকদের জীবনাদর্শ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম থেকেই গ্রহণ করেছিলেন এবং স্মৃতি ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রোক্ত চারি আশ্রম—যথা, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত করেছিলেন, অবশ্য কিছু অদলবদল করে।

আগে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির ধারণা ছিল যে, জৈন ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি শাখা মাত্র। লেশন, ওয়েবার ও উইলসন প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই মত প্রতিষ্ঠিত করতে খুবই যত্নবান হয়েছিলেন, কিন্তু ডাক্তার বুহ্‌লর ও ডাক্তার যোকাবী নামক দুই জন প্রখ্যাত জার্ম্মান পণ্ডিত, তাঁদের অপূর্ব্ব যুক্তিদ্বারা এই মত খণ্ডন করতে সক্ষম হন।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম প্রায় সমসময়ে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল এবং কয়েক শতাব্দী ধরে উভয় ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রসার লাভ করতে থাকে। কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু জৈন ধর্ম্মের প্রভাব এখনও লোপ পায়নি। তার প্রমাণ ভারতে এখনও জৈন ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা নগণ্য নয়।

মহাবীরকেই জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলা হয়, কিন্তু জৈনগণ তাদের ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করবার জন্যে আরও ২৩ জন তীর্থঙ্করের উল্লেখ করে থাকেন, যাঁরা নির্ব্বাণ লাভের সদুপদেশ প্রচার করে দেশবাসীর অসীম কল্যাণ সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সব জৈনদের মতে প্রথম তীর্থঙ্করের নাম ঋষভদেব, কিন্তু তাঁর আবির্ভাবকাল এখনও অজ্ঞাত।

দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ এক শত বৎসর বেঁচেছিলেন এবং মহাবীরের অভ্যুদয়ের আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি নাকি পরলোকে প্রয়াণ করেছিলেন।

মহাবীরের বিচিত্র জীবন-কথা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। জৈন-কল্পতরু গ্রন্থে তাঁর জীবনকাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তাতে বহুস্থানে অতিশয়োক্তি আছে এবং এমন সব অলৌকিক ঘটনা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে যে নির্ব্বিচারে সেগুলো বিশ্বাস করা কঠিন। এই গ্রন্থ রচনা করেছেন ভদ্রবাহু এবং তাতে অজস্র জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ঐতিহাসিক তথ্যেও এই গ্রন্থ অতি সমৃদ্ধ। এ ছাড়া অন্য অনেক জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ থেকে মহাবীরের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করা যেতে পারে।

অনেক বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থেও মহাবীরের জীবন-কথার আংশিক উল্লেখ রয়েছে, সেগুলিও খুব মূল্যবান।

প্রাচীন বিদেহ রাজ্যের রাজধানী ছিল বৈশালী নগরী। খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বৈশালী অতিবিখ্যাত মহাসমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। এই বৈশালী নগরীতে তখন এক প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যের কর্ণধার ছিল লিচ্ছবী বংশীয়েরা। এই রাজ্যের প্রধানকে রাজা নামেই অভিহিত করা হ'ত।

বৈশালীর নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে কুণ্ডগ্রাম নামে ছিল একটি গ্রাম, যার বর্ত্তমান নাম বসুকুণ্ড। মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত বসাঢ় ও বখীরা নামক গ্রামদ্বয় এখনও বৈশালীর স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে।

এই বসুকুণ্ড গ্রামে সিদ্ধার্থ নামে এক অভিজাতবংশীয় পরম ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় বাস করতেন। তিনি জ্ঞাত্রিক বংশীয় ক্ষত্রিয়দের প্রধান ছিলেন। তাঁর সহধর্ম্মিণীর নাম ছিল রাণী ত্রিশলা। রাণী ত্রিশলা বৈশালীর রাজা চেটকের সহোদরা ভগ্নী ছিলেন। চেটকের কন্যার বিবাহ মগধের সম্রাট বিম্বিসারের সহিত সম্পন্ন হয়েছিল। এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সিদ্ধার্থ বহু মানাস্পদ ব্যক্তি ছিলেন।

সিদ্ধার্থের এক কন্যা ও দুই পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের নাম বর্দ্ধমান। এই বর্দ্ধমানই যথাকালে কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সাধারণ্যে মহাবীর নামে পরিচিত এবং অশেষ খ্যাতির অধিকারী হন।

জৈন-কল্প-সূত্রে উল্লিখিত আছে, মহাবীর স্বর্গস্থিত পুষ্পোত্তর নামক স্থান থেকে মর্ত্তধামে জন্মগ্রহণ করতে মনস্থ করে ঋষভদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী দেবানন্দার গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী উক্ত বসুকুণ্ড গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু দেবতারা দেখলেন যে, ইতিপূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণবংশে কোন মহাপুরুষ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ জন্মগ্রহণ করেন নি। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে দেবানন্দার গর্ভ থেকে অপসারিত করে রাণী ত্রিশলার গর্ভে রেখে দেন। ত্রিশলার কনিষ্ঠ পুত্র বর্দ্ধমান কালক্রমে মহাবীর নামে সুপরিচিত হন।

জৈনদের মধ্যে আবার শ্রেণী-বিভাগ রয়েছে। তার মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ই প্রধান—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। মহাবীরের উপরোক্ত জন্ম-বৃত্তান্ত শ্বেতাম্বর জৈনগণ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন, কিন্তু দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈনগণ তা পুরোপুরি অলীক কল্পনা বলে মনে করেন।

বলা বাহুল্য, দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব বিষয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে, এটি তার মধ্যে প্রধানতম।

আবার পূর্ব্বের কথায় ফিরে আসা যাক্—রাজা সিদ্ধার্থ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বর্দ্ধমানের জাতকর্ম্মোপলক্ষ্যে বিশেষ উৎসবের আয়োজন করেন। শৈশবেই রাজা তাঁর বিদ্যা-শিক্ষার যথোচিত আয়োজন করেন। অসাধারণ মেধা ও ধীশক্তি বলে কৈশোরেই তিনি নানা শাস্ত্রে ও কলাবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন।

বিদ্যাশিক্ষা সমাপন করবার পর বর্দ্ধমানকে যশোদা নাম্নী এক রাজকুমারীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করা হয়। ক্রমে তাঁদের এক কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেই মেয়েটি বয়ঃ-প্রাপ্ত হলে রাজা তাকে জামালি নামক এক বিদ্বান ও সুন্দর পাত্রের হাতে সমর্পণ করলেন।

মহাবীর যখন সাধন-পথে অগ্রসর হয়ে 'জিন্' বা 'অর্হৎ' অভিধা লাভ করেন, তখন জামালী তাঁর শ্বশুরের প্রধানতম শিষ্য বলে পরিগণিত হন। কিন্তু জামাতার এই শিষ্যত্বগ্রহণ মহাবীরের অনেক জৈন ভক্তের মনঃপূত হয় নি এবং তা নিয়ে বিশেষ মতান্তর ও মনান্তরের সূচনা হয়।

ত্রিশ বৎসর বয়সে পিতৃ-মাতৃবিয়োগের পরে বর্দ্ধমান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দীবর্দ্ধনের অনুমতি গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন এবং ভিক্ষুর জীবন যাপন করতে থাকেন।

তিনি এমন কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন যে প্রায় এক বৎসর তিনি গাত্রবাস পরিবর্ত্তন করেন নি। তাঁর দেহাবরণের ভাঁজে ভাঁজে বহু পোকা-মাকড় আশ্রয় নিয়ে স্থায়ী ভাবে বাসা বেঁধেছিল। এর কিছুকাল পরে তিনি পরনের যাবতীয় জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে সাধনায় ব্রতী হলেন। ক্রমে ক্রমে আহারেও তাঁর আগ্রহ লোপ পেল। এইরূপ কৃচ্ছ্র-সাধন করে তিনি সমুদয় ইন্দ্রিয়গ্রামকে সম্পূর্ণ বশে আনয়ন করেন। এমনি ভাবে জিতেন্দ্রিয় হবার পর তিনি নিবিড় বনে বিচরণ করতে থাকেন। এই সময় তিনি উন্মুক্ত আকাশ-তলে শয়ন করতেন। দিগম্বর অবস্থায় এই প্রব্রজ্যাকালে তাঁকে বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তাতে কিন্তু এই সর্ব্বত্যাগী জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ব্রতচ্যুত হন নি।

তিনি কাউকেও ঘৃণা বা দ্বেষ করতেন না, ভোগ, তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা বর্জ্জনপূর্ব্বক সাধনপথে অগ্রসর হয়ে অবশেষে তিনি এমন এক উচ্চস্তরে উন্নীত হন যে পার্থিব বস্তুতে তাঁর আর কোন প্রয়োজন রইল না।

কথিত আছে যে, রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী নালন্দায় তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করেন। সেখানে গোশাল মংসলিপুত্র নামক এক ভিক্ষু তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই বন্ধুত্ব প্রায় সাত বৎসর স্থায়ী হয়েছিল এবং এই সময় উভয়ে কঠোর সাধনায় ব্রতী ছিলেন।

হঠাৎ কি কারণে গোশাল মংসলি-পুত্রের সহিত মহাবীরের মতান্তর ঘটে এবং পরে তা মনান্তরে পরিণত হয়। পরিণামে এই দুই সাধক-বন্ধুর মধ্যে চিরবিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়। ফলে গোশালি মংসলিপুত্র নিজেই একটি সম্প্রদায় গঠন করেন এবং প্রচার করেন যে, তিনিই 'অর্হৎ' বা 'তীর্থঙ্কর'। মহাবীরের 'অর্হৎ' বা 'তীর্থঙ্কর' হওয়ায় দুই বৎসর পূর্ব্বেই গোশাল মংসলিপুত্র নিজকে তীর্থঙ্কর বলে ঘোষণা করেন এবং নূতন সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। এই সম্প্রদায়ের নাম 'আজীবিক' সম্প্রদায়।

গোশালের মতবাদের উল্লেখ জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কিন্তু গোশাল মংসলিপুত্র অথবা তাঁর শিষ্যগণ এই নূতন মতবাদ ও 'আজীবিক' সম্প্রদায়ের তথ্য-সম্বলিত কোন গ্রন্থ রচনা করে নি।

জৈন গ্রন্থাদিতে দেখা যায়, গোশাল মংসলিপুত্রকে দাম্ভিক, ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, শঠ, ভণ্ড ইত্যাদি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, জৈনদের ও আজীবিকদের মধ্যে গভীর বিদ্বেষ-ভাব ও কলহ বিদ্যমান ছিল। বলা বাহুলা, এই দুই সম্প্রদায়ের কলহ ও বিসম্বাদ মহাবীরের প্রথম ধর্ম্মপ্রচার-প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট ব্যাহত করিতেছিল এবং এই বিপত্তি কাটিয়ে উঠতে তাঁকে অত্যন্ত বেগ পেতে হয়েছিল।

গোশালের প্রচার-কেন্দ্র ছিল শ্রাবস্তী নগরীর এক কুম্ভ-কারের দোকানগৃহে। এই দোকানটির মালিক ছিল হালহলা নামে এক কুম্ভকার-পত্নী। ক্রমে গোশাল শ্রাবস্তীতে নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

মহাবীর দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন এবং কৈবল্য অবস্থা প্রাপ্ত হন। এমনিভাবে সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী হন। এই সময় থেকেই তিনি 'জিন্' বা 'অর্হৎ' নামে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সময় মহাবীরের বয়ঃক্রম ৪২ বৎসর।

সিদ্ধিলাভ করার পর তিনি প্রথম 'নির্গ্রন্থ' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। নির্গ্রন্থ কথার মানে হ'ল বন্ধন-রহিত। নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের স্থলে এখন জৈন সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। জিনের শিষ্য জৈন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মহাবীর নিজে 'নির্গ্রন্থ' ভিক্ষু এবং 'জ্ঞাতৃ'বংশ সম্ভূত ছিলেন তাঁর বিরোধী বৌদ্ধগণ তাঁকে নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র বলে উপহাস করতেন।

মহাবীর ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল স্বীয় ধর্ম্ম-মত, ভারত-বর্ষের প্রতি প্রদেশে ও জনপদে গিয়ে প্রচার করেন ও বহু ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মগধ ও অঙ্গ দেশে, অর্থাৎ বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে তিনি স্বীয় মতবাদ প্রচারে বিপুল সাফল্য লাভ করেন। তিনি সবচেয়ে বেশী সম্বর্দ্ধিত হয়েছিলেন ও সম্মান লাভ করেছিলেন চম্পা, মিথিলা, শ্রাবস্তী বৈলাকী ও রাজ-স্থানে। এই সব স্থানে প্রায় সমুদয় গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করে।

কথিত আছে যে, সম্রাট বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুও তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং যথাযোগ্য ভাবে তাঁর সম্বর্দ্ধনা করেছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে দেখা যায় যে, উক্ত নৃপতিদ্বয় বৌদ্ধ ছিলেন। সম্ভবতঃ এই উভয় সম্রাটই জৈন ও বৌদ্ধ এই উভয় ধর্ম্মকে সমান শ্রদ্ধা করতেন।

মাত্র ৭২ বৎসর বয়সে মহাবীর দেহত্যাগ করে পরমাত্মায় বিলীন হন। তাঁর জীবনাবসান হয়েছিল পাটনা জেলার অন্তর্গত পাওয়া নামক জনপদে, রাজা হস্তিপালের জনৈক কর্ম্মচারীর গৃহে। পাওয়া গ্রাম এখনও জৈনদের মহাতীর্থরূপে পরিগণিত।

জৈন গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে যে ঈশার জন্মের ৫২৭ বৎসর পূর্ব্বে মহাবীর নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হন। মহাবীরের তিরোভাবের তিথি ও তারিখ নিয়ে অনেক মতভেদ দেখা যায়; এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত।

বৌদ্ধদের ন্যায় জৈনদের মধ্যেও এক ভিক্ষুসম্প্রদায় আছে—বৌদ্ধদের ন্যায় জৈনরাও জীবহিংসা করে না। অহিংসার দিক দিয়ে তারা বৌদ্ধদের চেয়েও এক ধাপ উঁচুতে। জৈনরা শুধু যে মানুষ পশু ও বৃক্ষে এক বিরাট প্রাণ-সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে তা নয়, তারা বলে যে অগ্নি, জল, বায়ু এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুতেও প্রাণস্পন্দন বিদ্যমান এবং এ সবের পক্ষে হানিকর কার্য্য করা মহাপাতক।

বৌদ্ধদের ন্যায় জৈনগণও বেদকে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকার করে না। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেও তাদের আস্থা নাই। তারা শুধু বেদোক্ত কর্ম্মবাদ ও নির্ব্বাণের সিদ্ধান্তগুলিকে মান্য করেন এবং জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন।

জৈনগণ চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের অস্তিত্ব স্বীকার করে। জৈনদের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ 'আগম' সাত ভাগে বিভক্ত। এই সাত খণ্ডের মধ্যে 'সঙ্গ' খণ্ড সর্ব্বপ্রধান ও বিরাট গ্রন্থ। আবার এই 'সঙ্গ' খণ্ড একাদশ ভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে 'আচারঙ্গ সূত্র' ও 'উপাসক দশা সূত্র' হ'ল সর্ব্বপ্রধান।

আচারঙ্গ সূত্রে জৈন ভিক্ষুদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে এবং উপাসক দশাসূত্রে উপাসক মণ্ডলীর কার্য্যক্রম নির্দ্দেশ করা হয়েছে।

জৈন ধর্ম্মগ্রন্থে পাওয়া যায় যে মহাবীরের মহাপ্রয়াণের দুই

শত বৎসর পরে মগধে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। সে সময় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য মগধের সম্রাট ছিলেন।

জৈন-কল্প সূত্রের রচয়িতা ভদ্রবাহু তখন মগধস্থ কোন এক বিরাট সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ছিলেন। তিনি এই সময় তাঁর স্বদলভুক্ত বহু জৈনকে সঙ্গে নিয়ে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটকে চলে যান। তখন মগধে আরও একটি বিরাট জৈনসম্প্রদায় ছিল। এই দলের নেতা ছিলেন স্থূলভদ্র।

মগধের মহামারীর কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। কিছু দিন পরে এই মহামারী ও দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হ'ল এবং যে সব জৈন কর্ণাটকে চলে গিয়েছিল, তারাও মগধে ফিরে এল। তখন দেখা গেল যে, যারা কর্ণাটকে গিয়েছিল তাদের চাল-চলনে ও বেশ-ভূষায় এক বিষম পরিবর্ত্তন ঘটেছে, ফলে তারা আর মগধের জৈনদের সঙ্গে কিছুতেই মিশতে পারলে না। মগধের জৈনগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করত, কিন্তু দেখা গেল কর্ণাটক ফেরত জৈনগণ নগ্ন অবস্থায় থাকায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমনি ভাবে দুটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হ'ল—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর।

আর এক ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবধান দুরতিক্রম্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কর্ণাটকগামী জৈনদের অনুপস্থিতিতে মগধের জৈনগণ এমন কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করে যার সার-তত্ত্ব ও ব্যাখ্যানাদি কর্ণাটকফেরত জৈনগণ কিছুতেই সমর্থন করলে না। তাদের সিদ্ধান্তসমূহ কর্ণাটক-ফেরত জৈনদের অনুমোদন লাভ করলে না। এই মতবিরোধ ক্রমেই বেড়ে চলল। পরে ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের বল্লভী সম্প্রদায়ের লোকেরা বর্ত্তমান জৈন ধর্ম্ম-সিদ্ধান্তসমূহ প্রণয়ন করে এবং সেগুলি সর্ব্বসম্মতক্রমে গৃহীত হওয়ায় এই বিরোধের সুমীমাংসা হয়। মথুরার শিলালেখসমূহে এই স্বীকৃতি দৃষ্ট হয়। এই সব শিলালেখ সম্রাট কনিষ্কের সময় নির্ম্মিত হয়েছিল।

এর পর জৈন ধর্ম্মের স্রোত মৃদু গতিতে বয়ে চলেছিল। উল্লিখিত শিলালিপিগুলিতে অনেক জৈন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর নাম উৎকীর্ণ রয়েছে যাঁদের অবদানে এই ধর্ম্মের শাস্ত্র-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে আছে।

অনেকের ধারণা জৈনগণ রক্ষণশীল বলেই তাদের ধর্ম্ম আজও ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় তার বিলুপ্তি ঘটে নি।*

* এই প্রবন্ধ লিখতে *Cambridge History of India* ও *Ancient India* থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।—লেখক

নেতাজীর অনুসরণে

বাংলার বিখ্যাত ঘৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার "শ্রী" মার্কা ঘৃতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিষ্প্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 'শ্রী' ঘৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ঘৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ ঘৃত যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা ঘৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

জানপদ সেনা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, এম-এ

বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অবশেষে লব্ধ হইয়াছে ; এখন প্রশ্ন হইতেছে, উহা কি করিয়া রক্ষা করিতে পারা যায়। আমাদের নবজাত গণতন্ত্রের শত্রু অনেক, ভিতরে ও বাহিরে। প্রত্যেক গণতন্ত্রের রক্ষকই হইল তাহার তরুণের দল। এরিষ্টটলীয় গণতন্ত্রে তরুণেরাই রাজ্যের সীমানা পাহারা দিত। গণতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জানপদসেনা সংগঠনেরও প্রয়োজন। কারণ গণতন্ত্র, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও জানপদ সেনা ট্রেনিং এই তিনটিই একসঙ্গে চলে। এই দুইটি আনুষঙ্গিকের অভাবে গণতন্ত্র কার্যাতঃ অচল হইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কিশোর ও যুবকদের সামরিক শিক্ষালাভের একান্ত প্রয়োজন। উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে কেন্দ্র করিয়া এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যেখানে ছাত্রের সংখ্যা কম, সেখানে দুই বা ততোধিক স্কুলকেও এক-একটি কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। মফস্বলে একাধিক গ্রামকে একই হাই স্কুলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা চলে। এ প্রসঙ্গে অনেকে হয়তো বলিবেন, বিভিন্ন স্থানের কংগ্রেস কমিটিগুলিও তো সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিবার ভার লইতে পারেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় সামরিক শিক্ষার পরিচালনা রাজনৈতিক দলগত না হওয়াই উচিত। পল্লী-ইউনিয়নগুলিকেও আমরা যে এক একটি কেন্দ্র ধরিব তাহারও সুবিধা নাই। কারণ প্রত্যেক ইউনিয়নে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় নাও থাকিতে পারে। অন্ততঃপক্ষে এক ব্রিগেড স্বেচ্ছাসৈনিক লইয়া একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইতে পারে। ইহাতে মনে হয় পাঁচটি হইতে আটটি পর্য্যন্ত ইউনিয়ন লইয়া একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। এখানে বলা ভাল যে, স্বেচ্ছাসৈনিক হইবার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক বয়স হইতেছে চৌদ্দ বৎসর। আর ট্রেনিঙের সময় হইল চারি বৎসর, অর্থাৎ চৌদ্দ হইতে আঠার বৎসর পর্য্যন্ত। এইরূপ ৪১ জন ছেলে লইয়া এক দল বা কোম্পানী স্বেচ্ছাসৈনিক গঠিত হইতে পারে, তিন কোম্পানীতে হয় এক ব্যাটালিয়ন, আর তিন ব্যাটালিয়নে (৩৬৯ জনে) এক ব্রিগেড এবং তিন ব্রিগেডে এক ডিষ্ট্রিক্ট। তিন ডিষ্ট্রিক্টে এক এরিয়া, তিন এরিয়াতে এক কম্যাণ্ড, আর তিন কম্যাণ্ডে এক আর্ম্মি। এই ভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি এক আর্ম্মি কম্যাণ্ডের অধীন হইবে।

শহরের মধ্যে প্রতি স্কুলে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ট্রেনিঙের প্রথম দুই বৎসরের কাজ চালান যাইতে পারে ; আর শেষের দুই বৎসর বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে মনোনীত ছাত্র লইয়া একটি সাধারণ কেন্দ্রে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। ১৫ ও ১৬ বৎসর বয়সে নকল বন্দুকদ্বারা শিক্ষা দেওয়া চলিবে, তবে এ সময়ে আসল বন্দুকের অংশগুলির সঙ্গেও পরিচয় করান চলে। এই সময়টাই শিক্ষার পক্ষে প্রশস্ত ; ১৭ ও ১৮ বৎসর বয়সে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত বন্দুক চালানো শিক্ষা দেওয়া যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রকোপ সহ্য করাইবার উদ্দেশ্যে জুন-জুলাইকে মাঝে ধরিয়া প্রায় তিন মাস কাল শিক্ষা-শিবিরের জন্য রাখা যাইতে পারে। তবে পরীক্ষা-শিবির শীতকালে চলিবার ব্যবস্থা করা উচিত। ১৪ হইতে ১৮ এই চারি বৎসরের প্রতি বৎসরে তিন মাস করিয়া ক্যাম্পিং ধরিলে মোটের উপর এক বৎসর কাল ট্রেনিঙের জন্য ব্যয়িত হয়। এই ট্রেনিঙের বিশেষ উদ্দেশ্যের মধ্যে রহিবে কষ্টসহিষ্ণুতা, পথ-ঘাট চেনা, সোজা-পথ বাহির করা, নূতন পথ বা বাঁধ তৈয়ারী করা, জঙ্গল-কাটা, গড়খাই খনন ও লক্ষ্যভেদ শিক্ষা ইত্যাদি। রুট-মার্চ্চ, প্যারেড, মোটর-বাইক অভিযান প্রভৃতিও শিবিরের কার্য্য-তালিকার মধ্যে থাকিবে ; খাল-বিল বা নদীতে সাঁতার ও নৌ-চালনার অভ্যাসও করান হইবে। দিক্-নির্ণয় শিখাইবার জন্য সূর্য্য তারা, ও দুপুরে ঘড়ির কাঁটার ছায়াপাত প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ সমীচীন। ক্যাম্পিঙের সময় ভাত খাওয়ার পরিমাণ কমাইতে হইবে ; রুটি, ডিম, মাছ, চা, পাঁউরুটি প্রভৃতিই বেশী চলিবে। জল-খাবার পরিমাণমত হইবে। ক্যাম্পিঙের খরচ অবশ্য রাষ্ট্রই বহন করিবে, তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণেরও দায়িত্ব বড় কম নহে ; কারণ দেশরক্ষার সমস্যাই আপাততঃ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রের দুর্ব্বলতম অংশ কোন কোন দেশীয় রাজ্য ও অরক্ষিত সীমান্ত—গ্রামাঞ্চলের উপর দৃষ্টি দিলেই এ বিষয় যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

দেশব্যাপী জানপদ সেনা গঠন রাষ্ট্রদেহে অভূতপূর্ব্ব বলসঞ্চার করিবে এবং রাষ্ট্র তাহার অদম্য অফুরন্ত শক্তি-উৎসের কতকটা সন্ধান এই পথেই পাইয়া বিষম বিপৎপাতকেও কাটাইয়া উঠিবে ; কোন রাষ্ট্রই হাজার বলশালী হইলেও শুধু বৈতনিক সৈন্যবাহিনীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে না।

পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা ও ভারতবর্ষ

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস, এম-এস্‌সি

বিগত মহাসমরের পর সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া এক দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন যাবতীয় খাদ্যশস্য যদি সাম্যের ভিত্তিতে সর্ব্বজাতির নরনারীর মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হইত তাহা হইলে হয়ত এই মারাত্মক অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইতে পারিত। অবশ্য আধুনিক খাদ্য-বিজ্ঞান অনুসারে যদি খাদ্যের পরিমাণ হিসাব করা যায় ত তাহাতেও প্রয়োজনীয় পুষ্টি সম্পাদন করা সম্ভব হইত না। উত্তর-আমেরিকা, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ প্রয়োজনাতিরিক্ত হওয়ায় উক্ত দেশসমূহের উদ্‌বৃত্ত খাদ্য অনেক সময় দুর্ভিক্ষ-কবলিত অঞ্চলসমূহে রপ্তানি করা সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্য-আমেরিকা এবং দক্ষিণ-আমেরিকার কিয়দংশের লোকেরা আধপেটা খাইয়া আছে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় সার, কৃষিকার্য্যোপযোগী যন্ত্রপাতি প্রভৃতির অভাবে নিজস্ব খাদ্যসমস্যা মিটাইতে সক্ষম হয় নাই। বহির্জগৎ হইতে খাদ্যশস্য ক্রয় করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা না থাকায় ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ পৃথিবীর উদ্‌বৃত্ত খাদ্যশস্য আশানুরূপ সংগ্রহ করিতে অক্ষম। হিসাবে পাওয়া যায় যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন বাদে সমগ্র ইউরোপের লোকসংখ্যা এশিয়া মহাদেশের লোকসংখ্যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। অথচ ইউরোপবাসীরা এশিয়াবাসীদের তুলনায় অধিক পরিমাণ চাউল, গম এবং ছয় গুণ অধিক মাংস খাইতে পায়।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান খাদ্যপরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়। আজ সমগ্র দেশের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য। বিদেশ হইতে খাদ্যবস্তু আমদানী করিয়া মাঝে মাঝে খাদ্যাভাবের কিঞ্চিৎ উপশম করা হয় মাত্র—কিন্তু অনাহারের বিভীষিকা এদেশের কোটি কোটি নরনারীর মন হইতে আদৌ দূরীভূত হয় না। বিগত ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষে প্রায় ত্রিশ লক্ষ নরনারীর প্রাণবিয়োগ হয়।

১৯৪৬ সালে আবার বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা গেল। তখন দক্ষিণ-ভারতেও নিদারুণ খাদ্যসঙ্কট ও অন্নাভাব পরিদৃষ্ট হইল। কেন্দ্রীয় সরকারের একাগ্র চেষ্টার ফলে বিদেশ হইতে চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য আমদানী করা সম্ভব হওয়াতে অতি কষ্টে দেশবাসীর প্রাণ রক্ষা হইল। বাংলাদেশের অদৃষ্ট নিতান্তই শোচনীয় এবং এখানে প্রায় প্রতি বৎসরই চাউলের অভাব দৃষ্ট হয়। সুজলা সুফলা বাংলাদেশের এই দুর্ভাগ্য যে কোন্ দিন কাটিবে তাহা বলা যায় না। তদুপরি বাংলা বিভাগ যে খাদ্য বিষয়ে আরও নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আজ লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী পশ্চিম বঙ্গের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা যথাসর্ব্বস্ব ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে, ভিক্ষার অন্ন কিংবা কষ্টার্জ্জিত স্বল্পাহার তাহাদিগকে নির্জ্জীব করিয়া ফেলিতেছে। সরকারও নিত্য নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের উর্ব্বরা ভূমি ফসলশুদ্ধ ফেলিয়া সেখানকার অধিবাসীদের দেশত্যাগ করিতে হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নিতান্তই সীমাবদ্ধ। বাহির হইতে আমদানী ছাড়া স্বাভাবিক পুষ্টিমানের ভিত্তিতে খাদ্য-রেশন সরবরাহ করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব। আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিলে এই সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। অবশ্য পশ্চিম বাংলার পতিত জমি-সংস্কার ও অনুরূপ পরিকল্পনাসমূহ কার্য্যকরী করিতে পারিলে সমস্যার কিয়ৎ পরিমাণ মীমাংসা হইবে সন্দেহ নাই। উন্নত ধরণের জলসেচন পদ্ধতি অবলম্বন ও সারপ্রয়োগদ্বারা কৃষির উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ এবং অনশন ও অর্দ্ধাশনপীড়িত গ্রামবাসী আশানুরূপ পরিশ্রমও ত করিতে পারিবে না। সুতরাং কৃষিজাত খাদ্যশস্যের উন্নতিসাধন সত্বর সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বাকী রহিল বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিয়া সমস্যার সমাধান করা। সমগ্র ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানী চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের বার্ষিক মূল্য প্রায় ১২৫ কোটি টাকা। এই বিপুল অর্থ বিদেশে না গিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইলে দেশের কত কল্যাণ হইত? কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে বাংলা ও পঞ্জাবের জন্য খাদ্যবস্তু ক্রয়ের ব্যয়ভার ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইবে বলিয়া মনে হয়। আবার আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির ফলে যদি কোন দিন যুদ্ধ বাধিয়া উঠে ত ভারতবর্ষ বিদেশের খাদ্যসরবরাহ হইতে হঠাৎ বঞ্চিত হইতে পারে। তখনকার অবস্থাও চিন্তা করা দরকার।

খাদ্য-সমস্যার আশু সমাধানের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সমগ্র পৃথিবী আজ এইজন্য রেশনিং পরিকল্পনা লইয়া ব্যস্ত। রেশনিঙের উদ্দেশ্য সঞ্চিত খাদ্যের সুষ্ঠু বণ্টন এবং তাহাও হওয়া উচিত খাদ্য-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে। যেখানে গমের পরিমাণ যথেষ্ট নয় সেখানে গমের তুল্য অন্যান্য শস্যাদি স্বল্প পরিমাণে মিশানো যায়। বোম্বাইয়ে বাদাম হইতে তেল নিষ্কাশন করিয়া পরে ঐ বীজ চূর্ণ করিয়া ময়দা বা আটার সহিত মিশাইয়া

রান্না করে আনন্দ পাবেন!
রসুই
বনস্পতির সেরা!
RASOI
VANASPATI
হিন্দুস্থান ডিভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্ : চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা।
ম্যানেজিং এজেন্ট : এন. আর. সরকার অ্যাণ্ড কোং লিঃ
২ পাউণ্ড, ৫ পাউণ্ড, ১০ পাউণ্ড
এবং ৩৭ পাউণ্ড টিনে পাওয়া যায়
HDX 31

সুফল পাওয়া গিয়াছে। এমন কি আমেরিকাতেও এইরূপ ময়দার সহিত বাদামের বীজ-চূর্ণ মিশ্রণ কার্য্য অনুমোদিত হইয়াছে। চাউল ও গমের পরিমাণ যখন বিদেশ হইতে আমদানী না করিয়া বাড়ানো সম্ভব নহে তখন খাদ্য-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পুষ্টিমানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি চাউল ও গমের সহিত বেশী পরিমাণ গোল আলু, লাল আলু, যব প্রভৃতি ব্যবহার করা যায় ত সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। দেশের আসল সমস্যা চাউল ও গমের ঘাটতি। সুতরাং দেশবাসীর উচিত অন্যান্য খাদ্য হইতে এই ঘাটতি পূরণ করা। প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও শ্বেতসারের কিয়ৎ পরিমাণ যদি চাউল ও গম ছাড়া অন্যান্য খাদ্য হইতে সংগ্রহ করা যায় এবং তাহাতে যদি লোক খাইয়া বাঁচে ত অবিলম্বে সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য। প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ভিটামিন প্রভৃতির অভাব পূরণ করিতে কচি শাকসব্জির মূল্য খুব বেশী। আধুনিক খাদ্য-বিজ্ঞানে ইহাকে এক নূতন আবিষ্কার বলা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে কচি-শাকপাতায় তাজা প্রোটিন, ভিটামিন, ফলিক এসিড প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

চাউল সম্বন্ধে একটি মূল্যবান তথ্যের কথা আলোচনা করা যাক্। ভারতবর্ষের বহু স্থানে আতপ চাউলের আদর বেশী। সেখানকার অধিবাসীদের নিকট সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ চাউল অধিকতর মুখরোচক। আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে সমপরিমাণ আতপ ও সিদ্ধ চাউলের মধ্যে শেষোক্তটির পুষ্টিমূল্য অনেক বেশী এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান হইতে আতপ অপেক্ষা সিদ্ধ চাউলের উৎপাদনও হয় বেশী। সুতরাং বেশী পরিমাণে সিদ্ধ চাউল আহারের রেওয়াজ হইলে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ স্বভাবতঃই বেশী হইত। অবশ্য কিয়ৎ পরিমাণ আতপ চাউল ধর্ম্মকার্য্যের জন্য (দেবতার পূজা প্রভৃতি) পৃথক করিয়া রাখিতেই হইবে। এইরূপে ব্যাপকভাবে সিদ্ধ চাউলের ব্যবহার আইন করিয়াই হউক, আর প্রচার-কার্য্যের দ্বারাই হউক প্রচলন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। হিসাবে দেখা যায় যে, আতপের বদলে কেবলমাত্র সিদ্ধ-চাউল আহারের অভ্যাস হইলে শুধু ইহা দ্বারাই ভারতবর্ষের উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ প্রতি বৎসর ৪০,০০০ টন বাড়িয়া যাইবে।

পুষ্টিকর খাদ্যসমূহের মধ্যে দুধ, মাংস, ডিম ও মাছ উল্লেখযোগ্য। জীব-দেহের পক্ষে এই সকল খাদ্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় এবং উহাদিগকে শরীর রক্ষাকারী খাদ্য (protective food) বলে। সাধারণের পক্ষে এই সকল খাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন। এই সকল খাদ্য রেশনিংএর আওতায় আসে নাই। কিন্তু দুধ যেমন প্রত্যেক শিশুর পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় সেরূপ মনুষ্যদেহের পুষ্টির জন্য মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতির স্বল্পবিস্তর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং ঐ সমস্ত খাদ্যদ্রব্যেরও সুষ্ঠু বণ্টন হওয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজন। দেশের ধনীগণ হয়ত ঐসব পুষ্টিকর খাদ্য বেশী খাইয়া নিজেদের ভাগের চাল, গম প্রভৃতির কিয়দংশ দরিদ্রদের ছাড়িয়া দিতে পারে। যাহারা মানসিক পরিশ্রম বেশী করে তাহারা প্রোটিনের (মাছ, মাংস) পরিমাণ বেশী খাইয়া যাহারা শারীরিক পরিশ্রম বেশী করে তাহাদিগকে নিজেদের ভাগের শ্বেতসার (চাউল, আটা) ছাড়িয়া দিতে পারে। ইহাতে সমস্যার আংশিক সমাধান হয়।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৪৭ সালে জনসংখ্যা ৪৫ কোটি ছিল। বাৎসরিক হিসাব ধরিলে অনুমান করা যায় যে ১০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বাড়িয়া ৫০ কোটিতে দাঁড়াইবে। সুতরাং এই অতিরিক্ত দশ কোটি লোকের খাদ্য-সরবরাহ এক নূতন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। দেখা যাইতেছে যে উৎপাদন ও সরবরাহ অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। কাজেই এখন খাদ্য শস্যাদির উৎপাদনবৃদ্ধিতে মনোযোগী হওয়া দেশবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য।

যাবতীয় স্ত্রীব্যাধির **প্রকৃতি** অব্যর্থ মহৌষধ

ঔষধটি বিশুদ্ধ অশোক, এলেট্রিস, অশ্বগন্ধা, ত্রিকুটী, এব্রোমাঅগোস্টা, ভ্যালেরিয়ান, ব্রোমাইড প্রভৃতি স্ত্রীরোগের বিশেষ বিশেষ ঔষধদ্বারা বৈজ্ঞানিকমতে সযত্নে প্রস্তুত। সর্বত্রই স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা ব্যবস্থাকৃত ও অতি সত্বর ফলপ্রদ। বড় বড় ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য অথবা সত্বর পাইবার জন্য সরাসরি প্রধান পরিবেশকের নিকট হিসাবের জন্য পত্র লিখুন। মূল্য ৪।০, ডাকমাশুল ও প্যাকিং ১।০ স্বতন্ত্র।

কুণ্ডু কেমিক্যাল ওয়ার্কস
কলিকাতা

প্রধান পরিবেশক
মেডিকা সাপ্লাইং কর্পোরেশন
১৪৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
পি. বি. ১৩৬ কলিকাতা

সমাজ-সংস্কারে বিধবা-বিবাহ

শ্রীরণজিৎ সান্যাল

হিন্দুসমাজের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টায় এদেশে যখনই কোনও সামাজিক আন্দোলন বা আইন প্রবর্তন বা সংস্কারের চেষ্টা হয়েছে, তখনই দেশের রক্ষণশীল সম্প্রদায় সে অগ্রগতির প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'এদের অহৈতুক শত্রুতা বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সকল চেষ্টাকে কেবলি ধূলিসাৎ করেছে'। সমাজ-সংস্কারে অগ্রণী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন এর জলন্ত সাক্ষ্য দেয়।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ বেআইনী হ'ল বটে, কিন্তু তখনও সমাজের স্থিতিশীলতায় কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। সে সময় সমস্ত দেশের বা সমাজের স্বার্থকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে চিন্তা করবার চেষ্টাও হয় নি। এই আদর্শ দেখালেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। এক নিকৃষ্ট সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রচেষ্টা সেকালের সামাজিক জীবনের মধ্যে যে প্রাণসঞ্চার করেছিল আজকের দিনে তা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। হিন্দুসমাজ তখন নির্বীর্যতার চরম সীমায় পৌঁছেছিল বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্মৃতি ও পরাশর সংহিতার ব্যাখ্যার সাহায্যেই গণচিত্তের স্রোত ঘুরিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। উত্তরকালে তাঁর প্রচেষ্টা ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইল বিধবা বিবাহ আইন (Hindu Widows' Re-marriage Act, 1856) বিধিবদ্ধ হয়ে। সে সময় এই অগ্রগতিমূলক আন্দোলনের বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনসাধারণ কি পরিমাণ বিপক্ষতা করেছিল তা এই আইনের প্রণেতা অন্যতম সার জে. পি. গ্রান্টের বিবৃতি থেকে জানা যায়। তিনি বলেন, এই আইনের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করে পঞ্চাশ হাজারের উপর দস্তখতযুক্ত প্রায় চল্লিশটি স্মারকলিপি কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হয়েছিল।

এই আইনে যে কয়েকটি ধারা আছে তার মধ্যে প্রধান হ'ল বিধবার বিবাহ এবং বিধবা-বিবাহের ফলে জাত সন্তান-সন্ততিদের বৈধতার (legality) আইনের সমর্থন দেওয়া। ধারাটির কিয়দংশ উল্লেখ করা যেতে পারে—

"No marriage contracted between Hindus shall be invalid and the issue of no such marriage shall be illegitimate by reason of the woman having been previously married or betrothed to another person who was dead at the time of such marriage, any custom and any interpretation of Hindu Law to the contrary notwithstanding."

এই ধারা থেকে অনুমান হয়, ইতিপূর্ব্বে যে কয়েকটি বিধবা-বিবাহ দেবার চেষ্টা হয়েছিল তাতে এই জাতীয় বিবাহের ফলে জাত সন্তানদের বৈধতার প্রশ্ন বিধবা-বিবাহকে আইনের দিক দিয়ে পঙ্গু করে রেখেছিল। এই আইনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ধারায় বলা হয়েছে যে, পুনর্বিবাহের দরুন বিধবাদের পূর্ব্বেকার বিবাহে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। বিধবা-বিবাহ আইনবদ্ধ হয়ে থাকা সত্ত্বেও বহুকাল ধরে সমাজে অগ্রাহ্য হয়ে রয়েছে, একথা বলাই বাহুল্য। এখনও বহু ক্ষেত্রে বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজে দেখা যায় যে, বিধবাদের সামাজিক স্বচ্ছন্দ পরিবেশের বাইরে এক আলাদা শ্রেণীর মানুষ হিসাবে গণ্য করা হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে বিধবাদের সংসারের বোঝা বলে মনে করা হয়, এমন দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে বিরল নয়। আমাদের এই মনোবৃত্তি কায়েম হওয়ায় সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টা তেমন সফল হচ্ছে না।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনা অনুসারে কেবলমাত্র কুড়ি থেকে পঁচিশ বৎসর বয়সের বিধবাদের সংখ্যা ছিল ৮,৪৬,৯৫১ এবং বিধবাদের মোট সংখ্যা ছিল ১৬,৮১,৬৭১। এই তথ্য ভারতের সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে আমাদের কুসংস্কারের চূড়ান্ত নিদর্শন হয়ে থাকবে। মহাত্মা গান্ধী একাধিক বিবৃতি ও প্রবন্ধে বালবৈধব্যকে সমাজের দুষণের কলঙ্ক বলে স্বীকার করেছেন, যদিও তাঁর মতে নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত বিধবারা হিন্দু সমাজের সম্পদস্বরূপ। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বৈধব্য দুর্নীতিকে নানা ভাবে প্রশ্রয় দিয়েছে। গান্ধীজীর মতে—'Widowhood imposed by religion or custom is an unbearable yoke and defiles the home by secret vice and degrades religion (*Conquest of Self*. পৃ. ২৩)। অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, আমাদের দেশে আর্থিক অভাব বা প্রবৃত্তির প্রেরণায় পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে এমন মেয়েদের মধ্যে বাল-বিধবার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়।

এদেশে অসহায় বিধবাদের সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব কম। তন্মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের কথা এখানে উল্লেখ করব। সেটি হচ্ছে লাহোরের সার গঙ্গারাম ট্রাষ্ট পরিচালিত বিধবা-বিবাহ সহায়ক সভা। উক্ত প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা কার্য্যালয় ১৮২ বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিধবা-বিবাহের প্রসারের জন্য উল্লেখযোগ্য কাজ করে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিনা পারিশ্রমিকে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা ও উক্ত প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করা, এবং জনসাধারণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচারের জন্য যাবতীয় বৈধ উপায় অবলম্বন করা। স্বাধীন ভারতে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানগুলির উপযুক্ত পরিচালনার ব্যবস্থা করার বিশেষ দায়িত্ব জাতীয় গবর্ণমেন্টের আছে।

বিধবা-বিবাহকে সামাজিক ভাবে গ্রহণ ও সমর্থন করতে হলে প্রচার ও আন্দোলন ছাড়াও যে বিধবাদের অভিভাবকদের নৈতিক গুরু দায়িত্ব রয়েছে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

নভেম্বরের নূতন রেকর্ড — হৈমন্তী সুরের প্রস্রবন

সত্যগোপাল দেব

GE 7391 { তোমায় গান শোনাতে প্রিয়
আমারে লবে গো চিনে

—আধুনিক

'চিত্র-গীতি'
নামক পুস্তকায় বাছাই করা বাণী চিত্রের গান গুলি প্রকাশিত হয়েছে। ডীলারের কাছে বিনা-মূল্যে পাবেন।

অমল দেব বর্ম্মণ

GE 7392 { দূরে সরে থাকি
মন নিয়ে একি খেলা

—আধুনিক

কুমারী সবিতা সিংহ
GE 7393
তোমার আঁখির পারে
মালার বদলে নিয়েছিনু বাণী
—আধুনিক

পরেশ দেব ও
পূরবী দেবী
GE 7394
মোর স্বপনের নীলপরী
প্রেমের নদীতে আছে
—দ্বৈত সঙ্গীত

বরদা গুহ
GE 7395
আর পারিনে ধর্ণা দিতে
মামা হোলো দেশের নেতা
—কৌতুক নক্সা

কল্প চিত্র মন্দিরের
'ওরে যাত্রী'
সাইন প্রোডিউসার্সের
'মায়ের ডাক'
নিউ থিয়েটার্সের
'অঞ্জনগড়'
বাণী চিত্রের গান
কলম্বিয়ায় শুনুন।

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের
নূতন চিত্র

"অঞ্জনগড়"

কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

VE 2555 { মোর গান গুন গুন
(কেন পরাণ হল বাঁধন হারা)
"ভাগ্যচক্র"—

সন্ধ্যা, হেমন্ত, ভারতী, পূরবী

VE 2556 { 'রামধুন'
(২ ভাগ)

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

VE 2557 { নাই নাই ভয় —(রবীন্দ্র-সঙ্গীত)
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও উৎপলা সেন
সর্ব খর্বতারে দহে —(রবীন্দ্র-সঙ্গীত)

THE NEW THEATRES LIMITED

Columbia Records
MAGIC NOTES TRADE MARK

কলম্বিয়া

গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড
কলিকাতা · বোম্বাই · দিল্লী · লাহোর · করাচী

পুস্তক-পরিচয়

দেবী-যুদ্ধ—৺শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ; প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, মিউনিসিপাল মার্কেট, শ্রীহট্ট। ২৬৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ৫৲ টাকা।

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি বলিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দোষ সমগ্র হিন্দু সমাজের। তাহা না হইলে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত উপাখ্যানাদি মন্থন করিয়া বর্ত্তমান যুগে ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইত না। অনেক সময়ই দেখা যায়, হিন্দুর এই সব প্রাচীন কথার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া লৌকিক জীবনের সুখ-দুঃখ মান-অপমানকে অনিত্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইংরেজ শাসনের কল্যাণে আমাদের আধ্যাত্মিকতার মোহ একটু আধটু টুটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য দেখিতে পাই, আমাদের রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া হিন্দুর সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাসের লৌকিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র বর্ত্তমান জীবনের হীনতার আলোকে সুর ও অসুরের বিবাদের বর্ণনা করিয়া, অতীতকে আমাদের সামনে জীবন্ত করিয়া ধরিয়াছেন।

শরচ্চন্দ্রের "দেবী-যুদ্ধ" নামক কাব্য সেই পর্য্যায়ভুক্ত। এই সাধক ব্রাহ্মণ শ্রীহট্ট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন; পুঁটিয়ার রাণী ৺শরৎ-সুন্দরীর আনুকূল্যে শিক্ষালাভ করেন, এবং বারেন্দ্রভূমে, উত্তরবঙ্গে, শিক্ষাব্রতীরূপে জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেন। এই কার্য্যে তিনি লোকের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। উত্তরবঙ্গের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় অনেকেই তাঁর ছাত্র ছিলেন। যুগধর্ম্মের অনুপ্রেরণায় তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ এই "দেবী-যুদ্ধ" কাব্যে পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরে এই কাব্য প্রকাশিত হয়। সেই যুগের চিন্তানায়কগণ সেই কাব্যকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সমালোচনায় পরিস্ফুট দেখা যায়। 'প্রদীপ' পত্রিকার ১৩০৮ বঙ্গাব্দের মাঘ ফাল্গুন সংখ্যায় এই সমালোচনা প্রকাশিত হয়। "দেবী-যুদ্ধের" কবি সেই পৌরাণিক কাহিনীকে (মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী উপাখ্যানকে) লৌকিক পরিচ্ছদে সমাবৃত করিয়া কাব্য রচনা করায় মনে হইতেছে—এ বুঝি মানব-সমাজের কথা, এ বুঝি প্রতিদিনের প্রত্যক্ষীকৃত ঘটনাবলীর অস্ফুট চিত্রপট। এই গুণে "দেবী-যুদ্ধ" পাঠকচিত্তকে বিমুগ্ধ করে।...মনে হয় বুঝি ইহার দেবাসুর সেকালের দেবাসুর নহে।"

স্বদেশীযুগে এই কাব্য ইংরেজ-শাসকের চক্ষে রাজদ্রোহসূচক বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রায় চল্লিশ বৎসর ইহা নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকায় স্থানলাভ করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পরে যে নবযুগের আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময়ে ইহা প্রকাশ করিয়া শ্রীগিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য স্বদেশী যুগের স্মৃতি উদ্দীপ্ত করিতে সাহায্য করিয়াছেন। কাব্যখানি দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া তাঁহার চেষ্টা আরও প্রশংসার যোগ্য। বর্ত্তমান যুগের পাঠকবর্গ এই দেশের নানা জাতির ও নানা সংস্কৃতির মধ্যে সংঘর্ষের একটা পরিচয় এই কাব্যের মধ্যে পাইবেন, এই কাব্যের সাহায্যে নিজের দেশের ইতিহাস বুঝিতে পারিবেন। প্রকাশকের শ্রম ও অর্থব্যয় তখন সার্থক হইবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

মায়ের কর্ত্তব্য

শিশুপালনের সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন শিশুদের দৈহিক সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি২র সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দন্তোদ্গমের সময়, সেবন করান উচিত।

বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী:—শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্ণতা, দুধ তোলা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, ক্ষয়তা, ব্রঙ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি।

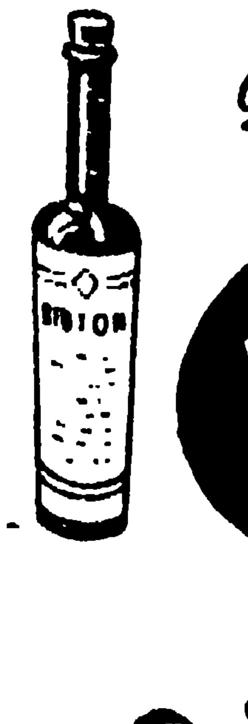

শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য

বিবটন

একটি পূর্ণাঙ্গ টনিক

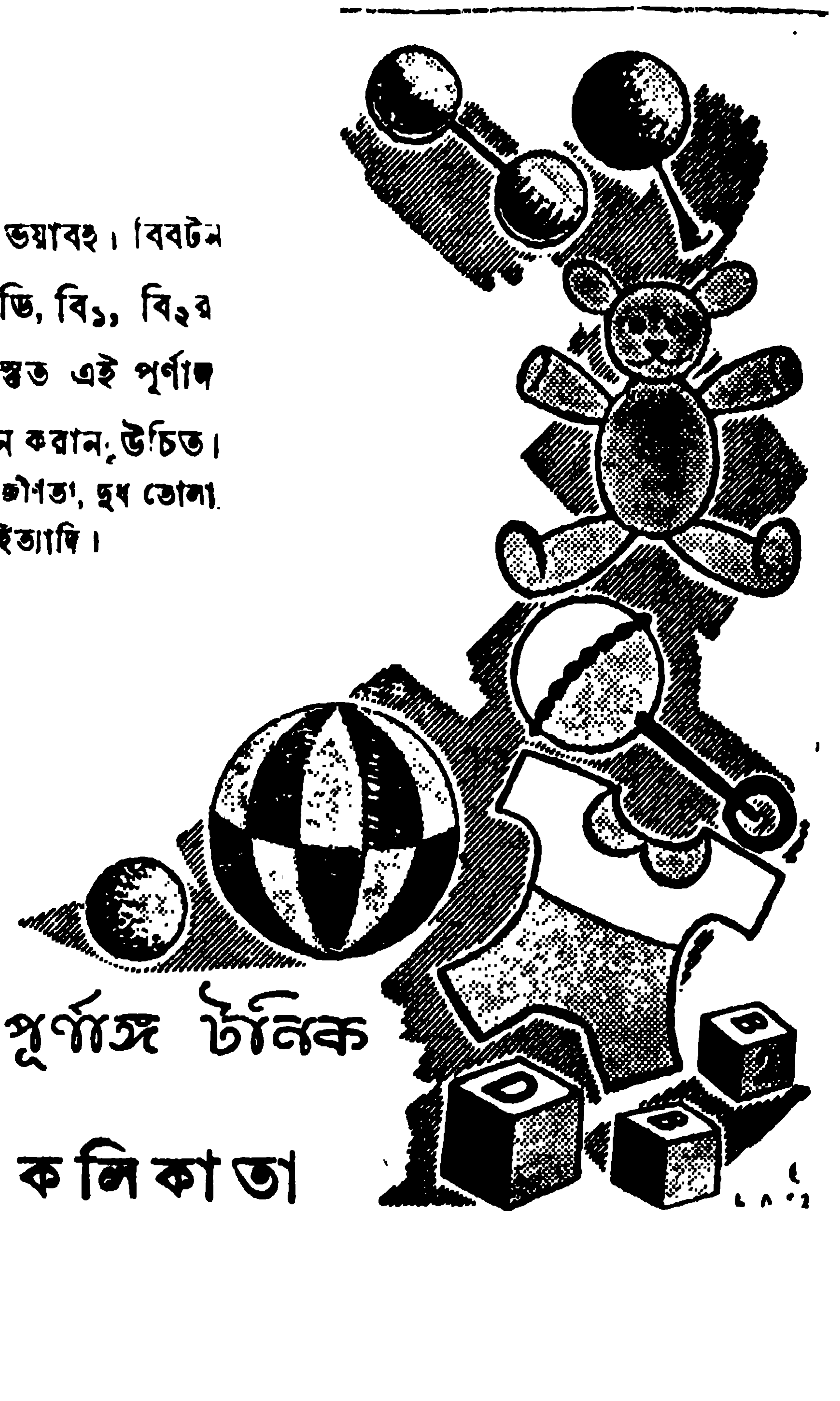

সিষ্টার এন্টিসেপটিকস্ ০ কলিকাতা

সীতার বনবাস—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ২৪৩.১ অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

"সীতার বনবাস" বিদ্যাসাগরের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহার প্রথম দুইটি পরিচ্ছেদ ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত, অবশিষ্টাংশ রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে সঙ্কলিত। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের দান কতখানি জানিতে হইলে "শকুন্তলা" ও "সীতার বনবাস" পাঠ করিতে হয়। সম্পাদকদ্বয় ভূমিকায় লিখিতেছেন, 'ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার দেশবাসীর জন্য এই দুইটি মহৎ কাব্যের গল্পাংশকে সুললিত বাংলা গদ্যে রূপান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' সমগ্র বাঙালী জাতিকে সাহিত্যরসে উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত করিয়াছে।·· সীতার বনবাস আজ আর সহজলভ্য নয়।" "সীতার বনবাসে"র প্রথম প্রকাশ-কাল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চবিংশতি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তিনি রচনাকে সহজ ও সুললিত করিবার জন্য প্রত্যেক সংস্করণেই তাহার কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সংস্করণে সম্পাদকেরা তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের সুন্দর এবং সাবলীল বাংলা আধুনিক পাঠককে আনন্দ দান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

টাকার বাজার—শ্রীঅতুল সুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৭৩ মূল্য ।৵।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার এই পুস্তকে দশটি অধ্যায়ে টাকার বাজারের স্বরূপ ও সংগঠন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, বিনিময়ের বাজার, দেশী বিলের বাজার, 'হুণ্ডী' ও স্বল্পমেয়াদী ঋণের বাজার, বন্ধকী বাজার, ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং, শেয়ার বাজার, মূলধনের বাজার ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। নিছক টাকার বাজার সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় পুস্তক কেহ লেখেন নাই, সুতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখককে অভিনন্দিত করিতেছি। বিষয়টি জটিল হইলেও লেখক যতদূর সম্ভব সহজ সরল ভাষায় বাঙালী পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। সাধারণ লোকের নিকট, এমন কি যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত সম্পর্কিত তাহাদেরও অনেকের নিকট ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কাজ-কারবার রহস্যময়। লেখক এই রহস্যের কতকটা উদ্ঘাটিত করিয়া সাধারণের নিকট ধরিয়াছেন। স্বাধীনতালাভের পর ব্যবসা সম্পর্কে এদেশবাসীর দায়িত্ব অনেক বাড়িয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে আমাদের নিজস্ব স্থান, আজ গ্রহণ করিতে হইবে। আধুনিক জগতের আর্থিক কাঠামোর সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকিলে একালের ব্যবসা-ক্ষেত্রে অন্ধের মত হাতড়াইতে হয়। এই ধরণের পুস্তক যতই দেশে প্রচারিত হইবে ততই প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসাক্ষেত্রের আসল চিত্র বাঙালীর নিকট পরিস্ফুট হইবে ও তাহাকে এদিকে আকর্ষণ করিয়া আনিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রগণও এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

অর্থনীতি সমাজ-রাষ্ট্র—শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী এবং শ্রীসুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়। মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০নং বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৫৫, মূল্য ৩৲।

প্রবন্ধের বই। ইহাতে মোট সাঁইত্রিশটি প্রবন্ধ আছে। পাঁচটি প্রবন্ধ রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কীয়; অন্যান্য প্রবন্ধে অর্থনীতি, সমাজনীতি, স্বাস্থ্য, ব্যাঙ্কিং, মুদ্রাস্ফীতি, যানবাহন, খাদ্যসমস্যা, পশুপালন, শিল্প, দামোদর

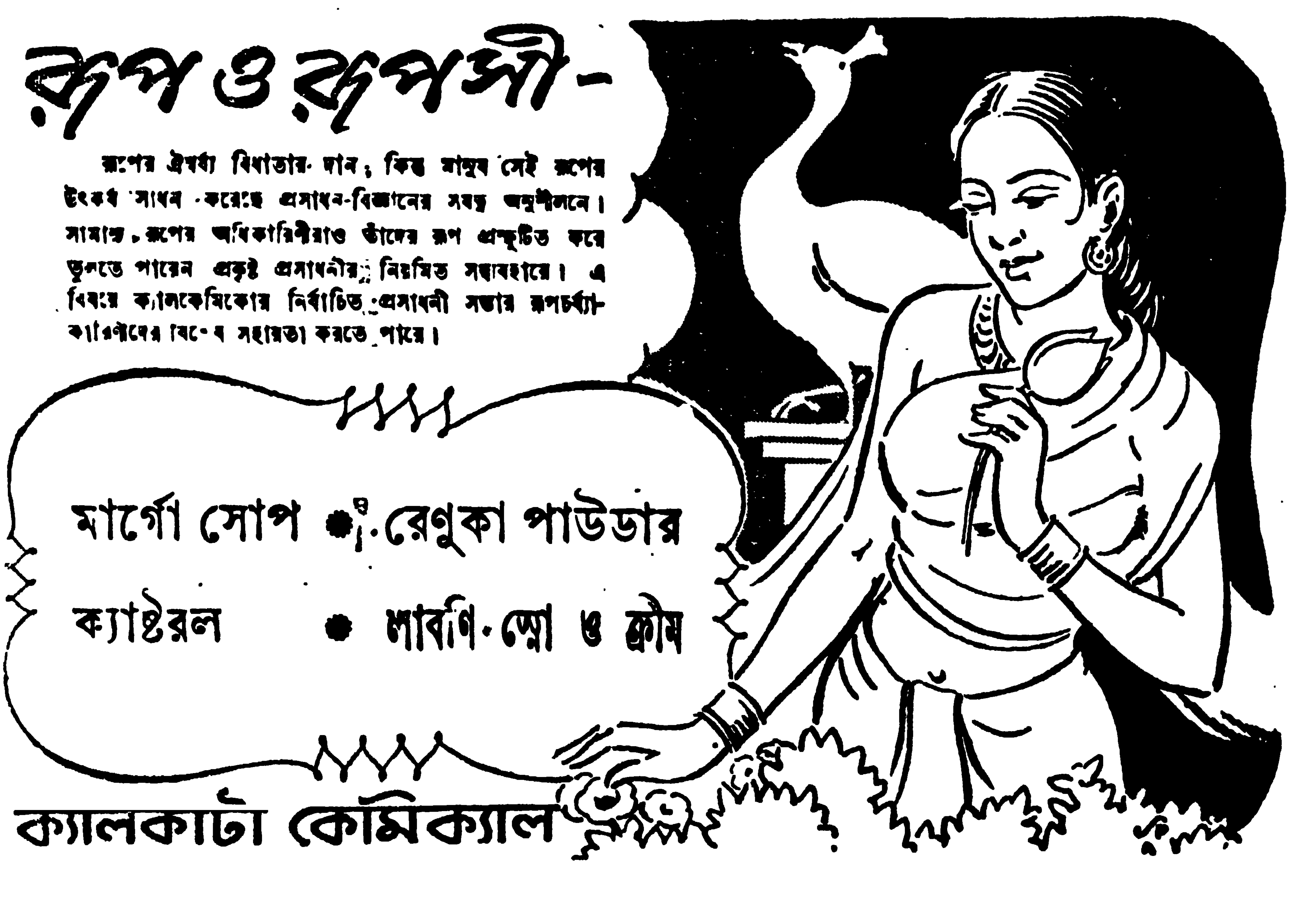

পরিকল্পনা প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। কমার্স ক্লাসের ছাত্র ব্যতীত সাধারণ পাঠকগণও এরূপ পুস্তক পাঠ করিয়া দেশের আধুনিক সংস্থা সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ ভারতীয় পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং জাতীয়তার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া লেখা বলিয়া মনোজ্ঞ হইয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ব্লু ব্লাড—শ্রীমাধবেন্দ্র মিত্র। প্রকাশক—পপুলার প্রকাশনা ভবন, ১৫৬, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। দাম—২৷৷০

উপন্যাসের নামকরণ হইতে মনে হয় এখানি কোন বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ। মৌলিক বাংলা রচনার এরূপ নামকরণ আদৌ সুষ্ঠু নহে।

বর্ত্তমান সমাজের কয়েকটি সমস্যাকে লেখক যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা সমালোচনার অতীত নহে। উপন্যাসের নায়ক একদা সন্ন্যাসাশ্রমে ছিল, কিন্তু সে আশ্রম-প্রবেশের কোন যুক্তিসহ যুক্তি তার ছিল না, যেমন আশ্রম-ত্যাগের পর তার বাস্তবমুখী চিত্তের দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যায়। অন্তর্মুখীন যে রস-পিপাসা মানুষকে সংসারবিমুখ করিয়া অমৃতলোকের পথ লইয়া যায়, সে সম্পদ সঞ্চয়ের তপস্যা তার ছিল না। তাই সন্ন্যাস গ্রহণ ও বর্জ্জন অনায়াসেই ঘটিয়াছে। ধর্ম্ম যে কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টিমাত্র নহে—এ সত্য প্রায় সর্ব্বজন-স্বীকৃত। ধর্ম্মের ব্যাখ্যা যে ভাবেই দেওয়া যাক—বাস্তবভূমিতে দাঁড় করাইয়া লেখক নীতিবিমুখ জগতের একটি চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার নায়ক-চিন্তাশীল, অধ্যয়নশীল, প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী—তবুও মনে হয় রক্তমাংসে গড়া সজীব পদার্থ নহে। ঔপন্যাসিক নন বলিয়াই লেখক গল্প-রচনার বহু মাল-মশলা স্বল্পপরিসরের মধ্যে অবহেলায় ছড়াইয়া দিয়াছেন। বহু নরনারীকে টানিয়া আনিয়াছেন, তাহাদের পরিচয়ও কিছু কিছু দিয়াছেন, কিন্তু জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, দ্বন্দ্ব-বেদনাকে রূপ দিবার প্রয়াস মাত্র করেন নাই। কতকগুলি সমস্যা ও প্রচলিত মতবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্য লইয়া কতকগুলি চরিত্র-পরিচিতির সার্থকতা উপন্যাসের ক্ষেত্রে নাই। সমস্যার সঙ্গে কাহিনীকে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে গাঁথিয়া রসসৃষ্টি করিতে না পারিলে একই সঙ্গে দর্শন ও অনুভূতির রাজ্যে সাড়া জাগানো কঠিন।

প্রুফের ত্রুটি ছাড়াও বানানে অনবধানতা আছে। 'র' ও 'ড়' কারের অপপ্রয়োগ এবং চন্দ্রবিন্দু বর্জ্জন তাহার মধ্যে প্রধানতম।

অগ্নিমন্থন—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চৌধুরী। কারবারী হিন্দ লিমিটেড। ১১, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—তিন টাকা।

উপন্যাস লিখিবার প্রয়াস আজকাল বাড়িয়াই চলিয়াছে, কিন্তু ভাষা-লক্ষ্মীর প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার পরিচয় বহুক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। গল্প শুনিতে কে না ভালবাসে, এবং সেই কারণেই গল্প শোনাইবার আগ্রহ মানুষের স্বাভাবিক। কিন্তু বাহন খোঁড়া হইলে গল্পটি গতিহীন ও ভারগ্রস্ত হইতে বাধ্য। 'অগ্নিমন্থন' উপন্যাসটি এই কারণেই সার্থক সৃষ্টি হয় নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতার অঞ্জলি—সঙ্কলয়িতা ও প্রকাশক: আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ ১৬০, মূল্য—দুই টাকা

বাংলা সাহিত্যে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করিয়া লেখা দেশের মুক্তি সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের বিশেষ অভাব রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র বাগল প্রণীত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের ধারাবাহিক কাহিনী 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' এই অভাব বহুলাংশে পূরণ করিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্য্যায়, ধারা ও কাহিনী কিশোরদের উপযোগী করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। স্বাধীনতা সংখ্যা 'শিশু-সাথী'তে ইহার অনেকগুলি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। এই পুস্তক পড়িয়া কিশোর পাঠক-পাঠিকা জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার কথা, বিপ্লবী বাংলার তরুণদের আত্মদানের কাহিনী, নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিবরণ প্রভৃতি অবগত হইয়া অনুপ্রাণিত হইবে সন্দেহ নাই;

বহু মূল্য দিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হয়, ইহা রক্ষার জন্যও দীপ্ত দেশপ্রেম, ক্ষাত্রবীর্য্য ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন। দেশের কিশোরদিগকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করিতে হইবে। ইহার ফলে দেশের জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ বীরবৃন্দের প্রতি তাহারা যেমন শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিবে, তেমনি নিজেদের জীবন গঠনের উপাদানও সংগ্রহ করিতে পারিবে।

'জাতীয় পতাকা' শীর্ষক প্রবন্ধে মাতঙ্গিনী হাজরা সম্বন্ধে একটু ভুল খবর আছে, মেদিনীপুরে থানা দখল করিতে গিয়া তিনি প্রাণ দেন নাই। ঘটনাটি ঘটে তমলুকে; ১৯৪২ সনের ২৯শে সেপ্টেম্বর স্থানীয় আদালত-প্রাঙ্গণ অভিমুখী দলের পুরোভাগে থাকিয়া পুলিসের গুলীতে তিনি নিহত হন।

কয়েকটি স্বদেশী গান ও কয়েক জন দেশ-নেতার ছবি পুস্তকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট উত্তম।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

তন্ত্রের আলো—শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার। প্রবর্ত্তক পাব-লিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম চার টাকা।

তান্ত্রিক উপাসনা সমগ্র ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ও বহুলপ্রচারিত। অবশ্য ইহার নামমাত্র শ্রবণে অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন - ইহার কোন কোন অনুষ্ঠান শিষ্ট সমাজে আপাতদৃষ্টিতে গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে; অথচ ইহার তাৎপর্য অনুসন্ধান অনেকেই করেন না—ইহার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিবার আগ্রহ ও চেষ্টারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলে তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্রসাহিত্যের দুর্জ্ঞেয় রহস্য অতি অল্পসংখ্যক লোকের নিকটই সুস্পষ্ট বা পরিচিত। অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য পূজাপদ্ধতি ও বিবিধ অনুষ্ঠানের বিধিনিষেধও যে অনেকেই জানেন এমন কথাও বলা যায় না। এরূপ অবস্থায় তন্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ববিশ্লেষণের যে প্রয়াস আলোচ্য গ্রন্থে দেখা যায় তাহা বিশেষ প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। সুপণ্ডিত গ্রন্থকার মহাশয় তন্ত্রোক্ত শিবতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, সদ্বিদ্যা, সম্ভূতি, জীব ও ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন—স্থানে স্থানে বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিবার জন্য আকর-গ্রন্থের উল্লেখ বা তাহা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হই-

মফঃস্বলে বসিয়া কলিকাতার দরে বই কিনুন

যে কোনও প্রকারের এবং বিভিন্ন প্রকাশকের নাটক, নভেল, ধর্মগ্রন্থ, ভ্রমণকাহিনী, চিকিৎসা ও আইনের পুস্তকাদি স্কুল-কলেজের ও উপহারের জন্য যে কোনও ভারতীয় দেশী ও বিলাতী ভাল ভাল পুস্তক আমরা সত্বর কলিকাতার দরে সত্বর সরবরাহ করি। /১০ ডাকটিকিট পাঠাইলে লাইব্রেরী ও উপহারের জন্য নানাবিধ নূতন নূতন পুস্তকের তালিকা পাঠান হয়। অর্ডারের সহিত মূল্যের অর্দ্ধাংশ দিলেই সমস্ত পুস্তক ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। প্যাকিং, ডাকমাশুল ও বিক্রয়কর স্বতন্ত্র। নিশ্চিত ও নিরাপদ আয়ের জন্য আমাদের স্থায়ী আমানতে টাকা জমা রাখুন। অন্যূন ৫০৲ টাকাও জমা রাখা হয়। প্রতি ৬ মাস অন্তর সুদ দেওয়া হয়।

কুণ্ডু পাব্লিসিটি সোসাইটী অব ইণ্ডিয়া

(পাব্লিকেশন এণ্ড বুক-সেলিং ডিপার্টমেন্ট)

১৩৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

য়াছে। অবশ্য অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন তন্ত্রের গূঢ় রহস্য ইহাতে কতটা আলোকিত হইবে বলা কঠিন। গ্রন্থের অনেক স্থলই যে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভাষাও সর্ব্বত্র নির্দ্দোষ নহে। প্রধান প্রধান তন্ত্রগ্রন্থের—বিশেষ করিয়া যে সমস্ত মূলগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহাদের এবং তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের পরিচয় বা বিবরণের অভাবে গ্রন্থখানির অঙ্গহানি ঘটিয়াছে। তন্ত্রনামে পরিচিত সকল গ্রন্থই প্রামাণিক নহে, তাই অবলম্বিত গ্রন্থের প্রামাণ্য নিরূপণও আবশ্যক। দার্শনিক তত্ত্বের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ব্যবস্থা তান্ত্রিক পূজা ও অনুষ্ঠানের মধ্যেই রহিয়াছে এ কথা তান্ত্রিক সমাজে সুবিদিত।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ক্রিব্রাহিম—শ্রীনিশিকান্ত বসু। নব্যবাঙ্গলা সাহিত্য সঙ্ঘ, আলমবাজার। মূল্য এক টাকা।

হালকা ধরণে লেখা বিদ্রূপাত্মক নক্‌শা—আমাদের অস্থির চিত্তের, নিষ্ঠাহীন মনের ছবি। চারি ধর্ম্মের সমন্বয়—সংক্ষেপে 'ক্রিব্রাহিম'। আমরা সবই মানি অথচ কিছুই মানি না, ইহাই লেখক দেখাইতে চাহিয়াছেন।

মায়াপুরী—শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী। ময়মনসিংহ প্রিণ্টার্স লিমিটেড। মূল্য ১।০।

ভরত, কংফুশিয়ো, কালিদাস, ট্রুম্যান, প্রগতি গাঙ্গুলী, কাঞ্চনমালা, রাক্ষসী এই কয়টি চরিত্র অবলম্বনে রচিত ভাবমূলক নাটিকা। কথায় ও গানে আধুনিক নরনারীর হালচাল বর্ণিত হইয়াছে।

সান্ত্বনা—১ম খণ্ড। শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাটুলি, বলাগড় (হুগলী)। মূল্য ১।০।

কয়েকটি গান। প্রাচীন ও নূতন ছন্দ ও ভাষা-ভঙ্গীর উপর লেখকের অনায়াস অধিকার আছে।

শিল্পকথা—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। দি কালচার পাবলিশার্স। ৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লেখক পাণ্ডিত্য এবং সমালোচন-নৈপুণ্যের জন্য বিখ্যাত। তাঁহার লেখায় একটি স্বাধীন চিন্তাশীল রসপিপাসু মনের সাক্ষাৎ পাই। কেবল বাংলা নহে, সংস্কৃত, ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যেও তাঁহার অনায়াস প্রবেশাধিকার। বিভিন্ন দেশের মনীষিগণের ভাবরসে তাঁহার চিত্ত পরিপুষ্ট। বর্ত্তমান গ্রন্থে 'শিল্পকথা', 'শিল্প ও জীবন', 'কবি ও যোগী', 'ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য', 'মালার্মে', 'উপনিষদের সুন্দর', 'কবিত্বের স্বরূপ', 'আধুনিক কবিত্ব', 'কাব্যের মহত্ত্ব', 'কাব্য ও ছন্দ', 'ছন্দের অ-আ', 'কবিত্বের একটি সূত্র', লোকোত্তর চেতনার কবিতা', 'কাব্য ও মন্ত্র', 'নব্য কাব্য', 'ইংরাজী ও ফরাসী', 'বাংলা লিপি-সংস্কার'—এই সতেরটি প্রবন্ধ আছে। সবগুলিই সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রাচীন ও নবীন উভয় সাহিত্যেই লেখক জীবন-রহস্য-রসের সন্ধান করিয়াছেন। নব্য সাহিত্যের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন। 'লিপি-সংস্কার' বিষয়ে তিনি উৎসাহী নহেন, কারণ তিনি অনুভব করেন "লিপি ভাষার জড় কাঠামো বা সঙ্কেত মাত্র নয়। লিপিরও আছে একটা প্রাণ, প্রকাশ ক্ষমতা, সৌন্দর্য্য। ...আশঙ্কা হয়, সারল্যের দোহাই দিয়ে আমরা শ্রীহীনতার মধ্যে গিয়ে না পড়ি।"

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উদ্দাম যৌবনে—উপন্যাস। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—পোঃ গড়িয়া, ২৪ পরগণা, লেখকের নিকট। মূল্য ৩৲।

আলোচ্য পুস্তকখানি ভূপর্য্যটক ক্ষিতীশবাবুর প্রথম উপন্যাস। কিন্তু প্রথম উদ্যম হিসাবেও উৎসাহ দিতে পারিলাম না। কোন চরিত্রই ফুটিয়া উঠে নাই, অথচ অবাস্তব এবং অবাঞ্ছনীয় ঘটনার ভিড়ে উপন্যাসখানি ভারাক্রান্ত। লেখক ভূমিকায় তাঁর পুস্তক-সমালোচনা নিজেই করিয়া নূতনত্ব দেখাইয়াছেন।

সেরা মানুষ গান্ধীজী—শ্রীবিজয়রতন বসাক ও শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী। সি, সি, বসাক এণ্ড সন্স। ১২৭, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—উপহার সংস্করণ ৸৶০, সুলভ সংস্করণ ।৶০।

মহাত্মা গান্ধীর কর্ম্মময় জীবনের কাহিনীগুলি ছোটদের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। গান্ধীজীর সত্যনিষ্ঠার এবং মহৎ আদর্শের জীবন্ত দৃষ্টান্তগুলি ছোটদের জীবন গঠনে যথেষ্ট সহায়ক হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বাংলার দামাল ছেলে—শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী। অভিযান গ্রন্থমালার দ্বিতীয় বই। পরিবেশক: সেনগুপ্ত এণ্ড কোং, ২।১ নবীন কুণ্ডু লেন ও এ, কে পালিত এণ্ড কোং, ৮নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় বাংলার তথা ভারতের গৌরব সুভাষচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের চমকপ্রদ কাহিনী ছোটদের বুঝিবার মত সহজ করিয়া লিখিত হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে স্বভাবতঃই মনের মধ্যে বিস্ময় উত্তেজনা এবং বেদনার সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্ব্বেই প্রভাতবাবু "বাঘ সিংহের লড়াই" লিখিয়া বিষয়-নির্ব্বাচনের জন্য ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকখানিরও আমরা প্রশংসা করিতেছি।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

অন্তরালে—শ্রীকানাইলাল ঘোষ। ঊষা পাবলিশিং হাউস। ৩৪নং মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

আমাদের সভ্য সমাজে লোকচক্ষুর অন্তরালে কত যে পাপ ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা চলিতেছে, মুহূর্ত্তের ভুলে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া কত স্ত্রী-পুরুষ যে নিজের জীবনে চরম দুর্ভাগ্যকে ডাকিয়া আনিতেছে তাহার আর অন্ত নাই। লেখক বর্ত্তমান উপন্যাসে সমাজের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকেরই ছবি ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু ক্ষমতার অভাবে তাহার পুস্তকখানি রসসৃষ্টি হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে। ইহাতে না আছে প্লটের বাঁধুনি, না আছে ভাষার গাঁথুনি কিংবা সার্থক চরিত্রসৃষ্টি। 'ফিমেল ডিজিজ স্পেশালিষ্ট' ডাক্তার চৌধুরীর 'চেম্বারে' গভীর রাত্রে একের পর এক ব্যাভিচারী এবং ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীরা আসিয়া নিজেদের অতীত দুষ্কর্ম্মের কথা স্বীকার করিতেছে। সেই দীর্ঘ ও জুগুপ্সাজনক বর্ণনা এতই বিরক্তিকর যে ধৈর্য্য ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া উঠা সম্ভবপর হয় না। লেখকের অপূর্ব্ব ভাষাজ্ঞানের কতকগুলি উৎকট দৃষ্টান্ত নিম্নে দিতেছি:

জ্যোতির্ব্বেদ সংরক্ষণোপায়

মহাভারত-ঋষি নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়া নির্দ্ধারিত জীবনপথের পূর্ব্বার্জ্জিত বাধা অপসারণ করুন। ইতি— উৎ-ভাকাঙ্ক্ষী সেবক; বহুকালের প্রসিদ্ধ "নীলকণ্ঠ সার্ব্বভৌম চতুষ্পাঠী" পরিচালক, "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত" পঞ্জিকাপ্রবর্ত্তক-বংশাবতংস, জ্যোতির্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীসতীশ সাহিত্য-সরস্বতী। "শ্রীগোবিন্দ কুটীর" চন্দননগর। (হুগলী)। জন্ম তাং সময় ও স্থান উল্লেখসহ প্রশ্ন ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়। জবাবী পত্র দিবেন।

জ্যোতিষায়ুর্ব্বেদ মতে সহজে ব্যাধিমুক্ত হউন।

চক্ষুরোগে—শতাধিক বর্ষ বিখ্যাত বাহ্যিক প্রলেপ "৺তারকেশ্বর লেপনী"—১ কৌটা, ডাক খরচসহ এক টাকা মাত্র।

ম হা জি জ্ঞা সা

লুই ফিশারের বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Great Challenge'-এর বাংলা অনুবাদ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক তথা সামাজিক বিবর্তন যে গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে এখনও পর্য্যন্ত নানাপ্রকার আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চলেছে তার ইতিহাস জানা প্রয়োজন আজ সকলেরই। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ এখনও প্রচুরভাবে প্রচারিত হয়নি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করে লুই ফিশার অত্যন্ত স্পষ্ট ও নির্ম্মমভাবে তা-ই আলোচনা করেছেন ব'লে আজকের দিনে এ-বই-এর প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

প্রথম পর্ব্ব—দাম চার টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড

পি ১৩ গণেশ চন্দ্র এভিন্যু
কলিকাতা

গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মহানগর (২য় সং) ২৲
সুবোধ ঘোষের
পরশুরামের কুঠার (২য় সং) ২
শুক্লাভিসার ২৷৹
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ফসল (২য় সং) ১৷৹
ঋণ ১৷৵১৹
নতুন দিনের কাহিনী ২৲
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
পতাকা ২৲
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
খেলনা ১৷৷৹
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের
নয়নচারা ১৷৷৹

কবিতা

জীবনানন্দ দাশের
মহাপৃথিবী ১৷৷৹
অজয় ভট্টাচার্য্যের
সৈনিক ও অন্যান্য কবিতা ১৷
অজিত দত্তের
পুনর্ণবা ১৷৷৹
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
সংকলিতা (২য় সং) ২৲
যৌবনোত্তর ৷৷৹
নতুন দিন ৷৷৹
প্রাচীন প্রাচী ১৷৷৹
দিনেশ দাসের
কবিতা (১৩৪৩-৪৮) ১৵৹
গোপাল ভৌমিকের
স্বাক্ষর ১৲

রাজনীতি ও অর্থনীতি

প্রবোধচন্দ্র সেনের
ধর্ম্মবিজয়ী অশোক ৩৲
হুমায়ুন কবিরের
মোসলেম রাজনীতি ৸৹
টাটা বিড়লা প্রভৃতির
বোম্বে পরিকল্পনা (দুই খণ্ড)
প্রতি খণ্ড ১৲
মিনু মাসানির
নূতনদৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ ৸৹
খাদ্য ৸৹
ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি ৸৹

গান্ধী-সাহিত্য

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
গান্ধী পরিকল্পনা ২৲
গান্ধীজির রাষ্ট্র পরিকল্পনা ২৲
ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম ৸৹
শিক্ষার বাহন ৷৷৵৹

জীবনী ও মতবাদ

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
রুশো ১৵৹
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
কার্লমার্ক্স ১৵৹
অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ডারুইন ১৵৹
সুবোধ ঘোষের
দিগম্বুক্ত করেন্ত ১৵৹

উপন্যাস

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
বৃত্ত ১৷৷৵৹
মরামাটি (২য় সং) ২৷৹
দিনান্ত (২য় সং) ৩৷৷৹
কষ্টি দেবায় (২য় সং) ৩৲
রাত্রি ৫৲
কল্লোল ৫৲
মৌচাক (যন্ত্রস্থ)
শৈলেন ঘোষের
তিনরঙ ২৲

ধর্ম্ম

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
বৌদ্ধধর্ম্ম ৩৲

পূর্ব্বাশা সিরিজ

ভারতীয় নারী ও সমাজ ৷৹
ধর্ম্ম ও নীতি ৷৹
সমাজ ও সাহিত্য ৷৹
সমাজ ও সংস্কৃতি ৷৹
সমাজ ও বিজ্ঞান ৷৹
সঙ্গীত ও সমাজ ৷৹
অনুন্নত দেশ ও সাম্রাজ্যবাদ ৷৹

উদ্ভাসিত, মুহূর্ত্তের দোহারে, লোকলজ্জার দোহারে, স্বার্থের দোহারে —(এই দোহারের মানে কি দোহন করিয়া, কোটরাগত চক্ষু, ঘূর্ণাক্ষরে। করণীয় কর্তব্য (অকরণীয় কর্তব্য কিছু আছে কি?))। উপহাসে হেসে উঠেছিলাম। পিতার পৌরুষত্ব (বীর্য) আছে। ইংরেজী জ্ঞানের একটু নমুনা: মিট টু ডেথ। সিন্থিলেটিক পরজন্ম (চার-পাঁচবার আছে) এটা কি রকম 'পরজন্ম'?

আর দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

ছবি ছড়ায় জহরলাল—শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী রত্নাকর পাবলিশিং হাউস। ১৬৬-এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা -২৯। মূল্য ৸০।

এই পুস্তকে ছবি ও ছড়ায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর জীবন-কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার এক পৃষ্ঠায় ছবি এবং অন্য পৃষ্ঠায় দুইটি করিয়া ছড়া আছে। লেখক লেখায় জবাহরলালের জীবনের যে ঘটনাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, রেখায় তাহা যেন চোখের সামনে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

১। কলিকাতা ২। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ ৩। পুরী ৪। বারাণসী। ৫। দার্জ্জিলিঙ ৬। দিল্লী—সি এ পার্থস্টি প্রণীত ইংরেজী পুস্তক হইতে শ্রীললিত ঘোষ কর্তৃক অনূদিত। ম্যাক্‌মিলান এণ্ড কোং লিমিটেড, ২৯৪, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে ৵০, ।০, ৶০, ৺০, ৶১০, ৩।০।

পুস্তিকাগুলি অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত হইয়াছে। সহজ ও স্বচ্ছ ভাষায় বর্তমান ভারতবর্ষের বিখ্যাত নগরীগুলির প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া লেখক ছেলেমেয়েদের মনে ভারতবর্ষের নাগরিক সম্বন্ধে কৌতূহল উদ্রেক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা, প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নয়নরঞ্জন সু-অঙ্কিত চিত্র-শোভিত বইগুলি ছেলেদের মনোরঞ্জন করিবে।

১। গীতাবীথি ২। ধারা—শ্রীবিজয়গোপাল। প্রাপ্তিস্থান, —উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা। প্রত্যেকের মূল্য ২৲।

প্রথম পুস্তকখানি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উদ্দেশে রচিত গীতাবলীর সঙ্কলন। গানগুলি ভাষা ও ছন্দ এমন সুমিষ্ট এবং মর্ম্মস্পর্শী যে, পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

দ্বিতীয় পুস্তকের ভাবধারা মূলতঃ এই যে, মানবের অনন্ত পিপাসা অনন্ত প্রেমময় ভগবানে আত্মসমর্পণেই চরিতার্থতা লাভ করে। মহাসিন্ধু হইতে জন্মলাভ করিয়া বারিবিন্দুসমূহ যেমন পাহাড়ের অন্ধকার গুহাতলে সঞ্চিত হইয়া পুনরায় সাগরের ডাকে পাষাণকারা ভেদ করিয়া কত বন-উপবন, প্রান্তর-লোকালয়, মরু-কান্তার পার হইয়া অবশেষে মহাসিন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া শান্তিলাভ করে, মানবের জীবনধারাও তেমনই অনন্ত প্রেমময়ের বাঁশীর ডাকে অধীর হইয়া শৈশব ও যৌবনের হাসি-কান্না ও সুখদুঃখের স্মৃতিবিজড়িত দিনের শেষে জীবনসায়াহ্নে ভগবানের ধ্যানে জ্ঞানে তন্ময় হইয়া আত্মস্থ হয়। দার্শনিক মহেন্দ্রনাথ সরকার ভূমিকায় ইহার একটি চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাহিত্যে নবাগত কবির ভাবের গভীরতা ও ভাষার লালিত্য প্রশংসনীয়।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

দেশ-বিদেশের কথা

বাঙালী বৈজ্ঞানিকের কৃতিত্ব

আমেরিকা, কানাডা এবং ইংলণ্ড হইতে উচ্চশিক্ষালাভ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সমাপ্ত করিয়া শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার আচার্য্য, পি-এইচডি (লণ্ডন) ডি-এসসি (কলিকাতা) সম্প্রতি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ডক্টর আচার্য্য ১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এসসি উপাধি লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি সার তারকনাথ পালিত বৈদেশিক ফেলোশিপ বৃত্তি লাভ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. ডব্লু. ম্যাক্‌বেন, এফ-আর এস, কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরলোকগত ই. এফ. বার্টন এবং লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের অধ্যাপক জি. আই. ফিনচ, এফ-আর-এস প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সহিত তিনি গবেষণা-কার্য্যে রত ছিলেন।

প্রাকৃতিক রসায়ন (Physical Chemistry) ব্যতীত ডাঃ আচার্য্য ইলেকট্রন অপটিক্‌স নামে এক আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ও ইলেকট্রন ডাইফ্র্যাকশন এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। ডাঃ আচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসবিহারী ঘোষ বৃত্তি এবং নাগার্জ্জুন পুরস্কারও লাভ করিয়াছেন। ডাঃ আচার্য্য সংস্কৃত সাহিত্যেও বিশেষ পারদর্শী।

ছাত্রজীবনে কুমিল্লার টোল পাঠশালায় টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া তিনি বিদ্যাবিনোদ ও ব্যাকরণতীর্থ উপাধি অর্জ্জনকল্পে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ এবং সাংখ্য-বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ডক্টর আচার্য্য ত্রিপুরা জেলার বাঘমারা গ্রামের অধিবাসী। তাঁহার পিতা পরলোকগত কৃষ্ণকুমার আচার্য্য একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন।

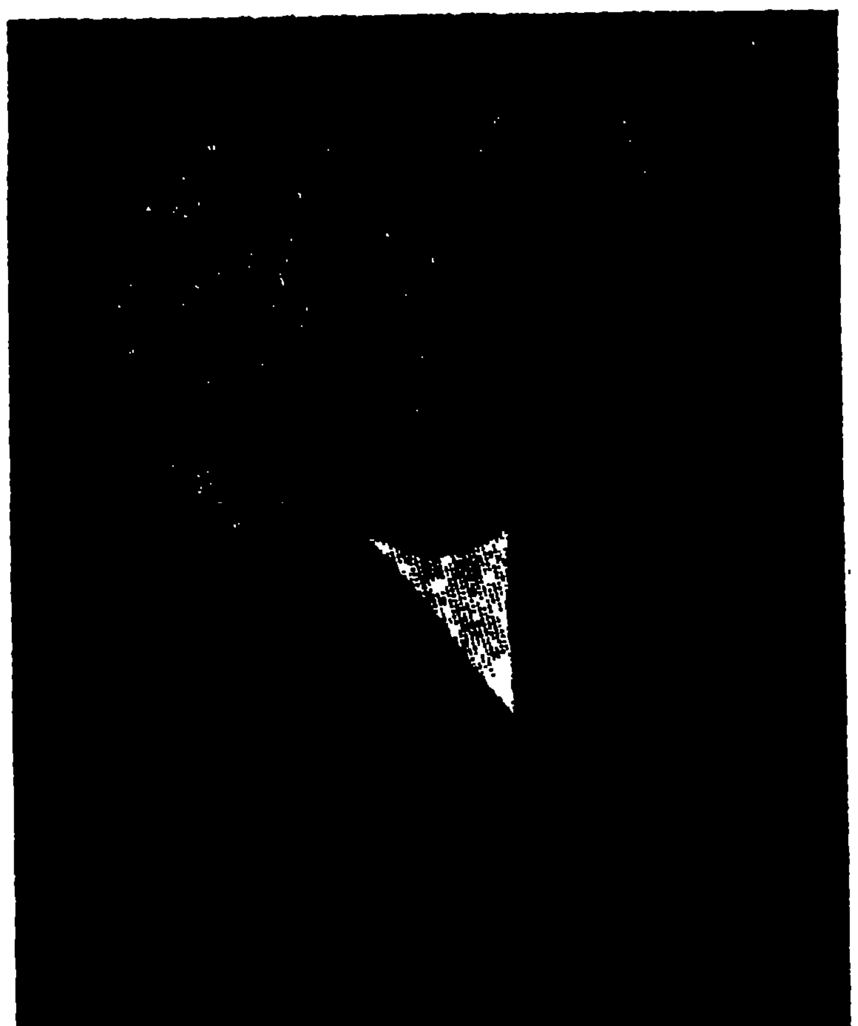

মহেন্দ্রনাথ শেঠ

জন্ম : ২৫শে আশ্বিন, ১২৮৫ । মৃত্যু : ২৮শে আশ্বিন, ১৩৫৫ ।

(বিবিধ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)

বেলাশেষের তান

শ্রীপ্রিয়প্রসাদ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

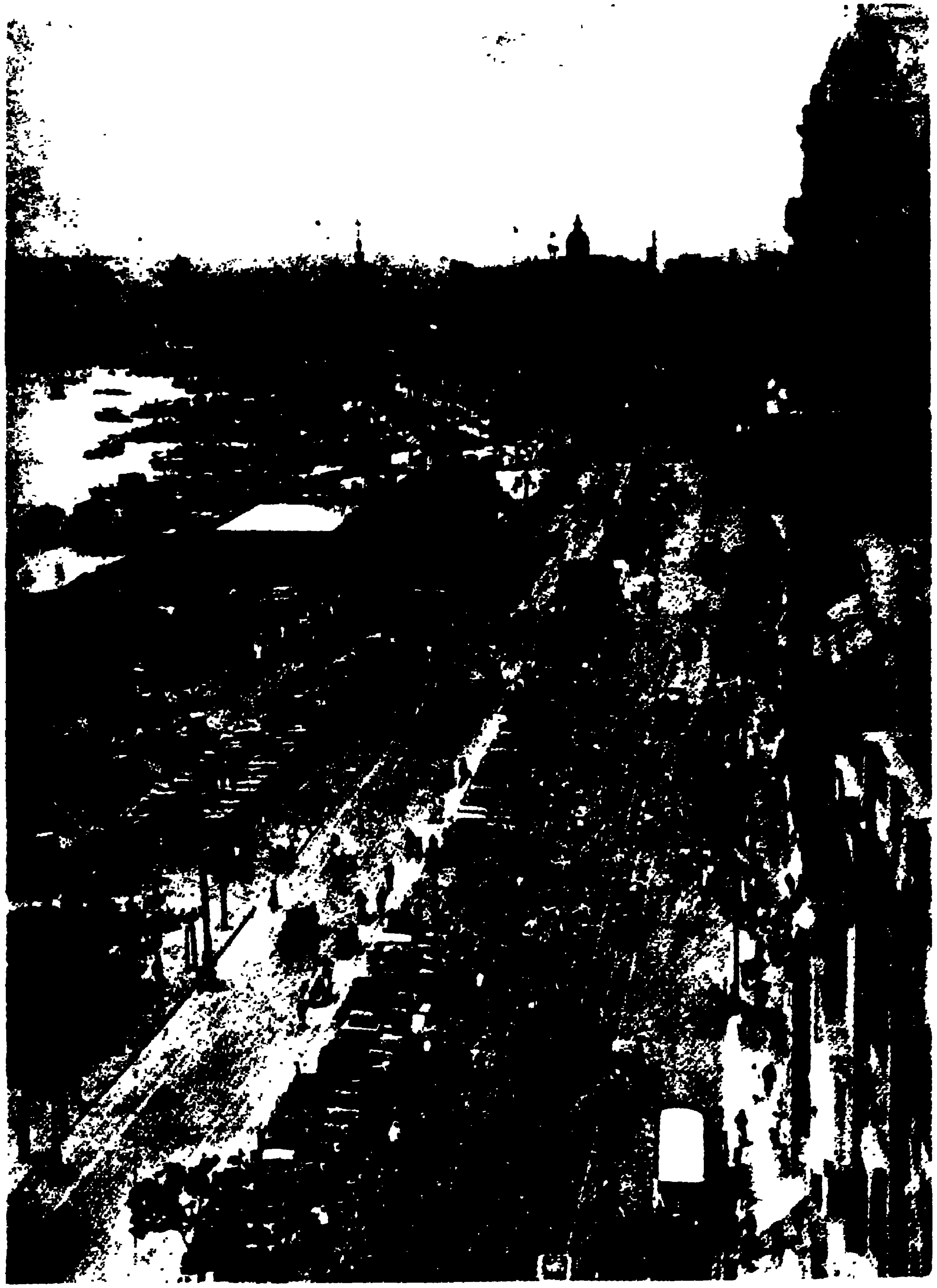

সাংহাইয়ের ইয়াং‌সি নদীতীরস্থ 'বুলেভার' বা প্রশস্ত রাজপথের দৃশ্য

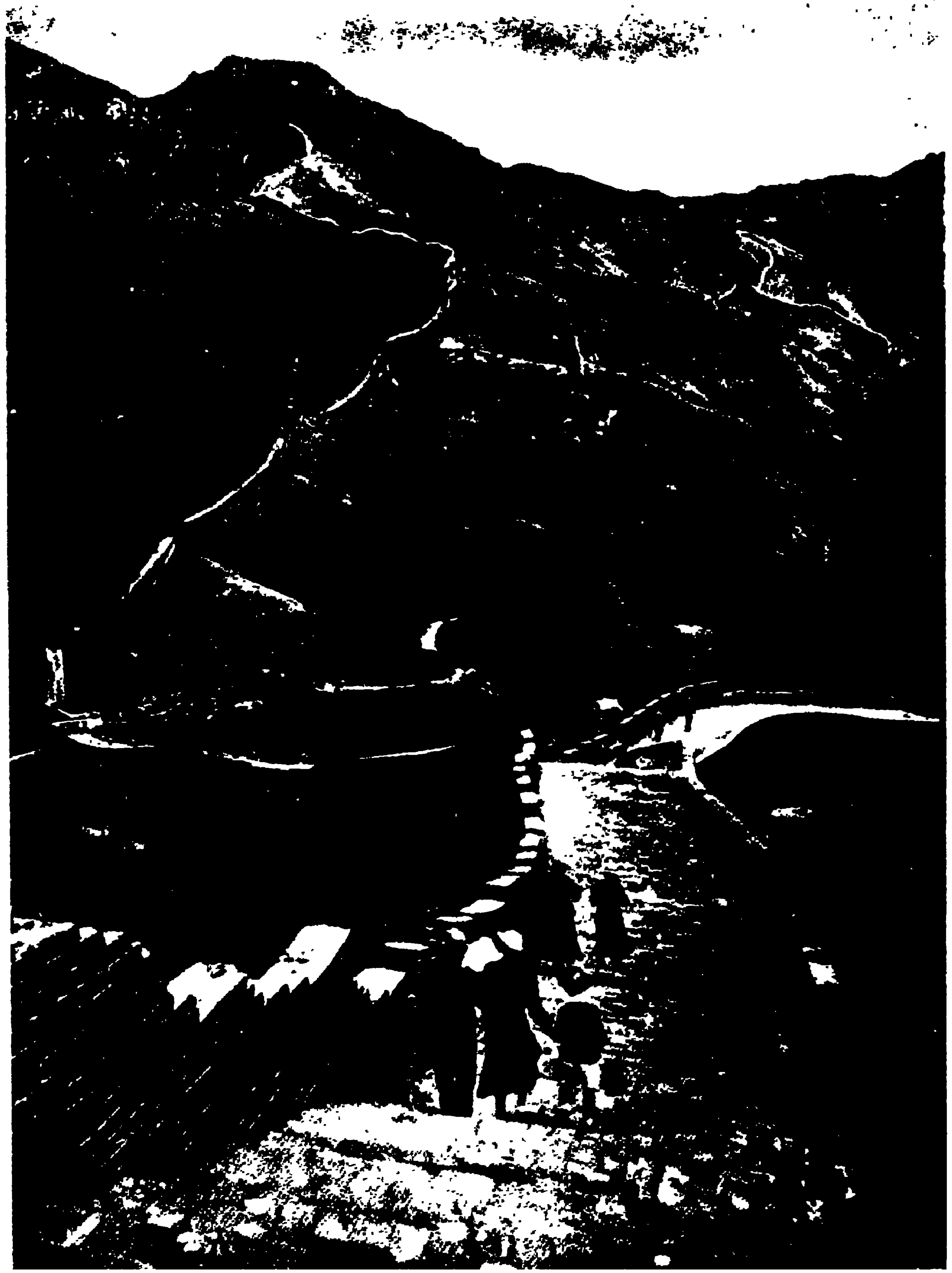

চীনের বৃহৎ প্রাচীরের একাংশের দৃশ্য

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৫৫ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কংগ্রেস অধিবেশন

স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইতেছে। কংগ্রেসের চালক-পরিষদ তাহার পূর্ব্বে দিল্লীতে মিলিত হইয়া নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা করিয়াছেন। সাধারণের সম্মুখে তাহার কিছু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, কিছু অংশ বোধ হয় এখনও চাপা আছে, কংগ্রেসের অধিবেশনের মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেও পারে। দিল্লীর ওয়াকিবহাল মহলের কথায় বুঝা যায় যে, চালক-পরিষদ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর আদেশ-উপদেশ দানের অধিকার পাইতে ইচ্ছুক। মন্ত্রিমণ্ডলীর বাহিরে যে সকল কংগ্রেসের মোড়ল নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির পরিচালকরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের বক্তব্য এই যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীগুলি কংগ্রেসের—অর্থাৎ তাঁহাদের—আজ্ঞাবাহী হওয়া উচিত, নতুবা দেশশাসনে ও পরিচালনে কংগ্রেসের আদর্শ রক্ষা সম্ভব হইবে না। এরূপ দাবি সত্য সত্যই হইয়াছে কি না তাহা সঠিক না জানায় আমরা তাহার বিচার মুলতুবী রাখিলাম।

কংগ্রেস-চালক-পরিষদ অধিবেশনের পূর্ব্বাহ্ণে খবরের কাগজে যে সকল প্রস্তাবাবলী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে মনে হয় যে ঐরূপ কোনও একটা গুপ্ত অভিযান সত্য সত্যই চলিতেছে। নহিলে স্বাধীন ভারতের প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে ঐরূপ অবাস্তব ফাঁকা আওয়াজ ও সাধু উদ্দেশ্যপূর্ণ ভূয়া কথার ছিনিমিনি খেলা হইত না। দেশের সাধারণের দুঃখকষ্ট বা অজ্ঞানতা মোচনে দেশের চালকদিগের প্রতি কোন নির্দ্দেশ ইহাতে নাই, কংগ্রেসের আদর্শ খর্ব্ব হইয়া দেশ কিরূপে অনাচারমগ্ন হইতেছে তাহারও কোন আলোচনা প্রসঙ্গ ইহাতে নাই।

সর্ব্বাগ্রে মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্কে যে প্রস্তাবনা করিয়া পরিষদ স্মৃতিতর্পণ ও কর্ত্তব্য পালনের পর্ব্ব শেষ করিয়াছেন তাহার সারাংশ দিয়ে দেওয়া হইল:

"দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেসকে কখনও ক্লেশ, কখনও সার্থকতা, কখনও বিজয়, কখনও পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু জাতির জনকের সুমহান্ নেতৃত্বে এই ক্লেশ জনসাধারণকে অগ্নিশুদ্ধ করিয়াছে, পরাজয় জাতীয় প্রচেষ্টায় দ্বিগুণ উৎসাহের সঞ্চার করিয়া বিজয়ের সূচনা করিয়াছে।

"দুই বৎসর পূর্ব্বে এক সঙ্কটকালে মীরাট শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, এই সঙ্কটের মধ্যেও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বই জাতিকে পরিচালিত করিয়াছে। এই দুই বৎসরের মধ্যে আমাদের কতক পরিমাণ সার্থকতা আসিয়াছে, দীর্ঘদিনব্যাপী স্বাধীনতা-সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু এজন্য আমাদের যে মূল্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা খুবই বেশী। জন্মভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছে। এই অবাঞ্ছিত দেশ বিভাগে জনসাধারণের মধ্যে উন্মত্ততা দেখা দেয়। মনে হয় যে, কংগ্রেসের আদর্শ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। গান্ধীজীর উদাত্ত বাণী সেই অন্ধকারের মধ্যেও আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করে, শোকাভিভূত অসংখ্য নরনারী সেই বাণী হইতে শক্তি ও সান্ত্বনা সংগ্রহ করিয়াছিল।

"ইহার পর আমাদের প্রতি চরম আঘাত আসে। প্রেম এবং শান্তির প্রতীক যিনি, ভারতের অপরাজেয় অন্তরাত্মার প্রতীক যিনি, সেই মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হইল।

"ইহার ফলে কংগ্রেসের দীর্ঘ সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হইলেও ইহা মুক্তির আনন্দ না আনিয়া দুঃখ এবং বিভ্রান্তই আনিয়া দিল।

"স্বাধীনতা অর্জ্জনের ষোল মাস পরে এবং কংগ্রেসকে যিনি গঠন করিয়াছেন, ইহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এগার মাস পরে কংগ্রেস সেই মহান্ আত্মা এবং তাঁহার বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে এবং প্রতিজ্ঞা করিতেছে যে, সেই সঞ্জীবনী বাণী অনুসরণ করিয়াই কংগ্রেস ভারত ও বিশ্ব-মানবের সেবা করিয়া যাইবে।

"ভারত স্বাধীনতা পাইয়াছে, কিন্তু ইহার ফলভোগের জন্য আমাদের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। কংগ্রেস-সেবীদের মনে রাখিতে হইবে জনসেবার ভার গ্রহণ করিবার গুরুদায়িত্ব তাহাদের রহিয়াছে এবং যাহারা এই দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য ভুলিয়া চাকুরী এবং ক্ষমতার জন্য লালায়িত হয়, তাহারা দেশের অহিতসাধন করিতেছে।

"ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যের এবং মিলনের ভাব বৃদ্ধি করিতে হইবে, শ্রেণী-বিভেদ দূর করিতে হইবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রেণীহীন গণতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ছিল গান্ধীজীর উপদেশ। তিনি বলিয়াছেন, নৈতিক আদর্শের প্রতি অবিচলিত থাকিতে হইবে, ইহাই জীবনকে অর্থপূর্ণ করিবে।"

এই তর্পণমূলক প্রস্তাবটিতে বিশেষ দ্রষ্টব্য এইমাত্র যে, দেশপিতার আকস্মিক মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ও আদর্শ সম্পর্কে তাঁহার স্বলিখিত যে সকল নির্দেশ "হরিজনে" ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল সে সম্পর্কে কংগ্রেস-চালক-পরিষদ একেবারে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন।

সর্দ্দার প্যাটেল ও পুলিস

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতীয় কংগ্রেস-শাসনযন্ত্রের সবল দক্ষিণ বাহু স্বরূপ এবং তিনি বাস্তবেও বিশ্বাসী। তাঁহার জীবনের সন্ধ্যা উপস্থিত, এখন তাঁহার খোলা কথা বলিবার সময় হইয়াছে। দিল্লীর পুলিসবাহিনীকে তিনি বলিয়াছেন :—

"আপনারা জনসেবার মনোভাব লইয়া কাজ করিবেন এবং জনসাধারণের আস্থাভাজন হইবেন।" "জনসাধারণ গবর্মেণ্ট সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করিবে তাহা প্রধানতঃ আপনাদের কাজের উপরই নির্ভর করে।"

"ভারত স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে পুলিসের কাজের ফলে জনসাধারণের সহিত তাহাদের প্রায়ই বিরোধ উপস্থিত হইত। পুলিস তখন জনসাধারণের নিকট অপ্রিয় ছিল। সমগ্র দেশব্যাপী পুলিসবাহিনীর এই কুখ্যাতি রহিয়াছে। এই কুখ্যাতি আজও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। এত দীর্ঘদিন ধরিয়া যাহার অস্তিত্ব ছিল তাহা দূর হইতে সময় লাগিবে।"

"কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। ভারত স্বাধীন হইয়াছে এবং জাতীয় গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুলিস এবং জনসাধারণের মনোভাবেরও পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন। দক্ষ এবং জনপ্রিয় পুলিসবাহিনী ব্যতীত গবর্মেণ্ট পরিচালনা সম্ভবপর নহে। আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষা করা পুলিসের কার্য্য এবং সর্ব্বত্র শান্তি রক্ষিত না হইলে নাগরিক জীবন যাপন অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং পুলিসের কার্য্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সরকারের জনপ্রিয়তা তাহাদের কার্য্যের উপরই নির্ভর করে।"

"পুলিসবাহিনী এমন শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন যেন আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষার জন্য কখনও সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন না হয়। সৈন্যবাহিনী দেশের সীমান্ত রক্ষা করিবে, আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীর সহায়তা প্রয়োজন হইলে উহা গবর্ণমেণ্টের দক্ষতার পরিচায়ক নহে।"

"আপনারা জনসাধারণের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করিবেন এবং তাহাদের আস্থাভাজন হইবেন। ইহা খুব কঠিন কাজ নহে। পুলিস যদি আন্তরিকতার সহিত জনসাধারণের সেবা করে, জনসাধারণের সহযোগিতা না পাইবার কোন কারণ নাই। পুলিসবাহিনীর সকলেই শান্তিকামী জনসাধারণের সেবক। যাহারা আইনভঙ্গ করে তাহাদের প্রতিও কঠোর ব্যবহার করা উচিত নয়। ইহাদিগকে শান্তিপ্রিয় নাগরিক করিয়া তোলাই পুলিসের কাজ।"

ইহা খুব আশাপ্রদ খাঁটি ভাষণ। কংগ্রেস-নেতৃবর্গকে এই জাতীয় কিছু উপদেশ দিলে দেশের উপকার হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শাসনকার্য্যে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের হস্তক্ষেপ

শাসনকার্য্যে, বিশেষতঃ ফৌজদারী মামলার বিচারে, কংগ্রেস কমিটিসমূহের সভাপতি ও সম্পাদকদের হস্তক্ষেপ প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং ইহার ফলে বিচারবিভ্রাট প্রায়শঃই ঘটিতেছে। ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এই ধরণের কার্য্যে সাধারণ লোকের যেমন অসুবিধা ঘটিতেছে, তেমনই লোকে কংগ্রেসের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে। কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন লোকের এই কার্য্যের ফলে সাধারণ লোকে সমগ্র কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানের উপর দোষারোপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কংগ্রেসের সুনামের পক্ষে ইহা অত্যন্ত হানিকর।

সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি একটি মামলার বিচারকালে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের এই ধরণের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আদালতে মামলা চলিতে থাকাকালে কোন কংগ্রেস-কর্ম্মী পক্ষ-বিশেষের হইয়া কোন রিপোর্ট দাখিল করিলে তাহা আদালত অবমাননার সামিল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কারণ উহা আদালতের বিচারকে প্রভাবান্বিত করে। পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁহার রায়ে তীব্র মন্তব্য করিয়া বলেন যে ফৌজদারী মামলার বিচারকালে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের হস্তক্ষেপ বড় বেশী ঘটিতেছে, ইহা বন্ধ হওয়া দরকার। এই ধরণের হস্তক্ষেপ হওয়ামাত্র তাঁহাদিগকে আদালত অবমাননার অভিযুক্ত করিবার জন্য প্রধান বিচারপতি নিম্ন আদালতসমূহকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, হয় তাঁহারা নিজেরা উহা করিবেন নতুবা হাইকোর্টকে জানাইবেন; হাইকোর্ট তাঁহাদের নামে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনিবেন। বিহারের একটি মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এক জমি দখলের মামলায় হস্তক্ষেপ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন এবং উহাতে মামলার মোড় ঘুরিয়া যায়। ব্যাপার হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়াইলে প্রধান বিচারপতি উপরোক্তরূপ তীব্র মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশেও এই শ্রেণীর হস্তক্ষেপ খুব বেশী রকম আরম্ভ হইয়াছে। এখানে এই অন্যায় আর বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই বন্ধ হওয়া দরকার।

ব্যক্তিস্বাধীনতা

ভারতবর্ষের নূতন রাষ্ট্রবিধিতে ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারাটি সামান্ত সংশোধনের পর গৃহীত হইয়াছে। রাষ্ট্রবিধির ১৩ ধারায় ব্যক্তিস্বাধীনতার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এবং ৯ ধারায় বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কোচ করিয়া কোন আইন ভারতবর্ষের কোন আইনসভা পাশ করিতে পারিবে না। প্রচলিত আইনসমূহের মধ্যে যেগুলি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ধারার পরিপন্থী সেগুলিও বাতিল হইয়া যাইবে। মানুষে মানুষে বৈষম্যমূলক কোন ব্যবস্থা অবশ্য ব্যক্তিস্বাধীনতা-রূপে গণ্য হইবে না এবং তাহা দূর করিবার জন্ত আইন প্রণয়নে কোন বাধা থাকিবে না।

রাষ্ট্রবিধির ১৩ ধারায় রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ দেওয়া হইয়াছে :

(১) বক্তৃতা ও রচনার স্বাধীনতা।

(২) নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা।

(৩) সঙ্ঘ ও ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা।

(৪) ভারতের সর্ব্বত্র অবাধে চলাফেরার স্বাধীনতা।

(৫) ভারতের যে কোন স্থানে স্থায়ী ও অস্থায়ী বসবাসের স্বাধীনতা।

(৬) সম্পত্তি অর্জ্জন, ভোগ ও বিক্রয়ের স্বাধীনতা।

(৭) ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা জীবিকার্জ্জনের স্বাধীনতা।

প্রত্যেকটি স্বাধীনতার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আবার ঐগুলি সঙ্কোচ করিবার অধিকার রাষ্ট্রকে দেওয়া হইয়াছে। ইহাই ভারতীয় রাষ্ট্রবিধির ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারাটির বিশেষত্ব। যথা, বক্তৃতা ও রচনার স্বাধীনতা ১৩ (১) (ক) ধারায় স্বীকার করিয়া ১৩ (২) ধারায় বলা হইয়াছে যে মানহানি, সিডিশন অথবা দুর্নীতিমূলক কার্য্যকলাপ অথবা রাষ্ট্রের ক্ষমতা বা বনিয়াদ ধ্বংসকারী কার্য্যকলাপ প্রভৃতি নিবারণের জন্ত বক্তৃতা ও রচনার স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিয়া আইন প্রণয়ন করিলে তাহা ১৩ (১) (ক) ধারার পরিপন্থী হইবে না। অন্যান্য বিষয়গুলি সম্বন্ধেও এই ভাবে স্বাধীনতা দানের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সঙ্কোচের অধিকারও দেওয়া হইয়াছে। গণ-পরিষদে বিতর্কের সময় কথা উঠে যে আমেরিকান রাষ্ট্রবিধিতে ব্যক্তিস্বাধীনতার সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে এবং কোন সময়েই উহাতে হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা শাসন বিভাগ বা আইনপ্রণেতাদের দেওয়া হয় নাই। পৌনে দুই শত বৎসর যাবৎ এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। ভারতীয় রাষ্ট্রবিধিতেও ব্যক্তিস্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ এই ভাবেই হওয়া উচিত। এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। রাষ্ট্রবিধির খসড়ার ধারাগুলি যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে সেই ভাবে গৃহীত হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাধানতার সঙ্কোচ যে কি ভাবে হইতে পারে তাহা বর্ত্তমান প্রচলিত সিকিউরিটি আইনে দেখা গিয়াছে। আইনটি কম্যুনিষ্ট দমনের মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া প্রণীত হয় কিন্তু পরে উহা যেভাবে প্রযুক্ত হইতেছে তাহাতে সুপরিচিত কম্যুনিষ্ট বিরোধী কর্ম্মীও উহার কবল হইতে রেহাই পায় নাই। সম্প্রতি আইনটি সংশোধন করিয়া এমন করা হইয়াছে যে উহার প্রয়োগ ব্যাপারে হাইকোর্টেরও হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কোচমূলক ব্রহ্মাস্ত্রটির প্রয়োগ এখন শাসকদের হাতে নিরঙ্কুশ ভাবে বর্ত্তিয়াছে। ভবিষ্যতেও এই ভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও বনিয়াদ ধ্বংসকারী কার্য্যকলাপ নিবারণের নামে ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কোচমূলক আইন প্রণয়ন করিয়া উহা বিপক্ষ দলের বা ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত হইবে এই আশঙ্কা আদৌ অমূলক নহে। ১৩ ধারায় অন্ততঃ এইটুকু উল্লেখ থাকা উচিত ছিল যে ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কোচমূলক কোন আইন প্রণয়নের সময়ে আদালতের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করা চলিবে না। আদালত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ আলোচনা কালেও এই ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ব্যক্তিস্বাধীনতার সর্ব্বপ্রথম বিষয় বিনা বিচারে গ্রেপ্তার না হওয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারা আলোচনার দিন পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ভাইস-প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে গণ-পরিষদে কোরাম নাই। তখন কোরামের ঘণ্টা বাজানো হয় এবং কয়েকজন সদস্য উহা শুনিয়া পরিষদগৃহে প্রবেশ করেন। তাঁহারা পরিষদ-গৃহের আশেপাশেই ছিলেন কিন্তু আলোচনায় যোগদানের জন্ত উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ইঁহারা আসিবার পরও উপস্থিত সদস্য-সংখ্যা নিতান্ত কম মনে করিয়া ভাইস-প্রেসিডেন্ট ১৫ মিনিটের জন্ত পরিষদের কাজ মুলতুবী রাখেন। রাষ্ট্রবিধি প্রণয়ন, বিশেষভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক পরিচ্ছেদ আলোচনায় বর্ত্তমান কংগ্রেস সদস্যবৃন্দের উৎসাহ ও দায়িত্ববোধ কতখানি এই ঘটনা তাহার সামান্ত পরিচয় মাত্র। ইঁহারা যে কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছেন তাহার জন্ত দিল্লী যাওয়া-আসার প্রথম-শ্রেণীর গাড়ী-ভাড়া ব্যতীত সেখানে অবস্থানের জন্ত বোধ হয় দৈনিক ৪৫৲ টাকা করিয়া ভাতাও পাইতেছেন।

ভারতরাষ্ট্রের ও পাকিস্থানের সীমানা

গত ২২শে অগ্রহায়ণ হইতে এই দুই রাষ্ট্রের প্রধানগণ নূতন দিল্লীতে মিলিত হইয়াছেন। সংবাদ পাইলাম যে এই সম্মেলনের প্রথম দিনে ৭টি কমিটি গঠিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে চতুর্থটি হইতেছে ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নানা "পাকিস্থানী" গণ্ডগোল লইয়া। সংবাদপত্রে এই বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে—পূর্ব্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ-আসাম এবং পূর্ব্ব-পঞ্জাব-পশ্চিম-পঞ্জাবের সীমানা-বিরোধ

কমিটি পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও ত্রিপুরার সীমানা বিরোধ ও ঘটনাবলীর এবং পূর্ব্ব-পশ্চিম পঞ্জাব সীমান্তের ঘটনাবলীর আলোচনা এবং (১) বিরোধসমূহের নিষ্পত্তি ও (২) এইরূপ ঘটনাবলী বন্ধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাব করা। আমরা পূর্ব্ব-পঞ্জাবের পশ্চিম সীমান্তে গোলাগুলি বর্ষণের কথা শুনিয়াছি; সম্মেলনের অধিবেশন সময়ে পর্য্যন্ত তাহা চলিতেছে; উভয় রাষ্ট্রের পুলিশ-বাহিনী পর্য্যন্ত ইহাতে লিপ্ত। সংবাদপত্রের বিবরণ পাঠ করিয়া এই ব্যাপারে দোষী-নির্দোষী নির্দ্দেশ করা সহজ নয়, এবং কলিকাতায় বসিয়া তাহা করিতেও চাহি না। ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্তের উত্তর হইতে দক্ষিণে যে বিভাগরেখা র‍্যাডক্লিফ সাহেব টানিয়া দিয়াছেন আসাম হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত, তৎসম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। তাহার ফলে আমরা বলিতে চাই—পূর্ব্ববঙ্গের "পাকিস্থানীদের" লোভ সংযত না হইলে, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিরক্ষা করা কঠিন হইবে। মুর্শিদাবাদ ও কাছাড় অঞ্চলে যে চোরাগুপ্তি আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ চলিতেছে, ইহার উল্লেখ না করিয়াও আশঙ্কার কারণ আছে।

দিল্লীর সম্মেলনে এই সব কথা উঠিবে। কিন্তু ৪নং কমিটির নির্দ্দেশনামার মধ্যে একটা বিষয়ের অনুল্লেখ দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা-নামার সংশোধনের কথার উল্লেখ কেন করা হয় নাই, তার কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। "আনন্দবাজার-পত্রিকার" সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য এই বিষয়ে বার-তেরটি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই বাঁটোয়ারা-নামার সংশোধন অপরিহার্য্য। এতৎসম্বন্ধে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ১৯৪৭ সালের ১৯শে আগষ্টের বিবৃতির একাংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনার দাবীর যুক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন: "বর্ত্তমান বাঁটোয়ারার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ভারত ও পাকিস্থানের নেতারা ভবিষ্যতে পরস্পর আপোষ বন্দোবস্ত করিবেন; ইহার প্রতিবন্ধক কিছু নাই।" উক্ত বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে দুই পক্ষেরই "আপত্তির হেতু আছে," এই স্বীকৃতির পর কেন এই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয় নাই, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়।

পাকিস্থান ও ত্রিপুরা রাজ্য

ত্রিপুরা রাজ্যের উপর প্রায় দুই মাস যাবৎ পাকিস্থানীদের আক্রমণ চলিতেছে। রাজ্যটির অর্থনৈতিক অবরোধ বসানো হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাজ্যের কর্ম্মচারীদের সীমান্তের নিকটে পাইলেই পাকিস্থানীরা তাহাদিগকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে; অনেক ক্ষেত্রেই অফিসারকে অতিশয় নৃশংসভাবে হত্যা করাও হইয়াছে। রাজ্যের মধ্যে হানা দিয়া লুঠ করা, ঘরে আগুন দেওয়া প্রভৃতি ক্রমেই বাড়িতেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মুসলমান প্রজাদের উপর অত্যাচারের কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করিয়া পাকিস্থানীদের উত্তেজিত করা হইতেছে এবং এই কার্য্যে নোয়াখালীর অনেক সুখ্যাত লীগনেতা সকলের অগ্রণী বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কাজই কলিকাতা আন্তঃডোমিনিয় চুক্তির পরিপন্থী, বহুবার পূর্ব্ববঙ্গ সরকারকে এই সমস্ত অন্যায় কার্য্যের বিবরণ জানাইয়াও কোন ফল হয় নাই।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা জেলায় এই মর্ম্মে এক ছাপানো ইস্তাহার বিলি করা হইয়াছে যে, ত্রিপুরারাজ্যের ভারত ডোমিনিয়নে যোগদান নিন্দনীয় কার্য্য হইয়াছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃত অধিকারী পাকিস্থানীরা; কোন পার্থিব শক্তি পাকিস্থানীদের এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

এই ব্যাপারে পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস প্রভৃতির নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। "আজাদ" পত্রে পূর্ব্ববঙ্গের জনৈক মন্ত্রীর যে সব উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ঐ গবর্ণমেণ্টের কর্ণধারগণের ত্রিপুরা সম্বন্ধে মনোভাব কি তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষাত্রবৃত্তি

পশ্চিমবঙ্গে সামরিক সংগঠন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ অন্যত্র প্রকাশিত হইল। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের পর হইতে প্রতি মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় যে সব সম্পাদকীয় মন্তব্য এই বিষয়ে প্রকাশিত হইয়াছে, প্রবন্ধ-লেখক তাহা প্রমাণ-প্রয়োগে সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীমনবাহাদুর সিং জাতিতে গোর্খা হইলেও আদর্শ ও মননশীলতায় তাঁহাকে বাঙালী হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার উপায় তিনি রাখেন নাই। এই প্রবন্ধই তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। একজন অবাঙালী এমন ঝরঝরে বাংলা লিখিতে ও বলিতে পারেন, তাহা সহজে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু সিং মহাশয় সে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যেই পরিচয় পাওয়া যায় যে, প্রায় চল্লিশ বৎসর হইতে তিনি বাঙালী জীবনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 'বাঙালী পল্টনে' যোগদান হইতে আজ পর্য্যন্ত তিনি বাঙালীর মধ্যে ক্ষাত্রবৃত্তি পুনরুত্থানের দুরূহ কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন বলিলে অন্যায় হইবে না। এই বিষয়ে তাঁহার বাস্তব জ্ঞান কত গভীর বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে সামরিক বৃত্তি প্রবর্ত্তন করা সহজ হইবে না। এই বিষয়ে আমরা প্রতি সংখ্যায় আমাদের নেতৃবর্গের মনো-যোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রদেশের দুইটি মন্ত্রিমণ্ডল—ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের

নেতৃত্বে গঠিত। ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমরা মাসের পর মাস এই সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন জানাইতেছি। ডাঃ ঘোষের নিকট হইতে কোন উত্তর পাই নাই; গান্ধীবাদী বলিয়া বোধ হয় সামরিক বৃত্তির প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা ছিল। ডাঃ রায় এই বিষয়ে সজাগ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তিনিও নানা বাধানিষেধ ও অনভিজ্ঞতার জালে পদে পদে আটকাইয়া যাইতেছেন। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের সামরিক নিয়মকানুন এই সব বাধার সৃষ্টি করিয়াছে; ইংরেজের পরিত্যক্ত ঠাট বজায় রাখিয়াই তাঁহারা দিনগত পাপক্ষয় করিয়া যাইতেছেন। কাশ্মীর অভিযানও নূতন করিয়া কোন কিছু করিবার অবকাশ দিতেছে না। কিন্তু ডাঃ রায়ের আসল প্রতিবন্ধক তাঁহার প্রদেশের লোকের নিশ্চেষ্টতা; সামরিক বৃত্তি সম্বন্ধে অনুৎসাহ। শ্রীমন বাহাদুর সিং ১৯১৮-১৯ সালের বাঙালী নেতৃবর্গের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, আজও তাহা অনেকাংশে প্রযোজ্য। শিখ, গাড়োয়ালী, গোর্খা, রাজপুত, মারাঠি, মাদ্রাজী ইংরেজ আমলে বাংলাদেশের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে এবং আজও তাহা করিবে এই ভরসায় আমরা দিন কাটাইতেছি। এই মনোভাবের পরিবর্তন না হইলে 'বাবু' জা'ত বাঙালীর হাতে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া কোন ফল হইবে না। শ্রীমন বাহাদুর সিং বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অকাট্য সত্য, এবং তাহা আমাদের আত্মাভিমানে আঘাত দিতে পারে। এরূপ আঘাতের প্রয়োজন আছে বলিয়াই আমরা এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট ইহাই হইল বড় সমস্যা—বাঙালীর মনকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। অনুরূপ কাজ যুগে যুগে জাতির সংগঠক-প্রধানদের করিতে হয়। অপরিচিত, নূতন নূতন শ্রেণী হইতে 'ক্ষত্রিয়' সংগ্রহ করার বৃত্তান্ত এই দেশের ইতিহাসে আছে। 'অগ্নিকুল' ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি রাজপুতানার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ; মহারাষ্ট্রের 'চিৎ-পাবন' ব্রাহ্মণ শ্রেণী সম্বন্ধে এইরূপ একটা কিংবদন্তী আছে। 'অগ্নি' সংস্কারের কল্যাণে অহিন্দু হিন্দু হইতে পারে, অনার্য্য আর্য্য হইতে পারে, লেখনী বৃত্তির লোকের অসিবৃত্তি অবলম্বনের পথ সুগম হইতে পারে, এই কথা আমাদের দেশের লোকের মনে জাগরূক থাকিলে আজ বাঙালী-প্রধানদের অন্ধকারে চারিদিকে হাতড়াইতে হইত না। 'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি' —এই কথা বলিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দুঃখ করিয়াছিলেন। আজও সে কলঙ্ক আমাদের মোচন হয় নাই। গুরুসদয় দত্ত 'রায়বেশে' নৃত্যের ইতিকথা আমাদের শুনাইয়াছেন; তাহা ছিল সামরিক 'জাতি' ও 'শ্রেণী'র উন্মাদনায় পূর্ণ। আমরা 'রায়বেশে'র নৃত্যের প্রদর্শনী দেখি, কিন্তু তাহার ইতিহাস জানি না বলিয়া তাহার পূর্ব্ব গৌরবের সঙ্গে বর্ত্তমান বাঙালী জীবনের কোন সম্পর্ক আছে বা থাকিতে পারে বলিয়া মনে করিতে পারি না। বাঙালী সৈন্যাধ্যক্ষ পাওয়া যাইলেও বাঙালী পদাতিক পাওয়া যায় না, তাহার রহস্যও এই আত্মবিস্মৃতির মধ্যে আছে। আজ বাঙালীকে 'সামরিক' জাতিতে পরিণত করিতে হইলে পূর্ব্ব ইতিহাসের জের টানিয়া নূতন সংস্কারের সৃষ্টি করিতে হইবে। এইরূপ সৃষ্টিকার্য্যের ক্ষেত্র—বাঙালী জীবনের জমিনের এক বৃহদংশ চাষের অভাবে পতিত রহিয়াছে। আবাদ করিলে সোনা ফলিবে। কে হইবেন এই আবাদকারী? ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সম্মুখে, তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীর সম্মুখে এই কর্ত্তব্যপথ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আছে।

কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের পুরাতন আইন-কানুনের বাধা আজ মনে হয় আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতেছে। প্রায় পনর দিন পূর্ব্বে কলিকাতার দৈনিক পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার মধ্যে এইরূপ ভরসার একটা ইঙ্গিত দেখিতেছি। ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া নামক সংবাদ-বিতরণী প্রতিষ্ঠান এই সংবাদ দিয়াছিলেন।

"The Government of West Bengal have promulgated the West Bengal National Volunteer Force Ordinance, 1948, which empowers the Government of West Bengal to raise and maintain a Volunteer Force to be called the West Bengal National Volunteer Force."

এই সংবাদের মর্ম্মার্থ আমরা এইভাবে বুঝিয়াছি। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নানা শ্রেণীর সৈন্যবাহিনী Regular Army, Territorial Force, Cadet Corps—রীতিমত সৈন্যবাহিনী, আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী যাহারা রীতিমত সৈন্যবাহিনীর পৃষ্ঠরক্ষা করিবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রবৃন্দ সামরিক বিদ্যার প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগে পণ্ডিত, এই শেষোক্ত দল গঠন করিবেন। পশ্চিমবঙ্গে এই শিক্ষাদানের, এরূপ সামরিক বাহিনী সংগঠনের ব্যবস্থা সর্ব্বভারতীয় ব্যবস্থার অঙ্গরূপে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনী West Bengal National Volunteer Force—এই ব্যবস্থার অতিরিক্ত। এই বিষয়ে আমাদের ব্যাখ্যা সঙ্গত কিনা তাহা মন্ত্রিমণ্ডলীর কোন মুখপাত্র বলিয়া দিলে ভাল হয়।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিমণ্ডলীকে বাঙালীর মধ্যে নূতন ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টিকার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। তাহার জন্য সমস্ত বাঙালী জাতিকে অগ্নিসংস্কারের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে হইবে। আমাদের জাতীয় চরিত্রে যে দুর্ব্বলতা, যে ক্ষুদ্রতা, যে পল্লবগ্রাহিতা, শরীর মনে যে আলস্য শিকড় বাঁধিয়াছে, তাহা এই আগুনে পুড়িয়া যাইবে। অগ্নিশুদ্ধ হইয়া নূতন বাঙালী ভাবের সঙ্গে ধর্ম্মের, চিন্তার সঙ্গে পরিশ্রমের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবতার সমন্বয়-সাধন করিবে। এই আশায়ই আমরা বাঁচিয়া আছি, এই বলিষ্ঠ জীবন রূপায়িত দেখিবার জন্য নিজের ক্ষুদ্র চেষ্টা ও শক্তি নিয়োজিত করিয়াছি।

পূর্ব্বাচল প্রদেশ

অব্যবস্থিতচিত্ত লোকের প্রসাদ, দান, ভয়ঙ্কর হইতে পারে, এই পুরাতন সাবধানবাণী নূতন করিয়া বুঝিতেছি আমরা কংগ্রেসের নূতন নেতৃত্বের কল্যাণে। গত সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের সর্ব্বোচ্চ পরিচালকমণ্ডলী একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে কংগ্রেসী বিধানে একটি নূতন প্রদেশের নাম যোগ করিলে মন্দ হয় না। এই সংবাদে নূতন কাছাড় জিলা, ত্রিপুরা রাজ্য ও মণিপুর রাজ্যের লোক উৎসাহিত হইয়া উঠে। এই প্রস্তাবকে রূপ দিতে পারিলে আসাম প্রদেশের বর্ত্তমান শাসক-সম্প্রদায়ের অনাচার ও অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তিলাভের একটা সম্ভাবনা দেখা দিবে এই ভরসায়। প্রায় ২৫ লক্ষ অসমীয়া-ভাষাভাষী যেরূপ করিয়া ৪৫ লক্ষ অ-অসমীয়া-ভাষাভাষীর উপর নবাবী চালাইতেছে, তাহা আর বেশী প্রশ্রয় পাইলে ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্ত অশান্ত হইয়া উঠিবে। আসামের পঁচিশ লক্ষ বাঙালীর, আট-নয় লক্ষ মণিপুরী, পাঁচ-ছয় লক্ষ মিজো-লুসাই, টিপ্‌রা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি বর্ত্তমান বড়দলৈ মন্ত্রিসভার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে, এবং কংগ্রেস পরিচালকমণ্ডলীর প্রস্তাবে আমরা বুঝিয়াছিলাম যে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট এই সমস্যার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু নবেম্বর মাসে সেই মণ্ডলীই মত বদলাইয়াছেন। তাহার কোন কারণ প্রদর্শন করিবার দায়িত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। দেশের লোকের বুদ্ধিবৃত্তির উপর এই অবিশ্বাসের ফল কি দাঁড়াইতে পারে, সেই সম্ভাবনার কথা মনে করিয়া আমরা পণ্ডিত নেহরু, সর্দ্দার প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে সাবধান করিয়া দিতে চাই।

আন্দামানে বাঙালী উপনিবেশ

প্রথমাবধি আমরা এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছি। পূর্ব্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ হিন্দু আন্দামানে নূতন জীবন গড়িয়া তুলিতে পারিবে, এই ভরসা করিয়া নয়। আজ তাহাদের জীবনে যে হতাশার ও ব্যর্থতার ভাব দেখা দিয়াছে, তাহার জন্য চাই একটা প্রতিষেধক। সেই প্রতিষেধক আসিবে গঠন-মূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টায়, তাহা যেখানেই হউক। "ঘরমুখো" বাঙালী জাতির কলঙ্ক মোচন হউক। আন্দামান দ্বীপ একটা নিমিত্তমাত্র।

সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গ হইতে শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতির নেতৃত্বে যে অনুসন্ধানমণ্ডলী বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত এই দ্বীপপুঞ্জে গমন করে তাহার সার্থকতা আমরা কামনা করিয়াছি। তাঁহাদের সঙ্গে একই জাহাজে পূর্ব্ব-পঞ্জাব হইতেও কয়েকজন সরকারী ও বেসরকারী অনুসন্ধানকারী গিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিচয় কলিকাতার কোন সংবাদপত্র দেন নাই। বাংলার মন্ত্রীর পক্ষেই প্রচারকার্য্য চলিয়াছে। মন্ত্রিমহাশয় দেশে ফিরিয়াছেন। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের নিকট তাঁহার বক্তব্য বলিবার জন্য আমন্ত্রণ পাইয়া দিল্লী গিয়াছেন শুনিয়াছি। তৎপূর্ব্বে তিনি সংবাদপত্রের মারফতে জানাইয়াছেন যে আন্দামান দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের জমি আছে; নূতন ভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন গঠন করিয়া তুলিবার অবসর আছে। কত লোকের সংকুলান হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলেন নাই। ভাসাভাসা ভাবে অনেক আশার কথা শুনাইয়া তিনি গিয়াছেন। তাঁহার দলের ২১৪ জনকে রাখিয়া আসিয়াছেন আরও ব্যাপক অনুসন্ধান করিবার জন্য। তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দুর নেতৃস্থানীয় বা প্রতিনিধি পর্য্যায়ের কে বা কাহারা ছিলেন, তাহা আমরা জানি না। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুকে বুঝাইয়া, "কালাপানির" ভয় ভাঙাইতে পারে, এরূপ কেহ ছিলেন কিনা তাহাও আমাদের জিজ্ঞাস্য।

কারণ আমরা মনে করি যে বাঙালী সমাজের সুখঃদুখের মায়া কাটাইয়া যাইবার প্রচেষ্টায় যাঁহারা উৎসাহ দিতে যাইবেন, তাঁহাদের "আপনি আচরি ধর্ম্ম" তাহা শিখাইতে হইবে। নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া যাঁহারা এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিবেন, তাঁহারাই হইবেন বাংলার বাহিরে "বৃহৎ বঙ্গের" প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহাদের যাঁহারা অনুগামী হইবেন তাঁহাদের কোন শ্রমকে ভয় করিলে চলিবে না।

এত ব্যাপক প্রচারের মধ্যে যাহা আরম্ভ করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আর একটা কথা আমরা শুনাইয়া রাখিতে চাই। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের নিকট হইতে কোনরূপ স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না পাইয়া থাকিলে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলীর এই বিষয়ে কোন ভরসার কথা উচ্চারণ করা সঙ্গত হইবে না। যদি পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু প্রধানদের কেহ নিজে উদ্যোগী হইয়া নিজের ব্যয়ে এইরূপ একটা অভিযান লইয়া যাইতে পারিতেন তবে তাঁহাদের দাবি অগ্রগণ্য হইত, তাঁহাদের সহকর্ম্মীদের শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতির নেতৃত্বে আজ যাহা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে বাঙালীর শক্তির কোন প্রমাণ নাই; উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য সংগঠন-শক্তির পরিচয় নাই। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের খেয়াল অনুসারে তাঁহাদের চলিতে হইবে। সেই খেয়ালের প্রকৃতি আমরা "পূর্ব্বাচল" প্রদেশের প্রস্তাবে দেখিয়াছি।

রেল-দুর্ঘটনা

আমাদের দেশে অসতর্কতার জন্য কত লোক প্রাণ হারাইতেছে অথবা জীবনের মত পঙ্গু হইয়া রহিতেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গল নাগপুর রেলের গত পাঁচ মাসের খতিয়ান হইতে তাহা বুঝা যায়। ১৯৪৮ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে ৮৪৭ জন লোক অসতর্কতার জন্য নিহত

আহত হইয়াছে। ইহার মধ্যে গাড়ীতে স্থানাভাবে পা-দানিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া পিছলাইয়া পড়িয়া ২৬৪ জন, সিগনাল-পোষ্টে ধাক্কা লাগিয়া ১৯ জন এবং চলন্তি গাড়ীতে উঠিবার জন্ত ঠেলাঠেলি করিতে গিয়া প্লাটফর্ম ও রেলের মাঝখানে পড়িয়া ১২ জন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হইয়াছে। এ তো গেল ভীড় ও স্থানাভাবজনিত দুর্ঘটনা। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার এই যে, নিছক অসতর্কতার জন্ত গাড়ীচাপা পড়িয়াছে ৩৮৮জন। শান্টিং-এর সময়ে দুইটি চলন্ত মালগাড়ীর মাঝখান দিয়া তাড়াতাড়ি লাইন পার হইতে গিয়া তিন ব্যক্তি উহার মাঝে পড়িয়া মরিয়াছে অথবা গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। চলন্তি গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ৪৩ জন হতাহত হইয়াছে। লাইনের উপর গাড়ী চাপা পড়িয়া ১৩০ জনকে মৃত বা অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে।

বেঙ্গল নাগপুর রেলের হিসাবে দেখা যায় যে ১৭২ জন তাড়াতাড়ি চলন্তি ট্রেনের সম্মুখ দিয়া লাইন পার হইতে গিয়া কাটা পড়িয়াছে; ইহার মধ্যে ১২৭ জনই মারা গিয়াছে। পাদানিতে দাঁড়ানো লোকদের মধ্যে ৩৫ জন আহত ও ৪ জন নিহত হইয়াছে। চলন্তি ট্রেনে উঠিতে বা নামিতে গিয়া ৪৮ জন হতাহত হইয়াছে।

শিক্ষার অভাবে একটা দেশের লোক নিজের হিতাহিত বিষয়ে পর্য্যন্ত কত দূর কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইতে পারে এই তথ্যগুলি তাহারই নিদর্শন মাত্র।

মাদ্রাজে 'স্পেশাল পে' বাতিল

মাদ্রাজ সরকার উচ্চ বেতনভোগী সরকারী কর্ম্মচারীদের 'স্পেশাল পে' তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কোন কোন শ্রেণীর অফিসারেরা ইংরেজ আমলে নিজ বেতনের উপরে একটা অতিরিক্ত 'স্পেশাল পে' পাইতেন; বর্ত্তমানে উহা বজায় রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই ইহাই মাদ্রাজ সরকারের অভিমত। সেক্রেটারী, বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি এবং বিভাগীয় কর্ত্তাকর্ত্তারা এখন হইতে আর কোন 'স্পেশাল পে' পাইবেন না। তাঁহাদের যানবাহন ভাতা বজায় থাকিবে তবে উহা সাধারণতঃ বেতনের এক-দশমাংশ পর্য্যন্ত হইবে কিন্তু কখনও ১৫০ টাকার বেশী হইবে না। বাড়ী ভাড়া যাহা তাঁহারা এখন পাইতেছেন সেটা ঠিক থাকিবে। পশ্চিমবঙ্গ এখন দরিদ্র প্রদেশ। এখানেও এই ধরণের ব্যয়-সঙ্কোচ আরম্ভ হওয়া উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিশন

স্বাধীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা-ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্ত ভারত-সরকার কর্ত্তৃক একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গঠনতন্ত্র ও কার্য্যাবলী উভয় সমস্তা সম্বন্ধেই কমিশন তদন্ত করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বর্ত্তমান গঠন প্রণালী, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে প্রচুর গলদ রহিয়াছে এবং উহার আমূল সংশোধন ও পরিবর্ত্তন আবশ্যক এ বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। ভারতীয়, ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের লইয়া এই কমিশন গঠিত হইয়াছে। কমিশন শীঘ্রই কলিকাতা আসিবেন। তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া শিক্ষাসমস্যার আলোচনার জন্ত এখন হইতেই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

স্তাডলার কমিশনের রিপোর্টের পর (১৯১৭) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যাবলী ভালভাবে এযাবৎ পর্য্যবেক্ষণ করা হয় নাই। তজ্জন্ত সরকার এ কমিশনের হাতে ব্যাপক ক্ষমতাদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যাহাতে কমিশন দেশের সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান গঠনতন্ত্র, কার্য্যাবলী ও ক্ষমতায় কি কি পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত, কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের সহিত ইহাদের সম্পর্ক কিরূপ হইবে, কমিশন এই সকল ব্যাপারে তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করিবেন।

ভারতীয় যুবকদের গণতন্ত্রের সমস্যাবলীর সহিত পরিচিত করা শিক্ষা-ব্যবস্থার গুরু দায়িত্ব। মানবতা ও বিজ্ঞানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাও কমিশনের অন্ততম আলোচ্য বিষয়। অন্তান্ত বিষয়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংশ্লিষ্ট কলেজসমূহে উঁচুদরের শিক্ষা, পরীক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষকদের যোগ্যতা ও বেতন, ছাত্রদের বাসস্থান, বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের পথ, আঞ্চলিক ও অন্তান্ত ভিত্তিতে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড় মুস্লিম-বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি, শিক্ষার মাধ্যম, গবেষণা-কার্য্যে শিক্ষকদের উৎসাহ দান, ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও চারুকলা শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ও গবেষণা-কার্য্যের ব্যবস্থা এবং উন্নতি সম্পর্কে স্ব স্ব অভিমত জ্ঞাপন করিবার জন্ত কমিশনের সদস্যদের কাছে এক প্রশ্নাবলী দাখিল করা হইয়াছে। দিল্লী অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার পর কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনের এক কর্ম্মসূচী গ্রহণ করিবেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা উত্তর ভারত সফর করিবেন। কমিশন প্রত্যেক কেন্দ্রে ৪ হইতে ৬ দিন অবস্থান করিবেন। আশা করা যায় যে, কমিশন আগামী জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

কমিশন আগামী বৎসর জুন মাসে তাঁহাদের কার্য্যাবলী সমাপ্ত করিবেন বলিয়া মনে হয়।

আন্দামান

সম্প্রতি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাংলা হইতে একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে কয়েকজন সেখানকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। ইঁহারা নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন:

আন্দামানে এখনই যাহাতে নূতন লোক গিয়া বসবাস করিতে পারে তাহার জন্য জঙ্গল কাটা দরকার এবং এই টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া উচিত।

যাহারা সেখানে যাইবে তাহাদের গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পোর্টব্লেয়ার হইতে কলিকাতার মধ্যে একটি সাপ্তাহিক ষ্টীমার সার্ভিস এবং ডাক ও খবরের কাগজ এবং সম্ভব হইলে কিছু যাত্রীবহনের জন্য একটি দৈনিক এরোপ্লেন সার্ভিস খোলা দরকার। এই কার্য্য কেন্দ্রীয় সরকারের করা উচিত।

আন্দামানের তিন ভাগে যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তা তৈরি করা দরকার এবং এই কার্য্যও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে লওয়া উচিত।

সংবাদপত্রে প্রকাশ এই সব প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট উপস্থাপিত করা হইবে।

এই প্রস্তাবগুলির সঙ্গে প্রথমেই একথা বলিলে ভাল হইত যে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে অর্পণ করা হউক। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে অবশিষ্ট কাজ অনেক সহজ হইত। বর্ত্তমানে আন্দামানের জঙ্গল পরিষ্কার, জমি দখল, পোর্টব্লেয়ার ও কলিকাতার মধ্যে অন্ততঃ একটি সাপ্তাহিক ষ্টীমার সার্ভিস এবং আন্দামানে পথঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ হইলেই সেখানে লোকজন যাওয়া সুরু হইতে পারে।

আসামে বাঙালী বিতাড়ন আরম্ভ

আসামে তেজপুর উচ্চ বালিকাবিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, সেখানে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ১৯৩২ সালে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তদবধি সেখানে বাংলা এবং আসামী উভয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্য্য চলিতেছে। বিদ্যালয়ের শতকরা ৪০টি ছাত্রী বাঙালী। আসামের বিদ্যালয়সমূহে বাংলার প্রচলন বন্ধ করিবার এই প্রথম চেষ্টা।

দামোদর কর্পোরেশনের বাজেট

আগামী দুই বৎসরের জন্য দামোদর কর্পোরেশনের বাজেট প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে ২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং ১৯৪৯-৫০ সালে ব্যয় হইবে ৭ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।

নিম্নলিখিত হারে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট, পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট এবং বিহার গবর্মেণ্ট এই টাকা দিবেন:

১৯৪৮-৪৯ সাল: কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট প্রায় ৭০ লক্ষ; পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট প্রায় ৯১ লক্ষ এবং বিহার গবর্মেণ্ট প্রায় ৬১ লক্ষ।

১৯৪৯-৫০ সাল: কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট ২ কোটি ৮১ লক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট ৩ কোটি ৪০ লক্ষ এবং বিহার গবর্মেণ্ট ১ কোটি ৯৫ লক্ষ।

দামোদর পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যে টাকা খরচ হইবে পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে তাহার সবচেয়ে বড় অংশ আসিয়া পড়িতেছে এবং বিহারকে দিতে হইতেছে সবচেয়ে কম। অথচ এই পরিকল্পনার সবচেয়ে বেশী লাভবান হইবে বিহার। দামোদর পরিকল্পনার ফলে মানভূম ভারতবর্ষের খনিজ-শিল্পের মধ্যমণি হইবে এবং দেশের মোট খনিজ-শিল্পের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ এখানে কেন্দ্রীভূত হইবে। মানভূম যদি বিহারেই থাকিয়া যায় তবে বিহার ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এবং ক্ষমতাশালী প্রদেশে পরিণত হইবে; কারণ দেশের লোহা তামা, কয়লা, অভ্র ও অন্যান্য বহুবিধ অতি প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য ও খনিজ দ্রব্যজাত শিল্প থাকিবে বিহারের হাতে। কয়েকটি জেলার চাষের জল এবং কিছু বিদ্যুৎ ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গের আর কতটা লাভ হইবে সেটা একবার খতাইয়া দেখিলে ভাল হইত। মেষ্টন এওয়ার্ড, নিমেয়ার এওয়ার্ড প্রভৃতিতে আর্থিক ব্যাপারে বাংলার প্রতি যে ধরণের অবিচার করা হইয়াছিল, স্বাধীনতা লাভের পর নিমেয়ার এওয়ার্ড পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ইনকাম ট্যাক্স এওয়ার্ডেও সেই মনোভাবই দেখা গিয়াছে। দামোদর পরিকল্পনার ব্যয় বহন বিষয়েও বাংলার উপর দিয়া অপরের সুবিধা করিয়া লওয়া হয় এরূপ ব্যাপার ঘটিতে না দেওয়াই ভাল।

পশ্চিমবঙ্গের শাসন ও শোষণ

ভারতরাষ্ট্রের পরিধির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব-পঞ্জাব প্রদেশ দুইটি ভারতবর্ষের বিভাগের পর জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই জন্ম সহজ ভাবে হয় নাই। ইংরেজ ডাক্তারের নির্দ্দেশ অনুসারে ছুরি চালাইয়া এই দুইটি প্রদেশকে বাহির করা হইয়াছে। রক্তক্ষয়ের জন্য তাহারা দুর্ব্বল; বৈদ্যসঙ্কটের জন্য, চিকিৎসামণ্ডলীর মধ্যে মতভেদের জন্য, চিকিৎসা ঠিক ঠিক চলিতেছে না।

পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নানা বিবৃতিতে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, এই প্রদেশে তণ্ডুল-বস্ত্র-তৈল প্রভৃতি মানব-জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা শীঘ্র সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি যে বিভাগের মাথায় বসিয়া আছেন তাহার কর্ত্তব্য উৎপাদন করা নয়, ব্যয় করা। সুতরাং উৎপাদনের জন্য অন্যান্য মন্ত্রী ও অন্যান্য বিভাগের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এই সব মন্ত্রিপ্রবরের বিভাগ কিভাবে কর্ত্তব্য পালন করিতেছে, তাহার পরিচয় আমরা প্রতি মাসে দিবার চেষ্টা করি। "নোকরসাহী" (bureaucracy)—লোকমান্য তিলকের ব্যবহৃত এই কথা—পরামর্শদাতাদের অভিজ্ঞতা মন্ত্রীদিগের থাকিতে পারে না। সুতরাং

তাঁহারা নোকরসাহীর অত্যন্ত গড়িমসি চালের নিকট হার মানিয়া যান। গত মাসে আমরা দেখাইয়াছি কি করিয়া কৃষি ও শিকার উন্নতি এই "লাল ফিতা"-ওয়ালাদের হাতে পড়িয়া কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি ধারণ করিতেছে।

এবার অন্ত দুই বিভাগের কথা আলোচনা করিব। সেচ-বিভাগ, কৃষিবিভাগ ও মৎস্তবিভাগের মধ্যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। পশ্চিমবাংলার খাল-বিল মজিয়া গিয়া কৃষির অবনতি হইয়াছে, মৎস্যের উৎপাদন কমিয়াছে। দামোদর পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হইতে এখনও অন্ততঃ দশ বৎসর লাগিবে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল এই পরিকল্পনার কল্যাণে পূর্ব্বের ন্যায় ধনধান্যে ভরিয়া উঠিবে; এই আশায় অনেকেই দিন গুণিতেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলের অবস্থাও ত মন্ত্রী মহাশয়কে ভাবিতে হইবে। দামোদর পরিকল্পনার মত বিরাট কিছু করিবার সম্ভাবনার জন্ত এই অঞ্চলের লোকে ত চোখ বুজিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য গঙ্গার উপর বিরাট বাঁধ দিয়া জলের প্রবাহ ভাগীরথীর ভিতর চালাইবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে শুনিয়াছি। কিন্তু উহা বাস্তবে পরিণত হইতে সময় ও অর্থ দুই-ই বহু পরিমাণে লাগিবে সুতরাং উহার ফল সম্প্রতি পাইবার আশা নাই এবং আশু ফলপ্রদ পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার নিতান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। এই পূর্ব্বাঞ্চলের প্রতি জিলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা খালবিল উন্নত করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুদ্ধ জলস্রোত বহতা করিয়া দিলে এই অঞ্চল বিরাট পরিকল্পনা হইতে অধিক লাভবান হইবে। এই সব কাজের জন্ত দিল্লীর নিকট হইতে সাহায্য পাওয়ার কথা নয়। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের সেচ-মন্ত্রীকে নিজের তৈলে নিজের মাছ ভাজিতে হইবে। তাহা হইলে মৎস্ত-বিভাগের মন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্করেরও নিদ্রার ব্যাঘাত কমিবে এবং আমরাও সংস্কৃত খালবিলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির আশায় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক পরিবেশিত চালের মধ্যেও খাত্ত-প্রাণ পাইব।

পশ্চিমবঙ্গের সনাতন খাল-বিলের সন্ধান লইবার জন্ত বৃহৎ কোন ব্যয়ের প্রয়োজন হইবার কথা নয়। রাজস্ব-বিভাগে তাহার হিসাব আছে। তদতিরিক্ত প্রতি জিলায় যেসব সংবাদ-পত্র আছে তাহার মধ্যেও উহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। আমরা বারাসত-বসিরহাট-বনগাঁ মহকুমার মুখপত্র "সংগঠনী" পত্রিকায় ১৬ই অগ্রহায়ণের সংখ্যায় প্রদত্ত এইরূপ একটা হিসাবের প্রতি সেচ-মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন তিনি চব্বিশ পরগণার খাল-বিল পরিদর্শন করিয়া "বৎসর" কাটাইয়াছিলেন। এবং এই পরিদর্শনের ফলে তিনি কয়েকটি "বাঁওড়" ও বিলের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিবরণ দিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া দেখা যায় যে কত সামান্ত সংস্কার করিলে ধান ও মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র দুইটি "বাঁওড়ের" উল্লেখ করিতেছি।

"তেঁতুলবেড়িয়া—(কাউডাঙা) বাঁওড়। এটিকে কচুরী-পানা তুলিয়া ইচ্ছামতীর সঙ্গে খালদ্বারা যুক্ত করিলে (½ মাঃ মাত্র) ইহাতে প্রচুর মাছ জন্মাইতে পারে।

যাদবপুরের (গাইঘাটা থানা) বিল। যমুনা হইতে নির্গত গোয়ালসুতীর খালের সঙ্গে বিলকে মাত্র ১০০ হাত যোগ করিয়া দিলে প্রচুর মৎস্ত উৎপাদন এবং চাষ আবাদের সুবিধা করা হইতে পারে।"

"সংগঠনীর" এই সংখ্যায়ই যমুনা ও পদ্মা এই দুই শাখা-নদী সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এক শত বৎসরের মধ্যে ইহাদের অবনতি ও রুদ্ধ-স্রোতের কাহিনী বর্ণনা করিয়া লেখক বলিয়াছেন,—

"২৪ পরগণার চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৮৫০ বর্গ-মাইল। তাহার মধ্যে ২৫০ বর্গমাইল জমির অধিকাংশই নির্ভর করে যমুনা নদী সংস্কারের উপর। ইহার সঙ্গে পদ্মা সংস্কৃত হইলে ও সংলগ্ন বিল ও বাঁওড়গুলির সুষ্ঠু ব্যবস্থা হইলে প্রায় ৪৫০ বর্গমাইল জমির উৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি পাইবে এবং ২৪ পরগণা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া হয়ত উদ্বৃত্ত অঞ্চলে পরিণত হইবে।"

এই সব তথ্য নূতন না হইতে পারে। এরূপ অনেক তথ্য হয়ত সরকারী কবুতরখানায় ধুলাবালি চাপা পড়িয়া আছে। প্রবন্ধ-লেখক তাহা আবার লোকের দৃষ্টিপথে আনিয়া তাহাদের ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহার সব আশা হয়ত বিচারগ্রাহ্য হইবে না। "সংগঠনী" পত্রিকা এইরূপ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া মফঃস্বলের সংবাদপত্র সমূহের সম্পাদক-মণ্ডলীর সম্মুখে নূতন দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়াছেন। এইরূপ তথ্যের সাহায্যে সেচ-বিভাগ, কৃষি-বিভাগ, মৎস্ত-বিভাগ ও জনস্বাস্থ্য-বিভাগ একযোগে অনেক সংস্কারে হাত দিতে পারেন। এই সব সংস্কারকার্য্যের জন্ত পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর মন্ত্রিমণ্ডলীর খেয়ালের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। পশ্চিমবঙ্গের আয়ত্তের মধ্যে যে সঙ্গতি আছে তাহাই যথেষ্ট। সকল কাজের জন্ত ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দিল্লীর দ্বারস্থ হওয়া অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের নিজের সামান্ত ধন ও শ্রমশক্তির উপর নির্ভর করিবার চেষ্টা-উত্তমকে আমরা শ্লাঘনীয় বলিয়া মনে করি। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রি-মণ্ডলীকে দিল্লীতে দৌড়াদৌড়ি করিয়া যেরূপ ভাবে পরিশ্রান্ত হইতে হইতেছে, তাহা নানা দিক দিয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে আত্মশক্তির পরিচয় দিতে পারিলে ঘর ও বাহির উভয়েরই বিশ্বাস ও সম্মানলাভ করা যায়।

দিল্লীর উপর নির্ভরশীলতা যেরূপ অপমানজনক, সেইরূপ কলিকাতার লালদীঘির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবার অভ্যাসও

নিন্দনীয়। উহা যে আমাদের মধ্যে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহার প্রমাণ সংগ্রহের জন্ত বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না। "সংগঠনী" পত্রিকার প্রবন্ধের মধ্যেও তাহা চোখে পড়ে। অনেক প্রবন্ধে কচুরীপানার উপদ্রবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এমন ভাবে ও ভাষায় যেন কেবলমাত্র কলিকাতাই এই উপদ্রবের হাত হইতে মুক্তি দিতে পারে। পঞ্চাশ বৎসর, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গদেশের পল্লীবাসী এরূপভাবে কলিকাতার মুখাপেক্ষী ছিল না। এইরূপ পরনির্ভরতার উপর ভরসা করিয়া চলিলে আমাদের "স্ব-রাজ" পর-রাজ হইতে বিলম্ব হইবে না।

ভারতবর্ষে অশিক্ষা

আমাদের রাষ্ট্রচালকেরা ও তাঁহাদের পরামর্শদাতাগণ স্বাধীন রাষ্ট্রের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার কথা আমাদের নানা ভাবে শুনাইতেছেন। কিন্তু কথা ও কার্য্যের মধ্যে যে দুরত্ব ইংরেজ আমলে চালু ছিল, আজও তাহা কমে নাই। উদাহরণ-রূপে বয়স্ক লোক শিক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, যাহা ভিয়েৎনামের মত ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, তাহা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল কেন? অনেক বিষয়ে ভিয়েৎনামের অবস্থা পশ্চিম-বঙ্গের অবস্থা অপেক্ষা সঙ্গীন। ভিয়েৎনাম আজ তিন বৎসর হইতে, ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে, ফরাসী সাম্রাজ্য-বাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়া আসিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের সেই সৌভাগ্য হইলে হয় ত শিক্ষা বিষয়ে বর্ত্তমান নিশ্চেষ্টতা ও ফাইল লইয়া দিনগত পাপক্ষয় করিবার প্রবৃত্তির প্রশ্রয় পাইত না।

সেই দুঃখ চাপা দিয়া এখন ভিয়েৎনামের কথা বলি। একখানি মার্কিন সংবাদপত্রে—*World-Over Press* এই বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। ফু-থো (Phu-tho) নামে কোন প্রদেশে ৪,১৫৮ জন শিক্ষক ৩৬৫৩টি ক্লাসে ৭০,০০০ লিখন-পঠনে অজ্ঞ লোকের শিক্ষায় ছয়-মাস কাল ব্যয় করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে; হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই প্রদেশে মাত্র ৯০,০০০ লোক অশিক্ষিত আছে।

ফরাসী আমলের ১৯৪০ সালের একটা হিসাবে দেখা যায় যে, ৩,২৪৫ জনের জন্ত মাত্র একটি স্কুল ছিল; ১,৩৮২ জনের জন্ত ছিল মাত্র একজন শিক্ষক।

ভিয়েৎনাম রাষ্ট্রে শিক্ষার যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা গতানুগতিক নহে; নিষ্ঠুর (tough)। এই বিবরণীতে দুইটি উপায়ের উল্লেখ দেখিলাম, তাহার কথা আমরা ভাবিতেও পারিতেছি না। ভিয়েৎনাম রাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী।

কোন বাজারে প্রবেশ করিতে হইলে প্রত্যেকের নাম দস্তখত করিয়া দিতে হয়; তাহা না পারিলে ফিরিয়া যাইতে হয়; নাম দস্তখত করিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারিলে বাজারে প্রবেশ করিতে পারে।

বিবাহ করিবার জন্ত সরকারের অনুমতি লইতে হয়। লিখন-পঠনে মূর্খ লোককে বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয় না। লেখাপড়া শিখিবার জন্ত এরূপ অমোঘ বিধান সহজে আবিষ্কার করা যায় না।

মন্ত্রীরূপে বা কর্ম্মচারীরূপে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রব্যবস্থা যাঁহারা পরিচালনা করেন তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের অভাব আছে তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। বিপ্লবী উপায়ে ক্ষমতা হাতে আসিলে তাঁহাদেরই অন্ত মূর্ত্তি দেখিতাম। সে সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই; তাহার ফলে আমরা ইংরেজ আমলের 'নোকরসাহী'টা পাইয়াছি। তাহা আমা-দের গলায় পাথরের ঘণ্টার মত ঝুলিতেছে। আর কত দিন এই বোঝা বহিয়া আমাদের চলিতে হইবে তাহাই বিবেচ্য।

"সেনদীঘি" মৎস্যের চাষ

কলিকাতার দশ মাইল দক্ষিণে বোড়াল গ্রাম অবস্থিত। আমাদের নবজাতীয়তার একজন প্রবর্ত্তকের জন্মস্থান বলিয়া এই গ্রাম উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে। প্রাচীন কালেও দেখা যায় এই গ্রামের একটা প্রসিদ্ধি ছিল—সেনরাজ বংশের নামের সহিত তাহা জড়িত। "সেনদীঘি" নামে একটি জলাশয় তাহার সাক্ষ্য দিতেছে বলিয়া স্থানীয় লোকের ধারণা। এই দীঘির পাড়ে একটি মন্দির "ত্রিপুরা-সুন্দরী"র উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। মন্দির আজ জীর্ণ, ভগ্ন; দীঘিও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইংরেজ আমলে যে সামাজিক অরাজকতা লোক-চক্ষুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না, তাহার অবসরে "ত্রিপুরা-সুন্দরী"র দেবোত্তরে হাত দিবার লোকের অভাব হয় নাই। সুতরাং দেখিতে পাই ১৯৩১ সালের জরিপে এই দীঘির সংলগ্ন অনেক ডাঙ্গা জমি স্থানীয় জমিদারদের মধ্যে অনেকের নামে সরকারী কাগজে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এর পরে বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণ বসুর আরব্ধ কর্ম সম্পূর্ণ করিবার জন্ত একটা নূতন জাগরণ আসিয়াছে। "ত্রিপুরা-সুন্দরী" সেবা সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান "ত্রিপুরা-সুন্দরী" মন্দিরের সংস্কার ও "সেনদীঘির" সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়া-ছেন। বিরাট দীঘির সংস্কারকার্য্য ব্যয়-বহুল ব্যাপার; প্রায় বিশ হাজার টাকা তাহাতে ব্যয় হইবে। "সেনদীঘি" সংস্কার করিতে পারিলে কেবল যে স্থানীয় জলাভাব দূর হইবার একটা উপায় বাহির হইবে, তাহা নয়। এই জলাশয়ে মৎস্যের "চাষ" করিতে পারিলে একটা আয়ের ব্যবস্থা হয়। সমিতির চেষ্টায় এই দীঘির গর্ত হইতে উত্থিত জমির উপর "ত্রিপুরা-সুন্দরী"র

স্বত্ব-স্বামিত্ব ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে; যে জমিদারদের হাতে তাহা চলিয়া গিয়াছিল তাঁহারা তাহা হৃষ্টচিত্তে ফিরাইয়া দিয়াছেন।

মামলা-মোকদ্দমার আশঙ্কা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া "ত্রিপুরা-সুন্দরী" সেবা সমিতি পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মৎস্য বিভাগের নিকট একটি আবেদন লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মৎস্যবিভাগ হাঙ্গামার হাত হইতে মুক্তি লাভের জন্য ১০০৲ টাকা এককালীন দান করিবার প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। আজ পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলীর মুখে মুখে "মাল্‌টি-পারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি" নাম প্রচার হইতেছে। নানা রকমের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটিমাত্র সমবায় সমিতি গঠন—ইহাই মনে হয় এই নূতন "স্লোগানের" অর্থ। বোড়ালের "সেনদীঘির" মতন জলাশয়ের সংস্কার এরূপ সমিতির আওতায় আসে কিনা, মৎস্যবিভাগ তাহার জন্য কোন চিন্তা করিয়াছেন কি?

শিক্ষকের ধর্ম্মঘট

কিছুদিন পূর্ব্বে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকেরা এক-দিনের জন্য ধর্ম্মঘট করেন। বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি কতকগুলি দাবির প্রতি দেশবাসী এবং গবর্ণমেণ্ট উভয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছিল এই ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য। দেশের লোকের সহানুভূতি শিক্ষকদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কোন সুফল হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। ধর্ম্মঘটের সমর্থক আমরা নহি; এই ধরণের প্রতিবাদমূলক ধর্ম্মঘটেও যে কোন ফল হয় না তাহাও এক্ষেত্রে দেখা গেল। কার্ত্তিক সংখ্যায় "শিক্ষক" পত্রে অধ্যাপক ডাঃ মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য লিখিত "শিক্ষকের ধর্ম্মঘট" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য। ডাঃ ভট্টাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক এবং "শিক্ষক" পত্রিকাটি "নিখিল বাংলার শিক্ষক সমাজের মুখপত্র" রূপে পরিচিত।

ডাঃ ভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন, "দাবি স্বীকার করিয়ে নেবার যে পন্থা অবলম্বিত হয়েছে তার সঙ্গে সহানুভূতি না থাকলেও শিক্ষকদের দুরবস্থার এবং দুর্গতিতে তাদের প্রতি সহানুভূতি সম্ভব।... ধর্ম্মঘটের উপর কটাক্ষ করে শিক্ষকদের দাবি অস্বীকার করা চলে না। জীবনযাত্রার মান এবং দ্রব্যমূল্য যে পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে তাতে বর্ত্তমান আয়ে আর বেঁচে থাকাই অসম্ভব।" ইহার পর লেখক শিক্ষকদের মিশনরীর সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছেন, "অন্যেরা পার্থিব সম্পদের দিকে যতটা নজর দেন, শিক্ষকের পক্ষে কি ততটা সমীচীন? আত্ম-প্রতিষ্ঠা অন্যের যতটা লক্ষ্য, আত্মবিসর্জ্জন কি শিক্ষকের পক্ষে ততটাই শোভন ও যোগ্য নয়? অন্যে যেখানে মুখর, শিক্ষক কি সেখানে মৌন হবেন না?...মিশনরীরা পেন্‌শন বা প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের জন্য তাগিদ দেন না।" বর্ত্তমান আয়ে বাঁচিয়া থাকা যে শ্রেণীর শিক্ষকদের পক্ষে অসম্ভব, লেখক তাঁহাদিগকে মিশনরীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আত্মবিসর্জ্জনের উপদেশ দিয়াছেন কিরূপে তাহা আমরা বুঝিলাম না। শিক্ষকেরও পরিবার পালন করিতে হয়, ভদ্রস্থতা রক্ষা করিতে হয়।

ডাঃ ভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন, "সামরিক বিভাগ এবং মিশনরীদের মধ্যে অভাববোধ ও অসন্তোষ নেই, কারণ যাই থাক না কেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষকেরা অভাবগ্রস্ত এবং অসন্তুষ্ট।...বেতন কিছু বৃদ্ধি হলেই যে এই অভাব অদৃশ্য হবে সে কথা মনে করারও কারণ নেই।...জীবনের মান বা বাসনা না কমলে সন্তোষ এক প্রকার অসম্ভব।... পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকই অর্থের সন্ধানে অনবরতই ঘুরছে এবং উপার্জ্জনের ফিকির খুঁজতেই তাদের মন ব্যস্ত থাকে। কিন্তু শিক্ষকেরাও যে অবিরাম এই ভাবে স্বর্ণ-মৃগের পিছনে পিছনে ছুটবেন এটা কেবল অশোভন নয়, সম্পূর্ণ অসমীচীন।" সামরিক বিভাগে এবং মিশনরী-দের মধ্যে অভাববোধ বা অসন্তোষ নাই লেখক কোন্ তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া একথা বলিয়াছেন আমরা তাহা জানি না, তবে সামরিক বিভাগের এক জন সৈনিক অথবা এক জন মিশনরী যে বেতন ও ভাতা পাইয়া থাকেন, মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন অপেক্ষা তাহা অনেক বেশী, এটা জানা কথা। আজকের দিনে চল্লিশ টাকা বেতনের শিক্ষক দ্বিগুণ বেতন দাবি করিলেও তাহাকে স্বর্ণ-মৃগের পিছনে ছোটা বলিয়া অভিহিত করিবার মত অকরুণ লোক দেশে বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রবন্ধের শেষে ডাঃ ভট্টাচার্য্য শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির উপায়স্বরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা অর্দ্ধেক কমাইয়া দেওয়ার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আমরা কোনরূপেই সন্তোষজনক মনে করিতে পারি না। ইংরেজ সরকার এদেশে শিক্ষাবিস্তারে প্রবলভাবে বাধা দিয়া আসিয়াছে। শিক্ষাবিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দে গবর্ণমেণ্ট বরাবরই যথাসম্ভব আপত্তি করিয়াছে। ডাঃ ভট্টাচার্য্য শিক্ষার বর্ত্তমান ত্রুটি কিছু কিছু আলোচনা করিয়া মন্তব্য করিতেছেন, "ত্রুটি সংশোধন না করে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা আর সমীচীন হবে না; যেখানে চারিটি বিদ্যালয় আছে সেখানে যদি দুইটি থাকতো তা হলে শিক্ষকদের বেতন অন্ততঃ কিছুটা হ'ত। সরকার যে টাকা দিতে ইচ্ছুক তার বেশী ভাগাভাগি না হলে শিক্ষকদের অসন্তোষ কমে যেতে পারে।"

এখানে ইংলণ্ডের নিজের শিক্ষাবিস্তারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮৭০ সালে বিলাতের এডুকেশন অ্যাক্ট পাস হয়। ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের তখন মোট জনসংখ্যা ছিল আড়াই কোটি। শিক্ষার মান উন্নতির

পর শিক্ষাবিস্তার হইবে এই আশায় বসিয়া না থাকিয়া ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট শিক্ষাবিস্তারে এমন ভাবে মন দেন যে ১২ বৎসরের মধ্যে নিম্নলিখিত অবস্থা দাঁড়ায় :

প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছাত্র-সংখ্যা
১৮৭০...	১৮,৭৮,০০০
১৮৮২...	৪৫,৩৮,০০০
বার বৎসরে বৃদ্ধি...	২৬,৬০,০০০
শিক্ষকদের সংখ্যা—	
১৮৭০...	১২,৪৫৭
১৮৮২...	৩৩,৫৬২
শিক্ষার ব্যয়—	
১৮৭০...	১,২৮,৬৪,০০০ টাকা
১৮৮২...	৪,৩১,৮৮,০০০ "

বাংলা-সরকার এই সময়ে শিক্ষার জন্ত ব্যয় করিতেন ৪,৮৭,০০০ টাকা।

দেশে এখন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। এই অবস্থায় শিক্ষার দ্রুত প্রসার একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার ব্যাপকতা এবং গভীরতা উভয়টির প্রতিই একসঙ্গে সমান দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে, কবে শিক্ষার মান উন্নত হইবে তার পর শিক্ষাবিস্তার করিব এই আশায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

আদালত ও পঞ্চায়েৎ-রাজ

পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর ডাঃ কাটজু এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-সমিতিতে সম্প্রতি একটি বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছেন। আইন পাস করিয়া ছাত্রদের আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অন্ত কাজে যাওয়া উচিত নয়, আদালতে যোগদান করাই কর্ত্তব্য, এই অভিমত প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে আইন ব্যবসায় একটি মহান্, স্বাধীন এবং উদার ব্যবসা। উকীলদের পক্ষে জালিয়াতি প্রভৃতি অসৎ কার্য্যে সহায়তা করা অতিশয় নিন্দনীয়, প্রত্যেক উকীলের সততা রক্ষা করিয়া চলা উচিত ডাঃ কাটজুর এই অভিমত সকলেই সমর্থন করিবেন। ডাঃ কাটজু ইহাও বলিয়াছেন যে, উকিলদের পক্ষে মক্কেলদের অনুরোধে কোনরূপ অসাধুতার আশ্রয় লওয়া অতিশয় নিন্দনীয়, ইহাতে সমগ্র আইন ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়। উকিল সমাজ এরূপ কার্য্যকলাপ সহ্য করিবেন না মক্কেলরা ইহা বুঝিতে পারিলে আর এই প্রকার অন্যায় সম্ভব হইবে না।

বর্ত্তমানে আইন ব্যবসায়ের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ডাঃ কাটজুর এই সতর্কবাণীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। গত যুদ্ধের কয় বৎসরে আর সব ব্যবসায়ের ন্যায় আইন ব্যবসায়ের অনেক অবনতি হইয়াছে। আগে লোকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্তই উকিলের দ্বারস্থ হইত এবং এমন উকিল অনেক ছিলেন যাঁহার মক্কেল কোনরূপ নৈতিক বা দুর্নীতিপরায়ণতার অপরাধে প্রকৃতই অপরাধী ইহা বুঝিতে পারিলে তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রকারান্তরে অন্যায়ের প্রশ্রয় দানে সম্মত হইতেন না। গত যুদ্ধে বিশেষভাবে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যুদ্ধের কয়েক বৎসরে ব্যবসা বাণিজ্য, সম্পত্তি ভোগদখল প্রভৃতির সঙ্কোচমূলক এত বিভিন্ন প্রকারের আইন পাস হইয়াছে যে সাধারণ লোককে বিপন্ন হইয়া যেমন আদালতে উপস্থিত হইতে হইয়াছে, তেমনি অসাধু লোক-দেরও অর্থাগমের অজস্র উপায় খুলিয়া গিয়াছে। আইনের ফাঁকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা শুধু যে আদালত হইতে মুক্তি লাভের জন্ত উকিলের শরণাপন্ন হইয়াছে তাহা নহে, অপরাধ অনুষ্ঠানের আগেও উকীলের পরামর্শ লাভ করিয়াছে এরূপ অভিযোগ অনেক হইয়াছে। ডাঃ কাটজুর উক্তি তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। যুদ্ধের সময় বহু গরীবের সম্পত্তি সরকার দখল করিয়াছেন। সরকারী ক্ষতিপূরণের টাকা তুলিবার জন্ত গরীব এবং নিরক্ষর লোককে উকীলের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে এবং তাহার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদিগকে প্রবঞ্চিতও হইতে হইয়াছে। দুর্নীতির বশীভূত হইয়া সরকারী উকীলের চেষ্টায় মামলার প্রধান আসামীদের মুক্ত করিয়া দেওয়ার দৃষ্টান্তও পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন উকীলের কার্য্যকলাপ আইন-ব্যবসায়ের মর্য্যাদার হানিকর হইতেছে ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা এই যে সমগ্রভাবে উকীল সমাজ তাহার কোন সক্রিয় প্রতিবাদ করেন না। এজন্ত সরকারী হস্তক্ষেপের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া উকীলেরা নিজেদের সংগঠনগুলির মারফত অনায়াসে এই সব পাপের প্রতিবিধান করিতে পারেন।

ডাঃ কাটজু বলিয়াছেন যে বিলাতী বিচার-পদ্ধতি এদেশের উপযুক্ত নহে। আমাদের দেশে পঞ্চায়েৎ-রাজ প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। পঞ্চায়েতের হাতে বিচার কার্য্যের দায়িত্ব অর্পিত হইলে বিচার লাভ সহজ এবং স্বল্পব্যয়সাধ্য হইবে। আমরা এই অভিমত সমর্থন করিতে পারিলাম না। আমাদের দেশে কোন কালেও পঞ্চায়েতের উপর সর্ব্ববিধ অপরাধের বিচারের ভার ছিল না; সম্পত্তিঘটিত বিরোধ গ্রামের স্মার্ত্ত পণ্ডিতের পাঁতি লইয়া পঞ্চায়েৎ মিটাইয়া দিতেন এবং ছোটখাট গ্রাম্য অপরাধের বিচারমাত্র তাঁহারা করিতেন। রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক এবং বহু রকমের ব্যক্তিগত অপরাধ প্রভৃতির জন্ত আইনবেত্তাদের লইয়া গঠিত আদালত ছিল। আদালতের কাজ রীতিমত ভাবে যদি চলে, উকীল এবং সলিসিটরেরা যদি মক্কেলকে জীয়াইয়া রাখিয়া ফী আদায়ের জন্ত অনর্থক তারিখ আদায় না করেন, হাকিমেরা যদি দ্রুত বিচার শেষ করি-বার জন্ত পীড়াপীড়ি করেন তাহা হইলে সুবিচার লাভ অনেক সহজ ও স্বল্পব্যয়সাধ্য হইতে পারে। বর্ত্তমানে বিচার বিভাগ

সর্ব্বসাধারণের নিকট ভীতি ও ব্যয়বাহুল্যের বস্তু হইয়া থাকিবার প্রধান কারণ উহার পরিচালনার ত্রুটি; আদালত বিলাতী ছাঁচে গঠিত ইহাই উহার প্রধান দোষ নহে। অশোক-চক্র এবং অশোক-স্তম্ভের মোহর আমরা জাতীয় পতাকায় এবং জাতীয় শীল মোহররূপে গ্রহণ করিয়াছি; বিচার-বিভাগ সংস্কারের দ্বারা উহার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অশোক যাহা করিয়াছিলেন আমরা সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে অন্ধকারে পথের সন্ধান মিলিবে। উকিল, ব্যারিষ্টার ও এটর্ণী এই তিনের অধিকার ও আয়ত্তে আসিয়া পশ্চিমবাংলায় বিচারপ্রার্থীদের সর্ব্বনাশ হইতে হয়। অচিরে ইহার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

ভারতরাষ্ট্রের আন্তর্জ্জাতিক নীতির মধ্যে অসঙ্গতি

শ্রীকৃষ্ণলাল শ্রীধরণী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভারতবর্ষের বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সভ্যতা-সাধনার" মল্লিনাথ" বলিয়া তাঁহার একটি বিশেষ পরিচয় আছে। দেড় বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার মাতৃভূমিতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এবং যুক্তরাষ্ট্রের ও ভারতবর্ষের অনেক সংবাদপত্রে এই দেশের জীবন সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ ও সংবাদ পাঠাইতেছেন। সম্প্রতি তিনি সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের প্যারিস অধিবেশনের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করিতেছেন, এবং ভারতবর্ষের আন্তর্জ্জাতিক নীতির মধ্যে যে নানা অসঙ্গতি আছে তাহার প্রতি ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক নানা সমস্যার সম্বন্ধে ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধিমণ্ডলী এমন একটা নীতি অনুসরণ করিতেছেন যাহা বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ভাবুক জবাহরলাল নেহরুর ছোঁয়াচ তাঁহাদের অনেককেই অল্পবিস্তর প্রভাবিত করিতেছে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীধরণী ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ববিলাসী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের অভিযোগ এখনও সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দরবারে অমীমাংসিত আছে। এই গবর্ণমেণ্ট আবার দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার অছি। এই অঞ্চল জার্ম্মানীর উপনিবেশ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজয়ের পর ইহা জার্ম্মানীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) অধীনে আসে। এই সঙ্ঘ তাহাকে অছিরূপে পরিচালনা করিয়া স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করিয়া গঠন করিবার জন্য তাহার শাসনভার দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে ছাড়িয়া দেন। গত ২৭।২৮ বৎসর এইরূপ শাসনের ফলে দেশের অধিবাসী কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের কতটা উন্নতি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গত বৎসর দক্ষিণ-আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব পেশ করেন যে দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকাকে তাঁহাদের রাষ্ট্রের অংশরূপে একাকীভূত করার অনুমতি দেওয়া হউক। ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধি শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ইহার বিরোধিতা করেন, এবং সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ এই আপত্তি গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, এবং ঐ গবর্ণমেণ্টকে নূতন অছিনামা পেশ করিবার অনুরোধ জানান।

এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া ঐ গবর্ণমেণ্ট এই বৎসরও তাঁহাদের দাবি পেশ করিয়াছেন। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এ বৎসরও তাহার বিরোধিতার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এবার মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলি ও পাকিস্থান তাঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে। এই কথার উল্লেখ করিয়া শ্রীধরণী বলিয়াছেন যে ভারতরাষ্ট্র যদি বাস্তবতার অনুসরণ করিত তবে মুসলমান রাষ্ট্রগুলি এরূপভাবে একটা শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রের অন্যায়ের সপক্ষে যাইতে সাহস পাইত না। ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ যদি বুঝাইয়া দিতেন যে প্যালেষ্টাইন বিভাগের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য পাইতে হইলে আরবরাষ্ট্র-গুলিকে কোন কোন বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতে হইবে, দানপ্রতিদানের নীতি মানিয়া চলিতে হইবে তাহা হইলে আরব রাষ্ট্রগুলি এরূপ ভাবে শ্বেতাঙ্গ প্রাধান্যের সপক্ষে ভোট দিতে পারিত না। ভারতরাষ্ট্র প্যালেষ্টাইন বিভাগের বিরুদ্ধে মত দিয়া প্রস্তাব করিয়াছে যে তৎপরিবর্ত্তে একটা যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হউক, প্যালেষ্টাইনে দুইটি সমমর্য্যাদা-সম্পন্ন রাজ্য এই যুক্তরাষ্ট্র (Federation) প্রতিষ্ঠা করুক। ইহুদীরা ইহার বিরোধী, আরবরাও তাহাদের নিরঙ্কুশ অধিকার চায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে। ইহার ফলে ভারত ইহুদীদের সাহায্য হারাইয়াছে, আরবদের সাহায্যও লাভ করিতে পারে নাই। এইজন্য আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে ভারতরাষ্ট্র নানাভাবে বিপন্ন হইতেছে।

পূর্ব্ব এশিয়ায় যুগ-পরিবর্ত্তন

প্রায় তের বৎসর জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চীনের চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্ট মর্য্যাদার সহিত টিকিয়া ছিল। অবশ্য তাহার পিছন হইতে শক্তি যোগাইতেছিল আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র। মাঞ্চুরিয়ায় বিবাদ আরম্ভ হয় ১৯৩১ সালে; জাপানের দাপটে ঐ দেশ হইতে চীনকে হটিয়া আসিতে হয়। আবার শক্তি পরীক্ষা আরম্ভ হয় ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে। পিপিং নগরীর মার্কো পোলো পুলের ঘটনার অজুহাতে জাপান চীন দেশের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। চারি বৎসর চীন প্রায় একাকী যুদ্ধ চালাইয়া গেল; পৃথিবীর সহানুভূতি তাহার মনের বল ও উৎসাহ অটুট রাখিতে সাহায্য করে। ভারতবর্ষ হইতেও এই প্রীতি অকুরন্ত ভাবে চীনের উপর বর্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই ভাবের গঙ্গোত্রী। কংগ্রেসের সভাপতি রূপে সুভাষচন্দ্র বসু চীনে একটি চিকিৎসক দল প্রেরণ করেন। ১৯৩৯ সালে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কংগ্রেসের প্রতিনিধি-

রূপে চীন দেশের তদানীন্তন রাজধানী চুংকিং গমন করেন। চিয়াং কাইশেক তখন চীনের কর্ণধার। তিনি এই প্রীতির প্রতিদানে সস্ত্রীক ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে আসেন; গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন; ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে প্রকাশ্যে অনুরোধ করেন তাঁহারা যেন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী মণ্ডলের সহিত সম্মানজনক আপোষ করিয়া ফেলেন।

এই সম্বন্ধে অদূর অতীতের কথা স্মরণ করিয়া আমরা চিয়াং কাইশেক পরিচালিত রাষ্ট্রের নূতন বিপর্য্যয়ে চিন্তান্বিত হইয়া পড়িতেছি। জাপানের পরাজয়ের তিন বৎসরের মধ্যে চীনা কম্যুনিষ্টদের আক্রমণে চিয়াংকাইশেক গবর্ণমেণ্ট মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীন হইতে হটিয়া আসিতেছে। চীনের রাজধানী নানকিনের উপর আক্রমণ আসন্ন। এই বিপর্য্যয়ের কারণ সম্বন্ধে যে তর্ক উঠিয়াছে তাহাতে যোগদান করিতে গেলে চীনের অবস্থা সম্বন্ধে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন। এই কারণ যথেষ্ট নয় যে সোভিয়েট ইউনিয়ন চীনা কম্যুনিষ্টদের পেছনে থাকিয়া সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করিতেছে; প্রতি-উত্তরে বলা হইতেছে যে চীনের পিছনেও ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সাহায্য আছে। এই ভাবে কাটাকাটি করিয়া অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্ট চীন দেশের জনগণের একটা বিরাট অংশের প্রীতি হারাইয়াছেন বলিয়াই বিপন্ন হইয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন তর্কের অবকাশ নাই। যে সব শক্তি জগতের শক্তিভাণ্ডারের চাবি-কাঠি হাতে লইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা—আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র ও ইউরোপ-এশিয়ার সোভিয়েট ইউনিয়ন—একমত হইতে পারিলে পূর্ব্ব এশিয়ার যুগ পরিবর্ত্তনে আশার আলোক দেখা দিতে পারে। তাহা না হইলে এই অঞ্চলের গণজাগরণের নেতৃত্ব কম্যুনিষ্টদের হাতে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। একটা কথা শুনা যায় যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এই অগ্রগতিকে বাধা দিবে। উত্তরে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়—তবে এতদিন কেন কম্যুনিষ্টদের প্রসারে বাধা দেয় নাই? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর শুনা যায় নাই, এবং জল্পনা করিয়াও কিছু বলিতে চাই না।

পনর-ষোল বৎসর পূর্ব্বে একখানি বই পড়িয়াছিলাম। আপটন্ ক্লোজ তাহার লেখক। বইখানির নাম—এশিয়ার বিদ্রোহ—*Revolt of Asia*। লেখক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে ব্রিটেন পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্বপদ হারাইবে; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সেই পদে বসিবে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারকরূপে নব-জাগ্রত এশিয়ার সম্মুখীন হইবে। তখন একটা ভীষণ সংঘর্ষ দেখা দিবে—সংস্কৃতির সংঘর্ষ; জাতি (race) ও বর্ণের (colour) সংঘর্ষ; অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক এক পক্ষে, পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের বৃহদংশ এক দিকে। এই লোক-বল ও সম্পদ নিয়ন্ত্রিত হইবে শক্তি-ত্রয়ের দ্বারা—সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীনারাষ্ট্র ও জাপান; এই ত্রি-শক্তির মধ্যে জাপানের স্থান হইবে তৃতীয় এবং সাম্রাজ্যবাদের দুইটি শেষ ধারকের বিরুদ্ধে এই ত্রিশক্তি আত্মস্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেও পরাঙ্মুখ হইবে না। এই বই পাঠ করিয়া মনে মনে প্রশ্ন করিয়াছিলাম—ভারত তবু কই?

আপটন্ ক্লোজের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে নাই। এক বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হইয়া জাপানের শক্তি খর্ব্ব হইয়াছে; তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে এবং দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শাসনে আছে। কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়া যাইতে এবং আর্থিক ক্ষতি পূরণ করিতে বেশী দিন লাগিবে না। জাপানের সৈন্যাধ্যক্ষদের বিচারে একজন ভারতবাসী বিচারক, ডাঃ রাধাবিনোদ পাল, নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের নির্দ্দোষ বলিয়াছেন, এবং দেশে ফিরিয়া যাহা বলিতেছেন তাহার মধ্যে আমাদের উক্তির সমর্থন পাই। যে সংযমের সহিত জাপানী জাতি পরাজয়ের নিষ্ঠুর বিধান স্বীকার করিয়া লইয়াছে, যে নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত তাহারা পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে; যুদ্ধোত্তর যুগের নানা অভাব যেরূপভাবে নীরবে, বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ জাতির পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং পরাজিত জাপান ও বিধ্বস্ত চীন সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে সংগঠিত হইয়া উঠিবার অবসর পাইলে পৃথিবীর চেহারা ফিরিয়া যাইবে।

আপটন ক্লোজ বলিয়াছিলেন এই তিন দেশের যুক্ত প্রয়াসে সোভিয়েট হইবে ভাবের গুরু, চীন দেশ হইবে তাহার পরিচালক (manager), এবং জাপান যোগাইবে তাহার সৈন্য-শ্রেণী। এই পরিণতির মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে ইংরেজ, স্কচ ও আইরিশ জাতির সহযোগিতার অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইবে। ইংরেজ করিয়াছে সাম্রাজ্য শাসন, স্কচেরা করিয়াছে সাম্রাজ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্যে লাভ এবং আইরিশরা করিয়াছে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণপাত। সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন ও জাপানের মধ্যে কর্ত্তব্যের ভাগ-বাঁটোয়ারা এই ভাবেই হইতে পারে। এই সম্ভাবনার মধ্যে যে যুগ পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যায় সেই পটভূমিতে ভারত-রাষ্ট্রের স্থান কোথায় তৎসম্বন্ধে আমাদের সজাগ হওয়া উচিত। কারণ কোন প্রাচীর তুলিয়া এই পরিবর্ত্তনের উচ্ছ্বাসকে আমাদের দেশ হইতে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না, যেমন পারে নাই চীন দেশ। ভাবের গতিপথ কোন বন্ধ নির্ম্মাণ করে না। লোকের মনে সমাজ-জীবনের নানা ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সব জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, তাহাই বিপ্লবের বাহক। এই কথাটা স্মরণ করিয়া চলিতে পারিলে ভারতবর্ষ গণ-তন্ত্র ও

সাধারণতন্ত্রের মধ্যে সেতু নির্মাণ করিতে পারে। সেই সৌভাগ্যের যোগ্য হইবার গুণ আমাদের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আমাদের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে তার বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে।

ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা

ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ডাঃ সোকর্ণ ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণে আমাদের দেশে আসিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯৪৭ সালের শীতকালে দিল্লী নগরীতে যে "নিখিল-এশিয়া" কনফারেন্স বসিয়াছিল তদুপলক্ষে এই সাধারণতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শারিয়ার আমাদের দেশে পদার্পণ করেন। ডাঃ সোকর্ণের আগমন উপলক্ষে ইন্দোনেশিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

জাপানী আক্রমণের সময় ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা পলাইয়া গিয়াছিল প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এই সব দ্বীপপুঞ্জ হইতে যেমন ইংরেজরা গিয়াছিল বর্ম্মা ও মালয় হইতে; ইংরেজের প্রধান ঘাঁটি সিঙ্গাপুরের যেমন পতন হইয়াছিল, সেইরূপ মাদুরা, ব্যাটাভিয়া প্রভৃতি ডাচ সামরিক কেন্দ্রও জাপানীদের হাতে চলিয়া যায়। জাপানের পরাজয়ের পর ডাচরা পূর্ব্বের শাসন-ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিতে চায়। কিন্তু গণতন্ত্রী ইন্দোনেশিয়ানরা একটা স্বাধীন সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই প্রত্যাবর্ত্তনে সশস্ত্র বাধা দেয়। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে এই সাধারণ-তন্ত্র (Republic) ঘোষণা করা হয়, এবং তার অস্তিত্ব নানা ভাবে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

ডাচদের ইহা মনঃপূত হইবার কথা নয়, এবং গত তিন বৎসর হইতে ইন্দোনেশিয়ান সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে। একথা সর্ব্বজনবিদিত যে ডাচ পুঁজিপতিদের মুরুব্বি ব্রিটিশ ও মার্কিনী পুঁজিপতিরা, এবং শেষোক্তদের সাহায্য না পাইলে তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং অধীনস্থ দেশসমূহের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সফলকাম হইতে পারিবে না। আজ তিন বৎসর ধরিয়া সে চেষ্টাই তাহারা করিয়া আসিতেছে এবং পূর্ব্ব-এশিয়ার জাগৃতি ও সংহতির পথে বহু বাধা স্থাপন করিতেছে। এই চেষ্টায় তাহারা ইন্দোনেশিয়ার নানা দ্বীপের পুঁজিপতিদের নিকটে নানা ভাবে সাহায্য পাইতেছে। সেইজন্য লিঙ্গরজাতি নগরীর সন্ধিসর্ত্ত (১৯৪৬) নানা ভাবে পদদলিত করিতেছে। তাহাদের তাঁবেদারীতে অনেকগুলি রাষ্ট্র গজাইয়া উঠিয়াছে; প্রায় প্রতি দ্বীপে একটি করিয়া রাষ্ট্র ডাচদের অনুগ্রহে গঠিত হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়া সাধারণতন্ত্রের পরিধি ও ক্ষমতা এই ভাবে সঙ্কুচিত হইতেছে যেমন করিয়া "পাকিস্থান" প্রতিষ্ঠার ভারতবর্ষের পরিধি ও ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইয়াছে। আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থার কারণ ও ফল বুঝিতে চেষ্টা করিলে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত নানা সংবাদে বিভ্রান্ত হইতে হইবে না।

গত এক মাসের মধ্যে ওলন্দাজদের দেশ হইতে একটি "মন্ত্রিমিশন" আসিয়াছিল ইন্দোনেশিয়ায়—সাধারণতন্ত্রের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আপোষ করিবার জন্য। রাষ্ট্রপতি ডাঃ সোকর্ণ ও প্রধান মন্ত্রী ডাঃ হাত্তা ওলন্দাজ প্রধানগণের সর্ত্তে আপোষ করিতে স্বীকৃত হইতে পারেন নাই। সর্ত্তগুলি কি তাহা স্পষ্ট করিয়া জানা যায় নাই। কিন্তু নানা বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রকে ওলন্দাজ তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির সমপর্য্যায়ে ফেলিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। আর একটা সর্ত্ত ছিল ওলন্দাজ রাজবংশের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রের সম্বন্ধ স্থাপন। এই সম্বন্ধের মধ্যে ওলন্দাজ প্রাধান্যের ব্যবস্থা বা ইঙ্গিত ছিল বলিয়াই বর্ত্তমান আলোচনা ফাঁসিয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। মার্কিনী সাহায্য ব্যতিরেকে ওলন্দাজ-সাম্রাজ্যের ঠাট বজায় থাকিতে পারে না। মার্কিন দেশ গণতন্ত্রের আদর্শ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এই তন্ত্রের মহিমা প্রচারের জন্য বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কল্যাণে যত সব উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার ব্যবহারে চক্ষু ধাঁধিয়া মরে, কর্ণ পীড়িত হয়। কিন্তু মার্কিন দেশের ব্যবহারে তাহার প্রমাণ পাওয়া কঠিন; মন ও মুখে যে ঐক্য থাকা প্রয়োজন তাহার অভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ মার্কিনী শাসক সম্প্রদায়ের আদরে লালিত-পালিত ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের স্পর্দ্ধা; এবং যত দিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের দেশ ডাঁচদের পিছনে থাকিয়া তাহাদের সাম্রাজ্য-লিপ্সাকে প্রশ্রয় দিবে তত দিন ইন্দোনেশিয়ায় শান্তি ফিরিয়া আসিবে না। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের "সদিচ্ছা মিশন" ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে; এখন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছে।

লোকসমষ্টি ও তাহার সংস্কৃতির ধ্বংস

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের আইনে একটি নূতন বিধান জুড়িয়া দেওয়া হইল। কোন রাষ্ট্র শান্তির সময়ে বা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাকালে যদি কোন লোকসমষ্টি নিঃশেষ করে বা তাহাদের সংস্কৃতি ধ্বংস করে তবে তাহা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে—যেমন হইয়াছিল পরাজিত জার্ম্মানীর নেতৃবৃন্দ এবং যেমন হইতে যাইতেছে জাপানের নেতৃবৃন্দ। লোকসমষ্টিকে নিঃশেষ করা যায় যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াও, তাহাদের সংস্কৃতির বিলোপ সাধন করা যায় শান্তির সময়েও। আমাদের দেশেও সম্প্রতি ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্টের পর কলিকাতা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, বিহার, উত্তর-পশ্চিম

সীমান্ত প্রদেশ, দিল্লী, পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশে যাহা ঘটিয়াছে তাহা এই নূতন আইনের আওতায় আসে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

অতীত যুগের ইতিহাসে আটিলা, চেঙ্গিস খাঁ, হালাকু প্রভৃতি লোকের নামের সঙ্গে এইরূপ অন্যায় ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে। সেই সময়ের মতি-গতি এইরূপ নিষ্ঠুরতাকে খুব নিন্দনীয় মনে করে নাই। ঐতিহাসিক যুগে—গত দুই হাজার বৎসরের মধ্যে—খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও ইসলামের মধ্যে ধর্ম্মান্তরিত করার কার্য্যকে সাধু-জনোচিত আখ্যায় অভিনন্দিত করা হইতেছে বলিয়া দেখিতে পাই। যদিও এই দুই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক দুই জনই ধর্ম্মপ্রচারে গায়ের জোরের স্থান নাই বলিয়া বিশেষ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, তবুও তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা এই অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াই ধর্ম্মের প্রতি আনুগত্যের বিশেষ বিশেষ প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব যুগের কোন ধর্ম্মই ইউরোপ-আমেরিকায় থাকিতে দেওয়া হয় নাই, হজরৎ মহম্মদ-পূর্ব্ব ইরাণের ধর্ম্ম আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মাত্র দেখা যায়; মধ্য-এশিয়ার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি ইসলামের দাপটে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর্য্য-অনার্য্যের ধর্ম্মের বিরোধ রক্ত-রঞ্জিত কিনা তৎসম্বন্ধে তর্ক চলিতেছে; হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরোধে তরবারির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল কিনা, তাহা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। গত দুই হাজার বৎসরের ইতিহাসে গায়ের জোরে ধর্ম্মপ্রচারের নিদর্শন ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। ইসলাম আসিয়া তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছিল। কোরান বা তরবারি—ইহার দুইটির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হইবে, এরূপ কিম্বদন্তী বিশ্বাস হয় ত করিতাম না। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টোবর নোয়াখালী-ত্রিপুরায় যে তাণ্ডবের সৃষ্টি করিয়া ৫০,০০০ হাজার হিন্দুকে দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে মুসলমান বানাইয়া ফেলা হইল, তাহা দেখিয়া কিম্বদন্তী ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করিতে দ্বিধা হয় না। সেই জন্য সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দরবারে পাকিস্থানের প্রতিনিধি মিসেস্ ইকরাম-উল্লা খাঁয়ের ওকালতী শুনিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। ভদ্রমহিলাটি সংস্কৃতি ধ্বংসের চেষ্টাকে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে দণ্ডনীয় করিবার পক্ষে অনেক যুক্তি দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশের উপর নির্ভর করিয়া মতামত প্রকাশ করা হইতেছে।

লোকসমষ্টি ধ্বংস (Genocide) নূতন নয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠা এই নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ; অনেক সময়ই এরূপ ধ্বংসলীলাকে পুণ্য কার্য্য বলিয়া অভিনন্দিত করা হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর মানব-মন এই প্রশংসায় সায় দিতে পারিতেছে না বলিয়া, সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে ঘটা করিয়া বক্তৃতা দেওয়া হইতেছে। লোকসমষ্টির প্রাণ ও সংস্কৃতির ধ্বংস বন্দুক-তরবারির সাহায্যে এক দিনে বা দুই দিনে করিলে বর্ত্তমান যুগের লোকের চোখে পড়ে। কিন্তু কোন রাষ্ট্র বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি নীরবে বহু দিন ধরিয়া ধ্বংসলীলার নানা প্রক্রিয়া চালাইয়া যায়, তাহার বিচার কে করিবে? কোন লোকসমষ্টির পক্ষে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করা কি সহজ বা সম্ভব? মিত্রশক্তিরা জয়লাভ না করিলে হিটলার বা তোজোর নিষ্ঠুরতার কোন প্রমাণ কি পাওয়া যাইত? ইহুদী জাতির মত সুসংবদ্ধ জাতি হিটলারের নিষ্ঠুর নীতির কথা বহু পূর্ব্বেই আমাদের শুনাইয়াছিল। কেহ কি তাহাতে কর্ণপাত করিয়াছিল?

সেইরূপে মিসেস্ ইকরাম-উল্লা খাঁয়ের "পাকিস্থানে" যাহা ঘটিতেছে তাহা Genocide—লোকসমষ্টির ধ্বংস ও তাহাদের সংস্কৃতির ধ্বংস—সে বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে নোয়াখালী জেলায় হিন্দুর পাকা ধান ক্ষেত হইতে যে ভাবে, নিয়মিত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, কাটিয়া লওয়া হইতেছে, তাহা Genocide-এর অঙ্গ বলিয়া নালিশ রুজু করিতে আমাদের মনে কোন দ্বিধা নাই। এইরূপ ধান কাটাকে চুরি বলে না। তাহা সুপরিকল্পিত কর্ম্মপন্থার অংশবিশেষ। হিন্দুকে হাতে মারিব না, ভাতে মারিয়া তাহার সংস্কৃতির ভিত্তি শিথিল করিয়া দিব; হয় তাহাকে ভিটামাটির মায়ায় প্রতিবেশীর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিতে হইবে, না হয় ভিটামাটির মায়া সংস্কৃতির পায়ে বলি দিয়া তাহাকে দেশ ত্যাগ করিতে হইবে যেমন করিতে হইয়াছে জার্ম্মানীর ইহুদীকে। এক হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে জার্ম্মানী এই ইহুদীদের জন্মভূমি ছিল; জার্ম্মানীর শাসক-সম্প্রদায়ের অনেকেই জার্ম্মানীর সঙ্গে এত প্রাচীন সম্বন্ধের দাবি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন না।

নোয়াখালী-ত্রিপুরায় "পাকিস্থানের" প্রকৃতির নূতন পরিচয় পাইয়াছিলাম বলিয়া আজ 'Genocide' সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশের অভিজ্ঞতার সাহায্যে পৃথিবীর নানা দেশে যাহা ঘটিতেছে তাহা অনুমান করা সম্ভব। পূর্ব্বে বিলাত-আমেরিকার ইতিহাস পড়িয়া আমাদের নিজের দেশের ঘটনাবলী বুঝিতে চেষ্টা করিতাম, সেইজন্য সে জ্ঞান ছিল কল্পনায় প্রসূত, বাস্তবতাশূন্য। আজ আমাদের জাতীয় জীবনের ঘটনাবলীর সাহায্যে আমাদের দেশের সম্বন্ধে সত্য জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইতেছে; বিদেশের সম্বন্ধেও জ্ঞান সত্য অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত হইতেছে। আমাদের এই জ্ঞান অর্জ্জন করিতে অনেক অশ্রুজলে তাহা পরিস্রুত করিতে হইতেছে। তবুও বলিব এই অশ্রুজল সার্থক হইবে, যদি আমরা সত্যের সম্মুখীন হইবার সাহস তাহা হইতে সংগ্রহ করিতে পারি, যদি বিশ্বাস করি যে সত্যব্রতীর অশ্রুজল এই বিশ্ববিধানে ব্যর্থ হয় না।

আমার জীবনের তন্ত্র

শ্রীযদুনাথ সরকার

আজ যে কথা বলতে হবে তার বিষয় হচ্ছে আমার জীবনের দর্শন, অর্থাৎ কোন্ আদর্শ সামনে ধরে, কোন্ মন্ত্র ধ্যান করে আমি এত বছর কাজ করে এসেছি। আত্মজীবনী ব্যাখ্যান করতে গেলে নিজকেই সব কাজের কেন্দ্র বলে ধরে নিয়ে চলতে হয়। রামায়ণ লিখতে গেলে রামকে বাদ দেওয়া যায় না। আমার জীবনে মেনে নেওয়া আদর্শটি দেখাতে গেলে আমি কোন্ পথে চলেছি, এবং কেন সে পথে চলেছি, তা না ব'লে উপায় নেই। যদি কেউ একে আত্মম্ভরিতা বলেন তবে অবিচার করা হবে।

আমরা সকলেই নিজ জীবনের আদর্শ বেছে নিই চোখের সামনে যাঁদের দেখেছি তাঁদের কাজগুলির ভিতর-কার মূলমন্ত্র বুঝে, অথবা বই পড়ে অতীতের মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণী ভেবে ভেবে। কারণ তরুণ মানুষ যে বড় মানুষের মত হতে চাইবে এটা স্বভাবের নিয়ম।

যাঁকে দেখে আমি নিজ জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য স্থির করতে পেরেছি, তিনি আমার পিতা, স্বর্গীয় রাজকুমার সরকার; আজ ৩৪ বৎসর হ'ল তিনি পরলোকগমন করেছেন; মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বৎসর। ধনী জমিদার-সন্তান এবং ইংরেজী শিক্ষিত হলেও তিনি কখনও ভোগ-সুখ বা আড়ম্বর চান নাই; চিরদিন সরল সংযত জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁর জীবনের ব্রত ছিল, আমাদের রাজশাহী জেলার সব রকম লোকহিতকর কাজে নিজকে নিয়োজিত করা। বাংলার প্রথম যুগের ইংরেজী শিক্ষার সমস্ত সুফলই তিনি পেয়েছিলেন। অথচ তাঁর চিত্ত শান্তি পেত, বল পেত, বৈষ্ণব ধর্মের এক সরল উদার রূপ হৃদয়ে মেনে নিয়ে—এতে কোন বাইরের ভঙ্গী বা বদ্ধ কুসংস্কার ছিল না, এজন্য তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করতেন, কলিকাতায় এলেই তাঁকে দর্শন করতেন। মুর্শিদাবাদ জেলার মরিচা-দিয়াড়ে তাঁর এক কাঠা ভূসম্পত্তিও ছিল না, অথচ সেখানকার মুসলমান প্রজাদের নীলকুঠিওয়ালা সাহেবদের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি অনেক বৎসর ধরে নিজের খরচে লড়াই করেন, জেলা আদালত ও হাইকোর্টে মোকদ্দমা ক'রে গবর্ণমেন্টের কাছে দরখাস্ত পাঠিয়ে, হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে আন্দোলন ক'রে, এমন কি ঐ বিষয় সংক্রান্ত দলিলপত্র ও সরকারী রিপোর্ট ছাপিয়ে তা পার্লামেন্টের উদারনৈতিক সদস্যদের জন্য বিলাতে পাঠিয়ে।

ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্য। তিনি আমার বালক চিত্তে ইতিহাসের নেশা জাগিয়ে দেন। আমাকে প্রথমে প্লুটার্কের লেখা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মহাপুরুষদের জীবনী পড়ান। সেই থেকে এবং পরে ইউরোপীয় ইতিহাস পড়ে আমার যেন চোখ খুলে গেল; আমার তরুণ হৃদয়ে অঙ্কিত হ'ল কি করলে কোনো জাতি বড় হয়, কি করলে ব্যক্তিগত জীবনকে সত্য সত্যই সার্থক করা যায়। স্বদেশী বস্ত্র ও শিল্পদ্রব্য ব্যবহার করা যে আমাদের নৈতিক কর্তব্য তা তিনি পুরাতন পার্টিশন আন্দোলনের যুগে নিজ বৃদ্ধ বয়সে পর্যন্ত প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হয়ে নির্ভয়ে বলেছিলেন।

এইরূপে যে জীবনমন্ত্রটি আমি পেয়েছি, তা বলবার আগে সাবধান করে দিই কেউ যেন না ভাবেন যে এই যোগসাধনায় আমি সিদ্ধিতে পৌঁছতে পেরেছি। আমার মৃত্যুর পরই জগৎ বলতে পারবে এর কতটা সার্থক হয়েছে, আর কতটা "বিফল বাসনারাশি" মাত্র। আমার জীবনমন্ত্রটি এই—জগতে কোনো খাঁটি জিনিষ, কোনো সাধু প্রচেষ্টা, কোনো সত্য জ্ঞান, নষ্ট হয় না। ফল পাবার আকাঙ্ক্ষা না করে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাও, ভগবান সেটাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। হে কর্মী! অনেক সময়েই তুমি নিজে তার ফল পাবে না। ধন খ্যাতি সুখ বা প্রতি-পত্তি কিছুই তোমার লাভ হবে না। কিন্তু তোমার কাজটি যদি খাঁটি জিনিষ হয় তবে তা বিশ্বমানবের সম্পত্তি হয়ে থাকবে, তা তোমার দেশকে ঐ এক দিকে ধনী করবে; আর কখন কখন বাইরের জগৎও তাকে চিনবে, আদর করবে, তার অনুসরণ করবে। শস্যের সুস্থ বীজ পাথরের গর্তে পড়লেও অনেক বছর পরে সুবিধাজনক জলবায়ু পেয়ে অঙ্কুর গজায়, গাছ হয়, সহস্রগুণ ফল প্রসব করে। সত্য কাজের, সত্য কথার, খাঁটি জিনিষের মধ্যে এই অজেয় প্রাণ-শক্তি আছে, এই চিরন্তনী সঞ্জীবতা আছে। হে সত্যব্রত সাধক! তোমার সাধনা বর্তমানে কেউ আদর করলে না বটে, কিন্তু বিশ্বরাজের এই বিধি তোমার হৃদয়ে সান্ত্বনা ও দৃঢ়তার কারণ হবে।

এ পথে যে পথিক হবে তার শুধু মনের বল নয়, অসীম ধৈর্য্যও চাই। তাকে অল্পে সন্তুষ্ট হলে চলবে না, সহজে কাজ সারব, এই ফন্দি করলে তার চেষ্টা শেষে পণ্ড হবে। যে ছাত্র পাঠ্য পুস্তক না প'ড়ে, শুধু সংক্ষিপ্ত নোট পড়ে বা

বাছা বাছা প্রশ্নগুলির উত্তর মুখস্থ করে, সে পরীক্ষা পাস করতে পারে, কখন কখন এই প্রদেশে ফাষ্ট ডিভিশনেও স্থান পায়, কিন্তু তার প্রকৃত বিদ্যা হয় নি, সে শিক্ষক হতে পারে না, আর হলেও ঠিক নিজের মত ছাত্রই তৈরি করবে। যে কাজ খাঁটি, যার ফল স্থায়ী হবে, তাকে সম্পূর্ণ করতে বেশী সময় লাগে, তার জন্য অনেক দিন ধরে অনেক রকম উপকরণ জোগাড় করতে হয়, এবং অনেক নূতন বিষয় পড়ে নিজকে সেই কাজের উপযুক্ত কারিগর করে তুলতে হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের চরিত্রের চিহ্ন হচ্ছে এই ধৈর্য্য, এই সুদূর পরিকল্পনা, এইমত সস্তা মেকী জিনিষের প্রতি বিমুখতা। নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি, কোনো একজন দিল্লীর বাদশা অথবা মারাঠা রাজার ইতিহাস লিখতে গিয়ে আমাকে প্রথমে দশ বছর ধরে তার উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে; সেগুলি সাজিয়ে, সংশোধন ক'রে, আলোচনা ক'রে, মনের মধ্যে হজম ক'রে, দশ বৎসর পরে ঐ পুস্তকের লেখা আরম্ভ করি, তার আগে নয়। পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুষ্প্রাপ্য পুস্তক কিনতে ও ফার্সী হস্তলিপির নকল নিতে বোধ হয় আমার উদ্বৃত্ত আয়ের অর্দ্ধেক খরচ হয়েছে; মারাঠা দেশে ত্রিশ-বত্রিশ বার এবং আগ্রা, দিল্লী, মালয়, রাজপুতানা, প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রদেশে বারো-তেরো বার বেড়িয়েছি। এ ছাড়া ঐ উপকরণসমূহ রীতিমত বুঝবার জন্য আমাকে ফার্সী, মারাঠী ও পোর্তুগীজ প্রভৃতি নূতন ভাষা শিখতে হয়। এই দশ বৎসর বাইরের জগতের কাছে আমার কাজ সম্বন্ধে নীরব থাকতে হ'ত। কেন অসময়ে ঘোষণা করে, লোককে আশা দিয়ে পরে নিজকে হাস্যাস্পদ করব? কিন্তু এই দশবর্ষ-ব্যাপী উদ্যোগপর্ব্বই আমাদের ধৈর্যের শেষ পরীক্ষা নয়। আমাদের গবেষণার ফলটি প্রকাশিত হবামাত্র চারদিক থেকে তার মূল্য সম্বন্ধে অবিশ্বাস, ঈর্ষ্যার কুৎসিত অপবাদ আমাদের ঘিরে ফেলে। কিন্তু যাই বিলাতের কোনো বিখ্যাত পত্রিকায় কোনো সাহেব আমাদের গবেষণার প্রশংসা করলেন, অমনি আমাদের স্বজাতীয় নিন্দুকগণ একেবারে চুপ হয়ে গেল।

খাঁটি কাজের পুরস্কার অনেক সময় এ জীবনেই পাওয়া যায়। কত অপরিচিত বিদেশী আমার প্রাথমিক লেখা প'ড়ে আমাকে ফার্সী, পোর্তুগীজ হস্তলিপি পাঠিয়ে, বা স্থানীয় খবর দিয়ে সাহায্য করেছেন। পরে শিষ্যগণ এসে আমার চারদিকে জুটেছে। আজ সমস্ত সভ্যজগৎ এক দেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া যেখানেই কোন খাঁটি জিনিষ বা নূতন সত্য বাহির হয়, অমনি সমস্ত সভ্যজগৎ তা জেনে নেয়, নিজের ক'রে ফেলে, এ রকম দৃষ্টান্ত আমার জীবনকালেই দেখা গেছে। পরাধীন ভারতে দু-জন ভারতবাসী বিশ্বপূজ্য হয়েছেন, নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। যেসব যুবক নীরবে খাঁটি কাজ করবার জন্য বুক বেঁধেছে, আমি নিজ দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের এই আশ্বাস দিচ্ছি—তোমরা ঠিক পথ বেছে নিয়েছ, তোমরা সফল হবেই হবে, "জীবনে না হয়, মরণে।"

আমাদের শিক্ষিত লোকদের দুর্ব্বল চরিত্র ও নীচ মন দেখে দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শেষ বয়সে misanthrope হয়ে পড়েন, অর্থাৎ মানবজাতিকে অবিশ্বাস ও ঘৃণা করতেন। কিন্তু দেখ, দেশসেবায় তাঁর যে জীবন উৎসর্গ হয়েছিল, তা নিষ্ফল হয় নি; যদি তিনি আজ জীবিত থাকতেন তবে এদেশে নানা রকম সমাজ-সংস্কার কার্য্যে এবং নানা ক্ষেত্রে, বাঙালীর যা কখনও ভাবা যায় নি, এমন সব প্রতিভা ও কৃতিত্ব দেখে তিনি আনন্দিত হতেন। সেইমত আমি নিজে দেখেছি, বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দেশবাসীর স্বার্থপরতায় চটে গিয়ে চেঁচাচ্ছেন—"এই গু-খেকো জাতের কিছু হবে না।" হায়! আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন ত দেখতে পেতেন যে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর সায়েন্স-এর সেই বৌবাজারের পুরানো বাড়ীতে গবেষণা ক'রে একজন ভারতবাসী জগদ্বরেণ্য হলেন, মৌলিক আবিষ্কারের জন্য রমন বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেলেন। মহেন্দ্রলালের জীবন ব্যর্থ হয় নি।

যে যুবক-সাধক এই মহা আদর্শ বরণ করবে, তাকে প্রথমে চারদিক থেকে দৈন্য হিংসা দুর্নাম এবং বহু বাধা বিপত্তি নীরবে সহ্য করতে হবে। এজন্য তার পক্ষে চাই একটি অন্তর্জগৎ, অর্থাৎ মনের মধ্যে একটা দুর্গ সৃষ্টি করা,—যেখানে বসে তার চিত্ত স্নিগ্ধতা শান্তি ও বল পেতে পারে। সেই জগৎটা হচ্ছে পূর্ব্বগামী মনীষিগণের রচিত সাহিত্য। আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ হয়েছে এই গ্রন্থের সাহচর্য্য। উপনিষৎ ও সংস্কৃত কাব্য, ইউরোপীয় কাব্য, ইতিহাস ও জীবনী, বাংলার ত কথাই নাই,—এগুলি আমাকে এক নূতন রাজ্য দিয়েছে যেখানে কোনো শত্রু প্রবেশ করতে পারে না, সেখানে গিয়ে আমি নূতন প্রাণশক্তি পাই। এটিও আমার পিতার কাছ থেকে শিখেছি।

সাহিত্য বা কলার সাধনা ঠিক যোগসাধনার মত। এতে কঠিন জিনিস দেখে ভয় পেলে চলবে না। যে লোক ভাবে যে সস্তায় কাজ হাসিল করবে, সে কখন কখন যশ বা ধন পেতে পারে বটে, কিন্তু তার জীবনের ফল একটি অসার প্রাণহীন শুষ্ক শস্যের খোসা-মাত্র। মেকী জিনিষ বেশী দিন চলে না।

যোগসাধনে রত তপস্বীর মতই আমাদের গবেষককে সরল শ্রমসহিষ্ণু জীবন যাপন করতে হবে, দীর্ঘকাল কঠোর দারিদ্র্য সহ্য করে তারপর সিদ্ধি আসবে। এইজন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে আমরা বিজ্ঞান-তপস্বী বলি। তিনি জীবনে Chemistry এবং দেশী লোকের যৌথ ব্যবসা—এই দুটিই ধ্যান করেছিলেন, সুখ নহে।

বর্তমান যুগে এইরূপ সাধনা আগের চেয়ে বড় কঠিন হয়ে পড়েছে। আমরা বলে থাকি এটা জনতন্ত্রের যুগ, age of democracy, কিন্তু যেখানে জনগণ অশিক্ষিত, অ-সংঘবদ্ধ, সেখানে রাজনৈতিক জুয়াচোরের প্রাধান্য হবেই হবে। সে ফন্দিবাজ লোক ব্যবসা বা বিষয়কর্মে লাভবান হবার সম্ভাবনা নাই দেখলে, সে দল পাকিয়ে নেতা হয়ে নিজের আত্মীয় ও অনুচরদের দেশের টাকায় ধনী করলে। চারদিকে এইরূপ অবিচার ও অসাধুতার প্রাধান্য দেখে চিন্তাশীল স্বদেশভক্ত যুবক হতাশ্বাস হতে পারে, সে ভাবতে পারে, "দূর ছাই! ভাল খাঁটি কাজ করা এদেশে অসম্ভব। চারদিকে চোরের রাজত্ব, ঘুষের জয়। আমি একক, তৃণমাত্র, এই বন্যার স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভেসে যাব।"

আমি তাকে বলব—"হতাশ হয়ো না। সত্যের জয় হবেই হবে, হয়ত তোমার মৃত্যুর পর। কিন্তু দেশের সকল সুসন্তানই যদি হতাশ হয়ে দেশের জন্য খাঁটি কাজ করার ব্রত মাথায় তুলে নিতে পিছুপা হয়, তবে দেশের কোন ভবিষ্যৎ থাকবে না, অসাধুতার বিরোধী সৈন্যদল গঠন করা কারও পক্ষে কখনও সম্ভব হবে না। সমস্ত জাতিটা লোপ পাবে। অযোগ্য প্রাণী, জুয়াচোর জাতি ধ্বংস হবে, প্রকৃতির এই কঠোর নিয়ম অনিবার্য্য।"

খাঁটি কাজের, জ্ঞানসাধনার, দেশসেবার কঠোর ব্রত কখন কখন সাধককে জীবিত কালেই পুরস্কার দেয়; আমি নিজে তা পেয়েছি। তাই, যে যুবক কর্ম্মী এই পথে চলে আমার চেয়ে কম ভাগ্যবান্ হবে, তাকে বলি—কোন বাধা, বাইরের কোন চক্রান্ত, সত্যসন্ধানী দেশসেবককে একটি সান্ত্বনা হতে বঞ্চিত করতে পারবে না—সে সান্ত্বনা এই, তোমাকে মৃত্যুশয্যায় বলতে হবে না—

জন্মেদং বন্ধ্যতাম্ নীতং ভব-ভোগোপলিপ্সয়া,
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ময়া।

অর্থাৎ হায়! আমি কি ঠকাই ঠকেছি! সারা জীবনটা মাটি করলাম, টাকা সুখ যশ এই সব ভোগের সামগ্রী খুঁজে খুঁজে। আমি একটা দৈব শক্তিসম্পন্ন মণি পেয়েছিলাম, যেটা আমাকে যা চাই তাই এনে দিতে পারত। অথচ আমি সেই চিন্তামণি ফেলে দিয়ে এক টুকরা চক্‌চকে অসার কাঁচ নিলাম।"*

* অল্-ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে প্রকাশিত। প্রবন্ধটি ১২ই অক্টোবর ১৯৪৮ কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রে পঠিত হয়।

জিজ্ঞাসা

শ্রীকমলরাণী মিত্র

চিহ্নিত করিয়া রাখো শোণিত অক্ষরে
সেই দিনগুলি, হে কালের ইতিহাস,
নারীর সম্মান যবে আর্ত কণ্ঠস্বরে
পূর্ণ করি ভারতের আকাশ-বাতাস,
ভারতের পৌরুষেরে করিল আহ্বান
চরম লাঞ্ছনা হ'তে লভিতে উদ্ধার!
সেদিন জাগে নি সাড়া; প্রলয়-বিষাণ
গরজি উঠে নি বাজি হানিয়া সংহার
ধর্মঘাতী কামাচারী পাপিষ্ঠের বুকে।
লাঞ্ছিতের ভগবান তুমিও সেদিন
অনন্ত-শয়ানে ছিলে—তোমার সম্মুখে
সতীত্বের পুণ্যব্রত হ'ল ধূলিলীন।

মিথ্যা স্তোকবাক্যজালে কর্ত্তব্যের দায়
কোনক্রমে সারা হ'ল সান্ত্বনার ছলে;
রাষ্ট্রনীতি মনুষ্যত্বে করিল বিদায়,
দুরাচার স্ফীতকায় প্রশ্রয়ের কোলে॥

সেদিন চিহ্নিত থাক্, কহিতে ধিক্কার
অপদার্থ পৌরুষের নির্বিকার মুখে;
সেদিন চিহ্নিত থাক্, নিতে অঙ্গীকার
তিলে তিলে প্রতিশোধ হানিতে কৌতুকে
সেদিন চিহ্নিত থাক্ ধ্বনিতে জিজ্ঞাসা
দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট বজ্র মেঘমন্দ্রভাষা;
"প্রহসন স্বাধীনতা কোন্ মূল্যে আজ
কিনিয়াছ বলো জনগণ-অধিরাজ!"

জয়দেবের দুকূল

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

জয়দেবের কৃষ্ণ দুকূল পরিধান করিয়া গোপাঙ্গনাদের সহিত বিহার করিতেন। অবশ্য একখানি দুকূল নয়, দুইখানি। একখানি অন্তরীয়, অপরখানি উত্তরীয়। উত্তরীয় প্রাবরণ, উড়ানী। তদ্দ্বারা ঊর্ধ্বাঙ্গ আবৃত থাকিত। এই বস্ত্রযুগ্মের নাম উদ্‌গমনীয়। এই কারণে কাহাকেও বস্ত্র দিতে হইলে ধুতি উড়ানী দিতে হয়। উড়ানী আবরণী, নারীর ওড়না। বহু প্রাচীনকাল হইতে বস্ত্র-ধারণের এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। কেহ কোথাও একবস্ত্রে যায় না। মলিন কিম্বা ছিন্ন বস্ত্রেও যায় না। কোন ভদ্রলোক গৃহে আসিলে যুগ্মবস্ত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার রীতি ভারতের সর্বত্র অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ইহার অন্যথা হইলে অসভ্যতা হয়। উদ্‌গমনীয় ধৌত বস্ত্রের হইত। ধৌত শব্দ হইতে ধৌতি। ধৌতি হইতে ধোতি, ধুতি আসিয়াছে।

জয়দেব লিখিয়াছেন, "বিচকর্ষ করেণ দুকূলে।" কৃষ্ণ কুঞ্জগত হইলে কৌতুক করিতে কোন গোপাঙ্গনা করদ্বারা দুকূলদ্বয় আকর্ষণ করিল।

কি বর্ণের দুকূল? গৌর দুকূল। পূজারি-গোস্বামী জয়দেবের টীকাতে গৌর অর্থে পীত করিয়াছেন। গৌর পীত বটে, কিন্তু আ-পীত। দুকূল পীত অর্থাৎ হরিদ্রাবর্ণ হইত না। কৃষ্ণ নব-নীরদবর্ণ ছিলেন না, ছিলেন আকাশ বর্ণ বা অতসীকুসুম বর্ণ, সে বর্ণ আ-নীল বা আ-কৃষ্ণ। আ-কৃষ্ণ অঙ্গে আ-পীত বসন বর্ণের বৈপরীত্যগুণে একের শোভা অন্যে বৃদ্ধি করে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় রক্ত ও হরিৎ, পীত ও নীল পরস্পর পরিপূরক বর্ণ। রাধিকা গৌরী ছিলেন, তাঁহার অঙ্গে নীলাম্বরী শোভা পাইত। কিন্তু সে নীল গাঢ় নীল নয়। প্রাচীন বঙ্গীয় কবি মেঘ-ডম্বর শাড়ীর উল্লেখ করিয়াছেন। ডম্বর সংস্কৃত শব্দ, অর্থ, সদৃশ। মেঘ-ডম্বর, মেঘের তুল্য নীল। বঙ্গীয় নারী মেঘ-ডম্বর শাড়ী পরিতে ভালবাসিতেন। অতএব তিনি গৌরী ছিলেন, কৃষ্ণা ছিলেন না। কৃষ্ণের পরিহিত দুকূল অবশ্য ধৌত। দুকূলের বর্ণ প্রক্ষালনে নষ্ট হয় নাই। বোধ হয় দুকূলের স্বাভাবিক বর্ণ পাণ্ডুর ছিল।

আমরা দুকূল দেখিতে পাই না। দুকূল কি বস্ত্র, জিজ্ঞাসা করিতে হয়। অমরকোশে দুকূল শব্দ আছে। ক্ষৌম ইহার পর্য্যায় শব্দ। অমরকোশের টীকাকার মহারাষ্ট্রীয় ভানুজি দীক্ষিত এই দুই বস্ত্রকে পট্টবস্ত্র বলিয়াছেন। ইহা এক মহা ভ্রম, পরে বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা ক্ষুমাজাত, ইংরেজীতে Linen.

বঙ্গদেশে দ্বাদশ খ্রীষ্ট শতাব্দে সর্বানন্দ অমরকোশের এক টীকা করিয়াছিলেন। তিনি ক্ষৌম ও দুকূলের অর্থ করিয়া লিখিয়াছেন, মল্ল নামে খ্যাত। আপ্টে-কৃত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানে বিশেষণ মল্ল শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট। অতএব মল্ল বলিলে উৎকৃষ্ট বস্ত্র বুঝাইত। আর সেই বস্ত্র দুকূল। মল্ল শব্দ হইতে বাংলায় ও হিন্দীতে মল্‌মল্ শব্দ আসিয়াছে। ইংরেজ বণিকের নিকট ইহার নাম মল্ (Mull)। কেহ কেহ ঢাকার সূক্ষ্ম বস্ত্রকে ঢাকাই মসলিন বলে। কিন্তু মসলিন ইংরেজী শব্দ। ইহা ঢাকাই মল্‌মল্। ইহা কার্পাস নির্মিত, ক্ষুমা নির্মিত নয়, কিন্তু এত সূক্ষ্ম যে দেশে-বিদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। জয়দেব সর্বানন্দের সমসাময়িক। তিনি নিশ্চয় মল্ল দেখিয়াছিলেন, আর কৃষ্ণের অঙ্গে সেই সূক্ষ্ম বস্ত্র অর্পণ করিয়াছিলেন।

দুকূল পট্টবস্ত্র নহে, ক্ষৌমবস্ত্র। ক্ষুমা-জাত ক্ষৌম। অমরকোশে 'অতসী স্যাৎ উমা ক্ষুমা', এক গাছের তিন নাম। অতসীর বাংলা নাম তিসী। ইহার বীজ মসিনা, সংস্কৃত মসৃণা। মসিনায় তৈল আছে। সে তৈলের নিমিত্ত বঙ্গে ও বিহারে তিসীর বিস্তর চাষ হইতেছে। তিসীর দুই তিন জাত আছে। কোনটার ফুল প্রায় শ্বেত, কোনটার আ-নীল, কোনটার অরুণাভ আ-নীল। কৃষ্ণ অতসীকুসুম শ্যাম ছিলেন। মৎস্য পুরাণ পাঠে জানা যায় হিমালয়-কন্যা পার্বতী কৃষ্ণা ছিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া গৌরী হইয়াছিলেন। বোধ হয় সেই কারণে অতসীর এক নাম উমা হইয়াছিল। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি অতসীর বল্কলে কোমল স্নিগ্ধ অংশু আছে। সেই অংশুর সূত্রে ও বস্ত্র নির্মিত হইত। সেই বস্ত্রের নাম ক্ষৌম। সূক্ষ্ম ক্ষৌমের নাম দুকূল ছিল। রামায়ণে, কালিদাসে, ভট্টিতে ক্ষৌম বস্ত্রের বহু উল্লেখ আছে। দুকূল এত সূক্ষ্ম হইত যে দেহলগ্ন অলঙ্কার উহার মধ্য দিয়া দেখিতে পাওয়া যাইত।

এখানে এদেশের বস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিতেছি। উপরে দেখাইয়াছি, দ্বাদশ খ্রীষ্ট শতাব্দে বঙ্গের দুকূল বহুজাত মল্ল নামে খ্যাত ছিল। কিন্তু এক শত বৎসরের মধ্যে দুকূল ও ক্ষৌমের দুর্গতি হইয়াছিল। বঙ্গদেশে ত্রয়োদশ খ্রীষ্ট শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে মেদিনীকোশ সঙ্কলিত হইয়াছিল।

এই কোশে দুকূল শব্দে শ্লক্ষ্ণ বস্ত্র ও ক্ষৌম আছে। শ্লক্ষ্ণ বস্ত্র কোমল স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম বস্ত্র। অর্থাৎ তৎকালে ক্ষুমাজাত দুকূল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। তৎপরিবর্তে লোকে শ্লক্ষ্ণবস্ত্রকে দুকূল বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পট্ট এইরূপ বস্ত্র হইতে পারে, এই বিবেচনায় সেই সময় হইতে ভ্রমের আরম্ভ হইয়াছিল। তৎকালে ক্ষৌমবস্ত্রও দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিতেছিল। ইহার প্রমাণ মেদিনীকোশে পাওয়া যায়। ইহাতে ক্ষৌম শব্দের অর্থ অট্ট, দুকূল এবং বল্কলজাংশুক, শণজ ও অতসীজ বস্ত্র। প্রথম দুই অর্থ অমরকোশ হইতে গৃহীত, অন্য অর্থ কালক্রমে আসিয়াছিল। ক্ষৌম অতসীজ বুঝি, শণজ নূতন, আর বল্কলজ আরও নূতন। শণজ বস্ত্রের নাম শাণ। এই শণ বর্তমানে জ্ঞাত পীত পুষ্প শণ নহে। শণ শব্দ দ্ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন শণ ভঙ্গা বা সিদ্ধি গাছের নামান্তর। এই শণ গাছের বল্কলে অংশু আছে। সে সাদৃশ্যে পীত পুষ্প শণের নাম হইয়াছে। ভঙ্গার ফুল নগণ্য।

ভঙ্গা হইতে পৃথক করিতে পীত পুষ্প শণের নাম ফুলশণ আছে। সংস্কৃত কোশে ও আয়ুর্বেদে শণ ভঙ্গা। অন্য অর্থ নাই। ভঙ্গা শণের অংশুতে বস্ত্র হইত। সে বস্ত্র শাণ (Canvas)। এই শণের বীজে তৈল আছে। লোকে সে তৈল খাইত। অতসীর যেমন অংশু ও তৈল, ভঙ্গা শণেরও তেমন অংশু ও তৈলের নিমিত্ত বিস্তর চাষ হইত। সমগ্র উত্তর-ভারতে, মধ্য ভারতেও এই শণের চাষ ছিল। গ্রামে চতুর্দশ ধান্যের চাষ হইত। তন্মধ্যে শণ একটি ধান্য (ধান্য অর্থে ধান, কলাই, তিল ইত্যাদি খাদ্যবীজ)। মনুসংহিতায় উপনয়ন কালে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীকে শাণবস্ত্র, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীকে ক্ষৌমবস্ত্র এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারীকে মেষলোমজবস্ত্র পরিতে বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশে শাণবস্ত্র ও ক্ষৌমবস্ত্র অজ্ঞাত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী শাণবস্ত্রের অভাবে পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেছেন। ওড়িষ্যায় কেঅটরা বড় জালের নিমিত্ত যেমন ফুলশণের সরু সুতলি করে তেমন সুতলি দিয়া ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়নের জন্য প্রায় জালের মত পাতলা ছোট কাপড় বুনে। হাত দুই লম্বা, পোয়া তিনেক চওড়া। বাঁকুড়ায় উৎকল শ্রেণীর অনেক ব্রাহ্মণের বাস আছে, কিন্তু উৎকলের কেঅট নাই। পুরোহিত ব্রাহ্মণ-বালকের উপনয়ন কালে বালকের কটিতে ফুল শণের অংশু বিছাইয়া মেখলা দ্বারা বদ্ধ করেন। বঙ্গদেশে ভঙ্গার চাষ ছিল না। বোধ হয় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে শাণবস্ত্র আসিত। শাণবস্ত্র স্থূল। ইহার চাদর হইত। আমরা কেম্বিশের থলিয়া, জুতা দেখিতেছি। কেম্বিশ এই শাণবস্ত্র।

মেদিনীর কালে যাবতীয় বল্কলজাত বস্ত্রের নাম ক্ষৌম হইয়াছিল। বস্ত্র কেবল পরিধেয় বস্ত্র নয়; চাদর, চটও বস্ত্র। তৎকালে ফুলশণের চাষ অধিক ছিল না। তৎপরিবর্তে পাটশণ সমধিক প্রচলিত ছিল। ইংরেজ বণিক গাছ পাটের (অর্থাৎ নালিতা পাটের) চাষ বিপুল আকারে বাড়াইয়াছে। পূর্বে অংশুর জন্য এই পাটের চাষ ছিল কিনা সন্দেহ। পাটশণের গাছ জবাগাছের তুল্য। ফুলের আকার জবাফুলের আকার; কিন্তু পীত-বর্ণ। এই পাট উচ্চভূমিতে কিন্তু নালিতা পাট নিম্ন ভূমিতে জন্মে। বাঁকুড়া ও মানভূমে এই পাটের চাষ এখনও চলিয়াছে। পূর্বে ইহারই নাম পাটশণ ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে সিংহলে বাণিজ্যে "পাটশণ বদলে ধবল চামর।" অর্থাৎ পাটশণ ধবল চামরের তুল্য উজ্জ্বল, এই কারণে বণিকেরা পাটশণের দ্বারা কৃত্রিম চামর করিত। শূন্য পুরাণে ইহারই নাম বেরাল-পাট, অর্থাৎ বেরাল-লোমের তুল্য উজ্জ্বল পাট। বেরাল পাট নাম অদ্যাপি বাঁকুড়ায় প্রচলিত আছে। অন্যত্র ইহার নাম মেষ্টা পাট, অর্থাৎ মেষ-লোমের তুল্য উজ্জ্বল পাট। পাটশণকে কোথাও কোথাও কেবল পাট বলিত। চৈতন্যদেবের সময়ে নবদ্বীপে শ্রীধর নামে এক পাট-ব্যাপারী ছিল। এই কারণে তাহার নাম পাটুয়া শ্রীধর হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে খুল্লনাকে খুঞা পরিতে হইয়াছিল। যেমন ভূমি শব্দ হইতে ভূমি+ইয়া=ভূমিয়া, ভূঞা; তেমন ক্ষৌম অপভ্রংশে খোম; খোম+ইয়া=খোমিয়া, খুমিয়া, খুঞা। এই খুঞা নিশ্চয় অতিশয় স্থূল বস্ত্র। বোধ হয় পাটশণের চট। খুঞা বুনিবার পৃথক তাঁতী ছিল। ভারতচন্দ্র খুঞা তাঁতীর উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব শণ শব্দে বৈদিক কাল হইতে অর্থ ভঙ্গা, পরে ফুলশণ ও পাটশণ আসিয়াছে। পট্ট শব্দেরও সেই দুর্দশা হইয়াছে। পট্ট অর্থাৎ গরদ কৃমিজ; তাহার সাদৃশ্যে বেরাল পাট নাম এবং ইহার সাদৃশ্যে গাছ পাট বা জুট।

কি কারণে ক্ষৌমের এই অধোগতি হইল তাহা ঐতিহাসিকের চিন্তনীয়। বোধ হয় জয়দেবের পূর্ব হইতেই দুকূল-বয়ন-কলার হ্রাস ও অবনতি হইতেছিল। তদুপরি মনে হয়, দেশে অশান্তিও চলিতেছিল। উদ্‌বেগের সময়ে কলার অবনতি অবশ্যম্ভাবী। লোকে ভালমন্দ বিচার করে না, যাহা পায় তদ্দ্বারা কাজ চালায়। বর্তমানে আমাদের সেই দশা হইয়াছে। তখন বোধ হয় কার্পাস চাষ অধিক চলিতে লাগিল এবং ক্ষুমা ক্রমশঃ অপরিচিত হইয়া পড়িল। লোকে মনে করিতে লাগিল বল্কলজাত বস্ত্র মাত্রই ক্ষৌম। টীকাকারেরা ক্ষৌম ও দুকূল না পাইয়া ইহার অর্থ কৌষেয় (তসর) ও পট্টবস্ত্র বুঝিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা পতিগৃহে যাইবেন, তাঁহার পরিধানের নিমিত্ত কণ্ব ঋষির তপঃপ্রভাবে বৃক্ষ হইতে আ-পাণ্ডুর ক্ষৌম আসিল। টীকাকার বুঝিলেন, কৌষেয়। কারণ তসর কোষ বৃক্ষে উৎপন্ন হয়। শকুন্তলা ঋষির আশ্রমে বল্কল পরিধান করিয়া থাকিতেন। সকল বৃক্ষ হইতে বল্কল পাওয়া যায় না। ইহা দীর্ঘও হয় না, কারণ এক হাত ব্যাসের অধিক স্থূল বৃক্ষ কাটিয়া তাহার বল্কল উন্মোচন করা সোজা কাজ হয় না। বৃক্ষের কাণ্ডের ব্যাস এক হাত হইলে বল্কল তিন হাত পাওয়া যাইবে। গুঁড়ির দুই হাত আড়াই হাত ছেদ করিয়া মুগুর দিয়া গাত্র পিটিতে থাকিলে বল্কল শিথিল হয় এবং খোলের ন্যায় পৃথক করিতে পারা যায়। তখন লম্বা-লম্বি চিরিয়া জলে ভিজাইয়া মুগুর দিয়া পিটিতে থাকিলে বল্কলের শ্লেষ ও শুষ্ক অংশ দূরীভূত হয় এবং ভিতরের অংশু-জাল থাকে। ইহাই পরিধেয় বল্কল। শকুন্তলাকে দুইখানি বল্কল পরিতে হইত। একখানি কটি বেষ্টন করিয়া মেখলা-বদ্ধ থাকিত, বোধ হয় আঁঠু পর্য্যন্ত লম্বিত হইত। অপর একখানি ছোট, ঊর্দ্ধাঙ্গ আবরণ করিত। স্কন্ধদেশে ডোরের গ্রন্থি দেওয়া হইত। বল্কল অদ্যাপি অদৃশ্য হয় নাই। ওড়িষ্যায় কুম্ভীপটিয়া নামে এক সম্প্রদায় আছে। তাহাদের এক জনকে বল্কল পরিয়া সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া সূর্য প্রণাম করিতে দেখিয়াছি। কটিতে ডোর বাঁধা, আঁঠু পর্যন্ত লম্বিত, খদির বর্ণ, কোমল। ওড়িষ্যায় ও অন্যত্র জম্বুকাদি বর্গের কুম্ভী নামে এক বৃক্ষ আছে। তাহার ফল কুম্ভাকার, এই হেতু বৃক্ষের নাম কুম্ভী। কুম্ভী ও পট সংস্কৃত শব্দ। কুম্ভীর বল্কল পট (বস্ত্র) হইয়াছে যাহার, কুম্ভীপট+ইয়া—কুম্ভীপটিয়া। কুম্ভীর বৈজ্ঞানিক নাম Careya arborea. প্রাচীনকালে মৃগচর্ম পরিধেয় হইত। চর্ম কেমন করিয়া স্থায়ী ও কোমল করিতে হয়, তাহা জানা ছিল। কিন্তু বল্কল ও চর্ম বস্ত্র-গণ্য হইত না।

অমরকোশে বস্ত্রের চতুর্বিধ উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে; বল্কলজাত, যেমন ক্ষুমা ভঙ্গা; ফলজাত যেমন কার্পাস, লোমজাত যেমন ঊর্ণা; কোষকীট-জাত, যেমন তসর ও পট্ট। আমার অনুমানে অমরকোশের বর্তমান সংস্করণ তৃতীয় খ্রীষ্ট শতাব্দে হইয়াছিল। ইহাই কিন্তু মূল অমরকোশ নহে। সর্বানন্দ বুদ্ধ অমরকোশ পাইয়াছিলেন। তাহা অন্ততঃ দুই-তিন শত বৎসরের পূর্ববর্তী হইবে। তাহাতে বস্ত্রের চতুর্বিধ উৎপত্তি থাকিবার কথা।

কিন্তু এই সময়ের পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশ ক্ষৌম ও দুকূলের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ইহার চারি শত বৎসর পূর্বে কৌটিল্য বঙ্গের দুকূলের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইতিহাস-পাঠক জানেন, চাণক্য পণ্ডিতের বুদ্ধিকৌশলে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি মুরা জাতীয়া কন্যার পুত্র ছিলেন। এই হেতু ইনি মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। চাণক্য শ্লোকে চাণক্যের নীতি বালকদিগেরও পরিচিত হইয়াছে। তিনি কুটিল নীতি দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের শত্রুদমন করিয়াছিলেন। এই হেতু তিনি কৌটিল্য নামেও খ্যাত হইয়াছেন। তিনি রাজ্য পরিচালনার নিমিত্ত "অর্থশাস্ত্র" নামে এক অমূল্য গ্রন্থ রচিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় এমন নীতি ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ আর একটি নাই। শুক্র-নীতি, বৃহস্পতি-নীতি, কামন্দক-নীতি, বিদুর-নীতি প্রভৃতি গ্রন্থে যাহা নাই, কৌটিল্যের অর্থনীতি গ্রন্থে তাহা আছে। মহীসুর রাজ্যের রুদ্রপট্টণ শামশাস্ত্রী মহারাজার গ্রন্থপাল ছিলেন। তিনি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আবিষ্কার ও প্রকাশ করেন, পরে ইংরেজীতে অনুবাদও করিয়াছিলেন। অনুবাদে দ্রব্যনির্ণয়ে অসংখ্য ভুলও করিয়াছিলেন। ইহাতে আশ্চর্যের কথা নাই। কারণ কেবল ভাষাজ্ঞান কিম্বা কেবল বিষয়জ্ঞান কিম্বা দ্রব্যজ্ঞান দ্বারা এইরূপ গ্রন্থ বুঝিতে পারা যায় না। এই তিনের সংযোগ সুদুর্লভ। তদুপরি অর্থশাস্ত্রের ভাষা অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও দুরূহ। তথাপি শামশাস্ত্রী-কৃত ইংরেজী অনুবাদ দ্বারা পাঠকের প্রভূত দিগ্‌দর্শন হইয়াছে। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও বেদবিদ্যায় অধিকার সর্বদা সুলভ নয়। অর্থশাস্ত্রের এক অধ্যায়ে রাজকোষে রক্ষার উপযুক্ত রত্ন ও আবশ্যক বস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ তালিকা আছে। সেখানে মাত্র তিনটি স্থানের দুকূলের উল্লেখ আছে। বঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুবর্ণকুড্য। বঙ্গ ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী দেশ, পুণ্ড্র পদ্মার উত্তরদেশ, সুবর্ণকুড্য কামরূপ। কৌটিল্য লিখিয়াছেন—"বঙ্গদেশ-জাত দুকূল শ্বেতবর্ণ স্নিগ্ধ, পুণ্ড্রদেশ-জাত শ্যামবর্ণ মণিতুল্য স্নিগ্ধ এবং সুবর্ণকুড্য-জাত সূর্যবর্ণ মণিতুল্য স্নিগ্ধ। এই সকল দুকূলের কোনটা এক-অংশু, কোনটা অর্ধ-অংশু অথবা দুই-তিন-চারি অংশু দ্বারা নির্মিত।"

কৌটিল্য ভারতবর্ষের মধ্যে উক্ত তিন দেশেরই দুকূল এবং কাশী ও পুণ্ড্রদেশের ক্ষৌম শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া রাজকোষে রাখিতে বলিয়াছেন। একটি অংশুর অর্ধাংশের দুকূল না জানি কত সূক্ষ্ম হইত! ক্ষৌম স্বভাবতঃ শ্বেত বা আ-পাণ্ডুর। শ্যামবর্ণ ও সূর্যবর্ণ নিশ্চয়ই রঞ্জিত বস্ত্র। ক্ষৌমে পাকা রং করা কঠিন। রঞ্জন-কলার কত উন্নতি হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাইতেছি। বঙ্গের ঐতিহাসিকেরা এই উল্লেখের গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন কি না সন্দেহ। খ্রী-পূ চতুর্থ শতাব্দে যে কলার এত

উৎকর্ষ হইয়াছিল, কত শত বৎসর পূর্ব হইতে ইহার অনুশীলন চলিতেছিল? এই দুকূল ও ক্ষৌম কে পরিত? কাহারা নির্মাণ করিত? নিশ্চয় বঙ্গীয়েরা। তৎকালে ক্ষুমার চাষও নূতন ছিল না। যজুর্বেদে ক্ষৌমের উল্লেখ আছে। সে বেদ খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দে রচিত হইয়াছিল। ইহারও কত শত বৎসর পূর্ব হইতে ক্ষুমার চাষ চলিয়া আসিতেছিল তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। শণ (ভঙ্গা)ও বহু প্রাচীনকাল হইতে বস্ত্রের প্রধান উপাদান হইয়া আছে। আমরা দেশের ইতিহাস জানি না। হিমালয়ের দক্ষিণাংশে পশ্চিম হইতে পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত প্রতিবৎসর ভঙ্গার জঙ্গল হইয়া থাকে। মজঃফরপুরে ও বিহারের উত্তরাংশে, মালদহে এমন কি বীরভূমের নদীকূলে ভঙ্গা জন্মিতেছে এবং বৃথা নষ্ট হইতেছে। অদ্যাপি শুনি নাই, কেহ সে ভঙ্গার অংশু দ্বারা সূত্র ও বস্ত্র নির্মাণ করিতেছে।

জয়দেবের দুকূল চিন্তা করিতে করিতে বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছি। এখন নিবৃত্ত হই।

প্রবাহ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

১

পরদিন যথাসময়ে মৃন্ময় দেশের মাটিতে পা দিল। রাত তখন ন'টা। অন্ধকার রাত্রি। আকাশে চাঁদ নাই। শুধু এখানে-ওখানে দুটি-একটি তারকা দেখা যায় মাত্র। আশেপাশের বড় বড় গাছগুলি অন্ধকারে খানিকটা বর্ণভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। ধীরে ধীরে মৃন্ময় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পশ্চাতে নৌকার মাঝি জিনিষপত্র লইয়া তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। রাত বেশী হয় নাই, কিন্তু এরই মধ্যে গ্রাম যেন ঘুমে আচ্ছন্ন। শুধু থাকিয়া থাকিয়া দুই-একটা বাদুড় খাদ্যান্বেষণে উড়িয়া যাইতেছে। এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যেই মৃন্ময় মানুষ হইয়াছে। রাতের এই ঘুমন্ত প্রাণময় জগতের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। এই মাটিতে পা দিতেই মন তাহার বিপুল আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে।

আরও খানিক অগ্রসর হইতেই একসঙ্গে বহু লোকের কণ্ঠস্বর মৃন্ময়ের কানে আসিল। সে ক্ষণকালের জন্ত থামিল। প্রতিমার সাজ-পোশাক লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। কর্মকারদের প্রতিমায় রং দেওয়া হইতেছে।

মৃন্ময় পুনরায় চলিতে সুরু করিল। সম্মুখেই জমিদার-বাড়ী। বাড়ীময় একটা চাঞ্চল্যের আভাস যেন। দ্বিতলের বড় হল-ঘরে একসঙ্গে অনেকগুলি মানুষের ছায়ামূর্তি ঘোরা-ফেরা করিতেছে। মৃন্ময়ের কেমন সন্দেহ হইল। মঞ্জুষার মার অসুস্থতার সংবাদ সে জানিত। দ্বাররক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহের মীমাংসা করিল। উহারা সকলে ভালই আছে।

আর একটি বাঁকের শেষেই মৃন্ময়দের বাড়ী। কিন্তু বাড়ীর আঙিনায় আসিয়া কাহারও সাড়াশব্দ পাইল না, কেননা পূর্বাহ্ণে সে কোন খবর দেয় নাই। তাহার আসিবার নিশ্চয়তা ছিল না বলিয়াই দেওয়া সম্ভব হয় নাই। গ্রামের আজকাল কি দুরবস্থাই না হইয়াছে। পূজা আসন্ন অথচ কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য নাই। মৃন্ময়ের নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল। পূজা-অর্চনায় সেকালের মত উৎসাহ বর্তমানে বড় একটা দেখা যায় না। কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলের মধ্যেই তখন সাড়া পড়িয়া যাইত। প্রতিমার গড়ন, তার মুখশ্রী, আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা লইয়া রীতিমত প্রতিযোগিতা চলিত। সেদিনের উৎসাহীর দল আজ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেশের প্রতি কাহারও তেমন মমতা নাই।

ছেলেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া মা অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিলেন। একমুখ হাসিয়া কহিলেন, তবে যে উনি বলছিলেন তুই আসবি নে···এবং খবর না দিয়া আসিবার জন্ত তিরস্কার করিতেও ভুলিলেন না।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, তোমায় মোটেই ভাবতে হবে না মা। ষ্টীমারে আমি পেট ভরে খেয়ে এসেছি।

মা কহিলেন, তোর যেমন কথা। পথে-ঘাটে আবার খাওয়া হয় নাকি। ঘরের ডাল-ভাতও ভাল।

মৃন্ময় পুনরায় কি বলিতে যাইতেই মা বাধা দিয়া কহিলেন, তোকে আর বাজে বকতে হবে না। যা বলি তাই শোন। হাত-মুখ ধুয়ে আমার কাছে বসবি আয়।

খড়ম পায়ে প্রতুলও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি কহিলেন, তোর চেহারাটা ত তেমন ভাল ঠেকছে না মিনু। কলকাতার জলবায়ু বুঝি সহ্য হচ্ছে না?

মা কহিলেন, পথ-ঘাটের কষ্টটাই কিছু কম মনে করছ তুমি? মৃন্ময়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন। মুখ, হাত-পা ধুয়ে নে। পুকুরে যেতে হবে না, তোলা জল আছে। আর বাপু ঐ

রাস্তা-ঘাটের কাপড়চোপড়গুলো বাইরেই ছেড়ে রাখিস। যার তার ছোঁয়াছুঁয়ি। তোদের ত আর জ্ঞানগম্যি কিছু নেই। কথা বলতে গেলেই তর্ক করবি, বলবি জাত মানি না। জাত না মানিস অসুখ-বিসুখ তো মানতে হয়।

মৃন্ময় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কোন জবাব দিল না। মা পুনরায় আপন মনেই বলিয়া চলিলেন, বোকা ছেলের কাণ্ডখানা দেখ তো! একটা খবর দিয়েও কি আসতে নেই। সকালবেলার অমন মাছটা…কিন্তু তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস কেন। তুই ফিরে আসতে-আসতেই আমি সব গুছিয়ে নেব। ঘরে ডিম আছে—কৈ মাছ আছে।

মৃন্ময় চলিতে চলিতে শুনিতেছিল, মা বাবাকে বলিতেছেন, চেহারাটা ওর সত্যিই বড় খারাপ হয়ে গেছে। কলকাতার বাড়ীতে কি কিছু খাওয়া জোটে! গোনাগুণতি সব কিছু—তাও আবার ঠাকুর-চাকরের হাতে প্রাণ। আর তেমনি হয়েছে মিনু। ছুটি-ছাটা পেলেই যদি ছুটে আসে, দুটো খাইয়ে দাইয়ে একটু মানুষ করে পাঠাতে পারি।

প্রতুল একটু হাসিয়া কহিলেন, ছুটিছাটা বছরে দশ বার পাওয়া যায় না।

মা কহিলেন, তা নাই বা পেলে লম্বা ছুটি। ছুটকো-ছাটকা তো প্রায়ই পায়। এই তো মঞ্জু বলছিল, মাসখানেক আগেও নাকি কি একটা পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে সাত দিনের ছুটি ছিল। পথের কষ্ট তো একটি দিন মাত্র। তা ছেলেও হয়েছে তেমনি।

প্রতুল প্রস্থান করিলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্ষেত হইতে গোটাকয়েক বেগুন লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, কহিলেন, মিনুকে ভেজে দিও। বেশী আর হাঙ্গামা এই রাত দুপুরে করো না। যা হোক একটা ব্যবস্থা করে দিলেই চলবে।

প্রতুল চলিয়া গেলেন। কিন্তু যাঁহাকে যাহোক-একটা ব্যবস্থার বিধি দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন তাঁহার এত সহজে মন উঠিল না।

মৃন্ময় ফিরিয়া আসিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল, তোমার যত কাণ্ড মা। বললাম আমার খিদে নেই। ভরপেট ষ্টীমারে—

মা ধমক দিলেন, ওখানে একটা আসন পেতে চুপ করে বসে থাক্।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, শরীরটাও তেমন ভাল ঠেকছে না। দুটো ভাতে ভাত হলেই ভাল হ'ত।

মা কহিলেন, আলাসনে মিনু। সেই ব্যবস্থাই হয়েছে।

মৃন্ময় সহসা প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হইল, আসবার পথে জমিদার-বাড়ীর দোতলায় অনেক লোকজন আর আলো জ্বলতে দেখে এলাম মা। মঞ্জুদের মা ভাল আছেন তো?

মা কহিলেন, মঞ্জু আজ বলছিল বটে ওরা কাল হাওয়া বদল করতে বেরিয়ে পড়বে। ওর মার ভাঙা শরীরটা কিছুতেই আর জোড়া লাগছে না।

মৃন্ময় কহিল, সামনে পুজো ফেলে এমন অসময়ে যে…

মা কহিলেন, প্রাণের চেয়ে তো আর বড় কিছু নেই বাবা—তা বলে মঞ্জুর বাবা এখুনি যাচ্ছেন না। তিনি যাবেন সেই কালীপুজোর পরে। সরকারমশাই আর ঠাকুর-চাকর সহ মঞ্জু তার মাকে নিয়ে যাচ্ছে। ভালোয় ভালোয় আরোগ্য হয়ে ফিরে আসেন তবে তো হয়।

মৃন্ময় কথা কহিল না। তাহার গ্রামে আসিবার আগ্রহের সুর কোথায় যেন কাটিয়া গেল।

মা পুনরায় কহিলেন, ভাবতেও কষ্ট হয়। নইলে এমন মাটির মানুষ—কোন দিক দিয়ে কোন অভাব তাঁর নেই, অথচ তাঁর মনে শান্তি নেই। ছেলে যদি অশান্তির কারণ হয় তা সব মা বাপের পক্ষেই মর্ম্মান্তিক। কাল সকালে উঠেই একবার দেখা করে আসিস মিনু। মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না।

মৃন্ময় তথাপি নীরব।

মা পুনশ্চ কহিলেন, তুই আসবি নে শুনে মঞ্জুর মা দুঃখ করছিলেন। নিজের পেটের ছেলে পর হয়ে গেল—তাই পরকে নিয়েও তার সোয়াস্তি নেই। বলেন, নাড়ির বাঁধন যখন ছেলেকে আটকাতে পারে নি তখন কথার দাম আর কতটুকু।

মৃন্ময় মনে মনে হাসিল।

মা যেন আপন মনেই বলিয়া চলিলেন, যেন মুখের কথার কোন দাম নেই।

মাতা-পুত্রের আলোচনাটা নিতান্ত একতরফা হওয়ায় এক সময় আপনিই তাহা থামিয়া গেল।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই মৃন্ময়ের ঘুম ভাঙিল। সকাল-বেলার মুক্ত বায়ু তার দেহমনকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। সে উঠিয়া পড়িল। নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া আসিতে হইবে এবং ফিরিবার পথে মঞ্জুদের বাড়ী হইয়া আসিবে। জমিদার-বাড়ীতে ভোর হয় আটটায়, সুতরাং তাদের ওখানে এখন যাওয়া চলে না।

রাস্তায় পা দিতেই ভূদেবের সহিত দেখা। মঞ্জুর ছোট ভাই ভূদেব। এই সামান্য কয়েক মাসের ব্যবধানেই সে যেন কিছু লম্বা আর রোগা হইয়া গিয়াছে। মৃন্ময় কহিল, ভাল আছ ভূদেব?

ভূদেব হাসিয়া কহিল, ভালই আছি মিনু-দা। কিন্তু আপনি শুনছিলাম এবার আসবেন না। কাল রাত্রে পৌঁছুলেন বুঝি।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, কথাটা এরই মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু মন যে বাধা মানে না ভাই। উভয়ে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। যেন খুব বড় একটা হাসির কথা হইয়াছে।

ভূদেব কহিল, বৌদি কালও বলছিলেন, দেখে নিস্ তুই, মিনু ঠাকুর-পো সময়মত নিশ্চয়ই আসবে। খবরটা তাকে দিতে হবে।

মৃন্ময় অন্য প্রসঙ্গে আসিল, গ্রামের আজকাল হাল-চাল কি ভূদেব। নূতন খবর কিছু আছে নাকি ?

ভূদেব কহিল, না নূতন খবর আর থাকবে কোত্থেকে।

মৃন্ময় একটু নিরাশ হইল, কহিল, খবর সব সময়ই থাকে ভূদেব। শুধু খুঁজে পেতে নিতে হয়। সে যাকগে, যাবে নাকি আমার সঙ্গে নদীর পাড়ে বেড়াতে ?

ভূদেব কহিল, এইমাত্র আমি বেড়িয়েই ফিরছি।

মৃন্ময় আর কথা বাড়াইল না। একলাই পথ চলিল। রাস্তার পাশ হইতে এঁঠেল গাছের এক টুকরা ডাল ভাঙিয়া লইল। পথ চলিতে চলিতে দাঁতন করা যাইবে। নদীর তীর ধরিয়া আরও খানিকদূর অগ্রসর হইয়া যাইতেই একটা বাঁকের মুখে রাধু বোষ্টমের সহিত মুখোমুখি দেখা। মৃন্ময় কহিল, কে, বোষ্টমদা না ?

হাসিমুখে রাধু বোষ্টম কহিল, চিনতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি। উভয়ের গতি মন্থর হইল।

মৃন্ময় কহিল, না চেনার কথা নয় বোষ্টমদা কিন্তু তোমার চোখ দুটো অমন লাল কেন ?

রাধু সশব্দে হাসিয়া উঠিল, বোকা লোকগুলো কি কোন কালে হিসেব করে চলতে জানে দাঠাকুর। চেয়ে আছ কি, এইমাত্র শ্মশান থেকে ফিরেছি। বাপ-খুড়ো, পাড়া-পড়শী মরদগুলো সব বোতল বোতল গিলে এসেছেন। গতি করবার বেলা এই রাধু বোষ্টম, কি করি বৌটা এসে কেঁদে পড়েছে।

মৃন্ময় বিস্ময় বোধ করিল। কহিল, তুমি কি সব উল্টো-পাল্টা বকছ রাধুদা ? কার আবার গতি করে এলে ?

রাধু কহিল, চণ্ডে বাগ্দীর দু'বছরের ছেলেটার। ঐ একটা মাত্র ছেলে। না পেল এক কোঁটা ওষুধ, না পেলে একটু সেবা-শুশ্রূষা। বৌটা সকালে বেরুল গোঁসাইপাড়ায় ধান ভানতে। ছেলেকে রেখে গেল ঘর আগলাতে। ফিরে এসে দেখে ছেলেটা মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। একেবারে আসল কলেরা। সন্ধ্যে নাগাদ সব ঠাণ্ডা। পাড়া-পড়শীরা সন্ধ্যার পর কারখানা থেকে এলেন মত্ত অবস্থায়। কাল পেয়েছে হপ্তার মাইনে। তখন ওদের সামলাতেই লোকের দরকার। চণ্ডের বৌটা এসে কেঁদে পড়ল। কি করি বল !

মৃন্ময় বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। রাধু পুনরায় বলিয়া চলিল, চণ্ডের নেশা ছুটে গেলেও আর কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। কি অলক্ষুণে কারখানাই হ'ল, গ্রামকে শেষ না করে আর ও ক্ষান্ত হবে না। রাধু একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, গিয়ে দেখি চণ্ডে তার মরা ছেলেটাকে বুকে নিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

মৃন্ময় তথাপি নীরব।

রাধু পুনরায় কহিল, কারখানা করেছিস্ বেশ করেছিস, কিন্তু তার মধ্যে মদের দোকান কেন !

মৃন্ময় বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, ওটা দরিদ্রকে দমিয়ে রাখবার পাকা বুনিয়াদ বোষ্টমদা। দেড়শ' বৎসর বিদেশী রাজত্বের করুণার দান।

রাধু বোষ্টম বারকয়েক মাথা নাড়িয়া কহিল, কথাটা ঠিক বুঝলাম না দাদাঠাকুর। দোষটা সত্যি কাদের। রাজার জাতের না আমাদের নিজেদের। এ করুণার দান তোমরা মাথায় তুলে নিয়েছ কেন। ঝেড়ে ফেলবার শক্তি এবং সাহস যখন তোমাদের নেই তখন মিথ্যা দোষ দেওয়া আর আত্ম-প্রবঞ্চনা করা একই কথা। রাধু বোষ্টম থামিল। তাহাকে যেন একটু উত্তেজিত মনে হইল।

মৃন্ময়ের বিস্ময় সীমা ছাড়াইল। তার পরিচিত রাধু বোষ্টমকে যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না। ক্ষেপাটে আত্ম-ভোলা অর্দ্ধশিক্ষিত রাধু বোষ্টমের এ যেন আর এক রূপ। মৃন্ময় বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতে রাধু বোষ্টম পুনরায় কহিল, ছোট মুখে বড্ড বড় কথা হয়ে গেল। কিন্তু কথাটা আমার নয়। ধার করা দাদাঠাকুর।

মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে কহিল, তা হোক। কিন্তু বড় খাঁটি কথা বলেছ তুমি বোষ্টমদা। সাহস এবং সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির অভাবই আমাদের প্রতিপদে অতলে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর মুষ্টিমেয় জনকয়েক স্বার্থান্বেষী তারই সুযোগ নিয়ে নিজেদের কায়েমী স্বার্থের পাকা ইমারত গড়ে তুলেছে।

মৃন্ময় একটু থামিয়া পুনরায় উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, তাদের সাবধান করে দিতে হবে যে, যাদের অস্থি-পঞ্জর দিয়ে তোমাদের ইমারতের গাঁথুনি তৈরি করেছ তারা একদিন নূতন প্রাণশক্তি নিয়ে বেঁচে উঠবে, যার প্রচণ্ড আলোড়নে কর্পূরের মত উবে যাবে তোমাদের ঐ নির্লজ্জ উৎপীড়নের উপায়গুলো।

রাধু বোষ্টম সহসা হাসিয়া উঠিল। কহিল, এ যেন শুধু হাত-পা ছুড়ে বীরত্ব দেখানো দাদাঠাকুর।

মৃন্ময় অত্যন্ত লজ্জা পাইল। রাধু সহসা অন্য কথা পাড়িল, আছ তো দিনকয়েক দাদাঠাকুর ? সময় করে একবার যেয়ো। গোটাকয়েক কথা আছে। রাধু আর উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াইল না। মাঠের পথে দ্রুত প্রস্থান করিল।

রোদ উঠিয়াছে। রাধু বোষ্টমের জন্য মৃন্ময়ের অনেকটা বিলম্ব ঘটিল। আজ আর বেড়ান হইবে না। কিন্তু তার জন্য একটুও দুঃখিত সে নয়। রাধুকে সে বরাবরই ভিন্ন চোখে দেখে। কিন্তু আজ ওর সম্বন্ধে তার মনে একটা কৌতূহল জাগিল। মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলিতেছিল। তেওয়ারীর কণ্ঠস্বর তার কানে যাইতেই তাহাকে থামিতে হইল। কোন

প্রকার ভূমিকা না করিয়াই তেওয়ারী জানাইল যে, মঞ্জুষা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে।

মৃন্ময় কহিল তোমাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম তেওয়ারী। চলো। একটু থামিয়া মৃন্ময় তেওয়ারীকে প্রশ্ন করিল, আমি এসেছি এ খবর তোমাদের মঞ্জুদিদি পেলে কেমন করে?

তেওয়ারী গোঁফের আড়ালে মৃদু হাসিল। প্রকাশ্যে কহিল সে তাহা জানে না।

মৃন্ময় অকারণে খানিকটা খুশী হইল।

বাহির-মহলেই মঞ্জুষা অপেক্ষা করিতেছিল। মৃন্ময়কে সহাস্যে অভ্যর্থনা করিল, সু-প্রভাত মিনুদা। তোমার বেড়ানো হ'ল।

মৃন্ময় হাসিল, কোন উত্তর করিল না। তেওয়ারী সময় বুঝিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। উভয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধটা এ বাড়ীর সকলেরই জানা।

মঞ্জুষা কহিল, আবার হাসছ কোন মুখে। সেই ভোর ছ'টায় এই পথ দিয়ে গেছ আর ফিরলে প্রায় সাড়ে আটটায়। তাও আমাকে ডেকে পাঠাতে হ'ল। নইলে এ বেলা হয়তো এখানে আসবার সময়ই হ'ত না তোমার।

চমৎকার অভিযোগ। কিন্তু প্রতিবাদ করা বৃথা। তথাপি হাসিমুখেই মৃন্ময় জবাব দিল, সকালবেলার মিষ্টি রোদটুকুর মোহ আমার কম নয় মঞ্জু।

মঞ্জু কহিল, এ মোহ আবার কবে থেকে?

মৃন্ময় কহিল, যদি বলি আজ থেকে এবং তা তোমার আহ্বান পৌঁছুবার আগে পর্যান্ত তা হলে কি তুমি তা বিশ্বাস করবে?

মঞ্জুষা দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া কহিল, যার কথা এবং কাজে কোন মিল নেই তাকে কেমন করে বিশ্বাস করা যায় বল তো! মঞ্জুষা ক্ষণকালের জন্য থামিয়া পুনরায় কহিল, তোমার চিঠি পেয়ে আমার যা রাগ হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন ধরেই আমার মন বলছিল তুমি আসবে। কিন্তু এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? ভেতরে চলো।

মৃন্ময় কহিল, তোমার মা কেমন আছেন?

মঞ্জুষা কহিল, মাঝে বড্ড বাড়াবাড়ি গেছে, ইদানীং খানিকটা ভালই আছেন। তাই হাওয়া বদলের ব্যবস্থা হয়েছে। আজই যাবার কথা ছিল কিন্তু ভোরবেলা উঠে বাবা মত বদলালেন। পুজোটা সামনে রেখে যাওয়া হতে পারে না। অথচ এ প্রশ্ন আগেও উঠেছিল, কিন্তু বাবা কারুর কথায় কান দেন নি।

মৃন্ময় কহিল, বিদেশে যাবার জন্যে তুমি বুঝি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছ?

মঞ্জুষা কহিল, বরং তার উল্টো। কিন্তু আমার কেমন ভয় করে। বাবা হয়তো মার মৃত্যু আশঙ্কা করছেন।

মৃন্ময় কিছু বলিবার জন্যই হয়তো মুখ তুলিয়াছিল, সহসা জীবানন্দের গলার সাড়া পাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ প্রশ্ন করিলেন, কে মিনু এসেছ নাকি!

মৃন্ময় নত হইয়া প্রণাম করিল। জীবানন্দ তার মাথায় হাত রাখিলেন। কহিলেন, প্রতুল বলছিল পড়াশুনার ক্ষতি হবে বলে এবার পুজোর সময় তুমি আসবে না। পড়াশুনোয় অবহেলা করতে বলছিনে, তা বলে পুজো-পার্ব্বনের সময় মা বাপের কাছে ফিরে আসতে হয় বৈকি। তাদের দিকটাও একবার ভেবে দেখা দরকার। জীবানন্দর কণ্ঠস্বর কেমন একটু ভারি ঠেকিল। তিনি পুনরায় কহিলেন, তা ছাড়া দেশ-গাঁয়ে আসা-যাওয়াটা একবার বন্ধ হয়ে গেলে শেষ পর্য্যন্ত ঐটেই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। নইলে গ্রামের আজ এ দুরবস্থা হবে কেন। তিনি থামিলেন।

মৃন্ময় নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু পিতার অলক্ষ্যে মঞ্জুষা একটু হাসিল। মৃন্ময়ের এই বিব্রত ভাবটিতে সে বেশ মজা পাইতেছিল। এতকাল শহরে থাকিয়াও তার মিনুদা ঠিক তেমনি লাজুক রহিয়া গিয়াছে।

জীবানন্দ পুনশ্চ কহিলেন, ছুটি-ছাটা পেলেই মা-বাপের কাছে আসতে হয়। এগুলি বন্ধন। তিনি প্রস্থান করিলেন।

মৃন্ময় এতক্ষণে কথা কহিল, ভারি কাহিল হয়ে পড়েছ মঞ্জু।

মঞ্জুষার দু' চোখে আনন্দ উপছাইয়া পড়িতেছে। সে হাসিয়া কহিল, অবশ্য তোমার মত লাজুক হয়ে পড়িনি। আচ্ছা কি হলে আমায় খুব মানাত মিনুদা? লজ্জায় মুখ লাল করে ছুটে পালিয়ে গেলে, না আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার দিকে চেয়ে থাকলে? মঞ্জুষা আর এক দফা হাসিয়া উঠিল।

মৃন্ময় প্রসঙ্গান্তরে যাইতে চায়। কহিল, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, না তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাবে।

মঞ্জু পথ চলিতে চলিতে পুনরায় প্রশ্ন করিল, আধ ডজন চিঠি দিয়েছি, আর একটা চিঠিরও উত্তর দেওয়া তুমি দরকার মনে কর নি মিনুদা।

মৃন্ময় কহিল, তোমার চিঠি পাইনি বলেই হয়তো।

মঞ্জুষা হাসিয়া কহিল, উপস্থিত দায় এড়াবার এর চেয়ে সহজ পন্থা আর কিছু নেই মিনুদা!

মৃন্ময় কহিল, তা হলে তুমি বলতে চাও যে, আমি তোমায় মিথ্যে বলেছি?

মঞ্জুষা কহিল, মিথ্যে বলতে আমারও বয়ে গেছে।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, কি লিখেছিলে অতগুলো চিঠিতে?

মঞ্জুষা প্রত্যুত্তরে হাসিমুখে কহিল, চমৎকার প্রশ্ন তোমার। সব কথা আমি যেন মনে করে বসে আছি। যখন যা মনে এসেছে তাই লিখেছি।

মৃন্ময় কোন কথা কহিল না।

মঞ্জুষা থামিতে পারিল না। কহিল, আচ্ছা সে কথা শুনে তোমার কি লাভ হবে মিনুদা।

মৃন্ময় কহিল, সে কথা জেনেই বা তোমার কি হবে মঞ্জু।

মঞ্জুষা হঠাৎ একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, তুমি বুঝি রাগ করেছ?

মৃন্ময়ও গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল, রাগ করিনি, কিন্তু দুঃখ পেয়েছি তোমার স্মৃতিশক্তির অপহ্নব ঘটতে দেখে।

মঞ্জুষা হাসিয়া ফেলিল। ধমক দিয়া কহিল, আবার বাজে কথা।

মৃন্ময় হাসিল। মৃদু কণ্ঠে কহিল, অনেকটা এগিয়ে গেছ দেখছি। শাসন করতেও দিব্যি শিখেছ।

মঞ্জুষা হঠাৎ যেন একটু লজ্জা পাইয়াছে এমনি ভাবে কহিল, আমি যেন তাই বলেছি। না না, তুমি ভারি অসভ্য হয়েছ···ছি···মঞ্জুষা অকস্মাৎ অন্যত্র প্রস্থান করিল। মৃন্ময় মঞ্জুষার মায়ের ঘরে প্রবেশ করিল।

মৃন্ময়কে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মঞ্জুষার মায়ের দুটি চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি মৃদুকণ্ঠে তাহাকে কাছে ডাকিয়া পাশে বসাইলেন। কহিলেন, আমি জানি মিনু আমার তেমন ছেলে নয়। পুজো-আর্চ্চার দিনে সে নিশ্চয় মায়ের কোলে ফিরে আসবে। মঞ্জুষার মা থামিলেন। অতর্কিতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। চোখের কোণে দেখা দিল অশ্রু-রেখা। মৃন্ময় অকারণে অপরাধীর মত ভাব দেখাইয়া বসিয়া রহিল। বলিবার মত কোন কথাই তার মুখে যোগাইল না। মঞ্জুষার মা পুনরায় কহিলেন, মঞ্জু বলছিল এটা তোমার পরীক্ষার বছর। পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে আসবে না। বোকা মেয়েটা শুধু পড়াশুনোর কথাটাই ভেবেছে, সেই সঙ্গে মা-বাপের কথাটা ভেবে দেখে নি। মা-বাপকে অসুখী রেখে কেউ কোন দিন বড় হতে পারে না।

দরজার পাশে মঞ্জুষা দেখা দিল। মা ডাকিলেন, তোর মিনুদা এসেছে মঞ্জু, ওর জন্য একটু খাবার দিয়ে যেতে বল মা।

মঞ্জুষা মায়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, আমি জানি মা। খাবার এখুনি বামুন-মা দিয়ে যাচ্ছে।

মঞ্জুষার মা কহিলেন, আমি তখনই তোকে বলেছিলাম না, মিনু আমার তেমন ছেলে নয়। ও নিশ্চয় পুজোর দিনে আসবে।

ইহার পরে যে কোন্ কথা আসিবে এ খবর মঞ্জুষার জানা। সে ব্যস্ত ভাবে অন্য কথা পাড়িল। ঐ দেখ মা কথায় কথায় কত বড় ভুল হয়ে গেছে। ন'টা বেজে গেল, তোমায় ওষুধ দেওয়া হয় নি এখনও। কেষ্টর মাকে দিয়ে যদি একটা কাজ কোন দিন হয়।

মা হাসিয়া কহিলেন, কেষ্টর মা ত কোনোদিন আমায় ওষুধ দেয় না মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, দেয় এ কথা আমি বলছি নে মা। দিলেও তো পারে এক আধ দিন। জান মিনুদা, এ বাড়ীর চাকর-বাকরগুলো হয়েছে এক একটি খুদে বাদশা। এই যে বামুন-মাকে এক ঘণ্টা হ'ল খাবার দিয়ে যেতে বলেছি, এল এখনও। ফাঁকি দেবার সুযোগ পেলে এতটুকুও সে ছাড়ে না।

বামুন-মার আবির্ভাবে প্রসঙ্গটা আপাতত চাপা পড়িলেও মঞ্জুষার অভিযোগের জের এইখানেই শেষ হইল না পুনরায় অন্য পথে প্রকাশ পাইল। মঞ্জুষা মাকে পুনশ্চ কহিল, এই যে সরকার মশাই—যাকে নিয়ে আমরা বিদেশে যাবার আয়োজন করেছিলাম তার উপরও আমার একটুকু আস্থা নেই। কাল ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার ফরমাসমত সব জিনিস পত্র ঠিক করে রাখা হয়েছে ত?

মাথা চুলকে জানালেন, প্রায় সবই ঠিক আছে। তবে··· এই তবের হিসেব নিতে গিয়ে দেখা গেল প্রায় সব কিছুই তখনও ঠিক হয় নি। কি ভাগ্যি এখন আমাদের যাওয়া হ'ল না।

ইহার পরে মঞ্জুষা আর এক কাণ্ড করিয়া বসিল। মাকে ঔষধ খাওয়াইয়া তাঁর গা ঘেঁষিয়া বসিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, একটা কাজ করলে হয় না মা।

মঞ্জুষার মা এবং মৃন্ময় একসঙ্গে তার মুখের পানে চাহিলেন। মঞ্জুষা তেমনি মৃদুকণ্ঠে কহিল, মিনুদাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেলে হয় না মা। ওর তো প্রায় দেড় মাসের ছুটি।

মায়ের মুখে হাসি দেখা গেল। মৃন্ময়ের চোখে বিস্ময়।

মা কহিলেন, গেলে তো ভালই হ'ত, কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব হবে মা, এত দিন পরে মিনু তার মা বাবার কাছে এসেছে।

মঞ্জুষা কহিল, কিন্তু আমরা তো আর দু-চার দিনের মধ্যেই যাচ্ছি নে। মিনুদা তার মা-বাবার কাছে থাকবার সুযোগ তো পাচ্ছেনই।

মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, মিনুর সুবিধে-অসুবিধের কথাটাও একবার ভাবা দরকার মঞ্জু।

মৃন্ময় হয়ত কিছু বলিবার জন্য মুখ তুলিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে মুখ খুলিবার অবকাশমাত্র না দিয়া মঞ্জুষা পুনরায় কহিল, মিনুদার সুবিধে-অসুবিধের কথা তোমায় ভাবতে হবে না মা, জ্যাঠাইমাকে ডেকে তুমি বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মায়ের মুখে মুহূর্তের জন্য একটুখানি হাসির রেখা দেখা দিল। কি ভাবিলেন তিনিই জানেন, প্রকাশ্যে কহিলেন,

কথাটা মঞ্জু নেহাত মন্দ বলে নি মিনু। আমাদের সঙ্গে দিন কয়েকের জন্ত ঘুরে আসবে চল। তোমার মায়ের অনুমতি আমি চেয়ে নেব।

মৃন্ময় কথা বলিবে কি! সে এই নির্লজ্জ মেয়েটির কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। সে না পারিল মুখ তুলিয়া চাহিতে, না পারিল একটা সহজ প্রতিবাদ করিতে এবং আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ হইল সে আসিয়াছে। এখন ফিরিতে হইবে। বেলা তখন দশটার কম নহে।

১০

দিনকয়েক পরে। মৃন্ময় মঞ্জুষাকে কহিল, তুমি যে এমন ছেলেমানুষি করতে পার এ আমি কোনদিন ভাবতেও পারি নি। আমি অবাক হয়ে সেদিন তোমায় দেখছিলাম। তুমি কি পাগল মঞ্জু।

মঞ্জুষা প্রতিবাদ করিল, কহিল, এর মধ্যে আবার পাগলামি তুমি কোথায় দেখলে। বাবা আপাততঃ সঙ্গে যাবেন না। সরকারের সঙ্গে যেতে আমার ভাল লাগে না।

মৃন্ময় বাধা দিয়া কহিল, কিন্তু আমার তো আসবার কথা ছিল না মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, তুমি না এলে একথা আমায়ও বলতে হ'ত না। যখন এসেছ তখন আমাদের সঙ্গে যেতে তোমার আপত্তি কেন? তোমায় সত্যি বলছি মিনুদা কতকগুলো বাজে অজুহাত দেখিয়ে আমায় দিয়ে একটা কেলেঙ্কারী করিয়ো না।

মৃন্ময় শান্ত কণ্ঠে কহিল, এ তোমার অন্যায় কথা। তা ছাড়া এর মধ্যে কেলেঙ্কারীর কি থাকতে পারে আমি বুঝে পাই না মঞ্জু। একটু থামিয়া মৃন্ময় পুনরায় কহিল, সব কথা বাদ দিলেও আর সামান্য ক'টা মাসের ব্যবধানে আমার পরীক্ষা এ কথা ভুললে ত চলবে না। যত গুরুতর অভিযোগই তোমার থাক তার সঙ্গে আমার যাওয়া-না-যাওয়ার কি সম্পর্ক।

মঞ্জুষা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, হয়ত তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু এ কথাও আমি বুঝি নে যে দু-বছরের অভ্যাস দু-সপ্তাহের অনভ্যাসে কতখানি ক্ষতি-গ্রস্ত হতে পারে।

মৃন্ময় কহিল, তুমি শুধু দু-সপ্তাহের অনভ্যাসটার কথাই ভাবছ। মনের দিকটা দেখছ না।

মঞ্জুষা মৃন্ময়কে কেমন করিয়া বুঝাইবে তার মনের এক আশ্চর্য্য অনুভূতির কথা। তার জীবনে মৃন্ময়ের প্রয়োজন যত বড় হইয়া উঠিতেছে কোথা হইতে দুইখানা অদৃশ্য বাহু যেন তাকে সবলে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতে চায়। মঞ্জুষা বিস্মিত হয়, চমকিত হয়। মৃন্ময়কে কাছে পাইয়া সে চঞ্চল হইয়া উঠে। তাহাকে সাধ্যমত নিজের কাছে ধরিয়া রাখিতে চায়। মনকে সে ধমক দেয়, বলে এ তার ভাববিলাস। কিন্তু মনের এই কাল্পনিক ভীতি তাহাতে দূর হয় না।

মঞ্জুষার চিন্তিত মুখের প্রতি ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া মৃন্ময় পুনরায় কহিল, চুপ করে আছ যে।

মঞ্জুষা মৃদুকণ্ঠে কহিল, মনের দিকটা যে চোখে দেখা যায় না মিনুদা, না হলে এ অনুযোগ তুমিও আমায় দিতে না; দুঃখ পেতে। কিন্তু এসব আলোচনা এখন থাক, আমি বড় ক্লান্ত। মঞ্জুষা ম্লানমুখে প্রস্থানোদ্যত হইতেই মৃন্ময় তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, আর একটু বসবে না—

মঞ্জুষা উত্তর দিতে গিয়া থামিল। পিওন আসিয়াছে। চিঠি আছে। মৃন্ময়ের চিঠি—লিখিয়াছে নান্তু। শিরোনামায় হস্তাক্ষর দেখিয়াই মৃন্ময় আন্দাজ করিয়াছে। মঞ্জুষা মৃন্ময়ের পাশে ঘন হইয়া বসিল।

নান্তুর চিঠি :—

তোমাদের নান্তুর পুনর্জ্জন্ম হয়েছে। আজ যে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছে সে তোমার পূর্ব্বপরিচিত নান্তু নয়। এক নূতন মানুষ নূতন চেতনা নিয়ে তোমাদের স্মরণ করছে। তাকে বিশ্বাস ক'রো ভাই। পাহাড়ের সেই কাহিনীটি বোধ হয় আজও ভুলে যাও নি। মানুষের দুষ্কৃতির ছাপ এত সহজে মন থেকে মুছে যেতে পারে না। কথাটা আমি জানি। তাই বলছিলাম যে তোমাদের সে নান্তুর মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু এই নবজন্মে যে জীবন আমার আয়ত্তে এসেছে তা অমূল্য। সেই কথাই বলব।

গানে আমার দখল ছিল এ কথা তুমি জান। নদীর তীরে বসে কত দিন যে আমরা গলা মিলিয়ে গান করেছি মঞ্জুকে শ্রোতা করে সে কথা কি ভুলেছি মনে কর। যদিও অতীত আমার কাছে মৃত, কিন্তু আমি যেন জাতিস্মর হয়ে পুনর্জ্জন্ম লাভ করেছি।

পাহাড় থেকে পালিয়ে গেলাম কলকাতায়। সহায়হীন, সম্পদহীন আমি। কে আমায় জানে, কে আমায় চেনে। আমার বিদ্যার দৌড় তোমার অজানা নয়। পাহাড়ের অবাঙালীর মধ্যে নিজেকে কোন রকমে চালিয়ে নিতে পারলেও আমার জাতভাইদের কাছে আমার কোন মূল্যই নেই। দৈনিক তিন চার ঘণ্টা পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে কেউ দশটি টাকা দিতে প্রস্তুত নয়। আমার যথার্থ মূল্য এরা চোখের পলকে বুঝে নিয়েছে—এখানে ফাঁকি চলবে না।

আবার বেরিয়ে পড়লাম। যদি না খেতে পেয়ে রাস্তার শুকিয়ে মরতে হয় তবে অপরিচিত স্থানে গিয়ে মরাই ভাল। তবু নিজেকে শেষ পর্য্যন্ত সান্ত্বনা দিতে পারব। কেউ আঙুল

দেখিয়ে বলবে না, হতভাগাটা না খেতে পেয়ে রাস্তায় পড়ে মরেছে।

রেল-কোম্পানীকে কোন রকমে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্ণৌ গিয়ে পৌঁছলাম। বেঁচে থাকবার মত একটা আশ্রয় পেলাম ব্যারিষ্টার মিঃ সেনের বাড়ীতে। আমার ভিক্ষুকের বেশ সেই দিনই ত্যাগ করতে হ'ল। আপত্তি করি নি, এর প্রয়োজন হয়তো আমার শেষ হয়েছে। কিন্তু নষ্ট করি নি, আজও সুটকেশে তা সযত্নে রেখে দিয়েছি।

অল্প কিছুদিনেই খানিকটা সুবিধা করে নিয়েছি। মিঃ সেন কেন জানি না খুব খুশী হতে পারেন নি। যদিও পিঠ চাপড়ে বলেছেন, নিজের পায়ে দাঁড়াবার এই চেষ্টাকে আমি সাধুবাদ দিচ্ছি কিন্তু বিপদ-আপদ মানুষমাত্রেরই আছে। প্রয়োজনের দিনে স্মরণ করো। ভদ্রলোক সত্যই সজ্জন।

এখানকার সঙ্গীত-কলেজে ভর্তি হলাম। জীবনে কোন কিছুই করি নি। নিজেকে নিয়ে ডুবে থাকবার মত একটা অবলম্বন ত আমার চাই।

এখানে অল্পেই বেশ একটু নাম হয়েছে। বন্ধু-বান্ধব এবং ভক্তের সংখ্যাও নিতান্ত মন্দ নয়। ছোট-খাট পার্টি থেকেও প্রায়ই ডাক আসছে। এক কথায় বেশ আছি। অকস্মাৎ মনে পড়ল তোমাকে। দুঃখের দিনে আত্মগ্লানিতে যখন আমি একেবারে বোবা হয়ে বেঁচে ছিলাম সে দিনেও তোমাদের জন্য মন আমার কেঁদে উঠত। আজও তার এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটে নি।

আজ কিছুদিন ধরেই অতীতের দিনগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। কি ছিলাম—কোথায় এসেছি, অদৃষ্ট আবার কোন্ পথে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এ আমার উচ্ছ্বাস নয় অথবা জীবন-দর্শন নিয়ে বক্তৃতাও দিচ্ছি না। বর্ত্তমানের সঙ্গে অতীতের তুলনা করতে গিয়েই একথাটি আমার বারবার মনে পড়ছে। মানুষের চাওয়ার যেমন শেষ নেই, সুযোগেরও তেমনি অন্ত নেই। শুধু চিনে নেবার অপেক্ষা—আঁকড়ে ধরবার ইচ্ছাশক্তি।

এখানে এক বিদেশী ভাই এবং বোনকে পেয়েছি। তাদের বাঙালী বললেও ভুল বলা হয় না যদিও তারা তা নয়। আমাদের সম্পর্কটা কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করেও না। কিন্তু আমার আর তাতে ভয় নাই। নিজের সম্বন্ধে আজকাল আমি অত্যন্ত সচেতন। মন আর মুখের মধ্যে একটা সম্মান-জনক ব্যবধান রেখে কথা বলি, তাতে আর যাই হোক কোন গোলযোগের সৃষ্টি হয় না। আমার উপর ওদের অগাধ বিশ্বাস, নির্ভরতার অন্ত নেই। লোকমুখে শোনা যায় দাদা নাকি তার বোনটির ভার আমার উপর দিয়ে কয়েক মাসের জন্য আমেরিকায় পাড়ি দেবেন। এটা গুজব, কিন্তু এই গুজব যদি সত্যি হয় তবে আমাকে আরও সংযত হতে হবে। মানুষের বিশ্বাসের মূল্য আজকাল কতকটা দিতে শিখেছি। তা ছাড়া তোমাকে বলতে আমার লজ্জা নেই—দোষও দেখি নে। একটা কথা কি জান? রক্তের যেখানে সম্বন্ধ নেই সেখানে ভাই বোন সম্বন্ধটা মধুর হলেও নিরাপদ নয়। সেখানে ভয় আছে এবং বিচিত্র সম্ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এসব আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক কারণ তার দাদা সত্যিসত্যিই এখুনি যাচ্ছেন না। ওদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানাবার আছে। বারান্তরে লিখব। শুধু মেয়েটির নামটা তোমায় জানিয়ে রাখছি। ওকে লীলা রাও বলেই মনে রেখো। বড় ভাল মেয়ে। ভাল কথা—আমাদের মঞ্জুর খবর কি? এত দিনে বোধ হয় অনেকটা বড় হয়েছে। ওকে আমার স্নেহ দিও। এখানে নানা জনের ভিড়ের মাঝেও ওকে সব সময় মনে পড়ে। কত বাজে চিন্তা এসে মনকে নাড়া দেয়। অসম্ভব কল্পনা…তাই নিজেকে শাসন করি। চিঠির উত্তর পেলে খুশী হব।

নান্টু

মঞ্জুষা কহিল, নান্টুদা কিন্তু বিনিয়ে বিনিয়ে বেশ লিখতে পারে। কবি-মানুষ!

মৃন্ময় কহিল, নান্টু বেশ আছে। 'এক কথায় যাকে বলে ভ্রাম্যমাণ জীবন। আজ এখানে, কাল ওখানে। গতি ওর কোথাও রুদ্ধ হয় না। ওকে আমি একতিল বিশ্বাস করি না। কালই হয়তো আর এক চিঠিতে লিখবে, চলিলাম বন্ধু লক্ষ্ণৌ ছেড়ে পেশোয়ার। এমনি ছন্নছাড়া ওর স্বভাব। ওর জীবনের এইটেই হ'ল স্বাভাবিক পরিণতি।

মঞ্জুষা কহিল, তুমি যতই বল, নান্টুদা এবারে বদলেছে।

মৃন্ময় একটু হাসিয়া কহিল, এটা ওর পরিবর্ত্তন নয়—এর নাম সাময়িক অবসাদ।

মঞ্জুষা কহিল, মিনুদা ভুলে যাচ্ছ যে নান্টুদাও মানুষ। তারও মন বলে একটা পদার্থ আছে।

মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখে উত্তর দিল, এরা আর এক জাতের মানুষ। এদের মনের সুর অন্য পরদায় বাঁধা। দৃষ্টিভঙ্গী ওদের আলাদা।

মঞ্জুষা অকস্মাৎ নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে মৃন্ময়কে প্রশ্ন করিল, এই যদি নান্টুদার সত্যিকার জীবনের ধারা হয় তো তার নাম কি বেশ থাকা? এর মধ্যে আনন্দ বা পরিতৃপ্তি কোথায়? অথচ একেই তুমি ভালো বলে একতরফা রায় দিয়েছ।

মৃন্ময় বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মঞ্জু? এ যে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

মঞ্জুষা কহিল, তুমি চাপা দেবার চেষ্টা করো না মিনুদা।

মৃন্ময় তেমনি বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, এর মধ্যে চাপা দেবার কি থাকতে পারে আমি ত ভেবেই পাই না। একটু থামিয়া সে পুনরায় কহিল, সব কথার মধ্যে নিজেদের টেনে আন কেন, এতে সহজ কথাটাও যে আর সোজা ভাষায় বলা চলে না, অথচ মন নিরর্থক সঙ্কুচিত হয়ে উঠে।

মৃন্ময়ের কথা মানিয়া লইয়া মঞ্জুষা কহিল, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমার কথা তোমায় ঠিক বোঝাতে পারব না। একটা অদ্ভুত অনুভূতি যেন আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যায়। আমার চোখের সামনে একটা বিশৃংখল ভবিষ্যৎ জীবনকে দেখতে পাই। আমার সাধারণ বুদ্ধিও কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

মৃন্ময় হাসিয়া উঠিল।

মঞ্জুষা পুনরায় কহিল, হেসে উড়িয়ে দিতে চাও—দাও, কিন্তু দোহাই মিনুদা এর মধ্যে তোমার যুক্তি-তর্ক টেনে এনো না। আমি মেনে নিচ্ছি তোমার যুক্তির কাছে দাঁড়াবার মত কোন পুঁজি আমার নেই।

মৃন্ময় তাহার হাসি থামাইয়া কহিল, না মঞ্জু, হাসি বা যুক্তি দিয়ে তোমাকে আমি বিব্রত করতে চাই না, কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝি না, হঠাৎ এই ধরণের চিন্তা তোমার মাথায় স্থান পেল কেন? আমার যতদূর বিশ্বাস আমার তরফ থেকে এমন কোন ব্যবহার তুমি পাও নি···

মৃন্ময়কে তার কথার মাঝখানে থামাইয়া দিয়া মঞ্জুষা কহিল, কোন কারণ নেই বলেই ত যুক্তিতর্কের প্রশ্ন তুলেছি। কিন্তু···জ্যাঠাইমা আসছেন, চুপ্।···

মৃন্ময়ের মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কহিলেন, মঞ্জু কতক্ষণ এসেছ মা? এইমাত্র তোমাদের ওখান থেকেই আসছি। তোমার মা ডেকে পাঠালেন, কিন্তু আমি এক সমস্যায় পড়েছি মিনু। অথচ না বলতেও পারলাম না। অনেক করে বললেন।

মঞ্জুষা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। মৃন্ময় মায়ের মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মা আপন মনে বলিয়া চলিলেন, তা ছাড়া ভেবে দেখলাম যে, তোর শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। এক কাজে দু'কাজই হয়ে যাক্।

মৃন্ময় বাধা দিয়া কহিল, কি বাজে বকছ মা। আমার শরীর আবার তুমি খারাপ দেখলে কোথায়? আর এক কাজে দু'কাজ কাকে বলছ তুমি?

মা ধমক দিয়া কহিলেন, কথার উপর কথা বলিস নে মিনু। আমার এক জোড়া চোখ আছে। বলুক না মঞ্জু, আমি মিথ্যে বলেছি কি সত্যি বলেছি!

মৃন্ময় কহিল, তুমি বলতে চাও কি মা?

মা বলিলেন, এটা তোর পরীক্ষার বছর তাও আমি ভেবে দেখেছি। কিন্তু সঙ্গে খানকয়েক বই নিয়ে গেলেই ত চুকে যায়। মঞ্জুদের সঙ্গে তোকে কক্‌স্ বাজার যেতে হবে—সেই কথাই হচ্ছিল ওর মার সঙ্গে।

মৃন্ময়ের ইচ্ছা হইতেছিল চীৎকার করিয়া বলে, ছাই চুকিয়া যায়। মা যদি কিছু বোঝেন। কিন্তু সে নীরব রহিল।

মা পুনশ্চ কহিলেন, মঞ্জু ওরা লক্ষ্মীপুজোর পরেই যাবে। ওর মার ইচ্ছে তুই সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসিস।

মৃন্ময় কহিল, আর তুমিও অমনি চট করে কথা দিয়ে এলে, কিন্তু আমি ভাবছি তোমার কথা থাকে কিনা। আমাকেও এক সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা ফিরতে হবে মা।

মা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, আমরা ত আর লেখাপড়া-জানা-মা নই যে হিসেব করে কথা দেব। তিনি চলিয়া গেলেন।

মঞ্জুষা এতক্ষণ একটি কথাও কহে নাই, কিন্তু মৃন্ময়ের মা প্রস্থান করিতেই সে কহিল, কথাটা একটু পরে বললেও পারতে মিনুদা। উনি কি ভাবলেন বলতো?

মৃন্ময় কহিল, যা আমাকে বলতেই হবে তা এখন বলা আর দু'মিনিট পরে বলা একই কথা। কিন্তু তুমি কি বলছিলে ত?···যে কথা বলিতে গিয়া মঞ্জুষাকে মাঝপথে থামিতে হইয়াছে মৃন্ময় সেই সম্বন্ধে একটা খোলাখুলি আলোচনা করিতে চায়।

মঞ্জুষা কহিল, আমার যা বলবার সে ত বলা হয়ে গেছে মিনুদা।

মৃন্ময় কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, অবশ্য তোমার আপত্তি থাকলে আমার বলবার কিছু নেই। জোর করতেও চাই না।

মঞ্জুষা মৃদু কণ্ঠে কহিল, তোমার সম্বন্ধে আমার বড় ভয় হয় মিনুদা। মঞ্জুষার কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভারী ঠেকিল। মুহূর্তের জন্য থামিয়া পুনরায় কহিল, আমি তোমায় কেমন করে বোঝাই বল তো যা নিজেই আমি ভাল করে বুঝে উঠতে পারি না।

মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে কহিল, অথচ এই নিয়েই তোমার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। আমার সত্যিকার মনের কথা তুমি কি জান না মঞ্জু?

মঞ্জুষা কহিল, সেই একই কথায় আমরা আবার ফিরে এসেছি মিনুদা। আমি সব বুঝি। যা বুঝি না তা নিতান্তই ব্যক্তিগত।

মৃন্ময় কহিল, তা হলে কি এই কথাই আমি বুঝব যে, আমার তোমাদের সঙ্গে না যেতে চাওয়া নিয়েই তোমার মনে খটকা বেধেছে?

মঞ্জুষা নীরব রহিল।

মৃন্ময় পুনরায় কহিল, চুপ করে থেকো না মঞ্জু।

মঞ্জুষা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, এক কথা বার বার বলে কোন লাভ নেই। কিন্তু আর নয় এবারে আমি যাই।

মৃন্ময় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, তুমি রাগ করেছ, এ সব রাগের কথা মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, রাগ! না রাগ করতে যাব কেন। সে আর দাঁড়াইল না। চোখের পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল। মৃন্ময় ডাকিল, আমার কথা আছে—দাঁড়াও মঞ্জু—কথাটা মঞ্জুষা শুনিয়াও শুনিল না। ক্রমশঃ

উত্তর-ব্রহ্মের কথা

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্মদেশে আসিয়াছি। কর্ম্মোপলক্ষে স্বাধীন ব্রহ্মের শেষ রাজধানী মান্দালয়ে আছি। ব্রহ্মরাজ মিণ্ডন (১৮৫৩-৭৮) ১৮৫৭ সালে মান্দালয় নগর স্থাপন করিয়া অমরপুর (স্থানীয় ভাষায় অমরাপুরা) হইতে এই স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মান্দালয়ের প্রাচীন নাম রতনবন। মিণ্ডনের পুত্র থিব (১৮৭৮-৮৫) ব্রহ্মের শেষ স্বাধীন নরপতি। ১৮৮৫ সালে তিনি ইংরেজ-সরকার কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া বন্দী অবস্থায় বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত রত্নগিরিতে প্রেরিত হন। ১৯১৬ সালে এখানেই তাঁহার দেহাবসান হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মহিষী সুপিয়ালা দেশে ফিরিয়া আসেন। কয়েক বৎসর পর তিনি পরলোকগমন করেন। রাজা থিবর এক কন্যা এখন ভারতবর্ষে তাঁহারই এক ভূতপূর্ব্ব পাচকের গৃহিণী। ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

অমরপুরের একটি প্রাচীন প্যাগোডা

ব্রহ্মদেশে, বিশেষ করিয়া উত্তর-ব্রহ্মে, ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত বহু দর্শনীয় স্থান আছে। কিন্তু আজকাল উক্ত অঞ্চলে ভ্রমণ মোটেই নিরাপদ নহে। দেশে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব চলিতেছে। লোকে বলে ইহা সাম্যবাদী বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে বহু স্থানে যাতায়াত-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং চোর ডাকাতের উপদ্রব বাড়িয়া গিয়াছে। সরকারী শাসনযন্ত্রের কার্য্যকারিতাও যেন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মদেশে বরাবরই প্রায় গোটা অক্টোবর মাস কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। কোজাগরী পূর্ণিমায় বৌদ্ধ-শ্রমণদিগের চাতুর্ম্মাস্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। সেই দিন ব্রহ্মদেশের দেওয়ালী উৎসব। ৩০শে সেপ্টেম্বর তিন সপ্তাহের জন্ত কলেজ ছুটি হইল। যে কয়জন বাঙালী অধ্যাপক একসঙ্গে ছাত্রাবাসে আছি, তাহার মধ্যে একজন ছুটি হইবার দিনই

সণ্ডার্স উইভিং ইন্‌স্টিটিউট, অমরপুর

কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। আর একজন রেঙ্গুনে যাওয়ার কথা বলিতেছেন। আমার পক্ষে কলিকাতা যাওয়া সম্ভব নহে। হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, যাওয়ার মজুরী পোষায় না। হাতে কোন কাজ নাই। একেবারে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকাও যায় না।

সময় কাটাইবার একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। ছাত্র কো থান সিন রাজা মিণ্ডন মিনের পরিত্যক্ত রাজধানী অমরপুর এবং ইরাবতীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত সাগাইং লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিল। বলা বাহুল্য, সানন্দে সম্মত হইলাম।

৩রা অক্টোবর প্রাতরাশের পর আমরা মোটরে যাত্রা করিলাম। কো থান সিনের নিজের গাড়ী এবং সে নিজেই চালক। যাত্রী চার জন -বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক উ মং মং জি, ছাত্র থান সিন ও কো মিয়া সিন এবং লেখক।

পথে প্রথমেই পড়িল অমরপুর। মান্দালয় হইতে ইহার দূরত্ব ৭.৮ মাইল। স্থানীয় ভাষায় ইহাকে টাউংমিয়ো অর্থাৎ দক্ষিণ নগর এবং মান্দালয়কে মিয়োওমিয়ো অর্থাৎ উত্তর বলে। পিচ-ঢালা প্রশস্ত রাজপথে মোটর চলিতে লাগিল। শহর ছাড়াইতেই রাস্তার দুই ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সবুজের প্রাচুর্য্য চক্ষু জুড়াইয়া দিল। যত দূর দৃষ্টি চলে কেবল ধান-ক্ষেত। মধ্যে মধ্যে গ্রাম। ফুঙ্গি চাউং অর্থাৎ সঙ্ঘারাম ব্রহ্মদেশের গ্রামের

একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। ছোট, বড়, মাঝারি প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ একটি চাউং অবশ্যই থাকিবে। মধ্যে মধ্যে প্যাগোডা বা বৌদ্ধমন্দির। ক্রমে অমরপুরে আসিয়া পড়িলাম।

আভা ব্রিজ

ব্রহ্মরাজ আলুম্পায়ার (১৭৫২-৬০) পুত্র বোডপায়ার (১৭৮২-১৮১৯) সিংহাসনারোহণের এক বৎসর পর তদানীন্তন রাজধানী আভা হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী অমরপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। বোডপায়ার জ্যোতিষীগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে আভার সৌভাগ্যের দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পুত্র বাজিড (১৮১৯-৩৭) পুনরায় আভাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৮৩৭ সালে বাজিডর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা থারাওয়াডি মিন (১৮৩৭-৪৬) রাজা হইয়া পুনরায় অমরপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। সেই হইতে ১৮৫৭ সালে রাজা মিণ্ডনের সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত অমরপুর ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল।

বর্ত্তমান অমরপুর মান্দালয় জেলার একটি চৌকি। প্রাচীন গৌরবের কোন নিদর্শনই এখানে বিদ্যমান নাই। রাজ-প্রাসাদের বা দুর্গের চিহ্নমাত্রও নাই। প্রাচীন রাজপ্রাসাদসমূহ কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল বলিয়া ব্রহ্মদেশের কোথাও কোন রাজ-প্রাসাদের অস্তিত্ব নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্য্যন্ত একমাত্র মান্দালয় রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন বিমান-বহরের প্রচণ্ড আক্রমণে আজ তাহার ভিত্তিমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনেকগুলি প্রাচীন ছোট-বড় প্যাগোডা দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এক দিন অসংখ্য উপাসক-উপাসিকার সমাগমে এইগুলি কোলাহলমুখরিত থাকিত। কালচক্রের আবর্ত্তনে সেদিন শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ এইগুলির অধিকাংশই পরিত্যক্ত, জনহীন, শৃগাল, কুকুর, সর্প ইত্যাদির আবাস-স্থল। অমরপুরের সণ্ডার্স বয়ন-বিদ্যালয় বিখ্যাত। সরকারী কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত এই বিদ্যালয়ে রেশম এবং সুতার কাপড় বুনিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। অধ্যক্ষ উ কো কো জি-র সহিত আলাপ হইল। বেশ অমায়িক, মিষ্টভাষী, তরুণ যুবক। জাপান হইতে বয়নবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হইয়া আসিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাকাল দুই বৎসর। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শ্রেণীতে ত্রিশ জন করিয়া মোট ষাট জন ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইহারা প্রত্যেকেই মাসিক ৩০৲ টাকা করিয়া সরকারী বৃত্তি ভোগ করে। ব্রহ্মদেশে রেশমের চাষ হয় না। ইংরেজ আমলে মান্দালয়ের মহকুমা মেমিওতে পরীক্ষা-মূলক রেশমের চাষ আরম্ভ করিয়া সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহাদির দরুন আজ পর্য্যন্ত ব্যাপক-ভাবে রেশমের চাষ করা সম্ভব হয় নাই। চীন হইতে ভামোর পথে রেশমের সূতা আনিয়া তাহা দ্বারা লুঙ্গি (স্থানীয় ভাষায় লুঙ্গি) ইত্যাদি তাঁতে বোনা হয়। সাধারণ সূতার জন্যও ব্রহ্মদেশ পরমুখাপেক্ষী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্য্যন্ত জাপান এবং ভারতবর্ষই প্রধানতঃ তাহার সূতার চাহিদা মিটাইত।

অমরপুরে বাজার, হোটেল, দোকানপাট, চায়ের দোকান ইত্যাদি সমস্তই আছে। এমন কি দুইটি ছবিঘরও আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্রহ্মদেশের অন্যতম প্রাচীন রাজধানী আভা এখান হইতে মাত্র ৬ মাইল। বর্ত্তমানে উহা একটি গণ্ড-গ্রাম। বর্ষাকাল বলিয়া রাস্তা খুব খারাপ। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও এ যাত্রা আভা যাওয়া হইল না।

অমরপুরের নিকটেই ব্রহ্মদেশের অন্যতম প্রধান নদী ইরাবতী। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চিন্দুইন এবং সিতাং ব্রহ্মদেশের অপর দুইটি প্রধান নদী। অমরপুরের নিকট ইরাবতীর উপর বিখ্যাত রেলওয়ে-সেতু—আভা ব্রিজ। এইখানে ইরাবতীর বিস্তার এক মাইল বা তাহার কিছু বেশী হইবে। সেতুর উপর একদিকে পায়ে চলার এবং অপর দিকে যানবাহনাদি চলাচলের পথ। মধ্যস্থলে রেল-রাস্তা। ১৯৩৪ সালে ব্রহ্মদেশের প্রদেশপাল সার হিউ ল্যান্সডাউন ষ্টিফেন্সন আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সেতুর উদ্বোধনকার্য্য সম্পন্ন করেন। বর্ত্তমানে এই সেতু অব্যবহার্য্য। ১৯৪২ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে পলায়নকালে ইংরেজগণ এই সেতুর কিয়দংশ ডিনামাইটের সাহায্যে উড়াইয়া দিয়াছিল। এখনও মেরামত হয় নাই। স্থানীয় লোকেরা জ্বালানি রূপে ব্যবহার করিবার জন্য জায়গায় জায়গায় রেল-লাইন হইতে কাঠের স্লিপারগুলি কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। এখানে-সেখানে কর্ত্তিত স্লিপারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে।

সেতুমুখ হইতে একটু দূরে পূর্ব্বদিকে একটি প্রাচীন ইমারতের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইহা একটি দুর্গের

ভগ্নাবশেষ। ব্রহ্মদেশীয়গণ ইহাকে থাপিয়ে ভান বলে। রাজা মিণ্ডনের রাজত্বকালে ফরাসীগণ রাজ-দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। জলপথে আক্রমণকারী শত্রুর উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্ত তাহারাই এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই সময় মান্দালয় দরবারে ফরাসীগণের প্রভাব এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, অনেকেই মনে করেন, ১৮৮৬ সালে ইংরেজগণ ব্রহ্মদেশ অধিকার না করিলে অবিলম্বে ইহা ফরাসী-কবলিত হইয়া পড়িত। ১৮৮৫ সালে ব্রহ্মরাজের সহিত ফরাসীদের একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে ফরাসীরা টাঙ্গু হইতে মান্দালয় পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণের অধিকার লাভ করিল। কথা রহিল যে, ৭৫ বৎসরে পর ইহা ব্রহ্মরাজের সম্পত্তি হইবে। ফরাসী এবং ব্রহ্মদেশীয়

আভা ব্রিজের নিকট প্রাচীন ফরাসী দুর্গের ভগ্নাবশেষ

মূলধনে পরিচালিত একটি ব্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। এই ব্যাঙ্ক রাজা থিবকে শতকরা ১২৲ টাকা এবং অন্যান্যদের শতকরা ১৮৲ সুদে টাকা ধার দিবে। পরিকল্পিত ব্যাঙ্ককে ব্রহ্মদেশে মুদ্রা তৈরি করিবার একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইল। এই সময় ফরাসীগণ ইরাবতী নদীতে ষ্টীমার লাইন খুলিবার সঙ্কল্পও করিয়াছিল। সুতরাং নিজ স্বার্থের খাতিরে ইংরেজ কর্ত্তৃক উত্তর-ব্রহ্ম জয় রাজনীতির দিক হইতে সমর্থনযোগ্য হইলেও বিশুদ্ধ নীতির দিক হইতে ইহাকে কোনক্রমেই সমর্থন করা চলে না।

আভা ব্রিজ পার হইলেই ইরাবতীর পশ্চিম কূলে সাগাইং। ইহার প্রাচীন নাম জয়পুর (ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় জয়পুরা)। ইহা উত্তর-ব্রহ্মের সাগাইং বিভাগের প্রধান শহর। বিগত যুদ্ধের সময় এই শহর বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। শহরের সর্ব্বত্র বিমান আক্রমণের সুস্পষ্ট চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। ১৩১৫ সালে আথিন খায়া নামক শান সামন্ত পানিয়া শাসক-রাজের অধীনতা অস্বীকার করিয়া সাগাইঙে রাজধানী স্থাপন করেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ৪১ বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

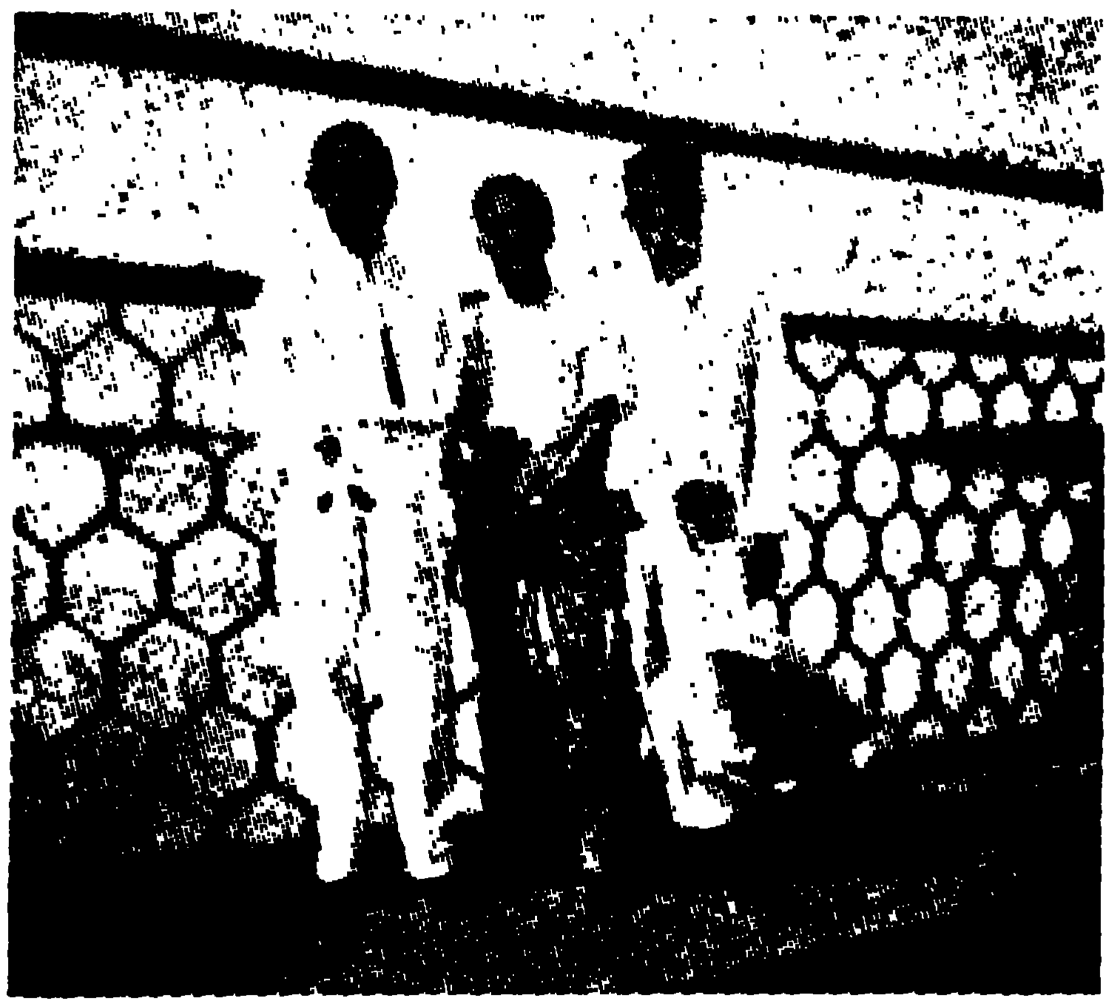

আভা ব্রিজের উপর ভ্রমণসঙ্গীদ্বয় সহ লেখক

তাঁহার পৌত্র থাডোমিন পায়া পরবর্ত্তী কালে, ১৩৬৪ সালে ব্রহ্মদেশের রাজধানী আভা নগর স্থাপন করেন। ১৫৩৪ সাল পর্য্যন্ত সাগাইং স্বাধীন শান-রাজগণের রাজধানী ছিল। ১৭৬০ সালে ব্রহ্মের শেষ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আলুম্পায়ার পুত্র নংদজির (১৭৬০-৬৩) রাজত্বকালে সোয়েবো হইতে পুনরায় সাগাইঙে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর সাগাইং পরিত্যক্ত হয়।

আমরা আভা ব্রিজে মোটর রাখিয়া শাম্পানে ইরাবতী পার হইলাম। নৌকার মাঝিমাল্লা সবাই চট্টগ্রামের মুসলমান। যাত্রী, মাল এবং গাড়ী পারাপার করিবার জন্ত লঞ্চের ব্যবস্থাও আছে। ভাড়া যাত্রী প্রতি ০ এবং প্রতি মোটরের জন্ত ৫৲।

সাগাইঙে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র কো বা সি-র বাড়ী গেলাম। এইখানে প্রথম ব্রহ্মদেশীয় আতিথেয়তার পরিচয় পাইলাম। কো বা সি-র পিতা জীবিত নাই। আমরা কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্র এই কথা বলিবামাত্র কো বা সি-র মাতা সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া আমাদিগকে বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। আসন গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সুদৃশ্য পাত্রে শীতল জল আনিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর একে একে পান চুরুট এবং পাখা আসিল। কোন প্রকার আতিশয্য নাই। সকলেরই সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব। আপ্যায়নের আতিশয্যে অতিথিকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয় না।

কো বা সি-র মাতা তাঁহার দুই কন্যার সহায়তায় একটি চুরুটের কারখানা পরিচালনা করেন। তাঁহার চারিটি ছেলের মধ্যে একটি পুলিস বিভাগে চাকুরি করে, আর একটি স্বর্ণ-কারের ব্যবসায় করে, আর দুইটি পড়ে। তাঁহার কারখানায় কাজ করিয়া প্রায় ৫০ জন শ্রমিক জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

সবাই নারী-শ্রমিক। ইহারা ১০০ চুরুট প্রস্তুত করিবার জন্য ।৶০ আনা করিয়া মজুরি পায়। একজন শ্রমিক দৈনিক ৩০০।৪০০ চুরুট প্রস্তুত করিতে পারে। ইহারা প্রাতরাশের পর কাজে আসে এবং একেবারে দিনের শেষে গৃহে ফিরে। মধ্যে কাজের ফাঁকে একবার কিছু খাইয়া লয়।

বসিবার ঘরে আমরা কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম। কো বা সি-র মাতা আমি ব্রহ্মদেশীয় ভাষা জানি না শুনিয়া রহস্য করিয়া বলিলেন যে কয়েক দিন তাঁহার চুরুটের কারখানায় যাতায়াত করিলে আমি নিশ্চয়ই তাঁহাদের ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিব। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া এবং কফি, বিস্কুট, কলা, বাতাবিলেবু এবং নারিকেল ইত্যাদি বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা এখান হইতে বাহির

মাতা, ভগ্নী এবং ভ্রাতা সহ কো বা সি

হইয়া সাগাইঙের বিখ্যাত পঙ্কতল প্যাগোডা, ঙা-টা-জি (Nga-tut-gyi) দেখিতে চলিলাম। বিদায়কালে গৃহস্বামিনীর জ্যেষ্ঠা-কন্যা একটি ফুলের তোড়া উপহার দিল।

ঙা-টা-জি বা পঙ্কতল প্যাগোডা সাগাইং শহরের এক-প্রান্তে অবস্থিত। ইহার এই নামকরণ কেন হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। ব্রহ্মরাজ থালনের (১৬২৯-৪৮) পুত্র মিন্দে মন্দমিট কর্ত্তৃক ১৬৪৮ সালে এই প্যাগোডা নির্ম্মিত হইয়াছিল। জুতা খুলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, ইহাই নিয়ম। ভিতরে প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি। ব্রহ্মদেশে আসিয়া বুদ্ধদেব চেহারায় খাঁটি মঙ্গোলীয় বনিয়া গিয়াছেন। অল্পদিন হইল ব্রহ্মদেশে আসিয়াছি। খুব বেশী ভ্রমণ করিবার সুযোগ এখনও হয় নাই; যত বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়াছি তন্মধ্যে মান্দালয়ের নিকটস্থ মহামুনি প্যাগোডাতে স্থাপিত, আরাকান হইতে আনীত বুদ্ধমূর্ত্তি ব্যতীত সুন্দর মূর্ত্তি একটিও চোখে পড়ে নাই। এই মূর্ত্তিটি মহামুনি নামে পরিচিত। অপূর্ব্বসুন্দর মূর্ত্তি। দু'দণ্ড চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। আমরা যে দিন ঙা-টা-জি প্যাগোডায় গেলাম তাহার তিন-চার দিন পরেই একটি উৎসব আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। উৎসব উপলক্ষ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি সাজাইবার ব্যবস্থা

পঙ্কতল প্যাগোডা, সাগাইং

হইতেছিল। দোকানপাট ইত্যাদিও আসিতে আরম্ভ হইয়াছিল।

সাগাইং শহর হইতে আন্দাজ আড়াই মাইল দূরে সাগাইং পাহাড়। এখানে অনেক বৌদ্ধ মন্দির, সঙ্ঘারাম ইত্যাদি আছে। ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ সঙ্ঘারামের ব্যবস্থা আছে। শেষজীবন সাগাইং পাহাড়ে কাটাইবার আকাঙ্ক্ষা অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ নরনারীর প্রবল। ইহা যেন এখানকার বৌদ্ধদের বারাণসী-স্বরূপ। সময় অল্প বলিয়া সাগাইং পাহাড়ে যাওয়া হইল না।

আবার শাম্পানে করিয়া ইরাবতী পার হইলাম। খেয়া-ঘাটে একটি দশ-বার বৎসরের বালিকা দেখিয়া মনে হইল ভারতীয়। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে সত্যই সে ভারতীয়। পিতার নাম বলিল রহিমতুল্লা। ভারতীয় মুসলমানগণ বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষ্যে ব্রহ্মদেশে আসিয়া অনেকেই বর্ম্মী-স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করিয়া এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা বনিয়া গিয়াছে। আচার-ব্যবহারে এবং কথাবার্ত্তায় ইহারা পুরাপুরি ব্রহ্মদেশীয়। কিন্তু ইহারা স্বধর্ম্ম এবং গোঁড়ামি কোনটাই ত্যাগ করে নাই। দিনের পর দিন ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিছু দিনের মধ্যেই ব্রহ্মদেশে একটি স্বতন্ত্র ইসলাম রাষ্ট্র স্থাপনের আন্দোলন আরম্ভ হওয়া অসম্ভব নহে। ব্রহ্ম-সরকারের এখন হইতেই এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

মান্দালয়ে যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে। থান সিন্‌দের বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। তাহার পিতা উ-লা-ব মহাশয়ের সহিত আলাপ হইল। ইনি মান্দালয়ের একজন সম্পন্ন ব্যবসায়ী। ইঁহার

পিতামহ চীনের ইউনান প্রদেশ হইতে প্রথম ব্রহ্মদেশে আসেন।

খাবার টেবিলে গিয়া দেখি সমস্ত আহার্য্যই ভারতীয় প্রণালীতে প্রস্তুত। থান সিন্ বলিল যে, আমার জন্যই বিশেষ করিয়া এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডাল, ভাজা, মাছ, মাংস, সালাদ, সয়াবিন সিদ্ধ এবং পুদিনার চাটনি ছিল। প্রায় আড়াই মাস পূর্ব্বে দেশ ছাড়িয়াছি। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন দিন এত তৃপ্তির সহিত আহার করি নাই। খাওয়া শেষ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিবার পর কিছু আতা এবং কলা আনিয়া দেওয়া হইল। বেন-বা-সিদের গৃহের মত এখানেও দেখিলাম যে, অতিথিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি রহিয়াছে। কিন্তু কোন প্রকার আতিশয্যের বালাই নাই। গৃহস্বামী এবং গৃহকর্ত্রীর সহিত সামান্য কিছু কথাবার্ত্তার পর আমরা মান্দালয় শহরের এক প্রান্তে মান্দালয়

দূর হইতে মান্দালয় পাহাড়ের দৃশ্য

পাহাড় দেখিতে বাহির হইলাম। এই পাহাড় প্রায় ১,০০০ ফুট উচ্চ। চূড়ায় উঠিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিকে চারিটি সোপান-পথ রহিয়াছে। পাহাড়ের গা কাটিয়া সিঁড়িগুলি তৈরি করা হইয়াছে। সিঁড়ির উপর আগাগোড়া টিনের চালা। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের গায়ে সমতল স্থান। কোথাও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, কোথাও তাঁহার পদচিহ্ন, কোথাও বা আবার ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাসের চিত্রাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে। আমরা সমতলবাসী। পাহাড়ে উঠা-নামা করিবার অভ্যাস নাই। কিছুদূর উঠিতেই পায়ে ব্যথা ধরিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়া উঠিতে লাগিলাম। অবশেষে চূড়ায় পৌঁছিলাম। চারিদিকে চাহিয়া চক্ষু জুড়াইয়া গেল। দূরে খরস্রোতা, বক্রগতি ইরাবতীকে এক খণ্ড স্থূল রৌপ্যসূত্রের মত দেখাইতেছে। চারিদিকে মাইলের পর মাইল জুড়িয়া চলিয়াছে হরিতের মেলা। কোথাও ছেদ নাই। মনে হয় যেন জুড়িয়া বিরাট একখানা সবুজ গালিচা পাতা। মনে পড়িল

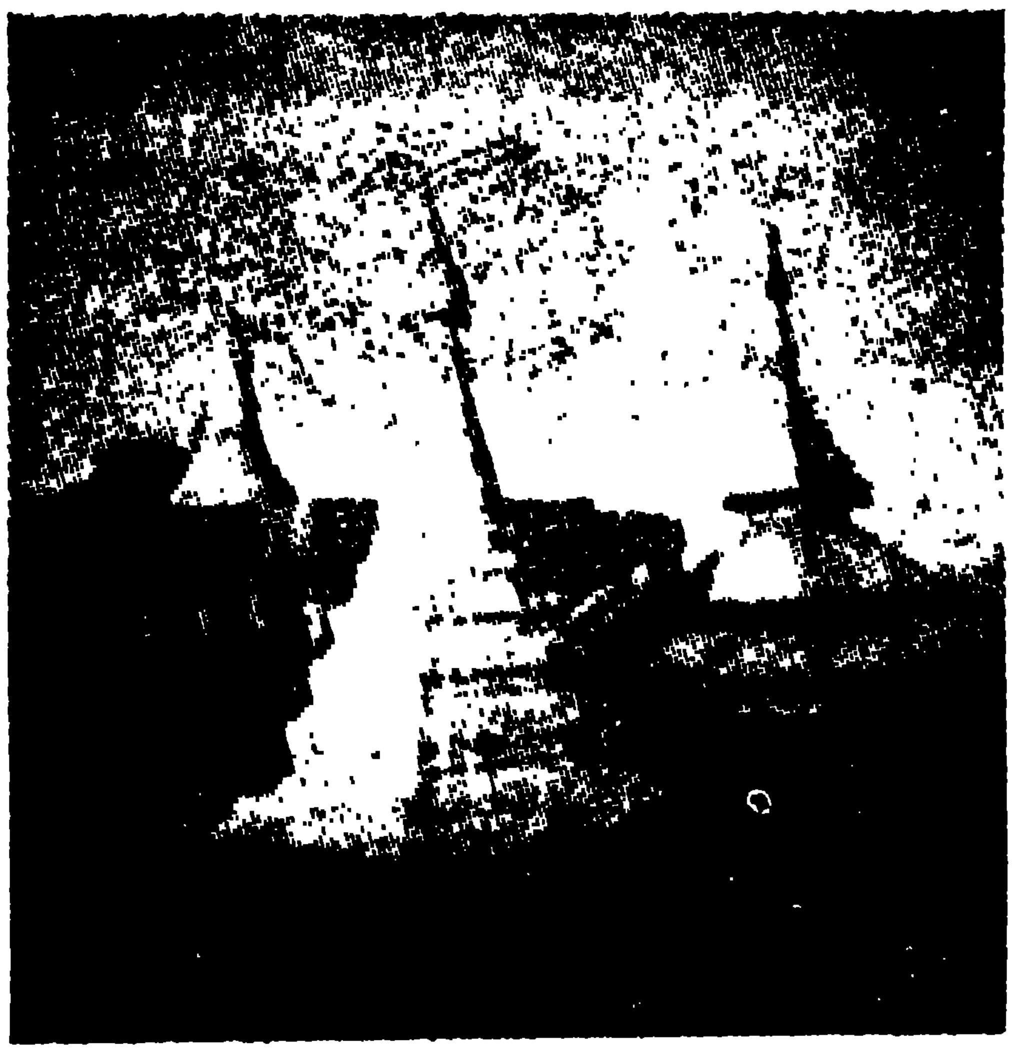

প্যাগোডাশোভিত মান্দালয় পাহাড়ের একাংশের দৃশ্য

বাঙালী কবির গান,—"এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে"। দেখিতেছি ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধেও এ কথা সমভাবেই প্রযোজ্য। মান্দালয় পাহাড়ের চূড়া হইতে ইরাবতীর পশ্চিমকূলে সিঙ্গুল প্যাগোডা দেখা যায়। এইখানে সর্ব্ববৃহৎ অক্ষত ঘণ্টা রক্ষিত আছে। ব্রহ্মরাজ বাজিড এই প্যাগোডা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহা অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে।

বিগত যুদ্ধের সময় মান্দালয় পাহাড়ে ইংরেজ ও গুর্খা এবং জাপ সৈন্যের মধ্যে তীব্র সঙ্ঘর্ষের পর গুর্খা সৈন্যদল এই পাহাড় অধিকার করে। বার্কশায়ার রেজিমেণ্ট ও গুর্খা সৈন্যদলের বীরত্ব-কাহিনী প্রস্তরফলকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। প্যাগোডা, সিঁড়ির চালা, মূর্ত্তি ইত্যাদিতে যুদ্ধের ধ্বংসলীলার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান।

মান্দালয় পাহাড় হইতে নিম্নের দৃশ্য

ভিক্ষু উ-খান্তির নাম ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। মান্দালয় পাহাড়ের প্যাগোডা ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার চেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছে। যাহারা যাহারা এই কার্য্যে অর্থসাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নাম পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে খোদিত

করিয়া রাখা হইয়াছে। ইঁহাদিগের মধ্যে বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকই আছেন।

পাহাড়ের পাদদেশে কুথোড প্যাগোডাতে ৭২৯খানি প্রস্তরফলকে সমগ্র ত্রিপিটক উৎকীর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা ব্রহ্মরাজ মিণ্ডনের কীর্ত্তি।

সমস্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। মান্দালয় পাহাড়ে ডাকাতের উপদ্রব আছে। আমরা পা চালাইয়া দিলাম। যখন মোটরে উঠিলাম তখন ধরিত্রীর আননের উপর তিমির-যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে। ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীন বাংলাদেশ

শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী

এ পর্য্যন্ত যা-কিছু প্রমাণ ও নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয়েছে তা থেকে আমরা এটুকু বুঝতে সমর্থ হয়েছি যে, অষ্ট্রিক জাতি এ দেশে নদীমাতৃক সভ্যতার প্রচলনকারী। সিন্ধু সভ্যতার মূলেও রয়েছে এই অষ্ট্রিক জাতির দান। অন্ততঃ প্রথম স্তরের সভ্যতা, যা নিঃসন্দেহে দ্রাবিড় উপনিবেশের পূর্ব্বযুগের ব্যাপার—তা যে কতকটা অষ্ট্রিক জাতীয় উপনিবেশস্থাপনকারীদের হাতে গড়া—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে যারা এই রকম প্রাগৈতিহাসিক তমসাচ্ছন্ন যুগে এসে বাসস্থাপন করেছিল এবং গ্রামীণ-সভ্যতার প্রচলন সুরু করেছিল তাদেরই কতকগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা উপজাতি[১] শতধাবিচ্ছিন্ন, নূতন পলিমাটির দেশ বাংলায় এসে তার প্রধান নদী[২] গঙ্গার তীরে সিন্ধু-সভ্যতার প্রথম স্তরের কিছুকাল পরে বসবাস করতে সুরু করে। তাই ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা "গঙ্গা" শব্দকে অষ্ট্রিক শব্দ বলেই ধরে নিয়েছেন। তাঁদের মতে এই শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে নদী। তবে পূর্ব্বরূপ গঙ্গা ছিল না; হয়ত "গাঙ্" বা "গঙা" ছিল। আজও দক্ষিণ বাংলায় নদীপথে গাঙ্ শব্দ খুব বেশী প্রচলিত। যদিও "জাং" শব্দের অর্থই আলাদা, তবু শুনতে অনেকটা গাঙ্ (গাং)-এরই মত। জাং শব্দের পূর্ব্বতন রূপ হয়ত "জাঙ্" বা "জঙা" ছিল। এর থেকে সংস্কৃত "জঙ্ঘা" শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে। আমাদের পুরাণ বলে, জহ্নুমুনির জঙ্ঘা দিয়ে গঙ্গা বেরিয়েছিল, তাই তার অন্যতম নাম "জাহ্নবী"। পুরাণের এই কাহিনী মনে হয় কোন অষ্ট্রিক উপাদানের উপর গড়ে উঠেছিল। অনুসন্ধান করলে এর মিল পাওয়া যায় আফ্রিকার নীল নদে বন্যার আবির্ভাব ও শ্বেতনীলের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাকালে যে সব উপকথার প্রচলন ছিল তার সঙ্গে। গাঙ্ ও জাং ছাড়া, ভূমিবাচক "মাল", বন্ধনবাচক "আল", "নল, কল, ছিট, জয়াল, যোগ, কটাল, ডিঙি, ডোঙা, ছিপ, ঠ্যাং; বাসি (বিশেষণ), ঝোপ, ঝাড়, কানি, কোয়ার, ভাঁটা, গণ, কূলি, ঘুঁটি, ডাক, ভাল (বিশেষ্য), সিম, বাঁশ, বাটাং, টোকা, চেলা, ভেড়ি, ডাঙ্গা, ওং, আঠা" প্রভৃতি শব্দ অষ্ট্রিক।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন পর্ব্বে ভারতে বিভিন্ন অষ্ট্রিক উপজাতির সমাগম হয়েছিল। অন্যান্য ভারতীয় প্রদেশগুলির তুলনায় বাংলায় তাদের অধিকসংখ্যক উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। পরবর্ত্তী কালে হয়ত বাংলা থেকে তারা কিছু কিছু সরে ছোটনাগপুরে ও আসামে গিয়েছিল। এখানে কিন্তু তাদের প্রথম আগমন কবে ঘটেছিল তা ঠিক করে বলা শক্ত। শুধু তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি লক্ষ্য করে বলা যেতে পারে হর-আহর (সূর্য্য পুত্র) বা প্রথম মেনেসের[৩] রাজত্বকালের পরে। অন্যদিকে বাংলায় তাদের প্রভাব প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৮০০ অব্দ পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল বলেই বৈদিক সাহিত্য ও মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয়। এই একমাত্র অষ্ট্রিক প্রভাবাধীন যুগে বাংলাদেশ কয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে[৪], তাই এখানে এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

১। ১৩৫৩-মাঘের প্রবাসীতে প্রকাশিত "প্রাগৈতিহাসিক বাংলাদেশ" প্রবন্ধে উপজাতিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে।

২। ভারতের অন্যতম প্রধান নদী সিন্ধুর তীরবর্তী ভূখণ্ডে দ্রাবিড় ও অন্যান্য জাতির উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব্বেই অষ্ট্রিক উপজাতীয়দের সমাগম হয়েছিল। এমন কি মিশরের নীলনদের তীরেও প্রথমে যে সভ্যতার বিকাশ হয় তা অষ্ট্রিক উপজাতীয়দেরই।

৩। ইনি মিশরে রাজবংশের প্রবর্তনকারী এবং প্রথম রাজা। ইনি নিজেকে সূর্য্যপুত্র বলে ঘোষণা করেন। এঁর আমল থেকে রাজাই দেবতা। এ ধরণের চিন্তার সূত্রপাত হয়। সমাজ ও মানুষের জীবনযাপন-পদ্ধতি সম্বন্ধে এঁর প্রচারিত বহু বিধান প্রাচীন মিশরীয়রা পালন করতে সুরু করেছিল। সংস্কৃত "মনু" শব্দ এই 'মেনেস' শব্দ থেকেই উদ্ভূত, আবার "মন্বন্তর" নামে রাজশাসনান্তর একই কারণে উদ্ভূত। আমাদের "অষ্টাভিশ্চসুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতো নৃপঃ" এবং এই জাতীয় অন্যান্য উক্তি সেই মেনেসের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

৪। ১৩৫৪ মাঘ সংখ্যার প্রবাসীতে প্রকাশিত "প্রাগৈতিহাসিক বাংলাদেশ" প্রবন্ধে।

এর পর দ্রাবিড় প্রভাবের যুগ। তাই রাজ্যের নাম হিসাবে পাই "হরিকেল", "পট্টিকেরা" শব্দ। গ্রামের নাম হিসাবে পাই "আটহ গড্ডি, দিজমকাজোলি, অজ্‌ক্‌ঢাচৈবল, বাল্লহিট্টা,[5] কণামেট্টিকা" ইত্যাদি শব্দ। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে তথাকথিত বর-পঞ্চালের অনুমিত প্রকৃত-রূপ বেরম-জোলের জোল অংশ, জোড়াসাঁকোর পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ "জোড়া" বা জোল হওয়াই সম্ভব, "নয়ান জোলি'র জোলি অংশ মূলতঃ দ্রাবিড় শব্দ। এ ছাড়া "জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ি-"র গুড়ি অংশ যা হয়ত আসলে নগরার্থক "কুর্" শব্দ ছিল, নিঃসন্দেহে তা দ্রাবিড়ীয়।

অষ্ট্রিক প্রভাব বাংলাদেশে বরাবরই বেশী থাকায় দ্রাবিড় প্রভাব কোনদিন প্রবলতর আকার ধারণ করে নি বলেই মনে হয়। অন্য দিকে অষ্ট্রিক সভ্যতা দ্রাবিড়ীয় বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণগুলি অল্পকালের মধ্যেই এবং সহজেই আত্মস্থ করে ফেলেছিল—এমন কথা বলা যায়।

দ্রাবিড়-সভ্যতার দুই রূপ ছিল—গ্রামীণ ও নাগরিক। অষ্ট্রিক জাতি এদেশে অনেকটা তাদেরই অনুসরণে নাগরিক সভ্যতার পত্তন করেছিল। তাই জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ির পাশাপাশি আমরা গৌড়, সমতট, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি অষ্ট্রিক নগরীর সন্ধান পাই। তবু অষ্ট্রিক সভ্যতার অনেক কিছু, যেমন—রাজা, রাজপ্রাসাদ, পূজা, শিল্প, সজ্জা প্রভৃতি ব্যাপার নিঃসন্দেহে দ্রাবিড়দের দান। বর্ত্তমানের হিন্দুধর্ম্মের রূপ তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর পূজার পূর্ব্বে যা ছিল, তা হচ্ছে অষ্ট্রিকদের লিঙ্গপূজা, প্রেতপূজা, বৃক্ষপূজা, প্রস্তরপূজা ইত্যাদি। আজও আমরা তাই মনসাপূজা করতে মনসা নামক কাঁটা গাছের ডাল ব্যবহার করি, ষষ্ঠীপূজা করতে বটের ডাল ব্যবহার করি, পিতৃলোককে আকাশ-প্রদীপ দিয়ে আলো দেখাই বা শিব বলতে পাথর পূজা করি। কিন্তু বসুধারা আঁকা, আল্‌পনা দেওয়া, ফুল দিয়ে পূজা করা—এগুলি হচ্ছে দ্রাবিড়দের দান—যা অষ্ট্রিক রীতি-নীতির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। শিব শব্দটি দ্রাবিড়ীয়। মূলতঃ উহা ছিল "শিবন্", আর "শম্ভু" শব্দটি ছিল "সেম্‌বো"। শিবন্ অর্থে রাঙা রঙ্ হয়। তাই পরবর্ত্তীকালে আর্য্যভাষায় শিবন্ শব্দের সহিত "ধুর্" [লোহিত-সৌন্দর্য্য অর্থে] যুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে "শিবনধুর্" শব্দ। ঐ শিবনধুর থেকে এসেছে বর্ত্তমানের "সিন্দুর" শব্দ। গরুকে গুরু[7] জ্ঞানে পূজা, নারায়ণের ও লক্ষ্মীর[8] পূজা খুব সম্ভবতঃ দ্রাবিড়দের দান।

বাংলায় দ্রাবিড়দের আগমন হয়েছিল সম্ভবতঃ বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৬০০-১৫০০ অব্দ নাগাদ।

দ্রাবিড়দের আগমনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কাল হচ্ছে আর্য্যবিজয়ের ও আর্য্যপ্রভাবের যুগ। মহাভারতের বিষয়বস্তু, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কাল নিরূপিত হয়ে থাকে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০০০-এর কাছাকাছি কোন সময়ে, অর্থাৎ লৌহযুগের দ্বিতীয় পর্ব্বে। মহাভারতের আদি, সভা, বন ও দ্রোণ পর্ব্বে আমরা পাই বাংলার অঞ্চলবিশেষের, বহু উপজাতির ও বহু উপভাষার উল্লেখ। সেই সঙ্গে এমন অনেক রাজার নাম পাই যা আর্য্যভাবাপন্ন বা সংস্কৃত হয়ে উঠেছে, যেমন—পৌণ্ড্র বাসুদেব, চন্দ্রসেন, সমুদ্রসেন, নরক প্রভৃতি। সমুদ্রবন অঞ্চলের রাজা ছিলেন সমুদ্রসেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক সুন্দর[9] বন বা সোঁদর বন শব্দের সৃষ্টি হয়েছে এই সমুদ্রবন থেকে। যেমন—সমুদ্রবন>সঁউদরবন>সোঁদরবন, আবার, সমুদ্রবন>সমুন্দর-বন>সুমুন্দরবন>সুন্দরবন। আবার এই সব রাজা কোনও কোনও আর্য্য রাজচক্রবর্ত্তীর অধীনতা স্বীকার করত এবং কর প্রদানও করত। তারা ব্রাত্য স্তোমের দ্বারা শুদ্ধ হয়ে আর্য্যের সম্মান বা আর্য্যত্বলাভ করত। অনার্য্য রাজাদের এই রকম আর্য্য হয়ে ওঠার উদাহরণ অবশ্য বহু পরবর্ত্তী কালীন। এর কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় ১৩৫৩ সালের মাঘ সংখ্যা জয়শ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে জাতীয় সংস্কৃতির কথা" এবং হিন্দুস্থান পত্রিকার ১৩৫৩ পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত "অহম রাজ স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ" নামক প্রবন্ধ দুটিতে। আসাম, মণিপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের অনার্য্য রাজারা নিজেদের অনার্য্য নামের পাশাপাশি আর্য্য বা সংস্কৃত নাম গ্রহণ করে ক্রমশঃ হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছিলেন তারই নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাই আমরা উক্ত দুটি প্রবন্ধে।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কিছুকাল আগে থেকে কি পরবর্ত্তী যুগের মধ্যেই তীরভুক্তি, সমুদ্রবন, সমতট, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি সংস্কৃত নাম কিয়ৎকাল কল্পিত হয়ে থাকতে পারে।

এর পরই হচ্ছে জৈন-প্রভাবের যুগ। আয়ারঙ্গসুত্ত, কল্পসুত্ত, ভগবতীসুত্ত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে জৈনধর্ম্ম প্রচারকদের রাঢ়ে ও সুহ্মে[10] আগমনের কথা জানতে পারা যায়। "নাথ" ও "নেঙটা" শব্দ বাঙালীর জীবনে জৈন-প্রভাবের চিহ্ন। সংস্কৃত "জ্ঞাতৃকপুত্র" শব্দ প্রাকৃতে "ঞ-ঞাতপুত্ত" রূপ পায়।

৫। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা" ও *Origin and Development of the Bengali Language*, vol. 1 (2nd Edn. 1926) এ নামগুলি পাওয়া যায়।

৬। *Origin and Development of the Bengali Language*. vol. 1. [প্রথম দিক]।

৭। বঙ্গশ্রী—আশ্বিন ১৩৪৪ "ধ্বনি ধ্বংসে ধ্বনির জন্ম" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

৮। "রুক্মিণী" শব্দ থেকেই বর্ত্তমানের "লক্ষ্মী" শব্দ এসে থাকতে পারে। একথা অন্যত্র বলেছি।

৯। আসলে ঐতিহাসিক ৺নিখিলনাথ রায় মহাশয় সুন্দরবনকে সমুদ্রবনের সঙ্গে অভিন্ন বলে প্রস্তাব আনেন। তাঁর "মুর্শিদাবাদের ইতিহাস"-এর প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১০। "Jainism in Bengal."—Promode Lal Pal, *Indian Culture*—pp. 524-25—[Miscellaneous]

জ্ঞাতপুত্ত পরবর্তীকালে "নাথপুত্ত" হয়ে দাঁড়ায়। শব্দটির শেষবর্তী পুত্ত অংশ খসে গিয়ে বাকী থাকে "নাথ" অংশটুকু। পরে আবার এই নাথ শব্দ সংস্কৃতে ফিরে গিয়ে স্বামী অর্থে [বা প্রভু অর্থে] ব্যবহৃত হতে থাকে আর উপাধিবাচক আখ্যায় পরিণত হয়। জৈনদের একটি আখ্যা ছিল "নির্গ্রন্থ"। এর অর্থ হয় বন্ধনহীন। প্রাকৃতে এর রূপ দাঁড়ায় "নিগ্গণ্ঠ।" অপভ্রংশ পর্বে তার পরিণতি হয় "নিঅণ্ঠ'-তে। আবার বাংলায় তাই হয়ে দাঁড়ায় "নেঙ্ট"—"নেঙটা"। "বর্দ্ধমানপুর" ও "রাঢ়া পুরী" নামের সঙ্গেও জৈনস্মৃতি জড়িয়ে আছে। "বর্দ্ধমান" ছিল মহাবীরের অন্যতম নাম। আজও শুনতে পাওয়া যায়—বাংলার কোন কোন গ্রামের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে "নাথ" শব্দ। বাংলার যোগীসম্প্রদায়ের মধ্যে "নাথ" উপাধি বহুকাল ধরে চলে আসছে। নাথধর্ম্ম আমাদের অজ্ঞতার ফলে মূলতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম বলে প্রচারিত হয়ে আসছে। এর একমাত্র কারণ গোড়ার দিকে সমধিক প্রভাবসম্পন্ন ও প্রতিযোগী বৌদ্ধধর্ম্ম অনেক জায়গাতেই জৈনধর্ম্মের উপরে আপতিত হয়ে তাকে কোণঠাসা করে দিয়েছিল। প্রকৃত তথ্যসংগ্রহ ও অনুসন্ধানের ফলেই জানা যেতে পারে যে, যেসব জায়গায় জৈনধর্ম্ম আগে এসে আধিপত্য বিস্তার করেছিল সেই স্থানে পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্ম্ম এসে জৈন-প্রভাবকে বিনষ্ট করে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিল। প্রচারের দিক থেকে প্রতিযোগিতার ভাব থাকায় বৌদ্ধধর্ম্মকে এক দিন হিন্দুধর্ম্মের কাছে এমন আঘাত পেতে হয়েছিল যে ভারত থেকে তাকে চির বিদায় গ্রহণ করতে হয়। বাংলায় জৈনধর্ম্মের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে মাটির তলা থেকে উদ্ধৃত বহু জৈন-মূর্ত্তিতে১১। তার ওপর নির্ভর ক'রে আজ আমরা অনুমান করতে সাহস পাই যে, বাংলায় বৌদ্ধ-মাগধী সভ্যতার ধারা এসে প্রবেশ করবার আগেই রাঢ়১২, গৌড়, সুহ্ম প্রভৃতি অঞ্চলে জৈনধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও তার বাহন হিসাবে অর্দ্ধ-মাগধী ভাষা এসে পৌঁছেছিল। তাই বাংলা ভাষার প্রাচীন স্তরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে অর্দ্ধ-মাগধীর দান-"র১৩-শ্রুতি", "ব-শ্রুতি"কে।

বাঙালীর জীবনে জৈন-প্রভাব খুব গুরুতর হয়ে না উঠলেও বা দীর্ঘকালস্থায়ী না হলেও তার মেয়াদ আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতক থেকে দ্বিতীয় শতক পর্য্যন্ত। আর তার পরে তার অস্তিত্ব চলে আসছে বৌদ্ধমিশ্রিত জৈনধর্ম্ম ও হিন্দুবিমিশ্র বৌদ্ধধর্ম্ম বলে। দর্শনের দিক থেকে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে জৈনধর্ম্মের অমিল থাকলেও আচার-অনুষ্ঠানগত মিল ছিল বলেই বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষে জৈন-সত্তাকে গ্রাস করে ফেলা সহজ ও সম্ভব হয়েছিল। তা না হলে নাথ উপাধিধারী যোগী সম্প্রদায়কে হিন্দুভাবমিশ্রিত বৌদ্ধ বলে মনে করার কোন কারণ দেখি না।

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব জৈনধর্ম্মের অনুসরণের ফলেই ঘটে থাকতে পারে। প্রথম সমাগম অশোকের রাজত্বকালের কাছাকাছি কোন সময়েই হয়ত হয়েছিল। বুদ্ধদেবের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপস্থিতির কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। মহাস্থানগড়ের ভগ্ন শিলালিপি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে বাংলাদেশ বৌদ্ধ রাজাদের শাসনাধীন হয়েছে। এই শিলালিপির ভাষা অশোকের অনুশাসনের ভাষার প্রায় অনুরূপ। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, এই শিলালিপি অশোকের যুগের না হলেও, তাঁরই কোন নিকট-বংশধরের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হয়ে থাকবে। লিপিখানির পাঠোদ্ধার করেন ডক্টর দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর। তাঁর প্রদত্ত পাঠ১৪ এই রকম :—

"………নেন সংবংগীয়ানং গলদনস
ছুমদিন মহামাতে সুলখিতে পুড নগলতে
এতং নিবহিপয়িসতি। সংবংগীয়ানং চ দিনে
তথা ধানিয়ং। নিবহি সতি দংগাতিয়ায়িকে
দেবাতিয়ায়িকসি। সু অতিয়ায়িকসিপি গংডকেহি
ধানিয়িকেহি এস কোঠাগালে কোসং ভরণীয়ে।"

এর যথাযথ আক্ষরিক সংস্কৃত অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছেন অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন, তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে১৫। এখানে তার উল্লেখ করছি :—

"………অনেন সংবংগীয়ানাং গলর্দনস
— মহামাত্র সুলক্ষ্মীতঃ পুণ্ড্রনগরতঃ এতৎ নির্বাহয়িষ্যতি।
সংবংগীয়াশ্চ দত্তং তথা ধান্যং। নির্বাহয়িষ্যতি দ্রঙ্গায়াত্যায়িকং
দৈবায়াত্যায়িকে। স্ব-ত্যায়িকেঽপি গণ্ডকৈঃ ধান্যকৈঃ
এষ কোষাগারে কোষং ভরণীয়ং।"

১১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আদিনাথের মূর্ত্তি, চারজন নাথ যোগীর মূর্ত্তি ও লেখকের ভ্রাতার নিকট রক্ষিত পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি-প্রভৃতি। শেষোক্ত মূর্ত্তিটি জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বোদরা গ্রামে কোন একটি পুষ্করিণী খননকালে আবিষ্কৃত হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের কোনও স্থানে মাটির তলা থেকে উদ্ধৃত একটি জৈন স্তূপ রাজেন্দ্র সিং সিংঘী মহাশয়ের বালিগঞ্জের বাড়ীতে সংরক্ষিত আছে।

১২। রাঢ়া পুরী নিয়ে কিন্তু মতদ্বৈধ আছে। প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। দ্রষ্টব্য : বিশ্বভারতী পত্রিকা—বৈশাখ-আষাঢ়-১৩৫৩। আবার "সংহতি" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে প্রভাসচন্দ্র পাল রাঢ়া পুরীর অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন।

১৩। দ্রষ্টব্য :—"চর্য্যাপদ" শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা ২৯ খণ্ড ১৩২৬-৮৫-১০৪ পৃষ্ঠায় সর্ব্বানন্দ বন্দ্যঘটীর দেওয়া প্রাচীন বাংলা শব্দাবলী [২ দফায়]।

১৪। *Epigraphia Indica*—Vol. XXI, Part 14.

১৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪।

এখন এই দুটি পাঠ আর ব্যাখ্যা থেকে মনে হয়—গলদনস বা গর্দ্দনস কোন মহামাত্রেরই নাম। অন্ততঃ ডক্টর ভাণ্ডারকর এটাই সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। বিপরীতে আমরা দেখতে পাই যে, (প্রাকৃত) গলদনস বা (সংস্কৃত) গর্দ্দনস প্রকৃতপক্ষে (সংস্কৃত) "করদানস্থ" বা "করাদানস্থ"-এর সমান। "কর" শব্দ "গল" হয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক, কিন্তু গলদনস নাম হওয়াটা অস্বাভাবিক। কর-আদায়কারী বা কর আদায়ের কাজে নিযুক্ত মহামাত্র—অর্থ করা অসঙ্গত হয় না। এর পর সুকুমারবাবুর ত্রুটি হয়েছে "ছমদিন" শব্দটিকে বাদ দিয়ে যাওয়ায়। আমাদের মনে হয় [প্রাঃ] ছমদিন শব্দ [সং] "দেবদত্ত" বা "ধর্ম্মদত্ত" শব্দের সমান। ফলে দেখা যায় যে, ঐ দেবদত্ত বা ধর্ম্মদত্ত হচ্ছে মহামাত্রটির নাম। সুতনুকা লিপিতে ছমদিন-এর প্রায় সমান শব্দ "দেবদিনে" আছে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা [প্রাঃ] দেবদিনেকে [সং] দেবদত্তের সমান বলে ধরে নিয়েছেন। এর পর আলোচনা করতে হয় "সুলখিতে" শব্দটিকে নিয়ে। সুকুমার বাবুর অনুবাদ মতে "সুলক্ষীতঃ" না হয়ে শব্দটি "সুরক্ষিত" হতেও পারে। "সুরক্ষিত-পুণ্ড্রনগরতঃ" একটি সমাসবদ্ধ পদ, এবং তার সঙ্গত অর্থও হয়। "তথা" শব্দ এখানে "তত্র" অর্থাৎ—সেখানে অর্থ করে। তা হলে সমগ্র লিপিখানির অর্থ দাঁড়ায় এই রকম :—

এতদ্দ্বারা সংবংগীয়দের কর-আদায়ের কাজে নিযুক্ত (বা কর-আদায়কারী) ধর্ম্মদত্ত (বা-দেবদত্ত) মহামাত্র সুরক্ষিত (বা সুলক্ষীসম্পন্ন) পুণ্ড্রনগর হইতে ইহা নির্ব্বাহ করিবেন। সংবংগীয়গণ সেখানে (বা সেইরূপ) ধান্য প্রদত্ত হইল। দৈব বিপৎকালে আর্থিক অভাব কাটিয়া যাইবে। সুদিনে ধান্য ও গণ্ডার দ্বারা এই কোষাগারের কোষ যেন ভরিয়া দেওয়া হয়।

পরবর্ত্তীকালে মন্ত্রযান, কালচক্রযান, বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি মতবাদের উদ্ভব ও প্রচলন হয়। আসল ধর্ম্মমতের এই রকম বিকৃতি ঘটার ফলেই বোধ হয় হিন্দুরা বৌদ্ধদের ঘৃণা করতে থাকে এবং বাংলায় কপটার্থক "ভণ্ড" শব্দের১৬ উৎপত্তি হয়। আবার ব্যর্থতাবোধক "পণ্ড" শব্দের উদ্ভব হয় ঐ শব্দ থেকে। "বুদ্ধ" শব্দ থেকে বাংলায় বুড্‌ঢ>বুড়া, বুড়ো শব্দেরও অপভ্রংশত্বপ্রাপ্তি ঘটে। বুদ্ধকে কোন-কোন জায়গায় শিব বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং সেই সব জায়গায় বুদ্ধ থেকে উৎপন্ন "বুড়ো" হয়ে দাঁড়িয়েছে১৭ শিবের বিশেষণ। তবু একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলায় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম দীর্ঘকালস্থায়ী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। আজ-কের দিনের বহু বৈষ্ণব ছিলেন মূলতঃ সহজযানপন্থী, বহু শাক্ত ছিলেন বজ্রযান ও কালচক্রযান পন্থী। বৌদ্ধজ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ, আচার্য্য শীলভদ্র, শান্তিদেব, বিভূতিচন্দ্র প্রভৃতি বাঙালী মনীষিগণের নামে একদা বৌদ্ধ ধর্ম্মজগৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বাঙালী তান্ত্রিক বৌদ্ধ অভিনবগুপ্ত এক দিন শঙ্করাচার্য্যের মত মহাপুরুষের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সুদূর সিংহল,১৭(ক) চীন ও তিব্বতের সঙ্গে প্রাচীন বাংলার সংযোগ বহুকাল ধরে অক্ষুণ্ণ ছিল।

মৌর্য্য সম্রাটদের নিযুক্ত উপরিক বা মহামাত্রদের অধীনে কিছুকাল থাকার পর বাংলাদেশ আবার আগেকার মত১৮ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশদ্বারা শাসিত হতে থাকে। এই সব রাজবংশের অধিকাংশই ছিল আর্য্যীকৃত অনার্য্য এবং এরা শূর, বর্ম্ম, সিংহ, ঘোষ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করত। কিন্তু কোন্ বংশ কতকাল রাজত্ব করেছিল এবং কোন্ অঞ্চল শাসন করত তার সঠিক প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি।

প্রায় পাঁচ শত বৎসর ব্যাপী এক অন্ধকার-যুগের পর গুপ্ত, পাল, সেন, শূর প্রভৃতি বংশের রাজত্বকালের কথা মুদ্রা, লিপি, কাব্য, ইতিহাস ও বিদেশী পর্য্যটকদের বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয়। এই সময়টা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত এবং ইতিহাসে এই যুগের পরিচয় হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ বলে।

গুপ্তবংশের শাসনকালে বাংলাদেশ আবার অখণ্ডত্ব লাভ করে। তার ফলে সমগ্র প্রদেশটি চারিটি ভুক্তিতে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক ভুক্তি কতকগুলি বিষয়ে এবং প্রত্যেক বিষয়ে কতকগুলি বীথি বা মণ্ডলে, আবার প্রত্যেকটি বীথি কয়েকটি চতুরকে বিভক্ত হয়ে শাসিত হতে থাকে। এ ছাড়া নূতন আরও দু-রকমের বিভাগের খবর পাওয়া যায়, যেমন পট্ট বা পাটক আর আবৃত্তি। যাবতীয় বিভাগের সর্ব্বনিম্ন স্তর ছিল গ্রাম। মনে হয় যে ভুক্তি অনেকটা এখনকার বিভাগের মত, বিষয় অনেকটা জেলার মত, মণ্ডল বা বীথি মহকুমার এবং চতুরক প্রায় চৌকি বা থানার মতই ছিল।

ভুক্তির প্রধান রাজকর্ম্মচারীর পদের নাম ছিল উপরিক, প্রতিরাজ। কুমারামাত্য, মহারাজ, মহাসামন্তও তাঁকে বলা হ'ত। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ থাকত সামন্ত বা বিষয়পতিদের। সামন্তদের সংযোগ থাকত মাণ্ডলিকদের সঙ্গে।

জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর সাহায্যে উপরিক ভুক্তির শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করতেন। এই প্রতিনিধি-

---

১৬। ভণ্ড> ভণ্ড> ভণ্ড। ১৭। যেমন, বুড়ো-শিবতলা।

১৭। (ক) বঙ্গশ্রী—১৩৫৩ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লেখকের "প্রাচীন বাংলা শিশু সাহিত্য" নামক প্রবন্ধে প্রমাণ করা হয়েছে যে, "সিংহলীয়" থেকে হিয়্‌হলি হয়ে বাংলা "হেঁয়ালি" শব্দের সৃষ্টি হয়েছে।

১৮। পৌরাণিক যুগে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারত থেকে। মৌর্য্যরাজাদের আমলে বাংলাদেশ যে অখণ্ডত্ব লাভ করে তার প্রমাণ পাওয়া যায় মহাস্থানগড়ের শিলালিপির "সংবংগীয়ানং" শব্দ থেকে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে আবার যে বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণও পাওয়া যায় সমুদ্রগুপ্তের স্তম্ভলিপি থেকে।

মণ্ডলী বা শাসন-পরিষদের নাম ছিল "অধিষ্ঠানাধিকরণ"। অধিষ্ঠানাধিকরণের সভ্যসংখ্যা ছিল চার। প্রথম নগরশ্রেষ্ঠী কিনা Bauker, দ্বিতীয় প্রথম সার্থবাহ, অর্থাৎ বণিক-সমাজের প্রতিনিধি (President of the Chamber of Commerce); তৃতীয় প্রথম কুলিক অর্থাৎ উৎপাদক-শিল্পী-দের প্রতিনিধি (Representative of the Industrialists) এবং চতুর্থ প্রথম কায়স্থ বা জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, অর্থাৎ রাষ্ট্র-দপ্তরের Chiof Secratry। গুপ্তযুগের শেষদিকের তাম্রপট্টলিপিতে অধিষ্ঠানাধিকরণের সভ্যদের নামের উল্লেখ নেই। তার কারণ উপরিক তখন স্বাধীন শাসক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মতামতের মূল্য অনেক কমে গিয়েছিল। তাম্রপট্টলিপিগুলি থেকে এইটুকু জানা যায় যে, কারও দেবতার উদ্দেশে বা ব্রাহ্মণকে দান করবার জন্ত জমি ক্রয় করবার ইচ্ছা হলে সেকথা তাকে সর্ব্বাগ্রে জানাতে হ'ত প্রথম পুস্তপালকে (Chief Record-keeper)। প্রথম পুস্তপাল দেখে শুনে জমি জরীপ করে সংবাদ দিলে পর উপরিক ও অধিষ্ঠানাধিকরণ সেই দান বা ক্রয় মঞ্জুর করে স্থানীয় মাতব্বর ব্যক্তিদের উদ্দেশে তাম্রশাসন দান বা তাম্রপট্ট-লিপি উৎকীর্ণ করাতেন।১৯

এই সময়ে আরও কতকগুলি নূতন পদ-পদবীর সৃষ্টি হয়েছিল—যেমন, মহামুদ্রাধিকৃত, মহাসর্ব্বাধিকৃত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, হট্টপতি, মহাপীলু পতি, মহাগণস্থ এবং মহাব্যূহপতি।২০ বর্ত্তমান উপাধি "রায় চৌধুরী" যাকে আমরা রাজ-চতুর্দ্ধারিক বা রাজ-চতুর্ধারী থেকে উৎপন্ন বলে মনে করি তার উৎপত্তি এই যুগেই কিনা তার কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি।

কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদে প্রধান অমাত্য বা মহাসান্ধি-বিগ্রহিক, রাজস্থানীয়, অঙ্গরক্ষ, ষষ্ঠাধিকৃত, চৌরোদ্ধরণিক, শৌল্কিক, দাশাপরাধিক, তরিক, মহাক্ষপটলিক, ক্ষেত্রপ, প্রমাতৃ, মহাদণ্ডনায়ক বা ধর্ম্মাধিকার, মহাপ্রতীহার, দাণ্ডিক, দাণ্ডপাশিক, দণ্ডশক্তি, মহাসেনাপতি, কোট্টপাল, প্রান্তপাল প্রভৃতি কর্ম্মচারীর পদ ছিল।

তখন রাজস্বকে বলা হ'ত—ভাগ, ভোগ, কর, উপরিকর ও হিরণ্য।

তাম্রপট্টলিপি থেকে যে সব মহত্তর২১ বা মুখ্য ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় তা এই রকম:—ধৃতিপাল, রিভু (ঋভু) পাল, বসুমিত্র, বসুমিত্র, স্থাণু দত্ত, বরদত্ত, নরসেন, প্রভুচন্দ্র, রুদ্রদাস, গুহ নন্দি, গুহবিষ্ণু, দাসরুদ্র, বসুশিব, শিবকুণ্ড, ধনস্বামী, সোমঘোষ বালঘোষ, জয়নন্দী, অপর শিব, প্রবর কুণ্ড, বোধিদেব, যোগ-দেব, শ্রীনাথ, ভবনাথ, বীরনাগ, রাজ্যনাগ, মধশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা, জন্মভূতি, যশোদাম, কেদার মিশ্র, গুরব মিশ্র, প্রজাপতি স্বামী, শৌণক স্বামী, ধূর্ত্ত ঘোষ ইত্যাদি। মনে হয় যে, এই সব নামের প্রথম ও শেষাংশ পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে ব্যবহৃত হতে থাকায় কালে উপনামে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং সেই সব উপনাম থেকে বর্ত্তমানের ঘোষ, বোস, দাঁ, সাঁই, রুদ্র, ভদ্র, ভড়, মিত্র, হুই, গুহ, নন্দী, কুণ্ড, দাস, পাল, নাথ, দত্ত, চন্দ্র, দেব, দে, সেন, শর্ম্মা, নাগ, ধর, শী প্রভৃতি উপাধির প্রচলন হয়েছে। আরও পরবর্ত্তীকালে—সপ্তম থেকে দ্বাদশ খ্রীষ্টীয় শতকের মধ্যে সৃষ্ট হয়—মুখ্যোপাধ্যায়>মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি উপাধিগুলি২২।

বাংলায় পাল আমলের সমসাময়িক আর একটি রাজবংশ সম্ভবতঃ বরাবর দক্ষিণাংশ বা "অরণ্য প্রদেশ" শাসন করত, সেটি হচ্ছে শূরবংশ। এই বংশের প্রথম রাজা আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা যথেষ্ট সন্দেহ রাখেন, কেননা তাঁর নামের কোন মুদ্রা, কি শীলমোহর বা অপর কোন বিশ্বাস-যোগ্য নিদর্শন ঐতিহাসিকদের চোখে পড়ে নি। একমাত্র কুলজী গ্রন্থগুলিতে তাঁর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কুলজীর উক্তি অনুযায়ী আদিশূর গৌড়ের রাজা ছিলেন এবং বাঙালীর জাতিভেদ ও সমাজব্যবস্থা যা ঠিক মনুসংহিতা অনুযায়ী নয়, বা আর্য্যিক বিভাগের অনুরূপ নয়, তা তাঁরই কীর্ত্তি। এই শূর-বংশের অন্যান্য রাজা—ক্ষিতিশূর, ধরাশূর, রণশূর ও লক্ষ্মীশূর। অনুশাসনের লিপিতে রণশূর ও লক্ষ্মীশূরের উল্লেখ আছে। রাজেন্দ্র চোল যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করেন তখন ধর্ম্মপাল, গোবিন্দচন্দ্র ও রণশূর যথাক্রমে দণ্ডভুক্তি, দক্ষিণ রাঢ় ও বঙ্গাল দেশ শাসন করতেন২৩। অরণ্যপ্রদেশ ও অপর মন্দারের (হুগলী অঞ্চলের) রাজা লক্ষ্মীশূর কৈবর্ত্তরাজ ভীমের সহিত রামপালের যুদ্ধে শেষোক্তকে সাহায্য করেছিলেন। এখন এই অনুশাসন-লিপি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের ব'লে স্থিরীকৃত হয়েছে। সুতরাং এই লিপি-বর্ণিত রণশূরের পূর্ব্বপুরুষ আদিশূরের তারিখ পড়ে সপ্তম-অষ্টম শতকেই। এই সময়ের সঙ্গে কুলজী কিম্বদন্তীর তারিখের খুব বেশী তফাৎ নেই।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে পঞ্চম শতক

১৯। দ্রষ্টব্য—বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সিরিজের অন্তর্ভুক্ত "প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী"—ডক্টর সুকুমার সেন।

২০। দ্রষ্টব্য—ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের "বাংলাদেশের ইতিহাস" ও *History of Bengal*—Dacca University Studies.

২১। এগুলি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের ব্যক্তিদের নাম।

২২। বাগচী শব্দের উদ্ভব হয় এইভাবে, যেমন, বঙ্গজীর (=বঙ্গজির)>বগ্‌গজিঅ>বাগজী, বাগচী। পাকড়াশী-র, যেমন—পাকুর+বাসী>পাকুড়াশী>পাকড়াশী। লাহিড়ী ও ভাদুড়ী-র উৎপত্তির কথা বলেছি"প্রাগৈতিহাসিক বাংলাদেশ" প্রবন্ধে। দ্রষ্টব্য-প্রবাসী মাঘ ১৩৫৪।

২৩। নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত শূন্য পুরাণের ভূমিকা ও ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদারের বাংলাদেশের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

পর্য্যন্ত। তার পর স্বাধীন-বঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপচন্দ্রের তারিখ ৫২৫ খ্রীঃ। এর পর ধর্ম্মাদিত্য ও সমাচারদেবের তারিখ ৫৭৫ খ্রীঃ। তাঁদের পরে শশাঙ্ক বা নরেন্দ্র গুপ্তের শাসনকাল ৬০০—৬৩৮। শশাঙ্কের পর খড়্গ বংশের ৬৫০—৭০০; পালবংশের ৭৫০—১১৬০; বর্ম্মবংশের ১০৭৫—১১৫০ ও সেনবংশের রাজত্বকাল ১০৯৫—১২৫০। ইহাদের পর রণবঙ্ক মল্ল হরিকাল দেবের ১২০০—১২২৫ ও দেববংশের শাসনকাল ১২২৫—১৩০০ পর্য্যন্ত।

এই সুদীর্ঘ হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে সমগ্র বঙ্গদেশ বিভিন্ন নদ-নদী দ্বারা বিখণ্ডিত থাকার দরুন মোটামুটি কয়েকটি দ্বীপে[২৪] বিভক্ত হয়েছিল, যেমন,—সিংহদ্বীপ, তালীদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, বৃদ্ধদ্বীপ, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, সুহ্মদ্বীপ, নলদ্বীপ প্রভৃতি, যেগুলি থেকে পরবর্ত্তীকালে সিংদিয়া, মাঝদিয়া, নদীয়া, তাল্‌দী, সুন্দিয়া, নল্‌দী প্রভৃতি স্থানের নামের প্রচলন হয়। তাদের আনুরূপ্যে অথবা "-দিয়া" অংশকে প্রত্যয়রূপে ধরে আরও পরবর্ত্তীকালে বহু গ্রামের নাম রাখা হয়, যেমন—কুতুবদিয়া ইত্যাদি। এমন কি মোগল সরকারের ডিহি বিভাগের "ডিহি" শব্দকে ভুল করে কেউ কেউ এই '-দিয়া' অংশের মূল শব্দ বলে মনে করেন, এরূপ দেখা গিয়েছে। আর নারিকেল পাটক, তালী পাটক, সপ্ত পাটক, (অ)লাবু পাটক প্রভৃতি "পাটক" বিভাগ ছিল, যা থেকে পরবর্ত্তী কালে—নারকেল বেড়ে, তাল বেড়ে, সাত বেড়ে, লাউ বেড়ে প্রভৃতি গ্রাম-নামের উৎপত্তি হয়েছে। "পাটক" ও "পট্ট" প্রায় সমার্থক শব্দ। এর অর্থ হ'ত পাড়া। বন্দর বা নৌকাঘাট বোঝাতে ব্যবহৃত "পত্তন" দিয়ে স্থানের নাম রাখা হ'ত, যেমন—শম্বুক পত্তন, চান্দট পত্তন, মনসা পত্তন ইত্যাদি। এই নামগুলি পরবর্ত্তী কালে—শামুক পোতা, চিংড়ি পোতা, মনসা পোতায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিল্ব শব্দ দিয়েও স্থানের নামকরণ হ'ত, যেমন—কেন্দু বিল্ব, মনসা বিল্ব, অক্রুর বিল্ব, চাতক বিল্ব ইত্যাদি। সেইগুলি থেকে বর্ত্তমানের কেঁদুলি, মনসার বিল, অক্রুরের বিল, চটকীর বিল এসেছে। গ্রাম ও পাড়া বোঝাতে "পট্ট, পট্টিক" শব্দ প্রায়ই ব্যবহৃত হ'ত, যেমন—চম্পপট্টিক, ঝ্‌ঙ্ক পট্ট, মল্ল পট্ট, যেগুলি থেকে বর্ত্তমানে চাঁপাটি, ঝিঝির আটি, মাদার আটি হয়েছে। আবার "পাটক" থেকে বহু জায়গায় "পাড়া" শব্দ এসে গেছে, যেমন—নব পাটক দক্ষিণ পাটক, বৃদ্ধ পাটক থেকে ন' পাড়া, দখিন পাড়া, বুড়া পাড়া ইত্যাদি। "পার্শ্ব" ও "সায়র" দিয়ে গ্রামের নামকরণ হ'ত, মহেশ্বর পার্শ্ব, সিদ্ধি পার্শ্ব, শঙ্খসায়র,[২৫] চন্দন সায়র ইত্যাদি। এদের থেকে পরবর্ত্তীকালে মহেশ্বরপাশা, সিদ্ধি-পাশা, শাঁক স'র, চন্দন স'র প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। "পুর" ও "গ্রাম" দিয়ে স্থানের নামকরণ সবচেয়ে বেশী হ'ত। তার প্রমাণ—নিত্যানন্দপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর, রামপুর, শান্তিপুর, বনগ্রাম, নবগ্রাম, বালুগ্রাম ইত্যাদি। "নগর" দিয়ে কিছু কিছু নামকরণ হ'ত, যেমন—রামনগর, দেবনগর, কাম্য নগর>কোন্নগর, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি। এগুলি ছাড়া সংস্কৃত থেকে বাংলা অনুবাদ করা গ্রামের নামও পাওয়া যায়, যেমন—যমল বৃক্ষিকা=জাগুল গাছি; পুষ্পবৃত্তিকা=ফুল বেড়ে ইত্যাদি। এ ছাড়া, বঙ্ক-ত্রা, যা থেকে—বঙ্ক ক-ত্তা> বয়গদ্দা>বানগদা; বজ্রকুক্ষিকা, যা থেকে বজ্জগুক্খিআ> বজর ঘুঁজিয়া>বেজার ঘোঁজ; বৃহিশাল>বিরিশাল>বরিশাল; স্রোত কুক্ষি>সোটকোখি>সুঁটখেক; কোল্লানাম্> কোলানাং>খোলনা, খুলনা; রক্ত মৃত্তিকা>রক্ত মট্টিআ>রাঙামাটি; কর্ণসুবর্ণ>কন্নসুঅন্ন>কানসোনা ইত্যাদি স্থানের নাম ক্রমবিকাশ লাভ করে। জনপদমূলক যে বিভাগ ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়—"ভূমি"-যুক্ত স্থানের নামে, যেমন, বীরহরভূমি>বীরভূমি>বীরভূম; মল্লভূমি>মল্লভূমি>মল্লভূমি>মালভূম, মানভূম; সুহ্মভূমি>সুম্‌হভূমি>সিংহভূমি> সিংভূম; দামলভূমি>দাবলভূমি>দঅলভূম>ধলভূম ইত্যাদি। সে যুগে নদ-নদীর নাম হয়েছিল—ত্রিবেণী, যমুনা, কালিন্দী, কুজতোয়া, ময়ূরাক্ষী, ব্রাহ্মণী, সরস্বতী ইত্যাদি।

আর্য্যদের সমাজ-ব্যবস্থার অনুসরণে বাংলায় ঠিক চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ হয় নি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী অবধি অন্ততঃ খুব বেশী স্বেচ্ছাচারিতা বিদ্যমান ছিল। তখন ছিল বৃত্তিমূলক উপনাম। ফলে ব্রাহ্মণের ঘোষ-উপনাম হ'ত, কৈবর্ত্তও ক্ষত্রিয় হ'ত। বিবাহ বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসৃত হ'ত না। কিম্বদন্তী অনুযায়ী গৌড়াধিপতি আদিশূর পশ্চিম ভারতীয় ভাবের অনুসরণ করবার জন্ত কান্যকুব্জ থেকে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আনিয়ে এদেশে কুলপ্রথার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁর আমলে কৈবর্ত্তরাও সম্মানের আসন পেয়েছিল, বৈদ্যরাও উচ্চবর্ণ বলে গণ্য হ'ত। একাদশ শতকে বল্লালসেন বাঙালী হিন্দু সমাজের পুনর্ব্যবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে করলেন। ফলে, কৈবর্ত্তরা নীচে নেমে গেল। তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হ'ল—হালিক ও জালিক। কায়স্থ হ'ল তিন রকমের, যেমন—কায়স্থ, করণ ও বদ্দ। তার মধ্যে আবার কুলীন ও মৌলিক বিভাগ হ'ল। বৈদ্যদের পরিচয় খুব গোলমেলে হয়ে দাঁড়াল। কায়স্থদের মধ্যে করণরা ছিল মসীজীবী, আর অন্ত শ্রেণীর কায়স্থেরা ছিল

২৪। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র দ্রষ্টব্য।

২৫। বাংলা ব্যাকরণ, প্রথম খণ্ড—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রণীত।

২৬। আবার এমনও হতে পারে—মহেশ্বরাবাস>মহেশ্বরা পাশ>মহেশ্বরপাশা এবং সিদ্ধাবাস>সিদ্ধাপাশ>সিদ্ধপাশা>সিদ্ধি পাশা।

অসিজীবী। কায়স্থ শব্দটি এসেছে ক্ষত্রিয়২৭ শব্দ থেকেই, যেমন—ক্ষত্রিয়>কসৃত্তিয়>কসৃত্ততিয়>কায়াথ>কায়থ, কায়েথ। তারই সংস্কৃত রূপ "কায়স্থ"। এখনকার দিনে অবশ্য করণ ও কায়েথ মিলে এক হয়ে গিয়েছে। অন্ত্যজ শ্রেণী ছিল দুই রকমের—এক জলাচরণীয় ও অন্যটি জলানাচরণীয়। এখনও অনেকটা সেই রকমই আছে। নাপিত, তাঁতি, সেক্‌রা, কুমার, কামার প্রভৃতির স্থান ছিল কায়স্থকুলের নীচেই।

২৭। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ—ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও ডঃ সুকুমার সেনের—'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থ।

কলঙ্ক

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

করমা গাঁয়ের লালসিং পুরা১ গৃহস্থ। দশ বিঘা ধানক্ষেত, বাড়িঘর, তিনখানা লাঙ্গল, গাই, মোষ তো আছেই, তা ছাড়া আরো আছে কিছু নগদ টাকা। লালসিং-এর সাঁঝিল২ মেয়ের নাম রুকিয়া বয়স হইবে তের কি চৌদ্দ, পাতলা গড়ন, কাঁধ পর্য্যন্ত কোঁকড়া চুল, চোখ দুটি হাসি হাসি, গায়ের রং তিল শাঁওর,৩ দেখিতে ভারি সুন্দর। মনোমত পাত্র পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া রুকিয়ার এই বয়সেও বিয়ে হয় নাই। লালসিং-এর মত লোক যাহার তাহার ঘরে তো আর মেয়ে দিতে পারে না, তাই খোঁজাখুঁজি চলিতেছে।

অবশেষে তিন ক্রোশ দূরে কোশীগাঁয়ের ভাতুসিং-এর ছেলে রূপনাকে পছন্দ হইল। ভাতুসিং-এর অবস্থা লালসিং-এর মত অত ভাল না হইলেও ঘরে খাবার আছে, দশ-বিশটা গাইগরু আছে তা ছাড়া ছেলেটি ভারি কাবিল৪। বয়েস আঠার-উনিশ, বলিষ্ঠ লম্বা দেহ, কালো কুচকুচে রং, দাঁতগুলি ঝকঝকে সাদা, ঠোঁট দুটি মানানসই পুরু, কানে সোনা। ছেলের শুধু যে রূপ আছে তা নয়, গুণও আছে। ঘর-গৃহস্থালির কাজে পাকা, আবার বাঁশী ও মাদল বাজাইতে ওস্তাদ। অতএব মহাদেওয়ের বিহার৫ পরে ফাগুনের এক শুভলগ্নে রূপনার সহিত রুকিয়ার বিবাহ হইয়া গেল।

শ্বশুরবাড়ী আসিয়া রুকিয়ার দিন আনন্দেই কাটে। একে তো বড়লোকের রূপবতী কন্যা, তার উপর শ্বশুরের আদুরে পুত্রবধূ—রুকিয়াকে সংসারের কাজ বিশেষ কিছু করিতে হয় না। শাশুড়ী-ননদেরাই সব কাজকর্ম্ম করে, হাসিয়া খেলিয়াই তাহার বেশী সময় কাটে।

স্বামী রসিক, সুন্দরী স্ত্রীর মর্য্যাদা রাখিতে জানে, আদর করিয়া, গান গাহিয়া, মাদল বাজাইয়া সব সময়েই খুশী করিতে চেষ্টা করে। আর রুকিয়া খুশীও হইয়াছে খুব; এমন স্বামী পাইয়া কোন্ মেয়ের না আনন্দ হয়! এক মণ কাঠের বোঝা জঙ্গল হইতে সে অনায়াসে মাথায় করিয়া বাড়ী লইয়া আসে, বিঘাভুঁই জমি এক বেলায় চাষ দিয়া ফেলে, আবার জ্যোৎস্না রাত্রে আঙিনাতে বসিয়া যখন মাদল বাজাইয়া গান সুরু করে তখন মনের মধ্যেটা কেমন করিয়া ওঠে—ইচ্ছা করে তার কালো মিষ্টি মুখখানার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে।

এই ভাবে দিন কাটে।

একদিন সকালবেলা মরদেরা যে যাহার কাজে গিয়াছে, ননদী গিয়াছে গোবর কুড়াইতে, শাশুড়ী রান্না লইয়া ব্যস্ত; হঠাৎ ডাকিয়া কহিল, 'কনিয়া৬ গে, জল নেই, এক ঘইলা৭ জল নিয়ে আয়'। রুকিয়া আস্তে আসিয়া খালি ঘইলাটা তুলিয়া লইল, তারপরে ঘরের বাহিরে আসিয়া সেটি নামাইয়া রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। খানিক পরে শাশুড়ী ডাকিল 'কনিয়া কনিয়া গে', রুকিয়া সাড়া দিল না। শাশুড়ী আবার ডাকিল, কিন্তু রুকিয়া নীরব; এইবার শাশুড়ী ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিল, এক ডেগ৮ দূরে পাশের বাড়ীতে কুয়া, এই সময়ে দশ ঘইলা জল আনা যায় অথচ বউটা করে কি? শাশুড়ী বাহিরে আসিয়া দেখিল খালি ঘইলার পাশে বউ দাঁড়াইয়া আছে। শঙ্কিত হইয়া শাশুড়ী কহিল, 'জল আন্‌তে যাসনি যে, শরীর কি খারাপ হয়েছে, না কেউ কিছু বলেছে!' রুকিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, কেহ কিছু বলে নাই। কি হইল তাহার—জল আনিতে গেল না কেন, শাশুড়ীর কোন প্রশ্নের উত্তরই সে দিল না—ঘইলার পাশে যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনি দাঁড়াইয়াই রহিল। ইতিমধ্যে ননদী আসিয়া উপস্থিত হইল, শাশুড়ী তাহাকে কহিল, 'তোর ভৌজিকে৯ পুছ কি করছে ওর, এক ঘইলা জল আন্‌তে বল্লাম তা জলও আনে না—জবাবও দেয় না।'

তার পরে ঘইলা তুলিয়া লইয়া নিজেই জল আনিতে চলিয়া গেল। ননদী রুকিয়ার আঁচল টানিয়া কহিল, 'কি হয়েছে বল না ভৌজি, তোকে ভূতে পেয়েছে নাকি?' ইহার

(১) সম্পন্ন, (২) সেজো, (৩) শ্যামল, (৪) উপযুক্ত (৫) শিবরাত্রি, (৬) বউ, (৭) কলসী, (৮) পা (৯) বৌদি,

উত্তরে রুকিয়া যাহা কহিল তাহা শুনিয়া ননদী চোখ দুটি বিস্ময়ে বড় বড় করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

শাশুড়ী জল লইয়া ফিরিতেই ননদী চেঁচাইয়া উঠিল—'শুনেছ মাইয়া, ভৌজি বলে কি? বলে পরের বাড়ীর কুয়োতে সে কোন দিন জল আনতে যায় নাই, কোন দিন যাবেও না।' শাশুড়ী জলের ঘইলা লইয়া ঘরে ঢুকিতেছিল, শুনিয়া দোর-গোড়ায় থ' হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। রাগে, অপমানে তার মুখখানা কালো হইয়া গেল, দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিল, 'পরের বাড়ী! পরের বাড়ী! গোতিয়ার[১০] বাড়ী জল আনতে যেতে অপমান! কেন আমরা যাই কেমন করে, আমাদের বুঝি ইজ্জত নাই?' উনুনের উপরে যে ডাল চাপানো সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া শাশুড়ী ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'বড়লোকের বেটি, লাখপতির বেটি, রাজার বেটি, গোতিয়ার বাড়ী থেকে জল আনতে অপমান বোধ হয়! আসল কথা বাড়ীতে কুয়ো নাই সেই কথাটা বলা হচ্ছে। আসুক তোর শ্বশুর, আসুক তোর ভাতার, তারাই এ কথার জবাব দেবে।' বকিতে বকিতে শাশুড়ী ঘরে ঢুকিল।

এদিকে ছোট হইলে কি হয়, ননদীটির মর্য্যাদাবোধ খুবই টনটনে—ভৌজির কথার গোপন ইঙ্গিতটা যে কি তা সে বুঝিতে পারিয়াছে—ভৌজির বাপ যে বড়লোক আর তার বাপ যে গরীব ভৌজি সে কথাই বলিতে চায়। বাপের বাড়ীর গরব লইয়া বাপের বাড়ীতেই তো সে থাকিতে পারিত—এখানে আসিল কেন? রুকিয়া এ কথার উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল, 'আমার বাপ গোরপড়কে[১১] তোদের বাড়ী আমাকে রেখে যায় নি।' আর যায় কোথায়, কলহের সুযোগ পাইয়া ননদী আঙিনাময় নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল, এ বিষয়ে সে যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছে, অনেক বুড়ীকে পর্য্যন্ত সে ঘায়েল করিয়া দেয়, ভৌজির মত একটা ছুঁড়িকে কাত করিতে কতক্ষণ! বাছা বাছা অশ্লীল বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, ভৌজির বাপ মা হইতে সুরু করিয়া তার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত কাহাকেও রেহাই দিল না। বাক্-যুদ্ধে রুকিয়াও অপটু নহে, কিন্তু ইতিমধ্যে শ্বশুর আসিয়া পড়ায় সে চুপ করিয়া রহিল, ভিতরটা তাহার জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল। ব্যাপার শুনিয়া শ্বশুরও যখন তাহাকে আক্রমণ করিল তখন আর সে সহ্য করিতে পারিল না—নিজের ঘরে ঢুকিয়া মেঝের পড়িয়া সে কাঁদিতে লাগিল, দুঃখে নহে—রাগে।

অনেক বেলায় স্বামী বাড়ী আসিল, অবিলম্বে তাহার কাছে শ্বশুর, শাশুড়ী এবং ননদী একযোগে নালিশ রুজু করিল। রুকিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল, স্বামী কি বলে, সকলের গলার আওয়াজই পাইল, পাইল না স্বামীর।

খাইতে তাহার ইচ্ছাও নাই, তাহাকে কেউ ডাকিলও না। আহারান্তে স্বামী যখন ঘরে ঢুকিল তখনও সে ভূমি-শয্যায় শুইয়া ছিল। স্বামী কাছে বসিয়া গায়ে হাত দিতে কোঁস করিয়া উঠিয়া বসিল, কিন্তু তাহার প্রশান্ত মুখের পানে চাহিয়া ভিতরের উত্তাপ অনেকখানি কমিয়া আসিল। স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, 'সত্যি বল, কি হয়েছে?' রুকিয়া জবাব দিতে যাইতেছিল এমন সময় ননদী আসিয়া উঁকি মারিল, তাহাদের কথাবার্ত্তা তখনকার মত আর হইল না।

ইহার পরে দিন কাটিতে লাগিল বটে, কিন্তু তেমন সুখে স্বচ্ছন্দে নহে। নতুন বৌয়ের আদরের মাত্রা একেবারেই কমিয়া গেল, খুঁটিনাটিতে ত্রুটির জন্য রুকিয়া কড়া কথা শুনিতে লাগিল। কোন কোন দিন সেও জবাব দিত, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিত, কড়া কথা গালাগালিতে পরিণত হইত।

বিষয়টা রুকিয়ার বাপ লালসিং-এর কানে পৌঁছিল। মাথায় মস্ত বড় মুড়েঠা[১২] বাঁধিয়া সে সমধিকে শিক্ষা দিতে রুকিয়ার শ্বশুরবাড়ী চলিল। সম্বর্দ্ধনা খুব সমারোহেই হইল, লালসিং মুড়েঠা লইয়া ফিরিল বটে, কিন্তু মান লইয়া ফিরিতে পারিল না।

ইহার পরে রুকিয়া যখন-তখন লাঞ্ছিত হইতে লাগিল, স্বামী তাহাকে লাঞ্ছনার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। এই অবস্থায় স্থানীয় প্রথানুসারে সকল বউ যাহা করে রুকিয়াও তাহাই করিল—এক দিন সুযোগ বুঝিয়া পলাইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

ইহার ফলে দুই পক্ষই ভীষণ রুখিয়া গেল। ভাতুসিং কহিল, এমন বউকে সে আর ঘরে আনিবে না, লালসিং জবাব দিল যদি ভাল চায় তবে ভাতুসিং যেন ফারকাতি[১৩] দিয়া দেয়, তাহার মত চামারের বাড়ী সে মেয়ে পাঠাইবে না।

বর্ষা আসিয়া পড়ে, কিছুদিনের মত কলহবিবাদ স্থগিত রাখিয়া মেয়েপুরুষে ক্ষেত-খামারের কাজে লাগিয়া যায়। ধান্য রোপণের গানে মাঠ-ঘাট মুখর হইয়া উঠে।

বর্ষান্তে আসে শরৎ—সবুজ ধানক্ষেত রোদে ঝলমল করিতে থাকে, বাতাসে শামসিহর[১৪] ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসে। লোকের এখন অখণ্ড অবসর, একটার পর একটা পরব আসিতে থাকে—কর্ম্মা, জিতিয়া, দশহরা। গ্রামের দশ জন মেয়ের মত রুকিয়াও হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, উৎসবে যোগ দেয়, নাচে, গান গায়। দিন কাটিয়া যায়।

একদিন নদীর ঘাটে রুমির মা আর মুদীবউ একটা কথা লইয়া হাসাহাসি করিতেছিল, মোহনের মা সেইখান দিয়া জঙ্গলে যাইতেছিল, কহিল, 'কথাটা কি, এত হাসি কেন?' মুদীবউ জবাব দিল 'হাসির কথা বলিয়াই এত হাসি।' জঙ্গলে যাওয়াটা স্থগিত রাখিয়া মোহনের মা আরও কাছে আসিয়া

১০ জ্ঞাতি ১১ পায়ে ধরে

১২ পাগড়ি ১৩ বিবাহ-বিচ্ছেদের পত্র ১৪ শিউলি

কহিল 'বল্ না ভাই, শুনে আমরাও একটু হেসে নিই।' মুদীবউ রুমির মাকে কহিল 'তুই বল্।' রুমির মা গলা খাটো করিয়া কহিল 'শুনিস্ নি বুঝি ঐ লালসিং-এর মেয়ে রুকিয়ার কথা?' মোহনের মা কহিল, 'শুনেছি বইকি, মেয়েটাকে আর শ্বশুরবাড়ী পাঠাবে না।' রুমির মা হাসিয়া কহিল, 'কি দরকার ওর শ্বশুরবাড়ী।' মোহনের মা গালে হাত দিয়া কহিল, 'কেন, কি করেছে?' মুদীবউ বলিল, 'কি আর করেছে—পিরীত করেছে।'

দেখা গেল কথাটা অনেক স্থানেই আলোচিত হইতেছে। সন্ধ্যাবেলা কুয়ার ধারে জল লইতে আসিয়া মইলা কাত করিয়া পাড়ার বউ ও মেয়েরা ঐ কথাই বলাবলি করিতেছে। একটি বউ কহিল, 'ওর ঢং দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সব সময় অত ঠাট-বাট কেন।' রুকিয়ার এক প্রতিবেশিনী কহিল, 'সত্যি বলছি সেদিন নিজের চোখে দেখেছি।' নিজের চোখে কি দেখিয়াছে তাহা বলিবার জন্য চারিদিক হইতে একই সঙ্গে অনুরোধ আসিল। সে বলিল, 'মরদ মদ খেয়ে এসে রাতে আমার সঙ্গে ঝগড়া সুরু করল, আমি রাগ করে ঘরের বাইরে এসে বসে থাকলাম, প্রহরখানেক রাত হয়েছে এমন সময় দেখি ছুঁড়ি চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি বড় মহুয়া গাছটার দিকে চলে গেল।' একটি যুবতী কহিল, 'ও বাবা, ঐ মহুয়া গাছটায় যে ভূত আছে গো।' আর একজন কহিল, 'আছে বৈকি, বড় রসিক ভূত।' উচ্চ হাসির রোল পড়িয়া গেল।

যাহা রটে তাহা বটে। কে একজন প্রায়ই অনেক রাত্রে রুকিয়াদের বাড়ীর পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়, দরজা খুলিয়া রুকিয়া বাইরে আসে, দুটিতে মিলিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া যায়। আবার হাটবারের দিন দুপুরবেলা গাঁয়ের মেয়েপুরুষ যখন হাট করিতে যায় তখন রুকিয়া একটা ঝুড়ি মাথায় লইয়া নদীর ওপারে শালবনটার সরু পথ ধরিয়া চলিতে থাকে, হঠাৎ কে আসিয়া তার চোখ দুটি পিছন হইতে চাপিয়া ধরে, রুকিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করে না, হাসিয়া ওঠে, তার পরে দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া গভীর বনে প্রবেশ করে।

ইহাও গাঁয়ের লোকের এক রকম গা-সহা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু দশহরার মেলার দিন রুকিয়া যে রকম বাড়াবাড়ি করিল তাহাতে প্রবীণারা তো বটেই, নবীনারা পর্য্যন্ত ছি ছি করিতে লাগিল। লাল টুকটুকে ঝুলা[১৫] ও ছাপাশাড়ি পরিয়া কানে তারপাত, গলায় হাঁসুলী আর খাঁখিয়া, হাতে বাঁক এবং কাংনা পরিয়া সে গ্রামের দশ জন মেয়ের সঙ্গে মেলায় গেল, কিন্তু খানিক পরে দল ছাড়িয়া যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল তাহা কেহ বলিতে পারিল না। আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরিবার সময় সে আসিয়া আবার দলে ভিড়িল।

কথাটা লালসিং-এর কানেও গেল; সে রাগে গর্জিয়া উঠিল, মান-ইজ্জত আর থাকিল না। মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, ভবিষ্যতে সে যদি এমন কাজ আর করে তাহা হইলে মেয়ে বলিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবে না, ছোঁড়াটা যেই হউক তাহাকে তো কাটিবেই, মেয়েকেও কাটিয়া দুই টুকরা করিবে।

লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাত, মাঠঘাট জ্যোৎস্নায় ভাসিয়া যাইতেছে। গ্রামখানি ঘুমন্ত, রাত অনেক, এমন সময় রুকিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, গায়ে তার লাল ঝুলা, পরনে ছাপাশাড়ি, সর্ব্বাঙ্গে গহনা। সে নিঃশব্দে বড় মহুয়া-গাছটার নীচে গিয়া দাঁড়াইল। সেখানটা আবছায়া অন্ধকার, সেই অন্ধকার হইতে কে এক জন রুকিয়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, চুপি চুপি কহিল, 'ইস্ বড্ড যে সেজেগুজে এসেছিস্।' রুকিয়া হাসিতে লাগিল, তার পরে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, 'একটা কথা বলব তোকে।' যুবক কহিল, 'কি বল্বি বল্।' রুকিয়া কহিল, 'বাপ্পা[১৬] বড় হাঁকাহাঁকি করেছে, বলেছে কেটে ফেলবে।' যুবক উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, 'তাই নাকি!' রুকিয়া যুবকের বুকের কাছে ঘেঁষিয়া কহিল, 'আমি বলি, দু'জনে কোথাও চলে যাই, কোন পরদেশ।' যুবক একটু ভাবিল তার পরে কহিল, 'তবে তাই চল্, কোথাও গিয়ে দু-তিন মাস নোকরি করব, তার পরে আবার ঘরে ফিরে আসব, তখন দেখবি সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।' দুই জনে মহুয়াতলা হইতে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পথে আসিয়া দাঁড়াইল, আলো আসিয়া পড়িল যুবকের কালো কুচকুচে সুকুমার মুখে, কানের সোনা তাহার ঝকমক্ করিয়া উঠিল। দু'জনে পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

১৫ মেয়েদের গায়ের কুর্ত্তা ১৬ বাপ

মুনি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

গুহার গোপনে মুনি চক্ষু মুদি করে ধ্যানযোগ
সহজে সকলে বলে বেঁচে থাকা তার কর্ম্মভোগ!
কি কাজে লাগে সে মিথ্যা চোখ পোরা নরদেহ ধরে?
জীবন্তে সমাধি যার সে কেন সমাধি-চিন্তা করে?
গুণী জানে, জানে জ্ঞানী তাঁহার চিন্তার স্রোত হতে
কল্যাণ-জাহ্নবী-ধারা বহে যেন গোমুখীর পথে,

বেতারের সুর-ধারা সহস্র যোজনে যেন পশে
ধ্যানের প্রবাহ তার সুন্দরের মন্দাকিনী রসে,
ঊষরে উর্ব্বর করে দেহে মনে স্বাস্থ্য করে দান,
ধরার ধরায় বর্গে, নিখিলের করে সে কল্যাণ।

আমার দাদামশায়—রাজনারায়ণ বসু

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী

আমার দাদামশায় রাজনারায়ণ বসুর বাড়ী কলিকাতার নিকটে বোড়াল গ্রামে। দাদামশায়ের বাবার নাম নন্দকিশোর বসু। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্য ছিলেন। তিনি দেখিতে গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, সুপুরুষ ছিলেন। উপযুক্ত বয়সে তাঁর বিবাহ ঠিক হয়। সুন্দরী কন্যাকে দেখে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা পছন্দ করেন। কন্যার রূপের প্রশংসা তিনিও শুনেছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বর গিয়ে বসলেন বিবাহ-বাসরে।

শুভদৃষ্টির সময় বর আগ্রহের সঙ্গে যখন কন্যার মুখের দিকে তাকালেন তখন চমকে উঠলেন—"একি! এ যে কালো কুরূপা কন্যা। কার জায়গায় কে এলেন! তিনি তখনি বললেন, 'এ মেয়েকে আমি বিয়ে করব না।' এমন করে কন্যাপক্ষ ঠকিয়েছেন!" তিনি বিবাহ-বাসর থেকে উঠে এলেন।

কন্যার বাবা বললেন—হাঁ, অন্যায় হয়েছে, আমার মেয়ে কালো সেজন্য কেউ পছন্দ করে না—কি করি! আমায় শেষে এই প্রতারণা করতে হয়েছে, আমাকে ক্ষমা কর—এখন জাতিকুল রক্ষা কর।

বরের মন তখন এ রকম অন্যায় আচরণের জন্য আক্রোশে পূর্ণ—তিনি কিছুতেই আর বিবাহের বাকি অনুষ্ঠানাদি করবেন না। তখন কন্যার পিতা রাজা রামমোহন রায়ের কাছে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বরকে বললেন—তোমাকে রাজা রামমোহন রায় এখনি ডেকেছেন।

রাজা রামমোহন রায় তাঁর গুরু। গুরু শিষ্যকে ডেকেছেন, কাজেই তিনি আর না গিয়ে পারলেন না। তিনি সেই নারীদের দুঃখে দুঃখী মহাপ্রাণ ভগবদ্‌ভক্তের কাছে গেলেন। রামমোহন তাঁর প্রিয় শিষ্যের মাথায় স্নেহভরে হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করে বললেন—"দেখ, দেখতে খারাপ হলে কি হয়? দেহের সৌন্দর্য্য ক'দিন থাকে! মেয়েটি শুনেছি ভাল, তা হলেই হ'ল।"

তখন তিনি রামমোহনের উপদেশ ভক্তিভরে গ্রহণ করলেন এবং অবশেষে সেই কালো মেয়েকেই ঘরে আনলেন। পরে দেখা গেল, রাজা রামমোহন রায়ের আশীর্ব্বাদ ফলেছে—তাঁর ঐ শিষ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজনারায়ণ বসু ধার্ম্মিক, বিদ্বান ও সাধু ব্যক্তি হওয়াতে সকলের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করেছিলেন।

ষোল বৎসর বয়সে দাদামশায়ের বিদ্যালয়ের লেখা-পড়া শেষ হয়। তিনি ঐ বয়সে লাইব্রেরী (এখনকার পি.আর.এস.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও ৪০৲ টাকা বৃত্তি পান। যখন তিনি কলেজের ছাত্র ছিলেন তখনই তাঁর লেখা ইংরেজী প্রবন্ধ তখনকার কালের গেজেটে প্রকাশিত হ'ত।

কলেজ থেকে বার হয়ে তিনি শিক্ষকতা-কর্ম্ম গ্রহণ করেন। মেদিনীপুর ছিল তাঁর কর্ম্মস্থল। তিনি সেখানকার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি তখন তথাকার অধিবাসীদের ও ছাত্রদের সর্ব্ববিষয়ক উন্নতি ও নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। তিনি সেজন্য কতকগুলি সভা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—যেমন আত্মোন্নতি সভা, সুরাপান-নিবারণী সভা ইত্যাদি। শেষে তথাকার লোকেরা বলতেন—এবারে একটা সভা-নিবারণী সভা করতে হবে।

তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি, কর্ম্মতৎপরতা ও সততা দেখে সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দিতে চেয়েছিলেন। সেই প্রস্তাব শুনে তাঁর মুখ চিন্তাক্লিষ্ট ও গম্ভীর হয়ে গেল। আমার দিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে কেন! কি এমন ভাবছ? কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে কি?

দাদামশায় বললেন—হাঁ, মনটা খারাপ হয়েছে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমায় ডেপুটির পদ দিতে চান। কিন্তু আমি স্কুলের কাজই সবচেয়ে ভালবাসি।—শেষ পর্য্যন্ত তিনি ডেপুটির পদ প্রত্যাখ্যান করলেন। এ কথা শুনে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বললেন—"Rajnarain is a mad chap—he neither wants promotion nor position" "রাজনারায়ণ দেখছি পাগল—সে উন্নতি লাভ করতেও চায় না, বড় পদও চায় না।

মেদিনীপুরে তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়াতে তিনি দেওঘরে বসবাসের আয়োজন সুরু করলেন। সেখানে ডাক বাংলার পাশে প্রচুর জমি কিনে সুন্দর বাড়ী করলেন। আমৃত্যু সেখানেই ছিলেন। এখন সে বাড়ী অন্য লোকে কিনে নিয়েছে।

দেওঘরে কত লোক তাঁকে দেখতে আসতেন। কেউ কেউ বলতেন, "বৈদ্যনাথে দুই মহাদেব আছেন—একজন পাথরের, আর একজন সজীব।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি তাঁকে দেখতে আসতেন এবং তাঁর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। অতিথিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁর কি প্রখর দৃষ্টি ছিল তা স্বচক্ষে দেখেছি।

শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায় যখন দেওঘরে অতিথি হতেন তখন বাড়ীখানি সর্ব্বদা হাস্যমুখরিত হয়ে থাকত। দুই বন্ধুতে এমন প্রাণখোলা হাসি হাসতেন যা দুর্লভ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায় কত মজা করে অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি এঁকে চিঠি লিখতেন, তা পড়ে আমরা তো হেসেই আকুল। তাঁর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের কত চিঠি আমার মা যত্ন করে একটা বাক্সে রেখেছিলেন।

মহর্ষি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর পারিবারিক সুখ-দুঃখের সব সংবাদ রাখতেন। মহর্ষির একখানি চিঠি আমার কাছে আছে, সেটি এখানে তুলে দেওয়া হ'ল—

ওঁ কাতুয়া

৬ মাঘ ৫১

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার,

আমার প্রতি তোমার যেমন অনুরাগ, তোমার প্রতিও আমার তেমনি অনুরাগ। তুমিও আমার guide, philosopher and friend—তুমিই আমার এক নিয়ত বন্ধু। Essay on Theism বিলাতে প্রকাশিত হইলে কোরাণ হইতে ঈশ্বর বিষয়ক বাক্য সকল সংগ্রহ করিয়া তাহা মুসলমান সমাজে প্রচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ। হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান তিন সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা তোমার চিরকালের লক্ষ্য—ইহা তোমার মনোগত স্পৃহা। ইহা সিদ্ধ হইলে মহাত্মা রামমোহন রায়েরও জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্গদেশের অবস্থা যে অতীব শোচনীয় তাহাও চিরকাল থাকিবে না। শূন্য বাটীও একদিন পুষ্পোদ্যান হইবে, অতএব শোক করিও না।

....

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে তোমার যে প্রকার ধৈর্য্য ইহাতে অবশ্য তোমার জয় হইবে। হাফেজ বলিয়াছেন যে ধৈর্য্য ও জয় পরস্পর পুরাতন বন্ধু, ধৈর্য্যের সংসর্গে জয়ের অভ্যুদয় হয়।

আমার সঙ্গে একটি আমার ছান্দোগ্য ব্রহ্মচারী আছেন। তিনি এখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অনুবাদ করিয়া দিতেছেন, তাঁহার নাম প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। তাঁহারই লিখিত এই পারসী অক্ষরের সহিত তোমার নিকট তাঁহার পরিচয় দিতেছি। ইনি আমার অতি যোগ্য শিষ্য।

তুমি যেমন হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছ, মহোদয় ভয়সী (Voysy)-ও সেইরূপ আবার ইহুদী সমাজে তাহা প্রচার করিতে যত্নবান। ব্রাহ্মধর্ম্মেরই এই যুগ। "সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সংপ্রাপ্তে তু কলৌ যুগে।" পুরাণের এই ভবিষ্যদ্বাণী অকাট্য। তুমি রেভরেণ্ড ভয়সীকে এই মেলে লিখিবে যে উনিশ জনের মধ্যে আদিব্রাহ্মসমাজও ৫০ পঞ্চাশ পৌণ্ড Theistic Church নির্ম্মাণের জন্য সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

যখন আমরা স্কুল-কলেজে পড়তাম তখন প্রতি বৎসর পূজার সময় দেওঘরে যেতাম। সেখানে কত আনন্দে আমাদের দিন কাটত। দেওঘরের নির্ম্মল, স্বাস্থ্যপ্রদ বায়ুসেবন ও সেখানকার টাট্‌কা তরিতরকারী ও ভেজালশূন্য দুধ, ঘি ইত্যাদি আহার করে নব বল ও স্বাস্থ্য নিয়ে আবার কলিকাতায় ফিরতাম।

দেওঘরের বাড়ীর সম্মুখে অনেকটা খালি জমি ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ফুলের বাগান এবং দক্ষিণে তরিতরকারী, ফলের বাগান ও মস্ত কুয়া ছিল। আমরা বাগানে বেড়িয়ে, ফুল তুলে, মালা গেঁথে কত আনন্দ পেতাম।

প্রতি বৎসর কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা তিথিতে রাত্রে দেওঘরের বাড়ীতে উপাসনা হ'ত। বহু লোককে নিমন্ত্রণ করা হ'ত। উপাসনার পর বাড়ীর সম্মুখে চারদিকে গোলাপ গাছে বেষ্টিত চত্বরে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন হ'ত—পরে বাগানে গিয়ে গান হ'ত। আমার দিদি কুমুদিনী বসু ও আমি গান করতাম—

—ফুটন্ত ফুলেরি মাঝে দেখরে মায়ের হাসি
কিবা মৃদুমন্দ সুধাগন্ধ ঝরে তাতে রাশি রাশি।
"(আমার) মা হাসেন ফুলের ভিতরে তাই ফুল এত ভালবাসি।"

—গানটি তাঁর অতি প্রিয় ছিল। আর একটি গান প্রতি বৎসর ঐ দিনে গাইতাম—

তোমারি মধুর রূপে ভরেছে ভুবন
মুগ্ধ নয়ন মন পুলকিত মোহিত মন

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ধরণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে দাদামশায় সকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তার ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন। ভক্তের মুখখানি ভগবৎ প্রেমে কি উজ্জ্বল হয়ে উঠত! তিনি বলে উঠতেন—"এমন রাতে ঘুম আসে না—তামাম রাত ভগবানের নাম হোক।"

তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধর্ম্মসঙ্গীত শুনতে ভালবাসতেন আর স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত সঙ্গীত শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। স্বদেশপ্রেমের স্রোত তাঁর শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল। আমরা যখন গাইতাম—

কত কাল পরে বল ভারত রে
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে—

তখন দুঃখে তাঁর হৃদয় ভেঙে পড়ত—আর যখন ঐ চরণটি গাইতাম—

তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে—

তখন বলে উঠতেন—ও গান গাস নে, ও গান গাস নে, সহ্য হয় না—আর সহ্য হয় না।

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি প্রাণ
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র পরাণ।"

এ গানটি তাঁর অতি প্রিয় ছিল। এত উত্তেজিত হয়ে উঠতেন যে, পক্ষাঘাত রোগে পঙ্গু দেহকে সোজা করে বিছানার উপর উঠে বসতেন ও ভগ্নকণ্ঠে যুবকোচিত উৎসাহের সহিত আমাদের সঙ্গে গাইতেন। বৃদ্ধবয়সেও তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হ'ত—মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠত।

তাঁর মাথার কাছে একটি ছোট টেবিলের উপর সব ধর্ম-গ্রন্থ থাকত—গীতা, উপনিষদ, বাইবেল, ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি। হাফেজের কাব্যও এগুলির একসঙ্গে স্থান পেত। এগুলি ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী, প্রাণের প্রাণ। হাফেজের গজলগুলি তিনি আবৃত্তি করতে খুব ভালবাসতেন।

শেষ বয়সে দেওঘরে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েক মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর কাছে গেলে তুলার মত নরম হাতখানি আমার সারা মুখে কত স্নেহের সঙ্গে বুলাতেন—কত আদর করতেন তা স্পষ্ট মনে আছে।

যখন আরও ছোট ছিলাম তাঁর খাটের কাছে বসে তাঁর পান ছেঁচে দিতাম—তিনি তখন বলতেন, 'তোমায় খেয়ে ফেলি ?' মা বলতেন, 'একথা শুনে আমি তাঁর দিকে চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকতাম, তখন তিনি কাছে ডেকে কত আদর করতেন।'

দেখতাম তাঁর মাথার কাছে একটা ছোট কাঠের বাক্স থাকত। আমরা, ছোটরা সে বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি করতে খুব ভালবাসতাম। দেখতাম যে বাক্সে দিয়াশলাই, মোমবাতি, নানা আকারের পেরেক, দড়ি, চিঠির কাগজ, খাম, পোষ্টকার্ড, ডাক টিকিট ইত্যাদি কত টুকিটাকি জিনিষ যা আমাদের চক্ষে অপ্রয়োজনীয় ঠেকত। আমরা বলতাম—আচ্ছা দড়ি রাখেন কেন!

তারপরে দেখি কি, এক দিন এমন হয়েছে বাড়ীতে একটিও দিয়াশলাই নাই—বাজার তো দেড় মাইল দূরে, কাছেও কোন দোকানপাট নেই, বাড়ীতে বিশিষ্ট অতিথি এসেছেন—জলখাবার তৈরি করতে হবে, উনুনে আগুন দিতে হবে। তখন তাঁর বাক্সে হাত পড়ত—মশারির দড়ির দরকার, কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন তাঁর শরণাপন্ন হতে হ'ত।

সংসারে সামান্ত সামান্ত জিনিষের জন্ত কত, মুশকিলে যে পড়তে হয়। লোকে সে সব জিনিষ তুচ্ছ মনে করে, কিন্তু অনেক প্রয়োজনীয় কাজ সেগুলির অভাবে হয় না।

একবার একজন কুষ্ঠরোগী তাঁকে দেখতে আসে। দাদা-মশায়কে কি শ্রদ্ধা-ভক্তি সে করত। দাদামশায় তাকে স্নেহের সঙ্গে আলিঙ্গন করেছিলেন—উপস্থিত সকলে সে দৃশ্য দেখে অবাক।

আমার সেজ মাসিমা বিধবা হবার পর তাঁর পুত্র-কন্যা সহ দাদামশায়ের কাছেই থাকতেন। আমার সেই মাসতুতো দাদা অবিনাশ বরাবরই রুগ্ন ছিলেন। তাঁর ভাত সহ্য হ'ত না—সাগু তরকারি ইত্যাদি দিনের বেলা খেতেন। দেওঘর স্কুলে তিনি পড়তেন। শিক্ষকেরা তাঁকে খুব ভাল-বাসতেন। তিনি বুদ্ধিমান্ ও সচ্চরিত্র ছিলেন—ক্লাসে সর্ব্বদাই প্রথম হতেন। আঠারো বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

আনন্দমুখর, হাস্তে উজ্জ্বল দেওঘরের বাড়ীতে মৃত্যুর ছায়া পড়াতে সকলেই শোকে আচ্ছন্ন, বাড়ীটি কিন্তু নীরব নিস্তব্ধ—শোকের ক্রন্দনোচ্ছ্বাস নেই। দাদামশায় যে পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী, এ অবস্থায় তাঁকে কি করে তাঁর প্রিয় নাতির মৃত্যু-সংবাদ দেওয়া যায়। সে তাঁর কত সেবা করত, সে যে দাদামশায়ের দক্ষিণ হস্ত ছিল। এ শোক যে তাঁর বুকে শেলসম বিঁধবে! আর তা যদি সহ্য করতে না পারেন, সকলে সেজন্ত সে গভীর শোক বুকের মধ্যে চেপে রেখে নীরবে অশ্রুজল ফেলত।

দাদামশায় অবিনাশের অসুখের সংবাদ শুনেছিলেন। তিনি কেবল বলতেন অবিনাশের খাটটা ধরে আমার কাছে নিয়ে এস। তখন আমার বড়মামা বললেন—সে আর নেই।

তখন দাদামশায় বললেন—একথা আমাকে জানাও নাই কেন? এ তো আনন্দের কথা! এখন তার সব ভার স্বয়ং ভগবান নিয়েছেন। আর তার জন্ত কোন ভাবনা নেই।"

এই গভীর শোকের সময় তাঁর অসীম ধৈর্য্য ও ঈশ্বরবিশ্বাস দেখে সকলে স্তম্ভিত। উপনিষদের সেই শ্লোকটি মনে পড়ল—যিনি ঈশ্বরপ্রেমিক তিনি সুখে দুঃখে বিচলিত হন না।

তিনি ১৩০৫ সনে ৩০শে ভাদ্র পরলোকগমন করেন।

তাঁর ছাত্রজীবনের কথা ও তখনকার দেশের হালচাল ও রীতিনীতির কথা কি সুন্দরভাবে তাঁর 'আত্মচরিতে' এবং 'সেকাল ও একালে' লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আমার দিদিকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তাঁর নাম কুমারীরত্ন রেখেছিলেন। দিদিকে তাঁর আত্মচরিত প্রকাশিত করবার সব ভার দিয়েছিলেন।

তাঁর আত্মচরিত পড়ে রবীন্দ্রনাথ দিদিকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন—

ওঁ শিলাইদহ

কল্যাণীয়াসু—

মাতঃ! তোমার প্রেরিত রাজনারায়ণ বাবুর আত্ম-চরিত পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। সেই সরল সহাস্য সরস-হৃদয় সাধুভক্তের জীবনী বঙ্গ-সাহিত্যে বিশেষ সমাদরের সামগ্রী হইয়াছে সন্দেহ নাই। বাল্যকাল হইতে একদিকে তাঁহাকে গুরুর স্থায় ভক্তি করিয়াছি আর একদিকে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ আশা আনন্দের প্রাচুর্য্যে তাঁহাকে আমাদের নিকটবয়সী অনন্তযৌবন সুহৃদের মত জ্ঞান করিয়াছি। অল্প বয়সে যখন সকলের চেয়ে বড় কথাকে গ্রহণ করিবার শক্তি ছিল না তখন সেই চিরপ্রফুল্ল বৃদ্ধের নিত্য উৎসারিত রসপ্রবাহ হইতে আমরা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও স্বদেশের প্রতি প্রেমে অভিষেক লাভ করিয়াছি। আজ তোমাদের পরিবারের মধ্যে যে দুঃখদুর্দ্দিনের গৌরব*

* তখন আমার পিতৃদেব কৃষ্ণকুমার মিত্র নির্বাসনে ছিলেন।

অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার মধ্যে তোমার মাতামহের সেই শুভ্র হাস্য সমুজ্জ্বল পবিত্র আশীর্ব্বাদ বিকীর্ণ দেখিতে পাইতেছি।

ইতি ১৭ই মাঘ ১৩১৫
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দাদামশায়ের মৃত্যুতিথিতে এই গানটি আমরা প্রার্থনার সময় গেয়ে থাকি আর ভাবি এ গানটি যে তাঁরই জীবনের ছবি—

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো
ধরায় আস।
এই অকূল সংসারে, দুঃখ আঘাত তোমার
প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে ;
ঘোর বিপদ মাঝে কোন্ জননীর মুখের
হাসি দেখিয়া হাস ?

যখন দাদামশায় শেষ রোগশয্যায় শায়িত তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায় আমার বড় মামা যোগীন্দ্রনাথ বসুর নিকট এই চিঠি লেখেন—

কলিকাতা
জোড়াসাঁকো
(No more Park Street)
বুধবার
Probably
২০শে জ্যৈষ্ঠ

প্রিয় যোগীন,

রাজনারায়ণবাবু সেই তখনকার আনন্দের হাসিতে ভরা—আর এখানকার তিনি প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া অস্তাচলাভিমুখে—আমাদের নিকট অস্তাচলাভিমুখে কিন্তু দেবগণের নিকট উদয়াচলাভিমুখে—যষ্টি হস্তে করিয়া চলিতেছেন। আমি তোমাদের ওখানে যাই ইহা আমার আন্তরিক প্রাণগত ইচ্ছা কিন্তু আমি যেরূপ নানা চক্রানুচক্রের মধ্যে পড়িয়া আছি তাহা এক প্রকার প্রাণবধকারী মাকড়সার জাল—তাহা কাটাইয়া মুক্ত বায়ুতে উত্থান করা সুকঠিন।

I am the 'dot' in the middle of the vortex, যাহাই হউক না—আমার Love, affection regards, admiration towards রাজনারায়ণবাবু = The same as always and will remain so for ever—দুঃখ কেবল এই যে চাক্ষুষ মিলন কখন ঘটিবে ঠিক বলিতে পারিলাম না। তাঁহাকে আমি গতবারে যেরূপ দেখিয়াছিলাম তাহার তুলনায় একণে তিনি কিরূপ আছেন আমাকে আর একটু খুলিয়া লিখিবে। তাঁহাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার এবং তোমাদিগকে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ—তোমরা নির্ব্বিঘ্নে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ধর্ম্মপথে অটল থাক—এবং কুশলে থাক—সাংসারিক সম্পদ, বিপদ যেন তোমাদিগকে জয় করিতে না পারে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

"নিষ্ঠুর ধরার বুকে"

শ্রীমীরা ভট্টাচার্য্য

নিষ্ঠুর ধরার বুকে সংসারের রিক্ত পাত্র ভরি
যে প্রেম এনেছ তুমি মন্দারের মধুগন্ধ হতে,
তাহারে কঠিন হাতে নিয়ে যাব আহরণ করি
ভাবিতে বেদনা পাই, নিয়ে যাব বেদনার পথে।
আমার ক্ষমতা ক্ষুদ্র তোমার সে প্রেমের সম্মান
দুঃখের ধরার মাঝে পারিবে না রাখিতে অক্ষত ;
অমরাবতীর হেম ধরণীরে কেবা দিল দান,
মানবের প্রাণে তাই বাসা নিল ব্যথিত দুর্গত।

মানুষ যে চিরদিন মরণেরে ভয় করে মরে,
প্রেমের অমৃত-স্বাদ মানুষের হৃদয়-ব্যথায়—
পাবার বাসনা কাঁদে নিশিদিন হারাবার ডরে
দুখের কালিমা-লেখা আঁকা তাই জীবন-খাতায়।
তাই তো মোদের বুকে কাঁদে নিত্য অমর্ত্ত্যের প্রেম
"ভুলিয়া সরণী-রেখা কোথা হতে কোথায় এলেম।"

মৌ-পিঁপড়ের মধুর জালা

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

আমরা সচরাচর আমাদের ঘরে ও বাইরে যে-সব পিঁপড়ে দেখতে পাই মৌ-পিঁপড়ে তাদের থেকে আলাদা। এরা ঠিক আমাদের দেশের পিঁপড়েও নয়, অন্ততঃ এখনও পর্য্যন্ত আমাদের দেশে ওদের খোঁজ পাওয়া যায় নি। প্রথম এদের আবিষ্কার করেন ডঃ ম্যাক কুক সাহেব আমেরিকার কোলোরোডো প্রদেশে। এখন মেক্সিকো এবং অষ্ট্রেলিয়ারও কোন কোন স্থানে ওদের খোঁজ পাওয়া গেছে। ওদের আবিষ্কার করতে ম্যাক কুক সাহেবকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। পাথরের তলায় গভীর সুড়ঙ্গের ভিতরে ছিল ওদের বাসা। মুখের দু'পাশের ছোট দুটি দাঁড়া দিয়ে পাথর কেটে পিঁপড়ের পাল সে-সব সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিল কতদিনে তা জানা নেই। সুড়ঙ্গ-বাসার একটি মাত্র মুখ—ভিতরে অন্ধকার। উপর থেকে ভিতরে কোথায় কি আছে তা জানবার কোন উপায় নেই। সুতরাং ম্যাক কুক সাহেবকে বাসা ভাঙতে হ'ল। কিন্তু সে কাজ তেমন সহজ ছিল না—হাতুড়ী, বাটালি, ছেনি, করাত প্রভৃতি লৌহযন্ত্র দিয়ে দিনের পর দিন একটু একটু করে অতি সাবধানে পাথর কেটে তাকে বাসার ভিতরের রহস্য উদ্ঘাটন করতে হয়েছিল। আজ ওদের সম্বন্ধে যে-সব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তা ম্যাক কুক সাহেবেরই চেষ্টার ফল।

মৌ-পিঁপড়ে মধুভক্ত। সবজাতীয় পিঁপড়েই অল্পাধিক পরিমাণে মধু বা মিষ্ট দ্রব্য খেতে ভালবাসে। কিন্তু মৌ-পিঁপড়েরা একান্তই মধুপিয়াসী—মৌমাছির মত মধু ভিন্ন অন্য কোন খাদ্যে ওদের রুচি নেই। মৌমাছির মত ওদের পিঠে ডানা নেই, ওদের গতিও খুব দ্রুত নয়। সুতরাং মধুর জন্য ফুলের ওপর ওদের নির্ভর করা চলে না—ফুল থেকে মধু সংগ্রহের জন্য মৌমাছির সঙ্গে প্রতিযোগিতা না ক'রে ওরা আবিষ্কার করল এক নূতন উপায়। কি করে ওরা এক দিন জানতে পারল, গল-পোকার গা থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তা মধুরই মত মিষ্টি, তেমনি সুস্বাদু।

দিনের বেলায় ওদের বাসা কোথায় তা খুঁজে বের করা শক্ত। গরম দেশ ও মরুবাসী হলেও অত্যধিক সূর্য্যের তাপ ওরা সহ্য করতে পারে না। তাই দিনের বেলায় বাসা থেকে বের না হয়ে স্নিগ্ধ অন্ধকারবেষ্টিত খোপগুলির ভিতরেই ওরা দিন যাপন করে। কিন্তু ঘুমিয়ে বা কুঁড়েমি করেও নয়। আহারের সন্ধানে ওদের সুড়ঙ্গ থেকে উঠে বাইরে আসতে হয়। ভিতরে ওদের অনেক কাজ। গর্ত্তের ভিতরে সুড়ঙ্গ বা ছোট ছোট কুঠরি একটি দুটি নয়। গর্ত্তের ভিতরটি যেন একটি প্রকাণ্ড দুর্গ। তার ভেতরে সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ, কুঠরির পর কুঠরি, ছোট বড় নানা আকারের পথ নানা দিকে চলে গেছে। সুড়ঙ্গগুলি সোজা নেমে গেছে গভীর

গাছের ডালে একাইড বা পিঁপড়ের "দুগ্ধবতী গাভী"

তলদেশে—দু'ধারের দেয়াল দুর্গপ্রাকারের মত খাড়া, জায়গায় জায়গায় ধারে ধারে ছোট ছোট কুঠরি। তার কোনটিতে নবজাত বাচ্চা, কোনটিতে অপেক্ষাকৃত বড় বাচ্চা, কোনটিতে ডিম। এদেরই একটির মধ্যে থাকে রাণী। রাণীর কুঠরিটি অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থানে ও সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত। বাচ্চাগুলিকে তার দিনে বার বার ক'রে খাওয়াতে হয়। ওদের গা পরিষ্কার করে দিতে হয়। কোথাও একটু বেশী ঠাণ্ডা বা গরম বোধ হলে বাচ্চাগুলিকে অন্যত্র সরাতে হয়, নিয়ে যেতে হয় অন্য কুঠরিতে। কুঠরিগুলির কোথাও একটু ময়লা বা ধুলোবালি জমতে পারে না। বাসায় বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে থাকবার জন্য নূতন নূতন কুঠরি করবারও প্রয়োজন হয়। তখন নূতন কুঠরি তৈরি করতে হয়, নূতন সুড়ঙ্গ খুঁড়তে হয়—বাসার ভিতরে দিনের বেলায় সর্ব্বক্ষণেই এই সব কাজ চলে। সুতরাং দিনের বেলায় বাসা হতে বের না হলেও ঘরে বসে বসে ওদের বিশ্রাম বা কুঁড়েমি করবার সময় কোথায়?

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ওদের মধুসঞ্চয়ের ব্যবস্থা। মৌমাছি মধুসঞ্চয় করে ওদের চাকে, ছোট ছোট খোপের মধ্যে।

জ্যান্ত জালার মুখ থেকে মধুপানরত কয়েকটি ক্ষুধার্ত্ত পিঁপড়ে

সে চাক ও খোপগুলি ওরা মোম দিয়ে তৈরি করে। এই মোম ওদের গায়েরই নিঃসৃত রস। মৌ-পিঁপড়ের মধু সঞ্চয়ের জন্ত মোম দিয়ে খোপ তৈরি করবার শক্তি নেই। কেননা মৌমাছির মত ওদের গায়ে মোম জমে না; অথচ মৌমাছির মত ওদেরও মধু সঞ্চয় করা প্রয়োজন। বাসায় মধু সঞ্চয়ের ব্যবস্থা না থাকলে, দুর্দ্দিনে অভাবের সময় ওরা কি খেয়ে বাঁচবে? বাচ্চাগুলি মধু ভিন্ন অন্ত খাবার মুখে দেবে না, রাণী মধু খেতে না পেলে ডিম পাড়া বন্ধ করে দেবে। আর কর্ম্মীগুলি? ওদেরও তো খাদ্য এক মধুই। অথচ ফুলের ন্তায় গল-পোকা যেখানে সেখানে বা যখন তখন পাওয়াও যায় না। গল-পোকার মধ্যেও একমাত্র ওক্ গাছের গলের গা হতে নিঃসৃত রসই ওদের খাদ্য। সুতরাং ওক্ বনের শিকারভূমিতে গলের প্রাচুর্য্য যখনই ঘটে তখন বাসার সকল কর্ম্মীরা মিলে যতটা পারে বাসায় সঞ্চয়ের জন্ত গল-পোকার গায়ের রস সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। বাসায় এনে বড় বড় জালাতে সঞ্চয় করে।

জালার কথা বলতেই আমাদের কুমোরের চাকে তৈরি পেটমোটা মাটির বড় বড় জালার কথা মনে পড়ে। কিন্তু মৌ-পিঁপড়ের মধুর জালা সেরূপ নয়, তাদের সে জালা নিজের হাতে তৈরিও করতে হয় না। বাসার ভিতরে যে সব কুঠরিতে জালাগুলি রক্ষিত হয়, সেখানে ওগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলে অবাক হতে হয়। সারি সারি জালাগুলি কুঠরির ছাদ থেকে ঝুলছে, মনে হয় ছাদের গায় যেন সারি সারি কতকগুলি বাতির ডুম ঝুলে আছে। ডুমের ভিতরের বাতির ন্তায় জালার ভিতরে মধুর রঙও তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি ঝক্‌ঝকে। কিন্তু এ জালা মাটি, ইট, কাঠ, পাথরে তৈরি নয়, এগুলি সবই এক একটি জীবন্ত পিঁপড়ে। বাসার অন্তান্ত পিঁপড়ের ন্তায় ওদেরও আছে হাত, পা, মুখ, মাথা, পেট। জ্যান্ত কয়েকটি পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে তাদের কুঠরির ছাদ। বাসার অন্তান্ত কুঠরির ছাদ যেমন মসৃণ এ কুঠরির ছাদগুলি তেমন মসৃণ নয়। ছাদের দেওয়াল খসখসে। মসৃণ ছাদে পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে ঝুলে থাকা শক্ত হ'ত।

যে পিঁপড়েগুলি ছাদে ঝুলে আছে ওদেরই উদরে উদ্বৃত্ত মধু সঞ্চিত হয়। তাদের প্রত্যেকটিরই উদর এক একটি মধুর জালা—জ্যান্ত জালা। মধুর ভারে উদরটি বিস্তৃত হয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার বেলুনের আকার ধারণ করেছে। পাকা টুসটুসে আঙুরের রসের ন্তায় উদরের মধুর উজ্জ্বল আভা যেন চামড়া ফেটে বের হয়ে আসছে। গম্বুজাকৃতি ছাদের গা ওরা পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে—গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে। মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিচ্ছে, মাথা নাড়ছে, কাঁধ এদিক ওদিকে নড়ছে, কিন্তু পায়ের অবলম্বন কিছুতেই খসছে না। একবার পা আলগা হয়ে নীচে পড়ে গেলে আর উপরে ওঠবার উপায় নেই। যে স্থানে পড়ে সেই স্থানেই চিৎ হয়ে ব্যাকুল ভাবে হাত, পা, মাথা নাড়তে থাকে। অনেক সময় উপর থেকে পড়ে গিয়ে অন্তদের চলার পথও বন্ধ করে দেয়। সে পথ দিয়ে চলতে গিয়ে পথে বাধা পেয়ে বাসার অন্তান্ত পিঁপড়েরা পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কেউ এসে ওকে উপরে ছাদের গায়ে তোলবার চেষ্টা বা কোন রকম সাহায্যও করে না। এক মাস, দু-মাস এমন কি তিন মাস কালও ওরা সেই একই স্থানে একই ভাবে পড়ে থাকে। অন্তান্ত পিঁপড়েরা পাশ দিয়ে যাবার সময় জিব দিয়ে চুষে চুষে গা পরিষ্কার করে দেয়, গায়ে শুঁড় বুলিয়ে বুলিয়ে আদরও জানায়। হয় ত দীর্ঘকাল দিনরাত্রি ক্রমাগত ঝুলে থাকার পর এই নূতন অবস্থায় ওরা একটু আরামও বোধ করে। আরামই বোধ করুক অথবা জ্বালা-যন্ত্রণাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুতেই সবকিছুর অবসান হয়।

কখন কখন ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে জালাটি যে ফেটেও না যায় তাও নয়। তখন মধু ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এত দিনের সযত্নে রক্ষিত মধুর শেষ পরিণাম এরূপ হবে, বেচারা জ্যান্ত জালাটি হয় তো কখনো ভাবে নি। কিন্তু ওর আর কিছুই করবার নেই। জালা ফাটবার শব্দ হয় তো বাসার অন্তান্ত পিঁপড়ের কানে গিয়ে পৌঁছয়, হয় তো বা গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে একটি দুটি করে সেদিকে আসতে থাকে। নাক তুলে এদিকে ওদিকে শুঁকতে থাকে। অচিরেই বুঝতে পারে বাসার বহু দিনের সঞ্চিত সম্পদ মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সেই সম্পদ চেটে চুষে খাবার জন্ত তখন তাদের সে কি ব্যগ্রতা। একটু একটু করে নিঃশেষে সবটুকুই ওরা পান করে নেয়। কিন্তু এ শুধু পান করবারই আনন্দ—এর একটু স্বাদ, একটু গন্ধেই ওরা সন্তুষ্ট। নিজেদের খাদ্যরূপে এর অতি সামান্তই ওরা

উদরে গ্রহণ করে। খাদ্যসংগ্রহের জন্য ওদের উদরে দুটি করে থলে থাকে। একটি থলেতে ধর্ম্ম-গোলার ন্যায় বাসার সকলের জন্য মধু সংগ্রহ করা হয়। সে মধু ওক্ গাছের গল-পোকার মধুই হোক্, কিম্বা ওদেরই পূর্ব্বে সংগৃহীত জালার পেট থেকে ঝরে-পড়া মধুই হোক। ধর্ম্ম-গোলাটি মধুতে ভরে গেলেই পেটের জালাগুলি যে ঘরে আছে সে ঘরে ওরা সোজা চলে আসে। তার পর একে একে ছাদে উঠে উদরের ধর্ম্ম-গোলায় সংগৃহীত সবটুকু মধুই জীবন্ত জালার উদরে ঢেলে দেয়।

পিঁপড়ের বাসায় ছাদে লম্বিত জ্যান্ত জালার সারি

পূর্ব্বেই বলেছি দিনের বেলায় মৌ-পিঁপড়ে বাসায় নানা কাজে ব্যাপৃত থাকে। সন্ধ্যা হলেই ওরা একে একে বের হয় মধু আহরণের জন্য। মধু সংগ্রহের জন্য ওদের বেশী দূরে যেতে হয় না—বাসার নিকটেই ওদের মধু-ক্ষেত্র ওকের বন। ছোট ছোট ঝোপগুলি কচি পাতায় ভরে গেছে। তারই পাতায় পাতায় ডালে ডালে গল-পোকার বাসা। সন্ধ্যা হতে না হতেই ওরা বাসা থেকে বের হতে থাকে। দেখতে দেখতে বাসার মুখ ও তার চারধার পিঁপড়ের পালে ছেয়ে যায়। একটু পরেই দেখতে পাওয়া যায় সার বেঁধে সকলে চলেছে ওক্ বনের দিকে। এ পথ ওদের অপরিচিত নয়, আগে মধু নিয়ে এ পথে বহু বার ওরা আনাগোনা করেছে। এক বৃহৎ সৈন্য-বাহিনীর মত নির্দ্দিষ্ট গতিতে পথ অতিক্রম করে একে একে সকলে এসে ওকের বনে প্রবেশ করে। মধু আহরণের জন্য তখন তাদের সে কি আনন্দ, সে কি উল্লাস! ওদের সন্ধানী দৃষ্টি ওক্ ঝোপের প্রতি ডালে, প্রতি পাতায় খুঁজে বেড়ায় গল্-পোকার বাসা। উদরের ধর্ম্ম-গোলাটি ক্রমশঃ মধুতে ভরে উঠতে থাকে। রাত ১২টা ১টা অবধি এই ভাবে মধুর সন্ধান চলে। তার পরেই সুরু হয় বাসায় ফিরবার পালা। ফিরবার পথে সৈন্যবাহিনীর নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষিত হতে পারে না। মধুর ভারে অনেকের গতি ধীরমন্থর, সংযত হয়ে আসে। যাদের উদর হালকা, যারা মধুতে পেট ভর্ত্তি করতে সমর্থ হয় তারা আগে আগে ছুটে চলে আসে। বাসার দিকে যতই ছুটে চলে আসুক না, বাসায় ঢোকবার পূর্ব্বে কিন্তু একবার গর্ত্তের মুখের কাছে তাদের সকলকেই দাঁড়াতেই হয়। সেখানে দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে ঢোকবার জন্য দ্বারপালকে প্রত্যেকেরই ছাড়পত্র দেখাতে হবে। দ্বারপাল মুখের দু'ধারের দুটি শুঁড় প্রত্যেকের গায়ে বুলিয়ে পরীক্ষা করে গায়ের গন্ধ নেবে। গায়ের গন্ধ নিয়ে ওরা বুঝতে পারে কে শত্রু, কে মিত্র। প্রতি বাসার পিঁপড়ের গায়ে থাকে একটি বিশেষ গন্ধ। গায়ের সেই গন্ধটিই ওদের ছাড়পত্র।

এর মধ্যে ভিতরে সাড়া পড়ে যায় মধু-আহরণকারীরা সব ফিরে এসেছে। পিঁপড়ের দল ঠেলাঠেলি করে ভিড় করে এসে দাঁড়ায় গর্ত্তের মুখের কাছটিতে। সকলেই তাদের ভারমুক্ত করতে ব্যস্ত। মুখের কাছে মুখ এনে হাঁ করে দাঁড়াতেই আহরণকারীরা এক এক ফোঁটা মধু তাদের মুখের ভিতরে ঢেলে দেয়। সেই মধু সবই সঞ্চিত হয় জ্যান্ত জালার মধ্যে দুঃসময়ের জন্য। যারা নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত তারা সঙ্গে সঙ্গে দু-এক ফোঁটা পানও করে।

ওদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় কতকগুলোর ক্ষুধা যেন আর কিছুতেই মিটছে না। ফোঁটার পর ফোঁটা মধু গলাধঃকরণ করেই যাচ্ছে। উদরটি মধুর ভারে বেশ ফুলে উঠেছে, তবু যেন ওদের তৃপ্তি নেই। মধুর আশায় কেবলই ওরা হাঁ করেই আছে—আহরণকারীরাও ফোঁটার পর ফোঁটা ওদের মুখে ঢেলেই দিচ্ছে। ওরা জানে এ মধু ভবিষ্যতে ওদেরই কাজে লাগবে, ভবিষ্যতে এরাই হবে মধুর এক একটি জ্যান্ত জালা—কারও আদেশে নয়, কারও পীড়নেও নয়, নিজেদেরই ইচ্ছায়। মধুর জালা হয়ে ছাদে আশ্রয় নেবার পূর্ব্বে নিজেদের উদরগুলিকে ওরা একবার উত্তমরূপে ভরতি করে নেয়, তারপর যেমন মধু ক্ষয় হয় তেমনি সেই ক্ষয় পূরণ হতে থাকে বাসার কর্ম্মী-পিঁপড়েদের দ্বারা।

পরবর্ত্তী সারা জীবনই ছাদে লম্বমান হয়ে ওরা বৎসরের পর বৎসর একই অন্ধকার কুঠরিতে একই অবস্থায় ঝুলে থাকে। মধুর ভারে উদরের বিস্তৃতি প্রায় আট দশ গুণ বেড়ে যায়। এই বৃহৎ ভারটি নিয়ে ছাদ থেকে ঝুলে থাকবার একমাত্র

অবলম্বন পায়ের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কয়েকটি থাবা বা নখ। কখন কখন কারোর উদরটি শূন্য হলে সে নীচে নামবার সুযোগ পায়। কিন্তু এরূপ সৌভাগ্য খুব অল্পই ঘটে।

বৎসরের পর বৎসর কেটে যায়, ঋতুর পর ঋতু আসে, বাসায় কর্মীদের মুখে মধুর প্রাচুর্য্য থেকে ওরা বুঝতে পারে বাইরে এবার ওকের ডালে পাতায় নূতন নূতন গল-পোকার বাসা হয়েছে, এবার উদরে মধু সঞ্চয় হবে। আবার শীত আসে; গলের বাসা শুকিয়ে যায় মধুর প্রাচুর্য্যও কমে আসে। এবার উদরের মধু ক্ষয় হবে, এবার ওদের মধু বিতরণের পালা। প্রতি বাসায় আট-দশটি করে কুঠরি থাকে মধুর জ্যান্ত জালাগুলির অবস্থানের জন্য আর প্রতি কুঠরিতে থাকে ৩০টি বা ততোধিক জালা।

আকস্মিক ঘটনায় না হলেও জরা-ব্যাধির আক্রমণে এদেরও একদিন মৃত্যু ঘটে। প্রাণ হারিয়েও ওরা ছাদেই ঝুলে থাকে। পিঁপড়েরা যখন মধু নিতে এসে দেখতে পায় জালাটি প্রাণহীন, তখন তাকে ছাদ থেকে নামানো হয়। প্রথমে উদরের অংশটি কেটে নীচে নামানো হয়—বৃহৎ ভার, কাঁধ দিতে হয় অনেককে। একবার নীচে নামানো হলে গড়িয়ে গড়িয়ে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতি বাসাতেই একটি করে সমাধিক্ষেত্র থাকে। জালাটি তেমনি মধুতে ভরা, মধুর স্বাদ এবং গন্ধও পূর্ব্ববৎ। কত শিশু, কত কর্ম্মী, কত রাণীর খাদ্য তার মধ্যে বোঝাই হয়ে আছে। কিন্তু কেউ তাতে হাত দেবে না—মধুর লোভে মৃতদেহকে খণ্ডিত করে কখনও তাকে ওরা অপবিত্র করে না। এ যেন সমাধিক্ষেত্রে উৎসর্গীকৃত দেবভোগ। এর উপর এখন ওদের আর কোন দাবি নেই। সমাধিক্ষেত্রে পাশাপাশি এরূপ অনেক জালা দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলি যেমন উজ্জ্বল তেমনি সোনালী মধুতে ভরা।

গল-পোকার গায়ের রসের ন্যায় এফাইড বা জাব-পোকার গায়ের রসও পিঁপড়ের একটি অতি প্রিয় খাদ্য। এফাইডকে পিঁপড়েদের দুগ্ধবতী গাভীও বলা হয়। গাইয়ের বাঁটের দুধের ন্যায় পিঁপড়েরা এফাইডের পিঠ থেকে রস দোহন ক'রে পান করে। দোহন করবার যন্ত্র ওদের মুখের শুঁড় দুটি। সেই শুঁড় দিয়ে এফাইডের পিঠে সুড়সুড়ি দিলেই রস নির্গত হয়। মৌ-পিঁপড়ে সেই রসধারা বা দুগ্ধ পেট ভরে পান ক'রে বাসায় নিয়ে এসে ওদের জ্যান্ত জালায় জমায়। বনে বুনো গোলাপ ফুটলে তার মধ্যে এক জাতীয় জাব-পোকার আবির্ভাব হয়। তখন মৌ পিঁপড়ের দল ওক বনের দিকে না গিয়ে এফাইডের রস দোহন ক'রে মধু সংগ্রহ করতে গোলাপের বনে আসে। এফাইডের গায়ে এরা রস পায় প্রচুর—এক একটি এফাইডের গা থেকে ওরা দিনে প্রায় ত্রিশ ফোঁটা ক'রে রস দোহন করতে পারে। এই এফাইড বা এদের দুগ্ধবতী গাভীগুলিকে এরা সযত্নে পালন করে।

কেন্দ্রীয় রাজস্বনীতি ও পশ্চিম বঙ্গের দাবি

শ্রীমনকুমার সেন

কেন্দ্রের সহিত প্রদেশসমূহের আর্থিক সম্বন্ধ নিরূপণ করা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান সমস্যা। ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রে এই সম্বন্ধের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা না থাকায় কেন্দ্রের সহিত প্রদেশগুলির আর্থিক সম্পর্ক লইয়া বহু বার বহু ভাবে তিক্ততা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় রাজস্ব-নীতির এই ত্রুটি ও গলদ প্রকারান্তরে প্রদেশগুলিকে আদায়ীকৃত রাজস্বের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কৃপাদৃষ্টি ও সুবিবেচনার উপর প্রদেশগুলির অর্থনৈতিক বিন্যাসকে নির্ভরশীল করিয়া রাখিয়াছে। বলা বাহুল্য, এইরূপ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত বণ্টন-ব্যবস্থা জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল। শুধু প্রদেশগুলিরই নহে, পরোক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিও এই ত্রুটিপূর্ণ নীতির ফলে হ্রাস পাইতেছে। ব্রিটিশ সরকারের তাঁবেদাররূপে পরাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট শাসন ও শোষণের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই প্রদেশগুলিকে যথাসম্ভব কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার ফলে যে প্রদেশে কেন্দ্রের যতটুকু কৃপাবর্ষণ হইয়াছে সেই প্রদেশ ততটুকু আর্থিক সঙ্গতিলাভ করিয়াছে, পর্য্যাপ্ত পাওনার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহা না পাওয়ায় কোন প্রদেশই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ উন্নয়নমূলক আর্থিক পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় নাই। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে এই ত্রুটির সংশোধন ও রাজস্ব সম্পর্কে প্রদেশগুলির পাওনার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ পরিষদে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এই বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁহার আনীত একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদ গ্রহণ করেন। প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই: "ভারতের খসড়া শাসনতন্ত্র এমনভাবে সংশোধিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে

প্রদেশগুলিকে রাজস্বের ব্যাপারে ভারতীয় পার্লামেন্টের ভোটাভুটির অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করিয়া না থাকিতে হয়, এবং প্রতি বৎসর কেন্দ্রের সম্মতি ও অনুমোদন সাপেক্ষ না রাখিয়া প্রদেশগুলির প্রাপ্য আয়কর সম্পর্কেও শাসনতন্ত্রে সুনির্দ্দিষ্ট বিধান থাকে।" প্রস্তাবটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ ইহার সহিত জড়িত।

১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রে ভারতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শ নির্দ্ধারিত হওয়ার পর প্রদেশসমূহের পক্ষ হইতে রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্ব্বণ্টনের জন্য দাবী জানানো হয়। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীসভা গঠিত হইলে এই দাবি প্রবলতর হয়। ভূমিরাজস্ব ব্যতীত প্রদেশগুলির উল্লেখযোগ্য কোন আয়ের উৎস না থাকায় মন্ত্রীসভা চালু হইবার পর প্রায় সকল প্রদেশেই বিক্রয়কর, শিক্ষাকর, কৃষি-আয়কর প্রভৃতি নূতন নূতন কর প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে; পক্ষান্তরে আয়কর, আমদানী-রপ্তানী শুল্ক, যানবাহন, ডাকবিভাগ প্রভৃতি সম্প্রসারণশীল আয়ের উৎসগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারভুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াও কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি যাবতীয় জাতিগঠনমূলক কর্ম্মের দায়িত্ব প্রদেশগুলির স্কন্ধে চাপানো হয়। এই দায়িত্ব পালনের জন্য কেন্দ্র হইতে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয় বটে, কিন্তু ঘাটতি প্রদেশরূপে পরিগণিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের প্রত্যাশী হইয়া থাকিতে কোন কোন প্রদেশ অসম্মত হয়। অধিকন্তু বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশ এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করে যে, আয়কর প্রধানতঃ এই দুইটি প্রদেশ হইতে আদায় করা হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন। অন্যান্য প্রদেশগুলিও এক বা একাধিক যুক্তি দেখাইয়া তাহাদের আপত্তি জ্ঞাপন করে। এই সমস্ত দাবির তীব্রতায় বাধ্য হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত করেন এবং স্যার অটো নিমেয়ারের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের সুপারিশগুলি উত্তরকালে 'নিমেয়ার সিদ্ধান্ত'রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কমিশন 'তুলা ও পাট রপ্তানী-কর' এবং 'আয়কর' সম্পর্কে পরিবর্ত্তনের সুপারিশ করেন। এইরূপ প্রস্তাব করা হয় যে, উক্ত দুইটি পণ্যের রপ্তানীকারী বন্দর-যে যে প্রদেশে অবস্থিত সেই সেই প্রদেশ উহাদের রপ্তানী-শুল্ক-লব্ধ রাজস্বের একটি অংশ পাইবে। এই ব্যবস্থার ফলে বাংলা ও বোম্বাই কিঞ্চিৎ সুবিধার অধিকারী হয়। আয়কর সম্বন্ধে কমিশন সিদ্ধান্ত করেন যে, আয়কর যে প্রদেশ হইতে আদায়ীকৃত হইবে, আদায়ের পরিমাণ ও লোকসংখ্যার আনুপাতিক বিচার করিয়া সেই প্রদেশকে আয়কর-লব্ধ রাজস্বের একটি অংশ প্রদান করা হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আয়করের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রের জন্য সংরক্ষিত রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ প্রদেশগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত হারে বণ্টন করা হয়:—

প্রদেশ	শতকরা হার
বোম্বাই	২০
বাংলা	২০
মাদ্রাজ	১৫
যুক্তপ্রদেশ	১৫
বিহার	১০
পঞ্জাব	৮
মধ্যপ্রদেশ	৫
আসাম	২
সিন্ধু	২
উড়িষ্যা	২
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১

উল্লিখিত হিসাব দৃষ্টে বুঝা যাইবে, দাবি নির্দ্ধারণের নীতির বিচারে প্রদেশগুলির জন্য যে হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা যুক্তিসহ হয় নাই। তাহা ছাড়া যে সকল ঘাটতি প্রদেশ পূর্ব্ব হইতেই কেন্দ্রীয় আবশ্যক সাহায্যের অধিকারী বলিয়া স্থির হইয়াছে, পুনরায় তাহাদের রাজস্ব পুনর্ব্বণ্টনের অন্তর্ভুক্ত করাও সঙ্গত হয় নাই। শুধু ইহাই নহে, তদানীন্তন বাংলার জনসংখ্যা বোম্বাইয়ের প্রায় তিন গুণ থাকা সত্ত্বেও রাজস্বের ব্যাপারে উভয় প্রদেশকে সমশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। রাজস্ব-নীতির গলদ প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল। স্বাধীন ভারতের গণসভা শাসনতন্ত্র রচনাকারী কমিটি এই বিষয়ে অনবহিত ছিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহারা দেশের বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থার অজুহাতে পূর্ব্বব্যবস্থাই আরও পাঁচ বৎসরকাল বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কমিটির এই সিদ্ধান্তের ফল এই দাঁড়াইবে যে, কেন্দ্রের রাজস্ব আদায়ের প্রশস্ত পন্থা বিদ্যমান থাকিলেও প্রদেশগুলিকে পর্য্যাপ্ত রাজস্বের অভাবে প্রতিপদে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া আর্থিক সাহায্যের জন্য কেন্দ্রের দ্বারস্থ হইতে হইবে। নিজেদের প্রাপ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত ও নিঃসংশয় হইতে না পারিলে প্রদেশগুলির পক্ষে কোন বৃহৎ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ঝুঁকি লওয়া সম্ভব নহে, সঙ্গতও নহে। আমরা বিশেষরূপে পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলিতেছি। ভারত-বিভাগ ও তাহার অনিবার্য্য পরিণতিস্বরূপ বঙ্গ-বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ একটি অতি ক্ষুদ্রায়তন প্রদেশে পরিণত হইয়াছে—খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সর্ব্বোপরি আশ্রয়-প্রার্থী সমস্যায় এই প্রদেশ যৎপরোনাস্তি বিব্রত। বহু টালবাহানার পর কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বসতির দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন সত্য, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্পর্কে তাহাদের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের উপরই বর্ত্তাইয়াছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টকে যদি

কেবলই কেন্দ্রের কৃপাপ্রার্থী হইয়া থাকিতে হয় এবং কেন্দ্রের আদায়ীকৃত রাজস্বে তাঁহাদের পাওনা সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা না থাকে তাহা হইলে প্রকারান্তরে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। শুধু ইহাই নহে, কেন্দ্রে যে প্রদেশের যতটুকু প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা আছে তদনুযায়ীই সেই প্রদেশের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হইবে না এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। ইতিমধ্যেই নানা কারণে প্রদেশগুলির পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতার অভাব ঘটিয়াছে, তদুপরি কেন্দ্রের রাজস্ববণ্টনে উক্তরূপ অবাঞ্ছনীয় বৈষম্য আরও তিক্ততার সৃষ্টি করিবে সন্দেহ নাই। অথচ শাসনতন্ত্রে রাজস্ববণ্টন সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট বিধান থাকিলে, তদনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশ পৃথক পৃথক ভাবে আদায়ীকৃত রাজস্বের অংশ লাভ করিবে, কাহারও কোন অভিযোগের কারণ থাকিবে না।

এই সকল সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য ভারতীয় গণ-পরিষদের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ একটি অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ সমিতি নিয়োগ করিয়াছিলেন। অভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত এই সমিতি রাজস্ববণ্টন বিষয়ে শাসনতন্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকাই সঙ্গত এরূপ সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত হইয়াছি। বিস্ময়ের বিষয়, সমিতির সুপারিশসমূহ মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করিয়াও কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্বের নির্দ্দিষ্ট হার এমনভাবে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন যদ্দ্বারা পশ্চিমবঙ্গকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন করা হইয়াছে। নূতন ব্যবস্থা এইরূপ :—

প্রদেশ	শতকরা হার
বোম্বাই	২১
পশ্চিমবঙ্গ	১২
মাদ্রাজ	১৮
যুক্তপ্রদেশ	১৯
বিহার	১৩
মধ্যপ্রদেশ	৬
পূর্ব্ব-পঞ্জাব	৫
আসাম	৩
উড়িষ্যা	৩

অর্থাৎ বাংলার প্রাপ্যকে প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ হ্রাস করিয়া তদ্দ্বারা অন্যান্য কতিপয় প্রদেশের উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ আয়তনে অবিভক্ত বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশে পরিণত হইয়াছে, সম্ভবতঃ এই একমাত্র স্থূলদৃষ্টিকোণ হইতেই পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করা হয়। অথচ বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কয়েক গুণ অধিক এবং বাংলা হইতে যে রাজস্ব আদায় করা হইত, সেই বাৎসরিক আয়করের প্রায় সমস্তটাই বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ হইতে আদায় করা হইতেছে। কাঁচা পাটের প্রধান অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গ-বহির্ভূত এলাকায় পড়িলেও চটকলগুলি সম্পূর্ণরূপে এই প্রদেশে অবস্থিত। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পাট-জমির অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের এলাকার অধীন। যে ৫৪ লক্ষ টাকা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আদায় হইত তাহা পশ্চিমবঙ্গের ৬ কোটি টাকার তুলনায় এতই নগণ্য যে তজ্জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য রাজস্ব শতকরা ২০ ভাগ হইতে ১২ ভাগে হ্রাস করিবার পশ্চাতে কোন যুক্তি নাই। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা বর্ত্তমানে বোম্বাই অপেক্ষা অনেক বেশী। অধিকন্তু ভারতীয় ইউনিয়নের সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় এই প্রদেশের কতকগুলি নিজস্ব সমস্যাও রহিয়াছে যাহার সমাধানের উপর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ নির্ভর করে। এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য হ্রাস করা অসঙ্গত ও অসমীচীন এবং বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রতিকূল। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য রাজস্বের হার পূর্ব্বাপেক্ষাও বর্দ্ধিত করিয়া, পরিষদের গৃহীত প্রস্তাবে প্রতিফলিত পশ্চিমবঙ্গবাসীর ন্যায্য দাবি সামগ্রিকভাবে স্বীকার করিয়া লইবেন ইহাই আমরা আশা করি।

অচেনা

শ্রীশান্তশীল দাশ

হে অচেনা, তোমায় আমি চিন্‌বো কেমন করে,
আস্‌বে কিগো, অরুণ বরণ উজল রথের 'পরে,
আস্‌বে কিগো, নদীর বুকে সোনার তরী বেয়ে,
আস্‌বে কিগো রূপের আভায় সারা আকাশ ছেয়ে,
আস্‌বে কিগো নৃত্য-পাগল কাল-বোশেখীর সনে,
আস্‌বে কিগো শাওন-মেঘে অঝোর বরিষণে,
আস্‌বে কিগো শিউলি-ঝরা শিশির-ভেজা প্রাতে,
আস্‌বে কিগো দখিন বায়ে ফুলবালাদের সাথে,
আস্‌বে কিগো ভোরের আলোয় পাখীর গানে গানে,
আস্‌বে কিগো সাঁঝের বেলা নদীর কলতানে,
আস্‌বে কিগো ঘুমের মাঝে নীরব নিঝুম রাতে,
নাম-না-জানা স্বপনপুরীর রাজকন্যার সাথে।
হে অচেনা, তোমায় আমি চিন্‌বো কেমন করে,
জানি না হায়, আস্‌বে কখন, কোন মুরতি ধরে।

সংস্কার

শ্রীহেমেন্দ্র মল্লিক

রাত্রি ছুইটা বাজিয়া গিয়াছে।

মিলিটারী ক্যান্টিনের পাশের ঘরে চুপচাপ বসিয়া আছি রাত্রি সাড়ে দশটা হইতে। বাহিরে চতুর্দ্দিক প্রগাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিলেও চট্টগ্রামের এই পার্ব্বত্য সেনানিবাসটির প্রতি অংশেই সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মব্যস্ততার চাপা আভাস ক্ষণে-ক্ষণেই পরিস্ফুট হইতেছিল।

বিশ্রামাগারের বড় টেবিলখানার একদিকে আমি বসিয়া আছি। সম্মুখে সিগারেটের টিন এবং খালি কফির পেয়ালা। মাথার উপরে কালো কাপড়ে ঢাকা বিদ্যুতের আলো। টেবিলের আশেপাশে ছুই-এক হাত পরিমিত স্থানটুকু জুড়িয়া মাত্র সে আলোকের রাজত্ব। বিমান আক্রমণ ও আত্মরক্ষার সামরিক বিধান অনুযায়ী কক্ষের বাহিরে আলো প্রতিফলিত হওয়া তো দূরের কথা, বাহির হইতে জানালা বা দ্বারপথে সে আলো দৃষ্টিগোচর হওয়াও গুরুতর অপরাধ।

আধ-আলো ও আধ-অন্ধকার এই ঘরখানিতে একই ভাবে বসিয়া আছি প্রায় তিন-চার ঘণ্টা। আরও কতক্ষণ এই ভাবে থাকিতে হইবে জানি না তবে আরব্ধ কার্য্য অর্দ্ধপথে ত্যাগ করা এবং মানসিক দৃঢ়তাকে বিসর্জ্জন দিয়া পরাজয় স্বীকার করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

যেকব ছত্রির অমানুষিক গাম্ভীর্য্যের প্রাচীর আমি ভাঙিবই। যেকব ছত্রি জাতিতে নেপালী—ধর্ম্মবিশ্বাসে খ্রীষ্টান। তাহার বয়স আন্দাজ ত্রিশ-বত্রিশ। বলিষ্ঠ ও অসমসাহসী যেকব ছত্রি আমাদের সেনানিবাসের একটি রত্ন। বিমান-মারা কামানের গোলা ছুড়িতেই যে তাহার একমাত্র দক্ষতা তাহা নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী অরণ্য-সংঘর্ষ, সঙ্গীনের সংঘাত ইত্যাদিতে কৃতিত্বপ্রদর্শন এবং বোমার আগুন নিভানোতেও তাহার মত ক্ষিপ্রগতি সাহসী সৈনিক আমাদের ছাউনীতে বিরল। অতএব, যেকব ছত্রি সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র। তাহার বর্ত্তমান দুর্ঘটনা ও বিপর্য্যয়ে সকলেই ব্যথিত, শোকগ্রস্ত ও উৎকণ্ঠিত।

যেকব ছত্রির জন্যই আমাকে এইভাবে বসিয়া বসিয়া রাত্রি যাপন করিতে হইতেছে। তাহাকে এই সময়ে বিশেষরূপে চোখে চোখে রাখিতে না পারিলে তাহার সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। উচ্ছ্বাসপ্রবণ পার্ব্বত্য আদিম জাতির মানুষ সে। শিক্ষা, সভ্যতা ও মিশনরী প্রভাবের দ্বারা যথেষ্ট ভদ্র, মার্জ্জিত ও নিয়ন্ত্রিতস্বভাব হইলেও এতবড় শোকের আঘাতকে সম্পূর্ণরূপে সামলাইয়া উঠা তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। অতিকষ্টে ঝাঁকড়াইয়া থাকা তাহার এই অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের বাঁধ যে-কোন মুহূর্ত্তেই ভাঙিয়া ধ্বসিয়া যাইতে পারে এবং সেই উন্মাদ অসংযমের সন্ধিক্ষণে তাহার দ্বারা সবকিছুই সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। আত্মহত্যা করা অথবা নিজের বন্দুক লইয়া অফিসার ও সাধারণ কর্ম্মচারী নির্ব্বিশেষে যাহাকে-তাহাকে হত্যা করা—কিছুই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

হাতঘড়িতে সময় দেখিলাম—ছুইটা বারো। আর একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিতেছি এমন সময়ে কক্ষের মধ্যবর্ত্তী দ্বারপথে একটা অস্পষ্ট পদধ্বনি শোনা গেল। একটু পরেই নার্স ইথেল সন্তর্পণে কক্ষমধ্যে আসিয়া কহিল, আর কফি লাগবে, রেভারেণ্ড?

কহিলাম না, ঘণ্টাখানেক পরে হলেই চলবে।

নার্স ইথেল সাবধানে যেকবের দিকে ইঙ্গিত করিয়া নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিল, কথা বলেছে একটাও?

না, তবে সাড়া দিয়ে মাথা নেড়েছে কয়েকবার।

একটা সিগারেট দিয়ে দেখুন না?

সে সমস্তই হয়ে গেছে নার্স। চিন্তা ক'রো না, সমস্ত রাতই আমি জেগে বসে থাকবো ওর জন্য।

২

ছুই সপ্তাহের ছুটিতে কলিকাতায় গিয়াছিলাম। যে-দিন ফিরিয়া আসিলাম সেই দিনই ঘটিল যেকব ছত্রির এই দুর্ঘটনা। বেচারা ক্ষুদ্র একটি অগ্রবর্ত্তী বাহিনী লইয়া চল্লিশ মাইল দূরে এক পাহাড়ের জঙ্গলে গিয়াছিল শত্রুপক্ষের গুপ্ত ঘাঁটি আক্রমণ ও ধ্বংস করিতে। একটার জায়গায় ছুই-তিনটি ছোট ও বড় ঘাঁটি বিধ্বস্ত করিয়া এবং কয়েকটি বন্দী লইয়া নিজের ছাউনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সে সংবাদ পায় যে, ষাট মাইল উত্তরে পাহাড়ের ধারে অবস্থিত নেপালী গ্রামখানি শত্রুর বিমান আক্রমণে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। যেকব ছত্রি বিশ্রাম করিবার জন্য কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়াই ছুটিল সেই গ্রামের উদ্দেশে। বেচারা তখনও আশা করিতেছিল যে, নব-পরিণীতা তরুণী বধূ, বৃদ্ধা মাতা ও নাবালক ভ্রাতা—তার জীবনের এই তিনটি শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, পরম আত্মীয়কে সে হয়তো তখনও ছুটিয়া গিয়া প্রাণে বাঁচাইতে সক্ষম হইবে। কিন্তু প্রাণে বাঁচানো দূরে থাক, তাহাদের ঘরখানির চিহ্নমাত্রও সে সারাদিন খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে, পাহাড় ও প্রান্তরে—খুঁজিতে কোথাও সে বাকী রাখে নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ হতাশ হইয়াই তাহাকে ফিরিতে হইল।

চট্টগ্রাম বন্দরে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই এ সংবাদ

পাইয়াছিলাম। ছাউনীতে আসিয়া আরও শুনিলাম যে, ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য অনেকেই নানাভাবে প্রবোধ দিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে যেকব ছত্রির এই অসাধারণ ও অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যকে ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে স্বাভাবিক ও সহজ অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে, কিন্তু নিদারুণ শোকাহত যেকব ছত্রি অফিসারের সিগারেট, ক্যাপ্টেনের হুইস্কী অথবা তরুণী নার্সদের সহাস্য নিমন্ত্রণ—কিছুতেই যেন আকৃষ্ট হইবার মত কিছু খুঁজিয়া পায় নাই।

ছাউনীর সর্ব্বত্র সংবাদটা ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা শোকের ছায়া নামিয়া আসিল। সাহস ও শক্তি এই দুটির জন্য সেনানিবাসে যেকব ছত্রির বন্ধু ও গুণমুগ্ধের অভাব ছিল না। বিমান আক্রমণের চরম সঙ্কট-মুহূর্ত্তে—যখন উচ্চ ও নিম্নপদস্থ সমস্ত অফিসার ও কর্ম্মচারীই অল্প-বিস্তর ভীত ও উত্তেজিত হইয়া অপেক্ষা করিতেন, সে সময়ে বিমান-মারা কামানের পিছনে দাঁড়াইয়া সমস্ত ছাউনীকে একাধিক বার রক্ষা করিয়াছে যেকব ছত্রি একাই! একই রাত্রে দুই বার আক্রমণের সময়ে শত্রুপক্ষের দুইখানি বিমান ভূ-পাতিত করার পর হইতেই যেকব ছত্রিকে আপনার করিয়া লইয়াছে ছাউনীর সকলেই, হাসপাতালের সাত-আট জন নার্সও তাহার একান্ত অনুগত হইয়া উঠিয়াছিল। কে জানে, তাহাদের বিচারে যেকব ছত্রিই সম্ভবত একমাত্র বীর-পুরুষ।...

সকল চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হইয়াছে তখনই আমি আসিয়া পড়িলাম। বয়সে প্রবীণ না হইলেও ছাউনীর খ্রীষ্টান কর্ম্মচারী ও অফিসারদের সমস্ত ধর্ম্মকৃত্যে পৌরোহিত্য করার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। অতএব খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী যেকব ছত্রিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার ভারও পড়িল আমারই উপরে। কেননা সকলের মতে যেকবের অসুস্থতাটা মানসিক এবং সে চিকিৎসায় আমিই নাকি একমাত্র ভরসা!

প্রথমে আমার নিজের জীপে করিয়া তাহাকে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইলাম। ভাবিলাম মুক্ত বায়ুতে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কিছুক্ষণ থাকিলে বেচারার মানসিক উদ্বেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইবে। তারপরে একে একে মিলিটারী ক্যান্টিন, ষ্টেশনারী ষ্টোরস্, ডান্সিং হল এবং জিমনাষ্টিক গ্রাউণ্ড—সর্ব্বত্রই তাহাকে লইয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিলাম। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর কশাঘাতে মূহ্যমান যেকবকে তাহার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও নিস্তব্ধতার আবরণ হইতে যে-কোন উপায়ে একবার মুক্ত করিতে পারিলেই যে জটিল সমস্যার অনেকটা সরল হইয়া যাইবে—ইহা নিশ্চিত বুঝিয়াই নিজের বিশ্রাম ও স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে লইয়া সারাটা সন্ধ্যা এখানে-ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেলেও যেকব ছত্রির মুখমণ্ডলে কোন প্রকার সজীব ভাবের লক্ষণ দেখা গেল না। সম্মোহিত ব্যক্তির মত নিশ্চল হইয়াই সে আমার পাশে বসিয়া রহিল। তাহাকে সিগারেট দিয়াছি মাথা নাড়িয়া সে জানাইয়াছে—খাব না! সিগারেট না খাইলেও মাথা নাড়ার সাড়া পাইয়া উৎসাহিত ভাবে পরবর্ত্তী ধাপ হিসাবে নিজে পাত্রী হইয়াও তাহাকে সহাস্যে হুইস্কী অফার করিলাম। তৃতীয় বার বলার পরে যেন পাষাণ-মূর্ত্তিতে প্রাণের সাড়া জাগিল। ছোট ছোট দুইটি চক্ষু সে আমার পানে নিবদ্ধ করিয়া আর একভাবে পুনরায় মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, এখন ইহাতে তাহার প্রবৃত্তি নাই। পুনরায় জীপে চড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আর বেড়াতে চাও, যেকব?

পুনরায় মাথা নাড়িয়া সে জানাইল—না।

৩

তাহার পর হইতেই আমরা ক্যান্টিনের পাশের এই ঘরে বসিয়া আছি। নরম গদীওয়ালা সোফায় তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিয়া নিজে একখানা বেতের চেয়ারে বসিলাম এবং দুই পেয়ালা কফির আদেশ দিলাম।

বলা বাহুল্য, এবারেও কোন প্রকার সাড়া প্রথমে সে দেয় নাই। তবে বিগত কয়েক ঘণ্টার সাহচর্য্য ও ঘনিষ্ঠতায় আমার প্রতি বেচারার কিঞ্চিৎ সখ্যভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াই হয়তো আর এক বার অনুরোধ করিতেই সে সুবোধ বালকের ন্যায় পেয়ালা তুলিয়া কয়েক চুমুক পান করিল।

কিন্তু তাহার পর হইতেই আবার যেন সে সুদীর্ঘ ধ্যানে মগ্ন হইয়াছে, মনে হইল গত দুই-তিন ঘণ্টার সমস্ত প্রয়াস ও উদ্যম আমার যেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল। যেকব ছত্রির বক্ষরুদ্ধ জমাট অশ্রুশিলাকে বুঝি কিছুতেই গলাইতে পারিলাম না।

আর এক বার হাতঘড়িতে সময় দেখিলাম—প্রায় তিনটা। দুই দিনের পথশ্রম ও ক্লান্তিতে সমস্ত শরীরটা ভাঙিয়া পড়িতে চাহিলেও সর্ব্বান্তঃকরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম, যেকব ছত্রির নিস্তব্ধতার পাষাণ-প্রাচীরকে ভঙ্গ করিবই, নচেৎ বিশ্রাম দূরের কথা, পুরোহিতের ব্রতই আমি পরিত্যাগ করিব।

শেষ উপায় হিসাবে একবার সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরকে স্মরণ করিলাম। কহিলাম, হে মঙ্গলময় সর্ব্বস্রষ্টা, আমার চেষ্টা ও আমার আন্তরিকতার মধ্যে নিশ্চয়ই ত্রুটি আছে। আমার অজানা হলেও তোমার কাছে তা অজানা নয়। যেকব ছত্রিকে সুস্থ করা যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তা হলে তাকে তুমি সুস্থ করে, স্বাভাবিক করে তোল। আমার উদ্যমকে সফল করতে তোমার অনন্ত শক্তির সাহায্য প্রেরণ কর।

ইহার পরে কেন জানি না সংশয় ও সন্দেহ-ভারাক্রান্ত অন্তর যেন কেমন হালকা ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মনে হইতে

৭০৩০ টন যুদ্ধ-জাহাজ 'দিল্লী'তে
ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন

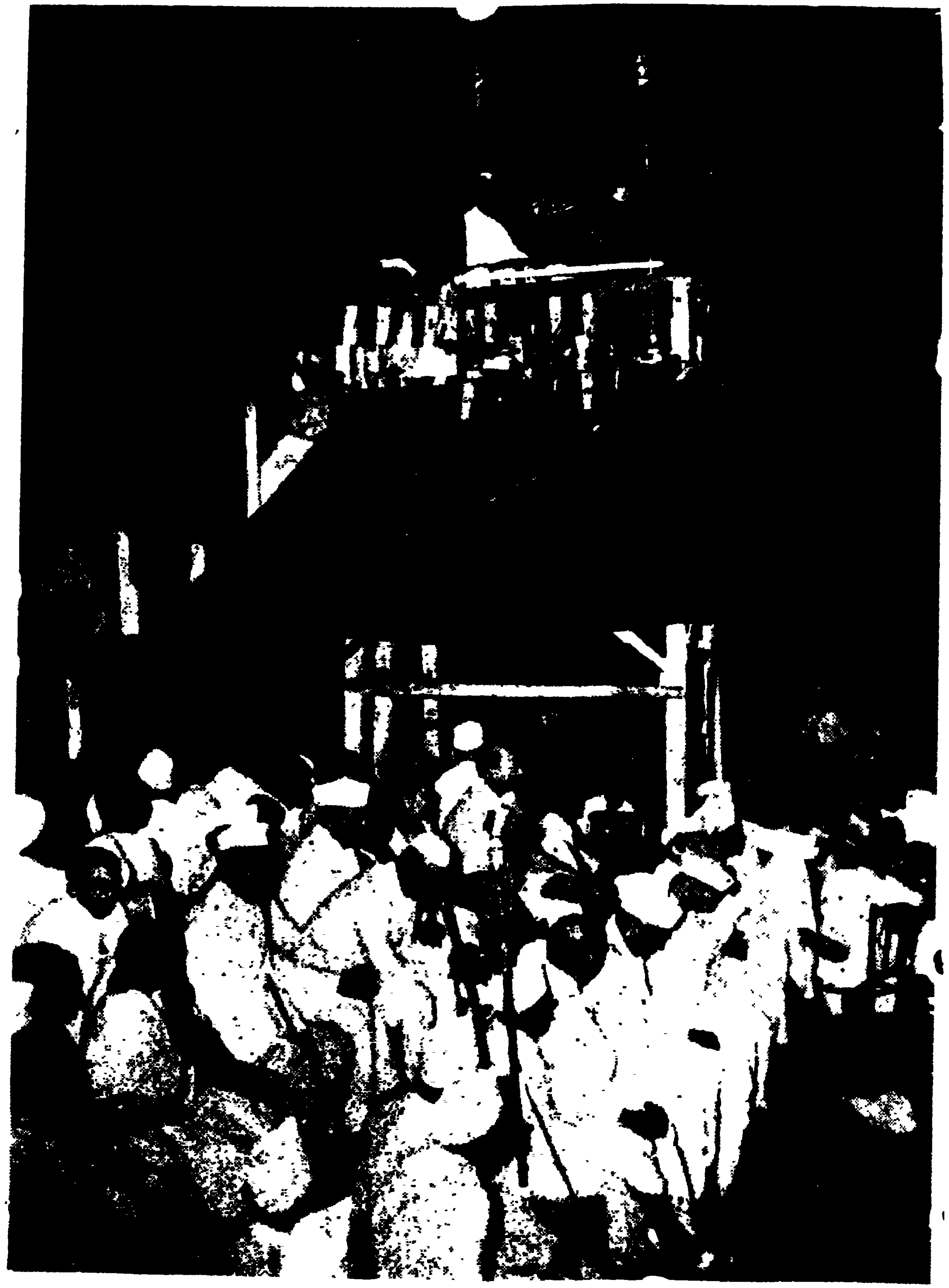

বোম্বাইয়ে বিরাট জনসভায় বক্তৃতারত
সর্দার প্যাটেল

নিউ দিল্লীতে বেলজিয়ান ট্রেড ডেলিগেশন প্রদত্ত প্রীতিভোজে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু

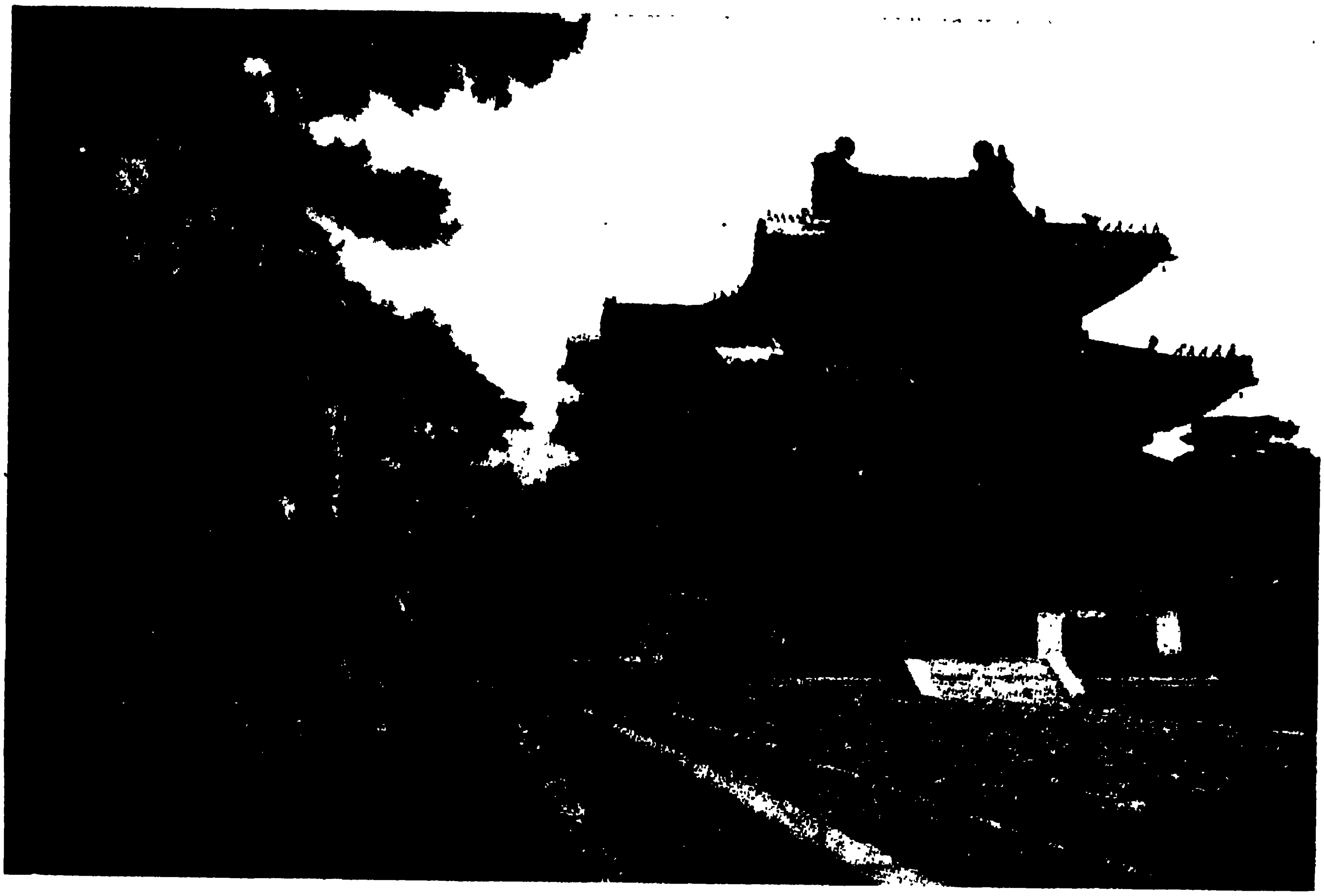

চীনের প্রাচীন মাঞ্চু রাজবংশের রাজধানী মুকডেনে রাজকীয় সমাধি-মন্দির

লাগিল, যেকব হুত্রির আরোগ্যের পথে আর কোন বাধা, কোন সঙ্কটই নাই। তাহার চিকিৎসা-ব্যবস্থার ভার যেন সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক ভগবান নিজের হস্তেই তুলিয়া লইয়াছেন।

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখি যেকব যেন সামান্য একটু নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিয়াছে। ক্ষণকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মনে হইল, সে যেন একান্ত উৎকর্ণভাবে দূরাগত কোন ক্ষীণ শব্দ শুনিবার চেষ্টা করিতেছে।

সচকিত হইয়া উঠিলাম। শত্রুবিমান নহে তো? আমাদের এই অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটিতে সব সময়ে সঙ্কেত-জ্ঞাপক 'সাইরেন' বাজে না। অনেক প্রকার অসুবিধার জন্যই তাহা সম্ভবপর হয় না। শত্রুবিমানের আগমন-ধ্বনিই আমাদের নিকটে সতর্কতার সঙ্কেত বহন করিয়া আনে। চাঞ্চল্য দমন করিয়া আমিও নিজের কর্ণেন্দ্রিয়কে সজাগ করিয়া তুলিলাম।

মিনিটখানেক পরে তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, কি শুনছ যেকব—এনিমি প্লেন?

যেকব নির্ব্বাক, নিশ্চল। সহসা মনে হইল, সংসারের সহিত বাহ্যিক সম্পর্ক রহিত হইয়া সে যে এত শীঘ্র শত্রু-বিমানের আগমন-ধ্বনি শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইবে তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে।

কক্ষদ্বারে আর এক বার মৃদু পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। নার্স ইথেল গরম কফির পাত্র লইয়া নিকটে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, কি খবর?

তাহার প্রশ্ন এড়াইয়া কহিলাম—আচ্ছা, নার্স ইথেল, তুমি কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছ? যেকবকে দেখেছ? কিছুক্ষণ থেকেই ঐ ভাবে বসে আছে বেচারা!

এক বার মাত্র যেকবের দিকে চাহিয়াই নার্স ইথেল কি যেন আবিষ্কার করার মত কহিয়া উঠিল, বুঝতে পেরেছি। নাইট-ওয়াচারর৷ গ্রামোফোন বাজাচ্ছে। আপনি কি গান শুনতে খুব ভালবাসেন, মিঃ হুত্রি? আচ্ছা, আপনি খান, আমি গান শোনাচ্ছি একটা।

নার্স ইথেল সুকণ্ঠী—নার্স ইথেল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তরুণী এবং সর্ব্বোপরি সে যেকব হুত্রির বর্ত্তমান ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সম্পূর্ণ দরদী। প্রাণ ঢালিয়া সে নতুন শেখা একখানি চমৎকার গান গাহিতে লাগিল।

এদিকে যেকব হুত্রির মুখাবয়বেও একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের সাড়া যেন ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। যেন আষাঢ়ের মেঘাবৃত দিনে আকস্মিক রৌদ্রাভাস! মনে হইল যেকব হুত্রির প্রতি এতক্ষণে বিধাতা সদয় হইলেন। নার্স ইথেলের সুললিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই যেন তাঁহার মঙ্গল-ইচ্ছা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া লইতেছে।

কিন্তু এ কি? কফির পেয়ালা টেবিলে রাখিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেকবের মুখের ঔজ্জ্বল্য যেন ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। পূর্ব্ববৎ গভীর ভাবে আর একবার সে বাতায়ন-পথে বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল…

চিন্তিত হইলাম। যেকব গান ভালবাসে, অথচ ইথেলের সুললিত প্রেমসঙ্গীতে সে আকৃষ্ট হইল না কেন? কি গান সে চায়? তাহার প্রিয়বিয়োগবিধুর শোকসন্তপ্ত অন্তর এখন কোন্ সঙ্গীতের জন্য পিপাসার্ত্ত?

প্রশ্নের উত্তর মনের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই আমার কণ্ঠ হইতে গান বাহির হইয়া পড়িল—

"Lead kindly light
Amid the encircling gloom
The night is dark
And I am far from home"!

"হে দয়াময়, অন্ধকারে তোমার আলো দেখাও। রাত্রি অন্ধকার—ঘর থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি আমি।"

চক্ষের সম্মুখেই আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিল! সোফায় সোজা হইয়া বসিয়া যেকব একান্ত আন্তরিকতার সহিত গানে যোগদান করিল! মনে হইল এই সরল বিশ্বাসী অন্তরখানি যেন বিধাতার কাছে প্রার্থনা প্রেরণ করিবার জন্যই এতক্ষণ নিরুদ্ধ আবেগে বোবা হইয়া ছিল। নার্স ইথেল আরম্ভ হইতেই এই অতিপরিচিত গানে তাহার মধুর ও দরদভরা কণ্ঠস্বর মিশাইয়া দিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে আমাদের দুই জনের সমবেত কণ্ঠস্বরকে ছাপাইয়া যেকবের স্বভাবরুক্ষ অথচ আন্তরিকতাপূর্ণ কণ্ঠধ্বনিতে কক্ষ মুখরিত হইয়া উঠিল। তাহার ব্যথিত অন্তরের গাম্ভীর্য্য-প্রাচীর ভাঙিয়া এতক্ষণে তাহার বুক হৃদয় যেন আত্মপ্রকাশের আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যেন এই একখানি মাত্র গানের ভিতর দিয়াই সে তাহার প্রিয়তমা পত্নী, বৃদ্ধা জননী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্তিম যাত্রাপথের নিরাপত্তার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের নিকটে নিজের সকল শুভকামনা ও প্রার্থনাকে রূপ দিতে চাহিল।

অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে সমগ্র ক্যান্টিন মুখরিত করিয়া, শেষ রাত্রের আকাশ-বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলিয়া মুক্তকণ্ঠে সে গাহিতে লাগিল:—

"When other helpers fail
And comforts flee
Help of the helpless
O! Abide with me"!

"যখন অন্য সহায়করা ব্যর্থ, সব সান্ত্বনা যখন দূরে চলে যায়, ওগো অসহায়ের সহায়—তুমি আমার সঙ্গে থেকো—"

শ্রীশচন্দ্র গুহ

শ্রীনিরুপমা দত্ত

গত ২৪শে জুলাই মালয়প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের একটি অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। সেখানকার ভারতীয়দের নেতা শ্রীশচন্দ্র গুহ উক্ত দিবসে অকস্মাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে শ্রীশচন্দ্র শুধু একজন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু সুদূর মালয়ে তাঁহার বিভিন্নমুখী প্রতিভার বিকাশ তাঁহাকে সকলের নিকট শ্রদ্ধাভাজন করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার নিষ্কলুষ চরিত্র, দানশীলতা প্রভৃতির কথা মনে হইলে এমার্সনের উক্তি মনে পড়ে—

"His heart was as great as the world but there was no room in it to hold the memory of a wrong!"

এই অমর উক্তি শ্রীশচন্দ্রের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল।

১৮৯১ সালে ১৫ই অক্টোবর কলিকাতার একটি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-পরিবারে শ্রীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ শ্রীঅম্বিকাচরণ গুহের তেজস্বিতা ও দানশীলতার কাহিনী কলিকাতায় সুবিদিত ছিল। বালককাল হইতে শ্রীশচন্দ্রের তীক্ষ্ণ ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া পিতা তাঁহাকে ছাত্রাবস্থায়ই বিলাতে পাঠান। সেখানে যথাসময়ে বি-এ পাশ করিয়া এবং পরে আইন পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিয়া শ্রীশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে কয়েক বৎসর ওকালতী করিবার পর ১৯১৯ সালে তিনি মালয়ে আগমন করেন।

মালাক্কা শহরে কিছুদিন ওকালতী করিয়া তিনি সিঙ্গাপুরে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সময় কয়েকটি কূট-চক্রান্তমূলক জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ করাতেই শ্রীশচন্দ্র এ-দেশে একজন শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ বলিয়া সুপরিচিত হন এবং ব্যবহারজীবী-মহলের ব্যাঘ্র নামে অভিহিত হন।

মালয়প্রবাসী ভারতীয়দের বিবিধ সমস্যা ক্রমশঃ শ্রীশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারত হইতে আগত হাজার হাজার শ্রমিকের ক্রীতদাসের ন্যায় শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন। সংবাদপত্র ও সভা মারফত তিনি মালয়-সরকারের আন্তর্জাতিক আইনবিরুদ্ধ শাসননীতির তীব্র সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি মালয়ের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। শ্রীশচন্দ্রের প্রেরণায় ভারতবাসীরা তখন ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্পর্কে দেশব্যাপী আন্দোলন চালাইতে থাকে। ফলে ভারত-সরকার এ বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য একজন নিরপেক্ষ প্রতিনিধিকে মালয়ে প্রেরণ করেন। মালয়-কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণ সহজেই ধরা পড়ে। উক্ত প্রতিনিধির রিপোর্ট নয়াদিল্লীতে পৌঁছাইতেই ভারত-সরকার মালয় কর্তৃপক্ষের নিকট এই মর্ম্মে একখানি পত্র দেন যে, মালয়ের বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কারখানাদিতে নিয়োজিত ও নির্যাতিত ভারতীয় শ্রমিকদের যেন অবিলম্বে স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

যখনকার কথা বলিতেছি তখন ভারতীয় শ্রমিক ছাড়া মালয়ের খনি ও রবার-শিল্প পরিচালনা করা একরূপ অসম্ভবই ছিল। অবশ্য চীনা শ্রমিকের তখন অভাব ছিল না; কিন্তু ভারতীয় শ্রমিকদের ন্যায় ন্যূনতম বেতনে তাহারা কখনই সন্তুষ্ট হইত না। সুতরাং উক্ত পত্র পাইয়া মালয়-সরকার চোখে সরিষার ফুল দেখিলেন। শ্রমিকদের শতকরা ৫০ টাকা হারে বেতন বৃদ্ধি করিবার এবং তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত ঔষধাদিসহ কয়েকজন বিশিষ্ট ডাক্তারকে প্রেরণ করার জন্য অবিলম্বে রবার এষ্টেটের মালিকদের উপর হুকুম জারী হইল। মালয়-সরকারের প্রবর্ত্তিত নীতিতে ভারত-সরকার সন্তুষ্ট হন। তখন হইতে ভারতবাসীদের স্বার্থ-সংরক্ষণের নিমিত্ত একজন করিয়া ভারতীয় প্রতিনিধি মালয়ে প্রেরণ করা হয়। অসহায় প্রবাসী ভারতবাসীদের দুর্গতিমোচনের এই পরিকল্পনাটি শুধু শ্রীশচন্দ্রের অক্লান্ত চেষ্টায় বাস্তবে রূপায়িত হয়।

১৯৩৯ সালে এখানে 'ইণ্ডিয়ান ইয়ুথ লীগ' নামে একটি স্বতন্ত্র ভারতীয় সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীশচন্দ্র তাহার স্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। দুর্গত প্রবাসী ভারতবাসীদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ও তাহাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করা এই সংঘের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়। স্থানীয় ভারতীয় প্রতিনিধির কার্য্যেও ইহার সদস্যেরা বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকেন।

১৯৪১ সালে মালয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে শ্রীশচন্দ্র হাজার হাজার নিরাশ্রয় নরনারীর জীবন রক্ষা করিয়া যেরূপ মহানুভবতা ও মানবহিতৈষণার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার তুলনা বিরল। উত্তর-মালয়ে অবতরণ করিয়া জাপবাহিনী যখন বন্যার জলের মত হু হু করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন ঐ সকল স্থান হইতে সহস্র সহস্র সর্ব্বহারা নরনারী সিঙ্গাপুরে পলাইয়া আসে। বোমা-বিধ্বস্ত সিঙ্গাপুরের অবস্থাও তখন অতীব শোচনীয়। এই সমস্ত শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া ও তাহাদের আহার্য্য সরবরাহ করা কর্তৃপক্ষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। এখানকার চীনা অধিবাসীরা কেবলমাত্র চীনা

আশ্রয়প্রার্থীদের খাদ্য ও আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করে। ফলে অন্যান্য জাতীয় লোকেদের দুর্গতির আর পরিসীমা রহিল না। আশ্রয়হীনদের এই দুর্গতি দেখিয়া শ্রীশচন্দ্রের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তিনি কয়েকজন সদাশয় ব্যক্তির সহযোগিতায় একটি বিরাট রেফিউজি ক্যাম্প বা আশ্রয়-শিবির প্রতিষ্ঠা করিলেন। উক্ত ক্যাম্পটির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইহাতে শুধু ভারতীয় নয়, বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের ২৫০০০ নরনারী—তন্মধ্যে শিশু এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংখ্যাও কম নয়—আশ্রয় ও আহার লাভ করে। রেফিউজি ফণ্ডের অর্থ নিঃশেষিত হইলে শ্রীশচন্দ্র নিজেই সেই বিরাট লোকহিতকর কর্ম্মের ব্যয়ভার বহন করেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই এদেশের হাজার হাজার নরনারী ভারতবর্ষ কিম্বা অষ্ট্রেলিয়ায় পলায়ন করিতে উদ্যত হয়। তখন প্রায় প্রতিদিনই জার্ম্মান ইউ-বোট দ্বারা ব্রিটিশের বহু জাহাজ জলমগ্ন করা হইতেছিল; অবশিষ্ট জাহাজগুলি নিযুক্ত ছিল যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ-কার্য্যে। সুতরাং উপরোক্ত নিরাপদ স্থানসমূহে গমনেচ্ছু নরনারীদের পাঠাইবার ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। গোড়ার দিকে যে জাহাজ কয়খানি পাওয়া গিয়াছিল, সরকারের নির্দ্দেশে সেগুলিতে শুধু শ্বেতাঙ্গ নারী ও শিশুদের পাঠানো হয়। 'কালা আদমি'দের অপেক্ষা করিতে বলা হয়। ধনী ব্যক্তিরা অবশ্য জাহাজ কোম্পানীর অনুগ্রহের প্রত্যাশা না করিয়া চতুর্গুণ ভাড়া দিয়া বিমানযোগে স্থানান্তরে চলিয়া যান, কিন্তু শতকরা নব্বই জনের পক্ষেই থালা ঘটি-বাটি বিক্রয় করিয়াও উড়ো-জাহাজের একখানি মাত্র টিকিট ক্রয় করা সাধ্যাতীত। কাজেই প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও জাহাজ কোম্পানীর আপিসে প্রত্যহ শত শত নরনারী বৃথা ধরণা দিতে থাকে। এই দৃশ্য দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র স্থির থাকিতে পারিলেন না। গবর্ণমেণ্টের সামরিক আইন লঙ্ঘন করিয়া তিনি তৎকালীন লাটবাহাদুরকে তীব্র ভাষায় একখানি পত্র লেখেন। শুধু স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার বলিয়া নয়, শ্রীশচন্দ্রের স্পষ্টবাদিতা, নির্ভীকতা ও মানবহিতৈষণার জন্য লাটবাহাদুর তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। সুতরাং তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া, বরং দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্রোত্তরে জানান যে, প্রধান সেনাপতির হস্তেই লোকাপসারণ-কার্য্যের ভার; অতএব শ্রীশচন্দ্রকে তাঁহার দ্বারস্থ হইবে। শ্রীশচন্দ্র এই সঙ্কটজনক অবস্থায় প্রধান সেনাপতির অনুগ্রহলাভের আশায় বৃথা বসিয়া না থাকিয়া অবিলম্বে ভারতের বড়লাট, কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড ও মহাত্মাজীকে তিনখানি টেলিগ্রাম পাঠাইলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। দুই সপ্তাহের মধ্যে ভারত-সরকার আশ্রয়প্রার্থীদের নিমিত্ত কয়েকখানি জাহাজ প্রেরণ করিলেন। এই সমস্ত জাহাজযোগে তাহারা নিরাপদে ভারতবর্ষে গিয়া পৌঁছে। শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত এরূপ অনেক ভারতীয় ছিল যাহাদের জাহাজ-ভাড়া দিবার ক্ষমতা ছিল না, শ্রীশচন্দ্র তাহাদের টিকিট কিনিয়া দেন।

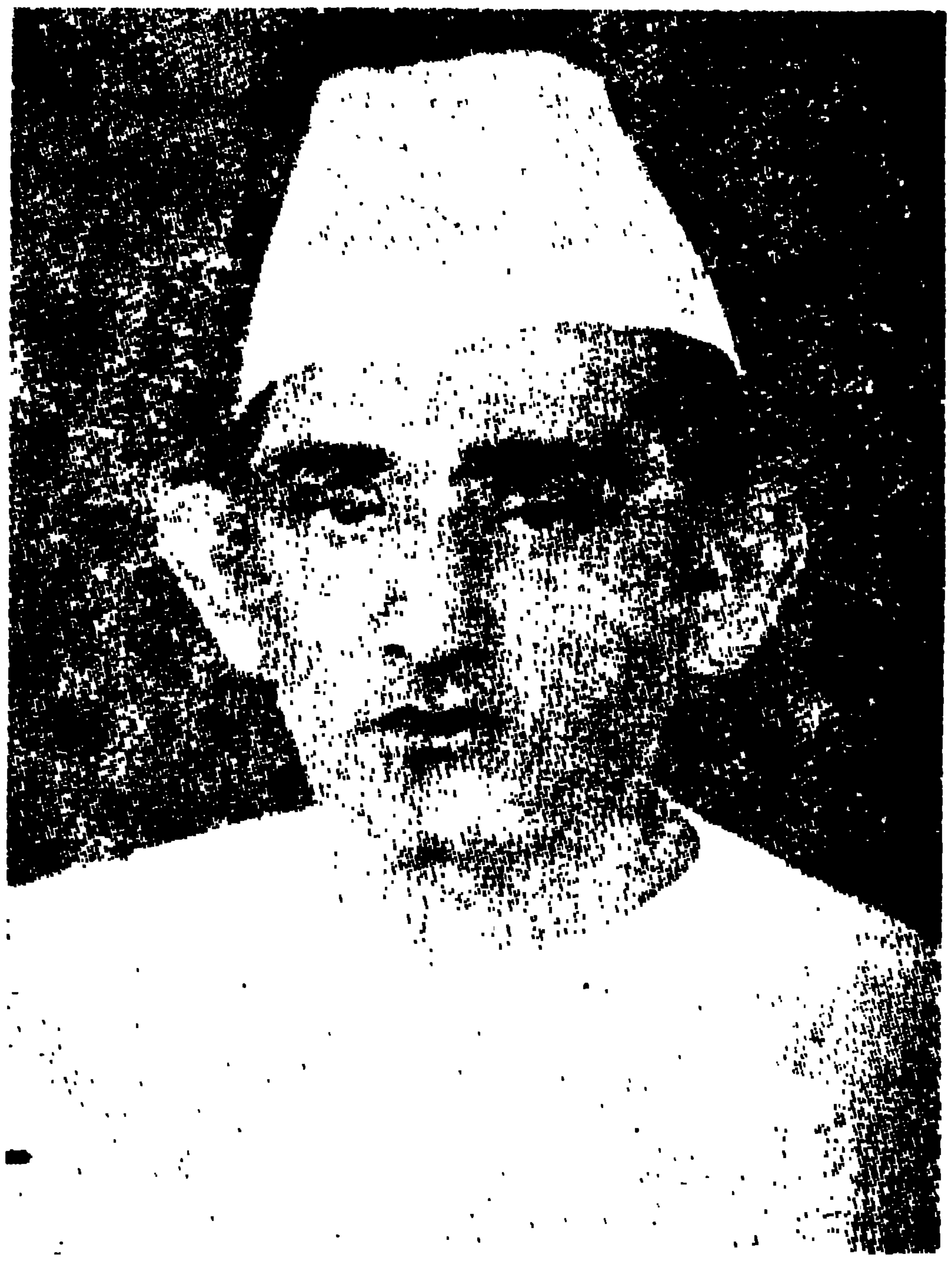

শ্রীশচন্দ্র গুহ

মালয় হইতে অনেক ভারতীয় চলিয়া গেলেও অর্দ্ধেকের বেশী এখানেই থাকিতে বাধ্য হইলেন। মালয়প্রবাসী ভারতীয়দের নেতৃস্থানীয় অনেকেই আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই ভারতে চলিয়া যান। কিন্তু তিন লক্ষাধিক ভারতবাসীকে এই বিপদের মুখে ফেলিয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইতে শ্রীশচন্দ্রের মন সরিল না। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও তিনি সিঙ্গাপুরে রহিয়া গেলেন।

সিঙ্গাপুরের উপর বিমান-হানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সরকারের শাসনব্যবস্থাও শিথিল হইয়া পড়িল। শ্রীশচন্দ্র তখন ভারতবাসীদের একটি সভা আহ্বান করিলেন, এবং অবিলম্বে তিন হাজার ভারতীয় যুবক লইয়া 'ইণ্ডিয়ান প্যাসিভ ডিফেন্স কোর' নামে একটি সঙ্ঘ গঠিত হইল। যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীশচন্দ্রের নেতৃত্বে এই স্বেচ্ছাসেবক দলটি যে কি ভাবে বোমাবিধ্বস্ত সিঙ্গাপুর শহরের শান্তিরক্ষা কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

শ্রীশচন্দ্রের নিঃস্বার্থ সেবায় মুগ্ধ হইয়া তৎকালীন গবর্ণর সার সেন্টন টমাস তাঁহাকে 'ভারত-সরকারের মালয়স্থ এজেণ্ট-জেনারেল' নিযুক্ত করেন। সিঙ্গাপুরের পতনের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় সার সেন্টন টমাস বেতারযোগে নয়া-দিল্লীতে এই

বাণী প্রেরণ করেন, "I have much pleasure in bringing to the notice of the Government of India the valuable services rendered by Mr. S. C. Goho of Singapore in the evacuation of women and children and in the fine example of courage and determination which he has set to his countrymen, and indeed to us all."

সিঙ্গাপুরের পতন হইলে পর আর একটি বিরাট দায়িত্ব শ্রীশচন্দ্র নির্ভীক চিত্তে গ্রহণ করিলেন। তাহা হইল পরাজিত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ৬৪০০০ অসহায় ভারতীয় সৈন্যের তত্ত্বাবধানের ভার। জাপানীরা শহর দখল করিয়া ব্রিটিশ সৈন্যদের আগে বন্দী করে। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদের বন্দী করার দিকে তাহাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। ওদিকে চৌষট্টি হাজার সৈন্য খাদ্যাভাবে শহরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে এবং নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতে থাকে। জাপানী সামরিক কর্তারা তখন শহরের হাজার হাজার চীনা পরিবারকে একেবারে সমূলে উচ্ছেদ-কার্য্যে মহা ব্যস্ত। ভারতীয়দের উপরও অনুরূপ অত্যাচার আরম্ভ হইতে পারে ভাবিয়া শ্রীশচন্দ্র স্বয়ং তাহাদের নিরাপত্তার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এতগুলি সৈন্যকে আশ্রয় দেওয়া, বিশেষতঃ দৈনিক দুই বার আহার্য্য সরবরাহ করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়, ধনী ব্যক্তিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিমুখ হইয়া অবশেষে শ্রীশচন্দ্র নিজের সঞ্চিত অর্থ দিয়া ভারতীয় সৈন্যদের খোরাক যোগাইতে লাগিলেন। যখন সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হইল তখন তিনি স্ত্রীর মূল্যবান অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া টাকা যোগাড় করিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে তাহাও ফুরাইয়া গেল। এবার তিনি নিজের প্রাসাদতুল্য গৃহ ও অন্যান্য ভূ-সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলেন। এই সময় প্রধান সেনাপতি ইয়ামাশিতার আদেশে উক্ত ভারতীয় সৈন্যেরা যুদ্ধবন্দী বলিয়া গণ্য হইল।

ইহার পর ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা ও প্রতিনিধি রূপে শ্রীশচন্দ্র জাপানী জঙ্গীলাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জঙ্গীলাট তাঁহার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন। জাপানী সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীশচন্দ্র ইণ্ডিয়ান ইউথ লীগকে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগে রূপান্তরিত করেন। তিনিই ইহার সভাপতি পদে বৃত হন। এই সময়ে জাপানী প্রধানমন্ত্রী হিদেকী তোজোর আহ্বানে তিনি অন্যান্য ভারতীয় সদস্যগণ সমভিব্যাহারে টোকিও যান এবং সেখানে গিয়া জানিতে পারেন যে বর্ম্মা বিজিত হইলে পর জাপান ভারত আক্রমণ করিবে। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য ভারতে সাম্রাজ্য-বিস্তার নহে, তাহাদের অভিপ্রায় এই যে ভারতবর্ষ জয় করিয়া ভারতবাসীর হস্তেই তাঁহারা দেশের শাসনকার্য্যের ভার অর্পণ করিবে। জাপ-কর্তৃপক্ষ কিছু ভারতীয় স্বেচ্ছা-সেবক ও সৈন্যের সাহায্য চান। মালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীশচন্দ্র সোৎসাহে দুই হাজার স্বেচ্ছাসেবক ও বন্দী-কৃত সাত শত ভারতীয় সৈন্য লইয়া একটি ভারতীয় মুক্তি-ফৌজ গঠন করিলেন। তাহার কিছুদিন পরেই নির্ব্বাসিত প্রবীণ নেতা শ্রীরাসবিহারী বসু টোকিও হইতে মালয়ে আগমন করিলেন। এক দিন জাপানের ভাবী ভারত-আক্রমণ সম্পর্কে রাসবিহারীর সহিত শ্রীশচন্দ্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়। রাসবিহারী বলেন যে, ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ শক্তিকে বিতাড়িত করিয়া জাপান ভারতবাসীর হস্তেই দেশের শাসন-ভার অর্পণ করিবে। তবে এতকাল পরাধীন থাকায় ভারত-বাসী নাকি এখনও দেশরক্ষা করিতে শিখে নাই; সেইজন্য ভারত-জয়ের পর জাপানী সৈন্যের কয়েকটি দখলদার বাহিনী (occupation army) ভারতে পঁচিশ বৎসর অবস্থান করিবে। তাঁহার শেষোক্ত কথাগুলি কূট-আইনজ্ঞ শ্রীশচন্দ্রের মনঃপূত হইল না। তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, না তাহা কিছুতেই হইতে পারে না; উহারা পঁচিশ বৎসর কাল ভারতে থাকিলে ভারত দ্বিতীয় মাঞ্চুরিয়াতে পরিণত হইবে; আমি এই চুক্তিতে কখনই রাজী হইতে পারি না। এই ব্যাপার লইয়া রাসবিহারীর সহিত শ্রীশচন্দ্রের মনোমালিন্য ঘটে এবং তিনি ভগ্নহৃদয়ে লীগের সভাপতির আসন ত্যাগ করেন। এই কারণে নবগঠিত মুক্তি-ফৌজেও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ায় তাহা ভাঙিয়া গেল। অফিসারদের বন্দী করা হইল। জাপানীরা শ্রীশচন্দ্রকে নজরবন্দী করিয়া রাখিল।

কয়েক মাস পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র মালয়ে আসেন। ইহার কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীশচন্দ্র মুক্তি পাইলেন। কিন্তু মধ্য-রাত্রে জাপানী গেষ্টাপো তাঁহার গৃহে আসিয়া গোপনে তাঁহাকে শাসাইয়া যায় যে, ভবিষ্যতে রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যেন পুনঃ-প্রবেশ না করেন; করিলে জাপ-সরকার তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। গেষ্টাপো অফিসারটি তাঁহাকে আরও বলে যে, এই সমস্ত গণ্ডগোলের কথা তিনি যেন নেতাজীর কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না করেন; এবং নেতাজী যদি তাঁহাকে কোন দায়িত্ব বা পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন তাহা হইলে শ্রীশচন্দ্র যেন হার্টের অসুখের অছিলায় তাহা অস্বীকার করেন।

মালয়ে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে নেতাজী শ্রীশচন্দ্রকে কোন একটি বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। এবার শ্রীশচন্দ্রের উভয়সঙ্কট। ম্লান হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, "জাপানী ডাক্তার আবিষ্কার করেছে আমার নাকি হার্টের অসুখ আছে, কাজেই রাজনীতিক্ষেত্রে জন্মের মত আমার প্রবেশ নিষেধ...।"

নেতাজী পূর্ব্বেই জনৈক অফিসারের নিকট ইহার আংশিক খবর পাইয়াছিলেন, এবার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। দুঃখের সহিত বলিলেন, "আচ্ছা, এখন

দু'দিন বিশ্রাম নিন তবে ভারত স্বাধীন হলে আপনিই হবেন তার প্রথম আইনসচিব···।" "হ্যাঁ, জাপানী চিকিৎসক যদি অনুমতি দেন তা হলে নিশ্চয়ই আপনার কথায় রাজী হবো"—শ্রীশচন্দ্র সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন।

তাঁহার অগ্রজ শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর সহপাঠী এবং বন্ধু বলিয়া শুধু নয়, শ্রীশচন্দ্রকে একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক বলিয়াও নেতাজী বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। বহু বার নিজের বাংলোয় শ্রীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করিয়া নেতাজী তাঁহার সহিত অনেক বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছেন।

জাপানী কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে শ্রীশচন্দ্র রাজনীতিতে যোগ না দিয়া আইন-ব্যবসায়ে আবার বিশেষ মনোযোগ দেন। এই সময় তিনি জানিতে পারেন, যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করে নাই, তাহাদের নাকি দুর্দ্দশার পরিসীমা নাই। এ সংবাদ অবগত হইবার পর শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ জাপানী গেষ্টাপোর অজ্ঞাতে সেই দুর্গত সৈন্যদের আর্থিক সাহায্য করিতে লাগিলেন। জাপানীরা জানিতে পারিলে যে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বোপার্জ্জিত অর্থে কুলাইত না বলিয়া তিনি কয়েক লক্ষ ডলার কর্জ্জ করিয়া সেই সকল বন্দীকে পাঠাইয়াছিলেন।

যুদ্ধবিরতি হইলে ব্রিটিশ সরকার মালয়ে পুনঃপ্রবেশ করেন। ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, শ্রীশচন্দ্র জাপানীদের সহযোগিতা করিয়াছিলেন; এই অপরাধে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যে-সব বন্দী সৈন্যের জীবন তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন, নয়াদিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহারা তদানীন্তন ভারত-সরকারের নিকট শ্রীশচন্দ্রের মহানুভবতার কাহিনী বর্ণনা করে। ভারত গবর্ণমেণ্ট ধন্যবাদপূর্ণ একখানি অভিনন্দনপত্র মালয় সামরিক কর্তৃপক্ষের মারফত শ্রীশচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। উক্ত পত্র দেখিয়া স্থানীয় সরকার অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং অবিলম্বে শ্রীশচন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হয়। সেই সময়ে দিল্লী হইতে মালয়ের ভূতপূর্ব্ব যুদ্ধবন্দী মেজর জেনারেল চৌধুরী (বর্ত্তমান হায়দ্রাবাদের সামরিক শাসনকর্ত্তা) শ্রীশচন্দ্রকে যে অপূর্ব্ব পত্রটি লেখেন তাহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হইল:—···"You were the first Indian in Singapore who came forward to help us at the risk of your own life. You saved many precious lives and for this our gratitude can never be wanting···." "সিঙ্গাপুরে আপনিই প্রথম ভারতীয় যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আপনি অনেক মূল্যবান জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেজন্য আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অভাব কখনো হইবে না।" এ বৎসরের গোড়ার দিকে এ দেশের প্রথম ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনকালে শ্রীশচন্দ্র একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হন। শ্রীশচন্দ্র এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, এইবার তিনি ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুষ্ঠিত ত্রুটিগুলির মূলোচ্ছেদ করিতে তৎপর হইবেন।

গত কয়েক মাস হইতে তিনি হৃৎপিণ্ডের অসুখে বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসকেরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহাদের কথা না শুনিয়া তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্যেই বিরাট কর্ত্তব্যের বোঝা বহন করিয়া চলিতে থাকেন। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার দুর্ব্বল শরীর একেবারেই ভাঙিয়া পড়ে। গত ১২ই জুলাই বাধ্য হইয়া ছয় সপ্তাহের বিশ্রাম লইবার উদ্দেশ্যে তিনি বিমানযোগে কলিকাতায় যান।

কিন্তু সেই বিশ্রামই তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের চিরবিশ্রাম হইল। অকস্মাৎ একদিন তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। সেই দীপশিখা মালয়-প্রবাসী ভারতীয়দের পথনির্দ্দেশ করিবার জন্য আর প্রজ্বলিত হইবে না।

বৃথাই প্রহরী আর

শ্রীরঘুনাথ ঘোষ

ধাবমান কালো ধোঁয়া স্তূপাকার কালো অন্ধকার
পৃথিবীর বুকে নামে কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমীর রাত,
উপবাসী আত্মা মোর অবিরাম বেয়ে চলে পথ
পিপাসিত মরুভূমি কাঁদে বৃথা: ডাকে হিম হাত।
আকাশের বুক থেকে ঝরে গেছে শুকতারা সব
ধ্রুবতারা মুছে গেছে চুপে চুপে অজ্ঞাতে কখন,
দিগভ্রষ্ট অন্ধকারে সীমাহীন কালো পারাবারে
ভেসে গেছে মিশে গেছে কত হায় সোনার স্বপন।

তবু গতি, তবু চলা, কুলুকুলু কালিন্দীর জল;
শিবা যে দেখায় পথ: ক্রুর কংস খুঁজিছে কাহারে?
দেবকীর হাহাকার, বসুদেব আঁখি ছলছল,
বৃথাই প্রহরা আর মথুরার কারার দুয়ারে।
চঞ্চল অধীর প্রাণ, অপেক্ষার নাহি অবসর;
কোটি কণ্ঠ আর্ত্তস্বরে অবিরাম মাগে প্রতীকার,
এসেছে লগন আজ কালপূর্ণ হ'ল এত দিনে
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিশারাত্রি তাই মোরে ডাকে অনিবার।

স্থায়ী বাঙালী পল্টন

শ্রীমন বাহাদুর সিংহ
(সুবেদার, ৪৯শ বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট)

প্রায় দুই শত বৎসর পরাধীনতার পর সম্প্রতি ভারতবাসীরা ইংরেজের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের ইচ্ছানুযায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন আজ আমাদের হাতে। ইংরেজ আমলের ভারতের সৈন্যবাহিনীতে রংরুট-নীতি ও সামরিক শিক্ষার বাধাবিঘ্নসমূহ আজ আর নেই। রাষ্ট্রের ভিতরে শৃঙ্খলা বজায় রাখবার এবং বাইরের শত্রু-আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য সৈন্যবাহিনী দরকার। ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষে মাত্র কয়েকটি প্রদেশের মধ্যেই সৈন্যবাহিনী গঠন সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজ বাঙালী জাতিকে "অসামরিক জাতি" বলে বহু বৎসর কোণঠাসা করে রেখেছিল। কারণ ইংরেজ ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল যে, এই বাঙালী জাতির মধ্যে মস্তিষ্ক ও বাহু এ দুটো শক্তি মিলিত হলে তাদের আর ভারতবর্ষে বেশী দিন রাজত্ব করতে হবে না। ইংরেজ রাজত্বের গোড়া থেকে যদি বাঙালীর জন্য সামরিক শিক্ষার পথ উন্মুক্ত থাকত তা হলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের রূপ বহুদিন আগেই বদলে যেত।

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে বাংলাদেশের নেতাদের অনেক পীড়াপীড়িতে ইংরেজ এক দল বাঙালী পল্টন গঠন করতে অনুমতি দিয়েছিল। সাত হাজার বাঙালী ছেলেদের নিয়ে বাঙালী পল্টন গঠন করা হয়েছিল। তারা সামরিক শিক্ষা পেয়েছিল, তাদের যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল—কিন্তু যুদ্ধের শেষে পল্টন ভেঙে দেওয়া হ'ল, বাঙালীরা ভারতের রেগুলার আর্মিতে কোন স্থান পেল না—এই হ'ল ফল। ইংরেজ বাঙালীদের সৈন্যবাহিনীর রংরুট-নীতির আসল পথ ইচ্ছে করেই দেখিয়ে দেয় নি এবং বাঙালী নেতারাও এই রংরুট-নীতির সম্বন্ধে ইংরেজের কূটনীতি সে সময় বুঝতে পারেন নি। এই রংরুট-নীতির ভুলের জন্যই বিগত প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বাঙালী পল্টন সফলতা লাভ করতে পারে নি।

আজ বাংলাদেশে ইংরেজ আমলের রংরুট-নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনসাধন করতে হবে। কে বলে বাংলাদেশে সৈন্য-বাহিনী পাওয়া যাবে না? বাংলাদেশে দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠবে, যদি আমরা নিজেদের মধ্যে দলাদলি, তর্কবিতর্ক ইত্যাদিতে অযথা সময় নষ্ট না করে একযোগে স্থায়ী বাঙালী ব্যাটেলিয়ন গড়ার কাজে মন দিয়ে ভবিষ্যৎ বাঙালীর সামরিক শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করি।

শতাব্দীর এক পাদের মধ্যে পৃথিবীতে পর পর দুটো ভীষণ যুদ্ধ এসেছে—যুদ্ধকালে বাংলাদেশে মুষ্টিমেয় বাঙালীদের নিয়ে এক একটি পল্টন গড়ে উঠছে—যুদ্ধ চলে গেলে, বাঙালী পল্টনও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ফলে বাংলায় বাঙালীদের স্থায়ী সৈন্যদল গঠন আর হচ্ছে না। এর কারণ কি ভেবে দেখা দরকার। আমি এক সময় আমাদের কমাণ্ডিং অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাঙালীকে রেগুলার আর্মিতে রাখা হবে কিনা। তিনি সে প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, নিশ্চয় রাখা হবে যদি তারা চায়। কিন্তু বাঙালী তখন চায় নি—এর জন্যে নেতাদের উদাসীনতা অনেকখানি দায়ী। কয়েকজন বাঙালী অফিসার এ বিষয়ে নেতাদের কাছে দরবারও করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা বলেছিলেন—যুদ্ধ যখন থেমে গিয়েছে তখন পল্টনের আর দরকার নেই।

বাংলাদেশের নেতাদের ও বাঙালী পল্টনের দোষ দেখিয়ে নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। গত যুদ্ধের রংরুট-নীতি এবং বাঙালী পল্টনের কার্য্যকলাপের দিকে লক্ষ্য করে ভবিষ্যতে বাঙালী নেতারা সাবধান হয়ে বাংলায় স্থায়ী সৈন্যদল গঠনের দিকে যাতে মনোনিবেশ করেন সেইজন্যেই আজ বাঙালী পল্টনের মন্দের দিকটার সব কথা স্পষ্ট করে খুলে বলতে প্রবৃত্ত হচ্ছি—মনে হয় এর দরুন বাংলায় সৈন্য সংগ্রহের কাজ কতকটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে। আজ বাঙালীকে পোশাকী সৈনিক হলে চলবে না; আজ তার মনে প্রাণে সৈনিকের ধর্ম্মে দীক্ষিত সৈনিক-বাঙালী হওয়া চাই।

১৯১৪ এবং ১৯৩৯ সালের যুদ্ধে বাংলায় ভ্রান্ত রংরুট-নীতির দরুনই বাঙালীরা সৈন্যবাহিনী হিসাবে সফলতা লাভ করতে পারে নি; তার কতকগুলি কারণ নিয়ে দেওয়া হ'ল।

(১) ৪৯তম বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট এবং বেঙ্গল কোষ্টাল ডিফেন্স ব্যাটারিতে শতকরা প্রায় নব্বই ভাগের বেশী উচ্চবংশ-জাত, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবক ভর্ত্তি হয়েছিল।

(২) পল্টনের ছেলেদের মধ্যে যারা একটু শিক্ষিত, তারা অনেকেই এই ধারণা নিয়ে পল্টনে যোগ দিয়েছিল যে ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের অধীনে লাভজনক উচ্চ অসামরিক পদ তারা পাবে। দেখা গেছে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকাকালীন অনেকেই ভারত গবর্ণমেণ্টে বড় পদের জন্য দরখাস্ত করেছিল।

(৩) এদের মধ্যে অনেকেই নূতন কিছু করার উন্মাদনা থেকেই সৈনিকরূপে পল্টনে যোগ দিয়েছিল। দেখা গেছে, পরে যখন তাদের স্বপ্ন ভেঙে গেল তখন বহু ছেলে নানা রকম ছুতো করে পল্টন ছেড়ে চলে এসেছিল।

(৪) এদের মধ্যে অনেকেই সংসারের নানা রকম ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে না পেরে মা, বাবা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের

সঙ্গে ঝগড়া করে, স্কুল-কলেজ পালিয়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেছিল। অনেকে মামলা-মোকদ্দমা থেকে রেহাই পাবার জন্য, আবার অনেকে বহু আপিসে চাকুরির সন্ধান করে পরে হতাশ হয়ে পল্টনে ভর্ত্তি হয়েছিল। পুলিশের হাত এড়াবার জন্য সন্ত্রাসবাদী দলের কয়েকজন যুবকও পল্টনে গিয়েছিল। তাদের অনেকের মা, বাবা, স্ত্রী এবং বহু আত্মীয়স্বজন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নৌশেরা ও করাচী ব্যারাক এবং সুদূর মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে, তাদের ছেলেদের ও স্বামীদের পল্টন থেকে ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে পল্টনের কমাণ্ডিং অফিসারকে অনুরোধ করে আবেদন-নিবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন।

(৫) যারা দেশভক্ত, তারা এই সুযোগে সামরিক শিক্ষা লাভের জন্য পল্টনে ভর্ত্তি হয়েছিল।

৬। যুদ্ধ শেষ হলেই তারা ঘরে ফিরে আসতে পারবে এই ধারণা নিয়ে অনেকেই 'ভলাণ্টিয়ার' হিসাবে পল্টনে ভর্ত্তি হয়েছিল।

৭। সাধারণতঃ বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে এদের অধিকাংশই যুদ্ধে গিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সৈনিক জীবনে 'Stamina' এবং 'Tenacity' বলে যে দুটি গুণ থাকবার কথা, এই সব শিক্ষিত বাঙালী যুবকের মধ্যে তার বিশেষ অভাব ছিল।

৮। বাঙালী ছেলেরা ভারতীয় পদ ও বেতন (Indian Rank Pay) সম্বন্ধে মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। কারণ ভারতীয় ও ব্রিটিশ অফিসার এবং সাধারণ সৈনিকের বেতনে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বাঙালী সৈনিকেরা প্রথম দিকে মাসিক এগার টাকা বেতন পেত। এই এগার টাকায় খাওয়ার খরচ চালাতে হ'ত। পরে অবশ্য খাই-খরচা সরকার থেকে পাওয়া যেত। আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে মনিঅর্ডার যোগে ব্যারাকে ছেলেদের টাকা পাঠাতেন।

৯। একটি পল্টনে সাধারণ সিপাহী হিসাবে ভর্ত্তি হলে, সেই পল্টনের প্রত্যেক সিপাহী যে অফিসার পদে উন্নীত হবে এমন হতে পারে না। রংরুট থেকে সিপাহী পদ লাভ করতে হলে প্রায় দু-বৎসর সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন। সিপাহী থেকে ল্যান্স্‌নায়ক, নায়ক, হাবিলদার, হাবিলদার-মেজর, জমাদার, সুবেদার এবং সুবেদার-মেজর পদলাভ করতে হলে সামরিক বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন এবং তা সময়-সাপেক্ষ। গত দুই মহাযুদ্ধে শিক্ষিত বাঙালী যুবকেরা সাধারণ সৈনিক হিসাবে পল্টনে ভর্ত্তি হবার দরুন ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, একজন বি-এ, একজন আই-এ, এক জন ম্যাট্রিকুলেট, এক জন স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া, এক জন সামান্য বাংলা লেখা-পড়া জানা, আর এক জন আকাট মূর্খ একই সঙ্গে ভর্ত্তি হয়ে একই ধরণের সামরিক শিক্ষা লাভ করল। সামরিক শিক্ষা অন্তে পরীক্ষার পর দেখা গেল যে, যে দু'জন মাত্র বাংলা লিখতে পড়তে পারে ও চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েছে তারা পাস করে বেরিয়ে এল। সৈন্যদলে থাকতে হলে যে গুণগুলি থাকা নিতান্ত দরকার, যথা—দেহের গঠন, শক্তি, হুকুম মানা ও দেওয়া, গুলিছোড়া এবং পরিচালনা করবার ক্ষমতা, সেগুলি এদের ছিল বলেই এ দু'জনকে উচ্চ-পদে উন্নীত করা হ'ল। আর তিন জন পাস করা নিতান্ত 'ভাল মানুষ' পিছনে পড়ে রইল, তারা সাধারণ সিপাহী হয়েই রইল। এইখানেই পল্টনের মধ্যে একটা অসন্তোষের ভাব দেখা দিল। পাস করা শিক্ষিত ব্যক্তি উচ্চপদ পেল না, পেল কিনা ঐ দু'জন মূর্খ? শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বিরাট একটা ষড়যন্ত্র চলল। যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দুক, গুলি, রিভলবার, মেসিন-গানের অভাব নেই। এই সব অস্ত্রশস্ত্র সকল সময় সৈনিকদের নিকটেই থাকত। সুদূর মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে একটি সামরিক ক্যাম্পে এক দিন গভীর রাত্রে এক দল উচ্চবংশীয়, শিক্ষিত যুবক তিন জন ঘুমন্ত বাঙালী অফিসারকে গুলি করে—ফলে এক জন অফিসার তৎক্ষণাৎ মারা যান, আর দু'জন ভীষণ ভাবে আহত হন। সামরিক বিচারে হত্যা-কারীদের মধ্যে দু'জনের সাধারণ কয়েদীর ন্যায় ফাঁসি হয়েছিল, আর এক জনকে পল্টন থেকে বিতাড়িত করা হয়। এইখান থেকেই বাঙালী পল্টনের অবনতি আরম্ভ হয়। ইংরেজও এই রকম কিছু একটা চেয়েছিল। বাঙালী পল্টনের এই কলঙ্কের কাহিনী এখনও বোধ হয় দিল্লী এবং লণ্ডনের সমর-দপ্তরের নথিপত্রে দেখতে পাওয়া যাবে। এর দরুন তখনকার বাংলাদেশের নেতাদের এবং বেসরকারী সৈন্যসংগ্রহ প্রতিষ্ঠান-গুলির কর্ম্মকর্ত্তাদের মাথা কতখানি নিচু হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এক দিন লক্ষ লক্ষ নরনারী হাওড়া ষ্টেশনে বাঙালী ছেলেদের বিদায়-অভিনন্দন জানিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধের শেষে বাঙালী সৈনিকেরা বাংলায় দীনবেশে ফিরে এল। বাঙালী সৈনিকেরা সেদিন বাংলার রাস্তায় রাস্তায় অন্নের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে। বাংলার নেতারা তখন একবারও তাদের দিকে ফিরে তাকান নি।

(১০) ১৯১৪ সালের যুদ্ধে বাঙালী অফিসার ছাড়া সাধারণ সৈনিকেরা যা বেতন পেত তাতে পল্টনে কাজ ক'রে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাধারণ সৈনিকের পক্ষে সংসার চালান অসম্ভব ছিল। সাধারণ সৈনিক থেকে অতি অল্প দিনের মধ্যে অফিসার পদে উন্নীত হবে তারও ভরসা ছিল কম। ভারতীয় অন্যান্য পল্টনের মধ্যে দেখা গেছে যে, সাধারণ সৈনিকেরা সৈন্যদলে কাজ করে নিজেদের সংসার বেশ ভাল ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। চাকুরি শেষে ঘরে বসে পেন্‌সনও ভোগ করছে। এমনও দেখা গেছে পল্টনে কাজ করে সারাটা

জীবন কাটিয়ে দিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধের মুখ কোন দিন দেখতে পায় নি।

বাঙালী ছেলেদের মধ্যে অনেকের এই ধারণা হয়েছিল যে তাদেরও বুঝি এই ভাবে পল্টনে জীবন কাটাতে হবে। এটাও একটা কারণ যার জন্যে পল্টনে ছেলেরা ভাল করে কাজ করে নি।

(১১) সৈন্যবাহিনীতে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা নিতান্ত দরকার। সৈনিকদের সর্ব্বক্ষেত্রে নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করলে চলে না। বাঙালী পল্টনের ছেলেদের মধ্যে আজ্ঞানুবর্ত্তিতার অভাব অত্যন্ত বেশী ছিল।

এক সময় কুর্দ্দিস্থানে ভীষণ বিদ্রোহ দেখা দেয়। কুর্দ্দিদের দমন করবার জন্য মেসোপটেমিয়া থেকে কুর্দ্দিস্থানে একটি কুর্দ্দি 'এক্সপিডিশনারি ফোর্স' পাঠানো হয়। ব্রিটিশ, গুর্খা, পঞ্জাবী এবং বাঙালী সৈন্যদল নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল। এই দলগুলি সমস্ত কুর্দ্দিস্থানকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে বিদ্রোহীদের দমন করায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। এই অবস্থায় এক সময় কুর্দ্দিস্থানে কোন একটি জায়গায় সমস্ত পল্টনের সৈনিক দল একসঙ্গে মিলিত হয়। বাঙালী সৈন্যদল শেষের দিকে ঐ দলগুলির সঙ্গে যোগ দেয়। সেখানে পৌঁছেই তারা দেখল গুর্খা সৈনিকেরা পাশের একটি কুর্দ্দি গ্রামের উপর মেসিন-গান চালিয়ে গ্রামটিকে পুড়িয়ে দিয়েছে। গ্রামের যুবক-যুবতীরা ঘোড়ায় চড়ে আগে থেকেই পাহাড়ে পালিয়ে গেছে। ভস্মীভূত গ্রামের অবশিষ্ট বুড়োবুড়ী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে বুক চাপড়াচ্ছে ও কাঁদছে। বাঙালী সৈনিকেরা দগ্ধ গ্রামের শোচনীয় অবস্থা এবং বুড়োবুড়ী ও বাচ্চাদের কান্না দেখে গুর্খা সৈনিকদের ওপর ভীষণ চটে গিয়ে বলতে লাগল, কি অন্যায়! গরীবদের গ্রাম পুড়িয়ে নিরীহ বুড়োবুড়ী ও ছোটদের উপর এ কি রকম অত্যাচার? বাঙালী ছেলেদের মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনা ও বিদ্রোহের ভাব দেখা গেল। গুর্খা সৈনিকদের এই অমানুষিক কার্য্যের প্রতিবাদ জানাতে মনস্থ করে কয়েক জন বাঙালী সৈনিক কমাণ্ডিং অফিসারের নিকট অগ্রসর হ'ল। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত কয়েক জন বাঙালী অফিসার এদের অনেক কষ্টে শান্ত করলেন।

সৈন্যবাহিনীতে এই রকম আচরণ সৈনিকের ধর্ম্ম নয়। সৈনিকের একমাত্র ধর্ম্ম হচ্ছে—"হুকুম মানা, তোপ্ দাগানা, বাত না বোল্না"—আদেশ পালন কর, গুলি ছোঁড়ো, কথা বলো না। সৈন্যবাহিনীতে ন্যায়-অন্যায় বিচারের ভার সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতির উপর।

(১২) সৈন্যবাহিনীতে উচ্চবংশ-নীচবংশ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদির কোন প্রভেদ নেই, মান-অভিমানের পালা নেই। একসঙ্গে উঠে-বসে কাজ করতে হয়। বাঙালী পল্টনে দেখা গেছে উচ্চবংশীয়, ধনী, শিক্ষিত সাধারণ সৈনিকেরা নিম্ন সম্প্রদায়ের এবং মূর্খ ও দরিদ্র সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে ঘৃণা বোধ করত।

(১৩) মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত বাঙালী ছেলেরা সাধারণ সৈনিক হিসাবে রেগুলার আর্মির পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। এরা অবশ্য খুব চালাক-চতুর এবং অল্পদিনের মধ্যেই সামরিক শিক্ষা আয়ত্তে আনতে পারে। শান্তি ও যুদ্ধের সময় শহর এবং শহরতলীতে 'Garrison duty', 'Ceremonial parade' প্রভৃতি অস্থায়ী কাজ খুব প্রশংসার সহিত করতে পারে। উত্তেজনার বশে হাসিমুখে প্রাণও দিতে পারে। দেশে স্থায়ী বা অস্থায়ী পল্টন গঠনের সময় হাজার হাজার ছেলে ভর্ত্তি হতেও পারে, কিন্তু এরা অল্পদিনের মধ্যেই পল্টন থেকে সরে যাবে।

(১৪) এই সব শিক্ষিত যুবককে স্থায়ীভাবে পল্টনে রাখলে অনেক সময় নেতাদের মধ্যে দলাদলি ও রাজনৈতিক মতবাদ ইত্যাদির চাপে দেশের মধ্যে বিদ্রোহ হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করবে। রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে সৈনিকের মাথা-ঘামানো মোটেই উচিত নয়।

(১৫) শিক্ষিত যুবকদের মধ্য থেকে উপযুক্ত লোক বেছে নিয়ে কমিশন্‌ড অফিসার পদে নিযুক্ত করা যেতে পারে। তা ছাড়া মেকানাইজ্‌ড আর্মির জন্য যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষিত যুবকের প্রয়োজন। পদ ও বেতনের দিক থেকেও অসন্তুষ্টির কোন কারণ থাকবে না। শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকেদের টেরিটোরিয়াল ফোর্সে নিযুক্ত করে সামরিক শিক্ষা দিয়ে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখা দরকার।

(ক) বাংলা গবর্ণমেন্ট এবং ছোট-বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারী, ২০-৪৫ বৎসরের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের বাংলা টেরিটোরিয়াল ফোর্সে নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। চাকুরীই যাদের সংসার প্রতিপালনের একমাত্র সম্বল তারাই হবে টেরিটোরিয়াল ফোর্সের উপযুক্ত সৈনিক। কারণ এক দিকে সংসারের টান, অপর দিকে চাকুরির মায়া—এই দুই দিকের টানে বাইরের কোন ব্যাপার সম্বন্ধে এদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিষ্ট পার্টি, প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্রীড়াক্ষেত্র এই বাংলাদেশ। তা ছাড়া এই সব দলের সভ্যদের মধ্যে নানা মুনির নানা মত, শতকরা আশী জন নেতা কুড়ি জন কর্ম্মী—ভাঙতে ওস্তাদ—গড়তে তার্কিক। এই সব নানা প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে বাংলাদেশে সৈন্যদল গঠন করা বড় সোজা কথা নয়। এই সব কারণে বাংলাদেশে টেরিটোরিয়াল ফোর্স গঠন করতে হলে প্রথমেই গবর্ণমেণ্টকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। গবর্ণ-

মেন্টকে শক্তিশালী করতে হলে দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-সমূহের উচিত গবর্ণমেন্টের সহযোগিতা করা—ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করতে হলে দেশে চাই যথেষ্ট সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত সৈনিক, আর সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত সৈনিক গড়ে তুলতে হলে উপরোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক।

(খ) গবর্ণমেন্ট এবং বাংলাদেশের প্রত্যেক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মধ্যে বাছাই করে সামরিক শিক্ষার জন্য মাসে দুদিন অর্থাৎ বৎসরে চব্বিশ দিন বেতনসহ ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে। এই কোর্সের মেয়াদ হওয়া উচিত পাঁচ বৎসর।

(গ) আপিসের বড়বাবু, ছোটবাবু এবং সাধারণ কেরানী একসঙ্গে সামরিক শিক্ষা লাভ করবে। দেশের কাজে এখানে মান-অপমান সব ভুলে যেতে হবে। এই সব ভদ্রলোকের শিক্ষার জন্য রেগুলার আর্মির কমিশন্‌ড্ এবং নন-কমিশন্‌ড্ অফিসারদের মধ্য থেকে Instructor বা শিক্ষক নিযুক্ত থাকবেন। বিলিতি পল্টনের অবসরপ্রাপ্ত বুনো কর্ণেল, মেজর, ক্যাপ্টেন এবং সরকারী বেসরকারী আপিসের বড়কর্তারা রেগুলার আর্মির সাধারণ এক জন সার্জেন্ট ইন্‌স্ট্রাকটারের অধীনে সামরিক শিক্ষালাভ করতে লজ্জা বোধ করেন না। ষাট বৎসরের এক জন কর্ণেল প্যারেডের সময় 'এটেনশান' অবস্থায় হাতের আঙুল একটু নেড়েছেন—অমনি সার্জেন্ট চীৎকার করে উঠল—"Sir, stop moving your b'oody finger"। কর্ণেল তৎক্ষণাৎ তাঁর আদেশ পালন করলেন। এই রকম আদেশ শুনলে আমাদের দেশের আপিসের বড়বাবুর রক্ত হয়ত মাথায় চড়ে উঠবে।

(ঘ) এই অতিরিক্ত সৈন্যদলের সামরিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করবার জন্য এদেশের ছোট-বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান-সমূহের বাৎসরিক লভ্যাংশের উপর শতকরা এক টাকা হারে কর ধার্য্য করে "ভারতীয় জাতীয় সমরশিক্ষা ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য।

(১৬) ১৯১৮ সালে মেসোপটেমিয়ায় "কুট-এল্-আমারা" নামক স্থানে ব্রিটিশ এবং ভারতীয় অ-বাঙালী অফিসার দ্বারা একটি বিরাট সামরিক মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে ৪৯তম বেঙ্গলী রেজিমেন্টের সিপাহীদের physical examination বা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই পরীক্ষা নিম্নলিখিত ভাবে হয়েছিল :—

(ক) প্রত্যেক সৈনিককে পুরো ইউনিফর্মে এবং সৈনিকের 'কিট' যথা—খাকি হাপ্‌প্যান্ট, কোট, হ্যাট, মোজা, বুট, পট্টি, বন্দুক, সঙ্গীন, গুলিভর্ত্তি ব্যাণ্ডোলিয়ার, জলভর্ত্তি ওয়াটার বট্‌ল, নানা জিনিষে ভর্ত্তি হ্যাভারস্যাক, ছোট একটা কোদাল এবং পিঠে একটা মোটা কম্বল বহন করতে হবে।

(খ) দশ কি পনর মাইল ঠিক মনে পড়ছে না, উঁচুনীচু জায়গা দিয়ে কখনও বা রাস্তা দিয়ে মার্চ্চ করতে হয়েছিল। রাস্তার মধ্যে মার্চ্চ করবার সময় জল পান করবার হুকুম ছিল না। রেজিমেন্টের এ বি সি ডি এই চারটি কোম্পানীকেই (কোম্পানীর সিপাহী থেকে সুবেদার মেজরকে পর্য্যন্ত) পরীক্ষায় যোগ দিতে হয়েছিল। ব্রিটিশ অফিসাররা অবশ্য ঘোড়ায় চড়ে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। যারা অসুস্থ, অথবা ক্যাম্পে ডিউটিতে ছিল তাদের পরীক্ষায় যোগদান করতে হয়নি। মেডিক্যাল বোর্ডের প্রধান কর্ত্তা ঘড়ি দেখে মার্চ্চ করবার হুকুম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মার্চ্চ সুরু হ'ল। সকালের দিকে এই পরীক্ষা হয়েছিল। চারটি কোম্পানী পর পর মার্চ্চ করে চলেছে। মাথার উপর প্রচণ্ড রোদ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মার্চ্চ করে ক্যাম্পের দিকে ফিরে আসবার সময় দেখা গেল রাস্তার মধ্যে ছেলেদের 'fall out' আরম্ভ হয়েছে। সে একটা বিশ্রী ব্যাপার। টপাটপ লাইন থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেরা রাস্তার দু'পাশে শুয়ে পড়ছে। ভারতীয় ও ব্রিটিশ অফিসাররা ছেলেদের উৎসাহ দেবার জন্য চীৎকার করছেন। এক লাইন থেকে অন্য লাইনে দৌড়াদৌড়ি করছেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে— অনেক ছেলের মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে, কেউবা জল খাচ্ছে, অনেকেই বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, পিঠ থেকে কম্বল সরিয়ে ফেলেছে—আবার কেউ কেউ বা নিজেদের বুক ও পেট চেপে ধরে রাস্তায় বসে পড়ছে আর বলছে "সার আর পারছি না"। রাস্তার দু'ধারে দলে দলে ছেলেরা সব শুয়ে, বসে হাঁপাচ্ছে। ক্যাম্পে এসে যখন আমাদের মার্চ্চ শেষ হ'ল, তখন দেখা গেল পল্টনের প্রায় অর্দ্ধেকসংখ্যক ছেলে 'fall out' করেছে। দুঃখে, রাগে ও অপমানে সমস্ত শরীরে আমার জ্বালা ধরে গিয়েছিল এটুকু বেশ মনে পড়ে। যারা ক্যাম্পে এসে পৌঁছাতে পেরেছিল ডাক্তার সাহেবেরা তাদের পুনরায় নাড়ী-পরীক্ষা করেছিলেন।

এই মেডিক্যাল বোর্ডের রিপোর্ট লণ্ডনে ও ভারতে কি ভাবে গিয়েছিল তা জানা যায় নি, তবে বাঙালী পল্টনের অফিসার কমাণ্ডিঙের একখানা চিঠি পড়লেই কতকটা অনুমান করা যেতে পারে। পত্রখানির কিয়দংশ এই—

"When it comes, however, to furthering appeals for the formation of further Bengalee Regiments, I consider that the Association is going beyond its province, and I certainly would not allow my name to be associated in any way with such a movement.

Moreover you and all the old soldiers of The 49th Bengalis must be well aware that the Battalion was not a success in Mesopotamia, and

that I personally expressed my opinion quite clearly that the Bengali was not good material for front line soldiering.

Those of you, and you yourself are possibly one of them, who were present at the physical examination of the Battalion by a Board of Officers assembled for the purpose at Kut in 1918, must know quite well how adverse the report of that Board was, and how lamentably the Battalion failed to pass the very easy test provided."

(গ) ইংরেজের এই মেডিকাল বোর্ড বসানোর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীদের সৈন্যবাহিনী থেকে সরিয়ে নেওয়া। —কাজ ফুরালে পাজী।

(ঘ) বাঙালী শিক্ষিত সৈনিকেরাও দেশে ফিরে আসবার এই একটা মস্তবড় সুযোগ পেয়েছিল। আমি জানি বহু ছেলে ইচ্ছে করে এই পরীক্ষায় 'fall out' হয়েছিল। কেমন করে 'fall out'-এর অভিনয় করেছিল তাই ব'লে অনেক ছেলেকে বাহাদুরি নিতে দেখা গেছে। শিক্ষিত বাঙালী সৈনিকেরা বুঝতে পারলে না, বাংলাদেশকে তারা সেই সময় দুনিয়ার লোকের চক্ষে কতটা হেয় করে তুলেছিল। বাঙালী নেতারা এই সব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের বাঙালী ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধ শেষ হলে ইংরেজ ভারতবাসীদের স্বায়ত্তশাসন দেবে এই ভরসায়।

(১৭) বাংলাদেশের নেতারা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ণধারা, কলিকাতা এবং বাংলার জেলা-শহরগুলিতে সভা করে এবং খবরের কাগজে প্রচার করে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত, মূর্খ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বৈশ্য, শূদ্র, ধোপা, নাপিত, মুসলমান, খ্রীষ্টান, স্কুল-কলেজের ছাত্র, থিয়েটারওয়ালা, যাত্রাওয়ালা, মুদি, কেরাণী, উকিল, জমিদার এবং কৃষক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর প্রার্থীকেই সৈন্যদলে ভর্ত্তি করতে আরম্ভ করলেন। দলে দলে ছেলেরা কলিকাতায় এসে রংরুট আপিসে ভর্ত্তি হতে লাগল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নৌশেরা এবং করাচী ব্যারাকে সামরিক শিক্ষালাভ করে যুদ্ধেও গেল। বাংলার নেতারা বাঙালী যুবকদের সেই সময় নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে পল্টনে ভর্ত্তি করেছিলেন, কিন্তু বাঙালী পল্টন ভেঙে দেবার পর বহু বাঙালী শিক্ষিত যুবকের ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

(১৮) লোকের কাছে বাহবা পাবার আশায় অথবা যুদ্ধের সময় একটা উত্তেজনার বশে এই ভাবে সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক একটি সৈন্যদল গঠন ক'রে—পরে ভেঙে দেওয়া হবে এ ধরণের পরিকল্পনা বর্ত্তমান লেখকের নয়। বাংলাদেশে যাতে স্থায়ী সৈন্য সংগ্রহ, সৈন্যদল গঠন, সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন এবং সৈনিক বংশ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়—এই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

১৯। স্থায়ী বাঙালী ব্যাটেলিয়ন গঠন করতে হলে নিম্নলিখিত ধরণের রংরুট-নীতি অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন :—

(ক) "ঘাস-বিচালির" দেশেই আমাদের যেতে হবে। নমঃশূদ্র, রাজবংশী, বাগ্‌দী, সাঁওতাল, মাহিষ্য, মুসলমান প্রভৃতি চাষীসম্প্রদায় থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে। এই সব সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে সৈনিক হবার গুণ যথেষ্ট আছে। দেহে শক্তি আছে, রোদ, জল, ঝড় সহ্য করে কাজ করবার ক্ষমতাও এরা রাখে। এরাই হবে প্রকৃত আজ্ঞানুবর্ত্তী। এরা সাধারণতঃ গরীব ও মূর্খ। এরা উত্তেজনাপ্রবণ নয়। ভারতীয় পল্টনের সৈনিকের বেতনেই এরা সন্তুষ্ট থাকবে। জীবিকার উপায় হিসাবে সহজ সৈনিক-জীবন গ্রহণ করতে এরাই সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সৈনিক বংশের ন্যায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এই সব সম্প্রদায় সৈনিক বংশে পরিণত হবে।

(খ) "বেঙ্গল হাইল্যাণ্ডার্স" বলে দুর্দ্দান্ত সৈন্যদল গঠন করতে আমাদের বেশী দূর যেতে হবে না। বাংলার অধীনে পার্ব্বত্য-অঞ্চলের অধিবাসী—গুর্খা, কোচ, কোল, ভীল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

(গ) আর একটি সম্প্রদায় থেকে সৈন্যদল গঠন করা যেতে পারে। বাংলায়ও বাংলার বাইরে বহু আশ্রম আছে—সেখানে বিভিন্ন কারণে সমাজ-পরিত্যক্ত বহু বাঙালী শিশু-সন্তান প্রতিপালিত হয়। এই সব শিশুসন্তানকে মানুষ করে, সৈন্যদলে ভর্ত্তি করে রাষ্ট্রের এবং সমাজের উন্নতিসাধন করা দরকার। এদের জন্য বাংলাদেশে একটি আলাদা 'কলোনি' বা আবাসভূমি স্থাপন করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে ভবিষ্যতে এদেরই বংশ সৈনিক-বংশ বলে গণ্য হতে পারবে। বাংলায় বাঙালীর আশ্রম ছাড়া অন্যান্য জাতির বহু অনাথাশ্রম আছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের শিশু-সন্তানদের সৈন্যদলে ভর্ত্তি করে এদের জীবনের মান উন্নত করতে হবে।

(২০) ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়নের সমর-দপ্তরের নির্দ্দেশ অনুসারে পশ্চিম বাংলার গবর্ণমেণ্টকেই বাঙালী পল্টনের সৈন্যসংগ্রহের ভার গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশে প্রত্যেক জেলায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, স্থানীয় কয়েকজন জমিদার, ধনী ব্যবসায়ী এবং (তিন অথবা চারটি মিলিত জেলার জন্য) এক জন সামরিক কমিশনড অফিসারকে নিয়ে ডিষ্ট্রিক্ট রিক্রুটিং কমিটি গঠন করা আবশ্যক। এই কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে জেলার ভৌগোলিক অবস্থান এবং গ্রামের লোকসংখ্যা অনুসারে ২০।২৫টি গ্রাম একত্রিত করে, গ্রামের মোড়লদের নিয়ে এক একটি "Village Recruiting Committee" বা গ্রাম রংরুট কমিটি গঠন করতে হবে। প্রত্যেক গ্রামেই এক জন করে মোড়ল বা মাতব্বর থাকে, যার কথা সাধারণ

চাষীরা মেনে চলে। এই সব মোড়লই হবে গ্রাম রংরুট কমিটির দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ।

স্বাধীন দেশের সৈন্যবাহিনীতে চাষী-সৈনিকের স্থান কোথায়, এবং চাষীর জীবিকা অর্জ্জনের পক্ষে সহজ সৈনিক-জীবন কিরূপ সহায়ক—গ্রামের মোড়লদের সে সম্বন্ধে আগে শিক্ষাদান করা নিতান্ত দরকার। গ্রামের মোড়লরাই কৃষকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করবে।

বাংলাদেশে সৈন্যসংগ্রহের এই ব্যবস্থা ততদিন চালু রাখতে হবে, যতদিন না বাংলায় একটি "সামরিক শিক্ষার ছাউনি" স্থাপন, সৈন্যসংগ্রহ, স্থায়ী একটি ব্যাটেলিয়ন গঠন ও সৈনিকদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় এবং চাষী-সম্প্রদায় জীবিকা অর্জ্জন হিসাবে সহজ সৈনিক-জীবন গ্রহণের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

(২১) গ্রামে কোন পরিবারে দু'জন যুবক থাকলে তাদের মধ্যে এক জনকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করে আর এক জনকে রাখতে হবে ক্ষেতের কাজ করবার জন্য। চার জন থাকলে দু'জনকে বাড়ীতে রেখে দু'জনকে সৈন্যদলে নিতে হবে। এমন ভাবে চাষীদের ভিতর থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে যাতে দেশের কৃষিকার্য্যের কোনরূপ ক্ষতি না হয়। এই সব কাজ ধীরে ধীরে করা দরকার। হঠাৎ যদি হুড়াহুড়া পড়ে এক দল সৈনিক ঢাকঢোল বাজিয়ে গ্রামের মধ্যে উপস্থিত হয় এবং সৈন্য-সংগ্রহের জন্য বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করে তো ফল উল্টো হতে পারে।

সৈন্যদলে ভর্ত্তি হলে মাসিক বেতন, প্রত্যেক মাসে বাড়ীতে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা, বাৎসরিক ছুটি, কার্য্য-শেষে পেন্‌সনপ্রাপ্তি, সরকারী ব্যয়ে খাওয়া-থাকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, ডাক্তার, ঔষধপত্র, ধোপা, নাপিত, ছুটিতে যাতায়াতের খরচ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় কৃষক-দের স্পষ্ট ভাবে বুঝাতে হবে। এই রংরুটদের উৎসাহ-দান করবার জন্য ভ্রাম্যমাণ সিনেমা বা চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা করা দরকার। গ্রাম রংরুট কমিটির মোড়ল-সভ্যদের মাসিক কিছু টাকা দেবার ব্যবস্থা করাও উচিত। গ্রামের যে মোড়ল খুব ভাল কাজ করতে পারবে তাকে একটা লাঙল, এক বলদ দিয়ে পুরস্কৃত করা উচিত। এর ফলে প্রত্যেক জেলার গ্রামে মোড়লদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাবে।

কোন একটি জেলা থেকে দু'শ কৃষক সৈন্যদলে ভর্ত্তি হবার জন্য এল, অমনি এদের নিয়ে ট্রেনে ষ্টীমারে চড়িয়ে হৈ চৈ করে সোজা কলিকাতা, ব্যারাকপুর অথবা বাংলার বাইরে কোন বড় শহরে সামরিক শিক্ষার জন্য পাঠানো মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ:—

(ক) এরা গ্রাম থেকে কলিকাতা পৌঁছবার পর ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেল মাত্র ১০০ শত জন উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে।

(খ) যে ১০০ শত জন 'unfit' বা অযোগ্য বিবেচিত হ'ল, তাদের গ্রামে ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে, এতে গবর্ণ-মেণ্টের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি এবং সময় নষ্ট হবে।

(গ) যারা পল্টনে রইল তাদের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠবে যখন দেখবে যে সঙ্গীরা গ্রামে ফিরে যাচ্ছে।

(ঘ) এই সব রংরুট সৈন্য শহরে রাখলে দুষ্ট লোকেরা এদের কানে নানা রকম কুমন্ত্রণা দিয়ে সৈন্যদল থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করবে।

(ঙ) গ্রামের রংরুট কমিটির আপিসে এই সকল রং-রুটের মেডিক্যাল এগজামিনেশনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

(চ) বাংলাদেশের মধ্যে শহর থেকে দূরে গ্রামের নিকটে একটা 'Traning camp' বা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে এই সব রংরুটের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

(২২) এই সব রংরুটের জন্য দু'বেলা ভাত, ডাল এবং তর-কারী—মাঝে মাঝে রুটী, মাছমাংস, এবং চিঁড়ে গুড় ইত্যাদি জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। দু'বেলা চাষীরা যাতে পেট ভরে খেতে পারে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

টিনের দুধ, ফল, চা, চিনি, পাঁউরুটি, বিস্কুট, মাখন, বাথ-সোপ, সিগারেট, গন্ধতেল, বাবু মোজা, চটি, টুথপেষ্ট, পাউডার, টাওয়েল প্রভৃতি এই সব রংরুটকে যেন দেওয়া না হয়।

যদি কোন প্রতিষ্ঠান এই পল্টনের সৈনিকদের কিছু দিতে চায় তা হলে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি দিতে পারে:—মোটা ধুতি, মোটা গেঞ্জি, গামছা, কাপড় কাচা সাবান, গায়ে ও মাথায় মাখবার সরিষার তেল, বিড়ি, দেশলাই ইত্যাদি। নানা রকম দেশী শাকসব্জীর বীজ এবং চারা কলম ইত্যাদি দিলে আরও ভাল হয়। এই সব জিনিষ তাদের গ্রামে পাঠিয়ে তারা চাষের উন্নতি করতে পারে। এতে একটা খুব ভাল ফল পাওয়া যাবে—সমস্ত চাষীর মধ্যেই সৈন্যদলে ভর্ত্তি হবার বিশেষ উৎসাহ দেখা যাবে।

(২৩) পশ্চিম বাংলার প্রত্যেক জেলা থেকে নিম্নলিখিত সংখ্যক লোক সংগ্রহ করে একটি বাঙালী পল্টন গঠন করা যেতে পারে।

	জেলা	রং-রুট সংখ্যা
১।	মেদিনীপুর	১০০
২।	বাঁকুড়া	৫০
৩।	হাওড়া	৫০
৪।	হুগলী	৫০
৫।	বীরভূম	৫০
৬।	বর্দ্ধমান	১০০
৭।	মুর্শিদাবাদ	১০০
৮।	নদীয়া	১০০
৯।	২৪ পরগণা	১০০

১০।	মালদহ	৫০
১১।	দিনাজপুর	৫০
১২।	জলপাইগুড়ি	১০০
১৩।	দার্জিলিং	১০০
	মোট	১০০০

প্রত্যেক জেলা থেকে নির্দিষ্টসংখ্যক লোক সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্য—

(ক) সৈন্যবাহিনীতে প্রত্যেক জেলার অধিবাসীদের সমান অধিকার।

(খ) একটি জেলা থেকে অধিকসংখ্যক লোক সংগ্রহ করলে উক্ত জেলায় চাষের ক্ষতি হতে পারে।

(গ) জেলার মধ্যে সৈন্যসংগ্রহের ব্যাপারে একটা কল্যাণকর প্রতিযোগিতার ভাব আনয়ন করা।

(ঘ) জেলা রংরুট কমিটির সভ্যগুলির কাজ সহজসাধ্য করে তোলা।

(২৪) প্রথম অবস্থায় এই অল্পসংখ্যক রংরুট সংগ্রহ করে একটি বাঙালী ব্যাটেলিয়ন গঠন করতে হবে। ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়নের অন্যান্য প্রদেশের স্থায়ী সৈন্যদলের ন্যায় এই ব্যাটেলিয়ানও রেগুলার আর্মিতে স্থান গ্রহণ করবে। রেগুলার আর্মির এই প্রথম বাঙালী পল্টনকে গড়ে তোলবার সময় খুব সাবধানতার প্রয়োজন হবে। রংরুটদের বাইরের লোকের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়। এই সব রংরুট যাতে সকল রকম সুখ-সুবিধা পায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। কারণ এই এক হাজার বাঙালী রংরুটই হবে ভবিষ্যৎ বাংলার রেগুলার আর্মির পথপ্রদর্শক। এই পল্টনের সৈনিকদের পুরো দু'বৎসর সামরিক শিক্ষালাভের পর প্রথমে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জেলায়, পরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে 'garrison duty' এবং সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শিক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকবে। এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় বাঙালী সৈন্যদল (রংরুট-সংখ্যা বাড়িয়ে ২০০০ করা উচিত) গঠিত হয়ে সামরিক শিক্ষা লাভ করবে। এই দ্বিতীয় দলের চাকুরীর মেয়াদ হবে মাত্র এক বৎসর। এই দলের সৈনিকেরা রেগুলার আর্মির প্রথম দলের সৈনিকদের মত সব সুযোগ-সুবিধাই পাবে, কিন্তু পেন্‌সন পাবে না। এতে দেশে শিক্ষিত সৈনিকের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং গবর্ণমেণ্টের পেন্‌সনের টাকাও বেঁচে যাবে। এই দ্বিতীয় দলের কার্য্যকাল পূর্ণ হলে তারা পুনরায় গ্রামে ফিরে যাবে—চাষবাসের কাজ করবে। এমনি ভাবে এক এক বৎসর অন্তর এক একটি দল সামরিক শিক্ষা লাভ করে গ্রামে ফিরে যাবে।

এই ভাবে বাংলাদেশে সমস্ত গ্রামের কৃষকদের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে এবং আর এক দিকে দেশের মাটির সম্পদকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তা হলে দেশে যত বড় যুদ্ধবিগ্রহই আসুক না কেন, বাংলায় বাঙালী সৈন্য-বাহিনীর অভাব হবে না।

বাংলাদেশের কৃষকেরা বংশপরম্পরায় যে আবহাওয়ার মধ্যে জীবন যাপন করে আসছে তাতেই তাদের আনন্দ ও শান্তি। চাষের জমি ও গ্রাম এদের সুখদুঃখের লীলানিকেতন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত গ্রামে বাস করেই এরা জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছে—বাইরের টানে এদের মন বড় টলে না।

আজ যদি হঠাৎ এদের গ্রাম থেকে বাইরে টেনে আনা হয় তা হলে সৈন্যদল গঠনে অসুবিধা হবে। মাটির মায়া ছেড়ে আসা বাঙালী কৃষকদের পক্ষে বড় কঠিন। এইজন্য বাংলাদেশের মধ্যেই শহর থেকে অনেক দূরে পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর স্থানে সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা উচিত—যাতে এই সব রংরুট মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে গ্রামে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখে আসতে পারে। আত্মীয়-স্বজনেরাও এখানে এসে এদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারে। তা হলে আত্মীয়বিচ্ছেদজনিত মনঃকষ্ট এদের অনেক কমবে। চাষীর জন্মগত অভ্যাসকে বজায় রাখবার জন্য শিক্ষাকেন্দ্রের সন্নিকটে বেশ কিছু জমি রেখে চাষের কাজও এদের দ্বারা করানো যাবে। এদের মধ্যে স্থায়ী বাঙালী ব্যাটেলিয়ন গড়ে তুলতে পারলে সুফল হবে এই যে, এদের পক্ষে পুরাতন আবহাওয়া থেকে ক্রমেই নূতন আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়ায়—গ্রাম থেকে জেলা-শহরে—শহর থেকে রাজধানী কলিকাতা, দিল্লী এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে।

সামরিক শিক্ষালাভের পর যোগ্যতা অনুসারে ল্যান্স-নায়ক থেকে সুবেদার মেজর প্রভৃতি পদ এই সম্প্রদায়ের সৈন্য-দলের মধ্যে থেকে হওয়া উচিত।

(২৫) ইংরেজ আমলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে বাংলা-দেশের গ্রামের। ইংরেজ গ্রামের দিকে একবারও তাকিয়ে দেখে নি, বা সেগুলোর কোন রকম উন্নতিসাধনের চেষ্টাও করে নি, গ্রামগুলোকে তারা শ্মশানে পরিণত করে চলে গেছে; অথচ এই গ্রামই হচ্ছে বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড। শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করতে হলে প্রথমেই গ্রামের উন্নয়ন নিতান্ত দরকার। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত "পিলেবাহিনী" গঠন করলে চলবে না। বাঙালী নেতাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিশেষ করে চিন্তা করে তদনুরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য,—

(ক) পতিত জমি উদ্ধার।

(খ) চাষের জমির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সার যোগানো।

(গ) পুকুর, খাল, বিল ও নদীর উন্নতি সাধন করা।

(ঘ) রাস্তাঘাটেরই সুব্যবস্থা।

(ঙ) গৃহপালিত পশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা।

(চ) ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ করা।

(ছ) 'Mobile Hospital' বা চলন্ত হাসপাতালের (মোটর বাস এবং নৌকা সহযোগে) ব্যবস্থা।

(জ) গ্রামে পাঠশালার সংখ্যা বাড়ানো।

(২৬) আর একটা বিষয় সব সময় বাংলাদেশে নেতা'দের মনে রাখা উচিত—সেটা হচ্ছে সৈন্যবাহিনীর খাদ্য-সঞ্চয়-ব্যবস্থা। সৈন্যদলের খাদ্য এমন ভাবে সঞ্চয় করে রাখতে হবে যাতে অনির্দিষ্টকাল যুদ্ধ চললেও হাজার হাজার সৈনিকের খাদ্যাভাব না ঘটে।

(২৭) বাঙালী পল্টনের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা ও দায়িত্ব ভারত ডেমিনিয়নের হাতে থাকলেও বাংলায় বাঙালীদের এরূপ নূতন সৈন্যদল গঠনের কাজে এই সময় পশ্চিম বাংলার গবর্ণমেন্ট এবং নেতাদের সহযোগিতা নিতান্ত দরকার। রেগুলার আর্মির কমিশনড এবং নন্‌কমিশনড্ (Instructor) অফিসারদের উপর এই প্রথম বাঙালী সৈন্য-দলের শিক্ষার ভার দেওয়া উচিত। ভাষা বুঝিয়ে দেবার জন্য বাঙালী অফিসার দরকার হবে।

(২৮) তুচ্ছ রাজনৈতিক কারণে সৈন্যবাহিনীতে যাতে কোন বিদ্রোহ না হয় তার জন্য এক জাতির পল্টনে অন্য জাতির কমিশনড্ অফিসার রাখবার ব্যবস্থা করা উচিত। দেখা গেছে ভারতের বড় বড় ছাউনিতে ভিন্ন ভিন্ন জাতের পল্টন একসঙ্গে রাখবার ব্যবস্থা আছে। তার কারণ রাজপুত পল্টন যদি বিদ্রোহী হয়—গুর্খা পল্টনকে দিয়ে দমন করা যায়। গুর্খা পল্টন বিদ্রোহী হলে মারাঠা পল্টন দিয়ে দমন করা যেতে পারে।

(২৯) বাঙালী পল্টন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে "সামরিক মেডিক্যাল কোর"-ও গঠন করা কর্তব্য। ১৯ (গ)-বর্ণিত অনাথাশ্রমের মেয়েরা নার্সের কাজে উপযুক্ত হবে।

(৩০) বাঙালী পল্টনের সৈনিকদের শিক্ষার শেষে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন পল্টনের মধ্যে এক সঙ্গে রেখে 'garrison duty' দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। সব সময় সৈনিকদের এক স্থানে রাখা উচিত নয়। নানা দেশে পাঠালে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারে, তা ছাড়া সৈনিকদের মন প্রফুল্ল থাকে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। ব্রিটিশ সৈন্যদের রক্ত তাজা রাখবার জন্য ইংরেজ একটা চমৎকার উপায় বের করেছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সব সময় যুদ্ধ লেগেই থাকত। আফ্রিদিরা এক এক জন নেতার অধীনে পরিচালিত হ'ত এবং মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে লড়াই করত, আর সুযোগ পেলেই এরা ইংরেজ সৈন্যদের বন্দুক বা খাদ্যসামগ্রী লুঠতরাজ করে আত্মসাৎ করত। ব্রিটিশ সৈন্যদের এই সব প্রদেশে কিছুকালের জন্য রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল—উদ্দেশ্য আফ্রিদি দমন এবং যুদ্ধ-শিক্ষা—এক সঙ্গে দু'কাজই চলত।

যদিও সৈন্যদলের সকল দায়িত্ব ভারত-গবর্ণমেন্টের, তাই বলে বাংলাকে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার ন্যায় সামরিক শিক্ষাও বহুমুখী। বহু বাঙালী ধনী বিশ্ববিদ্যালয়কে অজস্র টাকা দান করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তেমনি বাঙালীদের সামরিক শিক্ষার জন্য অর্থ দান করে বিত্তশালী বাঙালীরা কীর্তিমান হয়ে থাকতে পারেন। বাংলায় স্থায়ী সৈন্যদল গঠনের কাজে বাঙালী লেখকদেরও লেখনী পরিচালনা করে দেশবাসীকে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

প্রায় দুই শত বৎসর পরাধীনতার জন্য বাঙালী জাতির মধ্যে যে জড়তা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তা দূর করতে বহু চিন্তা, নানা পথের সন্ধান, বহু অর্থব্যয়, পরিশ্রম এবং সময়ের প্রয়োজন। শিখ, পঞ্জাবী, গুর্খা, মারাঠী এবং রাজপুত সৈন্যেরা ইংরেজ রাজত্বের গোড়া থেকেই এ পথে এগিয়ে চলেছে—আজ বাঙালী জাতিকেও ইংরেজ রাজত্বের অবসানে সামরিক সংগঠনের দিক দিয়ে নূতন পথে যাত্রা সুরু করতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে বাঙালী জাতির মস্তিষ্ক ও বাহুর মিলিত শক্তিতে পৃথিবীর মধ্যে একটি বিরাট এবং শ্রেষ্ঠ সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠবে—এ আশা অসঙ্গত নয়।

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

শনিবার প্রাতঃকালে হোবার্ট ত্যাগ করিয়া দুই গাড়ী বোঝাই হইয়া চলিয়াছি। এক গাড়ীতে রবিনসন, উড, করেষ্টার ও আমি। আমার সহযাত্রীরা সকলেই সদালাপী। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া ডার ওয়েন্ট নদীর তীর ধরিয়া চলিয়াছি। সুন্দর দিন। সুন্দর দৃশ্য। দুই-এক স্থানে ধূসর এবং কৃষ্ণ হংস-শ্রেণী দেখিলাম। রবিনসন ভারতবর্ষের কথা তুলিলেন। উড বলিলেন, "আজকের কাগজ দেখিয়াছেন কি? ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ওয়াভেলের স্থলে মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতবর্ষের বড়লাট নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ১৯৪৮এর ১৫ই জুনের মধ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।"

আমি—"যত দূর জানি ওয়াভেলের উপর ভারতবর্ষের কংগ্রেস-নেতাদের বেশ আস্থা ছিল। তবে ভারতবর্ষে এখন দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে।"

রবিনসন তাঁহার বাল্যকালের কথা তুলিলেন। বলিলেন,

"আমার পিতা আফগান-যুদ্ধে সেনাপতি লর্ড রবার্টসের এক জন সহকর্মী ছিলেন। আমার জন্ম হয় টাসম্যানিয়ায়। কিন্তু জীবনের প্রথম চার বৎসর আমি ভারতবর্ষে অতিবাহিত করি। কান্দাহার, রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর প্রভৃতি শব্দ তখন আমাদের পরিবারে সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতাম।"

একটু ভাবিয়া বলিলেন, "এখনও বোধ হয় দু-চারিটি হিন্দুস্থানী কথা স্মরণ করিতে পারি। সহস্। বাবুর্চ্চি। খিদমদ্‌কার। ঠিক বলিতেছি ত?"

একটু থামিয়া সলজ্জ ভাবে হাসিয়া বলিলেন, "আর যে দু-একটা কথা মনে পড়িতেছে সেগুলি বোধ হয় গালাগালি। যেমন, শূয়ারকা বাচ্চা। একবার ভারতবর্ষে যাইয়া আমার বাল্যস্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা আছে।"

হোবার্ট হইতে প্রায় দশ মাইল আসিয়া পড়িয়াছি। অদূরে চকোলেট, কোকো প্রভৃতি প্রস্তুতকারক ক্যাডবেরী কোম্পানীর কারখানা। কারখানাটির চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর; নিকটে ক্লিয়ার মণ্ট শহর। পাশ দিয়া আড়াই ফুট গেজের রেলগাড়ী চলিয়াছে। পরে বেয়া শহর। সেখানে অষ্ট্রেলিয়ান নিউজ প্রিণ্ট মিল অবস্থিত। এখানে প্রচুর খবরের কাগজ প্রস্তুত হয়। কাছেই নিউ নরফোক শহর। পরে গ্রেটনা গ্রীন ও হ্যামিলটন নামক দুইটি গ্রাম অতিক্রম করিলাম। এ সব স্থানের দৃশ্য ও আবহাওয়া নাকি স্কটল্যাণ্ডের মত। মাঝে মাঝে হপ্‌স্ বৃক্ষের কুঞ্জ ও বড় বড় আপেলক্ষেত। একটি গৃহস্থের বাড়ী সুদীর্ঘ পপ্‌লার বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা ঘেরা। বৃক্ষশ্রেণী যেন ব্যূহবদ্ধ হইয়া উন্নত শিরে পবনদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। শীর্ণা 'উজ' নদী পার হইয়া একটি চটিতে চা পান করিলাম।

পরে 'নাইভ' নদী পার হইলাম। তারপর রাস্তার দু'ধারে বিস্তীর্ণ বিরাটকায় ইউক্যালিপটাস্ বা গাম গাছের জঙ্গল আরম্ভ হইল। পাহাড়গুলিও এখন বড়। ক্রমশঃ জঙ্গলের চেহারা বদলাইল। এখন ওয়াট্যাল, সাসাফ্রাস ও ফার্ণ গাছই বেশী। মধ্যাহ্নে টেরেলিয়া শ্যালেটে উপস্থিত হইলাম। শ্যালেট অনেকটা আমাদের ডাক-বাংলো বা সার্কিট-হাউসের মত। এখানে 'ইওলো সাইপ্রাস্' বা স্বর্ণলতার বেড়া বড়ই মনোরম লাগিল। টেরেলিয়া শ্যালেট একটি খাড়া পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত। পাহাড়ের নীচে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কেন্দ্র—উপর হইতে ক্ষুদ্র কুটিরের মত দেখায়। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বাহির হইয়া পড়িলাম। সরিষা ফুলের মত একপ্রকার হলুদ ফুলে জঙ্গল ভর্ত্তি। ক্রমশঃ বাটলার্স গর্জে উপস্থিত হইলাম। অদূরে লেক, সেণ্ট ক্লেয়ার। গর্জের ভিতর দিয়া জল সবেগে নামিতেছে। সেখানে একটি বাঁধ তৈরি হইতেছে। অদূরে পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া সেগুলিকে ক্রেনে করিয়া ট্রেনের মধ্যে ঢালিয়া রেলপথে একটি মিশ্রণকারী যন্ত্রের মধ্যে ঢালা হইতেছে। সেখানে কংক্রিট প্রস্তুত হইয়া যন্ত্রসাহায্যে বাঁধের উপর পতিত হইতেছে।

ওয়াডামানা শক্তিগৃহের সম্মুখে

এইরূপে কংক্রিটের বাঁধটি গাঁথিয়া তোলা হইতেছে। বাঁধটির নাম নিউ ক্লার্ক বাঁধ। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সমস্ত দেখিলাম। পরে আবার টেরেলিয়ায় ফিরিলাম। সেণ্ট ক্লেয়ার হ্রদ হইতেই ডার ওয়েণ্ট নদীর উৎপত্তি। বাটলার্স গর্জের নিকট হইতে ডার ওয়েণ্টের জল টেরেলিয়া পর্য্যন্ত আনা হইতেছে। কাজেই ডার ওয়েণ্ট এখানে ক্ষীণকায়া। জলের রকমারি বাহন। কখনও কংক্রিটের খাল, কখনও লোহার চোঙ, কখনও একুইডাক্ট এবং যেখানে জল উপরে উঠাইতে হইতেছে সেখানে ইনভার্টেড সাইফন। এইরূপে জল টেরেলিয়ায় আনিয়া তত্রত্য খাড়া পাহাড়ের গা দিয়া ৮৫৫ ফুট নীচেকার শক্তিগৃহে প্রেরণ করা হইতেছে। টেরেলিয়ায় ফিরিয়া রাত্রে নীচে নামিয়া শক্তিগৃহ দেখিতে গেলাম। শ্যালেটের উচ্চতা ১৯৫৫ ফুট। যেখানে শক্তিগৃহ অবস্থিত তাহার উচ্চতা ১১০০ ফুট। জল পাহাড়ের মাথা হইতে ৮৫৫ ফুট নীচে পড়িতেছে। শক্তিগৃহে পাঁচটি টারবাইন। তিনটি চলিতেছে। টারবাইন ঘুরাইয়া দিয়া জল নামিয়া যাইতেছে। 'নাইভ' নদীর ভিতর দিয়া এই জলরাশি আবার ডার ওয়েণ্টকে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে। রাত্রে শ্যালেটেই ঘুমাইলাম। এখানে বেশ শীত। ঘরে বিদ্যুৎ-উত্তাপক জ্বালাইয়া রাখিতে হইল। ঐ দিন মোট ৯৫ মাইল পথ চলিয়াছি। হোবার্ট হইতে 'উজ' ৫৫ মাইল। উজ হইতে টেরেলিয়া ২৫ মাইল। টেরেলিয়া হইতে বাটলার্স গর্জ ১৫ মাইল। বাটলার্স গর্জ হইতে টেরেলিয়া ফিরিতে এই ১৫ মাইল পথ দ্বিতীয় বার অতিক্রম করিয়াছি।

পরদিন রবিবার প্রাতরাশের পর বাহির হইয়া পড়িলাম। জলশূন্য বন্ধুর 'নাইভ' উপত্যকার ভিতর দিয়া চলিয়াছি। দূর হইতে একটি শিশু দৃষ্টিগোচর হইল। নিশ্চয়ই রাস্তার কোন

চৌকিদার নিকটে ঘর বাঁধিয়া আছে। এ তাহারই শিশু। যে রাস্তা দিয়া চলিয়াছি, তাহার নাম 'মিসিংলিঙ্ক' বা হারানো

টাসম্যানিয়া মালভূমিতে সঙ্গীগণসহ লেখক

যোগসূত্র। রাস্তাটি নাকি উত্তর ও পশ্চিম উপকূলগামী রাস্তাদ্বয়কে সংযুক্ত করিয়াছে। একটি সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়িলাম। ইহার নাম 'ওয়াইল্ড ডগ প্লেন্‌স' বা পাগলা কুকুরের সমভূমি। চারিদিকে পাহাড় ও জঙ্গল। জঙ্গলের মাঝখান দিয়া চলিয়াছি। প্রথমে ছোট ছোট পাইন গাছ, পরে বড় বড় ইউক্যালিপটাস বা গাম গাছের জঙ্গল। এই জঙ্গলে কতকগুলি মেষ চরিতেছে। ইউক্যালিপটাস জঙ্গলের যেন শেষ নাই। ঠিক যেন ঝাড়গ্রামের শালবনের মত। লম্বা লম্বা গাছ সোজা উঠিয়া গিয়াছে; খুব মোটা ও সুগোল। দেখিতে বড় ভাল লাগে। গাছগুলিকে স্বল্পায়াসে মারিয়া ফেলিবার জন্য তাহাদের গোড়ায় আংটি কাটিয়া রাখা হইয়াছে। শিকড়গুলি মাটি হইতে যে রস টানিতেছে তাহা আর এই আংটির উপরে উঠিতে পারিতেছে না। ফলে গাছগুলি শুকাইয়া মরিতেছে। নগ্ন অনাহারক্লিষ্ট গাছগুলি পঞ্চাশের মন্বন্তরে লঙ্গরখানার সামনে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বাঙালীর মত হাত বাড়াইয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এখানে ভূমি নীরস। মাটির সমস্ত রসটুকুই যদি গাম গাছগুলি টানিয়া লয় তবে ঘাস জন্মায় না। ফলে মেষগুলি খাইতে পায় না। ঘাসের বৃদ্ধির জন্যই গাম গাছগুলিকে এভাবে মারিয়া ফেলা হইতেছে। গাছগুলিকে এত উপর হইতে নীচে লোকালয়ে লইয়া গেলে খরচ পোষায় না। তাই বড় বড় সুদৃশ্য গাছগুলিকে ধ্বংস করিবার এই স্বল্পব্যয়সাধ্য উপায় অবলম্বন করা হয়। জ্বালানি কাঠ করিবে সেরূপ লোকও এখানে নাই।

আমরা গ্রেট লেকের পার ধরিয়া শ্যানন শক্তিগৃহে পৌঁছিলাম। এখানে একটি শক্তিগৃহে তিনটি কল। শক্তিগৃহটি খাড়া পাহাড়ের গোড়ায়। পাহাড়ের মাথা হইতে নলের সাহায্যে শক্তিগৃহে জল নামানো হইতেছে। চাকা ঘুরাইয়া দিয়া জল খাল দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে নাকি একটি নববিবাহিতা যুবতী স্বামীর সহিত 'মধুচন্দ্র' যাপনার্থ এখানে আসিয়া এই খালে পড়িয়া গিয়া সলিল-সমাধি লাভ করেন। লোকে এখনও সেকথা স্মরণ করে। এখানকার জল খাল দিয়া ওয়াডামানায় নীত হইতেছে। এখান হইতে আমরাও ওয়াডামানায় পৌঁছিলাম। তখন মধ্যাহ্নকাল।

ওয়াডামানা শক্তিগৃহটি একটি ক্ষুদ্র সমতল উপত্যকায় অবস্থিত। উপত্যকাটির চারিদিকই পাহাড়ে ঘেরা। সবুজ বৃক্ষশ্রেণী পাহাড়গুলির সানুদেশকে যেন ভেলভেটে মুড়িয়া রাখিয়াছে। এখানে দুইটি শক্তিগৃহ। একটিতে নয়টি টারবাইন, অপরটিতে তিনটি। এখানে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। উপত্যকাটি বড় মনোরম। ভোজনের পর উপত্যকা-ভূমিতে অনেকক্ষণ পায়চারি করিলাম। সহসা দেখি একটি পাহাড়ের গায়ে একটি রামধনু লাগিয়া রহিয়াছে। মনে হইল আগাইয়া গেলে রামধনুটিকে হাত দিয়া ধরিতে পারিব।

বাটলার্স গর্জের নিকট পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া ক্রেনের সাহায্যে রেলগাড়ীতে তোলা হইতেছে।

দণ্ডায়মান (বামদিক হইতে)—রিচার্ডসন, রবিনসন, নাইট কেনেলি, লেখক—দূরে আলাপরত ফিটজিরাল্ড ও উড্

ওয়াডামানা ত্যাগ করিয়া আমরা অপরাহ্ণে গ্রেট লেকের তীরে 'মিয়েনা' হোটেলে পৌঁছিলাম। হোটেলটি একতলা পনর-ষোলটি ঘর। বারান্দার নীচেই দিগন্তবিস্তৃত হ্রদ। হ্রদের মধ্যে একটি ছোট পাহাড়। হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে একটি বড় বাঁধ। তাহার উপর ঘুরিয়া বেড়াইলাম। বাঁধটি ১১৮০ ফুট দীর্ঘ। বাঁধে চল্লিশ ফুট চওড়া সাতাশটি খিলান এবং পার্শ্বরক্ষার্থ এক শত ফুট গাঁথুনি আছে। এই বাঁধের ভিতর দিয়া হ্রদের জল শ্যানন শক্তিগৃহে নীত হইতেছে। এই স্থানে বহুলোক বঁড়শি দিয়া মাছ ধরিতে আসে। এই কোটোটি

ভ্রমণবিলাসীদের একটি বড় আড্ডা। বাঁধের ওপারে মাছের পোনা পালন করিবার কয়েকটি অগভীর পুকুর। সেখান

হক্‌সবেরি নদীর পুলের উপর দণ্ডায়মান, সান্তাল মহাশয় ও লেখক

হইতে এদেশে পোনা সরবরাহ করা হয়। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছোট ছোট পোনাগুলির সন্তরণলীলা দেখিলাম। হোটেলের বারান্দা হইতে হ্রদ, পাহাড় ও বাঁধের দৃশ্য পরম মনোজ্ঞ।

আমাদের জলবিদ্যুতের কাজগুলি দেখা শেষ হইয়াছে। কয়েক দিন যাবৎ সঙ্গীদের সঙ্গে একত্র ঘুরিয়াছি, একত্র খাইয়াছি, একই গৃহে শয়ন করিয়াছি। রবিনসন, উড এবং ফরেষ্টার বড় রসিক। ইঁহারা পথে নানা গল্পগাছা করিয়া আড্ডা বেশ জমাইয়া রাখিয়াছেন। মাঝে মাঝে সমস্বরে চীৎকার করিয়া গানও ধরিয়াছেন। একবার যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্তদের গান জুড়িয়া দিলেন। একবার আমার নামে গান রচনা করিয়া গাহিলেন। একবার এ টি গান ধরিলেন, তাহার ভাবার্থ—

সে এত রূপ লইয়া জন্মিল কেন?

সে আদৌ জন্মিল কেন?

এই সব বিষয়ে উডই অগ্রণী। তাহার উৎসাহ অফুরন্ত।

রবিবার রাত্রে ভোজনের পর হোটেলের লাউঞ্জে জোর আড্ডা চলিল। উড দিবাভাগে একটি রস-রচনা লিখিয়াছেন। তিনি এই মৌলিক রচনাটি পাঠ করিলেন। আমাদিগের প্রত্যেককেই তাহার সমালোচনা করিতে হইল। দেখিলাম বৃদ্ধ ফিট্‌জিরাল্ড এবং কেনেলিও কম রসিক নন। কেবল বৃদ্ধ সেক্রেটারী রিচার্ডসন বরাবর তাঁহার বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন আর নাইট সসম্ভ্রমে দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর হোটেল ত্যাগ করিয়া হোবার্ট অভিমুখে রওনা হইলাম। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া ছুটিয়াছি। পথে একটি ছোট শহরের মত গ্রাম। নাম বথওয়েল। এখানে ক্যাস্‌ল হোটেলে লঘু জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিপ্রহরে নিউ নরফোক শহরে পৌঁছিলাম। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন করিলাম। ফরেষ্টারের সঙ্গে ক্যামেরা ছিল। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের ছবি লইতেছিলেন। আমাকে চারিটার মধ্যে হোবার্ট পৌঁছিতে হইবে। আমাদের গাড়ী মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরই ছাড়িবে। কমিশনের সভ্যগণ ঐ দিন নিউ নরফোকে থাকিয়া যাইবেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর রবিনসন ও আমি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিউ নরফোক হইতে রওনা হইলাম।

হোবার্টে পৌঁছিয়া প্রথমেই রবিনসনের সঙ্গে ট্রেজারীতে গেলাম। সেখানে বিন্‌স ও অস্‌বোর্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কানাডার অর্থ-বিভাগের কার্য্য দেখিতে বিন্‌স. আগামী বৎসর অটোয়া যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহাকে অটোয়ার আপিসগুলির বিবরণ দিলাম, তত্রত্য কর্ম্মচারিগণের নাম ও ঠিকানা দিলাম। পরে ইহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলাম এবং প্রধান মন্ত্রী কস্‌গ্রোভকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিয়া বিমানের নগরস্থিত আপিসে পৌঁছিলাম। বেলা চারটায় হোবার্ট হইতে বিমানঘাঁটির দিকে রওনা হইলাম। বিমানে টাসম্যানিয়ার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত উড়িয়া সমুদ্রে পড়িতে হইবে। বিমান হইতে টাসম্যানিয়ার অভ্যন্তরস্থ পর্ব্বতসঙ্কুল মালভূমি ও তদুপরি গ্রেট লেক দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সমুদ্রের মধ্যে সূর্য্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য দেখিলাম। পশ্চিম আকাশ পরিষ্কার। দিগন্তের একটু উপরে কোদালে মেঘের সজ্জা। কোদালে মেঘগুলি যেন মণিমুক্তা-খচিত সোনার ঝালর। সূর্য্য ধীরে ধীরে সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করিলেন। নীচে নামিয়াও যেন আকাশের মেঘমালার পানে তাকাইয়া আছেন। মেঘমালা তখনও তাঁহারই অনুরাগের রঙে রঞ্জিত। ধীরে ধীরে মেঘের নীচেকার অংশ গাঢ় লাল হইল। রক্তিমাভা ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। অবশেষে মেঘ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। যেন তাহার উপর কেহ কালি লেপিয়া দিয়াছে।

বিমানে বসিয়া সংবাদপত্রে দেখিলাম, কেসি মহাশয় ব্রিটিশ সরকারের ১৯৪৮-এর ১৫ই জুনের পূর্ব্বে ভারতত্যাগের সঙ্কল্প-ঘোষণার প্রশংসা করিয়াছেন। রাত্রি আটটায় মেলবোর্ণের হোটেলে পৌঁছিলাম। ক্যানবেরার ট্রেজারী ডিপার্টমেণ্ট আমার জন্ত এই হোটেল ঠিক করিয়া সেকথা আমাকে টাসম্যানিয়ার ঠিকানায় জানাইয়া দিয়াছিলেন। হোটেলটির নাম 'হোটেল সিসিল'; শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

হোটেলে কেসি সাহেবের চিঠি আমার জন্ত অপেক্ষা

করিতেছিল। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁহার আপিসে যাইবার জন্য আমাকে লিখিয়াছেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সকালে প্রাতরাশের পর সহর দেখিতে বাহির হইলাম। শহরটি সুন্দর। কেন্দ্রস্থলে মার্কিণ প্রথায় সমান ও সমান্তরাল সারি সারি রাজপথ। বাড়ীগুলি সাধারণতঃ পাঁচ ছয় তলা। ঘুরিতে ঘুরিতে চিড়িয়াখানায় উপস্থিত হইলাম। পাখীর ঘরটি খুব ভাল লাগিল; চঞ্চল পাখীগুলির গায়ে রকমারি রঙের বাহার। অনেক প্রকারের ক্যাঙ্গারু দেখিলাম। দুইটি জানোয়ার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি প্লাটিপুস্, অপরটি এচেভন। প্লাটিপুস্ জীবজগতের ব্যতিক্রম। ইহা অণ্ডজ অথচ স্তন্যপায়ী। অণ্ডজ জীব যে স্তন্যপায়ী হইতে পারে তাহা ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতেন না। অষ্ট্রেলিয়ান প্লাটিপুস একদিন বৈজ্ঞানিক-জগতে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। এচেভন ছোট সজারুর মত। গায়ে কাঁটা ভর্ত্তি। আয়তনে বিড়ালের মত। ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম জানোয়ারসমূহের অন্যতম। সন্ধ্যায় সমুদ্র-তীরে বেড়াইতে গেলাম।

তখন সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে; কিন্তু দিনের আলো ঈষৎ কিছু রহিয়াছে। বেলাভূমি পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। নগর-কর্ত্তৃপক্ষ এখানে স্নানের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। বেলাভূমি প্রায় জনশূন্য। সমুদ্রে অল্প অল্প ঢেউ। দু-এক জন স্ত্রী-পুরুষ সমুদ্রে স্নান করিতেছে। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে শহরের দুইটি হাতা সমুদ্রের মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সহসা শহরের আলো জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল যেন বসুন্ধরা কাঞ্চনাভরণ খচিত হাত দুইটি জননী সিন্ধুর পানে বাড়াইয়া দিল। জননী পা টিপিয়া পিছাইয়া যাইতেছেন। কিন্তু আনন্দে তাঁহার তরঙ্গ-বন্ধুর বক্ষ কাঁপিতেছে। উপরে পঞ্চমীর চাঁদ মিটি মিটি হাসিতেছে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী বুধবার কমনওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশন আমার সুবিধার্থে একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করিয়াছিলেন। ঐ দিন সকালে ও বিকালে তাঁহাদের আপিসেই কাটাইলাম। কমিশন পূর্ব্বদিন টাসম্যানিয়া হইতে ফিরিয়াছেন। বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহারা আমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সকালে কেসি সাহেবের আপিসে গিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি বাংলাদেশের খবর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইংরেজের ভারত-ত্যাগের সঙ্কল্প-ঘোষণাকে প্রশংসা করিলেন। আলাপান্তে বলিলেন, "আমরা গ্রামে থাকি। শহরে আমাদের একটি ছোট বাড়ী আছে। আমার স্ত্রী আজ সেখানে গিয়াছেন। আপনি যদি বৈকালে আমাদের শহরের বাড়ীতে যাইতে পারেন তবে আমার স্ত্রী বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন।" আমি তাঁহার বাড়ীর ঠিকানা লইয়া হোটেলে ফিরিলাম। মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া অধ্যাপক উডের সহিত মিলিত হইলাম। তিনি তাঁহার সহকর্মিগণের সহিত আমাকে আলাপ করাইয়া দিলেন। পরে একটি বড় বইয়ের দোকানে লইয়া গিয়া অষ্ট্রেলিয়া সম্পর্কে কয়েকটি ভাল বইয়ের তালিকা দিলেন। বৈকালে কেসী সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কেসী-গৃহিণী ও কেসী মহাশয় আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সেখানে তাঁহাদের বঙ্গ-প্রবাসকালের সেক্রেটারী মিস্ প্যাট জ্যারেট উপস্থিত ছিলেন। কেসী-গৃহিণী বাংলাদেশের অনেকগুলি নারী-প্রতিষ্ঠানের কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, তিনি এখনও তাহাদের কোন উপকারে আসিতে পারিলে কৃতার্থ হইবেন। আমাকে পানীয় প্রদান করিলেন। আমি মদমিশ্রিত কোন পানীয় গ্রহণ করিব না শুনিয়া তিনি যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কেসী সাহেব অরেঞ্জ কোয়াসের কথা মনে করাইয়া দিলে তিনি যেন থৈ পাইলেন। আমি অরেঞ্জ কোয়াস পান করিলাম। কেসী সাহেবের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্বন্ধে নানা বিষয়ে কথা হইল। কেসী পকেট হইতে একটি সুন্দর রেশমের রুমাল বাহির করিয়া বলিলেন, "বাংলার-একটি জেলায় এগুলি তৈরি। এগুলি আমার বড়ই পছন্দ। আপনি যদি এরূপ দু'ডজন রুমাল তৈরি করাইয়া আমাকে পাঠাইতে পারেন তবে আমি বিশেষ উপকৃত বোধ করিব।" আমি স্বীকার করিলে নমুনা-স্বরূপ একটি রুমাল আমাকে দিলেন। গান্ধী, নেহরু ও জিন্নার কথা উঠিল। কেসী-গৃহিণী বলিলেন, "লাটভবনে আমাদের শ' তিনেক ভৃত্য ছিল। যখনই গান্ধী লাট-ভবনে আসিয়াছেন তখনই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তিন শত ভৃত্য তাঁহার পদধূলি লইয়াছে। কিন্তু নেহেরু বা জিন্না যখন লাট-ভবনে আসিয়াছেন তখন কাহারও এরূপ আগ্রহ দেখি নাই। তবে কি নেহেরু বা জিন্না সেরূপ জনপ্রিয় নন?"

আমি—"নেহেরু বা জিন্নার চেয়ে বেশী জনপ্রিয় নেতা ভারতবর্ষে নাই। তবে গান্ধীর কথা স্বতন্ত্র। গান্ধী শুধু জনপ্রিয় নেতা নন, তিনি তদপেক্ষা আরও বেশী কিছু।"

কেসী—"হাঁ, গান্ধী সাধারণের চক্ষে দেবতা।'

প্যাট জ্যারেট আমার নিকট একটি বিবৃতি চাহিলেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও কানাডা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতের, অষ্ট্রেলিয়ার এবং ভারত-অষ্ট্রেলিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কের কোন্ রূপ আমার চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে তাহা আমার নিকট জানিতে চাহিলেন। আমি স্বভাবতঃই প্রচার-পরাঙ্মুখ। কিন্তু কেসী সাহেবের আগ্রহাতিশয্যযুক্ত ইহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। স্থির হইল পরদিন সকাল ৮টার প্যাট জ্যারেট বিবৃতি শুনিবার জন্য আমার হোটেলে যাইবেন।

সেদিন মেলবোর্ণে বেশ গরম পড়িয়াছিল। তাপ ৯৫° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় হোটেলে পার্শ্বের জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি বলিলেন, "এখানে বায়ুর আর্দ্রতা বড় বেশী। কাজেই অল্প গরমে বেশী কষ্ট হয়; ঘামও বেশী হয়। আমাদের পার্থে যখন তাপ ১১০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে তখনও এত কষ্ট হয় না। বরং গ্রীষ্মে আমরা বেশ স্ফূর্ত্তিতে থাকি।" এদেশে এখন গ্রীষ্মকাল চলিতেছে। টাসম্যানিয়ায় গ্রীষ্মকালে তাপ ৮০° ডিগ্রীর উপরে উঠে না। মেলবোর্ণে তাপ সাধারণতঃ ৭০।৮০ ডিগ্রীর মধ্যে থাকে, কখন কখন ১০০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে। ক্যানবেরায়ও তাপ সাধারণতঃ ৮০° ডিগ্রীর নীচে থাকে। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় মাঝে মাঝে তাপ ১০০ ডিগ্রী ছাড়াইয়া যায়। কুইনসল্যাণ্ডের অবস্থাও তদ্রূপ। এখন পিচ ও পিয়ার ফল পাকিয়াছে। এগুলি টিনে ভরিয়া সেখানকার লোকেরা চালান দেয়। চিনির কারখানায় ষ্ট্রাইক চলিতেছে। সেজন্য ফল টিনে পুরিবার কারখানাগুলি চিনি পাইতেছে না। হাজার হাজার টন ফল হয়তো ইহার দরুন নষ্ট হইয়া যাইবে।

ঐদিন রাত্রিতে খাইবার সময় এক ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত আলাপ হইল। ভদ্রলোক লিবারেল পার্টির প্রচার-সচিব। কেসী সাহেব লিবারেল পার্টির এক জন নেতৃস্থানীয় সভ্য। উপরোক্ত ভদ্রলোক কেসী সাহেব ও বাংলাদেশের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভদ্রলোক গৃহাভাবে সপরিবারে হোটেলে বাস করিতেছেন। বলিলেন, "এদেশে গৃহ-সমস্যা বড় কঠিন। সরকার কিছুই করিতে পারিতেছেন না। ইহুদীগণ শহরে আসিয়া বহু বাড়ী কিনিয়া ফেলিতেছে, এবং সেলামী প্রভৃতি লইয়া লোকের উপর জুলুম করিতেছে।" ভদ্রলোকের স্ত্রীর জ্যোতিষী বা ভবিষ্যদ্বক্তার উপর খুব আস্থা। ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষীগণের সুনাম তাঁহার কানে পৌঁছিয়াছে। তাঁহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি বলিলাম, "ভারতবর্ষে অনেক ভাল জ্যোতিষী আছেন। আবার অনেক ভণ্ড জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীও আছে। তবে জ্যোতিষীর কথার উপর আস্থা স্থাপন করিতে আমি আপনাকে পরামর্শ দিব না, তাঁহাদের নিকট ভবিষ্যৎ জানিয়া লইবার আগ্রহকেও আমি প্রশংসা করি না। অন্ধকার জীবনপথে চলিবার জন্য ভগবান মানুষকে একটি সুন্দর প্রদীপ দিয়াছেন। সেটি তাহার বুদ্ধি। এই ভগবদ্দত্ত প্রদীপের সাহায্যে পথ চলাই শ্রেয়ঃ। এই প্রদীপটি নির্বাণ হইলে বা ইহার উপর আস্থা চলিয়া গেলেই বিপদ।"

ভোজনান্তে এই দম্পতির সঙ্গে অনেক বিষয় আলাপ হইল। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে আমাকে নিজেদের ঘরে লইয়া গিয়া ইহাদের আট ও দশ বৎসর বয়সের কন্যা দুইটির সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিলেন। কন্যাদ্বয় কলিকাতার কথা শুনিয়াছে। কলিকাতার মানুষ দেখিয়া খুশি হইল।

পরদিন ২৮শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার প্রাতরাশের পর প্যাট জ্যারেট আসিয়া উপস্থিত। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁহার নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দিয়া হোটেল ত্যাগ করিয়া এরোড্রোমে পৌঁছলাম। ক্যানবেরায় গিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন সম্পন্ন করিলাম।

ঐ দিন বৈকালে "হোটেল ক্যানবেরায়" ওয়াল্টার স্কট নামক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি এদেশের এক জন বিখ্যাত কস্ট-একাউণ্টেণ্ট। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে থাকিবে কিনা এই প্রসঙ্গে নানা আলাপ-আলোচনা হইল। স্কট বলিলেন, "আমাদের দেশে সর্ব্বসাধারণের মনে ইংরেজের প্রতি একটা প্রীতির ভাব আছে। অন্য সব বিষয়ে আমাদের মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু ইংরেজদের জন্য সকলেরই মনে খানিকটা স্নেহ বিদ্যমান।"

আমি—"আমরাও ইংরেজজাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সেক্সপীয়র বা নিউটনের নামে সকল ভারতবাসীই মাথা নোয়ায়। শুধু শাসক-ইংরেজের প্রতিই ভারত বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে। ভারতের শাসন-ব্যাপারে হস্তক্ষেপে বিরত হইলে ইংরেজের প্রতি ভারতবাসীর বিরূপ মনোবৃত্তির কোন কারণ থাকিবে না।"

স্কট—অবশ্য আপনারা যা ভাল বোঝেন তাহাই করিবেন। তবে আমার মনে হয় আপনারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে থাকিলেই ভাল হইত।

সারিপুত্র ও মোগ্গল্লান

শ্রীসুধাময়ী সেনগুপ্ত, এম-এ

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ হয়ত অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সংবাদটি এই যে ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয় সারিপুত্র ও মোগ্গল্লানের অস্থিপাত্র বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারত গবর্ণমেণ্টকে উপহৃত হইয়াছে। শীঘ্রই উক্ত অস্থি ভারতে আনয়ন করা হইবে এবং সাঁচী স্তূপের নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে উক্ত অস্থিপাত্র রক্ষিত হইবে।

এই সারিপুত্র ও মোগ্গল্লান সম্বন্ধেই যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

সারিপুত্র বুদ্ধের প্রধান শিষ্য ছিলেন এবং মোগ্গল্লানের স্থান তাঁহার পরেই ছিল। অবশ্য আনন্দ, উপালী, মহাকশ্যপ প্রভৃতি বুদ্ধের আরও কয়েকজন প্রধান শিষ্য ছিলেন, কিন্তু এই দুই জনের স্থান ছিল সর্ব্বোচ্চে।

সারিপুত্র ও মোগ্গল্লান উভয়েই বুদ্ধদেব অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। সারিপুত্র রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী নালক-গ্রাম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল বঙ্গন্ত ব্রাহ্মণ এবং মাতার নাম ছিল রূপসারি। এই রূপসারির পুত্র বলিয়াই তিনি সারিপুত্র (পালি সারিপুত্ত) নামে পরিচিত হন। অনেকের মতে তাঁহার আসল নাম ছিল উপতিস্স। সারিপুত্রের চুন্দ, উপসেন ও রেবত (পরে খদির-বনিয় নামে খ্যাত) আরও তিন ভ্রাতা এবং চালা, উপচালা ও শিশুপচালা নাম্নী তিন ভগ্নী ছিলেন। তাঁহারা সকলেই পরে বৌদ্ধ সঙ্ঘে যোগদান করেন।

মোগ্গল্লান (মৌদ্গল্যায়ন) রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী কোলিতগ্রামে এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই একই দিনেই সারিপুত্রেরও জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ঐ গ্রামের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল মোগ্গলী (মৌদ্গলী)। এই দুই পরিবারের মধ্যে সাত পুরুষ ধরিয়া প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। উভয় পরিবারের বালকদ্বয়ও শৈশব হইতেই পরস্পরের বিশেষ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠেন। একদা দুই বন্ধু এক অভিনয় দেখিতে যান এবং সেই অভিনয়দৃষ্টে সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া উভয়ে গৃহত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। তাঁহারা প্রথমে সঞ্জয় নামে এক আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তৎপরে তাঁহারা সদ্‌গুরুলাভের আশায় সমগ্র জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া সমুদয় জ্ঞানী ব্যক্তির সহিতই ধর্ম্মালোচনা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা স্থির করিলেন যে, উভয়ে পৃথক ভাবে পরম তত্ত্বের সন্ধান করিবেন এবং যিনিই প্রথমে উত্তরের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান লাভ করিবেন, তিনিই অপরকে সংবাদ দিবেন। এই-রূপ স্থির করিয়া তাঁহারা দুই জনে দুই দিকে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে সারিপুত্র রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অসসজী নামে বুদ্ধের এক শিষ্যের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। তাঁহার মুখে উচ্চারিত একটি শ্লোক শুনিয়াই সারিপুত্রের ধারণা জন্মিল যে, তিনি এতদিন ধরিয়া যে বস্তুর অন্বেষণ করিতেছিলেন, ইঁহার নিকট তাহা লাভ করিবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং 'স্রোতাপন্ন' হইলেন। (বৌদ্ধ ধর্ম্মসাধনার চারিটি স্তর, যথা—স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত্ত্ব। স্রোতাপন্ন—অর্থাৎ যে নির্ব্বাণ-স্রোতে আপন্ন অর্থাৎ নির্ব্বাণলাভের প্রয়াসে যত্নবান। সকৃদাগামী—অর্থাৎ যাহাকে নির্ব্বাণ লাভ করিবার জন্য আরও একবার আসিতে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। অনাগামী—অর্থাৎ যাহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, এই যাহার শেষ জন্ম এবং এই জন্মেই যে অর্হত্ত্ব লাভ করিবে—এই চতুর্থ ও শেষ স্তরই অর্হত্ত্বলাভ)। তৎপরে তিনি মোগ্গল্লানকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং অসসজীর প্রমুখাৎ শ্রুত শ্লোকটি তাঁহার সম্মুখে আবৃত্তি করিলেন, শুনিয়া মোগ্গল্লানও স্রোতাপন্ন হইলেন। তখন তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বগুরু সঞ্জয়ের নিকট গিয়া তাঁহাকেও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সঞ্জয় রাজী হইলেন না। সঞ্জয়ের পাঁচ শত শিষ্য তাঁহাদের অনুগমন করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং তাঁহারা সদলবলে ভগবান বুদ্ধকে দর্শন করিতে বেলুবনে উপস্থিত হইলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন এবং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্ঘভুক্ত করিয়া লইলেন। সঙ্ঘে প্রবেশের সপ্তাহকাল মধ্যে মোগ্গল্লান ও পক্ষকাল মধ্যে সারিপুত্র অর্হত্ত্বলাভ করিলেন।

সারিপুত্র ও মোগ্গল্লানের সঙ্ঘ-প্রবেশের দিনেই বুদ্ধদেব ঘোষণা করিলেন যে, এই দুই জনকে তাঁহার প্রধান শিষ্যপদে অভিষিক্ত করা হইল। নবাগত ভিক্ষুদ্বয়ের প্রতি এইরূপ শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শিত হওয়ায় অন্যান্য পুরাতন ভিক্ষুরা বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁহাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, জন্মে জন্মে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই নবীন ভিক্ষুদ্বয় তাঁহার নিকট এই বহুআকাঙ্ক্ষিত পদলাভ করিবার জন্য কত দুঃসহ কঠোর ক্লেশই না সহ্য করিয়াছেন।

বুদ্ধ সারিপুত্র ও মোগ্গল্লানকে আদর্শ শিষ্যরূপে গণ্য করিতেন এবং অপরাপর ভিক্ষুদিগকে তাঁহাদের আদর্শ অনু-

স্মরণ করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি সারিপুত্রকে সঙ্ঘের শিক্ষাদাত্রী জননী ও মোগ্‌গল্লানকে ধাত্রীর সহিত তুলনা করিতেন। এই দুই শিষ্য তাঁহার পরম বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন এবং সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানের ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার ভার তিনি ইঁহাদের হস্তেই অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও তাঁহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। ধম্মপদ অট্‌ঠ কথায় বর্ণিত আছে যে, দেবদত্ত যখন সঙ্ঘ-মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া পাঁচ শত ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে চলিয়া যান তখন তাঁহাদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য বুদ্ধ এই দুই জনকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ইঁহারা সফলকামও হইয়াছিলেন। অঙ্গুত্তর নিকায়ে একটি ঘটনার উল্লেখে জানা যায় যে এক সময় মোগ্‌গল্লান একটি দুর্বৃত্ত ভিক্ষুকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

সারিপুত্র বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন, বিশেষতঃ অভিধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। স্বয়ং বুদ্ধদেব সারিপুত্রকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র চতুরার্য্য সত্য (দুঃখ—অর্থাৎ জড়জগতের সব কিছুই দুঃখময় এই জ্ঞান; সমুদয়—অর্থাৎ এই দুঃখের কারণ ও উৎপত্তিস্থল, এই দুঃখ নিরোধ এবং নিরোধগামী অষ্টাঙ্গিক মার্গ) তিনি অত্যন্ত সরল ও সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। ভিক্ষুগণ কোনরূপ সঙ্কটে পড়িলে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। ভিক্ষুগণ তাঁহার উপদেশ প্রদানের বিষয় বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। সংযুত্ত নিকায়ের টীকায় এক স্থলে আছে, বুদ্ধ যখন তাবত্রিংশ স্বর্গে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া সঙ্কাশ্য নামক স্থানে অবতরণ করেন, সেই সময়েই সারিপুত্রের জ্ঞানের চরম পরীক্ষা হয়। বুদ্ধদেব সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকট একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং একমাত্র সারিপুত্র ব্যতীত কেহই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। সঙ্ঘের বিধিনিষেধ-সমূহের খুঁটিনাটি তিনি বিশেষ প্রযত্নের সহিত পালন করিতেন। সঙ্ঘের একটি নিয়ম ছিল এই যে, কোন সন্ন্যাসী একাধিক সামন বা শিক্ষার্থীকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবেন না। সুতরাং যে পরিবার দ্বারা তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন এইরূপ একটি পরিবারের এক বালক তাঁহার নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়া আসিলেও তিনি তাহার পিতা-মাতার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হন নাই। অবশেষে বুদ্ধদেব এই নিয়ম শিথিল করায় তিনি বালকটিকে উপসম্পদা দান করেন। অপর একটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, সারিপুত্র একবার উদরের যন্ত্রণায় বিশেষ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। মোগ্‌গল্লান তাঁহাকে ঔষধরূপে রশুন খাইতে অনুরোধ করেন। তিনি নিজেও জানিতেন যে, রশুন ভক্ষণ করিলে আরোগ্যলাভ করিবেন। কিন্তু ভিক্ষুর রশুন সেবন নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া তিনি কিছুতেই রশুন আহার করিতে রাজী হন নাই। অবশেষে বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করাতে তিনি রশুন সেবন করিলেন। দরিদ্রের প্রতি তাঁহার গভীর করুণা ও তাহাদের দুঃখমোচন করিবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা—'তবদাধিক' 'পুণ্য ও তাঁহার পত্নী', 'কুণ্ডকুচ্ছিসিন্ধব', 'জাতক' ও 'লোক-সত্তিস' প্রভৃতি গল্প হইতে প্রমাণিত হয়। কাহারও সামান্যতম উপকারও তিনি বিস্মৃত হইতেন না। মহাবঙ্গে একটি কাহিনীতে উল্লিখিত আছে যে, এক সময় এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস-গ্রহণাভিলাষী হইয়া সঙ্ঘে আগমন করেন। কিন্তু দেখা গেল কোন ভিক্ষু তাঁহাকে উপসম্পদা দান করিতে ইচ্ছুক নহেন। ব্রাহ্মণ সেইজন্য মনকষ্টে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন, এবং দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকেন। একদা বুদ্ধের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হওয়ায় তিনি ভিক্ষুদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ভিক্ষুগণ কারণ বিবৃত করিলে, বুদ্ধ সকল ভিক্ষুকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, কেহ এই ব্রাহ্মণকৃত কোন উপকার স্মরণ করিতে পারিতেছেন কিনা। সারিপুত্র তদুত্তরে বলেন, একদা যখন তিনি নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভিক্ষার্থে গ্রামে প্রবেশ করেন তখন এই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এক চামচ অন্নদান করিয়াছিলেন—(যদিও তাহাতে তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি না হইয়া ক্ষুধানলে ইন্ধনই প্রদত্ত হইয়াছিল)। যাই হোক, এখন বুদ্ধের আদেশে সারিপুত্র সেই ব্রাহ্মণকে উপসম্পদা দান করেন। সঙ্ঘের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও পরিচ্ছন্নতার দিকেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ধম্মপদ টীকায় বর্ণিত আছে, যে সঙ্ঘারামে তিনি বাস করিতেন তথাকার অন্যান্য ভিক্ষুগণ ভিক্ষায় বহির্গত হইলে তিনি সমস্ত সঙ্ঘারাম ঘুরিয়া দেখিয়া বেড়াইতেন। কোন স্থান অপরিষ্কৃত থাকিলে স্বয়ং তাহা সম্মার্জ্জনী দ্বারা মার্জ্জিত করিতেন, আসবাবপত্র যথাস্থানে ঠিক করিয়া রাখিতেন এবং পানীয় ও পদপ্রক্ষালনের জলাধারসমূহ জলপূর্ণ করিয়া রাখিতেন, পাছে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী কেহ সঙ্ঘে আসিয়া বলে যে দেখ, গৌতম বুদ্ধের শিষ্যগণের আবাসস্থান দেখ। এখানে কি অপরিচ্ছন্নতা, কি অব্যবস্থা!

আচার্য্যদের প্রতি সারিপুত্রের বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াই তিনি তাঁহার পূর্ব্বগুরু সঞ্জয়কে বুদ্ধের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিতে ও সঙ্ঘে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সঞ্জয় অবশ্য তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের শরণ লইবার পরামর্শ যিনি দেন তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের সেই পথপ্রদর্শক গুরু অসসজীর প্রতিও তাঁহার বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। কথিত আছে, তিনি অসসজী যে দিকে আছেন বলিয়া জানিতেন, প্রতি রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সেই দিকে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিতেন ও সেই দিকে মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিতেন। সারিপুত্র পিষ্টক ভক্ষণ করিতে বিশেষ

ভালবাসিতেন, কিন্তু পিষ্টক ভক্ষণে লোভের প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়া তিনি উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সমস্ত ভিক্ষুগণের মধ্যে কাহাকেও বুদ্ধ বচন অনুসরণে অননুরাগী দেখিলে তাহার প্রতি তাঁহার মনোভাব যেরূপ কঠোর হইয়া উঠিত, কাহারও ধর্ম্মবিষয়ে অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে তিনি সেইরূপই আনন্দিত হইতেন। মোগ্‌গল্লান ঋদ্ধিশক্তিতে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিলে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মোগ্‌গল্লানের ঋদ্ধিশক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি ধ্যান ইত্যাদি বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া ব্যতীত কেবলমাত্র চর্ম্মচক্ষেই প্রেতযোনি ও অন্যান্য অশরীরী আত্মাদের দেখিতে পাইতেন এবং বিভিন্ন লোকে গমন করিয়া তথাকার সংবাদাদি বুদ্ধকে আনিয়া দিতেন। বিমান বথ্‌ নামক গ্রন্থে তাঁহার এইরূপ বিভিন্ন লোকপরিভ্রমণের বহু উল্লেখ পাওয়া যায় এবং কথিত হয় যে, তিনি দেবলোকের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। সংযুত্ত ও মজ্‌ঝিম নিকায় এবং সুত্ত নিপাতে তাঁহার ঋদ্ধিশক্তির বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। একবার 'মিগার মাতু পাসাদে' বুদ্ধদেব অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ছিলেন উপরিস্থিত প্রকোষ্ঠে—তাহা সত্ত্বেও, নিম্নস্থ প্রকোষ্ঠে ভিক্ষুগণ প্রগল্‌ভ ভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন। তখন বুদ্ধের অনুরোধে মোগ্‌গল্লান ভিক্ষুদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য তাঁহার বিপুল পদভারে সেই গৃহ প্রকম্পিত ও ঘর্ঘরধ্বনি উত্থিত করিয়াছিলেন। অপর এক সময় শক্রের (ইন্দ্র) অহঙ্কার চূর্ণ করিবার এবং তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য তাঁহার বৈজয়ন্ত পুরীও তিনি কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার ঋদ্ধিশক্তির উৎকর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায় নন্দোপনন্দ নামক নাগের দমনে। অপর কোন ভিক্ষুর পক্ষে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর হইত না; কারণ অপর কেহ মোগ্‌গল্লানের ন্যায় এত শীঘ্র ধ্যানের চতুর্থ স্তরে উন্নীত হইতে পারিতেন না; এবং সেইজন্যই বুদ্ধদেব অপর কোন ভিক্ষুকে ঐ নাগদমনের অনুমতি প্রদান করেন নাই।

কিন্তু ঋদ্ধিশক্তি মোগ্‌গল্লানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও জ্ঞানের দিক দিয়াও তিনি হীন ছিলেন না। এ বিষয়ে সারিপুত্রের পরেই ছিল তাঁহার স্থান। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সারিপুত্র ও মোগ্‌গল্লানের ভিক্ষুদিগকে নানা বিষয়ে উপদেশ প্রদানের বহু উল্লেখ বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। ভগবান্‌ বুদ্ধ এক সময় কপিলাবস্তুতে শাক্যগণের নবনির্ম্মিত বিতর্ক গৃহে উপদেশ প্রদানান্তে ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং মোগ্‌গল্লানকে ভিক্ষুদিগের নিকট কিছু বলিবার জন্য আদেশ দেন। তদনুসারে মোগ্‌গল্লান তাঁহাদের নিকট কামনা ও তাহা হইতে মুক্তি-লাভের উপায় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাশেষে বুদ্ধ তাঁহার উপদেশ প্রদান-ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অপর এক স্থলেও ধ্যান ও মুক্তিলাভের উপায়সমূহ সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সারিপুত্র ও মোগ্‌গল্লান এই দুই জনের পরস্পরের প্রতি গভীর প্রীতি ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। ইঁহারা দুই জনে পরস্পরের গুণাবলীর যে কিরূপ প্রশংসা করিতেন বহু শ্লোকে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভগবান্‌ বুদ্ধের প্রতি উভয়ের অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এই দুই বন্ধুকে দৃঢ়তর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল। বুদ্ধের নিকট হইতে দূরে থাকাকালে তাঁহারা দিব্য দৃষ্টি ও দিব্য শ্রুতি দ্বারা কোন্‌ ভক্ত বুদ্ধের সহিত কিরূপ তত্ত্বালোচনা করিতেন, তাহা অবগত হইয়া কেবলমাত্র এই বিষয় লইয়াই আলাপ-আলোচনা করিতেন। বুদ্ধের অনুগত সকল ভিক্ষুর প্রতিই সারিপুত্র বন্ধুভাবাপন্ন হইলেও, মোগ্‌গল্লান ও আনন্দের প্রতি তিনি সবিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। বুদ্ধপুত্র রাহুলের প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত স্নেহ ছিল। এক সময় সারিপুত্রের জ্বর হইলে মোগ্‌গল্লান মন্দাকিনী-সরোবর হইতে পদ্মমৃণাল আনিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। গৃহস্থগণের মধ্যে অনাথপিণ্ডক সারিপুত্রের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং তাঁহার, অসুস্থ অবস্থায় তিনি যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য একাধিকবার তাঁহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে সেকথা উল্লিখিত আছে।

বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের কয়েক মাস পূর্ব্বে সারিপুত্র পরলোকগমন করেন। সংযুত্ত নিকায়ে দেখা যায়, তাঁহার জন্মস্থান নালক গ্রামেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার মৃত্যুতে বুদ্ধ তাঁহার উদ্দেশে এক প্রশস্তিবাণী উচ্চারণ করেন। টীকাগ্রন্থে তাঁহার মৃত্যুর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাতে আছে, বুদ্ধ বেলুব গ্রামে শেষ বর্ষা যাপন করিয়া শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, সারিপুত্র সপ্তদিবস মধ্যে নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মাতাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে পাঁচ শত ভিক্ষুসহ পৈতৃক বাটীতে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। কারণ তাঁহার মাতার সাতটি সন্তান অর্হত্ত্ব লাভ করিলেও তিনি স্বয়ং সঙ্ঘে আস্থাশীলা ছিলেন না। সপ্তম দিনে সারিপুত্র নালক গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র উপরেবতের মারফত মাতাকে তাঁহার আগমন-সংবাদ প্রেরণ করিলেন। পুত্র পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে মনে করিয়া মাতা আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গীদের অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সারিপুত্র বাটীতে আসিয়া সেই গৃহে আশ্রয় লইলেন—যেখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথম তিনি পৃথিবীর আলো-বাতাসের স্পর্শলাভ করিয়াছিলেন। এখানে তিনি আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। পুত্র পূর্ব্ববৎ সন্ন্যাসীই আছে দেখিয়া মাতা বিষণ্ণ অন্তরে নিজ গৃহেই আবদ্ধ থাকিতেন, সেইজন্য এ বিষয়ে কিছু জানিতে পারিলেন না। শক্র মহাব্রহ্ম প্রভৃতি দেবতারা এবং সারি-

পুত্রের ভ্রাতা চুন্দ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা ঐ সকল দেবতাকে দেখিয়া পুত্রের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি যথার্থই ঐ সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিনা। সারিপুত্র স্বীকার করিলে মাতা পুত্রের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই অবসরে সারিপুত্র তাঁহার নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলেন এবং ফলে তিনিও স্রোতাপন্ন হইলেন। তখন সারিপুত্র মাতৃঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে ইহা উপলব্ধি করিয়া সন্ন্যাসীদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিলে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার সন্ন্যাসীজীবনের সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহাদিগের নিকট কোন অপরাধ করিয়াছেন কি না? তাঁহারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলিলে তিনি শয়ন করিলেন। প্রত্যূষের সঙ্গে সঙ্গে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অমৃতলোকে প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় বন্দোবস্ত করেন। বিশ্বকর্ম্মা তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন। সারিপুত্রের দেহ ভস্মীভূত হইবার পর তাঁহার প্রিয় শিষ্য অনুরুদ্ধ সুগন্ধি বারিসেচনে চিতা নির্ব্বাপিত করেন। চুন্দ তাঁহার অস্থি, ভিক্ষাপাত্র ও বহির্বাস শ্রাবস্তীতে আনয়ন করিলেন।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন সারিপুত্রের দেহাবসান ঘটে। ইহার এক পক্ষকাল পরে,অমাবস্যা তিথিতে মোগ্‌গল্লান দেহ-রক্ষা করেন। টীকাকারদের মতে মোগ্‌গল্লানের মৃত্যু ঘটে নির্গ্রন্থ (জৈন) সম্প্রদায়ের এক চক্রান্তের ফলে। মোগ্‌গল্লান বিবিধ লোকে যাতায়াত করিতেন এবং আসিয়া সংবাদ দিতেন যে, বুদ্ধের পন্থাবলম্বীরা সুখে স্বর্গবাস করিতেছেন; কিন্তু বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বীগণ পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া, অশেষ দুঃখ-ভোগ করিতেছে। এই সকল সংবাদে অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনুগামীদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চাঁইরা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিল। কালশিলার এক গুহায় মোগ্‌গল্লানের অবস্থানকালে ঐ সকল লোক উক্ত গুহা ঘিরিয়া ফেলিল, কিন্তু তিনি তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া এক ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। উপর্য্যুপরি ছয় দিন এইভাবে বিফল-মনোরথ হইবার পর সপ্তম দিবসে শত্রুরা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিতে সমর্থ হইল এবং প্রচণ্ড প্রহারে মৃতকল্প অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি বহু কষ্টে প্রভু বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া চিরবিদায় প্রার্থনা করিলেন এবং সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু নাকি তাঁহারই এক পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফল। স্ত্রীর প্ররোচনায় তিনি তাঁহার অন্ধ পিতামাতাকে বনের মধ্যে লইয়া যান এবং তাঁহারা তস্কর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন, এইরূপ ভান করিয়া প্রহারপূর্ব্বক তাঁহাদের মৃত্যু ঘটান। এই পাপের ফলে তাঁহাকে বহু দিন নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এবং শেষ জন্মে এইরূপ প্রহারের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মোগ্‌গল্লানের বর্ণ ছিল নীলোৎপল অথবা নবীন জলধরের ন্যায় শ্যামল। সিংহল দেশে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, বহুদিন নরকে বাস করার জন্য তাঁহার বর্ণ ঐরূপ হইয়াছিল।

রাখী বন্ধন

শ্রীশান্তি পাল

হৃদয় দেউলে কে দিল আঘাত ?
দ্বারের কাছে,
হেরি পরিচিত পান্থ সেথায়
দাঁড়ায়ে আছে।
কতো বেদনার ছায়া ঘনাল আমার মনে,
কতো অতীতের মায়া জাগাল নীরব ক্ষণে,
কেন অকারণ নেচে ওঠে বুক,—
কলাপী নাচে ?
কাহারে যাচে।
বন্ধু এখন ছুঁয়োনা আমায়
দাঁড়াও স'রে,
রাতের নেশায় প্রাণের পেয়ালা
রয়েছে ভ'রে।

কেন কলরব এতো মদির নয়ন হানি ?
কেন হাসি-কাঁদা এতো বুকের কাছেতে টানি ?
কেন চেয়ে থাকো ছল-ছল দিঠি,
মুখের 'পরে ?
আবেগ ভরে।
বন্ধু যখন ভোরের আলোয়
ডাকিবে পাখী,
তখন আমার দেউলে পশিও
সুরভি মাখি।
যতো কথা আছে বোলো বিরলে বসিয়া একা,
যতো গান আছে গেয়ো পুরানো দিনের শেখা,
অধরের ছোঁয়া একটু তখন দিও,
চপল আঁখি,
বাঁধিও রাখী।

আরব রাসায়নিক প্রক্রিয়া

এম. আকবর আলী, এম-এস্‌সি

আরব রসায়ন-বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করলে একটা জিনিষ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটা হ'ল এর মধ্যে সুশৃঙ্খল সুনিয়ন্ত্রিত পন্থাগুলি। আরব রাসায়নিকগণ নানা বিষয়ে হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করলেও তাঁদের গবেষণায় প্রকৃত রসায়ন বলতে যেটুকুর সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে হেঁয়ালীর স্থান নাই। অবশ্য এই প্রকৃত রসায়ন কতটুকু বা কি সে সম্বন্ধে বাদানুবাদের যথেষ্ট অবকাশ আছে। তবে প্রকৃত রসায়ন হিসাবে এর মূল্য যাই হোক না কেন, এতে অনুসৃত প্রক্রিয়াগুলির মূল্য কিন্তু কিছুতেই কম নয়। অষ্টম শতাব্দীতে এগুলির উদ্ভাবনা বা কার্য্যকরী ভাবে ব্যবহারিক মূল্যও উপেক্ষণীয় নয়। আরব রসায়নের মধ্যে যেটুকু প্রকৃত রসায়নের সন্ধান পাওয়া যায় তার সবই যে এমনি ধরণের সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণের ফলে উদ্ভূত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আরব রাসায়নিকেরা রসায়ন-বিজ্ঞানে যে সমস্ত প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়েছিলেন এই প্রবন্ধে তারই উল্লেখ করা যাবে।

এই প্রক্রিয়াগুলির অধিকাংশেরই সন্ধান পাওয়া যায় প্রথম আরব রাসায়নিক জাবিরের গ্রন্থে। তবে স্পষ্ট বর্ণনা ও উদাহরণ দিয়ে প্রক্রিয়াগুলি সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক রাজী অগ্রগণ্য। জাবিরের সম্বন্ধে নানা সন্দেহ ও বাদানুবাদের অবকাশ থাকলেও রাজী ও রাজীর গ্রন্থাবলীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের ঐকমত্য আছে। সেইজন্যই উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলি যে আরব রাসায়নিকদেরই আবিষ্কৃত এবং পরবর্ত্তী কালের প্রক্ষিপ্ত নয় সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে। প্রক্রিয়াগুলি থেকে আবিষ্কৃত নানা রাসায়নিক দ্রব্য দেখে মনে হয়, আরব রাসায়নিকদেরই হাতে এ বিজ্ঞানের আরো উন্নতি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয় নাই। পরবর্ত্তী রাসায়নিকদের অধৈর্য্য ও অস্থিরচিত্ততাই হচ্ছে এর কারণ। বস্তুতঃ জাবিরের এবং রাজীর প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক ধারাকে যদি তাঁদের পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ এমনি সুস্পষ্ট, সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে অনুসরণ করতেন তা হলে আরব রসায়ন-বিজ্ঞানের অগ্রগতি হঠাৎ এভাবে ব্যাহত হত না। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে রসায়ন-বিজ্ঞানের যে উন্নতি হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য করলে অনায়াসে বলা চলে যে এমনি উন্নতি আরব রসায়নেও নবম দশম শতাব্দীতেই হয়ত অসম্ভব হ'ত না। রাজীর পরে যাঁরা রসায়ন-চর্চ্চা করেন তাঁদের অনেকেই বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বিশেষ করে পরশ-পাথর ও অমরত্বলাভের সাধনাকেই আঁকড়ে ধরেছেন, এইজন্যই তাঁরা পূর্ব্বেকার বৈজ্ঞানিকদের কাজের ধারা অনুসরণ না করে তাঁদের হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষার প্রকৃত ব্যাখ্যা বের করতে লেগে গেছেন। আর তারই জন্যে কূট তর্কজালের আশ্রয় নিয়েছেন। দুই-এক জন সামান্য একটু বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধির আশ্রয় নিলেও সহানুভূতির অভাবে তাঁদের অনেকেরই কাজ এগুতে পারে নি। Stapleton এবং Azo আরব রসায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—

"If Ar-Razi had been followed by men as keen as himself an experimental work in chemistry might have come into being several hundreds of years before it actually was born. As it was, subsequent writers on Alchemy were content either to copy or in many cases to pervert with results that are only evident when we follow up any particular experiment given by Jabir or Ar-Razi."

জাবিরের ও রাজীর পরবর্ত্তী কালের আরব রসায়ন সম্বন্ধে Stapleton এবং Azo-এর উক্তি যে অনেকটা সত্য, আরব রসায়ন আলোচনা করলে তা স্বতঃই হৃদয়ঙ্গম হবে।

আরব রাসায়নিকেরা রসায়ন-শাস্ত্র আলোচনায় যে সমস্ত প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতেন এখানে তার কিছু বর্ণনা দেওয়া গেল।

বিশুদ্ধি করণের প্রণালী

১। তাকতির—"কার" (cucurbit) এবং আম্বিক (alembic) ব্যবহার করে বিন্দু বিন্দু (কাতরা) পতিত নির্য্যাসকে একটি গ্রাহকের [কাবিলার (Receiver)] মধ্যে ধরা। এটিকে বর্ত্তমানের Distillation প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। সাধারণতঃ পাতন-পন্থা হিসাবেই এটি ব্যবহৃত হ'ত। তবে সব সময়েই তাকতির বলতে এই পন্থাই অনুসরণ করা হয়েছে এ বলা চলে না। অনেক সময় দুটি জিনিষের মিকচার বা মিশ্রণ থেকে সাধারণভাবে জল অপসারণ বা অন্য জিনিষ মিশ্রিত তরল পদার্থকে থিতাতে দিয়ে উপরকার তরল পদার্থ আস্রাবণ বা এমনি কাগজ কিম্বা কাপড়ের সাহায্যে ফিলটার করার প্রথাকেও "তাকতির" নামে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্ত্তমানের Filtration ও Decantation পন্থাকেও তাকতির প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক কথায় তাকতির প্রধানতঃ Distillation পন্থা হলেও সময় সময় Filtration ও Decantation হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে।

২। ইসতিনজাল—মূষার উপরে অন্য একটি সচ্ছিদ্র মূষা (বুত বার বুত)—Descensory) ব্যবহার করে জিনিষ-

গুলোকে বিশুদ্ধ করা। যে জিনিষটাকে শোধন করতে হবে সেটিকে তলায় ছিদ্রবিশিষ্ট মুচিতে রেখে গরম করা হয়। গরম করলে জিনিষটি গলে ছিদ্র দিয়ে নীচের মুচিতে জমা হয়। ময়লা, অপরিষ্কার গাদ ইত্যাদি সব উপরের মুচিতেই ধরা থাকে। রাজীর মাদখাল ও কিতাবুল আসরার গ্রন্থের যন্ত্রপাতির বর্ণনার মধ্যে এ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। সাধারণতঃ লোহা গলানোর ব্যাপারেই এ-পদ্ধতির বেশী ব্যবহার দেখা যায়। লোহাকে দ্রবণীয় আরসিনো সালফাইডে পরিণত করে ইসতিনজাল করে গলানো হ'ত। ইসতিনজাল অর্থ নীচে নামানো (making descend)। মুখা দুটি কাদা দিয়ে জোড়া লাগানো হ'ত।

তাকসিদ—প্রক্রিয়া হিসাবে একে ইসতেনজালেরই অন্যতম প্রক্রিয়া বলা চলে। তবে এ একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তাকসিদের ধাতুগত অর্থ হ'ল যে জিনিষটি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে তার মধ্যে একটি বিশুদ্ধীকৃত উপাদান (জাসাদ) বসিয়ে দেওয়া—ধাতু ও তৎকালীন বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক প্রস্তর নামে অভিহিত নানা ধাতব পদার্থের উপর এই প্রথা প্রয়োগ করা হ'ত। তবে ধাতু-গুলির মধ্যে লোহাই একমাত্র ধাতু যার উপর এই পদ্ধতি সাধারণতঃ প্রযুক্ত হ'ত। এর কারণও বোধ হয় লৌহের বৈশিষ্ট্য। এরিষ্টটলের মতে অন্য পাঁচ ধাতুর চেয়ে এতে মৃত্তিকার অংশ বেশী। (Meteorologica—Webster's translation.) ধাতু ছাড়া প্রস্তর নামে অভিহিত ছয়টি পদার্থের উপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই ছয়টি জিনিষ হ'ল মারকাসীসা (Pyrites), মাগনিশিয়া (earthly minerals), দাউস (Iron oxide), কাঁচ, তাল্ক (mica and asbestos) ও জিবসিন (Gypsum)—অবশ্য লৌহের উপর প্রযুক্ত পদ্ধতি ও ইসতিনজাল প্রথা একই। রাজীর ধারণামতে লোহার সঙ্গে যদি উসরুব (সীসা) এবং একটু সাদা এলিক্সির মিশানো যায় তা হলেই লোহা বিশুদ্ধ রৌপ্যে পরিণত হবে।

৩। তাশবিয়াহ—এর ইংরেজী অনুবাদ দাঁড়াবে Assation বা Roasting। যে জিনিষটিতে তাশবিয়াহ প্রথায় রাসায়নিক প্রক্রিয়া চালাতে হবে সেটিকে প্রথমে একটি "সালাইয়াহ"র উপর রেখে জল দিয়ে ভিজিয়ে নেওয়া হ'ত। তারপর ভিজা জিনিষকে, চারদিকে ভাল করে লেপা একটি বোতল বা বাটিতে রাখা হ'ত। অন্য একটি পাত্র আগে থেকেই চুল্লীর উপর রেখে দেওয়া হ'ত। যখন আগুনের উত্তাপে অতিরিক্ত জল উবে গিয়েছে বলে মনে হ'ত তখন বোতলটির মুখ বন্ধ করে দেওয়া হ'ত। তারপর যতক্ষণ না প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় ততক্ষণ তাপ দেওয়া চলতে থাকত। প্রক্রিয়াটি বর্ত্তমানের airbath-এর অনুরূপ। একেও airbath বলা চলে। এ প্রক্রিয়াটির একটি বিশেষত্ব হ'ল এই যে, এতে পরিমিত তাপ পাওয়া যায়। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তৎকালীন বৈজ্ঞানিকগণও পরিমিত তাপের সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং তারই ফলে তাঁরা Airbath পন্থা উদ্ভাবন করেন। সে হিসেবে এ প্রক্রিয়াটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

৪। তাবখ—এ তাশবিয়াহরই অন্যতম প্রণালী। ইংরেজী অনুবাদে একে Coction বা digestion বলা যায়। জিনিষটি যদি খুব বেশী আর্দ্র হ'ত তা হলেই এ প্রণালী প্রযুক্ত হ'ত।

৫। তালগিম—আলগাম—Amalgamation—ধাতুর সঙ্গে পারদের সংমিশ্রণ-প্রথাই তালগিম নামে পরিচিত। শব্দটির ধাতুগত অর্থ হ'ল বন্দী করা। সাধারণতঃ ঊর্দ্ধপাতন (sublimation) ও ভস্মীকরণের (calcination) পূর্ব্ব-ব্যবস্থা হিসাবে এ প্রণালীটি প্রযুক্ত হ'ত। যে জিনিষ বা ধাতুকে ঊর্দ্ধপাতন বা ভস্মীকরণ করতে হবে সেটিকে প্রথমে পারদের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে এলয় প্রস্তুত করে নেওয়া হ'ত। এই এলয়-প্রস্তুত-প্রথাকেই তালগিম বলে। যে ভাবে এই এলয় প্রস্তুত করা হ'ত তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় একে তালগিম বা বন্দীকরণ নাম দেওয়া হয়। এই প্রথাটি দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত একই ভাবে প্রচলিত থাকে। প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে যে, এই তালগিম শব্দ থেকেই বর্ত্তমান ইংরেজী amalgam শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। তালগাম শব্দটির past participle হ'ল "মুলগাম"—অর্থাৎ, "যাকে এই প্রথায় উজ্জীবিত করা হয়েছে।" রাজীর কিতাবুল আসরারে বর্ণিত একটি উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করা গেল। তার থেকে এ প্রথাটি সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যাবে। "দুই খণ্ড সীসা একসঙ্গে একটি লোহার চামচে (মিগরাফা) গলিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে এক জায়গায় রেখে দাও। যখন এগুলো প্রায় শক্ত হয়ে আসতে থাকবে তখন খলের একটি মুষল নিয়ে চামচের উপর জিনিষগুলোতে চাপ দিতে থাক, এবং আস্তে আস্তে এই চামচের মধ্যে পারদ ঢেলে দিতে থাক। যতক্ষণ না পারদ এ-গুলির সঙ্গে মিশে শক্ত পাথরে পরিণত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এমনিধারা চালাতে হবে। এই পারদকে কিন্তু পূর্ব্বে থেকেই বিশুদ্ধ করে নেওয়া দরকার। মিশ্রণপ্রক্রিয়ার পূর্ব্বে বিশুদ্ধ পারদকে জলপাইয়ের তেলে সিক্ত পশমী কাপড়ের মধ্যে রেখে দিয়ে পারদ ভাল ভাবে নিংড়ে নিতে হবে।"

৬। গোসল—lavation বা washing—এটিও ঊর্দ্ধ-পাতনের পূর্ব্বেকার পদ্ধতি। এর নানা প্রণালীর সন্ধান পাওয়া যায়। এক প্রণালী হ'ল জিনিষটির সঙ্গে লবণ মিশিয়ে গরম করা। এমনি ভাবে গরম করা জিনিষটিকে ফিল্টারের উপর জল দিয়ে ধোয়া হ'ত। এই হ'ল গোসল। এই গোসলের পরেই এ জিনিষটি ঊর্দ্ধপাতন করবার উপযোগী হয়েছে বলে মনে করা হ'ত।

তাসিদ—ঊর্দ্ধপাতন (sublimation) প্রথা বর্ত্তমানের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে ভাবে ব্যবহৃত হয় আরব-রসায়নে

তাসিদ প্রথাও অনেকটা সেই ভাবেই নিষ্পন্ন হ'ত। "উছালে" (Aludel) এ পদ্ধতির কাজ সমাধান হ'ত। অবশ্য সময় সময় তাসিদ ও তাকতির একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল-কেমীবিদগণ এই উছালকে একটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র বলে মনে করতেন। উছাল কি ভাবে তৈরি করতে হয় "মাদখাল" এবং "কিতাবুল আসরারে" সে সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ সম্বন্ধে যন্ত্রপাতি বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। তাসিদের কাজ কি ভাবে চলত, পারদ উর্দ্ধ-পাতনের বর্ণনা থেকে তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। জাবিরের Book of Seventy-র ৬১তম অধ্যায়ে পারদ উর্দ্ধ-পাতনের বর্ণনা আছে। রাজী তাঁর কিতাবুল আসরার গ্রন্থেও ঠিক একই ভাবের বর্ণনা আছে। রাজী যে জাবিরের পন্থারই অনুসরণ করেছেন দুইটি বর্ণনার সামঞ্জস্য থেকেই তা বেশ বোঝা যায়। তবে এটি জাবিরের নিজস্ব উদ্ভাবনা, না পূর্ব্বেকার গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থ থেকে নেওয়া সে বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। Stapleton ও Azo-র মতে জাবির খুব সম্ভব এটি গ্রীক বৈজ্ঞানিক-গ্রন্থ থেকে পেয়েছেন। রাজীর পারদ উর্দ্ধপাতনের পন্থাটির এখানে উল্লেখ করা গেল।

"পারদ উর্দ্ধপাতনের দুইটি পন্থা আছে। একটি লাল পারদের জন্য, অন্যটি সাদা পারদের নিমিত্ত। এই উর্দ্ধপাতনের মধ্যে দুটি বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। এক হ'ল একে আর্দ্রতাবিমুক্ত করা, আর অপরটি হ'ল একে শুষ্ক করা যেন এটি বিশোষক হতে পারে। আর্দ্রতা দুই ভাবে বিদূরিত করা যেতে পারে। প্রথমে, যে জিনিষটির সঙ্গে উর্দ্ধপাতন করতে হবে তার সঙ্গে এটিকে ভাল করে যেড়ে নাও। এই ভাবে মাড়া জিনিষটাকে একটা শিশির (কারুরা) মধ্যে পুরে নিয়ে মৃদু আগুনের জ্বালে তাপ দিতে থাক। শিশিটার চার দিক আগে থেকেই কাদা দিয়ে ভাল করে লেপে নিতে হবে। খানিকক্ষণ তাপ দেওয়ার পর আবার মেড়ে নাও। আবার তাপ দাও। এই রকম সাত বার কর যতক্ষণ না পারদ সম্পূর্ণ ভাবে 'মরে' যায়। তার পর একে আবার যে জিনিষের সঙ্গে ইচ্ছা উর্দ্ধপাতন কর। এর পর আবার মৃদু তাপে গরম করে এলুডালে রেখে দাও। পারদে যে আর্দ্রতা আছে সেটুকু সব নিঃশেষে পাতিত করবার জন্যে এলুডালের উপর অল্পপরিসর নলবিশিষ্ট কাঁচ অথবা সবুজ মৃন্ময় পাত্র রেখে দিতে হবে। নলের নীচেও একটি পাত্র (মুকুররুজাহ) রেখে দিতে হবে।

এলেমবিকের জায়গায় এলুডালের মাথার উপর একটা ঢাকনা (মিকাববাহ) ভাল করে বসিয়ে নিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এর উপরে যেন একটা ছিদ্র থাকে। ছিদ্রটা এমন হবে যে বড় একটি সূচের মাথা এর মধ্যে অনায়াসে ঢুকতে পারে। এই ছিদ্রের মধ্যে প্রদীপের একটি পশমী সলিতা রেখে দিতে হবে। সলিতার একদিক পাত্রের উপর ঝুলে থাকবে যেন পারদের মধ্যে যত আর্দ্রতা আছে সবই তাতে পাতিত হতে পারে।

এর পর এই এলেমবিক বা ঢাকনাটা সরিয়ে ফেলে অন্য একটা ঢাকনা দিয়ে এলুডালের মুখটি বন্ধ করতে হবে। ঢাকনা যেন এমন হয় যে এলুডালের মুখের উপর সুন্দর ভাবে বসানো যেতে পারে। ঢাকনাটি বসিয়ে দিয়ে জোড়ের জায়গায় উত্তমরূপে কাদা দিয়ে এঁটে দিতে হবে।

এলেমবিক ব্যবহারের চেয়ে অধিকতর উপযোগী হয়, যদি এলডালের উপর একটি সছিদ্র ঢাকনা ব্যবহার করা যায়। ছিদ্রটি কনিষ্ঠ অঙ্গুলি প্রবেশ করতে পারে এমনি বড় হওয়া দরকার। এমনি ভাবে এলুডালে কাজ করতে যতক্ষণ না জিনিষটিকে সাদা বা কালো ধূলির মত উপরে উঠতে দেখা যায় ততক্ষণ ছিদ্রটি খোলাই রাখতে হবে। সাদা বা কালো রঙের ধূলির মত জিনিষ উপরে উঠতে দেখলেই বোঝা যাবে যে পারদের আর্দ্রতা বিদূরিত হয়ে গেছে। এর পর জাবির ইবনে হাইয়ানের নির্দ্দেশ অনুসারে মসৃণ একটি কাঠির মাথায় তাকড়া জড়িয়ে ছিদ্রটি বন্ধ করে দিতে হবে।

সাধারণতঃ নিম্নোক্ত জিনিষগুলির সঙ্গে পারদ উর্দ্ধপাতন করা যেতে পারে—ফটকিরি, তুতিয়া, লবণ, গন্ধক, চুণ, গুঁড়া ইট, কাঁচ, লাক্ষার (gall nut) ছাই, ওকের ছাই, মারকাসীসা —এবং তরল পদার্থের মধ্যে ভিনেগার, তুতিয়ার জল, সাল এমোনিয়াকের জল, ফটকিরির জল "জাদ আর রাগওয়া" নামক সেই পারদ ও গন্ধকের জল।

"সাদা"র জন্য পারদ উর্দ্ধপাতন

এক 'রতল' পরিমাণ জমানো পারদ নাও এবং সাদা ফটকিরি লবণ ও ছাই প্রত্যেকটি সম-পরিমাণ নিয়ে একসঙ্গে উত্তমরূপে গুঁড়া করে মিশাও। গুঁড়াগুলোকে একটা ছালাইয়ার উপর বিছিয়ে নিয়ে ভিনেগার ছিটিয়ে দাও। তারপর সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা করে অর্থাৎ সারাদিনে তিন ঘণ্টা করে খুব ভাল করে গুঁড়া মিশাও। তারপর কাদা দিয়ে আবৃত একটা বোতলের মধ্যে রেখে দাও। এইবার বোতলটার মুখ বন্ধ করে যে উনুনে এই মাত্র রুটি সেঁকা হয়েছে তার গরম ছাইয়ের উপর রেখে দাও। এই ভাবেই এক রাত থাকতে দাও। সকালবেলা জিনিষটাকে গুঁড়া করে এলুডালের পাত্রের মধ্যে রাখ। কিছু গুঁড়া লবণ এলুডালের তলায় রেখে দাও। এইবার পূর্ব্বের মত এলুডালের উপর এলেমবিক ভালরূপে স্থাপন কর। তারপর এই ভাবে তাপ দিয়ে জিনিষটির আর্দ্রতা বিদূরিত কর। এর পর এলেমবিক তুলে নিয়ে তার জায়গায় অন্য একটি ঢাকনা রাখ এবং জোড়ের জায়গা কাদা দিয়ে লেপে দাও। কিন্তু যতক্ষণ না এই আগুনের মৃদু তাপে আর্দ্রতা বিদূরিত হয়ে যায় ততক্ষণ এর নীচে অল্প আগুন জেলে রাখ। ঢাকনা বেশ ভাল করে লাগিয়ে

নিয়ে এলুডালটিকে ঘণ্টাখানেক ধরে মৃদু তাপ দিতে থাক। তারপর আগুনের জোর একটু বাড়িয়ে অধিকতর তাপ উৎপাদন কর। প্রত্যেক রতল জিনিষের জন্য ১২ ঘণ্টা ধরে এমনি ভাবে তাপ দিতে হবে। যখনই ঢাকনার পাশটা বেশী উত্তপ্ত হয়ে উঠবে তখনই আগুন কমিয়ে দিও—তা না হলে ঢাকনার নীচে তাকে যে জিনিষ জমা হবে তা আগুনে পুড়ে যেতে পারে এবং নষ্টও হতে পারে। এই ভাবেই চলতে থাকবে যতক্ষণ না সমস্ত জিনিষ উর্দ্ধপাতন হয়। যা হোক এই উৎক্ষেপকে আবার অবশিষ্টাংশের সঙ্গে মিশিয়ে গুঁড়া করে নিয়ে পুনর্ব্বার উৎক্ষিপ্ত করতে হবে। তিন বার এই রকম করতে হবে।

চুন্নী (আতানিন) থেকে পোড়া হাড় নিয়ে খুব ভাল করে গুঁড়া কর। উৎক্ষেপের সঙ্গে সমপরিমাণ গুঁড়া-করা পোড়া হাড় এক ঘণ্টা ধরে উত্তমরূপে বিচূর্ণ কর। প্রত্যেক বার নূতন নূতন হাড়ের গুঁড়া দিতে হবে। তৃতীয় বারে সাদা মরা বিশোষক জিনিষ বেরিয়ে আসবে। ঢাকনার এক পাশে একটা ছিদ্র রাখা দরকার। ছিদ্রটি এমন হবে যেন একটি বড় সূচ তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। মাথায় তুলা জড়ানো একটা কাঠি এর মধ্যে ঢুকিয়ে রাখ। এই কাঠিটি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বের করে দেখতে হবে। এর সঙ্গে যে উৎক্ষেপ লেগে থাকবে তা একটি তাকের ওপর রেখে দাও। এই ভাবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় পর্য্যবেক্ষণের পর যখন দেখা যাবে যে, আর কোন উৎক্ষেপ বেরিয়ে আসছে না তখন আগুন নিবিয়ে দেবে। এবার যন্ত্রটিকে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে দাও। তারপর জোড়টি আস্তে আস্তে ভেঙে দিয়ে শেলকের উপর যে জিনিষগুলো জড়ো হয়েছে সেগুলোকে সংগ্রহ কর। এই সংগৃহীত জিনিষগুলো রেড়ীর তেল (খিরওয়া) দিয়ে ভিজিয়ে নরম করে একটি কাদা দিয়ে লেপা শিশির মধ্যে রাখ। শিশিটিকে একটি ছাইভরা পাত্রের উপর রেখে একখণ্ড কাঠের টুকরা দিয়ে বন্ধ করে দাও। ছাইয়ের পাত্রটির নীচে আগুন জ্বালিয়ে দাও যাতে আর্দ্রতা বিদূরিত হয়। তারপর শিশিটির মুখ খুব ভাল ভাবে সীল করে দিয়ে উপরে ছাইচাপা দাও। এই ছাইয়ের গাদার উপর ছোট ছোট কয়লা রেখে আগুন জ্বালিয়ে দাও। এমনি ভাবে শিশির মধ্যেকার জিনিষগুলো জমে যাবে। চীনা আয়না তৈরি করতে যে ধাতু ব্যবহৃত হয় এটা দেখতে তারই মত হবে। এটা হয়ে গেলে এর এক দিরহাম বিশ দিরহাম তামার উপর ঢেলে দাও। জিনিষটা তার মধ্যে প্রবেশ করে বেশ কাজ করবে।

তাখমিক—তারখিম। তাখমিক (Constriction) বা তারখিম (Incubation) তাসিদেরই একটি সহজ পন্থা। এতে ফ্লাস্ক (কারাবি) ব্যবহৃত হয়। জিনিষটি ফ্লাস্কের মধ্যে রেখে আস্তে আস্তে তাপ দিতে হবে। তবে যদি জিনিষটির সারাংশ বের করতে হয় তা হলে তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ফ্লাস্কে রাখতে হবে। তাপ দিতে দিতে জল বা তৈলাক্ত জিনিষটি যখন উবে যাবে তখন বোতলের মুখ বন্ধ করে তাপের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হবে। যতক্ষণ না সমস্ত জিনিষটি উৎক্ষিপ্ত হয়ে ফ্লাস্কের গলার কাছে জমা হয় ততক্ষণ এমনি তাপ দিতে হবে।

৮। তাকলিস—এর অর্থ ভস্মীকরণ। বর্ত্তমানের calcination নামে প্রচলিত পন্থাটির অনুরূপ। এর প্রক্রিয়া অনেকটা তাশবিয়ার অনুরূপ। এতে কাদা লেপা পাত্রটিকে প্রত্যক্ষভাবেই আগুনের তাপে দেওয়া হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জিনিষটি গুঁড়ো হয়ে যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এমনি তাপ দেওয়া চলতে থাকে।

রাজী কি ভাবে এই প্রক্রিয়ায় কাজ করতেন "কিতাবুল আসবার" থেকে তার একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা গেল। এ থেকে অতি সহজেই প্রতীয়মান হবে যে, Phlogiston Theory বর্ত্তমান রসায়নের ইতিহাসে যে সময় থেকে প্রথম উদ্ভাবিত হয় বলে বর্ণিত,তার প্রায় সাড়ে সাত শ' বৎসর আগে থেকেই বৈজ্ঞানিকদের মনে উঁকিঝুঁকি মারছিল। "আজসাদ (দেহ অর্থাৎ ধাতু), পাথর, লবণ পদার্থ, গাদ, ডিমের খোসা এবং আসদাফ (শুক্তি ও শামুকের খোলস) ইত্যাদির উপর তাকলিস-প্রথা প্রয়োগ করা হয়। এদের আসল কাজ হ'ল তাদের দৈহিক উপাদান নষ্ট করা। তাদের মধ্যে যে তেল ও গন্ধক জাতীয় জিনিষ রয়েছে সেগুলো পুঁড়িয়ে দেওয়া এবং এই ভাবে তাদের সাদা চুনে পরিণত করা। এর পর অবশ্য আর অধিক তাপ করা যেতে পারে না। দ্রবণীয় পদার্থের বেলায় নিয়োক্ত তিন ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রথম পুড়িয়ে, দ্বিতীয় তাশদিয়াহ অর্থাৎ মরিচাযুক্ত করে এবং তৃতীয় প্রথা হচ্ছে এমালগাম করে। তাশদিয়াহ হ'ল অন্য রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে রাসায়নিক প্রথায় কাজ করা।

প্রথম প্রথায় পুড়িয়ে রৌপ্যের ভস্মীকরণ—"দশ দেরহাম রৌপ্য লও এবং এর সঙ্গে আধ দেরহাম ওজনের গলান হলদে গন্ধক মিশিয়ে দাও। এগুলিকে সালাইয়াহর উপর রেখে খুব ভালভাবে মেড়ে এতে লবণ-জল দাও (আরবী—একে লবণ-জল খেতে দাও)। যতক্ষণ না পদার্থটি একেবারে শুকিয়ে যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এমনি করে মাড়তে থাক। এইভাবে মাড়া হলে পর একে একটি কাদালেপা পাত্রে (কুঁজো) তুলে নিয়ে উনুনের উপর রেখে দাও। খানিক পরে পাত্রটি সরিয়ে নাও। বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভিতরকার জিনিষ বের করে নাও। এগুলো আবার মেড়ে নিয়ে ধুয়ে নাও। এমনি ভাবে বার বার মাড়তে থাক—যতক্ষণ না জিনিষটি এমন সাদা গুঁড়োতে পরিণত হয় যে একে আর বেশী তাপ করা যাবে না।

তাশ্‌দিয়াহ্‌—তাকলিসের অন্যতম প্রথা হ'ল তাশ্‌দিয়াহ্‌। কিতাবুল আসরারের নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে তাশ্‌দিয়াহ্‌ প্রথার রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

(ক) তাশ্‌দিয়াহ্‌ প্রথায় সোনা ভস্মীকরণ—ইচ্ছামত কিছু সোনার টুকরা লও এবং একটি সালাইয়াহ্‌র উপর সমপরিমাণ পরিস্রুত সুরা সির্কা (Wine-Vinegar) মিশানো সাল এমোনিয়াক দিয়ে মাড়তে থাক যতক্ষণ না সোনা ধুলার মত গুঁড়োতে পরিণত হয়। দরকার হলে ত্রিশবার পর্য্যন্ত (ত্রিশ দিন) এমনি মাড়তে হবে।

(খ) তাশ্‌দিয়াহ্‌ প্রথায় রৌপ্য ভস্মীকরণ—ইচ্ছামত কিছু রৌপ্যের টুকরা ও সমপরিমাণ সালএমোনিয়াক লও। এগুলোকে একত্রে জল দিয়ে ভিজাও। এর পর এগুলোকে তিন বার জল দিয়ে খুব ভাল করে নাড়া দাও। যখন জল শুকিয়ে যাবে তখন আবার জল দিয়ে ভাল করে ঝাঁকুনি দিতে থাক। এমনি ভাবে যতক্ষণ না রৌপ্য সাদা ধূলিবৎ—"জানজারে" পরিণত হয় ততক্ষণ জল দিয়ে নাড়াতে হবে। (জালজারের ধাতুগত অর্থ হ'ল যার কোন অংশ নেই।) তার পর পদার্থটিকে ধুয়ে নিয়ে জল ও লবণ দিয়ে assate কর এবং যতক্ষণ না সাদা চুনে (নুরাহ্‌) পরিণত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত assate করতে থাক।

(গ) তাশ্‌দিয়াহ্‌ প্রথায় তামা ভস্মীকরণ—তামাকে জানজারে পরিণত করার জন্য এ প্রথা প্রয়োগ করা হয়। একটা তামার পাত নিয়ে গাঢ় (গালিজ) সির্কাতে চুবিয়ে নাও। (লিপজিগের পাণ্ডুলিপিতে সির্কার স্থানে "টাটকা দুধ" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। খুব সম্ভব এ ভিনেগারেরই তৎকালীন রাসায়নিক পরিভাষা মাত্র।) তারপর তামার পাতটিকে বাঁশের চাটাইয়ের উপর রেখে, চাটাইটিকে ভিনেগার ভরা অন্য একটি পাত্রের (বাতিয়াহ্‌) উপর স্থাপিত কর; এতে তামা জানজারে পরিণত হবে। পাতের উপরকার কিয়দংশ জানজার বা গুঁড়ো হয়ে গেলে সেট চেঁচে নাও এবং আবার পূর্ব্বপ্রথামত কাজ চালাও। এতে আস্তে আস্তে গোটা তামার পাত জানজারে পরিণত হবে।

অন্য একটি উৎকৃষ্ট পন্থা—তামার টুকরো এক রতল এবং সালএমোনিয়াক একসঙ্গে এক আউন্স নিয়ে সুরা ভিনেগারে চুবিয়ে দাও। দিনের মধ্যে এগুলোকে কয়েকবার ঝাঁকিয়ে দিতে হবে। যখন ভিনেগার শুকিয়ে যাবে তখনই আবার ভিনেগার দিয়ে ঝাঁকাবে। এভাবে এই মিশ্রণজাত পদার্থ পুরোপুরি জানজারে পরিণত হবে।

অন্য একটি উৎকৃষ্টতর পন্থা—এক রতল পরিমাণ সুন্দর রুসাখতাজ (পোড়া তামা অর্থাৎ তাম্রাম্ল—Copper oxide) নিয়ে ভালভাবে মেড়ে তার সঙ্গে এক আউন্স পরিমাণ সাল-এমোনিয়াক মিশাও। এখন দুই রতল পরিমাণ ভাল সুরা ভিনেগার নাও এবং তার সঙ্গে এক আউন্স সাল-এমোনিয়াক মিশ্রিত কর। এক রাত এমনি থাকতে দাও। তার পর ফিল্টার কর। এবার সালাইয়াহ্‌র উপর মাড়া রুসাখতাজ মিশিয়ে রেখে দাও। দিনের বেলায় এমনি মেড়ে নিতে হবে, এবং রাত্রে আরও ভিনেগার দিয়ে রেখে দিতে হবে। যখনই শুকিয়ে যাবে তখনই ভিনেগার মিশাবে—যতক্ষণ না সবটুকু জানজারে পরিণত হয়।

অবশ্য এই তিনটি প্রক্রিয়ায়ই copper acetate তৈরি হবে। তৃতীয় প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। এতে রাসায়নিকের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়। রাসায়নিক বুঝতে পেরেছিলেন যে, শেষ ফল অর্থাৎ copper acetate, ভস্মীভূত তামা থেকে যেমন তৈরি করা যেতে পারে তেমনি সাধারণ তামা থেকেও প্রত্যক্ষ ভাবেই তৈরি করা যেতে পারে।

(ঘ) লৌহ ভস্মীকরণ—লৌহের বেলায় অবশ্য এই ভস্মীকরণ প্রথা অতি সহজ। ভস্মীকরণ অর্থ লৌহে মরিচা ধরানো। মরিচা-ধরা লোহা বর্ত্তমান রসায়নে Iron oxide নামে পরিচিত। আরব-রসায়নে এর নাম হ'ল "জাফরান"। সাধারণ জলের সঙ্গে বাতাসের সাহায্যে অথবা লবণ ও ভিনেগার মিশানো জলের সঙ্গে বাতাসের সাহায্যে লোহাকে জাফরানে পরিণত করা হ'ত। একটি প্রক্রিয়া এখানে বর্ণনা করা গেল। "ভাল লোহার কতকগুলো টুকরা লও। এগুলোকে কয়েকবার জল ও লবণ দেয়ে ধোও যেন এর সমস্ত ময়লা বিদূরিত হয়। এই পরিষ্কৃত লোহার টুকরোগুলোকে একটা কাঁচের বোতলে রেখে, বোতলের ভিতরে সুরা ভিনেগার ঢেলে দাও। এইবার মিশ্রিত পদার্থকে দিনের মধ্যে কয়েকবার ভাল করে ঝাঁকিয়ে দেবে। যখনই শুকিয়ে যাবে তখনই আবার ভিনেগার দিয়ে ঝাঁকাবে—যতক্ষণ না সমস্ত লোহার টুকরো জাফরানে পরিণত হয়।" লৌহ ভস্মীকরণের অন্য একটি পদ্ধতিও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এ পন্থায় আর্সেনিক সালফাইড ব্যবহার করা হয়েছে। লোহার টুকরা প্রথমে আর্সেনিক সালফাইডের সঙ্গে গরম করলে যে Iron Arseno Sulphide তৈরি হয় তাকে তুতিয়া (জাজ) মিশনো ভিনেগার দিয়ে বিয়োজন করা হ'ত। তারপর যতক্ষণ না লাল গুঁড়োতে পরিণত হয় ততক্ষণ এই বিয়োজিত জিনিষকে তাপ দেওয়া হ'ত।

তাসবিল—বিশুদ্ধিকরণের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হ'ল তাসবিল। মাকাতিছল ওলমের তৃতীয় খণ্ডে এ পন্থাটির উল্লেখ দেখা যায়। ইংরেজীতে Lixivation বলতে যা বুঝায় এ শব্দটির মূল অর্থও অনেকটা তাই। এর উদ্দেশ্য ছিল জিনিষটাকে এমন সূক্ষ্ম দানাতে পরিণত করা যেন সেগুলি জলের উপর ভাসতে থাকে। প্রক্রিয়াটিতে অবশ্য ভস্মীকরণ-প্রথাও নিহিত রয়েছে।

বিশুদ্ধিকরণের দ্বিতীয় স্তর

তাশমি—এর ইংরেজী অর্থ দাঁড়াবে Ceration, পদার্থগুলির অতিরিক্ত সমস্ত ময়লা উপরোক্ত এক বা ততোধিক পন্থায় পরিষ্কার করে নিয়ে সেগুলির উপর তাশমি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

জাবিরের 'Book of Seventy'র অন্যতম গ্রন্থে তাশমি প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর মতে তাশমি হ'ল যে সমস্ত জিনিষ থেকে রুহ ও নাফস পৃথক করা হয়েছে সেই সমস্ত জিনিষে রুহ ও নাফস ফিরিয়ে আনা। কিতাবুল আসরারে রাজী সংমিশ্রণের তৃতীয় বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পদ্ধতি সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মূলও বোধ হয় জাবিরের এই থিওরী।

রাজীর বর্ণনা নিম্নরূপ—নাফস আগে পৃথক ভাবে তাশমি করে দ্রব কর, তারপর রুহও পৃথক ভাবে তাশমি করে গালিয়ে নাও। তারপর 'দেহ' (অবসাদ) পৃথক ভাবে তাশমি করে দ্রব কর। এই তিনটি দ্রবণ সমপরিমাণে একত্রে মিশিয়ে চল্লিশ দিন মাটির নীচে পুঁতে রাখ—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তারা বিশুদ্ধীকৃত হয় এবং একটি অনাটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে যায় ততক্ষণ এমনিভাবে রাখতে হবে।

এই তাশমি প্রক্রিয়া চার শ্রেণীর পদার্থের উপর প্রয়োগ করা যায় বলে রাজী তাঁর কিতাবুল আসরার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই চার শ্রেণীর পদার্থ হ'ল নাফসীয় (আত্মিক বস্তু), অবসাদ (দৈহিক বস্তু), লবণ পদার্থ এবং প্রস্তর-বস্তু। তাশমি করা হয় চার প্রকার বিকারক (Reagent) দ্বারা। এই চার প্রকার বিকারক হ'ল আত্মিক বস্তু, লবণ-পদার্থ, তৈল-পদার্থ ও সোহাগা জাতীয় (Borax) পদার্থ।

আত্মিক বস্তুগুলোকে লবণ পদার্থ, তৈল পদার্থ এবং সোহাগা জাতীয় পদার্থ দিয়ে, দৈহিক বস্তুগুলোকে আত্মিক বস্তু, লবণ পদার্থ এবং সোহাগা জাতীয় পদার্থ দিয়ে প্রস্তর বস্তু, লবণ-পদার্থ ও সোহাগা জাতীয় দ্রব্য এবং লবণ-পদার্থগুলোকে শুধু তৈল পদার্থ দিয়ে তাশমি করা যেতে পারে। তাশমি করে যে জিনিষ পাওয়া যাবে সেটা যদি কোন তপ্ত রৌপ্য বা তামার পাতের উপর ফেলা যায় তা হলে গলে যাবে এবং ধাতুর মধ্যেও প্রবেশ করবে। এই সমস্ত তাশমি-করা বস্তু ধাতুগুলোকে কিছু রঙীনও করে তুলতে পারে।

এই তাশমি প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত জিনিষগুলো কি তা স্থির নিশ্চয় করে জানা যায় না। তবে খুব সম্ভব এগুলো কতিপয় দ্রবণীয় বস্তুর একত্র সমাবেশ। এখানে রাজীর গ্রন্থে বর্ণিত সোনা তাশমি করার দুইটি পন্থার উল্লেখ করা গেল। এর প্রথমটি গ্রীক পদ্ধতির অনুরূপ। এই পদ্ধতিতে গ্রীক আলকেমীবিদ্‌গণ রাসায়নিক পরীক্ষা চালানোর জন্য নানা রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করতেন। দ্বিতীয়টি থেকে মনে হয় বৈজ্ঞানিক খুব সম্ভব দ্রবণীয় Double chloride of gold তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১। আত্মিক বস্তু দিয়ে সোনা তাশমি করা—"যতটা ইচ্ছা লাল সোনা লও এবং তা থেকে পাতলা পাত তৈরি কর। একটা কাদালেপা পাত্র লও এবং এতে বাষ্পীভূত গন্ধক—যাতে কাল রঙের কোন চিহ্নই নেই, স্তরে স্তরে সাজাও। এতে পাতলা সোনার পাতগুলোও স্তরে স্তরে সাজিয়ে দাও। এখন পাত্রটি ভিট্রিওল (জাজ) দিয়ে পূর্ণ কর। এইবার একটা ঢাকনা দিয়ে মুখ বন্ধ করে জোড়ার জায়গাটা ভাল করে এঁটে দাও। এখন পাত্রটিকে মাঝারি রকম উত্তাপের চুল্লীর (তান্নুর) উপর রাখ। মাঝারি উত্তাপ বলতে ঘুঁটের আলের মত আল বুঝায়। তারপর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তুলে নাও। এমনি ভাবে করতে থাক যতক্ষণ না গলে বয়ে যায়।

প্রক্রিয়াটির বর্ণনা থেকে মনে হয় ভিট্রিওল Copper sulphide এবং Iron sulphide-এ পরিণত হবে। এরই সঙ্গে সোনা ও গন্ধকে সংমিশ্রিত যে Gold sulphide তৈরী হবে, তার সঙ্গে হয়ত Copper sulphide বা Iron sulphide যুক্ত হয়ে double salt তৈরি হতে পারে।

লবণ দিয়ে সোনা তাশমি করা—গুঁড়া সোনার ভস্ম নাও এবং একে সালএমোনিয়াক্ সলিউসনে ভাল করে ভিজাও যাতে সমস্ত অংশই উত্তমরূপে একত্র হতে পারে। যতক্ষণ না শুষ্ক হয়, একে মাড়তে থাক। তারপর পিছনে কাদা দিয়ে একটি লেপা থালায় (সুকুর রুকা) অনাচ্ছাদিত কয়লার আগুনের উপর রেখে দাও। যখন দেখা যাবে এই মিশ্রিত পদার্থগুলি উপরে উপরে থামছে তখন উপরের ডালাটা তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য অন্যত্র তুলে রাখ। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আবার ডালা বন্ধ কর। এমনি ভাবে দশ বার কর। তারপর সালএমোনিয়াক সলিউসন দিয়ে ভাল করে ভিজিয়ে মাড়তে থাক। এভাবে দশ বার কর—যতক্ষণ না জিনিষগুলো জলগ্রাহী (deliquescent) লবণে পরিণত হয়।

হল-তাহলিল—Solution—শব্দটির ধাতুগত অর্থ হ'ল পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাসমূহকে পৃথক করে দেওয়া। এতে তাশমি প্রথায় যতটুকু পরিবর্ত্তন হয়েছে তার চেয়ে আরও অধিক পরিবর্ত্তন বুঝায়। বর্ত্তমান রসায়ন-শাস্ত্রে solution বলতে যে প্রক্রিয়া বুঝায় আরব-রসায়নেও তাহলিল ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহৃত হ'ত।

রাজী তাঁর তৃতীয় গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'হল' প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যে কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন, এখানে তন্মধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃত করা গেল। এ থেকেই প্রক্রিয়াটিতে কি প্রথা অনুসৃত হ'ত তার আভাস পাওয়া যাবে।

(ক) আলমিয়াহ্ আলহাদ্দাহ—'তীক্ষ্ণ' জল দিয়ে কতক-

হেমন্ত শিশিরে মেশা
নতুন গানের নেশা !

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

GE 7409 { না ধরা দেবার ছলে / একটি সেতুর বাঁধন

—আধুনিক

গৌরীকেদার ভট্টাচার্য

GE 7408 { আমি তো তোমারে ভুলি নাই / আজিও বুঝিনা কেন

—আধুনিক

গিরীন চক্রবর্ত্তী

GE 7406 { আমি যারে চাই / ফুল বাগানে নানা রঙের

—মুকুন্দদাসের গান

কুমারী নীভা বর্দ্ধন

GE 7411 { মধুবনে বাঁধা আছে / কে যায় কে যায়

—আধুনিক

শ্রীমতী প্রতিমা দাশগুপ্তা

GE 7410 { অশ্রুনদীর সুদূর পারে / মুখপানে চেয়ে দেখি

—রবীন্দ্র-সঙ্গীত

বহুখ্যাত বাণী চিত্রের গান

ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিকচার্স লিঃ-এর
নারীর রূপ
চিত্রের গান
GE 7437, GE 7438, GE 7439

সাইন প্রোডিউসার্স-এর
মায়ের ডাক
চিত্রের গান
GE 7390

নিউ থিয়েটার্স লিঃ-এর
অঞ্জনগড়
চিত্রের গান
—(বাংলায়)—
VE 2555, VE 2556
VE 2557
—(হিন্দিতে)—
VE 2556, VE 2558

কল্প চিত্র মন্দিরের
ওরে যাত্রী
চিত্রের গান
GE 7387, GE 7388
GE 7389

ঈষ্টার্ণ টকিজ লিঃ-এর
'নন্দরাণীর সংসার'
চিত্রের গান
GE 7405

কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী লিঃ

কলিকাতা — বোম্বাই — দিল্লী
লাহোর — করাচী

গুলি জিনিষের একটি বিচিত্র সংগ্রহ বলা যেতে পারে। মূত্র এবং অন্যান্য অজৈব পদার্থ থেকে প্রাপ্ত নানাবিধ তরল পদার্থ এবং ভিনেগারও এই 'তীক্ষ্ণ' জল নামে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়াও সালএমোনিয়াক মিশানো কষ্টিক সোডা, গাঢ় এমোনিয় সলিউসন, ক্যালসিয়াম সালফাইড (আদ্‌আর রাগওয়াহ্) এবং সালএমোনিয়াকে পারদের সলিউসনও ব্যবহৃত হ'ত। সালএমোনিয়াকে পারদ সলিউসন অবশ্য বিশেষ করে ভস্মীকৃত জিনিষগুলোকে দ্রব করবার জন্যই ব্যবহৃত হ'ত। (গাঢ় এমোনিয়া সলিউসন সাধারণতঃ সাল-এমোনিয়াক ও তাম্রায় একত্রে পাতন করে, সালএমোনিয়া ও colocynth pulp মিশিয়ে নিয়ে এই পাতিত জিনিষটি তৈরি হ'ত।)

খনিজ অম্ল পদার্থের (mineral acid) আবিষ্কারের দিক দিয়ে রাজীর এই পন্থা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এ পন্থায়ই রাজী হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈরি করতে সক্ষম হন। রাজীর গ্রন্থের এই অধ্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত প্রক্রিয়াটি থেকেই বুঝা যায় যে, তিনি সত্য সত্যই হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈরি করতে পেরেছিলেন। সে হিসেবে এটিকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড প্রস্তুতের অন্যতম প্রাথমিক প্রণালী বলা চলে। অবশ্য এখানেও মতভেদ আছে। বেকম্যান ও অন্যান্য প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের মতে রাজী সত্য সত্যই যাবতীয় খনিজ অম্ল (mineral acids) আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, কিন্তু ষ্টেপলটন ও তাঁর সহকর্মীরা এ বিষয়ে বেকম্যান প্রভৃতির সঙ্গে একমত নন। তাঁদের মতে বেকম্যান ও তাঁর সহকর্মীরা খুব সম্ভব Liber Bubacaris গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত কয়েকটি পরিচ্ছেদের উপর নির্ভর করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ষ্টেপলটন ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের মতের সমর্থনেও কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণাদি উপস্থাপিত করেন নাই।

সাতটি লবণের সলিউসন

সম-পরিমাণ সুমিষ্ট লবণ, তিক্ত লবণ, তাবারজাদ লবণ, আনদারানী লবণ, ভারতীয় লবণ, আলকিলি লবণ লও। এর সঙ্গে সম ওজনের দানাদার কেলাসিত সালএমো-নিয়াক মিশিয়ে নিয়ে সামান্য জল দিয়ে দ্রব কর। এইবার সংমিশ্রণটিকে পাতন কর। ফলে 'তীক্ষ্ণ' জল পরিস্রুত হয়ে বেরিয়ে আসবে এবং পাথরকে (সাখর) মুহূর্তের মধ্যে গলিয়ে ফেলবে। (লিপজিগের পাণ্ডুলিপিতে "সাখর" শব্দের পরিবর্তে "তালক্" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।)

ষ্টেপলটন ও তাঁর সহকর্মীরা, এসিডের দিকে রাজীর পরিচয় ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান। তাঁদের মতে, রাজীর সময়ে নাইটর (Nitre) অন্যান্য লবণ-পদার্থ থেকে পৃথক করা হয় নাই। একথা মেনে নিলে এই সময় নাট্রিক এসিড সম্পূর্ণ পৃথকভাবে তৈরি হয়েছিল বলে মনে হয় না। যদিও রাজী ভিট্রিওল শুষ্কপাতন করেছিলেন তবুও তিনি সাল-ফিউরিক এসিড তৈরি করেন নাই বলেই মনে হয়। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতদের ধারণা, রাজী শুধু রুহ ও নফস পৃথকীকরণের চেষ্টায়ই এমনিধারা পরীক্ষণ করেছিলেন এবং সেইজন্যই পাতিত করে প্রাপ্ত জিনিষকে আবার আলেম্বিকে অবশিষ্টাংশের মধ্যে মিশিয়ে দেন। এই পাতিত করে প্রাপ্ত জিনিষ যে একটি বিশেষ শক্তিসম্পন্ন দ্রাবক সেটা হয়ত তাঁর নজরে পড়ে নাই।

ষ্টেপলটন অবশ্য এ মতের সমর্থনে কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করেন নাই। তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা লাউফার প্রমুখ পণ্ডিতগণের মত খণ্ডন করে নাইটর যে আরবদের সুপরিচিত ছিল সে বিষয়ে প্রমাণ দিয়েছেন। লাউফারের মতে আরবগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে saltpetre-এর সঙ্গে পরিচিত হন। এই সল্টপিটার চীন থেকে প্রাপ্ত বলেই এর নাম দেন "ছালজ আস সিনি"—চীনের তুষার। (Sino Iranica P. 55।) ষ্টেপলটন ও তাঁর সহকর্মীরা লাউফারের এ মত সমর্থন করতে পারেন নাই। প্রথমতঃ ইবনে বাইতারের মতে সল্টপিটার এবং আসিয়ুস একই জিনিষ। আসিয়ুস অর্থ Stone of Assos ডিসকোরাইডিস এবং গ্যালেনের গ্রন্থে এই আসিয়ুসের উল্লেখ দেখা যায়। ইবনে বাই-তারের মতে এ জিনিষটি মরক্কোতে "বারুদ" নামে পরি-চিত ছিল। ইবনে বাইতার ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে মরক্কো পরিদর্শন করেন। ইবনে বাইতারের এই প্রমাণ ছাড়া স্বয়ং জাবিরের গ্রন্থেই এই জিনিষটির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর "কিতাবুল মিজান" গ্রন্থ থেকে মনে হয় তিনি এই জিনিষটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

(*Book of Balance*;—Berthelot & Hondas, La Chimie III, p. 155.)

(খ) গোবরে সলিউসন—এতে জিনিষটি সমচতুষ্কোণ পাত্রে পুরে পাত্রটিকে গোবরের মধ্যে পুঁতে ফেলা হ'ত। রাজীর কিতাবুল আসরার গ্রন্থে এ প্রক্রিয়াটি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নিম্নে পদ্ধতিটি বর্ণিত হ'ল।

বায়ুশূন্য স্থানে দুটি খাল খনন কর। খালগুলি দুই হাত (জিরা) গভীর ও এক হাত চওড়া হওয়া চাই। ওলকপির রস দিয়ে মিশানো পোষা পায়রার মল দিয়ে গর্ত দুটি ভাল করে লেপে নাও।

এইবার ঘোড়ার তাজা পুরীষ এবং সমপরিমাণ পায়রার মল একসঙ্গে মিশিয়ে এই মিশ্রিত জিনিষগুলোর মধ্যে ওল-কপির রস দিয়ে বেশ করে মাখ যেন ঘন কাঁইয়ের মত হয়। ঘোড়ার পুরীষ টাটকা হওয়া চাই সেইজন্য সেদিনকার পুরীষ নিতে হবে। এই কাঁই দিয়ে একটা গর্তের এক হাত পরিমাণ

উত্তর বায় জানায় শাসন—

শীতের হাওয়ায় রুক্ষ শাসন শুধু বনের গাছেই লাগে না মানুষের দেহেও লাগে।

বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে দেহকে খাপ খাওয়াবার জন্য সবচেয়ে পরিশ্রম করতে হয় লিভারকে। লিভার তার রক্তকণিকাগঠন, পিত্তনিঃসারণ রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা প্রতিনিয়তই দেহকে রক্ষা করছে।

তাই **কুমারেশ** অজীর্ণ উদরাময়, অ্যামিবাঘটিত আমাশয়, শিশু যকৃৎ, সূতিকা প্রভৃতি লিভার ও পেটের সকল পীড়া নিশ্চিতরূপে নিরাময় ত করেই তা ছাড়াও লিভারকে শক্তিশালী ক'রে অন্য রোগের আক্রমণও প্রতিরোধ করে।

কুমারেশ

দি ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ

সালকিয়া :: হাওড়া

জায়গা ভর্ত্তি কর। যে জিনিষটিকে দ্রব করতে হবে সেটিকে একটি চওড়া তলাযুক্ত সমচতুষ্কোণ বোতলে (কারুরা) রাখ। এই বোতলটির সমান আকারের একটা ছাঁচও (কালিব) সঙ্গে রাখতে হবে। এববার এই ছাঁচটি কাঁইয়ের মধ্যে ঠেসে বসিয়ে দাও। একটু নাড়াচাড়া করে এমন ভাবে বসাতে হবে যে ছাঁচটি যেন এর মধ্যে আলগা আলগা ভাবে লেগে থাকতে পারে। এর পর ছাঁচটি তুলে নিয়ে তার জায়গায় বোতলটি বসিয়ে দাও। বোতলটির মুখ আগে থেকেই প্লাস্টার (সারুজ) দিয়ে ভাল করে এঁটে দিতে হবে। এইবার বোতলের উপর একটি ভিজা ঝুড়ি (সাল্লাহ) জড়িয়ে দাও এবং তদুপরি গোবর দিয়ে চাপা দাও। এইবার সমস্ত জিনিষটা একটা বড় কুঁজো (ইজ্জনাহ) দিয়ে ঢাকা দাও এবং জোড়ের জায়গাটি বন্ধ করে দাও। প্রত্যেক দিন কুঁজোটা তুলে নিয়ে গোবরের উপর গরম জল ছিটিয়ে দেবে এবং সপ্তাহে একবার করে গোবরও বদলে দেবে। অতঃপর অন্ত গর্ত্তটির অর্দ্ধেকটা পায়রার মল দিয়ে পূর্ণ কর, তারপর আরও গোবর এর মধ্যে দিয়ে ছাঁচটিকে বসাও এবং এক রাত্রির জন্ত কুঁজো দিয়ে ঢেকে রাখ, তবে জোড় বন্ধ করো না। সকাল বেলা গোবরে ডুবিয়ে রাখা বোতলটি তুলে নাও এবং দ্বিতীয় গর্ত্তে বসানো ছাঁচটি তুলে নিয়ে সেই ছাঁচের জায়গায় বোতলটি বসিয়ে দাও। এইবার বোতলটির উপর একটি ঝুড়ি বসিয়ে দিয়ে ঝুড়িটাকে গোবর দিয়ে ঢেকে দাও। এখন সবগুলোকে কুঁজো দিয়ে ঢেকে দিয়ে জোড়ের জায়গা বন্ধ করে দাও। যতক্ষণ না জিনিষটি সম্পূর্ণভাবে দ্রব হয়ে যায় ততক্ষণ এমনিধারা করতে থাক। এই প্রক্রিয়াতেই যাহা সহজে গলে না, তেমন জিনিষও দ্রব করা যাবে।

(গ) ভিজা বাতাসে সলিউসন—এতে জিনিষসমেত পাত্রটিকে ভিজা বালির মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। জিনিষটি বাতাসের হাওয়া থেকেই আস্তে আস্তে দ্রব হয়ে যায়।

(ঘ) "দানে" সলিউসন—রাজী দানের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, এ হ'ল চওড়ামুখো ৩০ দাওরাক তরল জিনিষ ধরবার মত পাত্র। আইনুস সানাহ গ্রন্থ অনুযায়ী এক দাউরাক জলের ওজন হ'ল ১০৪০ দেরহাম। ১২৮ দেরহাম এক পাউণ্ডের সমান এবং ১০ পাউণ্ড এক গ্যালনের সমান ধরে নিলে এক দানের ধারকত্ব হবে ২৪ গ্যালন। প্রক্রিয়াটির বেলায় দেখা যায়, এমনি একটি পাত্রের দুই-তৃতীয়াংশ সির্কা দিয়ে ভর্ত্তি করা হ'ত। যে জিনিষটি দ্রব করতে হবে সেটি আলগা ভাবে একটা নেকড়ায় বেঁধে একটা হাতলে রেখে পাত্রের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত। নেকড়ার পুঁটুলির চার আঙুল নীচে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে তাই দিয়ে জিনিষগুলোকে গরম করা হ'ত। "দানের" মুখটি শক্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হ'ত। দানের বহির্ভাগ, পায়রা ও পশুর মল পাঁজরের রসের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে খুব ভালভাবে লেপে দেওয়া হ'ত। প্রদীপটা ভিতরে যে ভাবে রাখা হ'ত তাতে মনে হয় তার আয়ু খুব দীর্ঘ হ'ত না। এটা খুব শীঘ্রই নিবে

নেতাজীর অনুসরণে ঃ

বাংলার বিখ্যাত ঘৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার "শ্রী" মার্কা ঘৃতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিষ্প্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 'শ্রী' ঘৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ঘৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ ঘৃত যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা ঘৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

যেত, তাপের পরিমাণও খুব বেশী হ'ত না। যা হোক প্রত্যেক দিন দুই বার করে ঢাকনার উপর দিয়ে গরম জল ঢেলে দেওয়া হ'ত। এমনিভাবেই কাজ চলত যতক্ষণ না সমস্ত জিনিষ দ্রব হয়ে যেত। বৈজ্ঞানিকদের মতে এই পন্থাটি কঠিন ভস্মীকৃত জিনিষগুলোকে দ্রব করবার পক্ষে খুবই সুবিধাজনক।

(ঙ) কড়াইতে (মিরজাল) সলিউসন—কড়াইটি জল, তুষ বা ছোট ছোট করে কাটা ভেড়ার লোম, এবং পায়রার মল দিয়ে পূর্ণ করা হ'ত। জিনিষ সমেত পাত্রটি এই তুষ, জল ও মলপূর্ণ কড়ায়ের মধ্যে রেখে কড়াইটিতে জ্বাল দেওয়া হ'ত। যতক্ষণ না জিনিষটি দ্রব হয়ে যেত ততক্ষণ পর্য্যন্ত এমনি জ্বাল দেওয়া হ'ত।

(চ) 'তীক্ষ্ণ' জল দিয়ে কারও আলেমবিকে সলিউসন—যে জিনিষটি দ্রব করতে হবে সেটিকে খাতের মধ্যে এবং তীক্ষ্ণ জল তারে রেখে দিয়ে আলেমবিক দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর পর সমস্ত পাত্রটি একটি জলের পাত্র বা ছাইয়ের উপর বসিয়ে দেওয়া হয়।

(ছ) সিরদাবে কারাফস নিয়ে সলিউসন—সিরদাব বা সাবদান কি ধরণের যন্ত্র সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু অবগত হওয়া যায় না। "সিরদাব" অর্থ হল "ঠাণ্ডা ঘর" বা বরফের বাক্স। পূর্ব্ববর্ণিত প্রথামত এতে জিনিষটি কারফাসের সঙ্গে মিশিয়ে একটি পাত্রে রাখা হ'ত। পাত্রটি একটি হাতলের থেকে যন্ত্রের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত। যন্ত্রটির ঢাকনা ভাল করে বেঁধে দিয়ে খাইশ (সূতী কাপড়) দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হ'ত। খাইশের উপর মধ্যে মধ্যে জল ছিটিয়ে দেওয়া হ'ত। এমনি ধারা চলত যতক্ষণ না জিনিষটি দ্রব হয়ে যেত।

(জ) ভাকভির দ্বারা সলিউসন—বিশেষভাবে লবণ ও ভিট্রিওলের জন্যই এ পন্থা প্রযুক্ত হত। জিনিষটি প্রথমতঃ অল্প অল্প ভিজিয়ে রাত্রে খোলা বাতাসে রেখে দেওয়া হ'ত। পরদিন সকালে এটা পাতন করা হ'ত। পাতনের পর অবশিষ্ট অংশ দুই বার করে জলে ভিজিয়ে আবার শুকিয়ে নেওয়া হ'ত। তার পর পাতিত দ্রব্যও এর সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হ'ত। যতক্ষণ পাতিত দ্রব্য ওজনে বাড়তে থাকত ততক্ষণ পর্য্যন্ত এমনিধারা বার বার পাতন, জলে ভিজানো এবং শুকানো চলত। যখন ওজনে কমতে থাকত তখনই এই প্রক্রিয়ার সমাপ্তি হ'ত।

৪। তামজিজ বা মিজাজ—একে ইংরেজীতে বলা চলে combination। এই তামজিজ করতে তিনটি প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে বলে রাজী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই তিনটির মধ্যে অবশ্য তৃতীয় পন্থাটিই (সলিউসন করে এক সঙ্গে মিশানো) সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলে মত প্রকাশ করেছেন। প্রথা তিনটি হ'ল (১) প্রথমে মেড়ে নিয়ে assation করা; (২) মেড়ে নিয়ে পরে ceration করা (৩) সলিউসন করে একত্রে মিশানো।

৫। আকদ—ইংরেজীতে একে বলা চলে coagulation প্রথা। অবশ্য Fixation-ও বলা যেতে পারে। আলইক-সির তৈরি করতে এইটিই হ'ল চরম প্রক্রিয়া। এটিও নানা ভাবে করা যেতে পারে। (ক) assation করে (খ) ফ্লাস্ক এবং পাত্র করে (গ) দাফন বা গোবরে পুঁতে (ঘ) আলেমবিকে উত্তপ্ত করে।

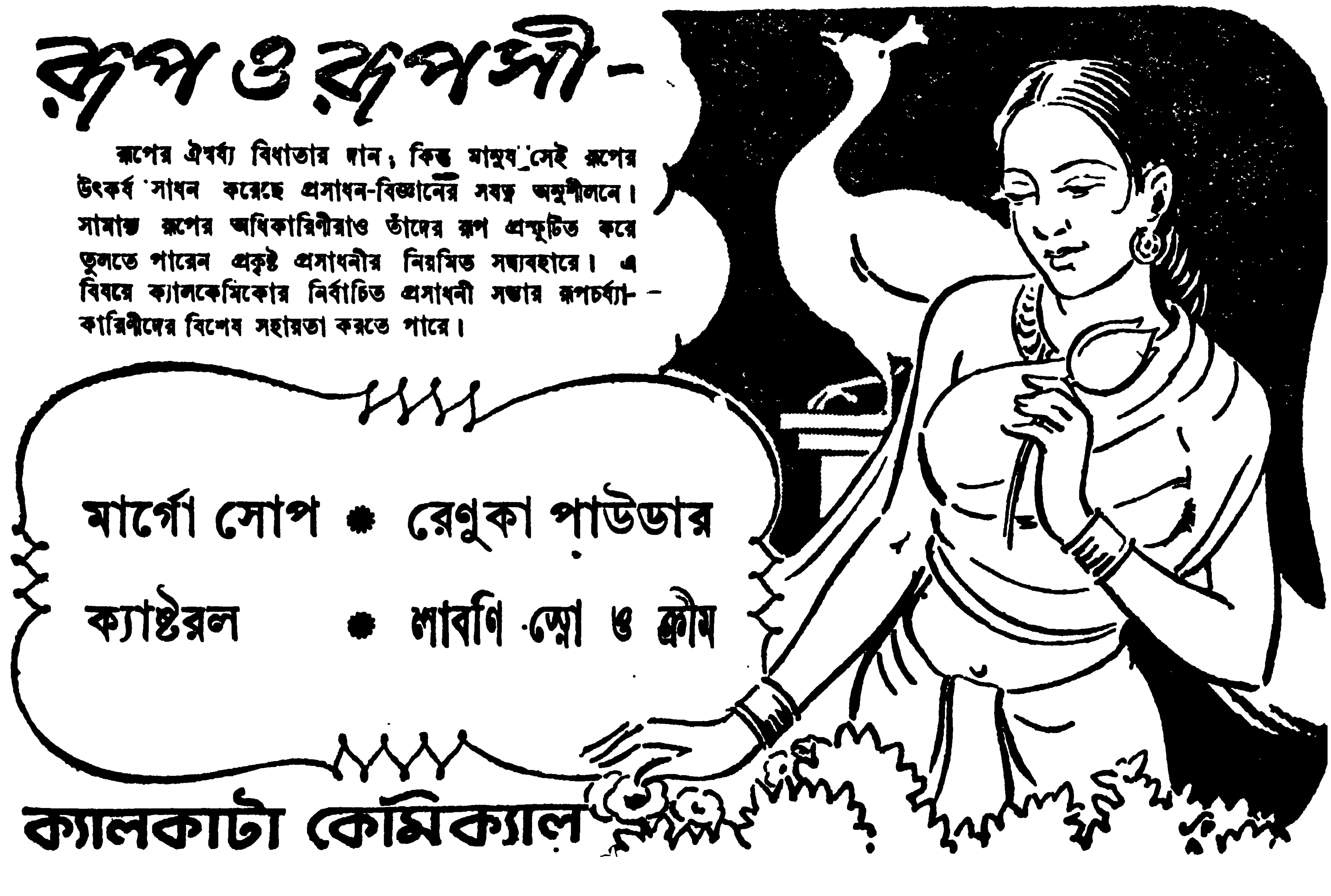

পুস্তক-পরিচয়

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড: ১৮২৪—১৮৫৮। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ১৩৫৫। পৃঃ ৯০। মূল্য দুই টাকা।

সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি; আলোচ্য গ্রন্থটি কলেজের ১২৫ বৎসর পরিপূর্তির উপলক্ষ্যে কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষের উৎসাহে রচিত। যোগ্য ব্যক্তির উপরই গ্রন্থ-রচনার ভার দেওয়া হইয়াছিল; কারণ এই যুগের শিক্ষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথের মত বিশেষজ্ঞ নাই বলিলেও চলে। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও তথ্যনিষ্ঠার সহিত তিনি উক্ত কলেজের নথিপত্র ও সরকারী দপ্তরের দলিলদস্তাবেজ হইতে ইহার প্রথম যুগের, অর্থাৎ ১৮২৪ সনে প্রারম্ভ হইতে ১৮৫৮ সনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধ্যক্ষতা কাল পর্য্যন্ত, একটি নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিক বিবরণ দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এই শিক্ষায়তনের যাঁহারা প্রাণস্বরূপ ছিলেন, সেই সকল শিক্ষক ও কৃতী ছাত্রদের বৃত্তান্ত যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু গ্রন্থখানি শুধু একটি কলেজের ইতিবৃত্ত নহে। আমাদের বর্তমান যুগের সংস্কৃতির ও গত যুগের শিক্ষা-বিস্তারের মূলে যে দুইটি সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল, তাহার একটি হইতেছে হিন্দু কলেজ (পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ) ও অন্যটি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ। হিন্দু কলেজের ইতিহাস আছে, কিন্তু বাংলাদেশের অন্যতর প্রাচীন বিদ্যালয়ের ইতিহাস ছিল না। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশেরই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাস। এই হিসাবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের কাছে এই গ্রন্থ যে ইহার বহু মূল্যবান্ উপকরণের জন্য অপরিহার্য্য ও আদরণীয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে প্রকাশ করিবার সংকল্প আছে; আশা করি ব্রজেন্দ্রনাথের মত সতর্ক ও বহুজ্ঞ গবেষকের সাহায্যে এ সংকল্প অচিরে সিদ্ধিলাভ করিবে।

শ্রীসুশীলকুমার দে

মহা-বিপ্লবী রাসবিহারী—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র। হরিহর লাইব্রেরী, ২৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২০৬ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা মাত্র।

এই পুস্তকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটা অধ্যায়ের ইতিহাস পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে দেশে যে জাগরণের উদ্ভব হয়, তাহার কর্ম-নায়কদের মধ্যে রাসবিহারী বসু বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার জীবন-কথা বলিবার সময় আজ আসিয়াছে; এতদিন ইংরেজের আইনের প্রতিকূলতায় যাহা প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না, সেই বাধা আজ দূর হইয়াছে। সুতরাং রাসবিহারী বসুর সর্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত এখন আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি। আজ পর্য্যন্ত যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নয় বলিয়া একটা ক্ষোভ থাকিয়া যায়। বর্তমান গ্রন্থখানিও সে অভাব মিটাইতে পারে নাই। কারণ ১৯১৫-১৯৪৫ সাল—রাসবিহারীর এই ত্রিশ বৎসরের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ইহার মধ্যেও নাই।

এই অভাব পূর্ণ হইবে না, যত দিন না জাপান-প্রবাসী কোন ভারতবাসী এ বিষয়ে উদ্যোগী হইবেন। তাঁহার আবার রাসবিহারী বসুর সহকর্মী হওয়া চাই। সেইরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম। শ্রীযুক্তা ঊর্মিলা দেবীর (দেশবন্ধুর ভগিনী) জামাতা শ্রীআনন্দমোহন সহায়ের নাম এই সম্পর্কে মনে পড়ে, আর মনে পড়ে রাসবিহারী বসুর পুত্র রঞ্জুকী বসু ও কন্যা ভারতী বসুর নাম। তাঁহাদের এই বিষয়ে একটা কর্তব্য আছে। তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃদেবের স্বদেশসেবার কাহিনী আমাদের শুনাইতে পারেন। কোন বাঙালী প্রতিষ্ঠান অগ্রণী হইয়া এই উদ্যোগ করিতে পারেন।

হয় ত এই বিষয়ে আমাদের কৌতূহল অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বিপ্লবীর জীবন বিপদের মধ্যে কাটিয়া যায়; এই বিপদের মধ্যে ইতিহাস লিখিয়া যাইবার সময় ও সুযোগ পাওয়া দুষ্কর। বিপ্লব সার্থক হইবার পর যদি বিপ্লবী বাঁচিয়া থাকেন, তবে তাঁহার জীবন-কথা জানিবার সম্ভাবনা থাকে। বর্তমান যুগে এইরূপ ভাগ্যবানদের মধ্যে লেনিন, মাজেরিক, বেনেস্ প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কদের নাম উল্লেখযোগ্য। দুর্ভাগ্য যে, রাসবিহারী বসু, নেতাজী সুভাষ প্রভৃতি বিপ্লবী-প্রধানগণ তাঁহাদের জীবনব্যাপী সাধনার পরিণতি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। সেইজন্য তাঁহাদের জীবন-কথার অসম্পূর্ণ বিবরণ শুনিয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

ব্যাঙ্কের কথা—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পারিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা। ৮/০+১৩৭ পৃষ্ঠা। দাম তিন টাকা।

এই বইখানি বাস্তবিকই সুপাঠ্য। সহজ ভাষায় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সর্ব-সাধারণের প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য সকল কথাই লেখক যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। সাধারণ বাঙালী পাঠক, ব্যবসায়ী ও ছাত্র, সকলেরই এই বইখানি উপকারে আসিবে। অর্থনীতি বিষয়ে এই বিশেষজ্ঞ লেখক পরিভাষা সম্বন্ধে অধিকতর অবহিত হইলে বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। সাধারণ ক্রেতার পক্ষে মূল্য একটু বেশী মনে হয়।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

বোরখা, ইনসাফ, ১ম ও ২য় খণ্ড (উপন্যাস)। দাদীর আসমান (গল্প-সংগ্রহ)—নেশাদ বাবু। দি ফিনিক্স প্রেস লিমিটেড, ৬৩, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ও সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৪, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—যথাক্রমে—২৲, ২।০ (প্রতিখণ্ড) ও ২।০ সিকা।

অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকখানি উপন্যাস ও গল্প রচনা করিয়া নেশাদ বাবু পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। নিজ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে—মুসলমান-সমাজের পারিপার্শ্বিক গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস তাঁর রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বাতন্ত্র্য আছে এবং চিন্তার ঐশ্বর্য্যও বিরল নহে। অল্প কথায় গভীর ভাবপ্রকাশ, দুই-একটি ছত্রে সুদূর-প্রসারী ইঙ্গিত এবং ভাষাটি সুমিষ্ট ও সাবলীল হইলেও প্রকাশভঙ্গী স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নহে। বিশিষ্ট সাহিত্যিকের বাক্ ও প্রকাশ-ভঙ্গীর ছায়া রচনার বহু স্থানে লক্ষ্য করা যায়। বহুস্থানে বাস্তবকে লঙ্ঘন করিয়া অতিনাটকীয় ঘটনায় চমকসৃষ্টির প্রয়াস আছে। তরল কৌতুক-

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের কয়েকটি উপন্যাস

মৌ চা ক

১লা জানুয়ারী প্রকাশিত হবে ॥

বৃত্ত

এক টাকা এগারো আনা ॥

মরামাটি

দ্বিতীয় সংস্করণ

দুই টাকা চার আনা ॥

দিনান্ত

দ্বিতীয় সংস্করণ

সাড়ে তিন টাকা ॥

কল্লৈদেবায়

দ্বিতীয় সংস্করণ

তিন টাকা ॥

রাত্রি

পাঁচ টাকা ॥

কল্লোল

পাঁচ টাকা ॥

●

শৈলেন ঘোষের উপন্যাস

তিনরঙ

দুই টাকা ॥

মহানগর

সকল গল্পরচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত লেখক। যে ক'জন লেখকের সাধনার মধ্যে দিয়ে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের পথ-পরিক্রমা সুরু হয়েছিলো প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের অন্যতম। কবিতায়, গল্পে, লঘু প্রবন্ধে, শিশুরঞ্জন সাহিত্যে ও অন্যবিধ বিচিত্র ভাবের লেখায় প্রথম থেকেই যে-কারণে প্রেমেন্দ্র মিত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তা ভাষার তীক্ষ্ণতা নয়, প্রকাশভঙ্গীর উগ্রতা নয়, ভাবের বৈপ্লবিকত্ব নয়, তা আটপৌরে ভাষার মধ্যে দিয়ে গূঢ়ার্থ প্রকাশের ক্ষমতা, পরিমিত কাব্যের প্রয়োগে অপরিমিত রহস্যের উদ্ঘাটনকুশলতা। সব জড়িয়ে তিনি তাঁর গল্পে (এবং কবিতায়) যে ভাবটি পরিস্ফুট করে তোলেন তা এমনি অনির্ব্বচনীয় রসে পরিপূর্ণ যে আপনি যদি রসের অভিসারী হন এবং জীবনের দার্শনিক তাৎপর্য্য উপলব্ধি করবার দিকে যদি আপনার মনের সহজ প্রবণতা থাকে, সোজা কথায় আপনার যদি জীবনবোধ থাকে, তা হলে তাতে আপনি অভিভূত হবেনই হবেন। দু' টাকা ॥

খেলনা

আজকের দিনের উদ্‌ভ্রান্ত অনিশ্চয়তায় ঠুনকো খেলনার মতোই দেখায় অজস্র মধ্যবিত্তের নষ্টভ্রষ্ট জীবনের ছবি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সাম্প্রতিক গল্প-সাহিত্যে এ-জন্যই বিশিষ্ট যে তাঁর নায়ক-নায়িকার চরিত্রে বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে ভঙ্গুর খেলনারই করুণ প্রতিভাস। ব্যর্থ যৌবনের দীর্ঘশ্বাস, উচ্চাভিলাষের করুণ পরিণতি, দারিদ্র্যপিষ্ট কুমারী-হৃদয়ের বোবাকান্না, আর সামঞ্জস্যহীন জীবন-যাত্রার হাস্যকর অভিনয়—সব যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর গল্পে। দেড় টাকা ॥

পতাকা

সাহিত্যক্ষেত্রে নেমে খুব অল্পদিনের মধ্যেই যাঁরা পাঠকসাধারণের কাছ থেকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করতে সমর্থ হন, তাঁদের সংখ্যা সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যে খুব বেশী নয়, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মিত্র সেই অল্পসংখ্যক লেখকদের অন্যতম। ছোটো ছোটো ঘটনার মধ্য দিয়ে মানবমনের যে আবর্ত্তন, তা-ই নিখুঁৎভাবে ধরা পড়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনায়। 'পতাকা' তাঁর সর্ব্বাধুনিক গল্প-গ্রন্থ। বাংলা গল্পসাহিত্যের ধারা আজ কোন্ পথ দিয়ে বয়ে চলেছে, জানতে হলে 'পতাকা' সংগ্রহ করা প্রয়োজন। দু' টাকা ॥

পরশুরামের কুঠার • শুক্লাভিসার

আধুনিক বাংলা ছোটগল্প সৃষ্টিতে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তার অনেকখানিই এনে দিয়েছিলেন সুবোধ ঘোষ। আশ্চর্য্য এক রূপ ও রসের আমদানী করে তিনি যেন বাংলাসাহিত্যের গতিকেই মোড় ফিরিয়ে নতুনতর পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর ভাষাও এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সুবোধ ঘোষের গল্পের আলোচনা-প্রসঙ্গে চতুরঙ্গ বলেছিলেন: 'রবীন্দ্রনাথের পর কি বিষয়বস্তুতে কি রচনাশৈলীতে বাংলা ছোটগল্পের মোড়কে তিনিই দিয়েছেন নূতনের যাত্রাপথের ইঙ্গিত। সুবোধবাবুর গল্প দুঃখবিলাসের কান্না নয়, মুক্তির বাণীর অদম্য প্রেরণাতেই সেগুলি গতিবান, ফলে শিল্পচাতুর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন।' 'দাম যথাক্রমে দু' টাকা, দু' টাকা চার আনা ॥

পূর্ব্বাশা-প্রকাশিত অন্যান্য বই-এর সম্পূর্ণ তালিকা সংগ্রহ করে রাখুন

পূর্ব্বাশা লিমিটেড

পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা

রসের অবতারণায় গল্পের মূল রস ফিকা হইয়া গিয়াছে—এমন দৃষ্টান্ত 'দাদীর আসমানে'র কয়েকটি গল্পে বিরল নহে। 'দাদীর আসমান' গল্পটিই একটি উৎকৃষ্ট গল্প বলিয়া গণ্য হইত, যদি চৌদ্দ বৎসরের ছেলে তমিজুদ্দিন ও মাষ্টার সাহেবের কথোপকথনে ফাজলামির চূড়ান্ত নিদর্শন রাখিয়া লঘু-গুরুত্বের সীমা লঙ্ঘন না করা হইত। অথচ 'মাটির মসনদ' প্রকাশ-সংযমের দরুন একটি চমৎকার গল্প হইয়াছে।

'বোরখা' ও 'ইনসাফ' উপন্যাসে মুসলমান সমাজের পারিপার্শ্বিক কতকটা ফুটিয়াছে, কিন্তু তাহার চেয়ে বেশী ফুটিয়াছে—রোশেন সেলিনার রোমান্টিক মনের প্রতিচ্ছবি। গল্পের মধ্যে ঘটনা-বিস্তৃতির অবকাশ অল্প বলিয়া হয়ত বোরখার রোমান্স তেমন উগ্র হয় নাই। এই নাটকীয় ঘটনার বহু সমাবেশে চমকসৃষ্টির প্রয়াস ইনসাফ উপন্যাসে লক্ষণীয়। ইনসাফের আরম্ভটি ভাল। ঝরঝরে লেখার ভঙ্গীতে—সুষ্ঠু বর্ণনায় ডক্টর জসীম উদ্দিন, সেলিনা, জয়নুল, আম্মা, খানবাহাদুর প্রভৃতি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু শেষাংশে নির্ব্বাচনের গোলকধাঁধায় ও রোমান্স-সৃষ্টির ধোঁয়ায় তাঁহারা বাস্তবের বেলাভূমি হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। উপন্যাসের শেষ অংশে ঘটনা ও সংলাপ সৃষ্টিতে নাটকীয় ভাবটা রসবোধকে বড় বেশী পীড়িত করে। রোমান্সের কল্পনাজাল বুনিবার অথবা গল্পের গতি বাড়াইবার তাগিদে স্পষ্ট চরিত্রগুলিকে তাড়াতাড়ি একটা পরিণতিতে পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে চরিত্র মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, বাহিরের ঘটনার সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গতি রক্ষা হয় নাই। ডক্টর জসীম উদ্দিনের চাঁদ দেখার প্রসঙ্গে সেকেন্দার দালালকে পরবীণ-স্মৃতিতে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া রোমান্সের চমক দিবার কোন আবশ্যকই ছিল না।

যাহা হউক, আলোচ্য উপন্যাস ও গল্প সংগ্রহগুলির মধ্যে একটি জিনিস অস্বীকার করা যায় না—সেটি নেশাদ বাবুর প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা। অনুভূতি-শীল মন, পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও ভাষার উপর দখল—তাঁহার লেখার বৈশিষ্ট্য।

মৃত্তিকা-শৃঙ্খল—সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার মিত্র। "লেখনী" ১বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

মৃত্তিকা-শৃঙ্খল একখানি ছোট গল্পসংগ্রহের বই। মোট বারটি গল্প ইহাতে আছে। এই বারটি গল্পের কোন কোন লেখককে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় কখনও হয়ত দেখিয়া থাকিব; তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত বলিয়া পরিচয়ের ক্ষেত্রে স্পষ্ট হইয়া উঠেন নাই। কিন্তু গল্পসংগ্রহ-পুস্তকখানি পড়িয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে বিশেষ করিয়া চেনা যায়, তাঁহাদের লেখনীকে সাধুবাদ না দিয়া পারা যায় না। গল্পগুলি আকারে ছোট তো বটেই—ছোটগল্প লেখার কলা-কৌশলও লেখকেরা বেশ খানিকটা আয়ত্ত করিয়াছেন। কল্পনায়, বাস্তবে এবং সর্ব্বোপরি লেখনীর সংযমে প্রায় সবগুলি গল্পই জমিয়াছে ভাল। এতগুলি নূতন লেখকের সাধনার রূপটিকে পাঠকদের গোচরে আনিবার এ ধরণের সাধু প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে বিরল। এজন্য প্রকাশক ধন্যবাদার্হ।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

যাবতীয় স্ত্রীব্যাধির **প্রকৃতি** অব্যর্থ মহৌষধ

ঔষধটি বিশুদ্ধ অশোক, এলেট্রিস, অশ্বগন্ধা, ত্রিকটী, এর্গোমাঅলোস্টা, ভ্যালেরিয়ান ব্রোমাইড প্রভৃতি স্ত্রীরোগের বিশেষ বিশেষ ঔষধদ্বারা বৈজ্ঞানিকমতে সযত্নে প্রস্তুত। ইহা সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের প্রতিষেধক হিসাবে স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা ব্যবহৃত ও অতি সত্বর ফলপ্রদ। রোগবিবরণ জানাইয়া /১০ ডাকমাশুল পাঠাইলে আমাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শমত ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়। সত্বর পাইবার জন্য সরাসরি প্রধান পরিবেশকের নিকট ভিঃপিঃর জন্য অন্তই পত্র লিখুন। মূল্য ৪৲, ডাকমাশুল ও প্যাকিং ১৷০ স্বতন্ত্র।

প্রধান পরিবেশক—
মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন
১৪৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
পি. বি. ১৩৩ কলিকাতা ৯

কুণ্ডু কেমিক্যাল ওয়ার্কস

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা—শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস। সরস্বতী লাইব্রেরী। সি ১৮।১৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৯৫, মূল্য ১৷০।

এই স্বল্পপরিসর পুস্তকে গ্রন্থকার পাঁচটি অধ্যায়ে ভারতীয় সভ্যতার পটভূমিকা, হিন্দু-মুসলমান সভ্যতার বিকাশ, ভারতে মুসলিম শাসন যুগ, সংস্কৃতি, মিলন প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হিন্দু মুসলমান বলিয়া দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতি ত নাই ই, এমন কি হিন্দু সভ্যতা ও মুসলিম সভ্যতা বলিয়া দুইটি পুরাপুরি পৃথক সভ্যতা বা সংস্কৃতিও নাই। বহু লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তির লেখা হইতে গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্যের সপক্ষে নজীর সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে বর্ত্তমান ভারতে যে সাম্প্রদায়িক কলহ চলিয়াছে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক কিম্বা ধর্ম্ম ও নেতৃত্বের দিক দিয়া এই দ্বন্দ্বের কোন ভিত্তি নাই। কিন্তু ভিত্তি না থাকিলেও দ্বন্দ্ব রহিয়াছে এবং বাড়িতেছে। ইহারও অবশ্য কারণ আছে। মিলনের পক্ষে যেরূপ যুক্তি আছে, ঝগড়া বাধাইবার জন্য সেরূপ যুক্তি না থাকিলে দ্বন্দ্বকারীদের বক্তব্য অবশ্যই আছে। বর্ত্তমান জগতে ন্যায়যুক্তি সুবিধাবাদীর কূটচক্র ভেদ করিতে পারে নাই। আর সর্ব্বসাধারণ অনেক সময়েই হুজুগে মাতিয়া কাজ করে, যুক্তির ধার ধারে না। ইহার উপর আবার শক্তিশালী পররাষ্ট্র ও শত্রুপক্ষের কারচুপি আছে। এইজন্যই কোন সুযুক্তিতে ফল হয় নাই, ভারত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—পাকিস্থান মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। অপর অংশ ভারত নামে পরিচিত হইলেও তাহাকে ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানগণ হিন্দুস্থান বা হিন্দু রাষ্ট্র বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কারণ হিন্দু বৈচিত্র্য স্বীকার করে, অপরের ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এজন্য হিন্দুর তথাকথিত 'রিলিজিয়ন' নাই, আছে 'ধর্ম্ম'—যাহা তাঁহার জীবনের প্রত্যেক দিককে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু তাঁহার চিন্তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে না। ইহাই ভারতের বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যের ছিটেফোঁটা ইসলাম 'রিলিজিয়নে'ও সংক্রামিত হইয়াছিল, তাই এদেশে হিন্দু মুসলমানে মিলন সম্ভব হইয়াছিল, তাই বেদান্তের পাশাপাশি সুফীমত আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে দারাশুকো যেমন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, বাদশা ঔরঙ্গজেবও তেমনি গোঁড়া মুসলমান সুতরাং একই ছন্দে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গাঁথা চলে না। তাই মিলনের সঙ্গে ভ্রাতৃবিরোধ ভারতের ভাগ্যলিপি। ভারতের মুসলমান যদি আপনাকে অ-ভারতীয় মনে করে তবে তাহাকে যুক্তিদ্বারা বুঝাইতে পারে এইরূপ শক্তির অভাব দেখা গিয়াছে। অবশ্য ভারতীয় কোন মুসলমান যদি নিজেকে এদেশের মনে করে তাহা হইলে তাহাকে উল্টা বুঝাইতে পারে এরূপ শক্তিও যে নাই তাহাও সত্য। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, ভারতীয় মুসলমান নিজেদের হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী হইতে 'পৃথক জাতি' মনে করে এবং এইজন্যই পাকিস্থান সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতীয় মুসলমানদের ইচ্ছা না থাকিলে পাকিস্থান কায়েম করে এ ক্ষমতা ইংরেজের ছিল না, এবং আজও মুসলমানদের অনিচ্ছায় পাকিস্থান এক দিনও টিকিতে পারে না। সুতরাং গ্রন্থকারের যুক্তির মূল্য যাহাই হউক, পালিটিক্সে তাহা আপাততঃ অচল বলিয়াই মনে হইতেছে। তবে এরূপ সদ্‌গ্রন্থের প্রচার

বনস্পতির সেরা

রসুই

২,৫,১০ ও ৩৭ পাউণ্ড টিনে পাওয়া যায়

হিন্দুস্থান ডিভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্‌:
চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা
ম্যানেজিং এজেণ্ট :
এন. আর. সরকার অ্যাণ্ড কোং লিঃ

HDX 4

সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। মুসলমান পাঠকগণের মধ্যে এরূপ গ্রন্থের প্রচার খুবই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—নং ৬৯, ৭১ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য—প্রত্যেকখানি এক টাকা।

প্রথমখানিতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের জীবনচরিত আছে। তিন জনই সমসাময়িক। দ্বিজেন্দ্রলাল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া মাত্র পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। রঙ্গমঞ্চে তাঁহার চন্দ্রগুপ্ত ও সাজাহান আজও পূর্ব্বের ন্যায় জনপ্রিয়। তাঁহার স্বদেশী সঙ্গীতগুলি অপূর্ব্ব। তাঁহার প্রবন্ধগুলিতেও যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'আর্য্যগাথা', 'আলেখ্য' ও 'মন্দ্র' এই তিনখানি তাঁহার কাব্যগ্রন্থ। 'ত্রিবেণী' খণ্ডকাব্য। 'আষাঢ়ে' ব্যঙ্গকাব্য। সীতা' নাট্য-কাব্য। নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ ও কাব্য লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল বত্রিশখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

'প্রবাস চিত্র' 'পথিক' হিমালয়' 'হিমাচল-বক্ষে' প্রভৃতি ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়া জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯) খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত ছোট গল্প একদা বাঙ্গালী পাঠককে মুগ্ধ করিয়াছিল। 'বিশুদাদা' 'তিন পুরুষ' প্রভৃতি তাঁহার উপন্যাস। তাঁহার রচিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধ শত। সূচনা হইতে সুদীর্ঘকাল অতীব যোগ্যতার সহিত তিনি "ভারতবর্ষ" মাসিকপত্র সম্পাদন করেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) খ্যাতনামা নাট্যকার। তাঁহার 'রঘুবীর' 'আলমগীর' 'নর নারায়ণ' প্রভৃতি নাটক বাঙ্গালী দর্শকের মনে প্রচুর আনন্দ বিতরণ করিয়াছে। তাঁহার রচিত রঙ্গনাট্য 'আলিবাবা' অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার 'নারায়ণী' উপন্যাস-সাহিত্যে নূতনত্ব আনয়ন করিয়াছিল। তিনি অর্দ্ধশতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা।

একসপ্ততি-সংখ্যক 'চরিতমালা'য় রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, নিখিলনাথ রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী আছে। উনবিংশ শতাব্দীর পুরাতত্ত্ববিদ্ হিসাবে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরই রামদাস সেনের নাম করিতে হয়। মাতৃভাষায় এই বিষয়ে গ্রন্থরচনায় রামদাস সেনই (১৮৪৫-১৮৮৭) অগ্রণী। তাঁহার তিন ভাগ 'ঐতিহাসিক রহস্য' বিবিধ-বিষয়ক প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞানের ভাণ্ডার। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় তিনি "বঙ্গদর্শনে" অনেকগুলি পুরাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ রচনা করেন। রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) প্রসিদ্ধ "সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাসে"র রচয়িতা। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম পত্রিকা-সম্পাদক। ঐতিহাসিক সাহিত্য-রচনার তিনি একজন পথপ্রদর্শক। দেশ ও জাতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার উৎস। ইতিহাস, জীবনচরিত ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি একুশখানি গ্রন্থ রচনা করেন। নিখিলনাথ রায় (১৮৬৫-১৯৩২) অক্ষয়কুমার মৈত্রের সমসাময়িক। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ইতিকথা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি যশস্বী হন। তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধ একদা বিখ্যাত সাময়িক পত্রসমূহ অলঙ্কৃত করিত। অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২) গীতিনাট্য প্রণয়ন করিয়া নাট্যজগতে স্বকীয় স্থান অধিকার করেন। তাঁহার দৃশ্যকাব্য 'নন্দবিদায়' একদা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার শিরী-ফরহাদ, লুলিয়া তুফানি প্রভৃতি বহুদিন সুখ্যাতির সহিত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-১৮৬৯) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। 'গাও হে তাঁহার নাম রচিত যাঁর বিশ্বধাম' এই বিখ্যাত ব্রহ্মসঙ্গীতটি তাঁহারই রচনা। তিনি

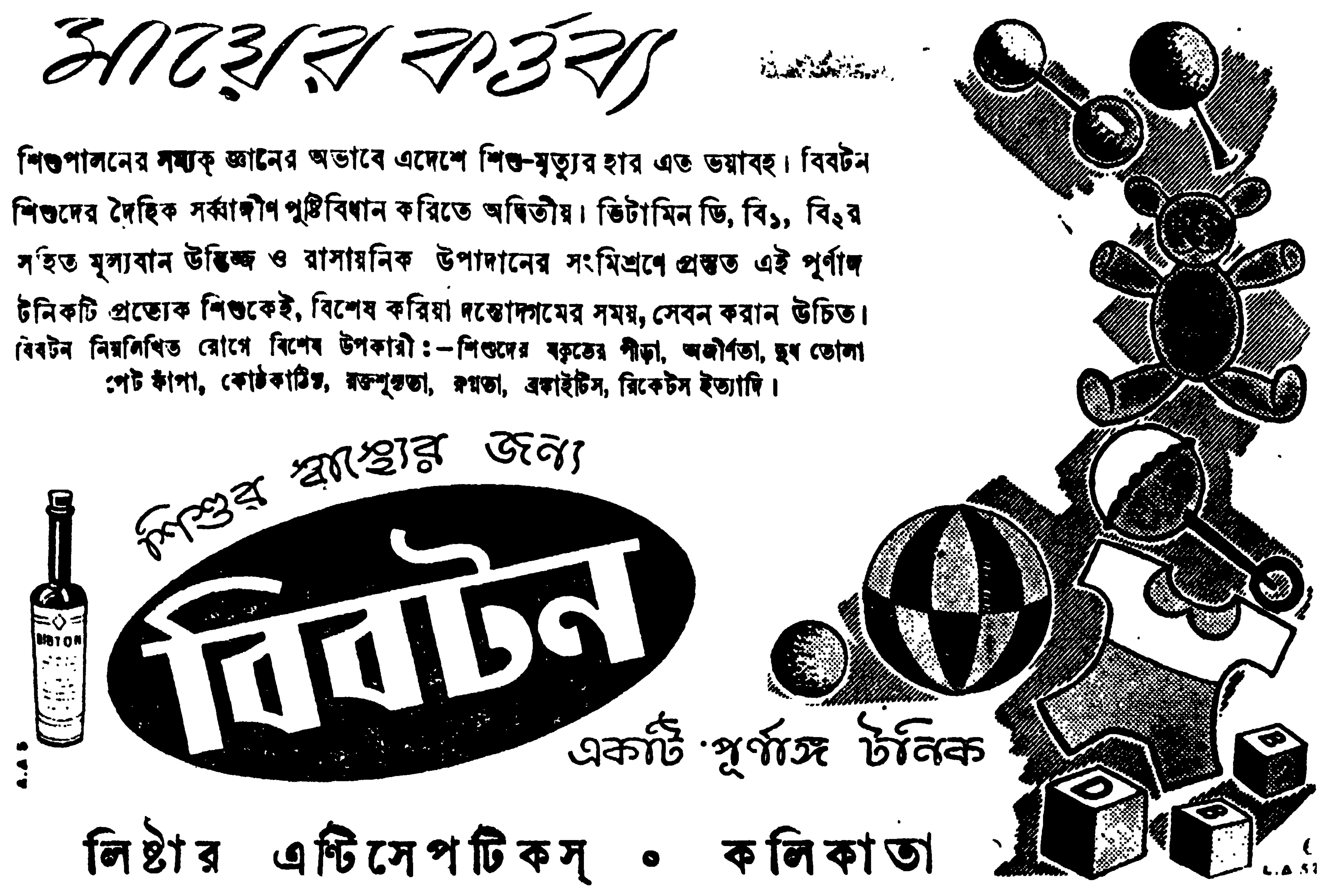

স্বদেশপ্রেমিক'। কংগ্রেসের অগ্রদূত চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কে তাঁহার উৎসাহ এবং প্রেরণা স্মরণীয়।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

দেশবিদেশের ছেলেমেয়ে—শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী ও শ্রীরঞ্জিৎ (?) সিংহ। দেশবন্ধু বুক ডিপো। ৮৪এ, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা ৬। দাম ১।০।

দেশে দেশে নব জাগরণের ঢেউ উঠিয়াছে। ভারতবর্ষেও রাষ্ট্রে, সমাজে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই জাগৃতির দিনে বঙ্গ-সন্তানদের পক্ষে অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েদের উন্নতি-প্রচেষ্টার কথা জানা দরকার। সে বিষয়ে বইখানি সাহায্য করিবে।

গীতিমঞ্জরী—শ্রীকানাই সামন্ত। সাহিত্যিকা। ১২৩, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

সুন্দর সরস এই গীতিগুলি শেফালির মত স্নিগ্ধ ও সুরভি। রবীন্দ্র-প্রতিভার কিরণে ইহারা পাপড়ি মেলিয়াছে, কিন্তু স্বকীয় লাবণ্য লইয়াই দেখা দিয়াছে।

বন্দনা—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ঊষা পাবলিশিং হাউস্। ৩৪, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য ৫৲।

পুরাতন ও নূতন স্বদেশী গানের সংগ্রহ। কবির নির্বাচন তাঁহার খ্যাতির উপযুক্ত হইয়াছে। ভূমিকায় তিনি 'জাতীয় সঙ্গীতের ধারা' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। যে সকল গান লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল অথচ জাতির মুক্তি-সংগ্রামে এক কালে প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে, সেগুলিকে রক্ষা করার এই প্রয়াস সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। ভারতের স্বাধীনতালাভের পরে রচিত কয়েকটি গান শেষের দিকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

রাত্রে যারা ভয় দেখায়—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। এন্. এম্. রায় চৌধুরী কোং লিঃ, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

বালকবালিকাদের জন্য কৌতূহলোদ্দীপক উপন্যাস রচনায় হেমেন্দ্র-বাবুর কৃতিত্ব অসাধারণ। এ গ্রন্থের কয়েকটি গল্প মৌলিক, অন্যগুলি বিদেশী কাহিনীর অনুসরণ। সব কয়টি গল্পই চিত্তাকর্ষক।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হিন্দুধর্ম্ম পরিচয় (দ্বিতীয় সংস্করণ)—স্বামী শ্রীমৎ শ্রদ্ধানন্দ। কলিকাতা—২এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীটস্থ 'মডেল পাবলিশিং হাউস' কর্তৃক প্রকাশিত। ১ম-২য় ভাগ একত্রে ৪৪ পৃঃ মূল্য ।৵০ এবং ৩য়-৪র্থ ভাগ একত্রে ৭৭ পৃঃ মূল্য ।৵০।

আলোচ্য পুস্তিকাদ্বয়ে যথোচিত সরল ভাষায় হিন্দুধর্ম্মের পরিচয় বর্ণনা করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ভাববর্জ্জিত হিন্দু ধর্ম্মের মূল রহস্য বুঝিবার এবং দৈনন্দিন জীবনে আচরণ করিবার বহু উপকরণ স্তরে স্তরে পরিবেশিত হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের সার এত সংক্ষেপে ও সরল ভাবে বর্ণনার জন্য গ্রন্থকার প্রশংসার্হ।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শতাব্দী—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। পূরবী পাবলিশার্স। ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে যে কয়খানি সার্থক উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে শ্রীরমেশচন্দ্র সেনের শতাব্দী তাহাদের অন্যতম। এই পুস্তকের একটি প্রধান আকর্ষণ ইহার ভাষা। এই নিরলঙ্কৃত অথচ রসসম্পৃক্ত ভাষার এমনি একটা যাদু আছে যে, ইহা পাঠকের মনকে কাহিনীর মধ্যে একেবারে তন্ময় করিয়া রাখে।

কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে পূর্ববঙ্গের বিলাস অঞ্চলের পল্লীগ্রাম মঞ্জরীকে কেন্দ্র করিয়া। লেখক ধ্যানযোগে নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের অন্তর-সত্তার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিয়াছেন। বাংলার মাটি, জল, মাঠ, ঘাট, নদী, ডোবা, খাল, বিলের সঙ্গে পল্লীর নরনারীর যে কি গভীর নাড়ীর যোগ তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া যেন হৃদয়ের সবটুকু দরদ ঢালিয়া দিয়া লিখিয়াছেন। বাংলার যে চাষী-সম্প্রদায় এদেশের মাটিতে সোনা ফলায়, তাহাদেরই একজন, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের রাজেশ্বর এই উপন্যাসের নায়ক। সে ছিল সহায় সম্বলহীন দরিদ্রের সন্তান, কিন্তু মাটির দৌলতে হইল অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক। তাহার আমলে শহর ও গাঁয়ের মধ্যে ঘটে মিতালি, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের স্রোত মঞ্জরীতে প্রবেশ করিয়া সেই ক্ষুদ্র পল্লীটিতে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করিল। রাজেশ্বরের জীবনে আসিতেছে পর পর আঘাত ব্যর্থতা মৃত্যুশোক আদর্শসজ্ঘাত; কিন্তু সবকিছুতে অবিচলিত থাকিয়া সে যে অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিতেছে, তাহা বিস্ময়কর। মাটির প্রতি তাহার গভীর টান আর তাহার অপরাজেয় পৌরুষ নুটহামসুনের *Growth of the Soil* উপন্যাসের নায়ক চাষী আইজাকের কথা মনে করাইয়া দেয় এবং আইজাকের মত—He is the man, the leader,—এই কথাগুলি তাহারও প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তেমনি এই চরিত্রটি অন্য সব কয়টি চরিত্রকে এক অদৃশ্য আকর্ষণে নিজের ব্যক্তিসত্তার পার্শ্বে টানিয়া রাখিয়াছে, এবং সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের আওতায় প্রত্যেকটি চরিত্রই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে পল্লী ও শহরের ব্যবধান ক্রমবিলীয়মান। পল্লীর পথল মহানগরীর ভাবগঙ্গার বিপুল প্লাবনে উচ্ছ্বসিত, বাংলার পল্লী আজ নবযুগের নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। "শতাব্দী"তে একদিকে যেমন আছে সেই যুগচেতনার প্রতিফলন, অন্য দিকে তেমনি আছে "দেশে আগত এক নূতন অতিথির" প্রতি স্বাগত-সম্ভাষণ। এই নবাগতের নাম কম্যুনিজম, রাজেশ্বরের মত খাঁটি গান্ধীবাদী অসহযোগী পর্য্যন্ত অবশেষে যাহার ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

এই বাজারে অল্পকালের মধ্যে উপন্যাসখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়ায় বাঙালী পাঠকের সাহিত্যপ্রীতির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

মফঃস্বলে বসিয়া কলিকাতার দরে বই কিনুন

বিভিন্ন প্রকাশকের নাটক, নভেল, ধর্ম্মগ্রন্থ, ভ্রমণকাহিনী, ব্যবসায়-বাণিজ্য, চিকিৎসা ও আইনের পুস্তকাদি, স্কুল-কলেজের ও উপহারের জন্য ভাল ভাল পুস্তক আমরা কলিকাতার দরে সত্বর সরবরাহ করি। ৴১০ ডাকটিকিট পাঠাইলে লাইব্রেরী ও উপহারের জন্য নানাবিধ নূতন নূতন পুস্তকের সন্ধানসহ সর্ব্বাঙ্গীন পুস্তক-তালিকা পাঠান হয়। অর্ডারের সহিত মূল্যের অর্দ্ধাংশ দিলেই সমস্ত পুস্তক ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। প্যাকিং, ডাকমাশুল ও বিক্রয়কর স্বতন্ত্র। নিশ্চিত ও নিরাপদ আয়ের জন্য আমাদের স্থায়ী আমানতে টাকা জমা রাখুন। সুদের হার ৩ বৎসরের জন্য শতকরা ৭৲ ও ৫ বৎসরের জন্য ১০৲ হিসাবে দেওয়া হয়। অন্যূন ৫০৲ টাকাও জমা রাখা হয়। প্রতি ৬ মাস অন্তর সুদ দেওয়া হয়।

কুণ্ডু পাব্লিসিটি সোসাইটী অব ইণ্ডিয়া
(পাব্লিকেশন এণ্ড বুক-সেলিং ডিপার্টমেন্ট)
১৪৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

ভারতের মুক্তিসন্ধানী— শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। ভারতী বুকষ্টল, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।•

'মুক্তির সন্ধানে ভারত' প্রণেতা শ্রীযোগেশ বাগল মহাশয় প্রচুর গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানাদি দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীর কৃতী ও দেশবরেণ্য মনীষিগণের জীবনী আলোচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহার সেই খ্যাতিকে বর্দ্ধিত করিবে। এই গ্রন্থে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, রামগোপাল ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কয় জন বরণীয় ব্যক্তির জীবনী ও কৃতির কথা আলোচিত হইয়াছে। দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ইহাদের সকলেরই অবদান অতুলনীয়। শিক্ষাবিস্তারে, মাতৃভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে, দেশের সংস্কৃতি, শিল্পবাণিজ্যের প্রসারে, স্বদেশের উন্নতি-পরিপন্থী আইনের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষে, সকল দিকেই ইঁহাদের সর্ব্বতোমুখী প্রচেষ্টা ও উদ্যম প্রত্যেক দেশবাসীর স্মরণীয় ও অনুধাবনযোগ্য। ইঁহাদের বিস্মৃতপ্রায় কীর্ত্তিকাহিনী তথ্যপ্রমাণাদিযোগে সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া গ্রন্থকার দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ভবিষ্যৎ সংস্করণে গ্রন্থকার ডবলিউ সি ব্যানার্জ্জি, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ আরও কয়েকজন মুক্তিসন্ধানী সাধকের জীবনী এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহা অধিকতর উপযোগী হইবে। কয়েকখানি ফটো পুস্তকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

দেশ-বিদেশের কথা

সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিগত ১৬ই পৌষ (২রা ডিসেম্বর), বৃহস্পতিবার, উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট জন-সেবক এবং কংগ্রেস-কর্ম্মী, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন কৌন্সিলর সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় মাত্র সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ পিতামাতা এবং আত্মীয় ও বন্ধুবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত বিজড়িত ছিলেন। রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ তাঁহার বিদ্যানুরাগকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। খেলাধুলার প্রতি অনুরাগও তাঁহার অল্প ছিল না। বি-এ এবং বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার ছোট আদালতে তিনি ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাহার পরই ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু হয়। কংগ্রেসকর্ম্মী রূপে তিনি সেই বিরাট আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যগণ একে একে কারাগমন করিলে উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির পরিচালন-ভার এই তরুণ কর্ম্মীর উপর পড়ে। অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত সম্পাদক-পদের গুরু দায়িত্ব পালন করিয়া সুধীরকুমার কারাবরণ করেন।

১৯৩১ সনে জয়ের পল্লী হইতে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কৌন্সিলর নির্ব্বাচিত হন। ঐকান্তিক সাধুতা, সচ্চরিত্রতা এবং কর্ম্মদক্ষতার গুণে তিনি এতই জনপ্রিয় হইয়াছিলেন যে পৌরসভার ত্রৈবাৎসরিক নির্ব্বাচনে তিনি পর পর তিন বার জয়লাভ করেন। এই সম্মানের আসনকে তিনি কখনও পদমর্য্যাদা হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। জনগণের নিঃস্বার্থ সেবাই তাঁহার ব্রত ছিল। পৌরসভায় স্থানলাভ করিয়া এই ব্রত উদ্‌যাপনে সুধীরকুমার তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের এসেসর নিযুক্ত হন। সর্ব্বশুদ্ধ এগার বৎসর তিনি পৌরসভায় ছিলেন। ইহার পর বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও সুধীরকুমার আর নির্ব্বাচনপ্রার্থী হন নাই। তাঁহার কার্য্যকালে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ, সুযোগ্য ও সত্যনিষ্ঠ কৌন্সিলররূপে পরিচিত ছিলেন। জনসাধারণকে আপনার জন মনে করিতেন বলিয়া তিনি সকলের পরম প্রিয় ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ প্রবল ছিল। তিনি বহু দিন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্য এবং শেষ পর্য্যন্ত 'রবিবাসরে'র উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রচারণাহীন পরোপকার এবং নিঃস্বার্থ দান তাঁহার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ছিল। তাঁহার নিকট উচ্চনীচ-ভেদ ছিল না, সুমিষ্ট ব্যবহারের জন্য ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। আন্তরিকতা, সাধুতা এবং কর্ম্মনিষ্ঠা গুণে সুধীরকুমার নেতাজীর স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। এই আজীবন কৌমার্য্যব্রতধারী, পরহিতব্রতী, নিরহঙ্কার, অমায়িক, প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী, চরিত্রবান, জন-সেবকের অকাল তিরোধানে দেশ একজন একনিষ্ঠ কর্ম্মী এবং নির্ভীক স্বদেশপ্রেমিককে হারাইল। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

দেবদত্ত ও অজাতশত্রু

শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত

সী প্রেস, কলিকাতা

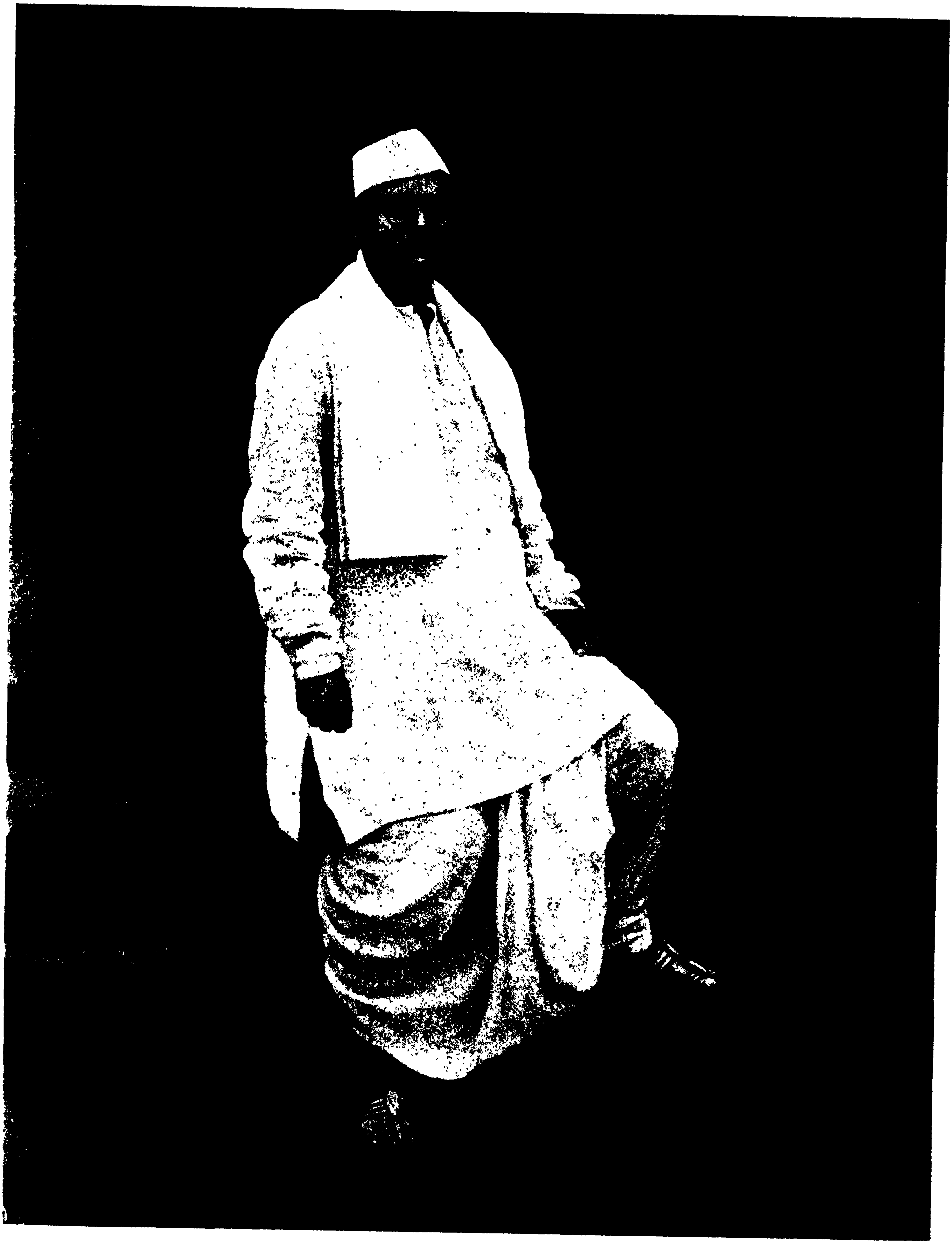

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৮শ ভাগ ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৫৫ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

যুবশক্তি ও গণ-আন্দোলন

বিগত মাসে আমরা দুই জন ক্ষণজন্মা পুরুষকে স্মরণ করিয়াছি। প্রথমে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, পরে দেশের ও জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণের স্মারক কৃত্যাদি হয়। বলা বাহুল্য, দুইটি ব্যাপারেই বাহ্যিক আয়োজন সমারোহ কোন কিছুরই ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু কয়জনের অন্তরে এই দুই জনের পুরুষকারের প্রকৃত চিত্র সম্যক্ ও স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হইয়াছে?

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বাংলার যুগযুগব্যাপী স্বাধীনতা-যজ্ঞের শেষ হোতা। তিনি জীবিত না মৃত সে সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে, কিন্তু তাঁহার অভাবে আজ বাংলা 'গত গৌরব হৃত আসন নত মস্তক লাজে', সকলের দ্বারে ভিখারীর অবজ্ঞা ও অবহেলার পাত্র এ বিষয়ে কাহার সন্দেহ আছে? কে আছে আজ, তাঁহার মত জীবন-মরণ পণ করিয়া, বাংলার তথা সমগ্র ভারতের জন্য শোণিত-তর্পণে এই পূণ্যভূমিকে সিক্তি করিয়া দেশের অতীত গৌরবকে জাগ্রত করিতে প্রস্তুত? কাহার আছে সেই ভয়-দ্বিধাহীন দৃঢ় সিদ্ধান্তযুক্ত চিত্ত, কোথায় আছে সেই স্থির সংকল্প, অদম্য উৎসাহপূর্ণ হৃদয়, কে আছে পুরুষসিংহ, যাহার কণ্ঠনিঃসৃত বাণী বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় সমস্ত দেশের লোকের মন আলোড়িত করিতে পারে? দেশের আজ চরম দুর্দিন; অভাব অভিযোগ চতুর্দ্দিকে, এবং বাংলার আজ সর্ব্বাপেক্ষা নিদারুণ অভাব নেতৃত্বের। কংগ্রেসের দল আজ দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থের চিন্তায় বিভ্রান্ত ও আদর্শচ্যুত এবং সেই অবকাশে দেশে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতেছে রাষ্ট্র-ধ্বংসকারী বিদেশীর চরবৃন্দ।

নেতাজীর জয়ধ্বনি "জয় হিন্দ্" শুনা যায় চতুর্দ্দিকে, শতকণ্ঠে লোকে গাহে "কদম কদম বঢ়ায়ে যাও"। কিন্তু তাঁহার কঠোর সংযম, সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গের উদাহরণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার লোক তো কোথায়ও দেখা যায় না। নেতাজী সুভাষ ছিলেন বাংলার যুবশক্তির জাগ্রত প্রতীক। কিরূপে তাঁহার মধ্যে স্বাধীনতার জ্বলন্ত পাবক মূর্ত্ত হইয়া "আজাদ হিন্দ্ ফৌজ"কে অনুপ্রাণিত করে সেকথা কোটি লোকে শুনিয়াছে। কিন্তু কি সাধনা, কত তপস্যার ফলে তাহা সম্ভব হইয়াছিল সেকথা কেহই একবারও চিন্তা করে না। যে যুবশক্তি বাংলার ভবিষ্যতের আশাভরসা তাহা আজ ভুল পথে চালিত ও ব্যর্থ চেষ্টায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছে। আজ বাংলাদেশে কেহ নাই তাহাদের বুঝাইতে যে, বিনা সংযম-শৃঙ্খলায় উদ্দাম গতিতে চলিলে তাহাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুইই অন্ধকার। সম্প্রতি কলিকাতায় নেতাজী-দিবসের অব্যবহিত পূর্ব্বে, ছাত্রবিক্ষোভের ফলে যে নিদারুণ বিপর্য্যয় দেখা গেল তাহা বিষম নৈরাশ্যজনক। ঐ ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া সস্তায় বাহবা লাভের সহজ উপায়—মন্ত্রীমণ্ডলী ও অধিকারীবর্গকে গালি দেওয়া ও অভিযোগ-অনুযোগের গগনভেদী চীৎকারে চতুর্দ্দিক কম্পিত করা। কিন্তু দেশের মঙ্গল ও জাতির প্রগতি-কামী ব্যক্তিমাত্রেই উহাতে আশ্বস্ত বা সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। চিন্তাশীল লোকমাত্রেই ইহাতে দেখিবেন শক্তির অপচয় ও জাতির অধোগতি। কেননা এতগুলি জীবন নষ্ট হইল, এতটা শক্তি ও সম্পত্তির নাশ হইল অযথা ও বিফলে। সত্যসত্যই ঐ যুবশক্তির উদ্দাম ও বিশৃঙ্খল অপপ্রয়োগে যদি বিশেষ লাভ কাহারও হইয়া থাকে তবে তাহা হইয়াছে দেশের ও জাতির শত্রুপক্ষের। আমরা উহাকে অপপ্রয়োগ বলিতে বাধ্য, কেননা ঐ শক্তি যথাযথ ভাবে, সংযম ও শৃঙ্খলার সহিত, প্রযুক্ত হইলে উহা সহস্র গুণ কার্য্যকরী হইতে পারিত।

সর্ব্বোদয় দিবস

গান্ধীজীর মহাপ্রস্থানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে কংগ্রেসের সর্ব্ব-ভারতীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি নিম্নলিখিত সঙ্কল্প-বাক্য ও কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিদারুণ হত্যাকাণ্ড ঘটে এক শুক্রবারে, মাঘ মাসের ১৬ তারিখে; এ বৎসর তার বার্ষিকী পড়ে রবিবারে, ১৭ই মাঘে। দেশের লোক অনেকটা গতানুগতিকভাবে এই দিবস গান্ধী-প্রশস্তিতে কাটাইয়াছেন; চিন্তাশীল লোকে নূতন করিয়া গান্ধীজীর ভাব ও কর্ম্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিগত তিন শত

পঁয়ষট্টি দিনে জীবনেও আচার-অনুষ্ঠানে কয়জন তাহা কার্য্যে অনুষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার হিসাব ব্যক্তিগত ব্যাপার। কারণ গান্ধীজী মূলতঃ ব্যষ্টির সততার ও দক্ষতার উপর নিজের সংস্কার-প্রচেষ্টার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেইজন্য কংগ্রেস কমিটির সংকল্প-বাক্য জাতির উদ্দেশে ঘোষিত হইলেও তাহার সাফল্য নির্ভর করে একান্তভাবে ব্যষ্টির উপর। এই কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজনে, তাহা ব্যষ্টির ও জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিলাম :

"ভারতের সুদীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম, যে সংগ্রাম পুরুষ পরম্পরায় পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের জীবন হইতে পরবর্ত্তীদিগের জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার ইতিহাসে ভারত দুঃখ ও সাফল্য উভয়েরই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। যেমন বহুক্ষেত্রে পরাজয় তেমনই বহুক্ষেত্রে জয়লাভও করিয়াছে। কিন্তু জাতির পিতার সর্ব্বতোশ্রেয় নেতৃত্বের গুণে দুঃখ জনসাধারণের জীবনকে সৎ ও শুদ্ধ করিয়াছে, প্রত্যেক পরাজয় জনসাধারণের প্রয়াসকে দ্বিগুণ উৎসাহে উদ্বোধিত করিয়াছে এবং জয়লাভের ভূমিকা রচনা করিয়াছে।

"সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি বৎসর পরীক্ষা ও বিপত্তির কালরূপে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এই সময়েও গান্ধীজীর বাণী পুনরায় জাতিকে প্রেরণা দান করে। এই কয়েকটি বৎসরের প্রয়াস কিছু পরিমাণে সাফল্যও লাভ করে এবং যে স্বাধীনতার জন্য পুরুষ পরম্পরায় আমাদের জাতি সংগ্রাম করিতেছে ও দুঃখ সহ্য করিয়াছে, সেই স্বাধীনতাও আমরা লাভ করিয়াছি।

"কিন্তু একটি বড় ক্ষতি স্বীকার করিয়া আমাদিগকে এই স্বাধীনতা লাভ করিতে হইয়াছে, কারণ মাতৃভূমি দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। দেশ খণ্ডনের এই শোচনীয় ঘটনার পরে জনসাধারণের মধ্যে যে উন্মাদের মত ক্রিয়াকলাপের মত্ততা দেখা দেয়, তাহাতে মনে হইয়াছিল যে, সেই প্রত্যেকটি মহৎ আদর্শ যাহার জন্য গান্ধীজী সাধনা করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা সকলই যেন সেই সময়ের মত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অন্ধকারময় অবস্থাও পুনরায় গান্ধীজীর আশাময় বাণীর আলোকে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং বেদনাপীড়িত অসংখ্য হৃদয় সেই বাণী হইতে সান্ত্বনা ও শক্তি লাভ করে।

"তাহার পর আসে সবচেয়ে দারুণ আঘাত। যিনি ভারতের অপরাজেয় আত্মিক শক্তির এবং প্রেম ও করুণার মূর্ত্ত প্রকাশ, তাঁহাকেই হত্যা করা হইল। এই কারণে যে প্রাপ্তির জন্য ভারত প্রয়াস পাইয়া আসিতেছিল এবং সুদীর্ঘ সংগ্রামের পরিণতিরূপে যাহা লাভ করা হইল, সেই স্বাধীনতার সহিত স্বাধীনতার উদ্দীপনা আসিল না—আসিল দুঃখ ও ভয়বিহ্বলতা।

"গান্ধীজীর স্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব রক্ষা করিয়া এবং তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া দেশ এই সকল ভয়ঙ্কর সঙ্কটের প্রতিবিধান করিতে প্রস্তুত হইল। সকল সঙ্কটের মধ্যে সবচেয়ে ভীষণ হইয়াছিল আত্মার সঙ্কট, যাহার ফলে ভারতের চিত্ত মলিনতায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং সেই লোকগুরু যে মহৎ শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা দেশ কিছুকালের মত বিস্মৃত হইয়াছিল।

"যিনি জাতিকে স্বাধীনতা ও নবজীবন দান করিয়া গিয়াছেন তাঁহার তিরোভাবের পর পূর্ণ একটি বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। তাঁহার তিরোভাবের প্রথম বার্ষিক দিবসে আমরা তাঁহার মহান্ আত্মার ও মহৎ বাণীর প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। জীবনসঞ্চারিণী সেই বাণী হইতে শিক্ষার আলোক গ্রহণ করিয়া আমরা ভারতের জনসাধারণ ও নিখিল মানবের সেবা করিতে থাকিব, আজ এই সঙ্কল্প আমরা গ্রহণ করিতেছি।

"গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংসার পথে সমগ্র জাতির জন্য রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে, এক্ষণে আমাদিগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদিগকে অবশ্যই স্মরণে রাখিতে হইবে যে, জনসাধারণের সেবা করিবার কাজকেই সবচেয়ে বড় সুযোগ ও ব্রতরূপে আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, ভবিষ্যতে এই জনসেবার কাজকেই ব্রতরূপে আমাদিগের পালন করা উচিত এবং পালন করিতে হইবে। যাঁহারা এই দায়িত্ব ভুলিয়া গিয়া সরকারী পদ ও ক্ষমতার জন্য প্রলুব্ধ হইতেছেন তাঁহারা দেশেরই ক্ষতি করিতেছেন।

"গান্ধীজীর নিকট হইতে বিশেষভাবে আমরা এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে, শান্তিপূর্ণ পন্থায় শ্রেণীবৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় জন্ম, গোষ্ঠী ও ধর্ম্ম অনুসারে মানুষের মর্য্যাদা বিচারের প্রভেদমূলক প্রথা ঘুচাইয়া দিতে হইবে, ভারতের সর্ব্বসমাজের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং সেই লক্ষ্যের দিকেই সকল সেবামূলক প্রচেষ্টা বেশী করিয়া নিয়োজিত করিতে হইবে। সবার উপর তিনি এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, সর্ব্ব অবস্থায় সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়াও নৈতিক সততার প্রতি নিষ্ঠা রাখিতে হইবে, কারণ জীবনের তাৎপর্য্যই এই নৈতিক সততার দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে।

"স্বাধীনতার সহিত ভারতের নৈতিক মর্য্যাদা যেন উত্তরোত্তর প্রসারিত হইতে পারে এবং গান্ধীজী যে সকল মহৎ লক্ষ্যের প্রতি তাঁহার সাধনা নিয়োজিত করিয়াছিলেন তাহা অর্জ্জন করা সম্ভব হইতে পারে, তাঁহারই বাণীর নির্দেশ অনুসরণ করিয়া জাতীয় ও সর্ব্ব-জাতীয়

সঙ্কট এবং বিপত্তির প্রতিবিধান করিবার জন্য আমরা সকল আগ্রহ লইয়া প্রয়াস করিব।"

সর্ব্বোদয় কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ

গান্ধীজীর "সর্ব্বোদয়ের" আদর্শ কোন বিশেষ জাতি, ধর্ম্ম ও দেশের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। প্রাচীন ভারতের "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই আদর্শ গান্ধীজীর জীবনে ও কর্ম্মে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। জগতের কোটি কোটি লোক তাঁহার জীবনের আলোকে এই আদর্শের মর্ম্ম কথা আজ নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতেছে। তিনি কেবল আদর্শ প্রচার করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না; আজীবন তাহার নির্দ্দেশ নিজের জীবনে আচরণ করিয়া, এই আদর্শকে আমাদের পক্ষে সহজ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই সাধনার উত্তর-সাধক তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য বিনোবা ভাবে তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি এই "সর্ব্বোদয়" দিবস উপলক্ষে, এই সহজ কর্ত্তব্যগুলি আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন:

১। প্রত্যেক কর্ম্মী নিয়মিত সুতা কাটিবেন।

২। তিনি খাদি পরিধান করিবেন—এই খাদি নিজ হাতের সুতায় তৈয়ারি হইবে অথবা সঙ্ঘের তৈরী প্রমাণিত হইবে।

৩। তিনি যথাসম্ভব গ্রামে প্রস্তুত জিনিষপত্র ব্যবহার করিবেন।

৪। নিজের ঘরে থাকিলে যাহাতে গরুর দুধ পান সেই চেষ্টা করিবেন।

৫। মাসে অন্ততঃ একদিন তিনি নিজে পায়খানা সাফ বা গ্রামের স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কীয় কোন কাজ করিবেন।

৬। যে স্থানে বুনিয়াদী শিক্ষালয় আছে সেখানে থাকিলে নিজের ছেলেদের ঐ শিক্ষালয়ে পাঠাইবেন।

৭। তিনি দেবনাগরী, উর্দু এবং দক্ষিণ ভারতের যে কোন একটি লিপি শিখিবেন।

গান্ধী পাঠের ইহাই "অ, আ, ক, খ"। এই পাঠ অতিক্রম করিয়া "গভীরে" গেলেই সর্ব্বোদয় বিদ্যায় পণ্ডিত হওয়া যায় এবং গান্ধীজীর আদর্শকে রূপদান করিবার শক্তি অর্জ্জন করা যায়।

কলিকাতায় জনতার বিক্ষোভ

গত মাঘ মাসের ৩-৪-৫ তারিখে কলিকাতার বুকের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গেল, তদুপলক্ষে শিক্ষিত জনতার কার্য্যকলাপের যে পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি তাহাতে বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। এই উন্মাদনার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা সময় সাপেক্ষ। কিন্তু এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী-মণ্ডলী ও অধিকারীবর্গ যে বিবেচনার অভাবের ও কংগ্রেস না করিলে কর্ত্তব্য-চ্যুতি হইবে। দেশের মধ্যে সমাজ-বিরোধী লোকের তৎপরতা বাড়িয়াছে, এই তথ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেও, কোন সান্ত্বনা লাভ করা যায় না; বর্ত্তমান অসন্তোষে ইন্ধন যোগাইবার লোকের অভাব নাই বলিয়া পুলিসের গুলি চালাইয়া সে সমস্যার সমাধান হইবে না। কোনও দেশে কোনও কালে তাহা হয় নাই। ইংরেজ আমলের অভিজ্ঞতার পর এইরূপ চেষ্টার ব্যর্থতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুত্যাগীর অভাব-অভিযোগ লইয়া দরবার করিবার জন্য শিয়ালদহ ষ্টেশনে এক বিরাট জনতা জমায়েত হয়। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আয়োজন-উদ্যোগ হইয়াছিল নিশ্চয়ই। বিনা চেষ্টায় সহস্র সহস্র স্ত্রী-পুরুষ এক স্থানে মিলিত হইতে পারে না। এই চেষ্টার সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কি পৌঁছে নাই? পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিবরণীতে এই সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখিলাম না। আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলির সঙ্গে গবর্মেণ্ট বা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অন্তরের যোগ থাকিলে এইরূপ অসাবধানতার পরিচয় পাইতাম না।

তারপর শুনিতে পাই, শিয়ালদহ ষ্টেশনে সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট পুলিসের একজন ডেপুটি কমিশনার উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করেন যে, তাহাদের মধ্যে চার-পাঁচ জন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সহিত দেখা করিতে পারেন; সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। এই কথায় আমাদের সন্দেহ প্রমাণিত হয় যে, কর্ত্তৃপক্ষ সময়মত জন-বিক্ষোভের সংবাদ পান নাই বা তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। শিয়ালদহ ষ্টেশনে যখন জনতা সমবেত হইয়া গিয়াছে, তখন হাতের পাশা ফসকাইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে বলিলে অন্যায় হইবে না। তাহার পর "টিয়ার গ্যাস" ও "লাঠি চার্জ্জ"; অন্য কোন অস্ত্র ত পুলিশের জানা নাই।

শিয়ালদহের ব্যাপারের প্রতিবাদে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া উঠিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় সভা করিল এবং লালদীঘির পারের শাসক-সম্প্রদায়কে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য রওয়ানা হইল। ইন্দোনেশিয়ার উপর ডাচ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও নাকি এই সঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। পুলিস ছাড়া আর কাহাকেও পাওয়া গেল না যাঁহারা এই শিক্ষিত জনতাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। সেইরূপ চেষ্টা করিয়াও নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। কংগ্রেসের নামে যাঁহারা দেশের লোকের প্রতিনিধি সাজিয়া চরিয়া ফেরেন তাঁহাদের দেখাও পাওয়া গেল না সুতরাং পুলিস ও ছাত্রেরা সম্মুখীন হইয়া এমন এক

গাড়ী পুড়িল, কয়েকজন বাঙালী সন্তান পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারাইল।

এই ঘটনার ফলে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে একটা বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের লোকের মন যদি এমন করিয়া দেশের শাসনব্যবস্থা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় তবে ভবিষ্যতের ভরসা কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের সকলকে খুঁজিতে হইবে। ইংরেজের আমলে অনেক দোষাদোষীর কারবার করা হইয়াছে। আজ সেই পথ ও পন্থা অচল। যাহাদের হাতে ভারতরাষ্ট্রের ও তাহার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশসমূহের শাসনভার আসিয়া পড়িয়াছে নূতন মন লইয়া বর্ত্তমানের সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হইতে যদি তাঁহারা না পারেন, তবে কোন সমস্যার সমাধান হইবে না। এই নূতন মন পাইতে হইলে ফাইলের উপর মুখ গুঁজিয়া থাকিলে চলিবে না, জনতার সঙ্গে মিশিতে হইবে, জনতার নাড়ী টিপিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, জনতার অভাব-অভিযোগের মধ্যে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করিতে হইবে, নিজের তথাকথিত শিক্ষিত মনের নানা সংস্কার ত্যাগ করিতে হইবে, এবং যে সংবেদন-শীলতার দৌলতে গান্ধীজী ভারতীয় জনতার মনে স্থান পাইয়া ছিলেন, তাহার অনুশীলন করিতে হইবে। নূতন যুগের এই নূতন সাধনা মনেপ্রাণে গ্রহণ না করিতে পারিলে, আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হইবে।

জনসভায় অনেক পরিকল্পনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই পরিকল্পনা জীবনে ও কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা আরম্ভও হয় নাই। লোকেরা অধৈর্য্য হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। অসততা ও লোভ দেশের ধনিক শ্রেণীর একাংশের মনে যেরূপভাবে দানা বাঁধিয়াছে, তাহা ভাঙিতে না পারিলে, গণমনের অধৈর্য্য রক্তক্ষয়ী অন্তর্বিদ্রোহে পরিণত হইবে। কলিকাতার গত মাসের শিক্ষা এই আশঙ্কাই আগুনের অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে।

নূতন বিক্রয়-কর

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক দিনের মধ্যে বিক্রয়-কর সংশোধন বিলটি পাস করাইয়া লওয়া হইয়াছে; উহার তাৎপর্য্য কি জনসাধারণ তাহা বুঝিবার একটুও সুযোগ পায় নাই। নূতন আইনানুসারে দিয়াশলাই, কয়লা, সরিষার তৈল, জ্বালানি কাঠ, ফুল, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রভৃতির উপর টাকায় তিন পয়সা হারে বিক্রয় কর বসিবে; অর্থাৎ উনুন ধরানো হইতে সুরু করিয়া, স্নানে, আহারের প্রতিগ্রাসে, এমন কি মৃত্যুর পর চিতারোহণে পর্য্যন্ত সকল বাঙালীকে বিক্রয় কর দিয়া যাইতে হইবে। নিউ ইয়র্কের ন্যায় ধনকুবেরের দেশেও সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রকে বিক্রয়-কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে; পাকিস্থানের ন্যায় শিশু রাষ্ট্রও বিক্রয়-কর হইতে পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়াছে। গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশের পক্ষে গণ-শিক্ষার উপর কোনরূপ কর ধার্য্য করাই অন্যায়; শিক্ষা যত ব্যাপক হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই কর্ত্তব্য। ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যগণ সভ্যতার এই মূলনীতির প্রতিও লক্ষ্য রাখেন নাই এমনই তাঁহাদের বুদ্ধি বিবেচনা।

আশ্বিন মাসে আমরা বিক্রয়-কর লইয়া কিছু মন্তব্য করিয়াছিলাম। আমরা লিখিয়াছিলাম যে, এমন কয়েকটি বাছাই করা দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর বসানো যায় যাহাতে জনসাধারণের কোন অসুবিধা হয় না, অথচ সরকারের প্রচুর আয় হয়। এই সম্পর্কে আমরা চট ও থলিয়া, শেয়ার মার্কেট এবং ডিসপোজালের মালের উপর বিক্রয়-কর বসাইবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। গত বৎসর কলিকাতা হইতে ১২৭ কোটি টাকার চট ও থলিয়া বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে; ইহার উপর বিক্রয়-কর থাকিলে তিন পয়সা হারে প্রায় ছয় কোটি টাকা আদায় হইত। বাংলার চট-কলের লাভের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই যায় ব্রিটেনে; পাট বেচাকেনার লাভ যায় জয়পুর, মারোয়াড় ও বোম্বাইয়ে; কাঁচা পাটের দামের তিন-চতুর্থাংশ যায় পাকিস্থানে এবং শ্রমিকের মজুরী যায় বিহারে। চটকলে যে পরিমাণ লাভ হয় তাহাতে টাকায় তিন পয়সা ট্যাক্স দেওয়া তাহাদের পক্ষে কিছুই নয়। গবর্মেণ্ট বলিয়া থাকেন যে, রপ্তানী দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর বসাইলে বাজার খারাপ হইবে। কথাটা সত্য নহে। মাদ্রাজের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য চামড়া; তাহার উপর দীর্ঘকাল যাবৎ বিক্রয়-কর আছে, তাহাতে মাদ্রাজের এই রপ্তানী ব্যবসার ক্ষতি হইয়াছে বা বাজার খারাপ হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই।

ফ্রান্সেও বাংলার ন্যায় প্রথমটা এলোপাথারি সকল দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর বসান হইয়াছিল। কার্য্যকালে দেখা গেল বহুসংখ্যক গরীবের উপর এই কর চাপাইতে গেলে আদায় কম হয়, লোকের ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার প্রবৃত্তি দৃঢ়তর হয় এবং অসন্তোষ বাড়ে। অতঃপর ফরাসী গবর্মেণ্ট অল্পসংখ্যক বাছাই করা দামী জিনিষের উপর বিক্রয়-কর বসাইয়া নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি বাদ দিয়া দেন, তাহাতে লোকেও সন্তুষ্ট হয়, সকলের আয়ও বাড়ে। শেয়ার মার্কেটকে তাঁহারা বিক্রয়-করের আওতায় আনেন। কলিকাতার শেয়ার মার্কেটকেও বিক্রয় করের আমলে না আনিবার কোন কারণ নাই; ইহারও লাভের অধিকাংশই জয়পুর, মারোয়াড় প্রভৃতি প্রদেশে যায়, খানিকটা না হয় বাংলায় থাকুক।

কলিকাতায় প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকার ডিসপোজালের মাল বিক্রয় হইতেছে, ইহার উপরও বিক্রয়-কর নাই। থাকিলে বার্ষিক কোটি টাকার উপর সরকারের আয় বাড়িবার কথায়। ইহার বিরুদ্ধে সরকারী যুক্তি এই যে, গবর্মেণ্টকে ট্যাক্স করা যায় না। কথাটা ঠিক নয়। বাংলা-সরকার তাঁহাদের পুস্তকাদি যাহা কিছু বিক্রয় করেন তাহার উপর বিক্রয়-কর আদায় হয়,

সুতরাং ভারত-সরকারের দ্বারা বিক্রীত দ্রব্যে বিক্রয়-কর আদায় করা যাইবে না কেন? তাহা ছাড়া করটা দিবে ক্রেতা।

বিক্রয়-করের পরিমাণও বাংলাদেশে অত্যধিক। নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি আমেরিকার অধিকাংশ ষ্টেটেই বিক্রয়-করের পরিমাণ শতকরা দুই টাকা মাত্র, কালিফোর্নিয়ায় আড়াই টাকা। ভারতবর্ষেও মাদ্রাজে টাকায় এক পয়সা, বোম্বাই বিহার যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতিতে টাকায় দুই পয়সা, একমাত্র বাংলাতেই বিক্রয় কর টাকায় তিন পয়সা অর্থাৎ শতকরা ৪॥৵০ আনা। পঞ্চাশের মন্বন্তরের এবং ভারত-বিভাগে বিধ্বস্ত বর্ত্তমান বাংলায় এত উচ্চহারে কর বস্তুতঃই পীড়াদায়ক, তাহার উপর মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা আয় বাড়াইবার জন্য জীবনযাত্রার সকল দ্রব্যের উপর ঐ কর সম্প্রসারণ ত রীতিমত অত্যাচার।

আশ্বিন মাসে আমরা আর একটি কথা লিখিয়াছিলাম যে, বিক্রয়-কর আদায়-ব্যবস্থা ভাল না হইলে জনসাধারণ ট্যাক্স দিয়া মরে কিন্তু উহার অধিকাংশই সরকারী কোষাগারে পৌঁছায় না, যায় অসাধু ব্যবসায়ী ও দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারীদের কবলে। বিক্রয়-করের পরিসর বৃদ্ধির আগে গবর্ন্মেণ্ট এ বিষয়েও কিছু অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই, বরং কার্য্যতঃ উহার বিপরীতই দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান বিক্রয়-কর কমিশনার এই বিভাগ পরিচালনায় দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। শোনা যায় একজন এসিসটাণ্ট কমিশনারের বিরুদ্ধে কয়েক মাস আগে দুর্নীতি দমন বিভাগের অনুসন্ধান আরম্ভ হইলে তিনি ছুটি লইয়া বিলাত চলিয়া গিয়াছিলেন; সম্প্রতি তিনি ফিরিয়া আসিয়া কাজে যোগ দিয়াছেন ইহা কি সত্য? তাঁহার সম্বন্ধে ঐ তদন্ত শেষ হইয়াছে কি? ইনি কি পূর্ব্বে আয়কর বিভাগে কাজ করিতেন, সেখান হইতে তিনি ছাড়িয়া আসিলেন কেন—সে বিষয়েও কোন সন্ধান লওয়া হইয়াছে কি? সেণ্ট্রাল সেক্সনে ভারপ্রাপ্ত এসিসটাণ্ট কমিশনারের এলাকা সমগ্র বঙ্গদেশ কিন্তু তাঁহার হাতে ছোটখাট বাঙালী ব্যবসায়ী ভিন্ন বড় বড় ব্যবসায়ীর উপর ট্যাক্স ধার্য্য হয় না কেন? একজন এসিসটাণ্ট কমিশনার বহুসংখ্যক ফাইল জমাইয়া পদত্যাগ করিয়াছেন এবং এখন ঐ আপিসেই ওকালতি করিতেছেন। এ কথা কি ঠিক এবং সত্য হইলে ইহার প্রশ্রয় কে দিল? কোন কোন ট্যাক্স অফিসার বড় বড় ব্যবসায়ীদের উপর কর ধার্য্য করিলে উহা কমাইবার বা ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য উপর হইতে চাপ আসে, এমন কথা প্রায়ই শোনা যায়। গবর্ন্মেণ্ট ইহা জানেন কি? গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীতে শাসিত দেশে শোনা কথা—hearsay allegations—যখন প্রবল হইয়া উঠে তখন তাহাকেও উপেক্ষা করিতে নাই—বিলাতের লিন্স্কী ট্রিবিউনালের এই শিক্ষা আমাদেরও গ্রহণ করা উচিত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হাইকোর্টের জজ লইয়া বিক্রয়-কর আপিসের কার্য্যকলাপ ও আদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান কমিটি অবিলম্বে গঠন করা একান্ত আবশ্যক। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত বাঙালীকে সম্পূর্ণ রূপে অব্যাহতি দিয়াও বিক্রয়-কর হইতে বাংলা-সরকারের বহু কোটি টাকা আয় হইতে পারে এবং বিক্রয়-কর বিভাগ সৎ ও দক্ষ কর্ম্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হইলে অসাধু ব্যবসায়ীদের উপদ্রব অনেক কমিতে পারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

পাবলিক প্রসিকিউটারের যোগ্যতা

আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটারের আচরণ সম্পর্কে একটি তদন্তের বিষয় আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম যে, তদন্তটি মাঝপথে থামাইয়া না রাখিয়া উহা শেষ করা উচিত ছিল। একটি মামলা সম্পর্কে তদন্তটির উদ্ভব। মামলায় যাহাদের প্রধান আসামী হওয়ার কথা, সেই সব ব্যক্তি রাজসাক্ষী হয় অথবা অন্যভাবে উপায়ে উপযুক্ত শাস্তি এড়াইয়া যায় এবং মামলা পরিচালকদের দোষে ইহা হইয়াছিল কিনা—ইহাই ছিল তদন্তের বিষয়বস্তু। অর্দ্ধেক তদন্তে নানা-প্রকার তথ্য প্রকাশ পায়, তাহার পরই পাবলিক প্রসিকিউটার কার্য্যকাল শেষ হওয়ার তিন সপ্তাহ আগে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আমাদের মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর ইহা ঘটে। এই সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ের প্রতি গবর্ন্মেণ্ট মনোযোগ দেন নাই বলিয়া বোধ হইতেছে। মামলা যখন আরম্ভ হয় তখন আলিপুরে একজন পাবলিক প্রসিকিউটার, একজন এডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটার এবং একজন এসিসটাণ্ট প্রসিকিউটার ছিলেন। তদন্তকারী পুলিস অফিসার মামলায় অভিমত লওয়ার জন্য নিয়মানুসারে প্রথমে তৎকালীন পাবলিক প্রসিকিউটারের কাছে যান কিন্তু তাঁহার কার্য্যকাল তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে বলিয়া তিনি এডিশনাল প্রসিকিউটারের কাছে অফিসারটিকে যাইতে বলেন। তিনি তৎপরিবর্ত্তে প্রথমে যান এসিসটাণ্টের কাছে। ইনি যে অভিমত দেন তাহার ফলে একজন আসামীর বিশেষ সুবিধা হয়, সে মূল আসামী না হইয়া রাজসাক্ষী হইতে পারে এবং তাহার বাড়ী তল্লাসীতে প্রাপ্ত খাতাপত্র ও মূল সার্চলিষ্ট আদালতে উপস্থিত হয় না। অতঃপর পুলিশ ডায়েরীর পরিবর্ত্তন ইত্যাদি লইয়া গোলযোগ হয়। প্রথম পাবলিক প্রসিকিউটারের এবং এসিসটাণ্ট প্রসিকিউটারের অভিমত প্রভৃতি প্রথমে হারাইয়া যায়, পরে তদন্তকারী পুলিস অফিসারের নিকট হইতে উদ্ধার হয়। ইতিমধ্যে তৎকালীন এডিশনাল প্রসিকিউটার পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত হন। ইহাই মামলার প্রধান বিষয় এবং উপরোক্ত এসিসটাণ্ট পাবলিক প্রসিকিউটারের আচরণও তদন্তের বিষয়ের মধ্যে। কিন্তু উপরোক্ত নূতন প্রসিকিউটার পদত্যাগ করায় ইনিই সম্প্রতি পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত হইয়াছেন।

একই মামলায় তিন জনের আচরণ তদন্তের বিষয় ছিল; তন্মধ্যে একজন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, একজনের পদোন্নতি হইল এবং তৃতীয় জন স্বপদে বহাল রহিলেন। তদন্ত সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে, তদন্ত সম্পূর্ণ হইবার পরে হইলে কিছু বলিবার ছিল না।

পাবলিক প্রসিকিউটার যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদের আচরণ সম্পর্কে জনসাধারণের মনে কোনরূপ প্রশ্ন যাহাতে জাগিতে না পারে তৎপ্রতি সরকারের বিশেষ মনোযোগ থাকা উচিত। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের পক্ষ হইয়া লড়িবার জন্য যাঁহারা নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা কোন কারণে আসামী পক্ষকে আইনের হাত এড়াইবার জন্য গোপন পরামর্শ বা সাহায্য করিতে পারেন, লোকের মনে এরূপ ধারণা জন্মিতে দেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে সমূহ অনিষ্টকর। পাবলিক প্রসিকিউটারদের সততা Cæsar's wife-এর ন্যায় সকল সন্দেহের অতীত হওয়া প্রয়োজন।

চান্দিনা প্রজাস্বত্ব বিল

কলিকাতা ও সহরতলী এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যাল এলাকার বহির্ভূত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্যান্য স্থানের চান্দিনা প্রজাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য ৯১ ধারা সম্বলিত চান্দিনা প্রজাস্বত্ব বিলটি ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। বিলে চান্দিনা প্রজাগণকে প্রজা ও অধীন প্রজা এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই সকল প্রজা বাসস্থানের বা ব্যবসার জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে জমি বন্দোবস্ত লইতে পারেন। স্বত্বাধিকারের কাল অনুযায়ী এই সকল প্রজাকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যদি কোন চান্দিনা প্রজা সম্পত্তি হস্তান্তর আইন বলবৎ হইবার পূর্ব্ব হইতে প্রজাস্বত্বের অধিকারী হইয়া থাকেন অথবা তাঁহার স্বত্ব গ্রহণের সময় যদি অজ্ঞাত থাকে অথবা তাঁহার স্বত্বাধিকার কাল যদি ১২ বৎসরের কম না হয়, তবে সেই চান্দিনা প্রজা স্বত্বে তিনি স্থায়ী, হস্তান্তরযোগ্য এবং উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগদখলের অধিকার পাইবেন এবং ঐ জমিতে তিনি পাকা বা অন্য কোন গৃহনির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষাদি রোপণ ও ফল ভোগ করিবার অধিকারী হইবেন। যে সব চান্দিনা প্রজা ১২ বৎসরের কম সময়ের স্বত্বাধিকারী, তাঁহারা উপরোক্ত শ্রেণীর প্রজাগণ অপেক্ষা কিছু কম অধিকার পাইবেন।

এই বিলের বিধান অনুযায়ী চান্দিনা প্রজার খাজনা শতকরা ১২৷০ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইবে না এবং একবার বৃদ্ধি করিবার পর খাজনা আর ১৫ বৎসরের মধ্যে বাড়ানো যাইবে না। আদালত ইচ্ছা করিলে খাজনা হ্রাস করিতে পারিবেন। যে সব অধীন প্রজা চান্দিনা প্রজাদের অধীনে জমি দখল করিয়া থাকিবেন, তাঁহাদিগকেও চান্দিনা প্রজাদের অধিকারের অনুরূপ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অধীন প্রজাদের খাজনা শতকরা ৪০৲ টাকার বেশী বাড়ানো যাইবে না। চান্দিনা স্বত্বের জমি হস্তান্তর, খাজনা-বিরোধের নিষ্পত্তি, খাজনা দাখিলের পদ্ধতি, বে-আইনী অর্থ আদায়ের জন্য দণ্ডদান এবং কৃষি জমির স্বত্ব চান্দিনা স্বত্বে পরিণত করিবার বিধানও বিলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মফঃস্বলের চান্দিনা প্রজা ও শহরের ঠিকা প্রজা লইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ আন্দোলন চলিতেছে। চান্দিনা প্রজাদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি বিল বঙ্গ বিভাগের পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের শেষ অধিবেশনে গৃহীত হয়, কিন্তু বঙ্গবিভাগের ফলে উহা আর ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করা যায় নাই বলিয়া বিলটি আইনে পরিণত হয় নাই। বর্ত্তমান বিলটি গৃহীত হওয়ায় এই অসুবিধা দূর হইল।

ঠিকা প্রজা বিল

কলিকাতা ঠিকা প্রজা বিলে কলিকাতার শহরতলী ও হাওড়ার ঠিকা প্রজা ও মালিকদের অধিকার ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিলে শহরের, শহরতলীর ও হাওড়ার চান্দিনা প্রজাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিলটি উত্থাপন করিয়া রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব বলেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব কলিকাতা ও হাওড়ার বস্তিগুলি তুলিয়া দিয়া ঐগুলির পরিবর্ত্তে উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা যায় ততই মঙ্গল এবং গবর্ন্মেণ্ট ইহার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিতও বটে। ঐসব নূতন বাসগৃহ এমন পরিকল্পনায় নির্ম্মাণ করা উচিত যাহাতে বিভিন্ন বাড়ী বিভিন্ন আয়ের লোকের বাসের উপযুক্ত হয়। কিন্তু ঐরূপ বৃহৎ পরিকল্পনা যত দিন না কার্য্যকরী হইতেছে এবং যত দিন বস্তি থাকিতেছে তত দিন মালিকের ইচ্ছানুসারে বস্তি প্রজার অযথা উৎখাত বন্ধ থাকা উচিত। রাজস্ব সচিব আরও বলেন যে, বস্তিবাসীদের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য সম্প্রতি গবর্ন্মেণ্ট তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে একটি তদন্ত করেন। কলিকাতার শতকরা ১০টি বস্তিতে ঐরূপ তদন্ত করা হয় এবং তাহার অর্দ্ধেকের ফল জানা গিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের নথি অনুসারে শহরে এখন ৪৩৭১টি বস্তি আছে। এই সব বস্তিতে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক বাস করে। এক শ্রেণী হইতেছে ঠিকা প্রজা; অপর শ্রেণী তাহাদের ভাড়াটিয়া। ঐরূপ একটি ভাড়াটিয়া তাহার ঠিকা প্রজাকে যে ভাড়া দেয় তাহা মাসে গড়পড়তা ৭৲ টাকারও উপর। ভাড়াটিয়াদের মধ্যে শতকরা ৪২ জনের অধিক লোকের আয় মাসে ৫০৲ টাকা বা তাহারও কম। শতকরা বড় জোর ৩৯টি বস্তির কামরাতে আলো-বাতাস চলাচল ভাল বলা যায়। বস্তিগুলিতে জল সরবরাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই তদন্তে স্পষ্ট জানা গিয়াছে, বস্তি-প্রজারা যে অবস্থায় বাস করে তাহার উন্নতি অবিলম্বে হওয়া দরকার, বিশেষতঃ জলের উন্নতি এখনই হওয়া উচিত। বস্তির অবস্থা ভাল হইলে শহরের রোগ কমিয়া সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হইবে।

পতিত জমির উদ্ধার

পতিত জমির উদ্ধার করিয়া ভারতরাষ্ট্রের খাদ্যশস্য বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণকল্পে গত ৫ই মাঘ দিল্লী নগরীতে এক সম্মেলন আহূত হয়। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজয়রামদাস দৌলৎরাম এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় রাজস্বমন্ত্রী ডাঃ জন মাথাইও উপস্থিত ছিলেন, আর ছিলেন বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব্ব পঞ্জাব, উড়িষ্যা, মধ্যভারত, বিন্ধ্য প্রভৃতি প্রদেশের, পাতিয়ালা, জয়পুর ও ভুপাল রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী বা ঐ বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীবর্গ। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ হইতে কেহ উপস্থিত ছিলেন, এই সংবাদ কার্য্যবিবরণীতে পাইলাম না। পশ্চিমবঙ্গে এরূপ চেষ্টার প্রয়োজন নাই, বোধ হয়।

এই সম্মেলনে একটি বিরাট পরিকল্পনাকে রূপদান করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে ২৭১ কোটি টাকা। এই ব্যয়ের মধ্যে ১৪৬ কোটি টাকা ভারতরাষ্ট্রের মুদ্রায় ও বাকী ১২৫ কোটি টাকা ডলার ও পাউণ্ডে ব্যয় হইবে। অর্থাৎ, ১২৫ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি যুক্তরাষ্ট্র ও বিলাত হইতে আনাইতে হইবে, এবং তজ্জন্য আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের নিকট এই পরিমাণ অর্থের জন্য ঋণদানের আবেদন করিতে হইবে।

এই পরিকল্পনার একটি কার্য্যসূচীর হিসাব দেখিয়াছি। ৬০ লক্ষ একর, প্রায় ২ কোটি বিঘা চাষের উপযোগী জমি ৭ বৎসরের মধ্যে কৃষির উপযোগী করিতে হইবে। ৪,৫০০টি গভীর কূয়া কাটাইতে হইবে প্রায় ৩০ লক্ষ একর অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি বিঘা জমিতে জলদান করিবার জন্য। কৃত্রিম সার উৎপাদন করিতে হইবে। এই কার্য্যসূচীর মধ্যে মাছের চাষেরও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে দেখিলাম। দেশের প্রায় ৫,০০০ বর্গ মাইল সমুদ্রতীরে পাঁচটি সামুদ্রিক মৎস্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়া গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যে ৬০ লক্ষ একর অর্থাৎ প্রায় ১৮০ লক্ষ বিঘা জমির উদ্ধার সাধন করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত প্রদেশ ও রাজ্যের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—পূর্ব্বপঞ্জাবে ১৫ লক্ষ বিঘা, পূর্ব্বপঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যে ১২ লক্ষ বিঘা, উড়িষ্যায় ১৫ লক্ষ বিঘা, মধ্যপ্রদেশে ও বেরারে ৯ লক্ষ বিঘা, যুক্তপ্রদেশে ৯ লক্ষ বিঘা। বিহারের প্রয়োজন এখনও জানা যায় নাই। এই ১৮০ লক্ষ বিঘার মধ্যে প্রায় ৬৬ লক্ষ বিঘা জমি হইবে নূতন, প্রায় ১২০ লক্ষ বিঘা হইবে কাশ প্রভৃতি ঘাসে আবৃত জমি।

এই আয়োজন ও অর্থব্যয় সার্থক হইলে প্রায় ৫ কোটি ৪০ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমানে প্রায় ১১০ কোটি মণ খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করা হইতেছে, তাহার জন্য প্রায় ১৩০ কোটি টাকা মাশুল গুনিয়া দিতে হইতেছে। যে ৭ বৎসরে পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা হইবে, সেই সময়ের মধ্যে আমাদের দেশে প্রায় ২ কোটি লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। এই সম্ভাবনার কথা মনে করিয়া অনেকে বলিতেছেন যে, ভারতরাষ্ট্রে জন্মের হার কমাইতে বা নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে খাদ্যফসলের বৃদ্ধিতে তার খাদ্যসমস্যা মিটিবে না। ৭ বৎসর পরে হয়ত দেখিব যে, আরও ১৮০ লক্ষ বিঘা জমিতে ফসল উৎপাদন করিয়া আমাদের অবস্থা যথাপূর্ব্বম্ আছে। শুনিতেছি, সমস্ত পৃথিবীব্যাপী খাদ্যাভাব আরও ৫।৬ বৎসর থাকিবে। জনসংখ্যাও এই সময়ে বাড়িবে। এই সমস্যায় বিজ্ঞানের উত্তর কি? জন্মনিরোধ না জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি?

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগ

শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-মন্ত্রী। তাঁহার শক্তির উপর পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যশস্য উৎপাদনের উন্নতি নির্ভর করে। এই কার্য্যে তিনি প্রায় বার মাসের মধ্যে কিরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন তাহা আমাদের জানিতে হইবে। কৃষির সঙ্গে গো-জাতির উন্নতি অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। পাঁজা মহাশয় এই বিভাগের জন্যও দায়ী। ইংরেজ আমলে এই বিভাগের কৃতিত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছি; অনেক অপদার্থতার পরিচয় পাইয়াছি। পাঁজা মহাশয়ের আমলেও সেইরূপ কথা শুনিতে হইতেছে বলিয়া আমরা দুঃখিত। বাংলাদেশের কৃষি বিভাগের পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সম্পাদিত "খাদ্য উৎপাদন" পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের আইন-পরিষদের কোন সভ্য প্রশ্ন করিয়া এই বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয়ে সাহায্য করিলে কৃতজ্ঞ থাকিব:

> গোজাতির উন্নতি বিধানে সরকারী প্রচেষ্টা
>
> গত বৎসর ২৪ পরগণা জেলায় উন্নত শ্রেণীর কতকগুলি ষাঁড় বিতরণ করা হইয়াছিল। পঞ্জাব প্রদেশ হইতে এই সকল ষাঁড় আনা হইয়াছিল। ২৪ পরগণায় ষাঁড় বিতরণ করিবার পর লোকে দেখিতে পাইল যে, কতকগুলি ষাঁড় "নিম আক্তা" অর্থাৎ বলদ এবং কতকগুলি এত অল্পবয়স্ক যে, যে উদ্দেশ্যে তাহাদের আনা হইয়াছিল এবং বিতরণ করা হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য সাধনে তাহারা একেবারে অক্ষম। আমরা অতি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, লাঙল বা গাড়ী টানার জন্য "নিম আক্তা" ষাঁড়গুলিকে চুঁচুড়া কৃষিক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অল্পবয়স্ক ষাঁড়গুলিকে খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া বড় করা হইতেছে। যে সকল কর্ম্মচারী পঞ্জাবে গিয়া এই সকল ষাঁড় নির্ব্বাচন করিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন এবং পঞ্জাব হইতে ২৪ পরগণা জেলায় পাঠাইয়াছিলেন তাঁহারা এখন কোথাকার কৃষিক্ষেত্রে কি কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন, তা

আমরা জানিতে পারি নাই। পিঁজরাপোলে ইহাদের সংবাদ লওয়া উচিত নয় কি ?

বিহারে বাংলা ভাষা

পুরুলিয়ার "সংগঠন" পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত মন্তব্য হইতে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রদেশের শাসকবর্গের মতিগতির একটা পরিচয় পাওয়া যায় :

…হঠাৎ এই স্কুলটিতে (পুরুলিয়া জিলা স্কুল) বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া বর্ত্তমান ইংরেজী সাল হইতে কর্তৃপক্ষ কেবল মাত্র হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্কুলটির ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনেরও বেশী ছাত্র বাংলা-ভাষাভাষী। ১৯৪৮ সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত প্রবেশিকা বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রেণীতে যে সব ছাত্র বিভিন্ন বিষয় তাহাদের মাতৃভাষা বাংলাতে শিক্ষা করিয়াছে, তাহারা বর্ত্তমান প্রবেশিকা বর্ষে (Matric Class) উত্তীর্ণ হইয়া হঠাৎ সব বিষয় হিন্দীতে কিরূপে বুঝিতে পারিবে তাহা যে কোন সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগোচর।

গত ৫ই ও ১২ই মাঘের মুক্ত-সংখ্যায় এই মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। তার পর সংবাদপত্রে দেখিতে পাই যে, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পুরুলিয়ার উকীল-সভা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই ঘোষণাও কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, বিহার গবর্ন্মেণ্ট কর্তৃক এই ব্যবস্থা ২৮শে জানুয়ারীর মধ্যে বাতিল না হইলে তাঁহাদের পোষ্য ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দকে বিভালয় হইতে ছাড়াইয়া লইবেন। তাহার পর সংবাদ আসিয়াছে, পুরুলিয়া জিলার সমস্ত স্কুলের বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ধর্ম্মঘট করিয়াছে, এবং এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের নিকট তাঁহাদের অভিভাবকেরা প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু যখন-তখন প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন; সরদার প্যাটেলও এই তানে খেয়াল মত যোগদান করেন। বিহারে যাহা ঘটিতেছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জানিলে ভাল হয়। এবং এই উপলক্ষে বিহার প্রদেশের পূর্ব্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে বাঙালীর সমস্যার কথা তাঁহাদের আবার জানাইয়া রাখিতে চাই। প্রায় ছয়-সাত শত বৎসর হইতে এই অঞ্চলে বাঙালীরা বাস করিতেছেন; ১৯১২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তাহা বাংলাদেশের শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ইতিহাস মনে রাখিলে বাঙালী ছাত্রবৃন্দের শিক্ষার জন্ত হিন্দী চাপাইয়া দেওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। বিহারের কংগ্রেস গবর্ন্মেণ্ট সেই কাজ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ফলে বাঙালী সমাজের মনে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে।

এইরূপ অত্যাচারের মূল উৎপাটন করিবার উদ্দেশ্যেই আজ পঁচিশ বৎসর হইতে বাঙালী সমাজ দাবী করিতেছেন যে, বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল বিহার হইতে বিযুক্ত করিয়া পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হউক। পূর্ব্বকালে বিহারী নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবে আপত্তি করেন নাই। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদও প্রকাশ্যে এই বিভাগের সমর্থন করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার মনে হিন্দী ভাষা প্রসারের লোভ জন্মিয়াছে। এই মনোভাব বিহারের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মনে সংক্রামিত হইয়াছে। পুরুলিয়ার জিলা-স্কুলের নূতন ব্যবস্থায় তাহার প্রমাণ পাইতেছি। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বলিতেছি, "আপনি মজিলি, ভাই! লঙ্কা মজাইলি"—এই দুঃখ করিবার সময় হয়ত একদিন আসিবে।

আসামে বাঙালী বিদ্যালয়ে অসমীয়া প্রবর্ত্তন

আসামের তেজপুর বাঙালী বালিকা বিদ্যালয়ে অসমীয়া ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করিবার জন্য যে চেষ্টা হইতেছে তাহার পূর্ণ বৃত্তান্ত এবং অভিভাবকদের প্রতিবাদের বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল। সংবাদটি ২৬শে মাঘের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে :

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

তেজপুর, ৬ই ফেব্রুয়ারী :—এই বৎসর হইতে অসমীয়া ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করায় তেজপুর বাঙালী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আলোচনার জন্য অভিভাবকগণ অত্র সন্ধ্যায় সমবেত হন। ডাঃ হেমচন্দ্র দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দে প্রমুখ ব্যক্তিগণ সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে এই বিদ্যালয়ের ইতিহাসের উল্লেখ করেন। বিদ্যালয়টি প্রধানতঃ বাঙালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যালয়ের পরিচালক কমিটির এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের সকলেই প্রতিবাদ করেন।

সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, গবর্ন্মেণ্টের বিনা নির্দ্দেশে ও অভিভাবকগণের অনুমতি না লইয়া বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি অসমীয়া ভাষাকে একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম করিয়াছেন বলিয়া এই কার্য্য বিধিবহির্ভূত। আর একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, পাঠ্য পুস্তকের তালিকা অসমীয়া ভাষায় দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, পরিচালন কমিটি জোর করিয়া বাঙালীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে বদ্ধপরিকর। ইহাদের সিদ্ধান্তই সুপারিশ বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং এই প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, এইরূপ স্বেচ্ছাচারমূলক কার্য্য কখনই বরদাস্ত করা যাইবে না। পরিচালন কমিটিকে এই সিদ্ধান্ত নাকচ করিতে হইবে, তাহা না হইলে এই সভা সদস্যগণের ও সম্পাদকের পদত্যাগ-দাবী জানাইবে; কারণ এই কার্য্যের জন্য ইঁহারাই দায়ী।

দশ দিনের মধ্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাঁহাদের প্রস্তাব

প্রত্যাহার করিতে বলিয়া একটি চরমপত্র দেওয়া হইয়াছে। সভায় আরও বলা হইয়াছে যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যার শতকরা ৪০ জন বাঙালী এবং বিদ্যালয়ে বাঙালীর দানই বেশী, সুতরাং পরিচালন কমিটিকে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে হইবে; সিদ্ধান্ত বাতিল না হইলে অভিযোগ দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। একটি প্রতিনিধিদল আসামের শিক্ষামন্ত্রী এবং গৌহাটিতে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইবেন। পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদকল্পে অভিভাবকগণ এই অভিমত জানান যে, এই দশ দিন তাঁহাদের কন্যারা বিদ্যালয়ে যাইবে না। প্রস্তাবের প্রতিলিপি ভারত গবর্ন্মেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী, আসাম গবর্ন্মেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী, আসাম গবর্ন্মেণ্টের বিদ্যালয়-সমূহের পরিদর্শিকার নিকট পাঠানো হইয়াছে।

ভারতের গৃহসমস্যা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গৃহসমস্যা সম্পর্কে ইউনাইটেড নেশ্যন্স কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য-সংক্রান্ত বিবরণীতে ভারতবর্ষের গুরুতর গৃহসমস্যা এবং দীর্ঘ মেয়াদী গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ইউনাইটেড নেশ্যন্সের সমাজ-কল্যাণ বিভাগ এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। এই রিপোর্টে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আর্থিক দুরবস্থার ফলে ভারতবর্ষ এখন যে শোচনীয় গৃহসমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

আমাদের মতে এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন বা রিপোর্ট প্রণয়ন ভারতীয় গৃহসমস্যা সমাধানের উপায় নহে। এই সমস্যা সমাধানের সহজ উপায় আমাদের হাতে আছে। গৃহসমস্যা সম্বন্ধে ভাবিতে গেলেই আমরা আগে চিন্তা করি সিমেন্টের কথা—অর্থাৎ পাকা ইমারৎ বাড়ীই যেন আমাদের একমাত্র বাসস্থান বা কর্ম্মস্থান। সোভিয়েট রাশিয়ার গৃহসমস্যা আমাদের চেয়ে শত গুণ বেশী, কারণ যুদ্ধে তাহার গৃহাদির যে ক্ষতি হইয়াছে সেরূপ কম দেশেই হইয়াছে। অথচ রাশিয়া বাড়ী বলিতে আগে বুঝে কাঠ এবং কাঠের বাড়ী তৈরি করিয়া তাহারা গৃহসমস্যা প্রায় সমাধান করিয়া আনিয়াছে। আমরা যদি সিমেন্টের পরিবর্ত্তে বাড়ী তৈরীর সরঞ্জাম বলিতে যাহা সহজে পাওয়া যায় তাহা দিয়াই কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতাম, তবে আজ বাসগৃহের এ দুর্দ্দশা হইত না।

বাঙালী ব্যাঙ্ক পতনের ফল

গত তিন-চারি বৎসরের মধ্যে প্রায় ১৫।১৬টি বাঙালী ব্যাঙ্কের পতন হইয়াছে; তাহার ফলে বাঙালী সমাজ প্রায় ৫০ কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই পতনের মুখ্য কারণ সম্বন্ধে আজ কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। পরিচালক-বর্গের অসাধুতা তাহার মধ্যে প্রধান ও প্রথম। এই সম্বন্ধে দেশের মন কিরূপ বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহা "বরিশাল হিতৈষীর" নিম্নলিখিত মন্তব্যে স্পষ্ট বুঝা যায়। এই পত্রিকার সম্পাদক শ্রীদুর্গামোহন সেন অশ্বিনীকুমারের মন্ত্র-শিষ্য; তিনি আজীবন ত্যাগের পথে চলিয়াছেন; ন্যায় ও সততার পক্ষ লইয়া সংগ্রাম করিয়াছেন; অনর্থক কাহারও উপর বিদ্বেষ পোষণ করেন নাই। এহেন ব্যক্তির মনে যখন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা জাগিয়া উঠে, তখন বুঝিতে হইবে অসাধু ব্যাঙ্ক-পরিচালকবৃন্দ কি করিয়া অগণিত লোকের অভিশাপের ভাগী হইতেছে। "বরিশাল-হিতৈষী" পূর্ব্ববঙ্গের গবর্ন্মেণ্টের নিকট যে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত। ভারতরাষ্ট্রের এই বিষয়ে কোন কর্ত্তব্য নাই কি? "বরিশাল-হিতৈষী" বলিতেছেন যে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এই ভাবে টাকার রপ্তানি বন্ধ হইলে "গৃহ-ত্যাগ"ও বন্ধ হইবে।

"বরিশাল সহরে এখনও কয়েকটি ব্যাঙ্কের অবশেষ দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা এখনও টাকা আদায় করে ও তাহাদের হেড অফিসে কলিকাতায় পাঠায়। অথচ এই টাকাগুলি ভিন্ন ডোমিনিয়নে চালান বন্ধ হইলে পাকিস্থানের অধিবাসিবৃন্দের পাওনা টাকাগুলি অনায়াসে আদায় হইয়া পাকিস্থানের আর্থিক অবস্থা ভাল করিতে পারিত। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কথা। যত দূর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে এই ব্যাঙ্কের প্রায় ২০।২৫ লক্ষ টাকা বরিশালেই আছে—লোকের পাওনার পরিমাণ ইহা অপেক্ষা কম। অথচ এই ব্যাঙ্কের পাওনাদার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের গরীব লোক। ইহারা পাকিস্থান গবর্ন্মেণ্টের প্রজা। পাকিস্থান গবর্ন্মেণ্ট কি দেখিবেন না—তাহারা নিরপরাধ নিরক্ষর গরীব (ধনী হইলেই বা কি) প্রজার টাকাগুলি তাহাদের সম্মুখ হইতে অক্লেশে লইয়া কলিকাতায় বসিয়া মহোৎসব না করে? তেমনি কথা ব্যাঙ্ক অব্ ক্যালকাটার। তাহারা যখন ঋণদান সমিতি নেয় তখন এক সর্ত্ত ছিল স্থানীয় পাওনাদারদের প্রাপ্য শোধ না করিয়া তাহারা এখানকার টাকা অন্যত্র লইয়া যাইতে পারিবে না। তবু কেন কলিকাতার কর্তৃপক্ষ এখনও নগদ টাকা এখান হইতে চাহিবে?"

"ইউনিয়ন ক্রেডিট ব্যাঙ্ক—বেশ লক্ষ লক্ষ টাকা মারিয়া কলিকাতা পগার পার হইয়াছে। অথচ তাহাদের সব ব্যবসায়ে লাভ জমকালভাবে চলিতেছে। তাহাদেরও যাহা *asset* (সম্পত্তি) আছে তাহা দ্বারা পাওনাদারদের দেনা শোধ হইতে পারে—যদি কলিকাতা হইতে টাকা শোষণ না করে, ইত্যাদি ইত্যাদি—*People's Bank,*

Speci Bank প্রভৃতির প্রতিও কঠোর ব্যবস্থাবলম্বন করা উচিত।"

শিক্ষার সংস্কার

মাতৃগর্ভ হইতে মানব-শিশু বহির্গত হইয়া আলো-বাতাসের এক নূতন পরিবেশের মধ্যে পড়ে; তাহার শরীর মনের একটা শিক্ষাদীক্ষা আরম্ভ হয়। সহজাত শক্তি ও সংস্কার এই নূতন পরিবেশের মধ্যে কি ভাবে রূপান্তরিত হয়, তাহার কার্য্য-কারণ এখনও পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় নাই। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুণ ও অগুণ নূতন পরিবেশের চাপে পড়িয়া রূপান্তরিত হয় কিনা, এই মূল সমস্যা লইয়া নৃতত্ত্ব-বৈজ্ঞানিক-দের মধ্যে এখনও তর্ক চলিতেছে এবং সে রূপান্তর উত্তর-পুরুষে সংক্রামিত হয় কিনা, তৎসম্বন্ধে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক ও অ-সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক একটা বিরাট বিতণ্ডায় ব্যাপৃত আছেন।

আমাদের দেশের প্রাচীন সমাজ-সংগঠকগণ এই বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নানা ভাবে বিক্ষিপ্ত নানা ইঙ্গিত আমরা পাই; এই সিদ্ধান্তের পিছনে যে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা চলিয়াছিল, তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। সুতরাং আমাদের দেশে নূতন করিয়া এই বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিতে হইবে। আমাদের সমাজ-সংগঠকগণ মানব জীবনকে—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, যতি ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমে ভাগ করিয়া মানবশিক্ষার যে ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রথম আশ্রমটি বর্তমান স্কুল কলেজের শিক্ষার পর্য্যায়ে পড়ে, এবং যদিও প্রাচীন আদর্শ ও উপায় আমরা গ্রহণ বা অনুসরণ করি না, তবুও দেশব্যাপী আলোচনার মধ্যে মাঝে মাঝে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে "স্বদেশী" যুগে আমাদের দেশের চিন্তা-নায়কগণ এই বিষয়ে একবার মনোযোগ দিয়াছিলেন। ব্রিটিশ আমলের শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের মানুষ করিতে পারে নাই, ঐ বিশ্বাসের প্রেরণায় তৎকালীন আলোচনা চলিয়াছিল; স্বাধীন দেশের উপযোগী সে শিক্ষা ছিল না; এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিবার গুণাবলীও সেই শিক্ষার কল্যাণে অর্জিত হয় না। এই অভাব বোধের তাড়নায়ই তখন আমাদের পূর্ব্বজগণ "জাতীয় শিক্ষার" কথা বলিতেন এবং "জাতীয়" স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই যুগের চিন্তা রাজনৈতিক প্রয়োজনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের প্রধানগণই সেই আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছিলেন।

প্রায় সেই সময়েই মিসেস অ্যানি বেশান্ত প্রাচীন হিন্দু সংস্কারের ভিত্তির উপর নূতন যুগের উপযোগী শিক্ষার পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। কাশী নগরীতে কেন্দ্রীয় হিন্দু কলেজ (Central Hindu College) স্থাপিত হয়। তাঁহার কল্পনার পরিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে। তাহার প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে, বোলপুরের কান্তারে প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ "শান্তিনিকেতন" স্থাপন করেন। রাজশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে সেই চেষ্টা সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয় নাই। প্রায় ৮০ বৎসরের ইংরেজী শিক্ষায় দেশের মতিগতি এমন ভাবে বদলাইয়া গিয়াছিল যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় ঐ পুরাতন আদর্শ ও রীতি অবলম্বন করিতে সাহস পাইতেছিলেন না। এই বিষয়ে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্ত্তিত আর্য্য সমাজের একটি "শাখা" মাত্র অধিকতর সাহসের পরিচয় দিয়াছে।

এই ইতিহাসের পাশাপাশি রাজশক্তি সমর্থিত শিক্ষাদীক্ষা অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। সেই শিক্ষার মধ্যে সংস্কারের চেষ্টা যে হয় নাই, তাহা নয়। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে বড়লাট রিপণের আমলে একটি শিক্ষা কমিশন বসে; বড়লাট কার্জ্জনের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার উন্নতিকল্পে আর একটি কমিশন বসে; প্রায় ১২ বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নতিকল্পে অপর একটি কমিশন বসে। এ তিনটি কমিশনের সিদ্ধান্তাবলী ও সংস্কারোদ্দেশ্যে প্রস্তাবাবলী আমাদের দেশে শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। তাই নূতন করিয়া অনুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে, এবং ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। আচার্য্য সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাহার সভাপতি।

প্রায় সত্তর বৎসরের মধ্যে চারিটি শিক্ষা-কমিশনের নিয়োগ হইয়াছে। দেশের চিন্তা-নায়কগণ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সব মতামত অনুযায়ী সংস্কার-চেষ্টা হয় নাই, একথাও বলা যায় না। তবুও তাহা ব্যর্থ হইল কেন বা তাহা আশানুরূপ ফলদান করে নাই কেন, তাহার একটি বা ততোধিক কারণ আছে। সেই কারণ বাহির করিতে না পারিলে, বর্ত্তমান অনুসন্ধানের পর পুরাতন ব্যর্থতা আবার আমাদের বিব্রত ও নিরুৎসাহ করিতে পারে। এই কথা বলিলে যথেষ্ট হইবে না যে, এই তিনটি কমিশন বিদেশী সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল; আর রাধাকৃষ্ণণ-কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন স্বাধীন "ভারতরাষ্ট্র"। ইংরেজ কখনও বলে নাই যে, তাহার আমলের শিক্ষা ভারতবর্ষের লোককে "অমানুষ" করিয়া রাখুক; ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তক মেকলে সাহেবের আশা ছিল—ভারতবাসী ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া বর্ত্তমান জগতের আদর্শানুযায়ী জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হইয়া উঠিবে।

মেকলের আদর্শ ও সেই আদর্শের সাফল্যের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে, এই কথা অস্বীকার না করিয়াও কি

বলা যায় যে, ইংরেজী শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে ? বর্ত্তমান ভারতবর্ষের একজন চিন্তানায়ক আচার্য্য যদুনাথ সরকার ফেব্রুয়ারী মাসের (১৯৪৯ খ্রীঃ) "মডার্ণ রিভিউ" মাসিক পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মনে হয় না যে ভারতরাষ্ট্রের শিক্ষা-সংস্কারে বিগত এক শত পঁচিশ বৎসরের ইতিহাসের শিক্ষা ও পদ্ধতি অবান্তর করিয়া ফেলিতে হইবে, এইরূপ মনোভাব গ্রহণীয় ও মঙ্গলপ্রদ। সুতরাং রামমোহন রায়ের যুগে প্রাচীন ভারতের আদর্শের ও বর্ত্তমান যুগের আদর্শের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে বিতর্ক ও আলোচনা চলিয়াছিল, আজও তাহার অবসর আছে। আমাদের নিজের লোকের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসিয়াছে বলিয়া দেশের জনমত এই বিষয়ে, এই আলোচনা সম্বন্ধে, অনেকটা নিশ্চেষ্ট। ইংরেজের আমলে বিতর্ক ও আলোচনা প্রখর হইয়াছিল ; কারণ, তখন রাষ্ট্রের ক্ষমতা শিক্ষার সাহায্যে আমাদের "অমানুষ" করিতেছে এইরূপ একটা বিশ্বাস আমাদের মনে বদ্ধমূল ছিল।

গান্ধীজীর আমলে এ বিশ্বাস উগ্র হইয়া উঠে। সেই জন্য তিনি ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে অসহযোগের বিধান দিয়া-ছিলেন। তার পর বর্ত্তমান শিক্ষার গোড়ায় গলদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি শিক্ষা সংস্কারের আমূল পরিবর্ত্তনের নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন ; তারই নাম "বুনিয়াদী শিক্ষা।" ইংরেজী শিক্ষা ছিল শহর-ঘেষা ; তাহা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে জাতীয় জীবনের শক্তি-মুখ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। সেই ব্যবধান দূর করিতে হইলে নূতন শিক্ষার প্রয়োজন ; দুই তিন কোটি শিক্ষিত সম্প্রদায় নয়, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ কোটি লোক-সমষ্টির শিক্ষার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে দেশে "মানুষ" সৃষ্টি হইতে পারে না। এই বিশ্বাস বা মনোভাবের নির্দ্দেশে ভারত-রাষ্ট্রের শিক্ষা-সংস্কারের চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হইবে কিনা এই তর্কের মীমাংসা যত দিন হইবে না, তত দিন শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের "মন-মুখ" এক হওয়া সম্ভব নয় ; চিন্তা ও কর্ম্মের মধ্যে ব্যবধান থাকিয়া যাইবে। একাগ্র মন লইয়া শিক্ষা-সংস্কারে হাত দিতে পারিব না।

ভারতরাষ্ট্রে নৈরাশ্য ও তিক্ততা

যে নিরাশা ও তিক্ততা ভারতরাষ্ট্রের গণ-মনে ধূমায়িত হইতেছে, তাহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধে তর্কের আর কোন অবকাশ নাই। ভারতরাষ্ট্রের নেতৃবর্গ তাহা জানিয়া শুনিয়াও এই মেঘ দূর করিতে পারিতেছেন না এবং তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হয় যে তাঁহারাও গতানুগতিকতায় গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। বিদেশী পর্য্যবেক্ষকগণও ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। এই অবস্থায় অনেকেই যে তুষ্ট হইয়াছেন, এই বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। দুই-এক জন বন্ধুভাবে আমাদের সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছেন, ধৈর্য্য না হারাইবার কথা বলিতেছেন।

World-Over Press (ওয়ার্লড ওভার প্রেস) নামক মার্কিনী সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা উইলিয়ম এলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন। সম্প্রতি তিনি World in Brief News Service—এই নামের আর একটি সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছেন। ভারতরাষ্ট্রের "স্বাধীনতা দিবসে"—১৯৪৮ খ্রীঃ ১৫ই আগষ্ট তারিখে তিনি আমাদের দেশের নানা ব্যর্থতার ও নিরাশার প্রতিষেধক রূপে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভের প্রথম দশ বার বৎসরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, এই অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতরাষ্ট্রের কার্য্যকলাপের বিচার। আজিকার পরাক্রমশালী (fantastically mighty U. S. A.) মার্কিনী যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরূপ নিরাশা ও ব্যর্থতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল এবং এই ঘরোয়া সংগ্রামে জয়লাভ করিবার ধৈর্য্য ছিল বলিয়াই আজ যুক্তরাষ্ট্র জ্ঞানে বিজ্ঞানে, অর্থে সামর্থ্যে পৃথিবীর চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছে।

বর্ত্তমান নিরাশা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমরা এতটা স্পর্শকাতর হইয়া উঠিয়াছি বলিয়াই উইলিয়ম এলেন আমাদের নূতন করিয়া শুনাইয়াছেন যে, মানবশিশুর জীবনে যেমন সেইরূপ জাতির জীবনেও প্রথম কয়েক বৎসর নানা রোগ-শোকের, নানা দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া যাইতে হয়। নেতৃবৃন্দের ত্রুটিবিচ্যুতির কঠোর সমালোচনা করিতে হইবে ; কিন্তু নিরাশ হইলে চলিবে না, নিরাশার প্রশ্রয় দিলে চলিবে না। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য প্রকাশ (despair) দণ্ডনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। আমাদেরও আজ সেই কথা স্মরণে আনিতে হইবে। সেই জন্য উইলিয়ম এলেনের এই প্রবন্ধ প্রণিধানযোগ্য। এলেন তাঁহার প্রবন্ধের তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন ম্যাসাচুসেটস শিল্প-বিজ্ঞান পরিষদের (Massachussets Institute of Technology) অধ্যক্ষ ডক্টর ওয়াকারের *The Making of a Nation* (একটি রাষ্ট্রের ও জাতির সংগঠন) নামক পুস্তক হইতে। উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক মহাসমুদ্রের উপ-কূলস্থিত ১৩টি উপনিবেশ জর্জ্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ইংরেজের শাসনপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। ১৭৭৬ খ্রীঃ বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয় ; ১৭৮১ খ্রীঃ এই বিদ্রোহ সার্থক হয়। ১৭৮৭ খ্রীঃ রাষ্ট্রতন্ত্র সঙ্কলিত হইয়া দেশের লোকের সম্মতিলাভের জন্য ভোটে দেওয়া হয়। নয়টি প্রদেশের (State) সম্মতি লাভ করিলে এই রাষ্ট্রতন্ত্র সর্ব্বজনগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে স্থির হয়। কয়টি প্রদেশ যোগদান করিবে, তৎসম্বন্ধে নেতৃবর্গের মনে নানা আশঙ্কা ছিল। দুর্ব্বলতর ও আকারে ক্ষুদ্র প্রদেশগুলি প্রথমে রাষ্ট্রতন্ত্র গ্রহণ করে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রদেশ ভার্জিনিয়া ক্ষুব্ধ হয় এই ব্যবস্থায় যে, উচ্চতর আইন সভায় (Senate) তাহার মর্য্যাদা ও ক্ষমতা ক্ষুদ্রতম প্রদেশের সমান, সকল প্রদেশই দুই জন করিয়া

প্রতিনিধি (Senator) নির্ব্বাচনের অধিকারী হইবে। জর্জ ওয়াশিংটনকে বলিতে শুনা গিয়াছিল : "প্রদেশগুলি (States) যদি এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ না করে, তবে পরবর্ত্তী রাষ্ট্রতন্ত্র রক্তের অক্ষরে লিখিত হইবে।" ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ প্রদেশটি যোগদান করে।

পূর্ব্বের গবর্মেণ্ট যে ঋণ করিয়াছিল তাহা এই যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে ; যুদ্ধের ব্যয় যুক্ত হইয়া একটা বিরাট ঋণের বোঝা এই নূতন রাষ্ট্রের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। এই ঋণ স্বীকার করিয়া গবর্মেণ্ট যে "কোম্পানীর কাগজ" দিয়াছিল তাহার দাম আসল মূল্যের আট ভাগের এক ভাগে নামিয়া যায়। বিদেশের নিকট ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে কোন মতবিরোধ ছিল না ; কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিকবর্গের নিকট ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয় ; ওয়াশিংটনের উত্তরাধিকারী টমাস জেফারসন্ প্রমুখ নেতৃবর্গ আসল মূল্যে এই ঋণ পরিশোধের প্রবল বিরোধী ছিলেন ; প্রতিপক্ষের নেতা ছিলেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন। তাঁহার মতই কয়েক বৎসর পরে গৃহীত হয় এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই কার্য্যের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের (Federal Authority) প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে একটা মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রেও এই নূতন রাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করা সহজ ছিল না ; বিদেশে এই বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল যে, "আত্মশক্তির জোরে নয়, ফ্রান্সের সাহায্যের জোরে যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে"—(The Americans owed their independence more to their ally, France, than to their own streagth)। হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স আমেরিকার রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় টাকা ধার দিয়াছিল ; এই ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে বহুদিন দরকষাকষি লাগিয়াই রহিল। যুক্তরাষ্ট্রের জন্মের অব্যবহিত পর ফরাসী বিপ্লবের আবির্ভাব হয় ; এই বিপ্লবে এই নূতন রাষ্ট্র একেবারে নিরপেক্ষ থাকিতে পারে নাই। তার ফলে, ফরাসী বিপ্লবের বাগ্‌বিতণ্ডার ফলে, প্রায় বিশ বৎসর এই নূতন রাষ্ট্রের মন নানাভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল ; এই নূতন "নেশন" নিজের নানা সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে নাই।

এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া উইলিয়ম এলেন বলিতে চান যে, ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের নৈরাশ্যগ্রস্ত হইবার কোন কারণ নাই। স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তার শক্তি এইরূপ নানা সমস্যার দ্বারাই পরীক্ষিত হয়। নেতৃবর্গের আত্মবিশ্বাস থাকিলে দেশের লোকের অভাব অভিযোগ, অসন্তোষ দূর করা কঠিন নয়। সকল কালে, সকল দেশে এইরূপ সমস্যা নানা আকারে হয়ত দেখা দিয়াছে ; তাহার সমাধান করিয়াই দেশসমূহ আত্মশক্তির পরিচয় লাভ করিয়াছে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে ; স্বয়ংসিদ্ধ হইয়াছে। এই ভরসায়ই সকলে কর্ম্ম করিয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের জন্য কোন নববিধান হইতে পারে না।

আন্তঃপ্রাদেশিক প্রচারসচিব সম্মেলন

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের প্রচারসচিবদের একটি সম্মেলন নয়া দিল্লীতে হইয়া গিয়াছে। ভারত-সরকারের প্রচারসচিব শ্রীযুক্ত দিবাকর সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন এবং সম্মেলন উদ্বোধন করেন পণ্ডিত নেহরু। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। প্রাদেশিক গবর্মেণ্টসমূহ কাজ করুক বা না করুক, নয়া-দিল্লীতে কো-অভিনেশন সম্মেলন বেশ ঘন ঘন হইতেছে এবং তাহার জন্য রাহা খরচও মন্দ হইতেছে না। সম্মেলনে শ্রীদিবাকর বলিয়াছেন, "প্রত্যেক লোকায়ত্ত গবর্মেণ্টেরই তাঁহাদের প্রভু জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং গবর্মেণ্ট তাঁহাদের জন্য কি করিতেছেন তাহা বর্ণনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।" দিবাকর মহাশয় এই কার্য্যটি সরকারী প্রচার বিভাগ মারফত বৈজ্ঞানিক উপায়ে করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে আমাদের মনে হয় যে, সরকারী কর্ম্মচারীরা যদি প্রত্যেকে কর্ত্তব্যপরায়ণ হন, ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিসের বড়কর্তারা পূর্ব্বের ন্যায় যদি যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে আপিসে আসিয়া প্রকাশ্যে বসেন ও সাধারণের বক্তব্য কিছু সময় শুনিয়া অভিযোগের দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে সরকারের উপর জনসাধারণের আস্থা অটুট রাখিবার জন্য প্রচারকার্য্যের প্রয়োজন কম হয়। ইংরেজ আমলেও যত দিন এই নিয়ম প্রচলিত ছিল তত দিন প্রচারবিভাগের ব্যয়বাহুল্য হয় নাই ; বিপ্লবীদের ভয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেবরা যেদিন হইতে প্রকাশ্য আপিস ছাড়িয়া খাসকামরায় প্রবেশ করিলেন সেদিন হইতেই জনসাধারণের সহিত সরকারের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং প্রচারবিভাগের প্রয়োজন বাড়িয়াছে। এখন তো আর সে ভয় নাই। এখন প্রত্যেক জেলায় তিন-চার জন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, তাহার উপর মহকুমা হাকিম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি আছেন। পুলিসের তো ছড়াছড়ি, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, অতিরিক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডেপুটি কমিশনার প্রভৃতিরও অন্ত নাই। ইঁহারা যদি সময় মত আপিসে আসেন এবং জনসাধারণকে অভিযোগ জানাইবার সুযোগ দেন তাহা হইলে বর্ত্তমান সরকার যে লোকায়ত্ত গবর্মেণ্ট, লোকে তাহা বুঝিবার সুযোগ পায়।

কেবলমাত্র প্রচার বিভাগের খরচ বাড়াইয়া যে গবর্মেণ্টের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়ানো যায় না, বাংলাদেশ তাহার প্রমাণ। এখানে লীগ গবর্মেণ্টের আমলে প্রচার বিভাগে ব্যয় অসম্ভব বাড়ানো হইয়াছে, তাহার পর বর্ত্তমান বঙ্গদেশ

এক-তৃতীয়াংশ হওয়ার পর ঐ বিভাগের খরচ দেড় গুণ বাড়িয়াছে, কিন্তু সরকারের প্রতি সাধারণ লোকের মনে যে বিরূপ ধারণা ক্রমশঃ জমিতেছে তাহা তদনুপাতে কি কমিয়াছে, না বাড়িয়াছে? খরচের নমুনা আমরা বাজেট হইতে উদ্ধৃত করিলাম :

সরকারী প্রচার বিভাগের ব্যয়—

	১৯৪৫-৪৬	১৯৪৮-৪৯
গেজেটেড্ অফিসার …	৪৯,৩১০ টাকা	৭০,০০০ টাকা
কেরাণী …	৩৭,৮৫০	৩২,০০০
চাপরাসী …	১,৯৯০	১,৮০০
অস্থায়ী কর্মচারী …	১,৩৩,৫৮৩	২,৩০,০০০
বাড়ীভাড়া ও অন্যান্য ভাতা	৪৬,১৩২	১১,০০০
মাগ্‌গি ভাতা …	৭৩,০৩৬	৮৫,০০০
রেশনের পরিবর্তে নগদ টাকা	নাই	৪,৫০০
ভ্রমণ ভাতা …	নাই	৭২,০০০
কণ্টিঞ্জেন্সি …	২,১৫৭	৮,৪০০
আপিস খরচ ও বিবিধ …	১,৮৫,৫৪০	২,৮৫,০০০
বই ও সাময়িক পত্র …	নাই	৯,০০০
	৫,২৯,৫৯৮	৮,১০,১০০

এটা স্বরাষ্ট্র বিভাগের অন্তর্গত প্রচার বিভাগ। তাহা ছাড়া সিভিল সাপ্লাইয়ের মধ্যে আর একটা প্রচার বিভাগ আছে এবং তাহার খরচও উপেক্ষণীয় নয়। এটির নমুনা নিম্নোক্ত রূপ :

সিভিল সাপ্লাইয়ের পাবলিসিটি প্রোডাকশন আপিস—

	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৮-৪৯
অফিসারদের বেতন …	১৭,৭০০ টাকা	১৩,২০০ টাকা
কেরাণীদের বেতন …	১১,৩০০	১০,৭০০
ভাতা …	৭,৮০০	৭,৬০০
কণ্টিঞ্জেন্সি …	৪,৫৩,৪০০	২,০০,০০০
	৪,৯০,২০০	২,৩১,৫০০

জনসাধারণ এখন রেশন সম্পর্কে অভ্যস্ত হইয়াছে। এখন রেশনের বিজ্ঞাপন মুসাবিদা করিবার জন্য এত বড় বিভাগ বজায় রাখিবার কোন প্রয়োজন আছে কি? "আপনার রেশন কার্ডের মেয়াদ বাড়ান" অথবা "আপনার রেশন কার্ডের মেয়াদ বাড়ানো না হয়ে থাকলে রেশন কার্ডখানা বাতিল হয়ে গেছে"—এই বিজ্ঞাপন হাজার হাজার টাকা ব্যয়ে ষ্টেটসম্যান, অমৃত বাজার, হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই, কারণ ঐ সব কাগজ যাঁহারা পড়েন রেশন কার্ডের মেয়াদ বাড়ানো সম্বন্ধে তাঁহারা সজাগ থাকিবেন ইহাই আশা করা উচিত। এ বিষয়ে একটি সরকারী প্রেসনোট তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। অশিক্ষিত সাধারণ লোকের জন্য রেশনের দোকানে বড় করিয়া বিজ্ঞাপন দিলেই কাজ চলিতে পারে। যে সব রেশন কার্ড হোল্ডারের নজরে এর একটিও পড়িবে না, বুঝিতে হইবে তাঁহাদের রেশন কার্ডের গরজ নাই।

এশিয়ার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘ টালবাহানা করিয়া ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রের উপর ডাচ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণে প্রশ্রয় দিতেছে। আমরা বহুবার বলিয়াছি যে, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য না পাইলে হল্যাণ্ডের প্রভুত্ব দু-দিনের বেশী ইন্দোনেশিয়ায় টিকিতে পারে না। একটা হিসাবে দেখিয়াছি যে, ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৪০০।৫০০ কোটি টাকা; ব্রিটিশের মূলধন প্রায় ১০০ কোটি টাকা, এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকবর্গের মূলধন প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। এই ত্রয়ীর মূলধন রক্ষার জন্য ব্রিটিশ ও মার্কিনী পুঁজিপতিরা ডাচ সাম্রাজ্যবাদকে জিয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাই হইল ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রের উপর আক্রমণের গোড়ার কথা।

১৯৪৫ খ্রীঃ জাপানের পরাজয়ের পর ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর পিছনে পিছনে ডাচ সৈন্যবাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় ঢুকিয়া পড়ে। সেই সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাপানী শাসনকর্তৃপক্ষ সাধারণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ব্রিটিশ ও ডাচ সৈন্যাধ্যক্ষেরাও এই ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছিল। এই স্বীকৃতির বলেই ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্র আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রায় স্বাধীন দেশের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। ডাচ গবর্মেণ্টের অসম্মতি ও আপত্তি সত্ত্বেও সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘের অধীনস্থ নানা প্রতিষ্ঠানে এই সাধারণতন্ত্রের পৃথক স্থান আছে। এই মর্য্যাদা ও স্বীকৃতি মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই।

এই স্বীকৃতির কথা মনে রাখিয়াই ব্রিটিশ ও আমেরিকার সাংবাদিকগণ ডাচ আক্রমণের নিন্দা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তাঁহাদের অনেক মন্তব্য পাঠ করিবার সুযোগ আমরা পাইয়াছি। কিন্তু এই ভর্ৎসনা ও তাঁহাদের গবর্মেণ্টের কার্য্য-কলাপের মধ্যে কোন সঙ্গতি দেখিতে পাইলাম না। "ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটার" নামে যুক্তরাষ্ট্রের একখানি প্রসিদ্ধ ও চিন্তাশীল পত্রিকা আছে। ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপার লইয়া পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু যে সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে পত্রিকাখানি পাশ্চাত্য জগৎকে এই বলিয়া সাবধান করিয়াছে যে, কম্যুনিজমের জুজুর ভয় দেখাইয়া এশিয়ার গণ-তন্ত্র ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ নিজের হাতে নিজের মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করিবে। অদূর অতীতে সে চেষ্টা হইয়াছে এবং ব্যর্থও হইয়াছে।

ওয়াল্টার লিপম্যান একজন বিখ্যাত সাংবাদিক। তাঁহার

একই প্রবন্ধ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সংবাদপত্রসমূহে এক দিনে প্রকাশিত হয়। একটা হিসাবে দেখিয়াছি যে, এই সব সংবাদ-পত্রের পাঠক প্রায় চার-পাঁচ কোটি। তিনিও পাশ্চাত্ত্য জগৎকে সাবধান করিয়াছেন এই বলিয়া যে, জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হইতে পারে; কিন্তু সে একটি কাজ করিয়াছে; সে পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদ ও প্রাধান্যের জারিজুরি ভাঙিয়া দিয়াছে। ঘটনার দ্রুত পরিবর্ত্তনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্র-শক্তিবর্গ আজ প্রায় দুইটি বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্জে বিভক্ত এবং অবস্থার তাড়নায় ইউরোপ খণ্ডের কয়েকটি দেশ আত্মরক্ষার জন্য আপনাদের শক্তি ও সামর্থ্য একত্র করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড পূর্ব্ব-এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী বলিয়া পরিচিত। সোভিয়েট ইউনিয়নের ভয়ে ইহারা একত্রিত হইতেছে। কিন্তু এই বিশ্বাস এশিয়াবাসীর মনে দৃঢ় হইতেছে যে, ইউরোপের এই জাতি-সঙ্ঘ এশিয়ার সম্ভ্রম ও স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য এক-কাট্টা হইতেছে, ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদ রক্ষার জন্য দল বাঁধিতেছে (a syndicate for the preservation of decadent empires)। কেবল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই তাহার কার্য্যকলাপ দ্বারা এই বিশ্বাস নষ্ট করিতে পারে। কিন্তু সে ভরসা কোথায়? যুক্তরাষ্ট্র ডাচ সাম্রাজ্যবাদকে কি সংযত করিতে পারিয়াছে?

স্বাধীন ব্রহ্মের সমস্যা

আমাদের প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশের উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। সাত আট বৎসরের মধ্যে জাপানী অভিযানের কল্যাণে তাহার জীবন ধনেপ্রাণে বিধ্বস্ত হইয়াছে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এক দিনে এক সময়ে ছয় জন নেতা নিহত হইলেন, তাঁহারাই ছিলেন নবব্রহ্মের রচয়িতা, এই সম্পর্কে ইউ আউঙ সানের নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে। তাঁহার হত্যাকারীরা তাঁহার সহকর্ম্মী ছিল জাপানী যুদ্ধের সময়, আউঙ সান সহ ছয় জন মন্ত্রীকে হত্যা করিয়া তাহারা প্রমাণ করিল যে, জাতি-শত্রুর মত নিষ্ঠুর শত্রু আর কেহ নাই।

তারপর ইংরেজের শাসন-ক্ষমতা প্রত্যাহৃত হইয়াছে; যাইবার সময় ইংরেজ ব্রহ্মদেশকে ব্রিটিশ রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার জন্য অনুরোধ করে নাই; করিয়া থাকিলেও ব্রহ্ম-দেশের প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু ও তাঁহার সহকর্ম্মিবৃন্দ এরূপ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদিগণ এই ব্যবস্থা মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহারা ব্রহ্মদেশে অন্তর্বিরোধী নানা দলের শত্রুতায় ইন্ধন যোগাইতেছেন। আউঙ সান, থাকিন নু প্রভৃতি ব্রহ্মদেশের নেতৃবর্গের কল্পনা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। উগ্রপন্থী কম্যুনিষ্ট দল এই চেষ্টার বিরোধী, তাঁহাদের নেতৃত্বে ব্রহ্মদেশের একাংশ থাকিন নু-র গবর্ন্মেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু তাঁহার গবর্ন্মেণ্টের প্রধান শত্রু হইয়াছে কারেণ জাতি। ইহাদের অনেকেই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, সেইজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহারা মনেপ্রাণে ইংরেজের হইয়া লড়িয়াছিল, এই অবসরে সামরিক নানা কৌশল তাহারা আয়ত্ত করে। ইহাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেকটা "পাকিস্থানী" মনোভাবাপন্ন; রক্তে ও ধর্ম্মে ব্রহ্মদেশের জনসমষ্টি হইতে পৃথক বলিয়া ইহারা নিজেদের জন্য পৃথক একটি রাষ্ট্রের দাবী করিতেছে। থাকিন নু-র গবর্ন্মেণ্ট এই দাবী স্বীকার করিয়াছেন। তবুও কারেণ বিদ্রোহীরা অস্ত্র সংবরণ করে নাই। ব্রহ্মদেশের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ একজন কারেণ; এই ব্যবস্থায় মনে হয় যে, থাকিন নু-র গবর্ন্মেণ্ট কোন জাতি-বৈর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না এবং আমাদের ভরসা আছে যে, তিনি এই বিদ্রোহ দমন করিয়া কারেণ-প্রধানগণের সঙ্গে একটা সম্মানজনক মীমাংসা করিতে পারিবেন।

ব্রহ্মদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে চট্টগ্রামের মুসলমানেরা দুই-তিন শত বৎসর হইতে বসবাস করিতেছে। ভারতীয় মুসলমানদের দেখাদেখি তাহারা "পাকিস্থানী" স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা সেই স্বপ্ন সার্থক করিবার জন্য সুযোগ সুবিধার অপেক্ষায় আছে। পূর্ব্ব পাকিস্থানের শাসকসম্প্রদায় এই বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। জানি না, থাকিন নু-র গবর্ন্মেণ্ট এই প্রতি-শ্রুতির উপর ভরসা করিয়া বর্ম্মী "পাকিস্থানী"দের অবহেলা করিতে পারিবেন কিনা।

আর একটা সমস্যা ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবর্গ সম্পর্কে দেখা দিয়াছে। তামিল দেশের চেট্টিসম্প্রদায় জমি বন্ধক রাখিয়া ব্রহ্মদেশের চাষী সম্প্রদায়কে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ধার দিয়াছিল। এই ঋণ চেট্টিসম্প্রদায়ের গলায় কাঁটার মত বিঁধিয়া আছে। গুজরাটি ও অন্যান্য ভারতীয় নাগরিক ব্রহ্ম-দেশের নানা ব্যবসায়ে নেতৃত্ব করিতেছিল, তাহাদের নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ কত জানি না। প্রায় কয়েক সহস্র ভারতীয় নাগরিক ইংরেজ আমলে সরকারী চাকুরী করিতেছিলেন; তাঁহাদের শেষাংশ প্রায় ২,৫০০ লোকের নিকট বর্ম্মী গবর্ন্মেণ্ট নোটিশ দিয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের চাকুরী বাতিল হইয়া যাইবে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, এই ২,৫০০ ভারতবাসী ব্রহ্মদেশের নাগরিক হইতে স্বীকার করিতে পারেন নাই বলিয়াই এই নিষ্ঠুর বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই বিষয়ে কোন মীমাংসা হইতে পারে কিনা তাহার জন্য চেষ্টা করা ভারত গবর্ন্মেণ্টের কর্ত্তব্য। অন্যান্য ভারত-ব্রহ্ম সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া রেঙ্গুনে যাইবার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কারেণ বিদ্রোহ সেই আয়োজন

পিছাইয়া দিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, ব্রহ্মের রাষ্ট্রবিপ্লবে ভারতীয় নাগরিকবর্গকে ক্ষতি স্বীকার করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে হইবে—ব্রহ্মের নাগরিক হইবার ইচ্ছা যখন তাহাদের নাই।

মার্কিনে ভারতীয় পুস্তক ও সংবাদপত্র

মার্কিনে যুক্তরাষ্ট্র আজ পৃথিবীর "গণতন্ত্রের" নেতা। সেইজন্য পৃথিবীর লোকের নিকট আত্ম-পরিচয় দিবার জন্য একটা বিরাট আয়োজন গড়িয়া তোলা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিক কার্য্যকলাপেই কেবল প্রচারিত হয় না; "মার্কিন বার্ত্তা" পাঠ করিয়া দেশের সমগ্র জীবনের, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎসা বিষয়ক নানা তথ্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়। পৃথিবীর অপরাপর দেশ সম্বন্ধেও তাঁহাদের কৌতূহলের অন্ত নাই; এবং তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার আগ্রহ অফুরন্ত। ইহার দৃষ্টান্ত পাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চতম পরিষদের লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে একটি ঘোষণার মধ্যে—ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থানের সকল প্রধান ভাষায় লিখিত পুস্তকই কংগ্রেসের লাইব্রেরিতে স্থান পাইবে। এখন উর্দু এবং হিন্দী ভাষায় রচিত প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বই এই লাইব্রেরিতে আছে। এইগুলি ছাড়াও বাংলা, পাঞ্জাবী, সিন্ধি এবং গুজরাটী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় লেখা বই এখানে রাখা হইবে। এই নূতন পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে, ভারত-"পাকিস্থান" এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দের বন্ধন দৃঢ়তর করা। এইজন্যই এখন কংগ্রেসের লাইব্রেরীতে এই দুইটি দেশ হইতে বহুসংখ্যক সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রাদি আনা হইতেছে। লাইব্রেরীর প্রধান পাঠকক্ষে এইগুলি রাখা হয়, যাহাতে সহজেই ইহারা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবন-যাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জনে এই প্রচেষ্টা আমাদের অনুরূপ কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করুক। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। সুতরাং ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ব্যাপকতর আয়োজন করার সময় আসিয়াছে।

বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি

ডক্টর মোহম্মদ শহীদুল্লাহের সভাপতিত্বে পূর্ব্ব পাকিস্থান সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন সম্প্রতি ঢাকা নগরীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি সাহিত্য-শাখার সভাপতিও ছিলেন। এই শাখায় বক্তৃতা উপলক্ষে তিনি এমন কতকগুলি কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন যাহার জন্য তিনি "আজাদ" প্রভৃতি উগ্র "দ্বি-জাতি"-তত্ত্বে বিশ্বাসীদের নিন্দাভাজন হইয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্ম ও ইসলাম দুইটি পৃথক ধর্ম্ম; নানা আচার-অনুষ্ঠানে এই পার্থক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পার্থক্যের উপর ভিত্তি করিয়া মুসলমান সমাজের বহুজনের মনে এই ভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে যে, হিন্দু এক জাতি (নেশন), মুসলিম আর এক জাতি (নেশন)।

ডক্টর শহীদুল্লাহের বক্তৃতায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙালী মুসলমান সমাজের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই "দ্বি-জাতি"-তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। আমরা "পাকিস্থানের" অন্যান্য প্রদেশের কথা বলিতে পারি না। কিন্তু ডক্টর শহীদুল্লাহের বক্তৃতায় যে ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারি।

> "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোনও আদর্শের কথা নয়; এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই। নৃতাত্ত্বিক গবেষণার অণুবীক্ষণযন্ত্র চোখে ধরে হয়ত আবিষ্কার করতে পারেন, কার শরীরে দু' চার ফোঁটা বেশী বা কম আর্য্য, আরব, পাঠান বা মোগল রক্ত আছে। কিন্তু ঋষি-কবির কথাই ঠিক—
>
> "হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য
> হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
> শক-হুন-দল পাঠান মোগল
> একদেহে হোলো লীন।"

প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে "আজাদ" পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা আকরম্ খাঁ বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, পাঁচ শত বৎসর মুসলিম আধিপত্য বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও বাঙালী হিন্দু মুসলিমের জীবনে ইসলামের ছাপ নিরেট হইয়া বসে নাই; চিন্তায়, কবিতায়, গানে বাঙালী মুসলিম হিন্দুর ঐতিহ্য মানিয়া লইয়াছিল অনেক ক্ষেত্রে। ইহা তাঁহার মতে ইসলামের কলঙ্ক; বাঙালী মুসলিমের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। সেইজন্য মৌলানা সাহেব সেই যুগকে বাঙালী মুসলমানের পক্ষে "অন্ধকারের যুগ" (dark age) বলিয়া নিন্দা করিতে দ্বিধা-বোধ করেন নাই।

এরূপ প্রচারণের ফলেই "পাকিস্থানী" মনোভাবের সৃষ্টি হইতে পারিয়াছিল, এবং আজ বাঙালী মুসলমানকে তাহার মাতৃ-ভাষার গৌরব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আন্দোলন করিতে হয় "নিজ বাসভূমে"।

কিন্তু দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বাঙালী মুসলমান অন্য ভাবের ভাবুক ছিলেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ নোয়াখালির সন্দ্বীপ-নিবাসী আবদুল হাকিমের, "নূরনামার" লেখকের, একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙালী মুসলমান সেই পরিচয় ভুলিতে চায়।

> "যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
> সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি।
> মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
> দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।
> দেশী ভাষা বিদ্যা মনে না জুয়ায়—
> নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায়।"

আচার্য্য যদুনাথ সরকারের জন্মোৎসব

আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের অষ্ট-সপ্ততিতম বর্ষ পরিপূর্ত্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিগত ২৪শে মাঘ তারিখে পরিষদ-ভবনে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যে মানপত্র পাঠ করা হয় তাহার প্রথম ও শেষ পংক্তি কয়েকটিতে আচার্য্য-দেবের জীবনের আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। "পরাধীন ভারতবর্ষের কলঙ্কিত ইতিহাস মন্থন করিয়া···অশেষ দুর্গতি ও নৈরাশ্যের মধ্যে মহিমময় অতীতকে স্মরণ করাইয়া আশা ও উদ্যমে আমাদের জীবন সঞ্জীবিত" করিয়াছিলেন তিনি। ইংরেজ ঐতিহাসিক বর্ণিত আমাদের অনৈক্য ও অপদার্থতার পরিচয় পরীক্ষা করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়াছিল বলিয়া আচার্য্য যদুনাথের "ইতিহাস-অনুশীলন কার্য্যকে" আমরা এরূপভাবে মন-প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাঁহার পূর্ব্বজগণের মধ্যে পশ্চিম-ভারতের মহাদেও গোবিন্দ রাণাডে ও রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকারের নাম করা যায়; বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম স্মরণীয়। তাঁহার অনুপ্রেরণায় ও শিক্ষায় যে "শাখা" বা শিষ্যমণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা আমাদের পূর্ব্ব-ইতিহাসের উপর আলোকপাত করিতে পারিবে, এই ভরসা আমরা করিতে পারি। কুশলী গুরুর কুশলী শিষ্য তাঁহারা।

বাংলাদেশের বাহিরে কর্ম্ম-জীবন কাটাইয়াও আচার্য্য যদুনাথ বঙ্গবাণীর সেবায় অকুণ্ঠ ছিলেন; আজিও বার্দ্ধক্য-কালে "মনের তারুণ্য সতেজ" আছে। সেই সেবার পরিচয় দিবার যোগ্য অধিকারী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ। প্রাণের আবেগে সেই স্বীকৃতি করিয়াছেন পরিষদ,—

> সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে তুমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়াছ, নিজের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রীতির দ্বারা তোমার উত্তরসাধকদের তুমি পথপ্রদর্শক হইয়াছ। তোমার নিরলস কর্ম্মসাধনা আজিও সঙ্কটকালে বার বার পরিষদকে রক্ষা করিতেছে, রমেশচন্দ্র জগদীশ-চন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র হরপ্রসাদ রামেন্দ্রসুন্দর হীরেন্দ্রনাথের ধারা তুমিই বহু ক্লেশে অব্যাহত রাখিয়াছ, তোমাকে আমরা কিছুতেই অবসর দিতে পারিতেছি না, অসহায়ভাবে বার বার তোমাকে আশ্রয় করিতে চাহিতেছি,···"

এই উৎসব উপলক্ষে আচার্য্যদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাপঞ্জী সম্বলিত একখানি পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে আচার্য্যদেবের জ্ঞানসাধকোচিত জীবনের নানা প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়; ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসু ইহার মধ্যে নিজের যাত্রাপথে অনেক অঙ্গুলিনির্দ্দেশ দেখিতে পাইবেন। কত সংবাদপত্রের আনাচে-কানাচে তাহা পড়িয়া আছে, দুই দিন পরে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইত না। এই পুস্তিকাখানিতে তার একটি সংগ্রহ মুদ্রিত হইল; দূর কালের [illegible] করিল।

ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের ত্রিনবতিতম জন্মদিবস

ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের ত্রিনবতিতম জন্মদিবস উদ্‌যাপনের আয়োজন হইতেছে ইহা সুখের বিষয়। বাংলার যে সব সন্তান বুকের রক্ত চিরিয়া স্বদেশী মন্ত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং আজীবন স্ব স্ব ক্ষেত্রে পরম নিষ্ঠার সহিত স্বদেশের সেবায় আপনার সকল শক্তি নিয়োজিত রাখিয়াছেন, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস তাঁহাদেরই একজন। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে :

শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের বয়ঃক্রম বর্ত্তমানে ৯৩ (?)। স্বল্পায়ু বাঙালী সমাজে এরূপ দীর্ঘজীবন লাভই পরম গৌরব। তদুপরি বিশেষ স্মরণযোগ্য এই যে, তাঁহার এই দীর্ঘজীবন দেশ ও দশের কল্যাণে পূর্ব্বাপর নিয়োজিত। এই আত্মভোলা, বর্ষীয়ান লোকসেবীকে সম্মান প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে তাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষ রূপায়িত আদর্শে আস্থা জ্ঞাপন মাত্র। অধকার দিনে ইহার উপযোগিতা, এবং প্রয়োজন অবিসংবাদিত, তাই শ্রীহট্ট সম্মিলনী যথোচিত উপচারে তাঁহার ত্রিনবতিতম (?) জন্মবর্ষ উদ্‌যাপনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমরা সানন্দে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। ডাঃ সুন্দরীমোহনের গুণমুগ্ধ লোকের অভাব নাই। তাঁহাদের সকলকেই এই অনুষ্ঠানে সর্ব্বাঙ্গীণ সাহায্য দানের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। যোগাযোগ স্থাপনের কেন্দ্র : বঙ্গবাসী কলেজ-সংলগ্ন আচার্য্য গিরীশচন্দ্র ছাত্রাবাস, ৩৫ স্কট লেন, কলিকাতা—৯। কার্য্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা শ্রীমতী মাধুরী ভট্টাচার্য্য।

তেজ বাহাদুর সাপ্রু

ভারতবর্ষের আর একজন মনস্বী-প্রধান দেহত্যাগ করিলেন। প্রায় ৮৩ বৎসর বয়সে এলাহাবাদের তেজ বাহাদুর সাপ্রুর তিরোধানে ভারতরাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। সভ্যজগৎময় আইনজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। দেশের রাজনীতিক জীবনে আপোষরফা করিয়া তিনি ছিলেন রাজনীতিক অধিকার আদায় করিবার পন্থায় বিশ্বাসী। যে উগ্র জাতীয়তা-বাদ ১৯০৫ সনে বাংলাদেশের হৃদয় হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল তিনি তাহার বিরোধী ছিলেন। সেইজন্য তিনি গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত অহিংস সংগ্রামেও যোগদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখনই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদ রণ-ক্লান্ত হইয়াছে, তখনই তেজ বাহাদুর সাপ্রু শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। গান্ধী-আরউইন সন্ধি তাঁহার এইরূপ চেষ্টার সাফল্যের প্রমাণ।

যুক্তপ্রদেশের সামাজিক জীবনে তেজ বাহাদুর সাপ্রুর প্রভাব শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। এই সমাজের এক স্তরে মুসলীম সংস্কৃতির অনুশীলন হইত এবং এই প্রচেষ্টার ফলে হিন্দু-মুসলীম সংস্কৃতির সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, এই প্রদেশের মুসলমান প্রধানগণই "দ্বি-জাতি" তত্ত্বের বেদীমূলে নিজের স্বার্থ ও দেশের স্বার্থ বলি দিয়াছেন। তেজ বাহাদুর এই সমন্বয়-প্রচেষ্টার প্রধান তত্ত্ব-ধারকদের মধ্যে একজন ছিলেন।

সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে পূর্ব প্রবন্ধে সিন্ধুধর্মের কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই। উহাতে মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা ও বেলুচীস্থানের তাম্রযুগের স্তূপ হইতে প্রাপ্ত পোড়া মাটির স্ত্রীমূর্তিগুলি স্ত্রীদেবতা অথবা দেবীর বিভিন্ন রূপের প্রতিমা, স্যর জন মার্শালের এই মতবাদের বিস্তারিত সমালোচনা মাত্র করা হইয়াছে। স্যর জন মার্শালের মতবাদ সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার পর প্রশ্ন উঠে, এইরূপ দুর্বল ভিত্তির উপর যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত তাহা কি কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

স্যর জন মার্শালের প্রচারিত এই মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহার দুইটি দিক আছে। সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানে প্রাপ্ত স্ত্রী মূর্তিগুলি যে স্ত্রীদেবতার মূর্তি, ইহা একটি দিক। এই মূর্তিগুলিকে স্ত্রী দেবতার মূর্তি বলিয়া স্বীকার করিলে প্রমাণ হইল যে সিন্ধুজাতি স্ত্রীদেবতার উপাসক ছিল। তারপরে বলা হইয়াছে, এই স্ত্রীমূর্তিগুলি মহাদেবী বা ধরিত্রীদেবীর বিভিন্ন রূপের প্রতিমা। মার্শালের কথায়—"representatives of the local forms of the Great Mother or Great Mother-goddess." এখানে local forms কথাটি মার্শাল হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অবতারবাদ স্মরণ করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন মনে হয়।

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্॥
(চণ্ডী ১২।৩৩)

দেবী নিত্যা হইয়াও পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হইয়া জগতের পরিপালন করিয়া থাকেন। দেবী পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হন বিভিন্নরূপে, বিন্ধ্যবাসিনী, শাকম্ভরী, শতাক্ষী, দুর্গা, ভীমা দেবী, ভ্রামরী তাঁহার বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন নামে, রূপে ও উদ্দেশ্যে দেবীর পূজা হিন্দুদিগের মধ্যে অতি পরিচিত ব্যাপার। দুর্গা কখন জগদ্ধাত্রী, কখন অন্নপূর্ণা, কখন মহিষমর্দ্দিনীরূপে পূজিতা। ইহা ছাড়াও দেখা যায় বিভিন্ন অঞ্চলে পূজিতা স্ত্রীদেবতাকে দেবীর অংশ বা একটি রূপ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কনক দুর্গা, জয় দুর্গা, বন দুর্গা, আর্য দুর্গা, শান্তা দুর্গা, পাদ দুর্গা, নব দুর্গা, বিজয়া দুর্গা, গুপ্ত দুর্গা, আল দুর্গা, কাব্য দুর্গা,—ইহাদের প্রকৃত কুলশীল অনেকাংশে অজ্ঞাত হইলেও সকলেই দুর্গার অংশ রূপে পূজিতা। ইহারাই local forms of the Devi। সে যাহা হউক, যখন সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রীমূর্তিগুলিকে দেবীর এই প্রকার অংশ রূপে পূজিতা দেবী বা মাতাগণের প্রতিমা বলা হইতেছে তখন স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে যে সিন্ধু ধর্মে এই সকল দেবী যাঁহার local forms সেইরূপ একজন মহাদেবীও পূজিতা হইতেন। মার্শালের মতবাদের ইহাই দ্বিতীয় দিক।

সমালোচনা করিবার সময় মার্শালের মতবাদের এই দুইটি দিকের পৃথক ভাবে সমালোচনা করা প্রয়োজন। পূর্বের প্রবন্ধে প্রধানতঃ প্রথমদিকটির সমালোচনা করা হইয়াছে। এই সমালোচনা প্রসঙ্গে দুইটি যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে। একটি যুক্তি এই যে, এই সকল স্ত্রীমূর্তির মধ্যে এমন কোন চিহ্ন নাই যাহা ধর্মার্থ বা দেবত্ব বোধক। সিন্ধু জাতির ধর্মের পরিচয় দেয় এরূপ বহু সীল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল সীলে খোদিত মূর্তির ও ধর্ম অনুষ্ঠানের (cult practices, rites) দৃশ্যের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ উঠে না। কয়েকটি সীলে স্ত্রীমূর্তিও দেখা যায়। ইহার মধ্যে প্রসিদ্ধ হরাপ্পা সীলিঙের উল্লেখ করা হইয়াছে। বৃক্ষ উপাসনার পরিচয় দেয় এরূপ একটি সীলিঙে স্ত্রী-মূর্তি দেখা যায়। এই সকল স্ত্রীমূর্তির সহিত উল্লিখিত স্ত্রী-মূর্তিগুলির বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই। চক্র, স্বস্তিকা, ত্রিশূল, শৃঙ্গ, নতজানু হইয়া ও হাত উঠাইয়া ভক্তি নিবেদন করিবার ভঙ্গী, পশুবাহন—সিন্ধু ধর্মের ধর্মার্থবোধক এই এই সকল চিহ্ন পরিচিত। উল্লিখিত মূর্তিগুলিতে এমন কোন চিহ্ন বা বিশেষত্ব নাই যাহা হইতে এগুলিকে দেবী-মূর্তি বলা সমীচীন মনে হইতে পারে। পণ্ডিতগণ কর্তৃক পণ্ডিতোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলা হইলেও কতকগুলি মূর্তির কদাকার, বিকৃত নাসিকা ও পক্ষীচঞ্চুর মত মুখ এই সকল মূর্তির দেবত্বের প্রমাণ, এই কথা শুনিয়া লোকে কৌতুক বোধ করিবে।

সমালোচনায় যে দ্বিতীয় যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা parallel finds-এর যুক্তি। আলোচনা প্রসঙ্গে মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মিশর, ঈজিয়ান অঞ্চল ও আনাতোলিয়ায় প্রাচীনযুগে পূজিত বিভিন্ন দেবীকে শিল্পে যে রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সিংহবাহিনী, আয়ুধধারিণী রণদেবী, শস্যগুচ্ছ হস্তে শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে অথবা vulture hood, শৃঙ্গ, মশাল, পদ্ম, সর্প ইত্যাদি ধর্মার্থবোধক পরিচিত চিহ্নের

দ্বারা যাহাদের দেবীত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে সেই সকল মূর্তির সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রী মূর্তিগুলির কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। মার্শাল যখন parallel finds-এর যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন তখন এই সাদৃশ্য বাস্তবিক কতটা দেখা যায় পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই এইরূপ অনুমান না করিয়াও বলা যায় যে উপরে উল্লিখিত দেশগুলির যে সকল দেবীমূর্তির সঙ্গে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না সেই সকল-মূর্তির সঙ্গে সাদৃশ্যের প্রমাণে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের মূর্তিগুলিকে দেবীমূর্তি বলিয়া বর্ণনা করিবার সময় মার্শাল পূর্বগঠিত মত বা সংস্কারের দ্বারা চালিত হইয়াছিলেন। এই পূর্বগঠিত মত কি পরে বলা হইতেছে।

মার্শালের মতবাদের দ্বিতীয় দিকটি সম্বন্ধে পূর্বের প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় নাই। এখানে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে।

সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রীমূর্তিগুলি দেবীমূর্তি বলিয়া স্বীকার না করিলে এই দ্বিতীয় দিকটির অর্থাৎ এই স্ত্রীমূর্তিগুলি মহাদেবীর বিভিন্ন রূপের প্রতিমা, এ কথা উঠে না। কিন্তু এগুলিকে দেবীমূর্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও অন্যত্র মহাদেবীর বা ধরিত্রীদেবীর উপাসনা যে প্রকার documentary evidence বা প্রাচীন লেখনের প্রমাণ এবং আনুষঙ্গিক প্রমাণ হিসাবে নানাবিধ পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে সিন্ধু উপত্যকা বা বেলুচীস্থানে এই দুইটি প্রমাণের কোনটির দ্বারা মহাদেবীর উপাসনার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় নাই। এ অবস্থায় যে সকল স্ত্রীমূর্তি দেবীমূর্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না সেই সকল স্ত্রীমূর্তির প্রমাণে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানে মহাদেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল—এই মত গ্রহণ করা বিপজ্জনক এবং এইরূপ মত প্রচার করা ততোধিক বিপজ্জনক। স্যর জন মার্শালের মত সাবধানী ও সত্যানুসন্ধিৎসু পণ্ডিত যে সকলপ্রকার সাক্ষাৎ ও আনুষঙ্গিক প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও এইরূপ মতবাদ প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই ইহার মূলে রহিয়াছে পূর্বগঠিত মতবাদের প্রভাব। এই পূর্বগঠিত মতবাদের প্রভাবে তাঁহার প্রচারিত মতবাদের অসঙ্গতি ও দৌর্বল্য মার্শালের নজর এড়াইয়া গিয়াছে।

এই পূর্বগঠিত মতবাদ কি দেখা যাউক।

প্রাচীন যুগে মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিশর, ঈজিয়ান অঞ্চল, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে স্ত্রীদেবতার উপাসনার বহুল প্রচার ছিল। শুধু যে নানা প্রকারের ও প্রমাণের সাহায্যে এই তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা নহে, নানা দেশীয় পণ্ডিতগণের দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার ফলে এই উপাসনা সকল অঙ্গ সম্বন্ধে যথাসম্ভব বিস্তারিত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হইয়াছে। তারপর বিভিন্ন স্ত্রীদেবতা যাঁহার অংশরূপে প্রকাশ এইরূপ একজন প্রধানা দেবী বা মহাদেবীর উপাসনা সম্বন্ধেও বিস্তারিত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হইয়াছে। এখন মেসোপটেমিয়া ও ইরাণ হইতে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল বহু স্ত্রীদেবতা ও একজন প্রধানা দেবীর যে উপাসনা অনুমান খ্রীঃ পূঃ ২য় সহস্রক হইতে প্রচলিত ছিল দেখা যায় তাহা যে মেসোপটেমিয়া ও ইরাণের নিকটবর্তী বেলুচীস্থান ও সিন্ধু উপত্যকায় প্রসারিত হইয়াছিল এরূপ কল্পনা করিতে কোন বাধা দেখা যায় না, বরং মনে হয় ইহা খুব সম্ভব ও স্বাভাবিক। সামান্য কোন বাধা থাকিলেও মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধু উপত্যকার সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগের যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার পর এই বাধা টিকিতে পারে না। সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনসমূহ আবিষ্কার হইবার মুহূর্ত হইতে পশ্চিম এশিয়ায় এই সভ্যতার উৎপত্তির মূল অনুসন্ধানের প্রয়াসের সূত্রপাত হইয়াছিল। স্ত্রীমূর্তিগুলি আবিষ্কার হইবার সময় হইতেই এই মত গঠিত হইয়া গিয়াছিল যে এগুলি পশ্চিম এশিয়ায় প্রাচীনযুগে পূজিত দেবীমূর্তির সিন্ধু-সংস্করণ মাত্র। ইহার পরে যখন দেখা যায় বেলুচীস্থানের একশ্রেণীর কদাকার স্ত্রীমূর্তিকে proto-type of Kali বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তখন আর বিস্ময়ের অবকাশ থাকে না। সিন্ধু ধর্মের নানা অঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যাখ্যার যাহাতে সমর্থন পাওয়া যায় বিশাল হিন্দু পুরাণ সাহিত্য হইতে সেই প্রকারের টুকিটাকি উদ্ধার করিতে পণ্ডিতগণ বিস্ময়কর নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সিন্ধু উপত্যকার একটি সীলে (No. 279) দেখা যায় একটি মহিষের নাকের উপর পা উঠাইয়া একটি মনুষ্য মূর্তি এক হাতে উহার একটি শৃঙ্গ ধরিয়াছে এবং অপর হাতে একটি বর্শার (a spear with a barbed point) দ্বারা মহিষের পৃষ্ঠে আঘাত করিতে উদ্যত। মহিষ, বিশেষ গঠনের বর্শা ও মনুষ্য মূর্তির সমাবেশ। একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এই দৃশ্যের ব্যাখ্যা করিলেন শিব ও অন্যান্য দেবতা মিলিয়া মহিষাসুরকে আক্রমণ করিতেছেন। এই ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়া অপর একজন পণ্ডিত স্কন্দপুরাণ হইতে একটি কাহিনী উদ্ধার করিলেন শিবের অনুচরগণ ও দেবতারা মহিষাসুরকে হত্যা করিতেছেন। ইহা যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়াতে চণ্ডী হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে দেবী মহাসুরকে পাদপীড়ন করিয়া শূল দ্বারা তাহাকে তাড়না করিলেন। তং মহাসুরং পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ। কোথায় খ্রীষ্ট জন্মের

তিন হাজার বৎসর পূর্বের সিন্ধু উপত্যকার সীলে মহিষ শিকারের দৃশ্য আর কোথায় চণ্ডী কর্তৃক মহিষাসুর বধের পৌরাণিক কাহিনী!

মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিশর, ঈজিয়ান অঞ্চল, এশিয়া মাইনরে দেখা যায় একজন প্রধানা দেবী পূজিতা হইতেন। বিভিন্ন দেশে পূজিত এই সকল প্রধানা দেবীর কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। ডি, জি, হগার্থের রচনা হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া মার্শাল এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল বুঝাইতে চাহিয়াছেন:

"In Punic Africa she is Tanit and her son; in Egypt Isis with Horus; in Phoenicia Astoreth with Tammuz (Adonis); in Asia Minor Kybele with Attis (Saberuz); in Greece Rhea with Young Zeus. Everywhere she is unwed, but made the mother, first of her companion by immaculate conception, and then of the gods and all life by the embrace of her son. In memory of these original facts her cult . . is marked by various practices and observance symbolic of the negation of true marriage and obliterations of sex. A part of her male votaries were castrated and her female votaries must ignore their married state, when in personal service, and after practise ceremonial promiscuity."

উপরের তালিকার সঙ্গে ইরাণের আনাহিতা ও মিথ্, মেসোপটেমিয়ার ইন্নিনী-ইস্তার ও তাম্মুজ, কাপাডোসিয়ার আরিন্না'র দেবী ও মাহ্, এবং সিরিয়ার আতরগাতিস ও তাঁহাদের সঙ্গী কিশোর দেব যোগ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া আরও দেখা যায়, বিশেষ ভাবে সুমেরো-বাবিলোনীয় ধর্মে, প্রধানা দেবী, যিনি দেবগণের মাতা ও সকল বস্তুর মাতা (Mother of the gods, Mother of all things) তিনি আবার অংশরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। কখন তিনি শস্যের অধিষ্ঠাত্রী, কখন নদী বা উৎসের দেবী, কখন যুদ্ধের দেবী, কখন প্রসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কখন আরোগ্যের দেবী।

সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রীমূর্তিগুলিকে দেবী মূর্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার পরে বিনা দ্বিধায় বলা হইয়াছে এই মূর্তিগুলি represent the Great Mother or Nature Goddess. এই মহাদেবীর উপাসনার উৎপত্তি হইয়াছিল মেসোপটেমিয়ায় বা আনাতোলিয়ায়। যে সকল তথ্যের সাহায্যে পশ্চিম এশিয়ায় এই উপাসনার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে উপরে এই উপাসনার যে সকল বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইল, সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানে সেই সকল তথ্যের সম্পূর্ণ অভাব, সেই সকল বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক কোন লুপ্ত নিদর্শনের উদ্ধার হয় নাই; কিন্তু এই সহজ, স্পষ্ট সত্য পণ্ডিতগণকে সংযত করিতে পারে নাই।

সুতরাং সিন্ধু ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, এই ব্যাখ্যা পূর্বগঠিত মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত. এই ব্যাখ্যা সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত ও উপযুক্তরূপে পরীক্ষিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সিন্ধু লেখনের পাঠোদ্ধারের ফলে নূতন লিখিত প্রমাণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রীমূর্তিগুলি যে দেবী মূর্তি এবং মহাদেবীর বিভিন্ন রূপের প্রতিমা—এই মতবাদ অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

এ পর্যন্ত যে সকল স্ত্রীমূর্তির সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত আর কোন স্ত্রীমূর্তি যাহা দেবীমূর্তি বলিয়া মনে হইতে পারে, সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গিয়াছে কিনা দেখা প্রয়োজন।

সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের পোড়ামাটির স্ত্রীমূর্তিগুলি বাদ দিলে মাত্র কয়েকটি সীলিঙে স্ত্রীমূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পুরুষ-মূর্তির তুলনায় স্ত্রীমূর্তির সংখ্যা খুব অল্পই বলিতে হয়। সীলিঙে যে স্ত্রীমূর্তিগুলি দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি যে দেবীমূর্তি বলিয়া মনে করা হইত তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। এখানে দুইটি সীলিঙের উল্লেখ করা হইতেছে। এই দুইটি সীলিঙের নারীমূর্তি বৌদ্ধ আমলের রিলিজিয়াস আর্ট স্মরণ করাইয়া দেয়। এই দুইটি সীলিং হইতে যতটা জানিতে পারা যায় তাহা হইতে মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় স্ত্রীদেবতার উপাসনার বহুল প্রচার ছিল একথা বলা সম্ভব হয় না।

প্রথমে হরাপ্পার একটি প্রসিদ্ধ সীলিঙের (M.I.C. P LXII 12) উল্লেখ করা হইতেছে।

হরাপ্পা সীলিঙের প্রসঙ্গে মার্শাল বলিতেছেন,—

"The cult of the Mother Earth is evidenced by a remarkable sealing from Harappa on which a nude female figure is depicted upside down with legs apart and a plant issuing from her womb."

মার্শাল হরাপ্পা সীলিঙের স্ত্রীমূর্তিকে ধরিত্রীদেবীর প্রতিমূর্তি বলিতেছেন এবং এই প্রকারের মূর্তির সাদৃশ্য পাইয়াছেন পশ্চিম এশিয়ায় নহে, ভারতবর্ষের গুপ্ত আমলের একটি টেরাকোটা রিলিফের সহিত (A.S.R. 1911-12 PL XIII, 40)। কিন্তু এই রিলিফের স্ত্রীমূর্তির অবস্থান ভিন্ন এবং মূর্তির স্কন্ধদেশ হইতে একটি পদ্ম বাহির হইয়াছে।

সীলিঙের অপর দিকে একটি পুরুষ ও স্ত্রীমূর্তি। পুরুষ মূর্তিটি দাঁড়াইয়া আছে, ডান হাতে কাস্তের মত একটি অস্ত্র। স্ত্রীমূর্তিটি উপবিষ্ট, প্রার্থনার ভঙ্গীতে তাহার দুই

হাত উপরে তুলিয়া আছে। মার্শালের ব্যাখ্যা এই যে পুরুষটি স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করিতে উদ্যত :

"And it is reasonable to suppose that the scene is intended to portray a human sacrifice connected with the earth-goddess depicted on the other side."

অর্থাৎ ধরিত্রীদেবীর তৃপ্তির জন্য নরবলি দিবার প্রথার পরিচয় এই দৃশ্যে পাওয়া যাইতেছে। সীলিঙের যে পৃষ্ঠে ধরিত্রীদেবীর মূর্তি আছে সেই পৃষ্ঠের বাম দিকে দেখা যায় দুইটি ব্যাঘ্র পরস্পরের দিকে চাহিয়া আছে। মার্শালের ব্যাখ্যা মতে এই ব্যাঘ্র দুইটি দেবীর animal ministrants, বাহন নহে, পুরোহিত বা পাণ্ডা।

ইহা সৌভাগ্যের বিষয় যে, হরাপ্পা সীলিঙের চিত্র হইতে শিল্পীর বক্তব্য অর্থাৎ কাহিনীটি বুঝিতে পারা যায়। এই হিসাবে সীলিঙের সাক্ষ্য মূল্যবান ও বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ। খোদিত দৃশ্য যে ধর্মার্থবোধক তাহাতে সন্দেহ নাই। যে স্ত্রীমূর্তির উদর হইতে বৃক্ষ নির্গত হইতেছে তাহা যে বৃক্ষ বা উদ্ভিদের প্রসবিনী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে (Vegetation goddess) কল্পিত তাহা সহজে অনুমান করা যায়। এই দেবীর অনুচর বা বাহন রূপে দুইটি ব্যাঘ্রও দেখা যায়। সীলিঙের অপর পৃষ্ঠের দৃশ্যটিকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি কামনায় নরবলির অনুষ্ঠানের দৃশ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি হয় না। কারণ পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য নরবলির প্রথা অতি প্রাচীন ও পরিচিত প্রথা। সিন্ধুধর্মে উদ্ভিদ প্রসবিত্রী ধরিত্রী দেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল—এই সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে একটি মাত্র বাধা দেখা যায়। সে বাধা এই যে, মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা ও বেলুচিস্থানে যে শত শত তাম্রযুগের নিদর্শন আবিষ্কার হইয়াছে তাহার মধ্যে হরাপ্পা সীলঙের অনুরূপ সীলিং আর একটিও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। ফলে এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে এই সীলিংটি বিদেশ হইতে আনীত কিনা।

কিশ এবং মধ্য ও উত্তর সুমেরের লাগাস হইতে আক্ষক (Akshak) পর্যন্ত অঞ্চলে প্রচলিত ধরিত্রী মাতার উপাসনা ও উহার বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় এবং ধরিত্রী মাতার যে সকল প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত হরাপ্পা সীলিঙের তুলনা করিলে দুইটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, নিপ্পুরে ধরিত্রীমাতার উপাসনা যে উন্নত স্তরে উঠিয়াছিল সেই স্তরে উঠিবার পূর্বে বিভিন্ন রূপে ধরিত্রী দেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। গেষ্টুন ছিল দ্রাক্ষার অধিষ্ঠাত্রী। নিন্দুরা শস্যের অধিষ্ঠাত্রী। উম্মা পক্ব শস্যের অধিষ্ঠাত্রী, বাউগুলা শস্যের ও প্রসবের অধিষ্ঠাত্রী। ধরিত্রী দেবীকে এই বিভিন্ন রূপে ও মূর্তিতে উপাসনাকে departmentalised worship of the Earth-Mother বলা যায়। ধরিত্রী মাতার এই সকল বিভিন্ন রূপ যাঁহার মধ্যে মিলিত হইয়াছে নিপ্পুরে সেই ধরিত্রী দেবীর উপাসনা হইত। এই হিসাবে হরাপ্পার সীলিঙে যে ধরিত্রী দেবী দেখা যায় তাহাকে departmental-goddess of vegetation বলা যায়। সকলের পূজনীয়া মাতা মহী, স্থাবর জঙ্গম সকল প্রজার মাতা পৃথিবী, ভুবনের রাজ্ঞী পৃথিবী (ঋগ্বেদ)—ধরিত্রী মাতার এই সর্বব্যাপক রূপের কল্পনার আভাস এই উদ্ভিদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কল্পনার মধ্যে নাই। দ্বিতীয় লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সুসা ও মেসোপটেমিয়ার ধরিত্রী দেবীর বিভিন্ন রূপের সঙ্গে সর্পের উপস্থিতি দেখা যায়। সর্পের সঙ্গে জীবনীশক্তির বা উৎপাদিকা শক্তির সম্পর্ক বহু ধর্মে দেখা যায়। সিন্ধু উপত্যকার নিদর্শনসমূহের মধ্যে কয়েকটি সীলে সর্পের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিন্তু উদ্ভিদের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর উপাসনার সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক নাই।

সে যাহা হউক, হরাপ্পা সীলিঙে উদ্ভিদের উৎপাদিকা শক্তিরূপে ধরিত্রীর যে রূপ দেখা যায় তাহার সঙ্গে মেসোপ-টেমিয়ার ধরিত্রী দেবীর বিভিন্ন রূপের কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। সুতরাং হরাপ্পা সীলিং বৈদেশিক আমদানী না হওয়াই সম্ভব।

এখন মোহেঞ্জোদারোর একটি সীলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সীলে (M.I.C. Vol 1, pte. XII—18) দেখা যায় একটি দীর্ঘকেশা নগ্ন স্ত্রীমূর্তি একটি বৃক্ষের দুইটি শাখার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। বৃক্ষটির পাতা দেখিয়া উহাকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলিয়া মনে হয়। মূর্তির মাথার দুই পার্শ্ব হইতে দুইটি শৃঙ্গ উঠিয়াছে, শৃঙ্গের মধ্যে পাতাসমেত ছোট একটি ডাল। এই স্ত্রীমূর্তির সম্মুখে একটি মনুষ্য মূর্তি ভক্তি নিবেদন করিবার ভঙ্গীতে (half-kneeling) অবস্থিত, সম্ভবতঃ উপাসক। তাহার মাথায় লম্বা চুল, দুইটি শৃঙ্গ ও শৃঙ্গের মধ্যে পাতাসমেত ছোট ডাল। তাহার পশ্চাতে একটি মানুষের মুখযুক্ত ছাগল দণ্ডায়মান। ইহার নীচে এক সারিতে সাতটি পুরুষ মূর্তি, পরনে হাঁটু অবধি ঝুলের ঘাগরা (short kilts), লম্বা বিনুনী (long pigtails) মাথার চুলে পাতা বা পালক। অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে একটি চতুষ্কোণ পাত্র (square partitioned receptacle)। নতজানু ভক্তের সম্মুখে অবস্থিত দীর্ঘকেশ, নগ্ন স্ত্রীমূর্তি যে উপাস্য দেবীমূর্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। মনুষ্যমুখ ছাগলকে মার্শাল protecting local divinity of a minor

type বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নীচের সাতটি পুরুষ মূর্তিকে ভক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

মোহেঞ্জোদারোর এই সীলটিকে সিন্ধুধর্মে বৃক্ষ উপাসনার একটি দৃষ্টান্ত বলা হইয়াছে। কতকগুলি সীলে বৃক্ষ, তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় উপাস্য। এই সীলটিতে tree spirit বা বৃক্ষসত্ত্বা স্ত্রীরূপে কল্পিত ও রূপায়িত হইয়াছে। Tree spirit পুরুষরূপে কল্পিত হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার কয়েকটি সীলে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং বৃক্ষসত্ত্বার স্ত্রীরূপে কল্পিত হইবার একটি দৃষ্টান্তের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা অনাবশ্যক।

মোহেঞ্জোদারোর এই সীলে খোদিত স্ত্রী-দেবতার মূর্তি ও অন্যান্য মূর্তি সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় ভারুত ও সাঁচীর কতকগুলি দৃশ্যের সঙ্গে এই সীলে খোদিত দৃশ্যের সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য এত নিকট যে চমকিত হইতে হয়। শুধু বৃক্ষশাখার অন্তরালে অবস্থিত স্ত্রীমূর্তি নহে, খাট ঘাগরা ও লম্বা বিনুনীসমেত পুরুষ মূর্তি ভারুত, সাঁচী ও অমরাবতীতে পাওয়া যায়। মার্শাল এই সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সিন্ধু উপত্যকার বৃক্ষপূজার নিদর্শন এবং পরবর্তী কালের (ভারুত ও সাঁচীর) নিদর্শনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পরবর্তীকালের নিদর্শনগুলি ট্রি-স্পিরিট যক্ষিনী বা যোগিনী রূপে কল্পিত আর সিন্ধু উপত্যকার নিদর্শনে দেবীরূপে কল্পিত। ইহার পর মার্শাল মত প্রকাশ করিয়াছেন :

"Tree-worship was essentially a characteristic of the pre-Aryan, not of the Aryan population."

এই ধরণের মত প্রকাশ করিবার সার্থকতা বা প্রাসঙ্গিকতা কি, বুঝা কঠিন। সিন্ধুধর্মে বৃক্ষ উপাসনার নিদর্শনগুলিতে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ এক জাতীয় বৃক্ষ প্রাধান্য পাইয়াছে এবং এ বৃক্ষ অশ্বত্থ। বৃক্ষ উপাসনার কেন্দ্ররূপে এই এক জাতীয় বৃক্ষ কেন সিন্ধুযুগে, বৈদিকযুগে, বৌদ্ধযুগে ও পৌরাণিক যুগে প্রাধান্য লাভ করিল (লেখকের *A Pre-historic Tree Cult*—Indian Historical Quarterly, Vol. XIX, 1943 দ্রষ্টব্য) এবং ইহার কি তাৎপর্য হইতে পারে তাহা অনুসন্ধান না করিয়া বৃক্ষ উপাসনার উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা এখানে পণ্ডশ্রম মাত্র এবং নিরর্থক। তার পর বৌদ্ধ শিল্পের সঙ্গে সাদৃশ্যের তাৎপর্য মার্শাল একপ্রকার উপেক্ষা করিয়াছেন, যদিও ইহা উপেক্ষা করিবার মত গুরুত্বহীন বিষয় নহে।

সে যাহা হউক, সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনার পরিচায়ক বিশেষ আর কোন নিদর্শনের উল্লেখ করা হয় নাই। এখানে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। পুরুষ ও স্ত্রীদেবতা একসঙ্গে দেখা যায় এরূপ কোন সীল বা আর কোন নিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। সিন্ধুধর্মে পুরুষ দেবতার সংখ্যা প্রবল স্ত্রীদেবতার সংখ্যা নগণ্য। নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের সঙ্গে (cult scenes) পুরুষ দেবতাদিগকে সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। স্ত্রীদেবতাকে মাত্র দুইটি অনুষ্ঠানের দৃশ্যে দেখা যায়। এই দুইটির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। অনুষ্ঠানের দৃশ্যগুলিতে ভক্ত বা উপাসকদিগের মধ্যেও স্ত্রীজাতিকে বিশেষ দেখা যায় না।

মনুষ্যমূর্তিতে কল্পিত স্ত্রীদেবতার উপাসনার প্রসঙ্গ ছাড়িয়া এখন অন্য এক শ্রেণীর নিদর্শনের উল্লেখ করা হইতেছে। এইগুলিকে স্ত্রীদেবতার উপাসনার পরিচায়ক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় কতকগুলি নানা আকারের রিং ষ্টোন (ring stone) বা আংটি বা চাকার মত জিনিস পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি চার ফুট হইতে চার ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট। বড় চাকাগুলি পাথরের, ছোটগুলি শাঁখের, পোরসিলেনের, নকল কার্নেলিয়ানের এবং পাথরের। (M.I.C. Vol I. Pl. XIII-9-12, XIV. 6-8)। মার্শালের ব্যাখ্যা অনুসারে এগুলি যোনির প্রতিমূর্তি। তিনি মনে করেন সিন্ধুধর্মে লিঙ্গ ও যোনি উপাসনা প্রচলিত ছিল। তাঁহার এই ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি মালাবার পয়েণ্টের শ্রীগুপ্তি প্রস্তর, তক্ষশীলায় প্রাপ্ত মৌর্য আমলের কতকগুলি আংটি বা চাকা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৌদ্ধশিল্পে এইগুলির অনুকরণ করা হইয়াছিল। শাক্ততন্ত্রের শ্রীচক্রের সঙ্গে তিনি মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার আংটিগুলির তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত,

"We are justified in supposing that the ringstones found at Mohenjo Daro may have the same cultural, fetish or magical significance that the ring stones of a later date had."

কিন্তু cultural, fetish or magical significance বলিয়া চাকাগুলির তাৎপর্যের লম্বা ফিরিস্তি দিলেও এই গোলযোগ থাকিয়া যায় যে, পরবর্তীকালের নিদর্শনগুলির তাৎপর্য কি ছিল তাহাই পরিষ্কার নহে। বলা বাহুল্য, সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে মার্শাল যে মত পোষণ করেন এই আংটিগুলির তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাখ্যা সেই মতের পরিপোষক। অপর একজন পণ্ডিত মার্শালের ব্যাখ্যার সমর্থনে এই যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন যে, মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় বহু লিঙ্গ মূর্তি (Phalli) পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং এই চাকাগুলির তাৎপর্য সম্বন্ধে মার্শাল যে ব্যাখ্যা

দিয়াছেন তাহাই সম্ভবতঃ ঠিক। এই লিঙ্গমূর্তিগুলি সম্বন্ধে পরে আলোচনা হইবে।

তক্ষশীলার মৌর্য আমলের চাকাগুলির উল্লেখ করিয়া মার্শাল বলিয়াছেন,—

"In these ring stones nude figures of a goddess of fertility are engraved inside the central hole, thus indicating in a manner that can be hardly mistakan the connection between them and the female principle."

তক্ষশীলার এই চাকাগুলির উপরে নানাপ্রকার কাল্পনিক দৃশ্য খোদিত দেখা যায়। এই সকল দৃশ্য হইতে চাকাগুলি কি কাজে ব্যবহৃত হইত তাহা বুঝা যায় না। ভীর স্তুপ হামিলায় প্রাপ্ত চাকাগুলি যে সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত চাকাগুলি হইতে ভিন্ন তাহা মার্শালের নিজের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় (A. S. I. 1927—28 p 66)। তার পর স্ত্রীমূর্তি নগ্ন হইলেই তাহাকে goddess of fertil ty বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রবৃত্তি ভারতবর্ষীয় ধর্মসমূহের ইউরোপীয় ব্যাখ্যাতাদিগের মধ্যে অসম্বরণীয় দেখা যায়। অথচ বৌদ্ধ আমল হইতে ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শনগুলিতে স্ত্রী-মূর্তি মাত্র নগ্ন বা অর্দ্ধনগ্ন।

সে যাহা হউক, পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, তক্ষশীলা, রাজঘাট, কোশামের প্রস্তরের চাকাগুলি (discs) সিন্ধু উপত্যকায় উল্লিখিত রিং ষ্টোন হইতে ভিন্ন ধরণের এবং তাঁহার ব্যাখ্যার সমর্থনের জন্য মার্শাল এইগুলি অপেক্ষা সাধারণে প্রচলিত কতকগুলি সংস্কার যেমন শ্রীগুণ্ডির প্রস্তর সম্পর্কে, এবং তান্ত্রিক চক্র, যন্ত্র, মণ্ডল প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণে পরিচিত তাৎপর্যের উপর অধিক নির্ভর করিয়াছেন। তান্ত্রিক, চক্র, যন্ত্র প্রভৃতির তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা এখানে অবান্তর, কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে শাক্ত তন্ত্রমতে ছিদ্রযুক্ত চক্র যোনির প্রতীক নহে, ত্রিকোণ যোনির প্রতীক। সাধারণে প্রচলিত সংস্কারের উপর মার্শাল অকারণে বেশী জোর দিয়াছেন, শাস্ত্রে এই ধরণের সংস্কারের স্থান নাই। শ্রীগুণ্ডি বা শত্রুঞ্জয়ের ছিদ্রযুক্ত বৃহৎ পাথরের চাকাকে যোনি বলিয়া বিশ্বাস এবং অশোকের স্থাপিত স্তম্ভকে শিবলিঙ্গ বিশ্বাসে পূজা, এই দুইটি সংস্কারের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এবং এই দুইটি সংস্কারের প্রকৃত কোন ভিত্তি নাই।

এই চাকাগুলির তাৎপর্যের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে।

জোহির (সিন্ধু দেশ) টাণ্ডো রহিম খাঁ স্তুপের মধ্যে একটি ছিদ্রযুক্ত গোল পাথরের চাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহা মোহেঞ্জোদারোর চাকাগুলির অনুরূপ। আবিষ্কর্তা ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে ইহা door socket। দয়ারাম সাহনী হরাপ্পায় কতকগুলি অসমান পাথরের চাকা বা আংটি পাইয়াছেন। তিনি এগুলির কোন ধর্মসংক্রান্ত তাৎপর্য আছে মনে করেন না। অন্যত্র প্রাপ্ত ঐরূপ আরও কতকগুলি চাকা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "what purpose they served remains a mystery (A.R. of A.S.I. 19 3-24, p. 53)। হরাপ্পার (main trench) চতুর্থ স্তরে এক স্থানে প্রচুর পরিমাণে এইরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির কোন ধর্মসংক্রান্ত তাৎপর্য আছে বলা হয় নাই। চক্রধরপুরের (ছোটনাগপুর) নিকটে একটি প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার কেন্দ্রে (pre-historic site) এইরূপ পাথরের চাকার অংশ পাওয়া গিয়াছে। বলা হইয়াছে, "it was used for weighing a digging stick," অর্থাৎ এই চাকা মাটি খুঁড়িবার যন্ত্রের মাথায় পরাইয়া দেওয়া হইত। মিঃ ক্রসফুট দক্ষিণ-ভারতের কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের বসতি স্থান হইতে অনুরূপ ছিদ্রযুক্ত পাথরের চাকা উদ্ধার করিয়াছেন। ঐগুলি ডিস বা প্লেটের কাজে ব্যবহার করা হইত বলা হইয়াছে।

শাঁখ, পোর্সিলেন ও পাথরের ছোট আংটিগুলি মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করা হইত কেহ কেহ ইহা বলিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত বড়গুলি তাঁত বুননীর লাটাই (spinning whorl) রূপে ব্যবহৃত হইত বলা হইয়াছে। ছিদ্রযুক্ত বড় পাথরের চাকাগুলি সম্ভবতঃ স্থাপত্য কার্যে ব্যবহার করা হইত বলা হইয়াছে।

মার্শাল যে সকল যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন অন্য প্রমাণাভাবে শুধু সেই সকল যুক্তির বলে, মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় পোর্সিলেন, শাঁখ ও পাথরের আংটি বা চাকাগুলিকে যোনির প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা মার্শালের ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। এই ব্যাখ্যার মূলে রহিয়াছে যে পূর্বগঠিত মতবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার প্রভাব।

সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে পূর্বের ও বর্তমান প্রবন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে এই তথ্যে উপনীত হয় যে সিন্ধুধর্মের একাংশ সম্বন্ধে এমন একটি ধারণা সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে সতর্ক ভাবে অনুসন্ধান করিলে যাহার কোন যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। হিন্দুধর্মে যখন ও যে প্রকারের স্ত্রীদেবতার উপাসনা রহিয়াছে তাম্রযুগের সিন্ধুধর্মে তাহা সেই

প্রকারে বিদ্যমান ছিল কেহ ইহা বলিলে বেশ আত্মপ্রসাদের ভাব মনে জাগে, মনে হয় সকলে জানুক হিন্দুধর্ম কত প্রাচীন। কিন্তু সিন্ধুধর্মের ব্যাখ্যাকারগণ চিনির প্রলেপ দিয়া অতি তিক্ত বটিকা গলাধঃকরণ করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মতানুসারে দাঁড়ায় হিন্দুধর্মে প্রচলিত স্ত্রীদেবতার উপাসনার উৎপত্তি ভূমধ্যসাগরের তীরে এবং প্রাচীন সেমিটিক ধর্ম হইতে। কি প্রণালীতে এই গলাধঃকরণ-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে দুইটি প্রবন্ধে তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণ সিন্ধুধর্ম হইতে একেবারে পৌরাণিক হিন্দুধর্মে নামিয়া আসিয়াছেন বৈদিক যুগকে ডিঙাইয়া। বৈদিক ধর্মকে তাঁহারা গণনার মধ্যে আনেন নাই; কারণ তাঁহাদের মতে বৈদিক ধর্ম বিদেশ হইতে আগত আর্যদিগের প্রচারিত ধর্ম। প্রাক্-আর্য যুগের সিন্ধুধর্মের স্ত্রীদেবতার উপাসনা এবং এই প্রাক্-আর্য যুগের ধারা বাহিয়া আসিয়াছে হিন্দুধর্মের যে স্ত্রীদেবতার উপাসনা, তাহার সহিত আর্যদিগের কোন সম্পর্ক নাই। স্ত্রীদেবতার উপাসনা করা যেন আর্যদিগের পক্ষে মানহানিকর ব্যাপার! কিন্তু দেখা যায় যে আর্য-জাতির প্রাচীনতম দলিল ঋগ্বেদে Great Mother বা Supreme Mother-এর উপাসনা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই Great Mother যিনি পরবর্তীকালে দুর্গা বা দেবী নামে প্রসিদ্ধ তাঁহার উপাসনার ক্রমবিকাশের ধারা ঋগ্বেদ হইতে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের মধ্য দিয়া মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত অনুসরণ করা যায়। সিন্ধুধর্মে স্ত্রী-দেবতার উপাসনা সম্বন্ধে মার্শালের প্রচারিত মত অগ্রাহ্য করিলে দেখা যায় সিন্ধুধর্মের সাদৃশ্য পৌরাণিক হিন্দুধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অনেক বেশী। বৈদিক ধর্মের সঙ্গেও সাদৃশ্যের অভাব নাই।

এ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে সিন্ধুধর্মে পুরুষ দেবতার উপাসনা সম্বন্ধে প্রচারিত মতবাদ পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

শরৎচন্দ্র

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

একই আকাশে রবি ও চাঁদের উদয় দেখেছ কেউ,
যে আলো লাগিয়া উথল মনের সাগরে উঠিল ঢেউ,
যে আলো জাগায়, যে আলো আবার নূতন স্বপ্ন আনে?
এমনি লগ্ন একবার আসে যুগান্ত-ব্যবধানে।
নীল নির্মল নভে যে দেখেছি শরৎচন্দ্রোদয়,
আমরা জেনেছি সূর্য্য-শশীর আলোক ভিন্ন নয়।

হে কথাকোবিদ, কে কবে এমন প্রাণের দরদ দিয়া
এঁকেছে মানুষে, সে রূপে হৃদয় উঠেছে উচ্ছ্বসিয়া!
কি সহানুভূতি, মানব-মমতা, কি প্রীতি অপরিমেয়,
ধন্য হয়েছি, নিকটে এসেছি, পেয়েছি তোমার স্নেহ।
মনোদর্পক হে কবি তোমার সার্থক কল্পনা,
প্রেমের আগুনে পুড়িয়া মানুষ হয়ে যায় খাঁটি সোনা।

সাহিত্য নয় শিল্প শুধুই, জীবন দিয়া সে গড়া,
ব্যথা, অনুভূতি, তীব্র তৃষায়, প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরা।
কে বা অকলুষ, কলঙ্কহীন? মানব-মনের কাছে
পাপ ও পুণ্য, মধু আর বিষ মেশামিশি হয়ে আছে।
কি না সে সহিতে পারে, আর কত সে ভালবাসিতে পারে,
বিশ্বস্রষ্টা বিস্মিত চোখে বুঝি চেয়ে দেখে তারে।
সে শুধু মানুষ, সে নহে দানব, দেবতাও সে ত নয়,
তুমি যে গাহিলে বিচিত্র সেই মানবিকতার জয়।
সমাজ-শাসন, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ বাহ্য এহ,
মন যে মুক্ত, বন্ধনে তারে বাঁধিতে পারে নি কেহ।
রাজভয় আর লোকনিন্দা যে করে নি তোমারে ভীত,
তোমার বাণীর তড়িৎস্পর্শে কারা হ'ল সচকিত!
বন্দীজীবনে চঞ্চলিল যে চিন্তা কূলপ্লাবী
স্বাধীন কণ্ঠে ঘোষিলে যে সেই চলার পথের দাবী।

কত বিস্ময়, কত মাধুর্য্য সৃষ্টি-প্রেরণা মাঝে,
বন্ধু, তোমার বাণীর বীণায় জীবন-বেদনা বাজে।
জীবনের কবি, সে কি অপূর্ব্ব মহাশ্মশানের ছবি,
নরমুণ্ডের গেণ্ডুয়া খেলে যেথা মহাভৈরবী।
ধূসর বালুর প্রান্তর ভেদি বহিছে শীর্ণ নদী,
আশেপাশে ফেলে দীর্ঘশ্বাস কারা যেন নিরবধি;
শকুন-শিশুর কান্না থামে না। তুমি সেথা একা বসি
অমারাত্রির কি রূপ আঁকিলে মনের গোপনে পশি!

সাধারণ মাঝে অসাধারণের সাক্ষাৎ পেলে তুমি,
তাই ত তোমারে অঙ্কে ধরিয়া ধন্য জন্মভূমি।
মানুষ কখনো পতিত হয় না—পতিতপাবন জানে,
সে চিরসত্যে প্রতিষ্ঠিলে কি অপরূপ রূপ-দানে।
চলিতে মানুষ পড়িতে সে পারে, পড়িয়া আবার ওঠে,
ধরার ধূলি ত মলিন করে না; পঙ্কে পদ্ম ফোটে।

স্নেহে আর প্রেমে মায়া-মমতায় নিখিলচিত্তহারী,
হৃদয়ের পুরে বন্দিনী, তাই চির-বিজয়িনী নারী।
বৈচীর মালা উপহার দিয়া যে হ'ল মানস-বধূ,
তার সেই প্রেম অমর করিতে লেখনীতে ঝরে মধু।
প্রেম তপস্যা, দুঃখ-দাহনে কখনো করে না ভয়,
প্রেমের নিষ্ঠা নারী ও নরের শ্রেষ্ঠ সে পরিচয়।
তোমার আলোর প্লাবনে জীবনে করিল কি রমণীয়,
ভালবাসিয়াছ সকলেরে, তাই তুমি সকলের প্রিয়!
মানবপ্রেমিক তোমার স্মরণে চিত্ত উঠিছে ভরি,
জন্মভূমির স্মৃতির তীর্থে তোমারে প্রণাম করি।*

* দেবানন্দপুরে অনুষ্ঠিত শরৎচন্দ্রের একাদশ স্মৃতি-বার্ষিকী সভায় পঠিত।

প্রবাহ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

১৩

এক মাসের উপর গত হইয়াছে। মৃন্ময় সেই যে আসিয়াছে আর যায় নাই। কতকটা পড়ার চাপে এবং কতকটা নিষ্প্রয়োজন বোধে। সত্যকার দায়িত্ব তার কতটুকু।

মৃন্ময়ের পরীক্ষা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর দুই দিন বাকী। সহসা রুবির জরুরী আহ্বান আসিল। মৃন্ময় জানাইয়া দিল যে, দুই দিনের আগে তার দেখা করিবার সুযোগ হইবে না। কিন্তু দুইটা দিনের ব্যবধান আর কতটুকু! দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল।

ইহার পরে মৃন্ময়কে দেখা গেল রুবিদের বাহিরের ঘরে চিন্তিত মুখে বসিয়া থাকিতে এবং রুবিকে পাওয়া গেল তার পাশে নিঃশব্দে নতমুখে উপবিষ্ট অবস্থায়। রুবিই প্রথমে কথা কহিল, দাদার যে এত বড় অধঃপতন হতে পারে এ কথা কেমন করে ভাবা যায় বলুন ত? তার উপর সাফাই গাইবার কি নির্লজ্জ চেষ্টা দেখুন। রুবি সুনির্মলের লেখা একখানা চিঠি মৃন্ময়ের দিকে আগাইয়া দিল কহিল, পড়ে দেখুন—

মৃন্ময় কহিল, আপনিই পড়ুন—

রুবি সহসা হাত কয়েক পিছাইয়া গিয়া কহিল, ঐ অনুরোধটি আমায় করবেন না। চিঠি রইল। ইচ্ছে হয় পড়ে দেখুন, নইলে ছিঁড়ে ফেলে দিন।

মৃন্ময় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আপনাকে চলে যেতে হবে না রুবি দেবী। বসুন, আমিই না হয় পড়ছি।

চিঠিখানা রুবিকেই লেখা হইয়াছে।

"আমার চলে আসা নিয়ে তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। এখানে আমি কতকটা শান্তিতেই আছি। জীবনে আমি বড় আঘাত পেয়েছি—যার জন্যে তৈরি ছিলাম না। আমার মস্ত বড় দুঃখ যে, যেখানে আমার সবচেয়ে বড় বিশ্বাস ছিল সেখান থেকেই চরম শাস্তি পেয়েছি। আমি লিলির কথা বলছি। তার রূপ আছে, শিক্ষা আছে এবং হয়তো আরও অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু তাকে আমি আর বিশ্বাস করতে পারছি না। পতন যে তার কোন্ পথ ধরে এসেছে তার প্রমাণ সে নিজেই দেবে। যতই তার শিক্ষা-দীক্ষা থাক লিলি বাঙালীর মেয়ে। নিজের আসল সত্তাকে সে কখনই উপেক্ষা করতে পারে নি। তাইতো আমাকে মুক্তির পথ বেছে নিতে হয়েছে। ভরসা করি লিলি তার নিজের জন্যেই আমাকে রেহাই দেবে।

সুনির্মল"

নিজের অজ্ঞাতে মৃন্ময়ের মুখ দিয়া বাহির হইল, স্কাউন্ড্রেল। তারপরেই গভীর নিস্তব্ধতা। এমনি আরও অনেকক্ষণ কাটিল। হয়তো আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইত—সহসা একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া মৃন্ময় শুষ্ক নীরস কণ্ঠে কহিল, যেখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি সেখানে লজ্জা সঙ্কোচ ইত্যাদি স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোকে আমাদের উপেক্ষা করে চলবারই হয়তো প্রয়োজন হবে। একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, এ দুর্ঘটনার জন্য আপনার দাদাই ষোল আনা দায়ী—এই কি আপনার অভিমত?

রুবি কহিল, এ মতামতের কথা নয় মৃন্ময় বাবু, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি আমার দাদাকেও জানি, আর লিলিদিকেও চিনি।

মৃন্ময় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, দেশে যাইবার পূর্ব্বেকার ঘটনাগুলি তার একে একে মনে পড়িতে লাগিল। যাহা অতি সামান্য বলিয়া তখন নজরে পড়ে নাই আজ সেই সব অতি তুচ্ছ ঘটনা নূতন রূপ ধরিয়া মৃন্ময়ের মনে এক কূট চক্রান্তের আভাস দিয়া গেল। সুনির্ম্মলের চরিত্রের যে দিকটা আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে একথা ভাবিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, মৃন্ময়কে শেষ পর্য্যন্ত জালে জড়াইবার জন্যই হয়তো সে চতুর্দ্দিক দিয়া আয়োজন করিয়া রাখিতেছিল। কিন্তু সে চেষ্টা তার ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই আজ তার পলাইয়া যাইবার প্রয়োজন হইয়াছে।

রুবি কহিল, কত বড় অন্যায় বলুন দেখি। নিতান্ত মেয়েছেলে বলেই কি এ অন্যায় লিলিদিকে মুখ বুজে সইতে হবে?

মৃন্ময় মনে মনে যাহাই ভাবুক না কেন প্রকাশ্যে তাহার আভাসমাত্রও দিল না। বরং একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিল, আপনি কি আপনার দাদার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে এ অনুযোগ দিচ্ছেন? লিলির সঙ্গে ইতিমধ্যে আপনার দেখা হয়েছে কি?

রুবি উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তীব্র কণ্ঠে কহিল, এর পরেও তাকে কখনও মুখ দেখানো যায় মৃন্ময়বাবু! ক্ষণকাল থামিয়া তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে রুবি বলিয়া চলিল, আমি লিলিদিকে বাঁচাতে চেষ্টা করব। তার সম্ভ্রমকে কিছুতেই ধুলোয় লুটাতে দেব না, দাদার নামে আমি কেস করব। হোক সে আমার ভাই। তাকে আমি বাধ্য করাব লিলিদিকে গ্রহণ করতে। এ ছেলেখেলা নয়।

মৃন্ময় মৃদু হাসিয়া কহিল, আপনার মন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছে বলেই একথা বলতে পারছেন। আমার বিশ্বাস লিলি আপনার কথায় রাজী হবেন না। তিনি যদি বুদ্ধিমতী হন,

সম্মত হতেও পারেন না। কারণ যে ঘটনাটা চেষ্টা করলে একটা সুনির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে তা ছড়িয়ে পড়বে সর্ব্বত্র, আলোচিত হবে চায়ের দোকানে, জানা-অজানা লোকের মুখে মুখে···

রুবি কহিল, আপনি বলতে চান কি ?

মৃন্ময় কহিল, বলতে আমি কিছুই চাই না। তবে আমার বিশ্বাস লিলি তাঁর নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবেন। অন্ততঃ আমাদের চেয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার ঢের বেশী বোঝেন। আমি বলি আপনি একবার লিলির সঙ্গেই বরং দেখা করুন। খামোকা হৈ-চৈ করবেন না। তাতে লিলির ভাল করতে গিয়ে হয়তো মন্দ করে বসবেন।

রুবি পুনরায় রুখিয়া উঠিল। কহিল, আপনি কি বলতে চান যে, এক জনের খামখেয়ালকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে আর একজন অন্যায় এবং অসম্মানের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেবে !

মৃন্ময় শান্ত কণ্ঠে কহিল, তাই যদি হয় তা হলেই বা করবার আছে কি ! সামাজিক জীব যখন আমরা।

রুবি কহিল, যে সমাজ মানুষকে মানুষের মত বেঁচে থাকতে সহায়তা করে না তারই দোরগোড়ায় মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবার কিসের প্রয়োজন !

মৃন্ময় কহিল, দেখুন এসব তর্কবিতর্ক এখন না তোলাই ভালো। বর্ত্তমানে আমাদের প্রশ্ন সমাজ নিয়ে নয় ; তার চেয়ে দেখুন সত্যি সত্যিই আপনি কিছু করতে পারেন কিনা।

রুবি কহিল, তর্ক করবার প্রবৃত্তি আমারও নেই। কথাটা আপনি তুলেছেন বলেই বললাম। একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিল, সমাজের কথা ছেড়ে দিয়ে ন্যায় অন্যায়ের কথাটাই যদি ধরা যায় তা হলেও কি এর প্রতিকার করাটা আপনি অন্যায় মনে করেন ?

মৃন্ময় কহিল, আমার মতামত এখানে অপ্রাসঙ্গিক। ন্যায় অন্যায়, ভালমন্দ নিয়েও আমি কিছু বলতে চাই না। মোটের উপর আপনার বক্তব্য এবং কর্ত্তব্য কি সেই কথাই বলুন।

রুবি কহিল, সেই কথাই আমি বলতে চাইছিলাম কিন্তু আপনিই সব গোলমাল করে দিচ্ছেন। অবশ্য এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমার লজ্জা থাকলেও কুণ্ঠিত হওয়া বা দ্বিধা করা উচিত নয়, নইলে আজ দাদার অন্যায় আচরণে আমায় মাটির তলায় মুখ লুকোতে হ'ত। দাদার চিঠিখানা আজ সপ্তাহের উপর হ'ল পেয়েছি। মাকে জানাই নি—জানাবও না। অথচ একেবারে চুপ করে থাকাও চলে না। যদিও আমি জানি যত বড় ক্ষতিই দাদা লিলিদির করুক না কেন, সে কখনও মুখ খুলবে না।—রুবি থামিল। মৃন্ময় কথা কহিল না। নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

রুবি পুনরায় বলিতে লাগিল, কিন্তু সে প্রতিবাদ করবে না বলেই কি সবাই চুপ করে থাকবে। মিথ্যাটাকেই সকলে জানবে—সত্য চিরদিনই গোপন থেকে যাবে।

মৃন্ময় একটু হাসিল, কহিল, আমি ত এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে বলছি, কিন্তু আপনি যে কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না। মিথ্যাটাকে নিয়ে এত হৈ-চৈ করে শেষে সত্যকেই যে আর খুঁজে পাবেন না।

রুবি কহিল, আমার প্রগল্‌ভতা আপনি মাপ করবেন। ক্রমাগত একই কথা ভেবে ভেবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না কোন্ পথে আমায় চলতে হবে।

মৃন্ময় শান্ত কণ্ঠে কহিল, আমি কিন্তু আবার বলছি আপনাকে লিলির সঙ্গে পরামর্শ করতে। ব্যাপারটাকে যত গুরুতর আপনি মনে করছেন আসলে হয়তো ততটা নয়। আর যদি আপনি নিশ্চিত জানেন যে, অন্যায়টা আপনার দাদার, তা হলে তাঁকেও কথাটা জোরের সঙ্গে জানিয়ে দিন।

রুবি কহিল, তাতে সত্যিকার কোন কাজ হবে না মৃন্ময়-বাবু। এতটুকু মনুষ্যত্ব যদি তার থাকত তবে লিলিদিকে টেনে এনে জনতার হাটে দাঁড় করাত না। আজ আমার গভীর লজ্জা যে সুনির্ম্মল আমার বড় ভাই। কিন্তু যাক এসব কথা। আমি আপনার কথামতই কাজ করব। লিলিদির কাছে কালই যাব। কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে আপনার আপত্তি আছে কি ?

মৃন্ময় কহিল, আছে বৈকি। কারণ এর মধ্যে মাথা গলানো আমার পক্ষে যেমন অশোভন তেমনি রুচি-বিরুদ্ধ। আপনি এত বোঝেন আর এই সোজা কথাটা বুঝলেন না। আপনাদের কর্ত্তব্য আপনারাই ঠিক করবেন। আমার সাহায্যের যদি প্রয়োজন হয় তো দূরের থেকেই তা করব।

রুবি কহিল, কিন্তু ভুলে যাবেন না যে, আপনার উপর একটি মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন, তার মান-সম্ভ্রম সব কিছু নির্ভর করছে।

মৃন্ময় কহিল, আপনি সহজ কথাকে জটিল করে তুলছেন কিন্তু। আমার উপর কারুর ভবিষ্যৎ অথবা সম্ভ্রম নির্ভর করে না। ঘটনাচক্রে আপনাদের মধ্যে এসে পড়েছি বলেই আমার কোন দায়িত্ব থাকতে হবে এ একটা কথাই নয়।

মৃন্ময় একটু থামিয়া কতকটা নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিল, এ আপনাদের রাতারাতি অতি আধুনিক হয়ে উঠবার কুফল, তাই ফলভোগেরও প্রয়োজন আছে। নইলে এ ধরণের ব্যাপার অভাবিতও নয়, আকস্মিকও নয়। কিন্তু আর না, আমরা অনেক দূরে এগিয়ে গেছি।

মৃন্ময় একটু লজ্জিত হইয়াছে এবং এই লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই অকস্মাৎ চলিয়া গেল। রুবি একটা কথা পর্য্যন্ত কহিবার অবকাশ পাইল না।

রুবিদের ওখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মৃন্ময় সরাসরি

হোষ্টেলে গেল না। এত দিনের শ্রান্ত-ক্লান্ত মনটা কোথায় আজ লঘু আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইবে, না কোথা হইতে এক অনাবশ্যক চিন্তা আসিয়া তাহার মাথায় ঢুকিয়াছে। ইচ্ছা করিলেও এ দায় সে এড়াইতে পারে না। যত দুর্ব্বলতা তার এইখানে। অথচ এমনি মজা যে নিজের এই দুর্ব্বলতার কথা তার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু গায়ে পড়িয়া দায় ঘাড়ে লওয়ায় এক প্রকার আনন্দ আছে—নেশার আকর্ষণের মত। মৃন্ময়েরও কতকটা তাই।

১৪

মৃন্ময় ট্রামে চলিয়াছে। কথায় কথায় রুবিদের ওখানেই তার অত্যন্ত দেরি হইয়া গিয়াছে। হোষ্টেলের একটা নিয়ম-কানুন আছে, মানিয়া চলিতে হয়।

হোষ্টেলে ফিরিয়া মৃন্ময় নান্টুর একখানা চিঠি পাইল। সেদিকে মন দিবার মত অবস্থা তখন তার নয়। ওদিকে খাবার ঘণ্টা দিয়াছে। মৃন্ময় কয়েক মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া আসিল। কিন্তু খাইতে বসিয়াও সে অন্যমনস্ক ভাবে সুনির্ম্মলের কথা ভাবিতেছিল, তর্কের খাতিরে যাহাই সে রুবিকে বলুক না কেন। রুবির অনুমানই তারও সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে। রুবি সুনির্ম্মলের বোন। ভাবিতেও কেমন লাগে।

দেবল মৃন্ময়ের এই অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করিয়া একটু ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল, আজকের পরীক্ষা কেমন হ'ল মৃন্ময়বাবু?

মৃন্ময় এই আকস্মিক প্রশ্নে চমকিত হইল, মুহূর্ত্তে আত্মস্থ হইয়া কহিল, কেন ভালই? পরে ঈষৎ হাসিয়া কহিল, আনমনা ছিলাম, তাই হঠাৎ চমকে উঠলাম।

দেবলও হাসিয়া কহিল, বাড়ীর কথা ভাবছিলেন বুঝি? এতদিন ত আপনার ভাববার অবকাশও ছিল না। আশ্চর্য্য একাগ্রতা আপনার।

মৃন্ময় কোন জবাব দিল না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। নান্টুর চিঠিখানা ঘরে টেবিলের উপর পড়িয়া আছে। আজ সকালবেলা মঞ্জুরও একখানা চিঠি সে পাইয়াছে। কক্সবাজার হইতে লিখিয়াছে। আগাগোড়াই মামুলি কথায় পূর্ণ। যথা:—মায়ের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হয় নাই। তাহারা হয়তো আর বেশী দিন ওখানে থাকিবে না। ইতিমধ্যে তার পরীক্ষা শেষ হইয়া থাকিলে একবার কক্সবাজার আসিলে মা বড় খুশী হইবেন। সে নিজে একটুও না…এমনি আরও কত কথা। মঞ্জু বড় সহজ। ওকে বুঝিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। কিন্তু নান্টু তো চিঠি লেখে না—যেন গল্প ফাঁদিয়া বসে।

মৃন্ময় চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল:—

"বহুদিন পরে আবার তোকে চিঠি লিখতে বসেছি। আমার বেদনা এবং আনন্দ এ দুয়ের কোন কিছু থেকেই তোকে বঞ্চিত করতে চাই না। আজ যথার্থই আমার বড় আনন্দের দিন। আমার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মনটা হঠাৎ স্বাভাবিক হয়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছে। তোকে এর আগের চিঠিতেই জানিয়েছি যে, এখানে আমি একটি ভাই এবং একটি বোন পেয়েছি। বোনটির সকল দায়িত্ব আজ আমার উপর। দাদা গেছেন আমেরিকায়। আমরা এসেছি ওয়ালটেয়ারে। আর শ্রীমতী লীলা রাও হয়েছেন মিসেস্ চক্রবর্ত্তী। তুই হাসিস নে, এ ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন উপায় ছিল না। বাস্তবিকই না। আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ নিয়ে লোকে অশোভন আলোচনা করবে এ আমরা চাই না। অথচ এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমরা শুধু লোকের মুখ বন্ধই করি নি, তাদের কাছ থেকে রীতিমত সম্মান আদায় করে নিচ্ছি। কিন্তু মনে আমাদের কোন গলদ নেই। একথা পূর্ব্বের চেয়ে জোর গলায় আমি বলতে পারছি।

ফিরোজ ম্যানসনে বাসা বেঁধেছি। সমুদ্রের ঠিক পাশেই। দিবারাত্র সমুদ্র-বারির উন্মত্ত গর্জ্জন শুনে শুনে কেমন যেন বিরক্তি ধরে গেছে। সমুদ্রের অবস্থা এখন বড় অশান্ত।

আমরা একই ঘরে আলাদা রাত কাটাই। লীলার নির্ভরতায় ফাঁকি নেই। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে ওর সুপ্ত মুখের পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের মর্য্যাদা দিয়ে লীলা কেমন করে আমার মত একটা উচ্ছৃঙ্খল মানুষকে আগাগোড়া বদলে দিয়েছে। নিজের উপর আমার বিশ্বাস এসে গেছে।

লীলা বড় চঞ্চল। হরিণীর মত চঞ্চল, অথচ তেজস্বিনী। ওকে নিয়ে মাঝে মাঝে আমার বড় বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। পাশের ফ্ল্যাটের মিঃ আয়েঙ্গার প্রায়ই আমাদের চায়ের টেবিলে নিমন্ত্রিত হন। লীলা ইচ্ছা করেই ডেকে পাঠায়। আয়েঙ্গার এসে হাজির হন। মিসেস চক্রবর্ত্তীকে নিয়ে কত রহস্যের সৃষ্টি করেন। লীলা হেসে গড়িয়ে পড়ে। আয়েঙ্গার অপ্রস্তুত হয়ে চলে যান কিন্তু আবার আসেন।

আমি বলি, এ সব কেন লীলা!

লীলা বলে, লোকটা বড় হ্যাংলা, তুমি কিছু জান না নান্টু!

আমি বলি, জেনে আমার দরকারও নেই। কিন্তু মিথ্যা ও লোকটাকে ক্ষেপিয়ে লাভ কি!

লীলা বলে, এ এক ধরণের আনন্দ নান্টু। তুমি এসব বুঝবে না।

জানি না কেন লীলা আয়েঙ্গারকে নিয়ে এমন করে নাচাচ্ছে। লীলাকে বলি, এসো এখান থেকে কোথাও চলে যাই। লীলার তাতেও কোন আপত্তি নেই। বলে, তুমি যখন সঙ্গে আছ যেখানে খুশী চল। পাগল আর কাকে বলে। কিন্তু বুক আমার ভরে ওঠে। বিদেশে আত্মীয়বন্ধুবিহীন অবস্থায় লীলা আমার চারদিক থেকে পরমাত্মীয়ার মত ঘিরে

রেখেছে। আমার জীবনের মরা গাঙে আবার জোয়ার এসেছে। কিন্তু তাতে ঘোলা জলের আবর্ত নেই—স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল।

আজ আমার কি মনে হয় জানিস্। তোদের মত শান্ত-শিষ্ট ভাল ছেলে না হয়ে জীবনে আমি ঠকি নি। বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুযোগ পেয়েছি। কোথাও টিকে যেতে পারি নি বটে, কিন্তু অনির্দ্দিষ্টের মধ্যে নিজের জীবন সম্বন্ধে যে উপলব্ধি আমার হয়েছে তার মূল্য চলার পথে বড় কম নয়। সে যাই হোক—এসব কথা আজ থাক। এর পরে দু-চারটে মামুলি খবরাখবরের পর আজকের মত বিদায় নেব।

তোর চিঠি আমি যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর দিতে ইচ্ছে করেই দেরি করেছি। লিখবার মত কিছু সংগ্রহ করা চাই তো!

লিখেছিস, মঞ্জু আমার চিঠিটা হজম করেছে! করলেই বা ক্ষতি কি! ওরা কক্সবাজার থেকে ফিরে এসেছে কি? আশা করি, মঞ্জুর মায়ের শরীর এখন ভালই আছে। চিঠির জবাব দিস্। ইতিমধ্যে অন্য কোথাও গেলে তোকে জানিয়ে যাব। —নান্টু"

মৃন্ময় চিঠিখানা হাতে করিয়াই বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। যে বিশ্বাস নান্টুকে মানুষ হইয়া উঠিতে সহায়তা করিয়াছে সেই বিশ্বাসই আর একজনকে শুধুমাত্র খেয়ালের খোরাকই যোগাইয়াছে। বুকে জাগাইয়া তুলিয়াছে লোলুপতা, পাশবিক আদিম ক্ষুধা। খাসা নাম—সুনির্ম্মল। নাম তার সার্থক হইয়াছে।

টাইমপিসটা টিক টিক করিয়া অবিরাম বাজিয়া চলিয়াছে। চতুর্দ্দিকে গভীর স্তব্ধতা। পাশের বিছানায় রুমমেট অকাতরে ঘুমাইতেছে। সম্মুখে থানা-প্রাঙ্গণের দেবদারু গাছে বাদুড়ের ঝাঁক। তাদের পাখার শব্দ, এবং মাঝে মাঝে দ্রুতগামী মোটরের আওয়াজ স্তব্ধ প্রকৃতির বুকে যেন জীবনের স্পন্দন জাগাইয়া তোলে। মৃন্ময়ের কোন দিকে হুঁস নাই। তার মাথার মধ্যে তখন অজস্র প্রশ্নের নীরব আনাগোনা চলিয়াছে।

ঠিক কথা—সহজ এবং অতি সাধারণ কথা। ঘটনা এক হইলেও মানুষের মনের উপর তাহা নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নহিলে মানুষ জীবনের ধারা আজ ভিন্নমুখী হইত। কিন্তু লিলি মেয়েটাই বা কেমন? তাহাকে দেখিলে ত সাধারণ মেয়ে বলিয়া মনে হয় না, বরং শ্রদ্ধারই উদ্রেক হয়। সে কেন এমন এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে টানিয়া আনিল। তার শিক্ষা, তার সংস্কার শেষ পর্য্যন্ত একটা খেয়ালের পায়ে মাথা খুঁড়িয়া আত্মহত্যা করিল। এই নিরভিমান মেয়েটি সম্বন্ধে কি উদার মনোভাবই না তার ছিল।

মৃন্ময় ভাবিতেছিল, মানুষের মনের আদিম প্রবৃত্তিটাই কি এত বড় হইয়া উঠিল যার কাছে শিক্ষা, সংস্কার, শ্লীলতা সব কিছু ম্লান হইয়া গেল। সংযম শুধুই কি একটা কথার কথা!

রাত অনেক হইয়াছে। মৃন্ময় সহসা আত্মস্থ হইল। অকারণে সে এসব কি ভাবিতেছে। কালই সে টিকিট কাটিবে। রুবি অসন্তুষ্ট হইবে? তাহাতে মৃন্ময়ের কিছুই আসিয়া যাইবে না। উহাদের ভালমন্দর বোঝা সে কেন বহন করিতে যাইবে।

মৃন্ময় শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিল এবং এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

কিন্তু পরদিন বাস্তবিকই সে টিকিট কাটিতে পারিল না। বরং বিকাল হইতেই রুবির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরের ঘরেই তার সাক্ষাৎ মিলিল, সে কিন্তু একলা নয়, লিলিও সেখানে ছিল। যদিও সে লিলির উপস্থিতি আশা করে নাই তথাপি বিস্মিত হইল না। মৃন্ময় মুখে কিছু না বলিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। লিলির পূর্ব্বের চেহারা আর নাই। অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট তার মুখভাব। কিন্তু লজ্জার এতটুকু আভাস তার কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

মৃন্ময় রীতিমত বিস্মিত হইল।

রুবিই প্রথমে কথা কহিল, আপনি আমাদের সাহায্য করবেন শুনে লিলিদি অত্যন্ত খুশী হয়েছেন মৃন্ময়বাবু। তার পর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনারা বসুন, আমি দু' মিনিটেই আসছি। রুবি চলিয়া গেল।

মৃন্ময় কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। কিন্তু লিলির কোন ভাবপরিবর্ত্তন দেখা গেল না। বরং সে-ই প্রথমে কথা কহিল, রুবির কাছে হয়তো আপনি অনেক কিছু শুনেছেন। কিন্তু তা নিয়ে আমার বলবার কিছু নেই। লোকে যত নিন্দেই করুক, আমি জানি অন্যায় আমি কিছুই করিনি। অবশ্য আমার এ কৈফিয়ৎ অনাবশ্যক। তবে এটুকু আমি বুঝেছি যে, আমার নিজের ভার আমাকেই বইতে হবে, সেখানে আর কারুর সাহায্য চাইতে আমি পারব না। কিন্তু আপনি অনাত্মীয় হয়েও আমার দুর্দ্দিনে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছেন এ আমার পরম সৌভাগ্য। অথচ…লিলি কথার মাঝে সহসা থামিয়া গিয়া প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হইল। মৃদু কণ্ঠে সে কহিল, আমার নিজের পথ আমি ঠিক করে নিয়েছি। আপনি মোটামুটি কিছু সাহায্য করলেই যথেষ্ট হবে। আমি বিদেশে চাকরি নিয়েছি। আপনি শুধু আমায় পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

লিলি পুনরায় থামিল, একটু চিন্তা করিয়া কহিল, আপনার উপর হয়তো জোর করে অত্যাচার করা হচ্ছে, কিন্তু

বিশ্বাস করুন এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন উপায় আমি খুঁজে পাই নি।

মৃন্ময় ধীরে ধীরে মুখ তুলিল, মৃদু কণ্ঠে কহিল, আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না—সত্যিকারের ঘটনাটা কি? বুঝে আমার দরকারও নেই, কিন্তু তবুও আমার মন বলে, কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি রয়ে গেছে, ইচ্ছে করলেই যার প্রতিবিধান হতে পারে।

লিলির মুখে ঈষৎ ম্লান হাসি দেখা দিল। সে শান্ত সংযত কণ্ঠে কহিল, তা হয়তো পারে। কিন্তু যেখানে মনের ফাঁক বুজল না সেখানে ফাঁকি ধরে লাভ কি মৃন্ময়বাবু।

রুবি ফিরিয়া আসিয়াছে। লিলি উঠিল, কহিল, আজ আমি যাই মৃন্ময়বাবু। পরশু আমি রওনা হব ঠিক করেছি। নিয়োগপত্রও ইতিমধ্যে পেয়েছি। দার্জিলিং মেল ধরতে হবে। রুবির প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া তেমনি শান্ত কণ্ঠে সে কহিল, তোমাকে ধন্যবাদটা আর দিলাম না। তবে তোমার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। তোমার জোড়া সত্যিই মেলে না।

রুবির মনোভাব মুহূর্তের জন্য বদলাইয়া গেল। কিন্তু চোখের পলকে আত্মসংবরণ করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, এখুনি যাবে লিলিদি। আমি যে তোমার চা দিতে বলে এলাম।

লিলির চোখে মুখে এক বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি দেখা দিল। সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তোমরা অনুরোধ করেছ বলেই ত আমি তা গ্রহণ করতে পারি না রুবি। অধিকার বলেও একটা কথা আছে, মন বলেও একটা পদার্থ আছে, যাকে কোন অবস্থায় অস্বীকার করা চলে না।

লিলি আর দাঁড়াইল না।

মৃন্ময় অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, অদ্ভুত মেয়ে—

রুবি কহিল, তার চেয়েও বিস্ময়কর লিলিদির মনের জোর। এত বড় যে একটা ঘটনা ঘটল অথচ তা যেন ওকে কিছুমাত্র নোয়াতে পারে নি।

মৃন্ময় একটু অন্যমনস্কভাবে কহিল, হয়তো তার নত হবার মত কোন কারণও নেই।

রুবি চমকিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই ধীর কণ্ঠে কহিল, আমি ত আপনাকে বরাবরই বলে আসছি যে লিলিদি অতল সমুদ্র, ওকে বুঝতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

মৃন্ময় একটু হাসিয়া কহিল, এ ব্যাপারে কেউই আপনারা কম যান না। অবশ্য আপনাদের কাউকে খুঁটিয়ে বুঝবার প্রয়োজনও আমার নেই। ঘটনাচক্রে আপনাদের মধ্যে এসে পড়েছি। বাধ্য হয়ে খানিক সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি দিনের জন্যও আপনাদের মধ্যে আমায় পাবেন না। সে যাই হোক আজ আমি যাই।

রুবি স্মিতহাস্যে কহিল, এসেই আপনি উঠি উঠি করেন কেন বলুন ত! আমাদের বুঝি সহ্য করতে পারেন না।

মৃন্ময় কহিল, কথাটা একেবারে মিথ্যে বলেন নি আপনি। পাড়াগাঁয়ের লোক কিনা—হঠাৎ আপনাদের মধ্যে এসে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। আপনাদের সমস্তরের হলে হয়তো উঠতেই চাইতাম না। জোর করে তাড়াতে হ'ত।

রুবি হাসিয়া ফেলিল, আপনি আমাদের কি মনে করেন বলুন ত!

মুখে রুবি যাহাই বলুক না কেন, অন্তরে অন্তরে সে খুশী হইয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে, তাদের আলোচনাটা একটা সহজ পরিহাসের পথে ফিরিয়া আসিয়াছে। লিলি সম্বন্ধে মৃন্ময় আজ যে ভাবে কথাবার্তা সুরু করিয়াছে তাহাতে রুবি কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। কি জানি কোন্ কথায় কি কথা আসিয়া পড়িবে। লিলির সহিত দেখা হইবার পর হইতেই মৃন্ময়ের কথার ভঙ্গী কেমন যেন বাঁকা পথ ধরিয়া চলিয়াছে।

মৃন্ময় সহসা রুবিকে প্রশ্ন করিল, আপনাকে যেন একটু চিন্তিত মনে হচ্ছে।

এই আকস্মিক প্রশ্নে রুবি চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সহজ কণ্ঠে কহিল, আমার চিন্তিত হওয়া কি খুবই অস্বাভাবিক মৃন্ময়বাবু? আজ ক'মাস ধরে ক্রমাগত শুধু ভাবছি। ভেবে ভেবে কূল পাই নি। অথচ যাকে নিয়ে এত দুর্ভাবনা সে কত অনায়াসেই না একটা মীমাংসায় এসে পৌঁছেছে। আমরাও যে প্রয়োজন হলে কত শক্ত হতে পারি তার প্রমাণ একটু আগেই পেলাম। তাইতো ভাবছিলাম কি ভাগ্যি যে আপনাকে পেয়েছি, নইলে এই নিয়ে আমি হয়তো ব্যাপারটাকে জটিলতর করে তুলতাম।

মৃন্ময় হাসিমুখে রুবির মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কোন জবাব দিল না।

রুবি কহিল, আপনি হাসছেন, কিন্তু আমি একবিন্দু মিথ্যে বলি নি।

মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখেই কহিল, না আপনি খুব সত্যবাদী।

রুবির দুই চোখে বিস্ময়! মৃন্ময় বলিতে চায় কি! তার এত উদ্যোগ-আয়োজন সবই কি এই লোকটি ব্যর্থ করিয়া দিবে। মৃন্ময়ের আজিকার ইঙ্গিতগুলি কেমন যেন অর্থপূর্ণ। শেষ পর্য্যন্ত ঘাটে আসিয়া কি ভরাডুবি হইবে?

ভরা কিন্তু ডুবিল না।

মৃন্ময় তার প্রতিশ্রুতি পালন করিবে।

১৫

যাত্রার পূর্ব্বে কাজটা যত জটিল বলিয়া মৃন্ময়ের মনে হইয়াছিল আসলে তাহার কিছুই হইল না। মৃন্ময় দাদা—লিলি তার ছোট বোন, বিধবা। সদ্য স্বামী হারাইয়াছে।

মিথ্যা…হোক মিথ্যা—এমন কত মিথ্যাই ত সত্য হইয়া জগতে টিকিয়া আছে। কে তাহার খোঁজ নেয়।

অমাবস্তার অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ীখানা নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। লিলি জড়সড় হইয়া শুইয়া আছে। নিদ্রিত কিংবা জাগ্রত তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। মৃন্ময় একাগ্র দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাহিয়া আছে। মায়া হয়। কত বড় দুশ্চিন্তা লইয়া ঐ মেয়েটি দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটাইয়া দিয়াছে। আজ যদিই-বা একটা কূলের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু কে বলিতে পারে সেখানেও স্থিতিলাভ করিতে পারিবে কিনা! অমন নির্মল স্নিগ্ধ মুখখানিতে দুশ্চিন্তার কালো ছাপ সুপরিস্ফুট। তথাপি ওর সহজ সৌন্দর্য্য এবং শুদ্ধ গাম্ভীর্য্য এতটুকু ব্যাহত হইয়াছে মনে হয় না।

লিলির পরনে একখানি সরুপাড় ধুতি। হাতে দুই গাছা করিয়া সোনার চুড়ি। এ ছাড়া আর অন্য কোন সোজা পথ তাদের চোখে পড়ে নাই। মৃন্ময় মৃদু আপত্তি তুলিয়াছিল। লিলি বাধা দিয়া বলিয়াছে আমার উপযুক্ত বেশভূষাই হয়েছে মৃন্ময়বাবু।

রক্ষা এই যে লিলি অবাঙালীর মধ্যে চলিয়াছে। নইলে কোন্ পথে যে বিপদ ঘনাইয়া আসিত তার সন্ধান পাওয়া কঠিন হইত। মৃন্ময় নিজেও বড় কম বিস্মিত হইল না তার নিজের এই মানসিক চাঞ্চল্যে। লিলি তার কে? তার সম্বন্ধে এত দুশ্চিন্তাই বা কেন? মৃন্ময়ের মন বলে, এগুলি মানুষের সহজ বৃত্তির স্বাভাবিক প্রকাশ।

মৃন্ময় জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ট্রেনের মধ্যে তার ঘুম হয় না। এঞ্জিনের বাঁশী তীব্র রবে বাজিয়া উঠিল। হয়তো কাছাকাছিই কোন ষ্টেশন। ট্রেনের গতিও হ্রাস পাইয়াছে, লোকালয়ের আভাস পাওয়া যাইতেছে যেন। দু'একখানি কুঁড়েঘর ও মিট্‌মিটে আলোর রেখা ক্ষণে ক্ষণে নজরে পড়িতেছে। গাড়ী কিন্তু দাঁড়াইল না। পুনরায় তার গতি দ্রুত হইয়া উঠিল। মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া আছে। ওদিকে লিলি যে বহুক্ষণ হইল উঠিয়াছে তাহা সে টের পায় নাই। সহসা সেইদিকে দৃষ্টি পড়িতেই বলিয়া উঠিল, আপনি কতক্ষণ উঠেছেন?

লিলি কহিল, অনেকক্ষণ। শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না। কিন্তু আপনি বুঝি সেই থেকেই বসে আছেন।

মৃন্ময় কহিল, ট্রেনে আমার ঘুম হয় না। আপনার খানিকটা হয়েছে ত?

ঘুম! লিলি একটুখানি হাসিল, মৃদু কণ্ঠে কহিল, হয়েছে বৈকি। লিলি থামিল, কিছুক্ষণ মৌনভাবে কি চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিল, আপনাকে আমার গোটাকয়েক কথা বলবার ছিল। আর হয়তো সুযোগ পাব না। আপনার এখন সময় হবে কি?

মৃন্ময় কহিল, বিলক্ষণ! সময় কাটাবার ভাবনার হাত থেকে তা হলে বেঁচে যাই যে।

লিলি কহিল, আমি রুবির কথা আপনাকে বলতে চাই। আমি জানি আমার সম্বন্ধে সে সত্যিমিথ্যে অনেক কিছু আপনাকে বলেছে। অনেক ভেবেই আমি প্রতিবাদ করি নি। নিজের যতটা ক্ষতি হবার তা তো হয়েছেই তার উপর আর নূতন করে কথা কাটাকাটি করবার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। তা ছাড়া একজন পুরুষমানুষের সাহায্যের প্রয়োজন আমার ছিল। বহু খবরের মধ্যে সুনির্মলের সঙ্গে আমার বিয়ের খবরটা রুবি নিশ্চয় আপনাকে দেয় নি।

মৃন্ময় প্রায় লাফাইয়া উঠিল। কহিল, আপনি কি বলছেন!

লিলি কহিল, সত্যি কথাই বলেছি। আপনি চমকে উঠছেন কেন। আইন আমার কথার সাক্ষ্য দেবে।

মৃন্ময়ের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে লিলির মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, অথচ আপনি বিনা প্রতিবাদে এত বড় একটা মিথ্যা কলঙ্ক মাথায় তুলে নিলেন!

লিলি শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, মাথা পেতে না নিয়ে আর কি করতে পারি আপনিই বলুন! মামলা-মোকদ্দমা করব? কিন্তু তাতে লাভ হবে কি। খামোকা মিথ্যেটাকেই আরও জীইয়ে রাখা হবে। তা ছাড়া যে লোক এত বড় প্রতারণা করতে পারে সে যে এত সহজে আমাকে মুক্তি দিয়েছে এর জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। আজীবন আমাকে এক মিথ্যাচারী প্রবঞ্চককে নিয়ে দিন কাটাতে হবে না। সহজ ভাবে অন্ততঃ নিঃশ্বাস ফেলতে পারব।

লিলি ক্ষণকাল থামিয়া পুনরায় কহিল, আপনাকে মিথ্যে বলব না মৃন্ময় বাবু। গোপনতার দিন আমার চলে গেছে। আপনি কি মনে করেন সুনির্মলকে ঘাঁটাতে গেলে সে জয়ঢাক পিটিয়ে আমার সুনাম প্রচার করবে। সে বরং আরও নানা হীন ষড়যন্ত্র আমার বিরুদ্ধে চালাবে। এক দিনের মাত্র কয়েক মুহূর্তের চিন্তায় আমি আজ একথা বলছি না। দিনের পর দিন ক্রমাগত ভেবে ভেবেই আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। সুনির্মল অমানুষ বলেই সব মিথ্যার বোঝা আমার মাথায় তুলে নিতে হয়েছে। আমি কি কিছুই বুঝি না মৃন্ময়বাবু!

মৃন্ময় মুখ তুলিয়া চাহিল। ক্ষীণ প্রতিবাদের কণ্ঠে কহিল, কিন্তু…

লিলি বাধা দিয়া কহিল, মিথ্যা যুক্তি দেখাবেন না মৃন্ময় বাবু। যে বিশ্বাস একবার হারিয়ে ফেলেছি তা তো আর ফিরে পাব না। তা বলে আপনি মনে করবেন না যেন আপনাকেও আমি ভুল বুঝেছি, বরং আজ আমার মস্ত বড়

ভরসা এই যে, আপনাকে আমি বন্ধুর মত, ভাইয়ের মত, আমার চরম সঙ্কটের দিনে কাছে পেয়েছি।

মৃন্ময় নীরবে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, আমি আর কিছু ভাবছি না, কিন্তু রুবি আমার সঙ্গে এ ছলনা করলে কেন। কতটুকু লাভ তার এতে হয়েছে? আপনাকে মিথ্যে বলব না লিলি দেবী—রুবির সম্বন্ধে আমার খুব ভাল ধারণাই ছিল। অন্ততঃ এসব নোংরামির মধ্যে তার হাত নেই বলেই বিশ্বাস করেছিলাম।

লিলি কহিল, এর থেকেই রুবিকে অতটা ছোট ভাবছেন কেন? আমারও ভুল হতে পারে ত। তা ছাড়া পারিবারিক স্বার্থের জন্য হয়ত তাকে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছে। এমনও ত হতে পারে যে, সে তার নিজের ইচ্ছায় চলে নি। কাউকেই আমি আর দোষ দিতে চাই না মৃন্ময়বাবু। অপরাধ যা তা আমারই একলার, নইলে আজ আমায় আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলকে ত্যাগ করে এমন করে আত্মগোপন করতে হবে কেন?

মৃন্ময় অকস্মাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, না এ কিছুতেই হতে পারে না। এমনি ক'রে পালিয়ে গিয়ে সবাইকে শুধু মিথ্যেটাই জানতে দেবে, আর সত্যিকারের অপরাধী যারা তাদের গায়ে এতটুকু আঁচ লাগবে না এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। তোমাকে আদালতের সাহায্য নিতে হবে। যা সত্য তা আর দশজনকে জানতে দিতে হবে।

মৃন্ময়কে বাধা দিয়া লিলি কহিল, আদালতের ডিগ্রির জোরে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণিত করতে হবে মৃন্ময়বাবু! লিলি বারকয়েক ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, এ হতেই পারে না। আমি তা পারব না। আমাকে ক্ষমা করুন আপনি।

মৃন্ময় কহিল, আমার কথামত কাজ করলে হয়ত আরও বহু দুর্ভাগা মেয়েকে আপনি ঐ শয়তানের হাত থেকে বাঁচাতে পারতেন। আমার কথটা একটু ভাল করে ভেবে দেখে না হয় পরে এর জবাব দেবেন। কিন্তু আমি ভাবছি একথা আমায় কলকাতায় জানালেন না কেন?

লিলি মৃদুকণ্ঠে কহিল, তাতেই বা কি লাভ হ'ত। কতগুলি বাজে কথা কাটাকাটি ছাড়া কোন উপকারই আমার হ'ত না। তা ছাড়া তখন হয়ত আমার কথা আপনিও বিশ্বাস করতেন না।

মৃন্ময় শান্তকণ্ঠে কহিল, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আপনার কিছুই এসে যেত না। বিশেষ করে আপনার বিয়ের অত বড় প্রমাণ যখন রয়েছে।

লিলি কহিল, আমি হয়ত অবস্থাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি, কিন্তু যেখানে প্রকৃত ভালবাসা নেই সেখানে এ মিথ্যের বেসাতি করে কোন লাভই হ'ত না। মন বলে যে সুনির্ম্মলের কোন বস্তুই নেই, এ আগে জানলে এত বড় শোচনীয় দুর্ঘটনা কখনই ঘটত না।

লিলি ক্ষণকালের জন্য চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, হয়ত আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু সুনির্ম্মলের চিঠিখানা কি আপনি পড়েন নি? যে নিজের একটা খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য এত বড় কলঙ্কের বোঝা বিনা দ্বিধায় আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে সে প্রয়োজনমত যে আরও নীচতার আশ্রয় নেবে না এমন ভরসা কি আপনি দিতে পারেন? আপনি কি জানেন সুনির্ম্মল বিলেত যায় নি—কাছাকাছি থেকেই অবস্থাটা লক্ষ্য করে চলেছে?

মৃন্ময় একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেও নীরব রহিল। তার চোখের সম্মুখে যেন ছায়াচিত্রের অভিনয় চলিয়াছে।

লিলি পুনশ্চ কহিল, আমার মনে হয় আপনি আমার অবস্থাটা এখনও ঠিক বুঝতে পারেন নি তাই একথা বলছেন। আমি বিপদকে বরণ করে নিয়েছি—আত্মরক্ষা করবার উদ্দেশ্যে। আমি বাঁচতে চাই মৃন্ময়বাবু।

লিলির কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। চোখ দুইটাও অশ্রুভারে টল টল করিতেছিল। উভয়েই নীরব। শুধু চলন্ত ট্রেনের অবিশ্রাম একঘেয়ে শব্দ ছাড়া আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। মৃন্ময় পুনরায় বাহিরে দৃষ্টি ফিরাইল। নীরন্ধ্র অন্ধকার। সীমাহীন অন্ধকারের মহাসমুদ্র যেন। সহসা লিলির পানে চাহিয়া মৃন্ময় কহিল, কিন্তু দুঃসাহসিকা আপনি।

লিলি কোন জবাব দিল না। মৃন্ময়ও আর কথা বাড়াইল না। উহাদের লইয়া সে তার অনেক মূল্যবান সময়ের অপচয় করিয়াছে, কিন্তু আর নয়। তা ছাড়া কথাটা লিলি নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই। তাহাকে হয়ত আরও গভীর ষড়যন্ত্রের জালে ফেলিয়া লাঞ্ছনার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িত। হয়ত দাঁড়াইবার মত কোন অবলম্বন লিলি আর খুঁজিয়া পাইত না। এ বরং কতকটা সে ভালই করিয়াছে। কিন্তু কি অপদার্থ এই সুনির্ম্মল! মেয়েদের জীবন লইয়া এমন ছিনিমিনি খেলা খেলিতে তার বিবেকে বিন্দুমাত্র বাধিল না। নিজের সৃষ্টিকে সে দ্বিধাহীন চিত্তে অস্বীকার করিয়া বসিল। মনুষ্যোচিত কোন স্বাভাবিক চেতনা কি তার মধ্যে নাই। খেয়ালটাই কি তার জীবনে এত বড় হইল, যার কাছে বিবেক-বুদ্ধি পর্য্যন্ত তলাইয়া গেল।

সুনির্ম্মলের কাছে লিলি ফুরাইয়া গিয়াছে। তার সম্বন্ধে যতটুকু ঔৎসুক্য তাহা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সুনির্ম্মল তাহাকে বাতিল করিয়াছে। বোকা মেয়ে নিজেকে এত বেশী সস্তা করিতে গিয়েছিলে কেন?

গাড়ী কি একটা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল।

(ক্রমশঃ)

ভারতের জনসম্পদ

শ্রীকস্তুরচাঁদ লালওয়ানী

জনসম্পদের দিক থেকে বিচার করলে ভারতকে একটি দেশ না বলে মহাদেশ বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত হবে। জনসম্পদের প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্যে এদেশ বহু শতাব্দী থেকে মহাদেশ নামের যোগ্য বলেই বিবেচিত হয়ে আসছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আছে বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন আকৃতির বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মের ভাষাভাষী লোক। গুর্খা, পাঠান, শিখ, রাজপুত থেকে আরম্ভ করে এদেশে আছে আর্য্য অনার্য্য, দ্রাবিড়, মোঙ্গল জাতীয় লোক। এদের কারও সঙ্গে সাদৃশ্য আছে প্রাচীন আর্য্যদের, কারও সঙ্গে মালয়, সুমাত্রা ও মাদাগাস্কারের লোকেদের, কারও বা সেমিটিক, মোঙ্গল প্রভৃতি বংশের লোকেদের। দেশী-বিদেশী, নবীন-প্রাচীন রক্তের সংমিশ্রণে বহু শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে ভারতীয় জনসম্পদ।

১। রক্তগত বিভিন্নতা

সারা ভারতে যত লোক আছে তাদের আমরা সাধারণতঃ বাঙালী, আসামী, বিহারী, উৎকলবাসী, ভাটিয়া, মারোয়াড়ী, মারাঠি, মাদ্রাজী, এই সব নামেই জানি। কিন্তু এ ত রক্তের দিক থেকে বিভিন্নতা নয়, এ হ'ল একই প্রদেশে বহু দিন ধরে একই সুখদুঃখের ভিতর বাস করার ফল। তুর্কো-ইরাণী রক্ত ব্রাহুই, বেলুচি ও আফগানদের শিরায় প্রবাহিত; এদের বসবাস উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। এরা দৈর্ঘ্যে মাঝারি আকৃতির চেয়ে কিছু বড়, গৌরবর্ণ, চোখের মণি কালো, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মাথা বেশ চওড়া, নাসিকা উন্নত। পঞ্জাব, রাজপুতানা ও কাশ্মীরের ক্ষত্রী, রাজপুত ও জাঠেদের শরীরে আছে আর্য্যরক্ত। তুর্কো-ইরাণীদের সঙ্গে এদের পার্থক্য খুবই সুস্পষ্ট। যে সব আর্য্য ভারতে বসবাস স্থাপন করেন এরা তাদেরই বংশধর। পরবর্ত্তী কালে এদের শরীরে যে অন্য রক্তের সংমিশ্রণ হয় নি তা নয়; তবে মোটামুটিভাবে আর্য্যদের বৈশিষ্ট্য আজও এদের মধ্যে বেশ দেখা যায়। এরা দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ; এদের চোখের মণি কালো, মাথায় প্রচুর চুল আছে, নাসিকা উন্নত হলেও বেলুচিস্থান বা সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীদের নাকের মত লম্বা নয়। সাইথো-দ্রাবিড় রক্ত পাওয়া যায় মারাঠি ব্রাহ্মণ ও কুনবিশদের মধ্যে এবং কুর্গের অধিবাসীদের মধ্যে। এদের মধ্যে সাইথীয় ও দ্রাবিড় এই দুই রক্তের মিশ্রণ হয়েছে। দ্রাবিড় রক্তের সংমিশ্রণে এদের আকৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, মাথা লম্বা এবং নাসিকা তেমন উন্নত নয়। এদের মধ্যে যারা অভিজাতবংশীয় তাদের শরীরে দ্রাবিড় রক্ত কম; অন্যান্যদের শরীরে দ্রাবিড় রক্তের আধিক্য। এ ছাড়া ভারতে আছে আর্য্য-দ্রাবিড় রক্তের লোক। এরা সাধারণতঃ হিন্দুস্থানী নামে পরিচিত। এদের বসবাস যুক্তপ্রদেশে, বিহার ও রাজপুতানার কোন কোন অঞ্চলে। এদের মধ্যে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ থেকে আরম্ভ করে চামার পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকই আছে। মোঙ্গল-দ্রাবিড় বংশের লোক বাংলা ও উড়িষ্যার অধিবাসী। ছিটেফোঁটা আর্য্যরক্ত যে এদের শরীরে নেই তা নয়। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ থেকে আরম্ভ করে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান পর্য্যন্ত সবাই আছে। ধর্ম্মের দিক থেকে বিভিন্ন হলেও এই প্রদেশের হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে রক্তগত পার্থক্য খুবই কম। এ থেকে একথা বেশ বোঝা যায় যে, এই প্রদেশের কিছু হিন্দু অধিবাসী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছিল। অভিজাতবংশীয়দের মধ্যে সামান্য আর্য্যরক্তের মিশ্রণ হয়েছে। খাঁটি মোঙ্গল রক্তের লোক পাওয়া যায় হিমালয়-প্রান্তে, নেপাল ও আসামে, এবং দার্জ্জিলিং ও সিকিমে। এদের মাথা চওড়া, রং পীতাভ গৌর, এরা খর্ব্বকায়, মুখ চেপ্টা, নাক থেবড়া। দ্রাবিড়-বংশীয় লোকেদের বাস হ'ল লঙ্কাদ্বীপে, মাদ্রাজে, হায়দ্রাবাদে ও মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতের প্রায় সর্ব্বত্র এবং ছোটনাগপুরে। ভারতের দ্রাবিড়-সভ্যতা অতি প্রাচীন। তার বহু নিদর্শন আজও পাওয়া যায়; পরবর্ত্তী কালে দ্রাবিড়-রক্তের সঙ্গে আর্য্য, সাইথীয়, ও মোঙ্গল রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে। এরা খর্ব্বকায়, গায়ের রং ঘোর কালো, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল আছে, মাথা লম্বা, নাক চওড়া ও চেপ্টা। এই যে বিভিন্ন জাতির লোকের কথা বলা হ'ল এরা এমনভাবে আজ দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং একে অপরের সঙ্গে মিশে গেছে যে, এদের বাসস্থান নিয়ে চুলচেরা বিচার করা কঠিন; তবে ভারতের এক প্রান্ত থেকে যদি অপর প্রান্তে যাওয়া যায় তা হলে এদের পার্থক্য অনেকখানি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং আপনা থেকেই অতি সাধারণ মানুষও এই পার্থক্য ধরে ফেলতে পারে।

২। ভারতের জনসংখ্যা

১৯৪১ সালে ভারতে পুনরায় লোকগণনা হয়। এই গণনা অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা হ'ল ৩৯০০ লক্ষ। তবে এই সংখ্যা যে কতখানি নির্ভুল সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। ১৯৩১ সালে যখন লোকগণনা হয় তখন কংগ্রেস তাতে যোগদান করে নি। ফলে কংগ্রেসের

সমর্থকেরা এই গণনা থেকে বাদ পড়ে যায়। এতে প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির সুবিধা হ'ল। ১৯৩১ সালের পর থেকে দেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে রাজনীতির ভিতর দিয়ে আমাদের সমাজদেহে যে বিষ ঢুকল, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ফলে তা সকল অবস্থার সকল বয়সের লোকের ভিতর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। তাই ১৯৪১ সালে যে লোকগণনা হয় তা প্রহসনে পর্য্যবসিত হ'ল। সকল সম্প্রদায়ের লোকই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অধিক করে দেখাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আদমসুমারির ব্যবস্থা ভাল; গির্জ্জায় বা স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে জন্মমৃত্যুর যে তালিকা থাকে তা থেকে সহজেই লোকসংখ্যা স্থির করে ফেলা চলে। এদেশেও জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা হয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের সাহায্য না নিয়ে কেন যে আদমসুমারির জন্য এত অর্থ ব্যয় করে এক বিরাট প্রহসনের অবতারণা করা হয় তা বোঝা কঠিন। সে যাই হোক, অন্য কোন সংখ্যা যখন হাতের কাছে নেই তখন জনসম্পদের বিশ্লেষণ-ব্যাপারে আমাদের সরকারী সংখ্যার উপরই নির্ভর করতে হবে। এই হিসাব অনুসারে ব্রিটিশ ভারতের জনসংখ্যা হ'ল ২৯৫৮০৮০০০ ও দেশীয় রাজ্যসমূহের জনসংখ্যা ৯৩১৯০০০০, মোট ৩৮৮৯৯৮০০০। ১৮৯১ সালে থেকে গত ৫০ বৎসরে সেই লোকসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩৯.১। ১৯৩১ সালের পর থেকে ১০ বৎসরে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে লোকসংখ্যার শতকরা বৃদ্ধি হয়েছে মোটের উপর ১৫ ভাগেরও বেশী। ১৯৩১ সালে এদেশের জনসংখ্যা ছিল—ব্রিটিশ-ভারতে ২৫৮৭৫৩০০০, দেশীয় রাজ্যে ৭৯৪৬৬০০০, মোট ৩৩৮২১৯০০০। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির এই অনুপাত নীচে দেখানো হ'ল :—

প্রদেশ	শতকরা বৃদ্ধি (১৯৩১-৪১)	দেশীয় রাজ্য	শতকরা বৃদ্ধি (১৯৩১-৪১)
মাদ্রাজ	১১·৬	বরোদা	১৬·৬
বোম্বাই	১৫·৯	কাশ্মীর	১০·৩
বাংলা	২০·৩	হায়দ্রাবাদ	১৩·২
যুক্তপ্রদেশ	১৩·৭	মহীশূর	১১·৮
পাঞ্জাব	২০·৫	কোচীন	১৮·১
বিহার	১২·৩	ইন্দোর	১৪·২
মধ্যপ্রদেশ	৯·৭	মণিপুর	১৪·৯
আসাম	১৮·৩	গোয়ালিয়র	১৩·৭
উড়িষ্যা	৮·৮	দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমষ্টি	১৩·৩
সীমান্ত প্রদেশ	২৫·২	উড়িষ্যার রাজ্যসমষ্টি	১২·৭
সিন্ধু	১৬·৭	রাজপুতানার রাজ্যসমষ্টি	১৮·১
বেলুচিস্তান	৮·২		

৩। জনসংখ্যার চাপ

জনসংখ্যার চাপ বলতে আমরা বুঝি প্রতি বর্গমাইলে গড়ে কত লোক বাস করে বা গড়ে কত লোক তাহার উপর নির্ভর করে। এটা নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের উপর, যেমন ভৌগোলিক অবস্থিতি, জীবন ও ধনের নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মান, অর্থনৈতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক বিকাশ প্রভৃতি। দেশ যদি সমৃদ্ধিশালী হয়, সম্পদের যদি প্রাচুর্য্য থাকে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের যদি সুযোগ সুবিধা থাকে তা হলে সে দেশে জনসংখ্যার যতই বৃদ্ধি হোক না কেন তাতে জীবনযাত্রার মানের উপর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা কোন কালেই ছাড়িয়ে যায় না। প্রত্যেকটি জিনিষেরই বাড়তির মাত্রা আছে; লোকসংখ্যার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু এই সীমারেখার মধ্যে যখন আর্থিক বৃদ্ধিকে ছাপিয়ে ওঠে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার; আমরা তখনই বলি যে, জনসংখ্যার চাপ বেশী হয়েছে। প্রতি বর্গমাইল জমির উপর নির্ভর করে পাঁচ জনই থাক, আর পাঁচ শ' জনই থাক তাতে কিছু যায় আসে না; আর্থিক সমৃদ্ধিই হ'ল আসল মাপকাঠি। যে দেশ সমৃদ্ধিশালী, যার সঙ্গতি আছে, তার প্রতি বর্গমাইলে পাঁচ শ' লোকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হওয়াও কিছু কঠিন নয়। আর যে দেশ হয়ে পড়েছে নিঃস্ব, সর্ব্বহারা, তার পক্ষে পাঁচ জন লোকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাও কঠিন। ইংলণ্ড ও ওয়েলসে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার চাপ হ'ল ৬৮৫; অথচ তারা বেশ আছে। আর আমাদের দেশে জনসংখ্যার চাপ মাত্র ২৪৬; অথচ এতেই আমরা ম্যালথাসের থিওরী আওতাতে থাকি। শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা উন্নত হওয়ায় ইংলণ্ডে এত বেশী লোকের চাপও কিছুই নয়। আমাদের আর্থিক উন্নতি স্বল্পই হয়েছে; তাই সামান্য জনসমষ্টিকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার সামর্থ্যও আমাদের নেই বললেই চলে। আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল এই যে, 'শিল্পবিপ্লবের' আগে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই জনসংখ্যার চাপ ছিল খুবই কম। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর থেকে সকল দেশেই জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, যত দিন কৃষিই কোনও দেশের লোকের জীবিকার প্রধান অবলম্বন থাকে তত দিন সে দেশে কৃষির চরম উৎকর্ষের অবস্থায় প্রতি বর্গমাইলে ২৫০ জনের বেশী লোকের বসতি সমীচীন নয়; কারণ তাতে জীবনযাত্রার মান ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা নেমে যাবার আশঙ্কা খুব বেশী থাকে। এ হ'ল ঊর্দ্ধতম সংখ্যা। বাস্তবিক পক্ষে, পৃথিবীর অনেক দেশেই কৃষির চরম উৎকর্ষ হয় নি; আমাদের দেশে ত মান্ধাতার আমলের অবস্থা আজও প্রায় চলেছে। এ অবস্থায় ২৫০ জন

লোক যদি প্রতি বর্গমাইলে থাকে তা হলে এদেশে দারিদ্র্যের আধিক্য হবে না ত কি ? বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার চাপের তুলনামূলক হিসাব নীচে দেওয়া হ'ল :

দেশ	প্রতিবর্গ মাইলে জনসংখ্যার চাপ	দেশ	প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার চাপ
ইংলণ্ড ও ওয়েলস	৬৮৫ (১৯৩১)	জাপান	৪২৬ (১৯৩৫)
ফ্রান্স	১৯৭ (১৯৩৬)	মিশর	৪৫ (১৯৪৩)
জার্ম্মানী	৩৮২ (১৯৩৯)	আর্জেন্টাইন	১৩ (১৯৪৫)
বেলজিয়ম	৭০৮ (১৯৪৪)	ব্রেজিল	১২'৬ (১৯৪০)
রুশিয়া	২০'৮ (১৯৩৯)	যুক্তরাষ্ট্র	৪০'৮ (১৯৪০)
চীন	১০২ (১৯৩৬)	কানাডা	৩ (১৯৪১)
ভারতবর্ষ	২৪৫ (১৯৪১)	মেক্সিকো	২৫ (১৯৪০)

উপরে কয়েকটি দেশের নাম করা হয়েছে। এদের মধ্যে যেগুলি শিল্পপ্রধান সেগুলির জনসংখ্যা খুব বেশী বটে ; কিন্তু সেই জনসংখ্যাকে ভরণপোষণ করাবার সামর্থ্য তাদের আছে। কৃষিপ্রধান দেশগুলির মধ্যে কিন্তু ভারতবর্ষেই জনসংখ্যার চাপ সব চেয়ে বেশী। এদেশের অনুপাতে অন্যান্ত কৃষিপ্রধান দেশে জনসংখ্যার চাপ নগণ্য বলা চলে। তাই সে সকল দেশের কৃষিও উন্নত, জনসাধারণও প্রগতিশীল। এদেশে লোক-সংখ্যার চাপেই কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে।

৪। বিভিন্ন প্রদেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। বাংলাদেশে জনসংখ্যার চাপ যত বেশী, সিন্ধু বা রাজপুতানায় সে অনুপাতে অনেক কম। আবার পূর্ব্ববঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার চাপ অনেক কম। এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত কারণগুলি কাজ করছে। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি কারণে পূর্ব্ববঙ্গের লোকসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ব্ববঙ্গের উর্ব্বরা জমিতে অল্প আয়াসেই সোনা ফলে। অপর পক্ষে, সিন্ধু, রাজপুতানা প্রভৃতির অনুর্ব্বর জমিতে লোকে নির্ভর করবে কিসের উপর ? তাই বহুদিন থেকেই এই সব অঞ্চলের লোক জীবিকা উপার্জ্জনের জন্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তবে বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা যতই উন্নত হতে থাকবে, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যাকে ভরণপোষণ করাবার সামর্থ্য যতই তাদের বাড়বে, ততই এই সব অঞ্চলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাই ভারতের যে সব অঞ্চল পিছিয়ে ছিল, যাদের আর্থিক উন্নতি আরম্ভ হয়েছে বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাদের জনসংখ্যা গত ৫০ বৎসর ধরে চলেছে বাড়তির পথে, আর যে সব প্রদেশের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি একই রকম রয়েছে তাদের জনসংখ্যা বাড়লেও আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধির পরিমাণ কম হয়েছে। পৃষ্ঠার সর্ব্বনিম্নে প্রদত্ত হিসাব থেকে বিষয়টি বেশ বোঝা যায়।

৫। ধর্ম্মানুক্রমিক জনসংখ্যা

জনসংখ্যার ধর্ম্মানুক্রমিক হিসাব রাখার বিপদ আছে যথেষ্ট। ১৯৪১ সালের আদমসুমারিতে এর ফলে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যার ফলে আদমসুমারি প্রহসনে পরিণত হয় সে কথা ইতিপূর্ব্বেই বলেছি। কারণ এতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ আরও উগ্র হয়ে উঠল। ১৯৪১ সালের আদমসুমারিতে "ধর্ম্ম"কে বাদ দিয়ে লোকগণনা হয় "সম্প্রদায়" হিসাবে—হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, উপজাতীয়, এইভাবে নয় ; হিন্দু (তপশীলী ও অন্ত), মুসলমান, উপজাতীয়, শিখ, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোক এই ভাবে। ১৯৩১ সালে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৬৮'২৪, মুসলমানদের ২২'১৬, বৌদ্ধদের ৩'৬৫, উপজাতীয়দের ২'৩৯, খ্রীষ্টানদের ১'৭৯ ও অন্তান্ত ১'৭৭। ১৯৪১ সালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা ছিল নিম্নলিখিত প্রকার : (হিসাব—'০০০,০০০)

সম্প্রদায়		ব্রিটিশ ভারত	দেশীয় রাজ্য
হিন্দু	তপশীলী	৩৯'৯	৮'৯
	অন্ত	১৫০'৯	৫৫'২
মুসলমান		৭৯:৪	১৫:০
উপজাতীয়		১৬'৭	৮'৭
শিখ		৪'২	১'৫
খ্রীষ্টান		৩'৫	২'৮
অন্তান্ত		১'২	১'০

দক্ষিণ ও মধ্যভারত এবং মাদ্রাজ প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যায়

প্রদেশ	১৮৮১-৯১	১৮৯১-১৯০১	১৯০১-১১	১৯১১-২১	১৯২১-৩১	১৯৩১-৪১
বাংলা	+ ৭'৬	+৭'৮	+ ৭'৯	+২'৭	+ ৭'৩	+২০'৩
বিহার-উড়িষ্যা	+ ৬'১	+১'১	+ ৩'৮	−১'৪	+১০'৮	+১২'৩ ৮'৮
বোম্বাই	+১৪'৪	−১'৮	+ ৬'০	−১'৮	+১৩'৩	+১৫'৯
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	+ ৯'৩	−৮'৩	+১৬'২	−০'০	+১১'৫	+ ৯'৭
মাদ্রাজ	+১৫'৬	+৭'৩	+ ৮'৩	+২'২	+১০'৪	+১১'৬
সীমান্ত প্রদেশ	+১১'৫	+৯'৯	+ ৭'৬	+২'৫	+ ৭'৭	+২৫'২
পঞ্জাব	+১০'১	+৬'৯	− ১'৮	+৫'৭	+১৪'০	+২০'৫
যুক্তপ্রদেশ	+ ৬'২	+১'৭	− ১'১	−৩'১	+ ৬'৭	+১৩'৭

অনেক বেশী—শতকরা প্রায় ৮৭ জন। বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা ও বোম্বাই প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যায় অনেক বেশী। সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও কাশ্মীরে প্রায় সবাই মুসলমান; পশ্চিম পঞ্জাব, পূর্ব্ববঙ্গ ও সিন্ধুতে মুসলমানেরা সংখ্যায় বেশী। আসামে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৩৪ জন, যুক্তপ্রদেশে ১৫ জন। শিখদের প্রায় সবাই থাকে পঞ্জাবে এবং জৈনেরা বাস করে রাজপুতানা, আজমীর-মারোয়াড় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে। উপজাতীয় লোকেদের মধ্যে অনেকেই থাকে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামে এবং কিছু কিছু বাংলা, মাদ্রাজ, রাজপুতানা ও মধ্যভারতে। খ্রীষ্টানদের মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী লোকই থাকে দক্ষিণ ভারত ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যে। অবশিষ্ট খ্রীষ্টানেরা ছড়িয়ে আছে সারা ভারতে। পার্শী এবং ইহুদীরা প্রধানতঃ বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসী।

৬। বাড়তি ও ক্ষয়ের পথে বিভিন্ন সম্প্রদায়

ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের দিক থেকে জনসংখ্যার কথা বলতে গিয়ে আরও দু-একটি বিষয় বলা দরকার। ভারতের জনসংখ্যা যে ভাবে ও যে হারে বাড়ছে তার অর্থনৈতিক বিচার পরে করা যাবে। তবে ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা সমান ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১০'৪, মুসলমানদের ১৩'০, শিখদের ৩৩'৯ এবং খৃষ্টানদের ৩২'৫ ও উপজাতীয় সংখ্যা কমেছে শতকরা ১৫'৩। এ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে উপজাতীয় লোকেরা চলেছে ক্ষয়ের পথে। হিন্দুদের সংখ্যা কিছু বাড়ছে বটে; কিন্তু বৃদ্ধির হার খুবই কম। যে অনুপাতে হিন্দুদের সংখ্যা বাড়ছে মৃত্যুর অনুপাত তার চেয়ে অনেক বেশী। তাই মোটের উপর হিন্দুরাও চলেছে ক্ষয়ের পথে। এর প্রতিকারের জন্যে চাই বৈজ্ঞানিক প্রজনন-পদ্ধতি ও সম্ভব হলে নূতন রক্তের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। মুসলমানদের সংখ্যা এখন বাড়তির পথে চলেছে। জীববিদ্যাবিষয়ক সিদ্ধান্ত (লেখকের 'অর্থশাস্ত্রের রূপরেখা' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে) অনুসারে এই বৃদ্ধি চলবে কিছু দিন ধরে। এর সহায়ক হবে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি। বাড়তি যখন তার চরম সীমায় পৌঁছাবে তখন আসবে একটা সুস্থির ভাব—লোকসংখ্যার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে। তার পরই জাতি চলবে ক্ষয়ের পথে। এই উত্থানপতন, হ্রাসবৃদ্ধির ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে মনুষ্য-সম্প্রদায়। এদেশের শিখ ও খ্রীষ্টানেরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সম্প্রদায়; তাই এরা চলেছে দ্রুত বাড়তির পথে।

৭। ধর্ম্মানুক্রমিক জনসংখ্যার উপর দেশবিভাগের প্রভাব

দেশবিভাগের পর ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩২৭৮০০০০ ও পাকিস্তানের জনসংখ্যা ৬৬১২২০০০। উভয় রাষ্ট্রে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার চাপ হ'ল যথাক্রমে ২৫৫ ও ২০০। তার পর থেকে দেশে বহু পরিবর্ত্তন হয়েছে। জিন্না সাহেব যখন লোকবিনিময়ের যুক্তি দেখিয়েছিলেন সে সময় অনেকেই সেই প্রস্তাবকে অসম্ভব ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু এই প্রস্তাবের সারবত্তা অচিরেই প্রমাণিত হ'ল। তবে বাস্তত্যাগী জনপ্রবাহ হ'ল প্রায় একতরফা। হিন্দুস্থানের মুসলমানেরা প্রায় সবাই হিন্দুস্থানেই থেকে গেল; মধ্যে থেকে বাস্তত্যাগ করতে হ'ল পাকিস্তানের হিন্দুদের। এর ফলে পশ্চিম-পাকিস্তান অর্থাৎ সিন্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত-প্রদেশ ও পশ্চিম-পঞ্জাব আজ প্রায় হিন্দুশূন্য। পূর্ব্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা দলে দলে চলে আসছে পরোক্ষ অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে। ভারত-সরকারের দায় এতে বেড়েছে—শুধু মুসলমানদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার জন্যই নয়; ভবিষ্যৎ অশান্তির কালে এই সব মুসলমান কি ধরণের মনোভাব অবলম্বন করবে সেদিক থেকেও। যেখানে ধর্ম্মগত ঐক্যবোধ এত বেশী সেখানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাময়িক আনুগত্যের উপর নির্ভর করে থাকলে দেশের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা থাকাই স্বাভাবিক। অথচ যথাসময়ে একটু কম উদার হয়ে যদি বাস্তববুদ্ধি অনুসারে ভারতবিভাগের প্রশ্নের মত লোকবিনিময়-ব্যবস্থা মেনে নেওয়া যেত এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যদি এই বিনিময় হ'ত তা হলে কোন অসুবিধারই সৃষ্টি হ'ত না।

৮। যৌন ও বর্ষানুক্রমিক জনসংখ্যা

এবারে যৌন ও বর্ষানুক্রমিক জনসংখ্যার বিচার করব। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিতে এর বিশেষ উপযোগিতা আছে। ১৯৪১-এর আদমসুমারি অনুসারে সারা ভারতে পুরুষের সংখ্যা হ'ল ২০১০২৬০০০ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১৮৭৯৭২০০০ অর্থাৎ প্রতি ১০০০ পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা হ'ল ৯৩৫ জন। ১৯৩১ সালে এই সংখ্যা ছিল ৯৪০ জন। এদিক থেকে অবশ্য চিন্তিত হবার কিছু নেই। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন স্তরের কথা যদি ধরা যায় তা হলে দেখা যাবে যে, মধ্যবিত্ত ঘরে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। আবার সমাজের নীচের স্তরে অনেক স্থলেই মেয়েদের সংখ্যা কম। এর সঠিক হিসাব দেওয়া কঠিন। তবে এই বৈষম্য ধরা পড়ে কতকগুলি সামাজিক প্রথার ভিতর। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কমবেশী পণপ্রথা বিদ্যমান

আছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশী বলে শুধু যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হতে পারছে না তা নয় সেই সঙ্গে যৌতুকপ্রদান প্রভৃতি কুপ্রথাও সমাজের ওপর চেপে বসে আছে। অপরপক্ষে, সমাজের নিম্নতন স্তরে যারা আছে তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। তাই তাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের বেশ প্রচলন আছে—এর জন্ত কোন যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন হয় নি। স্ত্রীলোকদের সংখ্যা সম্বন্ধে আর একটি বক্তব্য এই যে, এদেশে বালিকাদের সংখ্যা অন্ত দেশের তুলনায় বেশী হলেও প্রাপ্তবয়স্কাদের সংখ্যা অন্ত দেশের তুলনায় কম। এর প্রধান কারণ এই যে, মেয়েরা বাল্যাবস্থায় অর্থ-নৈতিক এবং অন্তবিধ কারণে উপযুক্ত যত্ন পায় না; এ ছাড়া প্রায়ই তাদের বিবাহ হয় অল্প বয়সে। অল্প বয়সে সন্তান হওয়ায় এবং পর পর অনেকগুলি সন্তানের জননী হওয়ায় তাদের জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হতে থাকে। পর্দাপ্রথাও স্ত্রীলোকদের স্বাস্থ্যভঙ্গের অন্যতম কারণ—বিশেষ করে বড় বড় শহরে যেখানে জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপে একটু খোলা হাওয়া পাওয়াও তাদের অনেকের পক্ষেই কঠিন। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কাদের অকালমৃত্যুর প্রধান কারণই হ'ল অল্প-বয়সে বিবাহ। আমাদের দেশেই যে সব অঞ্চলে বিবাহের বয়স কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সে সব অঞ্চলে কিছু ব্যতিক্রমও দেখতে পাওয়া যায়। বরোদা ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে বিবাহের বয়স সামান্ত একটু বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে শিশুমৃত্যু যেমন কমেছে তেমনি মেয়েদের জীবনীশক্তিও কিছু বেড়েছে। বিধবাদের সংখ্যাও আমাদের দেশে নিতান্ত কম নয়। এখানে শতকরা প্রায় ১৬ জন স্ত্রীলোক অল্প বয়সে বিধবা হয়; পূর্ণবয়স্কা বিধবারা এই হিসাবের বাইরে। ইংলণ্ডে অল্পবয়স্কা বিধবার সংখ্যা শতকরা ৮। এদের মধ্যে অনেকেই পুনর্বিবাহ করে। কিন্তু আমাদের এদেশের শত-করা ১৬ জন স্ত্রীলোকই মাতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় সামাজিক অব্যবস্থার ফলে। বিধবাদের এরূপ সংখ্যাধিক্যের মূলেও রয়েছে অল্প বয়সে বিবাহ। অবশ্য গত ৫০ বৎসরে বিধবাদের সংখ্যা কিছু কমেছে। ১৯০১ সালে সারা ভারতে প্রতি হাজারকরা ১৫ থেকে ৪০ বৎসরবয়স্কা বিধবাদের সংখ্যা ছিল ১৩৭। ১৯৩১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১১২তে। তন্মধ্যে আবার বাংলাদেশে বিধবাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। বাংলা-দেশে ১৯০১ সালে ১৫ থেকে ৪০ বৎসর বয়স্কা বিধবাদের সংখ্যা ছিল প্রতি হাজারে ২৪০; ১৯৩১ সালে এই সংখ্যা হ'ল ১৫৫। পঞ্জাবে বিধবাদের সংখ্যা সব চেয়ে কম—হাজারে মাত্র ৬৭ জন। ভারতবর্ষে বিভিন্ন বয়সে অবিবাহিতা স্ত্রীলোক ও বিধবাদের সংখ্যা নীচে দেওয়া হ'ল:—

(১৯৩১ সালের হিসাব)

বয়স	মোট স্ত্রীলোক	অবিবাহিতা	বিধবা	মোট স্ত্রীলোকের অনুপাতে অবিবাহিতা ও বিধবা স্ত্রীলোক (শতকরা)
১৫-২০	১৫৮৯৭৫১৪	২৩৬০৯৮৪	৫৩২৭৬২	১৮·২
২০-২৫	১৬৬৯৮০৯৬	১০২৯৭৭৩	৪৭৬৬৩৫	১১·৪
২৫-৩০	১৪৭২৪৫৬৫	৩৫৪৮৭৮	১৫৮০২০০	১৩·১
৩০-৩৫	১২৮১০৪৮৬	২৪৮৯৩৪	১৯৯৯৫৮৩	১৭·৫
৩৫-৪০	১০০৮৪৮৮৮	১৪৫৭০৮	২৮৪৮০৪৩	২৯ ৬

এবারে বয়সের দিক দিয়ে জনসংখ্যার বিচার করা যাক। এদিক থেকে গত ৬০ বৎসরে ভারতীয় জনসংখ্যার হিসাব নিম্নলিখিত প্রকার:—

(প্রতি হাজারে)

	১৮৯১		১৯০১		১৯১১		১৯২১		১৯৩১	
বয়স	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
০-১০	২৮৩·৭	২৯২·৩	২৬৪·৮	২৭২·১	২৭১·০	২৮১·৬	২৬৭·৩	২৮১·০	২৮০·২	২৮৮·৯
১০-২০	১৯৭·৪	১৭৫·৮	২১৩·০	১৯১·৭	২০১·৩	১৮২·৩	২০৮·৭	১৮৯·৬	২০৮·৬	২০৬·২
২০-৩০	১৬৭·৮	১৮০·১	১৬৬·৬	১৭৮·৭	১৭১·৮	১৮৯·৯	১৬৪·০	১৭৬·৬	১৭৬·৮	১৮৫·৬
৩০-৪০	১৪৫·৫	১৪০·১	১৪৫·৭	১৪০·৮	১৪৫·১	১৩৯·১	১৪৬·১	১৩৯·৮	১৪৩·১	১৩৫·১
৪০-৫০	১০০·৪	৯৪·৯	১০১·৯	৯৯·১	১০১·৪	৯৬·৯	১০১·৩	৯৬·৭	৯৬·৮	৮৯·১
৫০-৬০	৫৯·০	৫৯·৬	৬১·৪	৬২·১	৬০·৯	৬০·৭	৬১·৯	৬০·৬	৫৬·১	৫৪·৫
৬০-৭০	—	—	—	—	৩৪·০	৩৮·০	৩৪·৭	৩৭·৭	২৬·৯	২৮·১
৭০ ও তদূর্ধ্ব	৪৬·২	৫৭·৩	৪৬·৬	৫৫·৫	১৪·৫	১৭·৫	১৬·০	১৮·০	১১·৫	১২·৫

এদেশে শিশুদের জন্ম সংখ্যা হ'ল সব চেয়ে বেশী। কিন্তু জন্মহারের ন্যায় এদেশে শিশুমৃত্যুর হারও অত্যধিক। পাশ্চাত্ত্যের অনেক দেশেই শিশুদের সংখ্যা কম। এটা কিন্তু শিশুমৃত্যুর জন্যে নয়; এ হ'ল জন্মের হার কম বলে। বিষয়টি নীচের হিসাব থেকে বোঝা যাবে:—

বয়স	জাপান	ইটালী	জার্ম্মানী	ইংলণ্ড ও ওয়েলস	যুক্তরাষ্ট্র	ফ্রান্স
০-১০	২৫৪	১১০	১৫৮	১৮১	২১৭	১৩৯
১০-২০	২১২	২০৯	২০৫	১৯০	১৯০	১৭৭
২০-৩০	১৫৮	১৬১	১৮৪	১৬১	১৭৪	১৫০
৩০-৪০	১২০	১২৯	১৪২	১৪৬	১৫০	১৪৩
৪০-৫০	১০৫	১০৬	১২৮	১৩২	১১৫	১৩৮
৫০-৬০	৭৪	৮৭	৯৬·	৯৬	৭৯	১১৪
৬০ ও তদূর্দ্ধ	৭৭	১০৯	৯২	৯৪	৭৫	১৪০

উপরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য সব দেশেই শিশুদের সংখ্যা কম। ভারতীয় জনসংখ্যার সঙ্গে অন্য দেশের জনসংখ্যার পার্থক্য হ'ল এই যে, এদেশে বিভিন্ন বয়সের লোকের সংখ্যায় পার্থক্য খুব বেশী; অন্যদেশে এই পার্থক্য খুব কম। আমাদের দেশে উর্দ্ধতম সংখ্যা হ'ল ২৮৮·৯ এবং নিম্নতম সংখ্যা ১১·৫। এ দুয়ের ব্যবধান কত বেশী। বয়স্ক লোকেদের সংখ্যা এদেশে গত ৬০ বৎসর ধরে দ্রুত কমে চলেছে। ১৮৯১ সালে ৭০ বা তার চেয়ে অধিক বৎসর বয়স্ক লোকের সংখ্যা ছিল প্রতি হাজারে ৪৬·২; ১৯৩১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র ১১·৫-এ। অথচ ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশে বৃদ্ধদের সংখ্যা প্রায় শিশুদেরই সমান। ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশেও বৃদ্ধদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। প্রৌঢ় (৪০ থেকে ৫০ বৎসর) লোকদের সংখ্যাও বেশ কমেছে; অথচ অন্যান্য দেশে প্রৌঢ়দের মৃত্যুহার সবচেয়ে কম; আর দেশের সকল ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব করে এরাই। আমাদের দেশে পঞ্চাশের উপরে গেলেই পরকালের চিন্তা এসে পড়ে, মানুষ অবসর গ্রহণ করতে চায়। তাই এদেশে কর্ম্মক্ষম লোকের বয়স হ'ল ১৫ থেকে ৪০; ইউরোপে ১৫ থেকে ৬০ বা ৬৫ বৎসর। এর ফলে এদেশে কর্ম্মক্ষম লোকের সংখ্যা হ'ল শতকরা ৪০; ফ্রান্সে শতকরা ৫৩; ইংলণ্ডে ৬০। এদিক থেকেও আমাদের জনসম্পদের দৈন্যের কথা স্বীকার করতে হবে। কারণ পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির তুলনায় এদেশে কর্ম্মক্ষম লোকের সংখ্যা শতকরা প্রায় ২০ জন কম। কর্ম্মক্ষম লোকের সংখ্যা বাড়ানও আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ এরাই দেশকে শ্রীমণ্ডিত করতে পারবে। এর জন্য এক দিকে যেমন জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন আবশ্যক, অন্য দিকে তেমনি আবার লোকের জীবনীশক্তি বাড়াবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। ১৯২০ সালের পর থেকে অবশ্য মৃত্যুর হার অনেকখানি কমেছে; কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় আমরা যে আজও অনেক পিছিয়ে আছি তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

৯। যৌন ও বর্ষানুক্রমিক জনসংখ্যায় হ্রাসবৃদ্ধি

যৌন ও বর্ষানুক্রমিক জনসংখ্যায় হ্রাসবৃদ্ধির তিনটি মূল কারণ আছে। প্রথমটি হ'ল জন্মহারের তারতম্য; দ্বিতীয়টি মৃত্যুহারের তারতম্য; এবং তৃতীয়, ব্যাধির প্রকোপ। ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে জন্ম ও মৃত্যুহার নির্ভর করে ফসলের উপর। ফসল যদি ভাল হয় তা হলে জন্মহার বাড়বে, মৃত্যুহার কমবে। ঠিক উলটো ফল ফলবে ফসল খারাপ হলে। ব্যাধির প্রকোপের সঙ্গেও জনসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। আবার ব্যাধিরও প্রকারভেদ আছে। সব রকমের ব্যাধি সকল বয়সের লোকের হয় না। যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা; এই ব্যাধি বৃদ্ধদের বড় একটা হয় না, শিশুরা ও যুবকেরাই এই রোগে আক্রান্ত হয়। যে দেশে এই ব্যাধির প্রকোপ বেশী হবে সে দেশে প্রজননশক্তিও আপনা থেকেই কমে আসে। পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে আজ এই ব্যাধি প্রায় নির্ব্বাসিত হয়েছে। কিন্তু এদেশে এর প্রকোপ খুব বেশী। ম্যালেরিয়ার প্রভাবও ঠিক একই ধরণের। তবে এর আর একটি বিশেষত্ব হ'ল এই যে, ম্যালেরিয়ার প্রভাব যেন মেয়েদের উপরই বেশী। এদেশের মেয়েরা প্রায়ই নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপযুক্ত যত্ন নেয় না; পুরুষেরাও এ বিষয়ে প্রায় উদাসীন। এ অবস্থায় মেয়েদের শরীরে যে ম্যালেরিয়ার বীজ প্রবেশলাভ করে তা যেন স্থায়ীভাবে আড্ডা গেড়ে বসে। এতে মেয়েদের গর্ভধারণ-ক্ষমতা প্রায় হ্রাস পায়। ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোকের সন্তানও স্বভাবতই দুর্ব্বল, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাবিহীন হয়ে থাকে। উপরি-উক্ত তিনটি কারণ ছাড়া জন্মহার নির্ভর করে আর একটি বিষয়ের উপর। সেটি হ'ল স্থানান্তর-গমন। কৃষিপ্রধান দেশে জনসমষ্টিকে নির্ভর করতে হয় অনিশ্চিত নৈসর্গিক কারণের উপর। অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে যদি ফসল নষ্ট হয়ে যায় তা হলে গ্রাম থেকে বহু লোক চলে আসে সহরে রোজগারের আশায়। এদের অধিকাংশই যুবক। ফলে গ্রামাঞ্চলে লোকসংখ্যা কমতে থাকে। ফসল যদি ভাল হয় তা হলে তাদের শহরে আসার কোন প্রয়োজনই হয় না।

বীরভূমের জাতি-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌরীহর মিত্র

বীরভূমে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতি বাস করে তন্মধ্যে কতকগুলির আচার-ব্যবহার রীতিনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

ঢেকারু—বীরভূমের লাঙ্গুলে, বেড়েলা, কানমোড়া, মহুলা, জাহানাবাদ, রামপুর, টাপডুমরো, কুঁইড়ে (কুন্তিরা), হরিপুর, কুশুটিয়া, বান্দরগুলী, মল্লিকপুর, ভাদুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে সহস্রাধিক ঢেকারু জাতির লোকের বাস। এই জাতির আদি নিবাস কিন্তু বীরভূম নহে। মহম্মদবাজার, ডেঙচা, ডামরা, গণপুর প্রভৃতি গ্রামে লৌহ-নিষ্কাশন জন্য ইহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম দেশ হইতে আনীত হয়। লৌহ-নিষ্কাশন ইহাদের জাতীয় ব্যবসায় এবং লৌহশিল্পের জন্মদাতা বলিয়া ইহাদিগকে "জন্মকার" বা "কর্ম্মকার" বলা হয়। আবার অতিরিক্ত মদ্যপান হেতু ইহারা ঢিকার (ঢক্ ঢক্ করিয়া মদ্য-পান করা) জাতি বলিয়া অভিহিত হয়। তৎকালে কয়েক বৎসর এ জেলার উপরি-উক্ত বিভিন্ন স্থানসমূহে লৌহ নিষ্কাশিত হইবার পর কারখানাগুলি বন্ধ হইয়া গেলে ইহারা স্ত্রীপুরুষে দস্যুবৃত্তির দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টায় রত হয় এবং অল্প-কাল মধ্যেই ইহাতে তাহারা বিশেষ দক্ষ হইয়া উঠে। কিন্তু সরকার বাহাদুরের অক্লান্ত চেষ্টায় ইহারা এই নিন্দনীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহারা লোহার জিনিষ এবং মিশ্রিত পিতলের মাপা সের, পাই, পোয়া ইত্যাদি তৈরি করিয়া থাকে।

ইহারা দেখিতে বলিষ্ঠকায় এবং মাল বাগ্দীদের অপেক্ষা ইহাদের আকৃতি সুন্দর। ইহাদের গায়ের রঙ ময়লা। ইহাদের মেয়েদের দেহের গঠনও সুঠাম এবং মজবুত। ইহারা এ জেলায় আসিয়া বাংলা শিখিয়াছে, তবে ইহারা নিজেদের মধ্যে ভাঙা খোট্টাই ভাষার মত এক প্রকার ভাষায় কথা বলে।

ইহাদের টটেম বা সগোত্র মেষ। এই হেতু ইহারা মেষ ভক্ষণ করে না, তবে শূকর ও গোমাংসে ইহাদের আপত্তি নাই। চিচিঙ্গা এবং বেনে কুমড়া ইহাদের অভক্ষ্য ও অস্পৃশ্য। কারণ তাহাদের মতে প্রথমটি মেষের শৃঙ্গ এবং দ্বিতীয়টি মেষের উদর। ইহাদের গোত্র এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, এক কামার ভোজে মেষ-মাংস পরিবেশন করিবার অভিলাষ করিয়া একটি মেষ বলি দিলে ঐ দ্বিখণ্ডিত মেষ তৎক্ষণাৎ আকাশে উড়িয়া গিয়া তিন বার ঘুরপাক খাইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। সেই অবধি ইহাদের ধারণা যে মেষ তাহাদের আদি পুরুষ। আর কামার মেষ-ঘাতক বলিয়া সমাজ-পরিত্যক্ত হয় ও অপর দল স্বতন্ত্র জাতিতে পরি-গণিত হয়।

ইহাদের মেয়েরা ঘরের বাহিরে অপরের কোন কাজকর্ম্ম করে না। ঢেকারু জাতির মধ্যে "সাঙা" বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও তাহা নিতান্তই বিরল। কেবলমাত্র বালিকা-বিধবাদের সাঙা দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

অতি অল্প বয়সেই ইহাদের বিবাহ হয়। বিবাহে বর-পক্ষকে কন্যাপক্ষের হস্তে অবস্থাবিশেষে চারি টাকা হইতে ষাট টাকা পর্য্যন্ত পণ বাবদ দিতে হয়। বরপক্ষ নিতান্ত দরিদ্র হইলে কন্যাপণের হাত হইতে রেহাই পায়। পাছে জাত্যন্তর গ্রহণ করে এই আশঙ্কায় তাহাকে উক্ত দাবি হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়।

ঠাকুর, গুরু বা সমাজের প্রধান ব্যক্তির দ্বারা বিবাহের দিন স্থির করা হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে বরের দক্ষিণ হস্তের এবং কন্যার বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নখ ব্যতীত অপর সমস্ত অঙ্গুলির নখগুলি কাটিয়া ফেলা হয়। এই অনুষ্ঠানের পরে বর কন্যার বাড়ী বিবাহ করিতে যায়। বিবাহস্থলে পাঁচটি আম্রকলস পূর্ব্ব হইতেই বসানো থাকে। বর আসিবামাত্রই উক্ত কলসগুলির মধ্য হইতে, "ছামানি" কলসের জল তাহার মস্তকে ছিটাইয়া দিয়া বসিবার আসন দেওয়া হয় এবং কন্যাকে বরের নিকট আনা হয়। পরে বর-কন্যাকে কাপড় বা চাদর আবৃত করিয়া পরামাণিক বরের দক্ষিণ হস্তের এবং কন্যার বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ লম্বালম্বি ভাবে কাটিয়া দুই-এক বিন্দু রক্ত বাহির করিয়া দেয় এবং দুই-চারিটি আতপ ঐ রক্ত দ্বারা সিক্ত করিয়া লয়। এই রক্তসিক্ত আতপ লইয়া কন্যার পিতা বা তাহার অনুপস্থিতিতে অন্য কোন অভিভাবক বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করে এবং পরে কিছু কাঁসা, পিতলের বাসন, সামান্য চাউল ও দুই-একটি টাকা বরকে দেয়। বর এইগুলি গ্রহণ করিয়া কন্যার কপোলদেশ সিন্দূররঞ্জিত করিয়া তাহার মাথায় ঘোমটা দিয়া দেয়। এই ভাবে বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিয়ের ভোজে মদ না হইলে চলে না। যেমন করিয়াই হোক মদ যোগাড় করিতে হয়।

ইহারা মৃতদেহ দাহ করে এবং দশ দিন অশৌচ পালন করিয়া থাকে। অশৌচান্তে পশ্চিম হইতে খোট্টা নাপিত আসিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া যায়। খোট্টা নরসুন্দর না হইলে ইহাদের অশৌচ দূর হয় না। অন্য সময় এরূপ কড়াকড়ি বিধান দেখা যায় না। অশৌচান্তে গুরু এবং নাপিতকে যৎসামান্য অর্থদানের ব্যবস্থা আছে।

ঢেকারুরা অনেকেই গলায় মালা ও মস্তকে শিখা ধারণ করিলেও, ইহারা কিন্তু নিরামিষাশী নহে। খয়রাশোল থানার

তাম্বুলিয়া গ্রামের বৈষ্ণব বাবাজীরা ইহাদের গুরুগিরি করিয়া কিছু উপার্জ্জন করে।

মনসা ইহাদের উপাস্য দেবতা। মাঘ মাসে অশ্বত্থমূলে ইহারা বেদী নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার উপর আলিপনা আঁকিয়া নিরাকার মনসার পূজা করে—বেদীর উপর মনসার কোন মূর্ত্তি স্থাপন করা হয় না। পূজায় বলি দিবার প্রথা নাই। মালবাগ্দীরা কিন্তু এই পূজায় ছাগ ও মেষ বলি দিয়া থাকে।

নরী বা মুরী—হেতমপুর, ইলামবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে মুরী জাতির প্রায় তিন শতাধিক লোক বাস করে। ইহাদের আদি নিবাস পশ্চিম অঞ্চলের কোন প্রদেশ। সম্ভবতঃ গালার কারবার উপলক্ষ্যে বীরভূমে ইহাদের আগমন হয়।

পাটনা এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যাহারা গালার কাজ করে তাহাদিগকে লাহেরী বলে। অনুমান এই লাহেরী শব্দটিই প্রথমে লোরী, লারী এবং ক্রমে নরী বা মুরীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

ইহারা গন্ধবণিক বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়। ইহাদের ভিতর পৈঁতালী (গুঁই), ভদ্র, সেন, দাস, লাহা এবং মহলন্দ এই ছয় প্রকার উপাধি দেখা যায়।

পৈঁতালি বা গুঁইদের গোত্র বিষ্ণু, ভদ্রদের বিষ্ণু ও বশিষ্ঠ, সেনদের কুম্ভ, দাসদের বশিষ্ঠ এবং মহলন্দদের মহেন্দ্র বা মাহেন্দ্র।

তন্তুবায় জাতির ন্যায় মুরী জাতির স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই কর্ম্ম-বিভাগ পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। নদীয়া কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পের প্রতিযোগিতায় গালার কারবার উঠিয়া যাওয়ায় মুরীজাতির কেহ কেহ এখন চাষবাসে রত হইয়াছে।

ইহাদের আচার-ব্যবহার নবশাখ জাতির অনুরূপ। নবশাখদের ন্যায় ইহারাও অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ দিয়া থাকে। সাঙ্গা বা বিধবাবিবাহের প্রচলন ইহাদের মধ্যে নাই। বীরভূমের লোকেরা ইহাদের ছোঁয়া জল খায় না; কিন্তু অন্যত্র ইহারা জলাচরণীয়।

ইহাদের ব্রাহ্মণ-গুরু আছে। বর্দ্ধমান জেলার ব্রাহ্মণেরা ইহাদের ক্রিয়াকাণ্ডে পৌরহিত্য করিয়া থাকেন।

বগধ, বাগতীত বা বাগ্দী—ইহারা বীরভূমের অতি প্রাচীন জাতি। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি শুনা যায়। একবার পার্ব্বতী নাকি শিবের চরিত্রবল পরীক্ষার জন্য জেলেনীর বেশ ধারণ করিয়া শিবকে দেখা দেন। শিব জেলেনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গ লাভ করেন। পরে, পার্ব্বতী আত্মপরিচয় দিলে শিব ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান বাগ্দীরূপে পরিচিত হইবে এবং মৎস্য ধরিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিবে।

এই জাতির তেঁতুলে, নোড়া বা দুলে বা ডুলে (যাহারা ডুলি বহন করে), কুসমেটে বা কুশাগ্রয় এবং ক্ষেত্রী বা মেটে বা মাহান্তো এই চারিটি শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে তেঁতুলিয়াই শ্রেষ্ঠ। ডুলেরা নিম্নশ্রেণী বলিয়া গণ্য। ডুলে ব্যতীত অপর তিন শ্রেণীর ভিতর বিবাহের আদান-প্রদান আছে। ত্রয়োদশা নামক আরও একটি শ্রেণীর কথা শুনা যায়। এদের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে মজার গল্প প্রচলিত আছে:—শিবের নাকি কতকগুলি উপপত্নী ছিল। পার্ব্বতী ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া এই উপপত্নীদের অনিষ্টসাধন করিতে আরম্ভ করিলে শিব তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলেন যে, তাঁহার গর্ভে অচিরেই একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করিবে। ফলে পার্ব্বতীর যমজ সন্তান জাত হয়। এই যমজ ভ্রাতা-ভগিনী পরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইহাদের মিলনের ফলে বিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বীরের জন্ম হয়। হাম্বীরের চারি কন্যার নাম শান্ত, নেতু, মান্ত ও ক্ষেতু। এই চারি জন হইতেই উপরি-উক্ত চারি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ইহাদের চার শ্রেণীকেই এক হুঁকায় তামাক খাইতে দেখা যায়।

ইহারা মাছ ধরে, চৌকিদারের কর্ম্ম করে, পাল্কী বহন করে, চাষবাস করে, চূণ তৈয়ারি করে এবং মজুর খাটে। মৎস্য ধরাই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা নয়। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য নানাপ্রকার কর্ম্মে ইহারা লিপ্ত হয়। ইহাদের মেয়েরা জালি লইয়া পুকুরে ছোট ছোট মাছ ধরিয়া যৎসামান্য রোজগার করিয়া থাকে।

ইহারা অতি অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেয়। বিবাহের দিন সকালবেলা প্রথমে মহুয়া গাছের সঙ্গে বরের বিবাহের অভিনয় হয়। বর ঐ গাছকে আলিঙ্গন করে, তার পর উহার গায়ে সিন্দুর লেপিয়া দেয় এবং নিজের ডান হাতের কব্জীতে সূতা বাঁধে। বৃক্ষালিঙ্গনান্তে সূতা দিয়া মহুয়া-পত্র বাঁধে। সন্ধ্যার সময় মিছিল করিয়া বর কন্যার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়। শোভাযাত্রা বাড়ীর উঠানে উপস্থিত হইলে কন্যাপক্ষীয়েরা তাহার গতিরোধ করে। তখন উভয় পক্ষে কৃত্রিম যুদ্ধ হয়। সকল ক্ষেত্রে বরপক্ষই জয়লাভ করে—ইহাই রীতি। শালপল্লবরচিত কুঞ্জের চারি দিকে তেল হলুদ প্রভৃতি রাখিয়া দেওয়া হয়। এই সময় কিছু মাছ দেখাইয়া মেয়েরা বরকে সাদরে অভ্যর্থনা করে। এইরূপ অভ্যর্থনাকে 'ছেচুভি' বলে। ছাঁদনাতলায় একটি ছোট চৌকা গর্ত্ত খনন করা হয়। কনে পল্লবগুচ্ছ হস্তে বিবাহস্থলে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থান শত বার প্রদক্ষিণ করে এবং পরে গর্ত্তটিকে মধ্যস্থলে রাখিয়া বরের মুখোমুখি বসে। পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়া বরকনে উভয়ের এবং কনের কোন বয়োজ্যেষ্ঠা আত্মীয়ার ডান হাত একসঙ্গে বাঁধিয়া কন্যাসম্প্রদানপূর্ব্বক বর-কনেকে আশীর্ব্বাদ করেন। বর সিন্দুরের কৌটা বাম হস্তে লইয়া কনের কপালে ও সিঁথিতে তিন বার সিন্দুর লেপিয়া দিয়া তাহার মাথার

ঘোমটা টানিয়া দেয়। পরে পরস্পর পরস্পরকে ফুলের মালা উপহার দিয়া থাকে। পরদিন বর বধূকে লইয়া নিজ বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বিবাহের পর চার দিন পর্য্যন্ত বর-কনের গাঁটছড়া বাঁধা থাকে।

তেঁতুলে বাগ্দী ব্যতীত অপর সকল শ্রেণীর ভিতর বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাবিবাহে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। বর-কনে সামনাসাম্‌নি হইয়া মাদুরের উপর বসে এবং একে অপরের কপালে হলুদ ও জল ঠেকাইয়া দেয়। পরে চাদর দিয়া বর-কনেকে আচ্ছাদিত করা হইলে বর কনের বাম হস্তে "নোয়া" (লৌহ-বলয়) পরাইয়া দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিধবা ইচ্ছা করিলে তাহার দেবরকেও সাঙ্গা করিতে পারে।

উপযুক্ত কারণ ঘটিলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইতে পারে। সাধারণতঃ স্ত্রী বন্ধ্যা, অসতী, অবাধ্য বা সামাজিক বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে স্বামী তাহার হস্ত হইতে 'নোয়া' খুলিয়া লইয়া একটি কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলে। স্ত্রী ছয় মাস পর্য্যন্ত খোরপোষের দাবি করিতে পারে এবং সে ইচ্ছা করিলে পুনরায় বিবাহও করিতে পারে।

কেহ কোনরূপ অন্যায় আচরণ করিলে সমাজের মাতব্বর-গণ তাহার অপরাধের বিচার করে, তাহাদের বিধান অনুযায়ী দোষীকে জরিমানা দিতে হয়। অন্যথায় সে সমাজ-চ্যুত হয়।

সাধারণতঃ ইহারা শবদেহ নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দেয় বা মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলে, অনেকেই আবার শব দাহ করিয়া অস্থি বা ভস্মাবশেষ গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। তেঁতুলে ও কুশমেটেদের ৩১ দিনে, ত্রয়োদশাদের ১৩ দিনে, নোড়া বা দুলেদের ১১ দিনে অশৌচান্ত হয়।

ইহারা শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে বেলগাছের তলায় বেদী নির্ম্মাণ করিয়া উপদেবতার পূজা করে এবং তদুপলক্ষ্যে ছাগ, মেষ প্রভৃতি বলি দেয়। তাহাদের নিজ সম্প্রদায়েরই একজন পূজা করে। পূজাকালে তাহার উপর দেবতার ভর হয়। এই সময় পূজাস্থানে বহু স্ত্রী-পুরুষকে সমবেত হইতে দেখা যায়।

এতদ্ব্যতীত ইহারা দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা, ষষ্ঠী ঠাকরুণ, জগদ্ধাত্রী, কার্ত্তিক, মনসা প্রভৃতি বিভিন্ন দেবদেবীর ও ধর্ম্মরাজের পূজা করিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, মাঘ ও চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ষাট পূজা এবং ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও চৈত্র মাসে লক্ষ্মীপূজা করিয়া থাকে।

ইহাদের ভিতর শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আছে। তবে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেও মদ্যপান করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাথায় শিখা রাখে এবং গলায় মালা পরে। আবার কেহ কেহ ব্যাঘ্রক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে।

মাল—মাল বাগ্দীশ্রেণীর জাতিবিশেষ। ইহাদের মধ্যে (১) রাজছত্রধারী বা ছত্রধারী, (২) রাজবংশী, (৩) মল্লিক, (৪) পাহাড়ী (৫) কোল ও (৬) কাদর এই ছয়টি শ্রেণী আছে। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের আদানপ্রদান নিষিদ্ধ এবং এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোকের রান্না ভাত খায় না, এমন কি দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এক হুঁকায় ধূমপান পর্য্যন্ত করে না।

ইহারা মৎস্যশিকার, চাষবাস, জনখাটা, চৌকীদারী-কার্য্য ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। রাজছত্রধারীরা মাঝীর কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতে গরু, ছাগল, মেষ প্রভৃতি নানা গৃহপালিত জীবজন্তু থাকে।

উপরি-উক্ত শ্রেণীসমূহের মধ্যে মল্লিকরাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই বিধবাবিবাহের রেওয়াজ আছে। তবে সাধারণতঃ বিপত্নীকেরাই বিধবাকে 'সাঙ্গা' করিয়া থাকে। ইহাদেরও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত আছে। ইহারা কালী, দুর্গা, মনসা প্রভৃতি দেবীর পূজা করিয়া থাকে। উপদেবতার উপাসনাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। ইহারা প্রেত-পূজায় মুরগী বলি দেয় বটে, কিন্তু ইহারা হিন্দুধর্ম্মমতে নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্যাদি আহার করে না। ইহাদের অনেকের গলায় মালা আছে।

ইহারা শব দাহ না করিয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করে।

কেবট বা কৈবর্ত্ত—মনুসংহিতায় দেখা যায় যে, নিষাদ জাতীয় এক পুরুষ মৃত-বস্ত্র-পরিহিতা কদর্য্যান্ন-ভক্ষণকারিণী স্ত্রীর গর্ভে নৌকর্ম্মজীবী দাস বা মার্গব নামক পুত্র উৎপাদন করে। আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী মানবগণ তাহাকে কৈবর্ত্ত জাতীয় বলে। পরশুরাম সংহিতায় লিখিত আছে, স্বর্ণকার পুরুষ ও কুবেরিণী নারীর মিলনের ফলে জাত সন্তান কৈবর্ত্ত জাতীয় নামে পরিচিত। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে যে, গোপ পুরুষ এবং শূদ্র স্ত্রীলোকের মিলনে ধীবর অর্থাৎ কৈবর্ত্ত এবং শুঁড়ি এই দুই জাতির উৎপত্তি হয়। আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে যে, ক্ষত্রিয় পুরুষ দ্বারা বৈশ্য নারীর গর্ভে কৈবর্ত্তের জন্ম হয়।

এই জাতি বীরভূমের বহু পুরাতন অধিবাসী হইলেও ইহাদের আদি নিবাস কিন্তু উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। ইহাদের মধ্যে কেহ চাষী কৈবর্ত্ত, কেহ জেলে কৈবর্ত্ত—কেহ বা আবার চাষবাস এবং মৎস্যশিকার এই উভয় বৃত্তি দ্বারাই জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। ইহাদের প্রধান বৃত্তিই হইল খানা-ডোবা বিল পুকুর ও নদী হইতে বিভিন্ন উপায়ে মৎস্যশিকার করা।

ইহারা শুধু কৈবর্ত্ত নামেই অভিহিত হয় না। ইহাদের পরিচয়জ্ঞাপক নিম্নোক্ত আটটি নাম পাওয়া যায়। (১) ধৈবর বা ধীবর (যাহারা সরোবরের দুই দিকে জাল বাঁধিয়া মাছ ধরে), (২) দাস (বঁড়শী দিয়া যাহারা মাছ ধরে), (৩) বৈন্দ

(বৃক্ষসমূহের নিকটস্থ জলে বিন্দুজাল দিয়া যাহারা মৎস্য-শিকার করে), (৪) শৌণ্ডল (শুণ্ডল বঁড়শী দ্বারা মাছ ধরা যাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়), (৫) কৈবর্ত্ত (বড় জালের সাহায্যে যাহারা মাছ ধরে), (৬) মার্গার (ইহারাও জাল দিয়া মাছ ধরে), (৭) আন্দ (ঘাটে 'সাঙ্কু' বাঁধিয়া যাহারা মাছ ধরে) ও (৮) পর্ণক (বিষাক্ত পাতা জলের উপর ফেলিয়া যাহারা মাছ ধরে)। কিন্তু আমাদের এখানে মাত্র কৈবর্ত্ত, দাস, মার্গার প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়।

এই জাতির স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই মৎস্য বিক্রয় করিতে দেখা যায়। বড় বড় কাতলা মাছ পাইলে ইহারা তাহার মুখের ভিতর হাত পুরিয়া তালুর তৈলযুক্ত অংশ বাহির করিয়া লইয়া কাঁচাই গিলিয়া ফেলে।

এই জাতির ছেলেমেয়েদের অতি শৈশবেই বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সাঙ্গার প্রচলন নাই।

ইহারা প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে প্চুই মদ খায়। এই জাতির প্রায় সকলেই নিরক্ষর, তবে আজকাল কেহ কেহ মাত্র নিজের নাম সহি করিতে পারে।

সদ্গোপ—এই জাতির প্রাচীন নাম গোপ। ইহারা সৎশূদ্র বলিয়া পরিচিত। পরাশরসূত্রে লিখিত আছে যে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্র-কন্যার গর্ভে জাত পুত্রকে সদ্গোপ বলিয়া জানিবে। ইহাদের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলার গোপভূম পরগণা।

অতি প্রাচীনকালে ইহারা বীরভূমে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। এই জাতি নবশাখ বা নবশায়ক নামে গণ্য। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ইহাদের হাতে জল খায় এবং ইহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণরক্ষা করে। কৃষিকার্য্যই ইহাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। ইহাদের মধ্যে বিত্তশালী ব্যক্তি ও জমিদারের অভাব নাই। এই জাতির উপাধি মণ্ডল, ঘোষ, রায়, রায়চৌধুরী প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে অনেকেই লেখাপড়া শিখিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। ঘোষ উপাধিধারী সদ্গোপগণ নীলপুরের ঘোষ বলিয়া খ্যাত। এ সম্বন্ধে একটি ছড়াও প্রচলিত আছে। তাহা এই :—

ধন্য ধন্য বর্দ্ধমান,
চার চণ্ডী বিরাজমান,
উত্তরে কনকা নদী,
মধ্যে গঙ্গা ভাগীরথী,
দেখ প্রভু সনাতন
অনেকে করিয়া রণ
রণ করি নীলপুরে যায়,
নীলপুরে গিয়া দেখি চাষারের স্থান,
এক দিকে বসিলেন যত মুনিগণ
অপর দিকে বসিলেন গোপের নন্দন।
মৃত্তিকা খুঁটিয়া দেখ নাহি কোন দোষ,
সেইজন্য বলি মোরা নীলপুরের ঘোষ॥

ইহাদের ভিতর সাঙ্গা বা বিধবাবিবাহের প্রচলন নাই।

ভল্ল—লাভপুর ও ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধানতঃ এই জাতির বাস। পূর্ব্বে এদেশে সেন প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিধারী যে সমস্ত সামন্ত রাজা রাজত্ব করিতেন, ইহারা তাঁহাদের অধীনে সৈনিকের কর্ম্ম করিত। ইহারা ভল্ল লইয়া যুদ্ধ করিত বলিয়া ভল্ল বা ভল্লা জাতি নামে পরিচিত হয়। ইহাদের বর্ত্তমান আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়াও ইহাদিগকে বীর ও সাহসী বলিয়াই মনে হয়। বাগ্দী-জাতির সহিত নানা দিক দিয়া ইহাদের সাদৃশ্য আছে। বাগ্দীদের সহিত এক হুঁকায় তামাক খাইলেও ইহারা নিজেদের বাগ্দী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া মনে করে।

বাগ্দী-জাতির মত ইহারা মৎস্যশিকার বা পাল্কীবাহকের কার্য্য করে না। ইহারা জন খাটিয়া, চাষবাস করিয়া জীবিকার সংস্থান করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই চৌকীদারী ও সূত্রধরের কর্ম্ম করিয়া থাকে। ইহাদের জীবিকা অর্জ্জনের অন্যতম উপায় হইতেছে দস্যুবৃত্তি। ইহাদের মধ্যে অনেক ওস্তাদ লাঠিয়াল আছে।

বাগ্দীজাতির ন্যায় ইহারাও মদ্যপানে বিশেষ আসক্ত।

লেট—তীবর পুরুষ ও তৈলকার স্ত্রীর মিলনে দস্যু লেটজাতির উৎপত্তি। ইহারা মালবাগ্দীর সমস্তরের জাতি। রামপুরহাট মহকুমা অঞ্চলে প্রধানতঃ ইহাদের বাস। ইহাদের মধ্যে লিতু বা নেতু, কেতু, শাস্ত এবং মন্ত—এই চারিটি শ্রেণী বা থাক্ আছে। তবে এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর বিবাহ সম্বন্ধীয় সম্পর্কের আদান-প্রদান হয় না। এমন কি সমশ্রেণী ব্যতীত অপর শ্রেণীর রান্না পর্য্যন্ত ইহারা খায় না। ইহারা ডাকাতি, দিনমজুরি, জালবোনা, মাছ ধরা প্রভৃতির দ্বারা জীবিকার সংস্থান করে। মালবাগ্দীর সমজাতি হইলেও ইহারা তাহাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া আহার করে না। বাগ্দীরা বলে যে, তাহাদেরই একশ্রেণী হইতে লেট জাতির উৎপত্তি; কিন্তু লেট জাতির লোকেরা এ কথা স্বীকার করে না।

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে বা তাহার খোরপোষের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে। মনসা এবং ধর্ম্মরাজের প্রতি ইহাদের বিশেষ ভক্তি। ইহারা সমারোহের সহিত উক্ত দেবতাদ্বয়ের পূজা করিয়া থাকে।

সাঁওতাল জাতি—এই জাতির সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ বাংলা মাসিক পত্রিকাদিতে বাহির হইয়াছে।

ধাঙড়—এই জাতির লোকদের বীরভূমের বহু স্থানেই দেখা যায়। ইহাদের আদি নিবাস পশ্চিম অঞ্চল। ধাঙড় জাতির মুদি কোড়া, দুরি কোড়া, ধাঙড় ও সাঁওতাল

সদ্গোপ কন্যা

সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ

এই চারিটি শ্রেণী বা থাক্ আছে। এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর বিবাহ হয় না। কথিত আছে যে, ইহারা পূর্ব্বে দীঘি, জলাশয় প্রভৃতি খনন করিত। এইজন্য ইহাদের কোড়া (খোঁড়া বা খনন হইতে) পদবী হইয়াছে। সাঁওতাল জাতির ন্যায় ইহারা সহজে কাহারও উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে না। তবে বিবাহাদি উপলক্ষে ইহারা যে পক্ষের পাল্কী বহন করে সেই পক্ষের বাড়ীতে ভোজন করে।

ইঁদুর ধাঙড় জাতির প্রিয় খাদ্য। ইহারা মদ্যপানে বিশেষ আসক্ত, সারাদিন মজুর খাটিয়া দিনান্তে ইহারা প্রচুর পরিমাণে মদ খায় এবং পরদিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখে। সকালে উঠিয়াই উহা গরম করিয়া গলাধঃকরণ করে। ভাতের সঙ্গে ইহারা ব্যাঙ বা ইঁদুরপোড়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত খাইয়া থাকে। ইহারা দুর্গা, কালী, শিব, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করে। ইহাদের বিবাহে বরপণের রেওয়াজ আছে। কনের বয়স কমপক্ষে ১০।১২ বৎসর এবং বরের বয়স ২০।২২ বৎসর হওয়া উচিত। বিবাহে কন্যাপক্ষের তরফ হইতে ছেলের বাপকে পণস্বরূপ ৭।০ টাকা দিতে হয়। ঐ পণ দিতে না পারিলে বিবাহ হয় না। বিবাহে বরপক্ষকে রূপার ও পিতলের গহনা দিতে হয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বরযাত্রী যায়। বিবাহে কর্ত্তা নিজেই পুরোহিতের কর্ম্ম করে। ইহাদের স্বতন্ত্র পুরোহিত নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহের সময় বর গাছের উপর চড়িয়া বসিয়া থাকে; আর কনে নীচে হইতে বরকে ডাকিয়া বলে—

গাছে থেকে নাম তুমি
মাটি কেটে খাওয়াব আমি।

বিবাহের সময় মাদলের বাজনা ও গীত হয়। মেয়েরা গীতচ্ছলে বরপক্ষকে উপলক্ষ্য করিয়া ঠাট্টা-তামাশা করিয়া থাকে। কোন পরিবারে সন্তানের জন্ম হইলে ইহারা অশৌচ পালন করে। সাধারণতঃ বার কিম্বা মাসের মাঝে ইহাদের ছেলেমেয়েদের নামকরণ হয়। ইহাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা নাই। তবে বিধবাবিবাহ বা সাঙা আছে। পুরুষ যত বার ইচ্ছা তত বার বিবাহ করিতে পারে।

ইহারা শবদাহ করে, ক্ষেত্রবিশেষে গোরও দেয়। ইহারা দশ দিন অশৌচ পালন করিয়া শ্রাদ্ধক্রিয়াদি সম্পন্ন করে। এই সময় জ্ঞাতি-কুটুম্বদিগকে ভাত আর মদ খাওয়াইতে হয়।

ইহারা স্ত্রীপুরুষ উভয়ে প্রধানতঃ মাটি কাটিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। চাষবাসের কাজও ইহারা করিয়া থাকে। ধাঙড় মেয়েরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। ইহারা এক মুহূর্ত্তও আলস্যে অতিবাহিত করে না। অবসর সময়ে ইহারা খেজুর পাতার মাদুর বুনিয়া বাড়তি বেশ দু'পয়সা উপায় করিয়া থাকে। মাঠে ধান তুলিবার সময় উঞ্ছবৃত্তি দ্বারাও ইহারা ধান্যসংগ্রহ করে। সাঁওতাল জাতির মেয়েদের ন্যায় এই জাতির মেয়েরাও গাছে চড়িতে অভ্যস্ত। ইহারা কুর্পের সাহায্যে ধান-চাউলের ধূলাবালি পৃথক করিতে ওস্তাদ। ধাঙড় স্ত্রীলোকেরা শিশু-সন্তানগুলিকে কাপড় দিয়া পিঠে বাঁধিয়া লইয়া কাজকর্ম্ম করিতে বাহির হয়। ইহারা খুব কর্ম্মঠ। সাঁওতাল জাতির ন্যায় ইহারা কখন কখন গো-মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে।

ইহাদের নিজস্ব ভাষা থাকিলেও বাঙালীর সান্নিধ্যে বাস করায় ইহারা বাংলা বুঝিতে ও বলিতে পারে। সাঁওতালদের ন্যায় ইহারা ২০-র বেশী গুনিতে পারে না। ২০-র বেশী গুনিতে হইলে 'এককুড়ি এক' 'এককুড়ি দুই' এই ভাবে গণিয়া থাকে।

ডোম—লেট জাতীয় পুরুষের ঔরসে চণ্ডাল-কন্যার গর্ভে হাড়ি ও ডোম এই দুই সন্তানের জন্ম হয়।

সদ্যশ্চাণ্ডালকন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌ·ক।
বভুবতুর্স্তৌ দ্বৌ পুত্রৌ দুষ্টৌ হড্ডি ডোম্মৌ তথা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ

ইহারা নিজেদের উৎপত্তি ও আদি বাসস্থানের বিষয় কিছুই

সাঁওতালদের মাঝি থান

বলিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে 'বিশ ডেলে' 'আকুড়ে, 'শাজুনে' ও 'বাজুনে' এই চারিটি থাক্ দেখা যায়। শাজুনেরা ঝুড়ি, টোকা, পেছি, ডালি, পাখা, খাঁচা, লাটাই, চিক, ঝাফরি প্রভৃতি বুনিয়া থাকে। বাজুনেরা নহবৎ, ঢোল, কাঁসর, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাদন করে। ইহাদের সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ইচ্ছা করিলে ইহারা শালীকে বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পুরোহিত আছে। পুরোহিত-ঠাকুরকে ইহারা "ধরম পণ্ডিত" বলে। বিবাহে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে।

ডোমজাতির মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আছে। ইহারা কালী, সরস্বতী, মনসা এবং বিশ্বকর্ম্মার পূজা করে। বিশ্বকর্ম্মাকে ইহারা "বিশুকম্‌কর" বলে। ইহারা যে ছোট কাটারি দিয়া বাঁশ কাটে এবং বাঁশের শিল্পদ্রব্যাদি তৈয়ারি করে সেটি ভাদ্র মাসের শেষ দিনে বিশ্বকর্ম্মার পূজায় নিবেদন করে। ইহাদের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন লোকেরা মৃতদেহ দাহ করিয়া তাহার ভস্ম বা অস্থি লইয়া গঙ্গায় দিয়া আসে। সাধারণ গরীব লোকেরা শব নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দেয়। ইহারা গাভীকে "মা লক্ষ্মী" বলে এবং গোজাতিকে বিশেষ সম্মান করে।

ঢোল, কাঁসর, সানাই, রসুনচৌকী, নহবৎ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদন এবং বাঁশের নানাবিধ শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ ইহাদের জাতীয় ব্যবসায়।

হাড়ি—ময়লা পরিষ্কার করা হাড়িদের জাত-ব্যবসা, কিন্তু বীরভূমের হাড়িরা সকলেই মেথরের কর্ম্ম করে না। এখানে (১) ভুঁইমালী, (২) দাই বা মুল হাড়ি, (৩) কাহার এবং (৪) মেথর এই চারি শ্রেণীর হাড়ি আছে। শেষোক্ত শ্রেণীর হাড়িরাই মেথরের কর্ম্ম করিয়া থাকে। মেথর-হাড়িরা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—বাঙালী, মঘয়া ও বাঁশওয়ারী। কাহার-হাড়িরা শূদ্রবরের কর্ম্ম করে। কাহারও দাই-হাড়ির ব্রাহ্মণ-পুরোহিত আছে। ইহাদের মধ্যে কালী-ভক্তের সংখ্যাই বেশী। ইহারা স্ত্রীপুরুষ সকলেই একসঙ্গে বসিয়া সন্ধ্যার সময় হাঁড়ি হাঁড়ি পচুই মদ খায়। ইহারা সময় বিশেষে গো-মাংস ও ইঁদুরপোড়া খাইয়া থাকে।

শৈশবেই ইহারা ছেলেমেয়ের বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া ফেলে। বিবাহ উপলক্ষ্যে স্ত্রী-পুরুষে মদ খাইয়া মাদল-বাদ্যের সহিত একসঙ্গে নৃত্য-গীত করে। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে এই জাতির অনেকেই মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

বাউরি—বীরভূমে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার বাউরির বাস; ইহাদের মোলো, ধোলে, গোবৃরে ও কাহারে—এই চারিটি "থাক্" বা শ্রেণী আছে। প্রবাদ আছে যে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মুনিঋষিদের জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহের কর্ম্ম করিত। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ইহারা অনেকেই ব্যাঙ,

মাঝিরা নাগড়া ও মাদল বাজাইতেছে

শূকর ও গো-মাংস ভক্ষণ করে। ইহারা মুসলমানদের রান্না খায়। ইহাদের মধ্যেও অনেকেই মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

বিবাহের সময় কন্যার কোন পিতৃবন্ধু বরকে কোলে করিয়া ছাদ্‌নাতলায় লইয়া আসে এবং এইরূপভাবে কন্যাকেও তথায় আনা হয়। তৎপরে মালা বদল হইলে বর-কন্যা ঘরের ভিতর যায়। পরদিন কন্যার সিঁথিতে সিন্দুর ও হাতে

কর্ম্মরতা বাউরি রমণী

'নোয়া' পরানো হয়। ইহাদের সমাজে ছোট মেয়েও কোলে চাপিয়া শ্বশুরবাড়ীতে স্বামীর ঘর করিতে যায়।

ইহাদের সমাজে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। পিতা-মাতার মৃত্যুর ৩৬ ঘণ্টা পরে পুত্র নিমপাতা মুখে দিয়া জ্ঞাতির সহিত ভোজন করে এবং পরে আবার নিমপাতা মুখে দেয়। ইহার পর স্নান করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানে এক গুচ্ছ বেনামূল প্রোথিত করে এবং দশ দিন প্রত্যহ স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই বেনামূলে চাউল, ভিজা ছোলার দানা ও জল নিবেদন করিয়া পুনরায় স্নানান্তে বাড়ী ফিরে।

ইহারা চৈত্র-সংক্রান্তি এবং মহালয়ার দিন পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে।

মুচী—তিবর-পিতার ঔরসে এবং চণ্ডাল-মাতার গর্ভে এই মুচী বা চর্ম্মকার জাতির উৎপত্তি। 'তিবরেণৈঃ চণ্ডালাং চর্ম্মকারো বভূব' (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)। ইহারা রুইদাস এবং মুচীরাম দাস নামক দুই সাধু ব্যক্তির বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়।

ইহাদের মধ্যে (১) রুইদাস, (২) গুড়ে, (৩) খোলটা, (৪) শিখুরে, (৫) আদি বা রাঢ়ী ও (৬) কোনাই—এই ছয়টি শ্রেণী আছে।

ইহারা কালী এবং দুর্গার পূজা করে, কিন্তু গো-মাংস খায়।

রুইদাস মুচীদের গলার মালা আছে। তাহারা সাধারণতঃ তাঁতের কাজ করে। অন্যান্য শ্রেণীর মুচীরা জুতা তৈয়ারি, ঢাক বাদন প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে।

(১৫) তন্তুবায়—ইহারা তন্ত্রবাপ, তন্ত্রবায়, তন্ত্রী বা তাঁতি নামে আখ্যাত। এই জাতির স্ত্রী-পুরুষ রেশম, তসর ও সূতার থান, শাড়ী, ধুতি, চাদর, গামছা প্রভৃতি বয়ন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে।

ইহারা উত্তর, মধ্যম, বারেন্দ্র ও পূর্ব্বকুল—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং এই সকল থাকের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। ইহাদের উপাধি দাস, দত্ত, চন্দ্র, কুনার, কুনদাই, পুরো প্রভৃতি। পূর্ব্বোক্ত চারিটি থাক্ ব্যতীত ইহাদের শোনা, ভক্তে, বরবটে, মুসুরে, হাত-বেড়ে প্রভৃতি আরও বাইশটি থাক্ বা শ্রেণী আছে। ইহাদের সমাজে সগোত্র বিবাহের প্রচলন নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ঘৃতাচী বিশ্বকর্ম্মার কোনও আদেশ অমান্য করিলে তিনি তাঁহাকে এই অভিশাপ দেন যে, তাহাকে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ঘৃতাচীও বিশ্বকর্ম্মাকে অনুরূপ অভিশাপ দেন। ফলে, বিশ্বকর্ম্মা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ-বংশে এবং ঘৃতাচী গোপ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঘৃতাচী ঈশ্বরভক্তিপরায়ণা ছিলেন। একদিন

একটি ডোম পরিবার

যখন তিনি গঙ্গাতীরে ধ্যানস্থা তখন ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন এবং অবশেষে তাঁহারা পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। ফলে তাঁহাদের মালাকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, কংসকার, শঙ্খকার, তন্তুবায়, সূত্রধর, স্বর্ণকার ও চিত্রকর—এই নয় পুত্রের জন্মলাভ হয়।

ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে এবং গোপমাতার গর্ভে তন্তুবায়দের জন্ম বলিয়া ইহারা বিশ্বকর্ম্মাকে কুলদেবতা বলিয়া পূজা করে। ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীর দিন এই পূজা হয়।

মাল স্বামী-স্ত্রী

এই জাতি নবশায়ক সম্প্রদায় মধ্যে গণ্য—
"গোপোমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী—
কুলাল কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ।" (পরাশর সংহিতা)

এই জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ-প্রথা নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অধিকাংশই বৈষ্ণব।

তাম্বুলী—তাম্বুলীদের জাতীয় ব্যবসায় পান বিক্রয়। ইহারা তামুলী, তাম্বুলিক, তাম্বুলী বা তাম্লি নামে পরিচিত।

ইহাদের 'পাড়া গেঁয়ে', 'বিয়াল্লিশ গেঁয়ে', 'চৌদ্দ গেঁয়ে' ও 'ময়লা পেড়ে'—এই চারিটি থাক্ বা শ্রেণী আছে। এই সকল থাকের মধ্যে বিবাহাদির আদান-প্রদান হয়। তাম্বুলীদের কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, মৌদ্গল্য প্রভৃতি গোত্র আছে। ইহাদের সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে (৩১, ৯ম অধ্যায় উত্তরখণ্ড) লিখিত আছে যে, বৈশ্য পিতার ঔরসে এবং শূদ্রা মাতার গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি।

"বৈশ্যাত্তু শূদ্রকন্যায়াং জাতস্তাম্বুলিকস্তথা"।

কথিত আছে যে, ইহাদের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলা। তেলেঙ্গা মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে তথায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিলে ইহারা প্রাণভয়ে দেশত্যাগী হয়। ইহারা বহু দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। ইহারা বিশেষ ঘটা করিয়া বৈশাখী পূর্ণিমায় গন্ধেশ্বরী দেবীর পূজা অর্চনা করে। এই পূজার সময় ইহারা নিজেদের ব্যবহৃত জাঁতিগুলোকে দেবীর মূর্ত্তির নিকটে রাখে। ইহাদের ব্রাহ্মণ-পুরোহিত আছে।

কর্ম্মকার—এই জাতির লোকেদের মধ্যে অধিকাংশই কামারের কাজ এবং কেহ কেহ স্বর্ণকারের কর্ম্ম করে। ইহাদের মধ্যে 'মামুদ পুরে', 'উশ ভুলে', 'বন পেশে', এবং 'কামালে'—এই চারিটি থাক্ বা শ্রেণী আছে। ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং শূদ্রকন্যার গর্ভে ইহাদের আদিপুরুষের জন্ম।

কথিত আছে, এই জাতির আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলা। এক সময় বর্দ্ধমানাধিপতির সুবর্ণ-তরবারি হঠাৎ ভাঙিয়া গেলে উহা কিরূপে মেরামত হইবে এই চিন্তায় রাজা উদ্বিগ্ন হন। এই সময় এক কর্ম্মকারের এক চণ্ডাল-ভৃত্য ছিল। সে কর্ম্মকারের কাজ বেশ ভালরূপেই জানিত। চণ্ডাল-ভৃত্য ভগ্ন তরবারিখানি এরূপ নিপুণ ভাবে মেরামত করিয়া দেয় যে, তাহা দেখিয়া রাজা পরম সন্তোষ লাভ করেন। কর্ম্মকার তাহার চণ্ডাল-ভৃত্যের কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিলে রাজা তাহাকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিতে আদেশ দেন। চণ্ডাল-ভৃত্য রাজার নিকট আনীত হইলে রাজা তাহাকে পুরস্কার দিতে চাহিলেন। সে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে কর্ম্মকার-শ্রেণীভুক্ত হইতে চায়। ইহাতে রাজা সম্মতি দিলে কর্ম্মকারগণ অবিলম্বে বর্দ্ধমান পরিত্যাগপূর্ব্বক বিভিন্ন স্থানে গিয়া বসতি স্থাপন করে।

ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ নাই। স্ত্রী গুরুতর অন্যায় করিলে বা ব্যভিচারে লিপ্ত হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। পরিত্যক্তা স্ত্রী অপর স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। স্ত্রী কোন অবস্থায়ই স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে না। ইহাদের কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, আবার কেহ শৈব।

একটি ধাঙড় পরিবার

যদুপতিয়া—ইহা একটি সঙ্করজাতি। মুসলমান ফকিরের ঔরসে ও হিন্দু নারীর গর্ভে এই সঙ্করজাতির উৎপত্তি। ইহাদের আকৃতি হিন্দুর মত। ইহারা অনেকেই হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দুদের ন্যায় নাম রাখে—কালী, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করে এবং ইহাদের ব্রাহ্মণ-পুরোহিতও আছে। ইহাদের মেয়েরা হিন্দু ললনাগণের মত সিঁথিতে সিন্দুর পরে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে আবার কাহারও আল্লা বা খোদার উপর বিশ্বাস। তাহারা দাড়ি রাখে, মসজিদে যায়, পশু জবাই করে, রোজা রাখে, মৃতদেহ গোর দেয় এবং গোমাংস ভক্ষণ করে।

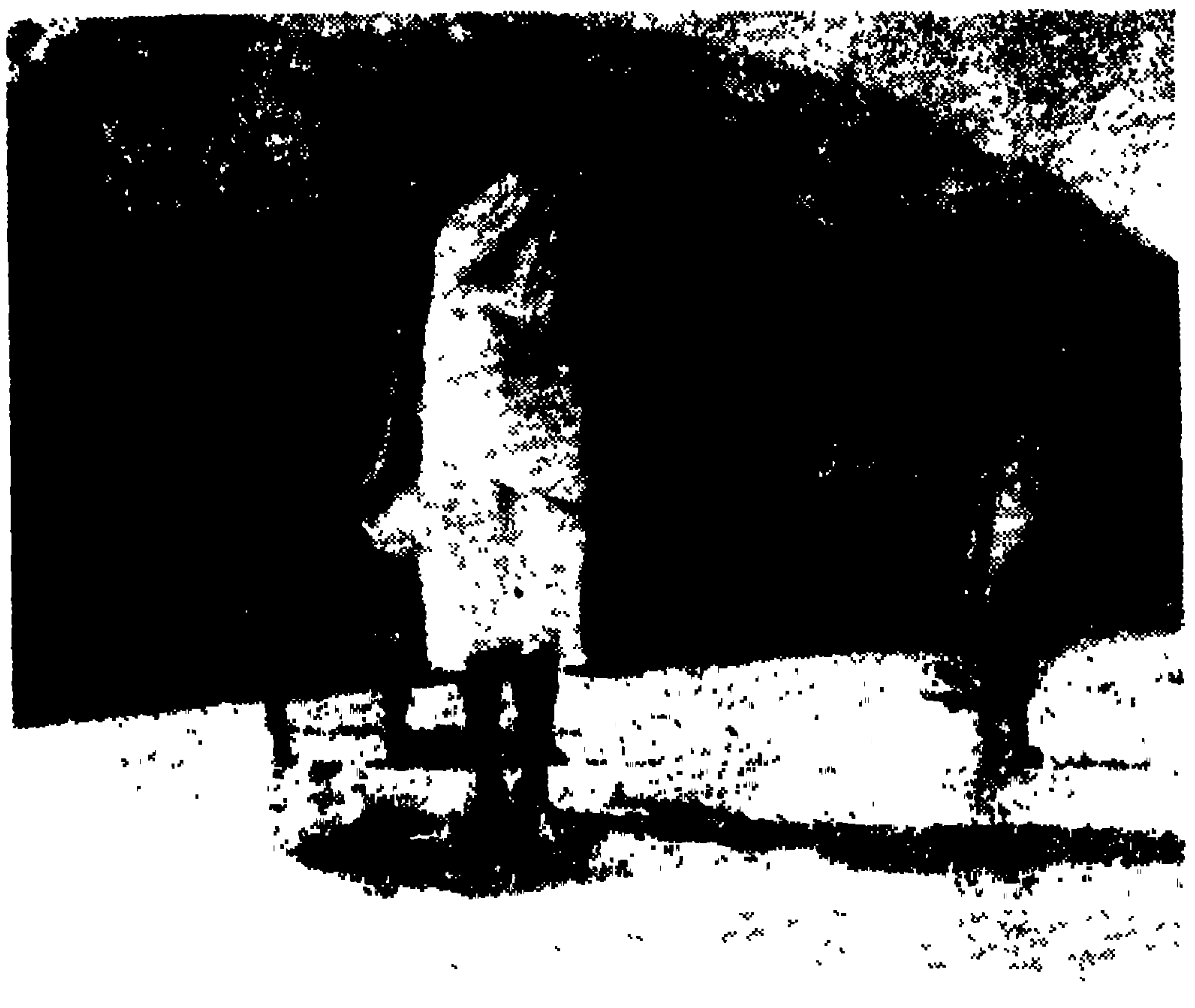

সপুত্র মেছেন

বিবাহের সময় ইহারা কাজীকে ডাকিয়া আনে। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা মুসলমানের রান্না খায়; কিন্তু মুসলমানেরা ইহাদের রান্না খায় না বা ইহাদের ছোঁয়া জল স্পর্শ করে না। মুসলমান এবং যদু-পতিয়াদের মধ্যে বিবাহ হয় না।

রামপুরহাট মহকুমার কোন কোন অঞ্চলে ইহাদের বাস। ইহারা কাঁসার ঘটি, বাটি, অলঙ্কার, কাঁসর, ঘণ্টা, লোহার বাটখারা প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ারি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে।

উপরি-উক্ত জাতিগুলি ব্যতীত বীরভূমে ভুনিয়া (জনসংখ্যা প্রায় হাজার), সুনরি (সাড়ে চৌদ্দ হাজার), মেহনা, মাড়ব বা কালোমালো, বাহুকি, পুষ্প বা মধু নাপিত (প্রবাদ আছে যে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মস্তক মুণ্ডন করিবার পর হইতে ইহারা অপর কাহারও ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া হস্ত অশুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই), রাজবংশী, কুড়োল, খয়রা, বেড়ো, বাইতি, কোনাই, দোষাদ, গাবেরি, কালোয়ার, খাত্তিক, লোহার, মুণ্ডা, ওরাঁও, তুরি প্রভৃতি আরও প্রায় সত্তর প্রকারের জাতি আছে।*

* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত কয়েকটি আলোকচিত্র শ্রীঅমলেন্দু মিত্র কর্ত্তৃক গৃহীত।

মৃত্যুঞ্জয়ের অগ্রদূত

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

চারদিকেতে অত্যাচার, হাত মেলেছে নগ্নভূত,
অন্তবিহীন অন্ধকার— চল্‌রে তোরা অগ্রদূত।
অন্ধকারে অস্তচাঁদ ঐ গর্জ্জে প্রলয় সিন্ধুজল,
শক্ত করে বক্ষ বাঁধো মৃত্যুমুখে অচঞ্চল।
আজকে মোদের অগ্নিপণ, বিঘ্ন দলো ভগ্নীভাই,
করতে হবেই মৃত্যুজয় সর্ব্বদুখের মুক্তি চাই।
সমাজগুরা দুর্নীতির গর্জ্জিছে ঐ ঘূর্ণীঝড়,
সর্ব্বনাশের ধ্বংসপাপ তূর্ণ আজি চূর্ণ কর্।
ছদ্মপাপের অগ্নিদাহে দেশজোড়া কি বিস্ফোরণ,
শৃঙ্খলতায় পঙ্কিল এ যে স্বাধীন মায়ের আলিম্পন।
সর্ব্বহারার রাত্রিদিবা দুঃখদহন অন্তরে,
সর্ব্বজ্বালার মৃত্যুগরল পান করো নীলকণ্ঠ রে!
অগ্নিদাহন পরীক্ষার ঐ সম্মুখে দিন ভক্তবীর,
জীবন্মৃতের ঘুমপুরীতে স্বপ্নেরি আজ ভাঙ্‌ প্রাচীর।
বল্‌রে সবাই গর্জ্জে বলো ধনিক-তোষণ ধর্ম্ম নয়,.
দুঃখে জীবন-যাত্রা-যাপন স্বাধীন মায়ের মর্ম্ম নয়।
শিল্পী কবি গুণী জ্ঞানী রইল যদিই অন্নহীন,
স্বাধীন হওয়ার ক্ষুণ্ণ বুকের মূল্য কি এই নাম রঙীন্?
করবি জাতির উচ্চ ললাট, করতে হবে অগ্নিপণ,
স্বাধীন হওয়ার মূল্য সেথায় শান্তি যেথায় চিরন্তন।
আর্ত্তজনে করবি ত্রাণ আজ দুর্নীতিরে ধ্বংস কর্,
সর্ব্বপাপের মর্ত্ত্য মুছে—আনবি তোরাই যুগান্তর।
দস্যুধনিক মিলগুলো ঐ দুঃস্থশোষণ পিঁজরাপোল,
বণিকদের ঐ অত্যাচারের ভিৎগুলো আজ উপ্‌ড়ে' তোল্।
অন্নবসন স্বস্তি ও সুখ কর্ম্মীদের আজ বণ্টি' দে,
দুঃস্থদের আজ সুস্থ করে' আনন্দে মন মণ্ডি' দে।
সর্ব্বপাপের ধ্বংসে আজি ঝঞ্ঝা উঠুক ঘোর ঘটায়,
ধূর্জ্জটিহীন যজ্ঞনাশে প্রলয় জাগুক শিবজটায়।
ধৈর্য্যে চলো শৌর্য্য দুলাল শঙ্কাতে ভাই মাৎ টলো,
জগন্নাথের ডঙ্কা বাজাও হিম্মতে আজ পথ চলো।
দুঃখেরি এই স্বর্গপথ প্রহ্লাদেরা গর্ব্বে আয়,
রাখবি জাতির মানইজ্জৎ সত্যিকারের মুক্তি চাই।
সঙ্গী তোদের ব্রহ্মবল পিণাক বাজায় রুদ্রকাল,
দুর্জ্জয় আজি চল্‌রে চল্ খাট্‌বে হুকুম তালবেতাল।
সঙ্গী তোদের বজ্র ঝড় উদ্দীপনার কি বিদ্যুৎ,
মৃত্যুমথন মন্ত্র পড়ো মৃত্যুঞ্জয়ের অগ্রদূত!

পল্লীপ্রান্তে (তেল রং)—শিল্পী শ্রীনীলরতন চট্টোপাধ্যায়

সমালোচকের দৃষ্টিতে শিল্পী ও শিল্পকলা

শ্রীঅমূল্যগোপাল সেন

আজকাল দেশের শিল্পানুরাগী জনসাধারণের মন শিল্পকলা সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হওয়ার দরুনই শিল্পীদের কাজের সমালোচনাও অনেক বেড়ে গেছে। সমালোচকদের তরফ থেকে এই শিল্পী-সমাজের বিরুদ্ধে বহু প্রকারের অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। যেমন—শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে নূতনত্বের প্রবর্ত্তন করতে পারছেন না, সমাজের বর্ত্তমান ভাবধারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছেন না, জনসাধারণের চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের দৃষ্টি চিন্তা-ধারার মিল নেই, ইত্যাদি। এ ধরণের সমালোচনার হাত থেকে শিল্পশিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরাও নিষ্কৃতি পায় না। এ সম্বন্ধে চিন্তা করে আমার মনে হয়েছে, প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীদের কাজের যে-কোন রকম সমালোচনা চলতে পারে, কিন্তু শিল্প-কলাশিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের কাজের শুধু টেক্‌নিক্ বা আঙ্গিক নিয়েই সমালোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ শিল্প-গুরুরা তো আর শিল্পী তৈরি করতে পারেন না; অক্লান্ত সাধনা করে তবে কলালক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করতে হয়। গুরু শুধু পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। কেমন করে তুলির টানে রসসৃষ্টি করা যায়, বাটালির কি রকম ঘা দিলে পাথরে প্রাণের স্পন্দন ফুটিয়ে তোলা যায়—এ সব গুরুর কাছে বসে

টবের গাছ (তেল রং)—শ্রীশান্তু মজুমদার

তরুণী (জল রং)—শ্রীসোমনাথ হোড়

শিখতে হয়—এর জন্ত নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রম দরকার। এক কথায় পরিশ্রম করে কারিগরী জিনিষটা গুরুর কাছ থেকে শিখে নিতে হয়, তারপর হাত পাকা হলে, নিজের পথ চিনে নিতে পারলে প্রতিভাবান শিল্পী নিজের মনের সকল অনুভূতিকেই স্বীয় শিল্পসৃষ্টির ভেতর দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন। কোন সমালোচক যদি একজন শিক্ষার্থীর কাছেও অভিনব বিরাট কিছু একটা প্রত্যাশা করেন তবে তাঁকে হতাশ হতে হবে বৈ কি? শিক্ষার্থীর প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য যেমন করেই হোক শিল্পের প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হয়ে সেগুলো আয়ত্ত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রচলিত এবং অপ্রচলিত মাধ্যমে পরীক্ষামূলক কাজ করা। নয়ত 'স র গ ম' না শিখে গানে নূতন সুর দিতে যাওয়ার মত, শিল্পরীতি আয়ত্ত না করে নূতন কিছু সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এক সময় দেখেছি, কলিকাতা শিল্প-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগকে, বিশেষতঃ প্রাচ্যকলা বিভাগে, পুরানো ভাল ভাল ছবি নকল করতে দেওয়া হ'ত। এই সব ছবি নকল করতে গিয়ে শিক্ষার্থী বুঝতে পারত ছবিতে কোথায় কোন্ রং কি ভাবে ব্যবহার করা যায়, কোন্ রেখাটা কোথায় কি ভাবে কতখানি টানলে ছবি সুন্দর হয়—এমনি নানা খুঁটিনাটি বিষয়। শুধু তাই নয়—সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীকে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করে নানা বিষয়বস্তুর স্কেচ্ করে আনবার জন্ত উৎসাহিত করা হ'ত। এতে শিল্পশিক্ষার্থীর একটা বিশেষ লাভ হ'ল। আঁকবার সময় প্রকৃতির যে সব খুঁটিনাটি অথচ প্রয়োজনীয় জিনিষ তার দৃষ্টি এড়িয়ে যেত, ভাল ছবি নকল করতে গিয়ে ক্রমশঃ সেগুলো তার চোখে ধরা পড়তে লাগল। এমনি করেই শিল্পী লাভ করলে প্রকৃতিকে দেখবার এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। তারপর তার নিজস্ব কল্পনা থেকে ছবি আঁকবার কাজ অনেক পরিমাণে সহজ হয়ে আসত। শুধু এইজন্তও ভাল ছবি নকল করার যথেষ্ট মূল্য আছে।

বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাঁরা পাশ্চাত্ত্যের অতিআধুনিক কয়েকজন শিল্পীর শিল্পকলার অনুরাগী, এদেশের শিল্পীরা তাদের ঢঙের (style) নকল করুক এটাই তাঁরা পছন্দ করেন। এই অনুকরণমূলক কাজকে অভিনব শিল্পসৃষ্টি বলে তাঁরা বাহবাও দিয়ে থাকেন। নকল করব, অথচ নিজস্ব বলে প্রচার করে লোকের তাক লাগিয়ে দেব, এ মনোবৃত্তি শিল্পী এবং শিল্পশিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। যাঁরা প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন এবং যথোপ-

রন্ধনরতা (জল রং)—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার সেন

যুক্ত সাধনায় যাঁদের সেই প্রতিভার বিকাশ হয়েছে—ভাল জিনিষ, নূতন সৃষ্টি তাঁদের হাত দিয়ে বেরিয়ে দেশের সংস্কৃতি-ভাণ্ডারকে একদিন নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ করবে—দু'দিন আগেই হোক্ বা দু'দিন পরেই হোক্, তার জন্ত তাড়াহুড়ো করার কোন প্রয়োজনই নেই। পাশ্চাত্য শিল্পবিদ্যালয়গুলোতে

তেল রঙে আঁকা একটি চিত্র—শ্রীনীলরতন চট্টোপাধ্যায়

অধিকাংশ শিক্ষকই শিক্ষার্থীর কাজের মধ্যে নূতনত্ব ততটা প্রত্যাশা করেন না—শিক্ষার্থী ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রম সহকারে সাধনা করে শিল্পের প্রচলিত পদ্ধতিগুলো আয়ত্ত করার চেষ্টা করছে কিনা, সেই দিকেই থাকে সেখানকার শিল্পশিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি। শিল্পকলার ইতিহাসে সম্ভবতঃ এমন একজনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যাবে না, যিনি ছাত্রজীবনে শিল্পের প্রচলিত পদ্ধতিগুলো আয়ত্ত করেন নাই। অগ্রগতি সকলেই চায়, শিল্পীরাও চায়; কিন্তু চলার অভ্যাস তো আগে করতে হবে, তারপর হবে অগ্রগতি।

আগেই বলেছি, যাঁরা শিক্ষানবিশীর পালা শেষ করে শিল্পীহিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তাঁদের সৃষ্টির যে-কোন রকম সমালোচনা চলতে পারে; সুতরাং তাঁদের কথা ছেড়ে দিয়ে দেখা যাক, প্রচলিত সমালোচনায় বর্ত্তমান সময়ে শিল্প-শিক্ষার্থীদের কতটুকু লাভ এবং ক্ষতি হয়েছে। কলিকাতা সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের এবারকার বাৎসরিক প্রদর্শনীর ছবিগুলো নিয়েই বিচার করা যাক। প্রায় আড়াই শতাধিক বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীর কাজের নমুনা এই প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষামূলক কাজ এই প্রদর্শনীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় এবং আশাপ্রদ জিনিষ বলে আমার মনে হয়েছে। খুব বেশী দিন আগেকার কথা নয়—এমন সময় ছিল যখন এক বিভাগের ছাত্র অন্ত বিভাগের ছেলেদের কাজ দেখতে পর্য্যন্ত পরাঙ্মুখ ছিল। তারা মনে করত যে তাতে শিল্পী হিসাবে তারা স্বধর্ম্মচ্যুত হবে। প্রাচ্য শিল্পবিভাগের ছাত্রেরা মনে করত, তৈল-রঙের ছবি দেখলে তাদের শিল্প-রুচি খারাপ হয়ে যাবে; আবার যারা পাশ্চাত্ত্য ধরণে তৈল-রঙের ছবি আঁকত তাদের ধারণা ছিল, প্রাচ্যকলা বিভাগে আসল বস্তু কিছু নেই, তা একেবারে সম্পূর্ণ ফাঁকির উপর প্রতিষ্ঠিত; ওখানকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। এ দেশীয় একজন নামকরা তৈলচিত্র-শিল্পী একবার কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন—"ওরে বাবা! হ্যাভেল সাহেব কি কম শয়তান! এ দেশের ছেলেরা পাছে ছবি আঁকা শিখে ফেলে তাই ভারতীয় শিল্প নাম দিয়ে ফাঁকির কল পেতে রেখেছে।" প্রাচ্য চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ সমঝদার ও রসজ্ঞ হ্যাভেল সম্বন্ধে যিনি এই ধারণা পোষণ করতেন তিনি আজ পরলোকগত। কিন্তু ভাবি

প্রতিকৃতি (তেল রং)—শ্রীসাবিত্রী সেনগুপ্ত

এই ভ্রান্ত ধারণা (ভ্রান্ত হলেও সরল) কেমন করে বদ্ধমূল হ'ল একজন শিল্পীর মনে? গোঁড়ামিই এর মূল কারণ নয় কি? কিন্তু এর জন্ত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হলেন কে? হ্যাভেল-বিদ্বেষী ভদ্রলোকটি একজন প্রতিভাবান শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও স্বদেশের বিরাট শিল্পৈশ্বর্য্যের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না।

এ ধরণের গোঁড়ামি শিক্ষার্থী এবং শিল্পী উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর ও মারাত্মক।

প্রদর্শনীর গ্রাফিক্ আর্টের কক্ষটি খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছে, যদিও ঐ কক্ষটিতে আরও আলোর ব্যবস্থা করলে অধিকতর নয়নানন্দকর হতে পারত। গ্রাফিক আর্টে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষামূলক ভাবে যে সকল চিত্রকর্ম্ম করছে সেগুলো খুবই প্রশংসনীয়। তন্মধ্যে চারুশিল্প বিভাগের ছাত্রী শ্রীমতী করুণা সাহার লিথো প্রেসের ছবিখানাতে (দুই রঙ লিথোগ্রাফ) উন্নত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া শ্যামলেন্দু বিকাশের ড্রাই পয়েণ্ট এচিং এবং সোমনাথ হোড়ের কাঠখোদাই চিত্র খুবই উপভোগ্য হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন কায়দায় এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কেমন করে একই মাধ্যম অবলম্বনে চিত্রকর্ম্ম করে যেতে পারে, একটু ভাল করে গ্রাফিক্ আর্টের কাজগুলো দেখলে তা বোঝা যায়।

প্রাচ্য শিল্পবিভাগেও অনেক পরীক্ষামূলক কাজের নিদর্শন দেখা যায়। ভারতীয় প্রথায় অঙ্কিত যে দুটো প্রতিকৃতি (portrait) চিত্র প্রদর্শনীতে টাঙানো হয়েছে তা শিল্পীর দুঃসাহসিক পরীক্ষামূলক কাজের নমুনা। কারণ আমরা এতকাল ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত প্রতিকৃতি-চিত্র যা দেখে আসছি তার সবগুলোই মুঘল পদ্ধতিতে অঙ্কিত ক্ষুদ্র ছবি (miniature painting)—রাজপুরুষ বা রাজকন্যা বা অনুরূপ কাহারো প্রতিকৃতি। সবগুলোরই পোশাক-পরিচ্ছদ ঝলমলে। এবারকার প্রদর্শনীতে দেখলাম—প্রতিকৃতি দুখানিই বেশ বড় করে আঁকা হয়েছে, খুব সাদাসিদে কাপড়-চোপড়-পরা অথচ খুব vivid বা সুস্পষ্ট। এত অল্প রঙে এবং অল্প রেখায় এত ভাল প্রতিকৃতি-চিত্র হতে পারে ধারণা ছিল না। এ বিভাগে ছাত্রছাত্রীদের অনেকের ছবিতে উপযুক্ত বর্ণপ্রয়োগ-নৈপুণ্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। ম্যানারিজম্ সব শিল্পীর মধ্যে কিছু না কিছু থাকে। তবু একঘেয়েমি নষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত। শিল্পীকে এক হিসাবে অভিনেতার পর্য্যায়ে ফেলা যায়; তাকে রূপরসবর্ণগন্ধবিশিষ্ট প্রকৃতির অন্তর-সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে আপন অন্তরের রসের সঙ্গে তার যোগসাধন করিয়ে তবে স্বকীয় রসসৃষ্টিকে বাইরে জনতার হাটে পরিবেশন করতে হয়; নয়ত ভোরের যে রঙ সন্ধ্যারও তাই, দুপুরেরও একই বর্ণ—উৎসবের ছবিতে যে বর্ণসমাবেশ, বিরহের ছবিতেও তাই—এতে রসের হানি হয়। ম্যানারিজম্ একটু-আধটু থাকলেও বিষয়বস্তুকে যদি অন্তরের মধ্যে যথাযথভাবে অনুভব করা যায় তা হলে রসের হানি হয় না। ম্যানারিজমের প্রভাব খুব বেশী হয় যদি মনে মনে অন্য কোন শিল্পীর বর্ণপ্রয়োগ বা রেখাবিন্যাস বা অনুরূপ কিছু নকল করার ইচ্ছা থাকে। এ সম্বন্ধে শিল্পগুরু নন্দলাল একবার আমাকে বলেছিলেন—"রাজপুত ছবি দেখ, মুঘল ছবি দেখ, পারস্য দেশীয় ছবি দেখ—ছবির রস গ্রহণ করার চেষ্টা কর, কিন্তু সাবধান—আঁকবার সময় ওসব সামনে থেকে একেবারে দূরে সরিয়ে রাখবে, এমন কি ওসব ছবির চিন্তা পর্য্যন্ত করবে না।" শুনেছি কোন একজন ছাত্র নাকি একবার হুবহু নন্দবাবুর কায়দায় একখানা পেন্সিল স্কেচ করে তাঁকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। ছবিখানি দেখে তিনি নাকি সেই ছাত্রকে প্রথমে খুব তিরস্কার করেছিলেন, পরে সস্নেহে বলেছিলেন—"ভয় কি! কায়দা আপনা থেকেই আসবে। কাজ কর খুব, কিন্তু কারও নকল করতে চেষ্টা করো না।"

প্রদর্শনীর প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই কোন কোন চিত্রকর্ম্ম দেখে আমার মনে হয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জনকয়েক অল্প আয়াসে নাম করার ইচ্ছাতেই হোক, বা অন্য কারণেই হোক এদেশের এবং বিদেশের নামকরা শিল্পীর আঁকা ছবিকে মনের মধ্যে রেখে, হয়ত বা নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাঁদের নকল করে যাচ্ছে। নকল যতক্ষণ ইচ্ছাকৃত এবং তা শুধু শিক্ষার উদ্দেশ্যে করা হয় ততক্ষণ ভাল; কিন্তু নিজেকে এবং পরকে ফাঁকি দিয়ে সস্তায় বাজিমাৎ করে নাম করার উদ্দেশ্যে নকল করতে যাওয়া মারাত্মক।

তৈলরঙের চিত্রের কক্ষেও কয়েকখানা ছবিতে উন্নত রুচি এবং বর্ণসমাবেশ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ এই ছবি কয়খানার নাম করা যেতে পারে—নীলরতন চাটুজ্জ্যের "চানাচুরওয়ালা" (তৈল রঙ চিত্র), শানু মজুমদারের "টবের ফুল" (তৈলরঙ চিত্র), সাবিত্রী সেনগুপ্তার আঁকা একখানা তৈল রঙের প্রতিকৃতি-চিত্র (৫০ নং), জীবেন্দ্রকুমার সেনের জল রঙের রান্নাঘরের ছবি ইত্যাদি। শানু মজুমদারের "টবের ফুল" ছবিখানি যদিও উৎরে গেছে, কিন্তু তাঁর ছবিগুলো ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করে দেখলে স্পষ্টই বুঝা যায় বিলাতের কোন প্রগতিপন্থী বিশিষ্ট শিল্পীর প্রভাব তাঁর চিত্রে যথেষ্ট। ছবিতে নূতনত্ব আমদানী করবার মোহে সেই বিদেশী শিল্পীর চিত্ররচনার আদর্শকে মনের মধ্যে রেখে তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন।

কমার্শিয়াল আর্টের চাহিদা দিন দিন যেরূপ বেড়ে চলেছে, এবং জনসাধারণের রুচিরও যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন হচ্ছে তার জন্য উক্ত বিভাগের ছাত্রদের কাজ আরও উন্নত ধরণের হওয়া উচিত এবং কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া বাঞ্ছনীয়। যদিও 'লেটারিং' কমার্শিয়াল আর্টের সবখানি নয়, এবং লেটারিং বাদ দিয়ে কমার্শিয়াল আর্ট একেবারে অসম্ভব একথাও সত্য নয়, তবু এটা কমার্শিয়াল আর্টের একটা প্রধান অঙ্গ। উক্ত বিভাগে লেটারিং আরও বেশী হলেই ভাল হ'ত।

ক্লে-মডেলিং বিভাগটি প্রায় 'ওয়ান ম্যান শো' অর্থাৎ এক ব্যক্তির প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছে। যে কাজটিই দেখতে যাই না কেন, দেখি তাতে একই ব্যক্তির নাম লেখা। সতীশ চক্রবর্ত্তীর পোট্রেটের হাত ভাল, কিন্তু ডিজাইনের হাত নিপুণ নয়। সতীশবাবুর ডিজাইনের রুচি অনেক উন্নত হতে পারে যদি তিনি কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত প্রাচীন ভারতের উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি-গুলো বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করেন। ভারতের বৃহত্তম যাদুঘর এবং ভারতীয় শিল্পের সেরা গ্যালারী কলিকাতা সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের পাশেই রয়েছে। অতিআধুনিক ও প্রগতিপন্থী হওয়ার আগে উক্ত গ্যালারীর জাতীয় চিত্রাবলী এবং মূর্ত্তিগুলি ভাল করে দেখলে তাতে বিশেষ লাভবান হবারই সম্ভাবনা।

সর্ব্বশেষে টিচারশিপ বিভাগের একখানা ছবির সমালোচনা করে আমার বক্তব্য শেষ করব। প্রথমে বলে রাখি টিচারশিপ ক্লাসের ছাত্রেরা ছাত্রও বটে আবার শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীও বটে; সুতরাং তাদের কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা হওয়া উচিত বলে মনে করি। উপরোক্ত ছবিখানির বিষয়বস্তু যে কি তা আমি বহু চেষ্টা করেও বুঝতে পারি নি। তবে এটুকু দেখলাম একটা পার্ক, তাতে সাহেব-দম্পতি বসে আছেন হয়ত বা সান্ধ্যবায়ু সেবন করছেন, সামনে আইসক্রিম-ওয়ালা, ছেলে, বুড়ো, ছেঁড়া কাপড় আরও কত কি? কোন্ ভাব যে শিল্পীর মনে দেখা দিয়েছে, বিষয়বস্তুর কোন্ জায়গাটার ওপর যে তিনি বিশেষ ইঙ্গিত করছেন তা তো বোঝা গেল না। বর্ণনির্ব্বাচন, তুলির টান এবং অঙ্কন-পদ্ধতি দেখে প্রতীতি হয় কোন প্রগতিপন্থী আধুনিক শিল্পীর প্রভাব রয়েছে এই শিল্পীর মনের গহনে। সমালোচকের তীব্র সমালোচনা "শিল্পীর সৃষ্টির সঙ্গে জনসাধারণের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার যোগ নেই"—একথা তাঁর প্রাণে লেগেছে, সেইজন্য চিত্রে বাস্তব ঘটনাসমাবেশের এই জগাখিচুড়ি। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এবং জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—"শুধু ঘটনার ছবি ফুটিয়ে তুললে কি সার্থক চিত্র হয়?" শুধু আবোল-তাবোল ঘটনার বর্ণনা করে গেলে যেমন তা সাহিত্য হয় না, উচ্চরবে আর্ত্তনাদ করলে যেমন তাকে কেউ গান বলে না, তেমনি শুধু খুব বেশী করে ঘটনার ছবি এঁকে গেলে তা প্রকৃত চিত্রপদবাচ্য হয় না। যা দেখলাম, যা অনুভব করলাম, যা ভাবলাম তাকে ভালভাবে গুছিয়ে সুন্দররূপে পরিবেশন করার ক্ষমতা থাকা চাই। তার জন্য সংযম দরকার—রঙের সংযম, রেখার সংযম, রসের সংযম, ভাবের সংযম, বর্ণনার সংযম। নীলরতন বাবুর ছবিখানা দেখে আমার বার বার মনে হয়েছে—ছবিখানা সংযমের অভাবে সৃষ্টি হিসাবে ব্যর্থ হয়েছে। আধুনিক সমালোচকেরা চিত্রে নূতনত্ব আমদানী করবার জন্যে যে ভাবে উপদেশ বর্ষণ সুরু করেছেন, চিত্রকর সম্ভবতঃ তারই দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই চিত্রখানি রচনা করেছেন।

শিল্পী, রাজনৈতিক এবং সমাজসংস্কারকের কাজ এক নয়। শিল্পীর কারবার প্রধানতঃ রসের সঙ্গে, সুন্দরের সঙ্গে—তবে যদি কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনা শিল্পীর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয় (এবং তা দেবেই) তা হলে আপনা থেকে তুলির আঁচড়ে যা বেরিয়ে আসবে তাই হবে সার্থক সৃষ্টি।

শিল্প-শিক্ষার্থীরা আজকাল অনেকে বলে থাকেন—"ছবির বিষয়বস্তু খুঁজে পাচ্ছি না।" এই বিষয়বস্তু খুঁজে না পাওয়ার জন্যেও, মনে হয়, ঐ একই মনোভাব দায়ী। সমালোচকের উপদেশ পড়ে শিল্পীরা ভাবছেন, "নূতন একটা কিছু করতে হবে, চিত্রে আমদানী করতে হবে হয় রাজনীতি, নয় ত সমাজসেবার আদর্শ।" আমার তো মনে হয় অঙ্কনের বিষয়বস্তু সর্ব্বত্র ছড়ানো রয়েছে। একটা ফুল, দু-চারটে পাতা, একটা পাখী এই দিয়ে জাপানী শিল্পীরা সার্থক শিল্পসৃষ্টি করে নি কি? প্রকৃতি তো প্রতি মুহূর্ত্তে নানা রঙে রসে আমাদের চোখের সামনে নব নব রূপে মূর্ত্তিমন্ত হয়ে উঠছে। আমাদের চেতনায় তাঁকে ধরতে পারলে চিত্ররচনা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হবে। তার জন্য তো বিস্তর বই পড়ার দরকার নেই, সমাজসংস্কারক বা রাজনৈতিক নেতার চেলা হবারও প্রয়োজন নেই। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের একটা খুব মূল্যবান কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়—"চোখ খুলেই রাখতে হয়, প্রাণকে জাগ্রত রাখতে হয়, মনকে পিঞ্জরখোলা পাখীর মত মুক্তি দিতে হয়, কল্পনালোকে ও বাস্তব জগতে সুখে বিচরণ করতে হয়। প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্নধরার জাল নিজের মত করে বুনে নিতে হয় প্রথমে, তারপর বসে থাকা—বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে নিজের আসন নিজে বিছিয়ে, চুপটি করে নয়—সজাগ হয়ে।"

চশমা

শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল

দা'দুর টেবিলে মেলা খবরের কাগজখানার ওপর অনেকক্ষণ ধরে খোলা পড়ে আছে চশমাখানা। এক দিকের ডাঁটিতে সুতো বাঁধা, কানে জড়িয়ে বাঁধবার জন্ত। কাচের ভেতর দিয়ে লেখাগুলোকে খাড়া খাড়া লম্বা লম্বা দেখায়, যেন চিড়িয়াখানায় দাঁড়িয়ে আছে সেই সারি সারি সারস পাখী যেগুলো এক পায়ে দাঁড়িয়ে পিঠে মুখ গুঁজে ঘুমোয় সারাদিন। কাচ দুখানার ওপরদিকে আবার অন্ত রকম দুখানা কাচ বসানো, চাঁদের মত। সেগুলো দিয়ে কিন্তু লেখাগুলো দেখা যায় আশপাশের সব লেখার মতই। দাদু কাগজ পড়তে পড়তে এক একবার ঐ ওপরের দু' টুকরো কাচের মধ্যে দিয়ে চোখ দুটো বার করে ঘাড় নীচু করে কথা বলবেন তোমার সঙ্গে। রণজিতের ভারি হাসি পায় তাঁর ঐ ভঙ্গিটুকু দেখলে। ওদের বাড়ীতে দাঁড়ের ওপর কাকাতুয়াটাও ঠিক ঐ রকম করেই ঘাড় নীচু করে তাকাবে তোমার দিকে। রণজিতের কেমন যেন একটু ভয়-ভয়ও করে, ওরা যদি ওর দিকে তাকায় অমনি ক'রে। তার মনে হয়, তার মনের সব লুকোনো কথা, খেয়াল আর মতলবগুলো যেন তারা সব দেখে ফেললে।

অথচ চশমাখানা চোখে না দিলে দাদুকে একটুও ভয় করে না। গাল-জোড়া গোঁফজোড়াটা থাকা সত্ত্বেও। খালি চোখে হাসিভরে যখন তিনি তাকান রণজিতের দিকে তখন তাঁকে তার ভারি ভাল লাগে। গলা জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। অতটা করতে আবার সাহস হয় না। আগে কখনো দেখেনি তাঁকে। এই তো মাত্র তিন মাসের আলাপ। তা ছাড়া পিপ্‌লু আর বাব্‌লুদের বাড়ী এটা। দাদু পিপ্‌লু আর বাব্‌লুকে এক এক সময়ে নিজেই টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে হেসে হেসে, মাথা ঝাঁকা দিয়ে কথা বলেন তাদের সঙ্গে। রণজিতেরও ওদের মত টেবিলে উঠে তাদের পাশে বসে পা দোলাতে ইচ্ছে করে। সে কাছে গেলেই কিন্তু দাদু ঐ চশমা-খানার ওপরের কাচের ভেতর দিয়ে চোখ বের করে কেমন অদ্ভুতভাবে তাকান তার দিকে। বকেনও না, ধমকানও না, শুধু ঐরকম করে তাকান। পিপ্‌লু আর বাব্‌লুকে এক একবার ধমক দিয়ে ওঠেন। রণজিতেরও ইচ্ছে করে দাদু তাকে ধমকে ওঠেন, ঠিক ওদের মত করে। দাদু তাকে ধমকানও না, আদরও করেন না। শুধু তাকান তার দিকে চশমার ভেতর দিয়ে। এক একবার অবশ্য চশমাখানা খুলে তার দিকে চেয়ে খাঁজ-পড়া চোখ দিয়ে হাসেন।

বাব্‌লুর আর পিপ্‌লুর দু-জনেরই নিজের নিজের আব্বাজীর একখানা করে গাড়ী আছে। শু হাওয়া-গাড়ী। রণজিতের ভারী আশ্চর্য্য লাগে। হাওয়া-গাড়ী আবার কারো নিজের থাকে নাকি? ও তো শুধু ভাড়া পাওয়া যায়। এই তো সেদিন আসবার সময়ে ভাড়া করা হাওয়া-গাড়ী করে সে কত ঘুরেছে আম্মাজী আর আব্বাজীর সঙ্গে ডিল্লীতে। তাই তো সে সেদিন পিপ্‌লু যখন বললে, "জানিস্ এটা আমার বাবার গাড়ী?" তখন রণজিৎ জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমার আব্বাজী টেক্সিওয়ালা আচে?" সে বুঝতে পারে নি, কথাটা জিজ্ঞেস করে সে কি অপরাধ করেছিল যে, তার জন্তে তার কানটা কস্‌কসে করে মলে দিয়ে এক চাচাজী শাসিয়ে গেলেন—"ঔর কভী ঐসী বাৎ নহীঁ বোল্‌না, রণ্‌জিৎ!". এ বাড়ীতে শুধু ঐ চাচাজীই কথা কইতে পারেন ভদ্রলোকের মত। আর এরা সব যে কি বলে, রণজিৎ তা বুঝতেই পারে না; "হামি ভাত্ত খেয়েছে", "তুমি বেড়াতে যাবি?" "হামার ক্ষিদে পেয়েছে।" এই রকম সব ওদের কথা। তা ছাড়া ওরা "ঝাড়কে" বলরে "গাছ", "মেজ্"কে বলবে "টেবিল", "পাঙ্খা"কে বলবে "পাখা," "বাত্তি"কে বলবে "আলো," "সুবহ্"কে বলবে "সকাল বেলা"। রণজিৎ শোনে সারা দিন আর হাসে মনে মনে।

দুপুরে খাওয়ার পর দাদু ঘুমোতে যান। তাঁর এক হাত ধরে পিপ্‌লু আর এক হাত ধরে বাব্‌লু। পিপ্‌লু আর বাব্‌লু খাটে গিয়ে শোয় দাদুর দু'পাশে। রণজিৎ একবার তাদের দিকে তাকিয়ে দেখে চোখ ফিরিয়ে নেয়। তারও ইচ্ছে করে ওদের মত করে দাদুর সঙ্গে শুতে। কিন্তু দাদুর হাত যে মাত্র দুখানা আর খাটের ওপর দাদুর পাশও মাত্র দুটো। কারো তিনটে হাতও নেই, তিনটে পাশও নেই। তা ছাড়া পিপ্‌লু আর বাব্‌লু ওরা তার চেয়ে অনেক অনেক ছোট। পিপ্‌লুর বয়েস মাত্র তিন আর বাব্‌লুর বয়েস যে তিনও নয়, আড়াই। ছো:! আর রণজিতের বয়েস পুরো সাড়ে তিন! সে তাদের চেয়ে মাথায় অনেক বড়। ওদের মধ্যে ঐ পিপ্‌লুটা প্রায় দোরের কড়ার সমান। আর রণজিৎ প্রায় খিল পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছল বলে।

ঘুমিয়ে উঠে পিপ্‌লু আর বাব্‌লু দাদুর হাতে দুধ খায় গেলাসে করে বিস্কুট দিয়ে। রণজিৎকে সেই সময়ে আম্মাজী অন্ত ঘরে নিয়ে যায়। চুপি চুপি বুঝিয়ে বলে, তার জন্তে তার আব্বাজীও বিস্কুট কিনে আনবে'খন এক দিন। বাচ্চারা খাবার সময়ে ওদের দিকে অমন করে তাকাতে নেই।— আম্মাজী এসব কথা আগে জানতই না। কি বোকা ছিল, সত্যি! ও এক দিন দাঁড়িয়ে ছিল ওদের খাবার সময়ে। তখন

ওদের ঐ ঠান্ ওদের কথায় কি বললে আম্মাজীকে ডেকে। সেই থেকে রণজিৎকে আম্মাজীর কাছে ওকথা প্রায়ই শুনতে হয়। ও অবশ্য কোনো প্রতিবাদ করে না। আম্মাজীটা সত্যিই ভারি বোকা। একেবারেই বুঝতে পারে না যে, সে বিস্কুট খেতে একেবারেই চায় না। পিণ্ডীতে থাকবার সময়ে ঐ আম্মাজীই তো ওকে বিস্কুট খাওয়াবার জন্যে কত সাধাসাধি করত। সে সব কথা আম্মাজী এর মধ্যেই ভুলে গেল কি করে?

রণজিৎ বিস্কুট খেতে চায়ই না। সেধে দিলেও নেবে না। কিন্তু দাদু ওদের দুধ খাওয়াবার সময়ে কেমন সব মজার মজার গল্প বলেন। আগে সে তার কিছুই বুঝতে পারত না। এখন গল্পগুলো প্রায় মোটামুটি বুঝতে পারে। প্রায় সবগুলোই 'শেরে'র গল্প—যাকে ওরা বলে "বাঘ"। সবচেয়ে মজার হচ্ছে সেই শেরটার কথা যেটা নস্যি নিয়ে হাঁচতে হাঁচতে অস্থির হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। এক একবার সে দোরের বাইরে থেকে কান পেতে শোনে। তারপর ওদের খাওয়া হয়ে গেলে আবার ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সব কথার মানে বুঝতে পারে না। এই ধরো না কেন, "বেড়াল" মানে কি? ও কথাটা জানা নেই বলে সে সমস্ত গল্পটাই বুঝতে পারে না যে। তাই জিজ্ঞেস করে: "'বেরাল' মানে কি আছে, দাদু?" দাদু কিন্তু গল্প থামাবেন না কিছুতেই। আবার যদি ও জিজ্ঞেস করে, বেরাল মানে কি, তো দাদু চশমার ওপরকার কাচ দুখানার ভেতর দিয়ে চোখ দুটো বের করে শুধু তার দিকে তাকাবেন, একটিও কথা না বলে। কি বিশ্রী ঐ চশমাটা!

সন্ধ্যেবেলা দাদু বেড়াতে যান, হয় পিপ্‌লুর মা হয় বাব্‌লুর আম্মাজীর হাওয়া-গাড়ী করে। সঙ্গে যায় পিপ্‌লু আর বাব্‌লু। রণজিতের অবশ্য হাওয়া-গাড়ী করে বেড়াতে খুবই ভাল লাগে। কিন্তু সে ঐ সময়টায় ওদের সঙ্গে একেবারেই যেতে চায় না। গাড়ীতেও দাদুর এক পাশে বসে পিপ্‌লু আর এক পাশে বাব্‌লু। রণজিৎ একেবারে সামনে চাচাজীর পাশেও বসতে চায় না তখন, যদিও সামনে বসলে সুবিধে এই যে, দু'পাশের দৃশ্যগুলোকে সে দেখতে পায় আগে, পিপ্‌লু আর বাব্‌লু দেখতে পাবার আগেই। তবুও সে একবার চাচাজীর কাছে দরবার করেছিল, পিপ্‌লু এসে বসুক না সামনের জায়গাটায়। পিপ্‌লুর বিশেষ আপত্তিও ছিল না। কিন্তু দাদুর ঐ চশমাটা! রণজিতের দিকে কটমট করে চেয়ে চক্‌চক্ করে উঠল, যেন চোখ রাঙিয়ে।

ঘরে কেউ নেই। খবরের কাগজের ওপর রাখা চশমাটা একবার নেড়েচেড়ে দেখলে রণজিৎ। বিশ্রী ঠাণ্ডা আর পিছল তার গা—জোঁকের গায়ের মত। কদাকার "খিলৌনা" দাদুর। অথচ ওটাকে এক দণ্ড কাছছাড়া করতে দেখে নি। ওটা অষ্টপ্রহর দাদুর নাকে। এক একবার দাদু ওটাকে টেনে নামিয়ে দেন নাকের ডগায় কিছুক্ষণের জন্য। তখন অন্ততঃ চোখ দুটো একটু ছুটি পায়। তার পর আবার কাচ দুখানা চোখ দুটোকে গিয়ে চাপা দিয়ে ফেলবে। সব জিনিষ ঐ রকম ঝাপসা আর খাড়া খাড়া, লম্বা লম্বা দেখে দাদুর যে কি লাভ হয় তা সে বুঝতেই পারে না। এর চেয়ে ঐ রঙিন কাচের ছবিওয়ালা দুরবীনগুলি চোখে দিয়ে থাকা ঢের ঢের ভাল। একটু ঝাঁকানি দিলেই একেবারে নতুন একখানা ছবি।

রণজিৎ চশমাখানাকে একবার নিজের চোখে লাগিয়ে দেখলে। এক পাশের ডাঁটিটা মাথার পিছন দিক পর্য্যন্ত চলে গেল। অপর দিকের সুতোটাও কানের চারি পাশে জড়িয়ে দিলে। নাঃ, একেবারে কিচ্ছু দেখা যায় না। এমন কি নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে তাও আয়নায় মালুম হয় না। সব ঝাপসা। সেই বহুকাল আগে একবার খুব জ্বর হবার সময়ে রণজিতের যে রকম মনে হ'ত চার দিকের জিনিষগুলোকে —এই চশমাখানা চোখে দিলেও সেই রকমই মনে হয়। ওটা চোখে দিয়ে থাকতে নিশ্চয়ই দাদুর ভীষণ কষ্ট হয়। ঐটেই বোধ হয় দাদুর নাকের ওপর বসে রণজিতের দিকে ঐ রকম কটমট করে তাকায়। দাদুর এই "খিলৌনাটা" সে লুকিয়ে ফেলবে নাকি? দাদুর চোখ দুটা তা হলে রণজিৎকে খুব ভালবাসবে। প্রায় হাসবে তার দিকে চেয়ে। গল্প বলবার সময়ে এইবার নিশ্চয়ই দাদু গল্প থামিয়ে ঐ বিদ্‌ঘুটে কথা-গুলোর মানে বলে দেবেন ওঁর ঐ চমৎকার উর্দ্দু ভাষায়। রণজিৎ চশমাটাকে চোখ থেকে নামিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দালান ছাড়িয়ে, বারান্দা পেরিয়ে সেই ওদিককার জিনিষপত্র রাখবার ঘরটার কাছে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, ঠিক কোন্ জায়গাটায় রাখলে দাদু ঐ বদ্‌মেজাজী কাচ দুখানার একেবারেই কোন হদিস পাবেন না। মনে মনে কি ভেবে সে ঢুকল জিনিষপত্র ভর্ত্তি ঘরটির ভেতরে। মেঝের ওপর থাকে থাকে সারি সারি বাক্স-পেটরা, দেয়ালের গায়ে টাঙানো ধামা, চালুনী, লোহার খাবার-ঢাকা, শেল্‌ফো-গুলোর ওপর বড় বড় কাচের বোতল, জার, শিশি, হাঁড়ি, সরাচাপা, মুখ-ঢাকা। কোথাও এতটুকু খালি জায়গা পড়ে নেই...

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রণজিৎ দোর বন্ধ করে দিলে আস্তে আস্তে। চোখে-মুখে তার বিজয়ের হাসি উপ্‌চে পড়ছে। ওদিককার বারান্দাটা থেকে বাগান দেখা যায়। জ্যাকৃটা বাগানময় কতকগুলো কাককে তাড়া করে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। কাকগুলো কিছুতে বাগান ছেড়ে যাবে না। কেবল এ-গাছ থেকে ও-গাছে গিয়ে বসছে। রণজিৎ কল-ঘর

থেকে একটা মগে করে জল ভরে নিয়ে এসে কাকগুলোকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিতে লাগল। তারা পরোয়াই করে না। কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত হয়ে রণজিৎ দালানে চলে গেল। মেঝের ওপর একটা সুতোর কাটিম পড়ে রয়েছে। সে সুতো খুলে চলল বেপরোয়া ভাবে। কি মজা, কেউ দেখতেই পাচ্ছে না কিছু। সবাই ঘুমোচ্ছে ছুপুরে। তারও ঘুমোবার কথা, কিন্তু আম্মাজী তাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছে আগেই। সুতরাং রণজিতের ঘুমোবার দরকারটাই বা কি? সে ইচ্ছে করলে এখন একেবারে খালি পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে, পাশের মাঠটায় যে একটা বাড়ী তৈরি হচ্ছে সেখানে টিউবকলটা থেকে প্রচুর পরিমাণে জল তুলে কলতলাটা ভিজিয়ে ফেলতে পারে। কিম্বা ওদিককার মাঠটায় যে কতকগুলো লোক হেইলোস্সা, হেইলোস্সা বলে গান গাইতে গাইতে মোটা মোটা খুঁটি পুঁতছে, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারে কি করে খুঁটিগুলো কাদার ভেতরে বসে যাচ্ছে এক এক ঘায়ে। যতক্ষণ খুশী—কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আবার কি ভেবে রণজিৎ একটা পেন্সিল দিয়ে একটা বইয়ের পাতা খুলে হিজিবিজি কাটতে লাগল।

তার পর সে বিকেলে রুটি দিয়ে চা খেয়ে বেড়াতে গেছে মাঠে। সেখানে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ছুটাছুটি করেছে হরদম। তারা তাকে কি বলতে বলতে পিছু পিছু তাড়া করেছে অনেকক্ষণ। তাতে তার ভারি মজা লেগেছে। ঘামে জামা ভিজিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ও যখন্ বাড়ী ফিরল তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাড়ী ফিরেই ছুটে গেছে আম্মাজীর কাছে। চাই এক গেলাস জল। শিগ্গীর, শিগ্গীর। ভীষণ পিয়াস লেগেছে আজী।...এমন সময়ে আব্বাজী ডাকে ওপর থেকে—"রণজিৎ, আও উপর্ আভী।"

আব্বাজী ফিরেছে এর মধ্যেই! কি মজা! হয়ত সেই অনেক দিন থেকে চাওয়া মার্ব্বেল ছুটোর কথা ভোলে নি। বিল্লীর চোখের মত জলজলে কাচের মার্ব্বেল! আব্বাজী তাকে কোলে করে নিয়ে নিশ্চয়ই একবার ছুড়ে দেবে ঐ পাখাটার কাছাকাছি, তার পর লুফে নেবে। রণজিৎ ছুটো করে ধাপ লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে ছুটে চলে। আব্বাজী!

কিন্তু এ কি? আব্বাজীর মুখ অমন গম্ভীর কেন? তার দিকে চেয়ে একটুও না হেসে জিজ্ঞেস করে: "দাছুর চশমা কোথায়?" ও হরি, সেই চশমাটা! দাছু কিছুতেই ওটার কথা ভুলতে পারে না। কি ভয়ঙ্কর ছেলেমানুষ! হ্যাঁ, সেই চশমাটা। কিন্তু কোথায় যে নিয়ে গেল, কিছু মনে পড়ছে না তার। সেই কাকগুলো, সুতার কাটিমটা সব মনে পড়ছে। কিন্তু চশমাটা যে কোথায় অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে চক্চক্ করে চোখ রাঙাচ্ছে তা কিছুতেই মনে পড়ছে না। আব্বাজী আবার জিজ্ঞেস করে: "বল্, চশমাটা কোথায় রেখেচিস।" রণজিৎ চুপ। কেবল ভাবতে চেষ্টা করে, কোথায় রাখলে সেটাকে। "চশমা তুই নিয়েছিস?" রণজিৎ ঘাড় নেড়ে জানায়, "হ্যাঁ"। "তা হলে দে এনে এক্ষুনি।" আব্বাজীর বজ্রকঠোর আদেশ। রণজিৎ আবার চুপ। রাগে আব্বাজী থর্-থর্ করে কাঁপছে। দাছুর মুখের দিকে তাকিয়ে রণজিৎ দেখে তাঁর চোখ ছুটো ঠিক সেই চশমার মত হয়ে উঠেছে। চশমা না পরেও তাঁর চোখ ছুটো যে কি করে ঐ রকম হয়ে যায়, তা সে ভেবেই পায় না। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে সে কেবলই মনে করতে চেষ্টা করে, কোথায় রেখেছে চশমাটাকে। দাছু আব্বাজীকে কি বললেন, চেঁচিয়ে। একটা কথার মানে জানে সে: "খোলোমী", উর্দুতে "ছুষমণী"। অন্য কথাগুলোর একটাও সে বুঝতে পারে না। শুধু দেখে দাছু ভীষণ চটে উঠে আব্বাজীকে কি সব বলছেন। তারপর হঠাৎ হাত ছুড়ে চিৎকার করে উঠলেন, "প্রহার"! কে জানে আবার ঐ কথাটার মানে কি? কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আব্বাজীর চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। লাফিয়ে উঠে রণজিতের গালে পিঠে, মাথায় যেখানে পারে মারে চড়। তারপর চলে লাথি, লাথীর পর লাথী। আব্বাজী চিৎকার করে মাঝে মাঝে: "তু মর্ যা! আভী মর্ যা। তু কৈঁসা লেড়কেকী মুঝে জুরুৎ নহী। মর্ যা তু!" চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে দেয় যেন।...

মার শেষ হয়, রণজিৎ মরে না কিন্তু। ওদের সেই পিণ্ডীতে সে খেয়েছে প্রচুর ভৈঁস কা ছুধ, আনার, সেব্, আঙোর। শুধু ঠোঁটটা কেটে গেছে, আর সর্ব্বাঙ্গে তার মারের দাগ। যাক, "প্রহার" কথাটার মানে শিখে নিয়েছে সে। এক দিন সে ঐ পিপ্লুটাকে এ্যায়সা "প্রহার" লাগাবে! আব্বাজী এক দিনও তার গায়ে হাত তোলে নি। আজ অমন করে মারলে কেন? বিছানায় শুয়ে কোঁপাতে কোঁপাতে ভেবে সে কূলকিনারা পায় না। তার আব্বাজী যে দাছুর অনুমতি না নিয়ে পিণ্ডীতে বিয়ে করেছিল আম্মাজীকে, সে যে বাংলা শেখে নি, তার উপর আজ তিন মাস হ'ল আব্বাজীর চাকরি গেছে, আর তারা যে তিন জনে পিপ্লু আর বাবলুদের বাড়ীতে বসে বসে খাচ্ছে—এ সবের কোন খবরই রাখে না সে...ভারি পিয়াস লেগেছে তার...

কিছুদিন পরে এক দিন আব্বাজী আর আম্মাজী আবার বাক্স-পেটরা গুছিয়ে ওকে নিয়ে চলে গেল। আবার হাওয়া-গাড়ী, রেলগাড়ী, খানিকটা আবার ষ্টীমারে করে যেতে হ'ল। নূতন জায়গাটার নাম শুনলে হাসি পায়: ডিব্রুগড়! চলে যাবার সময়ে রণজিৎ তার বহু দিনের চেপে-রাখা আকাঙ্ক্ষাটা মিটিয়ে গেছে। পিপ্লু আর বাবলুর চোখের সামনে দাছুর গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর গালে একটা চুমু খেয়ে গেছে। দাছুর চোখে নূতন চশমা। সেটাও তাকায় কটমট করে।...

তারপর কেটেছে অনেক দিন। একদিন বিছানায় বসে

বসে দাদুর কিছুতেই দুপুর কাটতে চায় না। ঠান্‌কে ডেকে বলেন: "আচ্ছা, সেই যে আমসত্বগুলো করেছিলে এ বছর, সেগুলো কি আমার সঙ্গে দেবে চিতের ?" সত্যিই, অমন মিষ্টি বোম্বাই আমের আমসত্বগুলোর কথা কারো মনেও নেই! সমস্ত বর্ষাটা গেছে তার ওপর দিয়ে। নিশ্চয়ই ছাতা পড়ে, পোকা ধরে সব নষ্ট হয়ে গেছে। ঠান্‌ ছোটেন তাড়াতাড়ি আমসত্ব আনতে। প্রকাণ্ড তোলো হাঁড়িভরা আমসত্ব। তাড়াতাড়ি মালপত্র-রাখা ঘর থেকে হাঁড়িটা নিয়ে আসেন দাদুর কাছে। সরার ওপর ঢাকা দেওয়া কাপড়টা খুলেছিল কে, কে জানে ?

সরাখানা সরিয়ে দেখেন আমসত্বগুলো শুকনো খট্‌খট্‌ করছে, একটুও ছাতা পড়ে নি। উপরের খানার খানিকটা ছিঁড়ে দিতে হবে দাদুকে। দাদুর আর তর সয় না। ক'দিন জ্বরে ভুগে ভারি ভাল-মন্দ খেতে ইচ্ছে করে তাঁর। আমসত্বখানা তুলে নেন নিজের হাতে।

ওমা, ঐ যে সেই চশমাখানা!

এক টুকরো আমসত্ব মুখে পুরে পাকলে পাকলে তাকে কায়দা করতে চেষ্টা করেন দাদু। চোখদুটো তাঁর চক্‌চক্‌ করে। চশমার রুষ্ট চক্‌চকানির মত মোটেই নয়।

অনির্ব্বাণ

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

(১)

অন্ধকারে আগুনের মত চোখ জ্বলে উহাদের
সমুদ্র-গর্জ্জনসম ভেসে আসে প্রতিবাদ-সুর—
কিন্তু সে তো মিশে যায় নিমেষেতে বুকে বাতাসের
চেতনা জাগে না মনে মদোন্মত্ত বর্ব্বর প্রভুর!

(২)

এইখানে প্রভাতের পাখী এসে গাহিত যে গান
শুকনো খড়ের চালে পড়িত যে কাঁচা-সোনা-রোদ,
চাষীরা আসিত লয়ে খুশীমনে মুঠো মুঠো ধান—
লোভীর চক্রান্তজালে তাহাদের আজি গতিরোধ!

(৩)

আজ তারা বহে শিরে ভারে ভারে কান্নার ফসল
রক্তাক্ত ক্লেদার্দ্র-জীর্ণ জীবনের বন্ধুর সড়কে
মুমূর্ষুরা শ্বাস ফেলে,— ব্যর্থ হ'ল যত অশ্রুজল!
মহামারী দুর্ভিক্ষের হাত ভরে অজস্র মড়কে।

(৪)

হলুদী ফসলভরা হেমন্তের একখানি ক্ষেত
ঘরে বাঁধা দুটি গরু—একখানি তীক্ষ্ণধার হাল,
ফসলের কালে রবে সুনিশ্চিত মৌসুমী সংকেত,
মুক্ত হবে অত্যাচার-শোষণের শত বেড়াজাল—

(৫)

সুকঠিন এ কি খুব ? অত্যাচারী মানুষের দল
ক্ষমতার মদে মাতি আর কত কাটাইবে কাল ?
নূতন যুগের স্বপ্ন তিলে তিলে হতেছে বিফল,
নেহারি বর্ব্বর-লীলা অট্টহাসি হাসে মহাকাল।

(৬)

কল্পনার স্বাধীনতা আজ নাকি বাস্তবে আসীন—
ওরা চায় লভিবারে তাই তার অকৃত্রিম স্বাদ;
নাহি চায় ক্ষয় পেতে, হয়ে যেতে দীন হতে দীন—
অগণিত কণ্ঠে তাই জানায় যে তার প্রতিবাদ!

(৭)

চোখে জ্বলে তাহাদের আশাদীপ্ত উল্কার অনল—
বিজয়-বর্ত্তিকা হয়ে চিরদিন র'বে অনির্ব্বাণ,
দাসত্ব-কঙ্কর-পথ সুমসৃণ করি' অবিরল
ওরা গেয়ে যাবে সেই জীবনের চিরজয় গান।

ব্রহ্মদেশের অধিবাসী

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্মদেশের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে সংস্কৃত ব্রহ্ম শব্দ হইতে এই দেশের নাম ব্রহ্মদেশ হইয়াছে। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন যে, চৈনিক শব্দ 'মিন' (Mein) হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে; ব্রহ্মদেশ বিরাট ইন্দোচীনের একটি অংশ। ইন্দোচীন নামটির সার্থকতা অবশ্য স্বীকার্য্য। ইহার অধিবাসীবৃন্দ সকলেই প্রায়-মালয় (Proto-Malay) এবং মঙ্গোলয়েড (Mongoloid) জাতির অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি মূলতঃ ভারতীয়।

ব্রহ্মদেশের অধিবাসীগণ মঙ্গোলয়েড জাতীয়। ১৯৪১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী এই দেশের লোকসংখ্যা ছিল ১৬,৮২৩,৭৯৩। চৈনিক, কোরীয়, জাপ, তিব্বতীয়,মালয়, পূর্ব্ব-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী এবং ব্রহ্মদেশীয়গণ মানব-জাতির একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই গোষ্ঠীর যে অংশ ব্রহ্মদেশে বাস করে তাহাকে তিনটি প্রধান শাখায় ভাগ করা যাইতে পারে— (১) তিব্বত-ব্রহ্ম, (২) মন-খ্মের এবং (৩) তাই-চীন। ব্রহ্ম এবং প্রায়-ব্রহ্ম জাতি, চীন কোচিন জাতি এবং লোলো জাতি তিব্বত-ব্রহ্ম শাখার তিনটি প্রধান উপশাখা। ইহাদিগের অন্তর্গত ৩২টি উপজাতি আছে। মন-খ্মের শাখা মন বা তালাইং, ওয়া, লা প্রভৃতি ১২টি এবং তাই-চীন শাখা শান, কারেণ, শ্যাম প্রভৃতি ১১টি উপশাখায় বিভক্ত।

তিব্বত-ব্রহ্ম শাখার লোকেরা তিনটি প্রধান দলে উত্তর দিক হইতে ব্রহ্মদেশে আগমন করে। কিংবদন্তী অনুসারে এই তিনটি দলের নাম পিয়ু, কানরান এবং থেট। থেট জাতির বংশধরগণই সম্ভবতঃ বর্ত্তমানে চিন নামে পরিচিত। পিয়ু-গণের এখন কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাহারা বোধ হয় ব্রহ্মজাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কানরান জাতির অধস্তন পুরুষই বোধ হয় আধুনিক আরাকানী জাতি। জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, তিব্বত-ব্রহ্মজাতি ব্রহ্মদেশে আসিবার পথে তিব্বতের পর্ব্বতে ইরাবতী নদীর উৎপত্তি স্থান অতিক্রম করিয়াছিল। এই স্থানেই চিনদের পূর্ব্ব-পুরুষ প্রধান অভিযাত্রীদল হইতে বিযুক্ত হইয়া যায়। ব্রহ্ম এবং প্রায়-ব্রহ্ম জাতি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। দীর্ঘ পথ অতিক্রমণকালে এই জাতির ছোট ছোট দল পিছনে পড়িয়া থাকে। তাহারই ফলে পরবর্ত্তী কালে ব্রহ্মদেশের উত্তর অঞ্চলে তিব্বত-ব্রহ্ম গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

লোলোগণ সম্ভবতঃ মেকং নদীর উপত্যকা-পথে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। এই জাতির কয়েকটি ছোট ছোট দল ব্রহ্মদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে ঘর বাঁধিয়াছে।

মন-খ্মের শাখা সম্ভবতঃ মেকং নদী ধরিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ইন্দো-চীন উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছিল। মন-খ্মেরগণই প্রাচীন কাম্বোডিয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইহাদিগের একটি দল মেকং নদীর পশ্চিমে শান অধিত্যকা এবং দক্ষিণ ব্রহ্মে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মন-খ্মেরগণই ইন্দো-চীনের প্রথম বহিরাগত জাতি। তবে ব্রহ্মদেশে এই দলের প্রধান শাখা মনগণ হয়ত ব্রহ্মজাতির পর ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করিয়াছিল।

তিব্বত-ব্রহ্ম এবং মন-খ্মের জাতিদ্বয়ের পর তাই-চীনগণ ব্রহ্মদেশে আগমন করিয়াছিল। ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সপ্তম শতাব্দীতে ইহারা চীনদেশের অন্তর্গত ইউনান প্রদেশে নানচাও নামে একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। সেখান হইতে পরে ইহারা দক্ষিণে শ্যাম এবং পশ্চিমে আসাম ও উত্তর-ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়াছিল।

ব্রহ্মজাতি নবম শতাব্দীতে মধ্য-ব্রহ্মের রুক্ষ ও অনুর্ব্বর অঞ্চলে (Dry Zone) বসবাস করিতে আরম্ভ করে। এই জাতীর রাজাদের সকল রাজধানীই—পাগান, আভা, অমরাপুরা এবং মান্দালয়—এই সমস্ত 'রুক্ষ অঞ্চলে' অবস্থিত। একমাত্র পেগু ইহার ব্যতিক্রম। ব্রহ্মজাতীয় টাঙ্গু বংশীয় রাজগণ ১৫৩১ হইতে ১৬৩৫ সাল পর্য্যন্ত পেগুতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা তালুনের ১৬২৯-৪৮ রাজত্বকালে আভায় রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রহ্মরাজ অনরত (১০৪৪-৯৭) উত্তর-ব্রহ্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা হরণ করিয়া একটি বৃহদায়তন রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল পাগান। ইরাবতীর ব-দ্বীপ অঞ্চল, দক্ষিণ-ব্রহ্মের তাটন জেলা এবং সিতাং উপত্যকার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত পার্ব্বত্য অঞ্চল অনরতের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্যব্রহ্মে বিকৃত মহাযান বৌদ্ধমত প্রচলিত ছিল। রাজা অনরতের উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার পরিবর্ত্তে হীনযান মত প্রচলিত হয়। এই হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মই তদবধি ব্রহ্মদেশের জাতীয় ধর্ম্ম। ১২৮৭ সালে মোঙ্গোলীয়গণ অনরত-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া পাগান অধিকার করে। এই সময় ব্রহ্মদেশ আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ইহারা সকলেই চীন-সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিত। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা টাবিনসোয়েটি (১৫৩১-৫০) এবং রাজা

বাই-ই-ন্নাং (১৫৫০-৮১) পুনরায় সমগ্র ব্রহ্মদেশকে একতাবদ্ধ করেন। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত এই ঐক্য স্থায়ী হইয়াছিল। এই সময় ইরাবতী ব-দ্বীপের মন-জাতি প্রবল হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তাহারা এত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, উত্তর-ব্রহ্মের অনেক স্থানও তাহাদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মনদিগের এই আধিপত্য কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই শোয়েবোর ব্রহ্মজাতীয় নায়ক আলুম্পায়া (১৭৫২-৫৮) সমগ্র ব্রহ্মজাতিকে সুসংহত করিয়া দেশে একতা স্থাপন করেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। আলুম্পায়াবংশীয় রাজগণ এক সময় সমগ্র ব্রহ্মদেশ, মণিপুর এবং প্রায় সমগ্র আসামের উপর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। ইহার পূর্ব্বে বা পরে কোন যুগেই ব্রহ্মরাজগণের আধিপত্য এতদূর বিস্তারলাভ করে নাই। ১৮৮৫ সালে আলুম্পায়া-বংশীয় শেষ রাজা থিব মিনকে (১৮৭৮-৮৫) সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইংরেজগণ ব্রহ্মদেশ দখল করে।

ব্রহ্মজাতি আজ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ মধ্য-ব্রহ্মের রুক্ষ অনুর্ব্বর অঞ্চলেই বাস করিতেছে। ১৯৩১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ব্রহ্মদেশে ইহাদের সংখ্যা ছিল কিঞ্চিদধিক ৮,৫০০,০০০। তন্মধ্যে ন্যূনাধিক ৪,৫০০,০০০ উত্তর-ব্রহ্মের মাগোয়ে, মান্দালয় এবং সাগাইং বিভাগের অধিবাসী। ইহারা প্রধানতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ খ্রীষ্টধর্ম্মও গ্রহণ করিয়াছে। তবে ব্রহ্মজাতীয়দের মধ্যে খ্রীষ্টানের সংখ্যা নগণ্য। অন্যান্য দেশের বৌদ্ধদিগের ন্যায় ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণও জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাসী এবং তাহারা আত্মা বা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ইহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার পূজা বা উপাসনা প্রচলিত নাই। প্যাগোডা অথবা মন্দিরে স্থাপিত বুদ্ধ এবং অন্যান্য মূর্ত্তির পূজা ইহারা করে না। ইহারা দেব-যোনির (nat) অস্তিত্বে আস্থাবান এবং উপদেবতার ভয়ও ইহাদিগের যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

মদ্যপান এবং জীব-হিংসা বৌদ্ধধর্ম্মানুসারে নিষিদ্ধ হইলেও ব্রহ্মজাতীয়গণ অনেকেই মদ্যপায়ী এবং প্রায় সকলেই মাংসাশী। একথা ব্রহ্মদেশের সকল অধিবাসী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। পল্লী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তাড়ি এবং পচুই প্রস্তুত হয়। শহরের অধিবাসীরা সামর্থ্যে কুলাইলে বিদেশের আমদানি মদই পান করিয়া থাকেন। অন্ন ব্রহ্মদেশের লোকেদের প্রধান খাদ্য। ঙাপ্পি (নাপ্পি—লবণের সাহায্যে রক্ষিত গলিত মৎস্য), কুক্কুট, শূকর এবং ভেড়ার মাংস ইহাদিগের প্রিয় খাদ্য। ইহারা গো-মাংসও ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে গো-মাংস ভক্ষণ গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। তাম্রকূট সেবনে ইহাদিগের অত্যাসক্তি আছে। গুরুজনদের সম্মুখে ধূমপান করা ইহাদের সমাজে দোষাবহ নহে। পার্ব্বত্য অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে অহিফেন সেবন প্রচলিত থাকিলেও ব্রহ্মজাতীয়গণ ইহার ঘোরতর বিরোধী।

স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মজাতি এবং ব্রহ্মদেশের অন্যান্য অধিবাসীরা ধর্ম্মের বহিরঙ্গের প্রতি অতিশয় মনোযোগী। ইদানীং ইহাদের সমাজে ফুঙ্গি বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সমাদর বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ইহার দুইটি প্রধান কারণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ ফুঙ্গিদের মধ্যে অনেকেই উচ্ছৃঙ্খল। অনেক অযোগ্য এবং অনধিকারী ব্যক্তিও এখন মস্তক মুণ্ডন করিয়া পীতবাস ধারণপূর্ব্বক ফুঙ্গি সাজিয়া থাকে। কোন কোন 'চাউঙ' বা সঙ্ঘারামত দুষ্কৃতকারিগণের রীতিমত আশ্রয়-স্থল হইয়া উঠিয়াছে। অনেক ফুঙ্গি আবার রাজনীতিতেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই জাতীয় 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী'দিগকে অবশ্য রেঙ্গুন, মান্দালয় প্রভৃতি বড় বড় শহরেই দেখা যায়। ফুঙ্গিদিগের সমাদর হ্রাসের দ্বিতীয় কারণ যুগধর্ম্মানুযায়ী প্রগতিশীল ভাবধারার প্রসার। ফুঙ্গিদিগের মধ্যে অনেকেই পীতবাস ধারণে অনধিকারী হইলেও ইঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ, আধ্যাত্মিক জগতে উন্নত এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিও আছেন।

ব্রহ্মজাতি এবং ব্রহ্মের অধিবাসী অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে জাতিভেদ এবং অবরোধ-প্রথা একেবারেই অজ্ঞাত। প্রাচীনযুগে প্যাগোডার রক্ষণাবেক্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত ক্রীত-দাসদিগকে অপাংক্তেয় বলিয়া গণ্য করা হইত। মৎস্যজীবী-দিগকে এখনও প্রাণীহত্যাকারী বলিয়া লোকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে।

ব্রহ্মজাতি স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয়, উদারহৃদয় এবং ভাব-প্রবণ। আপাতদৃষ্টিতে ইহাদিগকে অলস বলিয়া মনে হই-লেও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ইহারা অপরিসীম পরিশ্রম করিতে পারে। যাদুবিদ্যায় ইহাদের অগাধ বিশ্বাস। ইহারা বিশ্বাস করে যে, যাদুর সাহায্যে মানুষ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রের অভেদ্য হইয়া উঠিতে পারে। পূর্ব্বে ইহাদের পুরুষগণ হাঁটু হইতে কোমর পর্য্যন্ত উল্কিচিত্রিত করিত। এই প্রথা অধুনা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

লুঙ্গি (লুন্‌জি) এবং এঙ্গি (জামা) ইহাদিগের জাতীয় পরিচ্ছদ। স্ত্রী এবং পুরুষের লুঙ্গি পরিধান করিবার ভঙ্গী এক প্রকার নহে। মেয়েদের এঙ্গি পুরুষের এঙ্গি অপেক্ষা অধিক আঁটসাঁট। গাঁওবাঁও (অনেকটা পাগড়ির মত) পুরুষদিগের জাতীয় শিরস্ত্রাণ। আজকাল কেহ কেহ কোট, প্যাণ্ট ইত্যাদিও পরিয়া থাকে। লুঙ্গি, এঙ্গি এবং গাঁওবাঁও সূতী এবং রেশমী দুই প্রকারেরই হয়। ব্রহ্মজাতীয় পুরুষেরাও পূর্ব্বে লম্বা চুল রাখিত। এই প্রথা এখন প্রায় লোপ পাইয়াছে।

ব্রহ্মদেশীয় গৃহ সাধারণতঃ বাঁশ বা কাঠের মাচার উপর নির্ম্মিত হয়। বন্যা এবং বন্যজন্তুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ

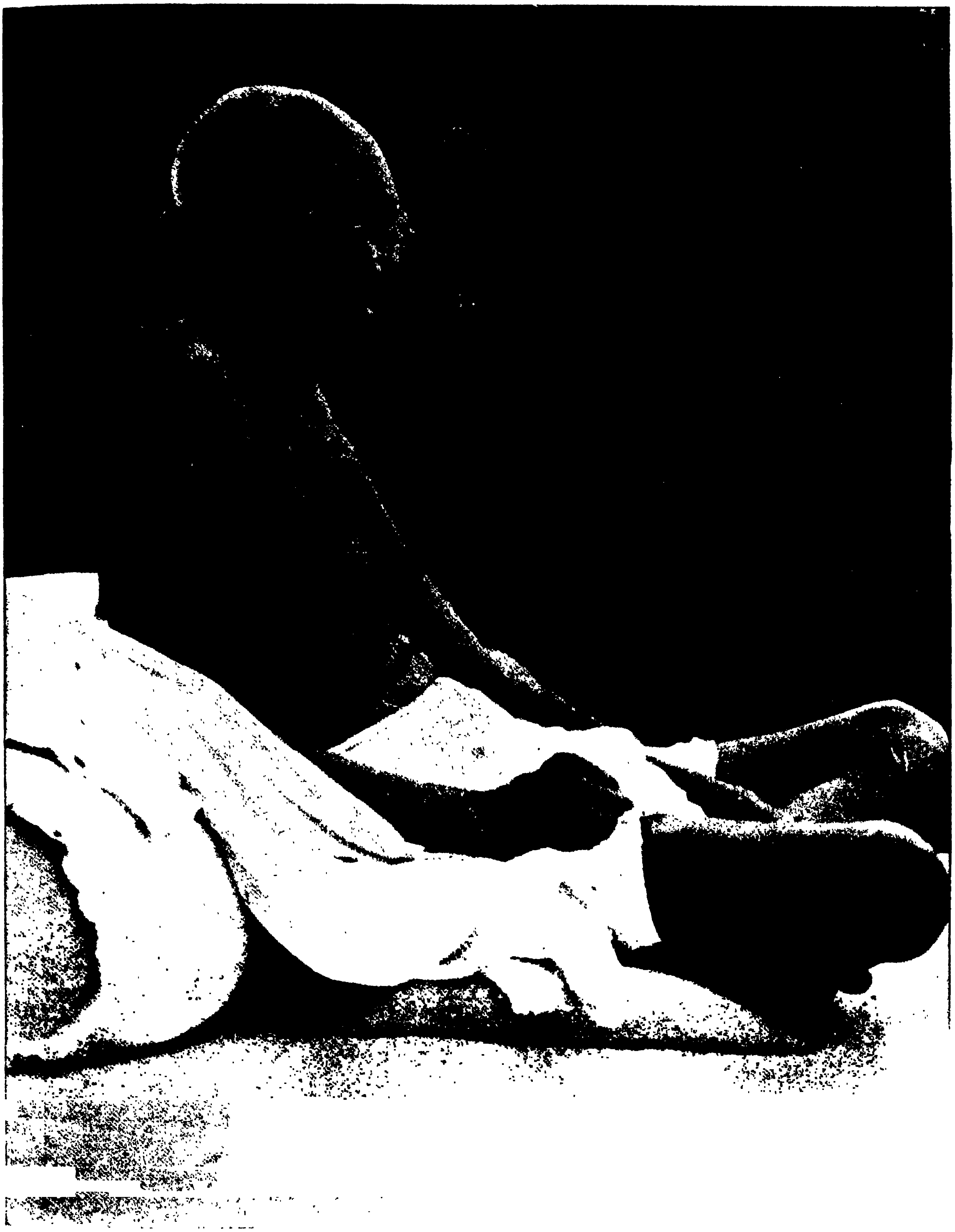

মহাত্মা গান্ধী

হায়দরাবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের সভাপতি স্বামী রামানন্দ তীর্থ (বামে) ও অন্যান্য কর্মকর্তাসহ পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু

ক্যাণ্টনের বাজার হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে দুইটি গল্পরত হাস্যময়ী চীনা তরুণী

রাখিবার জন্য গৃহতল মৃত্তিকা হইতে অনেকটা উচ্চে রাখা হয়। ঘরের নীচেকার ফাঁকা জায়গাই ভাঁড়ার বা গোয়ালঘর রূপে ব্যবহার করা হয়। গৃহে আসবাবপত্রের বাহুল্য নাই।

আরাকানীগণ ব্রহ্মজাতির ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি হইলেও ইরাবতী উপত্যকার ভাষা এবং আরাকানের ভাষার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। আধুনিক আরাকানীদের ধমনীতে বাঙালী রক্তের প্রচুর মিশ্রণ হইয়াছে। ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। ১৯৩১ সালে ইহাদিগের সংখ্যা ছিল ২০৮,২৫১। আরাকানের পর্ব্বতশ্রেণী চিন, ম্রো, চৌংথা, কামি প্রভৃতি উপজাতির আবাসস্থল। ইহাদিগের অধিকাংশই তিব্বত-ব্রহ্মগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। টেভয় এবং মার্গুইয়ের অধিবাসিবৃন্দ মূলতঃ ব্রহ্মজাতীয় হইলেও ইহাদিগের রক্তের সহিত কিছু পরিমাণ শ্যামদেশীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। টেনাসেরিমের দক্ষিণে স্বল্পসংখ্যক মালয় এবং তাহাদের জ্ঞাতি সালোন অর্থাৎ সামুদ্রিক বেদে বাস করে।

মন বা তালাইংগণ ব্রহ্মদেশে আগমনকারী মন-খ্মের জাতির প্রধান শাখা। ইহারা প্রথমতঃ ইরাবতীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে এবং নিম্ন-ব্রহ্মের তাটন ও আমহার্ষ্ট জেলায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ব্রহ্মজাতির আক্রমণের বিরুদ্ধে শতাব্দীর পর শতাব্দী আত্মরক্ষা করিয়া অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইহারা ব্রহ্মরাজ আলৌংপায়ার হস্তে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। ১৮২৪-২৫ সালে টেনাসেরিম ইংরেজের অধিকারভুক্ত হইবার পর মনজাতীয় বহু লোক ইংরেজ অধিকারে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে ইরাবতীর ব-দ্বীপ অঞ্চল প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। মনগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। রেঙ্গুনের বিখ্যাত শোয়েডাগন প্যাগোডা ইহাদিগেরই কীর্ত্তি। ইহারা বর্ত্তমানে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মজাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে এবং ইহাদিগের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই বলিলেও চলে।

ইরাবতী এবং সিতাং উপত্যকার পূর্ব্বে, উত্তর ব্রহ্মের ভামো জেলার দক্ষিণে এবং কারেনী রাষ্ট্রসমূহের উত্তরে শান অধিত্যকা অবস্থিত। শানজাতি প্রধানতঃ এই অঞ্চলে বাস করিলেও ইহারা বিচ্ছিন্নভাবে সমগ্র উত্তর-ব্রহ্মে এবং কিছু অধিক সংখ্যায় দক্ষিণ-ব্রহ্মের টেনাসেরিম বিভাগে ছড়াইয়া আছে। শানজাতি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশে আগমন করে। ইহারা তাই-জাতিরই একটি শাখা। সেইজন্য ইহারা তাই বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশে আগমনের পর ইহারা কালক্রমে সমগ্র উত্তর-ব্রহ্ম এবং আসামে ছড়াইয়া পড়ে। ইহারাই ১২২০ সালে আসামে অহোম রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা শ্যামদেশও নিজেদের অধিকারে আনয়ন করে। ব্রহ্মজাতি এবং শানজাতি উভয়েই প্রধানতঃ কৃষিজীবী, পল্লীবাসী এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। শান পুরুষদের পোশাক—বাউং-বি (ঢিলা পায়জামা), এঞ্জি (জামা) গাওঁবাঙ (পাগড়ী) এবং বাঁশের টুপি। শান মেয়েরা ব্রহ্মজাতীয়া রমণীগণের ন্যায় লুঙ্গি (লুঁজি) এবং এঞ্জি পরিধান করিয়া থাকে। শানগণ সাধারণতঃ অতিথিবৎসল এবং সদাশয়। ইহারা নিপুণ শিকারী। জুয়াখেলায় ইহাদের প্রবল আসক্তি আছে। ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, "ব্রহ্মদেশের অন্যান্য সমস্ত অধিবাসীর তুলনায় ইহারা মধুরপ্রকৃতিসম্পন্ন" ("most pleasant of the races of Burma to deal with")। ১৯৩১ সালে আদমসুমারি অনুযায়ী ব্রহ্মদেশের শান অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৯০০,২০৪। শান অধিত্যকায় শান ব্যতীত সাডাউং, পালাউং, ওয়া, টাউংথু প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি বাস করে। শান অধিত্যকার উত্তর-পূর্ব্বাংশে কোকং অঞ্চল প্রায় সম্পূর্ণভাবে চীনাদের দ্বারা অধ্যুষিত।

কারেণগণ তাই-চীন শাখার অন্তর্ভুক্ত। ইহারা পো এবং সাগ এই দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত। পো কারেণগণ প্রধানতঃ টেনাসেরিমের অধিবাসী। ইহারা বহুলাংশে মন জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সাগ কারেণগণ প্রধানতঃ কারেনী রাষ্ট্রসমূহে এবং ইরাবতীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে বাস করে। কারেনী রাষ্ট্রসমূহে যে সমস্ত কারেণ বাস করে তাহাদিগকে লাল কারেণও বলা হয়। কারেণজাতি ব্রহ্মদেশের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ইংরেজ শাসনকালে মধ্যে মধ্যে কারেণ-ব্রহ্ম বিরোধের কথা শোনা যাইত। ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর কারেণদিগের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং স্বাধীন কারেণ-রাষ্ট্র স্থাপনের আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই কারেণ-সমস্যা ব্রহ্মদেশের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহের অন্যতম। পর্ব্বতবাসী কারেণগণ প্রধানতঃ প্রেতোপাসক। সমতলবাসী কারেণদের মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ইহাদিগের মধ্যে কিছু খ্রীষ্টানও রহিয়াছে। শান অধিত্যকার ন্যায় কারেনী এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল বিভিন্ন জাতির বাসভূমি। ইহারা প্রায় সকলেই মন-খ্মের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত জাতির মধ্যে বাণিয়ক জাতির কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জাতির স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বিবাহের ঘোরতর বিরোধী। ফলে ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাণিয়ক জাতির ছয়টি মাত্র পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। আজ হয়ত তাহাও নাই।

'কাচিন' (চীনা ইয়েজিন হইতে) কথাটির প্রকৃত অর্থ অরণ্যচারী মানব। ব্রহ্মজাতি কর্ত্তৃক এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে কাচিনগণ 'জিংপ' বা নরখাদক এই নামে অভিহিত হইত। 'জিংপ' কথাটি মূলতঃ তিব্বতীয়। এই নাম হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কাচিন জাতি একদা নরমাংস ভক্ষণ করিত। জাতীয় কিংবদন্তী অনুসারে কাচিনগণ প্রায়

১২০০ বৎসর পূর্ব্বে মধ্য-তিব্বতের মালভূমি হইতে 'ন-মাই' এবং মালি উপত্যকার পথে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। শান অধিত্যকার কেংটুং রাজ্যে কিছু কাচিন থাকিলেও ভামো, মিচিনা ও কাথা জেলায় এবং শান অধিত্যকার উত্তরাংশেই ইহাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। অল্পসংখ্যক কাচিন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও ইহাদিগের মধ্যে প্রেতোপাসকের সংখ্যাই বেশী। কাচিনগণ উৎকৃষ্ট যোদ্ধা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহারা যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে।

কাচিন বা 'জিংপ' ভাষা তুরাণীয় ভাষা-গোষ্ঠির অন্তর্গত। পূর্ব্বে ইহাদিগের কোন লেখ্য ভাষা ছিল না। বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে সরকারী কর্ম্মচারী এবং খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণের চেষ্টায় এই অভাব দূর হইয়াছে।

সামন্ত বা মাতব্বরদের সহায়তায় কাচিন-অধ্যুষিত অঞ্চলের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে হুকং উপত্যকার চতুষ্পার্শ্বে এবং চিন্দুইন নদীর পশ্চিমতীরে নাগাদের বাস। ইহারা চিন এবং কাচিন জাতির জ্ঞাতি। ব্রহ্মদেশের এই নাগা-অধ্যুষিত অঞ্চল দুরধিগম্য। ইহার অধিকাংশই ১৯৪০ সালে ইংরেজ শাসনাধীনে আসিয়াছিল। নাগাজাতির কোন কোন শাখার মধ্যে এখনও নরমুণ্ড-সংগ্রহ (Head-hunting) প্রথা প্রচলিত আছে। নাগা-অধ্যুষিত অঞ্চলে যে খাদ্য উৎপন্ন হয়, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য। ধান ব্যতীত কিছু ভুট্টা এবং সজীও এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। গৃহপালিত পশু-পক্ষীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। গরু এবং মহিষ ত প্রায় দেখাই যায় না।

বন্য-পশু এবং শত্রুরা সহসা আক্রমণ করিয়া যাহাতে সহজে কোন ক্ষতি করিতে না পারে সেইজন্য নাগারা উচ্চস্থানে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহাদের গ্রামগুলি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। অনেক দূর হইতে ইহাদিগকে প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করিতে হয়। প্রত্যেক নাগা গ্রামেই অবিবাহিত তরুণ-তরুণীদের মিলনের জন্য একটি ঘর থাকে। অবৈধ মিলনের ফলে কোন তরুণী অন্তর্বত্নী হইলে যে তরুণ ইহার জন্য দায়ী, সে ঐ তরুণীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। গ্রামের মাতব্বরেরা যাহাতে একত্র সমবেত হইয়া পরস্পরের সহিত পরামর্শাদি করিতে পারে সেজন্য প্রত্যেক গ্রামেই একটি ঘর আছে। কোন বহিরাগতের পক্ষে কুমার-কুমারীদের মিলনাগারে অথবা বয়োবৃদ্ধদের 'সভাগৃহে' প্রবেশ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

নাগারা প্রেতোপাসক। বলি ইহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ। কৃষি-ঋতুর সূচনায় ও ভাদ্র-আশ্বিন মাসে যখন ফসল পাকিতে আরম্ভ করে তখন, এবং শস্যকর্ত্তনকালে পশু ও কোন কোন ক্ষেত্রে নরবলি দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য সময়েও ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় পশু এবং নরবলি দেওয়া হয়। বলির সময় কোন বহিরাগত দর্শকের উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয়। যখন কোন নাগাগ্রামে পশু বা নরবলি অনুষ্ঠিত হয়, তখন গ্রামের প্রবেশ-দ্বারে একটি বৃক্ষ-শাখা পুঁতিয়া রাখা হয়। এই বৃক্ষ-শাখা দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, গ্রামে পশু বা নরবলি হইতেছে। ধনুক এবং বিষমাখানো তীর নাগাদিগের প্রধান অস্ত্র। শত্রুর আগমনপথে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য নাগারা স্ব-স্ব গ্রামের চারিদিকে 'পঞ্জি' ভূপ্রোথিত করিয়া রাখে। এই 'পঞ্জি' আগুনে পাকানো সূক্ষ্মাগ্র বংশদণ্ড। ইহা এত ধারালো যে, ইহাতে বুটের তলা পর্য্যন্ত ফুটা হইয়া যায়। পঞ্জিগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই বিষ মাখানো থাকে। আক্রমণকারী শত্রুকে বাধা দিবার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবার সঙ্কীর্ণ পথগুলির উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত প্রস্তরখণ্ডসমূহ তাহার উপর বর্ষিত হয়।

বিভিন্ন নাগাগ্রামের মধ্যে বিরোধ এবং সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে। পোশাক-পরিচ্ছদে কোন কোন নাগা শানদের অনুকরণ করিলেও ইহারা অধিকাংশই কম্বলসর্ব্বস্ব।

চিনজাতি বহু শাখায় বিভক্ত। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসী ইহাদের অন্যতম থাডো শাখা আসামে কুকি নামে পরিচিত। ব্রহ্মদেশ অপেক্ষা আসামেই ইহাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। চিনগণের সিইন শাখা অন্যান্য শাখার তুলনায় প্রগতিশীল। চিনদিগের মধ্যে অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে। এক গ্রামে প্রচলিত ভাষা অনেক সময় অল্প কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকের নিকট দুর্ব্বোধ্য। চিন জাতির বিভিন্ন শাখা স্ব-স্ব প্রধানকর্ত্তৃক সরকারী তত্ত্বাবধানে শাসিত হয়। ইহাদিগের গ্রামগুলি বেশ বড়। কোন কোন চিন-গ্রামে পাঁচ শতেরও কাছাকাছি গৃহস্থ বাস করে।

ব্রহ্মদেশের অন্যতম অধিবাসী চিনবকগণ চিনদিগের জ্ঞাতি। ইহারা মেড়ু, মেম, মেমুন এবং রা এই চারিটি শাখায় বিভক্ত। চিনবক সুন্দরীগণ উল্কি দ্বারা মুখমণ্ডল চিত্রিত করে। ইহাদিগের গ্রামগুলি ক্ষুদ্রায়তন। কোন গ্রামেই ১৫।২০ ঘরের বেশী গৃহস্থ বাস করে না।

ওয়া জাতি প্রধানতঃ শান অধিত্যকা এবং ইউনানের মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্ম-সীমান্তে বাস করে। এই অঞ্চল ওয়ারাজ্য নামে পরিচিত। শালুইন নদী এবং মংলুন নামক শানরাজ্য পর্ব্বতবহুল ওয়ারাজ্যের পশ্চিম সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। মন-খ্মের গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত ওয়াগণ ব্রহ্মদেশের সর্ব্বাপেক্ষা অনগ্রসর জাতি। ইহাদিগের চাষের সময় অনুষ্ঠিত ভূমির উৎপাদিকা শক্তিবর্দ্ধক ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য্য 'অঙ্গ' হইতেছে নরমুণ্ডসংগ্রহ। বিভিন্ন ওয়া গ্রামের বাদবিসম্বাদ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ওয়াগণ স্বভাবতঃই সন্দিগ্ধপ্রকৃতি বলিয়া অপরিচিত

ব্যক্তির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। ওয়া রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে প্রতি পাঁচ দিন পর বাজার বসে। ইহারা নিজ নিজ গ্রামের নিকট পথের পাশে মানুষের মাথার খুলি সাজাইয়া রাখে। ওয়ারাজ্যের অধিবাসী লোই-লাগণও সম্ভবতঃ মন-খ্মের গোষ্ঠী হইতেই উদ্ভূত। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও অধিকাংশই এখনও প্রেতোপাসক। পূর্ব্বে ইহাদিগের মধ্যেও নরবলি-প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে এই প্রথা লোপ পাইয়াছে, নরবলির পরিবর্ত্তে ইহারা এখন পশুবলি দিয়া থাকে। ওয়াদিগের মধ্যেও কেহ কেহ নরমুণ্ড সংগ্রহ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে। ১৯৩৫ সালে জাতিসঙ্ঘ প্রেরিত ইসেলিন কমিশন কর্ত্তৃক চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত নির্দ্দিষ্ট হওয়ার পর ওয়ারাজ্য ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ব্রহ্মদেশের অপরাপর অধিবাসীর মধ্যে জেরবাদী, আরাকানী মুসলমান, আরাকানী কামান এবং মায়েডুগণের কথাও উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় মুসলমানদিগের ব্রহ্মদেশীয়া পত্নীর গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি জেরবাদীগণ প্রায় সকলেই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। আরাকানী মুসলমানগণ প্রধানতঃ আকিয়াব জেলার অধিবাসী। ইহারা চট্টগ্রামের মুসলমান-দিগের আরাকানী পত্নীর গর্ভজাত সন্তান। ইহারা সাধারণতঃ 'ইয়াখাইং কালা' (ইয়াখাইং=আরাকান, কালা=ভারত-বাসী। ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বে সমস্ত বিদেশীরই 'কালা' আখ্যায় অভিহিত হইত,) নামে পরিচিত। কামানগণ বলে যে, তাহারা শাহ্-সুজার অনুচরবর্গের বংশধর। মায়েডুগণ উত্তর-ব্রহ্মের শোয়েবো জেলার অন্তর্গত মায়েডুতে বাস করে। ইহাদিগের ভারতীয় পূর্ব্বপুরুষগণ বিভিন্ন সময়ে ব্রহ্মরাজগণ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া ব্রহ্মদেশে আনীত হইয়াছিল। কামান এবং মায়েডুগণ সকলেই মুসলমান। আরাকানের অধিবাসী মগগণ আরাকানী-পিতা এবং বঙ্গদেশীয় (চট্টগ্রাম জেলার) মাতার সন্তান। ইহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

বসন্তের বিদায়

শ্রীকালিদাস রায়

আমি বসন্ত আসিলাম দ্বারে, কই সেই উৎসাহ ?
কোথা পুষ্পিত ভাষায় সম্ভাষণ ?
বৎসর পরে অতিথি এলাম, উদাস চোখে যে চাহ !
এবার কই ত দিলে না আলিঙ্গন !
শুধু 'এস' বলি জানালে স্বাগত, গলা কেন ভার-ভার ?
কই ও কণ্ঠে কাকলিসিন্ধুর গান ?
প্রিয়া কি তোমার মানে বসিয়াছে রুদ্ধ করিয়া দ্বার ?
অথবা তোমারি হইয়াছে অভিমান ?
অথবা তুমি কি প্রিয়ার বিরহে যাপিছ ফাগুন মাস ?
চোখের দীপ্তি পাইয়াছে কেন ক্ষয় ?
প্রেয়সীর কথা তুলিয়া তোমায় করিবারে পরিহাস,
আজি যে আমার জাগিছে কুণ্ঠাভয় !
আমার পাখায় বায়ু কেন উঠে ভাঙিয়া তোমার কাছে ?
কুঞ্জে তোমার মূক কেন পিক শুক ?
কেন অলি আর প্রজাপতি তার পাখা গুটাইয়া আছে ?
কিংশুক কেন বাহির করে না মুখ ?
তব অঙ্কের বীণা আজি কেন অযতনে আছে পড়ি ?
গাঁথা নাই মালা, গৃহে নাই কোন সাজ !
শঙ্খ তোমার পঙ্কশয়নে যাইতেছে গড়াগড়ি ?
লেখনী হয়েছে কর্ণভূষণ আজ।
চিনিতে তোমারে নারিতাম, দেহে ফিরিয়া গিয়াছে ভোল
কুঞ্চিত চিনি, তাই তোমা চিনিলাম,
তুষার-ধবল শিরে কুন্তল, চর্ম্ম হয়েছে লোল,
একি হেরি কবি-জীবনের পরিণাম ?
উৎসব ছাড়া আমার বন্ধু কিছু নাই আর জানা,
নাই এবে তব উৎসবোচিত মন,
নিরানন্দের মন্দিরে মোর প্রবেশ করিতে মানা,
অনেক কুঞ্জে রয়েছে নিমন্ত্রণ।
প্রতি বৎসর সকলের আগে হেথা পাই আবাহন,
হই যে রঙীন রাগে অনুরাগে জাগে,
এবার আসর জমিবে না হেথা, নাই কোন আয়োজন,
বিতথ সবি, এ অতিথির ভাল লাগে ?
উত্তরে তুমি দক্ষিণ নও, হাসিতেছ ম্লান হাসি !
ভালবাসি তোমা তাই হয় বড় ভয়,
বিদায় বন্ধু, বিদায় বন্ধু, এবারের মত আসি,
ফিরিয়া আসিলে যেন পুন দেখা হয় !

সঙ্কল্প ও সিদ্ধি

শ্রীবিজয়কেতু বসু

অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে, অর্জ্জুনের পক্ষে "কর্ম্মযোগে"র পথ অনুসরণ করা উচিত। ইহাতে অর্থাৎ কর্ম্মযোগের পথে যে বুদ্ধি প্রযুক্ত হয় তাহা ব্যবসায়াত্মিকা। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি মানুষকে এক সুনির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। অব্যবসায়ীদের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ও অনন্তসংখ্যক। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় হইলে অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যের নির্ণায়ক মানসিক বৃত্তি এক হইলে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন দ্বিধা থাকে না। অব্যবসায়ী বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকেরা কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইতে অক্ষম। তাহাদের মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রাম্যমাণ। বাঙালীর রাষ্ট্রীয় জীবনে দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ তাহার এই অব্যবসায়ী-সুলভ বহুশাখাবিশিষ্ট বুদ্ধি। বাঙালী তাহার রাষ্ট্রজীবনে যখনই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে তখনই সে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন এবং বঙ্গ-ভারত সংযোগ-রক্ষার আন্দোলন—দুইটিই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথমোক্ত আন্দোলনটির চমকপ্রদ সাফল্যের পরই কেন বাঙালী রাষ্ট্রীয় জীবনে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল ইতিহাসের নিকট তাহার হেতুটি বিশেষ অনুসন্ধানযোগ্য শেষোক্ত আন্দোলনেরও সাফল্যের জয়ধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতেই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আবার বাঙালীর চিত্তে উদ্বেগের সৃষ্টি করিতেছে। এই উভয় ঘটনাই একজাতীয় কারণ হইতে সঞ্জাত। যতক্ষণ বাঙালীর সম্মুখে একটা সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল—তাহা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদই হোক অথবা ভারত-রাষ্ট্রের অন্তর্গত স্বতন্ত্র বঙ্গ গঠনের দাবিই হোক ততক্ষণ বাঙালীর রাষ্ট্রজীবনও উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। যখনই বাঙালীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব দেখা দিয়াছে তখনই বুদ্ধিভ্রংশের ফলে আলস্য, অবসাদ ও অন্তঃকলহ তাহার জাতীয় জীবনে প্রমাদ আনিয়াছে।

ব্যক্তিগত জীবনেও দেখা যায়, একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিলে চেষ্টার দৃঢ়তা আপনিই আসে, যেমন—পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে ছাত্রদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষ্য তাহাদের অক্লান্ত পাঠাভ্যাসে অনেকখানি সাহায্য করে। মানুষের জীবনের লক্ষ্য, ভারতের ধর্ম্মানুশাসিত সমাজ-বিদ্যার বর্ণনানুসারে চার শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ। এই চারটির নামই পুরুষার্থ এবং একত্রে তাহারা চতুর্ব্বর্গ নামে অভিহিত। পুরুষার্থ মানে পুরুষ যাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে পুরুষ বলিতে স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই বুঝাইতেছে। মোক্ষকে বলা হয় আত্যন্তিক পুরুষার্থ অর্থাৎ যাহা পাইবার পর পুরুষের কাম্য আর কিছু থাকে না এবং তাহার সর্ব্ববিধ দুঃখের অবসান হয়। মোক্ষের সহিত রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কম, কেননা রাষ্ট্র ঐহিক কামনা-বাসনাযুক্ত লোকদের লইয়াই গঠিত এবং সংসারী লোকের সাধনীয় বিষয় ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম এই তিনটি পুরুষার্থ। এ স্থলে ধর্ম্ম কথাটি ইংরেজী Religion-এর প্রতিশব্দ নয়। ভারতীয় সমাজবিদ্যায় ধর্ম্মের মানদণ্ড মানুষের দৈনন্দিন সাংসারিক আচরণ। যে আচরণ মানুষের জন্মগত প্রকৃতি ও সামাজিক প্রতিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে সক্ষম এবং পরিণামে মোক্ষলাভের সহায়ক তাহাই তাহার পক্ষে ধর্ম্ম। যে আচরণ প্রকৃতি বা সমাজ এ দুয়ের যে-কোন একটির পরিপন্থী তাহাই অধর্ম্ম। মানুষ জন্মাবধি ক্ষুৎপিপাসাদি কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না অনুভব করে। এইগুলি যে পর্য্যন্ত না আয়ত্তে আসে ততক্ষণ মানুষের পক্ষে অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করা দুরূহ হয়। যে বস্তু মানুষের এই প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম তাহারই নাম 'অর্থ'। মানুষের মন কেবল প্রয়োজন মিটিলেই শান্ত হয় না, প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয়েও আগ্রহ দেখানো মানুষের স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য। এই প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয়ের প্রতি যে আসক্তি তাহার নাম 'কাম'। কামশাস্ত্র-কারগণ কামের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া দেন তাহা অপেক্ষা-কৃত সঙ্কীর্ণ। সহজাত প্রবৃত্তিসঞ্জাত বিবিধ প্রয়োজনের মধ্যে যৌন প্রয়োজন এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই প্রয়োজন না মিটিলে জীবের বংশ রক্ষাই হয় না তাই তাঁহারা ইহার স্বতন্ত্র বিচার করিয়াছেন। ধর্ম্ম লাভে মানুষ শান্তি পায়, অর্থ লাভে মানুষ স্বস্তি পায়, কাম লাভে মানুষ সুখ পায়।

ব্যক্তিগত জীবনে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিলে যেমন চেষ্টার দৃঢ়তা বাড়ে, রাষ্ট্রজীবনেও তেমনি একটা লক্ষ্য সুনির্দ্দিষ্ট থাকিলে রাষ্ট্র সুসংগঠিত হয়। রাষ্ট্র নিজে ব্যক্তি নয় বটে, কিন্তু তাহার একটা ব্যক্তিত্ব আছে—তাই তাহার লক্ষ্যেরও একটা প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব আছে বলিয়া সমাজবিদ্যার যে সমস্ত সূত্র ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, পৃথিবীর রাষ্ট্রসমাজে রাষ্ট্রগত ক্ষেত্রেও সেই সমস্ত সূত্রই সমভাবে প্রযোজ্য হয়। সমাজে বাস করিতে গেলে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যেমন মানুষকে নিজের স্বার্থ এবং পরের স্বার্থ এই দ্বন্দ্বের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিতে হয়, রাষ্ট্রগত ক্ষেত্রেও তেমনি নিজ-রাষ্ট্রের মঙ্গল ও পর-রাষ্ট্রের অধিকার এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিতে হয়। রাষ্ট্রীয়

লক্ষ্যের বাস্তব রূপ নির্ভর করে রাষ্ট্রের পরিচালক ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ যে লক্ষ্যের বশবর্ত্তী তাহার উপর। রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোক যখন এই ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের অনুগামী হয় তখন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সংহতি দৃঢ় হয় এবং রাষ্ট্রজীবনে হতাশা দূর হয়। রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য কেবল ব্যক্তিগত লক্ষ্যের যোগফল মাত্র নয়, একটি সংগ্রহ বিশেষ। অঙ্কের যোগফল যেমন একটি স্থির সংখ্যা, রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য সেইরূপ অচঞ্চল বস্তু নয়। বিভিন্ন প্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাতোদ্ভূত রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য স্পন্দমান বস্তু। ইহার বাস্তব রূপ কেবল সংখ্যাগৌরবের উপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে কোন্ প্রকৃতির লোক আপাততঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশীল তাহার উপরেও নির্ভর করে। ভারতীয় সমাজবিজ্ঞায় বিভিন্ন স্বভাব অনুযায়ী মানুষ তিনটি মুখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত বলা যাইতে পারে, যথা (১) সাত্ত্বিক, (২) রাজসিক এবং (৩) তামসিক। রাজসিক প্রকৃতি আবার দুই জাতীয় হইতে পারে—দৈব এবং আসুর। এই শ্রেণীবিভাগকরণের মধ্যে মনোবিজ্ঞা এবং শারীরবৃত্তের একটি সুপরিচিত সূত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাহা জীবের শরীর বা মন যে-কোন ক্রিয়ার দিক হইতেই তিনটি অংশে বিশ্লেষণ করা চলে, যেমন (১) অন্তর্মুখ ভাগ (Afferent aspect), (২) কেন্দ্রভাগ (Central aspect) এবং (৩) বহির্মুখ ভাগ (Efferent aspect)। অন্তর্মুখ ভাগ জীবকে অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন করে, বহির্মুখ ভাগ তাহাকে বহিঃ-প্রকৃতি সম্বন্ধে সক্রিয় করে। কেন্দ্রভাগ এই উভয় অংশের মধ্যে সেতুস্বরূপ। একজন তৃষ্ণায় জল পান করিল, এ ক্ষেত্রে তৃষ্ণার অনুভূতি তাহার অন্তর্মুখ ভাগের ক্রিয়া এবং জল পানের চেষ্টা তাহার বহির্মুখ ভাগের ক্রিয়া। জল পানের যোগ্য কি না ইত্যাদি বিচার কেন্দ্রভাগের ক্রিয়া। অন্তর্মুখ ভাগ যখন ক্রিয়াশীল হয় তখন মানুষের স্বভাব সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয় এবং বহির্মুখ ভাগ যখন সক্রিয় হয় তখন তাহা রাজসিক ভাবাপন্ন হয়। যখন কোন বাধার ফলে অন্তর্মুখ বা বহির্মুখ ভাগে জড়তা আসে তখন মানুষের স্বভাব তামসিক ভাবাপন্ন হয়। সত্ত্বগুণের লক্ষণ প্রকাশ, রজোগুণের লক্ষণ চেষ্টা, উভয় দিকেই যে গুণ বাধা সৃষ্টি করে তাহাই তমঃ। মানুষের চেষ্টা সমাজের মঙ্গলের জন্যও হইতে পারে আবার অনিষ্টের জন্যও হইতে পারে, তাই উদ্দেশ্যভেদে রাজসিক প্রকৃতিকে পুনরায় দুইটি উপশ্রেণীতে পৃথক করা হইয়াছে—দৈব এবং আসুর।

রাষ্ট্রপরিচালনায় যে প্রভাব কার্য্যকর তাহাকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, (১) ব্যক্তিগত, (২) সম্প্রদায়গত। এই দুই জাতীয় প্রভাবকেই আবার (ক) প্রাপ্ত এবং (খ) অর্জ্জিত এই দুইটি উপশ্রেণীতে পৃথক করা সম্ভব। ব্যক্তিগত প্রভাবের উদাহরণ স্বরূপ বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী, আইনষ্টাইন, বার্ণার্ড শ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এগুলি সমস্তই অর্জ্জিত প্রভাব অর্থাৎ ইঁহারা নিজের চেষ্টায় বিপুল প্রভাবের অধিকারী হইয়াছেন। ইহার বিপরীত উদাহরণস্বরূপ হায়দরাবাদের নিজাম প্রমুখ দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রভাব উত্তরাধিকারসূত্রে ‘প্রাপ্ত’ হইয়াছেন। সম্প্রদায়গত ক্ষেত্রে ‘প্রাপ্ত’ প্রভাবের উদাহরণ-স্বরূপ জমিদারশ্রেণীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুরুষানুক্রমে জমিদারশ্রেণী প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এই প্রভাব তাহারা অর্জ্জন করে নাই, পূর্ব্বপুরুষ হইতে ‘প্রাপ্ত’ হইয়াছে মাত্র। সম্প্রদায়গত ভাবে অর্জ্জিত প্রভাবের উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে শ্রমিক আন্দোলনের কথা। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণী উপস্থিত যতটা প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত বস্তু নয়, নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের জীবনেই অর্জ্জিত। এই-খানে আমরা যদি ইতিহাসের গতির দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে দেখিতে পাই, কালক্রমে ‘অর্জ্জিত প্রভাব’ ‘প্রাপ্ত প্রভাবে’ পরিণত হয় এবং সম্প্রদায়গত উত্তরাধিকার ব্যক্তিগত উত্তরাধিকারে পর্য্যবসিত হয়। প্রভাব যে ভাবেই আয়ত্তে আসুক না কেন, রাষ্ট্রের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে সেই প্রভাবের ব্যবহার-প্রণালীর উপর। প্রভাব শুভ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইলেও তার আশানুরূপ সফল হওয়া বা না হওয়া কিন্তু নির্ভর করে অনেকটা প্রয়োগ-কৌশলের উপর। যে নেতা যথোচিত লক্ষ্য নির্ব্বাচনে দক্ষ এবং সেই লক্ষ্যের প্রচারে নিপুণ তিনিই লোকপরিচালনায় সমর্থ হন। উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব আকর্ষণ-শক্তি এবং প্রয়োগ-কৌশলের নিপুণতা—এই ত্রিবিধ গুণেরই সমন্বয় আবশ্যক। এতক্ষণ রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য স্থিরীকরণে রাষ্ট্রের বিভিন্ন আভ্যন্তর প্রভাবের কথাই আলোচনা করা হইল। রাষ্ট্রের লক্ষ্য নির্দ্ধারণে আভ্যন্তর প্রভাব বিশেষ শক্তিশালী হইলেও বাহ্য প্রভাবের গুরুত্বও মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। এই বিষয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ এবং বৈদেশিক প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহ উভয়েই বিশেষ ভাবে দায়ী হইয়া থাকে।

ব্যক্তিই রাষ্ট্রের মূল উপাদান এবং পরিণামে তাহার কর্ম্ম-প্রচেষ্টার উপরেই রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। অতএব রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য যে ব্যক্তির কর্ম্মপ্রচেষ্টা বৃদ্ধি করিবে তাহাই বাঞ্ছনীয়—এইটি একটি সূত্র। ব্যক্তি রাষ্ট্রের মূল উপাদান হইলেও ব্যক্তি হইতে সরাসরি রাষ্ট্রগঠন হয় না। ব্যক্তি হইতে পরিবার, পরিবার হইতে গোষ্ঠী ও নানাবিধ সমাজ-শ্রেণীর সমবায়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। সুতরাং যে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য পরিবার নির্ম্মাণে এবং পরিবার গোষ্ঠী তথা সমাজ প্রতিপালনে সহায়তা করিবে তাহাই রাষ্ট্রের আভ্যন্তর-গ্রন্থিসমূহ দৃঢ় রাখিতে পারিবে। এইটি লক্ষ্য নির্ব্বাচনের দ্বিতীয়সূত্র। পর-রাষ্ট্রের উপর প্রভাব থাকা-না-থাকার উপরেও রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধি

অনেকাংশে নির্ভর করে। এ স্থলে প্রভাব ও প্রভুত্ব এই দুইটি বিষয়ের প্রভেদ সর্ব্বদা মনে রাখা প্রয়োজন, কেননা প্রভুত্ব করিতে গেলে প্রায়ই প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়। প্রভুত্ব না করিয়াও প্রভাব বিস্তারের ঘটনা ইতিহাসে বিরল নহে। অশোকের সময় ভারতের বাহিরে ভারতীয় প্রভাব অথবা আধুনিক যুগে ভারতের বাহিরে বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য পর-রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে অথচ প্রভুত্ব করিবে না তাহাই কাম্য—এইটি রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য নির্ব্বাচনের তৃতীয় সূত্র।

রাষ্ট্রজীবনে সমৃদ্ধিলাভ যদি বাঙালীর সংকল্প হয় তবে তাহাকে সিদ্ধিলাভের জন্য উপযোগী লক্ষ্য স্থির করিয়া কর্ম্ম-প্রচেষ্টা বাড়াইতে হইবে। এই লক্ষ্য নির্ব্বাচনে চিন্তানায়কদের সাহায্য প্রয়োজন, লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে কর্ম্মনায়কদের প্রয়োজন। বাংলায় তাহার কোনটিরই অভাব না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যদি সম্প্রদায় ও প্রকৃতিনির্বিশেষে সকল বাঙালীকে কালজয়ী ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তাহার তাৎপর্য্য বুঝানো যায়, যদি চিরবিকাশমান ভারতীয় সভ্যতারচনায় বাংলার দান বাঙালী বুঝে তবে সংকল্প-সিদ্ধির জন্য যে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যের প্রয়োজন তাহার নির্দ্ধারণ কষ্টসাধ্য হইবে না।

সংগ্রাম ও শান্তি

শ্রীনির্ম্মাল্য দাশগুপ্ত

আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষ হইবার পর বৎসর ঘুরিয়া আসিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা অর্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু আমাদের সম্মুখে কঠোরতর সংগ্রাম—সে সংগ্রাম শান্তি ও সমৃদ্ধির সংগ্রাম। বিদেশী শাসনের আমলে শান্তি ও সমৃদ্ধির অভাবের জন্য আমরা বিদেশী শাসনকেই দায়ী করিয়াছি। আজ সে শাসন অপসৃত। আজ দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির দায়িত্ব তাঁহাদেরই যাঁহারা রাষ্ট্রের কর্ণধার। দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়া যে কংগ্রেস দেশের দুয়ারে স্বাধীনতাকে পৌঁছাইয়া দিয়াছে আজ তাহারই হাতে দেশ-পরিচালনার ভার। সংগ্রাম ও ত্যাগ দ্বারা জন-মনে কংগ্রেস যে বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে তাহাতে কংগ্রেসী আমলে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হইবে এই আশায় সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল যে এইবার দেশে সুখ শান্তি ফিরিয়া আসিবে, অভাব দূর হইবে এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। কিন্তু এক বৎসরের অভিজ্ঞতায় জনগণের অটুট বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে আঘাত লাগিয়াছে। কংগ্রেসী নেতাদের রাষ্ট্র-পরিচালন ক্ষমতায় তাহাদের মনে সংশয় জাগিয়াছে।

এই সংশয়েরই উত্তর পাই লক্ষ্ণৌয়ে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতায়। তিনি জনসভায় সমাগতদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'Remove the Congress and you will see India fall apart'। কংগ্রেসের প্রতি অনুরাগ দেশের এখনও যায় নাই; কংগ্রেসকে ভাঙিয়া দিবার কথা দেশবাসী এখনও মনে আনে নাই। কিন্তু কংগ্রেস যে পথে চলিয়াছে সেই পথেই চলিতে থাকিলে এক দিন আপনা হইতেই সে দেউলিয়া হইয়া পড়িবে। শিশু-রাষ্ট্রকে অনেক বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া চলিতে হইতেছে বলিয়া, বর্ত্তমানে ইহার কঠোর সমালোচনা না করিয়া ভবিষ্যৎ পরিণতির জন্য প্রতীক্ষা করিবার যে নির্দ্দেশ আমাদের দেওয়া হইতেছে তাহা অসঙ্গত নয়—কিন্তু যে শিশুর মধ্যে শৈশবেই ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দেয়, বা যে শিশুর কোনও অঙ্গ বিষাক্ত হয় সে সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করিবে কেমন করিয়া? শৈশব দেখিয়াই পরিণত কালে কি হইবে বুঝা যায়। শৈশবে যাহার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি প্রকাশ পায়, মহান্ প্রেরণার আভাস দেখা যায়—তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই আমরা আশান্বিত হই। জড়তা দেখিলে নৈরাশ্য বোধ করি।

শিশু-রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার কংগ্রেসের হাতে। কংগ্রেসী কর্ত্তৃপক্ষই আজ দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা। তাঁহাদেরই নির্দ্দেশ ও ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্রের নানা বিভাগে লোক নিযুক্ত হইতেছে। এই সব নিয়োগে কংগ্রেসের সহিত কাহার কত কালের যোগাযোগ আছে, কে কত বৎসর জেলে থাকিয়াছে তাহাই যেন যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংগ্রামের সময় যে সৈনিক নির্ভীক ভাবে অস্ত্রের আঘাত সহ্য করিয়াছে, শান্তির সময় সেই যে দেশ-পরিচালনার কাজ নির্ভুল ভাবে করিবে এমন কোন কথা নাই। সৈনিকের কাজ যুদ্ধ করা; মসনদে বসা নয়। অধিকাংশ কংগ্রেসীই বিগত ২০।২৫ বৎসর ধরিয়া ব্রিটিশ শাসনের অবসানের চিন্তা ও চেষ্টা করিয়াছেন। বিদেশী শাসনকে ধ্বংস করিবার প্রয়াসে তাঁহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটিয়া গিয়াছে। ধ্বংসের কাজে তাঁহারা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সেইজন্য গড়ার কাজেও তাঁহারা সুদক্ষ হইবেন এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

শান্তি ও সমৃদ্ধির কোন্ আভাস আজ আমরা দেখিতে

পাই ? স্বাধীনতালাভের পর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটার পর একটা জটিলতা চলিয়াছেই। কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ এই উভয় দেশীয় রাজ্যের সমস্যাই গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। হায়দরাবাদ সমস্যার একরূপ মীমাংসা হইয়াছে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান এখনও সুদূর পরাহত বলিয়া মনে হইতেছে। কথায় কথায় জাতিপুঞ্জ-সংসদের (U.N O.) দ্বারস্থ হওয়াতে আমাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় না। দেশের আভ্যন্তরীণ নানা সমস্যার কোনটারই সমাধান হয় নাই। সমাধানের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্, কোথাও তো আলোর রেখাও দেখা যায় না। খাদ্য-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা, উদ্বাস্তুদের সমস্যা—ছোট-বড় নানা সমস্যা লইয়া আমরা বিব্রত। সমস্যার মীমাংসা হওয়া দূরের কথা, সকলক্ষেত্রে অবনতির লক্ষণই দেখা যাইতেছে। দেশজোড়া এই অবনতির মূলে—দেশবাসীর নৈতিক অধোগতি। যেমন তেমন করিয়া নিজের পুঁজি বাড়াইবার দিকেই লোকের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য। এই সকল পুঁজিবাদীরা নীতি মানে না, মানবতার ধার ধারে না, আইনকেও ফাঁকি দেয়। তাহারই ফলে দেশে অনাচার, অভাব অভিযোগের অন্ত নাই। এ সমস্ত নির্ম্মম হস্তে দমন করিবার ব্যবস্থা নাই। ফলে অবনতির মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। জনসাধারণ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কংগ্রেসী আমলেও স্বাধীন দেশে কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল ? ইহার উপর আর এক গুরুতর সমস্যা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—প্রাদেশিকতা। প্রদেশে প্রদেশে এই যে অন্তঃকলহ ইহার জন্য দেশে আমাদের নিজেদের ক্ষতি তো হইতেছেই, বিদেশেও লজ্জার সীমা নাই। সমস্ত ভারতের প্রতিনিধি যে কংগ্রেস তাহারই হাতে দেশের শাসনভার, তবু কেন এই প্রাদেশিকতা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল ?

ভারত-শাসনের খসড়া-বিধিতে আমরা অনেক বড় বড় কথা পাই—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। কথাগুলি মহান্ আদর্শের দ্যোতক, কিন্তু কার্য্যতঃ কি দাঁড়াইয়াছে ? এই সব বড় বড় আদর্শের নামেই দুনিয়ায় যত অনাচার সংঘটিত হইয়া থাকে—ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দিবে।

খসড়া-বিধিতে দেখিতে পাই—

(1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters of employment under the State.

(2) No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth or any of them be ineligible for any office under the State.

বাস্তবক্ষেত্রে ইহা কি অনুসৃত হইয়াছে ? তবে ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের প্রথা প্রচলিত রহিল কি ভাবে ? ভারতের এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে বিদেশী বলিয়া গণ্য হইতেছে—ইহাই কি আমরা দেখিতেছি না ?

No minority whether based on religion, community or language, shall be discriminated against in regard to the admission of any person belonging to such minority into any educational institution maintained by the State.

The State shall not in granting aid to educational institution discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority whether based on religion, community or language.

কিন্তু কার্য্যতঃ দেখি, বিহারের সংখ্যালঘু বাঙালী সম্প্রদায় সব রকম সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়। ডোমিসাইল সার্টিফিকেট না থাকিলে স্কুল-কলেজে ভর্ত্তি হওয়া দুরূহ, স্কলারশিপ পাওয়া অসম্ভব। সার্টিফিকেট থাকিলেও ব্যবহারে তারতম্য করা হয়। যোগ্যতা থাকিলেও চাকুরীতে প্রমোশন বদলী ইত্যাদি বিষয়ে বাঙালীদের দাবী গ্রাহ্য হয় না। বিহারে বাঙালীদের স্বার্থরক্ষা বিষয়ে বিহারের কোনও মাথাব্যথা নাই। মানভূম, সিংভূম যাহাতে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত না হইতে পারে সে বিষয়ে বিহার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছে। এই সব অঞ্চলে বাংলা ভাষার পরিবর্ত্তে হিন্দী প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেন সেগুলিতে হিন্দীভাষী বিহারীদেরই অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করা হয়। এই সমস্ত সত্ত্বেও কি করিয়া বলা যায় যে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের সমান দাবি স্বীকৃত হইবে, এবং ভাষার জন্য কোন তারতম্য করা হইবে না ?

আসামের অবস্থাও একই প্রকার। সেখানে বাঙালী বিতাড়নের ব্যবস্থা দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিবে। লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিসংযোগও ঘটিয়াছে। এই তো সেদিন নওগাঁ ও গৌহাটিতে কত কাণ্ড হইয়া গেল। এ সমস্ত কি সংখ্যালঘুদের মনে অনাস্থার সৃষ্টি করে না ? উড়িষ্যাতেও বাঙালীদের লাঞ্ছনার কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। ভারতের এক প্রদেশের অধিবাসীদের যদি অন্য প্রদেশে এইরূপ দুর্গতি ভোগ করিতে হয়, তবে কংগ্রেসের বহু বিঘোষিত সাম্য ও মৈত্রী ইত্যাদি নীতির উপর জনসাধারণের আস্থা থাকে কি করিয়া ?

কংগ্রেসের নীতি ছিল ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশ-সমূহের পুনর্গঠন। বহু বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস এই নীতিই ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশ সিংভূম, মানভূম ন্যায়সঙ্গত ভাবে দাবি করিয়াও পাইতেছে না, বরং এই দাবি উত্থাপনের জন্য বাঙালীরা নিন্দিত হইতেছে। পণ্ডিত নেহরু, রাজাজী ইত্যাদি রাষ্ট্রপ্রধানগণ বলিতেছেন, 'কোন্ প্রদেশে কোন্ অঞ্চল রহিল ইহা লইয়া কোলাহল ও কলহ করা উচিত নয়—যে প্রদেশেই থাক ভারতেই তো রহিল। কিন্তু বিহার, আসাম ও উড়িষ্যায় বাঙালীদের দুরবস্থার কোন প্রতিকারের চেষ্টাও তো তাঁহারা করিতেছেন না। আরও একটি কথা। অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরল ও মহারাষ্ট্রের স্বতন্ত্র প্রদেশ হওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয় বিচার অনুসন্ধানাদির জন্য কমিশন

নিযুক্ত হইয়াছে, অথচ বাংলাভাষী অঞ্চল লইয়া দাবি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতেও কর্তৃপক্ষ অনিচ্ছুক। এই বৈষম্যমূলক আচরণে কংগ্রেসের পক্ষে তাহার মর্য্যাদা অনেকাংশে হারাইবার সম্ভাবনা।

কোনও দিক দিয়া কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কি? সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু চোরাকারবার এখনও পুরাদমে চলিতেছে। সমাজের এক স্তরে লোকে ক্রমশঃই উচ্চহারে ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে, আর এক দিকে লোকে অনাহারে অর্দ্ধাহারে জীবনীশক্তি হারাইতেছে।

জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা মোচনের আশ্বাস কম্যুনিষ্ট দলের শক্তির মূলে। তাহাদের বড় বড় কথা দুর্গত শ্রমজীবীদের প্রভাব বিস্তারের কারণ। কংগ্রেস যদি চাষী মজুরের অভাব দূর করিতে আন্তরিক চেষ্টা করিত, তাহা হইলেই কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিপত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা হইত। জোর করিয়া তাহাদের মুখবন্ধ করিতে হইত না। যাহারা যথার্থ অপরাধী বিচারালয়ে তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা কি যাইত না? সেই তো ব্রিটিশ আমলের বহুনিন্দিত অর্ডিনান্সেরই পুনরাবৃত্তি হইল কংগ্রেসী আমলে। দেশের এই দুঃখদুর্দ্দশা ও অভাবের দিনে কমিউনিষ্ট দল যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেশের পক্ষে অহিতকর অবশ্যই, কিন্তু সমস্ত দোষক্রটি সত্ত্বেও কম্যুনিষ্ট দল একটা কাজ করিতেছিল—কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কিছু অপ্রিয় সত্য ভাষণের শক্তি তাহার ছিল। ইহা বন্ধ করা কংগ্রেসের পক্ষে সমীচীন হইয়াছে কি? দেশ-পরিচালনার ভার যাহাদের হাতে, বিরুদ্ধ পক্ষের মতামত বিবেচনা করাও তাহাদের প্রয়োজন, তাহা হইলে নিজেদের গলদ বুঝিয়া তাহারা সংশোধনের চেষ্টা করিতে পারিতেন।

কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিল। কংগ্রেস এবং সমগ্র দেশই আজও সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে গান্ধীজীর নামই উল্লেখ করে। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, গান্ধীজীর রাজনৈতিক অস্ত্র অহিংসার সাহায্যে আমরা স্বাধীনতালাভ করিলাম, কিন্তু গান্ধীজী মৃত্যুতে যে সত্যের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, সেই সত্যকে আমরা নিয়ত নানাভাবে অবমাননা করিয়া আসিতেছি। আমরা সত্যকে বিসর্জ্জন দিয়া অসত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছি।

স্বাধীনতালাভ করিয়া যদি আমরা সুখে ও শান্তিতে না থাকিতে পারিলাম তাহা হইলে এই স্বাধীনতার মূল্য কি? সাধারণ লোকে চাহে সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে। দিল্লীর রাষ্ট্রপাল-প্রাসাদশীর্ষে ইউনিয়ন জ্যাক উড়িল, কি চক্রচিহ্ন শোভিত ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িল তাহাতে তাহার কি আসে যায়?

আধুনিক ব্যবহারে প্রাচীন সংজ্ঞার উপযোগ

অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

উদ্বাসন (Evacuation)

ইংরেজী evacuation শব্দের অর্থ 'স্থান খালি করিয়া দেওয়া'। ঠিক এই অর্থে প্রাচীন গ্রন্থে উৎ পূর্ব্বক বস্ ধাতু হইতে উৎপন্ন নানা রূপ পদের প্রয়োগ পাওয়া যায়।

বৈদিক গ্রন্থে সোম যাগ প্রকরণে প্রবর্গ্যোদ্বাসন নামে একটি অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে। উহার অর্থ প্রবর্গ্যসম্ভারের অপসারণ। এক স্থান খালি করিয়া সম্ভারগুলি অপর স্থানে সরাইয়া লইতে হয়—ইহাই 'উদ্বাসন'। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও (৩।১৪) এই পদটির উল্লেখ আছে।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।২।৬।৭) এক শ্রেণীর দুষ্ট লোকের বিশেষণ আছে 'উদ্বাসীকারিণঃ'। ইহাদের উৎপীড়নে অধিবাসীরা উদ্বাসী হইত অর্থাৎ বাসস্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। এই উদ্বাসীকারী পদের ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য লিখিয়াছেন—'দেশম্ এতম্ উদ্বাসং নিবাসশূন্যং কুর্ব্বন্তি'—ইহারা দেশকে 'উদ্বাস' অর্থাৎ নিবাসশূন্য করিয়া ফেলে।

পঞ্চদশ শতকে সংকলিত 'লেখ-পদ্ধতি' নামক গ্রন্থে দেখা যায়—কোন চাষী জমির ফসল সম্পর্কে অন্যায় আচরণ করিলে তাহাকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত। এই বহিষ্করণের নাম ছিল উদ্বাসন (গ্রামাৎ উদ্বাসনীয়ঃ—১৯ পৃঃ)। কোন এক ব্যক্তি তাহার পূর্ব্ববাস ত্যাগ করিয়া নূতন স্থানে আসিলে তাহাকে বলা হইত 'উদ্বস' (উদ্বস-কুটুম্বিকানাম্—১০ পৃঃ)। লেখ-পদ্ধতিতে উদ্বস শব্দের অর্থ বাস্তুত্যাগী। কিন্তু কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীতে (৫।৩৭৮) অনধ্যুষিত শূন্য স্থানকে 'উদ্বস' বলা হইয়াছে (নিত্যোদ্বসেষু নিরয়েষু নিগাঞ্চরেষুঃ)।

উল্লিখিত উদ্বাসন, উদ্বাস, উদ্বাসনীয় এবং উদ্বস শব্দের প্রয়োগ হইতে জানা যায়—উৎ পূর্ব্বক বস্ ধাতুর অর্থ to evacuate। এই ধাতু হইতে আর একটি পদ হয় 'উদ্বাস্ত'।

বাংলার সাহিত্যিকগণের রচনায় ভিটা-ছাড়া অর্থে উদ্বাস্ত পদের ব্যবহার আছে। সময়ে সময়ে সংবাদপত্রে বাস্তুত্যাগীদিগকে উদ্বাস্ত নামে উল্লেখ করা হয়। 'পরিভাষা সংসদ'ও

evacuceeর জন্য উদ্বাস্তু নাম প্রস্তাব করিয়াছেন। শব্দটি অভিপ্রেত অর্থের প্রকাশক তাহাতে সন্দেহ নাই। 'উৎ' উপসর্গের এক অর্থ বিয়োজন, পৃথক্‌করণ। সুতরাং বাস্তুভূমি হইতে বিয়োজিত ব্যক্তি প্রকৃত উদ্বাস্তু।

যাঁহারা পাকিস্থানের বাস ত্যাগ করিয়া এদেশে আশ্রয় লইতেছেন তাঁহাদিগকে সরকারী খাতাপত্রে refugee বলা হয়। ইঁহারা আশ্রয়ের সন্ধানে ফিরিতেছেন। সেদিক দিয়া দেখিলে refugee, আশ্রয়প্রার্থী বা শরণার্থী নাম অসংগত নয়। আবার আর এক দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ সংজ্ঞা অনুপযুক্ত বলিয়া মনে হইবে। জয়পুর কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া তাঁহার অভিভাষণে এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার মর্ম এই,—

> রাষ্ট্রনায়কগণের অনুমোদনক্রমে দেশবিভাগ হইয়াছে। তাহার ফলে বহু লোক পৈতৃক বসতি ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইতেছেন। এ সকল ব্যক্তি শরণার্থীরূপে ভারতবর্ষের অনুকম্পার ভিখারী হইতেছেন মনে করিলে অবিচার করা হইবে। ইঁহারা রাষ্ট্রিক অধিকার-বলেই এদেশে স্থান পাইবার যোগ্য। ইঁহাদিগকে ইংরেজীতে evacuee বলা সংগত। আমাদের ভাষায় ইঁহাদের নাম হওয়া উচিত 'পরবাসী' কিম্বা 'নির্বাসী'।

ডাঃ পট্টভি 'নির্বাসী' নামটি উৎকৃষ্ট মনে করেন। রাষ্ট্রপতির মন্তব্যের ফলে সংবাদপত্রে নির্বাসী পদের ব্যবহার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নির্বাসী শব্দের অপর এক অর্থ সুপ্রসিদ্ধ। তাহা ছাড়া, এ স্থলে 'নির্' অপেক্ষা 'উৎ' উপসর্গই যে সমধিক অর্থদ্যোতক হইবে তাহা উপরে প্রদর্শিত প্রয়োগগুলির আলোচনায় স্পষ্ট হইয়াছে। সুতরাং evacuee এবং তৎ-সম্পর্কিত ইংরেজী শব্দের জন্য নিম্নলিখিত রূপ প্রতিশব্দ গ্রহণ-যোগ্য হইবে বলিয়া মনে করি,—

evacuee = উদ্বাসী, উদ্বাস্তু
evacuated = উদ্বাসিত
evacuation = উদ্বাসন ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকারের অর্থপ্রকাশের জন্য এক বস্ ধাতু হইতে আরও অনেক প্রয়োজনীয় পদ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ধাতুটির যোগ্যতা অসামান্য, কয়েকটি উদাহরণ দিলেই তাহা স্পষ্ট হইবে।—

emigration—প্রবসন বা উৎপ্রবসন
rehabilitation—পুনর্বসন বা পুনরাবাসন
repatriation—প্রত্যাবাসন
immigration—অভিবসন বা অভিবাসন
domicile—নিবসন (ক্রিয়া), নিবাস (স্থান), নিবাসী (ব্যক্তি)
transportation—নির্বাসন

রাষ্ট্রভাষা ও সঙ্কীর্ণতা

অধ্যাপক শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ রায়

যে ভাষার সাহায্যে রাষ্ট্রের কার্য্যপরিচালনা সহজসাধ্য হয় রাষ্ট্রভাষার স্থান অধিকার করিবার যোগ্যতা তাহারই সবচেয়ে বেশী। ইংরেজ-শাসিত ভারতে ইংরেজীই ছিল রাষ্ট্রভাষা, তাই এত দিন ভারতের রাষ্ট্রভাষা লইয়া কোন বিতর্ক উপস্থিত হয় নাই। আজ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা লইয়া বহু মতবিরোধ উপস্থিত। এমন একটি ভারতীয় ভাষা রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত যাহার গতি স্বচ্ছন্দ, শব্দসম্পদ প্রচুর এবং যাহা শিক্ষা করিবার জন্য কোন প্রদেশবিশেষের অধিবাসীদের দ্বারস্থ না হইতে হয়। মাত্র এই কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা নির্দ্ধারণ করিতে গেলে প্রথমতঃ কেবলমাত্র দেবনাগর অক্ষর-সম্বলিত সংস্কৃত ভাষারই নাম উল্লেখ করা যায়। ভারতের যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য, যত কিছু সমৃদ্ধি, ভারতের কাছে জগতের যাহা কিছু শিক্ষণীয় সমস্তই সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডারে সুরক্ষিত; সুতরাং আজ যদি সত্যসত্যই ভারতকে তাহার মহিমোজ্জ্বল রত্নসিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা নেতৃবৃন্দের মনে জাগিয়া থাকে, সত্যসত্যই আজ যদি তাঁহারা পাশ্চাত্য ভাব ও প্রভাবমুক্ত হইয়া দেশমাতৃকার অর্চনার যোগ্য অধিকারী বলিয়া নিজেদের মনে করিয়া থাকেন তাহা হইলে বিচিত্র শব্দসম্ভার-সমৃদ্ধ—স্বচ্ছন্দ গতিশীল প্রাদেশিকতাগন্ধবর্জ্জিত সংস্কৃত ভাষাকে নিখিল-ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষণা করা তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। কেননা যতই দিন যাইতেছে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ বিভাগের দায় রাষ্ট্রভাষা নির্ণয় লইয়া বিরোধের তিক্ততা ততই বাড়িয়া চলিতেছে।

হিন্দুস্থানী (উর্দু ও হিন্দী মিশ্রিত), হিন্দী, বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত এই কয়টি ভাষা লইয়া রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যেকটির দাবির যৌক্তিকতা বিচার করিলে দেখা যাইবে—

(ক) বহুসংখ্যক লোক মোটামুটি হিন্দুস্থানী ভাষা বুঝিতে

পারিলেও এবং সেই ভাষায় কোনও প্রকারে কথাবার্ত্তা বলিতে সক্ষম হইলেও শব্দসম্পদে একান্ত দরিদ্র, সাধারণের কথ্য ভাষারূপে প্রচলিত, নিজস্ব অক্ষরসম্পদহীন এই ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবি করিতে পারে না। এস্থলে একথাও স্মরণীয় যে, যাঁহারা হিন্দুস্থানীকে নূতনরূপে গঠন করিয়া রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষপাতী তাঁহারা কিন্তু উর্দ্দু ও দেবনাগর এই দুই জাতীয় অক্ষরকেই তাহার বাহন করিতে চান। তাহার ফলে এই দুই জাতীয় অক্ষরই প্রত্যেকের শিক্ষণীয় হইয়া পড়ে। অন্যথায় মুসলমানপ্রধান অঞ্চলের রাজকর্ম্মচারীদের কাগজপত্র হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ এবং হিন্দু রাজকীয় কর্ম্মচারীদের কাগজপত্র মুসলমান রাজকর্ম্মচারিগণ ও তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কোন প্রকারেই পড়িতে পারিবেন না। ইহাতে কিরূপ অসুবিধার উদ্ভব হইতে পারে তাহা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। ইহা ছাড়া আভিজাত্যপূর্ণ, সুসংস্কৃত ও সুসমৃদ্ধ ভাষার প্রতি তাঁহাদের যে স্বাভাবিক অনুরাগ আছে তাহা পরিহার করিয়া নিতান্ত সাধারণ একটা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে মর্য্যাদা দান করিবেন তাহা মনে হয় না।

(খ) হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইলে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা দুর্ব্বল হইবে এবং এই ভাষাশিক্ষার জন্য বহু প্রদেশের অধিবাসীদের হিন্দী ভাষাবিদ্ পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হইতে হইবে—অথচ পরিভাষা প্রভৃতির জন্য সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হইতেও হইবে। ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির মধ্যে হিন্দী-সাহিত্য এত সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই যে, তাহা শ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবি করিতে পারে। হিন্দীর রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবির অনুকূলে বহু যুক্তি থাকিলেও প্রতিকূল যুক্তিগুলিও অকিঞ্চিৎকর নহে।

(গ) বাংলা রাষ্ট্রভাষা হইলে হিন্দীর ন্যায় প্রাদেশিকতার দোষগুলি অবশ্যই থাকিবে। ভারতের প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে বাংলাভাষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যরথীদের রচনা অবশ্যপাঠ্য হইলেও, এবং রাষ্ট্রভাষারূপে উপস্থিত হওয়ার আপেক্ষিক যোগ্যতা তাহার থাকিলেও এমন সব কারণ বিদ্যমান আছে যাহাতে বাংলা সর্ব্বভারতের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারিবে না।

(ঘ) ইংরেজী বৈদেশিক ভাষা। কোন বৈদেশিক ভাষা কোন স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষা হইবে তাহা সমীচীন নহে।

এদেশে নাম স্বাক্ষর মাত্র করিতে সক্ষম ব্যক্তিকেও শিক্ষিতের পর্য্যায়ে ফেলিয়া যদি শিক্ষিতের সংখ্যা দশ-বার জন মাত্র হয় তবে তাহার মধ্যে কয় জন ইংরেজীশিক্ষিত আছেন তাহা সহজেই অনুমেয়। যদি এই অত্যল্প ইংরেজীশিক্ষিত লইয়া দুই শত বৎসর রাজকার্য্য পরিচালনা করা বিদেশীর পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে তবে তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক সংস্কৃত ভাষাকুশল ব্যক্তি লইয়া বর্ত্তমানে রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা অসম্ভব হইতে পারে না।

ভারতীদের রক্তমাংসমজ্জার সহিত সংস্কৃত ভাষা অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। সকালে "ব্রহ্মা মুরারিঃ", "অহল্যা-দ্রৌপদী" প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া "নরং পঞ্চত্বমাগতম্" পর্য্যন্ত যদি আমরা সজ্ঞানে বা অর্থ না বুঝিয়া সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকি, তবে এক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষাকে উপেক্ষা করার সপক্ষে কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। আমাদিগকে পাশ্চাত্য ভাষার মোহপাশে বাঁধিয়া যাহারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহারাই আবার সেই সুযোগে সংস্কৃত ভাষার রত্নরাজি আহরণ করিয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে। প্রাণপণ পরিশ্রম দ্বারা ছাত্র-জীবনের অর্দ্ধেকেরও অধিক সময় ব্যয় করিয়া যদি আমরা ইংরেজী শিখিতে পশ্চাৎপদ না হইয়া থাকি তবে তদপেক্ষা অল্পসময়ে আমাদের সত্তার সহিত বিজড়িত সংস্কৃত ভাষা শিখিতে পারিব না কেন?

ভারতের প্রত্যেক ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় একটা যোগসূত্র থাকায়, ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত থাকায় এবং সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর সংস্কৃত ভাষার আলোচনা থাকায় সর্ব্বভারতীয় ভাষা হিসাবে একমাত্র সংস্কৃত ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা চলে—সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিলে এক্ষেত্রে বিতর্কের বা সংশয়ের কোন হেতু থাকিতে পারে না। পৃথিবীর অনেক সভ্যজাতির মধ্যে সংস্কৃতে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত আছেন। বর্ত্তমান যুগে দেবেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণ সংস্কৃতে নিবদ্ধ উপনিষদের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অহিংসার মূর্ত্ত প্রতীক যে মহাত্মা ভারতের বৈশিষ্ট্যকে জগৎসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া সমগ্র বিশ্বকে চমকিত করিয়া গিয়াছেন সেই গান্ধীজীর সাধনালব্ধ অমূল্য রত্নসমূহ মুখ্যতঃ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গীতা হইতেই সংগৃহীত। সংস্কৃত ভাষা সম্যক্ অনুশীলিত হইলে মাত্র পাঁচ বৎসর পরেই দেখা যাইবে সংস্কৃত শিক্ষিতের সংখ্যা বর্ত্তমান ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যাকে বহুগুণে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আজ জড়বিজ্ঞান "কত অল্প সময়ে কত অল্প ব্যয়ে, কত অধিকসংখ্যক প্রাণীর প্রাণ নাশ করা যায়" এ বিষয়ে চূড়ান্ত আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই অশান্ত জগৎ কি উপায়ে শান্তিলাভ করিতে পারে তাহার উপায় ভারত ব্যতীত কোন দেশই নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হয় নাই। ভারতকে আজ হিংসা-দ্বেষজর্জ্জরিত অশান্ত জগৎকে সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচার দ্বারা উপশান্ত করিতে হইবে—তাই চাই সংস্কৃত ভাষার সম্যক্ অনুশীলন। যে ভাষা এত সুসমৃদ্ধ তাহার সম্যক্ চর্চ্চা

হইলে তাহার গতি যে দুর্ব্বার হইতে পারিবে এবং তাহাই যে এ দেশের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রভাষারূপে পরিণত হইতে পারিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষাই ভারতের সর্ব্বত্র মর্য্যাদা পাইবার অধিকারী। প্রত্যেক অভিজাত ভাষার দুইটি রূপ থাকে—তাহার সহজবোধ্য রূপ লইয়া রাষ্ট্র-পরিচালনায় কোনও অসুবিধা হইবে এরূপ মনে হয় না। ইংরেজদের আগমনের পূর্ব্বে ফারসীভাষা বহুল প্রচলিত থাকিলেও সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। "অস্য বিক্রয় কবলা-পত্র মিদং কার্য্যাং" "শ্রীচরণেষু" "প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদম্" ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। সংস্কৃত যদি রাষ্ট্রভাষা হয় তাহাতে ভারতের যাবতীয় প্রাদেশিক ভাষা সমৃদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবে। ব্যাকরণদ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারে কোন কোন স্থানে অশুদ্ধি বা ভ্রান্তি যে হইবে না এরূপ কথা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু আজিকার দিনেও আমরা যে ইংরেজী বা যে প্রাদেশিক ভাষা সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতেও কি সর্ব্বক্ষেত্রে ব্যাকরণের নিয়ম মানিয়া চলি? সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতে গিয়া যদি কোন ব্যাকরণদুষ্ট পদ বা বাক্য ব্যবহৃত হয় তাহাতে অর্থবোধের বা ভাবপ্রকাশের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। পক্ষান্তরে ধীরে ধীরে বহু চলতি শব্দকেও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে স্থান দেওয়া সম্ভব হইবে। সম্প্রতি প্রত্যেক প্রদেশ স্ব-স্ব মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে গিয়া এই সংস্কৃত ভাষা হইতেই বিবিধ পরিভাষা সৃষ্টি করিতেছেন—অবিলম্বে সংস্কৃত ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইলে সারা ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলী নানা-বিষয়ক পরিভাষা ও সুখবোধ্য শব্দসমূহ গঠন করিয়া সমগ্র ভারতের কল্যাণসাধনে সমর্থ হইবেন।

ইংরেজের সহিত এতকালের যোগাযোগ সহসা ছিন্ন করা অসম্ভব—বিশেষতঃ আন্তর্জ্জাতিকতার প্রভাবও পরিহার করা সম্ভব নয় বলিয়া বহুজনকে অবশ্য ইংরেজী প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষা অবশ্যই শিক্ষা করিতে হইবে। প্রাদেশিক ভাষা সেই সেই প্রদেশের অধিবাসীদের অবশ্য শিক্ষণীয়। হিন্দুসমাজের যাবতীয় দৈব ও পৈত্র্যাদি কার্য্য সংস্কৃত ভাষায় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে বলিয়া বিশেষ করিয়া সংস্কৃত ভাষা প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্যশিক্ষণীয়।

কিন্তু যদি কোন প্রদেশ-বিশেষের ভাষা রাষ্ট্রভাষা হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় কার্য্যে প্রাদেশিকতা বৃদ্ধি পাইবে, সঙ্কীর্ণতা প্রশ্রয় পাইবে। তাই হঠকারিতার বশবর্ত্তী না হইয়া, ধীরভাবে চিন্তা করিয়া উদারতার সহিত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য নেতৃবৃন্দের সমক্ষে সবিনয়ে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি। অবিলম্বে নিখিল-ভারত সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষার প্রকৃত সংস্কার সাধিত হোক।

শিক্ষায় উৎকর্ষলাভের জন্য আমাদের যদি বিবিধ বৈদেশিক ভাষাশিক্ষার প্রবৃত্তি জাগিতে পারে তাহা হইলে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে কিছু শিক্ষণীয় থাকিলে তাহা গ্রহণের জন্য সারা পৃথিবীর লোকেদের সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা জাগিবে না কেন? কাজেই সংস্কৃত ভাষার প্রতি যে একটা অবজ্ঞার ভাব নিতান্ত অসঙ্গতভাবে সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে তাহা দূর করিতে হইবে।

চন্দ্রকান্ত দত্ত খাঁ

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের রাজত্বে দেবতামন্ত পীর খানজাহান আলি সাহেব সুবা বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ছত্রিশটি মহলে গঠিত সরকার খলিফাতাবাদের অধীশ্বর হইয়া এদেশে আগমন করেন। সে সময় এদেশে অতিমাত্রায় মগজাতির প্রাধান্য ছিল। মগেরা নানা স্থানে দস্যুবৃত্তি করিত। নিরীহ প্রজাবৃন্দের উপর তাহাদের পাশবিক অত্যাচারের সীমা ছিল না। তাহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যেই সম্রাট্ তোগলক খানজাহানকে প্রেরণ করেন।

দিল্লী পরিত্যাগকালে খানজাহান যে সমস্ত সহকর্ম্মী সঙ্গে লইয়া আসেন তন্মধ্যে মুসলমানও যেমন ছিলেন, হিন্দুও তেমনি ছিলেন। সকলেই অভিজাতবংশীয়, দক্ষ এবং রাজনীতিকুশল। "খান" উপাধি মর্য্যাদাসূচক। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে গুণী ব্যক্তিমাত্রই এই অভিধায় বিশেষিত হইতেন। চন্দ্রকান্ত দত্ত এই পদবীর অধিকারী হইয়াছিলেন।

বঙ্গেশ্বর আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যে পাঁচ জন কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে এ দেশে সমাগত হন তন্মধ্যে পুরুষোত্তম দত্ত অন্যতম। চন্দ্রকান্ত তাঁহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তিনি দিল্লীতে তৌজিনবীশের কার্য্য করিতেন। খানজাহানের সঙ্গীরূপে তিনি বঙ্গদেশে আগমনের সুযোগ প্রাপ্ত হন।

পঞ্চদশ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় কাল। সেই গৌরবময় যুগে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে। নবদ্বীপে

তিনি যে প্রেমের তরঙ্গ প্রবাহিত করেন, তাহাতে শুধু যে শান্তিপুর নদীয়াই ভাসিয়া গিয়াছিল তাহা নহে, সমগ্র বঙ্গদেশ সে তরঙ্গাভিঘাতে আবিলতাশূন্য হইয়াছিল। বাংলার বাহিরেও ইহার প্রভাব সম্প্রসারিত হয়।

চন্দ্রকান্ত হাবেলি খলিকাতাবাদ শহরের পূর্ব্ব দিকের যে অংশে থাকিয়া তাঁহার উপরে ন্যস্ত রাজসরকারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন তাহাই আজিকার চাঁদেরকোলা পল্লী নামে অভিহিত। চাঁদ শব্দ চন্দ্রেরই অপভ্রংশ। কোলা, স্থান-বোধক। গৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া চন্দ্রকান্ত ত্যাগের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি জীবসেবাকে জীবনের সার ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন। কর্ত্তব্যপালনে তিনি দৃঢ়চিত্ত ছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর ছিলেন না। রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ প্রজাদিগের দেয় করভার নিজেই বহন করিতেন।

বিদেশী বিলাসিতার স্রোত তখন এদেশে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই। গৃহে প্রস্তুত সূত্রে নির্ম্মিত বস্ত্রে ও উত্তরীয়ে ধনীদরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলের অঙ্গ শোভিত হইত। ইহাদের ভিতর পার্থক্য ছিল জীবসেবায়। সম্পন্ন ব্যক্তি সাধারণতঃ শিবিকাযানে গতায়াত করিতেন। তাহাতে কয়েকজন বাহক সপরিবারে প্রতিপালিত হইত। পদব্রজে গমনকালে যে ভৃত্য তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিত তাহারও পরিজনবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন এই কার্য্যে সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহিত হইত। এতদ্ভিন্ন অতিথিসেবা, আত্মীয়স্বজন-পোষণ, আশ্রিতজন-পালন, দৈব ও পিতৃপুরুষের কৃত্যাদির অনুষ্ঠান আর্থিক সঙ্গতিরই পরিচায়ক ছিল।

চাঁদেরকোলা গ্রাম চন্দ্রকান্তের সেবকগণে পূর্ণ ছিল। ঝাড়ুদার, চর্ম্মকার, বাদ্যকার, কুম্ভকার, নরসুন্দর প্রভৃতি জাতির তথায় অসদ্ভাব ছিল না। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ, বৈদ্যেরও বাস ছিল। অর্জ্জিত অর্থ তিনি কখনও পেটিকাবদ্ধ রাখিতেন না। "উপার্জ্জিতানাং বিত্তানাং ত্যাগ এব সংরক্ষণম্‌" এই নীতির অনুসরণে তিনি বার মাসে তের পার্ব্বণ উদ্‌যাপন করিতেন। তিনি পিতামাতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতেন। এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে সাধ্যানুসারে বিত্তাদি দানে পরিতৃপ্ত করিতেন, অনাথ-আতুরগণকে ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত করিতেন। তাঁহার বাটীতে নিত্য হরি-সঙ্কীর্ত্তন হইত। তাহাতেও প্রসাদবিতরণের ব্যবস্থা ছিল।

কথিত আছে, চন্দ্রকান্তের হাতে টাকা বাসি হইত না। তিনি বলিতেন—

"যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
নিজে খাও খেতে দাও সাধ্য অনুসারে॥"

গো-পশ্বাদিকে আহার্য্যদানেও স্বর্গলাভ হয়।

ঘাসমুষ্টিং পরাৎ.গবে সায়ং দদ্যাত্তু যো নরঃ।
অকৃত্বা স্বয়মাহারং স গচ্ছেৎ ত্রিপিষ্টকম্‌॥

তিনি গোজাতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন, পুষ্পচন্দনে শোভিত করিতেন, পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করিতেন। কাকবলি, শিবাবলি ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত কার্য্য তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্ম-তালিকাভুক্ত ছিল। কীটপতঙ্গের জন্য তিনি স্থানে স্থানে মিষ্ট দ্রব্যাদি রাখিয়া দিতেন।

সে যুগে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ এবং অনুরূপ কর্ম্মসমূহ ধর্ম্মকার্য্যের অন্তর্ভূত ছিল। যাহাতে শ্রান্ত পথিক বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া ক্লান্তি অপনোদন করিতে পারেন, বৃক্ষজাত ফলে ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিতে পারেন সে কারণ শুভদিনে যাগযজ্ঞের সহিত বৃক্ষ রোপণ করা হইত। জলাশয় খননও অনুরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত করিবার রীতি ছিল। কার্য্যসমাপ্তির পর উৎসর্গক্রিয়াও একটি যজ্ঞবিশেষ। জনসাধারণের স্বচ্ছন্দ গমনাগমনের নিমিত্ত বহু অর্থব্যয়ে রাস্তা নির্ম্মিত হইত। এই সমস্তই সেবাধর্ম্মের নামান্তর।

চাঁদেরকোলা অঞ্চল হইতে রাজধানী হাবেলি খলিকাতা-বাদ পর্য্যন্ত চন্দ্রকান্ত একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ করান। হস্তী, অশ্ব, শিবিকা প্রভৃতি যানবাহনে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই পথে গতায়াত করিতেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে ফলপ্রসূ বৃক্ষসমূহ রোপিত ছিল। ক্ষুধার্ত্ত এবং পথশ্রান্ত পথিক সুমিষ্ট ফলে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন এবং তরুচ্ছায়াতলে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেন। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য স্থানে স্থানে জলাশয়ও খনিত হইত।

খানজাহান আলি সাহেবের তিরোধানের পর তাঁহার সহকর্ম্মিগণ এদেশ ত্যাগ করেন। চন্দ্রকান্তও চিরতরে চাঁদের-কোলা হইতে বিদায় লইলেন। ইহার পরই ঐ পল্লীটি শ্রীহীন হইতে থাকে।

ধনিক শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চম।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ॥

অন্যান্য অধিবাসীরা যোগ্য নায়কের অভাবে উক্ত শাস্ত্রনীতি অনুসরণ করিয়া একে একে স্থানান্তরে গমন করেন। এইরূপে এই ঐতিহাসিক জনপদটি জনশূন্য হয়। চাঁদেরকোলার অধিকাংশ ভূমিই এখন পার্শ্ববর্ত্তী সাজদিয়া ও বিছট্ নামক গ্রাম-দ্বয়ের অন্তর্ভূত। এখন মাত্র তিন-চারিটি পরিবারের বসতিতে এই পল্লীর অস্তিত্ব রক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে এক ঘর হিন্দু অপর কয়েক ঘর মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। চারি-পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেকার রাজর্ষি জনক-তুল্য ত্যাগী গৃহী চন্দ্রকান্তের কীর্ত্তি-স্মৃতি "দত্ত খাঁর রাস্তা" এখনও বিদ্যমান। কিন্তু এই রাস্তা এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত এবং সমতল ভূমির সহিত প্রায় একীভূত। বহু স্থানে কৃষকগণ লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ দিয়া ইহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। যে স্থলে একটু চিহ্ন আছে তাহাও কণ্টকলতাবৃত এবং শ্বাপদকুলের অবাধ বিচরণক্ষেত্র।

আজিও দত্ত খাঁর রাস্তার ধ্বংসাবশেষ চন্দ্রকান্তের পুণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে। তাঁহার পুণ্যকর্ম্মের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইলেও তাহা ক্ষীণ আলোকবর্ত্তিকার ন্যায় আজিও দীপ্তি বিকিরণ করিতেছে। তাঁহার অপরাপর পুণ্য-কৃত্য এখন কালের কুক্ষিগত।

চট্টগ্রাম বিপ্লব-কাহিনী

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

চট্টগ্রাম বিপ্লব কাহিনীর অনেক কথাই জনসাধারণ অবগত আছেন। এ বিষয়ে আজকাল অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ হইতেছে। লেখকের এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হইয়াছিল। আলিপুরের সরকারী উকিল স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলাগুলি সরকার পক্ষে পরিচালনা করেন। তাঁহার সহকারীরূপে লেখককে ঐ মামলা পরিচালনায় যোগদান করিতে হইয়াছিল। ঐ সকল মামলায় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত বিপ্লবের বিভিন্ন ঘটনার প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়। ১৯২৮ খৃঃ হইতে বিপ্লবী নেতা সূর্য্য সেন বিপ্লবীদল গঠন আরম্ভ করেন। ১৯৩০ খৃঃ ১৮ই এপ্রিল তারিখ রাত্রে বিপ্লবীরা দলবদ্ধ ভাবে চট্টগ্রামের বিভিন্ন অস্ত্রাগার আক্রমণ করিয়া প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিয়া চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার পর হইতে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত পুলিস ও সৈন্য বাহিনীর সহিত বিপ্লবীদের মাঝে মাঝে সঙ্ঘর্ষ হয়। ইতিমধ্যে বিপ্লবীদের অনেকে পুলিস দ্বারা ধৃত হন এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ হয়। ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের গইরিলা গ্রামে সূর্য্য সেন পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর সহিত সঙ্ঘর্ষের পর ধৃত হন। অবশেষে ১৯৩৩ সালের ১৯শে মে চট্টগ্রামের গহিরা গ্রামে সরকার বাহিনীর সহিত শেষ সংগ্রামের পর তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত ধৃত হন।

বিপ্লবীদলের অনেক চিঠিপত্র রচনা, সাঙ্কেতিক বার্ত্তা প্রভৃতি পুলিসের হস্তগত হয়। সে সকল প্রমাণ স্বরূপ বিভিন্ন মামলায় দাখিল করা হইয়াছিল। তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। ঐ সকল কাগজপত্র মামলায় নথিভুক্ত ছিল, বর্ত্তমানে তাহার অস্তিত্ব আছে কিনা জানি না। কিন্তু মামলা পরিচালনার জন্য অনেক কাগজের অবিকল নকল ছিল। তাহা হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের একখানি পত্র এবং সূর্য্য সেনের দুইটি রচনা প্রকাশ করা যাইতেছে।

সূর্য্য সেনের পরিচয় বঙ্গসমাজে দিবার আবশ্যক নাই। তাঁহার সহকারীদের মধ্যে দুই জন নারী বিপ্লবী ছিলেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার ও কল্পনা দত্ত। প্রীতিলতা চট্টগ্রাম নিবাসী জগবন্ধু ওয়াদ্দাদারের কন্যা। তাঁহার ডাকনাম রাণী। ১৯২৮ খৃঃ প্রীতিলতা চট্টগ্রাম খাস্তাগীর বালিকা-বিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া আই-এ পড়িবার জন্য ঢাকায় যান এবং ১৯৩০ খৃঃ প্রথম বিভাগে আই-এ পাস করেন। তিনি বালিকাদিগের মধ্যে প্রথম স্থান ও সাধারণ প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ১৯শে এপ্রিল তারিখে পরীক্ষা অন্তে ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম ফিরিবার পথে প্রীতিলতা পূর্ব্বরাত্রে অনুষ্ঠিত অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনার বিষয়ে অবগত হন এবং বিপ্লবীদের সাহস ও বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া মুগ্ধ হন। বিপ্লবীনেতা মাষ্টারদার সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে। কিছুদিন চট্টগ্রামে থাকিয়া বি-এ পড়িবার জন্য প্রীতিলতা কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় থাকাকালীন ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি একজন বিপ্লবী বন্ধুর নির্দ্দেশে আলিপুর জেলে অবরুদ্ধ প্রাণদণ্ড-প্রাপ্ত বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সহিত ভগ্নী পরিচয় দিয়া সাক্ষাৎ করেন। এ সময় হইতে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসীর দিন পর্য্যন্ত (১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট) তিনি বহুবার রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর প্রীতিলতার মনে সাক্ষাৎভাবে বিপ্লবে যোগদান করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কিন্তু বি-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রীতিলতাকে ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিতে হয়। তিনি Distinction-এ বি-এ পাস করেন।

বি-এ পরীক্ষা অন্তে মাষ্টারদার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া প্রীতিলতা চট্টগ্রামে ফিরিয়া যান। ঐ সময়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রথম মামলা স্পেশাল ট্রাইবুনালের নিকট শুনানী হইতেছিল, তাহাতে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল প্রভৃতি অনেকেই আসামী ছিলেন। সূর্য্য সেন, নির্ম্মল সেন প্রভৃতি বিপ্লবী দলের কয়েকজন ধরা পড়েন নাই।

সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে ঐ বিপ্লবীদল তখনও নূতন সভ্য সংগ্রহ করিয়া বিপ্লবী প্রচেষ্টা চালাইতেছিলেন। কল্পনা দত্ত বিপ্লবীদলভুক্ত ছিলেন। তিনি সূর্য্য সেনের আবাসস্থল জানিতেন এবং জেলের ভিতরের ও বাহিরের বিপ্লবীদলের সহিত যোগাযোগ চালাইতেন। কল্পনা দত্তের সাহায্যে প্রীতিলতা ১৯৩২ সালের মে মাসে বিপ্লবী নির্ম্মল সেনের

সহিত এবং কয়েকদিন পরে সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন উভয়ের সহিত দেখা করেন। তাঁহারা ঐ সময়ে ধলঘাটে এক বিধবার গৃহে অবস্থান করিতেন। প্রীতিলতা ঐ স্থানে কয়েকবার তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১৯৩২ সালের ১৩ই জুন তারিখ রাত্রে পুলিস ও সৈন্য-বাহিনী ক্যাপ্‌টেন ক্যামেরণের নেতৃত্বে ধলঘাটে সূর্য্য সেনের আবাসস্থল ঘেরাও করে। ঐ সময় সেখানে সূর্য্য সেন, নির্ম্মল সেন, প্রীতিলতা এবং অপূর্ব্ব সেন (ভোলা) ছিলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। নির্ম্মল সেনের গুলিতে ক্যামেরণ নিহত হন এবং পরে সৈন্যদের গুলিতে নির্ম্মল সেন ও অপূর্ব্ব নিহত হন। সূর্য্য সেন ও প্রীতিলতা ঐ স্থান ত্যাগ করেন।

ধলঘাট সংগ্রামের পর প্রীতিলতা পুনরায় তাঁহার পিতার গৃহে ফিরিয়া আসেন ও পরে ৫ই জুলাই তারিখে শেষবারের মত পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া সূর্য্য সেনের সহিত যোগদান করেন। প্রীতিলতার একান্ত আগ্রহে সূর্য্য সেন তাঁহাকে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব অর্পণ করেন। ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রে প্রীতিলতা পুরুষবেশে ঐ অভিযানের পরিচালনা করেন। বিপ্লবীদল আক্রমণের পর ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। কিন্তু প্রীতিলতা পটাসিয়াম সায়ানাইড খাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরদিন তাঁহার মৃতদেহ পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবের সন্নিকটে পাওয়া যায়। গায়ে যে জামা ছিল তাহাতে তাঁহার বক্ষস্থলে একখানি ছোট শ্রীকৃষ্ণের ছবি সংলগ্ন ছিল।

সূর্য্য সেন প্রীতিলতাকে বীরবেশে সাজাইয়া ঐ অভিযানের নেতৃত্বের ভার দিয়া সমরাঙ্গনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। প্রীতিলতা নিশ্চিত মরণ বরণ করিবার একান্ত আগ্রহ লইয়া সূর্য্য সেনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আসেন। ঐ শেষ বিদায়ের পূর্ব্বে প্রীতিলতা কয়েকখানি চিঠিপত্র লিখিয়া ঐ স্থানে রাখিয়া আসেন। তাহারই একখানি "দাদা" সূর্য্য সেনের উদ্দেশ্যে লিখিত। সেই পত্রখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল। প্রীতিলতার মৃত্যুতে সূর্য্য সেন বিশেষ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাহার ১৫ দিন পরে বিজয়ার দিনে সূর্য্য সেন "বিজয়া" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং কয়েকদিন পরে "অনুভূতি" নামে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সূর্য্য সেনের উদ্দেশে প্রীতিলতার লিখিত চিঠি এবং সূর্য্য সেনের "বিজয়া" ও "অনুভূতি" প্রকাশিত হইল। এইগুলি এবং বিপ্লবসংক্রান্ত অনেক কাগজপত্র সূর্য্য সেনের নিকট পাওয়া গিয়াছিল।

প্রীতিলতার চিঠি

দাদা—

জীবনের গোধূলি বেলায় ভগবান আমায় তোমাকে দিয়েছিলেন। আমি মাথা পেতে আনন্দভরে তাঁর এই দান গ্রহণ করে ছিলাম। আজ আমার সবাইকে ডেকে বলতে ইচ্ছা করছে—

"ওগো তোমরা শুনে যাও—আমি এমন মানুষ পেয়েছি যাকে পেলে তোমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতে—আমি এমন একটি মহান্ হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছি যা আমার জীবনকে চলার পথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে।"

দাদা! তুমি যে আমায় অনেক দিয়েছ হৃদয় উজাড় করে আমাকে স্নেহ করেছ—প্রতিদানে কেবল ব্যথাই পেয়েছ—আজ আমার সেই একমাত্র দুঃখ। তোমার শত অনুরোধসত্বেও আমি ভুলতে পারলাম না—যে আমি তোমায় ব্যথা দিয়েছি, তোমার আদেশ অমান্য করেছি। কিন্তু দাদা, তুমি আমায় ভুল বুঝেছিলে এবং আজও আমি এই ধারণা নিয়েই যাচ্ছি যে তুমি আমায় ঠিক বুঝনি। বুঝবার চেষ্টা করনি—একটু ভাবলেই বুঝতে রাণীর এতটুকু দোষ ছিল না। যদি সেইজন্য একা আমি দুঃখ পেয়ে যেতাম আমার আনন্দের সীমা থাকত না—আমি যে কারও এতটুকু দুঃখ সহ্য করতে পারি না দাদা। ভেবেছিলাম যাবার আগে কাউকে এতটুকু দুঃখ দিয়ে যাব না। দুঃখ পাবার জন্য আমি বরাবরই প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু দুঃখ দিতে আমি রাজী নই।

আমার হয়ত আরও দু'একটা কথা বলবার ছিল। ইচ্ছা করলে বলতে পারতাম, কিন্তু বলিনি এই ভেবে যে তুমি ঠিক বিশ্বাস করবে না। আমি ভগবানের পায়েই আমার শেষ কথা নিবেদন করে দিলাম।

দোহাই দাদা! আমি একটা দুঃখ নিয়ে গেলাম বলে তুমি দুঃখ পেও না—তা হলে যে আমার আত্মা শান্তি পাবে না।

তুমি আমায় অনেক দিয়েছ—এতখানি পাব আমি কোন দিনও কল্পনা করিনি। তাই আমি এক একদিন ভাবতাম এত পাওয়া আমার সইবে না। আমি যে এতখানি পাবার যোগ্য নই। তোমার মধ্যে আমি শিশুর সরলতা দেখেছি—তোমার নিঃস্বার্থ স্নেহ আমাকে মুগ্ধ করেছে—তুমি বাস্তবিকই অতল। আমি তোমার নাগাল পেলাম কই? ভেবেছিলাম অনেক লিখবার আছে কিন্তু পারলাম না।

বিদায়ের বাঁশী করুণ সুরে বেজে উঠেছে। মনটা কেবলই অসীমের পানে ছুটে চলেছে।

আমি চল্লাম দাদা। আমায় আশীর্ব্বাদ কর, আমার সব দোষ ত্রুটী ভুলে যাও। তোমার কাছে কোন দোষ করেছি বলে ত মনে হচ্ছে না—যদিও বা করে থাকি সে আমার মেয়েলী মনের অদ্ভুতপানা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই বিশ্বাস যেন তোমার থাকে দাদা যে রাণী তোমার কাছে যেমনটি এসেছিল ঠিক তেমনটিই সে ফিরে গেছে। ইতি—

বোন্।

বিজয়া

তোমায় ঠাকুর বলব নিঠুর
কোন মুখে ?
শাসন তোমার যতই গুরু
ততই টেনে লও বুকে।

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পূর্ণ কর দহন দানে।

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কত বিজয়াই তো এসে গেছে। কিন্তু আজকের বিজয়া আর অন্য বিজয়ার মধ্যে কত তফাৎ —এবারকার বিজয়া যেন সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। জীবনে যা দেখিনি, জীবনে যা পাইনি, জীবনে যা শিখিনি এমন কত অভিনব জিনিষ নিয়েই বিজয়া এলো আজ আমার কাছে। কত নূতন অভিজ্ঞতাই সে নিয়ে এলো। গত দুই মাস যেন আমার জীবনের অভিনব অভূতপূর্ব্ব অধ্যায়। এই দু'মাসের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, আনন্দ, বিষাদ, জ্বালা আমার জীবনের খুব বড় সঞ্চয়ই হয়ে রইল। আজ বিজয়ার দিনে মার কাছে প্রার্থনা করছি যেন এই অমূল্য সঞ্চয়টুকু আমার জীবনকে ঐশ্বর্য্যময় করে তোলে। এই দু'মাসের সবকিছুর মধ্যে আনন্দই সবচেয়ে ছাপিয়ে উঠেছে। এত আনন্দ জীবনে যে পাইনি, বিষাদ আর জ্বালা আনন্দকে আরও মধুময় করে তুলেছে। আমার দুর্ভাগ্য—একান্ত দুর্ভাগ্য যে এমন প্রাণমাতান আনন্দের মধুর স্মৃতিই আজ আমায় অহরহ ব্যথা দিচ্ছে। আমরা দুর্ব্বল মানব,—আমাদের কাছে এত সুন্দর আনন্দটুকুর চেয়ে এমন আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে গেল তাকে হারাবার ব্যথাই বড় হয়ে উঠল।

আড়াই বৎসরের মধ্যে তিনটি বিজয়া এলো, এর মধ্যে কত অন্তরঙ্গ বন্ধু, কত আদরের ভাইবোন জীবনের বিজয়াই চোখে দেখলাম—আর পূর্ণ দায়িত্বই ঘাড়ে নিলাম —আজ একে একে সব কথা মনে পড়ছে। আজ মনে পড়ছে কত সুন্দর অমূল্য রত্নরাজি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য সব তুচ্ছ করে হাসতে হাসতে মাতৃযজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়ে চলে গেছে, একটু দ্বিধা করেনি, একটু সঙ্কোচ করেনি, আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে স্বেচ্ছায় মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আজ এমন পবিত্র দিনে তাঁদের কথা মনে করে আমার মত কঠিনহৃদয়ের চোখের জল আসছে—তাঁদের বীরত্বের কাহিনী মনে পড়ে আমার গৌরবে বুক ফুলে উঠছে। নরেশ বিধু, টেগরা, ত্রিপুরা, মধু, অর্দ্ধেন্দু, প্রভাস, নির্ম্মল, পুলিন, মতি, শশাঙ্ক, জিতেন, আন্দু, অমরেন্দ্র, মনা, রজত, দেবু, স্বদেশ, মাখন, রামকৃষ্ণ, নির্ম্মল, ভোলা সবারই কথা আজ একে একে মনে পড়ছে। আর স্মৃতির মধ্যে দিয়ে তাঁদের বিজয়ার সম্ভাষণ জানাচ্ছি। কত জীবনের বিজয়ার নিমিত্তই হলাম—কত স্নেহময়ী জননীর বুক শূন্য করে তাঁর সোনার পুতলিকে স্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতি দিয়েছি—কতজনকে অন্তরীণে, কারাগারে, নির্ব্বাসনে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছি, ঘরে ঘরে হাহাকারের সৃষ্টি করেছি—দেশের উপর গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারে নির্য্যাতন টেনে এনেছি। এ সবের দায়িত্ব থেকে নিজেকে বাদ দেই কি করে।

মা আনন্দময়ি মা আমার, আজ তোমার বিসর্জ্জনের দিনে তোমায় একান্ত ব্যাকুল হয়েই জিজ্ঞাসা করছি—আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি ? পনর বৎসর আগে অনেক ভেবে চিন্তে, ভাল মন্দ সব বিচার করে জীবনের যে লক্ষ্য, যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম আজও তাই আঁকড়ে ধরে আছি। দুর্ব্বলতা কি আসতে চায় নি ? কত রকমের দুর্ব্বলতা আসতে চেয়েছে কিন্তু তবুও নিজের লক্ষ্যটিকে ত ছাড়ি নি। আজও মনে হচ্ছে, খুব নিঃসন্দেহেই মনে হচ্ছে আমি যে পথে চলেছি দেশের অনেক লোক ভুল বুঝলেও সেই পথটাই ঠিক। এ বিশ্বাস এখনও আমার অটুট আছে, যে আমি অন্যায় করছি না, পাপ করছি না, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে গেলে আমার দেশে যে হাহাকার, অত্যাচারের সৃষ্টি হয়েছে, এর চেয়ে আরও অনেক বেশীই—সব দেশেই তাই হয়েছে। আমার আদর্শের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই আমার পথেই আমি চলেছি—এখনও কোন দ্বিধা আসেনি। মা তোমায় মিনতি জানাচ্ছি, যদি আমার ভুল হয়, আমার ভুল ভেঙ্গে দিও। আর যদি ঠিক পথেই আমি চলে থাকি তা হলে আমার বিশ্বাসকে আরও শক্ত করে দাও, আমাকে আরও শক্তিমান করে দাও—আমার মধ্যে যেন কোন রকমের দুর্ব্বলতা না আসে, আমি যেন আমার পথ থেকে কোন দিন এক চুলও না সরি। আমি যেন বড় নিঠুর ছিলাম, কিন্তু গত দু'মাসের পথ চলা যেন আমার নিঠুর হৃদয়ের মধ্যে মমতা এনে দিয়েছে, কারুণ্যের সৃষ্টি করেছে, তাই অতি আদরের ছেলে, মেয়ে,

ভাইবোনকে হারিয়ে তাদের যে সব আত্মীয়স্বজন আজ বিজয়ার দিনে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন, তাঁদের কথা মনে করে আমার মনে আজ ভীষণ লাগছে। হয়ত তাঁরা আমাকে তাঁদের বুকের ধন হারাবার নিমিত্ত মনে করে আমায় অভিশাপ দিচ্ছেন—সেজন্য আমি চিন্তা করছি না, কিন্তু তাঁদের বুকভাঙ্গা ক্রন্দন, মর্ম্মভেদী হাহাকার যে আমার বুকে ভীষণ বাজছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কত স্নেহ-ময়ী জননী তাঁর আদরের সন্তানকে হারিয়ে কি মর্ম্মান্তিক কান্নাই কাঁদছেন। কি অসহ্য বেদনায় তাঁর হৃদয় অস্থির হয়ে উঠছে—বিজয়ার এমন আনন্দের দিনটি তাঁর কাছে কত যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে। বাপ তার আদরের দুলালকে হারিয়ে বিজয়ার দিনে সমস্ত উৎসবকে বিষাদময় করে তুলেছেন। ভাইবোন তাদের স্নেহের ভাইবোনকে হারিয়ে আজ কত অসহনীয় যাতনাই ভোগ করছে। কত বড় অভাববোধ তাদের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। এ সব ভেবে আমার মত পাষাণও আজ গলে যাচ্ছে। আবার তোমায় জিজ্ঞাসা করছি মা, আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি, এত মায়ের চোখের জল, এত বাপের বুকফাটা কান্না, এত ভাইবোনদের হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস, এ সবের কারণ হয়েছি বলেই আমি কি অন্যায় করেছি। যদি তাই হয় তুমি আমার ভুল ভেঙ্গে দিও। আমায় ঠিক পথে চালিও। কিন্তু আমার মনে হয় আমি ঠিক পথে চলেছি। তাই চারিদিকে শ্মশান সৃষ্টি হচ্ছে দেখে মনে ব্যথা পেয়েও আমি আমার লক্ষ্যটিকে বুকে চেপে ধরে আছি—এই আশায় যে এ সকল পবিত্র শ্মশান স্তূপের উপরে একদিন স্বাধীনতার সৌধ নির্ম্মিত হবে।

পনের দিন আগে যে নিখুঁত পবিত্র, সুন্দর প্রতিমাটিকে এক হাতে আয়ুধ, অন্য হাতে অমৃত দিয়ে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছিলাম, তাঁর কথাই আজ সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে। তার স্মৃতি আজ সবকে ছাপিয়ে উঠেছে। যাকে নিজ হাতে বীরসাজে সাজিয়ে সমরাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুমতি দিয়ে এসেছিলাম, তার স্মৃতি যে আজ পনের দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত্ত ভুলতে পারলাম না। সাজিয়ে দিয়ে যখন করুণভাবে বললাম, "তোকে এই শেষ সাজিয়ে দিলাম। তোর দাদা ত তোকে জীবনে আর কোনদিন সাজাবে না।" তখন প্রতিমা একটু হেসেছিল, কি করুণ সে হাসিটুকু! কত আনন্দের, কত বিষাদের, কত অভিমানের কথাই তাহার মধ্যে ছিল। সে নীরব হাসিটুকুর ভিতরে অফুরন্ত কথা আমার সারা জীবন ভাবলেও শেষ করতে পারব না—শেষ করতে চাইও না। তা যেন আমার জীবনে নিত্য নূতন চিন্তার উপকরণ যুগিয়ে দিয়ে আমার জীবনকে ঐশ্বর্য্যময় করে তোলে, দিন দিন উন্মত্ত করে তোলে। সে ত নিজ হাতে অমৃত পান করে অমর হয়ে গেছে। কিন্তু মর জগতে আমরা তাঁর বিসর্জ্জনের ব্যথা যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আজ বিজয়ার দিনে, সেই দিনের বিজয়ার করুণ স্মৃতি যে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে কান্নার সুর তুলছে—চোখের জল যে কিছুতেই রোধ করতে পারছি না—
"চাপিতে গেলে উঠে দুকূল ছাপিয়া।"

সে যে আমার আনন্দের উৎস ছিল—নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, ছিল—সুন্দর, পবিত্র মহান্ ছিল। তার মধ্যে এক ধারে যত গুণ দেখেছি আর কোন মানুষের মধ্যে তত গুণ আমি দেখিনি। তার অন্তরের সৌন্দর্য্য আমায় মুগ্ধ করেছিল। তার মনের জোর, দৃঢ় সংকল্প, সাহস, বীরত্ব কারও চেয়ে কম দেখিনি। তার সরলতা, বাধ্যতা খুব সুন্দরই ছিল। তার শিক্ষা, আদর্শের অনুভূতি, সুন্দর ব্যবহার কিছুরই অভাব ছিল না। সর্ব্বোপরি কঠোর বিপ্লবী মনোভাবের মধ্যে ভগবানের উপর অটুট ভক্তি, বিশ্বাস, সে যে ভাবে বজায় রেখেছিল তা দেখলে বাস্তবিকই তাকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়। এত গুণের আধার ছিল বলে তাকে খুবই স্নেহ করতাম—হৃদয়ের সমস্ত উজাড় করে তাকে দিয়ে দিয়েছিলাম—প্রতিদানে অসীম আনন্দই পেয়েছি, এত আনন্দ জীবনে পাইনি, তাই এত স্নেহের, এত আদরের প্রতিমাকে নিজ হাতে বিসর্জ্জন দিয়ে চলে এলাম। সে দিনের কথা, আজ কেবলই মনে হচ্ছে প্রতিমাটিকে। সে এত অফুরন্ত আনন্দ আমায় দিল। এত গুণ দেখিয়ে গেল, এত মহৎ আত্মদান করে গেল, দেবতার মত শ্রদ্ধা আমায় দিল, সে সব কথা মনে করে আজ আনন্দ না পেয়ে তাকে সরাবার ব্যথাই আমার প্রাণে এত বেশী বাজছে—আজ আমার এই একমাত্র দুঃখ।

অসুরদলনী মা আমার। আজ বিজয়ার দিনে তোমার কাছে এই কামনা, তুমি আমায় এই বর দাও যেন তার স্মৃতি আমাকে আনন্দ দেয়, তার গুণের কথা মনে হলে যেন আমি গৌরব অনুভব করি। তার অপূর্ব্ব আত্মদান আমার প্রাণে যেন আনন্দ দেয়, আমাকে যেন আরও শক্তিমান করে তোলে, তার শ্রদ্ধা যেন আমাকে তার শ্রদ্ধার উপযুক্ত করে তোলে—তাকে হারাবার ব্যথাটা এত আনন্দকে ছাপিয়ে যেন কিছুতেই না উঠে।

আমার স্নেহের প্রতিমাকে বলছি—"রাণী, তোকে আমি কতদিন কত ব্যথাই দিয়েছি; আজ বিজয়ার দিনে তোর দাদার সব দোষত্রুটি ভুলে যা, আমার উপর আর অভি-

মান রাখিস না। তোকে হৃদয় উজাড় করে স্নেহ করেছি, তোর গুণ দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি—তোর ভগবৎ ভক্তি দেখে তোকে শ্রদ্ধা করেছি, তোর সঙ্গে প্রাণ খুলে নিঃসঙ্কোচে মিশেছি—এত আপনার করে নিয়েছিলাম বলেই হয়ত তোকে সামান্য দোষে অথবা বিনা দোষে কত গাল দিয়েছি, হয়ত কোন সময় ভুল বুঝে তোর মনে ব্যথা দিয়েছি, তোকে খুব স্নেহ করতাম বলে তোকে গাল দিতে কোনো দিন ইতস্ততঃ করেনি, মনে করতাম তোকে হাজার গাল দিলেও তুই আমার উপর রাগ করবি না, কোন দিন রাগ করিসও নাই—শেষ মুহূর্ত্তে তোকে ভুল করে আমি একটু গাল দিয়েছিলাম বলে তুই হয়ত অভিমান নিয়ে গেছিস। আজকের দিনে তুই যেখানে আছিস সেখান থেকেই আমার সব দোষ ত্রুটির জন্য আমায় ক্ষমা করে যা। শেষ মুহূর্ত্তে তোকে একটু কষ্ট দিয়েছি বলে আমি যে দিনরাত অশান্তির দহনে দগ্ধ হচ্ছি তা তো তুই দেখছিস। তোর দাদা যেন শান্তি পায় তার ব্যবস্থা তুই করে দে। তোর কি মনে নাই তুই তোর দাদার দুঃখ একটুও সহ্য করতে পারতিস না। তাই আবার বলছি আজকের এই পবিত্র দিনে আমার দোষত্রুটি সব ভুলে গিয়ে হাসিমুখে তোর দাদার বিজয়া-সম্ভাষণ গ্রহণ কর। আমার স্নেহের সম্ভাষণ—শ্রদ্ধার সম্ভাষণ তোকে জানাচ্ছি। আজ মিলনের দিন, ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার দিন, বিবাদ, বিসম্বাদ, দোষ ত্রুটি সবই ভুলে যাওয়ার দিন, আজ তুই আমার পাশে থাকলে যে আনন্দ আমি পেতাম দূর থেকেও সেই আনন্দ তুই আজ আমাকে দে। এমন সুন্দর দিনে মায়ের নামটি নিয়ে প্রাণ খুলে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, তোর মত নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক কাউকে আমি পাইনি। বাস্তবিক ফুলেরই মত তুই সুন্দর, পবিত্র ও মহান ছিলি। তোর অপূর্ব্ব আত্মদানে তোকে আরও সুন্দর আরও মহনীয় করে তুলেছে।

বরদাত্রী মা আমার—আমায় আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার স্নেহের প্রতিমার মধ্যে যা কিছু সুন্দর যা কিছু মহৎ দেখেছি তা যেন আমার এবং আমার প্রিয় ভাইবোনেরা জীবনে প্রতিফলিত করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি না করে।

"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

অনুভূতি

সেদিন বিজয়ার সন্ধ্যায় পাশের বাড়ীতে উঠানে কয়েকজন লোক হরিনাম কীর্ত্তন করছিল। শরতের জ্যোৎস্নায় সারা উঠান ভরে গিয়েছিল। আমার সে দিকে খেয়াল ছিল না—যে স্নেহের প্রতিমাটিকে পনের দিন আগে হারিয়েছি। তার চিন্তায় বিভোর ছিলাম। গানও বিশেষ শ্রুতিমধুর হচ্ছিল না। হঠাৎ যেন নাম-কীর্ত্তনটা আমার কানে মধুর ঠেকল। মাথা তুলে জানলার ফাঁক দিয়ে গায়কদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গান শুনতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা সুন্দর অনুভূতি এসে আমার অন্তরে একটা আনন্দের প্রবাহ সৃষ্টি করল। মনে মনে একটা সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের ছবি খুঁজতে লাগলাম—মনে পড়ে গেল পনের দিন আগে বিসর্জ্জনের দিনে প্রতিমার সঙ্গে ছোট শ্রীকৃষ্ণের ছবিটি দিয়েছিলাম। সেই সুন্দর মূর্ত্তিটি মানস নেত্রে দেখতে দেখতে হৃদয়ের মধ্যে তার ধ্যান করতে আরম্ভ করলাম। কীর্ত্তনের সুর কানের মধ্যে মধুর বাজতে লাগল। মন প্রাণ পুলকিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল যার বিসর্জ্জনের দিনে মূর্ত্তিটি সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলাম সে কথা। মনে হ'ল হরিনাম কীর্ত্তন শুনলেই তার দু' চোখ বেয়ে জল পড়ত এবং গায়কদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে তন্ময় হয়ে হরিনাম গাইত। আমার ধ্যানের মূর্ত্তিটিও সরে গেল না, অথচ মানস নেত্রে দেখতে পেলাম যে কত যত্ন করে ফুলের আসন সাজিয়ে এই মূর্ত্তিটিকেই পূজা করছে—ধ্যানস্তিমিতনেত্র মূর্ত্তিটির পানে চেয়ে আছে—নিশ্চল নিষ্পন্দ ভাবেই চেয়ে আছে। আর তার দু'চোখ বেয়ে দরবিগলিতধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। এমন পবিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার প্রাণ আনন্দে ভরে গেল। ধ্যানের মূর্ত্তিটি এবং ধ্যানে নিরত মানুষটি দু'জনকে এক সঙ্গে দেখতে দেখতে আনন্দে আমার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

কতক্ষণ পরে আমার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। চোখের জল মুছে আমার অনুভূতিটির কথা ভাবলাম। ভাবলাম যাকে হারিয়েছি তার শোকে সারা দিন রাত দগ্ধ না হয়ে এ ভাবের অনুভূতির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারলেই শান্তি পাওয়া যায়—হারাবার ব্যথাটাকে আনন্দে পরিণত করা যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে যাকে হারিয়েছি তাকে যথার্থ ভাবে অনুভব করা যায়।

ভগবান, আমাদিগকে এত দুর্ব্বল করেছ কেন? এই আনন্দটুকুকে স্থায়ী করে নেওয়ার ক্ষমতা দাওনি কেন?

'হেথা নয়, অন্য কোন খানে'

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

অভ্রভেদী নাগাপাহাড়ের সানুদেশে তরুচ্ছায়াপ্রচ্ছন্ন নিভৃত একটি পল্লী—নাম তার ওয়াকচিং। পল্লীটিতে কনিয়াক নাগাদের বাস।

ওয়াকচিং অধিত্যকার পশ্চিমপ্রান্তে এক অনতি-উচ্চ গিরি-শৃঙ্গের উপর নাগা-সর্দার শৌবার বাড়ী। সেখান থেকে যে দৃশ্য নজরে পড়ে তার আর তুলনা নেই।

ঊর্দ্ধে নিঃসীম নীল আকাশ, নিম্নে গিরিপাদমূল থেকে দিগন্তের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত শ্যামায়মান ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অনন্ত প্রসার। আকাশ ও ধরণীর এই অসীম বিস্তারের মধ্যে ওয়াকচিং যেন স্বর্গ থেকে খসে পড়া একটি নিরুপম সৌন্দর্য্যচ্ছবি।

এই পার্ব্বত্য পল্লীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আং* বংশের নাগা-সর্দার শৌবা। বংশমর্য্যাদায় আর প্রতিপত্তিতে তার জুড়ি নেই। জমিজেরাৎ ধন-দৌলত তার প্রচুর, সাংসারিক কোন অভাবই তার নেই। কিন্তু মনে তার সুখ নেই। বড় ছেলে শাঙকের বিয়ে নিয়ে মস্ত দুর্ভাবনায় পড়ে গেছে শৌবা।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর সর্দার যখন তার নিজ গোষ্ঠীর* একটি পাত্রীর সন্ধান পেলে তখন আশ্বস্ত হ'ল। পাত্রীটি তার সগোত্র চিংমাকের মেয়ে। গোটা ওয়াকচিং পুল্লীতে ধন-সম্পদ, পদমর্য্যাদা, বংশ-গৌরব সব দিক দিয়েই তার পরেই চিংমাকের স্থান। চিংমাকের মেয়েটির নাম শন্দা। শন্দাকে যেমন করেই হোক পুত্রবধূরূপে ঘরে নিয়ে আসতে সর্দার বদ্ধপরিকর হ'ল। শাঙকের বয়স তখন তের বৎসর মাত্র। তার ভাবী বধূ কিন্তু তার চেয়ে বারো বছরের বড়। সর্দার ভাবলে তাতে ক্ষতি কি। তাদের সমাজে বড় ঘরে এ ধরণের ব্যাপার তো আর নূতন নয়।

মোট কথা শৌবা নিজের বংশমর্য্যাদার দিকটাই দেখলে, পুত্র এবং পুত্রবধূর ভবিষ্যৎ জীবনের সুখশান্তির কথা মোটেই ভাবলে না।

চিংমাক প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করেছিল, বলেছিল,—"সর্দার, ছেলে যখন তোমার বড় হবে তখন আমার মেয়ের বয়সের ভাঁটা পড়বে। তখন যদি শাঙকের শন্দাকে মনে না ধরে···আমি আমার মেয়ের ভবিষ্যতের কথাই ভাবছি।"

---

* কনিয়াক নাগাদের মধ্যে আং বংশই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অভিজাত বংশ। সমাজের শীর্ষদেশে আং-পরিবারের সর্দারদের আসন। ভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে সর্দার-পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্কের আদান-প্রদান নিষিদ্ধ। এদের অভিজাত রক্তকে অবিমিশ্র রাখবার জন্যেই এই সামাজিক বিধান।

সর্দার 'মধু'র (ধেনো মদ) পাত্রটা এক চুমুকে নিঃশেষ করে সশব্দে হেসে উঠে বললে—"আরে রেখে দাও তোমার যত সব দুর্ভাবনা। এক সঙ্গে ঘর করলে সবই ঠিক হয়ে যায় হে। আর আমি বেঁচে থাকতে শাঙকের পক্ষে শন্দার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা যে সম্ভব নয় তা তুমি জান। কিন্তু এটাও সত্য যে, আমি চিরকাল থাকব না। কিন্তু গাঁয়ের মাতব্বরদের সামনে এখুনি আমি এমন ব্যবস্থা করছি যে, আমার মৃত্যুর পর শাঙক যদি শন্দাকে তালাক দিতে চায় তা হলে তাকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে। কাজেই তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। শ্রীমান যখন বড় হয়ে সব বুঝতে পারবেন তখন আর রা কাড়বেন না।

এদিকে দুই বেয়াই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল বটে, ওদিকে বর-কনে উভয়ের নিকটেই কিন্তু এ বিবাহ আপাততঃ অর্থহীন। বরটি তো নাবালক মাত্র, সে খেলাধুলো নিয়ে সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে মেতে রইল। আর পূর্ণযৌবনা কনের নিকট এ বিয়ে ছেলেখেলা বৈ আর কিছু নয়। দেখতে সে বেশ সুন্দরী। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অবিবাহিত তরুণের দল মধুলোভী ভৃঙ্গের মত তার পাশে এসে জুটেছিল এবং তাদের মধ্যে থেপাং মোরাং-এর* একটি ছেলের প্রতি সে হয়েছিল প্রণয়াসক্ত। বিয়ের পরও এই ছেলেটির সঙ্গে শন্দার প্রণয়লীলা চলতে লাগল অব্যাহত ভাবে।†

বিয়ের কিছুকাল পরে শন্দার একটি ছেলে জন্মাল। প্রথম যৌবনের প্রণয়লীলার পালা শেষ করে এবার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে এক নাবালকের ঘর করতে হবে ভেবে শন্দার মন খারাপ হয়ে গেল। যাতে এত শীঘ্র শ্বশুরবাড়ীতে না যেতে হয় সেজন্যে সে এক মনে আকাশের দেবতা গাওয়াং-এর নিকট প্রার্থনা করতে লাগল। গাওয়াং তার প্রার্থনা শুনলেন। ভূমিষ্ঠ হবার

---

* প্রত্যেক কনিয়াক নাগা গ্রাম কয়েকটি মোরাং-এ বিভক্ত। এক এক গোষ্ঠীর লোকেরা এক এক মোরাং-এর অন্তর্গত। ভিন্ন ভিন্ন মোরাং-এর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

† কনিয়াকদের সামাজিক বিধানমতে বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও কনে যে পর্য্যন্ত না সন্তানের গর্ভধারিণী হয় সে পর্য্যন্ত তাকে থাকতে হয় পিতৃগৃহে। এই সময় স্বামীর সঙ্গে তার দৈহিক কোন সম্বন্ধ থাকবে না। মা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু পূর্ব্ব-প্রণয়ীর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করে তাকে যেতে হবে স্বামীগৃহে। অবৈধ প্রণয়ের ফলে জাত সন্তান সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। পতিগৃহে আসার পর স্ত্রীকে কিন্তু একনিষ্ঠতা বজায় রেখে চলতে হয়।

কিছুক্ষণ পরেই ছেলেটি মারা গেল। আপদ চুকল ভেবে শদা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। সে রয়ে গেল বাপের বাড়ীতেই। বেশ আনন্দে তার দিন কাটতে লাগল।...

প্রায় এক যুগ পরে শদা আবার গর্ভে সন্তান ধারণ করলে। যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হ'ল একটি মেয়ে—মেয়েটি কিন্তু টিকে গেল। এবার আর স্বামীগৃহে না গিয়ে শদার উপায় নেই।

বিয়ের দীর্ঘ বারো বৎসর পর মেয়েটিকে নিয়ে শদা যখন প্রথম স্বামীর ঘর করতে এল তখন সে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্ত-সীমায় পা দিয়েছে। বয়স তার সাঁইত্রিশ—যৌবনে ভাঁটা পড়ে গেছে। আর শাক্কের তখন প্রথম যৌবন—বয়স তার পঁচিশ বৎসর মাত্র। তার পেশীবহুল সুগঠিত দেহের সৌষ্ঠব যেমন অনিন্দ্য, তেমনি অমিত তার সাহস আর শক্তিমত্তা। স্বামীর পৌরুষ-ব্যঞ্জক মূর্ত্তিখানির পানে তাকিয়ে শদার বার বার এই কথাই মনে হতে লাগল যে, স্বামীগৃহে আসতে তার বড় দেরী হয়ে গেল। সে শুধু ভাবতে লাগল, নিজের চলে-যাওয়া যৌবনকে কিছুতেই কি আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

শদাকে দেখেই কিন্তু শাক্কের মন তার উপর বিরূপ হয়ে উঠল। এই বিগতযৌবনা নারীকে নিজের স্ত্রীরূপে কল্পনা করাও যে দুঃসাধ্য!

স্পষ্টই সে তার মাকে জানিয়ে দিলে যে, শদার সঙ্গে স্বামীগিরির অভিনয় করা তার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। ফলে একই বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে তারা বাস করতে লাগল অপরিচিত অনাত্মীয়ের মত। পারতপক্ষে শাক্ক শদার মুখ দেখত না।

শাক্কের মতিগতি দেখে শৌবা হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত পেলে। তারই অবিমৃষ্যকারিতার দরুন ছেলে আর ছেলের বৌয়ের জীবন নষ্ট হতে চলেছে দেখে তার বড় অনুতাপ হতে লাগল। ভাবতে ভাবতে বুড়ো শক্ত অসুখে পড়ল। এই অসুখই হ'ল তার অন্তিম অসুখ—কয়েক দিনের মধ্যেই সে মারা গেল।

বাপের মৃত্যুর পর শাক্ক হ'ল বিপুল সম্পত্তির মালিক। বাপ যা রেখে গেছে তাতে পায়ের উপর পা তুলে বসে দিব্যি আরামে সে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে। ওয়াকাচং-এর গিরিগাত্রস্থ আড়াইশোটি শস্যক্ষেত্রের মালিক সে। এই সমস্ত ক্ষেতে প্রতিবৎসর যে পরিমাণ ধান আর জনার উৎপন্ন হয় তাতে শাক্কদের চার চারটি গোলাঘর ভরতি হয়ে যায়।

এই পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্যের মধ্যেও ঘরে কিন্তু তার শান্তি নেই। স্ত্রীর সংস্পর্শ সে সাধ্যমত এড়িয়ে চলে। কিন্তু দৈবাৎ যদি দু'জনে সামনাসামনি এসে পড়ে তো শদা বাক্য-বাণ বর্ষণ করতে করতে তার কাণ ঝালাপালা করে তোলে। তার উপর মা তো সারাক্ষণ তার উপরে চটেই আছে—চব্বিশ ঘণ্টা তার ভর্ৎসনার আর বিরাম নেই।...

যাই হোক, শাক্কের দিনগুলো চলতে থাকে একই ভাবে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই সুরু হয় তার নিশাচরবৃত্তি। আজ এ মোরাং-এ, কাল সে মোরাং-এ কাটে তার রাত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিরক্তি ধরে যায়—কোথাও গিয়ে সে স্বস্তি পায় না।

শীতের অবসানে নিষ্পত্র তরুরাজি নব কিশলয়দলে ভরে উঠেছে। উন্নত আরণ্য বৃক্ষসমূহের শাখা-প্রশাখা এক রকম থোকা থোকা শাদা ফুলে সমাচ্ছন্ন। বসন্ত সমাগমে বনভূমি যেন কুসুম-ভূষণে সজ্জিত হয়েছে। ওয়াকচিং-এর নাগা-পল্লীতে সুরু হ'ল অউ-লিং-মু অর্থাৎ বসন্ত উৎসবের সমারোহ।

উৎসবদিনে ভোর হতে না হতেই বালা মোরাং-এর সর্দ্দারের বাড়ীতে মাচার উপর গ্রামের সকল কুমারীরা এসে জড়ো হ'ল, সুরু হ'ল তাদের প্রসাধনপর্ব্ব। মেয়েরা সবাই হাঁটু গেড়ে সার বেঁধে বসে গেছে—সর্দ্দারের বৌ নিজে তাদের কাঁচখণ্ড আর শাঁখের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে তৈরি মালা আর রকমারি গয়নাগাঁটি পরিয়ে দিচ্ছে। মেয়েদের চুল বাঁধতে আর সাজাতে সারা মুলুকে বালা মোরাং-এর সর্দ্দারের বৌয়ের জুড়ি নেই—তাই মেয়েরা সবাই আজ তার দ্বারস্থ।

মাচানের এক পাশে বসেছিল শিকনা। খেপং মোরাং-এর এক নগণ্য চাষীর মেয়ে সে—কিন্তু এমনি অনিন্দ্য তার মুখশ্রী আর দেহসৌষ্ঠব যে, কোনো আং-পরিবারে জন্মালেই বুঝি তাকে মানাত। তার প্রসাদলাভের জন্য ওয়াকচিং-এর তরুণদের চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কারুর পানে সে অনুরাগের দৃষ্টিতে তাকালে না। এই দীর্ঘাঙ্গী তরুণীর ছন্দোময় দৃপ্ত গতিভঙ্গী তরুণদের হৃদয়ে দোলা দিত, কিন্তু তার মুখের প্রতিটি রেখায় প্রবল ব্যক্তিত্বের এমনি একটা সুস্পষ্ট ছাপ ছিল যে, কেউ তার কাছে ঘেঁষতে সাহস করত না।

সকলের কেশবিন্যাস সমাপন করে শেষে সর্দ্দারের বৌ শিকনাকে নিয়ে পড়ল। তার মাথার কেশে সযত্নে সিঁথি কেটে দীর্ঘ একটি বিনুনি বেঁধে দিলে। এই একবেণীধরা নিজেই তখন ব্যাপৃত হ'ল নিজের দেহসজ্জায়। পরনের মোটা কাপড়টি পরিত্যাগ করে পরলে সে এক হাত চওড়া, নক্সাপেড়ে একটি টকটকে লাল রঙের বস্ত্রখণ্ড, অনাবৃত ক্ষীণ কটিতে বাঁধলে সারি সারি রঙীন কাঁচে খচিত একটি নীবিবন্ধ; তার পর নিজের নিরাবরণ দেহকে সজ্জিত করলে সোনালী আর হলদে রঙের রকমারি পাথরের মালা, শাঁখের টুকরো আর পিত্তলনির্ম্মিত অজস্র বিচিত্র গয়নাগাঁটি দিয়ে। অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে ঢাকা পড়ে গেল তার সুডৌল নিটোল ক্ষুদ্র স্তনদ্বয়, তার সুকুমার পেলব বাহু দুখানি একেবারে কব্জী থেকে স্কন্ধমূল পর্য্যন্ত আবৃত হ'ল হরেক রকমের রঙীন চুড়িতে।

বেশসজ্জা শেষ করে শিকনা পায়ে বাঁধলে একজোড়া ঘুঙুর—পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো তালে তালে রুমুঝুমু রবে বাজতে লাগল।

প্রসাধনপর্ব্ব সমাপন হতে হতে বেলা হ'ল দ্বিপ্রহর। এবার সুরু হয় কুমারীদের নৃত্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা মাচার উপর পরস্পরের হাত ধরাধরি করে সমস্বরে সঙ্গীত করতে করতে বৃত্তাকারে নৃত্য করতে থাকে।

ওদিকে ছেলেরাও কিন্তু নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে নেই। বহুক্ষণ যাবৎ আংবান মোয়াং-এ অবিবাহিত যুবকদের আড্ডাগৃহে তারা নিজেদের বেশবিন্যাসে ব্যাপৃত। পরস্পরের মাথার দীর্ঘ কেশ আঁচড়ে দিয়ে তারা তাদের শিরস্ত্রাণসংলগ্ন লাল ছাগলোমের ঝুঁটির ওপর একজাতীয় বন বিহঙ্গের দুগ্ধশুভ্র পালকগুচ্ছ গুঁজে দিলে। অবশেষে সোনালী আর বেগুনি রঙের বনকুসুম কর্ণভূষণে পরে তারা প্রসাধনের পালা শেষ করলে।

সাজসজ্জা সমাপনান্তে সুদীর্ঘ বর্শা এবং সুতীক্ষ্ণ দাওগুলো শূন্যে ঘুরাতে ঘুরাতে গাঁয়ের পথে বেরিয়ে পড়ে তরুণের দল। তাদের প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে বন্ধুর পার্ব্বত্য পল্লীপথ—যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছে যেন দুর্দ্ধর্ষ সৈনিকের দল। তাদের শিরস্ত্রাণে গোঁজা পাখীর পালক এবং রক্ত-রাঙা পশু-লোমের ঝুঁটিসমূহ ইতস্ততঃ আন্দোলিত হতে থাকে। উৎরাই পথ বেয়ে যখন তারা নিচে অবতরণ করতে থাকে তখন মনে হয় আকাশ থেকে এক ঝাঁক বিচিত্রপক্ষ বিহঙ্গ যেন মাটির বুকে নেমে আসছে।

উৎরাই পথ অতিক্রম করে তরুণের দল অবশেষে বালা মোয়াং-এর সর্দ্দারের বাসভবন-সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে হাজির হয়। তাদের অভ্যাগমে নৃত্যপরা মেয়েদের হৃৎপিণ্ড অকস্মাৎ অস্বাভাবিক দ্রুত তালে স্পন্দিত হয়ে উঠে, কারো কারো নাচের তাল কেটে যায়।

সহসা প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি সহকারে তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠে তরুণের দল, তাদের করধৃত শাণিত বর্শাফলকে সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করতে থাকে। এমনি ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পুরোদমে চলতে থাকে নাচ—ক্রমে দিন অবসান হয়, নৃত্যের হয় সাময়িক বিরতি। ছেলেরা তখন সার বেঁধে খেতে বসে যায়, মেয়েরা তাদের ভাত শূকরের মাংস আর মদ্য পরিবেশন করে।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার সুরু হয় নাচের পালা—এবার ছেলেরা আর মেয়েরা নাচছে আলাদা আলাদা দু' জায়গায়। রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে নৃত্যপ্রাঙ্গণে। মাঝখানে জ্বলছে গনগনে কাঠের আগুন—তার আভায় নাচিয়েদের মুখগুলোকে দেখাচ্ছে রহস্যময়।

ধীরে ধীরে ভিড় কমে আসছে। নাচতে নাচতে তরুণেরা মেয়েদের নৃত্য-স্থলে এসে নিজ নিজ মনোনীতাকে নিয়ে অন্তর্দ্ধান হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে তরুণ-তরুণীরা প্রায় সবাই নৃত্য-প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করে চলে গেল—এখন ভাঙা আসরে অবিরাম নেচে চলেছে কয়েকটি মাত্র ছোট ছোট বালক-বালিকা।

শাঙ্কক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শিকনার পানে। শিকনারও অপলক দৃষ্টি তার মুখের উপর নিবদ্ধ। আজ শিকনা মন দিয়ে নাচতে পারে নি—বহুবার তালভঙ্গ হয়েছে। শাঙ্ককের বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি আর তার অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী আজ শিকনার রক্তে দোলা দিয়েছে। নাচতে নাচতে আজ সারাদিন বার বার সে শুধু অপাঙ্গে শাঙ্ককেই দেখেছে। শিকনার সেই প্রশংসমান দৃষ্টি শাঙ্ককের চোখ এড়ায় নি। সে চাউনি তার মনে একটা অপূর্ব্ব পুলকানুভূতি, একটা অসম্ভব আশার সঞ্চার করেছে।...

নাচতে নাচতে শাঙ্কক একেবারে শিকনার কাছে এসে দাঁড়ায়। ক্ষণকাল তারা পরস্পরের মুখের পানে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে। এই পরম ক্ষণে তাদের দু'জনের মধ্যে চোখে চোখে কি কথা হয় কে জানে?

অকস্মাৎ উভয়ে হাত ধরাধরি করে অনতিদূরবর্ত্তী বনান্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বসন্ত উৎসবের দিনকতক পরে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে শাঙ্কক রওনা হ'ল খেপং মোয়াং-এর সর্দ্দারের গৃহাভিমুখে।

পাহাড়ের উপর নীল চন্দ্রাতপের মত টাঙানো উন্মুক্ত উদার আকাশে প্রকাণ্ড কাঞ্চন-থালার মত চাঁদ উঠেছে। আকাশ থেকে ঝরে পড়া স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোৎস্নাধারা নীচেকার বনভূমিকে যেন রূপার পাতে মুড়ে দিয়েছে। পশ্চিমে পাংশা গ্রামের পেছন দিককার চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত আকাশস্পর্শী সুনীল পাহাড়শ্রেণী যেন কোন্ এক মায়াময় দুরধিগম্য সুদূর রহস্যলোকের আভাস জাগিয়ে দিচ্ছে।

চাঁদের আলো শাঙ্ককের মনে যেন নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। সংসারটা তার কাছে বড় মধুময় ঠেকছে—চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছে আকাশের চাঁদেরই মত গোল, পীতাভ গৌর শিকনার সুন্দর মুখখানি।...

দ্রুত পা চালিয়ে, চড়াই পথ বেয়ে শাঙ্কক ঊর্দ্ধে আরোহণ করতে লাগল।

সর্দ্দারের বাড়ীতে পৌঁছে সে কুমারীদের যৌথ শয়নাগারের* বহির্দ্দেশে গা-ঢাকা দিয়ে বসে রইল।...

* নাগা-সর্দ্দারদের বাড়ীতে পাড়ার যাবতীয় কুমারীদের জন্য একটি আলাদা শয়নাগার থাকে। কুমারীরা সকলে সেখানে একত্রে নিশিযাপন করে।

সেই অনতিবৃহৎ গৃহটির একদিকে একটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ প্রবেশ-ও-নির্গমন পথ। গৃহমধ্যে সমান্তরাল ভাবে পাতা রয়েছে কতকগুলো অপ্রশস্ত ছোট ছোট তক্তপোষ। ঘরের মাঝখানে মেঝের ওপর চুল্লীতে কাঠ জ্বালিয়ে আগুন করা হয়েছে—সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখা প্রায়ান্ধকার কক্ষে আলো-আঁধারির এক বিচিত্র মায়া সৃষ্টি করেছে। কুমারীরা নিজ নিজ শয্যার উপরে বসে উৎকণ্ঠাব্যাকুল হৃদয়ে প্রণয়ীদের আগমন-প্রতীক্ষা করছে। এদিকে রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত দ্বারপ্রান্তে তাদের প্রেমাস্পদদের পদশব্দ তো শ্রুত হ'ল না। কুমারীদের হৃদয়ে জাগে অজানা আশঙ্কা—বাসকসজ্জাদের বসন্তরজনী বুঝি বৃথাই যায়। তখন সবাই মিলে বড় করুণ এক বিষাদমাখা সঙ্গীত জুড়ে দেয়—তাতে বেজে ওঠে যেন কত যুগযুগান্তরের বিরহ-বেদনা।

সঙ্গীতের মাঝখানেই হঠাৎ ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে শাঙ্কক। সঙ্গে সঙ্গেই থেমে যায় বিরহ-সঙ্গীত।...সবাই উৎসুক চক্ষে তাকায়। কার ভাগ্য এতক্ষণে প্রসন্ন হ'ল? সহসা সবাই মিলে "চোর" "চোর" বলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠে শাঙ্ককে জাপটে ধরে। একটি মেয়ে শাঙ্ককের মুখের কাছে মুখ নিয়ে ভাল করে তাকে নিরীক্ষণ করে উচ্চস্বরে হেসে বলে উঠে—"আরে, এ যে দেখছি শিকনার মনচোর। নে ভাই শিকনা তোর চোরকে এবার তুই শাস্তি দে।"

ক্রমে ক্রমে এক একজন করে প্রণয়ীরা সেই কক্ষে এসে নিজ নিজ প্রণয়িনীর পার্শ্বে আসন গ্রহণ করে। উচ্চ হাস্যে লঘু পরিহাসে আনন্দ-গানে গৃহখানি মুখরিত হয়ে উঠে। ক্রমে ক্রমে আগুনের দীপ্তি স্তিমিত হতে হতে শেষে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাণ হয়ে যায়, পাশাপাশি উপবিষ্ট জোড়া জোড়া প্রণয়ীদের দেয়ালে প্রতিফলিত ছায়ামূর্ত্তিগুলো মিলিয়ে যায় অন্ধকারে।...

কাটল বেশ কিছুক্ষণ...গৃহমধ্যস্থ কলরব নির্ব্বাপিত... নির্ব্বাণদীপ অন্ধকার-কক্ষে সুরু হয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মৃদু প্রণয়কূজন। অতি সন্তর্পণে শয্যাত্যাগ করে উঠল শাঙ্কক আর শিকনা। টিপিটিপি তারা বাইরে বেরিয়ে এল। চারিদিক জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে, পর্ব্বতগাত্রস্থ বেণুবন যেন জ্যোৎস্নালোকে স্বপ্ন দেখছে...শাঙ্কক-শিকনার আদিম রক্তে জেগেছে বিপুল উন্মাদনা। পরস্পরের কণ্ঠালিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে তারা বনপথ অতিক্রম করতে লাগল।

প্রিয়তমাকে নিয়ে শাঙ্কক এসে পৌঁছল নিজের বহির্বাটীতে গোলাঘরের খোলা বারান্দায়। সেখানে ধানের আঁটি মাটিতে বিছিয়ে শিকনা শয্যারচনা করলে।

কিন্তু এমন রাতে চোখে ঘুম আসে না—জেগে বসে দু'জনে সুরু করলে অর্থহীন অজস্র আলাপন—সারাদিন কত কথাই না দু'জনের মনে জমা হয়ে ছিল!

বাটীতে আর একটি প্রাণীও বিনিদ্র-রজনী যাপন করছিল—সে শাঙ্ককের স্ত্রী শঙ্গা। হন্তদন্ত হয়ে সে ছুটে এল গোলাঘরে। এসেই একেবারে বোমার মত ফেটে পড়ল। শাঙ্কক একটি কথাও বললে না। শিকনার হাত ধরে গোলাঘর পরিত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়ল। বনপথের বাঁকে যখন তারা অদৃশ্য হয়ে গেল তখন ঘরে ফিরে গিয়ে ঘুমন্ত মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠল।

এদিকে জ্যোৎস্নালোকে আবার সুরু হয় শাঙ্কক-শিকনার পথচলা। অবশেষে গিয়ে পৌঁছয় তারা গ্রামপ্রান্তস্থ ধান-ক্ষেতের ধারে, শাঙ্ককের দোচালা ক্ষেত্রকুটিরে।

এমনি ভাবে পরিপূর্ণ মিলনানন্দের ভেতর দিয়ে কাটতে লাগল এই প্রণয়ীযুগলের দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

শাঙ্ককের দোচালা ক্ষেত্রকুটিরই এখন তাদের নিভৃত গোপন মিলনের স্থান। সেখানে লোকালয়ের কোনো কোলাহল তাদের কানে পৌঁছয় না। শুধু শোনা যায়, অনতিদূরে এক গিরিনদীর একটানা অশ্রান্ত গর্জ্জন।

শিকনার আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে হঠাৎ আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে শাঙ্কক বলে ওঠে—"শিকনা, তোমায় না পেলে সংসারে যে এত সুখ আছে তা আমি জানতেও পারতাম না। বিশ্বাস করো, ঐ নদীর চেয়েও গভীর আমার ভালোবাসা, এর স্রোতের চেয়েও বেশী তার বেগ।"

শিকনা কোনো জবাব দেয় না, শুধু কেমন যেন অসহায়ের মত প্রিয়তমের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ যেন তার সুন্দর মুখে নামে বেদনার পাণ্ডুর ছায়া—আনমনে সে যেন কি ভাবতে থাকে। শাঙ্কক তার এই ভাবান্তরের কোন হেতু খুঁজে পায় না।...দিন দিন শিকনার বিষাদের মাত্রা ক্রমেই যেন বেড়ে চলতে থাকে।

শেষে শিকনা একদিন সব কথা খুলে বললে, সে অন্তঃসত্ত্বা। শুনে শাঙ্ককের চোখের সামনে সারা পৃথিবীটা যেন ঘুরতে লাগল—একেবারে মাথায় হাত দিয়ে সে বসে পড়ল।

শিকনা গর্ভে ধারণ করেছে তার সন্তান, এতে তো দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী আনন্দ হওয়ার কথা ছিল তারই—কিন্তু এ অ-জাত সন্তান যে তার অবাঞ্ছিত। সে তো আসবে না তাদের উভয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্থাপন করতে। যে মুহূর্ত্তে সে ভূমিষ্ঠ হবে সেই মুহূর্ত্তেই পড়বে শাঙ্কক-শিকনার প্রণয়ে পূর্ণচ্ছেদ। শিকনা কয়েক বছর আগে থেকেই অপরের নিকট বাগ্‌দত্তা। বিয়ের প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদিও তখনই হয়ে গেছে। মা হবার সঙ্গে সঙ্গেই হবে তার মুক্ত স্বাধীন জীবনের অবসান। চিরতরে পিত্রালয় পরিত্যাগ করে নবজাত সন্তানকে নিয়ে চলে যেতে হবে তাকে স্বামীগৃহে—শাঙ্ককের সঙ্গে হবে তার চিরবিচ্ছেদ।...

কিন্তু সেই চরম দুর্দ্দিন আসতে এখনও মাসকয়েক বাকী

আছে। শিকুনার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে শাস্বক বললে,—"শিকুনা, ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা এখন মুলতুবী থাক। সমাজের বিধানকে এক দিন তো মাথা পেতে নিতে হবেই। কিন্তু আপাততঃ সমাজ সংসার সব মিছে, মনে হচ্ছে যেন দুনিয়ায় তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই।"

শিকুনা একান্ত অনুরাগের দৃষ্টিতে শাস্বকের মুখের পানে তাকালে—তার মনে হ'ল তাদের দু'জনের এই যে নিবিড় গোপন মিলন সংসারে একমাত্র তা-ই সত্য, বাকী সবকিছুই অবাস্তব, ছায়ার মতন মিথ্যা।

শাস্বক-শিকুনার প্রণয়লীলা চলতে লাগল যথাপূর্ব্বং, কিন্তু পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে চিরবিচ্ছেদের আশঙ্কা তাদের দু'জনকে ঘিরে রইল দুঃস্বপ্নের মত।...

এমনি ভাবে কাটল কয়েক মাস। এখন শিকুনা আসন্ন-প্রসবা—তার চাঞ্চল্যের হয়েছে অবসান, গতি হয়েছে মন্থর। সে বুঝতে পেরেছে শিগ্‌গিরই সে হবে সন্তানের জননী—ভাবতেও সারা দেহে যেন একটা পুলক-শিহরণ খেলে যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে সন্তান তার যেদিন প্রথম পৃথিবীর আলোবাতাসের স্পর্শলাভ করবে সেই পরম আনন্দের দিনই হবে তার কাছে চরম বেদনার দিন—সেই দিন থেকেই হবে তার সন্তানের জন্মদাতার সঙ্গে তার চির-বিচ্ছেদের সূচনা।...

সেদিন সন্ধ্যার পর দু'জনে তারা চলে গেল ওটিং-এর বনভূমিতে। আকাশে চাঁদ উঠেছিল। বনতলে পা ছড়িয়ে বসল শাস্বক, আর শিকুনা তার কোলে মাথা রেখে তৃণশয্যায় শুয়ে পড়ল। দু'জনেই চুপচাপ। হঠাৎ শিকুনা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না। শাস্বকের কোলে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এ কান্না কেন শাস্বকের তা বুঝতে বাকী রইল না। সে কোন কথা বললে না, শুধু নীরবে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

পরদিন যথারীতি সন্ধ্যার পর শাস্বক গিয়ে হাজির হ'ল খেপং মোরাং-এ কুমারীদের যৌথ শয়নাগারে। ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখলে শিকুনার চৌকির উপর শূন্য শয্যাটি পড়ে আছে। পরিচিতারা সকলেই উপস্থিত। কিন্তু তার উৎসুক ব্যগ্র চক্ষু দুটি যার সন্ধান করছে সেই শুধু নেই। তবে কি...শাস্বকের বুক দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল।

একটি প্রগল্‌ভা মেয়ে খিল খিল করে হেসে বলে উঠল—"ওদিকে তাকালে কি হবে মশাই। সে আর আসবে না... শিকুনার যে আজ দুপুরে ছেলে হয়েছে গো।...

শাস্বকের চোখের সামনে আচম্‌কা যেন নেমে এল গভীর অন্ধকার...মনে হ'ল সবকিছুই যেন ছায়ার মত শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রায় মেঝের ওপরেই বসে পড়ে আর কি! অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে সেখান থেকে বেরিয়ে এল।...

নিজের বাড়ীতে ফিরে এসে শাস্বক বহির্বাটিতে মাচার ওপরেই ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। দীর্ঘ এক বৎসর পরে আবার সুরু হ'ল তার একলা নিশিযাপনের পালা। ঘুম চোখে কিছুতেই আসে না। নিজেকে কেমন যেন শিশুর মত অসহায় মনে হয়। দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় সারা রাত সে ছটফট করতে লাগল।

পরদিন ভোরে যখন সে শয্যাত্যাগ করে উঠল তখন তাকে দেখলে আর চেনাই যায় না। কুঞ্চিত ললাটে তার দুশ্চিন্তার রেখা, নিশিজাগরণক্লান্ত চোখের কোলে পড়েছে কালিমা, মুখে সর্ব্বস্ব হারাণোর ছাপ। এক রাত্রে সে যেন বুড়িয়ে গেছে—বয়স তার যেন বিশ বৎসর বেড়ে গেছে।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে সে ধানক্ষেতের অভিমুখে রওনা হ'ল। ক্ষেত্রভূমিতে গিয়ে যখন পৌঁছল তখন দূর দিগন্তলীন পাতকোই পাহাড়শ্রেণীর উপর দিয়ে প্রভাত-সূর্য্য আকাশে উঠেছে। বিচিত্রবর্ণানুরঞ্জিত আকাশের পটভূমিকায় নীল পাহাড়ের চূড়াসমূহ চালচিত্রের মত শোভমান। পাহাড়ের পশ্চিম দিককার গড়ানে অংশ এখনও ছায়ায় ঢাকা। নীচেকার উপত্যকাভূমি অজস্র হিমকণায় সমাচ্ছন্ন—কে যেন রহস্যময়ী প্রকৃতির সুপ্ত মুখের 'পরে শুভ্র সূক্ষ্ম কৌষেয় অবগুণ্ঠন টেনে দিয়েছে। সূর্য্যের সোনালী রশ্মিপাতে প্রকৃতির সেই মুখাবরণখানি ঝলমল করছে।

এই মনোরম প্রভাতে ধানক্ষেতে তরুণ-তরুণীদের ভিড় জমেছে—সুরু হয়েছে ফসল-কাটার গান। শাস্বকের মনে পড়ল, আজ থেকেই আউ নিবু (শস্য কর্ত্তন) উৎসবের সুরু। তরুণ-তরুণীদের মনে তাই আজ ভোরবেলা থেকেই খুশীর বান ডেকেছে। সবাই উৎসবানন্দে ভরপুর, শুধু তারই জীবন থেকে উৎসব নিয়েছে চিরবিদায়।

দূরে শাস্বকের আগমনশীল মূর্ত্তিখানি দেখে তার বন্ধু-বান্ধবেরা খুশী হয়ে হর্ষধ্বনি করে উঠল। কিন্তু সে কাছে এলে তার চেহারা দেখে সবাই তো একেবারে হতভম্ব। ব্যাপারখানা কি? শিকুনার ছেলে হওয়ার খবর তাদের কানে তখনও পৌঁছয় নি।

চিনইয়াং-এর সঙ্গেই তার সকলের চাইতে বেশী হৃদ্যতা। সে জিজ্ঞেস করলে—"কি রে শাস্বু, আজ মচ্ছবের দিনে তোর এ ভাব কেন? ফুর্ত্তি-আমোদে যোগ দেওয়া তো দূরের কথা, তুই কথাই বলছিস না। তোর হ'ল কি, অসুখ করেছে না কি?"

শাস্বক জবাব দিলে, "না ভাই, অসুখবিসুখ কিছুই নয়। কাল শিকুনার ছেলে..." আর কিছু সে বলতে পারলে না, সকলের সামনে একেবারে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে।

চিনইয়াং তার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—"এ্যা, একেবারে কেঁদেই ফেললি। তুই পুরুষ-বাচ্চা, একটু শক্ত হ। আগে শদাকে তালাক দে। তার পর শিক্‌নার স্বামীকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে শিকনাকে বিয়ে করে ফেল। তা হলেই তো সব লেঠা চুকে যায়।"

চিনইয়াং-এর কথা শুনে শাঙ্কক যেন অকূলে কূল দেখতে পেলে। সাংসারিক ব্যাপারে এবং সামাজিক নিয়ম-কানুনাদিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সে। মুস্কিল-আসানের এসব উপায়ের কথা তার মনেই আসে নি। এখন চিনইয়াং-এর পরামর্শে সে যেন অন্ধকারে একটুখানি ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পেলে। বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিদায় নিয়ে সে বাড়ীর পথে রওনা হ'ল। শাঙ্কক দৃষ্টির আড়ালে গেলে সবাই বলাবলি করতে লাগল, শাঙ্ককটা মেয়েমানুষেরও অধম।

বাস্তবিক শাঙ্কক সাহসী বীরপুরুষ হলে কি হয়। সে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, মনটা তার ভারি নরম। কনিয়াক নাগাদের সমাজে সে ব্যতিক্রম।

শাঙ্কক শদাকে তালাক দিতে চায় শুনে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মাতব্বররা তার বাড়ীতে এসে জমায়েৎ হ'ল। তার শ্বশুর-শাশুড়ীও এসে উপস্থিত হ'ল, শিকনার স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদেরও ডেকে পাঠানো হ'ল। যথাসময়ে বসল বৈঠক।

বিবাহবিচ্ছেদ করতে হলে শাঙ্কককে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ কি কি দিতে হবে একে একে তার ফর্দ উপস্থাপিত করা হতে লাগল। শদার বাপ-মা অসম্ভব রকম মোটা টাকা দাবি করলে। শিকনার স্বামীর আত্মীয়স্বজনেরা বললে, শিকনার বিয়ের প্রাথমিক অনুষ্ঠানের সময় তাদের যে পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছিল তা একেবারে কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দিতে হবে। সমাজপতিরা ফতোয়া দিলেন, বিবাহবিচ্ছেদের আগেই বাড়ীটিকে ভেঙে আবার নূতন করে তৈরি করতে হবে, কেননা যে ঘরে প্রথমা স্ত্রী বাস করে গেছে সেই ঘরেই দ্বিতীয়াকে নিয়ে আসা সামাজিক বিধানে নিষিদ্ধ।

আং-সর্দারের ছেলের বিবাহবিচ্ছেদ এ তো আর সাধারণ ব্যাপার নয়। সমাজপতিরা দেখলে মোটা রকমের দাঁও মারবার এ একটা সুবর্ণ-সুযোগ—তারা এ সুযোগ ছাড়বে কেন? গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ জরিমানা-স্বরূপ যে টাকা দাবি করলে তা দিতে হলে শাঙ্কককে সর্ব্বস্ব বিক্রী করে ফতুর হতে হয়।

গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মোড়ল লেমং শাঙ্কককে সম্বোধন করে বললে—"ওহে ছোক্‌রা, তোমার বাপের সঙ্গে আমাদের যে সব কথাবার্ত্তা হয়েছিল সেই অনুযায়ীই আমরা আমাদের দাবি-দাওয়া উপস্থিত করছি। তুমি তখন নেহাত ছেলেমানুষ, এ সব তোমার জানবার কথা নয়। কিন্তু গাঁয়ের দশ জনের তা অজানা নয়। যাই হোক, তুমি রাজী তো।"

শাঙ্কক বুঝলে বাপ তার সব দিক দিয়ে আটঘাট বেঁধে গিয়েছে, কোথাও কোন ফাঁক রেখে যায় নি। শদাকে তালাক দিতে হলে যথাসর্ব্বস্ব দান-বিক্রী করে তাকে পথের ভিখারী সাজতে হবে। কিন্তু তাতে সে পিছপা নয়। শিকনার চেয়ে টাকাকড়ি ধনদৌলত জমিজেরাৎ তার কাছে বড় নয়। তবে কি এখনই সমাজপতিদের কথায় সে সম্মতিপ্রদান করবে?

কিছুক্ষণ সে চুপ করে ভাবতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হ'ল, সে যদি এমন করে পৈতৃক সম্পত্তি নিঃশেষ করে দেয় তা হলে কিংওয়াং-এর কি-উপায় হবে? কিংওয়াং তার একমাত্র নাবালক ছোট ভাই। বয়স তার পাঁচ-ছয় বছর মাত্র। বড় ছেলে বলে শাঙ্কক এখন বাপের সমুদয় সম্পত্তির মালিক। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে কিংওয়াং যখন উপযুক্ত বয়সে বিয়ে করে ঘর বাঁধবে তখন শাঙ্কককে তার অংশ তাকে গাঁয়ের মাতব্বরদের সামনে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়ে দিতে হবে।

দারুণ ফ্যাসাদে পড়ল শাঙ্কক। যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়েও শিকনাকে পেলে তার জীবনের সকল অভাব মিটবে সত্য, কিন্তু সেজন্যে কিংওয়াংকে সর্ব্বস্বান্ত করে, তার ভবিষ্যৎ মাটি করবার কি অধিকার আছে তার।...

অনেকক্ষণ ভেবে শাঙ্কক সমাজ-পতিদের বললে—"দয়া করে আমায় আজকের দিনটি সময় দিন। কাল সকালে আমার চরম মত জানাব।"

•

গভীর রাত্রে শয্যাত্যাগ করে উঠল শাঙ্কক। তার সকল ভাবনা দূর হয়েছে, সকল দুশ্চিন্তার হয়েছে অবসান—মন ভরে উঠেছে বিমল আত্মপ্রসাদে।

পাশেই ঘুমিয়ে আছে কিংওয়াং। ছোট ভাইটির ঘুমন্ত মুখে চুমু খেয়ে শাঙ্কক তাকে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করলে—তারপর ঘর থেকে পথে বেরিয়ে এল।

আজ সারাদিন সে অনেক ভেবেছে, ভেবে ভেবে অবশেষে সে তার কর্ত্তব্য স্থির করে নিয়েছে। প্রেম তার অনেক বড়, কিন্তু তার চেয়েও বড় আং-পরিবারের মর্য্যাদা। বহু পুরুষের কীর্ত্তিকলাপ আর সঞ্চিত সম্পদের ওপর তাদের পারিবারিক গৌরবের ভিত্তি। নিজের সুখের জন্যে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত সম্পদের অপচয় করে পারিবারিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলকে সে শিথিল করে দেবে না। আজ সমাজের শীর্ষস্থানে তাদের পরিবারের আভিজাত্যের আসন, কিন্তু শদার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে গিয়ে কাল যদি সে সর্ব্বস্বান্ত হয় তা হলে ওয়াকচিং-এর সবাই তাকে আর তার মা-ভাইকে দেখবে অবজ্ঞার চোখে। তারা তার প্রেমের মর্য্যাদা তো আর বুঝবে না, নাক সিঁটকে বলবে একটা মেয়ে-মানুষের জন্যে শাঙ্কক সর্ব্বস্ব খুইয়ে আং-পরিবারের সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছে। তার প্রেমের এত বড় অসম্মান ঘটতে সে দেবে না।...

সে বাপের অযোগ্য ছেলে কিন্তু কিংওয়াং বড় হয়ে রাখবে

বাপের নাম। সেই অবুঝ ছোট ভাইটিকে কিনা সে পথে বসাবার ব্যবস্থা করবে?—না তা হয় না। তার চেয়ে সে যদি ঘর ছেড়ে চিরতরে পথে বেরিয়ে পড়ে তা হলেই তো কত সহজে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ঘরে তার কিসের মায়া? মুখরা প্রৌঢ়া স্ত্রীর প্রতি নেই তার কোনও আকর্ষণ। পরের সন্তান তার সন্তানরূপে সমাজে পরিচিত। সবাই এ বিধানকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়ে আসছে। কিন্তু শাঙক এ সমাজ-বিধিকে প্রসন্ন মনে স্বীকার করতে পারে না। এ সমাজে নিজেকে কেমন যেন খাপছাড়া বলে তার মনে হয়—সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে এখানে তার স্থান নেই।

নিজের একাকিত্বের অনুভূতি তাকে অভিভূত করে ফেলে —মনে হয় সংসারে তার মত নিঃসঙ্গ কেউ নেই। তুচ্ছ ধন-সম্পদ, প্রিয়জনকে নিয়ে একখানি সুখনীড়ই যদি না বাঁধা হ'ল তা হলে মিছামিছি ঘরে থেকে লাভ কি?

তাই ঘর ছেড়ে সে বেরিয়েছে পথে। জন্ম-পল্লী পরিত্যাগ করে সে চলে যাবে এমন দূর দেশে যেখানে পূর্ব্ব-জীবনের সঙ্গে হবে তার সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ। যেখানে গেলে নূতন পরিবেশে শিকনার কথা, ওয়াকচিং-এর কথা, সবকিছু সে ভুলতে পারবে।

জ্যোৎস্নার প্লাবনে পাহাড়-বন-অধিত্যকা-প্রান্তর পরিপ্লাবিত। দ্রুতপদে বনপথ অতিক্রম করে সে এগুতে লাগল। ঠিক যেন নিশিতে পাওয়ার মত সে নিঃসুপ্ত গ্রামের উপর দিয়ে চলেছে।

পল্লীর শেষপ্রান্তে বনপথের এক বাঁকে শিকনার বাড়ী। থমকে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত বাড়ীখানির পানে এক বার তাকালে শাঙক, ভাবলে স্বামীর বুকে শুয়ে শিকনা কি এখন বিগত বসন্তরজনীর স্বপ্ন দেখছে!

কিন্তু পিছটান আর নয়—যাত্রা তার সুমুখ-পানে, গিরিবন অতিক্রম করে, সিনইয়াং নদী পেরিয়ে নরমুণ্ডচ্ছেদক নাগাদের পল্লী পাংশার অভিমুখে।

শিকনার বাড়ী ছাড়িয়ে সে সুরু করে চড়াই পথ বেয়ে ঊর্দ্ধে আরোহণ, পিছনে পড়ে থাকে শিকনার সঙ্গে প্রণয়লীলার শত স্মৃতি-বিজড়িত ওয়াকচিং পল্লী। গভীর নিশীথে দুর্গম গিরিপথে অজানার উদ্দেশে অভিযানের আনন্দে তার সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। দৃঢ় পদক্ষেপে চড়াইয়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করে সে সুমুখের সীমাহীন মহাশূন্যের পানে তাকায়।

নভোলীন পাতকোই পর্ব্বতমালার অভ্রভেদী সারামাটি গিরিশৃঙ্গ যেন তাকে কোন সুদূর রহস্যলোকের অভিমুখে হাতছানি দিয়ে ডাকে।*

---

* গল্পটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়, সত্য ঘটনামূলক। অষ্ট্রিয়ার নৃতত্ত্ববিদ্ Christoph von Fürer Haimendorf তাঁর *The Naked Nagas* নামক পুস্তকে দুটি কনিয়াক নাগা তরুণ-তরুণীর যে বিয়োগান্ত প্রণয়কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাকেই ভিত্তি করে বাস্তবে কল্পনায় মেশানো এই গল্পটি রচনা করা হয়েছে।

তারা দেখাবেই আলোর পথ

এস. এম. মুয্‌হরুল ইস্‌লাম

পৃথিবী মোদের বন্ধ্যা নয়,
ইতিহাস জানে পৃথিবী মোদের বন্ধ্যা নয়।
অমৃত-জীবন ছিল হেথা যুগ-যুগান্তর,
জয়গানে তার মুখরিত আজো নির্ব্বাক দিক-দিগন্তর।

ভীরু রাত্রিরা এসেছিল যবে, নভতল রবিরশ্মিহীন
জমাট আঁধারে পৃথিবীর বুক হিম-তুহিন,
পিশাচেরা এসে সেই আঁধারের পথ ধরি'
দুমড়ে মুচড়ে ভেঙেছিল কত নবজীবনের মঞ্জরী।
তখনো তো তারা নির্ভয়-চিতে তুচ্ছ করেছে অন্ধকার,
কঠিন বক্ষে হেনেছে আঘাত মুক্ত করিতে প্রভাত দ্বার,
রক্ত দিয়েছে ফাঁসির মঞ্চে, বুলেটের মুখে দিয়েছে প্রাণ
মৃত্যুর মাঝে তাহারা গেয়েছে জীবনের জয়দৃপ্ত গান।

তারাই শহীদ, তাদেরি যে খুনে লালে লাল সেই রক্ত-পথ,
খুঁজে খুঁজে আজ এখানে এসেছে নব-সূর্য্যের আলোর রথ।
পিশাচেরা আজ পালায়েছে দূরে—ঘোর-রাত্রির হয়েছে শেষ,
দিনের আলোকে অবসান হ'ল নিশীথের ব্যথা-দুঃখক্লেশ।

এই আলোকের মিনারে দাঁড়ায়ে স্মরি সেই শত শহীদ বীর,
ভুলি নি তো মোরা, ভুলিতে কি পারি তাদের দেওয়া সে
লাল রুধির?
ইতিহাস-বুকে সে মহাত্যাগের, সেই রক্তের সোনালী দাগ,
অমৃত আখরে আঁকা রবে আর ছড়াবে মহৎ প্রেরণা-রাগ।
সেই নিঠুর বেদনাকে স্মরি ফেলিব না আজ অশ্রুজল,
শুধু চাই···সেই রক্ত-শিখায় পাই যেন চির-নতুন বল,
যদি কোন দিন আঁধারের মাঝে চলিবার গতি হয়-ই শ্লথ,
ভয় নেই তবু, থাকি অলক্ষ্যে তারা দেখাবেই আলোর পথ।

সুফী তত্ত্বালোচনা

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল

সুফী (বা সূফী) মুসলমান ধর্মের একটি সম্প্রদায়বিশেষ। ইঁহাদিগকে হিন্দুধর্মের বেদান্তবাদীদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সুফী ধর্মের মতে ভগবান এক; তাঁহার কোন তুলনা নাই। তিনি নির্গুণ, অর্থাৎ গুণের অতীত; তাঁহার কোন বর্ণনা হয় না। সেই রূপহীন, নির্গুণ ভগবৎ-তত্ত্বের আলোচনা কেমন করিয়া করা যাইতে পারে? মৌলানা রূমী তাঁহার মস-নবীতে লিখিয়াছেন,

গর্ জ সি'র-ই-ম'রিফৎ অগাঃ শবী।
লফ্জ্ বগ্‌জারী সূয় ম'নী শবী॥

যদি সেই গূঢ় রহস্য জানিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বাক্য বা বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া সেই সত্তাকে উপলব্ধি কর। প্রকৃতই ভগবৎসত্তা উপলব্ধির জিনিষ, ইহাকে বর্ণনা দ্বারা বুঝাইবার উপায় নাই। আমরা দেখিতেও পাই যে, কোন ধর্মশাস্ত্রেই ভগবৎসত্তার সরাসরি কোন বর্ণনা নাই—এবং ইহা হইতেও পারে না; ইহার সোজাসুজি কোন বর্ণনা করিতে গেলেই সাধারণ মানুষ ইহার গূঢ় রহস্য সঠিক বুঝিতে না পারিয়া ভ্রান্তপথগামী হইবে। সেইজন্য সকল শাস্ত্রেই ভগবৎ-তত্ত্বের আলোচনা রূপকের সাহায্যেই করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট, হজরৎ মোহম্মদ প্রমুখ সকল ধর্মপ্রবর্ত্তকগণই রূপকের সাহায্যেই ভগবৎসত্তার বর্ণনা করিয়াছেন। সেই পরম পুরুষকে পার্থিব চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করা দুষ্কর। যে ভাগ্যবান পুরুষ তাঁহার এই পার্থিব চক্ষুকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন, তিনিই কেবল ভগবৎসত্তার দর্শনলাভ করিয়াছেন।

এই রূপকবর্ণনার যথেষ্ট উপকারিতাও রহিয়াছে। সাধারণ মানুষ এই রূপককেই ভগবানের প্রকৃত সত্তা মনে করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ইহার আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি সম্যক্‌ভাবে পালন করিতে চেষ্টা করে। মুসলমান ধর্মশাস্ত্র মতে এই বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'শরি'য়ৎ'। 'শরি'য়ৎনির্দ্দিষ্ট' আচার-অনুষ্ঠানাদি যথোচিতভাবে পালন করিয়া সাধারণ মানুষ ক্রমে সুফীনির্দ্দিষ্ট 'ত্বরীকৎ'-এ (পথ) অগ্রসর হয়। সেখান হইতে সালিক্-ই-রহ্ (ভগবৎ-পথের পথিক) ক্রমে ক্রমে 'ম'রিফৎ' (ভগবৎ জ্ঞান) ও হকীকৎ-এর (ভগবৎসত্তা) দিকে অগ্রসর হয়। মানুষ সেই ভগবৎসত্তায় পৌঁছিলে পর দেখিতে পায় যে, সকলই এক—এক ভগবান ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু সেই স্তরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে কেহ সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না যে, এক ভগবানই চরাচর ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তিনিই সবকিছুতেই বিরাজ করিতেছেন এবং তদ্ব্যতীত আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। আমরা দেখিতে পাই, ধর্মগ্রন্থাদিও এরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, সেগুলিতে যদিও বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও নানা তত্ত্বোপদেশাদির অনেক বর্ণনাই আছে তথাপি এমন অনেক তথ্যপূর্ণ বিষয়ও রূপকচ্ছলে বর্ণনা করা হইয়াছে যাহার আসল তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা দুরূহ ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে সুফী-কবিদের প্রেমপূর্ণ 'গজল' (প্রেমগীতি) বা হিন্দুধর্মের রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-কাহিনীর কথা বলা যাইতে পারে।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাহারো ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করা নিষেধ। প্রকৃতই যাহার ব্রহ্ম বা ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয় নাই, তিনি কি করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন? কৃষ্ণের প্রতি রাধার আত্মভোলা প্রেমের স্বরূপ কয়জন সঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন? সেইজন্যই দেখা যায় কৃষ্ণলীলার অপব্যাখ্যা হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহাকে কহি যে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম; প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
—চৈতন্য চরিতামৃত—আদিখণ্ড।

সুফী কবিগণও ঠিক এইরূপ ভাবেই প্রেমের মহিমা গাহিয়াছেন; মৌলনা রূমী বলিয়াছেন,

ম'নী আন্ নাবুবদ্ কি কূর্ ব কর্ কুনদ্
মর্দ্ বা বর্ নক্শ্-'আশিক্ তর্ কুনদ্

—'পরম সত্তার প্রেম দৈহিক সৌন্দর্য্যের প্রতি আসক্তির ন্যায় মানুষকে অন্ধ ও বধির করে না।' কিন্তু যতক্ষণ না মানুষ সেই প্রেমের আস্বাদ পায় ততক্ষণ সে পার্থিব প্রেমের প্রতিই আকৃষ্ট হয় এবং সেই ভগবৎপ্রেমের রসাস্বাদ হইতে বঞ্চিত থাকে। এই পার্থিব প্রেমও খাঁটি হইলে বিফলে যায় না—ইহাই ক্রমে গাঢ়তম হইয়া ভগবৎপ্রেমে পরিবর্ত্তিত হয়। স'দী ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে গাহিয়াছেন,—

জৌক-ই-দীন্ বাদ না দানী বখুদ্ আন্ তা নচশ্‌তী

এই প্রেম-রসের মাদকতা যতক্ষণ না আস্বাদন করিয়াছ, ততক্ষণ ইহা সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না -।

সেই ভগবৎপ্রেম কোন আড়ম্বরের ধার ধারে না। নিঃস্বার্থপরতাই ইহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কবি হাফিজ গাহিয়াছেন,—

রাজ-ই-দরূন্-ই-পর্দ্দ জ রিন্দান্-ই-মস্ৎ পুর্স্।
কয়িন্ ঃহাল্ নীস্ ৎ জাহিদ্-ই-'আলী-মুকাম্ রা॥

হরগিজ নমীরদ্ আন্ কি দিলশ্ জিন্দ শুদ্ ব'ইশ্‌ক্।
স.বতস্ৎ বর্ জরীদ-ই-'আলম্ দরাম্-ই-মা॥

"ভগবৎ প্রেমের গূঢ় রহস্য প্রেমোন্মত্তদের নিকট হইতে জানিতে চেষ্টা কর; বাহ্যিক আড়ম্বরবিশিষ্ট সাধুগণ ইহার প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাত নহেন।...ভগবৎপ্রেমে যাঁহার অন্তঃকরণ সজীব তাঁহার কখনও মৃত্যু নাই—আমাদের চিরন্তন অস্তিত্ব পৃথিবীর পৃষ্ঠে চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে।" এইরূপ গজলে যেমন ভগবৎপ্রেমের বর্ণনাদি আছে ও সুফীতত্ত্বাদি আলোচনা করা হইয়াছে তেমনি সুফীতত্ত্বের বিশ্লেষণ এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য নানা গল্প বা কাহিনীর মধ্যেও বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। অনেক সুফী কবিই—যেমন, 'অত্তার্, রূমী, স'দী, সুফীতত্ত্বসমূহ নানা গল্পের সাহায্যে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কোরাণেও এইরূপ অনেক গল্পের সমাবেশ আছে। এই সকল গল্পের অর্থ দুই ভাবেই করা যাইতে পারে—এক সাধারণকে জ্ঞানদান করণার্থ নানা উপদেশের সাহায্যে চলিত রীতিনীতি ও আইন-কানুন সাপেক্ষ শরি'য়ৎ অনুযায়ী ব্যাখ্যা; দ্বিতীয়, ত্বরীকৎ ও ম'রিফৎ (যোগমার্গ ও জ্ঞানমার্গ) অবলম্বনে ভগবৎ পন্থা অনুসরণকারীদের জন্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। কোরাণে এই দ্ব্যর্থপূর্ণ শ্লোকের যথাক্রমে নামকরণ করা হইয়াছে,—

(ক) অয়াৎ-ই-বায়্যিনৎ (সাধারণ ব্যাখ্যাযুক্ত শ্লোক)

(খ) অয়াৎ-ই-মুতশাবিহৎ (আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদিসম্পন্ন শ্লোক)।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাযুক্ত শ্লোকের নিদর্শন-স্বরূপ কোরাণে (১৭ সুরা বা অধ্যায়ে) বর্ণিত হইয়াছে: 'একদা পয়গম্বর মুসা ভগবানের নিকট তাঁহার চেয়ে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের সন্ধান প্রার্থনা করিলেন—এবং এই সম্পর্কে খিজিরের নাম উল্লিখিত হইল। কথিত আছে, খিজির একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ এবং জীবনামৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। মুসাও সেই অমরত্বলাভের জন্য দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে তাঁহার অনুচরসহ উপস্থিত হইলেন। দেখা গেল যে, মধ্যাহ্নভোজনের জন্য আনীত ভাজা মৎস্যটির কথা তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন এবং মৎস্যটিও স্বাধীন ভাবে জলে সাঁতার দিয়া চলিয়া গেল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মুসা খাবারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিলে অনুচর পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটির কথা বলিল। মুসা আবার সেই সাগর-সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং খিজিরের। দেখা পাইলেন। মুসা আরও জ্ঞান লাভার্থে তাঁহার অনুসরণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু খিজির আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার কার্য্যকলাপ মুসা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না বলিয়া অনেক সময় এই সকল ব্যাপারে ধৈর্য্য ধারণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। মুসা বলিলেন, ভগবৎ ইচ্ছায় আমি সকল বিষয়েই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিব।... অতঃপর তাঁহারা উভয়েই অগ্রসর হইলেই এবং তাঁহাদের ব্যবহৃত নৌকাটিতে খিজির ফুটা করিয়া দিলেন। মুসা বলিলেন, আপনি আরোহীদিগের ব্যবহৃত নৌকাটি সচ্ছিদ্র করিয়া দিয়া বড় অদ্ভুত কাজ করিলেন। খিজির ইহাতে উত্তর দিলেন, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, তুমি আমার কার্য্যকলাপে ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিবে না। মুসা তখন ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। নৌকাটি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন এবং একটি যুবকের সাক্ষাৎ পাইলেন। খিজির যুবকটিকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। মুসা জিজ্ঞাসা করিলেন, একটি নিরীহ যুবককে কেন অনর্থক বধ করিলেন? খিজির আবার তাঁহার পূর্ব্বের বক্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলেন। ইহাতে মুসা ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বলিলেন, আবার যদি এরূপ হয় তাহা হইলে আপনি আর আমাকে আপনার অনুসরণ করিতে দিবেন না। তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া চলিলেন, এবং একটি জনাকীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানকার লোকদের নিকট তাঁহারা খাবার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা ইহাতে মোটেই কর্ণপাত করিল না। নিকটেই একটি দেয়াল ভূমিসাৎ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া খিজির স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইহার সংস্কার করিলেন। ইহাতে মুসা প্রশ্ন করিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলেই এই কার্য্য সম্পন্ন করার যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করিতে পারিতেন। খিজির উত্তরে বলিলেন, তোমার এই প্রশ্ন আমাকে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে।

তবে যাইবার পূর্ব্বে আমি আমার কার্য্যকলাপের নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া যাইতেছি। পূর্ব্বোল্লিখিত নৌকাটি ছিল কয়েকজন গরীবের এবং তাহারা এই সাগরেই ব্যবসা করিত। আমি নৌকাটিকে ব্যবহারের অযোগ্য করিবার উদ্দেশ্যেই ছিদ্রযুক্ত করিয়া দেই—কারণ এই নৌকার উপরে ছিল একজন রাজার নজর, যিনি প্রত্যেক ব্যবহারযোগ্য নৌকাই জোর করিয়া লইয়া যাইতেন। যে যুবকটিকে হত্যা করি তার পিতামাতা ছিলেন সৎ, কিন্তু যুবকটি ছিল কাফের—তাহার নিষ্ঠুরতার দরুন সৎ পিতামাতার লাঞ্ছনা হইবার ভয়ে যুবকটিকে বধ করিয়া ফেলি। পরে ভগবৎ কৃপায় একটি সৎ ছেলে হইলে তাহার দ্বারা পিতামাতার অশেষ সুখ হইতে পারে। আর ঐ দেয়ালটি ছিল দুই জন পিতৃমাতৃহীন বালকের—দেয়ালের নীচে ছিল লুক্কায়িত ধনসম্পদ এবং তাহাদের পিতা ছিলেন একজন সৎ লোক। সেইজন্যই ভগবানের ইচ্ছা

HDX7
খাঁটি ঘি দুষ্প্রাপ্য ...
খাঁটি তেল দুর্মূল্য ...
বিশুদ্ধ বনস্পতি
রসুই
দিয়ে রান্না করুন
RASOI
VANASPATI
হিন্দুস্থান ডিভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা
ম্যানেজিং এজেন্টস: এন. আর. সরকার অ্যাণ্ড কোং লিঃ

ছিল যেন ছেলে দুইটি সাবালক হইয়া ইহা ভোগ করিতে পারে। যদিও তোমার মনে হইয়াছিল যে, আমি আমার ইচ্ছামতই এই সকল কার্য্যাদি করিয়াছিলাম; কিন্তু মনে রাখিও আমি কোনটিই ভগবানের সঙ্কেত ভিন্ন করি নাই।"

খিজির ও মুসা শ্রেষ্ঠ গুরু-শিষ্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পার্থিব জ্ঞান ও পরমার্থিক জ্ঞানস্বরূপ দুইটি সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে তাহাদের মিলন হয়। মৎস্যটি পার্থিব জ্ঞানের রূপক, ইহা পরমার্থিক জ্ঞানস্বরূপ সমুদ্রে পৌঁছিলে আপনা হইতেই তন্মধ্যে লুপ্ত হইয়া যাইবে। তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণার কোনই খেয়াল থাকে না—কিন্তু জ্ঞান-পথে অগ্রসর হইতে হইলে গুরুর সাহায্য ছাড়া উপায় নাই। সেইজন্য গুরুকরণ। এই বিপৎসঙ্কুল পরমার্থিক জ্ঞানস্বরূপ সমুদ্রপথে গুরু মস্ত বড় কাণ্ডারী। তিনি নৌকারূপ আধ্যাত্মিক উপদেশাদি সাহায্যে এই সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন। অপর পারে পৌঁছিয়া অর্থাৎ পরমার্থিক জ্ঞানশিক্ষা দিয়া পরে নৌকাটিতে প্রেমরূপ ছিদ্র করিয়া দিয়া ইহাকে অপর পারে অবস্থিত রাজা অর্থাৎ এই পার্থিব জগতে বিরাজমান শয়তানের ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া দিলেন। কারণ প্রেম-ভক্তিবিহীন কোন ব্যক্তিরই এই পার্থিব জগতে শয়তানের কবল হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় নাই। আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রথমেই চাই প্রেম ও ভক্তির সহিত গুরুর সদুপদেশ অনুসরণ করিয়া চলা। গুরুর দ্বিতীয় কার্য্য হইল, শিষ্যের কামনা-বাসনা বিনষ্ট করিয়া দেওয়া। যুবকটি কামনা-বসনার প্রতীক। কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ভক্ত আধ্যাত্মিক জীবনে ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিতে পারেন। তৃতীয় স্তরে ভক্ত সাধারণ লোকের উপকারই করিয়া যাইবেন, কিন্তু তাহাদের নিকট কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারিবেন না। খিজির স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ভগ্ন দেয়ালটির সংস্কার করিলেন— দেয়ালটি বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান বা শরি'য়ৎ-এর এবং পিতৃমাতৃহীন বালক দুইটি সাধুতার প্রতীক।

মহাত্মাগণ তাহাদের বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদি দ্বারা জনসাধারণকে অনাচার, লুণ্ঠন প্রভৃতি দুষ্কর্ম হইতে দূরে রাখিয়া শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন।

মৌলানা রূমীর 'মস্-নবী-ই-মন'বী' নামক আধ্যাত্মিক কবিতা হইতে সুফীতত্ত্বপূর্ণ একটি গল্পেরও উল্লেখ করা গেল। 'মস্-নবী-ই-মন'বী'কে অনেক সময় ফারসী ভাষায় কোরাণ বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং ইহা সুফীতত্ত্বের ব্যাখ্যানপূর্ণ একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহার প্রথম গল্পটির নাম 'রাজা ও সুন্দরী যুবতী'।—প্রাচীনকালে এক রাজা ছিলেন, যাঁহার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় শক্তিই করায়ত্ত ছিল। হঠাৎ এক দিন তিনি পাত্রমিত্রসহ শিকারে বাহির হইলেন, কিন্তু পথিমধ্যে একটি সুন্দরী যুবতীর প্রেমে পড়িলেন। যুবতীর প্রতি তাঁহার মন এত গভীরভাবে আকৃষ্ট হইল যে, তাহাকে তিনি রাজধানীতে লইয়া আসিলেন এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু শীঘ্রই যুবতীর একটি দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা দিল। অনেক চিকিৎসকই তাহার চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু যুবতী আরোগ্যলাভ করিলেন না। গত্যন্তর না দেখিয়া রাজা মস্জিদে গিয়া ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবান তাঁহার এই কাতরোক্তি শুনিতে পাইয়া স্বপ্নে তাহাকে জানাইলেন, "পরদিন প্রাতঃকালে যে চিকিৎসকের সঙ্গে তোমার প্রথম দেখা হইবে তাঁহাকে ভগবৎপ্রেরিত চিকিৎসক বলিয়া জানিবে"। নির্দ্দিষ্ট সময়ে দৈব-চিকিৎসক উপস্থিত হইলেন এবং রাজা তাহাকে সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। দৈব-চিকিৎসক নির্জ্জন গৃহে রোগিণীকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিলেন, এবং রাজাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, ইহা মনের রোগ; ঔষধাদিতে কোন কাজ হইবে না। এই যুবতী সমরখন্দের একজন স্বর্ণকারের প্রতি প্রণয়াসক্তা। সেই স্বর্ণকার যুবককে আনাইয়া রোগিণীর সহিত তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। চিকিৎসকের আদেশ অনুযায়ী স্বর্ণকারকে দূরদেশ হইতে আনয়ন করা হইল এবং যুবতীর সহিত পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করা হইল। শীঘ্রই যুবতী পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু কয়েকদিন পর ভগবৎ ইচ্ছানুযায়ীই সেই দৈব-চিকিৎসক পানের সহিত বিষপ্রয়োগে সেই স্বর্ণকারের প্রাণনাশের ব্যবস্থা করিলেন। সেই যুবতী প্রথমে হৃদয়ে বেশ একটু বেদনা অনুভব করিলেন। কিন্তু স্বর্ণকারের প্রতি তাহার আকর্ষণ কেবল মাত্র দৈহিক ছিল বলিয়া তিনি একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন না এবং পরে রাজার সহিত পুনরায় বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এই গল্পটিতে একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বনিহিত আছে। রাজাকে তুলনা করা হইয়াছে মনের সঙ্গে এবং এই দেহ তাহার রাজধানী। মন পার্থিব ও আধ্যাত্মিক এই উভয় শক্তিতেই শক্তিমান। অর্থাৎ সকল মানুষই দোষে গুণে জড়িত। রাজা একদিন শিকারে বাহির হইলেন অর্থাৎ ভগবৎ জ্ঞানলাভার্থে বহির্গত হইলেন। কিন্তু সেই পাত্র-মিত্র বা মনের সহচর অহঙ্কার, কাম প্রভৃতি রিপুর প্ররোচনায় পথিমধ্যে কামনা-বাসনায় জড়িত হইয়া ভোগাসক্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বেশীদিন ভোগ করিতে পারিলেন না। যুবতীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল—চিকিৎসকগণ হইলেন পার্থিব গুরুর প্রতীক। পার্থিব গুরুগণ, তাঁহাদের বুদ্ধি, মেধা ও চিন্তাশক্তিদ্বারা কেমন করিয়া মনের রোগ আরোগ্য করিতে পারিবেন? যখন রাজা (বা মন) দেখিলেন যে, এই সকল চিকিৎসকদ্বারা কোনই ফলোদয় হইতেছে

না, তখন তিনি ভগবানের প্রতি নির্ভরপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে সকল বিপদের কথা জানাইলেন। মানুষ যখন ভগবানকে আশ্রয় করে, তখন একটা উপায় খুঁজিয়া পাইবেই। ভগবানের প্রেরিত চিকিৎসকের অর্থাৎ আদর্শ গুরুর সাহায্যে তিনি জানিতে পারিলেন যে, কামনার বিকার উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং প্রথমে তিনি কামনার পার্থিব পরিতৃপ্তিলাভের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দৈব চিকিৎসক প্রথমই রাজার সকল অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু বাহ্যিক ভাবে রোগিণীকে পরীক্ষা করিলেন। সেই রূপ আদর্শগুরু প্রথম দৃষ্টিতেই শিষ্যের মনের সকল অবস্থা বুঝিতে পারেন, কিন্তু বাহ্যতঃ তাহা প্রকাশ করেন না। যুবতীর মন নীচ প্রবৃত্তিসমূহের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে—তিনি বাসনা সকল আরও চরিতার্থ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে বাসনাসমূহ চরিতার্থ করিবার পর, গুরু ভগবৎ আদেশানুযায়ী প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন—ইহাই হইল বর্ণকারের প্রাণনাশের তাৎপর্য্য। পরে দমিত কাম মনের সহিত একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া শান্তির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অধ্যাপক সাহার আধুনিক গবেষণা

শ্রীপিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের বিদগ্ধ সমাজে ও জগতের বৈজ্ঞানিক মহলে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা অপরিচিত নন। নামের সঙ্গে পরিচিত হলেও তাঁর গবেষণার জটিল তথ্য অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের মধ্যে অতি অল্প লোকেই জানেন এবং সেই তথ্য সাধারণ মানুষের সহজবোধ্য করে পরিবেশন করাও দুষ্কর। এক কথায় বলা যেতে পারে, সৌরলোকে পরমাণুদের ভাঙা-গড়ার ব্যাখ্যা নিয়েই হ'ল অধ্যাপক সাহার আধুনিক গবেষণা। সম্প্রতি দু'জন চৈনিক বিজ্ঞানীর পরীক্ষামূলক গবেষণার ফলে অধ্যাপক সাহার গবেষণার মূলতত্ত্ব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। অনেকে মনে করেন, অধ্যাপক সাহার গবেষণাকে বিজ্ঞানীরা যদি মানুষের কাজে লাগাতে পারেন তা হলে বর্তমানের পরমাণু বোমার চেয়ে বহু গুণ শক্তিশালী মারণাস্ত্র তৈরি করা সম্ভব হবে।

সূর্য্যের 'বর্ণচ্ছটা-মণ্ডল' ও কিরীটিকায় (করোনা) কয়েকটি মৌলের বিশেষ বর্ণালী-রেখার বা স্পেকট্রাম লাইন উদ্ভবের ব্যাখ্যা অধ্যাপক সাহা তাঁর আধুনিক গবেষণায় করেছেন। গ্যাসদেহী সূর্য্যকে মোটামুটি ভাবে চারটি মণ্ডলে ভাগ করা যায়। সূর্য্যের অন্তরতম মণ্ডলকে বলা হয় আলোকমণ্ডল বা ফটোস্ফিয়ার। সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলে গ্যাসের ঘনিমা (density) ও তাপের উষ্ণতা সবচেয়ে বেশী এবং সূর্য্যের প্রায় সমস্ত আলোক-তাপই আলোকমণ্ডল থেকে বিকীর্ণ হয়। আলোকমণ্ডলের ঠিক বাহিরের স্তরটিকে বলা হয় 'রেখা-হর' বা 'বর্ণ-হর' মণ্ডল ('রিভার্সিং লেয়ার'), কারণ এই মণ্ডল অতিক্রম করবার সময় সূর্য্যের সপ্ত-বর্ণী আলোর বিভিন্ন বর্ণের বিশেষ বিশেষ তরঙ্গমাত্রার আলো শোষিত হয়ে যায় ও তার ফলে সৌর-বর্ণালীতে ফ্রানহোফার (Fraunhofer) আবিষ্কৃত কালো রেখাগুলির উদ্ভব হয়। বর্ণ-হর মণ্ডলে গ্যাসের ঘনিমা ও তাপের উষ্ণতা, আলোকমণ্ডলের গ্যাসের ঘনিমা ও তাপের উষ্ণতার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম। রেখা-হর-মণ্ডলের বাইরের অংশটিকে বলা হয় বর্ণচ্ছটা-মণ্ডল ('ক্রোমোস্ফিয়ার')। বর্ণচ্ছটা-মণ্ডল হ'ল সৌর-আবহের সূক্ষ্ম স্তর। এখানে গ্যাসপুঞ্জে নিয়তই প্রচণ্ড আলোড়ন চলে এবং আলোড়িত গ্যাসপুঞ্জের বহুবিচিত্র রক্তশিখা এখান থেকে সূর্য্যের চক্রসীমা ছাড়িয়ে বহু যোজন দূরে ছিটকে পড়ে। বর্ণচ্ছটা-মণ্ডলে তাপের উষ্ণতা ও গ্যাসের ঘনিমা বর্ণ-হর মণ্ডলের চেয়েও কম এবং বর্ণচ্ছটা মণ্ডল থেকে ছিটকে

পড়া গ্যাসের শিখায় অন্যান্য মৌলের পরমাণুর চেয়েও হিলিয়ম, হাইড্রোজেন ক্যালসিয়মের আয়নিত ('আইওনাইজড') পরমাণুর আধিক্য সবচেয়ে বেশী।

অধ্যাপক সাহার মতে সূর্য্যের অন্তরতম প্রদেশ থেকে আলো ও তাপ-রূপে বিকীর্ণ তেজের কণা-ধর্ম্মী "কণিমার' ('ফোটন') সঙ্গে বর্ণচ্ছটা মণ্ডলে গ্যাসের পরমাণুগুলির নিয়তই 'অভিঘাত' চলেছে এবং তেজ-কণিমার সঙ্গে অবিরাম অভিঘাতের চাপে হাইড্রোজেন, হিলিয়মের মত হাল্কা ওজনের মৌলের পরমাণুগুলি প্রতিক্ষিপ্ত (রিকয়েলড) হয় সবচেয়ে বেশী, সৌর মহাকর্ষের টান কাটিয়ে সবচেয়ে দূরে ছিটকে পড়ে। প্রতিক্ষিপ্ত পরমাণুগুলি সূর্য্যের মহাকর্ষের টানে যখনই বর্ণচ্ছটা মণ্ডলে ফিরতে চাইবে তখনই আলো, তাপের কণিমার সঙ্গে ঠোকাঠুকির চাপ আবার তাদের বাইরে ঠেলে দেবে। এই ভাবে গ্যাসের শিখার ফুৎকার সূর্য্যের বর্ণচ্ছটা মণ্ডলে আলোড়িত হয়। ছোট ছেলে যেমন এক টুকরো পালক বা তুলোর আঁশকে ফুঁ দিয়ে মাটিতে পড়তে না দিয়ে হাওয়ায় নাচিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায় অনেকটা সেই ধরণেই তেজের কণিমাগুলি বর্ণচ্ছটা মণ্ডলে পরমাণুগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ক্যালসিয়ামের (পথমাল) ইলেকট্রন খোয়ানো, আয়নিত (আইওনাইজড) পরমাণুগুলি তাদের প্রায় সমভার, মাঝারি ওজনের অন্যান্য মৌলের পরমাণুগুলির চেয়ে একটি বিশেষ তরঙ্গ-মাত্রার আলো অধিক মাত্রায় শোষণ করতে পটু হয়ে ওঠে। অধ্যাপক সাহার মতে অন্যান্য মাঝারি ওজনের পরমাণুযুক্ত মৌলদের চেয়ে আয়নিত ক্যালসিয়ম পরমাণুগুলির ওপরেই বিকিরণের চাপ (রেডিয়েশন প্রেসার) তাই বেশী প্রকট হয় এবং তার ফলে অন্যান্য মৌলগুলির চেয়ে বর্ণচ্ছটা মণ্ডলের শিখা-ছটায় (প্রমিনেনসেস্) ক্যালসিয়ম বহু দূরে বিক্ষিপ্ত হয়। ক্যালসিয়মের প্রাচুর্য বেশী বলে সূর্য্যের শিখা-ছটার রঙ প্রায় সব ক্ষেত্রেই হয় জবাকুসুমসঙ্কাশং রক্ত-লোহিত।

বর্ণচ্ছটা মণ্ডলের আলোর বর্ণলিপিতে আয়নিত ক্যালসিয়ম পরমাণুর বৈশিষ্ট্যসূচক রেখা ছাড়া যথাক্রমে একটি ও দুটি ইলেকট্রন খোয়ানো উত্তেজিত (একসাইটেড) হিলিয়ম পরমাণুর বৈশিষ্ট্যসূচক রেখাও পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা এতদিন পর্য্যন্ত সেগুলির উদ্ভবের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। অধ্যাপক সাহার আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী এর ব্যাখ্যা হ'ল নিম্নোক্তরূপ—সূর্য্যের আলোকমণ্ডলের মধ্যে বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলির কেন্দ্রের যে ভাঙাগড়া চলে তার ফলে প্রচুর পরিমাণে শক্তি ছাড়া পায় এবং তৈরি হয় দুটি ইলেকট্রন খোয়ানো হিলিয়ম পরমাণু অর্থাৎ আল্‌ফা-কণা (আল্‌ফা-

। শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও
াঙ্গলাদেশে নিষ্প্রয়োজন। আজকাল
'শ্রী' ঘৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক
যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার
যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা

স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

পার্টিকেল)। পরমাণুগুলির কেন্দ্রের ভাঙনজাত ইলেকট্রন খোয়ানো উত্তেজিত হিলিয়ম পরমাণুগুলি অন্যান্য পরমাণুগুলির অভিঘাতের ফলে তাদের উত্তেজিত অবস্থার অনেকখানি শক্তি অপচিত করে প্রথমে একটি ও তারপর দুটি ছাড়া-পাওয়া ইলেট্রন পাকড়াও করে। এই দুটি মুক্ত ইলেকট্রন সংগ্রহ করবার সময় উত্তেজিত অবস্থার হিলিয়ম পরমাণুগুলি যে বর্ণলিপি পাঠায় তারই ফলে পূর্ব্বোক্ত রেখা দুটির উদ্ভব হয়।

সূর্য্যের বহির্মণ্ডলের নাম হ'ল সৌর কিরীটিকা বা কিরীটিকা-মণ্ডল (সোলার-করোনা)। বহু লক্ষ যোজন জুড়ে এর বিস্তার এবং সূর্য্যের অন্য তিনটি মণ্ডলের তুলনায় এখানে গ্যাসের ঘনিমা ও তাপের উষ্ণতা সবচেয়ে কম। সৌর-কিরীটিকা জলদবাষ্পের অণু, পরমাণু ও আয়নিত পরমাণু-কণার ভিড়ে ভর্ত্তি এবং এর স্বাভাবিক দীপ্তি প্রায় পূর্ণচন্দ্রের দীপ্তির সমান। সূর্য্যের আলোকমণ্ডলের প্রচণ্ড দীপ্তির জন্য সাধারণ দূরবীনের দৃষ্টিতে আলোক-মণ্ডল ছাড়া তার অন্যান্য মণ্ডলগুলিকে দেখা যায় না। সাধারণ দূরবীন দিয়ে সূর্য্যের বর্ণচ্ছটা মণ্ডল ও সৌর কিরীটিকা দেখতে হলে পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কিরীটিকা থেকে বিকীর্ণ আলোর বর্ণলিপির প্রথম পঠোদ্ধারের সময় বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে, সূর্য্যের সপ্তবর্ণ আলোকের একটানা বর্ণালীর (কন্টিনিউয়াস্ স্পেকট্রাম) বদলে কয়েকটি বিশেষ তরঙ্গমাত্রার আলোকের উজ্জ্বল রেখা কিরীটিকার বর্ণালীতে (স্পেকট্রাম) ফুটে উঠেছে। বিজ্ঞানীরা এই নবাবিষ্কৃত রেখাগুলিকে তাঁদের জানা ও এতাবৎ আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থগুলির বৈশিষ্ট্যসূচক রেখাগুলির সঙ্গে তখন মেলাতে পারেন নি এবং মেলাতে না পেরে রেখাগুলিকে কিরীটিকা মণ্ডলের একটি অজানা মৌলের বৈশিষ্ট্যসূচক বলে মনে করেন আর সেই অজানা মৌলটির নাম রাখেন করোনিয়াম বা মুকুটিকা মৌল। এর পর ১৯৪২ সালে সুইডেনের লুণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী বেঙ্গট এড্‌লেনের (Bengt Edlen) গবেষণার ফলে জানা যায়, কিরীটিকার বর্ণলিপিতে (স্পেকট্রাম) আবিষ্কৃত উজ্জ্বল রেখাগুলি লোহা, নিকেল, ক্যালসিয়ম ও আরগণ—এই চারিটি মাঝারি ওজনের মৌলদের ইলেকট্রন খোয়ানো পরমাণুগুলিরই বর্ণলিপির বৈশিষ্ট্যসূচক এবং মুকুটিকা (করোনিয়ম) বলে কোন নূতন অজানা মৌলের নয়। তাঁর মতে মুকুটিকা বলে কোনও মৌল সৌর-কিরীটিকায় থাকতে পারে না—মুকুটিকার অস্তিত্ব কাল্পনিক। লোহা, নিকেল, আরগন ও ক্যালসিয়ামের ইলেকট্রন খোয়ানো উত্তেজিত পরমাণুগুলি মাত্র বিশেষ অস্থায়ী অবস্থায় (মেটাষ্টেবল ষ্টেট) কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গমাত্রা আলো করার জন্যই কিরীটিকার বর্ণলিপিতে আবিষ্কৃত রেখাগুলির উদ্ভব হয়। সৌর কিরীটিকার বর্ণালীতে যথাক্রমে দশটি, এগারটি, তেরটি, চৌদ্দটি ও পনেরটি ইলেকট্রন খোয়ানো লোহার পরমাণুর, বারোটি, তেরটি ও পনেরটি ইলেকট্রন খোয়ানো ক্যালসিয়ম পরমাণুর এবং দশটি ও চৌদ্দটি ইলেকট্রন খোয়ানো আরগন পরমাণুর বৈশিষ্টাসূচক মোট চৌদ্দটি উজ্জ্বল রেখার সন্ধান বর্ত্তমানে পাওয়া গেছে। বেগুনী পারের আলো থেকে সুরু করে লাল-উজানী আলো পর্য্যন্ত প্রায় সকল বর্ণের আলোর এলাকায় এই রেখাগুলির তরঙ্গমাত্রা ছড়িয়ে আছে। এখন প্রশ্ন হ'ল হাইড্রোজেন, হিলিয়ম পরমাণুগুলির চেয়ে বহু গুণ ভারী লোহা, নিকেল, ক্যালসিয়ম ও আরগনের পরমাণুগুলি কোন প্রচণ্ড শক্তির ধাক্কায় এতগুলো করে ইলেকট্রন খোয়ানো এবং সূর্য্যের অন্তরতম মণ্ডলের সীমা ছাড়িয়ে মহাকর্ষের প্রচণ্ড টান এড়িয়ে কয়েক লক্ষ মাইল উঁচুতে উঠল, কিরীটিকায় দেখা দিল, এবং আপনাদের বৈশিষ্ট্যসূচক বর্ণলিপির উজ্জ্বল রেখাগুলি উত্তেজিত হয়ে বিকিরণ করতে লাগল। শুধু তেজ-কণিকাদের ধাক্কায় এত শক্তি তাদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব। এই প্রচণ্ড শক্তির উৎস কোথায়?

তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণায় অধ্যাপক সাহা এই প্রশ্নের মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক সাহার সিদ্ধান্ত অনুসারে সূর্য্যের আলোকমণ্ডলের সীমান্তে ইউরেনিয়ম পরমাণু নূট্রন অভিঘাতে (নূট্রন-বোম্বার্ডমেণ্ট) চার ভাগে ভেঙে যাচ্ছে এবং এই ভাঙনের ফলে তৈরি হচ্ছে লোহা, নিকেল, ক্যালসিয়ম ও আরগনের ইলেকট্রন খোয়ানো পরমাণু আর সেই সঙ্গে ছাড়া পাচ্ছে অপরিমেয় শক্তি। আধুনিক পরমাণু-বোমায় ইউরেনিয়ম পরমাণু মাত্র দু'ভাগে ভাঙা যায়। কাজেই অধ্যাপক সাহার প্রকল্প অনুযায়ী সৌরলোকে

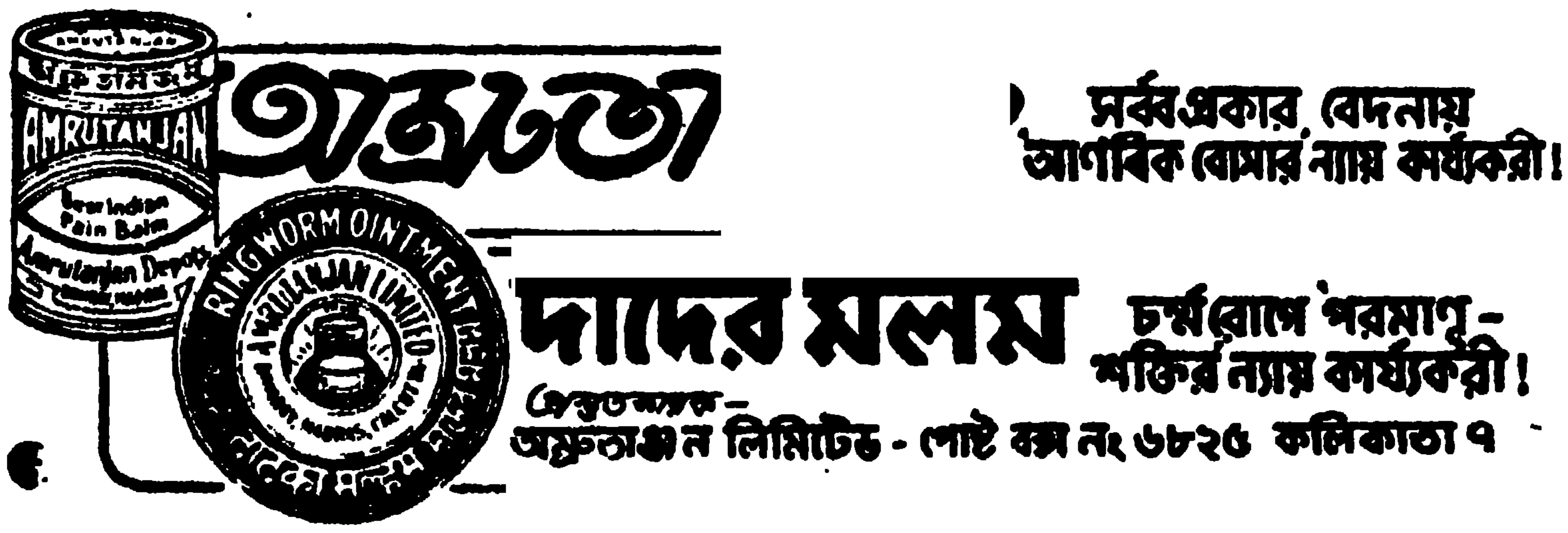

ইউরেনিয়মের ভাঙনের শক্তি পরমাণু-বোমার চেয়ে কত বেশী সেটা সহজেই অনুমেয়। ইউরেনিয়ম পরমাণু চার ভাগে ভাঙার পর যে অমিত শক্তি ছাড়া পায় তারই অভিঘাতে লোহা, নিকেল, ক্যালসিয়ম ও আরগন এই চারটি মৌলের প্রত্যেকটিরই পরমাণু চৌদ্দ থেকে ষোলটি পর্য্যন্ত ইলেকট্রন খুইয়ে উত্তেজিত হয়, সৌর মহাকর্ষের টান এড়িয়ে প্রচণ্ড বেগে আলোক-মণ্ডলের কয়েক লক্ষ মাইল উপরে কিরীটিকায় ওঠে। সেখানে মৌলগুলির ইলেকট্রন খোয়ানো পরমাণুগুলি ধীরে ধীরে তাদের খোয়ানো ইলেকট্রনগুলিকে পাকড়াও করতে সুরু করে এবং এই আয়নিত অস্থায়ী অবস্থার উত্তেজনার তেজ ছেড়ে দিয়ে তার বৈশিষ্ট্যসূচক তরঙ্গ-মাত্রার আলো বিকিরণ করে বর্ণলিপিতে আপন অস্তিত্বের সন্ধান দেয়। অধ্যাপক সাহার গবেষণা বহু বিরুদ্ধ সমালোচনার নিরসন করে কিরীটিকার বর্ণালীর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করেছে এবং কিরীটিকার বহির্মণ্ডলের গঠন ও বৈশিষ্ট্যের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। অধ্যাপক সাহার মতে দ্রুত-নির্গামী (র‍্যাপিড্‌লি-এস্‌কেপি'র) অতি বেগবান (হাই-স্পীড) ইলেকট্রনগুলির মেঘ দিয়ে কিরীটিকার বহির্মণ্ডলটি তৈরি হয়েছে এবং বর্ণচ্ছটা মণ্ডলের উপরের স্তরে লোহা ও নিকেলের বেশী ইলেকট্রন খোয়ানো পরমাণুদের সঙ্গে সৌর মণ্ডলের অন্যান্য মৌলগুলির পরমাণুর সংঘর্ষ ঘটার ফলেই এই অতি বেগবান ইলেকট্রনগুলি ছাড়া পায়।

হাল আমলের খবর হ'ল—চীনা বিজ্ঞানী ইং-সিয়েন-সান-সিয়াংগ (Tsien-San-Tsiang) এবং তাঁর পত্নী শ্রীযুক্তা হো-জাহ্‌-উই (Ho-zah-Wei) বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী জোলিও কুরীর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে, ইনিস্‌টিটিউট অফ্‌ ন্যুক্লিয়ার গবেষণাগারেই রাসায়ণিক উরেনিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রের ত্রি এবং চতুর্-ভাজনের (tri and quadri fission) অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন। এই চীনা বৈজ্ঞানিক-দম্পতির গবেষণার ফলে অধ্যাপক সাহার সৌরকিরীটিকা সংক্রান্ত আধুনিক সিদ্ধান্ত সত্য বলে সমর্থিত হওয়ায় বিজ্ঞানীমহলে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছে।

মায়ের কর্তব্য

শিশুপালনের সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন শিশুদের দৈহিক সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি$_{১}$, বি$_{২}$র সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দন্তোদ্গমের সময়, সেবন করান উচিত।

বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী:—শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্ণতা, দুধ তোলা পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, রুগ্নতা, ব্রঙ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি।

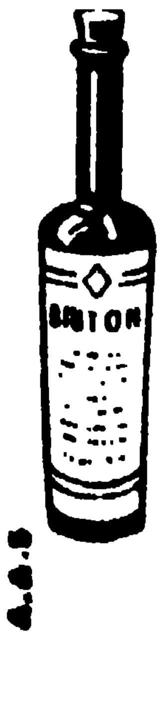

শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য

বিবটন

একটি পূর্ণাঙ্গ টনিক

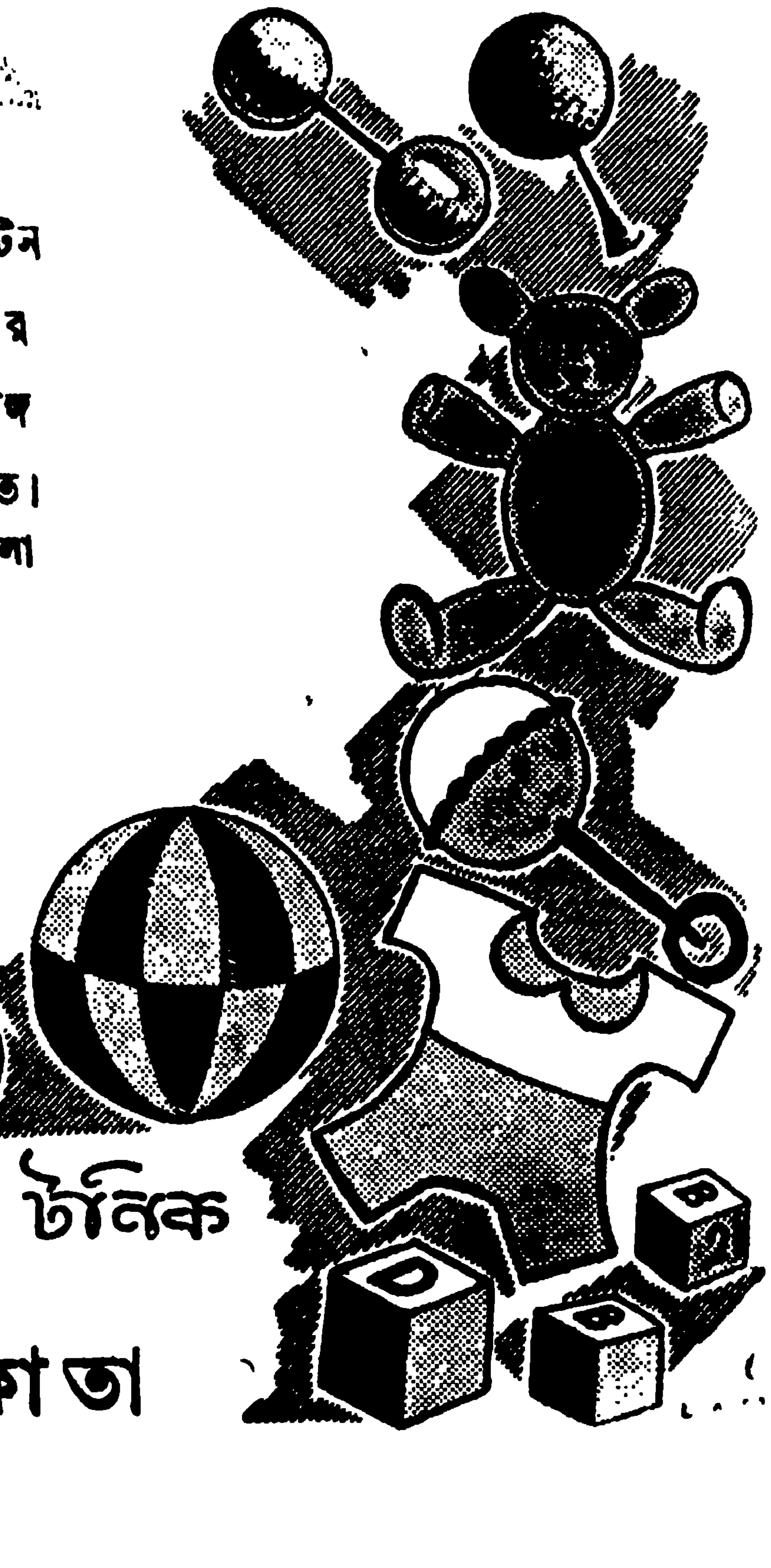

লিষ্টার এন্টিসেপটিকস্ • কলিকাতা

পুস্তক-পরিচয়

দিল্লীশ্বরী (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

গ্রন্থকার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম মহারথী। তিনি আচার্য্য যদুনাথের প্রবীণতম শিষ্য। ইতিহাসকে সরস প্রাণস্পর্শী সাহিত্যের রূপ দান করিতে ব্রজেন্দ্রবাবু সিদ্ধহস্ত, তাঁহার প্রণীত 'বেগম সমরু', 'জহান্-আরা' 'মোগল-বিদুষী' একাধারে উত্তম সাহিত্য অথচ নিখুঁৎ ইতিহাস। বর্ত্তমান পুস্তক 'দিল্লীশ্বরী'-র প্রথম সংস্করণ ১৩৩০ সালে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার "নিবেদনে" তিনি লিখিয়াছিলেন—"যাহাতে ইতিহাসের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, সেইজন্য ইতিহাসের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়াও রচনা যথাসম্ভব সরস করিবার চেষ্টা করিয়াছি।" বলা বাহুল্য, ব্রজেন্দ্রবাবুর এই দুরূহ প্রয়াস সফল হইয়াছে।

'দিল্লীশ্বরী' পুস্তক সুলতানা রজিয়ৎ এবং সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ঐতিহাসিক চিত্র—সুগম্য এবং সুনিপুণ, অথচ সরস ও সুপাঠ্য। রজিয়ৎ সত্যই সাহস, কূটনীতি এবং শাসনদক্ষতায় আলতামাশের সন্তানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু যুগধর্ম্ম ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল তাঁহার প্রতিকূল।

ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, কর্ণাল জেলার কইথাল নামক স্থানে সম্রাজ্ঞী রজিয়ৎ "তৃণতলে চিরসমাধি" লাভ করিয়াছেন। এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। কইথালে তিনি নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু উহার পরে ঐ শবদেহের কি গতি হইল ইতিহাসে লেখা নাই। অতি-বড় দুশমন্ হইলেও আলতামাশের পুত্রগণ ভগ্নীর মৃতদেহ ঐ স্থানেই ফেলিয়া আসিয়াছিল কিংবা মাটি চাপা দিয়াছিল অনুমান করা যায় না। বর্ত্তমানে পুরানা অর্থাৎ শাহজাহানের দিল্লী শহরের "তুর্কমান দরওয়াজা"-র কাছে ভদ্র ব্যক্তি—বিশেষতঃ হিন্দুর পক্ষে অগম্য এক মহল্লায় একটি সাধারণ মক্‌বরা আছে, উপরে ছাদ নাই। এইখানে দুইটি কবর আছে, স্যর সৈয়দ্ আহমদ তাঁহার 'আসার উস-সনাদিদ' নামক পুরাবৃত্ত-গ্রন্থে এইগুলিকে আলতুনিয়া ও রজিয়ৎ-এর সমাধি লিখিয়াছেন; বোধ হয় জনশ্রুতিই প্রমাণ। আমি একবার মুসলমানের ছদ্মবেশে মহল্লার ছেলেদের মধ্যে কয়েকটি দুয়ানি বিতরণ করিয়া সম্রাজ্ঞীর কবরে "জিয়ারত" করিতে গিয়াছিলাম। রজিয়ৎকে যাহারা সোনা-জহরতের লোভে খুন করিয়াছিল তাহারা জাট-চাষা, ইতিহাসে অবশ্য লেখা আছে "হিন্দু-জমিদার"—যাহা ব্রজেন্দ্রবাবু ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় "হিন্দু-জমিদার" পদবী এক বিশিষ্ট অভিজাত-শ্রেণীর পক্ষে প্রযোজ্য। দিল্লী কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে কৃষক নিজেকে কাশ্‌তকার বলিয়া পরিচয় দেয় না, বুক ফুলাইয়া বলে "জিমীদার", ধর্‌তী-কা মালিক; ফার্সীতে কৃষক অর্থে এই হিন্দুস্থানী শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। চষা ক্ষেতের পাশে নিদ্রিত স্ত্রীলোককে চাষা ব্যতীত আর কেহ খুন করিতে পারে না—"হিন্দু কৃষক" বলিলে সব দিক রক্ষা হয়।

'দিল্লীশ্বরী' পুস্তকের দ্বিতীয় চরিত্র "নূরজহান্" (পৃ ৪৩ হইতে ৯০)। সুন্দরী নূরজহানের ঐতিহাসিক পরিচয় অনাবশ্যক। তাঁহার জীবন-চরিত এত সংক্ষেপে অথচ সুষ্ঠুভাবে লেখা কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ব্রজেন্দ্র বাবুর 'দিল্লীশ্বরী' শুধু ছেলেরা নয়, ছেলেদের অভিভাবকেরাও পড়িবেন, পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবেন। শুধু বাংলা ভাষা নয়, ইংরেজীতেও নূরজহানের এইরূপ স্বয়ং-সম্পূর্ণ কাহিনী এবং চরিত্র-সমালোচনা লিপিবদ্ধ হয় নাই।

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

নমামি—শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী। প্রকাশক—বিমলারঞ্জন চন্দ্র; খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। ৭৮ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তিকায় বাংলার বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী যুগের এমন কয়েকটি চিত্র আঁকা হইয়াছে, যাহা ঐ যুগের মাহাত্ম্যকে আমাদের চোখের উপর নূতন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে। গল্পচ্ছলে কয়েকজন বিপ্লবী-প্রধানের কার্য্য-কলাপ বর্ণনা করিয়া লেখক তাঁহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও সময়কে পাঠকবর্গের নিকট জীবন্ত করিয়াছেন; আমরা সেই যুগের বিপ্লবীদের মনোভাবের যে পরিচয় পাই, বলার কৌশলে তাহা যে-কোন দেশের পক্ষে শ্লাঘনীয়।

প্রথম বর্ণনাটি "মহারাজ" নামে পরিচিত শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জীবনের ঘটনা-সংশ্লিষ্ট; তিনি নৌকার মাঝিরূপে, কালীচরণ নমামি (নমঃশূদ্র) রূপে—"ছোট জাত"-রূপে, বাঙালীর স্মৃতিতে অমর হইয়া থাকিবেন। "স্বদেশী" ডাকাতির প্রয়োজনে তাঁহাকে এই নূতন বৃত্তিতে হাত পাকাইতে হইয়াছিল, চলাফেরা কথাবার্ত্তায় তিনি "নমামি" হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এমন করিয়া ইংরেজের চক্ষে অনেক সময় ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিতেন।

প্রত্যেকটি বর্ণনা এক এক জন বাঙালী, অবাঙালী বিপ্লবীর জীবন-কথার উপর আলোকপাত করে। বীরভূম জিলার দুকড়িবালা "মাসী"র আত্মভোলা কার্য্য কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে; সেই যুগের মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজের প্রায় প্রতি ঘরে এরূপ মা, মাসী, দিদি, ঠাকুরমা, দিদিমা, এবং পত্নী বিরাজ না করিলে বিপ্লবী আন্দোলন ত্রিশ বৎসর টিকিয়া থাকিত না। গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জানাইতেছি—তিনি সেই যুগের হিন্দু বাঙালীর চিন্তা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার একাংশের ছবি বর্ত্তমান যুগের পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার ভাণ্ডার শূন্য হয় নাই; আমরা তাহা হইতে আরও দানের প্রতীক্ষায় থাকিব।

মফঃস্বলে বসিয়া কলিকাতার দরে বই কিনুন

বিভিন্ন দেশী ও বিলাতী প্রকাশকের নাটক, নভেল, ধর্ম্মগ্রন্থ, জ্যোতিষশাস্ত্র, রাজনীতি, ইতিহাস, সঙ্গীত ও কলাবিদ্যা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, চিকিৎসা, মনস্তত্ত্ব ও সম্মোহন বিজ্ঞান, অনুবাদ ও সমালোচনা সাহিত্য, স্কুল ও কলেজের ও ছেলেমেয়েদের ও বিবাহের উপহারের জন্য নানাবিধ ভাল ভাল পুস্তক আমরা কলিকাতার দরে সত্বর ভিঃ পিঃতে সরবরাহ করি। প্রতি অর্ডারের সহিত পুস্তকের আনুমাণিক মূল্যের অর্দ্ধাংশ পাঠাইলেই সমস্ত পুস্তক ডাকে যাইবে। ডাকমাশুল, প্যাকিং ও বিক্রয়কর স্বতন্ত্র।

আমাদের প্রকাশিত Guide to Bengalee Books (Catalogue) একখণ্ড সংগ্রহ করুন। ইহাতে নানাবিধ পুস্তকের বিস্তৃত সন্ধান পাইবেন। মূল্য ।০ আনা। ডাকব্যয় সহ ।/০, রেজিষ্টারীডাকে লইতে গেলে রেজেষ্টারী খরচা স্বতন্ত্র। সামান্য কিছু কপি অবশিষ্ট আছে।

কুণ্ডু পাব্লিসিটি সোসাইটী অব ইণ্ডিয়া

১৪৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

রাজনারায়ণ বসু—শ্রীশৈলেন্দ্র সিংহ ও শ্রীমিহিরবরণ সিংহ, ওরিয়েণ্ট বুক কোং, ৯নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৬২ পৃষ্ঠা। মূল্য বার আনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীশৈলেশ বসু। ওরিয়েণ্ট বুক কোং, ৭৫ পৃষ্ঠা। মূল্য বার আনা।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষ। ওরিয়েণ্ট বুক কোং। ৭৫ পৃষ্ঠা। মূল্য বার আনা।

শহীদ যুগল—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়। বি, সিংহ ব্রাদার্স, ৩৮নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ২৫২। মূল্য দুই টাকা বার আনা।

মহামানব—শ্রীশৈলেশ বসু। ওরিয়েণ্ট বুক কোং। ৯নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৮৮ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

এই পাঁচখানি বইয়ে ভারতবর্ষের এক শত বৎসরের ইতিহাসের পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, পাঁচ জন বাঙালী ও একজন গুজরাটীর জীবনের ঘটনা আশ্রয় করিয়া। রাজনারায়ণ বসু হইতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী পর্য্যন্ত বহু জনের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনিয়াছে। তার পূর্ব্বকথা রাজনারায়ণ বসুর জীবন-চরিতেই পাওয়া যাইবে—রামমোহন রায় হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-কথার বর্ণনার মধ্যে।

যদিও পুস্তক কয়খানি বালক-বালিকার জন্য লিখিত, তথাপি তাহাদের পূর্ব্বজগণও ইহা পাঠ করিয়া জ্ঞান এবং আনন্দ লাভ করিবেন। ইংরেজী শিক্ষা আমাদের মধ্যে একটা মোহের সৃষ্টি করে; ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্বের উপর বিশ্বাস আমাদের মনে শিকড় গাড়িয়া বসে, আমাদের জাতীয় হীনতা আমরা স্বীকার করিয়া লই। রাজনারায়ণ বসু সেই "Young Bengal", 'Young Bombay"—"যুবক বাঙালী", "যুবক বোম্বাইয়ের" নেতৃস্থানীয় ছিলেন। কিন্তু বিশ বৎসর যাইতে না যাইতেই এই শ্রেণীর মধ্য হইতেই "বিদ্রোহী" দলের উদ্ভব হইল, যাদের কার্য্যের পরিণতি দেখিলাম ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে।

প্রথম তিনখানি বইয়ে এই বিদ্রোহের ভাব-নায়ক, কবি, ও চিন্তা-নায়কের জীবন-কথা বর্ণিত হইয়াছে; তৃতীয় পুস্তকখানি সন্ত্রাসবাদী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকির জীবনের তিনটি বৎসরের কীর্ত্তি-কথায় পূর্ণ। অল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন ক্ষুদিরাম জীবনের সব দুঃখ আস্বাদ করিয়া হইয়াছিল "নীলকণ্ঠ"; প্রফুল্ল চাকির মধ্যে দেখিতে পাই রুদ্রের বহিঃপ্রকাশ। এই দুই জনের জীবনে জাতীয়তাবাদের যে আবেগ বাঙালী-সমাজের বুক হইতে ফুটিয়া উঠে, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছিল ১৮৯৭ খ্রীঃ মহারাষ্ট্রের দামোদর চাপেকারের মত যুবককে অবলম্বন করিয়া। বাংলাদেশ হইতে তাহা দিকে দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

এই "বিদ্রোহের" পিছনে যে সমাজ-মন সক্রিয় হইয়া উঠিতেছিল, তার জমি আবাদ করিয়াছিলেন রাজনারায়ণ বসু-প্রমুখ মনীষীবৃন্দ, তাহাতে ত্যাগ ও কর্ম্মসাধনার ফসল ফলাইয়াছিলেন "মহামানব" উপাধিতে ভূষিত নরপুঙ্গব। তাঁহার জীবন্ত উদাহরণে দেশের গণ-মনে যে ভাব-গঙ্গার আবির্ভাব হয়, তার বুকে আমাদের জাতীয় তরণী নানা বাধা অতিক্রম করিয়া রাষ্ট্রীয় মুক্তির ঘাটে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু যাত্রা তার শেষ হয় নাই। এই পাঁচখানি পুস্তকে বর্ণিত ভাব ও কর্ম্মের প্রয়োজন এখনও আছে। তাহা নানা লোকের দেহ মন আশ্রয় করিয়া নব রূপ পরিগ্রহ করিবে। সেইজন্য তৎসম্বন্ধে জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হইবে। এই পুস্তক কয়খানির প্রকাশকবৃন্দ আমাদের দেশের ভাবী সংগঠকমণ্ডলী মধ্যে জ্ঞানবিস্তারে সাহায্য করিয়া এক বিশেষ অভাব মোচনে অগ্রণী হইয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ। অনেক অপ্রকাশিত ছবি সন্নিবিষ্ট হওয়াতে বইগুলির সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে।

এত প্রশংসার মধ্যে একটি অপ্রশংসার কথা না বলিয়া পারিলাম না। এরূপ পুস্তকে মুদ্রাকর-প্রমাদ বলিয়া পরিচিত ত্রুটির বাহুল্য বাঞ্ছনীয় নয়। বানানে ভুলও অনেক আছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

মার্ক্সবাদ—হুমায়ুন কবির। গুপ্ত রহমান এণ্ড গুপ্ত। ৫৭।১৩, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১০৭, মূল্য ২৷৷০।

ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "মার্ক্সবাদকে জানতে এবং বুঝতে হলে তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই। কিন্তু যেন তার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত বা বক্তব্যকে ধ্রুব সত্য মনে করবার মতন মোহে পরিণত না হয়।" মার্ক্সবাদ আলোচনায় গ্রন্থকার এই শ্রদ্ধা সর্ব্বত্র বজায় রাখিয়াছেন এবং তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের মতামত বিশ্লেষণ করিয়া মার্ক্সবাদের মর্ম্ম বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মার্ক্সীয় দর্শন, ঐতিহাসিক জড়বাদ, ধনতন্ত্র ও শ্রেণীসংগ্রাম এবং শ্রমিকরাজ ও সাম্য-বাদ এই চারিটি অধ্যায়ে বর্ত্তমান পুস্তক সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে মার্ক্সবাদের দার্শনিকতা কোথায় ও কেন তাহা হেগেলের বিজ্ঞানবাদ হইতে পৃথক পথে গিয়াছে তাহাই দেখানো হইয়াছে। সোজা কথায় হেগেলের শেষ সিদ্ধান্ত মার্ক্সের দার্শনিক বিচারের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা। হাজার বৎসরের ইউরোপীয় বিজ্ঞানবাদী দর্শনের পরিণতি ঘটিয়াছে হেগেলীয় দর্শনে আর তাহার মোড় ফিরিয়াছে কার্ল মার্ক্সের বিপ্লবী চিন্তায়। ঐতিহাসিক জড়বাদও এ চিন্তাধারার পরিণতি মাত্র। মার্ক্সবাদীর মতে বাস্তবের ভিত্তি জড় পদার্থ। সমাজ প্রকৃতির অংশ। প্রচলিত উৎপাদন-বিধি মানুষের সামাজিক, ঐতিহাসিক সত্তা নির্দ্ধারিত করে, এই মানুষই সমস্ত কল্পনা ও ধারণার স্রষ্টা। সুতরাং পরোক্ষে উৎপাদন-বিধিই সমস্ত দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের ভিত্তি। যান্ত্রিক জড়বাদ ও কাল্পনিক বিজ্ঞানবাদ হইতে ঐতিহাসিক জড়বাদ শ্রেষ্ঠ—এ বিষয়ে মার্ক্সের মনে কোন সন্দেহ নাই। এই নূতন দর্শনে শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণী-সংগ্রামের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। মার্ক্সীয় দর্শনের অপর বিশেষত্ব ধনতন্ত্রের বিশ্লেষণ। এই দর্শনের মতে—সমস্ত কিছুই আপেক্ষিক হইলেও শ্রমমূল্যের সূত্র শাশ্বত। ধনিকের 'অতিরিক্ত মুনাফার' উপরে খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। ধনতন্ত্রের উৎপাদন সামাজিক প্রয়োজন বা কল্যাণে নহে, লাভের তাগিদে। এজন্য অতিবৃদ্ধি ও অতিহ্রাসের মধ্য দিয়া এই উৎপাদন অর্থনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি করে। টাকা-পয়সাকে মূলধন বা পুঁজি হিসাবে ব্যবহার ধনতন্ত্রের অপর বৈশিষ্ট্য। এজন্যই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সমস্ত পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত না হইয়া ক্ষান্ত হয় না। ধনতন্ত্রে পুঁজিপতি শ্রম খাটাইয়া নিজের লাভের মাত্রা বাড়ায়। সম্পৎশালী পুঁজিপতি ও সর্ব্বহারা শ্রমিকের স্বার্থদ্বন্দ্ব শ্রেণীসংঘর্ষে রূপান্তরের আভাস দেখা দেয়—এক কথায় ধনতন্ত্রের স্ববিরোধ বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। উৎপাদনের সঙ্গে উপভোগের সম্বন্ধ শিথিল হইয়া পড়ে—অর্থাৎ উৎপাদন ও বণ্টন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ও পদে পদে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়।

মার্ক্সের সঙ্গে হেগেলের প্রধান মতবিরোধ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির সম্বন্ধ-বিচারে। হেগেলের মতে রাষ্ট্র মানুষের প্রজ্ঞার চরম বিকাশ, ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের শেষ পরিণতি ও স্তর। মার্ক্সের মতে রাষ্ট্র শোষণের যন্ত্রমাত্র, যত-দিন শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীসংগ্রাম থাকিবে, ততদিন রাষ্ট্রের প্রয়োজন। শ্রেণী-হীন সমাজে উহার কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। সেই সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজে শোষণের অবকাশ থাকিবে না—মানুষের সঙ্গে মানুষের সহযোগিতায় রাষ্ট্ররূপ বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং মার্ক্সের মতে সমাজের শেষ পরিণতি শ্রেণীহীন ও রাষ্ট্রহীন পৃথিবী। শ্রমিক-বিপ্লবের লক্ষ্য অর্থনৈতিক শোষণের পরিসমাপ্তি এবং সমাজে শ্রেণীবিভাগের অবসান। সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ উভয়ের লক্ষ্য বিপ্লব হইলেও উভয়ের চরম আদর্শ এক নহে, এজন্যই ইহাদের মধ্যে বিরোধ। শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্ব মার্ক্সবাদের অপর বিশেষত্ব, যদিও ইহা প্রথম দৃষ্টিতে গণতন্ত্র-

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের 'কল্লোল'-উপন্যাসে ঘটনায় মন তৈরী হওয়ার কাহিনীই লিপিবদ্ধ—তাঁর 'মৌচাকে' মনই ঘটনা তৈরী করে চলেছে। এ-শতকের পুরোভাগে যে একটি মন জন্ম নিয়েছিল তা আজ, শতকের প্রথমার্দ্ধের অবসানে, কি কি ঘটনা তৈরী করে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে—'মৌচাক' তারই ইতিবৃত্ত। এখানে চরিত্রগুলোর বিকাশে কেবল লেখকই উপস্থিত নন, চরিত্রগুলোও পরস্পরকে উদ্ঘাটিত করে অগ্রসর হচ্ছে। শুধু লেখকই কাহিনীকার নন, চরিত্রগুলোও কাহিনীকার। উপমা টানলে বলা যায়, এখানে নিউটনের আর আইনষ্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গী জড়াজড়ি করে আছে। এ-ধরুণের আঙ্গিক উপন্যাস-সাহিত্যে নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব্ব। 'মৌচাকে' জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা নেই—যা তাঁর 'দিনান্ত', 'কস্মৈদেবায়', 'রাত্রি' বা 'কল্লোল'-এ অনিবার্য্যভাবে এসে দেখা দিয়েছিল। এখানে লেখক জীবনের দিকে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকাতে পারছেন—জীবনের অতীত ও ভবিষ্যতকে বিচ্ছিন্নতায় নৈরাশ্যপূর্ণ দেখতে পাচ্ছেন না। তাই জীবন এখানে সংপ্রসারণে দুর্ব্বার, নবীনতায় উজ্জ্বল।

মৌচাক

কাপড়ে বাঁধাই—৩৩৭ পৃষ্ঠা—দাম পাঁচ টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের অন্যান্য উপন্যাস :

বৃত্ত ১।৶৹, মরামাটি ২।৹, দিনান্ত ৩।৹, কস্মৈদেবায় ৩৲, রাত্রি ৫৲, কল্লোল ৫৲

প্রকাশক :

পূর্ব্বাশা লিমিটেড

পি ১৩, গনেশ চন্দ্র এভেনু্য, কলিকাতা ১৩

বিরোধী বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু সাম্যবাদীর দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিতে তাহা নহে। অথচ নৈরাজ্যবাদীর সঙ্গে মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক যদিও উভয়ের শেষ পরিণতি এক হইতে বাধ্য—উভয়ের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকে। সাম্যবাদের মূলনীতি এই দাঁড়ায় যে, সাধ্যমত সকলে পরিশ্রম করিবে আর সকলে প্রয়োজনমত উহার ফলভোগ করিবে।

বঙ্গভাষায় মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে এইরূপ সুচিন্তিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে কেহ লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। অপক্ষপাত আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সুষ্ঠু সমন্বয় এই পুস্তকের বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানপিপাসু পাঠকমহলে এই পুস্তক আদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

শুধু গল্প—শ্রীগিরীন্দ্র সিংহ সম্পাদিত। দি বুক এমপোরিয়ম লিমিটেড, ২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

এই গল্প-সঙ্কলনের একটি বিশেষত্ব—ইহা মূল্যে সুলভ। আজিকার দুর্মূল্যের বাজারে এই ধরণে গল্পরস পরিবেশনের চেষ্টা সাহিত্য-প্রীতির পরিচায়ক, এজন্য গল্প-পিপাসু পাঠকেরা প্রকাশককে অবশ্যই সাধুবাদ দিবেন। কিন্তু সম্পাদকের দায়িত্ব তাঁহার সাহিত্য-বিচার-ক্ষমতার উপর যতটা নির্ভর করে ততটা বোধ হয় সুলভ-প্রকাশের সৎসাহসে নহে। প্রসঙ্গত আশা করা যায়, স্বল্প মূল্যে প্রাপ্ত বস্তু ভারে সমৃদ্ধ হইলেও রসে যেন স্বাদহীন না হয়। লেখক ও লেখা নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদকের।

আলোচ্য গল্প-সংগ্রহের সবগুলি গল্পই সুনির্ব্বাচিত নহে—এরূপ অনবধানতা ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জবাহরলালের প্রসঙ্গ কি শুধু গল্পের পর্য্যায়ে পড়ে? যদিও সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ লেখাটির মধ্যে জবাহরলালের কথা যৎসামান্যই আছে। গল্পের আসরে এটির অনধিকার-প্রবেশ সম্পাদনার শৈথিল্যেরই পরিচায়ক। সুলভ জিনিষ সম্বন্ধে সর্ব্বকালের একটি অপবাদ আছে। এই অপবাদ খণ্ডনের উপায় নির্ব্বিচারে নাম-করা সাহিত্যিকদের রচনাসংগ্রহ নহে, তাঁহাদের সাহিত্য-মর্য্যাদাযুক্ত লেখাগুলিকে চয়ন করা। তেমন দৃষ্টান্ত কিছুকাল পূর্ব্বে সুলভতম মূল্যের (মাত্র দু' আনা) 'কথা ও কাহিনী' সিরিজ প্রকাশের মধ্যে ছিল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সভ্যতার অভিশাপ—শ্রীশান্তশীল দাশ। সাগরিকা স্মৃতি-মন্দির, ঘুঘুডাঙ্গা, কলিকাতা। দাম আট আনা।

'সভ্যতার অভিশাপ' স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জ্জিত কিশোর-নাটক। আধুনিক সভ্যতার সর্ব্বনাশা রূপটিই লেখক উক্ত নাটকের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আজকাল কিশোর-নাটকে কতকগুলি বড় বড় আদর্শের বুলি প্রচার করা একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নাট্য-রস পরিবেশন করা অপেক্ষা বড় বড় কথা বলার দিকেই যেন লেখকদের ঝোঁক বেশী। 'সভ্যতার অভিশাপ'ও ঠিক সেই ধরণের নাট্যরসহীন একখানি কিশোর নাটক। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু নাটক হিসাবে এই বই রসোত্তীর্ণ হয় নাই।

হামার—শ্রীমাণিকলাল সিংহ, এম-এ। প্রকাশক—শ্রীভীমচন্দ্র মাহিন্দার, ২১৯, রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া।

স্বদেশী-আন্দোলনের যুগ হইতে ১৯৪২ সালের গণ-আন্দোলন এবং আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অভিযান পর্য্যন্ত জাতির মুক্তিকামনা ও স্বাধীনতা-আন্দোলনের রূপটি নাট্যকার বেশ মুন্সীয়ানার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। লেখকের ভাষা নাটকের সম্পূর্ণ উপযোগী—তবে 'সিচুয়েশন' সৃষ্টিতে অধিকতর নৈপুণ্য প্রদর্শনের দ্বারা নাটকটিতে গতিবেগ সঞ্চারের যথেষ্ট সুযোগ ছিল—নাট্যকার তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন নাই। তবে বিষয়বস্তুর জন্যই নাটকখানি পাঠকদের আগ্রহ উদ্দীপ্ত করিবে।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

ফেব্রুয়ারীর গান

অনন্ত দেব মুখোপাধ্যায়

GE 7432 { এতো নহে প্রেম এযে ওগো / শুধু ক্ষমা চাওয়া ছিল বাকী
—আধুনিক

কুমার প্রদ্যোৎ নারায়ণ

GE 7434 { দুটি ফুল ফোটে / শুধু দুটি ফোঁটা আঁখিজল
—আধুনিক

বিনয় রায়, শ্রীমতী প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়
কুমারী রেবা রায় ও ভূপতি নন্দী

GE 7433 { বঙ্গ বন্দনা / —২ ভাগ

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

GE 7435 { কেন হারমানা ফুলহারে / জীবন-নদীর দুই তীরে জাগে
—আধুনিক

কুমারী নমিতা ধর

GE 7436 { কই রইলি ও মিতা / ও মোর ময়না ময়নারে
—ঝুমুর

'চিত্র মায়া'র ভাস্বর সৃষ্টি
'কবি' চিত্রের গান
কলম্বিয়া রেকর্ডে পাবেন

কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোং লিঃ
কলিকাতা — বোম্বাই — দিল্লী — লাহোর — করাচী

-পিন চিনে নিন-

রেকর্ড বাজাতে যে পিন বা নিড্‌ল্‌ ব্যবহৃত হয় তার গুণাগুণের উপর পরিচ্ছন্ন ও স্বাভাবিক স্বর প্রস্ফুরণ এবং রেকর্ডের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। রেকর্ড দীর্ঘস্থায়ী রেখে প্রত্যেকবারই স্বাভাবিক স্বর উৎপন্ন করতে হলে চাই বিশেষভাবে তৈরী ইস্পাতের অতি সূক্ষ্মাগ্র পিন। কলম্বিয়ার পিনগুলিতে এই গুণ আছে বলেই বিচক্ষণ লোকেরা বাজারের যা-তা পিন ব্যবহার না করে কেবল কলম্বিয়ার পিনই ব্যবহার করেন।

গুণভেদে কলম্বিয়ার কয়েকটি চমৎকার পিন

কলম্বিয়া 'সুপার্ব' লাউডটোন নিড্‌ল্‌—২০০টির বাক্স—১।০
কলম্বিয়া 'এক্সট্রা লাউডটোন' নিড্‌ল্‌—২০০টির. বাক্স—১।০
কলম্বিয়া ক্রোমিয়াম নিড্‌ল্‌ (এক পিনে বহু রেকর্ড বাজে) ১০টির প্যাকেট ১৲
কলম্বিয়া ড্যুরা গোল্ড নিড্‌ল্‌ ('পিক্‌-আপ'-এর জন্য) ১০০টির বাক্স—২।০

কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোং লিঃ

কলিকাতা — বোম্বাই — দিল্লী — লাহোর — করাচী

রূপ ও রূপসী-

রূপের ঐশ্বর্য্য বিধাতার দান, কিন্তু মানুষ সেই রূপের উৎকর্ষ সাধন করেছে প্রসাধন-বিজ্ঞানের সযত্ন অনুশীলনে। সামান্য রূপের অধিকারিণীরাও তাঁদের রূপ প্রস্ফুটিত করে তুলতে পারেন প্রকৃষ্ট প্রসাধনীর নিয়মিত সদ্ব্যবহারে। এ বিষয়ে ক্যালকেমিকোর নির্বাচিত প্রসাধনী সম্ভার রূপচর্য্যা-কারিণীদের বিশেষ সহায়তা করতে পারে।

মার্গো সোপ ✱ রেণুকা পাউডার
ক্যাস্টরল ✱ লাবণি স্নো ও ক্রীম

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

গণ্ডীর ভেতর—শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু। আই, এ, পি, কোং লিঃ। ৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

ছেলেদের উপন্যাস। মিঃ রায় বদলি হইয়া তিতিলগড়ে আসিয়াছেন। রেলওয়ে কোম্পানীর একটা ছোট বিভাগীয় আপিসের তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা। কতকটা খামখেয়ালী এবং হয়তো বা স্পষ্টবাদীও। প্রথম দিনেই তিনি আপিসের বহুদিনের অভ্যস্ত নিয়মের কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন, যাহার দরুন কর্ম্মচারীদের দৃষ্টি তাঁর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইল। কিন্তু আসল ঘটনা সুরু হইল দ্বিতীয় দিনে, যাহা এই উপন্যাসের মূল বিষয়-বস্তু।

মিঃ রায় কাজ বুঝিয়া লইবার জন্য দ্বিতীয় দিনে ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বেই আপিসে আসিয়াছেন। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নাই, আকস্মাৎ আলমারীর পিছনে একটা চাপা নিঃশ্বাস এবং মৃদু খস্ খস্ শব্দে তিনি উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। "কে, কে ওখানে?" একটা অজ্ঞাত রহস্যের আতঙ্কে তাঁর মন দুলিতেছিল। এইখান হইতেই উপন্যাসটি দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। কোন এক রাজবন্দী কোন রকমে ট্রেন হইতে পলাইয়া মিঃ রায়ের আলমারীর পশ্চাতে আশ্রয় লইয়াছে। সে ধরা পড়িতে চায় না। তার জীবনের সাধনাকে সফল করিতে চায়।" 'ভারত ছাড়' এই মহামন্ত্রকে জীবনের ব্রত করিয়াছে বলিয়াই সে বন্দী। মিঃ রায়ের কাছে সে আশ্রয়প্রার্থনা করিল। মিঃ রায় মহা সমস্যায় পড়িলেন, তার অন্তরের আসল মানুষটি সাড়া দিল। এই স্থান হইতেই মিঃ রায়ের চরিত্রের বিশেষত্ব আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়া।

একটির পর একটি ঘটনা অতি যত্নের সহিত চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে লেখক যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এবং তার এই চেষ্টা বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

হাসিকান্নার দেশে—শ্রীসুনির্ম্মল বসু। বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিমিটেড, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৮৫; মূল্য—দুই টাকা।

নাম-করা শিশু-সাহিত্যিকের লিখিত ছোটদের কবিতার বই। কবিতায় গল্প বলা হয়েছে। বইটির দুই ভাগ—হাসির দেশে ও কান্নার দেশে। হাসির দেশের মোটা গজেন্দ্র আর প্যাকাটি মার্কা বংশলোচন কি করে 'সুন্দর বন' যে সুন্দর নয় তার পরিচয় পেল, কি করে তারা ভ্রমণের পথে বাঘ, ডাকাত আর হাতীর পালকে তাড়িয়ে দিল, টক্-ঝালের যুদ্ধে কি করে লঙ্কারাজের কূটনৈতিক মন্ত্রী তেঁতুল-রাজাকে সন্ধি করাতে বাধ্য করাল, গোবর-পোরা-মাথা শ্রীগোবর কি করে মাগুর মাছের হাঁড়ির বদলে গোখরা সাপের হাঁড়ি এনে বেভো রুগীর রোগ সারাল, তার কৌতুককর বিবরণ শিশুচিত্তকে আকৃষ্ট না করে পারে না। কিন্তু এর চেয়েও ভাল লাগে কান্নার দেশের কাহিনীগুলো। এগুলি উদ্ভট কল্পনা নয়—এই পৃথিবীরই দুঃখের কথা, মানুষের সহানুভূতিহীনতা, অহঙ্কার, কুসংস্কার ও নিষ্ঠুর সামাজিক ব্যবস্থায় কত মানুষের জীবন, কত নবীন মনকে নিদারুণ ব্যথায় ক্লিষ্ট করে তোলে। এর সঙ্গে কিশোরমনের পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। কিশোর-মনেও মানুষের দুঃখ-বেদনা সমান ভাবে বাজে।

—"এরা ধনী টাকাই চেনে আর কিছু না জানে।
তেলা মাথায় তেল ঢালতে ওরা পরম পাকা,
মোদের জীবন ওদের কাছে কেবল ফাঁকি
একেবারে ফাঁকা।
ওদের কুকুর মোদের চেয়ে অনেক বেশী দামী,
কি এসে যায় ক্ষুধার জ্বালায় মরলে তুমি আমি।"

পড়তে পড়তে এই নির্ম্মমতার বিরুদ্ধে এ যুগের কিশোর-মন বিদ্রোহী হয়ে উঠবে।

বইখানি বেশ বড় অক্ষরে ঝরঝরে করে ছাপা, ছবিগুলিও সুন্দর। ২২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় লাইনটিতে অক্ষরের আতিশয্যে ছন্দপতন ঘটেছে। "যতই হোক অকর্ম্মার ধাড়ি"র এই স্থলে 'যতই কেন হোক আনাড়ি' বা এই ধরণের কিছুতে পূর্ব্বাপর ছন্দের ধারা বজায় থাকিত।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

সেকালের রবীন্দ্রতীর্থ—শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী। পূরবী পাবলিশার্স। ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের সহিত শিলাইদহের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। পদ্মাতীরবর্ত্তী এই গ্রামের সৌন্দর্য্য কবির চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল এবং সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছিল। এই গ্রামটিকেই লেখক 'সেকালের রবীন্দ্রতীর্থ' বলিয়াছেন এবং তাহার বিচিত্র কাহিনী সহজ ও সরল ভাষায় শুনাইয়াছেন। 'যুগল সা', 'জাপানী মিস্ত্রীর বৌ' প্রভৃতির বৃত্তান্ত চিত্তাকর্ষক। কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবীর কথাও গ্রন্থকার কিছু কিছু বলিয়াছেন। মানুষ রবীন্দ্রনাথকে জানিবার পক্ষে বইখানি সাহায্য করিবে।

ব্রজ-বাঁশরী—শ্রীকালিদাস রায়। ইউ, এন, ধর অ্যাণ্ড সন্স লিঃ। কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রেষ্ঠ ব্রজবুলি পদাবলী এবং কবি কালিদাস রায় কৃত সেগুলির এই বঙ্গানুবাদ কাব্যরসিকের পরম উপভোগ্য। বৈষ্ণব কবিতায় অনুরাগ এবং স্বীয় রচনা নৈপুণ্যে বহুদিন পূর্ব্বেই কবি বাঙালী পাঠকের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার 'ব্রজবেণু' এবং 'পর্ণপুটের' বৃন্দাবন-লীলারসাত্মক কবিতা আজিও অনেকের কণ্ঠস্থ। বর্ত্তমান গ্রন্থে কেবল ভাষান্তরের দিকে নহে, মূলের মাধুর্য্যরক্ষার দিকেও কবি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। অঙ্গসজ্জা গুণে উপহারের পক্ষেও কাব্য গ্রন্থখানি উপযোগী হইয়াছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্মরণীয় যাঁরা—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য। বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

আদর্শের সন্ধান—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী. ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

দুইখানি পুস্তকেই কয়েকজন স্মরণীয় বরেণ্য ব্যক্তির জীবন-কাহিনী কিশোরদিগের জন্য লিখিত হইয়াছে। প্রথমটি মনোজ্ঞ বর্ণনায়, রচনার উৎকর্ষে, কাগজে, ছাপায় সব দিক দিয়া শোভন ও উৎকৃষ্টতর। অল্প কথায় অনেকখানি বলার কৌশল গ্রন্থকারের আয়ত্ত, বর্ণনার ভঙ্গীতে অল্প কথায় আলোচ্য ব্যক্তির সমগ্র রূপটি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় বইখানি উপদেশ ও মন্তব্যের আতিশয্যে ভারাক্রান্ত, নিকৃষ্ট কাগজে ছাপা। অবশ্য মলাটের চিত্রটি সুন্দর। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা প্রশংসনীয়। প্রথম গ্রন্থে মনীষিগণের নামকরণেও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, যথা জ্ঞানভিক্ষু শ্রীজ্ঞান, বীর-সন্ন্যাসী, রাজ-ভিখারী, বিজ্ঞান-তপস্বী, শতাব্দীর সূর্য্য, বাংলার বাঘ ও বীর বিদ্রোহী। দ্বিতীয় বইটিতে রামমোহন, দয়ানন্দ, গুরু গোবিন্দসিংহ, গান্ধী, সুভাষ, লেনিন, কামাল, জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে।

দেশমাতৃকা স্তুতি—শ্রীপুরঞ্জন মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। প্রকাশক—ডাঃ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ৪ রামকমল বর্ম্মা, খিদিরপুর, কলিকাতা। মূল্য ৷৵০।

অতি অল্পমূল্যে এই সংগ্রহখানি সাধারণ্যে প্রচার করিবার জন্য গ্রন্থকার ধন্যবাদার্হ। বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের দেশাত্মবোধক উদ্দীপনাময় কবিতা ও সঙ্গীত এবং গীতা, চাণক্যশ্লোক, তুলসীদাস প্রমুখ সাধুগণের

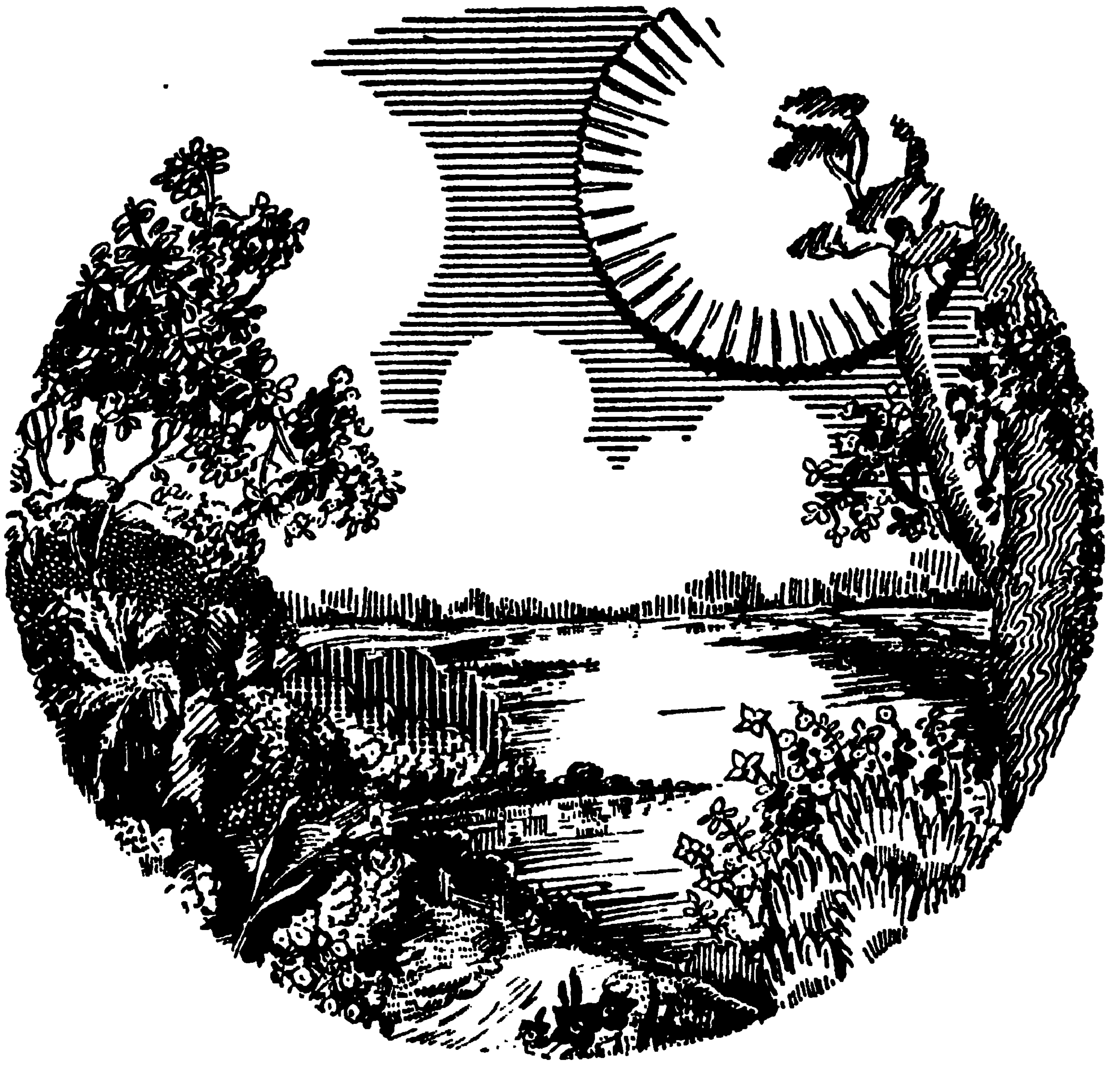

দক্ষিণের মন্ত্র গুঞ্জরণে

বসন্তের নব কিশলয়ের সমারোহের দিকে চেয়ে শীতের ঝরাপাতার কথা কে মনে রাখে? প্রকৃতির ভাঙ্গাগড়ার লীলায় যেখানে পাতা ঝরে আবার সেখানে নূতন পাতা গজিয়ে ওঠে।

মানুষের দেহেও নিত্যই এই ভাঙ্গাগড়ার খেলা চলছে। জানেন কি যে প্রতি ঘণ্টায় আমাদের দেহের রক্ষণ ও পোষণের কাজে লক্ষ লক্ষ রক্তকণিকা ক্ষয় হয়? এই বিরাট ক্ষয় কে পূরণ করে তা জানেন? এই ক্ষয়পূরণ করে আমাদের লিভার—তাই লিভারের সামান্য মাত্র অসুখে সাবধান না হলে বড় বিপদকে ডেকে আনা হয়।

কুমারেশ লিভারকে নীরোগ ও শক্তিশালী করে—রক্তকণিকা গঠন, দূষিত পদার্থ শোধন, রোগ-প্রতিরোধ, খাদ্য পরিপাক প্রভৃতি কার্য্যে সাহায্য করে।

তাই **কুমারেশ** শুধু অজীর্ণ, উদরাময়, শিশু যকৃৎ, সূতিকা প্রভৃতি রোগের অমোঘ ঔষধই নয়, দেহের স্বাস্থ্যরক্ষারও অমূল্য সহায়।

কুমারেশ

দি ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ

দোঁহা প্রভৃতির সারাংশ সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থকার দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে এই নৈবেদ্য সাজাইয়াছেন।

সংস্কৃতি সমস্যা—প্রকাশক: ডাঃ আনন্দ লাহিড়ী, পঞ্চবটী, রাঁচি ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, কলিকাতা।

বহু আত্মত্যাগ, সাধনা ও তপস্যার ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, কিন্তু এই স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আমাদিগকে দেশের গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না। গ্রন্থকার হিন্দুশাস্ত্রের অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার হইতে একখানি মাত্র শাস্ত্রগ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, মহাভারত শুধু আধ্যাত্মিক নহে, রাজনৈতিক, সামাজিক ও লৌকিক ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবাসীকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে।

ঘুমিয়ে ছিল রাজকুমারী—শ্রীইন্দিরা দেবী। একক সাহিত্য সম্প্রদায়, ৪৪৬।১, কালীঘাট রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের "শিশুমহলে"র পরিচালিকা ইন্দিরা দেবী ছোটদের জন্য বেতার-কেন্দ্র হইতে যে গল্পগুলি বলিয়াছিলেন তারই কয়েকটি এই বইয়ে সংগ্রহ করা হইয়াছে। গল্পগুলি সুমিষ্ট, গল্প বলার ভঙ্গীও সুন্দর। গল্পগুলি শিশুদের মনোরঞ্জন করিবে। ছবি, ছাপা ও মলাট উৎকৃষ্ট।

বাঁশীর ডাক—শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কবিতার বই। সবগুলি কবিতাই এক একটি ছোট কাহিনী অবলম্বনে সহজ ছন্দে ও ভাষায় রচিত। গাথা বা গীতিকবিতাগুলি কবি-হৃদয়ের ভাবাকুলতা ও সংবেদনশীলতার গুণে অন্তর স্পর্শ করে। মলাটের ছবিটি সুন্দর।

কয়েকটি গল্প—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। পূরবী পাবলিশার্স লিঃ। ৭।৩৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। মূল্য ২।০

অবজ্ঞাত, অন্ত্যজ, সমাজের সর্ব্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত মূক জনগণের জীবনেও যে উচ্চ অভিজাত-সম্প্রদায়ের মতই সুখ-দুঃখবোধ ও কল্পনাবিলাস ফল্গুধারার মতই বহিয়া চলিয়াছে, লেখক সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তাহাদের কথা 'কয়েকটি গল্পে' লিখিয়া পাঠকদের গোচরীভূত করিয়াছেন। এমন কি তিনি গৃহপালিত মূক পশুগণের মধ্যেও রোমান্সের সন্ধান পাইয়াছেন। 'কয়েকটি গল্পে' মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানিতে লেখকের রসসৃষ্টি-ক্ষমতা ও রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য সহজেই চিত্ত আকর্ষণ করে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ। ২৪৩-১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল এক টাকা।

বর্ত্তমান পুস্তকখানি সাহিত্যসাধক চরিতমালার ৭২ সংখ্যক গ্রন্থ। ইহাতে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের দুই জন প্রখ্যাত মনীষী এবং সাহিত্যসাধকের জীবন ও কৃতির কথা আলোচিত হইয়াছে।

রামকমল নিজ চেষ্টায় সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। একথা বৈষয়িক দিক হইতে যেমন সত্য, পাণ্ডিত্যের দিক হইতেও তেমনি সত্য। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্যে তাঁহার দান যথেষ্ট। কলিকাতা স্কুল-বুক-সোসাইটি, হিন্দু-কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি, মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বিভালয়ের পাঠ্য পুস্তকের অভাব দূরীকরণার্থে তিনি এসকল রচনায়ও মন দেন। তাঁহার ইংরেজী-বাংলা অভিধান তাঁহার সাহিত্যসাধনার বিরাট কীর্ত্তির পরিচায়ক।

পাদ্রী কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দু-সমাজের প্রতিকূলতামূলক বহু কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-সাধনা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষেই কল্যাণকর হইয়াছে। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, জীবনচরিত, দর্শন প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক নানা গ্রন্থ লিখিয়া তিনি মাতৃভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইংরেজী গ্রন্থও প্রচুর। কৃষ্ণমোহন শেষ জীবনে রাজনৈতিক আন্দোলনেও যোগ দিয়াছিলেন।

যোগেশবাবু বর্ত্তমান পুস্তকখানিতে এই সকল বিষয়ে যথাযোগ্য প্রমাণাদির উপর নির্ভর করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ব্ব-সূরিদের সাহিত্যসাধনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান করিয়া তিনি সাহিত্যানুরাগী বাঙালী পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

রাতের ছায়ামূর্ত্তি—শ্রীমণিলাল অধিকারী। রত্নাকর পাবলিশিং হাউস। ১৬৬-এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯। মূল্য এক টাকা চার আনা।

শিশুপাঠ্য ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। ইহা রত্নাকর সিরিজের ৩য় গ্রন্থ। কাহিনীটির সংক্ষিপ্তসার এই: অপরাধতত্ত্ববিদ এবং সখের ডিটেকটিভ তাপস চৌধুরী আর তার বন্ধু এবং সহকারী মলয় অবসর যাপন করিতে গিয়া উঠিয়াছিল মধুপুরের অভিজাত হোটেল 'মুন লাইটে'। সেখানে তাহারা হোটেলের ম্যানেজারের প্রমুখাৎ ঐ হোটেলে আগত শ্যামল গুহ নামে এক যুবকের রহস্যময় হত্যা-কাহিনী জানিতে পারিল। হোটেলে রাত্রে মাঝে মাঝে এক ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব হইত। তাপস বুঝিতে পারিল যে, ঐ হত্যার সঙ্গে ছায়ামূর্ত্তির সংযোগ রহিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত তাপস ও মলয়ের বুদ্ধিকৌশল ও দুঃসাহসিক কর্ম্মসম্পাদনে ছায়ামূর্ত্তির স্বরূপ ও শ্যামল গুহের হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল।

প্রচলিত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের সঙ্গে ইহার পার্থক্য আছে—লেখক রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টিতে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। শিশু-পাঠক কম্পিত বক্ষে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কাহিনীটি শেষ করিবে।

অপমানিতা মানবী—শ্রীপ্রশান্তি দেবী। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৮ সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা।

নারীর উপর যুগ যুগ ধরিয়া পুরুষ যে অবিচার, অত্যাচার করিয়া আসিতেছে তাহার প্রতিকার এ যুগের মেয়েদের করিতে হইবে; নারীর অবমাননা আমাদের জাতির ললাটে যে কলঙ্ককালিমা লেপিয়া দিয়াছে নারীকেই আজ অগ্রণী হইয়া তাহা মুছিয়া ফেলিতে হইবে—এই মূল ভাবটিই এই উপন্যাসের মধ্যে আগাগোড়া অনুস্যূত।

যুদ্ধের সময়কার ব্ল্যাক-আউটের কলিকাতার পটভূমিকায় উপন্যাস-খানি রচিত। বোমার ভয়ে কল্পনা বাপ-মায়ের সঙ্গে চলিয়া আসিল কলিকাতায়। তারপর নানা ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে অবশেষে তাহাকে মহানগরীতে চাকুরী লইতে হইল। এই নূতন জীবন অবলম্বন করিবার পর, যুদ্ধের বাজারে পুরুষরা নারীদের প্রতারিত করিয়া কিভাবে নারীত্বের অপমান করিতেছে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সে ভাবিল শুধু আত্মরক্ষা করিলেই তো চলিবে না, সমাজের সকল অপমানিতা মানবীকে চরম দুর্গতির হাত হইতে ত্রাণ করিবার ব্রত তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে—এই মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সে প্রণয়ী প্রকাশের বিবাহ-প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার প্রেমের অপমৃত্যু ঘটাইল।

উপন্যাসখানিতে লেখিকার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সংলাপ লিখিবার হাত আছে। কল্পনার চরিত্রটিকে তিনি অন্তরের সবটুকু দরদ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য চরিত্রের দিকে আরো একটু বেশী মনোযোগ দিলে ভাল হইত।

মূষিক-বাহন
শ্রীপ্রিয়প্রসাদ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

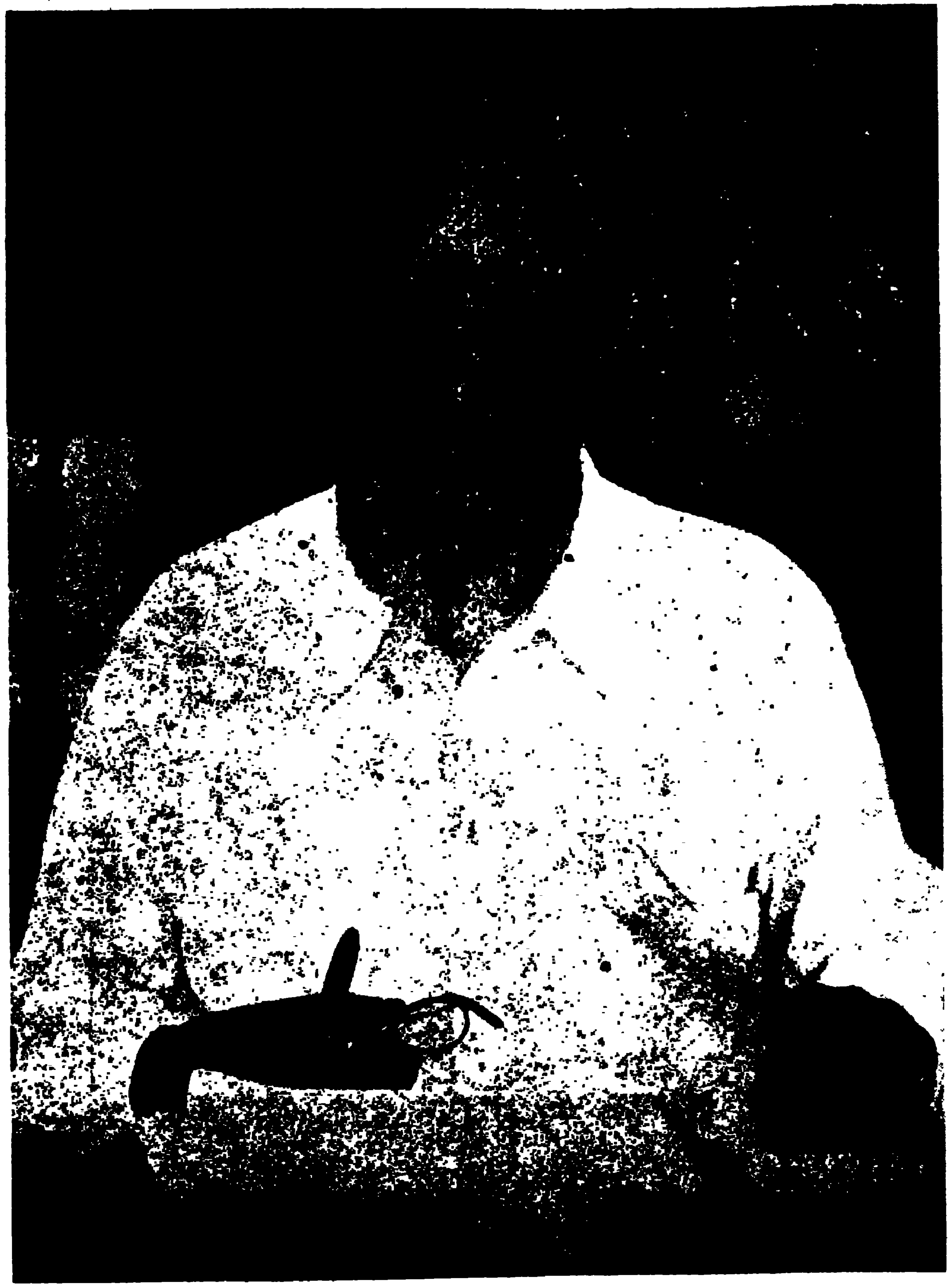

দীনবন্ধু সি. এফ. এণ্ড্রুজ

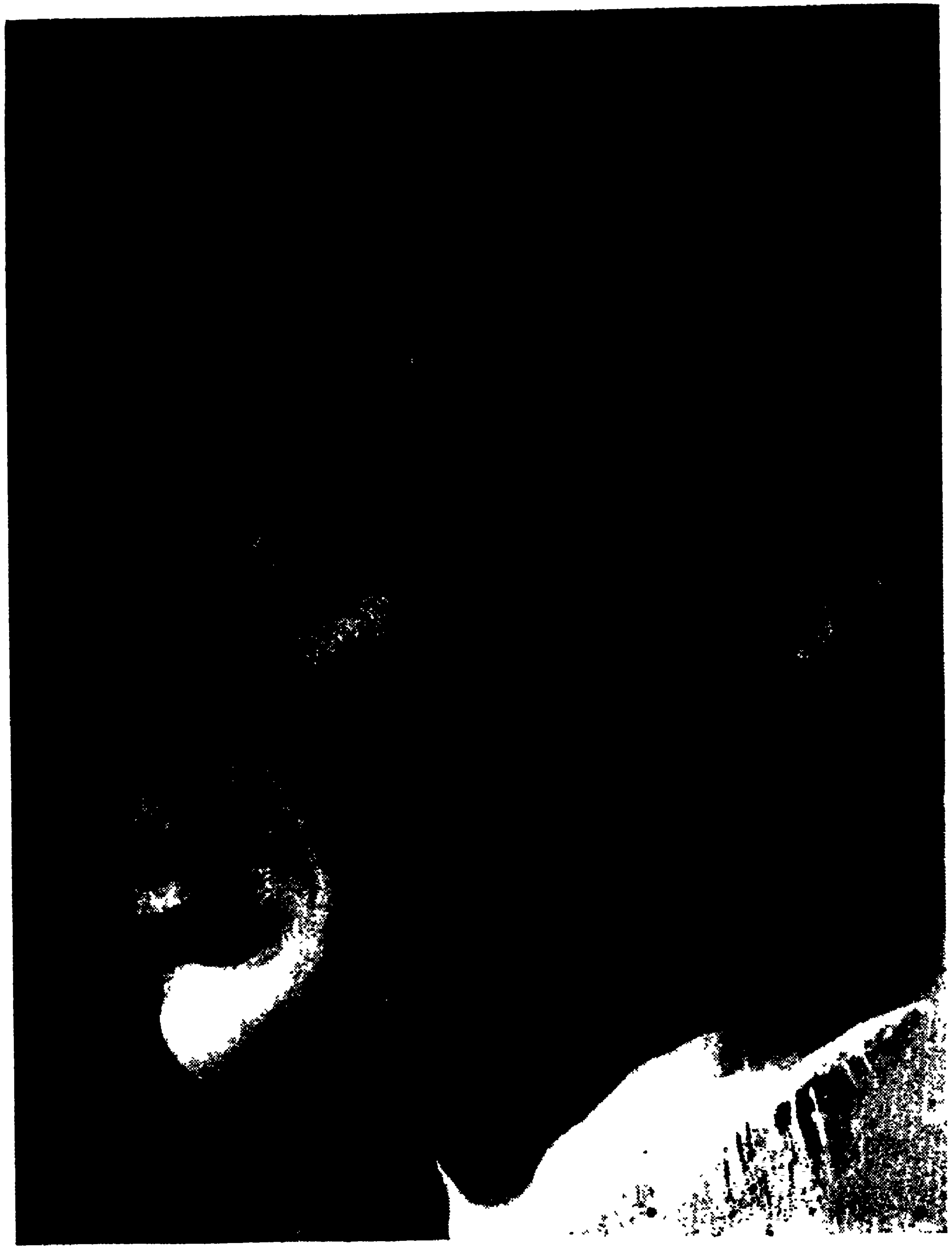

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর প্রতিমূর্ত্তি
ভাস্কর : শ্রীসুধীর খাস্তগীর

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৯শ ভাগ
১ম খণ্ড } বৈশাখ, ১৩৫৬ { ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নববর্ষ

নূতন বৎসর আগতপ্রায়। বর্ষফল গণনা দৈবজ্ঞ জ্যোতিষীর কর্ম, আমাদের সে অধিকার নাই। বিগত বৎসরের হিসাব-নিকাশ ও আগামী বৎসরের ভবিতব্যের পূর্ব্ব লক্ষণ বিচার—ইহাই আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আছে।

বিগত বৎসরের পূর্ব্বার্দ্ধ গিয়াছে বিষম আশঙ্কা ও ঘোর অন্ধকারের মধ্যে; উত্তরভাগে দেশে শান্তি কিছু ফিরিয়াছে বটে, কিন্তু অনাচারের স্রোত পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রবল থাকায় আশার আলো স্তিমিত ভাবেই রহিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পরে জনসাধারণ উৎফুল্ল চিত্তে যে সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলার আশায় ভবিষ্যকালের দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিয়াছিল, সে আশা এখনও সফল হয় নাই। বরং যাঁহাদের নেতৃত্ব ও পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া লোকে দেশের ও জাতির প্রগতির বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল, আজ দেশের জনগণ তাঁহাদের উপর আস্থা ও শ্রদ্ধা হারাইতে বসিয়াছে। কাণ্ডারী যেখানে দুর্ব্বলচিত্ত ও ভয়বিহ্বল সেখানে তরণীর গতি সরল ও শঙ্কাহীন হওয়া অসম্ভব—এই ভয় আজ প্রত্যেকের মনে রহিয়াছে।

বাংলা ও বাঙালীর উপর বিগত বৎসরে প্রতিপদে বিপদ-বিপত্তি আসিয়াছে। প্রথমে হইল দেশের অঙ্গচ্ছেদ—তাহার পর আসিল ভিন্ন প্রদেশীয়গণের বিদ্বেষ ও হিংসার প্লাবন। শরণার্থীর দল আসিল অগণিত, লক্ষ-লক্ষ, তাহাদের অভাব, অভিযোগ ও অনুযোগের শব্দে বাংলার গগন কাঁপিয়া গেল। অন্যদিকে দেশের শাসন রক্ষণ ও গঠন সকল ক্ষেত্রেই পতিত হইল অনাচার ও অর্থলালসার কলুষে। চোরাবাজারীর লুঠের ফলে দরিদ্র বাঙালী সর্ব্বহারা অসহায় ভিখারীতে পরিণত হইতে চলিল। দেশের জনসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ সকল ব্যবস্থাই শিথিল হইয়া পড়িল শাসনতন্ত্রের বিকারে। ভিন্ন প্রদেশের লোক দেখিল বাঙালী অসহায় এবং তাহাদের কর্ণধার সাজিয়া, কংগ্রেসের ভেক পরিয়া, যাঁহারা বাঙালী জাতির নেতৃপদ অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী, এবং সামান্য যে কয়জন নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের দল কম সুতরাং শক্তিও ক্ষীণ। দাসত্বের বিষ যাহাদের প্রত্যেক শিরায়, ধমনীতে বহিতেছে, তাহারা স্বাধীনতা অর্থে বুঝে স্বৈরাচার ও দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার। সুতরাং বিহারে, আসামে ও উড়িষ্যায় বাঙালীর উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। উড়িষ্যার কংগ্রেসের দেহ সম্পূর্ণভাবে বিকারগ্রস্ত হয় নাই, সুতরাং সেখানে এই অত্যাচার স্থায়ী হইল না। কিন্তু বিহারে ও আসামে তাহা বাড়িয়াই চলিল। উপরন্তু দেশবিভাগের ফলে ক্ষীণবল পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর স্কন্ধে আশ্রয়প্রার্থী বাস্তহারা দলের গুরুভার পড়ায় ফলে দেশের শাসন ও চালনের ব্যবস্থা বিকল হইবার উপক্রম হইল। শরণার্থীদিগের নেতা সাজিয়া স্বার্থান্বেষী ভণ্ডের দল দেশে বিক্ষোভ ও আর্থিক অপচয়ের স্রোত বহাইয়া দিল। ইহাই বাংলায় ১৩৫৫ সালের বিবরণ।

আগামী বৎসর বাঙালীর জন্য কোনও সুসমাচার আনিতেছে কি? আশার আলোর কোনও ক্ষীণ রশ্মি এদেশের আকাশে প্রতিফলিত হইয়াছে কি? ইহার উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ঘোরতর তমিস্রার পরই জ্যোতি দেখা যায়। যদি বাঙালীর হৃদয়ে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষা-বহ্নি পূর্ব্বেকার মত আবার জ্বলিয়া উঠে তবে রাত্রির পর প্রভাত আসিবেই। কপট নেতার স্তোকবাক্য ও নৈরাশ্যবাদী হা-হুতাশে কর্ণপাত না করিয়া আমাদের মন ও বুদ্ধির ভিতর হইতে জঞ্জাল বাহির করিয়া দিতে হইবে। যুবশক্তিকে উদ্দাম বিশৃঙ্খলার পথ হইতে ফিরাইয়া দেশের রক্ষা ও সংস্কারের কাজে লাগাইতে হইবে। ১৩৫৬ সালে প্রভাতের আশা পোষণ করিয়া আমাদের দৃঢ়চিত্তে ভবিষ্যের প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

মানভূমে দমন-নীতি

পুরুলিয়ার "সংগঠন" পত্রিকার গত ১লা চৈত্রের সংখ্যায় পুরুলিয়া সহরে গত দোল-উৎসব উপলক্ষে যে "রক্তের হোলী

খেলা" হইয়াছিল তাহার একটা বর্ণনা আছে এইরূপ : "গত ১৫।৩।৪৯ তারিখে দোল-পর্ব্বের পরদিন একদল পুলিশ মোটর-যোগে পথিপার্শ্বে রং, কাদা-মাটি নিক্ষেপ করিয়া চলিতে থাকে। নামপাড়ায় কোন এক কাপড়ের দোকানে উপবিষ্ট লোকদের রং ছুড়িলে দোকানের কাপড়-চোপড় নষ্ট হওয়ায় তাহারা প্রতিবাদ করে। পুলিশের দল তাহা উপেক্ষা করিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা সুরু করে ; ফলে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। বহু ব্যক্তি আহত হইয়াছে।" পুরুলিয়ার বাঙালী প্রধানদের মধ্যে অনেককেই হাজতে টানিয়া লওয়া হইয়াছিল ; ২১ দিন পর তাঁহারা জামিনে খালাস পাইয়াছেন।

রক্তের এই হোলী খেলায় পুরুলিয়ার মারোয়াড়ী শ্রেণীর নাম সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে ; তাঁহারা নাকি এই হাঙ্গামায় উৎসাহ-দাতারূপে কাজ করিয়াছে ; কোন কোন স্থানে সক্রিয় অংশ-গ্রহণ করিয়াছে। বিহারী হিন্দী ভাষা-ভাষীদের মনোভাব কি তাহা মুরলীমনোহর প্রসাদের উক্তিতে প্রতিফলিত—মাতৃভাষার রক্ষাকল্পে বাঙালীরা যে আন্দোলন করিতেছে অন্য কোন দেশে তাহার শাস্তিস্বরূপ তাহাদের কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইত। এই ব্যক্তি ভুলিয়া গিয়াছে যে, কামানের মুখের আগুনে কোন ভাব-সংঘর্ষের মীমাংসা হয় না ; বিহারেই কুমার সিংহের বিদ্রোহে এবং ১৯৪২ সালের আন্দোলনে ইংরেজ সে চেষ্টা করিয়াছিল ; আজ তাহার ফল কি হইয়াছে তাহার অর্থ বুঝিলে মুরলীমনোহর প্রসাদ নিজের মন ও জিহ্বাকে সংযত করিত। আমরা বাঙালীকে উত্তেজিত করিতে চাই না। এই "সত্যাগ্রহের" নেতা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ তাঁহার নানা বিবৃতিতে এইরূপ সংযমের উপদেশ দিয়াছেন। তিনি যে সব অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনা করিয়াছেন নিম্নলিখিত দাবীগুলির মধ্যে তাহার আকৃতি ও প্রকৃতির পরিচয় পাই :

১ম দাবী—আজ মানভূমের জীবনে যে সকল বহু প্রকারের অন্যায় দেখা দিয়াছে—মানভূমের অধিকার, শান্তি, সম্প্রীতি, সংগঠনশক্তি যে ভাবে বিনষ্ট করা হইতেছে তাহা দ্বারা আজ প্রমাণিত হইয়াছে—যাহাদের উপর কংগ্রেস বিশ্বাস করিয়া জনগণের শাসন পরিচালনের ভার দিয়াছে সেই সকল ব্যক্তির অযোগ্যতা এবং দুর্নীতি আশ্রয়ের ফলেই মানভূমের জনগণের এই দুঃখ এবং শান্তি ও অধিকারের পথে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। ঐ সকল ব্যক্তির কর্ম্ম ও আচরণের বিচার করিবার অধিকার উর্দ্ধতন কংগ্রেসের আছে ; তাঁহাদের দ্বারা আজ উহার বিচার করা হউক—এবং যাঁহাদের অযোগ্যতা ও অন্যায় কার্য্য প্রমাণিত হইবে তাহাদের হাত হইতে কংগ্রেস তথা জনগণের এই শাসনযন্ত্রকে মুক্ত করিয়া ইহাকে যথার্থ কংগ্রেস শাসনযন্ত্রে পরিণত করা হউক।

২য় দাবী—প্রাদেশিক সরকারের প্রশ্রয় এবং নিজেদের দুর্নীতিমূলক মনোবৃত্তির ফলে জেলায় সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বহু প্রকারের দুর্নীতি এবং জনগণের প্রতি অবিচার অত্যাচারমূলক অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে। এই সকলের বহু অবিসংবাদী প্রমাণ ও জেলাব্যাপী অগণিত দুষ্কৃতির দৃষ্টান্তে তাহা পূর্ণ হইয়া আছে। এই সকল অফিসারের কাজের বিচার করা হউক এবং বিচারে অন্যায় প্রমাণিত হইলে জনগণের শাসন-যন্ত্রকে ইহাদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া জনগণের যথার্থ শাসন পরিচালনার উপযোগী ব্যবস্থা করা হউক।

৩য় দাবী—কংগ্রেসী সরকারের ন্যায় কংগ্রেসের প্রাদেশিক ও জেলা কমিটিগুলির উপরও জনগণের সুব্যবহার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। কোথায় তত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন, জেলা ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পরিচালকদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা এই সকল অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করিতেছেন। তাঁহাদের এই সকল কর্ম্মের প্রমাণসমূহ রহিয়াছে। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা এই সকলের পূর্ণভাবে বিচার করা হউক—এবং অন্যায় প্রমাণিত হইলে তাহাদের হাত হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিয়া উহাকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে ব্যবস্থা করা হউক।

৪র্থ দাবী—স্বরাজের অর্থ জনগণের শাসন। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া আমরা এক শাসনের ব্যবস্থাবন্ধনে আবদ্ধ আছি। তাহা সকলকেই মানিতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক স্থানের জনগণের মতামত জানাইতে, তাহাদের ন্যায্য দাবী অনুযায়ী ব্যবস্থা পাইতে, সকল স্থানের জনগণের সহিত জেলার শাসনে অংশ লাভ করিতে অধিকার রহিয়াছে। আজ মানভূমের জীবনে এমন অবস্থা আসিয়াছে যে, জেলার শাসন ব্যবস্থায় জেলার লক্ষ লক্ষ লোকের বিন্দুমাত্র স্থান বা অধিকার নাই। জনমতের অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, জেলার লক্ষ লক্ষ লোক যদি কোন জেলা কর্ম্মচারীর নিয়োগ বা জেলার কোন ব্যবস্থাকে অন্যায় বলিয়া মনে করে তথাপি তাহার ন্যায্য দাবীর কোন মর্য্যাদা নাই। ইহার অবসান করিতে হইবে। জেলার শাসন ব্যবস্থায় যথার্থ জনমতের মূল্য থাকিবে। শাসন-যন্ত্রে জনশক্তির—পঞ্চায়েত শক্তির অংশ ও অধিকার থাকিবে—ইহাই আমাদের দাবী।

৫ম দাবী—শাসন-যন্ত্রে পঞ্চায়েত শক্তির আংশিক অধিকার লাভ তো দূরের কথা—আমাদের শাসন ব্যবস্থায় জন এমন কতকগুলি আইন আছে, যাহা জনগণের অসুবিধাজনক। তাহার বিচার ও পরিবর্ত্তনসাধন করা হউক।

৬ষ্ঠ দাবী—আমাদের জেলায় সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি করার পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে নিরাপত্তা আইন জারী রহিয়াছে। নিরাপত্তা আইন প্রতিষেধক আইন। কোন

স্থানের পরিস্থিতি গুরুতর ও বিপদসূচক হইলেই সেখানে প্রতিষেধক আইন জারী করা হয় এইজন্ত যে, অন্যায় করিবার পূর্ব্ব হইতে মানুষকে আইনে বাঁধিয়া রাখা হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অনুযায়ী আইনের আদর্শ হইল যে—আইন থাকিবে, যদি কেহ অন্যায় করে তবে সে আইনে পড়িবে। মহাত্মাজীর ৬ই এপ্রিলের যে অভিযান ছিল তাহা রাউলাট আইন নামক এই প্রকার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-হরণকারী অন্যায় আইনের বিরুদ্ধেই অভিযান ছিল। সমগ্র ভারত এই অন্যায় আইন রদ করিতে সেদিন বিরাট অভিযান করিয়াছিল। মানভূমে নিরাপত্তা আইন জারী করার মত কোন অবস্থা ছিল না বা নাই। উহা রাখিবার যৌক্তিকতা নাই। উহা কেবলমাত্র জনমত দমনের জন্তই রাখা হইয়াছে। যদি মানভূমে নিরাপত্তা আইন রাখা কোন দিক দিয়া প্রয়োজন হয় তবে নিরাপত্তা আইনের ব্যবহার করার ক্ষমতা আজ যাহাদের হাতে তাহাদের আচরণের বিরুদ্ধেই তাহা জারী থাকা প্রয়োজন। এই অন্যায়ভাবে জারী করা আইন প্রত্যাহার করিবার জন্ত আমরা দাবী জানাইতেছি।

৭ম দাবী—জেলায় জনগণের ভাষার উপর, শিক্ষার উপর, জেলার জীবন পরিচালনের স্বাধীন ইচ্ছার উপর আজ বহু প্রকারের বাধা ও অবিচার ঘটিতেছে। ভাষা ও শিক্ষার অধিকার অন্যায়ভাবে, কঠোরভাবে এবং বেআইনীভাবে পিষ্ট কর হইতেছে। এই সকল অন্যায় অবিচারপূর্ণ হস্তক্ষেপের অবসানের জন্ত দাবী জানাইতেছি।

৮ম দাবী—বিহার সরকার আজ এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিতেছেন। কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেস এই নীতি গ্রহণ করায় বিহার সরকারের চিন্তা হইয়াছে যে, মানভূমের অধিকাংশের ভাষা বাংলা হওয়ায় মানভূমের জনগণের কল্যাণ হইবে বিবেচনায় কংগ্রেস মানভূমকে ভাষার ভিত্তির নীতি অনুসারে বাংলার সহিত যুক্ত করিয়া দিবেন। তজ্জন্ত এই ভাষার ভিত্তির নীতির যথার্থ প্রয়োগকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে মানভূমের ভাষা হিন্দী প্রতিপন্ন করিতে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির আশ্রয় লইতেছেন। বিহার সরকারকে এই আচরণ হইতে নিবৃত্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মানভূমের ভাষা শিক্ষা বিষয়ে মানভূমের বাহিরের কাহারও হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নহে। মানভূমের জনগণই তাহা নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করিবে। ইহার যাহাতে ব্যতিক্রম না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে—ইহাই আমাদের দাবী।

৯ম দাবী—জনসাধারণের অমঙ্গলকারী, সমাজ-বিরোধী, কংগ্রেস-বিরোধী যে সকল ব্যক্তি জনগণের বিশ্বাসভাজন নহেন, তাঁহারা আজ নানাভাবে শাসন পরিচালকদের হাত হইতে এবং জনপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে জনগণের কার্য্য করিবার কর্ত্তৃত্ব এবং ক্ষমতা পাইতেছেন। এই সকল লোকের কার্য্যসমূহ বিচার পূর্ব্বক তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন যাহাতে এই সকল লোক এই ভাবে শাসন বিভাগ হইতে বা জনপ্রতিষ্ঠান হইতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা পাইয়া জনগণের অমঙ্গল করিতে না পারে। দেশের অগ্রগতির জন্ত আজ সর্ব্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থ ও দূষিত চক্র হইতে দেশের জনস্বার্থকে মুক্ত করা প্রয়োজন। তজ্জন্ত এ বিষয়ে কার্য্য-পন্থা গ্রহণ করা হউক। কতকগুলি সাময়িক পত্র দায়িত্ব-জ্ঞানহীনভাবে জনগণের মধ্যে ভেদ, বিদ্বেষ, প্রাদেশিকতা প্রচার করিতেছে তাহার বিচার করিয়া, তাহারা যাহাতে এই ক্ষতিকর কার্য্য করিতে সুযোগ না পায় তাহার ব্যবস্থা করা হউক। মানভূমে সহসা কতকগুলি নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান নিজেদের অন্যায় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত দেখা দিয়াছে। তাহারা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবে জনগণের মধ্যে ভেদ, বিদ্বেষ, দুর্নীতি প্রসার করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিচার করিয়া তাহাদের কর্ম্ম এবং উদ্দেশ্য অন্যায় প্রমাণিত হইলে, ইহাদের এই সুযোগ হইতে নিরস্ত করিতে হইবে ইহাই আমাদের দাবী।

১০ম দাবী—অন্ন প্রভৃতি ব্যাপারে জেলায় এক ব্যাপক দুর্নীতি ও ঘোর অব্যবস্থা চলিতেছে। জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের সরবরাহ ও বণ্টন বিষয়েও বহু অসুবিধা, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। অতি শীঘ্র এই সকল ব্যবস্থার অসুবিধা দূর করিয়া জনগণের কষ্টের লাঘব করা হউক ইহাই দাবী।

১১শ দাবী—সরকারী দুর্নীতির ফলে বহু জনের উপর বহু অবিচার ও ক্ষতিসাধন করা হইয়াছে। এই সকলের তদন্ত করিয়া যাহার যাহা ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্ত ক্ষতিপূরণ করা হউক ইহাই দাবী।

১২শ দাবী—মানভূমে অনুষ্ঠিত সর্ব্বপ্রকার অন্যায়ের—বর্ত্তমানে যাহা চলিতেছে এবং সম্প্রতি দেড় বৎসর যাবৎ যাহা মানভূমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হইয়াছে—তাহার পূর্ণরূপে তদন্ত, উপযুক্ত বিচার ও যোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। মানভূমের মুক্তি আন্দোলনের দাবীর যথার্থতা ও অধিকার স্বীকার করা হউক এবং জনসাধারণের জীবন হইতে এই বিশৃঙ্খলাময় অবস্থার অবসান করিয়া মানভূমের জীবন ক্ষেত্রকে সর্ব্বাঙ্গীণ গঠনমূলক কর্ম্মের ও পঞ্চায়েত শক্তির প্রসার ক্ষেত্ররূপে পরিণত ও পরিচালিত করার ব্যবস্থা করা হউক ইহাই আমাদের দাবী।

কংগ্রেসী শাসকবৃন্দের মধ্যে যে অহমিকা ও ক্ষমতা-লাভের লোভ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে এই

"সত্যাগ্রহের" প্রয়োজন ছিল। জাতি ও রাষ্ট্রের বন্ধু যাঁহারা তাঁহারা এই আন্দোলনের সাফল্য কামনা করিবেন।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন

গত পৌষ মাসে জয়পুর কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্ব্বে শাসনতন্ত্র গঠন পরিষদের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক নিয়োজিত কমিশন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করেন। ৩০ বৎসর ব্যাপী কংগ্রেসী নীতি তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়া দেন এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা অযৌক্তিক বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই অন্যায় ও অর্পিত মত দেশের গণ-মত গ্রহণ করিতে পারে নাই; তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলিয়া জয়পুর কংগ্রেসকে এক নূতন কমিটির উপর এই বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিতে বাধ্য করে। তিন জন সর্ব্বোচ্চ নেতার উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। গত ২৩শে চৈত্র এই ত্রয়ী তাঁহাদের ফতোয়া দিয়াছেন—বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন অযৌক্তিক। আমরা বিশেষ মনোযোগ সহকারে এই ত্রয়ীর মতামত বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই মতামতের সপক্ষে কোন যুক্তি পাইলাম না। একটা কথা আমাদের নিকট আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, বর্ত্তমান কংগ্রেসী নেতৃত্ব বর্ত্তমানে দেশের সম্মুখে যেসব সমস্যা দেখা দিয়াছে তৎসম্বন্ধে কোন মীমাংসা করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন; অবস্থার জটিলতা তাঁহাদের বিভ্রান্ত করিয়াছে; অতি সামান্য কোন সমস্যা সম্বন্ধে মনস্থির করিতে তাঁহারা ভয় পান। তাঁহারা দিনগত পাপ-ক্ষয় করিয়া যাইতেছেন; অবর্ণনীয় ভয় দেখাইয়া লোকমতকে স্তব্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ত্রয়ীর এই রিপোর্টের মধ্যে এই মনোভাবের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

"বর্ত্তমানে প্রদেশগুলির শাসনব্যবস্থা খুবই দুর্ব্বল। তদুপরি নূতন প্রদেশ গঠন দ্বারা চাপ বৃদ্ধি করা উচিত নয়।" শাসন-যন্ত্র দুর্ব্বল, কারণ তাহার যন্ত্রী যাঁহারা তাঁহারাও দুর্ব্বল। না হইলে উত্তর-ভারতে প্রাদেশিক সীমা সংশোধনের দাবীকে "সামান্য" বিষয় "(petty adjustment of provincial boundaries)" বলিয়া, তাহার সমাধান চেষ্টাও এড়াইয়া যাওয়া হইত না। বরং ইংরেজের ব্যবস্থার সপক্ষে এই তিন জন প্রাজ্ঞ কংগ্রেস-নেতা ওকালতী করিয়াছেন।

> "এই সকল প্রদেশের মূল যাহাই হউক না কেন, এবং তাহাদের গঠন যতই কৃত্রিম হউক না কেন, বর্ত্তমানে প্রত্যেকটি প্রদেশে শতাব্দীর রাজনীতিক, শাসনতান্ত্রিক এবং কিয়ৎপরিমাণে অর্থনীতিক ঐক্য কতকটা স্থায়িত্ব ও ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই যুক্তির বলে দুই শত বৎসরের মধ্যে বিদেশীর আধিপত্যে যে "ঐতিহ্যের" সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বজায় রাখিবার সপক্ষে অনেক যুক্তি ইংরেজ দিয়াছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরেজের সে যুক্তি অপাংক্তেয় ছিল। আজ তাহাও বাজারে উঠিলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইব না যখন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর আগামী লণ্ডন যাত্রাকে জয়ধ্বনিসহ অভ্যর্থনা করিবার অপেক্ষায় অনেকেই আছেন বলিয়া মনে হয়।

ভারতরাষ্ট্রের "মূলগত" নীতির ভিত্তি এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে—"বর্ত্তমান অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও অন্যান্য পৃথকীকরণের মনোভাবকে কোনরূপ উৎসাহ দেওয়া চলিবে না।" এই নীতিকে স্বীকার করিয়াও, মনেপ্রাণে এই নীতি গ্রহণ করিয়াও, এই কথা কি বলা যায় না যে, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্পর্কে যে দাবী বিগত ৪০ বৎসর হইতে ভাবে ও কর্ম্মে গৃহীত হইয়াছে, তার ফলে দেশে "পৃথকীকরণের" মনোভাব প্রশ্রয় পাইবে তাহা কি ভ্রান্ত ধারণা-প্রসূত? ভাষার বন্ধনে নানা জাতি, নানা লোক নানা পরিচয় যে ভাবে গ্রথিত হইয়া এক মহাভারতের সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় দিন গুনিতেছে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবর্গ তার মাহাত্ম্য বুঝিবেন না; সে সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। মহাভারতের ইতিহাসে যে ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশ প্রতি পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান, তাহার অর্থোদ্ধার করিবার শক্তি থাকিলে এই ঐতিহাসিক অনুজ্ঞা এরূপভাবে তাঁহারা লঙ্ঘন করিতেন না।

কংগ্রেসী ত্রয়ীর ফতোয়াকে আমরা গ্রাহ্য করার যোগ্য মনে করিতে পারিলাম না। কারণ ইহা জনমতকে বিভ্রান্ত করিয়া দেশের প্রকৃত সমস্যার প্রতি মনঃসংযোগ করিবার অবসর দিতেছে না। ভাষার ভিত্তির উপর ভারতরাষ্ট্রের পুনর্গঠনকে আমরা এমন কোন কঠিন কাজ বলিয়া মনে করি না। বাস্তবিকই তাহা "সামান্য" (petty)। কংগ্রেসী নেতৃবর্গ সাহস হারাইয়াছেন বলিয়াই ভয়ে তাহার সমাধান চেষ্টা করিতে পারিতেছেন না। বর্ত্তমান অবস্থা স্থায়ী হইতে দিলে বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী যে ভাবে ঐ প্রদেশে "শান্তি-রক্ষা" করিতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত ভারতরাষ্ট্রের দিকে দিকে বিস্তার লাভ করিবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টির সমক্ষে, মানভূম "সত্যাগ্রহের" উপর যে জুলুমবাজী চলিতেছে তাহার পরিণতি কি হইবে বা হইতে পারে, তাহা সর্দ্দার বল্লভ-ভাইয়ের মত লোকও বুঝিতে পারেন ন,—একথা আমরা বিশ্বাস করিতে অসমর্থ।

মানভূম সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে বামপন্থীদের মনোভাব

ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা পণ্ডিত শীলভদ্র যাজী মানভূম জেলার সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:

"আমি সবেমাত্র মানভূম জেলার আমার সফর শেষ

করিয়াছি। আমি ঝরিয়া, আদ্রা ও পুরুলিয়া পরিদর্শন করিয়াছি। জনসাধারণের মাতৃভাষা বাংলার উচ্ছেদ এবং অনিচ্ছুক লোকদের উপর জোর করিয়া হিন্দীভাষা চাপাইয়া দেওয়ার জন্য স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণ লোকদের উপর উৎপীড়ন করিতেছেন। মাতৃভাষা প্রচারে জনসাধারণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করার জন্য সরকারী কর্ম্মচারিগণ নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করিতেছেন। করাচী কংগ্রেসে এবং বর্ত্তমান গণ-পরিষদে মানুষের মৌলিক অধিকারের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বিহার সরকারের এবং স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যকলাপ তাহার বিরোধী।

"জিলার বহু ফরোয়ার্ড ব্লক কর্ম্মী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এখন সেখানকার অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাইতেছে। সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে মানভূম জেলা লোকসেবকসঙ্ঘের উত্তোক্তা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে জেলার প্রবীণ কংগ্রেস-কর্ম্মিবৃন্দ ৬ই এপ্রিল হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে জনসাধারণের শিক্ষালাভের অধিকার অর্জ্জন হইল ইঁহাদের প্রধান দাবি। অন্যান্য দাবি এই মৌলিক দাবি অথবা জনসাধারণের সেই মৌলিক অধিকার অস্বীকারের যে সম্মিলিত চেষ্টা চলিতেছে তাহা হইতে উদ্ভূত। মানভূম ও ধলভূমের বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসী হিন্দী ভাষার বিরোধী নহে; কিন্তু তাহাদের মাতৃভাষার স্থলে মানভূম ও ধলভূমের বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের উপর হিন্দীভাষা চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য জনসাধারণের আন্দোলনে বাধা দিতে নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করা অনুচিত।

আমি বিহারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এবং শিক্ষামন্ত্রীকে পুরুলিয়ায় গিয়া শ্রীযুক্ত অতুল ঘোষ এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহিত আপোষে মীমাংসা করিতে এবং তাঁহাদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লইয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

সরকারের বর্ত্তমান দমননীতি বাঙালীদের উপর নোয়াখালীর অনুরূপ শত শত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করার হুমকী দেখাইয়া রাঁচী ও অন্যান্য স্থান হইতে বেনামী চিঠিপত্র প্রেরণ এবং পরিষদে শ্রীবৃন্দাবনমোহন প্রসাদের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা অবস্থার উন্নতি হইবে না।

"আমি আশা করি বিহারের প্রধান মন্ত্রী পুরুলিয়া পরিদর্শন করিয়া মানভূম ও ধলভূমের বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের দাবি মানিয়া লইবেন। তাঁহারা শুধু তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন করিতেছেন।"

মানভূম সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে বামপন্থী ফরোয়ার্ড ব্লক তাঁহাদের কিংকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং সত্যের ও সত্যাগ্রহীদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। সোসালিষ্ট দলের মনোভাব এ বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া উচিত। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বিহারের লোক, তাঁর অভিমত প্রকাশ হওয়া দরকার।

মানভূম ও ধলভূম

মানভূম ও ধলভূম বাংলার প্রত্যর্পণের দাবি সম্পর্কে বিহার-সরকার মন স্থির করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বঙ্গভাষী অঞ্চল বাংলার ফেরত দিবেন না। ঐ অঞ্চলগুলি তাঁহাদেরই ছিল এই মিথ্যা ইতিহাস রচনার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বাংলা ভাষা উচ্ছেদ করিয়া হিন্দী প্রচলনের দ্বারা উহা হিন্দীভাষী অঞ্চলে পরিণত করিবার জন্যও তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ হইতে সুরু করিয়া মানভূমের ডেপুটি কমিশনার পর্য্যন্ত এ বিষয়ে একমত এবং একই উদ্দেশ্যে সেখানে বাংলা ভাষা উচ্ছেদের জন্য সরকারের দমননীতির তূণ হইতে সব কয়টি অস্ত্রই প্রয়োগ করা হইতেছে। শিষ্যবর্গের সত্যনিষ্ঠা ও অহিংসার পরিচয়ে রাজেন্দ্রবাবু নিজেকে নিশ্চয় ধন্য জ্ঞান করিতেছেন।

মানভূমে প্রবীণ কংগ্রেস-সেবকদের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। মানভূম ও ধলভূম বাংলায় প্রত্যর্পণের দাবির সহিত সত্যাগ্রহের কোন সম্পর্ক নাই, সত্যাগ্রহের কারণ স্পষ্ট ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যত্র আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম। সত্যাগ্রহ এবং প্রত্যর্পণ আন্দোলন মূলত: একই সমস্যা হইতে উদ্ভূত হইলেও উহা জড়াইয়া এক করা সমীচীন হইবে না। সত্যাগ্রহের নেতাদেরও তাহা ইচ্ছা নহে।

প্রত্যর্পণ আন্দোলন তীব্র করিয়া তোলার দায়িত্ব বাংলার। মানভূম সত্যাগ্রহের ফলে এই আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিলে উহা অস্বীকার করিবার উপায় কম থাকিবে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠন-বিষয়ক প্রস্তাবে ওয়ার্কিং কমিটির মনোভাবে বুঝা যায় যে আন্দোলন প্রবল হইলে ফল লাভের আশা আছে। কার্য্যতঃও তাহাই দেখা যাইতেছে। অন্ধ্রের নেতারা ও জনসাধারণ তাঁহাদের আন্দোলন সম্বন্ধে এত সজাগ যে, অন্ধ্রের দাবি উড়াইয়া দেওয়া যায় নাই, উহা স্বীকার করা হইয়াছে। বাংলার আন্দোলন হয় নাই বলিলেও চলে, এই জন্য বাংলা এত উপেক্ষিত হইতেছে। গণ-পরিষদে বাংলার প্রতিনিধিরা একটি মেমোরাণ্ডাম দাখিল করিয়াই নিরাময় হইয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিও একবার হঠাৎ উত্তেজিত হইয়াই পুনরায় পূর্ব্বের নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কিছুই করেন নাই। সভা ডাকিলে লোক হয় না, খবরের কাগজও গতানুগতিকতা

পরিহার করিয়া শক্ত হইতে পারিল না। বাংলার দাবী ব্যর্থ হইবে না তো কি ?

বীরভূম হইতে তাঁহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষকে জানানো হইয়াছে যে, তিনি যেন ওয়ার্কিং কমিটিতে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া কর্ত্তব্য পালন করেন। প্রধান মন্ত্রী থাকাকালে ডাঃ ঘোষ মানভূম প্রত্যর্পণ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন, এ বিষয়ে আন্দোলন নিষ্ফল ইহাও তিনি জানাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বিহার গিয়া বাঙালীদের সম্পর্কে যে সব কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন তাহাও বাঙালীদের সপক্ষে যায় নাই। এখন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেস সভাপতি নহেন, ডাঃ ঘোষেরও তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া প্রধান মন্ত্রীর গদীতে আসীন থাকার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। বোধ করি এই জন্যই সম্প্রতি দুই-একটা বক্তৃতায় তাঁহার পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তনের সুর একটুখানি অন্ততঃ ধরা পড়িতেছে। মেমোরাণ্ডামের দিন শেষ হইয়াছে, পরে কমিশন এবং ওয়ার্কিং কমিটির সাব-কমিটির রিপোর্ট পেশ হইয়াছে ; চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং আবেদন-নিবেদন মেমোরাণ্ডাম প্রভৃতি এখন নিরর্থক। এবার আন্দোলনের পালা আসিয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি নিজেই প্রকারান্তরে বলিয়া দিয়াছেন জনমত প্রবল না হইলে তাঁহারাই বা কি করিবেন ? পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের এখন আশু কর্ত্তব্য গণ-পরিষদে, ওয়ার্কিং কমিটিতে, নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে তাঁহাদের প্রতিনিধিবর্গকে সচেতন করিবার জন্য অবিরাম টেলিগ্রাম ও সভাসমিতির প্রস্তাব প্রেরণ করা যাহাতে তাঁহারা সজাগ হন এবং আন্দোলন আরম্ভ করিতে জোর পান। দেরাদুনে শীঘ্রই এ-আই-সি-সির অধিবেশন হইবে এবং উহাতে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব পাশ হইবে। বাঙালীকে এখানে সক্রিয় হইতে হইবে।

ভারতরাষ্ট্রের ভাষা-সমস্যা

উত্তর-ভারতের সংবাদপত্রে হিন্দী-হিন্দুস্থানীর মধ্যে কোন্‌টি ভারতরাষ্ট্রের সরকারী ভাষার স্থান অধিকার করিবে, তৎসম্বন্ধে উগ্র বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে ; কোন্ অক্ষরে তাহা লেখা হইবে তাহাও তর্কের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই তর্ক নূতন নয় ; গান্ধীজীর জীবদ্দশায় তাহার লক্ষণ দেখা দেয়। দেবনাগরী ও ফারসী এই উভয় অক্ষরে উত্তর-ভারতে প্রচলিত ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার কাম্য। শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন প্রমুখ কংগ্রেস-নেতা এই ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন ; গান্ধীজীর তিরোধানের পর তাঁহাদের বিরোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিতে পাই। ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু একটি প্রবন্ধে সম্প্রতি গান্ধীজীর অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন ; তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল ; ভারতবর্ষের ১৫ কোটি লোক হিন্দী ভাষাভাষী—এই যুক্তির জোরে তিনি হিন্দীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। ফার্সী অক্ষরে হিন্দুস্থানী ভাষার প্রচলনের সমর্থকেরা মুসলিম ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া "পাকিস্থানী" ওলট-পালটের পর বর্ত্তমানে নীরব আছেন। কিন্তু ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ প্রভৃতি ভারতরাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিক প্রধানগণ পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল প্রভৃতির মনোভাবের ঘোরতর বিরোধী ; এবং তাঁহাদের মন রক্ষার জন্যই পণ্ডিত নেহরু রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে আপাতবিরোধী মতামত প্রকাশ করিতেছেন।

দেশের অন্যান্য চিন্তানায়কগণ কি ভাবিতেছেন ও বলিতেছেন তাহার আলোচনারও প্রয়োজন আছে। দ্রাবিড়-ভাষাভাষী অঞ্চলের লোকেরা, বিশেষতঃ তামিল ভাষাভাষী লোকেরা, হিন্দী-হিন্দুস্থানী বিরোধী বলিয়া মনে হয়। তাহার নানা কারণ আছে। আচার্য্য বিনোবা ভাবে তাহার একটির বর্ণনা এই ভাবে করিয়াছেন :

> ব্যাকরণের দিক হইতে বাংলা ভাষা হিন্দীর তুলনায় অনেক সহজ। বাংলা ভাষায় লিঙ্গের পরিবর্ত্তনের সহিত মূল শব্দের পরিবর্ত্তন হয় না। যদি হিন্দী ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে সাত দিন লাগে তবে বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে এক দিন লাগিবে। দক্ষিণ ভারতের ভাষা-সমূহের মধ্যে মালয়ালম্ ভাষায় ক্রিয়ার ব্যবহার অতি সহজ। মালয়ালম্ ভাষায় ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান যে কোন কাল সম্পর্কে মূল ধাতু ব্যবহার করা হউক না কেন, লিঙ্গ এবং পুরুষের পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে না। দক্ষিণ ভারতের কোন ভাষায়ই লিঙ্গের ব্যবহার মোটেই জটিল নয়। পশু জগতে পুরুষ পশু পুংলিঙ্গের, স্ত্রীপশু স্ত্রীলিঙ্গের, অন্যান্য বিশেষ্য ক্লীব-লিঙ্গের। কিন্তু হিন্দীভাষায় 'পাত্‌থর' (প্রস্তর) শব্দ পুংলিঙ্গ, 'দিবাল' (দেওয়াল) প্রস্তরের দ্বারা প্রস্তুত হইলেও তাহা স্ত্রীলিঙ্গ। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের নিকট ইহা অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়, এবং এইজন্য হিন্দীকে তাহারা কঠিন বলিয়া মনে করে।

হিন্দীর উগ্রপন্থী প্রচারকেরা সমস্ত বিদেশী শব্দকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইতে দূর করিয়া দিবার পক্ষপাতী। আচার্য্য ভাবে, হিন্দী-হিন্দুস্থানীর সমর্থক হইয়াও, এই দাবির বিরোধী ; এই বিষয়ে তাঁহার মনোভাব ১৯৪৯ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ওয়ার্দ্ধায় যে রাষ্ট্রভাষা প্রচারক সম্মেলন হইয়াছিল সেই উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতায় স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে ; বর্ত্তমানে হিন্দীর যে রূপ প্রকট করিয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহা সংশোধিত না হইলে, রাষ্ট্রভাষা লইয়া একটা বিরাট

সমতা দেখা দিবে, এরূপ আশঙ্কার ইঙ্গিতও তিনি করিয়াছেন।

বাঙালী আজ হৃতবল; ৬।৭ কোটি লোকের মাতৃভাষা বলিয়া ভারতরাষ্ট্রে তাহার শ্রেষ্ঠতার দাবি লইয়া উপস্থিত হইতে পারিতেছে না; ভাব ও চিন্তার মাধ্যমরূপে তাহার দাবি "সত্য" বলিয়া গ্রহণ করিয়াও আচার্য্য ভাবে হিন্দী-হিন্দুস্থানীর সমর্থক। এই বিষয়ে "প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের" বড়-বিংশ অধিবেশনের সভাপতিরূপে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য:

> প্রদেশের রাষ্ট্রকাজ চলবে প্রত্যেক প্রদেশের মুখ্য ভাষায়, সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রকাজের জন্য প্রচলিত ভাষার মধ্যে একটি কি দুটি ভাষা বেছে নিতে হবে, প্রয়োজন হলে তাদের বদলে নিতে হবে। এই সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রকাজের ভাষার নাম দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রভাষা। প্রদেশের রাষ্ট্রকাজও চলুক এই রাষ্ট্রভাষায় এমন দাবিও কিছুদিন শোনা গিয়েছিল, এখন আর বড় যায় না। বোধ হয় রাষ্ট্রভাষার অত্যুৎসাহী ভক্তরাও বুঝেছেন যে, তার অর্থ প্রদেশের রাষ্ট্রকাজ চলবে সেই ভাষায় প্রদেশের জনসাধারণের যার সঙ্গে পরিচয় নেই। এবং কোনও ঐক্যের খাতিরেই এই রাষ্ট্রভাষা যে সব প্রদেশের মাতৃভাষা নয় তার লোকেরা এ আবদার সহ্য করবে না। কিন্তু সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রকাজের জন্য যে রাষ্ট্রভাষা তাকে ঘিরেই তর্ক ও দ্বন্দ্ব জমা হয়েছে।
>
> এই দ্বন্দ্বের তর্কে ভেবে দেখা ভাল ভারতবাসীর জীবনে এই রাষ্ট্রভাষার প্রসার ও প্রভাব কতটা। এই রাষ্ট্রভাষা হবে কাজ চালাবার ভাষা এবং কেবল ভারত মহারাষ্ট্রের কেন্দ্রের ও সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রকার্য্যের কেজো ভাষা, ও তাষার বাধ্যকর শিক্ষা তাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে যারা ঐ রাষ্ট্রকার্য্যের কর্ম্মপ্রার্থী ও সর্ব্বভারতীয় পলিটিক্যাল রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উচ্চাশা যাদের আছে। তারা একটু অসাধারণ লোক। মাতৃভাষা না হলেও এ ভাষা কাজ চালাবার মত শিখতে তাদের বেশী কষ্ট কি অসুবিধা হবার কথা নয়। বরং এ প্রস্তাব সমীচীন যে, হিন্দীর সঙ্গে একটি দাক্ষিণাত্যের ভাষাকেও সমমর্য্যাদার রাষ্ট্রভাষা করা হোক। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মনের মধ্যে যে একটি বিন্ধ্যপর্ব্বত আছে, তার শৃঙ্গ এতে কিছু নীচু হবে। যে অল্পলোকের রাষ্ট্রভাষা শিখতেই হবে একটির জায়গায় দুইটি ভাষা তাদের আয়ত্ত করা কঠিন নয়। হিন্দীভাষীদের তো একটি মাত্র অতিরিক্ত ভাষা শিখতে হবে। যাঁরা অপরকে নিজের ভাষা শিখতে ক্রমাগত বলছেন, একটা পরের ভাষা শিখতে তাঁদের আপত্তি থাকতে পারে না। বিশেষতঃ ভারতীয় ঐক্যের এও একটা বন্ধনী। কিন্তু এই রাষ্ট্রভাষাকে ভারতবর্ষের সকল বিদ্যালয়ে অবশ্য-শিক্ষণীয় করার কোনও অর্থ নেই। এই কেজো ভাষা যার কাজে প্রয়োজন সে শিখবেই। যার প্রয়োজন নেই তার উপর একটা অনাবশ্যক ভাষা শিক্ষার চাপ অত্যাচার। এ চাপে অনেক শিক্ষার্থীর মনের বিকাশ রুদ্ধ হয়।

এই প্রস্তাব সাহিত্য-রস-বেত্তার নয়, ইহা ভারত-রাষ্ট্রের একজন নাগরিক-প্রধানের। অতুলবাবু যে সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব করিয়াছেন, সেই সমস্যার "গভীরে" প্রবেশ করিলে যে উৎকট মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই বিপদের প্রতিও তিনি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছেন:

> বিরোধ আরম্ভ হবে যদি রাষ্ট্রভাষাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গায় চালাবার চেষ্টা হয় ওকে National Language নাম দিয়ে। যদি ও ভাষার সাহিত্যকে সাহিত্যিক বিচারে অন্য ভারতীয় ভাষার শ্রেষ্ঠতর সাহিত্যের চেয়ে বড় মর্য্যাদা দেবার চেষ্টা হয় রাষ্ট্রভাষার লেখা সাহিত্য বলে। রাষ্ট্রীয় ঐক্যের নামে যাঁরা রাষ্ট্র-ভাষাকে সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রকাজের ভাষা না রেখে সর্ব্ব-ভারতীয় ভাষা বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন তাঁদের মনে জাতি ও রাষ্ট্র এক, নেশন ও ষ্টেটে ভেদ নেই। কিন্তু জাতি ও রাষ্ট্র এক নয়। রাষ্ট্র জাতির একটা বিশেষ প্রকাশ মাত্র। রাষ্ট্ররূপের অতিরিক্ত জাতির বহুধা প্রকাশ রয়েছে। রাষ্ট্র যতই জাতির জীবনে বহুপ্রসারী হোক তার বাইরেও জাতির জীবন রয়েছে। যে জাতির নেই তার দুরদৃষ্ট। বৃহৎ জীবন থেকে সে জাতি বঞ্চিত। জার্ম্মানীর দুর্দিনে যখন সমস্ত জার্ম্মান জাতিকে একরাষ্ট্রে না বাঁধলে জাতির মৃত্যু ঘটবে মনে হয়েছিল তখন জার্ম্মান দার্শনিক জাতি ও রাষ্ট্রের, নেশন ও ষ্টেটের অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছিলেন। তার পর থেকে জার্ম্মানীর ভিতরে ও বাহিরে যখন যে শক্তিকামী রাষ্ট্রনেতা কি সমর-নায়কের প্রয়োজন হয়েছে এই আপদর্শকে ধ্রুবসত্য বলে প্রচার করেছেন। আরম্ভের ফল ফলেছে, কিন্তু পরিণামে হয়েছে সর্ব্বনাশ। এ তত্ত্বের বিকট পরিণতি আমরা দেখেছি হিটলারের জার্ম্মানীতে, মুসোলিনীর ইতালীতে। ষ্ট্যালিনের রুশিয়ায় এ পরিণতি অসম্ভব নয়। দুর্ভাগ্য সেই জাতি, দুর্ভাগ্য সেই যুগ যার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা পলিটিক্স। ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা এ পরিণাম থেকে ভারতবাসীকে রক্ষা করবেন।

বিহার প্রদেশের বর্ত্তমান শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া মনে ভরসা পাওয়া যায় না যে আমরা এই বিপদের হাত হইতে উদ্ধার পাইব।

আসামে বাঙালীর বিরুদ্ধে আর একদফা অভিযান

গৌহাটির দৈনিক "অসমীয়া"র ৩০শে মার্চ তারিখের সংখ্যায় আসাম জাতীয় মহাসভার সম্পাদক শ্রীঅম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী বাঙালখেদা আন্দোলনের নূতন আর এক পর্ব্ব আরম্ভ করিয়া একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন আসামে কাহারও বাংলায় কথা বলা উচিত নয়। "বাঙালী প্রণীত কোন পুস্তকই অসমীয়াদের পড়া উচিত নহে বরং অবাঙালী প্রণীত যে কোন হিন্দী বা ইংরেজী পুস্তক অসমীয়াদের পড়া কর্ত্তব্য।" তাঁহার মতে আসামের বাঙালীরা অসমীয়া ভাষা শিখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আসামের শত্রুতা করিয়াছে, এবং "এরূপ শত্রুদিগকে আসামে থাকিতে দেওয়া বিপজ্জনক।" "আসামের অধিবাসীদের বাংলা গান শুনা বা বাংলা সিনেমা দেখা উচিত নয়। যে সমস্ত দোকানে বাংলা সাইনবোর্ড আছে, সেগুলির পরিবর্ত্তন করিয়া অসমীয়া ভাষায় করা দরকার।"

বাঙালীর উপর আসামে আর এক পর্ব্ব আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার ইঙ্গিত এই বিবৃতিতে সুস্পষ্ট। বাঙালীরা অসমীয়া ভাষা শিখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আসাম-প্রবাসী প্রত্যেক বাঙালী সেখানে অসমীয়াদের সঙ্গে অসমীয়া ভাষাতে কথা বলেন, বাংলায় বলেন না, যেমন এখানে আমরা হিন্দী-ভাষীদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলি, তাহারা কেহ বাংলা বলে না। আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াও বিদেশী বা ভিন্ন প্রদেশবাসীকে তুষ্ট করিবার এই মজ্জাগত অভ্যাস বাঙালী কোথাও ছাড়ে নাই, আসামেও নয়। বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে বহুজনের কথা বাংলা হইলেও উহাতে হিন্দীর টান বেশ বুঝা যায়। আসামের বা বিহারের বাঙালী বাংলার সঙ্গে অসমীয়া বা হিন্দী শিখিতে কখনও আপত্তি করে নাই, মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্ত্তে অসমীয়া বা হিন্দী চাপাইবার প্রতিবাদ তাহারা করিয়াছে।

আসাম বা বিহার গবর্মেণ্ট বাঙালীর বিরুদ্ধে যে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে তাহা করাচী কংগ্রেসে এবং গণপরিষদে গৃহীত ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। ভারত-সরকার কিরূপে ইহাতে উদাসীন রহিয়াছেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়।

ক্ষুদিরাম-স্মৃতি উদ্বোধনে পণ্ডিত নেহরুর অনিচ্ছা

মজঃফরপুরে বিহার রাজনৈতিক সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরুর আগমনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর স্মৃতিরক্ষা কমিটি ক্ষুদিরাম স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি স্থাপনের জন্য পণ্ডিত নেহরুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী প্রথমটা রাজী হইয়াছিলেন। স্মৃতি কমিটিকে জানান হইয়াছিল যে, বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সহিত পরামর্শ ক্রমে যেন প্রোগ্রাম ঠিক করা হয়। শেষ মুহূর্ত্তে কমিটিকে জানান হয় যে, পণ্ডিতজী নীতিগত ভাবে 'এইরূপ অনুষ্ঠানের সহিত নিজেকে যুক্ত করার ঘোর বিরোধী। নীতিগত বিরোধ কবে এবং কোথায় হইল আমরা তাহা বুঝিলাম না। আই-এন-এর বীর শাহনওয়াজ প্রভৃতি যখন কোর্ট মার্শালে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তখন পণ্ডিতজী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়াছিলেন। ভগৎ সিংহের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা লাহোর কংগ্রেসে প্রকাশ পাইয়াছে। এই সেদিনও তিনি চন্দ্রশেখর আজাদের মাতাকে অর্থসাহায্য করিয়াছেন। ১৯৪২-এর বিপ্লব অহিংস সত্যাগ্রহ ছিল না, তাহার অন্যতম কীর্ত্তিস্থল বালিয়া জেলার বীরত্বের প্রশংসা তিনি প্রকাশ্যে করিয়াছেন। বিয়াল্লিশের বিপ্লবে যাঁহাদের জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল তাঁহাদিগকে উহা ফেরত দেওয়া হইয়াছে। অহিংস বিপ্লব ও সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে যে আবরণটুকু ছিল, পণ্ডিতজী নিজে কখনও তাহাতে খাঁটি গান্ধীপন্থীসুলভ গোঁড়া মনোভাব দেখান নাই, বিয়াল্লিশের বিপ্লবের পর কংগ্রেস নিজেই যাহাকে হিংস সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল তাহাকে মানিয়া লইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। অনেক খাঁটি অহিংস কংগ্রেসসেবী বিয়াল্লিশের হিংস সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন। গান্ধীজীও ইহা জানিতেন, পণ্ডিতজীও নিশ্চয়ই জানেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মন্ত্রীপদও দখল করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে আদর্শগত বা নীতিগত কারণে কংগ্রেসে স্থান দিতে কেহ আপত্তি করে নাই। বাংলার বিপ্লবী নায়কদের মধ্যেই বহুজনে কংগ্রেসে যোগ দিয়া কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়াছেন। এখন হিংসা-অহিংসার তৌলদণ্ডে স্বদেশপ্রেম মাপিবার দিন শেষ হইয়াছে ইহাই দেশবাসীর বিশ্বাস। এই সময়ে অকস্মাৎ ক্ষুদিরাম স্মৃতি উদ্বোধনে পণ্ডিতজীর অস্বীকৃতি রূঢ় আঘাতরূপে দেশের তরুণদের উপর পড়িয়াছে। ক্ষুদিরাম ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক বিশিষ্ট অধ্যায় সুরু করিয়াছিলেন, তাঁহার সে দান পণ্ডিতজী অস্বীকার করিতে পারেন কিন্তু ইতিহাস অনন্তকাল তাহা সোনার অক্ষরে বুকে ধরিয়া রাখিবে।

পশ্চিমবঙ্গের নূতন বিপদাশঙ্কা

বারাসত-বনগাঁও-বসিরহাট অঞ্চলের সুপ্রতিষ্ঠিত মুখপত্র "সংগঠনী" পত্রিকার ১৬ই চৈত্রের সংখ্যায় নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-শস্যের অবস্থা চিন্তা করিয়া এই বিষয়ের প্রতি আমরা পশ্চিমবঙ্গের গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি:

২৪-পরগণার সীমান্তবর্তী এলাকা বনগাঁ ও গাইঘাটার প্রত্যহই পাকিস্থানের ত্রিপুরা, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলা হইতে বহু মুসলমান পরিবার আসিয়া স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীদের সাহায্যে বিনামূল্যে বা অল্প মূল্যে জমি সংগ্রহ করিয়া সীমান্ত এলাকায় বসবাস স্থাপন করিতেছে; এবং ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উহারা বসবাসের জন্ত সীমান্ত এলাকাই বাছিয়া লইতেছে, কিছুতেই প্রদেশের অভ্যন্তরে যাইতেছে না। ইতিমধ্যেই কয়েক শত পরিবার আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে এবং অনেক হিন্দু জমিদারের নিকট হইতেও জমি সংগ্রহ করিতেছে। একে ত পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তত্যাগী হিন্দু পরিবারদের আগমনে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে তাহার উপর এইভাবে যদি মুসলমান অধিবাসীরা এখানে আসিতে থাকে তাহা হইলে খাদ্য-সংকট আরও ঘনায়মান হইবে। আর এই সমস্ত মুসলমান পরিবার কি উদ্দেশ্যে সীমান্তবর্তী এলাকায় আসিয়া ভীড় জমাইতেছে তাহাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আন্দামান দ্বীপে বাঙালী বসতি

গত ৩০শে ফাল্গুন কলিকাতার জাহাজ-ঘাট হইতে প্রায় ৫০০ শত উদ্বাস্তু স্ত্রী-পুরুষ-শিশু "মহারাজ" নামক জাহাজে আন্দামান যাত্রা করিয়াছেন।

ইঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আরও এক শত পরিবার আন্দামানে গমন করিয়াছেন। এই দুই দলের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী ও গ্রাম্য-শিল্প-জীবী। প্রত্যেক পরিবারে ৩০ বিঘা জমি পাইবেন; ছয় মাস এক বৎসর খাদ্যশস্য ও অন্য প্রকার অর্থ সাহায্য পাইবেন সরকার হইতে; শিল্পীরা পাইবেন শিল্পের সরঞ্জাম; গৃহনির্ম্মাণের জন্তও অর্থ সাহায্য পাইবেন; চাষের জন্ত গো ও মহিষ পাইবেন। আন্দামানের আবহাওয়া পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের আবহাওয়ার সদৃশ; সেইজন্ত আশা করা যায় এই অভিযাত্রীরা সশরীরে সুস্থ থাকিবেন।

আমরা জানি না এই দ্বীপপুঞ্জে কত লোকের ব্যবস্থা হইতে পারে; কেহ বলিতেছেন এক লক্ষ; কেহ বলিতেছেন দুই লক্ষ; এর বেশী লোকের সংস্থান হইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের উপযোগী জীবনযাত্রা সংস্থান করিবার জন্ত কত দিন লাগিবে, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমানে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। এইরূপ গঠন-কার্য্যে বাঙালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর স্থান নিজেদের করিয়া লইতে হইবে। এই ব্যাপারে কেহ অগ্রণী হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাই নাই। যদি তাঁহারা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের অপেক্ষায় কেহ বসিয়া থাকিবে না; আন্দামানের বাঙালী সমাজের মধ্য হইতে এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি হইলে আমরা খুশী হইব।

একটা কথা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। এই যে ৬০০।৭০০ শত বাঙালী অনির্দ্দিষ্টতার আহ্বানে দেশত্যাগ করিলেন, তাঁহারা বাঙালী সমাজের অঙ্গ; তাঁহাদের সঙ্গে বাঙালী প্রধানমন্দের হৃদয়-মনের যোগ রক্ষা করিতে হইবে।

রাজস্ব আদায়ে গলদ

আয়-কর, বিক্রয়-কর, ভূমি-রাজস্ব প্রভৃতি বিভাগ কর্তৃক নির্দ্ধারিত সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব দ্রুত আদায়ের জন্ত সার্টিফিকেট জারীর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই বিভাগের গলদের জন্ত বহু টাকা মারা যাইতেছে বা অনাদায়ী থাকিতেছে। সার্টিফিকেট অফিসারেরা ইচ্ছা করিয়া একটু ঢিলা দিলে নাজির প্রভৃতি বড় বড় দেনদারের ঠিকানা পাওয়া গেল না বলিয়া রিপোর্ট দেয় অথবা নানা অছিলায় টালবাহানা করিয়া খাতককে সম্পত্তি বেচিয়া সরিয়া পড়িবার সুযোগ দেয়। ইহাতে ইহাদের কিছু উপরি রোজগার হয় বটে, কিন্তু প্রভূত পরিমাণ রাজস্ব ইহাতে অনাদায়ী থাকে ও শেষ পর্য্যন্ত মারা যায়। কলিকাতার অনেক রাজস্ব আলিপুর সার্টিফিকেট আপিস কর্তৃক আদায় হয়। এই বিভাগের কার্য্যকলাপে কিছু কিছু গলদের সংবাদ শোনা যাইতেছে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে তদন্ত করিলে ভাল হয়।

নূতন বিক্রয়-কর আইন

বিক্রয়-কর সংশোধন আইন কার্য্যকরী হইয়াছে এবং নূতন আইনে কর আদায় আরম্ভ হইয়াছে। সরিষার তৈল, দেশলাই ও খবরের কাগজ আপাততঃ রেহাই পাইল কিন্তু কয়লা, কাঠ, ফল, ফুল প্রভৃতির উপর কর রহিয়া গেল। ফলের উপর ট্যাক্স আদায় লইয়া ইতিমধ্যেই গোল বাধিয়াছে, সংবাদপত্রে প্রকাশ মালগাড়ী বোঝাই যে সব ফল আসিয়াছে তাহা ডেলিভারী লইতে ফলওয়ালারা আপত্তি করিতেছে, বহু ফল পচিয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

বাংলাদেশে বিক্রয়-করে বহু প্রকার গলদ রহিয়াছে—ইহা আমরা কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি। নূতন সংশোধনেও এমন ব্যবস্থা রহিয়া গিয়াছে যাহাতে কর আদায়ের জটিলতা এবং করের উপর সাধারণের বিরক্তি থাকিয়াই যাইবে। উচ্চহারে এক পয়েন্ট বিক্রয়-কর এমন একটি জিনিষ যাহা দিতে গিয়া লোকের সামর্থ্যে কুলায় না এবং অসন্তোষ জন্মায়। সামান্ত হারে 'অল-পয়েন্ট' কর ইহার চেয়ে ভাল, কারণ উহা পরোক্ষ কর হইয়া পড়ে এবং সাধারণ ক্রেতারা উহা টের পায় না। করের হার কম থাকিলে পণ্যমূল্যের উপরেও উহার প্রত্যক্ষ প্রভাব কম পড়ে। মাদ্রাজে এই কারণে কর কম, আদায় সবচেয়ে বেশী এবং লোকে বিক্রয়-করের উপর অসন্তুষ্ট নয়।

বিক্রয়-কর একপয়েন্ট করিতে হইলে এমন জিনিষের উপর উহা বসানো উচিত যাহাতে লোকে পীড়িত না হয়।

বাংলাদেশে এটা আগেও কম দেখা হইয়াছে, নূতন সংশোধনে তো এই নীতির মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। বিক্রয়-করে অন্য সমস্ত প্রদেশের চেয়ে বাংলার জনসাধারণ বেশী বিব্রত হইতেছে। কারণ এখানে কর-নির্দ্ধারণ-নীতি ভুল, কর আদায়ে গলদ অত্যন্ত বেশী।

এখানে রেজিষ্টার্ড ডিলারদের নিকট হইতে কর আদায় হয়। ম্যানেজিং এজেন্সির দৌলতে বড় বড় কলকারখানা ভুঁইফোঁড় কোম্পানী খাড়া করিয়া তাহাদের নিকট হইতে মাল কেনে এবং তাহাদের নিকটে বিক্রয় করে। কারখানা এবং ভুঁইফোঁড় কোম্পানী উভয়েই রেজিষ্টার্ড ডিলারের সার্টিফিকেট লয়। এক রেজিষ্টার্ড ডিলার হইতে অপর রেজিষ্টার্ড ডিলারের ক্রয়-বিক্রয়ে কর লাগে না, যে রেজিষ্টার্ড ডিলার আন-রেজিষ্টার্ড ডিলারকে বিক্রয় করে তাহাকে শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে কর আদায় করিয়া সরকারে জমা দিতে হয়। বছরখানেক ব্যবসা চালাইয়া রেজিষ্টার্ড ডিলার কোম্পানী কারবার গুটাইয়া চলিয়া যায় এবং কর আদায় হয় না। কেবল রেজিষ্টার্ড ডিলার হইয়া মাল বেচাকেনা দ্বারা বিক্রয়-কর আত্মসাৎ করাই আজকাল একটা নূতন লাভজনক ব্যবসা দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

আমরা আগেও বলিয়াছি চটকলের চট ও থলিয়ার উপর বিক্রয়-কর বসানো হউক। মাদ্রাজের রপ্তানী দ্রব্য চামড়ার উপর বিক্রয়-কর আছে, বোম্বাইয়ের রপ্তানী দ্রব্য কাপড়ের উপর বিক্রয়-কর বসানোতে তাহাদের আয় প্রায় তিন কোটি টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। বাংলার চট ও থলিয়া একচেটিয়া কারবার, উহার উপর বিক্রয়-কর বসাইলে অন্ততঃপক্ষে তিন কোটি টাকা আয় হইবে এবং অনায়াসে বই, কাগজ, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, কয়লা, ফুল, ফল প্রভৃতি বাদ দেওয়া চলিবে। এটা কেন করা হইতেছে না আমরা তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না।

বিক্রয়-কর আপিসের অনেক কর্ম্মচারীর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ আছে ইহা আমরা আগেও বলিয়াছি। বর্ত্তমান কমিশনার বহু ভুল করিয়াছেন। দেড় বৎসর পূর্ব্বে বাড়তি অফিসার বলিয়া একদল সাব-ডেপুটি কালেক্টর ও সাব-রেজিষ্ট্রারকে বিক্রয়-কর আপিসে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইঁহারা এতদিনে কাজকর্ম্ম খানিকটা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন, এবার ইঁহাদিগকে সরাইয়া আবার নবনিযুক্ত নূতন লোক আনিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইঁহারা কি সকলেই অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন? বাংলায় অপ্টেড অফিসার বাড়তি হইয়াছে একথা বারবার বলা হইয়াছে, তবে নূতন লোক নিযুক্ত করাই বা হইতেছে কেন, ইঁহারা যখন কাজ শিখিয়া ফেলিয়াছেন তখন ইঁহাদিগকে সরাইয়া আবার বাড়তি অফিসারে পরিণতই বা করা হইতেছে কেন? বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে বি-কম পাস এবং মার্চ্চেন্ট আপিসের অভিজ্ঞতা না থাকিলে দরখাস্ত নিষ্ফল। ইহারও তাৎপর্য্য দুর্ব্বোধ্য। আয়-কর বিভাগে অর্থনীতি বা অঙ্কে অনার্স গ্রাজুয়েট এবং এম-এ পাশ ছেলেদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হয় এবং তাহাদের মধ্যে বাছাই করিয়া উপযুক্ত লোক লওয়া হয়। ইহাতে দক্ষ অফিসারের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বিক্রয়-কর আপিসে বি-এ, এম-এ বাদ দিয়া শুধু বি-কমের উপর ঝোঁক দেওয়ার অর্থ কি? অভিজ্ঞতার দিকে মার্চ্চেন্ট আপিসের অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র যোগ্যতা করা হইয়াছে, বিক্রয়-কর আপিসের অভিজ্ঞতা পর্য্যন্ত বাদ দেওয়া হইয়াছে; বিক্রয়-কর আপিসে বি-এ, বা এম-এ পাশ অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীরাও আবেদন করিতে পারিবেন না, বিজ্ঞাপনে ইহাই বুঝা যায়। ইহাতে বিক্রয়-কর আপিসে অসন্তোষ সৃষ্টি হইতে বাধ্য। এসিষ্টাণ্ট কমিশনার পদের জন্য সরাসরি দরখাস্ত আহ্বান করা হইয়াছে; ইহাও যুক্তিসহ নহে। এসিষ্টাণ্ট কমিশনারেরা আপীল শোনেন, ট্যাক্স অফিসাররূপে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা না থাকিলে আপীলের বিচার ভাল হইতে পারিবে না। যুক্তপ্রদেশ এবার বিক্রয়-করের আওতা হইতে অনেক জিনিষ বাদ দিয়া দিয়াছে, বিহার বিক্রয়-কর অর্দ্ধেক কমাইয়া এক পয়সা করিয়াছে, অথচ বাংলায় কি অবস্থা! এখানে কর আদায় ঠিকমত হইলে নূতন জিনিষের উপর কর বসাইবার প্রয়োজন তো হইতই না, বরং আরও কতকগুলি জিনিষকে করের কবল হইতে মুক্ত করা যাইত। বিক্রয়-কর আপিসের গলদ তদন্তের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষাবিল

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের বাজেট অধিবেশন শেষ হইয়াছে। শেষের দিকে মাধ্যমিক শিক্ষাবিল সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট দাখিল করা হইয়াছে। পরিষদের পরবর্ত্তী অধিবেশনে বিলের দফাওয়ারি আলোচনা আরম্ভ হইবে। মূল বিলের কতকগুলি প্রস্তাব সিলেক্ট কমিটি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ও উহার কার্য্যকরী পরিষদকে বিভিন্ন স্বার্থের অধিকতর প্রতিনিধিমূলক করিবার উদ্দেশ্যে উহাদের গঠনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন; বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি নিয়োগ বিষয়ে বোর্ডের ক্ষমতা বাড়াইয়াছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপূর্ণ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন।

সিলেক্ট কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, মূল বিলে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আরও অধিকতর প্রতিনিধিমূলক করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত বোর্ডের গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তন সাধন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। মূল বিলে বোর্ডের মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৪২, কমিটি সদস্য-সংখ্যা বাড়াইয়া মোট ৪৪ করিবার সুপারিশ করিয়াছেন।

তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব কর্মচারী বা মনোনীত ব্যক্তিদের লইয়া মোট নয়জন সরকারী সদস্য থাকিবেন। আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ডে মূল বিলে প্রস্তাবিত সাত জনের পরিবর্তে এক্ষণে মোট আট জন সদস্য থাকার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারও পদাধিকারবলে বোর্ডে থাকিবেন।

বোর্ডের গঠনতন্ত্রে কমিটি যে পরিবর্ত্তনের সুপারিশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে এই যে, বোর্ডে প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষয়িত্রীগণের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে এবং কমিটি বোর্ডে শিক্ষকগণের দুই জন শিক্ষক প্রতিনিধি এবং শিক্ষয়িত্রীদের একজন শিক্ষয়িত্রী প্রতিনিধি থাকিবার সুপারিশ করিয়াছে। কমিটি অপর পক্ষে বোর্ডে বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকগণের মূল বিলে প্রস্তাবিত চারি জন প্রতিনিধির স্থলে তিন জন প্রতিনিধি এবং প্রধান শিক্ষয়িত্রীগণের দুই জন প্রতিনিধির স্থলে এক জন প্রতিনিধি থাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বোর্ডে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ম্যানেজিং কমিটিগুলির প্রতিনিধির সংখ্যা মূল বিলে প্রস্তাবিত তিন জনই রাখা হইয়াছে।

কমিটি বোর্ডে জেলা স্কুল বোর্ডগুলির দুই জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি থাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মূল বিলে জেলা স্কুল বোর্ডগুলির প্রতিনিধিত্বের কোন ব্যবস্থা ছিল না। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষদ্বয়কে পদাধিকারবলে বোর্ডে সদস্য লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকারী যুব-মঙ্গল অফিসারও পদাধিকারবলে বোর্ডের সদস্য থাকিবেন বলিয়া সুপারিশ করা হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটি এইরূপ সুপারিশ করিয়াছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠিত হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গ্রহণ বন্ধ হওয়ার দরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আর্থিক ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে বার্ষিক কত টাকা সাহায্য করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া ঐজন্য বিলে প্রস্তাবিত ট্রাইব্যুন্যাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৭, ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সালে ৩০শে জুন তারিখে যে বৎসরগুলি শেষ হইতেছে, সেই বৎসরগুলিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক আয়ব্যয়ের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। মূল বিলে বিশ্ববিদ্যায়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব করিবার ব্যাপারে বিশেষ কোন বৎসর নির্দ্দিষ্ট করা ছিল না। কমিটি আরও বলিয়াছেন যে, ঐভাবে ট্রাইব্যুন্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক অর্থসাহায্যের যে পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন তাহা চিরতরে ঐ একই রূপ নির্দ্ধারিত থাকিবে এবং ট্রাইব্যুন্যালের ঐ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে রদবদল করিবার কোন ক্ষমতাই কোন আদালত বা অপর কোন্ কর্তৃপক্ষের থাকিবে না। আর কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ট্রাইব্যুন্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত তিন বৎসরের যে যে খাতের আয়ব্যয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন সেইগুলি হইতেছে: ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থিগণ কর্তৃক প্রদত্ত ফীর টাকার পরিমাণ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রবেশিকা পরীক্ষার টেক্‌স্‌ট বই-সমূহের আয়, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিবিধ রূপ ব্যয়, প্রবেশিকা পরীক্ষার টেক্‌স্‌ট বইগুলি প্রকাশের ব্যয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ বন্ধ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোনরূপ আয় বন্ধ হইলে সেই আয়ের পরিমাণ।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি আমরা আগেও সমর্থন করিতে পারি নাই, সিলেক্ট কমিটি হইতে উহা যে আকারে বাহির হইয়াছে তাহাতেও আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। মুসলিম লীগ আমলে শিক্ষা সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আনা হইয়াছিল সেইটিকেই অদলবদল করিয়া লওয়া হইতেছে মাত্র, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষার উন্নতির সর্ব্বাঙ্গীন এবং সম্পূর্ণ প্রয়াস দেখা যাইতেছে না। জোড়া-তালির ভাবটাই উহার মধ্যে বেশী পরিস্ফুট। ক্ষুদ্রায়তন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্কুল বোর্ড—এই তিনটি স্ব স্ব প্রধান বে-সরকারী বা আধাসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তদুপরি সরকারী শিক্ষাবিভাগ এতগুলি আলাদা কর্ত্তা প্রতিষ্ঠান গড়িবার সার্থকতা কি, ইহার প্রয়োজন কি, এই ব্যয়বাহুল্যের আবশ্যকতাই বা কোথায় তাহা এখনও দেশবাসীকে শোনানো হয় নাই।

সিলেক্ট কমিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতিপূরণের জন্য দরাজ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মতি ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। মূল বিলে ক্ষতিপূরণের হিসাব করার জন্য কোন বৎসরের উল্লেখ ছিল না, সিলেক্ট কমিটি উহার জন্য ১৯৪৭, '৪৮, '৪৯ এই তিন বৎসর ঠিক করিয়া দিয়াছেন। এই তিন বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহু বিভাগের আর্থিক লাভটা ষোল আনা কুড়াইয়া লইয়াছে, এই তিন বৎসরকে লাভের হিসাবের মূল বৎসর ধরিলে লাভের অঙ্ক সবচেয়ে বেশী হইবার কথা। যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত লাভকর হইতে বিলাতী কোম্পানীগুলিকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ভারতে ইংরেজ সরকার তাহাদের সব চেয়ে লাভজনক তিনটি বৎসরকে হিসাবের বৎসর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই চালটা যেন তারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। এখন বিবেচ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষা বাহির হইয়া গেলে তাহারা ক্ষতিপূরণ

পাইবে কোন্ যুক্তিতে ? ম্যাট্রিকের ছেলেদের নিকট হইতে বেশী টাকা আদায় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের ঠাট বজায় রাখিতে হইয়াছে, এই টাকাটা বন্ধ হইলে বেকায়দায় পড়িতে হইবে—এই অবস্থাটা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গৌরবজনক নহে।

আমাদের এখনও বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ব্যয়বহুল ও কর্তাবহুল তিনটি বিভিন্ন স্ব-স্ব প্রধান প্রতিষ্ঠান গড়িবার পরিবর্তে একটিমাত্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে শিক্ষা প্রসারের ভার অর্পণ করা উচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শতাব্দীপুরাতন গঠনতন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উহার বনিয়াদ সম্প্রসারিত করিয়া উহারই হাতে শিক্ষা বিস্তারের ভার দেওয়া যায়।

"ফসল বাড়াও" আন্দোলন

এই দুইটি কথা আজ একটা বিদ্রূপের ভাবে ব্যবহৃত হয়। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে গত ১লা চৈত্রের "খাদ্য-উৎপাদন" পত্রিকায় তাহা পাওয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-মন্ত্রীর দৃষ্টি এই মন্তব্যের উপর পড়িয়াছে কিনা জানিতে পারিলে খুসি হইব :

> পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কৃষি-বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ৮৮টি বীজাগারের মারফত পল্লী অঞ্চলে বৎসরে প্রায় এক কোটি টাকার বীজ, সার, কৃষিযন্ত্র প্রভৃতি সরবরাহ হইয়া থাকে। কৃষি-বিভাগ কর্তৃক বীজ সরবরাহ সম্বন্ধে প্রায়ই কোন না কোন প্রকারের অভিযোগ শোনা যায়। কিছু দিন আগে আমরা অবগত হইয়াছিলাম যে, বর্তমান বৎসরে রবি খন্দের সময় (কার্তিক অগ্রহায়ণ মাস) হুগলী জেলার হরিপাল বীজাগার হইতে মুসুরের বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল ; কিন্তু বীজ এত নিকৃষ্ট ও ধুলা মাটি বালিতে মিশান ছিল যে কৃষকেরা উক্ত বীজ কেনেন নাই ; তাঁহারা সমান মূল্যে (মণ প্রতি ১৭৲ টাকা) স্থানীয় বাজার হইতে ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বীজ ক্রয় করিয়া বপন করিয়াছিলেন। কিন্তু চাকরি বজায় রাখিবার জন্য বীজাগারের পরিচালক মহাশয়কে বীজের কাটতি দেখাইতেই হইবে ; সুতরাং তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণকে ধরিয়া কতক পরিমাণ বীজ বিক্রয় করিয়াছিলেন—বপনের জন্য নহে, মুসুর ডাল রান্না করিয়া খাইবার জন্য। এইরূপ ক্রেতাদের মধ্যে আমাদেরও এক জন বন্ধু ছিলেন ; তিনিও রান্না করিয়া খাইবার জন্য ৮।০ মূল্যে আধ মণ মুসুরের বীজ ক্রয় করিয়াছিলেন। শুনিলাম বীজাগারে মুসুরের বীজ এখনও মজুত আছে ; উপরোক্ত ভাবেও পরিচালক মহাশয় সম্পূর্ণ বীজ বিক্রয় করিতে পারেন নাই। পল্লী অঞ্চলের একটি বীজাগারের এই ক্ষুদ্র উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে কৃষি-বিভাগ কৃষির উন্নতিকল্পে কৃষকদিগকে কিরূপ সাহায্য করিতেছেন এবং অধিকতর খাদ্য উৎপাদনে তাঁহাদের উদ্যম কতটুকু। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভাল শস্যের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য গত বৎসরে (১৯৪৮-৪৯) সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল এবং বর্তমান বৎসরের (১৯৪৯-৫০) বাজেটে ইহার জন্য সাড়ে পনের লক্ষ টাকা রাখা হইয়াছে।

গ্রামবাসীর আত্মনির্ভরতা

রাষ্ট্রের প্রতি একান্ত নির্ভরতা বর্তমান যুগের একটা লক্ষণ ; জন্ম-পূর্ব্ব কাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত রাষ্ট্র আমাদের সকল দায় গ্রহণ করিবে এই মনোভাব অল্প-বিস্তর সভ্যজগতের চিন্তার মধ্যে দানা বাঁধিয়াছে এবং এই চিন্তা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সামগ্রিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ও দলীয় বা ব্যক্তির একনায়কত্ব। আমাদের দেশের চিন্তার সঙ্গে এই বিধানের খাপ খায় না ; অন্ততঃ স্বদেশী-যুগ পর্য্যন্ত আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তা ছিল ইহার বিপরীত ধর্ম্মী। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধ ও তৎসম্বন্ধে বিরাট আলোচনা। আজ সেই সব কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠার কোণে কোথাও একটু স্থান পাইয়াছে মাত্র ; লোকের চিন্তা ও কর্ম্ম সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ব্যক্তির মাহাত্ম্য অপ্রমান করিতে চেষ্টা করিতেছে।

গান্ধীজী রাষ্ট্রের উপর এরূপ একান্ত নির্ভরতার পক্ষপাতী ছিলেন না। ব্যষ্টির বা ব্যক্তিত্বের উপর বিশ্বাস তাঁহার জীবনাদর্শের সঞ্জীবন-মন্ত্র ছিল এবং এই আদর্শের উদ্দেশেই তিনি গত ত্রিশ বৎসর আমাদের সমস্ত কর্ম্ম-পন্থাকে পরিচালিত করিয়াছেন। আজ তাঁহার তিরোধানে এই আদর্শ ম্লান হইয়া গিয়াছে ; তিনি জীবিতকালেই দেখিয়া গিয়াছেন দেশের লোকের মন বিপরীত দিকে চলিয়াছে। কিন্তু তাঁহার জীবনাদর্শে বিশ্বাসী লোকের অভাব এখনও হয় নাই। সেই জন্যই ভারতরাষ্ট্রের জীবনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা একেবারে নিরাশ হইতে পারিতেছি না, এবং এই আদর্শের আলোয় অনেক সময়ই আমরা নানা গঠনমূলক কর্ম্ম-প্রচেষ্টার আলোচনা ও বিচার করিয়া থাকি।

ভারতরাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতির জন্য যে সব বিরাট পরিকল্পনার কথা শুনিতেছি, তাহাকে রূপ দিবার প্রচেষ্টাকে কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না করিয়াও আমরা মনে করি যে, ১০।১২ বৎসর আমাদের দেশের লোকের হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সেইজন্য একান্তভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরতার দিনেও আমরা সমাজ-জীবনে আত্মনির্ভরতার পরিচয় পাইলে উৎফুল্ল হই। এরূপ একটা কর্ম্মের বিবরণ "নির্ণয়" পত্রিকার একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণীর কতকাংশ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

"১৯৪৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে দ্বারকেশ্বর নদীতে প্রবল বন্যা হয়। হুগলী জেলার কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ 'হুগলী জেলা বন্যা সাহায্য সমিতি' গঠন করিয়া বন্যাপীড়িত অঞ্চলগুলিতে সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। সেবাকার্য্য করিতে করিতেই তাঁহাদের চিন্তায় এক আমূল বিপ্লব ঘটে। তাঁহারা চিন্তা করিতে সুরু করেন, নদীর জল-স্রোতকে কিরূপে কল্যাণ উৎসে পরিণত করা যাইতে পারে। সহসা তাঁহাদের জ্ঞানোন্মেষ হয়—বন্যার এই জলোচ্ছ্বাস, এই সুবিশাল জলরাশিকে বহু সুরক্ষিত ও অগভীর নদীনালা ও খালের মধ্য দিয়া দেশাভ্যন্তরে প্রবাহিত করাইয়া দিতে পারিলে, দেশমাতৃকার মুক্তিস্নান হয়। জল আপন গতিপথ পায়, ফলে বন্যার প্রকোপ বন্ধ হয়। কৃষিক্ষেত্রে পলি পড়িয়া ক্ষেত্র উর্ব্বর হয়, খানা ডোবা ধুইয়া গিয়া মশক-কীট ধ্বংস হয়, জলাশয়ে মৎস্য বৃদ্ধি পায় ও সর্ব্বোপরি জল সেচের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়ায় কৃষির শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটে। ১৯৪৪ সনের শেষ-ভাগেই কর্ম্মিগণ এই মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া 'খানাকুল থানা বোরো বাঁধ কমিটি' গঠন করেন।

"১৯৪৫ সনে কংগ্রেস-কর্ম্মিগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও জনসাধারণের পারস্পরিক সহযোগিতায় খানাকুল অঞ্চলে প্রথম বোরো বাঁধ নির্ম্মিত হয়। এই বাঁধ নির্ম্মাণের ফলে ৫টি গ্রামের ১৫ হাজার বিঘা জমিতে জলসেচ হয় এবং ফলে প্রায় ১ লক্ষ মণ বোরো ধান উৎপন্ন হয়। সর্ব্বসমেত ৪৭০০ পরিবার ইহাতে উপকৃত হয়। তদ্‌ব্যতীত আক, তিল, পেঁয়াজ, আলু প্রভৃতি শীতের ফসলেরও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মোট অর্থব্যয় হয় ২২৫৩৬৷৶১০, ফসল গোলায় উঠিলে কৃষকেরা বিঘা প্রতি ২।০ চারানী দিয়া প্রায় ২১০০০৲ টাকা শোধ করে।"

বাঙালী সমাজ আজ জীবন-যাত্রার অত্যাবশ্যক দ্রব্য ভাত-কাপড়-তেলের জন্য পরপ্রত্যাশী। এই অবস্থায় প্রবন্ধ লেখকের নিম্নলিখিত আবেদনের প্রতি আমরা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তিনি স্বীকার করিয়াছেন শ্রীরত্নমণি চট্টোপাধ্যায়-লিখিত "হুগলীতে বাঁধ-কার্য্য" (১৩৫৩ সনের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত) প্রবন্ধটির সহায়তায় এই তথ্যপূর্ণ বিবরণী দিতে পারিয়াছেন :

> ভারতযুক্তরাষ্ট্র সরকার ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে উত্তোগী হইয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে খানাকুল অঞ্চলে বাঁধ নির্ম্মাণের প্রয়োজন থাকিবে না সত্য, কিন্তু যে কয় বৎসর তাহা না হয়, সেই কয় বৎসর এইরূপ বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া শস্যোৎপাদনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এবং সমবায় প্রথায়ই ইহা করা যথার্থই যুক্তিসঙ্গত ও প্রশংসনীয়।

আমাদের বন-সম্পদ

ডাঃ রিপলে নামক একজন বৈজ্ঞানিকের নেতৃত্বে মার্কিন মুলুকের একদল পর্য্যবেক্ষক নেপালের পাহাড়-পর্ব্বতে ভৌগোলিক নানা অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদের বন-সম্পদ সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন তাহা আমাদের অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে নানা চিন্তার উদ্রেক করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিহার প্রদেশের কোশী নদীর উপরে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া উত্তর-বিহারের বাৎসরিক বন্যা-নিবারণের পরিকল্পনার উল্লেখ করা যায়। যে অঞ্চলে, নেপাল-বিহার সীমানার মধ্যে, এই বাঁধ নির্ম্মাণ হইবার কথা, তথায় সমস্ত বন উজাড় করিয়া ফেলায় বাঁধ টিকিতে পারে না, ইহাই ডাঃ রিপলের মত। গাছের শিকড় চাই প্রস্তর ও মাটিকে নিজ স্থানে রাখিবার জন্য। অন্যদিকে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে ডাঃ স্যাভেজ (Savage) নামক একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিকের মতানুসারে কোশী নদীর বাঁধ-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে এবং তাঁহার মতের উপর নির্ভর করিয়াই ১০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা স্থির হইতেছে। শেষে কি দুই মার্কিনী বৈজ্ঞানিকের মত-ভেদের জন্য এই পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইবে?

এতৎসম্পর্কে "বাঁকুড়া দর্পণ" পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের "এই ক্ষয়িষ্ণুতম" জেলার বনরক্ষা সম্বন্ধে একটি মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য। এই অঞ্চলেও বন-জঙ্গল-পাহাড় উজাড় হইয়াছে যাহার কল্যাণে জমি হইয়াছে রুক্ষ; বর্ষার সময় বন্যা আসে; বন্যার জল ধরিয়া রাখিবার ব্যবস্থাগুলি অচল হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি নাকি বাঁকুড়ার ৪,৫০০ বর্গ মাইল পরিধির মধ্যে অন্ততঃ ২৫০ বর্গ মাইল সরকারী প্রচেষ্টায় নূতন করিয়া বন-জঙ্গলে আবৃত করিবার চেষ্টা হইতেছে। "যে সমস্ত পতিত ডাঙ্গা পড়িয়া আছে," তাহা সরকারের হাতে তুলিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই পরি-কল্পনায় পল্লীবাসীর নিশ্চেষ্টতা ও পরনির্ভরশীলতা পরি-স্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ভাবি, স্বাধীন দেশের সরকার পঞ্চায়েত-রাজের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা প্রবর্ত্তন করিতে পারিতেছেন না কেন? এক সময়ে বৃক্ষ-রোপণ ছিল হিন্দু-সমাজের বাৎসরিক ধর্ম্ম-কর্ম্মের একটি অঙ্গ। সেই অনুষ্ঠানের অর্থ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ তাহা বাৎসরিক উৎসবে পরিণত করিয়া, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে হল-কর্ষণ প্রবর্ত্তন করিয়া ভূমি-লক্ষ্মীর প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যের কথা মনে করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যে শ্রেণী হইতে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ আসিয়াছেন, তাঁহারা আজ দুই-তিন পুরুষ হইতে ভূমির সঙ্গে সম্পর্কহীন। সুতরাং তাঁহারা শান্তিনিকেতনের শিক্ষাকে ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে রূপ দান করিতে পারেন নাই।

ভারতে বৈদেশিক মূলধন

পণ্ডিত নেহরু শেষ পর্য্যন্ত ভারতে বৈদেশিক মূলধন আগমনের সদর দরজা খুলিয়া দেওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন।

বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে ভারত-সরকারের মনোভাব কি হইবে পণ্ডিতজী ভারতীয় পার্লামেন্টে ৬ই এপ্রিল তারিখে তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। বৈদেশিক মূলধন ভারতীয় স্বার্থে খাটিবে এই উদ্দেশ্যে চারিটি সর্ত্তাধীনে উহা দেশে আসিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। দেশী কারখানার ন্যায় ভারত-সরকারের শিল্পনীতি অনুসারে বৈদেশিক কারখানাগুলিকে কাজ করিতে হইবে এবং ভারত-সরকারের আইন উভয়কেই সমানভাবে মানিতে হইবে। বিদেশী কারখানাগুলি লাভ করিতে পারিবে এবং লাভের টাকা দেশে পাঠাইতে পারিবে। বিদেশী কারখানাকে ভবিষ্যতে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং ঐ টাকা দেশে পাঠাইবার সুযোগ দেওয়া হইবে। বিদেশী কারখানার উচ্চপদে, বিশেষতঃ টেকনিক্যাল কাজে, অস্থায়ী ভাবে বিদেশী নিয়োগ করিতে দেওয়া হইবে। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র বিদেশী কারখানার পরিচালনায় ভারতবাসীর হাত থাকিবে।

পণ্ডিতজীর ঘোষণার পর দেশের ভবিষ্যৎ স্বার্থের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এই মহাগুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইতে দেওয়া হয় নাই। পণ্ডিতজীর বিবৃতিতে ভারতের ইংরেজ ও মারোয়াড়ী বণিকদের প্রতিনিধিরা আনন্দিত হইয়াছেন এবং ভারতের জাতীয় অর্থনীতির সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত প্রতিনিধি, জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির প্রাণ এবং বর্ত্তমানে তথা হইতে অপসারিত অধ্যাপক কে. টি. সাহা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের মনেও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কাই জাগিতেছে বিশেষতঃ এই কথাটিই বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে যে, ভারতশাসন আইনে বিলাতী কোম্পানীর যে রক্ষাকবচগুলিকে বহু আন্দোলনের ফলে তুলিয়া দিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করা হইয়াছিল স্বেচ্ছায় সেইগুলি আবার আমরা গলায় পরিলাম।

ভারতীয় কোটিপতিরা যুদ্ধের সময় যে অভূতপূর্ব্ব বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছেন দেশের শিল্পোন্নতির জন্য তাঁহারা উহা বাহির করিলেন না, পণ্ডিতজী ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, হয়ত ক্রুদ্ধও হইয়াছেন। অগত্যা তাঁহাকে বিদেশী মূলধন ডাকিয়া আনিতে হইয়াছে দেশের শিল্পোন্নতির জন্য। যুদ্ধে আমাদের শিল্পপতিদের হাতে যে টাকা আসিয়াছে তাহার সদ্ব্যয় হইলে বিদেশী মূলধনের প্রয়োজন আমাদের হইত না ইহা আমরাও মনে করি, কিন্তু তাঁহারা সে টাকা সরকারের ন্যায্য প্রাপ্য ফাঁকি দেওয়ার আশায় লুকাইয়াছেন, উহা বাহির করিবেনও না। ব্যাঙ্কের টাকা ধার লইয়া তাঁহারা কারবার করিতেছেন, এমন ভাব দেখাইতেছেন যেন তাঁদের হাতে টাকা নাই। কতকগুলি বড় কারখানা এবং বিদ্যুৎ-উৎপাদন-ব্যবস্থা দেশে না হইলেও চলে না, তাহার জন্য টাকা মিলিতেছে না, সুতরাং এই অবস্থায় বাহিরের টাকা আনা ছাড়া উপায় কি—পণ্ডিতজীর মনে এই ধারণা জন্মিয়া থাকিতে পারে।

সংরক্ষণ শুল্কের সুযোগ লইয়া চিনিওয়ালারা যে ভাবে দেশবাসীকে শোষণ করিতেছেন, বাজারে চাহিদা অপেক্ষা মালের সাময়িক অভাবের সুযোগে কাপড়, লোহা, সিমেণ্ট প্রভৃতি কারখানার মালিকেরা ক্রেতাদের যেভাবে শোষণ করিতেছেন তাহাতে বিদেশী প্রতিযোগিতার ফেলিয়া তাঁহাদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব শায়েস্তা করিয়া জিনিষের দাম কমানো ভাল—এই মনোভাবও অনেকের মনে জাগিতে পারে এবং তার জন্য বিদেশী মূলধন সমর্থনে তাঁহারাও আগ্রহশীল হইতে পারেন। ম্যানেজিং-এজেন্সি-পরিচালিত ভারতীয় কলকারখানা যেরূপ বেপরোয়া ভাবে ক্রেতা, অংশীদার ও রাষ্ট্র এই তিনকেই ঠকাইতেছে উহাদের ধ্বংস-সাধনে কাহারও দুঃখিত হইবারও কথা নয়।

কিন্তু যে সব সর্ত্তে বিদেশী মূলধন আমরা ডাকিয়া আনিলাম তাহাতে এই সব পাপ কি কমিবে, না আরও বাড়িবারই পথ পরিষ্কার হইবে? একজাতীয় ব্যবসায়ী সম্বন্ধে এবার স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা দরকার। নিজের খাদ্য আলাদা রাখিয়া যাহারা বিক্রয়ের খাদ্যে ভেজাল মিশায় তাহারা এতদিন বেচাকেনার ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল। গত যুদ্ধের শেষের দিক হইতে তাহারা ব্যাপক ভাবে কলকারখানা কিনিয়াছে এবং উৎপাদন-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ঠিক ঐ পাপ আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতায় দেখা যাইতেছে বহু বড় বড় ইংরেজ কোম্পানীতে ইহারা অংশীদাররূপে প্রবেশ করিয়াছে, বিলাতী অনেক কারখানা এবং কলিকাতার বিখ্যাত ইংরেজের দোকান ক্রয় করিয়াছে। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন বিদেশী কারখানার উপর ভারতীয় কর্তৃত্ব রাখিতে হইবে। টাকা দিবে একজন, কর্তৃত্ব করিবে অপরে ইহা বাস্তব অবস্থা নহে। এই অবস্থা তখনই আসিতে পারে যখন উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন হয়, প্রতিযোগিতা থাকে না। ইহাই একচেটিয়া কারবারের চরম অবস্থা এবং ক্রেতাসাধারণের ও দেশের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ। বিদেশীর টাকা এবং দেশী বণিকের স্থানীয় জ্ঞান, কূটবুদ্ধি, ট্যাক্স ও কণ্ট্রোল কর্তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা এবং শক্তিশালী মন্ত্রীদের উপর প্রভাব—এই সব যোগাযোগ ঘটিলে দেশের অবস্থা কি হইবে তাহা বস্তুতঃই ঘোর আশঙ্কার বিষয়। ম্যানেজিং এজেন্সি ও সিণ্ডিকেট ভাঙিয়া দিয়া বিদেশী মূলধন আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সরকার যদি এই কথা বলিতেন যে দেশী বা বিদেশী কোন কারখানাকে কোনরূপ একচেটিয়া জোট বাঁধিতে দেওয়া হইবে না তাহা হইলে অন্ততঃ কতকটা বিপদ প্রথম হইতেই কমিয়া যাইত। পণ্ডিতজীর ঘোষণার পর এখনই যে সব দীর্ঘ মেয়াদী কন্ট্রাক্ট হইয়া যাইবে, পরে সেগুলি ভাঙা অত্যন্ত কঠিন হইবে। উহার খেসারত দিতে হইবে জনসাধারণকে।

ব্রহ্মরাষ্ট্রে ব্রিটিশ মূলধন

স্বাধীন ব্রহ্মরাষ্ট্রে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর প্রাধান্য সম্বন্ধে একটা হিসাব দেখিলাম। নিম্নে তাহার সারাংশ তুলিয়া দিতেছি। এই প্রাধান্যের ফলে গোড়ায় যে মূলধন ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ তাহাদের তাঁবেদার দেশে নিয়োজিত করে, তাহা অতি অল্প দিনের মধ্যেই উশুল করিয়া লয়।

স্বাধীনতা লাভ করিয়াও ব্রহ্মদেশ এই সব বিদেশী পুঁজি-পতির প্রভাবমুক্ত হইতে পারিয়াছে কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ষ্টীল ব্রাদার্স (Steel Brothers) মাত্র ৬ বৎসরের মধ্যে মূলধনের শতকরা ২৩৫ভাগ লভ্যাংশ দিয়াছিল। এংলো-বর্মা টিন কোং (Anglo-Burma Tin Co.) প্রতিষ্ঠার ৫ বৎসর পরে শতকরা ১৩০ ভাগ হারে লভ্যাংশ দিতেছে; বর্মা তেল কোং (Burma Oil Co.) ১৯৩১-৩৫ অংশীদারদের লভ্যাংশ দিয়াছে শতকরা ১১৩ ভাগ হারে; ১৯৪৭ সনে দেখা যায় যে কোম্পানীর আয় তিন গুণ বাড়িয়াছে। ব্রিটিশ সরকারের আনুকূল্যে চালের ব্যবসায়ে ষ্টীল ব্রাদার্স প্রায় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বোম্বাই বর্মা ট্রেডিং কোং (Bombay Burma Trading Company) ব্রহ্মদেশের কাষ্ঠ ব্যবসায়ের মালিক বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইরাবতী জাহাজ কোং (Irrawady Flotilla Company) ব্রহ্মদেশের জলপথে যাতায়াতের নিয়ামক। বর্মা করপোরেশন লিঃ (Burma Corporation Ltd.) দেশের টিন, রৌপ্য, সীসা, দস্তা, টাংষ্টেন (Tungsten), তামা ইত্যাদি ধাতব-দ্রব্যের উপর প্রভুত্ব করে।

কয়লার খনির শ্রমিক

ভারতীয় মাইনিং এসোসিয়েশনের বাঙালী সভাপতি এবং বেঙ্গল কোল কোম্পানীর ইংরেজ সভাপতির বক্তৃতায় একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কয়লার খনিতে কয়লা উৎপাদন কমিয়াছে এবং খরচ বাড়িয়াছে। প্রথম জন বলিয়াছেন যে, ১৯৩৫ সালে একজন শ্রমিক গড়পড়তা সপ্তাহে ২.৫ টন কয়লা তুলিত, ১৯৪৭ সালে সে তুলিয়াছে ১.১৬ টন। দ্বিতীয় জন বলিতেছেন ১৯৩৮ হইতে ১৯৪৭-এর মধ্যে কয়লার খনিতে শ্রমিক সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ষাট জন, উৎপাদন বাড়িয়াছে মাত্র শতকরা সাত টন। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, খনির যাহারা আসল শ্রমিক অর্থাৎ মাটির নীচে যাহারা কাজ করে তাহারা মন দিয়াই কাজ করিতেছে, মাটির উপরে যাহাদের কাজ কঠিনও নয় বিপজ্জনকও নয় গোলমাল তাহারাই করে। কয়লার খনিতে শ্রমিকের মজুরী অনেক বাড়িয়াছে। যুদ্ধের আগে যাহারা মূল বেতন আট আনা রোজ পাইত তাহারা এখন পায় বারো আনা; তাহার উপর বেতনের দেড়গুণ মাগগি ভাতা বাবদ ১৸০ এবং অন্যান্য সুবিধা ।৶০, মোট দৈনিক ২।০ আনা পায়। ইহার উপর হাজিরা বোনাস, উৎপাদন বোনাস প্রভৃতি আছে।

কয়লার দাম যে ভাবে বাড়িয়াছে তাহা দেশের শিল্পোন্নতির সহায়ক নহে, কারণ ইহাতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির জন্য উহা অনেকটা দায়ী। যাহারা কয়লার রন্ধন করে তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকাল ছয় আনা মণের কয়লা পৌনে দুই টাকায় ক্রয় করিতে থাকা কঠিন। অংশীদারের লভ্যাংশও কম নহে, লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ আইনে কিন্তু ইহা কমিবে না। বেঙ্গল কোলের চেয়ারম্যান বলিতেছেন যে, কোম্পানীর ৩৫টা শেয়ার (১০০ টাকার) যাঁহাদের আছে ১৯৪৮ সালে তাঁহারা মাসে ৭৩৲ টাকা করিয়া পাইয়াছেন। ঐ বৎসর কোম্পানী যে লভ্যাংশ দিয়াছে ১৯৪৭-এ দিয়াছে তাহার প্রায় দ্বিগুণ এবং ১৯৪৬-এ প্রায় তিন গুণ। অর্থাৎ এই কোম্পানীতে যাঁহাদের শেয়ার আছে গত তিন বৎসরেই তাঁহারা শেয়ারের দাম তুলিয়াও তাহার উপর এক-তৃতীয়াংশ লাভ করিয়াছেন; আগের লভ্যাংশ তো ছাড়িয়াই দেওয়া গেল। মজুরী বাড়িবে, লভ্যাংশ বাড়িবে এবং উৎপাদন কমিবে—এই অবস্থা চলিতে থাকিলে কয়লার দাম কমিবে কিরূপে?

সোভিয়েট রাষ্ট্রে পাটচাষের সাফল্য

এই সম্বন্ধে দিল্লী হইতে প্রচারিত প্রচারপত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে:

সাধারণ লোকের ধারণা ভারতের কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও পাট চাষ করা সম্ভব নয়। রুশিয়ায় রাজতন্ত্রের আমলে পাট চাষের কম চেষ্টা হয় নাই। সোভিয়েট যুগে বিজ্ঞান অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতেছে। পাট চাষের জন্য কৃষিবিদেরা পাট গাছের প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করিয়া নির্ব্বাচন-নীতিকে নিখুঁত ভাবে খাটাইয়া পাটের চাষ সফল করিয়াছেন। উজবেকিস্থানে যে সকল পাটের গাছ ফলিয়াছে সেগুলি শিল্পের চাহিদা মিটাইবার উপযুক্ত। ১৯৩৯ সাল হইতে ১ হেক্টেয়ারে (২.৪৭ একর) ৭ টন (এবং আরো বেশী) শুষ্ক ডাঁটা, দেড় টন পর্য্যন্ত তন্তু এবং অর্দ্ধ টন পর্য্যন্ত বীজ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সালে ১০ টন পর্য্যন্ত ডাঁটা ১ হেক্টেয়ার হইতে পাওয়া গিয়াছে।

১৯৪৭ সালে ক্রাসনোদার অঞ্চলে কুবান নদীর অববাহিকার ক্ষেত্রে দুই বার জল সেচন করিয়া নূতন ধরণের পাট চাষ হইতেছে। এই পাট অপেক্ষাকৃত শীতল আবহাওয়ায় চাষ করা যায়।

সোভিয়েটে যে পাট উৎপন্ন হইতেছে তাহা কোন কোন

অংশে আমদানী করা পাট অপেক্ষা ভাল। বিদেশ হইতে আমদানী করা পাটের তন্তুর "breaking point" সোভিয়েটের পাটের চেয়ে ৪১৬ কিলোগ্রাম কম। ভারতে শত শত বৎসরের পর যে পরিমাণ ফলন হইতেছে সোভিয়েটে প্রথম বৎসরেই তাহা হইয়াছে। ঠিক মত লাঙ্গল দেওয়া interrow cultivation ধাতব সার প্রয়োগের দ্বারা প্রতি হেক্টারে ১০ টন ডাঁটা এবং দেড় টন তন্তু পাওয়া যাইতে পারিবে। গ্রীষ্ম প্রধান আবহাওয়ার পাটগাছ সোভিয়েটে ৪০ ডিগ্রী অক্ষাংশে ফলান যাইবে। ইহা সোভিয়েট কৃষির দান।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রশংসাকে কোনরূপ খাট না করিয়াও এই কথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের প্রায় ৭ বিঘা জমিতে "ধাতব সার" না দিয়াও (২'৪৭) একরে দেড় টন (প্রায় ৪১মণ) পাট তন্তু পাওয়া যায়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে পাট চাষের ব্যয়ের হিসাব পাইলে তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হইবে।"

দীনবন্ধু সি. এফ্. এণ্ড্রুজের স্মৃতিতর্পণ

গত ৫ই এপ্রিল দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের অষ্টম বার্ষিকী মৃত্যু-দিনে সমাধি ক্ষেত্রে সকালে তাঁহার সমাধির উপরে মাল্যদান করা হয়। বৈকালে ডক্টর কালিদাস নাগের সভাপতিত্বে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি জনসভারও অধিবেশন হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে ভারতবাসীর কল্যাণকর বহু প্রচেষ্টায় এণ্ড্রুজ আত্মনিয়োগ করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নানারূপ দুঃখবরণ করেন। মরিশস, ফিজী ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি একাধিকবার ঐসব স্থলে গমন করিয়াছিলেন। পীয়ার্সন সাহেবের সঙ্গে তিনি শেষোক্ত স্থানে যান এবং মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। জাতির প্রগতিমূলক প্রতিটি আন্দোলনের সহিত দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের আন্তরিক যোগ ছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার হিতসাধনের জন্য তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' এতাদৃশ ত্যাগী মহানুভবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বিশেষ ভাবে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

হরিনারায়ণ সেন

এই অক্লান্ত কর্ম্মীর তিরোধানে বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হইল, তাহা শীঘ্র পূরণ হইবার নহে। মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শানুযায়ী জীবন গঠন করিয়া সেন মহাশয় যৌবনেই অনুন্নত শ্রেণীর সেবা-ব্রত গ্রহণ করেন। ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতৃবর্গ পূর্ব্ববঙ্গের পতিত জাতির উন্নতিকল্পে একটি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন; তখন হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল হরিনারায়ণ অনলসকর্ম্মী হইয়া সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কারে পিষ্ট শ্রেণীর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন।

দেশ বিভাগের পর তিনি ২৪-পরগণা জেলার কোন অঞ্চলে নিজের কর্ম্মশক্তির ব্যবহারের পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। এই নূতন ক্ষেত্রে তাঁহার শক্তির পরিচয় দিবার অবসর পাইলেন না। ভগবান তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থিত-লোকে লইয়া গেলেন। আমরা তাঁহার পরিবারের উদ্দেশে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত

ক্যাপ্টেন দত্ত নামে সুপরিচিত এই বাঙালী প্রধানের দেহত্যাগ সংবাদ অপ্রত্যাশিত। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত পরিচয় এই সামরিক উপাধির মধ্যে পাওয়া যাইবে না। তাহা পাওয়া যাইবে "বেঙ্গল ইমিউনিটি" নামক ঔষধপত্র প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সংগঠক রূপে। দেশের রাজনৈতিক জীবনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে নবজাগরণের সূচনা হয় তাহাতে তিনি মুক্তহস্তে অর্থসামর্থ্য দিয়া এই জাগরণকে শক্তিশালী করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মের সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। ইহা তাঁহার আর এক পরিচয়।

ক্যাপ্টেন দত্ত বঙ্গদেশের রাজনৈতিক জীবনের নানা আবর্ত্তের মধ্যে কখনও তলাইয়া যান নাই; দর্শকের মত থাকিয়া যতদূর সম্ভব রাজনীতির সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি ত্রিপুরা জেলার স্বগ্রাম শ্রীকাইলে কলেজ প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দিয়াছিলেন; আজ তাহা পূর্ব্ববঙ্গের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। "পাকিস্থানের" পরিবেশে তাঁহার পুরাতন আদর্শ কত দূর বজায় থাকিবে, তাহা বলা কঠিন। নরেন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত তাহাকে নূতন রূপ দিতে পারিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে সেই দায়িত্ব পড়িয়াছে তাঁহার অগ্রজ শ্রীকামিনীকুমার দত্তের উপর।

ভারতের বিচার্য।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি।

১। ভারতরাষ্ট্র।

সংবাদপত্রে দেখিতেছিলাম, ভারতরাষ্ট্ররচনা-পরিষদে (Constituent Assembly) তর্ক উঠিয়াছে, India নামের ভারতীয় নাম কি হইবে। কেহ বলিয়াছেন ভারতবর্ষ, কেহ ভারত, কেহ হিন্দুস্থান। প্রশ্নটি এত গুরুতর বোধ হইয়াছে যে ইহার উত্তর পাওয়া যায় নাই; ভাবীকালের নিমিত্ত তর্ক স্থগিত আছে। কিন্তু কে না জানে, আমাদের দেশের নাম ভারত? দুষ্মন্ত-পুত্র ভরত যে দেশের রাজা ছিলেন, সে দেশের নাম ভারত। ঋগ্‌বেদের কালে ভরত নামে এক বংশ ছিল। দুষ্মন্তের পূর্বে ভরতবংশীয়েরা সরস্বতী নদীর তীরে বাস করিতেন। সেহেতুও এদেশের ভারত নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ভূ-পৃষ্ঠের এক এক ভাগের নাম বর্ষ ছিল। পর্বত দ্বারা বিচ্ছিন্ন অংশ, বর্ষ। এই সকল পর্বতের নাম বর্ষ পর্বত। ভারতবর্ষ হিমাচল দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। অতএব ভারত ও ভারতবর্ষ, একই অর্থ। বিস্তীর্ণ জলরাশি দ্বারাও ভূপৃষ্ঠের বিভাগ কল্পিত হইয়াছিল। এই সকল বিভাগের নাম দ্বীপ। হিমাচলের পূর্ব ও পশ্চিম বাহু দক্ষিণে প্রসারিত হইয়া দুই সমুদ্রে পড়িয়াছে। দুই দিকে দুই জলরাশি। এই হেতু ভারত একটি দ্বীপ। পামীর অধিত্যকায় জম্বু ফলের আকারের কৃষ্ণবর্ণের বহু গণ্ড শৈল আছে। সেই সকল শৈলের নাম জম্বু। এই জম্বু নাম হইতে ভারতবর্ষের নাম জম্বু দ্বীপ। এখন জম্বু দ্বীপ, এই নাম অপরিচিত হইয়াছে। কিন্তু কাশ্মীরের মহারাজা জম্মুরও মহারাজা। এই জম্মু নাম পুরাতন জম্বু। জম্বুর নিকটস্থ নদীতে সোনা পাওয়া যাইত। সেই হেতু সোনার এক নাম জাম্বুনদ।

ভারত শব্দ হইতে ভারতের অধিবাসী ও ভারতের ভাষা ভারতী। তুমি কে? আমি ভারতী (Indian National)। আমি হিন্দু, কি মুসলমান, কি পার্সী ইত্যাদি ধর্মজ্ঞাপক নাম বলিতে হইল না।

ভারত একটা দেশ। এই দেশের যাহারা অধিবাসী, তাহারা ভারত প্রজা। প্রজা People; যে জন্মে সে প্রজা, শাবক। প্রজা শব্দের করদাতা অর্থ পরে আসিয়াছে। প্রজাদের মধ্যে যিনি প্রভু, তিনি রাজা। কেহ ভুজবল দ্বারা প্রভু হইয়া থাকেন, কাহাকেও প্রজারা প্রভু-পদে বরণ করে। পুরুষানুক্রমে প্রভুত্ব না করিলে রাজা নাম পায় না, এমন কথা নাই। রাজাতে প্রজার ইচ্ছাশক্তি পুঞ্জীভূত হইয়াছে। কেহ সেবা দ্বারা, কেহ অর্থ দ্বারা, কেহ শস্য দ্বারা নিজেদের দেশ রক্ষণ ও পালন করে। এই কারণে প্রজা শব্দের এক অর্থ করদাতা হইয়াছে। ভারতের একজন রাজা আছেন। এখন তাঁহার নাম Governor-General. তিনি অধিরাজ, অথবা রাজ-রাজ। কারণ, অনেক রাজা তাঁহার অধীনে আছেন। রাজা পাইলাম, অতএব ভারত একটা রাজ্য। ইহাকে রাষ্ট্রও বলিতে পারি। রাজ্য ও রাষ্ট্র শব্দের মূল একই, অর্থও এক। দুইএরই অর্থ State. আমরা United States of America যুক্তরাজ্য বা রাজ্যযুতি বলি। Native States of India দেশীয় রাজ্য। অন্যান্য রাজ্য হইতে পৃথক বুঝাইবার নিমিত্ত ভারতকে রাষ্ট্র বলাই ঠিক। Congress Presidentকে 'রাষ্ট্রপতি' বলা কিছুতেই সঙ্গত নয়। যিনি রাজরাজ, তিনিই রাষ্ট্রপতি। Congress একটা দল। Congress President কন্‌গ্রেস-পতি। নানা Congress হইয়াছে। যেমন Science Congress, Trade Union Congress, Student's Congress ইত্যাদি। কিন্তু কন্‌গ্রেস নাম রাজনীতিকের (Politician) কন্‌গ্রেস, এই অর্থে প্রচলিত হইয়াছে।

রাজ্য আছে, রাজা আছেন, রাজার মন্ত্রী, অমাত্য, পাত্র ও বহু রাজপুরুষ আছেন। কেহ দেশ-শাসন-মন্ত্রী (Home Minister), কেহ বৈদেশিক মন্ত্রী (Minister for Foreign Affairs), কেহ রাজস্ব মন্ত্রী (Revenue Minister), কেহ আয়ব্যয়-মন্ত্রী ('Finance Minister), ইত্যাদি। রাজার মন্ত্রী-পরিষদ্ (Council of Ministers) ব্যতীত ব্যবস্থাপক পরিষদ্ (Legislative Assembly) আছে। ইহার সদস্যেরা রাজপারিষদ। ইহাঁদের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা ভা. পা. (ভারত পারিষদ)। পরিষদের President পরিষৎপতি। পতি শব্দ দ্বারা সকল স্থলে President বুঝিতে হইবে। সভার President, তিনি নারী হইলেও সভাপতি; সভানেত্রী নহেন। ভারত-রাষ্ট্র-রচনা পরিষদের কার্য অচিরে সমাপ্ত হইবে। তখন ভারত-ব্যবস্থাপক পরিষৎ একমাত্র পরিষৎ থাকিবে।

ভারতরাষ্ট্র কতকগুলি রাজ্যের সঙ্ঘ (Union)। রাজ্য তিন প্রকার—(১) পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, ওড়িষ্যা প্রভৃতি অঙ্গ রাজ্য; (২) কাশ্মীর, মহীশূর প্রভৃতি সামন্ত রাজ্য; (৩) মধ্য ভারত, সুরাষ্ট্র, রাজস্থান প্রভৃতি ছোট ছোট

রাজ্যের সমষ্টি, রাজকরাজ্য। অতএব ভারতরাষ্ট্র রাজ্য-সঙ্ঘ (United States of India)। পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেলের যত্নে আকুমারিকা-হিমাচল একরাষ্ট্র হইয়াছে। এমনটি পূর্বে কখনও হয় নাই। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় বিন্ধ্যাচলের উত্তরের ভারত যুধিষ্ঠিরকে সার্বভৌম স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারত অজ্ঞাত-প্রায় ছিল। বৌধায়ন দক্ষিণ ভারতে খ্রীষ্টের সহস্র বৎসর পূর্বে ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির ইহার ৪.৫ শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। নন্দবংশের মহাপদ্মনন্দ অত্যাচার দ্বারা একরাট্ হইয়াছিলেন। কিন্তু মগধের নিকটবর্তী মাত্র কয়েকটি রাজ্যকে মগধ রাজ্যের অন্তর্গত করিয়াছিলেন। মহারাজা অশোক ভারতে ও ভারতের বাহিরে ধর্ম-বিজয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তৎকালীন রাজ্য-সমূহের অধিপতি হন নাই। রাজন্যবর্গের যোগ দ্বারা ভারতরাষ্ট্র বলবান্ হইয়াছে।

যখন ভারতকে ভূপৃষ্ঠের একটা অংশ মনে করিব, তখন পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, ওড়িষ্যা ইত্যাদি এক এক প্রদেশ। যুক্ত-প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ, মধ্য-ভারত ইত্যাদি কতকগুলি নাম দ্বারা স্থান বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপ নাম অচিরে পরিবর্তন করা আবশ্যক। এই সকল দেশ এক এক রাজ্য। প্রত্যেক রাজ্যের রাজা, মন্ত্রী, ব্যবস্থা-পরিষৎ ইত্যাদি সবই আছে।

ভারত প্রজাতন্ত্র (Republic) হইলেও একজন রাজা অবশ্য থাকিবেন। তিনি তখন প্রজাপতি (President of the Republic) নামে আখ্যাত হইবেন। যখন ভারতীয় প্রজাকে ভারতী বলিতেছি তখন ভারতী এক Nation স্বীকার করিতেছি। ভারতীরা এক রাষ্ট্রের সজাত। অতএব Nationalism সাজাত্য। আর, Nationalist সাজাত্যী। Nationalization রাষ্ট্রস্বীকরণ। Provincialization রাজ্যস্বীকরণ।

২। ভারতভাষা ও ভারতলিপি।

এতদিন ইংরেজী ভাষা দ্বারা ভারতের সকল প্রদেশের লোক-ব্যবহার ও রাজকার্য চলিতেছিল। এখনও কি ইংরেজীই থাকিবে? যিনি বিজ্ঞানের উচ্চাঙ্গ শিখিতে চাহিবেন, দেশদেশান্তরের বার্তা জানিতে চাহিবেন, অপরাপর দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে চাহিবেন, অন্যান্য দেশের উত্তম সাহিত্য উপভোগ করিতে চাহিবেন, তাঁহাকে ইংরেজী শিখিতেই হইবে। ইংরেজী পরিত্যাগ করিলে চলিবে না; কেবল দেখিতে হইবে, ১৫।১৬ বৎসর বয়সের এদিকে কোন বালক ইংরেজী শিখিতেছে না। আর, অল্প বালক ইংরেজী শিখিলেই ভারতের কার্য চলিতে পারিবে।

একটা ভারতভাষা অবশ্য চাই। যে ভাষায় ভারত-রাষ্ট্রের কার্য ও লোক-ব্যবহার চলিতে পারিবে, ভারতের সমুদয় রাজ্যের অধিবাসী সহজে শিখিতে পারিবে, ও শিখিতে অভিলাষী হইবে, সে ভাষা ভারতভাষা হইবার যোগ্য। এমন ভাষা একটিও নাই।

হিন্দী-প্রচারক বলিতেছেন, মাথাগনতি করিয়া দেখ কোন্ ভাষায় কতলোক কথা কহে।

জনতন্ত্রের (Democracy) দোষই এই, সব মাথা সমান মনে করে। যদি হিন্দীভাষা রাষ্ট্রভাষা হয়, তাহা হইলে আমাদের পুত্রকন্যাকে চারিটি ভাষা শিখিতে হইবে। ১। মাতৃভাষা—বাংলা; (২) মাতৃভাষার বীজ—সংস্কৃত; (৩) ভারতভাষা—হিন্দী; (৪) ইংরেজী ভাষা। অবশ্য সকলকে এই রাষ্ট্রভাষা কিম্বা ইংরেজী শিখিতে হইবে না। তথাপি যাঁহারা উচ্চ শিক্ষালাভের অভিলাষী হইবেন, তাঁহাদিগকে ইংরেজী এবং যাঁহারা রাষ্ট্রের পদপ্রার্থী হইবেন তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রভাষা শিখিতেই হইবে। বিদ্যামন্দিরের প্রবেশপথে চারিটি অর্গল উল্লঙ্ঘন করা সহজ হইবে না। দ্রাবিড়-ভাষীকেও চারিভাষা শিখিতে হইবে। কেবল হিন্দীভাষীকে তিনটি ভাষা শিখিতে হইবে। জনতন্ত্রের দিনে সকলের সুখ-দুঃখ সমান ভাবিতে পারিতেছি কই?

আমরা সকলেই চাই, ভারত বলবান্ হউক, ধনধান্যে ভরিয়া যাউক, সুখ-সম্পদে অগ্রগণ্য হউক। বলবান্ করিবার নিমিত্ত রাজনীতিকেরা জাতিভেদ ভাষাভেদ দূর করিয়া সকল ভারতীকে সমান দেখিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু ইহা অসাধ্য মনে হয়। এই ভারতখণ্ডে কত বিভিন্ন 'রয়' (race) বাস করিতেছে। কত প্রকার আদিবাসী, কত প্রকার আর্যীয়, শত শত বৎসর বাস করিয়া আসিতেছে; কিন্তু অতি অল্প 'রয়' মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়াছে। প্রত্যেক 'রয়'ই জাতিস্মর। পুরুষানুক্রমে বুঝিয়া আসিতেছে, সে অন্য হইতে ভিন্ন, আচার-ব্যবহারে ভিন্ন, ভাষায় ভিন্ন। কিন্তু এত ভেদ সত্ত্বেও একটি বিষয়ে সকলেই অপরের সহিত নিজের সাজাত্য বোধ করে। সেটি ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টি। এক সংস্কৃতির দ্বারা আমরা সকলেই, হিমাচলবাসীই বা কি আর কুমারিকা-বাসীই বা কি, ভাবিতেছি, বেদব্যাস আমাদের ছিলেন; তিনি মহাভারতে ও পুরাণে আমাদেরই পূর্বপুরুষের কীর্তি বর্ণনা করিয়াছেন। রামায়ণ আমাদেরই, উপনিষদ্ ও গীতা সকলেই মানি। কালিদাস তোমার যেমন, আমারও তেমন। এই একটি বিষয়ে ভারতী প্রজার ঐক্য আছে,

অপর বিষয়ে অনৈক্য। যদি ভারতকে বলবান করিতে চাই, তাহা হইলে এই ঐক্যকে দৃঢ় ও স্পষ্ট করিতে হইবে।

সংস্কৃত ভাষা এই ঐক্যের সাধন। সংস্কৃত ভাষাকে ভারতভাষা করিলে অনেক সুফললাভ হইবে,—

(১) ভাষায় ভাষায় দ্বন্দ্ব থাকিবে না। কেহ বলিবে না, বলপূর্বক হিন্দীভাষা শেখানো হইতেছে। (২) সংস্কৃত ভাষা শিখিলে সকল ভাষাই পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইবে। তদ্দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদেরও স্ব স্ব রাজ্যের ভাষা শিখিবার সুবিধা হইবে। (৩) সংস্কৃত ভাষা দ্বারা উত্তর-দক্ষিণের, পূর্ব-পশ্চিমের আত্মীয়তা বৃদ্ধি হইবে।

(৪) সংস্কৃত সাহিত্য উন্মুক্ত হইয়া আমাদের আত্ম-গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

(৫) সংস্কৃত সাহিত্য এত উত্তম যে ইয়োরোপ ও আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা শিখিবার ব্যবস্থা আছে। এক আন্ধ্র শাস্ত্রী আমায় লিখিয়াছিলেন,—সংস্কৃত ভাষা থাকিতে কেন সংস্কৃত-আশ্রয়ী পরন্তু দূরাগত ভাষা শিক্ষা করিব? সংস্কৃত শিখিয়া আমরা ইয়োরোপ কিম্বা আমেরিকা গিয়া কথা কহিবার লোক পাইব। সেখানে কে হিন্দী বুঝিবে?

(৬) সেদিন সংবাদপত্রে পড়িতেছিলাম, আফগানরাজ কাবুল-বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা অবশ্যক করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন? যেহেতু সংস্কৃত ভাষা দ্বারা আফগান ভাষা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইবে। হিন্দী ভাষা শিখিলে কোন্ ভাষার কোন্ সাহিত্যের উপকার হইবে? এই কারণেই মাদ্রাজে বহুলোক, জ্ঞানীলোক, হিন্দীর বিরোধী হইয়াছেন।

(৭) রাজকার্যের নিমিত্ত ও লোকব্যবহারের নিমিত্ত বহু বহু ইংরেজী শব্দের স্ব স্ব রাজ্যের ভাষায় পরিবর্তন করিতে হইবে। সে সকল শব্দ কোথা হইতে আসিবে?

(৮) পূর্ব পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ ভারতখণ্ডের যেখানেই যাই, দুই পাঁচ জন সংস্কৃত-জানা লোক পাওয়া যায় এবং তাহাদের দ্বারা কথাবার্তাও চলে। আমি দেখিয়াছি, মালয়লম-ভাষী, মারাঠী-ভাষী, তেলুগু-ভাষী সহজ সংস্কৃতে কথা কহিয়াছেন, আর আমরা সংস্কৃত না জানিলেও বুঝিতে পারিয়াছি। এই সেদিন কাশ্মীর হইতে এক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন; তাঁহার মাতৃভাষা ডোগরা। কিন্তু অল্প স্বল্প সংস্কৃত ভাষা দ্বারা, কেন আসিয়াছেন, কোথায় যাইতেছেন, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে হইলে পণ্ডিত হইতে হয় না। (৯) সংস্কৃতই এক ভাষা যাহার সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশের সামর্থ্য আছে।

সংস্কৃত নাম শুনিয়া চমকাইবার কিছু নাই। যিনি সংস্কৃতকে ভারতভাষা-রূপে শিক্ষা করিবেন, তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় কাব্য লিখিতে হইবে না, কিম্বা ন্যায়দর্শনের টীকাও করিতে হইবে না। তিনি বহু সমাস-বদ্ধ শব্দও রচনা করিবেন না, আর বহু ক্রিয়াপদের রূপও শিখিবেন না। আমি পুরীতে ১৫।১৬ বৎসরের দুই ওড়িয়া বালককে সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে ও তর্ক করিতে দেখিয়াছি। তাহারা অল্প সংস্কৃত শব্দ জানিত, অল্প ক্রিয়াপদ জানিত। কিন্তু সেই অল্প ভাষাজ্ঞান লইয়াই তর্ক করিয়াছে। সংস্কৃত ভারতভাষা হইলে সে ভাষা বাহুল্য-বর্জিত হইয়া প্রারম্ভিক (basic) সংস্কৃত হইবে। সে নিমিত্ত অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে না।

কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষাকে ভারতভাষা করার বিরুদ্ধে বলিবার যুক্তি আছে। সংস্কৃত ভাষা চলিত ভাষা নয়। ইহাতে বর্তমান কালের উপযোগী সাহিত্যও নাই। সংস্কৃত ভাষাকে ভারতভাষা করিলে ভারতের লোকব্যবহার চলিতে পারিবে, কিন্তু বর্তমান কালের উপযোগী সাহিত্যের অভাবে কিছুকাল জীবন্মৃত হইয়া থাকিবে। ইতিমধ্যে পণ্ডিতেরা সর্দার পাটেলের বক্তৃতা, রাষ্ট্রপরিষদের প্রশ্নোত্তর, ইত্যাদি সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া নাগরাক্ষরে প্রচার করিতে থাকুন। সংস্কৃতের ভারত-ভাষা হইবার যোগ্যতা আছে কিনা সহজে পরীক্ষিত হইবে। এই পরীক্ষার পূর্বে সংস্কৃত ত্যাগ করা অবিবেচনার কার্য হইবে।

রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃত হউক, কিম্বা হিন্দী হউক, নাগরী-লিপি সর্বত্র প্রচলিত হইলে ভাষা শিক্ষার প্রথম কণ্টক থাকিবে না। বহুকাল পূর্বে এই পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ৫০০৯ কল্যব্দের মেষমাসে, অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে কলিকাতা হইতে 'দেবনাগর' নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার কিছু পূর্বে কলিকাতায় 'একলিপি বিস্তার পরিষদ্' নামে এক পরিষদ স্থাপিত হইয়াছিল। অনেক মান্যগণ্য বিদ্বান্ এই পরিষদের সদস্য ও সমর্থক ছিলেন। মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন। এক হিন্দীভাষী পণ্ডিত 'দেবনাগরে'র সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রে ভারতের নানা ভাষার প্রবন্ধ নাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইত। নাগরাক্ষরে বাংলা, ওড়িয়া, উর্দু, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ পড়িতে পারা যাইত, যদিও অর্থবোধ হইত না। নাগরাক্ষর দ্বারা সকল ভাষার শব্দের উচ্চারণও ঠিক হইত না। যদি ভারতবাসীর সাজাত্যবোধ জাগাইতে হয়, এক লিপি প্রচলন প্রথম কর্তব্য বিবেচিত হইবে।

কালে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন লিপি লুপ্ত হইয়া নাগরী লিপি ভারতের সর্বত্র প্রচলিত হইবেই। এ বিষয়ে এখন হইতে উদ্যোগ কর্তব্য। হিন্দী ও মারাঠী ভাষা নাগরাক্ষরে লিখিত হয়। যাবতীয় সংস্কৃতমূলক ভাষার যেমন, গুজরাতী, ওড়িয়া, বাংলা, মৈথিলী ও আসামীর অক্ষর নাগরাক্ষরের সামান্য রূপান্তর, অতএব সংস্কৃতমূলক ভাষায় নাগরী প্রচলনে আপত্তি থাকিবার কথা নয়। কেবল দ্রাবিড়-ভাষীকে নূতন অক্ষর শিখিতে হইবে।

বর্তমান প্রচলিত নাগরাক্ষরের আকারের ও সংযোগের দোষ আছে। অসংযুক্ত ও ঔ, অ অক্ষরে সংযুক্ত া ৌ যোগ করিয়া নির্মিত হইয়াছে। ইহার কোন যুক্তি নাই। নাগরাক্ষর খ ও স্ব দেখিতে একই প্রকার, ইত্যাদি। আমি 'বাংলা নবলিপি'তে যে প্রস্তাব করিয়াছি তাহার মূলসূত্র ধরিয়া নাগরাক্ষরের সংযোগ-রীতির সংস্কার করিলে লিখন- ও পঠন-কষ্ট অতিশয় লঘু হইবে। ছয়টি অনুনাসিক বর্ণের ছয়টি নাগরাক্ষর আছে। কিন্তু নাগরী লেখকেরা এক বিন্দুদ্বারা এই ছয় অনুনাসিক বর্ণ জ্ঞাপন করিতেছেন। ইহা অত্যন্ত দোষাবহ। পড়িবার পূর্বে পাঠককে জানিতে হইবে, পরে ক বর্গের অক্ষর থাকিলে বিন্দুদ্বারা ঙ বুঝিতে হইবে, ট বর্গের থাকিলে ণ বুঝিতে হইবে, ইত্যাদি। এইরূপ সংকেত পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারেন, কিন্তু শিক্ষার্থীরা সকল বিন্দুই এক মনে করে। এই দোষের এক বিখ্যাত উদাহরণ দিতেছি। রমেশ দত্ত মহাশয় ঋগ্‌বেদ সংহিতা বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বোধ হয় নাগরাক্ষরে সে বেদের মাতৃকা ছিল। ফলে 'ইন্দ্র' স্থানে ছাপা হইয়াছে 'ইংদ্র'। বোধ হয় এইরূপ কারণে বংশী শব্দ হিন্দীতে বন্‌সী হইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন রোমীয় লিপি শেখা সহজ। তাঁহারা ইংরেজীতে ২৬টি অক্ষর দেখিয়া মনে করিয়াছেন, নাগরাক্ষরমালা অতিশয় দীর্ঘ। কিন্তু বোধ হয় সব দিক তলাইয়া দেখেন নাই। বালক ইংরেজী শিখিতেছে এ, বি, সি (A. B C), নাগরী লিখিবার সময় পড়িবে অ, ব, চ। ইংরেজী laugh পড়িবে লাফ্, নাগরাক্ষরে পড়িবে লৌঘ। বালকের নিকট বিষম জঞ্জাল স্বরূপ হইবে। আমাদের ভাষায় ৫০টি বর্ণ অবশ্য চাই, পঞ্চাশটি অক্ষরও চাই। ঙ, ঞ, ণ, ন স্থানে ইংরেজীতে মাত্র একটি ন (n) আছে। সে অক্ষরের মাথায় তলায় বিন্দু ও তরঙ্গ দিয়া ঙ, ঞ, ণ বর্ণ করিলে তিনটি অক্ষরই আসিয়া পড়িল। ক লিখিতে ইংরেজীতে ka, খ লিখিতে kha ইত্যাদি অক্ষর যোগ দ্বারা বর্ণের নূতন অক্ষরই শিখিতে হইবে। আর, যখন সাধারণ লোকে ইংরেজী বর্জন করিতেছে তখন তাহার লিপি গ্রহণ কদাপি প্রীতিকর হইবে না।

এই প্রবন্ধ লিখিবার পর ১৯৪৯ সালের ১৩ ফেব্রুআরি তারিখে সংবাদপত্রে দেখিলাম, The Question of Language, এই নাম দিয়া ভারত-মহামন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, দুই প্রয়োজনে তিনি ভাষা সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন (১) সে ভাষায় ভারতরাষ্ট্রের কার্য পরিচালিত হইবে ; (২) সে ভাষা দ্বারা হিন্দুমুসলমানের সদ্ভাব রক্ষিত হইবে। তাঁহার মতে, হিন্দীই বল, আর হিন্দুস্থানীই বল, এই ভাষা ভিন্ন আর কোন ভাষা ভারত-ভাষা হইতে পারে না। তিনি উত্তম ভাষার এই এই লক্ষণ দিয়াছেন। সে ভাষার প্রত্যেক শব্দ একার্থ ও স্পষ্টার্থ হইবে ; সে ভাষা সাধারণ লোকের ভাষা হইবে ; সে ভাষা আপনাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, পৃথিবীর গতির দিকে দৃষ্টি রাখিবে ; সে ভাষা অন্যভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিতে পারিবে ও সকল প্রকার ভাব প্রকাশে সমর্থ হইবে ; সে ভাষা ক্রমশঃ পুষ্ট হইবার শক্তি রাখিবে এবং ওজস্বী হইবে। তিনি মনে করেন ইংরেজী ভাষার এই সকল গুণ আছে বলিয়া এত প্রসারিত হইতে পারিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা আমাদের মহাধন বটে, কিন্তু ইহা জীবন্ত ভাষা নহে। ইহাকে পুনর্জীবিত করা অসম্ভব। ইহা হইতে শব্দ গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু ইহার শব্দ বলপূর্বক প্রচলিত ভাষায় প্রবেশ করাইবার চেষ্টা বাঞ্ছনীয় নহে, আবশ্যকও নহে। কয়েক শত বৎসর হইতে ফারসী ভাষার প্রভাব, ইহার শব্দ ও ভাব, আমাদের ভাষায় চলিয়া আসিতেছে। সে ভাষার শব্দ ও ভাব রাখিলে আমাদের ভাষা সমৃদ্ধ হইবে। ইহা সাধারণ লোকের ভাষা হইবে, কয়েক জন পণ্ডিতের ভাষা নয়, ইত্যাদি। এই নিমিত্ত তিনি প্রায় তিন সহস্র শব্দের একটি কোশ সঙ্কলন বাঞ্ছনীয় মনে করেন। লোকব্যবহারে যে সকল শব্দ চলিয়াছে, সে সকল শব্দ এই কোশে থাকিবে। প্রয়োজন হইলে কোন কোন শব্দের পর্যায় শব্দ থাকিবে। আর একখানি পারিভাষিক শব্দের কোশ সঙ্কলন করিতে হইবে। তাঁহার মতে, নাগরীলিপি ভারতলিপি হইবে, এবং আবশ্যকক্ষেত্রে উর্দু ও চলিবে।

ভারতভাষার কি কি গুণ থাকিলে ভাল হয়, সে বিষয়ে সকলেই পণ্ডিতজীর সহিত একমত। কিন্তু সে সকল গুণ হিন্দুস্থানী ভাষার আছে কি? লোকব্যবহৃত কোনও সাধারণ ভাষার শব্দের একার্থতা ও স্পষ্টার্থতা গুণ নাই। দেখা যাইতেছে, পণ্ডিতজী হিন্দী ভাষায় পাঁচ-ছয় সহস্র বাঞ্ছিত শব্দ যোগ করিয়া উর্দুর তুল্য এক

নূতন ভাষা কল্পনা করিয়াছেন। উর্দু জবানে আকবর ও জাহাঙ্গীর বাদশাহ উৎসাহ দিলেও উহা প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর বাজারী জবান ছিল। ইংরেজের প্রয়োজনে মাত্র ৫০।৬০ বৎসর উহা সভ্যসমাজের ভাষা ও কবির ভাষা হইতে পারিয়াছে। অনুমান হইতেছে, এই 'নয়ী জবানে' বহু বহু আরবী-ফারসী শব্দ থাকিবে, অর্থাৎ উর্দু-প্রায় হিন্দী হইবে। তদ্দ্বারা রাষ্ট্রকার্য চলিতে পারে, কিন্তু দেশে এক সাধারণ ভাষার অভাব পূরণ হইবে না। আরবী-ফারসী-বহুল হিন্দীভাষার নাম উর্দু বা হিন্দুস্থানী। এই ভাষা দিল্লী অঞ্চলে ও যুক্ত-প্রদেশের লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে, বিশেষতঃ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অন্য স্থানের মুসলমানেরা সে ভাষা জানেন না। উর্দু অতি অল্প ভারতীয় মুসলমানের মাতৃভাষা। ভারতের জনমত অনুসন্ধান করিলে অতি অল্প লোক উর্দুর পক্ষে মত দিবেন।

৩। ভারত কালাদি-মান

আমরা ইংরেজী সন তারিখ লিখিতেছি। স্বাধীন ভারতেও কি তাহাই চলিবে? ১৯৪৯, ১০ ফেব্রুআরি, এই সন তারিখ ইংরেজী নয়, খ্রীষ্টানী। এই হেতু যাবতীয় খ্রীষ্টান দেশে প্রচলিত আছে। আমরা শক ও সৌরমাস কেন ত্যাগ করিব? শকারম্ভের উত্তম জ্যোতিষিক কারণ ছিল। এই হেতু আমাদের জ্যোতির্বিদেরা শকাব্দ গণিতেন। শক গণনা বৈজ্ঞানিক। লোক-ব্যবহারের নিমিত্ত সৌর মাস গণনা শ্রেষ্ঠ। চান্দ্র মাস কোথাও পূর্ণিমান্ত, কোথাও অমান্ত। আর, জ্যোতির্বিদ ব্যতীত তিথি গণনা অন্যের দুঃসাধ্য। কিন্তু সৌর মাসের দিন-সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিলে যে-সে লোক দিন গণিতে পারিবে। ইংরেজীতে যেমন জানুআরি ৩১, এপ্রিল ৩০, ইত্যাদি মাসের দিনসংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, কেবল এক ফেব্রুআরি মাস কোন বৎসর ২৮, কোন বৎসর ২৯ দিন হয়, সেইরূপ ক্রমে বৈশাখাদি মাসেরও দিন সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখিতে পারা যায়। কোন কোন মাসে সংক্রান্তি দিবসের অনৈক্য হইতে পারে। কিন্তু পঞ্জিকায় যেমন তিথি নক্ষত্র লিখিত হইতেছে, তেমনই সংক্রান্তিও লিখিত থাকিবে। সংক্রান্তি কৃত্যের বিঘ্ন হইবে না। আমরা সূর্যোদয় হইতে বার গণনা করি। এই কারণে খনার বচনে, "মঙ্গলের ঊষা বুধে পা। যথা ইচ্ছা তথা যা।" ইহার অর্থ, বুধবারের ভোর, সূর্যোদয় হইলেই বুধবার আরম্ভ হইবে। কিন্তু এখন আমরা ইংরেজী মতে অর্ধ রাত্রে বার আরম্ভ করিতেছি যাহা মঙ্গলের ঊষা, তাহা বুধের ঊষা হইয়া পড়িতেছে। তাহা হইলেও আমাদের অনেক জ্যোতির্বিদ্ সূর্যোদয়ে বার প্রবৃত্তি না ধরিয়া অর্ধরাত্রে ধরিতেন। তাহা বৈজ্ঞানিকও বটে। আমরা তাহা স্বীকার করিয়া লইলে বর্তমানের রীতি রাখিতে পারা যাইবে।

আমরা তিন মান লইয়া সংসার চালাইতেছি। (১) অঙ্গুলি মান অর্থাৎ দৈর্ঘ্য পরিমাণ; (২) তুলামান অর্থাৎ দ্রব্যের ওজন; (৩) কাল মান অর্থাৎ সময় পরিমাণ। এই তিন মান সকল মানের আদি। আমরা ইঞ্চি, গজ, ফুট, মাইল মাপিতে থাকিব? টন, হন্দর, পাউণ্ড, আউন্স দ্বারা ওজন করিব? ভারতের সর্বত্র এখন ইংরেজী মান চলিতেছে। পরেও কি সেই মান থাকিবে? আমি এখানে প্রশ্নটি উত্থাপন মাত্র করিলাম। ফরাসী দেশে প্রচলিত মীটরকে দৈর্ঘ্যের মিতি (Unit) করিতে পারা যায় কি না তাহাও বিবেচ্য। বেতার বার্তা শুনিতে হইলে মীটর ও কিলোওয়াট বুঝিতে হইতেছে। বিজ্ঞানে ইংরেজী মিতির (Unit) চলন নাই। সঙ্গে সঙ্গে আর এক প্রশ্ন মনে আসে। দশমিক পদ্ধতিতে গণিত কর্ম প্রচলিত করিতে পারা যায় না কি? দশমিক পদ্ধতি কোন্ অতীত কালে আর্যেরা আবিষ্কার করিয়াছিলেন! সভ্য দেশে তাহাই গৃহীত হইয়াছে।

৪। ভারত বন্দনাগীত।

আমরা ভারতী। ভারতের বন্দনা অবশ্য গাহিব। সে বন্দনার নাম ভারত বন্দনাগীত (Indian National Anthem)। ইহাকে সঙ্গীত বলিতে পারি যদি ইহার সহিত বাদ্য থাকে কিম্বা অনেকে একসঙ্গে গাহিতে থাকে। কেহ কেহ ইহাকে 'জাতীয় সঙ্গীত' বলিয়াছেন। কিন্তু জাতীয় সঙ্গীত নামে অনেক গীত রচিত হইয়াছে। সে সকল গীত আধ্যাত্মিক স্তুতি নহে, ভারতের সর্বত্র প্রচলিতও নহে। সুতরাং জাতীয় সঙ্গীত, এই নাম পরিত্যাজ্য।

ভারত বন্দনাগীত কোন্‌টা হইবে, তাহা লইয়া ভারত-রাষ্ট্র-রচনা-পরিষদে তর্ক উঠিয়াছে। কিন্তু যিনি 'স্বদেশী'র প্রাবল্য কালে 'বন্দেমাতরম্' গীতের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি অন্য কোন গীতকে ভারত বন্দনাগীত হইবার যোগ্য মনে করিবেন না। রাজদ্রোহী যুবক প্রহার খাইতেছে, কিন্তু 'বন্দেমাতরম্' ছাড়ে নাই। 'বন্দেমাতরম্' এক মন্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল, অপর কোনও গীত হয় নাই। কি শুভ লগ্নে বঙ্কিমচন্দ্র এই গীত রচনা করিয়াছিলেন! তখন কংগ্রেসের জন্ম হয় নাই, 'স্বদেশী' ভাবের উদয় হয় নাই।

প্রথমে তিনি ভারতমাতার বাহ্যমূর্তি বর্ণনা করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে

এক মহা মহিমময়ী শক্তি বিরাজ করিতেছেন। ইহা কবির অলীক কল্পনা নয়; জল, মাটি, বাতাসে আত্মার আরোপ নয়। বিশ্বচরাচর যে শক্তির প্রকাশ, সেই শক্তিই ভারতের জলে, ফুলে, শস্যে, যামিনীর জ্যোৎস্নায়, পুষ্পিত দ্রুমে, নর-নারীর যুদ্ধোদ্যমে, হৃদয়ের ভক্তিতে, বাহুর বলে প্রকাশিত হইয়াছে। কবি সেই চিন্ময়ী শক্তিকেই 'মাতা' বলিয়াছেন। তাঁহার নাম নাই, রূপ নাই। কেহ তাঁহাকে পিতা বলে, কেহ মাতা, কেহ প্রভু, কেহ সখা। যখন সঙ্গীতবিশারদ ওস্কার নাথ এই গীত গাহিতেন—আমি গ্রামোফোন রেকর্ডে শুনিয়াছি—তখন সকল শ্রোতা এই গীত বুঝিতে পারুক আর না-ই পারুক, তাহাদের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। ছন্দের ঝঙ্কারে, ভাষার ওজস্বিতা ও লালিত্যে, ভাবের ঔদার্য ও গাম্ভীর্যে এই গীত অতুলনীয়। কিন্তু সুরটি কঠিন, সকলে গাহিতে পারিবে না। আর, সে চেষ্টা করাও বৃথা। ইহার এমন সুর দিতে হইবে যে সুরে গীতের গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা রক্ষিত হয়। দেখিতে হইবে, আধুনিক নামে যে সব গান রচিত হইতেছে, সে 'তিড়িং রাগিণী' না আসে।

এই গীতে ৭৮টি মূল শব্দ আছে। তন্মধ্যে ৬টি মাত্র বাঙ্গলা, অবশিষ্ট সকল শব্দ সংস্কৃত। এ কারণ এই গীত ভারতের সর্বত্র সুবোধ্য। এই ৬টি বাঙ্গলা শব্দের (কেন মা, তুমি, এত, তোমারই, গড়ি) স্থানে সংস্কৃত শব্দ অক্লেশে বসাইতে পারা যায়।

বাঙ্গালী মুসলমান, বিশেষতঃ যুবকেরা, এই গীতের প্রতি প্রসন্ন নহেন। তাঁহারা মনে করিয়াছেন, এই গীতে হিন্দুকে মুসলমানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হইয়াছে। তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। যে সময়ে এই গীত রচিত হইয়াছিল, সে সময় বঙ্গ-বিহার-ওড়িষ্যায় সাত কোটি লোকের বাস ছিল। তন্মধ্যে অন্ততঃ আড়াই কোটি মুসলমান ছিলেন। তাঁহাদিগকে না লইলে "সপ্ত কোটি কণ্ঠ" কোথায় পাওয়া যাইবে? কবি বলিয়াছেন, হিন্দু মুসলমান মিলিত হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন। এই গীতের 'রিপু' ব্রিটিশরাজ।

মুসলমানদিগের আর এক আপত্তি, এই গীতে পৌত্তলিকতা আছে। যদি বলি, হিন্দু পুতুলের পূজা করেন না, তাহাতেও তাঁহারা এই গীত গ্রহণ করিতে পারেন না। হিন্দুই হউন, আর মুসলমানই হউন, সাধারণ লোকে যেমন বুঝে তেমনই করা উচিত। কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করিলে মুসলমানদের আপত্তি দূর হইতে পারে। যেমন 'সপ্ত কোটি' স্থানে ত্রিংশৎ কোটি, 'দ্বিসপ্ত কোটি' স্থানে দ্বিত্রিংশৎ কোটি করা হইতেছে, তেমন 'নমামি তারিণীং' স্থানে নমামি পালিনীং, 'তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে' স্থানে তোমারই মহিমা হেরি অন্তরে অন্তরে। যে কলিতে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর উল্লেখ আছে, সে কলিটি ত্যাগ করিলেও ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ গীতটি ছোট করিতে হইবে, নচেৎ বন্দনাগীত দুই মিনিটের মধ্যে সমাপ্ত হইবে না। ইহার অধিক কাল শ্রোতা নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। কিন্তু প্রথম তিন কলি বন্দনা গীতের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। চতুর্থ কলিটি এইরূপ করিলে সকল আপত্তির খণ্ডন হয়—

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই মহিমা হেরি
অন্তরে অন্তরে॥
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

শুনিতেছি, এই গীত ঐকতান বাদ্যের উপযোগী নয়। গীতটি ভক্তের স্তুতি। ইহা নাচনী ছন্দে গাহিলে ইহার মর্মচ্ছেদ হইবে। সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার ইহাকে ঐকতান বাদ্যের উপযোগী করিয়াছেন। মাস দুই তিন পূর্বে 'ভারতবর্ষে' সে সুরের স্বরলিপি প্রদর্শিত হইয়াছে। সে সুরে ভক্তিভাব ও গাম্ভীর্য রক্ষিত হইয়াছে।

এই গীত স্তুতি মন্ত্র। যেখানে-সেখানে যখন-তখন গাহিলে ইহার মাহাত্ম্য লুপ্ত হইবে।

(১) কোন সভা ভঙ্গের সময় এই গীত গাহিবে না। তখন শ্রোতারা চঞ্চল-চিত্ত হয়।

(২) নিত্য ও নিয়মিত কর্মের আরম্ভ কালেও এই বন্দনা গীত গাহিবে না।

(৩) সিনেমা ও থিয়েটারে কদাপি এই গীত গাহিবে না।

(৪) রেডিওতেও এই গীত গাহিবে না। কারণ, উপযুক্ত সময় নাই।

৫। মনুষ্য নামের পূর্বে শ্রী, শ্রীমতী।

এত কাল মনুষ্য নামের পূর্বে বাবু শব্দ লেখা হইতেছিল। এখন নামের পর ব্যবহৃত হইতেছে। যেমন, সুরেন্দ্রবাবু। বাবু শব্দ অতিশয় গৌরবজনক। ইহার ইংরেজী প্রতিশব্দ Sir. সংস্কৃত বপ্তা (জনক) শব্দ হইতে বপা—বাপা—বাপ, আদরে বাপু, তাহা হইতে বাবু। ইংরেজীতেও Sire শব্দ

হইতে Sir শব্দ আসিয়াছে। কালক্রমে বাবু শব্দের নানা অর্থ হইয়াছে। ইংরেজেরা বাবু নামে এ দেশের ভদ্রলোক বুঝিতেন। কেরাণী, আপিসের বাবু। হেড বাবু প্রধান কেরাণী। ক্রমে ক্রমে ইংরেজের মুখে বাবু শব্দের গৌরব নষ্ট হইয়াছিল। Baboo, a native (of Bengal), বহু কাল পূর্বে প্রোফেসর বো সাহেব তাঁহার ইংরেজী ব্যাকরণে "Baboo English" নামে এক অধ্যায় লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বাবুদের ইংরেজী ভাষা জ্ঞানের ভুল ধরিয়াছিলেন। এইরূপ নিন্দা শুনিতে শুনিতে আমরা বাবু ছাড়িয়া Mr. ধরিয়াছিলাম। এখন আমাদের স্বরাজ। মহাত্মা গান্ধী Mr. শব্দ প্রয়োগের অনৌচিত্য প্রথম দেখাইয়া দেন। ইয়োরোপের এক এক জাতির ভাষায় সম্মান-জ্ঞাপক এক এক শব্দ আছে। Mr. John, কিন্তু Herr Hitler, ইত্যাদি। তেমনি আমাদেরও নামের পূর্বে শ্রী লেখা আরম্ভ হইয়াছে। এখন ছোটলাট, বড়লাট, সকলেরই নামের পূর্বে শ্রী, লেখা হইতেছে।

অনেক দিন পূর্বে আমি 'প্রবাসী'তে শ্রী ও শ্রীমতী লেখার যুক্তি দেখাইয়াছিলাম। পুরুষের নামের পূর্বে শ্রী, শ্রীমান, শ্রীযুত, শ্রীযুক্ত, যেমন লিখিতে পারি, নারী-নামের পূর্বেও তেমন শ্রীমতী, শ্রীযুতা, শ্রীযুক্তা। কেহ কেহ মনে করেন, বাৎসল্যে শ্রীমান্ ও শ্রীমতী; ইহা এক বিষম ভ্রম। সধবা অথবা বিধবা নারীর নামের পূর্বে শ্রীমত্যা লেখা শত শত দলিলে দেখা যায়। দলিলে শ্রীমত্যা ভবসুন্দরী দেব্যা, এইরূপ প্রয়োগ দ্বারা বুঝায় না তিনি বালিকা কি যুবতী, সধবা কি বিধবা। পুরুষনামের পূর্বে শ্রী লিখিলে বুঝি তিনি শ্রীযুক্ত আর তিনি জীবিত। এইরূপ, শ্রীমতী লিখিলেও বুঝি, নারী জীবিত। অবিবাহিতা নারীর নামের পূর্বে কুমারী লেখা অতিশয় নিন্দনীয়। এটি ইংরেজী Miss শব্দের ভুল অনুবাদ। ইহা পরিত্যাজ্য। কোন নারী অনূঢ়া, সধবা কিম্বা বিধবা জানান ভারতীয় শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। ইয়োরোপে নারী স্বয়ম্বরা হয়। তাহাদের গান্ধর্ব বিবাহও হয়। অনূঢ়া কি না জানাইবারও প্রয়োজন ঘটে। আমাদের দেশে কন্যা পিতৃদত্তা। কিন্তু কি আশ্চর্য, নামের পূর্বে কুমারী শব্দ এখনও শুনিতে পাই। "তোমার নাম কি?" কন্যাটি বলিতেছে, "কুমারী অর্চনা চাটার্জি"। "তোমার দিদির নাম কি?" (একটু ভাবিয়া) "শ্রীমতী বন্দনা বানার্জি।" "তুমি বুঝি শ্রীমতী নও?" বালিকার বয়স ১৫।১৬ বৎসর, কিন্তু উত্তর করিতে পারিল না। সে বিদ্যালয়ে শিখিয়াছে, বিবাহের পূর্বে কন্যা শ্রীমতী হয় না।

ইদানীর কোন কোন লেখক স্বীয় নামের পূর্বে শ্রী বর্জন করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন, শ্রী লিখিলে পাঠক-সমাজকে জানান হয়, তিনি শ্রীমন্ত। তেমনি কোন কোন লেখিকা শ্রীমতী ত্যাগ করিয়া শ্রী লিখিতেছেন, কেহ বা শ্রীও ত্যাগ করিতেছেন। বাস্তবিক, নামের পূর্বে শ্রী থাকিলে বুঝি, যাঁহার নাম তিনি জীবিত। মৃত ব্যক্তির নামের পূর্বে শ্রী বসে না। কিন্তু যদি তিনি বিখ্যাত ও মান্য হন, তাহা হইলে তাঁহার নামের পূর্বে শ্রী লেখা কর্তব্য। দেবদেবীর নামের পূর্বে ও মান্য গ্রন্থের নামের পূর্বে শ্রী লেখা উচিত। "জয়তি শ্রীচণ্ডীদাসঃ কবিঃ।" চণ্ডীদাস বহুকাল স্বর্গগত, কিন্তু এখনও তিনি শ্রীমান্। এইরূপ, শ্রীভাগবত, শ্রীমান্ ভাগবত। পত্র কিম্বা গ্রন্থের আরম্ভে শ্রী লেখার রীতি ছিল। ইহা হইতে আমরা চলিত ভাষায় বলি 'শ্রী ফাঁদা।'

পুরুষের নামের পূর্বে শ্রী, নারীর নামের পূর্বে শ্রীমতী লেখা আমাদের শিষ্টাচার। শ্রীযুক্তা লিখিলে বর্ষীয়সী বুঝায় না। এরূপ প্রয়োগ ইদানী দেখিতেছি, পূর্বে কখনও দেখি নাই। অন্যান্য প্রদেশেও এই প্রভেদ অজ্ঞাত।

শ্রীজওহরলাল নেহরু, স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারি, কিন্তু শ্রীনেহরু লিখিলে মনে হয় তাঁহার সম্মান করা হইল না। যাঁহাকে সম্মান করি, তাঁহার নামের পূর্বে দীর্ঘ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। শ্রী, শ্রীল, শ্রীযুক্ত, সকলের একই অর্থ। কিন্তু সম্মান জানাইবার নিমিত্ত শ্রীল শ্রীযুক্ত লিখি। এই কারণে শ্রী অপেক্ষা শ্রীযুত বা শ্রীযুক্ত অধিক সম্মানজ্ঞাপক। ইংরেজীতেও Sj. ঠিক চলিয়াছে। যেখানে পুরা নাম না লিখিয়া উপনাম লিখিতে হয়, সেখানে শ্রীযুত বা শ্রীযুক্ত লেখা কর্তব্য। শ্রীনেহরু লিখিতে পারি না। লেখা উচিত শ্রীযুত নেহরু বা শ্রীযুক্ত নেহরু। তেমনই শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, এখানে শ্রীমতী নাইডু লেখাই ঠিক। ইংরেজীতে Sm. Naidu. ইহার পরিবর্তে শ্রীযুক্তা লেখা শুধু পাণ্ডিত্য প্রকাশ।

শ্রী শব্দ গৌরব বুঝায়। যিনি মনুষ্যজন্মে গৌরববোধ না করেন তিনি শ্রী লিখিবেন না। আসল কথা, ইংরেজেরা নামের পূর্বে Mr. বা Mrs. লেখেন না, অতএব আমরাও লিখিব না। ইংরেজী আচার-ব্যবহারের বহু অনুকরণের মধ্যে ইহা একটি।

শ্রীমতী লিখিবার দুই হেতু আছে,—

(১) ইহা আমাদের দেশের শিষ্ট রীতি; ইহা আমরা কেন ত্যাগ করিব?

(২) ইদানী এমন অনেক নাম আছে, যাহা শুনিয়া নর কি নারী বুঝিতে পারা যায় না। যেমন, হেমশশী সোম, পরিমল খাঁ, সবিতা তপস্বী, কিরণ বসু, শান্তি মুখার্জি, প্রকৃতি গুপ্ত, বিদ্যুৎ রাহা, নীলিমা বসু, অরুণিমা

কর, বাসন্তী ঘোষ, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কে নর, কে নারী, কেহ বলিতে পারিবে না। নাম-বিভ্রাটের আর এক কারণ জুটিয়াছে। কোন কোন পুরুষ স্বীয় নামের মধ্য শব্দ বর্জন করিয়া সংক্ষেপ করিতেছেন। যেমন, কালী মিত্র, পার্বতী সেন, শান্তি সান্যাল ইত্যাদি। যাঁহারা ইঁহাদিগকে না চিনেন, তাঁহারা ইঁহাদিগকে নারী মনে করিবেন।

কিছু দিন হইতে নারী নিজ নামের শেষে দেবী কিম্বা দাসী লেখা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই কারণেই নাম শুনিয়া নর কি নারী, বুঝিতে পারা যায় না। ভাষার ব্যাকরণেও এক বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের নামে দুই অংশ আছে; প্রথমাংশ স্বনাম, দ্বিতীয়াংশ কুলনাম বা উপনাম। সমুদয় কুলনাম পুংলিঙ্গ। অতএব অচলা চক্রবর্তী, এই নামটি পুংলিঙ্গ, যদিও সে কন্যা। অচলা চক্রবর্তীকে শ্রীমতী বলিতে পারি না। ইহার এক সমাধান আছে। কুলনামে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করিলে নামের পূর্বে শ্রীমতী স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারি।

বিবাহের পর কন্যা পিতৃকুল ত্যাগ করিয়া শ্বশুরকুলে প্রবেশ করে। পিতৃকুলে সে পিতৃকুলজাতা, শ্বশুরকুলে বধূ। শ্রীমতী নির্মলা বসুজাতা, সংক্ষেপে বসুজা, বিবাহের পর শ্রীমতী নির্মলা মিত্রানী বা মিত্রনী। পত্নী শব্দের সংক্ষেপে 'নী'; যেমন, শিবানী, ভবানী, মাতুলানী। আনী ও নী প্রত্যয় যোগে কুলের বধূও বুঝায়। এইরূপ, নাপিতানী, মালিনী, জেলেনী, মজুমদারনী, সরকারনী, চৌধুরানী ইত্যাদি গ্রামে বহু প্রচলিত আছে। ইদানী শিক্ষিকা অর্থে মাষ্টারনী শব্দ চলিতেছে। এখানে 'নী' যোগে স্ত্রী-মাষ্টার বুঝায়, মাষ্টার কুলের বধূ নয়। এইরূপ, ডাক্তারনী। যিনি শ্রীমতী সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়জা ছিলেন, তিনি পরে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুনী হইয়াছেন। এই রীতি প্রচলিত হইলে নারীর কুল বুঝিতে অসুবিধা হয় না। কেহ কেহ নিজের নামের পরে গুপ্তা লিখিতেছেন। এইরূপ 'আ' দিয়া স্ত্রীলিঙ্গ বুঝিতে পারি, কিন্তু তিনি কন্যা না বধূ, বুঝিতে পারা গেল না।

একবার এক মহিলা আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পুরুষের নামের পর বাবু বলিয়া সম্বোধন করা চলে; যেমন সুরেন্দ্রবাবু। আমরা এই রকম একটি শব্দের অভাব বোধ করিতেছি। আমরা এখন বলি 'অর্চনা দি'। কিন্তু অপরিচিতা মান্যা মহিলার নামের পরে 'দি' যোগ করিতে পারি না; পূর্ণ আকারে দিদিও বলিতে পারি না।" ইহার একটি সমাধান আছে। বাবা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বাবী। তাহা হইতে 'বাঈ' আসিয়াছে। উত্তর-ভারতে ও মহারাষ্ট্রে বাঈ শব্দ বহু প্রচলিত আছে। মরাঠীতে বাঈ শব্দের প্রথম অর্থ মাতা। হিন্দীতেও বাঈ শব্দের অর্থ মাতা বা গৃহিণী। ইহা হইতে মান্যা নারীর নামের পর বাঈ বলা হয়; অর্থাৎ তিনি মাতৃ-স্বরূপা। যেমন প্রাতঃস্মরণীয়া মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ ইত্যাদি। কিন্তু বাঙ্গলায় বাঈ বলিলে বাঈনাচ মনে আসে। রক্ষা এই, ইদানী আর বাঈনাচ নাই। আর কত দিকে ভাষা সাবধান হইবে? মধ্য-প্রদেশে ও উত্তর-ভারতে বাবুর পত্নীকে বাঈ বলা প্রচলিত আছে। যেমন রেলের মালবাবুর পত্নী মালবাঈ। যদি বাঈ বলিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, মহিলারা বাবী বলিতে পারেন। এই বাবী শব্দ নূতন রচিত নয়। বাঁকুড়ায় ছত্রিদের নারীরা বাবী। কোন কোন ছত্রিবংশের পদবী বাবু আছে। যেমন শ্রীকেদারনাথ বাবু। তাঁহাদের নারী বাবী নামে খ্যাত। যেমন, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা বাবী। অতএব বঙ্গ-মহিলা বাবী সম্বোধন অক্লেশে করিতে পারেন। প্রথম প্রথম নূতন ঠেকিবে, অভ্যাসে নূতনত্ব চলিয়া যাইবে।

এখানে বঙ্গের রীতিই আলোচিত হইল। ভারতের সর্বত্র যাহাতে একই রীতি গৃহীত হয়, তদ্‌বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

শিক্ষার মাধ্যম

ভাস্কর

১

এই পাড়ারই ছেলে। যেমন বুদ্ধিমান্ তেমনি সপ্রতিভ। সকলেই ইহার কাছে অনেক কিছু আশা করে। কিন্তু অকস্মাৎ এ কি হইল? এক দিন প্রাতে দেখা গেল ছেলেটি বাড়ীতে নাই। অনেক খোঁজ করিয়াও কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। নচিকেতা নিরুদ্দেশ।

আসল কথা, নচিকেতার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। পড়াশুনা, আহার, বিহার, লেক, পার্ক, সিনেমা, ক্রিকেট, সবই বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। অতি সাধারণ বেশে সে যাত্রা করিয়াছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করিয়া সে বাড়ী ফিরিবে না।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর যাইতেই, পাড়ার মেয়ে বাসন্তী ডাকিয়া বলিল, নচিদা, এত সকালে কোথায় যাচ্ছ বল তো?

নচিকেতার কোন উত্তর না পাইয়া সে আবার বলিল, শোন, মনে আছে ত, বলেছিলে কলেজ স্কোয়ারের রেলিং থেকে আমাকে দু' গজ ছিট এনে দেবে। আজ যেন ভুল না হয়।

আমার দ্বারা ওসব হবে না।

সে কি! তুমি অত রাগ করছ কেন বল তো?

আমায় বিরক্ত কর না। আমায় দিয়ে আর সংসারের কোন কাজ হবে না। আমি সংসার ত্যাগ করেছি।

বাসন্তী গালে হাত দিয়া বলিল, ওমা, সে কি!

হ্যাঁ, ভাই।

পাগল হলে নাকি?

না, পাগল হই নি। তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তুমি বুঝবে না। মোট কথা, আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। আমি চললাম।

'যমের বাড়ী যাও' বলিয়া বাসন্তী মুখ ফিরাইল।

'তাইতো যাচ্ছি' বলিয়া নচিকেতা পা বাড়াইল। বাসন্তীর চোখের কোণে বোধ হয় এক ফোঁটা জল টল্ টল্ করিয়া উঠিল।

২

নচিকেতা চলিয়াছে। কত পথ অতিক্রম করিয়াছে। আরও কত দীর্ঘ পথ যাইতে হইবে। যমালয় তো এখানে নয়। স্বর্গে গিয়া তবে যমের সহিত সাক্ষাৎ মিলিবে!

কত বন, কত পর্বত, কত মরু উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গম পথ বাহিয়া নচিকেতা চলিয়াছে। বনপ্রদেশে মুনি-ঋষিদের মত ফল-মূল আহার করিয়া কোন মতে জীবনধারণ করিতেছে। বনের মধ্যে কিছু দূর পর পরই গাছে আপেল, ন্যাসপাতি, কমলালেবু, আঙুর, আতা, পেয়ারা প্রভৃতি ঝুলিতেছে। ছোট ছোট গাছগুলিকে মাটি হইতে টানিলেই শাক-আলু, রাঙা-আলু, মিষ্টি-মূলা প্রভৃতি উঠিয়া আসে। সুতরাং মুনি ঋষিদের ক্ষুধা পাইলে ফল-মূলের কোন অভাব হয় না। অবশ্য পাওয়া যায় বলিয়াই তাঁহারা যখন তখন যত ইচ্ছা খান, তা নয়। শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সামান্য যেটুকু দরকার, তার বেশী খান না। নচিকেতাও এইরূপ পরিমিত আহার করিতে করিতে ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইতে হইতে স্বর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এক স্থানে একটি সুন্দর মাঠ। অনেকগুলি ছেলে খেলিতেছে। তাহারা নচিকেতাকে দেখিয়া বলিল, এস না ভাই, আমাদের সঙ্গে খেলবে।

নচিকেতা বলিল, না ভাই, আমি খেলাধুলা ছেড়ে দিয়েছি। ও সবে আমার আর মন নেই।

সে কি! এই বয়সে এখনই খেলাধুলা ছেড়ে দিলে চলবে কেন? এস খেলবে এস। খেলার পর, একটু জলযোগের ব্যবস্থাও আছে। মনে হচ্ছে, অনেক দূর থেকে আসছ। খিদেও পেয়েছে। এস, ভাই এস।

না ভাই, আমার ওসব খাবার খেতে নেই। আমি সংসার ত্যাগ করেছি। বনের ফলমূল ছাড়া আমার আর কিছু খেতে নেই।

কি সর্বনাশ!

হ্যাঁ ভাই! তোমরা আমার কথা বুঝবে না। আমি যাই।

নচিকেতা চলিতে লাগিল। ছেলেরা খেলায় মন দিল।

আরও অনেক দূরে। একটি সুন্দর ঝর্ণা। ঝর্ণার পাশে অনেকগুলি বড় বড় পাথর। পাথরের পাশে অগভীর জল। একটি চেপ্টা বড় পাথরের উপরে একটি গিন্নী-বান্নী গোছের মহিলা ঢাকাই সাবান দিয়া কাপড় কাচিতেছেন। পথে নচিকেতাকে দেখিয়া একটু আশ্চর্যান্বিত হইলেন। এ অঞ্চলে তো এমন মানব-সমাগম দেখা যায় না। তিনি একটু ইতস্তত করিয়া নচিকেতাকে ডাকিলেন, ওহে ছেলে, এদিকে এস ত।

নচিকেতা কাছে গেল। মহিলাটি বলিলেন, আহা, মুখখানা শুকিয়ে গেছে। বসো, একটু জিরোও। আমি এখুনি বাড়ী যাচ্ছি। চল আমার সঙ্গে। ভাল জয়নগরের মোয়া আছে। খেয়ে একটু জল খেয়ে নিও।

নচিকেতা বলিল, না মা, সে হয় না। আমি বিরাগী

ব্রহ্মচারী। আমি ওসব খেতে পারি নে। আমি যাচ্ছি অনেক দূর। পথে বনের মধ্যে ফলমূল যা পাওয়া যায় তাই খেয়ে আমাকে থাকতে হবে।

মহিলাটি বলিলেন, এমন পাগল ছেলে তো দেখিনি। চল আমার সঙ্গে, দুটো মোয়া খেতেই হবে।

না, সে আমি পারব না। আমি চললাম, আমায় মাপ কর।

এই কথা বলিয়া নচিকেতা আবার যাত্রা করিল। মহিলাটি কাপড়ে সাবান মাখাইয়া ঝর্ণার জলে ধুইতে লাগিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, কি ডেঁপো ছেলেরে বাবা!

৩

অবশেষে নচিকেতা স্বর্গে পৌঁছিয়াছে। একজন দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইন্দ্রপুরীর পথ ধরিয়া সোজা ইন্দ্র-ভবনের সম্মুখে পৌঁছিল। সম্মুখে কি বিরাট প্রাসাদ! নচিকেতা অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। বিশাল প্রাচীর, অসংখ্য প্রকার কারুকার্য্য-খচিত বিবিধ আকারের ভাস্কর্য্য, আকাশচুম্বী তোরণ, বিবিধ মণিমুক্তাবিশোভিত দ্বার প্রভৃতি অলৌকিক বস্তু নচিকেতাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। কিন্তু কোন বাহ্য আড়ম্বর নচিকেতার মত ছেলেকে বেশীক্ষণ অভিভূত করিতে পারে না। সে সোজা গিয়া বিশালবপু বিবিধ অস্ত্রাদিভূষিত প্রহরীকে বলিল, যমরাজের বাড়ীটা কোথায় বলতে পার?

নিশ্চয়ই পারি, স্বর্গের সমস্ত রাস্তা ও সমস্ত বাড়ীর ঠিকানা আমাদের জানা। এ না হলে আমরা প্রহরীর চাকরী পেতাম না।

তা হলে আমাকে বলে দাও না, কোন্ পথে যাব।

প্রহরী বলিল, এই সোজা পথে ত্রয়োদশ মোড় পর্যন্ত যাবে। তারপর ডান দিকে ফিরে একাদশ মোড় পর্যন্ত যাবে। তারপর বাম দিকে ফিরে নবম মোড় পর্যন্ত যাবে। তার পর আবার ডান দিকে গিয়ে সপ্তম বাড়ীটাই যমরাজের বাড়ী।

'ধন্যবাদ' বলিয়া নচিকেতা অগ্রসর হইল। স্বর্গের পথ-ঘাট খুব ভাল। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেব ও দেবীরা পদব্রজে, রিক্সায়, মোটরে যাতায়াত করিতেছেন। আকাশ নীল। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। চির বসন্ত বিরাজ করিতেছে। ফুলগুলি ফুটিবার পরে আর শুকায় না। জরা ও মৃত্যু নাই। সেইজন্য দেব-দেবীগণের জন্মসংখ্যা সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে হয়। নতুবা অতিরিক্ত ভীড়ে স্বর্গের স্বর্গত্ব রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিত। দেব ও দেবীগণ যৌবনে পদার্পণ করিবার পর আর তাঁহাদের বয়স বাড়ে না। নচিকেতা দেখিল, একটিও বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা নাই। শিশুর সংখ্যাও অতিশয় অল্প।

এ-দিক ও-দিক দেখিতে দেখিতে এবং মোড়ের সংখ্যা গুণিতে গুণিতে নচিকেতা যমের প্রাসাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীটির নিকটে গিয়া তিনটি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া একটি প্রশস্ত বারান্দায় উপনীত হইল। বাড়ীটি চিনিতে কাহারও কষ্ট হইবার কথা নয়। সমস্ত বাড়ীটিই অদ্ভুত রকমের কালো। সমস্ত বাহিরটায় ব্লু ব্ল্যাক কলার-ওয়াশ, ভিতরে সমস্ত দেওয়ালে আলকাতরার ডিষ্টেম্পার। মেঝেতে কালো মার্বেল পাথর। সমস্ত ফার্নিচারেই মেহগনি পালিশ। সোফা ও সেটিগুলির ঢাক্‌নি সিল্কের ছাতার কাপড়ে প্রস্তুত।

নচিকেতা ইতস্তত চাহিয়া একটি বড় দরজার পাশের কলিং-বেল টিপিতেই একটি প্রকাণ্ড বেয়ারা বাহির হইয়া আসিল, ঠিক যেন একটি কালো পাথরের মূর্ত্তি। দেখিতে ভয়ঙ্কর হইলেও কথাবার্ত্তা কিন্তু বেশ ভদ্র। বেয়ারাটি নচিকেতার আপাদ-মস্তক একবার দেখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাকে চাই?

নচিকেতা বলিল, যমরাজকে।

আপনি এখানে বসুন। আমি খবর দিচ্ছি। তাঁকে কি বলব?

বলবে, মর্ত্ত্য থেকে একটি ছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বিশেষ জরুরী কাজ।

বেয়ারা চলিয়া গেল। নচিকেতা বারান্দার পাশেই বেয়ারা-নির্দিষ্ট হল ঘরে ঢুকিয়া একটি সোফার উপরে বসিয়া পড়িল। পথের ক্লান্তিতে তাহার প্রায় ঘুম আসিতেছিল।

৪

যমরাজ আসিলেন। বিশাল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ, কারুকার্য্যখচিত কৃষ্ণবর্ণ ভূষায় সর্বাঙ্গ ভূষিত। সঙ্গে বিশাল দণ্ড ধারণ করিয়া একজন প্রহরী। দণ্ডটি দেখিতে অনেকটা আমাদের কাউন্সিলের সভাপতির দণ্ডের মত। যমরাজ অগ্রসর হইয়া আসিয়া নচিকেতার পাশের একখানি কেদারায় বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নামটি কি বল তো?

নচিকেতা।

নিবাস?

মর্ত্ত্যে, কলকাতায়।

বেশ! তা এখানে কেন? তোমার তো ভয়ানক সাহস দেখ্‌ছি।

আজ্ঞে, আমার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে। আমি এসেছি আপনার কাছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে।

এই সময়ে হল ঘরের একটি দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন যমপত্নী। তাঁহাকে দেখিয়াই প্রহরী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যমপত্নী ধীরে ধীরে আসিয়া নচিকেতার পার্শ্বে বসিলেন।

ইঁহাকে দেখিয়া নচিকেতা মুগ্ধ হইয়া গেল। যেমন সোনার মত গায়ের বর্ণ, তেমনি সুন্দর স্বর্ণাভ ভূষায় ভূষিত দেহ, তেমনি সোনার মত মৃদু হাসি। যমের পার্শ্বে যমপত্নীকে সম্পূর্ণ একটি বিপরীত চিত্র মনে হইতেছিল। এমন একটা দুর্বিষহ বৈপরীত্য ট্রামে বাসেও বড় একটা দেখা যায় না। নচিকেতা যমপত্নীকে এবং যমরাজকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

যমপত্নী বলিলেন, সুখে থাক বাছা। অনেক দূর থেকে এসেছ, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।

নচিকেতা বলিল, মাদের তো ঐ এক রোগ। কাউকে দেখলেই মনে হয়, তার খিদে পেয়েছে।

হ্যাঁ, বাবা, সেই জন্তেই তো আমরা মা। বসো, একটু খাবার কিছু নিয়ে আসি। চা খাও তো?

সবই তো খেতাম, কিন্তু এখন সব ছেড়ে দিয়েছি। এখন শুধু ফলমূল খাই।

যখন বনে ছিলে, পাহাড় পর্বত ভেঙে হাঁটছিলে, তখন ফলমূল খেয়েছ, বেশ করেছ। এখন আমাদের বাড়ীতে, বাড়ীর মতই খাবে। এটা তো বন নয়।

এই কথা বলিয়া যমপত্নী বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে একখানি বড় রেকাবীতে অনেকগুলি নানা প্রকারের খাবার আনিয়া একখানি টিপয়ের উপর রাখিয়া সেটি নচিকেতার সামনে আগাইয়া দিলেন। পশ্চাতে একটি চাকর চা আনিয়া খাবারের পাশে রাখিল। অনেক দিন পরে চায়ের গন্ধ নচিকেতার নাকের ভিতর দিয়া প্রায় মরমে পশিয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল।

সাধারণ কথাবার্তার সঙ্গে চা-পান শেষ হইল। যমপত্নী উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন। যমরাজ বলিলেন, এইবার বল, তোমার কি কাজ।

নচিকেতা সবিনয়ে বলিল, আমার সংসারধর্মে স্পৃহা নেই। আমাকে আপনি ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিন। আমি আজীবন এই জ্ঞানলাভ ও তদুপযুক্ত তপস্তায় নিযুক্ত থাকবো।

তুমি ভুল করেছ, নচিকেতা, বড় ভুল করেছ।

কেন বলুন তো!

তুমি আধুনিক যুগের কোন খবরই রাখ না। এক সময় ছিল, যখন ব্রহ্মজ্ঞানই হোক, বা অন্ত কোন প্রকার জ্ঞানই হোক, তার পন্থা ছিল—অভ্যাস, অধ্যবসায়, সাধনা, গুরু-সেবা প্রভৃতি। কিন্তু এই সব সেকেলে পন্থা এখন আর নেই। এখনকার শিক্ষার মাধ্যম বা উপায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বর্তমান পন্থা এত সহজ ও মনোরম যে এখন এই পন্থাই সর্ব-প্রকার জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলে গণ্য ও স্বীকৃত হয়েছে।

এই নূতন পন্থাটি কি? শিক্ষার মাধ্যম কি সত্যই পরিবর্তিত হয়েছে?

হাঁ, সেই কথাই তোমাকে বলছি। কথাটা একটা প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন করেই বলব। তত্ত্বের চেয়ে উদাহরণ ভাল।

৫

যমরাজ বলিলেন, 'কিছুদিন আগের কথা বলছি। আমাদের ওপাড়ায় বরুণের ভাগনেটি বেয়াড়া হয়ে উঠল। খালি মিথ্যে কথা বলে। কত বোঝান হ'ল, কোন ফল হ'ল না। বিত্তাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ থেকে 'সদা সত্য কথা বলিবে' এক হাজার বার আবৃত্তি করান হ'ল, কিছু হ'ল না। তারপর রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ থেকে রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি কত উদাহরণ দিয়ে কত উপদেশ দেওয়া হ'ল, কিছুই হ'ল না। 'সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্'-মন্ত্র বহু দিন ধরে জপ করান হ'ল, সবই বৃথা গেল। এমন কি জর্জ ওয়াশিংটন ও চেরী গাছের গল্প শেখান হ'ল। কিন্তু কোন ফলই পাওয়া গেল না।

একদিন গণেশের সঙ্গে দেখা। সব শুনে সে বললে, ওসবে কোন কাজ হবে না। সুশিক্ষার জন্ত সুমাধ্যম আবশ্যক। এক কাজ করুন। ওকে কয়েকদিন পর পর 'সত্যের পথ' নামে যে সিনেমাটা একসঙ্গে পাঁচটি সিনেমায় দেখান হচ্ছে, তাইতে পাঠিয়ে দিন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের মিথ্যাকথা বলার দোষ সেরে যাবে।

কি যে বল গণেশ ভায়া!

আমি ঠিকই বলছি। 'সত্যের পথ' বলে মন্দাকিনী এভেনিউতে যে ছবিটা দেখানো হচ্ছে, ওটার উদ্বোধন করেছেন স্বয়ং শ্রীইন্দ্র, প্রশস্তিবাণী দিয়েছেন শ্রীশুক্রাচার্য উদ্বোধন রজনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন দেবাদিদেব শ্রীশঙ্কর, অভিনেতা ও অভিনেত্রী কিন্নর কিন্নরী ও অপ্সরাগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন স্বয়ং শ্রীনারায়ণ, আর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছেন শ্রীকুবের। এ পর্যন্ত কোন ছবিতেই এমন দেব-সমাগম হয় নি। কাতারে কাতারে দেবদেবীরা যাচ্ছেন, এক যোজন, দুই যোজন লম্বা কিউ হচ্ছে। টিকিটঘরের সামনে একেবারে দেবে দেবারণ্য।

তা, এই ছবি দেখলে বরুণের ভাগ্নে সত্যপরায়ণ হয়ে উঠবে, এই তোমার ধারণা?

নিশ্চয়ই। ফলেন পরিচীয়তে।

এই আলোচনার পর বরুণের ভাগ্নেটিকে ঐ ছবি দেখতে পাঠান হ'ল। ছবির মধ্যে একটা গান আছে, সেই গানটিই তাদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে দিল। একটি অনিন্দ্য সুন্দরী অপ্সরা, বুকের কিঞ্চিৎ যা কিছু দোষ ছিল, সব রং দিয়ে ঢাকা। অপূর্ব পরিচ্ছদ, বেশি বর্ণনা অনাবশ্যক। পায়ে ঘুঙুর। অপূর্ব ভঙ্গীতে নাচতে নাচতে গান করছে—তোমরা সত্য বল রে—(সুর—সিনেমিয়া—আকাশে চাঁদ ছিল রে—)। এই

নৃত্য ও এই গান দেখবার ও শুনবার পর পরম মিথ্যাবাদীরাও সত্যবাদী হয়ে উঠল। তাদেরও সত্যবাদিতার পরম প্রেরণা পেয়ে রোজ একবার করে 'সত্যের পথ' দেখতে আরম্ভ করল। মামা বরুণ আশ্বস্ত হলেন।"

৬

একটু থামিয়া যমরাজ নচিকেতাকে বলিতে লাগিলেন, এখন বুঝেছ, বর্তমান যুগের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যম কি? সাহিত্য বল, বিজ্ঞান বল, ইতিহাস বল, ধর্ম বল, যা-কিছু শিক্ষা, করতে চাও, সব এরই মধ্যে পাবে। শুষ্ক নীরস সাধনা, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, এ সকলের কোন প্রয়োজন নেই একালে। শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি সম্পূর্ণ অবান্তর।

নচিকেতা বলিল, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে চাই শাস্ত্রজ্ঞান, শাস্ত্রপাঠ করতে হলে বহু সাধনা, ব্যাকরণ পাঠ প্রভৃতি চাই। এসব কেমন করে হবে?

ব্যাকরণ! হাসালে হে নচিকেতা, হাসালে। বর্তমান যুগে ব্যাকরণ সম্পূর্ণ বাহুল্য। তার পরিবর্তে এখন হয়েছে দ্রুত-পঠন। তাড়াতাড়ি পড়লেই আর ব্যাকরণ দরকার হয় না। বর্তমান জগৎটাই একটা তাড়াতাড়ির জগৎ। তাড়াতাড়ি কাজ সারার কৌশল আয়ত্ত করাই বর্তমান ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সাধনা। কাজেই যদি তুমি তাড়াতাড়ি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে চাও তো সিনেমায় যাও। ব্যাকরণ, শাস্ত্র, অধ্যয়ন, সাধনা, এ সবের কোনই দরকার হবে না।

নচিকেতা বলিল, তাই ত, এ কথাটি এমন ভাবে ত ভেবে দেখি নি, মর্ত্যলোকে এমন ভাবে কেউ আমাকে বুঝিয়েও দেয় নি। তা হলে আর এত কষ্ট করে আমাকে এত দূর আসতে হতো না, আপনাকে বিরক্ত করতে।

তা যাক, জগতে কিছুই অনর্থক নয়। তোমার এই আগ্রহ, এই শুভ আকাঙ্ক্ষায় আমি প্রীতিলাভ করেছি। আশীর্বাদ করি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

আচ্ছা, তা হলে আমি বিদায় হই।

কিন্তু ফিরবে কি করে? আবার সেই বনজঙ্গল ভেঙে? কিছু দরকার নেই। আমি তাড়াতাড়ি ফেরবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

যমরাজ উঠিয়া গিয়া ইন্দ্রকে টেলিফোন করিলেন, দেখো, মর্ত্য থেকে একটি খাসা ছেলে এসেছে। তার সব কথা পরে তোমায় বলব। সে মর্ত্যে ফিরবে। তোমার পুষ্পকটা এক ঘণ্টার জন্যে পাঠিয়ে দিও। ওকে কলকাতায় রেখে আসবে।

ইতিমধ্যে যমপত্নী হলঘরে আসিয়া মোটামুটি সব কথা শুনিয়া নচিকেতার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন, পাগল ছেলে! যাও বাড়ী গিয়ে ভাল করে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ব্যবস্থা কর গে।

পুষ্পক আসিয়া যমরাজের গৃহের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে থামিল। ঘর্ঘর শব্দ শুনিয়া নচিকেতা উঠিল এবং যমরাজ ও যমপত্নীকে প্রণাম করিয়া প্লেনে উঠিল। প্লেন ছাড়িবার সময়ে যমরাজ নচিকেতাকে বলিলেন, মনে রেখো—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
সিনেমৈব যং বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥

৭

নচিকেতা মর্ত্যে ফিরিয়া প্রত্যহ বাছিয়া বাছিয়া সিনেমা দেখিতে লাগিল। যে সকল ছবিতে লৌকিক মতে রমণীয় অথচ বৈদান্তিক মতে বর্জনীয় বস্তুগুলি বেশী করিয়া দেখান হয়, বৈরাগ্যলাভের অনুকূল বলিয়া সেইগুলি বার বার দেখিতে লাগিল। নচিকেতাকে দেখিয়া পাড়ার বাসন্তীও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়াশুনা ও গৃহকর্ম ছাড়িয়া বাছা বাছা ছবি দেখিতে আরম্ভ করিল এবং সিনেমাগৃহের সম্মুখে অপ্রত্যাশিতভাবে নচিকেতার সহিত সাক্ষাৎ হইতে লাগিল।

কিছু দিনের মধ্যেই উভয়ে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া স্ব স্ব গৃহ ও সংসার ত্যাগ করিল।

এখন উহারা উভয়ে মিলিয়া তারকা ও তারকিনীরূপে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভে উদ্বুদ্ধ করিয়া জীবন সার্থক করিতেছে।

সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিলা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন্ (বেথুন) কলিকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় (বর্ত্তমান বেথুন কলেজ) প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের বাধাবিপত্তি দূর করেন। তদবধি দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার লাভ করিতে থাকে। এই শুভ অনুষ্ঠানের পর হইতে আমরা কোন কোন বঙ্গমহিলাকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখি। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকামিনী দাসী 'চিত্তবিলাসিনী' নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশ করেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎসম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' (২৮ নবেম্বর) ইহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গুপ্ত-কবি স্বীয় পত্রে কুলকন্যাদের গদ্য-পদ্য রচনা স্থান দিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন; ইঁহাদের মধ্যে "ঠাকুরাণী দাসী" এই ছদ্ম নামে এক বিপ্র-বিধবা রচনা প্রকাশ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছিলেন: "এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতিরা সংপ্রতি বিদ্যালোচনাপূর্ব্বক রচনার সূচনা করিতেছেন, ইহার অপেক্ষা অধিক আহ্লাদকর ব্যাপার আর কি আছে! ইঁহারা বিদ্যাবতী হইলেই দেশের সমস্ত দুর্দ্দশা, দুর্গতি এবং দুর্নাম দূর হইবে তাহাতে আর সংশয় কি?" ('সংবাদ প্রভাকর,' ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৯)

মহিলাকুলের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের নিমিত্ত, তাঁহাদের রচনাবলী প্রকাশের জন্যও বটে, স্ত্রীপাঠ্য-বিষয়-সম্বলিত পত্র-পত্রিকারও আবির্ভাব হইল। এগুলির মধ্যে মজিলপুর নিবাসী উমেশচন্দ্র দত্তের মাসিক 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (আগষ্ট ১৮৬৩) ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত পাক্ষিক 'অবলাবান্ধব' (২২ মে ১৮৬৯) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্তঃপুরবাসিনীদের জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল; ক্রমশঃ তাঁহারা নিজেদের অধিকার ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধেও সচেতন হইয়া উঠিলেন। এ-বিষয়ে আন্দোলনের ভার তাঁহারা নিজেরাই গ্রহণ করিলেন;—দেশে মহিলা-সম্পাদিত সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র দেখা দিল।

আমরা গত শতাব্দীর মহিলা-পরিচালিত যে-সকল বাংলা পত্র-পত্রিকার সন্ধান পাইয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেগুলির কথা আলোচনা করিব।

বঙ্গমহিলা: মহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র—'বঙ্গমহিলা' নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র, খিদিরপুর-নিবাসিনী জনৈক মহিলার সম্পাদনায় ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭০) প্রকাশিত হয়। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (জ্যৈষ্ঠ ১৭৯২ শক) লেখেন:—

"এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। একটি হিন্দু স্ত্রী এই পত্রিকার সম্পাদিকা, কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। সম্পাদিকা আশা করেন, এখানি বঙ্গদেশের সকল শ্রেণী স্ত্রীলোকদিগের মুখস্বরূপ হইবে। স্ত্রীলোক-দিগের স্বত্ব প্রভৃতির সমর্থন করা ইহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকের সম্পাদিত সংবাদপত্র এ দেশে এই নূতন প্রকাশিত হইল। আমরা হৃদয়ের সহিত ইহার পোষকতা করিতেছি এবং আশা করি যে, কয়েক সংখ্যা পত্রিকাতে যেমন স্ত্রীজনোচিত শান্ত ভাব প্রকাশ পাইতেছে, চিরকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব! সম্পাদিকা যদি অনুচিত বিজাতীয় অনুকরণে ব্যগ্র না হইয়া আমাদের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিয়া ও সমুচিত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব সকল প্রকটিত করেন, এখানি ভদ্রসমাজে অত্যন্ত আদরণীয় হইবে।"

রচনার নিদর্শনস্বরূপ প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গমহিলা'য় প্রকাশিত "স্বাধীনতা" নামে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"প্রকৃত স্বাধীনতা কি? বোধ করি, এ কথা নব্য সম্প্রদায়ের অনেকে বুঝেন না, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতাকেই স্বাধীনতা মনে করিয়া থাকেন। বঙ্গমহিলারা যথার্থ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু কেহ কেহ তাহা পরাধীনতা জ্ঞান করিয়া স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত বলিয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, আমরা তাহা অনুমোদন করিতে পারি না। ইউরোপীয় কামিনীগণের যেরূপ স্বাধীনতা আছে, বঙ্গীয় স্ত্রীলোক-দিগকে ঠিক সেইরূপ স্বাধীনতা দিতে এদেশীয় কতক-গুলিন লোকের বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গমহিলাদের সে ইচ্ছা নাই। ইউরোপীয় ও আমেরিকান স্ত্রীজাতির যেরূপ স্বাধীনতা দেখা যায়, তাহাকে আমরা স্বেচ্ছা-চারিতা বলিয়া থাকি। স্ত্রীলোকে মনে করিলেই যে ঘোড়া চড়িয়া উড়িয়া যায়, ইচ্ছামতে পরপুরুষের সহিত হাস্যকৌতুক অথবা নৃত্যাদি করে, লজ্জাহীনার ন্যায় পুরুষদের সঙ্গে পান ও আহার করে, যখন তখন ভিন্ন পুরুষের হাত ধরিয়া যথাতথা বেড়াইয়া বেড়ায়, এমন স্ত্রীলোকদিগকে কি বলা যায়? তাহাদিগকে মেয়ে বলিতে তো আমাদের সাহস কুলায় না। নম্রতা এবং লজ্জাশীলতাই স্ত্রীলোকদের প্রধান গুণ। যে সকল স্ত্রী লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক নম্রতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বীরবেশে দেশ বিদেশে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করে তাহারা

কি স্ত্রী? না বীর? নারীজাতির এই সকল কার্য্য কি ভদ্রোচিত? না সভ্যোচিত? অথবা তা স্বাধীনতার ফল? এরূপ স্বাধীনতা যে বঙ্গস্ত্রীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান রমণীগণই তাহার প্রমাণস্থান। তাঁহারা ইউরোপীয় কামিনীদের ন্যায় স্বাধীনতা লাভে লোলুপ হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতির প্রতিকূলাচরণে এ পর্য্যন্তও সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মুখভঙ্গিমা ও সলজ্জভাব অবলোকন করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যেন তাঁহারা উক্তরূপ স্বাধীনতালাভার্থে স্ব স্ব প্রকৃতির উপরে বল প্রকাশ করিতেছেন।

ঐরূপ স্বেচ্ছাচারিতারূপ স্বাধীনতায় বঙ্গমহিলাদের কাজ নাই। তাঁহাদের যে স্বাধীনতা আছে, তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। কে বলে যে বঙ্গমহিলারা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহরূপ কারাগারে আবদ্ধ আছে? তাঁহারা কি আপন আপন ইচ্ছামত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারেন না? ইচ্ছানুসারে অশন বসন প্রাপ্ত হন না? আত্মীয়স্বজনের বাটীতে কি গমনাগমন করিতে পারেন না? তাঁহাদের মন কি স্বাধীন নহে? তবে তাঁহারা পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বন্দীদশায় অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?

বঙ্গমহিলাদের অনেক অভাব আছে, একথা আমরা পূর্ব্বাবধিই স্বীকার করিয়া আসিতেছি, আর সেই সকল অভাব যে ক্রমে ক্রমে মোচন হইবে একণে তাহার আকার-প্রকারও দেখিতেছি। শিক্ষাভাব এদেশীয় স্ত্রীলোকদের একটি বিশেষ অভাব ছিল, কিন্তু অধুনা বঙ্গাঙ্গনাগণের ভাগ্যে সেই শিক্ষার দ্বার মুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের বর্ত্তমান পোষাক পরিবর্ত্ত হউক, উচ্চতর শিক্ষা লাভ হউক, তখন দেখা যাইবে যে তাঁহাদের ন্যায় যথার্থ সভ্য, ভদ্র ও স্বাধীনচিত্ত স্ত্রী-জগতের আর কোথায়ও নাই। (সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা অনেক স্থলে ভারতীয় নারীজাতিকে স্ত্রীরত্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।) তখনই দেখিব যে বঙ্গস্ত্রী রত্নবিশেষ হইয়াছেন।

সে যাহা হউক, আজিকালি নব্য সম্প্রদায়ের কোন কোন লোক আপন আপন স্ত্রীকে কিছু কিছু স্বেচ্ছাচাররূপ স্বাধীনতা দিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের রমণীরা তদ্বিষয়ে সম্মতা নহেন, তজ্জন্য নবীন বাবুরা কিছু পীড়াপীড়িও লাগাইয়াছেন।

নবীন বাবু! এখন তুমি অল্প দিনের জন্য ক্ষান্ত হও, তোমার শোণিত কিঞ্চিৎ শীতল হইয়া আসুক। তুমি কি করিতে উদ্যত হইতেছ, তাহা বড় একটা বুঝিতেছ না, অতএব আমাদের দেশের বিজ্ঞলোকদের কাছে পরামর্শ লও। তোমার স্ত্রীকে যদি দশ জন অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে বসাইয়া দাও, তবে তিনি ভয়ে পাণ্ডুবর্ণা, লজ্জায় মলিনা হইয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইবেন সন্দেহ নাই। (২৩ এপ্রিল ১৮৭০ তারিখের 'হিন্দুহিতৈষিণী' পত্রে উদ্ধৃত)

অনাথিনী: ইহাই মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা; সম্পাদিকা—থাকমণি দেবী; প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১২৮২ (জুলাই ১৮৭৫)। ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' (২৯ শ্রাবণ ১২৮২) লিখিয়াছিলেন:—

"অনাথিনী (মাসিক পত্রিকা)—শ্রীমতী থাকমণি দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আজিমগঞ্জ বিশ্ববিনোদ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই শ্রাবণ মাস হইতে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত সাময়িক পত্র এ দেশে এই আমরা প্রথম দেখিলাম। পত্রিকাখানি স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদিগের অনল্প আহ্লাদের কারণ হইবে।"

সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়ের জামাতা—কাঁটালপাড়া-নিবাসী অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ম্মস্থল ধুলিয়ান হইতে 'অনাথিনী' প্রকাশ করেন। থাকমণি দেবী সম্ভবতঃ তাঁহার কন্যা হইবেন।* 'বান্ধব' (ভাদ্র ১২৮২) লিখিয়াছিলেন—"শুনিয়াছি, সম্পাদিকা অল্প বয়সের বালিকা।"

হিন্দুললনা: বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র। এই পাক্ষিক পত্রিকা ১২৮৪ সালের মাঘ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮) মাসে বারাকপুরের নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশিত হয়। 'হিন্দুললনা'র সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' (১৮ ফাল্গুন) লিখিয়াছিলেন:—

"হিন্দুললনা—এতন্নাম্নী একখানি পত্রিকার ১ম কাণ্ড ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা, এবং কোন হিন্দুললনা কর্ত্তৃক সম্পাদিত। সম্পাদিকা ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—'বাঙ্গালা ১২৭১ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে বঙ্গভাষায় বঙ্গমহিলা নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা স্বদেশহিতৈষিণী তথা বঙ্গবাসিনীগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী একটি হিন্দুমহিলা কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিতা হয়। বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক দ্বারা সংবাদপত্র প্রচারের সূত্রপাত তিনিই করিয়া যান। আমরা তাঁহারে সম্যক্‌রূপে অবগত থাকিলেও তাঁহার পরিচয়

* 'অনাথিনী' প্রকাশিত হইবার তিন মাস পূর্ব্বে, নসীপুর হইতে ভুবনমোহিনী দেবী-সম্পাদিত 'বিনোদিনী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকার গৌরব দিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে "ভুবনমোহিনী দেবী"—এই নামের আড়ালে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্রিকাখানি পরিচালন করিতেন। সুতরাং ইহাকে মহিলা-পরিচালিত মাসিক পত্রিকা বলা উচিত হইবে না।

প্রদানে ইচ্ছা করি না। বঙ্গমহিলা পত্রিকাখানি ৯।১০ মাস চলিয়া বন্ধ হইলে পর…।' হিন্দুললনার সংবাদপত্র প্রচারে পারগতা ও মতি হিন্দু সমাজের গৌরবের বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই।…বারাকপুর নবাবগঞ্জ হইতে ইহার প্রচার হইতেছে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক তিন টাকা।"

ভারতী : 'ভারতী'র নাম সাহিত্য-সংসারে সুবিদিত। ইহা ১২৮৪ সালের শ্রাবণ (জুলাই ১৮৭৭) মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী ও কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী—সকলেই সম্পাদকীয় চক্রের মধ্যে ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ১২৯০ সাল পর্য্যন্ত, সাত বৎসর, সুষ্ঠুভাবে পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, সাহিত্যানুরাগিণী কাদম্বরী দেবীর অপমৃত্যুর (৮ বৈশাখ ১২৯১) সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতী'র সেবকেরা উহার প্রচার রহিত করাই সাব্যস্ত করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ঘোষণা করেন—"ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।" কবি অক্ষয়চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী শরৎকুমারী চৌধুরাণী যথার্থই লিখিয়াছেন :—

"ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে বাঁধা থাকে, তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি-পরিবারে গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল,—ভারতীর সেবকেরা আর ফুল তোলেন না, ভারতী ধূলায় মলিন। এই দুর্দ্দিনে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর পালন-শক্তির পরিচয় দিলেন।" ("ভারতীর ভিটা" : 'বিশ্বভারতী পত্রিকা,' ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা)

অতঃপর ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত (১৩০৫ সাল বাদে) ত্রিশ বৎসর কাল 'ভারতী'র লালন-পালনের ভার মহিলা-হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইঁহাদের কার্য্যকাল এইরূপ :—

১২৯১—১৩০১ সাল … স্বর্ণকুমারী দেবী
১৩০২—১৩০৪ „ … স্বর্ণকুমারীর কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবী
১৩০৬—১৩১৪ „ … সরলা দেবী
১৩১৫—১৩২১ „ … স্বর্ণকুমারী দেবী।

সম্পাদিকাগণের বহু সুলিখিত রচনা 'ভারতী'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

খৃষ্টীয় মহিলা : নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৮৭ সালের মাঘ (জানুয়ারি ১৮৮১) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা সম্পাদন করিতেন—কুমারী কামিনী শীল। ইহাতে মহিলাদের রচিত সহজবোধ্য গদ্য-পদ্য রচনা স্থান পাইত। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' (২৯ এপ্রিল ১৮৮১) লিখিয়াছিলেন :—

"খৃষ্টীয় মহিলা—মাসিকপত্র—কুমারী কামিনী শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে কেবল স্ত্রীলোকেরাই লিখিয়া থাকেন, যে সকল স্ত্রীলোক ইহাতে প্রবন্ধাদি লেখেন, প্রবন্ধগুলি পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তাঁহারা সুশিক্ষিতা। এক একটি পদ্য প্রবন্ধ অতি সুন্দর লেখা হয়।"

সোহাগিনী : একখানি মাসিক পত্রিকা, প্রকাশকাল বৈশাখ ১২৯১ (এপ্রিল ১৮৮৪)। কৃষ্ণরঙ্গিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে 'সোহাগিনী' সম্পাদন করিতেন। ইহা ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট হইতে হৃদয়লাল শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত।

বালক : ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৫) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নামে সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—"বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্য মেজবউঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।" এক বৎসর সগৌরবে চলিবার পর 'বালক' 'ভারতী'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

পুণ্য : ১৩০৪ সালের আশ্বিন মাসে (অক্টোবর ১৮৯৭) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সম্পাদনায় 'পুণ্য' নামে একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। পত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবন্ধই স্থান লাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে গৃহস্থের এবং মানবমাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন আহারের বিষয় প্রতি মাসেই থাকিবে। ইহাতে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুকূল শিল্পবিদ্যা প্রভৃতিরও অভাব দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা যাইবে।"

অন্তঃপুর : এ নামের একখানি মাসিকপত্রিকা ১৩০৪ সালের মাঘ (জানুয়ারি ১৮৯৮) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদিকা—সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা বনলতা দেবী। 'অন্তঃপুর' "কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত"। প্রথম সংখ্যায় "প্রস্তাবনা"য় সম্পাদিকা পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"আজকাল মাসিকপত্রিকার অভাব নাই, রমণীদিগের উপযোগী পত্রিকাও কয়েকখানা সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়া রমণীদিগের উন্নতির সহায়তা করিতেছে।

আমরাও আজ ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া রমণীদিগের ও তাহাদের সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের জন্য একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি। অন্যান্য খ্যাতনামা পত্রিকার সহিত প্রতিযোগিতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সেরূপ দুঃসাহসও নাই। কেবল বঙ্গরমণীদিগের উন্নতিকল্পে আপনাদের যৎসামান্য শক্তি নিয়োগ করিয়া ধন্য হইব এই আশা।"

বর্ত্তমান শতাব্দীতে মহিলা-পরিচালিত বাংলা পত্র-পত্রিকার অসদ্ভাব নাই, সেগুলির আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

ধ্বনি-ধ্বংসে ধ্বনির জন্ম

শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী

ইতিপূর্ব্বে এ বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। এখানে আরো কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল।

ইন্দ্র। বৈদিক "ইন্দ্র" শব্দটি নেহাত অর্থহীন। অবশ্য, পরবর্ত্তী কালে এর অর্থ হয়েছিল শ্রেষ্ঠ, কি, -পতি, কেননা, ইন্দ্র দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আবার সেই কারণেই দেবতাদের পতিস্থানীয়—এই ভাবধারার অনুসরণ করে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, মৌলিক কোন্ শব্দ থেকে এই বৈদিক "ইন্দ্র" শব্দের সৃষ্টি হ'ল। তার কারণ—অবেস্তায় "ইন্দর" আর বেদে "ইন্দ্র" ছাড়া অন্য কোন সমগোত্রীয় প্রাচীন লোক-সাহিত্যে ঐ শব্দের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। বরং অন্য শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন—Jupiter (="দ্যৌঃ-পিতর্)" ; Jove (="দ্যাবঃ") ; Woden বা Odin (="ব্রহ্মন্" <*"ব্রধ্ মন্" কিনা বুদ্ধিসম্পন্ন), ইত্যাদি। এই রকম খোঁজ পাওয়ার পর বাধ্য হয়ে আমাদের বিবেচনা করতে হয় যে, "ইন্দ্র" শব্দ ওই "দ্যৌঃ-পিতর্" ইত্যাদি শব্দের সমবয়সী নয়, বরং পরবর্ত্তীকালীন। "ইন্দ্র" শব্দ "দ্যৌঃ-পিতর্" ইত্যাদির দ্যোতকও নয়। কেবলমাত্র পারস্যে ও ভারতে উপনিবিষ্ট আর্য্যমহলে ঐ নাম অপেক্ষাকৃত প্রাচীন "দ্যৌঃ-পিতর্, দ্যাবঃ"-র পরিবর্ত্তে দেবরাজ অর্থে ব্যবহৃত হ'ত।

এইরূপ প্রয়োগের ইতিহাস এইবার বলব। অনুসন্ধানের ফলে জানতে পারা যায় যে, ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠির মধ্যে "ঋক্ষন্দর,[১] বৃকন্দর,[২] পুরন্দর"—কিনা, ঋক্ষংদর, বৃকংদর, পুরংদর—অর্থাৎ সিংহ বা ভল্লুক হন্তা, বৃক বা নেকড়ে হন্তা, পুর, পুরী বা দুর্গ-বিদারণকারী, নামের প্রচলন ছিল। এই "পুর" শব্দটি কিন্তু একটি ইন্দো-ইউরোপীয় আর্য্য শব্দ (loan word)। হয় অষ্ট্রিক "উর্" (ur) নয়, দ্রাবিড়ীয় "কুর্" (kur) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-ভাষীর কাছে "পুর" শব্দে রূপান্তরিত হয়। শব্দটির আদি ও আসল অর্থ ছিল, citadel বা প্রাচীর-বেষ্টিত দুর্গ। আবার তা থেকে দুর্গসমেত নগর।

কালক্রমে "পুর" শব্দের variant দাঁড়ায়—"পুরী",—বোধ হয়, এখানে দুর্গ আছে এই অর্থে। বহু পরে এই শব্দটি আবার দুর্গের নামগন্ধহীন, সাধারণ নগর বোধক হয়ে দাঁড়ায়। সে যাই হোক্—ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠির ইন্দো-ইরাণীয় শাখার ভ্রমণ-পথে বহু অনার্য্য রাজ্য ও প্রতিষ্ঠান পড়েছিল। বাবিল, অসুর থেকে আরম্ভ করে সিন্ধু প্রদেশ পর্য্যন্ত এক নাগাড়ে হয় অষ্ট্রিক, নয় দ্রাবিড়দের সঙ্গে ঐ ইন্দো-ইরাণীয় শাখার সম্মিলন ও দ্বন্দ্ব ঘটেছিল। সুতরাং এই ভ্রমণ-পথের মধ্যে আনুমানিক দুই হাজার খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ থেকে পঞ্চদশ শতক খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের ভিতরে আর্য্যেরা দেবরাজকে শত্রু-দুর্গ ধ্বংস করার হেতুস্বরূপ ধারণায় "পুরন্দর" (=পুরংদর) এই নূতন নামে অভিহিত করতে থাকেন। "পুরন্দর" কালক্রমে "পুরীন্দরে" রূপান্তরিত হয় এবং "দ্যৌঃ-পিতর্" "দ্যাবঃ" প্রভৃতি আখ্যা অপ্রচলিত হয়ে পড়ে।

আরও পরবর্ত্তী কালে এই "পুরীন্দর"-এর প্রথমাংশ "পুর" পরিত্যক্ত হওয়ায় "ইন্দর্" ও "ইন্দ্র" রূপ চালু হয়। "ইন্দর্"-এর সহিত স্ত্রীত্ব-বোধক আ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন "ইন্দিরা"[৩] রূপের উদ্ভব হয়। তাই আমরা আবেস্তিক সাহিত্যে পাই "ইন্দর্" শব্দ এবং বৈদিক-সংস্কৃত সাহিত্যে পাই "ইন্দ্র", "ইন্দিরা" শব্দ। বোধ হয় "ইন্দর্" শব্দের স্বর-সঙ্কোচনের ফলেই বৈদিক সাহিত্যে গড়ে উঠে "ইন্দ্র" শব্দ।

রুদ্র। সংস্কৃতে "রুদ্র" শব্দের রূপ দেখান হয়, রুদ্+রক্, কিনা, যিনি রোদন করেন। বোধ হয় এই রোদনের দ্বারা বজ্রের হুঙ্কারকে লক্ষ্য করা হয়। সুতরাং বজ্রের স্বরূপ, কি অধিদেবতা যিনি, তিনিই রুদ্র।

আমাদের মনে হয় এর উৎপত্তি অন্যভাবে হয়ে থাকতে পারে। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় *"রুধ রস্" বলে একটি শব্দ ছিল, যা থেকে গ্রীক Ruthros, লাতিন Ruber, English red ও সংস্কৃত "রুধির" শব্দ উদ্ভূত হয়। সেই *"রু-ধ্-রস্" (স্=ঃ) শব্দ বৈদিক-সাহিত্যে "রুদ্র" রূপে পরিণত হয়ে থাকতে পারে। বজ্রের মেঘের সিঁদুরে রঙ এই শব্দ প্রয়োগের মূল কারণ হওয়াই বেশী সম্ভবপর।

লক্ষ্মী। "লক্ষ্মী শব্দটি অবৈদিক। পুরাণে পাওয়া যায় এইমাত্র। তবু এই শব্দের অবতরণ বৈদিক (আলোক বা জ্যোতিবাচক) রুক্ম + ইন্ + ঈ = "রুক্মিণী" শব্দ থেকেই ঘটেছে বলে এখানে এর উল্লেখ করা হ'ল।

হিন্দু-পারস্য। নাগাদ পনরশ' খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ ইন্দো-ইরাণীয় শাখার "অণু", "পুরু" বা "কুরু", "তুর্ব্বসু" বা "দুর্ব্বাসা" "বিশ্বমিত্র" বা "বিশ্বামিত্র" "ভৃগু" প্রভৃতি কতকগুলি দল তাঁদের সাংস্কৃতিক পুঁথি-পাটা সমেত কুভা বা কাবুল নদ অতিক্রম করে এগিয়ে এসে "পঞ্চ-অপ" বা "পঞ্চ-আপ" যেখানে কিনা—পঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কালক্রমে তাঁরা ঐ প্রদেশের মূলনদী সিন্ধুর নামানুযায়ী "সিন্ধবঃ" ("দেশ বাচিত্বাৎ বাহুল্যম্"—সূত্রানুযায়ী) বলে নিজেদের চিহ্নিত করে নেন। প্রাচীন পারসীকদের মুখে তারই রূপ দাঁড়ায় "হিন্দব"। তাই থেকে (এক বচনে) "হিন্দু" রূপ হয়। প্রাচীন গ্রীকেরা এই "হিন্দু"কে দাঁড় করায় Indus-এ। তা থেকে India ইত্যাদি। "পশু´" শব্দ দ্বারা আর্য্যেরা পার্শ্বাস্থি বুঝাতেন। তা থেকে উদ্ভূত হয় "পার্শ্বিক" কিনা পাশের কেউ বা কোন কিছু। ঐ শব্দই পরবর্ত্তী কালে "পারসীক" রূপ পরিগ্রহ করে এবং "পার্শ্ব" থেকে জন্মায় "পারস্য"। এর থেকে বোঝা যায় যে ভারতীয় আর্য্যেরা ইরাণীয়দের পাশের লোক কিনা, জ্ঞাতি বলেই গণ্য করতেন।

আর্য্য-ইরাণ-আর্ম্মানী-হেল্লাস্। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের প্রথমে শোনান যে, "ইরাণ" কথাটা (দেশের নাম) *"অইর্য্যানাম্" থেকে এবং * "অইর্য্যানাম্" পূর্ব্ববর্ত্তী "অর্য্যানাম্" বা "আর্য্যানাম্" থেকে উৎপন্ন।

আমরা দেখতে পাই যে, "আর্ম্মানিয়া" (Armenia) শব্দের মূলেও ঐ একই "অর্য্যানাম্" বা "আর্য্যানাম্" শব্দ রয়েছে। শব্দের মধ্যেকার দ্বিগুণিত "য্"-র স্থলে পরবর্ত্তী কালে যে "ম"-ধ্বনির উদ্ভব হয়েছিল তার কারণ হতে পারে—কোন নাসিক্য ধ্বনির সংস্পর্শে ঐ "য্"-ধ্বনি এসে* "অর্মাঁনাম্ বা "আর্মাঁনাম"-এ বিকৃত হয়েছিল। তার থেকে বর্ত্তমানের "আরমানী, আর্ম্মানিয়া" রূপের অবতরণ ঘটেছে।

আবার গ্রীক জাতি-বাচক "হেল্লেনেস্" (Hellenes), ও দেশবাচক "হেল্লাস্" (Hellas) শব্দ দুটিও এসেছে মৌলিক "অর্য্যানাম্" বা "আর্য্যানাম্" ও "আর্য্যাঃ" বা "অর্য্যাঃ" শব্দ দুটি থেকে। "আর্য্য" বা "অর্য্য" শব্দের প্রাচীন উচ্চারণ ছিল—"অর্-য়-য়" ও "আর্ য়-য়"। এই "অ" বা "আ"-ধ্বনি গ্রীক "এ"-ধ্বনির সমান। এই গ্রীক "এ"-ধ্বনি "হে"-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। আবার "য়"-স্থানে অনেক ক্ষেত্রে গ্রীকেরা "ল"-ধ্বনি ব্যবহার করতেন। তার ওপর, "র"-ধ্বনির পরিবর্ত্তে আর একটি "ল"-ও দেখা দেয়, এবং এমনি করে গড়ে ওঠে 'হেল্লাস্'-শব্দ। সুতরাং গ্রীক 'হেল্লাস্' = 'অর্য্যাঃ' বা 'আর্য্যাঃ'। আর পূর্ব্বোক্ত 'অর্য্যানাম্' বা 'আর্য্যানাম্' থেকেই ঐ ভাবে উৎপন্ন হয়েছিল 'হেল্লেনেস্' শব্দ। কিন্তু তফাৎ দাঁড়িয়েছে অর্থের দিক থেকে। যেহেতু 'আর্য্য' বা 'অর্য্য' একটি জাতির নাম, কিন্তু তারই সমান শব্দ 'হেল্লাস্' একটি দেশের নাম। আবার, 'অর্য্যানাম্' বা 'আর্য্যানাম্' বলতে দেশ বোঝায়, কিন্তু 'হেল্লেনেস্' বলতে একটি জাতি বোঝায়।

ধেনু-দয়নু। বাক্ বা speech-কে আর্য্যেরা বহু নামে অভিহিত করতেন, যেমন, 'ঋক্, গির্, গো, ধেনু' ইত্যাদি। বিশেষ ভাবে বাক্-রূপিণী ধেনুতে ব্রহ্ম দৃষ্টি অর্থাৎ বাক্-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে। যেমন:—'১। বাচং ধেনুমুপাসীত তস্তাশ্চত্বারঃ স্তনাঃ, স্বাহাকারো, বষট্কারঃ, হন্তকারঃ স্বধাকারস্তস্যৈ দ্বৌ স্তনৌ দেবাঃ উপজীবন্তি, স্বাহাকারং চ বষট্কারং চ হন্তকারং মনুষ্যাঃ স্বধাকারং পিতরঃ তস্তাঃ প্রাণ ঋষভো মনো বৎসঃ।'[4]

পশু ছিল আর্য্যদের সম্পত্তি। গাভী পশু, সুতরাং গাভী-বোধক ধেনু ছিল তাঁদের সম্পত্তিস্বরূপ। বাক্-ও মানুষের সম্পত্তিবিশেষ। বোধ হয় সম্পত্তিবোধ হইতে 'ধেনু' নাম বাক্য বোঝাতে ব্যবহৃত হ'ত। তার পর এল বাক্যের পবিত্রতা ও অবিনশ্বরত্বে দৃষ্টিভঙ্গী। যার প্রমাণ আমরা পাই সংস্কৃত 'ঋক্' শব্দে, গ্রীক্ 'লোগস্' (logos) ও লাতিন 'লোকস্' (loguos) শব্দে।

লিথুয়ানীয় ভাষায় আমরা 'ধেনু' শব্দকে পাই 'দয়্নু' রূপে। আবার ঐ নামে প্রচলিত প্রাচীন লোক-সাহিত্যের সন্ধানও পাই। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'ইউরোপ'—২য় খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠায় লিখছেন যে, 'লিথুয়ানীয়-দের মধ্যে, তারা খ্রীষ্টান হয়ে যাবার পূর্ব্বে যে-সব দেবতা বিষয়ক গান আর দেব-কাহিনী, আর অন্য গান প্রচলিত ছিল, সেগুলি সংগ্রহ করা হয়; ধর্ম্মেতিহাস আর ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এ সব গান অমূল্য; এই গানগুলিকে লিথুয়ানীয় ভাষায় 'দয়্নু' বলে—শব্দটি বৈদিক 'ধেনা' শব্দের লিথুয়ানীয় প্রতিরূপ—বৈদিক 'ধেনা'র সাধারণ অর্থ 'ধেনু' কিন্তু 'বাক্য, শব্দ' অর্থেও এর ব্যবহার আছে; লিথুয়ানীয় 'দয়নু' আর বৈদিক ঋক্ বা সূক্ত এক পর্য্যায়ের সাহিত্য, এ বিষয়ে মনে হয় যেন বৈদিক-সূক্তের মত রচনার ধারা খ্রীষ্টীয় সতর শতক পর্য্যন্ত লিথুয়ানীয়দের মধ্যে চলে এসেছিল। লেট্‌দের মধ্যেও অনুরূপ লোকগীত পাওয়া গিয়াছে।'

সুতরাং লিথুয়ানীয়[5] 'দয়্নু' = সংস্কৃত 'ধেনু' = 'ঋক্, সূক্ত, বাক্' ইত্যাদি।

১। গ্রীক 'Alexander' শব্দ 'অক্ষন্দর' হইতে উদ্ভূত।
২। মহাভারতের যুগে এই শব্দ বিকৃত হয়ে 'বৃকোদরে' পরিণত হয়।
৩। ইন্দিরা শব্দ কিন্তু বর্ত্তমানে লক্ষ্মীকে বুঝায়।
৪। দ্রষ্টব্য—সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ'।
৫। 'লিথুয়ানীয়' বানান কিন্তু সুনীতিবাবুর লেখায় 'লিথুআনীয়'—আছে।

শ্যাম উপসাগরের ধারে "কাউসেং—"ট্রেজার পাহাড়

পেনাঙের কথা

শ্রীগৌরমোহন দাস দে

ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি পেনাং ছবির মত সুন্দর শহর—সাগরের বুক থেকে উঠেছে। তাই যুদ্ধের চাকরির কল্যাণে মালয়ে আসবার পর থেকেই পেনাং যাবার সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম। সেজন্যে হঠাৎ এক দিন যখন আমার টাইপিঙে বদলির হুকুম এল তখন খুশী হয়ে উঠলাম—কেননা, টাইপিং থেকে পেনাং যাওয়ার সুবিধা অনেক। আমি টাইপিং যাবার দিনকতক পরে আমার ভ্রমণ-সঙ্গী চাটুজ্যেমশায় পুরাতন ভৃত্য বুদ্ধুকে সঙ্গে করে পোর্ট ডিকসন থেকে আমার আস্তানায় এসে হাজির হলেন—উদ্দেশ্য আমাকে নিয়ে একবার সমুদ্র-মেখলা পেনাঙের পথে পাড়ি দেওয়া। পেনাং যাবার কয়েকটি রাস্তা আছে। রেল-ষ্টেশন থেকে একটা আঁকাবাঁকা রাস্তা আসামগোমা গ্রামের ভেতর দিয়ে 'সোয়েটনহ্যাম' নামক রাস্তা দিয়ে বরাবর পেনাঙের দিকে চলে গেছে—আর একটি সিধা রাস্তা আছে, সেটা ইপো থেকে টাইপিঙে আসবার পথে পড়ে। আমরা 'আসাগোমা' গ্রামের মধ্য দিয়ে যাব স্থির করলাম।

পরদিন সকাল আটটায় কিছু জলযোগ করে চাটুজ্যেমশায়কে দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখাবার জন্যে জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পেনাং থেকে দশ মাইল দূরে এক জায়গায় এসে পৌঁছলাম। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের পেনাঙে পৌঁছবার সম্ভাবনা। সমুদ্র-গর্ভোত্থিত পেনাঙের বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করা আমার কতদিনের সাধ। এবার তা সফল হতে চলেছে ভেবে মনটা খুশীতে ভরে উঠল। জিপের গতি বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। ডানদিকে সবুজ ধানের ক্ষেত একেবারে গিরি-পাদমূল পর্য্যন্ত প্রসারিত। মাঝে মাঝে নারিকেল-বৃক্ষের বন। মসৃণ চিক্কণ দীর্ঘ পত্রগুলো যেন শ্যামলাঙ্গী প্রকৃতির দেহে চামর ব্যজন করছে। এখানে দুটো পুল আছে। একটা বৃটিশরা ভেঙে দিয়ে যায়, সেটা জাপানীরা আবার তৈরি করেছে আর একটা এখন মেরামত হচ্ছে। আমরা নয়া পুলটার ওপর দিয়ে জীপ চালিয়ে নিয়ে গেলাম। একটু পরে আমরা 'বুকিট টেঙ্গা' গ্রামে এসে পৌঁছলাম। ভারতীয়, মালয়ী ও চীনা এই তিন জাতিরই লোক এখানে আছে। এখানে ভারতীয়দের একটা মন্দিরও আছে। মন্দিরে পূজা-অর্চ্চনা হচ্ছে, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করছেন—এ সমস্ত সুপরিচিত দৃশ্য দেখে আমার দেশের কথা মনে পড়ে গেল। এখানে আমাদের একটি রেলওয়ে জংসন পার হতে হ'ল। একটা চৌরাস্তায় এসে দেখি বাঁদিকে ষ্টেশন, ডানদিকের রাস্তাটি কুলিম অভিমুখে গেছে। এদিকটায় রবার-ক্ষেত খুব কম। ধানক্ষেত আর নারিকেলের বন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে দেখি যে, পেনাং পাহাড়টি প্রাকারের মত দাঁড়িয়ে আছে—দূরত্ব এখান থেকে ছয় মাইল মাত্র। এখানটায় মালয়ী ও চীনা বস্তি বিস্তর। রাস্তা দিয়ে পঞ্জাবীরা চলেছে গরুর পাল ঠেঙাতে ঠেঙাতে। এখানকার তামিল কুলিদের বস্তিগুলি প্রবাসী ভারতীয় শ্রমিকদের দুরবস্থার কথাই

লেকের ধারের একটি দৃশ্য। দূরে পাহাড়ের কোলে জেলেদের ঘর

স্মরণ করিয়ে দেয়। এদেশের সমৃদ্ধির সোপান তৈরী করে দিলে এরা, অথচ মানুষের মত খেয়ে পরে সুস্থদেহে বাঁচবার অধিকার থেকে এরা বঞ্চিত। জায়গাটা সমুদ্রের কাছে বলে জলে জলময়। এখানে একটা ছোট্ট নদী পার হলাম।

নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে দেখতে বেলা বারোটা বেজে গেছে। আমাদের ইচ্ছা যে আমরা পেনাং শহর, জর্জ টাউন পরিক্রমা করে সেই দিনই টাইপিঙে পৌঁছুব। সেজন্যে আর দেরী না করেই পথে বেরিয়ে পড়লাম। দূর থেকে যে টাওয়ার ক্লক দেখা যাচ্ছিল সেটা জেনারেল পোষ্ট আপিসের ওপর। এখানে আগে বিদেশ গমনেচ্ছু লোকেদের টিকিট কিনতে হ'ত। এখন মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা সেই সব বড় বড় ঘরে আস্তানা গেড়েছে। জাপ অধিকারের সময় মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা ডানদিকের পিট্ ষ্ট্রীটের বাড়ীগুলোর ওপর অতর্কিতে চড়াও হয়ে বোমা বর্ষণপূর্ব্বক অনেকগুলো বাড়ী ভেঙে চুরমার করে ফেলে। গির্জ্জাটাও বাদ দেয় নি। তবে হাইকোর্টের কোন ক্ষতি হয়নি। এ সবের ধ্বংসাবশেষ এখনো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পিট ষ্ট্রীটের যে বাড়ীটা ভেঙে গেছে সেটা একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান ছিল বলে মনে হ'ল। সামনেই একটি দশ-বার বছরের শিখ ছেলেকে দেখতে পেয়ে এই বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে উত্তর দিলে নেতাজীর 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগে'র বাড়ী ছিল এটা তবে শত্রুর আক্রমণে এক জন ছাড়া বেশী লোক মরেনি।

শুনেছিলাম যে 'আয়ার হিতাম' মন্দির এখানকার একটি দর্শনীয় স্থান। আমরা এক চীনা ডাক্তারের দোকানে গিয়ে ঐ মন্দিরে যাবার পথের কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। ভদ্রলোক ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলতে পারেন—তিনি কতকটা ভাষায়, কতকটা আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে শেষে পথের ছবি এঁকে দেখিয়ে দিলেন। রাস্তার মানচিত্র আমাদের কাছে সব সময়ে থাকে, কিন্তু আয়ার হিতাম মন্দিরে যাবার রাস্তার নির্দ্দেশ সেই মানচিত্রে ছিল না। চীনা ডাক্তারটির নির্দ্দেশ-মত আমরা 'ডাটো কারামং' রোড ধরে ট্রলি বাসের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চললাম। বহুক্ষণ জিপ চালিয়ে এক খরস্রোতা গিরিনদীর ধারে এসে পৌঁছলাম। সেখানে খানিক জিরিয়ে আমরা পায়ে হেঁটে নিকটবর্ত্তী একটা মন্দির দর্শনে চললাম।

২

পুলটি পার হতেই ছোট ছোট দোকানের সারি নজরে পড়ল। সেখানে আম, জামরুল ইত্যাদি নানা ফল-মূল আর ধূপকাঠি ইত্যাদি বিক্রী হচ্ছে। মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বুদ্ধমূর্ত্তিকে ভেট.

পেনাঙের একটি রাজপথের দৃশ্য

দেবার জন্যে কেউ কেউ এ সব কিনে নিয়ে যাচ্ছে। সকল চীনারই হাতে দেখলাম একটি করে চন্দনকাঠ। আন্দাজ পঞ্চাশটি ধাপ অতিক্রম করে মন্দিরদ্বারে পৌঁছুতে হয়। সোপানগুলোর দু'পাশে ভিখারীর দল হাত নেড়ে কাতরাচ্ছে।

মন্দির-মধ্যে বেজায় ভিড়, সব জাতের সকল বর্ণের লোকের নিকটেই মন্দিরদ্বার অবারিত। প্রভু বুদ্ধের নিকট কেউই অস্পৃশ্য হরিজন নয়। এখানে মন্দিরাভ্যন্তরে সর্ব্ব জাতিবর্ণ-সমন্বয় দেখে খুব আনন্দ হ'ল। মনে পড়ল আমাদের দেশের দেবমন্দিরে ছোঁয়াছুঁয়ি আর জাতি-বিচারের কথা। উচ্চবর্ণের হিন্দু ভিন্ন আর কোনও জাতিরই আমাদের দেশের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই। এমনি ভাবে দেবতার দর্শন ও স্পর্শন থেকে বহু মানুষকে বঞ্চিত করে আমরা কোন্ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছি কে জানে? চীনাদের এ সব বালাই নেই। বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের সকল বর্ণের লোকেরই তাদের মন্দিরে অবাধ গতি। এখানে কোন ভেদ-বৈষম্য নেই। সুখের বিষয়

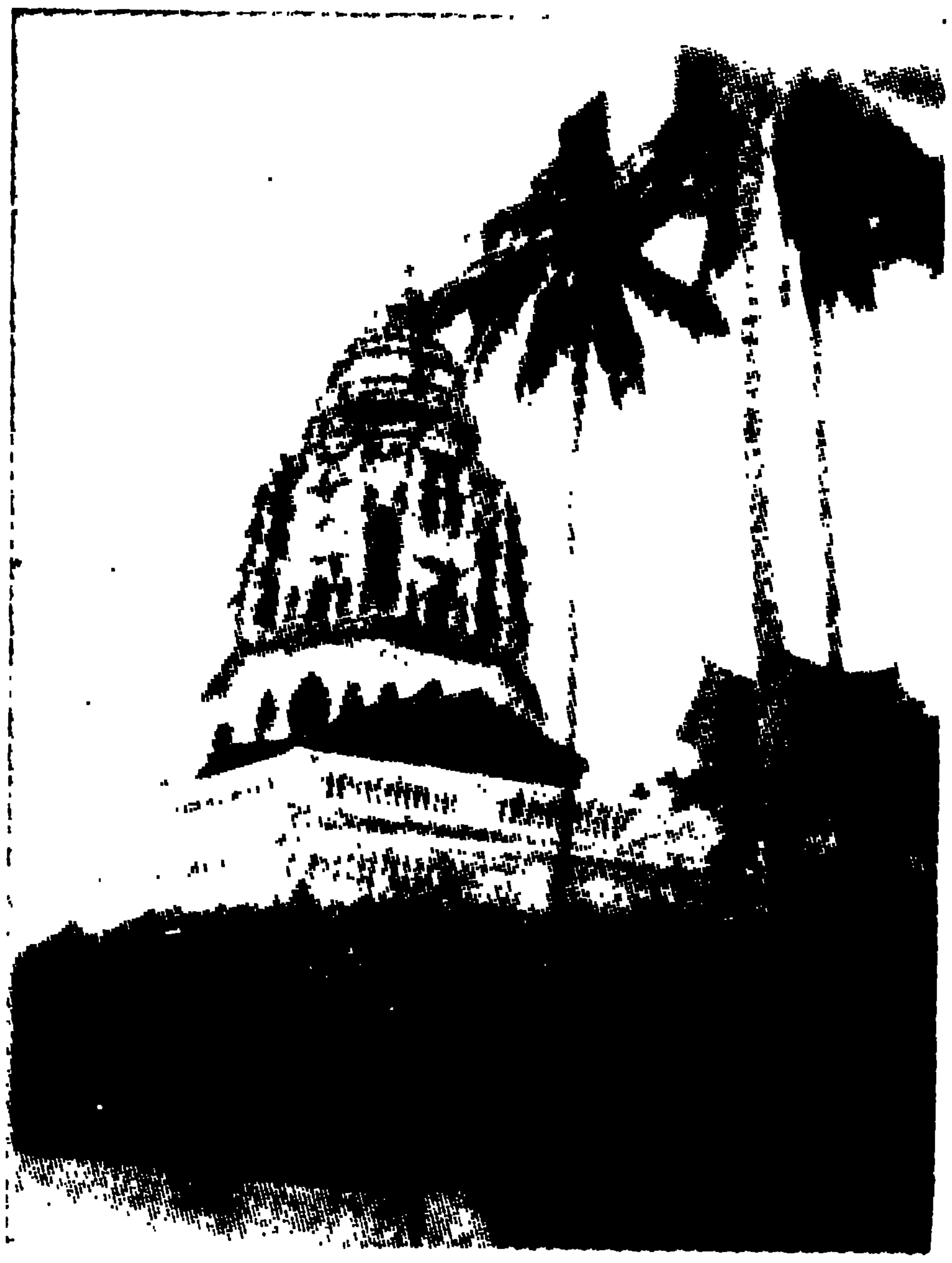

'আয়ার হিতাম' মন্দির

যে, আমাদের দেশের কুসংস্কারের অচলায়তন আজ ভেঙে পড়েছে—কোন কোনও জায়গায় হরিজনেরা দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে।

সোপানাবলী পার হয়ে একটা পুকুরের পাড়ে এসে হাজির হলাম। পুকুরটা কচ্ছপে ভর্তি—এরা কলমী শাক খায়। চীনা দোকানদার বসে রয়েছে কলমী শাক নিয়ে, দু' আটি শাক কিনলাম। ভাঁটানুদ্ধ পাতা একটা ফেলতেই একপাল কচ্ছপ গলা বাড়িয়ে এসে হাজির। তারপর সেই পাতাটি দখল করবার জন্যে তাদের মধ্যে সে কি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এ ওঠে ওর পিঠে, একটা দেয় আর একটাকে কামড়ে, বহুক্ষণ ধরে চলে কামড়া-কামড়ি, ঠোকাঠুকি। দৃশ্যটা বেশ উপভোগ্য। এ ছাড়া আর একটা পুকুরও আছে। তাতে কতগুলো কই ও অন্যান্য মাছ দেখলাম। এখানেও কতকগুলো শাকপাতা ফেলে দিলাম। গাইড বললে যে এগুলো 'হুলি' পুকুরের 'হুলি' মাছ কেউ ধরে না। একটু ওপরে একটা ফুল-বাগান, তাতে রংবেরঙের ফুল ফুটে রয়েছে। সামনে একটা গম্বুজ—ওপরে বৌদ্ধ মন্দির। পাহাড়ের নিভৃত স্থানে অবস্থিত মন্দিরটির শুভ্র গাম্ভীর্য হৃদয়কে নির্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিলে। এই মন্দির যেন ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্মের অভ্রভেদী বিরাট মহিমারই প্রতীক। খানিকটা গিয়ে আমরা বাঁদিকের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। সামনেই একটা বড় কাঠের মাছ ঝোলানো রয়েছে। ওপরে উঠে প্রথমেই সামনের মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে চন্দনকাঠ জ্বালাবার প্রকাণ্ড একটা পেতলের চুল্লী রয়েছে। চীনারা এ চুল্লীটির নাম দিয়েছে —'কেক্ লক্ সী টেম্পল'। এখানে দিনরাত অনবরত চন্দন-কাঠ জ্বালানো হয়। বৌদ্ধধর্মের বিমল রশ্মিচ্ছটায় একদা কেমন করে অর্দ্ধেক এশিয়া উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তাই ভাবতে লাগলাম।

এটিকে আনা হয় ষাট বছর আগে চীনদেশ থেকে। পেছনে কাঠের একটি বড় টেবিলের ওপরে টিনের কৌটার মধ্যে আছে কতকগুলো কাঠি। চীনারা জানু পেতে বসে কাঠি নাড়ছে। কাঠিগুলো কিছুক্ষণ নাড়বার পরে দু-একটি কাঠি মাটিতে পড়ে গেলে লোকেরা সেই কাঠি তাদের পুরোহিতের কাছে নিয়ে যায়। ব্যাপারটা প্রথমে একটু দুর্বোধ্য ঠেকেছিল, কিন্তু শেষে যখন দেখলাম যে পুরোহিত কতকগুলো ছাপানো ব্যবস্থাপত্র পড়ে সেগুলো এদের বিলিয়ে দিতে লাগলেন তখন বুঝলাম যে এরা সব রোগীর দল। এরা সেই ব্যবস্থাপত্র নিয়ে চীনা ঔষধালয়ে গিয়ে ঔষধ কিনে নিয়ে আসে।

এই কাঠিনাড়ার জায়গাটার পেছনে রয়েছে একটি কৃত্রিম পাহাড়—আর ঐ পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে প্রহরারত কতকগুলো শাস্ত্রীর মূর্ত্তি—সেগুলি সোনালী রং করা। মাঝখানে আছে 'দয়ার দেবী'র প্রতিমূর্ত্তি, তাঁর পদতলে তাঁর দুই বোন উপবিষ্ট। বাঁদিকে এক কোণে আছেন বজ্রের দেবতা আর সৃষ্টিকর্তা। মূর্ত্তিগুলোর ডাইনে ও বাঁয়ে নয় জন করে আঠার জন ভক্ত ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। বিদ্যুতের দেবী ও মৃত্যুদেবতা পাহাড়ে গুহার মধ্যে আছেন। এই ঘরটির ডানদিকে একটি ছোট ঘরে আমরা ঢুকলাম। ব্যাধির দেবতা এখানে আছেন—ভীষণদর্শন প্রহরীরা এঁকে পাহারা দিচ্ছে। ঔষধের কাঠি এখানেও রয়েছে, ব্যবস্থাপত্র পাশের ঘরে ঝুলছে। একব্যক্তি একটি খাতা নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আমরা কিছু কিছু তাকে দিলাম। এই অর্থ মন্দিরের কাজেই ব্যয়িত হবে। সামনের দালানে একটি পিত্তল-নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে—মূর্ত্তিটি ভারি সুন্দর, তাঁর আনন স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত। এরই নীচে আলারঙারের কতকগুলো ছোট ছোট বুদ্ধমূর্ত্তি আছে—কোনটি শ্যামদেশ থেকে কোনটি বা রেঙ্গুন থেকে আনীত। দালানের পিছনের ঘরটিতে আছে দুটি বিকটাকৃতি দেবমূর্ত্তি। এঁরা হচ্ছেন পাপীদের শাস্তিদাতা দেবতা। এঁদের উচ্চতা হবে প্রায় ষোল ফুট। চারটি মনুষ্যমূর্ত্তিকে এঁরা পদতলে নিষ্পিষ্ট করছেন। এ চার জন হচ্ছেন জুয়াড়ী, মাতাল, আফিংখোর ও মিথ্যাবাদী। এই চার শ্রেণীর অপরাধীর প্রতিমূর্ত্তি—এই সব দেখিয়ে লোকেদের পাপের কুফল সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা হয়। লোকশিক্ষার এই অভিনব পন্থাটি প্রশংসনীয়। সেখান থেকে

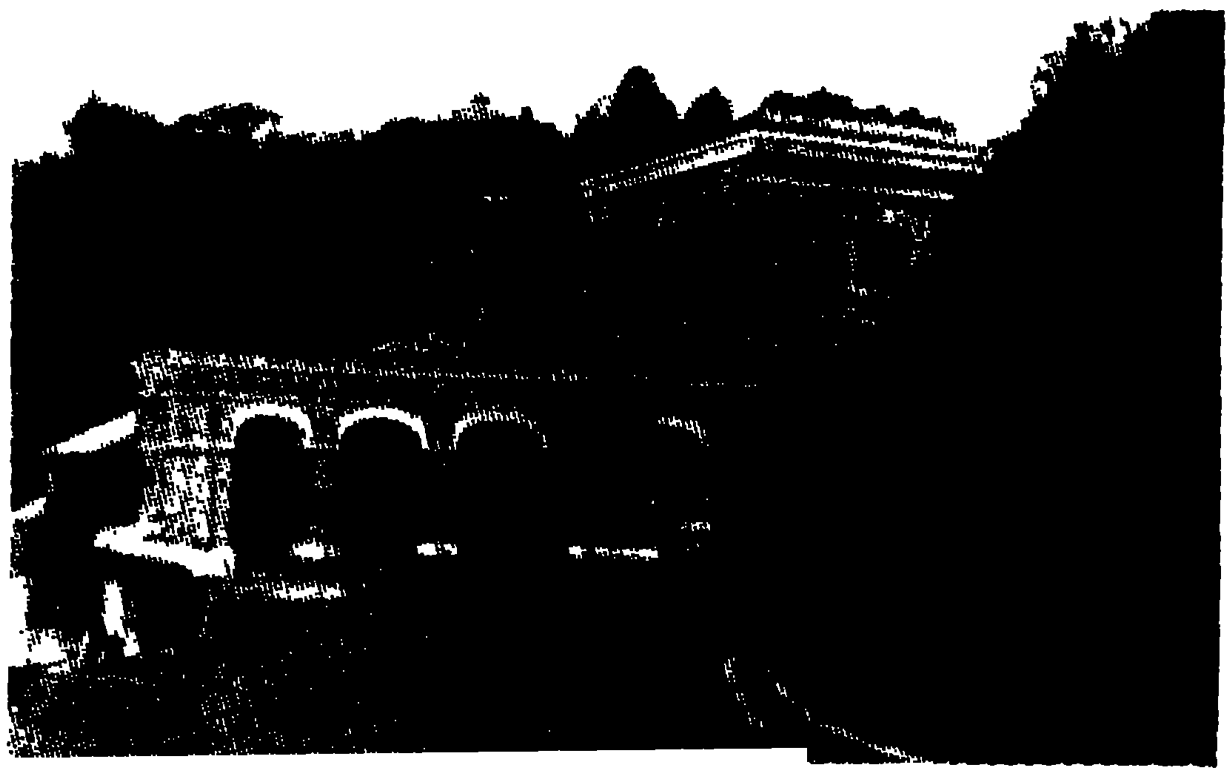

পেনাঙ্ রেলষ্টেশন

আমরা পেছনের ঘরে গেলাম, দুই দিকে আঠার জন বৌদ্ধ ভিক্ষু (প্রত্যেক দিকে নয় জন করে) ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। এই ঘরটির শেষপ্রান্তে তিনটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি—একটি মূর্তির মুখে প্রসন্ন হাসি, একটি ধ্যানীবুদ্ধ আর একটি হচ্ছে শিষ্যদের শিক্ষাদানরত বুদ্ধমূর্তি। এই মূর্তিগুলোর সামনে শ্যামদেশ থেকে আনীত একটি ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি। বড় বড় মূর্তিগুলো, বেশীর ভাগ, কাগজ আর মাটি দিয়ে তৈরি। প্রায় ষাট বছর আগে এদের প্রধান পুরোহিত পুনটাং চীন দেশ থেকে ভাস্কর ও শিল্পীদের আনিয়ে এই মন্দির আর এ সব মূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন। মন্দিরে ঢোকবার পথে একটা ঘরে এঁর ছবি টাঙানো আছে। ইনি এখানেই মহাপ্রয়াণ করেন। তাঁর শিষ্যেরা এই প্রাঙ্গণে তাঁর মৃতদেহ দাহ করেন। এখানে সব ঘরের ছাদের মাথায় একটি করে কাঠনির্মিত ড্রাগন আছে। এগুলোর গঠনকৌশল অনিন্দ্য। আমরা এ সব দেখে পাশের একটি প্যাগোডা দেখতে গেলাম। এটি নির্মিত হয় ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবার সময় দেখি চীনা পুতুলের মত ধবধবে সাদা কয়েকটি চীনা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একটিকে ডেকে এনে চীনা ভাষায় তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম "লু আ মিয়া হামি" (তোমার নাম কি?) সে তার নাম বললে আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, যে সে আমাদের সঙ্গে ভারতে যাবে কিনা? মেয়েরা সকলেই হেসে একেবারে লুটোপুটি—যেন বড় একটা মজার কথা। ছোটদের বিদায় জানিয়ে চলে এলাম।

আমরা 'থামার হিতাম' রোডের দিকে ফিরে চললাম। ষ্টেশনে থেকেই একজন গাইডকে সঙ্গে করে নেওয়া হ'ল। লোকটি ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কথা বলে—আমাদের কলিকাতার অশিক্ষিত চীনাম্যানদের মত। যাক, একে দিয়েই আমাদের কাজ চলবে।

আমরা 'থামার হিতাম' রোড ধরে 'ডাটো কারামাথ' রোডে এসে পড়লাম। ডানদিকে চলে গেছে গ্রীন লেন—আমরা সেই দিকেই মোড় নিলাম। এ দিকটা শহরের নিকটবর্তী, লোকের বসতি খুব ঘন। এখানে 'ফ্রি স্কুল' নামক একটি বিদ্যালয় আছে। এই জায়গাটির সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। এখানেই তিনি আজাদ হিন্দ স্কুল স্থাপনা করেন। তার পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন নিশীথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজী কর্তৃক সংগঠিত যে বালসেনাদের সাহস আর বীরত্বের কাহিনী আজ সমগ্র বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে তারা এখানেই শিক্ষালাভ করত। এটা ছিল দশ থেকে সতের বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালকদের শিক্ষাকেন্দ্র। এদের চেয়ে বয়সে বড় তরুণদের সিঙ্গাপুরে গিয়ে শিক্ষা নিতে

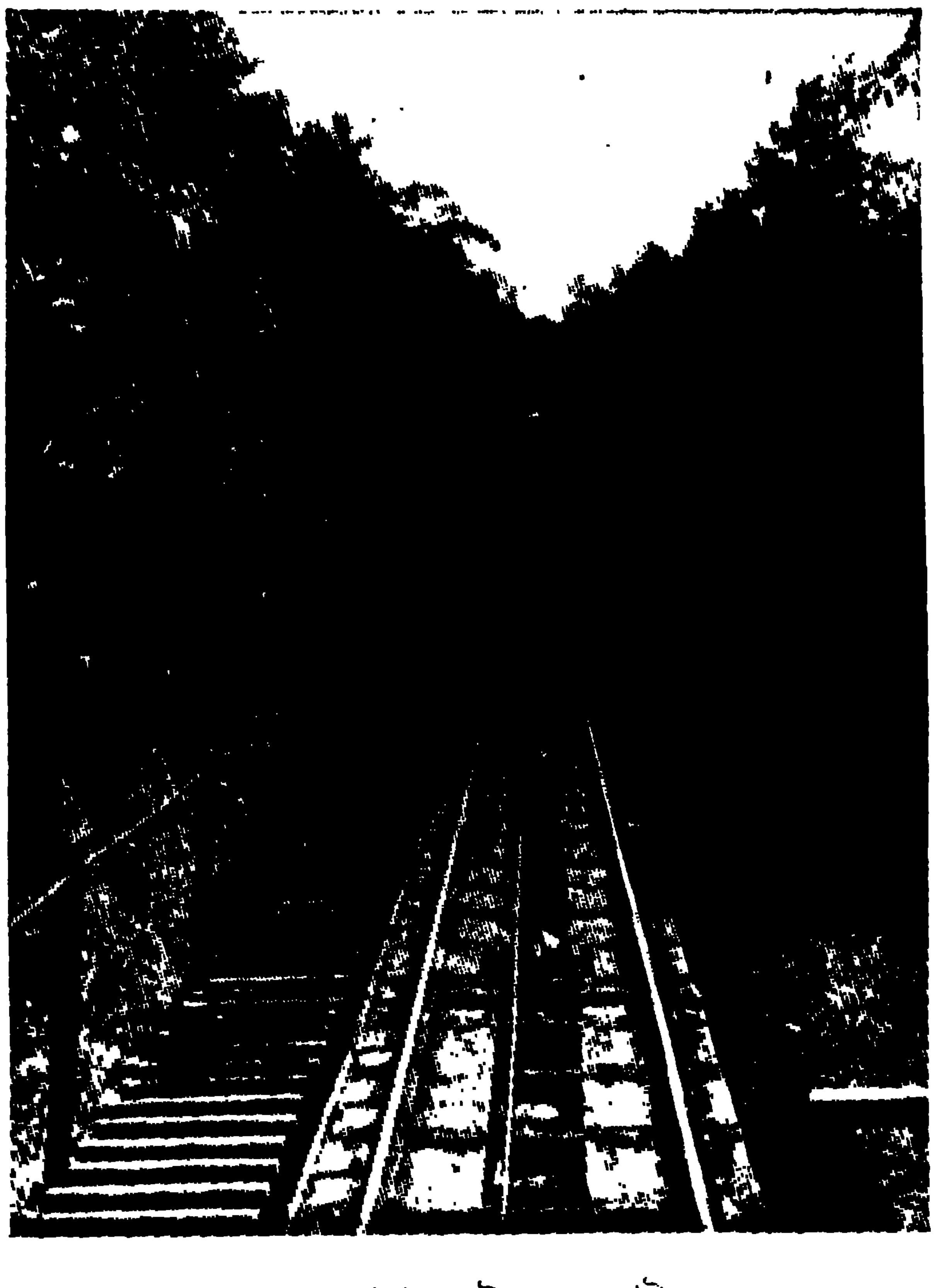

পেনাঙ পাহাড়ের উপর রেললাইন

হ'ত। এখানে দু' মাস শিক্ষা গ্রহণ করার পর বাছাই করা ছেলেদের সিঙ্গাপুরে বিভাধরী ক্যাম্পে পাঠানো হ'ত। এখানে এখন ডাচ সৈন্যেরা অবস্থান করছে—ওলন্দাজ সৈন্যদের যবদ্বীপ আক্রমণের তোড়জোড় সুরু হয়েছে পুরোমাত্রায়। দলে দলে এখানে এসে এরা সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। বৃটিশ এদের সাহায্য করছে অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য ও বস্ত্রাদি দিয়ে।

আরও এগিয়ে আমরা 'সুঙিয়্ পার' গ্রাম পার হয়ে চললাম। এই গ্রামপ্রান্তে মালয়ীদের কবর রয়েছে। প্রতি কবরের ওপর প্রস্তরনির্মিত ছোট ছোট পুতুল পোঁতা। বাঁদিকে প্রণালীতে 'সীপ্লেনের' ঘাঁটি। ডানদিকে পাহাড়ের ওপর বৃটিশ সৈন্যদের থাকবার কোয়া., টেনিস কোর্ট, বাগান

পেনাঙের একটি রাস্তা

ইত্যাদি দেখলাম। এ সব ছাড়িয়ে আমরা 'সুদিনিরং' গ্রামে এসে পড়লাম। গ্রামটি মন্দ নয়, বাজারটি খুব ছোট—রাস্তার উপরেই কেনা-বেচা চলছে। আমরা আরও নয় মাইল এগিয়ে গিয়ে সর্পমন্দিরে এসে পড়লাম। এটি 'পায়ান লাপাস্' গ্রামের সন্নিকটে এক পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। গাইড আমাদের মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গেল। জুতা পায়েই ঢুকে পড়লাম, কেউ বাধা দিলে না। সব জায়গায় একটি করে বিষধর সর্প কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে—গুণে দেখলাম একুশটি সর্প। জিজ্ঞাসা করে জানলাম আরও অনেক আছে। এগুলি নাকি মুরগী কিংবা হাঁসের ডিম খেয়ে বেঁচে থাকে। মন্দিরের পুরোহিত মালয়ী ও চীনা উভয় ভাষায়ই কথা বলতে পারেন। মন্দিরের ইতিহাস জানতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কেউ তা বলতে পারলে না। তবে মন্দিরটি যে খুব পুরাতন সকলেরই প্রমুখাৎ সে তথ্য জানতে পারলাম। এখানেও দেখি ঔষধ নেবার জন্যে লোকের ভিড়। মন্দিরটি দেখে আমরা চলে এলাম। রাস্তাটি সোজা চলে গেছে বৃটিশ এরোড্রামের ভেতরে। এবার আমাদের গন্তব্য স্থল পেনাঙ পাহাড়। গ্রীন্ লেন পার হয়ে আমরা 'আয়ার রাজা' লেনে এসে পড়লাম। এ স্থানটিরও ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে—এখানে ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের বালিকা সেনাদলের শিক্ষাকেন্দ্র। সতের বৎসরের অধিক বৎসর বয়স্কা বালিকাদের রাণী ঝান্সী বাহিনীতে যোগদান করতে হ'ত—সেটা ছিল সিঙ্গাপুরের উড্ স্ট্রীটে। মিসেস্ ধীবীর ছিলেন এখানকার পরিচালিকা।

পেনাঙ পাহাড় ষ্টেশনে এসে টিকিট কেটে আমরা ট্রেনে উঠলাম। ট্রেনটি ছোট, আয়তনে ট্রামের চেয়ে বড় নয়। এই রেল লাইনটি তৈরি হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। দুর্গম পার্ব্বত্য পথে প্রথম যখন রেল চালানোর চেষ্টা হয় তখন অনেক লোক মারা পড়ে। তারপর কোন দুর্ঘটনা হয়েছে বলে শোনা যায় না।

সামনের দিকে তাকিয়ে আছি। উর্দ্ধগামী রেলপথের মধ্যে দিয়ে মোটা কাছির মত একটা তার সিধা ওপরে উঠে গেছে। ভাবছি এ অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হবে; ট্রেনের এ স্বর্গারোহণপর্ব্ব কি করে সম্পন্ন হবে? পরে শুনলাম যে মোটা তারটাই আমাদের গাড়ীটাকে ওপরে টেনে নিয়ে যাবে। আড়াইটা বাজল, ওপর থেকে টেলিফোন এল—এবার ট্রেন ছাড়বে, ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল—গাড়ীর দরজা জানালা সব বন্ধ করা হ'ল। আমরা একটু একটু করে ওপরে উঠতে লাগলাম। যদি একবার ট্রেনের অধোগতি হয় তা হলে আমাদের যে কি দুর্গতি হবে তা ভেবে শিউরে উঠলাম। গাড়ী চলল খুব আস্তে আস্তে। যতই ওপরে উঠছি ততই নীচের ঘরবাড়ী সব ছোট দেখাচ্ছে—ঠিক যেন ছেলেদের খেলাঘরের মত। পাহাড়ের ওপর বেশ খানিকটা ওঠবার পর বাঁদিকে চীনাদের একটা মন্দিরের সামনে গাড়ীটাকে থামানো হ'ল। কণ্ডাক্টারের হাতে একটি ছড়ি ছিল সেটাকে দুটো তারে লাগিয়ে দিতেই গাড়ীর গতি থেমে গেল। আবার ছড়িটি হাতে নিয়ে নিলে গাড়ী চলতে আরম্ভ করে। গাড়ীতে চালক থাকে না—চালক থাকে ওপরে বিদ্যুতের ঘরে. সেখান থেকে দরকারমত গাড়ীর গতি বাড়ায় ও কমায়। যতই ওপরে উঠতে লাগলাম নীচেকার জর্জ টাউন শহরের দৃশ্যটি ততই নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করতে লাগল। ধরাপৃষ্ঠে সবুজ আর লাল রং দিয়ে কে যেন একখানি সুন্দর ছবি এঁকে রেখেছে। কোথাও গভীর বনানী, কোথাও বেগবতী ঝরণা-ধারার কলগান, পাখীর কূজনের সঙ্গে মিশে শ্রবণ পরিতৃপ্ত করছে। ঠাণ্ডা এখন একটু একটু করে বাড়ছে। কিছুক্ষণ ওঠবার পর আমরা এমন এক জায়গায় এলাম যেখানে লাইনটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। এই সময় আচমকা আর একটা ট্রেন আমাদের পাশ দিয়ে হুস্ করে নীচে নেমে গেল। প্রায় দু'হাজার ফুট ওপরে ওঠবার পর ট্রেনটি এসে একটি ষ্টেশনে থামল। এখানে একটি 'ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস' আছে। এখান থেকে চালক আমাদের ওপরে নিয়ে এল, এই জায়গায় আমাদের গাড়ী বদলাতে হ'ল। ট্রেন এ সময়ে যাত্রীদের নিয়ে ওপরে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা তাড়াতাড়ি ট্রেনের মধ্যে যেখানে পারি বসে পড়লাম। খানিক পরে যাত্রীদের নিয়ে ট্রেনটি ছাড়ল। আমরা আবার ওপরে উঠতে লাগলাম। ঠাণ্ডা বেশ লাগছে—কুয়াসার সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করে আমাদের ট্রেন এগিয়ে চলেছে। দু'পাশে চীনাদের সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাগুলো দাঁড়িয়ে আছে—অধিকাংশ জনাকীর্ণ। একপাশে একটি শান বাঁধানো বড় নালা রয়েছে—তার ভেতর দিয়ে ঝরণার জল নীচে পড়িয়ে

পড়ছে। কিছুক্ষণ পরে আমরা একটি সুড়ঙ্গ পার হলাম। এটি পাহাড় ভেদ করে ওপর উঠে গেছে। সুড়ঙ্গটি অতিক্রম করে আমাদের ট্রেন ক্রমশঃ উর্দ্ধে আরোহণ করতে লাগল। ডানদিকে পাহাড়ের কিয়দংশ কেটে সমতল ক্ষেত্রে পরিণত করে চৌবাচ্চা তৈরি করে সাঁতার কাটবার জন্ত সেটি জলে ভরতি করে রাখা হয়েছে। আশেপাশে অনেক চীনার বাড়ী দেখলাম। যাত্রীর দল মাঝে মাঝে ওঠানামা করছে। আমরা কিছুক্ষণ পরে ষ্টেশনে এসে পৌছলাম।

ষ্টেশনটি খুব ছোট, পাহাড়ের ওপর থেকে নীচেকার ভাসমান মেঘগুলোকে ভারি চমৎকার দেখায়। দূরে বহু নিম্নে পেনাঙ প্রণালীর বারিরাশির অনন্ত বিস্তার, কোথাও প্রণালীর গর্ভোত্থিত পাহাড়ের মালা উন্নতশিরে দণ্ডায়মান। পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে জেলেদের ছোট ছোট ঘরগুলো যেন পায়রার খোপের মত দৃশ্যমান। দূরে পাহাড়ের গায়ে ঝরণার জলে বাঁধ দিয়ে একটি জলাধার তৈরি হয়েছে—সেখান থেকে গোটা পেনাঙ শহরে জল সরবরাহ করা হয়।

কিছুক্ষণ যাবার পর আমরা রাস্তার মোড়ে এসে উপস্থিত হলাম। সব দেখা শেষ হলে আমরা বাড়ীর পথে রওনা হলাম। ট্রেন দাঁড়িয়েছিল, আমাদের নিয়ে নীচে নেমে এল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়; আমরা পেনাঙ পাহাড় ত্যাগ করে আরব মস্‌জিদ দেখে পেনাঙ ঘাটে এসে পৌছলাম। পেনাঙ কেল্লা, প্যাভিলয়ন, রেক্সথিয়েটার ও সুপ্রীম কোর্ট, পিকাডেলী, নাচঘর এসব পথের মাঝেই নজরে পড়ল।

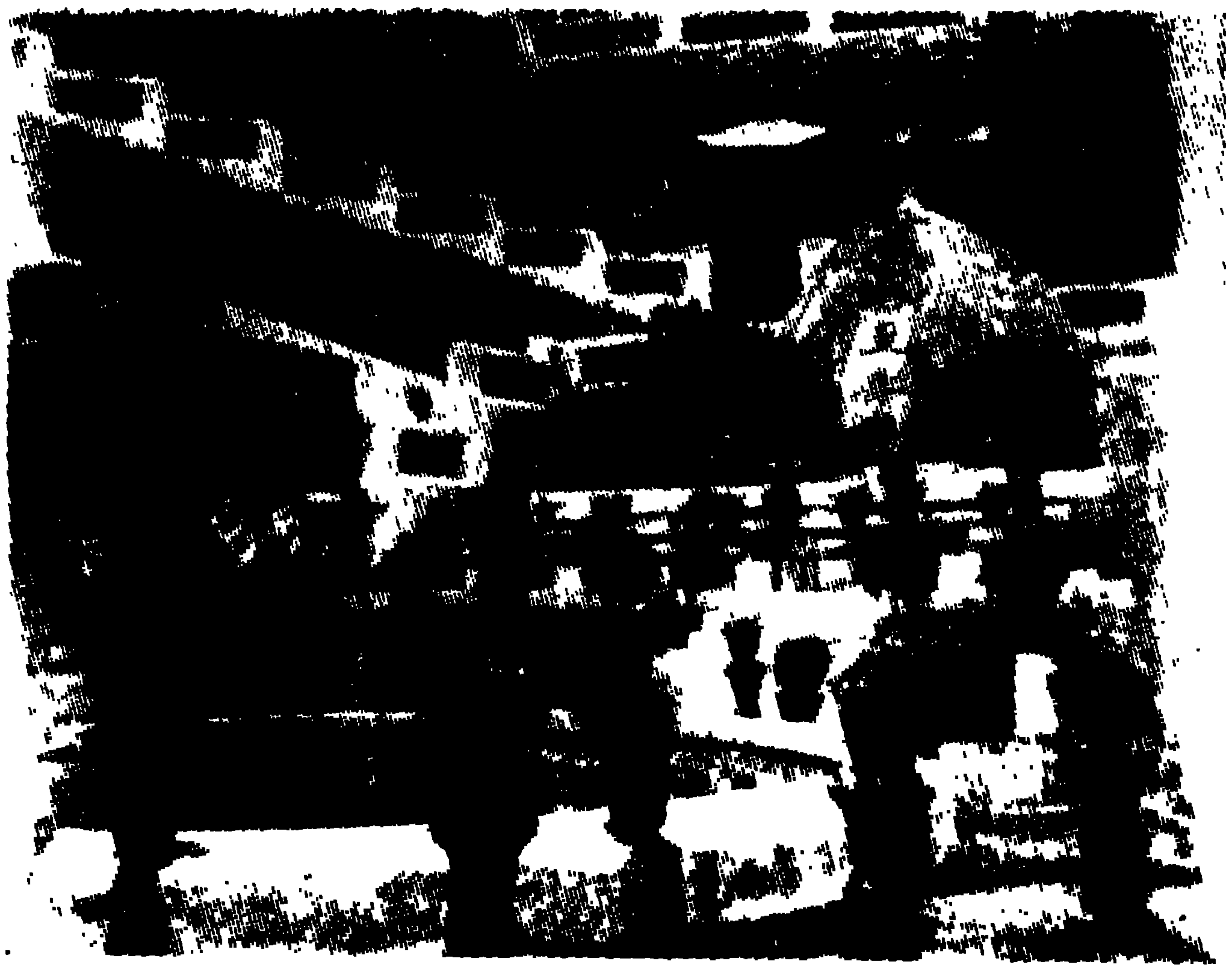

আয়ার হিতাম মন্দিরের মুখে বাগান

ফেরী ছাড়বার অনতিপূর্ব্বে আমরা ভেতরে গিয়ে স্থান সংগ্রহ করলাম। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে—আকাশ ভেঙে আরম্ভ হ'ল বৃষ্টি। আমরা ওয়াটারপ্রুফ মুড়ি দিয়ে জীপের মধ্যে বসে আছি। আশেপাশের অনেকগুলো লোক ভিজতে আরম্ভ করেছে। কেউ ঢুকছে ট্রাকের নীচে, কেউ গিয়ে পার্শ্বস্থ কোন ছত্রধারীর ছাতার নীচে আশ্রয় নিয়ে বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস পাচ্ছে।

অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণের ভেতর দিয়ে আমরা আমাদের পেনাঙ ভ্রমণ-পর্ব্ব শেষ করলাম। এই ভ্রমণের স্মৃতি মানস-পটে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

ভাস্কর্য

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

অনেক দিনের আশা তোমাকে শোনাবো আমি গান,
তাই ত মেঘের স্বরে নীলাকাশে নক্ষত্র-আহ্বান।
ফুলের ঘোমটা খুলে যে-মূর্চ্ছনা স্পর্শ রেখে যায়—
ঝড় নয়, ভালবাসা তুলেছিল মর্ম্মর ভাষায়।
উজ্জ্বল হলুদে-চাঁদ আমিই ত করুণায় জ্বালি,
মমতার মোমে সুতো হৃদয়ের করে জোড়াতালি।
জীবন কিছুই নয়, দাম নেই না থাকলে আশা,
তাই ত তোমাকে দিই আঙুরের মত ভালবাসা।

টুনো-কাঁচ তুমি শুধু তোমার যে নেই কোনো দাম-ই,
নক্ষত্রের গান নিয়ে কাছে এসে না দাঁড়ালে আমি।
পাথরকে কুঁদে কুঁদে দিয়েছি ত ভাস্কর্য মর্ম্মরে—
এনেছি অনেক প্রেম, ভালবাসা শিল্পহাত'পরে।
হ্রদের মতন কাঁপে তবু যেন অর্পিত হৃদয়।
তুমি না রইলে কাছে পৃথিবীকে মাঠ মনে হয়।

প্রবাহ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

১৯

সাধু বিস্মিত চোখে চাহিয়া রহিল। কোথাও যে একটা মারাত্মক ভুল হইয়া গিয়াছে একথা সে বিশ্বাস করিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটা কথাও বলিতে পারিল না। তার চোখে মুখে একটা অসহায় উদ্বেগ-ব্যাকুল ভাব ফুটিয়া উঠিল।

মৃন্ময় ততক্ষণে অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। গ্রাম ছাড়িয়া আজই সে চলিয়া যাইবে। আজই—এই মুহূর্তেই। একটি মুহূর্তের বিলম্ব তাহাকে পাগল করিয়া তুলিতে যথেষ্ট। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সমাধি রচনা হইয়াছে। এখানে আর কিসের মোহে সে পড়িয়া থাকিবে?

গ্রামকে সে ভালবাসে। এই মাটির উপর তাহার গভীর টান। কিন্তু কোন আকর্ষণই আর তাহার গতিপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে না। গ্রামের প্রকৃতিও যেন তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তাহার পানে চাহিয়া অবিশ্বাসের তিক্ত হাসি হাসিতেছে। আকাশে যেন কিসের একটা কুটিল ইঙ্গিত। চতুর্দ্দিকে শুধু ছি ছি রব উঠিয়াছে। কিন্তু কেন? সে ত কোন অন্যায় কাজ করে নাই—কোন দিন অন্যায়ের প্রশ্রয়ও দেয় নাই!

মৃন্ময়ের গতি দ্রুততর হইয়া উঠিল। তাহার অতীত জীবন সব মুছিয়া যাক, বিলুপ্ত হইয়া যাক। কিন্তু নদীতীরের বুড়ো বটগাছের তলায় আসিয়া সহসা তাহাকে থামিতে হইল। তাহার চলার গতি কে যেন অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতে থামাইয়া দিয়াছে। অতীতের কত কথাই না মনের কোণে আসিয়া ভিড় করিয়াছে। এই গাছতলায় বসিয়া কত দিন সে আর মঞ্জুষা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। সেই গাছ—সেই নদী—সবুজ ঘাসের মসৃণ আস্তরণ—সব কিছুই বিগত দিনের মধুর স্মৃতি বহন করিয়া আজিও বিরাজ করিতেছে। আজিও নদীর জলে তেমনি ঢেউয়ের নৃত্য... তাহাদের দু'জনের বুকেও যাহার দোলা লাগিত। একই সুর, একই তাল নিত্য তাহাদের কাছে নূতন রহস্যের সন্ধান বহিয়া আনিত। কিন্তু আজ নদী তাহার কাছে সুরহারা, ছন্দহীন। নাই তার কোন রূপ, কোন রস, কোন আকর্ষণ। শুধু একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা, শুধু একটা স্মৃতির আলোড়ন তাহার বুকের পাঁজরগুলিকে পর্য্যন্ত যেন শিথিল করিয়া দিয়াছে।

মঞ্জুষাকে লইয়া নীড় রচনা করিবার কত মধুর কল্পনা যে অনুক্ষণ তাহার মনে জাগিত সে খবর কেউ রাখে না—এমন কি, মঞ্জুষা নিজেও নয়। কেমন করিয়া দাম্পত্য জীবনের সূচনা করিবে তাহারই নিপুণ আলেখ্য মনের পাতায় পাতায় অঙ্কিত করিয়া সে স্বকীয় চেতনা দ্বারা তাহা অনুভব করিয়া দেখিত। হয়তো মঞ্জুষা তাহার মায়ের সহিত গল্প করিতে থাকিবে, কিংবা গৃহস্থালির সহায়তায় রত থাকিবে। মৃন্ময় মায়ের অলক্ষ্যে অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া আত্মগোপন করিবে, কিম্বা পাঠরত মঞ্জুষার চোখ টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে চমকিত করিয়া দিবে। তাহার পরে নিজেই প্রশ্ন করিবে, বলতো কে? মঞ্জুষা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া জবাব দিবে, রাজা বাদশা কেউ বোধ করি। কিন্তু দয়া করে চোখ ছাড়ুন। মৃন্ময় হয়তো তখন এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া অতি সন্তর্পণে একটি...

মঞ্জুষা এক হাতে তার চিবুক ঠেলিয়া ধরিয়া ত্রস্ত কণ্ঠে কহিবে, এই ছাড়...আ...জ্যাঠাইমা! মৃন্ময় সে কথায় কান দিবে না—মুচকি হাসিয়া কহিবে, এই কি...বল মিনুদা...নইলে...এক, দুই, তিন...শেষ পর্য্যন্ত মঞ্জুষা তার দুই বাহুর বন্ধনে পরিপূর্ণ ভাবে ধরা দিবে।

জ্যোৎস্না রাত্রে সে তাহার মনের পুঞ্জিত কথার ভাণ্ডার উজাড় করিয়া ফেলিবে। এত কথা যে সে জানে সেকথা তাহার নিজেরও অগোচর ছিল। কিসের পরশে যেন আজ তাহা দুকূল ছাপাইয়া উপচাইয়া উঠিয়াছে। গল্পের মাঝখানে হয়তো পাখীরা কলরব করিয়া জানাইবে প্রভাতের নির্দ্দেশ। মঞ্জুষা হাসিয়া কহিবে, এত কথাও তুমি জান! তখন ত একদম বোবা হয়ে থাকতে। মঞ্জুষার কথায় মৃন্ময় রাগ করিবে না বরং হাসিমুখে তাহাকে আরও কাছে টানিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিবে, এই মুহূর্ত্তে ওসব পুরনো কথা টেনে এনে নিজেকে ফাঁকি দিতে আমি পারব না। মঞ্জুষা তখন হয়তো ঘাড় বাঁকাইয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিবে, বুঝেছি থাক, মশাই!

তাই ত মৃন্ময় আজ আবার নূতন করিয়া ভাবিতেছে। কোথায় রহিল সেদিনের কল্পনা। তাহার আশার স্বপ্ন-সৌধ-রচনা। তাহার জীবনে মঞ্জুষার যে এমন করিয়া মৃত্যু ঘটিবে তাহা কে ভাবিতে পারিয়াছে। অথচ একদিন তাহাদের মৃদু-গুঞ্জনে এখানকার আকাশ-বাতাস পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিত। নদীজলের কলতানে তাহাদের বুকের কথা ছন্দে সুরে বহিয়া যাইত।

মৃন্ময় হঠাৎ যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। এ সব সে কি ভাবিতেছে। তাহার জীবনে এ চিন্তাও আজ নিছক বিলাসিতা। মৃন্ময় পুনরায় চলিতে সুরু করিল। সম্মুখে তাহার সীমাহীন পথ।...গৃহে ফিরিয়া আর কাজ নাই।

এখান হইতেই সোজা সে ষ্টীমার-ঘাটে যাইবে। ষ্টীমার যদি পাওয়া যায় ত ভালই, নহিলে নৌকাযোগেই সুরু হইবে তাহার নিরুদ্দেশ যাত্রা। এখানে আর একটি দিনও সে থাকিতে পারিবে না। এখানে সবকিছুই তাহার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে। তাহার উপর আর কাহারো আস্থা নাই। মৃন্ময়ের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাপ মা তাহাকে অবিশ্বাস করেন। মঞ্জুষাও তাহাকে বিশ্বাস করে না। অথচ সে একদিন মৃন্ময়কে ভালবাসিত—যে ভালবাসায় খাদ ছিল না। একথা মৃন্ময়ের চেয়ে বেশী করিয়া আর কে জানে? কিন্তু মঞ্জুষা যে তাহার উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে একথা ত কেহ তাহাকে বলে নাই। জবাবটাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে পাইল, যে কথা গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার সত্য বলিয়া ধারণা হইয়াছে সে কথা মঞ্জুষা অবিশ্বাস করিবে কোন যুক্তিতে। আর সত্য বলিয়াই যদি সে না মনে করিবে তবে নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল কেন? অন্ততঃ তাহার মুখের স্বীকারোক্তির অপেক্ষায় না হয় আর দিনকয়েক অপেক্ষা করিত।

একথা মৃন্ময়ের মনে একবারও জাগিল না যে, মন যখন ভাঙিয়া যায়, তখন যুক্তিতর্ক অথবা কাণ্ডজ্ঞান মানুষের স্বাভাবিক ভাবেই পঙ্গু হইয়া যায়।

ষ্টীমার আধ ঘণ্টার মধ্যেই পাওয়া গেল। নূতন করিয়া মৃন্ময়ের যাত্রা সুরু হইল। যদিও সে জানে না কোথায় কত দূরে গিয়া তার এ নিরুদ্দেশ-যাত্রা শেষ হইবে।

গ্রামের উপর, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের উপর, এমন কি তার নিজের উপর পর্য্যন্ত তার প্রবল অভিমান দেখা দিয়াছে। সহসা মৃন্ময়ের দু'চোখ সজল হইয়া উঠিল। সে সতৃষ্ণ নয়নে গ্রামের পানে চাহিয়া রহিল, গ্রাম্যপ্রকৃতির অনেক কিছুর সহিত আজও মঞ্জুষা মৃন্ময়ের কাছে জীবন্ত। এখানকার বেতঝোপ, বনকাঁটালির ঝাড়, ফণীমনসা গাছের সারি, নাহুদের কলাবাগান, চাটুজ্যেদের আমবাগান, বড় চালতা গাছটা, কেলিদিদির ধন্নে শাকের ক্ষেত ইহারা তাহাদের অতীতের বহু ঘটনার মূক সাক্ষী। কোথায় একটা পাখী অবিশ্রান্ত "বউ কথা কও" রবে ডাকিয়া মরিতেছে। অনন্তকাল ধরিয়াই বুঝি এমনি করিয়া ডাকিয়া চলিবে।

কত তুচ্ছ ঘটনা—যাহা শৈশবে তাহাদের দিনগুলিকে মনোরম করিয়া তুলিত, কৈশোরে তাহাই ভাবিতে গিয়া কেমন একটু কুণ্ঠিত লজ্জা অনুভব করিত, যৌবনে আলোচনার বস্তু হইয়া তাদের কত কথার রসদ যোগাইত। আজ সেদিনের সে কাহিনী অনুক্ষণ তাহার মনকে পীড়া দিবে। অথচ এক দিন এই স্মৃতিকে সে সংগোপনে নিজের অন্তরের মণিকোঠায় বহন করিত।

রাত নয়টায় মৃন্ময় আসিয়া কলিকাতা পৌঁছিল। পেটে ক্ষুধা আছে, কিন্তু আহারে প্রবৃত্তি নাই। সে রাতটা সে ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে কাটাইয়া দিল। পরদিন ভাবিল, একবার সুনির্ম্মলের বাড়ী গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসে যে, কেন সে মৃন্ময়ের এত বড় ক্ষতি করিল। মনের মধ্যে প্রতি-হিংসা-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিলেও সে আত্মসম্বরণ করিল। অন্যায়ের প্রতিবাদ অন্যায় দ্বারা করিতে তার বিচারবুদ্ধি সায় দিল না। সুনির্ম্মলের যদি মনুষ্যত্ব থাকিত ত তাহার সহিত দেখা করায় ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যে শুধুমাত্র পশুপ্রবৃত্তি লইয়া জন্মিয়াছে, নারীমাত্রেই যাহার কাছে ভোগ-বিলাসের পণ্য-সামগ্রী তাহার সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইতেও তাহার অন্তরাত্মা ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তবুও কিন্তু ভিতর হইতে তাগিদ আসে। একবার রুবির সহিত দেখা করিতে মন উন্মুখ হইয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, তুমি ত সবই জানিতে তবু কেন এই চক্রান্ত, এই দুরভিসন্ধি···এমনি অভিনয়, এত বড় ছলনা করিলে?

মৃন্ময়ের চিন্তাধারা যেন একটা সহজ পথ ধরিয়া চলিতে পারিতেছে না। সে শুধুই ভাবে, এবং এক সময় তাহাকে সুনির্ম্মলের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখা যায়। আজ আর সহজ ভাবে এ বাড়ীতে সে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। কেমন একটা অনাবশ্যক কুণ্ঠা এবং সঙ্কোচ তাহাকে বাধা দিতেছিল। অথচ তাহার কুণ্ঠিত অথবা সঙ্কুচিত হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

কিন্তু অপমানের চূড়ান্ত হইল যখন রুবি তাহাকে চরিত্র-হীন বলিয়া বিদ্রূপ করিল, সত্যই এতটা সে আশা করে নাই। হ্যাঁ—বিদ্রূপ ইহারা করিতে পারে বটে! কথাটা এই মুহূর্ত্তে মৃন্ময় নূতন করিয়া অনুভব করিল। উহাদের সাহস আছে—বিদ্রূপ করিবার মত মনোবৃত্তিও আছে। কিন্তু এখনও তুমি অন্তঃপুরিকা কেন? খাসা অভিনয় করিতে শিখিয়াছ। মৃন্ময় মনে যাহাই ভাবুক না কেন মুখে সে একটি কথাও বলিতে পারিতেছিল না। দু' চোখে তার বিস্মিত দৃষ্টি।

তার সে দৃষ্টির মধ্যে কি ছিল জানি না, কিন্তু রুবির কণ্ঠস্বর সহসা নরম হইয়া আসিল। মৃদু কণ্ঠে কহিল, দেখুন মৃন্ময়বাবু মিথ্যে আপনি আর আমায় জ্বালাতন করতে আসবেন না। আমার একান্ত অনুরোধ, আমার দ্বারা আর কোন অপ্রীতিকর কাজ করাতে আপনি আমাকে বাধ্য করাবেন না। এটুকু দয়া আপনি করবেন—

মৃন্ময় সহসা পাগলের মত হাসিয়া উঠিল। কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল সুতীব্র ব্যঙ্গের সুর—দয়া···দয়া করবার জন্যই ত এসেছি। কিন্তু আমি ভাবছি আপনারাও মানুষ। মানুষেরই মত আপনারা হেসে কথা বলেন, দুপায়ে হেঁটে চলেন।

রুবির স্বর পুনরায় কঠিন হইয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে ডাকিল, মৃন্ময়বাবু—

মৃন্ময় তেমনি বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, আপনি রাগ করেন কেন? দুটো সত্য কথাই না হয় বলেছি।—একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, না হয় আর বলব না। কিন্তু রুবিদেবীর আর কোন অনুরোধ নেই আমার কাছে, আর কোন রকমের সাহায্য? আর একবার দাদার বিরুদ্ধে মামলা করবার অনুরোধ করবেন না? কিংবা অন্য কিছু···

রুবি পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল, এর পরেও যদি আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকেন তবে বাধ্য হবে আমাকে···

তার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া পুনরায় মৃন্ময় কহিল, দারোয়ান ডাকবেন এই ত? আপনাদের অনেক টাকা আছে—দেউড়ীতে দারোয়ান আছে সে কথা জেনে শুনেই এ বাড়ীতে পা দিয়েছি। নিজেদের অনেক ছোট করেছেন—এটুকু আর বাকী রাখেন কেন। আপনাদের আসল পরিচয় জানতে ত আমার বাকী নেই--

মৃন্ময়ের মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। আর কোন প্রকার বাদানুবাদ না করিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

সেইদিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া রুবি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। আজ তাহার এই সর্ব্বপ্রথম মনে হইল যে, কাজটা সে ভাল করে নাই।

পুনরায় মৃন্ময় চলিতে সুরু করিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা তাহার নাই। কিন্তু জীবনধারণ করিতে গেলে মানুষকে অনেক কিছুই করিতে হয়, এবং এই প্রয়োজনের তাগিদ মিটাইতে হইলে অর্থেরও একান্ত আবশ্যক। নিজেকে সে স্রোতে ভাসাইয়া দিতে পারে না। তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে এবং মানুষের মতই বাঁচিতে হইবে।

মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে একটি পার্কে আসিয়া বসিল। সেখানে নানা শ্রেণীর লোকের ভিড়। মৃন্ময় সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল যে, মানুষ মাত্রেই অবস্থার দাস। সে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু অকস্মাৎ মঞ্জুষা যেন চোখের সম্মুখে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়ায়। তাহাকে যেন আর চেনাই যায় না। অনেকখানি শীর্ণ হইয়াছে। মুখে আর সে লাবণ্য নাই। শুধু দুই চোখে তার নালিশের ইঙ্গিত।

মৃন্ময় অর্থহীন চোখে চাহিয়া দেখিতেছে—যেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় জমিয়াছে, যেখানে ওরা খেলার আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যে যেন তাহার শৈশবের সঙ্গিনী মঞ্জুষা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন সে তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া চুপি চুপি বলিতেছে, জান মিনুদা, আমাদের বাগানে কত পেয়ারা পেকেছে, চলো দু' জনে পেড়ে খাই গে। পরে অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে পুনশ্চ যেন বলিয়া উঠিল, বাঁড়ুজ্যেদের চালতা গাছে অনেক চালতাও আছে—টক টক আর মিষ্টি মিষ্টি, ধনে শাক আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে বেশ হয় কিন্তু। বা রে—চলো না।—মৃন্ময় গিয়াছিল বৈকি। তার পরে আর একদিন—মৃন্ময় খুব মনোযোগের সহিত বাঁশের কঞ্চি আর নারিকেল গাছের পাতার সাহায্যে ঠাকুরঘর নির্ম্মাণে ব্যস্ত—মঞ্জুষা আসিয়া পিছন হইতে ডাকিল। অন্যমনস্কভাবে কঞ্চি কাটিতে গিয়া মৃন্ময় একটা আঙুলের আধখানা কাটিয়া ফেলিল। তার আজও পরিষ্কার মনে পড়ে এক হাতে নিজের কাটা আঙুল চাপিয়া ধরিয়া মঞ্জুষাকেই তাহার সান্ত্বনা দিতে হইয়াছিল। বোকা মেয়ে কাঁদিয়া আকুল। সেদিনকার কাটা ঘা আজ শুকাইয়াছে, দাগও মিলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু নাড়া পাইয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে। অতীতের অতি তুচ্ছ ঘটনাও বিলুপ্ত হয় না, মনের গহনে ঘুমাইয়া থাকে মাত্র। ইহার প্রভাব মানুষের জীবনে নিতান্ত কম নয়। তাহাদের চেতনার সহিত ইহার অস্তিত্ব। প্রয়োজনে ঘটে আবির্ভাব।

কিন্তু মঞ্জুষা কেমন করিয়া সেদিনকার কথা ভুলিয়া গেল। কেমন করিয়া সে মৃন্ময়কে এমন অসঙ্কোচে অবিশ্বাস করিতে পারিল। নহিলে দিনকয়েক সে অপেক্ষা করিত একবার তার মুখের স্বীকারোক্তির জন্য। সে ত মৃন্ময়কে ভাল করিয়াই জানিত। বস্তুতঃ একথাটা মুহূর্ত্তের জন্যও মৃন্ময় ভাবিল না, যে নিখুঁত অভিনয়ের জালে পড়িয়া সে নিজেও পথ খুঁজিয়া পায় নাই—প্রায় প্রতি দিনের নিয়মিত সাহচর্য্য তাহাকে যে সত্য জানিতে দেয় নাই তাহাদের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের কাছে মঞ্জুষা যদি হারিয়া গিয়াই থাকে তবে তাহার উপর দোষারোপ করা যায় কোন্ যুক্তিতে। মৃন্ময় না জানিলেও আমরা জানি মঞ্জুষা কেমন করিয়া নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল—যাহার জন্য গ্রামে রুবির আবির্ভাব—মৃন্ময় এবং মঞ্জুষার পিতার কলিকাতা গমন। কিন্তু মৃন্ময়ের সামান্য ভুলের জন্য সুনির্ম্মলের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইল না।

মঞ্জুষা তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, এ হতেই পারে না বাবা। নিশ্চয় এর মধ্যে কোন দুরভিসন্ধি আছে। মিনুদাকে আমি জানি, এত ছোট কাজ সে করতে পারে না।

জীবানন্দ বলিয়াছিলেন, তোমার কথাই সত্য হোক মা। কিন্তু মানুষই দেবতা হতে পারে, আবার তারাই পশুর পর্য্যায়ে নেমে যায়। তবে এমনি একটা খবর যখন পেয়েছি তখন একেবারে চুপ ক'রে থাকি কেমন করে। আমারও যে একটা কর্ত্তব্য আছে মা।

কর্ত্তব্য তিনি পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু চক্রব্যূহে প্রবেশ-পথ পাইলেও বাহিরের পথ খুঁজিয়া পান নাই। জীবানন্দ এবং প্রতুলকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল। মৃন্ময়ের আকস্মিক অন্তর্ধান এবং সর্ব্বোপরি তাহার নীরবতা সুনির্ম্মলকেই সহায়তা করিল। তাঁহাদের বিশ্বাসের শেষ অবলম্বনটুকুও আর অবশিষ্ট রহিল না।

পিতার মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়াই মঞ্জুষা তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুমান করিয়া লইল। তাই আর অনাবশ্যক প্রশ্ন করিয়া পিতাকে লজ্জা দিতে এবং সেই সঙ্গে নিজেও ব্যথা পাইতে সে চাহিল না, এবং সকল সময়ই সে মানুষের সংস্রব এড়াইয়া চলিতে লাগিল। মৃন্ময়ের অপরাধের বোঝা যেন শত গুণ হইয়া মঞ্জুষার উঁচু মাথা মাটির সহিত মিশাইয়া দিল।

ইহার পরেই মঞ্জুষার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিল। জীবানন্দ নির্বাক হইয়া গেলেন। মঞ্জুষার মনের কোণে যেটুকুও বা অনুকম্পা এবং বিশ্বাসের ছায়া অবশিষ্ট ছিল তাহাও এই বিপর্যয়ে ছত্রাকার হইয়া গেল। মঞ্জুষার মুখের প্রতিটি রেখা কর্কশ এবং কঠিন হইয়া উঠিল। সেখানে দয়ামায়ার লেশমাত্র নাই। জীবানন্দ ভয় পাইয়া গেলেন। মঞ্জুষাকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন, সবই আমার অদৃষ্টলিপি মা। নইলে এমন ত কোনদিন আমি ভাবি নি।

মঞ্জুষা শান্ত কণ্ঠে পিতাকে বলিয়াছিল, তুমি এতে কষ্ট পাচ্ছ কেন বাবা। আমি তোমারই মেয়ে একথা ভুলে যেয়ো না। কারুর কোন কাজেই আমাদের এতটুকুও ক্ষতি হবে না।

জীবানন্দ বলিয়াছিলেন, কথাটা ঠিক অমনি করে ভাবতে পারলে ত কোন কথাই ছিল না মা, আমি সবই বুঝি। বোঝাতে আমায় তোরা পারবি নে, কিন্তু আমি যে বড় অসহায়, বড় নিরুপায়।

জীবানন্দ একটু থামিয়া পুনরায় কহিয়াছিলেন, কারুর বিরুদ্ধে আমার একবিন্দু নালিশ নেই। মৃন্ময় যত বড় অন্যায় করুক না কেন সে সুখী হোক, কিন্তু এখানে আর আমি টিকতে পারছি নে মঞ্জু। তার চেয়ে এক কাজ করলে হয় না মা?

মঞ্জুষা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পিতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

জীবানন্দ কহিলেন, এ গাঁ ছেড়ে অন্য কোন দূর দেশে চলে যাব মা।

মঞ্জুষা যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছে এমনি আগ্রহের সহিত পিতার কথা সমর্থন করিয়া কহিল, সেই ভাল বাবা। এমন কোথাও চলো যেখানে কোন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের দেখা পাওয়া যাবে না।

জীবানন্দের কাছে মঞ্জুষার এতখানি আগ্রহ কেমন যেন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল। তিনি কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া পুনরায় কহিলেন, কিন্তু এর পরে মিনু যদি আবার ফিরে আসে মা।

মঞ্জুষার দুই চোখ সহসা জ্বলিয়া উঠিল। শান্ত অথচ কঠিন কণ্ঠে সে কহিল, তা হলে সে এসে এই কথাই জানবে যে, কারুর জন্যই কারুর আটকে থাকে না। কিন্তু এ সব কথা আর তুমি ভাবতে পারবে না বাবা। আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা বেশ করে ভেবে দেখেছি।

মঞ্জুষা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিয়াছিল, আমি যে মিথ্যে বলছি নে তার প্রমাণ একদিন তুমি পাবে বাবা। মঞ্জুষা মনে মনে এক কঠিন শপথ করিল।

ইহারই পরে তাহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে।

কিন্তু এত কথা মৃন্ময়ের জানিবার নয়, জানেও না। যতটুকু খবর সে রাধু বোষ্টমের নিকট ভাসা ভাসা ভাবে পাইয়াছে তাহাতেই তার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, এবং বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নটাই তার চোখে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু মঞ্জুষার মত সে কঠিন হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। বরং তাহার চিন্তা, তাহাদের অতীতের বহু ঘটনা তাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কখন চলিয়া গিয়াছে মৃন্ময়ের হুঁস নাই। বৈদ্যুতিক আলোয় চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মনে পড়িল, তাহাদের গ্রামেও সন্ধ্যা হয়। অন্ধকার নামে, আবার চাঁদের আলো হাসিয়া উঠে। পারিপার্শ্বিকের প্রকৃত রূপ কোথাও ব্যাহত হয় না। আজ তাহার চিরদিনের সেই একান্ত আপন গ্রামকে সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এত ছি ছি আর অপমানের বোঝা মাথায় লইয়া সেখানে মৃন্ময় আর ফিরিয়া যাইবে না।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস মৃন্ময়ের বুক ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। এই কয়টা দিন তাহার কেমন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। শুধু চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাত, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিজেকেই সহস্র রকমে প্রশ্ন করা। হঠাৎ তাহার মনে হইল যে, সে নিজের উপরই অবিচার করিতেছে। জীবনে পরিবর্ত্তন সকলেরই আসে। তাই বলিয়া এই ভাবপ্রবণতা তাহার কেন। তাহাকে বাঁচিতে হইবে, সুদিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

মৃন্ময় পুনরায় পথ চলিতে সুরু করিল। রাস্তার শেষে একটা হোটেল হইতে কিছু খাইয়া লইয়া সে পুনরায় বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু এই ভাবে উদ্দেশ্যহীনের মত পথে পথে আর কতদিন সে কাটাইবে?

নিনির কথা তাহার মনে পড়িল। সেই সঙ্গে মনে পড়িল রাজাবাবুর ছেলের কথা। সে-ই ভাল—মৃন্ময় ভাবিল।

ইহার চেয়ে সহজ কোন চিন্তা বা পথের সন্ধান আপাতত তাহার মিলিল না। তা ছাড়া যেখানে···সুনির্ম্মল, রুবি, তাহার আত্মীয়পরিজন রহিয়াছে, তাহার ত্রিসীমানার মধ্যেও সে থাকিতে ইচ্ছুক নয়। সকলের চোখের সম্মুখে হইতে সে একেবারে মুছিয়া যাইতে চায়, নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে চায়।

মৃন্ময় সহসা শিয়ালদহগামী বাসে উঠিল। আপাতত গতি তাহার ষ্টেশন পর্য্যন্ত।

(২০)

গ্রামের আবহাওয়া মঞ্জুষার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আত্মীয় স্বজনের সহানুভূতি জ্ঞাপন...তাহার বাবাকে একই প্রশ্ন বারে বারে করা, অনুকম্পার দৃষ্টিতে মঞ্জুষার পানে চাহিয়া থাকা তাহার কাছে যেমন ঠেকিত বিরক্তিকর, তেমনি মনে হইত অপমানজনক। ফলে মৃন্ময়ের প্রতি মঞ্জুষার মন অধিকতর বিরূপ হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং কতকটা আত্মীয়-স্বজনের ভয়ে ও আত্মগ্লানিতে যখন সে ম্রিয়মাণ তখনই মঞ্জুষার বাবার তরফ হইতে বিদেশে যাইবার প্রস্তাব আসিল। সে বাঁচিয়া গেল।

গ্রাম ত্যাগ করিয়া প্রথমে তারা কলিকাতায় আসিল। কিন্তু এখানকার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাহারা নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছিল না। অথচ কথাটা কেহই মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতেছে না। জীবানন্দ ভাবিতেছেন মঞ্জুষার কথা, আর মঞ্জুষা তার বাবার কথা। একে অপরের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া মৌন হইয়া আছে। মঞ্জুষা ভাবে, তাহার বাবা হয়তো শহরের এই কোলাহলের মাঝে নিজেকে খানিকটা অন্যমনস্ক রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। জীবানন্দের মনের চিন্তাধারাও ঠিক একই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আহা, মেয়েটার মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না।

কিন্তু দিন যতই চলিয়া যাইতে থাকে মঞ্জুষা মনের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর চাঞ্চল্য অনুভব করে। যে আশা অতি সঙ্গোপনে মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিল তাহাও আজ পর্য্যন্ত সাফল্য লাভ করিল না। তার প্রত্যেকটি গোপন প্রয়াসই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে যাহার ফলে মঞ্জুষা আরও বেশী বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। অথচ তাহার মনের কথা কাহারও নিকট খোলাখুলি প্রকাশ করিবার উপায় নাই।

ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার অছিলায় বহু স্থানেই মঞ্জুষা খবর লইয়াছে, কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। বরং নিদারুণ ব্যর্থতা তাকে প্রতিপদেই ভিন্ন পথে চিন্তা করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। তার নারীত্বের মর্য্যাদা হইয়াছে আহত। মনের কোণের ক্ষীণতম আশাও শেষ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট রহিল না।

মঞ্জুষা নিজেকে সহস্র রকমে ধিক্কার দেয় তাহার এই চিত্তদৌর্ব্বল্যের জন্য। পিতাকে প্রকাশ্যে বলে, তোমার বোধ হয় এখানকার জলহাওয়া সহ্য হচ্ছে না বাবা?

জীবানন্দ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, এ কথা কেন মা? আমি ত বেশ ভালই আছি।

মঞ্জুষা বলে, এর নাম কি ভাল থাকা বাবা? তোমার চেহারা দিন দিন কি হচ্ছে তা কি দেখছ না?

জীবানন্দ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, আমিও যে ঠিক এই কথাটাই ক' দিন ধরে তোমায় বলব ভাবছিলাম মঞ্জু।

মঞ্জুষা জোর করিয়া একটু হাসিল। গভীর কণ্ঠে বলিল, এ ভাবে আমার কথাটা তুমি চাপা দেবার চেষ্টা করো না বাবা। অন্তত আমার দিকে চেয়েও তোমার নিজের কথা ভাবা উচিত।

শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভারী হইয়া উঠিল।

জীবানন্দ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, আমি ত তোমার কোন কাজে বাধা দিই না মা!

মঞ্জুষা নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। অনর্থক পিতাকে এভাবে বিব্রত করিয়া সে আত্মগ্লানি অনুভব করিল। কতবড় ব্যথা যে তার বৃদ্ধ পিতা নিঃশব্দে বহন করিয়া ফিরিতেছেন একথা মঞ্জুষার চেয়ে বেশী ত আর কেহ জানে না। তথাপি কেন এই মিথ্যা ছলনা!

মঞ্জুষা লজ্জিত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, আমি ত সে কথা বলছি না বাবা। আমি ভাবছিলাম এখানকার জলবায়ু যখন আমাদের সহ্য হচ্ছে না তখন না হয় অন্য কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাওয়া যাক। এখানকার এই হৈ চৈ আমারও আর ভাল লাগছে না।

জীবানন্দ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, অতি উত্তম কথা মা। আজই তা হলে তৈরি হয়ে নাও। কথা কয়টি তিনি এমন ভাবে বলিলেন যেন এই মুহূর্ত্তে রওনা হইতেও তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।

মঞ্জুষা পিতার এই অস্বাভাবিক আগ্রহে মনে মনে ব্যথিত হইল। পিতার স্নেহপ্রবণতার উপর কত অন্যায় আব্দার সে করিতেছে। প্রকাশ্যে কহিল, আজ আর সম্ভব হবে না বাবা! তা ছাড়া দিনটাও আজ মোটেই ভাল নয়।

জীবানন্দ বার কয়েক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, এক সময় বড্ড মেনে চলতাম, কিন্তু আজ আর ভাবতেও ভাল লাগে না। আমার ভাল যে চারিদিকেই দেখতে পাচ্ছি।

মঞ্জুষা মৃদু কণ্ঠে কহিল, এসব ত তোমার কথা নয় বাবা! এত সহজেই আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলব কেন? আমাদের আজন্মের বিশ্বাস এই সামান্য কারণে ক্ষুণ্ণ হতে দেব কিসের জন্য!

জীবানন্দ পুনরায় ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ মাথা নাড়িলেন। মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, আজন্মের বিশ্বাস...সামান্য কারণ...আচ্ছা মা...থাক্ মঞ্জু...কিন্তু যাওয়ার ব্যবস্থা দু' এক দিনের মধ্যেই করে ফেল। শরীরটা বোধ হয় সত্যিই আমার খুব খারাপ যাচ্ছে।

মঞ্জুষা পিতার নিকটে আগাইয়া আসিল। আলগোছে তার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিয়া মৃদু কণ্ঠে

কহিল, আমি শুধু আজকের দিনের কথাই বলছিলাম। নইলে আমি নিজেও যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি বাবা। আমরা কালই এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব।

পুনরায় নূতন করিয়া তাহাদের যাত্রা সুরু হইল। ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার দ্রুত গতির সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুষার মন উধাও হইয়া চলিয়াছে বহু দূরের নানা স্মৃতির রাজ্যে। সে দিনগুলি তার জীবনে আর ফিরিয়া আসিবে না; শুধু ফেলিয়া গেছে স্মৃতি···বেদনা···জ্বালা। মঞ্জুষার মনে কত চিন্তাই না আনাগোনা করিতেছে। মৃন্ময়ের প্রতি কখনও অনুকম্পা দেখা দেয়, কখনও একটা হিংস্র প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তাহার কল্পনা শুধু কল্পনাই থাকিয়া যায়। তাহার চিন্তার এই বিচিত্র ধারা শুধু তাহাকেই শেষ পর্য্যন্ত বাজ করে—আপন অন্তরে আপনিই শুধু জ্বলিয়া মরে। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবারও উপায় নাই। সবার চেয়ে ভয় মঞ্জুর বাবাকে লইয়া। এ কথা সে ভাল করিয়াই জানে—কতখানি ব্যাকুল আগ্রহে তিনি দিবারাত্র মঞ্জুষার চালচলন কথাবার্ত্তা লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

মঞ্জুষা প্রাণপণে অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। তথাপি মাঝে মাঝে সে ধরা পড়িয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ অভিনয় করিয়া নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। অন্ততঃ মঞ্জুষা তাহা পারিতেছে না।

কত কথাই একের পর এক তার মনের কোণে উঁকি মারিতেছে। তাদের আদর্শ পরিকল্পনার কথা, ভবিষ্যৎ জীবনে স্বর্গরচনার কথা। যে স্বর্গে তথাকথিত ছোট-বড়র প্রভেদ থাকিবে না, তাদের মধ্যে ওরা নামিয়া যাইবে উহাদিগকে নিজেদের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে। সাড়া পাইয়া আরও কত কথা তার মনে আলোড়ন তুলিয়াছে। আজিকার এই পরিণতির কথা ভাবিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই অতীতের বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনা একের পর এক সার বাঁধিয়া তার চোখের সম্মুখে রূপ পরিগ্রহ করে। তাকে অস্থির করিয়া তোলে।···

হায়রে, কোথায় গেল তাদের সে কল্পনার মায়াসৌধ? এমনি করিয়াই কি সবকিছু ব্যর্থ হইয়া যাইবে? কিন্তু কেন? কিসের জন্ম? মঞ্জুষা একথার কোন উত্তর খুঁজিয়া পায় না। শুধু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লক্ষ্যহারার মত সে তার বাবাকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দার্জ্জিলিঙের গিরিকান্তার, পুরীর সমুদ্র, কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির, এগুলির কিছুতেই তাহার প্রয়োজন নাই। তবুও সে ঘুরিয়া বেড়ায়। মনকে আয়ত্তে রাখিতে সক্ষম হইতেছে না বলিয়া বাহিরে তার এই অনির্দ্দিষ্ট পথ-চলা।

শেষ পর্য্যন্ত জীবানন্দকেও এক দিন বাধা দিতে হইল। মৃদু প্রতিবাদ করিয়া তিনি কহিলেন, এমনি করে নিজেদের ক্ষতি করার কোন লাভ নেই মঞ্জু। তার চেয়ে বরং গ্রামেই ফিরে যাই চলো।

মঞ্জুষা প্রথমে তার বাবার কথাটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু মুহূর্ত্তেই অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়া মৃদু শান্ত কণ্ঠে কহিল, আজ হঠাৎ এ কথা কেন বাবা?

জীবানন্দ কহিলেন, এর নাম ত বায়ুপরিবর্ত্তন নয় মা!

মঞ্জুষা কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া লইয়া কহিল, কথাটা তুমি মিথ্যে বলো নি বাবা। বহু পূর্ব্বেই আমার একথা বোঝা উচিত ছিল যে, আমার পক্ষে যেটা অনায়াসসাধ্য তোমার পক্ষে তা মোটেই সহজ নয়। কিন্তু গ্রামে আমি আর ফিরে যেতে পারব না। তার চেয়ে বিদেশেই কোথাও স্থির হয়ে বসো বাবা।

শেষ পর্য্যন্ত হইলও তাহাই। পুরীতেই তাহারা তখনকার মত রহিয়া গেল।

মঞ্জুষা তার বাবাকে লইয়া রোজই একবার করিয়া বাহির হয়। কখনও সমুদ্রতীরে, কখনও জগন্নাথের মন্দিরে। অবসর সময় দেশ-বিদেশের গল্পে পিতাপুত্রী সময় কাটাইয়া দেয়। একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন।

মঞ্জুষা যেন একেবারেই ফুরাইয়া গিয়াছে। জীবানন্দ শঙ্কিত হইয়া উঠেন। মেয়েকে কাছে ডাকিয়া অনুযোগ দেন। মঞ্জুষা হাসিয়া তা শোধব করিবার চেষ্টা করে। বলে, এ তোমার দৃষ্টিভ্রম বাবা। স্নেহে তুমি অন্ধ হয়ে গেছ। এখানে ত আমি বেশ ভালই আছি।

জীবানন্দ সংগোপনে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। পিতা-পুত্রীর মধ্যে এই ধরণের ছলনার অভিনয় ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই।

জীবানন্দ মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া বার কয়েক মাথা নাড়িয়া কহিলেন, মিথ্যে আমায় ভুলাতে চাইছ মঞ্জু, কিন্তু দোহাই তোমার, এমনি করে আমায় কষ্ট দিও না মা।

মঞ্জুষা বিস্মিত হয়, কিন্তু প্রতিবাদ করে না। বরং পুরাতন ক্ষত আবার নূতন ভাবে জ্বালা করিয়া উঠে। কি সে করিবে! কতখানি ক্ষমতা তার, পিতাকে এই সর্ব্বনাশা দুর্ভাবনা হইতে কেমন করিয়া সে মুক্তি দিবে। নিজের কথা সে আর ভাবিতে চাহে না। সে ভাবনাই যে তাদের জীবন-যাত্রাকে নিরন্তর জটিল করিয়াই তুলিতেছে! ভাবিব না মনে করিলেই ত তার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না।

এমনি নানা চিন্তায় মঞ্জুষার মন যখন ভারাক্রান্ত···নিতান্ত অন্ধের মত সে যখন তার ভাবী পথের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে তখন একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে নান্টুর সাক্ষাৎ মিলিল জগন্নাথ-মন্দিরে। মঞ্জুষা নিজে হইতে না ডাকিলে নান্টুর কাছে হয়তো সে অপরিচিতাই থাকিয়া যাইত। বহু বৎসর পূর্ব্বে দেখা বালিকা মঞ্জুষার সহিত আজিকার মঞ্জুষার কোথাও একবিন্দু সাদৃশ্য নাই। তাই মঞ্জুষা যখন অনুযোগ দিয়া কহিল, না ডাকলে বোধ হয় চিনতেই পারতে না?···তখন কথাটা নীরবে মানিয়া লইয়া হাসিমুখে নান্টু কহিল, খুব সত্যি

কথা, কিন্তু তার জন্ত আমাকে অনুযোগ দেওয়া চলে না। এক যুগ আগের মঞ্জু যে কত ছোট ছিল তা সে ভুলে গেলেও আমি ভুলি নি। কিন্তু তোমার সাক্ষাৎ যে এখানে পাব এ আমার স্বপ্নের অতীত। কত খুশী যে হয়েছি সে তুমি কল্পনা করতেও পারবে না।

ইহার পরে সংক্ষেপে তাহাদের মধ্যে নানা আলোচনা হইল। তাদের পারিবারিক বিপর্য্যয়ের কথা, গ্রামের কথা, রাধু বোষ্টমের কথা। মৃন্ময়ের কথাটা মঞ্জুষা ইচ্ছা করিয়াই তুলিল না। কিন্তু মঞ্জুষা কথাটা এড়াইয়া যাইতে চাহিলেও নান্টুর তার সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ আছে এবং তাদের ভিতরের গোলযোগের কোন খবরও সে রাখে না। কাজেই সে অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল, মিনুর কথা ত কিছু বললে না মঞ্জু?…

মঞ্জুষা মুহূর্ত্তের জন্ত একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেও অচিরেই সামলাইয়া লইয়া বলিল, সে এক মস্ত বড় ইতিহাস নান্টুদা। এখানে এই জনতার মাঝে তা নাই বা শুনলে। আমাদের বাড়ী চল সেখানে গিয়ে সব বলব। বাবার শরীর ভাল যাচ্ছে না। তাঁকে নিয়েই এখানে আছি। কিন্তু তুমি কোথায় আছ সে কথা ত বললে না?

নান্টু বলিল, হোটেলে।

মঞ্জুষা কহিল, আর ত হোটেলে থাকা তোমার চলবে না।

নান্টু বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, কেন!

মঞ্জুষা স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, আমরা এখানে থাকতে তুমি থাকবে হোটেলে? এ কখনও হতে পারে না। লোকে শুনলেই বা বলবে কি!

নান্টু প্রাণ খুলিয়া কিছুক্ষণ হাসিল, বলিল, লোকের কথায় গায়ে ফোস্কা পড়ে না।

নান্টুর কথার ধরণে মঞ্জুষাও হাসিয়া উঠিল। কহিল, কিন্তু আমাদের পড়ে। তা ছাড়া এই বিদেশে একবার যখন তোমার দেখা পেয়েছি তখন তোমার কোন আপত্তিই শোনা হবে না।'

আপত্তি শেষ পর্য্যন্ত নান্টু করে নাই। তার সামান্ত জিনিষ পত্র লইয়া সেই দিনই সে হোটেল ত্যাগ করিল।

ক্রমশঃ

খেলাভঙ্গ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নীলকণ্ঠ নামটি তাহার— সুযশ বড় তার
দেশের সে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাবার খেলোয়াড়।
কোনো খেলায় হারত নাকো, এতই তাহার গুণ,
দাবা খেলার কুরুক্ষেত্রে—সেই ছিল অর্জ্জুন।
জঙ্গী খেলার দেখতো শত নয়ন সতৃষ্ণ—
বিজয় তারই—সারথি তার বুঝি শ্রীকৃষ্ণ।

একটি দিবস চল্‌ছে খেলা—ঘটলো অঘটন,
নীলকণ্ঠ উৎকণ্ঠিত বিষণ্ণ বদন।
'চটে গেল বাজি এবার' বলিয়া চঞ্চল
ছকটি দাবার উল্টে রাখে—নয়ন ছল ছল।
দেখে মনে সে কি গভীর নিরাশা চিহ্ন!
বেদনা তার বুঝবে কে আর দরদী ভিন্ন?

'চটে গেল বাজি' এ তো সহজ কথা নয়—
এ যেন এক দিগ্বিজয়ীর ভাগ্যবিপর্য্যয়।
এ যেন রে অভ্রভেদী আকাঙ্ক্ষা চুরমার,
চট্‌লো বাজি ভগ্ন-হৃদয় ভাবিছে 'হিটলার'।
লাল কেল্লা বহুৎ দূরে—চট্‌লো যে বাজি!
'কোহিমাতে' এ যেন রে কাতর নেতাজী।

রিক্ত করে, তিক্ত করে, জীবন সুদুর্লভ—
প্রারম্ভেতে বন্ধ হলো কাঙ্ক্ষিত উৎসব।
ফাঁসলো পরিকল্পনা তার—ডুবলো যেন হায়—
আশার বিশাল বহিত্র এক—সাগর মোহানায়।
বিফল হ'ল কি নৈপুণ্য? কি মহা উদ্যম!
এত বড় ওলটপালট ব্যথা কি এর কম?

এমনি আহা কতই বাজি চটছে দুনিয়ায়।
বার্ত্তা তাহার মর্ম্মব্যথার ক'জন বল পায়?
জ্যোতিষ্ক যায় উল্কা হয়ে—বিধির অভিশাপ—
অসমাপ্ত খেলার বেদন রেখে যে যায় ছাপ।
আনে যুগের পুষ্ট আশা কেমনে নৈরাশ!
চটা বাজির ব্যথায় ভরা—ধরার ইতিহাস।

বুদ্ধের অন্তরঙ্গ অন্তেবাসী আনন্দ

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

আনন্দ বুদ্ধের একজন প্রধান এবং পরম অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। তিনি বুদ্ধের খুল্লতাত অমৃতোদনের পুত্র।[১] বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য অনুরুদ্ধ ও (গৃহস্থ শিষ্য) মহানাম আনন্দের (সম্ভবত বৈমাত্রেয়) ভ্রাতা ছিলেন। আনন্দ ছিলেন বুদ্ধের সমবয়সী, একই দিনে উভয়ের জন্ম হয়।[২] ধর্মচক্র প্রবর্তনের দ্বিতীয় বৎসরে তিনি অনুরুদ্ধ, দেবদত্ত প্রভৃতি আরও কয়েক জন শাক্যবংশীয় রাজকুমারের সহিত সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। বুদ্ধ স্বয়ং তাঁহাকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দেন।[৩]

বুদ্ধত্বলাভের বিশ বৎসর পর তথাগতের বয়স যখন পঞ্চাশ পার হইয়াছে তখন এক দিন ভিক্ষুগণের সমক্ষে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, বয়োবৃদ্ধি হেতু তাঁহার সর্বক্ষণের জন্য এক জন পার্শ্বচরের প্রয়োজন।

প্রধান শিষ্যগণের প্রত্যেকেই আগ্রহের সহিত তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন। বুদ্ধ কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। আনন্দ নীরবে বসিয়াছিলেন। অন্যেরা যখন জানিতে চাহিলেন—তিনি কেন এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাইতেছেন না; আনন্দ তখন বলিলেন—"ভগবান তথাগতের উপরই নির্বাচনের ভার দেওয়া ভাল। তাঁহার যোগ্য সেবক তিনিই ঠিকমত বাছিয়া লইবেন।"

অবশেষে বুদ্ধ যখন আভাস দিলেন যে, তিনি আনন্দকে চান আনন্দ তখনই সম্মত হইলেন, কিন্তু আটটি সর্তে। এই সর্তগুলি হইতে আনন্দের মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। (১) উপহার প্রদত্ত কোন বিশেষ খাদ্য বা (২) বিশেষ পরিচ্ছদ বুদ্ধ তাঁহাকে দিবেন না। (৩) তাঁহার জন্য কোন "গন্ধকুটী" বা বিশেষ বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন না। (৪) বুদ্ধের কোনো নিমন্ত্রণে বুদ্ধ তাঁহাকে সঙ্গে লইবেন না। (৫) তাঁহার গৃহীত নিমন্ত্রণে তথাগতকে যাইতে হইবে। (৬) দূরদেশ হইতে আগত দর্শনার্থীকে, আসিবামাত্র তিনি বুদ্ধের নিকট লইয়া যাইবেন।

নিজের জন্য তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা এই: (৭) তাঁহার যখনই ইচ্ছা হইবে তখনই বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইয়া অন্তরের সংশয় নিবেদন করিবেন। (৮) তাঁহার অবর্তমানে ভগবান যে ধর্মব্যাখ্যা করিবেন, তাহা পুনরায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে হইবে।[৪]

বুদ্ধ সবগুলি সর্তই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

অতঃপর পঞ্চবিংশতি বর্ষ ব্যাপিয়া[৫] আনন্দ পরম আনন্দে তথাগতের সেবায় আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশতি বর্ষ ব্যাপিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। অতি প্রত্যূষে মুখপ্রক্ষালনের জল ও দন্তকাষ্ঠ আনয়ন, সম্মার্জনীর দ্বারা তথাগতের কুটীর পরিষ্কার; দিবাভাগে সর্বদা সর্বত্র তাঁহার অনুগমন, সমীপে অবস্থান, ইঙ্গিতমাত্রেই তাঁহার ইচ্ছা পূরণ; রাত্রিতে দীর্ঘ যষ্টি ও উল্কা লইয়া বহুবার তাঁহার "গন্ধকুটী" পরিক্রমণ—যদি তথাগতের কোনো প্রয়োজন হয়—যদি কেহ তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত জন্মায় সেজন্যই তাঁহার এই উদ্যোগ—এই সতর্কতা।[৬]

এ যেন দণ্ডকারণ্যে পঞ্চবটীর পর্ণকুটীরে রামচন্দ্র নিদ্রা যাইতেছেন এবং ভ্রাতৃস্নেহাসক্ত পরম ভক্তিপরায়ণ সেবক লক্ষ্মণ অনিদ্র নয়নে নীরবে প্রহরা দিতেছেন।

না—ইহা তাহাকেও অতিক্রম করিয়াছে। এক প্রৌঢ় নিজের সমবয়সী আর এক প্রৌঢ়ের সেবা করিতেছেন। দেহে তাঁহার ক্লান্তি নাই, নয়নে নিদ্রা নাই। ক্রমে প্রৌঢ় বার্ধক্যে উপনীত হইলেন। বয়ঃক্রম তাঁহার পঞ্চষষ্টি, সপ্ততি, পঞ্চসপ্ততি, ঊনঅশীতি হইল। তাঁহারই সেবার প্রয়োজন—কিন্তু তিনিই সেবা করিয়া চলিয়াছেন, ঊনঅশীতি বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ অন্যতম সমবয়সী বৃদ্ধের জন্য জল তুলিতেছেন। তাঁহার দেহে তৈলমর্দন করিতেছেন, তাঁহাকে স্নান করাইতেছেন, তাঁহার শয্যা প্রস্তুত করিতেছেন; নানা প্রয়োজনীয় অবশ্যকরণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ গ্রহণ করিতেছেন এবং অতিক্রত তাহা সম্পাদন করিতেছেন।

একাধারে ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু, তথাগতের প্রতি কি তাঁহার স্নেহ, কি তাঁহার প্রেম, কি তাঁহার শ্রদ্ধা। একসুরে বাঁধা

১ সুমঙ্গল বিলাসিনী, (P. T. S) ২য় খণ্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা। মনোরথপূরণী (S. H. B.) ১ম খণ্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা। মহাবস্তুতে (edited by Senart) আনন্দকে শুক্লোদনের অন্যতম ভ্রাতা শুক্লোদনের পুত্র ও দেবদত্তের ভ্রাতা (মহাবস্তু, ৩য় খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা) এবং তিব্বতী গ্রন্থে আনন্দকে অমৃতোদনের পুত্র ও দেবদত্তের ভ্রাতা বলা হইয়াছে। *Life of Buddha* by Rockhill, p. 13.

২ *Psalms of the Brethren* (Mrs. Rhys Davids) p. 349.

৩ ঐ পৃষ্ঠা ৩৪৯। বিনয়পিটক (Oldenberg) ২য় খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা।

৪ *Psalms of the Brethren*, pp. 350-51, জাতক-অট্ঠ বন্ননা (V. Fausböll) চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬।

৫ থেরগাথা (P. T. S.) ১০৩৯-৪৪ গাথা। জাতক-অট্ট বন্ননা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৬।

৬ মনোরথ পূরণী, প্রথম খণ্ড. ১৫৯ পৃষ্ঠা। *Psalms of the Brethren* p. 351,

বীণাযন্ত্রের এক তন্ত্রীতে আঘাত করিলে যেমন অন্য তন্ত্রীতে তাহার প্রতিধ্বনি জাগে সেইরূপ তথাগতের পীড়া হইলে, সমবেদনশীল আনন্দেরও পীড়া হইত।৭

তথাগতকে রক্ষা করিবার জন্য কতবার তিনি প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছেন। দেবদত্তের প্ররোচনায় রাজমাহুতগণ রাজহস্তী নালাগিরিকে (বা ধনপালকে) মদ্যের দ্বারা মত্ত করিয়া বুদ্ধকে যাহাতে সে পদদলিত করিয়া হত্যা করে, সেজন্য তাঁহার গমনপথে ছাড়িয়া দিল। সেই মত্ত হস্তীকে তথাগতের দিকে বেগে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া আনন্দ চকিতে বুদ্ধের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। বুদ্ধ বার বার তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সতত বশংবদ আনন্দ তাঁহার আদেশ পালনে অস্বীকৃত হইলেন। বুদ্ধ তাঁহার ঋদ্ধিশক্তির দ্বারা আনন্দকে রক্ষা করিলেন, এবং তাঁহার মৈত্রীগুণের দ্বারা সেই দুরন্ত হস্তীকে বশীভূত করিলেন।৮

আনন্দের প্রতি বুদ্ধের স্নেহেরও সীমা ছিল না। কত অন্তরঙ্গ আলাপ, কত বিচিত্র বিষয়ের আলোচনাই না তিনি আনন্দের সঙ্গে করিয়াছেন! আনন্দেরও প্রশ্নের অন্ত নাই। পরম কুতূহলী ছিল তাঁহার চিত্ত। প্রশ্নের পর প্রশ্ন লইয়া তিনি তথাগতের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং তথাগতও পরম স্নেহভরে তাঁহার সংশয়জাল ছিন্ন করিয়াছেন।৯

অনেক সময় তিনি তথাগতকে এমন প্রশ্ন করিয়া বসিতেন, যাহা অন্য কেহ করিতে সাহসী হইত না। তাঁহাকে নীরব দেখিলে আনন্দ কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন।১০ তাঁহার মুখে হাসি দেখিলে আনন্দ প্রশ্ন করিতেন—"হাসিতেছেন কেন?"১১ বুদ্ধও হাসিমুখে তাহার কারণ দেখাইতেন। এমনই অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁহারা।

আনন্দ যাহা অনুরোধ করিতেন বুদ্ধ তাহা না করিয়া পারিতেন না। আনন্দের অনুরোধে অনেক সময় তিনি তাঁহার পূর্বসিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়াছেন। অত্যন্ত গুরুতর

৭ দীঘনিকায় (P. T. S.) ২য় খণ্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা।

৮ জাতক+অট্‌ঠ-বন্ননা (V. Fausboll) ৫ম খণ্ড, ৩৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা। বিনয়পিটক, ২য় খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা (চুল্লবগ্‌গ)।

৯ সংযুত্তনিকায় (P. T. S.) তৃতীয় খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা, চতুর্থ খণ্ড, ৫৩-৫৫ পৃ, পঞ্চম খণ্ড, ২৮২-৮৬, ৩২৮-৩৪ পৃষ্ঠা। মজ্ঝিম নিকায় (P.T.S.) তৃতীয় খণ্ড, ৬২-৬৭, ১০৪-২৪ পৃষ্ঠা। অঙ্গুত্তর নিকায় (P. T. S.) প্রথম খণ্ড, ১৩২-৩৩, ২২২-২৮ পৃষ্ঠা, তৃতীয় খণ্ড, ১৩২-৩৪, ২১৪-১৮ পৃষ্ঠা। চতুর্থ খণ্ড, ২৭৯-৮০, পঞ্চম খণ্ড, ৭-৮, ৭৫-৭৭, ৩১৮-২২ পৃষ্ঠা। ধম্মপদ-অট্‌ঠ কথা (P. T. S.) তৃতীয় খণ্ড, ২৩৬, ২৪৮, পৃষ্ঠা।

১০ সংযুত্তনিকায়, চতুর্থ খণ্ড, ৪০০-৪০১ পৃষ্ঠা।

১১ মজ্ঝিমনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৫, ৭৪ পৃষ্ঠা। জাতক, অট্‌ঠ বন্ননা, ৩য়, ৪০৫ পৃষ্ঠা, ৪র্থ, ৭ পৃষ্ঠা।

বিষয়েও বুদ্ধ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আনন্দের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন।

সঙ্ঘে নারীর প্রবেশাধিকার আনন্দের অনুরোধেই সম্ভব হইয়াছিল। কপিলাবস্তুতে মহাপ্রজাপতী গৌতমী (বুদ্ধের মাতৃস্বসা বিমাতা এবং ধাত্রীদেবী) যখন শাক্য রাজান্তঃপুরের বহু নারীর সহিত সঙ্ঘপ্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন বুদ্ধ তখনই তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। তথাপি তাঁহারা বৈশালী পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গেলেন এবং সেখানে গিয়া পুনরায় সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। বুদ্ধ তখনও তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। নারীগণ তথাপি রাজান্তঃপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন না। মনের দুঃখে ক্রন্দন করিতে করিতে সেইখানেই তাঁহারা অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। রাজান্তঃপুরিকা তাঁহারা। কখনও কোনও শারীরিক শ্রম করেন নাই। পথ হাঁটিয়া পা তাঁহাদের ফুলিয়া গিয়াছে। দাঁড়াইবার শক্তি নাই, দেহ অবসন্ন, মন বিমর্ষ। তাঁহাদের দেখিয়া আনন্দের কোমলচিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি তথাগতকে তাঁহাদের সঙ্ঘে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধ কিন্তু, স্বীকৃত হইলেন না।

বার বার তিন বার তিনি এই ভাবে অনুরোধ করিলেন এবং তিন বারই বুদ্ধ সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

আনন্দ তখন অন্য পথ ধরিলেন। তিনি বুদ্ধকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—"বুদ্ধপ্রচারিত ধর্মের অভীষ্ট ফললাভের যোগ্যতা নারীদের আছে কিনা?" উত্তর হইল—"আছে। নারীগণও অর্হৎ হইতে পারেন বা নির্বাণ লাভ করিতে পারেন।"

এইরূপ স্বীকৃতির পর আনন্দের অনুরোধ অনুযায়ী কার্য না করা আর তথাগতের পক্ষে সম্ভব হইল না। আটটি সর্তে বুদ্ধ নারীদের সঙ্ঘ-প্রবেশ অনুমোদন করিলেন।১২

কথিত আছে—এই সময় বুদ্ধ মন্তব্য করিয়াছিলেন আনন্দ যদি তাঁহাকে নারীদের সঙ্ঘপ্রবেশের অনুমতি দিতে বাধ্য না করিতেন তবে তাঁহার প্রচারিত ধর্মের পরমায়ু হইত সহস্র বৎসর। নারীদের সঙ্ঘপ্রবেশের জন্য তাঁহার ধর্ম মাত্র পঞ্চশত বৎসর জীবিত থাকিবে।১৩

নারীদের প্রতি আনন্দের সহানুভূতি ছিল এইরূপ। এই জন্য নারীগণও আনন্দকে বড় ভালবাসিতেন। নারীদের এত ভালবাসা ও শ্রদ্ধা বোধ হয় বুদ্ধ-শিষ্যগণের আর কেহ পান নাই।

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসিনী উভয় শ্রেণীর নারীদের মধ্যেই আনন্দের

১২। অঙ্গুত্তর নিকায় (P. T. S.) ৪র্থ খণ্ড, ২৭৪-৭৯ পৃষ্ঠা। বিনয়পিটক দ্বিতীয় খণ্ড ২৫৩-৫৬ পৃষ্ঠা।

১৩। বিনয়পিটক, চুল্লবগ্‌গ।

সরোজিনী নাইডু

শ্রীচিত্রনিভা চৌধুরী অঙ্কিত

সারিপুত্ত ও মোগগল্লানের দেহাবশেষ সংরক্ষণ-ক্ষেত্র, সাঁচি

মন্দির ও মঠ, সাঁচি

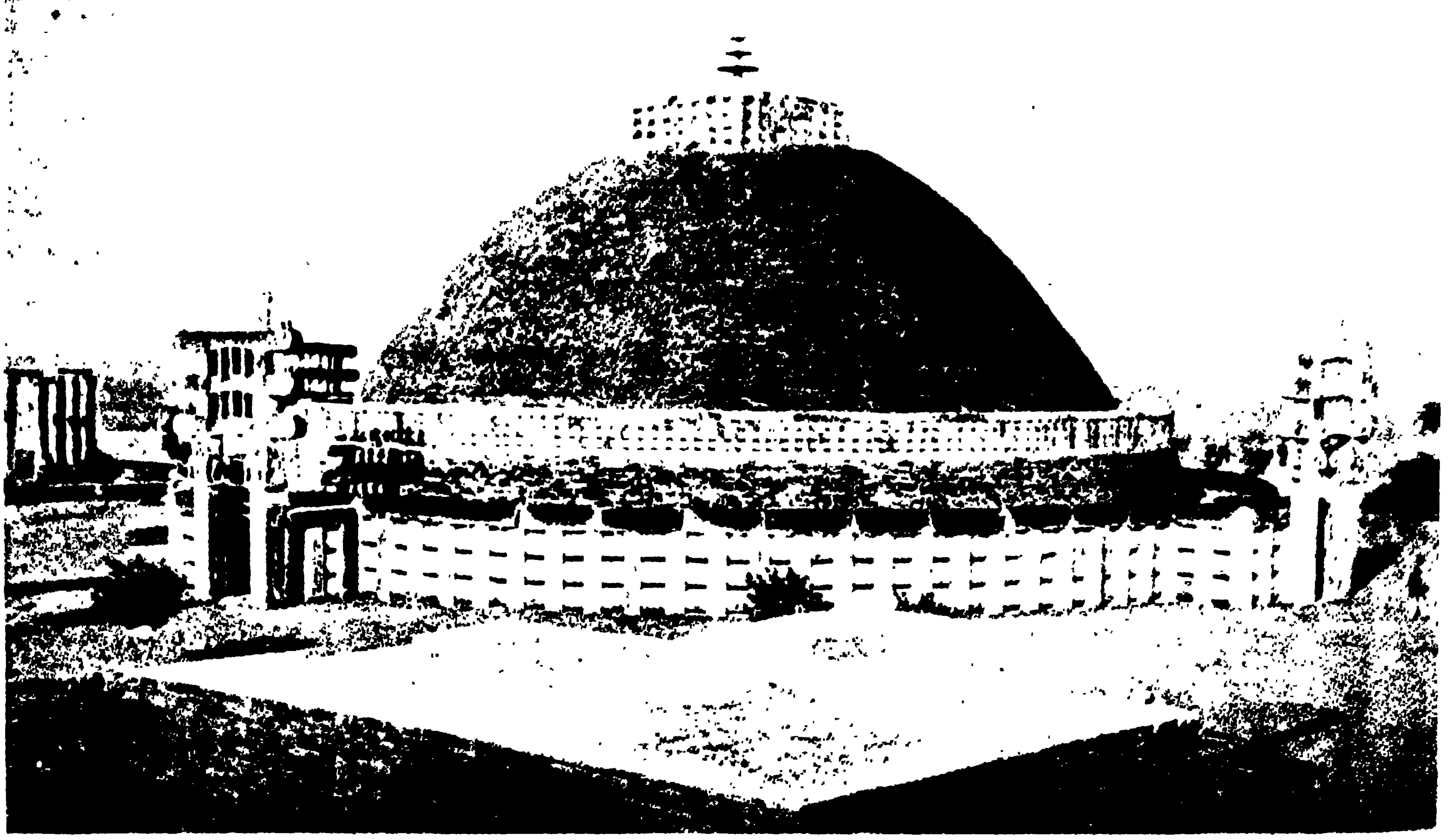

সাঁচি স্তূপ

প্রভাব ছিল অসীম। তিনি যখন উপদেশ দিতেন নারীগণ তাঁহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইতেন। তাঁহারা তাঁহাকে ব্যজন করিতে থাকিতেন এবং ধর্ম সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করিতেন।

তিনি যখন কৌশম্বী যান তখন রাজা উদয়নের অন্তঃপুরের মহিলাগণ তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্ত উপবনে সমবেত হন। তাঁহার উপদেশ শ্রবণে পরম সন্তোষ লাভ করিয়া, তাঁহারা আনন্দকে পঞ্চশত চীবর উপহার দেন।১৪

ধর্ম্মপদের ভাষ্যে আছে—কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তথাগতকে পঞ্চশত ভিক্ষুসহ প্রতিদিন তাঁহার প্রাসাদে পদধূলি দিবার জন্ত অনুরোধ করেন। বুদ্ধ যাহাতে তাঁহার মহিষী মল্লিকা ও বাসবখত্তিয়া এবং অন্তান্ত রাজান্তঃপুরিকাগণকে প্রতিদিন উপদেশ দেন—সেজন্তই তাঁহার এই অনুরোধ। বুদ্ধ তাঁহার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার পক্ষে প্রতিদিন এক স্থানে যাওয়া সম্ভব নহে। রাজা তখন অন্ত কোনও এক উপযুক্ত শিষ্যকে পাঠাইবার জন্ত তাঁহাকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ আনন্দকেই এই কার্য্যের ভার দেন।১৫

জাতকের ভাষ্যে আছে—রাজান্তঃপুরের মহিলাগণকেই বুদ্ধের অশীতি জন প্রধান শিষ্যের মধ্য হইতে গুরু নির্বাচনের ভার দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহারা সর্বসম্মতিক্রমে আনন্দকেই তাঁহাদের গুরু নির্বাচিত করিয়াছিলেন।১৬

পুরুষের সহিত নারীর অধিকার সমান হোক—ইহাই ছিল আনন্দের অন্তরের অভিপ্রায়। একবার তিনি বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন—"নারীরা কেন ধর্মাধিকরণের পদ অধিকার করেন না? নারীরা কেন বাণিজ্যাদিতে যোগ দেন না?" [অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য় খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা।]

অঙ্গুত্তর-নিকায়ের ভাষ্য হইতে জানা যায়, আনন্দের আকৃতি ছিল সুন্দর। একে দেখিতে সুন্দর১৭ তাহার উপর নারীদের প্রতি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন—ইহার জন্ত আনন্দকে একবার বিশেষ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। 'শার্দূলকর্ণাবদানে' তাঁহার সেই বিপত্তির ইতিহাস পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা"তে পাঠক তাহা অবগত আছেন। সুতরাং এখানে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না। বুদ্ধ তাঁহাকে এই বিপদ হইতে যেভাবে উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহা হইতেও তাঁহার প্রতি বুদ্ধের গভীর স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়।১৮

১৪। বিনয়পিটক, ২য় খণ্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা।

১৫। ধম্মপদ-অট্ঠকথা (P. T. S.) ১ম খণ্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা।

১৬। 'তাসব্বা মন্তেত্বা ধম্মভণ্ডাগারিকম্ আনন্দত্থেরম্ এব রোচেসুং।' জাতক-অট্ঠবন্ননা, ১ম খণ্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা।

১৭। মনোরথ পুরণী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৩৩ পৃষ্ঠা।

১৮। দিব্যাবদান (E. B. Cowell) পৃঃ ৬১১। শার্দূলকর্ণাবদান, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩, পৃঃ ১৯২।

দর্শনার্থী মাত্রই যাহাতে বুদ্ধের দর্শন পান, জিজ্ঞাসু মাত্রই যাহাতে বুদ্ধকে প্রশ্ন করিতে পারেন আনন্দ তাহার জন্ত সর্বদা চেষ্টা করিতেন। এমন কি, যদি তিনি বুঝিতেন বুদ্ধ কাহাকেও দেখা দিলে বা উপদেশ দিলে তাঁহার উপকার হইবে তবে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎকার বা উপদেশের ব্যবস্থা করিতেন।১৯ অথচ কেহ যাহাতে তথাগতকে অনর্থক বিরক্ত না করে, সেদিকে তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সতীর্থ ও সহকর্মী ভিক্ষুদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল মধুর। তাঁহারা অনেকেই অকপটভাবে আনন্দের নিকট নিজেদের দুর্বলতার বিষয় প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। নারীর দর্শনমাত্রেই বঙ্গীশ নামে এক ভিক্ষুর চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইত। তিনি আনন্দকে ব্যাকুলভাবে ইহা নিবেদন করেন এবং তাঁহার উপদেশ চান।২০

বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষণ যাঁহাদের তেমন বোধগম্য হইত না তাঁহারা আনন্দের নিকট তাহা বুঝিতে আসিতেন। আনন্দ ব্যাখ্যা করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিতেন। বুদ্ধপ্রচারিত ধর্মের যথার্থ ব্যাখ্যাতা বলিয়া তাঁহার বিশেষ সুনাম ছিল।২১

কখন কখন বুদ্ধ তাঁহার অসমাপ্ত ভাষণ আনন্দকে সমাপ্ত করিতে বলিয়া নিজে বিশ্রাম করিতেন। ভাষণ সমাপ্ত হইলে আনন্দ তথাগতের প্রশংসালাভ করিতেন।

কখন কখন এমনও দেখা গিয়াছে যে, আনন্দ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভিক্ষু ও গৃহস্থগণকে ধর্মোপদেশ দান করিতেছেন। আবার কখনও বা সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট তিনি তাঁহার পূর্বশ্রুত তথাগতভাষণ পুনরাবৃত্তি করিতেছেন।

কথিত আছে, আনন্দের স্মৃতিশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি বুদ্ধের বচন অক্ষরে অক্ষরে স্মরণ রাখিতে পারিতেন। বুদ্ধের দীর্ঘভাষণও বহুকাল পরে তিনি যথাযথ আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এজন্ত তিনি "ধর্মভাণ্ডাগারিক" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।২৩

সুত্তপিটকের প্রথম হইতে চতুর্থ নিকায়ের প্রত্যেকটি সুত্ত আনন্দের স্মৃতিপট হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। "আমি ইহা এইরূপ শুনিয়াছি" বলিয়া তিনি সুত্তগুলি আরম্ভ করিয়াছেন। বুদ্ধের সমস্ত ভাষণের সময়ই যে আনন্দ উপস্থিত ছিলেন তাহা নাও হইতে পারে। কিন্তু বুদ্ধের সহিত আনন্দের সর্তানুযায়ী আনন্দ কর্তৃক অশ্রুত ভাষণমাত্রই বুদ্ধ তাঁহাকে পুনর্বার শুনাইয়াছিলেন।

১৯। সংযুত্ত, ১ম খণ্ড, ১৮২-৮৩ পৃঃ, পঞ্চম খণ্ড, ৩২৩ পৃঃ। মজ্ঝিম নিকায় (P. T. S.) ১ম খণ্ড, ১৬০-১৭৫, ২৩৭-২৫১ পৃষ্ঠা।

২০। সংযুত্তনিকায়, ১ম খণ্ড, ১৮৫-৮৮ পৃ। থের গাথা, ১২২৩-২৬। *Psalms of the Brethren*, pp 397-401.

২১। অঙ্গুত্তর, ৫ম খণ্ড, ২২৫ পৃ। সংযুত্ত, ৪র্থ, ৯৩ পৃষ্ঠা।

২২। মজ্ঝিম, ১ম খণ্ড, ৩৫৩-৫৯।

২৩। থেরগাথা অট্ঠকথা (S. H. B.) ২য় খণ্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা। জাতক-অট্ঠবন্ননা, ১ম খণ্ড, ৩৮২ পৃ।

সারিপুত্ত, মহামোগ্গল্লান, মহাকস্সপ—আনন্দের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার সারিপুত্তের সহিত আনন্দের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য বলিয়া আনন্দ সারিপুত্তকে যেমন ভালবাসিতেন তেমনি শ্রদ্ধাও করিতেন। আর সারিপুত্ত নিজে যে-ভাবে বুদ্ধের সেবা করিতে চান আনন্দকে ঠিক সেইভাবে সেবা করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ ও কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন। তাঁহাদের দুই জনের কাহাকেও যদি কোনো উত্তম বস্ত্র উপহার দেওয়া হইত তবে তাহা তাঁহারা উভয়ে ভাগাভাগি করিয়া লইতেন। একবার আনন্দ এক বহুমূল্য চীবর উপহার পান। আনন্দের ইচ্ছা তিনি উহা সারিপুত্তকে দেন। সারিপুত্ত তখন অন্যত্র থাকায় বুদ্ধের অনুমতি লইয়া তিনি উহা সারিপুত্তের জন্য তুলিয়া রাখেন।

এই অন্তরঙ্গ সুহৃদ সারিপুত্তের মৃত্যু আনন্দকে শোকে অভিভূত করিয়া ফেলে। কথিত আছে, সারিপুত্তের মৃত্যু-সংবাদ যখন তাঁহার নিকট পৌঁছায়, তখন তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে। তাঁহার চিত্ত যেন বিপর্যস্ত, দেহ যেন বিবশ এবং মস্তিষ্ক যেন শূন্য হইয়া যায়।২৪

তথাগতের এরূপ অন্তরঙ্গ শিষ্য হইয়া পঞ্চবিংশতিবর্ষ যাবৎ এমন সতত তাঁহার সংস্পর্শে থাকিয়াও আনন্দ বুদ্ধের জীবিত অবস্থায় নির্বাণ বা অর্হত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। ইহা উল্লেখ করিয়া উদায়ী একবার তাঁহাকে বিদ্রূপ করেন, বুদ্ধ তাহা শুনিয়া বলেন—"বলিও না উদায়ী, এমন কথা বলিও না। * * * আনন্দ এই জীবনেই নির্বাণ লাভ করিবেন।"২৫

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

অবশেষে এক দিন আনন্দের নিদারুণ প্রিয়বিয়োগ, তথাগতের মহাপরিনির্বাণের দিন সমাগত হইল। কুশিনারার শালবীথিকায় আনন্দ দুইটি শালবৃক্ষের অন্তরালে তথাগতের অন্তিম শয্যা রচনা করিলেন। বৈশাখ মাস। নবীন কিশলয়ে, বিকশিত মঞ্জরীতে বিটপীদ্বয় পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সুগন্ধি শাল-কুসুমে তথাগতের কুসুমসম পবিত্র কলেবর আচ্ছাদিত হইয়া গেল।

আনন্দ তথাগতকে প্রশ্ন করিলেন—"অন্ত্যেষ্টি কি ভাবে হইবে?" ইহার পর তাঁহার পক্ষে আত্মসংবরণ করা আর সম্ভব হইল না, তিনি দূরে সরিয়া গিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে পরিনির্বাণের সময় যখন নিকটবর্তী তথাগত দেখিলেন—আনন্দ পার্শ্বে নাই। শুনিলেন নিরাশায় ভগ্নহৃদয়ে তিনি অন্যত্র রোদন করিতেছেন। তিনি তাঁহাকে কাছে আনাইলেন এবং মধুর স্বরে বলিলেন—"আনন্দ, যাহার উৎপত্তি হইয়াছে ধ্বংস তাহার অনিবার্য। ইহা প্রকৃতির নিয়ম, দুঃখ করিও না। দীর্ঘকাল ধরিয়া তুমি আমার বড় অন্তরঙ্গ ছিলে, আমার প্রতি তোমার স্নেহ, তোমার সেবা, তোমার একনিষ্ঠতার তুলনা নাই।"

বৈশাখী-পূর্ণিমা। রাত্রি তৃতীয় প্রহর। জ্যোৎস্নার বন্যায় আকাশ, পৃথিবী প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। শালফুলের সুগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত—এই অপূর্ব আবেষ্টনীর মধ্যে তথাগত সমাধিস্থ হইলেন। চিত্ত তাঁহার রূপ হইতে অরূপে মগ্ন হইল।

অরূপ সমাধির সর্বশেষ স্তরে চিত্ত যখন তাঁহার স্থিতিলাভ করিয়াছে, যখন তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ, হৃদস্পন্দন নীরব, দেহ নিস্পন্দ, মৃত্যুর সর্বপ্রকার লক্ষণ যখন প্রকাশিত হইয়াছে—আনন্দ তখন ফুকারিয়া উঠিলেন—"আর্য অনিরুদ্ধ! তথাগত কি পরিনির্বাণ লাভ করিলেন?" অনিরুদ্ধ উত্তর দিলেন—"আনন্দ! তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করেন নাই, তথাগত "সংজ্ঞাবেদিতনিরোধ" সমাধি লাভ করিয়াছেন।"২৬

এইভাবে সমাধি হইতে সমাধিতে প্রবেশ করিতে করিতে ভগবান বুদ্ধ রজনীর অন্তিমপ্রহরে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন।

শৈশবে যাঁহার সহিত একত্রে বর্ধিত হইয়াছেন, যৌবনে যাঁহার সাহচর্যে নূতন জীবন লাভ করিয়াছেন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থায় যাঁহার পরম অন্তরঙ্গ পার্শ্বচররূপে সর্বদা সর্বত্র ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়াছেন, সেই তথাগত যখন দীর্ঘ অশীতি বৎসরের অনুচর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন তখন আনন্দের মনের অবস্থা কেমন হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়।

এমন নিদারুণ বিচ্ছেদ-দুঃখের মধ্যেও আনন্দ দিকে দিকে বুদ্ধের গৃহস্থ শিষ্যগণকে সান্ত্বনা দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই কাজে তিনি এমন ব্যাপৃত রহিলেন যে, নিজের ধ্যানসমাধির সময় পর্যন্ত তাঁহার রহিল না।

এই আত্মভোলা পরার্থপর পুরুষপ্রবরের কোনদিন নিজের

২৪। 'মধুরকজাতো বিয় কাযো দিসা পি ন পক্খায়ন্তি, ধম্মা পি মে ন পটিভন্তি, আয়স্মা সারিপুত্তো পরিনিব্বুতো তি সুত্বাতি।১

সংযুত্ত, ৫ম খণ্ড, ১৬১-৬২ পৃষ্ঠা

২৫। অঙ্গুত্তর (P. T. S.) ১ম খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা।

২৬। মহাপরিনিব্বাণসুত্ত।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে নয় প্রকার ধ্যান বা সমাধির বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে চারিটি রূপধ্যান, চারিটি অরূপধ্যান। নবমটি হইতেছে ধ্যানের সর্বশেষ স্তর, যখন সর্বপ্রকার চেতনা ও অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হয়। ধ্যানের এই স্তরে মৃতদেহের সহিত ধ্যানীর দেহের প্রায় কোনও প্রভেদই থাকে না। মৃতের সহিত এই (সংজ্ঞাবেদিত নিরোধ) সমাধিতে সমাহিত যোগীর প্রভেদ মাত্র এই যে—দেহ তাঁহার উষ্ণ থাকে, প্রাণ বহির্গত হয় না এবং ইন্দ্রিয়গণ নষ্ট হয় না। বুদ্ধ যখন এই সমাধিতে সমাহিত হন তখন প্রিয়-বিচ্ছেদ-কাতর আনন্দের আশঙ্কা হয় যে তথাগত ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কথা ভাবিবার অবসর মিলে নাই। তথাগতের পরিনির্বাণের পরও তাঁহার এই স্বভাবের পরিবর্তন হইল না।

হয়ত এইভাবেই তাঁহার জীবন কাটিয়া যাইত। হয়ত এ জীবনে আর তাঁহার নির্বাণ লাভ হইত না। কিন্তু তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদগণের আগ্রহে এবং উৎসাহে আনন্দ এ বিষয়ে তৎপর হইলেন। পরম অধ্যবসায়ের সহিত সমাহিত হইয়া এক দিন তিনি তাঁহার সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করিলেন।[২৭]

আনন্দ অতি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। এক শত কুড়ি বৎসর বয়সে[২৮] তাঁহার দেহত্যাগ হয়। এইরূপ দীর্ঘজীবী বলিয়াই তাঁহার পক্ষে আশি বৎসর বয়সেও তথাগতের সর্বপ্রকার সেবা করা সম্ভব হইয়াছিল।

কনিষ্ঠ সহধর্মীদের শিক্ষা দিয়া এবং ধর্মানুপ্রেরণার দ্বারা তাঁহাদের উৎসাহিত করিয়া তিনি তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

২৭। সংযুক্ত, ১ম খণ্ড, ১৯৯-২০০ পৃষ্ঠা। বিনয়পিটক, ২য় খণ্ড, ২৮৬-৮৮ পৃঃ। সুমঙ্গলবিলাসিনীর (P. T. S.) প্রথম খণ্ডের ৯-১৩ পৃষ্ঠাতে বিস্তৃত বিবরণ মিলিবে।

২৮। ধম্মপদ অট্ঠকথা, ২য় খণ্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা।

উচ্চশিক্ষার অবস্থা

শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গত মহাযুদ্ধের সঙ্কটকালে পৃথিবীর সকল জাতিই নিজ নিজ দুর্ব্বলতার কেন্দ্রগুলি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে। তাহা দূর করিবার অন্যতম উপায়-স্বরূপ তাই তাহারা শিক্ষা-সংস্কারের জন্য যুদ্ধ সমাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। ইংলণ্ড ১৯৪৪ সালে নূতন শিক্ষা-আইন প্রণয়ন করিয়া সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। আমাদের দেশেও সার্জ্জেণ্ট-পরিকল্পনা অনেক দিনই প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। অধুনা বিশেষ করিয়া উচ্চশিক্ষার সংস্কারের জন্য অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের নায়কত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। কমিশনের সদস্যগণ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ এবং দেশীয় ভিন্ন বিদেশীয় সদস্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত। উচ্চতর নীতির দিক দিয়া প্রয়োজনীয় সংস্কারের সকল তথ্যই যে আমরা অবগত হইব ইহা নিঃসন্দেহ।

এই পরিস্থিতিতে, আশা করি, আমাদের স্নাতক-পূর্ব্ব (under-graduate) শিক্ষার বাস্তব অবস্থার বিবৃতি একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ সংস্কারের পরিকল্পনা যতই নিখুঁত হোক না কেন, সাফল্য বাস্তব ক্ষেত্রের প্রকৃতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করিবে। উচ্চতর নীতির দিক দিয়া সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রেরও স্থূল সংস্কার প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় সংশোধন ও আইন-কানুনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রের সকল অংশের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন আনয়ন করাও প্রয়োজন। এই স্তরের শিক্ষার বাস্তব অবস্থার সহিত আমরা সকলেই ন্যূনাধিক পরিচিত। সকল দৈনন্দিন সমস্যার মত ইহাও আমাদিগকে পীড়ন করিতেছে। সকল দৈনন্দিন সমস্যার মতই ইহার সম্বন্ধে সমালোচনা অপ্রিয় হইলেও অনভিপ্রেত হইবে না।

স্নাতক-পূর্ব্ব শিক্ষাক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আজ একটি দুষ্টচক্রে (vicious circle) পরিণত হইয়াছে। এই চক্রের কোন একটি অংশ হইতে বর্ণনা আরম্ভ করিতে হইবে। পর্য্যায়ক্রমে অংশগুলির বর্ণনার মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইলেও কোন একটি অংশই শিক্ষা-ক্ষেত্রের সকল ত্রুটির মূল, এইরূপ মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। প্রকৃতপক্ষে সকল ত্রুটির জন্য সকল অংশই দায়ী। সকল অংশেরই আজ সংস্কারের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

এই স্তরের শিক্ষার্থীদের কথা প্রথমে ধরা যাক। ইহারা সকলে সমান কারণে কলেজীয় শিক্ষার জন্য উপস্থিত হয় না। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর উপর সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ; কিন্তু ডিগ্রীর প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন রকমের। যদি কোন অভিনব বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করিয়া অল্পতর পরিশ্রমের বিনিময়ে এই ডিগ্রী বণ্টনের ব্যবস্থা করা যায়, তবে সকলেই আনন্দিত না হইয়া দুঃখিত হইবে না। ডিগ্রীই সকলের প্রয়োজন; অন্য কিছু নহে। কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা বা কোন কার্য্যে দক্ষতা অর্জ্জন করা তাহাদের উদ্দেশ্য নহে; কোন প্রকার জ্ঞানলাভ তাহাদের অভীষ্টের সীমারেখার বাহিরে। তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ধনিকশ্রেণীর। এই শ্রেণীর ডিগ্রীর প্রয়োজন অন্য সকলের চেয়ে পৃথক। তাহাদের সুদৃশ্য বাড়ী, গাড়ী, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র সকলই আছে। এইগুলির সহিত মানাইয়া একটি ডিগ্রীও তাহাদের প্রয়োজন। যেমন বাড়ী, গাড়ী প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য তাহারা মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া থাকে, সেইরূপ ডিগ্রী লাভের জন্যও তাহারা যথোপযুক্ত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহে। ভবিষ্যতে বিদ্যা ও বুদ্ধি সঞ্চালন করিবার, বুদ্ধিজীবীর বৃত্তি অবলম্বন করিবার কোন অভিপ্রায় তাহাদের নাই। তাহাদের পেশা এবং অর্থোপার্জ্জন ও জীবনযাত্রা-প্রণালী পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়া আছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সহিত তাহার

কোন সংস্রব নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী প্রকৃতপক্ষে ধনিক-শ্রেণীর নহে; কিন্তু তাহারা প্রতিপত্তিশালী গৃহ হইতে উপস্থিত হয়। ইহারা ভবিষ্যতে নানাক্ষেত্রে মর্য্যাদাপূর্ণ পদগুলি অধিকার করিয়া থাকিবে। তাহা তাহাদের জন্য একরূপ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু পাছে লোকে অযোগ্য বলিয়া মনে করে এইজন্য তাহাদের একটা ডিগ্রীর প্রয়োজন—আপিসের বাহিরে নামের সহিত একটা ডিগ্রী না থাকিলে লোকের অশ্রদ্ধার কারণ হইতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী দরিদ্র; তাহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহারাই প্রকৃতপক্ষে "শিক্ষিত বেকার" শ্রেণীর উৎস। তাহাদিগকে কঠিন জীবন-সংগ্রামে প্রায় একক অবতীর্ণ হইতে হইবে। তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিবার নানা কৌশল রহিয়াছে; এমন কি তাহাদের ডিগ্রীটাও যে তাহাদের উপযোগিতার মাপকাঠি নহে—তাহা কেবলমাত্র কাগজীয় নজির (paper qualification) ইহাও তাহাদিগকে শুনাইয়া দেওয়া হয়। তথাপি অন্ততঃ ডিগ্রীটা সম্বল না থাকিলে কোনও পদের প্রার্থী হইবারও সুযোগ থাকিবে না; কাজেই প্রাণপণে সে ডিগ্রীর প্রয়াসী।

প্রথম দুই শ্রেণীর ছাত্র সম্পূর্ণই অবগত আছে যে কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীতে যে অধ্যাপনা হইয়া থাকে তাহা সময়ে সময়ে তাহাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য কার্য্যকরী হইলেও বস্তুতঃ ডিগ্রীলাভ করিবার পক্ষে একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। তাহাদের গৃহশিক্ষক আছেন; তাঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি গুছাইয়া এক একটি করিয়া উত্তর প্রস্তুত করিয়া দিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নগুলির প্রকৃতিই এরূপ যে দুই-এক মাসের মধ্যেই উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত কতকগুলি উত্তর মুখস্থ করিয়া ফেলা যায়। ইহার জন্য প্রকৃতপক্ষে কলেজের শ্রেণীতে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের কথা কিছু স্বতন্ত্র। তাহাদের গৃহশিক্ষক নাই। অপেক্ষাকৃত অধিক পরিশ্রম করিয়া তাহারা সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা মুখস্থ করে। তাহাই অবলম্বন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব হয় না।

সুতরাং অধিকাংশ ছাত্রই কলেজের শ্রেণীতে যে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা শিক্ষার উদ্দেশ্যে নহে, অন্য কারণে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম এই যে, প্রতি বিষয়ে যতগুলি বক্তৃতা (lectures) দেওয়া হয় তাহার মধ্যে অন্ততঃ নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিতে হইবে। তদ্ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত কেহ হইবে না। সংক্ষেপে ইহাকেই ছাত্র-জগতে "পার্সেণ্টেজ" রাখা বলা হয়। প্রধানতঃ ইহার জন্যই কলেজের শ্রেণীতে ছাত্রদের সমাগম হইয়া থাকে। অংশতঃ গতানুগতিক ভাবেও তাহারা উপস্থিত হয় বটে; কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য যে শিক্ষা সেকথা কচিৎ তাহাদের মনে উদিত হয়। ডিগ্রী পাইবার উপায়-স্বরূপ বলিয়া "পার্সেণ্টেজের" উপর ছাত্রদের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। ছলে, বলে, কৌশলে "পার্সেণ্টেজ" রাখিতেই হইবে। কাজেই "প্রক্সি" দিবার বিধি প্রচলিত হইয়াছে। কলেজের বক্তৃতা শুনিবার প্রয়োজন অনুভূত না হইলে, বক্তৃতা অনুধাবন ব্যতীতই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হইলে, শ্রেণীতে উপস্থিত হইবার জন্য এরূপ কড়াকড়ি ব্যবস্থায় তাৎপর্য্য কি থাকিতে পারে? কাজেই অধিকাংশ ছাত্রই "প্রক্সি" দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ মনে করে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় নাকি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে তৈয়ারী। একটি ক্ষুদ্র বিষয়ে পার্থক্য এই যে, "পার্সেণ্টেজ" রাখিবার কোন নিয়ম তথায় নাই। কে কে উপস্থিত হইয়াছে তাহার অধ্যাপক কোন হিসাব রাখেন না। আমাদের কলেজগুলিতে কিন্তু ইহাই প্রধান বিষয়; ইহা লইয়া কত আড়ম্বর, কত আস্ফালন, কত কৌশল, কত বিরোধ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "পার্সেণ্টেজের" আকর্ষণ না থাকিলেও সেখানে শ্রেণীতে বড় কেহ সহজে অনুপস্থিত হয় না; নিজের গরজেই উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও কি ছাত্রেরা নিজের গরজেই শ্রেণীতে উপস্থিত হইবে? যদি হয়, তবে "পার্সেণ্টেজ" রাখিবার বিধির প্রয়োজন কি? যদি না হয়, তবে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রেণীতে উপস্থিত করিয়া কি কিছু লাভ হইতে পারে? শ্রেণীতে উপস্থিত হইলেই যে অধ্যাপকের বক্তৃতা মনোযোগ দিয়া শুনিবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। মনোযোগী নহে এরূপ অবাঞ্ছিত ছাত্রকে আবদ্ধ রাখিয়া অন্যান্যের শিক্ষার ব্যাঘাত জন্মাইবার কোন অর্থ হইতে পারে না।

কলেজের ছাত্রদের মনস্তত্ত্বের প্রথম কথা এই যে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে যে অধ্যাপনা হয় তাহা ডিগ্রী অর্জ্জনের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়; এবং দ্বিতীয় কথা এই যে, বাস্তব জীবনেও তাহার মূল্য কিছু নাই। ধনী কি দরিদ্র সকল শ্রেণীর ছাত্রেরই ডিগ্রীর প্রয়োজন আছে, কিন্তু জ্ঞানলাভের—বিশেষ করিয়া কলেজের শিক্ষায় যে জ্ঞানলাভ হয় তাহার প্রয়োজন নাই। শিক্ষার উপর এই অবিশ্বাস দূর করিয়া শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে এবং বাস্তব জীবনে এই শিক্ষার উপযোগিতা বৃদ্ধি করিতে না পারিলে, তাহাদের বর্ত্তমান মনোভাবের পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব।

দেখিয়াছি পরীক্ষার্থী তাহার পাঠ্য সাহিত্য ফেলিয়া রাখিয়া কোনও সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা হইতে চরিত্র-বিশ্লেষণ বা কাব্যের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ মুখস্থ করিতেছে। এই বিশ্লেষণ শিখিবার আগ্রহ তাহার নাই এবং অধিকাংশ ছাত্র তাহা শিখেও না। কলেজের অধ্যাপনা হইতে যে এই সব শিখিতে পারা যায় এরূপ বিশ্বাসও তাহাদের নাই। কিন্তু পরীক্ষার

পাস করিতে হইবে ; সুতরাং মুখস্থ করে এবং উত্তরপত্রে উদ্গীরণ করিয়া দিয়া আসে। যদি কখনও কোন পরীক্ষার্থী নিজ বিচারমত উত্তর লেখে, পরীক্ষক তাহা মুখস্থ করা বস্তুর সহিত সমপর্য্যায়ে ফেলিয়া বিচার করিবেন, ছাত্রদের ইহাই বিশ্বাস। সুতরাং তাহারা মুখস্থ করা ত্যাগ করিয়া বিশ্লেষণী শক্তির চর্চ্চা কখনও করে না। এক সময়ে স্নাতক-পূর্ব্ব স্তরে অঙ্কশাস্ত্রের অন্তর্গত "হাইড্রোষ্টাটিক্স" পাঠনা-কালে একটি ছাত্রকে অমনোযোগী দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তর যাহা পাইয়াছিলাম তাহার ভাবার্থ এই : "আমি কলা বিভাগের ছাত্র ; বিষয়টি শিখিতে গেলে পরিশ্রম দরকার। কিন্তু উহা বাদ দিয়াই অঙ্কশাস্ত্রের পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায় তাহা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। বিশেষতঃ আমার অর্থনীতিতে 'অনার্স'। তাহার সহিত 'হাইড্রোষ্টাটিক্সের' কি সংযোগ ? ভবিষ্যতে অর্থনীতিই যখন পড়িব তখন ইহা অবহেলা করিলে এমন কি দোষের হইল ?" আর একটি ছাত্রকে অনুরূপ প্রশ্ন করিলে সে বলিয়াছিল, "আমি মধ্যস্তরে (I.Sc.) ঐ বিষয়টি পড়িয়াছি। মোটামুটি তাহা হইতেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মত উত্তর করা যায়। আর দুই-একটা বিষয় যাহা দরকার বাছিয়া অবসরমত পড়িব। সমগ্রভাবে বিষয়টি শিখিবার আমার কি আগ্রহ থাকিতে পারে ? আমি ভূতত্ত্বে 'অনার্স' লইয়াছি। তাহার সহিত বিষয়টির কি সংস্রব ?" এ সব উক্তির উত্তর দিবার চেষ্টা করি নাই ; কারণ সঙ্গত উত্তর খুঁজিয়া পাই নাই। ছুতারী শিখিতে যাইয়া কোনও সাগরেদ কি তাহার ওস্তাদকে এরূপ বলিবে :—"করাতখানি তুলিয়া রাখুন ; উহার শিক্ষা ভিন্নই আমার ছুতারী চলিয়া যাইবে ?" করাত ভিন্ন ছুতারী চলে না বলিয়াই এবং করাতের কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন হয় বলিয়াই এরূপ উক্তি শোনা যায় না। হয়ত কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে অবস্থা অন্যরূপ ; হয়ত কোন কোন বিষয়ে অবহেলার ন্যায্য কারণ যথেষ্ট আছে। আজ তাহা বিশ্লেষণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যে সকল ছাত্রের প্রধান পাঠ্য অর্থনীতি তাহাদের পক্ষে অঙ্কশাস্ত্রের যে সব বিষয় প্রয়োজনীয়, যে সকল ছাত্রের প্রধান পাঠ্য পদার্থ-বিদ্যা তাহাদের পক্ষে তাহা প্রয়োজনীয় না হইতে পারে। বিবিধ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একই বিষয়ে বিভিন্ন রূপ পাঠ্য নির্ব্বাচন করা যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহা ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার গোড়াকার আমলে যেরূপ পুঁথিগত বিদ্যার যুগ চলিয়াছিল এখন আর তাহা চলিবে না। শিক্ষার উপর শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিতে হইলে বাস্তব জীবনে তাহার উপযোগিতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

শিক্ষকদিগের কার্য্যক্ষেত্রের এক স্তর এই ছাত্রগণ ; অপর স্তর ছোট ও বড়, অজ্ঞ ও বিজ্ঞ কর্ত্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ। সাধারণতঃ এই দুই স্তরকে জাঁতার উপর ও নীচের পাষাণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে যে গতানুগতিকতার স্রোত বহিতেছে কোনরূপ আঘাত করিয়া তাহাতে কল্লোলের সৃষ্টি না করা হয় ইহা কি সরকারী, কি বে-সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ উভয়েই চান। সুতরাং শিক্ষককে এই মূলমন্ত্রটি মনে রাখিয়া কাজ করিতে হয়। উপায়স্বরূপ তাঁহাকে অধ্যাপনার সময় কতকগুলি নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়। একটি এই যে, কোন কঠিন বিষয়বস্তু ছাত্রদিগের নিকট উপস্থিত করা চলিবে না। কোন বিষয় আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্যক্রূপে উদ্ঘাটিত করিতে গেলেও ছাত্রদের বিরক্তি উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা। সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ পন্থা হইতেছে "পল্লবগ্রাহিতা" —অর্থাৎ উপর উপর বিষয়টির আলোচনা করা। ইহার মধ্যে মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নাবলীতে কোন কোন বিষয় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহা যথাযথ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিতে হইবে। ছাত্রজগতে ইহারই নাম "suggestion"। উপযুক্ত "suggestion" পরিবেশন করিতে পারিলেই ছাত্রসমাজ শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবার কারণ দেখিতে পায় ; নতুবা নহে। শুধু অধ্যাপনার সময়ে নহে, অন্য সময়ে ও অন্যপ্রকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য প্রশ্ন উদ্ধারকার্য্যে সহায়তা করিতে পারিলে ছাত্ররা আরও কৃতজ্ঞ হয়। কোন সহকর্ম্মী ছাত্রদের উপকারার্থে কলিকাতায় আসিয়া এই "suggestion" সংগ্রহ করিয়া যাইতেন এরূপ আমরা শুনিয়াছি ; পুরস্কার-স্বরূপ তিনি ছাত্রদের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। আদর্শের দিক দিয়া ইহা যে অবাঞ্ছনীয় তাহা কে বুঝিবে ? পরীক্ষার সমগ্র বিষয়টির অভিজ্ঞতা নির্ণয় করাই যে উদ্দেশ্য এবং মাত্র নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্ব হইতে তৈয়ার করিয়া রাখিলে যে শিক্ষার ও পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তাহা কে বুঝিবে ? সমগ্র বিষয়টি না বুঝিয়া, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বিষয় মুখস্থ করিবার প্রবৃত্তির অধিক প্রশ্রয় দেওয়া যে শিক্ষকের কর্ত্তব্য নহে—বাস্তব অবস্থায় এই আদর্শ কে মানিয়া চলিবে ?

বড় বড় শ্রেণীতে যে সকল বক্তৃতা দেওয়া হয়, শিক্ষার দিক দিয়া তাহা যে বিশেষ ফলপ্রদ হয় না, ইহা প্রায় অবিসংবাদিত সত্য। তথাপি গতানুগতিক ভাবে শিক্ষককে এই বক্তৃতাগুলি দিয়া যাইতে হয়। অন্যান্য দেশে বক্তৃতার বিষয়বস্তু, ছোট ছোট অনুশীলন-শ্রেণীতে (tutorial class) ছাত্রদিগের নিকট হইতে যাচাই করিয়া লইবার প্রথা আছে। অনুশীলন-শ্রেণীর ফলাফল দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল প্রভাবান্বিত হয়। তদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নগুলির সহিত বক্তৃতাসমূহের একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকে। সুতরাং ছাত্রদের মনোযোগ স্বভাবতঃই বক্তৃতাগুলির উপর অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং বক্তৃতাগুলি বহুল

পরিমাণে সার্থক হয়। আমাদের দেশের অবস্থা অন্যরূপ। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র তৈরি করেন তাঁহারা এই স্তরে অধ্যাপনা করেন না। এমন হইতে পারে, শিক্ষক যে বিষয়টি প্রয়োজনীয় মনে করিয়া বিশেষ করিয়া শিখাইলেন, পরে দেখা গেল প্রশ্নকর্তা তাহা একেবারেই বর্জ্জন করিয়াছেন। সমগ্র ভাবে পাঠ্য বিষয়টির সহিত পরিচয় প্রশ্নকর্তার থাকে কিনা সন্দেহ। তিনি উচ্চতর বিষয় লইয়া অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন করেন; নিম্ন স্তরের পঠিত বিষয় সম্বন্ধে এবং ছাত্রদের দক্ষতা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয় তাঁহার নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ না থাকায় বক্তৃতাগুলির গুরুত্ব কমিয়া যায়। উপরন্তু অনুশীলন শ্রেণীদ্বারা বক্তৃতার বিষয়বস্তু যাচাই করিয়া লইবার প্রথা আমাদের দেশে এখনও প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং বড় বড় শ্রেণীতে যে সকল বক্তৃতা দেওয়া হয় তাহার সার্থকতা বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ অনুশীলন-শ্রেণী প্রচলন করা বর্ত্তমান অবস্থায় প্রায় অসম্ভব। বে-সরকারী কলেজগুলিতে উপযুক্ত স্থান ও উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক উভয়েরই অভাব। কোন কোন সরকারী কলেজে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক এবং উপযুক্ত স্থান আছে বটে; কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ উভয়েরই ইহাতে অকুণ্ঠ সমর্থন আজিও মিলে নাই। তাই শিক্ষার শকট একমাত্র "লেক্চারে"র ভগ্নচক্রের উপরই বাহিত হইতেছে। শিক্ষকের কোন গত্যন্তর নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও কর্তৃপক্ষ উভয়কে ডিঙাইয়া নূতন কোন ব্যবস্থা চালাইবার ক্ষমতা তাহার নাই। যে স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহার মোড় ফিরাইবার ক্ষমতা তাহার নাই; অসহায় ভাবে স্রোতের সহিতই তাহাকে চলিতে হইবে।

অপাত্রে বিদ্যা দান করা নাকি নিষিদ্ধ। আজিকার দিনে শিক্ষক "বিদ্যা দান" করিতে আদৌ সক্ষম হন কিনা সন্দেহজনক। তথাপি বিদ্যাদানের যে অভিনয় চলিয়াছে তাহাতে তাহার পাত্রাপাত্র বিচার করিবার অধিকার নাই। বে-সরকারী কলেজগুলিতে ছাত্রের উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা বিচার করিবার অবকাশ কোথায়? ছাত্রদের উপরই কলেজের অস্তিত্ব এবং শিক্ষকদিগের জীবিকা অর্জ্জন নির্ভর করিতেছে। পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া কাহাকেও ফিরাইয়া দেওয়া চলে না। সরকারী কলেজে পাত্রাপাত্র বিচার করা অনেকটা সম্ভব হইত, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ বাহিরের মুখোসের উপর যত মনোযোগী, শিক্ষানীতির প্রতি তত নহেন। বে-সরকারী কলেজের অনুকরণে অনেক সময় তাঁহারাও নির্ব্বিচারে ছাত্রসংখ্যা স্ফীত করিবার পক্ষপাতী। কারণ ছাত্রসংখ্যা বেশী হইলেই কলেজ "বড়" হয় এবং কলেজ বড় হইলেই কর্তৃপক্ষের কার্য্যদক্ষতার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহার পর হতভাগ্য শিক্ষককে ছাত্র-সাগরের মাঝাপথী যুবকদের সহিত কারবার করিতে হয়। সকলকে সংযত রাখিয়া অন্ততঃ উপরের সজ্জাটুকু রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সকল শক্তি নিয়োগ করিতে হয়; শিক্ষার আদর্শ হয় ধূলায় অবলুণ্ঠিত। কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইলে, অধ্যক্ষের সহায়তা-লাভ ভাগ্যে খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে; তিনি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিয়া শিক্ষকের সমালোচনা করেন মাত্র।

আদর্শের কথা চিন্তা করা যেন অধিকাংশ শিক্ষকের পক্ষে ভাববিলাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে; জাতিকে নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে; জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ, শক্তিশালী করিতে হইবে—এই গঠনকার্য্যের একটি বিশিষ্ট অংশের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত; এই পতাকা বহন করিবার মত শক্তি তাঁহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে। শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে তিনিও একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন। ইহা কে না চাহে? কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সময় ও সুযোগ তাঁহার নাই। বে-সরকারী কলেজে শিক্ষকতা করিলে দিবারাত্র অন্নচিন্তার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়; আজ সরকারী কলেজেও অনেকের অনুরূপ অবস্থা। হয়ত বা ইহার মধ্যেও কিঞ্চিৎ সময় বাঁচাইয়া এই কর্ত্তব্যে মনঃসংযোগ করা যাইত। কিন্তু তাহারও সুযোগ সঙ্কীর্ণ। যদি কর্ম্মস্থল কলিকাতার বাহিরে হয়, তবে ত আধুনিক চিন্তাধারার সহিত সংযুক্ত থাকিবার মত সকল প্রকার সাহিত্য (literature) তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে। কলিকাতায় কর্ম্মস্থল হইলে সুযোগ কতকটা আছে বটে; কিন্তু বিঘ্ন এই—প্রথমতঃ স্নাতকোত্তর (post-graduate) ও স্নাতক-পূর্ব্ব (under-graduate) এই দুই স্তরের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক বিচ্ছেদ আমাদের দেশে বিদ্যমান। যাঁহারা নিম্ন স্তরে শিক্ষকতা করেন তাঁহারা প্রায় সকলেই উচ্চ স্তর হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া কেবলমাত্র অবসর সময়ে কোন উচ্চতর বিষয়ের সহিত নিত্যকার সংস্রব রক্ষা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে মাত্র শিক্ষক কেন, সমাজের নানা স্তর হইতে উচ্চতর বিষয়ে গবেষণার সৃষ্টি হইত। প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা উচ্চতর বিষয় লইয়াই সর্ব্বদা নিযুক্ত, তাঁহারাও আধুনিক চিন্তাধারার সহিত সর্ব্বদা সম্যক্ যোগ রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। স্নাতক-পূর্ব্ব স্তরের শিক্ষকের পক্ষে তাহা অধিকতর দুরূহ। উচ্চস্তরের সহিত সংযুক্ত না হইলে এবং কোন গবেষণার প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট না হইলে, চিন্তার আধুনিক ধারার সহিত যোগ রক্ষা করা যায় না; ইহা পরীক্ষিত সত্য। দ্বিতীয়তঃ, অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করিয়া যদি কোন শিক্ষক উচ্চতর বিষয়ে দক্ষতা অর্জ্জন করেন, তাহা হইলে কি তাহার

কোন পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে ? নিষ্কাম কর্ম্মের মাহাত্ম্য যথেষ্ট ; কিন্তু সাধারণ মানুষের ধর্ম্ম এই যে, সে কর্ম্মের ফল আশা করিয়া থাকে। সত্যকার বিদ্যোৎসাহী কি শিক্ষা পরিচালকদের মধ্যে অধিক আছেন ? যদি না থাকেন, তবে শিক্ষকদের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণ-স্পৃহা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা কখনই জাগ্রত হইবে না।

ছাত্র ও শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষাক্ষেত্রের অপর একটি অংশ কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের মধ্যে কলেজের অধ্যক্ষ অন্যতম। সাধারণতঃ তিনি শিক্ষকদের মধ্য হইতেই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন ; যদিও কখন কখন ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। শিক্ষকদের মধ্য হইতে যাঁহারা নির্ব্বাচিত তাঁহারা শিক্ষা-ক্ষেত্রের সকল অবস্থার সহিত পরিচিত এবং শিক্ষকদের সহিত তাঁহাদের একটা সূক্ষ্ম সহানুভূতি বিদ্যমান। আদর্শের কথা তিনি সকলই অবগত আছেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সে দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর তাঁহার নাই। হয় তিনি কলেজের (বে-সরকারী) আর্থিক স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত, অথবা ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন করিবার জন্য কেবল-মাত্র বাহিরের ঠাট বজায় রাখিতে অধিকতর প্রয়াসী। শিক্ষা-নীতির কথা উভয় ক্ষেত্রেই অবহেলিত হইয়া থাকে।

অপর কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত ; (১) স্নাতকোত্তর ও (২) স্নাতক-পূর্ব্ব—এই উভয়বিধ শিক্ষার নীতিগত পরিচালনার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত। প্রথম ভাগটির পরিচালনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যক্ষ-ভাবে ও সমগ্রভাবে করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় ভাগের পরি-চালনা কার্য্যতঃ পাঠ্যতালিকা নির্দ্ধারণ ও পরীক্ষাগ্রহণে পর্য্য-বসিত। অন্যান্য দেশে এই দুই স্তরের মধ্যে একটা নিকট-সম্বন্ধ রক্ষা করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশে অন্যরূপ। আজ যে আমাদের শিক্ষা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হই-তেছে, সম্ভবতঃ ইহা তাহার অন্যতম কারণ। যাঁহারা পাঠ্য তালিকা নির্দ্ধারণ, প্রশ্ন রচনা ইত্যাদি করিয়া থাকেন তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে এই স্তরের শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন। এই স্তরের ছাত্রদের সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। কাজেই সময়ে সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দেশগুলি পাত্রোপযোগী হয় না। অপর পক্ষে এই স্তরের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহিত সংস্রবের অভাবে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠেন না। কি কারণে পাঠ্য-তালিকা পরিবর্ত্তিত হইল, প্রশ্নপত্রের ধারা পরিবর্ত্তিত হইল—তাহার প্রয়োজন স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিতে পারেন না। শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যাপক দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। শিক্ষকের আন্তরিকতার অভাবে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশগুলিও কার্য্যকরী হয় না। এই দুই স্তরের সংযোগের জন্য কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই না। কলিকাতা শহরে যাঁহারা শিক্ষকতা করেন তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও স্নাতকোত্তর শিক্ষার সহিত সংযুক্ত করা হইয়া থাকে। কলিকাতার বাহিরে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের পক্ষে এ সুযোগ উপস্থিত হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এ সুযোগপ্রদান অনুগ্রহ বলিয়া মনে করেন ; আবশ্যিক বলিয়া মনে করেন না। তথাপি কতক পরিমাণে কলিকাতায় শিক্ষকদের পক্ষে আধুনিক চিন্তাধারার সহিত সংযোগ রক্ষা করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহিত ভাববিনিময় করা সম্ভব। কলিকাতার বাহিরে যাঁহারা শিক্ষকতা করেন তাঁহাদের ব্যবস্থা কি হইবে ? উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে,তাঁহাদের কার্য্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হইলে সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাই কি ক্ষুণ্ণ হইবে না ? তাহার জন্য কি শিক্ষকই একমাত্র দায়ী ?

স্নাতক-পূর্ব্ব স্তরের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর সংযোগ পরীক্ষা-পরিচালনায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অধিকাংশ স্থলে ছাত্র-দের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রশ্নকর্ত্তার থাকে না। সুতরাং প্রশ্নের প্রকৃতি সময়ে সময়ে অত্যন্ত সরল ও অত্যন্ত কঠিন এই দুই অবস্থার মধ্যে দোলায়মান হয় ; সাধারণতঃ একটা নিম্নপর্য্যায়ে স্থির থাকে। কতকগুলি প্রশ্ন প্রতি তিন-চার বৎসর পর পর পুনরাবৃত্তি করা হয়। ইহা প্রশ্নকর্ত্তার শৈথিল্য নহে ; অবস্থাগতিকে তিনি এরূপ করিতে বাধ্য হন। এরূপ না করিলে অধিকাংশ ছাত্র উত্তীর্ণ হয় না। হঠাৎ কোন পরিবর্ত্তন করিলে সমগ্র কাঠামোটি ভাঙিয়া পড়িবে। তাই দেখিতে পাই আদর্শের দিকে এক পা বাড়াইয়া, দুই পা পিছাইতে হয়।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ; স্নাতকোত্তর ও স্নাতক-পূর্ব্ব উভয় স্তরের শিক্ষাই একই অধ্যাপকমণ্ডলী দিয়া থাকেন। প্রত্যেক কলেজের স্বাতন্ত্র্য আছে ; এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিও স্বতন্ত্রভাবে হইয়া থাকে। অপর পক্ষে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমতঃ স্নাতকোত্তর স্তর স্নাতক-পূর্ব্ব স্তর হইতে বিচ্ছিন্ন ; দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষা-কার্য্য কেন্দ্রীভূত। ইহার ফলাফল আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা সুফল পাওয়া যাইবে কিনা তাহা বিবেচনার সময় আসিয়াছে। কিন্তু আদর্শের দিক দিয়া বিকেন্দ্রীকরণই শ্রেয়ঃ স্থির হইলেও হয়ত বাস্তব অবস্থা দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিবে।

ছাত্র, শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ সকলে মিলিয়া তাই একটি দুষ্ট-চক্রের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রশ্ন বাছিয়া মুখস্থ করিলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় ; সেইজন্য ছাত্রের শিক্ষার আগ্রহ থাকে না—ফলে শিক্ষক গতানুগতিক ভাবে চলেন এবং কর্তৃপক্ষ শিক্ষা-তরণীর মুখ স্রোতের বিপরীত দিকে ফিরাইতে সাহস করেন না। এই দুষ্টচক্র কিরূপে ভেদ করিতে হইবে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা শিক্ষাবিদ্‌গণের হস্তে। কিন্তু ইহা যে আমা-দিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এই সত্য সর্ব্বসাধারণের উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

চট্টগ্রাম বিপ্লব-কাহিনী

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

প্রীতিলতার অন্তিম-বাণী

"Long Live the Revolution"

I solemnly declare I belong to the Chittagong Branch of the Indian Republican Army whose lofty ideal is to liberate my mother-country from the yoke of the tyrannical, exploiting and imperialistic British Government and to establish a Federal Indian Republic instead. This remarkable Chittagong party has captured the imagination of the youths and has given a new impetus to the Revolutionaries of Bengal, nay of the whole of India by its unprecedented display of the memorable 18th April, 1930, and its subsequent heroic achievements on the holy Jalalabad hill, at Samirpur, at Feni, at Chandannagar, at Chandpur, at Dacca, at Comilla and at Dhalghat. I feel proud that I have been thought fit to be a member of such a glorious party.

We are fighting freedom's battle. Today's action is one of the items of that continued fight. British people have snatched away our independence, have bled India white and have played havoc with the lives of millions of Indians both male and female. They are the sole cause of our complete ruin,—moral, physical, political and economic—and thus have proved the worst enemy of our country, the greatest obstacle in the way of recovering our independence. So we have been compelled to take up arms against the lives of any and every member of the British community, official or non-official, though it is not at all a pleasant thing to us to take the life of any human being. In a fight for freedom we must be ready to remove, by any means whatsoever, every obstacle that stands in our way.

When I was summoned by Great *Mastarda*, the venerable leader of my party to join today's armed raid I felt myself fortunate enough seeing my long-felt hankering fulfilled at last and accepted the task with full sense of responsibility. But when I was asked by that exalted personality to lead the raid, I felt diffident and protested by saying why a sister should take the lead when so many able and experienced brothers were present. *Mastarda* soon convinced me by his able arguments and I took my leader's command on my head and invoked the Almighty Father, whom I have adored since my childhood, to assist me in discharging my grave duty.

I think I owe an explanation to my countrymen. Unfortunately there are still many among my countrymen who may be shocked to learn how a woman brought up in the best tradition of Indian womanhood has taken up such a horrible deed as to massacre human lives. I wonder why there should be any distinction between males and females in a fight for her cause (sic) why not sisters? Instances are not rare that Rajput ladies of hallowed memory fought bravely in the battlefield and did not hesitate to kill their country's enemies. The pages of history are replete with high admiration for the heroic exploits of these distinguished ladies. Then why should we, the modern Indian women, be deprived of joining this noble fight to redeem our country from foreign domination. If sisters can stand side by side with the brothers in a Satyagraha movement, why are they not so entitled in a revolutionary movement? Is it because the method is different or because females are not fit to take part in it? As regards the method, *i.e.*, armed rebellion it is not a novel method. It has been successfully adopted in many countries and the females have joined it in hundreds. Then why should India alone regard this method as an abominable one? As regards fitness, is it not sheer injustice to the females that they will always be thought less fit and weaker than the males in a fight for freedom? Time is come when this false notion must go. If they are yet less fit it is because they have been left behind.

Females are determined that they will no more lag behind and stand side by side with their brothers in any activities however dangerous or difficult. I earnestly hope that my sisters will no more think themselves weaker and will get themselves ready to face all dangers and difficulties and join the revolutionary movement in their thousands.

Now I shall briefly relate how I was drawn into the revolutionary organisation.

When I was studying in the Matriculation Class in the Dr. Khastagir's Girls' School, I got an idea of a revolutionary organisation in Chittagong and was told that there was a very powerful man, endowed with many qualities befitting a revolutionary leader, at the helm of this organisation.

During the two years' stay at Dacca for my Intermediate course I was engaged in preparing myself as a fit comrade of the Great *Masterda*. However I did not neglect my study and in the year 1930, I passed the Intermediate Examination standing first among the girls and fifth in the General Competition.

It was the morning of the 19th April, 1930, when I came home after the examination and heard of the glorious activities (of the previous night) of the Chittagong heroes. My heart was filled with deep admiration for these great souls. But it pained me much that I could not take part in such heroic exploits and could not have a glimpse of *Masterda* whom I

have adored since I heard his name. The thought of Jalalabad Martyrs tinched my heart to its very depth. With such a state of mind I left Calcutta for my B.A. Degree. The thought of my country was ever predominant in my mind. I saw the tears of mothers mourning the loss of their beloved sons who sacrificed their lives on the alter of freedom.

With all these new impetus came to me when I was asked by one of my brothers to visit Ram Krishnada in the Alipore Central Jail where in a solitary cell he was awaiting extreme penalty meted out to him by the British Law for his love of country. I passed for a cousin sister of Ramkrishnada and anyhow managed to see every day this smart jolly young hero. I had about forty interviews with him before his execution. His dignified look, free conversation, calm surrender to death, sincere devotion to God, childlike simplicity, loving heart, sound knowledge and profound realisation impressed me very deeply and made me ten times more forward than what I have been. The association of this dying patriot made a great contribution to the advancement of my life towards perfection. After Ramkrishnada's execution my hankering after some practical revolutionary action grew more intense. However, I had to pass some 9 months more in Calcutta for my B.A. Examination. In the meantime I tried several times to have an interview with *Masterda* but failed.

After my examination in 1932, I hurried towards home with a strong determination to interview *Masterda* anyhow. In a few days my long-cherished desire was fulfilled and I soon stood before *Masterda* and Nirmalda the two great personalities guiding the famous Chittagong Revolutionary Party.

In my short interviews with Nirmalda I recognised his noble and beautiful heart in which staunch revolutionary principles and strong religious temperament so nicely combined. I am fortunate that I got opportunities to come in touch with such a great soul that silently passed away from the world without giving the countrymen any opportunity to know how great, how pure, how uncommon it was.

Nirmalda's tragic end gave me a severe shock and I became more desperate. The result of B.A. Examination was out by this time and I passed with Distinction. A few days after I plunged myself heart and soul into the revolutionary preparations leaving for good my beloved family.

Firm faith in my Almighty Father and cordial devotion to Him have been the most valuable treasure to me since my childhood. I have carefully cherished this treasure in my bosom throughout my whole life and today when I have come finally prepared to embrace his feet, that I have so earnestly hankered, my treasure seems to be more precious, more pleasant and more illuminating. Had not my revolutionary ideal been throughly consistent with my devotion to the Almighty I would never have been a revolutionary.

With an invocation to Him, I launch to discharge my today's responsibility and pray to him to purge me clean so that I may be worthy offering to Him.

তাৎপর্য্য :

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই বাহিনীর উদ্দেশ্য—অত্যাচারী, শোষণকারী, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের কবল হইতে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করিয়া একটি ফেডারাল ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিক বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। চট্টগ্রাম শাখার ১৯৩০ সনের ১৮ই এপ্রিল তারিখের অদ্ভুতপূর্ব্ব কৃতিত্ব এবং ইহার অব্যবহিত পরের জালালাবাদ পাহাড়, সমীরপুর, ফেণী, চন্দননগর, চাঁদপুর, ঢাকা, কুমিল্লা ও ধলঘাটে ইহার অসমসাহসিক কার্য্যকলাপে শুধু বাংলাদেশের কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের বিপ্লবী দলের মধ্যে নূতন সাড়া জাগিয়াছে, যুবশক্তির দৃষ্টিও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। আমি এইরূপ একটি দলের অন্তভুক্ত বলিয়া নিজেকে ধন্য মনে করি।

আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত। আজিকার কার্য্যটি এই সংগ্রামেরই একটি অঙ্গ। ইংরেজ জাতি আমাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইয়াছে, অবারিত শোষণের ফলে কোটি কোটি নরনারীর জীবন আজ বিপন্ন। আমাদের নৈতিক, শারীরিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের মূল কারণ তাহারাই। তাহারা এইরূপে আমাদের দেশের নিকৃষ্টতম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির পক্ষে তাহারা বিষম বিঘ্ন। এ হেতু সরকারী বেসরকারী সকল ইংরেজের বিরুদ্ধেই আমরা অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি, যদিও মনুষ্যের জীবন লওয়া কোন মতেই সুখকর কার্য্য নহে। স্বাধীনতার যুদ্ধে, যে-কোন উপায়েই হউক, সকল বাধাবিঘ্ন দূর করিতেই আমরা প্রস্তুত।

দলের শ্রদ্ধাস্পদ নেতা মাষ্টারদা যখন আজিকার আক্রমণে যোগদানের জন্য আমাকে আহ্বান করিলেন তখন আমি আমার বহুদিন পোষিত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করি, এবং সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াই এই কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি। কিন্তু যখন তিনি ইহার নেতৃত্বভার আমার উপর অর্পণ করেন তখন আমি কতকটা দ্বিধা বোধ করি এবং এই বলিয়া অনুযোগ দেই যে, এতগুলি অভিজ্ঞ ও যোগ্য ভ্রাতা উপস্থিত থাকিতে একজন ভগিনীর উপর কেন এই ভার দেওয়া হইতেছে। মাষ্টারদা তাঁহার ব্যবস্থার যুক্তিযুক্ততা আমাকে বুঝাইয়া দিলে আমি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম এবং আশৈশব পূজিত সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলাম, আমার কর্ত্তব্য পালনে তিনি যেন আমার শক্তি দেন।

স্বদেশবাসীদের নিকট আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। তাঁহারা অনেকেই হয়ত ভাবিবেন, একজন ভারতীয় নারী স্বকীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়া নরহত্যারূপ বীভৎস কার্য্যে কি করিয়া লিপ্ত হইতে পারে। আমি ভাবিয়া বিস্মিত হই, স্বাধীনতা-সংগ্রামে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে তারতম্য করা হয় কেন। রাজপুত-নারীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুনিধন করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাঁহাদের বীরত্ব-কাহিনীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল। এইরূপ দৃষ্টান্ত থাকিতে আমরা আধুনিক ভারতীয় নারীগণই বা কেন বিদেশীর কবল হইতে স্বদেশ উদ্ধারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিব না? সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যখন নারী-পুরুষ পাশাপাশি কার্য্য করিয়াছে, তখন বিপ্লবী আন্দোলনেই বা কেন পুরুষের সঙ্গে নারীগণ একযোগে কাজ করিতে পারিবে না? পদ্ধতি ভিন্ন, না নারীজাতি অযোগ্য বলিয়া? সশস্ত্র বিদ্রোহের ক্ষেত্রে নারীর যোগদান তো নূতন নহে। বিভিন্ন দেশে যে সব সার্থক বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে নারীগণ শতে শতে যোগ দিয়াছে। ভারতবর্ষেই বা ইহা কেন নিন্দার্হ হইবে? যোগ্যতা যদি বিচারের মাপকাঠি হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারীকে সর্ব্বদা পুরুষের চেয়ে কম যোগ্য বিবেচনা করা কি অসঙ্গত নহে? এই মিথ্যা ধারণা বর্জ্জন করিবার সময় আসিয়াছে। আজ সকল রকম কঠিন ও বিপৎসঙ্কুল কার্য্যেই নারীগণ তাহাদের ভ্রাতাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার বিশ্বাস, আমার ভগিনীরা দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া হাজারে হাজারে আসিয়া বিপ্লবী দলে যোগ দিবে। আমি কিরূপে বিপ্লবী দলে আসিয়া ভিড়িলাম এখন সেই কথা সংক্ষেপে বলিব। যখন ডঃ খাস্তগির বালিকাবিদ্যালয়ে প্রবেশিকা শ্রেণীতে পড়ি তখন আমি চট্টগ্রামের এই বিপ্লবী দলের কতকটা আঁচ পাই। তখন আমি শুনি যে, একজন বিশেষ শক্তিশালী লোক দ্বারা এই দলটি পরিচালিত হইতেছে। আই-এ পড়িবার জন্য আমি ঢাকায় দুই বৎসর কাটাই। তখন আমি মাষ্টারদার যোগ্য অনুচর হইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে থাকি। আমি পড়াশুনা রীতিমত করি এবং ১৯৩০ সনে আই-এ পরীক্ষা দিয়া সমগ্র ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করি।

আমি ১৯৩০ সনের ১৯শে এপ্রিল প্রাতে ঢাকা হইতে চট্টগ্রামে পৌঁছি এবং ইহার পূর্ব্বরাত্রের বীরত্বব্যঞ্জক ব্যাপারটির বিষয় অবগত হই। আমার অন্তঃকরণ স্বতঃই ইহার বীর অনুষ্ঠাতাদের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রশংসায় ভরিয়া উঠে। কিন্তু আমি এই কারণে বিশেষ দুঃখিত হইলাম যে, আমি এই ব্যাপারে তখনও যোগ দিতে পারি নাই এবং মাষ্টারদাকে এত দিনে একটি বারের তরেও দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইল না। জালালাবাদে বীর-সন্তানদের নিধনে আমি প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলাম। মনের যখন এইরূপ অবস্থা তাহার মধ্যেই আমি বি-এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় রওনা হইলাম। দেশমাতৃকার কথা প্রতিনিয়ত আমার মন অধিকার করিয়া থাকিত। জননীর যে-সব প্রিয় সন্তান স্বাধীনতা-আহবে আত্মাহুতি দিয়াছে তাঁহাদের সাশ্রুনয়ন দেখিয়া আমি অভিভূত হই।

আমি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রামকৃষ্ণদাকে দেখিতে যাইয়া নূতন প্রেরণা পাইলাম। এই সময়ে স্বদেশপ্রেমের অপরাধে ব্রিটিশ আইনে প্রাণদণ্ডে তিনি দণ্ডিত। তাঁহার ভগিনী বলিয়া আমি আমার পরিচয় দি, এবং প্রতিদিন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এইরূপে ফাঁসি হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি প্রায় চল্লিশ বার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাঁহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চাহনি, তাঁহার সুমধুর আলাপন, মৃত্যুর নিকটে তাঁহার একান্ত আত্মসমর্পণ, ঈশ্বরে অচলা ভক্তি, শিশুবৎ সারল্য, প্রীতিপূর্ণ হৃদয়, গভীর জ্ঞান এবং প্রগাঢ় অনুভূতি আমার উপরে একটি দৃঢ় ছাপ রাখিয়া যায় এবং আমি পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ কর্ম্মতৎপর হই। আমার জীবনাদর্শ পরিপুষ্টির পক্ষে তাঁহার সঙ্গ অনেকখানি দায়ী। রামকৃষ্ণদার ফাঁসি হইয়া যাইবার পর আমি বিপ্লবী-কার্য্যে যোগ দিবার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ি। যাহা হউক, বি-এ পরীক্ষা দিবার জন্য আমাকে কলিকাতায় আরও নয় মাস থাকিতে হইল। ইতিমধ্যে মাষ্টারদার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কয়েক বারই চেষ্টা করি, কিন্তু দেখা হয় নাই।

১৯৩২ সনে আমার পরীক্ষা শেষ হইবার পর আমি এই সঙ্কল্প লইয়া বাড়ী যাই যে, যে প্রকারেই হউক এবারে আমি মাষ্টারদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবই। কয়েক দিনের মধ্যেই আমার দীর্ঘকালের বাসনা পূর্ণ হইল। শীঘ্রই আমি মাষ্টারদা ও নির্ম্মলদার দেখা পাইলাম। এই দুই জনই চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের প্রধান নেতা ও পরিচালক।

নির্ম্মলদার সঙ্গে স্বল্প আলাপেই বুঝিলাম তাঁহার অন্তঃকরণ কত উঁচু। খাঁটি বিপ্লবী-ধারা ও প্রগাঢ় ভগবদ্ভক্তি তাঁহাতে এমন সুন্দরভাবে মিলিয়াছে। এরূপ একটি মহৎ প্রাণের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল। ইহা যে আমার কত সৌভাগ্য বলিয়া শেষ করিতে পারি না। নির্ম্মলদা নীরবে চলিয়া গেলেন। স্বদেশবাসীরা তাঁহার মহিমা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

নির্ম্মলদার শোচনীয় মৃত্যুতে আমি প্রাণে ভীষণ আঘাত পাইলাম, এবং আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলাম। এই সময়ে বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হয়। আমি প্রশংসার সহিত বি-এ পাশ করিলাম। ইহার কয়েক দিন পরেই প্রিয় পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনীর আবেষ্টনী চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া আমি বিপ্লবী কার্য্যে মনপ্রাণ সঁপিয়া দিলাম।

আশৈশব ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং আন্তরিক ভক্তি আমার

জীবনের মূল সম্পদ। এই সম্পদকে আমি বরাবর সাগ্রহে রক্ষা করিয়া চলিয়াছি। আজ আমার চিরবাঞ্ছিত সেই ঈশ্বরপদলাভের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আমার ঈশ্বরে ভক্তি ও বিপ্লবের আদর্শের মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকিত তাহা হইলে আমি আদৌ বিপ্লবীই হইতে পারিতাম না। তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া আমি আমার গুরুদায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইতেছি। তিনি যেন আমাকে শুদ্ধচিত্ত করিয়া দেন যাহাতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে চিরতরে সমর্পণ করিতে পারি।

প্রীতিলতার উদ্দেশ্যে সূর্য্য সেনের "Female organisation" প্রবন্ধের উৎসর্গ-পত্র

স্নিগ্ধ সুষমায় ভরা একটি পবিত্র ফুল তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য নিয়ে এই দীন পূজারীর কাছে এসেছিল মায়ের চরণে অর্ঘ্য হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। পূজারীকে কত বড়ই সে মনে করেছিল। কত বড় শ্রদ্ধার আসন তাকে দিয়েছিল, মায়ের কাছে উৎসর্গীকৃত হওয়ার জন্য। পূজারী ফুলটিকে অতি সমাদরে গ্রহণ করেছে। তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতায়, সৌরভে মুগ্ধ হয়েছে, মায়ের চরণে তার যাওয়ার ব্যাকুলতা দেখে তাকে শ্রদ্ধা করেছে, শেষ মায়েরই চরণে তাকে অঞ্জলি দিয়ে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে। সে আজ মায়ের কাছে চলে গেছে, মা তাকে কত যত্নে কত আদরে বুকে তুলে নিয়েছেন।

পূজারী আজ ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে সে যেন আজ ফুলের সঙ্গে তার পরিচয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে ফুলের মহত্বটুকু নষ্ট করে না ফেলে।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের পত্র

(১)

আলিপুর, সেণ্ট্রাল জেল
শুক্রবার বেলা দশটা
১০।৭।৩১ ইং

মনে হচ্ছে, একদিন তোমার ব্লাউজে একখানা স্বামীজির মনোগ্রাম আঁটা দেখেছিলাম। আমার ওটা খুব ভাল লেগেছিল। যুগগুরুর প্রতি এই অকপট শ্রদ্ধা এমনি করে চিরদিন তোমার অন্তর আলো করে রাখবে কি? ওকে তোমার খুব ভাল লাগে, আমারও তাই। কেউ যদি আমায় জিজ্ঞাসা করে ওর কী পরিচয় তোমার জানা আছে? কি জবাব দেবো ভেবে ত পাইনে। ওকে কতখানিই বা আমরা চিনতে পেরেছি। পশ্চিমের লোকেরা বলেছে cyclonic Hindu—আমার মতে He is the moral and spiritual force of all India—আজকালকার দিনে কথা কাটাকাটির ত অন্ত নেই। কারণ Blind belief জিনিষটা পছন্দ করে না কেউ। কিন্তু বিবেকানন্দর বেলায় কোন যুক্তিতর্কের আমল দিতে চাইনে। ওর প্রত্যেকটি কথা শুধু ওর কথা বলেই বিনা বিচারে মেনে নেওয়া চলে, ওর আদর্শের উপর একান্ত চিত্তে নির্ভর করা চলে। শুধু sentiment এর দিক থেকে আমার এ ধারণা জন্মেনি, ওকে চিনবার যেটুকু চেষ্টা আমি করেছি তার তরফ থেকেই আমি বলছি, মনুষ্যত্বের এত বড় আদর্শ আর কেউ দিতে পারেনি, পারবে কিনা তাও জানি না। মানুষকে শুধু মানুষ বলেই আর কেউ এমন ভালো বেসেছে কি?

অনেকদিন ভেবেছি তোমায় লিখব। তুমি লিখবে বলে আমিও লিখিনি। আমার চিঠির উত্তর পাব নিশ্চয়। বড় চিঠি লিখব ভেবেছিলাম কিন্তু ভাবলেই ত লেখা যায় না, তেমন পুঁজি ত থাকা চাই। সে যাক্ আমার চিঠি কিন্তু চাই-ই। বেশ ভালই আছি। বেহায়া শরীরটাকে বাগ মানাতে এখনও পারিনি। সব সময় অসুস্থ হব হব করে। আশা করি ভাল আছ। ভালবাসা জেনো। আসি তা হলে।

তোমার "রামকৃষ্ণদা"

(২)

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল
বুধবার ২৯।৭।৩১ ইং

তোমার baby envelope খানা অদ্য দুপুরে পেলাম। তার মধ্যে দেখি এক দুই করে চার পাতা চিঠি। দেখে খুসী হলাম। বসে বসে অনেকবার পড়া যাবে। পড়তে গিয়ে পড়লাম গণ্ডগোলে। কিছুই দেখি পড়তে পারিনে। অবাক হয়ে লেখাগুলোর দিকে চাইছিলাম। আগে তোমার লেখা দেখে কত হাসতাম আজ কিন্তু প্রশংসা না করে পারছিনে। আমার লেখা দেখে তুমি নিশ্চয় হাস, হেসো না কিন্তু; আমি রাগ করব।

এত লম্বা চিঠি লিখেছ আমার কাছ থেকে তেমন একখানি পাবে বলে। কিন্তু তোমাকে জানাচ্ছি আমার লিখতে বড় কষ্ট হচ্ছে। আজ তুমি যখন এসেছিলে তখন তোমাকে বলেছিলাম সর্দ্দি হয়েছে কিন্তু তখনই ১০২° জ্বর ছিল। দুপুরের দিকে জ্বর বাড়তে লাগল, প্রায় ১০৪° এর বেশী উঠল। বিছানা নিতে হ'ল কিন্তু তবুও ইচ্ছা হ'ল তোমার চিঠির উত্তর লিখি। কাগজ তখনও পাইনি কাজেই লেখাও হয় নি। এখন রাত আটটা বেজেছে কিন্তু জ্বর ত এখনও একটু কমলো না। মাথাটা বুঝি এবার ভেঙ্গে যাবে। সারাদিন সকলে হুড়াহুড়ি করেছে, এখন

চিঠি লিখতে আমাকে সবাই বারণ করছে। কিন্তু এক দিন দেরী হওয়া যে আমার পক্ষে কি তাও বুঝতেই পার। বাম হাতে মাথায় ice bag চেপে ধরে লিখছি কিছুতেই সুবিধা পাচ্ছি না। তবু লিখে যাচ্ছি—তোমার কথা না রাখলে যে রাগ করবে।

এত কথাও তোমার মনে থাকে? আজ তোমার চিঠি পড়ে সমস্ত অতীতটা একবার চোখের উপর ভেসে উঠল। তুমি কিন্তু ভারী দুষ্ট, কি সব মনে করিয়ে দিচ্ছ বল ত? তুমি মনে করেছ আমি সব ভুলে গেছি কিন্তু সত্যি আমি ভুলিনি। আমার আজও মনে পড়ছে।

তোমার সজল চোখ দুটি, আর কাঁদ কাঁদ মুখখানি,' কি নিষ্ঠুরই আমি ছিলাম। তুচ্ছ একটা কানবালার লোভে তোমার কান পাকড়ে ধরে ছিলাম; তোমার হয়ত এই স্মৃতিটুকুই আনন্দ দিচ্ছে, কিন্তু আমি ত আনন্দ পাচ্ছি না মোটেই। ঝোঁকের মাথায় কিলটা চড়টা মেরে বসি কিন্তু তুমি কাঁদছ দেখলেই প্রাণটা হায় হায় করে ওঠে। কিন্তু তোমার কাছে তা প্রকাশ করতে পারিনে। দাদা-গিরির অভিমান এসে বাধা দেয়। এখনও কথা বলতে গিয়ে কোথায় জানি তোমাকে offend করে ফেলি। যখন বলি তখন হুঁশই থাকে না পরে analyse করে দেখে যখন টের পাই তখন তা বুকে তীরের মত বেঁধে।

ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। কত মধুর স্মৃতিই মনের কোণে জোট বেঁধেছে। সে দিন নেই কিন্তু সে সুখের রেশও ত যায়নি, আজ স্বর গিয়েছে থেমে তবু "নীরবতায় বাজছে বীণা বিনা প্রয়োজনে", সত্যি সকল জিনিষেরই কল্পনা অতি মধুর। যতক্ষণ তুমি তোমার প্রার্থিত বস্তুটি পাওনি ততক্ষণ তা পেলে কেমন আনন্দ হবে তা ভেবে যতখানি তৃপ্তি পাও সত্যি সত্যি জিনিষটা পেয়ে গেলে তেমনটি পাও না, মনে হয় এ আর বিশেষ কি, যেন খুব সহজেই পেতে, এ কথা সত্যি নয় কি?

তোমার মতে আমি শুষ্ক, গান জিনিষটা মোটেই পছন্দ করিনে এই ত। কিন্তু তোমার এ ধারণা ভুল। গান জিনিষটা পছন্দ করে না এমন কাউকে ত আমি দেখিনে। উহার এমন আশ্চর্য্য শক্তি যে যে-কোন অবস্থায় মানুষের মনের একটা স্বচ্ছন্দ ভাব এনে দিতে পারে। তোমার গান শুনতে আমার সব সময়ে ভাল লাগত। কিন্তু তোমাদের মত বসে বসে তর্জ্জমা করবার ফুরসৎ আমার কোথায়—বিশেষতঃ আমি মোটেই সমঝদার নই, কানে বেশ লাগে—আসলে ছাই-পাশ কিছুই বুঝিনে; তোমাকে আমার গানের একটা নমুনা দিচ্ছি। একদিন এক বন্ধুর বাড়ীতে আমি আর সে দুইখানি চেয়ার পেতে বসে আছি, এমন সময় একটি ছোট মেয়ে কোলে একটি ছেলে নিয়ে এলো। ছেলেটির সে কি কান্না। কিছুতেই থামবে না। অগত্যা বন্ধুকে relief দেওয়ার জন্য বললাম "আমি একটা গান করি" শুনেই বন্ধুটি দু' হাতে আমার মুখ চেপে ধরল "তুই থাম ভাই, তোর গানের চেয়ে ছেলের কান্না ঢের ভাল।" দেখতো কেমন তারিফ করল আমার গানের। এখানে কিন্তু আমরা দু'জনে গান করতাম, কয়েকটি কোরাস আমাদের বাঁধা ছিল। বাইরে হলে এমন দুঃসাহস কখনো করতাম না। গানের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত পিঠে বিশ চড়ই পড়ত। কিন্তু এখানে বাধা দেয় না কেউ, তবে দু'জনে যখন স্বর ভাঁজতাম তখন হাত শতকের ভিতর কেউ বোধ হয় কারো কথা শুনতে পেত না।

এখন তুমি কি করছ জানিনে। হয়ত বই নিয়ে বসেছ কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে তোমার দু' পাতাও পড়া হচ্ছে না। মনটা তোমার কোথায় উধাও হয়ে চলে গেছে, তুমি তাকে বইতে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করছ কিন্তু পারছ না। তুমি লিখেছ ডিগ্রী পাওয়াটাই বড় নয়; ডিগ্রী না পেলেও অনেকে বিদ্বান্‌ হতে পারে। এ যুক্তি আমি মানি নে তা নয় তবে আমার মত ব্যক্তি যদি একথা বলে তখনই লোকে মুখের উপর বলবে "Grapes are sour" কেমন বলবে ত? আমার কিন্তু বড় ভয় আমি কিছুতেই এ কথা বলতে পারিনে।

প্রায় তিন পাতা ত লিখলাম—আর ত পারছিনে, মাথাটা কেবল টন টন করছে, এবার আমাকে ছুটি দাও, এই নিয়ে খুসী থেকো, কেমন?

হিন্দু মেলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সূচনা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইতে—কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা। কিন্তু এই ধারণা যে কতখানি ভ্রান্তিমূলক তাহা আজিকার দিনে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলা বোধ হয় আর আবশ্যক করে না।

নবগোপাল মিত্র

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মনে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত হইতে থাকে। আর এই বিষয়ে বাংলাদেশ ছিল অগ্রণী। ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভারতবাসীরা যে এক ও অভিন্ন এরূপ জ্ঞান তাহাদের বরাবর ছিল। রাষ্ট্রীয় বিষয়েও যে তাহাদের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য একই প্রকারের—ইংরেজ আমলে আধুনিক শিক্ষা গুণে আমরা এইরূপ ভাবিতে শিখি। এই ধরণের একজাতীয়তাবোধ—যাহাকে আমরা ইংরেজীতে বলিতে পারি "Indian nationhood"—বাঙালী মনীষীদের মনেই উদিত হয়। হিন্দু মেলাকে এই একজাতীয়তাবোধের প্রথম বহিঃপ্রকাশ বলিলে অতিরঞ্জন হইবে না। হিন্দু মেলার ইংরেজী নাম দেওয়া হইয়াছিল "National Gathering"। কিন্তু ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সহিত এই 'ন্যাশনাল গ্যাদারিং' বা হিন্দু মেলার একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। হিন্দু মেলা ছিল হিন্দুধর্ম্মাধীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলন-ক্ষেত্র, আর কংগ্রেস হইল বিভিন্ন ধর্ম্মাধীন ভারতবাসী মাত্রেরই সম্মিলন-স্থল। তবে একটি নিখিল-ভারতীয় সম্মেলনের ভাবাদর্শ আমরা হিন্দু মেলার মধ্যেই প্রথম পাইতেছি।

হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা হয় ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তিতে (১২ এপ্রিল ১৮৬৭)। রাজনারায়ণ বসু রচিত একটি জাতীয় সভার অনুষ্ঠানপত্র হইতে ভাব লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়ে কলিকাতা নগরীতে নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইহার ছয় বৎসর পূর্ব্বেই একটি জাতীয় মেলার প্রতিষ্ঠার আয়োজনের কথা ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ তারিখের অমৃত-বাজার পত্রিকায় এইরূপ পাইতেছি,—

"হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক লিখিয়াছেন যে চৈত্র মেলার স্রষ্টা ব্রাহ্মেরা নন। হিন্দু পেট্রিয়ট জানেন না যে কয়েকজন ব্রাহ্ম কয় বৎসর হইল এইরূপ একটা মেলা করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালার অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন।"*

পত্রিকা ১৮৭৪ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হিন্দু মেলার যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করেন তাহাতেও ইহার কিছু সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। পত্রিকা লেখেন,—

"অনেক দিন হইল একজন মহাপুরুষ দেশের দুর্গতি দেখিয়া ব্যাকুল হন। তিনি গ্রীক দেশীয় অলিম্পিক গেমের ন্যায় এখানে একটি মেলার উদ্যোগ করেন। তিনি ইহার নাম ধর্ম্মধ্বজ রাখেন। ইহার নিমিত্ত দেশের কয়েকজন প্রধান২ লোকের নিকট উপস্থিত হন। সংবাদপত্রেও ইহা লইয়া আলোচনা হয়। কিন্তু বিধাতা তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইতে দেন না। ইহার কিছুদিন পরে মেদিনীপুরে এই বিষয়ে কতক উদ্যোগ করা হয়। তাহার পর বাবু নবগোপাল মিত্র এই বৃহৎ ব্যাপারে কৃতসঙ্কল্প হন।..."

হিন্দু মেলার মূল উদ্দেশ্য—সর্ব্বরকম পরবশ্যতা পরিহার পূর্ব্বক স্বাবলম্বন গুণটির উন্মেষ এবং আত্মশক্তি ও ঐক্যবোধের বৃদ্ধি। ইহার উপায়স্বরূপ জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় শিক্ষালয়, জাতীয় সভা ও জাতীয়

---

* 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র প্রথম তিন বৎসরের ফাইল হইতে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক সংকলিত "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য। হিন্দু মেলা সম্পর্কে কিছু কিছু নূতন তথ্য ইহাতে আছে।

ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা এবং প্রতি বৎসর হিন্দু মেলার প্রকাশ্য অধিবেশনে এ সকল বিষয়ের উন্নতি-পরীক্ষা, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্র, ব্যায়াম ও কৃষিশিল্প দ্রব্যাদি প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করা। সপ্তম দশকের প্রথম দিকে যে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাও এই হিন্দু মেলারই প্রত্যক্ষ ফল বলা যায়।

২

জাতির সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষেও অভিনব। আমি "জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত" পুস্তকে (প্রকাশকাল ১৩৫২ আশ্বিন) ইহার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহার পর মেলাসম্পর্কিত কিছু কিছু নূতন তথ্য আমার হস্তগত হইয়াছে। এ সকল হইতেও মেলার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি হয়। মেলার চতুর্থ অধিবেশনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭০ তারিখে এইরূপ প্রকাশিত হয়,—

"হিন্দু মেলা। বিগত শনিবার ও রবিবার [১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী] মৃত বাবু আশুতোষ দেবের বেলগেছিয়াস্থ প্রশস্ত উদ্যানে মহাসমারোহে হিন্দু মেলা নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। মেলাস্থলে উক্ত দুই দিবসই অসংখ্য ইংরাজ, বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী, ও মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক একত্রিত হইয়াছিল। তথায় এতদ্দেশীয় নানাবিধ দ্রব্যজাত ও এতদ্দেশীয় স্ত্রীপুরুষগণের কৃত শিল্পাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। কৃষিপ্রদর্শন এবং নানাবিধ বৃক্ষলতাদির পারিপাট্য প্রদর্শন হয়, যে সকল দ্রব্যাদির প্রদর্শন হয় তাহা অতি চমৎকার, সকলে সেই সকল দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়াছেন। আমরাও এতদ্দেশীয়-দিগের প্রাচীন কালের বাদ্যযন্ত্রাদি এবং পূর্ব্বকালে এতদ্দেশীয়-দিগের সংগীত ও শিল্প শাস্ত্রাদির যেরূপ উন্নতি ছিল, তাহা দর্শন করিয়া বিস্মিত ও বর্ত্তমান সময়ের সহিত তাহার সাদৃশ্য সমালোচন করতঃ দুঃখিত হইয়াছি। মেলার কার্য্যবিবরণ পাঠ, এতদ্দেশীয়দিগের উত্তেজক সংগীতাবলি, ভীষ্মদেবের জীবনচরিত ঘটিত পুরস্কৃত প্রবন্ধ পাঠ, হিন্দুস্থানী বক্তৃতা প্রভৃতি যে সকল সভার কার্য্য দেখা গেল তাহাতে বোধ হয় এই সভা দ্বারা ভারতবর্ষের বিশেষ উপকার সাধন হইবে। মেলাস্থলে, ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, সন্তরণ, নৌকার বাচ্, অশ্বচালন প্রভৃতি বিষয়ে অপূর্ব্ব কৌশল সকল প্রদর্শিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আমোদজনক নানা প্রকার সঙ্গীত ও সঙ্গতাদি, সাধারণের হাস্যরসোদ্দীপক হইয়াছিল। একদল ঐকতান বাদক স্বীয় নৈপুণ্যও প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমরা যেরূপ দেখিলাম তাহাতে এই মেলার কোন অংশই নিন্দনীয় নহে। অতএব সর্ব্বসাধারণেরই এ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। অবশেষে আমাদের বক্তব্য এই—এই মেলার প্রারম্ভে ইহার নাম চৈত্র মেলা রাখা হয়। কিন্তু সাধারণে চৈত্রমাসে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন সময় পরিবর্ত্তনের অনুরোধ করাতে ইহার কর্তৃপক্ষগণ ইহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দু মেলা নাম দিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিলাম এবারেও দুই জনের 'সর্দ্দিগর্ম্মি' হইয়াছিল। বিশেষ এ সময়েও রৌদ্রের প্রাদুর্ভাব বড় কম নহে। অতএব যখন চৈত্র মেলার নাম পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তখন আরও একমাস পূর্ব্বে অর্থাৎ মাঘ মাসে হইলে আর কোন অসুবিধাই থাকে না।"

হিন্দু মেলার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হয় ১৮৭১ সনের ১১, ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী হীরালাল শীলের নৈনানস্থ বাগানে। এখানে প্রদর্শিত দুইখানি চিত্রের পরিচয় পরবর্ত্তী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় এইরূপ পাওয়া যাইতেছে,—

"হিন্দু মেলা।...শ্রীযুক্ত বাবু তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় নামক একজন অবৈতনিক চিত্রকর কুমারসম্ভবের অনুকরণ করিয়া যে দুইখানি চিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন, তাহা পরম প্রীতিকর হইয়াছিল। একখানির ছবির নিম্নভাগে এই শ্লোক লিখিত ছিল,—

'ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার।'

অপর চিত্রখানির প্রতিকৃতি এই, কন্দর্প মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে উদ্যত, পার্ব্বতীও পুষ্কর-বীজমালা শিবের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন, বনদেবতায় পার্শ্বে দণ্ডায়মান। মহাকবি কালিদাস কন্দর্পের আকার অবলোকন করিয়া নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন :—

'স দক্ষিণাপাঙ্গ নিবিষ্টমুষ্টিং
নতাংশ মাকুঞ্চিত সব্যাপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃত চারু চাপম্
প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্।'

এই দুইখানি চিত্র সামাজিক মাত্রেরই মনোহরণ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন ডাকাতে বাজী, ভোজবাজী, ব্যায়াম প্রদর্শন, ঘোড় দৌড়, বোট্ রেশ্, কথকতা, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি নানা বিষয়ে যে সকল প্রদর্শন হইয়াছিল, তাহা যে কতদূর প্রীতিপ্রদ, তাহা লেখনীদ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে না।"

৩

বাঙালী এককালে অস্ত্রচালনায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। তাহার তেজবীর্য্যও বহু ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইত। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার আওতায় এবং অধিক পরিমাণে শাসন-

নীতিবৈগুণ্যে তাহার শক্তিচর্চ্চায় ভাটা পড়িয়া যায়। বাঙালী যুবকদের মধ্যে শরীরচর্চ্চার উৎকর্ষ সাধন হিন্দু মেলার কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। নবগোপাল মিত্রের উৎসাহে জাতীয় ব্যায়ামাগার ব্যতীত আরও বহু ব্যায়াম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দু মেলার সাধারণ অধিবেশনে যুবকদের মধ্যে ব্যায়ামের প্রতিযোগিতা হইত। যাঁহারা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতেন তাঁহাদের হিন্দু মেলা নামাঙ্কিত পদক দেওয়ার রীতি ছিল। এইরূপ একটি পদকের উভয় পৃষ্ঠের চিত্র এখানে প্রদত্ত হইল।

হিন্দু মেলায় প্রদত্ত পদক

পদকটির অপর পৃষ্ঠা

ব্যায়ামকুশলী অন্নদাপ্রসাদ মিত্র এই পদকটি* পান। সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাঁহার যৎসামান্য পরিচয় এখানে দেওয়া গেল। অন্নদাপ্রসাদের আদিনিবাস হাওড়া জেলার অন্তর্গত বাঁকুল গ্রামে। তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সেই অতিশয় সাহসী বলিয়া পরিচিত হন। ডন কুস্তি ব্যায়াম সন্তরণ প্রভৃতিতে তিনি সুপটু ছিলেন। তাঁহার জন্ম ১২৬৭ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ। সুতরাং পদক প্রাপ্তিকালে ১৭৯৭ শক বা ইংরেজ ১৮৭৬ সনে তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক যুবক। তিনি বাংলার বাহিরে সুদূর পঞ্জাব পর্য্যন্ত গমন করেন। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া তাঁহার ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। বর্ত্তমান এম-এল বসু কোম্পানী নামক শিল্প-প্রতিষ্ঠান চেষ্টায় গড়িয়া উঠে। অন্নদাপ্রসাদ মিত্র তাঁহার রাশ্ নাম, পরবর্ত্তীকালে তিনি 'রাখালচন্দ্র মিত্র' নামে পরিচিত হন। হিন্দু মেলা ১৮৭৬ সনের ১৯শে ও ২০শে ফেব্রুয়ারী রাজা বদনচাঁদের টালা উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয়। এবারে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়।

হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাংলার বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রমশঃ ব্যাপ্তিলাভ করে। ব্যায়াম বিদ্যালয়ও নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।*

৪

পূর্ব্বের আগ্রহ-উদ্দীপনা কতকটা হ্রাস পাইলেও ১৮৭৯ সনেও ইহা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার বিবরণ ১৮৭৯, ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে গৃহীত হইল। এবারেও মেলার অধিবেশন হয় রাজা বদনচাঁদের টালার উদ্যানে ১১ই হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত। এবারকার একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল, বিখ্যাত বিদুষী পণ্ডিতা রমাবাঈর প্রধান অধিবেশন-দিনের (১৫ই ফেব্রুয়ারী) বক্তৃতা। প্রভাকরের বিবরণটি এই,—

"হিন্দু মেলা। বিগত মাঘ সংক্রান্তির দিবস উক্ত জাতীয় মেলা টালার রাজা বদনচাঁদের উদ্যানে আরম্ভ হইয়া গত সোমবারে সমাপ্ত হইয়াছে। মেলার প্রথম দিন অর্থাৎ সংক্রান্তির দিবস ১নং শঙ্কর ঘোষের লেনে নূতন কলেজিয়েট স্কুলবাটীতে খেলা সংক্রান্ত সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু চন্দ্রশিখর বসু হিন্দুধর্ম্মের সারবত্তা সম্বন্ধে এবং বাবু পদ্মনাভ ঘোষাল ভারতবর্ষের ইতিহাস নবীনরূপে লেখা আবশ্যক সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। বসুজ মহাশয়ের বক্তৃতা অনেকগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণযুক্ত। পদ্মনাভ বাবুর বক্তৃতা সারগর্ভ এবং মনোহর হইয়াছিল।

মেলার দ্বিতীয় দিবস ১২ই ফেব্রুয়ারি বুধবার বৈকালে ন্যাসনাল স্কুলে নর্ম্মাল স্কুল, চাঁপাতলা স্কুল, এবং ন্যাসনাল

* অন্নদাপ্রসাদের পৌত্র শ্রীযুত সুবোধকুমার মিত্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

* একটি ব্যায়াম বিদ্যালয়ের কথা 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৭৮ সনের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে এইরূপ লেখেন,—

বঙ্গযুবকদিগের বলোৎকর্ষসাধন বিদ্যালয়। কয়েক দিবস অতীত হইল, আমরা প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি যে, আপার সারকিউলার রোডে বঙ্গীয় যুবকদিগের বলোৎকর্ষসাধন জন্য একটি নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত বুধবার ২৫শে ডিসেম্বর বৈকালে সেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাধা হইয়াছে। তৎকালে রেবারেণ্ড ম্যাকডনাল্ড, বিবি ম্যাকডনাল্ড, ডাক্তর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার জমিদার বাবু শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, বাবু কালীচরণ সোম এবং বাবু লোকনাথ মৈত্র প্রভৃতি অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হইলে বিদ্যালয়ের ব্যায়াম বিভাগের শিক্ষক বাবু হরিচরণ মুখোপাধ্যায় বিশেষ দক্ষতার সহিত কতিপয় ব্যায়াম প্রদর্শন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। পরে সমবেত ছাত্রবৃন্দ ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি ক্রীড়ায় নিযুক্ত হন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিদ্যালয়ের কার্য্য সমাপ্ত হয়।…

স্কুলের ছাত্রগণ নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শন করেন, দর্শকবৃন্দ এই ব্যায়ামাভিনয় দর্শনে পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

তৃতীয় দিবস বৃহস্পতিবারে এক সভা হয়, এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। মেলার সুযোগ্য সহ সম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্র ছাত্রবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলি সারযুক্ত উক্তি দ্বারা নীতিগর্ভ উপদেশ দান করেন। পিতৃভক্তি, মনুষ্যত্ব এবং সাহস প্রকাশের উপায়, এবং রাজনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্কবাদ করা ছাত্রদিগের কর্ত্তব্য নহে, এই কয়টি বিষয় তিনি বিশেষরূপে বিবৃত করেন।

চতুর্থ দিবস শুক্রবারে ১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে নবগোপাল বাবুর আবাসে জাতীয় সংগীত সমিতি হয়। শনিবার দিবসে কাশীপুরে কামানের কারখানার ঘাটের নিকট গঙ্গাবক্ষে ছাত্রদিগের বাচ খেলা হয়। ন্যাসনাল স্কুলের ছাত্রগণ তাহাতে জয়ী হন।

মেলার প্রধান দিবস রবিবারে উপরোক্ত উদ্যানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় নানাবিধ প্রদর্শনী, ক্রীড়া, গীত, বাদ্য, এবং অগ্নিক্রীড়া হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে বেলা সার্দ্ধ নবম ঘটিকার সময় ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে মহাসমারোহে মেলাস্থলে যাত্রারম্ভ হয়। পতাকা, আশাসোঁটা, এবং জাতীয় কীর্ত্তন করিতে করিতে মেলার অনুষ্ঠাতা এবং হিতসাধকগণ বরাবর মেলাস্থলে গমন করেন। এতদ্দর্শনার্থ সহস্র সহস্র লোক রাজপথে সমবেত এবং অসংখ্য নরনারী নিজ নিজ বাটীর গবাক্ষাদি হইতে দেখিতে থাকেন। এ দৃশ্যটি পরম রমণীয় হইয়াছিল। মেলাস্থল নানাবিধ পতাকা, পত্র এবং পুষ্পাদিতে পরম রমণীয়রূপে শোভিত হইয়াছিল। দ্বারদেশে হিন্দু প্রথামত কদলী বৃক্ষাবলী রোপিত হইয়াছিল। মেলাস্থলে নানাপ্রকার ক্রীড়া এবং ব্যায়াম প্রদর্শিত হইয়াছিল। একজন বাঙ্গালীর সহিত একজন পঞ্জাবী পালোয়ানের কুস্তী হইয়াছিল। বাঙ্গালী জয়লাভ জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও শেষে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, ইহা দুঃখের বিষয় নহে। গতবর্ষে বাঙ্গালী পঞ্জাবীকে হারাইয়াছিল, এবার বাঙ্গালী হারিল, তাহাতে দুঃখ কি? চেষ্টা করা হউক আগামীবর্ষে আবার পঞ্জাবী হারিতে পারে। ইতিহাস যে বাঙ্গালী ও পঞ্জাবীকে শৃগাল এবং সিংহরূপে প্রভেদ করিতেছে, সেই বাঙ্গালী যে এখন পঞ্জাবীর সহিত কুস্তী করিতে সমর্থ হইল, ইহাই প্রশংসার বিষয়। উক্ত কুস্তীর পর দেবী সিংহ এবং পালোয়াম সিংহ পরস্পর অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া কুস্তী করে, কিন্তু শেষ জয় পরাজয় ধার্য্য হয় না। কয়েকজন কর্ণাটী বিচিত্র ক্রীড়া করিয়া দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় বাঙ্গালী লাঠিয়ালগণও বিচিত্র শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেলাস্থলে নানাবিধ দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। সূচীকার্য্য, কারুকার্য্য, এবং নানা স্থানের বহুবিধ প্রস্তর ও মৃত্তিকার দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। বিখ্যাতা বিদুষী রমাবাই ভারতীয় ভাষা শিক্ষা আবশ্যক, হিন্দুললনাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং পুরাকালে আর্য্যনারীদিগের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করেন, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে দর্শক মাত্রেই বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দান করেন। রজনীতে অগ্নিক্রীড়ার পর মেলা ভঙ্গ হয়। দিবাভাগে বৃষ্টি হওয়ায় আশামত লোক সমবেত হয় নাই। বলা বাহুল্য যে মেলার সুযোগ্য সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সহকারী সম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্রের যত্নে, শ্রমে, এবং অধ্যবসায়ে এই মেলা জাতীয় মান রক্ষা করিতেছে।"

হিন্দু মেলার চতুর্দ্দশ অধিবেশন খুব জাঁকাল রকমের হয় নাই। ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশনের কথা আর জানা না গেলেও হিন্দু মেলার জাতীয় ভাব এবং নিখিল-ভারতীয় আদর্শে ভারতবাসী নেতৃবৃন্দ অচিরেই উদ্বুদ্ধ হইলেন। কলিকাতার ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স এবং বোম্বাইয়ের ন্যাশনাল কংগ্রেস উক্ত ভাবাদর্শেরই প্রতিরূপ বলা যায়।

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

(১)

সে দিন বঙ্গের বুকে যুগান্তের জাগিল জোয়ার,
গঙ্গার তরঙ্গে বাজে শতাব্দীর অপূর্ব্ব সঙ্গীত,
মূর্চ্ছিত প্রাণের মাঝে ফিরে আসে মুহূর্ত্তে সম্বিৎ,
সে উল্লাসে বিপ্লাবিত জীবনের এ-পার ও-পার।
মন্ত্রিত কাব্যের শঙ্খ, দিকে দিকে শুনি যে ঝঙ্কার,
কলার জগতে কই সে কল্লোল? কোথা পথিকৃৎ?
বসন্তের আগমনে স'রে যাক্ দুর্দ্দিনের শীত;
তুমি এলে, এল পুষ্প, এল বর্ণ-সুষমা-সম্ভার।

চোখে তুমি দিলে দৃষ্টি, প্রাণে নব-সৃষ্টির সন্ধান,
রেখায় নূতন ছন্দ, রূপে দিলে যে রীতি স্বকীয়
চিরন্তন ভারতের, নহে তুচ্ছ বিদেশের দান,—
কিছু-বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিছু তার জানি অতীন্দ্রিয়।
আত্মবিস্মৃতের স্মৃতি ফোটালো কি সে-তুলির টান?
হে শিল্পী অতুলনীয়, তুমি এক, তুমি অদ্বিতীয়।

(২)

হে স্রষ্টা, আনিয়া দিলে জীবনের নূতন প্রেরণা,
নবীনের চিত্তে হ'ল অন্তহীন আশার উদ্ভব,
নব-নবোন্মেষ যার সে বুদ্ধির ঘটিল সম্ভব,
তোমার জ্যোতির স্পর্শে দীপে দীপে জাগে উদ্দীপনা।
প্রতিমা রচিয়া চলে অপরূপ তোমার কল্পনা,
কত সম্রাটের স্বপ্ন, ভাষাহীন কত দিব্য স্তব,
কত বন্দিনীর ব্যথা! এনে দিল আনন্দ-বিপ্লব
কলা-কুতূহলী মনে অনুপম তোমার রচনা।

কত বর্ণ, কত ছন্দ, কত ভাব, কত-বা ভঙ্গিমা,
প্রতি অঙ্গে রূপান্বিত, রেখান্বিত লীলার লাবণি,
চিত্রে চিত্রে বৈচিত্র্যের নাহি বুঝি সীমা-পরিসীমা,
কখনো কঠোর তুমি, কখনো বা কোমল নবনী।
যুগে যুগে জেগে রবে, শিল্পীগুরু, তোমার মহিমা,
সূর্য্য-চন্দ্র চেয়ে থাকে যার পানে, তুমি সে অবনী।

(৩)

চঞ্চল জগতে চলে অন্তহীন ছন্দের হিন্দোল।
যে ছন্দে আনন্দময় নিখিলের শাশ্বত কবিতা,
যে ছন্দে বাজায় বীণা জ্যোতির্ম্ময়ী বাণীর সবিতা,
সে ছন্দে তোমার তুলি তুলিল যে রসের হিল্লোল।
ঘুমন্ত পুরীর মাঝে দিকে দিকে জাগরণ-রোল,
বিস্মৃতির পার হ'তে দেশে ফিরে এল নির্ব্বাসিতা,
দেখা দিল স্বপ্নোত্থিতা নব রূপে চির-পরিচিতা,
মূর্চ্ছিত নিঃশব্দ চিত্রে শুনিলাম জীবন-কল্লোল।

অতি সুনিপুণ স্পর্শে বেজে ওঠে যন্ত্রের বেদনা,
মায়াময় সে অঙ্গুলি ধরে তুলি, ধরে তা লেখনী,
যৌবনে মাতায় সে যে, জাগায় তা শিশুর চেতনা,
লেখায় রেখায় তাই শুনি সুর-সৌন্দর্য্যের ধ্বনি।
অভিনন্দনের ছন্দে গাহি আজ তোমার বন্দনা,
তোমার প্রতিভা, দেব, লোকোত্তর হৃদয়-রঞ্জনী।

(৪)

আলো-ছায়া লুকোচুরি—এই সৃষ্টি কার খেলাঘর?
সোনার আকাশ-পটে গ্রহ-তারা সূর্য্য-চন্দ্র আঁকা,
লীলায়িত তরুশিরে বিহঙ্গেরা মেলে দেয় পাখা,
সে লীলায় যোগ দিলে তুমি শিল্পী, তুমি চিত্রকর!
তুমি কবি, কলাবিৎ, রূপদক্ষ, তুমি যে ভাস্কর।
ভেসে চলে ভাবগুলি সংখ্যাহীন সে হংস-বলাকা,
তবুও সুদূর নও, তুমি কর ধূলা-মাটি-মাখা,
শিশুর খেলার সাথী, বিধাতার লীলা-সহচর।

অতি ক্ষুদ্র পুত্তলিকা প্রাণ পেলে হোক তা মৃন্ময়ী,
ছোট-বড় নাহি ভেদ, নির্ব্বিচারে রচিছ খেলনা।
মনের মাধুর্য্যে তুমি মনোহর, তাই ত বিনয়ী,
শিশুচিত্তে, হে সুন্দর, আনো নিত্য নব সম্ভাবনা।
অবনীর ইন্দ্র তুমি, তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি যে বিজয়ী,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সেতু বাঁধে, হে আচার্য্য, তোমার কল্পনা।*

* রূপবাণী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অবনীন্দ্র-জয়ন্তী-সভায় পঠিত

দক্ষিণ-স্পেনের সেভিয়ে অঞ্চলের একটি নৃত্য

স্পেনের লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত সকল দেশেরই সাংস্কৃতিক সম্পদ। সরল পল্লীজীবনের ইহা সুখ-দুঃখের স্বতস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি। সুদূর অতীতে উদ্ভূত হইয়া কালস্রোতের বহু পরিবর্ত্তিত পারিপার্শ্বিকের প্রভাব সহ্য করিয়া এই সকল লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত এখনও এত প্রাণবন্ত রহিয়াছে যে, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকল রসগ্রাহী মনে তাহা আনন্দ পরিবেশন করিয়া আসিতেছে। আধুনিক যুগের আড়ম্বরময় জীবন-যাত্রায় আকৃষ্ট হইয়া লোকে এই অপূর্ব্ব সম্পদকে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ফলে বহু প্রকারের লোকনৃত্য লোপ পাইয়াছে, কোনও নৃত্যের মধ্যে আধুনিক নৃত্য মিশ্রিত হইয়া তাহার আসল রূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

কিছুদিন হইতে যে সকল পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে পুরাতন ঐতিহ্যকে রক্ষা করিবার প্রবণতা দেখা গিয়াছে স্পেন তাহাদের অন্যতম। স্পেনের প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন বিচিত্র, স্পেনিশ জাতির ইতিহাসও তেমনি বৈচিত্র্যময়। এই কারণেই ইহাদের লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের তুলনা সমগ্র ইউরোপে আর কোথাও মেলে না। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়া স্পেন একটি প্রকাণ্ড উপদ্বীপ, আয়তনে আমাদের ব্রহ্মদেশের সমান। ইহার উত্তর সীমায় সু-উচ্চ পিরেনিস্ পর্ব্বত, মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ পর্ব্বতবহুল মালভূমি, মালভূমির মধ্য দিয়া অনেক-গুলি গভীর নদী প্রবাহিত। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী পূর্ব্বাংশ সমতল। দক্ষিণে গোয়াদাল্‌কুইভার নদীর জলময় উপত্যকা। দেশের কোনও অংশে সারা বৎসর প্রচুর বারিপাত হয়, সেই অংশের জমি উর্ব্বর—তাহাতে কমলা, আঙুর প্রভৃতি ফলের এবং গম, ভুট্টা প্রভৃতি ফসলের চাষ হয়। আর এক অংশ ঊষর পর্ব্বতমালার উপরি-ভাগে পাইনবন, পাদদেশ ঘন তৃণসমাচ্ছন্ন। একদিকে এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আর এক দিকে স্পেনীয়দের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। বর্ত্তমান স্পেনীয়েরা বহুজাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত। অতীতে কেল্ট, লাটিন, টিউটনিক ও মূর প্রভৃতি জাতিসমূহ এই দেশ জয় করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বিজেতা জাতিগুলির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান স্পেনীয়দের মধ্যে বর্ত্তাইয়াছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ঐ সকল জাতির বৈশিষ্ট্যের ছাপ সুস্পষ্ট। এই কারণেই এখানে এত সুন্দর সুন্দর ও রকমারি লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত প্রচলিত। নৃত্যের পদক্ষেপের ভঙ্গী, সঙ্গীতের ছন্দ ও ঝঙ্কার এবং নৃত্য-গীত উৎসবে যোগদান-কারীদের পোশাক-পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়।

স্পেনের নৃত্যে প্রধানতঃ দুইটি বিশিষ্ট ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। এক ক্লাসিক—সম্পূর্ণ ভাবে স্পেনের নিজস্ব। অতি পুরাতন কাল হইতে শিল্পীপরম্পরায় এই ধারা চলিয়া আসি-তেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নাচ ও গান বিভিন্ন ধরণের। প্রত্যেক প্রদেশ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অতীব নিষ্ঠার সহিত রক্ষা

বার্সেলোনায় প্রচলিত একটি বিশেষ নৃত্য

করিয়া আসিতেছে। ঐ সকল প্রদেশের নাচ ও গানের সঙ্গে যে সকল বাদ্যযন্ত্র বাদিত হয় তাহাও অঞ্চলভেদে স্বতন্ত্র। ক্লাসিক পর্য্যায়ের নৃত্যে পাদক্ষেপে সামান্য পরিবর্ত্তন করাকেও ইহারা অপরাধ বলিয়া মনে করে।

অপর ধারার নাচের নাম ফ্লামেঙ্কো। মূলতঃ ইহা বেদিয়া নাচ। কালক্রমে দেশীয় নৃত্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া পরিবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। খাঁটি স্পেনীয় নৃত্যে বেদিয়া নাচের প্রভাব একেবারেই নাই। বেদিয়া নাচের গতি দ্রুত, ভঙ্গী লীলায়িত, নর্ত্তক বা নর্ত্তকীর দেহ-বাহু দ্রুত সঞ্চরমাণ। বেদিয়া নাচ দর্শককে চমৎকৃত করে, আনন্দ দেয়—কিন্তু তবুও ইহা চটুল ও হাল্কা। স্পেনীয়দের মতে যাহাতে গাম্ভীর্য্য নাই তাহা ইতর শ্রেণী-ভুক্ত। কোনও গৃহস্থের কন্যা সাধারণতঃ বেদিয়া নাচ শেখে না। তবে কেহ যদি নৃত্যবিদ্যাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। আধুনিক কালের কোন কোন প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী বেদিয়া নাচের সহিত স্পেনীয় নৃত্যের দুই-একটি পদক্ষেপের ভঙ্গী সংযোগ করিয়া নূতন নৃত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহারা রঙ্গমঞ্চে খ্যাতিলাভ করিলেও বা সৌখিন ধনী লোকের সামাজিক নৃত্যের আসরে সমাদর পাইলেও ইঁহাদের নৃত্য লোকনৃত্যের মর্য্যাদা পায় নাই।

ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে যে সকল বিভিন্ন প্রকারের লোকনৃত্য প্রচলিত, তাহা পুরাকাল হইতে শিল্পীপরম্পরায় অবিকৃত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। এই সকল নৃত্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা স্পেনীয়েরা তাহাদের পবিত্র ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। তাহাদের মতে নৃত্যশিল্প স্বতঃজাত, সৌন্দর্য্যময় প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত। যে বৃক্ষে এই পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে তাহার মূল দেশের মৃত্তিকার অন্তস্তলে নিহিত।

কথিত আছে, এক সময় পোপের নিকট অভিযোগ আসিল ফান্দাগো নৃত্য দুর্নীতিপূর্ণ। এই নৃত্য বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ধর্ম্মযাজক পরিষদে এই মর্ম্মে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল যে, যে কেহ এই নৃত্য দেখাইবে, স্পেন হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া

বেলেরিক দ্বীপপুঞ্জের একটি নৃত্যভঙ্গী

দেওয়া হইবে। ধর্ম্মগুরু পোপই ছিলেন স্পেনীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা। একজন ধর্ম্মযাজক বলিলেন যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইতেছে, তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া উচিত। ইহা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় নর্ত্তককে বিচারক-মণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত হইবার আদেশ দেওয়া হইল। অভি-যুক্ত নর্ত্তক ধর্ম্মযাজকদিগের সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল।

দার্বো নৃত্য

কোন্ দলের সহিত কোন্ দলের কোন্ তারিখে কোথায় প্রতিযোগিতা হইবে এবং প্রতিযোগী দলগুলিকে তাহাদের সাজসরঞ্জামসহ কিভাবে প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে সে সম্বন্ধে এক রকম ব্যবস্থা হয়। অনুরূপ ব্যবস্থা হয় কোন্ কোন্ শ্রেণীর নৃত্যগীতের প্রতিযোগিতা হইবে তাহা লইয়া।

আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় যে দল শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষিত হয়, সেই দলকে পরবর্ত্তী প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার জন্য পাঠানো হয়। প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আসরে বিচারক থাকেন সেই অঞ্চলের খ্যাতনামা নৃত্যগীত-বিশারদগণ। প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার আসরের বিচারকমণ্ডলী গঠন করিয়া দেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি কার্য্যালয়। এই বিচারকমণ্ডলীতে থাকেন দুই জন খ্যাতনামা গায়ক, যাঁহারা লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ, আর থাকেন জাতীয় সংসদের একজন প্রতিনিধি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিচারকদিগের রূঢ় ভ্রূকুটিপূর্ণ মুখমণ্ডল বিমল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। একে একে তাঁহারা নৃত্যের তালে তালে হাতে ও পায়ে তাল দিতে লাগিলেন। শেষে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সকলেই সেই নর্ত্তকের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করিয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। ফান্দাগো নৃত্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বাতিল হইয়া গেল। এই কাহিনীটি সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত।

কয়েক বৎসর হইতে স্পেনের লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতের একটি সুপরিচালিত বাৎসরিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। মেয়েরাই বিশেষ করিয়া এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া থাকে। ইহার ফলে এক দিকে যেমন আঞ্চলিক নৃত্য-গীতগুলির উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে অন্য দিকে তেমনি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের নৃত্যগীত শুধু সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। এই প্রতিযোগিতা অন্যান্য ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার ন্যায় সর্ব্বোতোভাবে নিয়মানুগ। নিয়মগুলি কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি কার্য্যালয় হইতে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রাদেশিক কার্য্যালয়গুলিতে প্রেরিত হয়। সেখান হইতে স্থানীয় নৃত্যগীতের দলের মধ্যে প্রচারিত হয়। প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন ও ইহার জন্য যে সকল ব্যবস্থা করেন তাহা দেখিলেই বুঝা যায়, প্রতিযোগিতার সাফল্যের জন্য তাঁহারা কতদূর যত্নশীল।

নৃত্য ও গীতের দলগুলি অঞ্চল হিসাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। গ্রাম্য, নাগরিক ও প্রাদেশিক। নৃত্য বা গীত অথবা মিশ্র নৃত্য-গীতের দল, এ দিক দিয়াও দলগুলি তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত। প্রতিযোগিতার আসরে গানের দলকে তিনটি গান অবশ্যই গাহিতে হয়—একটি ধর্ম্মবিষয়ক, একটি পল্লীগীতি এবং একটি পৌরাণিক গাথা। ইহা ছাড়া, দলের ইচ্ছা ও পছন্দমত তাহাদের নিজ অঞ্চলে প্রচলিত লোকসঙ্গীত অন্ততঃপক্ষে দুইটি গাহিতে হয়।

কানারি দ্বীপের 'ফোলিয়া' নৃত্য

আরাগোন প্রদেশের 'যোতা' নৃত্য

সমস্ত লোকনৃত্যই যুগ্মনৃত্য। প্রতি দলে নর্ত্তকী-সংখ্যা চারি জোড়া হইতে আট জোড়া পর্য্যন্ত হইতে পারে। সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় যেমন কি ধরণের সঙ্গীত গাহিতে হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত, নৃত্য-প্রতিযোগিতায় সেরূপ কোন নৃত্য কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়া দেন না। তাহারা যে-কোন নৃত্যই দেখাইতে পারে। যে দল নৃত্য-কলার দিক হইতে এমন কোন সুন্দর নৃত্য দেখাইতে পারে যাহা কোন গ্রাম্য নৃত্যশিল্পীর নিকট হইতে সংগৃহীত ও সেই বিশেষ নৃত্য বিলুপ্তপ্রায়, তাহা হইলে সেই দলই প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করে।

মিশ্রিত নৃত্যগীতের দলে ন্যূনকল্পে পাঁচশ ও ঊর্দ্ধসংখ্যায় সত্তর জন অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এই মিশ্রিত দলের সঙ্গে তাহাদের আঞ্চলিক বাদ্যযন্ত্র থাকে। উক্ত দল কর্তৃক যে বিশেষ নৃত্য প্রদর্শিত হইবে বা সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হইবে, ঐ সকল বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া তাহারই পটভূমি রচিত হয়। কয়েক বৎসর হইতে যে বাৎসরিক প্রতিযোগিতা হইতেছে, তাহাতে যোগদানকারীর সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে উহাতে মনে হয় ইহা সাধারণের মধ্যে দ্রুত-গতিতে প্রসারলাভ করিতেছে। প্রথম বৎসর প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিল ৭৪টি গানের দল, ২৪টি নাচের দল এবং ১৮টি মিশ্র নাচ ও গানের দল। মোট শিল্পী-সংখ্যা ছিল ৩১৩৫। দ্বিতীয় বৎসরে যোগদান করে ২০৩টি গানের দল, ১১৪টি নাচের দল ও ৫৩টি মিশ্র নৃত্য-গীতের দল—মোট শিল্পী-সংখ্যা ছিল ৭৬৭৭। পঞ্চম বৎসরে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় নিম্নলিখিত রূপ—গায়ক-দল ৩০৩, নর্ত্তক-দল ২১২, মিশ্র নর্ত্তক ও গায়কের দল ১৭৫—যোগদানকারী শিল্পী-সংখ্যা ২৪৭২৪।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য, ধীরে ধীরে কি ভাবে লোপ পাইয়া যাইতেছে তাহা ভাবিলে এবং ইহা সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই যে নাই, সেকথা মনে হইলে গভীর নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। পল্লীবাসীর সহজ জীবনধারা ব্যাহত হইয়া যাওয়ায় স্বাস্থ্যহীন, অন্নহীন, অর্দ্ধমৃত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট পল্লীবাসীর প্রাণে পূজা-পার্ব্বণে আর উৎসবের আনন্দ দেখা যায় না। লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যে তাহাদের সজীবতা আর প্রকাশ পায় না। বহুপ্রকার লোকনৃত্য এবং বহু পালাগান একদা পূর্ব্ববঙ্গে প্রভূত পরিমাণে প্রচলিত ছিল। ঐ সকল পালাগান কিছু কিছু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নির্দ্দেশে চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহা কয়েক খণ্ডে ছাপা হইয়াছে। মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন সাহেবের সংগৃহীত লোকসঙ্গীত এক সময় 'হারামণি' নামে 'প্রবাসী'তে ছাপা হইত। তাঁহার সঙ্কলিত 'হারামণি' এক খণ্ডও

সালামাঙ্কার 'কডন' নৃত্য

ছাপা হইয়াছে। সঙ্গীত বা পালাগানের কথা-অংশ কতকটা রক্ষা পাইয়াছে—ইহার কলা-অংশ কখনও যে পুনরুজ্জীবিত হইবে এরূপ সম্ভাবনা আপাততঃ সুদূর পরাহত বলিয়া মনে হয়—শিল্পীপরম্পরায় লোক-নৃত্যের ধারা প্রবহমাণ না থাকিলে ইহার অস্তিত্বই থাকে না। রবীন্দ্রনাথ ও গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের চেষ্টায় কয়েক প্রকার লোকনৃত্যের পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল—যদিও তাহা তেমন ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে নাই। অকৃত্রিম লোকনৃত্যের উৎপত্তি ও পরিণতি নিরক্ষর পল্লীবাসীর মধ্যে—সেখানে ইহাকে স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

দেশ স্বাধীন হইয়াছে। সাংস্কৃতিক সম্পদ বিবেচনায় লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত রক্ষা করা ও তাহা সঞ্জীবিত করা জাতীয় সরকারের অবশ্যকর্তব্য।

পরাধীনতার বন্ধন কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের ভাগ্যে এমন এক বিপর্যয় আসিয়া পড়িল যে, লোকের পেটের ভাত ও পরনের কাপড়ের তাগিদই আজ প্রবলতম। পল্লীবাসীর উৎসব-আনন্দই বা কোথায়, আর সেই উৎসবে নৃত্যগীত করিবার মত মনের অবস্থাই বা তাহাদের কোথায়!

রবীন্দ্রকাব্যে নারী

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত

রহস্যময়ী নারীপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে মুগ্ধ করিয়া বারবার তাঁহার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। বিশ্বের সৌন্দর্য্যের ললাম হইতেছে নারী। নারীর দেহ-লাবণ্যে, অন্তরের করুণায়, চিত্তের শুচিতায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন এক আশ্চর্য্য প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী' কবিতায় নারীর যে পরিচয় পাওয়া যায় সে মাতা নহে, কন্যা নহে, বধূও নহে। তাহার দুইটি রূপ—একরূপে পুরুষের চিত্তে সে উন্মাদনার সঞ্চার করে—তাহার কল্যাণশ্রীমণ্ডিত আর এক মূর্ত্তি মানব-হৃদয়কে বিস্ময়ে অভিভূত করে। গৃহে নারীর পরিচয় মাতারূপে, কন্যারূপে, ভগ্নীরূপে বা গৃহিণীরূপে। কিন্তু কবির ধ্যাননেত্রে দৃষ্ট সাংসারিক সম্পর্কের অতীত নারীর এই বিশ্ববিমোহিনী রূপ নিয়ত মানব-মনকে মুগ্ধ করে। তাহার এই সৌন্দর্য্যের আদি-অন্ত নাই, কবে যে তাহার প্রথম বিকাশ তাহা কেহ বলিতেও পারে না। তাই কবির মনে প্রশ্ন জাগে—

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি,
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী?

এই সৌন্দর্য্য যেমন যাবতীয় ঐহিক সম্পর্কের অতীত, তেমনি দেশ কালেরও বাহিরের:

যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী।

নারীর এই মোহিনী-শক্তি দেহাতীত অনন্ত সৌন্দর্য্যেরই প্রতীক। নারীর এই সৌন্দর্য্য জগতে দুইটি জিনিষ আনিয়াছে—অমৃত ও বিষ। এই সৌন্দর্য্যই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সঞ্জীবনীসুধা।

নারীর সৌন্দর্য্য এক দিকে যেমন অতীন্দ্রিয় রহস্যময়, অন্য দিকে তেমনি স্থূলভাবে তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই সৌন্দর্য্যই পুরুষকে নারীর প্রতি আকৃষ্ট করে, তাহার হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার করে, মুনি-ঋষিগণও এই প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল,

* * *

তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।

পুরুষের হৃদয়ের সুপ্ত প্রেমকে জাগ্রত করে নারী। সৌন্দর্য্যোপাসনার প্রথম হোমশিখা জ্বালিয়া দেয় নারী। এই সৌন্দর্য্যানুরাগের পরিণতিই ভালবাসায় বা প্রেমে। এই প্রেম পূজারই নামান্তর। কবি তাই বলিয়াছেন—"যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা।" এই প্রেমই মানুষকে সুন্দর করে, অতি সাধারণকে দান করে সম্রাটের মর্য্যাদা। প্রথমে পুরুষের কাছে নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্যই চরম বলিয়া প্রতিভাত হয়। 'অচ্ছোদ সরসীনীরে' স্নানার্থিনীর কথা স্মরণ করুন। রমণী আবক্ষ জলে ডুবাইয়া সযত্নপালিত শুভ্র রাজহংসটিকে নগ্ন বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া আদর করিতেছিল। বসন্তসখা মদন বকুলমূলের অন্তরালে বসিয়া ব্যগ্র কৌতূহলে সুন্দরীর স্নানলীলা দেখিতেছিল এবং উৎসুক নয়নে তাহার কোমল বক্ষস্থলে শর নিক্ষেপের সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন রমণী স্নান সমাপন করিয়া উপরে উঠিল তখন তার—

স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি' গেল খসি'।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল

বন্দী হয়ে আছে, তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র, ললাটে অধরে
উরুপরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে।

নারী সুন্দর ও পবিত্র হইলেও কামনাকলুষিত দৃষ্টিতে দেখিলে তাহার আসল রূপ চোখে প্রতিভাত হয় না। নারীর নিরাবরণ পবিত্র মূর্ত্তি মুগ্ধ ভক্তের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। অনঙ্গও স্নানরতা রমণীর নগ্নরূপে বিমুগ্ধ হইল। সে বকুলমূল ত্যাগ করিয়া আসিয়া নিমেষহীন নিশ্চল নয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, পরক্ষণেই ভূমিপরে

জানুপাতি বসি', নির্ব্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে, পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি।

নারী কেবল বিধাতার সৃষ্টি নহে; পুরুষ নিজের কল্পনায়ও তাহাতে সকল সৌন্দর্য্য আরোপ করিয়া, নানাভাবে তাহাকে সাজাইয়া নূতন রূপে সৃষ্টি করিয়াছে। শিল্পীরা তাহাদের মানসীমূর্ত্তিকে নব নব রূপ দান করিয়াছে। শিল্পীর এই মানস-প্রতিমাকেই তো লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন, 'অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা"। এই যে সৃষ্টি ইহা মানব-মনেরও বটে, বহির্জগতেরও বটে। এ দুইয়ে মিলিয়া ইহার পরিপূর্ণ সার্থকতা।

তুমি এ মনের সৃষ্টি তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।
যখন তোমারে হেরি জগতের তীরে
মনে হয় মন হতে এসেছ বাহিরে।

নারীর প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে কবি লাভ করিয়াছিলেন সত্যদৃষ্টি। যে পর্য্যন্ত নারী কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রীরূপে তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইতেন সে পর্য্যন্ত তিনি তাহার প্রকৃত রূপ দেখেন নাই।

যখন তোমার 'পরে পড়েনি নয়ন
জগৎলক্ষ্মীর দেখা পাইনি তখন।

সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে ভোগাকাঙ্ক্ষা মিশিয়া থাকা পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করা যায় না। দেহের মিলনে কখনও পরিপূর্ণ মিলনানন্দ লাভ করিতে পারা যায় না। তাই কবি বলিলেন—

এ কি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে?

তিনি 'নিষ্ফল প্রয়াস' কবিতায় লিখিয়াছেন :—

কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?"

ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিতে না পারিলে নারীর আত্মিক সৌন্দর্য্যের অনন্ত রহস্যভার অনুদ্ঘাটিতই থাকিয়া যায়। কবি যখন এই দুয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে নারীর পানে চাহিলেন তখন তিনি তাহার মধ্যে নারীত্বের সত্যরূপ, জগৎলক্ষ্মীর রূপ দেখিলেন।

বিমুগ্ধ কণ্ঠে কবি গাহিয়া উঠিলেন—

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে
তব পিছে পিছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

তিনি নারীর মুখশ্রীতে স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টার রূপমাধুরী অবলোকন করিলেন—

নিত্যকালে মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ
তোমা মাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ।

কবি দেখিলেন নারীর মধ্যে এক অপূর্ব্বসুন্দর বিশ্ববিজয়িনী রূপ। সৃষ্টির অসীম রহস্য বাঁধা পড়িয়াছে রমণীর দেহে মনে, রূপের আভায়। স্নেহের গভীরতায়, ভক্তির সুষমায়, ত্যাগের মহিমায় নারী মহিমময়ী। প্রেমের আলো কুরূপা নারীকেও মণ্ডিত করিয়া তোলে এক অপরিমেয় সৌন্দর্য্যে। প্রিয়তমের জন্য দেহমন-প্রাণ উৎসর্গ করিতে তাহার কি ব্যাকুলতা! কিন্তু তাহার মনে সংশয় জাগে—দেবতা তাহার পূজা গ্রহণ করিবেন কি না। যা-কিছু সুন্দর তাহা দিয়াই তো দেবতার পূজা করা হয়। সে অসুন্দর, সে রূপহীনা তাই তাহার কুণ্ঠার অন্ত নাই। কোন্ অর্ঘ্য লইয়া সে প্রিয়তমের নিকট উপস্থিত হইবে! সে নিজেকে প্রশ্ন করে—

পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়া।

* * *

দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে চাহিয়া দেখি তারে
কি বলে আপনারে দিব তায়।
তাই লুকিয়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে,
ভালবাসিতে মরি সরমে।
রুধিয়া মনোদ্বার প্রেমের কারাগার
রচেছি আপনার মরমে।

পুরুষ আশা করে গৃহলক্ষ্মীরূপে নারী একদিন তাহার গৃহে আসিয়া সংসারকে কল্যাণশ্রীতে মণ্ডিত করিয়া তুলিবে। সে স্বপ্ন দেখে—

একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দনচর্চ্চিত ভালে রক্ত পট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরী সঙ্গীতে, তার পরে
সুদিনে দুর্দ্দিনে, কল্যাণ-কঙ্কণ-করে,

সীমন্তসীমায় মঙ্গলসিন্দূর বিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্রশিয়রে।

কিন্তু নারী তো শুধু পুরুষের গৃহলক্ষ্মীই নয়, সে যে তাহার মানস-সুন্দরী, আজন্ম সাধনার ধন, তাহার জীবনের কবিতা তাহার কল্পনার উৎস।

শুধু তাহাই নহে, নারী পুরুষের,
জীবনের দুঃখ-দৈন্য অতৃপ্তির পর
করুণকোমল আভা গভীর সুন্দর।

এদিকে দয়িতের জন্য চিরকাল ধরিয়া নারীরও ব্যাকুল প্রতীক্ষার আর অন্ত নাই। প্রিয়তমের আহ্বান কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া নারীকে আত্মহারা করিয়া তোলে। তাই সে বলে—

মনে লেগেছিল হেন আমায় সে যেন ডেকেছে।
যেন চির-যুগ ধ'রে মোরে মনে করে রেখেছে!
সে আনিবে বহি' ভরা অনুরাগ,
যৌবন নদী করিবে সজাগ,
আসিবে নিশীথে, বাঁধিবে সোহাগ বাঁধনে,
আহা, সে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে॥

একদিকে নারী পুরুষের মানস-সুন্দরী, আর বাস্তবতার দিক দিয়া সে তার ঘরের গৃহিণী। ঘরসংসার লইয়া গৃহলক্ষ্মীর কত না চিন্তা! সে গৃহের শ্রী, স্বামী পুত্র পরিজনের মঙ্গল চিন্তায় সতত নিরত। প্রিয়তমের জন্য সে হৃদয়ের স্নেহপ্রীতি নিঃশেষে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দেয়। স্বামীর বিদেশ গমনকালে তাহার কত না চিন্তা! যাহাতে বিদেশে যাইয়া কোনরূপে অসুবিধা না হয় সে দিকে তাহার সজাগ দৃষ্টি।

সামান্য কয়েকটি কথায় বিদায়-কালের কি করুণ চিত্রই না কবি আঁকিয়াছেন।

চক্ষু ছল ছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার
তবুও সময় তার নাহি, কাঁদিবার
এক দণ্ডের তরে।
তার পর বিদায়-মুহূর্ত যখন ঘনাইয়া আসে তখন
অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষু 'পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি,
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।

পুরুষের কাছে একান্ত নির্ভরতায় নারীর নিঃশেষে আত্মসমর্পণের চিত্র আছে নীচের কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে—

সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণ করে, কুলায়প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখীর মত—মুখখানি তার
নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে।

রবীন্দ্রনাথের 'নারী' যে কেবল স্বামী-পুত্র-পরিজনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী গৃহের লক্ষ্মী, তাহাই তাহার সবটুকু পরিচয় নহে, শুধু ইহাকে নারীত্বের চরম বলিয়া কবি স্বীকার করেন নাই। গৃহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে বিশ্বের বিচিত্র কল্যাণ-কর্ম্মের সঙ্গে সংযুক্ত না হইতে পারিলে যে নারীত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না সেকথা তিনি নানা স্থানে নানা ভাবে বলিয়াছেন।

নম্রতা, কমনীয়তা, স্নেহপ্রবণতা নারী-চরিত্রের বিশেষত্ব। তাই বলিয়া চিরাচরিত সংস্কার পালনের জন্য নারী অন্তরের সত্যকে ও আদর্শকে অস্বীকার করিবে, অবমাননা করিবে রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মা তাহাতে সায় দিত না। নারীত্বের পরিপূর্ণ আদর্শ কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে চিত্রাঙ্গদার মুখ দিয়া কবি বলাইয়াছেন—

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নহি, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখদুঃখের মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

নারী শক্তিরূপিণী বলিয়া নিজের শক্তিহারা পুরুষের কর্ম্মসাধনার পথে সাহায্যকারিণী হইতে পারে। সমাজে নারীর স্থান হওয়া উচিত পুরুষের পাশে; তাহার কর্ম্মসঙ্গিনীরূপে। নারীত্বের সার্থকতার পথ চিনিয়া লইতে হইবে নারীকেই:

কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ?
দুর্দ্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গা-পাশে
দুর্জ্জয় আশ্বাসে।
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ।

বিষ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

অতীন একদা প্রতিজ্ঞা করেছিল—সামাজিক কুবিধি উচ্ছেদের জন্ত যথাসাধ্য করবে। সেই প্রতিজ্ঞার ঝোঁকেই এক গরীব গৃহস্থের মেয়েকে সে এক দিন বিয়ে করে ফেললে। এ নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে খানিকটা মনকষাকষি হয়েছিল—আর তার ফলে শুধু শাঁখা সিঁদুর হরিতকী নিয়ে আশা এ ঘরে আসে নি। আশার বাবা বিয়ের যৌতুক যথাসাধ্য দিলেও—সাধারণ্যে প্রচারিত হ'ল অতীনের প্রতিজ্ঞার কথা আর অতীনের পিতামাতার উদারতা। এ নিয়ে যেটুকু আন্দোলন হ'ল—তারই আত্মপ্রসাদে ওঁরা বেশ কিছুদিন স্ফীত হয়ে রইলেন। কালক্রমে বিয়েবাড়ির বাজনা, ভোজ, কুটুম্ব-সমাগম বন্ধ হলে—ব্যাপারটা পুরাতন সংসারের অঙ্গীভূত হয়ে যায়—এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। পুরাতন সংসারের হিসাবনিকাশটা নতুন করে আরম্ভ হ'ল।

পড়শীদের এক জন অতীনের মাকে বললেন, তা যাই বল দিদি, কাজটা অবিশ্যি খুব ভালই হয়েছে কিন্তু এ যেন জাত গেল অথচ পেটও ভরল না গোছের হ'ল।

অতীনের মা সুখদা বললেন, ও কথা বলো না ভাই, সোনায়-মোড়া মেয়ে ফেলে আশাকে ঘরে তুলেছি। একরত্তি সোনা না দিলে বিয়ের অঙ্গহানি হয় বলেই না ওই ফুঁয়ে-ওড়া চুড়ি ক'গাছা ওরা দিয়েছে।

প্রতিবেশিনী বললেন, সে অবিশ্যি তোমাদের মহত্ত্ব—কিন্তু বেয়াইয়ের কি চোখের চামড়া নেই? এমন ঘর বর পেলি—দু' দুটো পাস-করা রোজগেরে ছেলে—বাড়ি ভাড়ার আয়—শত জন্মের তপিস্তেতেও মেয়ের ভাগ্যে জুটতো না—

সুখদা বললেন, তা বেয়াই একটু কঞ্জুস আছেন—

একটু নয়, বিশেষ। প্রতিবেশিনী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন। একখানি ভাল গরদের শাড়ীও কি বেয়ানকে প্রণামী দেওয়া যেত না—সাতটা জা ননদ যখন নেই!

সুখদা ম্লান হেসে বললেন, তা ভাই আশীর্ব্বাদ কর ওরা সুখী হোক—আমাদের আর কতদিনই বা। ছেলে যে জীদের প্রতিজ্ঞা করে বসল গরীবের কুলমান উদ্ধার করবে।

উদ্গত নিশ্বাসটি বুকের মধ্যে টেনে নিলেন তিনি।

২

প্রতিজ্ঞা রক্ষার ব্যাপারটি মিটলে অতীনও ফিরে এল পুরাতন সংসারে। তার এই মহৎ দৃষ্টান্তে সমাজদেহে কোন পরিবর্তন ঘটল বা আর কেউ এতে অনুপ্রাণিত হ'ল কিনা—ওটা অনুভব করতে পারল না। বন্ধুরা তাকে প্রশংসা করলে, কিন্তু বিশেষ মাতামাতি করলে না। মাতামাতি খানিকটা হলে তার ত্যাগের মহিমায় সে হয়ত পুরাতন সঙ্কীর্ণ সংসারের মালিন্য থেকে মুক্তি পেত—মনটাকেও স্ববশে রাখতে পারত। কিন্তু ব্যাপারটা হ'ল বড় একটা পুকুরে ছোট্ট একটি ঢিল ফেলার মত। টুপ করে একটু শব্দ, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্ত জলের সামান্ত একটু কম্পন; সামান্তক্ষণের শব্দ ও কম্পনের সঙ্গে জলতলশায়ী ঢিলটাও লুপ্ত হয়ে গেল দৃশ্যমান জগৎ থেকে।

সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে আশাকে নিয়ে গৌরব করা চলে না—শিক্ষার দিক দিয়েও নয়। নেহাত সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ে—বাপ ভাইয়ের বৃত্তি করণিক—সংসারে অভাব অভিযোগ যথেষ্ট। এ মেয়ের সেবা-প্রত্যাশা চলে—সঙ্গ-প্রত্যাশা চলে না—এরা পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে না—পায়ের কাছে বসবার অভ্যাসে অভিভূত। নিশ্বাস ফেলে অতীন ভাবলে—সংসারে কাব্যের অবসর ক'টি লোকেরই বা থাকে।

শুভদৃষ্টি, ফুলশয্যা ইত্যাদি রঙ-মেশানো অনুষ্ঠানগুলি মিটলে অতীনের নীল আকাশ ধূসর হয়ে এল ক্রমশ। তবু সে চেষ্টা করলে—রঙের খেলাটা জমিয়ে রাখতে।

এক দিন উপহার দেওয়া মেঘদূতের অনুবাদখানি সে আশার হাতে তুলে দিয়ে বললে, ভাল করে পড়ে দেখো, এ অনুবাদটা নাকি ভালই হয়েছে।

দিন দুই পরে অভিমত জানতে চাইলে আশা প্রশংসা করলে বইয়ের ছবিগুলির। ছবিওয়ালা বইয়ের মোহ শিশুমনে যে প্রভাব বিস্তার করে—আশার মেঘদূতকে ভাল-লাগার অর্থ সেই ধরণের। তা ছাড়া প্রিয়জনের দেওয়া জিনিসে যথেষ্ট প্রীতির সঞ্চয় তো আছেই।

অতীন বললে, তোমার গল্পের বই পড়তে ভাল লাগে বুঝি?

আশা সসঙ্কোচে জবাব দিলে, গল্প শুনতে ভালই লাগে তো। আপনি বলুন না একটা গল্প।

সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রটি এই ভাবে বিধ্বস্ত হ'ল।

৩

এক দিন অতীন বললে, সিনেমায় যাবে—শরৎচন্দ্রের একখানা ভাল বই এসেছে।

সিনেমায় গিয়ে অতীন বুঝলে—শরৎচন্দ্রের কাহিনীর কৌতূহলে আশা এখানে আসেনি—ও এসেছে গান শুনতে—কৌতুক দেখতে—আর নতুন পরিবেশে নিজেকে উপভোগ করতে। প্রেক্ষাগৃহের মিশ্র কোলাহলে—সিগারেটের ধোঁয়া ও পুষ্পসারসৌরভে মেশা ভারি বাতাসটা—চা-চানাচুর-আইস-

জীব বিক্রেতার তীক্ষ্ণ চিৎকারে খাদ্ খাদ্ হয়ে মানুষগুলিকে অকারণে উত্তেজিত করে তুলছে। এর বিচিত্র স্বাদে খানিক-ক্ষণের জন্ত সংসার ভুলে-যাওয়ার নেশায় মেতে থাকে অনেকে, আশাও মেতে রইল।

সিনেমার বাইরে এসে অতীন জিজ্ঞাসা করলে, কেমন লাগল?

স্বপ্ন-ঘোর-মাখা চোখে আশা ওর মুখের পানে চাইল। একটু মাথা নেড়ে বললে, আর এক দিন আসবেন?

আসব—যদি গল্পটি আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পার।

গল্প আর কি—এক জনের সঙ্গে এক জনের বিয়ে হবেই। কত বাধা—কত বিপদ। আচ্ছা সংসারে এত খারাপ মানুষ থাকে কেন?

অতীন রাগ করে বললে, ভাল মানুষরা খুব বেশী ভাল কি না—তাই।

ওর বিরূপ কণ্ঠস্বর আশার মনে খোঁচা দিলে, সে বোকার মত একটু হাসলে।

৪

তারপর বন্ধুর গৃহে ফুলশয্যার নিমন্ত্রণ। বন্ধু অতীনের মতই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। না বিদ্যায় না বা উপার্জ্জনে অতীনের হাতে হাত মেলাতে পারে, অথচ বিয়ের পাল্লায় সে পৌঁছেছে সব সতীর্থের পুরোভাগে। বিয়ের পাওনা যা হয়েছে—তা অর্দ্ধেক রাজত্বের রসদ—রাজকন্তা বিত্তশালিনী বলে রূপের বিচার-বিতর্ক তেমন জমেনি।

বন্ধুকে একান্তে পেয়ে অতীন বললে, আমাদের প্রতিজ্ঞার কথাটা বোধ হয়—

বন্ধু বললে, ভুলিনি। কিন্তু বাবা মা এঁরা তো দাবি করেন নি কিছু। ওঁরা স্ব ইচ্ছায় যা দিয়েছেন—

অতীন প্রতিবাদ করলে, কথা ছিল দরিদ্র ঘরে আমরা বিয়ে করব।

বন্ধু ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললে, কন্তাপক্ষকে পীড়ন করব না এই ছিল আমাদের পণ। কে গরীব কে বড়লোক অত চুলচেরা বিচার করবার সময় কোথায়! তা ছাড়া অভিভাবক-দের হেঁটে ফেলাটি আমি পছন্দ করি না।

অতীন খোঁচা দিয়ে বললে, তাঁরা যখন অসুবিধা কিছু ঘটান নি!

বন্ধুও চড়া গলায় বললে, তোমার মত আবেগ ত্যাগের কোন মানে হয় না।

প্রীতিভোজের আসরে এ ধরণের তিক্ত আলোচনা অবাঞ্ছনীয় বলেই অতীন তর্কের জের টানলে না।

ফিরবার পথে আশা বললে, বউ তেমন সুবিধের হয় নি—রংটা চাপা।

অতীন বললে, রূপের অভাবটা রূপোয় পুষিয়ে নিয়েছে—বন্ধুকে বেশ খুশীই দেখলাম।

আশা উত্তর দিতে গিয়ে সামলে নিলে। যার ভাগ্যে রূপ বা রূপেয়া কোনটাই জোটে নি তার সঙ্গে এ আলোচনা চালানো যায় না।

৫

একে একে কয়েকজন বন্ধুর বিয়ে হয়ে গেল। প্রত্যেকের বউভাতে নিমন্ত্রণ খেয়ে অতীন বুঝলে—জীবনের দুটি বিভাগ আছে। সামনে যা মানুষকে চালায়—তার চাকা থাকে পিছনে—দৃষ্টির বাইরে। বয়সের গুণে ভাবপ্রবণতা অদেখা ভূতের মত পেয়ে বসে মানুষকে। এ রোগ ছোঁয়াচে কিন্তু অল্পায়ু। সংসারের হিসাব-নিকাশ এ জীবাণুকে অনায়াসে ধ্বংস করতে পারে—সেজন্ত মহৎ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে এত বিরল। যে দৃষ্টান্ত বইয়ের পাতায় আছে—তাকে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে উদ্ঘাটন করা মানায়। নিমন্ত্রণে-যাওয়ার দামী পোষাকের মত সদাসর্ব্বদা ব্যবহার করা চলে না। তার দৃষ্টান্ত দেখেই কি বন্ধুরা সাবধান হতে পারল। যে যা পেয়েছে সংগ্রহ করেছে—অভিভাবকদের দোহাই দিয়ে। যেন নিজের লোভ বলতে কোন বৃত্তিই পৃথিবীতে নাই—গুরুজনের মনে বেদনা না-দেওয়ার কঠিন কর্ত্তব্যে অনুপ্রাণিত সবাই। সে একা ব্যতিক্রম হয়ে রইল। না উঠবে সে বইয়ের পাতায় —না রইবে সে সংসারের খাতায় হিসাব-দক্ষতার পরিচয়ে। তাকে সবাই বলছে নির্ব্বুদ্ধি—অকেজো—আলস্যপরায়ণ। আশার গরীব বাপ তার নির্ব্বোধ ভাবালুতার সুযোগ নিয়ে খুব ঠকিয়েছে।

বন্ধুরা স্পষ্টই বলে, সংসারে ভুলের সংশোধন আছে—ভাবালুতার মার্জ্জনা নাই। সূর্য্যের আলোয় বসে চাঁদের স্বপ্ন দেখে যারা—তাদের পথ অন্ধকারেই হারিয়ে যায়।

বয়সের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বাড়ছে—মনে জমছে তিক্ততা। পৃথিবীর উপর—মানব-গোষ্ঠীর উপর ঘৃণা বাড়ছে—এ তিক্ততাকে দমন করার কৌশল অতীন জানে না।

আশার সঙ্গে সংঘর্ষ বেড়েই উঠল তার।

৬

মা বলেন, আমাদের ঠকিয়েছেন বেয়াই—ছেলেটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এমন যাদু করলে—

ঠকিয়ে যারা সামনে থাকে না—তাদের জব্দ করার পন্থাও তিনি জানেন—সেই পথ বেছে নিলেন তিনি। দু-দিকের চাপে আশা ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠল। বউকে গঞ্জনার অস্ত্রে বিঁধে বিঁধে—এঁদের মনে হ'ল—অস্ত্রের ধার তেমন নাই—আঘাতের নেশায় নতুন করে মেতে উঠলেন সবাই। নির্যাতনে প্রতিহিংসা চরিতার্থতার আনন্দলাভ হয়—আনন্দ সকরে উৎসাহিত হতেই—ব্যাপারটি বাইরে ছড়িয়ে পড়ল।

এক দিন অতীনের বন্ধু সুরেশ বললে, একটা কথা বলব —রাগ করবি না তো? ভূমিকাটা সেরে অতীনের কাঁধে ঝুঁকে পড়ে সে ফিস্ ফিস্ করে বললে, তুই নাকি বৌয়ের গায়ে হাত তুলিস্? সত্যি?

অতীন তীব্র দৃষ্টিতে চাইল ওর পানে। এ কথা বলার সাহস কোথায় পেল সুরেশ? এই তো কিছু দিন আগে—কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে—অতীনকে মহৎ দৃষ্টান্ত বলেও উল্লেখ করেছিল।

অতীন বললে, হাঁ—তুলি। আর কিছু শুনেছিস?

তুই রাগ করবি জানলে এ কথা তুলতাম না। কিন্তু জানিস তো মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলা—

মহাপাপ—ন্যায়শাস্ত্র বিরুদ্ধ—এই তো? তোমরা যাকে বলি দাও—তাকে খাঁড়া দিয়ে—পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মোলায়েম করে কাট—একেবারে বেড়ে কোপ বসাও না। হত্যাটি দোষের নয়—তার ধরণটাতেই তোমাদের আপত্তি।

বুঝলাম না তোর কথা—

বুঝবার দরকার নাই। রাগ করে অতীন চলে এল সেখান থেকে। চলে এল বটে—সুরেশের কথাটাকে ফেলে আসতে পারল না। সে বুঝতে পারছে না—কেন তার মনের অশান্তি বাড়ছে—আশাকে দেখলে কেন তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। রূপের পিপাসা মিটলো না—আদর্শ কুয়াসার মত গেল মিলিয়ে—তাই কি মনের হাহাকার!

বন্ধুরা বলে, তোর মেজাজ বিগড়েছে—কিছুদিন চেঞ্জে যা।

মা অনুযোগ করেন, যখনই হা-ঘরের মেয়ে ঘরে এনেছি—তখনই জানি একটা অঘটন ঘটবে।

বাবা বৈঠকখানায় বসে খালি তামাকের শ্রাদ্ধ করেন। ছেলের সঙ্গে কোন বিষয়েই পরামর্শ করেন না তিনি। আশার কোল আলো করে একটি অতিথি এলে হয় তো সংসারের রূপ যেত বদলে। কিন্তু ঘটনা চরম পরিণতিতে পৌঁছবে বলে সেটা ঘটল না।

৭

লোকের মুখে অনেক কিছুই রটল। আশার বাবা এক দিন তাকে দেখতে এলেন।

ঘন ঘন কলকে পালটে—তামাকের ধোঁয়ায় ঘরটাকে অন্ধকার করে অতীনের বাবা আত্মগোপন করলেন। বৈঠকখানার পাশ দিয়ে চটির শব্দ তুলে অতীন কোথায় বার হয়ে গেল—শ্বশুরকে একটা প্রণামও করলে না।

অতীনের মা দুয়োরের ফাঁকে উঁকি মেরে অভ্যর্থনা জানালেন নেপথ্যে, দেখ দেখি—এখন কাকে ডেকে মান রক্ষে করি! কুটুম এসেছে বাড়িতে—তা যেমন তাদের ব্যাভারই হোক—এক খালা সাজিয়ে না দিলে লোকে ছি-ছাক্কার করবে না? আমার হয়েছে মরণ—!

সত্যি এঁরা তেমন অভদ্র নন। আশার সঙ্গেও দেখা হ'ল।

মেয়ে বললে, বাবা, তুমি এঁদের ঠকালে কেন?

ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন, ঠকিয়েছি! এঁরা কি তাই বলেন? অতীনই ত—

মেয়ে চোখের জল মুছে বললে, কলেজে পড়ার সময় ছেলেরা তো অনেক কিছুই বলে—সেগুলো সব সত্যি কি!

ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে বললেন, তোকে যন্ত্রণা দেয় খুব?

আশা দ্রুতে বললে, না—না। রোজ এক কথা শুনলে গায়ে লাগে না। তুমি যাও বাবা—আর এস না।

হাঁ রে—তোর গায়ে গহনা দেখছি না যে?

ভারি তো গহনা—কি-ই বা দিয়েছিলে শুনি! মনের জ্বালা চেপে রাখতে পারলে না সে, বাপের পায়ের উপর উপুড় হয়ে দু' চোখের সঞ্চিত ধারাকে মুক্ত করে দিলে।

চোখের জল মুছতে মুছতে আশার পিতা বেরিয়ে এলেন।

৮

চিঠিপত্রের আদান-প্রদান অতঃপর বন্ধ হয়ে গেল। বেশ কিছুদিন কাটল এইভাবে।

আশার মা অনুযোগ তুললে—তার বাবা উত্তর দেন, মেয়েকে পরের ঘরে পাঠিয়েছি—তার সঙ্গে আর কি সম্পর্ক বল। সে বেঁচে থাক—কি নাই থাক—

মা শিউরে ওঠেন, ষাট্—ষাট্ ওকি অলুক্ষণে কথা!

আশার বাবার চোখ জ্বলে ওঠে—গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, বাংলাদেশে মানুষ নেই। এখানকার ছেলেরা ভাবুক, দপ করে জ্বলে ওঠে—মেতে ওঠে—কিন্তু মেরুদণ্ডহীন। এই পণ-প্রথাটিকে কিছুতেই কি উপড়ে ফেলা গেল না বাংলার মাটি থেকে।

আশার মা বলেন, তা কন্যাদানের মর্য্যাদা—

ছাই মর্য্যাদা! আদায়ের কল ছাড়া আর কিছু নয়। ক্ষোভে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল।

খানিক পরে বললেন, আমাদের বিয়ের কথা মনে পড়ে? আমিই কি অন্যায় করিনি?

আশার মা বললেন, তখন আমরা ছেলেমানুষ, কি-ই বা বুঝতাম?

আশার বাবা হেসে উঠলেন, হাঁ—ছোট্ট বীজে যে প্রকাণ্ড গাছ হয়—আর সে গাছ যে বটগাছ তা বুঝেও বুঝিনি। একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, বড় বড় কথার কি দাম—যদি কাজের সঙ্গে তা খাপ না খায়। বিয়ের ব্যাপারটা আজ আর আনন্দের ব্যাপার নয়—যেন দেনা-পাওনায় শোধ তোলাতুলির ব্যাপার।

৯

প্রতিশোধ তোলার মতই ব্যাপারটা ঘটল।

আশ্বিন মাস—বর্ষা পুরোদমে চলছে। শিউলি ফুল ফুটেছে—নদীর ধারে কাশের গুচ্ছও শ্বেত চাদরে পরিণত হয়েছে—দোয়েল পাখীর শিস সকাল বেলাটাকে মধুর করে তোলে। শরৎ এসেছে তবু প্রকৃতির বিষণ্ণতার ঘোর কাটেনি।

আশার বাবার কাছে খবর এল, আশা আর নাই। যদি শেষ দেখা দেখতে চান তো একেবারে শ্মশানঘাটে চলুন—দেরী করবেন না।

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বললেন, না।

প্রতিবেশীরা বললেন, এ মৃত্যু স্বাভাবিক নয়—খুনের চার্জ্জ আনুন। সাক্ষীসাবুদের অভাব হবে না।

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, না।

সবাই জিদ ধরলে, কেন নয়? এ অন্যায়ের শোধ না নিলে ওদের স্পর্দ্ধা বেড়ে যাবে।

বৃদ্ধ বললেন, শোধ তোলার জের টানব না আর। এমনধারা কত ঘটনাই তো হয়েছে—কত লোকই শাস্তি পেয়েছে, কি লাভ হয়েছে আমাদের। স্নেহলতার মৃত্যুর সময় যেখানে আমরা ছিলাম—তার থেকে এক পাও তো এগিয়ে যেতে পারিনি।

দূরে আগমনীর নহবৎ বাজছে—সে সুরে আকৃষ্ট হয়ে সকলেই ক্ষণকালের জন্ত চুপ করে রইলেন। আশার বাবার বিষণ্ণ সুর তার সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে মিশেছে।

অগ্রহায়ণের শেষে খবর এল অতীন আবার বিয়ে করছে। মেয়ের বাপের অবস্থা ভাল। দ্বিতীয়পক্ষ হলেও ছেলেকে তাঁরা যৌতুক দেবেন প্রচুর। প্রাপ্তির তুলনায় অতীনের বন্ধুরা এবার অনেকখানি পিছিয়ে পড়বে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

এমন এক সময়ের কথা আজও আমরা স্মরণ করিয়া থাকি, যখন ভারতভূমির উপর দিয়া জড়বাদের মহাপ্লাবন বহিয়া যাইতেছিল, আর শিক্ষিত সাধারণ তাহার খরস্রোতে আপন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি হারাইয়া বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া উঠিতেছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এক শুভ মুহূর্ত্তে এই জড়বাদের বন্যায় বাধা পড়িল। যে কয়জন বিশিষ্ট পুরুষ সে সময়ে পশ্চিমের বহির্ম্মুখী ভাবধারা রোধ করিয়া স্বদেশের অন্তর্ম্মুখী অমৃতধারা বহাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন চিরদিন নিজের স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই ক্ষণজন্মা মহামানব এক শত দশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ বাগ্মিতাদ্বারা দেশবিদেশে বিস্ময় উৎপাদন করিতেন, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দ্বারা চতুষ্পার্শ্বে শক্তি সঞ্চার করিতেন, অপূর্ব সংগঠনক্ষমতায় জনগণকে চমৎকৃত করিতেন—এসকল কেশবচন্দ্রের মহত্বকথার একদিক মাত্র। তিনি ছিলেন সকল প্রকার অগ্রগতির একনিষ্ঠ সাধক—একাধারে দেশপ্রেমিক, সমাজসংস্কারক ও ধর্ম্মনায়ক। তাঁহার অসামান্য উদ্যম, গভীর দেশাত্মবোধ সেকালে জাতিকে বিষম অনর্থ হইতে রক্ষা করিয়াছিল এবং একালেও জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অধ্যাত্মক্ষেত্রে 'নববিধান' কেশবচন্দ্রের অপূর্ব অবদান। এই 'বিধানে'র সহিত কোন ধর্ম্মের মূলতঃ বিরোধ নাই। অথচ ইহা একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্মমত। ইহার মধ্যে অদ্বৈতবাদী দার্শনিক নিজ মতের সার খুঁজিয়া পাইবেন, আবার ভক্তিবাদী বৈষ্ণবও নানারূপ মিল দেখিতে পাইবেন। 'নববিধানে' কেশবচন্দ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন ও আধুনিক, যাহা ভাল বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই; বিশ্বাস ও যুক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগ—এ-সকলও নববিধানে প্রয়োজনমত স্থান পাইয়াছে।

অতি অল্প বয়সে কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মসাধনা আরম্ভ হয়। যে বয়সে সাধারণ লোক ভবিষ্য সংসারে নূতন নূতন লালসায় উন্মত্ত হইয়া উঠে, জীবনের সেই আরম্ভক্ষণেই তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ হইয়াছিল। বাল্যকালেই তিনি দুষ্কর্ম্মে ঘৃণা বোধ করিতেন, পাপভয়ে অস্থির হইয়া উঠিতেন, পাপের সম্ভাবনাকে ভয়ঙ্কর জ্ঞান করিতেন। প্রথম হইতেই তাঁহার নির্ম্মল হৃদয় আস্তিক্যবুদ্ধিতে প্রদীপ্ত ছিল। কোনদিন সেখানে অবিশ্বাসের মালিন্য প্রবেশ করিতে পারে নাই। তিনি বারংবার প্রার্থনা করিতেন, আর ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেন। তাঁহার 'জীবনবেদে' (২ পৃঃ) তিনি বলিয়াছেন—

"যখন কোন ধর্ম্ম-সমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্ম্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটি ধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক শ্রেণীতে যাই নাই, ধর্ম্মজীবনের সেই উষা-

কালে 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর' এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইল।"

এইরূপে তাঁহার ধর্মজীবন আরম্ভ হয়। ইহার পরে কেশবচন্দ্র ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সংসারে বিতৃষ্ণা এবং ঈশ্বরে নিষ্ঠা ও নির্ভরতাই ভক্তি-সাধনের মূলতত্ত্ব। "অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক যেমন সর্বতোভাবে জননীর উপর নির্ভরশীল হয়, ক্ষুধার্ত গোবৎস যেমন অনন্যপরায়ণ হইয়া মাতৃস্তনের সন্ধানে প্রবৃত্ত থাকে", তেমনই ভক্তসাধক গভীর ব্যাকুলতার সহিত ঈশ্বরকে পাইতে ইচ্ছা করেন। কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরানুরাগও এইরূপ ছিল। ক্রমে সাধনবলে তাঁহার প্রাণে নূতন নূতন অনুভূতির সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি সাধনপ্রণালীতে শুষ্কতা বোধ করিলেন। তাঁহার সাধনার মধ্যে এত দিন জ্ঞানের আধিক্য ছিল; এখন তিনি প্রেমভক্তির পথ ধরিলেন। এই পথের সাধকগণ উপনিষদের পরমতত্ত্বকে কোন এক নামে অভিহিত করিয়া ভজনা করেন। ইঁহাদের নিকট ভগবান বাক্যমনের অগোচর বা ইন্দ্রিয়বোধের অতীত নন। ইঁহারা আরাধ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে পতি, পুত্র, সুহৃৎ, প্রভু পিতা বা মাতা-জ্ঞানে ধ্যান করিয়া থাকেন। পরব্রহ্মের উপাসক কেশবচন্দ্রও প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে উপাস্যকে জননী বলিয়া সম্বোধন আরম্ভ করিলেন। এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"প্রার্থনা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, দেখিতে চাহিলে দেখা যায়, শুনিতে চাহিলে শোনা যায়, এই জানিতাম"।—(জীবনবেদ, ৫ পৃঃ)

এইরূপে একদিক দিয়া তাঁহার সাধনের সহিত বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধানুগা ভক্তির মিল হইল। কিন্তু আর একদিক দিয়া কেশবচন্দ্র তাঁহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি অরূপ ব্রহ্মের ধ্যান করিতেন, কিন্তু ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিতেন।

কেশবচন্দ্রের সাধনপ্রণালী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, বৈষ্ণবের সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে। বৈষ্ণবগণ বলেন—আরাধ্য দেবতা অসীম ও অপরিমেয় হইলেও নিজের বিশিষ্ট ক্ষমতা বলে ভক্তের কাছে সসীম হইয়া ধরা দিয়া থাকেন। যিনি উপনিষদে নাম-রূপহীন নিরাকার ব্রহ্ম, তিনিই যোগীর নিকট জ্যোতির্ময় পরমাত্মা, আবার ভক্তের সম্মুখে রূপধারী ভগবান—

"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

এইরূপ ধারণাই বৈষ্ণব সাধনের ভিত্তি। বৈষ্ণব সাধক চরাচর সকল বস্তুতে আরাধ্যের রূপ দর্শন করেন।

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ।
স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তাঁর মূর্তি।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্তি।—চৈঃ চঃ

কেশবচন্দ্র নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন বটে; কিন্তু বৈষ্ণবভক্ত যেমন স্থাবর-জঙ্গমে আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের স্ফুরণ দেখেন, কেশবচন্দ্রও তেমনই বাহিরের সকল পদার্থে তাঁহার উপাস্য ব্রহ্মকে দেখিতেন। তিনি সাধনার এমন এক অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, যখন সাধক—

"সংসারের ভিতর যে ঈশ্বর বাস করেন, বাহ্য তাবৎ পদার্থে কেবল তাঁহাকেই দর্শন করেন।...তখন সাকারেও নিরাকার দর্শন হয়।...যোগী বাহিরের অনন্ত পদার্থ ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে নিরাকার ব্রহ্মকে দর্শন করেন। যাহা দেখেন তাহারই মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেন।" (ব্রহ্মগীতোপনিষদ্ ৫৬, ৫৭ পৃঃ)।

ভক্তিসাধনায় ধ্যানকালে অখণ্ড ব্রহ্মকে আপনার মনের মত ক্ষুদ্র করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। কেশবচন্দ্রও সাধনকালে ব্রহ্মকে অল্পাকাশে ধারণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"ঈশ্বর সৎ, সর্বব্যাপী। সাধনের অবস্থায় সাধক তাঁহাকে অল্পাকাশে ধারণ করিবেন।"

কিন্তু এই কথা বলিয়াই আবার সাবধান করিয়া দিয়াছেন—"এই অল্প স্থানে আবদ্ধ রাখিলে পৌত্তলিকতা হয়।" সুতরাং "অল্পাকাশে ধারণ" করিলেও "সঙ্গে সঙ্গে সর্বাকাশে স্মরণ" করিতে হইবে (ব্রহ্মগীতোপনিষদ্ ১৫ পৃঃ)। এই সকল ভাবের সহিত বৈষ্ণব উপাসনা-প্রণালীর বিরোধ দেখা যায় না।

সংসারে সমস্ত বস্তুই পরব্রহ্মের রূপভেদ মাত্র—ইহা উপনিষদের কথা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—চরাচরে আমি ছাড়া কিছু নাই। সকল পদার্থে ব্রহ্মদর্শনের উপদেশ দিয়া কেশবচন্দ্র সেই তথ্যই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতমতের মায়াবাদে বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু অদ্বৈতীর যাহা মূল কথা—জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের ঐক্য—তাহা পূর্ণরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। 'ত্রিনীতিবাদ' বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া তিনি বলিলেন—

"এই ঈশ্বর, এই আমি, এই তোমরা—যতক্ষণ এই তিন স্বতন্ত্র দেখিতেছি, ততক্ষণ আমরা ভ্রান্ত, ত্রিতাপে সন্তপ্ত। এই ভেদজ্ঞান হইতে নানাপ্রকার অধর্ম, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়। যতক্ষণ আমরা এই তিনের মধ্যে এক না দেখিতে পাই, ততক্ষণ কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারি না।"

ইহাই ত অদ্বৈতবাদ। কেশবচন্দ্র তাঁহার 'নববিধানে' অদ্বৈতবাদের সহিত ভক্তির মিলন ঘটাইয়াছিলেন। 'যিনি ব্রহ্ম তিনি হরি' এই কথার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

"যদি বৈষ্ণবের হরিকে ছাড়িয়া কেবল বেদান্তের ব্রহ্মকে লও, তবে অনেক অনিষ্ট হইবে। সকলে শুষ্ক-হৃদয় হইয়া পড়িবে। এখনকার হরিভক্তির সঙ্গে সঙ্গে বৈদান্তিক ব্রহ্মযোগকে একত্র মিলিত কর। যোগভক্তির যখন সম্মিলন হইল, হরিব্রহ্ম যখন অভেদ হইলেন, তখন বঙ্গবাসীর সৌভাগ্যের দিন উদিত, ভারতবাসীর সুখের দিন নিকটস্থ হইল।

প্রকৃতপক্ষে কেশবচন্দ্র ভক্তিবাদ, অদ্বৈতবাদ বা কোন বিশেষ বাদেরই খুঁটিনাটির অনুগামী ছিলেন না। তিনি ভগবদ্গীতা ও চৈতন্যচরিতামৃতের এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" গীতা

"যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।" চৈঃ চঃ ২।৮

'তীর্থচতুষ্টয়' নামক বাণীর মধ্য দিয়া তিনি স্পষ্ট করিয়াই সার কথা বলিয়া গিয়াছেন—

"যোগাসনে বসিয়া যদি দেখ, দেখিবে ধর্ম্মে ধর্ম্মে মূলগত বিবাদ নাই। আত্মরাজ্যে যাঁহারা বাস করেন, বিবাদের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বলেন, কি আশ্চর্য? ঈশার সঙ্গে গৌরাঙ্গের বিবাদ? কিসে কিসে বিবাদ হয়? অভেদ যেখানে, সেখানে বিবাদ হইবে? সমুদয় সত্য এক।"

কেশবচন্দ্র সমুদয় সত্য এক বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার 'নববিধানে' বেদ, কোরাণ, বাইবেল সবই মান্য। বুদ্ধ, যীশু, গৌরাঙ্গ সকলেই পূজ্য।

ন্যূনাধিক শতবর্ষ পূর্বে কেশবচন্দ্রপ্রমুখ মহাপুরুষগণ এদেশে একটা আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহাতে জাতির উপকার হইয়াছিল, সে কথা বলিয়াছি। সেরূপ আবহাওয়ার আবশ্যকতা আজ আমরা পদে পদে অনুভব করিতেছি। মনে হয়, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সকল দেশেই মানুষের অধ্যাত্মভাব এবং দৈনন্দিন কাজকর্মের উপর তাহার প্রভাব বিশেষ ভাবে কমিয়া গিয়াছে। মানুষ যেন আর সাংসারিক সীমার ঊর্দ্ধে অপর কোন কথা ভাবিতে পারে না। চারিদিকেই অন্যায়, অপচার বৃদ্ধি পাইতেছে; নিয়মানুবর্তিতার হ্রাস হইতেছে। এইরূপ নৈতিক অবনতি ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির ব্যবহারেও যেমন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনই দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। এসকল অনর্থের প্রধান কারণ হইতেছে ধর্মবুদ্ধির অভাব। জড় জগতের বাহিরে যে এক অদৃষ্ট শক্তি বর্তমান আছে, সমস্ত জীবের মধ্যে যে এক আত্মা অনুস্যূত রহিয়াছে, এ জ্ঞান থাকিলে কেহই এত অন্যায় করিতে পারে না; আত্মিক দৃষ্টি থাকিলে কখনই আত্মাশ্রয়ী জীবকে অবজ্ঞা করা যায় না। এইজন্যই আজ আধ্যাত্মিক আলোচনার বড় বেশী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

আত্মিক দৃষ্টির প্রসার না হইলে পৃথিবীর কল্যাণ নাই। বৈজ্ঞানিকগণের যে উদ্ভাবনী শক্তি সর্বতোভাবে মানব-সমাজের কল্যাণার্থ নিয়োগ করা উচিত, তাহাই আজ ধ্বংসের কার্য চালাইতেছে। ইহার মূলে আছে সেই আত্মিক দৃষ্টির ন্যূনতা। আমাদের দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অনেকেই বিজ্ঞানচর্চার বৃদ্ধির জন্য প্রযত্ন করিতেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জড় বিজ্ঞানের সহিত সমান ভাবে আত্মবিজ্ঞানের অনুশীলন না হইলে ফল ভাল হইতে পারে না। জগৎ কেবলই বহির্মুখে চলিতেছে, তাহাকে অন্তর্মুখ করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকগণও এখন এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর অ্যালেকসিস্ ক্যারেল[১] ও জে. বি. রাইন[২] এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক রীতিতে আত্মানুশীলন চলিতেছে। ডক্টর রাইন প্রয়োগশালায় পরীক্ষা দ্বারা এখন পর্য্যন্ত এইটুকু প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন যে, মানুষের মধ্যে শরীর-নিরপেক্ষ আরও কিছুর অস্তিত্ব আছে। জাগতিক বস্তুর মত আত্মাকে সর্বপ্রকারে বৈজ্ঞানিকের প্রয়োগশালায় বিশ্লেষণ করা চলিবে, এমন আশা করা যায় না। এইখানে আত্মার একটা স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়া মনে করি।

যাহা হউক, যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আত্মিকবোধের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। এই আত্মিকবোধের ফলেই আমাদের বৈদিক ঋষি বিশ্বজনের হিতের জন্য সুবুদ্ধি প্রার্থনা করিতেন, বহুজনের প্রীতির জন্য ধন-সম্পদ্ কামনা করিতেন। আত্মিকবোধের ফলেই ভক্ত প্রহ্লাদ সকল প্রাণীর আর্তি নিজে বহন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে দুঃখহীন করিতে চাহিয়াছিলেন। আত্মিকবোধের ফলেই বোধিসত্ত্বগণ অপরের মঙ্গলের জন্য নানা কষ্ট বরণ করিতে পারিতেন, আর এই আত্মিকবোধের ফলেই বৈষ্ণব ভক্ত নিজে দুঃখ সহিয়া অপরকে রক্ষা করিবার কথা চিন্তা করেন—"ধর্ম বৃক্ষ সহে আনের করয়ে পোষণ।"

(ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পঞ্চষষ্টিতম তিরোধান বার্ষিকী উপলক্ষে ৮ই জানুয়ারী ১৯৪৯ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা।)

১. *Man, the Unknown,*
২. *The Reach of the Mind.*

মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বর্ত্তমানে দ্রব্যমূল্য এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, দেশের সর্ব্বশ্রেণীর, বিশেষতঃ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতরে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মূল্যবৃদ্ধির দরুনই নানাক্ষেত্রে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে এবং সরকারের ও মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন বিপুল ভাবে প্রসারলাভ করিতেছে। শিক্ষক-সম্প্রদায়—যাঁহারা চিরকাল অতি ধৈর্য্যশীল বলিয়াই পরিচিত, তাঁহারাও সম্প্রতি প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিবাদ-স্বরূপ ধর্ম্মঘট পালন করিয়াছেন। শ্রমিকশ্রেণীর ত কথাই নাই—ধর্ম্মঘট ও সালিসী বিচার (ট্রাইবিউনাল) তাহাদের মধ্যে লাগিয়াই আছে—বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেহই সুখী হইতে পারিতেছে না। সালিসের রায়ে শ্রমিক-মালিক উভয়েই অসন্তুষ্ট, সুতরাং ইহাতে অসন্তোষের আগুন না নিবিয়া ক্রমেই অধিকতর প্রচণ্ডভাবে জ্বলিয়া উঠিতেছে। সমাজ-জীবনে এরূপ অবস্থা ভাবী বিপ্লবের সূচনা করে। রাষ্ট্রের দিক দিয়া এরূপ অবস্থা ও তাহার পরিণতি আরও ভয়াবহ—এজন্ত চিন্তাশীল রাষ্ট্রনায়ক ও অর্থনীতিবিদ্‌গণ এই সমস্যা সমাধানের জন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। গত বৎসর কলিকাতা, বোম্বাই এবং দিল্লীতে অর্থনীতিবিদ্‌গণ এবং সরকারের মুখপাত্র প্রভৃতি সমবেত হইয়া বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির কারণনির্ণয় ও তন্নিরাকরণের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্ত বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বোম্বাই ও কলিকাতায় সাধারণতঃ ধনবিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ্‌গণ এবং দিল্লীতে সরকারের মুখপাত্র, ধনিক-সম্প্রদায় ও শিল্পপতিদের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। কিরূপে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিয়া অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি স্বল্প মূল্যে সাধারণের লভ্য হয়, সকলেই সেই বিষয়ে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিয়াছিলেন। এখন বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচন করা যাক। মুদ্রাস্ফীতি জিনিষটা কি? এ প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয়, টাকা ফাঁপিয়া উঠা—তাহা হইলেও বিষয়টি ঠিকমত বোধগম্য হইল না। সঙ্গে সঙ্গেই আরও কতকগুলি প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসে: টাকা আবার ফাঁপিয়া উঠে কিরূপে? আর ফাঁপিয়া উঠিলেই বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয় কেন? অপিচ এইরূপ ব্যাপারের সহিত সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেদের কিরূপ সম্বন্ধ? এই সামান্ত ব্যাপার হইতেই দেশ ও রাষ্ট্রের এই বিপুল অনর্থ ঘটা সম্ভব হইলে, রাষ্ট্রনায়কেরা গোড়াতেই এই অনাচার রোধ করিবার চেষ্টা করেন নাই কেন? আরও অনেক প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে, সেগুলির উত্তর দেওয়া সহজ নহে এবং যে মূল সমস্যা লইয়া এই সকল প্রশ্নের উদ্ভব তাহার সমাধান খুবই কঠিন।

বিষয়টি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে গোড়াতেই সরকারী আয়ব্যয়ের একটু আলোচনা প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থদ্বারা যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সরকারী আনুমানিক আয় এবং ব্যয়ের বরাদ্দকে বাজেট বলা হয়। আদায়ীকৃত কর হইতে অধিকাংশ সরকারী আয় হইয়া থাকে। কর আদায় নানারূপে হয়, যথা—ভূমি-রাজস্ব, আমদানী-রপ্তানী-কর, নানা প্রকার উৎপাদন-কর, এক্সাইজ, আয়কর, রেলের আয় প্রভৃতি। যাঁহারা সরকারী চাকুরীয়া তাঁহাদের আয় নিশ্চিত, কিন্তু সরকারের নিজস্ব আয় অনিশ্চিত। কারণ কোন্ খাতে কর কতটা আদায় হইবে,—কি পরিমাণ ঘাট্‌তি পড়িবে তাহা বৎসরের শেষেই জানা যায়—বাজেটের অঙ্ক আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দ মাত্র। কিন্তু নিশ্চিত ও নির্দ্ধারিত ব্যয় গবর্ণমেণ্টকে রাষ্ট্ররক্ষার জন্ত করিতেই হয়, নতুবা দেশে বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ, বিপ্লব, অব্যবস্থা ইত্যাদির আশঙ্কা থাকে। যদি আয়ে ঘাট্‌তি পড়ে তাহা হইলেও সরকারের উপযুক্ত অর্থের সংস্থান করিতেই হয়। ইহা নানা উপায়ে হইতে পারে। একটা উপায় হইতেছে—ধার বা কর্জ্জ করিয়া খরচ চালানো। এই কর্জ্জ স্বল্প-মেয়াদী হইলে গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারী বিল বেচিয়া অর্থ সংগ্রহ বা কর্জ্জ করেন। আর দীর্ঘ-মেয়াদী হইলে দস্তুর মত কর্জ্জ (Loan) করিতে হয়। কর্জ্জ করিলে অবশ্যই সুদ দিতে হয়, তাহাতেও গবর্ণমেণ্টের খরচ বাড়িয়া যায়। কারণ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ছয় মাস অন্তর গবর্ণমেণ্টকে ধার-করা টাকার সুদ দিতে হয় এবং কর্জ্জের মেয়াদ ফুরাইলে আসল টাকা গবর্ণমেণ্টকে পরিশোধ করিতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টকে আয় বাড়াইয়া অর্থাৎ করবৃদ্ধি করিয়া এই সকল ঋণপরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হয়। তবে সে ক্ষেত্রেও ব্যাপার খুব সহজ নহে, কারণ করবৃদ্ধি করিলেই যে আশানুরূপ কর আদায় হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই, অপর পক্ষে করবৃদ্ধি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের স্বার্থে আঘাত করে বলিয়া তাহার দরুন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরেও গোলযোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং বেশী সুদ দিয়া সরকারের কর্জ্জগ্রহণ যেরূপ দেশ ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর, তেমনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বেশী কর ধার্য্য করিয়া আয়বৃদ্ধিও নানা জটিলতার সৃষ্টি করে। গবর্ণমেণ্টকে অবশ্য এই উভয় নীতির মধ্যে কোন্‌টি কতটা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া কাজ করিতে হয়। কারণ এতদুভয়ের ঘাতপ্রতিঘাত ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে সরকারী নীতির প্রতিক্রিয়া অপরিহার্য্য। ধরুন, কর আদায় দ্বারা খরচ কুলাইল না, কর্জ্জ করিয়াও বিশেষ ফললাভ

হইল না অর্থাৎ ব্যয় নির্ব্বাহ করা গেল না তখন গবর্ণমেণ্টকে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—তাহাকে রাষ্ট্রযন্ত্র সুষ্ঠুভাবে চালু রাখিতেই হইবে, কারণ রাষ্ট্রের সুপরিচালনার উপরেই ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের কল্যাণ নির্ভর করে।

প্রথম দুই উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও যদি আশানুরূপ ফললাভ না হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শেষ পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না—অর্থাৎ সরকারকে তখন মুদ্রাস্ফীতির আশ্রয় লইতেই হয়। কর্জ্জ গ্রহণ করিলে গবর্ণমেণ্টের কর্জ্জদাতাকে সুদ দিতে হয় এবং পরিশেষে মূলধন পরিশোধ করিতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত ঝঞ্ঝাট এড়াইবার উপায়ও গবর্ণমেণ্টের আছে। গবর্ণমেণ্ট বা রাষ্ট্র যদি কাগজের মুদ্রা ছাপাইয়া বিবিধ ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে কর আদায় এবং ঋণ গ্রহণ ব্যতিরেকেই রাষ্ট্রের কার্য্যাদি পরিচালনার ব্যয়-সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব হয়। ইহাতে প্রথমতঃ কাহাকেও অতিরিক্ত কর দিতে হইল না, দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টকেও অর্থাভাবের জন্ত কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইল না, অপিচ গবর্ণমেণ্টের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইল। একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই ব্যবস্থার ফলে গবর্ণমেণ্ট বিনা সুদের প্রতিশ্রুতি-পত্র (Hand-note) দ্বারা দেনা মিটাইলেন। কাগজী মুদ্রা আর কিছুই নহে চাহিবামাত্র পরিশোধনীয় সরকারী প্রতিশ্রুতি।

যদি এই ভাবে গবর্ণমেণ্টের ঘাটতি বাজেটের ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে দেশের আর্থিক গতির স্রোত কোন্ দিকে ফিরে তাহা বিবেচ্য। একথা সহজেই বুঝা যায় যে, এই ব্যবস্থায় কাগজী মুদ্রা ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে, কেননা এইরূপ বৃদ্ধিতে গবর্ণমেণ্টের সাময়িক অসুবিধা খুবই কম—ছাপার কারখানা মোটামুটি চালু রাখিলেই হইল। কাগজী মুদ্রার সাহায্যে ব্যয় নির্ব্বাহ করিলে পরোক্ষে ইহা সাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের সামিল হয় অথচ ইহার জন্ত সুদ দিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের অর্থকৃচ্ছ্রতার সময় ইচ্ছাকৃত না হইলেও এরূপভাবে ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সরকার অনেক সময় বাধ্য হইয়া থাকেন। যুদ্ধবিগ্রহের সময় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর বাড়াইয়া বা কর্জ্জ করিয়া ব্যয় নির্ব্বাহ সম্ভব হয় না, সুতরাং বাধ্য হইয়া গবর্ণমেণ্টকে শেষোক্ত পন্থা অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির আশ্রয় লইতে হয়। ফল যে পরিণামে ভাল হয় না তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা দেশের আর্থিক জীবনে যে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে দেশ ও জাতিকে তাহার শোচনীয় কুফল বহু বৎসর ধরিয়া ভোগ করিতে হয়।

এখন এই মুদ্রাস্ফীতির সহিত দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধির কি সম্বন্ধ সেকথা আলোচনা করা যাক। প্রতিদিনের বৈষয়িক অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, যাহা পরিমাণে বেশী পাওয়া যায় তাহার দাম কমে। প্রত্যেক পণ্যদ্রব্যের পক্ষেই এ কথা খাটে। অবশ্য আর কোন পরিবর্তন যদি না হয় এবং পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ না বাড়ে তবেই ঐ দ্রব্যের মূল্য কমে। ধরুন, টাকার পরিমাণ বাড়িয়া চলিল, কিন্তু সেই টাকায় যে পরিমাণ জিনিষের কেনা-বেচা হইবে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি হইল না তখন এটাই স্বাভাবিক যে দ্রব্যের অনুপাতে টাকার পরিমাণ বেশী হইয়া পড়িবে এবং ফলে বেশী টাকায় জিনিষ বিকাইবে। এ অবস্থায় সাধারণ লোকে বলিবে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়াছে। দ্রব্যের মূল্যকে টাকা দ্বারা প্রকাশ করিলেই আমরা তাহাকে বলি 'দাম' বা 'মূল্য'। টাকা দ্বারা দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ হয়। এই টাকা মূল্যবান ধাতুনির্ম্মিত হইলে একটা সুবিধা এই যে, অন্ত ভাবে উক্ত মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে যখন উহার মূল্য হ্রাস পায় তখন সঙ্গে সঙ্গেই লোকে ঐ মুদ্রার ধাতু-দ্রব্য গলাইয়া নানাবিধ অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতে ও শিল্পের কাজে লাগাইতে পারে। কারণ ধাতব মুদ্রার নিছক বিনিময়ের জন্ত ব্যবহার ব্যতীত অন্যান্ত ব্যবহারও চলে। লোকে সস্তা মোহর এবং মুদ্রার সোনা বা রূপা গলাইয়া গয়না গড়াইতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র দ্রব্য ক্রয় ছাড়া অন্য কোনো দিক দিয়া লাভজনক ভাবে কাগজী টাকার ব্যবহার চলে না, উহার প্রচলন বিনিময়ের জন্য—জিনিষ কিনিবার জন্য। ইহার পরিমাণ যত বাড়িবে ততই বিনিময়ের জন্য ইহা বাজারে আসিয়া জমা হইতে থাকিবে, ফলে ইহার অর্থাৎ টাকার দাম বা বিনিময়-মূল্য হ্রাস পাইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা চড়া দামে দ্রব্যাদি কিনিতে হইবে। পরিমাণ যত বাড়িবে টাকার দাম ততই কমিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের দাম বাড়িয়া চলিবে। এক কথায় টাকার দাম কমার অর্থ জিনিষের দাম বাড়িয়া যাওয়া এবং জিনিষের দাম কমার অর্থই হইতেছে টাকার দাম বৃদ্ধি পাওয়া। গত মহাযুদ্ধের বকশিস্‌স্বরূপ আমরা বহু কাগজী মুদ্রা লাভ করিয়াছি—ফলং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। যুদ্ধ থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ্ এবং চিন্তানায়কগণ যাহাতে এই মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা যায় তাহার পন্থা আবিষ্কারের জন্য গবেষণা করিতেছেন এবং এই অস্বাভাবিক মুদ্রামূল্য বৃদ্ধির প্রতিকারের জন্য নানা কার্য্যকরী পন্থার নির্দ্দেশও তাঁহারা দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে ভাল কিছু হইবার নহে। যদি বা আমরা স্বরাজ পাইলাম তো তাহা আসিল দেশকে খণ্ডিত করিয়া—লক্ষ লক্ষ লোকের ভিটা-মাটি উৎসন্ন হইল, রক্তাক্ষরিতে ইতিহাস হইল কলঙ্কিত। সর্ব্বোপরি ইহাতে আমাদের আর্থিক জীবন বিপর্য্যস্ত করিয়া এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইল যে, জটিল সমস্যা-জালে আজ আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া পড়িয়াছি। সেগুলির সমাধানের আশা যেন আলেয়ার আলোর মত ক্রমেই দূরে সরিয়া গিয়াছে।

এখন এদেশের বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির কথা ছাড়িয়া দিলেও গত এক বৎসরের মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলি খতাইয়া দেখার প্রয়োজন আছে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ১৯৪৬-৪৭ সন হইতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ যথাক্রমে কেন্দ্রের এবং প্রদেশগুলির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে বিশেষ ভাবে এই মুদ্রাস্ফীতির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। অবশ্য গবর্ণমেণ্টের আয়ের অঙ্কে ঘাটতি পড়াতেই এরূপ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৪৬-৪৭, ১৯৪৭-৪৮ এবং ১৯৪৮-৪৯ সনের আনুমানিক ঘাটতি যথাক্রমে ১০৭,৪৭ এবং ১২৪ কোটি টাকা। প্রাদেশিক বাজেটে চল্‌তি খাতে এ পর্য্যন্ত ঘাটতি ১১ কোটি, আর ইহাদের মূলধন খাতে খরচের ঘাটতি ৫১ কোটি অর্থাৎ মোট ঘাটতি ৬২ কোটি টাকা। সুতরাং চল্‌তি বৎসরের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এ দুটির সম্মিলিত ঘাটতির পরিমাণই ১৮৬ কোটি টাকা। নানা কারণে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে আর ঘাটতির পরিমাণও ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। অনেক উন্নয়ন-পরিকল্পনা যথা দামোদর উপত্যকা এবং মহানদী পরিকল্পনা প্রভৃতি, কর্ম্মচারীদের মাহিনা বৃদ্ধি, বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বসতি ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং কাশ্মীর যুদ্ধ ইত্যাদি নানা ব্যাপারে রাষ্ট্রের ব্যয় ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে। অথচ ওদিকে দেশের উৎপাদনবৃদ্ধি তো হয়ই নাই, বরং শ্রমিকগণের অসন্তোষ ও পৌনঃপুনিক ধর্ম্মঘটের দরুন বহুক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। বিদেশী মাল (যাহা গবর্ণমেণ্টের মতে কম প্রয়োজনীয়) আমদানী সম্পর্কে বাধা-নিষেধ আরোপ করায় ঐ সকল দ্রব্যও উপযুক্ত পরিমাণে বাজারে আসিতেছে না। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই নীতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ১৯৪৭-৪৮ সনে গবর্ণমেণ্টের ১৫০ কোটি টাকা কর্জ্জ করিয়া যোগাড় করিবার কথা ছিল কিন্তু ৭৫ কোটি টাকার বেশী পাওয়া যায় নাই। এদিকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যের দ্রব্যাদি—যথা কাপড়-চোপড় এবং কোন কোন স্থানে, খাদ্যশস্য বিনিয়ন্ত্রণের পর হইতেই অগ্নিমূল্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রতিক্রিয়া যে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কিরূপ ভয়াবহ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। উৎপাদনবৃদ্ধি সম্বন্ধে শিল্পপতিগণও খুব উৎসাহ দেখাইতেছেন বলিয়া মনে হয় না, বরং তাঁহাদের কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের সঙ্কল্পিত, অদূর ভবিষ্যতে শিল্পের জাতীয়করণ নীতির দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। এই সকল পুঁজিপতি গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণ যোগাইয়া থাকেন, শিল্পে অর্থনিয়োগ করিতে ভয় পান অথচ ইঁহাদেরই মোটা লাভের অঙ্ক দিন দিন স্ফীত হইতে থাকে। কিন্তু এই প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ইঁহাদিগকে অবিলম্বে নিজেদের কর্ম্মপন্থা বদলাইতে হইবে নতুবা অদূর ভবিষ্যতে সমষ্টির অকল্যাণকর কাজের জন্য ইঁহাদিগকে বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে।

যে মুদ্রাস্ফীতি আজ সমগ্র দেশে হাহাকারের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা রোধ করিবার জন্য এবং ইতিমধ্যেই তাহা যে কুফল প্রসব করিয়াছে তাহা বিদূরিত করিবার জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি কার্য্যকরী পন্থা অগৌণে অবলম্বন করা প্রয়োজন—

১। জীবনধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সম্পর্কে অবিলম্বে পুনরায় সরকারী মূল্য এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন। এই সকল দ্রব্যাদি হইতেছে—খাদ্যশস্য, শাক্‌সব্জী, খনিজ-তৈল, চিনি, বস্ত্র, লবণ, কয়লা ও কুইনাইন প্রভৃতি। গৃহনির্ম্মাণের উপকরণাদিও ইহার অন্তর্গত।

২। বিদেশ হইতে আমদানী সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্যের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। অবশ্য এই আমদানীর বিনিময়ে ভারতকেও বিদেশে যথেষ্ট পণ্যদ্রব্য রপ্তানী করিতে হইবে। নতুবা দেশের শিল্পোন্নতির জন্য কলকজার আমদানী ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা।

৩। যে সকল দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্ট হাতে লইয়াছেন তাহাও চালু রাখিতে হইবে, কারণ আশু না হইলেও ভবিষ্যতে এই সকল পরিকল্পনার কার্য্যকরী প্রয়োগ দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইবে।

৪। যাহাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় তাহার জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে সক্রিয় চেষ্টা।

৫। আর এরূপভাবে ব্যবসা ও শিল্পপতিগণের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং কর ধার্য্য করিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নীতিতে আস্থাবান থাকিয়া দেশের আর্থিক উন্নতির সহায়ক হন। অবশ্য ভার ও কুল দুই-ই রাখা খুবই কঠিন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কারণ আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামো ধনতান্ত্রিক—ইহাকে সমাজতান্ত্রিক করিয়া তুলিতে কিছু সময়ের আবশ্যক। প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ, বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, রেল ও যানবাহন ব্যবস্থা, সেচ-ব্যবস্থা, সার উৎপাদন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পরিসংখ্যান প্রস্তুত, কৃষিবিষয়ক গবেষণা প্রভৃতি এখন হইতে গবর্ণমেণ্টের নিজ হস্তে গ্রহণ করা উচিত।

৬। যাহাতে সাধারণের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বসাধারণকে উৎসাহ দান।

৭। আমাদের দেশে অগণিত দীনদরিদ্র লোকের মধ্যে কুটির-শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। চরকার প্রসার এই ব্যাপারে যাহাতে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

৮। সর্ব্বশেষে এই দুঃখদৈন্যের মধ্যেও যাহাতে জনসাধারণ সঞ্চয়ী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। কারণ এই উপায়েই আমরা সামাজিক মূলধন বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনের সহায়তা করিতে পারি। সোভিয়েট রুশিয়ার মত সাম্যবাদী রাষ্ট্রও দেশবাসী এবং শ্রমিকদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

সৌরশক্তির উৎস

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

১৯৪৫ সনের ৬ই আগষ্ট প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়া-ছিলেন, সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধের জন্ত যাহারা দায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে সেই শক্তি ব্যবহৃত হইতেছে যাহা দ্বারা সূর্য্য তাহার বিপুল শক্তি আহরণ করে।

ঐ বৎসরেই জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর দুইটি মাত্র এটম্‌-বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। রুজভেল্টের কথায়, এটম্‌-বোমার অমিত শক্তি এবং লক্ষ কোটি বৎসর ধরিয়া সূর্য্য আলো ও উত্তাপরূপে যে শক্তি বিতরণ করিতেছে তাহার মূল উৎস একই। ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য।

সার জেম্‌স্ জিন্‌স্ বলেন, কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আলো ও উত্তাপ ব্যতীত পৃথিবী জীবনধারণের সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং এই পৃথিবীতে অদ্যাবধি যে প্রাণিজগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার কারণ পৃথিবী সূর্য্য হইতে উপযুক্ত পরিমাণেই আলো এবং উত্তাপ আহরণ করিতেছে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে, সূর্য্য যে প্রতিনিয়ত আলোরূপে এত প্রভূত শক্তি হারাইতেছে তাহার ভবিষ্যৎ কি? সৌরশক্তির পরিমাণ কি অফুরন্ত? যদি না হয়, তবে এমন এক দিন আসিবে কি যখন সূর্য্য আর প্রাণিসমূহের জীবনধারণোপযোগী আলোক-শক্তি বিকিরণ করিতে সমর্থ হইবে না। জিন্‌স বলেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাণি-জগতের নিমিত্ত তৈয়ারী হয় নাই। একান্ত "আকস্মিকভাবে"ই যখন পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব হইয়াছে তখন এক দিন আকস্মিকভাবেই ধরাপৃষ্ঠে জীবন বলিতে কিছুই থাকিবে না তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে! তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সূর্য্যের জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণিজগতের অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত, আর সূর্য্যের ভবিষ্যৎও "অন্ধকার" বলিয়াই মনে হয়। তাই সৌরশক্তির উৎস এবং তাহার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার নিমিত্তই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

দুই শত কোটি বৎসর ধরিয়া সূর্য্য যে বিপুল পরিমাণ শক্তি তাপরূপে হারাইয়াছে তদ্দৃষ্টে মনে করা স্বাভাবিক যে, সূর্য্যের তাপসঞ্চয় অপরিমিত। এত অধিক তাপসঞ্চয়কারী পদার্থের উত্তাপ ন্যূনকল্পে এক শত কোটি ডিগ্রী (সেণ্টিগ্রেড) হওয়া একান্তই উচিত, অথচ অন্যরূপ পরীক্ষায় উহা মাত্র সাত কোটি ডিগ্রী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উত্তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের পদার্থরাশির তাপধারণ ক্ষমতার বৃদ্ধি হইলেও এত অধিক তাপসঞ্চয় করা সূর্য্যের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রম প্রমাণিত হইয়াছে। বলা যাইতে পারে যে, কোন রাসায়নিক উপায়ে দহন-ক্রিয়ার নিমিত্ত সূর্য্য এতাদৃশ শক্তি যোগাইতেছে। কিন্তু এত প্রচণ্ড শক্তিদানকারী কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথা আমরা জ্ঞাত নই। তদ্ব্যতীত সূর্য্যের অভ্যন্তরের উত্তাপ বাদ দিলেও বহির্ভাগে যে উত্তাপ আছে তাহাতে কোন প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরও দুইটি মতবাদ প্রচলিত হয়। আমরা জানি, কোন যান্ত্রিক শক্তিকে তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে। অনেকের অভিমত, সূর্য্যের বায়ুমণ্ডলে উল্কারাশির সংঘর্ষণজনিত উত্তাপই সূর্য্যে শক্তি যোগাইতেছে। হেলম্‌হোজ্‌ এবং কেলভিন্‌ বলিলেন, সূর্য্যের আয়তন অনবরতই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং এইজন্ত যে স্থিতিস্থাপক শক্তির সৃষ্টি হইতেছে তাহাই হইল সৌরশক্তির উৎস। কিন্তু এই উভয় মতবাদই ধোপে টিকে নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সৌরশক্তির উৎস সম্বন্ধে কোন মতবাদই গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ১৮৯৬ সনে হেন্‌রী বেকেরেলের 'স্বতঃদীপ্তি' (Radio activity) আবিষ্কার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে যুগান্তর আনয়ন করিয়া-ছিল; জ্যোতির্ব্বিদ্যাও বাদ পড়ে নাই।

১৮৯৯ সনে লর্ড রাদারফোর্ড প্রমাণ করিতে সমর্থ হইলেন যে, রেডিয়াম্‌, ইউরেনিয়াম্‌ প্রভৃতি স্বতঃদীপ্ত ধাতু হইতে অনবরত আলফারশ্মি, বিটারশ্মি, গামারশ্মি নামে তিন প্রকার শক্তিরূপে রশ্মি নির্গত হইতে থাকে। এইরূপ শক্তি নিঃসরণ করিয়া উক্ত ধাতুগুলি লক্ষ লক্ষ বৎসর পর সাধারণ সীসায় পরিণত হয়। তিনি ইহাও বলিলেন যে, এমনিধারা রশ্মিরূপে যে শক্তি পাওয়া যাইতেছে তাহার কারণ হইল পদার্থের পরমাণুর নিরত পরিবর্ত্তন এবং এই পরিবর্ত্তনটি নির্ভর করিতেছে অনেকটা দৈবের উপর। পরে অবশ্য প্রাকৃতিক উপায়ে পরমাণু ভাঙা সম্ভব হইয়াছে। উপরন্ত শক্তি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা এটম্‌-বোমা!

সে যাহাই হোক, সূর্য্যের ভিতরে যদি রেডিয়াম্‌, ইউরেনিয়াম্‌ প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ধাতু বিদ্যমান থাকে তবে হয়তো আলোরূপে এতাদৃশ শক্তি লাভ করা সম্ভব। কিন্তু এখানেও আপত্তির বিশেষ কারণ বিদ্যমান। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, যদি সূর্য্যের সমস্তটাই ইউরেনিয়াম্‌ ধাতুগঠিত হইত তবেই সূর্য্য হইতে বর্ত্তমানে যে শক্তি পাওয়া যাইতেছে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র পাওয়া সম্ভব হইত। তাহা ছাড়া, সূর্য্যের ভিতরে ইউরেনিয়ামের বিদ্যমান অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই; থাকিলেও তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্পই হইবে। তবে এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা উঠে। আইন্‌ষ্টাইনের

'আপেক্ষিক তত্ত্ব' (Theory of Relativity) অনুসারে দেখা যায়, পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা খুবই সম্ভব। নিম্নলিখিতভাবে তাহা বিবৃত করা যাইতে পারে:—

$$E = mc^2$$

[E = শক্তির পরিমাণ, m = পদার্থের ভর এবং c = আলোর গতিবেগ (প্রতি সেকেণ্ডে)]। আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল ধরিলে দেখা যাইবে যে, অতি সামান্য পরিমাণ পদার্থ-ক্ষয়ে বিপুল শক্তি পাওয়াই সম্ভব। কাজেই যদি মনে করিয়া লওয়া হয় যে, সূর্য্যের অভ্যন্তরস্থ পদার্থরাশিই অনবরত আলো-ও-উত্তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে তবে তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আসে। ব্যাপারটা যথাযথ বুঝিতে হইলে আমাদের জানা প্রয়োজন— সূর্য্যের অভ্যন্তরে কি কি পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং এত অধিক উত্তাপে উহাদের মধ্যে কি প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, অর্থাৎ সূর্য্যের ভৌতিক এবং রাসায়নিক গঠনবিধি।

কোন তারকা বা সূর্য্যের ভৌতিক এবং রাসায়নিক অবস্থা বুঝিতে হইলে তিনটি জিনিসের দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে—উত্তাপ, ঘনত্ব এবং চাপ। সূর্য্যের উপরিভাগ হইতে যাহাতে সর্ব্বদাই অত্যধিক পরিমাণে তাপ বিকীর্ণ হইতে পারে তজ্জন্য আমাদের ধরিয়া লইতে হয় যে, সূর্য্যের কেন্দ্রের দিকের উত্তাপ উপরিতল হইতে অনেক বেশী। ঘনত্বও কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া উপরিতলের দিকে ক্রমশঃই কমিয়া আসিয়াছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, সূর্য্যের উপরিভাগে চাপের পরিমাণ পৃথিবীপৃষ্ঠের চাপ অপেক্ষা এক সহস্র কোটি গুণ অধিক। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, সূর্য্য প্রধানতঃ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম নামে দুইটি বায়বীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত; কোন ভারী যৌগিকের বিদ্যমানতা অনেকটা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, থাকিলেও যৎসামান্য।

এ প্রসঙ্গে পদার্থের গঠনবিধি সম্বন্ধেও কিছু জানা একান্ত প্রয়োজন। পদার্থ-পরমাণু বিভিন্নসংখ্যক ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণিকা দ্বারা গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে নিউক্লিয়াস্ বা কেন্দ্রীন—নিউক্লিয়াসে পরমাণুর সমস্ত ধনাত্মক বিদ্যুৎকণিকা বা প্রোটন এবং কয়েকটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণিকা বা ইলেকট্রন রহিয়াছে, বাকী ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রীনের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তুলাকার পথে অনবরত ঘুরিয়া বেড়ায়। সাধারণ অবস্থায় পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটনের সংখ্যা একই থাকে। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীনে একটিমাত্র প্রোটন এবং ঘুরানো পথে একটিমাত্র ইলেকট্রন থাকে; হিলিয়াম্ পরমাণুতে থাকে চারিটি প্রোটন এবং চারিটি ইলেকট্রন, উহাদের মধ্যে দুইটি ইলেকট্রন কেন্দ্রীনে এবং দুইটি বাহিরে রহিয়াছে। যদি কোন পদার্থ-পরমাণুর কেন্দ্রীনের সঙ্গে অন্য কোন পরমাণু কেন্দ্রীনের সংঘর্ষ হয় তবে উহাদের মধ্যে একটা ভাঙনের কার্য্য সংঘটিত হয় এবং ফলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের পরমাণুর সৃষ্টি হয়। উপরন্তু এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য খানিকটা শক্তিও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এখন আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, সূর্য্যের অভ্যন্তরে কি প্রকারের পরমাণু-ভাঙনের কার্য্য চলিতেছে যাহার জন্য সূর্য্য এতাদৃশ বিপুল শক্তি বিকিরণ করিতে পারিতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সূর্য্যের ভিতরে ভারী পদার্থের বিদ্যমানতা খুবই কম বলিয়া মনে হয়। সুতরাং একমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীনে কেন্দ্রীনে সংঘর্ষের ফলে কি ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহা দেখা যাক। অতি বেগে ধাবমান দুইটি হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনের মধ্যে সংঘর্ষণের ফলে একটি ডিউটেরন্ * এবং একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎপরিপূর্ণ কণিকার সৃষ্টি হয়। তৎপর ডিউটেরন এবং আর একটি হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনের মধ্যে সংঘর্ষণ-কার্য্য চলে এবং তিন ভরযুক্ত একটি হিলিয়াম্ পরমাণু এবং কিছু পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই প্রকারে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ এবং সৌর শক্তির পরিমাণ একই।

* পরমাণবিক ভর যাহার দুই এইরূপ হাইড্রোজেন। উল্লেখযোগ্য সাধারণ হাইড্রোজেনের পরমাণবিক ভর এক।

কিন্তু এখানেও কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য রহিয়া যাইতেছে। সূর্য্যের কেন্দ্রে যে পরিমাণ তাপ আছে তাহাতে এবম্প্রকার কেন্দ্রীন ভাঙনের কার্য্য চলিলেও উপরিতলের তাপ অনেক কম থাকে বলিয়া এত শক্তিদানকারী ক্রিয়া নাও ঘটিতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এমন অনেক তারকা আছে যাহারা এই প্রকারেই তাহাদের বিচ্ছুরিত শক্তির উৎস আহরণ করে। তবে সূর্য্যের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কোন ভারী পদার্থের পরমাণু হয়তো এই প্রকারে ভাঙিয়া যাইয়া উপযুক্ত পরিমাণ শক্তি প্রদান করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু উহাদের পরিমাণ যে সূর্য্যের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট। কাজেই এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, যদি অঙ্গার, অক্সিজেন প্রভৃতি পদার্থগুলি এমনিভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে তবে হয়তো একদিন সূর্য্যে উহাদের ঘাটতি পড়িতে পারে এবং সূর্য্যের উত্তাপও সেদিন নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান হইয়াছে অন্য প্রকারে। পণ্ডিতগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনই ভাঙে, তবে অঙ্গার-পরমাণুর কেন্দ্রীন নিজে সাময়িক ভাবে ভাঙিয়া হাইড্রোজেনকে সাহায্য করে মাত্র। অঙ্গার যতটুকু ভাঙে ঠিক ততটুকুই গঠিত হইয়া থাকে। এইভাবে কেন্দ্রীন সংঘর্ষণজনিত শক্তি এবং সৌরশক্তির পরিমাণ যে একই তাহা প্রমাণিত হয়।

সৌরশক্তির উৎস সম্বন্ধে যখন সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হইয়াছে তখন সূর্য্যের সম্ভাব্য জীবনকাল সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা ধারণা করা মোটেই অসম্ভব নহে। একমাত্র হাইড্রোজেনই যদি সৌরশক্তি সংগ্রহের মূল হয় তবে সূর্য্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ কত তাহা ঠিকমত নির্ণয় করিয়া প্রতিনিয়ত কি পরিমাণ হাইড্রোজেন ব্যয়িত হইতেছে তাহা হিসাব করিলে সূর্য্যের পরমায়ু কতকাল সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। ইহা প্রায় এক সহস্র কোটি বৎসর বলিয়া অনুমিত হয়, অথচ সূর্য্যের বর্ত্তমান বয়স মাত্র দুই শত কোটি বৎসর। তাহা ছাড়া, পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, হাইড্রোজেনের পরিমাণ যত দিনে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, ঠিক সেই সময়-মধ্যে তাপের পরিমাণ আরও এক শত গুণ বর্দ্ধিত হইবে। তারপর অতিক্রান্ত সূর্য্য তাহার আলো-উত্তাপদানকারী ক্ষমতা হারাইয়া চিরতরে নিভিয়া যাইবে। কিন্তু মা ভৈঃ, তাহার এখনও আট শত কোটি বৎসর বাকী।

অফ বেঙ্গল লিঃ
…ল স্থাপিত)
…ী সুভাষ রোড, কলিকাতা
ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯২৬
…ং কার্য্য করা হয়।
…সমূহ
কলিকাতা, বর্দ্ধমান, চন্দননগর,
আসানসোল, ধানবাদ, সম্বলপুর,
…া), ও রাণাঘাট।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এইচ, এল, সেনগুপ্ত

"মধ্য দিনে যবে গান বন্ধ করে পাখী"

গ্রীষ্মের খররৌদ্রে যখন পাখী পর্য্যন্ত তার গান বন্ধ করে, গাছপালা কালবৈশাখীর ক্ষণবর্ষণের প্রতীক্ষায় উর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকে, মাঠের বুক ফেটে বেরোয় পৃথিবীর তপ্তশ্বাস—তখন মানুষের দেহেও লাগে তার দহনের জ্বালা।

গ্রীষ্মে মানুষের দেহের রসও শুকিয়ে আসে, তাই তার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা ক'মে যায়,—দেখা দেয় উদরাময়, কলেরা প্রভৃতি পীড়া ও মহামারী।

এ সময়ে আপনার দরকার **কুমারেশ**। কারণ **কুমারেশ** আপনার লিভারকে সবল করে, নূতন রক্তকণিকা-গঠনে সাহায্য করে এবং সর্ব্বোপরি আপনার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়।

কুমারেশ লিভার ও পেটের যে কোন পীড়া নিশ্চিত আরোগ্য ত করেই সঙ্গে সঙ্গে যে কোন রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও দেয়।

কুমারেশ

দি ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ্চ এণ্ড কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ

সালকিয়া :: হাওড়া

পুস্তক-পরিচয়

দামোদর পরিকল্পনা—শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় কলিকাতা—পৃষ্ঠা ৫৭, মূল্য ।০ আনা।

বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রন্থমালার ৬৯তম গ্রন্থ। স্বাধীন ভারতবর্ষকে নূতন করিয়া গড়িবার উদ্দেশ্যে বিবিধ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। দামোদর পরিকল্পনা উহাদের অন্যতম। বিহার ও বাংলা এই দুই প্রদেশের মধ্য দিয়া দামোদর নদী প্রবাহিত। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই এই নদীতে জল থাকে না। কিন্তু যখন বর্ষার প্লাবন আসে তখন ইহা করাল মূর্ত্তি ধারণ করে। এইজন্যই 'দামোদরের বন্যা' পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের মনে চিরদিনই ভীতির সঞ্চার করে। আমেরিকার টেনেসিভেলি প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে এই প্রলয়ঙ্করী নদীকে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষের কাজে লাগাইবার জন্য যে কল্যাণ-প্রচেষ্টা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে তাহার বিবরণ একটি ইংরেজী পুস্তকে প্রকাশিত হইলেও, বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আর কোনো পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। এই পুস্তকের গোড়ায় দামোদর নদী ও দামোদর উপত্যকার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। পরে কিরূপে দামোদর পরিকল্পনা সফল হইলে (ক) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, (খ) বিদ্যুৎ সরবরাহ, (গ) সেচ-ব্যবস্থা, (ঘ) জলপথে চলাচল, (ঙ) পানীয় জল সরবরাহ, (চ) ম্যালেরিয়া নিবারণ, (ছ) জমির ক্ষয়নিবারণ ইত্যাদি হইবে তাহা বিশদভাবে দেখান হইয়াছে। এই পরিকল্পনার সফলতার সহিত দেশের বহুমুখী উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত রহিয়াছে। এইরূপ অত্যাবশ্যক বিষয় দেশবাসী মাত্রেরই জ্ঞাতব্য। আমরা এই পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

বাংলার নদনদী—ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪৮, মূল্য ।০ আনা।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক। নদীকে আশ্রয় করিয়া দেশে দেশে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। আর্য্যভারতের সভ্যতা বিশেষভাবে সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সহিত ওতঃপ্রোত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমাদের সভ্যতা 'গাঙ্গেয় সভ্যতা'। গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় গঙ্গা-ভাগীরথী, ছোট গঙ্গা, বড় গঙ্গা, আদি গঙ্গা, গঙ্গার প্রাচীনতম প্রবাহ, যমুনা গঙ্গার উত্তর প্রবাহ, পদ্মা, গড়াই, মধুমতী, শিলাইদহ, ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা, জলাঙ্গী, চন্দনা, লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র, সুরমা-মেঘনা, করতোয়া, তিস্তা, পূর্ণভবা, মহানন্দা, আত্রাই প্রভৃতি নদনদীর আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য হইতে এবং বিদেশীয়দের পুরাতন নক্সা হইতে এই সকল নদীর পূর্ব্বকথা যথাসম্ভব উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক দেখাইয়াছেন যে, বাংলা ও বাঙালীর ভাগ্য যুগে যুগে এই নদীপ্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত ছিল; বলা বাহুল্য এখনও আছে। এই সকল নদীর গতিবিধি এদেশের নগর-গ্রামের সৃষ্টি-বিলয় আর্থিক ও সামাজিক উত্থান-পতন নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে। লেখকের সরস বর্ণনায় নদনদীর কথা এরূপ মনোজ্ঞ হইয়াছে যে পাঠক মাত্রেই ইহ পড়িয়া একাধারে জ্ঞান অর্জ্জন ও আনন্দ উপভোগ করিবেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার—শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, চীনভবন, বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে বৌদ্ধ সংস্কৃতগ্রন্থ বোধিচর্যাবতারের প্রথম আটটি পরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ সংকলিত হইয়াছে। ইহার আর একখানি বঙ্গানুবা কয়েক বৎসর পূর্বে মূলসহ প্রকাশিত ও প্রবাসীতে (ফাল্গুন ১৩৪২) সমালোচিত হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে মূল দেওয়া হয় নাই। তবে পূর্ব-প্রকাশিত অনুবাদে কয়েকটি পরিচ্ছেদ অসম্পূর্ণ ছিল। সুজিতবাবু সেই অসম্পূর্ণ অংশের মূল সংগ্রহ করিয়া তাহারও অনুবাদ করিয়াছেন। ফলে বর্তমান গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। পাদটীকায় ও দীপিকা নামে পরিশিষ্টে কঠিন ও পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হইলেও ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধমাত্র নাই। পক্ষান্তরে, সাধারণ গৃহস্থের জানিবার, বুঝিবার ও শিখিবার মত বিষয়ে ইহা পরিপূর্ণ। শ্রীমদ্-ভগবদ্ গীতার মত এই গ্রন্থের বহুল প্রচার ও আলোচনা বিশেষ কাম্য। বিশ্বভারতী এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বাংলা-সাহিত্য ও বাঙালী সমাজের উপকার করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে দুই জন বোধিসত্ত্বের আত্মত্যাগ-কাহিনী সংকলিত হইয়াছে। ইঁহাদের আদর্শের সহিত যীশু চৈতন্য-গান্ধীর আদর্শের ঐক্য সকলকে মুগ্ধ করিবে। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

১। আয়না (দ্বিতীয় সংস্করণ) **২। ফুড্ কনফারেন্স।** আবুল মনসুর আহমদ। নওরোজ লাইব্রেরী, ৪৭।১, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য প্রত্যেকটি ৩৲ টাকা।

আয়না ও ফুড্ কন্ফারেন্স—এই দুটি গল্প-সঙ্কলনের বই। প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে ব্যঙ্গ-সৃষ্টির প্রয়াস আছে। বাংলা-সাহিত্যে ব্যঙ্গ-রচনার চেষ্টা সার্থক হইলেও পরিমাণে তা অজস্র নয়। অসাধারণ প্রয়োগ-নৈপুণ্য না থাকিলে সমস্ত সৃষ্টিই বিকৃত হইয়া উঠে। 'আয়না'র ফ্রেমে নজরুল ইসলাম যথার্থই বলিয়াছেন, 'এ যেন সেতারের কান মলে সুর বের করা—সুরও বেরুবে, তারও ছিঁড়বে না।' এই ধরণের দুর্লভ রসসৃষ্টির ক্ষমতা ওস্তাদ শিল্পীরই সাধ্যায়ত্ত। সুখের বিষয়—আবুল মনসুর বহুলাংশে এই ক্ষমতাকে আয়ত্ত করিয়াছেন। প্রতিটি গল্পের মধ্যে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় আছে। সব মিলাইয়া আয়নার গল্পগুলিতে যে সব মানুষের স্বরূপ ফুটিয়াছে তাহাদের মন্দিরে, মসজিদে,

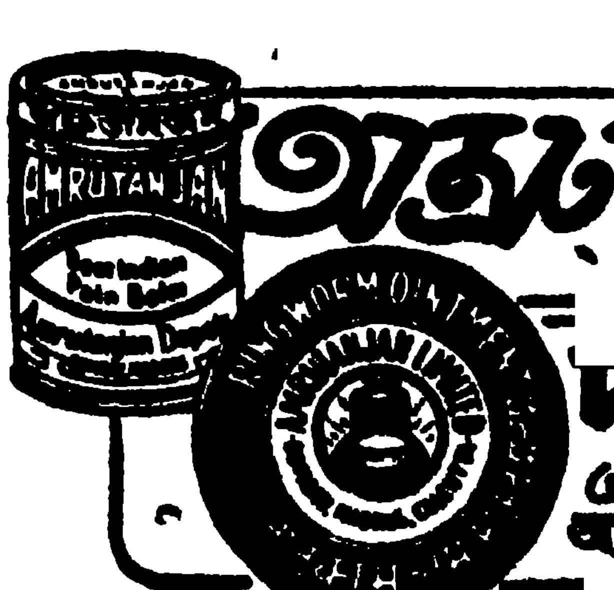
অমৃতাঞ্জন সর্ব্বপ্রকার বেদনায় আণবিক বোমার ন্যায় কার্যকরী।
দাদের মলম চর্ম্মরোগে পরমাণু-শক্তির ন্যায় কার্য্যকরী!
অমৃতাঞ্জন লিমিটেড - পোষ্ট বক্স নং ৬৮২৫ কলিকাতা ৭

পূর্ব্বাশা

বার্ষিক চাঁদা : মনিঅর্ডারে ৬৲ টাকা

বাংলা মাসিক পত্র
বৈশাখে বর্ষারম্ভ

প্রতি সংখ্যা : আট আনা

আজ থেকে ঠিক ১৭ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমানে ভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সুদূর এক মফঃস্বল শহরে "পূর্ব্বাশা" মাসিকপত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। জন্মকালে পূর্ব্বাশার উপকরণ ছিল স্বল্প ; কিন্তু তার স্বপ্ন ছিল গভীর, দূরব্যাপী, বিরাট। পূর্ব্বাশার সেই স্বপ্ন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আরও দুরবগাহ আরও ব্যাপক হয়েছে। জন্মাবধি পূর্ব্বাশা চেয়েছে দেশবাসীর চেতনার যথাযথ সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক বিকাশ। পত্রিকাটির সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা এতাবৎ সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখেই পরিচালিত হয়েছে। তার সমস্ত রচনা, রচনা-নির্ব্বাচন-প্রণালী এবং লেখকগোষ্ঠী মনোনয়ন ও গঠন-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সে এই কথাই বার বার, বৎসর বৎসর, বলতে চেয়েছে যে চাই চেতনার উন্নয়ন, জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী, সর্ব্বোপরি আমাদের সর্ব্বত্রসঞ্চারী জিজ্ঞাসা।

দেশবাসীর জীবনে পূর্ব্বাশার আদর্শকে রূপায়িত করার সুমহান্ প্রয়োজন পূর্ব্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। বরং স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই প্রয়োজন আরও অলঙ্ঘনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতা শুধু অধিকার ভোগের কথাই বলে না ; অধিকার অর্জ্জনের কথাও বলে। শৃঙ্খলমুক্তিতে দায়িত্ববন্ধন আরও বাড়লো। স্বাধীনতার শ্লথতাকে চিন্তার সংযম ও শৃঙ্খলার দ্বারা শাণিত ক'রে ইস্পাত-কঠিন রূপ দিতে হবে। চতুর্দ্দিকে পরিদৃশ্যমান পর্ব্বত-প্রমাণ হৃদয়হীনতাকে চূর্ণ ক'রে মানবতার আসন পেতে দিতে হবে। কুসংস্কার ও আপাত-রমণীয় সংস্কারের সমাধির উপর উত্তুঙ্গ করতে হবে যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের অটল সৌধ। তা-ই পূর্ব্বাশার সঙ্কল্প ও সাধনা।

প্রকাশক :

পূর্ব্বাশা লিমিটেড

পি ১৩, গণেশ চন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩

বক্তৃতামঞ্চে, রাজনীতির আখড়ায় ও সমাজ ব্যবহার পুরোভাগে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। ফুড্ কন্ফারেন্সের গল্পগুলিও মনের খাদ্য হিসাবে উৎরাইয়াছে ভাল। বিগত লীগমন্ত্রিমণ্ডলীর অনেকেই ফুড্ কন্ফারেন্সের ভোজের আসর জমাইয়াছেন। সমাজের অনাচার ও শাসননীতির ব্যভিচার দুই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিল্পী ছবির পর ছবি আঁকিয়াছেন। হাসিতে অশ্রুতে বেদনায় বিদ্রূপে ছবিগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ভাষা সম্বন্ধে অনুযোগের হেতু না থাকিলে আবুল মনসুরের রস-সৃষ্টিকে অনবদ্য বলা চলিত। হয়ত মুসলমান-সমাজের প্রতিবেশ ফুটাইবার জন্য আরবী ফারসীর অতিরিক্ত অলঙ্কার গল্পগুলির সর্ব্বাঙ্গে চাপাইতে হইয়াছে—ইহার ফলে আরবী ফারসী অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে কাহিনীর রসগ্রহণে যথেষ্ট বাধা জন্মিয়াছে। তা ছাড়া—সাস্থবান প্রাতস্মরণিয়, পুর্বপুরুষ, দিতীয়ত, সতন্ত্র, শশানে, প্রিতি, সার্থ, স্থির প্রভৃতি অজস্র বানানের যথেচ্ছাচারিতা কাহিনীর কৌতুক রস-উপভোগে বাধা জন্মায়।

ফুড্ কন্ফারেন্সে বিদেশী শব্দ আমদানীর ঝোঁকটা কম—গল্পগুলিও সেইজন্য অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও কৌতুক রসোত্তীর্ণ।

লীলাসঙ্গিনী—শ্রীশৈলেন বসু। বি, সিংহ এণ্ড ব্রাদার্স। ৩৮, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১৸০ আনা।

লীলাসঙ্গিনী একখানি উপন্যাস। প্রথম খণ্ডে ইহার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে নানাজাতীয় ফুলের গুচ্ছে বাঁধা একটি তোড়ার কথা স্বতঃই মনে হয়। বিচিত্র বর্ণের ফুলের বিন্যাসভঙ্গীতে তার জাতি বা জন্ম ইতিহাস থাকে অমুক্ত; উগ্র, মিষ্ট এবং গন্ধহীন সবরকম ফুলের সমষ্টি তখন একটি মাত্র স্তবকে রূপান্তরিত এবং সেইটিই তার রূপগুণময় কায়া।

লীলাসঙ্গিনীর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ গল্পের অবকাশ নাই বলিয়াই বিভিন্ন চরিত্রের বিকাশও চোখে পড়ে না। একটি ড্রয়িং রুমে আধুনিক যুগের তরুণতরুণীর মেলা, তাদের ফ্যাসান-দুরস্ত আচার-আচরণ, বাগ্বিভূতির কৌশলে বিশ্ব-সংস্কৃতির পরিচয় জ্ঞাপন, জীবন-দর্শনের লঘু একটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত—কৌতুকে ব্যঙ্গে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে আলাপবৃত্তকে সুষ্ঠু আকার দেওয়ার চেষ্টা ইহার মধ্যে নাই। এই ধরণের ড্রয়িংরুম-কেন্দ্রিক অতি আধুনিক জীবনের আলোকচিত্র বাংলা-সাহিত্যে বিরল নহে। এই ধরণের চিত্র দৃষ্টিতে বিভ্রম জন্মাইলেও তোড়ায় হারাইয়া যাওয়া ফুলের মতই ভঙ্গীসর্ব্বস্ব—যদিও সমাজের উপরের স্তরের কায়া এবং তার অনুসরণরত মধ্যস্তরের খানিকটা ছায়া ইহার মধ্যে পড়িয়াছে, এবং মোটের উপর অবাস্তব নহে। কালের গতি-প্রবাহে এ জিনিস আসিয়াছে—সমগ্র জীবনের অনুভূতি ইহার মধ্যে নাই। যাহা হউক, মাত্র প্রথম খণ্ডে কাহিনীর আরম্ভে উপন্যাস সম্বন্ধে ভালমন্দ কিছু বলা কঠিন। সংলাপ রচনায় লেখকের ক্ষমতার পরিচয় আছে। পরবর্ত্তী খণ্ডে কাহিনীর সঙ্গে ইহা সুপ্রযুক্ত হইলে চরিত্রগুলি স্বকীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দেশের জ্ঞাতব্য আইন (১ম খণ্ড)—এস, এন, ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল। ১২২+১৩ পৃঃ; ইষ্টার্ণ ল হাউস, পি-১৩, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য ২৸৵০ আনা।

বাংলা ভাষায় লিখিত আইনের বই বিরল। অথচ দেশের আইন সম্বন্ধে ইংরেজী অনভিজ্ঞ লোকেদের মোটামুটি জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। ইংরেজী অনভিজ্ঞ লোকের মধ্যে আইনের বিধানসমূহ জানিবার আগ্রহও খুব। বর্ত্তমান সমালোচক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অল-ইণ্ডিয়া রেডিও হইতে দেশের আইন সম্বন্ধে বাংলায় কয়েকটি বক্তৃতা দেন। লোকে সেগুলি আগ্রহের সহিত শুনিত। লেখক এই পুস্তক লিখিয়া দেশের একটি প্রকৃত অভাব দূর করিয়াছেন। বইখানি যে কেবলমাত্র অল্পশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকেদের উপকারে আসিবে তাহা নহে, শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও কাজে লাগিবে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন দলিল রেজিষ্টারী করিতে কি কি লাগিবে তাহা অনেকেই জানেন না, উকীল-বাড়ী গিয়াও সঠিকভাবে জানা যায় না—কারণ বাংলা-সরকার ১৯৩২ সালের পর আর Registration Manual ছাপেন নাই। নূতন উকীলের নিকট এই বই না থাকিবারই সম্ভাবনা। থাকিলেও ১৯৩৯ সালে ফি-এর যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা লিখিত নাই। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। লেখকের দুরূহ বিষয় সরল করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা আছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

দুর্গম হয় পন্থা—শ্রীঅশোক সেন। সেঞ্চুরী পাব্লিশার্স: ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

লেখকের প্রথম নাট্য-সঙ্কলন 'অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে' পাঠকসমাজের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহার দ্বিতীয় নাট্য-সঙ্কলন। লেখকের শক্তির উপর শ্রদ্ধা লইয়াই বইখানি পড়িতে বসিয়াছিলাম। কিন্তু লেখক আমাদের খুশী করিতে পারেন নাই। 'দুর্গম হয় পন্থা', 'কেন এমন হয়', এবং 'অভিনেতা' এই তিনটি নাটিকার ভিতর দিয়াই লেখক আপন বক্তব্য ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন—তাই উক্ত নাটিকাগুলি নাটকের ধর্ম্ম এবং চরিত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া তর্কবহুল আত্মচিন্তায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। চরিত্রের যেন কোন নিজস্ব বক্তব্য বা গতি নাই—লেখকের চিন্তারই তাহারা প্রতিধ্বনি করিতেছে। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-যোগ্যতার কথা বাদ দিলেও যে বাস্তবানুগ ও জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টি এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত রচনা—শ্রেষ্ঠ নাটকের উপাদান, উক্ত তিনটি নাটিকার একটিতেও তাহা লক্ষ্য করিলাম না। নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র-চিত্রণ এবং সংলাপ এমন হওয়া উচিত যাহা পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয়াবেগ আলোড়িত হইয়া উঠে—তবেই তাহা শ্রেষ্ঠ নাটকের পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে।

হৈমন্তী সেনের প্রচ্ছদপট চমৎকার, ছাপা ও বাঁধাই সুরুচির পরিচায়ক।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

পঙ্কিল—আলেকজান্দার কুপরিন। অনুবাদ: শ্রীকুমারেশ ঘোষ ও সুকুমার গুপ্ত। রীডার্স কর্ণার। ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা।

ইদানীং অনুবাদ-সাহিত্যের কদর বাড়িয়াছে। অনুবাদের মারফত বিদেশী ভাবধারার সহিত সহজে পরিচয় ঘটে, কিন্তু তাই বলিয়া যাঁরা বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ করেন তাদের আমাদের দেশের সামাজিক পরিবেশ, তার ঐতিহ্যের কথা ভুলিয়া যাওয়া সঙ্গত নয়। ভারতবর্ষ রুশিয়া নয়। এখানকার আধ্যাত্মিকতাকে ছোট করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে হয় না। বিগত মহাযুদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানির ফলে যে পাপাচার এ দেশের সমাজ-জীবনের একটা অংশকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে সেদিকে জনসাধারণের সজাগ দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যকতা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের উক্ত কুপরিনের কথায় সায় দিতে পারিতেছি না।

রুশিয়ায় সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বারবনিতাদের কেন্দ্র করিয়া পাপাচারের যে কদর্য্য পরিণতি দেখা দিয়াছিল তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই কুপরিন "য়্যামা দি পিট" নামক পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। পঙ্কিল ইহারই বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ ভালই হইয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

প্রবাসীর পুস্তকাবলী

রামায়ণ (সচিত্র) ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১০।০
সচিত্র বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ— রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	।০
সচিত্র বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ—ঐ	।০
চাটার্জির পিক্‌চার এল্‌বাম (১, ৪, ৫, ৮ ও ৯ বাদে)	প্রত্যেক ৪৲
উর্বসী (মনোজ্ঞ গল্পসমষ্টি)— ঐ	২৲
সোনার খাঁচা— শ্রীসীতা দেবী	২।০
আজব দেশ (ছেলেমেয়েদের সচিত্র) ঐ	১৲
বজ্রমণি (শ্রেষ্ঠ গল্পসমষ্টি) ঐ	২৲
উদ্যানলতা (উপন্যাস)—শ্রীশান্তা ও সীতা দেবী	২।০
কালিদাসের গল্প (সচিত্র)—শ্রীরঘুনাথ মল্লিক	৪৲
গীত উপক্রমণিকা—(১ম ও ২য় ভাগ) প্রত্যেক	১।০
জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ—ভারতচন্দ্র মজুমদার	১।০
কিশোরদের মন—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	।০
চণ্ডীদাস চরিত—(৺কৃষ্ণপ্রসাদ সেন) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সংস্কৃত	২।০
মেঘদূত (সচিত্র)—শ্রীযামিনীভূষণ সাহিত্যাচার্য্য	৪।০
হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর (সচিত্র)— শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪৲
পাথুরে বাঁদর রামদাস (সচিত্র)— শ্রীঅসিতকুমার হালদার	১।০
অমনা—শ্রীহেমলতা দেবী	১।০
খেলাধূলা (সচিত্র)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	১।০
বিলাপিকা—শ্রীযামিনীভূষণ সাহিত্যাচার্য্য	১৶০
ল্যাপল্যাণ্ড (সচিত্র)—শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ	১।০

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রবাসী কার্য্যালয়
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

BOOKS AVAILABLE

	Rs.	As.
Chatterjee's Picture Albums—Nos. 1 to 17 (*No. 1, 4, 5, 8 & 9 out of Stock*) each No. at	4	0
History of Orissa Vol. II —R. D. Banerji	25	0
Canons of Orissan Architecture—N. K. Basu	12	0
Dynasties of Mediæval Orissa— Pt. Binayak Misra	5	0
Eminent Americans: Whom Indians Should Know— Rev. Dr. J. T. Sunderland	4	8
Evolution & Religion— ditto	3	0
Origin and Character of the Bible ditto	3	0
Rajmohan's Wife—Bankim Ch. Chatterjee	2	0
Prayag or Allahabad—(*Illustrated*)	3	0
The Knight Errant (*Novel*)—Sita Devi	3	8
The Garden Creeper (*Illust. Novel*)— Santa Devi & Sita Devi	3	8
Tales of Bengal—Santa Devi & Sita Devi	3	0
Plantation Labour in India—Dr. R. K. Das	3	8
India And A New Civilization— ditto	4	0
Mussolini and the Cult of Italian Youth (*Illust.*)—P. N. Roy	4	8
Story of Satara (*Illust. History*) —Major B. D. Basu	10	0
My Sojourn in England— ditto	2	0
History of the British Occupation in India —[*An epitome of Major Basu's first book in the list.*]—N. Kasturi	3	0
History of the Reign of Shah Alum— W. Franklin	3	0
The History of Medieval Vaishnavism in Orissa—With introduction by Sir Jadunath Sarkar.—Prabhat Mukherjee	6	0
The First Point of Aswini—Jogesh Ch. Roy	0	8
Protection of Minorities— Radha Kumud Mukherji	0	4

Postage Extra.

The Modern Review Office
120-2, Upper Circular Road, CALCUTTA

বেণু ও বীণা (চতুর্থ সংস্করণ)—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। আর. এইচ. শ্রীমাণী এণ্ড সন্স, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৷০।

রবীন্দ্রনাথের রশ্মিচ্ছটায় দীপ্যমান হইয়াও যে দুই জন কবি বাংলার কাব্যগগনে নিজস্ব উজ্জ্বল মহিমায় বিদগ্ধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন সত্যেন্দ্রনাথ, অপর জন নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইঁহাদের কবিতার বলিষ্ঠ, ঋজু, প্রকাশভঙ্গী ও অকৃত্রিম বৈশিষ্ট্য অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন। 'বেণু ও বীণা' সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা-পুস্তক। 'কুহু ও কেকা', 'বেলাশেষের গান' প্রভৃতির ন্যায় ইহাতে কবির পরবর্ত্তী জীবনের কাব্যসৃষ্টির সকল বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই বটে, কিন্তু একটি উদার মানবতা ও দেশমাতৃকার ভক্ত-পূজারী কবি-হৃদয়ের যে স্বরূপ ইহাতে প্রকটিত হইয়াছিল, বাংলার সুধীগণ কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবামাত্র তাহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতেই 'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল', 'কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিস্ বিরস মুখে' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়। পুস্তকের গোড়ার দিকে সত্যেন্দ্র স্মরণে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি ও শেষের দিকে কবি ও কাব্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বইখানির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। উৎকৃষ্ট বাঁধাই ও রয়েল সাইজ পুরু কাগজে প্রত্যেকটি সচিত্র পৃষ্ঠায় রঙীন কালিতে মুদ্রিত এই বইখানি উপহারযোগ্য করিতে প্রকাশক চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

খেজুর বনের দেশে—শ্রীদেবেন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী। পর্য্যটক প্রকাশনা ভবন, ১৫৬ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৷০।

বিগত যুদ্ধে সৈনিকব্রত গ্রহণ করিয়া ইরাক ও ইরাণের সীমারেখায় টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে এবং সাত-অল-আরবের তীরে অবস্থিত সাহেবা, কারিও, সাম নদী, তামুমা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া সৈনিক-কবি দেবেন্দ্রকুমার পাল এই কবিতাগুলি লিখিয়াছেন।

মরুভূমি, খেজুরকুঞ্জ, দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও গুলবাগিচায় ভরা এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর সুন্দরীদের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের বন্দনা পারস্যের অমর কবি ওমর খৈয়াম এবং আরব ও ইরাণের অন্যান্য কবিগণ শতমুখে করিয়াছেন। এই 'খেজুর বনের দেশে' ঘুরিয়া কবি অতি সহজ ভাষায় ও ছন্দে তাঁহার কবিত্বপূর্ণ হৃদয়-দুয়ার উন্মুক্ত করিয়াছেন। কঠোর সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিয়াও কবি তাঁহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ের মাধুর্য্য হারাইয়া ফেলেন নাই। ভাবমাধুর্য্য ও কবিত্বরসে মণ্ডিত কবিতাগুলি পাঠক উপভোগ করিবেন। মলাটে অঙ্কিত, খর্জ্জুরবৃক্ষশোভিত গ্রামপ্রান্তে জলাশয়ের ধারে দুইটি ইরাণী তরুণীর চিত্রটি সুন্দর। গ্রন্থকার যদি সত্যই কবিযশঃপ্রার্থী হন, তো ভাষা, ছন্দ ও বানানের দিকে তাঁহাকে আর একটু লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্র একটি সুন্দর ভূমিকায় এই পুস্তকের কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

ছোটদের তুরস্কের গল্প—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷০ টাকা।

লেখক ইংরেজী হইতে তুরস্কের নিম্নলিখিত ছয়টি উপকথা এই বইয়ে সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন (১) প্রধান জ্যোতিষী (২) ক্রিষ্টাল (৩) বিষাদ (৪) সৎপরামর্শ (৫) নৈবাছুর (৬) নাসপাতি ভক্ষক (৭) লবণ

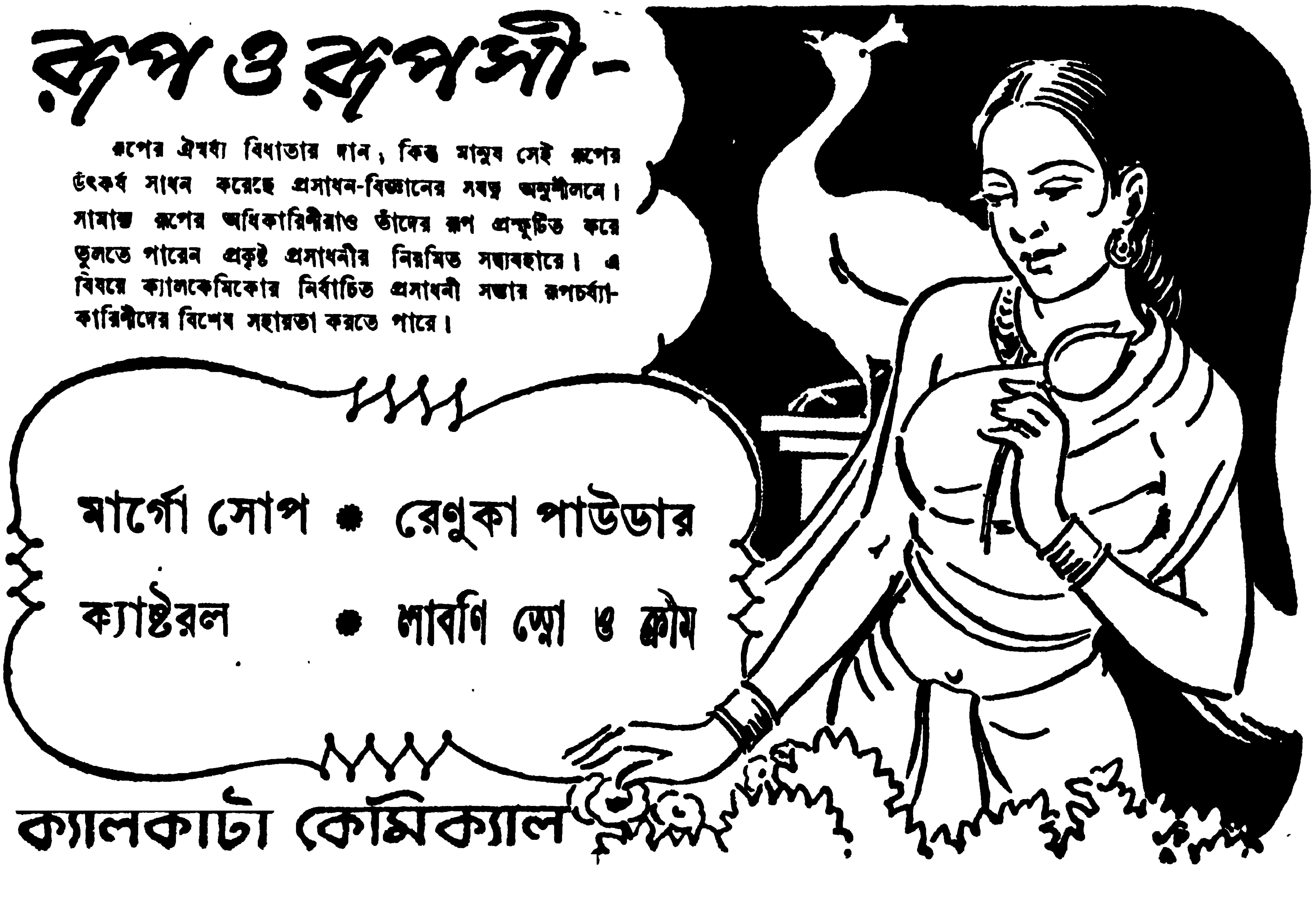

(৮) সোনার পাহাড়ের রাজা। এই সংগ্রহের মধ্যে প্রধান জ্যোতিষী, ত্রিষ্টাল এবং সোনার পাহাড়ের রাজা এই তিনটি গল্প শিশুমনে বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক করিবে। সৎপরামর্শ এবং লবণ এই দুইটি গল্প উপদেশাত্মক—এগুলিতে গল্পচ্ছলে নীতি-কথা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। লেখকের গল্প বলার ভঙ্গীটি সুন্দর—বাহুল্য ও উচ্ছ্বাস বর্জ্জন করিয়া তিনি লেখনীর উপর সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকখানিতে শুধু রাজা, উজীর, রাজপুত্র, রাজকন্যা, ডাইনি, দৈত্য প্রভৃতির কথাই নয়—সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের কাহিনীও স্থান পাইয়াছে।

শিকারের কথা—শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ। সংস্কৃতি বৈঠক। ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ কলিকাতা।

মৈমনসিংহের সুসঙ্গ দুর্গাপুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ একজন ওস্তাদ শিকারীরূপে বাংলাদেশে সুপরিচিত। শ্রেষ্ঠ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত তাঁহার শিকার সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী সংস্কৃতি বৈঠক 'শিকারের কথা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। লেখক বাল্যকাল হইতেই আরণ্য প্রকৃতি ও শিকারের অনুরাগী। আসামের গারো পাহাড় এবং বাংলা ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে শিকারের সন্ধানে দীর্ঘকাল ঘোরাঘুরি করিয়া তিনি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এই পুস্তকে 'সুসঙ্গের বনে শিকার' 'সুন্দরবনের শিকার, 'পুরীর কাছে এক দিনের শিকার' 'গারো পাহাড়ে হেঁটে মোষ শিকার' প্রভৃতি কতকগুলি অধ্যায়ে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। পুস্তকখানিকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে লেখকের কবিত্ব-মণ্ডিত ভাষা ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনাভঙ্গী।

পুস্তকখানি দুইখানি অধ্যায়ে বিভক্ত। শেষার্দ্ধে পাখীর শাবক প্রীতি, পাখীর প্রেম, হরিণের স্নেহ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কয়েকটি বড় করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে—এগুলি হইতে কুতূহলী পাঠক পশুপক্ষীর মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নেরও সুযোগ পাইবেন। পুস্তকখানি শুধু শিকারের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা হিসাবে নয়, সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যে এবং বর্ণনা-মাধুর্য্যেও কিশোর ও বয়স্ক সকল শ্রেণীর পাঠকেরই মনোহরণ করিবে। লেখকের অরণ্য-প্রীতি সহজাত। অরণ্যের নিভৃত নির্জ্জনতায় তিনি সময় সময় নিজের প্রকৃত সত্তাকে খুঁজিয়া পান, এবং এমন অপূর্ব্ব ভাষায় নিজের নিঃসঙ্গ মনের অনুভূতিকে প্রকাশ করেন যে, পাঠককে তাঁহার ধ্যানী প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হয়। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এই পুস্তকে একটি সুন্দর ভূমিকায় বলিয়াছেন—"আমরা এতদিন শান্তিরক্ষা আর দেশরক্ষার ভার বিদেশীর উপর ছেড়ে দিয়ে অহিংসার আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেছি, মনে করেছি শিকার শুধু জনকয়েক ধনী বা নিষ্ঠুর লোকের খেলা। কিন্তু এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, সকল দায়িত্ব আমাদের উপর পড়েছে, সুতরাং ক্ষাত্রবৃত্তির উপযুক্ত চর্চ্চা এখন ধর্ম্মকার্য্য।"

এই ক্ষাত্রবৃত্তির চর্চ্চায় দেশের কিশোর ও তরুণদের উদ্বুদ্ধ করিতে পুস্তকখানি বিশেষ সহায়ক হইবে।

নতুন ঠিকানা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু। দি ফিনিক্স প্রেস লিমিটেড। ৫৬, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১। মূল্য ৩৲ টাকা।

লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত। সম্ভবতঃ এখানি তাঁর প্রথম উপন্যাস। কিন্তু এই প্রথম উপন্যাসেই তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে আশান্বিত করিয়া তোলে। কাহিনীটি মোটামুটি এই:—ছেলেবেলায় মাতৃহীন প্রশান্ত প্রতিপালিত হইয়াছিল পশ্চিমের এক শহরে তাহার এক বৈজ্ঞানিক মামার নিকটে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নতুন

কানন দেবী ও সুচিত্রা মিত্র
VE 2562 আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু / এই লভিনু সঙ্গ তব

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
GE 7488 অয়ি ভুবন মনমোহিনী / আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে

শ্রীমতী কানন দেবী, শচীন গুপ্ত, ছাত্রছাত্রীগণ
VE 2561 ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে / হারে—রেরে—রেরে

শ্রীমতী কানন দেবী ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
VE 2564 তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি / নিশার স্বপন ছুটল যে

শ্রীমতী কানন দেবী
VE 2565 তিমির দুয়ার খোলো / এতদিন যে বসেছিলেম

কুমারী গীতা নাহা
GE 7503 চোখের আলোয় / যতখন তুমি

তড়িৎ চৌধুরী
GE 7489 কান্না হাসির দোল দোলানো / তোমারি ঝরণা তলায়

কুমারী বেলা রায়
GE 7490 কেন চোখের জলে / একলা বসে একে একে

সমরেশ রায়
GE 7504 যখন তুমি বাঁধছিলে / শেষ নাহি যে

'সন্দীপন পাঠশালা' চিত্রে—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'—'জাগ জাগ অলস' GE 7502

কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোং
কলিকাতা — বোম্বাই — দিল্লী — লাহোর — করাচী

বাপের সহিত তাহার কোন যোগাযোগ ছিল না। এমনি ভাবে জীবনের বাইশটি বছর কাটিয়াছিল তাহার 'ধীরগতি নদী'র মত। অকস্মাৎ মৃত্যুশয্যাশায়ী পিতার নিকট হইতে আসিল আহ্বান। অন্তিম শয্যায় পিতা শ্রীতিতোষ প্রশান্তকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইলেন যে, সে তাঁহার বন্ধু-কন্যা মণিমালাকে বিবাহ করিবে। শ্রীতিতোষের মৃত্যুর পর প্রভাবতী কন্যা মণিমালা সহ প্রশান্তর বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। কিছুদিন পরে তাহাদের বিবাহ হইল, এবং যথাসময়ে একটি ছেলেও জন্মিল। ছেলেটি হঠাৎ মারা গেলে পর মণিমালার মধ্যে পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ পাইল। সুরু হইল প্রশান্তর জীবনে নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, অদৃষ্টের রুদ্রলীলা। শেষ পর্য্যন্ত রাজপুতানার গভীর খাদে আত্মাহুতি দিয়া প্রশান্ত পিতৃকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

নিয়তির নিকট মানুষ যে কিরূপ অসহায়, অদৃষ্টের হস্তে সে যে ক্রীড়নক মাত্র তাহাই এই উপন্যাসের নায়ক প্রশান্তর ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে মর্ম্মান্তিকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির হস্তে প্রশান্তর অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ পাঠক-চিত্তকে বেদনায় পূর্ণ করিয়া তোলে, তার জীবন-নাটকের ঘাতপ্রতিঘাতে পাঠকচিত্ত বিচিত্রভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠে। উপন্যাসে দুটি জিনিষের আশ্চর্য্য সমন্বয় দেখিতে পাই—লেখকের কল্পনার প্রসার আর তাহার বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী। প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী, উগ্র স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্না প্রভাবতীর চরিত্রটি লেখকের একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। প্রশান্তর জীবন মন্থন করিয়া যে হলাহল উঠিয়াছিল তাহার মূলে রহিয়াছে এই আত্মকেন্দ্রিক মহিলার চক্রান্ত। লেখকের ভাষা বেগবতী, নদীর মত সহজ স্বচ্ছন্দ ও দুর্ব্বারগতি। রাজপুতানার পর্ব্বতসঙ্কুল রুক্ষ নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনায় তিনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন—একটি অভিনব পটভূমিকায় কাহিনীটি বেশ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চিরদিনের রূপকথা—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। মডার্ণ, বুকস্ লিমিটেড। ১৩০।১এ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা।

বাংলার রূপকথা-সাহিত্যের আসরে দক্ষিণারঞ্জন নিজের আসনটি কায়েম করিয়া লইয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে রূপকথার বই অজস্র রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার 'ঠাকুরমার ঝুলি' আজও এ ক্ষেত্রে অপরাজেয় হইয়া আছে। জাতীয় জীবনের গভীরতম উৎস হইতে উৎসারিত রূপকথার রূপময় ভাষা ও বিশিষ্ট ভঙ্গীকে অবিকৃত রাখিয়া তিনি যে অনবদ্য রস পরিবেশন করিয়াছেন তাহা কালজয়ী হইয়া বাংলার আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে চিরদিন আনন্দ-দান করিবে।

সুবর্ণ সুযোগ

ওজস:—দুর্ব্বলতানাশক ও শক্তিবর্দ্ধক। পেশী ও স্নায়ু সতেজ করে—৪৲

হাইড্রোকিল:—বিনা অস্ত্রে হাইড্রোসিল নির্মূল করে ও স্বাভাবিক আকারে আনে—৫৲।

ক্যাট্যারাক্টো:—বিনা অস্ত্রে যতদিনের হউক চক্ষুর ছানি কাটিয়া পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি দান করে। সকল রকম চক্ষুরোগে অব্যর্থ—৩৲।

ব্রেইনফুড:—ব্লাডপ্রেসার, হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ, মৃগী ইত্যাদি মারাত্মক রোগের অমোঘ অস্ত্র। ইহা মস্তিষ্ক শীতল রাখে, ধারণাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ছাত্র ও মানসিক পরিশ্রমীদের পরম বন্ধু—৩৲।

কুমারকল্যাণ:—শরীরের প্রধান যন্ত্র যকৃত বিকল হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সেই বিকল যকৃতকে সংস্কার ও বিশেষ কার্য্যকরী করিতে কুমারকল্যাণ অদ্বিতীয়। বিশেষতঃ বৃদ্ধ ও শিশুর ইহা জীবনরক্ষক—৲।

ডাঃ সি, ভট্টাচার্য্য—১২০, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা

মায়ের কর্ত্তব্য

শিশুপালনের সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন শিশুদের দৈহিক সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি$_1$, বি$_2$র সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দন্তোদ্গমের সময়, সেবন করান উচিত।

বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী:—শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্ণতা, দুধ তোলা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, রুগ্নতা, ব্রঙ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি।

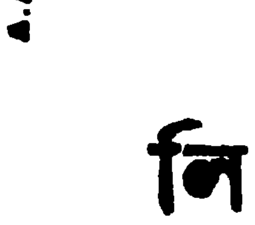

শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য

বিবটন

একটি পূর্ণাঙ্গ টনিক

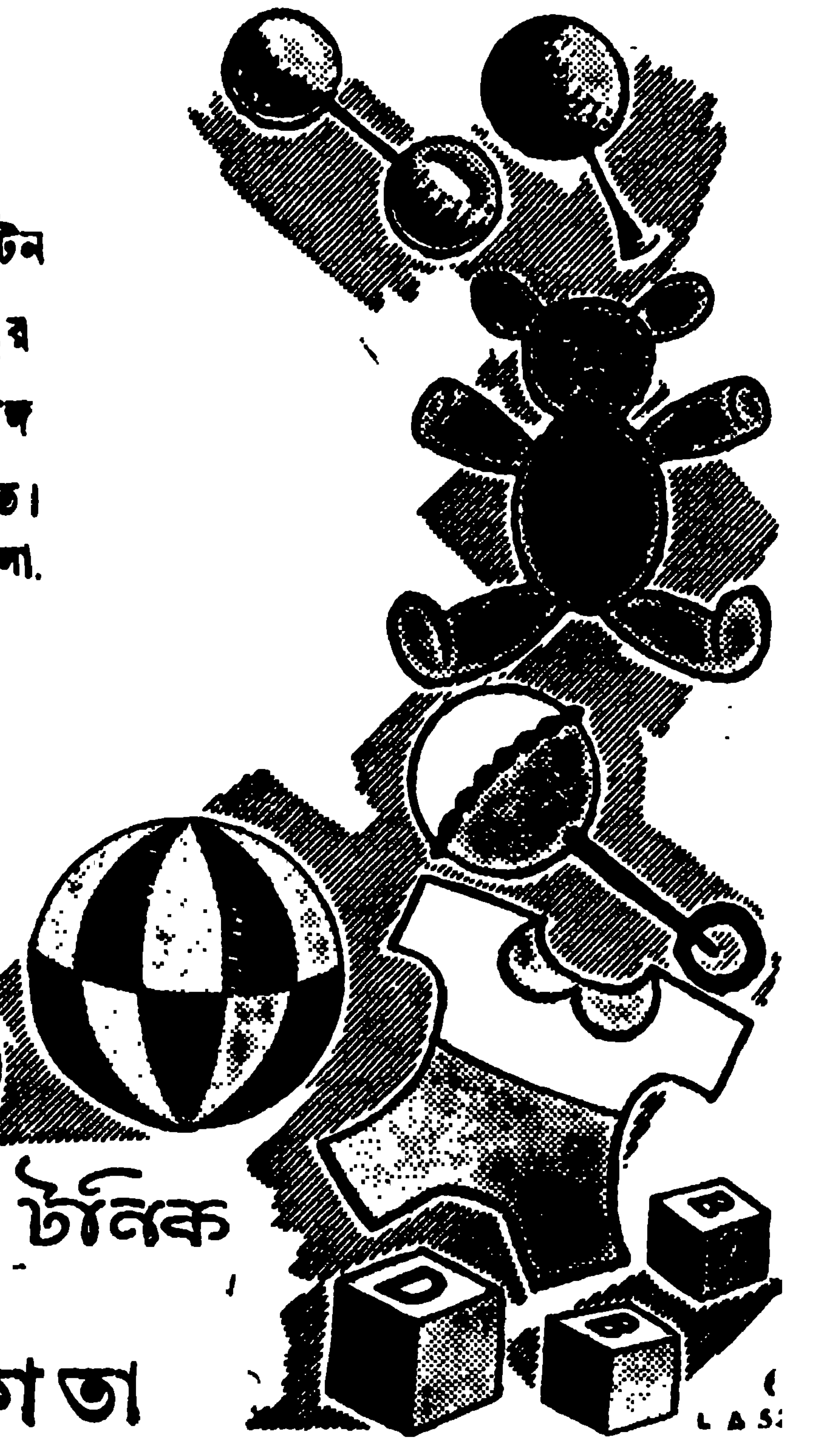

লিষ্টার এন্টিসেপটিকস্ • কলিকাতা

নববর্ষে প্রকাশিত হলো

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস

ভারতের অতীত ছিল পণ্ডিতের ধ্যান, শিল্পীর সাধনা, জনগণের আনন্দক্ষেত্র। পরাধীন দেশ ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি দেখেছে সেই অতীতে। তবু একান্ত প্রত্যক্ষতা ছিল না সেই অতীতের, আপন বলে তাকে চেনা হয়নি। বিদেশীর হাতে তৈরি ঘষা কাঁচের মধ্য দিয়ে তার অস্পষ্ট মূর্তিমাত্র দেখেছে শিক্ষিত সম্প্রদায়। তার বার্তা কখনো ছড়িয়ে পড়েনি সাধারণের রাজপথে।

আজ ভারতবর্ষের জীবনের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। শুধু অতীত নয়, ভারতবর্ষের সামনে বিপুল বর্তমান, বিপুলতর ভবিষ্যৎ। তাই অতীতকে আজ নিজের চোখে নতুন করে দেখতে হবে, বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে হবে তাকে, ভবিষ্যতের পথকে দেখতে হবে তারই আলোকে।

ধর্মে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রতত্ত্বে, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ভারত অপ্রতিবীর্য ছিল। সেই ভারতের দীপ্ত ইতিহাসকে সাধারণের জন্য ব্যাপকভাবে মেলে ধরেছেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তাই এ বই নিষ্প্রাণ তথ্যের বোঝা নয়, সজীব আলেখ্য। শুধু জানা নয়, সানন্দে জানা। সচিত্র। দাম ৪৲

অচিন্ত্যকুমারের

দুখানা বিখ্যাত উপন্যাস

বেদে অচিন্ত্যকুমার চিরকাল নতুন পথের প্রণেতা। সনাতনের ঘেরাটোপ ভেঙে বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা জীবনের প্রশস্ত পথে টেনে আনার বিপ্লবসাধন করেছিলেন, অচিন্ত্যকুমার তাঁদের অন্যতম অগ্রনায়ক। সেই সাহিত্যবিপ্লবের প্রথম দিকচিহ্ন 'বেদে'। অম্ল, মধুর, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত যেমন ছয়টি রস, তেমনি ছয়টি নায়িকা। কিন্তু প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন, প্রত্যেকেরই অন্তরে স্বতন্ত্র রহস্যের অন্ধকার। এই বিচিত্র, রহস্যঘন তটরেখা ছুঁয়ে ছুঁয়ে নদীর মত প্রবাহিত যার জীবন, সেই 'বেদে'। সচিত্র। দাম ৩৷৹

জননী জন্মভূমিশ্চ মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের একটি চিরকালিক সমস্যার আধুনিকতম আলেখ্যলিখন। ভঙ্গপ্রবণ সমাজের প্রথমতম প্রসঙ্গ। পুরনোর সঙ্গে নতুনের সংঘর্ষ, সংস্কারের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের। একটি ঘরোয়া কাহিনীকে অনুভবের গুণে গভীর বর্ণাঢ্য করে আঁকা হয়েছে। জীবন্ত ভাষা, উজ্জ্বল চরিত্র, বলিষ্ঠ মনোভঙ্গি —যা অচিন্ত্যকুমারের বিশেষত্ব, সবই এই উপন্যাসে পরিস্ফুট। দাম ২৷৹

শচীন্দ্র মজুমদারের

দুখানা অভিনব উপন্যাস

লীলামৃগয়া উপন্যাসের আঙ্গিকে কাব্যের রস পরিবেশন করলে তার আস্বাদ কতো মধুর হতে পারে 'লীলামৃগয়া'য় তার নিঃসংশয় পরিচয় মিলবে। আধুনিক সমাজ ও আধুনিক নর-নারী এই উপন্যাসের উপজীব্য, কিন্তু বিষয় সেই চিরন্তন, সেই পরকীয়া-প্রেম। ইন্দ্রিয়াতীত হয়েও যা ইন্দ্রজালের অতীত নয়। আধুনিক কালের প্রসঙ্গে পরকীয়াপ্রেমের এমন সম্মোহনী কাহিনী বাংলা সাহিত্যে আর লেখা হয়নি। দাম ৩৲

পলাতকা স্থান : এলাহাবাদ। কাল : ১৯৪২। পাত্রী : বহ্নিশিখার মতো বাঙালী এক মেয়ে। এ-মেয়ে বিজ্ঞানের সাধনা করে, পুলিশের গুলির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, প্রয়োজনে পুরুষবেশে পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু ছায়ার মতো অবিরাম তাকে অনুসরণ করে শুধু পুলিশবাহিনীর গোয়েন্দা নয়, লম্পট বিত্তশালী এক পুরুষ। সেই লালসাময় আলিঙ্গন থেকে তার ঊর্ধ্বশ্বাস পলায়ন। নতুন যুগের নারী, যেন নারীচরিত্র থেকেই পলাতকা। সচিত্র। দাম ৩৲

সিগনেট প্রেসের বই

১০/২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২০

চিরদিনের রূপকথায় 'রাজকন্যা', 'শিউলি', 'চাঁদের দেশ', 'কমল সায়র', 'মুকুট, 'চিরদিনের রূপকথা' এই কয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে। এই ধরণের রূপকথা চিরপুরাতন হইলেও চিরনূতন। রাজপুত্র রাজকন্যার কাহিনী, পরিকথা ইত্যাদি স্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষ সমান আগ্রহে শুনিয়া আসিতেছে। দক্ষিণাবাবু যে ভাষায় এই রূপকথাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিছক পুঁথির ভাষা নয়, তাহাতে দিদিমা ঠাকুরমার মুখের ভাষার সার্থক অনুকৃতি আছে বলিয়া এগুলিতে বাংলার খাঁটি রূপকথার আমেজ লাগিয়াছে।

অবশ্য সবগুলি গল্পই যে সার্থক সৃষ্টি হইয়াছে এমন কথা বলিতেছি না। কোনো কোনো গল্প পড়িয়া মনে হয় ঠিক যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাইলাম না। সেগুলিকে যেন টানিয়া বুনিয়া কোনমতে শেষ করা হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ গল্পেই কথার যাদুকর দক্ষিণারঞ্জনের স্বকীয়তার স্বাক্ষর রহিয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বসন্তরোগ ও প্রতিকার—কবিরাজ শ্রীকালীকেশব ঘোষ, সেবাব্রত ঔষধালয়—শ্যামলাল রোড, বর্দ্ধমান। মূল্য এক টাকা। পৃঃ ২৪০।

কবিরাজ শ্রীকালীকেশব ঘোষ সহজ ভাষায় বসন্ত রোগ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। সাধারণ গৃহস্থ ইহা পাঠ করিয়া যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। বিভিন্ন প্রকারের বসন্তের লক্ষণ ও দেশী, অথচ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বিষয় বইখানিতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপযুক্ত মূল্য কম হওয়ায় ইহা বহুজনসমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

স্মৃতিকথা—মন্মথকুমার বসু-রচিত ও শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু-সম্পাদিত। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ, ১১+২৪৭। মূল্য চারি টাকা।

মন্মথকুমার বসু মহাশয় দীর্ঘকাল সরকারী চাকুরী করিয়া পরিণত

নব বৈশাখে কুহু ওই ডাকে ০০০

নববর্ষের প্রীতি-অভিনন্দনে আনন্দময় মুহূর্তগুলি সঙ্গীতমুখর করে তুলুন—

গৌরীকেদার ভট্টাচার্য : GE 7476
এসো প্রদীপ হাতে :: আমি যে দেখেছি
—দু'টি চমৎকার আধুনিক গান

সুবিনয় রায় : GE 7477
এলেম নতুন দেশে :: গোপন কথাটি
—দুটি নতুন রবীন্দ্র-সঙ্গীত

গিরীন চক্রবর্তী : GE 7475
দুঃখ-দৈন্য-দৈত্য-দানব :: মিছে কেন এত
—মর্ম্মস্পর্শী ধর্মমূলক গান

কেচু চক্রবর্তী : GE 7479
তুমি আর আমি :: সেই প্রথম দিনের
—নবীন শিল্পীর সার্থক আধুনিক গান

শ্রীমতী রাধারাণী : GE 7480
ধিক্‌ রাজা ধিক্‌ :: মথুরাবাসিনী এক রমণী
—কীর্তন গানে স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন

পান্নালাল ভট্টাচার্য : GE 7478
যে বীণা বাজিয়ে গেলে :: না শুনে গিয়েছ
—দুটি সুন্দর আধুনিক গান

শ্রীমতী পূরবী দেবী : GE 7481
আঁখি দিয়ে গেল ডাকি :: কথাগুলি মোর
—কোমল মধুর কণ্ঠে আধুনিক গান

কানন দেবীর কণ্ঠে 'অনন্যা'
চিত্রের গানগুলি কলম্বিয়া রেকর্ডে বেরুল

কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোং

কলিকাতা — বোম্বাই — দিল্লী — লাহোর — করাচী

বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি যে-সব কাহিনী পুস্তকখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বেকার বাঙালী সমাজের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। গ্রামের তৎকালীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, দোল-দুর্গোৎসব, পূজা-পার্ব্বণ, পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ এবং দলাদলি প্রভৃতি সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত বর্ণনা উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক। তাঁহার কর্ম্ম-জীবনেরও নানা বিচিত্র ঘটনা সে যুগের শাসন-পরিচালনা-পদ্ধতির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। অবসর-জীবনে স্বদেশী আন্দোলনের গঠনমূলক কোন কোন কার্য্যের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। স্বদেশী বস্ত্র এবং অন্যান্য ব্যবসায়ে অল্প দিন পরেই কেন ভাটা পড়িয়া যায় তাহার কারণগুলি মন্মথ বাবু যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন আজিও সে সকল বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। পুস্তকখানির ভাষা সরস ও প্রাঞ্জল। সে যুগের সামাজিক চিত্র হিসাবে ইহার মূল্য যথেষ্ট।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

শরৎ জীবনী—'অরূপ' প্রণীত এবং কলিকাতা ৮৯ নং আপার সারকুলার রোডস্থ ভারতী সাহিত্য সভা হইতে শ্রীরমানাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা মূল্য এক টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া যে সব কর্ম্মযোগী গৃহী পরমার্থ সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই অন্যতম ছিলেন হুগলী আরামবাগ মহকুমার তিরোল গ্রাম নিবাসী শরচ্চন্দ্র মিত্র। পরিণত বয়সে পার্শীবাগান রামকৃষ্ণ সমিতি এবং শঙ্কর ঘোষ লেনস্থ একটি মেসবাড়ী ছিল তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র। এই সব অঞ্চলের বহু যুবক তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার কাছে যখনই যিনি গিয়াছেন, কেবল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা এবং দরিদ্রনারায়ণের সেবার উপদেশ ও উৎসাহই পাইয়াছেন। জীবনে বহু বাধা বিঘ্নে অবিচলিত থাকিয়া এই কর্ম্মযোগী যে ভাবে কর্ম্মযোগের সাধনা করিয়া গিয়াছেন তাহা বিস্ময়-কর। ইঁহার ত্যাগপূত কর্ম্মবহুল জীবনের কথা যত বেশী আলোচিত হইবে, ততই সমাজের কল্যাণ সুনিশ্চিত।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দেশ-বিদেশের কথা

খিদিরপুর একাডেমির বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী খিদিরপুরস্থ বি. এন. রেলওয়ে গ্রাউণ্ডে জেনারেল ম্যানেজার পি. সি. মুখোপাধ্যায়ের

সাধারণ দৌড়-প্রতিযোগিতায় প্রথম তিনজন :—
(বাম দিক হইতে) প্রভাত : তারিণী : চিত্ত

সভাপতিত্বে খিদিরপুর একাডেমির বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রতিযোগিগণের মধ্যে প্রভাত দত্ত, চিত্ত দাস ও তারিণী ভট্টাচার্য্য বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্রগণের দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বয়সের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং যোগদান-পূর্ব্বক ছাত্রদের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উৎসব-শেষে পুরস্কার বিতরণ হয় এবং প্রতিযোগী ছাত্রবৃন্দ ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

কিশোরদের দৌড়-প্রতিযোগিতায় প্রথম তিন জন

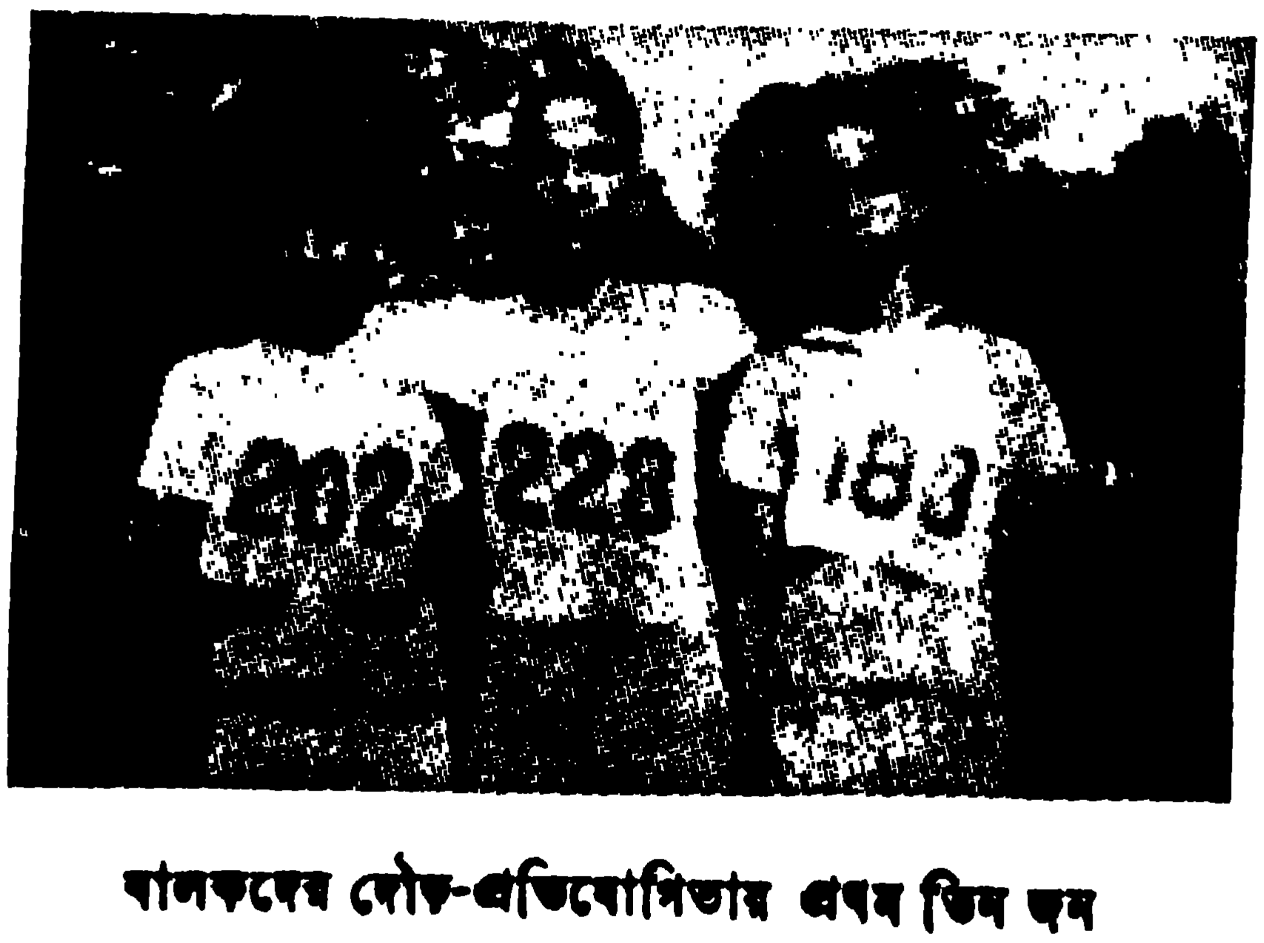

বালকদের দৌড়-প্রতিযোগিতায় প্রথম তিন জন

ব্যায়াম-প্রতিযোগিতায় খিদিরপুর একাডেমির ছাত্রবৃন্দ

একাডেমির ছাত্রবৃন্দের ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শন

যাদুকর পি. সি. সরকার

সম্প্রতি প্রকাশ যে, বর্ত্তমান বৎসরে স্ফিনিক্স ১৯৪৯ সুবর্ণ পদক বাংলার সুপ্রসিদ্ধ যাদুকর শ্রীযুক্ত পি. সি. সরকার লাভ করিয়াছেন।

বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়

গত ৩রা মার্চ্চ বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি লক্ষ্ণৌ টেকনিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া লক্ষ্ণৌয়েই বাস করিতেছিলেন। ইনি এলাহাবাদের সায়ান্টিফিক ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্ট কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারতে Table-blown glass apparatus প্রস্তুতকারকদের অন্যতম ছিলেন। ইঁহার শিক্ষালাভ এলাহাবাদেই হয়। সেই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিশেষ আলাপ-পরিচয় হয়। বেণীমাধব বাবুর কার্য্যকলাপের কথা বহুকাল আগে 'প্রদীপে' প্রকাশিত হইয়াছিল। "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক পুস্তকেও তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

মৌজ

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ভারতের গণপরিষদে কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত জম্মু এবং কাশ্মীরের চারি জন প্রতিনিধি।
দক্ষিণে—প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা

যুদ্ধবিরতির পরে কাশ্মীরের স্বাভাবিক অবস্থা।
ভারতীয় সৈন্যেরা এই সমস্ত শস্যক্ষেত্রের পাহারায় নিযুক্ত

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৯শ ভাগ ১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৫৬ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতা দিবস আগতপ্রায়। ঐ দিন কি ভাবে উদ্‌যাপিত হইবে তাহার জন্য বিভিন্ন পন্থাবলম্বী নানা জনে নানা মত দিয়াছেন। ৯ই আগষ্ট বিগত হইয়াছে, কিন্তু কাহারও মনে সেই যুগসন্ধিক্ষণের কথা পূর্ণরূপে উদিত হইয়াছিল কি? আজ আমরা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছি, যদিও তর্কের খাতিরে বা দুঃখ-কষ্টের ঝোঁকে যখন কেহ বলে যে এই স্বাধীনতা "ভুয়া" বা "ঠগে আজাদি ঝুটা হ্যয়" তখন আমরা অনেকেই তাতে সায় দিই। আমাদের সায় দেওয়ার প্রধান কারণ এই যে, আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ ভুলিয়াছি প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে। এখন স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতেও আমাদের লাগিবে অন্ততঃ সাত বৎসর। ইতিমধ্যে অনেক পণ্ডিতমূর্খ, অনেক অর্ব্বাচীন স্বৈরাচারীর কথায় আমরা টলিব, ভুল পথে লক্ষ বা কোটির পর্য্যায়ে লোকে চলিবে এবং দেশে অশান্তি ও অরাজকতার বন্যা বহিবে। ইহার কারণ আজ দেশের শীর্ষ স্থানের আসন শূন্য।

বাংলায় এখন ঘোর দুর্দ্দিন চলিতেছে। বাংলার আকাশ জ্যোতিষ্কবিহীন ও তমসাচ্ছন্ন। সেই তমিস্রার আড়ালে গণ-দেবতার আসনে অপদেবতার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে। স্বাধীনতার প্রথম উদ্বোধন হইতে দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের আরম্ভকাল পর্য্যন্ত যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির ন্যায় দেশকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই কবিগুরু আজ নাই, তাঁহার প্রিয়বন্ধু ও শিষ্য, যিনি নিদারুণ সাম্প্রদায়িক স্রোতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নোয়াখালির হিন্দু আর্ত্তগণের পরিত্রাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই মহাত্মাও চলিয়া গিয়াছেন। বাংলার স্বাধীনতার যজ্ঞে তাই হইয়াছে ভূতপ্রেতের আবির্ভাব।

বাংলার গৃহবিবাদ

বাংলার গৃহবিবাদের পালা চরমে উঠিয়াছে। যাঁহারা মন্ত্রীসভার আসন অধিকার করিয়া আছেন তাঁহাদের প্রাদেশিক কংগ্রেসের (?) "গদী" হইতে সরান হইয়াছে, এখন কোঁদল চলিয়াছে মন্ত্রিত্ব অধিকার লইয়া। দেশের ও দশের কথা এখানে অবান্তর, কেননা ইহা জমীদারী দখলের "সরিকানা লড়াই," প্রজা মরে কি বাঁচে তাহাতে কাহার কি আসে যায়? প্রজা তো প্রবাদ-কথিত উলুখড়, সুতরাং বাঘ ও মহিষের লড়াইয়ে তাহার প্রাণ যাইবেই ও শেষে জয়লাভ করিবে—বাঘও নয়, মহিষও নয়—সেই ফেরুপাল, যাহাদের চীৎকারে বাংলার আকাশ এখনই ফাটিয়া পড়িতেছে। সে যাই হোক, দুই পক্ষই উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন ও সেখানে মীমাংসাও হইয়াছে এইরূপে:

"তিন দিন কলিকাতায় অবস্থানকালে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন এবং সেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত তিনি যে সব আলোচনা করেন, পণ্ডিত নেহরু ওয়ার্কিং কমিটিতে তাহার বিবরণ দিয়াছেন এবং পশ্চিম বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটি পণ্ডিত নেহরুর বিবরণ ও রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিস্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মীদের সহিত আলোচনা করিয়া এই অভিমত পোষণ করেন যে, পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ যাহাতে তাহাদের পছন্দসই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে পারে তজ্জন্য যত শীঘ্র সম্ভব পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নূতন নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এবং বয়স্কদের ভোটাধি-কারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্ব্বাচন ১৯৫০ সালের শেষভাগে অথবা ১৯৫১ সালের প্রথমভাগে ছাড়া সম্ভবপর হইবে না বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৯৫০ সালের শেষভাগের পূর্ব্বে নূতন ভোটার তালিকা প্রস্তুত হইবে না বলিয়া তৎপূর্ব্বে সাধারণ নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠানও সম্ভবপর নহে। এই নূতন ভোটার তালিকা প্রস্তুতের পূর্ব্বে যদি কোন নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তবে তাহা ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এবং বর্ত্তমান ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই করিতে হইবে।

নূতন ভোটার তালিকা প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাথমিক কমিটি হইতে সুরু করিয়া সর্ব্বোচ্চ কমিটি পর্য্যন্ত কংগ্রেসের বিভিন্ন পর্য্যায়ের পূর্ণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানও সম্ভবপর নহে।

পুরাতন ভোটার তালিকা অতিশয় পুরাতন এবং তাহার অনেকগুলি এখন পাওয়াও সম্ভবপর নহে।

(১) এই কারণে ওয়ার্কিং কমিটি সুপারিশ করিতেছে যে :—(ক) এখন হইতে ছয় মাসের মধ্যে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের নূতন নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সময়ে বর্ত্তমান ব্যবস্থা-পরিষদ বাতিল করিতে হইবে।

(খ) যদি সম্ভব হয় তবে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থাসহ যৌথ নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যদি ইহা সম্ভবপর না হয় বা এই ব্যবস্থার যদি বিলম্ব ঘটে, তবে নির্ব্বাচনে বর্ত্তমান ব্যবস্থাই অনুসৃত হইবে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত যে সব শরণার্থী পূর্ব্ববঙ্গেও ভোটার ছিলেন কিন্তু এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গে বসতি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা অন্ততঃ ছয় মাস পশ্চিমবঙ্গে বাস করিতেছেন বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে তাঁহাদিগকেও যতদূর সম্ভব ভোটার তালিকাভুক্ত করা হইবে এবং বর্ত্তমান ভোটার তালিকা সংশোধন করা হইবে।

(গ) পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাজ চালাইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি অন্তর্ব্বর্ত্তী মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়া দরকার। এই মন্ত্রিসভা প্রদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের লইয়া গঠন করিতে হইবে। যাঁহারা বর্ত্তমানে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নহেন, তাঁহাদিগকেও এই মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা যাইবে। পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসী দল এই সম্পর্কিত যে কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের বিবেচনার জন্ত প্রেরণ করিবেন।

শীঘ্রই সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ইতিমধ্যে পরিষদের শূন্যপদ পূরণের জন্ত কোন উপনির্ব্বাচনের প্রয়োজন নাই।

কমিটি আরও মনে করেন—(১) পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতি পুনর্গঠন করা দরকার। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিভিন্ন দলভুক্ত ব্যক্তিকে এই কার্য্যকরী সমিতিতে স্থান দিতে হইবে। এই কার্য্যকরী সমিতির আবার একটি ক্ষুদ্রায়তন ওয়ার্কিং কমিটি থাকিবে এবং এই ওয়ার্কিং কমিটিতেও বিভিন্ন দলের কর্ম্মীদের স্থান দিতে হইবে।

(২) পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির পুনর্গঠন যদি সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে নিঃ-ভাঃ কংগ্রেস কমিটির পশ্চিমবঙ্গীয় সদস্যগণ প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিবেন।

(৩) পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনায় যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয় তবে ওয়ার্কিং কমিটি প্রয়োজনমত অপর যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

(৪) প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের চূড়ান্ত দায়িত্ব থাকিবে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের হাতে।

(৫) পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটিতে পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকজন সদস্যকে কো-অপ্ট করা বিধিসম্মত হয় নাই বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি অবিলম্বে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের নির্দ্দেশ প্রদান করিতেছে। এই সম্পর্কিত বিধান ভঙ্গ করা হয় নাই বলিয়া যে সব সদস্য প্রমাণ করিতে পারিবেন না বা যে সব ক্ষেত্রে বিধান লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইবে সেই সব সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করা হইবে।"

ওয়ার্কিং কমিটির উক্ত নির্দ্ধারণে বোধ হয় মন্ত্রিত্ব অধিকার প্রার্থীদের মন উঠে নাই, কেননা প্রাদেশিক কংগ্রেসের নামে বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে যে সতেরো দফায় অভিযোগ তাঁহারা করিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ ফিরিস্তি উত্তর-ভারতের নানা সাময়িক পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছে, এবং একটি পত্রিকা তাহার প্রায় সমস্তটাই ছাপাইয়াছে। ঐ অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয় করা বা বিচার করা এখানে সম্ভব নহে, যদিও ঐরূপ প্রচারের উদ্দেশ্যই তাই। অভিযোগের বিচার যদি কখনও হয় তবে দুই দলেরই বিচার হওয়া প্রার্থনীয়, কেননা যাঁহারা মহাসাধু সাজিয়া এখন বিচার প্রার্থনা করিতেছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ ওয়ার্কিং কমিটির কাছে গিয়াছে আমরা জানি।

২২শে শ্রাবণ

আট বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এমনি দিনটিতে বর্ষাবিধুর আকাশের নীচে রবীন্দ্রনাথ শেষ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। এই দিনের স্মৃতি দেশের লোকের মনে একটা বেদনা ও আকুলতা জাগায়। পঞ্জাবের উপর অসহ্য অপমানের জ্বালায় অস্থির হইয়া তিনি ইংরেজ-রাজ প্রদত্ত উপাধি ত্যাগ করেন, এই কথা সুবিদিত। কিন্তু তত সুবিদিত নয় সেই কথা যে ১৯১৯ সনের মার্চ-এপ্রিল মাস হইতেই গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের প্রতি তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত ১০ই জুলাইয়ের "হরিজন" হইতে তাঁহার পত্রের অংশ তুলিয়া দিলাম :

প্রিয় মহাত্মাজী,

শক্তির সকল রূপই যুক্তিবিরোধী—ঠিক যেন এক অশ্বের ন্যায়, চক্ষুতে আবরণ দেওয়া হইয়াছে, রথ টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে নৈতিক গুণ শুধু সারথিরই থাকিতে পারে, যিনি অশ্বকে পরিচালনা করেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের শক্তির মধ্যে নৈতিক কিছু থাকিতেই হইবে এমন কথা নয়; ইহা সত্যের অনুকূলে প্রযুক্ত হইতে পারে, সত্যের প্রতিকূলেও পারে। সকল শক্তির মধ্যে

যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, শক্তি সিদ্ধির নিকটবর্তী হইলেই তাহা বাড়িয়া উঠে, কারণ তাহা হইলে ইহা গিয়া লোভে দাঁড়ায়।

আমি জানি, আপনার শিক্ষা হইল কল্যাণের সাহায্যে অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। কিন্তু এরূপ সংগ্রাম বীরের জন্য, ক্ষণিক উত্তেজনার অধীন মানুষের জন্য নয়। একদিকে অকল্যাণ স্বভাবতই অকল্যাণের সৃষ্টি করে, অবিচারের ফলে হয় অত্যাচার, অপমানের ফলে জিঘাংসা। দুর্ভাগ্যবশত এরূপ শক্তির সৃষ্টি ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে, এবং হয় ভয়ে নয়ত ক্রোধে আমাদের কর্তারা তাঁহাদের নখদন্ত বাহির করিয়াছেন। তাহার নিশ্চিত ফল হইল আমাদের কাহাকে কাহাকেও প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় গোপন পথে চালিত করা, অন্য সকলকে একেবারে মূঢ় ও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলা।

এই সঙ্কটে আপনি মহান্ লোকনায়ক রূপে আমাদের মধ্যে সেই আদর্শে বিশ্বাস ঘোষণা করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন যে আদর্শকে আপনি ভারতের বলিয়া জানেন—যে আদর্শ গোপন প্রতিশোধের ভীরুতা ও ভীতত্রস্তের নতশিরে আনুগত্য উভয়েরই বিরুদ্ধে। ভগবান বুদ্ধদেব যেমন তাঁহার সময়ে এবং অনাগত সকল কালের জন্য বলিয়া গিয়াছেন:

অক্রোধেন জিনে ক্রোধম্ অসাধুং সাধুনা জিনে—অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ জয় করিবে, সাধুতার দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবে—

আপনিও তেমনই বলিয়াছেন।

এই হিতসাধনী ক্ষমতার শক্তি ও সত্য রূপ প্রমাণ করিতে হইবে তাহার অভয়ের দ্বারা এবং ভীতি-উৎপাদনের শক্তির উপর যাহার সাফল্য নির্ভর করে ও যাহা সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্রীকৃত দেশবাসীকে ভীতিসংমূঢ় করিবার জন্য ধ্বংসের যন্ত্র প্রয়োগ করিতে সংকুচিত হয় না এমন কোনও বাহিরের শক্তির সুযোগ গ্রহণে অস্বীকারের দ্বারা। আমাদের বুঝিতে হইবে যে, নৈতিক জয় বাহিরের সফলতার মধ্যে নাই। ব্যর্থতা তাহার মূল বা মর্য্যাদা কাড়িয়া লইতে পারে না। যাহারা ধর্মজীবনে বিশ্বাসী তাহারা জানে যে, অন্যায়ের পিছনে যখন ব্যাপক বাস্তব শক্তি থাকে তখন অন্যায়ের প্রতিরোধে দাঁড়ানোই জয়—সে জয় স্পষ্ট পরাজয়ের সম্মুখে আদর্শের প্রতি জীবন্ত বিশ্বাসের জয়।

আমি সর্বদাই অনুভব করিয়াছি, আর তাহা বলিয়াছিও যে, স্বাধীনতার মত মহাবস্তু দান হিসাবে কোনও জাতি পাইতে পারে না। তাহা পাইবার আগে আমাদের তাহা জিতিয়া লইতে হইবে। ভারতবর্ষ যখন প্রমাণ করিতে পারিবে যে, যে জাতি অধিকার করিয়াছে বলিয়াই শাসন করিতেছে তাহার অপেক্ষা ভারতবর্ষ নৈতিক হিসাবে উন্নত তখনই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা জিতিয়া লইবার সুযোগ আসিবে। দুঃখকষ্টের প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিতে হইবে। সে দুঃখকষ্ট মহৎ লোকের মাথার মণি, কল্যাণবুদ্ধিতে তাহার বিশ্বাস অটল। অধ্যাত্মশক্তিকে যাহারা বিদ্রূপ করে সেই ঔদ্ধত্যের সামনে তাহাকে অকুণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইতে হইবে।

আপনার দেশজননীর প্রয়োজনের মুহূর্তে আপনি আসিয়াছেন তাঁহাকে তাঁহার লক্ষ্যের কথা মনে করাইয়া দিতে, বিজয়ের সত্যপথে তাঁহাকে লইয়া যাইতে, তাঁহার বর্তমান যুগের রাজনীতির দুর্বলতা দূর করিতে—সেই দুর্বলতা মনে করে যে, কূটনীতির মিথ্যাচরণে অন্যের পোষাক পরিয়া ভড়ং করিলেই বুঝি কাজ হইবে।

তাই আমি অন্তরের সকল আবেগ দিয়া প্রার্থনা করি যে, আমাদের আত্মার স্বাধীনতা যাহাতে খর্ব হইতে পারে, এমন কিছু যেন আপনার অগ্রগতির পথে না আসিয়া পড়ে; সত্যের জন্য আত্মবলি যেন শুধু কথার মারপ্যাঁচের জন্য উন্মাদনার বিকারে দেখা না দেয়; বড় বড় নামের পিছনে যে আত্মপ্রবঞ্চনা লুকাইয়া থাকে তাহার ভয়ে যেন তাহা না নামে।

আপনার অকপট বন্ধু—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতায় অবাঙালীদের কার্য্যকলাপ

কলিকাতায় অবাঙালীদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে একটি নূতন বিষয় কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করা যাইতেছে। পুলিশ কনেষ্টবল পদে বাঙালী নিয়োগ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু লোক বাছাইয়ের পদ্ধতি ভাল নহে বলিয়া সুপারিশে অনেক বাজে লোক ঢুকিতে থাকে। হেড কনেষ্টবলেরা হিন্দুস্থানী; ইহারা এতদিন নিজেদের আত্মীয়স্বজন ভর্তি করিয়া কনেষ্টবল শ্রেণীটিকে প্রধানতঃ বিহারের একটি বড় উপার্জন কেন্দ্র করিয়া রাখিয়াছিল। হেড কনেষ্টবলেরা বাঙালী কনেষ্টবলদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে তিলকে তাল করিয়া উপরওয়ালাদের নিকট উপস্থিত করিয়াও তাহাদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে থাকে। ফলে আবার বিহারী নিয়োগ আরম্ভ হয় এবং কিছুদিন আগে সংবাদ বাহির হয় যে, কলিকাতার পুলিস কনেষ্টবলে সাঁওতাল আমদানীর চেষ্টা চলিতেছে। কনেষ্টবল পদে বিশেষ ভাবে ট্রাফিক পুলিসে বাঙালী ও বিহারীর তাৎপর্য্য কি তাহা যাঁহাদের রাস্তায় চোখ মেলিয়া চলা অভ্যাস তাঁহারা প্রতিদিন দেখিতে পাইবেন। রিক্সা, মহিষ এবং ঠেলা গাড়ী কলিকাতার রাস্তায় অতি অসুবিধাজনক বস্তু, ইহারা ট্রাফিকের কোন নিয়মকানুন মানে না, অনেক দুর্ঘটনার জন্য ইহারা দায়ী এবং বহু বাস ও গাড়ী চালককে ইহারা হঠাৎ পাশ কাটাইতে

গিয়া বা ষ্ট্যাণ্ডে আটকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অত্যন্ত বিপদে ফেলে। বিহারী ট্রাফিক পুলিস এদের কিছু বলে না। অথচ কোন বাঙালী গাড়ী চালকের সামান্যতম ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিলেই ইহারা ভয়ানক ভাবে কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠে। সম্প্রতি আরও একটি বিপদ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। আগে পুলিসকে লাঠি চার্জ্জ করিতে বলিলে রাস্তায় লাঠি ঠুকিয়া এবং লাঠি ঘুরাইয়া তাহারা ভয় দেখাইয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিত, পারত পক্ষে গায়ে লাগাইত না। এখন দেখা যায় ইহারা উপরওয়ালার হুকুমের অপেক্ষায় ছটফট করিতে থাকে। সশস্ত্র পুলিসের ব্যবহারেও এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

কলিকাতায় ষ্টেট বাস হওয়ায় রিক্সার খুব অসুবিধা হইয়াছে, বাঙালী হকার হওয়ায় বিহারী হকারদের পশার কমিয়াছে। সম্প্রতি গড়িয়াহাটার মোড়ে একটি রিক্সা উপলক্ষ্য করিয়া যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা গবর্মেণ্টের এবং বাঙালী জনসাধারণের পক্ষে উপেক্ষা করা কোনমতেই উচিত নহে। পাঞ্জাবী বাসের এখন দুইটি প্রতিযোগী—ট্রাম ও ষ্টেট বাস, এই দুইটির সামনে পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলা ইহাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ট্রাফিক পুলিসের ভারপ্রাপ্ত হেড কোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনার মহাশয় সম্প্রতি সরকারের টাকায় বিলাত হইতে ট্রাফিক বিষয়ে "জ্ঞান" অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু শহরের ট্রাফিকের মূল গলদ ও দুর্ঘটনার সর্ব্বপ্রধান কারণগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার তাঁহার সময় এখনও হয় নাই। ঘটনার দিন গড়িয়াহাট বাস ষ্ট্যাণ্ডে একটি পাঞ্জাবী বাস ষ্টেট বাসের পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, উহাকে পাশ কাটাইয়া বাহির হইতে গিয়া ষ্টেট বাসটির একটি রিক্সার সঙ্গে ধাক্কা লাগে, রিক্সাটি উল্টাইয়া যায়। কাছেই রিক্সা ষ্ট্যাণ্ড এবং ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড। রিক্সাটি যথাস্থানে না থাকিয়া বাস ষ্ট্যাণ্ডের গায়ে ছিল এবং তাহাও নিয়মমত না দাঁড়াইয়া আড়াআড়িভাবে ছিল ; পাঞ্জাবী বাসের আড়াল হইতে উহা দেখা যায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থানীয় বিহারীরা দল বাঁধিয়া আসিয়া বাসের ড্রাইভারকে আক্রমণ করে এবং শিখ ট্যাক্সিওয়ালারা দাঁড়াইয়া মজা দেখে, কারণ ষ্টেট বাস উভয়েরই শত্রু। সুখের বিষয়, কয়েকজন নাগরিক-কর্ত্তব্যবোধ সম্পন্ন বাঙালী অগ্রসর হইয়া বিহারী-দের বাধা দেন, বাসটি যাদবপুর চলিয়া যাইতে পারে। যাদবপুর হইতে আধঘণ্টাখানেক পরে বাসটি ফিরিলে আবার বিহারীরা দলবদ্ধভাবে উহা আক্রমণ করে। এবারও স্থানীয় বাঙালীরা আক্রমণ প্রতিহত করেন। বাসটি রাসবিহারী এভিনিউ দিয়া অগ্রসর হয়। কিন্তু এই সময়ে একটি খালি লরী ধরিয়া উত্তেজিত বিহারীরা আবার বাসটিকে তাড়া করে এবং পণ্ডিতিয়া রোডের মোড়ে যাত্রী নামাইবার জন্য বাস থামিলে উহাকে ধরে ও ড্রাইভারকে আক্রমণ করে। স্থানীয় লোকেরা তিনটা গুণ্ডাকে ধরিয়া পুলিসের হাতে সমর্পণ করে। এই ঘটনাটি অতি সামান্য ভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা ইহাকে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া মনে করি।

গড়িয়াহাটার ঘটনার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শিয়ালদহের ঘটনা ঘটে। রেল ষ্টেশনে কুলিদের অত্যাচার যুদ্ধের সময় হইতে অসহ্য হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের ন্যায্য মজুরী দ্বিগুণ বাড়াইয়া দেওয়া সত্ত্বেও ইহারা সন্তুষ্ট নহে, যাত্রীদের বেকায়দায় ফেলিয়া অসম্ভব চড়া হারে ইহারা মুটে ভাড়া আদায় করিয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা লইয়া গোলযোগ হইয়া-ছিল এবং ষ্টেশনে উপযুক্ত লোক রাখিয়া প্রতিকারের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ এই অত্যাচার বন্ধ হয় নাই। শিয়ালদহ ষ্টেশনে এইরূপ একজন কুলির অতিরিক্ত পয়সা আদায়ের জবরদস্তি হইতে বচসা হয়। বচসা হাতা-হাতিতে পরিণত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দলবদ্ধভাবে লাঠিসোটা লইয়া বিহারী প্রভৃতি অ-বাঙালী কুলিরা যাত্রীদের আক্রমণ করে। গড়িয়াহাটের মোড়ে বাঙালীদের কর্ত্তব্যবোধ জাগরণের যে সামান্য পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল এখানে তাহা আরও পরিস্ফুট হয়, এবং বিহারীদের মার ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ষ্টেশনের বাহিরে রাস্তায় কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল ইতর লোক লুঠপাট প্রভৃতি করে, ইহা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। শিয়ালদহের ব্যাপারে বাঙালী যে তৎপরতা ও দৃঢ়তা দেখাইয়াছে তাহার সুফল ফলিয়াছে, উদ্ধত বিহারী প্রভৃতি কতকটা সংযত হইয়াছে। গবর্মেণ্ট অবশ্য এখানেও দু'পক্ষ বাঁচাইয়া অর্থহীন বিবৃতি দেওয়া ছাড়া আর কোন কিছু করেন নাই। তবে মহরমের গত গোলযোগের ন্যায় সমস্ত দায়িত্ব বাঙালীর ঘাড়ে না চাপাইয়া বিহারীদের প্রথম আক্রমণের কথাটা যে সাহস করিয়া প্রেস নোটে বলিতে পারিয়াছেন, অন্ততঃ এইজন্যও তাঁহাদের ধন্যবাদ দিতে হয়।

বাঙালী শুধু চাকুরি করিতেই পারে, চাকুরি ছাড়া আর কিছু তারা করিতে রাজী নয় এই ধরণের কথা সেদিনও জবাহরলাল কলিকাতায় বলিয়া গিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় বাঙালী প্রবীণেরা উহা নীরবে শুনিয়াই আসিলেন, একটা জবাবও দিতে পারিলেন না। বাঙালী ডেস্ক-ওয়ার্ক ছাড়া আর কিছু করিবার উপযুক্ত নহে, করিতে চাহেও না, এই ধরণের একটা সূক্ষ্ম প্রচারকার্য্য ইংরেজ মাড়োয়ারী স্বার্থচক্র দীর্ঘকাল যাবৎ চালাইয়া আসিয়াছে, যাহার ফলে বহু বাঙালী নিজেও ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন কিন্তু এ কথা একদম ভুল। সামরিক বিভাগে পাইলট এবং আর্টিলারিতে বাঙালী দক্ষতা দেখাইয়াছে। সৈন্য বিভাগে বাঙালীর দক্ষতা প্রমাণিত হওয়ার পর ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট উহাতে বাঙালীর প্রবেশ কমাইয়া দেন। আবার এ দিকে সুযোগ পাওয়া মাত্র বাঙালী নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। এ বিষয়ে প্রধান সমস্যা এই যে, গবর্মেণ্টের সহায়তা ভিন্ন জীবনের কোন ক্ষেত্রেই এখন আর প্রদেশের লোকের পক্ষেও সম্পূর্ণ

ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য নহে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্ব্বস্তরে, মুটেমজুর, গয়লা প্রভৃতির কাজে পর্য্যন্ত এখানে এমন একটা অসম প্রতিযোগিতা রহিয়াছে যে, গবর্মেণ্টের সাহায্য ছাড়া বাঙালীর পক্ষে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। মুসলিম লীগ আমলে মুসলমানেরা অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি করিতে পারিয়াছিল কারণ গবর্মেণ্ট তাহাদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিল। গবর্মেণ্ট এখন আর পুলিস-রাষ্ট্র নহে, সমাজ কল্যাণ-রাষ্ট্র (Social Service State) হিসাবে উহা এখন জনগণের জীবনযাত্রার সকল স্তরে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। এই কারণেই গবর্মেণ্টের সহায়তা এবং উৎসাহ ভিন্ন কোন সামাজিক কাজ ও উন্নতি এখন আর সম্ভব নহে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ ভাবে এই কথা চিন্তা করা দরকার। আমরা আবারও বলিতেছি, ইহা প্রাদেশিকতা নহে, বাঙালীর জন্মগত অধিকার ও আত্মরক্ষার জন্য ইহা আবশ্যক।

কলিকাতায় বিদেশী ও অবাঙালী

ইউনাইটেড কিংডম সিটিজেন্স এসোশিয়েশনের সরকারী মুখপত্র "মান্থলি রিভিউ"এর গত জুন সংখ্যায় কলিকাতা শহরে বিদেশীদের নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে :

আফগান	১০০০	মিশরীয়	৩০
আমেরিকান	৮৫০	নরওয়েজিয়ান	১৪০
আর্জেন্টিন	১৫	পর্টুগীজ	৭
আরব	১২	রুমানিয়ান	৬
বুলগেরিয়ান	১	রাশিয়ান	১২০
চেক	৯০	শ্যামী	৩০
ডাচ	২২০	সুইডিশ	৬৫
দিনেমার	৫৫	সুইস	১০৫
বেলজিয়ান	১১০	স্পানিয়ার্ড	২০
ফরাসী	২০০	ইরাণী	১৭০
ফিন	১৬	ইরাকী	২৫০
গ্রীক	৩০	ইটালীয়ান	৯০
জর্ম্মান ও অষ্ট্রিয়ান	১৮০	পোল	৭৫
জাপানী	৫০	তুর্কী	২০
হাঙ্গেরিয়ান	৪৫	চীনা	১০,০০০

ইংরেজ এবং পাকিস্থানীর সংখ্যা এই তালিকায় নাই। তা ছাড়া অন্যান্য ডোমিনিয়নের কত লোক কলিকাতায় আছে তাহাও জানা থাকা উচিত।

কলিকাতায় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীদের সংখ্যা কত তাহাও এখন জানা দরকার হইয়া পড়িতেছে। ভারতের যে কোন শহর অপেক্ষা এক কলিকাতাতে হিন্দী ভাষা-ভাষীর সংখ্যা বেশী ইহা জানা যায়, কিন্তু এই সংখ্যাটি কত তাহা সঠিক পাওয়া যায় না। মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, গুজরাটি, দিল্লীওয়ালা, সিন্ধী প্রভৃতির সংখ্যাও জানা প্রয়োজন। এ কাজ এখন আদৌ কঠিন নয়, রেশন কার্ড ধরিয়া একটু চেষ্টা করিলে এক মাসের মধ্যেই এই অত্যাবশ্যক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান

ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্বসীমান্ত প্রদেশ তিনটি—পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য; তাহার পূর্ব্বে ও দক্ষিণে পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববঙ্গ। সুতরাং এই সীমান্ত প্রদেশসমূহের জনগণের মন সদাই জাগ্রত ও সতর্ক থাকিবে এই মনোভাব আমরা প্রত্যাশা করি। গত দুই বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হাজার হাজার মুসলমান স্ত্রী-পুত্র লইয়া পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে আসিয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে। পূর্ব্ববঙ্গের গবর্মেণ্ট এরূপ গমনাগমনের সংবাদ মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের লোক ত তাহাদের চক্ষুর সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিতে পারে না, এবং পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-বিভাগ যে সদা সত্য কথা কহিয়া থাকেন, তাহার প্রমাণও আমাদের নিকট বেশী নাই।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্ত অঞ্চলের মুখপত্র "সংগঠনী" পত্রিকার ১লা শ্রাবণের সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রতি আমরা পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই :

> বিভিন্ন সংবাদপত্রে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে, পাকিস্থানে খাদ্য এবং জীবনধারণের অন্যান্য ক্ষেত্রে সঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় মুসলমানরাও বাধ্য হইয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। এই কথা হয়তো সত্য, কিন্তু পাকিস্থানে সঙ্কট উপস্থিত হইলেও মুসলমানদের এই আগমন সমর্থন করা যায় না। কারণ একে ত রাজনৈতিক এবং কতকাংশে অর্থনৈতিক কারণে বাধ্য হইয়া হিন্দুরা চলিয়া আসিতেছে...তাহার উপর যদি মুসলমানরাও আসিতে সুরু করে তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গেও সঙ্কট সৃষ্টি হইবে এবং খাদ্যসঙ্কট দেখা দিবে। সুতরাং এই আগমন রোধ করা সরকারের কর্ত্তব্য। পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তাও হইবে বিপন্ন। কারণ ইহা লক্ষ্য করা উচিত যে, যে সমস্ত মুসলমান পরিবার এখানে চলিয়া আসিতেছে তাহারা সকলেই সীমান্ত অঞ্চলেই স্থান সংগ্রহ করিয়া বসবাস করিতেছে এবং সীমান্তবর্ত্তী মুসলমানপ্রধান এলাকা আরও মুসলমানপ্রধান করিয়া তুলিতেছে। ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের এইভাবে সীমান্ত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে। ইহাতে যে কোন মুহূর্ত্তে ইহার নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে আর ভিন্ন

রাষ্ট্রের অধিবাসীরা এইভাবে সীমান্তে বসবাস সুরু করিলে চোরাব্যবসায়েরও সুবিধা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন

গত মাসের "প্রবাসী"তে আমরা সরবরাহ মন্ত্রী মহাশয়ের একটি বিবৃতির সারবত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনে আমদানী করিতে হয়। "যুগবাণী" (সাপ্তাহিক) হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই হিসাব ভুল; পশ্চিমবঙ্গে যে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়, সরকারী দপ্তরে তাহার যে হিসাব আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় যে ৫০ লক্ষ মণ খাদ্যশস্যের ঘাটতি হইতে পারে।

"হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদক বলিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের ঘাটতি ত নাই-ই; বরং ২১ লক্ষ মণ বাড়তি হওয়া উচিত। সংখ্যাশাস্ত্রের এই পরস্পর বিরোধী উক্তিতে দেশের জনমত বিভ্রান্ত হইতেছে। কেন্দ্রীয় আইন-সভার সভ্য শ্রীযুক্ত সিংহের এক প্রবন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে যে, সারা ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের ঘাটতি আছে—এই কথা ভুল। এই সব প্রতিবাদের উত্তর প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে পাওয়া যায় নাই। ভারতরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের খাদ্য মন্ত্রীবর্গের এক সম্মেলন গত ১৮ই শ্রাবণ শেষ হইয়াছে; তাহার যে বিবরণ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই সন্দেহ ও প্রতিবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন মনে হয় নাই। অথচ ভারত-রাষ্ট্রে খাদ্যশস্য বাড়তি না ঘাটতি তাহা নির্ণয়ের উপর বিরাট সরবরাহ বিভাগের কাঠামো দাঁড়াইয়া আছে। এই বিষয়ে আন্দোলন না হইলে কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙিবে বলিয়া মনে হয় না।

ব্যাপারটা কিন্তু ঘোলাটে হইয়া উঠিতেছে। গত ১৭ই শ্রাবণ পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-মন্ত্রীমহাশয় এক সাংবাদিক সম্মেলনে যে আলোচনা করেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই অবস্থাটা বুঝা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার বলিতেছেন যে, ১৯৫১ সালের মধ্যে দেশকে খাদ্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিতে হইবে; বিদেশ হইতে তারপর কোন খাদ্যশস্যের আমদানী হইবে না। শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা বলিতেছেন, "১৯৫১ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে, তাহা মনে হয় না।" তিনি আমাদের প্রয়োজনের এক হিসাবও দিয়াছেন। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণী হইতে তাহা তুলিয়া দিলাম:

মোট প্রয়োজন

পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ। ইহার মধ্যে শতকরা ৮০ জনকে পূর্ণবয়স্ক হিসাবে গণ্য করিলে মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। দৈনিক ১৬ আউন্স হিসাবে পূর্ণবয়স্কের খাদ্যের প্রয়োজন। এই হিসাবে দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজন ৯ হাজার টন এবং বার্ষিক ৩২,৮৫০০০ টন। কিন্তু বার্ষিক গড়পড়তা উৎপাদনের হার প্রায় ৩২,০৯০০০ হাজার টন অর্থাৎ মোট ঘাটতির পরিমাণ ১৬,০০০ হাজার টন।

তিনি আরও বলেন যে, কলিকাতা এবং শিল্প এলাকার অধিবাসীর সংখ্যা রেশন কার্ডের ভিত্তিতে ৫৫ লক্ষ। অতএব দৈনিক ১৬ আউন্স হিসাবে বৎসরে ৭,১৭,০০০ টন খাদ্যের প্রয়োজন।

মোট উৎপাদন

১৯৪৮-৪৯ সালের উৎপাদন:— আমন—২৮'৮ লক্ষ টন; আউস—৪'০ লক্ষ টন এবং বোরো ১ লক্ষ টন অর্থাৎ প্রায় ৩৩ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন হয়। ইহা হইতে বীজ ও অন্যান্য কারণে নষ্ট বাবদ শতকরা ১০ ভাগ হিসাবে বাদ দিলে মোট উৎপাদন হইতেছে ৩০ লক্ষ টন। মোট ২,৭৯,০০০ হাজার টন খাদ্য আমদানী করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ ৩৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। গত তিন বৎসরে গড়পড়তা ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের এই বিবৃতি যাদব বাবুর হিসাবকে সমর্থন করে না।

এই বিতর্কের শেষ হইবে কবে? সরকারী হিসাবে যে ভুল ধরা হইতেছে, তৎসম্বন্ধে নীরবতাই কি এই প্রশ্নের উত্তর?

খাদ্য উৎপাদন

পুরুলিয়ার 'মুক্তি' স্থানীয় খাদ্য পরিস্থিতি আলোচনা করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা শুধু মানভূমে প্রযোজ্য নহে, দেশের সর্বস্থানেই ঐ অবস্থা এবং খাদ্যাভাব হইতে পরিত্রাণ লাভের যে পথ তাঁহারা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহাও সর্বত্র সমভাবে প্রযোজ্য। "মুক্তির" বক্তব্যের সারমর্ম এইরূপ:

চাষীর ঘরে যদি কিছু শস্য থাকে তবে দুর্দিন আসিলেও কোন রকমে সে চালাইয়া লয়। কিন্তু বৎসরে যে ধান উৎপন্ন হয় বেশীর ভাগ চাষীকেই তাহার উপরেও কর্জ করিয়া চালাইতে হয়। চাষের আগে বা চাষের সময় তাহাকে মহাজনের কাছে বা মহাজনের ইচ্ছামত সুদে ধান কর্জ করিতে হয় এবং ফসল হইলে তাহা শোধ করিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহাও নানাভাবে বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। জমিদারের খাজনা তো আছেই, তাহা ছাড়া বর্তমান সময়ে পুলিশ, ফরেষ্ট গার্ড, ওয়েলফেয়ার অফিসার, প্রকিউরমেণ্ট অফিসার, এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স অফিসার প্রভৃতি ও অন্যান্য সরকারী বেসরকারী কর্তা ও

অনুচরদের সেলামী, জবরদস্তি আদায়, বে-আইনি জরিমানা প্রভৃতি ব্যাপারেও তাহাকে ধান বা থালা ঘটি বাটি বিক্রয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। জমির উপর স্বত্ব সাব্যস্ত লইয়া মাঝে মাঝে মামলা-মোকদ্দমার খরচও জোগাইতে হয়। বর্ত্তমানে আবার এক অভিনব পন্থার আবিষ্কার হইয়াছে, বিহারে ইহা সুরু হইয়াছে, বাংলায় হয়ত শীঘ্রই হইবে। জমিদার জমিদারী উচ্ছেদের বাহানাতে আমীন দিয়া সমস্ত ক্ষেত খামার মাপ করাইতেছে। যদি কাহারও কোন ক্ষেত্রে এক ছটাক বা এক কাঠা জমি বাড়তি বাহির হইয়া পড়ে তবে ক্ষেতের মাথার জমি অন্ত লোককে বন্দোবস্ত করিবার ভয় দেখাইয়া এক'শ দুই'শ টাকা সেলামী লইয়া দুই টাকার রসিদ দিয়া ছাড়িয়া দেয়।

ইহা প্রকৃত অবস্থার একটা আংশিক ছবি মাত্র। বড়লাট কর্তৃক হালচাষের ছবি অথবা লাট-প্রাসাদের উঠান চাষের খবর সংবাদপত্রে ছাপাইয়া ফসল বৃদ্ধি করা যাইবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। আসলে ফসল বৃদ্ধি করিতে হইলে চাষীর দুরবস্থা দূর করা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট ঠিক এই কাজটি বাদ দিয়া বাকী সবকিছু করিতেছেন, জলের মত টাকা খরচ হইতেছে। চাষীদের এইরূপ অবস্থা বিচার করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে যে, তাহাদের চাষ বা চাষের উন্নতির পথে বাধা ও অসুবিধা কোথায় রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিতে হইবে এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সুগম করিয়া দিতে হইবে। শস্যের ফলন তখন তাহারা আপনিই বাড়াইবে। 'মুক্তি' মানভূম জেলার দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন—বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে জলসেচের জন্য এমন অনেক বাঁধ হইয়াছে গ্রামের লোক সেগুলি সম্বন্ধে ঠাট্টা করিয়া বলে—ব্যাঙও ভোবে না। চাকলতার নিকট প্রায় ১১০ একর 'নিঠা টাঁড়' লইয়া হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া যে পতিত জমি উদ্ধার করা হইতেছে তাহাতে কয় মণ ফসল ফলিতেছে তাহা যে কেহ সেই স্থানে গেলেই দেখিতে পাইবেন। চাষী যদি পতিত অনাবাদী জমি কাটিয়া ক্ষেত করে তবে জমিদার আসিয়া দখল করিয়া লয়। হালের জন্য একটি কাঠ জোগাড় করিতে হইলে ফরেষ্ট গার্ডের প্রণামী দিতে তাহাকে থালা ঘটি বেচিতে হয়। গোচারণ ভূমির অভাবে জঙ্গলের ধারে গরু চরাইলে জঙ্গল গার্ডকে গরু পিছু এক টাকা বেসরকারী জরিমানা দিতে হয়, হালের গরু রোগাক্রান্ত হইলে বা মরিয়া গেলে চাষ বন্ধ করিয়া তাহাকে পাগল হইতে হয়। বাঁধের জন্য মজুরী পাইতে হইলে তাহাকে হিন্দী প্রচার করিতে হয়। যে হিন্দী প্রচারক বাঁধ পায় সে মাটি না কাটিয়াই পুকুর তৈরি করে। চাষের ক্ষেতে বাঁধের বদলে চোখের জলে আকর 'বাঁড়ি' হইয়া যায়।

সহজ পথ আছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিবেন না। গ্রামের ষোল আনার পঞ্চায়েতের কাছে গিয়া বল কোথায় বাঁধ হইলে অথবা কোন্ কোন্ সংস্কার হইলে জলশূন্য স্থানে জল হইবে। ষোল আনার পঞ্চায়েতের উপর ছাড়িয়া দাও। তাহারাই হিসাব করিয়া বলিবে কত টাকা লাগিবে, টাকা তাহাদের হাতে দাও, তাহারা করিয়া লইবে। নিজেদের পরিশ্রম দ্বারা তাহারা যাহা কম পড়ে তাহা পূরণ করিবে। বাংলাদেশে খাসমহলগুলিতে এ বিষয়ে প্রচুর সতর্কতার অবসর রহিয়াছে। চাষের সময় তাহাকে অল্প সুদে ধান কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বহু জমি পতিত পড়িয়া আছে। বলিয়া দাও, যে নিজের পরিশ্রমে মাটি কাটিয়া জমি তৈরি করিবে বিনা সেলামীতে তাহাকেই সেই জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। চাষীকে উপলব্ধি করিতে দাও তাহার পিছনে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত শক্তি লইয়া তাহার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে—তাহার ঘাড়ে সরকারী অফিসার, মহাজন ও চোরাকারবারী চাপাইয়া তাহাকে পঙ্গু করিয়া রাখিলে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যাভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৮ সালে কয়েকটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে কোন কোনটির কাজ আরম্ভও হইয়াছে। প্রত্যেকটি স্কীমের জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে এবং কাজ বলিতে ঐ বাবদ অর্থব্যয় বুঝাইবে। মাছ বাজারে আসিয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। একমাত্র কাঁথি উপকূলে বৎসরে দশ হাজার মণ মৎস্যপ্রাপ্তির আশায় যে বিরাট খরচের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং উহার যে বিরাট অংশ ইতিমধ্যেই ব্যয় হইয়া গিয়াছে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। কাঁথি উপকূলে মাছ ধরা পরিকল্পনাটি গত অক্টোবরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী হওয়ার কথা ছিল এবং তদনুসারেই খরচপত্র হইয়াছে। বাংলার রাজস্ব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। অথচ এ দিকে দৃক্পাতমাত্র না করিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের সংখ্যা ও বেতন বৃদ্ধি হইতেছে এবং পরিকল্পনার নামে দুই হাতে জলে টাকা ঢালা হইতেছে। যে কাজ অতি অল্প ব্যয়ে সমবায় সমিতি দ্বারা হইতে পারে তাহা সরকারের নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া নূতন বিভাগ সৃষ্টি বা পুরানো বিভাগের আয়তন বৃদ্ধির কোনই সার্থকতা নাই। ইহাতে ব্যয় বাড়া ছাড়া আর কোন কাজই হইতেছে না। সুন্দরবনের মাছ কলিকাতায় আনিয়া মৎস্যাভাব দূরীকরণ যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় তবে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় সমবায় সমিতি মারফত ধীবরদের জাল প্রভৃতি দেওয়া এবং দ্রুত মৎস্য কলিকাতায় দ্রুত আনিবার জন্য লঞ্চ, বরফ প্রভৃতি সহজলভ্য করা। কৃষক বা ধীবর কোন বস্তু বিনামূল্যে চাহে না, তাহারা পয়সা

দিয়াই লইতে প্রস্তুত। খয়রাতী শুভানুধ্যায়ী না হইয়া গবর্মেণ্ট যদি তাহাদের কাজের বাধাগুলি জানিয়া লয়েন এবং সেইগুলি দূর করিবার ব্যবস্থা করেন তবেই প্রকৃত কাজ হইবে। ভাত কাপড় মাছ ডিম দুধ প্রভৃতি গবর্মেণ্ট নামক একটি প্রাণহীন যন্ত্র সরবরাহ করিবে আর দেশের লোক বসিয়া বসিয়া খাইবে ইহা কোন সমাজের পক্ষেই মঙ্গলজনক নহে। গবর্মেণ্ট সৎকাজে উৎসাহ দিবেন, অসৎ কাজে বাধা দিবেন, সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা যাহাতে কল্যাণপ্রদ হয় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন তবেই তো সমাজ গড়িয়া উঠিবে।

কাঁথি উপকূল পরিকল্পনাটি এইরূপ :

কাঁথি উপকূলে বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি স্থান হইতে আগত ধীবরদের মাছ ধরায় নিযুক্ত করা হইবে, তাহাদিগকে নৌকা, জাল প্রভৃতি দেওয়া হইবে এবং ধৃত মৎস্যের অর্দ্ধেক তাহারা পাইবে, বাকি অর্দ্ধেক গবর্মেণ্টের। মাছ লঞ্চে ডায়মণ্ডহারবার এবং তথা হইতে লরীতে কলিকাতা আনা হইবে। মৎস্য বিভাগে পাঁচটি লঞ্চ আছে, তাহার মধ্যে কয়টি এখন কার্য্যক্ষম তাহা বলা হয় নাই।

দশ জন এক্সপার্ট ধীবরকে বেতন দিয়া রাখা হইবে। তাহারা ধৃত মাছগুলি সংগ্রহ করা, বরফ দেওয়া, প্যাক করা প্রভৃতি কাজ খবরদারী করিবে।

প্রথম বৎসর দশ হাজার মণ মাছ পাওয়া যাইবে। তন্মধ্যে ৫০০০ মণ গবর্মেণ্টের। এই পরিমাণ মাছ ধরিতে নিম্নলিখিত লোক লাগিবে :

৬০ জন ধীবর ও পাঁচটি নৌকা লইয়া এক একটি দল গঠিত হইবে, এরূপ তিনটি দল থাকিবে, তাহারা তিনটি লাইনে জাল দিয়া মাছ ধরিবে। এক এক দলে ২০ জন ধীবর ও দুইটি নৌকা লইয়া গঠিত আর দুইটি দল গ্রিশটি গিল জাল দিয়া মাছ ধরিবে। ২০ জন ধীবর ও দুইটি নৌকা লইয়া গঠিত আর একটি দল ডেনিশ লাইনে এবং ড্রাগনীচ লাইনে দিয়া মাছ ধরিবে। পরিকল্পনা পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিলে এতগুলি লোক এইসব বৈজ্ঞানিক জাল লইয়া নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে এবং নদীর মোহানায় মাছ ধরিতে থাকিবে। কাঁথি অঞ্চলে হিসাব করিয়া সরকারী কর্তারা দেখিয়াছেন যে, একজন লোক দৈনিক ১৫ সের মাছ ধরিতে পারে, সুতরাং বৎসরে মাত্র ১৮০ দিন কাজ করিলেই দশ হাজার মণ মাছ ধরা পড়িবে।

এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া স্থির হইল কাঁথি উপকূলের সমুদ্রে এবং ২৪ পরগণার সুন্দরবনের মোহানায় অবিলম্বে কাজ সুরু হইবে। ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক কার্য্য শেষ হইবে, ১৫ই অক্টোবর মধ্যে কাজ আরম্ভ হইবে এবং তারপর দুই মাস অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালের মধ্যে সমগ্র পরিকল্পনা কার্য্যে প্রযুক্ত হইবে। ইহার পর সাড়ে সাত মাস কাটিয়া গিয়াছে, পরিকল্পনা অনুসারে অন্ততঃ ৬৬৭২ মণ মাছ এই সময়ের মধ্যে কলিকাতায় আসিবার কথা।

কত মাছ প্রকৃতপক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছে তাহা জানাইয়া দেওয়া উচিত। এই দশ হাজার মণ মাছ ধরিবার জন্য নিম্নলিখিত টাকা ক্যাপিটাল খরচ ও কর্ম্মচারীদের জন্য চলতি খরচ বরাদ্দ হইয়াছে :

কর্ম্মচারীর পদ	বেতন	স্পেশাল এলাউন্স	এক বৎসরের ব্যয় টাকা
১জন টেকনিক্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফিল্ড অফিসার (মেরিন) স্বয়ং করিবেন		স্পেশাল বেতন মাসিক ৭৫৲	৯০০
১জন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার	বেতন ৬০০৲, মাগ্‌গি ভাতা ১০৫৲	...	৮৪৬০
১জন প্রকিউরমেণ্ট জেলা ফিসারি অফিসার	(মেরিন) অফিঃ	স্পেশাল বেতন ৫০৲	৬০০
৪ জন ফিসারি ওভারসিয়ার	মেরিন বিভাগের লোক	স্পেশাল বেতন ২৫৲	১২০০
৩ জন ঐ	৫০৲ টাকা বেতন ও প্রচলিত ভাতায় নবনিযুক্ত	ঐ	৪৭৫২
২ পিয়ন	বেতন ৪০৲ টাকা		৯৬০
২০ জন সেবক (Attendant)	বেতন ৫০৲	...	১২,০০০
১০ জন এক্সপার্ট ধীবর	বেতন ১০০৲	...	১২,০০০
২ জন প্রহরী	বেতন ৭৫৲	...	১৮০০
৪ জন সারেং	বেতন ৭৫৲ ও ইণ্টেরিম পে	...	৬৮১৬
৪ জন ইঞ্জিন ড্রাইভার	ইণ্টেরিম পে		৬৮১৬
৬ জন লস্কর	বেতন ৩০৲ ও ভাতা		৫৪৭২
২ জন তৈলদাতা	বেতন ৬০৲ ও ভাতা		২৮৫৬
২ জন মাঝি	বেতন ৪৫৲		১০৮০
৪ জন লরী ড্রাইভার	বেতন ৬০৲ ও ভাতা		৫৭১২
২ জন লরী পরিষ্কারক	বেতন ৫০৲		১২০০
১ জন একাউণ্ট ক্লার্ক	বেতন ৪৫৲ ও ইণ্টেরিম পে		১২১২
১ জন টাইপিষ্ট	ঐ		১২১২
১ জন ষ্টোর-কীপার	বেতন ৭৫৲ ও ভাতা		১৭০৪
১ জন আর্দ্দালী	বেতন ১৩৲, মাগ্‌গী ভাতা ও ২৲ কলিকাতা এলাউন্স		৫৫২
কর্ম্মচারীদের বাড়ী ভাড়ার জন্য থোক বরাদ্দ			২০০০
			৭৯,০৪

এই গেল ট্রাকের হিসাব ; এবার প্রথম বৎসরের ১০ হাজার মণ মাছ ধরার বাজেট—

	টাকা
ক্যাপিটাল খরচ (বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আছে)	১,১১,৩২০।০
চলতি খরচ—	
কর্মচারীদের বেতন (উপরি-উক্ত হিসাবে)	৭৯,৩০৪
লঞ্চ এবং লরী চালাইবার পেট্রল	২৪,০০০
বরফ, লবণ, প্যাকিং প্রভৃতির খরচ	২৪,০০০
লঞ্চ, লরী প্রভৃতি মেরামত	১৫,০০০
উহাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র	৩০০০
বিবিধ ব্যয়	১০০০
	১,৪৬,৩০৪
মোট	২,৫৭,৬২৪।০

এবার ক্যাপিটাল খরচের নমুনা—

			টাকা
২টি ক্রুজার	অর্ডার দেওয়া হইয়াছে শীঘ্র পাওয়া যাইবে	দাম	২৯,১১৩
২টি মোটর ইঞ্জিনযুক্ত ডিঙ্গী—রডা কোম্পানী হইতে	শীঘ্রই কেনা হইবে		৮৮৮০
১টি ২ টন লরী—এলেনবেরী কোম্পানী হইতে	শীঘ্রই কেনা হইবে		৮০০০
সাইকেল—	কেনা হইয়াছে		৩০০
সরঞ্জাম সমেত ১টি অফিসার তাঁবু, ২টি সৈন্যের তাঁবু	কেনা হইয়াছে		৯৮৮৯।০
লণ্ঠন, টর্চ্চ প্রভৃতি	ঐ		১১৭।০
বালতি এবং মাছ হ্যাণ্ডলিং যন্ত্র	ঐ		১০০০
ডায়মণ্ডহারবারে জেটি তৈরী শীঘ্রই করা হইবে			১৬,০০০
ডায়মণ্ডহারবার, কাঁথি ও জলদায় মাছের অস্থায়ী গুদাম	„		৮০০০
নৌকা	তৈরি হইয়াছে		১০,০০০
জাল	„		২০,০০০
			১,১১,৩২০।০

এই হিসাবে এক মণ সরকারী মাছে খরচ পড়িবে নিম্নোক্ত রূপ এবং এই ভাবে ব্যবসা কতদিন চলিতে পারিবে তাহা বুঝা কঠিন—

ক্যাপিটাল খরচ	১১৲
কর্মচারী খরচ	৮৲
লরী ও লঞ্চ খরচ	৪৲
বরফ প্রভৃতির খরচ	২।০
	২৫।০

যে সুন্দরবনে মাছ ধরার জন্য এই খরচ হইবে সেখানে মাছের বাজার দর ২০৲ টাকা থাকে কিনা সন্দেহ।

হরিণঘাটার পরিকল্পনা

হরিণঘাটার "দুগ্ধনগরী" নির্মাণে সরকারের যে অব্যবস্থিত-চিত্ততার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আমরা নিরাশ হইয়াছি। হরিণঘাটার পরিকল্পনা ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর কেসি সাহেবের কীর্ত্তি ; তিনি বিদায় লইবার পূর্ব্বেই প্রায় ৪০।৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা নাকি করা হইয়াছিল ; তারপর এই চার বৎসরে আরও ১৫।২০ লক্ষ টাকা দণ্ড দিতে হইয়াছে। এই অবস্থায় কৃষি-বিভাগ একটু বেকায়দায় পড়েন। কি করিয়া ইহার একটা সদ্‌গতি করা যায়, তাহার ভাবনা ভাবিতে হয়। এত টাকা ব্যয় করিয়া এক ফোঁটাও দুধ হরিণঘাটা হইতে আসিল না, একটিও ভাল ষাঁড় বা গাভী হরিণঘাটার ছাপ পাইয়া দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের নিকট আসিল না, এই অবস্থায় আমাদের গভার-চর্ম্মী কৃষি-বিভাগও অস্থির হইলেন।

তাহার প্রতিকারের জন্য বিশেষজ্ঞদিগকে জড় করা হইল। তাঁহাদের চিন্তার ফলে স্থির হইল যে, কলিকাতার ৩০ হাজার গাভী ও মহিষ হরিণঘাটায় সরাইয়া লওয়া হইবে ; সেই স্থান হইতে দুধ সরবরাহ করা হইবে কলিকাতা নগরীকে। এই সিদ্ধান্ত নাকি উল্টাইয়া গিয়াছে। কলিকাতার 'খাটাল' অক্ষয় হইয়া থাকিবে ; ভারতরাষ্ট্রের নানা প্রদেশ হইতে উন্নততর গরু, মহিষ আমদানী করিয়া পশ্চিমবঙ্গে নূতন দুগ্ধবতী গাভী ও ভারবাহী বলদের সৃষ্টি হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি "দুগ্ধ (milk) কমিশনারের" পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে ; এই বিভাগেরই একজন পুরাতন "বিশেষজ্ঞ" এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন দ্রষ্টব্য মাত্র রহিল ফলাফল।

পশ্চিমবঙ্গে খাল ইত্যাদির অবস্থা

খাদ্য-উৎপাদনের নূতন পরিকল্পনা সম্বন্ধে কৃষিমন্ত্রী যাদব-বাবু যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহার পরিপূরকরূপে কলিকাতার বাহিরের সংবাদপত্রে যে সব প্রয়োজনের কথা বলা হয় তাহা জানিয়া রাখা ভাল। প্রথম মন্তব্য বাঁকুড়ার "হিন্দুবাণী" হইতে, দ্বিতীয়টি বালির (হাওড়া) "সাধারণী" হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে :

গত ১৩২২ সালে দুর্ভিক্ষের সময় তদানীন্তন সরকার পলাশবনী গ্রামে একটি খালের মুখে বাঁধ দিয়ে এই খালের জল ক্যানেল কেটে জয়নগর পর্য্যন্ত আনার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। ক্যানেলটি যত দিন ভাল ছিল তত দিন উত্তর পার্শ্বের প্রায় ২০০ মৌজাতে ধান, ইক্ষু, আলু, গম প্রভৃতি চাষ হচ্ছিল এবং বহু পতিত জমিও চাষের উপযোগী হয়ে-ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল উহা সংস্কার না হওয়ায় দশ বৎসর আগে বাঁধ ভেঙ্গে গেছে এবং খালের জল পূর্ব্ববৎ নদীতে গিয়ে পড়ছে। এই ক্যানেল স্থানীয় দরিদ্র কৃষিজীবী-

গণের পক্ষে সংস্কার করা সম্ভবপর নয়। জেলা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি খালের প্রতি বহুবার আকৃষ্ট করা হয়েছে; জেলা শাসক, সেচবিভাগীয় কর্তা প্রভৃতিদের এনে দেখানও হয়েছে; কিন্তু বহু অর্থব্যয় হবে, এই অজুহাতে কোন কিছুই করা হয় নি।

ভাওড়াপোতা খাল

হাওড়া ও হুগলী জেলার সীমান্ত রচনা করে ভাগীরথী হতে পশ্চিম দিকে গিয়েছে বালি খাল—তারই শাখা এই ভাওড়াপোতা খাল। এই খাল বালি, জগদীশপুর ও কিছু লিলুয়া ইউনিয়নের মধ্যে। বিখ্যাত দস্যু রতন পাখীর 'ছিপ' এই খালে যাতায়াত করত…তাই আজও খালের এই অংশকে 'পাখীর খাল' আর পাশের বৃহৎ বাগানটিকে 'পাখীর বাগান' বলে। এই খালটি দিয়ে প্রয়োজনমত জল নিকাশ ও জল সেচনের ব্যবস্থা হ'ত বলে কত রকমের রবিশস্য, ধান, পাট প্রভৃতি যে মাঠে মাঠে হ'ত তার শেষ নেই। কিন্তু হাওড়া-বর্দ্ধমান ও পরে কলকাতা-কর্ড রেলপথ নির্ম্মিত হওয়ায় ১২টি গ্রামের লক্ষ্মীস্বরূপা এই খালের সরল গতি অবরুদ্ধ হয়ে গেল। তার পর অন্ধ গ্রামবাসী স্বার্থের মোহে খালের জমি আত্মসাৎ করতে লাগল। কয়েক বৎসরেই খাল মজে গেল…নৌকা অচল হ'ল…কচুরী পানা বাসা বাঁধল, আর উপবাসী কৃষকের শূন্য উদর প্লীহায় স্ফীত হ'ল।

১৯৩৭ সালে জনহিতব্রতীদের এক প্রচেষ্টা হ'ল এই খালটিকে সংস্কার করার। কিন্তু রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য, ভূস্বামিগণের নিষ্ক্রিয়তা আর তদানীন্তন সরকারের অতি কৃপণের ভায় মাত্র ৬০০৲ টাকা দানে তাঁহাদের আশা সফল হ'ল না। খালের গতি একটু সরল হ'ল বটে, কিন্তু সঙ্কীর্ণ সাঁকোর পেষণে জলের প্রবাহ আর ঠিকমত হ'ল না। বর্ত্তমান বৎসরে সরকারী বিভাগ হতে হাওড়া জিলায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০০টি খাল কাটবার পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত বিলম্বে এই পরিকল্পনা হওয়ায়, আর বৈশাখেই প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় অধিকাংশ পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়েছে। স্থানীয় সমবায় সমিতির মাধ্যমে আর ইউনিয়ন বোর্ড ও কংগ্রেস কমিটির সহযোগিতায় এই খালের সংস্কার কার্য্যও গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সরকারী পক্ষে একটি সর্ত্ত ছিল যে, সাহায্যপ্রাপ্ত কৃষকেরা তিন বৎসরের মধ্যে ব্যয়িত অর্থ খাজনা স্বরূপ পরিশোধ করতে বাধ্য হবে। শহরের শিক্ষা ও সুবিধার জন্য বিনা সর্ত্তে বছর বছর বহুলক্ষ টাকা ব্যয়িত হচ্ছে কিন্তু জাতির মেরুদণ্ড এই সব গ্রামের সমৃদ্ধির জন্য আজ সরকার মাত্র ২ লক্ষ টাকা বিনা সর্ত্তে ব্যয় করতে পারেন না?

পশ্চিমবঙ্গে খাদি প্রস্তুত

গত মাসের "প্রবাসীর" সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা যুক্ত-প্রদেশের খাদি উৎপাদনের বিরাট ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে তৎসম্বন্ধে কি চেষ্টা চলিতেছে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। ১৯৪৮ সালের প্রারম্ভে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মন্ত্রিমণ্ডলী কর্ত্তৃক নিযুক্ত "খাদি বোর্ডের" অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন বসু এই প্রশ্নের উত্তরে একটি বিবরণ পাঠাইয়াছেন। সরকারী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য—গ্রামবাসীকে বস্ত্রে স্বাবলম্বী করা, খাদি-ব্যবসায় নয়; এবং অহিংস সমাজ সংগঠনের পথ পরিষ্কার করা।

এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী ছয়টি জেলায় ১২টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং প্রত্যেক কেন্দ্রে কর্ম্মী নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদিগকে চরকা ও গ্রামসেবার কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক কেন্দ্রের এলাকা সাধারণতঃ ১৪ হইতে ২০টি গ্রাম লইয়া গঠিত হয় এবং কর্ম্মীদের শিক্ষাকাল ৩ হইতে ৪ মাস সময় নির্দ্দিষ্ট হয়। এই ভাবে ১২টি কেন্দ্রে ১২টি খাদি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ১৮২ জন পুরুষ এবং স্ত্রী কর্ম্মীকে অভিজ্ঞ খাদি-শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষান্তে প্রত্যেক কর্ম্মীকে ১৫০-২০০ পরিবারের ভার গ্রহণ করিয়া গ্রামাঞ্চলে কাজ করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। স্থানীয় অবস্থানুযায়ী কর্ম্মিগণ একাকী অথবা দলবদ্ধভাবে গ্রামবাসীদের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া খাদির কাজ করিয়া আসিতেছেন। গ্রামবাসীদিগের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে পরিবর্ত্তন আনিবার জন্য কর্ম্মীরা তুলা ধোনা ও সুতাকাটা শিক্ষা দিয়া ব্যাপক চরকা প্রচলনের চেষ্টা করা ছাড়াও তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের সেবাকার্য্য করিতেছেন। গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, হরিজন সেবা, গো-ময় সারের উপযুক্ত ব্যবহার, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি এই সেবাকার্য্যের অন্তর্ভুক্ত।

কর্ম্মীরা শিক্ষা পাইবার পর ১৯৪৮ সাল হইতে গ্রামে কাজ আরম্ভ করেন। নিম্নে জুন, ১৯৪৮ হইতে মে, ১৯৪৯ পর্য্যন্ত খাদী কার্য্যের বিবরণী চুম্বক আকারে দেওয়া হইল।

১।	কেন্দ্র সংখ্যা	১২
২।	গ্রাম সংখ্যা	৪০০
৩।	পরিবার সংখ্যা	৩০,০০০
৪।	শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীর সংখ্যা	১৬৭
৫।	তুলা ধোনা ও সুতা কাটা-শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামবাসীর সংখ্যা	৬৫২৬
৬।	প্রচলিত চরকা সংখ্যা	৬০৭১
৭।	প্রচলিত তকলী সংখ্যা	৪৩১৮
৮।	কাটুনী কর্ত্তৃক উৎপন্ন সুতার পরিমাণ	১৭৭/০ মণ
৯।	উৎপন্ন সুতার মজুরী বা দাম	৩৫০০০৲ টাকা

১০।	উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ	
	(ক) ওজন	১০১/০ মণ
	(খ) বর্গগজ	৩০৬১০ বর্গগজ
১১।	তাঁতীর প্রাপ্ত মজুরী	১২,৫০০৲ টাকা
১২।	উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্য	৪২,০০০৲ টাকা

তাঁতীর অসুবিধার জন্য সমস্ত সূতা বুনাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। সমস্ত উৎপন্ন সূতা বুনাইতে পারিলে তাঁতী ২০,৮০০৲ টাকা উপার্জন করিতে পারিত এবং উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্য ৭০,৮০০৲ টাকা হইত। খাদি-পরিকল্পনাটি বস্ত্র-স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে গঠিত; খাদি-উৎপাদন ব্যবসায়ের ভিত্তিতে নয়। এই কারণে উৎপন্ন সমস্ত বস্ত্রই কাটুনীরা নিজে নিজে ব্যবহার করিয়াছে।

প্রারম্ভ হইতে মার্চ ১৯৪৯ পর্য্যন্ত মোট ১,৬৭,২৩১ টাকা খরচ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬৭,২৮৯ টাকা তুলা, চরকা, আসবাব ও গৃহনির্ম্মাণ কাজে ব্যয়িত হইয়াছে এবং ৯৯,৯৪২ টাকা কর্ম্মীর শিক্ষা, কর্ম্মীর ভাতা, সংস্থার খরচ প্রভৃতি খাতে খরচ হইয়াছে।

পঞ্চানন বাবুর বিবরণীতে কয়েকটি অসুবিধার কথার উল্লেখ দেখিতে পাই। নিয়ন্ত্রণের জন্য সময়মত তুলা সরবরাহ হয় নাই; পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথাসময়ে ও প্রয়োজন মত আর্থিক সাহায্য করেন নাই; তাঁতিরা মিলের সূতা কালো-বাজারে বেচিয়া অধিক লাভ করে; এই উদাহরণ দেশের নৈতিক জীবন বিষাক্ত করিয়াছে। পঞ্চানন বাবুর চেষ্টায় ও কর্ম্মীদের কর্ম্মের ফলে যদি দেশের আবহাওয়া কথঞ্চিৎও বিশুদ্ধ হয়, তবেই খাদি-উৎপাদনের সার্থকতা আছে বলিয়া গণ্য করিব।

আসামে বাঙালী উদ্বাস্তু

গত ৬ই শ্রাবণ কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি শহরে ভারত-সরকারের পূর্ব্বাঞ্চলিক উদ্বাস্তু সমস্যা সম্বন্ধে উপদেষ্টা শ্রীরোহিণীকুমার চৌধুরী যেসব উক্তি করিয়াছেন, তার গুরুত্ব ভারত-সরকার উপলব্ধি করিবেন, এই আশা আমরা এখনও করিতেছি। চৌধুরী মহাশয় ইংরেজ আমলে আসামের মন্ত্রী ছিলেন; বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য। তাঁহার পক্ষে আসাম গবর্ণমেণ্ট ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করা সহজ নয়। তবুও তাঁহাকে এই কার্য্য করিতে হইয়াছে। করিমগঞ্জ, শিলচর ও শিলঙেও চৌধুরী মহাশয় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইল:

আমি ইহা স্বীকার করি যে, ভারত-সরকার ও আসাম সরকার উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য এ দিকের উদ্বাস্তু-দিগের কোন সাহায্য করেন নাই। বিশেষ দরকারের জন্য ভারত-সরকার আসাম সরকারকে এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উহা হইতে এক পয়সাও খরচ হয় নাই।

এই উদ্বাস্তুগণ আপনাদের কোনরকম ক্ষতি করিবে—ইহা যেন আপনারা মনে না করেন। মানুষই মানুষকে সাহায্য করে। লোকের বসতি বাড়িলে স্থানের উন্নতি হয়। আসামে অন্যান্য দেশের তুলনায় জায়গার অনুপাতে লোকসংখ্যা কম। আমি নিজে আসামী হইয়াও বলি যে, আসামী ও বাঙালীদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই—আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, দীক্ষা ইত্যাদি সব বিষয়েই ভারতে একমাত্র বাঙালী ও আসামী এক। আমি ইহা খুব ভাল করিয়া দেখিয়াছি—ভারতের অন্যান্যরা বাঙালী ও আসামীদের কোন বিষয়েই আমল দিতে চায় না। দিল্লীতে আমাদের কোন মর্য্যাদা নাই। চাকুরী, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে আমরা বাঙালী ও আসামীরা সর্ব্ববিষয়ে অসুবিধা ভোগ করিতেছি। ভারত-সরকার হইতে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে কোন সাহায্যই পাই নাই। আসামে প্রায় ২।৩ লক্ষ উদ্বাস্তু আছে—ইহা মোটেই বেশী নহে।

আমি অনাহারে শীর্ণ ৪০।৫০ জন ব্যক্তিকে দেখিয়াছি; ইঁহাদের মধ্যে শিশু এবং মহিলাও আছেন। সরকারী সাহায্য আসিয়া না পৌঁছান পর্য্যন্ত স্থানীয় সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় এই সকল ব্যক্তিকে বাঁচাইয়া রাখিবার নিমিত্ত আমি হাইলাকান্দির মহকুমা হাকিম ও কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনারকে অনুরোধ করিয়াছি।

জরুরী অবস্থায় এই সকল উদ্বাস্তুকে সাহায্য দিবার মত কোন অর্থ কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার কিংবা হাইলাকান্দির মহকুমা হাকিম কাহারও কাছেই নাই। উদ্বাস্তুদের সাহায্যার্থ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট আসাম গবর্ণমেণ্টকে যে এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাদের হাতে কিছু টাকা দিবার জন্য কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার ইতি-মধ্যেই গবর্ণমেণ্টের নিকট লিখিয়াছেন।

সৌভাগ্যবশতঃ করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও শিলচরের ভিতর এবং চতুর্দ্দিকে অস্থায়ী বাসগৃহ নির্ম্মাণের উপযুক্ত যথেষ্ট স্থান আছে। এই জরুরী কার্য্যের প্রয়োজনীয় ব্যয়-সঙ্কুলান করিবার জন্য কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনারের হাতে যথোচিত অর্থ দিবার নিমিত্ত আমি ভারত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি মন্ত্রীর নিকট তার করিয়াছি।

শিলঙে এক সাংবাদিক সম্মেলনে চৌধুরী মহাশয় এই সমস্যাকে "রাজনীতি" হইতে দূরে রাখিতে আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু আসাম গবর্ণমেণ্ট তাহাই করিতেছেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীগোপীনাথ বরদলৈ বলিয়াছেন যে আসামে

বাড়তি জমি নাই। চৌধুরী মহাশয় বলিতেছেন ২।৩ লক্ষ উদ্বাস্তুর প্রয়োজনের উপযুক্ত জমি আছে। এই দুই উক্তির মধ্যে কোন্‌টি সত্য তাহা সকলেই জানে। বড়দলৈ মহাশয় "রাজনীতি" আনিয়াছেন এই সমস্যার মধ্যে, কারণ বর্ত্তমানে আসামে বাঙালী ও আসামী ভাষা-ভাষীর সংখ্যা প্রায় সমান—২৫।২৬ লক্ষ। বাঙালী উদ্বাস্তুকে আসিতে দিলে এই সমতা রক্ষা সহজ হইবে না, হয়ত ভোটের জোরে বাঙালী আসামীকে হারাইয়া দিতে পারে। এই আশঙ্কাই "বাঙাল খেদা" আন্দোলনের প্রেরণা জোগাইতেছে।

এই আশঙ্কা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজিতে হইবে। ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকের—সকল হিন্দুরই—এই অধিকার আছে; ভারতরাষ্ট্রের যে কোন প্রদেশে প্রবেশ করিবার ও ভদ্র-জীবন যাপন করিবার অধিকার কেহই কাড়িয়া লইতে পারে না। আসাম গবর্মেণ্ট তাহাই করিতেছেন; এবং কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট এই অনাচারের প্রশ্রয় দিয়াছেন। দুই বৎসর হইতে এই অনাচার চলিতেছে।

কাশ্মীর

গত ১১ই শ্রাবণ (২৭শে জুলাই) ভারতরাষ্ট্র ও "পাকিস্থান" রাষ্ট্রের সামরিক প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে একটা চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ২০শে শ্রাবণ নূতন দিল্লীতে পণ্ডিত জবাহর লাল নেহেরু সাংবাদিক সম্মেলনের সমক্ষে যে বক্তৃতা দান করেন, তদুপলক্ষে তিনি বলিয়াছেন—"ইহা নিতান্তই সামরিক ব্যাপার। গত ১লা জানুয়ারি যখন যুদ্ধ-বিরতি হয়, তখন কোন্ পক্ষের সৈন্যদল কোথায় ছিল, বর্ত্তমান চুক্তিতে তাহাই দেখান হইয়াছে।" কিন্তু আমাদের মনে হয় যে ব্যাপারটা যত সহজ ও লঘু করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা হইতেছে, তাহা তত সহজ নয়। বর্ত্তমান চুক্তিতে "আজাদ কাশ্মীর গবর্মেণ্টের" সৈন্যদলের অধিকৃত স্থান স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে; তাহারা কাশ্মীর-জম্মু রাজ্য হইতে সরিয়া যায় নাই যদিও এই বিষয়ে আমাদের প্রধান মন্ত্রী অনেক সময় অনেক বড় বড় কথা বলিয়াছেন। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে, এই বিষয়ে আমাদের রাষ্ট্রচালকগণ সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের প্রেরিত কমিশনের নানারূপ চাপে হেলিয়া পড়িতেছেন।

বর্ত্তমান চুক্তিতে কিন্তু কাশ্মীর সমস্যার কোনরূপ মীমাংসা হইল না। পণ্ডিত জবাহরলাল "দিনগত পাপক্ষয়" করিয়া যাইতেছেন; বিবৃতি-বক্তৃতায় এক কথা বলেন; কার্য্য-কালে দেখা যায় যে অবস্থার তাড়নায় অন্যরূপ ব্যবস্থা মানিয়া লইতেছেন। ইহা সম্ভব হইতেছে এইজন্য যে, কাশ্মীর সম্বন্ধে কোন স্থির নীতি গৃহীত হয় নাই। "পাকিস্থান" জানে সে কি চায়; সুতরাং সে যোগ-বিয়োগ করিয়া কিছু না কিছু পায় বা পাইতে পারে। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু জানেন না কাশ্মীর সম্বন্ধে তিনি কি চান বা কি পাওয়া সম্ভব।

সুতরাং কাশ্মীরের সমস্যার সুমীমাংসার জন্য ভারতরাষ্ট্রের আরও অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। সেই অবসরে সোভিয়েট রাষ্ট্র একটু হাত সাফাই দেখাইতে চেষ্টা করিবে। মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁর নিমন্ত্রণ তাহার প্রমাণ।

ভারতরাষ্ট্রে শিক্ষার ব্যবস্থা

গত ৮ই শ্রাবণ কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী ডাঃ তারাচাঁদ ভারতরাষ্ট্রের শিক্ষার নানাবিধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বেতারযোগে একটি বিবৃতি দেন করেন। বুনিয়াদি শিক্ষা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্য্যন্ত সরকারী নানা পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই বিবৃতি হইতে কিছু কিছু ধারণা করা যায়; পাঠক-বর্গের অবগতির জন্য তাহা তুলিয়া দিলাম:

> প্রত্যেক প্রদেশই নির্দ্দিষ্ট এলাকায় এবং নির্দ্দিষ্ট বয়সের ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। ১৬ বৎসর সময়ের মধ্যে ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তন, এই পরিকল্পনার চরম লক্ষ্য। ভারত গবর্মেণ্ট এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ব্যয়ের শতকরা ৩০ ভাগ বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন।
>
> গবর্মেণ্ট প্রাপ্তবয়স্কগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যগ্র। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইতি-মধ্যে কয়েকটি প্রদেশে ও কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্গত এলাকাসমূহে সামাজিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের এক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এজন্য যে অর্থ ব্যয় হইবে, কেন্দ্রীয় সরকার তাহার অর্দ্ধেক বহন করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।
>
> যে সকল কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হইয়াছে, কমিশন কি কি বিষয় অনুসন্ধান করিবেন এবং কমিশনের অধিকার প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ তারাচাঁদ বলেন:
>
> নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার ও প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া শিক্ষাপদ্ধতির অবশ্যই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। স্বাধীনতা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীনতা লাভের যে পদ্ধতি ভারতের পক্ষে উপযোগী এবং অবস্থার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, এখন আর তাহা স্বাধীন ভারতের প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ নহে।
>
> প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্ব্বজনীন এবং উন্নত ধরণের শিক্ষার প্রয়োজন। চরিত্রের এবং বোধ ও চিন্তা শক্তির মান যাহাতে উন্নত হয় এবং জাতীয় কর্ম্মক্ষেত্রের সকল বিভাগে জাতি যাহাতে যথার্থ নেতা পাইতে পারে, তজ্জন্যই ইহা

আবশ্যক। উন্নত ধরণের জীবনযাপনের নূতন পথ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে। সুতরাং শিক্ষার সকল স্তরের ও সকল পর্য্যায়ের ক্ষেত্রের নূতন পরীক্ষা প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এবং উচ্চ শ্রেণীর গবেষণার সকল দিক পরীক্ষা করিয়া কমিশনকে সুপারিশ করিতে বলা হইয়াছে।

বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য এবং নানা দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগ রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের কল্যাণে যে সকল নূতন পথ খুলিয়াছে তৎসম্বন্ধেও ডাঃ তারাচাঁদ কিছু বলিয়াছেন :

জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা-সমাজ ও সংস্কৃতি-পরিষদ ভারতীয়দিগের সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য বহুসংখ্যক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন: তদুপরি জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদের মারফতে বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষার জন্য আরও কতকগুলি বৃত্তি প্রদান করেন। দুর্লভ মুদ্রা এলাকা হইতে ভারতের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। বর্ত্তমান বৎসরে জাতিসঙ্ঘের সংস্কৃতি-পরিষদ দুর্লভ মুদ্রা এলাকা-সমূহ হইতে ভারতে পুস্তকাদি সরবরাহের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। তথ্যাদি সরবরাহ, মৌলিক শিক্ষা, শিল্প-কৌশল ও প্রাপ্তবয়স্কদিগের শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা, মিউজিয়মে চারুকলা প্রবর্ত্তন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উক্ত সংস্কৃতি-পরিষদ আমাদিগকে সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-কৌশল বিষয়ে এবং জনশিক্ষা সম্পর্কে কার্য্যকরী বিষয় সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সরবরাহে তাঁহারা সাহায্য করিতে পারেন। ইহা অবশ্যই স্মরণীয় যে, জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি-পরিষদের বিভিন্ন সম্মেলন ও সভা-সমিতিতে যোগদানের ফলে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক তৎপরতার বিষয় বিশ্বের সম্মুখে আনা সম্ভব হইয়াছে।

সম্প্রতি ১৬ই শ্রাবণ তারিখে, "প্রাপ্ত-বয়স্কগণের" শিক্ষা বিস্তারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ গবর্ন্মেণ্টের "পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা" সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আমরা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের অনেক ভুলত্রুটি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি-গোচর করিয়াছি। নূতন আয়োজনের প্রারম্ভে সেইরূপ আলোচনা করিব না। আগামী ৩০শে শ্রাবণ (১৫ই আগষ্ট) হইতে এই পরিকল্পনার রূপদান করা হইবে। নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম স্থির হইয়াছে। যথা—(১) নিরক্ষরতা দূর করার জন্য (প্রাপ্ত-বয়স্কগণের) সমাজ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন; (২) সংস্কৃতিবিষয়ক শিক্ষার জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, যেমন লাইব্রেরি, প্রকাশ্য থিয়েটার, অবসরকালীন কার্য্যকলাপ ইত্যাদি; (৩) শুনিয়া ও দেখিয়া শিক্ষা এবং অবসরকালীন শিক্ষা; (৪) নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্রের জন্য শিক্ষাব্রতীদের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সমাজসেবা; (৫) স্বেচ্ছাব্রতী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থানুযায়ী অতিরিক্ত কার্য্যক্রম এবং (৬) কার্য্য সম্পাদনকল্পে গঠিত ইউনিট ও কার্য্য-পরিচালনার ব্যবস্থা।

বর্ত্তমান বৎসরে ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যাল্পতা হেতু সরাসরি গবর্ন্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে পাঁচ শত কেন্দ্রের বেশী খোলা সম্ভবপর হইবে না। এই কার্য্যক্রমের সারাংশ এক শত পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা আরম্ভ হইবে। প্রথম বৎসরে চারি শত কেন্দ্রের প্রধান কাজ হইবে—নিরক্ষরতা দূর করার ট্রেনিং; তারপর পরবর্ত্তী প্রত্যেক বৎসরে অন্ততঃ তিন শত করিয়া নূতন কেন্দ্র খোলা হইবে। এই সকল সংখ্যার সহিত যুক্ত হইবে—গবর্ন্মেণ্টের সাহায্যে স্বেচ্ছামূলক এজেন্সীসমূহ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অতিরিক্ত কেন্দ্রসমূহ এবং ঐ সকল এজেন্সী অতিরিক্ত যে সকল কেন্দ্র খুলিবে, জেলাসমূহের লোকসংখ্যার অনুপাতে এই সকল কেন্দ্র যত দূর সম্ভব সমানভাবে বণ্টন করা হইবে। তবে পল্লীর এবং এলাকার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে মিটান হইবে। পল্লী এলাকার প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্র এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাধিক নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেকটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র দুই জন শিক্ষক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে; তন্মধ্যে এক-জন নিরক্ষরতা দূরীকরণে ট্রেনিং-প্রাপ্ত এবং অন্য একজন সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক শিক্ষায় ট্রেনিং-প্রাপ্ত।

বর্ত্তমান সময়ের জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্রে সমাজ শিক্ষা প্রদানের জন্য আংশিক সময়ে কাজ করার একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে। শিক্ষার সময় দুই মাস হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং বৎসরে এইরূপ তিনটি 'সেসন' হইবে। প্রতি বৎসর প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে যাহাতে এক শতের কম শিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক বাহির না হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক কেন্দ্রে চল্লিশ জন করিয়া প্রাপ্তবয়স্ককে ভর্ত্তি করা হইবে। অপরাহ্নে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইবে এবং পুরুষেরা সাধারণতঃ অপরাহ্নে শিক্ষা লাভ করিবে। এই 'কোর্স' শেষ হইলে পূর্ণ বয়স্কগণকে আরও নয় মাসকাল নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। সেখানে তাহাদিগকে উপযুক্ত সাহিত্য দেওয়া হইবে। সম্পূর্ণ 'কোর্সটি' এমনভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, প্রাপ্তবয়স্কগণ এক বৎসরের মধ্যে সংবাদপত্র ও সহজ ভাষায় পুস্তকাদি পাঠ করিবার যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে।

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সফল হউক ইহা আমাদের কাম্য। যে উপায় অবলম্বিত হইতেছে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও আজ তাহা ব্যক্ত করিব না। কেবল একটা কথা বলিতে চাই। গতানুগতিকভাবে সরকারী পরিকল্পনা চলিবে, চলিতে থাকুক। কিন্তু যে সব প্রতিষ্ঠান ১০।১২ বৎসর হইতে এই শিক্ষাদান ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদেরও "পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা"

করিয়া কার্য্যারম্ভের শক্তি যোগান পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ; পাঁচ বৎসরের জন্য কার্য্যোপযোগী অর্থ সাহায্য করা হইবে এরূপ প্রতিশ্রুতি পাইলে এসব প্রতিষ্ঠান নূতন উদ্যমে অগ্রসর হইতে পারিবে। বর্ত্তমানে সরকারী শিক্ষা-বিভাগ বিভিন্ন ওজন করিয়া সাহায্য বিতরণ করিতেছে, এবং নারীশিক্ষা সমিতি ও বঙ্গীয় বয়স্ক শিক্ষা সমিতির মত প্রতিষ্ঠানও তাহাদের শক্তি ও প্রয়োজন উপযোগী সাহায্য পাইতেছে না। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে পরিমাণ সরকারী সাহায্য ছিল, আজও তাহাই আছে যখন সর্ব্ববিষয়ে ব্যয় চারি গুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট "স্বেচ্ছামূলক এজেন্সির" কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের সহযোগিতা চাহিয়াছেন। কিন্তু প্রতিদানে বার্ষিক ২।৩ হাজার টাকার বেশী সাহায্য দান করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের হয় নাই। এ অবস্থায় তাঁহারা এরূপ নানা প্রতিষ্ঠানের অকুণ্ঠ সাহায্য প্রত্যাশা করিতে পারেন কিরূপে ? ফাইল হইতে চোখ তুলিয়া এই প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালকবর্গের সঙ্গে মন খুলিয়া একটু মিশিতে শিখুন ; তবেই ইহাদের অসুবিধা বুঝিতে পারিবেন, এবং তাহার প্রতিকার করিতে পারিলে ইহাদের সাহায্যে দেশের শিক্ষাসমস্যা সহজ হইয়া যাইবে।

রাষ্ট্রভাষা সমস্যা

আমাদের রাষ্ট্রভাষা লইয়া বিশেষ বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষের ১৪।১৫ কোটি লোক হিন্দি ভাষায় কথা বলেন এবং ভারতরাষ্ট্রের রাজধানী দিল্লী নগরী তাঁহাদের বাসস্থানের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া তাঁহারা আমাদের শাসকবর্গের উপর বিশেষ চাপ দিতে পারেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার তাঁহারা করিতেছেন। বর্ত্তমানে দিল্লী নগরীতে ঘটা করিয়া তাঁহারা একটা সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন—উদ্দেশ্য সর্ব্ব-ভারতীয় বিদ্বদ্বর্গের উপস্থিতিতে হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকার করাইয়া লওয়া। এই স্বীকৃতির সঙ্গে ভারত-রাষ্ট্রের জনমত মন খুলিয়া যোগদান করিতে পারিবে কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে বলিয়া কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ হিন্দীর উপর বিরূপভাব সংযত করিবার মানসে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী এক মাসের মধ্যে ভারতবর্ষের গঠন-বিধি ও ব্যবস্থা একটা চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করিবে। এইজন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের এই প্রস্তাব সময়োপযোগী হইয়াছে। ইহাতে বিতণ্ডার শেষ না হইলেও তাহা শান্ত হইবে। নিম্নে তাহা তুলিয়া দিলাম :

> ভাষা সমস্যা জনসাধারণের চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি তাই মনে করেন যে এই সম্পর্কে কয়েকটি মূলনীতি নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া উচিত। বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া এই নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রশ্নটাকে দুই দিক হইতে বিবেচনা করা হইয়াছে,যথা—শিক্ষা ও শাসন। ইহা ছাড়া সমগ্র দেশের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নও রহিয়াছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী এলাকার মধ্যে আদানপ্রদানে এই রাষ্ট্রভাষাই মাধ্যম হইবে।
>
> বর্ত্তমানে এমন কতকগুলি প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য আছে যেখানে একাধিক ভাষা প্রচলিত। এইরূপ বহুভাষা অতি সমৃদ্ধ এবং মূল্যবান সাহিত্য সম্পদে পুষ্ট। এই সমস্ত ভাষা শুধু রক্ষা করাই যথেষ্ট নয়, এইগুলির উন্নয়ন সাধন করিতে হইবে এবং এমন কিছু করা উচিত নয় যাহাতে ইহাদের উন্নতি ব্যাহত করা হয়।
>
> যে সকল প্রদেশে বা দেশীয় রাজ্যে একাধিক ভাষা প্রচলিত সেখানে এক একটি এলাকায় সন্দেহাতীত ভাবে এক একটি ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া প্রতি দেশে একটি ভাষা ক্রমশঃ আর একটি ভাষাকে আসন ছাড়িয়া দেয়—এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্যে সেই এলাকাগুলিকে দ্বিভাষী এলাকা বলা হইবে।
>
> কোন প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যের ভাষা কি তাহা সেই প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যই স্থির করিবে। বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রদেশসমূহের এক একটি ভাষার নির্দ্দিষ্ট এলাকায় এবং দ্বিভাষী এলাকায় বিভক্ত করিয়া লইতে হইবে। প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য এইরূপ প্রতিটি বিভাগের ভাষা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।
>
> শাসনকার্য্যের উদ্দেশ্যে প্রদেশ বা নির্দ্দিষ্ট এলাকার ভাষা ব্যবহৃত হইবে। প্রান্তদেশ বা দ্বিভাষী এলাকায় সংখ্যাল্প সম্প্রদায় যদি পর্য্যাপ্ত সংখ্যক জনবহুল হয় অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা কুড়ি ভাগ লোক সংখ্যাল্প সম্প্রদায়-ভুক্ত হয় তাহা হইলে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দলিল-পত্র, যথা—সরকারী নোটিশ, ভোটার তালিকা, রেশন-কার্ড প্রভৃতি উভয় ভাষাতেই লিখিতে হইবে। আদালত ও শাসনকার্য্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারী অফিসে দেশ বা এলাকা বিশেষের ভাষা ব্যবহৃত হইবে। তবে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে নিজ ভাষায় এবং সেই ভাষা সরকারীভাবে স্বীকৃত হইলে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।
>
> নিখিল-ভারতীয় উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি রাষ্ট্রভাষা থাকিবে। প্রাদেশিক বা দেশীয় রাজ্য সরকারের সহিত চিঠিপত্র আদান-প্রদানে সেই ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সমস্ত রেকর্ড সেই ভাষাতেই রক্ষিত হইবে, বিভিন্ন প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যের মধ্যে আদান-প্রদান ও চিঠিপত্র লেখালেখির জন্যও এই ভাষাই ব্যবহৃত হইবে। পরিবর্ত্তন-

কালে কেন্দ্র ও আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যাপারে ১৫ বৎসরের অনধিক কালের জন্য ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই সময় ক্রমশঃ ইংরেজীর স্থলে রাষ্ট্রভাষার সমধিক ব্যবহারদ্বারা ইংরেজীর পরিবর্তে রাষ্ট্রভাষাকে কায়েম করিতে হইবে।

শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রতি শিশু মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিবে শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবকের ইচ্ছানুযায়ী এই ভাষা স্থিরীকৃত হইবে। সাধারণতঃ ইহা এলাকা বা প্রদেশের ভাষা হইবে। তবে অন্যান্য স্থানে বিশেষতঃ প্রান্তিক এলাকায় এবং বড় বড় শহরে যেখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক বাস করে সেখানে সংখ্যালঘুর ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে কিংবা অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যদি উপযুক্তসংখ্যক যথা ১৫ জন ছাত্র দাবী করে তাহা হইলে সংখ্যালঘুর ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য বিভাগ খুলিতে হইবে। তবে এই সকল বিদ্যালয়ে মধ্যস্তরে সংখ্যালঘু ছাত্রদের জন্যও প্রাদেশিক ভাষা প্রবর্তন করা হইবে।

মাধ্যমিক স্তরে সাধারণতঃ প্রাদেশিক ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হইবে। তবে উপযুক্তসংখ্যক ছাত্র যদি দাবী করে তাহা হইলে সংখ্যালঘুর ভাষাতে শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন বা বিভাগ খোলা যাইতে পারে। স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করিবার—যথা, সেখানে সরকারী বা বেসরকারী এরূপ কোন বিদ্যালয় আছে কিনা, প্রাদেশিক তহবিল এইরূপ স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের ব্যয় বহন করিতে পারে কিনা। এই মাধ্যমিক স্তরে নিখিল-ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা করা যাইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে।

উর্দ্দুকেও এই ব্যাপারে একটি স্থান দিতে হইবে।

রাষ্ট্র-ভাষা সম্বন্ধে এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, তাহা "একটি" মাত্র হইবে। এই নীতি ও সিদ্ধান্তটাই অনেকের মনঃপূত হইবে না; তাঁহারা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে সুইজারল্যাণ্ডের মত ভারতরাষ্ট্রেও ৪।৫টি রাষ্ট্র-ভাষা থাকিবে। গত ১লা শ্রাবণের "হরিজন" পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত কথাগুলি জানিয়া রাখা ভাল:

> সুইজারল্যাণ্ড সুসংহত একটি জাতীয় সত্তা। চারটি জাতি লইয়া ইহা গঠিত—জার্মান, ফরাসী, ইতালীয় ও রোমক। তাহাদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের জাতীয় ভাষা ব্যবহার করে।
>
> সুইস্দের কেডারেল্ বিধানতন্ত্রের ১১৬ ধারাতে আছে: জার্মান, ফরাসী, ইতালীয় ও রোমক এই চারটি সুইজারল্যাণ্ডের জাতীয় ভাষা।
>
> জার্মান, ফরাসী ও ইতালীয় এই কয়েকটি সুইস্-কন্‌ফেডারেশনের সরকারী-দফতরের ভাষা।

প্রবন্ধের লেখক মিঃ ডোনাল্ড টাউনসেণ্ড আমেরিকাবাসী; তিনি অনেক দিন ভারতে আছেন এবং এখানেই বসবাস করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে তিনি যে-সব কথা বলিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইতে পারিলে আমাদের সকলের মঙ্গল:

> আমরা যদি প্রাচীনদের প্রতিযোগিতা পরিহার করি, দেশ জাতি ও জাতের গর্ব্ব ছাড়িতে পারি এবং আমরা যদি নিজেদের প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় এবং গৌণভাবে মাদ্রাজী, বাঙালী বা মারাঠী বলিয়া মনে করি তাহা হইলেই ভারতে সুইস্-পদ্ধতির প্রয়োগ করিতে পারা যায়।
>
> এখানকার ঔদার্য্য এবং পরমতসহিষ্ণুতা মনোমুগ্ধকর··· কত ব্যাপারই না এখানে মানিয়া লওয়া হয়। এখানে অনেক সময়ে আইনের বদলে প্রচলিত রীতিই গ্রাহ্য হয়। ধর্ম্ম ও ভাষার সম্বন্ধে সুইস্-বিধানতন্ত্রে বিধিনিষেধ কতই কম। অথচ আপন শ্রেষ্ঠত্ব, অগ্রগণ্যতা বা বিশুদ্ধতার কোন বোধই নাই।···

এই মনোভাবের অনুশীলন করিতে কতদিন লাগিবে, তাহা জানি না। এই "ঔদার্য্য" আমাদের জাতীয় চরিত্রে বদ্ধমূল না হইলে দেশের অকল্যাণ কেহই ঠেকাইতে পারিবে না; আজ যাঁহারা হিন্দী ভাষা লইয়া লাফালাফি করিতেছেন তাঁহাদের এই কথাটা মনে রাখিতে বলি।

পশ্চিম ইউরোপের বিপদ

বার্লিন নগরী সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও ইউরোপখণ্ডে নিশ্চিন্ততা আসে নাই। এই আশঙ্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী ডিন এচিশনের একটা উক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গত ১২ই শ্রাবণ তাহাদের ব্যবস্থাপক সভার বৈদেশিক কমিটির সমক্ষে তিনি এই কথা বলেন: "পশ্চিম ইউরোপের স্বাধীন জাতিগুলির নিরাপত্তার উপর আমাদের নিজেদের নিরাপত্তা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কিন্তু তাহারা বড় রকমের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম।" এই আক্রমণ কোথা হইতে আসিবে, তাহার প্রতিও এচিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে— "সোভিয়েট ইউনিয়নে বর্ত্তমানে যে সৈন্যবাহিনী আছে বিশ্বের ইতিহাসে শান্তির সময়ে এরূপ বিরাট বাহিনী আর কোন দিন কাহারও ছিল না।"

এইরূপ আশঙ্কা দূর করিবার জন্যই ইউরোপের ১২টি রাষ্ট্র মার্কিনী-রাষ্ট্রের সঙ্গে গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে এবং ইহা ছাড়া মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৬টি ইউরোপীয় রাষ্ট্রকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৭ সাল হইতে আর্থিক সাহায্য করিতেছে; এই সাহায্যকে আশ্রয়

করিয়া এই দেশগুলি যুদ্ধবিধ্বস্ত জীবনযাত্রা পুনর্গঠন করিতে সক্ষম হইবে। সম্প্রতি মার্কিন ব্যবস্থাপক সভায় ১৯৪৯ সালের জন্য প্রায় এক হাজার কোটি টাকা এতদর্থে মঞ্জুর করিয়াছে, যদিও দুইটি রাজনৈতিক দল এ বিষয়ে এখনও তর্ক করিতেছে।

"নিউ ইয়র্ক টাইমস" পত্রিকা এই মতবিরোধের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছে :

বিতর্কে প্রকাশ পাইয়াছে যাঁহারা উহার বিরোধিতা করিতেছেন তাঁহাদেরও অনেকে চুক্তিটির নীতি সমর্থন করেন ; পশ্চিম ইউরোপ আক্রান্ত হইলে উহার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

কিন্তু মতভেদ ঘটিয়াছে এই প্রশ্ন লইয়া যে কবে এবং কিভাবে সমবেত আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় আমরা যোগদান করিব—ফলে চুক্তিটির অন্তর্গত যে সামরিক সাহায্যদানের বিধান রহিয়াছে তাহাই এখন প্রধানতঃ তর্কের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

সেনেটের অধিকাংশ সদস্য শুধু যে অতলান্তিক চুক্তিটিই সমর্থন করেন তাহা নহে, কোন প্রকারের আক্রমণ আসিবার পূর্ব্বেই ইউরোপের জাতিগুলি যাহাতে আত্মরক্ষার জন্য সুসংহত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে সেজন্য তাহাদের সাহায্য করিতেও তাঁহারা ইচ্ছুক। উহার উদ্দেশ্য যাহাতে ঐরূপ একটা আক্রমণ না আসিতে পারে এবং নূতন একটা মহাযুদ্ধ সংঘটিত না হয়।

অন্যদিকে বিরোধী দলের অধিকাংশ সদস্য বলেন আক্রমণের পূর্ব্বে নহে—আক্রমণ সুরু হইবার পরেই মাত্র ঐরূপ সাহায্য দেওয়া উচিত। ব্যয় সঙ্কোচ, অথবা রাশিয়াকে না "খোঁচাইবার" ইচ্ছা অথবা মিত্ররাষ্ট্রগুলির প্রতি সংশয় প্রভৃতি কারণেই তাঁহারা এই কথা বলেন ; তাঁহাদের মতে পশ্চিম ইউরোপের শান্তি রক্ষার জন্য যে আমেরিকাও যোগদান করিবে এই প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট। এইজন্যই সামরিক সাহায্যদান ব্যবস্থাকে তাহারা শৃঙ্খলিত করিতে চাহেন। কিন্তু উহাতে মূল চুক্তির কোন মূল্য থাকিবে না ; বিরোধী দলের উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইবার সম্ভাবনা কম।

এই সব বিতর্কের উত্তরে সোভিয়েট বেতারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে কোন নূতনত্ব নাই : "যুদ্ধের বাতিক উস্কাইয়া দেওয়া ও দুর্ব্বলচেতাদের ভয় দেখানো"—ইহাই হইল এই "সাজ সাজ" ডাকের উদ্দেশ্য। গণতন্ত্র ও এক-নায়কত্বের এই বিতর্কে দুনিয়ার লোকসমষ্টি কতটা উপকৃত হইবে সেই সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ আছে। আমরা বুঝিতেছি না যে, এই বিরোধের প্রয়োজন কি। গণতন্ত্রের পক্ষে বলা হয় যে তার আক্রমণের কোন উদ্দেশ্য নাই। আত্মরক্ষার জন্যই সে সব আয়োজন-উদ্যোগ করিতেছে ; এক-নায়কত্বের প্রতিভূ সোভিয়েট রাষ্ট্র-গোষ্ঠীও বলিতেছে সেই কথা। এবং এক ভাব পোষণ করিয়া ও এক বুলি উচ্চারণ করিয়া তবুও তাহারা একাগ্র মন হইতে পারিতেছে না। মনুষ্য জাতির দুর্ভাগ্য।

এই বিরোধে ভারতরাষ্ট্রের স্থান কোথায়, তৎসম্বন্ধে আমাদের জনমত গঠিত হয় নাই। আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ বলিতেছেন যে আমরা দূরে দাঁড়াইয়া এই বিরোধ দেখিব ; কোন পক্ষে যোগদান করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। কিন্তু পৃথিবীর শক্তিপুঞ্জ যেরূপভাবে দলবদ্ধ হইতেছে তাহাতে নিরপেক্ষ ও নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব হইবে কিনা তৎসম্বন্ধে অবিশ্বাসের ভাবই প্রবল। সোভিয়েট রাষ্ট্র ত ধরিয়া লইয়াছে যে, ভারতরাষ্ট্র ইংলণ্ড ও মার্কিনের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে। এই বিশ্বাসের প্রেরণায়ই তাহার প্রবল প্রচার-যন্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ঘুরাইয়া লইয়াছে।

রামেন্দ্র-রচনাবলী

আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীর প্রথম খণ্ড পাইয়া সুখী হইলাম। বাংলা ভাষায় বর্ত্তমান সংস্কৃতির প্রবর্ত্তক ও ধারকবৃন্দের রচনাবলী প্রকাশ করিবার ব্রত গ্রহণ করা হইয়াছে ; এই গ্রন্থাবলী এই ব্রত উদ্‌যাপনের অংশ মাত্র।

বর্ত্তমান যুগের বাঙালীকে নূতন করিয়া তাহাদের স্বকীয় ইতিহাস শুনাইতে হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন ; সেই কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ় সংকল্প থাকিলে আমাদের জাতি উপকৃত হইবে। রামেন্দ্রসুন্দর দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় সম্পাদকদ্বয় "সাহিত্য সাধকমালার" ৭০ নং গ্রন্থে—("রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী") বিবৃত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে দেশে যে জাগরণ বাঙালীকে নূতন করিয়া গঠন করিয়াছিল তাহার ভাব ও চিন্তানায়কবৃন্দের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের নাম জাতির স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। সাহিত্য-পরিষৎ সেই ভাব ও চিন্তা সহজলভ্য করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া আমাদের সম্মুখে কর্ত্তব্য পালনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের গবর্মেণ্টের প্রদত্ত দশ সহস্র মুদ্রার দানে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদকদ্বয়ের অনুমান যে, আরও পাঁচ খণ্ডে "রামেন্দ্র রচনাবলীর" প্রকাশ তাঁহারা সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন। এতদর্থে বাঙালী সমাজের মুক্তহস্তে দান করিতে হইবে। সেই দানের পরিমাণ ২৫ হাজার টাকা মাত্র। ১০০০ লোক পঁচিশ টাকা এককালীন অগ্রিম দান করিলে এই দায় সহজে মুক্ত করা যায়। বাঙালী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এক হাজার লোকের অভাব এই কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। সংগঠনের যে দায়িত্ব তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙালী তাঁহাদের নিজের কর্ত্তব্য পালন করুন।

বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী

শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত

প্রায় সকল দেশের শিক্ষাবিদেরা স্বীকার করিয়াছেন যে, শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য শিশুকে দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিক তৈয়ারী করা। আর এক কথায় বলা যাইতে পারে, শিশু যে সমাজে আছে সেই সমাজের একজন সভ্য হইয়া যাহাতে ইহার উন্নতি বিধান করিতে পারে তাহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে একটা কথা আমরা ভুল করিয়া থাকি। আমরা ধরিয়া লই যে, সমাজব্যবস্থা ঠিকই আছে। শিশুকে এই প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় খাপ খাওয়াইতে পারিলেই হইবে। সমাজের ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা এবং সমাজের কোনও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে কিনা এই প্রশ্নও শিক্ষাবিদ্‌দের মনে আসা উচিত ছিল। আমার মনে হয় এতাবৎকাল শিক্ষার উন্নতিবিধানের যে চেষ্টা হইয়াছে তাহা ফলবতী না হওয়ার কারণ আমরা শিক্ষার একটা দিকের উপরই জোর দিয়াছি এবং আর একটা দিককে ছাড়িয়া দিয়াছি।

প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে কিরূপ সমাজ তিনি গড়িতে চান। শিশুকে সেই আদর্শ-সমাজের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। আদর্শ ভবিষ্যৎ সমাজের উপযোগী করিয়া শিশুকে গড়িয়া তোলাই শিক্ষার কাজ। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার এই দোষ, গান্ধীজীর চোখে পড়িয়াছিল তাই তিনি বুনিয়াদী শিক্ষাকে শিক্ষাপদ্ধতি (system of education) না বলিয়া জীবন-ধারণ-পদ্ধতি (way of life) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মহাত্মাজী কিরূপ সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন এবং শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা তাহা কতটা সম্ভব ইহাই এখন আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত।

আজ পৃথিবীময় সাড়া পড়িয়াছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। কিন্তু সত্যিকার গণতন্ত্র কি কোনও দেশে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে? সত্যিকার গণতন্ত্র তাহাকেই বলিব যেখানে সকল ব্যক্তিকে সমান সুযোগ দেওয়া হয়। আমার মনে হয় প্রত্যেক মানুষেই কোন না কোন বিষয়ে অন্যাপেক্ষা কিছু বেশী ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার বিশেষ ক্ষমতা বিকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহাকেই বলে গণতন্ত্র। কিন্তু আজ পৃথিবীর কোন্ দেশে এইরূপ সুযোগ দেওয়া হইতেছে? যখন যে দল বিশেষ ক্ষমতালাভ করিতেছে তখন তাহাদের বিরুদ্ধমতবাদীদের মুখ জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। পরিণত বয়সে কিরূপে আমরা আমাদের বাল্য ও কৈশোরের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারি?

শৈশব হইতে দেখিয়া আসিতেছি পরিবারে বাপ, মা আত্মীয়-স্বজন তাঁহাদের ইচ্ছা আমাদের উপর চাপাইয়া দিতেছেন, আমাদের নিজস্ব কোন মত থাকিতে পারে কিনা তাহা ভাবিয়াও দেখেন না। আমরা কেমন করিয়া আশা করিতে পারি যে, গণতন্ত্রবিরোধী পরিবেশের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া আমরা হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইব এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিব? তাই গান্ধীজী বলেন, প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে একটি ছোট-খাটো গণতান্ত্রিক 'রাষ্ট্রে' পরিণত করিতে হইবে। এই শিশুরাষ্ট্রে থাকিবে নানা বিভাগ ও নানা কাজ। প্রত্যেকটি কাজের ভার পড়িবে শিশুদের দ্বারা মনোনীত এক একজন মন্ত্রীর উপর। যদি সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রতিযোগিতামূলক প্রচার বাদ দিতে পারি তাহা হইলে এই শিশুরাষ্ট্রে মন্ত্রীরূপে নির্ব্বাচিত হইবে তাহারাই যাহাদের বিশেষ বিশেষ দিকে দক্ষতা আছে। এমনিভাবে সারা দেশময় প্রত্যেক বিদ্যালয়কে যদি একটি করিয়া শিশুরাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারি তাহা হইলে আমরা জগতে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব।

কোন্ সুদূর অতীতে ভারতবর্ষে গুণকর্ম্মের বিচার করিয়া জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। পুরুষপরম্পরায় একই কাজ করিলে সেই কাজের উত্তরোত্তর উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। তাঁতীর ছেলে জন্মাবধি তাঁতের কাজ দেখার দরুন যত সহজে তাহার তাঁত বোনা শিখিবার সম্ভাবনা আছে অপরের সেরূপ নাই। সভ্যতার প্রথম যুগে সমাজের কাজের বিশৃঙ্খলা যাহাতে না হয় তাহার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে এই কর্ম্মবিভাগের ভাল দিকটা না লইয়া আমরা তাহার খারাপ দিকটাই লইলাম। কর্ম্মবিভাগ হইতে উৎপত্তি হইল জাতিভেদ প্রথা। আর একটা সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে যাহার কাজ সমাজে যত বেশী শক্ত ও প্রয়োজনীয় সমাজব্যবস্থার দৌলতে তাহার স্থান হইল তত নিম্নে। এই জাতিভেদ ভারতবাসী—বিশেষ করিয়া হিন্দুদের মধ্যে হিংসাদ্বেষ ও হানাহানির প্রধান কারণ। জগতের ও মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য আমাদের প্রয়োজন হইয়াছে জাতিহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া তোলা। এইরূপ সমাজগঠন বক্তৃতা দ্বারা হইতে পারে

না। বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে একটি ছোট-খাটো জাতিহীন ও শ্রেণীহীন সমাজে পরিণত করিতে হইবে। সমাজের সমস্ত কাজই এখানে থাকিবে, কিন্তু থাকিবে না জাতিভেদ। চল্‌তি কথায় যাহাকে বলে 'জুতো সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত'—সমস্ত কাজ এই ছোট সমাজের সভ্যেরা পর্য্যায়ক্রমে করিবে। পালাক্রমে সকলকেই হইতে হইবে মেথর এবং পাচক, চাষা ও তাঁতী, নেতা ও আদেশপালক। এখন আছে রাজকুমারদের স্কুল ও সাধারণের স্কুল, বর্ণহিন্দুদের ও হরিজনদের স্কুল, মুসলমানদের স্কুল বা খ্রীষ্টান স্কুল। এগুলি উঠাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে গড়িয়া তুলিতে হইবে সব শ্রেণীর ছোট ছোট সমাজ।

আজ সারাবিশ্বে জ্বলিতেছে অশান্তির আগুন। এই অশান্তির আগুন নিবাইতে না পারিলে বিশ্বগ্রাসী তৃতীয় মহাসমর যে অবশ্যম্ভাবী তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই আগুনের উৎস কোথায় তাহার সন্ধান করিলে দেখিতে পাইব যে, জগতে গড়িয়া উঠিয়াছে দুইটি শ্রেণী—সব-পাওয়া ও সব-হারা। জগতের একদল লোক বিনা পরিশ্রমে বা অল্প পরিশ্রমে পাইতেছে জগতের সব সুখ ও সম্পদ, আর এক দল লোক সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া দু'বেলা দু'মুঠা অন্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। জগতের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অর্থনৈতিক 'গ্রাফ' (graph) সমরেখায় পরিণত হইয়াছে। ম্যাক্‌ডোনাল্ড দু একজন হইলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে ধনী ও শিল্পপতিদের ছেলেরা সমাজের উপরের স্তরে রহিয়া গিয়াছে এবং শ্রমিক ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি বিশেষ হয় নাই বলিলেই চলে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে এমন এক সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে প্রত্যেক সভ্যই সমাজকে কিছু না কিছু দান করিবে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কিছু না কিছু উৎপাদন করিতে হইবে। সমাজের জন্য প্রত্যেকের কিছু না কিছু উৎপাদন করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত করিতে হইবে বিদ্যালয়ে। তাই মহাত্মাজী প্রবর্ত্তিত বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইয়া উঠিয়াছে কর্ম্মকেন্দ্রিক। মহাত্মাজী উৎপাদনের দিকে জোর দিয়াছেন—কারণ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সমাজে শিশু শিখিবে সমাজের প্রয়োজনীয় কিছু না কিছু উৎপাদন করিতে।

শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনে নাগরিক হিসাবে সমাজে স্ব-স্ব স্থান গ্রহণ করিবার উপযুক্ত করিয়া তোলা শিক্ষার যে একটা উদ্দেশ্য সেই বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই। কিন্তু এখন কথা হইতেছে এই যে, সমাজে নিজের স্থান লইবার পূর্ব্বে প্রত্যেকের মধ্যে থাকা দরকার সমাজ-সেবার প্রবৃত্তি। বিদ্যালয়ে থাকিবার সময়েই সমাজের প্রধান প্রধান সমস্যার সহিত পরিচিত হইতে হইবে এবং সঞ্চয় করিতে হইবে ভবিষ্যৎ জীবনে পাথেয় হিসাবে সমাজ-সেবার অভিজ্ঞতা। বুনিয়াদী বিদ্যালয় এই বিষয়ে কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখা দরকার। ভারতবর্ষে বর্ত্তমান প্রধান সমস্যা অন্ন ও বস্ত্রের। প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সুতা-কাটা ও কৃষিকার্য্যকে আধারিক (basic) শিল্পরূপে গ্রহণ করিয়া সমাজের প্রধান দুইটি সমস্যা সম্বন্ধে শিশুদের অবহিত করা হইতেছে। আমাদের আর একটি সমস্যা হইতেছে 'সাফাই' বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। ব্যক্তিগত 'সাফাইয়ে'র দিক দিয়া দেখিতে গেলে জগতের মধ্যে ভারতবাসীদের শীর্ষস্থান বোধ হয় নিঃসন্দেহে দেওয়া যায়, কিন্তু সামাজিক 'সাফাইয়ে'র দৃষ্টিতে আমাদের স্থান অনেক নিম্নে। আমরা বাড়ীর ময়লা লইয়া গিয়া জমা করি রাস্তার মাঝখানে এবং প্রতিবেশীদের বাড়ীর সম্মুখে। বাড়ীর ময়লা আমরা পরিষ্কার করি, কিন্তু রাস্তার অপরিচ্ছন্নতা আমাদের চোখে পড়ে না। এইজন্যই গান্ধীজী বলিয়াছেন নয়া তালিম বা বুনিয়াদী শিক্ষার আরম্ভ 'সাফাই' হইতে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সাফাই বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ। নিত্য সাফাই ছাড়াও প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মধ্যে মধ্যে গ্রাম সাফাই ও সামগ্রিক সাফাই ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

আধুনিক সমাজের প্রধান গলদ হইতেছে সহযোগিতামূলক মনোভাবের অভাব। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজের মতামত প্রতিনিয়ত আমাদের মনে প্রতিযোগিতার স্পৃহা জাগাইতেছে। বিদ্যালয়ে শিশুকে বলা হইতেছে, যে-কোন প্রকারে অন্যান্য শিশু অপেক্ষা কয়েকটা বিষয়ে বেশী নম্বর পাইয়া ভাল ছেলের পর্য্যায়ে যাইতে। খেলার মাঠে শিশু চেষ্টা করিতেছে কেমন করিয়া অন্য সকলের চেয়ে ভাল খেলিতে পারে বলিয়া সুনাম অর্জ্জন করিবে। জগতের চিন্তাশীল মনীষিগণ আজ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, যদি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দূর করিতে না পারা যায় তবে মানব-সভ্যতার ঘোর দুর্দ্দিন অচিরে উপস্থিত হইবে। সহযোগিতাপূর্ণ সমাজব্যবস্থায় সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে। গান্ধীজী চাহিয়াছেন প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয় এক একটি ছোট ছোট প্রতিযোগিতাহীন, সহযোগিতামূলক সমাজে পরিণত হউক। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রথম দ্বিতীয় স্থান নির্দ্ধারিত করিবার জন্য কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা থাকিবে না। তাহার পরিবর্ত্তে থাকিবে সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি যাহাতে প্রত্যেক শিশুরই কিছু না কিছু অংশ থাকিবে। যে কাজের পরিকল্পনা

শিশুরা করিবে তাহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিবার সুযোগ তাহাদের দিতে হইবে এবং তাহাতে যেন প্রত্যেক শিশুরই কিছু না কিছু অংশ থাকে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সমাজ-জীবন সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হইলে কতকগুলি নিয়ম কানুন মানিয়া চলিতে হয়। ইহার নৈতিক গুরুত্ব ততটা না থাকিলেও ব্যবহারিক সার্থকতা আছে। আজ আমরা যে দিকে তাকাই দেখিতে পাই জাতীয় জীবনে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার অভাব। রেলষ্টেশনে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় টিকিট-ঘরের সম্মুখে লোকের ভিড়। বাসে ও ট্রামে লোক যাইতেছে ঝুলন্ত অবস্থায়। একের পর একজন দাঁড়াইয়া নিজের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করার অভ্যাস আমাদের এখনও হয় নাই। কোন সভা-সমিতিতে মাঝখান হইতে অনেককে উঠিয়া চলিয়া যাইতে দেখা যায়, পরিচিত অপরিচিত, অতিথি, আত্মীয়, ছোট বড় ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা সমাজের সকলেরই জানা উচিত। মুখে বলিলেও এতদিন আমরা সামাজিক শিষ্টাচারকে শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া গণ্য করি নাই। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে সামাজিক সৌজন্যকে শিক্ষার একটি মূল অঙ্গ বলিয়া ধরা হইয়াছে। বিদ্যালয়ে শিশু তাহার শিক্ষার্থী জীবনে যাহাতে সামাজিক আচার-ব্যবহারগুলি পালন করিতে পারে সেই বিষয়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি এবং চলিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান পার্থক্য এই যে, চলিত শিক্ষাপদ্ধতি একমুখী, কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি দ্বিমুখী। চলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থা ঠিকই আছে; শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুদের সমাজে নিজ নিজ স্থান করিয়া লইতে শিক্ষা দেওয়া। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, প্রতিযোগিতামূলক বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে। শিশুদের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে থাকিবার সময় এই ভাবেই নূতন সমাজের পূর্ব্বাভাস দিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে বুনিয়াদী শিক্ষায় সমাজ ও নাগরিক উভয়ই গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা রহিয়াছে।

কবির প্রতি

শ্রীকালিদাস রায়

কালকে সে দেশ স্বাধীন হবে আজ যে পরাধীন,
কাল সে হবে ধনকুবের আজ যে দীনহীন।
কাল তা হবে মস্ত শহর আজ যা বুনো গ্রাম,
কাল তা হয়ত সস্তা হবে যার আজ চড়া দাম।
আজকে মজুর মরছে খেটে মিটছে না তার দাবি,
কাল সে পাবে সারা দেশের ভাঁড়ার-ঘরের চাবি।
আজ যে শিলং দার্জ্জিলিঙে কাটায় গরম কাল,
কালকে রোদে তার ছেলেরে ধরতে হবে হাল।
আজ যে প্রভু কালকে হবে একশ' জনার দাস
অলস ভোগীর বংশধরে খাটবে বারমাস।
আজকে যারা লড়াই করে জলে স্থলে ব্যোমে
কালকে হয়ত দোস্তি তাদের উঠবে বেজায় জমে।
এই দুনিয়ায় এ সব ব্যাপার চিরদিনের নয়
আজকে যাহা সত্য তাহা কালকে মায়াময়।
এসব নিয়ে লিখবে দেশে যতেক পাঠ্যকার,
রাজনীতিবিদ্ বার্ত্তাজীবী কিংবা নাট্যকার।
মা চিরদিন প্রাণ-দুলালে টানবে নিজের বুকে,
ঘুম পাড়াবে চুমা খাবে তাহার সোনামুখে।
প্রিয়তম প্রিয়ার লাগি ভুলবে এ ভুবন
মিলনে সে মাতবে, হবে বিরহে উন্মন।
আর্ত্তে দেখে দরদীরা ফেলবে আঁখিনীর,
মহত্তমের চরণে লোক লুটাবে তার শির।
জীবনে আর ভুবনে সার, যা কিছু সুন্দর
চিরদিন তা নরনারীর ভুলাবে অন্তর।
যতই তুমি মুখটি বাঁকাও ব্যঙ্গশায়ক হানো,
জ্যোছ্‌না, ফুল, উষার হাসি হবে না পুরানো।
চিরদিনই অনুতাপে কলুষ ধুয়ে যাবে,
আর্ত্ত জ্ঞানী ভক্ত সাধক চিরন্তনেই চাবে।
সীমার নিবিড় সঙ্গ চাবে অসীম চিরদিন,
অসীমাতে সসীম হবে বন্ধবাধাহীন।
চিরদিনের এই ত রীতি দু'চার দিনের নয়।
সেই সৃষ্টির শিখর হতে একই ধারা বয়।
যে ভোলে সে ভুলুক এসব, করুক আস্ফালন,
কবি তুমি ভুল না তাই, চিরদিনের ধন।

মাণিক

শ্রীকালীপদ ঘটক

নাঃ, মাণিকের আর লেখাপড়া কিছুতেই হ'ল না। দিনরাত খালি কাজ আর কাজ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এতটুকু ফুরসত নেই মাণিকের, লেখাপড়া সে করবে কখন! তিন মাসের মাইনে দিতে পারে নি বলে নাম কেটে ওরা স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে মাণিককে। মাষ্টারগুলো ভয়ানক পাজী, মাণিকের গায়ে আর একটু জোর হলে এক হাত সে দেখে নেবে ওদের, নাম এমনি কেটে দিলেই হ'ল। এই নিয়ে সেদিন খুব একচোট বচসা হয়ে গেছে মাণিকের নিধিরাম পণ্ডিতের সঙ্গে; ক্লাস থেকে সে কোনমতেই বেরুতে চায় নি, পণ্ডিত তাকে বেত মারতে মারতে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছে। লিক্‌লিকে বেত্রাঘাতের ছড়ি, সপাং সপাং—মাণিকের পিঠটা সেদিন ফুলে উঠেছিল, এ কি সে সহজে ভুলবে! যেমন করে হোক নিধিরাম পণ্ডিতকে জব্দ না করে ছাড়বে না মাণিক। কিন্তু সে যে এখনও ছোট, আর একটুখানি বড় হোক—তার পর সে দেখে নেবে একবার নিধিরাম পণ্ডিতকে।

কিন্তু বাড়ী বসেও ত লেখাপড়া হতে পারে মনে মনে ভাবতে থাকে মাণিক, নাই-বা গেল সে নিধিরাম পণ্ডিতের ইস্কুলে। বই-পুঁথি যে ক'খানা কেনা হয়েছে—বাড়ী বসেই তা শেষ করে ফেলবে মাণিক। তার শুধু শক্ত লাগে অঙ্কটা, মণকষা সেরকষা বিঘাকালি কাঠাকালির আর্য্যা তার মুখস্থ, কিন্তু আর্য্যা মিলিয়ে অঙ্ক কষতে গেলেই কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়, উত্তর কিছুতেই মেলে না। মাণিকের বাবা অঙ্ক জানে খুব ভাল, অসুখটা তার সেরে গেলেই বিলকুল শিখে নেবে সে। তারপর আর পায় কে মাণিককে, সিধে একেবারে চলে যাবে সে মামার বাড়ী—অজয় নদীর পারে; সেখানে যে মস্তবড় হাই স্কুল, মাণিক গিয়ে ভর্ত্তি হবে সেই স্কুলে, বিস্তর সে লেখাপড়া শিখবে, তারপর বড় হয়ে চাকরি একটা যোগাড় করে নেবে কোলিয়ারীতে। মাণিকের মেজমামা কোলিয়ারীর খাদ-সরকার, বড়সাহেবকে বলে কয়ে চাকরি একটা সে যোগাড় করে দেবেই। মাসে মাসে টাকা আসবে পকেটে বিস্তর, সে জামাজুতো কাপড়-চোপড় কিনে ফেলবে, কোনো-কিছুই আটকাবে না। চাই কি সে মাঝে মাঝে কিছু বাড়ী পাঠাতেও পারে, হাঁ—টাকা ত মাণিককে পাঠাতেই হবে, বাড়ীতে যে ভয়ানক অভাব।

মাণিক সবে দশ পার হয়ে এগারোয় পড়েছে। বয়স তার কতই বা, ভয়লমতি বালক; সেও কিন্তু বোঝে অভাবের কি তাড়না। ছোটমত একটা মুদির দোকান ছিল মাণিকের বাবার, বেশ চলত দোকান, খেয়ে পরে নির্ভাবনায় দিন চলে যেত। দোকানটা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উঠে গেল, মাণিকের বাবার যে অসুখ, দোকান আর চালাবে কে। যে কয় বিঘা ধানজমির চাষ ছিল মাণিকদের—সামান্য কিছু দেনার দায়ে তাও নিলে মহাজনেরা নিলাম করে। ঠেকাতে পারলে না মানিকের বাবা, জমিগুলো গেল। বড় হয়ে সবকিছু আবার করে নেবে সে, আটকাবে না, শুধু মাণিকের যা একটু বড় হতেই দেরি। কিন্তু তার আগে কিছু লেখাপড়া শিখতে হবে মাণিককে, তা না হলে হাই স্কুলে ভর্ত্তি হবে কেমন করে; লেখাপড়া তাকে শিখতেই হবে।

সকাল সন্ধ্যা নিজের মনেই পড়াগুলো আওড়ে যায় মাণিক। কিন্তু বাবা যে তার পদে পদে, লেখাপড়া করবার কি ফুরসত আছে—সংসারের ফাইফরমাস খাটতে খাটতেই সারাটা দিন কেটে যায় মাণিকের। কবরেজবাড়ী থেকে তিনবেলা ওষুধ বইতে বইতেই পড়ার সময়টুকু কাবার হয়ে যায়। কিন্তু উপায় কি, বাপের যে তার ভয়ানক অসুখ, দেড় বছর ধরে বিছানায় পড়ে আছে মাণিকের বাবা, রোগ কিন্তু কোনোমতেই সারছে না। মানিকের মা সব সময়ই রুগী নিয়ে ব্যস্ত, একা মানুষ, সবদিক সে গুছিয়ে উঠতে পারে না, মাণিককে তাই বাধ্য হয়ে সাহায্য করতে হয় সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্মে।

মাঝে মাঝে মাণিক হাঁপিয়ে ওঠে। কাজকর্ম্মের চাপে পড়ে খেলাধুলো পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে তার। কিন্তু উপায় কি—মা যে একা, বাপ শয্যাগত, মাণিক ছাড়া আর যে তাদের কেউ নেই এই দুঃসময়ে সাহায্য করতে। পাড়ার লোক কেউ ফিরেও তাকায় না, গাঁয়ের লোক সব ভয় করে মাণিকদের বাড়ী আসতে; মাণিকের বাবার ব্যারামটা নাকি খুব শক্ত, সবাই বলে—মাণিক কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না। মাণিকের মা বলে হাঁপানি, লোকে বলে যক্ষা; নিমু কবরেজ আবার লোকের কাছে ব্যাখ্যা করে বলে রাজরোগ। মাণিকের মায়ের কথাই হয়ত ঠিক—হাঁপানি, এর মানে কতকটা বুঝতে পারে সে, কিন্তু যক্ষা—যক্ষা আবার কাকে বলে, যক্ষা মানে কি হাঁপানি? হবে হয়ত। সে যাই হোক, কবরেজের কথা শুনে কিন্তু হাসি পায় মাণিকের, সে আবার বলে কি না রাজরোগ। রাজরোগ মানেই হয়ত জানে না কবরেজ, রাজরোগ—মানে

রাজার রোগ, কিন্তু মাণিকের বাবা ত রাজা নয়, কবরেজ কি তা হলে ঠাট্টা করে ওকথা বলে! নিন্ কবরেজ লোকটা সুবিধের নয়, মাণিক ওকে চিনে নিয়েছে। বিনি পয়সায় এককৌটা ওষুধ দিতে চায় না, বলে ধারে কারবার বন্ধ। মাণিকের মা টাকা দিতে পারে নি বলে কবরেজ আজ ক'দিন থেকে রুগী দেখতে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। মাণিক কি আর সাধে ওর ওপর চটা! কবরেজের টেকো মাথা, ফোকলা দাঁত, আর বাংলা পাঁচের মত মুখখানা দেখলেই ভয়ানক গা-জ্বালা করে মাণিকের। ও বেটা রাজরোগ মানেই জানে না—তার আবার পসার দেখসে কি হয়, মাণিক ওর বিদ্যের দৌড় বুঝে নিয়েছে।

বিছানায় পড়ে পড়ে ধুঁকছে করালী মুখুজ্যে। এক মাস নয় দু'মাস নয়—দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল বিছানা আঁকড়ে পড়ে আছে সে, ব্যারাম সারবার কোন লক্ষণ নাই। চব্বিশ ঘণ্টা ঘুষঘুষে জ্বর আর খক্ খক্ কাশি, কাশতে কাশতে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে করালীর; এ রোগ কি সহজে সারে! জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছে করালী, টাকাপয়সা হাতে যে ক'দিন ছিল—ওষুধ-পথ্যের ত্রুটি করা হয় নি, একে একে দেখা গেল অনেক কিছু, ফল আদৌ হ'ল না। ও কি হয়—এ রোগ যে শিবের অসাধ্য, ওষুধ খাওয়া তাই ছেড়ে দিয়েছে করালী, সব বাজে, খালি পয়সার শ্রাদ্ধ। পয়সাই বা আসবে কোত্থেকে, অমন সুন্দর চালু দোকানটা বন্ধ হয়ে গেল করালীর, রোগের পিছনেই সব গেল তার; একটা কানা-কড়ির সংস্থান নাই, করালী আজ নিঃসম্বল। সবই ত যাবে, দুনিয়াটাই হয় ত সৃষ্টির বুক থেকে মুছে যাবে এক দিন, কাল পূর্ণ হতে শুধু যতটুকু দেরি। করালীর কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে, এবার তাকেও যেতে হবে, হয়ত খুবই শীগ্‌গির—দিনক্ষণটা শুধু জানা নাই তার। কিন্তু পৃথিবীর মায়া যে কোন মতেই কাটাতে পারছে না করালী, সত্যি কি সে বাঁচবে না? করালীর ডান হাতে বাঁধা ধর্ম্মরাজের অক্ষয় কবচ, দৈব মহৌষধ। এতেই নাকি এ রোগ সারে, করালী নিজে বিশ্বাস করে না, কিন্তু গৃহিণীর অগাধ বিশ্বাস; কয়েক দিন আগে পাঁচকুড়ি থেকে ধর্ম্মরাজের নির্ম্মাল্য আনিয়ে তামার একটা মাদুলী করে করালীর হাতে বেঁধে দিয়েছে তার স্ত্রী। লোকে বলে এ কবচ নাকি অব্যর্থ, করালীর মত হাজার হাজার রুগী এর আগে নাকি চাঙ্গা হয়ে গেছে এই ওষুধের গুণে। হবে হয়ত, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু—বিশ্বাসই আসল। করালীর কিন্তু বিশ্বাস হয় না, শুধু গিন্নীর মনস্তুষ্টির জন্যই কবচটা সে ধারণ করেছে। এতে করে তার হাতের নোয়া সিঁথির সিন্দুর যদি অক্ষয় হয়—করালী তাতে খুশীই হবে, মরতে ত সে চায় না, জীবনটা যে করালীর কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু তার চেয়েও বিরাট সত্য মানুষের এই অন্তর পেট, করালী একথা আবিষ্কার করেছে। খেয়ে করালীর আশ মিটে না, মনে হয় আরও খাই—আরও খাই—কি যে খাই; বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা কিছুতেই যেন মিটতে চায় না। তিন বেলা যদি পেট পুরে খেতে পেত করালী যে ক'টা দিন বেঁচে আছে, মরেও হয়ত সে তৃপ্তি পেত: জীবনের মায়া আর করে না করালী, কিন্তু ক্ষুধার তাড়না অসহ্য, মনে হয় শুধু কি খাই—কি খাই—কি যে খাই।

বড়ঘরের চালার এক প্রান্তে বিছানায় পড়ে পড়ে ধুঁকছে করালী, নিজের মনেই ভাবছে সে আকাশপাতাল। এবার কিন্তু খেতে হবে তাকে, খিদে পেয়েছে। সেই কোন্ সকাল বেলা ছটাক খানেক চা খেয়েছে করালী, তার সঙ্গে একটুখানি পালো বাঁটা, ছাই—শুধু ময়দার ভুষি, না কোন মিষ্টি—না কোন আস্বাদ, এও কখনো খেতে পারে মানুষে। ভাত চাট্টি খেতে হবে করালীকে, জ্বরটা হয়ত ছাড়ল।

লেপখানা একটু সরিয়ে দিয়ে উঁকি মেরে রান্না ঘরের দিকে একবার তাকাল করালী। রান্না তা হলে চড়েছে, তবে আর চিন্তা কি, জুটবেই দুটো যা হোক কিছু।

কোটরগত চোখ দুটো মেলে বাইরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে করালী। কি সুন্দর রোদ উঠেছে সারা উঠান জুড়ে, আকাশ যেন ঝলমল করছে রৌদ্রের বন্যায়। বাইরে গিয়ে একটু বসবে নাকি করালী। শীতকালের রোদ্দুর, বসলে হয়ত একটু আরাম হ'ত।

উঠতে গিয়ে কিন্তু হাঁপিয়ে পড়ল করালী, খক্ খক্ করে কাশতে আরম্ভ করলে, কাশির মধ্যে ঘং ঘং করে কেমন যেন একটা আওয়াজ হচ্ছে। রক্তটা আজ আবার উঠছে নাকি? করালী চেয়ে দেখে মাটির পাত্রটার দিকে, রক্তের কোন চিহ্ন নাই। দৈব ঔষধ কি কাজ করছে? বলা যায় না, করালী হয়ত একটু একটু করে সেরেও উঠতে পারে। শির-দাঁড়ায় কিন্তু ভয়ানক ব্যথা, টন্ টন্ করছে পাঁজরাগুলো। করালী পিতলের কাঁসিটায় কাঠি দিয়ে ঝন্ ঝন্ শব্দে আওয়াজ করে দিলে একবার, ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ—।

গলাটা একদম বেবে গেছে করালীর, জোরে তাই সে কথা কইতে পারে না, তার শিয়রের পাশে তাই এই কাঁসির ব্যবস্থা। দূর থেকে কাউকে ডাকতে হলেই কাঁসিটায় একবার ঝন্ ঝন্ আওয়াজ করে দেয় করালী, এই তার সঙ্কেত।

উঠানের এক পাশে তালপাতার একটা চাটাই পেতে বই-পুঁথি খুলে পড়তে বসেছে মাণিক। নিজের মনেই সে আউড়ে যাচ্ছে সাহিত্য-পাঠ, ইতিহাস, ভূগোল, ছোটদের রামায়ণ, জ্ঞানবিজ্ঞানের মধুভাণ্ড; অনেক কিছুই পড়তে হবে তাকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ করছে মাণিক—

"জল স্পর্শ করবো না আর, চিতোর রাণার পণ,
বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে থাকবে যতক্ষণ।"

ও ঘর থেকে কাঁসির আওয়াজ, ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ...। রান্নাঘর থেকে মাণিকের মা হরিমতি ডাক দিলে—মাণিক! তারপর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাণিকের দিকে চেয়ে বললে—উনুনটায় একটু পাখা করো বাবা, শিগ্গির আসছি আমি।

বই-পুঁথি বন্ধ করে ধীরে ধীরে উঠে পড়ল মাণিক। কাঁচা কয়লার ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে রান্নাঘরের ভিতরটা, উনুনের মুখে ধীরে ধীরে মাণিক পাখা করতে লাগল। এ সব কাজ অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে তার। কিন্তু সব চেয়ে মুশকিল হয় মাণিকের বাবা যখন পরের বাড়ী তাকে জিনিষ চাইতে পাঠায়। এর বাড়ী বেগুন, ওর বাড়ী পালং শাক, এর মাঠে মুলো, ওর ক্ষেতে পেঁয়াজ,—রোজ রোজ লোকে দেবে কেন! মাণিককে দেখে বিরক্ত হয় ওরা, কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কেউ ভাল করে কথাই কয় না। মাণিকের পক্ষে এ অসহ্য, এ যে ঘোরতর অপমান।

বড়ঘরের চালার এক পাশে উঠানের দিকে দরমার ঘেরা দিয়ে করালীর শোবার জন্য একটু ঠাঁই করা হয়েছে। মাটির উপর পুরু করে খড় বিছানো, তারি উপর করালীর বিছানা। শুয়ে শুয়ে খাওয়ার কথাই ভাবছে করালী। ভয়ানক খিদে পেয়েছে, হ্যাঁ রাক্ষসী ক্ষুধা, এটাকে কিন্তু কোনমতেই জয় করতে পারলে না করালী, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নয়।

করালী পিতলের কাঁসিটায় আর একবার ঝন্ঝন্ করে আওয়াজ করে দিলে। গৃহিণী হরিমতি ধীরে ধীরে বসল এসে করালীর বিছানাটা চেপে, কপালে তার হাত রেখে বললে—জ্বরটা কি ছাড়ল?

করালী মাথাটা একটু কাত করে হরিমতির মুখের দিকে শুধু তাকাল একটিবার। হরিমতি বললে, এ জ্বর কি ছাড়ে, এ কি ছাড়বার! করালী সুর টেনে জবাব দিলে—কমেছে।

কি বিদ্‌ঘুটে বিকৃত কণ্ঠস্বর! করালীর নিজের কানেই যেন কর্কশ ঠেকে। দেখতে দেখতে গলাটা একেবারে বসে গেল করালীর, এ কি আর সারবে! করালী একটু দম নিয়ে বললে, খিদে পেয়েছে, দেবে কিছু খেতে?

হরিমতি করালীর কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগল, বললে, বাইরে একটু বসবে চল, তেল মাখিয়ে গা-টা একটু মুছিয়ে দিই। তারপর ঠাকুরের চরণামৃত খেয়ে গরম গরম একটু চা খাবে,..কেমন?

চা ত একটু খাবেই করালী, ভয়ানক ঠাণ্ডা লাগছে। ভেলিগুড়ের চা—চিনি নাই—ওই দিয়েই এখন চা খেতে হয়; বেশ লাগে করালীর, ভেলিগুড়ের চা তার অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু দেবতার ফুল-জল—ঠাকুরের চরণামৃত—এ সব আর কি কাজে লাগবে! হরিমতির বিশ্বাস—অগাধ বিশ্বাস তার ঠাকুরদেবতার উপর, তিন বেলা ঠাকুরের দোরে মাথা খুঁড়ে—ধর্ম্মরাজের ফুলজল আর কবচের জোরেই করালীকে সে সারিয়ে তুলতে চায়। কতখানি অন্ধ বিশ্বাস—মনে মনে হাসি পায় করালীর। আর একবার সে চোখ মেলে তাকাল হরিমতির দিকে, মুখখানা যেন শুকিয়ে গেছে, রুখু মাথায় তেল পড়েনি কত দিন, সিঁথির সামনে টুকটুকে সিন্দুরের রেখাটি কিন্তু জ্বল্ জ্বল্ করছে, ভাগ্যবতী এয়োতীর চিহ্ন—মনে মনে আর একবার হাসল করালী, হরিমতির মুখের দিকে চেয়ে। বয়স ওর কতই বা, তিরিশ এখনও পার হয় নি, করালীর চেয়ে ও যে অনেক ছোট।

করালীর মনের মধ্যে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে গেল তার বিগত জীবনের বিচ্ছিন্ন কয়েকটা অধ্যায়। লুপ্ত যৌবনের উদ্দীপ্ত জয়-গান করালীও শুনেছিল এক দিন, রেশটুকু আজও তার মিলিয়ে যায় নি। কত কথা—কত ছন্দ—কত হাসি—কত গান—বিগত জীবনের কত মধুময় স্বপ্ন আজও যেন জড়িয়ে রয়েছে করালীর সুপ্ত হৃদয়তন্ত্রীতে। হরিমতির মুখের দিকে চেয়ে করালী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লে।

হরিমতি করালীর দুর্ব্বল দেহখানা ধরে ধীরে ধীরে তাকে নিয়ে গিয়ে বসাল উঠানের মাঝখানে একটা খাটিয়ার উপর। করালী হাঁপাতে লাগল, খাটিয়ার উপর একটা বালিশ ঠেস দিয়ে কোন রকমে বসে পড়ল করালী। শীতের সকাল, রোদ্দুরটা বেশ লাগছে, বেলা প্রায় প্রহর দেড়েক হ'ল। করালী হরিমতির দিকে চেয়ে বললে, মানকে গেল কোথায়?

মাণিক তখন রান্নাঘরের পিছন দিকে কুয়োতলায় বসে বসে দুর্ব্বাঘাস ছিঁড়ছে। বাড়ীর বকনা বাছুরটা—মাণিকের বুধি—রোদ্দুরে গা মেলে চুপচাপ বসে আছে কুয়োতলার পাশে। কচি দুর্ব্বাঘাস ছিঁড়ে বাছুটার মুখে গোছা গোছা করে ধরে দিচ্ছে মাণিক। বুধির উপর মাণিকের গভীর টান, বুধির সেবা-যত্ন বা আরাম-বিরামের এতটুকু ত্রুটি হবার উপায় নাই, সেদিকে মাণিকের কড়া নজর। বুধি যেন ওর খেলার সঙ্গী।

করালী আবার জিজ্ঞাসা করলে, মানকে কোথাও বেরিয়ে গেছে নাকি?

রান্নাঘরের পিছন দিকে চেয়ে হরিমতি একটা ডাক দিলে, মাণক!

পাঁচিলের ওপাশ থেকে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে মাণিকের বন্ধু কানিবুড়ো হাতছানি দিয়ে ডাকছে মাণিককে, গুলিডাণ্ডা খেলবার সময় হয়েছে। হাতের দুর্ব্বাঘাস ক'টা বুধির মুখে তুলে দিয়ে পাঁচিল টপকাবার যোগাড় করছে মাণিক। বাড়ীর ভিতর থেকে হঠাৎ ডাক পড়ল—মাণিক!

· মনটা ভয়ানক খিঁচড়ে উঠল মাণিকের। গুলিডাণ্ডা আরম্ভ হয়ে গেছে উপর বাগানে, এ সময় কি বাড়ীর মধ্যে থাকা চলে।

মাণিকের বন্ধু কানিবুড়ো এসে দাঁড়িয়ে আছে কখন থেকে। বাইরের দিক থেকেই কানিবুড়ো একটা শিস্ দিয়ে ইসারা করে বললে, পাঁচিল টপ্‌কে চলে আয় না, ভাবছিস কি?

মাণিকের মনটাও যাই যাই করছে, এ সময় একটু গুলিডাণ্ডা না খেললে কি চলে। পাঁচিলের উপর উঠে পড়েছে মাণিক, বাইরের দিকে এবার ঝপাং করে একটি লাফ দিতে পারলেই হয়; পিছন দিক থেকে হঠাৎ আর একটা ডাক এল—মাণিক।

হরিমতি গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রান্নাঘরের পিছন দিকটায়।

মাণিকের আর যাওয়া হ'ল না, দূর থেকে মায়ের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যেতেই ধীরে ধীরে পাঁচিল থেকে নেমে এল মাণিক। কে জানে—তাকে আবার কবরেজবাড়ী যেতে বলবে নাকি! নিমু কবরেজ লোকটা ভয়ানক পাজী। নিধিরাম পণ্ডিত আর নিমু কবরেজ—এ দুজনের জোড়া নাই গাঁয়ে, ওদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখতে চায় না মাণিক।

করালীর শরীরটা মোটে ভাল যাচ্ছে না—ক্রমশঃই খারাপের দিকে। হরিমতি বুঝতে পারছে সবই। কবচ আর ঠাকুরের চরণামৃতের উপর শ্রদ্ধা আজও অটুট আছে হরিমতির, কিন্তু এই সঙ্গে একটু কবেরজী ওষুধের ব্যবস্থা হলে ফল হয়ত তার ভালই হ'ত, সেই ব্যবস্থাই করে এসেছে হরিমতি। মাণিক কাছে এসে দাঁড়াতেই বললে, কবরেজ মশায়ের কাছ থেকে একটু ওষুধ নিয়ে আয় বাবা!

মাণিক যা ভাবছিল তাই।

করালী উঠান থেকে একটা ডাক দিলে বিকৃত-কণ্ঠে, মাণিক!

মাণিকের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। করালীর ওই দাবাগলার আওয়াজ, মাণিক যেন সহ্য করতে পারে না, বাপের এই দুরারোগ্য ব্যাধির কথা চিন্তা করে অত্যন্ত কষ্ট হয় মাণিকের।

হরিমতি বললে, যা বাবা—আর দাঁড়িয়ে থাকিস না, ওষুধটা শিগ্‌গীর নিয়ে আয়, যা।

মাণিক একটু ইতস্ততঃ করে বললে, পয়সা?

হরিমতি বললে, পয়সা এখন দিতে হবে না, কবরেজ মশায়কে আমি বলে এসেছি।

করালী রোদ্দুরে গা এলিয়ে চুপচাপ বসে আছে খাটিয়ার উপর, বালিসে হেলান দিয়ে। দূর থেকেই মাণিক তাকাল উঠানের দিকে। তারপর সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল, সোজা গিয়ে হাজির হ'ল সে নিমু কবরেজের বৈঠকখানায়।

নিমু কবরেজ চাটাইয়ের উপর বসে বসে কতকগুলো গাছগাছড়া আর শিকড়-বাকড় মিলিয়ে পাঁচনের পুরিয়া বাঁধছিল। মাণিককে দেখে কবরেজ একটু গম্ভীর হয়ে উঠল, বললে, কি হে, মাণিকচন্দর যে, ওষুধ চাই বুঝি?

মাণিক ঘাড় নেড়ে জানালে ওষুধ নিতেই এসেছে সে।

নিমু কবরেজ একটু ভারিক্কি চালে বললে, তা বেশ—ওষুধ নিয়ে যাও, কিন্তু দামটা যেন শিগ্‌গীর মিটিয়ে দিতে বল। বলো তোমার মাকে—বিনি পয়সায় ওষুধ আর আমি যোগাতে পারব না, বুঝলে?

মাণিক কোন জবাব দিলে না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নিমু কবরেজ বললে, এইখানে একটু দাঁড়া, ওষুধটা আমি নিয়ে আসি বাড়ীর ভিতর থেকে।

এই বলে সে মাঝের দরজাটা ঠেলে ভিতর দিকে ঢুকে পড়ল। কয়েক পা গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এসে বললে, আর হ্যাঁ—আমার এই আলমারিটিতে হাত দিয়ো না যেন, বুঝলে? তোমাদের আবার সব রকমই অভ্যাস আছে কিনা!

বাড়ীর ভিতর ঢুকল গিয়ে কবরেজ। মাণিকের মনটা হঠাৎ বিষিয়ে উঠল। কি সাংঘাতিক এই লোকগুলো! পদে পদে এরা বিনা কারণে যাকে-তাকে সন্দেহ করে যখন-তখন। এইজন্যই ত মাণিক দু'চক্ষে দেখতে পারে না নিমু কবরেজকে—লোকটা কি ইতর।

বাড়ীর মধ্যে গিন্নীর সঙ্গে কথা হচ্ছে নিমু কবরেজের, মাণিকের বাপের সম্বন্ধেই কথা হচ্ছে। স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছে মাণিক, কবরেজ-গিন্নী একটু সুর টেনে বলছেন, বল কি গো—বাঁচবে না।

কবরেজ জবাব দিলে, ও কি আর বাঁচে, বড় জোর দু'চার দিন।

মাণিকের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল, কবরেজ বলে কি, বাবা তার বাঁচবে না। নিশ্চয়ই বাঁচবে, কবরেজ হয়ত রোগই ধরতে পারে নি, কিম্বা হয়ত হিংসে করে বলছে সে এমন কথা।

মাণিকের বুকের ভিতরটা গুরগুর করতে লাগল কবরেজের কথা শুনে। কাগজের একটা পুরিয়া এনে মাণিকের হাতে দিলে কবরেজ, বললে—সকাল সন্ধ্যে দুটো করে বড়ি, তুলসী পাতার রস দিয়ে, বুঝলে? যাও এখন—দামটা যেন কাল সকালেই পাঠিয়ে দিতে বলো।

মাণিক তবু ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ওষুধের পুরিয়াটা কাপড়ের খুঁটে বেঁধে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকাল সে কবরেজের দিকে।

কবরেজ ভ্রূ কুঁচকে বললে, কি—এখনও দাঁড়িয়ে আছিস যে?

মাণিক একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, আপনি কি বলছিলেন বাড়ীর মধ্যে, বাবা নাকি বাঁচবে না?

কবরেজ একটু ইতস্ততঃ করে বললে, কে—কে বললে? বাঁচতে পারে বৈ কি—নিশ্চয়ই বাঁচতে পারে, তা নৈলে এত যত্ন করে ওষুধ দিচ্ছি কি জন্যে।

মাণিক একটু জোর দিয়ে বললে, তবে আপনি কেন বললেন এমন কথা। আপনি কি জানগুরু নাকি, হাত গুনে সব বলে দিতে পারেন?

কবরেজ এবার ভয়ানক চটে উঠল, গরম হয়ে বললে—মানে মানে এবার বিদেয় হও দেখি, জ্যাঠামি করবার আর জায়গা পাও নি!

মাণিক জোর গলায় বলে উঠল—ফের যদি কোন দিন আমার বাবার সম্বন্ধে আপনি ওরকম কথা বলেন, তা হলে কিন্তু ভাল হবে না।

কবরেজ চোখ পাকিয়ে বললে—কি করবি কি শুনি?

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল মাণিক—ঢিল মেরে দেব আপনার ওষুধের ওই আলমারিটি গুঁড়ো করে।

কবরেজ খাপ্পা হয়ে উঠল, বললে—কি—এত বড় কথা, এক চড়ে দাঁতগুলো ভেঙে দেব, জানিস। বেরো হারামজাদা এখান থেকে।

কবরেজ খানিক এগিয়ে গিয়ে মাণিককে একটা ধাক্কা দিলে। মাণিক আবার রুখে দাঁড়াল, বললে—খবরদার, গায়ে হাত দেবেন না।

নিমু কবরেজ থর থর করে কাঁপতে লাগল রাগে। ঘরের কোণ থেকে হাত দেড়েক একটা বাঁশের লাঠি তুলে নিয়ে মাণিককে সে তাড়া করে যাচ্ছিল, কবরেজ-গিন্নী এসে হঠাৎ বাধা দিলেন, বললেন—এ তুমি কি করছ বল ত!

নিমু কবরেজ দাঁত খিঁচিয়ে বললে—মুখের উপর কি রকম চোপা করছে দেখ না।

কবরেজ-গিন্নী মাণিককে মৃদু একটা ধমক দিয়ে বললেন—মাণিক!

মাণিক একটু শান্ত ভাবে বললে—দেখুন না—উনি বলেন বাবা নাকি বাঁচবে না, বাঁচা-মরার মালিক নাকি উনি!

কবরেজ মুখ খিঁচিয়ে তর্জ্জন করে বলে উঠল—পয়সা নেই, কড়ি নেই—মিনৃ পয়সায় ওষুধ দিচ্ছি, তার ওপর আবার তেজ দেখ! জুতিয়ে বেটার মুখ ভেঙে দেব!

কবরেজ-গিন্নী একটু উগ্র কণ্ঠে বললেন—তুমি থাম দেখি, সাধে কি আর লোকে বলে উনপঞ্চাশী!

কবরেজ রাগে গর গর করতে লাগল। মাণিক উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—ওষুধ নিতে আর আমি আসব না কবরেজ, কিন্তু ফের যদি কোন দিন আমার বাবার মরণ সম্বন্ধে কথা কয়েছ, তো তোমার টেকো মাথাটি গুলতি দিয়ে ফুটিয়ে দিয়ে যাব।

এই বলে হন্‌ হন্‌ করে বেরিয়ে গেল মাণিক। কবরেজ লাঠিখানা উচিয়ে ধরে ধাওয়া করলে পিছু পিছু, বললে—তবে রে—

কবরেজ-গিন্নী তাড়াতাড়ি ধরে ফেললেন কবরেজকে। নিমু কবরেজ রাগের মাথায় বোঁ করে ছুঁড়ে দিলে লাঠিটা মাণিকের দিকে লক্ষ্য করে।...

হরিমতির রান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। করালীর সর্ব্বাঙ্গে তেল মালিশ করে ভিজে গামছা দিয়ে গা-টা একবার ভাল করে মুছে দিলে হরিমতি। সরু একখানা চিরুণী দিয়ে তার উস্‌কো-খুস্‌কো চুলগুলো আঁচড়ে দিলে। দেবতার নির্ম্মাল্য করালীর মাথায় ঠেকিয়ে চরণামৃতের পাত্রটা তার মুখের সামনে তুলে ধরলে হরিমতি। করালী ঠোঁটদুটো একটু বিস্ফারিত করে নির্ব্বিকার ভাবে তাকাল একবার হরিমতির দিকে। হরিমতি মনে মনে ঠাকুরের নাম স্মরণ করে চরণামৃতটুকু ঢেলে দিলে তার মুখের মধ্যে।

খাবার ঠাঁই করে ধীরে ধীরে করালীকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে হরিমতি ছেঁড়া ক্যাম্বিশের একটা আসন পেতে। আহারে রুচি নাই করালীর, ক্ষুধা আছে—রুচিকর খাদ্যেরও একান্ত অভাব। টসটসে বিরি কলাইয়ের ঝোল, আর বুনো বেগুনের ঘ্যাঁট, এই দিয়ে কি রোজ রোজ খাওয়া পোষায়। মনে হয় যেন এক এক গ্রাসে গিলে ফেলি এক একটা কাঁড়ি, কিন্তু গলা দিয়ে গলতে চায় না। এই সব কি রুগীর খাদ্য, এই খেয়ে কি মানুষ বাঁচে!

ক্ষুধার মুখে কয়েকটা গ্রাস কোন রকমে উদরস্থ করে ভাতের থালাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল করালী। করুণ ভাবে তাকাল সে একবার হরিমতির দিকে, বললে—মাছওয়ালী কি আসে না আজকাল এদিক দিয়ে?

হরিমতি বললে—আসবে—মাছ পেলেই দিয়ে যাবে, বদে কেওটের মাকে আমি বলে রেখেছি। ডাল তরকারি আনব কিছু?

করালী কোন জবাব দিলে না, অবান্তর—অনাবশ্যক। মাছওয়ালী যে কেন আসে না করালী তা জানে, পয়সা ফেললে মাছের অভাব কি, গোলমাল ত ওখানেই। কিন্তু তা বলে কি শেষ পর্য্যন্ত না খেয়ে মরে যাবে করালী! যথেষ্ট মাছ রয়েছে গাঁয়ের পুকুরগুলোতে, জলে মাছে প্রায় সমান সমান, পোকা পড়ছে বেটাদের মাছে, অথচ সময় বুঝে একটা কেউ ঠেকায় না আজ করালী মুমূর্ষুকে। দুনিয়াটাই স্বার্থপর, কে কার কথা ভাবে—কে কার দিকে চায়!

কবরেজ-বাড়ী থেকে ওষুধ নিয়ে বাড়ী ফিরল মাণিক। কাপড়ের খুঁট থেকে পুরিয়া ক'টা বের করে হরিমতির হাতে দিলে। হরিমতি একটু আশ্বস্ত হ'ল, ওষুধ তা হলে দিয়েছে কবরেজ।

মাণিকের মনটা বড় মুষড়ে আছে। একটু অনুযোগের সুরে বলে উঠল মাণিক আর যেন তাকে কোন দিন নিমু কবরেজের বাড়ী ওষুধ আনতে না পাঠানো হয়। নিমু কবরেজ লোকটা মোটে ভাল নয়, মাণিক আর ওর দোর মাড়াবে না।

করালী খেতে খেতেই একটা ডাক দিলে, মাণিক!

মাণিক ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তার সামনে। করালী ভাঙা গলায় বললে—নায়েকদের গড়ে থেকে গোটাকয়েক মাছ ধরে আনতে পারিস, বাবা! ছিপ কাঁটা ঠিক আছে ত?

মাণিক সমস্যায় পড়ল। এই সেদিন সে একবার পরের পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে তাড়া খেয়ে এসেছে, আজ আবার ছিপ নিয়ে বেরুলে লোকে তাকে হ্যাঁচড় বলবে যে—মাণিক একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল।

করালী একটু মিনতির সুরে বললে, যা বাবা—যা, দেখ্ যদি পাস গোটাকতক।

করালীর এ আদেশ নয়—অনুরোধ, নিতান্তই অনুরোধ; এর বেশী কিছু নয়।

মাণিকের মনটা হঠাৎ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। ভাববার আর অবকাশ নাই তার, ধীরে ধীরে বেরুল সে পোনা মাছের ছিপগাছটা হাতে নিয়ে।

হরিমতি পিছন থেকে ডাক দিয়ে বললে, দুটো খেয়ে গেলি না কেন বাবা, ভাত নিয়ে আমি বসে থাকব কতক্ষণ!

মাণিক আর ফিরল না, যেতে যেতেই বলে উঠল, ফিরে এসে খাব।

করালী একটু খুশীই হ'ল, মাছধরার তাকবতর ঠিক জানা আছে মাণিকের, খালি হাতে সে ফিরবে না কিছুতেই।

খেয়ে উঠে আঁচাল করালী। হরিমতি আবার ধরাধরি করে বিছানার উপর নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে তাকে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা পান চিবুতে লাগল করালী। কেবলই তার মনে হতে লাগল কিছুই যেন আজ খাওয়া হ'ল না। চাদর একখানা মুড়ি দিয়ে করালী আবার পাশ ফিরে শুল।

পান চিবুতে চিবুতে করালী হঠাৎ ঘেমে উঠল কেন? বুকটার মধ্যে কেমন যেন আনচান করছে, করালী ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, পিতলের কাঁসিটার সে কাঠি দিয়ে আওয়াজ করে দিলে একবার—ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ—।

হরিমতি হাতের কাজ ফেলে ছুটে এল তাড়াতাড়ি। করালী একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। তালপাতার একটা পাখা নিয়ে হরিমতি বাতাস করতে লাগল। করালী হরিমতির ডান হাতটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললে,—ডলে দাও—ডলে দাও এই জায়গাটা, বুকটা যেন চেপে ধরেছে।

ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল হরিমতি। করালী মাথাটা কাত করে বিছানার পাশের দিকে মুখটা একটু বাড়াল, সে থক্ থক্ করে কাশল কিছুক্ষণ। রক্তটা আজ আবার উঠছে নাকি? আবার সেই উপসর্গ। কিছুক্ষণের মধ্যেই নেতিয়ে পড়ল করালী। হরিমতি তার মুখখানা বেশ পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে দিয়ে আঁচলে মুছে দিলে। তার পায়ের উপর লেপখানা টেনে দিতেই ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল করালী,—থাক্—থাক্—বড় গরম, একটু হাওয়া করে দাও।

হরিমতি খানিক পাখা করে দিতেই কতকটা যেন শান্ত হ'ল করালী। হরিমতি একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। কানের কাছে তার মুখ রেখে জিজ্ঞাসা করলে, কেমন লাগছে এখন?

করালী ক্ষীণকণ্ঠে বললে,—ভাল।

হরিমতি বললে,—ওষুধ দিই?

করালী চোখ বুজেই ঘাড় নাড়ল, বললে,—না—না—থাক, ভাল আছি আমি।—

হরিমতি করালীর মাথার কাছে ধীরে ধীরে পাখা করতে লাগল। তার শ্রান্ত চোখ দুটো যেন বুজে এল ঘুমের ঘোরে, নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল করালী।

হরিমতি উঠে গিয়ে রান্নাঘরটা বন্ধ করে দিয়ে এল। মানুকে যে কতক্ষণে ফিরবে!

পাড়ার রসিকদাস 'জয় রাধে কৃষ্ণ' বলে দাঁড়াল এসে হরিমতির সামনে। হরিমতি রসিককে অভ্যর্থনা করে বললে,—আয় বাবা—আয়, আজ ক'দিন থেকে আসিস নি যে?

রসিক বললে,—গাঁয়ে ক'দিন ছিলুম না খুড়ীমা-ঠাকরুণ, বাইরে গিয়েছিলুম। খুড়ো ঠাকুর এখন আছেন কেমন?

হরিমতি চালার উপর রসিককে একটা আসন এগিয়ে দিয়ে বললে, বস্ বাবা বস্, আছেন ভালই।

রসিক চালার ওপর ধীরে ধীরে বসল একধারে। রসিক দাস—লোকটি বড় ভাল, গান গেয়ে ভিক্ষে করে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়, সাতে পাঁচে থাকে না; সাধ্য থাকলে প্রাণ দিয়েও পরের উপকার করতে চায় রসিক। করালীর সঙ্গে রসিকের মেলামেশা বহু দিনের, করালীকে সে ভক্তি করে গুরুর মত। আর্থিক সাহায্য করা রসিকের সামর্থ্যের বাইরে, কিন্তু মাঝে মাঝে এসে এঁদের খোঁজ-খবরটা অন্ততঃ নিয়ে যায়। করালীর এই দুর্দিনে পাড়া-প্রতিবেশী ভুলেও কেউ ফিরে তাকায় না, সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে করালীর বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় না কেউ। রসিক কিন্তু আসে, সময় পেলেই খোঁজ-খবরটা নেয় এসে, খুড়ীঠাকরুণের সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কয়ে যায়।

গামছার খুঁট থেকে গোটাকয়েক বেগুন, গোটা দুই করেত বেল, আর গোটা চারেক কাগজী নেবু বের করে হরিমতির সামনে নামিয়ে দিলে রসিক, বললে, এ ক'টা তুলে রাখ ত মা-ঠাকরুণ।

রসিকের এই শ্রদ্ধার দান—ভালবাসার দান—মাঝে মাঝে এ নিতে হয় হরিমতিকে, রসিক তাদের অন্তরঙ্গ আপনজনের মতই। হরিমতি তরকারির চুপড়ির মধ্যে ওগুলো রেখে দিয়ে এল রান্নাঘরে। রসিকের সামনে এসে আবার বসল হরিমতি, বললে, এলি ভালই হ'ল, ওঁর হাতটা একবার দেখে যা দেখি বাবা, আমি ভাবছিলাম।

রসিক একটু হাত দেখতেও জানে, পাড়ায় ঘরে ঘরে মাঝে মাঝে হাত দেখতে ওর ডাক পড়ে। করালীর নাড়ী টিপে চুপচাপ ঠায় খানিকক্ষণ বসে রইল রসিক, তারপর হরিমতির দিকে চেয়ে বললে, নাড়ী ত বেশ ভালই দেখছি খুড়ীমা-ঠাকরুণ, কোন বিঘ্নি্ নাই।

হরিমতি বললে, ভাল বুঝছিস ?

রসিক নিজের মনেই যেন একটুখানি কি ভেবে নিলে, বললে, ভাল বুঝছি বৈ কি, ওসব তুমি ভেবো না খুড়ীমা-ঠাকরুণ, কিছু ভেবো না।

রসিক ঘুমন্ত করালীর দিকে আর একটি বার তাকাল, আপাদমস্তক তার নিরীক্ষণ করে নিলে একবার। ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস রসিকের অজ্ঞাতেই যেন বেরিয়ে এল। রসিক হরিমতির দিকে চেয়ে বলে উঠল, এক কাজ করলে হয় না খুড়ীমা-ঠাকরুণ, খুড়োঠাকুরের অন্ন-প্রায়শ্চিত্তিটা এর মধ্যে একদিন সেরে ফেললে হ'ত না।

হরিমতিও ক'দিন থেকে ভাবছে অন্নপ্রায়শ্চিত্তের কথা। কিন্তু খরচার অভাবে এ কাজে সে এগোতে পারে নি। রসিকের কথায় হরিমতি আরও একটু সজাগ হয়ে উঠল, বললে, রসিক, একটা কাজ করবি বাবা, গোটা কয়েক টাকার যোগাড় করে দিতে পারিস ?

নিঃসম্বল রসিক একটু বিস্মিত ভাবে তাকাল একবার হরিমতির দিকে, বললে, টাকা—কত টাকা বল দেখি ?

হরিমতি বললে, টাকা দশেক, বক্না বাছুরটা বিক্রী করলে পাওয়া যাবে না গোটা দশেক টাকা ?

রসিক মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, তা হয়ত পাওয়া যাবে, কিন্তু মাণিক যে ভয়ানক রাগ করবে খুড়ীমা-ঠাকরুণ !

হরিমতি বললে, তা হোক, ওকে আমি বুঝিয়ে দেব, পাইকারদি'কে তুই খবর দিয়ে আয় দেখি। ওঁর এ কাজটুকু আমি বাকি রাখব না রসিক, অন্নপ্রায়শ্চিত্ত একটা করতেই হবে।

রসিকও সায় দিয়ে বললে, করা খুবই দরকার।

মাণিক খুব পাকা জেঁতেল। ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে সে ছোটবেলা থেকেই সিদ্ধহস্ত। বাপের কাছ থেকে মাছ-ধরা বিদ্যেটা উত্তরাধিকারসূত্রে বেশ ভাল রকমই আয়ত্ত করেছে মাণিক। পুঁটি মাছের টোপ দিয়ে ছোট-খাটো পোনা মাছ সে অনায়াসে খেলিয়ে তুলতে পারে। মাণিকের সঙ্গী-সাথীরা পাল্লা দিয়ে মাছ ধরায় সহজে কেউ পেরে ওঠে না তার সঙ্গে, তাকতুক তার জানা আছে খুব ভাল। কিন্তু পরের পুকুরে চুরি করে মাছ ধরতে মাণিকের প্রবৃত্তি হয় না, সামনে পেলে ওরা অপমান করে, কেওট বেটারা দেখতে পেলে আবার ডাঁড়ি কেড়ে নেয়। মাণিক তাই কিছু দিন থেকে মাছ ধরা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। আজ কিন্তু একবার ছিপ হাতে করে আসতেই হ'ল মাণিককে, গোটাকয়েক মাছ আজ তাকে ধরতেই হবে।

পাড়ার লাগাও উদয়গড়ে বলে একটা ছোট্ট পুকুরে গিয়ে চার করেছে মাণিক। পুকুরের চারদিকে বাসক আর কালকাসিন্দার ঝোপ। পূব পাড়ে একটা ঝোপের মধ্যে সঙ্গী কানিবুড়োকে পাহারা দেবার জন্ত বসিয়ে রেখেছে মাণিক, কেওট এলে দূর থেকে ঠায় দেখতে পাওয়া যাবে। একান্ত যদি এসেও পড়ে—একটুখানি শুধু সঙ্কেতের অপেক্ষা, তাড়াতাড়ি ছিপ গুটিয়ে পশ্চিম পাড়ের আগাছার জঙ্গল দিয়ে সরে পড়তে বিশেষ সময় লাগবে না। অন্ধিসন্ধি সব ঠিক করা আছে মাণিকের, পূব পাড়ে বসে কানিবুড়ো ঠায় পাহারা দিচ্ছে ; চিন্তার কোন কারণ নাই। কেওটরা এসে পড়লে কিন্তু ভয়ানক অসুবিধার কথা, রীতিমত হুজ্জৎ করে বেটারা ; বিশেষ ক'রে বদে কেওট, পুকুরে কাউকে ছিপ ফেলতে দেখলে গাঁয়ের সীমানা পর্য্যন্ত পিছু পিছু সে তাড়া করে যায়, ধরতে পারলে অপমান করে ভয়ানক। ওই বেটাকেই যা একটু ভয়, সেইজন্তই ত বাসকঝোপে কানিবুড়োকে বসিয়ে রেখেছে মাণিক।

চারে প্রচুর মাছ জমে গেছে। নেয়তার টোপ দিয়ে ফেলবামাত্র চোঁ চোঁ করে ফাৎনা ডোবাতে আরম্ভ করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই টপাটপ গোটা পাঁচ-ছয় হালি পোনা মেরে ফেললে মাণিক, প্রত্যেকটাই রুই মাছের বাচ্চা, এক একটার ওজন প্রায় আধপোয়া তিন ছটাকের কাছাকাছি। এভাবে হালি পোনা মারায় যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ—তা পল্লীগ্রামের জেঁতেল ছেলেদের খুব ভাল রকমই জানা আছে। এ এক নেশা, মৎস্তশিকারের আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল মাণিক। তার বড় ভুল হয়ে গেছে, আসবার সময় একটা গামছা আনলে ভাল হ'ত, মাছগুলো গামছায় বেঁধে বাসক-ঝোপে লুকিয়ে ফেলতে পারলে কেউ টের পেত না। বুদ্ধি একটা ঠাউরে নিলে মাণিক—মাছ-গুলোকে জলের ধারে পাঁকের মধ্যে পুঁতে ফেললে এক একটা করে, যাবার সময় উঠিয়ে নিলেই চলবে।

আর একটা টোপ গেঁথে ফাৎনার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মাণিক, আরও দু' একটা মেরে নিয়ে তাড়াতাড়ি এবার সরে পড়তে হবে। কানিবুড়ো হঠাৎ দূর থেকে চাপা গলায় একটা ডাক দিলে—মাণিক !

মাণিকের যে এখন অবসর নাই, অনেক মাছ জমে গেছে

ঘাটে। টক্‌টক্‌ করে আবার কাৎনা নড়ে উঠল, চোঁ করে হঠাৎ ডুবে গেল কাৎনাটা; ঝ্যাচ্‌ করে মারলে এক খাই, চড়চড় করে মাছটাকে টেনে তুললে; পোয়াখানেক এক কালবাউশ। মাছটাকে দেখে মাণিকের মুখে চোখে ফুটে উঠল আনন্দের দীপ্তি, খুশির আমেজে সে মশগুল হয়ে উঠল। কানিবুড়ো উচ্চকণ্ঠে আর একটা ডাক দিলে—মাণিক!

মাছটার মুখ থেকে মাণিক বঁড়শী ছাড়াচ্ছে। মাটিতে পড়ে ছটফট করছে মাছটা। হঠাৎ পাহাড়ের উপর পিছন দিক থেকে কার গলার আওয়াজ—কে ডাঁড়ি ফেলছ হে?

মাণিক চমকে উঠল, পিছন ফিরে চেয়ে দেখে জাল কাঁধে পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে বদে কেওট স্বয়ং, কোমরের পাশ দিয়ে তার মস্তবড় একটা খারুই ঝুলছে।

বদে কেওট এগিয়ে এসে মাণিকের ডান হাতটা চেপে ধরলে, বললে—কার হুকুমে মাছ ধরতে এসেছিস শুনি?

মাণিক কারো হুকুম নেয় নি, হুকুম এমনিতে পাওয়াও যায় না, কিন্তু মাছ যে তার চাই। মাণিক কোন জবাব দিলে না, ক্যাল ক্যাল করে শুধু চেয়ে রইল।

বদে কেওট মাণিকের হাত থেকে জ্যান্ত মাছটা কেড়ে নিয়ে টান মেরে ফেলে দিলে পুকুরের জলে। জলচারী কালবাউশের পো মহানন্দে পাখনা নাড়তে নাড়তে এক লহমায় মিলিয়ে গেল আবার জলের মধ্যে। মাণিকের বুকের ভিতরটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল। বদে কেওট দাঁত খিঁচিয়ে বললে, ঘাড়টি মুচড়ে যদি পাঁকে পুঁতে দি'—কোন্ বাপ তোর রক্ষে করবে শুনি! কতগুলো মাছ মারলি?

ভয়ে মাণিকের মুখ শুকিয়ে গেছে, রাগে তার শরীরটা রি রি করতে লাগল।

বদে কেওট, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাইতে লাগল, হঠাৎ সে আবিষ্কার করে ফেললে—জলের ধারে খানিকটা ভিজে মাটি উঁচু হয়ে রয়েছে, উপরে কিছু পাঁক লেপা। মাণিকের রাখা মাছগুলো মাটি খুঁড়ে বের করে ফেললে বদে কেওট—গোটা কয়েক রুই মাছের বাচ্চা। কপালের ওপর চোখ তুলে বলে উঠল বদে—এই সব হালি পোনা মারতে কে হুকুম দিয়েছে শুনি? এ কি তোর বাবার পুকুর?

মাণিক হঠাৎ ফেটে পড়ল রাগে, তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলে উঠল, খবরদার বলছি, বাপ তুলে কথা বলিস না।

বদে কেওট মাছগুলো ধুয়ে খারুয়ের মধ্যে ভরে নিলে। মাণিকের দিকে সে দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া করে এল, বললে—চুরি করে মাছ ধরতে লজ্জা করে না, বেহায়া বামুন কোথাকার!

এই বলে সে মাণিকের ছিপটা হঠাৎ চেপে ধরলে, বললে, ছাড়্ ছাড়—ছেড়ে দে ডাঁড়ি।

মাণিকের আত্মসম্মানে প্রচণ্ড ঘা পড়ল, তার হাত থেকে ছিপ কেড়ে নিয়ে যাবে বদে কেওট—অসহ্য।

ছিপটা মাণিক দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে বলে উঠল—খবরদার।

বদে কেওট চোখ পাকিয়ে বললে—মেরে এখুনি লুৎ করে দেব, ভাল চাস ত ছেড়ে দে ডাঁড়ি।

মাণিকের হাত থেকে টান মেরে ছিপটা কেড়ে নিলে বদে কেওট। মাণিক তার পিছু পিছু গিয়ে দাঁড়াল পাহাড়ের উপর। বদে কেওট আর ফিরেও তাকাল না, পুকুরপাড় থেকে নেমে তিন্‌গাঁয়ের শুঁড়ি পথ ধরে সে জাল কাঁধে হন্ হন্ করে এগিয়ে যেতে লাগল, হাতে তার মাণিকের ছিপগাছটা।

মাণিক পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকেই ক্যাল ক্যাল করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল বদে কেওটের দিকে। মাছগুলো বেটা নিয়ে গেল খারুয়ে ভরে, হয়ত কোথাও বেচে দেবে, মাণিকের এত কষ্ট করে ধরা মাছ, খদ্দের পেলে হয়ত বিক্রী করেই ফেলবে। কিন্তু ছিপটা—ছিপটা যে মাণিকের নিজের, ছিপটা সুদ্ধ বেটা কেড়ে নিয়ে গেল যে। এ দুঃখ যে সে আর সইতে পারছে না।

পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিন্‌গাঁ পানে এক-দৃষ্টে চেয়ে রইল মাণিক, ভাবতে ভাবতে মনটা তার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, ভয়ানক কান্না পাচ্ছে মাণিকের।

পুবপাড়ের ঝোপ-ঝাপগুলো লক্ষ্য করে এদিক ওদিক চাইতে লাগল মাণিক, একটা ডাক দিলে—কানিবুড়ো!

কানিবুড়োর সাড়াশব্দ নাই, কোন্ সময় সে সরে পড়েছে, হয়ত বদে কেওটকে দেখেই।

ছিপটা কিন্তু মাণিকের কেড়ে নিয়ে গেল। ওপথ দিয়ে কোথায় যাচ্ছে বদে কেওট? হয়ত তিন্ গাঁয়ে মাছ ধরবার ডাক পড়েছে, হয়ত সালকোর মাজিদের পুকুরে মাছ ধরতে যাচ্ছে জাল কাঁধে করে। কিন্তু ছিপটা ত এমন ভাবে ছেড়ে দেওয়া ভাল হ'ল না, মাণিক গিয়ে ছিপটা ফিরিয়ে আনবে নাকি? ফিরিয়ে আনাই দরকার, অমন সুন্দর ছিপগাছটা জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে বেটা কেওট! মাণিকের পক্ষে এ যে ভয়ানক অপমান। ছিপটা তাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে, যেমন করে হোক।

মাণিক পাহাড় থেকে নেমে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করলে তিন্ গাঁয়ের সেই শুঁড়ি পথটা ধরে। বদে কেওট বহু-দূর এগিয়ে পড়েছে, পিছন পিছন ছুটতে লাগল মাণিক; যত দূরেই হোক ধরতে হবে ওকে, ছিপ না নিয়ে কিছুতেই মাণিক বাড়ী ফিরবে না।

শীতকালের বেলা পড়ে আসছে। মাণিকের কোন দিকে

ভ্রূক্ষেপ নাই, সে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলল—ছিপ তার চাই-ই।

হাত চারেক একটা বাঁশের কঞ্চি, কয়েক গজ সুতো, আর গেঁয়ো কামারের তৈরি একটা এক পয়সা দামের পোনা মাছের কাঁটা, সবসুদ্ধ ক'টা পয়সাই বা এর দাম! মাণিকের কাছে কিন্তু মূল্য এর বড় কম নয়, এ যে তার সখের জিনিস। তার কাছ থেকে ওটা কেড়ে নেওয়া, আর তার হাতের একটা আঙুল কেটে নেওয়া—এ যে সমান কথা, এ দুঃখ তার বুঝবে না কেউ। ভিন্‌গাঁ পানে দৃষ্টি রেখে দ্রুতপদে এগিয়ে চলল মাণিক।...

ক্রোশ আড়াই পথ ভেঙে সালকো গ্রামের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে মাণিক। বদে কেওটকে এর মধ্যে সে ধরতে পারে নি, মাণিককে তাই এগিয়ে আসতে হ'ল বরাবর সালকো পর্য্যন্তই। শীতকালের বেলা, দেখতে দেখতে সূর্য্য ডুবে গেল, মাণিক একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল।

সালকো ঢুকবার মুখে নিজ গাঁয়ের প্রতিবেশী রঞ্জন মোড়লের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল মাণিকের। মোড়ল তাকে দেখেই বলে উঠল—ওই মাণিক যে রে, পরব দেখতে যাবি নাকি সালকো?

অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে কয়েকদিন ধরে সালকো গ্রামে বেশ একটু ধুমধাম হয়। কাল থেকে এখানে যাত্রাগান আরম্ভ হয়েছে, মেলাও বসেছে একটা ছোটখাটো; খবরটা আগেই শোনা আছে মাণিকের। কিন্তু সেজন্য ত মাণিক আসে নি এখানে, রঞ্জন মোড়লের কথার কোন জবাব না দিয়েই বললে—'রঞ্জু কাকা, মায়ের সঙ্গে দেখা হলে একটু বলে দিও যেন—আজ আর আমি বাড়ী ফিরতে পারব না।

রঞ্জন মোড়ল ঘাড় নেড়ে বললে—আচ্ছা।

পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল মাণিক। সালকোর অন্নপূর্ণাতলায় সন্ধ্যারতির বাজনা বেজে উঠল, ঢাক ঢোল আর কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজে মুখর হয়ে উঠল ছোট্ট গ্রামখানা। মাণিক গিয়ে চুপচাপ ঢুকে পড়ল গাঁয়ের মধ্যে, চারদিকে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে গাঁয়ের ভিতরে বাজার বসেছে। বারোয়ারিতলা গিস্‌গিস্ করছে লোকের ভিড়ে। খানিকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে বাজার দেখে বেড়াল মাণিক, কত রকমারি লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল তার, কিন্তু কৈ—বদে কেওট ত একটি বারও মাণিকের চোখে পড়ল না। আছে ঠিক সে এই গাঁয়েই, সকাল না হলে আর হয়ত তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, রাত্রিটা আজ এইখানেই কাটাতে হবে মাণিককে. —বাড়ী ফিরবার যে আর কোন উপায় নাই।

মেলার এক পাশে রাস্তার ধারে একটা চৌকির ওপর হতাশ ভাবে বসে পড়ল মাণিক। এতখানা পথ হেঁটে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ক্ষুধাও পেয়েছে বেজায়, পয়সা থাকলে বাজার থেকে কিছু খেয়ে নিতে পারত, কিন্তু পয়সা ত নাই। একটা রাত কোন রকমে কাটিয়ে দিতে পারবে মাণিক, না খেয়েও কাটানো যাবে। কিন্তু বাড়ীর জন্ত মাণিকের বড় মন কেমন করছে, কোন দিনই তার বাড়ী ছেড়ে বাইরে থাকা অভ্যাস নাই। মা হয়ত ভেবে সারা হবে, কাজটা কি ভাল করল মাণিক?

ভাবতে ভাবতে মাণিকের মনটা ভারি চঞ্চল হয়ে উঠল। সঙ্গী পেলে এই মুহূর্তে মাণিক বাড়ী ফিরে যেত, কিন্তু উপায় নাই, রাত হয়ে গেছে—এ সময় আর কোন উপায় নাই। মা কি এতক্ষণ পাড়ায় খোঁজ করে বেড়াচ্ছে মাণিকের? মাণিককে ত সে খুঁজে পাবে না, মাণিক যে এখানে। কে জানে রঞ্জন মোড়ল গিয়ে খবরটা তাকে দিলে কি না! মা যদি মাণিককে দেখতে না পেয়ে কাঁদে! এতক্ষণ হয়ত কাঁদছে—নিশ্চয়ই কাঁদছে। এমন কাজ কেন করল মাণিক—ছিঃ!

অন্ধকারে মুখ গুঁজে সেই খালি চৌকিটার উপর চুপচাপ একেবারে শুয়ে পড়ল মাণিক। বাড়ীর কথা—বাপ-মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে মাণিকের হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল, চাপা গলায় নিজের মনেই সে বলে উঠল একবার—মা—মাগো—মা!

বাড়ীর কথা কোনমতেই ভুলতে পারছে না মাণিক। মেলাখেলার হৈ-হল্লোড় উৎসব আনন্দ কিছুই তার ভাল লাগছে না। সেই চৌকির উপর মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ পড়েই রইল মাণিক। পান-বিড়ির এক দোকানদার ডালায় করে কতকগুলি জিনিসপত্র সাজিয়ে চৌকির উপর নামাল এসে। মাণিককে দেখে লোকটা তাড়া দিয়ে বললে—কে এইখানে ঘুম মারছ হে, ওঠ ওঠ—ওঠে যাই ইখান থেকে, চৌকির ওপর দোকান পাতব।

মাণিক তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে মুছতে উঠে পড়ল। মেলার মধ্যে গিয়ে লোকের ভিড়ে সে মিশে গেল আবার। ভয়ানক শীত করছে মাণিকের, অঘ্রাণ মাসের রাত, মাণিকের পরনে শুধু একটা হাফপ্যান্ট আর গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি; এমন জানলে মাণিক পুরনো কোটটা আজ গায়ে দিয়ে আসত। ঝোঁকের মাথায় কাজটা কিন্তু সে ভাল করে নি, এমন করে না আসাই তার উচিত ছিল।

প্রহরখানেক রাত্রে যাত্রা আরম্ভ হ'ল অন্নপূর্ণাতলায়। কালীয়দমন যাত্রা, প্রহ্লাদ সিং-এর নামকরা দল; তিন গাঁ থেকে যাত্রা শুনতে লোক জমেছে প্রচুর। মাণিকও একেবারে ঠেলাঠেলি করে বসে পড়ল। আসর সাজান হয়েছে খুব চমৎকার, আটচালার চারদিকে চার চারটে ডে-লাইট জেলে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে; লোকজনের সমারোহ

আর যাত্রাপার্টির বাজনার ঝমকে গম্ গম্ করছে অন্নপূর্ণাতলা। এই সমস্ত দেখে শুনে মাণিকের মনটা একটু হালকা হয়ে এল, আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল মাণিক; চিন্তার কোন কারণ নাই —সকালবেলা বাড়ী ফিরলেই চলবে।

যাত্রা শুনতে শুনতে মশ্‌গুল হয়ে উঠল মাণিক। কৃষ্ণযাত্রা সে এর আগে কখনও শোনে নি, এই প্রথম। রাধা আর কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করছে দুটি কিশোর-বয়স্ক বালক। তাদের সুললিত কণ্ঠের একাবলী গান, উচ্ছ্বসিত মান-অভিমান, বৃন্দাদূতীর অপূর্ব্ব দূতীয়ালি—শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গল আদি রাখাল বালকদের হেলেবাড়ি হাতে নৃত্য,—এ সমস্তই খুব ভাল লাগছে মাণিককে। কালীয়দমন যাত্রা যে এত সুন্দর, মাণিকের তা জানা ছিল না। কি সুন্দর রাধা আর কেষ্ট সেজেছে ওই ছেলে দুটো, কি সুন্দর ওদের ভাবভঙ্গী, কি চমৎকার গলা; বৃন্দাদূতীর গানে আসরসুদ্ধ একেবারে মাত হয়ে গেছে। মাণিক অবাক বিস্ময়ে শুনে যাচ্ছে পালার গোড়া থেকেই। মড়াচূড়া পরে বনমালা গলায় দুলিয়ে বাঁশী হাতে যে ছেলেটা কেষ্ট সেজেছে বয়স ত তার এমন কিছু বেশী নয়; মাণিকের চেয়ে হয়ত কিছু বড় হবে। ছেলেটাকে মানিয়েছে খুব চমৎকার। যাত্রার দলে একটা চাকরি যোগাড় করে নেবে নাকি মাণিক! পারবে না সে কেষ্ট সাজতে? খুব পারবে, ইচ্ছা করলে মাণিক নিশ্চয়ই পারে। সে যদি কেষ্ট সেজে ওই ভাবে একবার আসরে দাঁড়ায়—সে কি সম্ভব, মাণিকের পক্ষে এ যে আশাতীত সৌভাগ্য।

কল্পনার বিচিত্র বর্ণে মাণিকের মনটা রঙিন হয়ে উঠল। মাণিক যেন স্বপ্ন দেখছে জেগে জেগে।

রাধিকার উন্মাদিনী বেশ। 'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' বলে ছাপুসনয়নে রোদন করছে রাধা, বৃন্দাদূতী তাকে গানের ছলে সান্ত্বনা দিচ্ছে।...

প্রভাসতীর্থে যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। নন্দ মহারাজ কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছেন ছেলের অদর্শনে। রাণী যশোমতী যজ্ঞশালার দ্বারপ্রান্তে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনপ্রার্থিনী। দ্বারী তাকে কিছুতেই দ্বার ছেড়ে দেবে না—আলুলায়িত-কেশা মলিনবসনা অর্দ্ধোন্মাদিনী এক ভিখারিণী এসে বলে কিনা সে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মা! প্রকাণ্ড এক ভোজপুরী দ্বাররক্ষক, লাঠিহাতে নির্ম্মমভাবে যশোদাকে তাড়না করছে মুখ ভেংচে তাকে বিদ্রূপ করছে। দ্বারীর আধা খোট্টাই কথাবার্ত্তা আর উৎকট ভাবভঙ্গি দেখে আসরসুদ্ধ লোক হেসে আকুল। কিন্তু মাণিকের ত কৈ হাসি পাচ্ছে না, লোকটা যে যশোদার অপমান করছে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে কোন মতেই যেতে দিচ্ছে না তাকে। যশোমতী দ্বারীর পায়ে ধরে সাধতে লাগল, শুধু একটি বার—একটি বার সে কৃষ্ণচন্দ্রের চাঁদমুখখানি দেখে আসবে, একটি বার তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে উত্তপ্ত বুকখানি তার একটুখানি জুড়িয়ে নেবে। দ্বারী কিন্তু নির্ব্বিকার, পাষাণ প্রাণ তার গলল না কোন মতেই; যশোদাকে একটা ধাক্কা দিয়ে দ্বিগুণতর পরুষকণ্ঠে সে বলে উঠল, ভাগো—ভাগো—নিকালো হিঁয়াসে।

সন্তানবিচ্ছেদকাতরা রাণী যশোমতী অঝোর নয়নে কেঁদে উঠল, যজ্ঞশালার দ্বারপ্রান্ত থেকেই আকুল কণ্ঠে সে ডাকতে লাগল তার প্রাণের দুলালকে—হা কৃষ্ণ—হা প্রাণধন—ওরে আমার সাগরছেঁচা মাণিক, কৈ—কৈ বাপ—কোথায় তুই?

মাণিকের হৃদয়ের তন্ত্রীতে কে যেন ঘা দিয়ে উঠল। যশোদার মূর্ত্তি ধরে আসরে দাঁড়িয়ে কে ওই পাগলিনীপ্রায় নারী! ও যে মাণিকের মা, মাণিককে যে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে; মাণিকের কাছে সে যেতে পারছে না, তাই দূর থেকে কাতর-কণ্ঠে ডাক দিচ্ছে—মাণিক—মাণিক!

নির্ম্মম দ্বাররক্ষক তবু তাকে দ্বার ছেড়ে দিল না, যশোদা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল সে যজ্ঞশালার দ্বারপ্রান্তে।

ফুঁপিয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠল মাণিক, যশোমতীর এ লাঞ্ছনা যে অসহ্য। মায়ের কথা স্মরণ করে নিজের মনেই হঠাৎ চীৎকার করে উঠল মাণিক,—মা—মা—গো!

যশোদার করুণ রসের অভিনয় ছোটবড় সকলকেই মুগ্ধ করেছে, মাণিক কিন্তু একেবারে উদ্বেল হয়ে উঠল। পাশ থেকে একজন বয়োবৃদ্ধ শ্রোতা মাণিকের দিকে চেয়ে সস্নেহে বললে, কি হ'ল কি খোকা, অমন করে কাঁদছ কেন?

মাণিক বিক্ষুব্ধভাবে উঠে দাঁড়াল, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল সে দ্বারীর দিকে চেয়ে, ওকে তোমরা বের করে দাও এখান থেকে, আসর থেকে ওকে দূর করে দাও।

বৃদ্ধলোকটি মাণিকের পিঠ চাপড়ে বললে, বসো বাবা বসো, ও আপনিই চলে যাবে এখন।

অভিনয় যে কতখানি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে মাণিকের এই স্বতস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাসেই তার নিদর্শন। আসর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারী মাণিকের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে একটু আদর করে গেল। মাণিকের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে সে বলে উঠল, বাহবা রে বুতরু, জিতা রহো—জিতা রহো বাচ্চা।

পরবর্ত্তী দৃশ্যে জটিলা বুড়ীর ব্যঙ্গাত্মক কথাবার্ত্তা, আর ননদিনী কুটিলার ভাবভঙ্গী দেখে শুনে অবাক হয়ে গেল মাণিক। কুটিলাকে লক্ষ্য করে বৃন্দাদূতী গান ধরেছে—

দারুণ ননদিনী
তুই যে লো পরম সয়ানী।

দারুণ ননদিনী।
ছাড়ালে ছাড়ে না লো শেয়াকুলের কাঁটা লো
রজপুতের লেঠা—
দারুণ ননদিনী।

গান শুনে মাণিকের মনটা আবার হালকা হয়ে গেল। এতক্ষণে সে বুঝতে পারছে এ সব কিছু সত্যি নয়—যাত্রার অভিনয়। আসরে বসে মাণিক যাত্রা শুনছে। তবে মনের ভুলে হঠাৎ চীৎকার করে উঠেছিল কেন মাণিক! কোথায় যেন তার ভুল হয়ে গেছে, হাঁ—ভুলই ত, সে হয়ত বুঝতে কোথায় ভুল করেছে।

যাত্রার শেষের দিকে চোগাচাপকান-পরা জুড়ির গানের রাগরাগিণী শুনতে শুনতে ঢুলতে লাগল মাণিক, ভয়ানক তার ঘুম পাচ্ছে। তার আশে-পাশে কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলে এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে শতরঞ্চির উপর। ঢুলতে ঢুলতে মাণিকও হঠাৎ গড়িয়ে পড়ল, গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল।

কখন যে যাত্রা ভেঙেছে কিছুমাত্র আর মনে নাই মাণিকের। যখন তার ঘুম ভাঙল—চারদিক তখন ফরসা হয়ে গেছে। লোকজন সব বাড়ী চলে গেছে, যাত্রা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক ফাঁকা।

মাণিক তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। সামনের পুকুর থেকে মুখ-হাত ধুয়ে এসে মেলার একটা চায়ের দোকানে উনানের পাশে জড়সড় হয়ে বসে পড়ল মাণিক। আগুনের তাতে হাত-পা বেশ করে সেঁকে নিলে একবার, এতক্ষণে যেন শীতটা কিছু কাটল। চারদিক রোদে ভরে গেছে, শীতের জন্ত আর কোন চিন্তা নাই মাণিকের। এবার কিন্তু মাণিককে বাড়ী ফিরতে হবে, বাড়ীর জন্ত তার মন ছটফট করছে। কিন্তু বদে কেওটের ত দেখা পাওয়া গেল না, ছিপটা কি তা হলে মারা গেল মাণিকের?

মাণিক উঠে গাঁয়ের প্রান্ত দিয়ে এদিক ওদিক খানিক পায়চারি করে বেড়াল। দূর থেকে মাণিকের চোখে পড়ল হঠাৎ—গাঁয়ের প্রান্তসীমায় অশথ গাছের সামনে কয়েকটা লোক ধরাধরি করে জাল গুটাচ্ছে। ওদেরি মধ্যে আছে নাকি বদে কেওট? ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল মাণিক সেইদিকে মুখ করে। বদে কেওট তখন সালকোর বাঁধে মাছ ধরতে যাবার জন্ত তৈরি হচ্ছে। মাণিক গিয়ে দাঁড়াল একেবারে তার সামনে। রাগে মাণিকের বুকের ভিতরটা যেন জ্বালা করছে, বদে কেওটের দিকে চেয়ে উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল মাণিক—আমার ছিপ—কোথায় রেখেছিস আমার ছিপ? ভাল চাস ত ফিরিয়ে দে বলছি।

মাণিককে দেখে অবাক হয়ে গেল বদে কেওট, বললে, সে কি ঠাকুর, এদ্দূর পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছ তুমি, কি ভয়ানক ছেলে রে বাবা!

মাণিক দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠল, ছিপ না নিয়ে কোনমতেই ফিরব না আমি, ভাল চাস ত ফিরিয়ে দে আমার ছিপ।

বদে কেওট জাল গুটাতে গুটাতে বললে, ঘাট হয়েছে বাবা—ঘাট হয়েছে, আমি মানে কি আমার চোদ্দ-পুরুষ তোমার ছিপ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। কি বিচ্ছু ছেলে রে বাবা!

এই বলে সে বাগ্দীদের একটা ছেলের দিকে চেয়ে বললে, ওরে, স্কুলঘরের আড়াছে একটা পুঁটি মাছের ভাঁড়ি তোলা আছে, ভাঁড়িটা একে দিয়ে দে'গা ত।

তারপর সে মাণিকের দিকে চেয়ে বললে, যাও ঠাকুর—যাও, লাওগা তোমার ছিপ, দূরে দূরে তোমার তওবৎ বাবা!

দলবল সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরতে চলে গেল বদে কেওট। বাগ্দীদের ছেলেটার পিছু পিছু মাণিক উঠল গিয়ে গাঁ-মুড়ায় স্কুলঘরের সামনে। স্কুল-ঘরে তালা দেওয়া, বাগ্দীদের ছেলেটি বললে, তুমি এইখানে দাঁড়াও ঠাকুর, কাঠিটা আমি নিয়ে আসি।

এই ঘরেই পাঠশালা বসে গাঁয়ের ছেলেদের। অন্নপূর্ণা-পূজা উপলক্ষে পাঠশালা বন্ধ, কেওটদের এ ঘরে বাসা দেওয়া হয়েছে।

স্কুলঘরের বারান্দায় মাণিক অপেক্ষা করতে লাগল। ছেলেটি চাবি নিয়ে ফিরে এল কিছুক্ষণ পরে। চাবি খুলে স্কুলঘরের আড়াচ থেকে ছিপটা পেড়ে এনে মাণিকের হাতে দিলে, তারপর বাইরে এসে তালাটা আবার বন্ধ করে দিলে।

মাণিক ছিপটা পেয়ে এতক্ষণে আশ্বস্ত হ'ল, বদে কেওটের পাল্লায় পড়ে এমন সুন্দর ছিপটা তার যেতে বসেছিল। কিন্তু একি—বঁড়শীটা কৈ, বঁড়শীটা কেউ ছিঁড়ে নিলে নাকি?

মাণিক ছেলেটির দিকে চেয়ে হতাশভাবে বলে উঠল, আমার বঁড়শী?

ছেলেটি পরিষ্কার বললে, আমি তোমার ছিপও দেখি নাই—বঁড়শীও দেখি নাই, আমি কি করে জানব?

ছিপটার দিকে একবার করুণভাবে তাকাল মাণিক, ময়ূর-পাখার কাৎনাটাও যে কে খুলে নিয়েছে। এ বদে কেওটের শয়তানী। ছিপটা হাতে নিয়ে হন্ হন্ করে ছুটল মাণিক বাঁধের দিকে মুখ করে। বদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না করে সে বাড়ী ফিরবে না।

প্রকাণ্ড সালকোর বাঁধ, বাঁচ ফিরিয়ে মাছ ধরা হচ্ছে। অন্নপূর্ণাপূজা উপলক্ষে মাঝিদের বাড়ী কুটুম্ব-ভোজনের বরাদ্দ আছে, গাঁ-গাঁওয়ালী ষোল আনা সমেত। গাঁয়ের ষোড়ল কালী মাঝি নিজে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে থেকে মাছ ধরা দেখা-শোনা করছে। ছিপ হাতে করে মাণিক গিয়ে হাজির হ'ল বাঁধের পাড়ে। বদে কেওট জাল থেকে মাছ বেছে বেছে খালুইয়ের মধ্যে ভরছিল, মাণিক গিয়ে তাড়াতাড়ি তার

সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠল—আমার বঁড়শী—বঁড়শীটা কেন ছিঁড়ে নিয়েছিস !

বদে কেওট মাণিকের দিকে একবার তাকাল, বললে—বঁড়শী আমি নিতে যাব কেনে ঠাকুর, গোলেমালে নিয়েছে হয়ত কেউ ছিঁড়ে।

মাণিক বললে—সে আমি জানি না বঁড়শী তোকে কিনে দিতে হবে—এক্ষুনি গিয়ে কিনে দিতে হবে।

বদে কেওট নিজের মনেই আবার জাল গুঁজতে লাগল, বললে—যাও ঠাকুর—যাও, সকাল থেকে আর বিরক্ত কর না, সরে পড় ইখান থেকে।

মাণিক কিন্তু কোনমতেই যাবে না, বদে কেওটের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে মাণিক।

কালী মাঝি এগিয়ে এসে বললে—এইটা কাদের ছেলে রে, কাঁদছে কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ?

বদে কেওট মাণিকের পরিচয়টা দিয়ে দিলে। কালী মাঝি ব্যাপারটা শুনে শশব্যস্তে বলে উঠল—বলিস কি রে, কি সর্ব্বনাশ ? একলা বাড়ী থেকে চলে এসেছে ?

বদে কেওট ঘাড় নেড়ে বললে, ছেলেটা কি সোজা !

মাণিক একবার ভুরু কুঁচকে তাকাল বদে কেওটের দিকে। কালী মাঝি বললে—কিছু খাবে ঠাকুর, খিদে পেয়েছে ? চল আমার সঙ্গে।

মাণিক বললে—না—বাড়ী যাব আমি।

বদে কেওট বলে উঠল—যাও না তাই মাঝি মশায়ের সঙ্গে, চিঁড়ে কলার করবে ত করে লাওগা।

মাণিক দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল—না।

কালী মাঝি বললে—দে—দে—একটা মাছ দে ঠাকুরকে খালি হাতে কি ফেরাতে আছে বামুনের ছেলেকে।

এই বলে কালী মাঝি নিজেই খারুই থেকে একটা সের তিনেক রুই মাছ বের করে কানকোর কাছটায় দড়ি দিয়ে বেশ শক্ত করে বেঁধে দিলে, হাত দিয়ে যেন ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

মাণিক একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল। মাণিকের হাতে মাছটা জোর করে গুঁজে দিলে কালী মাঝি, বললে—তোমার বাবার কাছে আমার কথা বল, করালী ঠাকুর যে আমাদের খুব চেনা লোক।

মাণিক রুই মাছটা হাতে ঝুলিয়ে এগিয়ে চলল আবার গাঁয়ের পথ ধরে। এত বড় মাছটা ওরা দিয়ে দিলে মাণিককে—এমনিতেই দিয়ে দিলে! তার মা বাবা মাছটা দেখে কি খুশীই না হবে। বাড়ীর দিকে মুখ করে জোরে জোরে পা চালিয়ে দিলে মাণিক।

দেখতে দেখতে বেলা হয়ে গেল অনেকখানি। কাল থেকে মাণিক বাড়ী ফিরে নি, মেলা দেখে আর যাত্রা শুনেই সারাটা রাত সে কাটিয়ে দিলে। মাণিকের মা হয়ত খুব ভাবছে এতক্ষণ, হয়ত কেন নিশ্চয়ই, এতক্ষণ হয়ত সে ঘরবার করছে মাণিকের পথ চেয়ে; ছেলের জন্তে হয়ত সে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিয়েছে। মাণিকের বাবার যে শক্ত অসুখ, হঠাৎ যদি ওষুধ আনতে যেতে হয়, একা ঘর ফেলে মাণিকের মা বেরুবে কেমন করে। মাণিক কিন্তু এভাবে চলে এসে কাজটা ভাল করে নি, না বুঝে খুব ভুল করেছে মাণিক।

ঝড়ের বেগে মাণিক এগিয়ে চলল। ক্রোশ দুই-আড়াই পথ মনে হচ্ছে যেন কতদূর—মনে হচ্ছে যেন কতদিন বাড়ী ছাড়া মাণিক। আরও বেগে—আরও জোরে সে পা চালিয়ে দিলে, যতদূর তার শক্তিতে কুলোয়।

হাঁটতে হাঁটতে শ্রান্ত হয়ে গাঁয়ের ধারে এসে পৌঁছল মাণিক, প্রহর দেড়েক প্রায় বেলা হয়ে গেছে।

এত বড় রুই মাছটা বয়ে আনতে আনতে হাত দুটো মাণিকের লাল হয়ে গেছে দড়ির টানে। তা হোক, তাতে কিছু এসে যায় না, মাছ ধরতেই ত বেরিয়েছিল মাণিক। মাণিকের বাবা মাছ খেতে চেয়েছে, কাল তাকে মাছ ধরে খাওয়াতে পারে নি মাণিক, আজ খাবে—যত খুশি খাবে। মাছটা হাতে ঝুলিয়ে ত্বরিতপদে এগিয়ে চলল মাণিক, মন তার পড়ে আছে বাড়ীর দিকে।

গাঁয়ে ঢুকতেই মাণিকের চোখে পড়ল কে একটা লোক খয়রা রঙের একটা বাছুরের গলায় দড়ি বেঁধে হেট্ হেট্ করে নিয়ে যাচ্ছে গাঁয়ের সরান দিয়ে। কে লোকটা, পাইকার রহমৎ মিঞা না ? রহমৎকে ভাল রকমই চেনে মাণিক, এ গাঁয়ের সকলেই চিনে। কিন্তু ও বাছুরটা যে মাণিকদের, সেই বকনা বাছুরটা—মাণিকের সেই বুধি। রহমৎ কি ওটাকে খোঁয়াড়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছে ? মাণিকের মনটা একটু খিঁচড়ে গেল।

তাড়াতাড়ি মাণিক এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে একটা ডাক দিলে,—রহমৎ মিঞা—ওহে ও রহমৎ মিঞা !

রহমৎ একটু থমকে দাঁড়াল, পিছন ফিরে তাকাল সে মাণিকের দিকে। মাণিক খানিক এগিয়ে গিয়ে বললে, বাছুরটাকে অমন করে টেনে নিয়ে যাচ্ছ কোথায় ?

রহমৎ বললে,—বেচতে যাব, লালগঞ্জের হাট।

মাণিক অবাক হয়ে গেল, একটু ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল—আমাদের বাছুর তুমি বেচতে যাবে কি রকম, কে তোমাকে হুকুম দিয়েছে ?

আরও খানিক এগিয়ে বাছুরের গলার দড়িটা হঠাৎ টেনে ধরলে মাণিক। রহমৎ মিঞা বলে উঠল, বাছুরটা আমি কিনে এনেছি ঠাকুর, শুধোও গে তোমার মাকে, কড়কড়ে দশটা টাকা দাম দিয়েছি।

মাণিক রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল, বাছুর আমি বেচব না, কিছুতেই না ; চল তুমি আমার সঙ্গে, টাকা তোমার এক্ষুনি ফিরিয়ে দেব আমি।

রহমৎ বললে, সে আর হয় না ঠাকুর, যাও যাও আর গোলমাল করো না।

বুধির গলার দড়িটা ধরে টানাটানি করতে আরম্ভ করলে মাণিক, বললে—আমার বাছুর আমি বেচব না, আমার খুশি, ভাল চাও ত ছেড়ে দাও বলছি।

দড়িটা বেশ শক্ত করে টেনে ধরে রুখে দাঁড়াল মাণিক।

রহমৎ মিঞা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, আরে যা যা ভটেক বিত্তেপ করিস না, বাপ ওদিকে মরতে বসেছে আর ছেলের তেজ দেখ, ভাগ্।

বলেই রহমৎ মিঞা মাণিকের হাত থেকে দড়িগাছটা ছিনিয়ে নিয়ে বাছুরের গায়ে সপাসপ কয়েক ঘা বসিয়ে দিলে বোয়ামের একটা ছড়ি দিয়ে। বাছুরটা মার খেয়ে হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করলে রহমৎ মিঞার সঙ্গে সঙ্গে। মাণিক আর দ্বিরুক্তি করলে না, সেইখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে গেল। বাপ যে তার অসুখ, খরচায় হয়ত টান পড়েছে, সেইজন্যই কি মাণিকের মা বেচে ফেলল বাছুরটাকে ? অসম্ভব নয়। দূর থেকে বুধির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে অতি করুণভাবে চেয়ে রইল মাণিক। সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে একেবারেই চলে গেল বুধি !

মাণিকের চোখ বেয়ে টস্ টস্ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

পাড়ার নিকুঞ্জ চক্রবর্ত্তী টেকো মাথায় গামছা ঢাকা দিয়ে ক্ষেত তদারক করতে যাচ্ছে হাতে একটা লাঠি নিয়ে। মাণিককে দেখেই নিকুঞ্জ বলে উঠল, কে রে মাণিক নাকি—ফিরলি ? তোর মা যে কত ভাবছে, যা- যা—শিগ্গির বাড়ী চলে যা।

মাণিক আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াল না, ছুটল সে বাড়ীর দিকে। বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি গিয়ে দূর থেকে চোখে পড়ল মাণিকের—ও পাড়ার ভটচায্যি মশায়—মাণিকদের কুলপুরোহিত—তাদেরই সদর দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন নতুন একখানা গামছার কতকগুলো কি জিনিষপত্র বেঁধে নিয়ে। মাণিক আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই ভটচায্যি মশায় হাটতলার বাঁকে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন দক্ষিণ পাড়ার গলিপথটা ধরে। মাণিকের বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে মাণিক। পাড়ার কয়েকজন মুরুব্বি লোক থেলো হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে জটলা করছেন রাস্তার ধারে একটা দাওয়ার উপর বসে। মাণিককে দেখে ওঁদেরি একজন বলে উঠলেন, মাণিক—ফিরলি নাকি রে ? যাক—বৈতরণীটা খুব পার হয়ে গেছে। যা—যা—আর দাঁড়াস নে, শীগ্গির বাড়ী চলে যা।

মাণিক এদের ভাবগতিক কিছু বুঝতে পারছে না। বৈতরণী পার হয়ে গেল কে ! কি এ কথার অর্থ ?

ঝড়ের বেগে মাণিক টলতে টলতে বাড়ী গিয়ে ঢুকল। সদর দোর থেকেই মাণিক শুনতে পাচ্ছে মায়ের গলার আওয়াজ। জোরে জোরে আওড়াচ্ছে মাণিকের মা—হরি নারায়ণ ব্রহ্ম ! হরি নারায়ণ ব্রহ্ম ! গয়া গঙ্গা গদাধর হরি !

মাণিক গিয়ে দাঁড়াল বড়ঘরের বারান্দার সামনে। মাণিককে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল মাণিকের মা।

মাণিক চেয়ে দেখে তার বাবাকে শোয়ান হয়েছে বারান্দার ঠিক সামনে, একটা ভুঁই-বিছানা পেতে। কপালে তার গঙ্গামৃত্তিকার তিলক, বিছানার পাশে কতকগুলো তিল-তুলসী ছড়ান। গলা ঘড় ঘড় করছে মাণিকের বাবার, চৈতন্যের লেশমাত্র নাই।

হাত-পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে মাণিকের। হরিমতি তার মুখের দিকে চেয়ে ভাঙা গলায় ডুকরে উঠল—মাণিক ?

মাণিকের হাত থেকে দড়িবাঁধা রুই মাছটা হঠাৎ ছিটকে পড়ল উঠানের উপর। মুমূর্ষু কয়ালীর শয্যাপ্রান্তে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল মাণিক, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাক দিলে, বাবা—বাবাগো !

মাণিকের মা মাণিককে একবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে কেঁদে উঠল, মাণিক—মাণিক রে !

প্রকৃতির লীলাভূমি সিকিম

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

নগাধিরাজ হিমালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত, প্রাকৃতিক পরিবেশে পরম রমণীয় দেশ এই সিকিম। তার অরণ্যানীর শ্যামলিমা, চিরতুষারাবৃত অভ্রভেদী পর্ব্বতশৃঙ্গের শুভ্র মহিমা, বিসর্পিত গিরি নির্ঝরিণীর ফেনিলতা, প্রকৃতিজাত পুষ্পস্তবকের সুষমার সমারোহ, দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর অরুণোদয়ে ও সন্ধ্যায় আলোকপাতে অপরূপ লীলাবৈচিত্র্য দর্শকের নয়নমন পরিতৃপ্ত ও সার্থক করে তোলে। প্রকৃতি যেমন একদিকে তার অকৃপণ হস্তে সিকিমের ওপর স্বাস্থ্য ও সম্পদ, সৌন্দর্য্য ও সুষমা উজাড় করে দিয়ে তাকে সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি করে তুলেছে অপর দিকে তেমনি এই দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশকে মানব-সভ্যতার সকল ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ হতে বঞ্চিত করে রেখেছে। একমাত্র বৈদ্যুতিক আলো ব্যতীত এখানে আধুনিক সভ্যতার আর কোন নিদর্শন নেই। ট্রাম, বাস, ট্রেন, এরোপ্লেন, হোটেল, সিনেমা, সংবাদপত্র সবই এখানে দুর্লভ। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার নিত্যপ্রয়োজনীয় এই সমস্ত বস্তুর অভাবে এদেশবাসীর মুখের হাসি ম্লান হয় নি, অন্তরের আনন্দের অভাব হয় নি।

পূর্ব্ব-হিমালয়ের অভ্যন্তরভাগে যে তিনটি দেশ পৃথিবীর দৃষ্টির বাইরে আত্মগোপন করে আছে, যে সব দুর্গম দেশের সংবাদ আমাদের নিকট এসে পৌঁছায় না সেগুলিই এই নেপাল, ভুটান ও সিকিম। যুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীনতার প্রবল উচ্ছ্বাসে যখন ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল প্লাবিত হয়ে গেল, সেই উচ্ছ্বাসেরই প্রবাহ এই দুরধিগম্য হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত নেপাল, ভুটান ও সিকিমেও দেখা দিল। নেপালে তার প্রতিক্রিয়া পূর্ণমাত্রায় প্রতীয়মান হয় এবং সিকিমে যে সে মাত্রা অতিক্রম করে গিয়েছিল, বহির্জগতের সে সংবাদ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। গত ৭ই জুন, যখন সংবাদপত্রে দেখা গেল যে, সিকিমের মহারাজা সার তাসি তামগিল এবং রাজ্যের তিনটি রাজনৈতিক দল—সিকিম ষ্টেট কংগ্রেস, সিকিম ন্যাশনালিষ্টস্ ও প্রজা সম্মেলন পার্টির মধ্যে বিরোধের ফলে রাজ্যে যে রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়েছে, তা বন্ধ করবার জন্য জরুরি ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট এই দিন হতে যখন অর্দ্ধস্বাধীন রাজ্য সিকিমের শাসনভার গ্রহণ করেছেন তখনই দেশের লোকের দৃষ্টি পড়ল এই সিকিমের ওপর।

অতি ক্ষুদ্র দেশ এই সিকিম। এর আয়তন মাত্র ২৮১৮ বর্গ মাইল—অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার মত ক্ষুদ্র। লোকসংখ্যা আরও অল্প—১ লক্ষ ২১ হাজার ৫ শত। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের বার্ষিক আয় কিঞ্চিদধিক পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র। এখানকার অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর। এখানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র দুটি। একটি ছেলেদের জন্য, অপরটি মেয়েদের। এখানে কোন কলেজ নেই। এদেশের লোকের নাম লেপচা। এখানকার প্রচলিত ভাষার নাম গুর্খালি।

সিকিমের প্রথম অধিবাসী কারা ছিল সে ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত। পূর্ব্বে ভোট অর্থাৎ তিব্বতের অধিবাসীরা এই সিকিমে বাস করত—তাদের নাম ছিল ভোটিয়া। এরা ভুটানের অধিবাসী ভুটিয়া নয়।

বর্ত্তমান নেপালের অধিবাসী গুর্খারা রাজপুতানা থেকে এসে

যখন নেপাল-সিংহাসনের অধিকারী নেওয়ার বংশের হাত থেকে সিংহাসন কেড়ে নিলেন তখন এই ভোটেরা নিজেদের দেশ সিকিম ত্যাগ করে ভয়ে তিব্বতের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুর্খারা বিনা বাধায় নেপালের সিংহাসন অধিকার করে। সিকিম অতিক্রম করার পর তারা এই অনধিকৃত দেশের দিকে আর দৃষ্টিপাত করে নি। প্রচুর ফলমূল এবং খাদ্যে সমৃদ্ধ ও অপূর্ব্ব পরিশোভিত পুষ্পসুষমায় এই অপরূপ দেশ তারা অধিকার করে বসল। বর্ত্তমান দার্জ্জিলিং জেলাও তখন সিকিমের অন্তর্গত ছিল।

আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে তিব্বতবাসীরা এই সিকিম অধিকার করে পূর্ব্বেকার অধিবাসিগণকে রণজিৎ নদীর তীরে হিমালয়ের সানুদেশে বিতাড়িত করে। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিস্তা নদীর পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত সমস্ত দেশ ভুটানের অধিবাসী ভুটিয়ারা অধিকার করে। সিকিমবাসীদের এই হ'ল প্রাচীন ইতিহাস। সিকিমের বর্ত্তমান অধিবাসীরা এক অতি শান্তিপ্রিয় জাতি।

যখন সিকিমের ওপর ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শ্যেনদৃষ্টি পড়ল তখন সিকিমরাজ গুর্খাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। গুর্খারা সিকিম রাজ্য প্রায় কবলিত করবার উপক্রম করেছে সেই সময় কৌশলী ইংরেজ ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল সিকিমরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধের শেষে সিকিমরাজ স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিতালিয়া নামক স্থানে ইংরেজের সঙ্গে তাঁর এক সন্ধি হ'ল। তাতে সিকিমরাজ তাঁর ৪০০০ বর্গ মাইল রাজ্য ফিরে পেলেন বটে, তবে তাঁকে ইংরেজের অধীন হয়ে থাকতে হ'ল। দশ বৎসর পরে নেপাল ও সিকিমের মধ্যে সীমারেখা নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হ'ল। সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল এই বিবাদ মিটাবার জন্য কাপ্তেন লয়েডকে নির্দ্দেশ দিলেন। ক্যাপ্টেন লয়েড মালদহের কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট জে. ডবলিউ. গ্রাণ্টকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয়ের বৃক্ষাদিপরিপূর্ণ দুর্ভেদ্য বনানী ভেদ করে উত্তর-পশ্চিম সিকিমের রিনচিন পং নামক গ্রামে পর্য্যন্ত এসে উপস্থিত হলেন। ক্যাপ্টেন লয়েড ও গ্রাণ্ট দার্জ্জিলিং জেলার দৃশ্যে মুগ্ধ হলেন। কালনেমির লঙ্কাভাগে'র ফলে দার্জ্জিলিং জেলা এসে পড়ল ইংরেজের অধিকারে। তার পর নির্জ্জন ও নিবিড় কানন-কান্তার সমাকীর্ণ এই বনস্থলী, জনাকীর্ণ গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হ'ল। দার্জ্জিলিঙের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর কাঞ্চনজঙ্ঘাও সিকিমেই অবস্থিত।

ভারত-সরকারের আশ্রিত রাজ্যরূপে পরিণত হবার পর থেকে সিকিমের রাজদরবারে একজন পলিটিক্যাল অফিসার নিযুক্ত হতেন। ভারতবর্ষ আত্মকর্ত্তৃত্বলাভ করবার পূর্ব্বে সিকিমে পলিটিক্যাল অফিসার ছিলেন এ. জে. হপকিন্স।

প্রদেশপাল কাটজুর অভ্যর্থনায় সিকিমের দেশীয় বাদ্য

১৯৪৮ সালে আগষ্ট মাসে মিঃ হপকিন্স অবসর গ্রহণ করেন। তখন স্বাধীন ভারত-সরকার তাঁর স্থলে শ্রীহরীশ্বর দয়ালকে নিযুক্ত করেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সিকিম রাজ্য ইংরেজ সরকারের অধীন ছিল। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য লাভের পর ভারত গবর্ণমেন্ট এই রাজ্যের সঙ্গে নূতন পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য এক কমিটি নিয়োগ করেন। এই আলোচনা চলবার সময় তখনকার মত এই রাজ্যের সঙ্গে এক স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদিত হয়।

ভারতবর্ষ থেকে তিব্বত যেতে হলে সিকিমের ভিতর দিয়ে ছাড়া আর কোন পথ নেই। এই স্থিতাবস্থা চুক্তি অনুসারে ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যে দুটি বাণিজ্যপথ এই রাজ্যের ভিতর দিয়ে গিয়েছে তার পরিচালনভার ভারত-সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং তিব্বত, ভুটান ও সিকিমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার দায়িত্ব সিকিমস্থিত ভারতীয় পলিটিক্যাল অফিসারের উপর ন্যস্ত হয়।

সিকিমে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গম, ধান, জোয়ার, কমলালেবু, দারচিনি ও আপেল প্রধান। এখানকার শিল্পদ্রব্যের উল্লেখযোগ্য পশুলোমজাত পশম ও পশমী দ্রব্য। এখানকার ফলের বাগান পরিচালনা করেন স্থানীয় সরকার। সিকিম হতে এবং সিকিমের মধ্য দিয়ে তিব্বত থেকে বাংলাদেশে আমদানী হয় ধান, গম, ডাল, পশম, তামাক, সরিষা, তিসি, গো ও ছাগচর্ম্ম, চমরীপুচ্ছ প্রভৃতি দ্রব্য। আর ভারতবর্ষ থেকে সিকিম এবং সিকিমের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য-পথে তিব্বতে রপ্তানী হয় ধান, গম, বস্ত্র, সুতা, লৌহ ও ইস্পাত নির্ম্মিত যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন দ্রব্য, পেট্রোল, রং, লবণ, চিনি, চা, তামাক,

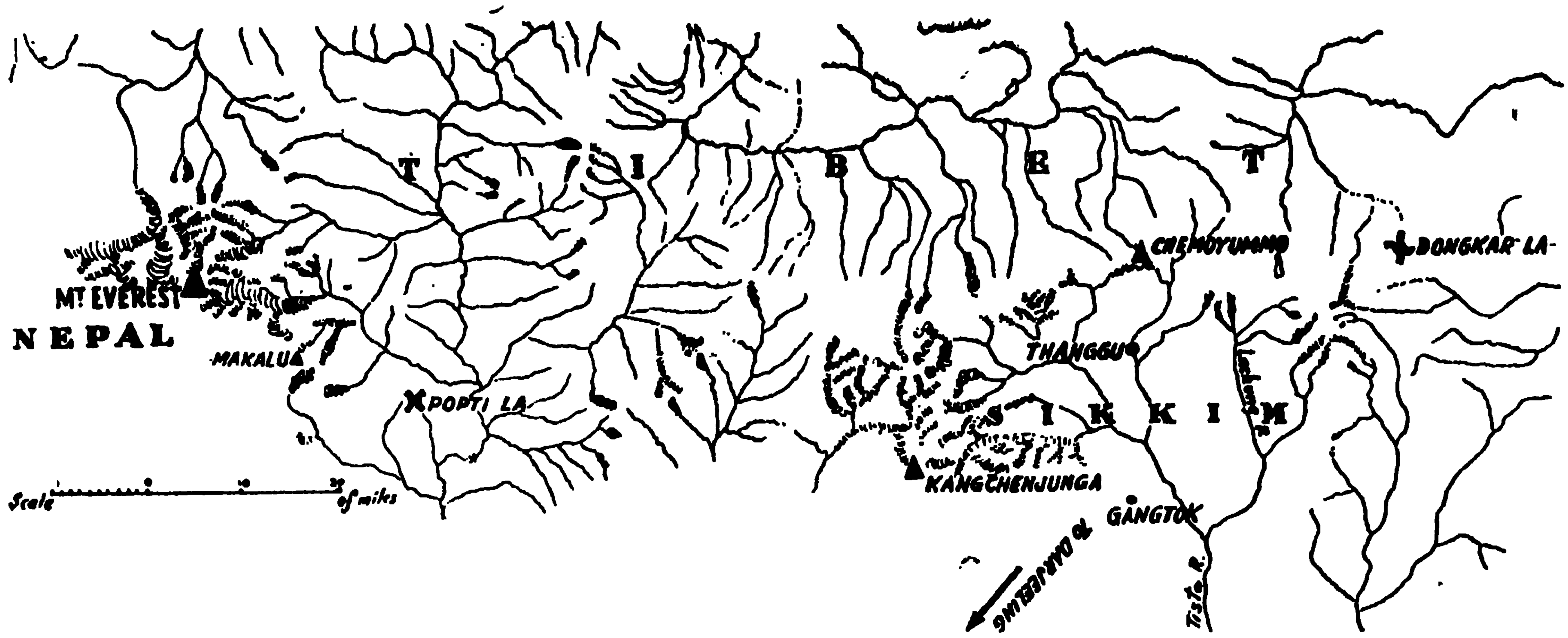

সিকিমের মানচিত্র

সুপারি, পিতল ও তামার দ্রব্য, স্বর্ণ ও রৌপ্য। কালিম্পং, গাহলি, ঘোলা প্রভৃতি কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত দ্রব্যাদি আমদানি ও রপ্তানি হয়।

বাংলাদেশ থেকে সিকিম যাবার দুটি পথ আছে। শিলিগুড়ি হতে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর সামনে পড়ে তিস্তা নদী। তিস্তা নদীর পুল অতিক্রম করার অর্দ্ধ মাইল পরে দক্ষিণ দিকে সিকিমে যাবার পথ। এই পথের মোড় থেকে সিকিম ৩২ মাইল, কালিম্পং ১০ মাইল এবং সিকিমের রাজধানী গংটক ৩৯ মাইল। এই পথের ধার দিয়ে বরাবর চলে গিয়েছে তিস্তা নদী। কখনও এই পথ নদী হতে শত শত ফুট উপরে পাহাড়ের গা দিয়ে চলেছে, কখনও বা নেমে এসে নদীর ধার দিয়েও চলেছে। নদীর ধারেই কোথাও বা শ্যামল বনানী মণ্ডিত পর্ব্বত, কোথাও বা পর্ব্বতের গভীর খাদের ভিতর দিয়ে নদীটি কলকল নাদে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এক মাইল উপরে রংজিৎ নদী এসে এই তিস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পার্ব্বত্য পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ। তিস্তা নদী হতে ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করে পথটি এসে পৌঁছয় রংপুতে। এই রংপু হ'ল সিকিম প্রবেশের প্রথম ঘাঁটি। রংপু নদীর উপর একটি সঙ্কীর্ণ সেতু আছে। এই সেতু অতিক্রম করে সিকিমে প্রবেশ করতে হয়। খরস্রোতা তিস্তা নদীর তীরে আরও সাত মাইল এই মনোরম পার্ব্বত্য পথে অগ্রসর হয়ে সিংটমে এসে উপস্থিত হতে হয়। এখানে পুলিশ গাড়ী অবরোধ করে। দর্শকগণের সই করবার একখানা পুস্তকে সকলকেই এখানে সই করতে হয়। কারণ নবাগতদের সন্ধান রাখা এ রাজ্যের এক প্রধান কাজ। রংপু হতে চার মাইল দূরে তাদিং নামে স্থানে কমলালেবুর এক সুন্দর বাগান আছে।

তিস্তা নদী এখানে শেষ হয়ে গেল। তার পরিবর্তে পথের ধারে ধারে প্রবাহিত হয়েছে ক্ষুদ্রকায়া কিন্তু খরস্রোতা রংনী চু। এখান হতে পথ পর্ব্বতের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। পথের ধারে ধারে শস্যের ক্ষেত। এখানে প্রচুর শস্য জন্মায়। আরও ২ ঘণ্টা পরে ৬০০০ হতে ৬৫০০ ফুট উপরে গংটকে এসে উপস্থিত হওয়া যায়। পথে চোখে পড়ে কোথাও বা ফার্ণ, অর্কিড ও পামের অপ্রাচুর্য্য, কোথাও বা ম্যাগনোলিয়া ও রডোডেনড্রন পুষ্প-স্তবকের অপরূপ লোহিত আভা। এই নয়নাভিরাম দৃশ্যে চক্ষু ও মন অপার আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে।

গংটকে দ্রষ্টব্য স্থান মহারাজার রঙীন প্রাসাদ, ডাকবাংলো, বাজার এবং সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিমন্দির। গংটকের বাজারে লেপচা, তিব্বতী, ভুটিয়া ও নেপালী—একসঙ্গে সকলকেই দেখতে পাওয়া যায়। শহরটি অতি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর। সর্ব্বোপরি এখান হতে কাঞ্চনজঙ্ঘার পরিবর্তনশীল রক্তিম রাগ-রেখা পরিদৃষ্ট হয় ও নয়নমন পুলকিত করে। কাঞ্চনজঙ্ঘার পার্শ্ববর্ত্তী প্যান্ডিম, নার্সিং ও সিনোল চু পর্ব্বতশৃঙ্গগুলিও অপরূপ।

সিকিমের পূর্ব্বপার্শ্বে ভুটান এবং পশ্চিমে নেপাল অবস্থিত। ইহার উত্তরে তিব্বত এবং দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ। ভারতের উত্তর ভাগ রক্ষা করে আসছে—নেপাল, ভুটান ও সিকিম। সুতরাং ভারতবর্ষকে এই তিনটি দেশের উপর সর্ব্বদা সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের বোমা বর্ষণকেন্দ্র নেপাল, ভুটান ও সিকিম হতে মাত্র ৩০০০ মাইল দূর। সুতরাং উত্তর-ভারতের সীমারেখায় অবস্থিত এই দেশত্রয়ের গুরুত্ব সমধিক। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এই দেশগুলির রক্ষাব্যবস্থা এবং বৈদেশিক নীতি স্বহস্তে গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নেই।

১৮১৭ সাল হতে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত

সিকিমের মহারাজা কর্তৃক প্রদেশপাল ডাঃ কাটজুর অভ্যর্থনা। প্রদেশপালের বামপার্শ্বে সিকিমের মহারাজা। তাঁহার বামে পলিটিক্যাল এজেন্ট শ্রীহরীশ্বর দয়াল

ভারতের সঙ্গে সিকিমের স্থিতাবস্থা চুক্তি ছিল। দার্জিলিং ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়ায় ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৮৩৫ সাল হতে সিকিম গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ১২ হাজার টাকা কর দিয়ে আসছেন। সম্প্রতি সেই কর আরও কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। সিকিমের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্যের বন্ধন দৃঢ় করবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলার প্রদেশপাল কৈলাসনাথ কাটজু চার দিনের জন্য সিকিম-রাজ সার তাসি নামগিয়েলের আতিথ্য স্বীকার করেন। ফলে সিকিমের সঙ্গে ভারতরাষ্ট্রের সম্পর্ক অধিকতর শুভ ও সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ হয়েছে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনাবসানের পর থেকে তিনটি রাজনৈতিক দল সিকিমে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এখানেও নেপাল প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের মত ক্ষমতা হস্তগত করবার আন্দোলন চলতে থাকে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে গংটকে অশান্তি দেখা দেয়। এই সময় রংপুতে ষ্টেট কংগ্রেসের অধিবেশনের পর কয়েকজন নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয়। সেই নেতাদের অনুগামিগণ গংটকে এসে এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করে এবং রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জনপ্রিয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের দাবি করে। ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধির হস্তক্ষেপের ফলে কংগ্রেস-নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং মহারাজা ও কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

সিকিম রাজ্যে ইতিমধ্যে কিছু শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়। ষ্টেট কংগ্রেসের নেতাদের নিয়ে গত মে মাসে এক মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয়। তাতে ষ্টেট কংগ্রেস দলের নেতা তাসি সেরিং প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজ্যের শৃঙ্খলা তা সত্ত্বেও ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। সিকিমের অবস্থা জটিল ও বিশৃঙ্খল হয়ে উঠছে দেখে উক্ত প্রতিনিধি ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানান যে, মহারাজা অথবা ষ্টেট কংগ্রেস রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সমর্থ হবেন না। অবস্থা প্রত্যক্ষ করবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিক দপ্তরের সহকারী সচিব ডঃ বালকৃষ্ণ কেশকারকে অবিলম্বে গ্যাংটকে প্রেরণ করেন। ডাঃ কেশকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে জানালেন যে মন্ত্রিমণ্ডল ও মহারাজের মধ্যে বিরোধ বিদ্যমান রয়েছে। এই অবস্থায় বিশৃঙ্খলা এবং রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বার পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্টের একজন দেওয়ান নিযুক্ত করে তাঁর হাতে সিকিমের রাজ্যভার অর্পণ করা উচিত। ডাঃ কেশকার অবিলম্বে গ্যাংটকে কিছু সৈন্য প্রেরণের জন্যও সুপারিশ করেন। তদনুসারে ২রা জুন এক-দল সৈন্য সেখানে প্রেরিত হয়। ইতিমধ্যে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। পলিটিক্যাল অফিসার ৩রা জুন জানান, ভারত গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে শাসনভার গ্রহণ না করলে রাজ্যে অশান্তি ও রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী।

এদিকে গত ৬ই জুন সিকিমের মহারাজা পলিটিক্যাল অফিসারকে জানান যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত শাসনকার্য্য পরিচালনা করা অসম্ভব। তিনি অনুরোধ করেন ভারত গবর্ণমেণ্ট যতদিন দেওয়ান নিযুক্ত না করেন তত দিন যেন পলিটিক্যাল অফিসারই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। সিকিমের মহারাজার অনুরোধে ভারত গবর্ণমেণ্ট ৭ই জুন হতে রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেছেন।

গবর্ণমেণ্ট প্রচার করছেন যে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই তারা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। মহারাজের অনুরোধ অনুযায়ী যথাসম্ভব শীঘ্র একজন দেওয়ান প্রেরণ করা হবে। রাজ্যে আইনসম্মত কার্য্যকলাপ বন্ধ করবার এবং শাসনকার্য্যে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণদের গ্রহণ না করবার কোন ইচ্ছাই ভারত গবর্ণমেণ্টের নাই। ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহে যে শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিশীল নীতি অনুসরণ করা হয়েছে সিকিমেও তা অনুসৃত হবে বলে গবর্ণমেণ্ট আশা প্রকাশ করেছেন।

আফ্রিকায় চীনাবাদামের চাষ

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়েছে—তা শুধু আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই সমস্যা এশিয়া ও ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রকট হয়েছে। সমস্যা সমাধানের জন্য সকলেই আজ নানাদিক থেকে নানাভাবে চিন্তা করছেন। অনেকেই ভাবছেন কি করে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা ভিন্ন এই সমস্যা সমাধানের আর কোন পন্থা আছে বলে মনে হয় না। সম্প্রতি ইংলণ্ডের শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট আফ্রিকা মহাদেশে খাদ্যোৎপাদনের যে একটি পরিকল্পনা রচনা করেছেন তা শুধু আমাদের দেশের পক্ষেই নয় পৃথিবীর সকল দেশের লোকের পক্ষেই অনুকরণীয়।

এই পরিকল্পনাটি রচিত হয়েছে আফ্রিকায় তৈলবীজ চীনাবাদাম চাষের জন্য। খাদ্যের সঙ্গে মাথাপিছু যে পরিমাণ স্নেহজাতীয় পদার্থের প্রয়োজন ইংলণ্ডের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তার ঘাটতি পড়েছে অনেকখানি। হিসাব করে দেখা গেছে এই ঘাটতি পূরণের জন্য বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে ১০ লক্ষ টন পরিমাণ চীনাবাদামের প্রয়োজন। পূর্ব্বে এই ঘাটতির বৃহৎ অংশ পূরণ হ'ত ভারতে উৎপন্ন চীনাবাদাম থেকে। কিন্তু লোকবৃদ্ধির দরুন ভারতবর্ষ বিদেশে চীনাবাদাম চালান দিতে এখন অসমর্থ। সুতরাং ইংলণ্ডের নিজের এই অভাব পূরণের জন্য চীনাবাদাম উৎপাদনের কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে সুদূর ভবিষ্যতেও তা পূরণ হবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই অভাব হতেই পরিকল্পনাটির সৃষ্টি।

প্রথম এই পরিকল্পনাটি যাঁর মাথায় আসে তিনি শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের লোক নন, তিনি ইংলণ্ডের একটি বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। তাঁর নাম ফ্র্যাঙ্ক স্যামুয়েল। দু'বৎসর পূর্ব্বে (১৯৪৬ খ্রীঃ) গ্রীষ্মের এক অপরাহ্ণে আফ্রিকার টাঙ্গানাইকা প্রদেশের উপর দিয়ে তিনি শূন্যপথে উড়োজাহাজে করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল নীচের জনবিরল উর্ব্বর ভূমির দিকে। যতদূর দৃষ্টি যায় নানা জাতীয় তৃণগুল্মে আচ্ছাদিত বনভূমি ভিন্ন তিনি আর কিছুই দেখতে পেলেন না। দেখামাত্রই চীনাবাদাম চাষের পরিকল্পনাটি তাঁর মনে উদয় হ'ল। তখনকার মনের অবস্থা সম্বন্ধে পরে তাঁর একজন বন্ধুকে তিনি বলেছিলেন—"আমার মনে তখন সে কি আনন্দ? হাজার হাজার যোজন বিস্তৃত বালুময় উর্ব্বর ভূমি আমার চোখের সামনে পড়ে আছে। আমার মনে হ'ল ভগবান নিজেই যেন চীনাবাদাম চাষের জন্য এই জমি তৈরি করে রেখেছেন। একবার শুধু জঙ্গল পরিষ্কার করে নিতে পারলেই হ'ল....।"

অদূরবর্ত্তী সমুদ্রতীরস্থ বন্দর দার-এস-সালামে এসে উড়োজাহাজ হতে নেমে হোটেলে গিয়েই তিনি সরকারী কাগজ নথিপত্র নিয়ে বসলেন। সারা রাত ধরে তিনি সমুদয় কাগজপত্র ঘেঁটে স্থানীয় বারিপাতের পরিমাণ, সে প্রদেশবাসী স্থানীয় মজুরের অবস্থা ও জমির গুণাগুণ ইত্যাদি তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন।

সমুদ্র-পথে চালান দিবার জন্য আফ্রিকার একটি নদীতে চীনাবাদাম নৌকা বোঝাই করা হইতেছে।

সেখান হতে ইংলণ্ডে ফিরেই তিনি তাঁর ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর নিকট তাঁর নূতন পরিকল্পনাটি পেশ করলেন। সেই সভায় আলোচনার পর সমুদয় পরিকল্পনাটি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করা হ'ল। কারণ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ একটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্ভব নয়। সভার আলোচনা থেকে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলী সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন এই পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত হলে তাঁদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হবে। কারণ এঁরাই পৃথিবীর মধ্যে স্নেহজাতীয় দ্রব্যের (oil and fats) সর্ব্বাপেক্ষা বড় ক্রেতা।

সভায় বসেই গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণের জন্য একটি স্মারকলিপিও রচনা করা হ'ল। স্যামুয়েল সাহেব সেই স্মারক-লিপিতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করলেন যে বর্ত্তমান সময়ের খাদ্যে ব্যবহার্য্য স্নেহজাতীয় দ্রব্যের ঘাটতি সাময়িক নয়। সমগ্র পৃথিবীর মাথা গুনতি হিসাবে প্রকাশ গত দশ বৎসরের মধ্যে লোকসংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোন দেশ এই ঘাটতি পূরণের জন্য অগ্রসর না হয় তা হলে সুদূর ভবিষ্যতেও এ ঘাটতি পূরণের কোন সম্ভাবনা নেই।

স্মারকলিপিটি পাওয়া মাত্র গবর্ণমেণ্ট বিবেচনার্থ সেটি প্রেরণ করলেন খাদ্য-সরবরাহ মন্ত্রীর দপ্তরে। তিন জন বিশেষজ্ঞের বিচারে পরিকল্পনাটি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবার পর কাজ আরম্ভ ও তার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ পার্লামেণ্ট হতে ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মঞ্জুর করা হ'ল।

কাজ আরম্ভ করতে গিয়ে দেখা গেল বাধা অনেক। প্রথমতঃ জমির জঙ্গল পরিষ্কার করতে হবে—তার জন্য যন্ত্রের প্রয়োজন। যন্ত্র কিনতে গিয়ে দেখা গেল যন্ত্রের অভাব খুব বেশী। আমেরিকায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেল সেখানকার যন্ত্র তৈরির কারখানাগুলিতে এক বৎসর আগে থেকেই মালক্রয়ের চুক্তি হয়ে গেছে। কিন্তু নূতন যন্ত্রের জন্য এঁদের বসে থাকা চলে না। এঁদের প্রয়োজন দ্রুত উৎপাদন। সুতরাং যুদ্ধে ব্যবহৃত পুরানো যন্ত্রের জন্য দেশ-বিদেশে লোক প্রেরণ করা হ'ল। মধ্যপ্রাচ্য, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধের উদ্বৃত্ত মালের গুদামে খোঁজ হতে লাগল পুরানো যন্ত্রের। নিউগিনি থেকে খবর পাওয়া গেল চৌষট্টি বৃহদায়তন কলের লাঙ্গল আছে, কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যবহারে কলকব্জা তাদের অনেক ক্ষয় পেয়ে গেছে, অনেক হারিয়েও গেছে। তন্মধ্যে কতকগুলি একেবারে অচল। অমনি প্রত্যুত্তরে টেলিগ্রামে খবর চলে গেল "অবিলম্বে ক্রয় করে জাহাজে করে মাল পাঠাও।" মিশর দেশের যুদ্ধক্ষেত্রের মরুপ্রান্তরে খোঁজ করে পাওয়া গেল কতকগুলি হাল্কা ধরণের কলের লাঙ্গল। সেখানে কিছু রাস্তা নির্ম্মাণের যন্ত্রও পাওয়া গেল। ফিলিপাইন দ্বীপ থেকে যুদ্ধে ব্যবহৃত উদ্বৃত্ত মালের গুদাম হতে এল জঙ্গল পরিষ্কার করবার, রাস্তা তৈরি করবা, চাষের ও অন্যান্য নানা জাতীয় শতাধিক যন্ত্র। এই সব পুরাতন যন্ত্র মেরামত করে কাজ আরম্ভ করে দেওয়া হ'ল। টাঙ্গানাইকার কঙ্গোয়া প্রদেশে পুরা দমে কাজ চলল, সপ্তাহে ২০০০ একর করে আবাদের জন্য জমি পরিষ্কার হতে লাগল কিন্তু যন্ত্র সবই পুরাতন, তিন শত যন্ত্রের মধ্যে এক শতের অধিক একসঙ্গে ব্যবহার করা যাচ্ছিল না। কাজ করতে করতে যে সব যন্ত্রের অধিকাংশই অচল হয়ে যাচ্ছিল সেগুলিকে কারখানায় নিয়ে বারংবার মেরামত করে নিতে হচ্ছিল।

অন্য এক বাধা এল বড় বড় গাছের বেলায়। যে সব যন্ত্র পাওয়া গিয়েছিল তা দিয়ে বড় বড় গাছের মূল উৎপাটন করা যাচ্ছিল না। অথচ সেরূপ গাছের সংখ্যাও নগণ্য নয়। প্রতি একর জমিতে মাটির গভীরে শিকড় প্রোথিত করে দাঁড়িয়ে আছে ১০০।১৫০ বড় বড় গাছ। এদের মূলোৎপাটনের জন্য নূতন ধরণের যন্ত্রের প্রয়োজন। পুরাতন যন্ত্রের নানা অংশ দিয়ে এবং তাদেরই রূপান্তরিত করে তৈরি করা হ'ল শারমেন্ট্যাঙ্ক (Shermentank)। মূলসমেত বৃক্ষ উৎপাটনের আর বাধা রইল না। একজন এঞ্জিনীয়ার এই যন্ত্রটি সম্বন্ধে বলেছিলেন "অসির কলায় লাঙ্গল তৈরির ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।"

এ যেমন যন্ত্রের দিকের প্রতিবন্ধক তেমনি মজুর সংগ্রহের বাধাও কম ছিল না। সেই প্রদেশের নিগ্রো অধিবাসী ওয়াগগো (Wagogo) জাতির মধ্যে সভ্যতার আলোক আজও পর্য্যন্ত কিছুমাত্র প্রবেশ করে নি। তারা সেই আদিম যুগের কৃষি-কার্য্যেই অভ্যস্ত। প্রয়োজনমত কুড়ুল দিয়ে জঙ্গল কেটে হাত-লাঙ্গল দিয়ে মাটি খুঁড়ে তাতে ওরা শস্যের বীজ বপন করে। বন্য জন্তু শিকারের অস্ত্র এখনও তাদের সেই সাবেক কালের তীর ধনুক বর্শা। যন্ত্র ওরা কোন দিনই ব্যবহার করে নি, সে সম্বন্ধে তাদের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। অথচ এদেরই লাগাতে হবে যন্ত্রের কাজে। হাতেকলমে শিক্ষা পেয়ে এই অল্প সময়ের মধ্যেই এরা যন্ত্র চালাতে দক্ষ হয়ে উঠেছে। প্রায় ৭০০ কলের লাঙ্গল, জঙ্গল পরিষ্কার করবার যন্ত্র এখন এরাই চালাচ্ছে। তাদের ভিতর থেকে দিন দিনই যন্ত্রীর (mechanics) সংখ্যা বাড়ছে, শিখছেও এরা খুব দ্রুত।

ইংলণ্ড হতে শ্বেতাঙ্গ মজুর-যন্ত্রীও এসেছে অনেক। পরি-কল্পনাটির কথা কাগজে প্রচারিত হতে না হতেই প্রায় লক্ষাধিক আরজি পড়েছিল কাজে যোগ দেবার জন্য। তন্মধ্যে অধি-কাংশই ৩৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক যুবক। গ্রীষ্ম-প্রধান অঞ্চলের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ওদের কোন অভিজ্ঞতা নেই। যারা চিরদিন শীত-প্রধান দেশে কাজ করায় অভ্যস্ত আফ্রিকায় এসে তাদের গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে খোলা প্রান্তরে কাজ করতে হবে। কিন্তু তাদের মনোভাব ছিল সৈনিকের ন্যায়। সৈনিক-জীবনের কঠোরতার সঙ্গেও ওরা অপরিচিত ছিল না। কারণ ওদের অধিকাংশই ছিল যুদ্ধক্ষেত্র-প্রত্যাগত সৈনিক।

পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত করবার পথে প্রথম যে সব অন্তরায় দেখা দিয়েছিল তা প্রায় অবসান হয়ে গেছে। ১৯৪৮-এর গ্রীষ্মের শেষের দিকে প্রায় ৭৫০০ একর জমি থেকে ফসল তোলা হয়েছে। ১৯৪৭-এর শেষভাগের মধ্যে এক লক্ষ একর জমি পরিষ্কার করে তাতে চীনা-বাদামের চাষ হবে। যদি এইভাবে কাজ চলতে থাকে ও দৈবচক্রে কাজে কোন বাধা না জন্মে তা হলে আগামী

তিন বৎসরের মধ্যে হিসাব অনুসারে প্রায় ৩২ লক্ষ একর জমি আবাদ হতে পারবে।

দু'বৎসর পূর্ব্বেও যে জনবিরল অরণ্যানী ছিল নানাজাতীয় হিংস্র বন্যজন্তুর বিচরণভূমি, নানাজাতীয় রোগবীজাণুবাহী কীট-পতঙ্গ মশা-মাছি প্রভৃতিতে ছিল পরিপূর্ণ, আজ সেখানে গড়ে উঠছে জনবহুল শহর। কলের লাঙল, ট্রাকটর প্রভৃতি যন্ত্রের গর্জ্জনে হিংস্র জন্তু সব বন ছেড়ে পালাচ্ছে। বন পরিষ্কার হওয়ায় মাছি-মশা প্রভৃতি অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের দলও বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত স্থানের অভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কঙ্গোয়াতে ইতিমধ্যেই ছোটখাটো একটি প্রি-কেব্রিকেটেড বাড়ীতে পূর্ণ শহর গড়ে উঠেছে। তাতে বৈদ্যুতিক শক্তিগৃহ (Power House) স্থাপিত হয়েছে, পানীয় জলের জন্য খোঁড়া হয়েছে নলকূপ, দোকানপাট বসেছে, ছেলেদের জন্য স্থাপিত হয়েছে স্কুল। বড় বড় পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছে, উড়োজাহাজে করে যাত্রীদের যাতায়াত চলছে শূন্য পথে, তার জন্য তৈরি হয়েছে অবতরণ-ভূমি। অদূরবর্ত্তী সমুদ্রতীরের বন্দর দার-এস-সালেমে যাবার জন্য পূর্ব্বে এক লাইনের যে ছোট একটি রেলপথ ছিল তাতে আর একটি লাইন যোগ করে রেলপথটির পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে। বহু দিন পূর্ব্বে এই দার-এস-সালেম ছিল আফ্রিকার দাস-ব্যবসায়ের একটি বৃহৎ কেন্দ্র। বহু দিন পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার পর আজ আবার সে স্থানটি কোলাহলমুখরিত বন্দরে পরিণত হয়েছে। চীনাবাদামের চাষকে উপলক্ষ্য করে আজ সেখানে আসছে দলে দলে এঞ্জিনীয়ার, বাড়ী তৈরির কারিগর, ব্যবসায়ী, বিগত বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যাগত বেকার সৈন্যদল।

এই সব বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের এক জায়গায় এসে বাস করবার সমস্যাও নিতান্ত কম জটিল নয়। এদের অনেকেই হয়ত এক জায়গায় এসে এক সমাজভুক্ত হয়ে বাস করতে চাইবে না, সকলেই হয়ত চাইবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে। কর্ম্মের অবসরে আনন্দপূর্ণ জীবনযাপন করবার জন্য প্রতি পরিবারে কিছু জমি দেওয়া হয়েছে সব্জী চাষের জন্য। তা ছাড়া শিশুদের শিক্ষারও বন্দোবস্ত করতে হবে। বড় হলে ওরা যাতে বেকার অবস্থায় বসে না থাকে, সকলে কাজ পায় তারও বন্দোবস্ত করতে হবে। ইতিমধ্যেই রুগ্ন ব্যক্তিদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্য স্থানে স্থানে হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট বাংলা ও পঞ্জাব হতে যে সকল বাস্তুহারাদের আন্দামানে নিয়ে গেছেন তাদের জন্যও এরূপ একটি ক্ষুদ্র আকারে হলেও ব্যাপক ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন। প্রথমে এর জন্য গবর্ণমেণ্টকে কিছু ব্যয় করতে হলেও পরিণামে ক্ষতি অপেক্ষা লাভের অঙ্কই হয়ত বেশী দেখতে পাওয়া যাবে। ইংলণ্ডের শ্রমিক গবর্ণমেণ্টও পরিণামে লাভের আশায়ই আফ্রিকায় চীনাবাদাম চাষের পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করেছেন। তাঁরা আশা করেন ১৯৫২ সনের পর হতে ৬ লক্ষ টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হলে (হবার সম্ভাবনাই বেশী) বৎসরে রাজকোষের ১ কোটি পাউণ্ড ব্যয় লাঘব হবে।

সাহিত্যের সমস্যা

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ছাত্রাবস্থায় সাহিত্যে আমার হাতেখড়ি হয় আত্মীয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকটে এবং আমার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় সবুজপত্রে। সবুজপত্র বন্ধ হইলে আমার পড়াশুনা সাহিত্যের পথ ছাড়িয়া অন্যপথে চলিতে থাকে। সাধারণ ভাবে সাহিত্যের সঙ্গে এবং সবুজপত্রের আমলের দুই-চারি জন শ্রদ্ধেয় বন্ধুবান্ধব ছাড়া সাহিত্যিকদের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বহুদিন পরে আবার সাহিত্যের পথে ফিরিতে গিয়া সম্মুখে বিপুল বাধা দেখিয়া নিরুৎসাহ বোধ করিতেছি।

কিন্তু কেমন সন্দেহ হইতেছে যে, যে বাধা আমাকে নিরুৎসাহ করিতেছে তাহার প্রভাব আজকালকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের উপরেও যেন দেখা যাইতেছে। অগ্রসর হইবার পথ যে সমস্যার কণ্টকিত মনে হইতেছে তাহা যেন কোন বিশেষ সাহিত্যিকের বা আমার মত সাহিত্যসেবা-প্রয়াসীর ব্যক্তিগত সমস্যা নহে, তাহা এদেশের সকল সাহিত্যিকের সাধারণ সমস্যা। মসীকৃষ্ণ মেঘের আবরণ নামাইয়া দিয়া উহা সম্মুখের পথ অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত বিচার করিয়া সাহিত্যের পথে এই প্রতিবন্ধকের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। ঈষৎ সংকোচের সঙ্গে সেই কথাই আজ বলিতেছি।

প্রথমেই দৃষ্টিপাত করিতে হয় মোটামুটি গত দশ বৎসরের ইতিহাসের পানে। কালবৈশাখীর প্রচণ্ডতা লইয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের অগ্রগতি, মালয় ও ব্রহ্মদেশে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সর্বনাশ, অবর্ণনীয় বিপদ ও ক্লেশের মধ্য দিয়া কুখ্যাত 'কালা'পথে অগণিত ভারতবাসীর ব্রহ্মদেশ হইতে

প্রত্যাবর্তন, বাংলার মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশুর অন্নাভাবে চোখের সম্মুখে বীভৎস মৃত্যু, আজাদ হিন্দ ফৌজের অভ্যুদয়, হিরোশিমা ও নাগসাকির অচিন্তনীয়, বর্বর ধ্বংসলীলা ও জাপানের পতন, বলদর্পিত মুসোলিনী ও জার্মান ফুয়েরের জীবনাবসান, চোখের সম্মুখে কত কি ঘটিয়া গেল। যুদ্ধ উপলক্ষে এদেশে অগণিত বিদেশীয়ের আগমন, তাহাদের কার্যকলাপের ফলে সমাজের স্তরে স্তরে বিপুল পরিবর্তন, অলক্ষ্য ও সর্পিল গতিতে লোভ, অনাচার ও নীতিহীনতার প্রসার চোখের সম্মুখে ঘটিল। ১৯৪২ সনের ভারতব্যাপী বিদ্রোহ-অগ্নির প্রজ্বলন চোখের সম্মুখে সংঘটিত হইল, ঘরে ঘরে এই অগ্নির উত্তাপ অনুভূত হইল।

তারপর এই সকল ঘটনার ফলে সমাজে ও লোকের মনে কোথায় কি ফাটল ধরিল তাহার সংবাদ লইবার অবকাশ হইতে না হইতে অতর্কিতে একদিন ভূপৃষ্ঠ ফাটিয়া অন্ধকার ভূ-গহ্বর হইতে অগ্নিময় ধ্বংসের স্রোত উৎক্ষিপ্ত হইয়া দেশকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ১৯৪৬-৪৭ সনের ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাবানলের কথা বলা হইতেছে। অবশেষে সেই স্রোতে বাহিত হইয়া চিরদিনের পোষিত আদর্শ ও আশা বিনষ্ট করিয়া আসিল দ্বিধা-বিভক্ত দেশের স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার আবাহন করিয়া উৎসব করিলাম আমরা। উৎসবের আনন্দ-কোলাহলে খেয়াল হইল না যে অপরের তাগিদে ও অবস্থার ফেরে দ্রুতগতিতে যে স্বাধীনতা আসিল তাহা আসিল একটা নৈরাশ্য ও বেদনার রূপ লইয়া। এ কথা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা নিরর্থক।

একটার পর একটা এতগুলি প্রচণ্ড বিপর্যয়ে দেশের লোকের গুরুতর মানসিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটিবার কথা। সে পরিবর্তন সাহিত্যিকের সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনের মুকুরে স্পষ্ট ধরা পড়িবার কথা। কিন্তু সমসাময়িক কালের সংবাদপত্র ছাড়া অন্যত্র অনুসন্ধান করিলে মনে হয় যে, কোন আশ্চর্য আঘাত-নিরোধক ব্যবস্থার সাহায্যে অধিকাংশ বাঙালী সাহিত্যিক মনের অবিচলিত সাম্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমসাময়িক ঘটনা লইয়া অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এক মহা নাটকের এই সকল দ্রুত পরিবর্তনশীল দৃশ্য সম্বন্ধে সামগ্রিক অনুভূতির অভাব এই সাময়িক রচনাগুলিতে স্পষ্ট।

আগেকার দিনের বাংলা সাহিত্যের প্রতি একটু দৃষ্টি ফিরান যাউক। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা, তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হইবার পরে বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁসের যুগ আরম্ভ হয়। আজকার দিনে অনেক ত্রুটি চোখে পড়িলেও যে নব নব সৃজনীশক্তির পরিচয় সে যুগের বাংলা সাহিত্যে মিলে তাহা আমাদের গৌরবের বস্তু। সে যুগের বিভিন্নমুখী ধারা ১৯০৫-এর দিকে একমুখী হইয়া নূতন স্বাধীনতা আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া জাতির জীবনে জোয়ার আনিয়া দিল। ইহার পরে দেখা যায় যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ক্রমে ক্রমে বাংলা সাহিত্যে পলায়নী মনোবৃত্তির অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে যদিও ১৯১৪-১৫ হইতে ১৯২১, ১৯২১ হইতে ১৯৩০-এর মধ্যে একসঙ্গে হিংসা ও অহিংসার পথে দেশ-মুক্তির আন্দোলন চলিতেছিল। সাহিত্যের এক অংশে এই পলায়নী মনোবৃত্তির অনুশীলন এখনও চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। কোন কোন সাহিত্যিকের রচনায় ইহার প্রভাব দেখা যায় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপর্যয়কর যুগ পর্যন্ত, মুক্তি আন্দোলনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত কেহ কেহ অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তারপর যেন সাহিত্যের প্রবাহ ব্যাহত হইয়া নানা আবর্তের সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে ঘুরিতেছে, প্রবাহের বাহিকাশক্তি বিলুপ্তপ্রায়। আজ আবার তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছে।

একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক সেদিন বলিলেন, সাহিত্যিকগণ এক বিভ্রান্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা পথ দেখিতে পাইতেছেন না। আজিকার দিনে এই কথা একজন সাহিত্যিক কেন বলেন? নানা দেশের সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় দেশে যুগ-পরিবর্তনের মুখে ও পরে সাহিত্য সে পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছে, হৃত স্বাধীনতার উদ্ধার বা সঙ্কুচিত স্বাধীনতার প্রসার দেশে নূতন, বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টির প্লাবন আনিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে য়ুরোপের বড় বড় দেশে ইহা ঘটিয়াছে। য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব এদেশে প্রসারিত হইলে মানসিক দৈন্য ও সংকীর্ণতা হইতে মুক্তির আস্বাদ পাইয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে যে নূতন বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠে তাহার বেলায় ইহা দেখা গিয়াছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ও পরে বাংলায়, মহারাষ্ট্রে, পঞ্জাবে নূতন ভাবের বন্যা আসিয়াছিল। সেই প্লাবনের যুগে ইহা পরিলক্ষিত হইয়াছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন নূতন রূপ লইল। দেশী ও বিদেশী নানা ধারা হইতে রস সংগ্রহপূর্বক পুষ্টিলাভ করিয়া, ১৯৪৭ হইতে বিয়াল্লিশ বৎসর আগে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য করিয়া ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লাভের যে সম্মিলিত অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল ১৯০৫-এর বিয়াল্লিশ বৎসর পরে তাহা পরিণতি লাভ করিল ভারত-বিভাগে ও ইংরেজের বিভক্ত ভারতবর্ষ পরিত্যাগে।

ইংরেজ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়াছে। প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থে দেশবাসীর প্রতিনিধিরা আজ শাসনযন্ত্রের চালক। আজিকার দিনে সাহিত্যিক বিভ্রান্ত কেন, পথ চিনিয়া এই অক্ষমতা কেন? আনন্দের প্রাচুর্য, প্রাণের বেগে সাহিত্য ত আজ সহস্র দল মেলিয়া ফুটিয়া উঠিবে। বহু রকমের গলদ যে ঘটিয়াছে

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
ভাস্কর—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়

জাতীয় রক্ষীবাহিনীর মহিলা বিভাগের দুই জন শিক্ষার্থিনী বেতারে সংবাদ আদান প্রদান অভ্যাস করিতেছেন

MAJOR GENERAL. J. N. GHAUDHURI. A. D. 1949.

মেজর জেনারেল জে. এন. চৌধুরী

কোথাও তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশ পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছে কিন্তু সে মুক্তির উল্লাস কই? হাজার বৎসর পরে হিন্দুভারত আজ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে, আত্মকর্তৃত্ব পাইয়াছে। কোথায় এত বড় সৌভাগ্যলাভের আনন্দ উচ্ছ্বাস, কোথায় নবজীবনের স্ফুরণ? কেন স্বাধীনতা লাভের পর নূতন প্রাণের জোয়ার আসিতে না আসিতে ভাটার টানে নদীগর্ভের অবশিষ্ট জলটুকু সরিয়া গিয়া পুঞ্জীভূত কর্দম ও জঞ্জালের কদর্যতা দৃষ্টি ও মনকে পীড়িত করিতেছে?

তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্টের পরে দেশে যে মহা পরিবর্তন হইয়াছে তাহা বন্ধ্যা? আনন্দহীন, প্রেরণাহীন স্বাধীনতার বন্ধ্যাত্ব কি সাহিত্যিক যে সংকটের সম্মুখীন হইয়া বিমূঢ় বোধ করিতেছেন তাহার জন্য দায়ী? এই চিন্তাও যে হতবুদ্ধিকর। ব্যক্তিগত ভাবে যে বাধার কথা বলিয়াছি, তাহার মূল কোথায় আজ সতর্ক অনুসন্ধান করিতে হইবে। সন্ধান করিতে হইবে বিচিত্র পত্র-পুষ্প-ফলের ঐশ্বর্য মণ্ডিত হইয়া যে নবযুগের আবির্ভাবের কথা, কি কারণে আজ তাহা শ্রীহীন মনে হইতেছে।

আজ দিকে দিকে বিক্ষোভ। লোকচিত্ত স্বপ্নভঙ্গের ব্যথায় পীড়িত, ক্ষুদ্রচিত্ততা, নির্লজ্জ লোলুপতার গ্লানিতে অভিভূত, আদর্শভ্রষ্ট রাজনৈতিক নেতার সদ্য পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত পদের তাড়নায় জর্জরিত। ক্ষমতার অধিকারী আজ দেশের শুধু বর্তমান নহে, ভবিষ্যৎকেও নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে অভিলাষী। যে স্বাধীনতার আলোক-স্পর্শে জন-মানস-পদ্ম বিকশিত হইল না, কি আশ্রয় করিয়া তাহা আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিবে? কি আশ্রয় করিয়া সাহিত্য নব সৃষ্টিতে জীবন্ত ও সমৃদ্ধ হইবে?

সাহিত্যের পথে ফিরিতে গিয়া নিরুৎসাহ বোধ করিতেছি এইজন্য। যে সকল অভিজ্ঞতা শতাব্দীকালের মধ্যে পরিপাক করা সম্ভব, অল্প কয়েকটি বৎসরের মধ্যে পর পর আসিয়া তাহা বিপর্যয় ঘটাইয়াছে, লোকের চিত্তের স্থৈর্য, স্বভাবের সংযম, চিন্তার প্রখরতা হরণ করিয়াছে। দীর্ঘ দিনের নিপীড়িত মনকে সুস্থ ও উদ্দীপ্ত করিবার কথা যাহার, ভাগ্যদোষে তাহা হইয়াছে অস্বাস্থ্যকর, উদ্দীপনাহীন।

আজিকার এই গ্লানিকর, হতবুদ্ধিকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যে আদর্শের প্রতি সত্যকার নিষ্ঠা নাই তাহার ঢকানিনাদ অতিক্রম করিয়া যে শক্তিমান সাহিত্যিক নবযুগের কথা নবযুগের ভাষায় বলিবেন সাগ্রহে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছি। তাঁহার আবির্ভাবের পথ বাধামুক্ত হউক কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি। বিমুখ জনমানসকে তিনি সৃষ্টির সৌন্দর্য ও প্রাণবত্তার দ্বারা অনুকূল করুন।

বঙ্গ ও আসামের দ্রাবিড় জাতি

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী

এক সময়ে বঙ্গদেশ ও আসামে দ্রাবিড়জাতির বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। তাহারা উভয় দেশের সমাজেই অনেক পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিল। এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ রহিয়াছে তাহা হইতে একটি মোটামুটি ইতিহাস এ প্রবন্ধে দিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্গদেশে আর্য্যগণ প্রথমে কখন আগমন করিয়াছিলেন তাহা জানা কঠিন হইলেও স্থূলভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব নহে। বঙ্গ যে আর্য্যভূমি তাহার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় জৈন ধর্ম্মগ্রন্থে। জৈন ধর্ম্মগ্রন্থসকল জৈনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরের মৃত্যুর পরে রচিত হইয়াছে। মহাবীরের মৃত্যু হয় ৫২৭ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে। অতএব স্থূলভাবে বলা যাইতে পারে যে, আর্য্যগণ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন প্রায় ৫০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে। তখন গৌতম বুদ্ধ জীবিত ছিলেন এবং মগধে বিম্বিসার রাজা ছিলেন। ইহার বহু পূর্ব্বে আর্য্যগণ বিদেহ ও মগধ অধিকার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সেখানে দ্রাবিড়গণ বাস করিত। আর্য্যদের বিদেহ ও মগধ আক্রমণে পরাজিত হইয়া তাহারা বঙ্গদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। দ্রাবিড়গণের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কাহারা বাস করিত তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ কিয়দংশে কোলীয় ও মোঙ্গোলীয় জাতি বাস করিত এবং তাহারা দ্রাবিড়দিগের নিকট পরাজিত হইয়া পর্ব্বতে ও জঙ্গলে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল।

আর্য্যগণ কর্তৃক বিদেহ ও মগধ অধিকার এবং দ্রাবিড়গণের বঙ্গদেশে আগমন প্রায় একই সময়ে হইয়াছিল। দ্রাবিড়গণ যে অন্ততঃ সমগ্র উত্তরবঙ্গ অধিকার করিয়াছিল, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। 'ভিটি', 'মারা' বা 'মারি', 'পেটা', 'বাদা' ইত্যাদি প্রত্যয়গুলি দ্রাবিড় শব্দ বা দ্রাবিড় নগর বুঝায়।

'গুড়ি' অর্থ বসতি ; 'মারা' বা 'মারি' অর্থ প্রাদুর্ভাব (হত্যা নহে) ; 'পেটা' অর্থ পণ্যবীথি ; 'বান্ধা' অর্থ ক্রয়বিক্রয় স্থান। উত্তরবঙ্গে 'সিলিগুড়ি'—সিলনামক দ্রাবিড় শাখার বসতি, 'ময়নাগুড়ি'—দ্রাবিড় ময়ন শাখার বসতি ; 'লাটা-গুড়ি'—লাটা শাখার বসতি বা নগর ; 'জলপাইগুড়ি' নদীর অপর তীর হইতে আগত দ্রাবিড়দিগের বসতি (পরে 'জলপাই' একটি ফলের নাম হইয়াছে, কারণ ইহা এদেশে ছিল না, স্পেন বা ইটালী হইতে সমুদ্র পার হইয়া জাহাজ-যোগে আসিত, জলের সহিত ইহার আর কোন সম্বন্ধ নাই) ; 'সালমারা' (আসামের একটি স্থান)—যেখানে শালবৃক্ষের প্রাদুর্ভাব ; 'ভেড়ামারা' যেখানে ভেড়া বা মেষ বহু পাওয়া যায় ; 'ঘোড়ামারা' যেখানে ঘোড়ার প্রাদুর্ভাব ; 'বোয়াল-মারী' যেখানে বোয়াল মাছের প্রাদুর্ভাব ; 'বাঘমারী' যেখানে বাঘের প্রাদুর্ভাব। 'পেটা' শব্দ এখনও বহরমপুরে ব্যবহৃত হয়, যেমন 'মঙ্গলবারপেটা' মঙ্গলবারে যেখানে বাজার হয়। আসামে 'পেটা' শব্দযুক্ত অন্ততঃ দুইটি শহর পাই বঙ্গদেশের সীমান্তে—'বড়পেটা' ও 'সরুপেটা'। 'বান্ধা' শব্দ 'হাতীবাঁধা' ও 'গাইবাঁধা' দুইটি উত্তরবঙ্গীয় নগরের নাম—প্রাচীন দ্রাবিড় অধিকার বুঝাইতেছে। আসামে বহু স্থানের নাম 'গুড়ি' শব্দযুক্ত, ইহাতে বুঝা যায় পূর্ব্বে সে সকল স্থানে দ্রাবিড় বসতি ছিল। কিন্তু আসামে যে এককালে সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া দ্রাবিড়গণের বসতি ছিল, তাহার আরও অনেক প্রমাণ আছে।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে সিলিগুড়ি নগরে দ্রাবিড় সিলগণ বাস করিতেন। ইঁহারাই তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিলেন। বলিতে গেলে ইঁহারাই বঙ্গদেশের দ্রাবিড়গণের নেতৃত্ব করিতেন। বহুকাল এইভাবে থাকিবার পরে যখন আর্য্যগণ উত্তরবঙ্গে রাজ্য স্থাপনা করিতে আসিয়া-ছিলেন, তখন দ্রাবিড়গণ তাঁহাদিগকে প্রবল বাধা দিয়া-ছিল। উত্তর-বঙ্গে কোথাও রাজ্যস্থাপন করিতে না পারিয়া তাঁহারা আসামের তেজপুরে গিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। সিলগণ সেখানে গিয়া প্রাগজ্যোতিষপুর আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহারা ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া আসামে চলিয়া যান। কামরূপে (গৌহাটিতে) রাজ্য স্থাপন করিয়া তাঁহারা খাসিয়া পর্ব্বতের সিলং চূড়ায় গিয়া বসবাস করেন। খাসিয়াগণ ইহাদের অনেক পরে খাসিয়া পর্ব্বতে বাস করিবার জন্য আসিয়াছিল। সিলগণ ক্রমে শক্তি সংগ্রহ করিয়া পাহাড়ের অপরদিকে সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া দুইটি বৃহৎ ভূখণ্ড অধিকার করিয়া নিজেদের নামে পরিচিত করিলেন। এই দুইটি স্থান 'সিলহট্ট' ও 'সিলচর'—প্রথমটি তাঁহাদের বাণিজ্য-স্থান, দ্বিতীয়টি তাঁহাদের বসতিস্থান। ক্রমে তাঁহারা আসামের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তেজ-পুরের অপর দিকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে 'সিলঘাট' পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মপুত্র পুনরায় পার হইতে পারেন নাই।

কেবল সিলগণই আসামে আসেন নাই। অন্যান্য বহু দ্রাবিড় শাখা তাঁহাদের সহিত অথবা তাঁহাদের রাজ্য স্থাপনের পরে আসামে আসিয়াছিল। বঙ্গদেশে যাহারা রহিয়া গেল তাহা-দের সংখ্যাও কম নহে, তাঁহারা একই দ্রাবিড় জাতি। পরে আর্য্যগণ কামরূপ ও আসাম জয় করেন। তাহারা সেখানকার অনার্য্যদিগের নাম দিলেন 'কামচারী' যাহা হইতে 'কাছাড়ী' শব্দের উৎপত্তি। তাহারা আর্য্যবিধি প্রতি-পালন করিত না বলিয়া তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারী মনে করিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। নওগাঁ জেলায় কামপুর ইহাদের নগর, কামরূপ বা গৌহাটি জেলায় ইহাদের আচার-ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং সেখানে ইহারা বাস করিত বলিয়া 'কাম-রূপ' নাম দেওয়া হইয়াছিল। আসামের দেবী 'কামাখ্যা' অনার্য্যদিগেরই দেবী। পরে পশ্চিম হইতে পূজারী ব্রাহ্মণ আনাইয়া এই দেবীকে হিন্দু দেবীতে পরিণত করা হইয়াছে।

কিন্তু অনার্য্যগণ কতকগুলি নাম দ্বারা আপনাদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীকে অভিহিত করিত, যেমন বড় বা বড়; 'মেচ' 'মেল চাই' অর্থ 'মেল' বা জাতীয় সভার মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে; 'রাজবংশী' রাজার বংশীয়, রাজবংশীয় বলিয়া সকলেই এ উপাধি গ্রহণ করিতে পারে। কোচবিহারের কাছাড়ীগণ সম্ভবতঃ বাঙালীদিগের সহিত মেলামেশা করায় অন্যান্য কাছাড়ীগণ তাহা-দের ঘৃণা করিত, সে অপবাদ দূর করিবার জন্য তাহারা নাম লইলেন 'কুল-চাই' কুচ বা কোচ অর্থাৎ কাছাড়ী কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যখন তাঁহারা কোচবিহারে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন, তখন কাছাড়ীগণ স্বভাবতঃই তাঁহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিত। আসাম ও বাংলার কাছাড়ী, মেচ, বড (বড়), রাজবংশী ও কোচ—সকলেই একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

ইহা ব্যতীত আর একটি আদিম জাতির আমরা পরিচয় পাই—ইহাদের নাম 'মণি'। মানভূম ও পূর্ব্ব দিকে মণিহারী ঘাটে আসিয়া ইহারা কিছুদিন বাস করিয়াছিল। পরে গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া কলিঙ্গ দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। পূর্ব্বে কলিঙ্গদেশের নারীগণ সুন্দরী বলিয়া খ্যাত ছিল, সম্ভবতঃ মণিপুরের নারীগণও ইহার মধ্যে পড়ে। ইহাদের আর একটি শাখা পূর্ব্ব দিকে আসামে গিয়া একটি স্বাধীন রাজ্য—মণিপুর—স্থাপন করে। সম্ভবতঃ আসামের সিলগণ ইহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ডিমাপুরে কাছাড়ীদিগের এক দুর্গ ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়।

এককালে দ্রাবিড়গণই প্রায় সমগ্র আসামের অধিপতি ছিল। তাহারা মোঙ্গোলীয়দের পরাজিত করিয়া পর্ব্বত ও জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিল। এইরূপে তাহারা পরবর্ত্তী কালের আর্য্য অধিকারের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিল।

কিন্তু আসামের আর্য্যগণ অনার্য্যদের চিরকাল স্বাধীন থাকিবার সুযোগ দেন নাই। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর সম্বন্ধে কিছু রহস্য আছে, তাহা না জানিলে পরবর্ত্তী কালের আসামের সামাজিক ইতিহাস সম্যক্‌রূপে বুঝা যাইবে না। এ বিষয়ে প্রচলিত ইতিহাসের বাহিরে যে সকল প্রমাণ আছে, তাহা বর্ণনা করিলে পাঠকদের বিরক্তির উদ্রেক হইতে পারে। সেইজন্য পূর্ব্বাপর ঘটনাগুলিই আমরা বলিতে চেষ্টা করিব। এই ইতিহাস দুইটি বিষয়ের মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রথমতঃ এই নূতন রাজ্যের নাম প্রাক্ বা পূর্ব্বজ্যোতিষপুর কেন হইল? পূর্ব্বজ্যোতিষপুর থাকিলেও ভারতবর্ষে কোথাও পশ্চিম জ্যোতিষপুরের নাম পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, অসমীয়া ভাষা ও বাংলা ভাষা একই মাগধী প্রাকৃত ভাষা, বলিতে গেলে অসমীয়া ভাষা বাংলাভাষা হইতেই উৎপন্ন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে উচ্চারণের কিছু পার্থক্য আছে। অসমীয়গণ চ বর্গ উচ্চারণ করিতে পারেন না, তাহার স্থানে স্পর্শবর্ণ উচ্চারণ করেন, ত বর্গকে ট বর্গে পরিণত করিয়াছেন এবং স্পর্শবর্ণের স্থানে বিশেষতঃ 'শ' ও 'স'এর স্থানে 'হ' উচ্চারণ করেন। এই পার্থক্য কিরূপে আসিল? এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদিগকে অতীত ইতিহাসের কথা কিছু বলিতে হইবে।

পারস্যদেশে একশ্রেণীর পুরোহিত ছিলেন, তাঁহারা ভারতে আসিয়া আপনাদিগকে সৌর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা গ্রহাচার্য্য দৈবজ্ঞ বা জ্যোতিষী। জেন্দ-আবেস্তা বা পারসিক ধর্ম্মগ্রন্থে 'অথর্ব্বণ' পুরোহিত বলিয়া ইহাদের উল্লেখ আছে এবং ইহাদিগকে ঘৃণা করা হইত। হয়ত বা ইহারা নানা গ্রাম্য দেবতারও পূজা করিত এবং মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা অশিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। জরথুস্ত্র-প্রচারিত ধর্ম্মে ইহারা যে অতি হীন বলিয়া গণ্য হইত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ দিকে পারস্যভাষায় স্পর্শবর্ণ 'হ' রূপে উচ্চারিত হইত, যেমন বৈদিক 'সপ্তসিন্ধবঃ' পারস্য ভাষায় 'হপ্ত হিন্দব' এবং চ কে 'স' রূপে উচ্চারণ করা হইত, যেমন বৈদিক 'চতুরঙ্গ' পারসিক ভাষায় 'সতরঞ্জ'। 'ত' স্থানে 'ট' ব্যবহার ইহাও অসম্ভব নহে, কারণ কোন কোন আর্য্যজাতিই যেমন ইংরেজ 'ত' উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহার স্থানে 'ট' উচ্চারণ করে। যাহা হউক, এই সৌর ব্রাহ্মণগণ পারস্য দেশে অনেকটা দীনহীন জীবন যাপন করিত। বৈদিক ভাষা শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারিত না বলিয়া ইহারা বৈদিক ধর্ম্মে ও বেদে অজ্ঞ ছিল সেজন্য আর্য্যগণও ইহাদিগকে ব্রাহ্মণের সম্মান দেন নাই।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে বা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে পারস্য হইতে পারদগণ (Parthians) আসিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। সৌর ব্রাহ্মণগণ তাহাদের সহিত আসিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিমে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এখনও কাশ্মীরের দক্ষিণে ও পঞ্জাবে ইহাদের বংশধরেরা আছে, কিন্তু তাহাদের ভাষা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, তাহারা তথায় আর্য্যগণের নিকট যে সম্মান পান নাই ইহা প্রায় নিশ্চিত। এ দিকে পারদগণের রাজ্য বহিরাগত শকেরা অধিকার করিল, এবং তাহাদের নিকট হইতে রাজ্য অপর বহিরাগত জাতি কুষাণগণ কাড়িয়া লইলেন। কুষাণদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ কণিষ্ক। তিনি বারাণসী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পাটলিপুত্রের রাজা তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া-লইয়াছিলেন। যখন পূর্ব্বের রাজ্যগুলি এক সম্রাটের অধীন থাকায় যাতায়াত নিরাপদ হইল, তখন সৌর ব্রাহ্মণগণ ক্রমাগত পূর্ব্ব দিকে গমন করিয়া বিদেহের পথে বা মগধের পথে পৌণ্ড্র-রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পৌণ্ড্ররাজ্য উত্তরবঙ্গকে বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা উত্তরবঙ্গের পশ্চিমাংশ, অপর অংশ দ্রাবিড়দের অধিকারে ছিল। পৌণ্ড্ররাজ ইহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া স্বরাজ্যে বাস করিতে দিয়াছিলেন।

পৌণ্ড্ররাজ্য বিহারের পূর্ব্বসীমান্তে অবস্থিত এবং ইহার রাজা ও অধিবাসীগণ সকলেই বাঙালী। গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে পৌণ্ড্ররাজ্যে গোলযোগ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। রাজবংশের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ হইতেই হউক অথবা নূতন রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা হতেই হউক রাজবংশীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনেক সৈন্য-সামন্ত লইয়া পূর্ব্বদিকে নূতন রাজ্য স্থাপনের জন্য অভিযান করিলেন। দেশের সৌর ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদানের ও নিরাপদে বাস করিবার আশা দিয়া অনেককেই সঙ্গে লইলেন। ইহার কারণ এই যে, নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে গেলে যে তাহার একাংশ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পূর্ণ করা প্রয়োজন, তাহার অন্য উপায় করিতে পারিলেন না। কারণ আর্য্য ব্রাহ্মণগণ একেই বঙ্গদেশে অল্প ছিল, এবং যাহারা ছিল তাহারাও এই অনিশ্চিত অভিযানের সঙ্গী হইতে চাহিল না। এই রাজার নাম কি তাহা জানা যায় নাই।

যাহা হউক, এই পৌণ্ড্ররাজার পূর্ব্ব দিক অভিযানে উত্তরবঙ্গের দ্রাবিড়গণ প্রবল বাধা দিয়াছিল। সেইজন্য তিনি কোথায়ও রাজ্যস্থাপন করিতে পারিলেন না। অবশেষে তেজপুরে গিয়া

রাজধানী স্থাপন করিলেন। তেজপুরের সন্নিকটে খোদিত প্রস্তরস্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে, ইহার নিকটে জঙ্গলের মধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত নগরীরও ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের আর্য্যগণ এই ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গে লইয়া পরে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া কামরূপ আক্রমণ করেন এবং ক্রমে আসামের প্রায় সমগ্র উত্তরাংশ অধিকার করেন। কিন্তু দেখা যায় যে, তাঁহারা সিলং পাহাড় অতিক্রম করিয়া অথবা আসামের গভীর জঙ্গলের পথ দিয়া কাছাড়ের সিলচর ও সিলহট অথবা মণিপুর আক্রমণ কারেন নাই। সিলগণ ও মণিপুরীগণ ততদ্দেশে স্বাধীন ছিলেন।

অতএব গণনা করিলে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে যখন প্রথম আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার অন্ততঃ ৮০০ বৎসর পরে আসামে আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশ হইতে আগত আর্য্যজাতির ভাষাই অসমীয়া ভাষা। কিন্তু গৌরব্রহ্মণদিগের দ্বারা তাহা বিস্তৃত হইয়াছে। সেজন্য আসামে পারসীকমূলক উচ্চারণ দেখা যায়, ইহা ব্যতীত ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা পার হইয়া বঙ্গদেশে যাতায়াত সহজ ছিল না বলিয়া ভাষা আরও কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

যদিও দ্রাবিড়গণ আর্য্যগণের প্রভাবে রাজ্য হারাইয়াছিল, তথাপি তাহাদের জাতিগত স্বাধীনতা আজ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতেছে। আর্য্যগণও ইহাদিগকে স্বকীয় সমাজ ও রীতিনীতি লইয়া থাকিতে দিয়াছেন. দ্রাবিড়গণ আপন আপন ভাষা রক্ষা করিয়াছে, যদিও তাহারা প্রাকৃত ভাষাও শিখিয়াছে।

কিন্তু দ্রাবিড় ও আর্য্যজাতির মধ্যে যে বহুল পরিমাণে মিশ্রণ হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। আসামে ব্রাহ্মণগণের বহু নারী দ্রাবিড়দিগকে বিবাহ করিয়াছিল এবং তাহাদের সন্তান আর্য্য-দ্রাবিড়-সম্ভূত। অসমীয়াগণ ইহাদিগকে শুতকুলিহা (শুতবংশীয়) বলিয়া ঘৃণা করেন আর বলিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া যেসকল বিধবা পুনরায় বিবাহ করিয়াছে, তাহাদের সন্তানগণ ঐ শ্রেণীর। কিন্তু ইহা প্রকৃত কারণ নহে। প্রাচীন আর্য্যসমাজে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, ইহার কোন অবিসম্বাদী প্রমাণ নাই। যখন বঙ্গদেশ হইতে কায়-বর্ত্তগণ আসামে আসিয়াছিল, তখন হইতে ইহারা আপনাদিগকে কায়-বর্ত্ত (বা কেওট) নামে পরিচয় দিত। প্রকৃতপক্ষে অনেক ব্রাহ্মণজাতীয়া নারীই স্বেচ্ছাক্রমে দ্রাবিড় বিবাহ করিয়াছিল কিন্তু মিশ্রণ এখানেই শেষ নহে। মুষ্টিমেয় আর্য্য-জাতি দ্রাবিড়গণের মধ্যে আসিয়া দ্রাবিড়সংমিশ্রণবিমুক্ত ছিলেন, ইহা আশা করা যাইতে পারে না। অনেকে দ্রাবিড়-কন্যা বিবাহ করিয়াছে এবং তাহাদের সন্তানগণ নামে আর্য্য হইলেও তাহাদের মধ্যে দ্রাবিড় ও আর্য্য এই উভয় রক্তই প্রবাহিত। ইহার জন্য দ্রাবিড়দিগের সহিত কোন বাদবিসম্বাদ হয় নাই। কারণ আর্য্যপ্রভাবমুক্ত দ্রাবিড়গণ স্ত্রীপ্রধান জাতি এবং তাহাদের মধ্যে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। কোন কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া তাহাদের নৈতিক ও সামাজিক বিধির প্রতিকূল। আর্য্য-অনার্য্য উভয় জাতির মিশ্রণের আর একটি রূপ দেখা যায়। মণিপুরীগণ হিন্দু বৈষ্ণব হইয়া এখন জাতিভেদ বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটি প্রথা আছে, কোন ব্যক্তি সর্ব্বজাতীয়া কন্যাকেই বিবাহ করিতে পারে, কেবল যাহারা সমজাতীয়া নহে, তাহাদের সঙ্গে আহার চলে না। এ প্রথা দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কিছুকাল পূর্ব্বেও ছিল। দ্রাবিড়-গণের মধ্যে জাতিভেদ নাই, তাহা হইলে মণিপুরীগণ কোথা হইতে এ রীতি পাইল? ইহা তাহারা অসমীয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, ইহাই অনুমান হয়। ব্রাহ্মণগণকে যেখানে তাহাদের সংখ্যা অল্প সেখানে এই প্রথা বাধ্য হইয়া প্রচলন করিতে হইয়াছে। ইহাদ্বারাও আর্য্য ও দ্রাবিড় অনেক মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু দ্রাবিড়গণ যে একেবারে হিন্দুসমাজভুক্ত হয় নাই, ইহা বলা যায় না। আসামের গোস্বামীগণ অর্থের বিনিময়ে অনার্য্য-জাতিকে হিন্দু রাজবংশী সমাজভুক্ত করেন। কিন্তু বঙ্গদেশ হইতে আগত কায়-বর্ত্তগণ ইহাদের অপেক্ষাও সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

মোঙ্গোলীয়দিগকে সমতলভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়া কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গ ও আসাম দেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছে। আর্য্যগণের নিকট পরাজিত হইয়াও আর্য্যসমাজের সমকক্ষরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আপনা-দের স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই। আর্য্যগণের পরে ব্রহ্মদেশীয় আহোমগণ আসাম অধিকার করিয়াছিল, তখনও ইহারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই। আহোমগণ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্রাবিড়গণ হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া শূদ্র ও দাস হইয়া থাকিবে এ কল্পনা সহ্য করিতে পারে নাই। ইহারা প্রভূত উন্নতি করিতে পারিত, কিন্তু একটি দোষই ইহাদিগকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করিয়া রাখি-য়াছে। ইহা অত্যধিক মদ্যপান। যদি ইহারা মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়া উন্নতির চেষ্টা করে তবে ইহাদের উন্নতির বাধা দূর হইয়া যায়। এই দ্রাবিড়দিগের ধর্ম্ম কি ছিল? ঋগ্‌বেদে ইহারা লিঙ্গোপাসকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। লিঙ্গোপাসনা শৈবধর্ম্মের অন্তর্গত। এখন ইহারা নানা আকার হইয়াছে, তাহাতে শৈবধর্ম্ম ঠিক আছে কিনা বলা কঠিন। ইহারা দেবী উপাসনাও করিত, পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'কামাখ্যা' দেবী মূলে আসামের অনার্য্যদিগের দেবী। আহোমগণ যখন আসাম অধিকার করিয়াছিল এবং বহু দিন

প্রবল প্রতাপে আসাম শাসন করিয়াছিল তখন তাহারাও শিব ও শক্তির উপাসনা গ্রহণ করিয়া আসামে প্রচলন করিয়াছিল। কিন্তু এ ধর্ম্ম তাহারা কাছাড়ীদিগের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করে নাই, হিন্দুদিগের মধ্য দিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। বৈদিক ধর্ম্মের কিছুই আসামে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কারণ ব্রাহ্মণগণ ছিলেন বেদে অজ্ঞ। যখন বাংলাদেশ হইতে বৌদ্ধ-ঘোষগণ গোয়ালপাড়ায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত বৌদ্ধাচার্য্যগণকেও লইয়া আসিয়াছিলেন। গোয়ালপাড়ার সন্নিকটে পঞ্চরত্ন পাহাড়ে তাঁহারা বিহারও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক চিহ্ন আজও দেখা যায়। কিন্তু অনুমান হয় পর্ব্বত হইতে গারোগণ নামিয়া আসিয়া তাহা ধ্বংস করে এবং ঘোষগণের গোসম্পদ অপহরণ করিতে থাকে। ঘোষগণ এ অবস্থায় মেচগণের শরণাপন্ন হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করে। শঙ্করদেব আসামে ভাগবৎ ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি বিষ্ণুর অবতারত্ব ও দাস্য ভক্তি স্বীকার করিতেন। পরবর্ত্তীকালে অনার্য্যদিগকে আর্য্যদের সমাজে (রাজবংশী নামে) স্থান দিয়া গোস্বামীগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন, কিন্তু অর্থের সম্বন্ধ থাকায় ইহা ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। নবদ্বীপ ও শ্রীহট্টের গোস্বামীগণ চৈতন্যপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম মণিপুরে প্রচার করেন। ইহার ফলে সমগ্র মণিপুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইয়া গিয়াছে।

এই সকল আলোচনা করিয়া মনে হয় অসমীয়া সমাজে দ্রাবিড় সভ্যতা ও দ্রাবিড় রক্ত প্রভূত পরিমাণে রহিয়াছে।

হিন্দু আমলে নারীর স্থান

শ্রীরঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ

আজকাল আমাদের দেশে আইনের সাহায্যে নারীর নানা অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে। এই ধরণের সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা যে খুবই বেশী তা সবাই স্বীকার করবেন। এ সমস্যার মূল কথা হ'ল সাম্যের ভিত্তিতে পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধকে সহজভাবে মেনে নেওয়া। পাশ্চাত্ত্য সমাজে এই নীতি কিছুদিন থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত, আমাদের সমাজে অবস্থাটা প্রায় উল্টো। বর্ত্তমানের বৈষম্যমূলক ও জটিল এই সমস্যা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতে গেলে অতীতের নারী-সমাজ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

হিন্দু আমলের প্রথম যে যুগ তা হ'ল বেদ, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদের যুগ। একমাত্র এই সময়েই নারীর অবস্থা ছিল আদর্শস্থানীয়। তখনকার সমাজ ছিল সরল, স্বাভাবিক এবং জটিলতাবিহীন। কৃষিজীবী আর্য্যপুরুষেরা জীবনের সব ক্ষেত্রেই নারীর সহযোগিতা নিয়ে চলত এবং যুদ্ধবিগ্রহে তাদেরকে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতে হ'ত বলে নারীকে স্বাধীনতা দিয়েছিল তাদের ইচ্ছামত ঘরসংসার ও শিল্পকর্ম্মাদি গড়ে তুলতে। তা ছাড়া তখনকার যে-কোন ধর্ম্মকার্য্যে পুরুষ এবং নারীকে সমানভাবে যোগদান করতে হ'ত; কাজে কাজেই কুড়ি-বাইশ বছরের পূর্ব্বে নারীর বিবাহ হ'ত না। শিক্ষিতা নারী তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকত; ফলে সমাজে অবাধ মেলামেশা, বিবাহের আগে যুবক-যুবতীর প্রণয়, বিধবার বিবাহ—এগুলিকে সহজভাবেই নেওয়া হ'ত। পর্দ্দার প্রচলন অথবা সতীপ্রথার কথা তখন কেউ ভাবতেও পারত না। স্বয়ংবর প্রথায় যেমন বিয়ে হ'ত, তেমনি বিবাহ-বিচ্ছেদও খুব সহজে ঘটতে পারত। স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল খুবই সন্তোষজনক এবং পুরুষদের মত নারীদেরও উপনয়নের পর থেকে নিয়মিত পাঠাভ্যাস করতে হ'ত। তার ফলে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গার্গী, মৈত্রেয়ীর মত বিদুষী মহিলার আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছিল। কেবলমাত্র একটি বিষয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি, সে হ'ল সম্পত্তিতে; নিজের বিয়ের যৌতুকাদি ছাড়া সমুদয়ই এমন কি প্রতিদিনের রোজগার পর্য্যন্ত পুরুষের হাতে তুলে দিতে হ'ত।

পরবর্ত্তী মহাকাব্য, সূত্র এবং স্মৃতির যুগে অবস্থার যথেষ্ট অবনতি ঘটল। এতদিনে আর্য্য-অনার্য্য সংমিশ্রণ অনেক দূর এগিয়েছে। আর্য্য-পরিবারে অনার্য্য স্ত্রী প্রবেশ করে এক মহা অনর্থের সৃষ্টি করল। অনার্য্য স্ত্রীরা যথেষ্ট শিক্ষাদীক্ষার অভাবে ধর্ম্মকার্য্যে পুরুষের সহায় হতে না পারায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য-স্ত্রীরাও তাদের সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'ল। তা ছাড়া যাগযজ্ঞ, পূজা এই সময় এত বেশী জটিল আকার ধারণ করল যে, নারীদের পক্ষে পুরুষের সঙ্গে তাল রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। ক্রমশঃ যাজক সম্প্রদায় ধর্ম্মকার্য্যে নারীকে নামেমাত্র সহযোগিনী রেখে তার এতদিনকার অধিকার খর্ব্ব করল। তার ফলে নারীর শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বহুল অংশে কমে গেল এবং উপনয়ন-প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হ'ল। শিক্ষার অভাবে নারীর অধিকার সম্বন্ধে চেতনা কমে গেল এবং তার বিয়ের বয়স কুড়ি-বাইশ থেকে নেমে এল ষোল, চৌদ্দ কিংবা বারোতে। আবার এতদিনে আর্য্যদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা পূর্ণ হবে উঠেছে, শান্তি শৃঙ্খলার

মধ্যে তাদের ভোগস্পৃহা বেড়ে যাওয়ার জন্যে তারা অল্প বয়সেই বিয়ে করা সুরু করল। অল্প বয়সে সংসারে ঢোকার ফলে নারী স্বভাবতই পুরুষের অধীন হয়ে পড়ল। বহুবিবাহ আরম্ভ হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্দাও এসে পড়ল। এ যুগে সন্ন্যাসধর্ম্মের বহুল প্রচারের ফলে সতীপ্রথা ও আজীবন বৈধব্যের আদর্শও প্রসারলাভ করল। এইভাবে কুপ্রথাগুলি ক্রমে ক্রমে এসে জুটল এবং পুরুষের নিকট নারীর অধীনতার গোড়াপত্তন হয়ে গেল। কেবলমাত্র সম্পত্তিতে নারীর অধিকার এ যুগে কতকটা এগিয়েছিল, কেননা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া সম্পত্তিতে সে জীবনস্বত্ব লাভ করল।

এর পর এল মৌর্য্য আমল। মেগাস্থিনিসের বিবরণী এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে যা জানা যায় তাতে দেখি অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। বাল্য-বিবাহ ও বহু-বিবাহ দুই-ই সমানে চলতে লাগল; ফলে নারী শোচনীয় ভাবে পরাধীন হয়ে পড়ল। শিক্ষাব্যবস্থা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকল উচ্চবংশীয়াদের মধ্যে এবং তাতে ফল এই হ'ল যে, সাধারণ নারী হয়ে পড়ল বড় বেশী আচারপরায়ণা এবং সংস্কারাচ্ছন্না। মহারাজা অশোক তাঁর এক শিলাশাসনে আক্ষেপ করেছেন যে, নারীরা অযথা কতকগুলি তথাকথিত মঙ্গল আচরণে ব্যস্ত থাকে যার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। তখনও বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলন ছিল এবং বিধবাদের বিয়েও কিছু কিছু হ'ত। তা সত্ত্বেও দুর্নীতির প্রশ্রয় এযুগে এসে পড়ল এবং আইন করে পতিতালয়গুলি নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা করতে হ'ল। তবে সম্পত্তিতে অধিকার আগের মতই বজায় রইল এবং মোটামুটিভাবে নারীর সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকল। কৌটিল্য লিখে রাখলেন তাঁর অর্থশাস্ত্রে—যেখানে নারীর অসম্মান করা হয় সেখানে দেবতারা অসন্তুষ্ট হন।

পরবর্ত্তী যুগে বা হিন্দু আমলের শেষ পর্ব্বে নারীর স্থান পূর্ণভাবে পুরুষের অধীন হয়ে পড়ল। গ্রীক-কুষাণ ও গুপ্তযুগে সংহিতা লেখকেরা ও ব্যাখ্যাকারেরা নারীকে পুরোপুরিভাবে পুরুষের কর্ত্তৃত্বের মুঠোর ভিতর এনে দিল। বিয়ের বয়স কমিয়ে করা হ'ল আট কিংবা নয়। অশিক্ষিতা বধূ হিসাবে নারী পুরুষের সহকর্ম্মিণী অথবা সহধর্ম্মিণী হবার অনুপযুক্ত হয়ে রইল। জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত ভাণ্ডার তার কাছে বন্ধ হয়ে রইল—গাথা, গল্প, পুরাণ বা উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে অতীতের শ্রুতিরোচক কাহিনীই হ'ল তার মনের একমাত্র উপজীব্য। তাতে অন্ধভক্তি, ভাবকতা ও কুসংস্কার বাড়তে থাকল। বিধবা-বিবাহ নিষেধ ও বহুবিবাহের বহুল প্রচলন নারী-সমাজকে ঠেলে দিল নানা অনাচারের পিচ্ছিল পথে। এর উপর মনু প্রমুখ কয়েকজন শাস্ত্রকার নারী-পুরুষের সম্বন্ধকে বিকৃত করে দেখালেন। তাঁরা জোর গলায় ঘোষণা করলেন যে নারীর স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়—সে বাল্যে থাকবে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের। স্ত্রী স্বামীকে দেবতার মত পূজা করবে, তার সমস্ত কথা শুনবে ও মেনে চলবে এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণে প্রাণত্যাগ করবে—এই হ'ল নারীর জন্য ব্যবস্থা। কোন স্ত্রীর সন্তান না হলে অথবা সব সন্তান মরে গেলে এমন কি তার শুধু কন্যা হলেও তাকে ত্যাগ করে তার স্বামী আবার বিয়ে করতে পারবে, পুরুষকে সে অধিকার দেওয়া হ'ল। যদিও মনু নারীর সম্মানকে অতি উচ্চে স্থান দিলেন তবু স্পষ্ট ভাবেই তাকে পুরোপুরি পুরুষের করতলগত করে দেওয়া হ'ল।

একথা আজকাল সবাই স্বীকার করবেন যে, যে সমাজে নারীর স্থান যথাযোগ্য নয় সে সমাজ-ব্যবস্থা ক্রমাবনতিশীল এবং ক্ষয়িষ্ণু। হিন্দু আমলের শেষ পর্ব্বে এই ভাবে নারীর স্থানকে হেয় করার জন্যই হিন্দুর জাতীয় শক্তি দুর্ব্বল হয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের ভারত-বিজয় সহজেই সম্ভব হয়। বৃটিশ শাসনের যুগে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা বুঝেছি যে একমাত্র শিক্ষা ও সংযমের গণ্ডীর ভিতরে নারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে গেলে তার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে পুরুষ ও নারীর সহযোগিতায়, নারী সেখানে থাকবে পুরুষের সহকর্ম্মিণী ও সহধর্ম্মিণী হিসাবে,—তার অনুগতা কৃপাপাত্রী হয়ে নয়। জগতের প্রগতিশীল সব দেশেই তাই হচ্ছে, আমাদের দেশেও যথাশীঘ্র তাই হওয়া উচিত।

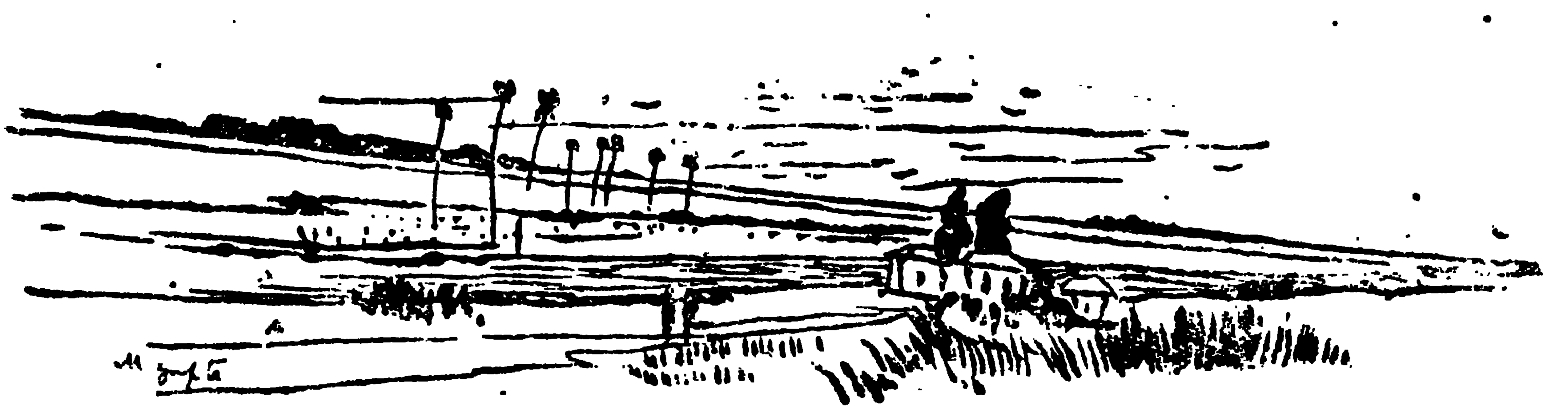

বাসি ফুল

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

আজ দিনকয়েক হইল সুধীর বাড়ী আসিয়াছে। সেদিন বিকালবেলা তাহার মা তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন—আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে সুধীর—আমাকে যদি একবার বাবা এই পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর ঘুরিয়ে আনতিস। সুধীর উৎসাহিত হইয়া বলিল—বেশ ত চল মা। আমারও ভারি ইচ্ছে—সাগর তো কখনও দেখি নি—এবার দেখে আসা যাবে। তাহার মা বলিলেন—তা হলে তো আর দিন নেই—আজ হ'ল দশমী, পরশুই যাত্রা করতে হবে।

—বেশ, তুমি গোছগাছ কর—বেশী কিছু কিন্তু নিয়ো না—যে ভিড় শুনে'ছি, পথে খুব কষ্ট হবে। আর দেখ মা, তুমি কিন্তু আগে থাকতে কারু কাছে গল্প করো না—তা হলে এবারও সেই কাশী যাবার বারের মত বার-চোদ্দ জন মেয়েছেলে এসে জুটবে।

সুধীরের মা বলিলেন—না বাবা, গল্প আবার করব কাকে ? তুই নিশ্চিন্দি থাক।

কিন্তু সন্ধ্যার আগে বোসেদের বাড়ীর নিস্তারিণী ঠাকুরাণী বেড়াইতে আসিলে তাঁহাকে বলিলেন—শুনেছ ঠাকুরঝি, সুধীর আমাকে গঙ্গাসাগরে নিয়ে যাচ্ছে—এই তো পরশু আমরা রওনা হচ্ছি। মৈত্রবাড়ীর বড়বউ ঘাটে যাইতেছিল—তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—কি বউ একেবারে যে ভরসন্ধ্যে বেলা ঘাটে যাচ্ছ। বড়বউ কি যেন বলিতে যাইতেছিল—তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—এবার বুঝি বাবা কপিল-মুনি দয়া করেছেন—পরশু আমি আর সুধীর সাগরস্নানে যাচ্ছি।

পরের দিন পাড়াময় কাহারও আর খবরটা জানিতে বাকী রহিল না। বিকালবেলা তারিণী মাঝির স্ত্রী আসিয়া ধরিয়া বসিল—দিদি ঠাকরোন, এবার আমাকে আর সদুকে সঙ্গে নিতে হবে—তা নইলে কিছুতেই ছাড়ব না। সেবার আপনারা কাশী গেলেন—আমার ভাগ্যে ঘটল না। এবার কিন্তু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতেই হবে।

সুধীরের মা বলিলেন—তাই তো সদুর মা—সুধীর রাজী হলে ত হয়। আচ্ছা যাও এখন, দেখি বলে কয়ে—সন্ধ্যেবেলা এস। বিকালবেলা সুধীর বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিলে বলিলেন, বুঝলি সুধীর, তারিণী মাঝির বউ এসে কত করে ধরেছে—তাকে আর তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আমি কিছু বলি নি বাবা—তুই যা বলিস তাই হবে।

সুধীর বিরক্ত হইয়া বলিল—তোমাকে ত আগেই নিষেধ করেছিলাম মা, যে আগে থাকতে কাউকে কিছু বলো না। আজ দেখি সারা গাঁময় সব্বাই জেনে ফেলেছে। মিত্তির-বাড়ীর পিসি, রমেনের মা বাবা যাবেন বলে ধরেছেন। এখন কাকে রেখে কাকে নেওয়া যাবে। চলুক সবাই—শেষটায় ভুগে মরতে হবে আমাকেই। একটু চুপ করিয়া ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু তার মেয়ে যাবে বললে না—তার মেয়ে তো—তার মেয়ে সৌদামিনী—সে যে আজ বছর দুই হ'ল বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী এসেছে।

পরের দিন বিকাল বেলা সুধীর জন ছয়েক যাত্রী সঙ্গে করিয়া কলিকাতার গাড়ীতে চাপিয়া বসিল।

২

পনর বছর বয়সে ভাল ঘর দেখিয়া সৌদামিনীকে তার বাবা বিবাহ দিয়াছিল। কিন্তু কয়টা মাস যাইতে না যাইতেই প্রকাশ পাইল সৌদামিনীর স্বামী সুবলের মূর্চ্ছা রোগ আছে। হঠাৎ সে কখনও কখনও অজ্ঞান হইয়া পড়ে—মুখ দিয়া ফেনা উঠে, সারা শরীর খিঁচাইতে থাকে।

সংবাদ পাইয়া তারিণী মাথায় হাত দিয়া বসিল—অনেক খরচপত্র করিয়া একমাত্র মেয়েকে বিবাহ দিয়াছিল, শেষে তাহার অদৃষ্টে এই হইল! মাস দুই পরে হঠাৎ এক দিন ভেদবমি হইয়া তারিণী ইহলোক ত্যাগ করিল। আরও কিছুদিন পরে তাহাদের বাড়ীর পাশের নদীটিতে সুবল নৌকা করিয়া কোথায় যেন যাইতেছিল—আর ফিরিয়া আসিল না। পরের দিন নদীর বাঁকের চড়ায় তাহার মৃতদেহ ভাসিতে দেখা গেল। ইহার মাস তিনেক পরে সৌদামিনী তাহার মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে—আর শ্বশুরবাড়ী যায় নাই। তারিণীর অবস্থা বেশ ভালই ছিল—খান দুই মাছ ধরার নৌকা—বেড়াজাল যাহা ছিল, ভাড়া খাটাইয়া সৌদামিনী আর তার মায়ের বেশ সচ্ছল ভাবেই দিন চলিয়া যাইত। তা ছাড়া তারিণী নগদ টাকাও কিছু রাখিয়া গিয়াছিল।

কলিকাতার গঙ্গার ঘাট হইতে তাহারা শেষ রাত্রে ষ্টীমারে চড়িল। সে কি ভিড়। সকলের আগে সুধীর, তাহার পিছনে পিছনে এক এক জন অন্যের কোমরের কাপড় ধরিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে ষ্টীমারের দিকে অগ্রসর হইল। ষ্টীমারটির দুই পাশে দুইখানি গাধাবোট জুড়িয়া দেওয়া, তাহারই একটিতে সুধীর জায়গা করিয়া লইল।

সৌদামিনী কখনও শহর দেখে নাই। কলিকাতা নগরী প্রথমেই তাহাকে একেবারে অবাক করিয়া দিল—তারপর ষ্টীমারে চড়িয়া গঙ্গার উপর দিয়া এই যে গাদা গাদা লোক যাইতেছে—ইহা আরও আশ্চর্য্য! ডায়মণ্ড হারবারের পরে সে ভাবিল এই কি সমুদ্র ? কোন দিকেই কূলকিনারা ত

চোখে পড়ে না। সব চাইতে বিস্ময় তাহার কাছে সুধীর দাদাবাবু। এত সবও জানে দাদাবাবু—কোথা হইতে কি সুবিধা আদায় করিতে হয়, কেমন করিয়া টিকেট কাটিতে হয়, জাহাজে চড়িতে হয়, আরও সব নানা প্রকারের ব্যবস্থা—সব যেন একেবারে দাদাবাবুর মুখস্থ। সৌদামিনী ভাবে—আচ্ছা হঠাৎ যদি দাদাবাবু এখন তাহাদের ফেলিয়া কোথাও চলিয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের এই ছয়টি প্রাণীর কি গতিই না হইবে। তাহারা সকলে মিলিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির হওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিবে না। ষ্টীমারের ভিতর চলিবার সময় পাশের এক যাত্রীর একটা পোঁটলায় বাঁধিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল সৌদামিনী—সঙ্গে সঙ্গে সুধীরের ধমক খাইয়াছিল সে। লজ্জায় মরিয়া গিয়াছিল সৌদামিনী। পরে খুব মিষ্টি করিয়া দাদাবাবু বলিয়াছিলেন, পথ দেখে চলতে হয়—এমনি করে কি পথে-ঘাটে চলা যায়, এখনই তো হাত পা ভাঙতে পারত। ধমক দিলে কি হইবে—সৌদামিনীর কোন দুঃখ হয় নাই। দাদাবাবুর সকলের উপরে কি সতর্ক দৃষ্টি!

সারারাত্রি ডায়মণ্ড হারবারের কাছে ষ্টীমার নোঙর করিয়া থাকিয়া সকালে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। বেলা গোটা বারোর কাছাকাছি গঙ্গাসাগরে আসিয়া পৌঁছিল। ষ্টীমার হইতে নামা এখন এক সমস্যা! ষ্টীমার তো একেবারে কূলের কাছে যাইতে পারে না, কাজেই ষ্টীমারের গায়ে অসংখ্য ভাড়াটে নৌকা আসিয়া লাগে, সেই নৌকায় চড়িয়া তীরে যাইতে হয়। এদিকে সমুদ্রের ঢেউয়ে ষ্টীমারের ডেকের তিন-চার হাত নীচের নৌকাগুলি কলার খোলার মত অনবরত দুলিতে থাকে—তাকাইলেই ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায়। কেমন করিয়া নামিবে সকলে! সুধীর ধরাধরি করিয়া সকলকে নামাইয়া দিল—অবশেষে সৌদামিনীর পালা—সুধীর চট্ করিয়া তাহার দুই-খানি হাত ধরিয়া ঝুপ করিয়া নৌকার উপরে ছাড়িয়া দিল। কি নরম অথচ জোরালো হাত দাদাবাবুর। সে একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল।

সাগরসঙ্গমের চড়ার উপরে নামিয়া—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! শুধু বালি আর বালি। এই বালির চড়ার উপরে কত যে যাত্রী আসিয়া হাজির হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে! এই বালির উপরে দুইখানা করিয়া হোগলার দরমা ফেলিয়া দিব্যি একটি কুঁড়েঘরের মত করিয়া যাত্রীরা তাহারই তলায় দুই এক দিনের জন্য সংসার পাতিয়া বসিয়াছে। এক একটি এমনি ঘরে বড়জোর দুই জন করিয়া লোক শুইতে পারে—হামাগুড়ি মারিয়া ভিতরে ঢুকিতে হয়। সৌদামিনী যে দিকে তাকায় সে দিকেই এমনি অগুনতি হোগলার ঘর। সুধীর কতকগুলি হোগলার দরমা কিনিয়া আনিল—তাহাদের চারখানা এমনি ঘর তৈরি হইল। একখানায় দাদাবাবু আর তার মা, অন্য দুইখানায় আর কয়জন, আর একখানা সৌদামিনী আর তার মায়ের জন্য ঠিক হইল। বালির উপরে বিছানা করিয়া শুইতে দিব্যি ভাল লাগিতেছিল সৌদামিনীর। তাহাদের সামনের ঘরটিতেই দাদাবাবু আর তাঁর মা থাকেন—একেবারে পাশাপাশি, হাত দুই দূর মাত্র। আগামী কল্য শেষ রাত্রি হইতে স্নান আরম্ভ হইবে, স্নান সারিয়া কপিলমুনি দর্শন, তারপর সারা মেলা ঘুরিয়া নানাপ্রকারের মূর্ত্তি দেখা—শত শত সাধু, কেহ বা লম্বা জটাওয়ালা—গায়ে ছাই মাখা, কেহ সামনে ধুনী জ্বালিয়া, কেহ চিৎ হইয়া চোখ বুঁজিয়া এই বালির উপরে পড়িয়া আছে—তাহাদের দর্শন করা আর দুই একটি করিয়া পয়সা দেওয়া। বালির উপরে উনুন খুঁড়িয়া, সঙ্গে আনা খাপরাতে চাল-ডাল মিশাইয়া খিচুড়ী পাক করিয়া লইল তাহারা। সুধীর শালপাতা কিনিয়া আনিল, সেই শালপাতা বালির উপরে পাতিয়া লইয়া তাহাতে খিচুড়ী ঢালিয়া খাইতে হইল। একেবারে বালির রাজত্ব—জামায়, কাপড়ে, গায়ে, ভাতে সব জিনিষেই কেবল বালি। শালপাতা ফুঁড়িয়া বালি উঠিয়া পাতের ভাত সব একাকার করিয়া দিতে চায়। বেশ মজা লাগিতেছিল সৌদামিনীর।

পরের দিন এক কাণ্ড করিয়া বসিল সে। শেষ রাত্রে উঠিয়া সকলে সাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া কপিলমুনি দর্শন করিতে গেল। কপিলমুনির ঘরটির কাছাকাছি সে কি ভিড়! সেই ভিড়ের ভিতরে সৌদামিনী হঠাৎ এক সময় বুঝিতে পারিল সে হারাইয়া গিয়াছে। সে তাহার মায়ের কাপড় ধরিয়া ছিল—কখন কাপড় ছাড়িয়া দিয়াছে, কখন তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা জানিতেও পারে নাই। প্রথমে সেই জনসমুদ্র ঠেলিয়া যে দিকে খুশী ছুটাছুটি করিল—চীৎকার করিয়া ডাকাডাকি করিল, শেষে কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া ক্রমে ক্রমে এক-পাশে, যেখানে একটু ভিড় কম সেখানে দাঁড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কোথায় যাইবে সে? তাহাদের হোগলার ঘরগুলা যে কোন্ দিকে—সে কোন-মতেই তাহা ঠাহর করিতে পারিল না। তাহাদের দল যে কতদূর অগ্রসর হইয়া গেল তাহাও বুঝিতে পারিল না। কিছু-ক্ষণ এমনি কাটিবার পর একজন লোক তাহার নিকটে আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি কি হারিয়ে গেছেন? সৌদামিনী কোনক্রমে জবাব দিল—হ্যাঁ।

—আমার সঙ্গে আসুন—আমাদের আপিসে যেতে হবে, সেখান থেকে খোঁজ করে আপনার ঠিকানায় পৌঁছে দেব। সৌদামিনী লোকটির কথা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিল না—অনেক দ্বিধা ও সংকোচের পর তাহার সহিত চলিতে লাগিল। কাছেই তাহাদের আপিস। কয়েকজন মিলিয়া তাহাকে প্রশ্ন

করিতে লাগিল—সঙ্গে কে কে আছে? কেমন করে হারিয়ে গেলেন? আপনাদের বাসা কোন্ দিকে কিছু ঠাহর করতে পারেন? পুষ্করিণীর কোন্ দিকে ছিলেন? ঐ যে লাল নিশান উঠছে ঐ দিকে কি আপনাদের বাসা? সৌদামিনী কোন প্রশ্নেরই ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারিল না।

অবশেষে একজন স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে তাহাকে দিয়া আপিস হইতে বলিয়া দিল—এর সঙ্গে যান, সারা মেলা ঘুরে ঘুরে ঠিক করুন কোথায় আপনাদের বাসা। সেই স্বেচ্ছাসেবকটির সহিত সৌদামিনী আপিস হইতে বাহির হইতেছে এমন সময় সে চেঁচাইয়া উঠিল—ঐ যে দাদাবাবু—ঐ—। ততক্ষণে সুধীর আগাইয়া আসিল। সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল, তুমি ভারি অসাবধান সৌদামিনী, তোমার জন্যে সকলে তো মহা চিন্তিত, তোমার মা তো একেবারে কেঁদে-কেটে অস্থির। কেমন করে হারিয়ে গেলে বল ত? সৌদামিনী জবাব দিল, যা ভিড়, হাতের কাপড় কখন ছুটে গেল ঠিক পাই নি। আবার সেই কপিলমুনির মন্দিরের কাছ দিয়া ভিড়ের মধ্যে সৌদামিনী ক্রমাগত পিছাইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, সুধীর ডান হাত দিয়া তাহার একখানি হাত শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া পথ করিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ভিড় অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিয়া সুধীর যখন তাহার হাত ছাড়িয়া দিল, তখন সে লজ্জা ও সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গিয়াছে।

তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই—আকাশের পশ্চিম প্রান্তে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছে। সমুদ্রের একেবারে তীর ঘেঁষিয়া চলিয়াছিল তাহারা—সমুদ্রের অশ্রান্ত গর্জ্জন আর যাত্রীদের কোলাহলে সারাটা জায়গা মুখরিত হইতেছিল। সুধীর বলিল, তোমার মত আনাড়ী লোককে কি কখনও তীর্থস্থানে আনতে হয়! তীর্থে এসে এত লজ্জা আর সঙ্কোচ করলে পায়ে পায়ে বিপদ।

সৌদামিনী হাসিয়া বলিল, আনাড়ী লোক বলেই ত আপনার সঙ্গে এসেছি, অন্য কেউ হলে কি মা আমাকে নিয়ে আসত?

নিজেদের বাসার কাছে আসিয়া সুধীর ডাকিয়া বলিল, এই যে সৌদামিনীর মা, তোমার মেয়েকে ফিরিয়ে এনেছি দেখ।

সাগরস্নান সারিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া সৌদামিনীর মনে হইল—আহা, এ যেন সাতটা দিনের একটা মধুর স্বপ্ন! সারাটা জীবন ধরিয়াই যদি এমনি সাগরস্নান চলিত!

৩

কয়েক দিন পরে সুধীর কলিকাতায় চলিয়া গেল। সৌদামিনীর কিন্তু আর কিছুতেই মন টিকিতেছিল না। নিজেদের বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া ক্ষণে ক্ষণে তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল সাগরসঙ্গমের সেই দৃশ্য। সেই উন্মুক্ত আকাশতলে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল জল আর জল—সেই সমুদ্রের অশ্রান্ত গর্জ্জন—সেই জনসমুদ্রের কোলাহল, সেই বালির উপরে বাঁসা বাঁধিয়া দাদাবাবুদের সহিত এক সঙ্গে থাকা, ষ্টীমার রেলগাড়ীতে ঠেলাঠেলি করিয়া স্থান করিয়া লওয়া। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া সে যেন অন্ধকূপের ভিতরে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমে বাঁশের ঝোপ, দক্ষিণে কলাবাগান, পূর্ব্বে সুপারি বাগান-ঘেরা এই সুন্দর বাড়ীখানি যেন তাহার নিকট আজ একেবারে বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সময় সময় সে সুধীরের মায়ের নিকটে গিয়া বিনা কারণে বসিয়া থাকে। সেদিন বলিতেছিল, আবার যদি কোথাও তীর্থ করতে যান খুড়ীমা, আমাকে আর মাকে কিন্তু সঙ্গে নিতে হবে। সুধীরের মা বলিলেন, সুধীরের ত ইচ্ছে একবার পুরী যায়—গঙ্গাসাগরের সমুদ্দুর দেখে নাকি তার মন ভরে নি। দেখি, মহাপ্রভু যদি টানেন তবে আষাঢ় মাসে শ্রীক্ষেত্র যাব ইচ্ছে আছে। সেইদিন হইতে সৌদামিনী দিন গুনিতে থাকে কবে আষাঢ় মাস আসিবে, কবে দাদাবাবুদের সঙ্গে আবার শ্রীক্ষেত্রে যাইতে পারিবে।

মাস দুই পরে হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে সৌদামিনীর মা ইহলোক ছাড়িয়া গেল। সৌদামিনী এবার একেবারে একা। নিকটেই দূরসম্পর্কের তাহার এক মাসির বাড়ী। মাসির আর কেহ ছিল না, তাহাকেই সৌদামিনী নিজের বাড়ী আনিয়া রাখিল।

সৌদামিনীর বয়স এই সবে উনিশ। সুন্দরী বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। সেদিন তাহার মাসি কথায় কথায় বলিতেছিল, বুঝলি সদু, এমনি করে আর কত কাল থাকবি, সারাটা জীবনই ত পড়ে আছে। বিধবার বিয়ে ত আজকাল আমাদের সমাজে চলছে, যদি মত করিস—বল। ও পাড়ার কেষ্ট মাঝির ছেলে ত এক পায়ে খাড়া। তুই কেবল মত করলেই হয়। তার অবস্থাও ত ভগবানের ইচ্ছেয় খারাপ নয়—দুই-এক'শ খরচ করতেও রাজী আছে।

সৌদামিনী চোখ পাকাইয়া জবাব দিয়াছিল, এইজন্যে বুঝি তোমার রোজ রোজ ঐ পাড়ায় যাওয়া হয় মাসি। সে দিন যে এতগুলো তামাকপাতা আর পান নিয়ে এলে, ওগুলো কেষ্ট মাঝির ছেলে ঘুষ দিয়েছিল বুঝি। অমনি যদি কর, আমার বাড়ীতে তা হলে আর জায়গা হবে না কিন্তু মনে রেখ।

মাসি আর কোন কথা বলে নাই, ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া গিয়াছিল।

বিকালবেলা সুধীরের মায়ের কাছে দাওয়ার উপরে সৌদামিনী বসিয়াছিল—এমন সময় ডাকপিয়ন আসিয়া একখানা চিঠি দিয়া গেল। খামখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া সুধীরের মা বলিলেন—সুধীর লিখেছে। খামখানা খুলিতেই তাহার ভিতর হইতে খানকয়েক ছোট ছোট ছবি বাহির হইয়া পড়িল! তাড়াতাড়ি সুধীরের মা ছবিগুলি তুলিয়া লইয়া বলিলেন—সুধীরের ফটো, দেখবি সহু—বলিয়া তাহার হাতে ফটো কয়খানি দিয়া চিঠি পড়িতে মন দিলেন। সৌদামিনী সতৃষ্ণ নয়নে ফটোগুলি দেখিতে লাগিল—চারখানা চার ধরণের ছবি—কোনখানিতে সে হাসিতেছে—কোনখানিতে ডাক্তারী কোট প্যাণ্ট পরিয়া ষ্টেথেস্কোপ হাতে করিয়া, কোনখানিতে খালি গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। সুধীরের মা ফটোকয়খানি তাহার হাত হইতে লইয়া খামের ভিতরে পুরিয়া পঞ্জিকার ভাঁজের মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিয়া বলিলেন—তুই একটু বোস সহু—আমি দুধের কড়াটা তুলে রেখে আসি।

সৌদামিনীর হঠাৎ কি বুদ্ধি হইল—তাড়াতাড়ি পঞ্জিকাখানা খুলিয়া খামের ভিতর হইতে একখানি ফটো বাহির করিয়া নিজের বুকের কাপড়ের ভিতরে লুকাইয়া ফেলিয়া—আবার তেমনি করিয়া খামখানা পঞ্জিকার ভিতরে রাখিয়া দিল।

আষাঢ় মাসে কিন্তু সুধীর বাড়ী আসিল না—তাহার মাও নানা কাজের চাপে শ্রীক্ষেত্রে যাইবার কথা ভুলিয়া গেলেন। শুধু ভুলিল না সৌদামিনী। সুধীরের মাকে অনেকবার স্মরণ করাইয়া দিয়া—অনেক তাগিদ দিয়া অবশেষে রথযাত্রা বাহির হইয়া গেলে নিরস্ত হইল।

পূজার সময় সুধীর বাড়ী আসিবে। তাহাদের গ্রাম রেল ষ্টেশন হইতে মাইল দেড়েক পথ। এই পথেরই আধ মাইলটাক জায়গা এমনই খারাপ হইয়া গিয়াছে যে, কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত সেখানে এক হাঁটু জল আর কাদা জমিয়া থাকে—সকলেরই আসিতে যাইতে বড় কষ্ট হয়—তবু কেহ মেরামত করিবার নামটি পর্য্যন্ত করে না। সুধীরেরও আসিতে খুব কষ্ট হইবে—তাহাই সুধীরের মা বলিতেছিলেন। সুধীর ষ্টেশনে আসিতে যাইতে কষ্ট পাইবে—এই কথাটা বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া সৌদামিনীর মনে বিঁধিতেছিল। পরের দিন সুধীরের মায়ের নিকটে গিয়া বলিল—একটা কথা খুড়ীমা—কাল আপনি পথের কথা বলছিলেন না—আমার ইচ্ছে যদি তিন-চারশ' টাকার ভিতরে হয় তা হলে পথটা আমিই মেরামত করে দেই। দাদাবাবু এলে আপনি শুনে রাখবেন—কত টাকা লাগবে। শুনিয়া সুধীরের মা একেবারে অবাক হইয়া গেলেন, বলিলেন—এত টাকা তুই পাবি কোথায় সহু—আর কেনই বা দিতে যাবি? সৌদামিনী বলিল—টাকা আমার আছে খুড়ীমা—মা মারা গেলে গুনে দেখলাম আটশ' টাকা তার বাক্সে ছিল। কি হবে আমার টাকা দিয়ে—কার জন্তে রেখে যাব। তবু তো একটা ভাল কাজে খরচ হবে। সুধীরের মা দুঃখের সঙ্গে বলিলেন—তোর কথা শুনে কষ্ট হয় মা—এই কচি বয়স অথচ সব সাধ-আহ্লাদই তোর শেষ হয়ে গেছে। সুধীর বাড়ী আসিয়া শুনিয়া বলিল—তুমি বল কি মা, একটা অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে মেয়ে—তার এত বড় হৃদয়! গ্রামে কিন্তু কত বড় বড় লোক রয়েছে তারা কেউ কথাটি বলে না।

সুধীরের মা বলিলেন—মেয়েটি বড় ভাল বাবা!

সেবার তিনশ' টাকা খরচ করিয়া রাস্তাটি মেরামত হইয়া গেল।

৪

বৎসরখানেক পরের কথা। সুধীর ডাক্তারী পাস করিয়া গ্রামে আসিয়া বসিয়াছে। এবার আত্মীয়স্বজন তোড়জোড় করিয়া তাহার বিবাহের জন্ত লাগিল। কয়েক স্থানে মেয়ে দেখার পর অবশেষে একস্থানে পাকা কথা হইয়া গেল। শহরে মেয়ে। বৈশাখ মাসেই বিবাহ। সুধীরের মা সে দিন সৌদামিনীকে বলিলেন—বিয়ের সব বাইরের কাজের ভার কিন্তু তোর ওপরে রইল সহু—একা মানুষ নইলে তো আমি পারব না, মা। সৌদামিনী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। বিবাহের পর সুধীর বউ লইয়া বাড়ী আসিয়াছে। লোকের মুখে মুখে বউয়ের খুব সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল—খুব ভাল বউ—খুব সুন্দরী বউ। আজ বউভাত—বাহিরের উঠানে ব্রাহ্মণভোজন চলিতেছে। সৌদামিনী একগাদা বাসনকোসন লইয়া উঠানের এক পাশে মাজিতে বসিয়াছিল—কি কাজে যেন বউয়ের ঘরের দিকে আসিয়াছে—বউয়ের কাছে তখন কেউ ছিল না। সেদিকে নজর পড়িতেই সৌদামিনী দেখিল—নূতন বউ তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। সৌদামিনী আগাইয়া গেলে বলিল—তুমি বুঝি এ বাড়ীর ঝি। দেখ আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। আমার ঐ জুতোজোড়াটা যদি জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে পার—কাল কাদায় পড়ে দামী জুতোজোড়া একেবারে বিশ্রী হয়ে গেছে। সৌদামিনী কোন জবাব না দিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল—নূতন বউ পুনরায় ডাকিয়া বলিল—শোন, রাগ করলে? কেন, আমাদের বাড়ীতে তো ঝি চাকরে এমনি সব কাজ করে থাকে। সৌদামিনী আর দাঁড়াইল না। পুনরায় বাসনে হাত দিয়া সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সকলের অলক্ষ্যে হাত ধুইয়া নিজের বাড়ী চলিয়া আসিল। রাত্রে সুধীরের মা তাহাকে আহারের জন্ত ডাকিয়া পাঠাইলেন—কিন্তু সে শরীর খারাপ করিয়াছে বলিয়া গেল

না—সেই যে সুধীরদের বাড়ী হইতে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল আর উঠিল না, সারা রাত্রির ভিতরে জলটুকু স্পর্শ করিল না।

৫

সৌদামিনীর দিন আর কাটিতে চাহে না। সংসার তাহার নিকটে একেবারে নিরর্থক হইয়া গিয়াছে—এখানে সে এতটুকু আনন্দ খুঁজিয়া পাইতেছে না। এ জীবনে তাহার মূল্য কি? কি হইবে এমনি করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া।

একবার সৌদামিনীর মাসির খুব জ্বর হইল। কয়েক দিন ধরিয়া সুধীর তাহাকে দেখিবার জন্ত আসিতে লাগিল। হাত দেখিয়া, বুক দেখিয়া ইনজেক্‌শান দিতে প্রতিবারেই সুধীরের প্রায় ঘণ্টাখানেক করিয়া সময় লাগিত। সৌদামিনী মহা উৎসাহে ইনজেক্‌শানের জন্ত জল গরম করিয়া দিত, হাত ধুইবার জল দিত—পথ্যাপথ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিত। কয়েকদিনের মধ্যে তাহার মাসি ভাল হইয়া উঠিল। সুধীরের আর আসিবার প্রয়োজন নাই—সৌদামিনীর দিন আবার আগের মত বিস্বাদ হইয়া গেল। হঠাৎ কোন কোন সময় তাহার অজ্ঞাতে মনে হইত—এত তাড়াতাড়ি তাহার মাসি ভাল হইয়া উঠিল কেন?

কয়েক দিন ভাবিয়া ভাবিয়া এক দুর্বুদ্ধি আসিল সৌদামিনীর মাথায়। কার্ত্তিক মাসের দিনে সে প্রত্যহ তিন-চার বার করিয়া স্নান করিতে লাগিল—রাত্রে অনেকক্ষণ ধরিয়া হিমের ভিতরে পাটি পাতিয়া শুইয়া থাকিত। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিকে কয়েক দিন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল—সমস্তটা বৃষ্টি তাহার মাথার উপর দিয়া গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই ইহার ফল ফলিল। সৌদামিনীর বুকে পিঠে বেদনা হইয়া জ্বর হইল। সুধীর তাহার বুক পরীক্ষা করিয়া বলিল—"প্লুরিসি"। খুব খারাপ অসুখ। কয়েক দিন ধরিয়া অসহ্য বুকের বেদনার সঙ্গে জ্বর চলিতে লাগিল। সুধীর রোজ দুই বেলা করিয়া আসে—হাত দেখে, বুক পরীক্ষা করে, ইনজেক্‌শান দেয়। দিন পনর পরে সৌদামিনী অনেকটা সারিয়া উঠিল বটে, কিন্তু একেবারে ভাল হইল না। মাঝে মাঝে নিশ্বাস লইতে তাহার বুকের ভিতরে বেদনা করিত। সুধীর তাহাকে খাইবার জন্ত একটা পেটেণ্ট ঔষধ দিয়াছিল। ঔষধ কিন্তু সৌদামিনী খাইত না—সকলের অলক্ষ্যে প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া ঢালিয়া ফেলিয়া দিত। সে ভাবিত কি হইবে বাঁচিয়া—এ জীবন কোন্ কাজে লাগিবে? কোন রকমে প্রতিদিন স্নান আহার করা—নিজের জন্ত সামান্ত যা কিছু কাজ করা, প্রতিদিন এই একঘেয়েমি কাজ ছাড়া সংসারে তাহার আর কিই বা করিবার আছে? ইহার জন্ত তাহাকে এমনি করিয়াই বঞ্চিত জীবনের বোঝা বহন করিয়া বেড়াইতে হইবে?...

মাস দুই এমনি চলিবার পর পুনরায় সুধীর এক দিন তাহার বুক পরীক্ষা করিয়া রীতিমত চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাগ করিয়া বলিল—এত দিন করছিলে কি—এক বার এসে আমাকে দেখাতে পার নাই!

সুধীরের মা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন—সৌদামিনী চলিয়া গেলে বলিলেন—কেমন দেখলি সুধীর? সুধীর চিন্তিত মুখে বলিল—আমার ত মনে হয়—শক্ত অসুখ, বাঁচা কঠিন।

—তাইতো বাবা, মেয়েটা কি শেষে এমনি করে মারা পড়বে?...

মাসখানেক পরে, সৌদামিনী একদিন শুনিতে পাইল—সুধীর চাকুরী লইয়া কলিকাতায় যাইতেছে। ইহার দিন তিনেক পরে সত্য সত্যই সুধীর তাহার ডিস্‌পেন্সারী বন্ধ করিয়া বিছানা বাক্স লইয়া কলিকাতায় রওনা হইয়া গেল।

সৌদামিনীর আর কোন আশা নাই—আকাঙ্ক্ষা নাই। এবার মরিতে পারিলেই হয়। সে বারে বারে মনে মনে নিজের মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল। তাহাদের গ্রাম হইতে মাইলখানেক দূরে পঞ্চাননতলা—পঞ্চাননতলার শিব ঠাকুর জাগ্রত দেবতা—যে যা কামনা করিয়া পূজা দেয় তাই ফলে। সেদিন সুধীরের মা বলিলেন—কাল পঞ্চাননতলায় পূজো দিতে যাব সদু—তোর হয়ে পূজো দিয়ে আসব—যাতে ভাল হয়ে উঠিস।

—ভাল আর আমি হতে চাই নে খুড়ীমা—ঠাকুরের কাছে সে প্রার্থনা আপনি করবেন না। তবে যদি পরজন্মে মানুষ হই—ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবেন এমন কপাল করে যেন আর না আসি। বলিতে বলিতে সৌদামিনী ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।...

ধীরে ধীরে অসুখ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। রাত্রে ঘুম হয় না—প্রথম দিকে একটু তন্দ্রার মত হয়—সারাটা রাত্রি জাগিয়া কাটে। তাহার ঘরের পশ্চিমের জানালাটি খুলিয়া দিয়া সে একদৃষ্টে আকাশের পানে তাকাইয়া থাকে।...

সেদিন বিকাল হইতেই শ্রাবণের ধারা অঝোরে ঝরিয়া পড়িতেছিল। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ঝিঁ ঝিঁ শব্দ একেবারে যেন কানের ভিতরে আসিয়া বিঁধিতেছিল। সৌদামিনীর বাড়ীর পাশের মরা গাঙে বানের জল আসিয়াছে—সেখান হইতে অসংখ্য কোলা ব্যাঙের ডাক কানে ভাসিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যাবেলা বিছানায় শুইয়া সে যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে অতিকষ্টে বিছানার নীচে হাতড়াইয়া কি যেন বাহির করিল, তারপর শিয়রের বাতিটি একটু উস্কাইয়া দিয়া সেই চুরি-করিয়া আনা সুধীরের ফটোখানার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিল। পরে ছবিখানি বুকের কাপড়ের ভাঁজের ভিতরে রাখিয়া

দিয়া চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। শেষরাত্রির দিকে অবস্থা তাহার অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। কয়েক বার বিছানার এপাশ-ওপাশ করিল, ভয় পাইয়া কাহাকে যেন ডাকিতে চাহিল, কিন্তু কথা ফুটিল না···কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া চিরদিনের মত একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। রাত্রি তখন একেবারে শেষ হইয়া আসিয়াছে—পশ্চিম আকাশে শুকতারাটি তখনও জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল।

সোমনাথ মন্দির দর্শনে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

[সম্ভবতঃ ৩০৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস্ প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন]

দেউল কি ? না না এ বিস্ময় !
আবির্ভাব সুন্দরের,
নরের এ হাতে গড়া নয়।
তুঙ্গ মন্দিরের শ্রেণী
মিশিয়াছে আকাশের নীলে,
ভূমাকে আনন্দ করি
পাষাণেতে এ কি রূপ দিলে ?
স্বরগের শিল্পী হেথা
রেখে গেছে তার পরিচয়।

২

চূড়াগুলি সব স্বর্ণময়,
সুবর্ণ-পদম ঊর্দ্ধে,
'ক্রেসস' কি করেছে সঞ্চয় ?
সঙ্গীত অশ্রুতপূর্ব্ব
সুধাস্যন্দী, গম্ভীর, মহান্,
পাষাণ ভিতরে যেন,
'অর্ফিউস্' গাহিতেছে গান
অনন্ত অম্বরে উঠি
স্বর্গ মর্ত্ত্যে করে সমন্বয়।

৩

স্নাত ভক্ত পূজারীর দল—
বিবিধ নৈবেদ্য বহি'
অবিশ্রান্ত করে চলাচল।
বিনীত বিচিত্র-বেশ
বর্ণের কি সমারোহ তার,
পুণ্য গন্ধ পরিবেশে
মানুষ সংসার ভুলে যায়,
আছেন যে ভগবান
মনে আর থাকে না সংশয়।

৪

দেবতা কি করে হেথা বাস ?
জানি নাকো দেখে কিন্তু
জাগে বুকে বিপুল উল্লাস।
হিন্দুর এ প্রাণকেন্দ্রে
পাওয়া যায় জীবনের সাড়া ;
সুদূর যুগের গন্ধ
সুপ্রাচীন সাধনার ধারা,
হেথা আমি প্রজ্ঞানের
সর্ব্বাঙ্গীণ হেরি অভ্যুদয়।

৫

সুঠাম পেশল দৌবারিক
যেন শত 'হার্কুলিস'
দাঁড়ায়ে রয়েছে নির্নিমিখ।
বিরাট তোরণদ্বার
সুবিশাল সুন্দর কবাট
ভিতরেতে অফুরন্ত
অপার্থিব আনন্দের হাট।
ধ্যানমগ্ন যোগীজন
প্রেমানন্দে পূর্ণ হয়ে রয়।

৬

এ যে দেশ-জাতির গৌরব !
সাধু, যাত্রী, পর্য্যটক
সবাকার চিত্ত নেত্রোৎসব।
এ মহা বৈরাগ্য-ক্ষেত্রে
বিস্ময়েতে হয়ে যাই মূক,
স্বর্গের অমৃত-সত্রে
অপাংক্তেয় আমি আগন্তুক—
তবু অবনত শিরে
দেবতার গেয়ে যাই জয়।

বিশ্বের খাদ্য-সঙ্কট

শ্রীসারথিনাথ শেঠ, এম্-এ

যুদ্ধোত্তর বিশ্বে আজ যে সমস্তাগুলি পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন এনেছে, তার মধ্যে বোধ হয় খাদ্য-সঙ্কট সমস্তা অন্যতম। এই সমস্যার সমাধানের জন্য বহু গবেষক, রাষ্ট্রনেতা, চিন্তানায়ক নানাভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতি বৎসর সমবেত হন এবং পৃথিবীর ছোট ও বড় রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতায় কি ভাবে এর সমাধান করা যায় সে বিষয়ে বহু পন্থা নির্দ্ধারণ করেন। ১৯৪৬ সালে ২রা এপ্রিল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশ্বের খাদ্য-পরিস্থিতির বিষয় একটি মন্তব্যলিপি প্রকাশ করেন। তা থেকে জানা যায়— ইউরোপ মহাদেশের উৎপাদিত গম-শস্যাদির পরিমাণ ১৯৪৫ সালের হেমন্তে মাত্র ৩ কোটি ১০ লক্ষ টন ছিল, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে এর পরিমাণ ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টন এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে স্বাভাবিক অবস্থায় ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টন পাওয়া যেত। অবশ্য রুশিয়ার হিসাব এতে দেওয়া হয় নি। ১৯৪৫-৪৬ সালে হেমন্তে ইউরোপের উৎপাদিত শস্যাদির অতিরিক্ত চাহিদার পরিমাণ ১৫°৬ লক্ষ টন ছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে মাত্র ৩'৭ লক্ষ টন ছিল। ভারতবর্ষ, চীন, ফ্রান্স, উত্তর-আফ্রিকা, দক্ষিণ-আফ্রিকা এবং আরও অন্যান্য দেশের যুদ্ধের পূর্ব্বে চাহিদার পরিমাণ মাত্র ২'৪ লক্ষ টন ছিল, কিন্তু তা বেড়ে গিয়ে ১০'৭ লক্ষ টনে দাঁড়ায়।

ব্রহ্ম ও শ্যাম প্রধান দুটি চাউল রপ্তানীকারী দেশে ১৯৪৬ সালের উৎপাদন মাত্র ৪'৯ লক্ষ টনে দাঁড়ায়, সেখানে যুদ্ধের পূর্ব্বে উৎপাদনের পরিমাণ স্বভাবতঃ ৮'৪ লক্ষ টন পাওয়া যেত। বর্ত্তমানে আমাদের মাথাপিছু ক্যালোরীর পরিমাণ এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। নিম্ন-তালিকায় তা প্রদর্শিত হ'ল।

	সমগ্র লোকসংখ্যার জন্য ১৯৪৫ সালের মাথাপিছু ক্যালোরীর হিসাব	যুদ্ধের পরে শতকরা পরিবর্ত্তনের হার
যুক্তরাষ্ট্র	৩,১৫০	১০২
কানাডা	৩,০০০	১০০
অষ্ট্রেলিয়া	২,৯০০	৯৭
ডেনমার্ক, সুইডেন	২,৮৫০।২,৯০০	৯০।৯৫
যুক্তরাজ্য	২,৮৫০,	৯৫
ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে	২,৩০০।২,৫০০	৭৫।৮৫
গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইটালী	১,৮০০।২,২০০	৭০।৭৫
জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া	১,৬০০।১,৮০০	৫০।৬০
ভারতবর্ষ, চীন ও অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলি	১,৫০০।২,০০০ কোনও কোনও স্থানে ৫০০	

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উত্তর-আমেরিকার উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ক্যালোরীর পরিমাণ যুদ্ধের পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং দক্ষিণ-আমেরিকায় শতকরা ১৭ ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরাজিত জাতিসমূহের মধ্যে জার্ম্মাণীতে তা কমে গিয়ে অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে

যবদ্বীপের একজন চাষী তার পুকুরের মাছগুলিকে খাবার দিতেছে

জনসাধারণের ভাগ্যে যে পরিমাণ খাদ্য জোটে তা অল্পমাত্র কমে গেলেই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। চীনদেশেও এই খাদ্যাভাব স্থায়ীরূপে বিদ্যমান আছে এবং সময়ে সময়ে তা দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করে। জাপানে যুদ্ধের পূর্ব্বে পাশ্চাত্ত্যের উন্নত জাতিসমূহের পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য জোটে নি।

খাদ্যাভাবের দরুন যে ভীষণ অবস্থায় আমরা পড়েছি তার বেশীর ভাগ অঞ্চলে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ বা অভাব যুদ্ধের পূর্ব্বেও

যবদ্বীপের একটি কৃষক পরিবার

ছিল। যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন ও কানাডার চেষ্টায় সম্মিলিত খাদ্যবোর্ড সংগঠিত হয়। তার দ্বারা সমস্যার সমাধান বিশেষ কিছুই হয় নি। ১৯৪৩ সালে ভার্জিনিয়া প্রদেশের হট্ স্প্রীংসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তরফ থেকে খাদ্য-কৃষি-বিষয়ক সম্মেলন আহূত হয় এবং সেখানে প্রচারিত হয় যে, সকলের প্রয়োজনীয় আহারের সংস্থান করতে গেলে সমগ্র পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি রেখে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হওয়া উচিত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য এবং কৃষি প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধিবেশন হয় কানাডার কুইবেক্ শহরে ১৯৪৫ সালে ১৬ই অক্টোবর থেকে ১লা নবেম্বর পর্য্যন্ত। সভাপতি মিঃ লিষ্টার বি. পিয়ারসন (ওয়াশিংটনস্থ কানাডার মন্ত্রী) বিশ্বের সকল জাতির সতর্ক হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এই জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠানের প্রতি সকল রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ সহযোগিতাই হবে 'বিশ্বব্যাপী খাদ্যাভাব বিদূরণের অন্যতম পন্থা। ১৯৪৬ সালের ২০শে মে থেকে ২৭শে মে তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিসচিব মিঃ ক্লিটন এণ্ডারসনের সভাপতিত্বে আর একটি জরুরী অধিবেশনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদ্দ্বারা খাদ্য-কৃষি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ স্যার জন্ বয়েড অরকে ভারার্পণ করা হয় যাতে শীঘ্রই স্থায়ীভাবে বিশ্বের খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্ত বিশেষজ্ঞদের এক পরামর্শ সমিতি গঠন করা যায় এবং সমগ্র খাদ্যাভাব-পীড়িত অঞ্চলে অত্যন্ত পর্য্যাপ্ত উৎপাদনকারী দেশগুলি থেকে খাদ্যের আমদানীর ব্যবস্থা করার চেষ্টা হয়।

১৯৪৬ সালে ২রা সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় অধিবেশনের সময় খাদ্য ও কৃষিপ্রতিষ্ঠানের কর্ম্মাধ্যক্ষ জানান যে, কোনও দিনই পৃথিবীতে যথেষ্ট খাদ্যের সংস্থান ছিল না। যুদ্ধের পূর্ব্বে দশ কোটি লোকের মাথাপিছু ২,২৫০ ক্যালোরী পরিমাণ খাদ্যও জুটত না। অথচ ব্রিটেনের বর্ত্তমান সঙ্কটপূর্ণ অবস্থাতেও মাথাপিছু ২,৭৫০ ক্যালোরীর ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করতে পেরেছেন। পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন যে সত্তরটি দেশে বাস করে সেগুলির বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যদি ১৯৬০ সালের লোকসংখ্যা বর্ত্তমান সময় থেকে শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় তবে আমাদের বাঁচবার জন্ত অন্ততঃ আট রকম নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যের শতকরা উৎপাদন-বৃদ্ধি নিম্নলিখিতরূপ হওয়া চাই—

	শতকরা পরিমাণ
খাদ্যশস্যাদি	২১
কন্দমূলাদি	২৭
চিনি	১২
স্নেহপদার্থ জাতীয়	৩৪
ডাল	৮০
ফল ও তরি-তরকারি	১৬৩
আমিষাদি	৪৬
দুধ	১০০

তিনি আরও বলেন যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক লোকের প্রয়োজনমত খাদ্যের সংস্থান ছিল না। শিশুদের শরীর পোষণ উপযোগী বা শরীরকে স্বাভাবিক কর্ম্মঠ রাখবার জন্ত যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে পারা যেত না। ১৯৪৬ সালের হেমন্তকালে যে বৎসর শেষ হয়েছে সেই সময় খাদ্যশস্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৪ কোটি টন, কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি বৎসর ৪১ কোটি টন পাওয়া যেত। সেই বৎসর খাদ্যের-জন্ত প্রয়োজন ছিল ৩৫'৫ কোটি টন। ১৯৪৭ সালে হেমন্তে যে বৎসর শেষ হয়েছে সেই বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি টন, তা সমগ্র পৃথিবীর চাহিদার চেয়ে শতকরা ১২'৪ ভাগ কম।

১৯৪৭ সালের প্রথমার্দ্ধে উৎপন্ন চাউল বণ্টনের বিবরণ

২রা জানুয়ারী (১৯৪৭ সালে) ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক জরুরী খাদ্য-সভায় ঘোষণা করা হয়। তাতে প্রকাশ—

ভারতবর্ষ	৪'১	লক্ষ	টন
চীন	২'৪৫	"	"
মালয়	২'২৫	"	"
সিংহল	২'০০	"	"
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল,			
মধ্যপ্রাচ্য ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	'৫৮৭	"	"
কোরিয়া	'৫	"	"
দক্ষিণ-আফ্রিকা	'০৭	"	"

এই সভা বিশেষ করে জানান যে, পৃথিবীতে যে কয়েকটি জাতি শুধুমাত্র চাউলের দ্বারা জীবনধারণ করে, তাদের চাহিদার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ চাউল নেই, কেননা মাত্র ১৬'৮২৬ লক্ষ টন চাউল বণ্টনের জন্য সংগ্রহ করা যেতে পারে, কিন্তু সমগ্র দেশগুলির প্রয়োজন মিটাতে এর দ্বিগুণ পরিমাণ শস্য সরবরাহ হওয়া দরকার।

১৯৪৭ সালে ৯ই জুলাই থেকে ১৩ই জুলাই পর্য্যন্ত প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক খাদ্যশস্য সম্মিলনে সভার কর্ম্মসচিব ডঃ ফিটজেরাল্ড বিশেষভাবে বলেন, ১৯৪৭-৪৮ সালের হিসাবে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে—অভাব রয়েছে মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ টন পরিমাণ, শস্যাদির অতিরিক্ত চাহিদার পরিমাণ ৫ কোটি টন, কিন্তু পাবার সম্ভাবনা মাত্র ৩ কোটি ২০ লক্ষ টন ছিল অর্থাৎ অভাবের পরিমাণ ১ কোটি ৮০ লক্ষ টন।

এর পর ১৯৪৭ সালে ২৫শে আগষ্ট থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ডঃ এফ্. টি. ওয়াহলেনের (সুইটজারল্যাণ্ড) অধিনায়কত্বে জেনেভাতে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় অধিবেশনে প্রায় ৩৭টি জাতির প্রতিনিধি যোগদান করেন। খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মাধ্যক্ষ স্যর জন্ বয়েড্ অর্ সকলকে সতর্ক করে বলেন—পর বৎসর শীত ও বসন্তের মধ্যে ইউরোপে লক্ষ লক্ষ লোককে অনাহারে কাটাতে হবে। এশিয়ার জনসংখ্যার অধিকাংশকে খাদ্যাভাবের মধ্যে কাটাতে হয় এবং এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের আয়োজন না করতে পারলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাতেই খাদ্যাভাবের হাহাকার পড়ে যাবে।

১৯৪৮ সালের ১৫ই নবেম্বর থেকে ১৯শে নবেম্বর পর্য্যন্ত এই সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে নূতন কর্ম্মাধ্যক্ষ মিঃ নরিস্ ই. ডড্ বলেন যে, ১৯৪৮ সালে যদিও উৎপাদিত শস্যাদির ফলে পৃথিবীর খাদ্যসঙ্কটের পরিমাণ লাঘব হয়েছে, তথাপি আমরা এখনও সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারি নি, কেবলমাত্র উত্তর-আমেরিকার উৎপাদনের উপর নির্ভর করলে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যার ফলে সমগ্র পৃথিবী বিপন্ন হবে। যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে পৃথিবীর খাদ্যশস্যের মোট চাহিদার মাত্র $\frac{১}{১০}$ অংশ উৎপাদিত হচ্ছে এবং পর্য্যাপ্ত উৎপাদনের দেশ থেকে অভাবগ্রস্ত দেশে রপ্তানীর পরিমাণ মাত্র $\frac{১}{৪}$ অংশে দাঁড়িয়েছে। মিঃ ডড্ জোর দিয়ে বলেন, পুনর্ব্বসতির চেষ্টা কিয়দংশে সাফল্য লাভ করলেও যুদ্ধের পূর্ব্বের ন্যায় খাদ্যশস্য উৎপাদিত হলেও তা প্রয়োজনের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত হবে। বিশেষতঃ আমাদের মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে প্রতিদিন ৫৫ হাজার নূতন মুখে অন্ন জোগাবার প্রয়োজন, কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। যুদ্ধজনিত লোকক্ষয় সত্ত্বেও গত দশ বৎসরেই পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় ২০ কোটি বেড়েছে।

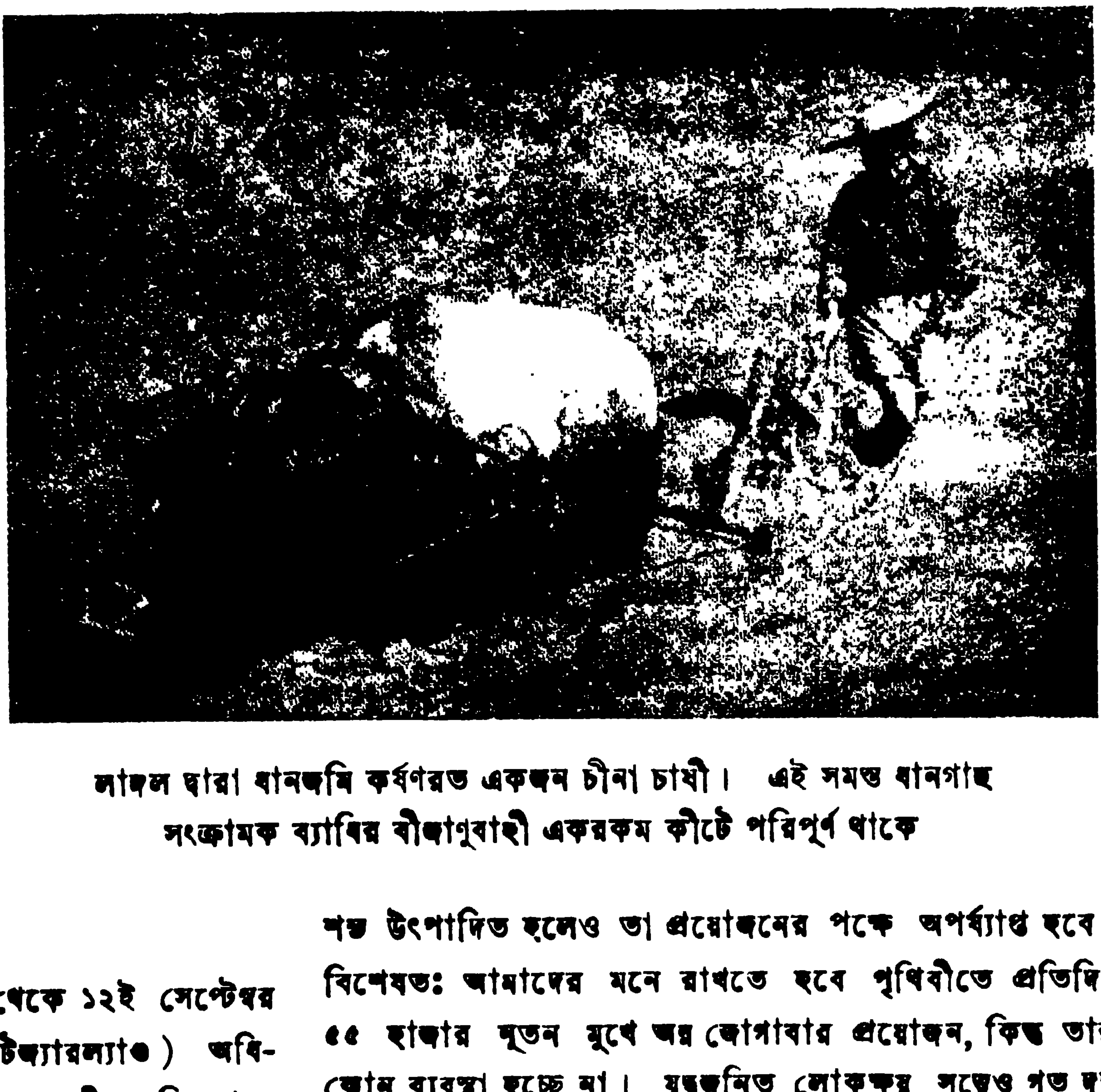

লাঙল দ্বারা ধানজমি কর্ষণরত একজন চীনা চাষী। এই সমস্ত ধানগাছ সংক্রামক ব্যাধির বীজাণুবাহী একরকম কীটে পরিপূর্ণ থাকে

১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে এশিয়া ও প্রাচ্য দেশসমূহে এ বিষয়ে গভীরতর আলোচনার জন্য স্থানে স্থানে কতকগুলি সভার অধিবেশন হয়। এর মধ্যে ব্যাঙ্ককে আন্তর্জাতিক চাউল কমিশনে, ব্রহ্ম, সিংহল, কিউবা, ইকোয়েডর, ঈজিপ্ট, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, ইটালী, মেক্সিকো, হল্যাণ্ড, পাকিস্থান, ফিলিপাইন, শ্যাম, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি ১৫টি দেশের প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই সকল অধিবেশনে চাউলের উৎপাদন,

চীনা কৃষকেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টুপী মাথায় পরিয়া জলা জমি হইতে ধানের চারা তুলিয়া আঁটি বাঁধিতেছে

নাই। তবে আশার কথা এই যে, ব্রহ্ম ও শ্যামে ধানচাষ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যাচ্ছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ব্রহ্মদেশে চাউল উৎপাদনের পরিমাণ ৫৪ লক্ষ টন ছিল, যুদ্ধের পূর্ব্বে সাধারণতঃ ৭০ লক্ষ টন পাওয়া যেত। ব্রহ্মদেশে চাউলের চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় রপ্তানীর পরিমাণ যুদ্ধের সময়কার তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগই আছে। শ্যামের অবস্থা ব্রহ্মদেশের মত। তবে ১৯৪৮-৪৯ সালে আশা করা যায়, রপ্তানীর পরিমাণ দশ লক্ষ টন হতে পারে। ইন্দো-চীনে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার দরুন আজও রপ্তানী হওয়ার মত শস্যাদি পাওয়া যাচ্ছে না। ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় শতকরা ৭০।৮০ ভাগ আজও স্থানীয় চাহিদার জন্য মজুত থাকে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে চাউল আমদানী সমেত স্থানীয় উৎপাদন দ্বারা সরবরাহ স্বাভাবিক স্তরে ছিল।

এ থেকে বোঝা যায় পাঁচটি প্রধান চাউল রপ্তানীকারী দেশে কৃষিসমস্যার সমাধান কিছু কিছু হলেও রপ্তানীর জন্য আশানুরূপ খাদ্যশস্য উৎপাদন হচ্ছে না। চাউল আমদানীকারী দেশগুলির মধ্যে সিংহল ও মালয়ের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সিংহলে মোট চাহিদার শতকরা ৭০ ভাগ চাউল আমদানী হ'ত। যুদ্ধের সময় ও পরে চাউল আমদানীর পরিবর্ত্তে সিংহলে গমের প্রচলন হয়। প্রাচ্যের অন্যান্য স্থানের ন্যায়, এখানেও মূল খাদ্যশস্যাদি, তরিতরকারী এবং ফলমূলাদির উৎপাদন বৃদ্ধি লাভ করেছে। মালয়ে মোট প্রয়োজনীয় চাউলের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ বাইরে থেকে আমদানী হ'ত। কিন্তু যুদ্ধের পরে গমের প্রচলন বেশী হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি চারিটি প্রধান গমরপ্তানীকারী দেশের কৃষিসমস্যা বিপরীত ধরণের। সেখানে যাতে দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন ও রপ্তানীর প্রয়োজন অপেক্ষা উৎপাদন অত্যধিক না হয়ে পড়ে, তজ্জন্য কৃষিজীবিগণ ও গবর্ণমেণ্ট সচেষ্ট থাকেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন ব্যাপারে খুব তৎপর হলেও অনুকূল অবস্থায় তাদের উৎপাদন বৃদ্ধির এখনও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আফ্রিকা এবং লাটিন আমেরিকা প্রভৃতি অনুন্নত অঞ্চলের একমাত্র সমস্যা নানা উপায়ে খাদ্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এ সমস্ত অঞ্চলে উন্নতির পথে অর্থ এবং উপযুক্ত

সংরক্ষণ, বণ্টন আহার ভক্ষণ সম্বন্ধে সম্মিলিত ভাবে কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্ধারণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক প্রচারপত্রে বলা আছে, যুদ্ধোত্তর বিশ্বে প্রায় চার বৎসর ধরে পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোকের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের অভাব রয়েছে এবং কোটি কোটি লোক, বিশেষতঃ চাউলভোজী জনগণ প্রায় অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

১৯৪৯ সালের ২৪শে মার্চ্চ সিঙ্গাপুরে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্যচাষের গবেষণা সম্মেলনে কর্ম্মাধ্যক্ষ মরিস্ ই. ডড্ জানান যে, সমুদ্র থেকে যে পরিমাণ মৎস্য পাওয়া যেতে পারে তা সংগ্রহ করবার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হয় নি অথচ এই মৎস্য থেকে বহুল পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব মোচন হতে পারে।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যে খাদ্যাভাব দেখা যাচ্ছে তার জন্য চাই পৃথিবীব্যাপী এক নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসরণ। ১৯৪৮ সালের খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বিবরণে আমরা জানতে পারি যে, পৃথিবীর অনুন্নত দেশসমূহের জন্য বর্ত্তমান উৎপাদন প্রচেষ্টা যথেষ্ট হয় নি। প্রাচ্যে পৃথিবীর ১/৫ অংশে সমগ্র লোকসংখ্যার অর্দ্ধেক প্রায়ই অনাহারে থাকে। একথা ঠিক যে, এই অঞ্চলের কর্ষিত জমি লোকসংখ্যার তুলনায় কম হলেও এগুলিকে যতদূর সম্ভব নিজস্ব উৎপাদনের উপর নির্ভর করতে হবে। আমদানী দ্বারা চীন এবং ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের কিয়দংশ মাত্র পূরণ করা যায়। ব্রহ্ম, চীন, ইন্দো-চীন এবং ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধের পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী শস্য উৎপন্ন হলেও ধান উৎপাদন সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়

চীনের ধানক্ষেতের অভিমুখে চীনা পুরুষ এবং শিশুসন্তানসহ সাদা কামিজ পরা একজন স্ত্রীলোক

কৃষিবিদের অভাব বিশেষ অন্তরায়। অন্যদিকে ইউরোপের একমাত্র সমস্যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার। সেই সঙ্গে শিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধি দ্বারা খাদ্যসম্ভার ও কাঁচামালের আদানপ্রদানও তার প্রয়োজন। যদি ইউরোপের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারলাভ না করে তবে সম্ভবত: অল্পমাত্র খাদ্যমানের দ্বারা কৃষি-বিষয়ক আত্মনির্ভরতার পথে সে চেষ্টা করতে পারে। সুখের বিষয়, ১৯৪৮-৪৯ সালে পৃথিবীর মোট রপ্তানী খাদ্যের পরিমাণ হবে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন। গত বৎসর ছিল ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টন এবং তার পূর্ব্বে ছিল ২ কোটি ৯০ লক্ষ টন। ১৯৩০-৩১ সালের পর এ পরিমাণ রপ্তানী আর হয় নাই।

বলা বাহুল্য, বিশ্বের সর্ব্বত্র খাদ্য-সঙ্কট বিষয়ে যথেষ্ট সাড়া পড়েছে। ভারতবর্ষে গত ১৯৪৩ সালের পর থেকে খাদ্য-দ্রব্যাদি একটা বাঁধাধরা নিয়মে সরবরাহ, বণ্টন, ও চাহিদার জন্য মজুত রাখা হচ্ছে। দেশবিভাগের পর অবশ্য এ সঙ্কটের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষে বাৎসরিক প্রয়োজনীয় সকল প্রকার খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপ :

খাদ্যশস্য	৬০০ লক্ষ টন
ডাল	৭৫ " "
স্নেহপদার্থ	১৯ " "
ফলমূল	৬০ " "
তরিতরকারী	৯০ " "
দুধ	২৩১ " "
আমিষ দ্রব্য	১৫ " "

হিসাব করে দেখা যায় যেটুকু শতকরা বাড়ান দরকার, তা হচ্ছে

খাদ্যশস্য	১০ ভাগ
ডাল	২০ "
স্নেহপদার্থ	২৫০ "
ফলমূল	১৫০ "
তরিতরকারী	১০০ "
দুধ	৩০০ "
আমিষ	৩০০ "

এর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার অবস্থার তুলনা করা যেতে পারে—১৯৩৫-৩৯ সালের পর্য্যায় শতকরা বৃদ্ধির পরিমাণ হচ্ছে নিম্নরূপ :

খাদ্যশস্য	১০৬
ফল ও তরকারী	১০৯
স্নেহপদার্থ	১২৩
চিনি	১০৫

সাধারণতঃ নানাদেশে প্রতি একর জমিতে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় নীচের তালিকা থেকে তা বোঝা যেতে পারে—

চাউল—	ভারতবর্ষ	৬০০ পাউণ্ড
	চীন	১,৪০০ "
	যুক্তরাষ্ট্র	১,৪৫০ "
	মিশর	২,০০০ "
	জাপান	২,৩০০ "
	ইটালী	৩,০০০ "
গম—	ভারতবর্ষ	৮০০ পাউণ্ড
	জার্মানী	২,২০০ "
	ইটালী	১,৩৫০ "

ভারতে কৃষিপদ্ধতির পরিবর্ত্তন আজ একান্ত প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে কৃষি-বিজ্ঞানের আলোচনার ফলে জানা গেছে উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত উপায়সমূহ অবলম্বিত হতে পারে—ক্ষেত্র সংরক্ষণ, বনসম্পদ বৃদ্ধি, জলসেচ, উন্নততর বীজ ও যন্ত্রাদি, জৈব এবং অজৈব সারের প্রয়োগ, গোমেষাদি পালনের উন্নততর ব্যবস্থা এবং পরিবর্দ্ধিত হারে ঋণদানের আয়োজন। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের কৃষিসমস্যার সমাধানের উপায়—যতদূর সম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি করা, কারণ নূতন শিল্পের

প্রসার হলেও বহুলোকের ভরণপোষণের পন্থা কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং ক্রমবর্দ্ধমান কৃষিকার্য্যের দ্বারা তাদের আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। এটুকু জেনে রাখা দরকার—সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শতকরা ৮১টি পরিবারের আয়ের পরিমাণ প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলারেরও কম এবং তাদের মধ্যে আবার শতকরা ৫৩টি পরিবারের আয়ের পরিমাণ প্রতি সপ্তাহের চার ডলারেরও কম। কেবলমাত্র আর্জেণ্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন, নিউজিল্যাণ্ড, সুইটজারল্যাণ্ড এবং যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে মাত্র মোট পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগের বাস সেখানে প্রতি সপ্তাহে আয়ের পরিমাণ ২০ ডলার হওয়ার ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহে আয়ের পরিমাণ যথেষ্ট কম। যা হোক, ভারতবর্ষে আজ কৃষি পুনর্গঠন ব্যাপারে বিশেষ সাড়া পড়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী দারুণ সঙ্কটের প্রভাব থেকে ভারতবর্ষ আজও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারছে না। ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রায় ৮০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে ১০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানী হয় অথচ ভারতবাসীদের মাথাপিছু দৈনিক খাদ্য আজও ১০ আঃ বা কোথাও কোথাও ৪ আউন্সের অধিক জোটে না। কিন্তু সম্মিলিত যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিকর খাদ্য কমিটির মতে খাদ্যশস্য মাথাপিছু ১৪ আঃ না হলে স্বাস্থ্য অটুট রাখা যায় না। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য আমাদের কৃষিসচিব একটি খাদ্যশস্য কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটি জাতীয় খাদ্যনীতিবিষয়ক রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করেন। রিপোর্টে প্রকাশ যে, ব্যাপক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়-স্বরূপ দেশে বহুমুখী জলশক্তির পরিকল্পনা চাই এবং বড় বড় বাঁধ-নির্ম্মাণ-কার্য্য শীঘ্র আরম্ভ করা প্রয়োজন। বড় বাঁধের দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা করা যাবে এবং বৎসরে মোট ১ কোটি টন উৎপাদনবৃদ্ধির আশা করা যেতে পারে। তা ছাড়া সারপ্রয়োগ ও উৎকৃষ্টতর বীজ বপন দ্বারা পতিত জমিগুলিকে চাষবাসের উপযোগী করা চাই। বিরাট পরিকল্পনা দ্বারা প্রায় ৪০ লক্ষ টন শস্য পাওয়া যাবে। আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে যে খাদ্যনীতি অবলম্বিত হবে তার দ্বারা প্রায় ৩০ লক্ষ টন উৎপাদন বৃদ্ধি হবে এবং পতিত জমিগুলির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি দ্বারা বাকীটা পাওয়া যাবে। কিন্তু ভারতবর্ষ আত্মনির্ভরতার পথে আরও দ্রুতগতিতে চলতে পারে। তাঁর জন্য এই বৎসরে গত ১৯শে মার্চ্চ তারিখে আমাদের কৃষিসচিব একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তিনি মনে করেন, ১৯৫১ সালের পর ভারতবর্ষে খাদ্যশস্য আমদানী করা দরকার হবে না। প্রায় ৮ লক্ষ একর পতিত জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে নলকূপ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এবং অপ্রয়োজনীয় শস্যাদি বপন বন্ধ করে আরও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। যেখানে স্থায়ী জলসেচের ব্যবস্থা আছে, সেখানে উন্নত বীজ, জৈব সার এবং কৃত্রিম সারপ্রয়োগ দ্বারা চাষবাস করা একান্ত দরকার হবে। কৃষিসচিব বলেছেন, যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা মনে করে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৮ সালে মোট আমদানী খাদ্যেশস্যের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৮৪ লক্ষ টন এবং এতে খরচ হয় ১৩০ কোটি টাকা। এ সম্বন্ধে এ বৎসরে প্রায় আটটি চুক্তিপত্র ভারতবর্ষ স্বাক্ষর করেছে—পাকিস্থানের সহিত তিনটি, অষ্ট্রেলিয়া এবং আর্জেন্টিনার সঙ্গে দুটি, রাশিয়া ও যুগোশ্লেভিয়া প্রত্যেকের সহিত একটি। এই বৎসরে আমদানীর পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়েছে মোট ৪০ লক্ষ টন:

আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, পৃথিবীর কৃষির উন্নতিসাধনের একমাত্র উপায় হচ্ছে আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতির প্রচার। ১৯৪৭ সালে ৪ঠা থেকে ১১ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ওয়াশিংটনে বিশ্বের খাদ্য-পরিষদে সার জন বয়েড অর্ সকলকে সতর্ক করে বলেছিলেন—এখনও যদি আমরা বিশ্বের খাদ্য-সঙ্কটের সমাধান করতে না পারি তা হলে ভবিষ্যতে মানব-জাতির অস্তিত্ব হয়ত লোপ পাবে। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে, যদি পৃথিবীর সকল জাতি কৃষির উন্নতির দিকে ঝোঁকে এবং যুদ্ধের জন্য যতটা উৎসাহ ও উদ্যম দেখায় অন্ততঃ সেই পরিমাণে উৎসাহ ও উদ্যম যদি খাদ্য উৎপাদনে প্রয়োগ করে তা হলে পাঁচ বছরের মধ্যে প্রচুর খাদ্য-সম্ভার পাওয়া যাবে। বর্ত্তমান অবস্থায় এইটুকু জেনে রাখা দরকার যে, এখনও কয়েক বৎসর ধরে আমাদের খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালাতে হবে। আরও একটা বিষয়ে অবহিত হওয়া খুবই দরকার। বিশ্বের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে, শান্তির পথে চলতে হলে সৌভাগ্যবশতঃ যে সমস্ত দেশে আজ প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হচ্ছে, সেই সমস্ত দেশের খাদ্যশস্যাদিতে অবাধ অধিকার এবং খাদ্যাভাব থেকে মুক্তি যদি আমরা সত্যই চাই, তা হলে একটি উন্নততর বৈদেশিক বাণিজ্য-প্রসারের নীতি অনুসরণ করতে হবে। বিশ্বের অর্থনীতির ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান ব্যবস্থার প্রধান অন্তরায় প্রত্যেকটি জাতির অর্থনীতিগত স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণবাদ। এই নীতিতে আস্থা সমগ্র মার্কিন জাতি ও পাশ্চাত্যের উন্নত জাতিগুলির মজ্জাগত হয়ে রয়েছে।

লর্ড বয়েড অর্ বলেছেন, পৃথিবী থেকে অনাহার-মুক্তি আন্দোলন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য এবং কৃষি-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে চালানো যেতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানেই সকল দেশের স্বার্থরক্ষা করা যাবে এবং খাদ্যশস্যবিষয়ক পরিকল্পনা

কার্য্যকরী হবে। খুবই দুঃখের বিষয়, আজও পৃথিবীতে কতকগুলি জাতি নিজেদের স্বার্থের জন্য অপর কতকগুলি জাতির সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে পারছে না এবং এর ফলে এশিয়া মহাদেশের তথাকথিত অনুন্নত দেশগুলি, যথা—ভারতবর্ষ, চীন, পাকিস্থান প্রভৃতি আন্তর্জ্জাতিক দলাদলির দরুন আত্মনির্ভরতার পথে বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। আজ বর্ত্তমান অবস্থায় হয়ত আন্তর্জ্জাতিক খাদ্যনীতি কার্য্যকরী করা সম্ভবপর হচ্ছে না, কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব এই বিষয়ে একটা সুনির্দিষ্ট নীতি নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক এবং সেটা সফল হবে একমাত্র ধনী, দরিদ্র, ছোট বড় সকল জাতির খাদ্যনীতি সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর হলে।

যে সমস্ত শক্তিশালী জাতি আজও কেবলমাত্র জাতীয় স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত এবং আগামী যুদ্ধের আশঙ্কায় কেবলমাত্র নিজেদের খাদ্যব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে সকলের চেয়ে বড় করে দেখছে, তারাই আজ আন্তর্জ্জাতিক খাদ্যশস্য পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করার প্রধান অন্তরায়। এই উদ্দেশে শক্তিশালী জাতিদেরই এগিয়ে আসতে হবে। এই বিশ্বব্যাপী খাদ্য-সঙ্কটের দিনে শক্তিশালী জাতিদের নিকট যে সুবর্ণ সুযোগ দেখা দিয়েছে, সমগ্র বিশ্বের স্থায়ী কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতির ভিত্তিতে খাদ্যসমস্যা মীমাংসার চেষ্টা যাতে হয়, সে বিষয়ে তাঁদের আলোচনা চালাতে হবে। তাঁরা কি এই যুগোপযোগী দায়িত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবেন না পিছিয়ে থাকবেন, এটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

প্রস্থানভেদ

(অনুবাদ)

শ্রীবাসনা সেন, এম-এ, কাব্যতীর্থ

(সুপ্রসিদ্ধ মহিম্নস্তোত্রের "ত্রয়ীসাংখ্যং যোগঃ"—এই সপ্তম শ্লোকের টীকাতে মধুসূদন সরস্বতী ভারতীয় আর্য্যশাস্ত্রসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মহিম্নস্তোত্রের টীকার এই অংশ পৃথকভাবে "প্রস্থানভেদঃ" নামে পণ্ডিত-সমাজে প্রসিদ্ধ। ইহা পাঠ করিলে অতি সহজেই ভারতীয় শাস্ত্রের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। ইহা বাংলায় ইতঃপূর্ব্বে অনূদিত হয় নাই)।

সমুদয় শাস্ত্রই পরমেশ্বর প্রতিপাদক, ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধের দ্বারাই হউক অথবা পরম্পরা সম্বন্ধের দ্বারাই হউক সংক্ষেপতঃ এই ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রস্থানভেদ এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইবে।

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিটি বেদ এবং শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ও কল্প এই ছয়টি বেদাঙ্গ। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা এবং ধর্ম্মশাস্ত্র এই চারিটি উপাঙ্গ। উপপুরাণসকল পুরাণেরই অন্তর্ভুক্ত; বৈশেষিকশাস্ত্র ন্যায়শাস্ত্রের অন্তর্গত; বেদান্তশাস্ত্র মীমাংসার অন্তর্গত, রামায়ণ, মহাভারত, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত, এই সকল লইয়া চতুর্দ্দশবিদ্যা। অতএব যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—(যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি আচারাধ্যায়—৩ শ্লোক) পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, অঙ্গসহিত ধর্ম্মশাস্ত্র, অঙ্গসহিত চারি বেদ এবং ছয়টি বেদাঙ্গ, এই চতুর্দ্দশটি ধর্ম্ম ও বিদ্যার স্থান। এইরূপে চারি উপবেদ লইয়া অষ্টাদশ বিদ্যা হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ এবং অর্থশাস্ত্র এই চারিটি উপবেদ। সকল আস্তিকের অর্থাৎ যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন তাঁহাদের এই পর্য্যন্ত শাস্ত্রপ্রস্থান; অপর একদেশিগণের অর্থাৎ শাক্ত, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতির প্রস্থানও ইহারই অন্তর্গত। যাঁহারা বেদ প্রামাণ্য স্বীকার করেন না তাঁহাদের পৃথক প্রস্থান আছে, সেই সকল প্রস্থান ইহাতে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তাহা পৃথকরূপে গণনা করা হইয়া থাকে। অতএব শূন্যবাদ লইয়া মাধ্যমিকগণের প্রস্থান প্রবৃত্ত হইয়াছে, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদমাত্র লইয়া যোগাচার প্রস্থান প্রবৃত্ত হইয়াছে; জ্ঞানাকারানুমেয় ক্ষণিকবাহ্যার্থবাদ লইয়া সৌত্রান্তিক প্রস্থান প্রবৃত্ত হইয়াছে; প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ বাহ্যস্বলক্ষণক্ষণিকবাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া বৈভাষিক প্রস্থান প্রবৃত্ত হইয়াছে। এইরূপে সৌগত অর্থাৎ বৌদ্ধগণের চারিটি প্রস্থান *। চার্ব্বাকগণের দেহাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রস্থান আছে। জৈনগণের দেহের অতিরিক্ত দেহ সম-পরিমাণ আত্মা আর একটি প্রস্থান। এইরূপে যাঁহারা বেদপ্রামাণ্য স্বীকার করেন না তাঁহাদের ছয়টি প্রস্থান। এই ছয়টি প্রস্থান বেদবাহ্য অর্থাৎ ইঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না এবং ইহা পুরুষার্থের উপযোগী

* সর্ব্বাস্তিত্ব অর্থাৎ বাহ্য ও আন্তর এই উভয়বিধ বস্তুর অস্তিত্ববাদী। এজন্য তাহাদের সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বলে। বৈভাষিকগণ সর্ব্বাস্তিত্ববাদী। সৌত্রান্তিকগণও সর্ব্বাস্তিত্ববাদী। এই উভয় প্রস্থানেই বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। সৌত্রান্তিকগণ বাহ্যবস্তুমাত্রকে অনুমেয় বলেন। বৈভাষিকগণ বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক ত্রিবিধ প্রস্থানেই বস্তুর ক্ষণিকত্ব স্বীকার করা হয়।

নহে বলিয়া আমরা ইহার উল্লেখ করিলাম না। আমরা এস্থলে যে যে প্রস্থান সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে পুরুষার্থের উপযোগী ও বেদানুকূল সেই প্রস্থানগুলির ভেদ প্রদর্শন করিব। বাহ্য প্রস্থানের উল্লেখ না করায় আমাদের কোন ন্যূনতা হইল না। কারণ আমরা বেদানুকূল প্রস্থান প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বেদানুকূল প্রস্থানসকল সাক্ষাৎভাবে বা পরম্পরাভাবে পুরুষার্থের উপযোগী হইয়া থাকে।

অনন্তর অজ্ঞগণের ব্যুৎপত্তির নিমিত্ত এই সকল প্রস্থানের স্বরূপ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিব; কারণ প্রয়োজনভেদেই প্রস্থানগুলির স্বরূপভেদ ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম-প্রতিপাদক অপৌরুষেয় প্রমাণবাক্যই বেদ নামে অভি-হিত হয়। বেদ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে বিভক্ত। এই মন্ত্রসকল অনুষ্ঠান-উপযোগী দ্রব্য ও দেবতা-প্রকাশক * এবং প্রায়শঃ ইহারা অনুষ্ঠানের করণকারক হইয়া থাকে। এই মন্ত্র-সকলও ত্রিবিধ—ঋক্, যজুঃ, সাম। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দবিশিষ্ট পাদবদ্ধ ঋকমন্ত্রসকল—অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্, ইত্যাদি। এই ঋকমন্ত্র গীতিযুক্ত হইলে সামমন্ত্র—'অগ্ন আয়াহি বিতয়ে' ইত্যাদি। এই উভয় লক্ষণবিযুক্ত অর্থাৎ যাহা পাদবদ্ধ নহে এবং প্রগীতও নহে তাদৃশ মন্ত্রই যজুর্মন্ত্রসকল—'ঈষেত্বা' ইত্যাদি। 'অগ্নীদগ্নীন্বিহর—এই সম্বোধন রূপ বেদমন্ত্র-সকলও যজুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা নিগদমন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপে মন্ত্রসকল নিরূপিত হইয়াছে।†

* মন্ত্র অনেক প্রকার হইলেও প্রধানতঃ চারি প্রকার বলা যাইতে পারে।

(১) করণমন্ত্র, (২) ক্রিয়মাণানুবাদিমন্ত্র (৩) অনুমন্ত্রণমন্ত্র, (৪) জপমন্ত্র।

১। করণমন্ত্র :—এই করণমন্ত্র পুরোঽনুবাক্যা, যাজ্যা প্রভৃতি। যে দেবতার উদ্দেশ্যে হবিঃ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে হইবে, সেই দেবতার প্রতিপাদক পুরোঽনুবাক্যা, যাজ্যা পাঠের পরে হবিঃ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। পুরোঽনুবাক্যা, যাজ্যা যাগের পূর্ব্বে পাঠ করিতে হয় বলিয়াই যাজ্যা, পুরোঽনুবাক্যা প্রভৃতি করণমন্ত্র। করণ ক্রিয়ার পূর্ব্বে হইয়া থাকে।

২। ক্রিয়মাণানুবাদিমন্ত্র :—কর্ম্মের সমানকালে যে সকল মন্ত্র পাঠ করা হয় তাহাকে ক্রিয়মাণানুবাদিমন্ত্র বলে। মন্ত্রোচ্চারণকালেই কর্ম্মটি করিতে হইবে। যেমন যূপপরীব্যাণ মন্ত্র (যুবাসুবাসাপরিবীতাগাৎ (৩।১।৩ ঋক্‌সংহিতা)।

৩। অনুমন্ত্রণমন্ত্র হবিঃ প্রক্ষেপের অনন্তর যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয় তাহাকে অনুমন্ত্রণমন্ত্র বলে। অধ্বর্য্যু যখন হবির প্রক্ষেপ করিবেন, অনন্তর যজমান স্বত্ব ত্যাগ করিবেন, অনন্তর অনুমন্ত্রণমন্ত্র পঠিত হইবে। যেমন 'একো মম একা তস্য'—ইত্যাদি যজুর্মন্ত্র।

৪। জপমন্ত্র—কেবলমাত্র অদৃষ্টলাভের জন্য যে সকল মন্ত্র পাঠ করা হয় তাহাকে জপমন্ত্র বলে।

† আথর্ব্বমন্ত্রসমূহ প্রায়শঃ ঋক্‌মন্ত্র। কোনও স্থলে যজুর্মন্ত্র আছে; সুতরাং আথর্ব্বমন্ত্র আর পৃথকভাবে পরিগণিত হইল না। যদিও সাম-মন্ত্রগুলি সমস্তই ঋক্‌মন্ত্র, তথাপি প্রগীত ঋক্‌মন্ত্রকে সামমন্ত্র বলা হইয়া থাকে। ইহাই ঋক্‌মন্ত্র ও সামমন্ত্রের প্রভেদ।

ব্রাহ্মণও ত্রিবিধ—যথা (১) বিধিরূপ, (২) অর্থবাদরূপ, (৩) এই উভয় বিলক্ষণরূপ অর্থাৎ যাহা বিধিও নহে অর্থবাদও নহে। ভট্টগণের মতে শব্দভাবনাই বিধি। প্রাভাকরগণের মতে নিয়োগই বিধি। সকল তার্কিকের মতে ইষ্টসাধনতাই বিধি। উৎপত্তি, অধিকার, বিনিয়োগ ও প্রয়োগভেদে বিধি চারি প্রকারও হইয়া থাকে। যাহা দ্বারা কর্ম্মের স্বরূপমাত্র জানা যায় অর্থাৎ কর্ম্মস্বরূপমাত্র বোধক, যে বিধি তাহা উৎপত্তি বিধি—'আগ্নেয়োঽষ্টাকপালো ভবতি' ইত্যাদি। যাহাদ্বারা যজ্ঞাদির ইতিকর্ত্তব্যতা সমন্বিত যাগাদিকরণের ফলসম্বন্ধ জানা যায় তাহা অধিকারবিধি—'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি। যাহাদ্বারা অঙ্গের সহিত অঙ্গীর সম্বন্ধ জানা যায় তাহা বিনিয়োগ* বিধি—যথা 'ব্রীহিভির্যজেত, সমিধো যজতি' ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিধি মিলিয়া সাঙ্গপ্রধান কর্ম্মপ্রয়োগের ঐক্য বুঝায় তাহা প্রয়োগবিধি।† এই প্রয়োগবিধি শ্রৌত, ইহা ভাট্টগণ বলেন, এবং প্রাভাকর বলেন, ইহা কল্প্য। কর্ম্মের স্বরূপ দ্বিবিধ, যথা—গুণকর্ম্ম ও অর্থকর্ম্ম। ক্রতুর কর্ম্মকারকাদিকে আশ্রয় করিয়া বিহিত কর্ম্মই গুণকর্ম্ম। এই গুণকর্ম্ম চারি প্রকার যথা—(১) উৎপত্তি (২) আপ্তি, (৩) বিকৃতি, (৪) সংস্কৃতি। 'বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নীনাদধীত, যূপং তক্ষতি—ইত্যাদি আধান ও তক্ষণের দ্বারা সংস্কারবিশেষাবশিষ্ট অগ্নি ও যূপ প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য' 'গাং পয়ো দোগ্ধি' ইত্যাদি অধ্যয়ন ও দোহনাদিদ্বারা যে স্বাধ্যায় ও পয়ঃ প্রভৃতি বিদ্যমানই ছিল তাহাদেরই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 'সোমমভিষুণোতি', 'ব্রীহিনবহন্তি, আজ্যং বিলাপয়তি' ইত্যাদি অভিষব, অবঘাত ও বিলাপনের দ্বারা সোমাদির বিকার হইয়া থাকে। 'ব্রীহীনপ্রোক্ষতি, 'পত্ন্যবেক্ষতে, ইত্যাদি প্রোক্ষণ, অবেক্ষণের দ্বারা ব্রীহি প্রভৃতি দ্রব্যের সংস্কার। এই চারিটি অঙ্গ হইয়া থাকে। ক্রতুর কারকসকল আশ্রয় করিয়া বিহিত কর্ম্মই অর্থকর্ম্ম।

অর্থকর্ম্ম দুই প্রকার—(১) অঙ্গ, (২) প্রধান। অতাদর্থ্য হইল অঙ্গ এবং অনতাদর্থ্য হইল প্রধান। পুনরায় অঙ্গ দ্বিবিধ যথা—(১) সংনিপত্যোপকারক, (২) আরাদুপকারক—প্রথমটি প্রধানের স্বরূপনির্ব্বাহক, দ্বিতীয়টি ফলোপকারি। সম্পূর্ণাঙ্গ-যুক্ত বিধিই প্রকৃতি, এবং বিকলাঙ্গ বিধিই বিকৃতি। এই উভয় বিলক্ষণ বিধি, অর্থাৎ যাহা প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে, তাহা দর্বিহোম। এইরূপে সমস্ত কর্ম্মে প্রকৃতি বিকৃতি

* অঙ্গকলাপ সমন্বিত অঙ্গীপ্রধানকর্ম্মের অনুষ্ঠানবোধক বিধিকে বিনিয়োগবিধি বলে।

† প্রয়োগবিধি পূর্ব্বোক্ত উৎপত্তি, অধিকার ও বিনিয়োগ এই ত্রিবিধ বিধির মিলিতরূপ। পূর্ব্বোক্ত বিধিত্রয়ের সম্মেলনাত্মক বিধিই প্রয়োগবিধি।

বিভাগ বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে বিধিভাগ নিরূপিত হইয়াছে। প্রাশস্ত্য ও নিন্দা প্রভৃতি লক্ষণের দ্বারা বিধিশেষ ভূতবাক্যই অর্থবাদ,* তাহা ত্রিবিধ, যথা—গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। যাহা অন্য প্রমাণবিরুদ্ধ অর্থ বুঝায় তাহা গুণবাদ, যথা—'আদিত্য যূপঃ' ইত্যাদি। যাহা অন্য প্রমাণ প্রাপ্ত্য অর্থের বোধক হয় তাহা অনুবাদ, যথা—'অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্,' ইত্যাদি। প্রমাণান্তর বিরোধ ও প্রমাণান্তরের প্রাপ্তি-রহিত অর্থের বোধককে অর্থাৎ যে অর্থবাদবাক্য প্রমাণান্তর-বিরুদ্ধ অর্থের বোধক নহে এবং প্রমাণান্তর প্রাপ্ত্যেরও বোধক নহে তাহা ভূতার্থবাদ—যথা ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ ইত্যাদি। এজন্য বলা হইয়াছে বিরোধে গুণবাদ, অবধারণে অনুবাদ, এবং বিরোধ ও অনুবাদ ভিন্ন যে অর্থবাদ তাহা ভূতার্থবাদ, অতএব অর্থবাদ ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ অর্থবাদ বিধিস্তুতিতে সমান হইলেও দেবতা অধিকরণন্যায়ের † দ্বারা ভূতার্থবাদের স্বার্থেও প্রামাণ্য দেখা যায়। যাহা অবাধিত ও অজ্ঞাতের জ্ঞাপক তাহাই প্রমাণ ‡। কিন্তু বাধিত বিষয়ত্ব এবং জ্ঞাতজ্ঞাপকত্ব রহিয়াছে বলিয়া গুণবাদ ও অনুবাদের প্রামাণ্য নাই। যদিও অর্থবাদ-বাক্য বিধিস্তাবক বলিয়া স্বার্থে তাৎপর্য নাই তথাপি অর্থবাদ বাক্য স্বার্থতাৎপর্য্য-রহিত হইলেও প্রামাণ্যের অপবাদক কেহ না থাকায় অর্থবাদবাক্যের ঔৎসর্গিক প্রামাণ্য সুস্থিতই থাকে**। এইরূপে অর্থবাদভাগ নিরূপিত হইল। বিধি এবং অর্থবাদ উভয় বিলক্ষণ বেদান্তবাক্য। বেদান্তবাক্য অজ্ঞাতজ্ঞাপক হইয়াও অনুষ্ঠাপক নহে বলিয়া তাহা বিধি হইতে পারে না। ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষদবাক্যই একমাত্র শেষী অর্থাৎ অঙ্গী, অপর সমস্ত বিধিবাক্যই ইহার অঙ্গ। বিধিসমূহ দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মরাশি পুরুষের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া ব্রহ্ম-প্রতিপাদক উপনিষদ্ বাক্যেরই অঙ্গ হইয়া থাকে। সুতরাং উপনিষদ্ বাক্য অন্যের অঙ্গ নহে বলিয়া অর্থবাদ হইতে পারে না। কিন্তু বেদান্ত-বাক্য এই উভয় বিলক্ষণ। অতএব কখনও কখনও বেদান্ত-বাক্য অজ্ঞাতজ্ঞাপক বলিয়া বিধিরূপে ব্যবহার করা হয়, কখনও ভূতার্থবাদরূপে ব্যবহৃত হয়; ইহাতে কোন দোষ নাই। এইরূপে ত্রিবিধ ব্রাহ্মণ নিরূপিত হইয়াছে। অতএব বেদ কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ডাত্মক এবং তাহাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রতিপাদক।

বেদ পুনরায় যজ্ঞনির্ব্বাহের নিমিত্ত ত্রিবিধ প্রয়োগের দ্বারা ঋক্, যজুঃ, সাম ভেদে ত্রিবিধ হইয়াছে। ঋগ্বেদের দ্বারা হোত্র প্রয়োগ, যজুর্ব্বেদের দ্বারা আধ্বর্য্যব প্রয়োগ, সামবেদের দ্বারা ঔদ্গাত্র প্রয়োগ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।* ব্রহ্মারূপ ঋত্বিক্, যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাহা এই বেদত্রয়েরই অন্তর্গত এবং যজ্ঞের অধিকারী যজমানেরও যে সমস্ত কর্ম্ম তাহাও এই বেদত্রয়ের অন্তর্গত। কিন্তু অথর্ব্ববেদ † যজ্ঞের অনুপযুক্ত, শান্তি, পৌষ্টিক, অভিচারের প্রতিপাদক, সেইজন্য অন্য বেদ হইতে ভিন্ন। এইরূপ প্রবচন ভেদ নিবন্ধন প্রতি বেদেই বহু শাখা ও ভিন্ন ভিন্ন; অতএব কর্ম্মকাণ্ডে ঋত্বিকগণের ‡ কর্ম্ম-ভেদ নিবন্ধন কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদ্য বস্তু ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ব্রহ্মকাণ্ডে বেদের সকল শাখারই একরূপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে প্রয়োজন ভেদে চতুর্ব্বেদের বিভাগ প্রদর্শিত হইল।

অনন্তর বেদাঙ্গসকল বলা যাইবে। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত প্রভৃতি বিশিষ্ট স্বরব্যঞ্জনাত্মক যে বর্ণো-চ্চারণ বিশেষ জ্ঞান তাহাই শিক্ষারূপ অঙ্গের প্রয়োজন। বেদের উচ্চারণ-জ্ঞান শিক্ষার অধীন। উচ্চারণ-জ্ঞানের অভাবে বেদমন্ত্রসমূহের আনর্থক্য হইয়া থাকে। অতএব ইহা বলা হইয়াছে—'মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽ-পরাধাৎ—(মহাভাষ্য) ইত্যাদি। সর্ব্ববেদসাধারণী শিক্ষা —'অনন্তর শিক্ষা কি তাহা বলিব'—ইত্যাদি পঞ্চখণ্ডাত্মিকা পাণিনিকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বেদের প্রতি শাখার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রাতিশাখ্য অন্যান্য মনীষিগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপ বৈদিক পদের সাধুত্বজ্ঞানের দ্বারা উহ প্রভৃতি ব্যাকরণের প্রয়োজন। 'বৃদ্ধিরাদৈচ্'**—ইত্যাদি ভগবান পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কাত্যায়ন মুনি পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিক রচনা করিয়াছিলেন। তারপর সেই পাণিনিসূত্রের ও বার্ত্তিক সূত্রের উপর ভগবান পতঞ্জলি মহাভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই ত্রিমুনি ব্যাকরণকে বেদাঙ্গ বলা হয়। ইহার অপর নাম মাহেশ্বর ব্যাকরণ। কৌমার প্রভৃতি ব্যাকরণসকল বেদাঙ্গ নহে, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগ মাত্র, জ্ঞানের জন্য প্রণীত হইয়াছে।

---

* অর্থবাদ দ্বিবিধ—১। প্রশংসার্থবাদ, (২) নিন্দার্থবাদ। যে অর্থবাদবাক্য লক্ষণার দ্বারা প্রাশস্ত্যের বোধক হইয়া থাকে তাহাকে প্রশংসার্থবাদ বলে। আর যে অর্থবাদবাক্য লক্ষণার দ্বারা নিন্দার্থবাদক হইয়া থাকে তাহাকে নিন্দার্থবাদ বলে।

† অধিকরণন্যায়—'তদুপর্য্যপি বাদরায়ণ সম্ভবাৎ' ব্রহ্মসূত্রম্।

‡ যাহা যাহা প্রসঙ্গ তাহা প্রমাণ।

** মীমাংসকমতে প্রামাণ্যের স্বতঃ প্রামাণ্য অপবাদকবশতঃই প্রসক্তপ্রামাণ্যের অপবাদ হইয়া থাকে। ভূতার্থবাদের অপবাদ কেহ নাই বলিয়া ঔৎসর্গিক প্রমাণের হানি হয় না।

* যজ্ঞে চারি জন ঋত্বিক থাকে, যথা—হোতা উদ্গাতা, অধ্যর্য্যু ও ব্রহ্মা।

† অথর্ব্ববেদ সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে ঋক্, যজুঃ, সামকে ত্রয়ী বলা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদকে বেদ বলা হইয়াছে। মনুসংহিতার ৩।১ শ্লোকে ভাষ্যকার মেধাতিথি অথর্ব্ববেদের বেদত্ব আছে কিনা এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে জয়ন্ত ভট্ট অথর্ব্ববেদের সর্ব্ববেদ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। (ন্যায়মঞ্জরী কাশীসংস্করণ পৃঃ

‡ ঋগ্বেদে ঋত্বিকের হোত্রপ্রয়োগ, সামবেদে ঋত্বিকের ঔদ্গাত্রপ্রয়োগ এবং যজুর্ব্বেদে ঋত্বিকের আধ্বর্য্যব প্রয়োগ।

** বৃদ্ধিরাদৈচ্—ইহা পাণিনি ব্যাকরণের প্রথম সূ ।

এইরূপ শিক্ষা, ব্যাকরণ দ্বারা বর্ণের উচ্চারণ এবং পদ-সাধুত্ব-জ্ঞান হইলে বৈদিকমন্ত্রসমূহের অর্থ জানিবার ইচ্ছায় ভগবান যাস্ক 'সমাম্নায়ঃ সমাম্নাত'—স 'ব্যাখ্যাতব্য'—ইত্যাদি ত্রয়োদশ অধ্যায়াত্মক নিরুক্ত রচনা করিয়াছিলেন। এই নিরুক্ত শাস্ত্রে নাম, আখ্যাত, নিপাত ও উপসর্গ ভেদে চারি প্রকার পদ নিরূপণ করিয়া বৈদিক মন্ত্র পদসকলের অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদের মন্ত্রসমূহ বাক্যরূপ। এই মন্ত্রবাক্য যজ্ঞে অনুষ্ঠেয় অর্থের প্রকাশন দ্বারা অনুষ্ঠানের করণ হইয়া থাকে। মন্ত্রবাক্য করণ। পদসমষ্টিই বাক্য। পদের অর্থজ্ঞান হইলে বাক্যের অর্থ জ্ঞাত হওয়া যায়। সুতরাং মন্ত্র-বাক্যের অর্থ জানিতে হইলে মন্ত্রের অন্তর্গত পদগুলির অর্থ জানিতে হইবে। বেদবাক্যের অন্তর্গত পদগুলির অর্থ নিরূপণ করিবার জন্য নিরুক্ত শাস্ত্র অত্যন্ত অপেক্ষিত। অন্যথা অনুষ্ঠান সম্ভব নহে।

'সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরী তু' (ঋক্‌সংহিতা ৮।৬।২) ইত্যাদি দুরূহ পদসকলের প্রকারান্তরে নিরুক্ত ব্যতীত অর্থজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। এইরূপ নিঘণ্টুসকলও বৈদিক দ্রব্যদেবতাত্মক পদার্থের পর্য্যায়শব্দাত্মক এবং নিরুক্তেরই অন্তর্গত।* তাহার মধ্যে পাঁচটি অধ্যায় সমন্বিত নিঘণ্টুসংজ্ঞক গ্রন্থ যাস্কই প্রণয়ন করিয়াছেন।

এইরূপ ঋক্‌মন্ত্রসকল পাদবদ্ধ ছন্দবিশিষ্ট বলিয়া এবং ছন্দ না জানিলে বেদে তাহার নিন্দা আছে বলিয়া ছন্দবিশেষ নিমিত্ত অনুষ্ঠানবিশেষেরও বিধানবশতঃ, ছন্দ জানিবার আকাঙ্ক্ষায় ও ছন্দের প্রকাশের নিমিত্ত—ধী, শ্রী, স্ত্রীম ইত্যাদি অষ্টাধ্যায়ী 'ছন্দবিবৃতি' ভগবান পিঙ্গল কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। 'তত্রাপ্যলৌকিকম্' ইত্যাদি ত্রিবিধ অধ্যায় দ্বারা গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ, জগতী এই সাতটি ছন্দ ও তাহাদের অবান্তর্ভেদ নিরূপিত হইয়াছে। ব্যাকরণে যেরূপ লৌকিক পদনিরূপণ সেইরূপ 'অথ লৌকিকম্' ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা আরম্ভ করিয়া পাঁচটি অধ্যায়ে ইতিহাস, পুরাণাদির উপযোগী লৌকিক ছন্দসকল প্রসঙ্গত নিরূপিত হইয়াছে।

এইরূপ বৈদিক কর্ম্মের অঙ্গ অমাবস্যা প্রভৃতি জানিবার নিমিত্ত ভগবান আদিত্য কর্ত্তৃক জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল। ইহাই সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামে প্রসিদ্ধ। গর্গ প্রভৃতি ঋষিগণও বহুবিধ জ্যোতিষশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।

শাখান্তরে পরিপঠিত সঙ্কলন দ্বারা বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের ক্রমবিশেষ জানিবার জন্যই কল্পসূত্রসমূহ প্রণীত হইয়াছে। তাহা পুনরায় ত্রিবিধ প্রয়োগভেদে তিনপ্রকার হোত্রপ্রয়োগ প্রতি-পাদনের জন্য আশ্বলায়ন, শাঙ্খায়ন প্রভৃতি ঋষিকর্ত্তৃক কল্পসূত্র প্রণীত হইয়াছে, আধ্বর্য্যবপ্রয়োগ প্রতিপাদক কল্পসূত্র বোধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রভৃতি প্রণীত; উদ্গাত্রপ্রয়োগ প্রতিপাদক কল্পসূত্র লাট্যায়ন, দ্রাহ্যায়ণ প্রভৃতি প্রণীত।

এইরূপে ছয়টি অঙ্গের প্রয়োজনভেদ নিরূপিত হইল। বেদের চারি উপাঙ্গের প্রয়োজনবিশেষ এখন বলা হইবে। ভগবান বাদরায়ণ কর্ত্তৃক (১) সর্গ, (২) প্রতিসর্গ, (৩) বংশ, (৪) মন্বন্তর, (৫) বংশ্যানুচরিত প্রতিপাদক পুরাণ রচিত হইয়াছিল। সেই সকল পুরাণ—(১) ব্রাহ্ম, (২) পাদ্ম, (৩) বৈষ্ণব, (৪) শৈব, (৫) ভাগবত, (৬) নারদীয়, (৭) মার্কণ্ডেয়, (৮) আগ্নেয়, (৯) ভবিষ্য, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, (১১) লৈঙ্গ, (১২) বারাহ, (১৩) স্কান্দ, (১৪) বামন, (১৫) কৌর্ম্ম, (১৬) মাৎস্য, (১৭) গারুড়, (১৮) ব্রহ্মাণ্ড, এইরূপে সংখ্যায় অষ্টাদশটি। প্রথমটি সনৎকুমার প্রোক্ত পুরাণ, দ্বিতীয়টি নারসিংহ নামে প্রসিদ্ধ, তৃতীয় নান্দ, চতুর্থ শিবধর্ম্ম, পঞ্চম দৌর্ব্বাস, ষষ্ঠ নারদীয়, সপ্তম কাপিল, অষ্টম মানব উপপুরাণ, নবম ঔশনস, দশম ব্রহ্মাণ্ড, একাদশ বারুণ-পুরাণ, দ্বাদশ কালী-পুরাণ, ত্রয়োদশ বাশিষ্ঠ, চতুর্দ্দশ মাহেশ্বর পুরাণ, পঞ্চদশ বাশিষ্ঠলৈঙ্গপুরাণ, ষোড়শ সাম্বপুরাণ, সপ্তদশ সৌরপুরাণ, অষ্টাদশ পারাশর, উনবিংশ মারীচপুরাণ, বিংশ সর্ব্বধর্ম্মার্থ-সাধক ভার্গবপুরাণ। এইরূপে বিংশতি উপপুরাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

পাঁচটি অধ্যায়সমন্বিত আন্বীক্ষিকী ন্যায় গৌতম (গোতম) কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান এই ষোলটি পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানই ন্যায়ের প্রয়োজন। এইরূপ কণাদ প্রণীত দশাধ্যায়াত্মক বৈশেষিক শাস্ত্র। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য দ্বারা ব্যুৎপাদনই বৈশেষিক শাস্ত্রের প্রয়োজন। ইহাও ন্যায়পদের দ্বারা উক্ত হইয়াছে।

এইরূপ মীমাংসাও দ্বিবিধ—(১) কর্ম্মমীমাংসা ও (২) শারীরকমীমাংসা। 'অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' এই সূত্রদ্বারা আরব্ধ হইয়া 'অন্বাহার্য্যে চ দর্শনাৎ' এই সূত্রদ্বারা সমাপ্ত দ্বাদশাধ্যায় সমন্বিত কর্ম্মমীমাংসা ভগবান জৈমিনি কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। (১) ধর্ম্মের প্রমাণ, (২) ধর্ম্মভেদাভেদ, (৩) শেষ শেষিভাব (অঙ্গাঙ্গিভাব), (৪) ক্রত্বর্থপ্রযুক্তি ও পুরুষার্থ-প্রযুক্তি, (৫) শ্রুত্যর্থপাঠের দ্বারা ক্রমভেদ, (৬) অধিকার-বিশেষ, (৭) সামান্যাতিদেশ, (৮) বিশেষাতিদেশ, (৯) উহ, (১০) বাধ, (১১) তন্ত্র, (১২) প্রসঙ্গ ইত্যাদি ক্রমে দ্বাদশ অধ্যায়ের অর্থ। সঙ্কর্ষণকাণ্ডও চারি অধ্যায়ে জৈমিনি কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। দেবতাকাণ্ডরূপে প্রসিদ্ধ উপাসনারূপ কর্ম্ম যাহা সঙ্কর্ষণকাণ্ডে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা কর্ম্মমীমাংসারই

* নিরুক্ত গ্রন্থ তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত। যথা—(১) নৈঘণ্টু, (২ নৈগম, (৩) দৈবত।

অন্তর্গত।* তারপর 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা আরব্ধ হইয়া 'অনাবৃত্তি শব্দাৎ' ইহা দ্বারা পরিসমাপ্ত চারি অধ্যায়ে শারীরকমীমাংসা, যাহা জীব ব্রহ্মের একত্ব সাক্ষাৎকারের হেতু এবং শ্রবণ প্রভৃতি বিচার প্রতিপাদক ন্যায় প্রদর্শন করে, তাহা ভগবান বাদরায়ণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। সকল বেদান্ত বাক্যের সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা পরম্পরাসম্বন্ধে প্রত্যক্, অভিন্ন, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্য, এই সমন্বয় প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শিত। বেদান্তশাস্ত্রের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের ৪টি পাদ আছে। সেখানে প্রথম পাদে স্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গযুক্ত বেদান্ত বাক্যসকল বিচারিত হইয়াছে। দ্বিতীয়পাদে অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গ বেদান্তবাক্যসকল যাহা উপাস্যব্রহ্মের প্রতিপাদক তাহা আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয়পাদে অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গ বেদান্তবাক্য প্রায়ই জ্ঞেয় ব্রহ্মের বিষয়ক তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে তিনটি পাদে বেদান্তবাক্যবিচার সমাপ্ত হইয়াছে। চতুর্থপাদে যে সমস্ত পদ সাংখ্যসম্মত প্রধান বিষয়ক বলিয়া সন্দেহ উৎপাদন হয়, তাহাতে 'অজ' প্রভৃতি পদের বিচার সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে প্রথম অধ্যায়ে বেদান্ত বাক্য সকলের অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সমন্বয় সিদ্ধ হইলে, সেখানে স্মৃতি, তর্ক প্রভৃতি বিরোধ সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে সাংখ্য, যোগ, কাণাদ প্রভৃতি স্মৃতির সহিত এবং সাংখ্যাদিপ্রযুক্ত তর্কের সহিত বেদান্ত সমন্বয়ে উদ্ভাবিত বিরোধের পরিহার বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদি মতের দুষ্টত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষনিরাকরণরূপ বিচার পরিদৃষ্ট হয়।† তৃতীয়পাদের পূর্ব্বভাগে মহাভূত সৃষ্টি প্রভৃতি শ্রুতির পরস্পর-বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে; এবং উত্তরভাগে জীববিষয়ক পরস্পরবিরুদ্ধ শ্রুতির পরিহার বলা হইয়াছে। চতুর্থ পাদে ইন্দ্রিয়বিষয় শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সাধন নিরূপিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের পরলোক গমনাগমন নিরূপণের দ্বারা বৈরাগ্য নিরূপিত হইয়াছে। এইজন্য এই পাদের নাম বৈরাগ্য পাদ। দ্বিতীয় পাদে পূর্ব্বভাগের দ্বারা 'ত্বং' পদার্থ শোধিত হইয়াছে। উত্তর ভাগের দ্বারা 'তৎ' পদার্থের শোধন প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে নানা শাখায় পঠিত পুনরুক্ত পদের নির্গুণ ব্রহ্মে উপসংহার করা হইয়াছে এবং প্রসঙ্গতঃ সগুণনির্গুণ বিদ্যায় অন্য শাখান্বিত গুণের উপসংহার এবং অনুপসংহার নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ পাদে নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার বহিরঙ্গসাধন আশ্রমকর্ম্ম ও যজ্ঞসকল এবং অন্তরঙ্গসাধন, শমদমাদি ও শ্রবণমননিদিধ্যাসন প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সগুণনির্গুণবিদ্যার ফলবিশেষ নির্ণীত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমপাদে শ্রবণাদির পুনঃপুনঃ আবৃত্তির দ্বারা নির্গুণব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া জীবন্মুক্ত পুরুষের পাপপুণ্যের দ্বারা নির্লেপতারূপ জীবন্মুক্তির কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে মৃতের উৎক্রান্তির প্রকার উক্ত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে সগুণব্রহ্মবিদের উত্তরমার্গে গমন বলা হইয়াছে। চতুর্থ পাদের পূর্ব্বভাগে নির্গুণব্রহ্মবিদের বিদেহকৈবল্যপ্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে। উত্তরভাগে সগুণব্রহ্মবিদের ব্রহ্মলোকস্থিতি কথিত হইয়াছে। এই বেদান্তশাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রের মুকুট। অন্য শাস্ত্রসকল ইহারই অঙ্গস্বরূপ, সেইজন্য ইহাই মুমুক্ষুগণের আদরণীয় এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রদর্শিত রীতিতে ইহাই রহস্য।

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, আঙ্গির, বশিষ্ঠ, দক্ষ, সংবর্ত্ত, শাতাতপ, পরাশর, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত, হারীত, আপস্তম্ব, উশনো, ব্যাস, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, দেবল, নারদ, পৈঠীনসি প্রভৃতি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক রচিত ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা বর্ণাশ্রমবিশেষের বিভাগ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যাসকৃত মহাভারত এবং বাল্মীকিকৃত রামায়ণ ধর্ম্মশাস্ত্রেরই অন্তর্গত এবং তাহারা ইতিহাসরূপে প্রসিদ্ধ।*

সাংখ্য প্রভৃতিও ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সাংখ্যাদিশব্দের দ্বারা পৃথক নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে ইহাদের সঙ্গতি পৃথকভাবে বলা উচিত।

অনন্তর চারি বেদের ক্রমশঃ চারিটি উপবেদ। আয়ুর্ব্বেদের আটটি স্থান যথা—(১) সূত্র, (২) শারীর, (৩) ঐন্দ্রিয়, (৪) চিকিৎসা, (৫) নিদান, (৬) বিমান, (৭) কল্প, (৮) সিদ্ধি। ব্রহ্মা, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরী ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয়, অগ্নিবেশ প্রভৃতি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।† আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পঞ্চস্থানাত্মক অষ্টপ্রস্থান সুশ্রুত রচনা করিয়াছিলেন।‡ এইরূপ বাগ্‌ভটাদি কর্ত্তৃক রচিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পৃথক প্রস্থান নহে। কামশাস্ত্রও আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত। আয়ুর্ব্বেদে বাজীকরণনামক কামশাস্ত্র সুশ্রুতকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে। বাৎস্যায়ন পাঁচটি অধ্যায়ে কামশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রোক্তপথে বিষয়ভোগ দুঃখমাত্রেই

* এই সঙ্কর্ষকাণ্ড কাহার রচিত, এই বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ইহা কাশকৃৎস্ন রচিত; কেহ কেহ বলেন জৈমিনি রচিত, আবার কেহ বলেন ইহা বাদরায়ণ রচিত।

† বিচার স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষনিরাকরণ এই দুইটি অংশে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

* আর্য্যশাস্ত্রে পাঁচখানা ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে। যথা—মহাভারত রামায়ণ শিবরহস্য বিদ্যাশুক্ত ও ব্রহ্মবিদ্যাসুখোদয়। "ভারাশিবিব্রা পঞ্চেতিহাস।"

† ঋগ্বেদের উপবেদ আয়ুর্ব্বেদ। সুশ্রুত সংহিতাতে আয়ুর্ব্বেদকে অথর্ব্ববেদের উপবেদ বলা হইয়াছে। অথর্ব্বসংহিতা ঋক্‌মন্ত্রাত্মক বলিয়া অথর্ব্ববেদের উপবেদ আয়ুর্ব্বেদও ঋগ্বেদেরই উপবেদ।

‡ চরকসংহিতায় কায়চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে। সুশ্রুতসংহিতা অস্ত্রচিকিৎসা প্রধান।

পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং বিষয়বৈরাগ্যই কামশাস্ত্রের প্রয়োজন। শাস্ত্রোদ্দীপিত মার্গে বিষয়ভোগ করিলেও দুঃখে পর্য্যবসান হইবে। রোগ, রোগের কারণ, রোগের নিবৃত্তি ও তাহার সাধনজ্ঞান চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রয়োজন।

এইরূপ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক রচিত চারি পাদে ধনুর্ব্বেদশাস্ত্র। (১) দীক্ষাপাদ, (২) সংগ্রহপাদ, (৩) সিদ্ধিপাদ, (৪) প্রয়োগ-পাদ। প্রথম পাদে—ধনুর লক্ষণ ও অধিকারী নিরূপণ করা হইয়াছে। এখানে ধনুঃ শব্দের সাধারণতঃ চাপ অর্থে নিরূঢ় প্রয়োগ থাকিলেও এখানে অস্ত্রমাত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই অস্ত্র চতুর্ব্বিধ যথা—মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত। মুক্ত অর্থাৎ চক্র প্রভৃতি, অমুক্ত খড়্গ প্রভৃতি ; মুক্তামুক্ত—শল্য এবং শল্যেরই নানাপ্রকার ভেদ ইত্যাদি, যন্ত্রমুক্ত—শর প্রভৃতি। মুক্তকেই অস্ত্রনামে অভিহিত করা হয়। অমুক্তকে শস্ত্র বলা হয়। তাহাও ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, পাশুপত, প্রাজাপত্য, আগ্নেয় প্রভৃতি ভেদে বহুবিধ।

এইরূপ অধিদৈবত মন্ত্রে চতুর্ব্বিধ অস্ত্রের কথা বলা হইল। এই চতুর্ব্বিধ আয়ুধের মন্ত্র ও দেবতা পৃথক আছে। মন্ত্র ও দেবতাযুক্ত আয়ুধে ক্ষত্রিয় ও তদনুযায়ীগণের অধিকার বুঝিতে হইবে। ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়ানুযায়ীগণ চারি ভাগে বিভক্ত ; যথা—পদাতি, রথারূঢ়, অশ্বারূঢ়, গজারূঢ়। ধনুর্ব্বেদে দীক্ষা, অভিষেক, শকুন,* মঙ্গলকরণ প্রভৃতি সকলই প্রথম পাদে নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে সকল শাস্ত্রজ্ঞ ও আচার্য্যদের লক্ষণ বলা হইয়াছে ও তাহার সংগ্রহণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে গুরুসম্প্রদায়সিদ্ধ শস্ত্রবিশেষজ্ঞগণের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস, মন্ত্রসিদ্ধি ও দেবতাসিদ্ধিকরণ নিরূপিত হইয়াছে। এইরূপ চতুর্থ পাদে শস্ত্রের দেবতার্চ্চনা, শস্ত্রের অভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধ অস্ত্রবিশেষের প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে। যুদ্ধাচরণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ; দুষ্টের দণ্ড ও প্রজাপালনে ধনুর্ব্বেদের প্রয়োজন। এইরূপ ব্রহ্মা প্রণীত, প্রজাপতি প্রণীত শাস্ত্রক্রমে বিশ্বামিত্র প্রণীত ধনুর্ব্বেদশাস্ত্র।

ভগবান ভরতকর্ত্তৃক গান্ধর্ব্বশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। গীত, বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতি ভেদে ইহার অর্থ বহুবিধ। দেবতার আরাধনা, নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রভৃতি এবং সিদ্ধি গান্ধর্ব্ববেদের প্রয়োজন।

এই প্রকার অর্থশাস্ত্রও বহুবিধ, যথা—নীতিশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র, শিল্পিশাস্ত্র, সূপকারশাস্ত্র, চতুঃষষ্টিকলাশাস্ত্র। তাহা নানা মুনিকর্ত্তৃক প্রণীত। এই সমস্ত শাস্ত্রের লোকব্যবহারানুসারে প্রয়োজনভেদ বুঝিতে হইবে।

এইরূপ অষ্টাদশবিদ্যা ত্রয়ীশব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। নচেৎ একটি বিদ্যাও কম হইলে ত্রয়ীর ন্যূনতা হইবে।

সাংখ্যশাস্ত্র ভগবান কপিলকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল* 'অথত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ'—ইত্যাদিরূপে। সাংখ্যশাস্ত্র ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রধানের কার্য্যসকল নিরূপিত হইয়াছে ; তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয়ের বৈরাগ্য এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বিরক্ত, পিঙ্গল ও আত্মবগণের আখ্যায়িকা নিরূপিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে পরপক্ষখণ্ডন প্রদর্শিত হইয়াছে, ষষ্ঠে সমস্ত শাস্ত্রের সংক্ষেপ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রয়োজন।

পতঞ্জলি প্রণীত যোগশাস্ত্র—'অথ যোগানুশাসনম্' ইত্যাদি রূপে চারি পাদে যোগশাস্ত্র নিরূপিত হইয়াছে। প্রথম পাদে চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ সমাধি এবং সমাধির সাধন, অভ্যাস, বৈরাগ্য নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে বিক্ষিপ্ত চিত্তের সমাধিসিদ্ধির নিমিত্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এইরূপ আটটি অঙ্গ নিরূপিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে যোগবিভূতি সকল ; চতুর্থ পাদে কৈবল্য নিরূপিত হইয়াছে। বিজাতীয় প্রত্যয়নিরোধ দ্বারা নিদিধ্যাসন সিদ্ধি-যোগের প্রয়োজন।

এইরূপে পশুপতিমতকে পাশুপতশাস্ত্র বলা হয়—পশুর পাশমুক্তির জন্য পশুপতি কর্ত্তৃক রচিত—'অথাতঃ পাশুপতং যোগবিধিং ব্যাখ্যাস্যাম'† ইত্যাদি রূপে পাঁচটি অধ্যায়ে পাশুপত শাস্ত্র বিভক্ত। এই পাঁচটি অধ্যায় দ্বারা কার্য্যরূপ জীব—সে পশু, কারণ ঈশ্বরকে পতি বলা হয় ; পশুপতিতে চিত্তসমাধানই যোগ, ভস্ম দ্বারা ত্রিষবণ স্নানকে বিধি বলা হয়, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। মোক্ষই এই শাস্ত্রের প্রয়োজন—তাহাকে দুঃখান্ত বলা হয়। এইরূপে (১) কার্য্য, (২) কারণ, (৩) যোগ, (৪) বিধি, (৫) দুঃখান্ত এই পাঁচটি নিরূপিত হইয়াছে।

নারদ প্রভৃতি পঞ্চরাত্ররূপ বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। এই বৈষ্ণবশাস্ত্রে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিটি পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। ভগবান বাসুদেব সকল কারণরূপ পরমেশ্বর। তাহা হইতে উৎপন্ন সঙ্কর্ষণ নামক জীব। তাহা হইতে মনরূপ প্রদ্যুম্ন, তাহা হইতে অনিরুদ্ধরূপ অহঙ্কার। এই সকল ভগবান বাসুদেবের অংশ-সম্ভূত, সুতরাং বাসুদেবের সহিত অভিন্ন ; ভগবান বাসুদেবের কায় মন বাক্য প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা আরাধনা করিয়া কৃতকৃত্য হওয়া যায় ইত্যাদি নিরূপিত হইয়াছে।

এইরূপে শাস্ত্রের প্রধান ভেদ নিরূপিত হইল। এই শাস্ত্র-সমূহ সংক্ষেপতঃ তিন প্রস্থানে বিভক্ত, যথা—আরম্ভবাদ

* শুভাশুভসূচক পশুপক্ষীর বিচরণ ও শব্দকে শকুন বলে।

* যদিও বর্তমান সময়ে আমরা এই সাংখ্যসূত্রই দেখিতে পাই, তথাপি ইহা মূল সাংখ্যশাস্ত্র নহে। এই সূত্রগুলি পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে। এই সাংখ্যসূত্র কোন প্রাচীনগ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই।

† পাশুপতশাস্ত্রের প্রথম সূত্র—'অথাতঃ পাশুপতং যোগবিধিং ব্যাখ্যাস্যাম।'

প্রথম, দ্বিতীয় পরিণামবাদ, তৃতীয় বিবর্ত্তবাদ। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু দ্ব্যণুকাদিক্রমে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগতের আরম্ভক হইয়া থাকে। তার্কিক ও মীমাংসকগণের মতে এই আরম্ভবাদে কার্য্য অসৎ এবং কার্য্যকারকবাদে উৎপন্ন হইয়া থাকে; সত্ত্ব-রজ-তম গুণাত্মক তত্ত্বকে প্রধান বলা হয়; এই প্রধান অহঙ্কারাদিক্রমে জগৎরূপে পরিণত হয়; সাংখ্য, যোগ, পাতঞ্জল, পাশুপত মতে সৎকার্য্যই সূক্ষ্মরূপে কারণ ব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়—ইহা দ্বিতীয় পক্ষ।* বৈষ্ণব মতে † পরমানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বীয় মায়াবশতঃ মিথ্যা জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইয়াছে—এই বিবর্ত্তবাদই তৃতীয় পক্ষ। সকল প্রস্থান প্রণেতা মুনিগণের সিদ্ধান্ত আপাততঃ ভিন্ন হইলেও বিবর্ত্তবাদে পর্য্যবসান দ্বারা অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই তাঁহাদের মুখ্য প্রতিপাদ্য ইহাই তাৎপর্য্য। বিভিন্ন প্রস্থানের মুনিগণ সর্ব্বজ্ঞত্ববশতঃ ভ্রান্ত নহেন। কিন্তু যাঁহারা বাহ্য বিষয়ে আসক্তচিত্ত তাঁহাদের আপাততঃ পরমপুরুষার্থে প্রবেশ সম্ভব নহে, তাঁহাদের নাস্তিক্যমাত্র প্রতিষেধের জন্য এই সকল প্রকারভেদ প্রদর্শিত হইল। নাস্তিক্যমাত্র প্রতিষেধের জন্য যে সমস্ত প্রস্থান রচিত হইয়াছে তাহাদেরও পরম তাৎপর্য্য অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই বটে। কিন্তু প্রস্থান-প্রণেতৃগণের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বেদবিরুদ্ধ অর্থেও তাহাদের তাৎপর্য্য আছে এইরূপ উৎপ্রেক্ষাপূর্ব্বক সমস্ত মতই উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়া জনগণ নানা পথানুসারী হইয়া থাকে।

* এই সিদ্ধান্তে কার্য্য সৎ এবং উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ কার্য্যে অবস্থিত এবং কারণ, ব্যাপারদ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তে অসতের উৎপত্তি স্বীকার করা হয় না।

† বৈষ্ণবগণও পরিণামবাদী। পরিণামবাদ দুইটি (১) জড়পরিণাম (২) চিৎপরিণাম।

লোটা নাগা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

আও নাগাদের দেশের দক্ষিণে দয়াং নদীর উভয় তীরবর্তী অঞ্চলে লোটা নাগাদের বাস। লোটাদের লোকসংখ্যা কুড়ি হাজারের বেশী নয়। যাবতীয় নাগা-সম্প্রদায়ের মধ্যে লোটাদের ভিতরেই খ্রীষ্টধর্মের প্রচার হয়েছে সবচেয়ে বেশী। পাহাড়ের পাদদেশে যে-সমস্ত লোটা বাস করে তারা প্রতিবেশী অসমীয়া হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পূজা-পার্ব্বণ ইত্যাদি বহুল পরিমাণে গ্রহণ করেছে। লোটাদের দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে কোনও কোনও গ্রামে খুব ধুমধাম করে লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে—এই পূজাকে এরা বলে রংসিকাম। এরা যে ভাবে নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠানাদি বর্জ্জন করতে সুরু করেছে তাতে মনে হয় যে, ভবিষ্যতে এদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলতে কিছু থাকবে না।

লোটাদের গায়ের বর্ণ পীত, মাথার চুল সাধারণতঃ খাড়া। লোটা যুবকেরা প্রায় সকলেই গোঁফদাড়ি নখ দিয়ে টেনে তুলে ফেলে। লোটাদের চক্ষু পিঙ্গল এবং ঈষৎ তির্য্যক। পুরুষেরা মাথার চার পাশ ক্ষুর দিয়ে চেঁচে কামিয়ে ফেলে। ছোট ছোট মেয়েদের মাথা কামিয়ে একদম নেড়া করে ফেলা হয়—সাত বছরের পর থেকে তারা লম্বা চুল রাখতে পারে।

পোশাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার

লোটাদের পরিধেয় বস্ত্রের নাম 'লেংটা'। (কথাটা অসমীয়া ভাষা থেকে ধার করা—মানে নেংটি)। এই অপরিসর বস্ত্রখণ্ড সাদা অথবা নীল রঙের এবং লাল ডোরা-কাটা ঝালরযুক্ত। মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড (সুরহাম) বাইশ ইঞ্চি চওড়া। এটি তারা কোমরে গেরো দিয়ে পরে। সুরহামের ফুল-পাতা ইত্যাদির নক্সা-তোলা পাড়ের বাহার চমৎকার।

লোটারা যখন ক্ষেতে কাজ করে কিংবা গ্রীষ্মকালে বাড়ীতে বিনা কাজে সময় কাটায় তখন লেংটা ছাড়া আর কিছুই পরে না। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে যাবার সময় কিংবা গ্রাম থেকে স্থানান্তর গমনকালে আন্দাজ আড়াই হাত লম্বা একটি চাদর গায়ে দিয়ে থাকে। তবে সাধারণতঃ মেয়ে পুরুষ সকলেরই ঊর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত থাকে। উত্তর অঞ্চলের অবিবাহিতা লোটা মেয়েরা ঘন নীল রঙের যে বস্ত্রখণ্ডটি পরিধান করে তার নাম মুকসু। বিয়ের দিন রাত্রিবেলা পতিগৃহে যাত্রাকালে নববধূ 'লয়েসু' নামে সাদা এবং লাল রঙের বর্ডার দিয়ে চতুষ্কোণ নকসা-তোলা যে বস্ত্রখণ্ডটি পরিধান করে সেটি অত্যন্ত নয়নাভিরাম।

লোটা মেয়েদের চেয়ে পুরুষদেরই গয়নাগাঁটির প্রতি আসক্তি বেশী। ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলেই সাধ্যমত অলঙ্কারাদি দ্বারা অঙ্গশোভা বর্দ্ধনের চেষ্টা করে। কানের তেলোয় ফুটো করে তারা পরে পেতলের আংটি, আর তাতে সুতোর গোছা গুঁজে রাখে। সেমা এবং আও নাগাদের মত

তাঁত বোনা

লোটারাও কনুইয়ের উপর হাতীর দাঁতে তৈরি বাজুবন্ধের মত আকৃতিবিশিষ্ট এক প্রকার গয়না (করো) পরে। আসল গজদন্তের 'করো' কিনবার ক্ষমতা যাদের নেই, তারা বাহুতে কাঠের তৈরি এক ধরণের সাদাটে মসৃণ এবং গোলাকার বাজুবন্ধ ধারণ করে। আগেকার দিনে নরমুণ্ড শিকার করে যে একটি বিশেষ উৎসব সম্পন্ন করত সে-ই কেবল কব্জীতে সারি সারি কড়ি দিয়ে তৈরি চুড়ি (খেকাপ) পরতে পারত।

বুনো কলার বীচি দিয়ে তৈরি এক ধরণের পাঁচ-ছয় নরী কণ্ঠহার লোটাদের অতি প্রিয় অলঙ্কার। এই হারে মাঝে মাঝে এক একটি ফুটো করা শাঁখের টুকরো বসানো থাকে। লোটা মেয়েদের গয়না-গাঁটির বালাই কম। এদের নিরাবরণ দেহ প্রায় নিরাভরণ বললেই চলে। কানের তেলোয় তারা লাল পশমী সুতো দিয়ে এক রকম পাখীর পালক জড়িয়ে রাখে। গলায় তাদের কলার বীচির মালা। কনুইয়ের উপর গোলাকার মোটা রূপ-দস্তার তৈরি বালা—কব্জীতে চার-পাঁচ গাছা করে ছোট ছোট চেপ্টা পিতলের চুড়ি।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :—লোটাদের প্রকৃতিতে অনেক সদ্‌গুণ আছে, কিন্তু এরা মনোভাব গোপন করতে সুপটু বলে বিদেশীর পক্ষে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশবার সুযোগ না হলে এদের স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া কঠিন। এরা রঙ্গরস করতে খুব ভালবাসে এবং প্রাণ খুলে হাসতে পারে। সততা এদের স্বভাবসিদ্ধ। চৌর্য্যবৃত্তির কথা এদের সমাজে বড় একটা শোনা যায় না। লড়াইয়ে লোটারা যথেষ্ট বীরপনা দেখিয়ে থাকে। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু শিকার করবার সময় লক্ষ্যভেদে তাদের অসাধারণ দক্ষতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দাম্পত্য ব্যাপারে লোটা পুরুষদের একনিষ্ঠতা আছে। লোটাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা অত্যধিক। আত্মহত্যার প্রধান হেতু হচ্ছে প্রণয়ঘটিত ব্যাপার।

পল্লী ও বাসগৃহ

লোটা গ্রামগুলো সাধারণতঃ পাহাড়ের সানুদেশে কোনও ঝর্ণার নিকটে প্রতিষ্ঠিত হয়। আগেকার দিনে বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করবার জন্যে লোটারা গ্রামের বাইরে পরিখা খনন করে তার তলদেশে এবং দুই পাড়ে 'পঞ্জী' (সূক্ষ্মাগ্র বংশখণ্ডসমূহ) পুঁতে রাখত। পারাপারের সুবিধার জন্যে এই পরিখার উপরে একটি তক্তা বিছানো থাকত, শত্রুর আক্রমণের আভাস পেলে সেটিকে সরিয়ে ফেলা হ'ত। গ্রামের ভিতরেও চারদিক মজবুত বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে মাঝে মাঝে পঞ্জী পুঁতে রাখা হ'ত।

প্রত্যেক লোটা গ্রামের প্রবেশপথের মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসমূহ নজরে পড়ে। আগেকার দিনে এই সমস্ত গাছের শীর্ষদেশে আরোহণ করে গ্রামরক্ষী দল শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করত।

লোটা গ্রামে ছোট ছোট কুঁড়েঘরের সংখ্যাই বেশী। ধনী লোকদের বাসভবনগুলিও অতিসাধারণ—আও সেমা প্রভৃতি অন্যান্য নাগাগোষ্ঠীর সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাসগৃহের মত বিরাট আকারের নহে। লোটারা ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলেই অত্যন্ত মিতব্যয়ী। জাঁকজমক দেখানোর জন্যে প্রচুর টাকা খরচ করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহনির্ম্মাণ এদের নিকট নেহাত অপব্যয় বলে বিবেচিত হয়।

মোরাং—প্রত্যেক নাগা গ্রাম দুই বা ততোধিক 'খেল' অর্থাৎ পাড়ায় বিভক্ত। প্রত্যেক খেলে অবিবাহিত যুবকদের একটি আড্ডাঘর বা মোরাং আছে। লোটাদের সমাজ-জীবনে এই মোরাং-এর প্রভাব খুব বেশী। মোরাং-এ বা চাম্পুতে স্ত্রীলোকদের প্রবেশাধিকার নাই। আগেকার দিনে যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হবার আগে এই চাম্পুতেই সর্দারদের বৈঠক বসত এবং নিহত শত্রুর ছিন্নমুণ্ড এখানেই প্রথম নিয়ে আসা হ'ত। সামাজিক বিধান অনুসারে বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গাঁয়ের প্রত্যেক যুবক রাত্রে মোরাং-এ শয়ন করতে বাধ্য। মোরাংগুলো সাধারণতঃ নির্ম্মিত হয় গ্রামপথের একেবারে শেষপ্রান্তে। লোটাদের স্থাপত্যশিল্পে দক্ষতার পরাকাষ্ঠা হচ্ছে এই মোরাং বা যুবকদের যৌথ শয়নাগারসমূহ। সাধারণতঃ এগুলো দৈর্ঘ্যে চল্লিশ ফুট এবং প্রস্থে পনর ফুট। কোনো কোনো মোরাং মাটির উপর এবং কোনো কোনোটি মাটি থেকে দুই ফুট উঁচু মাচার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

খাদ্য : ভাতই লোটাদের প্রধান খাদ্য। যাবতীয় গৃহপালিত জন্তু এবং অধিকাংশ বুনো জানোয়ারের মাংসই এরা খেয়ে থাকে। তা ছাড়া সব রকম পাখী, মৌমাছি, ভীমরুলের চাক, এবং বড় বড় মাকড়, শাদা পিঁপড়ে ইত্যাদি হরেক রকমের কীটপতঙ্গও এদের খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। বন্যজন্তুর মধ্যে বাঘ আর চিতা বাঘ মনুষ্যতুল্য বলে কেবলমাত্র এদের

মাংস লোটারা খায় না। মাছমাংস বাসি এবং পচা অবস্থায় খেতেই এরা বেশী পছন্দ করে। পশুর নাড়ীভুঁড়ি, রক্ত, চামড়া এক কথায় লোম ছাড়া আর সবকিছুই এরা অবলীলাক্রমে উদরস্থ করে।

'মধু' বা 'সোকো' (দেনো মদ) হচ্ছে লোটাদের প্রধান পানীয়। যখন মধু পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠে তখনই শুধু লোটারা জলপান করে। ভাত খাবার সময় লোটাদের মধু চাই-ই।

গ্রাম্য সংসদ : আগেকার দিনে লোটাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। বহিঃশত্রুরা প্রায়ই এসে গাঁয়ের উপর হানা দিত। এই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে কয়েকটি গ্রামের মাতব্বরদের নিয়ে এক একটি গ্রাম্য সংসদ গঠিত হ'ত এবং যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে সব চেয়ে প্রতিপত্তিশালী গ্রামের মাতব্বরদের পরামর্শই সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য হ'ত। অন্যান্য ব্যাপারে কিন্তু এক গ্রাম অন্য গ্রামের কর্তৃত্ব স্বীকার করত না। আগেকার দিনে প্রত্যেকটি গ্রাম শাসিত হ'ত একজন সর্দ্দার বা একিয়ুং দ্বারা। বয়োবৃদ্ধদের নিয়ে গঠিত এক পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় তিনি যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করতেন। যে ব্যক্তি প্রথম গিরিগাত্রস্থ জঙ্গল কেটে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করতেন তাঁকেই সর্দ্দার নির্ব্বাচিত করা হ'ত। উত্তরাধিকারসূত্রে সর্দ্দারের পদ তাঁর পরিবারের লোকেদের ভাগ্যেই জুটত। সকল ক্ষেত্রে পুত্রই যে পিতার স্থলাভিষিক্ত হ'ত তা নয়, পরিবারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিই নিজের ক্ষমতায় ও চরিত্রবলে সর্দ্দারের পদ লাভ করতেন। যুদ্ধে অধিনায়কত্ব করাই ছিল তাঁর সর্ব্বপ্রধান কাজ।

ইদানীং গ্রামের বিবাদ-বিসংবাদ ইত্যাদির মীমাংসা এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি নির্ব্বাহিত হয় প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী গ্রামবৃদ্ধদের নিয়ে গঠিত এক পরিষদদ্বারা। এই গ্রাম্য সংসদের প্রধান বা মোড়ল নির্ব্বাচিত হয় সরকার কর্তৃক।

গরুবাছুর বাড়ীঘর এ সকল হ'ল লোটাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কিন্তু জমির মালিক যে সর্ব্বক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষই হবে এমন কোনও কথা নেই। অবস্থাভেদে কোন কোন ভূমিখণ্ড গোটা গ্রামের, কোনও বিশেষ মোরাং-এর বা বিশেষ গোষ্ঠীর সম্পত্তি হতে পারে। গ্রামের সন্নিহিত যে সকল পোড়ো জমি আছে তাও সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। প্রত্যেক মোরাং-এর নিজস্ব জমি আছে—তা সমষ্টিগত ভাবে মোরাং-এরই সম্পত্তি, তদন্তর্গত কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়। এতে মোরাং-এর যুবকেরা সকলে মিলে চাষবাস করে, ফসল ফলায় এবং সেই ফসলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা মোরাং পুনর্নির্ম্মাণ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উৎসবের জন্য মাংসাদি ক্রয় করে। বিয়ের পর কোনও যুবক যখন মোরাং ছেড়ে নিজ বাটীতে গিয়ে ঘর-সংসার পাতে তখন নিজের নিরন্তর সাহচর্য্য এবং শ্রমের ফল থেকে সঙ্গীসাথীদের বঞ্চিত করায় ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ মোরাং-এর ছেলেদের তাকে কিছু মাংস দিতে হয়।

পাঙটি গ্রামের মোরাং বা চাম্পু

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি বিক্রয় করবার অধিকার লোটাদের নাই। কোনও ব্যক্তির উত্তরাধিকারী না থাকলে তার জমি গোষ্ঠীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

মুণ্ডশিকার : অন্যান্য নাগাদের মত আগেকার দিনে লোটাদের মধ্যেও নরমুণ্ড শিকার ও সংগ্রহের প্রথা ছিল। এই কুপ্রথা লোপ পাওয়াতে তাদের জীবনের ধারাই বদলে গেছে। তখনকার দিনে এদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার আর শান্তিপূর্ণ অবস্থা ছিল স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। সাধারণতঃ এরা যখন স্ত্রীপুরুষ একত্রে ক্ষেতে কাজে রত থাকত তখন সময় সময় শত্রুরা অতর্কিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের একেবারে কচুকাটা করে ফেলত। মাঝে মাঝে ভিন্ন গ্রামের জনকতক নরমুণ্ডশিকারী একজোট হয়ে লোটাদের গাঁয়ে এসে ঝরণার নিকটে জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকত এবং কোনও স্ত্রীলোক যখন ঝরণাতলায় জল নিতে আসত তখন অতর্কিত আক্রমণে তাকে হত্যা করে তার মুণ্ডটি কেটে নিত। নির্জ্জন পথে কোনও পথচারী হয় ত একাকী চলেছে হঠাৎ আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিত।

রণসজ্জায় লোটা যোদ্ধা

লোটারাও এমনি ভাবে সময় সময় ভিন্ন গ্রামে হানা দিয়ে নরমুণ্ড শিকার করত। ভিন্ন গোষ্ঠীর স্ত্রী-পুরুষ-যুবা-বৃদ্ধ-শিশু নির্ব্বিশেষে সবাইকে তারা হত্যা করত। যে সকল শিশুর দন্তোদ্গম হয় নি তাদের মুণ্ডগুলো তারা পথের পাশেই ফেলে দিয়ে চলে যেত, কেননা, অদন্ত শিশুর মুণ্ড তার নৃমুণ্ডমালায় স্থান পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হ'ত না। পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের মুণ্ডকেই তারা অধিকতর মূল্যবান বলে মনে করত। সাধারণতঃ নিহত ব্যক্তির মাথা এবং হাত-পায়ের আঙুলগুলো কেটে নেওয়া হ'ত। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাথা কাটা সম্ভব না হলে, কানটিমাত্র কেটে নিয়ে আসা হ'ত।

তখনকার দিনে লোটারা যুদ্ধে জয়লাভ করে শত্রুর কর্ত্তিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বস্ত্রখণ্ডে জড়িয়ে নিয়ে নিজেদের গৃহাভিমুখে রওনা হ'ত। এই বিজয়ীদল স্ব-গ্রামের প্রান্ত-সীমায় পৌঁছে তারস্বরে চীৎকার করে বলে উঠত—"ও শামাসারি।" অর্থাৎ—"আমরা দুশমনদের নিকাশ করেছি"। এই প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি শুনে গাঁয়ের স্ত্রীপুরুষ সকলের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হ'ত, বহুকণ্ঠের সম্মিলিত বিকট অট্টরোলে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠত—গ্রামপ্রত্যাগত বিজয়ী বীরবৃন্দের অভ্যর্থনা করবার জন্যে তারা "ও ইমাইইয়ালি" (আমরা খুশী হয়েছি) একথা বলতে বলতে ত্বরিতপদে ছুটে আসত। তখন মুণ্ডশিকারীরা এক শোভাযাত্রা গঠন করে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মোরাং-এ উপস্থিত হয়ে মদ্যপানে রত হ'ত।

নারীর মূল্য : লোটাদের সমাজে নারীর বিশেষ মর্য্যাদা আছে। ঘরে বাইরে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে লোটা স্বামী তার স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। লোটাদের সমাজে স্ত্রী স্বামীর দাসী নয়; স্বামী তাকে অস্থাবর সম্পত্তিবিশেষ বলেও মনে করে না—স্ত্রী হচ্ছে তার প্রকৃত কর্ম্মসঙ্গিনী। স্ত্রীকে পরিবারের সকলের জন্যে রান্নাবান্না করতে হয়, ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করতে হয়, জঙ্গল থেকে জ্বালানি এবং ঝরণা থেকে জল বয়ে নিয়ে আসতে হয়। ক্ষেতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কাজ করে পাশাপাশি উপবেশন করে, অতিথি অভ্যাগতেরা এলে সবাইকে যথোচিত ভাবে মধু পরিবেশন করা হয়েছে কিনা গৃহিণীকেই সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

ধর্ম্মবিশ্বাস : লোটারা প্রেতোপাসক। যে সমস্ত উপদেবতার পূজা তারা করে তন্মধ্যে কেউ কেউ উপযুক্ত উপচার পেয়ে যদি খোশ মেজাজে থাকেন তা হলে মানুষের কোনও অনিষ্ট করেন না। কেউ কেউ আবার কিন্তু রীতিমত দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন। আমাদের দেবকল্পনার সঙ্গে লোটাদের পটসু নামক দেবতাবৃন্দের কিঞ্চিৎ সারূপ্য আছে। তাঁরা আমাদের পৃথিবীর মতই এক লোকে বাস করেন। আমাদের আকাশ হচ্ছে তাঁদের অধ্যুষিত দেবলোকের তলদেশ। 'নরবপুই' এই দেবতাদের 'স্বরূপ'। পটসুদের ভাষা কিন্তু মনুষ্যভাষার অনুরূপ নহে। ৎসবোই গোষ্ঠীর কোনও কোনও লোক নাকি তাঁদের ভাষা বুঝতে পারে। লোটাদের বিশ্বাস যে, পটসুরা সময় সময় জোড় বেঁধে অনুচরবর্গপরিবৃত হয়ে মাঙ্গল্য দ্রব্য সহ পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিদের (রেটসেন) সঙ্গে আলাপাদি করে থাকেন।

লোটারা মনে করে যে প্রত্যেক মানুষের দুটো করে আত্মা আছে—ওমোন এবং সুঙ্গি। ওমোনকে দেখা যায় মানুষের ছায়ারূপে। আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন হয়, বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয় ওমোন তখন মানুষের দেহাভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দেন।

লোটারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। এদের একটি সিদ্ধান্ত এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ মৃতের দেশে গিয়ে নির্দ্দিষ্টকাল বাস করে। সেখানে আবার তার মৃত্যু হয় এবং পুনরায় মর্ত্তালোকে সে মাছি হয়ে জন্মায়। আর একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে—মানুষ পর পর নয় বার জন্মগ্রহণ করে। তার পর তার 'পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে'।

লোটার ধর্ম্ম তাকে কোন নীতিশিক্ষা দেয় না। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে নয়, কিন্তু ঐহিক সুখভোগের জন্যেই সে পূজা, বলিদান ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে। তা সত্ত্বেও কিন্তু বহু লোটা পাপকে ঘৃণা করে এবং সৎপথে থেকে জীবন কাটায়।

লোটাদের মধ্যে সিরোসি, পিকুচাক, রাঙ্কেনড়ি, টুকা প্রভৃতি বিবিধ সার্ব্বজনীন গ্রামীণ উৎসব প্রচলিত আছে। এদের সমাজে 'রেটসেন' নামক এক শ্রেণীর গুণী লোকের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। রেটসেনরা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, এদের নাকি ভবিষ্যৎ কথনের শক্তি আছে।

বিবাহ: লোটা ছেলেরা সাধারণতঃ সতেরো থেকে বাইশ বৎসরের মধ্যে বিয়ে করে থাকে, মেয়েদের বিবাহের বয়স চৌদ্দ থেকে আঠার। উত্তর অঞ্চলের লোটাদের বিবাহপ্রথা নিম্নলিখিত রূপ :—

কোনও যুবক যদি কোনও যুবতীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়, তা হলে সে তার পিতামাতাকে সেকথা বলে। তখন হয় তার মা, আর নয়তো অন্য কোনও বর্ষীয়সী আত্মীয়া কনের বাপের বাড়ী গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করে। বিয়েতে কনের বাপমায়ের মত থাকলে বরের মা বা আত্মীয়া দিনকতক পরে পুনরায় এক চোঙা ভরতি 'রোহি মধু' সহ কনের বাড়ীতে যায়—কনের বাপ মা সেই মদ্য পান করে। তার পর উভয় পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা হয়ে কন্যাপণ স্থিরীকৃত হলে পর বর কনেকে বাঁশ ও বেতের তৈরি একটি বর্ষাতি (ফুচিও) একটা ছোট ঝুড়ি আর একটা দায়ের হাতল উপহার দেয়।

দিনকতক পরে বিবাহের আনুষঙ্গিক ৎসইমুটা উৎসবের আয়োজন হয়। এতদুপলক্ষ্যে বর একটি মোরগ মেরে নিজেই রান্না করে এবং এই রান্না করা মাংস আর কিয়ৎ পরিমাণ মদ্যমিশ্রিত অন্ন সহ এক বুড়োকে সঙ্গে নিয়ে কনের বাপের বাড়ীতে যায়। বরের সহযাত্রী এই বৃদ্ধকে বলে হাৎসেন। হাৎসেন মদ্যমিশ্রিত অন্নের পাত্রটি কনের বাপের হাতে অর্পণ করে। কনের পিতা তখন কনেকে রান্নাঘর থেকে কিছু মদে ভেজানো ভাত নিয়ে আসতে বলে। কনে তখন দুই পরিবারের মদ্যসিক্ত অন্ন একত্রে মিশিয়ে তা চুইয়ে এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করে। বর-কনে ছাড়া আর সবাই এই পানীয়ের সদ্ব্যবহার করে থাকে। মদ্যপানের পালা শেষ হলে বরকনে গৃহমধ্যে শয্যার উপর পাশাপাশি উপবিষ্ট হয় আর হাৎসেন বরের আনা মুরগীটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে হাতে নিয়ে তাদের বিপরীত দিকে বসে। কিছুক্ষণ পরে সে তার বাহুদ্বয় বারকয়েক সুমুখের এবং পেছনের দিকে দোলায়িত করতে করতে প্রার্থনা করে, বরকনে দুটিতে যেন চিরকাল সুখে শান্তিতে একত্রে বাস করে। এই অনুষ্ঠানের পর বরকে প্রায় এক বৎসরকাল শ্বশুরালয়ে থেকে জন খাটতে হয়। ক্ষেতের সমুদয় ফসল কাটা হলে পর বরের আত্মীয়-কুটুম্বেরা জঙ্গলে গিয়ে কাঠসংগ্রহে রত হয় এবং প্রত্যেকে এক এক বোঝা করে কাঠ কনের বাপের বাড়ীতে বয়ে নিয়ে আসে। এই

'টুকু' উৎসবের জন্য চাল সংগ্রহে রত দু'জন 'পুঠি' বা পুরোহিত

শ্রমসাধ্য কাজের জন্যে তাদের প্রচুর মধু (মদ্য) পান করিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। এর দিন পাঁচেক পরে হয় লাৎসোয়া উৎসবের অনুষ্ঠান। বরের নিজ-গোষ্ঠির মেয়েরা এবং তাদের স্বামীরা জঙ্গলে যে উদ্বৃত্ত কাষ্ঠখণ্ডসমূহ পড়ে ছিল তা নিঃশেষে আহরণ করে নিয়ে এসে বরের শ্বশুরবাড়ীর সুমুখে গাদা করে রাখে। সেদিন রাত্রে কনের বাপের বাড়ীতে হাৎসেন (গুণী) একটা কুক্কুট-শাবককে গলা টিপে মেরে তার নাড়ীভুঁড়ি বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা পরীক্ষাপূর্ব্বক দম্পতির মধ্যে কে আগে মরবে, প্রথম সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে।

বৎসরান্তে বর শ্বশুরের ঋণমুক্ত হয়ে জনখাটার হাত থেকে রেহাই পেয়ে নিজের স্বতন্ত্র বাসগৃহ নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হয়—অবশ্য সে তখন শ্বশুরবাড়ীতেই অবস্থান করে। গৃহ-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হলে পর সুরু হয় হালাম উৎসবের উদ্যোগ-আয়োজন। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাত্রিবেলায় বরপক্ষের লোকেরা বরকনে উভয়কে বরের নবনির্ম্মিত বাসগৃহে (কিথাঙ্গো) নিয়ে যাবার জন্যে কনের পিত্রালয়ে এসে হাজির হয়। বরপক্ষীয়দের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই কনের বাপের বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে সুরু হয় উভয়পক্ষের লোকেদের মদ্যপানের পালা। বরকনে দু'জনেই তখন থাকে অন্দরমহলে। মদের পাত্রগুলো নিঃশেষিত হলে বরপক্ষের লোকেরা কতকগুলো

বিবাহিতা লোটা তরুণী

গাছের পাতায় মুড়ে কিছু মাংস এবং মদপূর্ণ একটি বাঁশের চোঙা ভিতর-বাড়ীতে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং কন্যাপক্ষীয়দের উদ্দেশ্যে সমস্বরে চেঁচিয়ে বলে ওঠে— "ওদের আসতে দাও। কথাবার্তা যা বাকী আছে তা কাল হতে পারে, পরশুও হতে পারে। রাত যদি পোহায়ে যায়, শোনা যায় মোরগের ডাক, তা হলে তো বরকনেকে তাদের নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হবে না। ভালয় ভালয় যদি না তাদের আসতে দাও, তা হলে আমরা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেব তোমাদের ঘরবাড়ী।" এমনি ভাবে কিছুক্ষণ তারা চেঁচামেচি করলে পর বর কনেকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসা হয়। তারপর স্ত্রী-পুরুষের এক সম্মিলিত শোভাযাত্রা রওনা হয় বরের বাড়ীর দিকে। এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকে বরের নিজ-গোষ্ঠীর একটি বিবাহিতা স্ত্রীলোক। শোভাযাত্রা বরের বাড়ীতে পৌঁছলে পর বরের কয়েকজন কুটুম্ব বর-কনেকে কিথাঙ্গ্রোতে নিয়ে যায়, শোভাযাত্রীরাও তাদের অনুগমন করে। বর-কনে কিথাঙ্গ্রোতে গিয়ে দেখে গৃহপ্রাঙ্গণে হান্ট-সেন তাদের প্রতীক্ষা করছে। হান্টসেন বরের বর্শাটি তার হাত থেকে নিয়ে সেটিকে খাড়া অবস্থায় কিথাঙ্গ্রোর বহিঃ-প্রাঙ্গণে মাটিতে প্রোথিত করে, তারপর বর-কনের হাতে কিছু জল ছিটিয়ে দিয়ে তাদের গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে যায়। গৃহ-প্রবেশ করে বর-কনে তার দু'পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। কিছু-ক্ষণ পরে তাদের সেখানে রেখে সে স্থানান্তরে চলে যায়।

স্বামী স্ত্রী কিথাঙ্গ্রোতে সে রাত্রি যাপন করে। বরের গোষ্ঠীর দুটি বালক সেদিন তাদের সঙ্গে শোয়। দুই দিন পরে স্ত্রীকে নিয়ে স্বামী মাংসাদি সহ শ্বশুরবাড়ীতে যায়।

আরও তিন-চার দিন পরে পনিরটসেন উৎসব উদ্‌যাপিত হলে পর বিবাহসংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : কারও মৃত্যু হলে পর তার অন্তিম শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনেরা প্রথমে তার চোখ দুটি ঢেকে দিয়ে মুখমণ্ডলে জলের ছিটা দেয়। এক বুড়ো একটি কুক্কুট-শাবকের পায়ে একটি কড়ি বেঁধে দিয়ে সেটিকে কিছুক্ষণের জন্যে মৃতের হাতের উপরে রাখে। তারপর মৃতব্যক্তির সঙ্গে মৃতের দেশে গিয়ে যাতে সে কক্ কক্ শব্দ করে সেখান-কার অধিবাসীদের নবাগতের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে পারে সে উদ্দেশ্যে সেটিকে মেরে ফেলে। এই নিহত কুক্কুট-শাবকটিকে মৃতের খাড়ের উপর দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

অতঃপর যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত মৃতের বাড়ীর সুমুখে আন্দাজ চার হাত গভীর একটি গর্ত খনন করা হয় এবং মৃত-দেহকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করে তন্মধ্যে শুইয়ে রাখা হয়। মৃতের কব্জীতে বেঁধে দেওয়া হয় একটি সচ্ছিদ্র কাচের মালা। মৃত্যুসরণী অতিক্রমণ কালে এছিলিভান খামো নামে এক বিদ্‌ঘুটে নামওয়ালা ভূতের সঙ্গে নাকি মৃতের মোলাকাত হয় এবং এই মালাটির বদলে উক্ত ভূত নাকি তাকে পান করবার জন্যে জল দান করে।

শবদেহটিকে কবরে রাখবার পর তদুপরি আড়াআড়ি ভাবে কতকগুলো ছোট ছোট বংশখণ্ড এবং মৃতের খাটিয়ার দুটো তক্তা স্থাপন করা হয় এবং কবরটিকে একটি বাঁশের চাটাই দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। কুকুর এবং শূকরের পাল যাতে কবরের মাটি না খুঁড়তে পারে সেজন্যে সমাধির উপরি-ভাগে পাথরের টুকরো এবং বুনো কাঁটা স্তূপাকার করে রাখা হয় এবং কবরটির চতুষ্পার্শ্বে একটি অনতিউচ্চ বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। সর্ব্বশেষে দুটো বাঁশের খুঁটি মাটিতে পোঁতা হয়—একটি মৃতের মাথার দিকে, আর একটি তার পায়ের দিকে। এই খুঁটি দুটোর উপরে এড়ো ভাবে রাখা হয় একটি লম্বা বাঁশ। আর তাতে মৃতের (পুরুষ হলে) দায়ের হাতল, কাপড়-চোপড়, কড়িখচিত লেংটা, গজদন্ত-নির্ম্মিত বাজুবন্ধ প্রভৃতি ঝুলিয়ে রাখা হয়, আর তার বর্শা-গুলো খাড়া অবস্থায় কবরের উপর পুঁতে রাখা হয়। স্ত্রী-লোকের বেলায় শিয়রের দিকের বাঁশের খুঁটিতে কেবল তার ঝুড়িটি এবং পাঁচ টুকরো মাংস ঝুলানো হয়।

এ সকল কৃত্য শেষ হলে পর কবরের ওপর জ্বালিয়ে দেওয়া হয় একটি মশাল। পুরুষের মৃত্যুর পরে ছয় দিন এবং স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পরে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত মৃতের পরিবারের

কারও ভিন্নদেশীয় সঙ্গে কথা বলা কিংবা কোন জীবহত্যা করা নিষিদ্ধ।

পরবর্ত্তী টুকা এমুং উৎসবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কবরের উপর অগ্নি অনির্ব্বাণ রাখা হয় এবং প্রত্যহ মৃতের উদ্দেশ্যে সমাধিক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্যাদি নিবেদন করা হয়। টুকা এমুঙের পর মৃতব্যক্তির আত্মা নাকি মর্ত্ত্যলোক ছেড়ে মৃতের দেশে প্রয়াণ করে। তখন থেকে কবরের উপর দিয়ে আবার সুরু হয় লোক চলাচল।

সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রসম্বলিত মহাবিশ্বের বিরাটত্ব এই আদিম জাতির লোকেদের হৃদয়ে বিস্ময়মিশ্র ভীতির উদ্রেক করে। ভূমিকম্প, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সম্বন্ধে তারা অদ্ভুত ধারণা পোষণ করে। তারা মনে করে, পৃথিবী সমতল এবং তার শেষ প্রান্ত যে কোথায় তা জানা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ভূমিকম্প সম্বন্ধে এদের ধারণা অনেকটা হিন্দু পৌরাণিক বর্ণনারই অনুরূপ। তারা বলে, পশ্চিম দিকে অস্তরবির দেশে যেখানে আকাশ আর ধরণী পরস্পরের সহিত মিলিত হয়েছে সেখানে নাকি বাস করে এক বিরাটকায় বিষধর—সে যখন গা ঝাড়া দেয় তখনই সারা পৃথিবী কেঁপে ওঠে।

শিলাবৃষ্টি সম্বন্ধে লোটাদের ধারণা আজব। তারা বলে, যে-পটসুরা আকাশে বাস করে, তাদের মাথার উপরে আছে আর একটি পটসু-লোক। সেখানকার পটসুরা অত্যন্ত দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন। তারা সময় সময় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের টুকরো নিক্ষেপ করে নীচেকার পটসুদের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করে। কিন্তু যখনই উপর থেকে প্রচণ্ড করকাপাত সুরু হয় তখন নীচেকার পটসুরা সাবধান হয়ে তাদের বাসগৃহের দরজাগুলি বর্ষাতির মত পিঠের ওপর বহন করে বাইরে বেরিয়ে যায়। বরফের বিরাট স্তূপসমূহ এই বর্ষাতির উপর আপতিত হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তারই মধ্য থেকে যে সকল ছোট ছোট টুকরো পৃথিবীতে ছিটকে পড়ে মর্ত্ত্যবাসীরা তাকেই বলে শিলাবৃষ্টি।*

*প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি J. P. Mills-এর *The Lhota Nagas* নামক পুস্তক থেকে গৃহীত।

বাঙালী ও মুষ্টিযুদ্ধ

শ্রীরাধিকারঞ্জন ঘোষাল

বর্ত্তমান বাংলার ক্রীড়াজগতে কিছুকাল যাবৎ মুষ্টিযুদ্ধের প্রসার বিশেষ লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশ এই দিক দিয়াও ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়া যাইতেছে। গাদী, হাডুডু প্রভৃতি বাংলার যে সকল জাতীয় ক্রীড়া বহুদিন যাবৎ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া আসিতেছিল। সেগুলি আধুনিক জগতে নিত্যনূতন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সমপদক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারে নাই। কাজেই সেগুলি এক প্রকার লোপ পাইতে বসিয়াছে। অবশ্য বিদেশের আমদানী ক্রীড়াদির মধ্যে বর্ত্তমান কালে ফুটবলকে বাঙালী একরূপ নিজস্ব করিয়াই লইয়াছে এবং ঐ ক্রীড়ায় বাংলার কিছু খ্যাতিও আছে। কিন্তু যে ভাবে বাহিরের খেলোয়াড় আমদানীর দিকে ইদানীং কর্ত্তৃপক্ষের নজর পড়িয়াছে তাহাতে ফুটবল ক্রীড়াজগতে বাঙালী খেলোয়াড়ের নাম আর কিছুকাল পরে শোনা যাইবে কিনা সে বিষয়ে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সঙ্কট-সময়ে বাংলার কয়েকটি ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠান বাঙালী যুবকদিগকে মুষ্টিযুদ্ধে নিপুণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়। বাংলা তথা ভারতের মুষ্টিযুদ্ধ উৎকর্ষের কথা চিন্তা করিলে প্রথমেই যাঁহার কথা মনে পড়ে তাঁহার নাম পি. এল. রায়—তিনিই ভারতে মুষ্টিযুদ্ধের প্রথম প্রবর্ত্তক।

তবে সাধারণ ভাবে বিচার করিতে হইলে প্রথমেই মনে জাগে মুষ্টিযুদ্ধ কি? ইহা আমাদের শিক্ষা করার সার্থকতা কি? ইহা কি শুধুই খেলাধুলার পর্য্যায়ভুক্ত?

স্থির ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের নিত্য-পরিচিত খেলাধুলার সহিত মুষ্টিযুদ্ধের কিছু পার্থক্য আছে। বর্ত্তমানে আমরা ফুটবল খেলি, ক্রিকেট খেলি, হকি খেলি কিন্তু এগুলি দ্বারা সমাজগঠনমূলক কার্য্যের সহায়তা আদৌ হয় কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। কিন্তু যদি আমরা পঞ্চাশ বা ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা স্মরণ করি তবে দেখি তখনকার দিনে খেলাধুলার দ্বারা শুধু যে ব্যক্তিগত ভাবে লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইত তাহা নয়, সমাজও সর্ব্বতোভাবে উপকৃত হইত। গাদী, হাডুডু প্রভৃতি খেলাধুলার মধ্য দিয়া তখনকার বাঙালীর স্বাস্থ্য যে ভাবে গড়িয়া উঠিত তাহা আজি-কার দিনে বিরল। তখন কুস্তির ব্যাপক প্রচলন ছিল—তাহাদ্বারা কুস্তিগীররা মনে আনন্দ লাভ করিত, তাহাদের শরীরগঠন হইত এবং তাহাদের হৃদয়ে সাহস ও শক্তি সঞ্চারিত হইত। কুস্তির চর্চ্চা প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কাজেই ইহাদের জায়গায় এমন একটি খেলা চালু হওয়ার প্রয়োজন যাহা দ্বারা শরীর-গঠন হইবে, মনে সাহস আসিবে অথচ যাহার মধ্যে ক্রীড়ার আনন্দও সমপরিমাণে বর্ত্তমান থাকিবে। মুষ্টি-

যুদ্ধের মধ্যে এগুলি আমরা পাই। ইহা মুষ্টিকের শক্তি-বর্দ্ধন করে, মনে একাগ্রতা আনয়ন করে, সাহস বৃদ্ধি করে, মুষ্টিককে যোদ্ধার অদম্য উৎসাহ এবং ধৈর্য্য ও বৈর্য্য দান করে অথচ ইহার মধ্যে আনন্দও কম পাওয়া যায় না। কাজেই

বাঁদিক থেকে—এইচ পাল, সন্তোষ দে
(বি বি-এর শিক্ষক) ও ফণী সুর

মুষ্টিযুদ্ধ এমন একটি ক্রীড়া যাহার মধ্য দিয়া যোদ্ধার এবং খেলোয়াড়ের মনোবৃত্তি একই সঙ্গে পাশাপাশি গড়িয়া উঠে।

মুষ্টিকের প্রথম প্রয়োজন উপস্থিতবুদ্ধি এবং তারপরই ধৈর্য্য। যে যত বেশী উপস্থিতবুদ্ধির সাহায্য লইতে শিক্ষা করিবে সে মুষ্টিযুদ্ধে তত বেশী সাফল্যলাভ করিবে। বিচার এবং বিবেচনা মুষ্টিযুদ্ধের অপরিহার্য্য অঙ্গ। প্রতিপক্ষের অবস্থান কিরূপ, এই অবস্থায় নিজ ভারসাম্য রক্ষা করিয়া কত অল্প শক্তির অপচয়ে কত প্রচণ্ড আঘাত হানিতে পারা যায়—এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তবে বিচক্ষণ মুষ্টিক একটি আঘাত করে এবং এতগুলি চিন্তা প্রায় একই সঙ্গে তার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতে থাকে। মুষ্টিককে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এতগুলি বিষয় বিচার-বিবেচনা করিয়া তৈরি হইয়া লইতে হইবে। মুহূর্ত্তের বিলম্বে তাহার ধরাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা, কাজেই মুষ্টিকমাত্রেরই বিচার-বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ যে মুষ্টিক মণ্ডলীর (Arena) মধ্যে ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলে সে মুষ্টিকের পরাজয় অনিবার্য্য। সুতরাং ধৈর্য্য মুষ্টিকের একটি অবশ্যশিক্ষণীয় গুণ। তার পর আসে শরীরগঠনের কথা। মুষ্টিকের পেশীগুলি স্থিতিস্থাপক (elastic) হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। রবার যেমন টানিয়া ছাড়িয়া দিলে নিমেষমধ্যে তাহার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে তেমনি মুষ্টিকের পেশীগুলিও এমনই হওয়া প্রয়োজন যেন সেগুলি প্রতিপক্ষকে আঘাত হানিয়া আবার মুহূর্ত্তমধ্যে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া আত্মরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে। মুষ্টিকের দৃষ্টি সব সময় সজাগ ও সতর্ক থাকা প্রয়োজন, চিত্তের স্থৈর্য্যও তার পক্ষে অত্যাবশ্যক। অতএব দেখা যাইতেছে, যে খেলার মধ্য দিয়া মানসিক ও শারীরিক বিভিন্ন বৃত্তির অনুশীলন একই সঙ্গে সম্ভব তাহার ব্যাপক প্রচলন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বর্ত্তমানে ধীরে ধীরে মুষ্টিযুদ্ধ বেশ প্রসারলাভ করিতেছে। জেলায় জেলায় মাননির্ণায়ক (Championship) মুষ্টিযুদ্ধ-প্রতিযোগিতা হইতেছে। সম্প্রতি আন্তঃস্কুল ও কলেজ মুষ্টি-যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে এই প্রতিযোগিতায় শতাধিক মুষ্টিক যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে তরুণ মুষ্টিযোদ্ধা পূর্ণ তালুকদার, শচীন চক্রবর্ত্তী, সুখেন্দু মুখুজ্যে, অরুণ মৌলিক, চিত্ত দাস প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ অবহিত হইলে ভবিষ্যতে ইঁহারা পুরাতন খ্যাতনামা মুষ্টিকদিগের ন্যায় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। শুধু শহর বা শহরতলীতে নয়, বাংলার গ্রামাঞ্চলেও আজ কিছু কিছু মুষ্টিযুদ্ধের প্রসার হইয়াছে। আজ বাংলার শহরে ও গ্রামে ব্যাপকভাবে মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন হইয়াছে। শ্রীসন্তোষ-কুমার দে মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন"ই দস্তানার সহিত বাঙালী ছেলেদের পরিচয় ঘটাইয়াছেন। যে বাঙালী এতদিন দস্তানাকে পরিহার করিয়া চলিত আজ তাহারা তাহা লইয়াই খেলিতে শিখিয়াছে। দে মহাশয়ের শিক্ষাগুণে বাঙালী মুষ্টিকদল সম্মিলিত ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক দলকে পরাজিত করিয়াছে। ভারতের মুষ্টিযুদ্ধ-ক্ষেত্রে যে ইঙ্গ-ভারতীয় মুষ্টিকদের একাধিপত্য ছিল আজ বাংলার মাননির্ণায়ক মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় তাঁহাদিগকে হিমাংশু পাল ও ফণী সুর প্রভৃতি মুষ্টিকদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। বহু বার তাঁহাদিগকে পরিতোষ দে, ভবানী দাস, প্রদ্যোৎ বসু, রবীন ভট্টাচার্য্য ও বিত্ত ঘোষ প্রভৃতি বাঙালী মুষ্টিকের নিকট হার মানিতে হইয়াছে।

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে আজ মুষ্টিযুদ্ধে বাঙালী খানিকটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অনেকে কিয়ৎপরিমাণে

সাফল্যলাভ করিবার পরই নিষ্ঠার সহিত অনুশীলন ছাড়িয়া দিতেছেন, ফলে পরিপূর্ণ কৃতিত্বলাভ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ানশিপ মুষ্টিযুদ্ধে ছয় জনের মধ্যে মাত্র হিমাংশু পাল ও কণী সুর বাঙ্গালী মুষ্টিকদিগের মান রক্ষা করিয়াছেন। বাঙালী নিপুণ মুষ্টিকের সংখ্যা আরও বাড়া দরকার, তাই দ্বিগুণ উৎসাহে আমাদের নূতন করিয়া মুষ্টিযুদ্ধের অনুশীলনে ব্রতী হইতে হইবে। সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন দলীয় প্রাধান্য স্থাপনের মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করা। বাহির হইতে নামকরা মুষ্টিক আমদানী করিয়া নিজ নিজ সমিতির সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস প্রশংসনীয় নহে। এই প্রসঙ্গে আসে পুরাতন ও নূতন মুষ্টিকদের কথা। অধিকাংশ শিক্ষকই পুরাতন মুষ্টিকদের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেন, নূতন মুষ্টিক তৈয়ারীর দিকে তাঁদের তেমন লক্ষ্য নাই। এই মনোভাব সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়। ইহার পরেই প্রয়োজন গভীর সম্প্রসারণ। মুষ্টিযুদ্ধের অনুশীলনকে শুধুমাত্র শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে কলিকাতাই সমগ্র বাংলাদেশ নয়। বাংলার পল্লীবাসীদের মুষ্টিযুদ্ধের চর্চা হইতে বঞ্চিত রাখিলে অন্যায় করা হইবে। আজকাল সন্তোষকুমার যে মহাশয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রসারের উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে যাইতেছেন—ইহা খুবই আশার কথা। তবে এই কাজ একলা কাহারও চেষ্টায় হইবার নয়। তাই প্রথম শ্রেণীর মুষ্টিকদের মধ্যে বাছাই-করা কয়েকজনকে তাঁহার সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। এইরূপ নিপুণ মুষ্টিকদের একটি দল থাকিবে—গ্রামে গ্রামে শিক্ষা দেওয়াই হইবে যাঁহাদের কাজ। প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। ইদানীং অনুকরণপ্রিয়তা যেভাবে ছোট বড় সকল শ্রেণীর বাঙালী মুষ্টিককেই পাইয়া বসিয়াছে তাহা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। ইঁহারা স্বকীয়তা হারাইয়া ফেলিয়া চালচলন, বেশভূষা, ভাবভঙ্গী ইত্যাদি সব দিক দিয়াই বিজাতীয় আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিদেশী মুষ্টিযোদ্ধাদিগের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ইঁহাদের মধ্যে বিরল।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীনীলরতন দাশ

মাতৃপূজার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যবে দেশ,
অগ্নিসাধক। সেদিন তোমার হেরিনু রুদ্রবেশ।
বন্দিনী মা'র বন্ধনদশা ঘুচাতে বীরের সাজে,
ঝাঁপ দিলে তুমি মুক্তিসমর-মৃত্যুসাগর মাঝে।
সে সাগর মথি' অমৃত আনিয়া বিলালে ভারতময়,
হিমাচল হতে কন্যাকুমারী গাহিল তোমার জয়।
নব নব ভাব-ধারায় ভরিল তব অন্তরখানি,
রচিয়া নূতন গীতার ভাষ্য শুনালে অমর বাণী।
কর্ম্মের সাথে ধর্ম্ম মিলালে, ভক্তির সাথে জ্ঞান;
জড়বাদ সাথে মিতালি পাতালো দর্শন-বেদ-গান।
যে সাধনা কভু অত্যাচারীর দর্পে করে না ভয়,
বিজ্ঞানীদের সৃষ্টিও মানে যার কাছে পরাজয়,—
ঐশী এবং অতিমানস সে শক্তির সাধনায়
সমাহিত তুমি, হে যোগিপ্রবর। তোমারি তপস্যায়
বিস্মিত হবে বিশ্ববাসীরা; নূতন মন্ত্র তব
দেখাবে জগতে মুক্তির পথ অপূর্ব্ব অভিনব।

তুমি

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

মনের গবাক্ষ-পথে উঁকি দেয় সাতরঙা পল্লী-কল্পনারা,
শ্যামলিম দেওদার কাননের সমীরণে কেঁপে হয় সারা;
দিবসের শেষ আলো সুনিবিড় নীলিম আকাশে
কি এক আবেশভরা স্বপ্নলীল মত্ততার সুরা নিয়ে আসে।

এখনো দিগন্ত ঘিরে সন্ধ্যারাণী বিছায় নি আঁচল সে কালো,
এখনো তারকা-বধূ সাজায় নি নীলগেহে মিটি মিটি আলো,
হয়নি এখনো শেষ নীলনভে বিহগের ডানা-সন্তরণ;
আরো কাছে সরে এসো লঘু পদে মলয়ার হোক সঞ্চরণ।
হাতখানি হাতে দাও, তারপর স্তব্ধতার যবনিকা টানো,
কথার বিনুনী থাক—সে তো সুললিত ভাষায় সাজানো।
এই ভালো—না-বলার মাঝখানে কত কি যে বলা হয়ে যায়,
কেবল হৃদয় তারে গেঁথে রাখে সমাদরে মণির কোঠায়।

কঠিন বাস্তব এসে কাছে যবে জীবনের অমৃত-ভৃঙ্গার,
অনিবার প্রত্যাঘাতে ভেঙে পড়ে ধূলিতলে শিখর-মন্দার—
তখন আসিও তুমি—কল্পলোক হতে এনো স্বপ্ন রাশি রাশি,
হবে সে ক্ষণিক জানি, তবু পাবো আশা-আলো-
অনুভূতি-হাসি।

চট্টগ্রাম বিপ্লব কাহিনী

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

গত সংখ্যা প্রবাসীতে সূর্য্য সেনের "Female organisation" —নারী সংগঠন বিষয়ে একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। "প্রথম দর্শন" শীর্ষক একটি পৃথক প্রবন্ধ ঐ সকল কাগজপত্রের সহিত পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধটি "নারী সংগঠন" প্রবন্ধের পরিশিষ্ট বলিয়াই মনে হয়। ইহাও অসমাপ্ত। এই অসমাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল।

২। সূর্য্য সেনের লিখিত "অন্তরীণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ গৈরিলায় অন্ত কাগজপত্রের সহিত পাওয়া যায়। ১৯২৬ সালে আত্মগোপন করিয়া থাকা কালে সূর্য্য সেন পুলিসের হাতে ধরা পড়েন। তাঁহাকে ইলিসিয়াম রোডে আই. বি. আপিসে লইয়া যাওয়া হয়। এই বিষয়ের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সরস ভাষায় লিখিত তাঁহার প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল।

৩। কল্পনা দত্তের একখানি চিঠি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। চিঠিখানির তারিখ ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী। কল্পনা তাহার "কান্না" নামক শিশু ভ্রাতার উদ্দেশ্যে এই চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন। ঐ সময় কল্পনা গৈরিলায় সূর্য্য সেনের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। চিঠিখানি আর যথাস্থানে পাঠানো হয় নাই। পর দিন ১৭ই ফেব্রুয়ারী ঐ আবাসস্থল পুলিস ও সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় এবং সূর্য্য সেন ধরা পড়েন। কল্পনা ও তাঁহার সঙ্গীরা কোনমতে ঐ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই চিঠিখানিতে একটি মর্ম্মস্পর্শী অনুভূতি প্রকাশ পাইতেছে।

৪। ঐ স্থানে (গৈরিলায়) সূর্য্য সেনের নিকট লিখিত প্রীতিলতার একখানি পত্র পাওয়া যায়। পত্রখানির তারিখ নির্ণয় করিবার উপায় নাই। এই সময় প্রীতিলতা কোন স্থানে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন এবং চিঠিতে নিজের নাম গোপন করিয়া "ফুলতার" নামক একটি ছদ্ম নাম ব্যবহার করিয়াছেন। চিঠিখানি প্রীতিলতার স্বহস্তে লেখা প্রমাণিত হয়।

৫। "The Chittagong Brigade" শীর্ষক একটি ইংরেজী কবিতা নলঘাটে পাওয়া যায়। হাতের লেখা কাহার প্রমাণিত হয় নাই। কবিতাটির নিম্নে "Ganeshda" লেখা আছে। অনুমান হয় কবিতাটি গণেশ ঘোষের রচনা। ইংরেজী কবিতা "Charge of Light Brigade"-এর অনুকরণে ওজস্বিনী ভাষায় কবিতাটি লিখিত হইয়াছে।

সূর্য্য সেনের রচনা

প্রথম দর্শন

একটি বাড়ীতে তাকে আনবার ঠিক হ'ল। আমরা ২।৩ দিন আগে Messenger পাঠিয়ে জানলাম যে আসতে পারবে কিনা এবং কখন আসতে পারবে। তার কাছ থেকে উত্তর এল "আপনি নেওয়ার জন্য লোক পাঠাবেন সেই দিন আসতে পারব ; কোন বাধাই আমাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।" Messenger একটি দিন ঠিক করে তাঁকে বলে এল। নির্দ্দিষ্ট দিনে Messenger-কে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে তাঁকে আনতে পাঠিয়ে দিলাম। তাঁদের আসতে প্রায় রাত ৮টার কম হবে না। Messenger-কে পাঠিয়ে ভাবলাম একটি মেয়ে তার মা বাপ প্রভৃতি অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে থাকে। এ অবস্থায় তার আসার পক্ষে কত বাধাই ত হতে পারে। বাপ মা যদি নিষেধ করে সে কি করে আসবে। সে ত আর স্বাধীন নয় যে তার নিজের ইচ্ছায় যেখানে সেখানে যেতে পারবে। অন্য যায়গায় যাচ্ছে বলে ফাঁকি দিয়ে ত তার আসতে হবে। যদি একা তাকে না যেতে দেয় তা হলে তার করবার কি আছে। সে ত ছেলে নয় যে স্বাধীনভাবে মা বাপকে না মেনে হলেও চলে আসবে। আমাদের হিন্দুর ঘরের মেয়ে সমাজের চাপে নানা দিক দিয়েই অধীন। এ অবস্থায় আজ আসতে পেরেছে বলেই সে যে আসতে পারবে তার স্থিরতা কি? সন্ধ্যা হয়ে এল, ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হ'ল, ভাত খাওয়ার জন্য shelter পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমি আর নির্ম্মলবাবু সঙ্গে আছি। আরও দুই জনের ভাত রাঁধবার জন্য বাড়ীর মালিককে বলে দিয়েছিলাম আর বলেছিলাম যে নির্ম্মলবাবুর বোন তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। গৃহস্থ তাই বিশ্বাস করেছিল। আমরা ভাত না খেয়ে ওদের আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ক্রমে ৯টা বেজে গেল তখনও আমরা খাই নে। ১০টার একটু পরে আমরা উঠানে বসে আছি তখন দেখলাম Messenger রাণীকে সঙ্গে নিয়ে আসছে। নির্ম্মলবাবু উঠান থেকে উঠে তাদের কাছে গেল, আমি ত রাণীর সঙ্গে এখনও পরিচিত হই নাই তাই আমি ২।৪ মিনিট পরে ঘরের মধ্যে গেলাম, নির্ম্মলবাবু রাণীকে বলল "মাষ্টারদা এসেছেন"। রাণী এসে আমার প্রণাম করে পায়ের ধুলা মাথায় নিল, বাতির সামনে তার আপাদমস্তক দেখলাম। প্রথম দর্শনে সে আমার মনের মধ্যে কি impression create করল ঠিক ভাষা দিয়ে বুঝাতে পারব না। দেখেই তাকে বেশ smart, cheerful, intelligent এবং cultured বলে মনে হ'ল। তার চোখেমুখে একটা আনন্দের আভাস দেখলাম। এতদূর পথ হেঁটে এসেছে, তার জন্য তার চেহারায় ক্লান্তির কোন চিহ্নই লক্ষ্য করলাম না।

দেখেই বুঝলাম আমার দেখা পেয়ে সে খুব আনন্দই পাচ্ছে। যে আনন্দের আভা তার চোখে মুখে দেখলাম, তার মধ্যে আতিশয্য নেই, Fickleness নেই, Sincerity প্রচুর ভাবেই তার মধ্যে ফুটে উঠছে। একজন উচ্চশিক্ষিত Cultured Lady একটি পর্ণকুটীরের মধ্যে আমার সামনে এসে আমাকে প্রণাম করে উঠে বিনীত ভাবে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মাথায় হাত দিয়ে নীরবে তাকে আশীর্ব্বাদ করলাম—কি আশীর্ব্বাদ করলাম জানি না, আজ মনে হচ্ছে বোধ হয় শীগ্‌গির মরতেই তাকে অজ্ঞাতসারে আশীর্ব্বাদ করেছিলাম। দেখলাম তার মধ্যে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। মনে হ'ল একজন ভক্তিমতী হিন্দুর মেয়ে হাতে প্রদীপ নিয়ে আরতি দেবার জন্য দেবতার মন্দিরে ভক্তিভরে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে কোন দুঃখ নাই, ক্ষোভ নাই, মুখে একটু নির্ম্মল আনন্দের চিহ্ণ ফুটে উঠেছে। একটা পবিত্র নিঃসঙ্কোচ ভাব। আমার সঙ্গে এই প্রথম বার দেখা করার কথা লিখতে গিয়ে সে নিজেই লিখেছে, যখন গ্রামের পথে, মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল যেন দেবদর্শনে যাচ্ছি। পরে তার কাছেও সেদিন তার হৃদয়ে দেবতার আসন সে আমার কাছে এনেছিল। কিন্তু ওর কাছ থেকে শোনার আগেই প্রথম দর্শনেই মনে হ'ল পূজারিণী ভক্তি-অর্ঘ্য সাজিয়ে দেবতার পূজা করতে এসেছে। চোখে মুখে পবিত্র আনন্দের ভাব। নীরবে আশীর্ব্বাদ করে ওকে বারান্দায় রেখে কাজের ছলে রান্নাঘরের দিকে গেলাম। কিছুই বলতে পারলাম না। আমি সাধারণতঃ লাজুক। কোন নূতন ছেলের সঙ্গে দেখা হলে তৎক্ষণাৎ কিছু বলতে পারি না। মেয়েদের সঙ্গে ত সে লজ্জা বেশী হওয়ারই কথা। আমি জীবনে বাড়ীর অথবা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গেও খুব কম কথাই বলেছি। কাজেই একটি অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেও প্রথম বাধ বাধ ঠেকবেই। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল তাই আমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। রাণীকে নির্ম্মলবাবুর বোন বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। তাই সে তার সঙ্গে খেতে বসল। খেয়ে উঠে নির্ম্মলবাবু অল্পক্ষণ তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বেরিয়ে গেল। তখন আমি রাণীর কাছে গিয়ে বসে একটু সঙ্কোচ করে কথা আরম্ভ করলাম। মনে হ'ল নিঃসঙ্কোচে তার সঙ্গে কইতেই পারব না। বাড়ীতে তার নাম বললাম খুকী। রাণী বলে সেখানে কেউ তাকে ডাকে নি। উদ্দেশ্য সেখানে তার নাম গোপন রাখা। কথার প্রারম্ভেই তাকে রামকৃষ্ণের সঙ্গে কথা কি ভাবে দেখা হয়, কি কথাবার্ত্তা হয় ইত্যাদি জিজ্ঞেস করলাম। এই কথা তোলায় বেশ ভালই হ'ল। সে নিঃসঙ্কোচে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার ইতিবৃত্ত সবিস্তারে খুব fluently এবং sweetly বলে যেতে লাগল।

তার নিঃসঙ্কোচ সহজ স্বচ্ছন্দভাব দেখে আমার সঙ্কোচ একেবারেই কেটে গেল। রাত্রে প্রায় দুই ঘণ্টা খুবই freely তার সঙ্গে কথা বললাম। আমি ত বেশী কিছুই বললাম না। তাঁর কাছ থেকে কেবল শুনলামই। রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা, কথাবার্ত্তা, রামকৃষ্ণের প্রতি তার শ্রদ্ধা, রামকৃষ্ণের গুণগুলির সম্বন্ধে তার ধারণা খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করে যেতে লাগল। তার একজন মানুষের গুণ গ্রহণ করবার, সুন্দর স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবার এবং নিঃসঙ্কোচে (fluenly) কথা বলে যাওয়ার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলাম। কি সহজ সরল ভাবেই না সে কথা বলে যেতে লাগল। ঐ রাত্রের দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার কথায়ই তার উপর আমার খুব ভাল ধারণা হয়ে গেল। সে বাড়ী থেকে প্রায় এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এসেছিল। মনে করেছিলাম তার বাড়ীর অবস্থাও খুব ভাল, তা ছাড়া এত দিন স্কুল কলেজে পড়েছে, হোষ্টেলে রয়েছে, কত decently চলেছে, কত ভাল decently মেয়েও দেখেছে যে এই বাড়ীর খারাপ খাওয়া খেতে তার হয়ত খুব কষ্ট হবে, তা ছাড়া যে কয়দিন আমাদের ওখানে, সে কয়দিন ত তাকে পলাতকদের মত ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে। এ সব কষ্ট তার মত একজন মেয়ের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবে কিনা? দেখলাম এত decently brought up সত্ত্বেও সেভাবে একটুও কষ্ট বোধ করছে না। আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলেছে এবং কাছে থেকে তার যা জানবার বলে নিচ্ছে—এতেই তার আনন্দ। তার action করার আগ্রহ সে পরিষ্কার ভাবেই জানাল। বসে বসে যে মেয়েদের organise করা, organisation চালান প্রভৃতি কাজের দিকে তার প্রবৃত্তি নেই, ইচ্ছাও নেই বলে।

সূর্য্য সেনের রচনা

অন্তরীণ

কলকাতার রাস্তায়

১৯২৬ সালের ৮ই অক্টোবর। প্রায় দু'বছর হ'ল abscond করেছি। ঐ দিন সকালবেলা ৮টার সময় shelter থেকে বেরিয়ে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের উপর খানিকদূর গিয়ে একটি লেনে ঢুকতে যাব এমন সময় দেখলাম একজন লোক গলির মাথায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে, তার হাবভাব দেখে spy বলে সন্দেহ হ'ল। মনে করলাম কলকাতার spy আমাকে কি করে চিনবে। সে গলির মাথায় দাঁড়িয়ে রইল, আমি গলির ভিতর ঢুকে পড়লাম, কিছু দূর গিয়ে আমার প্রয়োজনীয় বাসায় ঢুকে কথাবার্ত্তা শেষ করে shelter-এ ফিরবার সময় ঐ গলিটা দিয়ে না ফিরে ঘুরে আর একটা গলির মধ্য দিয়ে shelter-এ ফিরলাম, কারণ ভাবলাম যদি আগের গলিটা দিয়ে ফিরি তা হলে ঐ spyটা আমায় আবার

mark করতে পারে খেয়ে দেয়ে দুপুরবেলা আবার সেই বাসায় যাওয়ার কথা, তাই স্নান করে খেয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ পরে পৃথক আর একটা গলি দিয়ে উক্ত বাসায় গেলাম, পথে সন্দেহজনক কিছুই দেখলাম না, সেখানে ঘরের মধ্যে বসে কথাবার্তা বলছি—এমন সময় দেখলাম একজন যুবক বাসার সামনে blind laneটা দিয়ে বাসাটা pass করে চলে যাচ্ছে, দেখেই সন্দেহ হ'ল। কারণ blind lane দিয়ে সে যাবে কোথায়? বাসাটির পরেই laneটা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই বাসা pass করে তাকে এগিয়ে যেতে দেখে spy বলে সন্দেহ হ'ল, ২।১ মিনিট পরেই দেখি সে আবার ফিরে আমরা যে room-এ বসেছি তার জানালার ধারে এসে একজন লোকের নাম করে সে ওই বাসায় থাকে কিনা জিজ্ঞাসা করল, ও নামের কোন লোক সে বাসায় থাকত না—আমরা "না" উত্তর দিলে সে চলে গেল। তার জিজ্ঞেস করার ভঙ্গী দেখে আমাদের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হ'ল, একটু পরে আমি বাসার একটি ছেলেকে বাইরে রাস্তাটা দেখে আসতে বললাম, সে দেখে এসে বলল "রাস্তার ২।৩ জায়গায় দু'তিন batch plain dress পরা লোক দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছে—I. B.র লোক বলে মনে হচ্ছে"—শুনে মনে করলাম বাসার পর যেখানে laneটা শেষ হয়েছে সেখানকার ছাদ দেওয়াল টপকে বেরিয়ে চলে যাব, দেরী না করে দেওয়াল টপকে অন্য ধারের রাস্তায় পড়ে ছাতাটা খুলতে যাচ্ছি, দেখি যে লোকটি জানালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল সেই লোকটি আমার ৩০।৪০ হাত পেছনে, সে ইতিমধ্যে বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে ঘুরে পেছনের রাস্তায় এসে পড়েছে। আমি ছাতাটা খুলে চলতে লাগলাম, ঐ লোকটি এক পা দু'পা করে আমার ঠিক পিছনে এসে বলল। "দাঁড়ান মশায়", আমি তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে সাধারণ গতিতে চলতে লাগলাম, সে আবার আমাকে দাঁড়াতে বলল, আমি কেন দাঁড়াব জিজ্ঞেস করলে সে কোন জবাব দিল না এবং হঠাৎ আমার একটা হাত জোরে ধরে ফেলল, আমি হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করছি এমন সময় সে চেঁচিয়ে রাস্তার পাশের লোকদের বলল, "এ একজন ডাকাত, একে ধরুন", আর কেউ তাকে সাহায্য করল না, কিন্তু তার হাত আমি কিছুতেই ছাড়াতে পারলাম না। ইতিমধ্যে সে হাত নেড়ে কি একটা ইসারা করলে, আর ৪।৫ জন plain dress পরা লোক এসে আমায় ভালরূপে ধরে ফেলল। ঠিক সে-সময় রাস্তা দিয়ে একটা মোটর যাচ্ছিল, তারা মোটর ডেকে আমায় তার উপর তুলল, বুঝতে পারলাম তারা সবাই I. B. department-এর লোক। মোটরে তুলে তারা দুইজনে আমার দুই হাত ধরে রেখে কোমর এবং পকেট search করল, বলা বাহুল্য, আমার সঙ্গে incriminating কিছুই ছিল না, পকেটে কয়খানা Forward পত্রিকার cuttings আর একটি ক্ষুদ্র slip-এ ২।৩টি রেলওয়ে ষ্টেশনের time table লেখা ছিল। দু' হাত ধরে Search করবার সময়, তাদের অভদ্র, ইতর ইত্যাদি ডেকে খুব গাল দিলাম, তারা বিনা বাক্যব্যয়ে Search করে নিল। আমি গাল দিতে দিতে বললাম, "তোমরা যে পুলিসের লোক তারই বা নিদর্শন কি? শুধু শুধু একজন ভদ্রলোককে পথের মধ্যে অপমান করছ কেন? এর উত্তরে তাদের মধ্যে একজন একটু অবহেলা এবং গর্ব্বের ভাব দেখিয়ে শার্টের নীচে কোমরে ঝুলান revolver caseটা চাপড়ে বলল, "এই পুলিসের নিদর্শন।" বললাম, "পুলিস হলেই কি পথের মধ্যে লোককে অপমান করতে হয়।" Elysium Rowতে নিয়ে বড় officerদের সামনে Search করলেই ত হ'ত, আমি সেখানে তোমাদের against-এ নিশ্চয় Complain করব। তারা চুপ করে রইল। পথে আমার নাম জিজ্ঞাসা করল। বললাম, তোমাদের মত অভদ্রকে আমি নাম বলব না।—নাম না বলার ইচ্ছাটা আগে থেকেই ছিল। এখন তাদের অভদ্রতার সুযোগটুকে না বলার কারণ করে নিলাম।

সঙ্গে যে incriminating কিছু ছিল না তার কারণ তখন আমি ordinance (B. C. L. A. Act.)-এর absconder, শুধু শুধু firearms সঙ্গে রেখে Conviction টেনে লাভ কি? আর incriminating কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে না চলার অভ্যাস আমার চিরকালই আছে। বরাবরই আমি খুব careful থাকি। Carelessness-এর দোষে সমিতির secret পুলিসের হাতে গিয়ে যাতে না পড়ে এই চেষ্টা আমার সর্ব্বদাই থাকত। আজকালকার দিনের চেয়ে তখন আরও careful থাকতাম, এখন যেন একটু careless হয়ে পড়েছি, তার কারণ যারা আমার সাথী তারা বিশেষ careful থাকে না। কাজেই carelessnessটা contagious হিসাবে আমার উপরও কিছু আধিপত্য বিস্তার করেছে। আর careful থাকতে থাকতে মানুষ যেন ক্রমশঃ হাঁপিয়ে উঠে এবং carelessness-এর ভিতর একটু relief খুঁজে পায়। তাই চিরদিন careful থেকেও আজকাল যেন একটু careless হয়ে পড়েছি। যদিও আমার সাথীদের তুলনায় এখনও অনেক careful আছি। এত careful থাকি বলেই এখনও কোন কাগজপত্র পেয়ে পুলিস আমাদের চট্টগ্রাম বিপ্লব সমিতির বিশেষ ক্ষতি করতে পারে নি। আমার নিজের ভুলের দরুন বিশেষ কোন ক্ষতি এ পর্য্যন্ত হয় নি। যদি বেশী ক্ষতি হয়ে থাকে তা আমার ভুলের জন্য হয় নি। আমার comradeদের carelessness-এর দরুন হয়েছে।

দেখতে দেখতে মোটর Elysium Rowতে অবস্থিত Cen-

tral I. B. আপিসের (13 Elysium Row) গেটের ভিতর ঢুকে পড়ল। উঠানে মোটর থেমে গেল, আমি এবং I. B.-র লোকেরা নেমে গেলাম। উঠানে নামামাত্র আমার সঙ্গের একজন I. B.-র কর্মচারী একজনকে ডেকে বলল, "রায় সাহেবকে ডেকে আন।" একটু পরে দেখি রায় সাহেব ব্রজবিহারী বর্মণ আপিসের দোতালা থেকে নেমে উঠানে এসে দাঁড়াল, এবং আমার দিকে ভালরূপে ঠাহর করে দেখে বলল, "Oh! my friend Surjya Babu, I see."

একে একে অনেক অফিসার এসে আমার নাম জিজ্ঞাসা করল। আমি কিছুতেই বললাম না। তারা বলল, "অপনাকে আমরাও চিনেছি, শুধু শুধু নাম ধাম গোপন করে লাভ কি?" আমি বললাম, "আপনারা যদি চিনেই থাকেন তবে আমাকে আর জিজ্ঞেস করছেন কেন?" তবু তারা আমার নাম, আমি গত দুই বছর কোথায় ছিলাম ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করতে থাকল, আমি একটা কথারও জবাব না দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষে আর থাকতে না পেরে প্রশ্নকারীদের সম্বোধন করে বললাম, "I wont reply to any of your questions." একজন বলল, "Why." আমি উত্তর দিলাম, "Because I think it unnecessary." কোন সুবিধা করতে না পেরে তারা শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে উঠানে একটা চেয়ারে আমাকে বসিয়ে আমার ২।৩টা ফটো তুলে নিল, তারপর আমাকে escort করে দোতলায় নিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় I. B.-র যে লোকগুলি আমাকে নিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে দুই জন সিঁড়ির নীচে আমাকে অনুরোধ করল, আমি যেন তারা যে মোটরের মধ্যে আমাকে জোর করে Search করেছে এর জন্য কোন Complain না করি। তখনকার দিনে detenuesদের পক্ষে সমস্ত জাতীয় সংবাদপত্র খুব জোরে লিখত এবং কোন detenue-র উপর পুলিস অথবা জেল-কর্তৃপক্ষ কোন খারাপ ব্যবহার করলে তার জন্য খুব জোরে প্রতিবাদ চলত। Assembly ও Council-এ তা নিয়ে খুব আন্দোলন চলত। বোধ হয় সেজন্যই I. B.-র ঐ লোকগুলি আমাকে Complain না করার জন্য এবং তাদের উপর কোন রাগ না রাখার জন্য অনুরোধ করল। যাক, আমি তাদের কথার কোন উত্তর দিলাম না, উপরে গিয়ে দেখি একটা টেবিলের চারিদিকে চেয়ার রয়েছে এবং একটা চেয়ারে I. B.-র Special Superintendent নলিনী মজুমদার আসীন। কৃষ্ণবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট শরীর, তাঁকে আগে কোন দিন দেখি নি, ওদিন প্রথম দেখলাম। মজুমদার মহাশয় একখানা চেয়ারে আমাকে বসতে বললেন, এবং আমার নাম এবং এতদিন কোথায় ছিলাম ইত্যাদি প্রশ্ন করলেন। আমি এসব প্রশ্নের কোন জবাব দিলাম না, ইতিমধ্যে আরও ২।১ জন officer এসে আমার আশেপাশে বসে গেছেন, তন্মধ্যে রায়-সাহেব ব্রজবিহারী বর্মণ শ্লেষমিশ্রিত মিহি মিহি সুরে আমাকে বুঝাতে লাগলেন "এতদিন পথে ঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, কত অসুবিধা ভোগ করছিলেন এখন আর কোন অসুবিধা ভোগ করতে হবে না—জেলের ভিতর বেশ ভাল থাকবেন" ইত্যাদি। শুনে রাগ হ'ল, জবাব দিলাম, 'You need not bother yourself about that. I am wise enough to think of myself." কথা জবাবটি শুনে তিনি থেমে গেলেন। তখন মজুমদার মহাশয় উঠে Telephone ধরে কার সঙ্গে বাংলাতে কথা বললেন, আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে এই কথাগুলি বললেন, "চাটগাঁর বিপ্লবী নেতা সূর্য্য সেন ধরা পড়েছে। মনে করেছিলাম এত বড় একজন নামজাদা লোক boldly নিজের গৌরবের কাজগুলি এবং আদর্শের কথা বলে যাবে। কিন্তু দেখছি তিনি তাঁর নামটা পর্য্যন্ত বলছেন না।"...তারপর টেলিফোনে আরও কি কি কথা বলল mark করলাম না। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য আমাকে একটু শ্লেষ দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে boldly সব বলে ফেলার জন্য আমাকে excite করা। যাক, তাঁর কোন উদ্দেশ্য সফল হ'ল না, কিছুক্ষণ পর কলিকাতার পুলিস কমিশনার Mr. Armstrong এল (খুব সম্ভবতঃ তখন Tegart সাহেব ছুটিতে ছিল)। সেও এসে দু'চার কথা জিজ্ঞাসা করল এবং বলা বাহুল্য আমিও আগের মতই জবাব দিলাম। Armstrong চলে গেল। তখন আমাকে D. I. G Mr. Lowman-এর ঘরে নিয়ে গেল। দেখি সে বেশ ভদ্রভাবে smilingly আমাকে একখানা চেয়ারে বসাল। তারপর জিজ্ঞেস করল এদিন কোথায় কি ভাবে abscond করে ছিলাম, আমি উত্তরে বললাম, "I was not absconding I was leading peaceful life." শুনে সে মৃদু হেসে বলল, "We have declared Rs. 1000 for your arrest in last December and you say that you were not absconding. Well, I don't like to give you any pressure, you will have no troubles, you are arrested under Bengal Ordinance." আমি তাকে জেলে কোন অসুবিধা হবে কি না জিজ্ঞাসা করলে সে "না" বলল এবং বলল কোন অসুবিধা হলে Additional Deputy Secretary, Political Department, Govt. of Bengal অথবা আমাকে জানাবে। Addressগুলি এক টুকরা কাগজে লিখে দিল। মোটের উপর খুব ভদ্র ব্যবহারই Lowman করল। আবার নলিনী মজুমদারের আপিসে ফিরে গেলাম।

৩

কল্পনা দত্তের চিঠি

১৬ই ফেব্রুয়ারী
১৯৩৩ ইং

To
My dearest brother "Phaiya"

আজ আমার বার বার কেবল তোর কথাই মনে হচ্ছে, অনেকদিনই ত তোদের স্মৃতি আমার প্রাণে ব্যথার মধ্যেও আনন্দ দিয়েছে, কিন্তু আজ যেন সেই ব্যথাটুকুর মধ্যে আনন্দের ঢেউ দিচ্ছে। তোর সেই আধ আধ কথা, মিষ্টি হাসি, আমায় বার বার এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে যাদের আমি কত ভালবাসি, যাদের কথা বললে আমি আনন্দ পাই, তারাই পরে যখন জানবে যে তাদের মেজদি না বলে চলে গেছে—তুই যখন বড় হবি তখন হয়ত কারও কাছে শুনবি মেজদির কথা কিন্তু তখন কি বুঝতে পারবি যে আমি তোকে কত ভালবাসতাম। এই পলাতক জীবনে তোর কথা অন্যদের কাছে শুনে কত আনন্দ পেতাম! আসবার দিন তোকে যে একবারটি দেখে আসতে পারিনি, এইটাই খালি খালি মনে হচ্ছে। তুই ত ভাই কত জনের এখন আদর পাচ্ছিস, হয়ত কত জনের মধ্যে আমার আদরটুকুর অভাব অনুভব করতে পারছিস্ না। কিন্তু আমার ত মনে করতেই কষ্ট হয় যে আমার কথা বড় হলে তোদের মনে থাকবে না, হয়ত বা আবছায়ার মত মনের কোণায় একটু উঁকি মেরেই চলে যাবে। ওপার থেকে যদি দেখি যে আমার প্রাণের টান অনুভব করতে পেরেছিস্, তা হলে যে আমি অনেক আনন্দ পাব। আমার এ প্রাণের ডাকটুকু তোর কাছে পৌঁছবে কিনা ভগবান জানেন।

জীবনে কোনদিন কাউকেই আনন্দ দিতে পারিনি, তাই বলে কি সকলকে ব্যথাই দিয়ে যেতে হবে? আগে কোন দিন কে আমার কথায় ব্যথা পেল কিনা, কে সুখী হ'ল ভেবে দেখিনি, কিন্তু এখন কেন আমার প্রতি কথায় মনে হয়, কাউকে ব্যথা দিলাম নাকি! কেন এমন হয়? বোধ হয় যাবার দিন ঘনিয়েছে বলেই। যাবার আগে কারো প্রাণে ব্যথা দিতে চাই না, কিন্তু যা চাওয়া যায়, সকল সময় তা ত হয় না। কারো প্রাণে ব্যথা দিতে চাই না বলেই যেন আরো বেশী করেই আমার প্রতি কথায় কাজে সকলে ব্যথা পায়। আর এটাই যে আমার প্রাণে বেশী বাজে। আমি কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে পারি না। বুঝি আমার স্বভাবদোষেই এসব হয়ে থাকে। আমি যে ভুলে যাই, আমি আর এখন সেই সকলেরই আদরের ভুলুটি নই। আমার অত্যাচার সহ্য করবার মত ধৈর্য্য এখানে সকলেরই নেই। তাই ত শত চেষ্টা সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে আমি নিজেকে check করতে পারি না।

আমি যখন একদিনের জন্যও কোথাও যেতাম তখন ত তোমরা বলতে আমি না থাকাতে বাড়ীটা খালি খালি মনে হ'ত, আচ্ছা মা! আমি তোমাদের ছেড়ে এসেছি আজ তিন মাসেরও উপর হ'ল, এখন তোমাদের কি রকম লাগে? তোমরা কি আমাদের জন্য কাঁদ? তোমরা কি আমায় ভুলে যেতে পার না? আমার কি মনে হয়, জান মা! আমার মনে হয় তোমরা আমার জন্য খুব কাঁদ। আর দুপুরবেলায় এবং রাত্তিরে যখন শুতে যাও, তখন আমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়, কিছুই টের পাও না। সত্যি নয় কি? আমিও যে তোমাদের ভুলতে চেষ্টা করি। ভাবি যাদের ছেড়ে চলে এসেছি অন্য একটা কাজের জন্য তাদের জন্য আবার কিসের চিন্তা, কিন্তু তা পারি না যে, মা! আমার জন্য তোমরা আর চিন্তা করো না। মনে করো যে আমি মরে গেছি। আমায় ফিরে পাবে না। তোমার ত অনেক আছে, দেশের জন্য কি একটাকেও উৎসর্গ করতে পার না।

শ্রীতিলতার চিঠি

(৪)

শ্রীচরণেষু—

দাদা, ভেবেছিলাম আবোল-তাবোল অনেক কিছু লিখে আমার দাদার নিরালা জীবনে একটুখানি আনন্দ দেবার চেষ্টা করব কিন্তু ভগবান হঠাৎ যেন সব উল্টে দিলেন। ছুটাছুটি করে সবাইকে চলে আসতে হ'ল—তারপর যেন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করাটাই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেননা একান্ত মনে যা চেয়েছি তার পথে এত বাধা আমার মনে যে বড়ই ব্যথা দিচ্ছে দাদা। অনেক কিছুই মনে হচ্ছে, যাক্ আপনার আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হবে না কখনও আমি জানি। আমার উদ্দেশ্য সফল হবেই, নইলে যে আমি একেবারে মরিয়া হয়ে যাব। যাক্, এসব লিখব তা তো ভাবিনি।

আজ আপনার কাছে চিঠি লিখতে বসে ভাবছি আমি কার কাছে চিঠি লিখব? আমি যে তাঁর উপযুক্ত বোন হতে পারলাম না, তাঁর অগাধ স্নেহের মর্য্যাদা আমি যে রক্ষা করতে পারলাম না। কত অবাধ্যতা করেছি, কত মনে কষ্ট দিয়েছি, বুঝি নি যে ভগবান্ আমাকে অমূল্য সম্পদই দিয়েছেন। যাক্।

সোনাদা ও মেজদা এসেছিল। খুব ভাল লাগল তাদের সঙ্গে কথা বলতে—তারা আমাকে দেখে খুব খুশী—একেবারে জড়িয়ে ধরে বসেছিল। মা নাকি খুব কাঁদেন—কাঁদতে কাঁদতে হয়রান হয়ে যান্। রোজই কাঁদেন। বাবা কিছু কাতর হয়ে গেছেন, তবে বাবার খুব লেগেছে। আমার কাপড়-চোপড়গুলো গুছিয়ে রেখে দেবার জন্য বলে দিয়েছেন, তা কেউ ব্যবহার করলে বকুনি দেন। মন্টুর খুব অসুখ। গাল ফুলে

গেছে কিছু খেতে পারে না। এবং জ্বরও হয়েছে—রাত দুপুরে উঠে খালি আমাকে ডাকে।

দাদা! আমার মনে আজ বড়ই ব্যথা। আমি কি মানুষকে কষ্ট দিতেই শুধু সংসারে এসেছিলাম। আমি যে তা চাই না। লক্ষীটি দাদা এ হতভাগা বোনটিকে ভুলে যাবার চেষ্টা করুন। জানি স্নেহের বোনটিকে ভুলবেন না কিন্তু আমার সে কথাই বলতে ইচ্ছা করছে—আমার স্মৃতি যে আপনাকে ব্যথা দিচ্ছে।

আমার জন্য চিন্তা করবেন না। শরীর ভাল আছে। আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—স্নেহের ফুলতার

THE CHITTAGONG BRIGADE

1

Slowly, slowly, mile by mile,
  Marched forward to the grave,
To the dale of death, to the field of fame
  Marched the five dozen youths brave.
'Onward' the Chittagong Brigade
  To the yonder hills, cried the Captain brave
To the dale of death, to the field of fame
  Marched the five dozen youths brave.

2

Onward the Chittagong Brigade ;
  Was anybody a bit afraid ?
Not though all the soldiers knew
  Survive of them will but few
But the pain of bondage
  Robbed them of their peaceful age.
And it was freedom they did crave
  To the dale of death, to the field of fame
Marched the five dozen youths brave.

3

Hunger to them was constant mate
Drink they did not find to taste
Summer did its cruelty best
Fried them in its hot air's wave,
Cheerfully did they take them all,
Slowly all their force did fall,
But alive they were to the motherland's call
For the cause, her to save.
To the dale of death, to the field of fame
  Marched the five dozen youths brave.

4

Towards beaming they found at last
The holy 'Jalalabad' off mournful past.
Where the army settled them at first
In wait for the enemy fiendish knave.
The sun poured molten fire on them
The rifles turned up hot as flame
With hunger and thirst the delusion came
Only the *carrie* clinking broke the solitude grave
To the dale of death, to the field of fame
Kept in wait the five dozen youths brave.

5

At last when the sun did bend
And the painful day was at an end
On April 'mid twenty-second
The enemy was in sight.
'Halt' shouted the Captain dare
'Comrade fire' came the next order
When the sixty guns boomed together
And before rolled down night
To the dale of death, to the field of fame
Fought grave the five dozen youths brave.

6

Screened off the midst off dust and smoke
The guns sent the humble stroke
And 'put to fight the enemy's folk
While some amidst them fell down rolled
"Segra" opened the martyrdom's gate
And was followed by eleven in haste
While the fight ceased in the evening late
They marched down lest their comrades cold
To the dale of death, to the field of fame
Came down the fifty-eight bold.

7

When can their glory ceased to be said
Oh : the wild fight they made
All the people astound
Honour the attempt they made
Blessed the Chittagong Brigade
Noble one dozen dead.

"Ganesh-da"

শাহ্ আবদুল লতীফের কবিতা

এ. এন. এম. বজলুর রশীদ

সুফীসাধনার যে মূল সুর ও তত্ত্ব 'ফানাফিল্লাহ্' অর্থাৎ জীবনের একমাত্র আনন্দস্বরূপ আল্লার উপর পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ এবং সর্ব্বানুভূতি ও আত্মজ্ঞান—যে জ্ঞানের দ্বারা সাধক আপনার আত্মাকে পরমাত্মার একটি অংশ বলে অনুভব করেন এবং পরম একের বৃহত্তম ও সুন্দরতম সত্তার মধ্যে যে আত্মার সুমধুর অবসান, তাই হ'ল সিন্ধুর সুফীসাধক শাহ্ লতীফের কবিতার বিষয়বস্তু। প্রেমের মহৎ ও কণ্টকাকীর্ণ পথের ভেতর দিয়েই তাঁর যাত্রা সুরু, দুঃখকেই তিনি বরণ করেছেন, কারণ যে কাছে থেকেও নেই, বুকের ভিতর যে আছে, তথাপি যে সুদূর, তার প্রতি কবির যে অনির্ব্বচনীয় প্রেম, সেই প্রেম কবির অন্তরে সঞ্চারিত করেছে বিরহের তীব্র দাহ ও আনন্দ-আবেগ।

অন্যান্য সুফী কবিদের মত আবদুল লতীফও প্রচুর শব্দ-প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার করেছেন। 'সুর সুহিণী'তে কবি বলছেন—

সুহিনী, ভাল করে জানো সেই গুপ্ত নিয়ম
কেমন করে রহস্যের পথ দিয়ে
বিচারের সত্যতা হয় গতিশীল।
সত্যকার জ্ঞান তাদেরই আনন্দের ভেতরে
যারা ভালবাসে তাঁকে আপনার ভাবসত্তাকে বিলীন করে'।

আর এক জায়গায়—

আত্মচেতনাকে ধ্বংস কর এবং আমিত্ব থেকে
তোমাকে দাও বাদ। সত্যকার জীবনে থাকবে না
এই আমিত্ব-বোধ—
অন্যথায় সে জীবন হবে নিরর্থক ও ভারপীড়িত।
তারা বোকা যাদের কথায় 'আমি' বলে কথা।

বস্তুজগতের ক্ষণস্থায়ী দৃশ্যাবরণ ও মরীচিকার জাল ছিন্ন করবার জন্য সুফী সাধকগণ সর্ব্বদা সচেষ্ট। বাইরের ছায়া-ছবি, আপাতসুন্দর রূপরস, কামনা ও বাসনা সাধনপথের অন্তরায়, কারণ তা সত্যকে আবৃত করে রাখে—স্বল্পায়ু হলেও তার আবরণে চিরসুন্দর ও মধুর যে সত্তা তা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এই আবরণের বেদনা সুফী কবি রুমীর ভাষায় অপূর্ব্ব ভাবরূপ লাভ করেছে। রুমী বলছেন—

আমার চক্ষু থেকে অপসারিত কর
অজ্ঞানতার আবরণ—
প্রতি জিনিসের যা সত্যরূপ
অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বকে আর দেখিয়ো না—
তার রূপকে করো না আচ্ছন্ন—
এই দৃশ্যময় জগৎকে কর আরশির মত
তার বুকে প্রতিফলিত হবে তোমার রূপের প্রকাশ।
তোমার আমার ভেতরে আর রেখ না বন্ধু,
ব্যবধানের দূরত্ব ও অন্তরাল।

শাহ্ লতীফের কবিতাতেও এই ব্যবধানের বেদনা ও দূরত্বের দুঃখ ফুটে উঠেছে। তাঁর মতে, মানুষের বিপথগামী ও উচ্ছৃঙ্খল হৃদয় সেই আবরণ-জালকে ছিন্ন করবার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়, সে আবরণ মানুষকে আল্লার সান্নিধ্য থেকে বহুদূরে সরিয়ে রেখেছে। শাহ্ লতীফ এই ভ্রান্তপথচারী হৃদয়কে অর্ব্বাচীন এবং স্থূলবুদ্ধিচালিত উন্মার্গগামী উটের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রুমীর একটি বিখ্যাত কবিতায় সুফী-সাধকদের এ ধরণের ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দ ও ভাবপ্রতীক সুন্দর ভাবে একত্রে রূপ পেয়েছে। 'মসনভীতে' রুমী বলছেন—

(প্রেমের) সুরা উৎসারিত হয় সেই জগৎ থেকে
পাত্র তার এই জগতের—
পাত্র দৃশ্য কিন্তু সুরা থাকে অদৃশ্য হয়ে—
অদৃশ্য থাকে উটের দৃষ্টিপথ থেকে—
কিন্তু মুক্ত ও প্রকাশিত হয়
সাধনপথের ভক্তের নিকট।
আল্লাহ্, আমাদের চক্ষু আছে অন্ধ হয়ে।

শাহ্ লতীফ সিন্ধুদেশের পাহাড়, পর্ব্বত, উচ্চ বালুকাস্তূপ, নদনদী ও মহিষের পাল, রাখাল, কুমোর ইত্যাদির অতি সুপরিচিত বস্তুজগৎ থেকে প্রতীক ও রূপক আহরণ করেছেন। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত রূপক-গাথা 'সুহিনী ও মেহারে' বিরহের বেদনার্ত্ত চিত্তের আবেদন ও ব্যাকুলতা শব্দ-প্রতীকের ভিতর অপূর্ব্বতা লাভ করেছে। অনির্ব্বচনীয়কে প্রকাশ করবার জন্য কবি গ্রামের অতি সাধারণ ও সহজ দৃশ্যাবলী এবং জীবন-যাত্রা থেকে ভাবরস গ্রহণ করেছেন। সুহিণী ও মেহার নামক রূপক গাথাটির কথাই এখানে বলা যাক। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সঙ্গীতে যে মরমীবাদ ফুটে উঠেছে তার মূল বিষয়বস্তু হ'ল, সেই আত্মা যে আমাদের ভাবপ্রবাহের অন্তঃশীলায় বাস করে। মনের গহনে যার সর্ব্বদা অভিসার চলে, সে আত্মা দেহের সীমাবদ্ধতা ও তার বিকৃত কামনা-বাসনার নিষ্পেষণে নিপীড়িত হয়ে কাঁদে—প্রিয়তমের দেখা সে পায় না—বিরহের মর্ম্মান্তিক বেদনা তাকে অশেষ পীড়া দেয়, সে আত্মা বিরহে কাতর। কবি অনুভব করেন—তাঁর

বিরহিণী হৃদয়ের গভীর নির্জনতার অন্ধকারে প্রিয়জনের অভিসারে চলে। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে:

মম মনউপবনে চলে অভিসারে
আঁধার রাতে বিরহিণী।

কবি তাঁর বিখ্যাত রূপকনাট্য 'অরূপ রতনে'র মধ্যে এই ক্রন্দনরতা বিরহিণী আত্মাকে 'সুদর্শনা'র রূপক চরিত্রের ভিতর তার সকল ব্যর্থতা, বেদনা ও ব্যাকুলতার মধ্যে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজাকে সে চায়—কিন্তু বাধার অন্ত নেই। শেষে চরম দুঃখের ভিতর দিয়ে রাজা অর্থাৎ অদৃশ্য পরম-সুন্দর প্রিয়তমের সঙ্গে সুদর্শনা অর্থাৎ সন্ধানপর মানবাত্মার মিলন হ'ল। পরিবেশ ও প্রকাশভঙ্গী পৃথক হলেও শাহ্‌ লতীফের 'সুহিনী ও মেহারের' মূল বিষয়বস্তু ও ভাবরসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'অরূপ-রতনের' আশ্চর্য্য ঐক্য আছে। বস্তুতঃ সুফী ও বাউল কবিদের ভাবধারার মধ্যে প্রিয়তমের বিরহবেদনা ও মিলনের আশা-আনন্দ স্ফূর্ত্তিলাভ করে।

'সুহিনী ও মেহার' রূপক গাথার গল্পটি সংক্ষেপে বলছি। নদীর তীরে এক সদ্ভিপর কুমোর বাস করে। ইজ্জত বেগ এক ধনী মোগল বণিকের পুত্র, একদিন পথ দিয়ে চলতে অকস্মাৎ সুহিনীকে দেখে তার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হ'ল। ইজ্জত বেগ প্রত্যেকদিন হাঁড়ি-কুড়ি কিনতে আসে, আসল উদ্দেশ্য সুহিনীর দর্শনলাভ। সুহিনীও ক্রমে তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ল।

এদিকে হাঁড়ি-কুড়ি কিনতে কিনতে ইজ্জত বেগের পুঁজি ফুরিয়ে এল। পথের ফকির হয়ে সে সুহিনীর পিতার নিকট চাকরি ভিক্ষা করলে। কুমোরের মহিষদলের রক্ষক রূপে ইজ্জত বেগ নিযুক্ত হ'ল। এখন থেকে ইজ্জত বেগ 'মেহার' নামে পরিচিত হতে লাগল। সুহিনী ও মেহারের ভালবাসার বন্ধন ক্রমে নিবিড় ও সুদৃঢ় হয়ে উঠল। পিতামাতা কিন্তু কন্যার এই গোপন প্রেমের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল, উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেবার জন্য তারা সুহিনীকে 'দাম' নামে এক কুমোরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলে। মেহার বিতাড়িত হ'ল।

নদীর অপর তীরে মেহের ওরফে ইজ্জত বেগ মহিষের পাল চরায়—এপার থেকে প্রতি রাত্রে সুহিনী আগুনে-পোড়া মাটির গামলায় নদী পার হয়ে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হয়। এই উপায়ও বন্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে পিতামাতা এক দিন আগুনে পোড়া গামলার বদলে কাঁচা মাটির গামলা রেখে এল এই বিশ্বাসে যে, তাতে চড়ে নদী পার হবার সাহস সুহিনীর হবে না। কিন্তু রাত গভীর হয়ে আসতেই সেই গামলায় চড়ে সুহিনী অকূলে ভাসল। নদীর তরঙ্গ মালায় আঘাতে গামলার কাঁচামাটি খসে পড়ল। প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে আকুল আর্ত্তনাদ করে সুহিনী নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে গেল। সুহিনীর আর্ত্তনাদ শুনে মেহার ছুটে এল এবং তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে সেও অতলে তলিয়ে গেল।

'সুহিনী ও মেহারে'র কবিতাগুলির মধ্যে প্রেমাস্পদের সঙ্গে সুহিনীর ঐকান্তিক ও ব্যগ্র মিলনাকাঙ্ক্ষার বর্ণনা অপূর্ব্ব কাব্যরস ও মর্য্যাদা লাভ করেছে। অভিসারিণী প্রেমিকার আকুল আহ্বানে প্রেমাস্পদ প্রেমের আবর্ত্তে আপনি নিমজ্জিত হয়ে প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করলেন।

সুহিনীর ব্যাকুল কণ্ঠে প্রেমার্ত্ত সাধকের বেদনাই যেন ফুটে উঠেছে:

বন্যায় আতঙ্ক আর শত শঙ্কা ভয়—
হিংস্র শত কুম্ভীরের সহস্র আলয়;
আমার এ তনু বন্ধু, তনুর দুর্ব্বল,
প্রতিরোধ করিবার নাহি তার বল—
তোমার সাহায্য বিনা তরঙ্গের মাঝ,
বন্ধু কাছে এস মোর রাজ-অধিরাজ।
তরঙ্গে আতঙ্ক জাগে ফেনে ফেনময়,
আমার হৃদয় পঙ্গু—জাগিছে সংশয়
ঢেউয়ের নির্ম্মম ঘাতে—আমি নিঃসহায়
প্রভু তব ভিখারিণী ডাকিছে তোমায়।

প্রেম ও বিরহের দহন সুহিনীকে আকুল করেছে, তার তৃষ্ণার যেন শেষ নেই, অনন্ত সমুদ্রের বুকে সে বসে আছে, একবিন্দু জলকণার সন্ধান তবু কোথাও মিলছে না:

দেহ আমার জ্বলে যায়—সুতীব্র সে
অগ্নির দহন জ্বালা,
আমি পুড়ে খাক হয়েছি—কিন্তু সন্ধান
আমার চলছে।
পান করে' তৃষ্ণা মিটছে না—
সমগ্র সাগর সেঁচে ফেলেছি।
কিন্তু এক ঢোক জলেও তৃপ্তি পেলাম না।
রাত্রি নিকষকালো, আর এই কাঁচা মাটির পাত্র,
শঙ্কার কথা—বৃষ্টি এল নেমে
এখানে পথহীন জলরাশি—সেখানে সিংহ
করছে বিচরণ।
আমার প্রেমের নেশা যেন ভেঙে না যায়, বন্ধু
এ-জীবনকে বৃথা জেনে যখন প্রবেশ
করব তোমার দ্বারে।

অনন্ত প্রেমের আবর্ত্তে সুহিনী তলিয়ে গেল—এমনি করে তলিয়ে যায় কত সাধক, ভক্ত সুফী ও প্রেমিক—কিন্তু তারা একা নন্, তাদের সঙ্গে থাকেন তিনি জীবন-মরণের প্রভু যিনি—মানবের চিরকালের প্রেমাস্পদ যিনি সেই জীবনদেবতা।

বামদিক হইতে : দক্ষিণ আমেরিকা—মিসেস রোমেরো ব্রেষ্ট (আর্জেন্টিনা), ডেনমার্কের শিক্ষা-মন্ত্রী মিঃ জার্টভিগ ক্রিস্ক, এশিয়া—শ্রীমতী লীলা রায় (ভারতবর্ষ), ইউরোপ—মেরীথেরেসি আইকুইম (ফ্রান্স)

প্রথম আন্তর্জাতিক নারী শারীর শিক্ষা কংগ্রেস

কোপেনহেগেন : ডেনমার্ক

গত ১৮ই জুলাই (১৯৪৯) ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন-হেগেন নগরীতে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী শারীর শিক্ষা কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ছয় দিন ধরিয়া এই অধিবেশন চলে। বিশ্বস্ত পি. টি. আই—রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, এই কংগ্রেসে ২৩টি দেশের ২০০ মহিলা-প্রতিনিধি যোগদান করেন। পাঁচটি মহাদেশের পক্ষ হইতে পাঁচ জন মহিলা উক্ত কংগ্রেসের প্রতি শুভেচ্ছা ও আনুগত্য জানাইয়া বাণী দেন। কলিকাতার শ্রীমতী লীলা রায় ভারত তথা এশিয়ার প্রতিনিধিরূপে এই বাণী দিবার পর যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের শুভেচ্ছা পাঠ করেন।

মাদাম বারট্রাম (ডেনমার্ক) কংগ্রেসের উদ্বোধন করিতে গিয়া প্রতিনিধিগণকে ধন্যবাদ দেন। বিভিন্ন দেশ হইতে যে অভাবনীয় সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

ডেনমার্কের শিক্ষাসচিব ডাঃ জার্টভিগ ক্রীস্ক এবং কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর অধ্যাপক ডাঃ জান সেন প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানাইয়া বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলিতে নারীদের শারীর শিক্ষাক্ষেত্রে এই কংগ্রেস যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া নারীজাতির শক্তি ও কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে ইহা আশা ও আনন্দের কথা।

'কলেজ ছাত্রী শারীরিক শিক্ষা সঙ্ঘে'র সভাপতি মিস্ হ্যালেন হ্যাজেলটন সঙ্ঘের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বলেন, এই কংগ্রেস বিশ্বের নারীকল্যাণের যোগসূত্র হইল।

অতঃপর পাঁচটি মহাদেশের পক্ষ হইতে এই কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। মিস জেন হিউগ্স (দক্ষিণ-আফ্রিকা) জানান যে, দক্ষিণ-আফ্রিকার শারীর শিক্ষা ক্রমশঃ বাধ্যতামূলক শিক্ষারূপে গৃহীত হইতেছে। মিস্ মেরি আইকুইমের (ফ্রান্স) বাণীতে ইউরোপীয় নারীকে পুরুষের উপর নির্ভরপরায়ণ না হইয়া শারীর শিক্ষা গ্রহণে শক্তি অর্জন করিয়া পুরুষের দোসর হইতে হইবে—এই বলিষ্ঠ মতবাদ ধ্বনিত হয়। মিস্ ডেরিস প্লিউইস (কানাডা) বলেন, বিভিন্ন ভাষাভাষী হইলেও শারীর শিক্ষার মধ্য দিয়া যে শক্তি ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইবে সর্ব্ব দেশ ও জাতি তাহা একযোগে উপভোগ করিয়া পরস্পরের নিকটতর হইবে। মাদাম রোমেরো ব্রেষ্ট (আর্জেন্টিনা) দক্ষিণ-আমেরিকার পক্ষ হইতে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি সাধনার জয় ঘোষণা করেন। এশিয়ার পক্ষ হইতে শ্রীমতী লীলা রায় (ভারতবর্ষ) বলেন—"কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ এবং গান্ধীর স্মৃতিপূত এশিয়ার কন্যা আমি। 'শান্তির জন্য শক্তি সাধনা'ই এশিয়ার বাণী। তমসাচ্ছন্ন পৃথিবী এশিয়ার তপোবন-

উদ্ভূত 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' বাণীতেই জাগ্রত হয়। এশিয়ার নারী যুগযুগান্তর ধরিয়া শত দুঃখ দুর্য্যোগে, সহস্র বন্ধবন্ধার মধ্যেও জীবনের এই পরম বেদ বিস্মৃত হয় নাই ; আজও নয়।"

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করিয়া যে বাণী প্রেরণ করেন শ্রীমতী লীলা রায় এই কংগ্রেসে তাহা পাঠ করেন :

"আমি শ্রীমতী লীলা রায়ের নিকট হইতে নারীদের শারীর শিক্ষার প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেস সম্পর্কে সবিশেষ

কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষিকা মার্গিট কার্কিআইড (ডেনমার্ক)

অবগত হইয়া বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছি। ভারত এই কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছে জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম।

"আমরা মেয়েদের শরীর গঠনে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেছি—যাহাতে তাহারা ভারত এবং সমগ্র বিশ্বের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে। আমি এই কংগ্রেসের সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করিতেছি।"

পরিচিতি

শ্রীমতী লীলা রায়, বি-এ, বি-টি, বাংলা-সরকারের অধুনালুপ্ত 'কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন ফর উইমেন' হইতে শারীর শিক্ষার ডিপ্লোমা পান। ইহার পর কলিকাতার 'উইমেন্স কলেজ' এবং 'স্কটিশচার্চ্চ কলেজে'র ব্যায়াম শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত থাকাকালে বাংলা-সরকারের পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া তিনি উচ্চ শারীর শিক্ষার বৈদেশিক বৃত্তি লাভ করেন এবং প্রথমে কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে

শ্রীমতী লীলা রায়

ও তদনন্তর যুক্তরাষ্ট্রের ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষালাভ সমাপন করিয়া ১৯৪৮ সালে ইউটা হইতে অনার্সসহ এম্-এস্ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের শারীর শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং ভারতের শক্তিসাধনা সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা দিয়াছেন। শ্রীমতী লীলা হলিউড রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি সেখানে আলডুস হাক্সলীর মত বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের সংস্রবে আসিবারও সৌভাগ্যলাভ করেন। উক্ত আশ্রমে অনুষ্ঠিত আমেরিকার সর্ব্বপ্রথম কালীপূজায় তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী লীলা রায় সম্প্রতি কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক শারীর শিক্ষা কংগ্রেসে এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করিয়া ইউরোপের শারীর শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনে রত আছেন। শ্রীমতী লীলা সুপরিচিত নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের কনিষ্ঠা ভগিনী।

যামিনীকান্ত সেন

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আমরা পূর্ব্বদেশের মানুষ—আমাদের একটা অপবাদ আছে যে স্থানে অস্থানে আমরা কথা কইতে সুরু করলেই অতিশয়োক্তি করে থাকি। পাশ্চাত্য দেশের মানুষেরা আমাদের এই অপবাদ দিয়ে থাকেন যে, আমরা যেসব কথা বলে থাকি তা বেশীর ভাগ "পূর্ব্বদেশসুলভ অত্যুক্তি ও অতিবাদে" অর্থাৎ oriental exaggoration-এ দুষ্ট। জানি না এই অপবাদের মধ্যে কতটা সত্য আছে,—এই অপবাদটাই অত্যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা তারও বিচার করতে হয়। আমরা স্বভাবতই অত্যুক্তির ভক্ত কিনা তার বিচার না করেও বলা যায় যে, অন্তত: বন্ধুর শোক-সভায় কিছু অত্যুক্তি করবার অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু আমি যামিনীকান্ত সেনের শোক-সভায় কোনও অত্যুক্তি করতে চাই না। তাঁর কর্ম্মজীবনের একটা সহজ, সরল, আড়ম্বরহীন ফিরিস্তি দিলেই যথেষ্ট হবে।

যামিনীবাবু আমার সহপাঠী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজে (১৮৯৭ থেকে ১৯০০ সন পর্য্যন্ত) একাদিক্রমে ৪ বৎসর এক ক্লাশে আমি পড়েছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের আমার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছিল। মানুষটি কেমন তা জানবার প্রচুর সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। কলেজ ছাড়বার পর সপ্তাহে অন্তত: দু'দিন আমাদের দেখা হ'ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে তিনি ১৯০১ সালে হাইকোর্টে আপীল বিভাগে নাম লিখিয়ে ব্যবহারাজীবের বৃত্তি আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু আইনের ব্যবসায় তাঁর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় নাই। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী মানুষ, ব্যবহারিক জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জীবনসংগ্রামে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব তিনি মেনে নিতে পারেন নাই। জীবনের প্রারম্ভে তিনি পলিটিক্সে একবার জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯১২ সালে চট্টগ্রামের পলিটিক্যাল কনফারেন্সে তাঁকে সম্পাদকের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই তাঁর প্রথম কাজ, এবং এই তাঁর শেষ কাজ।

কিছুদিন পরেই তিনি অন্য পথ বেছে নিয়েছিলেন—সেটি হ'ল সাহিত্য-সাধনার পথ। রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসার পরেই সাহিত্যের সাধনা তাঁকে প্রথম আকর্ষণ করেছিল। এখন সাহিত্যের জগৎ হ'ল একটা অতি বিস্তৃত জগৎ,—এই সাহিত্যের মহাপ্রদেশে তিনি আপনার স্থান বেছে নিলেন—ভারতের কৃষ্টির ও ভারতের রূপশিল্পের সমালোচনার পথ। তিনি খুব চিন্তাশীল লোক ছিলেন, যে-কোনও বিষয়ের তত্ত্বাংশ নিয়ে তিনি আলোচনা করতে ভালবাসতেন। সুতরাং তাঁর লেখার মধ্যে এই চিন্তা-শীলতা ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রচুর পরিচয় আমরা পাই। লঘু সাহিত্য, গল্প বা উপন্যাস লেখা তাঁর দ্বারা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু রূপবিদ্যার নানা দিক তিনি নিপুণভাবে আলোচনা করে গিয়েছেন। তিনি যখন সাহিত্যের আসরে নামলেন তখন আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পে নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেছেন এবং দেশে ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের আলোচনা ও সমালোচনার তুমুল কোলাহল সুরু হয়েছে। তিনি এই আলোচনায় আত্মনিয়োজিত হয়েছিলেন—নানা প্রবন্ধে ও নিবন্ধে তিনি ভারত-শিল্পের দার্শনিক অংশের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তার জন্য তিনি গভীর গবেষণাও পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। প্রায়ই দেখতে পেতাম, তিনি ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে অনেক বই নিয়ে গভীর গবেষণায় নিমগ্ন রয়েছেন। তাঁর ভারত-শিল্পের আলোচনার ফলস্বরূপ আমরা পেলাম তাঁর বিরাট গ্রন্থ "আর্ট ও আহিতাগ্নি"। কলাবিদ্যা সম্বন্ধে এত বড় বই বাংলাভাষায় আর লিখিত হয় নাই। এই গ্রন্থে রূপতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা জটিল ও দুরূহ বিষয় তিনি আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক তাঁকে সুলভ জনপ্রিয়তা দিতে পারে নাই—কারণ এই সব বিষয়ের পাঠক ও সমঝদার অত্যন্ত কম। দু'চার জন মাত্র এই সব দুরূহ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। সুতরাং এই সব আলোচনার দ্বারা সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করা যায় না।

যা হোক, এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশের পর সাহিত্য-জগতে তাঁর কৃতিত্ব ও সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই পুস্তকের প্রকাশের পর বিভিন্ন মাসিক ও সাময়িক পত্রের সম্পাদক মহাশয়দের কাছ থেকে তাঁহার উপর দাবি সুরু হ'ল। এই দাবি তিনি হাস্যমুখে স্বীকার করে নিয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখতে সুরু করলেন, ভারত-শিল্পের নানা তত্ত্ব সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিয়ে বিষয়টিকে জনপ্রিয় করবার চেষ্টায় রত হলেন—কতদূর তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ভবিষ্যতের পাঠকেরা তার বিচার করবেন। তিনি অক্লান্ত ভাবে ক্রমাগত প্রবন্ধ লিখেছেন। বোধ হয়, বাংলাদেশে বাংলা কি ইংরেজী এমন কাগজ নাই যাতে তিনি প্রবন্ধ লেখেন নি। তাঁর লিখিত প্রবন্ধের সংখ্যা পাঁচ শতের বেশী বলে মনে হয়।

অনেকে মনে করেন যে, সাময়িক পত্রে ছোট ছোট প্রবন্ধ

স্বাদে গন্ধে
এর
জুড়ি নেই
রসুই
বনস্পতি
২, ৫, ১০ ও ৩৭ পাউণ্ড
টিনে পাওয়া যায়
হিন্দুস্থান ডিভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা
ম্যানেজিং এজেন্ট : এন্. আর. সরকার অ্যাণ্ড কোং লিঃ
HDX 13

লিখে সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থায়ী ইমারত নির্ম্মাণ করা যায় না। কিন্তু আমার মনে হয়, ভারতের বিবিধ কৃষ্টি সম্বন্ধে লিখিত এই অক্লান্ত সাধকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ যদি একত্র সংগৃহীত হয় তা হলে বহুমূল্য এবং নানা তথ্যপূর্ণ এমন একটি বিরাট গ্রন্থ রচিত হবে যার দ্বারা বাংলা সাহিত্য বিশেষরূপে পুষ্ট এবং সমৃদ্ধিশালী হবে।

কিন্তু কেবল ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখেই তিনি নিজের কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। বৌদ্ধ মহাযান-ধর্ম্মের দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি গভীর গবেষণা করে অনেক নূতন তথ্য উদ্ধার করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নেপালে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কিছুদিন থেকে অনেক প্রাচীন অপরিচিত এবং অপ্রকাশিত দেব-প্রতিমার ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করেছিলেন। এই সব নূতন উপকরণ অবলম্বন করে তিনি ভারতের প্রতিমাতত্ত্বের একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনার সঙ্কল্প করেছিলেন। কিছু কিছু লিখেও ছিলেন, কিন্তু গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নাই। তাঁর মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে এই গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত এই সব নূতন উপকরণ প্রকাশ করতে পারলে ভারতের প্রতিমা-তত্ত্বের উপর নূতন আলোকসম্পাত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ একবার এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, যে মানুষকে আমরা হারাই তাঁকেই আমরা বেশী করে পাই। যামিনীকান্তকে হারিয়ে আজ আমরা তাঁকে বেশী করে পাব—একথাই মনে হচ্ছে। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মূল্য সম্বন্ধে আমাদের চেতনা আজ জেগে উঠেছে। এই সুযোগে তাঁর সাহিত্য-রচনার একটি স্থায়ী সঙ্কলন প্রকাশ করা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য বলে মনে করি।

যামিনীকান্তের মৃত্যুতে বাংলার কৃষ্টির জগতে যে স্থানটি শূন্য হ'ল সেই শূন্য স্থানটি পূর্ণ করবার যোগ্য ব্যক্তি আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ভগবান তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন এই প্রার্থনাই করি।

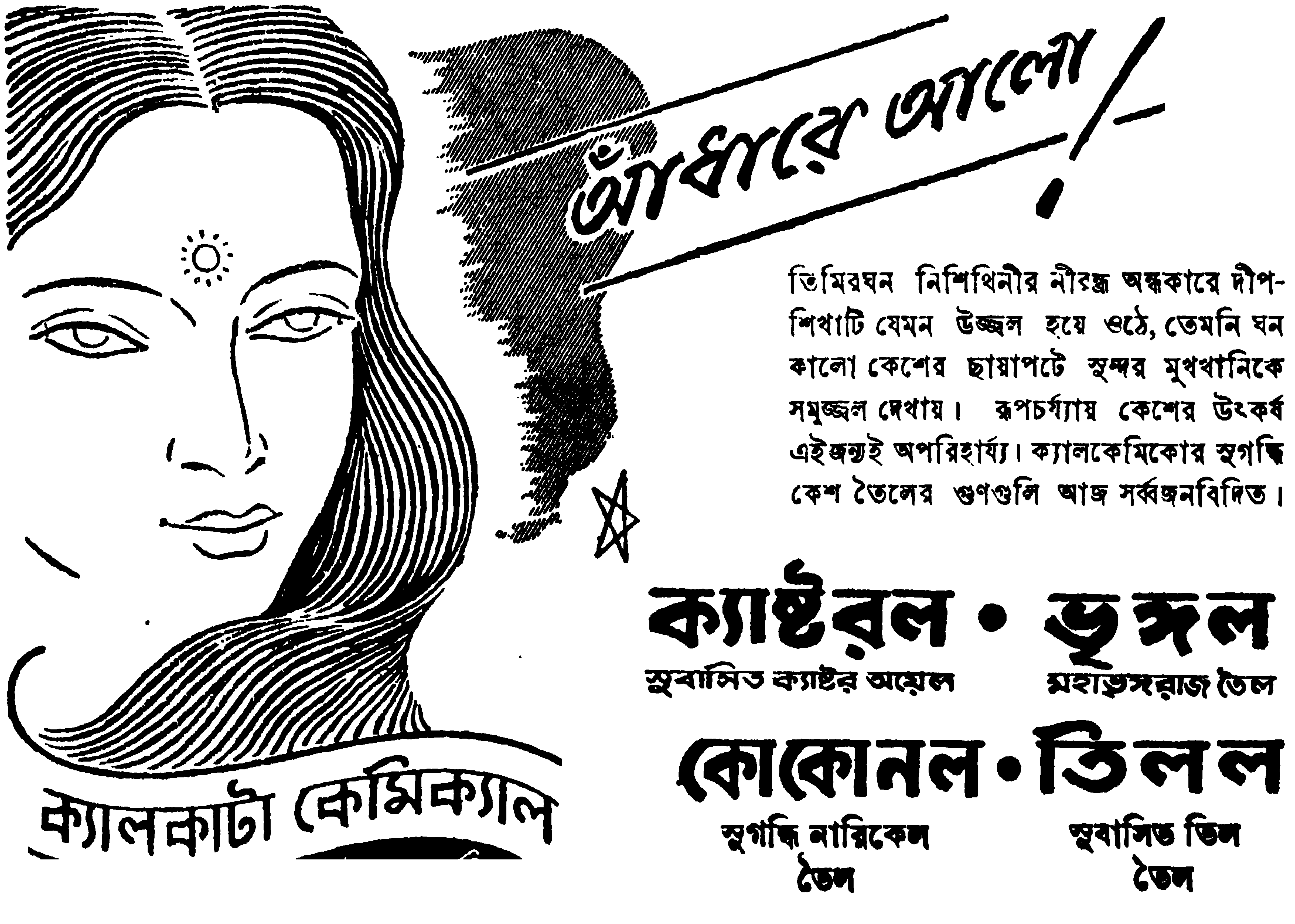

আলোচনা

বাংলা লিপির সংস্কার

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

বিগত বৎসরের কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত বাংলা লিপি-বিষয়ক আমার প্রবন্ধটি বাংলার সুধীদের একজনেরও যে নজরে পড়েছে এতে আমি খুশী। আরও খুশী হতাম যদি গত শ্রাবণের প্রবাসীতে সে-সম্পর্কে আলোচনা করবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায় আমার প্রস্তাবটির সঙ্গে আরও একটু ভাল করে পরিচিত হয়ে নেবার চেষ্টা করতেন।

পাঁচ বৎসরেরও অধিককাল লিপি-সংস্কার বিষয়ে আমি ভাবছি ও লিখছি। সেই-সব লেখার বেশীর ভাগ ছাপা হয়েছে বিশ্বভারতী পত্রিকাতে, অন্যত্রও কিছু কিছু ছাপা হয়েছে। সেই লেখাগুলির সারাংশ একটি প্রবন্ধের আকারে প্রবাসীতে পাঠাবার সময় এটা আমি ভেবেই ছিলাম যে, স্বল্প-পরিসরের মধ্যে আমার সমস্ত বক্তব্যকে খুব সুপরিস্ফুট আমি করতে পারব না; সেই কারণেই পূর্ব্বপ্রকাশিত অন্য লেখা-গুলির কয়েকটির নাম ঠিকানা সেই প্রবন্ধের পাদটীকায় আমি দিয়েছিলাম। একটু শ্রম-স্বীকার ক'রে সেই লেখাগুলি মণীন্দ্র বাবু যদি পড়তেন ত আমার প্রস্তাবিত লিপি-সংস্কারের সূত্র-গুলি তাঁর এতটা দুর্ব্বোধ্য মনে হ'ত না এবং তিনি এও দেখতে পেতেন যে, যে-সমস্ত বিরুদ্ধ যুক্তির কথা তাঁর মনে এসেছে তার প্রত্যেকটিকেই ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার বিচার-বিতর্কসহ-যোগে আমি খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু পাদটীকায় উল্লিখিত লেখাগুলি পড়া দূরে থাক, প্রবাসীর যে প্রবন্ধটি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, সেটিও আদ্যোপান্ত পড়বার তাঁর সময় হয়েছে বলে মনে হ'ল না। বিষয়টি গুরুতর, দায়সারা আলোচনা এ রকম বিষয় নিয়ে করা উচিত নয়।

"...সংস্কৃত ভাষায়...ব্যঞ্জনাক্ষর নিয়ত অকারান্ত", আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়ের লেখা থেকে এই কথা উদ্ধৃত করে মণীন্দ্র বাবু প্রশ্ন করেছেন, "এ তথ্যটি কি সুধীরবাবু চিন্তা ক'রে দেখেন নাই?" চিন্তা যে করেছি তার প্রমাণ আমার আলোচ্য প্রবন্ধটির ভিতরেই রয়েছে। তা ছাড়া, অন্যত্র আরও বিশদভাবে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা যে আমি করেছি সে কথারও স্পষ্ট উল্লেখ আমার প্রবন্ধটিতে আছে।

অবশ্য "...সংস্কৃত গোষ্ঠীর ভাষায়...ব্যঞ্জনাক্ষর নিয়ত

মায়ের কর্ত্তব্য

শিশুপালনের সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন শিশুদের দৈহিক সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি$_1$, বি$_2$র সহিত মুল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দন্তোদ্গমের সময়, সেবন করান উচিত।

বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী:—শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্ণতা, দুধ তোলা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, রুগ্নতা, ব্রকাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি।

শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য

বিবটন

একটি পূর্ণাঙ্গ টনিক

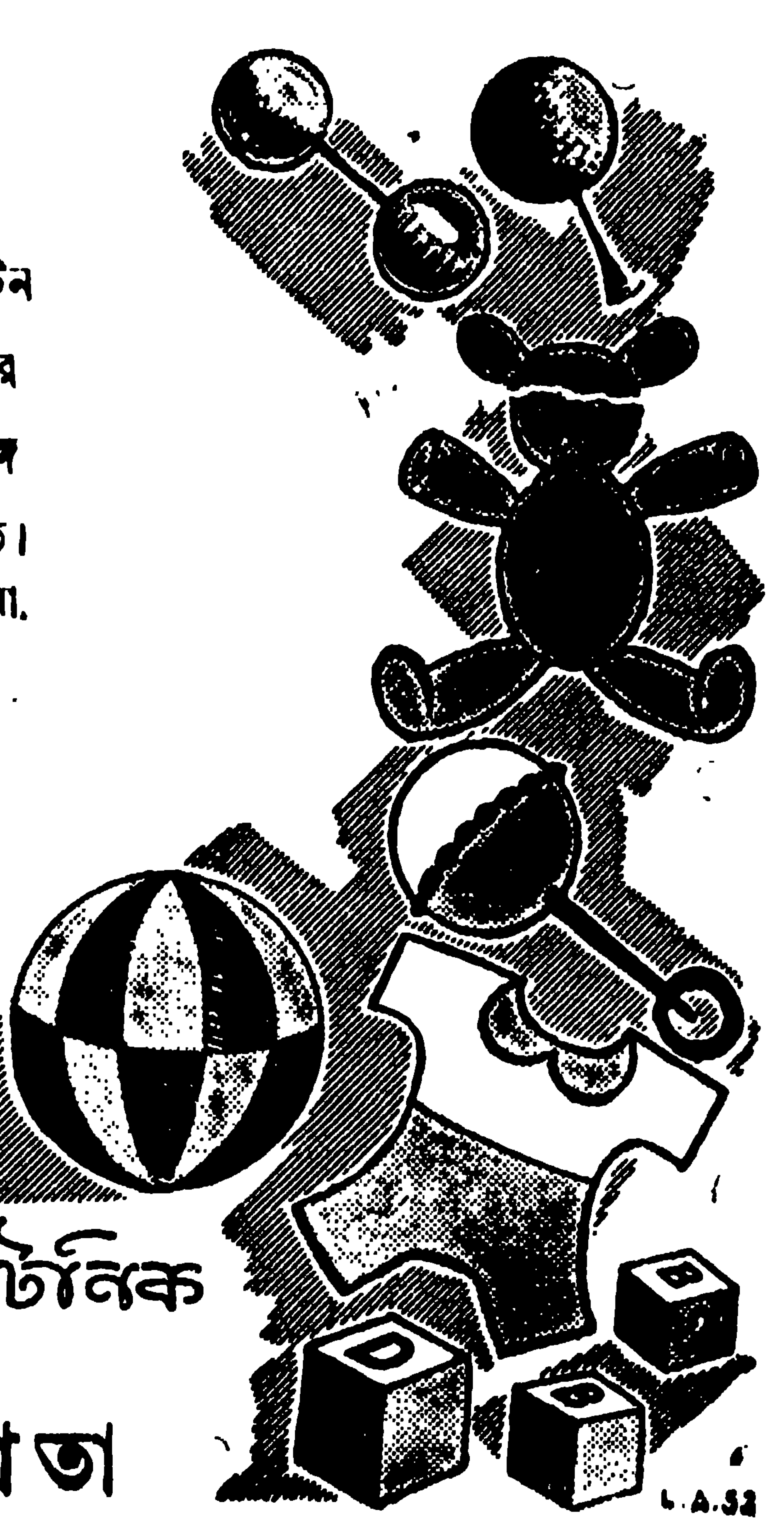

লিষ্টার এন্টিসেপটিকস্ • কলিকাতা

অকারান্ত" এই 'তথ্য'টি নিয়ে আমি চিন্তা করিনি, কেননা, বাংলা এবং অন্য অধিকাংশ সংস্কৃত গোষ্ঠীর ভাষা সম্পর্কে তথ্যটি নিতান্তই অমূলক।

প্রসঙ্গক্রমে মণীন্দ্রবাবু বলছেন, "পাতীর সংখ্যা বেশী হবে কিম্বা অ-ধ্বনিজ্ঞাপক নূতন চিহ্নটি তাই বিচার্য্য।" বিচার্য্য বিষয়টিকে মণীন্দ্রবাবু যতটা সহজ মনে করেছেন, মোটেই সেটা যে তা নয়, আমার প্রবন্ধটির মধ্যেই স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে সে-কথার, তাঁর চোখে পড়েনি। সহজ যে নয় তার প্রমাণ ভাল করে যদি পেতে চান ত মণীন্দ্রবাবু ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকাতে "বাংলা বানানে অ এবং অকার" নামীয় আমার প্রবন্ধটির "অকারান্ত-হসন্ত-হসন্তবৎ-ওকারান্ত" শীর্ষক অধ্যায়টি পড়ে দেখতে পারেন। সপ্তমবর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকাতে "অকার বনাম হস্‌চিহ্ন" প্রবন্ধটিও তাঁকে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

আমার প্রস্তাবিত অকার পূর্ণাবয়ব অক্ষরগুলির সমান মাত্রার ইংরেজী বড় হাতের V নয়। অক্ষর সমাবেশের মধ্যে এই নূতন ধ্বনিচিহ্নটির স্থান কোথায় এবং কতটুকু হবে, আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সে-কথাও আমি স্পষ্ট করেই বলেছি। সে যেমনই হোক, সূক্ষ্ম-কোণ-সম্বলিত দ্বিভুজ বাংলার বহু অক্ষরের মূলীভূত উপাদান; তা ছাড়া, ঋকারের যে চিহ্নটি এখন মূল অক্ষরের পায়ের নীচে কাত হয়ে বসে, সেইটেকেই উপরের সারে চিত করে বসালে আমার প্রস্তাবিত অকার হয়ে যাবে। নীচের দিকে কাত হয়ে বসলে পীড়াদায়ক হয় না, উপরের সারে চিত হয়ে বসলে চক্ষুর পীড়া উপস্থিত হয়, এ কেমনতর চক্ষুপীড়া?

আমার উদ্ভাবিত প্রণালীর একটিও আদর্শ আমার প্রবন্ধটির সঙ্গে আমি দিই নি বলে মণীন্দ্রবাবু অভিযোগ করেছেন। এ অভিযোগ তাঁকে করতে হ'ত না, যদি প্রবন্ধের পাদটীকায় উল্লিখিত "নূতন বাংলার বর্ণমালা' বিষয়ক আমার লেখাটিতে একবার তিনি চোখ বুলিয়ে নিতেন।

আমার প্রস্তাবিত "যুক্তস্বরাক্ষর"গুলি মণীন্দ্রবাবুর বিবেচনায় "অত্যন্ত জটিল", "একেবারে অচল" এবং তদুপরি "অনাবশ্যক।"

অ-এ আকার দিয়ে আ (বাংলায় ও দেবনাগরীতে) এবং অ-এ ওকার ঔকার দিয়ে ও ঔ (দেবনাগরীতে) আবহমান-কাল লেখা হচ্ছে। সেগুলি যদি জটিল না হয় ত, অ-এ ইকার উকার ইত্যাদি যোগ করে ই উ ইত্যাদি লিখিলে কি জটিলতার সৃষ্টি যে হতে পারে তা আমার বুদ্ধির অগম্য। তা ছাড়া, "যুক্ত স্বরাক্ষরে"র ব্যবহার বস্তুতই খুব বেশী হবে না, কারণ ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হলেই স্বরধ্বনির বাহন 'অ' লোপ পাবে, সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনিচিহ্নটি কেবল অবশিষ্ট থাকবে। আমার আলোচ্য

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ

(১৯৩০ সালে স্থাপিত)

হেড অফিস—৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

পোষ্ট বক্স নং ২২৪১ ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শাখাসমূহ

লেকমার্কেট (কলিকাতা), সাউথ কলিকাতা, বর্দ্ধমান, চন্দননগর, মেমারী, কীর্ণাহার (বীরভূম), আসানসোল, ধানবাদ, সম্বলপুর, ঝাড়সুগুদা (উড়িষ্যা), ও রাণাঘাট।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

এইচ, এল, সেনগুপ্ত

প্রবন্ধটিতে একথাও আমি বলেছি যে, সেবাগ্রামে basic হিন্দীর পাঠ্যপুস্তক কিছুকাল যাবৎ এই রীতি অনুসরণ করে ছাপা হচ্ছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিনা বাধায় যা চলছে মণীন্দ্রবাবু তাকে "একেবারে অচল" আখ্যা দিলেই তার অচলতা সাব্যস্ত হয়ে যাবে না। একথাও হয়ত বলা প্রয়োজন যে, মণীন্দ্রবাবু যে বস্তুকে "অনাবশ্যক" মনে করছেন, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুক্ত বিনায়ক সাভারকর, আচার্য্য বিনোবা ভাবে প্রমুখ মনীষীরা তাকে অত্যাবশ্যক বলেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

"মৌলিক স্বরাক্ষর"গুলি কি দোষ করল সে কথার আলোচনা, এবং এ ঐ ও ঔকে ছোট করে লিখে একার ঐকার ওকার ঔকারের কাজে কি যুক্তিতে লাগানো যেতে পারে তারও উল্লেখ আমার প্রবন্ধে আছে, মণীন্দ্রবাবু লক্ষ্য করেন নি। বেশী বলতে গেলে অনেক কথার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকাতে এবং অন্যত্র এবিষয়ে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করেই আমি বলেছি।

মণীন্দ্রবাবু জানতে চাইছেন, "যুক্তবর্ণ বর্জ্জন করতে বসে লিপির উপর যুক্তস্বরাক্ষর চাপান কিরূপ ব্যবস্থা?" ব্যবস্থাটা এইরূপ: যুক্তাক্ষরগুলির হঠাৎ কোনোও কারণে ব্রাত্যতা দোষ ঘটেছে বলে সেগুলিকে যে আমরা বর্জ্জন করতে চাইছি তা ত নয়? যুক্তাক্ষর ছাড়তে চাইছি অক্ষর-সংখ্যা কমাবার জন্যে। আমার কল্পিত স্বরধ্বনিচিহ্নগুলিও অক্ষর সংখ্যা বাড়াবে না, কমাবে, এই সহজ কথাটা মণীন্দ্রবাবু ভেবে দেখেন নি।

কিন্তু এ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমার কল্পিত স্বরবর্ণগুলিকে "যুক্তস্বরাক্ষর" মনে করা এবং বলা একেবারেই ভুল। আ কি একটা যুক্তস্বরাক্ষর? কিম্বা যোগেশবাবুর এ্যা অথবা ওা এবং আমার অী, অু, অূ, অৃ প্রভৃতি কি সমজাতীয়? মণীন্দ্রবাবু আমার স্বরবর্ণমালার অ-কে একটা স্বতন্ত্র অক্ষর ভাবছেন, আসলে সেটা তা নয়, যেমন ক, ব, ষ, র, এদের মধ্যেকার ব একটা স্বতন্ত্র অক্ষর নয়। বস্তুতঃ যোগেশবাবুর এ্যা এবং ওা যুগ্মস্বরধ্বনি হওয়া সত্ত্বেও যুক্তস্বরাক্ষর নয়। একাধিক অক্ষর পরস্পর মিলিত হয়ে নূতন চেহারার অক্ষরের উদ্ভব না হলে যুক্তাক্ষর হয় না।

স্র-র পক্ষ হয়ে আমার "ওকালতির" অর্থ মণীন্দ্রবাবু বুঝতে পারবেন, যদি একটু অবহিত হয়ে বাঙালীর স্র উচ্চারণ তিনি শোনেন, তবে স্র-এর মধ্যেকার স উচ্চারণ বাঙালীর রসনায় আমি যে বিশেষ শুনিনি, সেটা আমার শ্রবণশক্তির দোষের জন্যেও হয়ে থাকতে পারে।

আমার ম-ফলার "ভাঙা ম" এবং য-ফলাও মণীন্দ্রবাবুর মতে "অচল"। সচলতা অচলতা বিষয়ে মণীন্দ্রবাবু কোনোও রক্ষা-নিষ্পত্তিতে বিশ্বাস করেন না, যদিও বর্ত্তমানে যে যফলা ও মফলা বাংলায় চলছে সেই দুটিকেই রক্ষা করবার প্রস্তাব আমি করেছি। আমার প্রবন্ধটি দয়া করে আর একবার পড়ে মণীন্দ্র-বাবু জানাবেন কি, ম ফলা ও য ফলা না রাখলে, সর্ব্বত্র সমভাবে ম এবং য় দিয়ে বানান করলে, স্মার্টস্ এবং বিস্ময়, সহ্য এবং হ্যাঁ-য় হ্য এবং হ্-এর উচ্চারণ বৈষম্য কি উপায়ে আমরা নির্দ্দেশ করব?

আলোচনার গোড়ার দিকে মণীন্দ্রবাবু সাধারণ ভাবে যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলির সঙ্গে আমার প্রস্তাবিত লিপি-সংস্কারের কোনও বিরোধ নেই। আমিও অনাবশ্যক পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নই, লিখন এবং মুদ্রণ উভয় দিকেরই সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বলে আমিও মনে করি, এবং লিপি-সংস্কারের "প্রধানতম" ছেড়ে অন্যতম উদ্দেশ্যও যে উচ্চারণ-সংস্কার নয় তাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। তা ছাড়া, "প্রচলিত পদ্ধতিতে ছাপা পুস্তক পাঠ করতে" নব পদ্ধতিতে শিক্ষিত লোকদের কেন যে বিশেষ কিছু অসুবিধা হবে না, এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষিত জনগণ আমার প্রস্তাবিত অকার চিহ্নটি একবার দেখে নিলেই যে প্রস্তাবিত নূতন লিপি অনর্গল পড়তে পারবেন তারও উল্লেখ "প্রবাসী"তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধটির মধ্যেই রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, দু'রকম লিপিই পাশাপাশি চলতে পারে; এবং বেশ কিছুকাল তাই ত'দের চলতেও হবে; চিরকাল চলতেও বাধা নেই। লিপিসংস্কার বিষয়ে আমার প্রথম প্রবন্ধটিতে সেই প্রস্তাবই আমি করেছিলাম।

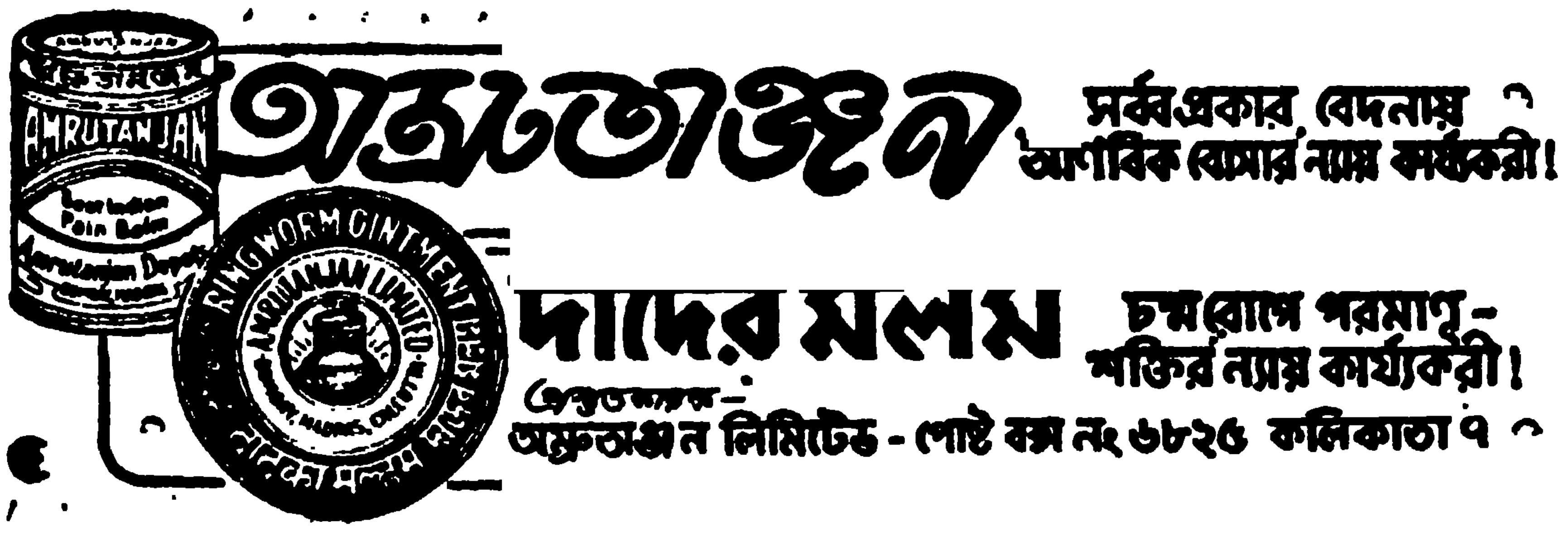

পুস্তক পরিচয়

সাম্প্রদায়িকতার গ্লানি—শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ডেমোক্রাটিক ভ্যানগার্ড, ১৮, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩০ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

স্বদেশীযুগে যে কিশোর ঘরের বাহির হইয়াছিল মাতৃভূমির স্বাধীনতা-উদ্ধারের আহ্বানে, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি নানা পথঘাট ঘুরিয়া প্রৌঢ় বয়সেও সে স্বস্তিলাভ করিতে পারে নাই। ইংরেজ শাসনের অপসারণে দেশের যে মুক্তি আসিয়াছে, লেখকের নিকট তাহা গ্রাহ্য নয়; স্বাধীনতার নূতন আদর্শ তাঁর চক্ষের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে; যুগ-যুগান্তের বঞ্চিতের সেবায় শেষ বয়সের দিন কয়টি নিয়োগ করিবার আকুতি তাঁর লেখায় দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পুস্তকখানির আলোচ্য বিষয়—হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ। আমাদের বক্তব্য এই যে, লেখক এখনও তাঁর স্বীয় সমাজের গণ-মনের স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই; মুসলমান সমাজের গণ-মানসের ভাব এবং প্রেরণা সম্বন্ধেও তাঁর কোন ধারণাই নাই। অর্থনীতিক ব্যাখ্যায় এই মনের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যুগে যুগে মানুষ ভাব ও বিশ্বাসের বেদীমূলে তার অর্থনীতিক স্বার্থ বলি দিয়াছে। এ কথাটা মনে রাখিলে লেখক সমস্যা-সমাধানের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তাঁর মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইত।

ছয়-সাত শত বৎসর ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান একত্র বাস করিতেছে। তবুও এক-মন এক-প্রাণ হইতে পারে নাই। কেন? সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধিই তার একমাত্র কারণ নয়। অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সমস্বার্থবোধ যদি ভাব ও কর্ম্মের নিয়ামক হইত তবে "পাকিস্থানে"র আকাঙ্ক্ষা মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে জাগিত না, এবং প্রতিবেশীর বুকে ছুরি বসাইয়া তাহা আদায় করা হইত না। নোয়াখালি ও বিহারে "পঞ্চায়েতি" ভাব ছিল না, একথা বলা চলে না; তবুও সে ব্যবস্থা ভাবের দাপটে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই ভাবের প্রকৃতি কি তা বুঝিতে না পারিলে "সাম্প্রদায়িকতার গ্লানি" আমাদের জীবনকে সর্ব্বদা বিপন্ন করিবে।

অতি অল্পসংখ্যক লেখকই এই ভাবের প্রকৃত পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। সেইজন্য তাদের সদিচ্ছা এবং আগ্রহও ব্যর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তকখানিও সেই পর্য্যায়ভুক্ত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

গীতা বোধ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তাৎপর্য্য)—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। অনুবাদক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকুমারচন্দ্র জানা। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৪৭। দাম বার আনা মাত্র; বিশেষ সংস্করণ, এক টাকা। পৃঃ ।৶০+১১০।

১৯৩০ সালে জেলে থাকার সময়ে গান্ধীজী গীতার প্রতি অধ্যায়ের

কল্লোল

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

॥ পাঁচ টাকা ॥

"সঞ্জয়বাবুর জড়িমাশূন্য ভাষার গুণে ইতিহাসের গতির সঙ্গে নায়ক প্রতীপের ভাবধারার কোন সংঘাত ঘটে নাই। সঞ্জয়বাবু বনেদী ঔপন্যাসিকের মনোরম সংযম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এই উপন্যাসখানি গতানুগতিক পুস্তক-তালিকার বাহিরে একটি বিশেষ স্থান দাবী করিতে পারে।"—আ ন ন্দ বা জা র

"...'কল্লোল' স্বাধীন বাঙ্গলার নূতন উপন্যাস। বিপ্লবের পটভূমিকায় এই উপন্যাসখানি চিত্তাকর্ষী, প্রেমের ফল্গু-ধারায় আনন্দময়, বিভিন্ন দল-উপদলের 'ধ্বনি' সামঞ্জস্যে অপূর্ব।... জাতীয় আন্দোলনের কাহিনী লইয়া উপন্যাস রচনায় এতদিন অনেক বাধা ছিল, সে বাধা অপসারিত হইয়াছে বলিয়াই হয়তো বাংলা সাহিত্যে এমন একখানি সুন্দর উপন্যাস পাঠের সুযোগ পাওয়া গেল।" —যু গা ন্ত র

"...সঞ্জয়বাবু ছোট গল্প আর উপন্যাসের একটা সিনথেসিস বের করতে পেরেছেন এই গ্রন্থে—আবিষ্কার করেছেন এক নতুন ফর্ম্ম। অর্থাৎ স্বল্পপরিসর সহর কোলকাতার মধ্যে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সারা ভারতবর্ষ, দেড় বছর কি তারও কম সময়ের মধ্যে ছবি এঁকেছেন ভারতের তথা সারা পৃথিবীর চিরন্তন অভিযানের—স্বাধীনতার পথে, শান্তির পথে, ইন্টেলেকচুয়ালিজমের পথে। আর 'কল্লোলে'র কয়েকটিমাত্র চরিত্র চোখের সামনে উপস্থিত করেছে সারা ভারতের অগণিত দল আর মতের মানুষকে।...'কল্লোল' সত্যিকারের সাহিত্যে রূপ দিতে পেরেছে আজকের রাজনীতিকে...।"—বসুমতী

বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস

মণিলাল সেন

॥ দুই টাকা ॥

সংস্কৃতির ঐতিহ্যই জাতির ইতিহাস। সাহিত্য শিল্পের ইতিহাস আলোচিত হলেও, বল্‌লে হয়তো মিথ্যে বলা হবে না, বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোনো ব্যাপক আলোচনায় কেউ হাত দেন নি। মণিলাল সেন বহুদিন থেকেই সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে যে গভীর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়ে এসেছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মারফৎ, তাতে এমন আশা করলে অন্যায় হবে না যে, বর্ত্তমান গ্রন্থে তারই সুসমঞ্জস রূপ নিখুঁৎভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত, বাংলাদেশে আবহমান কাল থেকে প্রচলিত সঙ্গীতধারা আর বহিরাগত সঙ্গীতধারা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ইতিহাস জান্‌তে হলে 'বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস' থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে।

প্রকাশক :

পূর্ব্বাশা লিমিটেড

পি ১৩, গনেশ চন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩

সারকথা অতি সহজ ভাষায়, অল্পশিক্ষিত মানুষও যাহাতে বুঝিতে পারে, সেইজন্য লিখিয়াছিলেন। মূল লেখা গুজরাটী ভাষায় ঐ সময়ে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি তাহার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদের ভাষাও সহজ, সরল। অল্পশিক্ষিত পাঠক-পাঠিকার পক্ষেও ইহা দ্বারা গীতার গান্ধী-ব্যাখ্যাত তাৎপর্য্য বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিমিটেড। পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভিনু্য, কলিকাতা ১৩। মূল্য ।০। পৃষ্ঠা ৩২।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লেখক সাম্যবাদী বহু নেতার লেখা হইতে মত সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নহে। বর্ত্তমান রুশদেশেও গত ত্রিশ বৎসরের চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা সম্ভব হয় নাই। "যৌথ কৃষিতে কৃষকদের তৃপ্তি নেই, তাদের মন জমি বা পশুর ব্যক্তিগত মালিকানার দিকে সদা জাগ্রত।" "সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্র কৃষকশ্রেণী বা শ্রমিক-শ্রেণীর করায়ত্ত নয়—রাষ্ট্র সেখানে আমলাতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, শ্রমিক কৃষকের সম্বন্ধে ভাঙন ধরে থাকলেও তাই তা উগ্র হয়ে বাইরে প্রকাশিত হ'তে পারে না।" বিগত মহাযুদ্ধের অংশীরূপে এবং বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় কার্য্যকলাপের পর সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আজ অন্যান্য ধনতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হইতে পৃথক করিয়া লওয়া শক্ত যদিও রুশদেশের ভিতরকার আর্থিক ও সামাজিক কাঠামো বাহিরের লোককে সাম্যবাদী আদর্শে গঠিত বলিয়াই জানানো হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠকের অনেক চিন্তার খোরাক যোগাইবে।

আওরঙ্গজেব—মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এম-এ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১১০, মূল্যের উল্লেখ নাই।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি শামসুল উলামা শিবলী নোমানী প্রণীত "আলমগীর আওরঙ্গজেব পর একনজর" নামক উর্দ্দু গ্রন্থের অনুবাদ। আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে সাধারণতঃ ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে যে মতামত পাঠ করা যায় এই গ্রন্থের মতামত তাহা হইতে ভিন্ন। অবশ্য গ্রন্থকার অপরের মত খণ্ডন করিয়াই তাঁহার নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম 'আওরঙ্গজেবকে সমর্থন' (Defence of Aurangzeb) দেওয়া চলে, কিন্তু গ্রন্থকারের তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে; কারণ তিনি বলিতে চান যে, কেবল সত্যের ও ন্যায়ের খাতিরেই তিনি উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, নিছক আওরঙ্গজেবের পক্ষে ওকালতি করার জন্য লেখেন নাই। কিন্তু এই পুস্তক দ্বারা পাঠকদের মধ্যে আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। মারাঠাযুদ্ধ, দাক্ষিণাতের মুসলমান রাজ্য ধ্বংস, ভ্রাতৃগণের সহিত যুদ্ধ, দারার প্রাণদণ্ড, সাজাহানের বন্দীদশা, হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন ইত্যাদি যে সকল অন্যায় কার্য্য আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল লেখক তৎসমুদয় হইতে সম্রাটকে অব্যাহতি দিয়াছেন। জিজিয়া কর সম্বন্ধে লেখক বলেন—"জিজিয়া প্রকৃতপক্ষে আদৌ অপকারী কর নহে বরং অমুসলমানের পক্ষে ইহা একটি ঈশ্বরানুগ্রহ বলিলেও হয়" (৫৫ পৃষ্ঠা)। তাঁহার বক্তব্য এই যে, সম্রাট একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন, এইজন্য তাঁহাকে অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে হইয়াছে। একমাত্র ঐসলামিক নীতির মানদণ্ড দিয়াই তাঁহার কার্য্যের বিচার করিতে হইবে এবং নিরপেক্ষ

শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক উপাদানে প্রস্তুত

আইও জেব্রোমল

হাঁপানী, সর্দ্দি ও কাশির মহৌষধ। সুনির্ব্বাচিত ও উপযুক্ত পরিমাণে সংমিশ্রিত উপাদানে প্রস্তুত। শ্বাসের যন্ত্রণা, শ্লেষ্মাপ্রবণতা, কাশি, কণ্ঠনালী বা বুকের অসহ্য কষ্ট ও তজ্জন্য নিদ্রাহীনতা ও অন্যান্য ক্লেশকর উপসর্গ এক মাত্রাতেই আরাম করে।

ডি জি আই

ষ্টমাক্ পাউডার

এক মাত্রাতেই সুফল দেয়
পেটফাঁপা, অম্বল, বুকজ্বালা, বমিভাব, পেটব্যথা, পিত্তাধিক্য, পিত্তশূল, আমাশয় ও পরিপাক সংক্রান্ত অন্যান্য রোগে আশু ফলপ্রদ।

— প্রাপ্তিস্থান —

গিরীশ ফার্ম্মেসী
বালিগঞ্জ (গড়িয়াহাটার মোড়)

বোস দত্ত এণ্ড কোং
১৬৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বনফিল্ড মেডিকেল ষ্টোর
২, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা

বার্ক এণ্ড কোং
ডাক্তারখানা
৩, ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পপুলার ফার্ম্মেসী
মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট

এল, এম, মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স লিঃ
১৬৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইষ্ট এণ্ড মেডিকেল হল
২৭০, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা

নিউ মেডিকেল ষ্টোর
মল্লিক ফটক, জি. টি. রোড, হাওড়া

ি—ডি, জি, আই লিঃ—১নং সার্কাস রেঞ্জ, কলিকাতা—১৯

ভারতবর্ষের আত্মাকে দীর্ঘকাল ধরে সন্ধান করেছেন জওহরলাল। এই বই সেই তীর্থযাত্রার আদ্যন্ত ইতিহাস। ধূসর অতীত থেকে রক্তিম বর্তমান পর্যন্ত সেই অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস পূর্ণপটে প্রসারিত। ভারতবর্ষের আত্মার সঙ্গে সমগ্র এশিয়ার কী নিবিড় যোগ, দূর ইওরোপের উপরেই বা কী তার প্রভাব, তারই প্রদীপ্ত বিশ্লেষণ। আর, একি শুধু সন্ধান? না, এ আবিষ্কার— এ পরা প্রাপ্তি। আগামী পৃথিবীর জন্মদাত্রী এই ভারতবর্ষ। তাই এই বই শুধু জিজ্ঞাসা নয়, এ উত্তর—শুধু যাত্রা নয়, উত্তরণ। শুধু ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা নন জওহরলাল, তিনি ইতিহাসের নির্মাতা। তাই ভারতবর্ষের আত্মার সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তাঁর নিজের আত্মার সন্ধান—একটি বিচিত্র ব্যক্তিত্বের উদ্ঘাটন। আত্মসন্ধানের এমন গভীর নিদর্শন তাঁর অন্য কোন বইএ প্রকাশিত হয়নি। অতীত বা বর্তমানের ভারতবর্ষের চেয়েও ভবিষ্যমান ভারতবর্ষ যে মহত্তর, বিপুলতর, তারই মর্মকথা এই বইএর প্রতি পৃষ্ঠায় স্পষ্ট হয়ে আছে।

আগামী পৃথিবীর
জন্মদাত্রী যে ভারতবর্ষ...

ভারত সন্ধানে

জওহরলাল
নেহরু

"এই বই ভারতের এক নতুন গীতা"
—ক্রিপ্‌স্

"সাহিত্যিক নেহরুর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা"
—বম্বে ক্রনিকল্

দাম ৮॥০

সিগনেট প্রেস • কলিকাতা ২০

এই প্রথম
বাংলা ভাষায়

শ
বার্নার্ড

প্রথম খণ্ড

বিরস নাটক

সম্পাদনা : প্রেমেন্দ্র মিত্র
দাম ৩॥০ টাকা

অন্নদাশঙ্কর বলেছেন : শ'র অনুবাদ পড়ে এ-দেশ সংস্কারমুক্ত হবে। মধ্যযুগের যূপে বন্দী থাকবে না।

সিগনেট প্রেস ; কলিকাতা ২০

আয়ারল্যাণ্ড অনেকদিন ধরে ইংলণ্ডের পদানত ছিল। সেই অবমাননার শোধ সে নিয়েছে বুঝি বার্নার্ড শ'র ভিতর দিয়ে সাহিত্যের চাবুকে ইংলণ্ডকে শায়েস্তা করে। শ' অবিশ্যি শুধু ইংরেজ সমাজকেই তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপের বেতের ডগায় তটস্থ করে রাখেননি, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত মানবসমাজ ও সভ্যতার উপরই তাঁর বক্রোক্তির বেত্রদণ্ড মুহুর্মুহুঃ আস্ফালিত হয়েছে।

মানবজীবনের যে-সমস্ত সমস্যায় সমস্ত বিশ্বসভ্যতা আজ আলোড়িত, তারই প্রাঞ্জল সমাধানের পথ দেখিয়েছেন বার্নার্ড শ' তাঁর নাটকে। তাঁর নাটক সমগ্র মানবজীবনের বিপুল বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে নিংড়ে নেওয়া সত্যের নির্যাস, সর্বরসের সমন্বয়ে অমৃতের মতো উপাদেয়। শ'র মতো ভাষার যাদুকরের মুখে সত্যের বাণী হাসির সুর হয়ে উছলে পড়ে। তাঁর কঠিনতম সমস্যামূলক নাটক তাই কৌতুককাহিনীর চেয়ে রসাল, তাঁর গভীরতম বক্তব্য চটুল পরিহাসের চেয়ে চমৎকার।

প্রথম খণ্ডের নাটকগুলিকে শ' নিজে নামকরণ করেছেন : 'বিরস নাটক'। এই 'বিরস নাটক' দিয়েই বর্তমান যুগের সবচেয়ে সরস নাট্যকারের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় শুরু হোক। ভাবীযুগের মানুষ হয়ে বার্নার্ড শ' যদি ভুল করে আমাদের মাঝে এগিয়ে এসে থাকেন, তাঁর লেখা না-পড়লে তেমনি ভুল করে এ-যুগ থেকে পিছিয়ে থাকা হবে।

ঐতিহাসিকের বিচারে আলমগীর শাস্তি না পাইয়া পুরস্কারই পাইবেন। তাঁহার পূত চরিত্রের বিপক্ষে শত্রুরও কিছু বলিবার নাই। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও লেখক আওরঙ্গজেবের কার্য্যসমূহ নির্ভুল ও সময়োপযোগী মনে করেন এবং তাঁহাকে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসকর্ত্তা না বলিয়া শ্রেষ্ঠ নির্ম্মাতা বলিতে চাহেন। অবশ্য প্রত্যেক যুক্তির সম্পর্কেই লেখক ইতিহাসের নজীর উপস্থাপিত করিতে ও ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের যুক্তি খণ্ডনে ত্রুটি করেন নাই। তবুও অনেক সময় লেখকের যুক্তিকে আওরঙ্গজেবের ওকালতি বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। যাহা হউক, আওরঙ্গজেব-চরিত্রের ভাল দিক পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিলেও লেখক তাঁহার যাবতীয় কার্য্যকে সমর্থন করিতে গিয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

অন্তরাগ—শ্রীরাইহরণ চক্রবর্ত্তী। মোগলটুলী, চুঁচুড়া। মূল্য ১৲।

বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় কবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাষা ও ছন্দের পারিপাট্য নাই, কিন্তু সরলতা ও আন্তরিকতার জন্য পড়িতে মন্দ লাগে না।

পূজারিণী চন্দ্রাবতী—শ্রীনীলাপদ ভট্টাচার্য্য। প্রবর্ত্তক পাব্লিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

'ময়মনসিংহ গীতিকায়' চন্দ্রাবতীর পালা যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই মহিলা-কবির করুণ জীবন-কথা ভুলিতে পারিবেন না। সরল ভাষায় ও ছন্দে লেখক কাহিনীটি নূতন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

দত্তা-পরিচিতি—শ্রীসচ্চিদানন্দ পাঠক। ইউনিভার্সাল পাব্লিশার্স। ২২১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট; কলিকাতা—৬। মূল্য ১৲।

'নিবেদনে' লেখক প্রথমেই বলিয়াছেন: "সাহিত্য-সমালোচনা বেশ শক্ত ব্যাপার।" তিনি সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করিয়াছেন বলা চলে না, তবে সমালোচকের গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন বলিয়া যথাসাধ্য প্রযত্ন করিয়াছেন। চরিত্র-বিশ্লেষণে তাঁহার নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

ধূপ—শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক। মূল্য ৸৵০।

দৈনন্দিন জীবনে রোমাণ্টিক স্বপ্ন—উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে সুষ্ঠু সঙ্গতি। প্রকাশভঙ্গীতে আছে ঈষৎ আধুনিকতার আমেজ। কিন্তু আধুনিকতা বলিলেই যে দুর্বোধ্যতা বা অর্থহীনতার কথা মনে আসে, তাহার লেশমাত্র নাই। অনুভূতি সত্য, রচনাও সাবলীল, মনোরম। প্রথম কবিতা 'ধূপ'। কবি বসিয়া আছেন—"ধূপ" জ্বলিতেছে।

* * * বাহিরের কাঁচের উপর
শিশিরেরা জমিছে আসিয়া।"
ধূপ নিবিয়া গেল। "শূন্যস্থানে তার, পড়ে আছে শুধু
এক ফালি ছাই।
আমরাও তাই।"

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ব্লু এঞ্জেল—অনুবাদক শ্রীশৈলবিহারী ঘোষ। বুক ষ্ট্যাণ্ড, ১।১।১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৩।০ টাকা।

হাইনরিখ্ ম্যানের নামকরা উপন্যাস ব্লু এঞ্জেল পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ছায়াচিত্রে সাফল্য কাহিনীটির জনপ্রিয়তার অন্যতম

৪২এর অধ্যায়

ভারতীয় জীবন-বীমার ক্ষেত্রে "হিন্দুস্থান"-এর বিচিত্র ও বিস্ময়কর ইতিহাসে আর একটি উজ্জ্বলতর নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইল। ইহা একদিকে যেমন হিন্দুস্থানের অবিচ্ছিন্ন বহুমুখী জনসেবার পরিচয় প্রদান করে, অপরদিকে তেমনি তাঁহাদের আর্থিক উন্নতি সাধনের সহায়ক হিসাবে জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠানের উপর কতখানি আস্থাবান ও নির্ভরশীল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই আস্থা ও নির্ভরশীলতা যে উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি পাইতেছে, সোসাইটির গত ১৯৪৮ সালের হিসাব-নিকাশেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়:—

নূতন বীমা ...	১৩,১৮,৫৭,২৫৮৲
মোট চল্‌তি বীমা ...	৬৩,৪২,২৬,৯৫৯৲
প্রিমিয়ামের আয় ...	২,৯৫,৮০,৪৫৪৲
বীমা তহবিল ...	১২,০৭,২০,৪৬১৲
মোট সম্পত্তি ...	১৩,৪১,৫১,০০৭৲
প্রদত্ত ও দেয় দাবীর পরিমাণ (১৯৪৮)	৬৭,৭১,৪৪৬৲

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্,—৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

হেতু। একটি সুন্দরী নটী ও বিগতযৌবন এক অধ্যাপকের ভালবাসার আকর্ষণ-বিকর্ষণে কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে। আপাত বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্যে মানব-মনের চিরন্তনী বৃত্তিগুলির ক্রমবিকাশ কাহিনীকে সুষ্ঠু পরিণতির দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে করুণ একটি সুর মনকে বেদনারসে অভিষিক্ত করিয়া দেয়। এই ধরণের সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রধান কাহিনীর অনুবাদ দুরূহ।

আলোচ্য অনুবাদটি তেমন সাবলীল না হওয়ায় ইহাতে মূল পুস্তকের রস তেমন জমে নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ইরাবতী—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। দিগন্ত পাবলিশার্স লিমিটেড। পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা। দাম চার টাকা।

রাজনৈতিক বিষয়বস্তু লইয়া লিখিত একখানি উপন্যাস। নায়ক সীমাচলম মাদ্রাজের এক শিক্ষিত যুবক—শুভলক্ষ্মী নামে একটি মেয়েকে সে ভালবাসে, কিন্তু শুভলক্ষ্মীর বাবা এই ভালবাসাকে অগ্রাহ্য করিয়া অপরের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া দেন। ফলে সীমাচলমের জীবনের ধারা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইতে সুরু করে। সীমাচলম খুড়ার মোটা টাকা আত্মসাৎ করিয়া ব্রহ্মদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপরে নানা চিত্তাকর্ষক ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে তার পরিচয় ঘটে মা-পানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ফতিমার, হামিদার, রাংগাম্মার সহিত। নিজেকে সে গভীর ভাবে জড়াইয়া ফেলে আকো, আঠুন ও থাকিন্‌ নিয়ার দেশকে স্বাধীন করিবার প্রচেষ্টার সহিত।

ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকায় উপন্যাসটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হইয়াছে। সহজ স্বচ্ছন্দ ভাষা এই বইয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন চরিত্রের নরনারী আপন আপন বিশেষত্বে উজ্জ্বল। তাহাদের কাহিনী মনে আনন্দ, বেদনা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ভারতীয়দের প্রতি ব্রহ্মবাসীদের মন কেন যে এতটা বিরূপ প্রসঙ্গক্রমে সে সম্বন্ধেও লেখক আলোকপাত করিয়াছেন।

হামিদাকে বড় ভাল লাগিল। আর ভাল লাগিল বালকবেশী একটি কিশোরী বালিকাকে যাহার সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য, কিন্তু এই স্বল্পস্থায়ী পরিচয় মনে গভীর রেখাপাত করে। সীমাচলমের নারীপ্রীতির বর্ণনায় লেখকের আর একটু সংযত হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

যারা ভালবেসেছে—শ্রীইন্দিরা দেবী। পূর্ণিমা সাহিত্য মন্দির। ৪৭, হালদারপাড়া রোড, কলিকাতা—২৬। মূল্য দুই টাকা।

এই বইয়ের 'নিবেদনে' লেখিকা বলিয়াছেন "বাস্তবের পটভূমিকায় যাদের দেখা আমরা অহরহ পাই এই লেখাতে তাদেরই ছায়া, তাদেরই ছবি।...সাধারণ মানুষের ভিড় ঠেলে যারা আমার চোখে অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে তাদের কথায় সেই সব অসাধারণ সাধারণ মানুষের কথায় আমার এই রচনা মুখর।" সাধারণ মানুষকে বিপুল মর্য্যাদা দিয়া অসাধারণ করিয়া তোলে প্রেম। যাহারা ভালোবাসে প্রণয়-দেবতা তাহাদের ললাটে জয়টীকা পরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বিপুল মহিমার অধিকারী করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই অসাধারণত্ব আবিষ্কার করিবার মত অন্তর্দৃষ্টি লেখিকার আছে। তাই তো এই পুস্তকের সাধারণ নরনারীর ভালোবাসা এবং ভালোলাগার কাহিনীগুলি এমন স্নিগ্ধমাধুর্য্যে মণ্ডিত এবং সত্য ও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। কাহিনীগুলি স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে একটা অচ্ছেদ্য যোগসূত্র। একই মূল সুর প্রত্যেকটি কাহিনীর মধ্যে অনুস্যূত—তাহা এই যে, স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাসা যেমন সত্য, সেই ভালোবাসার পরিবর্ত্তনও তেমনি সত্য। সাময়িক ভাবে বিশেষ কোনও কারণে একনিষ্ঠতার অভাব যদি হয় তাহা হইলেও ভালোবাসার মূল্য বা মর্য্যাদা তাহাতে কমিয়া যায় না। মানুষের জীবনে আসে বহুবিচিত্র প্রেমের ধারা। সুরুচির প্রতি শ্যামলের প্রেমে ফাঁকি নাই, কিন্তু কি এক দুর্নিবার শক্তি প্রণতির প্রতি আকৃষ্ট করিয়া পত্নীর নিকট হইতে তাহাকে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়; প্রবীরের জন্য দীর্ঘকাল প্রতীক্ষমাণা শ্রীপর্ণা ষ্টেশনে গিয়া দেখা পায় প্রিয়তমের পাশে সীমন্তে সিন্দূরবিন্দুশোভিত তাহার নবপরিণীতা পত্নীর। পত্নীপ্রেমিক সুবীর রাণীর সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া রুগ্না স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়। লেখিকার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে একেবারে জীবন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং তাহাদের ভালবাসিবার অনন্ত শক্তি যেমন হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে তেমনি পাত্রান্তরে তাহাদের ভালবাসার পরিবর্ত্তন এবং সাময়িক নিষ্ঠার অভাবকেও স্বাভাবিক ও ক্ষমার্হ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পুস্তকের সবগুলি কাহিনীই সমান উতরায় নাই। বিশেষতঃ ষষ্ঠ কাহিনীটি হইয়াছে অত্যন্ত ওঁচা এবং সস্তাদরের, বইয়ের মূল সুরের সঙ্গে তাহার যেন তাল কাটিয়া গিয়াছে।

লেখিকার ক্ষমতা আছে, কিন্তু স্থানে স্থানে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য এবং ভাবপ্রবণতার আধিক্য রসসৃষ্টিকে ব্যাহত করিয়াছে। কিন্তু এ সকল ত্রুটি উপেক্ষণীয়। যে সকল গুণ থাকিলে রচনা সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির পর্য্যায়ভুক্ত হয় এই পুস্তকে তার অসদ্ভাব নাই।

সকল দেশের সেরা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। ইণ্টার ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড। ৩০, চৌরঙ্গী রোড। কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা চার আনা।

আমাদের দেশের কিশোর-কিশোরীদের হৃদয়ে দেশপ্রেম জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে লেখক এই বহু তথ্যসম্বলিত পুস্তকখানি লিখিয়া-

ছেন। আজ যাহারা কিশোর, বড় হইয়া ভবিষ্যতে তাহারাই দেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে। কাজেই দেশের নর-নারী, জলবায়ু এবং প্রকৃতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই পুস্তকে লেখক শুধু যে দেশের অতীত গৌরবের কাহিনী শুনাইয়াছেন তাহা নয়, গৃহশত্রুর চক্রান্তে কি ভাবে আমাদের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল, ইংরেজ-বণিকের শোষণের ফলে কেমন করিয়া এদেশবাসীর দুর্গতি চরমে পৌঁছিল, এ সকল কথা সহজ সরল ভাষায় অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও ইহাতে গল্পের মত চিত্তাকর্ষক করিয়া বলা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নাই। আমাদের দেশে যে কি পরিমাণ কাঁচা মালের ছড়াছড়ি, 'সব পেয়েছির দেশে' নামক অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। দেশে এই সমস্ত দ্রব্যের উপযুক্ত ব্যবহার হইলে আজিকার স্বাধীন ভারত যে অদূর ভবিষ্যতে 'সোনার ভারতে' পরিণত হইবে, উপরি-উক্ত অধ্যায়টি মনোযোগ দিয়া পড়িলে কিশোরদের মনে সে ধারণা বদ্ধমূল হইবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

পরম আত্মদর্শন— শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন। ভবানীপুর ৫৫, সুবরবন স্কুল রোড হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ।৵০+১২৪ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

সমালোচ্য গ্রন্থে 'আত্মার দার্শনিক তত্ত্ব' 'আত্মরমণ বা ব্রহ্মানন্দ-রস সাধন' ইত্যাদি একাদশটি প্রবন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। যে-কোন সম্প্রদায়ের প্রকৃত সাধক এই গ্রন্থ পাঠে আধ্যাত্মিক উন্নতির খোরাক যথাসম্ভব পাইবেন। গ্রন্থে সাধনসময়ের সত্যসিদ্ধান্তের সম্যক আভাস পাওয়া যায়।

জাগরণ—স্বামী অচ্যুতানন্দ। হিন্দুস্থান বুক ডিপো, ১২,বঙ্কিম চাটার্জ্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। ৮৪ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থের তিনটি ক্ষুদ্র এবং চারিটি বৃহৎ কবিতা গীতা উপনিষদের উদার ভাবে ভারতীয় যুবকযুবতীদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। 'যুবকযুবতীর প্রতি' এবং 'ভারতললনার প্রতি' কবিতাদ্বয়ে যে সব উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সেগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

দেশ-বিদেশের কথা

কালিম্পং 'ইন্‌ষ্টিটিউট অব কালচার'

শ্রীযুক্ত দাশরথি রায়ের উদ্যোগে কালিম্পঙে স্থানীয় উৎসাহী সাপ্তাহিক অধিবেশন বসে। এই সকল অধিবেশনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা প্রদান করিয়া থাকেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে এবং জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করিতেছে।

উমাশঙ্কর নন্দী

শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর নন্দী বর্ত্তমান বৎসরে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন-শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

দাতা ও বিজ্ঞাপনের এজেণ্টদের প্রতি

ƒ হইবার সাধারণ নির্দ্দিষ্ট তারিখের কিছু কিছু
খ্যা এবং ৭ই আশ্বিন, কার্ত্তিক সংখ্যা প্রকাশিত
াষ্ট গ্রহণ ও ভিঃ পিঃ সংরক্ষণাদি গ্রাহকগণ
প্রয়োজনীয় সংখ্যার টাকা পূর্ব্বোক্ত প্রকাশ-
ন। বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপনের এজেণ্টগণ
তর এবং কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য ২০—৩১শে
। ব্যবস্থা অতি অবশ্য করিবেন। ইতি—

প্রবাসীর কর্ম্মাধ্যক্ষ

প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

জেলে

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্যামদেশের একটি প্রাচীন খেমির মন্দির (লোপবুরি)

তরকারীর বাজার, সিমলা —শ্রীপরিমল গোস্বামীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৯শ ভাগ ২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৫৬ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ছাত্র-আন্দোলন ও ছাত্র-বিক্ষোভ

বাংলার রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ছাত্র-আন্দোলন আরম্ভ হয় সম্ভবতঃ ডন সোসাইটির স্থাপনার সময় বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে। তাহার পর হইতে অদ্যাবধি এই অপরিণতমস্তিষ্ক ও তরলমতি তরুণ-তরুণীর দলসমষ্টি রাষ্ট্রনৈতিক দাবাখেলার ছকে ঘুটীরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যে সকল নেতা পথপ্রদর্শক রূপে ইহাদের রাজনৈতিক আন্দোলন বা রাষ্ট্র-বিক্ষোভের মধ্যে টানিয়াছিলেন বা টানিতেছেন তাঁহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর নেতৃগণ ইহাদিগকে দলে টানিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেন ও তাহার উন্নতির চেষ্টাও যথাসাধ্য করিতেন। আন্দোলন ও বিক্ষোভের মধ্যে ছাত্রদল পড়িলে ঐ শ্রেণীর নেতৃবর্গ পুরোগামী হইয়া ঝড়ঝঞ্ঝা নিজেদের মাথায় লইয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং সুখে-দুঃখে তাহাদের কখনও ভুলিতেন না। যাদবপুর কলেজ, ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল ইত্যাদি ঐ নেতৃবর্গই সহকর্ম্মী ছাত্রগণের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া সূচনা ও স্থাপনা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতৃগণ ছাত্রবৃন্দকে "কামানের খোরাক" (cannon fodder) রূপেই ব্যবহার করিয়াছেন; আন্দোলন বা বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া ছাত্রদলকে তাহাতে জড়াইয়া সমস্ত আপদ্-বিপদ তাহাদেরই ঘাড়ে চাপাইয়া নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথমাত্র দেখিয়াছেন। ছাত্রদলকে সুশৃঙ্খলা বা সংগঠনের পথ প্রদর্শন করার বিষয় তাঁহারা চিন্তাই করেন নাই, বরঞ্চ বহু ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নামে স্বৈরাচার ও উচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টিতেই উৎসাহ দিয়াছেন; যাহার ফলে ছাত্রদল ক্রমেই বিশৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারী হইয়া দেশে অশান্তির আকর হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার ঐ দুই প্রকার নেতৃবর্গের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অধিকাংশই দেশবন্ধু দাশের পূর্ব্বযুগের লোক এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রায় সকলেই তাঁহার পরবর্ত্তীকালের লোক। দেশবন্ধু দাশ ঐ দুই যুগের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতা সৃষ্টি করেন। তিনি ফরিদপুরের সম্মেলনের পর নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহা সংশোধনের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ও চেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অকালমৃত্যুতে তাঁহাকে ছাত্রদলের সর্ব্বনাশের দ্বার খুলিয়া রাখিয়াই চলিয়া যাইতে হয়।

তাহার পর পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই পঁচিশ বৎসরে অন্ততঃপক্ষে বাংলার পঞ্চাশ হাজার যুবক ও তরুণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চণ্ডনীতির অনলে দগ্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকশত দৃঢ়চিত্ত যুবক ও কয়েকটি তরুণী জীবন-মরণ পণ করিয়া ব্রিটিশ সরকারের সহিত চরম পরীক্ষায় মৃত্যুর সম্মুখীন হয়—বলা বাহুল্য, উহাদের ঐ চরম ব্রত নেতৃহীন নিরুদ্দেশ যাত্রার মতই ছিল—কয়েকশত গান্ধীজীর অহিংসপথের পথিক হইয়া আত্মোৎসর্গ করে। আরও কিছু ছেলে জেল ও অন্তরীণ অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়ার পর পুনর্ব্বার ছাত্রজীবন ও কর্ম্মজীবনের সূত্র ধরিয়া নূতন করিয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। কিন্তু বাকী সকলের অধিকাংশই দমননীতিতে জর্জ্জরিত, হতোদ্যম ও হতাশ্বাস হইয়া, উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে জীবনযাপন করিতে থাকে। এই শ্রেণীর যুবকই রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যান্বেষীর প্রধান শিকার এবং উহাদেরই নিজেদের ক্ষমতা-লালসা'র ইন্ধনরূপে ব্যবহার করিয়া ঐ নীচ বুদ্ধিজীবিগণ ইষ্টসিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিতে থাকেন। নেতৃত্বপ্রার্থী ব্যক্তিদিগের এই হীন পন্থা অবলম্বনের ফলে বাংলার রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যুবকদিগের মধ্যে উদ্দামভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সময় থাকিতে এই অবস্থার প্রতিকারের কোনও চেষ্টা হয় নাই। এক দিকে যেমন ব্রিটিশ দমননীতি উত্তরোত্তর চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিল অন্যদিকে তেমনই ভাবপ্রবণ বাংলার জনসাধারণ ছেলেদের ভালমন্দ সকল আচরণই বিনাবিচারে সমর্থন করিয়া তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারের পথে আগাইয়া দিল। নেতৃবৃন্দ নিজের নিজের স্বার্থ পূরণ ও দলপুষ্টি করিবার জন্য ছাত্রসমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবাধ্যতার দ্বার সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া দিলেন। বাংলার যুবক উদ্দামভাবে চলার ফলে শ্রমকাতর ও কর্ম্মবিমুখ হইল এবং প্রতিপদে ভিন্ন প্রদেশের যুবকদিগের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়

হইতে থাকিল। যুগ-যুগব্যাপী স্বাধীনতার সংগ্রামে সহস্র সহস্র লোকের আত্মাহুতি ও শোণিত-তর্পণে অর্জ্জিত সম্পদ এইরূপ হঠকারিতার ফলে বাংলার যুবক খোয়াইতে বসিল।

আজ স্বাধীনতা দেশে আশার আলোক আনিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে জগতে ঘোর দুর্দ্দিন। সেই দুর্দ্দিনের ছায়া এদেশেও পড়িয়াছে ও তাহার আড়ালে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের ক্রীতদাসবর্গ বাংলার যুবকসমাজে পঞ্চমবাহিনী গঠনে ব্যস্ত রহিয়াছে। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির আশু প্রতিকার এখন অত্যন্ত প্রয়োজন। এখনও ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন অযথা বিক্ষোভ ও ষ্ট্রাইক করার বিপক্ষে। শতকরা ২০ জন অবুঝ ছাত্র কতকগুলি উমার্গগামী নিকর্ম্মা যুবক-যুবতীর প্ররোচনায় সকলকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে; বলা বাহুল্য, ইহাদের পিছনে বিদেশী শত্রুর নির্দেশ ও অর্থ-সাহায্য রহিয়াছে। বাংলার ছাত্রকে পুলিস কখনও সামলাইতে পারে নাই ও পারিবে না, সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের উচিত স্কুল ও কলেজ হইতে গুণ্ড-প্ররোচক সরাইয়া ছাত্র সংগঠনে ছাত্রদেরই সাহায্য ও উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করা।

প্রস্তাবিত যুব-কংগ্রেস

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক নিযুক্ত সাব কমিটি প্রস্তাবিত যুব-কংগ্রেসের যে গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে ছয় দফা উদ্দেশ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:

(১) সদস্যদের মধ্যে চরিত্রের বিকাশ সাধন, শৃঙ্খলাবোধ, কর্ম্মদক্ষতা, ত্যাগ এবং সেবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধিকল্পে প্রচেষ্টা।

(২) দেশের সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্যাসমূহের যথার্থ উপলব্ধির জন্ত পাঠচক্র, ক্লাস, বিতর্ক, পাঠ-শিবির এবং গবেষণাকেন্দ্র গড়িয়া তোলা।

(৩) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত যুক্ত থাকিয়া অথবা কংগ্রেস কর্ত্তৃক গঠিত বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে থাকিয়া জনসেবামূলক কার্য্য পরিচালনার জন্ত শিক্ষাদান।

(৪) যুবকগণ যাহাতে খেলাধুলা, শরীর চর্চ্চার কেন্দ্র স্থাপন এবং অন্যান্ত অনুশীলন-প্রচেষ্টার অধিক সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করা।

(৫) সাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক ও জাতিভেদ প্রথার, গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং গঠনমূলক ও সমাজ সেবামূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করা এবং

(৬) কর্ম্মিদল গঠন, শহর ও পল্লী এলাকায় ভ্রমণের ব্যবস্থা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্ত যুবজনকে উৎসাহ দান।

সাব কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ১৫ জন মনোনীত সদস্য লইয়া ভারতীয় যুব-কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠিত হইবে এবং এই ১৫ জনের মধ্যে অন্ততঃ একজন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য থাকিবেন।

প্রাদেশিক এবং জেলা সংস্থাসমূহ গঠিত হইলে উক্ত সংস্থাসমূহ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সদস্যগণ কেন্দ্রীয় বোর্ডের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বা সদস্যগণ ব্যতীত অপর সকল মনোনীত সদস্যের স্থলাভিষিক্ত হইবে।

প্রাদেশিক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্যদের লইয়া অনুরূপভাবে প্রাদেশিক বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কররাও দেও সকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিকট সার্কুলার প্রেরণ করিয়া বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছেন, এই বিষয়ে আর এতটুকু সময়ক্ষেপ করা উচিত নহে। যথাসম্ভব শীঘ্র যুব-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। একটি সুসংবদ্ধ যুব আন্দোলন কংগ্রেস তথা দেশের পক্ষে শক্তির উৎসস্বরূপ হইবে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। নৈরাশ্য এবং ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে দেশে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সমাধানেও এই আন্দোলন যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

আম্বালাতে এক ছাত্র সভায় পণ্ডিত নেহরু, ছাত্র ও ছাত্রপ্রতিষ্ঠানের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "কোন ছাত্রপ্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির মধ্যে টানিয়া আনা সঙ্গত নহে, কারণ সেক্ষেত্রে দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দল কর্ত্তৃক স্বার্থসাধনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রগণ তাহাদের রুচি অনুযায়ী যে-কোন রাজনৈতিক আদর্শবাদের উপাসক হইতে পারে। প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে আসিয়া পড়িলে ছাত্রের পক্ষে রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নকে পরিণত হইবার আশঙ্কা আছে। পণ্ডিত নেহরু ছাত্রসমাজকে আর একটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। শিক্ষার্থী ছাত্র তাহার স্কুল কলেজের জীবনেই এমন যোগ্যতা অর্জন করে না যাহার দ্বারা রাজনীতি বা সমাজের অন্য কোন ব্যাপারে তাহারা নেতৃত্ব করিতে পারে। ছাত্রজীবনে নিষ্ঠার সহিত বিদ্যাশিক্ষার পর, স্কুল-কলেজের বাহিরে আসিয়াও দেশ, জাতি ও পৃথিবী সম্বন্ধে বহু বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং আরও অধ্যয়ন ও কর্ম্মসাধনের দ্বারা জ্ঞান অর্জন করিতে হয়, তবেই নেতৃত্ব করিবার দায়িত্ব এবং যোগ্যতা লাভ করা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থী ছাত্রের জীবন প্রধানতঃ আত্মসংগঠনের জীবন, 'নেতৃত্ব' করিবার স্পৃহা তাঁহাদিগের থাকা উচিত নহে। এই বাস্তব সত্যটুকু স্মরণ রাখিয়া ছাত্রগণ যদি শিক্ষার্থীরূপে তাঁহাদের 'শিখিবার স্পৃহা' সবচেয়ে বেশী করিয়া পোষণ করেন তবেই তাঁহারা প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির অধিকারী হইতে

পারিবেন।" আমরা আশা করি, যুব-কংগ্রেস গঠনকারীগণ পণ্ডিত নেহরুর এই উক্তি স্মরণ রাখিবেন।

ভারতীয় মুদ্রামূল্য হ্রাস

ভারত গবর্মেণ্ট ১৯শে সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলেন, ষ্টার্লিং ও ভারতীয় মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে জনসাধারণের নিজেদের নিকট অথবা ব্যাঙ্কে আমানত যে অর্থ রহিয়াছে, তাহার মূল্যের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না। কোন কোন মুদ্রা-ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-মূল্যেরই ইহা দ্বারা কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র।

গবর্মেণ্ট জনসাধারণকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, যে সকল দ্রব্য বিশেষ ভাবে এখানে উৎপন্ন হয় এবং যাহার উপর জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় বিশেষভাবে নির্ভর করে, মুদ্রামূল্য হ্রাস সেই সকল দ্রব্যের মূল্যের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে না। এই বৎসরে ডলার অঞ্চল হইতে কোনরূপ খাদ্য-শস্য আমদানী হইবে না বলিয়া এই ব্যবস্থার ফলে মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না।

ভারত গবর্মেণ্ট আশা করেন, যাহাতে দেশের মঙ্গল হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহারা মুদ্রামূল্য হ্রাস সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন।

কাট্‌কা কারবারের ফলে যে মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য গবর্মেণ্ট প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন এবং করিবেন।

ইস্তাহারের পূর্ণ বিবরণ এইরূপ: ষ্টার্লিং মূল্যের সমান অনুপাতে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস করার সম্পর্কে ভারত গবর্মেণ্টের প্রস্তাব আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতীয় টাকা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ২১ সেণ্টের সমান হইবে। ইহার পূর্ব্ব মূল্য ছিল ৩০·২২৫ সেণ্ট। এই অবস্থায় এক টাকার মূল্য ·১৮৬৬২১ সেণ্ট গ্রাম স্বর্ণ মূল্যের সমান হইবে অথবা এক আউন্স স্বর্ণের মূল্য ১৬৬·৬৬৬৬ টাকা হইবে। এই মূল্য এখন হইতেই বলবৎ হইবে। ষ্টার্লিং এবং ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। টাকার মূল্য যথারীতি এক শিলিং ৬ পেন্স থাকিবে।

ডলার অঞ্চলে দেনা-পাওনা সংক্রান্ত অসুবিধার জন্য কিছু দিন হইতেই এই মূল্য হ্রাস করিবার কথা বলা হইতেছিল। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা দ্বারা ভারতের পক্ষে ডলারের অভাব সমস্যার সমাধান হইবে না বলিয়া ভারত গবর্মেণ্ট এ ব্যবস্থা সমর্থন করেন নাই। ভারতীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই মুদ্রা হ্রাসের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহা প্রয়োজনীয়ও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। ভারতের রপ্তানি সীমাবদ্ধ বলিয়া মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়া ইহা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

কিন্তু ষ্টার্লিং-এর মূল্য হ্রাস করা সম্পর্কে ইংলণ্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এবং অন্যান্য দেশ এই ব্যবস্থা অনুসরণ করায় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে, ভারতের পক্ষেও এই ব্যবস্থা অনুসরণ করাই একমাত্র পন্থা। ভারতের আমদানী রপ্তানি ব্যবসা অধিকাংশ ষ্টার্লিং অঞ্চলের সঙ্গে। সুতরাং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতের অসুবিধা না করিয়া ষ্টার্লিং-এর মূল্য অনুপাতে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য বেশী রাখা সম্ভব নয়। কারণ ইহার ফলে তথায় রপ্তানি বাজারেরও ক্ষতি হইবে, এবং আমদানীও আরও হ্রাস করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় ভারত মুদ্রাহ্রাস ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া পারিবে না। এই মনোভাবের ফলে পুরাতন বিনিময় হারে দেনা-পাওনা অসম্ভব হইয়া পড়িত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হইত। সুতরাং ভারতের পক্ষে এই ব্যবস্থা অবলম্বন ভিন্ন উপায় ছিল না।

মূল্য হ্রাসের পরিমাণ সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, ষ্টার্লিং-এর মূল্য যে হারে হ্রাস করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা কম হারে হ্রাস করিলে ভারতের সমস্যার সমাধান হইত না। ষ্টার্লিং অপেক্ষা অধিকতর মূল্য হ্রাসের কোন প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং বিশেষ বিবেচনার পর ভারত গবর্মেণ্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, দুই বৎসর পূর্ব্বে ষ্টার্লিং ও ভারতীয় মুদ্রার বর্ত্তমান হার অপরিবর্ত্তিত রাখা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, সেই অনুযায়ীই বর্ত্তমান ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

মুদ্রামূল্য হ্রাস সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ মহলের অভিমত

অদ্য কর্ত্তৃপক্ষ মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, ষ্টার্লিং ও ভারতীয় মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে ডলার অঞ্চল হইতে ভারতে মাল আমদানী বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে।

এই সূত্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, ভারতকে ডলার অঞ্চল হইতে মাল আমদানী শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। কারণ এই জাতীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং এই জাতীয় দ্রব্য আমদানীর জন্য নির্দ্দিষ্ট বরাদ্দ টাকার পরিমাণ যদি বৃদ্ধি না হয়, তবে তাহাকে আমদানী আরও হ্রাস করিতে হইতে পারে।

ডলারের মূল্য হ্রাস না পাইলে ডলার আমদানী ধীরে ধীরে কমিয়া যাইবে। উপরোক্ত সূত্র বলে ডলার মূল্য হ্রাসের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

তাঁহারা বলেন, ষ্টার্লিং-এর মূল্য হ্রাসের ফলে ডলার অঞ্চল বিশেষভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে কাঁচা মাল পাইবে এবং এই সকল হইতে প্রস্তুত দ্রব্যের উৎপাদনেও কম ব্যয় হইবে। মুদ্রামূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত দেশসমূহে এই সকল দ্রব্য আবার সস্তা দামে পাওয়া যাইবে। চড়া দামে কেনা কাঁচা মাল হইতে যে সমস্ত দ্রব্য পূর্ব্বেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরে সস্তায় যে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হইবে, তাহাদের মূল্যের সমতা হইবার পূর্ব্বে কিছু সময় অতিবাহিত হইবে।

এই মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে ষ্টার্লিং অঞ্চল হইতে ভারতে আমদানী মালের মূল্যের কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না।

এই মহল বলেন, এই মূল্য হ্রাস ভারতের বর্ত্তমান জীবিকানির্ব্বাহ ব্যয়ের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে না। কারণ ভারতের আমদানীর শতকরা ৭৫ ভাগ ষ্টার্লিং হইতে আসে এবং বর্ত্তমান ব্যবস্থার ফলে ইহার মূল্যের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না। অবশিষ্ট শতকরা ২৫ ভাগ আমদানী দ্রব্যের জন্য ভারতকে উচ্চতর মূল্য দিতে হইবে এবং কোন কোন দ্রব্যের মূল্য এই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে। ডলার অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি, ইস্পাত প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

এই মহল বলেন, খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে, ইহা সম্ভব নয়, কারণ ডলার অঞ্চল হইতে ভারতে খাদ্য আমদানী হইবে না। যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সম্পর্কে ভারত ইংলণ্ড হইতে এই সমস্ত দ্রব্য আমদানীর ব্যবস্থা করিবে এবং ইংলণ্ড হইতে এই সকল দ্রব্য পাইবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দিক হইতে ব্রিটিশ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানী সম্পর্কে বিমুখতা হ্রাস পাইবে।

সোমবার ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে পাউণ্ড ষ্টার্লিং-এর মূল্য চার ডলার তিন সেণ্টের পরিবর্ত্তে দুই ডলার আশী সেণ্ট ধার্য্য হইয়াছে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় টাকার মূল্য ২১ মার্কিণ সেণ্ট ধার্য্য হইবে। ব্রিটেনে এক মার্কিণ ডলারের দাম পাঁচ শিলিং-এর কিছু কম হইতে সাত শিলিং দুই পেন্সিতে দাঁড়াইবে।

রবিবার রাত্রে ওয়াশিংটন হইতে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস বেতারযোগে এই যুগান্তকারী ঘোষণা করেন। ১৯৩১ সালে ব্রিটেন কর্ত্তৃক স্বর্ণমান ত্যাগের পর, অর্থনৈতিক জগতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যকর ঘোষণা। ষ্টার্লিং-এর মূল্য শতকরা সাড়ে ত্রিশ ভাগ হ্রাস করার সিদ্ধান্তে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে ও টাকার বাজারে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ক্যামিল গাট ঘোষণা করেন যে, আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার পাউণ্ড ষ্টার্লিং, দক্ষিণ আফ্রিকার পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়ার পাউণ্ড, নরওয়ের ক্রোনার, ডেনমার্কের ক্রোনার এবং ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাস অনুমোদন করিয়াছেন। মঃ ক্যামিল গাট বলেন, মুদ্রার মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত যথাযথ হইয়াছে।

মুদ্রার মূল্য হ্রাসের ফলে স্বর্ণের দাম স্বতঃই বৃদ্ধি পাইবে। নিউ ইয়র্ক পৌঁছানি স্বর্ণের দাম প্রতি আউন্স ২৫০ শিলিং (ষ্টার্লিং)-এ দাঁড়াইবে। লণ্ডনের দর সম্ভবতঃ ২৪৮ শিলিং ৭ পেন্স হইবে। স্বর্ণের বর্ত্তমান দর ১৭২ শিলিং আছে।

মুদ্রামূল্য হ্রাস বিষয়ে সার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের মন্তব্য

'সাধারণের বোধগম্য' সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায় ষ্টার্লিং-এর মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস ব্রিটেনের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "বর্ত্তমান ষ্টার্লিং-ডলার সমস্যার সমাধানের অন্য কোন পথ নাই বলিয়াই আমরা এই পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের ভবিষ্যতের সুখসমৃদ্ধি এবং আর্থিক নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, ষ্টার্লিং-এর স্থায়িত্ব এবং অধিক পরিমাণে ডলার উপার্জ্জনের জন্য আমাদের ব্যাপক এবং চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। বেকারদের সংখ্যাবৃদ্ধি অথবা সমাজসেবামূলক কার্য্যাবলীর সংকোচসাধন প্রভৃতি দেশের পক্ষে অহিতকর কার্য্যে সম্মতি দিয়া, আমরা বর্ত্তমান ডলার সঙ্কট সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইতে পারি না।

আমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি তাহা যে কোন দেশের পক্ষেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের গত্যন্তর ছিল না, একথা ব্রিটেনের অধিবাসীদের স্মরণ রাখিতে হইবে।"

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস বলেন, "গত বৎসর বসন্তকালে নানারূপ গুজব প্রচারিত হয় যে, ষ্টার্লিং-এর বিনিময় হার অত্যন্ত বেশী। মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হইতে পারে এই আশঙ্কায় লোকে নানাবিধ উপায়ে পাউণ্ড ষ্টার্লিংকে ডলার এবং স্বর্ণে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করিতে থাকে। বৃটেনের মজুত ডলার এবং স্বর্ণের পরিমাণ কম থাকায়, এইরূপ লোকসান বন্ধ করার ব্যবস্থা আমাদের করিতে হইয়াছে। আসল কথা এই যে, নূতন দর এরূপভাবে বাঁধিয়া দিতে হইবে, যাহাতে দর কমিতে না পারে, অবস্থা উন্নত হইলে যে কোন সময়ে বিনিময়-হার বৃদ্ধি করা যাইবে।

"ষ্টার্লিং-এলাকার খাজাঞ্চি হিসাবে বৃটেনের দায়িত্ব খুব বেশী। কিন্তু, ইহা কেবল ষ্টার্লিং এলাকার সমস্যা নহে, ইহা সমগ্র ডলার বহির্ভূত এলাকার সমস্যা। ইহার সমাধান করিতে হইলে সকলের সহযোগিতা চাই।

"আয় ব্যয়ের সমতা আনিতে হইলে, হয় আমাদের ডলার উপার্জ্জন বৃদ্ধি করিতে হইবে, নতুবা খরচ কমাইতে হইবে।

আয় বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া খরচ কমাইবার চেষ্টা, অর্থনীতির অভিন্ন নীতি কখনই সমর্থন করা যায় না। কারণ উহার ফলে আমরা কাঁচা মাল এবং অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি হইতে বহুলাংশে বঞ্চিত হইব। আমাদের জীবন-যাত্রার মানের অবনতি ঘটিবে। ডলার এলাকা হইতে উপার্জ্জন বৃদ্ধির চেষ্টা আমাদের করিতে হইবে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ১৯৫২ সালে মার্শাল সাহায্য বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহার পূর্ব্বেই আমাদের স্বাবলম্বী হইতে

হইবে। বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানের অবনতি যদি বন্ধ করিতে হয়, ১৯৫২ সালের মধ্যে আমাদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ডলার উপার্জ্জন করিতে হইবে।" জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়া স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস বলেন, "মুদ্রার মূল্য হ্রাসের ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই অজুহাতে বেতন বৃদ্ধির দাবী করা হইতে পারে। বেতন বৃদ্ধি করা হইলে উৎপাদনের ব্যয়ও বর্দ্ধিত হইবে। তাহার ফলে মুদ্রার মূল্য হ্রাসে আমাদের মূল নীতি, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে ডলার এলাকায় পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের অবস্থা ব্যাহত হইবে। জনসাধারণকে বেতন বৃদ্ধির দাবী না করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস আরও বলেন, ডলার এলাকায় আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমরা কৃতকার্য্য হইলে, মুদ্রাস্ফীতির কারণে আমাদের দেশে দ্রব্যাদির আভ্যন্তরীণ মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। উহা বিশেষ বিপজ্জনক বলিয়া আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফল

মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফল কি হইবে তাহা এখনও কেহই নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারিতেছেন না। ব্রিটেনের এবং ভারতবর্ষের এ বিষয়ে একই অবস্থা। পণ্ডিতজী নিজেও বলিয়াছেন যে ইহার সঠিক ফলাফল বুঝিতে কিছু সময় লাগিবে।

পণ্ডিত নেহরু একটি বেতার বক্তৃতায় মুদ্রামূল্য হ্রাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাতে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় কোন বাধা আসা উচিত নয়; দ্রব্যমূল্য বাড়িবারও কোন কারণই নাই, সুতরাং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াও উচিত নয়। ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য কমিয়াছে বটে, কিন্তু দেশের ভিতরের কেনা-বেচায় টাকার দরের কোনরূপ তারতম্য হইবে না। পণ্ডিতজী বিশেষ জোরের সঙ্গে এই কথা বলেন যে, আমাদের জীবনযাত্রার জন্ম প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য আর বাড়িলে তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না। মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা কেহ করিলে গবর্ণমেণ্টকে তাহা নিবারণ করিতেই হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের উপায়ের উন্নতি বিধান করিয়া মূল্য-মান কমাইবার জন্ম গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিতে থাকিবেন।

পণ্ডিতজী বলেন যে টাকার মূল্য হ্রাস ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ ভাবে নিজের ইচ্ছাতেই করিয়াছে। ব্রিটেনের পাউণ্ডের দাম কমাইয়া দেওয়াতেই এই মূল্য হ্রাসের প্রশ্ন উঠে। এই মূল্য হ্রাসের ফলে আমাদের সাময়িক একটু সুবিধা হইবে মাত্র, স্থায়ী সুবিধার জন্ম আমাদের অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—ইহা লইয়া আমাদের উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই। টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে সমাজ-বিরোধী কার্য্যকলাপ যদি দেখা দেয় তবে আমাদিগকে তাহা নিবারণ করিবার জন্ম কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের পক্ষে যুক্তি এই যে এতদিন বাজারে টাকার বড় টানাটানি গিয়াছে। ব্যাঙ্কের সুদের যে সরকারী দর ঘোষণা করা হয় বাজারে সেই সুদে টাকা পাওয়া যায় না, তার চেয়ে অনেক বেশী সুদে শিল্প বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় ঋণ সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে যত বার ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন, সরকারী ঋণের সুদ কম বলিয়া সেই চেষ্টা সফল হয় নাই; যাহাদের হাতে টাকা আছে তাহারা এত কম সুদে ধার দিতে অনিচ্ছুক বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ঋণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাগুলিও অতি দ্রুত খরচ হইয়া যাইতেছে। বৈদেশিক বাণিজ্যেও আমাদের পাওনার পরিবর্ত্তে মোটা দেনা দাঁড়াইয়া যাইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক দেনা পাওনায় আমাদের কিছুতেই সুবিধা হইতেছে না। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে আমাদের ষ্টার্লিং ব্যালান্স উঠিয়া শূন্যে মিলিয়া যাইতে বেশী সময় লাগিবে না। এই অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় মুদ্রামূল্য হ্রাস। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর যে সব সুবিধা হইয়াছিল তাহার অভিজ্ঞতা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। ১৯৩২-৩৩ সালে কারেন্সি কণ্ট্রোলারের রিপোর্টে দেখা যায় যে মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে ব্যাঙ্কের জমা টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, টাকা সস্তা হইয়াছিল এবং গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির দাম বাড়িয়াছিল। মুদ্রামূল্য হ্রাসের যাঁহারা সপক্ষে তাঁহারা আশা করিতেছেন যে এবারও এইরূপই আমাদের টাকার বাজারের অবস্থা ভাল হইবে। এখন টাকার দরে প্রভেদ হইবে। ষ্টার্লিং ব্যালান্স কমা বন্ধ হইয়া উহা আবার বাড়িতে আরম্ভ করিবে। ষ্টার্লিং ব্যালান্স বাড়িলে নোট প্রচার বাড়িবে। নোট বাড়িলে টাকা সস্তা হইবে, অল্প সুদে টাকা পাওয়া যাইবে। টাকা সস্তা হইলে নূতন নূতন কোম্পানী গঠিত হইবে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে আমদানী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের ফলে নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিবে। ইহাতে বহির্বাণিজ্যেরও উন্নতি হইবে। এই ভাবে মুদ্রামূল্য হ্রাস আমাদের ক্ষতির কারণ না হইয়া মঙ্গলেরই আকর হইয়া উঠিবে।

অপর পক্ষে আর একদল মুদ্রামূল্য হ্রাস আমাদের দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অশোক মেটা বলেন, মুদ্রামূল্য হ্রাস ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে আমাদের দেশকে বাঁধিয়া দেওয়ার অর্থনৈতিক পরিণাম। ইহাতে দেশের সাধারণ লোকের ক্ষতি হইবে কারণ মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবে, কাজেই জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। ডলার অঞ্চল হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী বন্ধ হওয়ায় আমাদের শিল্প-প্রসার ব্যাহত হইবে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের দাম বাড়িবে। খাদ্য আমদানী যদি এই ভাবে চলিতে থাকে তবে তার দামও বেশী পড়িবে

এবং খাদ্যের দামও বাড়িবে। পাকিস্থান মুদ্রামূল্য হ্রাস না করিলে আমাদের চটকল অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। পাকিস্থানের টাকার দর বেশী থাকিলে পাকিস্থানের সহিত বাণিজ্যে ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কারণ পাকিস্থানী দ্রব্যের দাম আমাদের দেশে বাড়িয়া যাইবে। পাকিস্থান হইতে আমরা তুলা, পাট ও গম আমদানী করি বলিয়া আমাদের অনেক ক্ষতি হইবে। কিন্তু পাটের দাম বাড়িলে তার চাপ আমাদের উপর এত বেশী পড়িবে যে তাহা আমাদের পক্ষে সামলানোই কঠিন হইবে। বাংলার অবস্থা হইবে সবচেয়ে সঙ্গীন। আমাদের কাপড়ের মিলের অবস্থা সামান্ত ভাল হইতে পারে, কারণ বিদেশে কিছু বেশী কাপড় বিক্রয়ের আশা আছে। তবে এই প্রতিযোগিতা হইবে জাপানী কাপড়ের সঙ্গে, বিলাতী কাপড়ের সঙ্গে নয়।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক মিঃ সি. এন. ভকীল বলেন, আমাদের যন্ত্রপাতি এবং খাদ্যের জন্ত আমেরিকার উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রভাব আমাদের আভ্যন্তরীণ মূল্যের উপরেও আসিয়া পড়িবে। আমাদের জিনিষের দাম আমেরিকার বাজারে সস্তা হইবে এটা ঠিক, কিন্তু আমাদের তাহাতে কতটা লাভ হইবে, কত মাল আমরা বেচিতে পারিব তাহার স্থিরতা নাই। ষ্টার্লিং ব্যালান্সের মূল্য ডলারের হিসাবে শতকরা ৩০ ভাগ কমিয়া গেল, উহা দ্বারা আমরা যে পরিমাণ ডলার কিনিতে পারিতাম এখন তার চেয়ে কম পাইব। আমাদের দেশের জিনিষপত্রের দাম বিলাতী এবং আমেরিকান জিনিষের চেয়ে বেশী। এই অবস্থায় অনায়াসে আমরা টাকার দর বাড়াইয়া জিনিষের দর কমাইবার কথা বলিতে পারিতাম। ইহা সম্ভব না হইলে অন্ততঃ মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়া মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি করা আমাদের পক্ষে উচিত কাজ হয় নাই। ইহা দ্বারা আমরা ডলারের অভাব ঘুচাইতে পারিব কিনা সন্দেহ। ভারতে ডলার আমদানী এবং আমেরিকান কোম্পানী স্থাপনের যে আলাপ চলিতেছে তাহার জন্ত এতখানি ত্যাগস্বীকারের কোন প্রয়োজন ছিল না।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারী বলেন, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই অত্যধিক মুদ্রামূল্য হ্রাসের পক্ষে কোন যুক্তি নাই। দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়া দাম বাড়িবে। মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিবার ক্ষমতা ভারত-সরকারের আছে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সাময়িক সামান্ত লাভ ইহাতে হয়ত হইতে পারে কিন্তু আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় যে বিরাট ক্ষতি হইবে তাহার তুলনায় লাভ যাহা হইবে তাহা নগণ্য।

মুদ্রামূল্য হ্রাস বিষয়ে পাকিস্থানের সিদ্ধান্ত

পাকিস্থান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের অনুপাতে পাকিস্থানের টাকার মূল্য হ্রাস করিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য রাত্রে পাকিস্থান মন্ত্রিসভার পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী অধিবেশনের পর উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এতৎসম্পর্কে বর্ত্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণরত পাকিস্থানের অর্থসচিব জনাব গোলাম মহম্মদের সহিত আলাপ-আলোচনা করা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। মন্ত্রিসভার অধিবেশনে 'পাকিস্থান ষ্টেট ব্যাঙ্কের' গবর্ণর এবং পাকিস্থান সরকারের জেনারেল সেক্রেটারী উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্থানের এই সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের পক্ষে আপাততঃ অতিশয় ক্ষতিকর হইবে। শ্রীযুক্ত অশোক মেটা ও শ্রীযুক্ত ভকীল যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই দেখা দিয়াছে। আপাততঃ পাকিস্থান তুলা ও পাট বেচিয়া আমাদের নিকট হইতে বেশী দাম আদায়ের চেষ্টা করিবে। শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্থান মুদ্রামূল্য হ্রাস না করিয়া পারিবে কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। পাকিস্থানের সবচেয়ে বেশী বাণিজ্য ভারতবর্ষের সঙ্গে। ভারতবর্ষ তাহাকে পাল্টা জব্দ করিবার চেষ্টা করিলে পাকিস্থানের পক্ষে সামলানো কঠিন হইবে সন্দেহ নাই। চটকলগুলি এখনই পাকিস্থানের পাটের অন্যায় মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে মাসে এক সপ্তাহ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইতেছে এবং ইহাতে পাটের দর অনেক কমিয়াছে। পাকিস্থানের হাতে বহু পাট জমা পড়িয়া আছে। ডাণ্ডী এবং কলিকাতা পাট কম করিয়া কিনিলে পাকিস্থানের অতি লাভের স্বপ্ন হাওয়ায় মিলাইয়া যাইবে। পাকিস্থান মুদ্রামূল্য হ্রাস না করায় ডাণ্ডীকেও পাটের দাম বেশী দিতে হইবে, ইহাতে স্কটল্যাণ্ডের চটকলেরও প্রভূত ক্ষতি হইবে। সুতরাং তাহাদের পক্ষেও কলিকাতার পথ ধরা ব্যতীত গত্যন্তর থাকিবে না। পাটের দাম মুদ্রামূল্য হ্রাস না হওয়ায় টাকায় পাঁচ আনা বাড়িয়া যাইবে, ইহাতে উৎপাদন ব্যয় যাহা পড়িবে তাহার ফলে চট ও থলিয়া এত দুর্মূল্য হইয়া পড়িবে যে, আমেরিকাও উহা কিনিতে চাহিবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং এ বিষয়ে প্রথম হইতেই কঠোরতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। তুলার দামও এইভাবে টাকায় পাঁচ আনা বাড়িয়া যাওয়ায় ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির বিদেশে কাপড় বেচিয়া লাভ করিবার যেটুকু আশা ছিল তাহাও শেষ হইয়া গেল। ভারত সরকারের অতঃপর মিশর, পূর্ব্ব-আফ্রিকা প্রভৃতি ষ্টার্লিং এলাকা হইতে তুলা ক্রয়ের চেষ্টা করা আবশ্যক।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রধান কুফল মূল্যবৃদ্ধি আমাদের দেশে দেখা দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিবে বেশী ব্যবসায়ী ও মিল-মালিকদের সততা এবং অসাধু ব্যবসায়ী প্রভৃতির অতিলাভ দমনে গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার উপর। পাকিস্থানের সিদ্ধান্ত ইহার উপর একটা অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি করিয়া দিল; ইহা সরল করিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেও দেশবাসী তাহা সমর্থন করিবে।

পশ্চিমবঙ্গে সামরিক বৃত্তি

"সামরিক শিক্ষালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ভর্ত্তি হইবার জন্ত বাংলার যুবকদের নিকট যে আহ্বান জানান হইয়াছে, তাহাতে যুবসমাজ বিশেষ সাড়া দেয় নাই। যাহারা ভর্ত্তি হইবার জন্ত এ পর্য্যন্ত আবেদন করিয়াছে তাহাদের যোগ্যতার মান খুব নীচু।

সামরিক শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উৎসাহ দিবার জন্ত এবং সকল প্রকার তথ্য সরবরাহ করিবার নিমিত্ত এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে—সামরিক অফিসারগণ বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ পরিদর্শন করিবেন এবং কলেজের অধ্যক্ষ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, অভিভাবক এবং ভারতের সশস্ত্র বাহিনীতে লোক-সংগ্রহের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের সভায় বক্তৃতা দিবেন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই সামরিক অফিসাররা সফর আরম্ভ করিবেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ পশ্চিমবঙ্গের দেশরক্ষা সমন্বয়সাধক অফিসারের নিকট আবেদন করিলে সামরিক শিক্ষালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পাঠ্য তালিকার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। যাহারা প্রার্থী হইতে ইচ্ছুক তাহাদের নিকট নিম্নলিখিত বিবরণগুলি প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে—সেনা বিভাগ, নৌ-বিভাগ ও বিমান বিভাগের প্রার্থীরা দুই বৎসর পর্য্যন্ত ইণ্টার সার্ভিসেস্ উইং-এ যৌথভাবে প্রাক্-কমিশনে শিক্ষালাভ করিবে। সামরিক শিক্ষালয়ে সামরিক শিক্ষা ব্যতীত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্ত নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য তালিকার সমুদয় পুস্তকও পড়ান হইবে। ঐ শিক্ষালয়ে ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, পৌর বিজ্ঞান, ভূগোল, আধুনিক ভাষা প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং যন্ত্র চালনা শিক্ষা, রণক্ষেত্রের ক্রিয়াকৌশল শিক্ষা, মানচিত্র দেখা এবং নৌ-বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই শিক্ষাদানের সময় গবর্ণমেণ্ট পাঠের ব্যয়, থাকা ও খাওয়ার ব্যয় বহন করিবেন। প্রার্থীদের হয়ত মাসে আনুমানিক ৩৫৲ টাকা হাতখরচ লাগিতে পারে। দুই বৎসর শিক্ষালাভের পর কৃতী প্রার্থীদের যে বিষয়ের জন্ত নির্ব্বাচিত করা হইবে তাহার জন্ত বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। সেনাবিভাগের শিক্ষার্থীরা সামরিক বিভাগে চলিয়া যাইবে এবং নৌ ও বিমান বিভাগের শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বিভাগের শিক্ষার জন্ত স্ব স্ব বিভাগে যাইবে।

প্রত্যেক বৎসরে দুইটি ট্রেনিং কোর্স আছে। একটি জানুয়ারী মাসে ও অপরটি জুলাই মাসে। প্রত্যেকটি কোর্সের জন্ত আনুমানিক দুই শতটি পদ শূন্য আছে। ইণ্টার সার্ভিসেস্ উইং-এ ভর্ত্তি হইতে হইলে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত একটি পরীক্ষা দিতে হয়। কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের লিখিত পরীক্ষায় যাহারা কৃতকার্য্য হইবে তাহাদের সার্ভিসেস্ সিলেকশন বোর্ডের নিকট হাজির হইতে হইবে। ঐ বোর্ড সামরিক শিক্ষালয়ে গ্রহণের জন্ত প্রার্থী মনোনয়নের চূড়ান্ত সুপারিশ করিবে।

প্রাথমিক পরীক্ষা যাহারা দিবে শিক্ষার কোর্স আরম্ভ হইবার মাসের প্রথম তারিখে অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী এবং ১লা জুলাই তারিখে তাহাদের বয়স ১৫ বৎসরের কম অথবা ১৭ বৎসরের বেশী হইলে চলিবে না। সর্ব্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা হইতেছে ম্যাট্রিকুলেশন পাস অথবা অনুরূপ কোন পরীক্ষায় পাস।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপরে উদ্ধৃত বিবৃতিটি প্রকাশিত করিয়াছেন। এই বিবৃতির প্রথম অংশ পাঠ করিয়া আমরা লজ্জিত হইয়াছি; বাঙালী যুবকদের ততোধিক লজ্জিত হওয়া উচিত। তাহাদের পক্ষ হইয়া ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হইত যে ইংরেজের ভেদনীতির ফলে বাঙালী-যুবক সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে না। আজ সেই বাধা সরিয়া গিয়াছে; সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করিবার জন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আহ্বান আসিয়াছে। কিন্তু এই আহ্বানে বাঙালী "যুব সমাজ বিশেষ সাড়া দেয় নাই।" কেন? ইহার উত্তর পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বাঙালী সমাজকেও এই কর্ত্তব্য-চ্যুতির কারণ সম্বন্ধে নীরব থাকিলে চলিবে না। যদি যুব-সমাজ এইভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রের সেবায় পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে, তবে সমাজ ধ্বংসের পথে যাইবে এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যদি এই বিষয়ে তৎপর না হন, তবে বাঙালী সমাজের বাঁচিবার অধিকার নষ্ট হইয়া যাইবে।

পশ্চিমবঙ্গে সেচকার্য্যের প্রসার

পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার বলিয়াছেন যে, প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাল-বিল-নদী বুজিয়া গিয়াছে, কৃষির উন্নতির জন্ত বদ্ধ জল-প্রবাহকে পুনরায় প্রবহমাণ করিবার পরিকল্পনা মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে স্থানীয় লোকের সাহায্য পাওয়া যাইবে; বাহির হইতে লোক আমদানী করিলে যে অত্যধিক ব্যয় হয় তাহা নিবারিত হইবে এবং আপাততঃ দামোদর বাঁধ ও ময়ূরাক্ষী বাঁধ প্রভৃতি বিরাট বিরাট পরিকল্পনার ভাবনায় অস্থির হইতে হইবে না। পশ্চিমবঙ্গের মত ক্ষয়িষ্ণু প্রদেশের পক্ষে ইহা কম আশার কথা নয়। এইরূপ স্থানীয় উন্নতির পরিপোষক রূপে আমরা স্থানীয় সংবাদপত্রের সাহায্যে প্রদেশের নানা খাল বিল নদীর দুরবস্থার সন্ধান দিতেছি। বর্ত্তমান মাসে "সত্যাগ্রহ

পত্রিকা"র ২৬শে ভাদ্র তারিখের সংখ্যা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণটি উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-মন্ত্রী ও সেচমন্ত্রী এই বিষয়ে তৎপর হইবেন—

কলিকাতা হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে বর্তিবিল প্রায় পঁচাত্তর বর্গমাইল লইয়া বিস্তৃত। এই বিলের অধিকাংশ ব্যারাকপুর মহকুমায় ও অবশিষ্টাংশ বারাসত মহকুমায় অবস্থিত। ইছামতী খাল, সুবর্ণবতী বা সোনাই নদী এবং লাবণ্যবতী বা নোয়াই খালের দ্বারা ইহার জল নির্গত হইত। ইছামতী খাল ঐ বিলের জল বহিয়া লইয়া আসিয়া গঙ্গায় ঢালিত, কিন্তু এই খালকে ইহার পতন স্থানে উভয় পার্শ্বের ফ্যাক্টরী ও মিলের দ্বারা সরু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুবর্ণবতী ও লাবণ্যবতী এই বিলের জলকে বিদ্যাধরীতে ফেলিত। সুবর্ণবতী মজিয়া গিয়া জলের অভাবে তটবর্তী গৃহস্থের ছোট ছোট ডোবায় পরিণত হইয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তির জল সেই দিক দিয়া খুব কমই যায়। অথচ এই নদীই বর্তির জল লইয়া যাওয়ার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পথ ছিল। লাবণ্যবতীকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করিয়া একটি ক্যানেলে পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার নীচের দিকে কচুরীপানাতে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া এই খাল দিয়া বর্তির জল কখনও বেশী বাহির হইত না, এই কথা স্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকেই বলেন। বর্তির বিলকে উদ্ধার করিলে লক্ষ লক্ষ টাকার খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হইতে পারে। এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বিঘার জমিতে নয় লক্ষ মণ ফসল হয়। ইহা ছাড়া নানা প্রকারের রবি ফসল এবং মাছও হইতে পারে।

বৃহত্তর কলিকাতার সেচ ও জলনিকাশ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার দেরী থাকিলে অল্প-স্বল্প টাকা খরচ করিয়া ইছামতী পরিষ্কার, মোটিশ দিয়া সুবর্ণবতীর পুনরুদ্ধার ও সংস্কার করা এবং লাবণ্যবতীর নীচের দিক সাফ করিয়া দেওয়া কঠিন নয়। ব্যারাকপুর মহকুমার সমবায় সমিতিগুলির প্রতিনিধিবর্গের একটি কমিটিকে এই ভার দিলে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। তাহাতে তাঁহারা জনগণের ও তাঁহাদের নিজেদের অভীপ্সিত কর্ম্ম পাইবেন। শ্রমিক তাঁহারাই খুঁজিয়া বাহির করিবেন এবং সত্যকার একটি কর্ম্ম করিলেন বলিয়া মনে অসীম সন্তোষ পাইবেন।

শুধু বর্তির বিল নয়, ব্যারাকপুর মহকুমায় আরও অনেকগুলি ছোট ছোট বিল বা জলাভূমি আছে। সেই সমস্ত স্থানের জনগণ ও কর্ম্মিবৃন্দ ঐগুলির উদ্ধার করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। সরকার ও কংগ্রেসকর্ম্মিগণ এই ব্যগ্রতাকে যদি ঐ কাজে অতি সত্বর লাগাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতের বহু বিপদ হইতে যে তাঁহারা মুক্ত হইবেন, তাহা নহে, দেশের খাদ্য উৎপাদন ও ধন-বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করা হইবে।

এই সম্পর্কে সাধারণেরও চেতনা হওয়া উচিত। জনগণ ও কর্ম্মিবৃন্দ যদি সত্য সত্যই ব্যগ্র ও চেষ্টিত থাকেন তবে এ সকল কার্য্য অবিলম্বে হইয়া যায়। ইহা ভিন্ন প্রদেশে যথা—উড়িষ্যা ও যুক্ত প্রদেশে—নিত্যই হইতেছে আমরা দেখিতেছি এবং ঐ কারণে যুক্ত প্রদেশের চাষী ও কর্ম্মীদল বিশেষ লাভবান হইয়াছে। বাংলায় দুই-তিন স্থলে ঐরূপ চেষ্টার কথা শুনিয়া আমরা সরকারী বিভাগকে বিশেষ চাপ দেওয়ায় তাঁহারা টাকার ব্যবস্থা করেন কিন্তু পরে দেখা গেল যে কার্য্যোদ্ধার অপেক্ষা বিনাশ্রমে সরকারী টাকার অপচয়েই স্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তাদিগের উৎসাহ অনেক বেশী, সুতরাং টাকার অপচয় বেশ কিছু হইল, সাধারণের উপকার কিছুই হইল না। ঐরূপ ঘটনা নিতান্ত লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য-বিভাগ

"যুগবাণী" পত্রিকার ১৭ই ভাদ্র তারিখের সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিবরণ ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কর্ম্মচারী শ্রেণীর দুর্নীতি ও অক্ষমতা চলিতে দিলে কোন রাষ্ট্রই টিকিয়া থাকিতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রনায়কগণ ইহা দমন করিতে পারিতেছেন না কেন, সে-রহস্য কে উদ্‌ঘাটন করিবে?—

বাংলা-সরকারের একটা ফিশারি এডভাইসরি বোর্ড আছে। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাইটার্স-বিল্ডিংস্‌-এ মৎস্য-মন্ত্রী শ্রীহেম নস্করের ঘরে ঐ বোর্ডের একটি সভা হয়। স্বয়ং মন্ত্রী মহাশয়, সেক্রেটারী শ্রীসুশীল দে, ফিশারি ডিরেক্টর, সহকারী ফিশারি ডিরেক্টর শ্রীকালী সাহা, ফিশারি বিভাগের এডিশনাল ডেপুটি সেক্রেটারী প্রভৃতি সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাগণ এবং ডাঃ বীরেশ গুহ, শ্রীকুবেরচন্দ্র হালদার, এম-এল-এ, প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। উপরোক্ত পরিকল্পনাটি বুঝাইয়া দিয়া ডাঃ কালী সাহা বলেন যে ন্যায়সঙ্গত বিতরণ ও দুর্নীতি নিবারণের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। শ্রীকুবেরচন্দ্র হালদার কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, যে সব ডিষ্ট্রিবিউশন-কমিটির মারফত সুতা, নৌকা প্রভৃতি বিলি করার কথা তিনি তার একটির সদস্য এবং তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, জিনিষপত্র বিলি-ব্যবস্থার সময় তাঁহাদের প্রায়ই কিছু জানিতে দেওয়া হয় না। এসিষ্ট্যান্ট ফিশারি অফিসার বিলি করেন এবং সংশ্লিষ্ট লোকদের নিকট হইতে ঘুষ লইয়া ইহা করেন।...

কৃষি-বিভাগ, মৎস্য-বিভাগ এবং সেচ-বিভাগে করদাতাদের বহু টাকা অবিবেচনা এবং অসাবধানতার জন্য নষ্ট হইতেছে ইহার অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উপরওয়ালারা অসাবধান বা অদূরদর্শী হইলে দুর্নীতিপরায়ণ

অসৎ কর্মচারীরা তাহার সুযোগ লইবেই। শ্রীভূপেন্দ্র-চন্দ্র হালদার যে অভিযোগ করিয়াছিলেন মন্ত্রী মহাশয় এবং বিভাগীয় সেক্রেটারী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উঁহার তদন্ত করিয়া সত্য নির্ণয়ে অগ্রসর হইলে লোকেও সন্তুষ্ট হইত, অসাধু কর্মচারীও ভয় পাইত। তাহা না করিয়া তাঁহারা দু'জনেই এমন ভাবে উত্তর দিলেন যাহা উহারা তাঁহাদের দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করিবে এবং উহার ফলে পরোক্ষ সমর্থন পাইবে। যেখানে ডিষ্ট্রিবিউশন কমিটি গঠিত হইয়াছে সেখানে কমিটির ভিতর দিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে বিলিব্যবস্থাগুলি হওয়া উচিত, সমবায় সমিতি মারফতেও ইহা হইতে পারিত। তাহাতে সকলে সাহায্যের দরখাস্ত করিবারও সুযোগ পাইত এবং সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ্যে নৌকা ও জাল দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় কাহারও ন্যায়সঙ্গত আপত্তি করিবার কারণ থাকিত না। তাহা না করিয়া একজন বিশেষ গবর্মেণ্ট অফিসারের হাতে টাকা দেওয়ার দায়িত্ব দিলে অসাধুতার সুযোগ ঘটিবেই এবং গবর্মেণ্টেরও বদনাম হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য-বিভাগের একজন বিশিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে পরামর্শ-সমিতির একজন সভ্য একটি গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। এই অভিযোগ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা সকলেই প্রতীক্ষা করিবে।

"যুগবাণী" পত্রিকার এই প্রবন্ধে একটি হিসাব দেখিলাম। তাহার মধ্যে সরকারী তত্ত্বাবধানে ৬০০ খানি নৌকা প্রস্তুতের আয়োজন দেখিলাম; প্রতি নৌকার ব্যয় ধরা হইয়াছে ৫০০৲ টাকা হারে। মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্বের আমলে খাজা সাহাবুদ্দিনের কর্তৃত্বাধীনে নৌকা নির্ম্মাণের জন্য যে প্রচণ্ড অপব্যয় হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি কি ইতিমধ্যেই বিলীন হইয়া গিয়াছে? সেই যুগের নৌকা-নির্ম্মাণ-বিশারদগণের খোঁজ নিলে অনেককেই দেখা যাইবে যে শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের বিভাগের বিস্তৃত পক্ষ-পুটের ছায়ায় তাঁহারা বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা ত সহজে ব্যবসা (occupation) ছাড়িবার লোক নন।

পশ্চিমবঙ্গে জন-শিক্ষা

গত ২০শে ভাদ্র কলিকাতার রোটারি ক্লাবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-বিভাগীয় ডিরেক্টর শ্রীস্নেহময় দত্ত এক বক্তৃতা উপলক্ষে আমাদের ভরসা দিয়াছেন যে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৫০ জন লিখন-পঠনক্ষম হইবে। এই বিষয়ে গত ১৫ই আগষ্ট হইতে "প্রাপ্ত বয়স্কদের সামাজিক শিক্ষা" বিষয়ে যে প্রচেষ্টার আরম্ভ হইয়াছে তাহার সফলতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই তিনি এই আশার কথা শুনাইতে পারিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের নির্দ্দেশানুসারে এই শিক্ষার গতি ও পরিণতি অনেকটা স্থির করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ডাঃ দত্ত এই সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন কিনা জানি না। দৈনিক সংবাদপত্রে তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন উল্লেখ দেখিলাম না। বক্তৃতার মুখবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"আমাদের দেশের সামাজিক শিক্ষা আধুনিক জগতের প্রগতিশীল দেশসমূহের শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে পৃথক হইবে।" অন্যান্য দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আছে, আমাদের দেশে তাহা নাই, এইজন্য আমাদের শিক্ষাসমস্যা আরও ব্যাপক ও গুরুতর। ইহার প্রকৃতি বুঝাইতে গিয়া বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে ডাঃ দত্ত বলিয়াছেন :

> ভারতবর্ষে প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাদান তিনটি পর্য্যায়ের হইবে; প্রথমতঃ জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা এবং এই সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ও বাস্তব প্রাথমিক জ্ঞান দান করা; দ্বিতীয়তঃ আমাদের চিরাচরিত ব্যবস্থা, যথা—যাত্রা, কথকতা, কবিগান প্রভৃতির মারফত তথ্য-বহুল সাংস্কৃতিক শিক্ষাদান; তৃতীয়তঃ যাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইবে তাহাদিগকে আর অজ্ঞানান্ধকারে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

এই সামাজিক শিক্ষা প্রদানের জন্য কি উদ্যোগ-আয়োজন করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন :

> আমরা বিভিন্ন জেলায় প্রথম ৫ শত কেন্দ্র মনোনীত করিয়াছি। আমাদের পরিকল্পনানুসারে প্রতি বৎসর কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ান হইবে। তবে ইহা সম্পূর্ণ কেন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্যের উপর নির্ভর করে।
>
> যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষয়িত্রীর অভাব হেতু সরকার মহিলাদের জন্য ২৫টির বেশী কেন্দ্র খুলিতে সক্ষম হন নাই।

এই দুইটি উক্তির মধ্যে শেষোক্তটি সম্বন্ধে আমরা বলিতে চাই যে, ডাঃ দত্ত তাঁহার অসাফল্যের কারণ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করেন নাই। এই প্রদেশের বয়স্কা মহিলাবৃন্দের মধ্যে "সামাজিক শিক্ষা" বিস্তারের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১০০ জন শিক্ষয়িত্রীকে একত্র করা হয়; হেষ্টিংস হাউসে তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়; প্রায় দুই মাস এই শিক্ষাকার্য্য চলে। তার পর যে কি হইল তাহাই ডাঃ দত্ত চাপিয়া গিয়াছেন।

আমরা শুনিয়াছি যে বয়স্ক শিক্ষা কমিটি এই সম্বন্ধে যে-সব প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা নিজেদের খেয়াল মত উল্টাইয়া দিয়া ডাঃ দত্তের বিভাগ এমন এক বিরোধী ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন যে, স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থাটা বানচাল হইতে চলিয়াছে। এই বিষয়ে আমাদের পত্রিকায় অনেক সমালোচনা হইয়াছে; ডাঃ দত্ত তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। এখন নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিতেছেন। যে ১০০ জন

শিক্ষয়িত্রীকে বয়স্কা স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন সেই "যোগ্যতাসম্পন্না" শিক্ষয়িত্রীদের যোগ্যতার সদ্ব্যবহার করা হইল না কেন, সেই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর ডাঃ দত্তের উক্তির মধ্যে নাই।

তারপর ৫০০ শত কেন্দ্রের কথা। এইগুলির সহায়তায় দুই-তিন হাজার বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষকে "সামাজিক শিক্ষা" দেওয়া যাইতে পারে। আর পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ শিক্ষার উপযোগী লোকের সংখ্যা প্রায় ৯০ লক্ষ। সুতরাং কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। কিন্তু তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-বিভাগকে "কেন্দ্রীয়" সাহায্যের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে। সেই সম্বন্ধে কি প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে তাহা বলিলে ডাঃ দত্তের ভরসার উপর গুরুত্ব প্রদান করিতাম। সংবাদপত্রে দেখিলাম যে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট বলিয়াছেন যে শতকরা ২০ ভাগ খরচ কমাইতে হইবে। অনেক বড় বড় পরিকল্পনার উপর এইরূপে কুঠারাঘাত হইবে। বয়স্ক-শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা যে তার মধ্যে পড়িবে না তৎসম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই।

আর একটা কথা, ডাঃ দত্তের বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের গবর্মেণ্ট হইতে কি সাহায্য পাইবেন, তাহা প্রদেশবাসীকে বলেন নাই। শুনিয়াছি আড়াই লক্ষ টাকা নিজেদের আয়োজন উদ্যোগেই ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন; কলিকাতায় নূতন আফিস ও অফিসার, আট নয়টি জেলায় নূতন অফিস ও অফিসার নিযুক্ত করিয়া ভাণ্ডার খালি করিয়া ফেলিয়াছেন। অথচ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে এই আড়াই লক্ষ টাকা তুলিয়া দিলে চার-পাঁচ গুণ কাজ বেশী হইত। বয়স্ক শিক্ষা কমিটিতে এরূপ বেসরকারী স্বায়ত্ত-শাসিত (autonomus) প্রতিষ্ঠানের কথা উঠিয়াছিল; তাহাতে কর্ণপাত করা হয় নাই। এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলেও সরকারী বিভাগের হাতে তাহা পড়িলে শিব গড়িবার চেষ্টায় বানর গড়া হইত কিনা সেই বিষয়ে স্থির করিয়া কিছু বলা যায় না।

এই ত গেল বয়স্ক শিক্ষার কথা। এখন প্রাথমিক শিক্ষার কথা কিছু বলিতে হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রচার বিভাগের উদ্যোগে গত ২৪শে ভাদ্র হইতে একটি বুনিয়াদি শিক্ষা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। এই উপলক্ষে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ভরসার কথা নাই। তিক্ত ঔষধ খাইতে হইলে লোকের মন যেরূপ বিরক্ত হইয়া যায় সেইরূপ মনই হরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। "বুনিয়াদি শিক্ষা"-ব্রতে উৎসর্গীকৃত কর্মী শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া হরেন্দ্রবাবু কয়েকবার বলেন, "বিজয়বাবু বলিয়াছেন যে কুড়ি বৎসরে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ বিস্তার হইতে পারে। এই কথা ত খুব আনন্দের কথা, ভরসার কথা।...বিলাতে প্রায় ৭০ বৎসর লাগিয়াছিল প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।" এই বক্তৃতা শুনিয়া মনে হয় যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর নয়, বিজয় বাবুর মতন লোকের!

বয়স্ক শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের উপর ভরসা রাখিয়া নিশ্চিন্ত। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় "বুনিয়াদি শিক্ষা"-ব্রতীদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন। সেই বিভাগেরই একজন সেক্রেটারী "বুনিয়াদি শিক্ষা শিক্ষণ" কেন্দ্রে বক্তৃতা দেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যের সপক্ষে! এই অভিজ্ঞতার পর পশ্চিমবঙ্গে জনশিক্ষার ভবিষ্যৎ কি হইবে, তৎসম্বন্ধে তর্কের অবকাশ আছে কি?

বাস্তুহারার সাহায্য-বিধান

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গত ২৩শে জুন ইউরোপখণ্ডে যাত্রা করেন নিজের চক্ষু চিকিৎসার জন্য ও পশ্চিমবঙ্গের নানা উন্নতির পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিদেশী বিশেষজ্ঞবৃন্দের পরামর্শ লাভের জন্য। তার ২।৩ দিন পূর্ব্বে তিনি বাস্তুহারাগণের সাহায্য-বিধান সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য একটি স্বায়ত্ত-শাসিত বোর্ড নিযুক্ত করিয়া যান। তাঁহার স্বদেশ ত্যাগের পরই এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হইল যে খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের মত বোর্ডের দু'একজন সভ্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে "প্রবাসীর" সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছিলাম:

> শুনিতেছি এই বোর্ডের ক্ষমতা সম্বন্ধে লিখিত-পঠিত ভাবে কোন নির্দ্দেশ নাই বলিয়া এই বিষয়ে বোর্ডের সভ্যবৃন্দ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আছেন। এই সময়ে মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের দুর্ব্বলতার সুযোগে নষ্টামির একটি চেষ্টা হইয়াছিল। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর হস্তক্ষেপে তাহা নাকি ব্যর্থ হইয়াছে।"

শ্রীমতী মৃদুলা সারাভাই গত জুলাই মাসের ১২-১৪ তারিখে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর কলিকাতা নগরীতে অবস্থান সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; তাহার মধ্যে এই স্বায়ত্ত-শাসিত বোর্ডের উল্লেখ আছে; তাঁহারই নির্দ্দেশে নাকি এইরূপ বোর্ড গঠন করিতে আরম্ভ করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই যে গণ্ডগোল আরম্ভ হইল তার শেষ হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের বাস্তুহারা সাহায্যবিধান বোর্ড সূতিকাগারেই বিনষ্ট হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

খাদ্য-উৎপাদনের হিসাব

খাদ্য-সংগ্রহ জীবের প্রধান ও প্রথম বৃত্তি ; এই বিষয়ে জীব একটা অশিক্ষিতপটুত্ব লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই বৃত্তির পরিচালনা তাহার পক্ষে একটা সহজ ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও খাদ্য-উৎপাদন একটা সমস্তার আকার ধারণ করিয়া রাষ্ট্র-নায়কগণকে বিভ্রান্ত করিতেছে। অন্ত দেশের কথা নাই বলিলাম। আমাদের ভারতরাষ্ট্রে ত দেখিতেছি খাদ্যের সন্ধানে দিকে দিকে লোক ধাইতেছে ; নিজেদের অবস্থার অতিরিক্ত মূল্য দিয়া খাদ্য-সংগ্রহ করিতেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশসমূহ আমাদের প্রয়োজন বুঝিয়া আমাদের মত দরিদ্র দেশের কষ্টার্জ্জিত অপ্রচুর অর্থ দু'হাতে লুঠ করিতেছে। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আমরা উৎপাদন করিতে পারিতেছি না কেন, এই প্রশ্নের সদুত্তর পাই না।

কৃষকেরা যথেষ্ট উৎপাদন করিতেছে না ; কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প উৎপাদন করিয়া তাহারা অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্য পায়—এই যুক্তি অনেকেই দেখাইতেছেন। আর বেশী উৎপাদন করিয়া বেশী অর্থ ঘরে তুলিতে পারিলেও তাহারা সেই অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিতে পারে না ; সেইজন্য খাদ্য উৎপাদনে তাহাদের উৎসাহ নাই—এরূপ কথাও অনেকে বলিতেছেন। অনুরূপ অনেক যুক্তি শুনিতে পাই। কিন্তু যুক্তির বাহুল্যে দেশের লোক দিশাহারা হইয়া পড়িতেছে ; এবং কোন যুক্তির উপর ভরসা করিতে না পারিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছে।

ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু পর্য্যন্ত এই বিতর্কে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রায় এক মাস পূর্ব্বে এক বেতার বক্তৃতা উপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতরাষ্ট্রে শতকরা ১০ ভাগ খাদ্য শস্যের ঘাটতি আছে। এর উত্তরে গণপরিষদের সভ্য শ্রী আর. কে. সিধ বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশে খাদ্য-শস্যের ঘাটতি নাই। তাহার প্রতি উত্তরে কেন্দ্রীয় খাদ্য-বিভাগের জনৈক "মুখপাত্র" গত ২৩শে ভাদ্র তারিখে মন্তব্য করেন যে "শ্রীসিধের উক্তির ফলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইবে।" এই মন্তব্যের একটি মাত্র অর্থ হইতে পারে—কেন্দ্রীয় খাদ্য-বিভাগ, তাহাদের উপদেষ্টাগণ, অনেক অর্থনীতিক বিশেষজ্ঞ যখন বলিতেছেন যে দেশে খাদ্য-শস্যের ঘাটতি আছে, তখন শ্রীসিধের বিপরীত উক্তিতে দেশের লোক ও দুনিয়ার লোক ভুল বুঝিতে পারে এবং ভুল বুঝিয়া দেশের লোক খাদ্য উৎপাদনে যথোচিত উৎসাহিত হইবে না ; দুনিয়ার লোকে ভারতরাষ্ট্রের খাদ্যের প্রয়োজন মিটাইতে উৎসাহ বোধ করিবে না।

শ্রীসিধ এই মন্তব্যের যুক্তি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তিনি গত ২৫শে ভাদ্র তারিখে এক বিবৃতি দান করিয়াছেন। এই বিবৃতি পাঠ করিলে মনে হয় যে, কেন্দ্রীয় খাদ্য-বিভাগের খাদ্যশস্যের ঘাটতির হিসাব ভুল এবং এই ভুলের তাড়নায় পড়িয়া আমরা ধনে-প্রাণে নষ্ট হইতেছি। দেশবাসীর সমস্ত ব্যাপারটা বুঝা উচিত। সেইজন্য আমরা শ্রীসিধের বিবৃতিটি তুলিয়া দিলাম। ইহা "আনন্দবাজার পত্রিকার" ২৬শে ভাদ্রের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল :

> শ্রীযুত সিধ বলেন, উক্ত 'মুখপাত্র' যদি আমার বিবৃতি পড়েন, তিনি দেখিবেন যে, আমি ১৩,২২,০০০ টন উদ্বৃত্ত হইবে ইহাই বলিয়াছি, মন্ত্রিসভার কথিত ৪৩,২২,০০০ টন উদ্বৃত্ত ইহা আমি বলি নাই। ২৩শে জুলাই তারিখের প্রকাশিত প্রবন্ধে আমি আনুপূর্ব্বিক পরিসংখ্যান দিয়াছিলাম। মন্ত্রিসভা আমার সে সমস্ত তথ্যাদি ভুল প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। এই সম্পর্কে খাদ্য বিভাগ তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) আমার প্রদত্ত তথ্যাদি সরকারী পরিসংখ্যানের সঙ্গে মিলে না। (২) কারখানার প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমজীবীরা জনপ্রতি ১৬ আউন্স খাদ্য আহার করিয়া থাকে। (৩) খাদ্য রেশন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ভারত ব্রহ্মদেশ হইতে ১৫লক্ষ টন চাউল আমদানী করিত।
>
> প্রথম বিষয় সম্পর্কে খাদ্যবিভাগ বলেন নাই যে, আমার প্রদত্ত পরিসংখ্যান ভুল। দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বলা যায় যে, গবর্ণেমণ্ট রেশন অঞ্চলে প্রাপ্তবয়স্কের জন্ত ১০-১২ আউন্স খাদ্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ১৬ আউন্স হিসাবে ধরিয়া এই পরিমাণ বর্ত্তমানে বৃদ্ধি করা উচিত নয়। খাদ্যবিভাগ শতকরা ৮৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক ধরিয়াছেন ; কিন্তু এই গবর্ণমেণ্টই কয়দিন পূর্ব্বে প্রাপ্তবয়স্কের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা শতকরা ৮০ জন বলিয়াছিলেন। এইভাবে প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেখান হইতেছে।
>
> তৃতীয় বিষয়, রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেও ভারত ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করিত সত্য। কিন্তু ইহা দ্বারা ভারতের খাদ্য উৎপাদনের কোন ক্ষতি হইত না। প্রকৃত ব্যাপারটি এই—উৎপন্ন খাদ্যের শতকরা ২ ভাগ মাত্র আমদানী করা হইত। এই ২ ভাগ আমদানী না করিলে আমাদের উপবাস করিতে হইত ইহা সত্য নয়। ব্রহ্মদেশের চাউলের মূল্য কম ছিল বলিয়াই ইহা আমদানী করা হইত। ১৯৪৪-৪৫ সালে যে পাঁচ বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ সময়ে ধান্তচাষের জমির পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৫-৪০ এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রতি বৎসর গড়পড়তা ৭৩৫ লক্ষ একর জমিতে ধান্ত চাষ হইত। ১৯৪৪-৪৫ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৮৩১ লক্ষ একর হয়। ব্রহ্মদেশের প্রতিযোগিতা নষ্ট হওয়ায়ই এই বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছিল।

এ সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করা হইলেও ভারত হইতেও বিদেশে চাউল ও গম রপ্তানি হইয়া থাকে।

১৯৩৬—৩৭, ৩৭—৩৮, ৩৮—৩৯ সালে ভারত হইতে যথাক্রমে ৩,১৩,০০০; ৫,৪০,০০০ এবং ৩,৬১,০০০ টন গম এবং ২,৫৭,০০০; ২,৫৬,০০০; ৩,০৬,০০০ টন চাউল রপ্তানি হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৩৫,০০০ টন বজরাজাতীয় খাদ্যও রপ্তানী হইত। ইহার কারণ ভারত এজন্ত উচ্চ মূল্য পাইত। আমরা সস্তা দামের জিনিষ খাইতাম এবং অধিক মূল্যের খাদ্য রপ্তানি করিতাম।

এই সকল তথ্য হইতে বুঝা যাইবে যে, রেশনিং প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ভারতে চাউল আমদানী হইত বলিয়াই বর্ত্তমান খাদ্যশস্য আমদানী সমর্থন করা যায় না। খাদ্য-বিভাগ এক একটি করিয়া এই সকল তথ্য ভুল প্রতিপন্ন করুন। গবর্ণমেণ্ট ১৯৫১ সাল হইতে আমদানী বন্ধ করিতে চান, কিন্তু আমি এখনই উহা বন্ধ করিতে চাই। ইহা দ্বারা দেশের প্রয়োজনের কোন হানি হইবে না বলিয়াই বিশ্বাস করি।

আমি বিশেষ জোরের সঙ্গে বলিতেছি যে দেশে খাদ্যাভাব নাই। এইজন্যই আমি আমদানী বন্ধ করিতে চাই। খাদ্যবিভাগ যদি এই আমদানী বন্ধ করা উচিত মনে করেন তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের তথ্যাদি আবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার মতাবলম্বী হইবেন।

আমার ঐ প্রবন্ধে আমি বলিয়াছিলাম যে, ছোলাজাতীয় খাদ্য ভারতে সর্ব্বদাই উদ্বৃত্ত থাকে; কিন্তু তবুও বিদেশ হইতে ছোলা আমদানী করা হয়। আশ্চর্য্যের কথা, এই বিষয় সম্পর্কে কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই। আমার ২৩শে জুলাই তারিখের প্রবন্ধ সম্পর্কেও কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই।

শ্রীসিদ্ধ কেন্দ্রীয় খাদ্যবিভাগকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। আমরা তাহার ফলাফলের প্রতীক্ষায় রহিলাম। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতার "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের" বাণিজ্য সম্পাদক গত জুলাই মাসের ৭ই তারিখের সংখ্যায় একটা হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের ঘাটতি নাই, বরং ২১ লক্ষ মণ বাড়তি। গত শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে এই হিসাবের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ মন্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি নীরব। এই দুই মাসেও এই বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য শুনাইতে সময় পাইলেন না।

যুক্তপ্রদেশে জমীদারী প্রথার বিলোপ

যুক্তপ্রদেশে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করিয়া "কৃষক-রাজের" গোড়াপত্তন আরম্ভ করা হইতেছে। যে আইন পাস হইয়াছে, তাহার বিধান অনুসারে জমিদার শ্রেণীকে সম্পত্তি হস্তচ্যুতির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রায় ১৭০ কোটি টাকা দেওয়া হইবে। এই টাকা প্রদানের জন্য একটি উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। কৃষকশ্রেণী যদি থোকে ১০ বৎসরের খাজানা প্রদান করেন তবে তাঁহারা জমির মালিক হইবেন। এই ব্যবস্থায় নাকি আশাতীত সাড়া পাওয়া যাইতেছে; কৃষকেরা সাগ্রহে সরকারী তোষাখানায় ১০ বৎসরের খাজানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বাংলাদেশে জমিদারী প্রথার বর্ত্তমান রূপ বড়লাট কর্ণওয়ালিস কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। এই প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে তখন (১৭৯৩ সন ও তাহার দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে) নানারূপ তর্ক উঠিয়াছিল। তাহার পরে যে প্রায় ১৬০ বৎসর অতীত হইয়াছে সেই সময়েও এই তর্কের অবসান হয় নাই। রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে এই জমিদার শ্রেণীর আবির্ভাব কখন ও কি করিয়া ঘটিল তাহা গবেষণার বিষয়। হিন্দু যুগের সমাজ-ব্যবস্থায় পল্লীস্বরাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল; "পাঁচ-ই" ছিল পল্লীর জমির মালিক, পাঁচ-ই পল্লীর জমি কৃষকের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিত। কৃষকের শ্রমের ফলে যে ফসল উৎপন্ন হইত তাহার উপর তাহার অধিকার ছিল; পল্লীর জমির উপর নয়।

এই ব্যবস্থা—এই সাম্যবাদ—রূপান্তরিত হইয়া কখন ও কি করিয়া জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে তর্ক অনেক হইয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক হাণ্টার বলিয়াছেন যে, কর্ণওয়ালিসের বিধান প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে যে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তখন দেখা যায় জমিদারী প্রথাও আছে; পল্লীস্বরাজও আছে এবং দুই ব্যবস্থার মাঝামাঝি নানারূপ প্রথাও আছে। গত ১৬০ বৎসরে এই জমিদারী প্রথার সু ও কু অনেক রূপই দেখা গিয়াছে। আজ তাহার অবসান হইল যুক্তপ্রদেশে। অন্যান্য প্রদেশে তাহার অনুকরণ করা হইবে। ইহাই যুগ-ধর্ম।

এই বিষয়ে আর তর্কের অবসর নাই। এই সময়ের মধ্যে পাশ্চাত্য আদর্শে আমাদের সমাজের অনেক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের পল্লীস্বরাজের আদর্শের উপর সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন আঘাত করে বিদেশী আদর্শ। কর্ণওয়ালিসী ব্যবস্থার ফলে জমিদার শ্রেণী গ্রাম ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্ব আদর্শের শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য পল্লীগ্রামে কেহই রহিল না। ইংরেজের পুলিস পল্লীগ্রামকে দৈ-রাজ্য হইতে রক্ষা করিল। আজ আবার পঞ্চায়েৎ-রাজের আবির্ভাব হইতেছে, দশে মিলিয়া আবার স্বাধীন ভারতের পুনর্গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। যুক্তপ্রদেশে জমিদারী প্রথার বিলোপ এই সম্ভাবনারই দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমাদের কর্ত্তব্যের কাঠামো প্রস্তুত করিতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গের গণ-বিক্ষোভ

বরিশাল শহরে মুসলমান বালকগণের "মুকুল-ফৌজের" সঙ্গে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ভাল ব্যবহার করেন নাই বলিয়া এক দল মুসলমান যুবক শহরের সকল স্কুলকে "ধর্ম্মঘট" করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করে। "একান্ত অনিচ্ছায়" হিন্দু বালকবালিকাগণও বাহির হইয়া আসে। শহরে ১৪৪ ধারা প্রবর্ত্তিত ছিল। শোভাযাত্রার উপরে চলিল "মৃদু" যষ্টিচালনা। এই ঘটনার পশ্চাতে নানা হস্ত কাঠি নাড়া-চাড়া করিতেছিল। স্থানীয় পত্রিকা "হেলালে পাকিস্থান" এই বিষয়ের উপর একটু আলোকপাত করিয়াছেন :

"আমরা জানি যখনই কোন জনকল্যাণকর আন্দোলন প্রদেশে এবং জিলায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে তখনই উপরোক্ত প্রতিক্রিয়াশীল দল পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করিয়া জনকল্যাণের পথ রোধ করিয়াছে। ইহাদের নগ্ন রূপ ধরা পড়িয়াছে—ভাষা আন্দোলন শুরু করিয়া বিশ্ববিত্থালয় আন্দোলন পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারে। ইহাদের দ্বারা রাজনীতির নামে প্রকাশ্য দিবালোকে রাহাজানি, গুণ্ডামি ও চোরাকারবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মিলাদ মাহফিল হইতে লীগ কর্ম্মী সাজাহানের মাইক্রোফোন লুঠ, লীগ কর্ম্মী ওহাব আলীর উপর অধাচুম্বিক আক্রমণ ও রক্তপাত, ছাত্র লীগ কর্ম্মী হবিবর রহমানকে অতর্কিতে ছুরিকাঘাত, কেরোসিন তেলের চোরাকারবার, আরও কত কুকীর্ত্তি যাহাদের দ্বারা সাধিত হইল তাহারা সাধুজন, কোন আইনের আমলে আসে না, আইন তাহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে না। কারণ তাহাদের গায়ে সরকারী ছাপ রহিয়াছে, তাই মুকুলদের ব্যাপারে ইহারা যে "গাঁয় মা মানে আপনি মোড়ল" সাজিবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? আমরা যতদূর জানি গোলমালের কারণ এবারকার আজাদী দিবসের কার্য্যসূচী। সরকারী কার্য্যসূচীকে বানচাল করিবার জন্য তথাকথিত ছাত্র লীগের তরফ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কার্য্যসূচী বাহির করা হয়। মুকুলদের কেন্দ্র করিয়া, তিলকে তাল করিয়া, মিথ্যাকে সত্য সাজাইয়া এক ব্যক্তিগত কলহকে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করিতে চেষ্টা করিলেন। ইঁহাদের খামখেয়াল ও খোষমেজাজ মাফিক জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট না চলিলে চলিবে কেন?

পূর্ব্ববঙ্গের মোসলেম লীগ বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেটের আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। আর "বরিশাল হিতৈষী" বলিতেছেন—সংখ্যালঘুদের এই সব ক্ষেত্রে 'সবচে ভালা চুপ' এই নীতি অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু "দুই দলের যুদ্ধে নলখাগড়ার" ক্ষয়ের কথা ভাবিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

কম্যুনিষ্ট গৃহ-বিবাদ

যুগোস্লাভিয়ার সর্ব্বাধিনায়ক মার্শাল টিটোকে লইয়া সোভিয়েট রাষ্ট্র-প্রধানগণ গলায় কাঁটা লাগার অবস্থায় পড়িয়াছেন; মার্শাল টিটোর নামের অনুকরণে ইংরেজী ভাষায় একটি নূতন শব্দ রচিত হইয়াছে—টিটোইজম—মার্কসপন্থী হইয়াও ষ্টালিন-বিরোধী। এই গৃহবিবাদ কম্যুনিষ্ট বিরোধী রাষ্ট্র-প্রধানগণের মনে আনন্দ উপচিয়া পড়িতেছে—যা' শত্রু পরে পরে, এই ভাবিয়া।

আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সংবাদপত্রগুলি প্রচার করিতেছিল যে, সোভিয়েট রাষ্ট্র যুগোস্লাভিয়ার সীমান্ত অঞ্চলের দিকে সৈন্য সমাবেশ করিতেছে; ভয় দেখাইয়া যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রনায়কগণকে বাগে আনিবার উদ্দেশ্যেই এই সমরায়োজনের ব্যবস্থা হইতেছে। এমন কথা পর্য্যন্ত রটনা করা হয় যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের নির্দ্দেশে হাঙ্গারী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি আশ্রিত রাষ্ট্রসমূহ যুগোস্লাভিয়াকে আক্রমণ করিবে।

কিন্তু ১লা সেপ্টেম্বর লণ্ডন হইতে একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মনে করেন না, সোভিয়েট রাষ্ট্র যুগোস্লাভিয়াকে আক্রমণ করিবে। তবে যদি সামরিক আয়োজন-উদ্যোগের মাধ্যমে মার্শাল টিটোকে নত করিবার চেষ্টা সফলকাম হইতেছে বলিয়া দেখা যায় তবে ত্রিশক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স—একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দরবারে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে টানিয়া লওয়া হইবে।

এটা এমন ভীতিপ্রদ ব্যবস্থা নয়। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ এখনও এমন শক্তিমান হইতে পারে নাই যে, তাহার সভ্যবৃন্দের জুলুমবাজী সংযত করিতে পারিবে; অন্ততঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাষ্ট্র ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে কিছু করিবার শক্তি তাহার নাই। তাহার পক্ষ হইতে ইন্দোনেশিয়া, ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থানকে লইয়া খেলা চলিতে পারে। তাও বেশী দিন চলিবে না।

ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় বরিশালে ধর্ম্মরক্ষিণী সভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করেন। তৃতীয় দিনে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার যোগ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতার প্রসঙ্গে ১৯০৯ সালে কলিকাতা হইতে অরবিন্দের নিরুদ্দেশের ইতিহাস বর্ণনা করেন। ইহা বাঙালীর বিপ্লবী জীবনের ইতিহাসের অঙ্গ বলিয়া দেশবাসীর জানিয়া রাখা ভাল। "বরিশাল হিতৈষীর" বিবরণ হইতে তাহা তুলিয়া দিলাম :

ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল সামসুল আলম বাংলার

বিপ্লবী কর্ত্তৃক হত হইলে শ্রীঅরবিন্দকে ষড়যন্ত্রে জড়াইবার দুরভিসন্ধি সিষ্টার নিবেদিতা ও সার জগদীশ বসু জানিয়া অরবিন্দকে ম্যাজিনীর মত আত্মগোপন করিতে অনুরোধ করেন।

শ্রীঅরবিন্দের সহিত বাংলার বিপ্লবী চন্দননগরের ৺চারুচন্দ্র রায়ের পরিচয় ছিল, চন্দননগরে নৌকায় গিয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন; তিনি আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিলে উদাসীনের ন্যায় অরবিন্দ "রাণীঘাটে" তরী বাঁধিয়া ঈশ্বরের নির্দ্দেশ প্রতীক্ষায় নির্ব্বিকার চিত্তে অপেক্ষায় রহিলেন।

এই সংবাদ আমার বিপ্লবী বন্ধু ৺শ্রীশচন্দ্র ঘোষ আমায় জানাইল। অতি প্রত্যূষে এই ঘটনা হয়, তার পর বহু সময় অতিবাহিত হইয়াছে, শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যাখ্যাত হইয়া কোথায় প্রস্থান করিলেন, তাহা সে অবগত নহে, এই কথাও শ্রীশচন্দ্র জানাইল।

আমি চক্ষু নিমীলিত করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিলাম। গঙ্গার জাহ্নবী-কূলে অনেকখানি চড়া পড়িয়াছে। প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাসবশতঃ সেই চরের উপর দিয়া যন্ত্রচালিতের ন্যায় দক্ষিণে না গিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইলাম।

নবকিশলয়যুক্ত বট-অশ্বত্থতলে বোট বাঁধা ছিল, আমি অনুমান করিলাম নিশ্চয় অরবিন্দ—জিজ্ঞাসা করিয়া নৌকায় উঠিলাম—দেখিলাম চুঁচুড়া কনকারেন্সের বীর-মস্তিষ্ক অরবিন্দ নলিনী গুপ্তের কোলে মাথা রাখিয়া নয়ন বিস্ফারিত করিয়া আছেন—চারি চক্ষুর মিলন হইল—এ যে যোগীর মিলন! কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—"তুমি আমায় নিতে এসেছ? চল—তোমার প্রতীক্ষায় আমি আছি।" দক্ষিণা বাতাসে পাল তুলিয়া দিলাম। বলিলেন—"আত্ম-গোপন করতে এসেছি।" আজ যেখানে প্রবর্ত্তক আশ্রম, তখন ছিল শ্মশান—সর্প-ভয় প্রচুর। আমি সেই শ্মশানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। আমি শ্রীঅরবিন্দকে আমার বাটীর মধ্যে আনিলাম—নলিনী, বিজয়, সুরেশকে বলিলেন—"আমার বন্ধুকে পেয়েছি, তোমরা থাকলে নির্জ্জন বাস হবে না।" তাহারা আমার ও অরবিন্দের মুখের দিকে চাহিয়া বিদায় লইলেন। তিনি দেড় মাস এখানে অবস্থান করেন। বাজারের খাবার খাওয়াইতাম। হাঁটিবার সময় তাঁহার পদশব্দ হইত না—তৃপ্তির সহিত বিহ্বল হইয়া খাই-তেন। দিবাভাগে কারখানায় আমার গুদামে রাখিতাম। আমার স্ত্রীর কর্ম ছিল—অপ্রশস্ত কাপড় পরিয়া, মাথায় চুল খোলা রাখিয়া, ঝাঁটা দিয়া ঘর পরিষ্কার করা। সেই অবস্থায় একজন পুরুষকে দেখিয়া জিহ্বা কাটিয়া অরবিন্দের দিকে চাহিলেন। অরবিন্দও চাহিলেন। স্ত্রী আমাকে বলিলেন—"ডাকাত-চোরকে আশ্রয় দিয়েছ?" আমি বলিলাম—"সুরেন বাঁড়ুজ্জে—বিপিন পালের নাম শুনেছ—ইনিও তদ্রূপ একজন।" তিনি বলিলেন—"আমি তোমার স্ত্রী—তোমাকে খাওয়াই—তোমার দুয়ার সব সময় খোলা রাখি—কিন্তু অরবিন্দের কথা জানাও নাই কেন—তাঁকে খাওয়াও কোথায়?" তৎপর যুক্ত পরিবারের কেহ টের না পায় তাই তিনি নিজের অন্ন তাঁহাকে দিতেন। অরবিন্দ বলিলেন—"I have seen Kali-mata in her."

দেড় মাস পরে জানাজানি হইল। সুকুমার মিত্রের সাহায্যে পাসপোর্ট জোগাড় করিয়া পণ্ডিচেরীতে পাঠাই-লাম সৌমেন্দ্রঠাকুর নাম দিয়া। সেখান হইতে সুদর্শন চক্রবর্ত্তীকে এক মাস পরে পাঠাইয়া খবর দিলেন। ৮০৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় বাড়ী পাওয়া গেল—সে খরচ আমাকে পাঠাইতে হইত—তিনি আমাকে গুরু বৈষ্ণবী জ্ঞানের মন্ত্র—শাস্ত্র মন্ত্র দিয়া ১,০০৮ বার জপ করিতে বলিলেন। আমি মাদ্রাজে গেলাম—তথাকার অবস্থা খারাপ—অরবিন্দ বলিলেন—"যে ভাবে হউক আমাকে ২০০৲ টাকা পাঠাবে।" আমি দেশের পোশাকে ফিরিলাম—টাকা পাঠাইতে লাগিলাম।

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়

১৮৯০ খ্রীঃ ১৭ই মে তারিখে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়; আগামী ১৭ই মে তারিখে এই শিক্ষালয়ের "হীরক-জয়ন্তীর" তারিখ। "তত্ত্ব কৌমুদী" পত্রিকার ১লা ভাদ্রের (১৮ই আগষ্টের) সংখ্যায় শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় এই শিক্ষালয়ের ইতিকথা বিবৃত করিয়াছেন। এই বিবরণী হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় তুলিয়া দিলাম:

সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তির আদর্শের যে সমস্ত ধারক ও বাহক "পৃথিবীময় এক মহা সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠার" প্রাথমিক সূত্র হিসাবে এদেশে নিয়মতন্ত্রানুসারে পরিচালিত ধর্ম্ম-সমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যে সমস্ত প্রগতিশীল ব্যক্তি নারী-স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতে এবং নারীজাতির প্রগতি-পথের সকল অন্তরায় দূর করিবার ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেনের নারীবিদ্যালয়ে নর্ম্যাল পর্য্যন্ত পঠনপাঠনের যে ব্যবস্থা ছিল তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিতে পারায় আরও উচ্চতর শিক্ষা প্রদান মানসে প্রথমে হিন্দু মহিলাবিদ্যালয় ও তাহার অল্পদিন পরে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান প্রণালীর উৎকর্ষে মুগ্ধ হইয়া বাংলার ছোটলাট সার অ্যাসলি ইডেন ও বেথুন স্কুল পরিচালক সমিতির সভাপতি হাইকোর্টের বিচারপতি

সার রিচার্ড গার্থ বেথুন স্কুলের সহিত ঐ স্কুলের মিলন সাধনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। ব্যয়বহুল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সরকার ও দেশবাসীর সহায়তা ভিন্ন পরিচালন করা যে কত কঠিন তাহা বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতাগণ অনুভব করিতেছিলেন। সেজন্য সহজেই উভয় প্রতিষ্ঠানের মিলন সম্ভবপর হইল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উভয় স্কুল মিলিত হইয়া এণ্ট্রান্স অবধি পড়াইবার ব্যবস্থা হইল।

এই ব্যাপারের ফলে সহজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার নারীজাতির জন্য উন্মুক্ত হইল বটে, কিন্তু এই মিলনের অল্পদিন পরেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষগণ সরকারী স্কুলের ধর্ম্ম ও নীতি বিবর্জ্জিত শিক্ষার কুফল বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্ম জীবনের উপযোগী একটি নারীশিক্ষা নিকেতন স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। এই চাহিদারই পরিণতি ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় সম্পর্কে কয়েক বৎসর আলোচনা সভা আহূত হইয়া আলাপ-আলোচনা চলে কিন্তু ব্যয় বহন ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্থিরনিশ্চয় হইতে না পারায় সমাজের তরফ হইতে কিছু করা সম্ভবপর হয় না। এই অচল অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় নিজেদের দায়িত্বে ২১০।৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

দুই তিন বৎসর চলার পর নানাকারণে দ্বারকানাথ-শশীপদ-প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি উঠিয়া যায়। তাহার পর ১৮১১ শকের মাঘোৎসবের সময় (January 1890) ব্রাহ্মগণের এক আলোচনা সভায় স্থির হয় যে, ব্রাহ্ম বালিকাগণের শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য একটি স্কুল স্থাপন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, কেননা সরকারী স্কুলে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা ব্রাহ্মজীবন প্রসারের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

এই বিদ্যালয় স্থাপনে প্রধান উদ্যোগী হইলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও অল্পদিনের মধ্যে প্রাথমিক ব্যয়াদি বাবদ বাইশ শত টাকা সংগৃহীত হইল এবং কিছু মাসিক সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন সকল সমাধা হইয়া স্কুল স্থাপন করা সম্ভব হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম তারিখে অর্থাৎ ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৮১২ শকে, ইংরেজী ১৭ই মে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। বর্ত্তমান সময়ে ৩০শে জানুয়ারী যে প্রতিষ্ঠা দিবস-উৎসব হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রধান উদ্যোক্তা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্মোৎসব। প্রকৃত প্রতিষ্ঠা দিবস ১৭ই মে।

স্মরণ রাখা উচিত যে, সে সময়ে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা, বিজ্ঞান, সূচীশিল্প, সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় নাই। সেজন্য অন্যান্য বিদ্যালয়ে এগুলি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ই এইগুলির পথপ্রদর্শক ও ব্রাহ্মসমাজই এইগুলির প্রবর্ত্তক।

ব্রিটিশ "কমনওয়েল্‌থভুক্ত" থাকার লাভ

সম্প্রতি কানাডার ওন্টেরিয়ো প্রদেশের বিগউইন-ইন শহরে ব্রিটিশ রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিবর্গের এক সভা হইতেছে। সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে—কম্যুনিজমের প্রসার রুদ্ধ করিবার জন্য আর্থিক উন্নতিমূলক ব্যবস্থা, না সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন, কোন্‌টি সমধিক আশু গুরুত্বপূর্ণ? এই সম্বন্ধে একটি বিতর্ক চলে। একজন কানাডীয় প্রতিনিধি বলেন যে, কম্যুনিষ্টদের আক্রমণাত্মক অভিযান প্রতিরোধের জন্য সামরিক ব্যবস্থাবলম্বন করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি বলেন যে, পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট-বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়াছে। কাজেই কে কোন্ দলে যোগ দিবে, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় শীঘ্রই উপস্থিত হইবে।

ভারতীয় ও পাকিস্থানী প্রতিনিধি স্ব-স্ব দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার আয়োজন উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা বলেন যে, গণতান্ত্রিক জাতিসমূহের মর্য্যাদা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার সর্ব্বোত্তম উপায় হিসাবে সাধারণের বৈষয়িক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। তাঁহারা আরও বলেন যে, তাঁহাদের দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অধিকতর উন্নত করা না হইলে তাহারা অভাবে অসন্তোষ পোষণ করিবে এবং কম্যুনিজমের প্রচারে বিভ্রান্ত হইয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে যে, তাহারা কম্যুনিষ্ট সমাজ সংস্থায়ই অধিকতর সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

এত দূরে থাকিয়া এই বিতর্কের পক্ষে ও বিপক্ষে যে-সব যুক্তির পরিবেশন করা হইয়াছিল তাহার প্রকৃত মর্ম্মার্থ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপিত একটা যুক্তি এই ব্যাপারটাকে স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে; ব্রিটিশ রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর শ্বেতাঙ্গ দেশসমূহের মনোভাব তাহার আলোকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যায়। আমাদের প্রতিনিধির মন্তব্যটি সেইজন্য সর্ব্বদা মনে রাখা প্রয়োজন। বিগউইন-ইন হইতে প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে:

> ভারতীয় প্রতিনিধিগণ ব্রিটিশ ও কানাডীয় অভিমত সমর্থন করিতে না পারিয়া বলেন যে, কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহকে সর্ব্বত্র যেন শুধু কম্যুনিজমের বিরোধিতার অজুহাতে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী শক্তিসমূহকে সমর্থন করিতে বাধ্য না করা হয়। ঐরূপ বাধ্যতামূলক কার্য্যে বিশ্বের

বহু স্থানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সমর্থন করা হইবে। তাহার ফলে কম্যুনিজমের প্রসার ঘটান হইবে। তাঁহারা মনে করেন, ইহার পরিবর্ত্তে সামাজিক ও বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি যাহাতে হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা অধিকতর প্রয়োজন; কম্যুনিষ্টবিরোধী নীতিই যেন আমাদের পাইয়া না বসে।

ব্রিটিশ রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর অ-শ্বেতকায় দেশসমূহের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে কোন এক দলে যোগ দিবার জন্য; এই বিবরণী পাঠ করিয়া এই কথা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অন্য দিকে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বলিতেছেন যে, তাঁহার রাষ্ট্র কোন পক্ষেই যোগদান করিতে চায় না বা করিবে না।

ক্ষেত্রনাথ ঘোষ

রংপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের পিতা ক্ষেত্রনাথ ঘোষ পরিণত বয়সে (৮০ বৎসরের ঊর্দ্ধ) বরিশাল শহরে নিজ গৃহে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। প্রায় ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তিনি "নিউ ইণ্ডিয়া" সাপ্তাহিক পত্রিকার লেখক রূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইমার্সন সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধাবলী বিদ্বজ্জন সমাজে আদৃত হইয়াছিল। প্রাচীন আদর্শের শিক্ষক সম্প্রদায়ের নিস্পৃহ জীবনযাপন ও জ্ঞানানুশীলন করিয়া এই অজাতশত্রু মানুষটি তাঁহার পরিচিত সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

দেশের সকল প্রগতিমূলক প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁহার মনের যোগ ছিল। আদর্শ গৃহী ও আদর্শ সামাজিক জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া তিনি প্রার্থিত লোকে চলিয়া গেলেন।

গোপীনাথ শ্রীবাস্তব

গোপীনাথ শ্রীবাস্তব তাঁহার কর্ম্মজীবন মাত্র ৪৬ বৎসরে শেষ করিলেন; তাঁহার তিরোধানে যুক্তপ্রদেশ একজন চিন্তাশীল স্বদেশসেবকের সেবা হইতে বঞ্চিত হইল। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন; তিনি গান্ধীযুগে প্রবর্ত্তিত সমস্ত আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন।

১৯৩৭ সনে যখন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা হয়, তখন গোপীনাথ শ্রীবাস্তব পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারীর পদে মনোনীত হন; ১৯৪৬ সনে যখন শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ আবার প্রধান মন্ত্রী পদে মনোনীত হন, তিনি তখন তাঁহার মন্ত্রিসভায় গোপীনাথ শ্রীবাস্তবের স্থান করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন।

তৎপূর্ব্বেই গোপীনাথ "হিন্দুস্থান" নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদনায় পত্রিকাখানি কংগ্রেসী দলের প্রগতিশীল অংশের মুখপত্ররূপে লোকপ্রিয় হইয়া উঠে।

পুলিনবিহারী দাসের স্মৃতিরক্ষা

বিগত ২৪শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতার এক জনসভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আমরা মনে করি এই প্রস্তাব জনসাধারণের সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণীয়:

"জাতীয় জাগরণের যুগসন্ধিক্ষণে ভারতের বৈপ্লবিক ক্ষেত্রে পুলিনবিহারীর আবির্ভাব এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা। তিনি তাঁহার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও অপূর্ব্ব সংগঠন শক্তি লইয়া জাতীয় যুবশক্তির পুরোভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান হন এবং ক্ষাত্র-শক্তির সঞ্জীবন স্পর্শে মুমূর্ষু জাতির দেহে নবজীবনের জাগরণ আনয়ন করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার সেই অতুলনীয় অবদানের কথা স্মরণ করিয়া এই সভা পরলোকগত বিপ্লবী নেতার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে। এই সভা পুলিনবিহারীর স্মৃতিরক্ষার একান্ত প্রয়োজন অনুভব করিতেছে।"

স্মৃতিরক্ষা কমিটি আপাততঃ নিম্নলিখিত ভাবে পুলিন-বিহারী দাসের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব মনে করিয়াছেন:

(১) পুলিনবিহারীর আদর্শে যুবকগণকে শরীর চর্চ্চার এবং আত্মরক্ষার কৌশল ও শক্তি-সঞ্চয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য একটি আদর্শ ব্যায়ামাগার সংগঠন।

(২) দেশের যুবকগণের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা (ডিসিপ্লিন) আনয়ন, সামরিক বিদ্যা শিক্ষা এবং বৃত্তিহিসাবে সামরিক জীবন অবলম্বনে উৎসাহ ও প্রেরণা দানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠন। এই প্রতিষ্ঠানকেন্দ্র হইতে পুস্তিকা প্রচার, সভা ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা, কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট একটি অধ্যয়নাগার স্থাপন প্রভৃতি করা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপন।

(৩) কলিকাতায় নিমতলা শ্মশানে পুলিনবিহারীর নশ্বর দেহ দাহ করার স্থান সুনির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সেই স্থানটি ঘেরাও করিয়া সেখানে একটি প্রস্তরফলক স্থাপন। সেই স্মৃতিফলকে তাঁহার জীবনাদর্শ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা।

পুলিনবিহারী দাসের সুদৃঢ় চরিত্র, আদর্শ-কর্ম্মনিষ্ঠা, তাঁহার অসামান্য সংগঠন প্রতিভা এবং দেশের সম্মুখে কর্ম্মময় জীবনের আদর্শ স্থাপনের জন্য তাঁহার গৌরবময় মৃত্যু বরণ দেশবাসীকে আমরা স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা আমরা জাতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

স্মৃতিরক্ষা তহবিলে যাঁহার যাহা সাধ্য চাঁদা প্রেরণ করিয়া এই আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করাইবেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

অর্থ সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা—১। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কোষাধ্যক্ষ, পুলিনবিহারী দাসের স্মৃতিরক্ষা কমিটি—১নং বর্দ্ধণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় ১১ই আশ্বিন (২৮শে সেপ্টেম্বর) হইতে ২৪শে আশ্বিন (১১ই অক্টোবর) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র-টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্য্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

রাজা ভোজ

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

[অদ্য "ধারা" নিরাধারা নিরালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতাঃ খণ্ডিতাঃ সর্ব্বে ভোজরাজে দিবং গতে ॥]

১

প্রাচীন ভারতের বিক্রমাদিত্য এবং রাজা ভোজ সর্ব্বজন-পরিচিত হইলেও এই দুই মহাপুরুষের ভাস্বতী কীর্ত্তি-কৌমুদীর উপর অধুনাতন ঐতিহাসিক গবেষণা এক অনিশ্চয়তার কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্যগণ ইতিপূর্ব্বেই বিক্রমাদিত্যের "নবরত্ন সভা" লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়াছেন। কালিদাস, বররুচি প্রমুখ এক এক রত্নের মধ্যে কোথাও এক, কোথাও দুই শতাব্দীর ব্যবধান আবিষ্কার করিয়াছেন; অথচ স্বয়ং বিক্রমাদিত্য কোথায় কিংবা কোন্ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই।

সুদূর উজ্জয়িনী এবং ধারা নগরী হইতে বিক্রমাদিত্য এবং রাজা ভোজের শিপ্রা-চর্ম্মণ্বতী তুল্য উত্তরবাহিনী যশোধারা ইতিহাস-গঙ্গায় মিলিত হইয়া রূপকথার কথাসরিৎসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে একাধিক বিক্রমাদিত্য এবং একাধিক ভোজদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস এবং সত্যের প্রতি উদাসীন কবি ও আলঙ্কারিকগণ সকলেই একাকার করিয়াছেন, কালিদাস এবং বররুচিকে একাদশ শতাব্দীর "সমরাঙ্গন"-বিলাসী, "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" পরমার-কুলতিলক ধারাধিপতি ভোজদেবের সভায় আনিয়া ফেলিয়াছেন। স্তাবকের স্তুতি ও দানমাহাত্মেই কালপ্রভাবে তাঁহার কীর্ত্তি ম্লান না হইয়া বরং মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। যাঁহারা মালবপতি ভোজদেবের প্রকৃত ইতিহাস জানিবার জন্য উৎসুক তাঁহারা সুপণ্ডিত ডাঃ ধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কৃত *History of the Paramaras* নামক প্রামাণ্য গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক চরিত্রের "মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে উঠে কথায় কথায়"—এই কথা অনেক সময় সত্য। কালের জোয়ার-ভাটায় রামা-শ্যামার মিথ্যা খ্যাতি কিংবা অপযশের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। যাঁহাদের স্মৃতি জাতির হৃদয়ে জনশ্রুতির দ্বারা রূপায়িত হইয়া ঐতিহাসিক সত্যকে নিষ্প্রভ করিয়া থাকে তাঁহারাই অমরত্বের অধিকারী। এইজন্য কোন ঐতিহাসিক চরিত্রের যথাযথ বিচার করিতে হইলে উহার সম্বন্ধে সত্য এবং মিথ্যা, খাঁটি ইতিহাস এবং অলীক জনশ্রুতি দুইটাই জানা দরকার। এই প্রবন্ধে রাজা ভোজ সম্বন্ধে উত্তর-ভারতে প্রচলিত এবং সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত কিংবদন্তী—যাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই বাঙালী পাঠকের কাছে নিবেদন করিব, কোন কোন নৈষ্ঠিক ঐতিহাসিকের বৃথা ক্রোধ দেখিয়া হয়ত সাহিত্যরসিক হাসিবার অবকাশ পাইবেন।

২

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে (১০১০ ইং) ভোজদেব মালব-রাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং আনুমানিক ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি গজনীর সুলতান মামুদ এবং তাঁহার পুত্র মাসুদের সমসাময়িক। সুলতান মাসুদের রাজত্বকালে আবুরিহান্ অল্-বেরুনী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা এবং হিন্দুর দর্শন-জ্যোতিষাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তহকীক-ই-হিন্দ্ নামক প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—মালবের রাজধানী ধারা নগরীতে তখন ভোজদেব রাজত্ব করিতেছিলেন।

ভারতের ভাগ্যাকাশে তখন কালরাত্রির ছায়া পড়িয়াছে। পেশওয়ার হইতে শতদ্রুতীর পর্য্যন্ত ইসলামের কুক্ষিগত। কনৌজ মথুরা সৌরাষ্ট্রের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে মুসলমান আক্রমণের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা।

মামুদের কোষমুক্ত তরবারি সিন্ধুর পশ্চিম তীরে আর্য্যভূমিকে রাক্ষস-ভূমিতে পরিণত করিয়াছে। কাশ্মীর ব্যতীত সমগ্র উত্তরাপথে তীর্থস্থান কলুষিত, দেবতা ও দেবায়তন চূর্ণীকৃত, জনপদসমূহ বিধ্বস্ত, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে বৈশ্য-শূদ্র দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া গজনীর গোলামবাজারের পণ্যস্বরূপ হইয়াছে। ক্ষত্রিয় যোদ্ধার কঙ্কালে নির্ম্মিত হইয়াছে মুসলমান শহীদের বেহেস্ত-সোপান, গাজীর শৌর্য্যমিনার। কায়স্থগণ বিজেতার পদানত, উচ্ছিষ্টভুক-ভৃত্য; ব্রাহ্মণগণ ম্লেচ্ছ সান্নিধ্যে ভীত হইয়া সরস্বতীভাণ্ডার মস্তকে লইয়া কান্যকুব্জ, কাশী, অবন্তী, সৌরাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থী। সুদূর অতীতে শক হূণ যাহা করে নাই, রাজা ভোজের রাজ্যসীমা চর্ম্মণ্বতীর অপর পারে উহার শতগুণ বীভৎস তাণ্ডবলীলা তখন অবাধে চলিতেছিল। রন্তিদেবের গোমেধ যজ্ঞে নিহত গোচর্ম্মস্তূপের কীর্ত্তি বহন করিয়া চর্ম্মণ্বতী (চম্বল) যমুনার নীল ধারায় আজিও আপন মুক্তি খুঁজিতেছে; মুসলমান অধিকারের পর রন্তিদেবের কীর্ত্তি

ম্লান হইয়া গিয়াছে, পঞ্চনদ প্রদেশের নদীপঞ্চক প্রত্যেকেই রক্তধারা চর্ম্মন্বতী হইয়া সুলতান মামুদ ও তাঁহার অনুযাত্রীগণের ধর্ম্মান্ধতার বার্ত্তা নদ-রাজ সিন্ধুকে নিবেদন করিতেছে। মামুদের মৃত্যুর পরও মুসলমান প্রতাপ খর্ব্ব হয় নাই; অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল বটে। মামুদ বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। কাফের হিন্দুর বিশ্বস্ততা, "স্বামীধর্ম্ম" এবং শৌর্য্য ইসলামের পতাকাতলে "লামা" ধর্ম্মাবলম্বী রণদুর্ম্মদ তাতার জাতির বিরুদ্ধে খোরাসানের মরুপ্রান্তর এবং "অক্ষু" (Oxus) নদীতীরে পরীক্ষিত হইল। নেতৃত্ব ও একতার অভাবে যে আর্য্যজাতি মুসলমান অশ্বসাদীর গতিরোধ করিতে পারে নাই তাহারাই ভৃতিভুক যোদ্ধারূপে ততোধিক অপরাজেয় তাতার জাতিকে পরাজিত করিয়া গজনী-সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমান্ত রক্ষা করিতে লাগিল। নাপিত-পুত্র জয়সেন মামুদের পুত্র মাসুদের রাজত্বকালে মুসলমানবাহিনীর অধিনায়করূপে আর্য্যাবর্ত্ত লুণ্ঠনে বাহাদুরী দেখাইয়া সুলতানের প্রীতিভাজন হইয়া উঠিয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে দ্বিতীয় "শকারি" বিক্রমাদিত্যের কর্ম্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। ভারতভূমি হইতে তখনও ক্ষত্রিয়-তেজ তিরোহিত হয় নাই; বাংলার পাল, দাক্ষিণাত্যের চোল-কর্ণাট, মধ্যপ্রদেশের হৈহয়-কলচুরী, মালবের পরমার, রাজপুতানার চৌহান, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল, সৌরাষ্ট্রের চালুক্যগণ দুর্ব্বলহস্তে রাজদণ্ড ধারণ করিতেন না; অথচ সকলেই যেন মোহনিদ্রাগ্রস্ত, রাজনৈতিক চেতনাশূন্য। বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ ছাপ্পান্ন খণ্ডে বিভক্ত হওয়ার পর হইতে ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদের জন্য ব্যথা ও অনুভূতি নিবারক কোন ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, ডান হাত কাটিয়া ফেলিলেও হিন্দুজাতির বাঁ হাত খবর পায় না। পঞ্চনদ প্রদেশ আর্য্যভূমি-বিচ্ছিন্ন হইয়া বিজাতির বিধর্ম্মীর কবলগ্রস্ত হইল; কাঠুরিয়ার কুঠারে একটি শাখা ভূপাতিত হইলে বৃক্ষের যতটুকু ব্যথা লাগে ততটুকু ব্যথা বাদবাকী ভারতের বুকে লাগিল না।

৩

ভোজদেব রাজা মুঞ্জের (দ্বিতীয় বাক্-পতিরাজ) ভ্রাতুষ্পুত্র। অপুত্রক রাজা তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা "মুঞ্জ" অত্যন্ত পরাক্রমী, সুপণ্ডিত এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি প্রত্যন্ত রাজ্যসমূহের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। কর্ণাট্‌রাজ দ্বিতীয় তৈলপ এবং গুজরাটের চালুক্যবংশীয় রাজা ভীম মালব-রাজ্য জয় করিবার জন্য একাধিক অভিযান করিয়াছিলেন। রাজা মুঞ্জ গুজরাটবাহিনীকে পরাজিত করিয়া মেবাড় ও রাজপুতানার পূর্ব্বার্দ্ধে আপন অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। হৈহয়-কলচুরি বংশীয় দ্বিতীয় যুবরাজদেবকে পর্য্যুদস্ত করিয়া তিনি হৈহয় রাজধানী ত্রিপুরী বিধস্ত করেন। কর্ণাটক-অধিপতি সোলঙ্কী দ্বিতীয় তৈলপ মালব আক্রমণ করিয়া ছয় বার পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু নীতিনিপুণ মন্ত্রী রুদ্রাদিত্য প্রতিবার রাজমুঞ্জকে স্বীয় রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া কর্ণাটরাজের পশ্চাদ্ধাবন হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন। সপ্তম বার তিনি গোদাবরী পার হইয়া বিজয়োল্লাসে কর্ণাটরাজ্য লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অতঃপর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তৈলপের হস্তে বন্দীদশা প্রাপ্ত হইলেন। তৈলপ কুশতৃণের মত তীক্ষ্ণধার মুঞ্জ ঘাসের দড়ি দিয়া বাঁধিয়া মহারাজ মুঞ্জকে কিছুদিন কাঠের পিঁজরায় আবদ্ধ রাখিলেন। পরে নিতান্ত নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া তাঁহার ছিন্নমুণ্ড শূলে চড়াইয়া আপন ক্রোধ শান্ত করিলেন। কর্ণাট কারাগারে মুঞ্জের শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিন্ধুরাজ (সিন্ধুল) মালব-রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। সুলতান মামুদ যখন কনৌজ ও মথুরা আক্রমণ করেন তখন গুজরাট ও মালব আত্মবিগ্রহে উন্মত্ত। গুজরাটের রাজা সোলঙ্কী চামুণ্ডরায়ের সহিত এক যুদ্ধে ভোজদেবের পিতা সিন্ধুরাজ নিহত হইলেন।

মালবের রাজধানী রাজা মুঞ্জের রাজত্বকালেই বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত ধারানগরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এই ধারানগরীতে কোন এক অজ্ঞাত দিবসে যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে কুমার ভোজদেব অনাথা মালব রাজলক্ষ্মীর আমন্ত্রণে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর ধারা শুভাধারা এবং সরস্বতী শুভাধিষ্ঠিতা হইলেন। কলচুরি, কর্ণাট এবং সৌরাষ্ট্রের সহিত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পুরুষপরম্পরা "বৈর" চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং রাজ্যারোহণের পর রাজা ভোজের ত্রিশঙ্কু অবস্থা। রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পিতার মৃত্যুর পরিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি গুজরাট আক্রমণের সঙ্কল্প করিলেন। ধারানগরীর বাহিরে বিজয়স্কন্দাবার বিজয়-পতাকায় সুসজ্জিত এবং মালববাহিনী জয়যাত্রার উৎসবে মাতিয়া উঠিল। কবিগণ মালবরাজগণের যশোগীতি গাহিয়া এবং চিত্রকরগণ নির্জ্জিত শত্রু-রাজগণের ছবি দেখাইয়া সৈন্যদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য আদিষ্ট হইল। এই সময়ে রাজা ভোজের সভায় "ডামর" (দামোদর) নামক গুজরাটের দূত উপস্থিত। "ডামর" ছিল অতি কদাকার এবং অতি ধূর্ত্ত। তাহাকে জব্দ করিবার জন্য রাজা ভোজ একখানা ছবি দেখাইলেন; ইহা রাজা মুঞ্জের কারাগৃহের চিত্র—

কোণে কৌঙ্কনকঃ কপাটনিকটে লাট কলিঙ্গোঽঙ্গনে।
ত্বং রে কোশল! নূতনো মম পিতাপ্যোঽত্রোষিতঃ স্থণ্ডিলে।
কারাগারের এক কোণে হতভাগা কোঙ্কণের (মহারাষ্ট্র) রাজা, কপাটের নিকটে "লাট", অঙ্গনে "কলিঙ্গ"। কর্ণাট-রাজ তৈলপ এক জায়গায় একটি পাকা বেদী দখল করিয়া আছেন দেখিয়া নবাগত কোশল-রাজের ঈর্ষা হইল। তিনি হাঁকিলেন, "হঠো"। তৈলপ তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন ; তুই বেটা "কোশল" নূতন আমদানী ; এই স্থণ্ডিল ছিল আমার বাপের, তারপর হইতে আছি আমি। এইভাবে জেলখানায় একটু মাথা গুঁজিবার জায়গার জন্য কারাবদ্ধ রাজগণের ঝগড়া, ধাক্কাধাক্কি ইত্যাদি।

গুজরাটের চর শিয়াল পণ্ডিত "ডামর" পটখানা দেখিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সে বলিল, অতি চমৎকার কল্পনা মহারাজ—প্রায় নিখুঁত ; তৈলপের হাতে আপনার জ্যেষ্ঠতাত প্রবলপ্রতাপ সম্রাট্ মুঞ্জের কাটা মুণ্ডটি চিত্রিত হয় নাই কেন? রোষে ক্ষোভে রাজা ভোজ তখনই হুকুম দিলেন, মালবসেনা প্রথমে কর্ণাটের দিকে কুচ করুক, সৌরাষ্ট্রের পালা আসিবে ইহার পরে। ডামরের চালে রাজা ভোজ মাৎ হইয়া গেলেন।

৪

রাজ্যারোহণের পর সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর (আনুমানিক) রাজা ভোজ তাঁহার প্রবল শত্রু চেদী, কর্ণাট এবং গুজরাট রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধে জয়-পরাজয় অবশ্যই ছিল। ইহা ঐতিহাসিক ব্যাপার ; সুতরাং এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। এই ইতিহাস যেন কবির পান্টা, কে কাহাকে যুদ্ধে কখন হারাইয়াছিল কবিদের উৎপাতে জানিবার যো নাই। প্রত্যেক রাজার সভায় বিদ্যার সমাদর ছিল, বিচক্ষণ কবিগণ তাঁহাদিগের সভা অলঙ্কৃত করিতেন। বিজয়লব্ধ তিলকে তাল করিবার, হাত সাফাই কিংবা পরাজয়কে মহান্ বিজয়রূপে কাব্যে অমরত্ব দান করিবার নিঃসঙ্কোচ বিবেক, নিরঙ্কুশ কল্পনা এবং মুখর রসনার জন্য কবিগণ চিরকালই প্রসিদ্ধ। কাব্যে অন্য রকম ঐতিহাসিক মাল-মসলা বিস্তর পাওয়া যায় ; কিন্তু ইতিহাসের মেরুদণ্ড-স্বরূপ সময়ানুক্রম সন তারিখ, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা কাব্যে প্রত্যাশা করা মরীচিকাভ্রম। অমূলক কিংবা স্বকল্পিত জনশ্রুতিকে আশ্রয় করিয়া তথাকথিত "চরিত্র" লেখকগণ ইতিহাস-উদ্যানের কণ্টকগুল্ম-স্বরূপ। রাজবল্লভ-রচিত "ভোজ-চরিত" পুস্তকে লিখিত আছে—মহারাজ মুঞ্জের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য ভোজদেব কর্ণাটক অভিযান করিয়া তৈলপকে বন্দী করেন, এবং অনুরূপ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করেন। অথচ ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন—দশম শতাব্দীর শেষপাদে ভোজের রাজ্যারোহণের ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে তৈলপ পরলোকগমন করিয়াছিলেন। এই যুগে প্রশস্তিকারগণ মিথ্যাকে কায়েমী ভাবে পাকা করিবার অনুশাসন রচনা করিয়াছেন ; পরবর্ত্তীকালে মিথ্যাপ্রশস্তি এবং কূট তাম্রশাসনও প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রমাণ : (১) উদয়পুর (গোয়ালিয়র) প্রশস্তি :—

চেদীশ্বরেন্দ্ররথ [তোগ্‌গ] ল [ভীমমু] খ্যান্
কর্ণাটলাটপতি-গুর্জর-রাট্ তুরুষ্কান্।

অর্থাৎ চেদীশ্বর [হৈহয় বংশী কলচুরী গাঙ্গেয় দেব], ইন্দ্ররথ, তোগ্‌গল [*Tughral* Turkish chief], ভীম [সোলঙ্কী ভীমদেব প্রথম ?] গুর্জররাষ্ট্র [গুর্জর প্রতীহার] এবং তুরুষ্ক [মুসলমান] দিগকে পরাজিত করেন।

আমরা অন্য প্রমাণ অনুসারে পাইতেছি এই সময়ে গুজরাটসেনা মালব সৈন্যকে পরাজিত করিয়াছিল, ভোজদেব কিছুদিন ভীমের কারাগারে বন্দী ছিলেন ইত্যাদি। একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কোন "তোগ্‌গল" দিল্লীর দক্ষিণে আসিয়াছিল প্রমাণ নাই। সুলতান সিহাবুদ্দীন ঘোরীর সেনাপতি বাহাউদ্দীন তোগ্রল সর্ব্বপ্রথম মালব জায়গীর পাইয়াছিলেন, গোয়ালিয়রের হিন্দুরাজার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল রাজা ভোজের মৃত্যুর চল্লিশ বৎসর পরে। তুরুষ্কদিগকে পরাজিত করিবার গৌরব অর্জ্জন করিতে পারিলে ভোজদেব প্রকৃতই দ্বিতীয় "শকারি" [রাজপুতানায় মুসলমানদিগকে "শক" বলা হইত] বিক্রমাদিত্য হইতেন, সুলতান মামুদের মৃত্যুর পরও উত্তর-ভারতের হিন্দুরাজগণ "তুরুষ্কদণ্ড" নামক কর আদায় করিতেন না। হিন্দুজাতির বিক্রম পর্ব্ব হইবার পরেই ইতিহাসে এই যুগে অবন্তীর যশঃস্পর্দ্ধী অন্যত্র একাধিক "বিক্রমাদিত্য" দেখা দিয়াছিল। রাজা ভোজের তাম্রলিখিত এক দানপত্রে (১০৭৬ বিঃ সম্বৎ) কোঙ্কণবিজয় উৎসবে এক ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ ভূমিদান করিয়াছিলেন—গোটাই অনুমান, ইহার উপর "স্বয়ং ভোজদেবকে" হস্তাক্ষর আছে! কোঙ্কণ শব্দ যদি বঙ্গের অন্তর্গত মারাঠা "কোঁকণ" দেশ বুঝায় তাহা হইলে "কোঙ্কণ-বিজয়" হয় মিথ্যা আত্মপ্রসাদ, না হয় দানপত্র কৃত্রিম।

আয়নায় দোষ থাকিলে চেহারা ছোট বড় দেখায়। ইতিহাসদর্পণেরও এই ধর্ম্ম। কোন প্রকার "প্রেম"—যথা দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম-কর্ত্তৃক যদি ইতিহাসমুকুর রূপান্বিত হয় তাহা হইলে তিলকে তাল দেখায় ; রাজা ভোজ সম্রাট্ ভোজ হইয়া পড়েন, তাঁহার রাজ্যসীমা পূর্ব্বদিকে চেদি কনৌজ, কাশী, বঙ্গবিহার, উড়িষ্যা, আসাম ; দক্ষিণ দিকে বিদর্ভ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট-কাঞ্চী ; পশ্চিমে গুজরাট সৌরাষ্ট্র

লাট ; উত্তরে চিতোর, সান্তর কাশ্মীর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়ে—প্রায় আসমুদ্র-হিমাচল কিছুই বাদ থাকে না ! এই দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ ? ইতিহাসের "মুগ্ধবোধ" যাঁহারা আয়ত্ত করেন নাই তাঁহাদিগের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ পরবর্ত্তীকালের এক কবির অত্যুক্তি—

"কেদার-রামেশ্বর-সোমনাথ-সুণ্ডীর-কালানল-রুদ্রসৎক্তৈ"

ইহার উপর অনুমান চলিয়াছে সুণ্ডীর বাঙ্গালার "সুন্দরবন", "কালানল"টা ঠিক ঠাহর করিতে পারেন নাই—মনে হয় কাঙ্গরার জালামুখী। এই সমস্ত স্থানে এক এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্রাট্ জগতীতলে নিজ নামের সার্থকতা প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার উপর জনশ্রুতিমূলক প্রমাণও পাওয়া যায়। রাজা ভোজ এক দিন খলিফা হারুন অল রশীদের মত ছদ্মবেশে শহরে বাহির হইয়াছিলেন। দৈবক্রমে এক "দিগম্বর" জৈন সাধুর সহিত রাজার বার্ত্তালাপ হইল। সাধু দুঃখ করিয়া বলিলেন, 'জন্মটা আমার বৃথাই গেল, না যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইতে পারিলাম, না গার্হস্থ্যসুখ কপালে জুটিল।' পরদিন প্রাতঃকালে রাজসভায় সাধুর ডাক পড়িল। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার শক্তি কত দূর ? সাধু উত্তর দিলেন,

দেব ! দীপোৎসবে জাতে প্রবৃত্তে দন্তিনাং মদে।
একচ্ছত্রং করোম্যহং সগৌড়ং দক্ষিণা-পথম্ ॥

[দীপমালিকা ব্রতারম্ভে এবং হস্তিগণ মদধারা ক্ষরণে প্রবৃত্ত হইলে অর্থাৎ শরৎ সমাগমে আমি গৌড়দেশ হইতে দক্ষিণাপথ অবধি সমস্ত ভূমি একচ্ছত্র করিতে পারি।]

সাধুর নাম ছিল কুলচন্দ্র। তিনি রাজা ভোজের সেনাপতি-পদ গ্রহণ করিয়া রাজা ভীমের রাজধানী পাটননগরী (অনহলওয়ারা পট্টন) বিধ্বস্ত করেন। বাদবাকী ভারতবিজয় বোধ হয় ইনিই করিয়াছিলেন ; তবে সেনাপতি "কুলচন্দ্র" এই বৃহৎ ব্যাপারে কয়টি "অর্দ্ধচন্দ্র" খাইয়াছিলেন জানা নাই।

৫

রাজা ভোজের কীর্ত্তি কালপ্রভাবে ম্লান না হইয়া নির্জ্জিত হিন্দুজাতির হৃদয়ে উজ্জ্বলতর অথচ অবাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যপুরাণে ভোজের এক চমৎকার বর্ণনা আছে। এই ভবিষ্যপুরাণ সাধারণ প্রচলিত পুথি হইতে স্বতন্ত্র—বোধ হয় খোট্টাই সংস্করণ ; কোথাও "ভবিষ্যৎকালের" প্রয়োগ নাই ; যাহা কিছু লেখা হইয়াছে সবই মহর্ষি সূত বলিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণে আছে—

ভোজরাজ দশ হাজার সৈন্য এবং [কবি] কালিদাসকে লইয়া সিন্ধু নদী পার হইয়াছিলেন। তিনি গান্ধারবাসী ম্লেচ্ছ, কাশ্মীর, আরব এবং "শট" [পাঠান ?]দিগকে পরাজিত করিলেন। ইহার পর তিনি "মরুস্থলনিবাসী" [মক্কাস্থিত ?] মহাদেবকে পঞ্চগব্য সমন্বিত গঙ্গাজল দ্বারা স্নান এবং চন্দনাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া নিম্নোক্ত স্তব পাঠ করিলেন—

"নমস্তে গিরিজানাথায় মরুস্থলনিবাসিনে।
ত্রিপুরাসুরনাশায় বহুমায়া প্রবর্ত্তিনে ॥
ম্লেচ্ছৈর্গুপ্তায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দ-রূপিণে।
ত্বং মাং হি কিংকরং বিদ্ধি শরণার্থমুপাগতম্ ॥

ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক গুপ্ত দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হইয়া রাজা ভোজকে বলিলেন, বাহীক দেশ [পঞ্জাব সিন্ধু এবং সিন্ধু নদীর পশ্চিম দেশসমূহ] ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক সুদূষিত হইয়াছে। এই দারুণ বাহীকদেশে আর্য্যধর্ম্ম কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। দৈত্যরাজ বলি কর্ত্তৃক প্রেরিত যে মায়াবী ত্রিপুরকে আমি এই স্থানে কোপানলে দগ্ধ করিয়াছিলাম সেই অসুর "দৈত্যকুলবর্দ্ধন" পৈশাচিক কার্য্যে তৎপর "মহামদ" নামে এই দেশে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। হে রাজন্ ! তুমি ধূর্ত্তগণ অধ্যুষিত, পিশাচকর্ম্মাগণের দেশে গমন করিও না। আমার প্রসাদে এই স্থানে আগমনজনিত পাপমুক্ত হইয়া তুমি শুদ্ধ হইবে।

এই কথা শুনিয়া রাজা ঐ স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সিন্ধুতীরে উপস্থিত হইলেন। রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ "মহামদ" চেলা-চামুণ্ডা লইয়া সিন্ধুতীরে আসিয়াছিল, "মায়ামদ-বিশারদ" মহামদ অতি প্রেমভরে রাজাকে বলিল, মহারাজ ! তোমার দেবতা আমার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। দেখ, সে আমার উচ্ছিষ্ট খাইতেছে। রাজা যে রকম শুনিলেন সেই রকমই [দেবতাকর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট ভোজন] চোখে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, দারুন ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণে তাঁহার মতি হইল। ইহা শুনিয়া কালিদাস হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "রে বাহীকপুরুষাধম ধূর্ত্ত ! তুই রাজাকে সম্মোহিত করিবার জন্য মায়া সৃষ্টি করিয়াছিস্। আমি তোকে বধ করিব।" অতঃপর কালিদাস কোন মন্ত্রবিশেষ দশ সহস্র বার জপ এবং যজ্ঞে এক হাজার বার হোম প্রদান করিলেন। মায়াবী মহামদ ভস্ম হইয়া ম্লেচ্ছ-সম্প্রদায়ের দেবতা হইয়া গেল। "মহামদের" শিষ্যগণ মদগর্ব্ব ত্যাগ করিয়া ঐ ভস্মরাশি সহ ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে "বাহীক" [আরব ?] দেশে পলাইয়া গেল। ঐ স্থানে মরুভূমির মধ্যে ঐ ভস্ম প্রোথিত হইল এবং উহা ম্লেচ্ছদিগের তীর্থস্বরূপ "মদহীন" [মদিনা] শহর নামে বিখ্যাত হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই। সেই "বহুমায়া-বিশারদ" পিশাচ-দেহ ধারণ করিয়া রাত্রিকালে ভোজরাজকে বলিতে লাগিল, "হে রাজন্ ! আপনার আর্য্যধর্ম্ম "সর্ব্ব-

ধর্ম্মোত্তম" বলিয়া পরিচিত। আমি ঈশ্বরের আদেশে দারুণ "পৈশাচধর্ম্ম" প্রচার করিব, আমার ধর্ম্মাবলম্বী জনগণ "লিঙ্গচ্ছেদী" [সুন্নত ক্রিয়াশীল], মস্তকে "শিখাহীন", "শ্মশ্রুধারী" স্বজনে ব্যভিচারী "উচ্চালাপী" এবং "সর্ব্বভক্ষী" হইবে। "কৌল" [বরাহ] ব্যতীত সমস্ত পশু তাহাদের ভক্ষ্য হইবে। "মুসল" দ্বারা তাহাদের সংস্কার হইবে এবং তাহারা কুশতৃণের ন্যায় [বহুবিস্তার] হইবে। এইরূপে "মুসলবন্ত" [মুষলধারী] "ধর্ম্মদূষক" জাতিগণের উৎপত্তি হইবে এবং আমার প্রতিষ্ঠিত "পৈশাচধর্ম্ম" বিস্তার লাভ করিবে।"

[ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গ পর্ব্ব, খণ্ড ৩, অধ্যায় ৪ পৃঃ ২৮৩]

হিন্দুগণ রাজা ভোজকে "শৈব" কিংবা জৈনমতাবলম্বী বলিয়া দাবি করিলেও মুসলমানের দৃঢ় বিশ্বাস রাজা ভোজের মত ব্যক্তি কাফের হিন্দু হইতেই পারে না। ধারানগরীর আবদুল্লা শাহ চঙ্গাল নামক ফকিরের কবরের উপর হিঃ ৮২৯ সনে [১৪২২ খ্রীঃ] খোদাই-করা এক শিলালিপিতে উল্লেখ আছে, রাজা ভোজ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আবদুল্লাহ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। "গুলদস্তে অবর" (?) নামক এক উর্দ্দ-পুস্তিকায় লেখা আছে আবদুল্লাহ্ শাহ ফকিরের কেরামতী দেখিয়া রাজা ভোজ তাঁহার কাছে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রাজা ভোজের সমসাময়িক অল বেরুণী কিংবা পরবর্ত্তী কালে ঐতিহাসিক আবুল ফজল-ফিরিশতা, কিংবা সম্রাট্ জাহাঙ্গীর এইরূপ উদ্ভট কথা লিখেন নাই। গায়ের এবং গলার জোরে মুসলমানেরা রাজগৃহে বুদ্ধদেবকে মকদুমশাহ, দেবদত্তকে ইবলিস করিয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র এবং বিশেষতঃ বাংলাদেশে বহুপূর্ব্বে চিতারূঢ় হিন্দুপ্রধানগণকে পীর-ফকির বানাইয়াছে, সুতরাং রাজা ভোজ বাদ পড়িবেন কেন ?

দিল্লী এবং হরিদ্বারে ঐতিহাসিক স্বকর্ণে শুনিয়াছে "মক্কেশ্বর" শিব কাবাশরীফে আত্মগোপন করিয়া আছেন। ১৯২১ কিংবা ২২ সালে হরিদ্বারে অর্দ্ধকুম্ভ মেলায় এক নাগা সন্ন্যাসীর ধুনীর চারিপাশে লোকের ভিড় দেখিয়া আমিও দাঁড়াইলাম। তখন সন্ন্যাসী জোরগলায় মুসলমানভীত হিন্দু-গণকে অভয়বাণী শুনাইতেছিলেন—"মুসলমানকে ভয় কি ? উহারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত ; শিব তাহাদের ইষ্টদেবতা যিনি মক্কায় আছেন। ঐ শিবের মাথায় একবার জল-বিল্বপত্র চড়াইতে পারিলেই মুসলমানের সুবুদ্ধি ফিরিয়া আসিবে। আমরা ছাড়া ঐ কাজ অন্য কেহ করিতে পারিবে না।" হঠাৎ আমার মনে পড়িল এই নাগা-সন্ন্যাসীরাই নগদ চারি টাকা এবং দালরুটির খাতিরে পাণি-পথের তৃতীয় যুদ্ধে গোঁসাই উমরাওগীর ও অনুপগীর বাবাজীর অধীনে আব্দালীর পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বহু মারাঠা বধ করিয়াছিল। ইহাদের সুবুদ্ধি কখন উদয় হইবে ?

দিল্লীতে এক আর্য্যসমাজী বন্ধু বলিয়াছিলেন আফ্রিকা-প্রবাসী একজন আর্য্যসমাজী কাবাশরীফে বিল্বপত্র চড়াইবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছে। পরে কি হইল শুনিবার পূর্ব্বেই দিল্লী ছাড়িয়া আসিয়াছি। আর্য্যসমাজীর যাঁহা কথা তাঁহা কাজ ; হয়ত বেলপাতা চড়াইয়া ফল বিপরীত হইয়াছে, আর্য্যসমাজীগণ লাহোর হইতে উৎখাত হইয়া দিল্লী আসিয়াছেন।

৬

রাজা ভোজের বিদ্যা ও ভোজবাজীর উৎপত্তি-বিষয়ক আলোচনার পূর্ব্বে তাঁহার যশঃস্পর্দ্ধী বাঙ্গালী "গঙ্গারাম তেলী"র জন্মকথার উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ধারা বা বর্ত্তমান ধার নগরীতে একটি মসজিদ আছে, লোকে উহাকে "লাট মসজিদ" বলে। উহা প্রথমে রাজা ভোজ প্রতিষ্ঠিত একটি দেবমন্দির ছিল। উক্ত দেবমন্দির হিঃ ৮০৩ (১৪০৪ ইং) সালে মালবের প্রথম স্বাধীন মুসলমান শাসক দিলাবর খাঁ ঘোরী ঐ মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করেন। এই মসজিদের পাশেই লৌহনির্ম্মিত একটি স্তম্ভ পড়িয়া আছে এই জন্য উহা "লাট মসজিদ" নামে জনসাধারণের কাছে পরিচিত। এই "লাট" সম্বন্ধে এক অদ্ভুত গল্প আছে। এক সময়ে নাকি ধারানগরীতে গাংগলী বা গাংগী নামে এক তেলী-বৌ ছিল। সে আসলে ছিল রাক্ষসী। গাংগী-র এক বিরাট বাটখারা ছিল, লোহার ঐ লাটটি ছিল রাক্ষসে বাটখারার মাঝখানের ডাণ্ডা। সরিষার বদলে সে প্রতি রাত্রে হস্তকণ্ডুয়ন নিবৃত্তির জন্য ঐ বাটখারাতে বড় বড় পাথর ওজন করিয়া স্তূপ করিত —ঐ সমস্ত পাথর এখনও পড়িয়া আছে। পরে কেমন করিয়া রাজা ভোজের নামের সহিত গাংগালী বা গাংগীর নাম জনশ্রুতি জুড়িয়া দিল কেহ বলিতে পারে না ; অথচ মালব তথা সমগ্র উত্তর-ভারতে লৌকিক কথা চলিয়া আসিতেছে, "কহাঁ রাজা ভোজ ঔর কহাঁ গাংগলী তেলন্"—ইহা একটি বিসদৃশ বস্তুর তুলনায় প্রতি ইঙ্গিত। বাংলাদেশে এই কথা কখন কি ভাবে ঘরে ঘরে "কোথা রাজা ভোজ, কোথা গঙ্গারাম তেলী" হইয়া গেল জানা যায় না। অবন্তী হইতে এই হিন্দুস্থানী লৌকিক বাক্য হয়ত বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছিল। যাহা হউক, "গাংগলী তেলন্" লিঙ্গপরিবর্ত্তন করিয়া "গঙ্গারাম তেলী" হইতে পারে কিনা ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌গণ বিচার করিবেন। এই দেশেও ঐ জনশ্রুতির

ঐতিহাসিক রূপ আবিষ্কার করিবার জন্য গবেষণা চলিতেছে।

রাজা ভোজ ধারা নগরীতে সংস্কৃত ভাষার উন্নতিকল্পে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। উহার আদি নাম ছিল "ভোজশালা"। ভোজের বংশধর অর্জ্জুন বর্মার সময়ে লিখিত "পারিজাত মঞ্জরী" নাটকে ইহার নামোল্লেখ হইয়াছে "শারদা-সদন"। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অংশে রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার হল ছিল। এইখানে নাটিকাদির অভিনয় হইত। হিঃ ৮৬১ (১৪৫৭ ইং) মালবের সুলতান মামুদশাহ্ খিলজী "শারদা-সদন" হইতে সরস্বতীকে বিতাড়িত করিয়া উহাকে মসজিদে পরিণত করেন। এই মসজিদের প্রস্তরখণ্ডে খোদাই-করা সংস্কৃত নাটক ও কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মসজিদ এখন "কামাল মৌলার মসজিদ" বলিয়া পরিচিত। ডাঃ প্রাণনাথ শুক্ল একটি প্রবন্ধে এই স্থানে প্রাপ্ত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভাবার্থ—যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ "গাঙ্গেয়" নামা শক্তিশালী রাক্ষসকে এবং অর্জ্জুন "গাঙ্গেয়" ভীষ্মকে বধ করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন সে প্রকার হে ভোজ! তুমিও ত্রিপুরীপতি "গাঙ্গেয়" (বিক্রমাদিত্যকে) এবং ত্রিকলিঙ্গের রাজধানী কল্যাণপুরের চালুক্য-নরপতিকে পরাজিত করিয়া যশস্বী হইয়াছ।

হিন্দী ভাষায় "রাজা ভোজ" রচয়িতা শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর নাথ রেউ অনুমান করিয়াছেন—পরবর্ত্তী কালে আসল ইতিহাস লুপ্ত হওয়ায় সাধারণ লোক "কঁহা রাজা ভোজ কঁহা গাঙ্গেয় ঔর তৈলঙ্গ"—এই পূর্ব্বপ্রচলিত লোককথায় উক্ত রাজাদের নামের জায়গায় "গাংগলী" গাংগী তেলেনী অথবা "গাঙ্গু তেলী"-র নাম ঢুকাইয়া দিয়াছে। তিনি আরও বলেন লাট মসজিদের লৌহস্তম্ভটি হয়ত রাজা ভোজ উক্ত দুই জন রাজাকে পরাজিত করিয়া বিজয়স্তম্ভ-স্বরূপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় উহা মন্দির-প্রাঙ্গণের ধ্বজদণ্ড যেমন কুতব-মসজিদের লোহার লাট। ইহাও হইতে পারে কর্ণাটরাজ মহাপরাক্রমী দ্বিতীয় তৈলপের খ্যাতিকে ম্লান করিবার জন্য "তৈলপ"-কে পরাজিত মালববাসীরা তেলী করিয়াছে। হিন্দুস্থানী "গংগু তেলী' বাংলায় হয়ত প্রথমে "গঙ্গা তেলী" পরে "গঙ্গারাম তেলী" হইয়াছে।

৭

রাজা ভোজ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কিংবা করাইয়াছিলেন। তাঁহার সভা ছিল পাণ্ডিত্যের পরীক্ষামণ্ডপ। তাঁহার রাজত্ব পণ্ডিত ও কবিগণেরই রাজ্য ছিল। ছয় শতের অধিক শাস্ত্রজ্ঞ এবং সুরসিক কবিকে তিনি রাজার হালেই রাখিয়াছিলেন। রাজা ভোজের ঐশ্বর্য্য এবং দানশীলতার পরিমাপ তাঁহার সভাপণ্ডিতগণে উঠানেই পাওয়া যাইত। পণ্ডিতের বাড়ী যেন এক একট বাদশাহী মহল। স্ত্রী কয়টা ছিল বলা যায় না, তবে প্রতি রাত্রে নারীগণের ছিন্ন মুক্তাহার হইতে গলিত মুক্তার দানাগুলি দাসীরা প্রাতঃকালে ঝাঁট দিয়া উঠানের এ কোণে স্তূপ করিয়া রাখিত; অলক্তরঞ্জিত তরুণীগণে মন্দাক্রান্তা পাদন্যাসে শ্বেত মুক্তারাজি অভিমানে লাল হই উঠিত। কেলিসহচর শুকপক্ষী রক্তাভ মুক্তাকে দাড়িম্ব বী ভ্রমে চঞ্চুপুটে গ্রহণ করিয়া আশা-ভঙ্গ-জনিত ক্ষো ট্যাঁ ট্যাঁ করিত। কবি বিল্হন সুদূর কাশ্মীর হইতে শুনিয় ছিলেন গৃহবলিভুক্ পারাবতগণ রাজা ভোজের ইঙ্গিত ধারানগরীর প্রাসাদ-অলিন্দ হইতে বকম বকম করি তাঁহাকেই স্বাগত নিবেদন করিতেছে। কবি ঊর্দ্ধশ্বা কাশ্মীর হইতে ধারানগরীতে পৌছিয়া শুনিলেন, ধারানগরী নিরাধারা, সরস্বতী নিরালম্বা, পণ্ডিতগণ মহামহীরুহচ্যু ব্রততীর ন্যায় ভূপাতিত, রাজা ভোজ দিব্যধামে প্রয়া করিয়াছেন।

রাজা ভোজের রাজ্যে স্ত্রী ও শূদ্র ব্যতীত সকলে সংস্কৃত ভাষায় বার্ত্তালাপ করিত। তাঁহার পোষা তোত এবং বাথানের মহিষ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ছন্দে মনের কথা প্রকা করিতে পারিত এইরূপ দৃষ্টান্তও আছে। দুঃখের বিষ যাহার বিদগ্ধ পাণ্ডিত্য ও রসগ্রাহিতার প্রশংসায় সম ভারতবর্ষ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল সেই ভোজদেব এক দি স্ত্রীর কাছে মূর্খ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। বাহিরে যিনি যত বড় পণ্ডিত বাড়ীর ভিতরে পা বাড়াইলে তিনি তত বড় অজমূর্খ। ভোজরাজমহিষী এক দিন অন্দরমহলে সখী সহিত বিশ্রম্ভরসালাপে মশগুল ছিলেন। এমন সময় সভা বিদায় করিয়া রাজা অন্তঃপুরে আসিলেন; একটা কাব্যসমস্যা তাঁহার মাথায় ছিল, সুতরাং কিছু অন্যমনস্ক। তিনি হঠাৎ রাণীর সামনে আসিয়া পড়িলেন, সখী ঘোমটা টানিয়া অদৃশ্য হইল। এইভাবে রসভঙ্গ হওয়াতে রাণী কুপিত হইয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "মূর্খ"। কথাটা রাজার মনে সূচীবৎ বিদ্ধ হইল, রাজা ভোজ মূর্খ? যথার্থ মূর্খ হইলে রাজা হয়ত রাণীকে একপ্রস্থ প্রহার করিতেন; কিন্তু "মূর্খ" কথাটাই তাঁহার কাছে হইল এক পণ্ডিতী সমস্যা। পরদিন সভায় পণ্ডিতগণ একে একে উপস্থিত হইবামাত্র রাজা কিঞ্চিৎ রুষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন,

---

* মুক্তাঃ কেলিবিসূত্রহার—গলিতাঃ সম্মার্জনীভির্হৃতাঃ।
প্রাতঃ প্রাঙ্গনসীম্নি মন্থরচলদ্ বালাঙ্ঘ্রি লাক্ষারুণাঃ।
দূরাদ্দাড়িম্ববীজশঙ্কিতধিয়ঃ কর্ষন্তি কেলিশুকাঃ।

[কাব্য-প্রকাশম্]

"মূর্খ"। সকলেই অবাক্ অথচ নিরুত্তর। এই সময় কালিদাস হাজির হইলেন এবং "মূর্খ" শব্দ দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইলেন। কালিদাস হাসিয়াই বলিলেন—

"খাদন্নগচ্ছামি হসন্ন জল্পে।
গতং ন শোচামি কৃতং ন মন্যে॥
দ্বাভ্যাং তৃতীয়ো ন ভবামি রাজন্।
কিং কারণং ভোজ ভবামি মূর্খঃ॥"

"হে রাজন! রাস্তায় চলিবার সময় আমি খাইতে খাইতে [যথা চানাচুর বাদামভাজা] চলি না; কথা বলিবার সময় অট্টহাস্য করি না; গত বিষয়ের জন্য অনুশোচনা কিংবা কৃতকার্য্যতা হেতু অহঙ্কারও আমার নাই। [বার্ত্তালাপে রত] দুই জনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিও আমি হই না, তবে কি জন্য আমি মূর্খ হইব?"

বাঙালীমাত্রেরই অতঃপর সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

৮

কলহান্তরিতা ভোজরাজপ্রিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ণিমার অদ্ধরাত্রে রাজার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চোখ মেলিয়া দেখিলেন শ্লথবসনা নিষ্কলঙ্ক শশীকলা গাঢ় সুষুপ্তির অঙ্কশায়িনী। গবাক্ষজাল বিচ্ছুরিত চন্দ্রিকা রাণীর বুকে মুখে পড়িয়াছে, জ্যোৎস্নার গায়ে ছায়ার কাটা দাগ। আত্মহারা হইয়া রাজা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কবিতার এক চরণ আবৃত্তি করিলেন—

"গবাক্ষমার্গ-প্রবিভক্ত-চন্দ্রিকো
বিরাজতে বক্ষসি সুভ্রু! তে শশী।"

দ্বিতীয় পাদ পূরণ করিতে না পারিয়া তিনি বার বার ঐ পদ আওড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ নেপথ্যে কেহ বলিয়া উঠিল—

"প্রদত্তঝম্পঃ স্তনসঙ্গবাঞ্ছয়া
বিদূরপাতাদিব খণ্ডতাং গতঃ॥

রাজা বুঝিতে পারিলেন তৃতীয় ব্যক্তি আশেপাশে নিশ্চয়ই কোন মতলবে লুকাইয়া আছে। তারপর চোর ধরাধরির ব্যাপার। প্রতঃকালে চোর রাজসভায় আনীত হইল, রাজা সরাসরি প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। চোর কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া সুললিত ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় রাজাকে এক নিবেদন জানাইল। ভাবার্থ—

"মহারাজ! "ভ"-কার আদ্য নামের রাশিতে যমরাজ প্রবেশ করিয়াছেন। ভট্টি, ভারবি, ভিক্ষু, এবং সুকবি ভীমসেন মরিয়াছেন, বাকী মাত্র আমরা দুই জন; একজন স্বয়ং ভূপতি ভোজ এবং দ্বিতীয় আমি—চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হতভাগা ভূকুণ্ড। এক জনের পরেই এই বার আর এক জনের পালা।"

এই কবি ভূকুণ্ড ছিলেন নবাগত প্রত্যর্থী। গতানুগতিকভাবে প্রশস্তি পাঠ করিয়া সভায় পরিচিত হইবার পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া তিনি এক মৌলিক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, অন্দর মহলে চুরি কিংবা অন্য কোন মতলব তাঁহার ছিল না। কেহ কেহ হয়ত সন্দেহ করিবেন কবি কি করিয়া চোর হয়? ইতিহাসে বহু প্রমাণ আছে কবি শুধু চোর নয়, ডাকাত হইয়া রাহাজানিও করিতে পারে। খলিফা হারুন্ অল্-রশীদের সভাকবি আবুনেবাস কবিতা রচনার ক্লান্তি অপনয়ন এবং আনুষঙ্গিক উপরি রোজগারের লোভে প্রতিরাত্রে শহরের বাহিরে ডাকাতি করিবার জন্য বাহির হইতেন এবং বেকায়দায় পড়িলে নিজের সঠিক পরিচয় দিয়া সরিয়া পড়িতেন।

৯

রাজা ভোজের রাজধানীতে এক দরিদ্র অথচ বিদ্বান্ সুরসিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। স্বভাব কিঞ্চিৎ কুঁড়ে ও খরকুণো ছিল। একদিন ব্রাহ্মণী অসহিষ্ণু হইয়া উৎপাত আরম্ভ করিলেন—তাঁহাকে রাজসভায় যাইতেই হইবে। ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নচিত্তে অগত্যা রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কুতো আগম্যতে বিপ্র!"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—আজ্ঞে, কৈলাস হইতে সম্প্রতি আসিলাম।

প্রশ্ন হইল, "দেবাদিদেবের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল ত?"

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন—"বহু পূর্ব্বেই তাঁহার অঙ্গহানি হইয়াছিল, শিব সম্প্রতি মারা গিয়াছেন! ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সভাসুদ্ধ লোক অবাক্। ব্রাহ্মণ শ্লোকদ্বারা বুঝাইয়া দিলেন—

মহাদেব "হরিহর" হইয়া অর্দ্ধ অঙ্গ হারাইয়াছিলেন, বাকী অর্দ্ধেক গিরিজায়াকে প্রদান করিয়া অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়াছেন। তাঁহার বিভূতির কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। জটাচ্যুত হইয়া গঙ্গা সাগরগামিনী হইয়াছেন; কণ্ঠবিলগ্ন শেষনাগ পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন; মস্তকস্থিত শশীকলা আকাশে উঠিয়াছেন; শিবের সর্ব্বজ্ঞতা এবং ঈশ্বরত্ব আপনাকে আশ্রয় করিয়াছে। অবশিষ্ট ছিল ভিক্ষাবৃত্তি—উহা পড়িয়াছে আমার ভাগে।

রাজা খুশী হইয়া হুকুম দিলেন ব্রাহ্মণকে একটি "মহিষী" দান করা হউক; ছেলেমেয়ে দুধ খাইবে। ধূর্ত্ত রাজকর্মচারী একটি মহিষাসুর-গৃহিণীকে ব্রাহ্মণের কাছে হাজির করিল। ইহাকে লইয়া গৃহে ফিরিলে গৃহিণীর কাছে যে সম্বর্দ্ধনা পাইবেন ব্রাহ্মণের উহা বুঝিতে দেরী হইল না। তিনি মহিষের কাছে গিয়া হাতমুখ নাড়িয়া উহার

কানে বিড় বিড় করিতে লাগিলেন। রাজা ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ নিবেদন করিলেন, মহারাজ! "মহিষী" নারাজ, অধিকন্তু আমাকে গালি দিতেছে এবং বলিতেছে [সংস্কৃত ভাষায়]—ভাবার্থ

ভর্ত্তা মহিষাসুরকে দেবী ভবানী কৃতযুগে বধ করিয়াছেন। আমি বিধবা, স্তন শুকাইয়া গিয়াছে, দাঁত অবশিষ্ট নাই, শিং দুইটি ভাঙা, এই অবস্থা দেখিয়াও জিজ্ঞাসা করিতেছ আমার সন্তান সম্ভাবনা আছে কি? তোমার লজ্জা হয় না?

১০

রাজা ভোজের সভায় কবি কালিদাসের প্রতিপত্তি দেখিয়া অন্য কবিগণ ঈর্ষায় পুড়িয়া মরিতেছিল। কালিদাস লোকচক্ষুর অন্তরালে মৎস্য ভোজন করিতেন, কিন্তু স্বয়ং রাজা ভোজও ইহা জানিতেন না। এক দিন কালিদাস পুঁথির মত বাঁধিয়া বগলে করিয়া জ্যান্ত একটি মাছ লইয়া চলিয়াছেন, হঠাৎ তাঁহার শত্রুরা রাজাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে আটকাইয়া ফেলিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কক্ষে কিং?"—বগলে ওটা কি? কালিদাস কথায় হার মানিবেন কেন? তিনি উদাসীন ভাবে বলিলেন, "মম পুস্তকং।" রাজা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তোমার কিতাব হইতে জল পড়িতেছে কেন? কালিদাস হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! এটা আমার কবিতার আসল বস্তু রস জলের মত টস্ টস্ করিয়া পড়িতেছে।" আঁশটে গন্ধটা রাজার নাকে গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, গন্ধঃ কিম্? কালিদাস বলিলেন, কিছুই নয় মহারাজ!

"নন্থ রামরাবণবধাৎ সংগ্রামগন্ধোৎকটঃ।"

অর্থাৎ কাব্যে বর্ণিত রামকর্ত্তৃক রাবণবধজনিত সংগ্রামের উৎকট গন্ধ। রাজা নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন; বস্তুটি অস্থির দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাব্যটা প্রাণবন্ত মনে হয়, কেন?" জীবঃ কিম্? কালিদাস হাসিয়া বলিলেন, এই পুথিতে আমার মৃতসঞ্জীবনী "গৌড়-মন্ত্র" লিখিত আছে; সুতরাং ইহা ছটফট না করিয়াই পারে না। আবার প্রশ্ন হইল, লেজটা কিসের? কালিদাস বলিলেন, "তালপাতায় লেখা পুঁথির।"

ইহার উপর তালাশীর প্রশ্নই উঠে না। কালিদাস বাহাদুর বটে!

মাতৃরূপ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দূর পল্লীতে গিয়াছিনু এক—রুক্ষ নীরস দেশ,
  নাহিক কোথাও শ্যাম মমতার লেশ।
পিপাসু মরম পায় না খুঁজিয়া কোনোখানে কোমলতা,
  কিসের অভাব লাগে—জাগে বুকে ব্যথা।
একটা বাড়ীতে উঠিলাম গিয়া—আশ্রয় দিল শুধু।
  আতিথেয়তায় নাহিক একটু মধু।
ছেলেমেয়েগুলা পরুষ স্বভাব কর্কশ আচরণ
  বাৎসল্যের পায় নাই পরশন।

গৃহমাঝে রাজে গৃহস্বামীর জননীর ছায়াছবি
  ফিকে হয়ে গেছে ভক্তির দাগ লভি।
পূজে সন্তান ও চিত্রপট—পদতলে মাথা লোটে
  ছবিটি কিন্তু সুন্দর নয় মোটে।
সুন্দর নয়—দর্শনীয় তা বলা যায় না'ক কভু
  আকৃষ্ট হ'ল মোর আঁখি মন তবু।
তনয়ের চোখে মাতৃমূর্ত্তি দেবীমূর্ত্তি যে ভাই,
  এ সারা ভুবনে সমান উহার নাই।
অতি অনিন্দ্য অপরূপ ছবি হার মানে ওর কাছে,
  কিছুতেই নাই ও ছবিতে যাহা আছে।
আমি যাহা দেখি প্রস্তর—তাহা পরশমণি যে তার
  পৃথক চক্ষু চাই উহা দেখিবার।

দেখি আর ভাবি অনন্ত রূপে জননীর গতায়তি
  কখনো ষোড়শী কখনো বা ধূমাবতী।
মা আমার তাই মিশালেন রূপ দশমহাবিদ্যায়
  সুরূপা কুরূপা অপরূপ মহিমায়।
কভু কঙ্কালী, কখনো ভারতী, কভু ভুবনেশ্বরী—
  শুভঙ্করী মা কখনো ভয়ঙ্করী।
যে মাতা প্রসব করেছেন যাহা সুন্দর অসুন্দরে,
  যে রূপেই দেখি তাহাতেই মন ভরে।
লাবণ্য যাঁর ভুবন ভুলানো কুৎসিতও নন কম
  দুই সার্থক উভয়ই যে অনুপম।
কখনো ললিত, কখনো পূরবী, দীপক ও ভৈরবী
  এক কণ্ঠের সঙ্গীত তাঁর সবই।
তীব্র আমিষগন্ধী কুবাস, কভু কস্তুরী-বাস—
  গন্ধবহ যে তাঁরি এক নিঃশ্বাস।
যত অমৃত, ততই গরল, যত রূপ, তত ধ্বনি
  জননী আমার কি সুধা-মন্দাকিনী।
মোর প্রগল্ভ আঁখি পায় নাকো কোনো রূপ যেথা খুঁজি
  কত রূপ তিনি প্রসবিনী তা কি বুঝি?
চোখে এলো জল—বাক্ মন আঁখি হ'ল মোর সংযত
  অনাদর হ'ল আদরেতে পরিণত।

রামায়ণী কারবার

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

আমি তখন পূর্ব্ব-উড়িষ্যার একটি করদ রাজ্যে অরণ্যবিভাগের একজন ওভারসিয়ারের পদে নিযুক্ত আছি। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অরণ্যে কাজ করিতেছিলাম, ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী মিষ্টার সেন ডাকিয়া পাঠাইলেন, তল্পিতল্পা সমেত; বলিলেন—"মিষ্টার মুখার্জ্জি, পূবের দিকের জঙ্গলে একটু পাকারকম বন্দোবস্ত করতে চাই, গন্ড-বিজুরি আর মহুয়ালি একটা এলাকার মধ্যে না রেখে আলাদা আলাদা করে দু'জন বিভিন্ন ওভারসিয়ারের অধীনে রাখতে চাই, মহুয়ালি অংশটার জন্যে আপনাকে ঠিক করেছি।"

উত্তরটার জন্য মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; যেন একটা প্রস্তাব, নিম্নস্থ কর্ম্মচারীর ওপর হুকুম নয়। মনে মনে মানচিত্রে জায়গাটার ধারণা করিয়া লইতে যে আধ মিনিটটাক দেরি হইল, তাহার পর বলিলাম—"বেশ যাব, সার।"

আদেশটাকে প্রস্তাবের আকার দেবার যে একটু হেতু আছে সেটা পরে প্রকাশ পাইবে। দ্বিধাহীন উত্তরে মিষ্টার সেন যেন একটু সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন—"কারণটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন। দেখেছি মহুয়ালি নিয়ে ঐ যে একটা অন্ধবিশ্বাস আছে, সেই জন্যে ও অংশটা বরাবরই নেগ্লেক্টেড হয়ে এসেছে। কিছু দরকার পড়লে, খোঁজ নিয়ে দেখেছি, অফিসার নিজে ওদিকে গিয়ে ক্যাম্প ফেলে থাকতে চায় না, হয় একটা দিন বা তারও কম সময়ের জন্যে লোক দেখানো এন্কোয়ারি করে রাত হবার আগেই পালিয়ে আসে, নয়তো নিজের মেটকে পাঠিয়ে দেয়। সেও প্রায় নিজে যায় না, একটা ছুটো কুলি পাঠিয়ে কোনখানে গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকে, তারপর কুলির কথার ওপর অফিসারের কাছে রিপোর্ট দেয়; সেও তারই শোনা রিপোর্টের ওপর ডায়েরি করে এখানে হেড আপিসে পাঠিয়ে দেয়। কুলিটাও যে যায়ই একথা কেউ বলতে পারে না, তাই আমরা যে খবর পাই সেটা এক হিসেবে একেবারেই ভুয়ো। এই করে দেখছি ও অঞ্চলটাই যেন ক্রমে ক্রমে এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাটা করলাম, আর রিলায়েব্‌ল মনে করে আপনাকেই ডেকে পাঠিয়েছি। ষ্টেটের খানিকটা খরচ বাড়ল, কিন্তু এ পরীক্ষাটা দরকার হয়ে পড়েছে।"

যাত্রার দিন আরও খানিকটা উপদেশ-নির্দ্দেশ দিয়া বিদায় করিলেন; একটু প্রচ্ছন্ন প্রলোভনও দেখাইলেন—"মহুয়ালির দিক থেকে একটু নিশ্চিন্দি হলেই হেড আপিসে আমার একজন এসিস্ট্যান্টের জন্যে ওপরে লিখব; এর্টা পেরে উঠছি না, তখন আপনারাও চেষ্টা করতে পারেন, আমি শুধু সিনিয়রিটিই দেখব না।"

২

জায়গাটা ষ্টেটের একেবারে প্রান্তভাগে, উত্তর-পূর্ব কোণে; তিনটি প্রদেশ এখানে একটি কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, পশ্চিমে উড়িষ্যার এই করদ রাজ্য, উত্তরপূর্বে বিহার, দক্ষিণ-পূর্ব্বে বাংলা। এইরূপ সংস্থানের জন্যই মহুয়ালির অরণ্য-সম্পদ রক্ষা করা একটু দুষ্কর। জায়গাটা খুব সমৃদ্ধ; শাল, বাঁশ, মহুয়া, সাবুই-ঘাস, লাক্ষা, মধু প্রভৃতি জঙ্গলের সাধারণ উৎপন্ন দ্রব্যাদি তো আছেই, এ ছাড়া খনি-সম্পদও প্রচুর, বিশেষ করিয়া তামা ও লোহা। মৃত্তিকার উপরের ভাগে কোথাও কোথাও পাথরের সঙ্গে মেশান এই দুইয়ের কাঁচা আকর পাওয়া যায়, এবং এই সবই লইয়া তিনটি প্রদেশের সীমান্তবাসীদের মধ্যে বিপুল এক চোরাকারবার চলে। এটা দিন দিনই বাড়িয়া উঠিতেছে এবং ইহার কারণ সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। মহুয়ালি সম্বন্ধে রাজধানী পর্য্যন্ত অনেক লোকের একটা আশঙ্কা যে, জায়গাটায় একটা যাদু আছে, অধিক দিন (সাধারণের মতে ত্রিরাত্রির অধিক) যাপন করিলে এখান হইতে ফিরিয়া আসা আর সম্ভব নয়। কি হয় সেটা কেহ বলিতে পারে না; নূতন যখন চাকরি লই, একটা কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়—এই যে একটা সারা অঞ্চল 'ক্ষুধিত পাষাণে'র রহস্য লইয়া পড়িয়া আছে ইহার কারণটা কি? কিছু অনুসন্ধান করি, এ-মুখে সে-মুখে শুনিয়া সমস্ত ব্যাপারটার যেটুকু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সংগ্রহ করিতে পারি তাহা এই যে, এই জায়গাটা সম্বন্ধে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস মহুয়ালি পৃথিবীর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত, কতকটা শিবের ত্রিশূলের ওপর বারাণসীর অবস্থানের মত—আর বহুদিন পূর্বে এইখানে যদুপতি মোহান্তি নামে একজন ফরেষ্ট ওভারসিয়ার ডিউটিতে বাস করিতে আসিয়া চতুর্থ দিন হইতে একেবারে নিখোঁজ হন। জায়গাটি এই নূতন ব্যবস্থার পূর্ব্বে গন্ড-বিজুরি চাকলার অন্তর্গত ছিল। মোহান্তির পর ত্রিরাত্রি যেমন করিয়া আপনা-আপনিই মহুয়ালি-বাসের সীমানির্দ্দেশ হইয়া গিয়াছে, নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করিয়া কেহ একটা রাত্রিও আর কাটায় নাই এখানে, এবং এ রহস্যের ওপর আর আলোকসম্পাতও হয় নাই।

এই সঙ্কীর্ণ ভিত্তির ওপর আমি নিজে যে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া লই তাহা এই যে, সমস্তটাই চোরাকারবারীদের কৌশল—হয়ত স্থানীয় বড় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল একটা বিশ্বাস,

নিজের নিজের ভূমিখণ্ড সম্বন্ধে সাধারণতঃ যেমন থাকেই ইহাদের ভিতর,—যাহাদের স্বার্থ তাহারা এইটাকে সুকৌশলে রাজধানী পর্য্যন্ত চারাইয়া দিয়াছে, তাহার পর হয়ত চক্রান্ত করিয়া মোহান্তির প্রাণনাশ ঘটাইয়াই কাহিনীটাকে একটা বাস্তবের রূপ দিয়া নিজেদের কারবার নিষ্কণ্টক করিয়া লইয়াছে।

সদরে অল্পদিন থাকার পর আমি দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বদলি হই, সেটাও সীমান্ত প্রদেশ, বহু সমস্যা, গড়-বিজুরি মহুয়ালি লইয়া আমার কৌতূহলটা ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া পড়ে।

তিন দিন গোযান এবং হস্তিপৃষ্ঠে অভিযানের পর চতুর্থ দিবস বৈকালে আমার নূতন কর্মস্থলে উপস্থিত হইলাম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার পূর্বধৃত সিদ্ধান্তে প্রথম আঘাত লাগিল।

মিষ্টার সেন বেশ সরলভাবেই মহুয়ালি সম্বন্ধে ব্যবস্থার লাগিয়াছেন; কয়েষ্ট আপিসটা যে বসাইয়াছেন তাহা একেবারে সমস্ত অঞ্চলটার কেন্দ্রে, একটু পূর্ব্ব ঘেঁষিয়া এমন একটি জায়গা যেখান হইতে সমস্ত সীমান্তটার ওপর আধিপত্য থাকে, অথচ অন্তদিকে নিবিড় দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলটার ওপরেও দৃষ্টি রাখা যায়, কেননা ষ্টেটের অভ্যন্তরের যে চোরাকারবারী বুনো জাতের দল, তাড়া খাইলে তাহারা এই প্রাকৃতিক দুর্গের মধ্যেই আশ্রয় লয়।

কিন্তু আমি আপিসটার এই সুনির্দ্ধারিত সংস্থানের কথা বলিতেছি না, আমার সিদ্ধান্তে যাহা প্রথম আঘাত দিল, তাহা অনির্দ্দিষ্ট একটা কিছু—যাহা সমস্ত জায়গাটার মধ্যে ছিল প্রচ্ছন্ন। পশ্চিম দিকটা কতকটা যেন বৃকচাপ, ঘনারণ্য পাহাড়ের স্তূপ—মনে হয় কোন্ সেই সুদূর বিন্ধ্য-সাতপুরা অমরকণ্টক থেকে পাহাড়ের ঢেউ গড়াইয়া গড়াইয়া আসিয়া এইখানে এককালি ক্রেসেণ্ট চাঁদের একটি নীল রেখায় থামিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকটা মুক্ত, প্রথমতঃ সমস্ত জায়গাটাই ঢালু হইয়া, আপিসটাকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় দশ-পনর মাইলের একটা অর্দ্ধবৃত্ত সৃষ্টি করিয়াছে। মাঝে মাঝে ছাড়া ছাড়া ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী, যেন পশ্চিমের বিক্ষুব্ধ ঊর্ম্মির এক-আধটা টুকরা ছিটকাইয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে। এর পিছনেই প্রায় বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে একটি দীর্ঘতর নীল পর্ব্বতরেখা, উত্তরের দিকে একটু আয়ত, মসিঘন, তাহার পর দক্ষিণের দিকে ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

কিসে যে কি হইল ঠিক বলিতে পারি না, তবে জায়গাটাতে পৌঁছানর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনের উপর একটি শ্রান্ত ঔদাস্য যেন ছায়া বিস্তার করিতে লাগিল। পরে ভাবিয়া দেখিয়াছি অন্তত তিনটি কারণ উপস্থিত ছিল; প্রথমতঃ মহুয়ালির আপন ঐতিহ্য, দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘ যাত্রা-পথের অবসান, অর্থাৎ স্পন্দমান সচল জীবনের একটা বিরতি; তৃতীয়ত, দিনের যে সময়টিতে পৌঁছিলাম আমি। হয়তো এই তিনের মিলিত প্রভাবেই আমার মনে হইল, সমস্ত জায়গাটাতেই যেন আছে কিছু একটা, একদিন বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে খোঁজ করিতে গিয়া যে সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিলাম সমস্ত ব্যাপারটা চোরাকারবারীদের কারসাজি, সেটাতে বেশ একটু সংশয় জাগিল।

অবশ্য তখন মনের এই বিলাস লইয়া পড়িয়া থাকার চেয়ে অনেক বড় কাজ হাতে। আবাস-স্থানটা একবার দেখিয়া লইয়া লোকজন দিয়া জিনিসপত্রগুলা সবই গুছাইয়া লইলাম। চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্নানাদি সারিয়া লইলাম; তাহার পর সঙ্গে যা আছে এবং এখানে যাহা অধীনস্থ লোকেরা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া পাচক ব্রাহ্মণকে রাত্রের আহার সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়া নবরচিত বাংলোর সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটা ক্যাম্প-চেয়ারে গা এলাইয়া বসিলাম। মেট, কুলি, আর্দালি লইয়া জন কুড়ি লোক; কয়েকজন আমার সঙ্গেই স্থায়ীভাবে থাকিবে, কয়েক জন আশপাশের গ্রামের অধিবাসী, সকলেই চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। পাচক একটা ক্যাম্প টেবিলে চা, জলখাবার রাখিয়া গেল, সেবন করিতে করিতে জায়গাটার সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহ করিবার জন্য লোকগুলার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলাম।

যে ঔদাস্যটা মনকে স্পর্শ করিয়াছিল, সেটা ঠেলিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য যে ছিল না এ কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু সন্ধ্যা যতই আগাইয়া আসিতে লাগিল ততই ঐ অনুভূতিটা যেন মনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। এমনি সন্ধ্যা সময়টাই নিঃসঙ্গতাপ্রিয়, সেদিন যেন আরও আত্মস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলাম; এক সময়ে আকাশলগ্ন এই পূরবী সুরের কাছে যেন আত্মসমর্পণ করিয়াই লোকগুলাকে সরাইয়া দিলাম।

সূর্য্যের রক্তিম আভা যতই গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই বেশী করিয়া আত্মলীন হইয়া উঠিতে লাগিলাম আমি। মনে হইল, দক্ষিণের বিস্তীর্ণ আতাম্র রুক্ষ ভূভাগ—এ যেন গৈরিকধারী উদাসী জীবন; তাহার সামনে ঐ মৃত্যু, পর্ব্বতের পুঞ্জীভূত তমিস্রার রহস্যময়রূপে, উভয়ে পরস্পরের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

পার্ব্বত্য অরণ্যের মধ্যে বহুদিন কাটিল বহু নব নব প্রতিবেশে; কিন্তু ঠিক এ ধরণের অনুভূতি কখনও হয় নাই। দেহটা সেদিন দুর্ব্বল ছিল, তাহার সঙ্গে নিশ্চয় মনটাও, দুর্ব্বল মনকে এ ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত ভাবিয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই বাংলোর মধ্যে চলিয়া গেলাম। অস্বীকার করিব না

এদিকে ঘোড়াহিরর রহস্যজনক পরিণামের কথাটাও মনের এক কোণে কোথায় জাগিয়া থাকিয়া মনটাকে অজ্ঞাতেও দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছিল। গ্রামের যে দুলিয়া একত্র হইয়াছিল তাহাদেরও সে রাত্রে উপস্থিত থাকিবার হুকুম দিয়া আমি বাংলোর মধ্যস্থলে নিজের ঘরটিতে প্রবেশ করিলাম। ঠাকুরকে সকাল সকালই রন্ধন সমাধা করিতে বলিয়া দিয়াছিলাম, একটু রাত্রি হইতেই আহার শেষ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম।

তাহার পরদিন উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কাজে লাগিয়া গেলাম—কতকটা যেন এই ভয়েও যে কালকের ভূত আবার ঘাড়ে আসিয়া না চাপিয়া বসে। সবাইকে জড়ো করিয়া ম্যাপ সামনে রাখিয়া সমস্ত এলাকার একটা হিসাব লইতে লাগিয়া গেলাম—কোথায় কি রকম পথ, কোন্ বনে কি কি উৎপন্ন হয়, কোন্ গ্রামে কি রকম মানুষ, আরও সব খুঁটিনাটি যাহা আমার প্রয়োজন। চোরাকারবারের গতিবিধি সাধারণতঃ কোন্ কোন্ পথ বাহিয়া তাহাও ইহাদের যতটা জানা আছে, এবং আমি জেরা করিয়া যতটা পারিলাম সংগ্রহ করিতে—জানিয়া লইলাম। ইহার পর এক সপ্তাহের একটা টুর-প্রোগ্রাম (পরিক্রমা-সূচী) ছকিয়া লইয়া লোকগুলিকে সেই দিন হইতেই প্রস্তুত হইতে বলিলাম। না, কাল যা নমুনা পাইয়াছি, খুব বেশী দিন এখানে থাকা চলিবে না। তা ছাড়া হেড আপিসে এসিষ্টান্ট পদের জন্ত লোভটাও আছে, তাড়াতাড়ি মহলটিকে সামলাইয়া দিয়া একটা সুনাম অর্জ্জনের দিকেও প্রবল ঝোঁক আছে। আহারের পর অল্প একটু বিশ্রাম লইয়াই ঘোড়ায় জিন কষিতে বলিলাম।

টুরই এ বিভাগের প্রধান কাজ, সে হিসাবে প্রথম দিনের সাফল্যে সন্তুষ্টই হইলাম। প্রায় মাইল ছ' সাতের একটা বৃত্ত শেষ করিয়াছি, নিজের প্ল্যান অনুযায়ী দুইটি নূতন ঘাঁটিও বসাইয়া দিলাম, গ্রামের মাতব্বরদের সহায়তায় ষ্টেটের নিজের লোক চালাইবে। পরদিন জায়গাটার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার জন্ত আরও বেশী কাজ করিতে পারিলাম, চতুর্থ দিনে মাইল দশেক দূরে একটা ক্যাম্প ফেলিয়া দুই দিন কাটাইয়া বাংলোর দিকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত আগাইয়া গেলাম। বেশ অনেকগুলি কাজ হইল, খবর পাইতে লাগিলাম ত্রিরাত্রি অতিক্রম করিয়াও মহলটির হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া না যাওয়ায় চারিদিকে বেশ একটা বিস্ময়-গুঞ্জন তুলিয়াছি, চোরাকারবারী-মহলও চকিত-বিস্ময়ে চোখ রগড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। সাত দিন পরে বেশ একটি ভদ্ররকমের রিপোর্ট পাঠাইয়া দিলাম হেড আপিসে।

এদিককার খবরও দেওয়া দরকার। কাজকর্ম্ম সারিয়া প্রায় সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া আসিতাম, তাহার পর ক্লান্তির জন্তই সেই প্রথম দিনের রুটিনটাই আমার পুনরনুষ্ঠিত হইত। মনের দিক দিয়াও হইত একই ধরণের অভিজ্ঞতা। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তাভা আমার দক্ষিণের আয়ত গৈরিক প্রাঙ্গণ আর বাঁয়ের ধূম্র পর্ব্বত-স্তূপের উপর যখন শেষ স্পর্শ দিত, মনে হইত আমি যেন জীবন আর মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, মনটা কেমন যেন হইয়া যাইত—সেই কেমন হওয়ার বিশেষত্ব এই যে, জীবনের চেয়ে মৃত্যুটাকেই আমার পূর্ণতর সত্য বলিয়া মনে হইত।

একটা কথা বলা হয় নাই—বিশেষ করিয়া এই বৃহত্তর পটভূমির মধ্যে উপভোগ করিবার জন্ত—বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে গল্পগুলিকে রূপায়িত করিয়া লইবার জন্ত, রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গল্পের বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম—সন্ধ্যার পর সেইগুলি থেকে বাছিয়া বাছিয়া গল্প পড়া আমার নিত্য কর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছিল—বিশেষ ভাবে 'মণিহারা' আর 'ক্ষুধিত পাষাণ', তাহারও মধ্যে বিশেষ করিয়া 'ক্ষুধিত পাষাণ।' এ আমার ছিল যেন কল্পলোককে বাস্তবে নামাইয়া আনার জন্ত একটা মন্ত্র-সাধনা, ঠিক উপযোগী পরিবেশের মধ্যে কতকটা শ্মশানে আসন পাতিয়া শক্তি-সাধনার মতই। কিন্তু আশ্চর্য্য, অত করিয়াও ঠিক ও-ধরণের অনুভূতি জাগিল না আমার মনে। "ক্ষুধিত পাষাণে"র মধ্যে আছে একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার মর্ম্মভেদী সুর, মৃত্যুর পটভূমিকায় দাঁড়াইয়া…জীবনের দিকে লুব্ধ আতুর দৃষ্টি-ক্ষেপ ; আমার, কিন্তু এ ছিল সম্পূর্ণ পূরবীর হতাশ—বৈরাগ্যের, আমার দক্ষিণের জীবন বাঁয়ের মৃত্যুর দিকে যুক্ত করে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার বিষণ্ণ আলোকে নিয়ত আত্মনিবেদন করিত—হে বিলয়, হে মুক্তি, হে বন্ধু, তুমি আমায় পরিপূর্ণ ভাবে তোমার মধ্যে গ্রহণ কর…

বেশ কিছু দিন গেল ; বাঁচিয়া আছি বলিয়া নিশ্চয় বহু-লোকের বিরাগভাজন হইতেছি—কিন্তু কাজ হইতেছে। আমার দিনের জীবন বিচিত্র, কিন্তু সন্ধ্যা আর রাত্রির জীবনটি সেই একই সুরে ঢালা। তাহার পরে হঠাৎ একদিন একটা কথা মনে হইল—যে দিন এখানে পদার্পণ করিয়াছি সেই দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত আমার মোটামুটি কর্ম্ম ও অবসরের সূচী প্রায় একই রকম। সেই উদয়াস্ত কাজ, অস্তাচলগামী সূর্য্যের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া বসা, রাত্রে কিছু গল্প পাঠ, আহার, নিদ্রা।

এক দিন ইচ্ছা হইল, একটু ওলট-পালট করিয়া দিই। সমস্ত দিন একেবারে নিরম্বু কর্ম্মহীনতায় কাটাইয়া, বৈকালে ঘোড়ায় করিয়া নিতান্তই শুধু বেড়াইবার জন্তই বাহির হইয়া গেলাম। জায়গাটার সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় হইয়াছে, কোন লোক পাইলাম না, শুধু কার্তুজের বেল্ট আর স্ট্র্যাপবাঁধা বন্দুকটা ঝুলাইয়া লইলাম।

এক একটা ঢালুর ধাপ বাহিয়া নামিয়া গেলাম প্রায় মাইল

মেডেক দূরে বাঁকাই নদীর ধারে। এই স্থানটির উপর অনেক দিন থেকে আমার লোভ ছিল, কিন্তু কাজের ভিড়ে আসা হয় নাই। আজ কাজের ভিড় ঠেলিয়া সকাল থেকে এইটিকে লক্ষ্য করিয়া ছিলাম।

যখন পৌঁছিলাম তখন সূর্য্যাস্ত হইয়া গেছে। আমার আজকের প্রোগ্রামটা নিতান্তই আকস্মিক, অত তিথি দেখিয়া ঠিক করি নাই, তবু আকস্মিক ভাবেই আজ তিথিটা আমার অদৃষ্টে পূর্ণিমা দাঁড়াইয়া গেল। সন্ধ্যার ছায়া একটু গাঢ় হইবার আগেই পূর্ব্ব দিকচক্রে পূর্ণিমার চাঁদ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নদীর একটু তফাতে একটা বাবলা গাছ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার গুঁড়িতে ঘোড়াটাকে বাঁধিয়া আমি অল্প একটু নীচে নামিয়া বসিলাম। এ অঞ্চলটায় জানোয়ারের খুব বেশী উপদ্রব নাই, তবু বেশ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

সেই দিন রাজধানীতে রচা আমার সেই বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে দ্বিতীয় আঘাত লাগিল —

বালু আর অগভীর কয়েকটা জলরেখা লইয়া নদীটা এখানে প্রায় শ'তিনেক হাত চওড়া, বাঁয়ের তটরেখা ক্রমেই রুক্ষ হইয়া হইয়া দূরে পর্বতের উপর উঠিয়া গিয়াছে, আমার সামনে এটা একটা বাঁক, এর পরই দক্ষিণে তটরেখা দুইটা নামিয়া নামিয়া কয়েকটা বাঁকের পর অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

আমি কোন্ একটা অপার্থিব লোকে চলিয়া গিয়াছিলাম; কখন, কোন্ পথে প্রবেশ করিয়াছি বলিতে পারিলাম না, যখন পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে খানিকটা চৈতন্য হইল তখন দেখি পূর্ণিমার চাঁদটা আকাশে বেশ খানিকটা উঠিয়া আসিয়াছে, আমার সামনে বিস্তৃত বালুচরের ওপর জ্যোৎস্না একটি সুন্দরী রমণীর মতই অলস-শায়িত, নদীর ঈষচ্চঞ্চল বিচ্ছিন্ন জলধারা-গুলা যেন তার স্রস্ত শাড়ীর ভাঁজ—মৃদু হাওয়ায় দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। শরৎ কাল, এর পরেই সমস্তটা একটা গাঢ় কুয়াশায় ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আজ আমার মন্ত্র-সাধন সফল হইল। কিন্তু 'ক্ষুধিত পাষাণ'ই যে পূর্ণ সিদ্ধিতে রূপ লইয়া জাগিয়া উঠিল তাহা নয়। আমার অনুভূতির মধ্যে সন্ধ্যার পূরবী আর রজনীর বসন্ত-রাগ—বৈরাগ্য আর আবেগময় বাসনা মিলিয়া এক অপরূপ মিশ্র সুরের ক্রন্দনে জাগিয়া উঠিল। মনে হইল পাইতে চাই—শুধুই পাইতে চাই—কি বা কাহাকে সেটা শুধু এই জন্যই বলা যায় না, যেহেতু সীমাতীত সৌন্দর্য্যে তা অচিন্তনীয়; কিন্তু তা ভোগেরই, সে ভোগের নাম নাই, যেহেতু তা শুধু ভূমান্ত নয়, আবার পার্থিবও নয়। দেহ মন-আমার যুক্ত আকাঙ্ক্ষা দিয়া, পঞ্চেন্দ্রিয়, তার পর ইন্দ্রিয়াতীত কোন ইন্দ্রিয় যদি থাকে সে-সবের নিবিড়তম আলিঙ্গন দিয়া তাহা পাইবার বস্তু। আমার যে বৈরাগ্য তা এইজন্য নয় যে আমি কোনও তাপসবাঞ্ছিত মুক্তির অভিলাষী—এই পৃথিবী রূপ-রস-গন্ধাদির শত প্রলোভনেও নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তাই আমি চাই নিষ্কৃতি।...হে অসীম সুন্দর! হে অসীম সুন্দরী, তুমি কে? তুমি কোথায়?—এই ত্রিদিবস্খলিত জ্যোৎস্না-রজনীর রহস্য-আলোকে আমি তোমার অস্তিত্বের ইঙ্গিত মাত্র পাইয়াছি—কি তপস্যা চাই বল—আমায় তোমার পূর্ণতার মধ্যে ডাকিয়া লও...

আমি তাহা হইবার নয়, তবু হায়, অন্তত কাহিনীটিও যদি এইখানে শেষ করিতে পারিতাম!...

৩

পূর্ব সীমান্তেই আমার কাজ বেশী, তখন বাকিও অনেক, কিন্তু, সেই রজনীর অভিজ্ঞতার পর বাঁকাই নদীটা কি একটা অদ্ভুত মোহে যেন পাইয়া বসিল আমায়, বিশেষ করিয়া এর কম অংশটা, সেটা বঙ্কিম গতিতে ধীরে ধীরে গিরিশ্রেণীর মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার একটা কারণ এই যে দক্ষিণে স্থানে স্থানে নদীটা দেখা আছে—সমতলের দিকে সৌন্দর্য্যও অনেকটা বিশেষত্ববর্জিত। এখানকার সৌন্দর্য্যটা সে রাত্রে এমন অভিভূত করিল যে মনে কেমন একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গেল, বাড়িতে বাড়িতে পশ্চিমে এ সৌন্দর্য্য হয় তো এমনই হইয়া উঠিয়াছে যে দিবাভাগেও সেই রাত্রির অভিজ্ঞতার পুনরা-বর্ত্তন হইতে পারে। যাঁহাদের অভিজ্ঞতা নাই তাঁহারা এ কথাটা ঠিক বুঝিবেন না, কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের অতল রহস্য-গাম্ভীর্য্যের মধ্যে এই ধরণের এক একটা অদ্ভুত মোহ দাঁড়াইয়া যায় কখন কখনও—কোন একটা পাহাড় লইয়া, কোন একটা নদী লইয়া, এমন কি কখনও সামান্য কোন একটা বৃক্ষ লইয়াও; অন্তত দেখিয়াছি আমার কয়েক ক্ষেত্রে হইয়াছে—আর এই বিশেষ ক্ষেত্রে তো একটা কারণ ছিলই—সেই রাত্রির অভিনব অনুভূতি।

পরদিন বৈকালে টুর হইতে ফিরিয়া সবাইকে একত্র করিয়া বলিলাম—"এদিককার কাজ আপাতত বন্ধ রৈল, কাল সকালে নদীর খাত বেয়ে পশ্চিম দিকে যাব, সেই মত তোয়ের থাকবে তোমরা।"

আশ্চর্য্য, কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবার মুখ যেন শুকাইয়া গেল, কোন উত্তর না দিয়া সবাই চাপা আতঙ্কে পরস্পরের মুখের পানে চাহিতে লাগিল। এমনই একটা নূতন কাণ্ড যে আমি থমকিয়া গিয়া মেটকে প্রশ্ন করিলাম—"ব্যাপারখানা কি মহাপাত্র?"

মেট ঠোঁট দুইটা জিভে ভিজাইয়া লইয়া বলিল—"নদীর পথ ধরে ওদিকে খুব বেশীদূর যাওয়া...সে ঠিক হবে না হুজুর..."

হঠাৎ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে মস্ত বড় একটা তথ্য আবিষ্কারে আমার সমস্ত মনটা সচকিত হইয়া উঠিল—"তা হলে বাঁকের নীচেই চোরাকারবারীদের আড্ডা! ঘোড়া

হইতে নামিয়া—বাংলোর দিকে যাইতে যাইতে হুকুমটা দিয়াছিলাম, বেশ ভালভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলাম—"কেন, বাধা বা আপত্তিটা কি ?"

উত্তর নাই, মাথা নীচু করিয়া আছে মুখ চাওয়া-চাওয়ির ঘটা একটু বাড়িয়া গেল মাত্র। সন্দেহ মিটিয়া যাওয়ায় বেশ খানিকটা জোরের সঙ্গেই আদেশ দিয়া আবার ফিরিয়াছি, মহাপাত্র দুই পা আগাইয়া পাশে আসিয়া বলিল—"ওদিকে তপস্যা করছেন…"

ঘুরিয়া দাঁড়াইতে হইল, মুখ দিয়া কোন প্রশ্ন বাহির করিতে পারার আগেই মহাপাত্র তাহার বক্তব্যটা পূরণ করিয়া দিল—

"পওহারী বাবা ওদিকে তপস্যা করছেন হুজুর—এখান থেকে প্রায় পো'টাক পথ দূরে নদীর ধারে। কথাটা কাউকে বলা মানা, আর গেলেই একটা না একটা অনিষ্ট হয় তাই হুজুরকে মানা করছিলাম।"

লোকটাকে ভাল বলিয়াই জানিতাম, একটু ব্যঙ্গের স্বরেই বলিলাম—"ও, বলা মানা! শুধু বুঝি তোমরা এ ক'জনেই জানবে ?…তা গেলে অনিষ্টটা কার হয় সেটা এবার বুঝতে পারবে—তোমরা সকলেই…। আপাতত তোমার ওপর আমার হুকুম—তপস্বী কোন রকমে যেন খবর না পায় যে আমি আসছি। কাল আমি না বেরনো পর্য্যন্ত কোন লোক বাংলো ছাড়বে না, এ সত্ত্বেও যদি লোকটাকে কাল গিয়ে না দেখি তো দায়িত্ব তোমার। যাও।"

সেদিন সন্ধ্যার পর বাহিরে একটা ক্যাম্প-চেয়ার লইয়া বসিলাম। একাই। মনটা বড় চঞ্চল আজ, এক রকমের অনুভূতি নয়—ভেতরে একটা চাপা উল্লাস উঠিয়াছে, একটা খুব বড় সাফল্য সামনে, মহুয়ালির রহস্য এত দিনে ভেদ করিতে চলিয়াছি, আমিই !…এর পাশেই বেশ একটা ভয়—আজই হয় তো আমার শেষ রাত্রি, মিত্র-বেশে এতগুলো শত্রু আমায় ঘিরিয়া—রাজধানী থেকে আমার সঙ্গে আসিয়াছে মাত্র চার জন, কে জানে তাহারাও ভিতরে ভিতরে এদের দলে ভিড়িয়া গিয়াছে কিনা ; ইহারা আজ প্রাণপণে চেষ্টা করিবে আমায় এ জগৎ থেকে লুপ্ত করিয়া ওদের পথের এই নূতন কণ্টক অপসারিত করিবার ; মহুয়ালির রহস্য ভেদ করিব কি, আজ রাত্রে হয় তো মোহান্তিঘটিত ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হইয়া সে রহস্য আরও জটিল, আরও দুর্ভেদ্যই হইয়া উঠিবে…

এর পর ভয় আর উল্লাসের মাঝখানে ধীরে ধীরে আর একটা অনুভূতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল এবং হয় তো মহুয়ালির রাত্রির কুহকে সেইটাই আমার মনকে অধিকার করিয়া ফেলিতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটা আবার সেই প্রথম দিনের উদাস সুরে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। দিনের পৃথিবী, কর্ম্মের পৃথিবী আমার কাছে হইয়া উঠিতে লাগিল নিতান্তই অসত্য। এর জন্য এত কেন ? …হয় তো সত্যই কোনও জীবন্মুক্ত পুরুষ কোন নিগূঢ় সত্যের সন্ধানে করিয়াছেনই আত্মনিয়োগ, আমি বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াই কেন ? হয় তো মহুয়ালির বাতাস তাঁহার প্রভাবেই এই রকম উদাস, এই রকম জীবন-বিমুখ। আমি এঁর পুণ্যে যদি নাই পারি অভিসিঞ্চিত হইতে, তো আমার সঙ্কীর্ণ স্বার্থের মোহে সেই মহাপুরুষের তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিয়া একে কলুষিতই বা করিতে যাই কেন ?

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া অনেক ভাবিলাম। এক সময় মহাপাত্রকে ডাকিয়া লইলাম এবং বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই প্রশ্ন করিয়া সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু জানিয়া লইলাম। সেও যে খুব বেশী জানে না, এইটেই আমার শ্রদ্ধা এবং প্রত্যয় দিল বাড়াইয়া। কিন্তু লোকে যখন তাঁহাকে দেখিয়াছে তখন দেখিবার কৌতূহলটা চাপিতে পারিলাম না। ঠিক হইল দলবল না লইয়া গিয়া শুধু আমি আর মহাপাত্র এই দুই জনে যাইব। সে বার দুই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারেরও ব্যবস্থা করিবে।

মহুয়ালির রাত্রির সঙ্গে দিবসের কোন মিল থাকে না। সকালে উঠিয়া আবার ঠিক করিয়া লইলাম সদলবলেই যাইতে হইবে। রাত্রির নির্দ্দেশ খানিকটা মানিয়া লইয়া মাঝামাঝি একটা এই ঠিক করিলাম যে দলটাকে কাছাকাছি ভালভাবে লুকাইয়া রাখিয়া একাই, অথবা নিতান্ত মনস্থির করিয়া উঠিতে না পারি তো মহাপাত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়া প্রথম সাক্ষাৎকারটা সারিব। অর্থাৎ সন্ন্যাসী যেরূপেই দেখা দিতে চান প্রস্তুত থাকিব—মহর্ষি বাল্মীকি রূপেই হোক বা দস্যু রত্নাকর রূপেই হোক। রাতের সঙ্গে দিনের একটা রফা করিলাম।

৪

অদ্ভুত ব্যাপার !

একাই গিয়াছিলাম। জায়গাটা সত্যই অপূর্ব্ব। দুই দিকে গগনচুম্বী পাহাড়, তাহার মাঝখানে নদীটা সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়া খানিকটা অবসরের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই একধারে পাহাড়ের কোলে বেশ বড়গোছের একটা চাতাল। একেবারে নিষ্পাদপ নয়, খানিকটা ঝোপঝাপ আছে, এবং তাহার মাঝখানে পাথরের উপর পাথর সাজাইয়া খানতিনেক ঘর লইয়া বেশ একটি বাড়ীর মত। নিতান্ত হেলা-ফেলা ভাবে সাজানো নয়, মশলা দিয়া বেশ ভাল করিয়া গাঁথা।

আশ্রমের রূপ দেখিয়াই আমার রাত্রির কুহক অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল, যেটুকু বা হয়তো অবশিষ্ট ছিল, পরের দৃশ্যে একেবারে গেল ঘুরিয়া। একটি দীর্ঘ সবল পুরুষ, আমার দিকে পিছন ফিরিয়া, উঠানের মাঝখানে একটা বেলগাছের গুঁড়ি ধরিয়া প্রবল বেগে ওঠ-বোস করিতেছে, যেহেতু সমস্ত

শরীর বাহিয়া ঘাম ঝরিতেছে, পালোয়ানী চঙের একটা হিস হিস্ শব্দ হইতেছে নিঃশ্বাসের। এদিকে পালোয়ানের মতই একটা আণ্ডিয়া পরা।

লুকাইবার প্রয়োজন নাই, বিস্ময়ের সঙ্গে শঙ্কিতও হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তখন মরিয়া হইয়া গিয়াছি, এদিকে হাতে রাইফেলটাও আছে; গলা খাঁকারি দিলাম।

লোকটা ঘুরিয়া একেবারে প্রস্তরবৎ নিশ্চল হইয়া গেল; দারুণ ভয় এবং বিস্ময়ে চোখ দুইটা যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। বুঝিলাম, পাপীর মন; নিজের সাহস কতকটা ফিরিয়া আসিল। তবুও সঙ্গীদের জড়ো হইবার জন্য হুইসিল্‌টা বাজাইয়া দিলাম, তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলাম—"আমি হচ্ছি এই জঙ্গলের ওভারসিয়ার। আপনি এখানে করেন কি?"

বাঙালী নয়, তবে কি জাত ঠিক বোঝা যায় না। বয়স মনে হইল পঞ্চাশ-বাহান্ন, এইরকম। মাথাটা মুণ্ডিত। এমন লাস, তবু ভয়ে যেন কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গিয়াছে। উত্তর না দিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

তখন আর আমার ভয় নাই। লোকগুলিও আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়াছে। বলিলাম—"উত্তরটা দিন। শুনছি এখানে নাকি কোন এক মহাপুরুষ তপস্যা করেন? তাঁকে দেখতে চাই আমি।"

লোকটা আগাইয়া আসিল এতক্ষণে, কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—"সো তপস্যা আমিই কোরে উরসিয়ার বাবু। মহা-পুরুষ কি হোবে? মামুলি আদমি আছি—পাপের শোরীর..."

চোখটা একবার সমস্ত শরীরটার উপর বুলাইয়া লইলাম, বলিলাম—"ও! আপনিই করেন তপস্যা? তা বেশ, যেমন আছেন দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন, তপস্যার ফলপ্রাপ্তির সময় হয়েছে।"

এমন একটা দীন, করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল যে সে-দৃষ্টিতে একটা দুর্বৃত্তের এতটুকু হিংস্রতা বা এতটুকু লোলুপতা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বলিল—"কি বলছেন, উরসিয়ার বাবু, আমি একটুও সোমঝাতে পারছি না। আমি সোন্নাসী মানুষ, ফল তো আমার ভগবান দিবেন, যখন তাঁর মর্জ্জি হবে।"

বলিলাম—"তা হলে ভেঙেই বলি আপনাকে, যদিও না বললে চলত। মহুয়ালির জঙ্গলে আপনারা সবাই মিলে যে চোরাকারবারটা চালাচ্ছেন, সেটা বন্ধ করবার জন্যে সরকার আমায় মোতায়েন করেছেন এখানে। দলবল নিয়ে আমার সঙ্গে আপনাকে রাজধানীতে যেতে হবে।"

লোকটা একেবারে শিহরিয়া উঠিল; কিছু বোধ হয় ভয় ছিল, কিন্তু তাহার চেয়ে ঢের বেশী ঘৃণার, একবার দুইটা হাত দিয়া কান দুইটা স্পর্শ করিয়া বলিল—"আরে ছিঃ ছিঃ উরসিয়ার বাবু, আপনি একি কোথা বলছেন! আমার সোহোরে সোহোরে অত বড় ব্যেবসা, আমি জঙ্গলে এসে লেকড়ি-লাহ্ চোরি করব!...আমার গৃহস্থ্ আশ্রমের নাম মংনিরাম, কানপুরে আমার অতবড় গল্লার ব্যেবসা—মংনিরাম গৌরীশঙ্কর নামে, কোলকাতায় আমার মংনিরাম পিরুমল নাম দিয়ে অত বড় কারখানা, উদিকে পাকিস্থানে..."

বিস্ময়ের সীমা হারাইয়া ফেলিতেছি, যা বলিতেছে, এবং যেভাবে, সেটা যদি অভিনয়ই হয় তো লোকটার অভিনয়ে বাহাদুরি আছে, বলিলাম—"বেশ, এখানে তা হলে করছেন কি?" তপস্যার জন্যে তো ডন-বৈঠক করার কথাও নয়, আর এ পাকা এমারৎও তপস্যার জায়গা নয়।"

মংনিরাম অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, যেন একটা কথা বলিবেন কি বলিবেন না, মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তাহার পর বোধ হয় না বলিয়া উপায় নাই দেখিয়াই সেইরকম কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন—"না উরসিয়ার বাবু, আমার তপস্যার অলূহেদা একটা মক্ আছে, জঙ্গলের একটু ভিতরে, এখান থেকে চার রসি দূরে...আওর..."

বলিলাম—"হাঁ, বলুন।"

"আওর, আমি যে তপস্যা করি তাতে ডণ্-বৈঠ্‌কির একটু জরুরৎ আছে উরসিয়ার বাবু...শরীরে একটু তাকৎ দরকার।"

—অদ্ভুতভাবে একটু হাসিলেন। সব গিয়া কৌতূহলটাই তীব্র হইয়া উঠিতেছে, প্রশ্ন করিলাম—"কি রকম? তপস্যায় ডন-বৈঠকের কথা তো এপর্য্যন্ত কৈ..."

মংনিরামের সহজ ভাবটা ফিরিয়া আসিয়াছে, বলিলেন—"আসুন উরসিয়ারবাবু, আপনি আমার অভ্যাগৎ, একটু ঠণ্ডা হয়ে নিন, তারপর আপনাকে সোব বলছি, মক্‌ভি দেখলাচ্ছি।...অরে ভিখুয়া, সরবৎ হাজির কর্—দো গিলাস।"

দু'জন বেশ তাগড়া গোছের লোক একটা ঘরে এতক্ষণ আত্মগোপন করিয়াছিল, বাহির হইয়া আসিল। সরবৎ যা' আসিল একেবারে পালোয়ানী—পেস্তাবাদাম, শশাবীচি দেওয়া, ভিখুয়ার হাতে দুইটা বড় বড় সিদ্ধির গোলা। আমি লইলাম না, মংনিরাম নিজেরটা গেলাসে গুলিয়া চোঁ চোঁ করিয়া পান করিয়া লইলেন। আমারটাও শেষ হইলে বলিলেন—"চলুন এবার মক্‌টা দেখিয়ে আনি।"

মহুয়ালি এতদিন প্রাকৃতিক কুহকে যেমন ভাবে ভুলাইয়াছিল, তাহার মানুষ দিয়াও ঠিক সেই ভাবেই যেন মোহাবিষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। রসি চারেক দূরে ঘন অরণ্যের মধ্যে একটা উপরে আচ্ছাদন দেওয়া শ্বেত পাথরের বাঁধান চমৎকার বেদী। চারিদিকে মোটা লোহার ছড় দিয়া ঘেরা, মনে হইল যাহাতে তপস্যার সময় কোন জানোয়ার না আসিতে পারে।

একটা ধরণা আছে, মোটা চেনের সঙ্গে একটা তালা ঝুলিতেছে।

বিস্ময়ে এবার আমারই বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে।

মংনিরাম আমার মুখের পানে চাহিয়া এবার একটু বড় করিয়া হাসিলেন; প্রশ্ন করিলেন—"দেখলেন আমার তপস্যার মক্?"

বিহ্বলভাবে বলিলাম—"তা তো দেখছি, কিন্তু কি তপস্যা করেন আপনি এর মধ্যে, ইন্দ্রলোকের জন্যে, কি চন্দ্রলোকের জন্যে, কি বিষ্ণুলোকের…"

মংনিরাম হাত দুইটা তুলিয়া বলিলেন—"কুছ্ নেহি, কুছ্ নেহি উরসিয়ার বাবু, আমি আপনাকে সোব বলছি, লেকিন আর কোই জান্‌বে না, অচ্ছা?"…বেশ, আসুন মকের ভিতর।"

ভিতরে গিয়া দুই জনে বসিলাম। মংনিরাম পদ্মাসন হইয়া বসিয়া, বাঁ হাত দিয়া আমার পিঠটা একবার স্পর্শ করিয়া চাপা গলায় আরম্ভ করিলেন—

"আসল বাৎ, বিলকুল ভিতরের বাৎ—যাকে ফিরিঙ্গীরা টিরেড সিক্‌রেট বোলে—এ আমার তপস্যা নয় উরসিয়ার বাবু, আমরা কারবারী জাত, এ আমার এক কারবারকা ফন্দি—আমি রামায়ণী ব্যেবসা করব উরসিয়ার বাবু…"

"রামায়ণী ব্যবসা!"

কিছুই ধারণা করিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। রামচন্দ্র তো ধান-চাল, কাপড়, সোনা-রূপা সুদ্ধ সারা লঙ্কাটা বিভীষণের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। আন্দাজের মধ্যে শুধু মনে পড়িল হনুমান আম খাইয়া আঁটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন—সেই সূত্রে আমের ব্যবসায়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই তো! কিন্তু তাহার সুযোগই বা কোথায়, এটা কোন্ সময়ই বা?

মংনিরাম বলিয়া চলিলেন—"দেখিয়ে উরসিয়ার বাবু, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে যোখোনই কোনও মনুষ্য কোনও তপস্যা করতে যাবে—ইন্দ্রের গদির জন্যে, কি চন্দ্রের গদির জন্যে, দেবতারা একটা না একটা বাধা পৌঁছাবে। রামায়ণ কা বাৎ খেয়াল করুন—বিশ্বামিত্র বেচারি, না খেয়ে, না ঘুমিয়ে তপস্যা করতে লাগল তো উদিকে ইন্দ্র মহারাজের আর চৈন্ রইল না, মেনকাকে বললেন…"

কহিলাম—"ও, আপনি মহাভারতের কথা বলছেন…"

"হাঁ তাই হোবে, আমাদের গদির একধারে মহারাজজি পাঠ করে—রামায়ণ চাহে মহাভারত, ও একই কথা।… ইন্দ্র মহারাজ মেনকাকে বললেন—যা বেটি ওর তপস্যা নষ্ট্ করে দিয়ে আয়।…এই রকম আরও কোতো তপস্বীর তপস্যা নষ্ট্ হোলো। এবার আমি এক মতলব বের করেছি…"

কহিলাম—"কি বলুন।"

"আমি দিন রাতের বিচমে সিরফ্ চার ঘণ্টা আরাম করি বাবু, বাকি সব মকে বসে তপস্যা আর তপস্যা। বেশ, চার ঘণ্টা বাদ গেল তো চার ছক্কা চৌবিশ, ছ' দিনে এক দিন বাদ গেল, বছরে হারাহারি দু'মাস। তা হলে উ সব মুনি ঋষিদের যেখানে বারো বছর লাগত, সেখানে আমার চৌদ্দ বছরে ফল হাঁসিল হবে। এইবার শুনুন, উরসিয়ার-বাবু, আমি বসে বসে তপস্যা করছে—ফল হাঁসিল হবে, ফল হাঁসিল হবে—এমন সময় ইন্দ্র মহারাজ মেনকা কি উর্ব্বশী, কি রম্ভা যাকে হোক হুকম করবে—"যা বেটি অমুক জঙ্গলে অমুক জায়গায় মংনিরাম তপস্যা করছে, আমার ইন্দ্রত্ব নিবে, তুই যা নষ্ট্ করে দিয়ে আয়…"

একটু হাসির সহিত বড় বড় চোখ করিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি বিমূঢ় ভাবে নিরুত্তরই রহিলাম।

—"বেশ তো?…অচ্ছা, আব শুনিয়ে। আমি কিছু জানি না, চোখ বুজে আছি, এমন সময়, ঘুমতে ফিরতে, নাচতে, গান করতে, ভাব বাৎলাতে বাৎলাতে আমার মকের কাছে মেনকা কি উর্ব্বশী, কি রম্ভা, এসে পড়ল, তার পর আরও কাছে, তার পর বিলকুল ভিতরে। তার পর ধেয়ান ভাঙছে না দেখে সেই একেবারে কাছে এসে স্পর্শ্ করতে যাবে কি এই এমনি করে শালীকে পাকড়ে…"

দেখাইবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া আমার দিকে ঝুঁকিতেই সভয়ে একটু সরিয়া গেলাম, মংনিরাম হাত দুইটা গুটাইয়া লইয়া সোজা বসিলেন, বলিলেন—"না না, আরে না…কি হবে আমার শকুন্তলার মতন এক লেড়কি নিয়ে?… পরলোকমে কাম দিবে?…হিসাব কা বাৎ, আপনি শুনুন—স্বর্গ থেকে রম্ভা, কি উর্ব্বশী, কি মেনকা আসছে, তাও কি কাজ?—না, ধেয়ান ভাঙতে হবে তপস্বীর—কিৎনা জেবর—জেবরাৎ—হীরা, মোতী, পান্না, চুন্নি, পোখরাজ; তাও কি এখানকার জিনিস উরসিয়ার বাবু?—খাস স্বর্গ্‌কা মাল, এক এক টুকরার দাম এক এক কড়োর; শাড়িটাই যা পরে থাকবে তার হিসাব দুনিয়ায় কে দিতে পারে?…ইরকম করে বাঁ হাতে ঝাপটে ধরে শাড়ি, চুড়ি, জশম্, তাগা, হাঁসুলি, হার, কণ্ঠি, কমরকা গেট, পায়ের মোল, নাকের বেশর, কানের কুণ্ডল, মাথার মুকুট—সোব এক এক করে খুলে নিয়ে বলব—"যা শালী, তোর ইন্দ্র মহারাজকে বোল্ গিয়ে মংনিরামের ধেয়ান ভেঙে দিয়ে এসেছি!…এতো চুরি ইয়া ডকৈতি বলতে পারবে না, উরসিয়ার বাবু—কে ডেকেছিল উকে গরীবের ধেয়ানটি ভাংতে?"

আমার মুখের ভাবটা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার জন্য দেহের ঊর্দ্ধ ভাগটা একটু পিছনে সরাইয়া লইয়া একমুখ হাসি লইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। নিজের বুদ্ধির সাফল্যে নিজেই বিস্মিত হইয়া গেছেন। আমার চেহারাটা নিশ্চয়

তখন ধৈর্য্যাতীত, মংনিরার তাহার মধ্যে অত একটা কিছু সন্দেহ করিয়া একটু জোরেই হাসিয়া উঠিয়া আমার হাতে একটা মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন—"আর না, না, উরসিয়ার বাবু, সে রকম কিছু মতলব নেই—শাড়ি পিনিয়েই পাঠিয়ে দিব বেটিকে ...আরে বিচুয়া, পরীরাণীকে শাড়ি তো হাজির কর।"

দুটি অনুচরের মধ্যে একজন একটা শাড়ি লইয়া উপস্থিত হইল। বনুদের গোলায় যোগানো একটি লালপাড়ের অতি সাধারণ সাঁওতালী শাড়ি। তার হাতে তুলিয়া দিয়া মংনিরার হো-হো করিয়া দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে লাগিলেন—ব্যবসায়-বুদ্ধির সঙ্গে নিজের রসিকতার কথাও ভাবিয়া নিশ্চয়—কোটি কোটি টাকায় বসন-ভূষণ দত্ত দিয়া পরীরাণীকে তো এই পরিয়া হেঁট মুখে ইন্দ্রমহারাজের সামনে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

শিল্পময় শ্যাম

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ

শিল্পের দিক দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় শ্যামদেশ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তার ললিত-কলা সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত হৃদয়ের গোপন তন্ত্রীতে এমন এক অপূর্ব্ব অনুভূতি জাগায় যা সহজে বিস্মৃত হওয়া যায় না। সে যেন নির্ঝরের মত সদা আত্মপ্রকাশ করে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে সঙ্গীতে ও নৃত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যে ও কারু-শিল্পে।

শ্যামদেশের চারুকলার মূলে রয়েছে বৌদ্ধধর্ম্ম। এই বিষয়ে চীনের সঙ্গে তার তুলনা চলে। সেখানেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে সদাপ্রবহমাণ স্রোতস্বিনীর মত এক বিচিত্র প্রেরণা জুগিয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে দুঃখবাদ নিহিত বলে তার শিল্পে এর স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। এইখানেই শ্যামদেশীয় শিল্পের গৌরব। সে ভারতীয় শিল্পের মাধুরীময় পথ অনুসরণ করে এই বিষাদকেই বড় করে দেখিয়েছে। সেখানে চীনা অথবা তিব্বতীয় চারুকলার পার্থিব ভাব খুব কমই আছে। তার বদলে আছে কেবল কারুণ্যপূর্ণ এক নীরব আত্মপ্রকাশ। সত্যিই এর তুলনা নেই।

সিংহলের পালি ধর্ম্মগ্রন্থ "মহাবংশ" থেকে জানা যায় যে, মৌর্য্য সম্রাট্ অশোক খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে "সুবর্ণভূমি"তে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকল্পে দুই জন প্রচারক পাঠান। এঁদের এক জনের নাম সোণ এবং আর এক জনের নাম উত্তর। এই "সুবর্ণভূমি"র প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে মতভেদ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, এই দেশটি দক্ষিণ-ব্রহ্মের কোন স্থানে ছিল। অপর পক্ষে, এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই দেশ শ্যামের অন্তর্ভুক্ত হওয়াও বিচিত্র ছিল না। শ্যামদেশের বর্ত্তমান অধিবাসী "থাই"দের মধ্যে এক কিংবদন্তী আছে যে, অশোকের দ্বারা প্রেরিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রচারকেরা দক্ষিণ-শ্যামে সমুদ্রকূলে অবস্থিত প্রাচীন নাখন পাথোমে প্রথম জাহাজ থেকে অবতরণ করেন। নাখন পাথোম সংস্কৃত "নগর প্রথমে"রই ভুল উচ্চারণ।

এখন এই সুবর্ণ-ভূমির প্রকৃত অবস্থিতি যেখানেই হোক না কেন, মৌর্য্যযুগের (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩২৪-১৮৭) ভারতীয় ভিক্ষুরাই যে প্রথম শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন এটা অনুমান করা যেতে পারে। এই সময় থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম শ্যামদেশের সর্ব্ববিধ শিল্পে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে আসছে।

শ্যামদেশের শিল্পকে মোটামুটি ভাবে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা, "মন-খেমির" (Mon-Khmer) যুগের এবং "থাই" যুগের শিল্প। প্রশান্ত মহাসাগরীয় "অষ্ট্রিক" গোষ্ঠী-ভুক্ত "মন্" ও "খেমির"রা শ্যামদেশে রাজত্ব করত খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-চীনে এমন এক বিরাট রাষ্ট্র-বিপ্লব হয়, যার ফলে শান্-মালভূমি এবং মেনাম-উপত্যকার ইতিহাস একেবারে ওলটপালট হয়ে যায়। চীন-দেশের "স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের" অধিপতি কুব্লাই খান দক্ষিণ-চীনের ইয়াংসি নদীর উপত্যকা থেকে "থাই" জাতিকে তাঁর "মোগল" সেনাদের দ্বারা নির্দ্দয়ভাবে উৎসাদিত করেন। ফলে বিতাড়িত "থাই"রা পূর্ব্ব-ভারত (আসাম ও মণিপুর), ব্রহ্মদেশ এবং শ্যামদেশে প্রবেশ করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্যামদেশের শেষ খেমির সম্রাট্ অরুণাবতী রুস্নাং "থাই"দের দ্বারা পরাজিত হন এবং এই সময় থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিজয়ী "থাই"-রাই শ্যামদেশে রাজত্ব করে আসছে।

"মন্" ও "খেমির" শিল্পের মূলে রয়েছে গাম্ভীর্য্য। তাদের নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি যেন দুঃখ ও মহিমার গৌরবময় প্রকাশ। এতে যেন বুদ্ধের চরমতম বাণীর আভাস আছে:

"সব্বে সংখারা দুঃখা,
সব্বে সংখারা অনিচ্চা,
সব্বে সংখারা অনত্তা।"

অর্থাৎ

"সমস্ত সংস্কারই দুঃখময়,
সমস্ত সংস্কারই অনিত্য,
(এবং) সমস্ত সংস্কারই আত্মহীন।"

কালীবাড়ীর সম্মুখস্থ পথের ধারের ঘরকন্না

সিমলার পথে কাশ্মীরী শ্রমিক।
কাজ চাই, কিন্তু কাজ নেই—অনাহারে শীর্ণ করুণ মূর্ত্তি
[শ্রীপরিমল গোস্বামীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

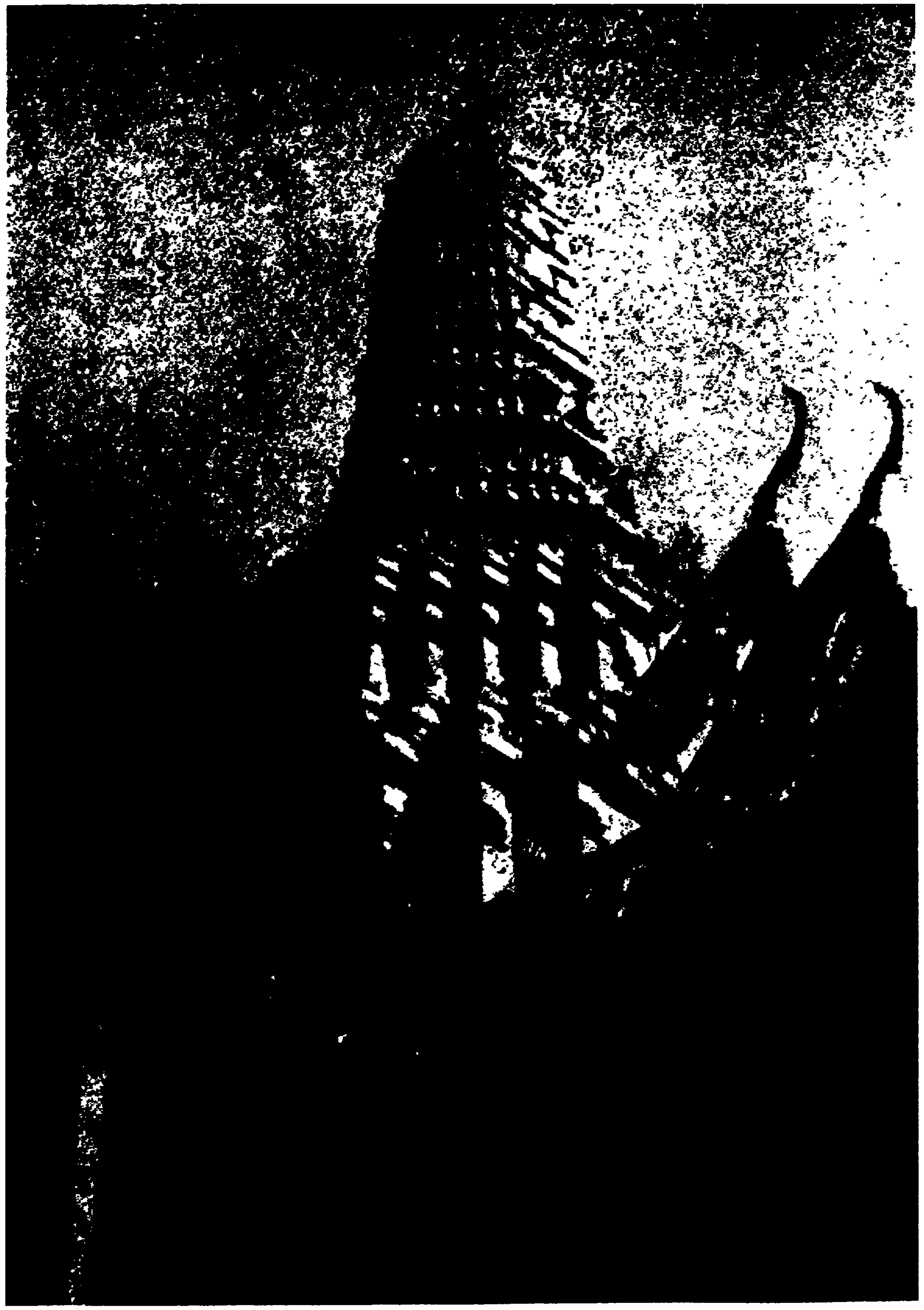

ব্যাঙ্ককের "ওয়াট ফ্রা কেও" মন্দিরের একটি শিখর

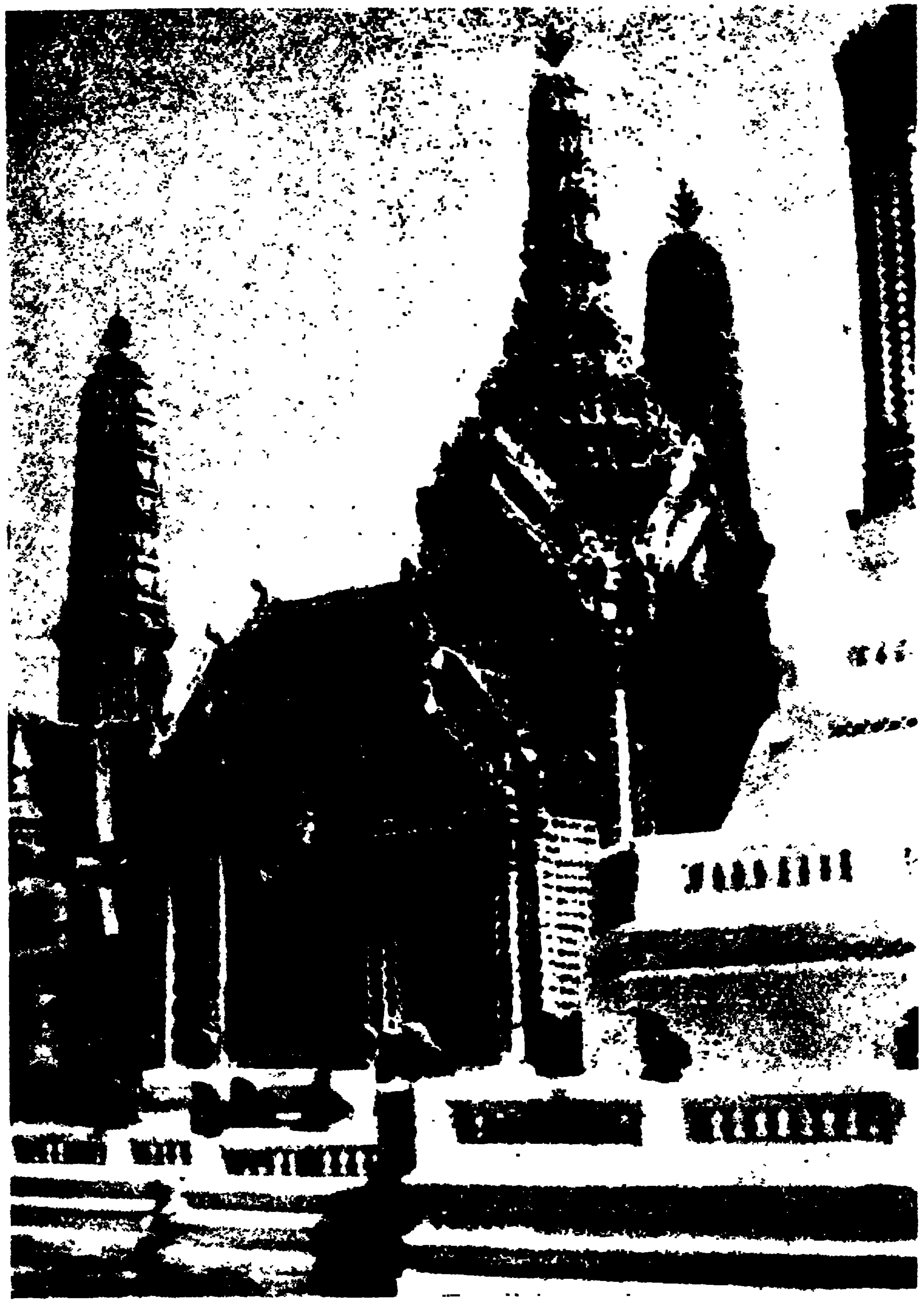

একটি আধুনিক থাই মন্দির (ওয়াট্ ফ্রা কেও)

এই বৈরাগ্যের ছাপ "খেমির" বুদ্ধমূর্ত্তিগুলির আননে অপরূপ ভাবে ফুটে উঠেছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের পরেই শ্যামদেশের শিল্পে রয়েছে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব। প্রাগৈতিহাসিক প্রশান্ত মহাসাগরীয় জাতিদের রহস্যময় ধর্ম্ম-বিশ্বাসও একে কম প্রভাবান্বিত করে নি। এক কথায় বৌদ্ধধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম এবং প্রাগৈতিহাসিক ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মিশ্রণেই শ্যাম দেশের শিল্পের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ। চীনের প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ইন্দোচীনে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে সেখানে নাগ-পূজার বিশেষ প্রচলন ছিল। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে হিন্দু ঋষি কৌণ্ডিন্য ইন্দোচীনে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন সোমা নাম্নী এক নাগরাজ-কন্যার পাণিগ্রহণ ক'রে।১ এই সময় এবং পরবর্ত্তী কালেও ইন্দোচীন, কম্বোজ এবং শ্যামে নাগপূজার প্রাধান্যের কথা জানতে পারি। এই নাগেরা সম্ভবতঃ "অষ্ট্রিক" গোষ্ঠিভুক্ত ছিল। এই সব কারণে বোধ হয় বৃহত্তর শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পরেও নাগপূজার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকে। সেখানকার অধিবাসীরা ভাস্কর্য্যে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে নাগকে যুক্ত করে। এইখানে বুদ্ধের বাহনরূপে নাগরাজকে ক্ষোদিত করা হয়। সুতরাং "মন্" ও "খেমির" জাতিদের দ্বারা সৃষ্ট অধিকাংশ বুদ্ধ মূর্ত্তির সঙ্গে ইন্দোচীনের প্রাগৈতিহাসিক সর্পপূজার সাদৃশ্য দেখতে পাই। প্রাচীন শ্যামদেশের ভাস্কর্য্যে গৌতম বুদ্ধের এই মানবরূপ (Anthropomorphic form) এবং জীবরূপের (Theriomorphic form) সমাবেশ সত্যই অপূর্ব্ব। প্রত্নতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে এর মূল্য অপরিমেয়।

"থাই"রা পূর্ব্ববর্ত্তী "খেমির" জাতির কাছ থেকে তাদের শিল্প গ্রহণ করে। তাদের দ্বারা নির্ম্মিত যে বৌদ্ধ শিল্প চিয়েং সেন, সুখোদয়, স্বর্গলোক এবং আয়ুথিয়ার গড়ে ওঠে, তার মূল প্রেরণা আসে "খেমির" অথবা "খোম" শিল্প থেকে। ডাঃ কোদেস্ (C'oedes) "থাই"দের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন,—

" . . . inheriting as it did the succession of the Khmer Kingdom, which sank in part beneath the blows that it administered, it transmitted to the Siam of Ayudhya a good number of Cambodian art-forms and institutions which still subsist in the Siam of to-day." ২

উপরোক্ত নানা কারণে "থাই" শিল্পেও নাগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া, অষ্ট্রিক সভ্যতার প্রথম দিকের আরও নানা চিহ্ন থাইদের চারুকলার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তাদের বর্ত্তমান রাজধানী ব্যাংককের অনতিদূরে "মন"

বিষ্ণুলোক হইতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি
[কলিকাতা আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত

জাতির অধ্যুষিত পাক্লাটে একটি প্রাচীন ও ভগ্ন বৌদ্ধ বিহারে দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তির পাদদেশে কুমীরের (থাই ভাষায় "চোরখে") মূর্ত্তি আছে। এই কুমীরের পূজা হয়ত শ্যামদেশে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে প্রচলিত।

শ্যামদেশে বহুকাল আগে থেকে "ফী" (Phi) নামে এক দেবতার পূজা চলে আসছে। এই দেবতার পূজা বহু বাড়ীর সামনে খেলা-ঘরের মত ছোট্ট কাঠের দেবস্থান গড়া হয়ে থাকে। এখানকার মাটির পুতুলগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। কে বলতে পারে, হাজার হাজার বছর আগে প্রশান্ত মহাসাগরের পরস্পরবিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলিতে যে এক বিরাট সভ্যতা বিরাজ করত, হয়ত এই "ফী" পূজার মাটির অমসৃণ পুতুলগুলি তারই নিদর্শন। এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, এই পুতুলগুলি বাংলার "ষষ্ঠী" পূজা উপলক্ষে তৈরি মাটির পুতুলগুলির কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

শ্যামদেশের চারুকলায় হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবও বড় কম নয়।

১। R. C. Mazumdar—"*Campa*", Introduction, দ্রষ্টব্য।

২। "Origins of the Sukhodaya dynasty," *Journal of the Siam Society*, Vol. XIV.

আয়ুথিয়ার বিখ্যাত বুদ্ধমূর্ত্তি
"ফ্রা মোন্‌খলপোবিত" (মঙ্গলপবিত্র)

আনুমানিক, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে ইন্দোচীন ও শ্যামে কৌণ্ডিন্য ঋষির ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রচারের পর থেকে এই সব দেশের শিল্প হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে আসছে। খেমির রাজধানী লোপবুরি (লবপুরি), ফিমাই১ ও বজ্রপুরি ও জয়শ্রী এবং থাই রাজধানী সুখোদয় এবং আয়ুথিয়াতে মহাদেব, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, অর্দ্ধনারীশ্বর ইত্যাদি হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর অনেকগুলি মূর্ত্তি এখন ব্যাংককের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সংমিশ্রণের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধ হয়, বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বরের কল্পনা। এই দেবতা অনন্ত করুণা-ময় এবং সর্ব্বজীব—পাপী পুণ্যবান-নির্ব্বিশেষে—তাঁর করুণার অধিকারী। এক কথায় অবলোকিতেশ্বরের কল্পনায় এমন এক অনন্ত গরিমা আছে যা আর কোনও দেবদেবীর মধ্যে কমই দেখা যায়। শ্যাম, চীন এবং জাপানে তাঁর পূজা অত্যধিক প্রচলিত। চীনদেশে তিনি "ক্যোয়াফিন্‌' এবং জাপানে তিনি "ক্যোয়াজন্‌" নামে পরিচিত।২ শ্যামের পার্শ্ববর্ত্তী কম্বোজ অবস্থিত বেয়নের একটি সুপ্রাচীন মন্দির-শিখরের চতুষ্পার্শ্বে বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বরের যে বিরাট মুখাবয়ব নির্ম্মিত আছে তা অপূর্ব্ব। বেয়নের এই বিখ্যাত অবলোকিতেশ্বরকে দেখলে মনে হয় যে তিনি যেন দূর প্রাচ্যের শ্যামল বনানী থেকে সর্ব্বজগতের সর্ব্বজীবকে অকৃপণ করুণা বিতরণ করছেন।

প্রাচীন শ্যামের স্থাপত্যেও হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। প্রাচীন "মন্‌ খেমির" এবং মধ্যযুগীয় "থাই"দের দ্বারা নির্ম্মিত অনেক বৌদ্ধ-বিহারের চূড়ায় ত্রিশূল গ্রথিত আছে। এ ছাড়া এই সব মন্দিরে শৈব ধর্ম্মের চিহ্নস্বরূপ বৃষমূর্ত্তি স্থাপিত দেখা যায়। প্রাচীন "মন্‌ খেমির" মন্দিরগুলি ভারতীয় হিন্দু স্থাপত্যের অনুকরণে নির্ম্মিত হ'ত। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে "থাই"দের আগমনের সঙ্গে এই হিন্দু স্থাপত্য-রীতির পরিবর্ত্তন ঘটে এবং মন্দিরের শিখরগুলি ("ফ্রো চেদ" অথবা "প্রাং") সরু এবং লম্বা হতে থাকে। আধুনিক যুগে চীনা স্থাপত্যের প্রভাবে অনেক "থাই" মন্দির মঠের ছাদ ঢালু এবং বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত।

"থাই" যুগে "খেমির" ভাস্কর্য্যেরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। "খেমির"দের দ্বারা নির্ম্মিত বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলিতে ক্রমে এই যুগে এক অপূর্ব্ব সূক্ষ্মতার প্রবর্ত্তন হয়। এই সূক্ষ্মতাই "থাই" ভাস্কর্য্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। পূর্ব্বতন খেমির ভাস্কর্য্যের পুরু ওষ্ঠ ও নাসিকা এবং নিমীলিত নয়ন আর প্রশস্ত ললাট থাইযুগে এক অপূর্ব্ব তীক্ষ্ণতা এবং সাবলীলতা লাভ করে। এই সময়ে উত্তর-শ্যামে চিয়েং সেন, সুখোদয় এবং বিষ্ণুলোকে নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তিগুলির মুখশ্রী পাতলা ঠোঁট, সরু নাসিকা এবং ভাবপূর্ণ নয়নের সামঞ্জস্যে এক অতি বিচিত্র রূপ ধারণ করে। এ ছাড়া, থাই বুদ্ধের দেহসৌষ্ঠবও অপূর্ব্ব। জনৈক শিল্প-বিশেষজ্ঞের মতে এই মূর্ত্তির আঙ্গিক রেখা যেন অনেকটা প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখার কম্পিত ভঙ্গিমার মত।৩ ডাঃ কুমারস্বামী থাই ও খেমির ভাস্কর্য্যের তুলনা করে বলেছেন,—

"The Thai type evolved in the North is characterised by the curved elevated eye-brows, doubly curved upward sloping eye-lids (almond-eyes), acquiline and even hooked nose, and delicate sharply moulded lips and a general nervous refinement contrasting strongly

১। মূল নাম "ভীমপুর।"
Cf. B. R. Chatterji—"*Indian Cultural Influence in Cambodia*", pp. 51, 224.

২। Binyon—"*The Paintings of the Far East.*" K. D. Nag—"*Indian and the Pacific World.*"

৩। Prof. Silpa Bhirasri—"Sculpture and Painting in Siam." *Mirror, Vol. 1, No. 9.*

with the straight brows and level eyes, large mouth and impassable serenity of the classic Khmer formula." *

এখন, প্রশ্ন এই যে, থাইরা দক্ষিণ-চীন থেকে এলেও তাদের প্রথম ভাস্কর্যে "মোঙ্গোল" প্রভাব কিছুমাত্রও প্রতিভাত হয় নি কেন? এর উত্তর দিতে হলে আমাদের প্রথমে জানা দরকার "থাই"দের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল। এ বিষয় আগেই বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ-চীনে তারা প্রথমে বসবাস করত। তাদের আদি বাসভূমি "নান্ চাও" ও তার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এই সব অঞ্চলে সম্ভবতঃ বহু প্রাচীনকালেই বাংলার সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে। বহু শতাব্দী যাবৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ধরে বাংলা ও দক্ষিণ-চীনের মধ্যে যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তার প্রমাণ আছে। নান্ চাওয়ের একটি প্রবাদ থেকে জানা যায় যে, মগধের সম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোকের তৃতীয় পুত্র নান্ চাওয়ের অধিবাসীদের আদিপুরুষ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রসিদুদ্দিন-লিখিত বিবরণ পাঠেও নান্ চাওয়ের উপর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের কথা জানতে পারি। এ ছাড়া, দক্ষিণ-চীনে থাইদের আদি-বাসভূমির উপর বৃহত্তর বঙ্গের নানাবিধ ধর্ম্মগত এবং সংস্কৃতি-গত প্রভাবের কথা ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে জানতে পারা যায়।১ উপরোক্ত নানা কারণই থাই-শিল্পকলার সূক্ষ্ম মাধুর্য্যের উৎস। সম্ভবতঃ এইজন্যই উত্তর-শ্যামে অবস্থিত চিয়েং সেনের সর্ব্বপ্রাচীন "থাই" শিল্পকলায় পাল ও সেন যুগের বাংলার শিল্পের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ডাঃ লে মে'র (Dr. Le May) মতে এই শিল্পকলা বহুলাংশে পালযুগের শিল্পধারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। চিয়েং সেন এবং পরবর্ত্তী সুখোদয় যুগের অনেক বুদ্ধমূর্ত্তির ভঙ্গিমা আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেকটা পাল ও সেন যুগের বুদ্ধমূর্ত্তির মতই সুডৌল এবং লাবণ্যময়।

সুখোদয় যুগের পাষাণ এবং ব্রোঞ্জ প্রভৃতি মিশ্রধাতুর বুদ্ধমূর্ত্তিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল মাথার উপর প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখা অথবা গোলাকৃতি কেশগুচ্ছের সমাবেশ। এই যুগের মূর্ত্তিগুলি সত্যই অপূর্ব্ব। তথাগতের দণ্ডায়মান মূর্ত্তিতে তার স্মিতহাস্য, তাঁর অগ্রগামী বাম পদ, বাম হস্তে অভয় মুদ্রা এবং শিরোপরি এক সুন্দর লেলিহান বহ্নিশিখা সবকিছুতে মিলে যেন এক অনির্ব্বচনীয় প্রেমের রূপ প্রতিষ্ঠা করেছে। বরাভয় যেন তাঁর অহিংসা এবং ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আর অগ্নিশিখা তাঁর চরমতম প্রজ্ঞার বিকাশ যা দগ্ধ করে তৃষ্ণা ও মোহের ছলনা ও ইন্দ্রজালকে। এখানে যেন বিষয়বিরাগী শাক্য-রাজপুত্র সকলকে সাহস দিয়ে বলছেন,

"ফেণূপমং কায়ম্ ইমং বিদিত্বা
মরীচিধম্মং অভিসমবুধানো
ছেত্বান মারস্স পপুপ্ ফকানি
অদস্সনং মচ্চুরাজস্স গচ্ছে।" ইত্যাদি।

অর্থাৎ,

"এ দেহকে ফেনসম জেনে
জেনে তার মরীচিকা-মতি
"মার" বৃষ্ট পুষ্পশর নাশি
যাও চলি মৃত্যুরাজ দৃষ্টির বাহিরে।"১ ইত্যাদি।

অথবা,

"উত্তিঠ্ঠে নপ্পমজ্জেয় ধম্মং সুচরিতং চরে,
ধম্মোচারি সুখং সেতি অস্মিন্ লোকে পরম্হি চ

শ্যামদেশের রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পের উপর অঙ্কিত বীণাবাদিনী সরস্বতী মূর্ত্তি
[শিল্পী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক বৃহদাকারে অঙ্কিত

* *The History of the Indian and the Indonesian Art.*

১। R. C. Mazumdar—'*Campa*'; introduction, pp. XIV—XV.

১। মৃত্যুরাজের দৃষ্টির বাহিরে যাওয়া, অর্থাৎ, "নির্ব্বাণ" (হিন্দুশাস্ত্রে "মোক্ষ") লাভ করা।

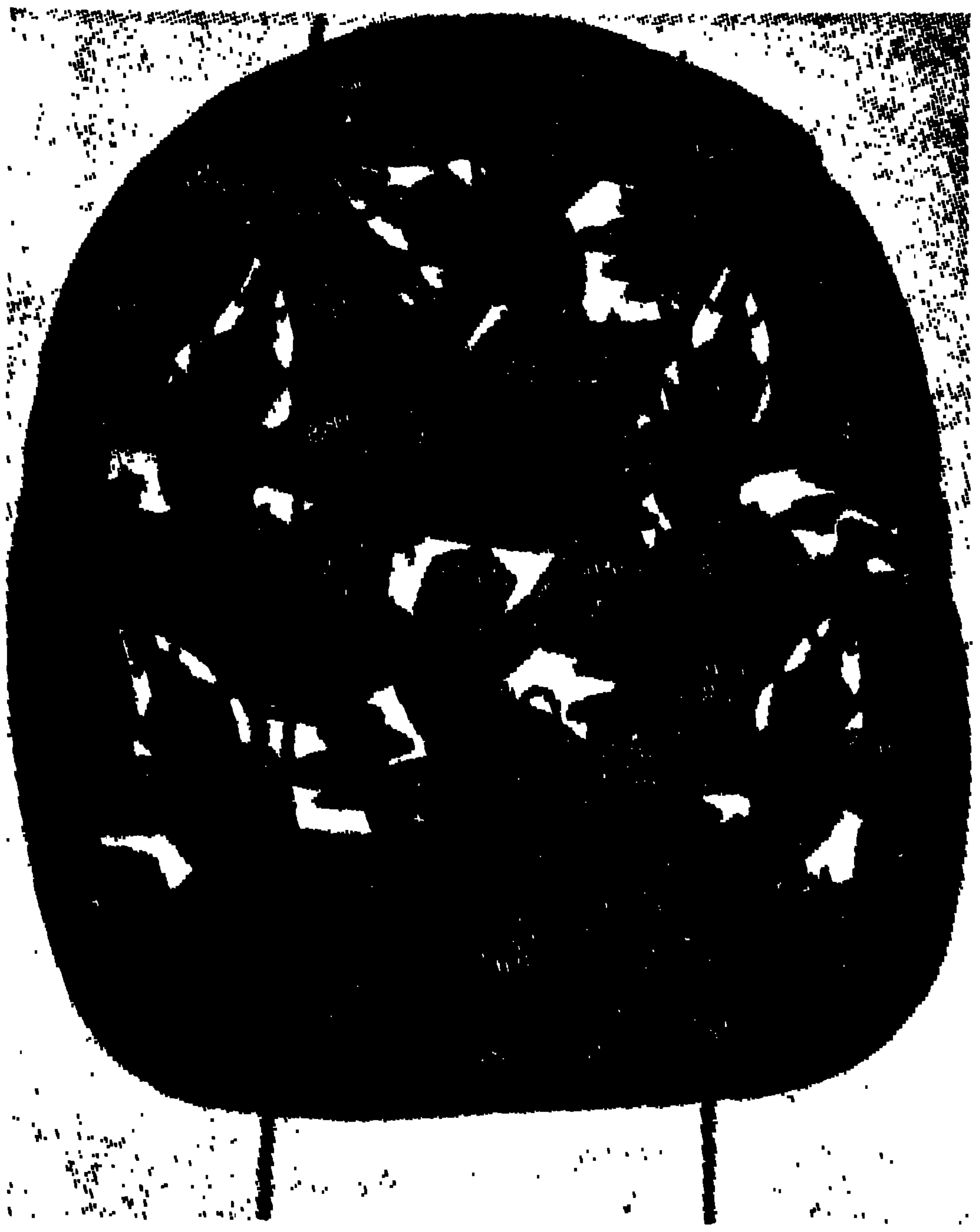

নৃত্যরত রাবণ ও তাঁহার যোদ্ধৃবৃন্দ—ছায়ানৃত্যে

অর্থাৎ,

"ওঠো, অলস হয়ে থেক না, ধর্ম্মকার্য্য করে যাও ; কারণ ধর্ম্মচারী ইহলোক এবং পরলোকে সুখে থাকেন।"

সুখোদয় যুগ শেষ হলে আরম্ভ হ'ল আয়ুথীয় যুগ (খ্রীঃ ১৩৫০-১৭৬৭)। এই যুগে, বিশেষ করে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্যামদেশ বারংবার ব্রহ্মদেশ দ্বারা আক্রান্ত হয়। ব্রহ্মদেশের পরাক্রান্ত নৃপতি বায়িন্নায়ুং (খ্রীঃ ১৫৫১-১৫৮১) এবং তৎপুত্র নন্দবায়িন (খ্রীঃ ১৫৮১-১৫৯৯) মধ্য ও উত্তর-শ্যামে অবস্থিত লাম্ফুন, বিষ্ণুলোক এবং লোপবুরি অধিকার করেন। ফলে থাই চারুকলায় ব্রহ্মদেশের শিল্পও ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এই সময় কোন কোন ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তির মাথায় মুকুট দেওয়ার রীতি হয়। এই মুকুট দেখতে হুবহু ব্রহ্মদেশীয় "প্যাগোডার" মত। এই মুকুটশোভিত ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি ("ভূমিস্পর্শ" ভঙ্গি) সত্যই ভাবমাধুর্য্যে অনিন্দ্যসুন্দর। এই রকম একটি ক্ষুদ্র পুরাতন মূর্ত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "আশুতোষ মিউজিয়ামে" রক্ষিত আছে। বর্ত্তমান লেখক এটি সংগ্রহ করেছিলেন উত্তর-শ্যামে অবস্থিত বিষ্ণুলোকের একটি প্রাচীন অর্দ্ধ-ভগ্নীভূত মন্দির থেকে। এই মন্দিরটি ব্রহ্মদেশীয় অভিযাত্রী সৈন্যবাহিনীদ্বারা আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে বিধ্বস্ত হয়েছিল। বর্ত্তমান শ্যামের অধিকাংশ বুদ্ধমূর্ত্তিই সুখোদয়, বিষ্ণুলোক এবং আয়ুথীয়া যুগের মূর্ত্তিগুলির অনুকরণে গঠিত। আধুনিক ব্যাংককের (অথবা "ক্রুংথেপ"—দেবতাদের নগর) "ওয়াট্" অথবা মন্দিরগুলির মধ্যে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের অনেক মূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। শ্যামের বর্ত্তমান "চক্রি" বংশের সম্রাট চুলাসংকর্ণ বিষ্ণুলোকের বিখ্যাত প্রাচীন "বুদ্ধ জিনরাজ" মূর্ত্তির অনুকরণে ব্যাংককের ওয়াট বেঞ্চামাপোবিত্তে (পঞ্চম-পবিত্র) একটি মূর্ত্তি তৈরি করিয়েছিলেন। এ ছাড়া ওয়াট ক্রা কেতন (থাই উচ্চারণ "কেতুকোন" একটি অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু) অথবা ওয়াট ফো (Pho)-র শায়িত বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তিও প্রাচ্যের এক অপূর্ব্ব শিল্পনিদর্শন। এই মূর্ত্তিকে থাইরা "ক্রা মন্" অথবা "সুপ্ত ভগবান" আখ্যা দিয়েছে। "ক্রা নন্" সম্রাট বজিরভাদের (Rama VI) তিরোধানের (১৯২৫ খ্রীঃ) পর বহুদিন শ্যামদেশে অবজ্ঞাত ছিল। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে মার্শাল পিবুল সোংগ্রাম (বিপুল সংগ্রাম) ব্যাংককের আরও অনেক মন্দিরের মত ওয়াট ফোরও জীর্ণসংস্কার সুরু করেন। এই সময় বর্ত্তমান লেখক এক দিন উক্ত শায়িত বুদ্ধমূর্ত্তি দেখতে যান তাঁর এক থাই বন্ধুর সঙ্গে।

শ্যামদেশের চিত্রকলাও অতুলনীয়। সম্ভবতঃ এর উৎপত্তি মধ্য যুগে এবং তা আয়ুথীয়া যুগের শেষদিকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশলাভ করে। বৌদ্ধ জাতকের উপাখ্যানসমূহ, রামায়ণের গল্প এবং যবদ্বীপের পঞ্জিমহাকাব্য (Panji Epic)এর বিষয়বস্তু। ওয়াট সি সুমের অপূর্ব্ব জাতক-আলেখ্য, সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আয়ুথীয়ার সম্রাট্ মহাধর্ম্মরাজাধিরাজের সময় (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৩৫৭-১৩৮৮) চিত্রিত করা হয়েছিল।[১] এই প্রাচীর-চিত্র সবচেয়ে আকর্ষণীয়। বোধ হয় এতে দেবধর্ম্ম-জাতকের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ডাঃ কুমারস্বামীর মতে ওয়াট সি সুমের এই প্রাচী-চিত্রের উপর সিংহলের পোলন্নরুবার অনুরূপ শিল্পের যথেষ্ট প্রভাব আছে। তাঁর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহ করবার অবকাশ আছে। প্রথমতঃ পোলন্নরুবার চিত্রকলা থেকে যে ওয়াট সি সুমের চিত্রকলা অনুকরণ করা হয়েছিল এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের অজন্তা এবং সমসাময়িক চীনা চিত্রশিল্পের প্রভাবও শ্যামদেশের চিত্রকলায় বড় কম নয়।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে শ্যামদেশের চিত্রকলা সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিকাশ লাভ করে। এই সময় থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জাতক, রামায়ণ এবং যবদ্বীপের পঞ্জিমহাকাব্যই ঐ চিত্রকলায় সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রামায়ণকে শ্যামদেশে বলা হয়ে থাকে

১। বৌদ্ধ "ধর্ম্মচক্র" থেকে।

১। Coomaraswamy—*The History of th Indian and the Indoneshian Art*, p. 177.

"রামকীর্ত্তি" (উচ্চারণ,"রামকীয়েন")। এই "রামকীর্ত্তি" অথবা "রামকীয়েন" ভারতের মূল রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও তাতে বাংলার কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং তামিল রামায়ণের প্রভাবও বড় কম নয়। শ্যামদেশের রাজপুত্র ধানি নিবাতের মতে,—

"That original version (of the Ramayana) have come over to this side of the Bay of Bengal at about the same time as primitive Buddhism as early as the IIIrd Century of the Christian era. Mediaeval Indian versions such as the Tamil and the Bengali based upon the classical Ramayana came later to Java . . . . These and the primitive folk-tale (*i.e.*, the original Rama-story) combined to produce what we have now in Siam." *

এখানে অবশ্য একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, "থাই" রামায়ণের সবটাই সংস্কৃত, তামিল অথবা বাংলা রামায়ণ থেকে গৃহীত নয়। এর মধ্যে মূল কাহিনী ছাড়া থাই এবং কতকটা পূর্ব্বতন খেমিরদের ব্যবহারিক জীবনের আভাস পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, "রাম-কীর্ত্তি"তে সুন্দরী নারীদের প্রাধান্য খুবই বেশী। এ ছাড়া শ্যামদেশের চিত্রকলা এবং নৃত্যশিল্পে রামকীর্ত্তির যে চিত্র প্রতিফলিত হয়, তাতেও আয়ুথীয়া যুগ (খ্রী: ১৩৫০-১৭৬৭) এবং তার পরবর্ত্তী ব্যাংকক যুগের (খ্রী: ১৭৬৯ অব্দ থেকে আধুনিককাল পর্য্যন্ত) প্রথম দিকের থাইদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়। এখানে যেন দশরথপুত্র রাম এবং দশকন্ধের সেনানীদের মধ্যে কঠোর সংগ্রাম শ্যাম এবং ব্রহ্মদেশের ঐতিহাসিক সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ব্যক্ত করছে। শ্যামদেশের "খোন" অথবা মুখোশ-নৃত্যে কোন কোন সময় রাক্ষস সেনাপতিদের অশ্বারোহী হিসাবে দেখানো হয়ে থাকে। এই সব জায়গায় রাক্ষস সমরনায়কের কোমরবন্ধনীতে একটি ছোট কাঠের ঘোড়া বাঁধা থাকে। এই সেনাপতিরা এমনভাবে নৃত্য করতে থাকেন যে, দেখে মনে হয় সত্যই তিনি একটি তেজী ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে আছেন। অপর পক্ষে রামচন্দ্র এবং তাঁর অনুগামী সেনাদের কদাচিৎ অশ্বপৃষ্ঠে দেখা যায়। এই নৃত্যের মধ্যে মধ্যযুগীয় শ্যাম-ব্রহ্ম বিরোধের ছাপ আছে বলে মনে হয়। বারংবার দেখা গিয়েছে যে, ব্রহ্মদেশীয় অশ্বারোহী সেনাবাহিনী শ্যামদেশ নির্দ্দয়ভাবে লুণ্ঠন করেছে।

"পঞ্জি"-মহাকাব্য হুরিপানের বীর রাজপুত্র রাদেন ইনুর সঙ্গে রাজকুমারী চন্দ্রকিরণের প্রেমকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই মহাকাব্য থাই ভাষায় অনূদিত হয়। এই থাই অনুবাদে রাদেন ইনুকে ইনাও এবং চন্দ্রকিরণকে বুসবা (পুষ্পা) নামে অভিহিত করা

নৃত্যরত ইনাও ও বুস্‌বা

হয়েছে। শ্যামদেশের এই অনুবাদের নাম "ইনাও।" এই কাহিনীকে অবলম্বন করে থাই শিল্পীরা যে সব চিত্র অঙ্কিত করেছেন তা সত্যিই প্রেমের সূক্ষ্মতা এবং ভাবমাধুর্য্যে অতুলনীয়। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের বিচারে ইনাও-এর চিত্রকলা এক অপূর্ব্ব উৎকর্ষ লাভ করেছে।

শ্যামদেশে এমন এক শ্রেণীর প্রাচীরচিত্র আছে যাকে ঐতিহাসিক চিত্র আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই সব চিত্র সাধারণতঃ শ্যামদেশের মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ঘটনা-সমূহ অবলম্বনে অঙ্কিত। বিশেষ করে, এতে শ্যাম-দেশের সঙ্গে ব্রহ্ম এবং কম্বোজের রাজনৈতিক বিবাদই পরিস্ফুট হয়েছে। এই ধরণের চিত্রে পর্ত্তুগীজ এবং ফরাসী সৈন্যদের অনেক দৃশ্য আছে। এর প্রধান কারণ এই যে, ফিরিঙ্গীরা (থাই ভাষায়, "ফরাং") আয়ুথীয়া-যুগের শেষার্দ্ধে এবং পরবর্ত্তী ব্যাংকক-যুগে থাইজাতির বেতনভোগী হয়ে অনেকবার ব্রহ্মদেশীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করে। ব্যাংককের বিখ্যাত "ন্যাশনাল মিউজিয়ামে" অনেক প্রাচীর-চিত্র আছে। ১৮৮৭ সালে চক্রিবংশের বিখ্যাত সম্রাট চুলালংকর্ণ (খ্রী: ১৮৬৮-১৯১০) অনেক ছবির বিষয়বস্তু নির্দ্ধারণ করে সেগুলো আঁকিয়ে নেন। সম্রাটের আদেশে এই সব ছবির কাহিনীকে ভিত্তি করে কাব্যও রচিত হয়।

* "The shadow-play as a possible origin of the masked-play." *Journal of the Siam Society, October, 1948.*

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্যামদেশে এক নূতন চিত্র-শিল্পের প্রবর্ত্তন হয়। তাকে নিঃসংশয়ে আধুনিক আখ্যা দিতে পারা যায়। এই শিল্পে রহস্যবাদ এবং "Symbolism"-এর মিশ্রণ ঘটেছে এবং ইউরোপীয় শিল্পের অনুকরণে এর বিষয়বস্তু নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে।

শ্যামদেশের পুতুলগুলি (থাই ভাষায়, "তুকতা") যেন সৌন্দর্য্যের প্রতীক। এই পুতুলগুলিকে শিল্পের দিক দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—প্রাগৈতিহাসিক শিল্প দ্বারা প্রভাবিত কাঁচা অথবা পোড়ামাটির পুতুল এবং মধ্যযুগ ও বর্ত্তমান কালের "পৌত্তলিক কলার" অভিব্যক্তি মাটির অথবা জরির পুতুল।

প্রথম শ্রেণীর পুতুলের উৎপত্তি সম্ভবতঃ আর্য্য এবং দ্রাবিড়পূর্ব্ব "অষ্ট্রিক" সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে। এই পুতুলগুলি সাধারণতঃ "ফী" দেবতার পূজা উপলক্ষে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পুতুলগুলি "রামকিয়েন", ইনাও এবং বৌদ্ধ জাতক অবলম্বনে তৈরি হয়ে থাকে। সাধারণতঃ বর্ত্তমান ব্যাংককে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, রাবণ, বিভীষণ ('বিভেক') ইনাও এবং জাতক-বর্ণিত অর্দ্ধ শিখিনী কিন্নরী মনোহরার পুতুলগুলিই বেশী পাওয়া যায়। এই পুতুলগুলির জরির কাজ সুন্দর।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে শ্যামদেশের শিল্পের সৌন্দর্য্য এবং উৎকর্ষ সম্বন্ধে হয়ত কতকটা ধারণা করা যেতে পারে।

যে সংস্কৃতির আলো একদিন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রেখে এসেছিলেন সমুদ্রের ওপারে এই সব দেশে, আজ আবার আমাদের সেই সম্পদ আহরণ করে আমাদের দেশে নিয়ে আসতে হবে।

কবি ও কাব্য

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

কোন এক পল্লীপ্রান্তে নিভৃত প্রাঙ্গণে
ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত ধূসর সন্ধ্যায়
যূথিপরিমলবাহী মেদুর পবনে
জুড়াইয়া তনুমন, স্নিগ্ধ দীপালোকে
পড়িতেছ এ আমার মর্ম্মের কাহিনী
ছন্দোময়,—হে অজ্ঞাত পাঠক আমার!
দুরন্ত আবেগ মোর—প্রাণের উচ্ছ্বাস
ওগো বন্ধু, তব চিত্ততটমূল 'পরে
পড়িছে কি আছাড়িয়া আজি এই ক্ষণে
কলোচ্ছল জাহ্নবীর বারিধারা-প্রায়
তুলিয়া হিল্লোল? মোর দুঃখ সুখ যত,
ক্ষুদ্র সাধ, ক্ষুদ্র আশা, আনন্দবেদনা,—
তব মনোবীণাতারে একটি ঝঙ্কার
তুলিছে কি জাগাইয়া? কুসুম সমান
বনবন-অন্তরালে কণ্টকশয্যায়
অনন্ত স্ফুটন ব্যথা সহি' অবিশ্রাম
তোমাদেরি তরে করি সুরভি-বিথার!
ধূপের নীরব দাহ কে দেখেছে চোখে?—
চায় সবে স্নিগ্ধ তার মধুর সুবাস!
আমার অন্তরে থাক্ বেদনা আমার,—
তোমার আনন্দ লাগি বচন-রচন
ক'রে যাই ছন্দোবন্ধে; যদি লাগে ভালো
তাই মোর এ জীবনে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার!
চাহি নি জীবনে কভু রাজার সংসদ,
খ্যাতি, মান, নিন্দাস্তুতি করি নি ভ্রূক্ষেপ,
রচি নাই ছটাভরা কথার কুহক—
চমকিত করিবারে কভু বিশ্বজন!
আমার কবিতা—সে যে আমারি হিয়ার
অকৃত্রিম অনুভূতি সহজ সরল।
বাল্মীকি, রবীন্দ্র নই—নহি কালিদাস,—
নগণ্য যদিও তবু—তবু আমি কবি!
বেদনায় উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত আমার
সেদিন লাগিবে ভালো—যদি কোন দিন
কর্ম্মহীন আষাঢ়ের উতল সন্ধ্যায়
বহুদিন-ভুলে-যাওয়া একখানি মুখ
জেগে ওঠে স্মৃতিপটে; যদি এ সংসার
লাগে কভু জ্বালাময়, তিক্ত, রসহীন;
জীবনের খরতাপে কল্পনা-কুসুম
যায় যদি ঝলসিয়া কভু কোন দিন,—
সেদিন পড়িও তুমি কবিতা আমার!
পারিব না তোমাদের উৎসবের রাতি
করিবারে মধুময়, সরস, উজ্জ্বল
কৃত্রিম উল্লাস-রসে। বাসকশয়নে
মদির চম্পক-গন্ধে কোকিল কূজনে
প্রিয়াকণ্ঠলীন হয়ে থাক যদি সুখে—
সেথায় ডেকো না মোরে! শূন্য গৃহতলে
হু হু ক'রে কাঁদে যবে সাথীহারা প্রাণ—
নিশীথের রন্ধ্রহীন সান্দ্র অন্ধকারে,—
সেদিন পড়িও তুমি কবিতা আমার!

বাঙ্গলা লিপি-সংস্কার

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

গত বৎসর আষাঢ়ের প্রবাসীতে "বাঙ্গলা নবলিপি" প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কথাটা এই, প্রচলিত লিপির দোষ আছে কি? সে দোষ অক্ষরের আকারে, না অক্ষর যোজনায়, না দুইতেই? আমি উক্ত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, অক্ষরের আকারে ও অক্ষর যোজনায়, উভয়েই দোষ আছে।

কিন্তু এতকাল সে দোষ চলিয়া আসিতেছে, আমরা সে দোষ সংশোধন অর্থাৎ লিপি-সংস্কার করিবার প্রয়োজন অনুভব করি নাই। এখন এমন কি অবস্থা হইয়াছে, যে নিমিত্ত লিপি-সংস্কার করিতে বসিব?

বহুকাল হইতে আমরা দেশে শিক্ষা-বিস্তার করিতে বলিতেছি। দেশ অন্ধকারে ডুবিয়া আছে, দুঃখে দারিদ্র্যে রোগে কষ্ট পাইতেছে। জ্ঞানই ইহার একমাত্র প্রতিকার। কতজনকে কত বিষয় মুখে মুখে শিখাইবে? এক অদ্ভুত বিদ্যা আছে, সে বিদ্যা লিখন-পঠন বিদ্যা। সে বিদ্যা লাভ করিলে লোকে নিজে নিজে জ্ঞান অর্জন করিতে পারিবে। বিদ্যাগ্রহীতা যত অল্প সময়ে ও সহজে সে বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারে, তত তাহার ও বিদ্যাদাতার সুবিধা। বিদ্যাদাতা দানের পাত্র বাড়াইতে পারিবেন, বিদ্যাগ্রহীতা সংসারের আবশ্যক কর্ম করিতে সময় পাইবেন। কেবল বালক-বালিকা নয়, প্রাপ্ত-বয়স্ককেও লিখন-পঠন বিদ্যা দান করিতে হইবে। মূল্য লইয়া নয়, বিদ্যা প্রদান। তাহারা কেহই নিষ্কর্মা বসিয়া থাকে না, পাঠশালায় দুই-তিন বৎসর আনা-গনা করিতে পারে না।

এইরূপ চিন্তা করিয়াই নবলিপি প্রস্তাব করিয়াছি। যে লিপি আছে, তাহা যথাসম্ভব রাখিব, আবশ্যক হইলে কোন কোন অক্ষরের আকার অল্প-স্বল্প পরিবর্তন করিব। কিন্তু দেখিব, পরিচিত লিপির সংস্কার করিতেছি, উহা বিসর্জন করিতেছি না।

আমাদের এই বহুদিনের কামনা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এতকাল শিশুশিক্ষা ইচ্ছাধীন ছিল। পশ্চিমবঙ্গরাজ সে শিক্ষা নিজের হাতে লইতেছেন এবং দেশের যাবতীয় বালক-বালিকাকে শিক্ষা দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। শিশুকে পাঠশালায় না পাঠাইলে তাহার পিতা দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেন। ব্যাপারটি ক্ষুদ্র নয়। শিক্ষামন্ত্রী প্রাপ্ত-বয়স্কদিগেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যাপার আরও গুরুতর। পশ্চিমবঙ্গে আড়াই কোটি লোকের বাস, তাহাদের কেহই নিরক্ষর থাকিবে না। যদি দশ বৎসরের মধ্যেও এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলেও কি বিপুল আয়োজন ও অর্থব্যয় আবশ্যক হইবে, তাহা চিন্তা করুন। এই দরিদ্র দেশে, অন্নবস্ত্র কষ্টের দেশে, রোগশোক-ক্লিষ্ট দেশে, ইহা সুসাধ্য করিতে হইলে শিক্ষার পথ সুগম করিতে হইবে। শিশুদিগকে যত বৎসরই শিক্ষা দেওয়া হউক, আর যে পদ্ধতিতেই হউক, সকলকে লিখিতে পড়িতে গণিতে শিখাইতে হইবে। যত অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে বাঙ্গলা ভাষা লিখিতে ও পড়িতে শিখে দেশের নিরক্ষরতা তত সহজে দূর হইবে। বর্তমানে বাঙ্গলা অক্ষর পরিচয় করিতে, পড়িতে ও লিখিতে শিখিতে শিশুদের প্রায় দুই বৎসর লাগে। প্রাপ্ত-বয়স্কেরাও সহজে পারে না। প্রচলিত সংযুক্ত স্বরাক্ষর ও ব্যঞ্জনাক্ষর কণ্টকস্বরূপ হইয়া আছে।

আমি নবলিপিতে দুইটি সূত্র গ্রহণ করিয়াছি। (১) যাবতীয় সংযোজ্য স্বরাক্ষর ব্যঞ্জনের পরে বসিবে। (২) যাবতীয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর স্ব স্ব আকারে পাশে পাশে বসিবে। একটি অন্তঃস্থ-ব অক্ষর কল্পনা করিতে হইয়াছে। ক্ষ, জ্ঞ ও হ্ম এই তিনটি সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্তমান আকারে রাখিতে হইয়াছে। এই দুই সূত্রের বহির্ভূত যাহা কিছু লিখিয়াছি, তাহা গ্রহণ করিলে ভাল হয়, না করিলে "নবলিপি"র উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে না।

দশ-বার জন বিজ্ঞ ব্যক্তি নবলিপি সম্বন্ধে কেহ পত্রদ্বারা, কেহ মুখে মুখে তাঁহাদের মত জানাইয়াছেন। (১) কেহ বলিয়াছেন, নবলিপি চলিবে না, কারণ ইহা নূতন। (২) এক বিজ্ঞ বন্ধু মানুষের মনের গতি নির্ণয় করেন। তিনি নবলিপিতে আমায় এক পত্র লিখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, এই লিপি লিখিতে কাগজ ও সময় বেশী লাগে, এই লিপি চলিবে না। কিন্তু এই দুই কারণেই বাঙ্গলা যুক্তাক্ষর উপরে-নীচে বসিয়াছে, ছোট-বড় ও ব্যঙ্গ হইয়াছে। এই দোষ সংশোধনের নিমিত্তই নবলিপির কল্পনা। এই লিপিতে সংযুক্তাক্ষর পাশে পাশে বসিয়া লিখন ও পঠন সুগম করিয়াছে। প্রচলিত লিপিতে র অক্ষরের উপরের ভুজ রেফ (ʹ) ও নীচের ভুজ র ফলা (্র) হইয়াছে। সেখানে অক্ষর নাই, নূতন চিহ্ন শিখিতে হইতেছে। ব অক্ষরের তলে বিন্দু দিলে র হয় কেন, ইহা শিশুকেও ভাবায়। এই কারণেই আমি বহুকাল হইতে বর্তমান র অক্ষর বর্জন করিতে বলিতেছি। নাগরী-র (र) অপর বাঙ্গলা অক্ষরের সহিত মিশিয়া যায়। (৩) কেহ বলিয়াছেন, বাঙ্গালী সংস্কার-

ভীক্‌। অত্যাপি গুরু, শিশু, রূপ, হৃদয়, অর্চ্চনা, কর্ম্ম, ভক্তি, উদ্ধার ইত্যাদি শব্দের লৈখিক আকার অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছে, আর তাহাদের পুত্র-কন্যাকেও শিখাইতেছে। (৪) কেহ কেহ কয়েকটি অক্ষরের আমার উপন্যস্ত আকার অস্বাস্থ্য মনে করিয়াছেন। আর, (৫) কেহ কেহ জানাইয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গরাজ নবলিপি গ্রহণ না করিলে ইহা চলিতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ সমালোচক বলিয়াছেন, নবলিপি চলিলে ছেলেরা বাঁচিয়া যাইবে। এইরূপ সমালোচনার মধ্যে একটিকে আমি সত্য বলিয়া মানি, রাজার অনুমোদন ব্যতীত কেহ নবলিপি পাঠশালায় ধরাইতে পারে না। কেবল অনুমোদন নয়, নবলিপিতে শিশুশিক্ষার ও প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার নিমিত্ত বই ছাপাইতে হইবে। এক বালিকাকে আমি গুরু, শিশু, স্থান, ক্রম ইত্যাদি শব্দ আমার কল্পিত ও "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় প্রত্যহ মুদ্রিত আকারে লিখিতে শিখাইয়াছিলাম। সে বিদ্যালয়ে গেল; শিক্ষিকা বলিলেন, "এই বানান চলিবে না, তোমার বইতে যেমন আছে তেমন লিখিতে শিখ।" সে আবার পুটলী করিতেছে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের বানান কিরূপ, তাহা দেখিবার লোক নাই।

আমার আশঙ্কা ছিল, সমালোচক মহাশয়েরা একটা বড় আপত্তি তুলিবেন, এই লিপি শিখিয়া কেহ বর্তমান মুদ্রিত পুস্তক পড়িতে পারিবে না। কিন্তু দেখিতেছি, কেহ সে তর্ক তুলেন নাই। আর, কোন্ মুখেই বা তুলিতেন? প্রত্যহ লক্ষাধিক পাঠক "আনন্দবাজার পত্রিকা" পড়িতেছেন; আর, তাঁহারাই প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকও পড়িতেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর একটির নীচে আর একটি পূর্ণ আকারে থাকে; আর নবলিপিতে পাশে পাশে আছে। গুরুতর প্রভেদ নয়। এই কারণে মনে করি, নবলিপি চলিবার বাধা নাই। সংস্কর্তব্য আকার নবলিপির প্রধান অঙ্গ নয়, বাদ দিলেও ক্ষতি হইবে না।

কেহ কেহ নবলিপির উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া আমায় পত্র লিখিয়াছেন। কোন্নগরবাসী এক ভদ্রলোক নূতন স্বর ও ব্যঞ্জনাক্ষর বহু যত্নে ও বুদ্ধি প্রয়োগে উদ্ভাবন করিয়া আমায় দেখাইয়াছেন, তাঁহার কল্পিত অক্ষর কত অল্প, আর কত সহজে শিখিতে পারা যায়। তিনি ভুলিয়াছেন, বাঙ্গলা ভাষা নূতন নয়, ইহার অক্ষর আছে। লিপি-সংস্কার এক কথা, আর নূতন লিপির সৃষ্টি আর এক কথা। কালীঘাটবাসী আর এক ভদ্রলোক লিখিয়াছেন, আমরা শব্দ যেমন উচ্চারণ করি তেমন বানান করিলে অনেক অক্ষর কমিয়া যাইবে। হ্রস্ব ই ও দীর্ঘ ঈ স্থানে একটি ই, হ্রস্ব উ ও দীর্ঘ ঊ স্থানে একটি উ; ঞ, ণ, ন স্থানে একটি ন; শ, ষ, স স্থানে একটি শ, ইত্যাদি। আমি অন্য তর্ক না তুলিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কাহার উচ্চারণ প্রমাণ ধরিবেন? এক বারানসীবাসী লেখক লিখিয়াছেন, ইংরেজী শব্দ অতি দ্রুত হাতে লিখিতে পারা যায়। এইরূপ অক্ষর দ্বারা ভারতের যাবতীয় ভাষার শব্দ লিখিতে পারা যায়। এই কল্পনা করিয়া তিনি বাঁ দিকে হেলান অক্ষর উদ্ভাবন করিয়া সে লিপির নাম "লিপি-ভারতী" রাখিয়াছেন। সেই লিপিতে এক পৃষ্ঠা আদর্শ ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি কিন্তু বহু চেষ্টাতেও সে লিপির মধ্যে ক অক্ষর আবিষ্কার করিতে পারি নাই। সে আদর্শের মধ্যে প্রচলিত অক্ষরে কোথাও লিখিয়াছেন তামিল, কোথাও গুজরাটী, বাঙ্গলা, নাগরী ইত্যাদি। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কে এই লিপি চায়?

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে "লিপি সংস্কার" নাম দিয়া শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় নবলিপির সমালোচনা করিয়াছেন। আমি পড়িয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। তিনি বিস্তৃতভাবে নবলিপির দোষ দেখাইয়াছেন, গুণের দিকে তেমন দৃষ্টি করেন নাই। আমি একে একে তাঁহার আপত্তির খণ্ডন করিতেছি।

(১) অক্ষরের প্রচলিত আকার যথাসম্ভব রক্ষা করিতে হইবে। আমারও সেই মত। দোষ সংশোধনের নিমিত্ত অক্ষরের আকারে ও যোজনায় পরিবর্তন আবশ্যক হইলে সে পরিবর্তন স্বীকার করিতেই হইবে। এইরূপ পরিবর্তন নূতন নয়। নবলিপিতে যে পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহাতে প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক পড়িতে অসুবিধা হইবে না। ঈ, ৃ, য, য়, ড়, ঢ় যেমন আছে তেমন থাক। তদ্দ্বারা নবলিপির সূত্র ছিন্ন হইবে না। কিন্তু আমি র-এর পক্ষে নই। একটি অন্তঃস্থ-ব অক্ষরের অভাব মিটাইতে হইবে।

(২) আমিও বুঝি, লিপি-সংস্কার ও শব্দের উচ্চারণ সংস্কার এক কথা নয়। কিন্তু যদি লিপিদ্বারা উচ্চারণ সংস্কার হয়, তাহাতে আপত্তি কি?

(৩) এমন লিপি চাই যদ্দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার আবশ্যক ধ্বনি প্রকাশ করিতে পারা যায়। কোন ব্যঞ্জনাক্ষর অকারান্ত কিম্বা হসন্ত জানাইবার নিমিত্ত সে অক্ষরের পরে বিন্দু কিম্বা হস্ চিহ্ন দিলে ক্ষতি কি? 'কটমট ভাষা' আর 'কটমট চাহনি' এই দুই 'কটমট' এর উচ্চারণ এক নয়। প্রথমটির ট অকারান্ত, দ্বিতীয়টির ট হসন্ত। ইহা বুঝাইবার জন্য এই দুই চিহ্নের প্রয়োজন। সাবধান লেখক পাঠকের পাঠ ও বোধ সৌকর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

(৪) ঋ অক্ষরের উচ্চারণে এখনও লক্ষ লক্ষ লোক রি

বলে। রাধাকৃষ্ণ, অদ্যাপি 'রাধাকৃষ্‌ণ' শুনি নাই। কয়েকজন নব্য 'কৃস্‌ন' বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা মূর্ধণ্য ষ ও মূর্ধণ্য ণ-এর উচ্চারণ বর্জন করিতেছেন। কৃষ্ট, এই উচ্চারণে মূর্ধণ্য ষ ও যৎকিঞ্চিৎ মূর্ধণ্য ণ-এর ধ্বনি আছে।

(৫) আমার জন্মস্থান দক্ষিণরাঢ়ে বটে। কিন্তু আমি আমার জন্মস্থানের উচ্চারণ প্রচার কামনায় কখনও কিছু লিখি নাই। সমগ্র বঙ্গদেশের উচ্চারণ আমার লক্ষ্য। কলিকাতা, মৌখিক ভাষায় কদাপি 'কলকাতা' নয়। কলিকাতার এক সম্ভ্রান্তবংশের বর্ষীয়সী নারীর মুখে আমি বহুবার 'কোলকেতা' শুনিতে পাই। তিনি কখনও 'কলকেতা' বলেন না। ক-এর পরে ই না থাকিলে কো হইতে পারে না। বাঙ্গলা শব্দ উচ্চারণের একটা প্রধান সূত্র এই যে ই উ স্বর পরে থাকিলে পূর্ববর্তী অ ঈষৎ ও হয়। যেমন, হরি, মধু। সেই কারণে কলিকাতা প্রায় 'কোলকাতা' শোনায়। কিন্তু ঈষৎ ও। এখানে ক-এর পর ই গ্রস্ত, লুপ্ত নয়। 'বলিবে, বলিল, বলিত' মৌখিক ভাষায় 'বলবে, বলল, বলত' নয়। এখানে ই ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে ভাষা অবোধ্য হইবে। এই গ্রস্ত ই ধ্বনি জ্ঞাপনের নিমিত্ত একটি চিহ্ন না দিলে পাঠক ঠিক উচ্চারণ করিতে পারিবেন না। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে এই গ্রস্ত ই উচ্চারণ সাধারণ। রামশালি শব্দ হইতে রামশাইল; ই ঈষৎ। পূর্ব পশ্চিমে যেখানে যাইবেন, সেখানেই শুনিতে পাইবেন। কেহ 'রামশাল চাল' বলে না। কল্য অর্থে 'কাল' লিখিতে পারি না। কলিকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের মৌখিক ভাষার অনেক শব্দ দূরবর্তী স্থানের লোকের নিকট অবোধ্য। উপরি-উক্ত মহিলা 'ঘোনো দুধ', 'গোমের আটা', 'ওষ্টোমীর উপোস', 'ওসুখ সারা' ইত্যাদি বলেন। আমি হাসি; তিনি বলেন, "আমরা কোলকেতায় এই রকম বলি।"

(৬) সে বলিয়া চলিয়া গেল, সংক্ষেপে 'সে বলে চলে গেল' নয়। দুই একটা উদাহরণ দিলে আমার তর্ক সুবোধ্য হইবে। বাঙ্গলা উচ্চারণে কোন শব্দে ই পরে আ থাকিলে মৌখিক ভাষায় আ স্থানে এ হয়। যথা, পিঠা—পিঠে, তিনটা—তিনটে, চারিটা—চারটে; বেগুন+ইয়া=বেগুনিয়া, ই পরে আ থাকাতে বেগুন্যে অথবা বেগুনে' (স্বং)। আগুনিয়া বোমা, 'আগুনে বোমা' নয়। আগুন্যে লিখিলেই ভাল, সংক্ষেপ করিতে হইলে আগুনে'। এই উৎকলা দ্বারা বুঝিতেছি, 'য়' লুপ্ত হইয়াছে। সেইরূপ, বলিয়া—বল্যে, সংক্ষেপে বলে'। পদ্যে ছন্দের অনুরোধে কবি করিয়া স্থানে করি', নিরখিয়া স্থানে নিরখি' লেখেন। অতএব উৎকলা থাকিলে বুঝি সেস্থানে শব্দের কোন অক্ষর গ্রস্ত বা লুপ্ত হইয়াছে। একটি চিহ্নের একটি অর্থ থাকিলেই ভাল। না পাইলে অগত্যা একটি চিহ্ন উৎকলা গ্রহণ করিতে হয়। তখন লিখিব, ক'লকাতা, চা'ল, ডা'ল, বলে', চলে' ইত্যাদি।

(৭) মণীন্দ্রনাথবাবু লিখিয়াছেন, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি চিহ্নের বাঙ্গলা নাম আছে। কিন্তু আমি সে সব নাম বলিতে শুনি নাই। পাদচ্ছেদ, অর্ধচ্ছেদ, পূর্ণচ্ছেদ, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন ইত্যাদি নামের দ্বারা প্রয়োগ বুঝি, আকার বুঝিতে পারি না। ছেদনাস্ত্র বলিলে ছুরিকা, কর্তরী, খড়্গ, অসি ইত্যাদি বুঝায়, এ সকল অস্ত্রের আকার বলা হয় না।

উপরে যে বালিকার উল্লেখ করিয়াছি, সে বিদ্যালয়ে শিখিয়াছে, ৫+২=পাঁচ যুক্ত দুই, ৫−২=পাঁচ বিযুক্ত দুই, ২/৫=দুইয়ের পাঁচ। এইরূপ শব্দ ব্যবহার দ্বারা ভাষা বিকৃত হইতেছে। পূর্ববঙ্গে ৫+২=পাঁচ যোগ দুই, ৫−২=পাঁচ বিয়োগ দুই, ২/৫=পাঁচের দুই, চলিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এতকাল পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের একই কর্তা ছিলেন, কিন্তু দুই বঙ্গে দুই রীতি চলিয়াছিল!

মহারাষ্ট্রে রাঢ়ীয় তান্ত্রিক সম্প্রদায়

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের প্রসাদ-লব্ধ উপকরণ হইতে সুদূর মহারাষ্ট্রে শিবাজীর সময়ে বাঙালী এক তান্ত্রিক-গুরুর শিষ্য কি ভাবে তন্ত্রমত প্রচার করিয়াছিলেন তাহার বিস্ময়জনক বিবরণ বর্ত্তমান প্রবন্ধে সঙ্কলিত হইল। শ্রীযুত সরকার-রচিত *House of Shivaji* গ্রন্থের অভিনব সংস্করণে ২১ অধ্যায়ে শিবাজীর প্রিয় পার্ষদ রাজকবি কবীন্দ্র পরমানন্দের সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে (পৃ. ৩১০-২০ দ্রষ্টব্য)। পরমানন্দ "অণুপুরাণ সূর্য্যবংশম্" নামে শত-সর্গাত্মক এক বিরাট মহাকাব্য রচনা করিয়া শিবাজীর কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পুণার আনন্দাশ্রম হইতে এই মহাকাব্যের ৩২ সর্গাত্মক আবিষ্কৃতাংশ "শিবভারত" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। কবিত্বপূর্ণ মনোহর সংস্কৃত রচনা একশ্রেণীর নিকট বেদবাক্যবৎ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইলেও শিবাজীর জীবনী বিষয়ে এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক অতি সামান্য অংশই পাওয়া যায়, অধিকাংশই কল্পনাপ্রসূত। ফলতঃ এ জাতীয় মহাকাব্য ইতিহাসগ্রন্থরূপে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

কবীন্দ্র পরমানন্দের পৌত্র কবীন্দ্র গোবিন্দ "অনুপুরাণ সূর্য্যবংশের" অন্তর্ভুক্ত বলিয়া "অংশাবতরণম্" নামে বহু সর্গাত্মক অপর এক মহাকাব্য রচনা করিয়া শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর বৃত্তান্ত লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কিয়দংশ মুদ্রিতও হইয়াছে (*Annals, B. O. R. I*, XIX. pp. 49-60)। এই মুদ্রিতাংশ হইতে আমরা জানিতে পারি, কোঙ্কণদেশীয় "শিবযোগী" নামক এক "চিত্তপাবন" ব্রাহ্মণ "রাঢ়"দেশীয় এক পরমাদ্ভুতচরিত সিদ্ধপুরুষের কথা শুনিয়া দীর্ঘকাল "রাঢ়াপুরী"তে অবস্থান করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শিবযোগী দেশে ফিরিয়া গিয়া (বর্ত্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত রত্নগিরি জিলায় অবস্থিত) "শৃঙ্গারপুরী"তে মঠনির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন :

> প্রেম্ণা শৃঙ্গারপূর্ব্যাং ব্যরচয়দথ মঠং কোঙ্কণে জন্মদেশে
>
> বস্তুং যোগী প্রসিদ্ধস্তদনু সুতগুণং সন্নিবাসং চকার।

কালক্রমে এই শৃঙ্গারপুর হইতে তন্ত্রমত মহারাষ্ট্রে বহুল প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নিশ্চলপুরী নামক এক তান্ত্রিক গুরুর ক্রিয়াকলাপে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং শিবাজী তন্ত্রমতে তাঁহার "অভিষেক" পুনঃসম্পাদন করিয়াছিলেন এবং তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষণ করেন। এই অভিষেকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনিরুদ্ধ সরস্বতীরচিত "শিবরাজ-রাজ্যাভিষেক কল্পতরু" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে (কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির ৩০৮৮ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য)।

শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার অমাত্যেরা চক্রান্ত করিয়া কনিষ্ঠপুত্র রাজারামকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শম্ভুজী তাইকে সরাইয়া দিয়া সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে পূর্ব্বতন অমাত্যদের পরিবর্ত্তে "কবিকলস" নামক উত্তর-ভারতীয় এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ প্রধান অমাত্যপদে বৃত হইয়াছিলেন। কবিকলসের পরামর্শানুসারে উল্লিখিত শিবযোগীকে শম্ভুজী দীক্ষাগুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শম্ভুজীর ভাগ্য এই সময়ে অনেকটা সুপ্রসন্ন হইয়াছিল, কিন্তু অপুত্রক বলিয়া তাঁহার মনে দুঃখ ছিল। মহারাষ্ট্রের বৈদিক ব্রাহ্মণগণ পূজাদিদ্বারা শম্ভুজীর অপুত্রতা দূর করিতে সমর্থ হইল না। তখন শিবযোগী আসিয়া রাজাকে ৺কালীপূজা করিতে পরামর্শ দিলেন। এই তান্ত্রিক পূজানুষ্ঠানের ফলে শম্ভুজীর এক পুত্রসন্তান লাভ হয় (১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে) এবং কবিকলসপ্রমুখ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রভাব রাজভবনে এতটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে, মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ এই কারণেই শম্ভুজীর প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন।

মহারাষ্ট্রাধিপতির রাজভবনে অনুষ্ঠিত এই কালীপূজার কথা বিস্ময়জনক হইলেও ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। যাঁহার প্ররোচনায় ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ শিবযোগী রাঢ়াপুরীতে কাহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন—এই প্রশ্ন স্বতঃই অনেকের মনে উদিত হইবে। এ বিষয়ে আমাদের অনুমান বিবৃত করার পূর্ব্বেই কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। কবীন্দ্র গোবিন্দ শিবযোগীর দীক্ষাদি বিষয়ে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা প্রায় সমস্তই কল্পিত, অতিরঞ্জিত ও অপ্রামাণিক বলিয়া মনে হয়। শিবযোগীর দীক্ষাকাল ১৬৫০-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ-মধ্যে নির্ণয় করা যায়। তৎকালে "রাঢ়া" নামক কোন "মহাপুরী"র অস্তিত্বই ছিল না ! রাঢ়দেশে অবস্থিত কোন প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রামকেই কবি রাঢ়াপুরী বলিয়া ধরিয়াছেন এবং ঐ গ্রামের নাম নিঃসন্দেহে নির্ণয় করার কোন উপায় নাই। দশটি মনোহর শ্লোকে "ত্রিপথগাতীরে" অবস্থিত রাঢ়াপুরীর যে বর্ণনা আছে তাহা সমস্তই কবিকল্পনামাত্র এবং বাস্তব পরিচয়ের সমাবেশ তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিদ্যমান নাই। উদাহরণ-স্বরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :

হংসৈঃ পরমহংসৈশ্চ বালখিল্যৈঃ সমাবৃতা।
গন্ডভেরৈরভিবৃতা সিংহব্যাঘ্রমৃগাদিভিঃ ॥ (৪ শ্লোক)

খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে রাঢ়দেশের কোন স্থানে "বালখিল্য" মুনিগণ ও সিংহাদি জন্তু বাস করিত, ইহা অতি উৎকট কবি-কল্পনা ছাড়া কিছুই নহে।

শিবযোগী রাঢ়দেশে আসিয়া যাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীযুত যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহাকে "সিদ্ধযোগী" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পরিচয় মূলগ্রন্থে এই ভাবে লিপিবদ্ধ আছে :

কশ্চিৎ সিদ্ধঃ শ্রীঃ স * * সর্ব্বেষাং শ্রুতিমাগতঃ।
মহানির্ব্বাণপদবীং যুগযন্ত্রিজলীলয়া।
আসীদাসীমধরণীবলয়ে লয়পণ্ডিতঃ ॥ (৩১-২ শ্লোক)

এস্থলে রাঢ়ীয় সিদ্ধপুরুষের নামটি ক্রটিত রহিয়াছে—তাঁহার স-কারাদি কোন নাম ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। বরোদার পুঁথিতে এস্থলে কি পাঠ আছে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অতঃপর মূলগ্রন্থে শিবযোগীর দীক্ষাগ্রহণের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিবরণটিও প্রামাণিক হইতে পারে না। তান্ত্রিক দীক্ষা অতি গোপনীয় অনুষ্ঠান—শিবযোগী দেশে ফিরিয়া গিয়া ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কবি গোবিন্দ তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, একথা কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। বস্তুতঃ তন্ত্রসারাদি বঙ্গদেশের প্রামাণিক তান্ত্রিক নিবন্ধে যে সকল দীক্ষাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে তাহার সহিত কবিবর্ণিত বিবরণের মিল নাই। "আম্নায়" ঘটিত বিভিন্ন ঘটের জলধারা অভিষেক বঙ্গীয় পদ্ধতিতে নাই। দীক্ষাগুরুর দুইটি উপমানপদও—"গোরখো যথা (৪৩ শ্লোক) এবং দত্তাত্রেয় ইব" (৪৫ শ্লোক)—গৌড়ীয় তন্ত্রসম্প্রদায়ের অনুকূল নহে। গোরক্ষনাথ ও দত্তাত্রেয় কালীমন্ত্রের উপাসক ছিলেন না। আমাদের অনুমান কবি গোবিন্দ নিজদেশে প্রচলিত তন্ত্রদীক্ষার পদ্ধতিই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, রাঢ়দেশে শিবযোগীর দীক্ষার সহিত বস্তুতঃ তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। দীক্ষাগ্রহণের পর শিবযোগীকে নূতন নাম দেওয়া হইয়াছিল :

আত্তং তদ্-"বীরনাথা"খ্যং গৃহীত্বাতি মনোরমং।
শিষ্যত্ব কল্পয়ামাস স সিদ্ধো নাম সংভ্রমাৎ ॥ (৪৯ শ্লোক)

বোধ হয় "বীরনাথ" পাঠ হইবে (বরোদার পুঁথির পাঠ এস্থলেও গবেষণীয়)। অভিষেকের পর তান্ত্রিক সাধকদের নাথান্ত নাম দেওয়ার বিধান আছে।

কবি গোবিন্দ যেরূপ নিপুণভাবে তন্ত্র-ঘটিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ থাকে না যে তিনি স্বয়ং পুরুষানুক্রমে তান্ত্রিক ও তন্ত্রশাস্ত্রে কৃতবিদ্য ছিলেন। এই রাজকবিবংশের তান্ত্রিকতার নিদর্শন তথাকথিত "শিবভারত" গ্রন্থমধ্যেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের প্রথম সর্গে লিখিত আছে গ্রন্থকার কবীন্দ্র পরমানন্দ স্বয়ং ছিলেন :

"একবীরা" প্রসাদেন লব্ধবাক্‌সিদ্ধিবৈভবম্ (১৬ শ্লোক)

মঙ্গলাচরণ স্থলেও "একবীরাং ভগবতীং গণেশং চ সরস্বতীম্" (১।২৬ শ্লোক) বলিয়া সর্ব্বাগ্রে কুলদেবতা ভগবতী একবীরার নামোল্লেখ আছে। অন্যত্র (১।৩২ শ্লোক) এই কুলদেবতা "চতুর্ভুজা" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। একবীরা অন্যতম শক্তিদেবতা। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে এই দেবতার ধ্যানাদি পাওয়া যায় না—বুঝা যায় বঙ্গদেশে এই দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ একস্থলে (বঙ্গবাসী সং পৃ. ৬৪) "একবীরাকল্প" নামক গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। দেবীভাগবত প্রভৃতি পুরাণে ১০৮ শক্তিপীঠের তালিকা আছে—তন্মধ্যে পাওয়া যায় "সহ্যাদ্রাবেকবীরা তু"। অর্থাৎ একবীরা সহ্যাদ্রির অধিষ্ঠাত্রী শক্তিদেবতা। ইহার অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান আছে কিনা আমরা অবগত নহি। সহ্যাদ্রি অঞ্চল "কেরল" দেশের অন্তর্গত ছিল এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ন্যায় কেরল সম্প্রদায়ও তান্ত্রিকদের মধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে বিদ্যাধরাচার্য্যধৃত একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে :

গৌড়াঃ শাল্বাঃ সুরাষ্ট্রৈশ্চ মাগধাঃ কেরলাস্তথা।
কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ ॥

এই বচনানুসারে কেরল তান্ত্রিকদের মর্য্যাদা গৌড়ীয়দের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। কবীন্দ্র পরমানন্দ ও তদীয় পৌত্র কেরল সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক ছিলেন সন্দেহ নাই। এক স্থলে কবি গোবিন্দ "অথ যন্ত্রং কেরলানাং" (*Annals l. c.*, p. 55) বলিয়া তাহা স্পষ্টাক্ষরেই সূচিত করিয়াছেন। সুতরাং শিবযোগীর দীক্ষাদি ব্যাপার কবি কেরলমতের গ্রন্থানুসারে কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া ধরিতে হইবে। তিনি রাঢ়ীয় এক গুরুর শিষ্য ছিলেন এবং রাঢ়দেশ হইতেই কালীপূজার অনুষ্ঠান শিখিয়া মহারাষ্ট্রে প্রচার করিয়া সকলকাম হইয়াছিলেন, এই দুইটি মাত্র তথ্য প্রামাণিক বলিয়া কবি গোবিন্দের কাব্যগ্রন্থ হইতে উদ্ধার করা যায়। বাংলার বাহিরে কালীপূজার প্রচলন অত্যন্ত বিরল।

বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে প্রাচীনকাল হইতে কত শত সহস্র শক্তিশালী তান্ত্রিকসাধক ও সিদ্ধপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ এবং তাঁহাদের বিষয়ে বিন্দুমাত্রও গবেষণা হয় নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে রাঢ়দেশের গঙ্গাতীরেও বহুতর অলৌকিক প্রভাবশালী শক্তিসাধক বিদ্যমান ছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে শিবযোগীর গুরুকে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। তথাপি আমাদের একটা অনুমান এস্থলে বিবৃত হইল। দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত হুগলী জেলায় অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ "গুপ্তপল্লী" (প্রকাশ্য গুপ্তিপাড়া) গ্রাম প্রাচীন

কাল হইতে একটি বিশিষ্ট সাধনক্ষেত্র রূপে পরিচিত ছিল। রাজা বিশ্বেশ্বর রায়ের গুরু সত্যদেব সরস্বতী ও তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরাদি অদ্যাপি এই গ্রামের প্রত্নসম্পদ্ নির্দ্দেশ করিতেছে। কবি গোবিন্দের রাঢ়াপুরীতে যে সকল হংস পরমহংস বিদ্যমান ছিলেন স্বয়ং সত্যদেব তাঁহাদের অন্তর্ভূত হওয়া বিচিত্র নহে। আমাদের অনুমান কবি গোবিন্দ এই সমৃদ্ধ গুপ্তপল্লীকেই রাঢ়া মহাপুরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিব। রাঢ় বঙ্গের বহুগ্রামে রাঢ়ীয় কাশ্যপগোত্র চট্টবংশীয় শোভাকরের বংশ বিদ্যমান ছিল। বল্লালী কুলীন চট্টহলায়ুধের পৌত্র এই শোভাকর খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীতে, অর্থাৎ প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে, বিদ্যমান ছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার অন্যতম বংশধর সুবিখ্যাত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ১৬৬৬ শকাব্দে চৈত্র মাসে (১৭৪৫ খ্রীঃ) রচিত "চন্দ্রাভিষেক" নামক সপ্তাঙ্ক নাটকের প্রস্তাবনায় শোভাকরকে মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রস্তাবনার শ্লোকটি উদ্ধারযোগ্য :

শোভাকরো দ্বিজবরঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যাং
বিদ্যানবদ্যকবিতাদিগুণাম্বুরাশিঃ।
যশ্চন্দ্রশেখরগিরৌ কৃতপুণ্যপুঞ্জঃ
সিদ্ধিং জগাম পরমাং মনুসত্তমস্য॥

(অস্মদীয় পুথির ৩৷২ পত্র)

অর্থাৎ, চাটিগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে বহু সাধনা করিয়া শোভাকর শ্রেষ্ঠ মন্ত্রবিশেষে পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং শোভাকরকে বাংলার একজন প্রাচীনতম তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ বলিয়া ধরা যায়—কৃষ্ণানন্দ, পূর্ণানন্দ প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠ শক্তিসাধকগণ শোভাকরের প্রায় ৩০০ বৎসর পরবর্ত্তী। শোভাকরের অধস্তন অষ্টম পুরুষ সিদ্ধেশ্বর খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীতে গুপ্তিপাড়ায় বাস স্থাপন করেন। শোভাকর বংশের এই শাখায় বহু পণ্ডিত, কবি ও সাধক জন্মগ্রহণ করিয়া গুপ্তিপাড়ার খ্যাতি বাড়াইয়াছিলেন। উক্ত সিদ্ধেশ্বরের এক জন বৃদ্ধপ্রপৌত্র মথুরেশ (অথবা মথুরানাথ) বিদ্যালঙ্কার একজন মহাকবি ও সাধক ছিলেন। ১৫৯৪ শকাব্দে (১৬৭২ খ্রীঃ) তিনি "শ্যামাকল্পলতিকা" নামে ১০৮ শ্লোকে উৎকৃষ্ট কালিকাস্তুতি রচনা করিয়াছিলেন।

বেদাঙ্কতিথিশাকেষু তুলাহে চণ্ডরোচিষি।
অকারি মথুরেশেন শর্ম্মণা কালিকাস্তুতিঃ॥

অর্থাৎ শিবযোগীর রাঢ়াপুরীতে অবস্থান কালে মথুরেশ জীবিত ছিলেন সন্দেহ নাই। এই স্তুতির প্রতিলিপি ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। "বিদ্যোদয়" পত্রিকায় ইহা প্রথম সটীক মুদ্রিত হয় (১৮৯৯-১৯০১ খ্রীঃ) এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। আমাদের নিকট ১৩ পাতায় সম্পূর্ণ স্তুতিটির একটি সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী আছে। পুষ্পিকা ("ইতি দেবীস্তুতি-টিপ্পনী রচিতা শ্রীমথুরানাথকবিনা") হইতে ইহা স্বয়ং মথুরেশের রচনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই মথুরেশ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, পশ্চিম ভারতে জয়পুরের নিকটবর্ত্তী "সাবিত্রীপর্ব্বতে" সর্ব্বানন্দ নামক সিদ্ধপুরুষের নিকট তিনি দীক্ষিত হইয়াছিলেন (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ. ৯৪৪-৬)। সুদূর সাবিত্রী-পর্ব্বতের সহিত গুপ্তিপাড়ার একজন বিশিষ্ট সাধকের এই সংযোগ লক্ষ্য করার বিষয়। এই ক্ষীণসূত্র ধরিয়াই আমরা অনুমান করিতে অগ্রসর হইতেছি যে কোঙ্কণের শিবযোগী রাঢ়ে আসিয়া থাকিলে গুপ্তপল্লীতেই আসিয়াছিলেন, যদিও বলা বাহুল্য, এসম্বন্ধে আরও প্রচুর গবেষণার অবকাশ রহিয়াছে।

জীবন-সন্ধ্যায়

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

যখন নামিবে সন্ধ্যা জীবনের সায়াহ্ন-বেলায়,
গৃহ-কোণে রবে বসি' নিদ্রাতুরা স্তব্ধ নিরালায়,
পুথিখানি লয়ে মোর ধীরে ধীরে পড়িও যতনে
আর ভেবো, ফেলে-আসা সেদিনের কথা আনমনে।

ভেবো মনে, একদিন তব আঁখিপল্লব প্রচ্ছায়
ছিল দুটি সুগভীর মধুর কোমল সুষমায়,
সৌন্দর্য্যপিপাসু হয়ে আসিয়াছে কত লুব্ধ জনা,
সত্য, মিথ্যা, প্রেম লয়ে তব প্রেম করিয়া কামনা।

ভেবো, ছিল একজন পরিপূর্ণ অন্তর যাহার
পথিক আত্মারে তব বেসেছিল ভালো অনিবার,
নিত্য রূপান্বিত তব আননের দুঃখ-রেখাগুলি
সযত্নে গভীর প্রেমে হৃদয়েতে রেখেছিল তুলি।

বসি' নিজ গৃহ-কোণে ভেবো মনে ব্যথিত সন্ধ্যায়,
জীবন হইতে প্রেম দিনে দিনে কেমনে বিদায়
নিয়ে যায় গিরিশিরে; তারপর সুদূর-তিমিরে
নক্ষত্রের অন্তরালে গোপনে লুকায় ধীরে ধীরে।*

* কবি W. B. Yeats রচিত "When you are old" কবিতার অনুবাদ।

পতঙ্গ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে শচীনবাবু কত কি ভাবিতেছিলেন। পথের বাঁয়েই কেরাণীকুলের মেস। হরিদা ডাক দিলেন—শচীনবাবু তামাক খেয়ে যান।

শচীনবাবু ধূমপানের জন্য থামিলেন। একটা বেতের মোড়ায় বসিয়া সুগন্ধি তামাক টানিতেছিলেন—সত্যর জন্য মনটা তাঁর বার বার কাঁদিয়া উঠিতেছিল। হরিদা নীরবে বসিয়া আছেন।

শচীনবাবু কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করিলেন—সামনের চৌকিতে একটি কনষ্টেবল বসিয়া আছে। গালপাট্টা দাড়ি—ভোজপুরী না হয় গয়া মজঃফরপুরী হইবে। সে বাহিরের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছে। সেও সম্ভবতঃ শচীনবাবুকে লক্ষ্য করে নাই—এমনি ভাবে চাহিয়া আছে…

শচীনবাবু হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন—তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু পুলিশের চোখে জল কেন সেকথা জিজ্ঞাসা করিবার মত মনোভাব তাঁহার ছিল না, তাই তিনি প্রশ্নও করিলেন না।

সে হঠাৎ কহিল—নোকরি ছোড় দেগা বাবুজী।

হরিদা কহিলেন—নকরী ছোড় দেগা—তেওয়ারী।

—জরুর দেগা, আবি ছোড় দেগা।

হরিদা প্রশ্ন করিলেন—কেন?—তেওয়ারী হিন্দীতে জবাব দিল—এমনি করে ছেলেছোকরাদের মারবার জন্যই কি চাকুরী? এ কাজ করতে পারব না, আমারও এমনি বেটা আছে। চোর নয়, ডাকাত নয়, বাবুলোক—এদের গায়ে লাঠি মারব পেটের দায়ে—এ নোকরি আমি করব না—

—বাড়ীর সব কি করবে?

—রামজী যা করাবেন।

—তোমার যে জেল হবে চাকরি ছাড়তে চাইলে—

—হবে হোক, বাবুরাও ত সব জেলেই যাবে—

শচীনবাবু নীরবে শুনিতেছিলেন—হরিদা চুপ করিলেন। তেওয়ারীর চোখ দিয়া তখনও জল পড়িতেছিল। সে অকস্মাৎ কাতর-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—এইসা নকরী হাম ক্যায়সে করেঙ্গে বাবুজী? ছোড় দেগা নকরী—এ নেমকহারামী হ্যায়—

তেওয়ারী চোখের জল মুছিয়া উত্তেজিত ভাবে চলিয়া গেল। শচীনবাবুর মনটি বেশ প্রসন্ন হইল—সত্য আঘাত পাইয়া নির্ভীক কণ্ঠে হাঁকিতেছে বন্দে মাতরম্, আর এই তেওয়ারী আঘাত দিয়া কাঁদিতেছে। তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন—সত্য, তোমার জয় হোক।

শচীনবাবু হুঁকা রাখিয়া আবার উঠিলেন—

মোড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া দারোগা ও আর একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর কথা হইতেছিল। দারোগা মামুদ হোসেন বলিতেছে—কায়দামত একটু আধটু বন্দুক চালাতে যদি পারতাম তা হলে হয়ত প্রমোশনটা তাড়াতাড়ি হ'ত। এমনিধারা লাঠি চালিয়ে কি কিছু হয়।—সিগারেটের একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া তিনি ঈষৎ হাসিলেন, যুদ্ধে জিতিয়া শিবিরে বসিয়া যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন।

অন্য ভদ্রলোক কহিলেন—বন্দুক ত চালাবে, কিন্তু রয়ে সয়ে, মানুষ মারা যত সোজা ভাবো আসলে ততটা নয়।

—হ্যাঁ, কি হবে? ওতে আমার মন টলে না।

একটি ঢিল আসিয়া তাহার গায়ে পড়িল। ফিরিয়া চাহিতেই দেখেন একটা দশ বছরের বালক তাঁহার পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিতেছে—মিরজাফর—নেমকহারাম মামুদ হোসেন—। তাহাকে বেটন হাতে তাড়া করিয়া গেলেন, কিন্তু সে যেন নিমেষে ভোজবাজীর মত অদৃশ্য হইয়া গেল।

শচীনবাবু জানেন—তাদের স্কুলে ক্লাস থ্রিতে পড়ে ছেলেটি। তাহার হাসি পাইল—গণেশ সাধ্যমত প্রতিবাদ করিয়াছে বৈ কি?

বাসায় ফিরিতেই মীরা দরজা খুলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল—শহরে কিসের গোলমাল হচ্ছে গো?

—স্বদেশী গোলমাল।

—কি হয়েছে ভাল করে বল—

শচীনবাবু যাহা দেখিয়াছেন এবং যাহা শুনিয়াছেন তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। তখনও চোখের উপর ভাসিতেছে সত্যর দল রক্তাক্ত দেহে মাটিতে শুইয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিতেছে বন্দেমাতরম্—

মীরা সহানুভূতির সঙ্গে কহিল—সত্যর খুব লেগেছে না গো? অনেকটা কেটে গেছে? কেন এমন করে মারে?

—চাকরির উন্নতি হবে বলে—

—ছিঃ, ওরা এমন অমানুষ কেন? ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেই ত পারত, মারলে কেন? ওদের কি ছেলেপুলে নেই—

শচীনবাবু করুণ হাসি হাসিলেন—ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, এ ত সবে আরম্ভ, আরও কত কি হবে তা কে জানে।

—না না, সত্যকে বারণ কর, এমনি ক'রে মা'র খেয়ে কি হবে ?

—সে ত মার খেয়ে মরবে বলেই নেমেছে, তাকে বারণ করে কি হবে ?

মীরা সভয়ে কম্পিত কণ্ঠে কহিল, ষাট, ষাট, অমন কথা বলো না। সত্যর মত ঠাণ্ডা ছেলে, তার এ কেমনতর জেদ!

শচীনবাবু জবাব দিলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তিনটে মাত্র, তা হোক, একটু চা কর ত।

মীরা চা করিতে গেল। শচীনবাবুর চোখের সামনে লাঠি চালনার দৃশ্যটা বারবার ভাসিয়া উঠিতেছিল এবং মনটা বেদনায় ভারাক্রান্তই শুধু নয় বিদ্রোহীও হইয়া উঠিতেছিল।

গার্ল স্কুলের দপ্তরী আসিয়া একখানি পত্র দিল, মিস্ রায় লিখিয়াছেন—

প্রিয় শচীনবাবু,

অবিলম্বে একবার দেখা করিবেন। পাঁচটা হইতে ছ'টা পর্য্যন্ত আপিসে আপনার জন্ত অপেক্ষা করিব। যত কাজই থাক, নিশ্চয়ই আসিবেন। ইতি—

আপনাদের
অণিমা রায়।

মনটা বিষণ্ণ ছিল, মিস্ রায়ের জরুরী আহ্বানেও মেঘ কাটিল না, কিন্তু দেখা করার যে একান্ত প্রয়োজন তাহা শচীনবাবু ভাল করিয়াই বুঝিলেন।

বিকালে শচীনবাবু বাহির হইয়াছিলেন—

পথে সত্যর সহিত দেখা, সে চায়ের দোকানে চা খাইতেছিল, শচীনবাবু চা পান করিবার অজুহাতে দোকানে ঢুকিয়া সত্যর পাশেই বসিয়া পড়িলেন এবং দু'একটা কথা-বার্ত্তার পর তাহার আঘাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। সত্য সহাস্ত মুখে জানাইল, না স্যর, সে রকম কিছু লাগে নি, সব ক'টাই হাতের উপর দিয়ে গেছে, একটা মাথায় লেগে সামান্ত কেটেছে।

শচীনবাবু ক্ষত ও কালশিরাগুলি ভালো করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সত্য কহিল, ও কিছু না স্যর। তবে বেশী দিন বোধ হয় বাইরে থাকতে পারব না এই যা দুঃখ। কাগজ পড়ছেন—কেমন সুরু হয়েছে সব।

শচীনবাবু চলিয়া আসিলেন দুঃখিত অন্তঃকরণে, কিন্তু হৃদয় তাহার একটা নূতন প্রেরণায় ভরিয়া উঠিল—যে মৃত্যুকে মানুষ এত ভয় করে প্রকৃতই অবস্থাবিশেষে তা এমন ভয়াবহ নয়, সত্য সে ভয়কে এড়াইয়াছে, সে যেমন করিয়াই হোক...

অণিমা রায় আপিসেই ছিলেন। শচীনবাবুকে দেখিয়া কহিলেন, এত দেরী করতে হয় ছিঃ। কতক্ষণ বসে আছি। সত্য কেমন আছে? খুব লেগেছে—

—তেমন নয়, তবে খানিকটা চোট লেগেছে।

শচীনবাবু তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া চুপ করিলেন। অণিমা কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ওরা কেমন করে এমন ভয়শূন্ত হয়েছে জানেন?

—জানি, তাদের ধ্রুব বিশ্বাস তারা ভারতের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবে, সগর্ব্বে তখন তারা বলবে আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছি, আমরা দেশমাতৃকার সেবক। এই আকাঙ্ক্ষা তাদের মন থেকে সব দুর্ভাবনা দূর করেছে।

অণিমা কহিলেন, সত্যর অন্তরে যে এই সাহস ও শক্তি ছিল তা কোন দিন ভাবতে পেরেছেন?

—না। এটা বাস্তবিকই বিস্ময়কর—

অণিমা আরও ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, আমাদের কি কিছুই করবার নেই। আমরা কি কেবল দর্শক—

—হ্যাঁ, নিরপেক্ষ দর্শক।

অণিমা একটু বিচলিত ভাবে কহিলেন—সত্য আমার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল, প্রয়োজন হলেই চাইব তখন দিয়ে কুলোতে পারবেন না। সে কি এইজন্তেই? সে টাকা ত আপনি ফেরত দিয়ে যান।

—আমি জানি না। তবে এ কাজের জন্ত হওয়া বিচিত্র নয়। টাকার তাদের প্রয়োজন হবেই—মানুষ, রক্ত ও অর্থ এ তিনটেই তাদের মূলধন।

অণিমা কহিলেন—আমার যথাসাধ্য আমি দেব, কিন্তু কেমন করে দেব, কাকে দেব তা ত আমি জানি না। আপনি প্রয়োজন হলে চাইবেন—

—আমি কে? আমি কেন চাইব?

অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিয়া মিস্ রায় কহিলেন—আমি মেয়েছেলে বটে, কিন্তু পেটে আমার কথা থাকে। আমাকে বিশ্বাস করুন—

—বিশ্বাস করি।

—তবে কেন ছেলেভুলানো কথা বলেন? আপনি সত্যদের সবকিছু জানেন—আমি জানি, সে যেরূপ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার নাম করে তাতে আপনার আদেশ ব্যতীত সে নিশ্চয়ই কিছু করে নি। আপনি তাদের নেতা!

—আমি? অবাক করলেন! আমি আজ প্রথম শুনলাম যে সত্য এই ব্রতে ব্রতী।

অণিমা রায় হাসিলেন, কিন্তু মনে হইল তিনি শচীনবাবুর কোন কথা বিশ্বাস করিলেন না। সহাস্তে কহিলেন—যা হোক, একটি কথা বলি আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অকৃত্রিম তাতে আপনি সন্দেহ করবেন না, আর আমার অর্থ আপনার আদেশেই ব্যয়িত হবে।

শচীনবাবু বিস্মিত হইয়াছিলেন, স্মিতহাস্তে কহিলেন—

প্রশ্নার বদলে যদি অন্ত কোন কথার দ্বারা আপনার মনোভাব প্রকাশ হ'ত ?

—কি কথা… ? মিস্ রায়ের যেন একটু ভাবান্তর দেখা গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া কহিলেন—দাঁড়ান চা নিয়ে আসি। বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

শচীনবাবু স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছিলেন—চারি পাশের ঘটনা প্রবাহ তাঁহাকে কোথায় ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। এই মেয়েটির কথাগুলিও যেন হেঁয়ালিপূর্ণ…

চা আসিল। চা পান করিতে করিতে শচীনবাবু কহিলেন—আপনার ব্যাপার ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে আপনিও সত্যর মতই বিপ্লবী, মুখে অজ্ঞতার ভান করে আমাদের মত নিরীহ মানুষকে বিভ্রান্ত করেন।

—থাক ওসব কথা। কথায় কথা বাড়ে।

—আমার অনুরোধ সত্য কথাই বলবেন, সত্যের অভিনয় করবেন না।

—আপনার আসল লোভ কোথায় সে আমি জানি—তা আমার ক্যাসবাক্সেরই প্রতি।

অণিমা রায়ের কথা শুনিয়া শচীনবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন—নমস্কার, এর পরে এ জায়গা ত্যাগ করাই বোধ হয় সমীচীন।

পরদিন শচীনবাবু মোড়ের মাথায় প্রেসে বসিয়া স্কুল ম্যাগাজিনের কাজ করিতেছিলেন হঠাৎ রাস্তায় একটা গোলমাল শুনিয়া তাকাইলেন—একটি শোভাযাত্রা যাইতেছে। সঙ্গে লিখিত বিজ্ঞপ্তি—পঞ্চমবাহিনী ধ্বংস হোক, জাপানকে রুখতে হবে। জনকয়েক তরুণ ও কয়েকটি দশ-এগার বৎসর বয়সের বালিকার শোভাযাত্রা। সর্ব্বসাকুল্যে জনকুড়ি হবে। জনৈক ভদ্রলোক মন্তব্য করিলেন—এ সব মেয়েরা রুখবে জাপানকে ? বড়সড় হলেও না হয় কোমরে আঁচল জড়িয়ে রুখে দাঁড়াতে পারত।

শচীনবাবু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পথের লোক শোভাযাত্রার নমুনা দেখিয়া হাসিতেছে।

একজন কহিলেন—জাপানকে রুখতে হবে তা এখানে কি ? সিঙ্গাপুর যাও—

অপর ব্যক্তি কহিলেন—কম-অনিষ্ট পার্টির শোভাযাত্রা।

যাহাই হউক শচীনবাবুর আর কাজ করিতে ইচ্ছা ছিল না, তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত, বলিলেন—আপনার নাম শুনে আলাপ করতে এলাম।

ভদ্রলোক মুখ-চেনা—নাম মণিবাবু। শচীনবাবু সাগ্রহে কহিলেন—বসুন, বসুন। আপনি দয়া করে এসেছেন সে পরম সৌভাগ্যের কথা।

চা পানের ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা চলিতেছিল। মণিবাবু কহিলেন—ইস্কুল ত বন্ধই, আপনারও পড়াশুনোর এখন প্রচুর অবসর, আমাদের 'জনযুদ্ধ' এখন পড়ুন না, দু'চারখানা। এই যে শিক্ষার অবস্থা, স্কুল কলেজ বন্ধ করে স্বদেশী করা এর কি কোন মানে হয়—এর দ্বারা কি হবে ?

শচীনবাবু কহিলেন—ছুটি পেলাম, বেশ নিশ্চিন্তে দিনগুলো যাচ্ছে। এইটেই লাভ। ছেলেরাও একটু জিরিয়ে নিচ্ছে—

—একে কি বিপ্লব বলবেন ? এটা ত একটা হুজুগ।

—হুজুগ না হলে কি বিপ্লব হয় ? শান্ত মনে বিচার করে কাজ করে সবাই, কিন্তু বিপদের মধ্যে যেতে পারে ক'জন ?

—যুদ্ধটা আপনার কি বলে মনে হয় ? এটা…

—এটা অকৃত্রিম যুদ্ধ।

—এর কারণ ?

—ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধে নামা সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য, জাপানের সাম্রাজ্য অর্জ্জনের জন্য, আমেরিকার কিছু সুবিধে করে নেওয়ার জন্য, এমনি…

—এটা জনযুদ্ধ, যাকে বলে ক্লাস ষ্ট্রাগল। ফ্যাসিজম চায় শ্রমিক ও কৃষককে নিষ্পিষ্ট করে আপনার স্বার্থসিদ্ধি করতে, রাশিয়া তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এ যুদ্ধে যদি মিত্রশক্তি জিততে পারে তবে পৃথিবীর সকলেরই মুক্তি হবে—সকলেই স্বাধীন হবে, সুখী হবে।

শচীনবাবু হাসিয়া বলিলেন—তা হবে না। মানুষ সুখী কোন দিনই হবে না, ধনসম্পত্তির সমান ভাগের উপর সুখ দুঃখ নির্ভর করে না, তা হলে জগতে বড়লোকেরা অসুখী হ'ত না।

—আর যাই হোক রাশিয়া ত সাম্রাজ্যের জন্যে যুদ্ধ করছে না—it is for the people.

—নিজের লাভ না দেখলে কেউ যুদ্ধ করে না—এই আমার ধারণা।

—কিন্তু এই জনযুদ্ধের বিরুদ্ধে যারা পঞ্চমবাহিনীর কাজ করছে তারা কত বড় বিশ্বাসঘাতক।

—এটা জনযুদ্ধ নয়, এর বিরুদ্ধে কাজ করাটাও তাই বিশ্বাসঘাতকতা নয়। এটা সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ, যারা এতে সহায়তা করবে তারা সাম্রাজ্যের ভিত পাকা করে দেবে। রাশিয়া যদি জনগণের জন্যই যুদ্ধ করে থাকে তা হলেও ভারতবাসীর সাহায্যের চোদ্দ আনা যাবে সাম্রাজ্যবাদের খাতে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি যুদ্ধ-বিপ্লব এসব কিছুই পছন্দ করি না। খাও দাও পড়াশুনো করো এই চাই…

—তবে, আপনার ত শান্তির জন্যে চেষ্টা করা উচিত ?

—আমার ? তা হলেই ত অশান্তি ডেকে আনব, দরকার কি আমার অত শত দিয়ে।

—তবুও দেশের প্রতি আপনার একটা কর্ত্তব্য রয়েছে।

—কিছু নয়। যেহেতু দেশ আমার প্রতি কোন কর্ত্তব্য করে নি। নইলে···যাক সে কথা।

মণিবাবু হাসিয়া কহিলেন, ওটা অভিমানের কথা। আমি যতদূর জানি আপনার কথাই কেবল ছেলেরা শোনে, এ ক্ষেত্রে আপনারই উচিত তাদের এই সমস্ত বিপ্লবাত্মক ব্যাপার থেকে নিবৃত্ত করা। যাক্ আমি আমাদের পত্রিকা পাঠিয়ে দেব, বইও দেব কিছু কিছু পড়ে দেখবেন।

—তা দেবেন। সাম্যবাদ সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু পড়েছি, এবং মনে মনে লেনিন, ষ্টালিন প্রভৃতিকে সত্যই শ্রদ্ধা করি—তাঁরা রাশিয়ার অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধন করেছেন।

মণিবাবু স্মিতহাস্তে কহিলেন, তা ত বটেই।

মণিবাবু প্রস্থান করিলেন।

পরদিন সকালে মীরা চা লইয়া আসিয়া শচীনবাবুর সামনের চেয়ারখানায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শচীনবাবু গত কয়দিনের ঘটনাগুলির কথা ভাবিতেছিলেন, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার কি আজ কোন কর্ত্তব্য নাই? তিনি কি শুধু নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র।

অকস্মাৎ মীরাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, কি বসে রইলে যে, কিছু বলবে?

—ওরা সকলে বলছে, সত্য তোমার এখানে যেরূপ আসা-যাওয়া করে তাতে তোমাকেই পুলিশ ধরতে পারে।

শচীনবাবু হাসিয়া কহিলেন, সত্য দোকানে চা খায়, দোকানীকেও ধরবে তা হলে।

—না, তোমাকে ধরবে বলছে সকলে।

—ধরলে কি করব, তুমি থেকো লাটুকে নিয়ে।

—সে কেমন করে হবে, আমি পারব না। তুমি এমনি ভাবে ভাসিয়ে দিয়ে যাবে—

সিঁড়িতে চটির শব্দ হইল—গীতা ও অঞ্জলি আসিতেছে।

তাহারা আসিয়াই কহিল, বৌদি আমাদের চা? চলুন চা নিয়ে আসি।

গীতা ও অঞ্জলি মীরাকে লইয়া অন্দরে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সত্য আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, সার, আজ আমাদের মিছিল বেরুবে, আর শহরে হরতাল তা তো জানেনই। চারটায় মিটিং হবে—যাবেন।

—হ্যাঁ যাবো বই কি?

সত্য হাসিয়া কহিল, আমি ত কয়েক দিনের মাঝেই ডুব দিতে বাধ্য হচ্ছি। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। বৃথা জড়াতে চাইনে আপনাকে, কিন্তু এ কাজ যে আপনি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হবে না।

—আমি?

—হ্যাঁ, আপনি। আপনি ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না আমরা।

—কি কাজ?

—আমাদের টাকা পয়সা কিছু আছে এবং আরও আসবে। আপনার কাছে এগুলো গচ্ছিত রাখতে চাই।

সত্য কয়েকটি ছেলে ও মেয়ের নাম করিয়া কহিল, এরা টাকা চাইলে দেবেন এবং এনে দিলে রাখবেন। অন্ত কেউ দিলেও রাখবেন—এই মাত্র। গীতা আর অঞ্জলি রইল তারা সাহায্য করতে পারবে—

শচীনবাবু স্মিতহাস্তে কহিলেন, হ্যাঁ শুনেছি এসব টাকা নিয়ে অনেকে কেঁপে গেছে, এবার যদি দুঃখ ঘোচে—

সত্য হাসিয়া কহিল, আপনি ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না।

তাহার পর চিঠিপত্রের সাঙ্কেতিক একটা পরিভাষা সে বুঝাইয়া দিয়া কহিল, আমরা এমনি ভাবে সংবাদ দেব, নইলে বিপদ আছে। পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া কহিল, এই ত নির্দ্দেশ। দু'চার জন মরবেই, অতএব সতর্কভাবে কাজ করতে হবে আমাদের। 'ডু অর ডাই' হচ্ছে নির্দ্দেশ—

গীতা ও অঞ্জলি আসিয়া কহিল, মিছিলের পুরোভাগে আমরা থাকব আজ সার, তাই আপনার পদধূলি মাথায় দিয়ে যাই।

তাহারা প্রণাম করিল।

—আশীর্ব্বাদ করবেন।

—শচীনবাবু মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলে চলিয়া গেল।

একটু পরে তিনি ভাবিয়া দেখিলেন—ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক তিনি সত্যর কথামত কাজ করিয়া যাইতেছেন এবং করিবার প্রতিশ্রুতি না দিলেও তাহারা বিশ্বাস করিয়া গিয়াছে যে তাহাদের কাজ তিনি করিবেনই। এত বড় বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে তিনি কেমন করিয়া আঘাত হানিবেন?

অপরাহ্নের দিকে মিছিল বাহির হইল—

পুরোভাগে গীতা ও অঞ্জলি জাতীয় পতাকা হস্তে—পিছনে শতাধিক মহিলা। তাহার পর দুই সহস্রাধিক লোক। কণ্ঠে তাহাদের তূর্য্যধ্বনির ন্যায় নিনাদিত হইতেছে—বন্দে মাতরম্, ভারত ছাড়ো—শচীনবাবুর সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা চলিতে লাগিল, কিন্তু সত্য কোথায়। বহুক্ষণ খুঁজিয়া তিনি তাহাকে পাইলেন; পাশে পাশে যাইয়া শোভাযাত্রাকে সে পরিচালনা করিতেছে।

মোড়ের মাথায় পুলিশের বিরাট বাহিনী—শচীনবাবুর

বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিল নিরস্ত্র এই জনতার উপর গুলীবর্ষণ হইবে। গীতা অঞ্জলি এরা যে পুরোভাগে!

ধ্বনি হইতেছে—ভারত ছাড়—কিন্তু যাহারা এতদিন ভারতকে নিঃশেষে শোষণ করিয়া পুষ্ট হইয়াছে, তাহারা কি সে মধুভাণ্ড স্বেচ্ছায় সুবোধ বালকের মত ত্যাগ করিবে? যদিই তাহারা যায় তবে সর্ব্বনাশ করিয়া দিয়া যাইবে।

শচীনবাবু শঙ্কাব্যাকুল চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। না জানি মোড়ের মাথায় কি বিপর্য্যয় ঘটিবে।

মিছিল ধীরে ধীরে মোড় অতিক্রম করিয়া চলিল, পুলিশ বাধা দিল না। মিছিলের একাংশ ধ্বনি তুলিল, 'স্বাধীন ভারতে বিশ্বাসঘাতকের'—অন্য অংশ প্রতিধ্বনি করিল—'বিচার হবে।'

পুলিসবাহিনীর অফিসারদের মুখে একটু হাসির রেখা খেলিয়া গেল।

মিছিল নির্ব্বিঘ্নে শহর পরিক্রমা করিয়া মাঠে সমবেত হইল। সভা আরম্ভ হইল। অনেকে বক্তৃতা দিলেন।

সকলের শেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সত্য বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল, তাহা যেমন আন্তরিকতাপূর্ণ তেমনি জ্বালাময়ী ভাষায় দৃপ্ত। তাহা জনগণের মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিতে লাগিল। আজ দেশের সম্মুখে যে বিরাট কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া জীবনপণে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সে শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান করিল। বলুন আপনারা, বন্দেমাতরম্।...বন্দেমাতরম্ ভারত ছাড়...ভারত ছাড়। জীবনপণে...স্বাধীনতা চাই—"

সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ইষ্টকখণ্ড সভাস্থলে পতিত হইল, সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই তাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজনকে আহত করিল। পরক্ষণেই একখানা ছোট ইট আসিয়া সত্যর কপালে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তাহার দেহ রক্তাপ্লুত হইয়া গেল। সে পড়িয়া গেল।

একটা গোরগোল হইয়া সভা ভাঙিয়া গেল। কতকগুলি লোক ছুটিল—কম্যুনিষ্টরা ঢিল মারিয়াছে সভা পণ্ড করিতে—অদূরে বটবৃক্ষের তলায় কতকগুলি লোক লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা আক্রমণ করিল। একটা অনির্দ্দিষ্ট অনিয়ন্ত্রিত হট্টগোলের মাঝে মারামারি হইয়া গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠ জনশূন্য হইয়া পড়িল।

শচীনবাবু ক্ষুণ্নমনে বাড়ী ফিরিতেছিলেন—এই জনসমুদ্রে কোথায় সত্য, কোথায় গীতা, কোথায় অঞ্জলি।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, রাস্তার মাঝে মাঝে অন্ধকার জমিয়া উঠিয়াছে; মিউনিসিপালিটির ক্ষীণ আলোকে তাহা গাঢ়তর বলিয়া মনে হইতেছে। অন্ধকারে হঠাৎ একটি ছেলে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শচীনবাবু কহিলেন—কে?

—আমি বিমল দার। সত্যদার তেমন লাগে নি, দিদিরা ভালই আছেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

—আর?

—কিছু কিছু জখম হয়েছে উভয় পক্ষে, তবে তা গুরুতর কিছু নয়—বিমল ত্বরিতপদে চলিয়া গেল।

শচীনবাবু আর একটু আগাইয়াই দেখেন লাঠি হাতে কয়েকটি যুবক উত্তেজিত ভাবে ছুটিতেছে। কাহারও প্রশ্নের উত্তরে একজন বলিল, দেখি ওদের একটাকে খুন করবই—

তাহারা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

একদল কনেষ্টবল বেটন হাতে দ্রুত মার্চ করিয়া চলিয়া গেল—শচীনবাবু ধীরে ধীরে বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

রাত্রি হইয়াছে, মীরা আলোর সামনে লাটুকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। শচীনবাবু আসিতেই মীরা কহিল, কোথায় ছিলে? এত গোলমাল, আমি ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি—

শচীনবাবু কহিলেন, সকলে বেড়াচ্ছে আর আমি বেড়াতে বেরুলেই তোমার ভাবনা—

—মারামারি হচ্ছে যে?

—আমি কি মারামারি করতে গেছি? অত ব্যস্ত হলে চলবে কেন?

লাটু কহিল, বাবা আমাকে একটা নিশান বানিয়ে দেবে, আমি বন্দেমাতরম্ বলবো—

শচীনবাবু সস্নেহে তাহাকে কহিলেন, দেব বাবা। কাল সকালে বানিয়ে দেব।

মীরা খাবার আনিতে গেল। শচীনবাবু বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন—ইহা ত আরম্ভ মাত্র, কেবলমাত্র সরকার নয়, দেশের প্রতিক্রিয়াশীল লোকগুলির সঙ্গেও সমানে যুঝিতে হইবে। এঁরা সবাই ভারতীয়—কোথায় ইংরেজ, সমগ্র শহরে ত একটিও ইংরেজ নাই। এত শত্রু ঘরে বাহিরে এর মধ্যে সত্য ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, আজ তাহার কপালে দেশের ভাইদেরই দেওয়া রক্ততিলক।

...এই রক্ততিলকের ইতিহাস যেদিন লেখা হইবে সেদিন সত্যর স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইবে? স্বাধীন ভারতের স্বপ্নই সে দেখিয়াছে কিন্তু তাহার বাস্তব রূপ কি দেখিতে পাইবে? দেশমাতৃকার চরণতলে আত্মবিসর্জ্জন দিবে কত কর্ম্মী, কত বীর, কত অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাণ। তাহারা কি পাইবে, কি পাইয়াছে? শচীনবাবু তো নির্ব্বিকার দর্শকমাত্র!

মীরা খাবার লইয়া আসিয়া কহিল, কি ভাবছ? স্কুল ত বন্ধ আছে, চল আমরা দেশের বাড়ীতে যাই।

শচীনবাবু হাসিয়া কহিলেন, কোথায় যাবে? সর্ব্বত্রই এই গোলমাল।

মীরা ভীতভাবে কহিল, কিন্তু কি হবে? যদি তোমাকে ধরে?—তুমি ওর মাঝে যেও না লক্ষীটি।

—না না। আমি যাই নি, যাব না—তুমি বিশ্বাস কর। তোমাকে আর খোকাকে ফেলে আমি কোথায় যাব?

পরদিন সকালে সংবাদ পাওয়া গেল—

সত্যদের দলের বিশিষ্ট কর্ম্মী নগেন রায়ে বহিরাগত কতকগুলি লোককে নৌকায় তুলিয়া দিয়া ফিরিবার পথে নেতা মণিবাবুর ভ্রাতার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আহত হইয়াছে। তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, কিন্তু অবস্থা আশঙ্কাজনক। নগেন মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজের জবানবন্দীতে নাকি তাহার নাম করিয়াছে এবং সমস্ত ঘটনাই বলিয়াছে।

বিপ্লববিরোধী কর্ম্মীরা সকলে রাতারাতি শহর ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং সত্যদের দলের সব কয়জন বিশিষ্ট কর্ম্মীর নামেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে।

গীতা সংবাদগুলি দিয়া কহিল, তাই সত্যদার সঙ্গে আর দেখা হবে না, কিন্তু খবর পাবেন।

—তোমরা?

এখনও দেরী আছে বলে মনে হয়। গীতা হাসিয়া কহিল, বেশীক্ষণ থাকলে আপনার বিপদ আছে। আমি যাই—

গীতা চলিয়া যাওয়ার পরে শচীনবাবু কিছুক্ষণ ভাবিয়া ধীরে ধীরে অণিমা রায়ের ওখানেই রওনা হইলেন। অণিমা আপিস-কক্ষেই একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, আসুন। অকস্মাৎ?

—হ্যাঁ, সাহিত্য সমিতির একটা অধিবেশনের আয়োজন করা দরকার তাই এলাম।

শ্রীমতী রায় পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইনি মিস্ বসু, স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী।

—নমস্কার। আপনি নিশ্চয়ই সাহিত্য সমিতির সভ্য হয়ে সমিতির গৌরব বৃদ্ধি করবেন।

অতঃপর কিছুক্ষণ আলাপের পর মিস্ বসু বিদায় লইলেন। অণিমা রায় সকল সংবাদই পাইয়াছিলেন, শচীনবাবু তথাপি আত্মোপান্ত জানাইলেন।

শ্রীমতী রায় একটু চায়ের যোগাড় করিয়া আসিয়া কহিলেন, এই গোলমালের মাঝে আবার সাহিত্য কেন?

মনটাকে চাঙ্গা করবার জন্তে…। একটা কাজের ভার সত্য দিয়ে গেছে—আমার কাছে তাদের টাকাকড়ি সব গচ্ছিত রাখতে হবে এবং আমার উপরেই নাকি কেবল তারা আস্থা স্থাপন করতে পারে। ভাবছি এই সুযোগে যদি দারিদ্র্য ঘোচে, অনেকে ত বেশ গুছিয়ে নিচ্ছে।

শ্রীমতী রায় বলিলেন—ভাল পথই বেছে নিয়েছেন—আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।

শচীনবাবু বলিলেন—কিন্তু একটি কথা বুঝিনি, সেটা হচ্ছে দাতাই বা কে গ্রহীতাই বা কে? যারা সব ছিল জানা তারা ত সব ফেরার? অবশ্য গ্রেপ্তারের ভয়ে নয়, কর্ম্মী আটকা পড়লে কাজ পণ্ড হবে এই জন্তেই ধরা পড়তে অনিচ্ছুক। শহর আপাততঃ নিষ্কণ্টক—কম্যুনিষ্টরা পলাতক, সত্যরা ফেরার।

শ্রীমতী রায় বললেন—তবে ত স্কুল খুলে দেওয়া যায়।

—হ্যাঁ, আমাদের স্কুল বোধ হয় দু'চার দিনের মধ্যেই খোলা যেতে পারে।

—ধন্যবাদ।

কিছুক্ষণ অবান্তর আলাপ-আলোচনার পরে শ্রীমতী রায় বলিলেন—আপনাকে ভাল লোক বলেই জানতাম কিন্তু আপনার পেটে পেটে এত?

শচীনবাবু পরিহাস করিলেন—আমি নিরপরাধ—আমার পেটে কিছু নেই।

—আচ্ছা, টাকার বুঝি আপনার খুব বেশী প্রয়োজন হয়েছে।

—আমি—সরল মানুষ, আমাকে ব্যঙ্গ করবেন না।

সাহিত্য সমিতির সভার দিন নির্দ্ধারিত হইল, এবারের সভা হইবে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সেনের বাসায়। শচীন বাবু ফিরিয়া আসিলেন—এবার একটা জিনিষ তিনি লক্ষ্য করিলেন—মিস রায় আগেকার মত চঞ্চল হন নাই, আজ সম্ভবতঃ বুঝিয়াছেন যে ইহাই অনিবার্য্য পরিণতি।

বাসার সামনে একটি কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া ছিল, ঢুকিতেই সে কহিল—মাষ্টার বাবু, দারোগাবাবু আপনাকে ডেকেছেন।

—কে?

—মামুদ হোসেন সাহেব, দরকার আছে।

শচীনবাবুর সমস্ত অন্তর মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ক্রোধ চাপিতে পারিলেন না, কহিলেন—সময় নেই আমার, দরকার হলে তাঁকে আসতে বলো। সকালের দিকে বাসায় থাকি—

কনেষ্টবল সেলাম জানাইয়া চলিয়া গেল—

ঘরের মাঝে অঞ্জলি বসিয়া ছিল। সে কহিল—দারোগার মেয়ের নাম রিজিয়া, তাকে পড়াতে বললে, না বলবেন না।

—না, আমি পড়াতে পারবো না।

অঞ্জলি কহিল—ওটা যে আমাদের দরকার সার।

—আচ্ছা ভেবে দেখব।

কিন্তু এই টিউশনি গ্রহণ করিতে মন কিছুতেই সায় দিতেছিল না। তাঁহার সমস্ত অন্তর আজ ইহাদের উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রমশঃ

ভারতের শিল্পোন্নয়ন কোন্ পথে ?

ডক্টর শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

[কেন্দ্রীয় শিল্প-সরবরাহ বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা, প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউট অব সুগার টেকনলজি ও হারকোর্ট বাটলার টেকনলজিকাল ইন্‌ষ্টিটিউটের যুগ্ম-সমাবর্ত্তন উৎসবোপলক্ষে প্রদত্ত পাণ্ডিত্য-পূর্ণ, মনোজ্ঞ বক্তৃতাটিতে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়ার শিল্পোন্নতির উজ্জ্বল ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় শিল্প-সম্প্রসারণে রাজনীতিক, শিল্প-গবেষক, শিল্পপতি এবং তরুণ শিল্প-বিজ্ঞানীর আশু-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা স্বদেশহিতৈষী মাত্রেরই প্রেরণা-উদ্দীপক ও প্রণিধানযোগ্য।

এই অনুবাদটি ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব সুগার টেকনলজি (কাণপুর)-এর অধ্যক্ষ মহোদয়ের সৌজন্য ও অনুমতিক্রমে তৎপ্রকাশিত উক্ত ইংরেজী বক্তৃতা হইতে গৃহীত—অনুবাদক শ্রীহরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

আপনারা আমাকে এই সমাবর্ত্তন-উৎসবের পৌরোহিত্য করিতে আদেশ করিয়া সবিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন ; আমি ভাবিতেছিলাম, আমার প্রতি এই আহ্বান আসিল কেন ? আজ পূর্ব্বাহ্নে ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ-মহোদয়েরা আমাকে জানাইলেন যে, তার কারণ আপনারা এই উপলক্ষে সময় সময় এমন কাহারও কাহারও দ্বারা বক্তৃতা প্রদান করাইতে ইচ্ছা করেন, যাহার জীবনের অধিকাংশ সময় নেতৃত্বের খাতিরে অথবা সাধারণ্যের ইচ্ছার তাগিদে, ছাত্রদের মধ্যে কাটিয়াছে। এই পরিপূর্ণ উৎসব-গৃহটি সংযুক্ত প্রদেশ এবং এই নগরীর সমাজ-জীবন ও শিল্পক্ষেত্রে যাঁহারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহাদের অনেকের উপস্থিতিতেই অলঙ্কৃত হইয়াছে। এই বিদ্যালয় দুইটির বিভিন্ন প্রয়োগশালা আজ পূর্ব্বাহ্নে ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখার এবং তাহাতে পরিচালিত গবেষণার বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল ; অধিকাংশ বিষয়ই উদ্ভিজ্জ পদার্থের প্রস্তুত-প্রণালী পরীক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট। যদি শিক্ষকগণ কোন কোন সময় মনে করেন যে, তাঁহাদের কর্ম্মোত্তম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উৎসাহোদ্দীপক অভিমত কিংবা বিত্তশালী ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে সতেজ না রাখিলে চলে না, তবে তাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিকই বলা যাইতে পারে এবং এখানকার অনেকেই এই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া আমার মনে হয়। ইহা অতি স্বাভাবিক যে, বর্ত্তমান গণ-তান্ত্রিকতার যুগে শিক্ষক ও ছাত্রগণ দেশসেবার জন্য বৃহত্তর সুযোগ ও অধিকতর সুবিধা পাওয়ার চেষ্টায় যত্নবান হইবেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস—আমাদের দেশে প্রত্যেক শিক্ষক, গবেষক এবং ছাত্রের নিষ্ঠা ও কুশলতাপূর্ণ সেবার প্রয়োজন আজ যত বেশী, তত আর কখনও অনুভূত হয় নাই।

দাসত্বের যুগ অতিক্রান্ত হইয়া স্বাধীনতার অরুণোদয়ে ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক যে, আমাদের দেশবাসী এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়াছে—ভবিষ্যতে তাহারা পূর্ণতর জীবন উপভোগ করিতে পারিবে। তাহাদের ইহাও বিশ্বাস—যে বিশ্বাস

ডক্টর শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ সমাবর্ত্তন উৎসবে বক্তৃতা করিতেছেন।
ডক্টর ঘোষের পার্শ্বে এস্, সি, রায়, (ডাইরেক্টর) মহাশয়কে উপবিষ্ট দেখা যাইতেছে

ব্যথার সুর জাগাইয়া তোলেও বটে—জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে সব আপনাআপনি হইয়া যাইবে। আমাদের এই বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে ; আমাদের আত্মবিশ্বাস পোষণ করিতে হইবে, যাহার গভীরতায় আমরা আমাদের দুর্লভ লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারি। তবে, জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে, আর জ্ঞানের সহিত সম্পর্কহীন নিছক সাধু-ইচ্ছা কেবলই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়—এই দুইয়ের মধ্যে সুগভীর ব্যবধান বর্ত্তমান। এই জ্ঞানের ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও শিল্প-শাস্ত্র এক বিশিষ্ট সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনাসমূহ যে সমস্ত সম্পদের উপর নির্ভর করে, তাহা যথাসম্ভব সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি, উদ্যমশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত বিকাশ করিতে হইলে উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমান হারে ব্যবহারিক শিক্ষার ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্য গবেষণার ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। সুতরাং আমাদের

বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান অধিকতর পরিমাণে সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের ভূমি, বন ও খনি হইতে সম্পদসমূহ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে সমর্থ হই এবং শিল্পজ দ্রব্যসমূহ অধিকতর কুশলতার সহিত উৎপাদন করিতে পারি।

একটি প্রবচন আছে, নীতিকথার চেয়ে দৃষ্টান্ত অধিকতর কার্য্যকরী; তাই আমার মনে হয়, প্রাকৃতিক সম্পদ কার্য্যকরী করিয়া তোলার ব্যাপারে নূতনতর আগন্তুক হইলেও আজ যে দুইটি দেশ বিশ্বের মঞ্চে শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে আপন আপন প্রভাব বিস্তার ক'রতেছে, তাহাদের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম মহান্ নেতা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্ তাঁহার দেশবাসীর নিকট ক্রমাগতই প্রচার করিয়া বেড়াইতেন যে, মানুষের উন্নতির সুলভতম ও নিশ্চিত পন্থা হইতেছে—প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অনুশীলনে উৎকর্ষ সাধন করা। আমেরিকাবাসী তাঁহার এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া লাভবান হইয়াছে এবং জগৎকে দেখাইতে পারিয়াছে যে, যে-কোন দেশই সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হইতে পারে, যদি সেই দেশ মাত্র দুইটি সর্ত্ত পরিপূরণ করিতে সমর্থ হয়; তার একটি হইতেছে—প্রাকৃতিক সম্পদ সেই দেশের থাকার দরকার; আর দ্বিতীয়টি হইতেছে, ঐ সম্পদ আহরণ করিয়া কাজে লাগাইবার মত প্রতিভাও ঐ দেশের অধিবাসীদের থাকা প্রয়োজন।

বহু বৎসর পূর্ব্বে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইহার প্রতিষ্ঠা-দিবসের ত্রিশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করিয়াছিল। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মাধ্যক্ষ (Dean) আমাদিগকে ইহার ইয়ার্ডের (yard) চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখাইলেন—যাহাকে তিনি 'ইয়ার্ড' বলিয়া অভিহিত করেন, তাহা কতকগুলি সুপরিকল্পিত ও সুরক্ষিত ভূমি-সমষ্টি; যাহাকে বেষ্টন করিয়া বিশাল সৌধরাজি নির্ম্মিত হইয়াছে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমেরিকার অন্যান্য জায়গায় অনুরূপ ভূমিকে যেমন 'ক্যাম্পাস্' (Campus) বলে, আপনি তাহা না বলিয়া ইহাকে ইয়ার্ড বলিতেছেন কেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "তিন শতাব্দী পূর্ব্বে ধর্ম্মীয় স্বাধীনতাকামী ঔপনিবেশিকেরা (Pilgrim Fathers) বোষ্টন শহরে অবতরণ করেন; তখন তাঁহারাই চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাকারবেষ্টিত এই ইয়ার্ডটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা এখানেই রাত্রিতে বিশ্রাম করিতেন এবং নিজেদের গাভীগুলি রক্ষা করিতেন। এই ব্যবস্থার ফলে হিংস্র জন্তু বা রেড ইণ্ডিয়ান গুপ্ত-শিকারীরা উপদ্রব সৃষ্টি করিতে পারিত না। আর এই গাভীর দুগ্ধই এখানকার শিশুদিগকে পান করিতে দেওয়া হইত এবং তাহাতে এই 'ইয়ার্ডে' একটি শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইহাই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা করিল। একটি শিশু-বিদ্যালয় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ার ব্যাপার সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক বিরাট উন্নয়নের প্রতীক-স্বরূপ। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশের আদিম অধিবাসীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে ক্রমাগত রক্ত-ক্ষয়ী সংগ্রাম ভিন্ন গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা সমাধানের অন্য কোন উপায় ছিল বলিয়া জানিত না। আর সেই দেশ আজ পনর কোটি লোকের পুষ্টিরক্ষার উৎকর্ষে জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। দেশটিতে এখন খাদ্য-সামগ্রীর যেন বন্যা বহিয়া চলিয়াছে এবং জনসংখ্যার যে ২৫ ভাগ অধিবাসী কৃষিজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহারা শুধু সুষ্ঠুরূপে তাহাদের স্বদেশবাসীরই খাদ্য-সংস্থান করিয়া ক্ষান্ত নহে, পরন্তু আমাদের মত দরিদ্র দেশের লোকেদের জন্যও প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-বস্তু উদ্বৃত্ত রাখিতে পারিতেছে এবং আমাদের কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারীরা যখন অন্নের জন্য তাহাদের দ্বারে গিয়া করাঘাত করেন, তখন তাহার অত্যধিক মূল্যে উদ্বৃত্ত খাদ্য-শস্য এই দেশে রপ্তানী করে। আমি আজ সকালবেলা সংবাদ-পত্রে পড়িলাম, তাহারা প্রতিবৎসর এক কোটি বিশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য রপ্তানী করিতে পারে। ঐ দেশের স্বাস্থ্য ও রোগ-নিরোধক ব্যবস্থা এত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যে, লোকের গড় পরমায়ু হইতেছে চৌষট্টি, যেখানে ভারতবাসীদের পরমায়ুর হার তেইশে দাঁড়ায়। ইহা শুধু এইজন্য সম্ভবপর হইয়াছে যে, ঐ দেশের জনগণের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে ক্রমশঃ অধিকতর আয়ত্তে আনার জন্য অনবরত চেষ্টা চলিতেছে এবং আধুনিক পরিচালনা-পদ্ধতিতে উৎকৃষ্টতর নূতন নূতন দ্রব্য উৎপাদন, জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিকরণ এবং শস্য ও গৃহপালিত পশুর উন্নতি-সাধন বিষয়ে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলিতেছে।

অবশ্য, এই যুক্তি দেখান যাইতে পারে যে, একটি ধীশক্তি-সম্পন্ন জাতির বহু বৎসরের ক্রমাগত চেষ্টার ফলে এই দৃষ্টি-আকর্ষণকারী অগ্রগতি সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু রাশিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করুন; সে জগৎকে দেখাইয়াছে যে সুবিবেচনা-প্রসূত জাতীয় পরিকল্পনা দ্বারা উন্নতির মন্দগতি ত্বরান্বিত এবং অর্থনৈতিক বিকাশ দ্রুততর করিয়া তোলা যায়। ১৯১৭ সনে যখন সেই দেশের রাজতন্ত্র বিপ্লবের বন্যায় ভাসিয়া গেল, তখন রাশিয়াতে সবেমাত্র শিল্পোন্নয়ন-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল এবং তখন তাহার অবস্থা ভারতবর্ষের মতই ছিল। রাশিয়ার জননায়ক বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক বিপ্লব চরম লক্ষ্য নহে; ইহার পর কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন ব্যাপারেও বিপ্লব আনিতে হইবে—যাহাতে প্রত্যেক নাগরিকের জীবনযাত্রার মান, উৎপাদনের নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত উন্নতির সুযোগ-সুবিধা ইউরোপের অধিবাসীদের সমপর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে।

বিশ্লেষণ করিলে সর্ব্বশেষে এরূপ দাঁড়ায় যে, রাশিয়ার

অধিবাসীরা ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে—গৃহপালিত জন্তুর উপযুক্ত ব্যবহার এবং যন্ত্রপাতির প্রয়োগ দ্বারাই ধনের সৃষ্টি হয়—শুধু সদ্-ভাবনা দ্বারা ধন পাওয়া যায় না, কিংবা ভগবদ্ভক্তির ফলস্বরূপও ইহা আমাদের উপর বর্ষিত হয় না। আদিম যুগে কিরূপে ক্রীতদাসের শ্রমের উপর এবং পরবর্ত্তী যুগে দরিদ্রের সহিষ্ণুতার উপর ভিত্তি করিয়া সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল সে-কথা তাহারা বিস্মৃত হয় নাই; সেখানে আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল যে, বিজ্ঞানের অবদানে জগতের কোন কোন অংশে সভ্যতা জনসাধারণের সন্তোষবিধানের উপর ব্যাপক ভিত্তি স্থাপন করিয়া দাঁড়াইবার সকল প্রয়াস করিতেছে। এখন দেখা যাক, সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা কি?—সে চায়, শৈশবে উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইবার এবং বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা ও বয়স্থ হইলে তাহার দৈহিক এবং মানসিক গঠনের উপযোগী জীবিকা-সংস্থান; সে চায় সুন্দর বাসগৃহ, প্রচুর অন্নবস্ত্র তথা জীবনধারণের অন্যান্য সামগ্রী, রোগমুক্ত থাকার সঙ্গত ব্যবস্থা ও আয়ের কতক উদ্বৃত্তাংশ যাহা দ্বারা তাহার বিশ্রাম ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সুযোগ সম্ভবপর হইতে পারে। সমাজের এমন একটি চিত্র যাবতীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, মহাপুরুষ ও দার্শনিকদের স্বপ্নমাত্রই হইয়া রহিয়াছে, উপরিবর্ণিত স্বর্গরাজ্য মানব-ইতিহাসে কদাচিৎ রূপপরিগ্রহ করিয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ এই নহে যে, সর্ব্বকালেই মানুষের পাপের ফলে এরূপ হইয়া থাকে বরঞ্চ সত্য কথা এই যে, তাহার অধিগত উৎপাদন-পদ্ধতি ও করায়ত্ত যন্ত্রপাতি দ্বারা অতি অল্প দিন পূর্ব্ব পর্যন্তও সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পর্য্যাপ্ত পণ্যোৎপাদন করা মানুষের দৈহিক ক্ষমতার বাহিরে ছিল এবং কোন না কোন উপায়ে দুর্ব্বলকে তাহার শ্রমলব্ধ ফল হইতে বঞ্চিত করিয়া শুধু শক্তিশালী ব্যক্তিই উল্লিখিত জীবিকার মানে পৌঁছিতে পারিত।

শিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ দেড় শতাব্দী পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহাতে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন, বণ্টন ও চলাচল বিষয়ে এক নীরব অথচ প্রচণ্ড শক্তি বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে। সভ্যতা গড়িয়া তুলিবার জন্য মানুষের দাসত্ব এখন একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। যন্ত্রই এখন অনায়াসে ক্রীতদাসের কাজ করিতে পারে এবং মানুষের আর সেই দুঃখকষ্ট সহ্য করিবার প্রয়োজন নাই। ইংলণ্ডে মাথাপিছু কর্ম্মক্ষমতার পরিমাণ মোটামুটি ততটুকু দাঁড়ায় যাহা ১৮০০ একক (Unit) বৈদ্যুতিক শক্তি নিষ্পন্ন করিতে পারে। এই কাজের শতকরা পাঁচ ভাগ মাত্র মানুষ বা গৃহপালিত জন্তুর দৈহিক শক্তিদ্বারা সাধিত হয় এবং বাকী সমস্তই গ্যাস, তৈল, বাষ্প ও বিদ্যুৎ-জাতীয় প্রাকৃতিক শক্তিদ্বারা সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক শক্তির প্রতি একক দুই জন লোকের দৈনিক কাজ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। সুতরাং আমরা ইহা বলিতে পারি যে, ইংলণ্ডের প্রত্যেকটি অধিবাসীর জন্য দশটি যন্ত্র-ক্রীতদাস কাজ করিয়া থাকে। এই ক্রীতদাসগুলির কর্ত্তব্য কি? ইহারা নিপুণ প্রভুর সুবুদ্ধি-দ্বারা পরিচালিত হইয়া কাঁচামাল হইতে ব্যবহারোপযোগী মাল তৈয়ার করা, জমি চাষ করা, বীজ বপন করা, ফসল কাটা, লোক ও মাল চলাচলের ব্যবস্থা করা এবং কারখানায় নিজের জন্য বা বিদেশের সঙ্গে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে দ্রব্য উৎপাদন করিবার কাজে লাগে। এখন মনে করুন, এই ক্রীতদাসগুলি ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল এবং ইংলণ্ডের অধিবাসীরা সকল কাজ নিজের হাতে করিতে বাধ্য হইয়া পড়িল; তৎক্ষণাৎ কাজের পরিমাণ আগের তুলনায় বিশ ভাগের এক ভাগে নামিয়া আসিবে এবং দ্রব্যের উৎপাদনও সেই অনুপাতে হ্রাস পাইবে এবং যে 'বিভারিজ' পরিকল্পনা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়ক নিরাপত্তা-বিধানের জন্য পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। যেখানে রাশিয়ার প্রতি ছয় জন লোকের জন্য একটি যন্ত্র-ক্রীতদাস কাজ করিত, সেক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রতিটি লোকের জন্য এইরূপ দশটি ক্রীতদাসকে কাজে খাটানো হইত। ইংলণ্ড কেন ধনী হইয়াছিল আর রাশিয়া কেন দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল—ইহাই তাহার মূল কারণ।

ইহাতে রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, দেশের শিল্পোন্নতি একমাত্র সুলভ যন্ত্র-শক্তি, কাঁচামাল ও কুশলী শিল্পবিশারদের প্রচুর সরবরাহের উপরই নির্ভর করে এবং তজ্জন্য লেনিন সমগ্র রাশিয়ায় বিরাট আকারে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এতদ্বিষয়ে সহানুভূতিহীন বিদেশবাসীরা—যাঁহারা সেই গোঁড়া নীতিতে আস্থা রাখিতেন যে, শক্তি নিয়োজিত করার মত শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই শক্তি উৎপাদন করা দরকার—তাহারা লেনিনের এই 'বিদ্যুতীকরণ' পরিকল্পনাকে 'বৈদ্যুতিক হত্যাকরণ' পরিকল্পনা বলিয়া ব্যঙ্গ করিলেন। কিন্তু লেনিন ঠিকমতই আগের কাজ আগে করিয়া গেলেন এবং স্থির করিলেন যে, একবার সুলভে ও ব্যাপকভাবে শক্তি উৎপাদন করিয়া ফেলিতে পারিলে, শিল্পবিষয়ে অগ্রগতি অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে।

খনিজ পদার্থের জন্য অনুসন্ধান ও তথ্য-পরীক্ষা পরিকল্পনানুযায়ী যথারীতি আরম্ভ হইয়া গেল। যখন অন্যদেশে ভূতত্ত্ববিদের সংখ্যা ছিল ১০০, তখন সোভিয়েট রাশিয়াতে ১০,০০০হাজার ভূতত্ত্ববিদ্ সমগ্র দেশে নিবিষ্ট মনে খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ফলে, রাশিয়া তাহার ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পসমূহের প্রয়োজনীয় যাবতীয় খনিজ পদার্থ ও খনিজ তৈল সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেশরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি খনিজ-দ্রব্য—যেমন, ক্রোম্,

ম্যাঙ্গানিজ, ভেনাডিয়াম, অভ্র—এখন এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, রাশিয়া এইগুলি অনায়াসেই ইংলণ্ড ও আমেরিকায় রপ্তানী করিয়া থাকে।

রাশিয়ায় শিল্প-বিশেষজ্ঞ গড়িয়া তুলিবার জন্য শিক্ষাদানের বিরাট ব্যবস্থা এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এমন একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অধ্যাপক জোফী লেনিনের আদেশক্রমে মাত্র তিন জন শিক্ষক লইয়া ফিজিকো-টেক্‌নিকেল ইন্‌ষ্টিটিউটের সূচনা করেন। রাশিয়ার সকল জায়গা হইতে মেধাবী ছাত্রগণকে ঐখানে আনিয়া একত্র করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইল এবং জানাইয়া দেওয়া হইল, তাহাদের আহার ও শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় রাষ্ট্র বহন করিবে। এই উদ্দেশ্যে বাঞ্ছিত অর্থের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করা হইল না, কারণ ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্যাবলী সমগুণ শ্রেণীর (Geometrical progression) হারে দ্রুত সম্প্রসারিত করিয়া যাইতেই হইবে। তাহাতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঐ বিদ্যায়তনটি বিরাট আকারে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল—তখন ইহাতে ২০০০ হাজার শিক্ষক, ছাত্র ও শ্রমজীবী কাজ করিতেন। ঐস্থান হইতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন এমন নরনারীই ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে যে পঞ্চবার্ষিকী-পরিকল্পনাপরম্পরা কার্য্যে পরিণত করা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার পরিচালক ও কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। রাশিয়ার অধিবাসীরা জানিতেন যে, যে-কোন পরিকল্পনাকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে কর্ম্মনৈপুণ্যকে জপমন্ত্রের মত করিয়া লইতে হইবে। ফলে তাহাদের নিকট কয়লাখনির শ্রমিক ষ্টেখানভের দ্বারা, খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকের উৎপাদন বহুপরিমাণ বৃদ্ধি করিবার কৌশলপূর্ণ উদ্ভাবনের সংবাদ, সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার সমগ্র স্থান জুড়িয়া পরিবেশন করার মত গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইল, অথচ ঠিক ঐ সময়ে সংঘটিত রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসনত্যাগের খবর সংবাদপত্রে সামান্যভাবে উল্লেখ করা হইল মাত্র।

এখন আমাদের অবস্থা কিরূপ দেখা যাক্‌। অর্থাৎ লেনিনগ্রাডের ফিজিকো-টেকনিকেল ইন্‌ষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কিছু পূর্ব্বে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এই ইন্‌ষ্টিটিউটের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই ইন্‌ষ্টিটিউট দুইটি ডি. ওয়াই. আথাওয়ালে, আর. সি. শ্রীবাস্তব, এস. সি. রায় এবং ডাঃ ডি. আর. ধিংরা ও তাঁহাদের সুযোগ্য সহকারিগণের পরিচালনায় ছাত্রদের শক্তির পূর্ণবিকাশের সুযোগ দিয়াছে এবং দেশের শর্করা ও তৈলশিল্পে বিদ্যালয় দুইটির সেবাকে বিশিষ্ট অবদান বলা চলে। শিক্ষকমণ্ডলী তাঁহাদের কার্য্যাবলী শিল্পশিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে—যথা, তন্ত ও পচাই (fermentation) শিল্প, কেমিক্যাল ইন্‌জিনিয়ারিং, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য ও মৃৎশিল্প, কাঁচ ও ভেষজদ্রব্য প্রস্তুত-প্রণালী শিল্প ইত্যাদিতে সম্প্রসারিত করিতে ইচ্ছা করেন।

১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে শিক্ষাদান বিষয়ে যে মান প্রচলিত ছিল তদনুযায়ী বিচার করিলে দেখা যাইবে, ইন্‌ষ্টিটিউট দুইটির কাজ খুবই ভাল হইয়াছে এবং কার্য্য-সম্প্রসারণের বিবেচনাধীন পরিকল্পনাগুলিও তথ্যানুমোদিত বলিয়াই মনে হইতেছে। তবে এই নবযুগে আমরা কি পুরাতন মাপকাঠিতেই নিজেদের পরিচালিত করিব? আমরা—যাহারা বাকি বিশ্বের জাতি-সমষ্টির মধ্যে যোগ্য স্থান অধিকার করার জন্য আজ পশ্চাতে পড়িয়া সংগ্রাম করিতেছি—এই সমস্ত অচল পরীক্ষাদ্বারা নিজেদের কাজের গুণাগুণ বিচার করিব? বরং, আমি প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্মুখে অগ্রগতির মাপকাঠি হিসাবে এই প্রশ্নগুলি উপস্থাপিত করিব;—আমরা প্রত্যেক ভারতীয় কি প্রতিটি ইংলণ্ডবাসী বা আমেরিকাবাসীর মত সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, উদ্ভাবনক্ষম, সংহতিপ্রিয় ও স্বদেশহিতৈষী? আমরা প্রত্যেকে কি ব্যবহারিক শিল্পের পারদর্শিতায়, অর্থনৈতিক নৈপুণ্যে, সংগঠনক্ষমতা ও সমবেত প্রচেষ্টায় তাহাদের সমকক্ষ? যদি না হই, তবে কত শীঘ্র তা হওয়া সম্ভবপর?

যখন আমরা এইরূপ আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তখনই আপনাদের এই ইন্‌ষ্টিটিউটের মত বিদ্যালয়গুলি উজ্জ্বল হইয়া দৃষ্টিপথে পতিত হয়। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সম্পদের মতই বিপুল; অথচ আমাদের শতকরা ৮০ জন মধ্যযুগীয় কৃষকের মত নেহাত প্রাণধারণোপযোগী কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাপন করে; এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—মূর্খতা, ব্যাধি, অপুষ্টি ও সময় সময় দুর্ভিক্ষ। আজ আমার মনে পড়ে—একবার ওয়াশিংটনে বিদেশীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-বিভাগের কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, যদি ভারতের চল্লিশ কোটি লোক এক বৎসরের জন্য আপন আপন কাজ হইতে ছুটি নেয়, তবে এতদুদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত ৬০ লক্ষ আমেরিকাবাসী উৎপাদনের আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সমগ্র ভারতের লোকের খাদ্য ও কার্য্যের বর্ত্তমান প্রয়োজন মিটাইয়া দিতে পারিবে। ঠিক এই জায়গাতেই যে আমাদের অর্থনীতির দুর্ব্বলতা, ইহা সহজেই বুঝা যায়। এক জন লোক তাহার আদিম যুগীয় কলা-কৌশল ও পুরাতন যন্ত্রপাতি দ্বারা যে পরিমাণ ধনোৎপাদন করিতে পারে, তাহা একজন নিপুণ শ্রমিক আধুনিক যন্ত্রপাতিদ্বারা যে ধনোৎপাদন করিবে, তাহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। যাহারা জানে, কিভাবে যন্ত্রকে ক্রীতদাসের মত খাটাইতে হয় এবং যাহারা দৈহিক পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে যান্ত্রিক শক্তি দ্বারা কার্য্য করিয়া যায় (যাহা আমি পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি) তাহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অবধারিত। আমাদের স্ত্রী-পুরুষ পর্ণকুটীরে জন্মিয়াও স্বভাবতঃ যতটুকু বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হয়, তাহা একজন সাধারণ আমেরিকাবাসীর অপেক্ষা কম নহে।

যাহারা ২০০০ হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে এই দেশে সেইদিনকার বিশ্বের বিস্ময়-উদ্রেককারী সভ্যতা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল, ভারতের আজিকার নরনারী তাদের ঐ সমস্ত পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতেই এই উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হইয়াছে। আপনাদের মত যে সমস্ত যুবক সাংস্কৃতিক ও শিল্প-শিক্ষার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপরই এই শ্রমসাধ্য কর্ত্তব্য বর্ত্তাইয়াছে—ভারতের শ্রমিকদিগকে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে বর্ত্তমান সময়োপযোগী কুশলতা অর্জ্জনে আপনাদিগকে এমনভাবে সাহায্য করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের কাজ, এখনকার মত যেন কাহার সহনশীলতা কত বেশী তাহার প্রতিযোগিতা মাত্র না হইয়া—ইহা এক আনন্দময় উপজীব্যে পরিণত হইতে পারে। যে-দেশ প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ও বুদ্ধি-বৃত্তি-সম্পন্ন জনতার বাসভূমি সেই দেশ ব্যাপক ক্লেশ ও দারিদ্র্যের আবাসস্থল হইয়া থাকিবে, তাহা এক অসহনীয় সামঞ্জস্যহীনতার ব্যাপার ;—ইহাতে আমাদের প্রত্যেকেরই লজ্জায় অভিভূত হওয়া উচিত এবং ইহা হইতে আমাদের জাতি যে বিশৃঙ্খল অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা দূর করার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য।

যদি আমাদের জননায়কগণ ইহা উপলব্ধি না করিতে পারেন যে, আমাদের ভাবী কল্যাণ দেশরক্ষা ব্যতিরেকে অন্য যে সমস্ত সমস্যার সমাধানের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহার অধিকাংশই হইতেছে অর্থনৈতিক ও শিল্প-বিজ্ঞান বিষয়ক, তাহাতে এই বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থা দূরীভূত হইবে না। বিভিন্ন সমস্যা —যেমন, প্রাদেশিক সীমা নির্দ্ধারণ, স্বয়ং-শাসিত অন্তঃরাষ্ট্র গঠন, গ্রাম্যপঞ্চায়েৎ সৃষ্টি, মাদকদ্রব্য বর্জ্জন—এমনকি স্ত্রী-জাতির অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ও সন্তোষজনক সমাধানের জন্য আরও কিছু সময় অপেক্ষা করিতে পারে ; কিন্তু যখন সমগ্র বিশ্ব অগ্রগতির দিকে চলিয়াছে, তখন ভারতের জনসাধারণ স্বভাবতঃই অধীর হইয়া, যে অর্থনৈতিক ক্লেশ তাহাদের সমূহ দুর্ভোগের কারণ হইয়াছে, তাহার আশু সমাধানের জন্য দাবি জানাইবে। তা ছাড়া আমাদের মধ্যে অনেকেই এই অশুভ আশঙ্কা করিতেছেন—যাহার অনেক নিদর্শন সুদূর প্রাচ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে—যদি আমরা ভারতে ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইয়া না যাই, তবে সুব্যবস্থিত প্রগতি আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সেই পরিমাণ অর্থ সাধারণ ধনভাণ্ডার হইতে ব্যয় করিতে হইবে, যাহা পূর্ব্বে কখনও সম্ভবপর বলিয়াই মনে করা হইত না। যখন এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য চাপ দেওয়া হয়, তখনই রক্ষণশীল অর্থনীতিকগণ ও অভিজ্ঞ শাসনকুশলীবৃন্দ অর্থাভাবের ধুয়া তুলিয়া থাকেন। আমি নিজে অর্থনীতিবিশারদ নহি ; তবে, আজ আমার মনে পড়ে, লর্ড ওয়াভেল ভারতের বড়লাটের পদগ্রহণের পূর্ব্বে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, কোন জাতিই অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, ব্যাধি প্রভৃতি শান্তির রিপুকে রোধ করার জন্য সেই পরিমাণ অর্থোৎপাদনে সমর্থ হয় নাই, যে পরিমাণ অর্থ যুদ্ধবিগ্রহের জন্য ব্যয়িত হইতেছে। যে সকল শিল্পপতি বোম্বাই পরিকল্পনার প্রণেতা, তাঁহারা এক সুচিন্তিত মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, অর্থ দেশের অর্থ-নীতির পরিচালক নহে, শুধু ইহার যন্ত্র ও পরিচারক মাত্র। দেশের প্রকৃত মূলধন দেশের দ্রব্য-সম্পদ ও গণশক্তি ; আর অর্থ শুধু ঐ সম্পদকে কার্য্যোপযোগী করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট পন্থায় কোন বিশেষ কর্ম্মপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করার উপায়-স্বরূপ। এই বিষয়ে আমরা সংযুক্ত রাজ্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া লাভবান হইতে পারি। যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে তাহাদের সাফল্যমণ্ডিত কার্য্যাবলী বিশ্বের বিস্ময়োৎ-পাদন করিয়াছে। তাহাদের জাতীয় আয় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫০০ কোটি পাউণ্ড হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ৯০০ কোটি পাউণ্ডে বর্দ্ধিত হইতে পারার মূলে আছে—তাহাদের প্রাকৃতিক সম্পদ-রাজিকে পূর্ণরূপে কার্য্যোপযোগী করিয়া তোলা এবং জনগণকে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া রাখা। শ্রমিক-সরকার এই জাতীয় আয়ের শতকরা বিশ ভাগ অর্থাৎ ১৮০ কোটি পাউণ্ড ভারী কলকব্জা, ছোট যন্ত্রপাতি, ইন্‌জিনিয়ারিং কারখানা, বিদ্যুৎ-সরবরাহ এবং শ্রমজীবীদের বাসগৃহ নির্ম্মাণ ও কৃষি বিষয়ক উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন স্থির করিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের শিল্পবিশারদের সংখ্যা যথাসাধ্য বর্দ্ধিত করার জন্যও চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, কৃতবিদ্য বিজ্ঞানীর সংখ্যা বর্ত্তমানের ৫৫০০০ হইতে বাড়াইয়া ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৯০০০০ হাজারে দাঁড় করান হইবে। এতদুদ্দেশ্যে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রতি, যুদ্ধোত্তর কালের প্রথম দশকের ভিতরে সরকারী খরচে শিক্ষা শতকরা ৮০ গুণ সম্প্রসারিত করার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যদি আমরা ভারতবর্ষেও জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ ভাগ উৎপাদনক্ষম প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত করিয়া আমাদের জনগণের পুরাপুরি কাজ যোগাইতে পারি, তাহাদের শিল্প-নৈপুণ্য বিকাশের ব্যবস্থা করিতে পারি এবং ক্রমবর্দ্ধমান পরিমাণে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্ভবপর করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে—একটি প্রাকৃতিক সম্পৎশালী দেশে দরিদ্র লোকের বাস—এই যে আপাতঃ ভ্রমোৎপাদক ব্যাপার আমাদের দেশে ঘটিয়া রহিয়াছে, তাহা আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এইরূপ নির্য্যাতিত, ক্ষুধার্ত্ত, অশিক্ষিত এবং নিঃসহায় জনসাধারণকে একই স্বার্থ ও একই সংস্কৃতির তাগিদে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত, সুখাদ্য-পরিপুষ্ট, শিক্ষিত, আত্মনির্ভরশীল ও ঐশ্বর্য্যশালী এক জাতিতে রূপান্তরিত করাই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তরুণ বন্ধুগণ, আমরা আশা করি, আপনারা যাঁহারা এইবার উপাধিলাভ করিলেন তাঁহারা ঐরূপ লক্ষ্যে পৌঁছি-বার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করিবেন। আমরা ইহাও আশা করি, আমাদের জাতীয় সরকারের নেতৃত্বে ভারতে মানব-প্রকৃতি আত্মপ্রকাশের এক নূতন স্তরে পৌঁছিবে এবং ভাগ্যের কুটিল চক্রে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পিত নিষ্ক্রিয় আত্ম-সন্তুষ্টির পরিবর্ত্তে জনগণের মধ্যে আনন্দ ও উন্নতির জন্য সবল প্রচেষ্টা দেখা দিবে। নবীন শিল্পবিজ্ঞানীরূপে আপ-নারা নিঃসন্দেহে ইহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, শিল্পজগৎ আপনাদের শিল্পজ্ঞান কাজে খাটাইবে। যদি বুদ্ধিমত্তার সহিত চালিত না হয়, তবে আপনাদের কারিগরী নৈপুণ্য শ্রমজীবীর জীবন-বিকাশে কোন কাজেই আসিবে না। আপনারা যে প্রতিষ্ঠানের কার্য্যভার গ্রহণ করি-বেন, তাহার নৈপুণ্য যেরূপ আপনাদের কাম্য, সেইরূপ যে সমস্ত লোক আপনাদের সঙ্গে অথবা আপনাদের অধীনে কাজ করিবে, তাহাদের সুখশান্তিও আপনাদের সবিশেষ বিবেচ্য বিষয় করিয়া লওয়া উচিত। আমার দৃঢ় ধারণা, আপ-নারা সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন, অনুকূল পারিপার্শ্বিকে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কার্য্য মনুষ্যত্ব-বিকাশের সহায়ক। আর চাপ দিয়া যন্ত্রের কাছে আবদ্ধ করিয়া অনিচ্ছায় কাজ আদায় করা একরূপ ক্রীতদাস-চালানোর ব্যাপার।

আমার একান্ত বাসনা, আপনারা এই আদর্শের আলোক-বর্ত্তিকা শিল্প, ব্যবসায় ও শাসন-ব্যাপার-সম্পৃক্ত বাস্তব জগতে বহিয়া লইয়া চলুন। আপনাদের ডিপ্লোমা বিদ্যায়তন দুইটির নিয়মপ্রণালী ও ঐতিহ্য অনুসারে অর্জ্জিত জ্ঞানের চিহ্ন-স্বরূপ। তাহা এই বার্ত্তা বহন করিতেছে যে, এখন আপনারা সেই বিদ্বগুলীর পর্য্যায়ে সমুন্নীত যাঁহারা আপন আপন জ্ঞানের শক্তিকে জগতের মহত্তর কল্যাণ কার্য্যে নিয়োজিত করেন। এই সৃষ্টি-স্পৃহা কিয়ৎপরিমাণে এখন আপনাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। প্রার্থনা করি, আপনারা সানন্দচিত্তে এই সৃজনী প্রতিভা নিজেদের মধ্যে যথাশক্তি বিকশিত করিয়া তুলুন এবং আপনারা আমাদের সুখ ও সমৃদ্ধির অগ্রগতির পথে নেতৃত্ব করুন। যে জগৎ আপনারা গড়িয়া তুলিবেন, সেখানে কর্ম্ম-বিমুখতার পরিবর্ত্তে কর্ম্মপ্রচেষ্টা, অজ্ঞতার পরিবর্ত্তে জ্ঞান, অনৈক্যের পরিবর্ত্তে ঐক্য, ঘৃণার পরিবর্ত্তে প্রীতি বিরাজ করুক। আপনারা নবযুগের কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিয়া চলুন—

প্রভাতের জাগ্রত-জীবন পরমকল্যাণ
যৌবন হিল্লোল আনে ত্রিদিব-সন্ধান।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

চুপ কর্ বীণ্ তার সব গান সুর,
দুঃখের পাপ-দিন আজ ভরপুর
চারদিক ক্রন্দন বন্দন ঘোর
চক্ষের লজ্জায় সন্দন-ঘোর,
একদম ফাঁক তাই ভূতপ্রেত দল,
কর্মের সঙ্গী যে সেই সম্বল।
যাত্রার পথ কই? সৎ চিন্তায়—
আজ সব সংস্কার। সব নিন্দায়
লজ্জায় সব বোধ লাজ শূত
চিন্বার ভেদ্ নাই পাপ পুণ্য
দেশভর তস্কর বঞ্চক-দল,
দিন্‌রাত জন্‌গণ্ মন টলমল।
এর নাম গণরাজ? দুঃখের পুর,
কাব্যের নির্জীব ছন্দের সুর।
লোহের ইঞ্জিন সেই তার প্রাণ,
গণরাজ মৃত্যুর নব সন্ধান।
ভাইবোন সকলই আশ্রয়হীন,
মৃত্যুর পথ সব যায় রাতদিন।
বঞ্চিত জনগণ নিন্দায় ম্লান,
ইজ্জৎ যায় যায় সেই সন্ধান।

এক দিক স্বর্ণের জৌলুষ লাল,
অন্যের দিক সব দীন কঙ্কাল।
চুপচাপ পিকশুক কণ্ঠের গীত
শিল্পীর চিত্তের সেই সম্বিৎ।
চারদিক ধর্ম্মের হিংসার খুন,
সভ্যায় ভক্তেরা গায় মাধবগুণ।
স্বার্থের দাসরাজ নৈতিক দল,
কর্ম্মীর দল সব ঘুস্ চঞ্চল।
হুঁস্ নাই সেই সব লোকদের গায়,
চন্দন দেয় আর বন্দন গায়।
সেই লাজ কুণ্ঠাও ভয় গঞ্জন,
দেবরাজ রোষ-বাজ দাও বজ্রণ।
যত্তায় তত্তায় জয়জয়কার,
বর্ব্বর দন্তের মন্ত্র-গর্জ্জার,
উত্তাল গর্জিতে রোষ গর্জ্জায়,
বিষাদ সজ্জন আজ লজ্জায়—
তাণ্ডব নীচ শির নির্ব্বাক মুখ,
নির্ধন দৈন্যের এই কৌতুক;
চোখ বোজ সব লোক দেখ [illegible],
যায় যায় দীন যায় [illegible]

বিদেশীর চক্ষে হিন্দু দেব-দেবী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

শারদীয়া সমাগত। এ সময় হিন্দু-বাংলা জাতীয় উৎসবে মাতোয়ারা হইয়া উঠে। বস্তুতঃ হিন্দুর দুর্গোৎসব শুদ্ধমাত্র একটি পূজা-উৎসব নয়; ইহার সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিল্পসম্পৃক্ত এত সব বিষয় জড়িত হইয়া আছে যে, ইহাকে আমাদের জাতীয় উৎসব বলা আদৌ অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জন নহে। হিন্দুর দেব-দেবী সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা সময়োপযোগী, স্বাভাবিকও বটে। যে বিষয়টি আবহমান-কাল হিন্দুর জীবন-মূলে রস সঞ্চার করিয়া আসিতেছে, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে সেই পূজা-উৎসব সম্বন্ধে বিদগ্ধ জনের মনেও স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক।

পৌত্তলিক বলিয়া হিন্দু-সমাজের এককালে বিশেষ নিন্দা হইয়াছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে খ্রীষ্টানগণ হিন্দুর দেব-দেবীর উপর অযথা গালিবর্ষণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। এই কার্য্যে যে শুধু খ্রীষ্টান পাদ্রীরাই লিপ্ত হইয়াছিল তাহা নহে, পাদ্রী ব্যতীত পদস্থ সরকারী, বেসরকারী ইংরেজেরাও সমস্বরে ইহার নিন্দাবাদ করিতে লাগিয়া যান। সার চার্লস গ্রাণ্ট, সার উইলবার ফোর্স প্রমুখ মানব-হিতৈষীরাও ইহা হইতে বাদ পড়েন না। তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন দুই-ই তমসাচ্ছন্ন ভারত-বাসীর উদ্ধারের প্রকৃষ্ট পন্থা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন এদেশে রাজ্য-বিস্তারে ও রাজ্য-সংরক্ষণে লিপ্ত। কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত ভাবে যাহাই ভাবুন, তাঁহারা তখন এই উভয় পন্থারই বিরোধী ছিলেন। ভয় পাছে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার এবং ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দরুন ভারতবাসীরা কোম্পানীর শাসনের উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়ে। কোম্পানীর রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহাদের এ প্রকার ভীতির কারণও আর রহিল না। পাদ্রীদের খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রচলনে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ তাঁহারা এ সকল বিষয়ে নানা ভাবে সাহায্যই করিতে থাকেন। ১৮৩৫ সনে বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কর্ত্তৃক ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন সরকারী ভাবে ধার্য্য করায় প্রথম আমলের দ্বিধা-সন্দেহের উপর পূর্ণচ্ছেদ পড়িল।

২

গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই হিন্দু দেব-দেবীর উপর পাদ্রীদের আক্রমণ অতিরিক্ত মাত্রায় আরম্ভ হয়। রামমোহন রায় হিন্দুদের মধ্যে একেশ্বরবাদ প্রচার দ্বারা সমাজে সংহতি স্থাপনের প্রয়াস পাইতেছিলেন। তিনি পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পাদ্রীদের অযথা নিন্দাবাদে তিনিও

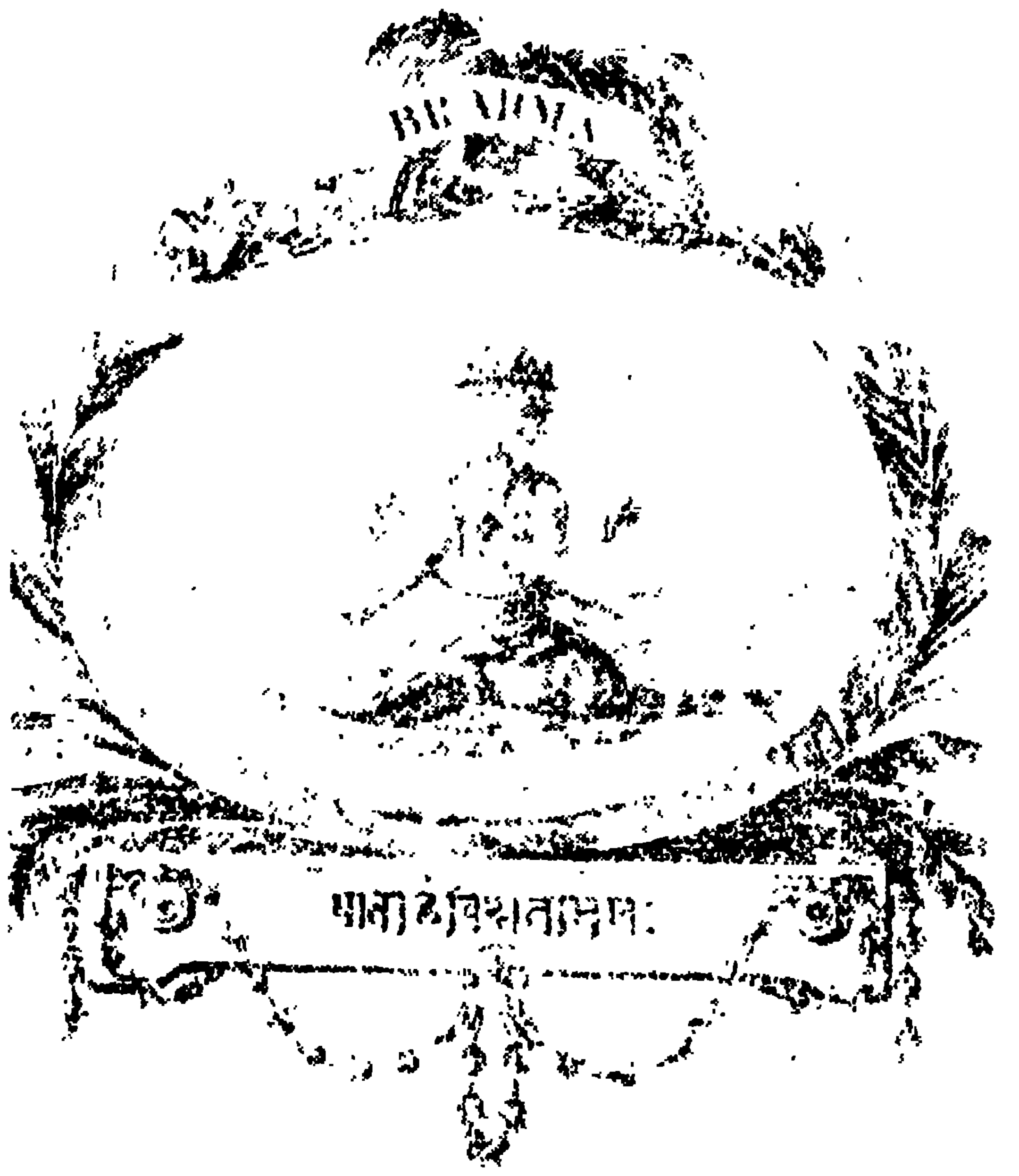

ব্রহ্মা

নীরব থাকিতে পারেন নাই। তিনি পাল্টা খ্রীষ্টানী পৌত্তলিকতার উল্লেখ করিয়া ইহাই বুঝাইয়া দিলেন যে, সমাজে বিগ্রহ-পূজারও স্থান আছে। যাহারা উচ্চতম চিন্তাধারায় অভ্যস্ত হইতে পারে নাই এরূপ সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে বিগ্রহ-অর্চনার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট।

পাদ্রীরা কিন্তু ইহাতে নিরস্ত হইলেন না। তৃতীয় দশকে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফের নেতৃত্বে তাঁহারা পুনরায় হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করিয়া দেন। এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, পাদ্রী ডাফ বাংলাদেশে পদার্পণ করিয়া প্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের নিকট হইতে বিশেষ সহায়তা লাভ করেন। একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁহাকে রামমোহনের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। রামমোহনের বিলাত গমনের পর তৎপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ও এই বিদ্যালয়টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। ডাফ, ডিয়ালট্রি প্রমুখ পাদ্রীরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যে হিন্দুধর্ম তথা হিন্দু দেব-দেবীর পূজার্চ্চনার নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা নব্যশিক্ষিত হিন্দু যুবকগণকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেও প্রয়াসী হইলেন। ক্রমে মফস্বলে গমনান্তর সাধারণ লোকদিগকেও নানা প্রলোভন দেখাইয়া খ্রীষ্টান করিতে তাঁহারা প্রবৃত্ত হন।

৩

পাদ্রীদের এই কার্য্যে প্রধান প্রতিবাদী হইলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের একেশ্বরবাদে গভীর বিশ্বাসী, দেশমধ্যে, বিশেষতঃ স্বদেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রচারকল্পে তিনি বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সকলই মূলতঃ এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও পরিপোষণের উদ্দেশ্যেও এই তিনটি উপায়ের মাধ্যমে কার্য্য চলিতে থাকে। কিন্তু একেশ্বরবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রমুখ পাদ্রীদের হিন্দুধর্ম্মের উপর মিথ্যা আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করিতে বাধ্য হইলেন। ডাফ ১৮৩৫-৩৯ সনের মধ্যে বিলাতে ও আমেরিকায় ধনের সাথে হিন্দুধর্ম্মের উপর গালিবর্ষণ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার এই সকল বক্তৃতা আবার *India and India Missions* নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। দেখিতে দেখিতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণও বাহির হইয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় কয়েকটি প্রবন্ধে ইহার সমুচিত জবাব দিলেন। আবার ডাফ নিজ বিদ্যালয়ে কোমলমতি ছাত্রদের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে অগ্রসর হইলে দেবেন্দ্রনাথ রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী সমাজ-নেতাদের সম্মিলন ঘটাইয়া কিরূপে ইহার প্রতিরোধে অগ্রসর হইয়াছিলেন ঐ সময়কার সামাজিক ইতিহাসে ইহার সম্যক্ পরিচয় মিলিবে।

হিন্দু দেব-দেবী তথা হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ-গ্রাহ্য অংশের উপর এই যে বিদেশীয়, বিশেষ করিয়া ইউরোপীয় পাদ্রীদের আক্রমণ তাহার ফলে সমাজের শিক্ষিত লোকেরাও এ সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনান্তর ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন

বিষ্ণু

তেমন অনুভব করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাই সমাজের গভীরতম প্রদেশের সঙ্গে তাঁহাদের যোগাযোগ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত

ঈশ্বর বা মহেশ্বর

কুবের

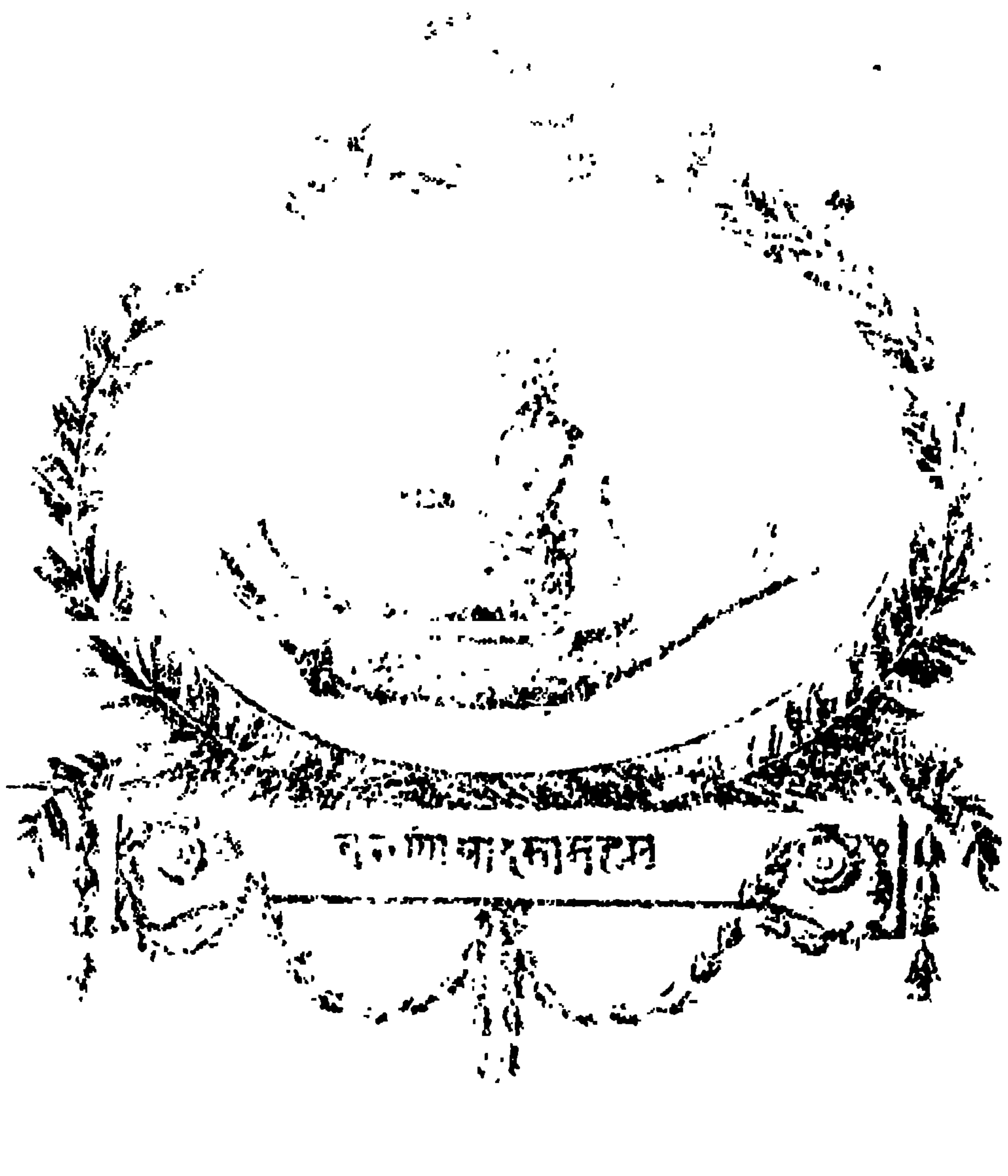

বরুণ

হইতে পারে নাই। বাঙালী-জীবনের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে হইলে যে বস্তু হইতে তাহারা প্রাণরস আহরণ করিতেছে তাহার সহিত আমাদের যোগস্থাপন করিতে হইবে, এবং সহানুভূতি-পূর্ণ হইয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। রাহুমুক্ত হইয়াও আজি আমরা যদি এরূপ আলোচনায় সানন্দে রত না হই তবে আর কবে হইব ?

৪

একটু আগে বলিয়াছি, মানবহিতৈষী ইংরেজগণও হিন্দুদের অধঃপতনের জন্ত দেব-বিগ্রহার্চ্চনাকে সাক্ষাৎ-ভাবে এবং তাহাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের অসদ্ভাবকে পরোক্ষভাবে দায়ী করিতেন। সার উইলিয়ম জোন্‌সও এই শ্রেণীর ইংরেজ ছিলেন। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন এবং এদেশে ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হউক ইহাও কামনা করিতেন। মূর্ত্তিপূজক বলিয়া হিন্দুদের প্রতি কারুণ্যও প্রদর্শন করিয়াছেন। তথাপি মনে হয়, হিন্দুর দেব-দেবী সম্পর্কে নিরপেক্ষ এবং সহানুভূতিপূর্ণ আলোচনায় তিনিই প্রথম অগ্রণী হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদের ভ্রান্তপথগামী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও হিন্দু দেব-দেবীর মহিমা ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নিজ মনোভাব কবিতায় ব্যক্ত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। কামদেব, প্রকৃতি, ইন্দ্র, সূর্য্য, নারায়ণ, গঙ্গা, লক্ষ্মী, ভবানী ও দুর্গার উপরে জোন্‌সের কয়েকটি কবিতা আছে। দুর্গা সম্বন্ধে তাঁহার কবিতাটির শেষ কয়েক পংক্তি এই :

"O, Durga, thou hast deign'd to shield
Man's feeble virtue with celestial might,
Gliding from yon jasper field,
And, on a lion borne, hast brav'd the sight;
For, when the demon Vice thy realms defied,
And arm'd wi h death each arched horn,
Thy golden lance, O Goddess mountain-born,
Touch but the pest He roar'd and died."

কার্ত্তিকেয়

জোন্‌স-কৃত নারায়ণ ও লক্ষ্মীর কবিতাও উচ্চভাব ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সুললিত এবং মনোজ্ঞ। নারায়ণ সম্পর্কে তাঁহার কবিতার শেষাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :

"Blue crystal vault, and elemental fires,
That in the ethereal fluid blaze and breathe;
Thou, tossing main, whose snaky branches wreathe
This pensile orb with intertwisted gyres;
Mountains, whose radiant spires
Presumptuous rear their summits to the skies,
And blend their em'rald hue with sapphire light;
Smooth meads and lawns, that glow with varying dyes
Of dew-bespangled leaves and blossoms bright,

Delusive Pictures! unsubstantial shows!
My soul absorb'd One only Being knows,
Of all perceptions One abundant source,
Whence ev'ry object moment flows:
Suns hence derive their force,
Hence planets learn their course;
But suns and fading worlds I view no more;
God only I perceive; God only I adore."

সার উইলিয়ম জোন্‌স কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের (বর্ত্তমান হাইকোর্টের পূর্ব্বজ) বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই প্রাচ্যবিদ্যা—সংস্কৃত, আরবি, ফারসিতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আগমনান্তর প্রাচ্যবিদ্যা চর্চ্চায় রত অন্যান্য সুধীবর্গের সঙ্গে মিলিত হইয়া ১৭৮৪ সনের ১৫ই জানুয়ারী এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনিও হিন্দুদের বিগ্রহ-পূজার বিরোধী ছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কিরূপে সার্থকভাবে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করিতেন। তিনি উক্ত বৎসরেই "On the Gods of Greece, Italy and India" শীর্ষক গ্রীস, ইটালী এবং ভারতবর্ষের দেব-দেবীর উপরে একটি তুলনামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষে ১৭৮৮ সনে প্রকাশিত *Asiatick Researches* নামক প্রথম পুস্তকখণ্ডে এটি সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে চৌদ্দটি হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিচ্ছবিও প্রদত্ত হইয়াছে। সেকালে দেব-দেবীর যে ধরণের মূর্ত্তি প্রচলিত ছিল তৎসমুদয়ের মধ্যে তাহার ছাপ পড়িলেও ইহা হিন্দু শিল্পী বা মূর্ত্তিকারকের দ্বারা নির্ম্মিত বা খোদিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

এই সকল চিত্রে নাগরী অক্ষরে নির্দ্দিষ্ট দেবতার নামেরও প্রতিলিপি রহিয়াছে। তখন ভারতবর্ষে অক্ষর খোদাই সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। নাথানিয়েল হালহেডের বাংলা ভাষার ব্যাকরণের বাংলা অক্ষরগুলি কোম্পানীর পদস্থ কর্ম্মচারী প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌ সার চার্লস উইলকিন্‌স কর্তৃক খোদাই করা হয়। নাগরী অক্ষরেরও তিনি ছেনি কাটিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক একজন বাঙালীকে এই বিদ্যা শিখাইয়া যান। দেবতার প্রতিচ্ছবির নিম্নে নাগরী অক্ষরে যে সংস্কৃত লিপি রহিয়াছে তাহা সার চার্লস উইলকিন্‌সের খোদাই করা, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

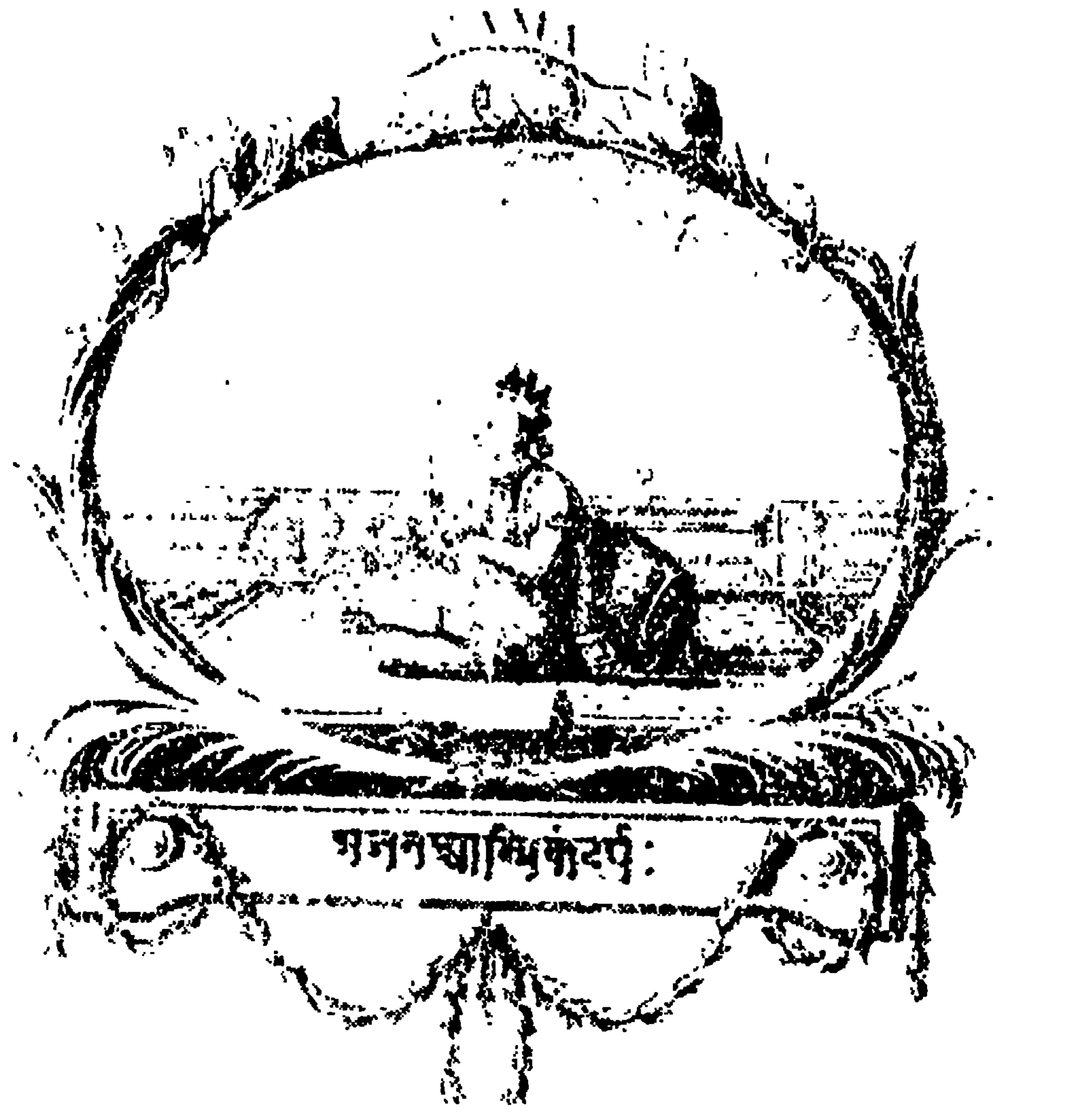

কামদেব

৬

জোন্‌স সাহেব তাঁহার প্রবন্ধে এক একটি হিন্দু দেবতার উল্লেখ করিয়া তদনুরূপ গ্রীক ও ইটালীয় দেবতার উল্লেখ

করিয়াছেন। এই তিনটি দেশের কোথায় আগে কোন্ দেবতা পূজিত হইতেন তাহার কাল-নির্দ্দেশের মধ্যে তিনি যান নাই। প্রত্যেকটি দেশের দেবতার সাধারণ গুণ বা ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া সাম্য বা বৈষম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি আলোচ্য প্রবন্ধে যে-সব হিন্দু দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন এখানে তাহার প্রত্যেকটিরই উল্লেখের প্রয়োজন নাই, মাত্র কয়েকটির পরিচিতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। প্রবন্ধোক্ত ক্রম অনুযায়ী এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।—

গণেশ : প্রথমেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশের কথা জোন্স বলিয়াছেন। গণেশ রোমান দেবতা জেনাসের সমতুল। হিন্দুর সকল যাগযজ্ঞ,

গণেশ

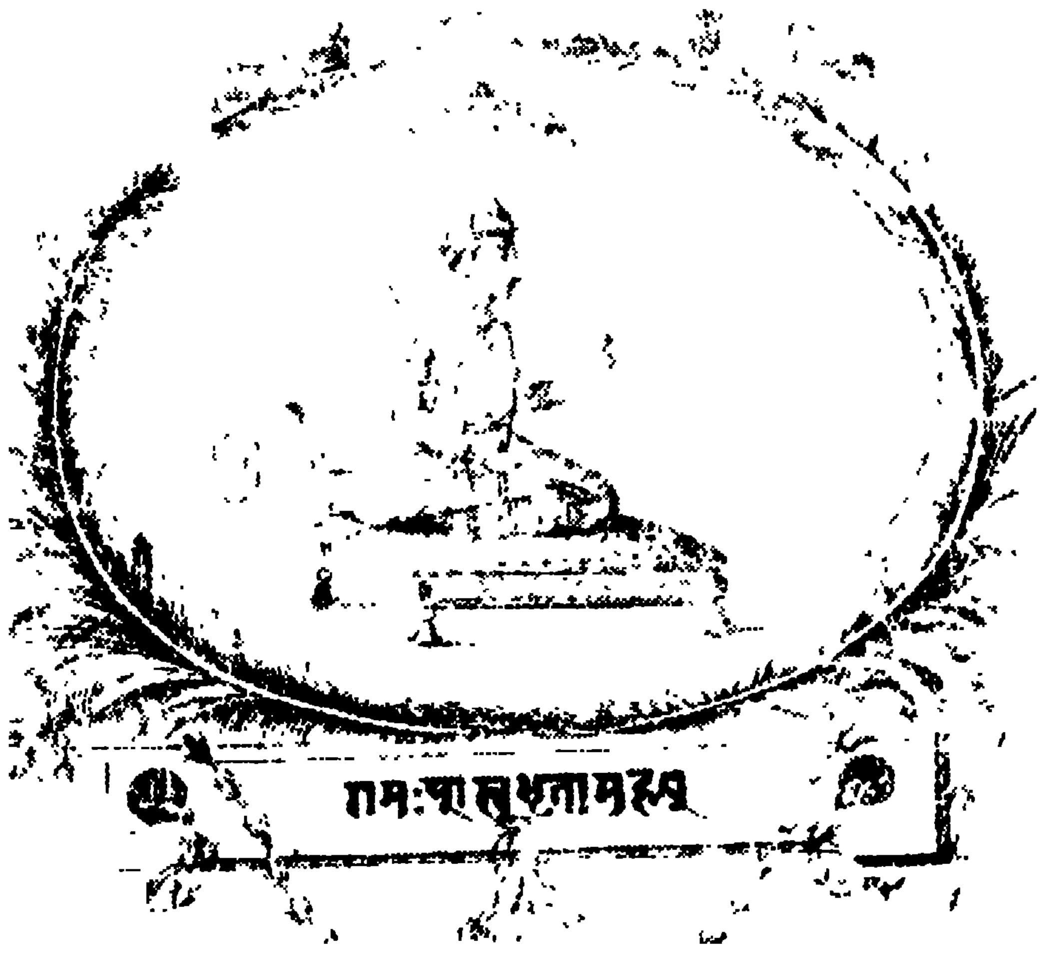

রাম

কৃষ্ণ

পূজা-পার্ব্বণে সর্ব্বাগ্রে গণেশকে আবাহন করিতে হয়। যাবতীয় ঐহিক কর্ম্মের আরম্ভেও গণেশের নামোল্লেখ এবং পূজার্চ্চনা প্রশস্ত। "গণেশায় নমঃ" এই উক্তি-দ্বারা গ্রন্থরচনা সুরু করা বিধেয়। দাক্ষিণাত্যে গণেশ 'গণপতি' নামে প্রসিদ্ধ। গণপতি-উৎসব সেখানকার জাতীয় উৎসব। গণেশ বা গণপতি-পন্থীরা সমাজে 'গাণপত্য' আখ্যা লাভ করিয়াছে।

ইন্দ্র : ইহার পর ইন্দ্র সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ইন্দ্রের মধ্যে রোমান দেবতা জুপিটারের গুণাবলী কিছু কিছু বিদ্যমান। ইন্দ্র স্বর্গের রাজা, শচী তাঁহার সহধর্ম্মিণী। অমরাপুরী বা অমরাবতী তাঁহার রাজধানী। প্রাসাদের নাম বৈজয়ন্ত, প্রমোদ-উদ্যান—নন্দনকানন। তাঁহার ঐরাবত হস্তী, সারথি মাতলি, অস্ত্র বজ্র। ইন্দ্র বায়ু এবং বৃষ্টির দেবতা। তিনি অপরিসীম শক্তির অধিকারী।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ঈশ্বর বা মহেশ্বর : ইন্দ্র শক্তিশালী হইলেও এই তিন জন দেবতার শক্তির নিকট কিছুই নহেন। জিউসের সঙ্গে ইঁহাদের সাদৃশ্য আছে। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—এই তিন জন যথাক্রমে এই তিনটি গুণের অধিকারী। প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বদ্ধ। এইজন্য ইঁহাদের বলা হয়—একে তিন, তিনে এক। এক কথায় ব্রহ্মা সৃজনকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং ঈশ্বর বা মহেশ্বর ধ্বংসকর্ত্তা; অর্থাৎ, অন্যায়ের

সূর্য্য

নারদ

ধ্বংস করিয়া তাহার স্থলে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি সদা নিরত। একারণ ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টি বা গঠনকার্য্যও নিহিত রহিয়াছে। ঈশ্বর বা মহেশ্বরকে গ্রীক দেবতা 'জোভ'-এর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। তিনি ব্রহ্মাপ্রদত্ত অস্ত্রে দৈত্য-নিধনে লিপ্ত। তাঁহার আবাসস্থল কৈলাস পর্ব্বত। তিনি ত্রিলোচন, পত্নী দুর্গা, উমা বা হৈমবতী। তাঁহার বাহন শ্বেত ষাঁড়—সৃষ্টির চিহ্ন। 'ত্রিশূল' তাঁহার নিত্যসঙ্গী।

বরুণ : জলের দেবতা। রোমান প্রতিরূপ 'নেপচুন'। মহেশ্বর এবং দুর্গার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ। দুর্গোৎসব অন্তে দেবী জলে বিসর্জ্জিতা হন। জলের অন্য নাম জীবন। কাজেই জলের দেবতা মানুষের জীবন রক্ষা করেন। পদ-মর্য্যাদায় মহেশ্বর, এমন কি ইন্দ্রেরও নীচে তাঁহার স্থান।

কার্ত্তিকেয় : শিবপত্নী দুর্গার বহু নাম। পার্ব্বতী নামেও তিনি আখ্যাত। রোমান দেবতা 'জুনো'র গুণাবলী তাঁহার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার সঙ্গে পুত্র ষড়ানন কার্ত্তিকেয় নিত্য বিরাজমান। কার্ত্তিকেয়ের বাহন ময়ূর। কার্ত্তিকেয় রোমান দেবতা 'মার্সাস'-এর সমগুণসম্পন্ন। তিনি দেব-সেনাপতি। পুরাণে 'স্কন্দ' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাই পারসিক 'স্কন্দ' বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। তবে তাঁহাকে ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজাণ্ডার বলিয়া যে অনেকে মনে করেন তাহা একেবারেই ভ্রমাত্মক।

গঙ্গা : নদীর জলে দেবতা বিসর্জ্জন হিন্দুর পূজা-উৎসবের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। হিন্দুর নিকট তিনটি নদী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পবিত্র ও পূজ্য—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। তিনটি নদী প্রয়াগে যে স্থানে মিলিত হইয়াছে তাহার নাম ত্রিবেণী বা ত্রিবেণীসঙ্গম। ঐ স্থানে সরস্বতী নদীর চিহ্নমাত্র নাই। সাধারণের বিশ্বাস—এখানকার সরস্বতী লুপ্ত হইয়া সঙ্গোপনে হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। এ কারণ ঐ স্থানটিরও এই নাম।

রাম ও কৃষ্ণ : ভগবানের দুই অবতার। রামের কীর্ত্তি-কথা রামায়ণে বর্ণিত। কৃষ্ণের পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকী। বৃন্দাবন এবং মথুরা তাঁহার বাল্য ও কৈশোরের লীলাভূমি। ভারত-যুদ্ধকালে তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন মহা-ভারতে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়।

সূর্য্য : গ্রীক দেবতা এপোলো'র সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য বিদ্যমান। তিনি অশ্ব-রথে আরোহণপূর্ব্বক নানা দিক পরিক্রমা করেন। তাঁহার অশ্বিনীকুমার দুই যমজ সন্তান। চন্দ্র ঈশ্বরের আর একটি বিকাশ এবং পুরুষ-সন্তান। হিন্দুদের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে উদ্ভূত বলিয়া কোন কোন রাজ বংশ যথাক্রমে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ বলিয়া কথিত হয়।

নারদ : ব্রহ্মার মানস পুত্র। রোমান দেবতা 'মার্কারী' বা গ্রীক-দেবতা 'হার্মিস'-এর অনুরূপ। সন্ধি-বিগ্রহে নারদ সুচতুর রাজনীতিক। সর্ব্বদা দৌত্য-কার্য্যে তিনি লিপ্ত। তিনি খুব উঁচুদরের সঙ্গীতজ্ঞ এবং বীণা-যন্ত্রের উদ্ভাবক। তিনি বীণা-সংযোগে সঙ্গীত দ্বারা ত্রিভুবন বিমোহিত করেন।

এ সকল ব্যতীত কামদেব, কালী, নারায়ণ, লক্ষ্মী

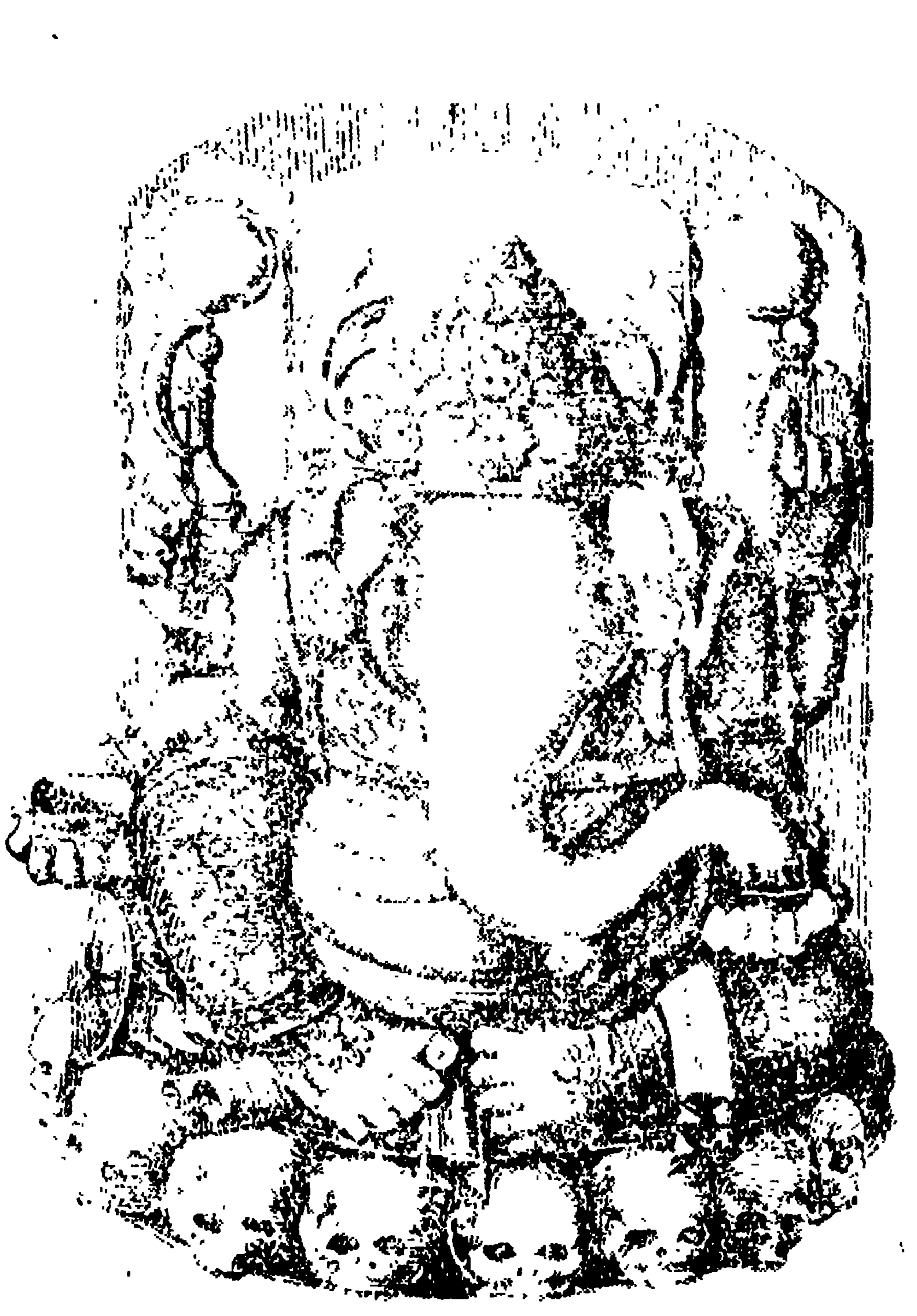

নরমুণ্ডোপরি গণেশ—নবদ্বীপ

প্রভৃতি সম্বন্ধেও জোন্‌স আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে ধরণের আলোচনার পথ মাত্র দেখাইয়াছেন সে সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যানের বিশেষ অবকাশ রহিয়াছে। কোন কোন বাঙালী মনীষীও খণ্ডশ: হিন্দু দেব-দেবীর সম্বন্ধে আলোচনায় ইতিপূর্ব্বে রত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

৭

জোন্‌স কর্ত্তৃক দেব-দেবী সম্পর্কিত আলোচনার নির্দ্দেশ-মাত্র এখানে দেওয়া হইল। কিন্তু তিনি ইহার উপসংহারে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন এখানে তাহার উল্লেখ করাও কর্ত্তব্য। তাঁহার আলোচনা নিরপেক্ষ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সহানুভূতি-ব্যঞ্জক হইলেও তিনিও খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোকে হিন্দুদের অনুপ্রাণিত করাইতে প্রয়াসী ছিলেন। পূর্ব্বে ইহার আভাস আমরা পাইয়াছি। প্রবন্ধ-শেষে তিনি হিন্দু এবং মুসলমানদের কি ভাবে খ্রীষ্টধর্ম্মানুরাগী করা যায় তদ্বিষয়ে নিজ মত ব্যক্ত করেন। ইসলাম ধর্ম্মের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্মের অনেকটা মিল থাকায়, মুসলমানদের খ্রীষ্টান হওয়া সম্পর্কে তিনি বিশেষ আশা পোষণ করিতে পারেন নাই। তবে হিন্দুদের সম্পর্কে তিনি নিরাশ ছিলেন না। তিনি লিখিয়াছেন—হিন্দুরা বলেন, ঈশ্বর এক, বিভিন্ন দেবতার মধ্যে তাঁহারই পূজা হয়। যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে যে দেবতারই পূজা করুন না কেন, তিনি ঈশ্বরেরই সান্নিধ্যলাভ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু তাঁহারা 'গস্‌পেলে'র সঙ্গে হিন্দু শাস্ত্রের সাদৃশ্যের কথাও বলেন। ঈশ্বরের অবতার বহু, তন্মধ্যে যীশুখ্রীষ্ট একটি।

বলা বাহুল্য, জোন্‌স এরূপ উক্তি সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে কোন মিশনরী বা পাদ্রী সম্প্রদায় দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে। এদেশীয় সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় 'মেসায়া' বা মানব-পরিত্রাতা যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব সম্পর্কে যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছে, তৎসম্বলিত পুস্তক রচিত ও প্রচারিত হইলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে। এতৎসত্ত্বেও যদি সাফল্যলাভ না করা যায় তাহা হইলে কুসংস্কার এবং মতিভ্রমতারই আধিপত্যের জন্য ক্ষোভপ্রকাশ করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করণীয় থাকিবে না। ("We could only lament more than ever the strength of prejudice and the weakness of unassisted reason".)

মহিষমর্দ্দিনী—নবদ্বীপ

জোন্‌স হিন্দু দেব-দেবীর বিষয় আলোচনা করিতে গিয়াও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তথাপি হিন্দু দেব-দেবী সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত তুলনামূলক আলোচনার পথ-প্রদর্শক বলিয়া তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

কবিগুরু গ্যেটের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী

কাজী আবদুল ওদুদ

সুদীর্ঘ আয়ু গ্যেটের লাভ হয়েছিল। তাঁর সাহিত্যিক জীবন হয়েছিল যেমন দীর্ঘ তেমনি সমৃদ্ধ। কিন্তু এই দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ সাহিত্যিক জীবনে জাতির নিরবচ্ছিন্ন সমাদর তাঁর লাভ হয় নি। তাঁর তিরোধানের পরে বহু বৎসর পর্য্যন্ত জাতির অন্তরের পূজালাভ হয় তাঁর নয়, তাঁর বন্ধু শিলারের। তাঁর একালের ইংরেজ চরিতকার রবার্টসন বলেন : ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো-প্রুসীয় যুদ্ধের পরে তাঁর জাতি তাঁর প্রতিভার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাঁরসৃষ্ট সাহিত্য তাঁর স্বদেশে বিপুল ভাবে আলোচিত হয়। কিন্তু তা হলেও এ ব্যাপারটি দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে, তাঁর চিন্তা ও সাধনা আর তাঁর জাতির চিন্তা ও সাধনা প্রায় পরস্পর-বিরোধী হয়েছে। উগ্র জাতীয়তা সম্বন্ধে সুবিখ্যাত তাঁর এই উক্তি :

মোটের উপর বিজাতি বিদ্বেষ এক অদ্ভুত ব্যাপার। যেখানে চিত্তোৎকর্ষের যত অল্পতা সেখানে এর তীব্রতা তত বেশী। কিন্তু চিত্তোৎকর্ষের এমন স্তর আছে যেখানে এর সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে, ফলে অনুভাবকের স্থান লাভ হয় অনেকটা জাতীয়তার উর্দ্ধে, প্রতিবেশী জাতির দুঃখবিপত্তি তখন তার মনে হয় স্বজাতির দুঃখবিপত্তির মত।

কিন্তু উগ্র জাতীয়তা বহু সদ্‌গুণসম্পন্ন জার্ম্মান জাতির অবলম্বন হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতেই, আর বিংশ শতাব্দীতে তার পরিণতি যা হয়েছে তা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু শুধু জার্ম্মানী কেন, উগ্র জাতীয়তা, অন্য কথায় রক্তপিপাসু সংগ্রামমুখিতা, একালে মানুষের সমাজে ব্যাপকভাবে সক্রিয় হয়েছে—রাষ্ট্র, বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দল, সবারই সাধারণ পরিচয়-চিহ্ন হয়েছে এখন 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব—একথা বলা যেতে পারে। অবশ্য এ পথের ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে দেবার মত মনীষী একালে খুব কম জন্মগ্রহণ করেন নি। ইউরোপের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল জাতির এবং মানুষের প্রতি এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে লাঞ্ছিতও হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জগতের প্রায় প্রতি জ্ঞান-কেন্দ্রে বর্ত্তমান সভ্যতার এই সঙ্কট সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন। আর মহাত্মা গান্ধী অহিংসা ও মৈত্রীর যে সম্ভাবনার ছবি জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা মূর্ত্ত করে গেছেন মানুষের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরেই লেখা থাকবে। কিন্তু তবু একথা অনস্বীকার্য্য যে, আজ মানুষের সাধারণ গতি অপ্রেম আর সংঘর্ষের দিকেই।

এই পরিবেশে উন্মাদনায় নিরানন্দ, ক্ষুদ্র-মহৎ পাপী-পুণ্যাত্মা নির্ব্বিশেষে মানুষের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি, বিপ্লবে নয় অতন্দ্রিত প্রয়াসে ও বিকাশে আস্থাবান গ্যেটের প্রতি এ যুগের মানুষ, অর্থাৎ এ যুগের শিক্ষিত মানুষ, কোন্ দৃষ্টিতে তাকাবে? বহুবার বহু শক্তিধর তাঁর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছেন এই বলে যে তিনি প্রতিভাবান্ হলেও বুর্জ্জোয়া—সুখী দলের। আজকার প্রধানদেরও কি তাঁর সম্বন্ধে তাই-ই বক্তব্য হবে? মনে হয়, তেমন নিঃশঙ্ক সিদ্ধান্তের পথে একালে এই বাধা উপস্থিত হয়েছে যে, 'উন্মাদনা', 'বিপ্লব' এ সবের দ্বারা ভাল যা সম্ভবপর তার সীমা আজ যেন মানুষ দেখতে পেয়েছে—দেখতে পেয়েছে, উন্মাদনা আর বিপ্লব থেকে সংঘবদ্ধ হবার ক্ষমতা মানুষের মন্দ লাভ হয় না, বহুর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা যা সম্ভবপর হয় তাও প্রশংসনীয়, কিন্তু এই সব ভালর সঙ্গে মন্দ এই ঘটে যে ব্যক্তির স্বাধীনতা পায় লোপ, সাহিত্য, ইতিহাস হয়ে ওঠে শেখানো বুলি—বলা বাহুল্য এমন মন্দ ভয়াবহ মন্দ।

একালের ব্যাপক হানাহানি ও বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে এই একটি বড় সত্য অবশ্য মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে যে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও মহৎ সম্ভাবনায় সব মানুষের অধিকার, জগতে নিরন্ন ও কর্ম্মহীন কেউ থাকতে পারে না। মূলত এ অতি প্রাচীন সত্য, প্রাচীন কালের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনেতারা ও মনীষীরা এ সত্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ত্রুটি করেন নি, নিজেদের জীবনে এর যোগ্য দৃষ্টান্ত তাঁরা রেখে গেছেন। কিন্তু প্রাচীন সত্য হলেও এর যথাযোগ্য স্বীকৃতির দিকে মানুষের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করবার গৌরব একালেরই। অষ্টাদশ শতাব্দীর নব-মানবিকতা প্রচারের সময় থেকে এই একালের আরম্ভ বলা যেতে পারে।

গ্যেটের ঐতিহাসিক মর্য্যাদা সাধারণত এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মানবিকতার এক ব্যাপক দৃষ্টান্ত হিসাবে। কিন্তু তাঁর সেই মানবিকতায় এমন সম্পদ আছে যার দিকে মানুষের দৃষ্টি তেমন আকৃষ্ট হয়েছে মনে হয় না, হলে তারা হয়ত এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হ'ত যে একালে মানবিকতার যে পর্য্যাপ্ত স্বীকৃতি লাভ হয়েছে গ্যেটেতে তার প্রাথমিক পরিচয় মাত্র নয় বরং এক পরম সার্থক বিকাশ—আজও যা অশেষ অর্থপূর্ণ। ভুলভ্রান্তি ও অক্ষমতাপূর্ণ মানুষের দিকে গ্যেটের দৃষ্টি শুধু ক্ষমাশীল ও সহানুভূতিশীল নয়, গভীর ভাবে শ্রদ্ধাশীল—মানুষ দেবতার অংশ এমন কোনো ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে নয়, কোন মানুষই সম্ভাবনাহীন নয়—এই চেতনা থেকে। এরই গুণে তরুণ বয়সে মানব-চরিত্রের কদর্য্যতার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত হলেও মানব-দ্বেষ অথবা সংস্কারকের অসহিষ্ণুতা তাতে দেখা দেয় নি; এরই গুণে বহুল পরিমাণে জাতির অনাদর পেয়েও অতি সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে এমন ধারণা পোষণ করতে তাঁর বাধে নি যে, এই উপেক্ষিত সাধারণ "সংযম, সন্তোষ, ঋজুতা, বিশ্বাস, সামান্য সাফল্যলাভে উৎফুল্লতা, সরলতা, অনন্ত কষ্টসহিষ্ণুতা" প্রভৃতি গুণের জন্য "ভগবানের সৃষ্টিতে যেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

সাধারণের প্রতি কারুণ্য নয় শ্রদ্ধা, আর উন্মাদনায় ও হিংস্রতায় অনাস্থা—গ্যেটের মানবিকতার এই দুই শ্রেষ্ঠ নির্দ্দেশ একালের সভ্যতার সঙ্কটে মানুষের পরম আশ্রয় হবারই যোগ্য।

২৮ আগষ্ট, ১৯৪৯।

বঙ্গভাষা ও রাষ্ট্রভাষা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

[illegible] বাংলার জীবনে জোয়ার আসিয়াছে। বঙ্গভঙ্গের বেদনায় বাঙালী মর্মাহত। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে সারা বাংলা তরঙ্গায়িত। সে তরঙ্গ ভারতের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। বাংলার কবি গাহিলেন,

> বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
> বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
> সত্য হউক, সত্য হউক,
> সত্য হউক, হে ভগবান।

রবীন্দ্রনাথের আশা কি সার্থক হইয়াছে? বাঙালীর ভাষা কি তাহার সত্তা বিস্তীর্ণ করিয়া, উপযুক্ত আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, সত্য হইয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে?

গণপরিষদে প্রস্তাবরূপে এখনও পর্য্যন্ত গৃহীত না হইলেও রাষ্ট্রভাষার সমস্যা আত্যন্তিক উত্তেজনা, উষ্মা, আবেগ এবং বিতর্কের মধ্য দিয়া আসিয়া বর্ত্তমানে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে।— দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দীভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদালাভ করিবে বটে, তবে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের প্রথম পনের বৎসর ইংরেজীই রাজকার্য্য পরিচালনার ভাষা থাকিবে, সেই সঙ্গে প্রয়োজন হইলে হিন্দীও ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

বাধ্য হইয়া হিন্দীভাষা-ব্যবহারের আতঙ্ক পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতের অন্তরে একটা দারুণ দুঃস্বপ্নের মতই চাপিয়াছিল, পঞ্চদশ বর্ষের অবকাশ বুকের উপর এই অপ্রার্থিত বোঝার গুরুভারকে সাময়িকভাবে কতকটা লঘু করিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্যই কি নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইলাম?

হিন্দী যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইল। পনের বৎসর পরে [illegible] তাহারই হইবে।

[illegible] উঠিবার পূর্ব্বে আকাশ-বাতাস বাষ্পতঃ শান্ত থাকে। [illegible] মধ্যে সমস্তাটিকে পুনর্ব্বিচার করা যাক।

১

[illegible] জাতীয় ভাষা নামে অভিহিত করা হয়। [illegible] প্রদেশের মধ্যে ভাববিনিময়ের জন্য একটি [illegible] ভাষা না থাকিলে রাষ্ট্রের গৌরব থাকে না, তাবৎ [illegible] ইংরেজীতে কাজ চলিতেছিল, কিন্তু [illegible] জাতীয় ভাষার প্রয়োজন। [illegible] কথা। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে [illegible] চলিতেছেন। হিন্দী-প্রচারের [illegible] দেখাইতেছেন। [illegible]

কালে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করি। সতের সাল [illegible] সেই সূত্র ধরিয়া ১৩৪৫ সালের আষাঢ় মাসের "প্রবাসী[illegible]" একটি প্রবন্ধ লিখি। আজ দেখিতেছি, তখনও [illegible] এখনও তেমনি জাতীয় ভাষা সম্বন্ধে নেতা ও পণ্ডিত[illegible] ও ধারণার মধ্যে একটা অস্পষ্টতা রহিয়াছে। সেই[illegible] লিখিয়াছিলাম।—

"রাষ্ট্রভাষার ইংরেজী নামকরণ হইয়াছে 'ন্যাশ[illegible] ল্যাঙ্গোয়েজ'। রাষ্ট্র ও নেশন এক কি? নেশন কি? [illegible] বা কি?

পূর্ব্বপুরুষ অভিন্ন বলিয়া যাহাদের ধারণা, ধর্ম্ম ও ইতিহা[illegible] এক, এবং সেই ঐক্যবোধের ফলে যাহাদের আচার ও [illegible] সাম্য ঘটিয়াছে, এমন একভাষাভাষী বহুতর মানবের [illegible] 'জাতি' বা people বলা চলে।

বহুসংখ্যক মানব যদি এক দেশে অবস্থান করে, [illegible] তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় [illegible] সাধারণ কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই একদেশবাসী মানব[illegible] 'রাষ্ট্র' বা state নামে অভিহিত করিতে পারা যায়।

রাষ্ট্রে একটি মাত্র জাতি থাকা সম্ভব, আবার বহু [illegible] সম্মিলনেও রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে। ফরাসী রাষ্ট্রে [illegible] জাতি। রুষ-রাষ্ট্রে বহু জাতি। যেখানে এক জাতি [illegible] এক ভাষা। যেখানে বহু জাতি সেখানে বহু ভাষা। একজাতিত্ব এবং একভাষিত্ব রাষ্ট্রের লক্ষণ নহে। রাষ্ট্রে [illegible] জাতি এবং বহু ভাষার স্থান আছে। 'পীপ্‌লে'র সহিত [illegible] হইলেও আজকাল 'নেশন' শব্দটি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত [illegible] রাষ্ট্রগত জাতি বা জাতিসমষ্টিকে নেশন বলিলে বিরো[illegible] হইবে না। ভারতবর্ষে বহু জাতি-বর্ণ বাস করে। [illegible] যদি পরতন্ত্র না হইত তাহা হইলে বহুজাতিত্ব বা [illegible] হেতু তাহার একরাষ্ট্র হইতে বাধা ছিল না। একজা[illegible] বাহিক নিমিত্তমাত্র, অপরিহার্য্য গুণ নহে, [illegible] নেশন গঠিত হয়।

তাহা হইলে রাষ্ট্রভাষা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য কি?

লক্ষ্যের স্থিরতা থাকা চাই, উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা থাকা [illegible] তাহা আছে কি? ভাবী রাষ্ট্রের কার্য্যনির্ব্বাহ-ব্যাপারে [illegible] ভাষা প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে, না দেশের [illegible] মধ্যে বাক্যালাপের সুবিধার জন্য এই ভাষার [illegible] অর্থাৎ ইহা রাষ্ট্রের ভাষা হইবে, না জনসাধারণের ভাষা [illegible]

[illegible]

ভাষা। চিন্তাজগতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ সেই ভাষা হইবে তাহার বাহন। সে ভাষায় বাক্য ও অর্থের গৌরব থাকা চাই।

যাহা সাধারণের ভাষা তাহার ধর্ম্ম সুবোধ্যতা। তাহার মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা হইবার যোগ্যতা না থাকিতেও পারে। তাহা বাজারের ভাষা হইলেও চলে। তাহার মধ্যে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু আশা করিবার প্রয়োজন নাই।

হিন্দীভাষা-প্রচলনের উদ্দেশ্যের মধ্যে এইরূপ একটি অস্পষ্টতা আছে।...রাষ্ট্রের কার্য্যসৌকর্য্যার্থে ভাষার ব্যবহার এক কথা, সাধারণের বোধগম্য ভাষার প্রচলন আর এক কথা।"*

২

দারুণ দুর্দৈবের বশে ভারতবর্ষ আজ বিভক্ত। তবুও ভারতবর্ষ অখণ্ড, অবিভাজ্য, এক, সমগ্রতার সুষমায় সমঞ্জসীভূত।

এ কথা জানি। ভারতবর্ষের অপূর্ব্ব ঐক্যকে অন্তর দিয়া মানি।

ঐক্যকে মানি। তাই বলিয়া এই প্রকাণ্ড ভারতবর্ষের বিপুল বৈচিত্র্যকে লঘুভাবে অস্বীকার করিব কি করিয়া? চত্বারিংশ কোটি মানবের নিবাস মহাদেশপ্রায় এই বিশাল ভারতবর্ষ একটি রহস্যময় সংস্কৃতির সূত্রে বিধৃত। ছয় সহস্র বর্ষের ঐতিহ্যের উপর সে সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সিন্ধু-সভ্যতার ধারা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষা। তখনও ছিল, এখনও আছে। মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, শৌরসেনী প্রভৃতি বহু লৌকিক ভাষা দেশের বিভিন্ন বিভাগে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আজও বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, কানাড়ী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষা প্রদেশে প্রদেশে প্রচলিত। এ সকল ভাষায় লোকে কথা কহে। ইহাদের সাহিত্যও আছে। তন্মধ্যে দু-একটি ভাষায় সাহিত্য কোন কোন পাশ্চাত্য জাতির সাহিত্যের সমতুল্য, কোন কোন বিষয়ে হয়ত শ্রেষ্ঠ।

ইহা বাস্তব সত্য। রাজনৈতিক ভাবনার বশে এই তথ্যকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই।

ভারতভূমি এক ও বহুবিস্তৃত। এক দেশ, এক ভাষা এবং এক বর্ণের দ্বারা বিধৃত হইলে তাহা শুধু আনন্দদায়ক নয়, অভূতপূর্ব্ব হইত। সেই এক এবং অবিচ্ছিন্ন ভাষার অতুলনীয় বিস্তৃতি হইত পৃথিবীর বিস্ময়। যাহা হয় নাই এবং যাহা হইবার নয় তাহা লইয়া পরিতাপের প্রয়োজন নাই।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের ন্যায় তাহার ভাষার বহুলতা প্রকৃতির দান। প্রকৃতির বিপর্য্যয় না ঘটিলে ভাষার বিপর্য্যয় ঘটিবে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শক্তির অপচয়। যাহা স্বাভাবিক তাহাকে অতিক্রম করিয়া অস্বাভাবিকের পশ্চাদ্ধাবন মরীচিকার পিছনে ছোটার মতই অসঙ্গত। কৃত্রিম ভাষার প্রচলনে ভাষার বহুত্ব কমিবে না। রাজনৈতিক মস্তিষ্কপ্রসূত হিন্দুস্থানী বা হিন্দী ভাষা স্বাভাবিকভাবে সমুদ্ভূত নয়। কৃত্রিম বলিয়াই তাহা পরিহার্য্য।

৩

সত্য কথা বলিতে গেলে রাশিয়া-বর্জ্জিত ইউরোপ একটি অখণ্ড দেশ। খণ্ড ইউরোপকে এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। যদি সে প্রয়াস সার্থক হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতের সেই অখণ্ড ইউরোপের রূপ কি হইবে, কে জানে? ভাষাই বা কি হইবে? তাহা কি ইংরেজী, তাহা কি ফরাসী, তাহা কি জার্ম্মান? তাহা কি ইতালীয়? তাহা ত সম্ভবপর নয়। সেই মহা-ইউরোপীয় রাষ্ট্রে মহাদেশভুক্ত সব দেশের ভাষাই রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা লাভ না করিলে মিলন বিরোধে পর্য্যবসিত হইবে।

ভারতবর্ষও ভবিষ্যতের সেই অখণ্ড ইউরোপের মত এক বৃহৎ দেশ—মহাদেশ না-ই বলিলাম। ভবিষ্যতের সেই মহা-মিলনের কল্পনা বর্ত্তমান ভারতবর্ষের পক্ষেও প্রযোজ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এক জাতি, এক ধর্ম্ম, এক রাষ্ট্র, এক ভাষার স্বপ্ন দেখিতাম। তখনকার দিনে সে স্বপ্নের সার্থকতা ছিল। সে স্বপ্ন সেদিন সত্য ছিল বলিয়াই আমাদের প্রাণে প্রেরণা জোগাইয়াছে। তখন আমরা ভাবিতাম আমরাও বুঝি ইংরেজ বা ফরাসীর মত সম-উপাদানে গঠিত একটি জাতি। জাতির মধ্যে বিষম-উপকরণের কথা তখন আমরা ভাবি নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ন্যাশন্যালিজ্‌ম্ বা জাতীয়তার মাপকাঠি দিয়া আজিকার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ঐক্য এবং একরাষ্ট্রত্ব পরিমিত হইতে পারে না। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই আজিকার মিলনের মূলসূত্র। ইহাই বর্ত্তমানের ফেডারেলিজ্‌ম্। আমেরিকার শতকরা আশি জন এংলো-স্যাক্সন। কাজেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবে প্রভাবিত হইয়া সেখানে এক ধরণের ফেডারেশন সম্ভবপর হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দী নূতনতর পরীক্ষার যুগ। অতীতে অপরিচিত নানা নূতন ভাব এবং নূতন প্রশ্নে আজিকার জীবন সমস্যা-সঙ্কুল। ভবিষ্যতের যে ইঙ্গিত আমরা পাইতেছি তাহারই আভাসে আজিকার নীতি নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

এক জাতি, এক ধর্ম্মের স্বপ্ন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে ভাঙিয়া গিয়াছে। প্রাদেশিক জীবনের সত্তা একান্তভাবে পিষ্ট করিয়া,

* প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫৫: লেখক রচিত 'বঙ্গভাষা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে একত্রে তালগোল পাকাইয়া, একটিমাত্র ভাষাকে রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ভাষায় পরিণত করিবার চেষ্টা আজ না হয় না-ই করিলাম। আজ আমরা দেহের পরিমাপে পায়ের জামা তৈরি না করিয়া, জামার কাপড়ের পরিমাপে দেহকে সঙ্কুচিত করিবার অসম্ভব আয়োজনে লাগিয়া গিয়াছি। সুইজারল্যাণ্ডের মত ছোট দেশেও তিন ভাষায় রাষ্ট্রের কাজ চলে; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ হিন্দী ভাষার মধ্যে আমাদের বিরাট ভারতবর্ষকে পুরিতে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভূদেব, রাজনারায়ণ অথবা কেশবচন্দ্র যদি হিন্দীর কথা বলিয়াই থাকেন তখনকার অবস্থায় সে যুক্তির হয়ত কতকটা সারবত্তা ছিল। আজ সে অবস্থাও নাই, সে মনোভাবও নাই। হিন্দী সে যুগ হইতে খুব বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই, সাহিত্য সম্পর্কে বাংলা আজ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা।

৪

হিন্দী মনোভাব যাঁহাদের পাইয়া বসিয়াছে তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষের যেখানে যাও দেখিবে হিন্দী না জানিলে মুশকিলে পড়িতে হইবে। দিল্লী আগ্রা বেড়াইতে যাও দেখিবে হিন্দী ছাড়া চলে না, পঞ্জাবে যাও দেখিবে তাদা হিন্দীতে কাজ চলিয়া যাইবে। তাঁহাদের ধারণা উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষই যেন সমগ্র ভারতবর্ষ। বিশাল ভারতবর্ষের দক্ষিণ অর্দ্ধাংশ, পূর্ব্বেও ভারতবর্ষ আছে।

হিন্দীও আঞ্চলিক ভাষা, বাংলাও আঞ্চলিক ভাষা। এক আঞ্চলিক ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে আর এক আঞ্চলিক ভাষার অগ্রাধিকার অস্বীকার করিলাম। হিন্দীও সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা নয়, বাংলাও নয়, তামিলও নয়। শতকরা বিশ জন হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয় না, শতকরা ত্রিশ জন হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় না। ইহা শুধু বিশ-ত্রিশের প্রভেদ, এই আধিক্য নিতান্তই আপেক্ষিক। অর্দ্ধাংশের উপর অর্থাৎ শতকরা ষাট হইলে, এমন কি পঞ্চান্ন হইলেও, সংখ্যাগুরুত্বের দাবী করা চলে। প্রচারের দ্বারা অভিভূত আমরা ত্রিশকে সংখ্যাগুরু বলিয়া ধরিলাম, বিশ-পঁচিশকে তাহাদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিলাম।

জহরলাল বলিয়াছেন, হিন্দী জনপ্রিয় ভাষা—popular language। যাহা জনপ্রিয় তাহাকে সাধারণের ভাষা, common language অথবা lingua franca করা চলে, রাষ্ট্রভাষা নয়। যে ভাষা সর্ব্বোত্তম এবং মহত্তম তাহাই বরণীয়, তাহাই রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্য। স্বাধীনতা যখন পাই নাই, তখন পরীক্ষা করা চলিত। আজ পরীক্ষার দিন বিগত। দশ বা পনের বৎসরের চেষ্টায় পর হিন্দীকে রাজাসন প্রদান করা হইবে। ভাষার মধ্যে যে রাণী তাহাকে বঞ্চিত করিব কেন? অকারণ সময়ক্ষেপ কেন? দশ বা পনের বৎসরে অত প্রদেশ বাংলা শিখিয়া লইতে পারে। শতকরা সত্তর বা পঁচাত্তর জনকে যদি হিন্দী শেখানো চলে, শতকরা আশী জনকে বর্ত্তমানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা বাংলা শেখানো চলিবে না কেন? উত্তর-ভারতে হিন্দী চলে, উর্দ্দু চলে। দক্ষিণ-ভারতে পূর্ব্ব-ভারতে তাহারা বোধ্য নয়, গ্রাহ্য নয়, জনপ্রিয় নয়। এক অঞ্চলের জনপ্রিয়তা অন্য অঞ্চল সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

হিন্দী বা হিন্দুস্থানী একটি কৃত্রিম ভাষা, বিহার হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত লোকেরা কোনরূপে বুঝিতে পারে এমন একটি তৈরি-করা ভাষা। কাহারও জন্মলব্ধ নয়, ইহা প্রস্তুত ভাষা। ইহাকে কোন বিশেষ অঞ্চলের ভাষা বলা চলে না। ইহা লেখ্য ভাষা, কথ্য নয়। দিল্লী বা লক্ষ্ণৌর অধিবাসী বারাণসী বা পাটনার অধিবাসীর মত কথা কহে না। অমৃতসরের অধিবাসী ভিন্নরূপ কথা বলে। ইহা বাংলার মত অখণ্ড ভাষা নয়। অতএব যাহা মূলতঃ লেখ্য ভাষা সেই হিন্দী-ভাষীর সংখ্যা নয় কোটি বা দশ কোটি ইহার অর্থ হয় না। এবং শতকরা ত্রিশ জনের ভাষা অতএব ইহা ভারতের সাধারণ ভাষা এই কথা বলিয়া লোকের উপর হিন্দী চাপানো চলে না। যাহা সাধারণ ভাষা, জাতীয় ভাষা বা lingua franca তাহা impose করা যায় না। সাধারণভাষা-গ্রহণ ব্যাপারটি সময়সাপেক্ষ। পারস্পরিক ভাববিনিময়ের সুবিধার জন্যই সাধারণ ভাষা। তাহা বাজারের ভাষা। রাষ্ট্রের কার্য্য পরিচালনার্থ যে ভাষার প্রয়োজন তাহা হইবে সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মক্ষম এবং সম্পদশালী।

৫

বলিয়াছি, ভারতবর্ষ বিচিত্র হইয়াও এক। নানা খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত হইয়াও প্রাচীন ভারতবর্ষ এক ঐক্যসূত্রে বিধৃত ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি সমগ্রতা ছিল। রাজা যেখানে রাজত্ব করুক বা যে-ই রাজা হোক, একরূপ বিধি, একরূপ বিধান, একরূপ শাস্ত্রানুশাসনে সকলকে চলিতে হইত। ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত লোকে তীর্থযাত্রা করিত। রাজ্যভেদে ধর্ম্মস্থানের প্রভেদ ছিল না। প্রাকৃত-জনে প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিত। তৎসত্ত্বেও সুদূরে তীর্থযাত্রা আটকাইত না, প্রবাসে ভাব-বিনিময়ের বাধা ঘটিত না। সর্ব্বত্র কিন্তু সকলেই সংস্কৃতে মন্ত্র পড়িত। রাজ-সভায় মন্ত্রণাপরিষদে রাজা এবং সভাসদেরা, বিদ্বৎসভায় পরিব্রাজক ও পণ্ডিতেরা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক ও ছাত্রেরা সংস্কৃতে কথা কহিত। সংস্কৃত ছিল স্মৃতির ভাষা, পুরাণেতিহাসের ভাষা, দর্শনের ভাষা, বিজ্ঞানের ভাষা, সাহিত্যের ভাষা। সংস্কৃত ছিল সংস্কৃতির ভাষা। এবং সংস্কৃতির ভাষা বলিয়াই সে সমস্ত খণ্ডত্ব অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

৬

এই সংস্কৃত ভাষার উত্তরাধিকারী কে ?

ভাষার নিরিখ সাহিত্যে। সংস্কৃত সাহিত্য এত বিচিত্র, এমন ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়াই সংস্কৃত ভাষা এত নৈপুণ্য, এত যোগ্যতা লাভ করিয়াছে।

সুষ্ঠু প্রকাশের জন্যই ভাষা। যাহাতে পূর্ণ অভিব্যক্তি নাই সে ভাষা নিরর্থক। ভাষার অভিব্যক্তি সাহিত্যে। লোকগণনার দ্বারা নয়, সাহিত্যের দ্বারা আমরা ভাষার মূল্য নির্ণয় করি।

অভিধানের মধ্যে সব কথাই পাওয়া যায়। সেখানে শব্দগুলি স্থাণু, নিশ্চল। সাহিত্যে শব্দরাশি গতিশীল হয়। প্রতিভা সাহিত্যকে জীবন্ত করে। প্রতিভাবানের স্পর্শে শব্দ সচল, প্রাণবান, আবেগবান হয়। ভাষার অন্তর্নিহিত বিরাট সম্ভাবনাকে প্রতিভা সার্থক করে।

অতএব সাহিত্যের বিচারেই ভাষার বিচার করিব। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর চসারের প্রতিভা বহু dialect-এ বিভক্ত ইংরেজীকে এক করিল। তাঁহার ভাষাই ইংরেজী ভাষা বলিয়া গৃহীত হইল। দান্তের ভাষা সমগ্র ইটালীর ভাষা হইয়া উঠিল। হাই-জার্ম্মান লো-জার্ম্মানের প্রভেদ ঘুচাইয়া গ্যেটের ভাষা জার্ম্মাণীর ভাষা বলিয়া গণ্য হইল।

সোনারূপার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। কিন্তু টাঁকশালের ছাপই তাহার মুদ্রামূল্য নির্দ্ধারিত করে। টাঁকশালের ছাপ পাইয়া ধাতু হয় প্রচলিত মুদ্রা—current coin। প্রতিভার ছাপ পাইয়া ভাষাও তেমনি current language হইয়া উঠে।

বাংলা ভাষার উপর প্রতিভার রাজকীয় ছাপ পড়িয়াছে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—এমনি বহুতর প্রতিভার স্পর্শে বাংলাসাহিত্য উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময়। সে আজ তাই পৃথিবীর অন্যতম প্রচলিত ভাষা।

ভাষার মাপকাঠি প্রয়োগে, ব্যবহারে। জীবনযাত্রার যত বিভাগ আছে সাহিত্যেও তত শ্রেণীবিভাগ। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, আইন, বিচারব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ক্রীড়া, অভিনয়, শিক্ষা, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি—এ সকলেরই প্রকাশ সাহিত্যে। সাহিত্য ভাষাগত। বাংলাভাষা জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য!

শতাধিক বর্ষ ধরিয়া আমরা ইংরেজীর চর্চ্চা করিয়া আসিতেছি। এই ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন। জীবিকা-নির্ব্বাহের ভাষাও ইংরেজী। সেদিনের সংস্কৃতের মত জ্ঞানার্জ্জনের ভাষা আজ ইংরেজী। এই ভাষার মধ্য দিয়াই আমরা বিশ্বের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছি।

এক দিকে বঙ্গভাষা ইংরেজীর প্রাণশক্তি, প্রকাশ-কুশলতা, সাবলীলতা ও বৈচিত্র্যের অধিকারী হইয়াছে, আর এক দিকে সংস্কৃতের মহিমা, ভাবগৌরব, শব্দের অজস্রতা, শব্দগঠনের কৌশল, মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সে উত্তরাধিকারী। এই দুই সাহিত্যের সংস্পর্শে বঙ্গ-সাহিত্য ও ভাষা প্রাণবান, প্রবহমাণ, বেগবান, বর্দ্ধনশীল, বিবর্ত্তনশীল, গ্রহণপটু, শোভাময়, বৈচিত্র্যপূর্ণ, নবনবরূপোল্লাসিত, এবং জগৎ ও জীবনের সর্ব্ব-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইয়া উঠিয়াছে।

একদিন সংস্কৃত ছিল সংস্কৃতির ভাষা। ফার্সী সংস্কৃতকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। সংস্কৃতের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল ইংরেজী। এক বাংলা ছাড়া ইংরেজীর স্থান কে-ই বা গ্রহণ করিতে পারে ?

শতাধিক বর্ষের অক্লান্ত সাধনায় যে বঙ্গসাহিত্য জগৎসভায় স্থান পাইয়াছে সেই সাহিত্যের ভাষা কি ভারত-সভায় স্থান পাইবে না ?

৭

সে দিন লিখিয়াছিলাম—

"হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইতে চায়। স্পর্দ্ধার কথা বটে। স্বাধীন ভারতবর্ষে সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা ছিল। একদা মৃত্তিকাপ্রোথিত, অতীতের অপূর্ব্ব নিদর্শন, সুবর্ণখচিত এক সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিয়া তদুপরি আরোহণের উপক্রম করিলে ভোজরাজকে দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা বার বার প্রশ্ন করিয়াছিল—তাঁহার যোগ্যতা কি ? ভোজরাজ যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য রূপী বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনে বসিবার যোগ্যতা যদি কাহারও থাকে তাহা বাংলার। অন্যের নাম না-ই করিলাম—বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যে সাহিত্য কালিদাসের কাব্যে, ভাস-ভবভূতির রচনায়, পাণিনি ভাস্করাচার্য্যের তথ্যবিচারে ঐশ্বর্য্যশালী, সেই গৌরবময় সংস্কৃত সাহিত্যের অবিসম্বাদিত উত্তরাধিকারী একমাত্র বাংলা সাহিত্য।"*

সে দিন গর্ব্ব ছিল। আজ ভাবিতেছি, আমার সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবিয়া গেল। বিক্রমাদিত্যের শূন্য সিংহাসন সত্যই যে আজ ভোজরাজ দখল করিয়া বসিল। বাংলার শত বর্ষের সাধনা সার্থক হইল কই ?

৮

আজ দেশের একটা অংশকে হিন্দী মানসিকতায় পাইয়া বসিয়াছে। যাহা প্রতিভার দ্বারা লব্ধ হইল না, প্রচারকার্য্য ও দলবদ্ধতার সাহায্যে, কূট-কৌশলের বলে তাহা লাভ করিবার বণিকবুদ্ধিকেই আমি হিন্দী মানসিকতা আখ্যা দিতেছি। একদা যে বুদ্ধিতে কংগ্রেস-যন্ত্রটিকে আয়ত্তে আনিতে ইহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, সেই বুদ্ধি বিস্তার করিয়াই ইহারা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার আসনে বসাইতে চায়। হিন্দী মানসিকতা হইতে মুক্ত না হইলে জীবন ও রাজনীতি নির্ম্মল হইবে না। ভাষা ও সাহিত্য জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

---

* "রাষ্ট্রভাষা", প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫৫।

বলিয়াছি, সাহিত্যের মূল্যেই ভাষার মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। ভাষার উপকরণে আমরা সাহিত্যের প্রতিমা গড়ি। প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে প্রতিভা।

কাহার রচনা দিয়া আমরা হিন্দী সাহিত্যের পরিমাপ করিব? প্রেমচাঁদের কথা শোনা যায়। প্রেমচাঁদ বাংলার বর্ত্তমান বহু লেখকের অপেক্ষা বড় নয়।

বিতর্কে তুলসীদাসের নাম প্রায়ই উচ্চারিত হয়। তুলসীদাস নমস্ত। কিন্তু তুলসীর রামচরিত লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে প্রচলিত আওয়াধি ভাষায় রচিত। সে হিন্দী আমাদের পরিচিত হিন্দী নয়। তা ছাড়া অতীতের দ্বারা বর্ত্তমানের পরিমাপ সম্ভব হইলে কৃত্তিবাস বা চণ্ডীদাসের মাপকাঠিতে আমরা বাংলা ভাষার পরিমাণ করিতে বসিতাম। চণ্ডীদাসকে দিয়া বাংলার, বিদ্যাপতিকে দিয়া মৈথিলের, তুকারামকে দিয়া মারাঠির, তিরুবল্লুবরকে দিয়া তামিলের পরিমাণ করিতে যাওয়া, তুলসীদাসকে দিয়া হিন্দী ভাষার মূল্য নির্ণয় করিতে যাওয়ার মতই বিচিত্র ব্যাপার।

কাব্য ভাষার প্রাণপ্রাবল্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। গদ্য প্রয়োজনের ভাষা, ব্যবহারের ভাষা, প্রাত্যহিকতার ভাষা। কোন ভাষা কতটা কর্ম্মক্ষম, তাহার নির্দ্দিষ্টতা, স্পষ্টতা, তাহার প্রকাশ-শক্তির পরিচয় গদ্যেই পাওয়া যায়।

বহু প্রতিভাবান লেখকের সাধনার ফলে শতবর্ষের মধ্যে বাংলা গদ্য যে-কোন শ্রেষ্ঠ ভাষার গদ্যের সমতুল্য হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দী গদ্যে কাহার সাধনাকে আমরা অভিনন্দিত করিব?

৯

মাতৃস্তন্যের সহিত আমরা মাতৃভাষা পান করিয়াছি। দেশের মাটির রসে আমাদের দেহ এবং ভাষার রসে আমাদের মন পুষ্ট হইয়াছে। অবতর ভাষার সে শক্তি থাকে না, থাকিতে পারে না। জীবনের সহিত বিযুক্ত যে ভাষা তাহা নির্জ্জীব, বলহীন। শক্তিহীন ভাষা জাতিকে শক্তিহীন করে। বলহীনের দ্বারা জাতীয় চরিতার্থতা লভ্য নয়।

মাতৃভাষার মধ্যে যে প্রাণস্পর্শ লাভ করি শেখা-ভাষার মধ্যে সে প্রাণস্পর্শ পাই না বলিয়া তাহা সাধারণতঃ সাহিত্যে রূপান্তরিত হয় না। হিন্দী যদি রাষ্ট্রের ভাষাই হয় তবুও তাহা বাহিরের ভাষাই থাকিয়া যাইবে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা।

ইংরেজীতে 'হ্যাণ্ডিক্যাপ' বলিয়া একটি কথা আছে। ঘোড়দৌড়ে নিকৃষ্টতর অশ্বগুলি অসমপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাহাতে একান্তভাবে পরাজিত না হয় এই উদ্দেশ্যে তেজস্বী ও দ্রুতগামী ঘোড়াগুলির পিঠে আনুপাতিক ভার চাপাইয়া দেওয়া হয়। Handicapped বাঙ্গালীকেও এইরূপ হিন্দী রাষ্ট্রভাষার বোঝা বহন করিয়া রাজকার্য্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে।

যে সাহিত্য মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত গড়িয়া তুলিল তাহা রূপে রসে, ভাবে ভঙ্গিমায়, সামর্থ্যে কৌশলে, সৌষ্ঠবে নৈপুণ্যে অনুপম। সে সাহিত্য ভারতবর্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ভারতবর্ষের অধিদেবতা ভারতীর করকমলে আমরা এই ভাষা ও এই সাহিত্য, এই অস্ত্র ও এই বীণা তুলিয়া দিয়াছি। ভারতবর্ষের জনসাধারণ যদি সেই অপূর্ব্বঝঙ্কৃত বীণাধ্বনি শুনিতে বিরত হয়, যদি তাহারা সেই অসাধারণ শক্তিশালী বজ্র ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাহা হইলে বলিব তাহা ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য। বলিব, হায়রে দুর্ভাগা দেশ, শতবর্ষের সার্থক সাধনাকে তুচ্ছ করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিলে; অসীম ঐশ্বর্য্যকে পায়ে ঠেলিয়া, হে দরিদ্র, তুমি নিজেকে চিরবঞ্চিত করিলে। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সাধনার পরিচয় বঙ্গ-সাহিত্যে নিবদ্ধ।

১০

বাংলা শুধু রসসাহিত্যে সমৃদ্ধ নয়, জ্ঞান-সাহিত্যেও সে গরীয়ান। পাশ্চাত্যের অমিত্রাক্ষরকে যেমন সে অবলীলাক্রমে আপন করিয়া লইয়াছে, ম্যাক্সওয়েলের ভূতকেও সে তেমনি অনায়াসে আয়ত্ত করিয়াছে। ঋগ্বেদের অনুবাদ, রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ, ষড়দর্শনের ব্যাখ্যা ও আলোচনা, উপনিষদ্‌গুলির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, সংস্কৃত কাব্য ও নাটকসমূহের অনুবাদ বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। দার্শনিক গবেষণা, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, নৃতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা, বৈদিক ও পৌরাণিক অনুসন্ধান—বঙ্গসাহিত্যকে গরিমাময় করিয়াছে। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ধর্ম্মবাণী তাহার সম্পদ। বঙ্গভাষায় প্রবন্ধ-সাহিত্যের তুলনা নাই।

১১

বাঙ্গালার মত এমন ভাষাপ্রীতি কাহারও নাই। তাহার মনে দেশপ্রেম ও ভাষাপ্রেম একই সঙ্গে জড়াইয়া আছে। যে যুগে নিধু গুপ্ত বলিয়াছেন,"বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা।" শতবর্ষ পূর্ব্বে ঈশ্বরগুপ্ত মাতৃভাষার বন্দনা করিয়াছেন,

"মাতৃসম মাতৃভাষা পূরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে।"

কবি মধুসূদন বিদেশীর মোহমুক্ত হইয়া বঙ্গভাষাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,

"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?"

আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, বাংলা সাহিত্যে বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা একই জননীমূর্ত্তি রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন,

"জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ, চাহি না মান,
যদি তুমি দাও, তোমার ও-দুটি অমল কমল-চরণে স্থান।"

১২

দেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যাহা আবদ্ধ তাহাই প্রকৃত প্রাদেশিক। বাংলার বাতায়ন বাহিরে খোলা, বিশ্বের অভিমুখে তাহার দ্বার মুক্ত, বিশ্বের ভাব-কল্পনার মধ্যে তাহার প্রসার। যাহা দেশের গণ্ডী পার হইয়া পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাব-কল্পনার মধ্যে প্রসারিত হইয়া পড়ে নাই, হিন্দীই হোক বা হিন্দুস্থানীই হোক তাহাই সত্যকার প্রাদেশিক। বাংলা বিশ্ব-ভাষার অন্যতম। বিশ্বসভায় যাহার আসন ভারতসভায় তাহার স্বীকৃতি নাই কেন?

কবি কামিনী রায়ের একটি কবিতা আছে, তাহার নাম "পাছে লোকে কিছু বলে।" আজ বাংলাদেশকে "পাছে লোকে কিছু বলে"-র ভীরুতায় পাইয়া বসিয়াছে। পাছে লোকে প্রাদেশিক বা প্রান্তিক বলে এই ভয়ে যাহা সত্য বলিয়া অন্তরে অনুভব করিতেছি তাহাও ব্যক্ত করিতে সন্ত্রস্ত হই। একদা বাংলাদেশ একেলা চলিতে ভয় পায় নাই। "যদি আর কেউ না আসে, একলা চল, একলা চল, একলা চল রে।" আজ আমরা সেই উপলব্ধির দৃঢ়তা, অনুভূতিসঞ্জাত সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছি। সকলের পুরোবর্ত্তী হইয়া বুকের উপর অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়া ভারতবর্ষের পতাকা আমরাই বহন করিয়াছি। আজ স্বাধীনতার মন্দিরদ্বারে আসিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিয়া দেশ-জননীর পূজা করিলে পাছে লোকে প্রাদেশিক মনে করে এই আশঙ্কায় আমরা কম্পিত। হিন্দীভাষীরা রাষ্ট্রভাষার আসনে হিন্দীকে বসাইবার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের চেষ্টাকে অন্য পরে কা কথা বাঙালী বিদ্বানেরাও প্রাদেশিক নামে আখ্যা দিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। অথচ যে ভাষা শ্রেষ্ঠ, যে ভাষা জগৎসভায় বরেণ্য, যে ভাষা সংস্কৃতের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে সংখ্যাহীন শব্দরাশি গ্রহণ করিয়াছে, সন্ধি-সমাসে, কৃৎ-তদ্ধিতে শব্দের নব নব রূপ দিয়াছে, ফার্সী আরবী হিন্দী দ্রাবিড় ইংরেজী হইতে শব্দগ্রহণ করিতে যে ভাষা এতটুকু দ্বিধা করে নাই, যে ভাষা শুধু সংস্কৃতের নয় ইংরেজী ফরাসী ও রুষ সাহিত্যের বহু আধুনিক গ্রন্থের অনুবাদ, আলোচনা ও পরিচয়ে সমৃদ্ধ, সেই সুপরীক্ষিত ভাষা, পাছে লোকে কিছু বলে এই ভয়ে, রাষ্ট্রভাষা হোক এই কথা বলিতে ভয় পাই।

'জয় হিন্দ' বলিয়া পাড়ি দিলে দিল্লী দূর না হইতেও পারে, কিন্তু জাতীয় চরিতার্থতায় সে পথ পৌঁছিবে না। উৎকৃষ্ট ত্যাগ করিয়া আমরা নিকৃষ্ট গ্রহণ করিব না। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে আজ বীর নাই। কেহ বুক ফুলাইয়া সাহস করিয়া প্রবলকণ্ঠে বাংলার দাবী জানাইতে পারিল না।

আমি যাহা এতক্ষণ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা এই। সাধারণ ভাষা বা জাতীয় ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা পৃথক বস্তু। ভারতবর্ষ বহুর মধ্য দিয়া এক। এই বিশাল দেশে সুইজারল্যাণ্ড, কানাডা বা রুষরাষ্ট্রের মত একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা করিলে চলে। রাজনৈতিক কারণে নয়, ভাষার অন্তর্নিহিত গুণের জন্য রাশিয়ায় রুষভাষা প্রবল। যাহাকে মেজরিটি বলে হিন্দী সেরূপ সংখ্যাধিকের ভাষা নয়। সাহিত্য দিয়া ভাষা পরিমিত হয়। হিন্দীতে প্রতিভার আবির্ভাব হয় নাই। বঙ্গভাষায় হইয়াছে। সে-ই সংস্কৃতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। বঙ্গভাষা জ্ঞান-সাহিত্যে সমৃদ্ধ। অতএব রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্য।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, উভয়েই সমান দোষে দোষী। মাতৃভাষাকে শ্রেষ্ঠ জানিয়াও রাষ্ট্রভাষার আসন দাবী করিতে যে বিরত থাকে সে অন্যায় করে। সে মাতৃভাষাদ্রোহী। মাতৃভাষাদ্রোহিতা শুধু অপরাধ নয়, তাহা পাপ। অবহেলা ও উদাসীনতার বশে আমরা যে পাপ করিলাম আমাদের উত্তরপুরুষকে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অগ্রণী বাংলা যখন সকলের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইবে, রাষ্ট্রে যখন হিন্দীভাষীরা সহজ আধিপত্য লাভ করিবে, আবেদন অনুযোগ ও অনুতাপ ছাড়া যখন আমাদের আর কোন উপায় থাকিবে না, তখন এই পাপের জ্বালা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিব। হেলায় মাতৃভাষাকে তাহার ন্যায্য আসন হইতে বঞ্চিত করিলাম। তিথি অনুকূল ছিল, সে তিথি বহিয়া গেল। অলীক জাতীয়তার অন্ধমোহে বাংলা ভাষাকে দূরে সরাইয়া দিলাম। যাহাকে বিদায় দিলাম নয়নজলেও তাহাকে আর ফিরাইতে পারা যাইবে না। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে ইহা ঘটিত না। উদ্যোগী হইলে বাংলাকে তাহার ন্যায্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতাম। রাষ্ট্রের শ্বেতশতদলে বঙ্গবাণীর আসন করিয়া লইতে পারিলে আমরা লক্ষ্মীও লাভ করিতে পারিতাম। আমরা উদ্যোগী নই, পুরুষসিংহ নই। ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পুরুষসিংহেরা অন্তর্হিত হইয়াছে। সিংহের গর্জ্জন আর শোনা যায় না। দেশ মূর্চ্ছিত। জীবন-মরণের প্রশ্নেও বঙ্গসাহিত্যের ঘুমন্ত পুরীতে আজ সাড়া জাগে না।

আমি জানি, হয়ত অরণ্যে রোদন করিতেছি। কিন্তু জানি, সে অরণ্য জনারণ্য। কোটি কোটি বঙ্গভাষীর রুদ্ধবেদনায় তাহা আজ স্তব্ধ। একদিন এই ভাষাহীন, মূক, মূর্চ্ছিত অরণ্য জাগিয়া উঠিবে। ঝড়ের ঝঙ্কারের সঙ্গে রুদ্ধরোষ অরণ্যের গর্জ্জন মিলিয়া প্রলয়-কলরোল সৃষ্টি করিবে। অরণ্যের জাগরণের প্রতীক্ষা করিয়া আছি।*

---

* রবি-বাসরে পঠিত।

সতী

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বিমলা হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে।

খবরের কাগজে ফলাও করে সংবাদ দিয়েছে :

—রাত্রির অন্ধকারে পঞ্চবিংশতি বর্ষ-বয়স্কা বিচারাধীন যুবতীর সরকারী হাসপাতালের আশ্রয় হইতে পলায়ন।—

এই খবরের উপর সম্পাদকীয়ও লিখেছে কোন কোন সম্পাদক। জাতীয় চরিত্রের ক্রমবর্দ্ধমান অধঃপতন নিয়ে ভাল ভাল কথার মালা গেঁথেছে তারা। আপনারাও পড়েছেন সকলে। এ সংবাদ কারও নজর এড়িয়ে যাবার নয়। আপিসের টিফিন রুমে, রেস্তোরাঁয়, ট্রামে, বাসে বিমলাকে নিয়ে অনেক মুখরোচক আলোচনা আপনারা করেছেন জানি। কিন্তু খবরের কাগজের সংবাদ, হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষের বিবৃতি আর পুলিস কোর্টের নথিপত্রের কাহিনীতে চাপা পড়ে গেছে যে ইতিহাস, তাকেই আপনারা একেবারে গালগল্প বলে উড়িয়ে দেবেন। দিন উড়িয়ে, তবু সেই ইতিহাস বলছি, শুনুন।

বাগেরহাট লাইট রেলওয়ের একটি ছোট্ট ষ্টেশন। ষ্টেশনের কাছে বসে শুধু সপ্তাহের হাট। লোকজনের বসতি বিরল সেখানে। আসল গ্রামটি হ'ল নদীর ওপারে। নদী বলতে অবশ্য মাত্র কয়েক হাত চওড়া একটা খাল। লগি দিয়ে ঠেললে খেয়ানৌকা এপার থেকে ওপারে গিয়ে ঠেকবে।

নদীর পাড় থেকে বাড়ীর পথটা খুব বেশী নয়। তবু একটা লোক নিতে হ'ল হেমন্তর, সঙ্গে তার বিস্তর মাল-পত্র। প্রায় দু'তিন মাস দক্ষিণের সেই লোনা অঞ্চলে কাটিয়ে আসতে হয়েছে তাকে। কি বছরই ধান কাটবার সময় যেতে হয়, নইলে ন্যায্য পাওনা আদায় করা যায় না। এবারে ধান ফলেছে ভাল। পিছনে আসছে নৌকা-বোঝাই ধান। বাড়ীতে রয়েছে বড় ভাই বসন্ত। সে ত কুঁড়ের বাদশা। ধান ওঠাবার ব্যবস্থা করতে তাড়াতাড়ি তাই তাকে বাড়ীতে আসতে হয়েছে।

বিমলার বিয়ে হয়েছে সাত বছর। ছেলেমেয়ে হয় নি তার। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ সে-ই আছে বাড়ীতে। কাজকর্ম্ম সবই তাকে দেখতে হয়। ধান এলে প্রায় সবটাই ঝেড়ে-পুছে গোলায় তুলতে হবে তাকে। শাশুড়ী বুড়োমানুষ, বড় বউয়ের ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। বড় বউ রোগের আড্ড। বিছানায় পড়েই আছে।

বাড়ীতে এসেই হেমন্ত ক্ষেপে গেল। গলা সপ্তমে চড়িয়ে বললে, ধান ত এসে গেল বলে, উঠানে গোবর পড়ে নি কেন এখনও?

ভাইয়ের মূর্ত্তি দেখে বসন্ত সুড় সুড় করে পালিয়ে গেল।

বড় বউ কাতরাতে লাগল।

হেমন্তর মা বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে বললে, বলি ও ছোট বৌ, উঠানটা এখনও নিকোতে পার নি—কোন কাজই কি তুমি তাড়াতাড়ি করতে পার না বাছা?

এতদিন এসেছে এ বাড়ীতে, কিন্তু ওদের ধরণ ধারণ বুঝতে পারে না বিমলা। সেই সকাল থেকেই শাশুড়ী বক বক সুরু করেছে : কাল বাড়ীতে পাঁচটা লোক খাবে। শেষে লজ্জায় পড়তে হবে সবাইকে। চাল বাটা হ'ল না এখনও, পিঠে হবে কিসে।

সেই চালই বাটতে বসেছিল বিমলা। একা আর কদিক সামলায়। সব কাজই করতে হবে তাকে অথচ সে যেন হয়েছে সকলের চোখের বিষ। বড় বউয়ের সাত মাসে সন্তান নষ্ট হ'ল। সবাই বললে—নতুন বউ অলক্ষুণে। সেবার অজন্মা হ'ল, তাও নাকি তার দোষে। বাছুর ম'ল একটা, গালাগাল খেল বিমলা। শুধু বিমলাই নয়, তার বাপ, মা, তাদের চৌদ্দ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করলে এরা।

হেমন্তর কথার উত্তরে একটু রেগেই বললে বিমলা : ধান ত এখনও আসে নি। দিচ্ছি দু' মিনিটে গোবর লেপে।

মিষ্টি করে কথা বলতে শেখে নাই হেমন্ত। মুখটা বিকৃত করে বললে : তবেই হয়েছে আর কি। দু'মিনিটে আমার পিণ্ডি গেলাও হবে না; অলক্ষ্মী—বুঝেছ মা, অলক্ষ্মী ভর করেছে আমাকে।

উঠান ঝাঁট দিতে নিজেই লেগে গেল হেমন্ত।

শেষ পর্য্যন্ত বিমলাই কিন্তু উঠান নিকাল। ধান এলে ঝাড়পোছ করলে। কিন্তু বদনাম ছাড়া প্রশংসা জুটল না তার।

কিছু ধান গোলায় উঠল, কিছু হ'ল বিক্রি। ধানের বন্দোবস্ত শেষ হলেই হেমন্তর ছুটি। ব্যস, টিকিটিও আর তার দেখা যাবে না। বিশ্বাসদের জমিদারীতে কাজ করে সে। কখনও সেখানে থাকে, কখনও ঘোরে এখানে ওখানে। বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক তার নেই বললেও চলে। গাঁয়ের লোকেরা তার সম্বন্ধে ফিস্‌ফাস করে কত কথা বলে। বিমলাও যে কিছু কিছু না শুনেছে এমন নয়। দু' একবার সাহস করে বলেছেও হেমন্তকে, কিন্তু উত্তরে কেবল মার খেয়ে মরেছে হেমন্তর হাতে। হেমন্তর কেলেঙ্কারীর কথা শুনে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে বিমলা। বন্ধ বন্ধ করে আয়নায় মুখ দেখেছে, সে ত কুৎসিত নয়! আজও ত চেহারায় ভাঙন ধরে নি তার। আর রূপ না হয় নাই হ'ল, গুণও কি তার নেই?

শাশুড়ী বলে, যে মেয়েমানুষ পুরুষকে ঘরে ধরে না রাখতে পারে তার মধ্যে আবার পদার্থ আছে না কি?—বিমলা শুনে আর হাসে। ঘরে যার মন নাই, তাকে বৃথা ধরে রাখবে সে কোন্ ছলাকলা দেখিয়ে।

পাঞ্জাবীর উপর চাদর চড়িয়ে হেমন্ত বেরিয়ে যাচ্ছিল, বিমলা এসে বললে: কবে ফিরবে?

হেমন্ত উত্তর দিলে না।

বিমলা পেছন পেছন সদর পর্য্যন্ত এল।

হেমন্ত মুখ ফিরিয়ে দেখলে। কিছু দূর গিয়ে ইসারায় কাছে ডাকল বিমলাকে।

বিমলা কাছে গেলে হেমন্ত বললে, ঘরে ধান রইল, খাবার ত ভাবনা নেই। আমাকে চাও না তুমি।

এমন ধরণের কথা হেমন্ত আগেও বলেছে। জবাবে বিমলা কিছুই বলে নি। অনুক্ষণ মনে মনে আকাশপাতাল ভেবেছে। কি করেছে সে, কোথায় তার অপরাধ? মনে-প্রাণে হেমন্তকে সে আপনার করে নিতে চেয়েছে, কিন্তু প্রতিদানে পেয়েছে কঠোর ব্যবহার। এমনি হেমন্ত থাকে বেশ, কিন্তু তাকে দেখলেই যেন সে ক্ষেপে যায়। আসলে বিমলাকে সে যেন স্ত্রী বলেই স্বীকার করতে চায় না।

আজও চুপ করে যেত বিমলা—ফিরেও যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে: বিয়ে করেছিলে কেন তবে আমাকে?

হেমন্ত হাসল—অত্যন্ত বিশ্রীভাবে হাসল।

—তোমাকে নয়, বিয়ে করেছিলাম দক্ষিণের ঐ কলন্ত জমিটাকে। আর ঐ জমিটার জন্যেই তোমাকে দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারি না।

বিয়ের সময় বিমলার বাবা জমিটা দিয়েছিল হেমন্তকে।

বিমলা বললে, তাও পাবে তুমি। আর সেও আমার ভাল। বাপের বাড়ীই পাঠিয়ে দাও আমাকে।

চলতে চলতে হেমন্ত বললে, মা, দাদা, রয়েছে, তাদের মত নাও।

হেমন্তর ভাবভঙ্গী অসহ্য মনে হ'ল বিমলার। বললে, তুমি কি কেউ নও?

না না না। কত দিন বলতে হবে সে কথা।

হেমন্ত দাঁড়িয়ে গেল।

বিমলা যেন ক্ষেপে গেল। পাঁচ মুখের পাঁচ কথা আমারও কান এড়ায় না।

হেমন্ত বিমলার কাছে এগিয়ে এসে বললে, ঠিকই বলে তারা। তুমি আমার কেউ নও। খাঁচার আটকানো, পোষমানা পাখী, তার বেশী কিছু নও তুমি আমার কাছে।

বিমলার মুখের লাগাম ছিঁড়ে গেছে। সেও বললে, চরিত্র যার নষ্ট হয়েছে তার কাছে ওর বেশী কি মূল্য আর পাব।

খপ্ করে বিমলার হাতটা ধরে হেমন্ত কঠোর স্বরে বললে, কি বললি?

বিমলা পাগলের মত বকতে লাগল, আমাকে ঠকিয়েছ, আমার বাবাকে ঠকিয়েছ তুমি। তোমার কেলেঙ্কারীতে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয় আমার। তুমি—তুমি মানুষ নও...

হেমন্ত বিমলার হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে আনতে আনতে বললে, আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা এবার।

উঠানে ছিল ধান নিড়োবার লাঠি। সেইটে টেনে নিয়ে হেমন্ত বিমলার আপাদমস্তক পেটাতে লাগল।

মার আগেও খেয়েছে, কিন্তু আজকে মার খেয়ে জ্ঞান ছিল না বিমলার। অনেকক্ষণ পরে যখন সম্বিৎ ফিরে পেল তখন সর্ব্বাঙ্গ যেন তার ব্যথায় টন টন করছে। হাতের পেশীতে, পিঠে কালসিটে দাগ পড়েছে। টলতে টলতে উঠে সে গিয়ে দাওয়ার উপর বসল। বাড়ীতে যেন জনপ্রাণী নেই। বিমলা জানে কেউ বেরিয়ে এসে দেখবে না তাকে।

দাওয়ার খুঁটি ধরে ধরে বিমলা গিয়ে ঘরে ঢুকল। জল গড়িয়ে খেল। বিমলা জানে এমনি করেই এক দিন মরবে সে। এতক্ষণ কাঁদবারও শক্তি ছিল না তার। এইবার চোখের জমা জল হু হু করে বেরিয়ে এল। হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল বিমলা।...

চিঠি পেয়ে ভাই এসে নিয়ে গেল বিমলাকে।

বিমলার বাবা বললে, মাটি নিয়েই ও হতচ্ছাড়া সন্তুষ্ট হোক, মেয়েকে ও বাড়ীতে আমি আর পাঠাচ্ছি না।

বিমলার ছোট বোনাই মোক্তার। সে বললে, পাঁটছড়ার গিঁট ত আর আলগা হবে না। আলাদা থাকবার জন্যে মামলা করো তুমি মেজদি।

বিমলা হাসল—একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলে, —কি হবে ভাই নালিশ করে?

পাড়াপ্রতিবেশী আর আত্মীয়-স্বজন এসে সদুপদেশ দিলে, জীবনটা ভগবানের দান। তাকে এমন ব্যর্থ হতে দেওয়া মহাপাপ বিমলা। লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হও।

অনেক ভেবেচিন্তে বিমলা শেষ পর্য্যন্ত পড়াশুনা করতে রাজী হয়ে গেল। বই সংগ্রহ হ'ল। ভায়েদের একজন স্কুলের মাষ্টার। সে তাকে পড়াশুনার সাহায্য করতে পারবে।

মন স্থির করে পড়তে আরম্ভ করেছিল বিমলা। এমন সময় এক দুঃসংবাদ নিয়ে নিজে এল বসন্ত। কাছারীবাড়ী থেকে সাংঘাতিক রকম পীড়িত হয়ে ফিরেছে হেমন্ত। সেবা-শুশ্রূষা করবার লোক নেই তার।

—এ-যাত্রা হেমন্ত বুঝি আর বাঁচে না বৌমা।

বসন্ত বিমলার সামনেই কেঁদে ফেলল।

বিমলার বাপ, ভাইয়েরা চোখের জল দেখে গলল না। বরং সুযোগ পেয়ে গালাগাল দিল বসন্তকে।

বিমলাও কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে।

বসন্ত ফিরে আসছিল। পথে নেমে হঠাৎ পেছন ফিরে দেখে, পুঁটলি হাতে বিমলাও আসছে।

বসন্ত বললে—থাক বৌমা, ফিরে যাও তুমি।

বিমলা নীরবে আঙুল বাড়িয়ে তাকে পথ চলতে ইঙ্গিত করলে।

পেছন থেকে বিমলার ভায়েরা চেঁচিয়ে বললে—কথা শোন্ বিমলা, নইলে বাপের বাড়ীর দরজাও তোর বন্ধ হবে।

বিমলা টলল না।

হেমন্তর অসুখের সত্যিই বাড়াবাড়ি চলছিল। ডাক্তার বলছে,—বুকে দোষ, লিভারে দোষ। খুব সাবধানে রাখতে হবে। প্রাণ দিয়ে করতে হবে সেবা। দামী ঔষধের ফিরিস্তিও বড় কম নয়।

বিমলা সেই যে এসে স্বামীর শিয়রে বসল আর উঠল না। চোখের কোলে কালি পড়ল, চেহারায় ভাঙন ধরল, গায়ের গয়নাও খসল একে একে।

পুরোপুরি দুটি মাস পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠল হেমন্ত।

হেমন্তর ঘর থেকে দু'মাস পরে নিজের ছোট ঘরে উঠে এল বিমলা। সুস্থ হয়ে উঠেছে হেমন্ত, এবার সে তার স্বরূপ ধরবে। অসুখের ঘোরে যে অসহায়তা তাকে পেয়ে বসেছিল এখন তার চিহ্নমাত্র থাকবে না। আবার সে হয়ে উঠবে অকরুণ, নিষ্ঠুর।

বাইরে থেকে বেড়িয়ে ফিরল হেমন্ত। এসে আর নিজের ঘরে ঢুকল না। সরাসরি চলে এল বিমলার ঘরে। অত্যন্ত মোলায়েম সুরে বললে—আজকে কিন্তু একটু চা দিতে হবে আমাকে। কতদিন যে তোমার হাতে চা খাই নি।

হেমন্ত দিব্যি গড়িয়ে পড়ল বিছানার উপর।

বিমলা চা তৈরি করে তার হাতে দিতে দিতে বললে—ডাক্তারে বারণ করেছে, তবু নাও—একটু বেশী দুধ দিয়ে দিলাম।

চা খেতে খেতে হেমন্ত গল্প আরম্ভ করলে। কথা যেন তার আর শেষ হতে চায় না। রাতের খাবারও খেল সে ঐ বিছানায় বসে।

বিমলা তাড়া দিয়ে বললে—নাও ঢের হয়েছে। রাত অনেক হ'ল, এবার শুতে যাও।

আকাশ থেকে পড়ল যেন হেমন্ত—ঘর ছেড়ে শুতে যাব ওখানে নাকি?

প্রলাপ বকছে নাকি হেমন্ত। বিমলা স্তব্ধ হয়ে গেল।

হেমন্ত ছেলেমানুষের মত আব্দার ধরলে—আমার যে বড্ড ঘুম পেয়েছে।

বিমলা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—বেশ ত থাক এ ঘরে আজ। আমি যাচ্ছি ও ঘরে।

হেমন্ত হঠাৎ উঠে ফস করে বিমলার আঁচলটা চেপে ধরলে, বললে—কোথায় যাবে?

তার চোখে মুখে যে ভাষা ফুটে উঠেছে বিমলার কাছে তা অভাবনীয়।

বিমলা বাধা দিলে না, প্রতিবাদ করে বললে না কিছু। দশ বছর বাদে কি বিয়ের মন্ত্র প্রাণ পেল?

মাঝে মাঝে বিমলার মনে হয়, যমের হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে বলেই কি হেমন্তর এই ভাবান্তর? হেমন্তর বাড়াবাড়ি দেখে ভয় হয় তার, একদিন রাশ ছিঁড়ে পালাবে না ত সে!

অপরাজিতকে জয় করবার আদিম লোভ বিমলাকেও পেয়ে বসল। পুরুষ-মানুষকে ধরে রাখবার ক্ষমতা যে মেয়ের নেই তার মধ্যে পদার্থ আছে নাকি—শাশুড়ীর সেই কথাগুলো অহরহ মনে পড়ে বিমলার। সব আশঙ্কা দূরে ঠেলে এবার সে নিজেকে যাচাই করতে উঠে-পড়ে লেগে গেল।

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি বহু দিন পরে হেমন্তকে জমিদারের কাজে বাইরে যেতে হ'ল। পনের দিন কেটে গেল—সে না বাড়ী ফিরল, না পাঠাল কোন খোঁজখবর! অবশ্য আগে ত এমন কতবার দু'তিন মাস সে বাইরে কাটিয়ে এসেছে। কিন্তু হেমন্তর অসুখের পর থেকে নবজীবন লাভ করেছে বিমলা। এখন তার অনুপস্থিতি একেবারেই সে সহ্য করতে পারে না। বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিমলা।

শাশুড়ী রাগ করে বললে, পুরুষমানুষ বাইরে না গিয়ে কি চিরকাল তোমার আঁচল ধরে বসে থাকবে। অমন করে চোখের জল ফেললে সংসারের অকল্যাণ হবে ছোটবৌ!

দিনকতক পরে হেমন্ত ফিরে এল।

বিমলা বললে, এবার কিন্তু বড্ড দেরী করেছ বাড়ী ফিরতে। খোঁজখবর দিলে তবুও ত খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়!

হেমন্ত বললে, কত জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, খোঁজখবর দেব কি করে? অন্য কর্মচারীটির অসুখ, সব কাজের চাপ পড়েছে আমার উপর।

বিমলা তার মুখের পানে চেয়ে চমকে উঠল, চেহারা অমন হয়েছে কেন? অসুখে পড়েছিলে নিশ্চয়ই। আমাকে লুকোবে না কিন্তু কিছু।

হেমন্ত বললে, আরে না—না। সময়মত খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, চেহারার আর দোষ কি!

বিমলা তার হাত ধরে বললে, কিছুদিনের জন্যে ছুটি নাও এবার। এমন শরীর নিয়ে বাড়ী থেকে বেরুতে দেব না তোমাকে।

হেমন্ত বললে, এ কি আর কেরাণীর আপিস। এ সময়

কি ছুটি চাইলে দেবে। তবে বাইরে আর যেতে হবে না। এখান থেকেই কাছারি যাব। তুমি ভেব না।

বিমলা তবু খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'ল। সেবা-শুশ্রূষা করে হেমন্তর চেহারা আবার সে আগেকার মত করে দিতে পারবে।

কথা দিলেও হেমন্ত, কিন্তু তা ঠিকমত রাখতে পারল না। কোন দিন বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে যায়, কোন দিন আবার একেবারেই ফেরে না। প্রশ্ন করলে বলে, নতুন বছর পড়েছে এখন কাজ বেশী। মনের প্রফুল্লতা যেন কমে এসেছে হেমন্তর। মেজাজ আবার তার খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। বিমলা কিছু বলতে গেলে ধমকে ওঠে, এ কি দশটা পাঁচটার আপিস! সবাইকে পিণ্ডি গেলাতে হলে উদয়াস্ত এমনি পরিশ্রম করতে হয়।

নেহাৎ মিথ্যে বলে না হেমন্ত। মন না মানলেও চুপ করে যায় বিমলা।

হঠাৎ এক দিন কাজে গিয়ে সেদিন আর ফিরল না হেমন্ত। সাত দিন সাত দিন করে মাস ঘুরে গেল। কোন খবরই হেমন্ত দিলে না।

বিমলার ভাবনা চিন্তা চরমে উঠল। ধৈর্য্যের বাঁধ তার ভেঙে পড়ল। মনে জাগল একটা অবিশ্বাসের আশঙ্কা। এতদিন বাদে সে যেন নিশ্চিতই বুঝতে পারল, জীবনটা তার ব্যর্থ হয়েছে। তবে কি হেমন্তর ভালোবাসা ভান মাত্র? নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে বিমলা কঠোর হয়ে উঠল। জীবনে এল তার ঘোরতর বিতৃষ্ণা।···

একদিন বাড়ীতে একখানা পাল্‌কি এসে পৌঁছল। সকলে ধরাধরি করে পালকি থেকে নামাল হেমন্তকে। বছরখানেক আগে যেমন হয়েছিল তেমনই দশা হয়েছে তার।

বিমলা ঘরের জানালা ধরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল, একজন বলছে, শহরের হাসপাতালে রাখতে আর চাইল না। হেমন্তকে কঠিন রোগে ধরেছে বসন্তদা।

হঠাৎ যেন একটা ভূমিকম্প হ'ল। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল বিমলা।

হেমন্তর মা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বিমলাকে জড়িয়ে ধরে বললে, ঘরের লক্ষ্মী আমার, তুই ত একবার হেমন্তকে যমের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলি। আমার হেমন্তকে দেখ মা!

বিমলার হাতে কিছু টাকা ছিল। গহনা থেকে থালা-বাটি জমিজমা বেচে সে স্বামীর চিকিৎসার জন্য জলের মত অর্থ-ব্যয় করতে লাগল। স্নানাহার নেই, বিশ্রাম নেই, কলের পুতুলের মত বিমলা হেমন্তকে নিয়ে পড়ে রইল। বাইরে থেকে নামকরা একজন ডাক্তার এল।

ইনজেকশন দিয়ে ডাক্তার অপ্রসন্ন মুখে ফিরে যাচ্ছিলেন। স্বামীর পাশ ছেড়ে বিমলা তার পেছনে পেছনে উঠে এল মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে ডাক্তার দাঁড়িয়ে গেলেন প্রশ্ন করলেন, কিছু বলবেন?

বিমলা জিজ্ঞাসা করল, আমার স্বামীর কি অসুখ ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার কি যেন ভাবলেন। পরে বললেন, এদিকে আসুন বলছি!

বারান্দার এক কোণে এসে ডাক্তার প্রশ্ন করলেন, ছেলে-মেয়ে হয়েছে আপনার?

'না' - বলতে গলার স্বর কেঁপে গেল বিমলার।

তিন মাসের ভ্রূণ তার অতি ক্ষুদ্র অস্তিত্বের ক্ষীণ আভাস পাঠায় যে বিমলার সর্ব্বাঙ্গে। ডাক্তারের কাছে মিথ্যা বলে সে কি তাকে চেপে রাখতে পারবে।

ডাক্তার বলতে লাগলেন—উত্তরাধিকারসূত্রে বংশধরেরা পায় ঐ কুৎসিত রোগ। কাণা, বোবা, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায় তারা। তাদের বড় দুঃখের জীবন।

বিমলা বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল। আর কোন প্রশ্ন সে করতে পারল না।

ডাক্তার গম্ভীর ভাবে চলে গেলেন।

স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস নিতে পারছে না বিমলা। বিকলাঙ্গ, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, কাণা, বোবা—ভবিষ্যতের একটা দারুণ ভয়ে শিউরে উঠল বিমলা।

শাশুড়ীর সেই কথাটি বার বার মনে পড়তে লাগল তার—পুরুষমানুষকে যে ঘরে রাখতে পারে না তার মধ্যে আবার পদার্থ আছে নাকি? ঘরছাড়া অসংযমী স্বামীকে ঘরে রাখতে গিয়ে সে কি দিয়েছে শুধু দেহ আর মন। তার মাংসে, নাড়ীতে, মজ্জায়, রক্তে জড়িয়ে রয়েছে যে অনাগত জীব তার দেহও কি দেয় নি বিষিয়ে?···বুক চাপড়ে আর্ত্তনাদ করে উঠল বিমলা। হেমন্ত তাকে চরম সাজা দিয়েছে।

বাইরে উদ্দাম স্রোতে ভাটা ধরেছে যখন, ব্যাধিতে দেহ আর মন হয়েছে পঙ্গু। যখন আশ্রয় নেই, সেবা করবার লোক নেই—তখন মনে পড়েছে ঘরকে।

ঘরের মধ্যে শুয়ে কাতরাচ্ছে হেমন্ত। সমস্ত দেহে তার দাহ, তীব্র যন্ত্রণা সারা অঙ্গে। হেমন্ত ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে।

বিকলাঙ্গ, বোবা, খোঁড়া—সমাজে আনে ঘৃণা আর অপযশ। ঘৃণায়, হিংসায়, গলার শিরা আর মুখের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠল বিমলার। হাত দুটো নিশপিশ করতে লাগল তার।

ঘরে ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বিমলা। বিছানার সঙ্গে মিশে রয়েছে যেন হেমন্তর প্রেতাত্মা। তার কণ্ঠনালীতে একটু চাপ দিতে বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। বিমলার মধ্যে সত্যি পদার্থ আছে কিনা, এবার

সে দেখিয়ে দেয়, যদি নিজের শক্তি সে যাচাই করে দেখতে চায়, মরবার আগে সে যদি জানিয়ে দেয় সেও নির্মম ভাবে প্রতিশোধ নিতে জানে, তা হলে ?

বিমলা পাগলের মত হেসে উঠল। সামনের আয়নায় নিজের মুখ দেখে কেঁপে উঠল সে। সে কি সত্যি তবে পাগল হয়েছে ? এসব পাপ চিন্তা মনে আনল কি করে সে !

বিমলার মনে পড়ল ঠাকুমার সেই গল্প। মনে পড়ল সেই সতী নারীর কথা মরণাপন্ন স্বামীকে যিনি নিজে পতিতালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন—

হেমন্ত ক্ষীণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল : ওগো, অষুধ দাও আমাকে তাড়াতাড়ি, আর যে সহ্য হয় না।

বিমলা কি পাষাণ হয়ে গিয়েছে ! সম্বিৎ ফিরে পেতেই সে ছুটল টেবিলের দিকে ঔষধ আনতে ?

ঔষধটা গেলাসে গড়িয়ে নিয়ে সে হেমন্তর মুখে ঢেলে দিতে দিতে বললে : ভয় কি, অষুধ খাও, সেরে যাবে।

ঔষধ গিলে মুখ বিকৃত করলে, হেমন্ত আরও যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল, উঃ, গলা যে জ্বলে গেল !

বিমলা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে : চুপ কর, অস্থির হয়ো না।

হেমন্ত কিন্তু থামল না ; আরও দ্বিগুণ জোরে চেঁচাতে লাগল : জ্বলে মলাম, আমাকে বিষ দিয়েছে, বিষ—

সবাই ছুটে এল।

বিমলা শিশিটা নিয়ে এল হাতের মুঠোয়। সবাই দেখল, ছোট অক্ষর হলেও স্পষ্ট বাংলা দুটি হরফ 'বিষ' জ্বল জ্বল করছে শিশির গায়ে।

হেমন্ত অস্পষ্ট সুরে আবার আর্তনাদ করলে···বিষ, বিষ বিষ দিয়েছে।

ডাক্তার এল, পুলিশ এল। মরবার আগে হেমন্ত শেষ জবানবন্দী দিয়ে গেল—বিমলা তাকে বিষ দিয়েছে। সাক্ষী-প্রমাণও জুটে গেল। বিমলাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেল।

যেটুকু সন্দেহ ছিল, ময়না তদন্তের বিবরণী তার নিরসন করলে। খুনে বউটার ফাঁসি না হয়ে আর যায় কোথায় !

এই ক'টা দিন আর রাত, অনুক্ষণ বিমলা নিজের বিচার নিজে করেছে। আদালতের প্রয়োজন কি, সেখানে হার-জিত ত কথার মারপ্যাচে। সে নিজে যে খুনে নয় কে প্রমাণ করবে ? সেই মেরেছে হেমন্তকে। সেদিন ঔষধ দেবার এক মিনিট আগে যে চিন্তা সে করেছিল, তার অবচেতন মনের সেই চিন্তা নিজের অগোচরে খাবার ঔষধ আনতে গিয়ে মালিশের বিষ তেল দুর্ব্বার হাতে টেনে এনেছে। বিমলা নিজেও অহোরাত্র ভেবে ভেবে এই-ই স্থির জেনেছে ; সে ত বাঁচতে পারে না। আদালত তার করবে কি ?

গারদে বসে বসে বিমলা ভাবত সেই সতী নারীর কথা, আর স্বপ্নে ভেসে উঠতে দেখত হেমন্তর সেই বিকৃত মুখ—আমাকে বিষ দিয়েছে—বিষ দিয়েছে আমার স্ত্রী বিমলা।

অমাবস্যার রাত। বিমলা পেছনের জানালা আর বাগানের বড় গাছের ডালটার দূরত্ব একবার বেশ করে দেখে নিলে।

আদালত আর হাসপাতালে তার প্রয়োজন কি ? সে ত নিজের বিচার নিজেই করে নিয়েছে। গভীর রাতে দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বিমলা হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেল একদিন।

যদি

শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায় চৌধুরী

প্রণয়ের নদীবুকে কোন এক আরক্ত সন্ধ্যায়
যত সব এলোমেলো সেতু বেঁধেছিলে,
তোমার আমার ব্যবধানে···
বাস্তবের করাঘাতে যদি কোন দিন
ভেঙেচুরে যায়।
কোন এক স্তিমিত সন্ধ্যায়···
তোমার চোখের তারা জ্বলে জ্বলে যদি নিভে হায়—
তোমার আমার যত সবুজ কামনা—
জীবনের তরু হতে খসে পড়ে যায়,
প্রেমের মুকুল যত—হাল্কা গোলাপী
অভিশপ্ত দাবানলে পুড়ে পুড়ে হয়ে যায় খাক !
ভবিষ্যের পানে চাহি ভয় হয় তাই—
বারংবার কেঁপে ওঠে বুক
এর মাঝে শান্তি কোথা—কোথা তবে সুখ ?
তার চেয়ে শোন প্রিয়া—সেই ভালো মোর
আমা হতে তুমি মোর দূরে দূরে থাক—
তোমার চোখের ঐ চটুল চাহনি
তোমার আবেগভরা রক্তের ঝলকে—
ডালিম ফুলের মত ফিকে ফিকে লাল
অধরের শত শত অজস্র চুম্বন
আমাদের নিরলস চোখের পাতায়
আজি হতে স্বপ্ন হয়ে থাক।
শীতের শিশির-ভেজা ঘন কুয়াশায়
পৃথিবীর সজীবতা যায় যদি যাক।

পশ্চিম হিমালয়ের পথে

শ্রীপরিমল গোস্বামী

২

কাইথু অঞ্চলটি সিমলার প্রধান কেন্দ্রস্থল থেকে অনেকটা নিচে। ষ্টেশন থেকে অনেকটা দূর আসার পর যখন সেই নিম্নগতি শুরু হ'ল তখন এ রকম প্রায়-খাড়া পথে নামায় অনভ্যস্ত আমার অসুবিধা হচ্ছিল খুবই। তা ভিন্ন পথের দীর্ঘ ক্লান্তি এ রকম পথে চলার পক্ষে অনুকূল নয়, সেজন্যে এক একবার বেশ ভয় হচ্ছিল যে, হয় তো এখানে আসাটা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যাবে, এ পথে একবার নেমে আর উপরে ওঠার প্রবৃত্তি থাকবে না। দুর্বল দেহে অনভ্যস্ত পথে এ ভাবে ওঠা-নামা করা সত্যই অত্যন্ত কষ্টদায়ক। অসম্ভব রকমের ঢালু পথ। অতি সন্তর্পণে এক পা এক পা করে নামছিলাম। অনেকটা দূর নেমে আসার পর বাঁয়ের দিকের বাঁক ঘুরে আরও নিচে নামছি এক ফুট প্রশস্ত অসমান পথে। কিছু দূর নেমে আবার ডান দিকের বাঁক ঘুরে চলছি। এরই শেষে দুর্গা-ভিলার দোতলা। চমৎকার ছোট বাড়িটি। উপরের তলায় কিরণকুমার রায় ও ফণী চাটুজ্জের বাস। এরা একই সঙ্গে কলকাতায় কাজ করত এবং অফিস সিমলায় উঠে এলে এরাও সিমলায় এসেছে বছর তিনেক হ'ল। বাঙালী হিসাবে সাহসের পরিচয় দিয়েছে সন্দেহ নেই, কেননা, হঠাৎ এত দূরে আসতে হবে ভয়ে, অথবা অন্যান্য অসুবিধায়, অধিকাংশ বাঙালীই তখন কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। প্রবাসে বাঙালীর সংখ্যা কি এখন দ্রুত কমে যাচ্ছে? দেখলাম ল্যান্সডাউনে মাত্র দু'তিন ঘর বাঙালী আছে, এবং ল্যান্সডাউন থেকে সিমলা যাবার পথে কোটদ্বারে ট্রেনের মধ্যে মাত্র একজন বাঙালীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, তিনি রেলওয়ে এসিষ্টান্ট ষ্টেশন মাষ্টার, নজিবাবাদে আসছিলেন। এ ভিন্ন দু'দিনের পথে একটিও বাঙালী দেখিনি।

দুর্গা-ভিলায় এসে পৌঁছলাম তিনটের কিছু পরে। বাড়িটি ঢালু পাহাড়ের গায়ে, কাজেই পাহাড় পথে সোজা এসে দোতলায় নামা যায়, এক তলায় নামতে হলে অন্য পথে ঘুরে নামতে হবে। বাড়ির সম্মুখের উন্মুক্ত দৃশ্যে মুহূর্তে আমাদের পথের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল (তার সঙ্গে অবশ্য ভাল ভাল খাবারও ছিল)।

আমি বহুপূর্ব হতেই ঠিক করেছিলাম বিকেলে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করব, কোথায়ও বেরুব না, কিরণও বলল একবেলা বিশ্রাম করাই উচিত। কালীকিঙ্করেরও সেই মত। সুতরাং গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী কমলাকে খাবার ঘরের পরবর্তী নৈশ বৈঠক তদ্বিরের ভার দিয়ে কিরণ আমাদের সঙ্গে আড্ডা জমাতে বসে গেল। দুর্গা-ভিলা থেকে সম্মুখস্থ দৃশ্য খুব সুন্দর। দুই পাশে একটার পর একটা পাহাড় দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেছে, মাঝখানে আঁকা-বাঁকা উপত্যকা, অনেকটা দূরে দূরে এক একটা বাড়ি, পুতুলের বাড়ির মত ছোট পাহাড়ের গায়ে লেগে

সিমলা বালিকা বিদ্যালয়ের বাঙালী ছাত্রী

আছে। দূরের মানুষগুলোকে প্রায় পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছে। আকাশে ভাঙা মেঘ, সুতরাং আকাশের নীলিমা এখানে উপভোগ্য। পাহাড়ের গায়ে গায়ে 'রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি খেলা' পরম রমণীয়। সব পাহাড়ে একসঙ্গে রোদ পড়লে এত সুন্দর দেখায় না। এক এক সময় রোদে এক একটি পাহাড় আলোকিত হয়ে উঠছে তাতে মনে হয় যেন সমস্ত দৃশ্যপট ঘূর্ণীতে চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। বাঁয়ের দিকে দীর্ঘ উঁচু পাহাড় হাজার হাজার দেওদার গাছের অরণ্যে ঢাকা। মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে, এমন কি লাট সাহেবের বাড়িটিও তার উচ্চ

স্থানের অসাধারণ গৌরব নিয়ে সাধারণ নিম্নতলবাসীর দৃষ্টিগোচর হয়ে আছে।

পায়ের নিচে চেয়ে দেখি টেনিস খেলার উপযুক্ত ছোট একটুখানি জায়গা সমতল করে তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত সবুজ পরিবেশে ঐ একটুখানি শাদা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। শুনলাম ওটি টেনিস কোর্ট নয়, ঘোড়দৌড়ের মাঠ। মাঠটিকে যে অত ছোট দেখাচ্ছে তার কারণ ওটি আমার অবস্থান থেকে নিচের দিকে অনেক দূরে অবস্থিত, পার্বত্য অঞ্চলে সর্বত্রই পরিপ্রেক্ষিত বোধে এই রকম ভ্রান্তি ঘটে। এই ঘোড়দৌড়ের মাঠের দৌড়ের দিন অনেকগুলো ঘোড়া দেখে প্রথমে সেগুলোকে পাখী মনে হয়েছিল। তার পর যখন তারা সেই ডিম্বাকৃতি মাঠে ছুটতে সুরু করল এবং শত শত লোকের চীৎকার চার দিকের পাহাড়ের প্রাচীরে বাধা পেয়ে উপরে উঠে এল তখন মনে হ'ল যে এটি ঘোড়দৌড়ই বটে। জায়গাটি যে অনেক দূরে অবস্থিত তার আর একটি প্রমাণ এই যে, সেই নির্জন আবহাওয়ায় অত লোকের সম্মিলিত চীৎকার অত্যন্ত ক্ষীণ ভাবে কানে এসে পৌঁছতে লাগল। কিন্তু সে হ'ল আরও ক'দিন পরের অভিজ্ঞতা, কারণ ওখানে রেস খেলা হয় রবিবারে।

সিমলার এক অংশ

সন্ধ্যার কিছু পরেই ক্ষীর আবির্ভাব ঘটল এবং তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিমলা প্রবাসের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে নানা রকম আলোচনা চলতে লাগল। এখানে একটা বিষয়ে সবাই এক মত যে, এ রকম অপূর্ব সুন্দর পরিবেশে, এমন নির্জন আবহাওয়ায়, কিছুকাল থাকা অভ্যাস করলে কোলাহল ও জনতাপূর্ণ জায়গা আর ভাল লাগে না। কথাটা সত্য। কারণ জায়গাটা এতই উঁচু যে সর্বদা মনের মধ্যে এই চেতনাটি জাগ্রত থাকে যে, ধূলিধূসরিত প্রতিদিনের অতি পরিচিত একঘেয়ে পৃথিবী থেকে হঠাৎ যেন মেঘের রাজ্যে উঠে এসেছি। এই ধারণাটি বিশেষ করে বাঙালীদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। ইংরেজীতে একটি কথা আছে যার অর্থ হ'ল — সাদাসিদে জীবন, উচ্চ চিন্তা (প্লেন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিংকিং)। ও দুটোর একটা হয় ত সম্ভব, কিন্তু দুটো এক সঙ্গে বোধ হয় কোন বাঙালীর পক্ষেই সম্ভব নয়। সাদাসিদে জীবন কাটিয়ে উচ্চ চিন্তায় মগ্নগুল কোন বাঙালীকে আমি অন্তত দেখিনি। আমরা প্লেন লিভিং-এ অনেকেই অভ্যস্ত, কিন্তু হাই থিংকিং-এর পরিবর্তে হাইট থিংকিং করি। অর্থাৎ উচ্চ চিন্তার স্থলে উচ্চতার চিন্তা করি, এবং আমার মনে হয় প্লেন শব্দটিরও সমতল ভূমির সমার্থক অর্থটি ধরে নিলে আমাদের সম্পর্কে প্লেন লিভিং এণ্ড হাইট থিংকিং কথাটি সম্পূর্ণ খাটবে। আমরা সেটাই করে থাকি, অর্থাৎ সমতল ভূমিতে বাস করে উচ্চতার চিন্তা করি। সিমলা সেই হাইট থিংকিং-এর বিড়ম্বনার হাত থেকে সিমলা প্রবাসী বাঙালীদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই উচ্চতায় বসে নিজেকে নতুন করে পাওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ আছে, অবশ্য এর জন্যে মনের দিক দিয়ে পূর্ব প্রস্তুতি থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ মননশীল হওয়া আবশ্যক

বড় ডাকঘরের নিকটস্থ পথ

মাল, সিমলা

এখানে বসে মনের প্রসারতা স্বভাবতই বৃদ্ধি পায়। দেশের কথা চকিতে যদি কখনও মনে পড়ে তখন একই সঙ্গে পঞ্জাব এবং বাংলা এই দুই দূরবিচ্ছিন্ন দেশ ও তার মধ্যবর্তী সমস্ত দেশের রূপ কি একই সঙ্গে মনে পড়ে না? কিন্তু এটি হ'ল ভাবের দিক, অর্থাৎ একটু চেপে ধরলে যার স্পষ্ট অর্থ হারিয়ে যায়, সুতরাং এই দিকটির কথা আর না বলাই ভাল। সিমলার উচ্চতায় আরও আকর্ষণ আছে এবং সেটি সেই দিনই রাত্রে খেতে বসে প্রত্যক্ষ করা গেল। চমৎকার চাল, সুমিষ্ট মাছ, সুস্বাদু দুধ এবং নানাজাতীয় তরকারি এখানে প্রচুর। এমন সুখাদ্য মাছ যে এখানে মেলে (এবং ল্যান্সডাউনে আদৌ মেলে না) এই তথ্যটি জানা না থাকায় জ্ঞান-জগতে একটা মস্ত বড় ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। ল্যান্সডাউনে ছিল জ্ঞান সিং, বালকমাত্র, হাসি মুখ, কোমল স্বভাব। এইখানে তার পরিপূরক রূপে দেখলাম কৃপারামকে। এ রকম অনমনীয় মেরুদণ্ডবিশিষ্ট মানুষ কমই দেখা যায়। যখন সে কাজ করে, যখন সে হাঁটে, যখন সে সামনে ঝুঁকে পড়ে, যখন সে ডাইনে বামে অথবা পিছনে ফেরে, তখন তার অন্য যা-কিছু পরিবর্তন ঘটুক মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে, কোনো দিকে এতটুকু বেঁকে যায় না, দেখে মনে হয় যেন একটি মাত্র নিরেট হাতে গড়া সেটি, বরঞ্চ একটুখানি পিছন দিকেই হেলানো; সম্মুখের দিকে কদাপি নয়। কিন্তু বিশ্বস্ত ভৃত্য, রান্না এবং বাজার করার কাজ সে একাই করে এবং উত্তমরূপেই করে।

দুর্গা-ভিলার নিচের তলায় শুনলাম এক মাতাজি আছেন এবং তিনি বাঙালী। সিমলা অঞ্চলে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে, এবং শিষ্যের সংখ্যাও কম নয়। দুর্গা-ভিলা বাড়িখানির যিনি মালিক তিনিও তাঁর শিষ্যদের অন্যতম, তাই মাতাজি দুর্গা-ভিলায় মাঝে মাঝে এসে বাস করেন। তাঁর বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁর জটা, সেই জটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত নেমে এসেছে।

আমরা যখন আলাপে ব্যস্ত ছিলাম কালীকিঙ্কর তখন তাতে যোগ না দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল। কোথায় তা পরে বোঝা গেল। শ্রীমতী কমলার কাছ থেকে মাতাজি সম্পর্কে অনেক কাহিনী শুনে সে খুব কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল এবং কমলাই তাকে মাতাজির কাছে নিয়ে গিয়েছিল আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। তারপর শিল্পী ও সন্ন্যাসিনীর অনেকক্ষণ কি আলাপ হয় তা জানি না, কিন্তু বোঝা গেল মাতাজি শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করে তার প্রতি প্রীত হয়েছেন।

তার প্রমাণ পাওয়া গেল পর দিনই। দুর্গা-ভিলার দোতলা থেকে নিচে যেতে হলে ঘর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে একটা বাঁক ঘুরে নিচে নামতে হয়। এই রকম এক দিকের বাঁকের কাছে ছাউনি সম্বলিত একখানি বেঞ্চি আছে। শিল্পী সেই জায়গাটাই তার দৈনন্দিন আহ্নিকাদির জন্যে বেছে নিয়েছিল। পর দিন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা আন্দাজ সময়ে শিল্পী ফিরে এসে বললে আহ্নিক শেষে চোখ খুলেই দেখে একটি পাত্রে উৎকৃষ্ট কয়েকটি মিষ্টান্ন ও এক গেলাস জল তার সম্মুখে রয়েছে। বলা বাহুল্য, মাতাজির স্নেহের ওটি মিষ্টান্ন রূপ। বললাম কাল সকালে তোমার সঙ্গে আমিও বসে যাব চোখ বুজে, কিন্তু বললাম নিতান্তই ঠাট্টাচ্ছলে। কারণ বস্তু-জগতের সৌন্দর্যের প্রতিই আমার লোভ বেশি। তাই যতক্ষণ সম্ভব চোখ খুলে রাখার চেষ্টা করি, জানি না হয় তো আধ্যাত্মিক জগতের সৌন্দর্যের স্বাদ পেলে সেই দিকেই ঝুঁকে পড়তাম কি না, হয় তো চোখ খোলারই দরকার হ'ত না আর।

কিরণ, কণী অনেক আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল তাদের কার্যস্থলে। আমরা দু'জনও বারোটার মধ্যে খাওয়াদাওয়া শেষ করে বেরিয়ে গেলাম দৃশ্য দেখতে। কিন্তু ঘর থেকে বেরুলেই ক্রমাগত উপরে উঠতে হয়, এবং আমার পক্ষে তা অত্যন্ত কষ্টকর মনে হতে লাগল। দু'এক মিনিট পরেই কিছু বিশ্রাম করলে এবং খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলে ততটা কষ্টকর হয় না। আপন গরজেই এই কৌশলটি আবিষ্কার করে নিলাম। দু'বছর আগে শেষ পাহাড়ে ওঠা-নামা করেছি কিন্তু এ রকম প্রাণান্তকর মনে হয় নি—যদিও বহুদূর হাঁটার

পর অসম্ভব ক্লান্তি অনুভব করেছিলাম। কিন্তু এখানে প্রতি মিনিটে এরকম ক্লান্ত হয়ে পড়তে হবে তা আগে কল্পনা করা যায় নি। পথ দীর্ঘ এবং গ্রেডিয়েন্ট বেশি। দীর্ঘ পথ এই জন্যে যে সিমলা বহু বিস্তৃত জায়গা, সুতরাং দুর্গা-ভিলা থেকে ঘুরে ঘুরে শুধু উপরে উঠেই নিষ্কৃতি পাচ্ছি না, অপেক্ষাকৃত সমতল পথের সন্ধানে অনেকটা দূরত্বও অতিক্রম করতে হচ্ছে। কিছুটা উপরে উঠে দেখি দুর্গা-ভিলা কত নিচে পড়ে আছে। পথের দিকে চেয়ে দেখি আরও তিন গুণ পরিমাণ উপরে উঠতে হবে। একটু একটু করে এগিয়ে এবং দু'এক মিনিট অন্তর বিশ্রাম করে চলতে লাগলাম। এই ভাবে চলতে চলতে ছারবঙ্গের বাড়ি ছাড়িয়ে প্রশস্ত উৎকৃষ্ট পথ পাওয়া গেল, এবং সেই পথে যতদূর যাওয়া সম্ভব গেলাম। শিল্পী কোন্ কোন্ জায়গায় বসলে ছবি আঁকার সুবিধা হবে সেই সব জায়গা মনে মনে চিহ্নিত করে রাখছিল। এ পথে ক্যামেরা খোলার বিশেষ দরকারই হ'ল না, বিশেষত্ব কিছুই ছিল না।

ছড়ির বাজার

বিনা টিকিটে ভ্রমণের একটি বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত

ফিরে এলাম আমরা ঘণ্টা কয়েক ঘুরেই। শিল্পী যে-কোনো জায়গায় অবশ্য বসে যেতে পারত, কিন্তু আমি সঙ্গে থাকায় তা আর হ'ল না, কারণ যে সব পথে ঘোরা হ'ল সে সব পথে আমি সম্পূর্ণ বেকার। শিল্পীর পক্ষে একা বেরুনোই প্রশস্ত। আমার পক্ষেও তাই। আমি ফিরে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পরই শিল্পীর পা চঞ্চল হয়ে উঠল, সুতরাং আমি একা শয্যাশায়ী হয়ে রইলাম। আধঘণ্টা আন্দাজ কেটে গেছে, ইতিমধ্যে ভারী পায়ের শব্দে চেয়ে দেখি শিল্পী ফিরে এসেছে। কি ব্যাপার? বললে, জল নিতে ভুল হয়ে গেছে। ব্যাগে রং তুলি কাগজ সবই আছে জল নেই! সুতরাং ভুল যাত্রা সংশোধন করে সে আবার দুর্গা-ভিলা এবং সংলগ্ন পাহাড় কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল। তার আসা এবং যাওয়ার মধ্যে যে উত্তেজনা প্রকাশ পেল তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল তার উপযুক্ত উৎকৃষ্ট দৃশ্য সে পেয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে ফণী এসে আসর জমিয়ে বসেছে। ভদ্রতার অন্তরঙ্গতার এবং মধুর চিত্তাকর্ষী কাহিনী রচনায় নিপুণ। একটা ভরসা হ'ল এই যে, সিমলা-বাসের পরিমিত ক'টা দিন আর যদি পাহাড়ে ওঠানামা নাই করতে পারি তা হলেও কোনো ক্ষতি হবে না, ফণীকে পেলেই যথেষ্ট হবে। শুধু অফিসের কয়েক ঘণ্টা যা অসুবিধা। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে অসুবিধাও দূর হ'ল, পরদিন তার প্রবল জ্বর এসে গেল।

এদিকে সন্ধ্যা আটটা বেজে গেছে, সিমলায় তখনও অন্ধকার হয় নি (কলকাতা থেকে প্রায় এক ঘণ্টা পরে ওখানে সূর্যাস্ত হয়)—এমন সময় হঠাৎ যেন আকাশের আলো নিভে গেল, চেয়ে দেখি মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, এবং আরও দেখি ঝম ঝম করে বৃষ্টি নেমে পড়েছে। শিল্পী তখনও ফেরে নি—কিন্তু ফিরতে দেরি হ'ল না, কিছুক্ষণের মধ্যেই শিল্পী ভিজে ভিজে ছবি নিয়ে এসে হাজির হ'ল এবং কালবিলম্ব না করে তুলি চালিয়ে জলের সঙ্গে রঙের সামঞ্জস্য করে ফেলল। ছবিখানি ভেজাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নি, কারণ খুব বেশি ভেজে নি। সন্ধ্যার অল্প আলোয় চাপা রঙে মণ্ডিত পাহাড়গুলো যেন ঢেউয়ের মতো উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। পর্বতমালার এ রকম প্রাণোচ্ছ্বসিত প্রকাশ একমাত্র শক্তিশালী তুলিতেই ফুটতে পারে।

তরকারী-বাজারের একটি দৃশ্য

কাছে আগে ছুটে গিয়ে নিজেদের হিন্দুত্বের পরিচয় দিতে থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যাত্রীদের মধ্যে এ বিষয়ে খুব গোঁড়ামি দেখা গেল না, যদিও কুলিদের অত্যাচারে হয় তো বাধ্য হয়েই 'হিন্দুত্বের' ঘাড়ে বোঝা চাপাতে হয়। মনে হ'ল বিষয়টির দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িক মনোভাব জিইয়ে রাখছে এই সব কুলিরা, এটি অত্যন্ত অন্যায়, বরঞ্চ এই নিচের ধাপেই এর ঠিক উল্টোটা হওয়া উচিত ছিল। আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক নৃশংসতা ও বর্বরতার যুগ অতীত যুগ হিসাবে না মেনে নিলে রাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষতি করা হবে, এ কথাটা প্রত্যেকেরই এখন স্মরণ রাখা দরকার।

সিমলার দৃশ্যে শিল্পী সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়ে বিশেষ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, এবং পরদিন সকালের খাওয়া শেষ করেই বেরিয়ে গেছে ব্যাগ ঘাড়ে নিয়ে। আমি পড়ে আছি একা ফণীর সঙ্গে। ফণীর প্রবল জ্বরের কথা পূর্বেই বলেছি, অতএব সেটি আমার সুযোগ। আমরাও কিছু পরেই বেরিয়ে গেলাম উর্ধ্ব পথে। এই যাওয়ার উদ্দেশ্য, ক্রমশঃ পাহাড়পথে চলায় অভ্যস্ত হওয়া এবং ঐ সঙ্গে যদি দৈবাৎ কোনো ছবির বিষয়বস্তু পাওয়া যায় তা দেখা। দৃশ্য সম্পর্কে মোহ কেটে গিয়েছিল, কেননা, এ সব বিস্তৃত দৃশ্যে অসাধারণত্ব কিছুই ছিল না, তা ছাড়া চোখে যে বিস্তার তৃপ্তিকর, ক্যামেরার সাহায্যে একসঙ্গে ততটা বিস্তার ধরা পড়ে না, এবং যাকে প্যানোরামিক চিত্র বলে তাও এখানে অন্তত আমাদের নির্দিষ্ট ভ্রমণ-সীমার মধ্যে কোথায়ও তোলার সুযোগ ছিল না। সুতরাং ঠিক করলাম বাজার, লোকজন ও পথঘাটের ছবিকেই প্রধান করতে হবে। কিন্তু সেই জনপূর্ণ জায়গা তখনও আমাদের দৃষ্টির বাইরে ছিল, এবং সে দিকে যেতে হলে বিকেলের দিকে যাওয়াই ভাল। সুতরাং টানেল ভেদ করে ওপারের বড় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে চার দিকের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। এই পথে বাস চলাচল করে এবং এখান থেকে শহরের খানিকটা অংশ বেশ দেখা যায়। বাস্-এর অবস্থা পৃথিবীর বোধ হয় সর্বত্রই সমান। ভিড়ের আতিশয্য সর্বত্র। টানেলের পাশে দু'দল কুলি বসে আছে যাত্রীদের মালপত্র বহনের আশায়। কুলিরা দুটি দলে বিভক্ত কেন সে বিষয়ে ফণীর কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেল। সিমলার মতো বড় জায়গার পক্ষে এটি অবশ্যই লজ্জাকর, এবং আরও বেশি লজ্জাকর হচ্ছে এই যে, বাস্ থামলে বড় দলটি বাস্-এর

এই প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এলাম আমরা প্রায় বারোটার সময়। শিল্পী তখনও ফেরে নি। আমরা একটু বিশ্রাম করতেই কার পদধ্বনি শোনা গেল দরজার বাইরে। প্রবেশদ্বারে কাঠের পথ বেয়ে কেউ এলে আগে থাকতেই বেশ বোঝা যায়। শিল্পী ফিরেছে মনে করে দরজা খুলতে দেখি ফণীর অফিসের এক পিওন, হাতে চিঠি। তাতে লেখা আছে জ্বর খুব প্রবল না হলে অফিসে একটি জরুরি কাজ ছিল, আসা প্রয়োজন। কিন্তু জ্বর তখন প্রায় এক'শ তিন ডিগ্রী, তাই চিঠির সাহায্যেই নির্দেশাদি দিয়ে ফণী বিছানায় শুয়ে পড়ল, এবং আরও ঘণ্টাখানেক শিল্পীর জন্যে অপেক্ষা করেও যখন দেখলাম আপাততঃ তার ফিরে আসার কোন চিহ্ন নেই তখন আমরা স্নান এবং আহার শেষ করে স্থায়ী ভাবে শয্যাশায়ী হলাম।

শিল্পী ফিরল বেলা দু'টোয়, প্রকাণ্ড এক ছবি শেষ করে। দুপুর বেলার উজ্জ্বল রূপ, পাহাড়ে পাহাড়ে রঙের খেলা, ঘন নীল আকাশে ভাঙা ভাঙা শাদা মেঘ। শিল্পী পাহাড় দেশের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ করে ফেলেছে আর তাকে আটকায় কে? তাই সে এসে খাওয়াটা কোনো রকমে শেষ করেই আবার বেরিয়ে গেল ব্যাগ ঘাড়ে নিয়ে। সিমলার আপিস বা বাণিজ্য অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্রের বাইরে যত জায়গা আছে তা এমনই নির্জন এবং শান্ত যে শিল্পীর পক্ষে তাকে সম্পূর্ণ আদর্শ পরিবেশ বলা চলে। পথের ধারে বসে রঙীন ছবি আঁকছে অথচ অকারণ কৌতূহলীর ভিড় নেই। দু'একজন যারা একটু কাছে এসে দেখে গেছে তারা শিল্পীর প্রতি সম্মান রেখেই তা করেছে। বাজে লোক কেউ তাকে বিরক্ত করে নি।

বিকেলে আমাদের আর কোথায়ও বেরনো হ'ল না, যদিও আমার মনে হচ্ছিল, হাঁটতে খুব অসুবিধা হ'ত না। বাজার এলাকাটি দেখার জন্তে বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, আর ঐ সঙ্গে অভিজাত অঞ্চল। পরদিন শনিবার, অতএব কিরণ বিকেলে আমাদের সঙ্গী হবে এ রকম কথা হয়েছিল। অফিস থেকে ফিরবে ছুটোর পর, তারপর রওনা হব। ভয় হচ্ছিল শেষ বেলায় গিয়ে কতটুকু আর দেখা যাবে। তা ছাড়া আকাশের অবস্থা অনিশ্চিত, গত রাত্রেও খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিরণকে জিজ্ঞাসা করলাম আগামী কাল তার প্রবল জ্বর হবার সম্ভাবনা আছে কিনা। সে বললে আদৌ নেই। উল্টে তার এক মাসের পুত্রের জ্বর হয়ে গেল।

এদিকে আমার পাহাড় পথে চলার সাহস অনেকটা বেড়ে গেছে, কৌশল ইতিমধ্যেই আয়ত্ত করে ফেলেছি, কাজেই পরদিন সকাল বেলাটা আর ঘরে বসে কাটাতে ইচ্ছা হ'ল না, ঠিক করলাম কালীকিঙ্করের সঙ্গে বেরিয়ে যাব। সে দৈনিক ছুখানা করে ছবি আঁকছে ছু'বেলা। সুতরাং আমার সঙ্গে যাওয়া মানে তার একখানা ছবি নষ্ট হওয়া। কিন্তু একটা রফা করা গেল। চলতে চলতে যদি ছবির জায়গা মিলে যায় তা হলে সে বসে যাবে সেখানেই।

কিন্তু আমরা ছুর্গা-ভিলা ছেড়ে উপরের পথে একটুখানি নীচের দিকে নামতেই দেখি এক কাশ্মীরী মুসলমান উঠে আসছে উপরের দিকে। দেখতে প্রায় আবছুল গফফার খাঁয়ের মতো, তেমনি দীর্ঘদেহ এবং সুন্দর। হাতে দড়ি, পিঠে শূন্ত থলে, শক্তিশালী পুরুষ, কিন্তু তবু অভাবের ছাপ তার সর্বাঙ্গে। তাকে দাঁড়াতে বললাম, অত্যন্ত অনুগতের মতো দাঁড়াল ক্যামেরার সম্মুখে। কালীকিঙ্করও একটা স্কেচ এঁকে নিল। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কাজ মেলে না, খেতে পায় না ভাল করে। তাকে কিছু পয়সা দিলাম, কিন্তু মনে হ'ল এটি তার পক্ষে একেবারেই আশাতীত। সে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে তার বহু ছুঃখের কথা আমাদের শোনাল। মনে হ'ল যেন কত কাল সে মানুষের মুখ থেকে একটি অনুকম্পাপূর্ণ কথা শোনে নি।

এই একটি লোকের ছবি নিয়ে আমার এক বেলার কর্তব্য শেষ হ'ল এবং অল্প কিছু দূর ঘুরেই শিল্পীকে মুক্ত করে দিলাম। সিমলা-প্রকৃতি তাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করছে, কিন্তু বিদ্যুতের শত শত তারের বন্ধনীতে নিজেকে জড়িয়ে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখছে অধিকাংশ জায়গাতেই। শিল্পীকে বললাম. যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে. কারণ বিকেলে আমরা শহর অঞ্চলে যাব। কিন্তু তার আর ফেরা হ'ল না যথাসময়ে। ইতিমধ্যে বেলা সাড়ে তিনটে আন্দাজ সময়ে কিরণ ও আমি বেরিয়ে গেলাম। আমি জানতাম সিমলা ভ্রমণ আজ বিকেলেই শুরু এবং শেষ, এর পর সুযোগ বা উৎসাহ কিছুই থাকবে না। তাই আমি অনেকগুলো ছবি তোলার উপযুক্ত ফিল্ম নিলাম পকেটে। ছুর্গা-ভিলা থেকে বেরিয়ে প্রথম বড় রাস্তা ধরতেই সামর্থ্য প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে গেল এবং সেখান থেকে ঘোরা পথ এড়াবার জন্তে কিরণ আমাকে যে পথে টেনে নিয়ে চলল সে পথে সিমলায় অন্তত ছ'মাস হাঁটা অভ্যাস করে সব শেষে উঠা উচিত। ছুর্ভাগ্য বশত: আমাকে প্রথমেই উঠতে হ'ল সেই পথে। ছু'তিন মিনিট উঠেই মনে হ'ল সিমলায় অন্ধকার নেমে আসছে। অন্ধকার সত্যিই নামছিল আকাশ-পথে। বর্ষার মেঘ মাথার উপরে, ছু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে গায়ে। তখন যুদ্ধের সময়ের রেল-কর্তৃপক্ষ প্রচারিত কয়েকটি বিজ্ঞাপন আমার মানস চোখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার একটি হচ্ছে "ট্র্যাভেল হোয়েন ইউ মাষ্ট।" অর্থাৎ নিতান্ত জরুরি হলে তবেই ভ্রমণ করো। নিজেকে প্রশ্ন করলাম—এই অপরাহ্ণ ভ্রমণটা কি সত্যই জরুরি ছিল ? মন বলল, শুধু এ ভ্রমণ নয়, ল্যান্সডাউন ভ্রমণ এবং সিমলা ভ্রমণ সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং উদ্দেশ্যহীন।

মনে হচ্ছিল যেন সমস্ত জীবনে এর মত অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ আর করি নি। পথের এক ধারে তারের বেড়া ছিল, সেই তার ধরে উঠতে পারলে কিঞ্চিৎ সুবিধা হ'ত, কিন্তু তা হ'ল না, কারণ উপরে ওঠার চেয়েও নিচে নামার যাত্রী বেশি ছিল এবং তার ছিল তাদের দখলে।

বৃষ্টি পড়ছিল টিপ টিপ করে, মনে হচ্ছিল যেন এক যুগ কেটে গেছে এরই মধ্যে। অবশেষে উঠে এলাম সমতল ক্ষেত্রে, কালীবাড়ির সীমানায়। ঐখানে একটুখানি ঘুরে এবং বিশ্রাম করে অনেকটা আরাম বোধ হ'ল। কালী-বাড়ি থেকে নিচের দৃশ্য অত্যন্ত চমৎকার। কঠিন তারের বাধা না থাকলে এইখানে কিছু ভাল ছবির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দৃশ্যের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম, ছুঃখ ছিল না। তাই ওখান থেকে বেরিয়েই পথের ও পথের পাশের মানুষের ছবি তোলা শুরু করে দিলাম। কাপড়-কাচা তরুণী থেকে তামাক টানা বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা সবাই হাসি মুখে আমার উদ্দেশ্য সাধনে সহযোগিতা করল। আকাশে মেঘ বহু পূর্বেই কেটে গিয়ে চার দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আমরা এগিয়ে চলেছি ম্যালের দিকে। বাড়িগুলি পথের পাশে ছবির মত লাগছে। ক্রমে অভিজাত অঞ্চলের চিহ্ন ফুটে উঠছে। পুরুষেরা সাহেবী ও মেয়েরা মেম সাহেবী ভঙ্গীতে চলাফেরা করছে। মেয়েদের রং মাখার বাড়াবাড়িটা অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই এংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সমান পর্যায়ে উঠেছে। এটি খুব বেশি দিনের ঐতিহ্য বলে মনে হয় না দেখে। হয় তো মেমসাহেব-দের রাজত্বকালে ইচ্ছা ও অভ্যাসটা কিঞ্চিৎ চাপা ছিল, তাদের প্রভাব কেটে যাবার পর ইচ্ছাটা অবাধ হয়ে উঠেছে

কিন্তু অভ্যাসটা এখনও পাকা হয় নি। কিংবা "স্বাধীন ভারতে প্রথম রং মাখা" এই মনোভাব আছে এর মূলে— কাজেই বাড়াবাড়িটা সাময়িক বলে ধরা যেতে পারে। কিংবা হয় তো আমারই ভুল, পিছিয়ে-পড়া কলকাতা শহর থেকে এসে হঠাৎ এ সব নতুন মনে হচ্ছে। যারা আড়াই টাকায় তিন শিশি সুগন্ধ তেলের সঙ্গে উৎকৃষ্ট তিনটি হাতঘড়ি বাংলা দেশে বিক্রি করে ধনী হয়, অথবা সর্ব্বদুঃখবিনাশী ম্যাজিক আংটি বাঙালীর কাছে দু'টাকায় বিক্রি করে বাঙালীর দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে, তারা বাঙালীর অপেক্ষা যে অনেক বেশি প্রগতিশীল এ বিষয়ে সন্দেহ কি? অতএব আর চিন্তা না করে বিষয়টি মেনে নিলাম। তার পর চলল ঘোরার পালা। যখন পা আর চলে না তখন ভ্রমণ শেষ করে এক-খানা ছড়ি কিনে তারই সাহায্যে ঘরে ফিরে এলাম। পঞ্জাব দেখা আমার প্রায় শেষ হয়েছে, আর অল্প কিছু বাকী, সেটুকু রেলপথে পাওয়া যাবে। এ দিকে শিল্পী দৈনিক দুখানা করে রঙীন ছবি শেষ করছে, আর আমি শুয়ে শুয়ে সময় কাটিয়ে দিচ্ছি।

২৭ জুন রওনা হওয়া গেল। গাড়িতে আসন আমাদের রিজার্ভ করা ছিল এবং কালকার পর থেকে দু'রাত্রির ঘুমের মাশুলও অতিরিক্ত দেওয়া ছিল। আমাদের কামরায় আমরা দু'জন ভিন্ন আর চার জন স্থানীয় ব্যক্তি উঠলেন। তাঁদের তিন জন মিলিটারী ও এক জন সিভিল। তাঁরা গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাস খেলায় মন দিলেন। তার জন্যে দাবী হ'ল আমাদের উঠে অন্য দিকে যেতে হবে। এ দাবী পূরণ করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু তাঁরা মাঝখানের মালপত্রের উপর তাস বিছিয়ে চার জন এমন ভাবে বসলেন যাতে আমা-দের বেশ অসুবিধা হতে লাগল।

আরও দু'এক জন ভদ্রলোক উঠলেন, তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু এই চার জন বর্বরের মনে তাঁদের জন্যে কিছুমাত্র চিন্তা আছে বলে মনে হ'ল না। পাশের গাড়ি থেকে তাঁদেরই স্বদেশবাসী কয়েকজন মহিলা স্নানঘরে যাবার সময় তাঁদের পা এবং তাসের আসর ডিঙিয়ে যেতে বাধ্য হলেন, কিন্তু তাতেও তাঁদের অভিনব শিক্ষা এবং সংস্কৃতি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ'ল না। আমার সম্মুখস্থ সাহেববেশী খেলোয়াড় আমার পাশে পা তুলে দিলেন। আমাকেও বাধ্য হয়ে তাঁর পাশে পা তুলতে হ'ল, কিন্তু তাতে তাঁর আপত্তি হ'ল না। দেখলাম যাঁর যেমন খুশি অন্যের গায়ে পা তুলে বসছেন। এর মধ্যে যে অভদ্রতা আছে সে বোধই তাঁদের নেই—এটি বেশ বোঝা গেল। মহিলাদের প্রতিও তাঁদের কিছুমাত্র সৌজন্য নেই। রূপোর কোদালের মতো বকুবকে দাঁত সর্বদা হাঁ-করা মুখ থেকে বেরিয়ে আছে। যুগান্তরের বর্বরতার ছাপ চোখে-মুখে। অতএব সাহেবী পোষাক তাঁদের নিতান্তই অনুকরণ মাত্র, মুখের ইংরেজী বুলিও প্রভুভক্তির নিদর্শন মাত্র। তাসের আড্ডার চার জন লোক পরস্পর খুব যে পরিচিত তা মনে হ'ল না, এক ধর্মীও নয়, তাই এঁদের সাধারণ পাঞ্জাবীদের প্রতিনিধি হিসাবে দেখলে খুব যে ভুল দেখা হবে তা মনে হয় না। অবশ্য পাঞ্জাবীদের মধ্যে সংস্কৃতিবান লোকেরও দেখা পেয়েছি ইতিপূর্বে, কিন্তু তাঁদের দেশে বসে সেই সব দৃষ্টান্তকে ব্যতিক্রম ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।

কালকার গাড়িতে উঠে যেন মস্ত বড় একটা আরাম পেলাম। গাড়ির বাইরে আমাদের নামের কার্ড দেওয়া ছিল, অতএব সেটিকেই ঘুমের গাড়ি মনে করে আমরা শুয়ে পড়লাম। যতগুলো আসন তার অতিরিক্ত এক জন যাত্রীও ছিলেন না। আমার পাশে নীচে ছিলেন এক রেস্তারেঁও। তাঁর সঙ্গে আলাপ শুরু হ'ল। যতদূর মনে পড়ে রেস্তারেঁও মরিস্ তাঁর নাম। যুবক, এবং অত্যন্ত মধুরভাষী। পরস্পর পরিচয় প্রসঙ্গে শিল্পীর ছবিগুলি তাঁকে দেখালাম। হঠাৎ তাঁর হাত থেকে দু'একখানা ছবি পড়ে যাওয়াতে তিনি অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সেগুলি তুলে ক্রমাগত দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন যে যেভাবে সাজানো ছিল তা বোধ হয় নষ্ট হ'ল।

ভদ্রতা, সৌজন্য, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির একটা মধুর স্বাদ পেলাম সুদীর্ঘ ছ'ঘণ্টা পরে, মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। তারপর ছবি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে যে আলাপ হ'ল তাতে তাঁর এ সম্বন্ধে জ্ঞান দেখে বিস্মিত হলাম। রীতিমতো পণ্ডিত লোক, মুখে তাঁর প্রকৃত শিল্প-সমালোচকের ভাষা। আমি কথা তুললাম, চমৎকার ছবি আঁকতে পারেন এমন শিল্পী ইউরোপের সর্বত্রই সংখ্যায় অনেক বেশি। কি করে এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি বললেন স্কুল থেকেই ছোটদের চিত্রবিদ্যার সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং ওসব দেশে সচিত্র সাময়িকপত্র এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ছবির চাহিদা খুব বেশি, সুতরাং শিল্পীদের মধ্যে প্রতি-যোগিতাও খুব বেশি। তা ভিন্ন ছবির গ্যালারিগুলিতে সবাই সবসময় ভাল ছবি দেখার সুযোগ পায়, কাজেই শিল্পীর চোখ এবং মন তৈরি হবার সুযোগ থাকে সবারই। তবে আজকাল যুদ্ধের পরে গোড়া থেকেই স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয় পৃথক করে দেওয়া হয়েছে, তাড়াতাড়ি কাজের লোক চাই দেশে এখন।

এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হ'ল তাঁর সঙ্গে। তিনি সকালে দিল্লী ষ্টেশনে নেমে গেলেন। দিল্লীর পর থেকে আবার বিনাটিকিটে ভ্রমণের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। একটি দশ বছরের মেয়ে আমাদের গাড়ির বাইরে পাদানির উপর দাঁড়িয়ে চলতে লাগল। ঘণ্টায় ৫৫ মাইল বেগে গাড়ি ছুটছে কিন্তু সে নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে আছে একটা পুঁটুলি হাতে নিয়ে।

তারপর আবিষ্কার করলাম (কানপুরে) যে আমাদের

গাড়িতে যে তিন জন মহিলা ও এক যুবক ছিলেন তাঁরাও ঐ পথের পথিক।

তারপর আবিষ্কার করলাম আরও ভয়ানক একটা জিনিস—মোগলসরাই ষ্টেশনে। আমরা দু'জনে ঘুমের গাড়ির জন্যে মোট চল্লিশ টাকা দেওয়া সত্ত্বেও ঘুমের গাড়ি আমাদের আদৌ দেওয়া হয় নি—শুধু বসার জায়গা রিজার্ভেশন মাত্র এবং তার জন্যও পৃথক টাকা দেওয়া ছিল। ফিরে এসে রেলকম্পানীকে চিঠি দিয়েছিলাম অভিযোগ করে, আজও (১৬-৯-৪৯) তার উত্তর পাই নি।

বাড়ি [illegible] সাত দিন পরে কিরণ লিখছে—সিমলা এখন অদ্ভুত সুন্দর হয়ে উঠেছে, রঙে রঙে ছেয়ে গেছে সব পাহাড়। ফণী লিখছে—সমস্ত সিমলাই যেন সুপার-টার্ণার।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন—১৯৪৯

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

এতদিনে ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কিং আইন পাশ হওয়ায় (১৯৪৯ সনের ১০নং আইন) প্রকৃতই দেশের একটা অভাব দূর হইল। ১৯১৩-১৭ সনের ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের বিপর্য্যয় হইতেই ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত আইনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ১৯৩১ সনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত আইনের সুপারিশ করেন। অবশ্য উক্ত কমিটির বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ কোম্পানী-আইনের সংশোধন করিয়া ব্যাঙ্কসম্পর্কীয় কয়েকটা ধারা সন্নিবেশিত করিলেই উহা কার্য্যকরী হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। তদনুযায়ী ১৯৩৬-৩৮ সনে ভারতীয় কোম্পানী-আইন সংশোধন করিয়া ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত কয়েকটি ধারা (২৭৭ এক হইতে ২৭৭ এন্) জুড়িয়া দেওয়া হয়। ১৯৩৪ সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন পাশ হয় এবং ১৯৩৫ সনের ১লা এপ্রিল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্য আরম্ভ হয়। উক্ত আইন অনুযায়ী তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি কতকটা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আওতায় আসে, কিন্তু তাহাও এত গৌণভাবে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গোড়া হইতেই এদেশের জন্য একটি ব্যাঙ্ক আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কারণ ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব যথেষ্টই ছিল। এদেশের ব্যাঙ্ক উন্নয়ন বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অনেককিছু আশা করা গিয়াছিল। বিশেষতঃ কৃষিঋণ বিষয়ে ভারতবাসী মাত্রেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে, যথেষ্ট সাহায্য পাইবার আশা করিয়াছিল। যে দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষির উপর নির্ভরশীল সে দেশের আর্থিক কাঠামো মহাজন-মুদী-স্বর্ণকারের উপর কিছুতেই ছাড়িয়া দেওয়া যায় না—এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। অথচ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইতে দেখা গেল না। মুষ্টিমেয় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক, উপরের স্তরের ব্যবসায়ী ও শিল্পীগণের সহায়ক হইলেও নিম্নস্তরের বিরাট কৃষক-সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পিকর্ম্মীগণ পূর্ব্বের ন্যায় অসহায় অবস্থাতেই পড়িয়া রহিল। এদিকে নানারকম লোকের হাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক নামীয় এক ধরণের প্রতিষ্ঠান দেশময় গজাইয়া উঠিল। এই সকল ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠাতাগণের ব্যাঙ্ক-সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা এবং ব্যবসায়ের সাধারণ সততা এ দুয়েরই যথেষ্ট অভাব ছিল। ফল যাহা দাঁড়াইল তাহা এদেশের ব্যাঙ্কের ইতিহাসের এক করুণ কাহিনী। বহু নব-প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়া দেশময় এক বিরাট বিপর্য্যয়ের এবং দেশবাসীর মনে অবিশ্বাসের সৃষ্টি করিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৩৯ সনে ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত আইনের একটি খসড়া গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করে, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকারকর্তৃক কোন আইন প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু সাময়িকভাবে বিশেষ ব্যবস্থা নিতান্তই দরকার বোধে ১৯৪২ এবং ১৯৪৪ সনে কোম্পানী আইনের সংশোধন করা হয়। কিন্তু দেশের সর্ব্বত্র ব্যাঙ্কের অবস্থার অবনতির দরুন গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৪ সনের নভেম্বর মাসে ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত আইনের খসড়া কেন্দ্রীয় আইন-সভায় উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ইতিমধ্যে আইন-সভা ভাঙিয়া দেওয়ায় ১৯৪৬ সনের মার্চ্চ মাসে আবার আইনের খসড়া উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু এই বিলটিও গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে প্রত্যাহার করেন। ঘটনার ক্রমপরিবর্ত্তনের জন্যই এইরূপ করা দরকার হইয়াছিল। এই স্বল্পকালের মধ্যে ১৯৪৬ সনে (২৭ নং আইন) ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলির ব্রাঞ্চ বা শাখা খোলার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য, এবং এই সনেই (১৯৪৬ সনের ৪নং) ব্যাঙ্ক পরিদর্শন ও তদন্ত সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বাড়াইয়া একটি অর্ডিনান্স জারি হয়। ১৯৪৭ সনে (১৯ নং) আর একটি অর্ডিনান্স দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৮ ধারা সংশোধন করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই অধিকার দেওয়া হয় যে, উহা যে-কোন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ককে যে-কোন বন্ধকী উপযুক্ত মনে করিলে উহার উপরে কর্জ্জ দিতে পারিবে। কয়েকটি তপশীল-

ভুক্ত ব্যাঙ্ক কেন পড়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদিগকে উপযুক্ত সময়ে অর্থসাহায্য করে নাই এবং ঐরূপ সাহায্য পাইলে ব্যাঙ্কগুলির কাজ হয়ত বন্ধ করিতে হইত না—এইরূপ জনমত প্রকাশ পাওয়ায়, গবর্ণমেন্ট উক্ত অর্ডিনান্স জারি করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি সঙ্কটকালে যাহাতে আরও বেশী সাহায্য পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করেন।

১৯৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে নূতন করিয়া আবার ভারতীয় আইন সভায় ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত আইনের খসড়া উপস্থাপিত করা হয়, এই বিল সম্বন্ধে জনমতও গ্রহণ করা হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, গত ১৯৩৯-৪৭ এই কয় বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই খসড়া মূল খসড়া হইতে অনেক উন্নত ও ব্যাপক ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং ইতিমধ্যে সাময়িকভাবে কোম্পানী আইন বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন বা অর্ডিনান্স জারি করিয়া যেভাবে আইনের সংশোধন বা পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছিল তৎসমুদয়ই এই নূতন আইনের খসড়ায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত ১৯৩৬-৩৮ সনের সংশোধিত কোম্পানী আইনের সকল ধারাই এই নূতন আইনে পুনঃসন্নিবেশিত হইয়াছিল। ১৯৪৯ ফেব্রুয়ারী মাসে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ডোমিনিয়ান আইন-সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং ১০ই মার্চ্চ তারিখ গবর্ণর জেনারেলের সম্মতিক্রমে আইনে পরিণত হইয়াছে। এই আইন দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত বিধানগুলি একাধারে সন্নিবেশিত ও আবশ্যকমত সংশোধিত হইয়াছে। .

এই নূতন আইনের ব্যবস্থাগুলি বিবেচনা করা যাক—

ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর সংজ্ঞা

এই আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী বা ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য। সুতরাং প্রথমেই 'ব্যাঙ্ক' কাহাকে বলে বা ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা কি তাহা জানা প্রয়োজন। কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দেওয়া কোন দেশের আইনের পক্ষেই সহজ হয় নাই, বিশেষতঃ আমাদের দেশে ত' নয়ই। কারণ এখানে 'ব্যাঙ্ক'-এর নামে অনেকেই অনেক রকম ব্যবসা চালাইয়া থাকে। সুতরাং বাস্তবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই আইনে বলা হইয়াছে যে, যে সকল ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কিং বা লগ্নির জন্য কোন প্রকার চল্‌তি বা স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিবে তাহারাই এই আইনের আওতায় আসিবে। অবশ্য সমবায় প্রতিষ্ঠান বা ব্যাঙ্ক এই আইনের আওতায় পড়িবে না প্রথমেই তাহা বলা হইয়াছে (প্রথম অংশ—৩ ধারা)। যে সকল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতায় পড়িবে (অবশ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যতীত) সেগুলি ছাড়া অপর কোন প্রতিষ্ঠান 'ব্যাঙ্ক' 'ব্যাঙ্কার' বা 'ব্যাঙ্কিং' শব্দ তাহাদের নামের অংশরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না (৭ ধারা)। ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান কি প্রকারে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারিবে (দ্বিতীয় অংশ ৬ ধারা) তাহা বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে এবং স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে উহা 'ম্যানেজিং এজেন্ট' রূপে কোন কোম্পানীর কার্য্য করিতে পারিবে না (৬ বি ধারা)। উল্লিখিত ৬ ধারার ১৫টি উপধারায় বর্ণিত কার্য্যাবলী ছাড়া ব্যাঙ্কিং কোম্পানী অপর কোন কার্য্য করিতে পারিবে না (৬ (২) ধারা)। আইনের ৮ ধারায় আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে 'প্রত্যক্ষে' বা 'পরোক্ষে' মালের কেনা-বেচা (যাহা অন্যান্য ব্যবসায়ীর কাজ) ব্যাঙ্ক করিতে পারিবে না। তবে সাময়িকভাবে ব্যাঙ্কের নিজ বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় সম্পর্কে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না। ইহার ব্যবস্থাও আছে। পুরাতন ব্যাঙ্কের পক্ষে এরূপ কার্য্য শেষ করিবার জন্য আইনে নির্দ্দিষ্টভাবে সময় (সাত বৎসর) বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে উহা সম্ভব না হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আরও পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবে।

কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম

নিয়ম হইয়াছে যে, মানেজিং এজেন্ট দ্বারা ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইতে পারিবে না এবং কোন ব্যাঙ্কও ম্যানেজিং এজেন্টের কার্য্য করিতে পারিবে না। যিনি কখনও দেউলিয়া হইয়াছেন বা পাওনাদারগণের দেনা শোধ না করিতে পারিয়া রফা করিয়াছেন (Compounded with creditors) অথবা কোন আদালত কর্ত্তৃক দুর্নীতির (immoral torpitude) অপরাধে শাস্তি পাইয়াছেন তিনি ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী হইতে পারিবেন না। ব্যাঙ্কের কাজে কমিশন পাইবেন বা লাভের অংশীদার হইবেন, এ সর্ত্তেও কোন কর্ম্মচারী নিয়োগ চলিবে না। শুধু তাহাই নহে, ব্যাঙ্কের সাধ্যের অতিরিক্ত এবং সাধারণতঃ যে মাহিনা পাওয়া ও দেওয়া সম্ভব তাহা হইতে বেমানান বেশী মাহিনা দিয়া কর্ম্মচারী রাখা চলিবে না। কাহারও মাহিনা অসম্ভবরকম বেশী কিনা ইহার চরম বিচারের কর্ত্তা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। অপর কোন কোম্পানীর ডাইরেক্টর কিম্বা অপর কোন কার্য্যে নিযুক্ত বা ব্যাপৃত লোক কিম্বা ব্যাঙ্কের পরিচালনের জন্য পাঁচ বৎসরের অতিরিক্ত কালের জন্য নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকেই ব্যাঙ্কের কার্য্যে রাখা চলিবে না। কেহ ব্যাঙ্কের কার্য্যে ইতিমধ্যে নিযুক্ত হইয়া থাকিলে ১৯৪৪ সনের ১লা জুলাই হইতে তাঁহার কার্য্যকালের পাঁচ বৎসর গণনা করা হইবে। অবশ্য ঐ পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে ডিরেক্টারগণ কোন ব্যক্তিকে আবার অনধিক পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এই নিয়ম আধিকারিকগণের (officer) সম্বন্ধে প্রযোজ্য, সাধারণ করণিকের (clerk) উপর প্রযোজ্য নহে।

আইনের ১০ম ধারার উপরোক্ত বিধানসমূহ হইতে দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্মচারী নিয়োগ, তাহাদের গুণাগুণ বিচার,

মাহিনা ও কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাকালের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেও গত তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন কয়েকটি কঠোর বিধান করা হইয়াছে এবং এ বিষয়ের চরম বিচারের ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর বর্ত্তিয়াছে।

মূলধন

এদেশের অল্প মূলধনে স্থাপিত অনেক ব্যাঙ্কের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে—এজন্য যখন ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের প্রথম খসড়াটি প্রস্তুত হয় তখন হইতে এই বিষয়ে একটু কড়াকড়ি দেখা গিয়াছিল। সাধারণভাবে ইহার সমালোচনায় বলা হইয়াছিল যে, মূলধন সম্পর্কে দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একটু সুবিধা না দিলে উহাদের পক্ষে কাজ চালানো অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে এবং হয়ত আইনের কড়াকড়ির জন্য ইহাদের অনেককে কারবার গুটাইতে হইবে। ক্ষুদ্র সুপরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি—বিশেষতঃ যেগুলি পল্লী-অঞ্চলে কার্য্য করিতেছে, উঠিয়া যায় ইহা কাহারও অভিপ্রেত ছিল না—এজন্য শেষ পর্য্যন্ত যখন ব্যাঙ্ক আইন পাশ হইল তখন এই সকল ছোট ব্যাঙ্কগুলিও যাহাতে টিকিয়া থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে অথচ প্রথম প্রস্তাবের মূল নীতির কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।

আইনের ১১ সংখ্যক ধারার বিধানগুলি এইরূপ—

অভারতীয় ব্যাঙ্ক

এই আইন কার্য্যকরী হইবার তিন বৎসরের মধ্যে বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতিসাপেক্ষ আরও এক বৎসর-মধ্যে, কোন অভারতীয় ব্যাঙ্কের মূলধন অন্তত পনর লক্ষ এবং ইহাদের কার্য্যস্থল বোম্বাই বা কলিকাতা শহরে হইলে কুড়ি লক্ষ টাকার কম হইলে চলিবে না। এই সমগ্র মূলধন নগদ বা অবন্ধকী গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে নিয়োজিত ভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে হইবে। কোন কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইলে পাওনাদারগণের প্রথম দাবি হইবে এই গচ্ছিত টাকার উপর। পুরাতন অভারতীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে উপরোক্ত নিয়ম প্রযোজ্য। কোন নূতন অভারতীয় ব্যাঙ্ককে উক্ত মূলধনের টাকা জমা দিয়া তবে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

ভারতীয় ব্যাঙ্ক

যে সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যস্থল একটি মাত্র—আর তাহাও আবার কলিকাতা বা বোম্বাই শহরে নহে তাহাদের মূলধন ও রিজার্ভ মিলাইয়া (value) অন্ততঃ ৫০,০০০ টাকা হইবে।

যে সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যস্থল একটি মাত্র, কিন্তু তাহা

মায়ের কর্ত্তব্য

শিশুপালনের সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন শিশুদের দৈহিক সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি$_1$, বি$_2$র সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দন্তোদ্গমের সময়, সেবন করান উচিত।

বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী:—শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্ণতা, দুধ তোলা পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, রুগ্নতা, ব্রঙ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি।

শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য

বিবটন

একটি পূর্ণাঙ্গ টনিক

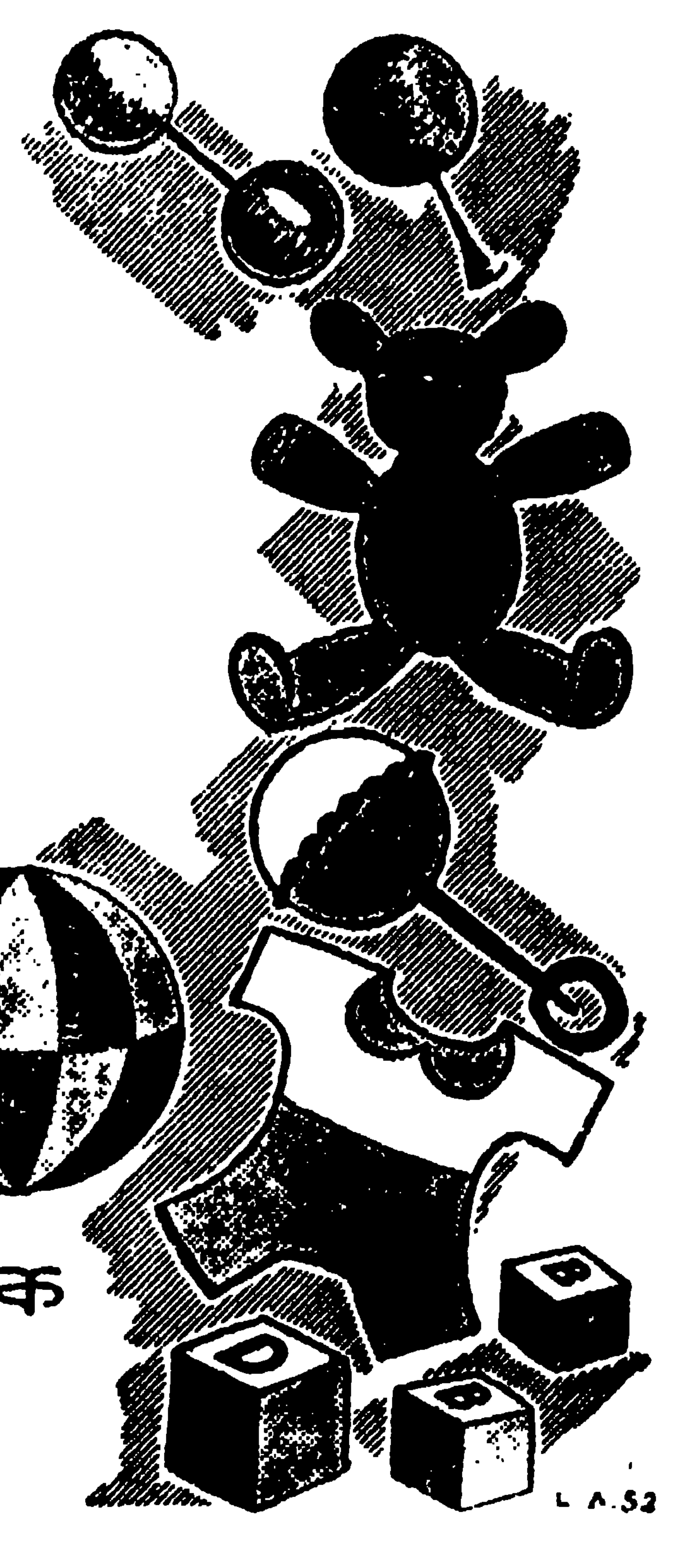

লিষ্টার এণ্টিসেপটিকস্ ০ কলিকাতা

L.A.52

কলিকাতা বা বোম্বাই সহরে অবস্থিত তাহাদের মূলধন এবং রিজার্ভ মিলাইয়া অন্ততঃ ৫,০০,০০০৲ টাকা হইবে।

যে সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যালয় একাধিক প্রদেশে এবং কলিকাতা ও বোম্বাই এই দুইটি শহরেই যাহাদের কার্য্যালয় অবস্থিত তাহাদের মূলধন এবং রিজার্ভে মিলাইয়া অন্ততঃ ১০,০০,০০০৲ টাকা হইবে।

যে সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যালয় একটি মাত্র প্রদেশে অবস্থিত অথচ তাহা কলিকাতা বা বোম্বাই সহরে নহে তাহাদের প্রধান কার্য্যালয়ের জন্ম মূলধন ও রিজার্ভ মিলাইয়া অন্ততঃ ১,০০,০০০৲ টাকা হইবে এবং জেলার মধ্যেকার অন্যান্য প্রত্যেক শাখার জন্য ১০,০০০৲ টাকা, জেলার বাহিরে, কিন্তু প্রদেশের অন্তর্গত প্রত্যেক শাখার জন্য ২৫,০০০৲ টাকা প্রয়োজন হইবে, তবে এরূপ ব্যাঙ্কের মোট মূলধন ৫,০০,০০০৲ টাকার বেশী প্রয়োজন হইবে না।

যে সকল ব্যাঙ্কের একটি বা একাধিক কার্য্যালয় একটি মাত্র প্রদেশে অবস্থিত, কিন্তু উহা কলিকাতা বা বোম্বাই শহরে স্থাপিত সেই সকল ব্যাঙ্কের মূলধন ও রিজার্ভ মিলাইয়া অন্ততঃ ৫,০০,০০০৲ টাকা হইবে এবং অতিরিক্ত প্রত্যেক শাখার জন্য ২৫,০০০৲ মূলধনের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু মোট মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ১০,০০,০০০৲ টাকার বেশী প্রয়োজন হইবে না।

এখানে বলা আবশ্যক যে, মূলধন বলিতে আদায়ীকৃত মূলধন (paid up capital) বুঝাইবে এবং যেখানে মূলধন সিকিউরিটিতে বা স্বর্ণে নিয়োজিত সেখানে মূল্য (value) বলিতে প্রকৃত অর্থাৎ বিনিময়যোগ্য (exchangeable value) মূল্য বুঝাইবে। অর্থাৎ যে মূল্য কেবল বইয়ের পাতায় লেখা আছে তাহাতেই চলিবে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাচাই করিয়া আদায়ী মূলধন এবং অবশিষ্ট লাভ বা রিজার্ভের প্রকৃত মূল্য যাহা নির্দ্ধারণ করিবে তাহাই গ্রহণীয় হইবে।

এই ব্যবস্থাদ্বারা ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলির অন্ততঃ সর্ব্বনিম্ন মূলধনের কাঠামো ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র অথচ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি (যাহাদের সংখ্যা সমগ্র ভারতের মোট ব্যাঙ্ক-সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ) যাহাতে রক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই বিষয়ে যে চরম নির্দ্ধারক করিয়া ভুল বা ভুয়া হিসাবরক্ষার পথ বন্ধ করা হইয়াছে তাহাও ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের পক্ষে কল্যাণজনক।

অনুমোদিত, বিক্রীত এবং আদায়ীকৃত মূলধন

আইনের ১২ সংখ্যক বিধান অনুযায়ী আদায়ীকৃত মূলধন (paid up capital) অন্ততঃ বিক্রীত (subscribed) মূলধনের অর্দ্ধেক এবং তাহা আবার অনুমোদিত (Authorized) মূলধনের অর্দ্ধেক হইতে হইবে, অন্যথা ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবে না। ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের অংশ (Share) কেবলমাত্র সাধারণ অংশ (ordinary Share) হইবে। ১৯৪৪ সনের ১লা জুলাই-এর পূর্ব্বে কোন প্রেফারেন্স সেয়ার বা সুদবাহী অংশ বিক্রয় হইয়া থাকিলে তাহা অবশ্য গ্রাহ্য হইবে। অংশ, সাধারণ বা সুদবাহী যাহাই হউক প্রত্যেক অংশীদারই দেয় মূলধনের অনুপাতে কোম্পানীতে ভোটের অধিকারী হইবেন। কিন্তু কোন একজন অংশীদারের ভোট মোট ভোটের শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী হইবে না। যে সকল ব্যাঙ্ক ১৯৩৭ সনের ১৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে সমিতিভুক্ত হইয়াছে তাহাদিগকে এই ধারার ব্যবস্থা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

অংশ বিক্রয় প্রভৃতি

অংশ বিক্রয়ের উপরে শতকরা আড়াই টাকার অতিরিক্ত কমিশন দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্যাঙ্কের অনাদায়ী মূলধন রেহান বন্ধ করা বেআইনী হইয়াছে। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময়ে অংশ বিক্রয়ের কমিশন, দালালী, ক্ষয়ক্ষতি প্রভৃতি যে সকল প্রাথমিক ব্যয় হয়—যাহার জন্য কোন পাওনা বা সম্পত্তি (Assets) নাই, তাহা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে অংশীদারকে লভ্যাংশ দেওয়া আইনবহির্ভূত। যিনি এক ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর আছেন তিনি অন্য কোন ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর হইতে পারিবেন না ইহাও আইনের বিধান।

বণ্টনীয় লভ্যাংশ

প্রত্যেক ব্যাঙ্কিং কোম্পানীকে একটা রিজার্ভ ফণ্ড রাখিতে হইবে এবং এই তহবিলে প্রত্যেক বৎসর নিট লাভ হইতে অন্ততঃ শতকরা কুড়ি ভাগ সরাইয়া রাখিতে হইবে এবং এইরূপ না করিয়া অংশীদারগণের মধ্যে কোন লভ্যাংশ বণ্টন করা যাইবে না। যতদিন না রিজার্ভ আদায়ী মূলধনের সমান হয় ততদিন এইরূপে রিজার্ভ গঠন চলিতে থাকিবে।

নগদ তহবিল

তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যতীত প্রত্যেক ব্যাঙ্ক নিজের তহবিলে বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অথবা উভয়ে মিলাইয়া চলতি ও স্থায়ী

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ
"ভেরোনা হেলমিন্থিয়া"
শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় "ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুবিধা দূর করিয়াছে।
মূল্য—৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ—১৮০ আনা।
ওরিয়েণ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
৮।২, বিজয় বোস রোড, কলিকাতা—২৫

নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে

লেডি চ্যাটার্লির প্রেম

ইউরোপীয় সাহিত্যজগতে 'লেডি চ্যাটার্লির লাভার'এর মতো আর কোনো উপন্যাস এতখানি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি বোধ হয় করেনি। ডি এইচ লরেন্সের এই উপন্যাসখানি নীতিবাদীদের কড়া শাসন সত্ত্বেও, আজো জীবন্ত হয়ে আছে, তার কারণ, বক্তব্য সম্বন্ধে যত মতভেদই থাক, লরেন্সের অসামান্য প্রতিভার বহ্নিদীপ্ত প্রকাশ এই বইএ কোনো মতেই অস্বীকার করবার নয়। লরেন্সের জীবনবেদ ইউরোপের কাছে যতটা দুর্বোধ আমাদের কাছে ততটা নাও হতে পারে, এই গ্রন্থে যে আমাদের তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সংগে তার মিল বড় কম নয়। তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শনে তান্ত্রিক মতবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। জীবন সাধনার গভীরতম উপলব্ধিকেই 'লেডি চ্যাটার্লির প্রেম'এ লরেন্স রক্ত মাংসের রূপ দিয়েছেন। প্রচলিত সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা ছাড়িয়ে কাম ও কামনা এখানে অপরূপ এক রহস্যগভীর পূজানুষ্ঠানের উপকরণ হয়ে উঠেছে। দাম ৩॥০

অনুবাদ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অচিন্ত্যকুমারের

ইন্দ্রাণী

সহস্রের জনতায় কোথায় কে একজন সামান্য যুবক, আর কোথায় কে একটি সাধারণ মেয়ে। কী এক আশ্চর্য মুহূর্তে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে আর চকিতে হাজার বছরের অন্ধকার ঘর আলো হয়ে যায়। সেই সামান্য যুবক সম্রাট হয়ে ওঠে আর সেই সাধারণ মেয়ে হয়ে ওঠে রাজেশ্বরী। কিন্তু কতদিনের সেই স্বপ্ন রচনা, সেই আকাশচারণ? আছে সংঘর্ষসঙ্কুল পৃথিবী, দৈনন্দিন প্রাণ ধারণের তিক্ততা। সেই সম্রাট যুবক তখন এক ভবঘুরে বেকার আর সেই রাজেশ্বরী মেয়ে এক শিক্ষয়িত্রী। আবার তারা বিচ্ছিন্ন, অপরিচিত। কিন্তু যে প্রদীপে একদিন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর আলো হয়েছিল, সে কি নেববার? জীবিকার চেয়ে জীবন কি বড় নয়? প্রয়োজনের চেয়ে বড় কি নয় প্রেম? সেই অপরাভূত প্রেমের গরিমাময় কাহিনীই এই উপন্যাস। দাম ২॥০

অচিন্ত্যকুমারের

বেদে

সাধারণ পরিভ্রমণ দেশ থেকে দেশে, আর এই পরিব্রজ্যা হৃদয় থেকে হৃদয়ে। মানুষের অন্তরে যে একজন গৃহহীন বৈরাগী বাস করছে এ তারই ঘর খোঁজার কাহিনী। কাছের মানুষ হয়েও কোথায় সে দূরে বসে আছে -- রূপে-রূপে সেই অপরূপার অনুসন্ধান। সংস্কারমুক্ত জীবনের অভিনব সংসার কামনা। য়ুরোপের সাহিত্যে যেমন নুট হামসুনের 'ওয়াণ্ডারার্স' বাংলা সাহিত্যে তেমনি এই 'বেদে'। বহু পৃথিবী পেরিয়েও যেমন আকাশ, তেমনি বহু প্রেম ও বহু প্রাপ্তি পেরিয়েও সেই অনির্বেয় আকাঙ্ক্ষা। বহু বাসনায় বিশ্বরমার উপাসনা। দাম ৩॥০

শচীন্দ্র মজুমদারের

পলাতকা

স্থান : এলাহাবাদ। কাল : ১৯৪২। পাত্রী : বহ্নিশিখার মতো এক বাঙালী মেয়ে। এ-মেয়ে বিজ্ঞানের ছাত্রী। দেশই তার দয়িত, দেশজোড়া আগুনের মধ্যে নিজের শিখাটুকুকে মিলিয়ে তার সার্থকতা। প্রয়োজনে কালভার্টের নিচে রাত কাটায়, পুরুষের ছদ্মবেশে ছাত্রাবাসে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু ছায়ার মতো অবিরাম তাকে অনুসরণ করে একদিকে গোয়েন্দা বাহিনীর পুলিশ, অপরদিকে লালসামত্ত এক পুরুষ। সেই তৃষ্ণার্ত আলিঙ্গন থেকে তার ঊর্ধশ্বাস পলায়ন। শচীন্দ্র মজুমদারের রোমাঞ্চকর রসঘন রচনা। দাম ৩

সিগনেট প্রেস ১০।২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২০

আমানতের যথাক্রমে শতকরা পাঁচ ও দুই ভাগ জমা রাখিবে এবং প্রত্যেক মাসের পনর তারিখের মধ্যে, পূর্ব্ব-মাসের প্রত্যেক শুক্রবার চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ কিরূপ ছিল ও তৎসম্পর্কিত ব্যাঙ্কের নগদ তহবিলের হিসাবের তিনখানি নকল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পাঠাইতে বাধ্য থাকিবে।

অপর প্রতিষ্ঠানে অর্থনিয়োগ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি লইয়া ব্যাঙ্কিং কোম্পানী অছিরূপে (undertaking and executing trusts, undertaking of the administration of estates as executors, trustees or otherwise) বা নিরাপত্তার জন্য দ্রব্যাদি গ্রহণ (providing of safe deposit vaults) করিতে কিম্বা ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত অন্যান্য আবশ্যক কার্য্য করিতে পারিবে। কিন্তু অপর কোন কোম্পানীর শতকরা ত্রিশ ভাগ বন্ধকী রাখিতে বা ক্রয় করিতে কিম্বা ব্যাঙ্কের নিজের আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের শতকরা ত্রিশ ভাগ এভাবে নিয়োগ করিতে পারিবে না। যদি এই আইন বলবৎ হইবার পূর্ব্বে কোন ব্যাঙ্ক ঐরূপ করিয়া থাকে তবে অবিলম্বে তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জানাইতে হইবে এবং উহার অনুমতি লইয়া অনধিক দুই বৎসরের মধ্যে আইন অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। এই আইন কার্য্যকরী হইবার এক বৎসরের পর কোন ব্যাঙ্কই উহার কোন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বা ম্যানেজারের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন কোম্পানীর অংশের বন্ধকগ্রহীতা, মর্টগেজগ্রহীতা বা মালিক হইতে পারিবে না।

এই বিধান দ্বারা যাহাতে অবাঞ্ছিত স্থানে ব্যাঙ্কের অর্থ-নিয়োগ না হয় এইরূপ ব্যবস্থাই করা হইয়াছে।

কর্জ্জ এবং অর্থনিয়োগে কড়াকড়ি

ব্যাঙ্ক নিজ অংশ বা শেয়ার বন্ধক রাখিয়া ধার দিবে না। কোন বন্ধক না রাখিয়া কোন ডিরেক্টারকে অথবা ডিরেক্টারের স্বার্থ রহিয়াছে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান ও প্রাইভেট কোম্পানীকে ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দিবে না। এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীতে কোন ডিরেক্টর অংশীদার ও অন্যভাবে স্বার্থসংযুক্ত, এমন কি জামিনদার হইলেও, ব্যাঙ্কের কর্জ্জ দেওয়া নিষেধ।

কোন ব্যাঙ্ক হইতে কোন প্রতিষ্ঠানকে বন্ধকী না রাখিয়া কর্জ্জ দিলে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে ব্যাঙ্কের কোন ডিরেক্টর, ম্যানেজিং এজেণ্ট, জামিনদাতা বা ডিরেক্টররূপে সংশ্লিষ্ট থাকিলে যে মাসে ঐরূপ কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী মাসের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে তাহা রিটার্ণ (return) দ্বারা জানাইতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রিটার্ণ পরীক্ষা করিয়া উক্ত ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য, ঋণ আদায়ের বা অপর কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আদেশ দিবে এবং যে সময়ের মধ্যে তাহা সম্পন্ন করিতে বলিবে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক তাহা মান্য করিতে বাধ্য থাকিবে।

শুধু তাহাই নহে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে ২১ সংখ্যক ধারার বলে যে-কোন ব্যাঙ্ককে ও ব্যাঙ্কগোষ্ঠীকে কি ভাবে কর্জ্জ দিতে হইবে সেই বিষয়ে নির্দ্দেশ দিতে পারেন এবং এই নির্দ্দেশ সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কসমষ্টি মানিতে বাধ্য। এমন কি কতটা কর্জ্জ দিতে হইবে, কি সুদ লইতে হইবে, কি বন্ধকী রাখিতে হইবে এবং কত মার্জ্জিন রাখিতে হইবে, এবিষয়েও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আদেশই চরম বলিয়া গ্রহণীয় হইবে। অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার্থেই এই সকল বিধিব্যবস্থা করিবে।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর লাইসেন্স গ্রহণ

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে আদেশপত্র (লাইসেন্স) না পাইলে কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানী কাজ করিতে পারিবে না। যে সকল ব্যাঙ্ক আইন পাশ হইবার সময় ব্যবসা করিতেছিল তাহাদিগকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ছয় মাস মধ্যে অনুমতি-পত্রের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। অবশ্য ইতিমধ্যে তাহারা ব্যবসা চালাইয়া যাইতে পারিবে।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আমানতকারীগণকে আবশ্যকমত জমার টাকা প্রত্যর্পণ করিতে সক্ষম কিনা অনুমতি দিবার পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহা দেখিবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এদিকেও লক্ষ্য রাখিবে যেন ব্যাঙ্কের পরিচালনে আমানতকারীগণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। এতদ্ব্যতীত অভারতীয়, বিদেশে সমিতিভুক্ত ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ইহাও দেখার প্রয়োজন হইবে যে, উক্ত ব্যাঙ্কের নিজদেশে ভারতীয় ব্যাঙ্কের ব্যবসা সম্পর্কে কোন বৈষম্যমূলক বিধান নাই এবং উক্ত ব্যাঙ্ক

অমৃতাঞ্জন
সর্ব্বপ্রকার বেদনায় আশুফল প্রদানে প্রত্যক্ষ কার্য্যকরী!
দাদের মলম
চর্ম্মরোগে পরমাণু-শক্তির ন্যায় কার্য্যকরী!
প্রস্তুতকারক-
অমৃতাঞ্জন লিমিটেড - পোষ্ট বক্স নং ৬৮২৫ কলিকাতা ৭

ভালো রান্না
খেয়ে যেমন তৃপ্তি
পরিবেশনেও
তেমনি...
অনেকের মতো আমিও
রসুই
দিয়ে রান্না করি
RASOI
VANASPATI
হিন্দুস্থান ডিভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্ঃ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা।
ম্যানেজিং এজেণ্ট ঃ এস. আর. সরকার অ্যাণ্ড কোং লিঃ
২,৫,১০,৩৭ পাউণ্ড
টিনে পাওয়া যায়।

এদেশের ব্যাঙ্ক-আইন সম্পর্কীয় যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধান পালন করিয়াছে।

অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ সর্ত্তাধীনে আদেশপত্র বা লাইসেন্স দিতে পারিবে এবং সর্ত্তাদি পূরণ না হইলে লাইসেন্স বাতিল করিতেও পারিবে। ইহা ব্যতীত লাইসেন্সের নিয়মাদি ভঙ্গ করিলে লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাইবে। যে সকল ব্যাঙ্ক এই আইন পাশ হইবার সময় হইতে ব্যবসা করিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে লাইসেন্স দিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রস্তুত না থাকিলে অর্থাৎ তাহাদের আইনসম্মত-ভাবে মূলধন প্রভৃতি না থাকার দরুন তাহারা লাইসেন্স পাইবার যোগ্য বিবেচিত না হইলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহাদিগকে অন্ততঃ তিন বৎসর এবং দরকার মনে করিলে আরও বেশী সময় দিতে পারিবে এবং ঐ সময়ের মধ্যেও যোগ্যতা অর্জ্জন না করিলে পরে লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।

কোন ব্যাঙ্কের লাইসেন্স বাতিল করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিবার অধিকার থাকিবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বিচারের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না।

এ স্থলে একটি বিষয় জানা প্রয়োজন যে, ভারতীয় বীমা-আইনে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লওয়া ব্যতীত বার্ষিক একটা ফি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ব্যাঙ্ক আইনে তাহা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট সুব্যবস্থাই করিয়াছেন।

শাখা বা ব্রাঞ্চ খোলা সম্বন্ধে ব্যবস্থা

আইনের ২৩ ধারায় ব্যাঙ্কের কার্য্যস্থল পরিবর্ত্তন ও নূতন আপিস খোলা সম্বন্ধে বিধি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। একই সহর বা গ্রামে কার্য্যস্থল পরিবর্ত্তন করা যাইবে, কিন্তু কোন নূতন শাখা খুলিতে হইলে লিখিত ভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি দরকার হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এরূপ আদেশ দিবার পূর্ব্বে ব্যাঙ্কের অবস্থা ও ইতিহাস, পরিচালন-ব্যবস্থা, মূলধন ও আয়ের অঙ্ক এবং যেখানে নূতন আপিস খোলার প্রস্তাব হইয়াছে সেখানে আদৌ সর্ব্বসাধারণের দিক হইতে নূতন ব্যাঙ্কের চাহিদা আছে কিনা বিচার করিয়া দেখিবে। অবশ্য সাময়িক ভাবে অনধিক এক মাসের জন্য ব্রাঞ্চ খুলিলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতির কোন প্রয়োজন হইবে না।

নগদে সম্পত্তি রাখার বিধান

এই আইন পাশ হইবার দুই বৎসর পরে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান মেয়াদ-শেষে উহার চল্‌তি ও স্থায়ী আমানতের অন্ততঃ কুড়ি ভাগ নগদে, সোনায় বা অবন্ধকী অনুমোদিত সিকিউরিটিতে (unencumbered approved security) নিয়োজিত রাখিতে বাধ্য থাকিবে। অবশ্য এই কুড়ি ভাগ সম্পত্তির মূল্য

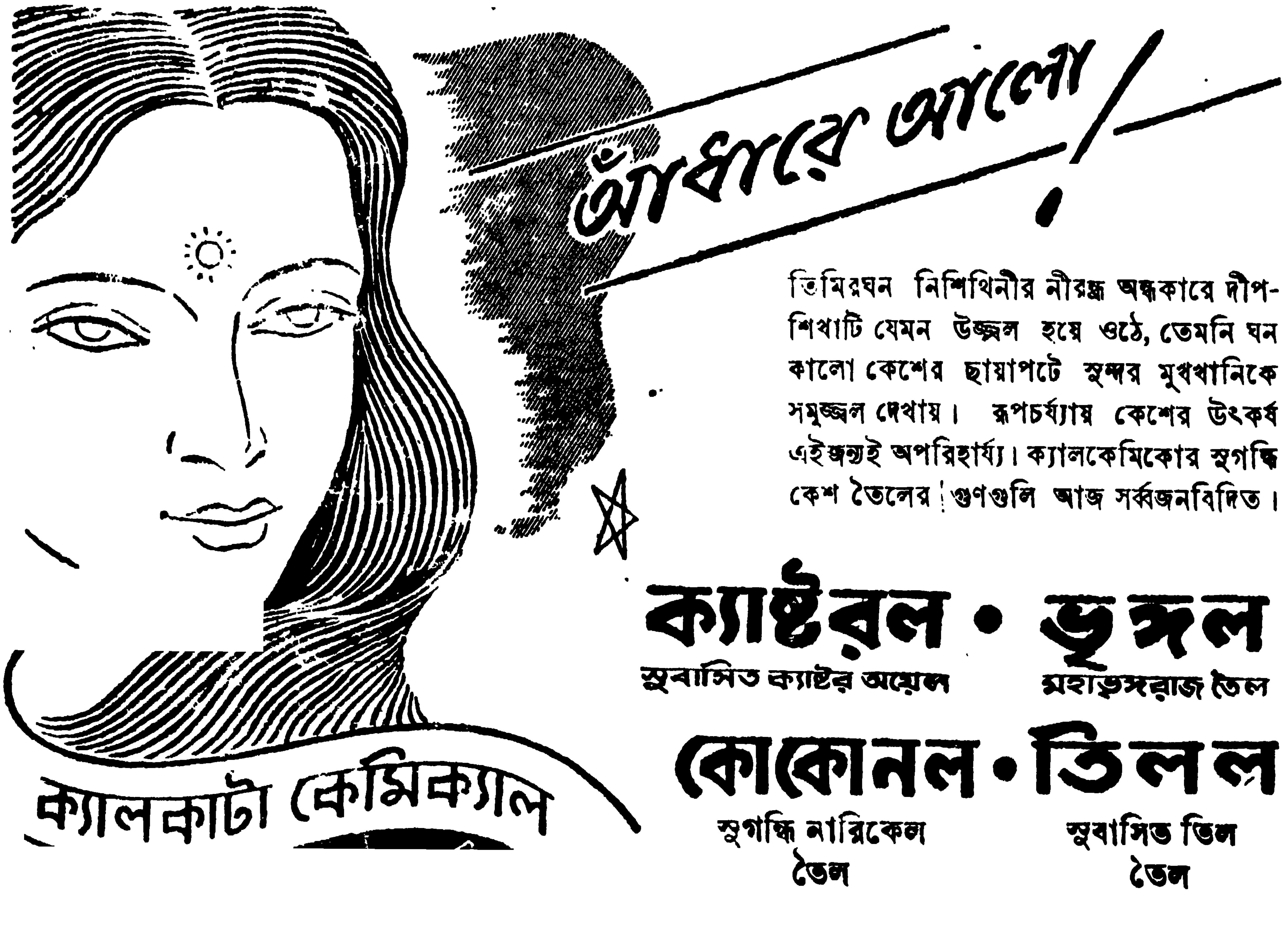

বাজারের চলতি দামে ধার্য্য হইবে। আমানতের হিসাবে আদায়ী মূলধন বা লাভ-ক্ষতির হিসাবের উদ্বৃত্ত অংশ ধরা হইবে না, এবং তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আইন অনুযায়ী যাহা জমা রাখিবে তাহাও এই ধারা অনুযায়ী কুড়ি ভাগের মধ্যেই ধরা হইবে। প্রতিদিনের হিসাবের লেন-দেনের উপর কড়াকড়ি আমানতকারিগণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছে।

প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ মার্চ্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের শেষ দিনে প্রত্যেক প্রদেশে ব্যাঙ্কের সম্পত্তি (assets) এরূপ ভাবে নিয়োজিত রাখিতে হইবে যাহাতে উহা চলতি ও স্থায়ী আমানতের শতকরা পঁচাত্তর ভাগের কম না হয়। যাহাতে কোন ব্যাঙ্কের সম্পত্তি আমানতকারীগণের স্বার্থের প্রতিকূলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরাইয়া না লওয়া যায় এই বিধান দ্বারা তাহাই করা হইয়াছে। ইহার অন্য উদ্দেশ্য প্রত্যেক প্রদেশের মূলধন অনেকটা স্থানীয় উন্নতির জন্য নিয়োগ করা।

হিসাব সম্পর্কিত বিধান

বৎসর শেষ হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রতি বৎসর, দশ বৎসর পর্য্যন্ত লেন-দেন হয় নাই (inoperative) এরূপ হিসাবের তালিকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে দাখিল করিতে হইবে। স্থায়ী জমার প্রত্যর্পণের তারিখ হইতে উহার দশ বৎসর গণনা করিতে হইবে।

প্রত্যেক প্রদেশে কোন ব্যাঙ্কের সম্পত্তি কিরূপে রক্ষিত আছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে তাহার মাসিক বিবরণ (returns) প্রদান করিতে হইবে।

ইহা ব্যতীতও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে-কোন ব্যাঙ্কের ব্যবসা-সম্পর্কিত তথ্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাহিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক উহা দিতে বাধ্য থাকিবে। এই সমস্ত তথ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আবশ্যক মনে করিলে সাধারণের হিতার্থে প্রকাশিত করিতে পারিবে।

প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে আইনের নির্দ্দেশিত ভাবে বৎসরান্তে উদ্বৃত্ত পত্র (balance sheet) ও লাভ-ক্ষতির হিসাব (profit and loss account) প্রস্তুত করিয়া যথারীতি হিসাবপরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হইবে। বৎসর শেষ হইবার তিন মাস মধ্যে হিসাব পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং ইহার তিনখানি নকল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে দাখিল করিতে হইবে। অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে হিসাব দাখিলের সময় আরও বাড়াইয়া দিতে পারিবে। এই পরীক্ষিত হিসাবের তিনখানি নকল জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের নিকটেও পাঠাইতে হইবে। বিদেশী ব্যাঙ্কিং কোম্পানীও প্রতিবৎসরের পরীক্ষিত হিসাব পরবর্ত্তী বৎসরের আগষ্ট মাসের প্রথম সোমবারের মধ্যে ভারতের

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ

(১৯৩০ সালে স্থাপিত)

হেড অফিস—৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

পোষ্ট বক্স নং ২২৪৭ ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শাখাসমূহ

লেকমার্কেট (কলিকাতা), সাউথ কলিকাতা, বর্দ্ধমান, চন্দননগর, মেমারী, কীর্ণাহার (বীরভূম), আসানসোল, ধানবাদ, সম্বলপুর, ঝাড়সুগুদা (উড়িষ্যা), ও রাণাঘাট।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

এইচ, এল, সেনগুপ্ত

যে যে স্থানে উহার ব্যবসা চলিতেছে এরূপ প্রত্যেক আপিসে সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ্যভাবে রাখিতে বাধ্য হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক তদন্ত

কোম্পানী আইনের ১৩৮ ধারার ব্যবস্থার বাহিরেও কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে-কোন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের বই, খাতাপত্র ও কার্য্যপ্রণালী এক বা একাধিক পরিদর্শক দ্বারা তদন্ত করাইতে পারিবে। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর কর্ম্মচারী মাত্রেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্তকারী পরিদর্শককে যাবতীয় সংবাদ ও তথ্য যোগাইতে বাধ্য থাকিবে। পরিদর্শনকারী (অনেকটা বিচারকের মত ?) হলপ করাইয়া যে-কোন ডিরেক্টর বা কর্ম্মচারীকে মৌলিকভাবে পরীক্ষা করিতে পারিবেন। ব্যাঙ্কের কার্য্য ও পরিচালন আমানতকারিগণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করা হইতেছে কি না রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহাই দেখিবে ও সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইবে। কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া ব্যাঙ্কবিশেষের ভবিষ্যতে জমা গ্রহণ বন্ধ করিতে পারিবেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে উক্ত ব্যাঙ্ক গুটাইবার (liquidate) জন্য আদেশ দিতে পারিবেন এবং এই সম্পর্কিত রিপোর্ট বা বিবরণী আবশ্যকবোধে সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

আইনের ৩৬ ধারায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা আরও ব্যাপক করা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ ব্যতীতই যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরাসরি যে-কোন ব্যাঙ্কের কার্য্যে হস্তক্ষেপ, উপদেশদান, অর্থসাহায্য, ডিরেক্টরগণ ব্যাঙ্কের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া যাহাতে সুব্যবস্থা করেন তাহার জন্য সভা আহ্বান প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারে এরূপ বিধান করা হইয়াছে।

প্রতি বৎসর দেশের ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবস্থা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করা ও উক্ত ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর কার্য্য বন্ধ ও গুটাইবার ব্যবস্থা

কোন ব্যাঙ্ক পাওনাদারের দেনা মিটাইতে অক্ষম হইলে সাময়িক ভাবে কোর্ট ঐ সম্পর্কে ব্যাঙ্কের অনুকূলে (অর্থাৎ দেনা পরিশোধের কার্য্য বন্ধ রাখিবার জন্য) সাময়িক আদেশ দিতে পারেন। কিন্তু এই সম্পর্কে চরম আদেশ দিবার পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক তদন্ত ও রিপোর্ট দরকার হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট দেখিয়া কোর্ট পূর্ব্ব আদেশ বহাল, বাতিল বা সংশোধন করিতে পারেন।

ভবিষ্যতে একমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কই ব্যাঙ্কের কারবার গুটানোর ব্যাপারে সরকারী লিকুইডেটর হইবে এবং এই সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের একীকরণ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুসন্ধান ও রিপোর্ট ব্যতীত কোন আদালতই ব্যাঙ্ক ও তাহার পাওনাদারগণের মধ্যে কোন আপোষ-রফা অনুমোদন করিবেন না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন আপোষ-রফা আমানতকারিদের স্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া রিপোর্ট দিলে কোর্ট তাহা গ্রাহ্য করিয়া রায় দিবেন।

অতঃপর কোন দুইটি বা ততোধিক ব্যাঙ্কিং কোম্পানী পরস্পর মিলিত হইতে চাহিলে সর্ব্বাগ্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লিখিত অনুমোদন দরকার হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন ব্যতীত ব্যাঙ্কের একীকরণ (amalgamation) আইনসম্মত হইবে না।

এই আইনের চতুর্থ ভাগে, উহার বিধান অমান্য করিলে নানারূপ জরিমানা ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং প্রায় প্রত্যেক ব্যবস্থায়ই রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কোম্পানী আইনের যে সকল সুবিধা প্রাইভেট কোম্পানীগুলি ভোগ করে এই আইন দ্বারা প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলিকে সেই সকল সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে (৪৯ ধারা)। এই আইন দ্বারা কতকাংশে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আইন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন, ভারতীয় কোম্পানী আইন বাতিল বা সংশোধন করা হইয়াছে। এক কথায় বলা যায় যে, এই আইন পাশ হইবার পরে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ও বীমা-ব্যবসায়ের মত অনেকটা সরকারকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইল। তবে এই নিয়ন্ত্রণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায়—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে (১লা জানুয়ারী ১৯৪৯ হইতে) সরকারী ব্যাঙ্ক। যদি এই ব্যাঙ্ক-আইন দ্বারা ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের মোড় ফেরে তবে দেশের শিল্প, বাণিজ্যের শ্রী ফিরিবে। জনসাধারণ নিশ্চিন্ত ভাবে দেশী ব্যাঙ্কে নিজেদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ আমানত রাখিতে পারিবে। তবে জানিয়া রাখা ভাল যে, কেবল আইন দ্বারাই কোন দেশে শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয় নাই। দেশের শিক্ষিত যুবকগণের মধ্য হইতে ভাল ব্যাঙ্কার তৈরি হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির মত আমাদের দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ ততটা সজাগ বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ বাঙালী ব্যাঙ্কারগণ নিজেদের ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির মোহে এখনও আচ্ছন্ন। দেশে ভাল ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করিতে হইলে এই মূল (key) ব্যবসায়কে দূরদর্শিতার সঙ্গে অনেকটা নিঃস্বার্থ ভাবে পরিচালন করা দরকার। অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ বিষয়ে ছোট-বড় সকল ব্যাঙ্ককেই সকল সময়ে সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রস্তুত থাকিবে। সর্ব্বসাধারণের টাকায় ব্যাঙ্ক চলে, সুতরাং তাহাদের আরও ব্যাঙ্ক-মনোভাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। ব্যাঙ্কের পরিচালক ও গ্রাহক উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় স্বাধীন ভারতের ব্যাঙ্ক ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে—ইহা আশা করা খুবই সমীচীন।

পুস্তক পরিচয়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা—প্রথম খণ্ড ১৮১৮-১৮৩০। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ (১৩৫৬)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১|০+৫৩০। মূল্য দশ টাকা।

১৩৩৯ সনে যখন এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ইহা বিদ্বজ্জন-সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ১৭ বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থের আরও দুইটি সংস্করণ বাহির হওয়ায় প্রমাণিত হইল যে, বাঙ্গালী জন-সাধারণও ইহার আদর করিতে শিখিয়াছে। যে-দেশে কবিতা ও গল্প-উপন্যাস ব্যতীত সাধারণতঃ অন্য কোন গ্রন্থ জনপ্রিয় হয় না, সে দেশে এই শ্রেণীর গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ গ্রন্থকারের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের জন্য যে সমুদয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, দেশবাসী যে তাহার মূল্য বুঝিয়াছে ইহা এ দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে বিশেষ আশার কথা।

বাংলার প্রাচীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' হইতে বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ ও বিষয় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পুরাতন পত্রের পৃষ্ঠা ঘাঁটিয়া এইরূপ সঙ্কলন করা যে কিরূপ আয়াসসাধ্য ব্যাপার, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। সংগ্রহ-কার্য্যেও গ্রন্থকার ঐতিহাসিকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে সমুদয় গুরুতর পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বঙ্গদেশ মধ্যযুগের সংস্কার ও সভ্যতা পরিহার করিয়া আধুনিক সভ্যতার অধিকারী হইয়াছে তাহার সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে হইলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শিক্ষা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের খুঁটিনাটি এমন অনেক ব্যাপার জানা দরকার যাহা প্রচলিত ইতিহাসে পাওয়া যায় না, কেবল সাময়িক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তাহার অনুসন্ধান মেলে। কিন্তু প্রাচীন সংবাদপত্র অতিশয় দুষ্প্রাপ্য; এবং সুলভ হইলেও তাহা হইতে এই সমুদয় উদ্ধার করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। এই জন্য প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে তথ্য সংকলন বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু এই গুরুতর কার্য্যের পথ-প্রদর্শক, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কেহ কেহ তাঁহার পূর্ব্বেও কোন সংবাদপত্রের সার সঙ্কলন করিয়া থাকিলেও এরূপ ব্যাপকভাবে ইতিহাসের সর্ব্ববিধ উপকরণ সংগ্রহ-কার্য্যে আর কেহ ব্রজেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বে রত হন নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের একটি বিশেষ স্মরণীয় যুগ। মানুষের ন্যায় জাতীয় জীবনেও কেবল বৎসরই কালের মাপ নহে, ভাব ও অভাবই প্রকৃত কালের মাপ। এ কথা বলিলে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে ১৩০০ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ—এই পাঁচ শত বৎসরে বঙ্গদেশের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ১৮০০ হইতে ১৯০০ এই এক শত বৎসরের পরিবর্ত্তন

তাহার অপেক্ষা অনেক গুরুতর। পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাসে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে যে ব্যবধান, আমাদের দেশেও এই দুই যুগের মধ্যে ব্যবধান ঠিক তদ্রূপ। সুতরাং এই এক শত বৎসরের বিস্তৃত ইতিহাস না জানিলে আমাদের দেশের এই গুরুতর পরিবর্ত্তনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অত্যন্ত অধিক। কারণ এই যুগের প্রকৃত ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। এই ইতিহাস লিখিতে হইলে যে মালমশলার প্রয়োজন তাহাও সংগৃহীত হয় নাই। এই জন্যই শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু এই বিষয়ে যাহা করিয়াছেন তাহার মূল্য অত্যন্ত বেশী। সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি যথাক্রমে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম ও বিবিধ—এই কয়টি প্রধান ভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। পরিশিষ্টে 'বঙ্গদূত' নামে সে যুগের আর একখানি সংবাদপত্র হইতে কিছু কিছু সংবাদ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সমুদয় সংবাদ হইতে যে ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় ভূমিকায় গ্রন্থকার তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার দ্বারা উদ্ধৃত অংশের ঐতিহাসিক মূল্য বুঝিবার পক্ষে পাঠকগণের বিশেষ সুবিধা হইবে। পরিশেষে গ্রন্থোক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং যে সকল শব্দ বর্ত্তমান কালে সুপরিচিত নহে, অকারাদিক্রমে তাহার তালিকা ও অর্থ দেওয়া হইয়াছে। বিস্তৃত বিষয় সূচীটি গ্রন্থোক্ত নানা বিষয় সত্বর নির্ণয় করিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিবে। আমরা এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

গান্ধী পন্থায় গ্রাম-গঠন—শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার বসু। আই, এ, পি, কোং লিমিটেড, ৮নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১২৪ পৃষ্ঠা। মূল্য—দেড় টাকা মাত্র।

এই পুস্তকখানির লেখক ত্যাগব্রতী। দক্ষিণেশ্বর অন্নদা ঠাকুরের আশ্রমে তাঁহার কৈশোর কাটে; যৌবনে (১৯২৯-৩০ সনে) খাদি প্রতিষ্ঠানে গঠনমূলক কার্য্যে তাঁহার হাতেখড়ি হয়; তারপর তিনি প্রায় ১৫ বৎসর ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় পল্লী-সংগঠন কার্য্যে কাটাইয়াছেন। আজ প্রৌঢ় বয়সে তিনি গান্ধীজীর একজন নৈষ্ঠিক শিষ্য; তাঁহার গঠন-মূলক কর্ম্মে দৃঢ়ব্রত। গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি জীবনের যাত্রাপথে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, লোক-সেবার যে সুযোগ পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবনে ব্যর্থ হয় নাই।

গান্ধী-পন্থায় তিনি বিশ্বাসী এবং পল্লীবাসীর বর্ত্তমান নিশ্চেষ্টতা দূর করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া তাদের কাছে একজন "কেষ্ট-বিষ্টু" বলিয়া প্রতীয়মান হইবার কল্পনাকে দূরে রাখিয়াছেন; তাদের "একজন" হইতে চাহিতেছেন—এই সাধনার কথা পুস্তকে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমানে তিনি বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই পুস্তকে তার বিবরণ আছে। কর্ম্ম-মাহাত্ম্যে ও বর্ণনা কৌশলে তাহা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

বিশ্ব-রহস্যে নিউটন ও আইনষ্টাইন—অধ্যাপক মোহম্মদ আবদুল জব্বার, এম, এস্‌সি। দি মালিক লাইব্রেরী, ১৩, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা। পৃঃ ১৫০; মূল্য—২৷০ টাকা।

আজকাল সাধারণ শিক্ষিতের মধ্যেও এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁরা নিউটন ও আইনষ্টাইনের নাম শোনেন নি। তবে অনেকেই কেবল এটুকু জানেন যে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আর আইনষ্টাইন আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তাঁদের আবিষ্কারের প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে অনেকেই বিশেষ কোন খবর রাখেন না। আলোচ্য বইখানিতে লেখক উচ্চ গণিতের দুরূহ তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের খুঁটিনাটি এবং জটিলতা বাদ দিয়ে নিউটন ও আইনষ্টাইনের আবিষ্কৃত তত্ত্বের মূল রহস্য সাধারণের বোধগম্য করবার চেষ্টা করেছেন। লেখকের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

সম্পূর্ণ প্রাদেশিকতাবর্জ্জিত না হলেও লেখকের ভাষা সরল এবং স্বচ্ছন্দগতি। কিন্তু ভাষা সরল হলেও বইখানির প্রথমাংশের (নিউটন আবিষ্কৃত তত্ত্ব) মত দ্বিতীয়াংশের (অর্থাৎ আপেক্ষিকতাবাদের) আলোচনা সাধারণ পাঠকের পক্ষে আপেক্ষিকতাবাদের মূল রহস্য অনুধাবন করতে কতটা সহায়ক হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। লেখক Tensor Calculas, Space-time, Non-Euclidean Geometry (লোবাচেবস্কীয়, রীমানীয় জ্যামিতি), Tractrix প্রভৃতির উল্লেখ এবং কিছু কিছু আলোচনা করেছেন; কিন্তু সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে এসব বিষয়ে ব্যাখ্যাসহ বিশদ আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

Atomic Theory প্রসঙ্গে লেখক কয়েকস্থলে অণু কথাটি ব্যবহার করেছেন। বাংলা ভাষায় Molecule অর্থে অণু এবং Atom অর্থে পরমাণু এই কথা দুটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লেখক কিন্তু এটম অর্থেই অণু কথাটি ব্যবহার করেছেন। বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনায় এরূপ ভুল মারাত্মক। এ ছাড়া বইখানিতে বানান ভুলও যথেষ্ট রয়ে গেছে। আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয়—লেখক যেন অতি সতর্কতার সঙ্গে 'জল' কথাটার পরিবর্ত্তে 'পানি' কথাটা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে হামেশা ব্যবহৃত আসমান, জমিন, ইমারৎ প্রভৃতি শব্দগুলোকে বর্জন করে' 'আকাশচুম্বী অট্টালিকা', 'পৃথিবীর মাটি'র প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন কেন—বোঝা গেল না।

স্বাধীন ভারত যেন মনে রাখে যে তার নবজন্ম বাংলায়, আর্য্যাবর্ত্তে নয়।

বাঙালী

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

বাংলার মৃত্যু ঘটাবে সারা ভারতের অপমৃত্যু। সর্বনাশের প্রহরেই বাঙালীকে হতে হবে আগামী বিপ্লব ও সভ্যতার অগ্রদূত।

বাঙালীর সমাজ ও রাজনীতি, সংস্কৃতি-ধর্ম্ম-সাহিত্য-কলা, অর্থনীতি ও সমস্যা, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সারা ভারতের পটভূমিতে লেখা হয়েছে এই বইটিতে। মূল্য : ২৷০

প্রকাশনী : সিটি কলেজ : বাণিজ্যবিভাগ :: ১৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্যাধির পরাজয়—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ৫১; মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য বইখানিতে লেখক বিভিন্ন রকমের রোগোৎপাদক জীবাণুর আবিষ্কার এবং ঐ সব জীবাণুঘটিত ব্যাধির প্রতীকারের উপায় নির্ধারণে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সুদীর্ঘ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। সংক্ষিপ্ত হলেও এতে বিষয়বস্তুর দৈন্য নেই। বিষয়বস্তু অবিকৃত রেখে সহজবোধ্য ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয় লিখতে চারুবাবু সিদ্ধহস্ত। এই বইখানিতেও তাঁর এ বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে লেখা হলেও সাধারণ পাঠক বইখানা পড়ে গল্প-উপন্যাস পড়ার মতই আনন্দ উপভোগ করবেন। এ ধরণের বইয়ের সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-প্রচারের উদ্দেশ্য সার্থক হবে বলেই মনে হয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মহাপ্রভু (নাটক)—শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত। জাহ্নবী সাহিত্য মন্দির। ১০।৩, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

অধুনা বাংলা-সাহিত্যে জীবনীমূলক নাটক রচনার দিক ঝোঁক দেখা যাইতেছে। সেই ধারা অনুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন পণ্ডিত মহাপ্রভুর অলৌকিক জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক ভক্তিমূলক নাটকের মত ইহাতেও ভক্তিরসের প্রাবল্যে নাট্য-রস আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহার রচনা নাটক হিসাবে সার্থক হইয়াছে—একথা বলা চলে না।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

১৪ই ডিসেম্বর: রচনা দমীত্রী মেরেজ্‌কোবস্কী। অনুবাদক—চিত্তরঞ্জন রায় ও অশোক ঘোষ। রীডার্স কর্ণার (গ্রন্থবিহার), ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। দাম ৩।০

"রীডার্স কর্ণার" অনুবাদ-সাহিত্যের ভিতর দিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আলোচ্য উপন্যাসখানির মূল সুর হইল বৈপ্লবিক রহস্যবাদ। একদিকে রিয়েলিয়েবের নিরালম্ব নাস্তিক্য আর একদিকে পেস্তেলের দার্শনিক অজ্ঞেয়বাদ, এই দুইটি ভাবধারা এই কাহিনীর মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে।

পুস্তক নির্ব্বাচন এবং স্বচ্ছন্দ অনুবাদ সত্যই প্রশংসার যোগ্য, পরিচ্ছন্ন প্রচ্ছদপটটিও চিত্তাকর্ষক।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ইনি আর উনি—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। দিগন্ত পাবলিশার্স লিঃ, পি-৬ মিশন রো এক্সটেনসান, কলিকাতা। মূল্য ৩৲।

এই পুস্তকে লেখকের রচিত শৈল চক্রবর্ত্তী বিচিত্রিত পাঁচটি ব্যঙ্গচিত্র রচনা স্থান পাইয়াছে। মফঃস্বলে যাযাবর আপিসজীবনের সাময়িক আস্তানায় সরকারী কর্ম্মচারীগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঘরে ও বাইরে পরস্পরের পদমর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি লইয়া কৌতুকজনক আলোচনা ও বিতর্ক, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট নিম্নতন কর্ম্মচারীদের চাটুবৃত্তি ও অপরপক্ষে পদস্থগণের নিম্নতন কর্ম্মচারীদের প্রতি সানুগ্রহ আচরণ, প্রধানতঃ এই সকল বিষয় লইয়া গল্পগুলিতে কৌতুক ও ব্যঙ্গরসের সৃষ্টি করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের সুতীক্ষ্ণ ও শাণিত বাক্যরচনা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের নির্ম্মম কশাঘাত বইটিকে উপভোগ্য করিয়াছে। ছোট গল্পরচনায় অচিন্ত্যবাবু ওস্তাদ ও কুশলী শিল্পী।

কাজল—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। পূরবী পাবলিশার্স লিঃ। ৩১।১, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯। ৩০৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪।০।

'শতাব্দী', 'কুরপালা', 'কয়েকটি গল্প' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া লেখক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের গুণে ইতিপূর্ব্বেই পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি গল্পের বর্ণনার নিছক বস্তুতান্ত্রিক, নির্ভীক দুঃসাহসিকতা, চরিত্রসৃষ্টিতে অন্তর্দৃষ্টি বিশ্লেষণ ও পর্য্যবেক্ষণ, গভীর ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি কয়েকটি গুণে সভ্য সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয় বিষয়বস্তুর অবতারণা ও আলোচনা করিয়াও সাহিত্যিকের মর্য্যাদা হইতে না ময়া যান নাই। ইহাই এই গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট্য। সুদীর্ঘ উপন্যাসখানি একটি পতিতার জীবনকাহিনী, প্রসঙ্গতঃ সমগ্র গণিকাসমাজ ও একটি পল্লীবিশেষের কাহিনী। পল্লীর শ্যামল স্নেহশীতল বক্ষের মায়া কাটাইয়া একটি বালবিধবা কেমন করিয়া ধাপে ধাপে গণিকাসমাজের সর্ব্বোচ্চ শীর্ষে ও অধঃপতনের সর্ব্বনিম্নস্তরে উপনীত হইল, ঊর্ণনাভের জালে পড়িয়া মক্ষিকার মত আর তাহার বাহির হইয়া আসিবার কোনই উপায় রহিল না, গৃহস্থ, সমাজ ও সভ্যতার অন্যায় অনুশাসন ও পুরুষের শত প্রকার প্রলোভনের ফলে এইরূপ কত অনাথা অবমানিতা সমাজ-পরিত্যক্তা নারী গণিকাসমাজের সংখ্যাবৃদ্ধি করে, এই সমস্ত বিষয় আলোকচিত্রের মত নিপুণভাবে শিল্পী এই গ্রন্থে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পতিতাগণের অষ্টপ্রহরের জীবনযাত্রার ধারা ও গণিকাসমাজের বাস্তব জীবনের বর্ণনা পড়িয়া কেহ কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, কিন্তু মরমী পাঠকের চিত্তকে সমাজের একদিককার মর্ম্মস্পর্শী চিত্র ব্যথিত ও মথিত করিয়া তুলিবে। এই পুস্তকে এক দিকে যেমন আমরা বাড়ীওয়ালী, দালাল ও পাপ-ব্যবসায়ে লিপ্ত নরনারীর দেখা পাই অন্যদিকে তেমনি হতভাগিনীদের মধ্যে গৃহস্থঘরের বধূদের মত সখীত্ব, সহানুভূতি, পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝিতে পারি, ইহারাও তাহাদের ঘৃণিত জীবনের মধ্যে একেবারে পশুত্বের স্তরে নামিয়া যায় নাই, মাত্র ব্যবসায়ের খাতিরে পশুত্বের অভিনয় করিয়া যায়। বইখানিতে সুধীগণ চিন্তার যথেষ্ট খোরাক পাইবেন।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

পথ যে বহুদূর—শ্রীপরেশ সাহা। জাতীয় গ্রন্থ-ঘর। ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা আট আনা।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস একদা অখণ্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিল। ১৯৪৭-এর আগষ্ট মাসের পর দেশ স্বাধীনতা লাভ করিল বটে, কিন্তু সে আংশিক স্বাধীনতা মাত্র—আর সে স্বাধীনতাও আসিল অখণ্ড ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া। এই তথাকথিত স্বাধীনতালাভের পর দেশে চোরাকারবারের বাহুল্য, আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা, ইত্যাদি যে সকল জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে সেগুলি এই ক্ষুদ্র নাটিকাখানিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই স্বাধীনতার প্রসাদে পুষ্ট হইতেছে ধনী আর পুঁজিপতি সম্প্রদায়, কিন্তু দেশের অগণিত মূঢ় মূক জনগণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়াছে, কিন্তু যতদিন না অর্থনৈতিক শোষণের সমাপ্তি হইতেছে ততদিন জাতির পূর্ণতালাভের পথ বহুদূরে—ইহাই হইল নাটিকাখানির প্রতিপাদ্য। সুগভীর দেশপ্রীতি এবং দেশের নিপীড়িত জনগণের প্রতি দরদ নাটিকাখানিতে প্রাণসঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছে ; তবে সংলাপে ভাবপ্রবণতা এবং উচ্ছ্বাসের একটু বাড়াবাড়ি হওয়ায় স্থানে স্থানে অতিনাটকীয়তার আমদানী হইয়াছে। পাত্রপাত্রীদের মুখে রাজনৈতিক মতবাদ এবং পরিস্থিতির বিশ্লেষণাত্মক দীর্ঘ বক্তৃতাও নাট্যরসকে ক্ষুন্ন করিয়াছে। কিন্তু এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও লেখকের শক্তি আছে একথা স্বীকার করিতেছি। নাটিকখানি শুধু যে মনে ভাবাবেগের সঞ্চার করে তাহা নয়, দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা সম্বন্ধে ভাবনারও উদ্রেক করে।

ভারতের অমর প্রতিভা—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী। প্রাপ্তি-স্থান—ক্যালকাটা বুক হাউস। কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

অথচ ভারতীয় সঙ্গীতে একমাত্র ধ্রুপদ ছাড়া খেয়াল টপ্পা ঠুংরী সকল শ্রেণীর সঙ্গীতেই তবলা অপরিহার্য্য। বাংলা ভাষায় সঙ্গীত ও স্বরলিপি বিষয়ক পুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু তবলা বাজনা শিখিবার নির্ভরযোগ্য পুস্তক অতি বিরল। এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক হইতেছে ঢাকার প্রসিদ্ধ তবলাবাদক প্রসন্নকুমার বণিক্য মহাশয়ের তবলা-তরঙ্গিণী। কিন্তু তাহাতে তালঘটিত এত খুঁটিনাটি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, বইখানি প্রাথমিক তবলাবাদ্য-শিক্ষার্থীর ঠিক উপযোগী নহে। বর্ত্তমান পুস্তকের লেখক ওস্তাদ মসিদ খাঁর ছাত্র—তাল সম্বন্ধে উপপত্তিকসিদ্ধ এবং ক্রিয়াসিদ্ধ দুই-ই। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্যই এই বইখানি লিখিয়াছেন। এই বইয়ে তেতালা, একতালা, সুর-ফাঁক প্রভৃতি ২২টি তালের বোল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তালগুলির বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার জন্য মাঝে মাঝে লেখক যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন সেগুলি প্রণিধানযোগ্য। তবলায় হস্ত-সাধনে নৈপুণ্য অর্জ্জন আয়াস-সাধ্য। রবীন্দ্রবাবুর বইখানি শিক্ষার্থীদের বিশেষ কাজে আসিবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

সহজ যৌগিক ব্যায়াম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী। "উমাচল শাস্ত্র প্রকাশনী", ৫৮।১।১২ কে, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১ম খণ্ড ২৲ এবং ২য় খণ্ড ২।০ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বিবিধ যৌগিক আসন, মুদ্রা, মানুষের আকৃতি ও স্বভাবের উপর গ্রন্থিক্রিয়ার প্রভাব, পথ্যাপথ্য প্রভৃতি বিষয়ে এবং ২য় খণ্ডে প্রাণায়াম, ষটকর্ম ও স্বরোদয় শাস্ত্র বিষয়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত বহু হিতকর মতের সহায়তায় বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। যোগ-বিদ্যার দ্বারা শুধু যে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয় তাহা নহে, দৈহিক উন্নতিসাধনও যথেষ্ট হইয়া থাকে। এই বিদ্যার বিলুপ্তি দীর্ঘ কাল ঘটিয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং যোগীপুরুষ—'আপনি আচরি ধর্ম্ম' জগতকে শিখাইবার জন্য বহু পরিশ্রমে নানা চিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া এই লুপ্ত বিদ্যা জন-সমাজের দৈহিক কল্যাণে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বইখানি শিক্ষিত নরনারীদের কাজে লাগিবে আশা করা যায়।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল—শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এইচ. চাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, ১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য ৩।০।

ইদানীং আমাদের দেশে ভূগোল শিক্ষার উন্নতি হইয়াছে। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। ভূগোল শিক্ষার যে বিভিন্ন দিক আছে এতদিন অনেকেরই হয়ত তাহা জানা ছিল না। আলোচ্য পুস্তকখানি এগারটি অধ্যায়ে পূর্ণ। প্রাকৃতিক পরিবেশ, কৃষি ও কৃষিজ দ্রব্য, প্রাণিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, অরণ্য সম্পদ, শিল্প প্রভৃতি অধ্যায়গুলিতে আমাদের বিভিন্ন সম্পদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। নিজ সম্পদ সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। বিভিন্ন সম্পদ মানচিত্র সহযোগে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানির বহুল প্রচার হইবে নিশ্চয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

[illegible]স, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।